সাপ্তাহিক বসুমতী

uk- H05257-20-27182

ঘোষ-মন্ত্রিসভার পতন আসন্ন ?

বিক্ষুব্ধ কংগ্রেসীদের নতুন দল গঠনঃ বিকল্প সরকার গঠনের তোড়জোড়

20

২ বর্ষ ঃ ৩৫শ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ২রা ফাল্গুন, ১৩৭৪ বঙ্গাব্দ] OLDEST WEEKLY OF NORTH INDIA [72nd year, No. 35, 15th Feb.

271182

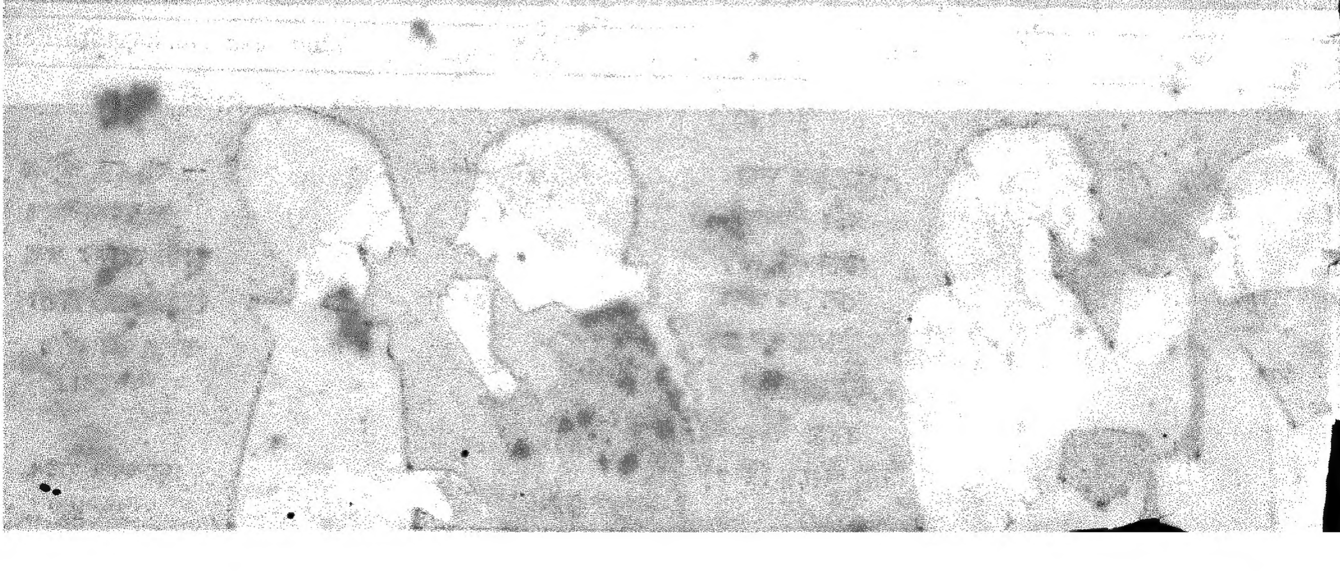

সূচীপত্র

756.9 003/3

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয়	...	২১৭৯
আজকের মানুষ	...	২১৮০
বঙ্গদর্শন	...	২১৮১
অবক্তব্য	— চন্দ্রগুপ্ত	২১৮৩
ভারতদর্শন	...	২১৮৬
আন্তর্জাতিক	...	২১৯০
যা দেখেছি, যা পেয়েছি (স্মৃতিচয়ন)	— সুধীরঞ্জন দাস	২১৯২
অগ্নিযুগের একটি অধ্যায়	— অনন্ত সিংহ	২১৯৭
দুটি কবিতা (কবিতা)	— উইলিয়াম গোল্ডেন	২২০২
সপ্তাহের বোঝা	— কৃত্তিবাস ওঝা	২২০৩

20

সাহিত্য-সম্রাট—বন্দেমাতরম্ মন্ত্রের ঋষি

বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থাবলী

—উপন্যাস—

প্রথম খণ্ড :—রাজসিংহ, বিষবৃক্ষ, যুগলাঙ্গুরীয়, মৃণালিনী, রজনী। [সচিত্র] মূল্য—তিন টাকা

দ্বিতীয় খণ্ড :—দুর্গেশনন্দিনী, কৃষ্ণকান্তের উইল, ইন্দিরা, রাধারাণী, সীতারাম। মূল্য—তিন টাকা

তৃতীয় খণ্ড :—আনন্দমঠ, চন্দ্রশেখর, কপালকুণ্ডলা, দেবী চৌধুরাণী। [সচিত্র] মূল্য—৩, টাকা।

—সাহিত্য—

প্রথম খণ্ড :—কৃষ্ণচরিত্র, লোকরহস্য, বিবিধ প্রবন্ধ (১ম)। মূল্য—তিন টাকা

দ্বিতীয় খণ্ড :—(১ম ভাগ অনুশীলন), মুচিরাম গুড়, বিবিধ প্রবন্ধ (২য়), বিজ্ঞান রহস্য। মূল্য—তিন টাকা

সুদৃশ্য কাপড় ও বোর্ডে বাঁধা (রাজ সংস্করণ)
মূল্য প্রতিখণ্ড ৪·৫০ টাকা মাত্র

মাইকেল মধুসূদন দত্তের

মাইকেল গ্রন্থাবলী

প্রথম ভাগ :—মেঘনাদবধ কাব্য, বীরাঙ্গনা কাব্য, পদ্মাবতী নাটক, বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ, একেই কি বলে সভ্যতা? (বোর্ড বাঁধাই)—সাড়ে চার টাকা।

দ্বিতীয় ভাগ :—কৃষ্ণকুমারী নাটক, শর্মিষ্ঠা নাটক, তিলোত্তমা-সম্ভব কাব্য, ব্রজাঙ্গনা কাব্য, চতুর্দশপদী কবিতাবলী, বিবিধ কাব্য, মায়া কানন, হেক্টর বধ। (বোর্ড বাঁধাই) চার টাকা

কবি বিহারীলাল চক্রবর্তীর

গ্রন্থাবলী

রবীন্দ্রনাথ বলেন—"আধুনিক বঙ্গসাহিত্যে প্রেমের সঙ্গীত এরূপ সহস্রধারে উৎসের মত কোথাও প্রোৎসারিত হয় নাই। এমন সুন্দর ভাবের আবেগ, কথার সহিত এমন সুরের মিশ্রণ আর কোথাও পাওয়া যায় না।"

বাঙ্গালার নব গীতিকবিতার প্রবর্তক, রবীন্দ্রনাথ, অক্ষয় বড়াল, রাজকৃষ্ণ রায় প্রভৃতির কাব্যগুরু, ঋষি কবি বিহারীলাল চক্রবর্তীর রচনার সমাবেশ।

কবির জীবনী, সুবিস্তৃত সমালোচনা সহ সুবৃহৎ গ্রন্থ
মূল্য তিন টাকা

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড, ১৬৬ বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলিকাতা—১২

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
আকাশবাণী-পরিক্রমা ...	— মেঘদূত	২২০৫
রবীন্দ্রনাথ ও সুভাষচন্দ্র (ধারাবাহিক প্রবন্ধ)	— শঙ্করীপ্রসাদ বসু	২২০৭
ঝড় (ধারাবাহিক উপন্যাস) ...	— জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী	২২১০
রাজনীতি ও ছাত্রসমাজ (ধারাবাহিক প্রবন্ধ)	— প্রদ্যোৎকুমার রায়	২২১৭
নব ভুশুণ্ডীর মাঠে (গল্প)	— রজত রায়চৌধুরী	২২২৪
রূপমঞ্চ—ওদেশে এবং এদেশে ...	— শিলালি	২২২৯
রঙ্গজগৎ ...		২২৩১
খেলাধুলা ...	— শান্তিপ্রিয়	১২৩৬

কবিকঙ্কণ চণ্ডী

মুকুন্দরাম চক্রবর্তী

(কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর বিভাগের পাঠ্যপুস্তক)

মধ্যযুগের বঙ্গসাহিত্যে কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তীই সর্বশ্রেষ্ঠ কবি। তাঁহার চণ্ডীর কাহিনী বাঙ্গালার বিশিষ্ট জাতীয় জীবনের কাহিনী। তাঁহার কাব্যে পাই মধ্যযুগের বাঙ্গালার সমাজের সুস্পষ্ট আলেখ্য। শাসক সম্প্রদায়ের দ্বারা নির্যাতিত বাস্তুচ্যুত মুকুন্দরাম দুঃখ ও বেদনাক্লিষ্ট বাঙ্গালার প্রতিনিধি কবি—ব্যক্তির দুঃখ কি করিয়া সর্বজনের দুঃখ হইতে পারে বাঙ্গালা সাহিত্যে তাহা মুকুন্দরামই সর্বপ্রথম দেখাইয়াছেন। এই হিসাবে তিনি আধুনিক বাঙ্গালার রোমান্টিক সাহিত্যসাধনার অগ্রদূত।

—বর্তমান গ্রন্থে আছে—

১। মূল কাব্য, ২। সুবিস্তৃত ভূমিকা, ৩। কবির জীবনী, ৪। কাব্য-পরিচিতি, ৫। কবিকঙ্কণ যুগের বঙ্গভাষা (ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র লিখিত), ৬। অধ্যাপক শ্রীবিজিতকুমার দত্তের সুলিখিত ভূমিকা, ৭। বিস্তৃত কাব্য সমালোচনা এবং ৮। অপ্রচলিত শব্দের অর্থ।

মূল্য সাড়ে চার টাকা

ভক্তসাধক, কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেনের

ভক্তিমাধুরী-রঞ্জিত

রামপ্রসাদ গ্রন্থাবলী

শ্রীশ্রীকালী-কীর্তন, বিদ্যাসুন্দর, পদাবলী, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, সীতা-বিলাপ, আগমনী, বিজয়া, অপূর্ব প্রকাশিত কবিতাবলী, কবির জীবনী।

একত্রে মূল্য তিন টাকা

উজ্জয়িনীর সেই বিশ্ব-চিত্তজয়ী বিশ্ববিমোহন মহাকবি—
সারস্বতকুঞ্জের পুণ্যজ্যোৎস্না—সাহিত্য জগজ্জ্যোতি—
প্রতিভা ও মনীষার অবতার—সরস্বতীর বরপুত্র—
সৌন্দর্যের মহাকবি—

কালিদাসের গ্রন্থাবলী

সর্বাঙ্গসুন্দর রাজাধিরাজ সংস্করণ

অনুবাদক—বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সাহিত্য রস-সুরসিক

পণ্ডিত রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ

প্রথম ভাগে ঃ—রঘুবংশ, মালবিকাগ্নিমিত্র, ঋতুসংহার, পুষ্পবাণবিলাস, শৃঙ্গার-তিলক, শৃঙ্গার-রসাষ্টক। ৮·০০

তৃতীয় ভাগে ঃ—শকুন্তলা, বিক্রমোর্বশী, শ্রুতবোধ, দ্বাত্রিংশৎ-পুত্তলিকা, কালিদাস-প্রশস্তি। ৮·০০

প্রাচীন-সাহিত্যের-গৌরব-মুকুট—
সাহিত্যের চির-সমাদৃত কোকিল—
রায়গুণাকর

ভারতচন্দ্রের গ্রন্থাবলী

অন্নদামঙ্গল, বিদ্যাসুন্দর, মানসিংহ, চোরপঞ্চাশৎ, রসমঞ্জরী, সত্যপীর, ধেড়েভেড়ের কৌতুক, ফর্দরফৎ, হিন্দী কবিতালহরী, বলিরাজা, চণ্ডী, নাগাষ্টক, 'সংস্কৃত, পার্শী', হিন্দী' নানা ভাষার কবিতাবলী, কবির জীবনী, ঋতু-বর্ণনা, রাধাকৃষ্ণের প্রেমালাপ, কবিতাবলী।

মূল্য তিন টাকা

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেডঃ ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলি-১২

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

বৃহস্পতিবার, ২রা ফাল্গুন, ১৩৭৪ বঙ্গাব্দ বাংলা ভাষায় দ্বিতীয় সর্বাধিক প্রচারিত সাপ্তাহিক পত্রিকা PRICE: 30 Paise
২ বর্ষ : ৩৫শ সংখ্যা—মূল্য : ৩০ পয়সা Thrusday, 15th February, 1968

কংগ্রেস-পি ডি এফ-মন্ত্রিসভার পতন ?

একান্ত অলৌকিক কিছু না ঘটলে পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেস-পি ডি এফ মন্ত্রিসভার পতন অবধারিত বলা যায়। এতোদিন সোচ্চারে ঘোষণা করা হয়েছিল, পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেস দল অভগ্ন ও অটুট। কিন্তু এখন এই দলের অবস্থা এমনই ছিন্নভিন্ন যে, যে আভ্যন্তরীণ গলদ দীর্ঘদিন ধূমায়িত ছিল বর্তমানে তার বিস্ফোরণ ঘটেছে। সুতরাং কংগ্রেস দলের সঙ্গে পি ডি এফ কোয়ালিশন সরকার গঠন করলেও তা পতনোন্মুখ।

এতদসত্ত্বেও বিধানসভার অধিবেশন ১৪ই ফেব্রুয়ারী বসবে—এটাই ঠিক আছে। গণতন্ত্রের মূল উদ্দেশ্য রক্ষার জন্য বিধানসভাই প্রধান স্থান, একথা বলা নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভাকে গদিচ্যুত করার সময় সে কথা ভাবা হয় নি, এটাও চরম দুর্ভাগ্যের ব্যাপার। ১৪ই ফেব্রুয়ারীর অধিবেশনও হয়তো প্রহসনে পরিণত হবে, কেন না সেই অধিবেশনে বিরোধী সদস্যদের একাংশ উপস্থিত থাকতে পারছেন না। উপস্থিতি থেকে বঞ্চিত হবার কারণ এই যে, সরকারী নির্দেশে তাঁরা বিনা বিচারে কারান্তরালে। জনপ্রতিনিধিদের এইভাবে বিধানসভার অধিবেশন থেকে বঞ্চিত রাখার একমাত্র অর্থ—গণতন্ত্রের মুণ্ডচ্ছেদ। কারাগারে অবরুদ্ধ জনপ্রতিনিধিরা বিধানসভায় তাঁদের বক্তব্য পেশ করতে পারবেন না। তাছাড়া থাকতে পারে, বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে সরকারের আস্থা-অনাস্থারও প্রশ্ন। বর্তমান অধিবেশনেই বাজেট পেশ করার কথা; এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ অধিবেশনের পূর্বাহ্নে জনপ্রতিনিধিদের বিনা বিচারে জেলে আটক করে রাখা শুধু সরকারের অগণতান্ত্রিক মনোভাবেরই পরিচয় দেয় না, একথাও প্রমাণ করে যে, কোয়ালিশন সরকার দলীয় সংকটে ভাঙনের ভয়ে ভীত হয়ে অন্যায়ভাবে বিরোধীদের ভোটদানের অধিকার থেকে বঞ্চিত করছে। জানি না, এইভাবে কোনো সরকার হাল ধরে তুফান পার হতে পারে কি না। তবে রাজ্যপাল প্রতিষ্ঠিত সরকার কখনো জনপ্রিয় সরকার হতে পারে না। তাই সেই সরকারের পক্ষে জনপ্রতিনিধিদের মৌলিক অধিকার অন্যায়ভাবে ক্ষুণ্ণ করাই সম্ভব।

হয়তো রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিচার করে অনেকেই এখন অধিবেশনের কথা বিশেষভাবে ভাবছেন না। তাঁদের অভিমতে, বর্তমান মন্ত্রিসভা ধোপে টিকতে পারে না। শ্রীশঙ্করদাস ব্যানার্জী ও শ্রীআশু ঘোষের নেতৃত্বে ১৯ জন বিক্ষুব্ধ কংগ্রেসী এম-এল-এ কোয়ালিশন মন্ত্রিসভার প্রতি তাঁদের সমর্থন প্রত্যাহার করে নিয়েছেন এবং নতুন দল গঠন করেছেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে উচিত ছিল—মুখ্যমন্ত্রী কর্তৃক পদত্যাগপত্র পেশ করে রাজ্যপালকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে দেওয়া। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী নাকি বিধানসভার সম্মুখীন হতে চান। আমরা আগেই বলেছি বিরোধী সদস্যদের কারাগারে বন্দী রেখে বিধানসভায় গণতন্ত্রের প্রহসন করা অনুচিত, যদিও বিধানসভায় সম্মুখীন হবার ইচ্ছা বাস্তবানুগ।

বিধানসভা যদি বসেও, রাজনৈতিক পরিস্থিতির কি কিছু উন্নতি হবে? আমাদের মতে, তা সম্ভব নয়। ক্ষমতালোলুপতার জন্যে কংগ্রেস দলে ভাঙন, শক্তিমত্ততার জন্যে পি ডি এফ-এর মধ্যে মতান্তর—কখনো এই সরকারকে বাঁচিয়ে রাখতে পারে না। আর যে-ভাবে এতোদিন বেঁচে আছে তাতে সর্বনাশ হচ্ছে সারা পশ্চিমবঙ্গের মানুষের। হাজার হাজার লোক এখনো পর্যন্ত কারাগারে বন্দী. আইন-শৃংখলা পশ্চিমবঙ্গে কতোটা রক্ষিত হয়েছে—সংবাদপত্র পাঠকেরা তার খবর প্রত্যহ কাগজের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় পাচ্ছে। ধান-চালের মরশুমেই দুর্ভিক্ষের অদূরাগত পদধ্বনি, দ্রব্যমূল্য কি হারে বৃদ্ধি পেয়েছে আকাশবাণী মারফৎ বাজার দর শুনলেই তার প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে, শিক্ষাক্ষেত্রে সরকার প্রকাশিত পুস্তক ফুটপাথে তিন-চারগুণ বেশি দামে বিক্রি হচ্ছে বলেও অভিযোগ আসছে, তার তবু এই সরকার চোখ-কান বুজে একমাত্র নিজেদের কোয়ালিশন সংসার বাঁচাবার আপ্রাণ চেষ্টায় ব্যস্ত।

আমরা মনে করি, আর সংকট বাড়িয়ে লাভ নেই। আপাতত যা আশু প্রয়োজন—তা হচ্ছে জনমনে স্থায়িত্ববোধ সৃষ্টি করা এবং এ ব্যাপারে রাষ্ট্রপতির হস্তক্ষেপই বর্তমান সমস্যার চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হতে পারে।

বলাই বাহুল্য, গণতন্ত্রের কথা যতোই বলা হোক, জনগণ ধরে নিয়েছে গণতন্ত্র ফাঁকা বুলি ছাড়া আর কিছু নয়। বর্তমান মন্ত্রিসভাকে গদিনশিন করা থেকে আজ পর্যন্ত যা ঘটেছে বা ঘটছে, তাতে গণতন্ত্রের কোনো নমুনা নেই। এরকম ধারণার অবসান হতে পারে যদি রাষ্ট্রপতি শাসনভার গ্রহণ করে যথাসম্ভব শীঘ্র পুনর্নির্বাচনের নির্দেশ দিয়ে জনগণের অধিকারকে প্রতিষ্ঠিত করতে সাহায্য করেন। এতে আরো একটি কাজ হবে—তা হচ্ছে এই যে—শৃংখলা ফিরে আসবে, যথার্থ আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত হবে।

সম্পাদকীয়

আজকের মানুষ

লেখা পড়ে আমরা লেখককে চিনে নিতে পারি, গলা শুনলে বুঝতে পারি গায়ক বা বক্তাটি কে। এমন কি, সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শুনলেও আগন্তুক কে অনুমান করা শক্ত নয়। কিন্তু আঘাতের প্রচণ্ডতা দেখে কি আঘাতকারীকে ধরা যায়? খুব যায়। এ মাসের সুরু থেকেই দক্ষিণ ভিয়েতনামের প্রাদেশিক রাজধানীগুলোর ওপর যে সাংঘাতিক আক্রমণ আরম্ভ হয়েছে, তার প্রচণ্ডতা দেখে আজ আর কারো বুঝতে বাকি নেই যে এ-আঘাতের পেছনে মস্তিষ্কটি গিয়াপেরই। জেনারেল ভো ঙুয়েন গিয়াপ উত্তর ভিয়েতনামের সেনাধ্যক্ষ, ঐতিহাসিক দিয়েন বিয়েন ফু'র প্রধান নায়ক, জনপ্রিয়তার দিক থেকে উত্তর ভিয়েতনামীদের কাছে যাঁর স্থান রাষ্ট্রনায়ক হো চি মিনের পরেই।

সায়গনের মার্কিন দূতাবাস দখলের ঘটনা থেকে দক্ষিণ ভিয়েতনামের প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ মার্কিন ঘাঁটি ও সরকারী সেনানিবাসের ওপর আঘাত ও আক্রমণ-রচনার কলাকৌশল দেখে সামরিক কর্তারা মালুম পেয়েছেন এ-দুঃসাহসিক ঝুঁকি জেনারেল গিয়াপ ছাড়া অন্য কারো সাধ্য হতো না নেবার। এ যে একেবারে মার্কামারা কায়দা, যে-কায়দা দেখিয়ে একদিন জার্মান ফিল্ড মার্শাল রোমেল বৃটিশ জেনারেলদের চোখে ধুতরো ফুল লাগিয়ে দিয়েছিলেন। জেনারেল গিয়াপও ১৪ বছর আগে ফরাসীদের একবার দেখিয়েছেন, এবার মার্কিন সেনাধ্যক্ষদের পালা।

অথচ অতুলনীয় রণকৌশলের অধিকারী হলেও গিয়াপ কোন মিলিটারী একাডেমিতে সামরিক শিক্ষালাভ করেন নি। আমেরিকান সেনাধ্যক্ষরা তাঁকে রোমেলের সঙ্গে তুলনা করলেও সেই জার্মান সেনানায়কের মত আধুনিক উঁচুদরের তালিমও তিনি পান নি। গিয়াপ বলেন, 'বনজঙ্গলই আমার সামরিক বিদ্যালয়।' বাস্তবিক গভীর অরণ্যে তিনি গেরিলা যুদ্ধের কৌশলই রপ্ত করেছেন। সেদিক দিয়ে তিনি মাও সে-তুঙ এবং 'চে' গুয়েভারার রণকৌশলই অনুসরণ করে চলেছেন।

আমেরিকানরা গিয়াপের রণনীতির মধ্যে রোমেলের ছায়া দেখতে পারেন, কিন্তু রোমেল কখনই গিয়াপের স্বপ্নের নায়ক ছিলেন না, তাঁর আদর্শপুরুষ নেপোলিয়ান। বর্তমান উত্তর ভিয়েতনামের এক দরিদ্র কিন্তু শিক্ষিত পরিবারে গিয়াপের জন্ম। তাঁর বয়স যখন মাত্র ১৪, তখন থেকেই তাঁর বুকের ভেতর ধিকি ধিকি আগুন জ্বলতে সুরু করে—দেশপ্রেমের আগুন। ফরাসী উপনিবেশবাদীদের লৌহশৃংখল থেকে দেশমাতৃকা ভিয়েতনাম-ইন্দোচীনের মুক্তি ঘটাতে হবে। গুপ্ত সংগঠনে যোগ দিলেন বালক গিয়াপ। পরে কমিউনিস্ট পার্টিতে।

কিন্তু নেপোলিয়ানকে আদর্শপুরুষ মানলেন তিনি কী করে? করেছিলেন ইতিহাস পড়ে এবং পড়িয়ে। ফরাসী আমলের রাজধানী হুয়েতে এক কলেজে পড়াশুনো শেষ করে গিয়াপ হ্যানয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইন বিষয়ে ডিগ্রি নিলেন। তবে মক্কেলের জন্য ওকালতি

গিয়াপ

করলেন না, যদি করতে হয় তো করবেন দেশেরই জন্যে। সে ভূমিকাও পরে অবশ্য পালন করলেন। তার আগে নিলেন স্কুলমাস্টারী। হ্যানয়ের থাং লং স্কুলে ইতিহাসের মাস্টার। ফরাসী উপনিবেশ, নেপোলিয়ান তো বিশেষ জোর দিয়ে পড়ানো হবে। কিন্তু কর্তারা কি সেদিন জানতেন নেপোলিয়ান পড়াতে দিয়ে আরেকজন নেপোলিয়ান তাঁরা তৈরি করবেন? কিভাবে নেপোলিয়ান তাঁর আক্রমণের পরিকল্পনা রচনা করতেন, সে পরিকল্পনাই বা কি এবং তাঁর রণকৌশল কী ছিল, প্রতিটি সূক্ষ্ম বিষয় গিয়াপ মনপ্রাণ দিয়ে অনুধাবন করেছেন, ব্ল্যাকবোর্ডে ছক এঁকে ছাত্রদের তা বুঝিয়েছেন। ছাত্রদের নেপোলিয়ান পড়াতে পড়াতে গিয়াপ বোধ হয় নিজেকে নেপোলিয়ান মনে করতে সুরু করেছিলেন। আকারেও তেমনি [illegible] খাটো পাঁচ ফুট উচ্চতার মা[illegible] আক্রমণেও তেমনি নিখুঁত। ফরাসী[illegible] দিয়েনবিয়েনফুতে তাদের সৃষ্ট নেপোলিয়ানের সম্যক পরিচয় পেয়েছে।

কিন্তু এই ভিয়েতনামী নেপোলিয়ানটির যত লম্ফঝম্ফ সবই বোধ হয় একটা স্কুলের চার দেওয়ালের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকতো, যদি না ফরাসী সরকার সেদিন কমিউনিস্ট পার্টিকে বে-আইনী ঘোষণা করতেন। '৩৯ সনে গিয়াপ গেলেন পালিয়ে, চীনে; সেখানে দেখা মিললো গুরু হো চি মিনের। এখানে প্রবাসী ভিয়েতনামীদের সংগ্রামী সংগঠন ভিয়েত-মিন দলে যোগ দিলেন গিয়াপ। হো চি মিন তাঁর ওপর দায়িত্ব দিলেন গেরিলাদের সুসংগঠিত সেনাবাহিনী হিসেবে শিক্ষিত ও পাকাপোক্ত করে তোলার। কিন্তু গিয়াপের নিজের শিক্ষা সেদিন কী ছিল, ব্ল্যাকবোর্ডে যুদ্ধক্ষেত্রের ছবি আঁকা ছাড়া!

হো চি মিন সেদিন যে যোগ্য লোকের হাতেই সেনাবাহিনীর দায়িত্ব অর্পণ করেছিলেন তার প্রমাণ বার বার মিলেছে, উপর্যুপরি সাফল্যের প্রতীকচিহ্ন গিয়াপের ইউনিফর্মে আঁটা রয়েছে আজ। বহু যুদ্ধের নায়ক গিয়াপ আধুনিক ভিয়েতনামের রূপকথারও নায়ক। তাঁকে ঘিরে রচিত হয়েছে অজস্র বিশ্বাস্য-অবিশ্বাস্য, বাস্তব-কাল্পনিক কাহিনী, উপকাহিনী। গিয়াপ ক্রোধে আগ্নেয়গিরির মত উত্তপ্ত হয়ে উঠতে পারেন, আবার মুহূর্তের মধ্যে মমতায় তাঁকে তুষারের মত গলতেও দেখা যায়। তিনি বোঝেন কাজ, আগে দায়িত্ব পালন; পরে অন্য সব কিছু। তাঁর কাছে জীবনের আলাদা কোন মূল্য নেই, দায়িত্ব জীবনের চেয়েও বড়। গিয়াপ বলেন, 'প্রতি মিনিটেই তো পৃথিবীতে হাজার হাজার মানুষ মরছে, জন্মাচ্ছে, দেশের সম্মানের জন্যে মৃত্যুবরণ করা এমন আর বেশি কি।

কিশোর-তরুণের মাথা গিয়াপের নামে আপনিই নত হয়, যখন তারা শোনে যে গত ২৭ বছর ধরে যিনি একটা সেনাবাহিনীর উচ্চতম আসনে রয়েছেন তাঁর জীবনযাপন একেবারে সাদাসিধে ধরণের। গিয়াপ মদ স্পর্শ করেন না, ধূমপানও না। তাঁর পোষাক-আসাকও আটপৌরে ধরণের। আর পায়ে তাঁর সাড়ে ছ' আনা দামের টায়ারের রবারের চটি!

গিয়াপ গোড়া থেকেই উত্তর ভিয়েতনাম বাহিনীর সেনাবাহিনীর অধ্যক্ষ। দেশের উপ-প্রধানমন্ত্রী এবং প্রতিরক্ষামন্ত্রীও তিনি। কিন্তু জনপ্রিয়তার দিক থেকে তাঁর স্থান দ্বিতীয় হলেও কমিউনিস্ট পার্টি নেতৃত্বে তাঁর মাত্র ষষ্ঠ স্থান। গিয়াপ ভাবপ্রবণ মানুষ, তাঁর প্রথম স্ত্রী ফরাসী কারাগারে মারা যান। সেই ফরাসীদের তিনি পাততাড়ি গুটোতে বাধ্য করেছেন। এবার বিদায়ের পালা কার?

জনজীবনে বিপর্যয়

পশ্চিমবঙ্গে গত কয়েকমাসে জনজীবনে এক অভূতপূর্ব বিপর্যয় সৃষ্টি হয়েছে এবং যা সবচেয়ে দুঃখের বিষয় তা হচ্ছে এই যে, এই বিপর্যয় একান্তভাবেই মনুষ্যসৃষ্ট। পশ্চিমবঙ্গের জনসাধারণের অবস্থা গত বছরেই শোচনীয় হয়েছিল। পর পর কয়েকটি বছর অজন্মার বছর হওয়ায় দু'বেলা দূরের কথা একবেলায় একমুঠো ভাতও অনেকের কপালে জোটে নি। গত সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে চালের দাম চার টাকা কিলোয় উঠেছিল। তা সত্ত্বেও জনসাধারণের এইটুকু আশা ছিল যে, আগামী বছর পর্যাপ্ত ফলন হবে, এবং যদি সরকার ঠিকমত সংগ্রহ করতে পারেন তাহলে অন্তত একবেলায় একমুঠো ভাতও বরাতে জুটবে। বিগত যুক্তফ্রণ্ট সরকার এ বছরের জন্য খাদ্য সংগ্রহের একটি ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন। সে পরিকল্পনা সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছিল, এখানে তার পুনরাবৃত্তি অনাবশ্যক। তাঁরা দশ লক্ষ টন চাল সংগ্রহের পরিকল্পনা করেছিলেন, এবং বলতে গেলে এটাই তাঁদের কাছে জীবন-মরণের প্রশ্ন ছিল কেন না সরকার কতটা কর্মঠ সেটা এই সংগ্রহকার্যের সাফল্যের উপরই নির্ভরশীল ছিল। ১৯৬৭ সালের ২১শে নভেম্বর যুক্তফ্রণ্টের বদলে নতুন সরকারের আবির্ভাব ঘটল। এই নতুন সরকার গঠনের সার্থকতা কি ছিল সেটা অবশ্য জনসাধারণের অধিকাংশ এখনো বুঝে উঠতে পারেন নি। ধরে নেওয়া যাক বিগত যুক্তফ্রণ্ট সরকার দেশের প্রাথমিক সমস্যাগুলির সমাধান করতে পারেন নি। ধরে নেওয়া যাক তাঁদের খাদ্যনীতি অবাস্তব, তাঁরা বেকার সমস্যার সমাধান করতে পারেন নি, তাঁরা কলকারখানাসমূহকে "ঘেরাও" করে বন্ধ করে দিয়ে নতুন করে বহু লোককে বেকার করেছেন। ধরে নেওয়া যাক তাঁরা আইন ও শৃংখলাকে বজায় রাখতে পারেন নি। ধরে নেওয়া যাক তাঁরা আত্মকলহে দ্বিধাবিভক্ত ছিলেন। এবং এই সকল কারণেই ধরে নেওয়া যাক যুক্তফ্রণ্টের পতন ঘটিয়ে নতুন সরকার গঠনের প্রয়োজন ছিল। কিন্তু নতুন সরকার গঠনের পর এই সব সমস্যার কি একটিরও সমাধান হয়েছে? আজকে জনসাধারণের মধ্যে এই চিন্তাটাই সবচেয়ে বেশি প্রকট হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই বছরটা পর্যাপ্ত ফলনের বছর হওয়া সত্ত্বেও পৌষ-মাঘ মাসেও লোকের ঘরে অন্ন নেই। বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী যখন যুক্তফ্রণ্ট সরকারের খাদ্যমন্ত্রী ছিলেন তখন তিনি বার বার বলতেন যে, রেশনে বরাদ্দের পরিমাণ বাড়িয়ে দিলেই লোকে আর কালোবাজার থেকে চাল কিনবে না। পি, ডি, এফ মন্ত্রিসভা তৈরি হবার পর থেকেই শোনা গেল যে, রেশনে বরাদ্দ অনেকটা করে বাড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে।

দিল্লী দরবারে ব্যর্থ বিক্ষুব্ধ কংগ্রেসী এম এল এ-দের কয়েকজন

কিন্তু হা হতোস্মি! এখন জানা যাচ্ছে যে সরকারের পক্ষে তা সম্ভবপর নয়। যাদের পয়সা আছে তারা কালোবাজার থেকে কিনে খাও এবং যাদের পয়সা নেই তারা খাদ্যসমস্যার মত 'বড় বড় ব্যাপার নিয়ে' মাথা ঘামিও না। পৌষ-মাঘ মাসেই খোলাবাজারে চাল আড়াই টাকা কে জি, ভাদ্র-আশ্বিনে কি দর দাঁড়াবে তা এখন থেকেই অনুমেয়। সরকারী সংগ্রহনীতি একেবারেই ব্যর্থ। সব ধান-চাল জোতদার-মহাজনদের লক-আপে চলে গেছে আপাতত যার বাইরে আসার কোন সম্ভাবনা নেই। সবচেয়ে বড় কথা রেশনে চাল ও গমের পরিমাণ বাড়ানো না হলেও দামের বহর অনেক বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। চিনি দুষ্প্রাপ্য সামগ্রী, কেরোসিন বাজারে কোথাও নেই। এবং সরকার নির্বিকার উদাসীন। যুক্তফ্রণ্টের খাদ্যনীতি অনুসৃত হলে নাকি দেশের সর্বনাশ হত, কিন্তু নতুন খাদ্যনীতির যা বহর দেখছি এ যে সর্বনাশের উপর আরও এককাঠি ইতিমধ্যেই হয়ে গেছে। শ্রমশিল্পের ক্ষেত্রেও যদি ধরে নেওয়া যায় যে যুক্তফ্রণ্টের অনুসৃত নীতির ফলেই কারখানাগুলি বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, বর্তমান সরকারের আমলে সেগুলি নিশ্চয়ই খোলা উচিত ছিল। তা তো খোলেনই নি, অধিকন্তু অবস্থার যে আরও অবনতি হয়েছে তা স্বয়ং শ্রমমন্ত্রীর বক্তব্যেই প্রকাশ। আইন ও শৃংখলা বলতে আমরা যা বুঝি তা বর্তমান সরকারের আমলে ফিরে আসে নি। প্রতি মুহূর্তেই আইন-শৃংখলার হানি ঘটেছে, শুধু এক বেলঘরিয়াতেই নয় পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্রই। যে কোন দিনের সংবাদপত্র খুললেই তার পরিচয় পাওয়া যাবে। আজকের জনজীবনে যে শৃংখলাহানির ঘটনাগুলি ঘটছে তার জন্য দায়ী দেশজোড়া সামগ্রিক হতাশা, নেতৃত্বের ব্যর্থতা, তরুণ অনুপ্রাণিত হবে বা অনুকরণ করবে এমন ব্যক্তিত্ব ও চরিত্রের অভাব, বয়স্কদের রাজনীতির স্বরূপ তো তারা চোখের উপরেই দেখতে পাচ্ছে। পুরাতন নৈতিক মূল্যবোধসমূহ ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে, কিন্তু বর্তমান নেতৃত্ব কোন নতুন মূল্যবোধের সৃষ্টি করতে পারে নি। পুলিশ দিয়ে রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীকে জেলে পাঠিয়ে আইন ও শৃংখলা রক্ষা করা যাবে না। যুক্তফ্রণ্টের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয় যে, যুক্তফ্রণ্ট সরকার দলাদলিতে বহুধা বিভক্ত ছিল, মন্ত্রীদের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা ছিল না, প্রত্যেকেই দলীয় স্বার্থে কাজ করে গেছেন। কিন্তু বর্তমানের অবস্থাটা তার চেয়ে অনেক

শোচনীয়। সেখানে কোন দলের কোন মত ছিল, এখানে দেখছি এক দলেরই কোন মত, তাঁরা দলীয় স্বার্থে মারামারি করেছেন, এঁরা করছেন ব্যক্তিগত স্বার্থে। সরকার আছে কি নেই তাও বোধ হয় বোঝবার উপায় নেই। জনসাধারণ প্রতি মুহূর্তেই ভাবছেন এই বুঝি সরকার উল্টে গেল। প্রশাসন কর্তৃপক্ষ, সরকারী অফিসার প্রত্যেকেই কাজে দ্বিধাগ্রস্ত। সরকার কখন আছে কখন নেই এই চিন্তা যদি রাইটার্স বিল্ডিংসকে আচ্ছন্ন করে রাখে তাহলে কাজকর্ম কিভাবে হবে? বস্তুত সর্বদিক থেকেই পশ্চিমবঙ্গের নাভিশ্বাস উঠেছে, এবং এই পরিবেশে জনসাধারণের স্বাভাবিক গতি একেবারেই বিপর্যস্ত। জানি না এরকম ইচ্ছাকৃত ভাবে সংকট ও সমস্যার সৃষ্টি করে রাজনীতির ধুরন্ধরেরা কতখানি লাভবান হবেন।

রাজনৈতিক সংকট

পশ্চিমবঙ্গের সংবাদপত্রগুলিতে রাজনীতির খবর ছাড়া এখন আর কোন খবর নেই। আরও কিছু সংবাদ আছে যেগুলি হচ্ছে আইন ও শৃঙ্খলার অবনতির সংবাদ, কিন্তু এটা আপেক্ষিক বলে এর কথা বাদই দেওয়া গেল। আরও একশ্রেণীর খবর সংক্ষিপ্তাকারে পাওয়া যায়। সেখানে থাকে শহরতলী ও গ্রামাঞ্চলের দুর্দশার কথা, যদিও সব সংবাপত্রে নয়। এবং সে সংবাদগুলিরও প্যাটার্ন এক; গ্রামের অভ্যন্তরে চালের দাম বাড়ছে, তা সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতার সীমা পেরিয়ে যাচ্ছে, এবং গ্রামাঞ্চলের চাল কোন কোন লোকের কারসাজিতে চোরাপথে শহরে চলে আসছে। মোটামুটি এই তিনটি শ্রেণীর সংবাদ ছাড়া আর কিছুই সংবাদপত্রে থাকে না, এমন কোন খবর পাওয়া যায় না যা কিছুটা মানুষকে উদ্দীপনা দেবে। আগে তাও বিভিন্ন নীতি সংক্রান্ত মন্ত্রী-দের কিছু কিছু ঘোষণা সংবাদপত্রে স্থান পেত, এখন যা অবস্থা তাতে অবশ্য বিবৃতি ও পাল্টা বিবৃতি প্রকাশিত হয়, কিন্তু তা সরকারের পলিসিসংক্রান্ত নয়, একান্তই ক্ষমতা কাড়াকাড়ির সাড়ম্বর ঘোষণা।

কাজেই রাজনীতি ভিন্ন অন্য কিছু নিয়ে লেখবারও সুযোগ এখন নেই। বিগত সপ্তাহের বঙ্গদর্শনেই আমরা বলেছি পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিক্ষেত্রে এক অভূত-পূর্ব সংকটের উদয় হয়েছে, এবং বর্তমান সরকারের রাজনৈতিক অস্তিত্ব এমন এক জায়গায় এসে উপস্থিত হয়েছে যে, যে কোন মুহূর্তেই তা আভ্যন্তরীণ বিস্ফো-রণে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যেতে পারে। ঘোষ মন্ত্রিসভার ভিত্তিমূল যে অত্যন্ত জীর্ণ হয়ে গেছে, এটা আর কোন গোপন খবর নয়। কংগ্রেস দলের বর্তমান নেতৃত্ব বলছেন যে, প্রয়োজন হলে তাঁরা রাষ্ট্রপতির শাসনের দাবি জানাবেন। অপর পক্ষে শ্রীআশুতোষ ঘোষের নেতৃত্বে বিদ্রোহী কংগ্রেসী এম এল এ-গণ দিল্লী থেকে ফিরে এসে কংগ্রেস-পি ডি এফ কোয়ালিশন মন্ত্রিসভার প্রতি তাঁদের সমর্থন প্রত্যাহার করে নিয়েছেন এবং শ্রীশঙ্করদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে নতুন দল 'ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক ফ্রণ্ট' গঠন করেছেন। যুক্তফ্রণ্টের সমর্থনে বিকল্প মন্ত্রিসভা গঠনের তোড়জোড়ও সুরু হয়েছে।

এদিকে ১৪ই তারিখে বিধান-সভায় অধিবেশন বসছে, এবং ওই দিনটি পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতির ভবিষ্যৎ গতি-প্রকৃতির নিয়ামক হবে। এদিকে একই সঙ্গে চলছে যুক্তফ্রণ্টের আইন অমান্য আন্দোলন যা মোটেই লঘু করে দেখার বিষয় নয়। যে হারে প্রতিদিন গ্রেপ্তার বরণ চলছে তাতে অতি শীঘ্রই একটি জটিল প্রশাসনিক সমস্যার উদ্ভব হবে। বস্তুত সে অবস্থা ইতিমধ্যেই সৃষ্টি হতে চলেছে।

মোট কথা এই রাজনৈতিক সংকট শুধু পশ্চিমবঙ্গের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারই নয়, সারা ভারতের সংসদীয় গণতন্ত্রের সামনে একটা বিরাট প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে। বর্তমান মন্ত্রিসভার বৈধতার বিরুদ্ধে যে মামলাটি হাইকোর্টে দাখিল করা হয়েছিল সেই মামলার রায় অনুযায়ী যে তথ্যটি পওয়া গেছে তা হচ্ছে এই যে, রাজ্যপাল প্রয়োজন মনে করলে তাঁর ধারণার ভিত্তিতে যে কোন মন্ত্রিসভাই খারিজ করে দিতে পারেন। অর্থাৎ এই রায় অনুযায়ী রাজ্য-পালের ক্ষমতা ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের গভর্নরের ক্ষমতার চাইতে বিন্দুমাত্র কম নয়। তাই যদি হয় তাহলে ভারতীয় সংসদীয় গণতন্ত্রে জনগণের সার্বভৌমত্ব, অর্থাৎ জনগণ নির্বাচিত আইনসভার সার্বভৌমত্বের কোনই বস্তু-গত মূল্য নেই। আমরা যখন কলেজের ছাত্র ছিলাম তখন রাষ্ট্রবিজ্ঞানের একটি প্রশ্ন পরীক্ষায় আসত রাজ্যপাল পদটি বজায় রাখার সার্থকতা কি? কেন না ধরেই নেওয়া হত রাজ্যপাল নৈবেদ্যের চূড়ায় সন্দেশের মত বিরাজ করেন, তিনি 'রুল' করেন না 'গভর্ন' করেন না, তাও আনুষ্ঠানিকভাবে। কিন্তু বর্তমান মামলার রায় অনুযায়ী দেখা যাচ্ছে যে তিনি 'রুলও' করেন, বস্তুত তাঁর ব্যক্তিগত ইচ্ছা বা ধারণার উপরেই কোন সরকার গদিতে বহাল থাকার অধিকারী। আমরা যে ভুল শিখেছিলাম এটা এতদিনে জানা গেল। তাহলে কি স্বীকার করতে হবে ১৯৪৯ সালের ভারতীয় সংবিধান আসলে ১৯৩৫-এরই পুনরাবৃত্তি যার গায়ে গণতন্ত্র নামক শব্দটির রং মাখানো আছে?

খাদ্য সংকট

কেন্দ্রীয় খাদ্যদপ্তরের নিকট ধর্না দেবার জন্য পশ্চিমবঙ্গের খাদ্য কমি-শনার শ্রী বি আর গুপ্ত বৃহস্পতিবার দিল্লী গেছেন, উদ্দেশ্য, যদি দিল্লী পশ্চিম-বঙ্গের ব্যাপারে কিছুটা করুণা প্রদর্শন করে। গত ৩১শে জানুয়ারী কেন্দ্রীয় খাদ্য বিভাগের রাষ্ট্রমন্ত্রী আন্নাসাহেব সিন্ধে জানিয়েছিলেন যে, পশ্চিমবঙ্গকে কেন্দ্রীয় সরকার কোনরকম খাদ্যের ব্যাপারে সাহায্য করতে আপাতত অক্ষম। তিনি আরও জানিয়েছিলেন যে, কেন্দ্রের প্রদত্ত গমের সরবরাহ আরও কমানো হবে। শ্রীগুপ্তের দিল্লী যাবার উদ্দেশ্য যাতে এই রাজ্যকে চাল ও গম সরবরাহের ব্যাপারে কেন্দ্র একান্তই মুখ ঘুরিয়ে না থাকে। গম সরবরাহের ব্যাপারে ইতিমধ্যেই অনিশ্চিত অবস্থা দেখা দিয়েছে। রাজ্যের আভ্যন্তরীণ খাদ্য সংগ্রহ এক কথায় ব্যর্থ। অবিলম্বে কেন্দ্রের সাহায্য না পেলে সরকারকে মাথায় হাত দিয়ে বসতে হবে। এদিকে রাজ্য রাজনীতির একটা অনিশ্চিত অবস্থার ফলে বিভিন্ন জেলায় খাদ্য সংগ্রহ একেবারেই হয় নি। আমেরিকা থেকে সময়মত গম না আসার জন্য ফেব্রুয়ারী মাসের প্রথম সপ্তাহে কেন্দ্রের কাছ থেকে কোন গম পশ্চিমবঙ্গ পায় নি। জানুয়ারী মাসের বরাদ্দ ছিল ৮৫ হাজার টন। দিয়েছে ৬৬ হাজার টন। ময়দার কল-গুলিতে ও বেকারিগুলিতেও সরকার সরবরাহের বহর কমিয়ে দিয়েছেন যার ফলে বাজারে পাঁউরুটির অভাব দেখা গেছে। রাজ্য সরকারের হাতে মাত্র আট হাজার টন গম মজুত আছে এতে রেশনে সাতদিনও গম যোগানো যাবে না। সরকার যে খোলাবাজার থেকে চাল কিনছিলেন তাও বন্ধ হয়ে গেছে, কেন না 'ডিসট্রেস সেল' এখন আর নেই। কয়েকটি বাদ দিলে রাজ্যের ধানকলগুলি এখন চাষীদের কাছ থেকে ধান কিনছে না। রাজ্য সরকার রাজ্যের মিলগুলির উপর শতকরা সত্তর ভাগ লেভি করেছিলেন, এবং আশা করে-ছিলেন যে এর দ্বারা আড়াই লক্ষ টন চাল পাওয়া যাবে। কিন্তু সে আশাও মরীচিকা হয়ে দাঁড়িয়েছে। বর্তমান সরকার এখন নিজের ফাঁদে নিজেই বন্দী হয়ে পড়েছেন, কেন না যাঁদের নিয়ে সরকার তাঁরাই একদা লেভি, কর্ডন ও সংগ্রহের বিপক্ষে ছিলেন, এবং তাঁরাই একদা গ্রামবাসীদের লেভি প্রদানের বিপক্ষে উৎসাহিত করেছিলেন। আজকে গ্রহের ফেরে সংগ্রহের দায়িত্ব তাঁদেরই হাতে গিয়ে পড়েছে, এবং সেই দায়িত্ব পালন করতে তাঁরা সংগতভাবেই ব্যর্থ হয়েছেন।

(১০।২।৬৮)

অবক্তব্য

চন্দ্রগুপ্ত

একটি বিপন্ন সারস্বতপ্রতিষ্ঠান

১৭৮৪ খৃস্টাব্দের ১৫ই জানুয়ারী: ভারতবর্ষের তথা পৃথিবীর অন্যতম বিখ্যাত বিদ্বৎপ্রতিষ্ঠান 'এশিয়াটিক সোসাইটি'র জন্মদিন। তদানীন্তন সুপ্রীম কোর্টের বিচারক উইলিয়াম জোন্স (১৭৪৬-৯৪) তাঁর কয়েকজন বন্ধুর সাহায্যে প্রাচ্যবিদ্যা-সংক্রান্ত এই গবেষণা-সংস্থা প্রতিষ্ঠা করেন। এশিয়াটিক সোসাইটির লক্ষ্য ও কার্যপ্রণালীর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বহুভাষাবিদ্ জোন্স বলেছিলেন, সমগ্র এশিয়াখণ্ডে যা কিছু মানুষের কীর্তি এবং প্রকৃতির সৃষ্টি (whatever is achieved by Man and produced by Nature) সে সম্পর্কে গবেষণা করাই হবে তাঁদের উদ্দেশ্য। এই মহৎ উদ্দেশ্যকে বাস্তবে রূপায়িত করার জন্য তিনি আমৃত্যু কঠোর পরিশ্রম করেছিলেন। জোন্সের আদর্শে অনুপ্রাণিত সমসাময়িক ও পরবর্তীকালের বিদ্যানিষ্ঠ গবেষকদের পরিশ্রমের ফলে এই প্রতিষ্ঠান কালক্রমে বিশ্বের অন্যতম বিদ্বৎ-প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়।

১৭৮৪ খৃস্টাব্দের ২২শে জানুয়ারী এশিয়াটিক সোসাইটির প্রথম অধিবেশন হয়। স্যর উইলিয়াম জোন্স সোসাইটির সভাপতি নির্বাচিত হন এবং মৃত্যুকাল (১৭৯৪) পর্যন্ত ঐ পদে বৃত ছিলেন। সপার্ষদ গভর্নর-জেনারেল নবজাত প্রতিষ্ঠানের পৃষ্ঠপোষক হতে সম্মত হন। পরবর্তীকালে তিনজন গভর্নর-জেনারেল স্যর জন শোর, মার্কুইস অফ হেস্টিংস এবং লর্ড হার্ডিঞ্জ এশিয়াটিক সোসাইটির সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করেন। লর্ড উইলিয়াম বেণ্টিঙ্কের (১৮২৮-৩৩) সময় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, অতঃপর সপার্ষদ গভর্নর-জেনারেলের পরিবর্তে শুধুমাত্র গভর্নর-জেনারেলই সোসাইটির পৃষ্ঠপোষক থাকবেন। পরে এই প্রথার পরিবর্তন করে এই রাজ্যের গভর্নরকে পৃষ্ঠপোষক রাখা স্থিরীকৃত হয়। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল সোসাইটির পৃষ্ঠপোষক।

গোড়ার দিকে এশিয়াটিক সোসাইটির অধিবেশনে ভারতীয়দের প্রবন্ধপাঠের অনুমতি দেওয়া হলেও কোন ভারতীয়কে সদস্য মনোনীত করা হতো না। ভারতীয়দের মধ্যে প্রথম প্রবন্ধ পাঠ করেন বারাণসীর প্রধান বিচারপতি আলী ইব্রাহিম খাঁ। ১৭৮৪ সালের ১৩ই জুন তিনি হিন্দুদের বিচারপদ্ধতি বিষয়ে ফারসীতে লেখা একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন, পরে সেটি জোন্স কর্তৃক ইংরেজীতে অনূদিত হয়। ১৮২৯ খৃস্টাব্দে সর্বপ্রথম ভারতীয়রা সোসাইটির সদস্য হবার সুযোগ পান। স্বল্পসংখ্যক এই সম্মানিতদের সব কজনই বাঙালী: দ্বারকানাথ ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, রামকমল সেন, রসময় দত্ত ও শিবচন্দ্র সেন। আরও পরে ১৮৪৬ খৃস্টাব্দের এই নভেম্বর পরবর্তীকালের স্বনামধন্য ঐতিহাসিক রাজেন্দ্রলাল মিত্র মাসিক ১০০ বেতনে এশিয়াটিক সোসাইটির সহকারী কর্মসচিব ও গ্রন্থাধ্যক্ষ হন। ১৮৫৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে রাজেন্দ্রলালকে সোসাইটির সাধারণ সদস্য বলে ঘোষণা করা হয় এবং জুন মাসে তাঁকে সোসাইটির কাউন্সিলের অন্যতম সদস্য মনোনীত করা হয়। এশিয়াটিক সোসাইটির সূত্রে রাজেন্দ্রলাল সম্পর্কে এত কথা বলার কারণ, রাজেন্দ্রলালই প্রথম ভারতীয় যিনি শুধু কাউন্সিলের সদস্য হবার সম্মান লাভ করেন নি, ১৮৮৫ খৃস্টাব্দে এশিয়াটিক সোসাইটির সভাপতি নির্বাচিত হবার ঈর্ষাযোগ্য সম্মানও অর্জন করেছিলেন।

১৮০৮ খৃস্টাব্দে পার্ক স্ট্রীট—চৌরঙ্গীর সংযোগস্থলে এশিয়াটিক সোসাইটির নিজস্ব ভবন নির্মিত হলে এই প্রতিষ্ঠানের কর্মকাণ্ডের বিস্তৃতি ঘটে। জোন্সের সময়ে সদস্যদের কোন দক্ষিণা দিতে হতো না, তাঁর অব্যবহিত উত্তরসূরী জন শোর প্রতিষ্ঠানের ক্রমবর্ধমান ব্যয়নির্বাহের জন্য সদস্যদের কাছ থেকে বার্ষিক চাঁদা নেওয়ার প্রথার বার্ষিক প্রবর্তন করেন। প্রতিষ্ঠার কয়েক বছর পরে সোসাইটির মুখপত্রের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হলে ১৭৮৮ সালে 'এশিয়াটিক রিসার্চেস' পত্রিকাটির আত্মপ্রকাশ ঘটে। 'এশিয়ার ইতিহাস, পুরাতত্ত্ব, শিল্প, বিজ্ঞান ও সাহিত্য' সংক্রান্ত গবেষণার ফল এতে বেরোতে থাকে। 'এশিয়াটিক রিসার্চেস'-এর পরিবর্তে ১৮২৯ খৃস্টাব্দে 'গ্লিনিংস ইন সায়েন্স' এবং পরে ১৮৩২ খৃস্টাব্দে এই পত্রিকা 'জার্নাল অফ দি এশিয়াটিক সোসাইটি'রূপে আত্মপ্রকাশ করে। 'গ্লিনিংস' ও 'জার্নাল' প্রথমে হার্বার্ট ও পরে জেমস প্রিন্সেপ সম্পাদনা করেন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য ১৮৩৭ খৃস্টাব্দে এই এশিয়াটিক সোসাইটিতেই জেমস প্রিন্সেপ অশোকলিপির পাঠোদ্ধার করে ভারত ইতিহাসের দিগন্ত উন্মোচন করেন। সারত, আমাদের সাংস্কৃতিক ইতিহাসের বিশিষ্ট তারিখের তালিকায় ১৭৮৪ অন্যতম। এশিয়াটিক সোসাইটির প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে প্রাচীতত্ত্ব তথা ভারতবিদ্যা-গবেষণার যে ভিত্তিপ্রস্তর সেদিন স্থাপিত হয়েছিল, সেই বনিয়াদের উপর দেশী-বিদেশী মনীষীদের পরিশ্রমে পরবর্তীকালে যে হর্ম্য নির্মিত হয়েছে, তা ভারতবর্ষের তথা সমগ্র এশিয়ার অম্লান গৌরব।

বোম্বাই, সিংহল, মালয়, যুক্তরাজ্য প্রভৃতি দেশ-বিদেশের সমনামীয় বিদ্বৎ-প্রতিষ্ঠানগুলির জনক কলকাতার এই এশিয়াটিক সোসাইটি যে পৃথিবীর প্রথম সারির মিউজিয়ামগুলির অন্যতম ইণ্ডিয়ান মিউজিয়ামেরও জন্মদাতা এ তথ্য হয়তো অনেকের অজানা। সেকালে এশিয়াটিক সোসাইটির মিউজিয়াম (স্থাপিত ১৮১৪) ছিল ভারতবর্ষের প্রধানতম সংগ্রহশালা। ১৮৬৬ খৃস্টাব্দে সোসাইটির কাউন্সিল এই সংগ্রহশালার প্রায় সবটাই সরকারকে হস্তান্তরিত করেন এবং সেই সংগ্রহকে কেন্দ্র করেই বর্তমান ইণ্ডিয়ান মিউজিয়াম গড়ে ওঠে। স্থির হয়, মিউজিয়ামের অছি-কমিটিতে সোসাইটির একজন প্রতিনিধি থাকবেন।[1] পাঠকদের অবগতির জন্য জানাই, এশিয়াটিক সোসাইটির সংগ্রহে আজও কিছু উল্লেখযোগ্য পুরাবস্তু আছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ খৃস্টপূর্ব তৃতীয় শতকের একটি তাম্রলেখ, সম্রাট অশোকের একটি প্রস্তরলেখ, কণিষ্কের সমকালীন একটি তাম্রলেখ (খৃস্টীয় প্রথম শতক), লক্ষ্মণ সেনের আমলের দুটি তাম্রলেখ, বহু পুরাতন মুদ্রা কিংবা রেনল্ডস, রুবেন্স, ড্যানিয়েল, চিনারী প্রমুখ প্রখ্যাত শিল্পীদের মূল চিত্রকৃতির উল্লেখ করা যায়।

প্রাচীন পুঁথিসংগ্রহের বৈভবে এশিয়াটিক সোসাইটি পৃথিবীর অন্যতম অগ্রণী প্রতিষ্ঠান। সংস্কৃত, পালি, প্রাকৃত, আরবী, ফার্সী ইত্যাদি ভারতীয় ভাষায় লিখিত পুঁথি ছাড়া তিব্বতী, বর্মী, চীনা প্রভৃতি অন্যান্য ভাষায় লেখা পুঁথিও এই

---

১ এই সূত্রেই উল্লেখযোগ্য, কয়েক বছর আগে কেন্দ্রীয় সরকার ইণ্ডিয়ান মিউজিয়ামের কিছু মূল্যবান পুরাবস্তু দিল্লীর ন্যাশনাল মিউজিয়ামে অপসারণের যে চক্রান্ত করেছিলেন, মূলত এশিয়াটিক সোসাইটির প্রতিনিধির আপত্তির জন্য তা ব্যর্থ হয়।

সংগ্রহে বর্তমান। পুঁথির সংখ্যা চল্লিশ হাজারেরও বেশি। এদের বেশ কয়েকটি চিত্রিত, শিল্পগৌরবে যেগুলি মনোযোগের যোগ্য। প্রাচীনত্বের বিচারেও এশিয়াটিক সোসাইটির পুঁথিসংগ্রহ মূল্যবান। তালপাতায় লেখা 'কুব্জিকামতম্' নামক তন্ত্রগ্রন্থের সর্বপ্রাচীন পুঁথিটি খৃস্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে অনুলিখিত। চিত্রিত পুঁথিগুলির মধ্যে প্রাচীনতম 'অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা' নামীয় মহাযান বৌদ্ধ-গ্রন্থের তালপাতার পুঁথি খৃস্টীয় দশম শতকে অনুলিখিত। নেপালদেশীয় নীল কাগজে পঞ্চদশ শতকের লেখা 'পরমার্থনাম সঙ্গীতি'র পুঁথিটি কাগজে-লেখা পুঁথিগুলির মধ্যে প্রাচীনতম। আরবী ফার্সী পুঁথিসংগ্রহের মধ্যে 'কুলিয়াত-ই-জামি' বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। ভারতীয় চিত্রকলার বিবর্তনের ধারা অনুসরণের জন্য সোসাইটির সংগ্রহভুক্ত সংস্কৃত আরবী-ফার্সী ইত্যাদি চিত্রিত পুঁথিগুলির অধ্যয়ন অপরিহার্য। পুঁথিসংগ্রহের সঙ্গেই মুদ্রিত গ্রন্থের উল্লেখ করতে হয়। মুদ্রিত গ্রন্থের সংখ্যা প্রায় দু' লক্ষ, প্রাচীনতম মুদ্রিত গ্রন্থ ১৪৯৯ খৃস্টাব্দে ভেনিসে ছাপা। অন্যান্য প্রাচীন গ্রন্থের মধ্যে হ্যালহেডের 'বাংলা ব্যাকরণ' (১৭৭৮ সালে হুগলীতে ছাপা), 'মালাবার ও ইংরেজী অভিধান' (১৭৭৯ সালে মাদ্রাজে ছাপা), রামরাম বসুর 'লিপিমালা' (১৮০২ সালে শ্রীরামপুরে ছাপা) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

এশিয়াটিক সোসাইটি'র নিজস্ব প্রকাশনার মধ্যে 'এশিয়াটিক রিসার্চেস', ও 'জার্নাল'-এর কথা ইতিপূর্বে বলা হয়েছে। জ্ঞান-বিজ্ঞানের অগ্রগতিতে আলোচ্য বিদ্বৎ-প্রতিষ্ঠানটির দানের গুরুত্ব ও ব্যাপকতা 'এশিয়াটিক রিসার্চেস' ও 'জার্নাল'-এর পুরনো সংখ্যাগুলিতেই শুধু নয়, সোসাইটির বিভিন্ন প্রকাশনাতেও সপ্রমাণ। এই প্রকাশনাগুলির মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখ-যোগ্য 'বিবলিওথেকা ইণ্ডিকা' নামক গবেষণা-গ্রন্থমালা। সংস্কৃত, পালি, প্রাকৃত, আরবী, ফার্সী প্রভৃতি ভাষায় লিখিত প্রাচীন গ্রন্থাবলী এই গ্রন্থমালায় বিশেষজ্ঞদের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছে। আমাদের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের আকররূপে অত্যন্ত মূল্যবান এই সব প্রাচীন গ্রন্থের প্রকাশনায় সোসাইটির কৃতিত্ব অবশ্যস্বীকার্য। বিশিষ্ট এই গ্রন্থমালা ছাড়া পাণ্ডিত্যপূর্ণ অন্যান্য গ্রন্থের সংখ্যাও অনুল্লেখ্য নয়। অপেক্ষাকৃত সাম্প্রতিক প্রকাশনার মধ্যে বিখ্যাত বিজ্ঞানী শিশিরকুমার মিত্রের কীর্তিগ্রন্থ 'দি আপার অ্যাটমস্ফিয়ার' মনীষার ক্ষেত্রে সোসাইটির ঐতিহ্য অক্ষুণ্ণ রেখেছে।

এশিয়াটিক সোসাইটি সম্পর্কে আর একটি তথ্য, যা হয়তো অনেকের অজানা, এই সারস্বত প্রতিষ্ঠানটি ভারতবর্ষের বিজ্ঞানচর্চাতেও অগ্রপথিকের ভূমিকা নিয়েছে। 'জিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইণ্ডিয়া', 'জুওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইণ্ডিয়া' "বটানিক্যাল সার্ভে অফ ইণ্ডিয়া" প্রভৃতি পরবর্তীকালের সরকারী বিজ্ঞান-সংস্থাগুলির কাজ এক সময় এশিয়াটিক সোসাইটিই করত। বিজ্ঞান কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠার মূলেও এশিয়াটিক সোসাইটির উদ্যম স্মরণীয়।

•

জ্ঞান-বিজ্ঞানের সর্বতোমুখী প্রসারে এশিয়াটিক সোসাইটির উদ্যমী ভূমিকা এতই সুবিদিত যে সে সম্পর্কে অধিক বাগ্‌বিস্তার বাহুল্যমাত্র। অথচ স্বাধীন ভারতবর্ষের এমনই দুর্ভাগ্য ১৮৪ বছরের এই বিখ্যাত ভারতীয় সারস্বত প্রতিষ্ঠান আজ অর্থাভাবে পঙ্গু হতে চলেছে। গত ৫ই ফেব্রুয়ারীর এশিয়াটিক সোসাইটির বার্ষিক অধিবেশনে সোসাইটির সভাপতির ভাষণ এবং কর্মসচিবের প্রতিবেদন শিক্ষানুরাগী মাত্রেরই নৈরাশ্যের কারণ। সোসাইটির প্রতি সরকারের, বিশেষত কেন্দ্রীয় সরকারের, ঔদাসীন্য সরকার-সুলভ হলেও নিঃসন্দেহে নিন্দনীয়। এশিয়াটিক সোসাইটির কর্মচারীরা মাত্র এক বছর আগেও যে দুঃসহরকমের কম বেতন পেতেন, তাতে দুঃখের সঙ্গে বিস্ময় অনুভব করি। বিস্ময় এ কারণে, জীবনধারণের অনুপযোগী বেতনেও তাঁরা ভেঙে পড়েন নি, এশিয়াটিক সোসাইটির দরোজা বন্ধ করার মতো বিক্ষুব্ধ শ্রমিকসুলভ সহজ রাস্তা অবলম্বন করেন নি। গত বছর অপেক্ষাকৃত তরুণ সদস্যদের নিয়ে গঠিত এশিয়াটিক সোসাইটির কাউন্সিল বা পরিচালক-মণ্ডলী তাঁদের দীর্ঘদিনের অভাব-অভিযোগ অনেকাংশে পূরণ করতে পেরেছেন জেনে আমরা আশ্বস্ত বোধ করছি। বর্তমান বছরে সদ্যোগঠিত পরিচালকমণ্ডলীতে তরুণদের প্রাধান্য আলোচ্য প্রতিষ্ঠানের পক্ষে স্বাস্থ্যকর এবং নিঃসন্দেহেই সুসংবাদ। প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীদের বেতনবৃদ্ধি বা অন্যান্য উন্নয়নে পশ্চিমবঙ্গ সরকার যে অর্থ সাহায্য করেছেন, প্রয়োজনের তুলনায় তা অযথেষ্ট হলেও, রাজ্য সরকার শিক্ষানুরাগীদের ধন্যবাদ পাবেন। এবং এই সূত্রেই এশিয়াটিক সোসাইটির প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের সাম্প্রতিক বিমাতৃসুলভ মনোভাব স্মরণীয়। শিক্ষার নামে কেন্দ্রীয় সরকারের অপব্যয় আজ আর নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না, অথচ সরকার ভুলেও পশ্চিমবঙ্গে অবস্থিত এশিয়াটিক সোসাইটির মতো একটি সুপ্রাচীন সারস্বত প্রতিষ্ঠানের জন্য কপর্দক ব্যয় করতে প্রস্তুত নন।

এশিয়াটিক সোসাইটির এই অর্থাভাব কিভাবে কতটা দূর করা যাবে? পরিচালক-মণ্ডলী অবশেষে সোসাইটির বহিরঙ্গের বিভিন্ন অংশ ব্যবসায়িক বিজ্ঞাপনের জন্য ভাড়া দিয়েছেন। বিদ্বৎপ্রতিষ্ঠানের বাড়িতে ব্যবসায়িক বিজ্ঞাপনের নিঃশব্দ চিৎকার নিঃসন্দেহেই অপ্রীতিকর, কিন্তু পরিচালকমণ্ডলীর সামনে এ ছাড়া অর্থোপায়ের অন্য কোন সহজ রাস্তা খোলা ছিল না। এশিয়াটিক সোসাইটির গ্রন্থাগারের উন্নতি, কর্মচারীদের পর্যাপ্ত বেতনবৃদ্ধি, গৃহসংস্কার ইত্যাদি বিবিধ উন্নয়নমূলক কাজে যে-পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন, তার বহুলাংশ যদি কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকার বহন না করেন, তাহলে এই প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে পড়বে। বিশ্ববিখ্যাত এই সুপ্রাচীন সারস্বত প্রতিষ্ঠানটিকে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাবার জন্য চন্দ্রগুপ্ত সরকার, বে-সরকারী বাণিজ্য-সংস্থা এবং দেশের তাবৎ শিক্ষানুরাগী অর্থবানদের কাছে বিনীত আবেদন জানাচ্ছেন। ভারতবর্ষের গৌরব এশিয়াটিক সোসাইটি যদি অর্থাভাবে পঙ্গু হয়ে পড়ে বা মৃত্যুর পথে এগিয়ে যেতে থাকে, তবে তা সমগ্র ভারতবর্ষের দুরপনেয় কলঙ্ক।

কিন্তু অর্থাভাবই কি এশিয়াটিক সোসাইটির একমাত্র সমস্যা? আরও একটি সাম্প্রতিক সমস্যা আজ এশিয়াটিক সোসাইটির বিপদের কারণ হয়ে দেখা দিয়েছে। সোসাইটির বিদায়ী সভাপতি ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার সেদিন তাঁর ভাষণে সেই আগামী বিপদের ইঙ্গিত দিলেন। রাষ্ট্রভাষারূপে হিন্দীর আশু আত্মপ্রকাশে এশিয়াটিক সোসাইটির সম্ভাব্য পরিণতি প্রসঙ্গে ডক্টর মজুমদার আশঙ্কা করেন, জ্ঞান-বিজ্ঞানের সর্বোচ্চ-স্তরে হিন্দী বা আঞ্চলিক ভাষার ব্যবহারের ফলে এশিয়াটিক সোসাইটির সর্বভারতীয় তথা বিশ্বজনীন চরিত্রের ধ্বংস অনিবার্য। এশিয়াটিক সোসাইটিতে ইংরেজীর পরিবর্তে হিন্দী প্রবর্তিত হলে এশিয়ার সভ্যতা ও সংস্কৃতি সম্পর্কিত গবেষণা যে বহুলাংশে ব্যাহত হবে সে সম্পর্কে তিনি তাঁর নিঃসন্দিগ্ধ মনোভাব প্রকাশ করেন। ডক্টর মজুমদারের আশঙ্কা, এশিয়াটিক সোসাইটি যদি ইংরেজীর ব্যবহার বজায় রাখেন, তবে রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় উভয় সরকারই অর্থসাহায্য সঙ্কুচিত করবে; এবং দ্বিতীয়ত, ইংরেজী-অভিজ্ঞ শিক্ষিত-দের সংখ্যা ক্রমশ হ্রাস পাবার ফলে সোসাইটিতে উপযুক্ত গবেষকদের সংখ্যাও স্বভাবতই কমে আসবে, আর সোসাইটির পক্ষে তা হবে দুর্ঘটনার সামিল। হিন্দীকে তাড়াহুড়ো রাষ্ট্রভাষা করার ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের নির্বোধ উদ্যমের সমালোচনা করে ডক্টর মজুমদার সব্যঙ্গ মন্তব্য করেন, যে পদ্ধতিতে আমাদের সরকার

ইংরেজী হটিয়ে হিন্দীকে রাষ্ট্রভাষা করতে চাইছেন তা অনেকটা এরকম : একটি বিরাট নদী, নদীর উপর বর্তমান সেতুটির কিছুটা ভেঙে ফেলা হলো, আর সেই সঙ্গে প্রস্তাবিত নতুন সেতুর খানিকটা তৈরি করে দীর্ঘদিনের জন্য চুপচাপ বসে থাকা। ফলে আগামী বহু বছরের জন্য নদীর দুই তীরকে যুক্ত করার ব্যাপারে দুটি সেতুর কোনটিই কাজে এল না। ইংরেজীর ত্বরিত অবলোপের ভয়াবহ ফল শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদারের এই উপমায় মর্মস্পর্শীভাবে ফুটে উঠেছে।

*

মানুষের মতো প্রতিষ্ঠানেরও বোধ তাঁর ভাগ্য অন্য। ১৮৪টি শীত-বসন্ত অতিক্রম ক'রে যে-সারস্বত প্রতিষ্ঠান আজও তাবৎ ভারতবর্ষের গৌরব, তাকে বাঁচাবার প্রধান দায়িত্ব অবশ্যই সরকারের। কিন্তু সেই সঙ্গে প্রত্যেক শিক্ষানুরাগী ভারতবাসীরও কর্তব্য আছে। এশিয়াটিক সোসাইটির সর্বাঙ্গীন উন্নতির জন্য তাঁরা সচেষ্ট হবেন, এই আশা কি চন্দ্রগুপ্তের মতো একজন শিক্ষাব্রতীর পক্ষে নিতান্তই দুরাশা?

আমার কেবলমাত্র এইটুকু করতে হয় যে আমি যত টাকা নিয়মিতভাবে সঞ্চয় করতে চাই সেই পরিমাণ টাকা আমার মাইনে থেকে কেটে রাখার জন্য আমার নিয়োগকারীকে অধিকার দিয়ে দিই। নিয়োগকারীই বাকি সব কাজ করেন।

অফিসের কর্মীগণও এই রকম সুবিধে পেতে পারেন।

আপনার পোষ্ট অফিসেই আপনি সম্পূর্ণ বিবরণ পেতে পারেন।

কারণ এটা
খুব সহজ

জাতীয় সঞ্চয় সংস্থা

davp 67/393 B.

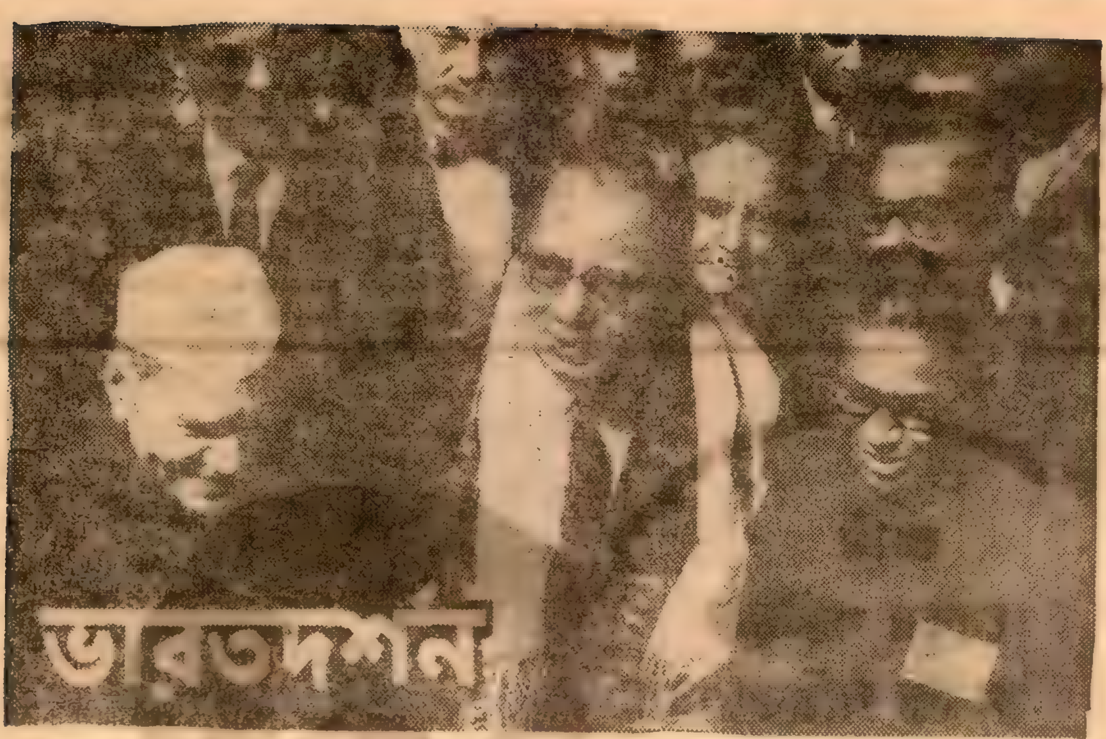

দিল্লীতে উ থাণ্ট

থাণ্ট-ইন্দিরা বৈঠক

রাষ্ট্রসঙ্ঘের সেক্রেটারী জেনারেল শ্রী উ থাণ্ট তিন দিনের সফরে ভারতে আসেন এবং উচ্ছ্বসিত অভিনন্দনের সঙ্গে ভারতবাসী তাঁকে স্বাগত জানান। উ থাণ্ট এবং প্রধানমন্ত্রী অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে বর্তমান ভিয়েতনাম পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করেন এবং উভয়েই লোকক্ষয়ী রণক্ষেত্রে আশু শান্তির প্রয়োজন উপলব্ধি করেন।

সমগ্র দুনিয়ার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে আজ অমর ভিয়েতনাম এবং তার সংগ্রামী জনগণ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিপুল সমরায়োজনকে তাঁরা কিছুমাত্র তোয়াক্কা না করে গভীর মরণপণ প্রত্যয়ের সঙ্গে শোষণমুক্ত ভিয়েতনাম প্রতিষ্ঠার জন্য আবাল বৃদ্ধ বনিতা দিনের পর দিন ইতিহাসে অভূতপূর্ব এক লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন। তাঁদের বীরত্ব এবং মুমুক্ষার প্রতি আজ সমগ্র দুনিয়া সশ্রদ্ধ এবং সচেতন হয়ে উঠেছে। খোদ মার্কিন দেশেও ভিয়েতনাম যুদ্ধ-বিরোধী মনোভাব গড়ে উঠেছে তীব্র থেকে তীব্রতর ভাবে। তবু এই যুদ্ধকে চালিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে লক্ষ লক্ষ ডলার ও হাজার হাজার জীবনের অপচয়ে। সুতরাং দুনিয়ার প্রত্যেকটি শান্তিপ্রিয় মানুষ চাইছেন ভিয়েতনামে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হোক। অমর ভিয়েতনামের শোষণমুক্ত স্বাধীনতা হোক অক্ষয়।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার শান্তিও ঐ ভিয়েতনামকে কেন্দ্র করেই বিঘ্নিত হওয়ার আশংকা। আন্তর্জাতিক অন্যান্য প্রশ্নের মধ্যে শ্রী থাণ্ট কোরিয়া ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে বিশেষ উদ্বিগ্ন আলোচনাও করেছেন।

ভুটানরাজের ভারত সফর

ভুটানরাজ দ্রুক গিয়ালপো ভারতে এসেছেন ছ'দিনের সফরে।

নেপাল ভুটান ভারত চিরকালই এক মায়ের তিন সন্তানের মতো হিমালয়ের পদাম্বুজ চুম্বন করে প্রাত্যহিক কর্তব্য সমাপন করে আসছে। এই তিনের রাজনৈতিক ও ভৌগোলিক সীমারেখা এই তিনকে কখনো স্বতন্ত্র করতে পারে নি। নেপালীরা যেমন, ভুটানীরাও তেমনি ভারতে আপনাদের কখনই বিদেশী জ্ঞান করেন না, ঠিক যেমন কাবুলীরা ভারতে অবস্থানের সময় ভারতকে আপন দেশ বলেই মনে করেন।

এই অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক চলেছে আবহমানকাল ধরে এবং সে সম্পর্কে বহিঃশক্তি কখনো কোথাও ফাটল ধরাবার চেষ্টা করলেও ব্যর্থই হয়েছে।

ভুটানরাজকে স্বাগত জানাবার সময় উভয়তই সেই দৃঢ় বন্ধনের কথা স্বীকৃতি পায়। ভারত-ভুটান সম্পর্ক প্রতিদিন দৃঢ়তর হয়ে উঠুক এ প্রার্থনা মামুলী লৌকিকতামাত্র নয়, অত্যন্ত স্বাভাবিক।

ভুটানরাজের আগমনে সেই সম্পর্ক আরও দৃঢ় হয়ে উঠবে।

অকংগ্রেসী শাসন ভাঙার অধিকার

সম্প্রতি গুজরাট পরিষদ দলের সভায় প্রশ্নোত্তর প্রসঙ্গে উপ-প্রধান তথা অর্থমন্ত্রী মোরারজী দেশাই অকংগ্রেসী সরকার ভাঙার বিষয়ে কংগ্রেসের ন্যায়সংগত অধিকার আছে বলে যে দাবি করেছেন এবং যে যুক্তি সাজিয়েছেন তা অনেকটা আত্মপ্রবঞ্চনারই সামিল। এই তর্কের আলোকে কংগ্রেসীরা নিজের কোলে ঝোলটানা যুক্তি আহরণ করতে পারেন মোরারজী দেশাই-এর কাছ থেকে। কিন্তু সেক্ষেত্রে সত্যের অপলাপ ঘটারই সম্ভাবনা।

শ্রীযুত দেশাই যুক্তি হিসেবে বলেছেন, কংগ্রেসকে কাবু করার জন্য অকংগ্রেসীরা জোট বেঁধে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়েছে, দলত্যাগীদের মুখ্যমন্ত্রী বানিয়েছে। সুতরাং অকংগ্রেসী মন্ত্রিসভা উচ্ছেদেও তাই কংগ্রেসের অধিকার জন্মেছে।

কিন্তু ঘটনাবলী কি সত্যই তাই? গত চতুর্থ নির্বাচনে কয়েকটি অকংগ্রেসী জোট ত্রি-কোণ, চতুষ্কোণ ভোটযুদ্ধেও বহুক্ষেত্রে কংগ্রেসকে পরাজিত করে বিভিন্ন রাজ্যে কংগ্রেসকে অভ্যাসগত সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভে বঞ্চিত করেছে। তা ছাড়া অকংগ্রেসী দলগুলির প্রত্যেকেরই বিশেষ বিশেষ কর্মসূচী ছিল, জোটবদ্ধ অবস্থায়ও তাঁরা সর্বনিম্ন কর্মসূচীর ভিত্তিতেই একত্রিত হয়েছিলেন। নির্বাচনের অভাবিত ফলাফল বিভিন্ন অকংগ্রেসী দলের সামনে সর্বনিম্ন কর্মসূচীর ভিত্তিতে কংগ্রেসের বিকল্প সরকার গঠন করে সুস্থ গণতান্ত্রিক আবহাওয়া সৃষ্টির সুযোগও সমুপস্থিত করিয়েছিল। অকংগ্রেসী সরকারগুলির পত্তন সেই সর্বনিম্ন কর্মসূচীর ভিত্তিতে। অকংগ্রেসী সরকারগুলির আভ্যন্তরীণ কোন্দলও ঐ কর্মসূচী রূপায়ণকে কেন্দ্র করেই। সুতরাং

মন আজ খুশীতে ভরা
শরীর যদি ভাল থাকে তাহলে জনগণের জন্য মানুষ আনন্দে মেতে ওঠে প্রকৃতির সৌন্দর্য উপভোগ করবার জন্য।
আপনিও স্বাস্থ্য ভাল রাখবার জন্য সাধনার অব্যর্থ মহৌষধ প্রতিদিন আহারের পর দুইবার করে দু'চামচ মৃতসঞ্জীবনীর সঙ্গে চার চামচ মহাদ্রাক্ষারিষ্ট (৬ বৎসরের পুরাতন) খাবেন। এতে ক্লান্তি দূর করে, খিদে ও হজমশক্তি বাড়ে, সর্দি কাশি থেকে রেহাই পাবেন।
সাধনা ঔষধালয় ঢাকা
অধ্যক্ষ ডাঃ যোগেশ চন্দ্র ঘোষ, এম.এ, আয়ুর্বেদশাস্ত্রী, এফ.সি.এস, (লণ্ডন) এম.সি.এস, (আমেরিকা), ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক।
কলিকাতা কেন্দ্র ডাঃ নরেশ চন্দ্র ঘোষ, এম.বি. বি-এস, আয়ুর্বেদাচার্য্য।
৩৬, সাধনা ঔষধালয় রোড
সাধনা নগর, কলিকাতা ৪৮

প্রতিষ্ঠা এবং আভ্যন্তরীণ বিবাদ অকংগ্রেসী সরকার এই দুইটি অবশ্যই নিয়ন্ত্রিত হয়েছে আদর্শের ভিত্তিতে। যেখানে বিবাদের তীব্রতা ফুটে শরিকানী আগুন ধরিয়েছে সেখানেও তার মূল কারণ হয়েছে আদর্শগত। অবশ্য অকংগ্রেসী সরকারের পতন হয়ত সেজন্যও এতদূরে ত্বরান্বিত হত না, যদি বিরোধী কংগ্রেস অকংগ্রেসী সরকারগুলিকে ফেলবার জন্য মরিয়া হয়ে না উঠতেন। কংগ্রেসের এ বিষয়ে সুবিধাও ছিল প্রচুর।

এক তো কংগ্রেসই ভারতের কেন্দ্রীয় ক্ষমতার দখলদার। দ্বিতীয়ত টানা কুড়ি বছর রাজত্বের পর কংগ্রেস বিভিন্ন রাজ্যের প্রশাসনিক কর্তাদের ওপর প্রভাব বিস্তার করে তাঁদের অনেকের মন ও মেজাজ কংগ্রেসী ক্ষমতাকে জিইয়ে রাখার পক্ষে তৈরি করে আসছিল। প্রশাসনে দুর্নীতি মাকড়ের জাল বিস্তার করেছে উত্তর-স্বাধীনতাকালে। সে জাল যাঁরা নির্বিঘ্নে বুনছিলেন ক্ষমতা পরিবর্তনে তাঁদের গায়ে মন্দ বাতাসের স্পর্শ লাগল। অকংগ্রেসী সরকারকে সেই বিমুখ প্রশাসন সামলে চলতে হয়েছে। এবং প্রশাসন যে কিভাবে এই সরকারগুলির পিছনে লেগেছিল। রাজকর্মের, নির্দেশ পালনের হাল যে পানি পাচ্ছিল না এবং অন্তর্বাঁধালা চক্রান্ত যে বহুদূর সংযোগ স্থাপন করে নষ্ট মাজীরের সৃষ্টি করছিল, বিভিন্ন ক্ষেত্রে সে সম্পর্কে অকংগ্রেসী সরকারগুলির অসহায় অভিযোগ বারম্বার শোনা গেছে। ফলত শুধু শরিকানী নীতির দ্বন্দ্বেই নয়, প্রশাসনিক বাগড়ায়ও অকংগ্রেসী সরকারকে প্রভূত বেগ পেতে হয়েছে। আবার এমনও সংবাদ শোনা গেছে যে, কর্তাব্যক্তি প্রশাসনিক কর্মচারীদের সঙ্গে রাজ্য কংগ্রেসের কতিপয় নেতা বহুক্ষেত্রে তলে তলে সংযোগ রেখে প্রশাসনিককার্যে বিঘ্ন উপস্থিত করানোর প্রয়াস পেয়েছেন। এই জাতীয় ঘরের ঢেঁকির কুমীররা অকংগ্রেসী সরকার উৎখাত করার সঙ্গে সঙ্গে বিকট উল্লাসে অকংগ্রেসী নেতাদের শিক্ষাদানের জন্য যেভাবে উত্তেজনা অনুভব করছেন বলে দেখা গেছে, তাতেই তাঁদের মনোভাব আপনি প্রকাশ হয়ে পড়েছিল। বলা বাহুল্য, অকংগ্রেসী সরকারের সমালোচনায় বড় একটা কাউকে এই মহতী অসুবিধার কথা স্বীকার পেতে দেখা যায় না। সরকার প্রশাসনিক সহযোগিতা ব্যতিরেকে অচল। গণশক্তি বাইরে থেকে কতদূর সহায়তায় আসতে পারে। তৎসত্ত্বেও অকংগ্রেসী সরকার অসহায়ভাবে উপায়ান্তর না দেখে জনগণেরই দ্বারস্থ হয়েছেন বারম্বার এবং আহ্বান মাত্র সজাগ সাড়াও পেয়েছেন। তদ্দ্বারা এটাও প্রমাণ হয়েছিল যে অকংগ্রেসী সরকারকে জনগণ নীতিভ্রষ্টতার অপরাধে কখনো অপরাধী করেন নি। অতি অল্পকালে সে বিষয়ে কারও পক্ষেই কোনোও সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়াও অসম্ভব ছিল।

প্রশাসন বানচাল করার ক্ষমতা রাখেন, সমাজের সেই পয়সাওয়ালা শ্রেণীও যাঁরা বিগত কুড়ি বছরের স্বাচ্ছন্দ্যে অবাধে কালো টাকার পাহাড় জমিয়ে তুলেছিলেন, ক্ষমতা হস্তান্তরে প্রশাসনিক মাকড়গুলির সঙ্গে তাঁরাও প্রথমটা দিশেহারা হয়ে পড়ে পরে সর্বশক্তি নিয়োগ করে টাকার প্যাঁচ কষতে শুরু করে দিয়েছিলেন। একটা দুর্নীতিপরায়ণ দেশে এই টাকার প্যাঁচ যে কী সাংঘাতিক বস্তু, শুধু নির্বাচনের পর নির্বাচিত সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করার ব্যাপারেই নয়, নির্বাচনকালে টাকা ছড়িয়ে ভোট কেনার ব্যাপারেও তার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া গেছল। বিশেষ করে উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম ভারতে ভোটযুদ্ধ বহুক্ষেত্রে অর্থযুদ্ধে পর্যবসিত হয়।

সুতরাং অকংগ্রেসী সরকারের পেছনে এই দুষ্ক্রিয়াও সমান চালু ছিল।

প্রলোভনের ফাঁদ পেতে কিভাবে এম-এল-এ ক্রয় করা হয়েছে ও তারই ফলে অকংগ্রেসী সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার পর-মুহূর্ত থেকেই কিভাবে ঝড়-ঝাপটা সামলে চলেছেন, ভারতের নাগরিকবৃন্দের মধ্যে যাঁদের স্মরণশক্তি হাওয়া পরিবর্তনের সঙ্গে ক্ষয়প্রাপ্ত না হয়, তাঁরাই জানেন।

এমতাবস্থায় অকংগ্রেসী সরকারগুলিকে তাঁদের নীতি-রূপায়ণের ক্ষেত্রে মুহুর্মুহু নানা বিপদ সংঘাত উত্তরণ করে এগোতে হয়েছে। তথাপি 'আদর্শ' ও নীতিতে শরিক দলগুলি স্ব স্ব ক্ষেত্রে অটুট থাকার প্রয়াস পেয়েছেন। অকংগ্রেসী সরকার যে-ক্ষেত্রে বিদ্রোহী কংগ্রেসীদের নিয়ে গরিষ্ঠতা অর্জন করেছে, জনগণ সেক্ষেত্রেও সেই বিদ্রোহী কংগ্রেসীদের মাথায় তুলে নিয়েছেন তাঁদের চারিত্রিক বলিষ্ঠতা ও নীতি-নিষ্ঠা দেখে। সুতরাং সে হিসেবেও অকংগ্রেসী সরকার নীতিভ্রষ্ট হয়েছে এ-কথা হয়ত স্বয়ং দেশাইও নিরপেক্ষভাবে বলতে ইতস্ততই করবেন। পশ্চিমবঙ্গের অজয় মুখোপাধ্যায় বা বিহারের মহামায়া-প্রসাদ নতুন করে কীর্তি স্থাপনে সক্ষম হয়েছেন। আজ তাঁরা নিঃসন্দেহে জনপ্রিয়। অকংগ্রেসী সরকার এঁদের সান্নিধ্যে কাজের সুযোগই পেয়েছেন, অর্থাৎ যে জনকল্যাণের জন্যই সরকার প্রয়োজন (সরকারের জন্য দেশ নয়) সেই জনকল্যাণের পথে অগ্রসরণের ক্ষেত্রে ঐ দুই নেতার অবদান স্মরণীয় হয়ে রইল। সে হিসাবে অকংগ্রেসীরাই বরং প্রমাণ করেছেন যে কংগ্রেসের প্রতিটি চরিত্রই গণস্বার্থ-বিরোধী চিন্তার ধারক বাহক নয়। কংগ্রেসী হিসেবেই কেউ তাঁদের কাছে অচ্ছুৎ নন, বরং মাথার মণি। তাঁদের কাছে যা পরিত্যাজ্য তা হল আদর্শহীন ক্ষুদ্র স্বার্থপরায়ণতা।

জনগণও মহামায়া কিম্বা অজয়বাবুকে যখন সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ করেন তখন বোঝা যায়, কংগ্রেসের প্রতি নয়, বিদ্বেষ জনগণের কতকগুলি বৃদ্ধ কুটচক্রীর বিরুদ্ধে। সেজন্যই বাংলা দেশ ও অন্যত্র বিদ্রোহী কংগ্রেসীরা জন্মমাত্র অভাবনীয় সাফল্যের সঙ্গে নির্বাচন-সাগর পাড়ি দিতে পেরেছেন। এই হিসেবে দেখলে এটা পরিষ্কার হয়ে যায় যে যদিও মুখে অকংগ্রেসীরা বারম্বার বলছেন কংগ্রেসকে ক্ষমতাচ্যুত করাই তাঁদের লক্ষ্য, কিন্তু কার্যত তাঁদের দৃষ্টি কংগ্রেসী নামক সেই ক্ষমতালোভী চক্রের প্রতিই। কুড়ি বছর ধরে যাঁরা শুধু নিজেরটা গোছাবার দিকেই মনোনিবেশ করে আসছেন। অনেক প্রগতিশীল দল তাই কংগ্রেসের প্রগতিবাদী গণদরদী নেতাদের সঙ্গে সর্ব বিষয়ে হাত মেলাতেও উৎসুক।

মোরারজী দেশাই-এর বক্তব্যে সে কারণ সারবত্তার অভাব লক্ষণীয়। কংগ্রেস নয়, দুর্নীতিগ্রস্ত কংগ্রেসকে গদিচ্যুত করাই ছিল অকংগ্রেসী সরকারগুলির লক্ষ্য। এজন্য তাঁরা অবাধে কংগ্রেসছুট নেতাদের শীর্ষস্থানে বসিয়েছেন একটি কর্মসূচী রূপায়ণের অঙ্গীকার পাথেয় করে। যেখানে তার হেরফের দেখা দিয়েছে, সেখানেই অকংগ্রেসীরা মন্ত্রিসভা ছেড়ে বারম্বার বেরিয়ে আসতে চেয়েছেন। অকংগ্রেসীরা তাই কংগ্রেসছুটদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে ক্ষমতা অধিকার করেছেন বলতে যা বোঝায়, কয়েকজন গদি-আকাঙ্ক্ষী সদস্যকে দলে টেনে অকংগ্রেসী সরকার ভেঙে দেওয়াকে সেই দৃষ্টিতে দেখা যায় না।

কংগ্রেস যেখানে কোয়ালিশনে বসেছে বা বসতে চলেছে সেখানে ঐ অটুট আদর্শ-নিষ্ঠার কোন্ পরিচয়টা দেখা যাচ্ছে যাতে দুটি অবস্থাকে সমদৃষ্টিতে গ্রহণ করা যেতে পারে। পশ্চিমবঙ্গ ও বিহারে অকংগ্রেসী সরকার পতনের সঙ্গে সঙ্গে গদি নিয়ে রাজ্য কংগ্রেসে যে তুলকালাম কাণ্ড শুরু হয়ে গেছে, তারপরও শ্রীদেশাই দুই অবস্থাকে কিভাবে সমদৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে পারেন তা বুদ্ধির অগোচর। অকংগ্রেসীদের ক্ষমতালাভ ও কংগ্রেসের নতুন করে ক্ষমতা করায়ত্ত করার মধ্যে মৌলিক প্রভেদের গভীর তাৎপর্যটি হয় তিনি উপলব্ধি করেন নি, নয় করতে অনিচ্ছুক।

সম্প্রতি বিহারের প্রাক্তন কংগ্রেসী মুখ্যমন্ত্রী শ্রীবিনোদানন্দ ঝার একটি বিবৃতিতে ক্ষমতালাভের পেছনে কংগ্রেসী উচ্চাকাঙ্ক্ষার রূপটি এতো বেশি প্রকট

হয়ে পড়েছে—প্রসঙ্গত যার আলোচনা আমার উপরোক্ত সিদ্ধান্তের পক্ষে সহায়ক নজীর হিসেবে উদ্ধার করা যায়। পশ্চিম-বঙ্গেও কংগ্রেসী কোয়ালিশন প্রতিষ্ঠার পর শ্রীঝার মতো অনেকে হতাশ হয়ে রুষ্ট হয়ে উঠেছেন, দৈনিক পত্রিকায় যে রোষের চিত্র শিরোনামের মর্যাদা লাভ করছে। এ সমস্তই আদর্শহীন ক্ষমতাকাঙ্ক্ষার সাক্ষ্য বহন করে। যে মেজাজের সঙ্গে অকংগ্রেসী সরকার পতনের মেজাজ একেবারেই খাপ খায় না।

শ্রীঝা ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেছেন: "মুখ খুলিবার ইচ্ছা আমার ছিল না। কিন্তু ঘটনার গতি দেখিয়া রাজ্যের পরিবর্তিত অবস্থা সম্বন্ধে নিজের বক্তব্য প্রকাশ না করিয়া পারিতেছি না। অনাস্থা প্রস্তাব কোন সময় উত্থাপন করা হইবে তাহা লইয়া আমাদের অনেকের মধ্যে মতভেদ ছিল। কিন্তু নিজেদের মনের কথা চাপিয়া রাখিয়া আমরা পার্টি ও কংগ্রেস হাই কমান্ডের নির্দেশ মানিয়া লইয়াছি ও তাঁহাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিয়াছি।

"আমাদের কার্যের ফলাফল বিচার করা এখন সম্ভব নয়। তবে দুইটি জিনিস খুব স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। আমাদের প্রতিপক্ষ আভ্যন্তরীণ কলহে ভাঙিয়া পড়িতেছিল। কিন্তু এখন তাহারা সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া উঠিতেছে এবং অনাস্থা প্রস্তাব পাশের পর জনগণের উৎসাহেও ভাটা পড়িতেছে। দ্বিতীয়ত, যে মন্ত্রিসভা গঠনের জন্য কংগ্রেস দলের নেতা মহেশপ্রসাদ সিংহ এত চেষ্টা করিয়াছিলেন, মন্ত্রিসভা গঠনের পর কিন্তু তাঁহাকেই সম্পূর্ণ পাশ কাটাইয়া যাওয়া হইতেছে। মনে হয়, তিনি একেবারে পেছনে পড়িয়া গিয়াছেন এবং অন্যান্য শক্তিগুলি সমগ্র নাটকটি পরিচালনা করিতেছে। এই পরিস্থিতির জন্য আমরা সবাই দুঃখিত। আমার সন্দেহ হয়, কয়েকজন কংগ্রেসকর্মীর পরবর্তী ক্রিয়াকলাপ আমাদের আরও লজ্জায় ফেলিবে। গুজব রটিয়াছে যে, কয়েকজন কংগ্রেসকর্মী শোষিত দলের মন্ত্রিসভার সহিত যুক্ত থাকিবে। প্রশ্ন হইতেছে, সে ব্যাপারে আমাদের নেতার মুখ্য ভূমিকা থাকিবে কি?

"আরও গুজব রটিয়াছে যে, একজন পরাজিত ভদ্রলোক মনোনীত সদস্য হিসাবে বিধান পরিষদে প্রবেশ করিতে যাইতেছেন। কেহ নির্বাচনপ্রার্থী হইলে তাহাতে আপত্তির কিছু নাই কিন্তু তিনি যদি পিছনের দুয়ার দিয়া আইনসভায় প্রবেশ করিয়া পরে সরকারী শাসনের বল্গা ধারণ করেন, তাহা হইলে সে এক অভিনব ব্যাপার ঘটিবে এবং আমাদের লজ্জা রাখিবার জায়গা থাকিবে না।

"কংগ্রেসকর্মীদের অসহায় বোধ করিবার কিছু নাই। তাঁহারা সাংবিধানিক রীতি-নীতির এই হত্যাকাণ্ড দেখিয়া নীরব দর্শক হইয়া থাকিতে পারেন না। বিহারবাসী ও কংগ্রেসকর্মীদের নিকট আমার আবেদন, আপনারা সজাগ থাকুন এবং স্বাধীনতা রক্ষার প্রয়োজনে সর্বপ্রকার ত্যাগের জন্য প্রস্তুত থাকুন।"

শ্রীঝার বিবৃতিটি লক্ষ্য করলেই মোরারজী দেশাইয়ের যুক্তির ফাঁকি আরও স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়।

শ্রীদেশাই বলেছেন, অকংগ্রেসীরা দলত্যাগীদের (অবশ্যই কংগ্রেস থেকে) মুখ্যমন্ত্রী বানিয়েছে, তাই কংগ্রেসেরও অকংগ্রেসী মন্ত্রিসভা উচ্ছেদ করার অধিকার আছে।

আগেই বলা হয়েছে দলত্যাগী বলে অকংগ্রেসী মন্ত্রিসভার যে ক্ষমতাচ্যুত মুখ্যমন্ত্রীদের ইঙ্গিত করা হয়েছে এবং কংগ্রেস যে সমুদয় দলত্যাগী নিয়ে নয়া মন্ত্রিসভা

সাপ্তাহিক বসুমতীর আগামী আকর্ষণ

॥ ভিয়েতনাম : যুদ্ধের কেন্দ্রে ॥

ভিয়েতনাম-এর বিবরণ সংবাদপত্রের প্রাত্যহিক বিষয়। কিন্তু সেই বিবরণ থেকে কতটুকুই বা জানা যায়? সাংবাদিক শ্রীবরুণ রায় ভিয়েতনাম-যুদ্ধক্ষেত্রের প্রত্যক্ষদর্শী। শুধু যুদ্ধক্ষেত্রের রোমহর্ষক আলোচনাতেই তাঁর বাস্তব লেখনী সীমাবদ্ধ নয়, তিনি সেখানের রুগ্ন মাটি ও মৃত্যুতীর্ণ মানুষের চাঞ্চল্যকর তথ্য তুলে ধরেছেন পর পর কটি আলোচনায়।

গঠন করেছেন (যেমন বিহারে বি পি মণ্ডল ও তাঁর পারিষদবর্গ) এ'দের মধ্যে সুস্পষ্ট চারিত্রিক বৈসাদৃশ্য আছে। বি পি মণ্ডল কোন্ আদর্শের প্রেরণায় দলত্যাগী কেউ তা জানেন না। শ্রীমণ্ডল ক্ষমতালাভের জন্য যেভাবে অগ্রসর হয়েছেন, গণতান্ত্রিক ভারতে কেউ তেমনভাবে বুক ফুলিয়ে এগিয়েছেন বলেও স্মরণ হয় না।

অকংগ্রেসী মন্ত্রিসভায় বি পি মণ্ডল কোনো আদর্শগত চোট পান নি। গদি ছাড়তে হল বলে মনে বড় ব্যথা পেয়ে নিজেকে শোষিত সম্প্রদায়ের পর্যায়ে ভাবতে শুরু করেন এবং গদি ফিরে পাওয়ার জন্য, বরং কিছু বেশি পাওয়া অর্থাৎ মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার জন্য তাঁর দল ভাঙানোরা খেলা সমগ্র দেশের বিস্মিত দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। বি পি মণ্ডলকে মহামায়া বা অজয়বাবুর সমপর্যায়ে চিন্তা করা কোনও বুদ্ধিমান মনুষ্যের কর্ম নয়। আমার মনে হয় শ্রীযুত দেশাই-এর বক্তব্যে নিশ্চয় এহেন কোন সচেতন উদ্দেশ্য থাকতে পারে না। হাজার হোক তিনিও কংগ্রেসী। একদলের সহকর্মীদের সম্বন্ধে তাঁর শ্রদ্ধা নষ্ট হতে পারে এমন কাজ ঐ দুই নেতার দ্বারা এ পর্যন্ত হয় নি। [illegible]তে শ্রীদেশাই বক্তব্য অন্যভাবে রাখতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সে যাই হোক, শ্রীবিনোদানন্দ ঝা-এর ক্ষোভেই স্পষ্ট, (বিশেষ মোটা হরফে চিহ্নিত বাক্যনিচয় লক্ষ্য করলে) ক্ষমতার লোভ কংগ্রেসকে আজ কিভাবে সাঁড়াশি চাপ চেপেছে। শ্রীঝার প্রধান দুঃখ, যে মহেশপ্রসাদ মহামায়া সরকার উচ্ছেদে এতো তৎপরতা দেখালেন, মন্ত্রিসভা গঠনের বেলায় তাঁকেই কিনা বাদ দেওয়া হচ্ছে। হায়, এতো কাণ্ডের উদ্দেশ্যই তো ছিল মন্ত্রিসভা অধিকার। এখন কাজ গুছোনোর পর রাজ্য কংগ্রেসে অন্য আর একদল ফলভাগী হতে চলেছে। এই ঘোর অন্যায় বিনোদানন্দ ঝার মতে সংবিধানের হত্যা। একটি জনপ্রিয় সরকারকে হটিয়ে জনৈক বি পি মণ্ডলকে মুখ্যমন্ত্রীর গদিতে বসানোর জন্য মহেশপ্রসাদের চেষ্টা কিন্তু সাধু। কী সাধু দুঃখই না আজকের কংগ্রেসী মহলকে গ্রাস করেছে।

শ্রীঝা অতঃপর সচেতন হয়ে মুখ খুলেছেন, পেছনের দরজা দিয়ে এখন এমন কারও হাতে কোয়ালিশন মন্ত্রিসভার ক্ষমতার বল্গা দেওয়া হচ্ছে, যিনি ঝা গোষ্ঠীর মনোনীত নন। সুতরাং শ্রীঝার চাঞ্চল্য স্বাভাবিক। কিন্তু মহেশপ্রসাদ যে বি পি মণ্ডলকে নিয়ে এতো কাণ্ড করলেন, স্বয়ং সেই বিন্ধ্যেশ্বরীও পিছনের দরজা দিয়েই কংগ্রেসী দরাজ বদান্যতায় মুখ্যমন্ত্রিত্ব লাভ করেন নি। তাঁর তো বিধানসভা বা বিধান পরিষদে কোন আসন ছিল না। তাঁকে পরিষদের একটি মনোনীত আসনে একজনকে পদত্যাগ করিয়ে সেই জায়গায় মনোনয়ন দিয়ে গদিনসীন করানো হল। কিন্তু এতো বড় অনাচারও শ্রীঝাকে ক্ষুব্ধ করে নি। তাঁর ক্ষোভের কারণ, গদি হস্তগত হয়েও ফস্কে যেতে বসেছে এই কারণেই।

মাত্র ২০৲ টাকায় ট্রানজিস্টার

অল ওয়ার্ল্ড ৩ ব্যান্ড সুলভতম ট্রানজিস্টার সমবায় ভিত্তির মাধ্যমে মাত্র ২০৲ টাকায় পাঠানো হয়। ইংরেজীতে আপনার অর্ডার বুক করুন।

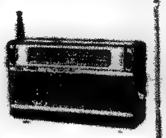

Ceylon Traders (WBC-22)
Post Box 1257, Delhi-6.

আন্তর্জাতিক

ভিয়েত কং গেরিলাদের সঙ্গে প্রচণ্ড যুদ্ধে বিপর্যস্ত মার্কিন নৌসৈন্যদের কয়েকজন

দক্ষিণ ভিয়েতনাম :

সমগ্র দক্ষিণ ভিয়েতনাম জুড়ে এখনও প্রচণ্ড লড়াই চলছে। ভিয়েত কং গেরিলাদের আক্রমণে দক্ষিণ ভিয়েতনাম ও মার্কিন সৈন্যরা বিপর্যস্ত।

সর্ব শেষ খবরে দেখা যায়, দক্ষিণ ভিয়েতনামের ৪৪টি প্রদেশের মধ্যে ৩১টি প্রদেশের রাজধানী ভিয়েত কং-দের আক্রমণে বিপন্ন। খাস সায়গনের ৯টি জেলার মধ্যে প্রায় ৬টিতে ভিয়েত কংদের প্রাধান্য দেখা যাচ্ছে। দক্ষিণ ভিয়েতনামের উপ-রাষ্ট্রপতি নুয়েন কাও কি বলেছেন, ভিয়েত কং-দের ৩ রেজিমেন্ট সৈন্য সায়গনের কাছে রয়েছে। যে-কোন সময় তারা আক্রমণ সুরু করতে পারে।

কিন্তু প্রধান লড়াই চলছে খে সান নৌঘাঁটির কাছে। দক্ষিণ ভিয়েতনামের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের এই সুরক্ষিত মার্কিন নৌঘাঁটিটি উত্তর ও দক্ষিণ ভিয়েতনামের মধ্যে অবস্থিত যুদ্ধমুক্ত এলাকার ১৫ মাইল দক্ষিণে এবং লাওস সীমান্ত থেকে ২০ মাইল পূর্বে অবস্থিত। খে সান নৌঘাঁটিটি ধ্বংস করে এই এলাকা দখল করার জন্য ভিয়েত কং গেরিলারা অভিযান সুরু করেছে। মার্কিন পক্ষের অভিযোগ, খে সান অভিযানে উত্তর ভিয়েতনামের নিয়মিত সৈনাবাহিনীও অংশ গ্রহণ করেছে। উত্তর ভিয়েতনামের প্রতিরক্ষা-মন্ত্রী ও দিয়েন বিয়েন ফু লড়াই খ্যাত বীর যোদ্ধা জেনারেল ভো নুয়েন গিয়াপ স্বয়ং নাকি খে সান অভিযানের পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছেন এবং তিনি নিজে যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত থেকে সৈন্য পরিচালনা করছেন। ১৯৫৪ সালে ফরাসীদের সঙ্গে মুক্তিসংগ্রামীদের প্রচণ্ড যুদ্ধের পর দিয়েন বিয়েন ফু'র পতন হয় এবং তারপরই ফরাসীদের পরাজয় সুনিশ্চিত হয়। দিয়েন বিয়েন ফু'র ১৩ বছর পর আবার গিয়াপ নিজে যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্য পরিচালনার জন্য উপস্থিত হয়েছেন। মার্কিন মহলের আরও খবর, খে সান দখলের জন্য গিয়াপের নেতৃত্বে ২০ হাজার উত্তর ভিয়েতনামী সৈন্য এসেছে এবং আরও ২০ হাজার সৈন্য লাওস সীমান্তের অপর পারে অপেক্ষা করছে।

খে সান দখল করে দক্ষিণ ভিয়েতনামের উত্তরাঞ্চলে পুরোপুরি কমিউনিস্ট আধিপত্য প্রতিষ্ঠাই এই অভিযানের উদ্দেশ্য। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই অভিযান প্রতিরোধ করার জন্য দৃঢ়সংকল্প। দক্ষিণ ভিয়েতনামে মার্কিন সামরিক বাহিনীর প্রধান জেনারেল ওয়েস্টমোরল্যাণ্ড ইতিমধ্যেই খে সানে আরও ৫ হাজার নৌ-সৈন্য বৃদ্ধি করেছেন। অন্যান্য অঞ্চল থেকে সৈন্যদের এখানে আনার জন্য দক্ষিণ ভিয়েতনামের অপর সকল বিমান চলাচল সাময়িকভাবে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। বর্তমানে খে সান ঘাঁটিতে ৪৫ হাজার মার্কিন সৈন রয়েছে। ওয়াশিংটনে জনসন প্রতিরক্ষাসচিব রবার্ট ম্যাকনামারা ও জয়েন্ট চীফ অব স্টাফের সঙ্গে দীর্ঘ সময় ধরে আলোচনা করেছেন। সবাই নাকি জনসনকে বুঝিয়েছেন, দিয়েন বিয়েন ফু'তে ফরাসীদের যে বিপর্যয় হয়েছিল, খে সানে মার্কিনদের তা হবার কোন আশংকা নেই। খে সান রক্ষার জন্য তাই মার্কিন সামরিক প্রস্তুতি বৃদ্ধি করা হয়েছে।

মার্কিন সৈন্য নতুন করে উত্তর ভিয়েতনামের বিরুদ্ধে পাল্টা আক্রমণ সুরু করেছে। মাঝে কিছুদিনের জন্য উত্তর ভিয়েতনামে মার্কিন বোমাবর্ষণ বন্ধ ছিল। আবার পুর্নোদ্যমে বোমাবর্ষণ সুরু করা হয়েছে। বোমাবর্ষণের প্রধান লক্ষ্য এবারও উত্তর ভিয়েতনামের রাজধানী হ্যানয় ও হাইফং বিমানঘাঁটি। যে-সব বিমান হাইফং-এ বোমা ফেলতে গিয়েছিল, তারা ফিরে এসে খবর দিয়েছে, সোভিয়েট বোমারু বিমান উত্তর ভিয়েতনামী সৈন্যদের কাছে দেখা গিয়েছে। খে সান অভিযানে উত্তর ভিয়েতনাম এই প্রথম ট্যাংক ব্যবহার করেছে। এই ট্যাংকগুলিও নাকি সোভিয়েট ইউনিয়নে প্রস্তুত।

ভিয়েত কং মুক্তিবাহিনী এবং উত্তর ভিয়েতনামের সৈন্যদল এবার বেশ ভালভাবেই প্রস্তুত হয়ে মার্কিন সৈন্যদের বিরুদ্ধে লড়াই-তে নেমেছে। প্রচুর সৈন্য, অস্ত্র ও অর্থবলে বলীয়ান হয়েও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এদের সংগে এঁটে উঠছে না। উত্তর ভিয়েতনামের সরকারী দলের দৈনিক মুখপত্র 'নান দান' বলা হয়েছে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আক্রমণাত্মক কার্য বন্ধ না করলে উত্তর ও দক্ষিণের জনসাধারণ ঐক্যবদ্ধ ভাবে এই সংগ্রামকে আরও জোরদার করবে এবং মার্কিন সৈন্যদল নিশ্চিহ্ন করা ও মুক্তিবাহিনীর চূড়ান্ত জয় না হওয়া পর্যন্ত তারা ক্ষান্ত হবে না।

উভয়পক্ষই চূড়ান্ত বোঝাপড়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। খে সানের লড়াই দিয়েন বিয়েন ফু'র মত এবারও ভিয়েতনাম যুদ্ধের ইতিহাসে শেষ কথা বলবে কি না, এখনও তা জোর করে বলার মত সময় আসে নি।

উত্তর কোরিয়া :

৫ই ফেব্রুয়ারী দক্ষিণ কোরিয়ার রাজধানী সিওলের দৈনিক পত্রিকা 'সোহোসুন ইলবো' খবর দিয়েছে, 'পুয়েবলো'র ব্যাপারে উত্তর কোরিয়া ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে মতৈক্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। শান্তিগ্রাম পানমুনজোনে কোরীয় যুদ্ধবিরতি কমিশনের বৈঠকে কয়েকবার আলোচনার পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি স্বীকার করেছেন যে, মার্কিন গোয়েন্দা জাহাজ 'পুয়েবলো' উত্তর কোরিয়ার আঞ্চলিক সাগরে প্রবেশ করেছিল এবং এর জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র উত্তর কোরিয়ার কাছে ক্ষমা চাইবে। ঠিক হয়েছে, একজন উচ্চপদস্থ মার্কিন সামরিক অফিসারের স্বাক্ষরে ক্ষমা প্রার্থনার এই পত্র প্রেরণ করা হবে। পরিবর্তে, উত্তর কোরিয়া ক্রু সহ 'পুয়েবলো'কে মুক্তি দেবে। ৮৩ জন ক্রু'র মধ্যে ১ জন মারা গেছেন এবং ২ জন গুরুতর আহত হয়েছেন। নিহত নাবিকের মৃতদেহ সহ অপর ৮২ জনকেই ছেড়ে দেওয়া হবে। পরবর্তী খবরে প্রকাশ, ৯ই ফেব্রুয়ারী পিয়াংগিয়াং থেকে

ক্রু-দের গ্রেপ্তার করে পানমুনজামের উত্তরে অবস্থিত কায়সং-এ আনা হয়েছে। কায়সং রওনা হবার পূর্বে এদের নাকি পিয়াং-পিয়াং-এ এক বিরাট সমাবেশে উত্তেজিত জনতার বিদ্রূপ ও গঞ্জনার সম্মুখীন হতে হয়েছে। কায়সং-এ বন্দী ক্রু-দের আনা হয়েছে, পানমুনজামে মার্কিন সামরিক প্রতিনিধিদের হাতে এদের প্রত্যর্পণ করার জন্য।

কিন্তু ১০ই ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত এই বন্দীদের মুক্তি দেবার কোন সংবাদ পাওয়া যায় নি। বরং, ১০ই ফেব্রুয়ারী পানমুন-জামে দুইপক্ষের মধ্যে আর একবার গোপন বৈঠক হয়েছে দেখা যাচ্ছে। এই নিয়ে দুপক্ষের ভেতর পঞ্চম বার বৈঠক হল।

তবে 'পুয়েবলো'র ব্যাপারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যে নরম হয়েছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। 'পুয়েবলো' আটক করার সঙ্গে সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যেভাবে সামরিক তৎপরতা বৃদ্ধি করেছিল, তাতে রীতিমত একটা যুদ্ধ সুরু হবার আশংকা দেখা দিয়েছিল। মার্কিন নৌবহর 'এন্টার-প্রাইজ' জাপান সাগরে উত্তর কোরিয়া অভিমুখে রওনা হয়েছিল। 'এন্টার-প্রাইজে'র শক্তিবৃদ্ধির জন্য সাপোর্ট-ক্যারিয়ার 'ইয়র্ক টাউন', অ্যাটাক-ক্যারিয়ার 'ক্যানবেরা', ১১টি ডেস্ট্রয়ার, আর একটি গোয়েন্দা জাহাজ 'ব্যানার' এবং অসংখ্য বোমারু বিমান পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে বিশ্বজনমতের গতি দেখে বোধ হয় মার্কিন কর্তারা সম্বিৎ ফিরে পেয়েছেন। নিজেদের দেশেও তাদের কম সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয় নি।

শেষ পর্যন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র উত্তর কোরিয়ার সঙ্গে আলোচনায় বসেছে। শান্তির পরিবেশ সৃষ্টির জন্য 'এন্টার-প্রাইজ'কেও উত্তর কোরিয়া থেকে সরিয়ে নিয়ে এসেছে।

মার্কিন কর্তারা একথাও বুঝেছেন, 'পুয়েবলো' যে গোয়েন্দাগিরি করার জন্য উত্তর কোরিয়ার আঞ্চলিক সাগরের মধ্যে ঢুকে পড়েছিল, এ কথা স্বীকার না করলে কোন মীমাংসা হবে না। তাই দেখা যাচ্ছে, ওয়াশিংটনে পররাষ্ট্রসচিব ডিন রাস্ক ও প্রতিরক্ষাসচিব রবার্ট ম্যাকনামারা উভয়েই প্রকারান্তরে এ কথা স্বীকার করেছেন। এমন কি 'পেনটাগন' পর্যন্ত এ কথা মেনে নিতে বাধ্য হয়েছে। ৯ই ফেব্রুয়ারী 'পেনটাগনের' একজন মুখপাত্র ওয়াশিংটনে বলেছেন, ১০ ও ২১ জানুয়ারী 'পুয়েবলোর' ওপর বেতারের কোন নিয়ন্ত্রণ ছিল না, এ অবস্থায় তার পক্ষে উত্তর কোরিয়ার আঞ্চলিক দরিয়ায় ঢুকে পড়া একেবারে অসম্ভব নাও হতে পারে!

তবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যেভাবে 'পুয়েবলো'র ব্যাপারে দুটি স্বীকার ও ক্ষমা প্রার্থনা করে উত্তর কোরিয়ার সঙ্গে মিটমাট করে নিচ্ছে, দক্ষিণ কোরিয়া সরকারের তা একেবারেই পছন্দ নয়। কোরিয়া ফ্রন্টে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সম্মানহানি ও উত্তর কোরিয়ার মর্যাদা-বৃদ্ধি দক্ষিণ কোরিয়ার দিক থেকে অত্যন্ত অস্বস্তিকর এবং তার ভবিষ্যৎ নিরাপত্তার পক্ষে বিপজ্জনক। তাই এখন দক্ষিণ কোরিয়ার সরকারী কর্তারা মার্কিন যুক্ত-রাষ্ট্রের বিরুদ্ধেই বিক্ষোভ প্রকাশ করছেন। পানমুনজামের আলোচনাও তাঁরা পছন্দ করেন নি। তাঁদের বক্তব্য, দক্ষিণ কোরিয়ার রাষ্ট্রপতি চুং-হি পার্ককে হত্যা করার জন্য কমিউনিস্টরা ২১শে জানুয়ারী যে ব্যর্থ-চক্রান্ত করে-ছিল, আগে সে-বিষয়ে আলোচনা করতে হবে এবং উত্তর কোরিয়া এ ব্যাপারে ক্ষমা চাইবার পর অন্য বিষয়ে আলোচনা হবে। স্বাভাবিকভাবেই মার্কিন কর্তৃপক্ষ এ কথায় কর্ণপাত করেন নি। এখন দক্ষিণ কোরিয়ার দাবি, উত্তর কোরিয়ার আক্রমণাত্মক কার্যের বিরুদ্ধে দক্ষিণ কোরিয়াকে রক্ষা করার জন্য আরও বেশি করে মার্কিন সৈন্য প্রেরণ করতে হবে, না হলে তারা দক্ষিণ ভিয়েতনাম থেকে কোরীয় সৈন্যদের ফিরিয়ে আনবে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দক্ষিণ কোরিয়ার আব্দার মত উত্তর কোরিয়ার সঙ্গে আলোচনা বন্ধ করে নি, কারণ 'পুয়েবলো' নিয়ে তার ছুঁচো গেলার মত অবস্থা হয়েছিল। তবে দক্ষিণ কোরিয়ায় আরও বেশি সৈন্য প্রেরণে বোধ হয় তার আপত্তি নেই, যদি না অবশ্য ভিয়েতনামের বাধা আসে। তাই দেখছি, জনসন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রাক্তন সহকারী প্রতিরক্ষা-সচিব সাইরাস ভ্যান্সকে সিওল পাঠিয়ে-ছেন এ ব্যাপারে দক্ষিণ কোরিয়ার নেতা-দের সঙ্গে কথাবার্তা বলার জন্য।

'পুয়েবলো'র ব্যাপারে অপমানের জ্বালা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সহজে ভুলতে পারবে না। তাই ভবিষ্যতে দক্ষিণ কোরিয়া আক্রান্ত, এই অজুহাতে নতুন করে উত্তর কোরিয়ার বিরুদ্ধে মার্কিন হামলা সুরু হলে বিস্মিত হবার কিছু থাকবে না। ভ্যান্স সফর তারই প্রস্তুতি।

কিউবা :

কিউবার বর্তমান শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগে গত সপ্তাহে হাভানায় ৩৭ জনের বিচার ও শাস্তি হয়েছে।

আমেরিকা ভূখণ্ডের একমাত্র কমিউ-নিস্ট রাষ্ট্র কিউবায় গুপ্তচরবৃত্তির অভি-যোগ নতুন নয়। কিন্তু এতদিন যত অভিযোগ আনা হয়েছে, তার পেছনে মার্কিন গোয়েন্দা বিভাগের হাত ছিল এবং গুপ্তচররা মার্কিন সরকারের পক্ষে কাজ করেছে, এই কথা বলা হয়েছে। কিন্তু এবারের অভিযোগটা সম্পূর্ণ বিপরীত। এই গুপ্তচররা নাকি সোভিয়েট সরকারের পক্ষে চক্রান্ত করছিল।

ফাইডেল ক্যাস্ট্রোর ভাই ও কিউবার অন্যতম বিশিষ্ট নেতা রাউল ক্যাস্ট্রো স্বয়ং এই গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগ এনে-ছেন। চক্রান্তকারীদের প্রধান আনিবাল এসকালান্তে নিজেও কিউবার একজন প্রবীণ ও বিশিষ্ট কমিউনিস্ট নেতা।

রাউলের অভিযোগ, আনিবাল এসকা-লান্তের নেতৃত্বে একটি দল কিউবার কমিউনিস্ট পার্টি ও সরকারের মধ্যে সোভিয়েট ইউনিয়নের পক্ষে একটি চক্র গড়ে তুলেছে। এরা সোভিয়েট ইউনিয়ন, চেকোস্লোভাকিয়া এবং অন্যান্য পূর্ব য়ুরোপের দূতাবাসের সাহায্যে গুপ্তচর-বৃত্তির কাজে লিপ্ত রয়েছে। চিলি ও আর্জেন্টিনা থেকেও এরা সাহায্য পেয়েছে।

এই সোভিয়েটপন্থীরা ফাইডেল ক্যাস্ট্রোর সরকার উৎখাতের কোন চেষ্টা করে নি, এদের উদ্দেশ্য ছিল সরকারের নীতির পরিবর্তন করা। কিউবার অর্থ-নৈতিক নীতির পরিবর্তন, বিশেষ করে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে কিউবার অনুসৃত বিপ্লবী নীতির পরিবর্তনই নাকি এদের লক্ষ্য। ল্যাতিন আমেরিকার বিভিন্ন দেশে বর্তমানে কিউবা যে গেরিলা যুদ্ধের উস্কানি দিচ্ছে, তার পরিবর্তে এরা শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতি অনুসরণ করতে চেয়েছে। চে গুয়েভারার নীতিকে এরা সম্পূর্ণ পাল্টে দিতে চায়।

বিচারের ফলে গুপ্তচরদের প্রধান নায়ক এসকালান্তের ১৫ বৎসর কারাদণ্ড হয়েছে এবং অন্যান্যদেরও সকলেরই কম-বেশি শাস্তি হয়েছে।

মার্কিন আক্রমণাত্মক কার্যের বিরুদ্ধে কিউবার রক্ষায় বারে বারে সোভিয়েট ইউনিয়ন এগিয়ে এসেছে। তবু বিভিন্ন প্রশ্নে সোভিয়েট ইউনিয়নের সঙ্গে কিউবার মতভেদ রয়েছে। কিন্তু এই মতভেদের দরুণ শেষ পর্যন্ত সোভিয়েট ইউনিয়ন কিউবা সরকারের বিরুদ্ধে গুপ্ত-চরবৃত্তিতে উস্কানি দেবে, এটা আপাত-দৃষ্টিতে অবিশ্বাস্য বলেই মনে হয়। তবে এই ঘটনা কিউবা-সোভিয়েট ইউনিয়ন সম্পর্কের ক্ষেত্রে অবনতির লক্ষণ, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

যা দেখেছি, যা পেয়েছি

স্মৃতিচয়ন

শ্রীসুধীরঞ্জন দাস

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

অষ্টবিংশ অধ্যায়

কলকাতা হাইকোর্টে জজীয়তী

(১)

উনিশ শ' চল্লিশ সাল থেকেই মাঝে মাঝে বার লাইব্রেরীতে জল্পনা-কল্পনা উঠত যে আসছেবার ব্যারিস্টারদের মধ্যে কে জজ হবেন। আমার নামও তার মধ্যে শোনা যেত। কিন্তু সে সব গুজবের কোন ভিত্তিই ছিল না। চীফ জাস্টিস ডার্বিসায়ারের সামনে মাঝে মাঝে আপীল কোর্টে হাজির হওয়া ছাড়া তাঁর সঙ্গে আমার একেবারেই পরিচয় ছিল না। আর যে সব আপীলে আমি তাঁর কাছে ব্রীফ পেয়েছিলাম সেগুলির মধ্যে নিজের কল্পনা দেখাবার তেমন সুযোগও ছিল না এবং আমার কোন সওয়াল-জবাব যে তাঁকে মুগ্ধ ও অভিভূত করে ফেলেছিল তা ভাবিও করতে পারি নে। তবে ওরিজিন্যাল সাইডে যেখানে আমার কাজ বেশি ছিল সেই সব কোর্টের জজেদের সঙ্গে চীফ জাস্টিস ডার্বিসায়ারের ওরিজিন্যাল সাইডের ব্যারিস্টারদের সম্বন্ধে কোন আলোচনা হয়েছে কিনা কখনো তাও জানি নে। লর্ট উইলিয়ামস সাহেবের ঘরে আমার ব্রীফ এক সময়ে আসত খুব বেশি এবং তাঁর কোর্টে আমার কাজ করতে সুবিধেই হোতো—অর্থাৎ আমার কাজ তাঁর পছন্দসই হোতো বলেই মনে করতাম। কিন্তু তাঁর সঙ্গে ত' চীফ জাস্টিসের বাক্যালাপই বন্ধ ছিল। ম্যাকনেয়ার ও আমীর আলী সাহেবর কোর্টে বিস্তর ব্যারিস্টার বসে থেতেন। সুতরাং তাঁদের মধ্যে আমার হয়ে চীফ জাস্টিসকে এঁরা সুপারিশ করবেন বলে ধরে নেবার কোনই কারণ ছিল না। এক ছিলেন প্যানক্রিজ সাহেব যাঁর কোর্টে আমাকে প্রায়ই যেতে হোতো। একবার একটা কেস করছিলাম প্যানক্রিজ সাহেবের ঘরে। তখন গুরুদেব রবীন্দ্রনাথকে খুবই অসুস্থ অবস্থায় কলকাতায় অস্ত্রোপচারের জন্যে আনা হয়েছিল। অস্ত্রোপচারের পর তাঁর শারীরিক অবস্থা ক্রমশই খারাপের দিকে যাচ্ছিল। ১৯৪১ সালের ৭ই আগস্ট সকালেই শুনেছিলাম যে তাঁর বাঁচবার আর কোন আশাই নেই। মহামনীষী তখন মহাপ্রয়াণের পথে যাত্রা করেছেন। যখন সকালে গিয়ে সেই অর্ধেক শোনা কেসটা করতে লাগলাম মনটা যেন কেমন বিক্ষিপ্ত হয়েছিল। মুখে মুখে শহরময় খবর পৌঁছল যে রবীন্দ্রনাথ শেষ নিশ্বাস ফেলেছেন। কোর্টেও সে খবর এলো। প্যানক্রিজ সাহেব, কি করে জানি না, জানতেন যে আমি শান্তিনিকেতনের ছাত্র। মধ্যাহ্ন বিরতির পর কোর্টে এসেই বললেন—

"Mr. Das you must have heard the sad news about the Poet. If you desire to go and pay your last respects to him I can rise now."

কৃতজ্ঞতায় আমার হৃদয় সেদিন উদ্বেলিত হয়ে উঠেছিল। আমি মাথা নেড়ে জানালাম যে আমি যেতে চাই। জজ সাহেব উঠে পড়লেন। একটুক্ষণ পরেই তাঁর এক চাপরাশী এসে জানাল যে কবির শব শোভাযাত্রাটা কোন্ পথ দিয়ে যাবে তা যেন তাঁকে পারলে জানিয়ে দিই টেলিফোনে। বুঝলাম যে প্যানক্রিজ সাহেবেরও মনোগত বাসনা ছিল রবীন্দ্রনাথকে একবার শেষ দেখা দেখে নেবার। প্যানক্রিজ সাহেবের সঙ্গে আমার অন্তরঙ্গতা এর উপরে ওঠে নি কখনো। তিনি যে আমার জন্যে আগ বাড়িয়ে চীফ জাস্টিসের কাছে সুপারিশ করবেন তা ভাবতেই পারি নি। মনে হয় বার লাইব্রেরীতে এই ধরণের গুজব উঠত আমার কাছ থেকে বেয়ে চেয়ে জেনে নেবার জন্যে যে ভেতরে ভেতরে কোন কথা হচ্ছে কি না। সুতরাং আমাদের এক জুনিয়ার ব্যারিস্টার বন্ধুর উক্তির নকল করে হেসে বলতাম—"তোমরা আমার পা টানছ?"

উনিশ শ' বেয়াল্লিশ সালের পুজোর ছুটিটা সপরিবারে কালিম্পংয়ে কাটিয়েছিলাম। পুজাবকাশের পর সেবার হাইকোর্ট খুলেছিল আঠারই নভেম্বর। আমাদের ছোট ছেলে মাণিক (সুহৃদ)-এর তখন শরীরটা বেশ খারাপই ছিল। তার আগে পাটনাতে টাইফয়েড হয়ে তিনি খুবই ভুগেছিলেন। সেই জন্যে বুবু মাণিককে নিয়ে কালিম্পংয়ে রয়ে গেলেন এবং আমি আমাদের মেয়ে কাজল (অঞ্জনা)-কে নিয়ে কলকাতায় ফিরে এলাম। আমাদের বড় ছেলে সুরঞ্জন তখন হাওয়াই ফৌজে ঢুকে বোধ হয় বম্বেতে বা যোধপুরে ট্রেনিং নিচ্ছিলেন। আমার কোর্ট খুলবার আগেই কলকাতা ফেরার উদ্দেশ্য ছিল যে কাজল স্কুলের পড়া এবং আমি এটর্নীদের সঙ্গে কনসাল্টেসন করে কেসগুলি তৈরি করে রাখব। সেই সময়টায় বুবু কলকাতায় না থাকায় আমার সংসারের যাবতীয় ভার কাজল নেন তাঁরই ঘাড়ে। সুতরাং সেই আঠার উনিশ বছরের মেয়ে চাকরবাকরদের উপর সর্দারী করতেন এবং আমার উপর তাঁর গার্জেনীর অন্ত ছিল না—নাওয়া শোওয়া আহারে। কোর্ট খুলতে মোটে কয়েকদিন বাকি। সেদিন সারা সকালটা বেশ খাটুনীই হয়েছিল আমার এটর্নী মক্কেল নিয়ে ব্রীফ পড়তে। যথাসময়ে গার্জেন আফিসঘরে এসে সকলের জ্ঞাতার্থে জানালেন যে তাঁর বাপের আর দেরি করা চলবে না। খেয়ে-দেয়ে বিশ্রাম করতেই হবে। নইলে শরীর খারাপ হলে মাকে কি বলবেন? আমার এটর্নী বন্ধুরা সবাই কাজলকে জানতেন এবং স্নেহও করতেন। তাঁরা ব্যাপার বুঝে —"হ্যাঁ, তাই ত', বড় বেলাই ত' হয়ে গেছে" বলে কাগজপত্র গুটিয়ে উঠে গেলেন। কাজলকে মৃদু তিরস্কারের মত গলা করে কিন্তু হাসতে হাসতে বললাম—"তুই ত' আচ্ছা মেয়ে। ভদ্রলোকদের ঐ রকম করে তাড়ালি?" কাজল বললেন—"তাড়াব না ত' কি। মা থাকলে আরো আগেই তাড়িয়ে দিতেন।" মেয়ের মাথায় হাত

মৌসুমী নকশা
পথ চলতে পায়ের আরাম—
চমৎকার খোলামেলা গড়ন, ছিমছাম
মনোরম স্টাইল...বাটার এইসব স্যান্ডাল বা চপ্পলে
নিজেকে আপনি অনেক বেশি পরিচ্ছন্ন
এবং স্বাচ্ছন্দ বোধ করবেন। সঠাম,
কোমল ওপর-চামড়া, তেমনি মোলায়েম আর
মজবুত সোল—প্রত্যেক পদক্ষেপে আশ্চর্য
আরাম। স্টাইলের বহুমুখী বৈচিত্র্য
এদের আরেকটি বৈশিষ্ট্য। আজই এসে
দেখে যান বাটার দোকানে স্যান্ডাল ও চপ্পলের
সুদর্শন মৌসুমী নকশা।
অরুণা ১০.৫০
১২.৫০
শান্তি ১৬.৯৫
Bata
৭.৯৫
এয়ারকুল ১৭.৯৫

বুলিয়ে তারিফ করে স্নান সেরে খেয়ে দেয়ে বিছানায় একটু অঙ্গ দিয়েছি ঠিক দিই নি ভাতের ঘুমে চোখটা বুজে এসেছিল। এমন সময় কাজল দৌড়ে হন্তদন্ত হয়ে শোবার ঘরে এসে আমাকে ঠেলে জাগিয়ে দিলেন যে জরুরী কি টেলিফোন এসেছে। পরে যা শুনলাম তাতে কাজলের ও যিনি টেলিফোনে কথা বলেছিলেন তাঁর যে কথাবার্তা হয়েছিল সেটা এই ধরণের :

The Caller : May I speak to Mr. S. R. Das ?

Kajal : Father is resting. Please ring up later.

The Caller : The matter is very urgent, I must speak to Mr. Das at once.

Kajal : Father is resting and can't be disturbed now.

The Caller : Will you please tell Mr. Das that The Chief Justice of Bengal wants to speak to him ?

চীফ জাস্টিস কথা কইতে চান শুনেই ভয় পেয়ে মেয়ে টেলিফোনের রিসিভারটা ফেলে দৌড়ে এসেছেন বাপকে খবর দিতে। ধড়ফড়িয়ে উঠে গিয়ে রিসিভারটা তুলে কথা বললাম।

Self : Yes, Das speaking.

The Caller : This is Chief Justice speaking.

Self : Yes, Sir Harold ?

C. J. : I want to see you very urgently.

Self : When and where do you want me to see you ?

C. J. : Now. At my house. Can you manage it ?

Self : Yes. I shall come at once.

C. J. : So long then.

কথাবার্তা শেষ হোলো। ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারছিলাম না। তবে এটা যে জজীয়তী সম্বন্ধে হতে পারে তা যে মনে হয় নি তাও বলতে পারি না। খানিকটা কেমন এলোমেলো ভাবনা মনে আসতে লাগল। আমার ড্রাইভার তখন বাড়ি চলে গেছে। সন্ধ্যের আগে আর আসবে না। কি করা যায়। পোষাক পরে একটা ট্যাক্সি ডাকিয়ে চললাম চীফ জাস্টিসের মিডলটন রোর বাড়িতে—লরেটো হাউসের উল্টো দিকে। যেতেই চীফের জমাদার বেশ বড় একটা সেলাম করে গাড়িবারান্দা থেকে ভেতরে নিয়ে বসবার ঘরে বসিয়ে বড় সাহেবকে খবর দিতে ছুটল। ডার্বিসায়ার ঘরে ঢুকেই হাত বাড়িয়ে করমর্দন করে "Had a nice holiday ?" বলে বসতে বলে পাশেই বসলেন। তারপর যা কথাবার্তা হোলো সেটা সংক্ষেপে এইরকম :

C. J. : Das, I should have spoken to you before we broke up for the Pujas. It is my fault. I was myself anxious to get away for my holiday. The reason for my sending for you is to offer you a place on the Bench in the place of poor Panckridge.

Self : A judgeship for me ?

C. J. : Yes, why not ? I have seen you in Court and I have heard a lot about you from Panckridge. I hope you will take it.

Self : It is very kind of you, Sir Harold. But I must consult my wife who is away at Kalimpong. I do not know if she will be able to manage with a judges' pay.

C. J. : You have no liabilities. You have a small family. If you don't take it I shall have to bring out somebody from England. But I don't want to do it.

Self : I appreciate the honour but the only question is whether I can afford to give up my income at the bar.

C. J. : I know you are making much more than a judge's pay. But think of it, Das. A judgeship will bring you a secluded life or ease and comfort. You can render a good deal of service to your country as a judge. Besides, don't forget a judgeship will bring you a comfortable pension in your old age.

Self : There is, no doubt, force in what you are saying.

C. J. : Look at old H. D. Bose. He declined judgeship twice and now in his old age he has to work like a slave. Think of these things and let me have your answer here and now. I shall immediately ring up the Governor so that the matter will be finalised immediately and you can be sworn in on the very reopening day. This is a call of duty and a barrister cannot refuse to respond unless there be any real good reason for it.

আর কোন ওজর মনে না আসায় খালি জানালাম যে আমার জজের পোষাক ও গাউন আসছে সোমবারে কিছুতেই তৈরি হবে না। তিনি হেসে বললেন—

"That does not matter. We can lend you one for a few days. At any rate you can use your barrister's gown until your judges' robe is available. Thank you, Das. Wait a minute. I shall ring up the Governor at once."

বলেই সিঁড়িবরে গিয়ে টেলিফোন ধরলেন। শুনতে পেলাম তিনি বলছেন—

"He is willing. Finalise the matter as soon as possible."

ফিরে এসে বেশ হাসি হাসি মুখে চাপরাশীকে বললেন লেডি সাহেবকে খবর দিতে। এক বুধা ঘরে ঢুকলেন। আমাকে অভিনন্দন জানিয়ে করমর্দন করে চা খাওয়ালেন। আমার মাথাটা তখন

কেমন যেন পাক খাচ্ছিল। কি যেন একটা ওলটপালট হয়ে গেল আমার জীবনে। শিষ্টাচার সেরে বেরিয়ে এলাম। গাড়ি-বারান্দা পর্যন্ত চীফ জাস্টিস এগিয়ে দিলেন। নিজের ঠোঁটের উপর তর্জনীটা রেখে হাসতে হাসতে বললেন—

"Mum's the word, Das, except to your wife."

মাথা নেড়ে জানালাম যে বুঝেছি। বাড়ি থেকে বেরিয়ে একটু হেঁটে ক্যামাক স্ট্রীটে একটা ট্যাক্সি ধরে বাড়ি ফিরলাম। কাজল বোঝেনই নি যে আমাকে জজীয়তী দেবার জন্যে চীফ জাস্টিস ডেকে পাঠিয়েছিলেন। তিনি ভেবেছিলেন কোন কেস সংক্রান্ত ব্যাপারের আলোচনা হয়েছিল। তাই তিনি আর কোন কথাই তোলেন নি। বাবা মা আগেই চলে গেছেন। বুবুকে লক্ষ্য করে জানালাম সব ব্যাপারটা। পরে যথাসময়ে তিনি সম্মতি জানালেন। সেইদিন সন্ধ্যায় বৌঠানকে গিয়ে প্রণাম করে এলাম কিছু না বলে। ফেরবার পথে আমাদের পরিবারের শুভানুধ্যায়ী স্যার-বাহাদুর রামতরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মশায়ের সঙ্গেও দেখা করে এলাম। খুবই সৌভাগ্যের বিষয় যে বার লাইব্রেরীতে ছুটির জন্যে তখনো সদস্যদের সমাগম হয় নি এবং জজীয়তীর কোন গুজব তখনও ওঠে নি। সুতরাং অনুসন্ধিৎসু কেউই আমাকে এ বিষয়ে কোন প্রশ্নই করেন নি। করলে জাজ্জল্যমান মিথ্যে কি করে বলতাম? যাক, জিজ্ঞেস না করায় চীফ জাস্টিসের কাছে আমার কথার খেলাপ হয় নি।

এদিকে নতুন ব্রীফও আসছে। ছাড়তেও পারি না. কেন না তা হলেই সন্দেহ হবে এটর্নীদের, যে একটা কিছু ঘটেছে। দেখতে দেখতে ১৮ই নভেম্বর কোর্ট খুলে গেল কিন্তু আমার জজীয়তীর কোন ঘোষণাই বের হোলো না। কি করা যায়? আফিসে গেলাম। কোর্টে কাজও করলাম। বাড়ি ফিরে সন্ধ্যার সময় এটর্নী মক্কেল নিয়ে কনসাল্টেসনও করলাম। সব জিনিষটাই যেন অলীক বলে ঠেকতে লাগল। এই রকমভাবে নভেম্বরের তিন সপ্তাহই কেটে গেল। আবার ভাবলাম যে হয়ত রাজনৈতিক কোন কারণে প্রস্তাবটা বানচাল হয়ে গেছে যেমন হয়েছিল অতুল গুপ্ত মশায়ের বেলায়। হাজার হোক দেশবন্ধুর ভাই ত'। চুলোয় যাক জজীয়তী। কাজে মন দিলাম। নভেম্বরের প্রায় শেষভাগে পৌঁছে গেলাম। সন্ধ্যায় আমার আফিস ঘরে খুব জোর একটা কনসাল্টেসন চলছিল। টেবিলের উপর মারোয়াড়ী লালু বাঁধান লম্বা হিসেবের খাতা ছড়ান —রোকড়, নকল ও খাতা বা লেজার। কি একটা দফা (entry) খুব মনোযোগ দিয়ে দেখছি এমন সময় ঝন্ ঝন্ করে টেলিফোন বেজে উঠল। রিসিভারটা কানে দিতেই শুনলাম সুশীল সেনের আওয়াজ। বললেন—"বাবা, ডুবে ডুবে জল খাওয়া হচ্ছিল?" শুধালেম—"হোলো কি হে? কথা ত' শোনালে খুব।" সুশীল বললেন—"রেডিও টেডিও রাখ?" বললাম—"না ত'। কনসাল্টেসনই করব, না, রেডিও শুনব?" সুশীল বললেন—"এইমাত্র রেডিওতে বললে যে তুমি গদিতে উঠে গেছ হে। মেরে দিলে, বাবা। যাই হোক, খুব খুশি হয়েছি, ভাই।" সুশীল বরাবরই আমাকে মদত দিতেন। তা ছাড়া একটা বাঁদী ত' ব্রজ হোলো। খুশি হবারই কথা। টেলিফোনটা রেখে দিয়ে মুখ ফিরিয়ে দেখি আমার এটর্নী ও মক্কেলরা উদ্‌গ্রীব হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে আছেন। তাঁরা সঠিক বোঝেন নি কিছু কিন্তু আমার সম্বন্ধে রেডিওতে কিছু বলেছে সেটা বুঝে আঁচ করেছিলেন বিষয়টা। তখন আর না বলার কোনো মানে হয় না। তা ছাড়া ঐ সময়ে বসে কাজ করবার মত মানসিক সংযম আমার ছিল না। এটর্নী পাত-তাড়ি গুটিয়ে উঠলেন। আমার ব্রীফটা ও যে নোটটা করেছিলাম তা দিয়ে দিলাম।

তারপর আরম্ভ হোলো টেলিফোনের পালা, রাত দুপুর পর্যন্ত। ঠিক মনে নেই সেদিন বোধ হয় ছিল ২৮শে কি ২৯শে নভেম্বর। চীফ জাস্টিসের সচিব জানালেন যে ১লা ডিসেম্বর সকালেই শপথ নিয়ে কোর্টে বসতে হবে। জজের পোষাক আর গাউন কোথা? ওই ব্যারিস্টারের কালো কোটেই চলবে? গাউন? টেলিফোন করলাম সতীশ দাদার ছেলে ধ্রুবরঞ্জনকে। বললাম—"ওহে ধ্রুব, তোমার বাবার পুরনো গাউনটা আছে? ক'দিনের জন্যে দিতে পার?" ধ্রুব উৎসাহিত হয়ে বললেন—"হ্যাঁ, আছে বৈকি। আমি কাল সকালেই পৌঁছে দেব।" বুবুকে টেলিগ্রাম করলাম তার পরদিন সকালে। আমার অতি প্রিয় ও বিশ্বস্ত মুহুরী বিধুভূষণ এলেন প্রায় কাঁদ কাঁদ হয়ে। "আপনি এ কি সর্বনাশ করলেন, স্যার। এতগুলো টাকা ছেড়ে দিলেন।" ব্যারিস্টারদের ক্লার্কের দশার সঙ্গে তুলনা হয় মারি করেলির Sorrows of Satan-এর (শয়তানের দশার)। ক্লার্ক খেটেখুটে তার সাহেবকে দাঁড় করায় সেইটেই তার ধর্ম। কিন্তু সাহেব তার যত উপরে ওঠে ততই জজীয়তীর নাগালের মধ্যে এসে পড়ে—এই ভয়ও তার মনকে উতলা করে। ব্যারিস্টারের বাবুর মাইনেটা অত্যন্তই গৌণ, তহুরীটাই আসল। একদিনে সেটা বন্ধ হয়ে গেল বেচারী বিধুভূষণের। যতটা সম্ভব বুঝিয়ে সুঝিয়ে তাঁকে বিদায় করলাম। আমার ডেভিলরা সবাই

অপরিসীম খুশি হলেন। আমার ভাইয়েদের ত' কথাই নেই।

পয়লা ডিসেম্বর কোর্টে গেলাম—বাবা মাকে মনে মনে স্মরণ করে এবং সমস্ত মনপ্রাণ লুটিয়ে তাঁদিকে প্রণাম্ করে। ইডেন গার্ডেনের উত্তর-পূর্ব কোণায় বাঁ দিকে মোড় ঘুরে একটু এগিয়ে গিয়ে আবার মোড় ঘুরে লর্ড অকল্যান্ডের ব্রোঞ্জ মূর্তি বাঁয়ে রেখে এগিয়ে লর্ড নর্থব্রুকের মূর্তির কাছে একটু দাঁড়িয়ে বোধ হয় আমার ভাই প্রদোষকে নামিয়ে দিয়ে হাইকোর্টের দক্ষিণ-পশ্চিম গেট যেটাকে বলে Judges' gate, সেইটে দিয়ে ঢুকে ডান দিকের ছোট সিঁড়ি ঘরের কাছে নামলাম। রেজিস্ট্রার, চীফ জাস্টিসের সচিব এবং অনেক চাপরাশীর দল ও জন-কতক এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান সার্জেন্ট অভ্যর্থনা করলেন নমস্কার করে। সকলকে প্রতি-নমস্কার করে অফিসারদের সঙ্গে করমর্দন করে উপরে উঠে গেলাম। শুনলাম যে আমাকে আপাতত হাইকোর্টের উত্তরের দিকে নতুন সেসন্স কোর্ট যেটা তখন খালি ছিল সেখানে বসতে হবে। রেজিস্ট্রার আমাকে পথ দেখিয়ে সে কোর্টের চেম্বারে পৌঁছে দিলেন। সিঁড়ি দিয়ে উঠে বাঁ দিকের পাটি দিয়ে মোড়া গলির উপর দিয়ে জজের লাইব্রেরীর ভিতর দিয়ে আবার সরু একটা পথ দিয়ে এগিয়ে ডান দিকে মোড় ঘুরতেই দেখলাম কাঠের পার্টিসনে ঘেরা এক সার কতকগুলো খুপরি। পরে জেনেছিলাম যে সেই সব চেম্বারকে বলা হাতো Horse boxes. সব চেয়ে যেটা শেষের সেই চেম্বারের ভিতর দিয়ে আবার ছোট গলি দিয়ে গিয়ে পৌঁছলাম সেসন্স কোর্টের জজের চেম্বারে। জজ আক্রাম তখন ছিলেন ওই শেষের Horse Box-টাতে। তাঁর ঘরের মধ্যে দিয়ে যেতে হোলো বলে একটু ইতস্তত করছিলাম দেখে তিনি বললেন—

"Never mind, Das, I am a roadside judge."

আমার নির্দিষ্ট চেম্বারে গিয়ে কাপড়-চোপড় বদলিয়ে ফিরলাম চীফ জাস্টিসের ঘরে। সেখানে দেখলাম সব কয়জন জজই সমবেত হয়েছেন। চীফের সচিবের সঙ্গে ঘরে ঢুকতেই চীফ তাঁর টেবিলের সামনে উঠে দাঁড়ালেন। অন্য জজেরাও উঠলেন। আমি চীফের বাঁ পাশে দাঁড়ালাম। রেজিস্ট্রার শপথের কাগজখানা আমার হাতে দিলেন। চীফ পড়ে যেতে লাগলেন আর-আমি সেই হলফটার পুনরাবৃত্তি করে গেলাম। বোধ হয় এক মিনিটেরও বেশি সময় লাগে নি। তারপর কি একটা খাতায় না কাগজে সই করলাম। আমি কলকাতা হাইকোর্টের অতিরিক্ত (additional) জজ হলাম। চীফ সাহেব করমর্দন করে অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানালেন। অন্যান্য জজেরাও তাই করলেন। শিষ্টাচার সেরে আবার হাই-কোর্টের পশ্চিম ও উত্তর দিক প্রদক্ষিণ করে সেসন্স কোর্টের জজের চেম্বারে গিয়ে পৌঁছলাম।

গিয়ে দেখি ঘরে বসে আছেন আমাদের এ্যাডভোকেট জেনারেল স্যার অশোক রায় ও ওরিজিন্যাল সাইডের রেজিস্ট্রার, ডেপুটি রেজিস্ট্রার, মাস্টার ইনসলভেন্সি রেজিস্ট্রার, রেফারী ও এ্যাসিস্ট্যান্ট রেজিস্ট্রার। চেম্বারের বাইরে বহু লোকের মিলিত গুঞ্জনও দরজার ফাঁক দিয়ে আসছিল। পরে শুনেছিলাম যে উকিল কৌঁসুলীদের অনুরোধে সেদিন সব জজেরাই আধ ঘণ্টা পরে কোর্টে বসেছিলেন যাতে করে ব্যবহারজীবীরা যাঁরা ইচ্ছে করেন তাঁরা আমাকে অভ্যর্থনা জানাতে যেতে পাবেন। এ্যাডভোকেট জেনারেল সাহেব হেসে হাত বাড়িয়ে দিয়ে করমর্দন করে শুভেচ্ছা জানালেন। চেম্বারে সমবেতদের সকলের সঙ্গে শিষ্টাচার সারতে বোধ হয় একটু দেরি হয়েছিল। এ্যাডভোকেট জেনারেল তাড়া দিলেন—"দাশ, শীগগির করে এস। উকিল কৌঁসুলী ও এটর্নীরা অপেক্ষা করছে।" তিনি বেরিয়ে গেলেন এবং তাঁর পিছু পিছু অন্যান্যরাও বেরিয়ে গেলেন। তারপর একজন চাপরাশী চলল আগে আগে এবং আমি চললাম তার পশ্চাতে। চেম্বার থেকে বেরিয়েই ডান দিকে কয় ধাপ সিঁড়ি দিয়ে উঠলেই এজলাস। সেসন্স কোর্টের পূব দিক থেকেই এতদিন এজলাস দেখেছি। এবার এজলাস থেকে কোর্টরুমটা দেখে নিলাম। একজন চাপরাশী বড় চেয়ারটা বেঁকিয়ে ধরেছিল। আমি তার সামনে দাঁড়াতেই সে চেয়ারটা আমার পেছনে ঠেলে দিল। আমি খুব বিনীতভাবে মাথা নত করে সকলকে নমস্কার জানালাম। চোখের সামনেই দেখলাম তিনটে বড় বড় তৈলচিত্র। মাঝেরটা ছিল পুরানো সুপ্রিম কোর্টের বিখ্যাত চীফ জাস্টিস স্যার ইলাইজা ইম্পির। আমরা কৌঁসুলী বা জজের দিকে চেয়ে পশ্চিমমুখো হয়ে বসতাম বলে এই ছবিগুলি চোখেই পড়ত না। এবার এজলাস থেকে এই ছবিগুলি দেখে মনটা কেমন করে উঠল। ঐ সব বড় বড় জজের সগোত্র হয়ে গেলাম। এই কথাগুলি লিখতে যেটুকু বা সময় লাগল মনের মধ্যে সেটা একেবারে তড়িৎপ্রবাহবৎ ঝিলিক মেরে গেল। তারপর চোখ চেয়ে দেখি ঐ বড় সেসন্স কোর্টটা এটর্নী, ব্যারিস্টার ও উকিলে ভরে গেছে। যাঁরা জায়গা পান নি তাঁরা বারান্দায় দাঁড়িয়ে উঁকিঝুঁকি দিয়ে দেখবার চেষ্টা করছিলেন। পরে শ্রদ্ধেয় এইচ ডি বোস সাহেবকে বলতে শুনেছি সেদিন আমাকে অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাতে কোর্টে যে জনসমাগম হয়েছিল তা তাঁর দীর্ঘ অভিজ্ঞতায় তিনি আর কখনো দেখেন নি—স্যার আশুতোষ চৌধুরীর বেলায়ও নাকি এমন ভিড় হয় নি। মনটা যেন ভরে উঠল চেনা মুখ-গুলি দেখে। আমার উপরে এঁদের প্রীতি দেখে মুগ্ধ হলাম। এত বড় সম্পদের অধিকারী যে আমি তা সেইদিন প্রথম হৃদয়ঙ্গম করলাম। এ্যাডভোকেট জেনারেল সাহেব বারের তরফ থেকে আমাকে স্বাগত জানালেন। এটর্নীদের তরফ থেকে তাঁদের সোসাইটির তৎকালীন প্রেসিডেন্টও বললেন আমার অনেক গুণের কথা। উকিলদের তরফ থেকে কেউ কিছু বলে-ছিলেন কি না এবং বলে থাকলে কে বলেছিলেন মনে নেই। আমি স্বপ্নাবিষ্টের মত শুনছিলাম এবং হৃদয়ের মধ্যে সমস্ত জিনিষটা সঞ্চয় করে রাখছিলাম। সেদিন আমার বাবা মা বেঁচে থাকলে খুশি হতেন। আর খুশি হতেন আমার সহ-ধর্মিনী কিন্তু তিনি ছিলেন তখন কালিম্পংয়ে। এই সকল শুভেচ্ছার জবাব দিতে হয়েছিল। প্রতিভাষণে কি যে বলে-ছিলাম মনে নেই। কিছু লিখে নিয়ে যেতে পারি নি তাড়াহুড়োর জন্যে। যাই হোক যেটুকু বলেছিলাম তা অন্তর থেকেই বলেছিলাম। সবাইয়ের শুভেচ্ছার জন্যে ধন্যবাদ জানিয়ে বরাবরই তাঁদের সহ-যোগিতা কামনা করে অনুষ্ঠান শেষ করলাম। এ কথা বলতেই হবে যে সহ-যোগিতা আমি সেদিন তাঁদের কাছে কামনা করেছিলাম তা পূর্ণভাবেই তাঁদের কাছ থেকে শেষ পর্যন্ত পেয়েছিলাম। সকলের মঙ্গল ইচ্ছা ও সহানুভূতি আমাকে সেদিন কর্মপথে এগিয়ে দিয়ে গেল। আমি কলকাতা হাইকোর্টের জজ হয়ে বসলাম।

[ক্রমশঃ]

আপনিও পাইতে পারেন

আমাদের অতি জনপ্রিয় মিনী—৬৮ পোর্টেবল ৩ ব্যান্ড অল ওয়ার্ল্ড ট্রান-জিস্টার যাহা এখন ৩২৲ টাকায় মাসিক সহজ কিস্তিতে দেওয়া হইতেছে। সারা ভারতে অর্ডার বুক করিয়া কমিশনও অর্জন করুন।

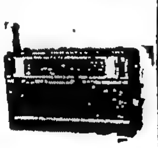

J. L. SANSON, & CO.
P.B. 1288, (W.B.C.) Delhi-6.

অগ্নিযুগের একটি অধ্যায়

অনন্ত সিংহ

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

জেলের মধ্যে খোলা আদালত

চন্দননগরের বৈপ্লবিক ঐতিহ্য বাঙালী কোনদিনই ভুলতে পারে না। বিপ্লবী নায়ক রাসবিহারী বসুকে বাল্যবয়সে মাতৃস্নেহে লালন করেছে চন্দননগর। বিশ্বাসঘাতকের রক্তে তর্পণ করবার জন্য আদর্শ বিপ্লবী কানাইলালকেও আমরা পাই চন্দননগরে। আবার বহু বছর পরে গোন্দলপাড়ায় মধ্যরাত্রের রিভলভার যুদ্ধের বাস্তব নাটকে মাখনের আত্মদানে চন্দননগরের বুকে আর একটি বৈপ্লবিক স্তম্ভ রচিত হল।

অগ্নিযুগের ইতিহাসের যে অধ্যায়টুকুর সঙ্গে আমি পরিচিত তার যে ক'টি পাতা আমাদের কেন্দ্র করে চন্দননগরে রচিত হয়েছে, আমার মনে হয় তার আর একটি বিশেষ তথ্য লিপিবন্ধ করা উচিত। ভারতে ফরাসীর অধীনস্থ চন্দননগরের আইন-আদালত ফরাসী সরকারের আইনকানুন অনুযায়ী নিয়ন্ত্রিত হোত। দুই-ই সাম্রাজ্যবাদী সরকার—'চোরে চোরে মাসতুতো ভাই'। তবু তাদের অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্ব থাকে বলেই প্রত্যেক সরকার নিজ-দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী সরকারী নীতি প্রণয়ন করে। চন্দননগরে প্রাণদণ্ডের বিধি ছিল না। আমাদের বন্ধুরা—লোকনাথ, আনন্দ ও গণেশ চন্দননগরে ধরা পড়েছে। কাজেই তারা চন্দননগর সরকারের বন্দী। এই জন্যে আইনজ্ঞরা প্রশ্ন তোলেন—এক দেশের বন্দী অন্য দেশের আইনে বিচারার্থে স্থানান্তরিত ও সমর্পিত হতে পারে কি এবং কোন্ আইনের অধিকারে বৃটিশ পুলিশ স্যার চার্লস টেগার্টের পরিচালনায় ফরাসী শাসিত চন্দননগরে বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে? আমাদের পক্ষের ব্যারিস্টার চন্দননগর নিবাসী শ্রদ্ধেয় শ্রীশ বোসের প্রচেষ্টায় চন্দননগরের ফরাসী কর্তৃপক্ষের কাছে চন্দননগরের অধিবাসী ও আইন-বিশারদেরা একটি প্রতিনিধি দল পাঠান এবং তিনজন বিপ্লবী বন্দীকে ইংরেজ সরকারের হাতে সমর্পণ করার বৈধতা সম্বন্ধে প্রশ্ন তোলেন। চন্দননগরের ফরাসী সরকার তাঁদের কিছুই সদুত্তর দিতে না পেরে এই প্রশ্ন সমাধানের একমাত্র অধিকারী ফ্রান্সের কেন্দ্রীয় সরকার—এই অজুহাতে চন্দননগরের শাসকগোষ্ঠী পার পেতে চাইলেন।

এই বিষয়ে নথিগত তথ্য আমি যেটুকু সংগ্রহ করতে পেরেছি তা নিম্নে উল্লেখ করলাম। চুঁচুড়ার পুলিশ ইন্সপেক্টার বিমলাপদ ব্যানার্জী তাঁর জবানবন্দীতে বলেছেন—

"There were a number of sergeants and some superior officers — including Waterworth, D. I. G., Burdwan Range and my S. P. There were also some French Police and officials—including the Administrator, the Commissioner of Police, Chandernagore. .The accused and the articles found with them were all brought by the French Police and some sergeants to the office of the Commissaire du Police. The Commissioner of the Police was there. He examined the accused when they were brought, through an interpreter. The Calcutta sergeants went away. I had been told by my S. P. to wait as he told me the prisoners would be extradited. From there the Commissioner held them and the articles kere taken before the French Magistrate. .....Half an hour or so after the accused and search lists and the articles were brought back and made over to me by the COMMISSAIRE of the French Police. In the meantime I had rung up Chinsurah and a Police Party came down from there and we took the three accused and the articles and the search lists to the District Magistrate of Hooghly, Mr. J. B. Kindersley, ..."

ইন্সপেক্টার বিমলাপদ ব্যানার্জীর জবানবন্দী থেকে জানা যাচ্ছে, ফরাসী চন্দননগরের Administrator বৃটিশ সরকারের হাতে বন্দী তিনজনকে সমর্পণ করে। বন্দীদের এই extradition আইনবহির্ভূত বলে প্রতিবাদ ওঠে এবং ফরাসী চন্দননগরের কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে পণ্ডিচেরীতে ফরাসী গভর্নরের কাছে আইনগত প্রতিবাদ জানানো হয়। এতেও কোন সুরাহা হয় নি। অবশ্য সফল পাওয়ার খুব আশাও আমরা পোষণ করি নি। সাম্রাজ্যবাদী শক্তি নিজেদের আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বে লিপ্ত থাকলেও বিপ্লবী-শক্তিকে খর্ব করতে তারা যে বিস্মৃত হবে না তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই। অসম্ভব জেনেও আমাদের প্রতি সহানুভূতিশীল ও প্রভাবশালী ব্যক্তিরা আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন চন্দননগরে ধৃত গণেশ, আনন্দ ও লোকনাথের বিচার যেন ফরাসী সরকারের অধীনে ফরাসী আইন অনুসারেই হয়। কারণ, ফরাসী সরকারের আইনে প্রাণদণ্ডের বিধান না থাকায় তাঁরা আশা করেছিলেন, বিপ্লবী বন্দীদের প্রাণদণ্ড হবে না। কিন্তু পণ্ডিচেরীর ফরাসী গভর্নর বৃটিশ সরকারের সঙ্গে নেপথ্যে হাত মিলিয়ে আমাদের তিন

বন্ধুর extradition অনুমোদন করলো। এই extradition অনুমোদন করার সময় ফরাসী সরকারকে আইনগতভাবে ফ্রান্সের সর্বোচ্চ আদালতের রায় নেওয়ার প্রয়োজন হয়—নইলে তথাকথিত গণতন্ত্রী বিধানসভায় সাম্রাজ্যবাদীদের Constitutional Position-এর ঠাট যে বজায় থাকে না!

আমাদের ব্যারিস্টার স্বর্গত শ্রীশ ঘোষের কাছে উপর মহলের খবর ছিল যে, বৃটিশ সরকার কোন ইংরেজ আইনজ্ঞের সাহায্যে ফ্রান্সের আদালতে প্রমাণ ও তথ্যাদি উপস্থিত করার পর তিনজনের extradition order চূড়ান্তভাবে আদায় করতে সমর্থ হয়। এই সংবাদের ভিত্তিতে শ্রীশ বোস সরকার পক্ষের সাক্ষী, ইন্সপেক্টার বিমলাপদ ব্যানার্জীকে জেরা করে এই extradition প্রশ্নে দুই সাম্রাজ্যবাদী সরকার কিভাবে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল তা' উদ্ঘাটনের চেষ্টা করেন। কিন্তু একে সরকারী সাক্ষী তায় আবার পুলিশ কর্মচারী—কাজেই সব প্রশ্ন বেমালুম অস্বীকার করে গেলেন। তবু প্রকাশ্য আদালতে সর্বসমক্ষে শ্রীশবাবুর ওজস্বিনী ভাষায় তীব্র প্রশ্ন ও সাক্ষীর উত্তর ঘটনার সত্যতাকে চাপা দেবার চেষ্টা করলেও একেবারে উড়িয়ে দেওয়া বাস্তবে সম্ভব হয় নি।

শ্রীশবাবুর প্রশ্নের উত্তরে ইনস্পেক্টার জবাব দিলেন—

"I do not know if Sir Charles Teggert and Messrs Bratley and Mackinty have gone on leave one after another and whether that has anything to do with this Chandernagore affair.

Q.—Have you been asked by anybody to be very cautious in your evidence so that the name of the person who killed the boy may not transpire?

"Ans.—No."

চন্দননগরের ঘটনার পর Administrator ও পণ্ডিচেরীর গভর্নরের কাছে যখন extradition order রহিতের চেষ্টা হচ্ছিল, তখন বৃটিশ সরকার গণেশ, লোকনাথ ও আনন্দের বিচার আমাদের সঙ্গেই চালিয়ে যাওয়ার জন্য ব্যস্ত। তাদের চন্দননগরে গ্রেফতার করার কয়েক দিনের মধ্যেই চট্টগ্রাম জেলে স্থানান্তরিত করা হয়।

সেই সময় জেলে আমাদের কোন দৈনিক সংবাদপত্র সরবরাহ করা হোত না। বহু অনশন ও অনশনে জীবননাশের আরও প্রায় বছর পনেরো পর রাজনৈতিক বন্দীরা জেলের অভ্যন্তরে দৈনিক সংবাদপত্র পাঠের সুযোগ পায়। কাজেই চন্দননগরের এত বড় একটি বিপর্যয়ের সংবাদ স্বাভাবিকসূত্রে পাওয়ার আমার কোন উপায় ছিল না। আমি জেলে এসে এই মাস দুয়েকের ভেতর "স্মাগল" করে চোরাই পথে খবরের কাগজ আনাবার কোনো ব্যবস্থাও করি নি। কারণ, 'জীবনে একেবারেই আসক্তিহীন নিতান্ত নিরীহ গোবেচারা'—এইভাবেই আমি জেলে ছিলাম।

চন্দননগরের এই খণ্ডযুদ্ধের খবর প্রথম আমার কানে এল এক ছুটির দিনে। কোন একজন জেল-কর্মচারী আমাকে বলে—"চন্দননগরে রিভলভার যুদ্ধ হয়েছে। আপনাদের একজন মারা গেছে ও তিনজন ধরা পড়েছে...।" খবরটা শুনে আমার মন গভীর বেদনায় ভারাক্রান্ত হল। যেদিন মরণপণ যুদ্ধের জন্য আমরা প্রস্তুত হয়েছিলাম সেইদিন থেকেই এই অবশ্যম্ভাবী পরিণতির আশঙ্কায় প্রতিটি মুহূর্ত গুণেছি। কিন্তু তবু এই বহু প্রত্যাশিত শোচনীয় পরিণাম আমাকে ব্যথিত ও বিচলিত করল কেন্? এই কেনর উত্তর কবির ভাষায় যতই ভাবি না কেন—ঘরছাড়া দিক্‌হারা বৈরাগী মঙ্গলশঙ্খ নহে নহে তোর তরে—তবু অমঙ্গলসূচক পরিণতির প্রভাবমুক্ত হওয়া কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। যুদ্ধে আমাদের পরাজয় হয়েছে—আমরা একজন সাথীকে চিরতরে হারিয়েছি, তিনজন বন্দী হয়েছে—এই সংবাদ স্বভাবতই আমার মনকে তোলপাড় করেছে।

আমি চন্দননগরের বাড়ি পরিত্যাগ করার পর লোকনাথ গিয়ে যে আমার শূন্যস্থান ইতিমধ্যে পূরণ করেছে তা আমি তখনও জানতাম না। চন্দননগরে স্যার চার্লস টেগার্টের সশস্ত্র অভিযানের বর্ণনা দিতে গিয়ে আমি সেই যুদ্ধে লোকনাথের উপস্থিতির কথা ইতিপূর্বে লিখে গেছি। তাই পাঠকবর্গের মনে ধারণা হতে পারে আমি ধরা দেবার পরেও চট্টগ্রাম জেলে বসে চন্দননগরের বাড়ির বা আমাদের দলের অন্যান্য খবর রাখার সুযোগ পেয়েছি। কিন্তু আগেই বলেছি এই দুটি মাসের মধ্যে সেরূপ যোগাযোগ ব্যবস্থার সুযোগ হয়ে ওঠে নি। আমি জানতাম চন্দননগরের বাড়িতে আমি ছাড়া কেবল গণেশ, মাখন ও আনন্দ ছিল। কাজেই খবর অনুযায়ী একজন যদি মারা যায় তবে তারা দুজন ধরা পড়বে—তিনজন গ্রেফতার হয়েছে বলার কারণ কি? আবার, সুহাসিনীদি ও শশধরদা যদি বন্দী হয়ে থাকেন, তবে চারজনের গ্রেফতারের খবর দিওয়া যেত—তিনজন কি করে হোল?—এইরূপ নানা প্রশ্নে আমার মন খুব বিচলিত ও বিষণ্ণ হল।

আমার যত দূর মনে পড়ে সেপ্টেম্বরের দুই তারিখের ঘটনা কলকাতার সংবাদপত্রে পরিবেশিত হয় তিন তারিখ আর চট্টগ্রামে তা' প্রকাশিত হয় চার তারিখ সকালে। স্থানীয় পাঞ্চজন্য পত্রিকা নিশ্চয়ই তিন তারিখেই সেই সংবাদ সরবরাহ করেছিল, কিন্তু তা' হয়ত ঘটনার খুবই সংক্ষিপ্ত বিবরণী। যা হোক্, আমাকে আর বেশিদিন অস্থিরতা ও অনিশ্চয়তার মধ্যে থাকতে হল না—চার তারিখ আমার কাছে সংবাদ পৌঁছল। পাঁচ তারিখ সকাল থেকেই জেল কর্তৃপক্ষের তৎপরতার কতকগুলি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করে মনে হল আমাদের আরো কাউকে জেলে আনবার ব্যবস্থা হচ্ছে। জেলের যে নির্জন কক্ষটিতে আমি ছিলাম তার পাশে পাশে আরো পাঁচটি অনুরূপ নির্জন কক্ষ ছিল। তারই মধ্যে তিনটি সেলে দ্বিতীয় শ্রেণীর বন্দীর ব্যবহারযোগ্য আসবাবপত্র রাখা হল। সেলের ডিউটির জন্য আরো বেশি প্রহরী মোতায়েন হল।

৫ই সেপ্টেম্বর সকাল দশটা-এগারোটার সময় জেলে আমাদের তিনজন বন্দী সাথী—লোকনাথ, আনন্দ ও গণেশকে চট্টগ্রাম রেলস্টেশনে ট্রেন থেকে নামিয়ে পুলিশের গাড়িতে তোলা হল। স্টেশনে জেল-সুপারিন্টেন্ডেন্ট S. D. O. এবং এডিশন্যাল পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্ট ও তাদের সঙ্গে বহু জেল ওয়ার্ডার উপস্থিত ছিলেন। চতুর্দিকে পুলিশ ও মিলিটারীর লৌহবেষ্টনীর মধ্যে বন্দীদের গাড়ি থেকে নামিয়ে চট্টগ্রাম জেলে নিয়ে যাওয়া হল। ফেণী স্টেশনের সংঘর্ষে যে সমস্ত পুলিশ কর্মচারী উপস্থিত ছিলেন ও আমাদের গুলীতে আহত হয়েছিলেন, তাঁদের সুস্পষ্টভাবে চিনিয়ে দেওয়া হল আমাদের সাথী দুজনকে—শ্রীগণেশ ঘোষ ও শ্রীআনন্দ গুপ্ত এবং এই দুজনকে সনাক্ত করার জন্য তাঁদের ওপর কড়া নির্দেশ জারী হল। কিন্তু Test-identification Parade-এ তাঁদের কেউই আমাকে সনাক্ত করেন নি। ইন্সপেক্টার বসেৎ মিঞা কোর্টে স্বয়ং আমাকে বলেছিলেন যে, কর্তৃপক্ষ এ'দের সততার উপর যথেষ্ট সন্দিহান হয়েই পাছে চিনতে পারে নি বলে তাঁরা কোন অজুহাত তোলেন সেই ভয়েই সনাক্তকরণ ব্যাপারে তাঁদের এইভাবে বাধ্য করেছিলেন।

তাছাড়া বাস্তবে যখন দেখলাম লোকনাথদের জেলে আমার দু' ঘণ্টার মধ্যেই Test-identification-এর ব্যবস্থা হয়েছে এবং ফেণী স্টেশনের সব ক'জন

"মা মণি! আমায় কিন্তু ঐ খাবার আরো দিতে হবে।"
'কুসুম খাবারের স্বাদই বদলে দিয়েছে— ওর খিদেও তাই বেড়ে গেছে।'
"কুসুম বনস্পতি দিয়ে রান্নাবান্না করতে ব'লে মীনা কাপুর উপকার করেছেন বলার নয়। কুসুম খাঁটি ও টাটকা—এতে রাঁধলে খাবারের স্বাভাবিক স্বাদ মুখে লেগে থাকে। আমার সব রান্নাবান্না কুসুম বনস্পতি দিয়েই করি। এতে খাবার যেমন রুচিকর হয়, তেমনিই স্বাস্থ্যপ্রদ। কুসুমের রান্না বাড়ীর সবাই ভালোবাসে।"
আপনিও কুসুম দিয়ে রান্না ক'রে দেখুন, বাড়ীর সবাইকে তৃপ্তি দেবার কী আনন্দ।
খাঁটি স্বাদ পেতে হলে কুসুম বনস্পতি দিয়ে রান্না করুন
কুসুম প্রোডাক্টস লিমিটেড, কলিকাতা-৮
KUSUM
VANASPATI
ENRICHED WITH VITAMINS A & D
2 Kg. Nett
KUSUM PRODUCTS LIMITED
CALCUTTA

সরকারী সাক্ষীকেই উপস্থিত করা হয়েছে সনাক্ত করতে, তখন এই বাস্তব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বুঝতে একটুও অসুবিধে হয় নি যে, একই ট্রেনে ফেণী থেকেই পুলিশের এই সব সাক্ষীকে আনা হয়েছে। তারা নির্দেশ অনুযায়ী সময় ও সুযোগ মত গণেশ ও আনন্দকে চিনে নিতে বাধ্য হয়েছে এবং চাকরীর খাতিরে উপায়হীন হয়েই এদের দুজনকে সনাক্ত করেছে। সরকারপক্ষের একটা ভয়ানক সমস্যা ছিল—যদি সাক্ষীরা শেষ পর্যন্ত কাউকে সনাক্ত না করে তাহলে ফেণী সংঘর্ষের মামলার কোন ভিত্তিই যে থাকবে না? তাই আদর্শগত মানবিক নীতির ভূমিকা কেন ইংরেজ সরকারী কর্মচারীরা পরিহার করলো, তা' নিয়ে অনুশোচনা করে রাজনীতির মৌলিক শাস্ত্রকে যেন না ভুলি। ছলে বলে কৌশলে শত্রুকে পরাজিত করতেই হবে—এই হল রাজনীতি এই হল রণকৌশল। ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদ তা' অতি নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেছে বলেই অতি সহজে দু'শ বছরেরও অধিককাল ভারতবাসীকে পদানত রাখতে পেরেছে। কাজেই এই সাম্রাজ্যবাদী শক্তির উচ্ছেদের জন্য তদপেক্ষা বহু গুণ অধিক ছল, বল ও কৌশলের প্রয়োজন। তাই আজ আক্ষেপ করবো না—সাম্রাজ্যবাদী কৌশল থেকে শিক্ষা গ্রহণ করবো।

চট্টগ্রাম ছোট্ট একটি বন্দর শহর। পুলিশ ও মিলিটারীতে শহর ছেয়ে গেছে—কর্তৃপক্ষ প্রচুর পল্টন আমদানী করেছে। গ্রামে গ্রামে মিলিটারী ছাউনী পড়েছে। শহরের প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ স্থানে মিলিটারী প্রহরার ব্যবস্থা হয়েছে, প্রতিটি রাস্তায় পুলিশ ও মিলিটারী দিবারাত্রি টহল দিচ্ছে। ইংরেজ সরকারের প্রচণ্ড শক্তি। তবু তাদের চোখে ঘুম নেই—জেলে আছে গণেশ ঘোষ, লোকনাথ ও অনন্ত সিং, বাইরে আছেন নির্মলদা, অম্বিকাদা ও মাস্টারদা। আমি আবার ধরা দিয়েছি স্বেচ্ছায়। কে জানে আমাদের কি উদ্দেশ্য—কে জানে আমরা জেলের ভেতরে ও বাইরে সংযোগ ঘটাবো কি না—কে বলতে পারে যদি আমাদের আর কোনো ষড়যন্ত্র বা আক্রমণের প্ল্যান থাকে!

কিস্তিবন্দীতে ট্রানজিস্টার

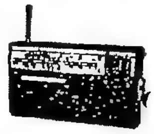

২৫৫ টাকা মূল্যের "এসকর্ট" ৩ ব্যাণ্ড অলওয়ার্ল্ড পোর্টেবল ট্রানজিস্টার মাসিক ২৫ টাকা কিস্তিতে লউন।

JAPAN AGENCIES (B-77)
Post Box. 1194, Delhi-6.

চট্টগ্রামের জেল এমনিতেই যথেষ্ট সুরক্ষিত। চারিদিক সুদৃঢ় উচ্চ প্রাচীরে ঘেরা। আমি আসবার আগে থেকেই এই জেলে যুববিদ্রোহের বন্দীরা ছিল। তাই অতিরিক্ত প্রহরীর ব্যবস্থা ইতিমধ্যেই কর্তৃপক্ষ করেছিল। আমি এই জেলে আসার পর আরো সুষ্ঠু নিরাপত্তার উদ্দেশ্যে আরো পল্টন আমদানী করলো। এর ওপর আবার গণেশ ও লোকনাথ এল। দিন দিন নতুন নতুন ব্যবস্থা হচ্ছে। Inspector General of Prison এসে নিজে তদারক করলেন। বাংলা দেশের জেলসমূহের আবহমানকালের নিয়ম লঙ্ঘন করে ইনস্পেক্টার জেনারেল আমাদের ক্ষেত্রে জেলের আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা ব্যবস্থা ইংরেজ জেলার ও ইংরেজ ওয়ার্ডারদের সাহায্যে আরো পাকাপোক্ত করতে আদেশ দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে ডিস্ট্রিক্ট জেলে এই প্রথম ইউরোপীয়ান ওয়ার্ডার ও ইউরোপীয়ান জেলার বহাল হল। কেবল তাই নয়, বাছাই করা হিন্দুস্থানী জেল-ওয়ার্ডার, যাদের Retire করে পেনসন পেতে মাত্র কয়েক বছর বাকী তেমন একদল জেল সেপাই এলো স্পেশাল ডিউটিতে—এরা কেবলমাত্র আমাদের জন্য জেলের অভ্যন্তরে সুরক্ষিত স্থানটি পাহারা দেবে। জেলের অভ্যন্তরে পুলিশ পাহাবার কোন আইন নেই। বন্দুক নিয়ে জেলের ভেতর পাহারা দেওয়া Jail-code-এর একেবারে বাইরে। এই নিয়মের ব্যতিক্রম করে আমাদের ওয়ার্ডের চতুর্দিকে রাইফেলধারী পুলিশ পাহারার ব্যবস্থা হল।

এই তো গেল জেল-কর্তৃপক্ষ তরফের ব্যবস্থাপনার নমুনা। জেলা-কর্তৃপক্ষ কিন্তু এতেও নিশ্চিন্ত নন—Eastern Frontier Rifles-এর এক কোম্পানী গুর্খা সৈন্য (প্রায় ১৫০ জনেরও অধিক) নিযুক্ত করলেন তাঁরা। তারা মিলিটারী কায়দায় প্রায় বারো ফুট পরিধি জুড়ে জেল-প্রাচীরের বাইরে চারপাশে কাঁটাতারের বেড়া দিল। জেল-প্রাচীরের একটু উপরে চার পাঁচ জায়গায় রিফ্লেক্টারের সাহায্যে তীব্র ইলেকট্রিক আলোর ব্যবস্থা করল। জেলের সামনে তাদের ক্যাম্প—জেল গেট, অফিস ও জেল-অস্ত্রাগার [illegible]লে বসেছে। জেল-অফিস সব জেলেরই দুই পাশে থাকে। চট্টগ্রাম জেলেও একই ব্যবস্থা। জেল-অফিসের উপরে গুর্খা সৈন্য মেসিনগান নিয়ে পজিশন নিয়েছে। চট্টগ্রাম জেলটি তারা লৌহদুর্গে পরিণত করেছে, ঠিক যেন বিশ্বকর্মা রচিত লখিন্দরের লৌহনির্মিত বাসরঘর—একটি সূচ প্রবেশের ছিদ্রও রাখে নি।

এইরূপ প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও শত্রুর শক্তি ও চাতুর্যের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবার জন্য কোথায় যেন একটা ক্ষীণ আশার আলো দেখছিলাম। কিন্তু ক্রমেই সেই আলোও নিভে যেতে লাগল। কর্তৃপক্ষ স্থির করল আবার নতুন করে আমাদের বিচার সুরু করবে। এই দেড় মাসে আমাদের যা টাকা পয়সা ব্যয় হয়েছে এবং তাছাড়াও পরিশ্রম ও নানা ক্ষয়ক্ষতির প্রতি কোনো ভ্রূক্ষেপ না করেই ইংরেজ সরকার কলমের এক খোঁচায় Denovo Trial-এর হুকুম দিল। কতখানি আইনবহির্ভূত কাজ! আবার যদি কেউ ধরা পড়ে এবং আবার যদি denovo trial-এর আদেশ হয় তবে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের আত্মপক্ষ সমর্থনের শক্তির উপর এটা যে কতখানি [illegible]ঘাত তা' সহজেই অনুমান করা যায়।

আমাদের মামলার Judgment থেকে উদ্ধৃত করছি—

"It may be mentioned here that the trial commenced on 27-7-30, when 32 accused were brought before us but as subsequently on 8-9-30, three absconding accused namely, Ganesh Chandra Ghosh, Lokenath Bal and Ananda Gupta who had been arrested on 2-9-30, in Chandernagore, were produced before us, we decided for reasons stated in the order recorded in the order sheet on 10-9-30 to try them jointly with the other accused. On 11th September, 1930, therefore, the trial was recommended denovo and all the witnesses who had been previously examined were examined afresh."

নতুন করে আবার সব সাক্ষীদের ডাকা হবে, আবার প্রথম থেকে বিচার সুরু হবে! বৃটিশ আইন অনুযায়ী খোলা আদালত গৃহে সর্বসমক্ষে ন্যায়বিচারের বিধি প্রচলিত থাকা সত্ত্বেও আমাদের ক্ষেত্রে, কর্তৃপক্ষের সুবিধার্থে, সেই বিধান বিকৃতভাবে প্রযোজ্য হল—'জেলের চার দেওয়ালের অভ্যন্তরে খোলা আদালত গৃহে' সুবিচারের সুব্যবস্থা তারা করবে। কর্তৃপক্ষ সদর আদালতে মাসের পর মাস বিচার চালাবার ঝুঁকি নিতে সাহস করল না।

জেলের ভেতর দিন রাত রাজমিস্ত্রী ও ছুতোরের কাজ সুরু হল—খটাখট্ ঠকাঠক্ সব সময় লেগেই আছে। সাধারণ

কয়েদীদের রাখবার জন্য দুটি খুব বড় দোতলায় দু'দিনের মধ্যেই বিচারকক্ষ তৈরি হল। ট্রাইব্যুনালের এজলাস—এক ধাপ নিচে পেশকারদের বসার ব্যবস্থা; উকিল-ব্যারিস্টারদের ব্যবহারের জন্য টেবিল-চেয়ার সাজানো হল; সাক্ষীর কাঠগড়া ও অভিযুক্তদের জন্য আরও একটি সুবৃহৎ কাঠগড়া এবং অপর পাশে, বেশ কিছুটা দূরে স্বীকারোক্তিকারীর জন্য একটি পৃথক কাঠগড়া প্রস্তুত হল। ব্যবস্থার কোনরকম ত্রুটি নেই। এজলাসের পেছনে পর্দা ঘিরে জজদের Retiring Room-এর ব্যবস্থাও হয়েছে—ইলেকট্রিক লাইট ও ফ্যানেরও কিছুমাত্র অভাব নেই। কিন্তু সদর আদালতের সুযোগ-সুবিধে ও স্পেশাল দর্শকের উপস্থিতির কোনো ব্যবস্থা ছিল না। জেলের অভ্যন্তরে এইরূপ পরিবেশের গাম্ভীর্য ভীতিপ্রদ—বহিদৃষ্টিতে সুবিচারের আয়োজনের অনুকূল নয়।

নতুন করে বিচার আরম্ভ হবে—ক্ষয়-ক্ষতি লোকসান যা হল তা বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়স্বজনদের। আমরা অভিভাবক ও আমাদের প্রতি সহানুভূতিশীল ব্যক্তিদের এর জন্য সমবেদনা জ্ঞাপন এবং সরকারের এইরূপ অবৈধ Denovo Trial-এর প্রতি বিক্ষোভ প্রদর্শন করলেও এই নতুন ব্যবস্থায় মামলা শেষ হতে আরো যে অন্তত দুটি মাস সময় বেশি লাগবে এর জন্য আমরা মনে মনে আনন্দিত হয়েছি।

কি শোচনীয় অবস্থা! জেলের বাইরে মিলিটারী, জেলের ভেতরে ইংরেজ জেলার ইংরেজ ওয়ার্ডার ও বাছাই করা কুড়ি-বাইশ বছরেরও অধিক পুরনো বিশ্বাসী সেপাই। এর ওপরেও আবার পুলিশী ব্যবস্থা—জেলের ভেতর বন্দুক উঁচিয়ে দু'জন সেপাই আমাদের ওয়ার্ডের চতুর্দিকে পাহারা দিচ্ছে। রাতদিন বাইরে ও ভেতরে বুটের আওয়াজ—ডিউটি চেঞ্জ হচ্ছে, অফিসারেরা রাউণ্ডে আসছে—তাদের সেলাম ঠোকা হচ্ছে, রাত্রে হাঁকডাক চলছে—Halt! Who comes there? এতদিন তবু আশায় ছিলাম বহুকাল ধরে মামলা চলবে এবং প্রতিদিন জেলের বাইরে আদালতে যাবো। কিন্তু জেলেই বিচার ব্যবস্থা হওয়ায় আমাদের শেষ আশার আলোও বুঝি নিভে যায়!

শরৎবাবু আমাকে প্রশ্ন করেছিলেন—"জেল থেকে পালাতে পার?" উত্তর দিয়েছিলাম—"চেষ্টা করতে পারি।"— "কত টাকা লাগবে?"—"অন্তত পাঁচ হাজার।"

শরৎবাবু টাকা দিয়েছেন—কলকাতা থেকে নিজে বয়ে এনে বৈপ্লবিক উপহার পাঠিয়েছেন মাস্টারদাকে—বোমা ও টাকা। আমাদের জেল-ভাঙার প্রচেষ্টায় তাঁর সর্বপ্রকার সমর্থনের ইচ্ছাও তিনি প্রকাশ করেছেন।

আমরা শরৎবাবুর কাছ থেকে জেল-ভাঙার প্রোগ্রামের জন্য টাকাও নিয়েছি। এটা তো গেল শরৎবাবুর কাছে আমাদের commitment! এ ছাড়াও আমরা যে শপথ নিয়েছি বৈপ্লবিক অন্তরের অতি গভীরে—জালালাবাদ, ফিরিঙ্গীবাজার, কালারপোল ও চন্দননগরের হত্যালীলার প্রতিশোধ নেবো—জেল ভাঙবো এবং প্রচণ্ড বিস্ফোরণের সাহায্যে ব্যাপক ধ্বংস-লীলার এক নতুন অধ্যায় সৃষ্টি করবো।

কিন্তু সরকারের অপ্রতিহত প্রচণ্ড শক্তির বিরুদ্ধে এবং এইরূপ দুর্ভেদ্য পুলিশ ও মিলিটারী ব্যূহ ভেদ করে আর কোন সক্রিয় বাস্তব বৈপ্লবিক পরিকল্পনা গ্রহণ করা কি সম্ভব? মিলিটারী, পুলিশ ও জেল-কর্তৃপক্ষ একজোট হয়ে যে অভাবনীয় ব্যবস্থার প্রবর্তন করেছে এবং সর্বোপরি কারাপ্রাচীরের অভ্যন্তরে বিচার ব্যবস্থা যে প্রতিকূল অবস্থার সৃষ্টি করেছে, তাতে যে-কোন বিপ্লবীরই নৈতিক ও মানসিক বল হ্রাস পাওয়া খুবই স্বাভাবিক। পৃথিবীর যত অস্ত্রাগার আছে এবং তাতে যতই শক্তিশালী মারণাস্ত্র থাকুক না কেন, তার চাইতেও অধিক শক্তিশালী অস্ত্র—সৈন্যের morale (মনোবল)! প্রবল শত্রুর প্রচণ্ড শক্তির বিরুদ্ধে বিপ্লবীদের মহাস্ত্র—তাদের morale! সেদিন বুঝেছিলাম শত্রুর দুর্ভেদ্য ব্যূহ দেখে মনোবল হারালে চলবে না। আপাতদৃষ্টিতে যা অসম্ভব বলে মনে হয় তাকেও সম্ভব করা যায় যদি বৈপ্লবিক morale বজায় থাকে—প্রথমেই আশাহত হয়ে পরাজয় মেনে নেওয়া না হয়।

আজ এই প্রসঙ্গে সীমিত গণ্ডির মধ্যেও তুলনামূলকভাবে বলতে ইচ্ছে করছে ভিয়েৎ কংদের কথা। কি করে সাম্রাজ্যবাদী যুক্তরাষ্ট্রের হেলিকপ্টার রাখবার সুরক্ষিত এলাকা আক্রমণ করে প্রায় চল্লিশটি হেলিকপ্টার প্রতিবার ধ্বংস করতে ভিয়েৎ কংরা সমর্থ হয়েছে? আমেরিকান মিলিটারী কম্যাণ্ড প্রথমবারের অভিজ্ঞতা থেকে নিশ্চয়ই সাবধান হয়েছিল সন্দেহ নেই। কিন্তু যত সাবধানতাই অবলম্বন করুক না কেন—Where there is a will there is a way! ভিয়েৎ কংরা তিন-তিনবার আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদীদের সমস্ত সাবধানতা ও রণকৌশল ব্যর্থ করে প্রতিবারই কোন-না-কোন নতুন পদ্ধতিতে আক্রমণ চালিয়ে আমেরিকান হেলিকপ্টার ধ্বংস করেছে। এই সেদিনও সাইগন যুদ্ধে পঞ্চাশটি হেলিকপ্টারকে জমি ছেড়ে ওড়বার আর সময় দেয় নি, ময়দানেই তাদের সমাধি রচনা করেছে। পৃথিবীর সমর ও বৈপ্লবিক ইতিহাসে এইরূপ শত-সহস্র ঘটনার উল্লেখ আছে। এইসব ঘটনার মূলে যে বাস্তব দুর্দমনীয় morale আছে তা হল—পরাজয় মানবো না, 'আর কোন উপায় নেই' তা কখনই হতে পারে না, 'অসম্ভব' শব্দ কেবল মূর্খের অভিধানেই পাওয়া যায়—বিপ্লবীর অভিধানে নয়।

১৯৩০ সালে চট্টগ্রাম জেলে বসে কর্তৃপক্ষের সেইরূপ ব্যাপক আয়োজন দেখে আমাদের সীমিত শক্তিতেও আমরা morale হারাই নি। জেলের দুর্ভেদ্য প্রাচীর ও দিবারাত্রি ইংরেজ সরকারের সামরিক ব্যূহের অট্টহাসি আমাদের অন্তরে বিভীষিকার সঞ্চার করতে পারে নি। আমরা ল্যাণ্ডমাইন ও ডিনামাইট দিয়ে জেল ও শহরের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ স্থান উড়িয়ে দেবার ব্যাপক আয়োজন সফলতার সঙ্গেই করেছিলাম—পর্দার অন্তরালে এই ব্যাপারে সরকারকে শেষ পর্যন্ত আমাদের সঙ্গে মীমাংসায় আসতে হয়। এই ঘটনা প্রকাশ করবো বলেই পাঠকবর্গকে সরকারের ব্যাপক ব্যবস্থার এত বিশদ বিবরণ জানাবার প্রয়োজন মনে করেছি। নইলে সঠিক উপলব্ধি করা যাবে না—কেন সরকারকে আমাদের কাছে নতি স্বীকার করতে হয়েছিল। ঘটনার সামঞ্জস্য রেখে আমাদের প্রস্তুতি যেভাবে চলেছিল স্থান অনুযায়ী তার বিবরণ আমি ব্যক্ত করে যাব।

১১ই সেপ্টেম্বর, ১৯৩০ সাল—জেলে কোর্ট বসেছে। আমাদের অভিভাবকেরা এবং জামীনে যাঁরা মুক্ত ছিলেন তাঁরা বাইরে থেকে আসবেন। আমাদের ও সরকার পক্ষের ব্যারিস্টারদেরও জেলে আসতে হবে। কিন্তু জেলের বিধান অনুযায়ী যে-কেউ জেলের মধ্যে প্রবেশ করুক না কেন জেল-গেটে তার শরীর তল্লাসী হবেই। কাজেই জেল-কর্তৃপক্ষ আইনমত জেল-গেটে একের-পর-এক সবাইকে সার্চ করে জেলের ভেতরে ঢুকতে দিচ্ছে। কিন্তু জেলের এই নিয়ম আদালতে প্রবেশের সময় কেন প্রয়োগ করা হবে? হোক না বিচার জেলে—বসুক না কোর্ট কারা-প্রাচীরের অন্তরালে, তাতে কি আসে

কিস্তিবন্দীতে ট্রানজিস্টার

মাসিক ১০৲ টাকার সহজ কিস্তিতে ৩২০৲ টাকা মূল্যের টেলি-ফুইন পোর্টেবল ৩ ব্যাণ্ড, অল ওয়ার্ল্ড ৮ ট্রানজিস্টার। আবেদন করুন:—

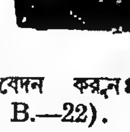

Atlas Co. (S. B.—22).
Box No. 1329, Delhi-6.

দুটি কবিতা

উইলিয়াম গোমেশ

উর্বর করে গেছে

অন্য কোন প্রস্তুতি দাও
চিনে নেবো রক্তের রং কিংবা সমুদ্রের জল
অথবা আকাশ
জলগার জলীয় বাতাস
বৃষ্টি হয়ে উর্বর করে গেছে
এ দেশের মাঠ।।
ফসল কাটার জন্য যা একটু দেরি
আগাছার জন্য প্রথম প্রথম ভয় হয়
আমরা সৎ চাষী কিনা
লাঙলে বুকের আশা অত্যন্ত কঠিন।।

পিছনে পড়ে থাক

এখন তো মাঠে যাওয়া নিতান্ত প্রয়োজন

কঠিন বন্ধনে মোড়া থাক ঋণ আর আয়োজন

আমোদের থেকে দূরে ছোটা

কোনো কোটোটা যেন না হারিয়ে

বাকি আছে বীজ ধান বোনা

কৃষক ভাই প্রভাত হেঁকে আজ

পিছনে পড়ে থাক প্রার্থনা অথবা নমাজ।।

যায়? উকিল, ব্যারিস্টারেরা স্বাধীনভাবে বিনা বাধায় কোর্টে যাবেন—তাঁরা কেন এইরূপ অপমানসূচক ব্যবহার বরদাস্ত করবেন? কুমিল্লার বাঘা উকিল—কুমিল্লা কেন, বাংলার দেশনেতা ও প্রসিদ্ধ উকিল স্বর্গীয় অখিলচন্দ্র দত্ত মহাশয় জেলের এইরূপ তল্লাসীর প্রতি ক্রুদ্ধ প্রতিবাদ জানালেন। জেল সুপারিন্টেন্ডেন্টের কোন ওজর-আপত্তি তিনি শুনলেন না। শ্রীঅখিলচন্দ্র দত্ত সুস্পষ্টভাবে জানালেন—

"I am not concerned at all with the jail. I am to go to Court to defend my client. I will go straight to Court on a legal mission. What do I care for the Jail rules? They do not concern me at all. I refuse to attend as a captive lawyer. I do protest against the legality of being searched. As a free lawyer I shall go straight to attend court, or else my client would go undefended."

অখিলবাবুর এইরূপ দৃঢ় আপোষহীন মনোভাব আমাদের পক্ষের সব উকিল ব্যারিস্টার একবাক্যে সমর্থন করলেন। সকলেই একমত—শরীর তল্লাসী ছাড়াই তাঁদের জেলের কোর্টে উপস্থিত থাকতে দিতে হবে; আর তা নাহলে কর্তৃপক্ষের এইরূপ অশোভন হস্তক্ষেপের ফলে তাঁদের মক্কেলরা আত্মপক্ষ সমর্থনে বঞ্চিত হবেন। স্বর্গীয় অখিলবাবুর সেই ক্রুদ্ধ প্রতিবাদের জয় হল। উকিল ব্যারিস্টারেরা সকলেই বিজয় গৌরবে জেল-কোর্টে প্রবেশ করলেন।

বিচার শুরু হল। ট্রাইবুনালের বিচারকেরা স্ব স্ব আসনে আসীন। মামলা আবার প্রথম থেকে আরম্ভ হবে। কাজেই সরকারী উকিল খাঁ সাহেব আব্দুল গফুর তাঁর প্রারম্ভিক বক্তৃতা শুরু করলেন। এই বক্তৃতার সারমর্ম সাক্ষীদের দ্বারা সমর্থিত হয়েছে এবং জজ সাহেব তাঁর জাজমেন্টে উল্লেখ করেছেন—

"The three accused, Ganesh Ghosh, Anantalal Singh and Lokenath Bal and also Ambica Chakravarty, accused now awaiting trial and absconding accused Surya Kumar Sen and Nirmal Sen had been interned during the period 1924 to 1926....They were subsequently released... In December 1928, the All India session of the Congress was held in Calcutta which was attended by Ambika Chakravarty, Surya Sen, Nirmal Sen, Anantalal Singh, Harigopal Bal and Tarakeswar Dastidar (another absconding accused). At this Congress numerous volunteers were wearing khaki military uniform and commanded by Subhas Bose and Jatin Das, wearing the uniform of military officers. The prosecution suggestion is that these Chittagong visitors after witnessing this display of pseudo-militarism returned home filled with a spirit of emulation which was soon to be translated into practice.

"After their release Ananta Singh, Lokenath Bal and Ganesh Ghosh proceeded to interest themselves in the development and organising of physical culture clubs of which at the time there were many in existence in Chittagong where youths, chiefly of the student class, indulged in physical exercise and lathi play. Among these were the Sadarghat, Nalapara, Rahamatganj, Brindaban, Chandanpura and Asadganj clubs. Sometime in 1927-28, a Central Physical Culture Association had been formed for the better organisation of these clubs ... The grant was utilised by the Association in appointing Anantalal Singh as the Instructor to the various physical culture clubs ..."

প্রথম দিন এই বক্তৃতা শেষ হয় নি। পরের দিনও Public Prosecutor আমাদের বিরুদ্ধে, ষড়যন্ত্রের মূল উদ্ঘাটন করতে, ধারাবাহিকভাবে অনেক কথা বলেছেন।

[ক্রমশঃ]

সপ্তাহের বোঝা

কৃত্তিবাস ওঝা

স্বর্গত কৌতুক অভিনেতা নবদ্বীপ হালদারের কথা নিশ্চয়ই অনেকের মনে আছে। কাংস্যকণ্ঠ আর বিস্ময়ভরা চোখে নবদ্বীপ হালদার পর্দায় দর্শকদের সামনে আসলে বোঝা যেত একটা হাসির দৃশ্য উপভোগ করা যাবে। সিনেমা জগতের কৌতুক অভিনেতার অভিনয় স্মরণ করবার জন্য নয়, আমার কিন্তু রাজ্য রাজনীতিতে নেতাদের অনেকের ভূমিকা দেখে মাঝে মাঝে মনে হয় যেন স্বর্গত তুলসী লাহিড়ী, সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, নবদ্বীপ হালদারের অভিনয় দেখছি। যে অভিনেতারা নিজেরা কখনও না হেসে অপরের হাসির খোরাক জোগাতেন। যেমন নবদ্বীপ হালদারের একটা উক্তি আজকের দিনে বারে বারে মনে পড়ছে। কি বইতে অথবা কি পরিবেশে নবদ্বীপ হালদার কথাটা বলেছিলেন সে কথা মনে নেই, শুধু কথাটা মনে আছে। "অশান্তি হতে দেব না"—নবদ্বীপ হালদারের এই কথাটা বলবার পরই দেখা যেত একের পর এক অশান্তি সৃষ্টি হচ্ছে। পশ্চিম-বঙ্গে সরকারী রাজনীতিতে নবদ্বীপ হালদারদের সেই একই সরকথার সার কথা "অশান্তি হতে দেব না" সার কথা হয়ে দাঁড়িয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের যুক্তফ্রন্ট সরকারের পতন ঘটানো হয়েছিল সম্ভবত একটিমাত্র প্রকাশ্য ও প্রত্যক্ষ কারণে। সেই কারণ হল রাজ্যের শান্তি-শৃংখলা বিপন্ন—শান্তি-শৃংখলা ভেঙে পড়েছে, তাই শান্তির পূজারীরা শান্তি প্রতিষ্ঠায় ধর্মযুদ্ধে অবতীর্ণ হয়ে শান্তির রাজ্য স্থাপন করতে তৎপর হলেন। একসময় দিল্লীতে শ্রীবিজয় সিংহ নাহার যুক্তফ্রন্টের আমলে একশতটি মৃত্যুর খতিয়ান পেশ করে বলেছিলেন—সব রাজনৈতিক হত্যা ও মৃত্যু। এই মৃত্যুর মধ্যে কলেরা, টাইফয়েড রোগীরা ছিল কি না জানি না, তবে আজ যদি কেউ শ্রীনাহারের পথ অনুসরণ করে রাজ্যের আড়াই মাসে মৃত্যুর খতিয়ান তৈরি করেন, তবে তিনি অবলীলাক্রমে কম করে পাঁচশত ব্যক্তির মৃত্যুর তালিকা প্রস্তুত করতে পারবেন। চোলাই মদ খেয়েই মৃতের সংখ্যা সেঞ্চুরী করেছে। অনেকে বলবেন, চোলাই মদের সঙ্গে শান্তি-শৃংখলার সম্পর্ক খোঁজা উদ্দেশ্যমূলক। কিন্তু চোলাই মদ তৈরারি বন্ধ করা, মদের বে-আইনী ব্যবসা ধরা প্রভৃতি কাজের জন্য তো পুলিশ বিভাগ বিশেষ করে আবগারী পুলিশ বিভাগ রয়েছে। এবং ঐ বিভাগ স্বরাষ্ট্র পুলিশ বিভাগের অন্তর্গত—তাদের কাজটি কি? চোলাই মদের কথা থাক, গত আড়াই মাসে সারা রাজ্যে খুন হত্যাকাণ্ডের সংখ্যা বেড়েছে কেন? প্রাত্যহিক সংবাদপত্রসকল ধরলে দেখা যাবে একটানা একটার পর একটা চাঞ্চল্যকর মৃত্যুর সংবাদ আছে। কংগ্রেস এম এল এ আফাক চৌধুরী দুর্ঘটনায় মারা গেছেন বলে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল, কিন্তু চৌধুরীর ভাই আবদুল করিম চৌধুরী কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র-মন্ত্রী ও রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর নিকট স্মারকলিপি পেশ করে বলেছেন, ওটা দুর্ঘটনা নয়—ওই মৃত্যুর পিছনেও রহস্য আছে। ট্যাক্সিচালক খুন এমন এক ঘটনায় পরিণত হয়েছে যে, রাত্রে বন্ধুবান্ধব নিয়ে ট্যাক্সিতে উঠতে চাইলে সহজে ট্যাক্সি পাবেন না, পরন্তু যদি একটু নির্জন এলাকা আপনার গন্তব্য হয়, তবে কোন ট্যাক্সি ড্রাইভারই আপনাকে ট্যাক্সিতে তুলবে না; কারণ গত কয়েক মাসে তিনজন ট্যাক্সিচালক খুন হয়েছে এবং একটি খুনেরও কিনারা হয় নি। খুনের এই তালিকায় দেখা যাবে কোন গ্রামার নেই। বেলেঘাটা সি-আই-টি বিল্ডিংসের যুবতী বধূ, শিশু ও কন্যাকে নৃশংসভাবে হত্যা থেকে শুরু করে কাশীপুরে ৭৫ বৎসর বয়স্কা বৃদ্ধা শ্রীমতী আশালতা সেনগুপ্তাকে হত্যা পর্যন্ত সব হত্যাগুলি হিসাব করলে দেখা যাবে, যেন একদল নরমুণ্ড শিকারী শহরে ঘুরে বেড়াচ্ছে, যারা শুধুমাত্র নরমুণ্ড শিকারেই আনন্দ পায়, পিছনে অন্য কোন উদ্দেশ্য নেই। কাশীপুরের রতনবাবু রোডের শ্রীমতী আশালতা সেনগুপ্তা ৭৫ বৎসর বয়স্কা বৃদ্ধা পূজায় বসেছিলেন, তাঁকে কে বা কারা খুন করে গেছে। বাঘা যতীন কলোনীর শ্রী যোগেন্দ্রনাথ দে নামে ৫০ বৎসর বয়সের এক বৃদ্ধ খুন হলেন—কেন? কারণ জানা যায় নি। মঙ্গল-বার রাত্রে শিবপুরে চারাবাগান এলাকায় গলাকাটা অবস্থায় ২৮ বৎসর বয়সী ঊষারাণী রায়কে পাওয়া গেল—ঠিক এই অঞ্চলেই তারাচাঁদ পোদ্দার লেনে পনেরো দিন আগে ৩০ বৎসর বয়সের শ্রীমতী রেখা চট্টোপাধ্যায়কে গলাকাটা অবস্থায় পাওয়া গিয়েছিল। বুধবার খড়দহে ভাগাড় রোডে ১৬ বৎসর বয়সের শ্রীমতী সরস্বতী দেবীকে সকাল বেলা কে বা কারা হত্যা করে।

এইভাবে খুন ও হত্যার তালিকা করলে দেখা যাবে সংখ্যা ক্রমেই বাড়ছে।

অবশ্য কেউ বলবেন, খুন, রাহাজানি, হত্যা—এইগুলির সঙ্গে শান্তি শৃংখলা রক্ষার সম্পর্ক খুব বেশি নেই। কারণ, পাহারা দিয়ে অথবা কড়া প্রশাসনিক ব্যবস্থায় এই অপরাধ দমন সম্ভব নয়। কিন্তু প্রশ্ন হল প্রতিরোধ না হয় সম্ভব নয়, কিন্তু প্রতিকার বা কিনারা কেন সম্ভব নয়। আর তা যদি সম্ভব না হয় তবে এত গোয়েন্দা পুলিশ, এত বাহারের ফরেনসিক ল্যাবরেটরী আর নাকি মিত্তা কুকুরের গলায় বছর বছর পদক পরিয়ে এত বাড়াবাড়ি কেন?

বি, সি, মাইতি এণ্ড কোং

—ইলেকট্রো প্লেটিং সামগ্রী—

নিকেল ভ্যাট ও ব্যারেল * ডাইনামো * পালিশিং মেসিন এবং প্লেটিং করিবার জন্য যাবতীয় সামগ্রীর আদি সরবরাহক।

শো রুম :—৯৪, প্রেমচাঁদ বড়াল স্ট্রীট, কলি-১২। ফোন : ৩৪-৩১৭০

৩, রাধামোহন পাল লেন, কলি-১২ : অফিস-ফোন—৩৪-৪৮৪৬

গুপ্ত হত্যা না হয় প্রতিরোধ করা কঠিন, কিন্তু বেলঘরিয়ায় পুলিশ ও প্রশাসন কর্তৃপক্ষের অতি পরিচিত গুণ্ডা দল গত ২৪শে জানুয়ারী প্রকাশ্য দিবালোকে স্টেনগান, রাইফেল, রিভলবার, বোমা নিয়ে বেপরোয়া খুনজখম করে যে চ্যালেঞ্জ রাজ্যের প্রশাসনকে দিয়েছে তার প্রতিরোধ বা প্রতিকারও কি সম্ভব নয়?

আক্রমণ না হয় প্রতিরোধ করা না গেল, কিন্তু সংঘর্ষ প্রতিরোধেও কি প্রশাসনের হাত পা বাঁধা! নিউ বারাকপুরে অথবা জোড়াবাগানে যে সংঘর্ষ হয়ে গেল—তারও কি কোন প্রতিকার নেই। লাঠি গুলি কাঁদুনে গ্যাস আর পটকা এই শব্দগুলি নিত্যদিনের কাগজে না দেখলেই যেন আজকাল খবরের কাগজ জোলো মনে হয়। বালীতে গুলী—একজন নিহত সোমবারের ঘটনা, আবার বুধবার দেখুন—বেহালায় কাঁদুনে গ্যাস, লাঠি চালনা, পটকা নিক্ষেপ। অর্থাৎ খুন, হত্যা, লাঠি-গুলী, পটকা, কাঁদুনে গ্যাস খবরের কাগজের অর্ধেক দখল করে থাকবে, আর শ্রীনবদ্বীপ হালদার বলবেন অশান্তি হতে দেব না। আড়াই মাসে হাজার হাজার লোক কারাবরণ করেছে; রাজ্যময় ১৪৪ ধারার বেড়াজাল। প্রত্যহ বিধানসভার নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের নিরাপত্তা আইনে গ্রেপ্তার করা হচ্ছে। বিধানসভা খুললে মারদাঙ্গা হবে আশঙ্কা করা হচ্ছে—তবু নবদ্বীপ হালদার বলবেন অশান্তি হতে দেব না। আড়াই মাসে হাজার হাজার লোক কারাবরণ করেছে। রাজ্যময় ১৪৪ ধারার বেড়াজাল, বিধানসভায় নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের নিরাপত্তা আইনে গ্রেপ্তার করা হচ্ছে। বিধানসভায় ঢুকলে মারদাঙ্গা হবে আশঙ্কা করা হচ্ছে—তবু নবদ্বীপ হালদার বলবেন—অশান্তি হতে দেব না। উপরের ঘটনাগুলি কে ঘটাচ্ছে, কারা ঘটাচ্ছে, কার দায়িত্ব বেশি তার চুলচেরা বিচার পণ্ডিতজনেরা করুন, কিন্তু সুস্থ ও সুদক্ষ প্রশাসন তাকেই বলে যে প্রশাসক উপরোক্ত ঘটনাগুলি প্রতিরোধ করতে পারতেন, প্রতিকার করে ঘটনার উৎস রোধ করতে পারতেন।

প্রশ্ন শুধু শান্তি শৃঙ্খলারই নয়—গ্রাম্য মানুষের কথা 'বেশ ভালই আছি, তবে কষ্ট শুধু অনাহারের'। মাঠের ধান গোলায় উঠতে না উঠতেই মাঘ মাসে গণ্ডগ্রামে চালের দর কম করে দু' টাকা আর শহরে আড়াই টাকার উপরে। মাঘ মাসে এই অবস্থা হলে ভাদ্র-আশ্বিন মাসে কি হবে সেই কথা শুধু ভবিতব্য জানে না, রাজ্যের রাজ্যপালও এ বছরের উৎপন্ন শস্যের সরকারী হিসাবে বিশ্বাস করেন না—প্রকাশ্যে বলেন, স্ট্যাটিসটিক্যাল ব্যুরোর হিসাব ঠিক নয়, উৎপাদন অনেক বেশি হয়েছে। রেশনে চালের দাম বেড়েছে, চিনির পরিমাণ হ্রাস পেয়েছে আবার দামও বেড়েছে।

অর্থাৎ জীবনের নিরাপত্তা, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা, পেটের অন্নসংস্থান সবদিকেই প্রাণান্তকর অবস্থা। তবু নবদ্বীপ হালদার বলছেন, অশান্তি আমি হতে দেব না।

প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সদ্য অনুষ্ঠিত এক সভায় একজন প্রভাবশালী সদস্য একটি মূল্যবান কথা বলেছেন—'সব সময় শুধু শান্তিরক্ষার তাগিদ, শান্তিরক্ষাই যেন একমাত্র সমস্যা। তাই যদি হয়, তবে শান্তিরক্ষার জন্য রাজ্যে মিলিটারী শাসন কায়েম করে ম্যানেকশকে মুখ্যমন্ত্রী করলেই ভাল হয়। কথাটা লঘু নয় গভীরভাবে চিন্তা করার—অশান্তি হতে দেব না বলে শুধু চিৎকার করলে হয়তো নবদ্বীপ হালদার হওয়া যায়, কিন্তু সুস্থ সবল প্রশাসক হওয়া যায় না, আর শান্তি স্থাপন করাও যায় না।

(৮।২।৬৮)

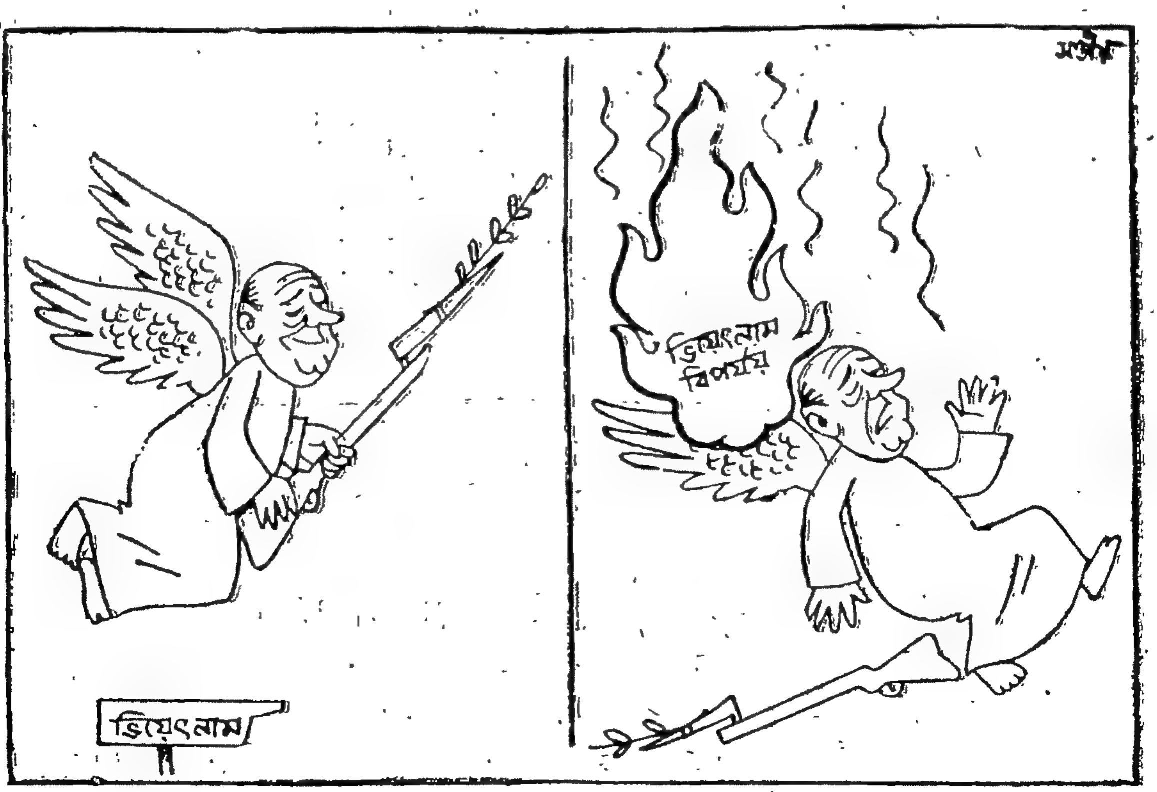

আকাশবাণী পরিক্রমা

মেঘদূত

আকাশবাণীতে কোন অনুষ্ঠান নির্দিষ্ট সময়ে নিয়মিত প্রচারিত হলে বুঝতে হবে যে, অনুষ্ঠানের প্রযোজকরা কোন উদ্দেশ্য নিয়ে এ-কাজটি করছেন। 'বিদ্যার্থীমণ্ডল' তেমনি একটি উদ্দেশ্যমূলক অনুষ্ঠান। এখন দেখা প্রয়োজন উদ্দেশ্যটি কোন ফল দিচ্ছে কিনা। আকাশবাণীর কর্তৃপক্ষ আশা করি খোঁজ খবর নিয়ে জেনেছেন, দুপুরে 'বিদ্যার্থীমণ্ডলে'র অনুষ্ঠানের সময়ে বাঙলা দেশের শতকরা-ক'টি স্কুলে রেডিও শোনানোর ব্যবস্থা রয়েছে। যদি সে সংখ্যা মুষ্টিমেয় হয় (মনে হয়, মুষ্টিমেয় হতে বাধ্য) তবে কাদের জন্য এ ব্যবস্থা? দ্বিতীয় প্রশ্ন, অনুষ্ঠানসূচী স্কুলের ছেলেমেয়েদের কাছে যাতে আকর্ষণীয় হয় তার জন্যই-বা কী ব্যবস্থা করা হচ্ছে? শুধু গড়গড় করে কতকগুলো প্রবন্ধ পড়ে গেলে কাঁচা মনে দাগ কাটবে না কোনদিন। 'বিদ্যার্থীমণ্ডল' স্কুলের ক্লাস নয় যে, নীরসভাবে তাকিয়ে থাকা চাই, মাস্টারমশায়ের পড়ানো ভালো লাগুক না লাগুক শুনতে হবে, কারণ পরীক্ষা দিয়ে নম্বর পেয়ে উঁচু ক্লাসে ওঠার প্রয়োজন। বিদ্যার্থীমণ্ডলের প্রাথমিক উদ্দেশ্য হবে শিশুমনে কৌতূহল জাগিয়ে তোলা। মণ্ডল পরিচালক যদি মনে করেন, তিনি তা পেরেছেন তবে বলবো, তিনি সার্থক পরিচালক। অন্যথায় তিনি কর্তব্য ঠিকমতো পালন করতে পারলেন না।

একটি কৌতূহলী ছাত্রকে দেখলাম, আলোচ্য বিভাগের অনুষ্ঠান শুনতে শুনতে হঠাৎ অভিধান খুলে একটি শব্দের অর্থ বার করতে চাইলো। আমারো মনে হলো বেতার-বক্তা বোধ হয় ভুলে গেছেন কাদের উদ্দেশে তাঁর প্রবন্ধ পড়া। এত কঠিন কঠিন শব্দ ব্যবহার করছিলেন যে আমিও বিরক্ত বোধ করলাম। আলোচনাটি নিঃসন্দেহে বড়োদের সভায় চালিয়ে দেওয়া যায়। এসবক্ষেত্রে অযোগ্যতা কার—অপরিণত বয়স্ক শ্রোতার, না বক্তার, না পরিচালকের?

বিদ্যার্থীমণ্ডলের লক্ষ্য হওয়া উচিত জোর করে শেখানো নয়; শুধু জানতে আগ্রহী করে তোলা। এখানেও মেঘদূতের মনে হয়, আকাশবাণী আবিষ্কৃত পেটেণ্ট পদ্ধতিটিই কিশোরমনে কাজ করছে, 'দাদা, পালিয়ে আয়, শিখিয়ে দেবে।' শিখিয়ে দেবার মেজাজ কর্তৃপক্ষ ত্যাগ করতে না পারলে শিখবার রাস্তায় ১৪৪ ধারা চিরটাকাল থেকে যাবে।

*

৩১শে জানুয়ারী সকাল ৯-৪৫-এ অতুলপ্রসাদ এবং বেলা ৩-১৫-এ রবীন্দ্র-সঙ্গীত পরিবেশন করলেন আরতি ভট্টাচার্য। শিল্পীর কণ্ঠস্বর সুরেলা এবং গায়নরীতিটিও পরিচ্ছন্ন। কর্তৃপক্ষ যদি সকালের এবং রাতের অনুষ্ঠানে শিল্পীটিকে গাইবার সুযোগ দেন তো শ্রোতারা আশা করি তাঁর গান শুনে আনন্দ পাবেন।

*

৪ঠা ফেব্রুয়ারী সুচিত্রা মিত্র গাইলেন রবীন্দ্রসঙ্গীত। তাঁর গান অতি উচ্চস্তরের। শিল্পীরূপে তিনি বাঙালীর মনে চিরস্থায়ী আসন করে নিয়েছেন। সঙ্গীত তাঁর সাধনালব্ধ ধন। তথাপি শ্রীমতী মিত্রের গায়নরীতি সম্পর্কে দু'-একটি কথা সবিনয়ে বলছি।

শ্রীমতী মিত্রের স্পষ্ট উচ্চারণ প্রশংসনীয়। তবে তাঁর গানে মাঝে মাঝে উচ্চারণকে খুব বেশি সুস্পষ্ট করার চেষ্টাও প্রকাশ পায় বলে মনে হয়—হয়তো এ চেষ্টা অনিচ্ছাকৃত। জানি না শিল্পীর সঙ্গীত শিক্ষার সুরুতে উচ্চারণকে অতিমাত্রায় স্পষ্ট এবং তীক্ষ্ম করার দিকে ঝোঁক ছিল কিনা। পুরানো অভ্যাসটি দাঁড়িয়ে গেছে হয়তো।

উচ্চারণকে অতিমাত্রায় স্পষ্ট করতে চাইলে শব্দের বা উক্তির একাংশে শ্বাসাঘাত (stress) পড়তে বাধ্য, ফলে নির্দিষ্ট শব্দে বা শব্দাংশে মৃদু হাতুড়ি-পেটা স্বর সৃষ্টি করে। তখন গানের তো বটেই এমন কি কথাবার্তার ক্ষেত্রেও স্বরোচ্চতা (পিচ এফেক্ট) কমে আসে। তাতে সুর ও স্বরের মিষ্টতার হয় লাঘব। ক'টা কথা বলার একমাত্র উদ্দেশ্য যাঁরা প্রতিভাদীপ্ত শিল্পীদের অনুকরণ এবং অনুসরণ করেন তাঁরা এসব সযত্নে লক্ষ্য করলে উত্তরসূরীরূপে লাভবান হবেন।

অনেক সময়ে এমনও দেখা যায়, নামী শিল্পীর শারীরিক অসুস্থতাজনিত সঙ্গীতের ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলিকে শিক্ষানবীশরা গানের রীতি ভেবে অনুকরণ করে ফেলেছেন! গাইবার সময়ে কোন কোন গায়ক-গায়িকার বেলায় মনে হয়, যেন মুখে পানের দোনা গোঁজা রয়েছে, কারুর বা মাঝে মাঝে গলা খাঁকারি বা ঝাঁকানি দেওয়া অভ্যাস, কোন কোন তরুণ শিল্পী আন্তরিকতার সঙ্গে এসব অনুকরণ করে বসেন! গুরুর ত্রুটি এবং মুদ্রাদোষ থেকে নিজেকে মুক্ত রেখে শিক্ষা গ্রহণ শিক্ষার্থীর একান্ত কর্তব্য। ত্রুটি বা মুদ্রা গুরু গৃহের ঘরানা নয়।

*

৪ঠা ফেব্রুয়ারী বেলা একটায় অভিনীত হয় "জমি"। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের এই নাটিকাটি বেতারে অভিনীত নাটিকা থেকে ভিন্ন গোত্রের, ভিন্ন স্বাদের। একদিকে মুসলিম সমাজ এই নাটকটির অবলম্বন, অপরদিকে দুঃখী মানুষের ওপর ধনবান মানুষের অত্যাচারটিও সুন্দর পরিস্ফুট হয়েছে। বেতারে প্রচারিত নাটকগুলি লক্ষ্য করছি। পরিবর্তনও অনুধাবন করছি। গত পক্ষে আকাশবাণী-পরিক্রমার রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালি' উপন্যাসের বেতার নাট্যরূপের উল্লেখ করেছি।

*

একই তারিখে বেলা দুটোয় 'পুনশ্চ' অনুষ্ঠিত হলো। বেলা একটায় সামাজিক নাটক 'জমি'র পর বেলা দুটোর কাব্যনাট্য শ্রীনীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর 'প্রথম নায়ক' শুনলাম। কাব্যনাট্যটি ইতিপূর্বে আমরা পড়েছি, ভালোও লেগেছে। কিন্তু সেটি নাট্যকাব্য না হওয়ায় 'জমি'র শ্রোতারা রেডিও বন্ধ করে উঠে পড়েন। শেষ অবধি মেঘদূত অবশ্য শুনেছিল এবং তার এও মনে হয়েছিল, শ্রীচক্রবর্তীর সুন্দর কাব্যনাট্যটিকে কি বিরূপ করে তোলাই ছিল এদিন 'পুনশ্চ'-র উদ্দেশ্য!

*

৫ই ফেব্রুয়ারী রাত ৮-৪৫ মিঃ পুরাতনী গেয়ে শোনালেন আঙ্গুরবালা। শৈশবকাল থেকে এই শিল্পীর গান বেতারে শুনে আসছি। মনে হয়, শিল্পী বৃদ্ধা, কণ্ঠস্বর তো তাই জানাতে চায়। আঙ্গুরবালা এবং এঁর কালের কয়েকজন শিল্পী একটি ধারা প্রবর্তন করেন। সে ধারাটি আজ লুপ্ত হতে চলেছে। বেতার মারফৎ যখন এঁদের গান শোনার সৌভাগ্য হয় তখন কর্তৃপক্ষের অকুণ্ঠ প্রশংসা না করে পারা যায় না।

*

ও-দিন রাত ১০-৪৫ মিঃ রবীন্দ্র-সঙ্গীত শোনালেন দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়। শিল্পীর স্রষ্টা তাঁকে দিয়েছেন অপূর্ব কণ্ঠস্বর: আর শিল্পীর সাধনা অপূর্ণ রাখলো তাঁর উচ্চারণ অস্পষ্টতা। রবীন্দ্র-সঙ্গীতের শিল্পীর উচ্চারণকে সঙ্গীতের অঙ্গ বলে মনে করা উচিত। উচ্চারণ

অক্ষমতা এ জগতে খ্যাত অর্জনের অন্তরায়।

*

ওদিন রাত ৯-৩০ মিঃ অরুণকৃষ্ণ ঘোষের কণ্ঠে অতুলপ্রসাদের গান ভাবের দিক থেকে প্রশংসনীয় হয়েছিল।

*

৬ই ফেব্রুয়ারী রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিবেশন করলেন বুলবুল সেন। এই শিল্পী মাঝে মাঝে স্বল্প প্রচলিত গান আমাদের শুনিয়ে থাকেন। বহু শ্রোতার ধারণা, রবীন্দ্রসঙ্গীত বোধ হয় শ'-আড়াই গানের সমষ্টি মাত্র। সেজন্য তাঁদের দোষ দেওয়া যায় না। মেলায়, জলসায়, বেতারে, রেকর্ডে সর্বত্র ক'খানি গান বারে বারে পাওয়া যাচ্ছে। কবি যে প্রায় আড়াই হাজার গান রচনা করেছেন তা অন্তত এ থেকে বোঝার উপায় নেই। সেক্ষেত্রে যেসব শিল্পী প্রচলিত গানের সঙ্গে কম প্রচলিত গানও পরিবেশন করেন তাঁরা রবীন্দ্রসঙ্গীতের তথা রবীন্দ্র সংস্কৃতির যথার্থ বোদ্ধা বলে নির্দিষ্ট হবেন।

*

১০-২-৬৮-র সকাল ৯-৪৩ মিঃ রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইলেন বলরাম দাস। শিল্পীর গান শুনে শুধু হেসেছিলাম সেদিন। ১১-২-৬৮

ইনি একটী অফিসের হাস্যময়ী, এবং সুচতুরা সুপারিনটেণ্ডেণ্ট। কঠোর পরিশ্রম এবং কর্মকুশলতার জন্য তিনি টাইপিষ্ট থেকে এতোখানি উন্নতি করতে পেরেছেন। তিনি বলেন, "বাড়ীর জন্য আমাকে বিশেষ কোন চিন্তা করতে হয়না বলে আমার কাজ আমি মনযোগ দিয়ে করতে পারি। আমি এবং আমার স্বামী যে মাইনে পাই, তা আমাদের ছোট পরিবারের পক্ষে যথেষ্ট। আমাদের তিনটী সন্তানকে যথাসম্ভব উপযুক্ত ভাবে মানুষ করে তোলবার জন্য আমরা চেষ্টা

করছি। ছয় বছর পূর্বে যখন আমাদের তৃতীয় সন্তানটী জন্মগ্রহণ করলো তখনই আমরা স্থির করি যে আমাদের আর সন্তানের প্রয়োজন নেই। আমি সত্যিই সুখী।"

ইনি সুখী।

আপনি?

রবীন্দ্রনাথ ও সুভাষচন্দ্র

শঙ্করীপ্রসাদ বসু

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

ছাত্রশাসনতন্ত্র : নেতার জন্ম

একটি প্রহার যে এত পরিস্থিতির সৃষ্টি করতে পারে কে জানত। সরকার প্রেসিডেন্সি কলেজ বন্ধ করে দিলেন, সরকার হয়ে চিরকালের জন্য কলেজ তুলে দেবেন, তাও জানালেন। প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যক্ষ খেপেন চটে, তাঁর সংগে পরামর্শ না করে কলেজ বন্ধ করা হোল কেন। সেই নিয়ে তুমুল ঝগড়া করে এলেন শিক্ষামন্ত্রীর সংগে। বেয়াড়া ছাত্রদের সংগে এই অধ্যক্ষ স্বয়ং এমন বেয়াড়া আচরণ করলেন যে, তিনি নিজ অধ্যক্ষের দ্বারা সাসপেন্ড হলেন, এবং উক্ত সাসপেন্ড অধ্যক্ষ কাজ বুঝিয়ে দেবার আগে নিজের শেষ ক্ষমতায় সাসপেন্ড করে দিলেন বেয়াড়াতম ছাত্রটিকে।

"দাঁতমুখ খিঁচিয়ে আমাকে তিনি বললেন,—'বোস, তোমার মত বেয়াড়া ছেলে কলেজে আর নেই, তোমাকে আমি সাস্পেন্ড করলাম।' কথাগুলো আজও আমার মনে আছে। জবাবে আমি শুধু বলেছিলাম—ধন্যবাদ। তারপর বাড়ি চলে এলাম। শংকরাচার্যের মায়াবাদের ঘোর মন থেকে কেটে গেল।"

বাইরের এই পরিস্থিতি—এর আকর্ষণীয়তার চেয়ে আমাদের কাছে মূল্যবান ভিতরের ছবি—মানুষের অন্তর্গহনের সংবাদ—যেখানে সে যথার্থ সত্য—যেখানে স্বরূপে সে অমহৎ বা মহৎ। সুভাষচন্দ্রের বন্ধু দিলীপকুমারের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ, তিনি ঐ সময়ের একটি চিত্র উপহার দিয়েছেন, যার দ্বারা আমরা একদিকে বাঙালী সংস্কারে এই ধরণের ঘটনার একটি সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়ার রূপ দেখতে পাই, অন্যদিকে ফুটে উঠেছে সুভাষচন্দ্রের মনের রূপ—বহুজনের সাক্ষ্য অনুযায়ী ঐ বয়সেই যে ছিল অসাধারণ চরিত্র।

"তখন আমি পড়ি বি এসসি, সুভাষ বি এ। হঠাৎ একদিন শুনলাম ইংরাজ অধ্যাপক ওটেন তাঁর ক্লাসে এক ছাত্রকে যা-তা বলে গালিগালাজ করেছেন। ছাত্রসমাজে সে সময়ে এখনকার মত কথায় কথায় স্ট্রাইক পিকেটিং ইত্যাদি হোত না। তার উপর এখানে অপমানকারী খাস সাহেব—রাঙামুখো গোরা।...ফলে ছাত্ররা রাগ করলেও অধ্যাপকের বিরুদ্ধে কী যে ঠিক করবে ভেবে পায় নি। তাদের মধ্যে দু দল ছিল যেমন সর্বত্রই থাকে—নরম ও গরম। একদল চেয়েছিল ওটেন সাহেবের কাছে গিয়ে সুধামাখা হাসি হেসে বলবে—'লাথি যদি না খাব তো জন্মেছিলাম কিসের জন্য?'......ছাত্রসমাজে আর একদল ছিল বটে গরমপন্থী, কিন্তু তারাও কেমন যেন দোমনা। অর্থাৎ তারা 'ঘরে খিল্ দিয়ে রাজার মাকে ডান' বলতে পটু হলেও বাইরে এসে দিব্যি নিরীহ সভ্যভব্য বেশেই ঘুরে বেড়াত।.....

এইখানেই দিঙ্‌নির্ণয় করতে অভ্যুদয় হয় 'বর্‌ন লীডার'-এর। জনসাধারণের মধ্যে যে আগুন চাপা থাকে তাকে প্রকাশ করতে পারে কেবল সে-ই—তার দুর্দম সাহসে, পরিণাম-চিন্তার বিসর্জনে। এ করে সে ভেবেচিন্তে নয়, না করে থাকতে পারে না বলেই ঝাঁপিয়ে পড়ে সকলের ব্যথা অপমানের শরিক হতে। আগুনের স্বধর্মই এই—আগুন ছড়িয়ে দেওয়া।

তাই তো সুভাষ এই সময়ে 'পর্বতের চূড়াসম সহসা প্রকাশ।'......পরে একদিন আমাকে বলেছিল—'সত্যিই ভাই আমি গুরুমারা বিদ্যায় পোক্ত ছিলাম না কোনদিন। কিন্তু যখন দেখলাম গরমপন্থীদের মধ্যেও অনেকেই শুধু মুখে বড়াই করেই খালাস, কাজের বেলা গায়েব—তখন আর থাকতে পারলাম না দিলাম ঝাঁপ—যা হবার হবে।.....

"পরিস্কার মনে আছে পরদিন সকালবেলার কাহিনী। মেজমামা চায়ের টেবিলে খবরের কাগজ খুলেই চিৎকার—'ওরে মণ্টু, তোদের সাহেবকে যে সুভাষরা দিয়েছে কাল গোবেড়েন।'

আমি লাফিয়ে উঠলাম—'দেখি দেখি!' দাদামশায় (সেকেলে সজ্জন—ভয়েই সারা) বললেন—'এসব কী করেছে ওরা—ছি ছি? এর নাম—'

মেজমামা (হেসে)। গুরুমারা বিদ্যে বাবা, একালের ধর্মই যে এই। (আমার দিকে কটাক্ষ করে), তুই ওদের মধ্যে ছিলি না তো রে?

আমি (হেসে)। না। মেজমামা ফুলপ্রুফ অ্যালিবি দেবেন—আমি তিনটের শো-এ তাঁর সঙ্গে গিয়েছিলাম সিনেমায়—ছটা পর্যন্ত তাঁর নজরবন্দী।

দাদামশায় (স্বস্তির দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে)। বাঁচা গেল...কিন্তু—

আর কিন্তু—আমি ছুটলাম এলগিন রোডে। সেখানে সুভাষের সংগে দেখা হতেই দোরে খিল দিয়ে ফিসফিসিয়ে বললাম, 'আমাকে বাদ দিলে কেন সুভাষ?'

সুভাষ গভীর স্নেহে আমার পিঠ চাপড়ে বলল,—তোমার ভাই মা-বাবা নেই, দাদামশায়ের কাছে আছ—তোমাকে কেন মিথ্যে বিপদের মধ্যে টানা? না, দিলীপ, এ তোমার কাজ নয়। আমরা শাস্তি দিয়েছি বটে, কিন্তু তার জন্য ভুগতে হবে।"

মানুষটিকে চিনলাম—তার হৃদয়কে। যার মা-বাবা নেই, এমন একটি ছেলেকে সে বিপদে জড়াতে চায় নি। বিপদ বুক পেতে নেবার মত চওড়া বুক তার ছিল। অনেকেই তাকে বলেছিল, গা ঢাকা দিতে। সকলকে বাঁচাতে গিয়ে রিংলীডারের মুল কলঙ্ক তুলে নিল নিজের ললাটে। সুভাষ বলেছিলেন—'অপরকে উসকে দিয়ে যে দায়িত্ব নিতে পিছপাও হয় সে কাপুরুষ।' সুভাষ বলতেন—'আমি সব সইতে পারি দিলীপ, কেবল কাপুরুষতা দেখলে আমার গায়ের মধ্যে যেন রি-রি করে ওঠে।'

ইতিমধ্যে তদন্ত কমিশন গঠিত হয়েছে। কমিটির সভাপতি স্যার আশুতোষ। সেই কারণে অনেকের ধারণা ছাত্ররা সুবিচার পাবে। সরকারী ও মিশনারী কর্মচারীরা কিন্তু রক্তচক্ষু, ব্যাঘ্রদন্ত। শাস্তিটা যাতে কড়া রকমের হয় তার জন্য আগ্রহের সীমা নেই। এই সময়ে পরিস্থিতির নিপুণ বিশ্লেষণ করে রবীন্দ্রনাথ এক দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখলেন। আগেই বলেছি প্রবন্ধটি বেরিয়েছিল সবুজপত্রে, এবং প্রবন্ধটিকে ইংরেজি করে প্রকাশ করেছিলেন মডার্ন রিভিউ পত্রিকায়, পাঠিয়ে দিলেন বাংলার গভর্নর লর্ড

কারমাইকেলের কাছে, যাতে তিনি চ্যান্সেলার হিসাবে অপরাধী ছাত্রদের সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত করার পূর্বে সমস্ত অবস্থাটি বিবেচনা করে দেখতে পারেন।(২)

রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধটি আকারে বড়, তবু বহুলাংশে তা উপস্থিত করব। কারণ এই প্রবন্ধটি ছাত্রজীবন সমস্যা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের পরিপূর্ণ বোধ-শক্তির প্রমাণ, এবং ভারতে ইংরেজ শাসনের বিকৃতি সম্বন্ধে সাক্ষ্য-বিবরণ। ইংরেজ ও ভারতীয়ের পারস্পরিক সম্পর্ক সম্বন্ধে উৎকৃষ্ট বিশ্লেষণ প্রবন্ধটিতে আছে, আর আছে উৎপীড়িত ছাত্রদের সম্বন্ধে তাঁর অপরিসীম সহানুভূতি।(৩)

প্রবন্ধের সূচনায় সমস্যার উপস্থাপনা :—

"প্রেসিডেন্সি কলেজে ছাত্রদের সহিত কোনো কোনো য়ুরোপীয় অধ্যাপকের যে বিরোধ ঘটিয়াছে তাহা লইয়া কোনো কথা বলিতে সঙ্কোচ বোধ করি। তার একটা কারণ, ব্যাপারটা দেখিতেও ভাল হয় নাই, শুনিতেও ভাল নয়; আর একটা কারণ, ইংরেজ ও ভারতবাসীর সম্পর্কের মধ্যে যেখানে কিছু ব্যথা আছে, সেখানে নাড়া দিতে ইচ্ছা করে না।

"কিন্তু কথাটাকে চাপা দেওয়া চলিবে না। চাপা থাকেও নাই—বাহির হইয়া পড়িয়াছে। মনে-মনে বা কানে-কানে বা মুখে-মুখে সকলেই এর বিচার করিতেছে।

"বিকৃতি ভিতরে জমিতে থাকিলে একদিন সে আর আপনাকে ধরিয়া রাখিতে পারে না। লাল হইয়া শেষকালে ফাটিয়া পড়ে। তখনকার মত সেটা সুদৃশ্য নয়।

"বাহিরে ফুটিয়া পড়াটাকেই দোষ দেওয়া বিশ্ববিধানকে দোষ দেওয়া,—এমনতর অপবাদে বিশ্ববিধাতা কান দেন নাই। ভিতরে ভিতরে জমিতে দেওয়া লইয়াই আমাদের নালিশ চলে।

"যাক বাহির যখন হইয়াছেই, তখন বিচার করিয়া কোনো একটা জায়গায় শাস্তি না দিলে নয়। এইটেই সংকটের সময়। জিনিসটা ভদ্র রকমের নহে এটা ঠিক। ইহার আক্রোশটা প্রকাশ করিব কার উপরে? প্রায় দেখা যায় সহজে যার উপর জোর খাটে শাসনের ধাক্কাটা তারই উপরে পড়ে। ঘরের গৃহিণী যেখানে বৌকে মারিতে ভয় পায়, সেখানে ঝিকে মারিয়া কর্তব্য পালন করে।"

রবীন্দ্রনাথ প্রথমে স্বীকার করেছেন, প্রেসিডেন্সি কলেজের ব্যাপারটা দেখতে বা শুনতে কোনো দিক দিয়েই ভাল হয় নি। ঘটনার আপাত রূপটা যে সুশ্রী নয়, তা মানতেই হবে। কিন্তু প্রশ্ন—দায়িত্বটা কার? কাক উড়ে গেল এবং তাল পড়ল—তাল পড়ার কারণ কি সর্বক্ষেত্রে শুধুই কাকের উড়ে যাওয়া? রবীন্দ্রনাথ পরিষ্কার বললেন, বিকৃতিকে ভিতরে জমতে দিলে সে লাল হয়ে ফেটে পড়বে—ঐ ফেটে পড়াটা বিশ্ববিধান—অভিযোগ যদি করতে হয় তা করতে হবে বিকৃতি জমতে দেওয়ার বিরুদ্ধে। মারাত্মক কথা। রবীন্দ্রনাথ ফরিয়াদী ও আসামীকে এক স্তরে দাঁড় করালেন এবং শুধু তাই নয়, ইঙ্গিত করলেন আপাতত না হলেও অন্তরত ফরিয়াদীই আসামী—'প্রায়ই দেখা যায় যার উপর জোর খাটে শাসনের ধাক্কাটা তারই উপরে পড়ে।' ইংরেজ ও ভারতীয় যেখানে প্রতিপক্ষ সেখানে দুর্বল পক্ষ কে বলে দিতে হবে না।

অতঃপর রবীন্দ্রনাথ বিচারসভার কর্তব্য সম্বন্ধে নিজের ধারণা প্রকাশ করলেন :—

"বিচারসভা বসিয়াছে। ইতিমধ্যেই ছাত্রদের সম্বন্ধে শাসন কড়া করিবার জন্য কোনো মিশনারী কলেজের কর্তা কর্তৃপক্ষের নিকট আবদার প্রকাশ করিয়াছেন। কথাটা শুনিতেও হঠাৎ সংগত বোধ হয়। কারণ ছাত্রেরা অধ্যাপকদের অপমান করিলে সেটা যে অপরাধ হয় তাহা নহে, সেটা অস্বাভাবিক হইয়া ওঠে। যেখান হইতে আমরা জ্ঞান পাই, সেখানে আমাদের শ্রদ্ধা যাইবে এটা মানবপ্রকৃতির ধর্ম। তাহার উল্টা দেখিলে বাহিরের শাসনে এই বিকৃতির প্রতিকার করিতে হইবে, সেকথা সকলেই স্বীকার করিবেন।

"কিন্তু প্রতিকার প্রণালী ঠিক করিবার পূর্বে ভাবিয়া দেখা চাই স্বভাব ওলটায় কিসে?

"কাগজে দেখিতে পাই, অনেকে এই বলিয়া আক্ষেপ করিতেছেন যে, যে-ভারতবর্ষে গুরুশিষ্যের সম্বন্ধ ধর্ম-সম্বন্ধ, সেখানে এমনতর ঘটনা বিশেষভাবে গর্হিত। শুধু গর্হিত এ কথা বলিয়া পার পাইব না, চিরকালীন এই সংস্কার অস্থিমজ্জার মধ্যে থাকা সত্ত্বেও ব্যবহারে তাহার ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে কেন, এর একটা সত্য উত্তর বাহির করিতে হইবে।"

রবীন্দ্রনাথ একটি সহজ সত্য উপরে তুলে ধরলেন—অধ্যাপককে মারা ছাত্রের পক্ষে 'অস্বাভাবিক'—সেটাতে আছে মানব-প্রকৃতির বিরোধিতা। ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে তার চিরকালীন সংস্কারের ব্যতিক্রম। সুতরাং তেমন অস্বাভাবিক যখন ঘটেছে—রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য—তার কারণ আছে—সেই কারণ অনুসন্ধান করা বিচারসভার কর্তব্য।

ঐ 'কারণ' রবীন্দ্রনাথ নিজে সন্ধান করছেন এইবার। প্রথমে কলেজজীবনের আরম্ভে বয়ঃসন্ধিকালের ছাত্রমনস্তত্ত্বের অনবদ্য বিশ্লেষণ :—

"বাংলাদেশের ছাত্রদের মনস্তত্ত্ব যে বিধাতার একটি খাপছাড়া খেয়াল এ কথা মানি না। ছেলেরা যে বয়সে কলেজে পড়ে সেটা একটা বয়ঃসন্ধির কাল। তখন শাসনের সীমানা হইতে স্বাধীনতার এলাকায় সে প্রথম পা বাড়াইয়াছে। এই স্বাধীনতা কেবল বাহিরের ব্যবহারগত নহে। মনোরাজ্যেও সে ভাষার খাঁচা ছাড়িয়া ভাবের আকাশে ডানা মেলিতে সুরু করিয়াছে। তার মন প্রশ্ন করিবার, তর্ক করিবার, বিচার করিবার অধিকার প্রথম লাভ করিয়াছে। শরীর মনের এই বয়ঃসন্ধিকালটিই বেদনাকাতরতায় ভরা। এই সময়েই অল্পমাত্র অপমান মর্মে গিয়া বিঁধিয়া থাকে এবং আভাসমাত্র প্রীতি জীবনকে সুধাময় করিয়া তোলে। এই সময়েই মানব-সংস্রবের জোর তার পরে যতটা খাটে এমন আর কোনো সময়েই নয়।

"এই বয়সটাই মানুষের জীবন মানুষের সঙ্গপ্রভাবেই গড়িয়া উঠিবার পক্ষে সকলের চেয়ে অনুকূল, স্বভাবের এই সত্যটিকে সকল দেশের লোকেই মানিয়া লইয়াছে। এই জন্যই আমাদের দেশে বলে 'প্রাপ্তে তু ষোড়শে বর্ষে পুত্রং মিত্রবদাচরেৎ'—তার মানে এই বয়সেই ছেলে যেন বাপকে পুরোপুরি মানুষ বলিয়া বুঝিতে পারে শাসনের কল বলিয়া নহে—কেন না, মানুষ হইবার পক্ষে মানুষের সংস্রব এই বয়সেই দরকার। এই জন্যই সকল দেশেই ইউনিভার্সিটির ছাত্ররা এমন একটুখানি সম্মানের পথ পাইয়া থাকে যাহাতে অধ্যাপকদের বিশেষ কাছে তাহারা আসিতে পারে এবং সেই সুযোগে তাদের জীবনের পরে মানব-সংস্রবের হাত পড়িতে পায়। এই বয়সে ছাত্রগণ শিক্ষার উদ্যোগপর্ব শেষ করিয়া মনুষ্যত্বের সার জিনিসগুলিকে আত্মসাৎ করিবার পালা আরম্ভ করে—এই কাজটি স্বাধীনতা বা আত্মসম্মান ছাড়া হইবার জো নাই। সেইজন্যই এই বয়সে আত্মসম্মানের সম্বন্ধে দরদ বড় বেশি হয়। চিবাইয়া খাইবার বয়স আসিলে বেশ একটু জানান দিয়া দাঁত ওঠে, তেমনি মনুষ্যত্বলাভের যখন বয়স আসে তখন আত্মসম্মান চেষ্টাটা একটু ঘটা করিয়াই দেখা দেয়।

"এই বয়ঃসন্ধির কালে ছাত্ররা মাঝে মাঝে এক-একটা হাঙ্গামা বাধাইয়া বসে।

২—রবীন্দ্রজীবনী ৩—৪০৮

৩—একটি প্রশ্ন—এ ব্যাপারে 'আঁভার' ছেলেটিকে কি রবীন্দ্রনাথ স্মরণ করতে পেরেছিলেন, প্রবন্ধ লেখার কালে?

শুধু ঠিকমত তাক ক'রে...
ক্লিক
করুন
...প্রতিবারই নিখুঁত ছবি তুলে দেবে
ক্লিক III
কোনো হিসেবের ঝামেলা নেই—ভুল হবার ভয় নেই
প্রত্যেক '১২০' ফিল্মে ১২টি বড় ছবি (৬×৬ সেন্টিমিটার)
এভার-রেডি কেস, পোর্ট্রেট লেনস ও ফ্ল্যাশ গানের দাম আলাদা।
ক্লিক III — এমনই সুন্দর হাতে খড়ি দেবে, আপনি আর ছাড়তে চাইবেন না।
আগফার তত্ত্বাবধানে প্রস্তুতকারক : দি নিউ ইণ্ডিয়া ইণ্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড, বরোদা।
একমাত্র পরিবেশক :
আগফা-গেভার্ট ইণ্ডিয়া লিমিটেড বোম্বাই • নিউ দিল্লী • কলিকাতা • মাদ্রাজ
সুন্দর ঝকঝকে প্রিণ্ট ও এনলার্জমেন্টের জন্যে আগফা ফোটো পেপার অবশ্য চাইবেন
CMAG-99-203 BEN

যেখানে ছাত্রদের সঙ্গে অধ্যাপকদের সম্বন্ধ স্বাভাবিক, সেখানে এই সকল উৎপাতকে জোয়ারের জলের জঞ্জালের মত ভাসিয়া যাইতে দেওয়া হয়—কেন না তাকে টানিয়া তুলিতে গেলেই সেটা বিশ্রী হইয়া ওঠে।"

কেবল মনোবিশ্লেষণ নয়, যুক্তি-বিস্তারের পদ্ধতিও চমৎকার। বয়ঃসন্ধি কালে সর্বদেশীয় ছাত্রমনস্তত্ত্বের স্বাভাবিক রূপ কি, এবং সুস্থ ও স্বাধীন দেশে সে সম্বন্ধে কেমন সহিষ্ণুতা ও বিবেচনার সঙ্গে ব্যবহার করা হয়—রবীন্দ্রনাথ তার উল্লেখ করছেন এই জন্য যে, এই পশ্চাৎ-পটে উপেক্ষিত ও নিগৃহীত বাঙালী ছাত্রদের বিদ্রোহ অবশ্যম্ভাবী বলে স্বীকৃত হবে। বাংলাদেশে ছাত্রজীবনের অপরিমেয় দুর্গতি রবীন্দ্রনাথ বেদনার অক্ষরে ফুটিয়েছেন, আর ফুটেছে ছাত্র-শাসনের দারোগাদের প্রতি ঘৃণা :—

"বিধাতার নিয়ম অনুসারে বাঙালী ছাত্রদেরও এই বয়ঃসন্ধির কাল আসে, তখন তাহাদের মনোবৃত্তি যেমন একদিকে আত্ম-শক্তির অভিমুখে মাটি ফুঁড়িয়া উঠিতে চায়, তেমনি আর একদিকে যেখানে তারা কোন মহত্ত্ব দেখে, যেখান হইতে তারা শ্রদ্ধা পায়, জ্ঞান পায়, দরদ পায়, প্রাণের প্রেরণা পায়, সেখানে নিজেকে উৎসর্গ করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া ওঠে। মিশনারি কলেজের বিধাতাপুরুষের বিধানে ঠিক এই বয়সেই তাহাদিগকে শাসনে-পেষণে দলনে-দমনে নির্জীব জড়পিণ্ড করিয়া তুলিবার যাঁতাকল বানাইয়া তোলা জগদ্বিধাতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ—ইহাই প্রকৃত নাস্তিকতা।

"জেলখানার কয়েদী নিয়মের নড়চড় করিলে তাকে কড়া শাসন করিতে কারো বাধে না, কেন না তাকে অপরাধী বলিয়াই দেখা হয়, মানুষ বলিয়া নয়। অপমানের কঠোরতায় মানুষের মনে কড়া পড়িয়া থাকে, তাকে কেবলি অমানুষ করিতে থাকে, সে হিসাবটা কেহ করিতে চায় না—কেন না, মানুষের দিক দিয়া তাকে হিসাব করাই হয় না। এইজন্য জেলখানার সর্দারি যে করে সে মনুষ্যকে নয়, অপরাধীকেই সকলের চেয়ে বড় করিয়া দেখে।......

"কিন্তু ছাত্রকে জেলের কয়েদী বা ফৌজের সিপাই বলিয়া আমরা তো মনে ভাবিতে পারি না। আমরা জানি তাহা-দিগকে মানুষ করিয়া তুলিতে হইবে। মানুষের প্রকৃতি সূক্ষ্ম এবং সজীব তন্তু-জালে বড় বিচিত্র করিয়া গড়া। এইজন্যই মানুষের মাথা ধরিলে মাথায় মুগুর মারিয়া সেটা সারানো যায় না,—অনেক দিক বাঁচাইয়া প্রকৃতির সাধ্য-সাধনা করিয়া তার চিকিৎসা করিতে হয়। এমন লোকও আছে এ সম্বন্ধে যারা বিজ্ঞানকে খুবই সহজ করিয়া আনিয়াছে—তারা সকল ব্যাধিরই একটি মাত্র কারণ ঠিক করিয়া রাখিয়াছে, সে হচ্ছে ভূতে পাওয়া। এবং তারা মিশনরি কলেজের ওঝাটির মত ব্যাধির ভূতকে মারিয়া ঝাড়িয়া গরম লোহার ছ্যাঁকা দিয়া চীৎকার করিয়া তাড়াইতে চায়। তাহাতে ব্যাধি যায় এবং প্রাণপদার্থের প্রায় পনের আনা তার অনুসরণ করে।

"এ হইল আনাড়ির চিকিৎসা। যারা বিচক্ষণ তারা ব্যাধিটাকেই স্বতন্ত্র করিয়া দেখে না; চিকিৎসার সময় তারা মানুষের সমস্ত ধাতটাকে অখণ্ড করিয়া দেখে; মানবপ্রকৃতির জটিলতা ও সূক্ষ্মতাকে তারা মানিয়া লয় এবং বিশেষ কোনো ব্যাধিকে শাসন করিতে গিয়া সমস্ত মানুষটাকে নিকাশ করিয়া বসে না।

"অতএব যাদের উচিত ছিল জেলের দারোগা বা ড্রিল সার্জেন্ট বা ভূতের ওঝা হওয়া, তাদের কোনোমতেই উচিত হয় না ছাত্রদিগকে মানুষ করিবার ভার লওয়া। ছাত্রদের ভার তাঁরাই লইবার অধিকারী যাঁরা, নিজের চেয়ে বয়সে অল্প, জ্ঞানে অপ্রবীণ ও ক্ষমতায় দুর্বলকে সহজেই শ্রদ্ধা করিতে পারেন, যাঁরা জানেন শক্তস্য ভূষণং ক্ষমা, যাঁরা ছাত্রকে মিত্র বলিয়া গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত হন না।"

আর কি বেশি কঠিন কথা বলা সম্ভব —রবীন্দ্রনাথ যা বললেন! ইংরেজ অধ্যাপকরা 'জেলের দারোগা', 'ড্রিল সার্জেন্ট', বা 'ভূতের ওঝা' হবার যোগ্য! তাদের ঠেলে দেওয়া হয়েছে কমলবনে। সুভাষচন্দ্রের বাহুপ্রহার এই বাণীপ্রহারের চেয়ে অধিক কঠিন নয়।

বাংলাদেশে ইংরেজ শিক্ষক ও ভারতীয় ছাত্রের সম্পর্কের অস্বাভাবিকতা আবার বিশ্লেষিত হোল তীক্ষ্ণভাবে, তারই পাশে পাশে যথার্থ শিক্ষকের চারিত্র্য ধর্মের রূপ :—

"যীশুখৃষ্ট বলিয়াছেন, শিশুদিগকে আমার কাছে আসিতে দাও। তিনি শিশু-দিগকে বিশেষ করিয়া শ্রদ্ধা করিয়াছেন। কেন না শিশুদের মধ্যে পরিপূর্ণতার ব্যঞ্জনা আছে। যে মানুষ বয়সে পাকা হইয়া অভ্যাসে সংস্কারে ও অহমিকায় কঠিন হইয়া গেছে, সে মানুষ সেই পূর্ণ-তার ব্যঞ্জনা হারাইয়াছে—বিশ্বগুরুর কাছে আসা বড়ই কঠিন।

"ছাত্রেরা গড়িয়া উঠিতেছে—ভাবের আলোকে, রসের বর্ষণে তাদের প্রাণ-কোরকের গোপন মর্মস্থলে বিকাশবেদনা জ কাবতেছে। প্রকাশ তাদের মধ্যে থামিয়া যায় নাই—তাদের মধ্যে পরিপূর্ণ-তার ব্যঞ্জনা। সেই জন্যই সদ্গুরু ইহা-দিগকে শ্রদ্ধা করেন, প্রেমের সহিত কাছে আহ্বান করেন, ক্ষমার সহিত ইহাদের অপরাধ মার্জনা করেন, এবং ধৈর্যের সহিত ইহাদের চিত্তবৃত্তিকে ঊর্ধ্বের দিকে উদ্ঘাটন করিতে থাকেন। ইহাদের মধ্যে পূর্ণ মনুষ্যত্বের মহিমা প্রভাতের অরুণ-রেখার অসীম সম্ভাব্যতার গৌরবে উজ্জ্বল; সেই গৌরবের দীপ্তি যাদের চোখে পড়ে না,—যারা নিজের বিদ্যা, পদ বা জাতির অভিমানে ইহাদিগকে পদে পদে অবজ্ঞা করিতে উদ্যত তারা গুরুপদের অযোগ্য। ছাত্রদিগকে স্বভাবতই শ্রদ্ধা করিতে না পারে, ছাত্রদের নিকট হইতে ভক্তি তারা সহজে পাইতে পারিবে না। কাজেই ভক্তি জোর করিয়া আদায় করিবার জন্য তারাই রাজদরবারে কড়া আইন ও চাপরাসওয়াল পেয়াদার দরবার করিয়া থাকে।

"ছাত্রদিগকে কড়া শাসনের জালে যাঁরা মাথা হইতে পা পর্যন্ত বাঁধিয়া ফেলিতে চান তাঁরা অধ্যাপকদের যে কত বড় ক্ষতি করিতেছেন সেটা যেন ভাবিয়া দেখেন। পৃথিবীতে অল্প লোকই আছে নিজের অন্তরের মহৎ আদর্শ যাহাদিগকে সত্য-পথে আহ্বান করিয়া লইয়া যায়। বাহিরের সঙ্গে ঘাতপ্রতিঘাতের ঠেলাতেই তারা কর্তব্য সম্বন্ধে সতর্ক হইয়া থাকে। বাহিরের সঙ্গে বোঝাপড়া আছে বলিয়াই তারা আত্মবিস্মৃত হইতে পারে না।"

এরপরে রবীন্দ্রনাথ যে কথাগুলি বলেছেন, সেগুলি এই প্রবন্ধের পক্ষে গুরুতম কথা, সেখানে আছে তথাকথিত অন্যায়কারী ছাত্রদের উন্মুক্ত কার্যসমর্থন। স্পর্শকাতর মনের কোনো একজন কবি শিক্ষক-প্রহারের মত ভয়াবহ ব্যাপারকেও পারিপার্শ্বিকের বিচারে ন্যায়সঙ্গত মনে করতে পারেন, সেটাকে আত্মমর্যাদার প্রমাণ এবং অন্যায়ের যোগ্য প্রতিবিধান বিবেচনা করতে পারেন—সেটা ধারণা করাও কঠিন। এ সব ক্ষেত্রে অস্পষ্ট কথার জালে হয়-নয়-এর মধ্যে সিদ্ধান্তটিকে দুলিয়ে বা ঝুলিয়ে রাখাই স্বাভাবিক ছিল। রবীন্দ্রনাথ তা করেন নি। রবীন্দ্রনাথ ছাত্রদের কৃতকর্মকে (হয়তো প্রহারের 'ফর্ম'-টিকে বাদ দিয়ে) সমর্থন করেছেন—

"এই জন্যই চারিদিকে যেখানে দাসত্ব, মনিবের সেখানে দুর্গতি, শূদ্র যেখানে শূদ্র, ব্রাহ্মণের সেখানে অধঃপতন। কঠোর শাসনের চাপে ছাত্রেরা যদি মানবস্বভাব হইতে ভ্রষ্ট হয়, সকল প্রকার অপমান, দুর্ব্যবহার অযোগ্যতা যদি তারা নির্জীব-

ভাবে নিঃশব্দে সহিয়া যায়, তবে অধিকাংশ অধ্যাপকদিগকেই তাহা অধোগতির দিকে টানিয়া লইবে। ছাত্রদের মধ্যে অবজ্ঞার কারণ তাঁরা নিজে ঘটাইয়া তুলিয়া তাহাদের অবমাননার দ্বারা নিজেকে অহরহ অবমানিত করিতে থাকিবেন। অবজ্ঞার ক্ষেত্রে নিজের কর্তব্য কখনই কেহ সাধন করিতে পারে না।

"অপরপক্ষ বলিবেন, তবে কি ছেলেরা যা-খুশি-তাই করিবে, আর সমস্তই সহিয়া লইতে হইবে? আমার কথা, এই ছেলেরা যা-খুশি-তাই কখনই করিবে না। তার ঠিক পথেই চলিবে যদি তাহাদের সঙ্গে ঠিক মত ব্যবহার করা হয়। যদি তাহাদিগকে অপমান কর, তাহাদের জাতি বা ধর্ম বা আচারকে গালি দাও, যদি দেখে তাহাদের পক্ষে সুবিচার পাইবার আশা নাই, যদি অনুভব করে যোগ্যতা সত্ত্বেও তাহাদের স্বদেশীয় অধ্যাপকেরা অযোগ্যের কাছে মাথা হেঁট করিতে বাধ্য হয়, তবে ক্ষণে ক্ষণে তারা অসহিষ্ণুতা প্রকাশ করিবেই—যদি না করে, তবে আমরা সেটাকে লজ্জা এবং দুঃখের বিষয় বলিয়া মনে করিব।"

ছাত্রদের কি ধরনের অপমান সহ্য করতে হোত বা হয়েছিল, বিচার চেয়েও কিভাবে তারা সুবিচারে বঞ্চিত ছিল, তার অতি সংযত বর্ণনা সুভাষচন্দ্র দিয়েছেন, পূর্বে তা উদ্ধৃত করেছি। রবীন্দ্রনাথ-কথিত স্বদেশী অধ্যাপকদের মাথা হেঁট করার গ্লানিজনক দুর্ভাগ্যের ইতিহাস বর্ণনা করার প্রয়োজন নেই, রবীন্দ্রনাথের বন্ধু জগদীশচন্দ্র বসুর কর্মজীবন তার দৃষ্টান্তস্থল হয়ে আছে। এমন পরিস্থিতিতে ছাত্ররা অভিপ্রেত অসহিষ্ণুতা দেখিয়ে রবীন্দ্রনাথকে 'লজ্জা ও দুঃখ' থেকে রক্ষা করেছে, বিবেকানন্দকেও (সুভাষচন্দ্র বিবেকানন্দের ভাবশিষ্য), বিবেকানন্দ বলে গেছেন, পাথর ব্যভিচার করে না, গাছ চুরি করে না, তাই বলে মানুষ গাছ পাথর হবে নাকি?

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ নিরপেক্ষ। যে-কোন জিনিসের বিপরীত পক্ষ থাকে। ন্যায়-ধর্মের খাতিরে রবীন্দ্রনাথ বিপক্ষ পক্ষের কথা বলবেন :—

"অপরপক্ষে একটি সংগত কথা বলিবার আছে। য়ুরোপীয়ের পক্ষে ভারতবর্ষ বিদেশ, এখানকার আবহাওয়া ক্লান্তিকর, তাঁহাদের পানাহার উত্তেজক, আমরা তাঁহাদের অধীনস্থ জাতি, আমাদের বর্ণ, ধর্ম, ভাষা, আচার সমস্তই স্বতন্ত্র; তার উপরে, এদেশে প্রত্যেক ইংরেজই রাজশক্তি বহন করেন, সুতরাং রাজাসন তাঁহার সঙ্গে সঙ্গেই চলিতে থাকে;—এই জন্য ছাত্রকে কেবলমাত্র ছাত্র বলিয়া দেখা তাঁর পক্ষে শক্ত, তাকে প্রজা বলিয়াও দেখেন। অতএব অতি সামান্য কারণে অসহিষ্ণু হওয়া তাঁর পক্ষে স্বাভাবিক। বাঙালী ছাত্রদের মানুষ করিবার ভার কেবল তাঁর নয়, ইংরেজরাজের প্রতিষ্ঠা রক্ষার ভারও তাঁর। অতএব একে তিনি ইংরেজ, তার উপর তিনি ইম্পীরিয়াল সার্ভিসের অধ্যাপক, তার উপর তিনি রাজার অংশ, তার উপরে তাঁর বিশ্বাস তিনি পতিত উদ্ধার করিবার জন্য আমাদের প্রতি কৃপা করিয়াই এ দেশে আসিয়াছেন, এমন অবস্থায় সকল সময়ে তাঁর মেজাজ ঠিক না থাকিলেও পারে। অতএব তিনি কিরূপ ব্যবহার করিবেন সে বিচার না করিয়া ছাত্রদেরই ব্যবহারকে আষ্টেপৃষ্ঠে কঠিন করিয়া বাঁধিয়া দিতে হইবে। সমুদ্রকে বলিলে চলিবে না যে, তুমি এই পর্যন্ত আসিবে তার ঊর্ধ্বে নয়, তীরে যারা আছে তাহাদিগকে বলিতে হইবে তোমরা হঠ হঠ, আরো হঠ।"

রবীন্দ্রনাথ যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলেন ইংরাজপক্ষ সমর্থনের। সে পক্ষের অসহিষ্ণুতার পরিবেশ বিচারও করেছিলেন, কিন্তু তাঁর মনের সমর্থন ছিল না সেখানে—নিরপেক্ষ প্রয়াস চাপা ব্যঙ্গে আত্মখণ্ডন করেছে।

অতএব পুরাতন কথাটাই পুনশ্চ বের হয়ে আসে—অপমানিতের বেদনার রূপঃ—

"সমস্যাটা আমাদের পক্ষে শক্ত হইয়াছে এই কারণেই। এই জন্যই আমাদের স্বদেশীয় বিজ্ঞেরাও ছাত্রদিগকে পরামর্শ দিয়া থাকেন যে, বাপু তোমরা কোনমতে এগজামিন পাস করিয়াই সন্তুষ্ট থাক, মানুষ হইবার দুরাশা মনে রাখিও না।

"এ বেশ ভাল কথা। কিন্তু সুবুদ্ধির কথা চিরদিন খাটে না—মানবপ্রকৃতি সুবুদ্ধির পাকা ভিতের উপরে পাথর গাঁথিয়া তৈরি হয় নাই। তাকে বাড়িতে হইবে এইজন্যই সে কাঁচা। এইজন্য কার্যের ঘেরটাকে সে খানিকটা দূর পর্যন্ত সহ্য করে, তারপরে প্রাণের বাড় আর আপনাকে ধরিয়া রাখিতে পারে না, একদিন হঠাৎ বেড়া ফাটিয়া ভাঙিয়া পড়ে। যে প্রাণ কাঁচ তারই জয় হয়, যে বাঁধন পাকা সে টেকে না।

"অতএব স্বভাবকে যদি কেবল একপক্ষেই মানি এবং অপরপক্ষে একেবারেই অগ্রাহ্য করি, তবে কিছুদিন মনে হয় সেই এক তরফ নিষ্পত্তিতে বেশ কাজ চলিতেছে। তারপরে একদিন হঠাৎ দেখিতে পাই কাজ একেবারেই চলিতেছে না। তখন দ্বিগুণ রাগ হয়—যা এতদিন ঠাণ্ডা ছিল তার অকস্মাৎ চঞ্চলতা গুরুতর অপরাধ বলিয়াই গণ্য হইতে থাকে, এবং সেই কারণেই শাস্তির মাত্রা দণ্ডবিধির সহজ বিধানকে ছাড়াইয়া যায়। তারপর হইতে সমস্ত ব্যাপারটা এমনই জটিল হইয়া ওঠে যে, কমিশনের পঞ্চায়েৎ তার মধ্যে পথ খুঁজিয়া পায় না; তখন বলিতে বাধ্য হয় যে, কুড়াল দিয়া কাটিয়া, আগুন দিয়া পোড়াইয়া, স্টিম রোলার দিয়া পিষিয়া রাস্তা তৈরি কর।

"কথাটা বেশ। কর্ণধার কানে ধরিয়া টিকা মারিতে মারিতে স্কুলের শেরা পার করিয়া করিয়া দিল, তারপরে লৌহশাসনের কলের গাড়িতে প্রাণরসকে অন্তরুদ্ধ তপ্তবাষ্পে পরিণত করিয়া য়ুনিভার্সিটির শেষ ইস্টেশনে গিয়া নামিলাম, সেখানে চাকরির মরুবালুতে দীর্ঘ মধ্যাহ্নে জীবিকা-মরীচিকার পিছনে ধুঁকিতে ধুঁকিতে চলিলাম, তারপরে সূর্য যখন অস্ত যায়, তখন যমরাজের সদর গেটের কাছে গিয়া মাথার বোঝা নামাইয়া মনে করিলাম জীবন সার্থক হইল—জীবনযাত্রার এমন নিরাপদ এবং শান্তিময় আদর্শ অন্য কোথাও নাই। এই আদর্শ আমাদের দেশে যদি চিরদিন টেকা সম্ভবপর হইত তাহা হইলে কোন কথা বলিতাম না।"

কান্নাবোজা বিদ্রূপের স্বরে রবীন্দ্রনাথ মৃতের জীবনবন্দনা করেছেন—বৃটিশ শাসনে বাঙালী মধ্যবিত্ত জীবনে হায়-হায় রূপ। মনুষ্যত্বের অর্থ, এই দীন জীবনকে উপড়ে ফেলা। মনুষ্যত্বের সে অর্থ ইংরেজেরই দান, যে অর্থকে অন্য এক ইংরেজ হরণ করেছে। মনুষ্যত্বসাধক ইংরেজকে রবীন্দ্রনাথ 'বড় ইংরেজ' বলেছেন—সে ইংরেজের মহিমা খ্যাপনে তাঁর লেখনীর বহুমূল্য মসী বারেবারে ব্যয় করেছেন, এ প্রবন্ধেও তার ব্যত্যয় হয় নি।

ইংরেজী শিক্ষার মহত্ত্ব সম্বন্ধে না হলেও ইংরেজ শিক্ষকের মহত্ত্ব সম্বন্ধে গভীর সন্দেহ এসেছিল রবীন্দ্রনাথের শেষ জীবনে। ভারতকে সভ্য করা বিষয়ে ইংরেজের পাওনা দাবীকে বিদ্ধ করে রবীন্দ্রনাথকে বলতে হয়েছিল—পৃথিবীর অন্য জাতি সভ্য হবার জন্য ইংরেজের অপেক্ষায় বসে থাকে নি। আলোচ্য প্রবন্ধ লেখার সময় পর্যন্ত কিন্তু ইংরেজ-চরিত্রের শুভবুদ্ধিতে তাঁর আস্থা যথেষ্ট

আপনি কি সুখী হতে চান? তবে আমার মনের কথা বই পড়ুন ১০ নং পয়সা বইটি মনোরম পড়িতে আনন্দ। ১০ নং পয়সা টিকিট ২ খানা পাঠালে ১ খানা বই বুক পোস্টে যায়।

ক্যাপ্টেন জে এন বসাক, M.B.I.M.S (Eng)
৫/বি, জগদীশনাথ রায় লেন, কলি-৩

এবং ভারত-ইতিহাসে ইংরেজের ভূমিকা সম্বন্ধে তিনি স-সম্ভ্রম। ভারত যে সর্ব-মানবের মিলনক্ষেত্র—রবীন্দ্রনাথ তাঁর এই প্রিয় 'থিয়োরীকে' এই প্রবন্ধে পুনরায় উপস্থাপিত করবেন, এবং ইংরেজকে হৃদয়ের সঙ্গে গ্রহণ করতে না পারলে ভারতের ইতিহাসসাধনা যে অসম্পূর্ণ থেকে যাবে, তাও তিনি বিশ্বাস করেন।

"ইংরেজকে আমাদের দেশের পক্ষে আপন করিয়া না লইতে পারিলে আমাদের পক্ষে কলেব শাসন থাকিবে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের সম্বন্ধ মানবসম্বন্ধ না হইবে, ততক্ষণ Pax Britanica আমাদিগকে শান্তি দিবে, জীবন দিবে না। আমাদের অন্নের হাঁড়িতে জল চড়াইবে মাত্র, চুলাতে আগুন ধরাইবে না। অর্থাৎ ততক্ষণ ইংরেজ ভারতবর্ষের সৃজনকার্যে, বিশ্বকর্মার ঘনিষ্ঠ সহযোগী হইবে না, বাহির হইতে মজুরি করিয়া কেবল ইঁট-কাঠ ফেলিয়া দিয়া চলিয়া যাইবে। ইহাকেই একজন ইংরেজ কবি বলিয়াছেন This white man's burden! কিন্তু burden কেন হইতে যাইবে? সৃষ্টিকর্তার ডাকে ইংরেজ এখানে আসিয়াছে, তাকে সৃষ্টিকার্যে যোগ দিতেই হইবে। যদি আনন্দর সঙ্গে যোগ দিতে পাবে তবেই সব দিকে ভাল, যদি না পারে তবে এই Land of regrets-এর তপ্ত বালুকাপথ তাহাদের কঙ্কালে খচিত হইয়া যাইবে, তবু ভার বহিতেই হইবে। ভারত-ইতিহাসের গঠনকাজে যদি তাহাদের প্রাণের যোগ না ঘটে তাহা হইলে ভারত-বর্ষের বিধাতা বেদনা পাইবেন, ইংরেজও সুখ পাইবে না।

"তাই ভারত-ইতিহাসের প্রধান সমস্যা এই ইংরেজকে পরিহার করা নয়, ইংরেজের সঙ্গে ভারতবর্ষের সম্বন্ধকে সজীব ও স্বাভাবিক করিয়া তোলা। এতদিন পর্যন্ত হিন্দু মুসলমান ও ভারতবর্ষের নানা বিচিত্র জাতিতে মিলিয়া এ দেশের ইতিহাস আপনা-আপনি যেমন-তেমন করিয়া গড়িয়া উঠিতেছিল। আজ ইংরেজ আসার পর এই কাজে আমাদের চেতনা জাগিয়াছে। ইতিহাস রচনায় আজ আমাদের ইচ্ছা কাজ করিতে উদ্যত হইয়াছে।

"এইজন্যই ইচ্ছায় ইচ্ছায় মাঝে মাঝে দ্বন্দ্ব বাধিবার আশঙ্কা আছে। কিন্তু যাঁরা এ দেশের সঞ্জীবনমন্ত্রের তপস্বী, রাগদ্বেষে ক্ষুব্ধ হইলে তাঁহাদের চলিবে না। তাঁহাদিগকে এ কথা মনে রাখিতে হইবে যে, ইচ্ছায় ইচ্ছায় মিল করাই চাই। কারণ ইংরেজ ভারতের ইতিহাসধারাকে বাধা দিতে আসে নাই, তাহাতে যোগ দিতেই আসিয়াছে। ইংরেজ নহিলে ভারত-ইতিহাস পূর্ণ হইতেই পারে না। সেইজন্যই আমরা কেবলমাত্র ইংরেজের আপিস চাই না, ইংরেজের হৃদয় চাই।"

[ক্রমশঃ]

॥ নাটক ॥ নাটক ॥ নাটক ॥ নাটক ॥ নাটক ॥

বহুকাল পরে আবার পাওয়া যাচ্ছে।

ম হা ক বি

গিরিশচন্দ্র ঘোষের রচনাবলী

প্রথম খণ্ড : প্রফুল্ল, ম্যাকবেথ, ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব ও স্বামী বিবেকানন্দ সম্পর্কে চারটি প্রবন্ধ, তিনখানি গীতিনাট্য ও গ্রন্থপরিচয়। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪১২। মূল্য দশ টাকা।

দ্বিতীয় খণ্ড : সিরাজউদ্দৌলা ; য্যায়সা কা ত্যায়সা ; জনা ; দোললীলা ও গ্রন্থপরিচয়। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩৫৮। মূল্য দশ টাকা।

তৃতীয় খণ্ড : পাণ্ডবগৌরব, বলিদান, আবুহোসেন ও গ্রন্থপরিচয়। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩৫২। মূল্য দশ টাকা।

চতুর্থ খণ্ড : চৈতন্যলীলা, ভ্রান্তি, মলিনাবিকাশ, হীরার ফুল, বিবিধ রচনা ও গ্রন্থপরিচয়। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩০২। মূল্য দশ টাকা।

পরমহংসদেব শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর ভক্ত-শিরোমণি অতি প্রিয় নোটো গিরিশকে বলেছিলেন,—"অভিনয়ের প্রয়োজন আছে বৈ-কি—ওতে লোকশিক্ষা হবে। আর তোমার লেখা—ও যে ভারি ভাল হয়েছে।"

প্রতিটি খণ্ড বোর্ডে বাঁধাই। মূল্যবান কাগজে ছাপা।

রচনাবলী সম্পাদনা ঃ শ্রীরমেন চৌধুরী

অবিলম্বে অর্ডার পেশ করুন।

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা-১২

রঙ । জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

মোটরবাইকের পিছনে ব্রততীকে বড় সুন্দর লাগছিল।

সীতাংশু ডাক্তারকে বার বার সাবধান করে দিল। 'খুব হুঁসিয়ার হয়ে গাড়ি চালাবি। সাঁকোর কাছে দুজনেই নেমে পড়বি। না হয় একটু কষ্ট করে জায়গাটা হেঁটে পার হতে হবে।'

'আমাদের জন্যে একটুও চিন্তা করবেন না সীতাংশুবাবু, আমরা ঠিক রাণীরবাগ পৌঁছে যাব। কিন্তু আপনি কথা দিন কবে যাবেন আবার।'

'যাব, ঠিকই যাব, এদিককার কাজ একটু পাতলা হলেই একদিন গিয়ে হাজির হব।' সাদা শাড়ির ওপর কালো ওভার-কোট; ডাক্তারগিন্নীকে কেমন যেন অন্যরকম দেখাচ্ছিল। হয়তো পাতার ছায়া ও জ্যোৎস্না পড়ে মুখটা শরীরটা এমন রহস্যময় মনে হচ্ছিল, তার ওপর বেণীটা কেন জানি খুলে দিয়েছে; ব্রততীকে কালো জামার ওপর কালো চুলের ঢেউ, এক সেকেণ্ড স্থির চোখে ছবিটা দেখে সীতাংশু অন্যদিকে তাকাল। 'আমার একেবারেই ইচ্ছে ছিল না এই রাত করে ঠাণ্ডায় ডাক্তার আপনাকে নিয়ে রওনা হয়।'

সাইকেলের হ্যাণ্ডেল ধরে দাঁড়িয়ে ডাক্তার কথাগুলি শুনছিল। এবার 'রাস্তায় যতটা ঠাণ্ডা লাগবে, তোর টিনের চালের ডেরার মধ্যে রাত কাটালেও ততটা ঠাণ্ডাই লাগত। তাছাড়া দুজনকে শোবার জায়গা দিতিস কোথায়।'

'কেন, একরাত না শুয়ে তুমি পারতে না?' ব্রততী হাল্কা গলায় হাসল। 'না হয় তিনজনে বসে গল্প করে করে রাত কাটান যেত।'

'ও, তাহলে তোমার থেকে যাওয়ার ইচ্ছে ষোল আনা ছিল।' বেশ তো, থাক না, আমাকে কিন্তু যেতেই হবে, জান তো একটা কলেরা রুগী ফেলে এসেছি।'

সীতাংশু ব্রততীর চোখের দিকে তাকাল। ব্রততী ফিক করে হেসে ফেলল।

'শুনলেন তো কথা, তুমি থাক, আমি চলে যাই—কেমন স্বার্থপর এই মানুষ।'

'না, ঠিকই বলছি, আমার একটুও আপত্তি নেই যদি তুমি এখানে রাত্তিরটা থেকে যাও, বরং—বরং আমি কাল দিনের বেলা একফাঁকে এসে তোমাকে নিয়ে যাব।'

'থাক, আর কথা বলতে হবে না।' ধমক দিয়ে উঠল রণধীরের স্ত্রী। তারপর এক সেকেণ্ড চুপ করে থেকে কিছু একটা ভাবল, তারপর তার থমথমে অভিযোগের গলা শোনা গেল। 'এটা তুমি ভাল করেই জান; তোমাকে ছেড়ে বাইরে কোথাও রাত কাটানো আমার পক্ষে মরে গেলেও কোনো-দিন সম্ভব হবে না।'

রণধীর আর কথা বলল না। সীতাংশু চুপ। চোখের সামনের বিস্তৃত বিশাল শীত-রাত্রির বনভূমির স্তব্ধতা অনুভব করল সে। এতক্ষণ হাসি ও আনন্দের মধ্যে সময় কেটেছে, এখন দুজনের যাবার মুহূর্তে এমন একটা তিক্ততা সৃষ্টি হবে, সীতাংশু যেন প্রস্তুত ছিল না। যেন এই জন্য সে নিজেকে দায়ী মনে করল। রাত্রে দুজনের থেকে যাওয়ার প্রস্তাবটা তার মুখ থেকে যদি না বেরোত—

'চলি সীতাংশুবাবু—' সীতাংশু চমকে উঠল। হেসে ঘাড় কাত করে ব্রততীর মুখের দিকে তাকাতে ব্রততীও হাসল। 'আপনি যাবেন কিন্তু একদিন।'

'যাব; নিশ্চয় যাব।' সীতাংশু ঘাড় কাত করল।

'চলি রে জংলী।' রণধীর এক পায়ে প্যাডেল চেপে ধরে তার গাড়িতে স্টার্ট দিল। সীতাংশু কথা না বলে ঘাড়টা শুধু নাড়ল। একটা লাল আলোর বিন্দু পিছনে নিয়ে ডাক্তারের মোটরবাইক জঙ্গলের পথে সরে গেল। লতাপাতার সবুজ ঠাণ্ডা গন্ধ ছাড়িয়ে খানিকটা পোড়া তেলের গন্ধ সীতাংশুর নাকে লাগল। মুখের ভিতরটা বিস্বাদ ঠেকছিল, কিন্তু তবু একটা সূক্ষ্ম হাসি ঠোঁটের আগায় ঝুলিয়ে সে দূরের বনপথে যেখানে জ্যোৎস্না ও অন্ধকার মাখামাখি হয়ে একটা অস্পষ্ট কুয়াশার পর্দা তৈরি করে রেখেছে সেখানে চোখটা ধরে রাখল। মোটর-বাইকের লাল আলোর ফুটকিটা আর দেখা গেল না।

মাধব ও তার দিদি অনেকক্ষণ ঘরে ফিরে গেছে। বন্ধু ও বন্ধুপত্নীকে বিদায় দিতে সে আমলকীতলা পার হয়ে বড় অশোকগাছটার কাছে চলে এসেছিল। এখন আস্তে আস্তে ঘরের দিকে ফিরে চলল। শীতের রাত হলেও তেমন যেন ঠাণ্ডা লাগছিল না, গুমট মনে হচ্ছিল। যেন দুপাশের প্রত্যেকটা গাছ গরম নিশ্বাস ছড়াচ্ছে। অবশ্য খোলা মাঠে নামলে কতটা ঠাণ্ডা লাগবে, সেখানে কনকনে বাতাস বইছে কি না সীতাংশু চিন্তা করল। তা হলেও দুজনের গায়ে যখন গরম কোট আছে, জঙ্গল পার হয়ে টিয়া-টুলির বড় মাঠ পার হবার সময় ডাক্তার ও ডাক্তারগিন্নীর খুব একটা যে কষ্ট হবে না তাও সে অনুমান করতে পারছিল। কিন্তু কল্পনার চোখে সে আর একটা ছবি দেখ-ছিল। কেমন করে তারা বাঁশের সাঁকোটা পার হচ্ছে। ডাক্তার তার মোটরসাইকেল

ছুটিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। ব্রততী পিছনে হাঁটছে। স্ত্রীকে সামনে রেখে রণধীরও গাড়িটা নিয়ে পিছনে হাঁটতে পারে। কিছু বলা যায় না। উঁহু, দৃশ্যটা কল্পনা করার সঙ্গে সঙ্গে সে নিজের মনে ঘাড় নাড়ল, এত রাত্রে নির্জন পথে ডাক্তার কখনও ব্রততীকে পিছনে রেখে আগে আগে সাঁকো পার হতে সাহস পাবে না। নিজের জন্য না, স্ত্রীর জন্য রণধীরের ভয়। ভয় ভাবনা সতর্কতা।

তাই তো, নিজে সে বিয়ে করে নি, স্ত্রীর জন্য সারাক্ষণ একটি স্বামীকে কত শত দুশ্চিন্তা পোহাতে হয় সীতাংশু জানে না। এই নিয়ে সে মাথাও ঘামায় না। তবে চোখের ওপর ডাক্তারকে যা দেখে, যতই কাজের দোহাই পাড়ুক রুগীর কথা বলুক, এক সেকেণ্ডের জন্যও সে স্ত্রীকে ভুলে থাকতে পারে না।

এইমাত্র মুখে সে বলছিল বটে, 'সীতাংশুর ডেরায় রাত্রে তুমি থেকে যাও, আমি চললাম।' কিন্তু কিছুতেই ব্রততীকে ফেলে রেখে সে রাণীরবাগ ফিরে যেত না। প্রাণ গেলেও না। তার চোখ দেখে সীতাংশু বুঝেছে, গলার স্বর শুনে বুঝেছে।

তবে কি স্ত্রীকে সে পরীক্ষা করছিল। সীতাংশু মনে মনে হাসল। কাকে পরীক্ষা করত রণধীর? ব্রততীও যে কিছুতেই তাকে রাণীরবাগ পাঠিয়ে দিয়ে এই জঙ্গলে রাত কাটাতো না রণধীরের চেয়ে একথা আর কার ভাল জানা আছে।

তবু একটু তিক্ততা রেখে গেল তারা টিরাটুলির এই জঙ্গলে। একটু হেঁয়ালী। কার জন্য? সীতাংশুর জন্য? একটু দেখুক সে, ভাবুক? আমাদের মধুর ভাণ্ড পূর্ণ আছে, ভালবাসার সুধায় এতটুকু টান ধরে নি। কিন্তু সীতাংশুকে সবটা বুঝতে দেওয়া কেন, একটা আদর-আপ্যায়ন করল সে দুজনকে, সুতরাং সামান্য একটু হেঁয়ালীর কুয়াশা তার চোখের সামনে ছড়িয়ে দিয়ে রসিকতা না করে গেলে বন্ধুকৃত্য সম্পন্ন হত কি করে। এই?

এছাড়া এর অন্য কোনো অর্থ সীতাংশু হাতের কাছে খুঁজে পাচ্ছিল কি। যেমন তখন। খেতে বসে রণধীর এমন একটা ভান করছিল, যেন রাণীরবাগের সাজান-গোছান ঝকঝকে বাংলোর জীবনে তার অরুচি ধরে গেছে। এখন তার জঙ্গল ভাল লাগবে, সীতাংশুর মতন একটা টিনের চালের ডেরা। আলো থাকবে বাতাস থাকবে, আর থাকবে পাতার ঝরঝর শব্দ পাখির কাকলী।

কিন্তু তার এই সদিচ্ছা কতক্ষণ ছিল? কতক্ষণ ধরে রাখত? ডাক্তারগিন্নীর মাত্র একটা ভ্রূকুটির আঘাতে তা ছিঁড়ে তছনছ হয়ে গেল। তারপরেও যতক্ষণ এখানে ছিল দুজন, ভুল করেও রণধীর আর জঙ্গলে এসে থাকার কথা উচ্চারণ করে নি।

তাই তো, মুখে আলো বাতাস পাখির গান ঝিঁঝির ডাকের কথা বলছিল সে, আর চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে মাধবের দিদিকে দেখছিল। কাজেই হঠাৎ তার জঙ্গলে এসে থাকার ইচ্ছা হচ্ছে শুনে ব্রততী যে ভয় পাবে চমকে উঠবে এবং সঙ্গে সঙ্গে স্বামীকে সংশোধন করতে ভুরু কুঁচকে শাসন করতে লেগে যাবে রণধীর বুঝি নিজেও তা জানত।

না কি স্ত্রীর এই শাসনটুকুও সীতাংশু দেখুক, দেখে তাদের দাম্পত্য প্রেমের গভীরতা আর একবার অনুভব করুক—হুঁ, রণধীর যে আজও কত সহজে নিজের ইচ্ছা মর্জি হাওয়ায় উড়িয়ে দিয়ে ব্রততীর শাসন নিষেধ ইচ্ছা ও রুচির কাছে আত্মসমর্পণ করছে—জিনিসটা ভাল করে বন্ধুকে দেখাবার জন্য এমন একটা উটকো ইচ্ছা তখন মুখ দিয়ে সে বের করল?

কিছুই দরকার ছিল না এসবের। সীতাংশু মনে মনে বলল, 'ভালবাসার সফেন সমুদ্র নিয়ে তুমি ঘর করছ ডাক্তার, সেখানে উঁকি দেব হাত বাড়াব সেই সাহস আমার নেই, মাঝে মাঝে লোভ যে না হয়েছে তা নয়, চুরি করে কতদিন তোমার সাজান ঘর দেখতেও গিয়েছি, কিন্তু সমুদ্রের ডাক শুনে তরঙ্গভঙ্গ দেখে ভয় পেয়ে পিছিয়ে এসেছি। এসেই মনে হয়েছে, আমার এই জঙ্গলের জীবন ভাল। এখানে অনেক বেশি শান্তি। এখানে চাকচিক্য নেই, আড়ম্বর নেই, সবই কেমন সরল সহজ সাধারণ। আমার কয়াতীরা কাঠুরিয়ারা কুলি-মিস্ত্রীরা, অথবা জঙ্গলের এক-একটা গাছ পাখি, অথবা কিশোর মাধব, মাধবের দিদি—এদের দিকে আমি যত সহজে তাকাতে পারি, যত সহজে মিশতে পারি রাণীরবাগের বাংলোয় গেলে তা হয় না। একটা বাধা একটা যন্ত্রণা আমার নিশ্বাস চেপে ধরে। চিন্তা করি—এমন হয় কেন, উত্তরটাও সহজে পেয়ে যাই। সেখানে শুধু ভালবাসার উদ্গার, ভালবাসা পেয়ে আরও ভালবাসা না-পাবার হাহাকার, অথবা ভালবাসা না পেলে জীবন কেমন হত, তাই নিয়ে অভিনয়, এই অভিনয়ের মধ্যেও চমৎকার মান-অভিমান আছে ঝগড়া আছে তিক্ততা আছে—যেমন একটু আগে দুজনে গল্পের অভিনয় করে গেল।'

এখনও ছবিটা সীতাংশুর চোখের সামনে ভাসছে। নিঃশব্দ গাছেরা তাকিয়ে তাকিয়ে দুটি আশ্চর্য মানুষকে দেখল, সীতাংশু দেখল। যদি মাধব থাকত সেও দেখত, তার দিদি দেখত। দিদি কি অভিনয়টা বুঝত—হয়তো বুঝত, স্বামীর ঘর করে এসেছে যুবতী, কিশোর মাধব কিছুই বুঝত না, মুখে আঙুল গুঁজে চেয়ে থাকত। সবটাই তার কাছে জটিল দুর্বোধ ঠেকত। তাই তো, এখানে কেউ অভিনয় জানে না। মাধবের মতন সীতাংশুর নিজেরও এ-বিদ্যায় হাতেখড়ি হয় নি। যা বলা যায় হতে দেয় নি। তার কুলি কয়াতীরা অভিনয় জানে না। তা হলে শীতের দুপুরেও তাদের কপাল গর্দান ঘামে চকচক করত না, তারা সরল তারা বিশ্বাসী। শীত গ্রীষ্ম বর্ষা হেমন্ত—সব ঋতুতে তারা এখানে হৈ-হৈ করে কাজ করে, কাজ শেষ করে গান গেয়ে বাড়ি ফেরে। দেখে অভিনয়কুশলী মানুষদের চোখ টাটায়, অবাক হয় কেউ। আর এখানে অভিনয় করবে কে? সুখী? সীতাংশু মাথা ঝাঁকাল। যদি অভিনয় জানত বেচারা, তো বাচ্চা কোলে নিয়ে আসানসোল থেকে কাঁদতে কাঁদতে মুরারির ডেরায় এসে উঠত না। আজও সেখানে থেকে যেত, যেমন অঢেল ভালবাসা পেয়ে কেউ কেউ ভালবাসা না-পাবার অভিনয় করে, কাঁদাকাটা করে মান-অভিমান করে, তেমনি সুখীও এক ফোঁটা ভালবাসা না পেয়ে অনেক পেয়েছি, এক ফোঁটা ভালবাসা না দিয়ে অনেক দিয়েছি-এর অভিনয় করে হেসে কেঁদে স্বামীর ঘরে দিনগুলি কাটিয়ে দিত।

ঘরে ঢুকে হ্যারিকেনের সলতেটা বাড়িয়ে দিল সীতাংশু। এতটা সময় দুটি অতিথি এ-ঘরে কাটিয়ে গেছে তার ছিটেফোঁটা চিহ্নও কোথাও নেই। সব কেমন সুন্দর করে আবার সাজিয়ে-গুছিয়ে ঠিক করে রেখে গেছে মাধবের দিদি। তিনজন বসে খাবে বলে টেবিলটা ঘরের মাঝখানে টেনে আনা হয়েছিল, সেই সঙ্গে দুটো চেয়ার একটা বেঞ্চি। সব আগের জায়গায় ফিরে গেছে। ছাইদানীতে এত সিগারেটের টুকরো জমেছিল। সেটাও পরিষ্কার করে ধুয়ে মুছে আবার জায়গামত বসিয়ে রাখা হয়েছে। তারা হাত-মুখ ধোবে বলে জলের জাগ বালতি তোয়ালে সাবান কত কী টেনে টেনে আনা হয়েছিল। এখন একটি জিনিসও এখানে ওখানে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে নেই। যেখানে যেটা থাকবার ঠিক সেখানে রেখে দেওয়া হয়েছে। মানে এসব জিনিস বাইরের কোনো মানুষ এসে ব্যবহার করেছিল বলে আর যেন মনে হয় না। যেমন ওপাশ থেকে আরাম-কেদারাটা টেনে এনে রণধীর কতক্ষণ ওটার ওপর শুয়ে বসে বিশ্রাম করছিল, গল্প করছিল। যেমন দেওয়ালের হুক থেকে আরশিটা টেনে নামিয়ে রণধীরের স্ত্রী অন্তত কয়েকবার ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে নিজের মুখখানা দেখেছিল এবং যাবার আগে ওটা সামনে রেখে আর একবার বেশ জমকালো

বৈজ্ঞানিকদের আবিষ্কার

ব্যথা-বেদনা তাড়াতাড়ি দূর করবার আধুনিক উপায়

নতুন মাইক্রোফাইন্ড 'অ্যাসপ্রো'

এখন আমাদের দেশে পাওয়া যাচ্ছে।

যে কোনো ব্যথা-বেদনাই আমাদের সমস্যা: 'অ্যাসপ্রো' রিসার্চ ইনস্টিটিউটের বৈজ্ঞানিকরা অনেক গবেষণার পর ব্যথা-বেদনা দূর করার জন্য আবিষ্কার করেছেন নতুন মাইক্রোফাইণ্ড 'অ্যাসপ্রো'—আরো তাড়াতাড়ি ব্যথা-বেদনা দূর করার নতুন উপায়!

মাইক্রোফাইণ্ড বলতে কি বোঝায়? মাইক্রোফাইণ্ড বলতে বোঝায় যে, ব্যথা-বেদনা দূর করার যে উপাদানগুলি 'অ্যাসপ্রো'-তে মেশানো হয়, তা ৩০ গুণ বেশী সূক্ষ্ম করা হয়েছে। এক বিশেষ পদ্ধতিতে তৈরী এই নতুন ট্যাবলেটে এখন প্রায় ১৫ কোটি সূক্ষ্ম কণা রয়েছে। এর ফলে বেদনা নাশ করবার শক্তি দ্বিগুণেরও বেশী সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ে এবং মুহূর্তের মধ্যে ব্যথা-বেদনা দূর করে।

মুহূর্তের মধ্যে কাজ শুরু হয়ে যায়—অনেকক্ষণ ধরে কাজ চলতে থাকে: নতুন মাইক্রোফাইণ্ড 'অ্যাসপ্রো'-র ব্যথা দূর করবার সক্রিয় উপাদানটি অতি সহজেই এবং খুবই শীগগির শরীরের সঙ্গে মিশে গিয়ে ৫ থেকে ৭ ঘণ্টা পর্যন্ত শরীরের মধ্যে থাকে। সেইজন্যেই মাইক্রোফাইণ্ড 'অ্যাসপ্রো' আরও তাড়াতাড়ি ব্যথা-বেদনা দূর ক'রে দেয় এবং তার ফল অনেকক্ষণ স্থায়ী হয়।

অতি সহজেই আপনি খেতে পারেন: নতুন মাইক্রোফাইণ্ড 'অ্যাসপ্রো' আপনি যেভাবে খুসী খেতে পারেন—শুকনো, জলের সঙ্গে মিশিয়ে অথবা এক গ্লাস জল বা যে কোনো গরম পানীয়ের সঙ্গে।

নিম্নোক্ত প্রকারের যন্ত্রণায় নতুন মাইক্রোফাইণ্ড 'অ্যাসপ্রো' খাবেন: ব্যথা-বেদনা • মাথাধরা • গা-ব্যথা • দাঁতব্যথা • বাতে বেদনা • জ্বর-জ্বর-ভাব • ফ্লু জ্বর • গলাব্যথা।

মাত্রা: প্রাপ্তবয়স্ক: দুইটি ট্যাবলেট। প্রয়োজন হলে আবার খাবেন। শিশুদের জন্য: একটি ট্যাবলেট বা আপনার ডাক্তারের নির্দেশমত।

নতুন মাইক্রোফাইণ্ড 'অ্যাসপ্রো' কিভাবে কাজ করে দেখুন

ট্যাবলেটের কণাগুলির আকার যত বড় হয়, ততই শরীরের সঙ্গে মিশে যেতে দেরী হয়—আপনার আরাম পেতেও সময় লাগে।

'অ্যাসপ্রো' মাইক্রোফাইণ্ড হওয়ার ফলে নতুন মাইক্রোফাইণ্ড 'অ্যাসপ্রো'-র প্রতিটি ট্যাবলেটে প্রায় ১৫ কোটি সূক্ষ্ম কণা রয়েছে। তাই শরীরের সঙ্গে সহজ-সত্বর মিশে যায় এবং খুব তাড়াতাড়ি ব্যথার উপশম হয়।

নতুন মাইক্রোফাইণ্ড 'অ্যাসপ্রো' ব্যথা-বেদনা দূর করার সর্বাধুনিক উপায়।

নতুন মাইক্রোফাইণ্ড 'অ্যাসপ্রো'

তাড়াতাড়ি ব্যথা-বেদনা দূর করে।

নিকোলাস-এর তৈরী

করে প্রসাধনটা সেরে নিয়েছিল।

সেই আরশি যেমন দেওয়ালে ঝুলত অবিকল সেরকম আছে। আরামকেদারাটা ওদিকের দেওয়ালের গায়ে ঠেস দিয়ে আগের মতন দাঁড়িয়ে আছে। চামচ গেলাস কাপ ডিশ বাটি তাকের ওপর যেমন সাজান থাকে এখনও তাই আছে।

সব দেখে সীতাংশুর একটা কথা মনে হল। অবশ্য এটা তার মনগড়া কল্পনা। যেন মাধবের দিদি চাইছে না, এঘরে দুটি অতিথি এসে তিন-চার ঘণ্টা কাটিয়ে গেছে তার কোন রকম চিহ্ন থাক। ওরা চলে যাবার সংগে সংগে সুখী সব ঘষেমেজে ধুয়েমুছে পরিষ্কার করে দিয়েছে। যেন মানুষ দুটিকে ভাল লাগে নি তার। হেসেছে কথা বলেছে রান্নাবান্না করে খাইয়েছে সত্যি, কিন্তু যেন অন্তর থেকে ডাক্তার ও ডাক্তার-গিন্নীকে সে ভালবাসতে পারে নি। কেন? তাদের চালচলন কথাবার্তা বেশভূষা। জঙ্গলের জীবনের সংগে যা মোটেই খাপ খায় না। সীতাংশুর বন্ধু তারা, কিন্তু তবু এই ডেরার মধ্যে যতক্ষণ থেকে গেছে, মনে হয়েছে চোখ মুখ হাত পা কান মাথা নিয়ে দুটো জীবন্ত অহংকার কথা বলে গেছে হেসে গেছে খেয়ে গেছে গল্প করে গেছে—যাবার সময় ভালবাসার মোটা বোয়েমটার ছিপি খুলে কিছু তেতো ফেনা ও বুদবুদ অশোকগাছটার নিচে ছড়িয়ে দিয়ে বোঝাটা একটু হাল্কা করে গেছে—এই?

না, তা হবে কেন, সীতাংশু নিজের মনে মাথা ঝাঁকাল। ঐ দুটি মানুষ সম্পর্কে এতসব চিন্তা করার কী দায় পড়েছিল মাধবের দিদির। আসলে চাকরি করতে এসেছে ও। কাজ করতে করতে মনিবের চোখ দুটো দেখেছে, সেই সংগে তার মনের ভিতরেও উঁকি দিয়েছে, উঁকি দিয়ে যেটুকু বুঝবার তক্ষুণি বুঝে নিয়েছে। তারপর যা যা করবার করেছে, ঘষেমেজে সব পরিষ্কার করল, জিনিসপত্র জায়গামতন গুছিয়ে রাখল, ঘরের আগের চেহারা ফিরে এল।

অর্থাৎ সীতাংশু যেমনটি চাইছিল।

তাই তো, যতক্ষণ ডাক্তার ডাক্তারগিন্নী এঘরে ছিল, ভয়ংকর অস্বাচ্ছন্দ্যবোধ করছিল সে। নিশ্চয় তার মুখ দেখে সুখী টের পেয়েছে। সীতাংশু যে অন্যরকম আশা করেছিল। ব্রততী একলা আসবে টিয়া-টুলির জঙ্গল দেখতে, আঁচলে বেঁধে ডাক্তারকে নিয়ে আসবে এমন তো কথা ছিল না।

তবু ভাল যে ভালয় ভালয় বিদায় হয়েছে। যদি অতিরিক্ত দুটো মানুষকে তার এই এক ফোঁটা ঘরে থাকতে দিতে হত তো কী সাংঘাতিক বিপদের কথা ছিল। শীতের রাত, দুজনে গায়ে দিয়ে শোবে এত কাপড়চোপড়ই বা সে জোগাড় করত কোথা থেকে। একটুখানি একটা তক্তপোষ। একজন কোনোরকমে শুতে পারে, তা না হয় স্বামী-স্ত্রী, ঠাণ্ডা পড়েছে, গাদাগাদি হয়ে শুয়ে রাতটা কাটিয়ে দিত, সীতাংশু কোথায় থাকত? বাইরে গাছ-তলায়? না কি শোয়ার অসুবিধা দেখে সীতাংশুর সংগে বসে গল্প করে দুজন রাত কাবার করে দিত। এমন একটা প্রস্তাব ব্রততীর মুখ থেকে বেরিয়ে পড়েছিল না। উঁহু, রণধীর কিছুতেই এভাবে বসে রাতজাগা সমর্থন করত না। ডাক্তার মানুষ, আর তা-ও নিজের দিক থেকে সে যা-ই করত, ব্রততীকে একটুও রাত জাগতে দিত না। ব্রততীর শরীর খারাপ হবে—জেনেশুনে কেমন করে সে এ জিনিস হতে দিত। ওদিকে ব্রততী নিজে থেকে কথাটা মুখ দিয়ে বের করেছিল বটে, কিন্তু তা বলে সে-ও কি রণধীরকে না ঘুমিয়ে বসে বসে গল্প করতে দিত, মরে গেলেও সীতাংশু একথা বিশ্বাস করবে না। সেদিন তো চোখের ওপর নাটকটা দেখে এল। স্বামীর শরীর খারাপ হয়েছে কি হবে ভেবে গিন্নীর কী আতংক। এই নিয়ে তো এক পশলা ঝগড়াই হয়ে গেল দুজনের মধ্যে, গিন্নী বেশ একটু কান্নাকাটিও করল, ম্যানেজারের ছেলের টাইফয়েড হয়েছে, তা বলে ঠাণ্ডার মধ্যে রুগী দেখতে বেরিয়ে স্বামী একটা অসুখ বাধিয়ে আসবে এ কেমন কথা। পরে অবশ্য ঘরে এসে ডাক্তার সীতাংশুর সংগে বসে মুর্গির ঝোল দিয়ে খানকয়েক পরটা সাবাড় করেছিল। তার শরীর খারাপ ছিল বা হবে এমন কোনো লক্ষণ সীতাংশু দেখতে পায় নি।

যাই হোক, শেষ পর্যন্ত যে তারা এখানে রাত কাটাত না, যেমন করে হোক রাণীরবাগ ফিরে যেত সীতাংশু জানত।

চলে গেছে. ভালই হয়েছে। মনে মনে সে বলল, আর যেন কোনোদিন শখ করে ছুটিতে জোড়া বেঁধে টিয়াটুলির জঙ্গল দেখতে না আসে। এলেই অভিনয় করবে। দাম্পত্য প্রেমের ঢেকুর তুলে মান-অভিমান ঝগড়াঝাঁটি—কত কী রঙ্গ না জঙ্গলটাকে দেখাতে চাইবে। তার মানে সীতাংশু দেখুক মাধব দেখুক মাধবের দিদি দেখুক—দিদির হাতের পাখিটাও দেখুক খাঁচার ভিতরটা থেকে গলা বাড়িয়ে এ জিনিস দেখবে, মাধবের 'বখাটে ছেলে' কালা দেখবে। কারখানা বন্ধ না থাকলে কুলি মিস্ত্রী করাতী কাঠুরিয়ারা পর্যন্ত দেখত, আর দেখবে বনের এই গাছগুলি। সাজান গোছান ঝকঝকে বাংলোর দুটি মাজাঘষা চেহারার নিখুঁত অভিনয়।

এদের সমস্ত চিহ্ন মুছে দিয়ে সুখী বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছে।

তখন প্রসাধন করার সময় ব্রততীর আঙুল থেকে একটুখানি ক্রিম লেগে গিয়ে আরশির একটা কোণা কেমন ঝাপসা হয়েছিল। সেই দাগটুকু এখন আর নেই। যেন মাধবের দিদি নিজের আঁচল দিয়ে আরশিটা ভাল করে মুছে আবার বেড়ার গায়ে টাঙিয়ে রেখেছে। কে বলবে ওটা ডাক্তারগিন্নীর হাতে উঠেছিল। কেমন ঝকঝক করছে এখন।

ভাল করেছে সুখী, এখানে সে উপস্থিত থাকলে সীতাংশু তার কাজের খুব সুখ্যাতি করত। ডাক্তার ও ডাক্তারগিন্নীকে যাতে আর একবারও মনে না পড়ে তার জন্য বেচারাকে এই অতিরিক্ত কাজগুলি করতে হল তো। খাটুনির ওপর খাটুনি।

আর একটা ভাল কাজ করে গেছে সে। আগের রাত্রে খাঁচাসুদ্ধ পাখিটাকে সংগে করে বাড়ি নিয়ে গেছে। আজ আর তা করে নি। খাঁচাটা বেড়ার গায়ে ঝুলছে। যেন এতক্ষণ পাখিটা ঝিমোচ্ছিল। পায়ের শব্দ পেয়ে জেগে উঠে কালো পুঁতির মতন চোখ দুটো মেলে পিটপিট করে সীতাংশুর মুখটা দেখছে।

চমৎকার দাওয়াই! সীতাংশু হাসল। রাণীরবাগের মানুষ দুটিকে ভুলে থাকতে পাখির মতন আর আছে কী! পাখি মানেই বন। বন মানে পাখি। বনের বাইরে তার. মন কোথাও ছুটে যাবে—এ জিনিস সে নিজে যেমন চাইছে না, মাধবের দিদিও চাইছে না। একটি মেয়ে কত সহজে না পুরুষের মন বুঝে ফেলে।

খাঁচার ভিতর হাত ঢুকিয়ে ছানাটাকে তুলে এনে সীতাংশু একটু সময় বুকের কাছে ধরে রাখল, এক ফোঁটা উত্তাপ। ওপাশে কালাও খাঁচার ভিতর থেকে চিঁচি করে ডাকছিল।

আলো নিবিয়ে শুতে গিয়ে তার মনে হল, এমন একটা চিন্তা সুখীর মাথায় আসা খুবই স্বাভাবিক। বনের মতন শান্তি আর কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না। এখানে ছলচাতুরী নেই বঞ্চনা নেই অভিনয় নেই।

তা ছাড়া নিজে কত দুঃখ ও বঞ্চনা পেয়ে মাধবের দিদি এই জঙ্গলে ছুটে এসেছে তার চোখ দেখলে বোঝা যায়।

আসানসোলের মানুষটা তাকে এক-দিনের জন্যও ভালবাসে নি। তাতে তার কী এসে যায়। পাখিওয়ালা তাকে ভালবাসে। দেখা হওয়া মাত্র কেমন সুন্দর একটা পাখির ছানা ধরে দিয়েছে। আবার দেবে। যদি এটা মরে যায় কি উড়ে চলে যায় তো আর একটা পাখি সুখীকে ধরে উপহার দেবে। বনে অনেক সুখ। অনেক বেশি শান্তি।

[ক্রমশঃ]

রাজনীতি ও ছাত্রসমাজ

প্রদ্যোৎকুমার রায় ॥

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

প্রথম পর্যায়

॥ চার ॥

বাংলার বিপ্লবীদের কাছে শ্রীঅরবিন্দ রচিত 'ভবানীমন্দির' একখানি অতি পবিত্র গ্রন্থ হিসেবে বিবেচিত হত। এই গ্রন্থখানি ১৯০৫ সালের প্রথমে লিখিত হয়। অল্পসংখ্যক কপি মাত্র তখন ছাপানো হয়েছিল। এর প্রচার শ্রীঅরবিন্দের ঘনিষ্ঠমহলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। "It was for Private Circulation only."১ এই গ্রন্থখানি বিপ্লবী আন্দোলনের প্রথম যুগে বিপ্লবীদের অসাধারণ শক্তি ও সাহস যুগিয়েছে। বিপ্লবীদের অবশ্যকর্তব্যও এতে নির্দেশিত হয়েছে। ভারতের নবজন্ম সম্ভব করতে হলে শক্তির মাধ্যমেই তা করতে হবে এই ছিল গ্রন্থের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। এই গ্রন্থখানি সম্বন্ধে সরকারী রিপোর্টে বলা হয়েছে :

"The Bhawani Mandir (Temple of Bhawani, one of the Manifestations of the Goddess Kali) exalts Bhawani as the manifestation of Shakti. Indians must acquire mental, physical, moral and spiritual strength. They must copy the methods of Japan. They must draw strength from religion. How this is to be done is described in moving and powerful terms. The book is a remarkable instance of Perversion of religions ideals to political purposes."২

সরকারী মতে শ্রীঅরবিন্দ লিখিত 'ভবানীমন্দির' নিন্দিত হলেও সে যুগের বিপ্লবপন্থী রাজনৈতিক চিন্তাধারা বুঝতে হলে 'ভবানীমন্দির' পাঠ অপরিহার্য। মূল গ্রন্থখানি থেকে কিছু উদ্ধৃতি দিচ্ছি :

"Bhawani is Shakti. In the present age, the Mother is manifested as the mother of strength. She is pure Shakti.

* * * *

Bhakti is the leaping flame, Shakti is the fuel. If the fuel is Scanty how long can the fire endure ?"

* * * *

"India therefore needs Shakti alone. The deeper we look, the more we shall be convinced that the one thing wanting, which we must strive to acquire before all others, is strength—strength physical, strength mental, strength moral but above all strength spiritual which is the one unexhaustible and imperishable source of all the others. If we have strength everything else will be added to us easily and naturally. In the absence of strength we are like men in a dream who have hands but cannot seize or strike, who have feet but cannot run."

* * * *

"If India is to survive, she must be made young again. Rushing and billowing streams of energy must be poured into her; her soul must become, as it was in the old times, like the surges, vast, puissant, calm or turbulant at will, an ocean of action or of force."

* * * *

"India Must be Reborn, Because her Rebirth is Demanded by the Future of the World."

* * * *

"It was to initiate this great work, the greatest and most wonderful work ever given to a race, that Bhagawan Ramkrishna came and Vivekananda preached. If the work does not progress as it once promised to do it is because we have once again allowed the terrible cloud of Tamas to settle down on our souls—fear, doubt, hesitation, sluggishness. We have taken, some of us, the Bhakti which poured forth from the one and the Jnana given us by the other, but from lack of Shakti, from the lack of Karma, we have not been able to make our Bhakti a living thing. May we yet remember that it was Kali, who is Bhawani, Mother of strength whom Ramkrishna worshipped and with whom he became one."

* * * *

"But the destiny of India will not wait on the falterings and failings of individuals; the Mother demands that men shall arise to institute **Her** worship and make it universal."৩

বৈপ্লবিক রাজনৈতিক আন্দোলনে শ্রীঅরবিন্দ ভারতের প্রতিটি মানুষকে আহ্বান জানিয়েছেন।

"To all the children of the mother the call is sent forth to help in the sacred work."৪

১৯০৭ সালের ২২শে আগস্ট জাতীয় মহাবিদ্যালয়ের শিক্ষক ও ছাত্রদের এক সভায় ছাত্রদের দ্বারা বিশেষ অনুরুদ্ধ হয়ে তিনি তাদের প্রতি উপদেশ হিসাবে কিছু বক্তব্য রাখেন। 'ভবানীমন্দিরে'

১ Life of Sri Aurobindo—A. B. Purani, p. 76.

২ Sedition Committee Report, 1918, p. 17.

৩ Bhawani Mandir — Sri Aurobindo.

আদর্শের পরিপ্রেক্ষিতেই শ্রীঅরবিন্দের এই ভাষণকে দেখতে হবে। এই ভাষণটি জাতীয় মহাবিদ্যালয়ে তাঁর বিদায়-ভাষণ। শ্রীঅরবিন্দের বক্তব্য অত্যন্ত স্পষ্ট। তিনি বলেন—

"What we want here is not merely to give you little information, not merely to open to you careers for earning a livelihood, but to build up sons for the Mother land to work and to suffer for her. That is why we started this college and that is the work to which I want you to devote yourselves in future. What has been insufficiently and imperfectly begun by us, it is for you to complete and lead to perfection. When I come back I wish to see some of you becoming rich, rich not for yourselves but that you may enrich the Mother with your riches. I wish to see some of you becoming great, great not for your own sakes, not that you may satisfy your own vanity, but great for her, to make India great, to enable her to stand up with head erect among the nations of the earth, as she did in days of yore when the world looked up to her for light. Even those who will remain poor and abscure, I want to see their very poverty and abscurity devoted to the Mother land. There are times in a nation's history when providence places before it one work, one aim to which everything else, however high and noble in itself, has to be sacrificed. Such a time has now arrived for our Mother land when nothing is dearer than her service, when everything else is to be directed to that end. * * * * Work that she may prosper, suffer that she may rejoice. All is contained in that one single advice. My last word to you is that if you have sympathy for me, I hope to see it not merely as a personal feeling, but as a sympathy with what I am working for. I want to see this sympathy translated into work so that when in future I shall look upon your career of glorious activity, I may have the pride of remembering that I did something to prepare and begin it."৫

গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী শ্রীঅরবিন্দের উক্ত বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলছেন, "১৯০৭। ২২শে আগস্ট ছাত্রদের 'বিদায় অধিবেশনের উত্তরে অরবিন্দ যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন—তাহা হইতে স্পষ্ট প্রমাণ হয় যে, তিনি জাতীয় পরিষদের ছাত্রদিগকে রাজনীতির সংস্রব হইতে দূরে না থাকিয়া অতিশয় ঘনিষ্ঠভাবে, এমন কি জীবন পর্যন্ত বিসর্জন দিয়া দেশকে, মাতৃভূমিকে সাক্ষাৎ জীবন্ত মা বলিয়া জানিয়া সেবা করিতে বলিয়াছিলেন। জীবন বিসর্জন দিয়া দেশকে মা বলিয়া সেবা করা রাজনীতি ভিন্ন আর কি? মৃত্যুভয় উপেক্ষা করিয়া দেশের স্বাধীনতার জন্য কাজ করাই তখন অরবিন্দের রাজনীতি ছিল।"৬ শ্রদ্ধেয় গিরিজাশঙ্করের মন্তব্যই ছাত্র ও রাজনীতি প্রসঙ্গে শ্রীঅরবিন্দের মনোভঙ্গির যথার্থ বিশ্লেষণ।

শ্রীঅরবিন্দ নিবেদিতাকে বলেছেন, 'শিখাময়ী'। শ্রীমতী লিজেল রেম রচিত ভগিনী নিবেদিতার জীবনীগ্রন্থের বঙ্গানুবাদ করেছেন শ্রীমতী নারায়ণী দেবী। অরবিন্দ আশ্রমের শ্রদ্ধেয় শ্রীঅনির্বাণ নারায়ণী দেবীকে সর্বতোভাবে সাহায্য করেছেন। অনুবাদিকার কথায় নারায়ণী দেবী লিখছেন, "মূল ফরাসীর সঙ্গে মিলিয়ে বইখানা তিনি (শ্রীঅনির্বাণ) আগাগোড়া পরিমার্জন করে দিয়েছেন।" শ্রদ্ধেয় অনির্বাণ উক্ত পুস্তকের ভূমিকায় লিখেছেন, "বিবেকানন্দকে না জানলে যেমন বাংলার তপঃশক্তির পরিচয় পাওয়া যায় না, তেমনি নিবেদিতাকে না জানলেও বিবেকানন্দের ভারতস্বপ্নকে জানা যায় না।

"আজ ভারতবর্ষের নবযুগের ব্রাহ্মমুহূর্তে এই শক্তিরূপিণীর অবদান আমাদের সকলেরই 'শ্রোতব্য মন্তব্য এবং নিদিধ্যাসিতব্য'।"

এমা কালভে একজন বিখ্যাত ফরাসী শিল্পী। তাঁর সঙ্গীত স্বামীজীর অত্যন্ত প্রিয় ছিল। প্যারিসে স্বামীজী মিঃ লেগেটের সঙ্গে একদিন এমার অভিনয় দেখতে যান। পরদিন লেগেটের বাড়িতে স্বামীজীর সঙ্গে এমার আবার সাক্ষাৎ হয়। স্বামীজী এমাকে অনুরোধ করেন, "অনুষ্ঠানের শেষে (পূর্বদিন) সুরের আগুন জ্বালিয়ে তুললে যে গানে আমায় সেটি গেয়ে শোনাবে এমা? ওটি আমি শিখতে চাই।"

"লা মার্সেইল্যাজ? কিন্তু ও যে সমর সঙ্গীত, স্বামীজী। কামান গর্জে উঠছে, সৈন্যেরা হুঙ্কার ছাড়ছে......'

'হ্যাঁ ঐ গানটিই। ও গানে নির্ভয়ের আগুন জ্বলে তোমাদের অন্তরে, দেশকে ভালবেসে তার জন্য প্রাণ দেবার প্রেরণা পাও তোমরা, তাই না? কল্পনায় দেখতে পাও, কিছু না ভেবেই নাগরিকরা কোন অদৃশ্য শক্তির আহ্বানে মাথা তুলে দাঁড়াল। আমার ছেলেদের এ গান শেখাব।' "৭

স্বামীজী তাঁর শিষ্যা ভগিনী নিবেদিতার মাধ্যমে বাংলা দেশের তরুণদের মাথা তুলে দাঁড়াতে শেখাতে চেয়েছিলেন। কাজেই নিবেদিতাকে তিনি মুক্তিবাহিনীর একজন করে তৈরি করেছিলেন। "গুরু যে শিক্ষা দিয়েছিলেন এইবার তার সত্যকার মূল্য বোঝা গেল। নিবেদিতাকে স্বাতন্ত্র্য দিয়েছিলেন তিনি, তাঁকে গড়ে তুলেছিলেন কর্মযোগিনী করে। অটল বিশ্বাসের বর্মে আবৃত হয়ে তিনি যেন মুক্তিবাহিনীর একজন হতে পারেন এই ছিল তাঁর আশা।"৮

ভারতবর্ষের স্বাধীনতাই ছিল ভগিনী নিবেদিতার ধ্যানধারণা। এ দেশের মানুষ সংস্কৃতি, ধর্ম শিল্প, সাহিত্য ও বিজ্ঞান সব কিছুতেই ছিল তাঁর প্রবল আগ্রহ। কিন্তু মূলত তিনি ছিলেন রাজনীতির

৪ Bhawani Mandir — Sri Aurobindo.
[Bhawani Mandir' গ্রন্থখানি A. B. Purani লিখিত 'Life of Sri Aurobindo' নামক পুস্তকে পুনর্মুদ্রিত হয়েছে। তাছাড়া Sri Aurobindo Mandir Annual এ (Jayanta No. 15, 1956, 15th August) গ্রন্থখানি ছাপা হয়েছে।]

৫ Speeches—Sri Aurobindo p. 3-4.

৬ শ্রীঅরবিন্দ ও বাংলায় স্বদেশীযুগ—গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী, পৃঃ ৫১৩।

৭ নিবেদিতা—শ্রীলিজেল রেম—অনুবাদিকা—নারায়ণী দেবী। পৃঃ ৩৩৭।

৮ নিবেদিতা—শ্রীলিজেল রেম—অনুবাদিকা—নারায়ণী দেবী। পৃঃ ৩৮৯।

স্যাড়তে ছেলেদের রাজনীতি বিষয়ে শিক্ষা দিতেন। গুপ্ত সমিতির পরামর্শদাতা হিসাবে যে তিনি কাজ করতেন—সে কথা পূর্বেই বলেছি।

গিরিজাশঙ্কর লিখেছেন যে, শ্রীঅরবিন্দ ভগিনী নিবেদিতার সংগে পরামর্শ করেই 'ক্লার' বধের পরিকল্পনা করেছিলেন। এ-প্রসংগে র‍্যান্ড ও আয়ার্স্টের গুপ্ত হত্যা সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দের মন্তব্য স্মরণীয়। নিবেদিতা ১৮৯৮ খৃস্টাব্দের ২৮শে জানুয়ারী ভারতবর্ষে আসেন। "এবং তাঁহার আগমনের মাত্র ৭ মাস পূর্বের ঘটনা র‍্যান্ড ও আয়ার্স্টের গুপ্ত হত্যা। স্বামী বিবেকানন্দ এই হত্যাকারীর প্রশংসা করিয়াছেন। ইহাদের সোনার মূর্তি তৈরি করিয়া বোম্বাই জাহাজঘাটে প্রতিষ্ঠা করিতে বলিয়াছিলেন।"২৯ নিবেদিতার বাগবাজারের বাড়িতে বসেই বারীন্দ্রকুমার ও ভূপেন্দ্রনাথ 'যুগান্তর' পত্রিকা প্রকাশের পরিকল্পনা করেন। নিবেদিতা সন্ত্রাসবাদী যুবকদের সিনফিনদের গুপ্ত সমিতির নিয়ম-কানুন শিক্ষা দেবার কাজে ব্যস্ত থাকার ফলেই তিরু মালাচার্যের অনুরোধ পেয়েও মাদ্রাজে 'বালা ভারত' কাগজের সম্পাদিকার দায়িত্ব নিতে অস্বীকৃত হয়েছিলেন। বিপ্লবী হেমচন্দ্রকে প্যারিসে পাঠাবার ব্যাপারেও ভগিনী নিবেদিতার হাত ছিল বলে অনেকে বিশ্বাস করেন।

বাংলা দেশের সন্ত্রাসবাদী রাজনীতিতে বোমার ব্যবহার হয়েছে প্রচুর। বোমা তৈরির কাজে নিবেদিতার তরুণ বিপ্লবীদের সাহায্য করেছেন অকুণ্ঠভাবে। "নিবেদিতা আচার্য বসুকে (জগদীশচন্দ্র বসু) বলিয়া তাঁহার বিজ্ঞানের গবেষণাগারে উল্লাসকরের কার্যকে নিপুণভাবে পরিসমাপ্তির জন্য তাঁহাকে এবং আরও একটি যুবককে ভর্তি করিয়া দিলেন। জগদীশচন্দ্র বসুর মাধ্যমে অন্যান্য যুবকদের তিনি বিখ্যাত রাসায়নিক পি, সি, রায়ের গবেষণাগারে ভর্তি করিয়া দিলেন। পি. সি. রায় নিবেদিতার অনুরোধ অত্যন্ত আগ্রহের সহিত রক্ষা করিলেন।

"নিবেদিতা নিজেই পি. সি, রায়ের নিকট যুবকদের লইয়া গিয়াছিলেন। পি, সি, রায় গবেষণাগারের চাবি ইচ্ছা করিয়াই ফেলিয়া যাইতেন; এবং অনেক রাত্রে একা আসিয়া শূন্য গবেষণাগার পর্যবেক্ষণ করিতেন; বোমা তৈয়ারীর ফরমূলাগুলি টেবিলের নিচে কাগজ চাপা থাকিত। তিনি সেগুলি সংগ্রহ করিয়া দেখিতেন। যন্ত্রগুলি নিজেই পরিষ্কার করিতেন।

২৯ ভগিনী নিবেদিতা ও "বাংলার বিপ্লববাদ"—গিরিজাশঙ্কর। পৃঃ ১১১।

এসিডগুলি উধাও হইয়াছে—তাহাও দেখিতেন। এই সাহায্যের জন্য নিবেদিতা পি, সি, রায়ের নিকট অতিশয় কৃতজ্ঞ ছিলেন।"৩০

স্বাধীনতা আন্দোলন চলবে বিপ্লবের পথ ধরে। অসাধারণ মিল ছিল ভগিনী নিবেদিতা ও অরবিন্দের আদর্শের মধ্যে। "নিবেদিতা ও অরবিন্দের আদর্শ—(১) ইংরেজ বর্জিত স্বাধীনতা—(২) উপায় পর পর সন্ত্রাসবাদ, গেরিলাযুদ্ধ, (৩) শেষে (সৈন্য ভাঙ্গাইয়া আনিয়া) সশস্ত্র প্রকাশ্য বিদ্রোহ।"৩১

ভগিনী নিবেদিতা স্বামীজীর আদর্শকে রূপ দিতে চেয়েছেন প্রতিটি কাজে। জীবন ঢেলে দিয়েছেন দরিদ্রনারায়ণের সেবায়। লোকশিক্ষার কাজে করেছেন প্রাণপাত। উজাড় করে ভালবেসেছেন এই হতভাগ্য দেশের আশার খনি ঐ দুর্বার প্রাণচঞ্চল ছাত্রদলকে। স্বামীজী বলেছেন, "অন্য নাম হাতের কাছে না পাওয়ায় আমি নিজেকে Socialist বলিয়া পরিচয় দিতে চাই।"৩২ আদর্শের দিক থেকে ভগিনী নিবেদিতার পরিচয় কী হতে পারে পাঠকগণ ভেবে দেখবেন। রক্তমাখা পথেই প্রকৃত স্বাধীনতা আসবে বলে বিশ্বাস ছিল তাঁর। সে স্বাধীনতা হবে নরনারায়ণের—হিন্দু-মুসলমান, ধনী-দরিদ্র, উচ্চ-নিচ সব তফাৎ ঘুচে গিয়ে যে নবীন ভারতবর্ষ তৈরি হবে তার ভিত্তিভূমি হবে সমাজতন্ত্রবাদ। বিবেকানন্দ, অরবিন্দ ও নিবেদিতা বোধ হয় সেই ভারতবর্ষেরই কল্পনা করেছিলেন।

৩০ ভগিনী নিবেদিতা ও বাংলার বিপ্লববাদ—গিরিজাশঙ্কর। পৃঃ ১২০—১২১।

৩১ ভগিনী নিবেদিতা ও বাংলায় বিপ্লববাদ—গিরিজাশঙ্কর। পৃঃ ৯৮।

বাংলার সন্ত্রাসবাদ আন্দোলনের প্রাণকেন্দ্র ছিল ইস্কুল-কলেজের ছাত্রবৃন্দ। ১৯১৭ সালের ডিসেম্বর মাসে গভর্নর জেনারেলের আদেশে একটি কমিটি নিয়োগ করা হয়—যার কাজ ছিল ভারতবর্ষের সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ সম্পর্কে তদন্ত করা এবং এইসব অবাঞ্ছিত কার্যকলাপ বন্ধ করার জন্য সরকারের কী ধরণের আইন প্রণয়ন করা কর্তব্য—সে বিষয়ে উপদেশ দেওয়া। Mr. Justice Raulatt (S. A. T. Raulatt) এই কমিটির সভাপতি নিযুক্ত হয়েছিলেন। একজন বাঙালীও এই কমিটির সদস্য ছিলেন তাঁর নাম মিঃ পি সি মিত্র।

৩২ ভগিনী নিবেদিতা ও বাংলায় বিপ্লববাদ—গিরিজাশঙ্কর। পৃঃ ১১৫।

উক্ত রিপোর্টে ষষ্ঠ অধ্যায়ে বাংলা দেশের ইস্কুল-কলেজের ছাত্রদের সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ সম্বন্ধে বলা হয়েছে।

"Abundant evidence has compelled us to the conclusion that the Secondary English Schools, and in a less degree the Colleges, of Bengal have been regarded by the revolutionaries as their most fruitful recruiting centres."৩৩

এই রিপোর্টে বাংলা দেশের শিক্ষাধিকারিকের ১৯১৫-১৯১৬ সালের রিপোর্টের কিছু অংশ তুলে দেওয়া হয়েছে। শিক্ষাধিকারিক (D. P. I.) লিখছেন :

It is customary to trace the genesis of much sedition and crime to the back streets and lanes of Calcutta and Dacca, where the organisers of anarchic conspiracies seek their agents from among University students."৩৪ "The fruition of the conspiracy has been tragic indeed. We will not dwell further on the dreary record of the Sonarang National School, which was rather an association organised for robbery and murder that a place of education. Nor need we tell the tale of the Madaripur High English School, of which two ex-pupils have been hanged, one committed murder and was afterwards killed fighting the police, others have been imprisoned ..."৩৫

* * *

"On the person of Ramesh Chandra Acharji, the principal convict in the Barisal conspiracy case, was found a District Organisation Scheme which contained the following provisions :—

'The District organizer shall first make himself acquainted with the number of Entrance and Middle English Schools or Colleges in his centre. * * * The chief of the centre shall make arrangements to disseminate the 'idea' more among the students of the entrance schools and colleges etc. Etc.' "৩৬

"We have marshalled in this chapter only the most prominent parts of the testimony which has convinced us that the revolutionary Associations have spared no pains to secure recruits from schools and colleges. By elaborate endeavour and astutely devised methods they have achieved a degree of success which, unless strong countered by combined official and non-official effort, must gravely prejudice the future of Bengal."৩৭

Sedition Committee Report-এর 'Annexure 2'-তে একটি সুন্দর পরিসংখ্যান দেওয়া হয়েছে। এ থেকেই পরিষ্কার বোঝা যাবে যে সন্ত্রাসবাদী রাজনৈতিক আন্দোলনে বাংলা দেশের ছাত্রসমাজ কী অপূর্ব ভূমিকা গ্রহণ করেছিল!

Annexure 2.

Statistics as to * * * occupation or profession of persons convicted in Bengal of revolutionary crimes or killed in Commission of such crimes during the year 1907—17.

Students	Teachers	Landowners	Persons of no occupation	Trade & Commerce	Doctors or Compounders	Clerks & persons in Govt. Service	Newspapers & Presses	Cultivators	Opium Smugglers	not recorded
68	16	19	24	23	7	20	5	1	1	2

দেশের মুক্তি আন্দোলনে শুধু অহিংসই নয়, সহিংস পথও গ্রহণ করেছে বাংলা দেশে। জাতীয় ইতিহাসের একটি অবিস্মরণীয় অধ্যায় হবে বাংলা দেশের বিপ্লবী আন্দোলনের কাহিনী। আর এই বিপ্লবী আন্দোলনকে সার্থক করে তুলেছিল বাংলা দেশের ছাত্রসমাজ। বিপ্লবীদের প্রতি ঋণ স্বীকার যদি স্বাধীন ভারতের অবশ্যকর্তব্য হয় তবে সেই সঙ্গে ছাত্রসমাজের কাছেও ঋণ স্বীকার অপরিহার্য। অন্তত সত্যের খাতিরেই এ দায়িত্ব পালন কর্তব্য।

৩৩ Sedition Committee Report, 1918—P. 75.

৩৪ Sedition Committee Report, 1918—P. 75.

৩৫ Sedition Committee Report, 1918—P. 79.

৩৬ Sedition Committee Report, 1918—P. 76.

৩৭ Sedition Committee Report, 1918—P. 80.

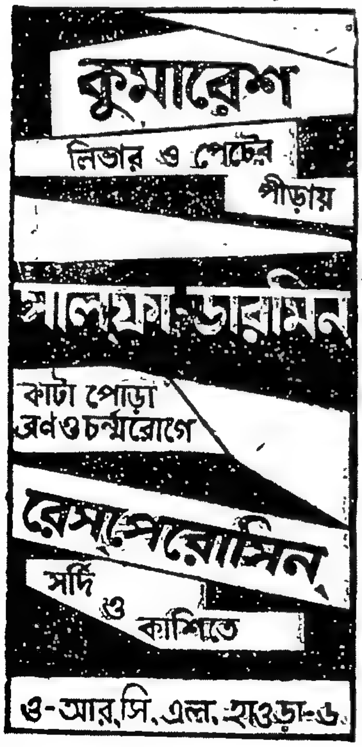

একান্ত অনুরাগিণী। স্বামীজীর সঙ্গে ভগিনী নিবেদিতার সাক্ষাৎ হয় লণ্ডনে ১৮৯৫ খৃস্টাব্দে। তার পূর্বেই তিনি Kropotkin-এর সংস্পর্শে এসে বিপ্লবপন্থী হয়েছিলেন। "এই সময়ে নিবেদিতা আইরিশ হোমরুল আন্দোলনে যোগ দিয়া সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই আন্দোলনের সময় লণ্ডনে যে কয়টি বিপ্লবকেন্দ্র ছিল, নিবেদিতা ঐ বিপ্লবকেন্দ্রগুলির পরিচালনার ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন।"৯

ভারতে আসার আগে নিবেদিতার লেখা বিভিন্ন চিঠিতে তাঁর মনোভাব বোঝা যায়। পরন্তয়ে থেকে মিসেস হুলকে তিনি যে পত্র লিখেছিলেন তাতে নবজাগ্রত ভারতীয়দের প্রতি তাঁর মনোভাব স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। "...সেইসঙ্গে ওদেশের (ভারতের) রাষ্ট্রচেতনার প্রয়োজনটাও অত্যন্ত পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি যে। এ হল আমার মনের কথা—নিজের কাছে আমায় খাঁটি থাকতেই হবে। নবজাগ্রত ভারত আর ভারতীয়দের জন্য আমার কিছু করবার আছে—এ বিশ্বাস আমার জন্মেছে।"১০

মিস্ ম্যাকলয়েডকে লিখ্লেন, "এখন ভারতের কর্তব্য হল তাঁদের (ইংরাজদের) তাড়িয়ে দিয়ে আবার আপন স্বভাবে ফিরে যাওয়া। মনে হয় এ ধরণের একটা কিছুই ভারতের পক্ষে আদর্শ সাধনা। ইংলণ্ডের রাজ্য শাসনের পালা এখনও শেষ হয় নি। কিন্তু সর্বান্তঃকরণে কামনা করি, সেদিন আসুক যেদিন এ পালা সাঙ্গ হবে। ইটালীর স্বাধীনতাসংগ্রামে দেশের কচি ছেলেরাও রংরুট হয়ে ম্যাটসিনির পাশে দাঁড়িয়ে মুক্তির বার্তা প্রচার করেছিল। ভারতবাসীরা স্বদেশের স্বাধীনতা যেদিন আমাদের হাত থেকে ছিনিয়ে নেবে, সেদিন আমি যেন আবার নতুন জন্ম নিয়ে 'তরুণ ভারতের' জয়গাথা উচ্চারণ করতে পারি এই আমার প্রার্থনা।

* * * বৃক্ষরোপণ, শিশুশিক্ষা বা ভূমিবিভাগ—এই সব সমাজহিতকর কাজের কথা ভুলে গেছি মনে কোর না। তাও চাই। কিন্তু সেই সঙ্গে চাই উদার আহবান, জনতার উন্মাদনা, প্রাণ বিসর্জনের তীব্র আকাঙ্ক্ষা। এগুলো না হলে চলবে না।

*** আমার কাজ হল চোখ মেলে দেখা আর অন্যদের চোখ খুলে দেওয়া। যাকিছুটুকু আপনি হবে। স্বপ্ন দেখাটাই সবচাইতে শক্ত।'

*** যদি মনে কর আমার সবই ভুল, সবই সর্বনেশে, অশেষ কৃতজ্ঞতায় তোমার পা ছুঁয়ে আমার পথে আমি চলে যাব। আমার পাওয়া স্বপ্নকে আমায় রূপ দিতেই হবে।" (১৯০১-এর ২৬শে এপ্রিল আর ১৯শে জুলাই-এর চিঠি।)১১

বাংলা দেশের রাজনীতিতে ভগিনী নিবেদিতাকে প্রত্যক্ষ অংশ গ্রহণ করতে দেখি স্বামীজীর দেহত্যাগের পর। রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসীদের মতের সঙ্গে তাঁর মতের মিল হয় নি। স্বামীজী একবার সন্ন্যাসীদের বলেছিলেন, "ও (নিবেদিতা) যদি মঠের সঙ্গে কোনও সম্পর্ক নাও রাখে তোমরা ওকে সম্পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য দিও।"১২

স্বামী ব্রহ্মানন্দ যখন নিবেদিতাকে রাজনীতির কাজ ছেড়ে নারীশিক্ষার কাজে আত্মনিয়োগ করতে বলেন নিবেদিতা উত্তর দিয়েছিলেন, "আর কিছু আমার দ্বারা হবে না। ভারতমাতার সাধনার সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছি, দেশের ভাবনা আর আমি এক হয়ে গেছি। এপথ ছেড়ে দেওয়ার চেয়ে মরা আমার পক্ষে অনেক বেশি সহজ।"১৩ নিবেদিতা তাঁর স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখায় বদ্ধপরিকর হলেন। এর ফলে তাঁর কার্যাবলীর সঙ্গে মিশনের আর কোনও যোগাযোগ রইল না। মিস ম্যাকলয়েডের কাছে নিবেদিতা বলেছিলেন, "কেবল মনে হয়, গোটাকয়েক মেয়েকে প্রভাবিত করা নয়। আমার কাজ হল একটা জাতিকে জাগিয়ে তোলা।"১৪ (নরওয়ে হতে লেখা চিঠি)

বিশ শতকের সুরুতে বাংলা দেশের গণজীবনে খুব একটা উত্তাপ ছিল না। কিন্তু এই সময়ে যে নবজীবনের অঙ্কুর দেখা যাচ্ছিল এ কথা সত্য। বিপ্লবী সঙ্ঘ-সংস্থা গড়ে তুলতে কতিপয় ব্যক্তি চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশেও কিছু কিছু গুপ্ত সমিতি এই সময়ে স্থাপিত হতে থাকে। দেশের স্বাধীনতার জন্য বীরের মত প্রাণ দিতে অল্প হলেও কিছু সংখ্যক ব্যক্তি এ সময়ে গড়ে উঠেছিলেন। সংগঠন তখন খুবই দুর্বল। কিন্তু কর্মীদের উদ্দীপনা আছে। কাজেই, "বীরের মত জীবন দিতে চায় যারা, তাদের সঙ্গে নিবেদিতাও জড়িয়ে পড়েছিলেন"১৫

---

৯ ভগিনী নিবেদিতা ও বাংলার বিপ্লববাদ—গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী পৃঃ ৩১।

১০ নিবেদিতা—লিজেল রেম'। অনুবাদিকা—নারায়ণী দেবী। পৃঃ ৩৬২।

১১ নিবেদিতা — লিজেল রেম'— অনুবাদিকা—নারায়ণী দেবী। পৃঃ ৩৬৩-৩৬৬।

১২ নিবেদিতা — লিজেল রেম'— অনুবাদিকা—নারায়ণী দেবী। পৃঃ ৪০৩।

১৩ নিবেদিতা — লিজেল রেম'— অনুবাদিকা—নারায়ণী দেবী। পৃঃ ৪০৩।

১৪ নিবেদিতা — লিজেল রেম'— অনুবাদিকা—নারায়ণী দেবী। পৃঃ ৪০৬।

১৫ নিবেদিতা — লিজেল রেম'— অনুবাদিকা—নারায়ণী দেবী। পৃঃ ৩৯১।

দেশ সেবায় নিয়োজিত,

এ্যালবার্ট ডেভিড লিমিটেড

কলিকাতা—৫০

নীতি ও বিজ্ঞানানুযায়ী ঔষধ
প্রস্তুতকরণের অগ্রণী

—ব্রাঞ্চ সমূহ—

বোম্বে - মাদ্রাজ - দিল্লী - নাগপুর
বেজওয়াড়া - শ্রীনগর - গৌহাটী

সহযুগ দাসদের ফলে ভারতীয়রা আত্মত্যাগের মন্ত্র প্রায় ভুলতে বসেছিল। কর্মীদের বলিষ্ঠ চরিত্র ও আদর্শবাদ না থাকলে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা সম্ভব নয়। গুপ্ত সমিতির কর্মীদের মধ্যে আত্মত্যাগের প্রেরণা যোগান নিবেদিতা। তিনি বলতেন, "তোমাদের মানুষ হতে শেখাব বলে আমি এসেছি। তোমাদের রামায়ণ-মহাভারতকে প্রত্যক্ষ করে তোল আজ। * * * তোমাদের নিজের রামায়ণ নিজে রচনা কর। রূপকথায় নয়, দেশমাতৃকার সেবা করে, তাঁর কাজ করে।"১৬

বোম্বাই-এ এক বক্তৃতাপ্রসঙ্গে নিবেদিতা বলেন, "একটি কথাই বলবার ছিল স্বামীজীর, বার বার একটি বাণীই দিয়ে গেছেন, উত্তিষ্ঠত! জাগ্রত! লড়াই করে চল, লক্ষ্যে না পৌঁছানো পর্যন্ত থামবে না।"১৭ ছাত্ররা এসে শুধোয় আমরা কোন্ কাজে লাগব? নিবেদিতা উত্তর দেন, "যেভাবেই হ'ক ভারতবর্ষের সেবা কর।"১৮

শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে ভগিনী নিবেদিতার প্রথম সাক্ষাৎ হয় বরোদায়। তখন থেকেই অরবিন্দের বিপ্লবী কাজে তিনি পূর্ণ সহযোগিতা করতে প্রতিশ্রুত হন। শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন, "Then about my relation with sister Nivedita—they were purely in the field of Politics."***১৯ শ্রীঅরবিন্দ আরও বলেছেন : I tried to unite them (groups of revolutionaries) under a single organisation with the Barrister P. Mitra as the leader of revolution in Bengal and a Central Council of five persons, one of them being Nivedita."২০

শ্রীঅরবিন্দের কাজ নিবেদিতার সহযোগিতায় অনেক সহজ হয়েছিল। শ্রীঅরবিন্দ বিপ্লবী আদর্শে অনুপ্রাণিত; কিন্তু এ-বিষয়ে তাঁর বাস্তব অভিজ্ঞতা কম ছিল। অন্যদিকে পূর্বে বৈপ্লবিক আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত থাকায় ভগিনী নিবেদিতার গুপ্ত সমিতির কাজ-কর্ম পরিচালনার অভিজ্ঞতা ছিল প্রচুর।

১৯০২ খৃস্টাব্দে সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ডন্ সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করেন। ভগিনী নিবেদিতা ডন্ সোসাইটিতে বক্তৃতা দিতেন। এখানকার ছাত্রেরা নিবেদিতার বক্তৃতায় স্বদেশসেবায় আকৃষ্ট হয়েছিল। সেকালের বাংলা দেশের জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিরা বিভিন্ন বিষয়ে বক্তৃতা করতে আসতেন ডন্ সোসাইটিতে। এই সোসাইটির সংগে সংশ্লিষ্ট হওয়ার ফলে ভগিনী নিবেদিতার পক্ষে তৎকালীন বাংলা দেশের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সংস্পর্শে আসা খুবই সহজ হয়েছিল।

স্বামীজীর দেহত্যাগের পর এ দেশের ছাত্রদের প্রকৃত মানুষ করে গড়ে তুলতে ভগিনী নিবেদিতা একটি সংস্থা প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু নানা কারণে তা সম্ভব হয় নি। দশ সহস্র বিবেকানন্দ গড়ে তুলতে হবে এই ছিল তাঁর ইচ্ছা। এ কাজের জন্য তাঁর নিজের প্রতিষ্ঠান না থাকায় নিবেদিতা ডন্ সোসাইটির মাধ্যমেই সে-কাজ করতে চেষ্টা করলেন। সোসাইটির ছেলেদের তিনি প্রায়ই বলতেন, "সরকারী চাকুরীর মোহ ছাড়। গোলামী ছাড়।"২১ ছাত্রদের বোঝাতেন, "তোমাদের আরাধ্যা দেবী ভারতমাতা। মন্দিরের বেদীতে ফুল পাতা সাজিয়ে আর ধূপ-ধুনো জ্বালিয়ে তাঁকে পাবে না। তিনি আছেন দুর্ভিক্ষের হাহাকারে, দারিদ্র্যের তাড়নায়। তোমার আত্মাহুতিতেই তাঁর আবির্ভাব।"২২

১৯০২ সালের নভেম্বর মাস থেকেই ভগিনী নিবেদিতা ছাত্রদের তাঁর রবিবাসরীয় প্রাতরাশের বৈঠকে নিমন্ত্রণ করতে থাকেন। রাজনীতির চর্চাই এই আসরের মূল উদ্দেশ্য। "ডন্ সোসাইটির ছেলেরা তখন তৎপর হয়ে উঠেছে, দেশে বিপ্লবী ভাবধারা প্রচার করছে। তাদের 'পরে নিবেদিতার অসামান্য প্রভাব। তাঁর বাগবাজারের বাড়িতে রবিবাসরীয় প্রাতরাশের বৈঠক বসে। ওটি হল তাঁর শক্তি সঞ্চারের উপলক্ষ।"২৩ ধীরে ধীরে এই বৈঠকটি আরও সব গুণী-জ্ঞানী ব্যক্তিদেরও আকর্ষণ করতে লাগল। এখানে সবারই একটি মাত্র পরিচয়—সকলেই দেশপ্রেমিক। "এক বছর পরে এই প্রাতরাশের আসরটি হয়ে উঠল রাজনীতিক বৈঠক বিশেষ। * * * নিবেদিতা হলেন সেই আড্ডার প্রাণ। তখনকার বৈঠকের সপ্তাহের বিশেষ বিশেষ ঘটনা আর কাগজওয়ালাদের নিয়ে আলোচনা চলত। নির্বাসিত বিপ্লবীদের পরিবারবর্গকে দরকার বুঝে সাহায্য করবার আশু ব্যবস্থাও হত ওখানে।"২৪ রেমঁ লিখেছেন, "নিবেদিতার 'প্রাতরাশ' অনুষ্ঠানগুলি নতুন ভাবের প্রচার কেন্দ্র ছাড়া আর কিছুই নয়।"২৫

বিপ্লবী বারীন্দ্রকুমার ও তাঁর দলের ছেলেরা এই আসরে আসতেন। নিবেদিতার সংগে তাঁরা ভাবী বিপ্লবী আন্দোলনের রূপ কী হবে তা আলোচনা করতেন। বারীন্দ্র ছিলেন খুব চট্‌পটে এবং বেপরোয়া। সময় নষ্ট না করে সত্বর কাজে লেগে পড়াই তাঁর ইচ্ছা। তরুণ বারীন্দ্রের এভাবই স্বাভাবিক। নিবেদিতা বলতেন, "উদ্দেশ্য মহৎ কিন্তু নিজেকে তৈরি করেছ? মনে রেখ তোমার জীবন শুধু তোমার নয়। তুমি জন্মেছ তোমারই মত আর দশজনের জন্য—এক কথায় সব মানুষের জন্য।"২৬

বিপ্লবী দলে ছাত্রদের সংখ্যাই অধিক। নিবেদিতার প্রতি তাঁদের অখণ্ড বিশ্বাস। নিবেদিতার অঙ্গুলী হেলনে এই সম্প্রদায় যে সব কিছুই করতে সাহস করত—বারীন্দ্রকুমারের নিম্নলিখিত বক্তব্যই তার প্রমাণ দেয়। বারীন্দ্রকুমার নিবেদিতাকে বলছেন : "তুমি হবে আমাদের 'জোয়ান অব্ আর্ক', পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে আমাদের এই শর্ত। তোমায় আমরা চাই। তোমার পিছু পিছু তাল ঠুকে চলবে আমাদের বাহিনী। কোথায় নিয়ে চলেছ তাও যদি জানি, তবু সব ঠিক হয়ে যাবে। তুমি হুকুম কর শুধু।"২৭ এই গভীর বিশ্বাস তরুণ সমাজ তাঁরই উপর রাখে যিনি বলতে পারেন, "* * যদি কাউকে জোটাতে না পার, আমি তোমায় সাহায্য করব। * * * ঘাবড়ে যেও না। কাজে লাগ রাস্তা খুলে যাবে সামনে।"২৮

বারীন্দ্রকুমারের গুপ্ত সমিতিকে নিবেদিতা তাঁর গ্রন্থাগারের বহু বই দিয়েছিলেন। তিনি নিজেও মাণিকতলার

১৬ নিবেদিতা — লিজেল রেমঁ—অনুবাদিকা—নারায়ণী দেবী। পৃঃ ৩৯৪।

১৭ নিবেদিতা — লিজেল রেমঁ—অনুবাদিকা—নারায়ণী দেবী। পৃঃ ৪১২।

১৮ নিবেদিতা — লিজেল রেমঁ—অনুবাদিকা—নারায়ণী দেবী। পৃঃ ৪১৩।

১৯ Life of Sri Aurobindo—A. B. Purani, P. 66.

২০ Life of Sri Aurobindo—A. B. Purani, P. 67

২১ নিবেদিতা — লিজেল রেমঁ—অনুবাদিকা—নারায়ণী দেবী। পৃঃ ৪০৭।

২২ নিবেদিতা — লিজেল রেমঁ—অনুবাদিকা—নারায়ণী দেবী। পৃঃ ৪০৮।

২৩ নিবেদিতা — লিজেল রেমঁ—অনুবাদিকা—নারায়ণী দেবী। পৃঃ ৪২৮।

২৪ নিবেদিতা — লিজেল রেমঁ—অনুবাদিকা—নারায়ণী দেবী। পৃঃ ৪২৮।

২৫ নিবেদিতা — লিজেল রেমঁ—অনুবাদিকা—নারায়ণী দেবী। পৃঃ ৪৩১।

২৬ নিবেদিতা — লিজেল রেমঁ—অনুবাদিকা—নারায়ণী দেবী। পৃঃ ৪৩২।

২৭ নিবেদিতা — লিজেল রেমঁ—অনুবাদিকা—নারায়ণী দেবী পৃঃ ৪৩২।

২৮ নিবেদিতা — লিজেল রেমঁ—অনুবাদিকা—নারায়ণী দেবী। পৃঃ ৪৩৩।

মেয়েদের ছোটবেলা থেকেই
ত্বকের যত্ন নিতে শেখান।
তিনি সুন্দরী, তিনি রূপসী!
প্রতিদিনের ত্বক পরিচর্য্যায় তাঁর এই অপরূপ সৌন্দর্য্যের
উৎস-সাধনা বিউটি ক্রীম।
সাধনা বিউটি ক্রীম রূপসাধনায় অনন্য
সাধনা ঔষধালয়-ঢাকা
সাধনা ঔষধালয় রোড, সাধনানগর, কলিকাতা-৪৮
অধ্যক্ষ যোগেশ চন্দ্র ঘোষ, এম.এ.
আয়ুর্বেদশাস্ত্রী, এফ.সি.এস. (লণ্ডন)
এম.সি.এস. (আমেরিকা) ভাগলপুর
কলেজের রসায়ন-শাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক
কলিকাতা কেন্দ্র:
ডাঃ নরেশচন্দ্র ঘোষ,
এম.বি.বি.এস. (কলিঃ)
আয়ুর্বেদাচার্য
SADHANA
Beauty
CREAM
সাধনা
বিউটি
ক্রীম

সারাদিনের তেতে ওঠা মাঠে সন্ধ্যার হাওয়া কেঁপে কেঁপে অনেকটা মেয়েলী-গলার নাকী সুরের মত একটা শব্দ তুলে বইতে শুরু করেছে। আগাছাগুলো শুকিয়ে আম্‌সি। ঘাস যা ছিল পুড়ে খাক। এবড়ো-খেবড়ো মাঠটার পূর্বদিকে বিরাট দুটো অশ্বত্থ গাছ। তার আড়ালে কোনো এককালে জীবিত থাকা কোনো মন্দিরের ইঁটের খিলানগুলো দাঁত বার করে রয়েছে। সম্মুখে নাটমন্দির ছিল তার ধারণা হয় ছড়ানো ইঁটের ইতস্তত পাঁজাগুলো দেখে। উত্তরের মজা খালের গর্তে কাঁটাগাছের ঝোপ। ফণীমনসার ঝাড়। আর তারই পাশে খানকয়েক তেঁতুলগাছের উঁচু মাথা। পশ্চিম দিকের খোলা মাঠের ওপারে অনেকদূরে একটা-দুটো আলো। ওদিকে আছে রেললাইন। আছে জনবসতি। এই বিস্তৃত মাঠের পতিত জমিটার বাসিন্দা অনেক। বিচিত্র তাদের জাত। আর যদিও মাঠটার মধ্যে কোনো সীমানা চিহ্নিত করা নেই, তবুও এখানকার অধিবাসীদের এলাকা পৃথক। সামান্যতম নড়চড় হবার উপায় নেই।

এই মাঠেই এসে বাসা বেঁধেছে মণ্টি। সম্প্রতি পোড়ো মন্দিরের একটা ভাঙা খিলান তার আশ্রয়। এই মন্দির পেরিয়ে কিছুটা নাবালো জমি পার হয়ে, একটা কারখানার সীমানা অতিক্রম করলে একটা বস্তি। তারপরেই একটা বড় সড়ক। তাতে চেপে বসলেই কলকাতা। একেবারে ধর্মতলা-চৌরঙ্গী। গত সন্ধ্যার কথাই মণ্টির মনে পড়ছিল বার-বার। ইস্‌! কোথা থেকে কি যে হয়ে গেল ঠিক আন্দাজ করতেই পারে নি মণ্টি। অথচ, মণ্টি ভাবল, এ সব ওই উল্লুক বিমলেটার বদমায়েসি। না হলে, সুমিতাকে ও অনায়াসেই কন্ট্রোল করতে পারত!

মনটা খারাপ হয়ে গেল মণ্টির। খিলানটার ওপর বসে সে পাদুটো ঝুলিয়ে নিল। হাওয়ায় দুলতে লাগল তার ঠ্যাং দুটো। হঠাৎ বুকের পাঁজরগুলোর ভেতরটা খাঁ খাঁ করে উঠল। আট-দশ বছরের অভ্যেস। ইদানীং বছর তিনেক সেই অভ্যাসটাকেই জম-জমাট করেছিল। সন্ধ্যা হলেই চৌরঙ্গীর সেই বারটা হাতছানি দিত। সুমিতা, চন্দনা, মিসেস সিংহরায়ের আধো আধো কথা, চাউনি, তাদের পানপাত্রে চুমুক এবং সব শেষে আত্মসমর্পণের জন্য ব্যাকুলতা। সন্ধ্যে থেকে মাঝরাতটা কাটত নেশায় নেশায়। তুফান উঠত রক্তে। সেই রক্তস্রোত আছড়ে পড়ত ঠোঁটে, করস্পর্শে। তারপর সেই নিশি-পাওয়া ভূতের মত প্রতি মাসের মুনলাইট পিকনিকের মাতাল রাতটা। চনমন করে উঠল মণ্টি।

কাল মনাই বলেছিল, অত গিলিস্‌ নি মণ্টি। আজ বেসামাল হবি।

মণ্টি বলেছিল, শাট আপ্‌। মণ্টি সরকার বেহেড হয় না কোনোদিন। ওই লিকলিকে লজ্জাবতী লতা সুমিতার মতন হার্ট নয়—দুপেগ পেটে পড়লেই কাত, তিন পেগে বমি, চার পেগে—

ইউ শাট আপ, চেঁচিয়ে উঠেছিল মনা। তোর মতন অপরের মিসেসের গা চাটি না আমি। সেই বা কি রে? তার কীর্তি কে না জানে, বলব!

মাথায় বোধহয় খুন চেপেছিল মণ্টির। বুনো মোষের মতন সে গুঁতোতে এসেছিল মনাকে। ঠিক সেই সময় টেবিল থেকে একটা বোতল তুলে সুমিতাই তার মাথায় ফটাস্‌ করে একটা বাড়ি দিয়েছিল। মণ্টির বাহ্যজ্ঞান বোধহয় লোপ পেয়েছিল। একটানে সে ছিঁড়ে দিয়েছিল সুমিতার দেহাবরণ। আর সেই সময়েই চন্দনা আরশোলার মত ফর্‌র্ ফর্‌র্ করে বমি ঢেলেছিল তার গায়ে। আর ওই বিমলবাবু নাটের গুরু, তিনি দার্শনিকের মতন বলেছিলেন, মণ্টি, তুমিও কি তোমার তৈরি নায়কের মতন ব্যবহার করতে শিখেছ? ডোণ্ট ফরগেট, ওটা আমার প্ল্যানে তৈরি।

দাঁত খিঁচিয়ে মণ্টি ঘুরে তাকিয়েছিল। তখন বিমলবাবুর বুকে লেপটে পড়ে মিসেস সিংহরায় বলছে, বিমলবাবু, আমায় বাঁচান, মনতোষবাবু মাতাল হয়ে গেছেন।

মাতাল? দাঁতে দাঁত কিড়্‌মিড়্‌ করে উঠেছিল মণ্টি। তুমি শালা মাতাল হও নি কোনোদিন। সেদিন সোনারপুরের বাগানবাড়িতে মণ্টিবাবু, মণ্টিবাবু আপনার পরের উপন্যাসে আমায় নায়িকা করুন না, বলতে বলতে ঢলে পড়ো নি!

মনা মুখিয়ে উঠেছিল, বলেছিল, একেবারে বেহেড হয়ে গেছে, লিঙ্গজ্ঞান পর্যন্ত নেই।

মিসেস সিংহরায় বলছিল, মনোতোষবাবু, আপনি কাইন্ডলি একটা সীন করবেন না।

মণ্টি তখন ঠিক সেই মুহূর্তে ভেবেছিল, এই মনা বিমলে, সিংহরায়, চন্দনা, সুমিতা এদের বাস চাপা পড়ে মরা উচিত। এদের লিভার পচে যাওয়া উচিত। এদের এদের—ভাবতে ভাবতে মণ্টি শুনতে পেল, সুমিতা বলছে, একেবারে জানোয়ার হয়ে গেছে। ঠিক ঐ গল্পের কুকুরটার মতন।

ব্যাস! তখন আর খেপা কুকুর হতে বিলম্ব হয় নি। এক লাথিতে টেবিলটা উল্টে দিয়েছিল মণ্টি, সুমিতার ছেঁড়া কাপড়টা বোধহয় দ্রৌপদীর। টেনেও শেষ করতে না পেরে হঠাৎ ছেড়ে দিয়েছিল। আর তাতেই হুড়মুড় করে ছিটকে পড়েছিল বিমল, সুমিতা আর মনা। এখন মনার মনে হল টাগ অফ্‌ ওয়ারে ওপক্ষে তিনজন ছিল। তাই শাড়িটাকে সে সম্পূর্ণ বাগ মানাতে পারে নি।

কিন্তু তারপরের ব্যাপারটা অকল্পনীয়। হঠাৎ দরজা খুলে রাস্তায় নেমে এসেছিল মণ্টি। প্রাণভয়ে ছুটতে ছুটতে একেবারে বড় রাস্তায়। পা টলছিল। বেঁকে বেঁকে যাচ্ছিল শরীরটা। তখন মনে হয়েছিল দুটো অত্যুজ্জ্বল চোখ। বাঘের না সিংহের! বোঝবার আগেই চিঁড়ে-চ্যাপ্টা হয়ে গেল সে। ডবল ডেকারে কোথায় মনাদের মারবে মণ্টি, না কী পরিহাস তার জীবনে, সেই কি না চাপা পড়ল দোতলা বাসে। বুকের মধ্যেটা হু হু করে উঠল।

তখন সন্ধ্যা নেমেছে। গুমোট। ঠ্যাং দোলানো বন্ধ রেখে মণ্টি হঠাৎ একলা একলা বোধ করল। এতবড় মাঠে সে একা। বন্ধু নেই, বান্ধবী নেই, কেউ নেই। সত্যিই কি কেউ নেই। মনের দুঃখে গান ধরল মণ্টি:

আজি এই সন্ধ্যায় হু হু করে মন
সুরাদেবী বোতলেতে দাও দরশন।

এমন সময় ভাঙা ইঁটের পাঁজার পাশের একটা ন্যাড়া বেলগাছের শীর্ণ ডালপালাগুলো কাঁপিয়ে হুর্‌-র্‌-র্‌-র্‌ শব্দ করে নেমে এল ব্রহ্মদত্যি। মোটা-সোটা নাদুস-নাদুস চেহারা। ভুঁড়িটা পিপের মত। ঘাড়ে-গর্দানে। ভারিক্কি চালে বললে, তুই কে রে বেটা মোদোমাতাল, বিষ্যুৎ-বারের ভর সন্ধ্যেবেলায় সুরাদেবীর গান ধরেছিস্‌?

মণ্টি উত্তর দিল না। ঠ্যাং দুটো জোরে দোলাতে লাগল। তারপর শিস্‌ দিয়ে গাইতে লাগল সুরটা আর তেরচা-ভাবে দেখতে লাগল ব্রহ্মদত্যিকে। ব্রহ্মদত্যি কাছে এসে দেখল মণ্টিকে। বললে, হুম্‌। বেটা গল্পলিখিয়ে। এ হাল হল কেন?

সহানুভূতির স্পর্শে গলে পড়ল মণ্টি। রেডিও'র সুইচ অন করলেই যেমন অনর্গল গান-কথিকা গড় গড় করে বেরিয়ে আসে, তেমনি বেরিয়ে এল তার বর্তমান হালের ইতিবৃত্ত। শুনে প্রকাণ্ড একটা দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়ল ব্রহ্মদত্যি। যে খিলানটার উপর বসে ছিল মণ্টি, সেটা নড়ে উঠল সেই নিশ্বাসের তোড়ে। মণ্টি বললে, আপনি কতদিন আছেন?

সম্প্রতি। ব্রহ্মদত্যি বললে, ছিলুম খাসা। সাপ্তাহিক পত্রিকার সম্পাদনা করতাম। লেখকরা তোষামোদ করত, মদ খাওয়াত, সুযোগসন্ধানী লোকেরা এটা-ওটা প্রচার করতে বলত—তাদের কথা শুনলে বাঁহাতে মোটা টাকা মিলত—

আছাড়া আরও কত যে ফন্দিফিকির ছিল, তা তোমায় কি বলব।

তারপর?

না হে ভায়া, তা নয়। গণ্ডগোল বাধল ঘরে। এমন দজ্জাল বৌ, চোখ দুটো গোয়েন্দার, মনটা শেয়ালের, শরীরটা—যাক্‌গে। সে দিনরাত ক্যাচর-ক্যাচর শুরু করে দিলে। তোমার পত্রিকার এ সংখ্যার কবরী দাশগুপ্তা কে? ও সংখ্যার সুমিতা দেবী কে? উমাশশী সিংহ'র কবিতা ঘন ঘন বেরুচ্ছে কেন? কেন এত মেয়ে তোমার কাছে যায়? কেন ফিরতে রাত হয়? কেন মদ খাও? এত টাকা তোমার কে দিচ্ছে?

ধুত্তোর সংসার। কা তব কান্তা। মদ গিলতে লাগলাম দিবারাত্র। বিনা পয়সায় মিলত অনেক বোতল। একদিন টলতে টলতে বাড়ি ফিরলাম। বৌ বললে, যেখানে ছিলে, সেখানে যাও। এ ঘরে তোমার জায়গা নেই।

হারামজাদীর কথা শুনে পিত্তি জ্বলে গেল। টানলাম চুলের মুঠি। সেও কম যায় না। বললে, কী এতবড় আস্পর্ধা, গায়ে হাত—ভবে রে মিনসে—আজ ঝাঁটাব বাড়ি দিয়ে তোমার ভূত ছাড়াবো। বলব কি ভাই—সেই যে ঝাঁটার বাড়ি খেলাম—তাতেই ভূত হয়ে গেলাম। তবে বলব কী; এখনও মনটা বড় খাঁ খাঁ করে সন্ধ্যেবেলায়। কী মনে হয় জানো?

কী? মণ্টি ব্যগ্র হয়ে জিজ্ঞাসা করল।

মনে হয়। মনে হয় কল্যাণী আমায় যথার্থই ভালবাসত।

হতাশ হল মণ্টি। না লোকটা একেবারেই স্রেবেরে। বউ-এর ভালবাসায় কাত হয়ে পড়ে।

সহসা কালিদাসের মেঘদূতের মন্দাক্রান্তা শ্লোক ভেসে এল বাতাসে। উৎকর্ণ হল মণ্টি। এই আদিগন্ত তৃণশূন্য প্রান্তরে বিরহ বেদনার প্রশস্তি! ব্রহ্মদৈত্য বললে, চল যক্ষর কাছে যাই, তেঁতুলতলার উইঢিবির পরিত্যক্ত গুহায় ওর আড্ডা। যাই চল বড় রপ্ত করেছে ইংরেজি আর সংস্কৃত কাব্য-কবিতা। কণ্ঠস্থ। যদিও নিজের বলে চালায়। আরে বাবা, আমি সম্পাদক ছিলাম, আমি তো জানি ও মাল কার।

তেঁতুলগাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে যক্ষ কবিতা পাঠ করছিল। সম্পাদকরূপী ব্রহ্মদৈত্য বললে, আসলে এটা ফরাসী কবির প্রভাবে রচিত। আগে শোন।

শুনতে হল না। যক্ষ বললে, দাদা যে পেন্নাম, বলেই সাষ্টাঙ্গে মাথা ঠুকে দিল। দেখাদেখি মণ্টিও ব্রহ্মদৈত্যর বুড়ো আঙুল দুটো ছুঁয়ে নিল একবার। যক্ষ বললে. আপনার প্রিয় সেই কবিতা দুটো আগে শোনাই—বলে তিরিশ বছর আগেকার লেখা দুটো কবিতা আউড়ে গেল যক্ষ।

মণ্টি বললে, আপনি এখানে এলেন কেমন করে?

সে দুঃখ তুমি বুঝবে কি? কবিতার পর কবিতা লিখলাম। বান ডাকলাম কাব্যজগতে। লিখলুম গল্প উপন্যাস। শব্দের চমৎকার বাঁধুনি দিয়ে মনের এলোমেলো চিন্তাগুলোকে জট পাকিয়ে ছুঁড়ে দিলাম প্রবন্ধে। তবু তেমন নাম হল না। টাকাও তেমন হল না। আমার দেখাদেখি বউও কলম ধরল, তারও নাম হল আমার মতন। কী দুঃখ দেখ, সে আর আমি কি একরকম প্রতিভার অধিকারী! হঠাৎ দেখি মেয়েও লিখছে, ছেলেও লিখছে, জামাইও লিখছে—সবাই লিখছে। আর তাদের লেখায় সে কী উত্তাপ! সে কী মাদকতা! এমন মাদকতা পড়েছিলাম ইংরেজি উপন্যাসে—ট্রেনে যেতে যেতে। মনে হল আমার ষাট বছর বৃথাই গেছে। হে ঈশ্বর, প্রার্থনা জানালাম, আমার যৌবন ফিরিয়ে দাও, আমার রক্তে পুনর্যৌবনের জোয়ার আনো—আমি যুবক হতে চাই, যৌবন চাই—চাইলাম, কিন্তু কী বলব তোমায়, আমার এই দাদা জানে, আমাকে ফিরিয়ে দিল উমাশশী। ওই উমাশশীর জন্য কী না করেছি। শুনলাম, আমার ছেলেকেই ও বলছে, ওই ওল্ড ম্যানটা হাঙ্‌রি মনে মনে। বাট, হাউ ফানি, হি হ্যাজ লস্ট অল হিজ এনার্জিস।

তিন দিন ভাবলাম, আমি হৃতবীর্য। আমার যৌবন নেই—শেষে আত্মহত্যা করলাম। বাট আই নো. সি মাস্ট কাম হিয়ার ওয়ান ডে। আই অ্যাম ওয়েটিং ফর দ্যাট মোমেণ্ট।

আই অলসো। বলতে বলতে পিয়ানো-একর্ডিয়ান হাতে এসে দাঁড়ালো স্পুক। পাকানো গোঁফ। ছুঁচলো দাড়ি বললে, একটা গুড নিউজ আছে। এইমাত্র একটা শাকচুন্নীকে দেখলাম। ওঃ! এ প্যারাগন অব বিউটি। টিপিক্যাল ইণ্ডিয়ান গার্ল। সেই উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ গায়ের রঙ, সেই ঠোঁটের কোণের প্রাণমাতানো মিচকে হাসি, সেই ঘোমটার ফাঁক দিয়ে তির্যক কটাক্ষ। ওহ! আই হ্যাভ লস্ট মাই সেন্স।

শুনে ছটফট করে উঠল মণ্টি। আস্তানাটা জানা দরকার। কিন্তু স্পুকটার যেমন ষণ্ডামার্কা চেহারা, একটু আশঙ্কিত হল মণ্টি। তারপর বললে, অল্প কিছুদিন হল এসেছেন বুঝি এখানে?

প্রায় ছ'মাস হল। স্পুক বললে, আপনাকে তো কাল রাত্রেই দেখলাম। মার্ডার অর সুইসাইড কেস?

অ্যাক্সিডেণ্ট, গম্ভীরভাবে মণ্টি বললে, আপনার বুঝি সুইসাইড।

ননসেন্স। ফোঁস করে উঠল স্পুক। সুইসাইড করে উইক পার্সন্‌স। ধর্মতলায় নিউ আটলাণ্টিক বারে ঢুকেছো কোনদিন?

না। ঘাড় নাড়ল মণ্টি।

আমি ওখানকার অর্কেস্ট্রা কন্‌ডাক্ট করতাম। বলতে বলতে আঙুলগুলো চালালো স্পুক। গম্‌গম্ করে বেজে উঠল পিয়ানো-একর্ডিয়ান।

তারপর?

ইউ নো, ইণ্ডিয়ান গার্লদের ভিড় হত খুব আমার বারে। অনলি বিকজ অব মাই অর্কেস্ট্রা। আমার নেশা ছিল তিনটে, পিয়ানো বাজানো, মদ খাওয়া আর ইণ্ডিয়ান গার্ল। বাট দ্যাট র‍্যাসকেল স্মিথ ইউ নো, দ্যাট র‍্যাসকেল এভরি স্যাটারডেতে নতুন নতুন ইণ্ডিয়ান গার্লদের নিয়ে আসতো। একদিন রসিকতা করে জিজ্ঞেস করলাম, আজকের পার্টি তো দেখছি খুবই খুবসুরৎ কোথায় পেলে? ব্যাস। ব্যাটা সোয়াইন কা বাচ্চা। আমাকে গাল দিলে।

আমিই বা ছাড়ব কেন? তারপর মারামারি। গলা টিপে খুন করলাম শালাকে।

ফাঁসির পর এখানে এসেছি। এখানকার সব পেত্নী আর শাকচুন্নীদের খবর আমার নখদর্পণে। বাট, মাই মিশন ইজ টু অবজারভ দেম অনলি। আমি শুধু দেখি কেবল দেখি—পিয়ানোর সুর তুলে মুহূর্তে উধাও হয়ে গেল স্পুক।

মণ্টি তার সন্ধানে ছুটবে বলে যেই লাফ দিয়েছে, পেছন থেকে ব্রহ্মদৈত্য আঁকড়ে ধরল তাকে। বললে, একটু বস, এখনি কাবলী ভূত আসবে পার্ক স্ট্রীট আর নিউ মার্কেট ঘুরে। খাঁটি বিলিতি মাল পাবে।

আবার বুকের ভেতরটা খাঁ খাঁ করে উঠল। উদাস হয়ে গেল মণ্টি। এমন সময় হুস করে একটা শব্দ হতেই চেয়ে দেখল কাবলীভূত গোটাচারেক বোতল হাতে দাঁড়িয়ে বিকট হাঁ-মুখে হাসছে। সারা মুখটায় গোঁফদাড়ির জঙ্গল। তার ওপর এই বিকট হাসি। মণ্টির মনে হল ওই প্রকাণ্ড মুখগহ্বরের মধ্যে ঢুকতে পারলে বোধহয় বিশ্বরূপ দর্শন করা যায়। যক্ষ উঠে বসল। চক্‌চক্ করছে তার চোখের গর্তটা। লকলক করছে গলার নালী। তখন গোল হয়ে বসল চারজন।

কাবলী অনিচ্ছা সত্ত্বেও কেবল ব্রহ্মদৈত্যর খাতিরে একটা পুরো বোতল দিল মণ্টিকে। সবে দু'ঢোক গিলেছে মণ্টি, দেখতে পেল কাবলী তার ঝোলার ভেতর থেকে ছোট্ট একটা পুরিয়া বার করল।

ছোঁ মেরে নিল যক্ষ। বলল, কত টাকা চাই বল।

কাবুলী ভ্যাবাচাকা খেয়ে বিষম খেল ভয়ানক। কাশতে কাশতে তার বিশাল বপু আর বিপুল গোঁফ ঝড়ের সময় নেচেওঠা নদীর ঢেউয়ের মত উঠতে পড়তে লাগল। বললে, রুপেয়া কোন্ মাঙ্তা, সুদ দাও। সুদ। মাহিনামে সাড়ে বারো পারসেন্ট।

যক্ষ বলল, এখানেও সুদ চাও। আমার যে অনেক টাকা। আমি এখন ধারে খাই না।

কাবুলী দাড়ি নেড়ে বললে, আস্‌লীকা কারবার হাম কভি নেহি কিয়া—সুদ দাও সুদ।

যক্ষ বেঁটে মানুষ। হাসিটাও ছোট আকারের। বলল, বেশ তাই হবে। তুমি রোজ সুদই নিও।

বোতলটা শেষ করে কাবুলী উঠল। তারপর চক্ষের নিমেষে হাওয়া।

মণ্টি বললে, বেটা ভূত হয়েও সুদ চায়। আচ্ছা জ্বালা।

কে না চায় বাবা, তুমি মরেও মদ চাও কেন? কী বল যক্ষভাই।

ঠিক ভাই ঠিক। যাই বল, অনেক-দিন পরে আজ বেশ মৌতাত হয়েছে।

উঠল দুজন। মণ্টি বললে, আচ্ছা দাদা, কাবুলীটা এখানে এল কী করে?

সে আর এক গল্প। ব্যাটার এন্তার টাকা ধার নিয়েছিল এক ফিল্ম প্রডিউসার। কথা ছিল এক বছর পর থেকে শতকরা পনেরো পার্সেণ্ট হিসেবে প্রতি টাকায় সুদ দেবে—আর আসলও। ফিল্ম লাইনের ব্যাপার জানো তো? বারো মাসের জায়-গায় চোদ্দ মাস কেটে গেল, তখনও বই আধখানা। কাবুলী প্রডিউসারের দরজায় দাঁড়িয়ে থাকে। প্রডিউসারের মেয়ে জানলা দিয়ে বলে, এই কাকে চাও?

বেন্ আছে, বেন্—

বীরেনের মেয়ে বলে, নেই, বাবা বাড়ি নেই।

আছে, আছে, জানি আছে, ঘরে আছে।

তোর মুণ্ডু আছে। কাবুলীভূত কোথাকার—বলে মেয়ে দড়াম করে জানলা বন্ধ করে দিল। এদিকে বীরেনের মেয়ের সঙ্গে পাড়ার একটা ছেলের একটু ইয়ে ছিল, সে রকে বসে গুলতানি করছিল। ব্যাপারটা দেখে কী ভাবল কে জানে, দল নিয়ে চড়াও হল কাবুলীর ওপর। সেদিন পালিয়ে বাঁচল কাবুলী। কিন্ত রোখ গেল না। খোঁজ নিয়ে জানল ত্রিবেণীতে সুটিং-এ গেছে বীরেন। নায়ক-নায়িকার একটা দুর্ধর্ষ প্রেমের ফাইন্যাল টেক হচ্ছিল তখন, নায়ক বলছে, বিশ্বাস কর মিতা, যা শুনেছ সব ভুল, যা দেখেছ তা মিথ্যা,— এমন সময় 'বেন, এ বেনবাবু' বলে উৎকট চিৎকারে সেখানে দৌড়ে এল কাবুলী। নায়িকা ভয়ে নায়কের অঙ্কে মিশে গেল। ক্যামেরাম্যান থমকে পড়ল। হৈ-চৈ কাণ্ড বীরেন বললে, এ ব্যাটা পাগল। তাড়াও ওকে তাড়াও।

হাতের কাছে যে যা পেল তাই নিয়ে তাড়া করল কাবুলীকে। ক্যামেরার স্ট্যান্ড, লাঠি, কাঠের টুকরা, থান ইঁট মায় স্ক্রীপট্-এর ফাইল। কাবুলী প্রাণ-ভয়ে দৌড়ুল। সামনেই নদী, পেছনে আর্টিস্ট আর টেকনিসিয়ানদলের রুদ্র-মূর্তি। কোনো উপায় না দেখে লাফিয়ে পড়ল নদীতে। বেচারা। প্রাণের ভয়ে ভুলে গিয়েছিল যে সে সাঁতার জানে না। ডুবে মরল। তারপরেই এখানে বাসা বেঁধেছে।

মণ্টির মনে হল, এ সব খবরগুলো আগে পেলে এক-একটা উপন্যাসের বিস্ফোরণ ঘটানো যেত। অগত্যা সঘন একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে সে ধীরে ধীরে ব্রহ্মদত্যির সংগ ত্যাগ করল। স্পুক্‌কে পেলে ভালো হত। এ মাঠে কার কোথায় আস্তানা তার ব্লু-প্রিণ্ট আছে স্পুকের কাছে। কিন্তু মণ্টিও কম নয়। মিনিট পনেরোর মধ্যেই সে মোটামুটিভাবে সমস্ত পেত্নী, শাঁকচুন্নী আর ডাকিনীর আস্তাগুলো জেনে নিল। অশ্বত্থগাছের এরিয়াটা পুরুষের নিষিদ্ধ এলাকা। ওখানেই বেশ কয়েকটা ডগ্‌কা ডগ্‌কা শাঁকচুন্নী আছে। তবে মণ্টির মন হরণ করেছে একটা পেত্নী। আহা কী রঙ্, সেই উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, তন্বী, পক্ক বিম্বাধর; আর কী হৃদয়বিদারক কটাক্ষ! এসবও ভুলতে পারত মণ্টি। কিন্তু নারী-দেহের ও যথার্থ জহুরী। ঘোমটার ফাঁকই হোক, আর শাড়ির ফাঁকই হোক—মণ্টি আসলী-নকলী ধরতে পারে সহজেই। তবে একটা ডাকিনীকে পেছন থেকে দেখেছে মণ্টি। যার চলে যাবার ছন্দটি মনে রাখার মত।

দিন কয়েক সন্ধ্যেরাতটা কাটল নিষিদ্ধ এলাকার আনাচে-কানাচে। ইতিমধ্যে ডাকিনীর সঙ্গে চোখাচোখি হয়েছে। ডাকিনী ইঙ্গিত দিয়েছে। মণ্টি ডিগবাজি খাচ্ছে সেই সংকেতে। আর এমন সময় হঠাৎ সামনে এসে পড়েছিল সেই আহামরি শাঁকচুন্নী। শাড়ির হাওয়ায় মণ্টির কলিজাটা দুমড়ে গিয়েছিল। শুধু কি তাই ওই পেত্নীটাকেও একটা মোক্ষম কটাক্ষ করেছে মণ্টি। পেত্নী দাঁত খিঁচোয় নি। গাল দেয় নি। মণ্টি আহ্লাদে আটখানা। মোটে একটাও পায় না কেউ, তার বরাতে পেত্নী-শাঁকচুন্নী আর ডাকিনী।

কিন্তু স্পুকটার পেটে পেটে যে এত, তা কেমন করে জানবে মণ্টি। সেদিন রাতে সে চুপিসারে ডাকিনীর ঘরে উপ-স্থিত হয়েছে। সবে প্রেমালাপ জমেছে এমন সময় পেত্নী এসে হাজির। বললে, প্রিয়তম, তুমি শেষকালে একটা নষ্টা স্ত্রীলোকের পাল্লায় পড়বে—এ আমি হতেই দেব না।

আমিও না, বলে জানলার পাশে এসে দাঁড়াল শাঁকচুন্নী। বললে মণ্টিবাবু আমার ঘরে আসুন, আমি উমাশশী।

ঠিক সেই মুহূর্তে বাইরে প্রবল কোলাহল উঠল। আকাশ-বাতাস ভরে উঠল সে চিৎকারে। জিভ কেটে মুহূর্তে ঘোমটা টেনে মিলিয়ে গেল শাঁকচুন্নী। পেত্নীও হাওয়া। ডাকিনী বললে, আপনি যদি বাঁচতে চান তো আমাকে বউ বলে মেনে নিন।

তোমাকে?

হ্যাঁ। না হলে আপনার হাড় মাস গুঁড়ো হয়ে যাবে। আপনি প্রেতসমাজের কলঙ্ক। আপনি সতীত্ব নাশ করবার জন্য স্ত্রীলোকের গৃহে প্রবেশ করেছেন।

বাইরের কোলাহল প্রবলতর হল। স্পুক, কাবুলী, ব্রহ্মদত্যি, যক্ষ প্রভৃতি কয়েক শত প্রেত প্রবল আস্ফালন করতে লাগল। মন্ত্র পড়তে লাগল সকলে-সমস্বরে। সংস্কৃত-বাংলা-ইংরেজি-কাবুলী বিভিন্ন ভাষার সমবেত মন্ত্রশক্তি ক্রমেই বাড়তে লাগল। তারপর হুড়মুড় করে সবাই দরজা ভেঙে ঢুকে পড়ল ঘরে। স্পুক ঘাড় ধরে টেনে আনল মণ্টিকে।

আকাশে তখন শুক্লা চতুর্থীর চাঁদ। মণ্টি দেখল তার দিকে জ্বলন্ত চোখের রাশি রাশি আগুন। ব্রহ্মদত্যি বললে, স্পুকের অভিযোগ ঠিক। এ ছোকরা ভূতসমাজে বসবাসের অযোগ্য। একে পশু-সমাজে প্রেরণ কর।

সঙ্গে সঙ্গে শ'য়ে শ'য়ে ভূত ধাক্কা দিতে দিতে মণ্টিকে পশুভূতদের সীমানায় ঠেলে পাঠিয়ে দিল।

মণ্টির ভীষণ ভয় করছিল। ব্রহ্ম-দত্যিটার তাহলে প্রাণে দয়ামায়া আছে। কী ভাগ্যি মৃত্যুদণ্ড দেয় নি। ভূতের মৃত্যুদণ্ড কেমন সে সম্বন্ধে যদিও তার কোনো ধারণা ছিল না, তবুও সে হাঁফ ছেড়ে বাঁচল।

সারা রাত সে একটা আশ্শ্যাওড়া গাছের গোড়ায় চুপ করে বসে রইল। ঘাড়টায় হাত বোলাতে লাগল বারবার। ব্যাটা স্পুকের হাতের থাবাগুলো যেন

যাদের। পরদিন রাস্তা ক্রমশে মণ্টির স্ফূর্তি আবার ফিরে এল। সে দেখল এখানে অনেক কুকুর-কুকুরী, শুয়োর-শুয়োরী। সতীত্ব-ক্ষতিকর বালাই নিশ্চয় এখানে নেই। মনে মনে খুশি হল মণ্টি। এবং অচিরাৎ একটি কুকুরীর গা চেটে চেটে ভাব করে নিল। দিন-কয়েক কাটল আনন্দে। মাদী শুয়োর-গুলো আর মাদা কুকুরগুলোর পেছন পেছন ঘুরতে লাগল সে। কিন্তু পশুরা অত্যন্ত স্বার্থপর, নিষ্ঠুর এবং জল্লাদপ্রকৃতির। তারা মণ্টির পেছনে একজোট হয়ে বিদ্রোহ ঘোষণা করল। নেড়ী-হাউণ্ড-ম্যাস্টিফ-অ্যালসে-সিয়ান প্রভৃতি যাবতীয় কুকুরভূত, শুকরভূত, শেয়ালভূত, খ্যাঁকশেয়ালভূত সকলে মিলে, এমন কী গণ্ডারকুতর গাধাভূত পর্যন্ত ধাক্কা দিতে-দিতে আর কামড়াতে কামড়াতে ক্ষতবিক্ষত করতে করতে মণ্টিকে খালে ফেলে দিলে। অমনি আরশোলা, চামচিকে আর প্রজাপতির দল তাকে লুফে নিল।

সাতদিন ফণীমনসার ঝোপে আটকে রইল মণ্টি। সারা গায়ে দগদগে ঘা। ভাবল, ধনুষ্টঙ্কার, জলাতঙ্ক, ক্যান্সার সব রোগগুলো বোধহয় তাকে একসঙ্গে অ্যাটাক করবে। কিন্তু ভাগ্য ভাল মণ্টির। সাতদিন ধরেই দেখল কয়েকটি মাদী আরশোলার কী বাহার! কেমন পেখম! কী চলার ভঙ্গিমা! দেখেই আত্মসমর্পণ করল মণ্টি। সেদিন সন্ধ্যে হতেই সে মাদী আরশোলাটার পিছু নিল। আর-শেয়ালটা যায়, থমকে দাঁড়ায় পেছন ফিরে দেখে। আবার হাঁটে। মণ্টি ভাবল এ যেন সেই "চলে নীল শাড়ি নিঙাড়ি নিঙাড়ি পরাণ সহিত মোর।" পরাণ যখন চলতে শুরু করল সাতদিন পর তখন চামচিকার প্রতিও চোখ পড়ল মণ্টির। মণ্টি জানত না চামচিকারা ধূর্ত, শয়তান এবং বিশ্বাসঘাতক। অন্ধকার ঘরে তাকে বন্দী করে সে ডেকে আনল আরশোলাভূত, চামচিকেভূত আর প্রজা-পতিভূতদের। তারপর তারা সকলে মিলে তাদের সমাজের পরিবেশ কলুষিত ও কলঙ্কিত করার অপরাধে পশুজগতে ফেরত পাঠিয়ে দিল।

নব ভুশুণ্ডীর মাঠের অভিহিত তিনটি লোকের সীমানা এক জায়গায় এসে মিশেছে। সেইখানেই কোলাহল উঠল প্রবল। পশুভূতরা আর ফিরিয়ে নিতে চায় না মণ্টিকে, মানুষভূতরাও নয়। আরশোলারাও রাখবে না মণ্টিকে। তখন সন্ধ্যার প্রথম প্রহরে নব ভুশুণ্ডীর মাঠের মধ্যভাগে হাজার হাজার বিবিধশ্রেণীর ভূতের তাণ্ডব নৃত্য ও গগনভেদী চিৎকার ও আস্ফালনে তৃতীয় মহাসমর অত্যাসন্ন হয়ে উঠল। পেত্নী-শাঁকচুন্নী-ডাকিনীর নাকীসুরের আর্তনাদের সঙ্গে স্কন্ধকাটা-জিন-কাবুলী-যক্ষ-ব্রহ্মদৈত্যের বিচিত্র ভাষার হুঙ্কার, কুকুর-শেয়াল-গাধা-বিড়ালের অবি-মিশ্র চিৎকার, আরশোলার নাকে-কানে উড়ে বসা, চামচিকার ঘূর্ণী নাচন, ভোমরার হুল ফোটানো গুনগুন এক দক্ষযজ্ঞের সূচনা করল। ঢাকা পড়ল চাঁদ তারা আকাশ, পশ্চিমের জনবসতির আলোগুলো ঢাকা পড়ল ধুলোয়। প্রলয় হয় বুঝি।

অতএব, একান্ত প্রার্থনা, যদি কেউ উপযুক্ত ওঝার সন্ধান রাখেন, অনুগ্রহ-পূর্বক বাংলা ও বাঙালীর কল্যাণের জন্য, তাকে অবিলম্বে নব ভুশুণ্ডীর মাঠে প্রেরণ করুন।

বর্তমান বঙ্গসাহিত্যে সর্বাধিক জনপ্রিয় লেখিকা

আশাপূর্ণা দেবীর

গ্রন্থাবলী

আবার একখণ্ড প্রকাশিত হয়েছে!

তিনখানি সম্পূর্ণ উপন্যাস। সাতটি বড় গল্প

১। বলয়গ্রাস ২। প্রেম ও প্রয়োজন

৩। দুর্নিবার ৪। এক গুচ্ছ গল্প

মূল্য মাত্র সাড়ে ছয় টাকা

আগেই বেরিয়েছে আর এক খণ্ড

গ্রন্থাবলী

১। জহুরী ২। অনির্বাণ

৩। সোনালী দিনের মন

৪। এক গুচ্ছ গল্প

মূল্য মাত্র পাঁচ টাকা

বসুমতী (প্রাঃ) লিঃ
কলিকাতা-১২

রঙ্গমঞ্চ ওদেশে
শিল্পালি এবং এদেশে

বের্টোল্ট ব্রেশট : ১৯১৯-এ অক্টোবর—ব্রেশট তখনও পড়াশুনো করছেন এবং মিউনিখে বোহেমিয়ান জীবনযাপন করছেন। এই সময় আবার তিনি অগস-বার্গের DER VOLKSWILLE নামে স্থানীয় বামপন্থী ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট সোশ্যালিস্ট পার্টির কাগজে থিয়েটার ক্রিটিক হিসাবে লিখতে শুরু করেন। তাঁর সমালোচনা হোত অত্যন্ত কঠিন জাতের। যেমন ধরুন :

The man who has leased the Augsburg Municipal Theatre as his milch-cow knows today, after so many years, 'about as much about literature as an engine driver knows about geography....

ব্রেশটের তীব্র শ্লেষাত্মক মন্তব্য এবং কঠিন সমালোচনার পরিচয় পাওয়া যায় এই জাতীয় উক্তি থেকে। ঐ থিয়েটারের লোকেরা এই ধরণের সমালোচনার বিরুদ্ধে খোলা চিঠি লিখে প্রতিবাদ জানালেন। ফলে হোল ব্রেশট আরও তীব্র কশাঘাত শুরু করলেন তাঁর পরের সমালোচনা-গুলিতে। এই থিয়েটারের কর্তাব্যক্তিদের এবং অভিনেতার দলের প্রতি ১৯২১ সালের আরম্ভ অবধি ব্রেশট এইভাবেই ক্রমাগত আঘাত হেনে চলেছিলেন।

এই ব্যাপারটা থেকে আমাদেরও অনেক শিক্ষণীয় জিনিস আছে। ব্রেশট ঐ থিয়েটারটি সম্বন্ধে এত তীব্র সমালোচনা করতেন কেন? নিশ্চয়ই ওখানে তৃতীয় শ্রেণীর নাটক এবং তার থেকেও নিম্নস্তরের অভিনয়রীতি প্রচলিত ছিল। ব্রেশটের শিল্পমনের কাছে এটা অসহ্য হওয়াতেই তিনি এই অবস্থার সমাপ্তি ঘটাতে চাইছিলেন তাঁর ক্ষুরধার সমালোচনার দ্বারা। যেমনটা করবার চেষ্টা করতেন বার্নার্ড শ নাইনটিজে। তবে শ অনেক সময়েই কন্সপিকিউয়াস হবার জন্য অসত্যকে সত্য বলে প্রচার করতেন—যেমন স্যার হেনরী আরভিং সম্বন্ধে তাঁর মতামত। শ মনে মনে বেশ জানতেন আরভিং অদ্বিতীয় অভিনেতা এবং পরিচালক ছিলেন। লাইসিয়ামে আরভিং-এর পরিচালনায় নিজের নাটক মঞ্চস্থ করাতে পারলে তিনি নিজেকে ধন্য মনে করতেন। কিন্তু শ'র সে প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছিল। এসব কথা আমরা গর্ডন ক্রেগের বিভিন্ন লেখা থেকে জানতে পারি। আরভিং কিন্তু নিজের মহত্ত্ব এবং ডিগনিটি সব সময় বজায় রেখে যেতেন—তাঁর নাটক এবং অভিনয় সম্বন্ধে শ-এর বিরূপ মন্তব্য তিনি অনায়াসে অগ্রাহ্য করে গেছেন সব সময়। অবশ্য শ-এর আক্রমণে নীচতা থাকতো না।

আমাদের দেশে এই মহত্ত্ব এবং গাম্ভীর্য দেখেছি শিশিরকুমারের ভেতর। মুখে মার্কসিস্ট বুলি আওড়ানো এক অভিনেতা—ইনি অবার সুযোগ সুবিধামত পাল্টে থাকেন—অনেক আজেবাজে কথা এক সময় লিখতেন শিশিরকুমারের বিরুদ্ধে। শিশিরবাবু তা গ্রাহ্যের মধ্যেই আনেন নি কখনও। যাক যে কথা বলছিলাম। ব্রেশট নাট্যমঞ্চের কদর্যতা সহ্য করতে পারতেন না বলেই অগসবার্গের স্থানীয় থিয়েটার সম্বন্ধে তীব্রভাবে লেখনী ধরেছিলেন। কিন্তু আমাদের দেশে সমালোচকদের ভেতর এ জাতীয় কোন প্রচেষ্টা দেখা যায় কি? দিনের পর দিন বাংলা পেশাদারী মঞ্চ ক্রমশ নিম্নস্তরে নেমে আসছে। অথচ কয়েক বছরের কাগজের নাট্য-সমালোচনার বিভাগের উপর চোখ বুলিয়ে দেখুন—তৃতীয়, চতুর্থ শ্রেণীর নাটক এবং অভিনয়কে উচ্ছ্বাসভরে কি প্রশংসাই না তাঁরা করে গেছেন। দাড়ি লাগিয়ে গেঁও গেঁও করলেই সাজাহান চরিত্রের রূপায়ণ করা হয় না। কিছুকাল আগে এক তথাকথিত অভিনেতা ভদ্রলোক সাজাহান সেজে স্টেজের উপর ক্রমাগত পেখোসের বদলে বেথোস সৃষ্টি করছিলেন—দর্শক বলতে অবশ্য হলে বিশেষ কেউ থাকতো না। এঁর বন্ধুস্থানীয় এক সমালোচক কাগজে লিখলেন যে এঁর সাজাহান নাকি শিশিরকুমার, অহীন্দ্র চৌধুরীর সাজাহানকে অনেকখানি পেছিয়ে ফেলে এসেছে। এই যদি সমালোচনার মান হয় তবে আমাদের দেশে অভিনয়ের মান উঠবে কি করে।

বিখ্যাত আমেরিকান অভিনেত্রী হেলেন হেজ একবার বলেছিলেন—"ব্রডওয়ের ক্রিটিকরা অত্যন্ত কঠিন বলেই ওখানকার থিয়েটারের অভিনয় এখনও খারাপ হতে পারে নি। ইংলণ্ডের ক্রিটিকরা অত্যন্ত সহজভাবে থিয়েটারের বিচার করেন—ফলে ইংলণ্ডের অভিনয়ের মান অনেক নেমে গেছে।

আসলে ক্রিটিকরা যদি সঠিকভাবে নাটক এবং অভিনয়ের বিচার করেন, তবেই দেশের রঙ্গমঞ্চ উন্নত হতে পারে।

হিন্দী ছবির ব্যাপারটাই দেখুন না! আনন্দ দেবার নামে যে রসিকতার বা অশ্লীলতার মালমসলা এতে থাকে তা দেখে লোকে কি ধরণের আনন্দ বা শিক্ষা পেতে পারে বলুন? এ নিয়ে একটা সত্যিকার আন্দোলন শুরু করা উচিত আমাদের দেশে।

ক্রিটিক ব্রেশটের কথায় স্বভাবতই আমাদের দেশের সমালোচকদের কথা এসে গেল। ব্রেশটের স্কুলের সহপাঠী এবং ডাক্তারী পড়বার সময় সহাধ্যায়ী অটো মুয়েলেরসার্ট ব্রেশটের মেয়েলি পারদর্শিতা সম্বন্ধে বলেছেন :

"He got ninety per cent of his women that way."

এই সময়টা ছিল বিক্ষোভ এবং রুক্ষ আচরণের যুগ। জার্মানীর বুকের উপর দিয়ে বিপ্লব এবং বিপ্লববিরোধী রাজনীতির উত্থান-পতন ক্রমান্বয়ে বয়ে চলেছিল। মতবাদ নিয়ে বন্ধুদের ভেতর বিচ্ছেদ এবং পুনর্মিলনও ঘটেছে। এই প্রসঙ্গে মুয়েলেরসার্ট একটি চমৎকার কাহিনী বলেছেন : তাঁর তীব্র এবং ভয়ঙ্কর বামপন্থী মতবাদ সত্ত্বেও ব্রেশটের তিক্ত এবং ব্যঙ্গপূর্ণ সেন্স অব হিউমার সব সময়েই বজায় থাকতো। একদিন মুয়েলেরসার্ট ঠিক করলেন তিনি একদল দক্ষিণপন্থী পরিবর্তনশীলদের সঙ্গে (the Freikorps) যোগ দেবেন—এরা এই সময়ে জার্মানীতে এলায়েড আর্মিজদের খুবই বিব্রত করে তুলেছিল। মুয়েলেরসার্ট তাঁর মনের কথা ব্রেশটকে লিখে জানালেন। জবাব এল—ব্রেশট জানিয়েছেন এই সঙ্গে তাঁদের বন্ধুত্বের অবসান ঘটল এবং মুয়েলেরসার্ট যদি মারাও যান তাহলেও ব্রেশট তাঁর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সময় উপস্থিত থাকবেন না। সপ্তাহখানেক বাদে ব্রেশটের আর একটি চিঠি এল—তিনি মত বদলিয়েছেন। যেহেতু একজনের মূর্খতার জন্য তার সঙ্গে বিচ্ছেদের সৃষ্টি করা উচিত নয়, সেজন্য ব্রেশট ঠিক করেছেন যে শেষ পর্যন্ত মুয়েলেরসার্ট মারা গেলে তিনি তাঁর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াতে যোগ দেবেন। মুয়েলেরসার্ট কিন্তু এরপর ঐ দক্ষিণপন্থী Freikorps-এর দলের সঙ্গে যুক্ত হন নি।

এরপর ব্রেশট তাঁর ডাক্তারী পড়া হঠাৎ স্থগিত করে দিয়ে রঙ্গমঞ্চের জগতে প্রবেশ করলেন। জার্মানীর থিয়েটারে বেশির ভাগ যুবক নাট্যকারেরা যেভাবে জীবিকা অর্জন শুরু করেন সেই চিরাচরিত রীতিরই অনুসরণে তিনি একটি থিয়েটারে ড্রামাটার্জের পদ নিলেন। এপাড়ো ম্যাকসন থিয়েটারে কিন্তু এ পদটি দেখা যায় না। এর কাজ হল—

ব্রেশট (যৌবনে)

থিয়েটারের আবাসিক নাট্যকার হিসাবে নাটক লেখা, অন্যের নাটককে উপযোগী করে নেওয়ার কাজ, প্রোগাম তৈরির ব্যাপারে সম্পাদনা করা এবং পাবলিক রিলেশনস অফিসারের দায়িত্ব বহন করা। ব্রেশট মিউনিখ কামেরস্পিলের ড্রামাটারজেন নিযুক্ত হলেন। এখানকার ম্যানেজার অটো ফ্যাকেনবার্গ তাঁর নাটকের পাণ্ডুলিপিগুলো পড়ে খুবই চমৎকৃত হয়েছিলেন এবং ব্রেশট রচিত 'ড্রামস ইন দি নাইট' (TROMMELN IN DER NACHT—Sept. 1922) নাটকটি মঞ্চস্থ করবার পরিকল্পনা করছিলেন। এইসময় যদিও ব্রেশট ফ্যাকেনবার্গের জন্য কিছুটা কাজ করছিলেন। তবে সেই সঙ্গে অন্য সব মঞ্চেও তাঁর নাটকের অভিনয়ের জন্য প্রচেষ্টা চালাচ্ছিলেন এবং সেইসঙ্গে নিজের নাটকের প্রকাশক খুঁজছিলেন। তাছাড়া রাজধানী বার্লিনে যাতে রঙ্গজগতে ঢুকতে পারেন সে সম্বন্ধে তিনি তৎপর হয়ে উঠেছিলেন। এই উদ্দেশ্যে ১৯২১ সালে ব্রেশট বেশ অনেকবার বার্লিন পরিভ্রমণে গিয়েছিলেন। এখানে ১৯২২ সালের প্রথম দিকে আরনল্ট ব্রোনেলের সঙ্গে আলাপ হয়—সে কথা পরে বলবো।

ব্রেশট সম্বন্ধে এই ধারাবাহিক প্রবন্ধমালায় আমি বিস্তৃতভাবে তাঁর জীবন সম্বন্ধে আলোচনা করতে চাই এই কারণে যে আজকাল কলকাতায় তাঁর কয়েকটি নাটকের বঙ্গীকরণ মঞ্চস্থ হচ্ছে। যাঁরা এসব নাটক মঞ্চস্থ করেন অনেক সময়েই তাঁদের দরকার হয় ব্রেশটের জীবনী, রাজনীতিক, অর্থনীতিক, সমাজতান্ত্রিক ব্যাপারে ব্রেশটের মতবাদগুলি স্পষ্টাস্পষ্টিভাবে জানবার। অথচ সব সময় তাঁরা ব্রেশট সম্বন্ধে দরকারী মালমসলা খুঁজে পান না। এসব তথ্য সম্বন্ধে কিছু কিছু দুষ্প্রাপ্য বই আমার হাতে থাকাতে সেগুলো থেকেই এই প্রবন্ধমালার মূল বিষয়গুলো আমি ব্রেশট অনুরাগীদের কাছে তুলে ধরতে পারছি। এ বিষয়ে সম্প্রতি আমাকে বিশেষভাবে অনুরোধ করেছিলেন 'দি ইনকামট্যাক্স স্পোর্টস এণ্ড রেক্রিয়েশন ক্লাবের' কয়েকজন সভ্য। তাঁদের সপ্তাহব্যাপী নাট্যসংস্কৃতি উৎসবে আমি চারদিন উপস্থিত ছিলাম এবং দুটি ব্রেশটের নাটকের অভিনয় এঁরা দেখিয়েছিলেন একটি শ্রীউৎপল দত্ত কৃত অনুবাদ 'সমাধান' এবং অপরটি শ্রীসৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বঙ্গীকরণ 'সমাধান'। নাটক দুটির অভিনয় এবং প্রযোজনার আলোচনা আমি আগের একটি সংখ্যাতে করেছি। তবুও বলি নাটক দুটি দেখে সত্যিই মনটা বেশ চাঙ্গা হয়ে উঠেছিল। দুটি নাটকের বিষয়বস্তুর সঙ্গেই আমাদের দেশের বর্তমান অর্থনীতিক এবং রাজনীতিক সমস্যার এমন একটা সাদৃশ্য অনুভব করেছিলাম যা বেশ কয়েক দিনের জন্যই গভীরভাবে মনের খোরাক জুটিয়েছিল। আর আসলে এইটেই তো নাট্যকারের সব থেকে বড় কাজ—দর্শক এবং পাঠকের মনে চিন্তার তরঙ্গ সৃষ্টি করা। সব বড় নাট্যকারই তো এই কাজই করে গেছেন—সেক্সপীয়ার, শ', গলসওয়ার্দি, ইবসেন, স্ট্রীণ্ডবার্গ, পিরানদেল্লো, হাউপ্টমান, ওনীল থেকে ব্রেশট অবধি। যে নাট্যকার নিজে চিন্তাশীল নন, তিনি পাঠক বা দর্শককেও চিন্তা করাতে পারেন না। কেউ কেউ আছেন যাঁরা মন ভোলানো গল্প বলতে পারেন মোলায়েমভাবে—যেমন ধরুন সমারসেট মম। মমের নাটক পড়ুন বা দেখুন, বেশ ভাল লাগবে একবার। দ্বিতীয়বার আর সে নাটক সম্বন্ধে কোন কৌতূহল বা ব্যাকুলতা আপনার মনে আসবে না। অথচ হ্যামলেট, ওথেলো, ম্যাকবেথ প্রভৃতি সেক্সপীয়ারের নাটক সম্পর্কে জানবার এবং জানাবার ইচ্ছা আমাদের কোনদিনই শেষ হবে না। শ'-এর নাটক চিরকালই নাট্যানুরাগীদের ইণ্টালেকচুয়াল ফুডের যোগান দেবে। গলসওয়ার্দির জাস্টিস এবং স্ট্রাইফ শুধু মর্মস্পর্শী নাটক নয়, এদের আবেদন মানুষের শাশ্বত নীতিবোধের কাছে। মনস্তাত্ত্বিক ব্যাপারে যে কত উচ্চস্তরের নাটক লেখা যায় তার উদাহরণ পিরানদেল্লো। ইবসেন, স্ট্রীণ্ডবার্গ, হাউপ্টমান তো জীবনের বিভিন্ন দিক সম্বন্ধেই প্রথম শ্রেণীর নাটক রচনা করে গিয়েছেন। যার বার পড়েও মনে অতৃপ্তি আসে না। কত চিন্তার উদয় হয় দর্শক বা পাঠকের মনে কত সমাধানের কথাও মনে জাগে।

আর আধুনিক যুগের দুই বিরাট দিকপাল নাট্যকার ওনীল এবং ব্রেশট। এঁদের নাটক মনে যে বিরাট আলোড়নের সৃষ্টি করে তা তো এঁদের লেখার সঙ্গে যাঁদের পরিচয় আছে সবাই ভালভাবেই জানেন। ওনীলের লেখাতেও জায়গায় জায়গায় যথেষ্ট এলিয়েনেশনের ব্যাপার আছে—বিশেষত 'মোর্নিং বিকামস ইলেকট্রা' এবং 'স্ট্রেইঞ্জ ইণ্টারলিউড' নাটকে—এই বিচ্ছিন্নকরণের জন্যই তিনি বিস্তৃতভাবে সলিলকি এবং এ্যাসাইডের সাহায্য নিয়েছেন এই দুটি নাটকে। ব্রেশটকে আমার মনে হয় সব থেকে বড় গণনাট্যকার—সাধারণ লোককে এমন সহজ সরলভাবে তার জীবনের নানাদিক বোঝাতে আর কোন নাট্যকার পেরেছেন? অথচ বিদগ্ধ দর্শক বা পাঠকও ব্রেশটের নাটক থেকে যথেষ্ট চিন্তা করবার খোরাক পেতে পারেন। আর সেৎসুয়ানকে তো আমার একমাত্র পুরোপুরি মার্কসিস্ট নাটক বলে মনে হয়। [ক্রমশঃ]

রঙ্গজগৎ

চলচ্চিত্রে মুনাফা ও ভারতীয় ছবি

ভারতীয় চলচ্চিত্রের একটি সমীক্ষাতে দেখা যায় : ১৯৬৭ সালে এই শিল্পে ৯০ কোটি টাকা মূলধন নিয়োগ করা হয়েছিল। বার্ষিক আয় হয়েছে বিদেশী ছবির জন্য দশ কোটি টাকা, ভারতীয় চলচ্চিত্রের জন্য ৫০ কোটি টাকা এবং প্রমোদকর ও প্রদর্শনী কর বাবদ আরো ৩৫ কোটি টাকা। সর্বমোট আয় প্রায় ৯৫ কোটি টাকা। বিদেশে ভারতীয় ছবি দেখিয়ে এক কোটি ৩৬ লক্ষ টাকা আয় হয়েছে। টাকার অঙ্ক এবং ছবির সংখ্যার দিক থেকে পৃথিবীতে ভারতীয় চলচ্চিত্রের স্থান তৃতীয়। ভারতীয় ছবির প্রযোজকদের নজর একমাত্র টাকার দিকে। টাকা ছাড়া শিল্পসৌন্দর্য, বাস্তবতা, নৈতিকতা এবং দেশ ইত্যাদি কোন দিকেই তাঁদের নজর দেবার সময় নেই। টাকার পেছনে উন্মাদের মত তাঁরা ছুটেছেন।

জাপান চলচ্চিত্র নির্মাণের দিক থেকে দ্বিতীয় স্থানাধিকারী। কিন্তু জাপানী প্রযোজকরা ভারতীয়দের মত জাতি-ধর্ম বিসর্জন দিয়ে হলিউডের উচ্ছিষ্ট কুড়িয়ে টাকা আয় করতে চায় না। তাদের স্বাতন্ত্র্যবোধ আছে। তাই জাপানে এত বেশি সংখ্যক ছবি তৈরি হলেও আমাদের মত কাণ্ডজ্ঞানবর্জিত ছবি হয় না, উচ্চমানের ছবিও হয়, এবং তার সংখ্যা কম নয়। জাপানে আমাদের মত তারকা-প্রথার এত প্রাধান্য ঘটে নি। আমাদের দেশে যোল লাখ টাকার মজুরী নেয় এমন তারকা সেখানে প্রশ্রয় পায় না। তাই তুলনামূলক কম টাকায় ছবি করা চলে, এবং প্রযোজকরা একটা সীমিত আয়ের মধ্যে থাকতে পারলে সন্তুষ্ট। আমাদের দেশের মত সর্বগ্রাসী মুনাফালালসা ওদের পেয়ে বসে নি। এ কারণে জাপানী ছবির একটা স্বতন্ত্র মর্যাদা আছে।

ভারতীয় ছবিতে যেদিন থেকে কালো টাকার অনুপ্রবেশ ঘটেছে সেদিন থেকে ছবির অধঃপতন, এবং তারকা-প্রাধান্য সৃষ্টি হয়েছে। প্রথমে বোম্বাই-এর ফাটকাবাজ ব্যবসায়ী এবং ঠিকাদাররা তাদের চুরির টাকা লুকোবার স্থান হিসাবে চলচ্চিত্র শিল্পকে বেছে নেয়, তার পরে বাংলাদেশে একই ঘটনা দেখা যাচ্ছে। কাল যারা ছিল ফাটকাবাজ কারবারী আজ তারা ছবির প্রযোজক। এবং এই প্রযোজনাসূত্রে কোন কোন শিল্পীকে অভিনয়ের সুযোগ দেবার ও অর্থের প্রলোভনে নিজেকে বিলাসের সামগ্রী করে রাখা; এবং প্রচারের ঢাক বাজিয়ে তাকে 'তারকা' রূপে উপস্থিত করা ইত্যাদির জন্য ছবির মান আজ নিচের দিকে। এবং এ ধরনের প্রযোজকের জন্য কাণ্ডজ্ঞানহীন ছবি নির্মাণ সম্ভব হচ্ছে। এসব ছবি দেখাবার ও নির্মাণ করার অবাধ স্বাধীনতা রয়েছে প্রযোজকদের। দেশের সরকার এদের বিরুদ্ধে কোন কথা বলবে না—কারণ এদের থেকে যে মোটা অঙ্কের প্রমোদকর আসে। মন্ত্রীরা মাঝে মাঝে সভায় দু-চার কথা বলেন, তা যে বক্তৃতা-বিলাস সে কথা কারোর বুঝতে বাকী নেই। কারণ সমর্থন না থাকলে বিদেশ থেকে এত বাজে ছবি আসতে পারে না, এবং বিদেশীরা বছরে দশ কোটি টাকা ভারতের লোককে বোকা বানিয়ে লুটে নিতেও পারে না।

সমীক্ষায় চলচ্চিত্র শিল্পে আয়ের যে চিত্র প্রকাশ পেয়েছে, এতে বড় ব্যবসায়ীরা এই শিল্পের প্রতি আরো আকৃষ্ট হবে। বড় শিল্পপতি এবং ফাটকাবাজদের অবাধে এই শিল্পে আসতে দিলে ছোট প্রযোজকদের গুটিয়ে যেতে হবে, এবং আঞ্চলিক ছবিকে দারুণভাবে মার খেতে হবে। আঞ্চলিক ছবি যে দুস্থারখানা হবে তাতে জাতির ও অঞ্চলের কোন বৈশিষ্ট্য থাকবে না। বোম্বাই ছবির একটা ছোট পরীক্ষামূলক ল্যাবরেটরি হবে আঞ্চলিক স্টুডিওগুলি। সমীক্ষায় আয় ও মূলধন নিয়োগের অঙ্ক পাওয়া যায়, কিন্তু ছবির প্রযোজকদের আসল চেহারা প্রকাশ পায় না। তা পেলে চলচ্চিত্রজগতে যে অসাধু ব্যবসায়ীদের প্রাধান্য হয়েছে সে কথা বোঝা যেত।

—সুজন

[illegible]

চিত্র আলোচনা

পঞ্চশর

(পরিচালনা : অরূপ গুহঠাকুরতা)

ফিল্ম ক্রাফটের 'পঞ্চশর' মুক্তিলাভ করেছে। সাহিত্যিক সুবোধ ঘোষের একটি সুখপাঠ্য গল্প 'আবিষ্কার' এই ছবির চিত্রনাট্যের অবলম্বন। গল্পের নায়িকা এক চঞ্চল ও উচ্ছলিতা স্বভাবের তরুণী। মনের সরলতা ও বে-পরোয়া চলাফেরায় শহরের সে আলোচনার বিষয়। নিন্দা করার লোকই বেশি। পরেশের সঙ্গে এই অতসীর পরিচয় আকস্মিক। এতদিন কলকাতা থেকে পড়াশোনা করে পরেশ এখন বাড়িতে এসেছে। কোন কাজকর্ম জোটে নি। নিজের মনে সাহিত্যচর্চা করছে, কিন্তু একটি গল্প-কবিতাও কাগজে ছাপাতে পারেনি। শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়ে তার বাবার দোকানের সঙ্গে রেডিও মেরামতের দোকান খোলে। এই দোকানে একদিন অতসী উপস্থিত হয় তাদের গ্রামোফোন মেরামতের জন্য। তারপর থেকে দুজনার পরিচয় এবং পরিচয় থেকে বন্ধুত্ব। এমন সময় অতসীর বান্ধবী প্রতিমার ইঞ্জিনীয়ার দাদা অভিলাষ এসে তার প্রতি অতসী আকৃষ্ট হয়। একটি সৌজন্যমূলক চিঠির সুযোগ নিয়ে অতসী তার মনের কথা অভিলাষকে খুলে লেখে। অভিলাষ এতে বিব্রত বোধ করে এবং পরিষ্কার জানিয়ে

দেয় যে নিজের বোনের বান্ধবী ছাড়া সে অতসী সম্পর্কে তার বেশি কিছু ভাবে নি। কিন্তু পরেশের বন্ধু পোস্ট অফিসের কর্মী পল্টু চুরি করে এনে এই চিঠি পরেশকে দেখায়। অভিলাষের প্রত্যাখ্যানে অতসী মনে ব্যথা পেতে পারে এই মনে করে—তার মনকে খুশিতে ভরিয়ে রাখবার জন্য অভিলাষের নামে পরেশ নিজের মনের কথা উজাড় করে দিয়ে চিঠি দেয়। এভাবে চিঠির আদানপ্রদানে এক দিকে অতসীদের বাড়িতে, আর এক দিকে অভিলাষের মনে দুই বিপরীত ক্রিয়া ঘটে। শেষ পর্যন্ত অভিলাষকে আবার গ্রামে আসতে হয়—এবং ভুল বোঝাবুঝির অবসান হয়। এবার অতসী আসল পত্র-লেখককে ধরবার জন্য এক মতলব আঁটে, এবং নাটকীয় পরিস্থিতিতে সফল হয়।

ছবিটি উপভোগ্য। সব সময় কৌতুকের মেজাজে কাহিনী বিস্তার লাভ করেছে। তবে যেরূপ স্বচ্ছন্দ গতিতে ছবি অগ্রসর হওয়া উচিত ছিল সেভাবে হয় নি। উপজাতিদের নাচ, শিকারের দৃশ্য ইত্যাদি সংযোজনা করা সত্ত্বেও ছবির বৈচিত্র্য বৃদ্ধি পায় নি এবং ঢিলেঢালা গতিতে এগিয়েছে। সময় সময় একঘেয়েমি বিরক্তি সৃষ্টি করেছে। বরঞ্চ প্রশ্ন উঠেছে শিকারের দৃশ্যটির কি প্রয়োজন ছিল। যদিও ছবিতে প্রচুর বহির্দৃশ্যের আকর্ষণ রয়েছে এবং পরি-চালক ও সম্পাদনায় (শৈলেন চ্যাটার্জী) তাকে ভালভাবে ব্যবহার করেছেন, কিন্তু সময় সময় তাতেও সম্পাদনা দোষে সময় এবং পরিবেশের সমন্বয় ঘটে নি। কখন কখন বাহুল্য মনে হয়েছে। মোটামুটি উপভোগ্যতা সত্ত্বেও পরিচালনা এবং সম্পাদনার আমরা প্রশংসা করতে পারছি না।

সময় সময় যে একঘেয়েমি সৃষ্টি হয়েছে তাকে পুষিয়ে দিয়েছেন রবি ঘোষ। রবি ঘোষ পল্টুর চরিত্রে আশ্চর্য রকমের অভিনয় করেছেন। একটি পার্শ্বচরিত্র হলেও তার চাহনি, বলা ইত্যাদি প্রতিটি অভিব্যক্তি কাহিনীর মূল মেজাজের সঙ্গে সংহতিপূর্ণ। অতসীর চরিত্রে রুমা গুহঠাকুরতা চমৎকার অভিনয় করেছেন। চঞ্চল ও বে-পরোয়া স্বভাবের এক তরুণীর

মিতালী ফিল্মসের 'হংসমিথুন' ছবিতে অপর্ণা দাশগুপ্ত

চিলড্রেন্স ফিল্মস সোসাইটি ও ইমেজ ইণ্ডিয়া প্রযোজিত শান্তিপ্রসাদ চৌধুরী পরিচালিত 'হীরের প্রজাপতি' ছবিতে সাধনা রায়চৌধুরী, নবাগতা শুচিতা রায় ও রূপা দাশশর্মা।

মনের সরলতা ও সঙ্গ কামনাকে তিনি যথার্থ কৃতিত্বের সঙ্গে ফুটিয়ে তুলেছেন। এতে তাঁর অভিনয়-দক্ষতার পরিচয় রয়েছে। তবে প্রথম দর্শনের সঙ্গে শেষের দিকে তাঁর রূপসজ্জার সঙ্গতি নেই, যে কারণে তাঁকে কাহিনীর অতসী অপেক্ষা কিছুটা বেশি বয়সের মনে হয়েছে। নায়করূপে শুভেন্দু চ্যাটার্জী আমাদের মোটেই সন্তুষ্ট করতে পারেন নি। অনিল চ্যাটার্জী আনন্দময় অভিলাষকে যথার্থভাবে রূপ দিয়েছেন। অন্যান্য চরিত্রগুলিতে যথাযথ অভিনয় করে ছবির কাহিনী গঠনে সাহায্য করেছেন জহর রায়, সুমিতা সান্যাল, কণিকা মজুমদার, সীতা মুখার্জী, পিসু মজুমদার, ব্রতীন ঠাকুর, অনুভা দেবী প্রমুখ।

ছবির সঙ্গীতের কাজ প্রশংসনীয়। বহির্দৃশ্য নির্বাচনেও পরিচালকের শিল্পদৃষ্টির পরিচয় রয়েছে এবং উপভোগ্যতা বৃদ্ধি করেছে।

পথে হল দেখা

(পরিচালনা : শচীন অধিকারী)

জ্যোতির্ময় রায় লিখিত কাহিনী ও বিধায়ক ভট্টাচার্যের চিত্রনাট্য 'পথে হল দেখা' নেহাৎই একটি পণ্যচিত্র—যার কোন শিল্পরস ও বুদ্ধির আবেদন নেই। সাধারণ বোম্বাই ছবিগুলির চিত্রনাট্যের ছকে—এই ছবির কাহিনী গ্রন্থনা, তবে বোম্বাই ছবির আনন্দ পরিবেশন-ক্ষমতা এতে নেই।

অনসূয়া এক বাতিকগ্রস্ত ব্যক্তির শিক্ষিতা কন্যা। তার জীবন অতিষ্ঠ করে তুলেছে আর এক বাতিকগ্রস্ত ডাক্তার। একটু মুক্তির নিশ্বাস নেবার জন্য বাইরে গেলে পিতৃ অর্থে জীবনযাপনকারী এক অকর্মণ্য যুবক (?)-এর সঙ্গে দেখা। দেখা থেকে প্রণয়। তার পরে একটু এদিক-ওদিক হয়ে মিলন।

'ছোট্ট জিজ্ঞাসা' ছবিতে মাধবী মুখার্জী ও প্রসেনজিৎ

এই কাহিনীর নায়িকা সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়। সাধারণত এ ধরণের চরিত্র অপেক্ষা মধ্যবিত্ত সংসারের তরুণী ও বধূর চরিত্রে তাঁকে মানায় ভাল। তবে এখানেও তিনি নিরাশ করেন নি। নায়ক হয়েছেন ভানু ব্যানার্জী। চরিত্রটি কৌতুকের না হলেও যেহেতু ভানু ব্যানার্জী—সেহেতু কৌতুকের হয়ে গেছে। যথেষ্ট রং-এর প্রলেপ সত্ত্বেও বয়সটা একটুও কম দেখান—বা দেহের বাঁধুনীকে যুবকোচিত না দেখানোয় চল্লিশোত্তীর্ণ নায়ককে গ্রহণ করা একটু কষ্টকর। এ ধরণের ছবি বাস্তবধর্মিতা রক্ষা করে না—যে কোনভাবে দর্শকদের আনন্দ দানই উদ্দেশ্য, সুতরাং সেভাবে জহর রায়, সবিতা চ্যাটার্জী (বোম্বাই), তরুণকুমার, বিপিন গুপ্ত, শ্যাম লাহা, ভারতী দেবী, অমর মল্লিক, শীতল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ যথেষ্ট হাস্যরস সৃষ্টিতে সাহায্য করেছেন।

ছবির বিভিন্ন বিভাগের কাজ অতি সাধারণ, তার মধ্যে একমাত্র প্রশংসা পাবার যোগ্য মধুসূদন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পাদনা এবং ভি বালসারার সঙ্গীত।

যাদুকর এ, সি সরকার তাঁর 'ক্রাউন এণ্ড দি ক্যানন' খেলাটি দেখাচ্ছেন

স্টুডিও খবর

হীরের প্রজাপতি

শিশু-সাহিত্যিক শ্রীমতী লীলা মজুমদারের 'বকধার্মিক' কাহিনী অবলম্বনে 'হীরের প্রজাপতি' ছবিটি নির্মিত হয়েছে। একটি হীরকখচিত প্রজাপতির ব্রোচকে কেন্দ্র করে এই ছবির চিত্রকাহিনী। আকস্মিক ঘটনাচক্রে নিরুদ্দিষ্ট এই হীরের প্রজাপতিটি খুঁজে বার করতে গিয়ে ক্ষণে ক্ষণে যে রহস্য ও কৌতুক দানা বেঁধে ওঠে—তারই অনিবার্য ফলশ্রুতি 'হীরের প্রজাপতি' ছবিটি। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে সমগ্র ছবিটি মাইথন ও পারিপার্শ্বিক বহির্দৃশ্যে—লেক, পাহাড়, অরণ্য, আদিবাসীদের গ্রাম ইত্যাদি অঞ্চলে গৃহীত হয়েছে।

ছবির উদ্যোক্তা চিলড্রেন্স ফিল্ম সোসাইটি। ইমেজ ইণ্ডিয়ার পক্ষে ছবিটি প্রযোজনা করেছেন শান্তিপ্রসাদ চৌধুরী। তিনিই ছবির পরিচালনা ও সংলাপ রচনা করেছেন। চিত্রনাট্য রচনায় তিনি সহায়তা গ্রহণ করেছেন পরিচালক ঋত্বিক ঘটকের।

বোম্বাই-এর তরুণ ক্যামেরাম্যান আর, এস, রাও এই ছবির আলোকচিত্র গ্রহণ করেছেন। সঙ্গীত পরিচালনা ও সম্পাদনা করেছেন যথাক্রমে নির্মলেন্দু চৌধুরী ও নানা বসু।

শ্রীমতী রাজলক্ষ্মী দেবী এই ছবিতে এক দুর্ধর্ষ অথচ স্নেহপ্রবণা পিসির

চরিত্রে অভিনয় করেছেন। গল্পে গোয়েন্দার মজার চরিত্রে অভিনয় করেছেন রবি ঘোষ। অনুপকুমার ও শেখর চ্যাটার্জী দুটি চরিত্রে রয়েছেন। ক্যামেরাম্যান গোপাল সান্যাল এ ছবিতে ক্যামেরা না ধরে অভিনয় করে দেখিয়ে দিয়েছেন তিনি অভিনয়ও করতে পারেন। এক তরুণী শিক্ষিকার চরিত্রে সুব্রতা চ্যাটার্জী, মাসিমার চরিত্রে সাধনা রায়চৌধুরী, মায়ের ভূমিকায় বিনতা রায় এবং ছবির মূল কিশোরী চরিত্রে বিনতা রায়ের কন্যা শুচিতা রায় অভিনয় করেছেন। এ'দের সঙ্গে আছেন জহর রায়, গণেশ বাগচী (নবাগত), অতিথিশিল্পী তপন ভট্টাচার্য।

ছবির কাজ আগামী মার্চ মাসে শেষ হবে।

ছন্দগীতিকার 'শাজাহানের স্বপ্ন' নৃত্য-গীতি নাট্যে জাহানারা ও শাজাহানের ভূমিকায় চন্দনা গুহ রায় ও অনুভা বসু।

সঙ্গীত কথা

শাজাহানের স্বপ্ন

সংগীত ও নৃত্য শিক্ষায়তন 'ছন্দগীতিকা'র সপ্তদশ বার্ষিক সমাবর্তন উৎসব ও পুরস্কার বিতরণ গত ২৮শে জানুয়ারী ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলে সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয়েছে। লেডী ব্রেবোর্ন কলেজের অধ্যক্ষা ডক্টর রমা চৌধুরী প্রধান অতিথি হিসাবে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এবং তিনি অভিজ্ঞানপত্র ও পুরস্কার বিতরণ করেন। ডক্টর চৌধুরী এই সংগীতনৃত্য শিক্ষায়তনের আরো উন্নতি কামনা করে ভাষণ দেন।

শুয়েবের গান: পশ্চিম জার্মানীর এক বিশেষ সংগীতানুষ্ঠান—যাতে বেহালার দণ্ড ব্যবহার করা হয়।

অভিজ্ঞানপত্রাদি দান অনুষ্ঠানান্তে ছন্দগীতিকার অধ্যক্ষ ননী মিত্র রচিত ও পরিচালিত শাজাহানের স্বপ্ন গীতিনৃত্য নাট্য মঞ্চস্থ হয়। সম্রাট শাজাহান মমতাজ বেগমের প্রণয় উপাখ্যানের অগ্রকাহিনী এক সাধারণ যুবক সিরাজ ও প্রতিবেশী কন্যা আরজু মেহেরুন্নিসা জানের বাল্য প্রণয় এই নৃত্য-গীতি নাটিকার অবলম্বন। পরিচালক শ্রীমিত্রের সুদক্ষ পরিচালনায় নৃত্য-গীতি নাট্যটি দর্শকদের যথেষ্ট আনন্দ দান করেছে। এই নৃত্যনাট্যের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেছেন সংগীত পরিচালনায় তরুণ শিল্পী সাধন নন্দী। তাঁর সঙ্গে নেপথ্য সংগীতে সহযোগিতা করেছেন ছন্দগীতিকার অনুরাধা মুখার্জী, রীতা সেনগুপ্ত, কামাখ্যা রায়। নৃত্যাভিনয়ে সিরাজ, শাজাহান, মমতাজ, জাহানারা এবং ঢেরাদারের চরিত্রে যথাক্রমে বন্দনা গুহরায়, অনুভা বসু, মুক্তা দত্তরায়, চন্দনা গুহরায়, স্বপ্না ঘোষের অভিব্যক্তি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আগ্রার জনপথে কিশোর-কিশোরী ও পল্লীরমণীদের নৃত্যটি যথেষ্ট উপভোগ্য হয়েছে। এই নৃত্যে অংশ গ্রহণ করেছে সীমা চৌধুরী, বেবকানী মুখার্জী, কৃষ্ণা রায়, কাতু ও পিয়ালী। শাজাহানের স্বপ্ন নৃত্যাভিনয়ে আরও অংশ গ্রহণ করেছেন রেখা দে, শ্যামলী চক্রবর্তী, পিয়ালী গুপ্ত, রমা ভট্টাচার্য, ভগবতী পাল, সুচেতা পাল, সন্ধ্যা মুখার্জী

শোক-সংবাদ

রেণুকা রায়ের জীবনাবসান

অল্পদিন রোগভোগের পর বুধবার সুপরিচিতা অভিনেত্রী শ্রীমতী রেণুকা রায়ের মৃত্যু হয়েছে। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৪৯ বছর। স্বামী, দুই পুত্র এবং অসংখ্য বন্ধু-বান্ধব তিনি রেখে গেছেন। খুব ছোটবেলায় শ্রীমতী রায় অভিনয়-জগতে আসেন। পূর্ণ থিয়েটার

রঙ্গমঞ্চে তাঁর প্রথম অভিনয়। চলচ্চিত্রে 'দেবদাসী' ছবিতে নর্তকীর ভূমিকায় তাঁর প্রথম অভিনয়। তাঁর অভিনীত ছবির সংখ্যা প্রায় তিনশ'। তাঁর শেষ অভিনীত ছবি 'বিবাহ বিভ্রাট'। শেষের দিকে তিনি হাসির ছবি ও কৌতুকময়ী চরিত্রে যথেষ্ট সাফল্যের সঙ্গে অভিনয় করেছেন।

সংবাদকণা

সারা রাত্রি যাত্রা

শিবরাত্রি উপলক্ষে পূর্ণশ্রী প্রেক্ষাগৃহে ২৬শে ফেব্রুয়ারী রাত ন'টা থেকে সারারাত যাত্রাভিনয় অনুষ্ঠিত হবে। এই অনুষ্ঠানে থাকবে নবরঞ্জন অপেরার 'মাইকেল মধুসূদন' ও 'দেবগিরি', এবং ক্যালকাটা মেরী মেকার্স ক্লাবের 'কুমুদ'।

যাদু রত্নাকর এ সি সরকার

দক্ষিণ ভারত পরিক্রমার শেষে সদলবলে কলকাতায় ফেরার পর যাদু-রত্নাকর এ সি সরকার পুর্ণোদ্যমে স্থানীয় প্রদর্শনীর কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। সম্প্রতি শহরে তাঁর যে কয়টি প্রদর্শনী হয় তার মধ্যে শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের পুনর্মিলন উৎসবে অনুষ্ঠিত তাঁর প্রদর্শনীর কথা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই অনুষ্ঠানে শ্রী এ সি সরকার তাঁর অন্যান্য বৈশিষ্ট্যপূর্ণ খেলার সঙ্গে সম্প্রতি সংযোজিত তাঁর 'এস-এল ৬৮' ও 'ক্রাউন এণ্ড দি ক্যানন' খেলা দুটি দেখিয়ে দর্শকদের মুগ্ধ করেন। তাঁর সুষ্ঠু প্রদর্শনভঙ্গীর গুণে প্রতিটি খেলাই বিশেষ উপভোগ্য হয়।

মার্ক্স জীবনীচিত্র

পূর্ব-জার্মানীতে একটি শিশুদের চলচ্চিত্র নির্মিত হচ্ছে কার্ল মার্ক্স-এর জীবনী অবলম্বনে। ছবিতে শিশুদের উপযোগী করে কার্ল মার্ক্স-জীবনের কথা বলা হবে।

নাটকের জন্য পৌরকর বৃদ্ধি

সংবাদে প্রকাশ, রবীন্দ্র ভারতী অনুমোদিত নাট্য সংস্থাগুলি আগামী ১লা এপ্রিল হতে যে নাটক মঞ্চস্থ করবেন তার জন্য পৌরকর দিতে হবে দশ টাকা। ৩১শে মার্চ পর্যন্ত পুরনো হারে অর্থাৎ নাটক পিছু এক টাকা বলবৎ থাকবে। এই দশগুণ কর বৃদ্ধির প্রস্তাব ৭ই ফেব্রুয়ারী পৌর অর্থ কমিটির সভায় গৃহীত হয়েছে।

রবীন্দ্র ভারতীতে সমিতিভুক্ত নয় এমন সংস্থাগুলির বর্তমানে চল্লিশ টাকা করে কর দিতে হয়।

নাট্য সম্মেলন

নাট্য সম্মেলনের ৪র্থ বার্ষিক অধিবেশন এবার বসছে শ্যাম স্কোয়ারে (সুভাষ বাগ) মার্চের প্রথম সপ্তাহে। এবারেও অনুষ্ঠানসূচীতে অনেক বৈশিষ্ট্য দেখা যাবে। অনুষ্ঠানও চলবে পাঁচদিনব্যাপী।

শুক্রবার ১৬ই ফেব্রুয়ারী শুভারম্ভ !

মন মাতানো গান আর দমফাটা হাসির অনাবিল আনন্দ-অর্ঘ্য

সহ-ভূমিকায় : রবি ঘোষ, জহর গাঙ্গুলী, জহর রায়, সবিতা, রুমা।

রূপবাণী ০ ভারতী ০ অরুণা ০ মৃণালিনী ০ সুচিত্রা

যোগমায়া ০ পারিজাত ০ স্বপ্না (চন্দননগর) ০ কৈয়া ০ শ্রীরামপুর

টকীজ ০ নৈহাটি সিনেমা ০ কুইন (বজবজ) ও অন্যত্র

খেলা ও ধুলা

টসে জিতে বাংলার অধিনায়ক প্রথমে ব্যাটিং করার সুযোগ পেলেও, খেলার চূড়ান্ত ফলাফলে তিনি নিজেই হেরেছেন বম্বের অধিনায়ক হার্ডিকারের কাছে।

শনির দশা

[ব্যর্থতায় ভরা বাংলার ক্রীড়াজগৎ]

বাংলা দেশের ক্রীড়াজগতের ওপর এখন বোধহয় শনির দশা চলেছে। তাই দিকে দিকে আজ শুধু বাংলার ব্যর্থতা। ফুটবল, ক্রিকেট, হকি কিম্বা অন্য কোন বিষয়েই নেই সাফল্য—শুধু তাই নয়, নেই সাফল্যের এতটুকু আশাও! নৈরাশ্যের অতল অন্ধকারে তলিয়ে যাচ্ছে বাংলা দেশের খেলাধুলার জগৎ!

ফুটবলে বাংলা না কি অপ্রতিদ্বন্দ্বী। ফুটবলে বাংলাই ভারতের সর্বেসর্বা! অথচ সেই বাংলা দল গত ক'বছর ধরে সন্তোষ ট্রফি ঘরে তুলতে পারছে না! ভারতের শ্রেষ্ঠ ফুটবল-খেলিয়ে প্রদেশের এই রকম অসহায়তা সত্যিই মর্মান্তিক! কিন্তু বাস্তব বড়ই নির্মম। তাই বছরের পর বছর বাংলা হারছে সন্তোষ ট্রফির খেলায়।

ক্রিকেটে বাংলা কোনদিনই ভালো নয়। ভারতীয় টেস্ট দলে বাংলার খেলোয়াড়রা কখনো-সখনো চান্স পেয়েছেন। আর রঞ্জি ট্রফিতে, প্রথম দিকে সেই একবার জিতবার পর বাংলা আর কখনো সে ট্রফির মুখ দেখতে পেলো না! এবার রঞ্জি ট্রফির সেমি-ফাইন্যালে বোম্বাই দলের বিরুদ্ধে বাংলার খেলা নিয়ে অনেকে অনেক আশাই পোষণ করেছিলেন এতোদিন ধরে। স্বপ্ন দেখছিলেন, দুর্বল বোম্বাই দলকে বাংলা বোধহয় এবার হারাবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে বাংলা অতি প্রত্যাশিতভাবে প্রথম ইনিংসের ফলাফলে পরাজিত হলো।

আর হকির কথা তো না তোলাই বুদ্ধিমানের কাজ। সেখানে শুধু চাপ চাপ অন্ধকার। আর সেই অন্ধকারে জোনাকির আলোর মতো ঝক ঝক করছে বাংলা হকি দল। নামেই শুধু বাংলা দল। কিন্তু সে দলে বাঙালী খেলোয়াড়ের সংখ্যা এক কিম্বা দুই-এর বেশি কোনদিনই উঠছে না! তবে কি বাঙালী খেলোয়াড়রা হকি খেলতে জানেন না? ... ...

ঘুরে-ফিরে আবার না হয় আসি ফুটবলের কথাতেই। ক্রিকেটে যেমন বোম্বাই, তেমনি ফুটবলে ছিলো বাংলা। কিন্তু সেই ফুটবল খেলাতেও বাংলা দলের আজকের হাল খুব একটা আশাপ্রদ নয়। যদিও ভারতের সেরা ট্রফিগুলো প্রায় প্রতি বছরই কলকাতার দলগুলি জয় করে আনে! এ বছর যেমন রোভার্স আর ডুরান্ড কাপ জিতে এসেছে ইস্টবেঙ্গল!

কিন্তু আই এফ এ শীল্ডের খেলা নিয়ে মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গল আর আই এফ এ-র মধ্যে যে স্নায়ুযুদ্ধ চলেছে—আর যাই হোক তাকে কোন মতেই সমর্থন করা যায় না। বড় বড় দলগুলোর বেলায় আই এফ এ কর্তৃপক্ষের দুর্বল মনোভাবের পরিচয় আর একবার নতুন করে পাওয়া গেলো। যাঁর হাতে ক্ষমতা তাঁকে যদি যাদের ওপর সেই ক্ষমতা প্রয়োগ করা হবে, তাদের মুখের দিকে চেয়ে চলতে হয়—তাহলে এর চেয়ে বেশি কি বা আর আশা করা যেতে পারে......!

তবে মোহনবাগানের কাছ থেকে আমরা আর একটু বেশি স্পোর্টিং মনোভাব আশা করি! রোভার্স, ডুরান্ডের সংগে আই এফ এ শীল্ডটাও যদি লাভ করতে পারে তাহলে ইস্টবেঙ্গল স্থাপন করবে এক নতুন রেকর্ড। আর সে রেকর্ড প্রতিষ্ঠায় মোহনবাগান ক্লাবেরও উচিত ইস্টবেঙ্গলকে একটা সুযোগ দেওয়া। সে খেলায় ইস্টবেঙ্গল যদি জিততে পারে তো ভালোই, আর যদি জিততে না পারে—তাহলে মোহনবাগানের স্পোর্টিং মনোভাব নিয়ে আর কেউ কোন কথা বলতে পারবে না! —শান্তিপ্রিয়

যথা পূর্বং তথা

ক্রিকেটে বাংলার অবস্থা এখন আবার যথা পূর্বং। অর্থাৎ যেখানে আমরা ছিলাম আজো আছি সেখানেই। একচুলও এগুতে পারি নি আমরা। অথচ কতো বড় একটা সহজ সুযোগ এবার এসেছিলো আমাদের কাছে। কিন্তু সে সুযোগ এতটুকুও কাজে লাগল না। রঞ্জি ট্রফির সেমিফাইন্যালে বম্বের বিরুদ্ধে খেলায় কোনক্রমে সরাসরি পরাজয় এড়িয়ে বাংলা হেরেছে প্রথম ইনিংসের ফলাফলে।

অথচ বাংলার কাছে বম্বেকে হারাবার কতো বড় সুযোগটাই না এসেছিল এবার! ভাঙা বম্বে দল এসেছিলো কলকাতায় খেলতে! বম্বে দলের নামী খেলোয়াড়রা এখন ভারতীয় দলের সংগে গেছেন অস্ট্রেলিয়া আর নিউজিল্যান্ড ভ্রমণে। তাই বম্বে এবার তার পূর্ণ শক্তি নিয়ে পারছে না রঞ্জি ট্রফির খেলায় অংশ গ্রহণ করতে।

তাই দলগত শক্তির বিচারে বাংলা দল খুব একটা কম ছিলো না! ফলে বাংলার ক্রিকেটরসিকদের মনে জেগেছিলো নতুন আশার আলো! সেমিফাইন্যালে বম্বেকে হারাতে পারলে, শেষ পর্যন্ত বাংলা হয়তো ফাইন্যালে মাদ্রাজকেও কাত্ করতে পারবে।

আর পারবে ভারতের সেরা ক্রিকেট প্রতিযোগিতার পুরস্কার রঞ্জি ট্রফি লাভ করতে। রঞ্জি ট্রফির খেলা শুরু হয়েছে ১৯৩৪-৩৫ সালে। তারপর থেকে আজ পর্যন্ত বাংলার ভাগ্যে শিকে ছিঁড়েছে মাত্তর একবার। ১৯৩৮-৩৯ সালে বাংলা লাভ করেছিলো রঞ্জি ট্রফি! তারপর থেকে এ বছর পর্যন্ত রঞ্জি ট্রফি বাংলার কাছে আলেয়ার আলোর মতো হঠাৎ চমক লাগিয়ে আবার হারিয়ে গেছে গভীর অন্ধকারের অন্তরালে!

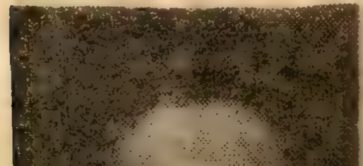

অম্বর রায়

ভারতীয় দলে যার স্থান হলো না, অথচ নিজের যোগ্যতার পরিচয় আজো যে দিয়ে চলেছে সেই অম্বর রায় বম্বের বিরুদ্ধে বাংলার ত্রাণকর্তার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন।

জয়ের আনন্দে সীমা ছাড়িয়ে গিয়ে মদের বোতলে মনের তৃষ্ণা মেটাচ্ছেন জয়সীমা। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে তৃতীয় টেস্ট ম্যাচের দ্বিতীয় ইনিংসে সেঞ্চুরী করার পর জয়সীমা আনন্দে বিভোর। কিন্তু সে টেস্টে ভারত হেরেছিলো মাত্র ৩১ রানে। তবে সে পরাজয়ের গ্লানি নয়, নিজের সাফল্যে জয়সীমা উচ্ছ্বসিত।

তাই এবার বম্বের ভাঙা দলকে দেখে বড় আশা করেছিলেন বাংলার ক্রিকেটরসিকরা! কিন্তু তাঁদের সেই আশার মুখে ছাই পড়লো খেলার প্রথম দিনই—যখন মাত্র ১৮৬ রানে শেষ হয়ে গেলো বাংলার প্রথম ইনিংস। আর জয় পরাজয় নির্ধারিত হয়ে গেলো বম্বে যখন তাদের প্রথম ইনিংসে ৪৩৬ রান করলো ৯ উইকেটের বিনিময়ে।

তবু বাংলার দুই ব্যাটসম্যান অম্বর রায় আর শ্যামসুন্দর মিত্রর দৌলতে বাংলা কোনক্রমে পেয়েছে সরাসরি পরাজয়ের হাত থেকে রেহাই। দু' ইনিংসেই অম্বর আর শ্যামসুন্দর ভালো খেলেছিলেন বলেই বাংলা কিছুটা খেলতে পেরেছিলো!

ওঁরা দুজন ছাড়া বাংলার অন্যান্য ব্যাটসম্যানরা ব্যাটিং-এ যেমন দিয়েছেন ব্যর্থতার পরিচয়, বোলিং-এও তাঁরা তেমনি হয়েছেন ব্যর্থ! আর ফিল্ডিং-এর কথা তো ছেড়েই দিলাম। কত্রো ক্যাচ যে ঐ ক'দিনে মাটিতে ফেলেছেন তাঁরা তার কোন ইয়ত্তা নেই।

প্রথম ইনিংসে বাংলার সর্বোচ্চ রান ছিলো অম্বর রায়ের ৪৭। আর সেখানে বম্বের ছিলো দুটি সেঞ্চুরী। বম্বের অধিনায়ক হার্ডিকার করেছিলেন ১৩৫ রান। আর তরুণ খেলোয়াড় এস নায়েক করলেন ১৩৬ রান। দ্বিতীয় ইনিংসে বাংলার ২৭৮ রানের মধ্যে ছিলো শ্যামসুন্দর মিত্রর ১০৪ আর অম্বর রায়ের ৭১।

নিউজিল্যাণ্ডে ভারতীয় দল

অস্ট্রেলিয়ায় পর পর চারটি টেস্টে পরাজয়ের পর সফরের শেষ দুটি হাল্কা মেজাজী খেলায় জিতে ভারতীয় দলের খেলোয়াড়রা গিয়ে হাজির হয়েছেন নিউজিল্যাণ্ডে। আর প্রথম খেলায় প্রাথমিক ব্যর্থতার পর শেষ পর্যন্ত নিউজিল্যাণ্ডের সভাপতি একাদশের বিরুদ্ধের খেলাটা শেষ হয়েছে অমীমাংসিতভাবে। সভাপতি একাদশের ২০২ রানের উত্তরে ভারতের প্রথম ইনিংস শেষ হয়ে যায় মাত্র ১০৬ রানে। দ্বিতীয় ইনিংসে সভাপতি একাদশ ৬ উইকেটে ২৩৫ রান করলে, ভারত খেলার শেষ পর্যন্ত ৭ উইকেটে ২৬৪ রান করতে সমর্থ হয়। ভারতের সুর্তির ৮৮ আর পতৌদির ৪৫ রানই একমাত্র উল্লেখযোগ্য।

নিউজিল্যাণ্ডে সাধারণ খেলাগুলো নিয়ে এখন আর কেউ বিশেষ মাথা ঘামাচ্ছেন না। সকলের নজর এখন টেস্ট খেলার দিকে। বিদেশের মাটিতে পর পর ১৭টি টেস্ট খেলায় হারার পর ভারত ১৫ই ফেব্রুয়ারী থেকে নিউজিল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে প্রথম টেস্ট খেলায় মিলিত হচ্ছে। সকলেই তাই তাকিয়ে আছেন টেস্ট খেলার

একনজরে ভারত নিউজিল্যাণ্ডের টেস্ট খেলার ফলাফল

সাল	সফরকারী অধিনায়ক	ভারতের জয়	নিউ জঃ	ড্র	মোট খেলা
১৮৫৫-৫৬	এইচ বি কেভ	২	০	৩	৫

সর্বোচ্চ রান—ভারতের পক্ষে ৩ উইকেটে ৫৩৭ মাদ্রাজে ; ৭ উইকেটে ৫৩১ দিল্লীতে
নিউজিল্যাণ্ডের পক্ষে ২ উইকেটে ৪৫০ দিল্লীতে

সর্বনিম্ন রান—ভারতের পক্ষে ১৩২ কোলকাতায় ;
নিউজিল্যাণ্ডের পক্ষে ১৩৬ বম্বে টেস্টে

ফলাফলের দিকে। নিউজিল্যাণ্ডের বিরুদ্ধেও ভারত হারবে, না কি নিউজিল্যাণ্ডের বিরুদ্ধেই ভারত বিদেশের মাটিতে প্রথম টেস্ট জয়ের স্বাদ আস্বাদন করবে......?

পাশ কাটানোর প্রয়াসে

সম্প্রতি আই, এফ, এ'র এক সিদ্ধান্ত নিয়ে কলকাতার ফুটবলরসিক আর খেলোয়াড় মহলে মতভেদ দেখা দিয়েছে। এ বছর থেকে ফুটবল লীগের ফিরতি খেলাগুলো আর হবে না। (গত সংখ্যায় এ বিষয়ে লেখা হয়েছে)। সিদ্ধান্তটি ঐতিহাসিক সন্দেহ নেই। কিন্তু এর ফলে লাভ কি কিছু হবে? বাংলা দেশের ফুটবল খেলার মান কি এতোটুকুও উন্নত হবে?

এই বিষয়টি নিয়ে এখন নানা মুনির নানা মত! কেউ বলছেন, এতে লাভ কিছুই হবে না। বরঞ্চ লোকসানের অংকটাই বাড়বে। তাঁদের মতে লীগের খেলায় ওঠা-নামা চালু করে বিভাগীয় দলের সংখ্যা কমালেই কাজের মতো কাজ হতো। আর একদল বলছেন, এর ফলে খেলোয়াড়দের বেশি খেলায় অংশ গ্রহণ করতে হবে না। তাঁরা বিশ্রাম পাবেন! ফলে খেলার উন্নতি হবেই!

কিন্তু সত্যিই কি তাই? খেলোয়াড়রা কি সত্যিই বিশ্রাম পাবেন? অফিসের খেলা আর ফালতু খেলা যাকে সাদা বাংলায় ক্ষেপ খেলা বলা হয় সেগুলো কোথায় যাবে? তবে এ কথা আর আজ আমরা হলপ করে বলতে পারি, আই, এফ, এ কর্তৃপক্ষ যদি ভেবে থাকেন যে, তাঁদের এই সিদ্ধান্তের ফলে বাংলা দেশের ফুটবল খেলার মান উন্নত হবে তাহ'লে তাঁদের কুম্ভীরাশ্রুপাত করা ছাড়া কোন উপায় থাকবে না। শুধু তাই নয় এ কথাও সকলকে স্বীকার করতে হবে যে সব কিছু জেনে-শুনে তাঁরা দায়সারাগোছের যা নিতে হয় তাই নিয়েছেন এমন একটি সিদ্ধান্তকে ঐতিহাসিক আখ্যা দিয়ে বুদ্ধিমানের মতো পাশ কাটাতে চাইছেন।

সমাচার দর্পণ

কলকাতার হকি লীগের খেলা আরম্ভ হয়েছে। ১৩ই ফেব্রুয়ারী থেকে প্রথম বিভাগীয় দলগুলোও প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হলো। কিন্তু এখনকার খেলাগুলোতে কোন আকর্ষণই নেই! যে দলগুলোর খেলা থাকলে দর্শকরা মাঠে ছোটেন—তাঁরা সম্ভবত মার্চ মাসের আগে মাঠে নামবেন না। কারণ তাঁদের অধিকাংশ খেলোয়াড়ই এখন গেছেন মাদ্রাজে জাতীয় হকি প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে!

কলকাতায় আই, এফ, এ বনাম বার্মা দলের খেলায় পাম্পানার গোলে আই, এফ. এ জিতেছিলো। ছবিতে পাম্পানার গোল করার দৃশ্য আর ভারতের গোলরক্ষক থংগরাজকে দেখা যাচ্ছে বার্মার টিনুর একটি জোরালো শট ধরতে! রবীন্দ্র সরোবর স্টেডিয়ামে পরাজিত হবার আগে বার্মা দল গৌহাটিতে ৩—০, দিল্লীতে ৪—২ আর পাটনায় ১—০ গোলে জিতেছিলো। কালিকটের খেলাটি শেষ হয়েছিলো ১—১ গোলে।

আইন-কানুনের দুনিয়া

ক্রিকেট খেলার আইন-কানুনের মধ্যেগুলি গোলমেলো নিয়ম আছে, এল, বি, ডব্লিউ তার মধ্যে অন্যতম। শুধু অন্যতম বললে বোধহয় সবটা বলা হবে না। কারণ দেশ-বিদেশের ক্রিকেট ময়দানে এই এল, বি, ডব্লিউ আউটটি নিয়ে ঘটেছে অনেক মতভেদ, অনেক অস্বস্তিকর পরিস্থিতির মোল কারণ হয়তো বা ক্রিকেট আইনের সব থেকে গোলমেলো এই নিয়মটি!

নিচে ছবির সাহায্যে এই নিয়মটি সম্বন্ধে মোটামুটিভাবে আলোচনা করা হচ্ছে।

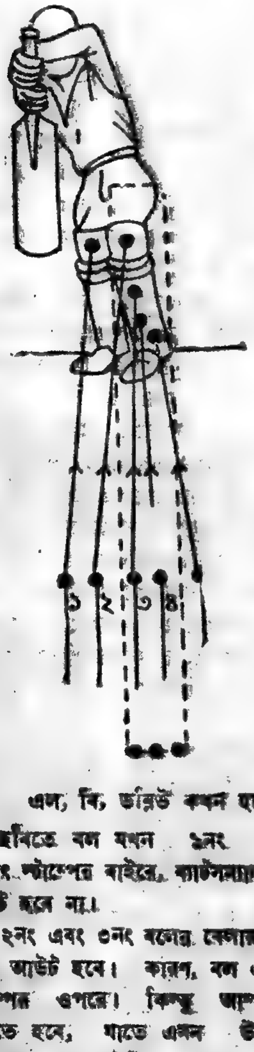

এল, বি, ডব্লিউ কখন হবে

ছবিতে বল যখন ১নং অবস্থায় অর্থাৎ স্টাম্পের বাইরে, ব্যাটসম্যান তখন আউট হবে না।

২নং এবং ৩নং বলের বেলায় ব্যাটসম্যান আউট হবে। কারণ, বল একেবারে স্টাম্পের ওপরে। কিন্তু আম্পায়ারকে দেখতে হবে, যাতে এমন উঁচু বলে ব্যাটসম্যানকে আউট দেওয়া না হয়, যে বল স্টাম্পের ওপর দিয়ে বেরিয়ে যেতো।

৪নং বলের বেলায়ও ব্যাটসম্যান আউট হবে। তবে আম্পায়ারকে লক্ষ্য রাখতে হবে যে লেগ ব্রেক বল হলে বলটা যেন এমন না হয় যে স্পিন করে বলটা অফ স্টাম্পের বাইরে দিয়ে বেরিয়ে যেতো।

৫নং-এর বেলায় ব্যাটসম্যান আউট হবে না। কারণ, বলটা লেগ স্টাম্পের বাইরে পিচ খেয়েছে। লেগ স্টাম্পের বাইরের বলে ব্যাটসম্যান কোন সময়েই আউট হবে না।

এল, বি, ডব্লিউ আউটের আবেদন হলে আম্পায়ারকে দেখতে হবে যে বলটি বোলারের দিককার উইকেট এবং ব্যাটস-

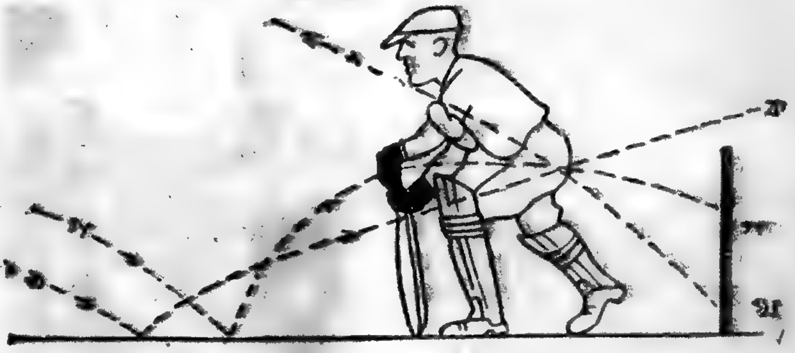

ক—বলটি স্বাভাবিক উইকেটের ওপর দিয়ে চলিয়ে যাবে। উইকেটে লাগার কোন সম্ভাবনা নেই। সুতরাং ব্যাটসম্যান আউট হবে না।

খ ও গ—এই দুক্ষেত্রেই ব্যাটসম্যান আউট হতে পারে, কারণ, বলটার উইকেটে লাগার সম্ভাবনাই বেশি। তবে এক্ষেত্রে আম্পায়ারকে খুবই সতর্কতার সংগে সিদ্ধান্ত নিতে হবে!

ম্যানের দিক্‌কার উইকেটের সোজাসুজি পড়েছে কি না, কিম্বা স্ট্রাইকার ব্যাটসম্যানের অফের দিকে পড়েছে কি না। যে বলে স্ট্রাইকার ব্যাটসম্যান এল, বি, ডব্লিউ আউট হবেন, আম্পায়ারকে নিশ্চিত হতে হবে যে বলটি পায়ে কিম্বা ব্যাটসম্যানের শরীরের অন্য কোন অংশে না আঘাত করলে উইকেটে নিশ্চয়ই লাগতো।

এল, বি, ডব্লিউ আউট দেবার আগে আম্পায়ারকে নিম্নলিখিত চারটি বিষয়ে নিশ্চিত হতে হবে—

(১) পায়ে কিম্বা শরীরের অন্য কোন অংশে না লাগলে বলটি উইকেটে নিশ্চিত আঘাত করতো; অর্থাৎ বলটি উইকেট ভেঙে দিতে সমর্থ ছিলো কি না।

(২) বলটি দুই প্রান্তের উইকেটের সোজাসুজি কি না অথবা বলটি স্ট্রাইকার ব্যাটসম্যানের অফের দিকে পড়েছে কি না।

(৩) হাত ছাড়া শরীরের অন্য কোন অংশে প্রথমে আঘাত করেছে কি না।

(৪) শরীরের যে অংশে বলটি আঘাত করেছে, সেই অংশটি বল লাগার মুহূর্তে দুই প্রান্তের উইকেটের সোজাসুজি ছিলো কি না—উচ্চতা যাই হোক না কেন।

সাপ্তাহিক বসুমতীর চাঁদার হার

সাপ্তাহিক বসুমতীর বাৎসরিক চাঁদা সডাক ১৮, টাকা, ষাণ্মাসিক ৯, টাকা ও ত্রৈমাসিক ৪·৫০ টাকা। প্রতি সংখ্যা ৩০ পয়সা।

তিন মাসের কম গ্রাহক করা হয় না। গ্রাহক হতে হলে আপিসে অগ্রিম টাকা জমা দিতে কিংবা মনি অর্ডারে টাকা পাঠাতে হবে।

—কর্মাধ্যক্ষ, বসুমতী

হনুমন্ত সিং

মাত্র কিছুদিন আগে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের অধিনায়ক সোবার্স ছেলেটার খেলা দেখে আরো বেশি খুশি হয়ে বলে গেলেন, "বিশ্বের সেরা ব্যাটসম্যানদের পর্যায়ে উঠবে সে।"

আর ক্রিকেটার তৈরির কারিগর আলফ গোভার ইংলণ্ডের মাটিতে তার খেলা দেখে বলেছিলেন, "গ্রেট ক্রিকেটার-দের তালিকায় একে দেখা যাবে......!

এই ছেলেটা আর কেউ নয়—ভারতের তরুণ ক্রিকেটার হনুমন্ত সিং। অথচ সেই হনুমন্ত সিং-ই বাদ পড়েছেন অস্ট্রেলিয়া-নিউজিল্যাণ্ড সফরকারী ভারতীয় দল থেকে।

আর বাদ পড়েছেন অদ্ভুত অজুহাতে! হনুমন্ত নাকি অসুস্থ! সেই দোহাই দিয়েই তো তাঁকে দলে স্থান দেওয়া হলো না! কিন্তু তারপরই হনুমন্তকে দেখা গেল স্টেট ব্যাঙ্কের পক্ষে খেলতে, রঞ্জি ট্রফির খেলায় অংশ গ্রহণ করতে!

তাহ'লে কি এই কথাই প্রমাণিত হয় না যে ভারতীয় ক্রিকেট কণ্ট্রোল বোর্ডের সিলেকশন কমিটি অসুখের মিথ্যে দোহাই দিয়ে হনুমন্ত সিংকে দল থেকে বাদ দিয়েছেন!

কিন্তু কেন এই অবিচার? কেন আজ হনুমন্ত সিং-এর মতো তরুণ ক্রিকেট খেলোয়াড়কে সইতে হচ্ছে এমনই অবহেলা? জানি এ প্রশ্নের কোন উত্তর নেই। উত্তর দেবার প্রয়োজনও বোধ করবেন না আমাদের ভারতীয় ক্রিকেট কণ্ট্রোল বোর্ড।

কিন্তু আজ অস্ট্রেলিয়ায় ভারতীয় দলের এই পর পর পরাজয়ের পর এ প্রশ্নের উত্তরই আমরা দাবি করবো সবার আগে! কেন হনুমন্ত সিং, দুরানীর মতো খেলোয়াড়দের ভারতীয় দলে স্থান হলো না? কিসের স্বার্থে তাঁদের বাদ দিয়ে অযোগ্য খেলোয়াড়দের দলে স্থান দেওয়া হলো......?

অথচ হনুমন্ত সিং-এর দলে স্থান না পাবার পেছনে কোন যুক্তিই নেই। বয়েসে অল্প, কিন্তু খেলায় অনন্য! তাঁর খেলায় আছে সহজ-সরল অনাড়ম্বর ভঙ্গিমা। কিন্তু ছন্দিত নৃত্যের ছন্দে ছন্দায়িত হয়ে ওঠে তাঁর ব্যাটিং করার মুহূর্তগুলো!

কিন্তু ক্রিকেট তো হনুমন্ত সিং বেশিদিন দেখছেন না। ক্রিকেট খেলার ওপর ঝোঁকও ছিলো না তাঁর এতোটুকুও। ফুটবল, হকি আর সাঁতার নিয়েই ছোট-বেলা থেকে মেতে ছিলেন তিনি।

পরিচায়তে

দেরাদুন ওয়েলহাম স্কুলে পড়ার সময়ও ক্রিকেট খেলার দিকে ফিরেও তাকাতেন না হনুমন্ত!

স্কুলের গণ্ডী পেরিয়ে হনুমন্ত এলেন ইন্দোরের ডালি কলেজে। দাদা সূর্যবীর সিং তখন ক্রিকেট খেলোয়াড় হিসেবে কিছুটা নাম করে ফেলেছেন! দাদার খেলা কিছুটা যেন টানলো হনুমন্তকে!

কিন্তু তারপর যখন মুস্তাক আলী

হনুমন্ত সিং

আর বি, বি নিম্বলকারের সান্নিধ্যে এলেন হনুমন্ত, তখনই পাল্টে গেলো তাঁর খেলোয়াড় জীবনের মোড়। খেলার রাজা ক্রিকেটের আকর্ষণে মেতে উঠলেন তরুণ রাজকুমার হনুমন্ত সিং।

কোথায় গেলো ফুটবল, কোথায় গেলো হকি আর সাঁতার! ক্রিকেটের রমণীয় রসের রসিক হয়ে হনুমন্ত সিং ক্রিকেটানন্দে মেতে উঠলেন! ইন্দোরের ডালি কলেজের দিনগুলো তাঁর জীবনে বয়ে আনলো নতুন আশার আলো! যে দাদা সূর্য-বীরকে দেখে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন হনুমন্ত—সেই দাদাকে পেছনে ফেলে এক লাফে অনেকদূর এগিয়ে এলেন ভারতীয় ক্রিকেটের এক উজ্জ্বল তারকা হনুমন্ত সিং।

১৯৫৬-৫৭ সাল থেকে হনুমন্ত সিং রঞ্জি ট্রফির খেলায় অংশ গ্রহণ করতে আরম্ভ করলেন! দেখতে দেখতে কেটে গেলো ক'টা বছর। ক্রিকেট-জীবনে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার সাধনায় তখন হনুমন্ত মত্ত!

১৯৬৩-৬৪ সালে ইংলণ্ড দল এলো ভারত সফরে। ভারতীয় দলে সম্ভাব্য টেস্ট খেলোয়াড় তালিকায় তখন স্থান লাভ করেছেন হনুমন্ত। শুধু তাই নয় দিল্লীর চতুর্থ টেস্টে ভারতীয় দলে প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগও এসে গেলো। যে সুযোগ আজো এলো না তাঁর দাদা সূর্যবীর সিং-এর জীবনে!

কিন্তু টেস্ট খেলার প্রথম সুযোগেই শত রান করার কৃতিত্ব অর্জন করে হনুমন্ত সিং তাঁর জীবনের প্রথম খেলাতেই বাজী মাৎ করলেন। মাত্র ৬৫ ওভার ব্যাটিং করে হনুমন্ত সিং তাঁর জীবনের প্রথম টেস্টে করলেন ১০৫ রান।

আর তারপর থেকে এতোকাল ভারতের পরম নির্ভরযোগ্য ব্যাটসম্যান হিসেবে হনুমন্ত সিং ছিলেন অনন্য! কিন্তু কেন জানি না গত বছর ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ক্রিকেট দলের ভারত ভ্রমণের সময় থেকে হনুমন্ত সিং-কে অবহেলা করতে শুরু করলেন ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের মাননীয় সদস্যরা।

শেষ পর্যন্ত সেই অবহেলার চূড়ান্ত ফলশ্রুতি হিসেবে অস্ট্রেলিয়াগামী দল থেকে হনুমন্ত বাদ পড়লেন অদ্ভুত এক অজুহাতের হোতা হয়ে। কিন্তু আজ হাতে হাতে পাওয়া গেলো হনুমন্ত সিং-এর মতো খেলোয়াড়দের দল থেকে বাদ দেওয়ার ফল!

এ কথা তো আজ আর কেউই অস্বীকার করবেন না যে হনুমন্ত সিং-দের মতো খেলোয়াড় দলে থাকলে, আর যাই হোক, ভারত অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে অন্তত শেষের ঐ দু'টি টেস্টে অমনভাবে হারতো না......!

কিন্তু যাঁদের এ কথা বোঝার দরকার সবার আগে, তাঁরা যে বুঝেও বুঝবেন না......!! সুতরাং হনুমন্ত সিং-এর মতো খেলোয়াড়রা অবহেলিত হবেনই।

সম্পাদিকা—জয়ন্তী সেন
বসুমতী (প্রাঃ) লিঃ-এর পক্ষে ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কালকাতা-১২
বসুমতী প্রেস হইতে শ্রীসুকুমার গুহমজুমদার কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বসুমতীর শাস্ত্র-প্রচার গ্রন্থরাজি

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা :

(মূল, ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত)

প্রামাণ্য অনুবাদ—সহজ, সরল, প্রাঞ্জল, প্রাণময়। বিশুদ্ধ সংস্করণ। সুন্দর বোর্ডে বাঁধা। মূল্য : ২-০০ টাকা।

গীতা গ্রন্থাবলী :

(পঞ্চবিংশতি গীতার সমাহার)

মূল সংস্কৃত ও সরল বঙ্গানুবাদ। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা যেমন মহাভারতের সার, এই গীতাগুলি তেমনি সর্বশাস্ত্রের সারাৎসার। হারীত, দেবী, যম, বৈষ্ণব, তুলসী, অবধূত, জীবন্মুক্তি, ষড়্জ, হংস, মঙ্কি, গীতাসার, পিতৃ, পৃথিবী, সপ্তশ্লোকী, রাম, পরাশর, শান্তি, শিব, ভগবতী, বোধ্য, গর্ভ, পাণ্ডব, উত্তর, রাস, শ্রীমদ্গীতাসার—এই পঞ্চবিংশতি গীতার সমাবেশ, প্রতিটি ধর্মপ্রাণ ব্যক্তির অবশ্যপাঠ্য গ্রন্থ। রেক্সিন ও বোর্ডে বাঁধা। মূল্য : ৫-০০ টাকা।

উপনিষদ গ্রন্থাবলী :

১ম খণ্ড : ঐতরেয়, কৈবল্য, কঠক, নৃসিংহতাপনী।

২য় খণ্ড : শ্বেতাশ্বতর, পরমহংস, সন্ন্যাস, নীলরুদ্র, চূলিক, আরুণেয়, কণ্ঠশ্রুতি, জাবাল, পিণ্ড, আত্ম, ষটচক্র, ভৃগু, শিক্ষা, ব্রহ্মবিদ, নারদ, পরিব্রাজক, পৈঙ্গল, তুরীয়াতীত, বাসুদেব, শাণ্ডিল্য, নারায়ণ (ক), নারায়ণ (খ)।

৩য় খণ্ড : ঈশ, কেন, প্রশ্ন, মুণ্ডক, মাণ্ডুক্য, তৈত্তিরীয়, পাশুপত-ব্রহ্ম, প্রাণাগ্নিহোত্র, ভাবন, গরুড়, শ্রীরামপূর্বতাপনীয়, শ্রীরামোত্তরতাপনীয়, পঞ্চব্রহ্ম, কালাগ্নিরুদ্র, বাজসনেয়, রামরহস্য, গোপালপূর্বতাপনীয়, গোপালোত্তরতাপনীয়, কৌষীতকি, অমৃতবিন্দু, কালিকা, সর্বসার ও অমৃতনাদ। কাপড় ও বোর্ডে বাঁধা। মূল্য : প্রতি খণ্ড—৪-০০ টাকা।

ছান্দোগ্য-উপনিষদ :

সামবেদের তাণ্ড্যশাখার ছান্দোগ্যব্রাহ্মণের অন্তর্গত। মূল সংস্কৃত ও বঙ্গানুবাদ। মূল শ্রুতি ও শ্রুতির অনুবাদ। শঙ্করাচার্যের মহাভাষ্য, শাঙ্কর ভাষ্যের সরল অনুবাদ। তথ্যপূর্ণ-জ্ঞানগর্ভ ভূমিকা সম্বলিত বৃহদায়তন গ্রন্থ। ৮১২ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। শাস্ত্র প্রচারোদ্দেশ্যে এখনও নামমাত্র মূল্যে বিক্রয় হইতেছে। মূল্য—৬-০০ টাকা।

সাংখ্য-দর্শন :

মহর্ষি কপিলকৃত : উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় অনূদিত। সাংখ্যদর্শন সর্ব দর্শনের সার বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। মূল্য—২-০০ টাকা।

বৈশেষিক দর্শন :

মহর্ষি কণাদ প্রণীত। বোর্ড বাঁধাই। মূল্য—৩-০০ টাকা।

জৈমিনির মীমাংসা-দর্শনম্ :

॥ পরমর্ষি জৈমিনি বিরচিত : মূল ও বঙ্গানুবাদ ॥

প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডে—পারমর্ষ সূত্র, পূর্ব মীমাংসা, বেদার্থবিচার, ধর্ম মীমাংসা, জৈমিনি সূত্র, পূর্বতন্ত্র, জৈমিনি সূত্রের আক্ষরিক অর্থ, শ্রীমৎ শবর স্বামীর ভাষ্যের ভাবার্থানুবাদ, কর্মকাণ্ডের পুনঃ প্রবর্তক কুমারিল ভট্টের শ্লোকবার্তিক ও তন্ত্রবার্তিক টীকা-বিষয়ক পাদটীকা-সমন্বিত। পণ্ডিত ভূতনাথ সপ্ততীর্থের দীর্ঘকালের সাধনায় অনূদিত, দুই খণ্ডে সম্পূর্ণ এই বৃহদায়তন গ্রন্থের মূল্য প্রতি খণ্ড—৮-০০ টাকা।

শ্রীশ্রীগুরুশাস্ত্রম্ :

(বিবিধ তন্ত্র ও পুরাণাদি হইতে গুরু-শিষ্যের কর্তব্যাকর্তব্যাদি, দীক্ষা প্রণালী, গুরুপূজা, স্তোত্র, পুরশ্চরণ প্রভৃতির অপূর্ব সঙ্কলন।)

গুরুগীতা, গুরুতত্ত্বম্, দীক্ষাপদ্ধতি, শ্রীগুরু, মন্ত্রমালা প্রভৃতি অধ্যায়ে বিভক্ত। মূল্য—৩-০০ টাকা।

মহানির্বাণতন্ত্র :

(সর্ব দেবদেবীর মন্ত্রকোষ ও শিবতত্ত্ব-প্রদীপিকা-সম্বলিত)

মূল সংস্কৃত, বঙ্গানুবাদ, ব্যাখ্যা, পাদটীকা-সমন্বিত বৃহদায়তন দুর্লভ গ্রন্থ। তন্ত্রশাস্ত্রের সার। পঞ্চমকার সাধনার নিগূঢ় মর্ম, তন্ত্রসাধনার গুহ্যতত্ত্ব উদ্ঘাটিত। কাপড় ও বোর্ডে বাঁধা। মূল্য—১০-০০ টাকা।

হঠযোগ প্রদীপিকা :

(যোগশাস্ত্রের হঠযোগ সাধন গ্রন্থ মূল ও সরল বঙ্গানুবাদ। শ্রীমৎ স্বাত্মারাম যোগীন্দ্র প্রণীত ও শ্রীমৎ জ্ঞানানন্দ স্বামী সম্পাদিত।) মূল্য—৩-০০ টাকা।

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড ॥ ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলিকাতা - ১২

Thrusday, 15th February, 1968 SAPTAHIK BASUMATI REGD. No. C71
PRICE : 30 Paise GRAM : "BASUMATI" PHONE : 34-7771, 72, 73, 74

মহাকাশ যান হ'তে

হাঁ, সব স্বাভাবিক আছে।
যন্ত্রগুলো চমৎকার কাজ করছে।
আকাশ গাঢ় কালো নীল। অত কোথায় সূর্য্যের আলোতেও
তারাগুলো আগুনের মত জ্বলছে।

এখন ভারতের ঠিক উপর দিয়ে যাচ্ছি —
ঐ মশলার দেশটা নিচে দেখা যাচ্ছে — ঐ দূরে মশলার
দ্বীপপুঞ্জ SPICE ISLANDS চোখে পড়ছে। এসব স্থান হতেই
হাজার বছর ধরে পৃথিবীর সবজাতি মশলা নিয়ে যাচ্ছে।
আর,--- হাঁ, হঠাৎ মনে পড়ে গেল-----

এখান থেকেই সব চাইতে সেরা ভারতের গুঁড়ো মশলা
(কুকমী) কলকাতা হতে তৈরী হয়ে ভারতের সর্ব্বত্র
ছড়িয়ে পড়ছে!

কুকমী
বাজারের সেরা
গুঁড়ো মশলা

গ্রাম : "স্পাইসমার্ট" মিল-কাশীপুর ফোন: ৩৩-১২০২, ৩৩-২০৮১

নিজস্ব মিলে বৈজ্ঞানিক প্রথায় প্রস্তুত
'কুকমী'—সর্বাধিক বিক্রীত গুঁড়ো মশলা
পনের লক্ষ প্যাকেট মাসিক বিক্রয়
১২৫ বৎসরের অধিক প্রাচীন ও বর্তমানে মশলার বৃহত্তম প্রতিষ্ঠান

16 FEB 1968

[সা]প্তাহিক বসুমতী

চরম বিশৃঙ্খলার মধ্যে বিধানমণ্ডলীর যুক্ত অধিবেশন

স্পীকারের পূর্বতন রুলিং বহাল : সর্বস্তরে অচলাবস্থা

: ৩৬শ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ৯ই ফাল্গুন, ১৩৭৪ বঙ্গাব্দ] OLDEST WEEKLY OF NORTH INDIA [72nd year, No. 36, 22nd Feb., 196

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয়	...	২২৪৩
আজকের মানুষ	...	২২৪৪
বাংলাদেশ আর পূর্ববাংলার কবি (প্রবন্ধ)	— নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়	২২৪৫
বঙ্গদর্শন	...	২২৪৭
ভারতদর্শন	...	২২৫০
আন্তর্জাতিক	...	২২৫৩
মেঘনা পারের কবিতা		
একসার জবলন্ত নাম	— হাসান হাফিজুর রহমান	২২৫৬
নিষ্ঠুর বিদ্রোহ	— আবদুর রশীদ ওয়াসেকপুরী	২২৫৬
হৃদয়ে হৃদয় ছুঁয়ে	— শামসুর নাহার বেগম	২২৫৬
২১শে ফেব্রুয়ারী, পূর্ব দেশ	— বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	২২৫৭
প্রতিদিন আমি	— কল্যাণকুমার দাশগুপ্ত	২২৫৭
জন্মার মায়ের মুখ পদ্মায় মেঘনায়	— জয়ন্তী সেন	২২৫৭
ঢেউ	— আয়ুব আলী মোল্লা	২২৫৭

রহস্য গল্প। খুনের গল্প। ডাকাতির গল্প। এ্যাডভেঞ্চারের গল্প।

সদ্য প্রকাশিত হইল।

শিশু-সাহিত্যের সম্রাট

হেমেন্দ্রকুমার রায়ের

গ্রন্থাবলী

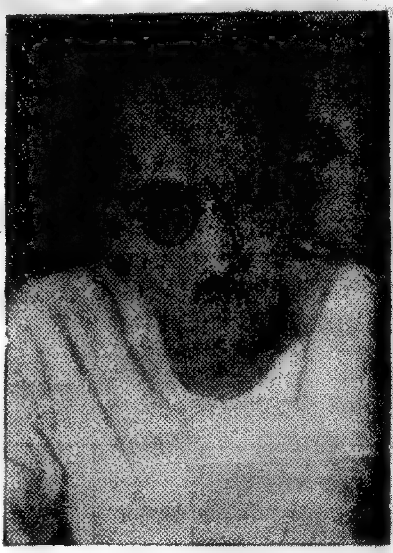

শিশু ও কিশোর-কিশোরীদের জন্য লেখা—কিন্তু হেমেন্দ্রকুমারের রচনা আবালবৃদ্ধবনিতা পড়ে থাকেন। হেমেন্দ্রকুমারের ছখানি সাড়াজাগানো উপন্যাস এই সুবৃহৎ গ্রন্থাবলীতে স্থান পেয়েছে।

১। যকের ধন ২। প্রদীপ ও অন্ধকার ৩। রহস্যের আলোছায়া
৪। ক্ষুদিরামের কীর্তি ৫। চাবি ও খিল
৬। একরাত্রি মাত্র ৭। এক গুপ্ত রহস্য
ও গোয়েন্দা গল্প।

পৃষ্ঠা সংখ্যা ২১৬
মূল্য মাত্র ছয় টাকা

বসুমতী প্রাঃ লিঃ
কলিকাতা-১২

অবিলম্বে অর্ডার পেশ করুন !!

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
সপ্তাহের বোঝা ...	— কৃত্তিবাস ওঝা	২২৫৮
বঙ্গভাষার অন্তরেখা (প্রবন্ধ) ...	— মৈত্রেয়ী দেবী	২২৬০
রবীন্দ্রনাথ ও সুভাষচন্দ্র (ধারাবাহিক প্রবন্ধ)	— শঙ্করীপ্রসাদ বসু	২২৬৩
বাটোয়ারা (গল্প) ...	— স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়	২২৬৭
যা দেখেছি, যা পেয়েছি (স্মৃতিচয়ন) ...	— সুধীরঞ্জন দাস	২২৭১
পূর্ব পাকিস্তান—একটি দৃষ্টিকোণ থেকে (প্রবন্ধ)	— সাগর বিশ্বাস	২২৭৫
রক্তের অক্ষরে লেখা (প্রবন্ধ) ...	— দীপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	২২৮০
ভিয়েতনাম : ঝড়ের কেন্দ্রে (প্রবন্ধ) ...	— বরুণ রায়	২২৮২
পলিমাটি (পূর্ববঙ্গের গল্প) ...	— সিরাজুল ইসলাম	২২৮৬
ঝড় (ধারাবাহিক উপন্যাস) ...	— জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী	২২৯০
পূর্ব পাকিস্তানের নাটক ...	— কল্পতরু সেনগুপ্ত	২২৯৫
রূপাজগৎ	... ...	২২৯৭
খেলাধুলা ...	— শান্তিপ্রিয়	২৩০১

আমাদের বই পাঠককে তৃপ্তি দেয় : পাঠাগারের গৌরব বৃদ্ধি করে :
উপহারেও নয়ন-মন-মুগ্ধকর

আশু প্রকাশনার অপেক্ষায় :
গজেন্দ্রকুমার মিত্রের নূতন উপন্যাস

শুভ বিবাহ কথা ৩·০০

বনফুল-এর উপন্যাস

প্রচ্ছন্ন মহিমা ৪·০০
ত্রিবর্ণ ১০·০০

স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের

অপরাহ্নের আলো ৪·০০

মহাশ্বেতা দেবীর
ঐতিহাসিক পটভূমিকায় লিখিত উপন্যাস

অমৃত সঞ্চয় ১০·০০

সরোজকুমার রায়চৌধুরীর

অনুষ্টুপ ছন্দ ৫·০০

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের

বাসরলগ্ন ৯·০০

শচীন্দ্র মজুমদারের

লীলা মৃগয়া ৩·০০

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর

নীল রাত্রি ৩·৫০

প্রেমেন্দ্র মিত্রের উপন্যাস

পরাশর ২·৭৫
সৌদামিনী ৩·০০

চিত্রিতা দেবীর

দুই নদীর তীরে ৬·৭৫

আশাপূর্ণা দেবীর

মেঘপাহাড় ৩·০০
কাঁচ পুঁতি হীরে ৯·০০

সঞ্জয় ভট্টাচার্যের

সৃষ্টি ৫·৫০

বুদ্ধদেব বসুর

হে বিজয়ী বীর ৩·৫০

প্রশান্ত চৌধুরীর

অগোচোতি ৩·২৫

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের

কিংশুর গান ৩·৫০

বিমল মিত্রের

সুয়োরাণী ৩·২৫

কনাদ গুপ্তের

পূর্ব-মীমাংসা ২·৫০

সুশীল রায়ের

পদ্মিনী ২·৫০

উপহারযোগ্য কয়েকখানি কবিতা গ্রন্থ
বিশু মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত

কবি-প্রণাম ৫·০০

[নবীন ও প্রবীণ বহু বিদগ্ধজনের কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য]

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের

কবি-চিত্ত ৫·০০

প্রেমেন্দ্র মিত্রের

কখনো মেঘ ৪·০০
ফেরারী ফৌজ ২·০০
সাগর থেকে ফেরা ৩·৫০

আনন্দগোপাল সেনগুপ্তের

সেই আমি সাংবাদিক ৩·০০

সঞ্জয় ভট্টাচার্যের

স্বনির্বাচিত কবিতা ৪·০০

ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাঃ লিঃ : ৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলি-৭
ফোন : ৩৪-২৬৪১

সাপ্তাহিক বসুমতী

সম্পাদিকা
জয়ন্তী সেন

৭২ বর্ষ ঃ ৩৬শ সংখ্যা—মূল্য ঃ ৩০ পয়সা বাংলা ভাষায় দ্বিতীয় সর্বাধিক প্রচারিত সাপ্তাহিক পত্রিকা
বৃহস্পতিবার, ৯ই ফাল্গুন, ১৩৭৪ বঙ্গাব্দ

PRICE : 30 Paise
Thursday, 22nd February, 1968

রাষ্ট্রপতির শাসনের বিলম্ব কেন ?

একান্ত অঘটন না ঘটলে পশ্চিমবঙ্গের কোয়ালিশন মন্ত্রিসভার পতন অবধারিত—এই কথা আমরা গত সপ্তাহে বলেছিলাম। এখন স্বীকার করে নিতে হবে, অঘটন কিছু ঘটেছে, তা নইলে ১৪ই ফেব্রুয়ারী বিধানসভার অধিবেশনের অব্যবহিত পরেও কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা কিভাবে গদিনশিন থাকতে পারে!

আসলে ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ মুখে এতোদিন যাই বলে থাকুন না কেন, নিশ্চিত পতনের মুখে এখন পূর্ব প্রতিশ্রুতি বিস্মৃত হয়ে অন্য পথে চলছেন। কংগ্রেস ও পি-ডি-এফ দলের পক্ষ থেকে এতোদিন সোচ্চারে ঘোষণা করা হয়েছিল, যে মুহূর্তে জানা যাবে—তাদের মন্ত্রিসভা সংখ্যালঘু হয়ে গেছে তখনই মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করবে, একদিনের জন্যও গদি আঁকড়ে থাকবে না।

যখন এই লম্বা-চওড়া বুলি আওড়ান হচ্ছিল, তখন এই ধারণা ক্ষমতাসীন নেতৃবৃন্দের মধ্যে দৃঢ়বদ্ধ ছিল যে কংগ্রেস দলটি অভগ্ন ও অটুট। এই ধারণাবশেই অধিবেশনের বেশ কিছু আগে স্পীকারের বিরুদ্ধে অনেক অনাস্থা প্রস্তাব পড়েছিল এবং সরকারপক্ষের আশা ছিল যে, স্পীকার পূর্বের মতো রুলিং প্রদান করলে নতুন সভাপতির আমদানী করা হবে।

বিধানসভার অধিবেশন ১৪ই ফেব্রুয়ারী বসেছিল। জাঁকজমকপূর্ণ শোভাযাত্রা পরিত্যাগ করে রাজ্যপাল পেছনের দরজা দিয়ে বিধানসভায় প্রবেশ করেছেন এবং স্পীকার তাঁর পূর্ব রুলিং বহাল রেখেছেন। কিন্তু স্পীকারের রুলিং প্রদানের ফলে সংবিধানগত প্রশ্নের মীমাংসা করার জন্যে যে-সব উপায়ের কথা আগে শোনা গেছিল, এখন রাজনৈতিক পরিস্থিতি একেবারে পরিবর্তিত হওয়ায় সে ব্যাপারে সরকারপক্ষের তেমন সাড়াশব্দ নেই।

রাজনৈতিক পরিস্থিতির জটিলতা গভীরতর হয় সেদিন, যেদিন বিধানসভায় (১৪ই ফেব্রুয়ারী) দেখা যায়—কোয়ালিশন মন্ত্রিসভার মোট সদস্য ১০৬ বলে বলা হলেও ১৩৩-এর বেশি নয়।

অধিবেশনের দিন ভারতীয় জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের সদস্যগণ উপস্থিত হন নি। তাঁদের অনুপস্থিতির কারণ এই যে, তাঁরা মনে করেন সংখ্যালঘু মন্ত্রিসভার পক্ষে রাজ্যপালের ভাষণদান অনুচিত। আমরাও মনে করি, অধিবেশন বসার পূর্বে রাজ্যপালের কাছে ভারতীয় জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের সদস্যরা উপস্থিত হয়ে মন্ত্রিসভার প্রতি তাঁদের আস্থা প্রত্যাহার করে নেওয়ার ফলে সরকার সংখ্যালঘু তা প্রমাণিত হয়েছিল। অথচ অজয়-মন্ত্রিসভাকে বিধানসভার বাইরে যেভাবে রাজ্যপাল বরখাস্ত করেছিলেন, কোয়ালিশন মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে তিনি সেরূপ কার্যকর কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করেন নি। প্রসঙ্গত বলা প্রয়োজন, বিধানসভা আহ্বান করার তারিখ ঘটিত প্রশ্ন আজো উঠলেও—একথা ঠিক যে, মন্ত্রিসভাই বিধানসভা আহ্বানের দিনস্থির করতে পারেন। অবশ্য যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভার বেলায় রাজ্যপাল তা মানেন নি। তিনি বর্তমান কোয়ালিশন মন্ত্রিসভাকে রক্ষা করার জন্যই স্বনিয়ম বদলে ফেলে বিধানসভার অধিবেশনের ফলাফল দেখতে চেয়েছিলেন। কিন্তু অবস্থার বিপাকে সমস্ত সংবাদপত্রের হিসেব-নিকেশে কোয়ালিশন মন্ত্রিসভার সংখ্যালঘুত্ব প্রমাণিত হলেও, জানি না রাজ্যপাল সংবিধানের কোন নির্দেশে সেই মন্ত্রিসভাকে এখনো টিকিয়ে রেখেছেন। হয়তো অঘটন কিছু ঘটতে পারবে পতন থেকে উদ্ধারের আশা আছে। কিন্তু সেই অঘটন কি? সেই অঘটন হচ্ছে, কোয়ালিশন সরকার একটু সময় পাক, যাতে ছলে-বলে-কৌশলে দলত্যাগ ঘটিয়ে দলবৃদ্ধি করতে পারে। এই ধরণের আচরণ সংবিধানের উপর আক্রমণের তুল্য বলেই আমরা মনে করি। আরো মনে করি, যে মন্ত্রিসভা সংখ্যালঘু বলে সারা পৃথিবীর লোক জানলো—(বিধানসভার হাজিরাখাতায় তার প্রমাণ লিপিবদ্ধ) তাকে টিকিয়ে রাখার জন্য কেন্দ্রের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীচ্যবন পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রিসভাকে বৈধ বলে লোকসভায় ঘোষণা করলেন কোন্ সংবিধানিক শক্তিতে? উপরন্তু তিনি রাজ্যপালের কাজকর্মেরও সমর্থন করেছেন। অথচ আমরা ভাবতে পারি না, সংখ্যালঘু কোয়ালিশন মন্ত্রিসভাকে এমনভাবে বাঁচিয়ে রাখলে সংবিধানের মর্যাদা কতটুকু রক্ষা পাবে। এই কারণে মনে হয়, পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান রাজনৈতিক অবস্থা ও জটিল সাংবিধানিক প্রশ্ন থেকে মুক্তি পাবার একমাত্র পথ অবিলম্বে রাষ্ট্রপতির শাসন বহাল করা ও তারপর জনসাধারণের রায় গ্রহণ করা। কিন্তু দলীয় স্বার্থকে উপেক্ষা করে সংবিধানের সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য উপরি উক্ত পথ অবলম্বন করা কি সম্ভব হবে!

সম্পাদকীয়

আজকের মানুষ

'দি কিং ইজ ডেড, লঙ লিভ দি কিং।' কথাটা শুধু ইংল্যাণ্ডের রাজা (বা রাণীর) ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য নয়, সকল দেশের সকল রাষ্ট্রপ্রধানের বেলায়ই খাটে। কারণ, সর্বোচ্চ ক্ষমতার আসনটা দীর্ঘদিন শূন্য রাখা চলে না, একজন বিদায় নিলে আরেকজনকে দিয়ে তা পূর্ণ করতে হয়। শুধু রাষ্ট্রপ্রধানই বা বলি কেন, একটা সংস্থা বা সংগঠনের প্রধানের পদ খালি রেখে কি সংগঠনের কাজ সুষ্ঠুভাবে চালানো যায়? পরিবারের কর্তার অবর্তমানে সাময়িকভাবে হলেও তো পরিবারের সমস্ত দায়িত্বভার একজনকে গ্রহণ করতে হয়। কেউ হাল না ধরলে মাঝদরিয়া বেয়ে নৌকো চলবে কী করে? দীনদয়াল উপাধ্যায়ের জায়গায় তাই অটলবিহারী বাজপেয়ীকে দেখা যাচ্ছে। গত সপ্তাহে রহস্যজনকভাবে শ্রীউপাধ্যায়ের মৃত্যু ঘটেছে, বাজপেয়ী তাই জনসঙ্ঘের সভাপতির পদ পেয়েছেন।

শ্রীবাজপেয়ীর খ্যাতি অবশ্য সারা ভারতেই ছড়িয়ে পড়েছে। এবং তাঁর সুনাম আজ জনসঙ্ঘের সভাপতির পদ লাভ করেছেন বলে নয়, পার্লামেণ্টে তাঁর প্রতিটি সুচিন্তিত ভাষণের কারণে। জনসঙ্ঘের সভাপতি হওয়া বরং তাঁর পক্ষে কিছু অসম্ভব নয়, কারণ সংগঠনটির জন্ম থেকেই এর সঙ্গে তিনি ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত রয়েছেন, সেদিন থেকেই তিনি সংস্থাটির একজন সক্রিয় এবং উৎসাহী সদস্য। বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কাজ নিয়ে তিনি জনসঙ্ঘকে গড়ে তুলেছেন, উত্তর ভারতে সংগঠনটির প্রভাব বৃদ্ধি করার মূলে শ্রীবাজপেয়ীর অবদান অসামান্য। গোড়ায় তিনি কিছুকাল জনসঙ্ঘের প্রথম সভাপতি ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির প্রাইভেট সেক্রেটারী হিসেবে কাজ করেছেন। দলের কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদের সদস্যপদ লাভ করেন তিনি ১৯৫৪ সনে, তারপর মাত্র দু' বছরের মধ্যেই দলের জেনারেল সেক্রেটারী হলেন।

শ্রীবাজপেয়ীর জন্ম গোয়ালিয়রে। কানপুরে শিক্ষা শেষ করে তিনি বেশ কিছুকাল সাংবাদিকতা করেন। কবিতা দিয়েই শুরু অবশ্য। প্রথমে 'রাষ্ট্রধর্ম' নামে একটা মাসিকপত্রের সম্পাদক, পরে সাপ্তাহিক 'পাঞ্চজন্য' তাঁর সম্পাদনায় বেরোতে থাকে। তারপরে লক্ষ্ণৌ-এর একটা দৈনিক সংবাদপত্রের সম্পাদক এবং সবশেষে দিল্লীর আরেকটা দৈনিকের। লেখনীর মাধ্যমেই তাঁর রাজনৈতিক আদর্শের পরিচয় পাওয়া যায়। গোড়ায় তাঁর গোঁড়ামি যথেষ্ট ছিল, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আদর্শে তাঁর অবিচল আস্থা ও বিশ্বাস ছিল সেদিন। এবং আর এস এস-এর সঙ্গে তাঁর মতাদর্শগত আত্মীয়তার কারণে তিনি জনসঙ্ঘের প্রতি আকৃষ্ট হন। বস্তুত তাঁর প্রকাশিত বহু প্রবন্ধেই তাঁর

বাজপেয়ী

রাজনৈতিক আদর্শের পরিচয় মিলেছে এবং এই তরুণ চিন্তাবিদ ও বুদ্ধিজীবীকে পেয়ে দলের মর্যাদা অবশ্যই বেড়েছিল।

'৫৭ সনে নির্বাচনে জয়লাভ করে শ্রীবাজপেয়ী যেদিন লোকসভায় প্রবেশ করেন, সেদিন থেকেই জাতীয় নেতা হিসেবে তিনি স্বীকৃতি লাভ করেন। সেদিন স্বয়ং জওহরলাল পর্যন্ত শ্রীবাজপেয়ীর বাগ্মিতার সবিশেষ প্রশংসা করেছিলেন। কি জাতীয় কি আন্তর্জাতিক —প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নেই শ্রীবাজপেয়ী তাঁর চিন্তাধারার মৌলিকত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন। যখনই লোকসভায় কোন জরুরী প্রশ্ন উঠেছে, তখনই তিনি সে আলোচনায় অংশ গ্রহণ করে তাঁর দলের মতামত পরিষ্কারভাবে ব্যক্ত করেছেন। তাঁর দলের দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে বিচার করে যখন তিনি ভারত সরকারের ভূমিকা ভ্রান্ত মনে করেছেন, তখনই তিনি কঠোর ভাষায় সরকারের সমালোচনা করেছেন।

চিন্তাধারার বলিষ্ঠতা, অমায়িক স্বভাবের কারণে শ্রীবাজপেয়ী আজ জননেতার সম্মান পাচ্ছেন। এ সম্মান অবশ্য আরেকটি প্রধান কারণেও। জনসঙ্ঘ দলটি প্রগতিশীল মহলে একটা সাম্প্রদায়িক সংগঠন হিসেবে পরিচিত। বিজ্ঞানবাদী এবং সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী সুধীসমাজে তাই জনসঙ্ঘের প্রভাবও বিশেষ নেই। কিন্তু তবুও উত্তর ভারতের একটা বিরাট এলাকায় জনসঙ্ঘের প্রভাব-প্রতিপত্তি অসামান্য। চতুর্থ সাধারণ নির্বাচনে এ-দলের সাফল্যও কংগ্রেস এবং বিরোধী দলগুলির কাছে প্রায় অভাবনীয় ছিল। নির্বাচনে জনসঙ্ঘের এ অভূতপূর্ব সাফল্যের পেছনে শ্রীবাজপেয়ীর অবদান যে অসামান্য—একথা অস্বীকার করার উপায় নেই।

শ্রীঅটলবিহারী বাজপেয়ী '৬২—'৬৭ পর্যন্ত ছিলেন রাজ্যসভার সদস্য। শেষ নির্বাচনে আবার জয়লাভ করে তিনি লোকসভার সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন। তবে শ্রীবাজপেয়ীর সাফল্যের মূলে তাঁর সংগঠনের ভূমিকা যতখানি, তার চেয়ে তাঁর নিজের কৃতিত্ব কিছু কম নয়। জনসঙ্ঘের গোঁড়া সাম্প্রদায়িকতা থেকে শ্রীবাজপেয়ী নিজেকে অনেকাংশে মুক্ত রেখেছেন। শুধু তাই নয়, স্বতন্ত্র কিম্বা পাতিতপন্থীদের সঙ্গে দলের একটা আত্মিক যোগাযোগ গড়ে তোলার জন্যে শ্রীবলরাজ মাধোক যে যত্নবান হয়েছেন শ্রীবাজপেয়ী তার ভয়ানক বিরোধী। তিনি বরং সাধারণ শত্রু কংগ্রেসের বিরুদ্ধে প্রগতিশীল দলগুলির সঙ্গে এক মোর্চায় মিলিত হবেন, পায়ে পায়ে তাল মিলিয়ে যাবেন, তবুও জনসঙ্ঘকে প্রতিক্রিয়াশীলতার পথে পিছু হটার পথে নিয়ে যাবেন না। তার মানে অবশ্য এই নয় যে, শ্রীবাজপেয়ীর নেতৃত্বে জনসঙ্ঘ একটা প্রগতিশীল সংগঠনে উন্নীত হবে। তা যদি নাও হয়, তবুও কি শ্রীবাজপেয়ী তাঁর ব্যক্তিগত প্রগতিশীল আদর্শ জলাঞ্জলি দিতে রাজী হবেন?

বাংলাদেশ আর পূর্ববাংলার কবি

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

জন্মের সংগে সংগে মানুষ আসে মায়ের কোলে আর স্বদেশের আলোয়। তাই মা আর মাতৃভূমিই তার প্রথম আরাধ্য, প্রথম ধ্যান।

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী ! ভারতবর্ষের আদি কবি এই স্বদেশ-বন্দনার মন্ত্র শুনিয়েছিলেন কতকাল আগে। কিন্তু জাতি-ধর্ম-গোষ্ঠীর নানা বাধা যুগযুগান্তর ধরে পার হয়ে, আত্মদ্বন্দ্বে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে—এই স্বদেশচেতনাকে আমরা ভারতীয়েরা অধিকারের লাভ করেছিলাম ইংরেজ আসবার পরে। ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ চক্রান্তের পটভূমিকায় বাঙালীর দেশ-বোধের সর্বাত্মক উদ্বোধন ঘটল : "আজ বাংলা দেশের হৃদয় হতে কখন আপনি, তুমি এই অপরূপ রূপে বাহির হলে জননী।" আর মনে হল, "আমার এই দেশেতে জন্ম, যেন এই দেশেতেই মরি !" রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর 'বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা' সেদিনের স্বদেশ-সাধনার এক অপূর্ব অভিজ্ঞানপত্র !

এই স্বদেশ-দর্শন আমাদের ঘটল দুদিক থেকে। একদিকে তার মহিমার অনুধ্যান—তার ইতিহাস—ঐতিহ্য, তার শৌর্য-বীর্য-গৌরব-মনীষা-প্রতিভার উত্তরাধিকারবোধ—যেমন সত্যেন দত্ত গর্ব-ভরে বলেছেন—"আমাদের সেনা যুদ্ধ করেছে সজ্জিত চতুরংগে/দশাননজয়ী রামচন্দ্রের প্রপিতামহের সংগে।" এবং এই ইতিহাস বলেই "বাঘের সংগে যুদ্ধ করিয়া আমরা বাঁচিয়া আছি/আমরা হেলায় নাগেরে খেলাই, নাগেরি মাথায় নাচি।" অন্য দিকে স্বদেশের এক বস্তুময় সৌন্দর্য, এক অপূর্ব মৃন্ময়রূপ—এতদিন যার দিকে "অনাদরে চাইনি ফিরে, ভেবে-ছিলাম দুঃখিনী মা—" সেই অনাদৃতা জন্মভূমির ঐশ্বর্যমূর্তিও অপরূপ হয়ে ফুটে উঠলো আমাদের চোখের সামনে :

"ভাঁটফুলে তোর আগুন ঝাঁটার,
জলছড়া দেয় বকুল তার
জটশালিকে বন্দনা গায়,
নকীব হেঁকে চাতক ধায়।
নাগকেশরে চামর করে,
কোয়েল তোয়ে সংগীতে
অভিষেকের বারি ঝরে নিত্য
চেরাপুঞ্জিতে।"

রবীন্দ্রনাথ - দ্বিজেন্দ্রলাল - রজনী-কান্ত থেকে সত্যেন্দ্রনাথ-যতীন্দ্রমোহন বাগচী - কুমুদরঞ্জন - মোহিতলাল-নজরুল পার হয়ে জীবনানন্দের "রূপসী বাংলা" কত অনুজ কবিদের দৃষ্টিতে মমতার প্রত্যয়ে বন্দনার তিলোত্তমা হয়ে উঠল। 'সার্থক জনম আমার, জন্মেছি এ দেশে'—এ মাটির সব তুচ্ছ সামগ্রী, প্রতিটি তৃণপর্ণ, প্রতিটি পাখির ডাক, প্রত্যেক প্রজাপতির পাখার অনুরণন—কবির কাছে আনল আনন্দিত নন্দনের সংবাদ। বাংলা দেশের লক্ষ্মীপ্যাঁচা, তার হেমন্তের মাঠ, তার শীতের রাতে রেশমের মতো 'রোমে শুভ্র মাখা ইঁদুর'—তার রূপসার ঘোলাজলে ডিঙা বাওয়া কিশোর, তার রাঙা মেঘে সাঁতার কাটা বকের পাল, তার রূপশালী ধানভানা মেয়েটি, 'তাজা আতার ক্ষীরের মতো পুবের বাতাসের ছোঁয়া, তার তালবাকলের রেখায় রেখায় গড়িয়ে পড়া বৃষ্টি, তার কলকে ফুলের কুঞ্জবনে 'ঘাস-গেলাদের' আলো—সব মিলে এক গীতল চিত্রল বাংলা দেশ যেন কবি-সাহিত্যিক-শিল্পীর ভাবলোকে নবজন্ম লাভ করল। বাঙালীর গরিব ঝাঁপিটিতে দেখা দিল বিশ্বলক্ষ্মীর সোনার কৌটা।

প্রতিবেশী পূর্ববাংলার আধুনিক কবিরাও স্বদেশকে এই চিত্রময় সংগীতময় রূপলোকে কিভাবে বিভাসিত করে তুলেছেন, আজ তারই কিছু কিছু উদাহরণ তুলে ধরি। বাংলা দেশের এই চিরকালীন উত্তরাধিকারে কবি সৈয়দ আলী আহসান "আমার পূর্ব-বাঙলা"কে এইভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন :

"আমার পূর্ববাংলা একগুচ্ছ স্নিগ্ধ
অন্ধকারের তমাল
অনেক পাতার ঘনিষ্ঠতায় একটি
প্রগাঢ় নিকুঞ্জ
সন্ধ্যার উন্মেষের মতো
সরোবরের অতলের মতো
কালো কেশ মেঘের সঞ্চয়ের মতো
বিমুগ্ধ বেদনার শান্তি,
আমার পূর্ববাংলা বর্ষার অন্ধকারের
অনুরাগ
হৃদয় ছুঁয়ে যাওয়া সিক্ত নীলাম্বরী
নিকুঞ্জের তমাল কনকলতায় ঘেরা
কবরী এলো করে আকাশ দেখার
মুহূর্ত...
...অজস্র ফুলের বন্যা অফুরন্ত
ঘুমের অলসতায় চোখ বুজে
আসার মতো শান্তি
কাকের চোখের মতো কালো চুল
এলিয়ে
পানিতে পা ডুবিয়ে রাঙা-উৎপল
যার উপমা
হৃদয় ছুঁয়ে যাওয়া সিক্ত
নীলাম্বরীতে দেহ ঘিরে
যে দেহের উপমা স্নিগ্ধ তমাল—
তুমি আমার পূর্ববাংলা
পুলকিত সচ্ছলতায় প্রগাঢ় নিকুঞ্জ।"

রবীন্দ্রনাথ থেকে জীবনানন্দ পর্যন্ত বাংলা দেশের প্রতি সব অমর্ত্য-সৌন্দর্য-সচেতন চোখ মেলে অন্তরের অনুরাগে বাংলার বস্তুরূপকে প্রদীপিত করে তোলবার সমস্ত আকুলতা এর মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে। স্বদেশ সম্পর্কে শুধু একটা গম্ভীর আইডিয়ার অভিব্যক্তিই নয়—এ নীলাম্বরী শাড়িপরা শ্যামলী বাংলার প্রতি কোমল ভালোবাসার একটি অকৃত্রিম উৎসার।

এই মনোভঙ্গি থেকেই জনাব সৈয়দ আলী আহসান একটি 'বৃষ্টির' দিনে এমনি করে প্রকৃতির সংগে একাত্ম হয়ে যেতে পারেন, বাংলা দেশের প্রতি এই ভালোবাসা নিয়েই তাঁর সমস্ত সত্তা বৃষ্টির আনন্দে "একীভূত আনন্দ কুঙ্কুম" হয়ে উঠতে পারে :

"বৃষ্টির পৃথিবী একা যেন এক আদিম
সম্ভার
হঠাৎ পাহাড় যেন একমাত্র অরণ্যে
আকাশে।
একটি দুইটি পাখি সজীবতা পালকে
ও ঘাসে
আমার আনন্দ যেন বর্ণে আর বিন্যাসে
কুঙ্কুম।

অস্তের একাকী সূর্যে হৃদয়েতে রক্তের
সঞ্চার।
বরফ পাথর যেন দুচোখের বিস্তারিত
ঘাস
একক সন্ধ্যায় যেন বৃষ্টিস্বচ্ছ সব
উপহার।
কি আশ্চর্য পরিত্রাণ একমুঠো পলাশের
আর
আমার সমস্ত সত্তা—একীভূত আনন্দ
কুঙ্কুম॥"

এই কবিতায় অবশ্য বস্তু-তন্ময়তা মূলে কথা নয়, বৃষ্টির একটি ইমপ্রেশ্যন এখানে বাস্তব চিত্রধর্মিতাকে অতিক্রম করে অনুভূতির ঘনীভূত আনন্দ-কুঙ্কুমে নিস্তব্ধ হয়েছে। আবার এই বৃষ্টিকেই মাটি এবং মানুষের মমতার প্রত্যয়-সচেতনায় কবি সানাউল হক দেখছেন তাঁর "ধানকন্যার জন্য" কবিতায় ঃ

"তিনদিন তিনরাত অনর্গল
জলের মাদল
ঝির ঝির ঝির
হিমতাড়িত বুনো মেঘের দল
আকাশ ভেঙে নামল কল কল কল।
নামল নামল নামল
বৃষ্টি ঃ বৃষ্টি ঃ বৃষ্টি ঃ
কার্তিকের আইবুড়ো ধানের ক্ষেতে
রোদ শুকনো ডোবায়
রূপালী রেখা শান্তশ্রী নদীতে।
...খনার মুখে শুনেছি
কার্তিকের বৃষ্টি বৃষ্টি নয়, সোনা।
বিন্দু বিন্দু জল নয়, রতি রতি সোনা।
মাঠে মাঠে ধান হয় নাকি বোনা।
শুনেছি এ বৃষ্টি সুপ্রসন্ন দিনের
ইসারা—
ভাগ্যহত বাঙলার চাষীর জন্যে
ধানী সভ্যতার পুষ্টির জন্যে।
ধানকন্যে, আদিকালের জিবকাটা
মেয়ের
সেই অত্যাশ্চর্য আশ্বাস নিয়ে।
মানবেতিহাসের এক প্রান্তে দাঁড়িয়ে
প্রকৃতির পরিহাস অভ্যস্ত মন নিয়ে
তোমার স্বপ্নে আজও স্বপ্ন গড়ি,
সোনালী একঝলক হাসির জন্যে
মাথা কুটে মরি।
হে ধানকন্যে,
শুধু তোমার মুখ চেয়ে
তোমার সোনাদানায়
তোমাদের ঘর ভরে দেবে আশায়,
আমার দুর্লভ ছুটির এ কয়টা দিন
বৃষ্টির হাতে সঁপে দিলাম—
তোমার সোনালী চুলের গন্ধে
স্বপ্নের শিবির বাঁধলাম।"

এ যেমন ধানের স্বপ্ন, করুণাঘন প্রকৃতির উদ্দেশ্যে মানুষের চিরকালের কুড়োনো ভালোবাসার উৎসার, তেমনি আর একটি মাটির গভীর স্বাদের জন্য আকূতি—এক নিত্যকালের প্রাণ-রহস্যে হৃদয়ের স্পন্দন মিলিয়ে মগ্ন মৌনে ডুবে যাওয়া। যে জীবন প্রতিদিন আমাদের মুঠো থেকে স্খলিত হয়ে যাচ্ছে—যে সময় আমাদের ক্লান্ত করছে, জীর্ণ করছে, সেই জীবন আর সময়ের কাছ থেকে মুক্তির রহস্য, আনন্দিত নবীনায়নের সন্ধান এই প্রকৃতির অন্তর্লোকেই নিহিত। জীবধাত্রী বসুন্ধরার কাছে এই সন্ধান চেয়েছেন রবীন্দ্রনাথ, ঘাসের ওপরে শুয়ে থাকা জীবনানন্দের সেই লোকটি এরই স্বাদ চেয়েছে— "গভীর—গভীর"। আর—আরো কিছু বস্তুসাপেক্ষ হয়ে একালের পূর্ববাংলার তরুণ কবি ওমর আলী তাঁর 'পিপাসা' কবিতায় লিখেছেন ঃ

"লাউয়ের জাঙলার নীচে দোয়েল,
চড়ুই
পালকে শীতের শুষ্ক ধূলি মাখে,
জাঙলার ওপরে
পাতায় অস্থিরভাবে বেড়ায় এবং
পোকা ধরে
তাদের সতেজ শব্দে মুখরিত
ঝোপঝাড় ভুঁই ;
বাবলাগাছের মধ্যে ঘুঘু ডাকে, কাশ,
শরবনে টুনটুনি
নুপুর বাজায় যেন, কান পেতে শুনি।
সিম ও বেগুন গাছ, পেয়ারা ও কলা,
লেবু বরবটি গাছ চারদিকে,
বাড়ীকে আচ্ছন্ন করে আছে, বাড়ীটিকে
দিয়েছে সৌন্দর্য আর নিরিবিলি শান্তি,
দূরে মাঠ
পড়ে আছে শূন্য, সব মাষকলাই
তোলা হয়ে গেছে,
ছুটে গেলে খেয়াঘাট
পাওয়া যায়, বালুচর, ছোট ছোট গ্রাম
মায়াময়,
সবুজ গাছ ও ঝোপঝাড়ে ঢাকা শীতের
সময়,
কুহকে আচ্ছন্ন হয়, সকাল সন্ধ্যায়।

মাঠের কলাই তোলা দীর্ঘ শূন্যতার
লোকটি দাঁড়িয়ে বললো, এই মাঠে,
সবুজ ঘাসের পরে যদি
শুয়ে থাকতে পারতাম আমি নিরবধি,
পৃথিবীতে অন্য কাজ, দারিদ্র আমার
না থাকতো আর,
পৃথিবীর সৌন্দর্যকে নদীতীরে, বনে,
প্রান্তরে খুঁজে ফেরা
যেতো যদি, দেখা যেতো, গাছপালা
ঝোপঝাড়ে ঘেরা
শীতের সবুজ গ্রামে কার চারু হাত
স্পর্শ বুলিয়ে গেছে, সাদা জোছনা
রাখে সারারাত।"

প্রকৃতিকে এ শুধু ভালোবাসা নয়—এ বয়স্ক জীবনের সব ক্লান্তি, সব উদ্‌ভ্রান্তি থেকে আবার তরুণায়নের আকূতি—কুমুদরঞ্জন যাকে বলেছেন—শিথিল ফুলের কোরক হবার আকাঙ্ক্ষা সব পাপড়িতে। ওমর আলীও বলেছেন ঃ

"ছুটতে উজ্জ্বল চোখে বিচিত্র
প্রজাপতির পিছে,
তোমার বয়স যদি হতো ফের
আঠারোর নিচে।
নানান ফুলের মধ্যে আর গাছলতার
মধ্যে তুমি অনায়াসে
পারতে হারিয়ে যেতে, আম, বাবলা,
বটগাছের পাশে।"

কিন্তু শুধু দুচোখ ভরে সৌন্দর্য দেখা নয়, শুধু ধানকন্যার গান নয়, কেবল আমার বাংলার বন্দনা নয়, অথবা প্রকৃতির প্রাণ-চেতনায় একাত্ম হয়ে কৈশোরের নীল দিনগুলিতে ফিরে যাওয়াও নয়। এই বাংলা দেশ, তার পদ্মার কূল, তার ধান, তার পাটের ক্ষেত, তার ডাহুকের ডাক, তার নির্জন বন আর তার আকাশের চাঁদ কি আরো কোন ইঙ্গিত দেয় না। কোনো বৃহৎ জীবনের, কোনো মহৎ ব্যঞ্জনার, কোনো উদ্দীপ্ত চেতনার ? কবি আবদুল হাই মাশরেকির 'ডাক দিয়ে যাবো' তারই উত্তর। এ এক "চাঁদের" আকাঙ্ক্ষা—যা শান্তি, যা কল্যাণ, যা আনন্দ ঃ

"মানুষ সরল। নির্জন বন
চাঁদের মতন শান্তিকে পেতে প্রস্তুত মন।
ডাহুকের গান আর অঘ্রাণে ধানের
প্রাণ...।
...কারণ এ চাঁদ যারা চায়—তারা
ভাটিয়ালী গায়।
পদ্মার চরে ফসল ফলায়
আর চাঁদ শুধু শীর্ণ মুঠোয় তা
পেতে চায়।
সেখানে বাতাসে ঘুড়ি ওড়ানোর
ধান পাটক্ষেত প্রাণ জুড়োনোর।
সহজ কথারা গান কুড়োনোর
হৃদয়কে সেথা ডেকে নিয়ে যাও
চাঁদকে দেখাও।
সেখানে দাঁড়িয়ে সব মিলে এসো
শপথ কঠিন হাত উঠোনোর
ডাক দিয়ে যাই।
গান গেয়ে যাই চাঁদের আলোর
ফুল ফোটানোর
টান দিয়ে যাই বাঁধন ছেঁড়ার—
প্রাণ দিয়ে যাই।

স্পীকার কর্তৃক বিধানসভা মূলতুবী ঘোষণা করার পর বিধানসভা ভবনের বাইরে সমবেত জনতার আনন্দোৎসব

সাম্প্রতিক পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক ইতিহাসে ১৪ই ফেব্রুয়ারী তারিখটির তাৎপর্য যে কতখানি তা কোন রাজনীতি-সচেতন পাঠককে নতুন করে বোঝানোর অপেক্ষা রাখে না। ২৯শে নভেম্বর তারিখের বিধানসভার অধিবেশনে স্পীকার শ্রীবিজয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর ঐতিহাসিক রুলিং-এ বর্তমান ঘোষ-মন্ত্রিসভার অস্তিত্বের বৈধতার বিষয়ে প্রশ্ন তুলে যে সাংবিধানিক সংকটের সূত্রপাত করেছিলেন তা এড়ানোর জন্য প্রায় এই দুমাস ধরে চেষ্টার কোন ত্রুটি হয় নি, কেন্দ্রীয় সরকারের বাঘা বাঘা সংবিধান বিশেষজ্ঞরা দশ শত চেষ্টা করেও স্পীকারের রুলিংকে এড়িয়ে ঘোষ-মন্ত্রিসভাকে বিধানসভাসিদ্ধ করতে পারেন নি। ১৪ই ফেব্রুয়ারী তারিখে বিধানসভার পুনরায় যে অধিবেশন ঘটল তাতে স্পীকার তাঁর পূর্বতন রুলিং-ই বজায় রাখলেন, এবং জানালেন যে গত রুলিং-এ তিনি বর্তমান মন্ত্রিসভার বৈধতা সম্পর্কে যে প্রশ্ন তুলেছিলেন সে প্রশ্নের সুমীমাংসা আজও না হবার দরুণ তিনি আবার অনির্দিষ্টকালের জন্য বিধানসভা মূলতুবী রেখেছেন। বলা বাহুল্য স্পীকারের এই ঘোষণার ফলে পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক পরিস্থিতি আরও জটিল হল। অভিজ্ঞরা ইতিমধ্যেই বলতে সুরু করেছেন যে একমাত্র রাষ্ট্রপতির শাসন ছাড়া বর্তমান অচলাবস্থা দূর করার আর কোন রাস্তাই খোলা নেই।

নাটকের মহড়া

পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক পরিস্থিতি সেই দিনটি থেকে পুনরায় চঞ্চল হয়ে উঠলো যেদিন থেকে কংগ্রেস-পি ডি এফ কোয়ালিশনের সূত্রপাত হল। এর পরবর্তী কাহিনীগুলি পাঠকের জানা আছে যেগুলির পুনরাবৃত্তি করার প্রয়োজন নেই। শ্রীআশু ঘোষের প্রকাশ্য বিদ্রোহ কংগ্রেস সংগঠনের বিরুদ্ধে বহুদিনের পুঞ্জীভূত বিক্ষোভেরই অভিব্যক্তি, এবং গোড়ার দিকে কংগ্রেসী নেতৃবর্গ শ্রীআশু ঘোষের উপর তেমন গুরুত্ব আরোপ না করলেও কালক্রমে বোঝা গেল যে শ্রীঘোষের শক্তি কতখানি, বিশেষ করে যখন তাঁর সঙ্গে শ্রীশংকরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মত অভিজ্ঞ নেতা সামিল হয়েছেন। অপর দিকে ডঃ ঘোষের পি ডি এফ দলের মধ্যেও ভাঙনের লক্ষণ দেখা যায়। গত ২৫শে জানুয়ারী তারিখে ভারত-সভা হলে পি ডি এফ-এর একটি মিটিং-এ প্রায় হাতাহাতির উপক্রম হয় এবং পি ডি এফ-এর নেতৃত্বকে চ্যালেঞ্জ জানানো হয়। তৃতীয় শক্তি অর্থাৎ যুক্তফ্রন্টও চুপ করে বসেছিলেন না। তাঁরা ২৬শে জানুয়ারী থেকে একটি দীর্ঘস্থায়ী আইন-অমান্যের প্রোগ্রাম নিয়ে সরকারের সমস্ত শক্তিকে তাঁদের দিকে কেন্দ্রীভূত করিয়ে একটি অভূতপূর্ব পরিস্থিতির সৃষ্টি করার চেষ্টা করে যাচ্ছিলেন। মাত্র কয়েকদিন আগেই শ্রীআশু ঘোষ বিদ্রোহী ১৮ জন সদস্যের বর্তমান সরকারের প্রতি সমর্থন প্রত্যাহারসূচক পত্র রাজ্যপালের হাতে দিয়ে এসেছেন, এবং শ্রীশংকরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বিবৃতি মারফত জানিয়েছেন যে বিধানসভায় তাঁদের এই নতুন দল যুক্তফ্রন্টের সমর্থনে নতুন সরকার তাঁর নেতৃত্বে গঠন করতে সমর্থ। অর্থাৎ এর ফলে ঘোষ-মন্ত্রিসভার 'আনসেট্ল্ড' অবস্থা আরও 'আনসেট্ল্ড' হয়ে পড়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে এই নবগঠিত দলটি গত ১৪ই ফেব্রুয়ারী বিধানসভায় হাজির হয় নি, যার ফলে এবারে 'ভোট অফ কনফিডেন্স' উত্থাপিত হলে সম্ভবত তা কংগ্রেস-পি ডি এফ মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধেই যেত।

বিধানসভার ঘটনা

সে যাই হোক ১৪ই ফেব্রুয়ারী তারিখের বিধানসভার অধিবেশন নানান দিক থেকে বিশেষভাবে স্মরণীয়। প্রথমত এই অধিবেশনে রাজ্যপাল কার্যত কোন ভাষণ দিতে পারেন নি। রাজ্যপালের আগমনের অব্যবহিত পূর্বে বিরোধীপক্ষের সদস্য প্রধান দরজার সামনে দাঁড়িয়ে 'ধর্মবীর ফিরে যাও' ধ্বনি দিতে থাকেন, তখন অন্য একটি দরজা দিয়ে রাজ্যপাল কোনপ্রকারে সভাগৃহে প্রবেশ করতে কোনক্রমে সমর্থ হন মাত্র। বিরোধীদের প্রচণ্ড ধ্বনির মধ্যে মিনিট দুয়েকের মধ্যেই তিনি প্রবেশ ও প্রস্থান করেন। বিধানসভার স্পীকার বা বিধান পরিষদের চেয়ারম্যান কেউই তাঁর সঙ্গে ছিলেন না, সদস্যদের সঙ্গে তাঁর পরিচয়ও কেউ করিয়ে দেন নি। এ বিষয়ে স্পীকার বলেছেন, "আমি তাঁকে সঙ্গে করেই নিয়ে যাচ্ছিলাম, তারপর তিনি যে কোথায় চলে গেলেন তা জানি না। তিনি বিধানসভার চেম্বারে কি ঢোকেন নি, কিছু বলেছেন কি বলেন নি কিছুই জানি না।" এর পরবর্তী ঘটনাসমূহের সঙ্গে পাঠকমাত্রেই পরিচিত আছেন. এখানে তার পুনরাবৃত্তি না করে

দ্বিতীয় অধিবেশন অর্থাৎ বিধানসভার মূল অধিবেশনের কথায় আসা যাক। এই অধিবেশনে স্পীকার জানান যে যেহেতু বিগত অধিবেশনে ঘোষ-মন্ত্রিসভার বৈধতা সম্পর্কে তিনি যে প্রশ্ন তুলেছিলেন তার কোন সন্তোষজনক সমাধান হয় নি, তাঁর পূর্বের রুলিং-এর সঙ্গে সঙ্গতি রেখে এবারেরও বিধানসভা অনির্দিষ্টকালের জন্য মুলতুবী করে দেওয়া ছাড়া আর কোন পথ নেই, এবং তিনি তাই করেছেন। বস্তুত স্পীকারের এই রুলিং প্রত্যাশিত ছিল, কেন না অন্য যে কোন পন্থাই তাঁর পূর্বের রুলিং-এর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হত না, এবং তাতে স্পীকার পক্ষপাতদুষ্ট হয়ে পড়তেন। এই দিকের বিচারে তাঁর যা করণীয় তা তিনি ঠিকই করেছেন।

অতঃ কিম

একটা জিনিস সকলের কাছেই পরিষ্কার হয়ে গেছে যে ১৪ই ফেব্রুয়ারীর বিধানসভার পর রাজ্যের রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে জটিলতা ও অনিশ্চয়তা বহুগুণে পূর্বের চেয়ে বর্ধিত হয়েছে। পরদিনের সংবাদপত্রসমূহে বলা হয়েছে যে রাজ্যপাল পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান সাংবিধানিক অচলাবস্থা দূরীকরণের জন্য এই রাজ্যে বর্তমান মন্ত্রিসভাকে টিকিয়ে রেখে বিধানসভার কাজ সাসপেন্ড করার জন্য সুপারিশ জানাবেন এবং বিধানসভার ক্ষমতা ও অধিকার কেন্দ্রীয় পার্লামেন্টের উপর ন্যস্ত করা হবে। কিন্তু এই রকম প্রচেষ্টা কি পূর্বে হয় নি? মনে রাখতে হবে ২৯শে নভেম্বরের পর প্রত্যহই সংবাদপত্রে এই রকম সংবাদ প্রকাশিত হত যে পশ্চিমবঙ্গের সাংবিধানিক অচলাবস্থা দূরীকরণের সূত্র খুঁজে পাওয়া গেছে, কিন্তু কার্যত কিছুই করা সম্ভবপর হয় নি। বরং স্পীকার যা বলেছেন, এর পর একমাত্র রাষ্ট্রপতির শাসনই বর্তমান অচলাবস্থা দূর করতে পারে। এই জটিল অবস্থা অবসানের জন্য কেন্দ্রীয় কর্তাদের উচিত অবিলম্বে বিধানসভাকে সাসপেন্ড করে পশ্চিমবঙ্গে রাষ্ট্রপতির শাসন প্রবর্তন এবং বর্তমান কোয়ালিশন সরকার বাতিল করে দিয়ে নতুন বিকল্প সরকার প্রবর্তন করা। যদি সেই চেষ্টা ব্যর্থ হয়, তবে মধ্যবর্তী নির্বাচনের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করা। বুধবার কংগ্রেসের কোন কোন মহলে এমন কথাও শোনা গেছে যে, এখনি রাষ্ট্রপতির শাসন চালু করার কোন প্রয়োজন নেই। বাজেট পেশ করানোর সময় কয়েকদিনের জন্য রাষ্ট্রপতির শাসন চালু করলেই হবে। রাজ্যপাল কি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন সেকথা সুস্পষ্টভাবে এখনো পর্যন্ত বোঝা যায় নি। কিন্তু বুধবারের বিধানসভার অধিবেশনে যুযুধান দুই পক্ষের সদস্য সংখ্যার হিসাব সংশয়াতীতভাবে প্রমাণ করেছে যুক্তফ্রন্ট এবং নবগঠিত আই এন ডি এফ-এর যুক্ত শক্তি প্রতিদ্বন্দ্বী কংগ্রেস-পি ডি এফ জোটের চাইতে কিছু বেশি। সব মিলিয়ে অবস্থাটা খুব আশাপ্রদ নয়।

স্পীকার শ্রীবিজয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে মন্ত্রিসভা বজায় রেখে বিধানসভা সাসপেন্ড করলে তা বৈধ বলে গণ্য হতে পারে না। তিনি বলেন, মন্ত্রীরা প্রথমে বিধানসভার সদস্য, পরে মন্ত্রী। বিধানসভা সাসপেন্ড করা হলে যে সব মন্ত্রী বিধানসভা হতে নির্বাচিত তাঁরা কি করে কার্যকরী থাকেন?

কংগ্রেস-পি ডি এফ মন্ত্রিসভা শুধু অবৈধই নয়, সংখ্যালঘুতে পরিণত হয়েছে বলে যুক্তফ্রন্টের পক্ষ থেকে দাবি জানানো হয়েছে। ১৬ই ফেব্রুয়ারীতে প্রকাশিত একটি বিবৃতিতে বলা হয়েছে যে কেন্দ্রীয় কংগ্রেসী সরকার রাজ্যপাল এবং কংগ্রেস-পি ডি এফ কোয়ালিশন সংসদীয় গণতন্ত্রের সকল নীতি ধ্বংস করার জন্য একযোগে কাজ করছে। ১৪ই ফেব্রুয়ারী বিধানসভা সদস্যদের হাজিরা খাতা অনুযায়ী পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে যে, কংগ্রেস-পি ডি এফ মন্ত্রিসভার সংখ্যাগরিষ্ঠতা নেই। কিন্তু রাজ্যপাল এখনো মন্ত্রিসভাকে বহাল রেখেছেন। এমন কি নতুন করে সমর্থন আদায়ের চেষ্টার জন্য রাজ্যপাল কংগ্রেস-পি ডি এফ-কে সময় দিচ্ছেন। রাজ্যপালের এই আচরণ পক্ষপাতমূলক বলে যুক্তফ্রন্টের তরফ থেকে ঘোষণা করা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে গত ১৬ই ফেব্রুয়ারীর একটি ইংরেজী দৈনিকের সংবাদ যে ডঃ ঘোষ দশ দিন সময় চেয়েছেন সে কথাও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

বর্তমান কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা যে সংখ্যাগরিষ্ঠ দল, সে সম্পর্কে পূর্ণ তথ্য এখনো রাজ্যপালের নিকট পেশ করা সম্ভব হয় নি, যদিও সংবাদে প্রকাশ যে, রাজ্যপাল

যুক্তফ্রন্টের তৃতীয় পর্যায়ের গণ-আইন অমান্য আন্দোলনের 'মহিলা দিবস'-এ মহিলাদের আইন অমান্য ও 'ছাত্র দিবস'-এ ছাত্র-মিছিলের দৃশ্য।

'উদারভাবে' মুখ্যমন্ত্রীকে আগামী সপ্তাহের মধ্যে তাঁর দলের সঠিক সংবাদ জানাতে বলেছেন। সরকারী মহল থেকে জানা গেছে রাজ্যপাল তাঁর গোপন রিপোর্টে শুধু যে রাজনৈতিক পরিস্থিতিই বিশ্লেষণ করেছেন তা নয়, স্পীকারের রুলিং-এর ফলে যে অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে তাও ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন।

এদিকে গত শুক্রবার নবগঠিত এন ডি এফ-এর সঙ্গে শ্রীঅতুল্য ঘোষের আলোচনা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। শ্রীআশুতোষ ঘোষ দৃঢ়তার সঙ্গে বলেছেন যে তাঁর দল থেকে কয়েকজন কংগ্রেসে ফিরে গেছেন এ সংবাদ সর্বৈব মিথ্যা, আর তাঁর এন ডি এফ দল থেকে যদি একজনকে কংগ্রেস ভাঙিয়ে নেয়, তবে তিনি কংগ্রেস থেকে পাঁচজনকে ভাঙিয়ে আনবেন। শ্রীকাজেম আলি মীর্জা একটি বিবৃতিতে জানিয়েছেন যে, রাজ্যপাল যদি সংবাদপত্রের সংবাদমত ডঃ ঘোষ-মন্ত্রিসভাকে সংখ্যাধিক্য অর্জনের জন্য কোন সময় দিয়ে থাকেন তবে বুঝতে হবে রাজ্যপাল নিজে একটি সংখ্যালঘু মন্ত্রিসভাকে বাঁচিয়ে রাখবার শরিক হয়েছেন।

এ পর্যন্ত সংবাদপত্রসমূহে প্রকাশিত সংবাদের ভিত্তিতে নিশ্চিত করে কিছু বলা না গেলেও এটুকু মনে করার সংগত কারণ আছে যে, যে কোনদিন পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক চিত্রের আমূল পরিবর্তন হয়ে যাওয়া সম্ভব।

রাজ্যপালের ভাষণ

রাজ্যপালের যে ভাষণটি বিধানসভায় পঠিত হয়েছে বলে ঘোষণা করা হয়েছে তার পরিপূর্ণ বয়ান সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে। তা থেকে একটি চিত্তাকর্ষক তথ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। সেটি হচ্ছে এই যে এ বছরে পশ্চিমবঙ্গে না কি একদম ফলন হয় নি। সত্যের এতখানি বিকৃতি আমরা মোটেই আশা করি নি। শাসনক্ষমতায় যে দলই অধিষ্ঠিত থাকুক না কেন, তার সাফাই গাওয়াটা রাজ্যপালের কর্তব্য একথা অবশ্যই স্বীকার্য, কিন্তু তা বলে তাঁর পক্ষে এমন কিছু বলা নিশ্চয় উচিত নয় যা মানুষের হাসির উদ্রেক করে। এবারের পর্যাপ্ত ফলনের কথা বর্তমান মুখ্যমন্ত্রীও বারবার বলেছেন। যাঁরা রাজ্যপালের ভাষণ লিখে দিয়েছিলেন তাঁদের কি এটুকুও খেয়াল ছিল না। নাচতে না জানলে উঠোনের দোষ, বাংলা এই প্রবাদবাক্যটি রাজ্যপালের ভাষণে এমন মর্মান্তিকভাবে ফুটে উঠেছে যা দেখে কাণ্ডজ্ঞানসম্পন্ন মানুষের হাস্যবেগ সংবরণ করাই কঠিন হয়ে পড়ে।

ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনের রাজ্য শাখার সম্মেলন

গত ১১ই ফেব্রুয়ারী দুর্গাপুরে অনুষ্ঠিত ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনের রাজ্য শাখার সপ্তবিংশ সম্মেলনের সভাপতির ভাষণে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের প্রধান চক্ষু চিকিৎসক ডঃ প্রবোধকুমার গুহ কয়েকটি রূঢ় সত্য কথা বলেছেন। তাঁর বক্তব্যের আসল কথা হচ্ছে এই যে জনস্বাস্থ্য ও চিকিৎসকের সমস্যা দেশের অপরাপর সমস্যার সঙ্গে বিচ্ছিন্নভাবে দেখলে চলবে না। তিনি স্পষ্ট বলেছেন যে, যদি দেশের অধিকাংশ লোক বেকার থাকে, পর্যাপ্ত খাদ্য ও উন্নততর জীবনধারা থেকে বঞ্চিত থাকে তাহলে জনস্বাস্থ্যের কোন উন্নতি ঘটতে পারে না। তিনি গত বিশ বছরের সরকারী শাসনব্যবস্থার তীব্র সমালোচনা করে বলেন যে, সরকার এদেশের খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি করতে ব্যর্থ হয়েছে. শিল্পক্ষেত্রে সরকারী নীতি সম্পূর্ণ ব্যর্থ, বেকার সমস্যা সমাধান ও অপরাপর সকল কার্যই দূরদৃষ্টি ও সুপরিকল্পনার অভাবে

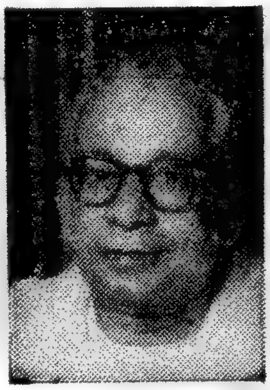

ডঃ প্রবোধকুমার গুহ

বিপর্যস্ত। কাজেই বর্তমান সামাজিক অবস্থার আমূল পরিবর্তন ব্যতীত চিকিৎসা ও জনস্বাস্থ্য বিভাগের উন্নতির আশা সুদূরপরাহত। ডঃ গুহ বর্তমান ব্যাধিগ্রস্ত সমাজের আসল রোগটা কি তা ধরতে সক্ষম হয়েছেন এবং এই রোগের নিরাময় কিভাবে সম্ভবপর তার সুদীর্ঘ ব্যবস্থাপত্রও দিয়েছেন। বস্তুত তাঁর সারগর্ভ ভাষণে সরকারের কর্তব্য সম্বন্ধে তিনি যে সব সুপারিশ করেছেন তার সবগুলি না হলেও অনেকগুলি এই মুহূর্তে গ্রহণ করা সম্ভব। কিন্তু সমস্যাটা হচ্ছে বেড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধার। ডঃ গুহের সময়োপযোগী সতর্কবাণী এবং মূল্যবান পরামর্শগুলির গতি কি শেষ পর্যন্ত ওয়েস্ট পেপার বাস্কেটেই হবে? আমাদের আশংকা অবশ্য তাই, কেন না ডঃ গুহের সঙ্গে এ বিষয়ে আমরা একমত যে গত বিশ বছরে হয়ত অনেক কিছুই করা সম্ভবপর ছিল, যা করা হয় নি।

মধ্যশিক্ষা পর্ষতের সভাপতির উদ্দেশ্যে

মধ্যশিক্ষা পর্ষতের উদ্দেশ্যে আমাদের জিজ্ঞাস্য, মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ প্রকাশিত বইগুলি পেতে এত হয়রানি ভোগ করতে হয় কেন? এই প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বইগুলির কালোবাজার প্রকাশ্যেই চলে, এবং মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ যেভাবে এই সব বই বিক্রয়ের বন্দোবস্ত করেছেন তাতে কালোবাজারকে ইচ্ছা করেই যেন প্রশ্রয় দেওয়া হচ্ছে। (এই প্রসঙ্গে চন্দননগর থেকে শ্রীরতিরঞ্জন ঘোষ আমাদের দপ্তরে একটি পত্র পাঠিয়েছেন যেখানে তিনি দেখিয়েছেন একটি বারো আনা মূল্যের বই-এর জন্য তাঁকে পাঁচ টাকা ব্যয় করতে হয়েছে, চন্দননগর থেকে চুঁচুড়ার স্কুলবোর্ড অফিসে তাঁকে দশবার ছুটোছুটি করতে হয়েছে)। মধ্যশিক্ষা পর্ষতের অনুমোদিত দোকানগুলি খুঁজে বার করা মুস্কিল, খুঁজে পেলেও হয়ত গিয়ে দেখা গেল দরকারী বইটি ফুরিয়ে গেছে, বিক্রেতা প্রদত্ত দিনে আবার গিয়ে দেখা গেল বই আসে নি। অথচ ওই একই বই বাইরে পাওয়া যায়—গলাকাটা দামে, কখনো বাধ্যতামূলকভাবে এক বা একাধিক নোটবই সহ। শহরের কথা বাদ দেওয়া গেল, যাঁরা পল্লীগ্রামে বা দূরবর্তী অঞ্চলে বাস করেন তাঁদের অবস্থা একবার ভেবে দেখুন। অথচ এটা এমন কিছু একটা সমস্যা নয়। অন্যান্য প্রকাশকেরা যেভাবে তাঁদের বই বিক্রয় করেন সেরকম বন্দোবস্ত করে নিলেই হয়। এটা এমন কিছু কঠিন কাজ নয়। পুস্তকবিক্রেতা কমিশনে বই বিক্রি করবে তার যতগুলি কপি দরকার বোর্ডের প্রকাশালয় থেকে নিয়ে যাবে, পুস্তক বিক্রেতারা অন্যসব বই-এর ক্ষেত্রে যেভাবে প্রকাশকদের কাছ থেকে বই নিয়ে যান ঠিক সেইভাবে। আমাদের ছাত্রাবস্থায় ম্যাট্রিকুলেশনের ইংরাজী, বাংলা ও সংস্কৃত বই-এর প্রকাশক ছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। আমরা আমাদের অঞ্চলে যে কোন দোকান থেকেই তা কিনতে পারতাম। এখনো কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত ইণ্টারমিডিয়েট বেঙ্গলী সিলেকশন হায়ার সেকেণ্ডারীতে পড়ানো হয়, বা বিশ্বভারতী প্রকাশিত পাঠসংকলন। কই, সে সব বই তো পেতে কোন হাঙ্গামা নেই, যে কোন দোকানেই পাওয়া যায়। মধ্যশিক্ষা পর্ষতের বই পেতে এত ঝামেলা কেন? এতে যেন কালোবাজারকেই স্বেচ্ছাকৃতভাবে প্রশ্রয় দেওয়া হচ্ছে। আমরা এর বিহিত কামনা করি। (১৭।২।৬৮)

ভারত দর্শন

রাষ্ট্রপতির বাজেট অভিভাষণ

রাষ্ট্রপতি ডঃ জাকির হোসেন সংসদের যুক্ত অধিবেশনে অনেক উচ্চাশা-সম্পন্ন একটি মামুলী ফিরিস্তি হাজির করে ১৯৬৮ সালের বাজেট অধিবেশন শুরু করলেন। ফিরিস্তি বলতে সরকারের প্রভূত প্রকার কৃতিত্বের একটি তালিকা নিয়মানুসারে রাষ্ট্রপতির ভাষণে উল্লিখিত হয়েছে, যে তালিকা ভারত সরকারের প্রচারদপ্তর থেকে প্রকাশিত একটি পুস্তিকাবিশেষ বলেও আনায়াসেই ভ্রম যেতে পারত যদি না রাষ্ট্রপতি উক্ত পুস্তিকাটি যুক্ত অধিবেশনে পাঠ করে শোনাতেন। আর তাহলে এই ভাষণকাল উপলক্ষে বিরোধী সদস্যদের বিক্ষোভাদি প্রকাশেরও কারণ ঘটত না। কিন্তু এই অনুষ্ঠানিক ভাষণ প্রদান পর্বে রাষ্ট্রপতি কথিত কেন্দ্রীয় সরকারের 'গর্ব'-কে তাচ্ছিল্য করার জন্যই বিরোধীপক্ষকে ওয়াক আউট করতে হয়েছিল। অন্তত আশিজন বিরোধী সদস্য সক্ষোভে সভা-কক্ষ ত্যাগ করে যান। ভাষানীতির প্রতিবাদে দ্রাবিড় কাজাঘাম মুন্নেত্রা দলের সদস্যরা তো আগে থেকেই অনুপস্থিত ছিলেন।

রাষ্ট্রপতিকে, সুতরাং, কেন্দ্রীয় সরকারের গর্বের তালিকা শূন্যকক্ষে সরকারী দলকেই পড়ে শোনাতে হয়েছে, অন্যান্য সদস্যরা তাঁকে শ্রবণেন্দ্রিয় ধার দিয়ে নিজেদের অনুগৃহীত করার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়েছেন।

রাষ্ট্রপতি সগর্বে ঘোষণা করেছেন যে, কেন্দ্রীয় সরকার দেশের হরেকরকম সমস্যা উত্তীর্ণ হয়ে লক্ষ লক্ষ সাধারণ মানুষকে দুর্বিপাক থেকে উদ্ধার করেছেন। অতএব এজন্য "আমরা গর্ব অনুভব করতে পারি।" রাষ্ট্রপতি দেশের ঐক্যের প্রতীক-স্বরূপ। তিনি যখন 'আমরা' বলেন গৌরবে, তখন স্বভাবতই তার অর্থ হয় 'দেশবাসী'। কিন্তু বস্তুত দেশবাসী যে সরকারী তৎপরতায় কিঞ্চিন্মাত্র গর্বিত নন, তা সাধারণের মতই স্বয়ং রাষ্ট্রপতিও অবগত আছেন। কিন্তু অনুষ্ঠানে বাস্তবকে বাস্তবতর করে দেখানোর গৌরবে বহুবচন ব্যবহারের মতই স্বাভাবিক। তাই রাষ্ট্রপতি 'আমরা' শব্দ ব্যবহার করেছেন আনুষ্ঠানিকভাবে এবং আমরা বাস্তব অবস্থার দিকে তাকিয়ে অনুভব করতে পারছি, বিগত কুড়ি বছরে, বিশেষ নেহরুজীর নেতৃত্বের ও লালবাহাদুরের অন্তিম নিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে জনগণের সমস্যা চক্রবৃদ্ধিহারে বেড়েই গেছে।

রাষ্ট্রপতি খরা অজন্মা ও মহামারীর দোহাই পেড়েছেন বিশ শতকের একটি উন্নয়নশীল সভ্য দেশের রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে। যে যুগে প্রকৃতি প্রায় বিজ্ঞান-শাসিত এবং যে দেশে উপযুক্ত বিজ্ঞানীর অভাব কপালে করাঘাত করার মতো ভয়ঙ্কর নয়, যে দেশে কাজে কাজে ও অকাজে কোটি কোটি টাকা নয়-ছয় হয়, সেই দেশের রাষ্ট্রপ্রধান যখন প্রাকৃতিক দুর্যোগের কাছে অসহায়তা জানান তখন,

ডঃ জাকির হোসেন

আমাদের গর্ববোধ হয় না, হয় দুঃখ। রাষ্ট্রপতি গর্বিত কেন না ঐ সব গোলযোগ সত্ত্বেও এদেশে মানুষ বেঁচে আছে এবং একেকে মেরে অপরের ভালো করে বাঁচার জন্য দৈনন্দিন উত্তেজনায় পার্লামেন্ট-হাউস থেকে নিতান্ত কেরানী অফিসরের পার্সোনাল এ্যাসিস্ট্যান্ট পর্যন্ত সর্বদা চঞ্চল। এই চাঞ্চল্যটুকুই ভারতে জীবন-স্পন্দন। তা, বহু সমস্যার মাঝেও সেই স্পন্দন শোনা গেছে। সুতরাং আমরা বেঁচে আছি। সরকার বাঁচিয়ে রেখেছেন। বাজার গরম। কালোবাজার ততোধিক। অতএব 'গর্বে'র কারণ খুঁজে পেয়েছেন ভারত-বর্ষের রাষ্ট্রপতি ডঃ জাকির হোসেন।

ডঃ হোসেন আত্মতৃপ্ত। সরকার যথা-সময়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন, সেবা প্রতিষ্ঠানগুলি আদিম যুগের মতো আর্ত জনগণের মধ্যে দলে দলে সেবা করে বেড়িয়েছেন, এবং মাভৈঃ, বিদেশী সাহায্যও এসেছে নিরমরক্ষা করে।

প্রশ্ন একটি, দেশ স্বাধীন হল, অথচ জনগণের সেই পরমুখাপেক্ষিতা ঘুচলো না, আবহমানের আর্ত নর-নারায়ণ সেই চিরকালের প্রার্থীর মতো ভিক্ষাপাত্রটি নিয়ে ভাঙা ভিটের দোরে বসে রইল। তথাপি রাষ্ট্রপতি 'গর্ব' অনুভব করতে কসুর করেন নি। আমাদের সংকোচ হয়।

রাষ্ট্রপতি প্রকৃতির কোপে নিগৃহীত জনগণের মনোবলে খুব খুশি হয়েছেন। মনোবল বলতে কী বোঝায় বা তিনি কী বোঝেন জানি না, মনোবল বললে আমার সেই সত্যেন দত্তের ছত্র ক'টি মনে পড়ে, সেই 'আমরা' কবিতার 'মারী নিয়ে ঘর' করা আর 'বাঘের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া আমরা বাঁচিয়া আছি' আর 'আমরা হেলায় নাগের খেলাই নাগেরি মাথায় নাচি'। পরাধীন এবং সাম্রাজ্যবাদ-শোষিত মানুষের এই মনোবলের সঙ্গে স্বাধীন কেন্দ্র-শাসিত মানুষের মনোবলের মধ্যে যদি চারিত্রিক তফাৎ না পাওয়া যায় তবে কেন আমাদের 'গর্ব' বোধ করতে হবে বুঝে পাই না।

রাষ্ট্রপতি একশত আট শতাংশ উৎ-পাদন বৃদ্ধির সংবাদ দিয়েছেন সঙ্গে যোগ করেছেন যে, খাদ্যোৎপাদন বৃদ্ধির ফলে মূল্যের ঊর্ধ্বগতিও নাকি থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে। সরকারী হিসাব বস্তুটি দুর্বোধ্য। মূল্যের ঊর্ধ্বগতি যে কবে কখন কোথায় অবরুদ্ধ হল, সাধারণ মানুষ তা টের পেলেন না। তাঁদের যে কে সেই বাঁচো আনতে তাইনে কুলোয় না, দিন দিন দুর্ভোগ বাড়ে। রাষ্ট্রপতি একটি হিসাবও উল্লেখ করেছেন। তা হল, যে ক্ষেত্রে ১৯৬৬ সালেই দাম বাড়ে ষোল শতাংশ, এবার সম্বৎসরে সেই হার দাঁড়িয়েছে মাত্র ৬ শতাংশে। অর্থাৎ ১৯৬৬-র দশ শতাংশ কম। খবর উল্লেখযোগ্য খবর সন্দেহ নেই। এই হিসাবে দামের ঊর্ধ্ব-গতি আগের তুলনায় ক্রমহ্রাসমান। তবে দাম বাড়ছে এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। আমাদের দৈনিক বাজার কিন্তু সরকারী হিসেবে বাড়ছে কি না সন্দেহ। সরকারী হিসেবটা বাঁধা দরের। সাধারণ বাজার দর যার তোয়াক্কাও রাখে না। সাধারণ বাজারে দর বাড়ে কালোটাকার সর্বগ্রাসী

কুমার সঙ্গে তাল রেখে। এক-একটা জিনিস পঞ্চাশ শতাংশ বেশি দাম দিলেও পাওয়া যায় না।

যেমন, যদি কলকাতা ও শহরতলীতে কেরোসিন সংকটের কথাই ধরেন, তো আপনাকে কবুল করতেই হবে যে, রেশন কার্ডের বিনিময়ে লিটার পিছু পঞ্চাশ পয়সার তেল আপনি পঞ্চাশবার দোকান ঘুরেও যোগাড় করতে অসমর্থ। আপনার পাওনা দশ লিটার হলে সপ্তাহে এক লিটারও আপনি অক্লেশে পান না। দোকানী বলে, যোগান নেই। ঘুরতে ঘুরতে হতাশ আপনি অন্য একটি দোকান থেকে সেই তেলই এক টাকা লিটারে সংগ্রহ করে আনতে বাধ্য হচ্ছেন। অনুযোগ-অভিযোগে ফলম নাস্তি। দোকান বালিরও এমন চমৎকার ব্যবস্থা যে, আপনি আপনার এলাকার দোকানটি পান না। তেল সংগ্রহ করতে অটো-মোবাইল পোড়ানোর ব্যবস্থা করেছেন মহারাজ তৈলদাতারা। সুতরাং রাষ্ট্রপতির দুর শতাংশের ঘোষণা মেকী ঠেকে। অথচ রাষ্ট্রপতির ভাষণকে অসত্য ভাষণ বলা যায় না। এমন কি বাস্তবের বিকারও বলতে কলম সরবে না। পাউরুটি কেলেঙ্কারী কে না জানেন। আপনি কার্ড নিয়ে হাজির হন, সাঁইত্রিশ পয়সায় রুটি নেই। ছাড়ুন পঞ্চাশ। শুভ বিজয়ার সাজানো মিষ্টান্নের মতো থরে থরে সাজানো পাউরুটি একাধিক সংগ্রহ করতে কিছুমাত্র বেগ পেতে হবে না। প্রকাশ্যে এই কালো-বাজার। অভিযোগ-অনুযোগে ফলম নাস্তি।

রাষ্ট্রপতি এই ভয়াবহ প্রকাশ্য কালো-বাজারের অনস্বীকার্য অস্তিত্বের স্বীকৃতি দানে ভয় পেয়েছেন। অথচ ভারতবর্ষে বাজার মানেই কালোবাজার। সাদাবাজার বহুকাল চিতার চেপেছে। রাষ্ট্রপতি যে উৎপাদন বৃদ্ধির খবর শুনিয়েছেন, সে খবর শুনে সাধারণ মানুষ দুহাতের চেটো উল্টে বলবেন, সুসংবাদ বটে। তবে বেল পাকলে কাকের কী!

রাজনৈতিক পরিস্থিতির সংকটে রাষ্ট্রপতি উদ্বিগ্ন। কিন্তু সঙ্কট ত্রাণের পন্থা তাঁর নির্দেশ করার দায়িত্ব নেই। তিনি কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন দলের নেতা। স্বভাবতই কেন্দ্র যে রাজ্যকে সর্বদাই দরাজ সাহায্যের বাহু প্রসারিত করে বসে আছেন, এই দল ঘেঁষা উক্তি করে তিনি আরও এক দফা আত্মতৃপ্তি লাভ করেছেন। অথচ তিনিও জানেন, তাঁর বক্তব্য অন্তঃসারশূন্য। প্রমাণ অকংগ্রেসী রাজ্যগুলির অভিযোগ। অথচ রাষ্ট্রপতি আপন দায়িত্বে এজাতীয় আত্মতুষ্টিকর উক্তির মধ্যে তাঁর ভাষণ সীমাবদ্ধ রেখেছেন।

তাঁর পূর্ববর্তী ডঃ রাধাকৃষ্ণনের ভাষণে সরকারের নির্ভয়ে সত্য সমালোচনা ইতিপূর্বে আমরা লক্ষ্য করেছিলাম। সেকারণ ডঃ রাধাকৃষ্ণনের প্রতি কতিপয় কংগ্রেসী নেতা অনেক সময় রুষ্টও হয়েছিলেন। কিন্তু দার্শনিক রাষ্ট্রপতি সত্য ভাষণে বিরত থাকেন নি। রাষ্ট্রের কর্ণধার হিসেবে তিনি তাঁর কর্তব্য পালন করেছিলেন যথাযথ।

আমাদের বর্তমান রাষ্ট্রপতি বাজেট অধিবেশনে রাষ্ট্রের যাবতীয় সামস্যার উল্লেখ করে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন এবং সরকার যে এই সমুহ সমস্যাকে ঐন্দ্রজালিকসম কৃতিত্বের সংগে উত্তরিত হয়েছেন এমন কল্পনার সাহায্যে রাষ্ট্রপতি আত্মপ্রসাদ সন্ধান করে তুষ্ট থাকবার চেষ্টা করেছেন।

দুঃখের কথা এই যে আমাদের বর্তমান রাষ্ট্রীয় কর্ণধারও কেন্দ্রীয় সরকারের মতই জনসংযোগবিচ্ছিন্ন এবং গণস্বার্থ সম্পর্কে কেবলমাত্র উদ্বেগ-সম্বল। উভয়েই ক্ষমতার রাজপ্রাকারের অন্তরালে সংগৃহীত সংবাদে আত্মতৃপ্ত। এঁরা প্রাসাদচূড়ার বাতায়নপথে প্রজা-সাধারণের সুখদুঃখ প্রত্যক্ষ করে আমলাবর্গের ফাইল থেকে জাতীয় অগ্রগতির ফিরিস্তি মনোনয়ন করেন।

সরকারী বিবৃতি যেমন, রাষ্ট্রপতির ভাষণও তেমনি আমলানির্ভর। আমাদেরও আসল মালিক তাই পাকে-প্রকারে সেই পুরাতন আমলাশ্রেণী। আমরা আমলা-পালিত নাগরিক, যুক্ত অধিবেশনে প্রদত্ত আমলায় সাজানো ফিরিস্তি রাষ্ট্রপতির ভাষণ মারফৎ শ্রবন করে কৃতার্থ হই।

রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের বেঁধে মারার প্রস্তাব

রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের ওপর বহুকাল যাবৎই সৎ মাতৃসুলভ ব্যবহার প্রদর্শন করে কেন্দ্রীয় সরকার নামডাক করেছেন। আমাদের রাষ্ট্রপতি রাজ্যগুলির প্রতি কেন্দ্রীয় দরদে যতই আহ্লাদিত হয়ে থাকুন কেন্দ্রীয় কর্মচারী এবং রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের বেতন-ক্রমে আকাশ-পাতাল তফাৎ বজায় রেখেই রাজ্যের ব্যাপারে কেন্দ্রের যুক্তিহীন নির্দয় মনোভাবের একটি জ্বলন্ত প্রমাণ বহুদিন থেকেই একই রাষ্ট্রে হ্যাভস্ এবং হ্যাভ নটসের সৃষ্টি করে রেখেছে। কেন্দ্র বিভিন্নভাবে রাজ্যগুলির রাজস্বে প্রকাণ্ড থাবা বসিয়ে অধিকাংশ অধিকার করে চলেছে, রাজ্যগুলি শোষিত প্রজার মতো সেই ব্যবহার মুখ বুজে সয়ে এসেছে এযাবৎকাল। কারণ কেন্দ্র-রাজ্যে সম-দলীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত ছিল। কেন্দ্রের দলনেতাদের বদান্যতার ওপরই নির্ভরশীল ছিল রাজ্যের সরকারী কর্ণধারদের চাকুরীর স্থায়িত্ব। তাঁরা পারতপক্ষে কেন্দ্রের কাছ থেকে কিছু আদায়ে সক্ষম হতেন। প্রায়শ বিমুখ হওয়া এবং সহাস্যে তা মেনে নেওয়াই ছিল তাঁদের গদি রক্ষার সহজ উপায়।

বাধ সেধেছিল চতুর্থ নির্বাচন। রাজ্যে রাজ্যে ভিন্ন দলীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত হতেই কেন্দ্রের বড় ভাইসুলভ রাজভোগ পুরোপুরি ভোগ করার অন্যায় আব্দারে প্রথম বাধা পড়ল। কেন না অকংগ্রেসী সরকার রাজ্য কংগ্রেসী নাবালকত্ব পরিহার করে একেবারেই সাবালকত্ব গ্রহণ করে বসলেন। এমন কি তাঁরা বিশেষত সরকারী কর্মচারীদের ওপর কেন্দ্রীয় নিষ্ঠুরতার চালু চাবুকটি এক ঝটকায় দুমড়ে মুচড়ে ভেঙে দিলেন।

ক্ষমতা লাভ করেই অকংগ্রেসী সরকারগুলি রাজ্যে রাজ্যে সরকারী কর্ম-চারীদের ভাতা কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারী-দের সমান করার চেষ্টা করলেন। কোথাও পুরোপুরি এই সমতা রক্ষা করা সম্ভব হল, কোথাও নিদারুণ অর্থাভাব পুরো সমতা আনতে অপারগ হয়েছিল, যেমন পশ্চিমবঙ্গে। কিন্তু ক্ষমতালাভের সঙ্গে সঙ্গেই রাজ্য সরকারী কর্মচারিগণ এক ধাক্কায় যে আয়বৃদ্ধির মুখ দেখলেন তা তাঁদের দুর্বহ জীবনে সংগ্রামের পথে একটা বড় রকম পাথেয় তুলে দিল। এজন্য অকংগ্রেসী সরকারগুলির প্রতি সরকারী কর্মচারীদের কৃতজ্ঞ থাকার কারণ আছে।

কিন্তু যখন সরকারী কর্মচারীদের স্বার্থ সংরক্ষণে অকংগ্রেসী সরকারগুলি একজোটে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ তখনও কেন্দ্রীয় অর্থভাণ্ডারের মোটা চাবিকাঠিটি হাতে অর্থ তথা উপ-প্রধানমন্ত্রী মোরারজী দেশাই হুঙ্কার দিয়ে উঠেছিলেন, খবরদার, রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের পাই পয়সাটি পর্যন্ত কিন্তু রাজ্য সরকারকেই ব্যবস্থা করতে হবে। হু, হু, বাবা, একটা পয়সা ছাড়ব না।

মালিক তিনি। কুবেরের ভাণ্ডার তাঁর হাতে। রাজ্য দোহনে তাঁর খামার-ঘর পরিপূর্ণ। সেই তিনি যদি একটি পয়সা না ছাড়েন। যদি একদিকে মূল্য-বৃদ্ধির বোঝা চাপিয়ে রাজ্য সরকারী কর্ম-চারীদের মুখের অন্ন ঘণ্টায় ঘণ্টায় কমিয়ে দিয়ে রোমকরাজ নিরোর মতো একতারা বাজান দিল্লীর মসনদে সমাসীন হয়ে। হতভাগ্য রাজ্য সরকারী কর্মচারীরা তাহলে দীর্ঘশ্বাস মোচন ছাড়া আর কী করতে পারেন। দিল্লীর প্রভুতন্ত্র প্রতিষ্ঠার বাসনা কেন্দ্রের। তাই দুই কিসিমের সরকারী কর্মচারী তাঁরা মোতায়েন রাখতে বদ্ধপরিকর। (এই দেশেই পশ্চিম পাকিস্তান কর্তৃক পূর্ব পাকিস্তান শোষণের ফিরিস্তি শুনতে পাই আমরা।) অকংগ্রেসী সরকারগুলি কিন্তু কেন্দ্রীয়

জমিদারীসুলভ তর্কে ক্ষান্ত হন নি। তাঁরা রাজকোষ উজাড় করে কেন্দ্রীয় সরকারের কু-অভিপ্রায় বানচাল করার জন্যই রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের ভাতা কেন্দ্রের সংগে সমতায় স্থিত করতে চেয়েছিলেন। বাধ্য হয়ে কয়েকটি কংগ্রেসী রাজ্যও কেন্দ্রের কূট চালকে উপেক্ষা করার চিন্তা করতে বাধ্য হয়েছিলেন।

অকংগ্রেসী পাঞ্জাব, হরিয়ানা, রাজস্থান (যে সময়) কেন্দ্রীয় হারে রাজ্য কর্মীদের মহার্ঘভাতা প্রদান করা চালু করে দিয়েছিলেন। পশ্চিমবঙ্গের তদানীন্তন অর্থ ও উপ-মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসু আজ হয়ত ভাবতে পারেন, সেদিন নিগৃহীত রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের পুরোপুরি কেন্দ্রের সংগে সমহারে ভাতা প্রদান করলেই ভালো হত। ইতিপূর্বে কংগ্রেসী সরকারগুলি মাঝে মঝে ৩ টাকা পাঁচ টাকা হারে কখনো ভাতা বৃদ্ধি করেছেন বটে কিন্তু বাজার মূল্য আরও বহুগুণ বেড়ে যাওয়ায় ঐ বৃদ্ধি কোনো সাহায্যেই আসে নি। তাছাড়া ঐ তিনটি টাকার জন্য কর্মীদের অনেক অপ্রিয় আন্দোলনের শরিক হতে হয়েছে।

রাজ্য সরকার কোনদিনই রাজ্য সরকারী কর্মীদের জন্য ভাতা সম্পর্কে কোনও বিধিবদ্ধ নিয়ম করেন নি কেন্দ্রীয় কর্মীদের অনুরূপে। কেন্দ্রীয় কর্মীরা মূল্যবৃদ্ধির সংগে সংগে ভাতা বৃদ্ধির আশ্বাস পেয়ে আশ্বস্ত আছেন। কিন্তু যদিও সরকারের, বিশেষ কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদনক্রমেই বাজারে নির্ধারিত দাম বাড়ে। (কালোবাজারের কথা স্বতন্ত্র) যেমন চিনি, কয়লা, কাপড় ইত্যাদির সম্প্রতি মূল্যবৃদ্ধি এবং যেহেতু সরকারের অক্ষমতার জন্যই দর-দাম নিয়ন্ত্রিত হয় না সঠিকভাবে, সে জন্য সরকারী কর্মচারীদের দায়িত্ব সরকারের ওপর অবশ্যই বর্তায়। কিন্তু আগের মতই অর্থ তথা উপ-প্রধানমন্ত্রী মোরারজী দেশাই পুনশ্চ হুমকী ছেড়েছে এই বলে যে, দাম যেমনই বাড়ুক, কেন্দ্র রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের ভাতা বৃদ্ধি জনিত কোনও আর্থিক দায়িত্ব বহন করবেন না। উপরন্তু রাজ্য সরকারগুলি যাতে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ওপর ওভারড্রাফট নিয়ে সেই টাকায়ও রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের অভাব পূরণ না করতে পারেন, সর্বভারতীয় নেতারূপে কথিত শ্রীমোরারজী দেশাই তার জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশও দিয়েছেন। সুতরাং ব্যাপারটার মধ্যে রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের নিগৃহীত করার নিষ্ঠুর মনোভাব ছাড়াও একটা কূট রাজনৈতিক খেলা আছে বলে অনায়াসেই বোঝা যায়। এই রাজনীতি কেন্দ্রের শোষণমূলক মনোভাব এবং রাজ্যগুলিকে দাবিয়ে রাখার জন্য এক শ্রেণীর সুবিধাভোগী কেন্দ্রীয় কর্মচারীর সৃষ্টি করছে বলে অধীনের বিশ্বাস। ঔপনিবেশিক শাসন [illegible] সরকারী আমলার জন্ম দিয়ে থাকে শাসিত শাসনের জন্য। কেন্দ্র যে কোনমতে রাজ্যগুলিকে শাসনই করতে চায় এবং রাজ্যের উপর কেন্দ্রীয় শাসনে নিয়ে পুরতে চায় কর্মচারী সমস্যায়ও সেই মনোভাব সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। রাজ্যগুলিকে সর্বদা বেকায়দায় রেখে কেন্দ্রীয় মাতব্বরীর জগদ্দল তার ঘাড়ে চাপিয়ে রাখার এও এক ধরনের কূটনীতি।

নচেৎ গজেন্দ্র গদকার কমিশন তো কেন্দ্রের দ্বারাই সৃষ্টি। এই কমিশনও কেন্দ্রীয় কর্মীদের সমহারে রাজ্য কর্মীদের ভাতা বৃদ্ধির পক্ষে অনুমোদন দিয়েছেন। অথচ কেন্দ্র এমন একটি অবস্থা সৃষ্টি করে রেখেছেন যে জন্য রাজ্যের পক্ষে সরকারী কর্মীদের সমস্যার সুরাহা করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে। একমাত্র উপায় কেন্দ্রের তোয়াক্কা না রেখে জোর করে ব্যবস্থা গ্রহণ। কিন্তু কেন্দ্রের কাছে রাজ্য সরকারকে যতকাল আনত মস্তকে থাকতে হবে ততকাল সে কাজ সুদূরপরাহত ব্যাপার।

নামেই যুনিয়ন। আসলে আমাদের কেন্দ্র রাজ্য সম্পর্ক যুনিটারী। সেজন্যই কেন্দ্রীয় দাপটের নিচে রাজ্য সরকার অসহায়।

এই অবস্থায় কেন্দ্রের রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের বেঁধে মারার আয়োজন সত্যই ভয়াবহ। কেন্দ্র ও রাজ্যে মূল্যান্তরের ফারাক নেই। কিন্তু কেন্দ্রীয় কর্মীদের মাহিনাবৃদ্ধির প্রভাব বাজারে মূল্যবৃদ্ধির চাপ যে বাড়ায় তা সরকার স্বীকৃত কেন না, সরকারই বলেন, কর্মচারীদের মাহিনাবৃদ্ধিতে মূল্যবৃদ্ধি প্রশ্রয় লাভ করে। কেন্দ্রীয় কর্মীরা শুধু মূল্যবৃদ্ধির অনুপাতে ভাতাবৃদ্ধিরই সুযোগভোগী তাই নয়। তাঁদের জন্য কেন্দ্র আরও বহু সুবিধারও ব্যবস্থা করেছেন। যার ফলে তাঁদের প্রকৃত আয় (real wage) বর্তমান আর্থিক আয় (nominal wage) ছাড়াও অনেক বেশি। তাঁরা কেন্দ্রীয় সরকারী ভবনগুলির (কোয়ার্টার) সুবিধা পাচ্ছেন। যে ভবনগুলির এক একটি ফ্ল্যাট বস্তুত সুন্দর ও বৈজ্ঞানিকভাবে নির্মিত। যে ফ্ল্যাট সাধারণভাবে ভাড়া করতে হলে মাহিনার দশ শতাংশ নয়, কর্মীদের পুরো মাহিনার অর্ধেকই গুণতে হত, কেন্দ্রীয় কর্মচারীরা সে জাতীয় কোয়ার্টার অতি সুলভে ভোগ করছেন। তাঁদের চিকিৎসা ও অন্যান্য দায়িত্বও সরকার গ্রহণ করছেন।

নিঃসন্দেহে ওয়েলফেয়ার স্টেটের কর্তব্যই কেন্দ্র পালন করছেন, যা না করা হলেই সরকার নিন্দার্হ হতেন। সে হিসেবে কেন্দ্রীয় কর্মীরা যে প্রত্যাশার অতিরিক্ত কিছু পাচ্ছেন, এমন কথা বলা যায় না। বরং যা প্রাপ্য তারই কিছু তাঁরা সরকারের কাছে আদায় করে নিতে পেরেছেন।

রাজ্য কর্মীরা কিন্তু সেই পরিমাণেই কেবল অতিরিক্ত বোঝার চাপ সহ্য করে আসছেন এবং ক্রমে তাঁদের সহ্যসীমাও অতিক্রান্ত হতে চলেছে।

ইতিপূর্বে রাজ্যে রাজ্যে রাজ্য সরকারী কর্মচারী সংস্থাগুলি বিচ্ছিন্নভাবে দুর্বল ছিলেন। বর্তমানে তাঁদের সর্বভারতীয় কো-অর্ডিনেশন কমিটি গঠিত হওয়ায় তাঁরাও শক্তিশালী হয়ে উঠছেন এবং হয়ত অদূর ভবিষ্যতে তাঁদের চাপে কেন্দ্রীয় অনমনীয়তাও নরম হতে বাধ্য হবে। তাঁদের এইভাবে বেঁধে মারার পরিকল্পনা কেন্দ্রকে একদিন না একদিন ত্যাগ করে ওয়েলফেয়ার স্টেটের কর্তব্য তাঁদের প্রতিও পালন করতে হবেই।

ইতিমধ্যে কেন্দ্রের উচিত, কেন্দ্রীয় সরকার নিযুক্ত গজেন্দ্র গদকার কমিশনের সুপারিশ কার্যকরী করার জন্য রাজ্যগুলিকে আর্থিক সাহায্য দান করা। রাজ্য কর্মীদের জবরদস্তি নীপীড়িত অবস্থার মধ্যে ঠেলে রাখার মোরারজীনীতি পরিত্যক্ত না হলে, স্পষ্টতই ভারতে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারী কর্মীদের মধ্যে একটি সুবিধাভোগী ও অপর একটি নিগৃহীত শ্রেণীর জন্ম হবে যার সুদূরপ্রসারী ফলাফল মোটেই রমণীয় হবে না। রাজ্যের ওপর কেন্দ্রীয় অবদমনও ভবিষ্যতে কেন্দ্র রাজ্য সংঘাতকে আরও জোরদার করবে।

বিহার:

ট্রেনের তলায় তীর্থযাত্রী

মুঙ্গেরের লক্ষ্মীসরাই রেল স্টেশনে ১২নং আউন দিল্লী এক্সপ্রেস পরিষ্কার রাস্তা পেয়ে যখন দ্রুতবেগে ছুটে আসছিল তখন যাত্রী পূর্ণিমা উপলক্ষে সিমেরিয়া ঘাটে স্নানার্থী পুণ্যকামীর একটি দল এক্সপ্রেসের চাকার তলায় পড়েন। তেরজন তৎক্ষণাৎ নিহত হয়েছেন বলে সংবাদ। চারজন মারা গেছেন হাসপাতালে এবং ষোলজন হয়েছেন গুরুতরভাবে আহত।

১৯৬৬ সালের অক্টোবর মাসেও ঐ লক্ষ্মীসরাই স্টেশনে অনুরূপ দুর্ঘটনা ঘটেছিল। দশেরার মেলায় অসতর্ক যাত্রীরা যন্ত্রদানব রেলগাড়ির শোণিতপিপাসা মিটিয়েছিলেন।

বিহার রাজ্যের দেহাত অঞ্চল থেকে প্রতি বছর এবং বছরের প্রায় সব সময়ই বহু তীর্থযাত্রী ভারতের নানা তীর্থস্থান পর্যটন করে বেড়ান। মধ্যযুগের সংস্কার এদের তীর্থ পর্যটনের জন্য আজীবন সঞ্চয়ে ব্যস্ত রাখে। দুর্বহ নিষ্ঠুর দারিদ্র্যের মধ্যেও এঁরা পরলোকে শান্তির

আশায় ইহলোকে অর্থ সঞ্চয় করে তীর্থ পর্যটন করেন। এ'দের সংস্কারগত নিষ্ঠা সত্যই বিস্ময়কর।

অজ্ঞানের অন্ধকার এবং অবর্ণনীয় দারিদ্র্য এই মহৎ কাজে এ'দের অদম্য উৎসাহ যোগান দিয়ে গেছে। দলে দলে লোটা এবং কম্বল নিয়ে বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা হাত ধরাধরি করে বেরিয়ে পড়েন। প্রাইভেট বাস সার্ভিস এবং রেলওয়ে এ'দের তীর্থ-পর্যটনের দরুণ মোটা টাকা উপায়ও করে থাকে।

লক্ষ্মীসরাইয়ের ঘটনায় ঠিক যাঁদের কথা ভাবছি, তাঁরাই যন্ত্রদানবের শিকার হয়েছেন কিনা সংবাদে তার অবশ্য কোনো উল্লেখ পাই নি। কিন্তু সিমেরিয়া ঘাটের স্নানার্থী স্বভাবতই যে স্থানীয় রাজ্যবাসী এবং রেলপথ পার হওয়ার দলবদ্ধ অসতর্ক প্রয়াসও যে শিক্ষিত মহলে অস্বাভাবিক তা কল্পনা করে নেওয়া যায়।

স্থানীয় রেল কর্তৃপক্ষ পুণ্যার্থীদের মানসিকতা সম্পর্কে নিশ্চয় ওয়াকিবহাল যদি সুদূর কলকাতার কোনো নাগরিক এ'দের অসহায় অনালোকিত জীবনের খবর রাখতে পারেন, তবে স্থানীয় রেল কর্তৃপক্ষ তা না জানেন এমন কথা অচিন্তনীয়। তাই পুণ্যার্থীদের যখন জানা ছিল তখন (এবং পুণ্যার্থীরা সাধারণতই বিশেষ ভাবরাজ্যের বাসিন্দা) তাঁদের নিরাপত্তার জন্য পূর্বাহ্ণেই কর্তৃপক্ষ ব্যবস্থা রাখতে পারতেন। বিশেষ ১৯৬৬ সালে যখন অনুরূপ দুর্ঘটনা একই স্থানে ঘটেছিল। কিন্তু রেল কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র দূরদর্শিতার পরিচয় রাখেন নি। উপস্থিত জনতাও তাই রুষ্ট হয়ে লক্ষ্মীসরাই স্টেশন আক্রমণ করেন ও কর্মীদের মারপিট করেন।

ট্রেনে কাটা পড়ার জন্য অবশ্য স্টেশন কর্মীদের হাত নেই। স্টেশন কর্তৃপক্ষের যেটুকু অবহেলা আছে আগেই তার উল্লেখ করেছি। এ জাতীয় হত্যাকাণ্ড হয়ত এড়ানো যেতো, যদি ১৯৬৬-র অভিজ্ঞতার কিছু শিক্ষা স্টেশন কর্তৃপক্ষ কাজে লাগাতেন।

এতোগুলো পুণ্যার্থীর জীবনের নিরাপত্তা সম্পর্কে স্থানীয় কর্তৃপক্ষের অবহেলা মর্মান্তিক।

কেন্দ্র রাজ্য সম্পর্কে কেন্দ্রীয় বিপত্তি

কেন্দ্রীয় সরকার বর্তমানে দুটি সমস্যা নিয়ে সর্বাধিক বিব্রত। এক ভাষা, দুই, পশ্চিমবঙ্গে রাজ্যপাল প্রতিষ্ঠিত এবং সেন-ঘোষ জোট সমর্থিত কংগ্রেস-পি-ডি-এফ মন্ত্রিসভাকে ক্ষমতার আসনে বসিয়ে রাখা। ভাষা প্রশ্নে হিন্দীবাদীদের একগুঁয়েমী যে দেশব্যাপী বিপদ বিপর্যয়ের কারণ হয়েছে কেন্দ্র তা এখন মিন মিন করে স্বীকার পেতে সুরু করেছেন এবং কয়েকজন তথাকথিত 'শক্ত মানুষ' নেতাও এবার বেকায়দা দেখে যুক্তির পথে আসতে চাইছেন। অর্থাৎ তাঁরা অহিন্দী রাজ্যগুলির চাপকে এতোকালে হৃদয়ঙ্গম করতে শুরু করেছেন। কেন্দ্রে হিন্দীবাদীর প্রাধান্যে কাজ হয় নি।

পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে এখনো কেন্দ্রের চৈতন্যোদয় হতে বোধহয় বাকি আছে। ইতিমধ্যে কলকাতা মহা ধর্মাধিকরণের রায় কেন্দ্রীয় নেতাদের মনে নতুন ভরসাও যোগান দিয়েছে। তৎ সত্ত্বেও রাজ্যের রাজনৈতিক পরিস্থিতি ক্রমশ জটিল আকার ধারণ করায় স্বয়ং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী যে বিশেষভাবে বিমূঢ় বোধ করছেন সম্প্রতি সংসদে পশ্চিমবঙ্গ সম্পর্কে প্রশ্নোত্তর কালে তা ধরা পড়ে গেছে। পঃ বঙ্গ সম্পর্কে কেন্দ্র কী করতে যাচ্ছেন, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তার কোন আকস্মিক জবাব দিতে পারেন নি। এখন কেন্দ্রীয় কংগ্রেস সরকার বলছেন, বিধানসভাই মন্ত্রিসভার গরিষ্ঠতা যাচাই-এর উপযুক্ত স্থান। আর তারই সংগে রাজ্যপাল কর্তৃক মন্ত্রিসভা খারিজ করাও সংগত বলে অভিমত প্রকাশিত। এই দুই পরস্পর বিরোধী চিন্তা রাজ্যের রাজনৈতিক অবস্থার ফেরে কেন্দ্রকে স্বীকার করে নিতে হচ্ছে।

কি হিন্দী, কি মন্ত্রিত্ব, উভয় ক্ষেত্রেই রাজ্যের ওপর কেন্দ্রের চাপ পুনর্বিবেচনার সময় এসেছে। কেন্দ্রীয় নেতাদের কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থাই তার প্রমাণ।

(১৬।২।৬৮)

অচল রথ—

ভিয়েতনাম যুদ্ধের নৃশংসতার একটি দৃশ্য

দক্ষিণ ভিয়েতনাম:

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কি শেষ পর্যন্ত ভিয়েতনামের যুদ্ধে পরমাণু বোমা ব্যবহার করবে? জনসনের ভিয়েতনাম নীতির কঠোর সমালোচক এবং সেনেটের পররাষ্ট্র সম্পর্ক বিষয়ক কমিটির চেয়ারম্যান ফুলব্রাইট এই আশঙ্কার কথা ব্যক্ত করেছেন। ফুলব্রাইট বলেছেন, ভিয়েত কং গেরিলা ও উত্তর ভিয়েতনাম সৈন্যবাহিনীর আক্রমণে পর্যুদস্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এখন যুদ্ধ জয়ের জন্য বেপরোয়া হয়ে পরমাণু বোমা ব্যবহারের কথা বিবেচনা করছে। এই বিষয়ে পররাষ্ট্রসচিব ডিন রাস্ক, প্রতিরক্ষাসচিব রবার্ট ম্যাকনামারা এবং জয়েন্ট চীফ অব স্টাফের সভাপতি জেনারেল হুইলারের মধ্যে আলোচনা চলছে।

কেবলমাত্র সামরিক কর্তারাই নন, মার্কিন জনমতের একাংশও যে আজ ভিয়েতনামে পরমাণু বোমার ব্যবহার চায় সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। প্রতিনিধিসভার পররাষ্ট্র বিষয়ক কমিটির সদস্য ডেমোক্রাটিক পার্টির ওয়েন হেস প্রকাশ্য বিবৃতিতে পরমাণু বোমা ব্যবহারের দাবি জানিয়েছেন। হেস বলেছেন, যুদ্ধে পরাজয়ের চেয়ে পরমাণু বোমা ব্যবহার শতগুণে ভাল। ভিয়েতনামের যুদ্ধে পরমাণু বোমা নিক্ষেপ না করাকে হেস চরম বোকামি বলে বর্ণনা করেছেন।

কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পরমাণু বোমা ব্যবহার করলে সেটা কি খুব চালাকির কাজ হবে? হিরোশিমা- নাগাসাকির সময় কেবলমাত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হাতে পরমাণু অস্ত্র ছিল। আর আজ মার্কিণ প্রতিপক্ষ সোভিয়েট ইউনিয়ন এমন কি চীনও পারমাণবিক বলে বলীয়ান। উভয় পক্ষই পরমাণু বোমা নিক্ষেপে সক্ষম। তার পরিণতি কি হবে?

দক্ষিণ ভিয়েতনামে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও দক্ষিণ ভিয়েতনামের সৈন্যবাহিনী ক্রমেই বেশি করে মার খাচ্ছে। প্রাচীন রাজধানী হুয়ে এখন ভিয়েত কং-দের দখলে চলে গেছে। শহরের মাঝখানে মার্কিন সৈন্যদের একটি ঘাঁটি থেকে এখনও প্রতিরোধ চালানো হচ্ছে, এবং আকাশ-পথেও মার্কিন বিমানের বোমাবর্ষণ চলছে, তবু হুয়ে পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হয় নি। আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণ কমিশনের যে দলটি হুয়েতে ছিলেন, তার একজন ভারতীয় সদস্য যুদ্ধের সময় আহত হওয়ায় ভারতীয়, পোল ও কানাডীয় সদস্যদের নিয়ে গঠিত এই দলটি হুয়ে ত্যাগ করে অপেক্ষাকৃত নিরাপদ দা নাং-এ আশ্রয় নিয়েছেন।

রাজধানী সায়গনের অর্ধেকের বেশি ভিয়েত কং গেরিলাদের হাতে। উত্তর ভিয়েতনামের সরকারী দলের মুখপাত্র 'নান দান' দাবি করেছে, এবারের আক্রমণে মুক্তিবাহিনীর হাতে দক্ষিণ ভিয়েতনাম সৈন্যবাহিনীর এক-তৃতীয়াংশ নিশ্চিহ্ন হয়েছে। অন্তত ৪০ হাজার মার্কিন ও দক্ষিণ ভিয়েতনামী সৈন্য এই ১২।১৩ দিনের যুদ্ধে মারা গেছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভিয়েতনামে আরও বেশি করে সৈন্য পাঠাচ্ছে। ১৩ই ফেব্রুয়ারী ওয়াশিংটনে সহকারী পররাষ্ট্র-সচিব ফিন গোলডিং ঘোষণা করেছেন, দক্ষিণ ভিয়েতনামে মার্কিন সেনাবাহিনীর প্রধান জেনারেল ওয়েস্টমোরল্যাণ্ডের অনুরোধে আরও ১০,৫০০ মার্কিন সৈন্য ভিয়েতনামে পাঠানো হয়েছে।

এর পরেও মার্কিন ও দক্ষিণ ভিয়েতনামের কর্তারা বলছেন, তাঁরাই জিতছেন! ১৬ই ফেব্রুয়ারী দিল্লীতে দক্ষিণ ভিয়েতনামের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ত্রান ভান দো বলেছেন, ভিয়েত কং গেরিলা ও উত্তর ভিয়েতনামের সৈন্যদের আক্রমণ সম্পূর্ণ প্রতিরোধ করা সম্ভব হয়েছে। তারা এখন পিছু হটছে। ত্রান ভান দো আরও বলেছেন, কমিউনিস্টরা ভেবেছিল যে এই অতর্কিত আক্রমণের পর সারা দেশে তাদের সমর্থনে গণ-অভ্যুত্থান শুরু হবে। কিন্তু তা না হওয়ায় এখন তারা হতাশ হয়ে পড়েছে।

দক্ষিণ কোরিয়া:

দক্ষিণ কোরিয়ার নেতাদের গোঁসা ভাঙাবার জন্য মার্কিন রাষ্ট্রপতি লিণ্ডন তাঁর ব্যক্তিগত প্রতিনিধি সাইরাস ভ্যান্সকে সিওল পাঠিয়েছেন। প্রাক্তন সহকারী প্রতিরক্ষাসচিব ভ্যান্স সিওলে এসে রাষ্ট্রপতি চুং হি পার্কের সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনা করেছেন। পররাষ্ট্রমন্ত্রী কিউ হো চাই-এর সঙ্গেও তাঁর কথা হয়েছে।

'পুয়েবলো' গোয়েন্দা জাহাজ আটকের ব্যাপারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র উত্তর কোরিয়ার কাছে আত্মসমর্পণ করছে, এতেই দক্ষিণ কোরিয়ার রাগ। পানমুনজানের গোপন বৈঠকেও তাদের আপত্তি। কিউ হো চাই মার্কিন রাষ্ট্রদূত উইলিয়াম পোরটারকে পরিষ্কার বলেছেন, পানমুনজানের আলোচনা গোপনে না করে প্রকাশ্যে করতে হবে, অথবা দক্ষিণ কোরিয়ার প্রতিনিধিকে এই আলোচনায় যোগদানের অনুমতি দিতে হবে। দক্ষিণ কোরিয়াকে বাদ দিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র উত্তর কোরিয়ার সঙ্গে চুপি চুপি মীমাংসা করে নেবে, তা চলবে না।

দক্ষিণ কোরিয়ায় সম্প্রতি যেভাবে কমিউনিস্ট অনুপ্রবেশ শুরু হয়েছে তাতেও দক্ষিণ কোরিয়া সরকার বিচলিত। এ বিষয়েও তারা উপযুক্ত নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি চায়।

সাইরাস ভ্যান্স ও চুং হি পার্কের মধ্যে ১৩ই ফেব্রুয়ারী তিন ঘণ্টা আলোচনা হয়েছে। উভয়েই এই বিষয়গুলি সম্পর্কে আলোচনা করেছেন: (১) দক্ষিণ কোরিয়ার নিরাপত্তা—১৯৫৩ সালের চুক্তি অনুসারে যে কোন আক্রমণে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দক্ষিণ কোরিয়াকে সাহায্য করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ; (২) পানমুনজান বৈঠক—এই বৈঠকে দক্ষিণ কোরিয়ার প্রতিনিধির যোগদানের দাবি নিয়ে কথা হয়েছে; (৩) 'পুয়েবলো' আটকের পর এই অঞ্চলে যে মার্কিন সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করা হয়েছে তা অব্যাহত রাখা হবে; এবং, (৪) দক্ষিণ কোরিয়ায় রাষ্ট্রসংঘ কম্যাণ্ডের নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে দক্ষিণ কোরিয়াকে অংশ গ্রহণ করতে দিতে হবে—কম্যাণ্ডার মার্কিন জেনারেল চার্লস বোনস্টিনের অধীনে একজন দক্ষিণ কোরীয় সহকারী কম্যাণ্ডার নিয়োগ করতে হবে।

দক্ষিণ কোরিয়াকে খুশি করার উদ্দেশ্যে ইতিমধ্যেই জনসন কোরিয়ার জন্য আরও ১০ লক্ষ ডলার সামরিক সাহায্য দেবার জন্য কংগ্রেসের কাছে সুপারিশ করেছেন।

কেনিয়া :

কেনিয়া থেকে দলে দলে এশীয়রা চলে আসছে। এদের অধিকাংশই ভারতীয় ও পাকিস্তানী। পাঁচ বছর আগে যখন কেনিয়া ব্রিটিশ শাসন থেকে মুক্তি লাভ করে তখন ব্যবস্থা করা হয়েছিল, কেনিয়াবাসী এশীয়রা ইচ্ছা করলে ব্রিটিশ নাগরিকত্ব গ্রহণ করতে পারে। আজ এশীয়রা তাই ব্রিটিশ নাগরিকত্ব গ্রহণ করে বৃটেনের পথে পাড়ি দিচ্ছে। নাইরোবি বিমান বন্দর থেকে প্রতিদিন গড়ে প্রায় ১০০ জন করে লণ্ডন যাত্রা করছে। ১৯৬৩ সালে স্বাধীনতার পর থেকে এ পর্যন্ত এক লক্ষ নব্বই হাজার এশীয় কেনিয়া থেকে বৃটেন গেছে। নাইরোবির বৃটিশ হাইকমিশনারের অফিস থেকে এশীয়দের জন্য প্রতি মাসে গড়ে দেড় হাজার পাসপোর্ট দিতে হচ্ছে।

এশীয়রা কেনিয়া ত্যাগ করে বৃটেনে উদ্বাস্তু হয়ে যাচ্ছে কেন? এদের অভিযোগ: কেনিয়ায় এদের প্রতি বৈষম্য করা হচ্ছে। ব্যবসায় ও কর্মসংস্থানে বাধার সৃষ্টি করা হচ্ছে এবং এরা দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকে পরিণত হচ্ছে। কেনিয়ায় ব্যবসা উপলক্ষে বহু পূর্ব থেকেই অনেক এশীয় রয়েছে। এদের মধ্যে এক-তৃতীয়াংশ কেনিয়ার নাগরিক। বাকি যারা তারা কেনিয়ার নাগরিকত্ব গ্রহণ করতে পারে। এদের মধ্যে অনেকেই নাগরিকত্ব গ্রহণের জন্য আবেদন করেছে। কিন্তু ২৩।২৪ মাসের ওপর আবেদন করা সত্ত্বেও এদের নাগরিকত্ব দেওয়া হয় নি। তার ফলে বেশ কিছুটা অসুবিধা হচ্ছে। তার ওপর সম্প্রতি অর্থনীতিতে কেনিয়াকরণের যে নীতি গ্রহণ করা হয়েছে তাতে বলা হয়েছে যে-সব কাজ আফ্রিকীয়রা পারবে তা অপরকে দেওয়া হবে না। ইমিগ্রেশন আইনের কড়াকড়িও করা হয়েছে। এতেই বিচলিত হয়ে এশীয়রা দলে দলে কেনিয়া ছেড়ে, বহু দিনের পরিশ্রমে অর্জিত সম্পত্তি ঘর-বাড়ি ফেলে চলে যাচ্ছে।

জোমো কেনিয়াট্টার দেশ কেনিয়াতে এশীয়দের প্রতি এই বৈষম্যে অনেকেই দুঃখ বোধ করবেন। কিন্তু এই আজ ঘটছে। কেবল কেনিয়া নয়; মালাউই, উগাণ্ডা ও তানজানিয়া থেকেও এশীয়রা চলে আসতে বাধ্য হচ্ছে। হয়তো কিছু উচ্চবিত্ত এশীয়দের উন্নাসিক আচরণ আফ্রিকীয়দের মধ্যে এই এশীয় বিরোধী মনোভাব সৃষ্টির জন্য দায়ী। কিন্তু তার জন্য সাধারণ এশীয়রা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

এশীয় উদ্বাস্তুরা যে বৃটেনেও সুবিধা করতে পারবে তা মনে হয় না। বৃটেনের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাও ভাল নয়। ব্যবসায় মন্দা, বেকার সমস্যা বৃটেনে আজ প্রকট। তাছাড়া এভাবে কালো এশীয়দের বৃটেন আগমন এক শ্রেণীর ইংরেজ ভাল চোখে দেখছে না। তারা এই আগমন প্রতিরোধ করার জন্য দাবি জানিয়েছে।

কমন্স সভার পাঁচজন রক্ষণশীল সদস্য 'বহিরাগত আগমন' বন্ধ করার জন্য বর্তমান 'ইমিগ্রেশন' আইন পরিবর্তনের দাবি জানিয়ে কমন্স সভায় একটি প্রস্তাব উত্থাপনের নোটিশ দিয়েছেন। রক্ষণশীল দলের প্রথম সারির নেতা কমন্সসদস্য এনক পাওয়েল বি-বি-সি-তে এক ভাষণ প্রসঙ্গে এশীয়দের এভাবে বৃটেনে আসার তীব্র বিরোধিতা করেছেন।

এই অবস্থায় উইলসন সরকার খুবই অস্বস্তির মধ্যে পড়েছেন। নীতিগতভাবে তাঁরা সমতার নীতি অনুসরণের জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, এবং সাদা ও কালোর মধ্যে কোন তফাৎ করতে পারেন না। অথচ, এই অন্তহীন উদ্বাস্তু আগমনের ফলে বৃটিশ জনমতের অন্তত একাংশেরও বিক্ষোভ উপেক্ষা করাও তাঁদের পক্ষে সম্ভব নয়। উইলসন কি এ ব্যাপারে কেনিয়া, ভারত, পাকিস্তান—এদের নিয়ে আলোচনার চেষ্টা করবেন ?

বেলজিয়াম :

ভাষার কলহে এবং ছাত্র আন্দোলনের ফলে বেলজিয়াম সরকারের পতন ঘটেছে। ভারতের বর্তমান ভাষা দ্বন্দ্ব এবং ভাষার প্রশ্নে ছাত্র আন্দোলনের পটভূমিকায় বেলজিয়ামের এই ঘটনা বিশেষভাবে অনুধাবনযোগ্য।

ভাষা নিয়ে বিবাদ বেলজিয়ামে অনেক দিন ধরেই চলছে। এখানে ৫০ লক্ষ ফ্লেমিশ ওলন্দাজ ভাষায় কথা বলে, আর ৩০ লক্ষ ওয়ালুন ফরাসীভাষী। নানা ব্যাপারে এই দুই গোষ্ঠীর ভাষা-দ্বন্দ্ব প্রকাশ পায়। ভাষার চেয়েও বড় কথা, সংখ্যালঘু ওয়ালুনরা সম্পদ, শিক্ষা-দীক্ষা, রাজনৈতিক আধিপত্য সব ব্যাপারেই অপেক্ষাকৃত অনগ্রসর ফ্লেমিশদের চেয়ে এগিয়ে আছে। তাই ফ্লেমিশদের রাগ রয়েছে ওয়ালুনদের ওপর।

বিশ্বের বৃহত্তম ক্যাথলিক বিশ্ববিদ্যালয় লুভেঁ বিশ্ববিদ্যালয় এই অঞ্চলের প্রাচীনতম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। ১৪২৬ সালে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হয়। প্রথমে কেবলমাত্র লাতিন ভাষায় এখানে পড়ানো হত, এখন ফরাসী ও ওলন্দাজ ভাষাতেও হয়। বর্তমানে লুভেঁ বিশ্ববিদ্যালয়ে ১১ হাজার ওলন্দাজভাষী ছাত্র, এবং ৯ হাজার ফরাসীভাষী ছাত্র। ওলন্দাজভাষী ফ্লেমিশরা বেশ কিছুদিন ধরে দাবি জানাচ্ছে, বিশ্ববিদ্যালয়টিকে ভাগ করে ফরাসী অংশকে পৃথক করে দিতে হবে। সাত মাইল দূরে ফ্ল্যানডারসের ভেতরেই আর একটি জায়গায় কেবলমাত্র ফরাসীভাষীদের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় করতে হবে। বর্তমান লুভেঁ বিশ্ববিদ্যালয় কেবলমাত্র ফ্লেমিশদের জন্য থাকবে। ফরাসীভাষী ওয়ালুনদের এতে ভীষণ আপত্তি। তারা এই পৃথকীকরণের বিরোধী। পৃথক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করে নতুন বাড়িঘর তৈরি, বইপত্র অপসারণ, শিক্ষক ও ছাত্রের স্থানান্তর সব মিলিয়ে হিসাব করে দেখা গেছে, প্রায় ১৪০ মিলিয়ন ডলার অতিরিক্ত ব্যয় হবে। তাছাড়া এই কাজের ফলে ৫৪৩ বৎসরের প্রাচীন এই বিশ্ববিদ্যালয়ের মর্যাদাহানি হবে।

কিন্তু ফ্লেমিশরা নাছোড়বান্দা। ফ্লেমিশ ছাত্ররা সভা, মিছিল, বিক্ষোভ এমন কি বলপ্রয়োগের দ্বারাও হামলা করেছে। পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষ হয়েছে। ওয়ালুন ছাত্রদের সঙ্গে মারপিটও হয়েছে। লুভেঁ ছাড়াও রাজধানী ব্রাসেলস, আন্টুপ, ব্রুজেস, মালিনেস প্রভৃতি শহরে এই বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে।

সম্প্রতি ফ্লেমিশপ্রধান বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ স্থির করেছেন; ফরাসী ফ্যাকালটিকে বিশ্ববিদ্যালয় এলাকার মধ্যে নতুন কোন ঘর ব্যবহার করতে দেওয়া হবে না। এতে জটিলতা ও উত্তেজনা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে।

বেলজিয়ামের প্রধানমন্ত্রী ভ্যানডেন বোয়েনান্তস্ নিজে ফ্লেমিশ হলেও ভাষার প্রশ্নে তিনি উদার নীতি গ্রহণের চেষ্টা করেন। বেলজিয়ামের অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং আন্তর্জাতিক মর্যাদা বৃদ্ধির দিকে তিনি বেশি দৃষ্টি দিয়েছেন। তাঁর ধারণা, এ কাজে সফল হলে ভাষা কলহ থেকে তিনি দেশবাসীর দৃষ্টি ফেরাতে পারবেন। কিন্তু তাঁর এই প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে।

বোয়েনান্তস লুভেঁ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরোধ মেটাবার জন্য দেশের ক্যাথলিক বিশপদের মধ্যস্থরূপে কাজ করার জন্য অনুরোধ করেছিলেন। কিন্তু বিশপরাও ব্যর্থ হয়েছেন। শেষ পর্যন্ত বোয়েনান্তস সিদ্ধান্ত করেন, লুভেঁ বিশ্ববিদ্যালয় বিভক্ত করা হবে না—ফরাসী ফ্যাকালটি এখানেই থাকবে। এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে মন্ত্রিসভার ৮ জন ফ্লেমিশ মন্ত্রী পদত্যাগের হুমকী দেন, এবং একটা বড় রকমের মন্ত্রিত্ব সংকটের সৃষ্টি হয়। এই অবস্থায় বোয়েনান্তস পদত্যাগকেই শ্রেয় বলে মনে করেন এবং তিনি রাজা বদোঁনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁর মন্ত্রিসভার পদত্যাগপত্র পেশ করেন।

বেলজিয়াম এখন নতুন নির্বাচনের সম্মুখীন। এই নির্বাচনে ফ্লেমিশ ও ওয়ালুনদের বিরোধ আরও প্রকট হবে। শেষ পর্যন্ত কি বেলজিয়াম বিভাগ করতে হবে ?

মেঘনা পারের কবিতা

॥ ১ ॥

একসার জ্বলন্ত নাম

হাসান হাফিজুর রহমান

আম্মা তাঁর নামটি ধরে একবারও ডাকবে না আর?
ঘূর্ণিঝড়ের মতো সেই নাম উন্মথিত মনের প্রান্তরে
ঘুরে ঘুরে জাগবে, ডাকবে,
দুটি ঠোঁটের ভিতর থেকে মুক্তোর মত গড়িয়ে এসে
একবারও উজ্জ্বল হয়ে উঠবে না, সারাটি জীবনেও না?
কি করে এই গুরুভার সইবে তুমি, কতোদিন?
আবুল বরকত নেই; সেই অস্বাভাবিক বেড়ে ওঠা
বিশাল শরীর বালক, মধুর স্টলের ছাদ ছুঁয়ে
হাঁটতো যে তাকে ডেকো না?
আর একবারও ডাকলে ঘৃণায় তুমি কুঁচকে উঠবে—
সালাম, রফিকউদ্দিন, জব্বার—কি বিষম খোকা খোকা নাম;
এই একসারি নাম বর্শার তীক্ষ্ণ ফলার মতো এখন
হৃদয়কে হানে।

বিচ্ছেদের জন্য তৈরি হওয়ার আগেই আমরা ওদেরকে
হারিয়েছি—
কেন না প্রতিক্রিয়ার গ্রাস জীবন ও মনুষ্যত্বকে সমীহ করে না।
ভেবে ওঠার আগেই আমরা ওদেরকে হারিয়েছি
কেন না, প্রতিক্রিয়ার কৌশল এক মৃত্যু দিয়ে হাজার
মৃত্যুকে ডেকে আনে।

আর এবার আমরা হারিয়েছি এমন কয়জনকে
যাঁরা কোনদিন মন থেকে মুছবে না,
কোনদিন কাকেও শান্ত হতে দেবে না:
যাঁদের হারালাম তাঁরা আমাদেরকে বিস্তৃত করে দিয়ে গেল

দেশের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্তে, কণা কণা করে
ছড়িয়ে দিয়ে গেল
দেশের প্রাণের দীপ্তির ভেতরে মৃত্যুর অন্ধকারে
ডুবে যেতে যেতে।
আবুল, বরকত, সালাম, রফিকউদ্দিন, জব্বার

কি আশ্চর্য, কি বিষম নাম! একসার জ্বলন্ত নাম॥

॥ ২ ॥

নিষ্ঠুর বিদ্রোহ

আবদুর রশীদ ওয়াসেকপুরী

অভিশাপ ভরা এখানে জীবনগুলি
আতঙ্ক সুখ, মানবতা নেই কোনো,
অপমৃত্যুর নাগর-দোলায় দুলি
বেঁচে থাকা সেই কাহিনী
শুনাই, শোনো:

বৃথা জিজ্ঞাসা: নেই কোনো উত্তর:
নীরব কণ্ঠ: রক্ত অশ্রুপাত!
রাক্ষুসী খেলা জমছে ভয়ঙ্কর,
উন্মাদ দিন,—হীন পাশবিক রাত।

মেঘনা পারের ছায়া-স্বপ্নিলগুলি
ছেয়েছে আকাশে কুটিল ভয়াল মেঘ
বৃথাই রক্ত: শোধ হয় নাকো ঋণ,
অজানা শঙ্কা, বাড়ে শুধু উদ্বেগ।

গোলাভরা ধান আর গলা ভরা গান
মনে হয় আজ রূপকাহিনীর মতো,
চাঁদের আলোয় নেই সে
রূপালী স্নান,
ফসলে আগুন জ্বলছে ইতস্তত।

মধু-সন্ধ্যায় পাতা-ছাওয়া কুঁড়ে পাশে
নীলাম্বরীর আঁচল উড়ে না আর,
জল ভরা ছলে যৌবন-উল্লাসে
কিষাণবালাকে নদী তীরে
পাওয়া ভার।

মন্দিরে নেই সন্ধ্যা আরতি শাঁখ,
মসজিদ কাঁদে—কোথায়
আজান সুর?
মাঠে মাঠে নেই রাখালের ফেরার ডাক,
জাগে সম্মুখে রাত্রির কালোচূড়।

কুলুকুলু রবে মেঘনার কালো পানি
অত্যাচারের কাহিনী কহিয়া বয়,
দুই তীরে আম কাঁঠালের হাতছানি
গুয়া-নারিকেল ইঙ্গিতে কথা কয়।

মেঘনার পাড়ে সবুজের সমারোহ
তারি পাশে জাগে উষ্ণ রক্তকণা!
ক্ষমাহীন এক নিষ্ঠুর বিদ্রোহ
এখানে ছড়াবে গলিত সূর্য-সোনা॥

॥ ৩ ॥

হৃদয়ে হৃদয় ছুঁয়ে

শামসুন নাহার বেগম

আমার এ বুকের আঁচল
সবুজের ছোঁয়া পেয়ে
ফসলের ডাকে
পত্ পত্ উড়ে অভিনন্দন দেয়।

শুধু আমারই নয়!
যেখানে অনেক মানুষের কামনা
সূর্যের প্রবল তাপে
পুড়ে পুড়ে ডেকে আনে শুধু হাহাকার!

নিশ্চিত সম্ভাবনায় জাগে মৌসুম
আজিকে ভাঙে তোমার ও আমার
অনেক জনের ঘুম।
যেখানে আশার দীপালী জ্বেলেছে
হৃদয়ে হৃদয় ছুঁয়ে
সৌরভে মেতে উঠি আজ
আঁখিজল দিয়ে জীবনের আহ্বানে
আমার মতো মানুষের কল্যাণে
মুছে দেই কলঙ্ক সব!

আমার এ বুকের আঁচলে
ফসলের ডাকে লিখি,
উজ্জ্বল সম্ভাবনায় আর সবুজের ছোঁয়ায়
এখনো আমার এ মন জাগে
প্রত্যাশা নিয়ে
এবং চেয়ে রয় প্রতীক্ষায়।
যেখানে আশার মিলিত কণ্ঠে শুনি
ফসলের ডাকে সংগত অভিমান।

২১শে ফেব্রুয়ারী, পূর্ব দেশ

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

"হৃৎপিণ্ডের মাণিক রে তুই
রাজেশ্বরী, আমার বাংলা ভাষা!
জোর করে যে কাড়তে এসেছিল, তার রক্তে মাখা ছুরি
আমার বুকের মধ্যে সর্বনাশা
আগুন দেখে ভয় পেয়েছে। আগুন দেখে পালিয়ে গেল রে!
চোখ রাঙিয়ে মুখের ভাষা কাড়তে এসেছিল,
এমনি যার গায়ের জোর!"

এসব কথা বলেছিলো পূবের দেশে
নিহত মানুষেরা! তারা প্রাণ দিয়েছে কিন্তু ভোরবেলার
সূর্যোদয়, ভাষা
ভালবাসায় রাঙিয়ে দিয়ে গেছে। কোনো জহ্লাদের সাধ্য
ছিল না
রাখবে তাদের ভাষার বুকে পা।

হৃৎপিণ্ডের মাণিক সে-যে আগুন। শোনো ;
দেশ বিদেশের মস্তানেরা!—
সর্বনাশা আগুনে দিলে পা
হারতে হবে, খুনের রাঙা দু'হাত থেকে রক্ত মুছতে
জীবন যাবে!
মুখের ভাষা কাড়তে পারবে না।

পূবের দেশের নিহত মানুষেরা মন্ত্র শিখিয়ে গেছে,
অনির্বাণ প্রেমের গান উচ্চারণ।

প্রতিদিন আমি

কল্যাণকুমার দাশগুপ্ত

সূর্য কি শুধু পশ্চিমে শুধু পূর্বে?

অন্ধকারের অন্ত আকাশ ছাড়িয়ে
রাম-রহিমের বাংলা দীপ্ত দাঁড়িয়ে
বলে : 'ছেঁড়া মানচিত্র তোদের
চিত্তে আবার জুড়বে!'

দু-চারজনের অপকীর্তির স্তম্ভ
কীর্তিনাশার শুভ্রশোভন দম্ভ
মুছে দেবে, হবে নতুন বাংলা
হয় নি যা ইতিপূর্বে।

আজও তাই সব দুঃখ মাড়াতে পারি,
প্রতিদিন আমি একুশে ফেব্রুয়ারী।

আজও তাই শুনি রক্তে সারাক্ষণ
গঙ্গার বানে পদ্মার গর্জন,
বাংলা তোমার কক্ষপথে যে-
পৃথিবী ঘুরছে ঘুরবে—
সে-ই বলে দেবে সূর্য কোথায়
পশ্চিমে না কি পূর্বে॥

আমার মায়ের মুখ পদ্মায় মেঘনায়

জয়ন্তী সেন

আমার মায়ের মুখ মেঘনীল পদ্মায় মেঘনায়
ভোরের আলোর মত ভেসে আসে রোদের সোনায়
ঢেউ-এ দোলে কালো চুল দুই চোখে নিবিড় আকুল
ছলো ছলো ভালোবাসা, এক রাশি করে পড়া ফুল।

আমার মায়ের মন কোমল নদীর দুটি তীর
সবুজ ধানের শীষে থরো থরো হাওয়ার শরীর
ক্লান্তির প্রহরে সুখ জড়ো করা সুস্নিগ্ধ কুলায়
আকাশে জোছ্না কাঁপে—যার বুক মমতা বিলায়।

আমার মায়ের ভাষা মৃদু সুরে শুনি কানে কানে
গভীর ঘুমের প্রান্ত ছুঁয়ে যাওয়া দোলনার গানে
জন্মের প্রথম ধ্বনি—উৎস যার আলোয় হাওয়ায়
জড়ানো পাতার শব্দে, তরঙ্গিত পদ্মায় মেঘনায়।

ঢেউ

আনসুর আলী মোল্লা

যেন এই দুনিয়ার ঘাটে
দু' তীরের দুটি নায়ে বিদেশী দু' মাঝি।
এ-পারের লোক আর যায় না ও-হাটে।
বসে আছি : কেউ যদি যেতে হয় রাজী।

সারাদিন পার হয়। আসে নীল রাত।
দুটি নায়ে দুটি বাতি যেন উন্মুখ!
ঢেউয়ে ঢেউয়ে এক হয় মেঘনার হাত
মাঝখানে দুটি নাও আর দুটি বুক।

কত কথা হয়। ধীরে ধীরে ক্ষয়ে যাওয়া
স্মৃতিগুলি একেবারে ভুলি নি তো কেউ।
দু'জনার প্রাণে একই মেঘনার হাওয়া,
আমাদের কাছে দেখে নাচে যেন ঢেউ॥

সপ্তাহের ঝোঁক

কৃত্তিবাস ওঝা

অবশেষে বহু প্রতীক্ষিত পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার বাজেট অধিবেশন নামীয় নাটকের অভিনয় শেষ হল। এই নাটকের একমাত্র মহত্ত্ব ও কৃতিত্ব হল সকল অভিনেতাই নিজ নিজ ভূমিকা সাফল্যের সঙ্গে অভিনয় করেছেন এবং নাটকের যে পরিণতি আশা করা হয়েছিল সঠিকভাবে সেই পরিণতি লাভ করেছে। নাটক দেখতে বসে যেমন দর্শকরা সাময়িকভাবে নাটকে উপস্থাপিত দৃশ্যের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যায়—অর্থাৎ দর্শকদের মন কখনও নাটকের দৃশ্য অনুযায়ী স্বর্গের উর্বশী কিন্নরীদের সান্নিধ্য অনুভব করে অথবা নরকের পাপযন্ত্রণা ভোগের করুণ দৃশ্যে মনোবেদনা ভোগ করে; কিন্তু নাটক শেষে শ্রীনিত্যানন্দ কেরানী বা শ্রীমান সন্দীপ ভাদুড়ী বা শ্রীমতী শকুন্তলা ভট্টাচার্য নিজেদের বাড়ি ফিরে যান ও নিত্যদিনের তেল-তন্ডুলের হিসাবে মগ্ন হন। আমাদের অবস্থা ঐ একই। ১৪ ফেব্রুয়ারীর বিধানসভা নাটক আমরা দেখেছি কিন্তু সেই নাটক রাজ্যের জনজীবন অথবা রাজনৈতিক জীবনে কোন পরিবর্তন আনতে পারে নি। আমরা হরিপদ নিত্যানন্দ কেরানীর দল একই জায়গায় আছি।

অভিনেতাদের সকলের অভিনয়ই অবশ্য সফল হয়েছে। এই নাটকের নায়ক রাজ্যপাল শ্রীধরমবীর তাঁর কথামত ঠিক মতই অভিনয় করেছেন। রাজ্যপাল বলেছিলেন, তিনি বিধানসভায় যাবেন ও ভাষণ দেবেন। রাজ্যপাল তাঁর কথামত ঠিক দুটো বাজতে কয়েক মিনিট থাকতে বিধানসভা ভবনে আসেন ও যথারীতি আনুষ্ঠানিক শোভাযাত্রায় অংশ নেন; পরে সদর পথে বাধা পেয়ে অন্য দরজা দিয়ে বিধানসভায় প্রবেশ করেন এবং একটু নিরাপদ স্থানে দাঁড়িয়ে বাজেট ভাষণের কিছুটা পাঠ করেন। কাজেই রাজ্যপালের কথামত তিনি বিধানসভায় এসেছেন ও ভাষণ দিয়েছেন ধরে নিতে কোন অসুবিধা নেই যেমন স্বর্গত শচীন সেনগুপ্তের সিরাজদ্দৌলা রেকর্ড নাটকে স্বর্গত নির্মলেন্দু লাহিড়ীকে 'সুবে বাংলার নবাবরূপে ধরে নিতে কোন কষ্ট হয় না।

এই নাটকের অপর মুখ্য অভিনেতা স্পীকার তাঁর অভিনয়ও সঠিকভাবে করেছেন। স্পীকার বলেছিলেন, তিনি যথাযোগ্য মর্যাদায় রাজ্যপালকে বিধানসভা ভবনে নিয়ে আসবেন ও রাজ্যপালকে তাঁর কর্তব্য করতে দেবেন। তাই রাজ্যপাল বিধানসভার গেটে উপস্থিত হলে স্পীকার শ্রীবিজয় বন্দ্যোপাধ্যায় রাজ্যপালকে করমর্দন করে অভ্যর্থনা করেছেন, শোভাযাত্রা করে বিধানসভাকক্ষ অভিমুখে নিয়ে এসেছেন; কিন্তু এক সময় তাঁকে না জানিয়ে তাঁর অজ্ঞাতে রাজ্যপাল অন্য পথে অন্যত্র চলে গেছেন।

সবিনয় নিবেদন

স্থানাভাববশত এ সংখ্যায় অনন্ত সিংহের 'অগ্নিযুগের একটি অধ্যায়', 'চন্দ্রগুপ্ত'-এর 'অবক্তব্য' এবং শিলাজির 'রঙ্গমঞ্চ—ওদেশে এবং এদেশে' শীর্ষক নিয়মিত রচনাগুলি প্রকাশ করা গেল না, এর জন্যে আমরা দুঃখিত। আগামী সংখ্যা থেকে রচনাগুলি যথারীতি প্রকাশিত হবে। —সম্পাদিকা

কাজেই রাজ্যপাল যদি শোভাযাত্রা ত্যাগ করে, স্পীকারকে ভরসা না করে নিজ দায়িত্বে কোথাও চলে যান, তবে তার দায়িত্ব স্পীকারের থাকে না। কাজেই তিনি যতক্ষণ স্পীকারের সঙ্গে ছিলেন, ততক্ষণ স্পীকার তাঁর নিরাপত্তা বিধান করেছেন এবং তাঁর গতিপথ মুক্ত রেখেছেন। কিন্তু পরে রাজ্যপাল কোন্ পথে বিধানসভায় প্রবেশ করেছেন বা প্রবেশ করে কোন ভাষণ দিয়েছেন কি না, রাজ্যপালের দেহে কোন আঘাত লেগেছে কিনা—সবই স্পীকারের অজ্ঞাতে ঘটেছে। আর স্পীকারের অজ্ঞাতে রাজ্যপাল যদি কোন প্রকারে লাঞ্ছিত বা নিগৃহীত হয়ে থাকেন, তবে তার জন্য স্পীকারকে কিছু বলার থাকে না। স্পীকারের বিধানসভায় দ্বিতীয় দৃশ্যের অভিনয়ও সুনিপুণ হয়েছে বলা যায়। স্পীকার যথাসময়ে এলেন, দাঁড়ালেন, নমস্কার বিনিময় করলেন আর তাঁর রুলিংটি প্রদান করে চলে গেলেন। কেউ কেউ প্রশ্ন তুলেছেন স্পীকারের প্রবেশ সময়মত হয় নি। কিন্তু স্পীকার বলেছেন—আমার ঘড়িতে নির্দিষ্ট সময়ে আমি হাউসে প্রবেশ করেছি, বিধানসভার সেক্রেটারী তাঁর ঘড়ির ঠিক সময় আমায় শোভাযাত্রা করে হাউসে নিয়ে গেছে—হাউসের ঘণ্টা বাজা বন্ধ হতেই আমার দায়িত্ব পালন করেছি; কাজেই অন্য কোন ঘড়িতে যদি অন্য সময় হয়ে থাকে তার জন্য স্পীকারের কিছু করণীয় নেই। রাজ্যের সব ঘড়ি স্পীকারের ঘড়ির সঙ্গে তাল রেখে চলবে—অথবা স্পীকার সব ঘড়িকে তাঁর ঘড়ির সঙ্গে মিলিয়ে চলতে বাধ্য করবেন এমন কোন "ক্ষ্যামতা" স্পীকারের নেই। স্পীকারের অভিনয়ে চরম উৎকর্ষতা দেখা যায় তাঁর ভাষণে রাজ্যপালের কোন উল্লেখ না রাখায়। এই অধিবেশন যে বাজেট অধিবেশন বা এই অধিবেশনে যে রাজ্যপাল এসেছিলেন তার কোন উল্লেখ স্পীকার করেন নি। কারণ স্পীকার তো জানেনই না যে রাজ্যপাল হাউসে এসেছিলেন। কারণ, স্পীকার রাজ্যপালকে নিয়ে আসছিলেন কিন্তু পিছন থেকে হঠাৎ রাজ্যপাল কোথায় চলে যান তা তিনি জানতেন না বা তাঁর পক্ষে তা জানা সম্ভবও নয়। পরে যখন তিনি হাউসে প্রবেশ করেছেন, তখনও তিনি হাউসে রাজ্যপালকে দেখেন নি, কাজেই হাউসে রাজ্যপালের কোন অস্তিত্ব স্পীকারের জানা ছিল না।

একইভাবে রাজ্যের সরকারী কংগ্রেস-পি ডি এফ দলও তাদের অভিনয়ের কৃতিত্ব দাবি করতে পারে। কংগ্রেস দল যে পথেই হোক রাজ্যপালকে হাউসে এনেছে, যেখানে হোক তাঁকে দাঁড় করিয়ে বাজেট অধিবেশনের উদ্বোধনী ভাষণ পাঠ করবার সুযোগ করে দিয়েছে আর যে গাড়িতে চাপিয়েই হোক রাজ্যপালকে রাজভবনে ফিরে যাবার সুযোগ করে দিয়েছে। কংগ্রেস দলের এর চেয়ে বেশি কিছু আকাঙ্ক্ষা ছিল না; তাঁদের সেই আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয়েছে।

নাটকের অন্যতম প্রধান চরিত্র যুক্তফ্রন্টের অভিনয়ও কিন্তু পরম সাফল্য-

খণ্ডিত ও নিন্দিত হয়েছে। যুক্তফ্রন্ট বলেছিল তারা রাজ্যপাল শ্রীধরমবীরকে বিধানসভায় ভাষণ দিতে দেবে না। সেই কথা তারা ঠিক রেখেছে। শ্রীধরমবীর বিধানসভায় অন্য দরজা দিয়ে প্রবেশ করে কোন রকমে একখানি চেয়ারে পা রেখে তাঁর ভাষণ পাঠ করেছেন এবং ভাষণদানকালে রাজ্যপালের পাশে স্পীকার ছিলেন না, স্পীকারের ন্যায়দণ্ড ছিল না, এমন কি স্পীকারের আসনে পর্যন্ত রাজ্যপাল পৌঁছাতে পারেন নি। সাধারণ নিয়মে রাজ্যপালের ভাষণ দেবার আগে সদস্যদের জানিয়ে দেওয়া হয় রাজ্যপাল ভাষণ দিচ্ছেন—এই ক্ষেত্রে সেই সামান্য কাজটুকু পর্যন্ত হয় নি। কাজেই যুক্তফ্রন্ট বলতে পারে অজ্ঞাতপরিচয় এক ব্যক্তি বিধানসভার এক কোণে দাঁড়িয়ে এক মিনিট কি করেছে না করেছে তাঁকে রাজ্যপাল বা তাঁর ভাষণ বলে ধরে নেবার কোন কারণই থাকতে পারে না। বহু সময় বৌপ্যমুদ্রা দ্বারা দক্ষিণা না দিয়ে হরীতকী ফল উৎসর্গ করে পূজা অনুষ্ঠান সমাপন হয় কিন্তু এইক্ষেত্রে হরীতকী ফলও প্রদান করা হয় নি। সর্বোপরি যুক্তফ্রন্ট চেয়েছিল বর্তমান সাংবিধানিক ও শাসনতান্ত্রিক অচলাবস্থার অবসান বা সমাধান যাতে তাদের মতে বে-আইনী বিধানসভায় না হয়—সেই সিদ্ধান্ত বর্ণে বর্ণে পালিত ও রক্ষিত হয়েছে। যুক্তফ্রন্ট এখনও বলতে পারবে ঘোষমন্ত্রিসভা বে-আইনী, আবার আন্দোলন করে ঘোষমন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে সংগ্রামকেও বজায় রাখতে পারবে। যুক্তফ্রন্টের কোন অবস্থায় কিছুই হারাবার নেই—এইক্ষেত্রে যুক্তফ্রন্ট কিছু হারায় নি, পরন্তু বিধানসভা ডেকে কোয়ালিশন সরকার উদ্দেশ্যসিদ্ধিতে ব্যর্থ হয়ে যুক্তফ্রন্টের জমার ঘরে কিছু জমা করে দিয়েছে বলা যায়। কংগ্রেস এতদিন ধরে দিল্লী-দিল্লী ছোটাছুটি করে ঘোষণা করেছিল—বিধানসভার অচলাবস্থা অবসানের সমাধানসূত্র তারা পেয়ে গেছে, কিন্তু এই বিধানসভার অধিবেশনের পর দেখা গেল সেই বাগাড়ম্বর নিতান্তই ভুয়া। যুক্তফ্রন্ট রাজ্যের কোয়ালিশন সরকারকে যথারীতি ত্রিশঙ্কুর অবস্থায় রাখতে পেরেছে, তাই সব মিলিয়ে যুক্তফ্রন্টের অভিনয়ও পরম সার্থক হয়েছে। কিন্তু আমরা হরিপদ কেরানীর দল যারা সরকার পরিচালনার জন্য খাজনা, ট্যাক্স দিয়ে থাকি, আমরা যারা বিধানসভা পরিচালনার জন্য হাতীর খরচ বহন করি—তারা কি পেলাম সেটাই হল বিবেচ্য। সকলেই নিজের নিজের প্রেস্টিজের লড়াই করছেন—যথা স্পীকার, সরকারী দল ও বিরোধী দল—কেউ হার মানতে রাজী নন, কেউ একচুল পিছিয়ে আসতে রাজী নন, আর এই প্রেস্টিজের লড়াইয়ে প্রাণে মরছি আমরা সাধারণ মানুষ হরিপদ কেরানীর দল। বিবদমান শক্তিগুলি নিজেদের কথা অনেক ভাবছেন, ভেবেছেন এবং ভাবলেনও : কিন্তু সেই সঙ্গে যদি আমাদের কথাও একটু ভাবেন তবে বোধ হয় সমস্যার সমাধান অনেকটা সহজতর হয়। কিন্তু সেই শুভবুদ্ধি কারই বা হবে, আর কেই বা জাগ্রত করবে সেই শুভবুদ্ধি!

সুকান্ত-সমগ্র

সুকান্ত ভট্টাচার্যের

ছাড়পত্র (৩·০০)। ঘুম নেই (২·৫০)। পূর্বাভাস (২·০০)। মিঠেকড়া (২·০০)। অভিযান (১·৭৫)। হরতাল (১·৫০)। গীতিগুচ্ছ (১·৫০)।

অপ্রকাশিত পত্রগুচ্ছ ও অপ্রচলিত কবিতার একত্রিত সংকলন।

দাম পনরো টাকা

●

সুকান্ত ভট্টাচার্য সম্পাদিত

আকাল

তের শ পঞ্চাশের শ্রেষ্ঠ বাংলা কবিতার সংকলন। দাম ২·০০।

অশোক ভট্টাচার্য অনূদিত

দেবব্রত মুখোপাধ্যায় চিত্রিত

ওমরখৈয়ামের রুবাইয়াৎ

দাম চার টাকা

●

সদ্য প্রকাশিত হল

অশোক ভট্টাচার্য প্রণীত

কবি সুকান্ত

সুকান্ত ভট্টাচার্যের প্রামাণ্য জীবনীর দ্বিতীয় সংস্করণ।

।। দাম ৩·০০ ।।

সারস্বত লাইব্রেরী

২০৬ বিধান সরণী। কলিকাতা ৬। ফোন: ৩৪-৫৪৯২

বঙ্গভাষার ভিতরের কথা

মৈত্রেয়ী দেবী

সমগ্র বঙ্গ সংস্কৃতির এক রূপ ও ভাব। দেশ ভাগ হবার ফলে সে কথা আমাদের সর্বদা স্মরণ থাকে না বটে। কিন্তু এ সত্য নানা কারণে আজ বিশেষভাবে স্মরণীয়।

শ্রদ্ধেয় দীনেশচন্দ্র সেন লিখেছিলেন, "প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে যেন হিন্দু ও মুসলমানী কথা গলাগলিভাবে মিশিয়া আছে"। যে কেহ প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত তিনিই একথা জানেন। জানেন ডাঃ শহীদুল্লাহ ও আজকের পাকিস্তানের বঙ্গভাষাসেবীরা অনেকেই। বর্তমানে পাকিস্তানে পুরোন বাংলা চর্যাপদ প্রভৃতির চর্চা খুব বেশি—কারণ পল্লীসাহিত্যের মধ্যে হিন্দু-মুসলমানের এই মিলিত ঐতিহ্যকে পুনরাবিষ্কার তাদের একান্ত প্রয়োজন হয়েছে।

অথচ এই সত্য পাকিস্তান সৃষ্টির প্রাক্‌কালে রাজনৈতিক ঘূর্ণীঝড়ে একেবারে ধূলোর আচ্ছন্ন হয়েছিল। বিচ্ছেদ সৃষ্টি করবার জন্যই ভাষা ও সাহিত্যের মধ্যে কাটার চাষ সুরু হয়েছিল। কারণ বাংলাদেশের প্রাণ রূপকথার কৌটার মধ্যে ভ্রমরার মত সাহিত্যের মধ্যেই বেঁচে আছে। তাই যখন দেশকে ভাগ করবার জন্য দ্বিজাতিতত্ত্বের অবতারণা হল প্রথম আঘাত পড়ল ভাষা ও সাহিত্যের উপর। এবারও দেখলাম পাক্‌-ভারত যুদ্ধের সুরুতেই সেই পুরনো ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি—রবীন্দ্রসঙ্গীতের উপর পাহারা, নজরুলের গানের বিকৃতিসাধন, এই সব রাজনীতি ব্যবসায়ীদের কুকীর্তি আজকের পূর্ববঙ্গের শিক্ষিত মানুষের কাছে ধিকৃত হয়েছে। রাজনৈতিক তর্কাতর্কি পার হয়ে পূর্ববঙ্গের সাহিত্য আজ যেদিকে চলেছে সে মিলনের পথ—ভাঙা মন জোড়া লাগাবার পথ—বস্তুত সাহিত্যের সেই তো কাজ—সাহিত্যের আনন্দযজ্ঞে মিলনেরই নিমন্ত্রণ।

হিন্দু-মুসলমানের মিশ্রিত রচনা এই বঙ্গভাষা ও সাহিত্য-এরমধ্যে মুসলমানের দান যে কত ব্যাপক ও গভীর তা সেই দ্বন্দ্বমুখর প্রাক্‌-স্বাধীনতা যুগে বসে দীনেশ সেন মহাশয় বিস্তারিত করে লিখেছিলেন। ব্রাহ্মণদের কুক্ষিগত সংস্কৃত ভাষায় আবদ্ধ সাহিত্য যখন ছিল সাধারণের অগম্য তখন রামায়ণ মহাভারত ও পুরাণাদি মুসলমান রাজার আদেশেই বাংলা ভাষায় অনূদিত হয়েছিল। রাজা জানতে চান প্রজার সংস্কৃতি ও জীবন মাঝখানে আছে ব্যাকরণ কণ্টকিত সংস্কৃত—তাই বাংলাকে সরল করার কাজে "সনাতন হুসেন সাহ নৃপতি তিলক" বিশেষ সচেষ্ট হয়েছিলেন। তার পূর্বে বাংলা ছিল অশিক্ষিত চাষাভুষোর ভাষা। এ ভাষায় কোনো সংগ্রন্থ রচিত হওয়াই নিষিদ্ধ ছিল। চলতি ভাষায় যারা রামায়ণ মহাভারত শুনবে তারা রৌরব নরকে যাবে।

ব্রাহ্মণদের অচলায়তন থেকে উদ্ধার করে চলিত জীবনসঙ্গমে সাহিত্যের রসপ্রবাহ বইয়ে দিয়ে তাকে ঐশ্বর্যপূর্ণ করে তুলেছিলেন মুসলমান রাজন্যবর্গ। আর রাজরাজড়ারা যা করেন, ব্রাহ্মণদের শত বিধিনিষেধ অগ্রাহ্য করে ছোট হিন্দু-রাজন্যবর্গ তার অনুকরণ না করে পারেন না। দীনেশচন্দ্র লিখছেন..."মুসলমানগণ এইভাবে বঙ্গদেশে বাংলাভাষাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া আমাদের সাহিত্যে এক নূতন যুগ আনয়ন করিলেন। শুধু তাহাই নহে তাঁহাদের প্রভাব আমাদের ভাষার বক্ষে আরবী ফারসীর ভৃগুপদচিহ্ন অঙ্কিত করিয়া দিল।" অর্থাৎ বিদেশী বহু শব্দ বাংলার মধ্যে যুক্ত হয়ে তাকে সমৃদ্ধ করল। স্বাভাবিকভাবে এই যে বিভিন্ন সংস্কৃতির মিলন এতে কোনো ক্ষতি নেই—ক্ষতি হয় তখনই যখন কোনো উদ্দেশ্য নিয়ে ভাষা ও সংস্কৃতির উপর জবরদস্তি চালান হয়।

বাংলাদেশের পল্লীসঙ্গীত, মুসলমান কৃষকের অতুলনীয় সম্পদ—অতুলনীয় সম্পদ তার ভাটিয়াল গান তার বাউলের জীবনদর্শন যা সুরে ছন্দে গভীর তাৎপর্যময়। এই রসের জগতে হিন্দু-মুসলমান মেশামেশি করে বাস করেছে একে অপরের পুরাণ ইতিহাস ও ধর্মকাহিনী থেকে প্রেরণা ও আনন্দ পেয়েছে।...এই জীবন থেকে রস ও মাধুর্য আহরণ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথও। পতিসর, সাজাদপুর বিরাহিমপুরের গ্রামে গ্রামে পদ্মার বুকে ভাসমান 'পদ্মা' তরণীতে রবীন্দ্রনাথের আশ্চর্য যৌবনের অনেকগুলি দিন কেটেছিল। পল্লীসাহিত্য, পল্লীসঙ্গীত বিশেষ করে বাউল সাধক যাঁরা মুসলমান হয়েও কোনো সম্প্রদায়ের গণ্ডীতে বদ্ধ নয়, তাদের মধ্যে মানবধর্মের যে পরিণতি রবীন্দ্রনাথ দেখেছিলেন তা তাঁকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। শুধু বাউলের সুর নয়, তার তত্ত্ব তার বাণী রবীন্দ্রকাব্যে নতুন মহিমায় প্রকাশ পেয়েছে। বাউল গানের কতকগুলি ভাষা রবীন্দ্রনাথ গ্রহণ করেছেন যেমন 'অরূপ' 'অরূপরতন' 'অধরা' ইত্যাদি এমন কি তাঁর জীবন-দেবতার কল্পনা, তাঁর সীমা অসীমের তত্ত্বও অনেকখানি এই সব গ্রাম্য সাধকদের কাব্য থেকে নতুনভাবে উৎসারিত হয়েছে। তিনি লিখেছেন, "এ দেশের অধিকাংশ মুসলমানই বংশগত জাতিতে হিন্দু ধর্মগত জাতিতে মুসলমান"—এই সত্য ভারতের ইতিহাসে নানা সাধকের সাধনায় কবির সাহিত্যে গানে শিল্পীর শিল্পে সমন্বয়ের পরমাশ্চর্য শক্তিরূপে আমরা দেখেছি। তাই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "যে সব উদার চিত্তে হিন্দু-মুসলমানের বিরুদ্ধধারা মিলিত হতে পেরেছে, সেই চিত্তে সেই ধর্মসঙ্গমে ভারতবর্ষের যথার্থ মানসতীর্থ স্থাপিত হয়েছে।"

রামানন্দ কবির দাদু রবিদাস প্রমুখের ধর্মীয় সাধনার মধ্যে এই মিলনের একটা রূপ, আর একটা রূপ চির বহমান লোক-সাহিত্য ও লোকসঙ্গীতে। এ সত্ত্বেও রাজনীতির ক্রুর খেলায় একদিন চক্রান্ত হল বাঙালীর এই প্রাণের জিনিসকে ধ্বংস করবার জন্য। যে আরবী ফারসী শব্দ স্বাভাবিক নিয়মে উভয় সংস্কৃতির শুভ-সংযোগে বাংলাভাষায় প্রবেশ করেছে যাকে দীনেশচন্দ্র 'ভৃগুপদচিহ্ন'রূপে অভিহিত করেছেন, সেই ভাষাতেই যখন দ্বিজাতিতত্ত্ব কায়েম করবার স্বার্থে আরবী ফারসী শব্দের কৃত্রিম সংযোজনার ফলে এক উৎকট মুসলমানী বাংলা সৃষ্টি সুরু হল, তখন তিনিই দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, হায়—"ভাষা পণ্ডিত বা মোল্লার হাতের মোরব্বা নয়!"

বাংলাভাষার মধ্যে আরবী ফারসী ও উর্দুর অবাধ মিশ্রণ ঘটিয়ে একটি খিচুড়ি ভাষা তৈরির মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল হিন্দু ও মুসলমান যে "বংশগত জাতিতে" এক সেই সত্যটি আচ্ছন্ন করা। রেষারেষি বেড়েই চলল, ক্রমে তারই চূড়ান্ত পরিণতি দেশ ভাগে গিয়ে দাঁড়াল।

চোখের আড়ালে চলে গেল বেশির ভাগ বাঙালী মুসলমান সমাজ। যে বিদ্বেষের আগুন জ্বলেছিল তারই ভস্ম-

রাশি ছড়িয়ে পড়ে সাহিত্যের মিলন উৎসকে রুদ্ধ করে দিল। পশ্চিম বাংলা ও পূর্ব বাংলার যোগসূত্র হল ক্ষীণ। এদিকের হিন্দু বাঙালী তার আপন ঐতিহ্যগর্বে গর্বিত হয়ে মুখ ফিরিয়ে রইল, জানতেও পারল না বাংলাভাষার একটি নতুন স্রোত কি প্রাণবেগে কি ভাব-সংগমে নতুন পথে চলেছে।

নানা ক্ষুদ্র স্বার্থ সংঘাত বিদ্বেষকেই ক্রমাগত ইন্ধন দিতে লাগল। ফলে আমাদের কাছে সমগ্র পাকিস্তানই যেন এক ভয়াবহ রাজ্য হয়ে রইল। সে যেন রাক্ষসের বিচরণভূমি। পাকিস্তানের জনজীবনে নিগূঢ়ভাবে এই উপমহাদেশের মিলনসাধনা কোনভাবে বিকশিত হচ্ছে, আজ তা কোন পরিণতির দিকে যাচ্ছে সে সম্বন্ধে আমাদের অজ্ঞতার জন্য দায়ী এদেশের পত্রপত্রিকা, এদেশের নীতিহীন সত্যভ্রষ্ট সাংবাদিকতা। যাদের হাতে মানুষে মানুষে পরিচয় ঘটানোর অপ্রতুল শক্তি, তারা সে শক্তির অপব্যবহার করেছে মানুষে মানুষে ভেদ সৃষ্টি করার কাজে, কলহের দিকটাই উচ্চ কলরোলে রাজনৈতিক সংঘাত সৃষ্টি করবার কাজে লাগান হয়েছে। ফলে বিবাতিক্ত মন নিয়ে পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুসমাজের অনেক মানুষ ভুলে গেছে যে, পাকিস্তান সরকার ও সে দেশের জনগণ এক কথা নয়।

পাকিস্তান সৃষ্টির পরে উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করবার চেষ্টাতেই পূর্ববঙ্গের বাঙালীর মনে এক সর্বহারা ভাব এসে পড়ল। ইতিহাসহারা এক ছিন্নমূল জাতি সৃষ্টি করার এই চক্রান্তকে রুখবার চেষ্টাই তাই ২১শে ফেব্রুয়ারীর জীবন-পণ সংগ্রামে প্রকাশ পেল। পূর্ববঙ্গের ভাষা আন্দোলন তাই ঐক্যের আন্দোলন —ভাঙা হৃদয়কে জোড়া লাগাবার আন্দোলন, দ্বিজাতিতত্ত্বের মিথ্যার জাল ছিন্ন করে সত্য প্রতিষ্ঠার আন্দোলন। এ কেবলমাত্র পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষার শরিকী বিবাদ নয় বা রুজি-রোজগারের ক্ষেত্রে সুবিধা সৃষ্টির দাবি-দাওয়া মিটিয়ে নেবার জন্যই মাত্র নয় বা কোনো প্রাদেশিক বুদ্ধির ক্ষুদ্রতা থেকে এ দাবি উচ্চারিত নয়। অসাম্প্রদায়িক উদার মানবতাকে প্রতিষ্ঠিত করা, সাংস্কৃতিক ঐক্যকে ও প্রগতিশীল ভাবধারাকে প্রচার করার জন্য বাঙালীত্বকে একটি সিম্বল বা প্রতীকরূপে সামনে ধরে চলেছে এ আন্দোলন। কারণ বঙ্গ-সংস্কৃতির গভীরতর ঐক্যকে এখনও বহু মানুষ উপলব্ধি করতে হয়ত পারে নি। এখনও এ সত্যের ব্যাপক প্রতিষ্ঠার প্রয়াস চলেছে যে, আগে আমরা বাঙালী তারপরে হিন্দু বা মুসলমান।

প্রসিদ্ধ সাংবাদিক আমেদুর রহমান লিখছেন :—

"পাকিস্তান আন্দোলনের তাত্ত্বিক ভিত্তি খুঁজতে গিয়ে অনেকেই অনেক কথাই বলেছেন, আজও সমানে বলে চলেছেন। সবগুলো একত্রিত করে মিলিয়ে জড় করলে দেখা যাবে একটা প্রকাণ্ড 'না' ক্রমশই প্রকাণ্ডতর হয়ে উঠছে। এ প্রসঙ্গে পাকিস্তান আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত পরবর্তীকালে কেন্দ্রীয় সরকারের মন্ত্রীপদে অধিষ্ঠিত জনৈক প্রবীণ ব্যক্তির সঙ্গে সান্ধ্যকালীন আলোচনার এক খণ্ডাংশ উদ্ধৃত করবার লোভ সম্বরণ করতে পারছি না—সেদিনকার সেন্টিমেন্ট তোমরা বুঝতে পারবে না—মুখে এক রহস্যময় হাসি ছড়িয়ে তিনি বললেন, "জানো আমরা ডিম ছেড়ে আণ্ডা খেতে আরম্ভ করেছিলাম..." কিন্তু তাতে পার্থক্যটা কোথায় ? হাসিটা আরো প্রশস্ততর করে তিনি বলেছিলেন, "সেই তো মজা সেইটাই তো তোমরা বুঝতে পারবে না—হিন্দুরা ডিমকে ডিম বলে সেজন্যই আমরা ডিম খেতে পারি না, খাবো আণ্ডা!" (এখানে উল্লেখযোগ্য যে, আণ্ডাও আরবী ফারসী শব্দ নয়: তদ্ভব শব্দ, সংস্কৃত অণ্ড থেকে জাত। এ সম্বন্ধে বদরুদ্দীন ওমর তাঁর সংস্কৃতির সংকট গ্রন্থে লিখেছেন যে সামন্তযুগীয় মনোভাব বর্তমান থাকায় যে সমস্ত তৎসম ও তদ্ভব শব্দ খানদানী মুসলমানদের জবানে শুদ্ধীকৃত হয়েছে তা ছিল গ্রহণযোগ্য) এই ডিম এবং আণ্ডার লড়াই-ই নাকি বস্তুত পাকিস্তান-আন্দোলনের দার্শনিক ভিত্তি। কথাটা হাস্যকর হলেও হাসবার মত যে নয় একটু অনুধাবন করলেই তা আমরা বুঝতে পারব। ...একটা উত্তুঙ্গ 'না'কে সামনে রেখে রাজনৈতিক আন্দোলন হয়ত চালানো যায়, ঘটনাচক্রে তাতে সাফল্য লাভও হতে পারে কিন্তু সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে 'না' ব্যাপারটা বলতে গেলে সর্বঘাতী। অথচ উত্তর স্বাধীনতার রাজনৈতিক কারণে উক্ত 'না'টাই পূর্ব পাকিস্তানের সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে অনাবশ্যক রকমে বড় হয়ে উঠল। আমরা দেখলাম এটাতে 'না' ওটাতে 'না' সর্বত্র কেবল 'না' 'না' 'না'। বাংলাভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করা যাবে না; বাংলাভাষায় সাহিত্য রচনাকালে যথেষ্ট বাংলাশব্দ ব্যবহার করা যাবে না। রবীন্দ্রনাথ আমাদের কবি নন। রবীন্দ্র-শতবার্ষিকী পালন করা যাবে না ইত্যাদি শত প্রকার 'না' আমাদের সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে চারিদিক থেকে ঘিরে দাঁড়ালো। যুক্তিটা হল এই প্রকার: 'না'র প্রাচীর খাড়া না করলে শিশুরাষ্ট্র পাকিস্তানকে ব্যাপক শত্রুতার কবল থেকে কিছুতেই রক্ষা করা যাবে না। এই 'না'র দ্বারা কে রক্ষা পেল তা প্রণিধানের অবসর না হলেও এটা বোঝা গেল যে, ওতে পূর্ব-পাকিস্তানের সাহিত্য ও সংস্কৃতির হল মরণদশা।......

"এই চেষ্টা বারবার হামলার আকারে নেমে এলো...ভাষার উপর আক্রমণ বাংলা হরফের উপর আক্রমণ, বাংলাভাষার 'পৌত্তলিক' হরফ বদলে দিয়ে রোমান কিংবা আরবী হরফ প্রবর্তনের পবিত্র চেষ্টা, বাংলাসাহিত্যের বিরুদ্ধে কুৎসিত প্রচার, এমন কি নজরুলের বিরুদ্ধে অপপ্রচার। রবীন্দ্রনাথকে বিসর্জন দেবার চেষ্টা, যুক্তবাংলার জুজুর ভয় প্রদর্শন, লেখক সাহিত্যিক বুদ্ধিজীবীদের দেশপ্রেমে সন্দেহ প্রকাশ—তাদের পিছনে গোয়েন্দা নিয়োগ এবং তাদের উপর নানারকম নির্যাতন ইত্যাদি চলতে লাগল অবিরাম—অন্যদিকে সরকারী নির্দেশবলে পূর্ব পাকিস্তানের রূপ নিরূপণ ও গতি নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা হল প্রচুর। সরকারী দপ্তরে তার নীল নক্সা তৈরি হল, আর সরকার পোষিত সংস্থার সাহায্যে তা কার্যকরী করার চেষ্টা হল বিস্তর...এতে করে এক শ্রেণীর পোষা লেখক তৈরি হলেন এবং পোষকের কৃপায় তাঁরা নাদুস নুদুসও হয়ে উঠলেন সত্য, কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানের সাহিত্যের দৈন্য দশা ঘুচল না।"

সাংবাদিক অধুনা স্বর্গীয় আমেদুর রহমানের এই সুচিন্তিত মন্তব্য থেকে একটু বিশদভাবেই উদ্ধৃতি করা গেল। কারণ তাঁর বক্তব্যের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানের আধুনিক বাঙালী মুসলমানের সাহিত্য-সংস্কৃতি ও তার সংকটের উদ্ভবের সমগ্র ছবিটি পরিষ্কার হয়ে উঠেছে। শেষোক্ত যে অবস্থাটি বর্ণনা করা হয়েছে তা আমাদেরও অপরিচিত নয়। এখানেও সরকারী পোষণে পদলেহী এক সাহিত্যিক গোষ্ঠী সৃষ্টি হয়েছে যারা শুধু সরকারী মর্যাদার জন্যই লালায়িত নয়, যারা অর্থলোভে নিজের স্বাধীন সত্তাকে বিক্রি করে দিয়েছে, কোনো উপায়ে ধনাহরণই উদ্দেশ্য হওয়ায় সবরকম প্রগতিশীল আন্দোলনের বিরোধিতা করায় যারা সদা সচেষ্ট। দেশের মধ্যে কায়েমী স্বার্থের পোষণ ও তোষণই যাদের পেশা, এরকম অবস্থায় পেশাদারী বুদ্ধি নিয়ে সাহিত্যের নবদিগন্ত উন্মোচন করতে পারে না বলেই এরা অবক্ষয়ের পথ ধরেছে। এ বিষয়ে পশ্চিম ও পূর্ব বাংলার মধ্যে একটা পার্থক্য রয়েছে। পূর্ব পাকিস্তানের কিছু কিছু সাহিত্যিক ও পত্র-পত্রিকা সরকারী স্বার্থের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধা থাকলেও বেশির ভাগ জনপ্রিয় সংবাদপত্র, লেখক সাহিত্যিক ছাত্রছাত্রী তরুণ সম্প্রদায় এই ধর্মরাষ্ট্রের ক্ষুদ্র গণ্ডী থেকে মুক্ত

হবার জন্য বদ্ধপরিকর। ভীতিপ্রদর্শন শাসন বা প্রলোভন কোনো কিছুর দ্বারাই তাদের মুক্ত চিন্তার প্রবাহকে আটকানো যাচ্ছে না। পত্র-পত্রিকার সম্পাদকরা পুলিশের তাড়া খেয়ে ফিরেও নিজেদের অসাম্প্রদায়িক মতামত প্রকাশ করে যাচ্ছে। পাকিস্তানের প্রতি আনুগত্যের অভাবের কলঙ্ক আরোপ অর্থাৎ দেশদ্রোহিতার অপবাদও তাদের সংগ্রাম-মুখরতাকে রুদ্ধ করতে পারে নি।

ইতিহাসের দিকে তাকিয়ে দেখলে আমরা জানি সরকারী পোষণ ও তোষণের চেয়েও লাঞ্ছনাই সাহিত্যকে জাগিয়ে তোলে, আঘাতের সংঘাতেই সচেতন সক্রিয় চিত্তে সৃষ্টির বিকাশ হয় পূর্ণতর। ইংরেজ শাসন ও ভ্রূকুটি রবীন্দ্রনাথ বা নজরুলের রচনার প্রবাহকে খণ্ডিত করতে পারে নি—এমন কি জারের কঠিন শাসনেও রাশিয়ার বড় বড় সাহিত্যিকদের কলম কম্পিত হয় নি—বাধার আঘাতে তাদের স্পর্ধা আরো বেড়েই গেছে।

পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ আজ এই সুযোগসন্ধানী রাজনৈতিক স্বার্থান্বেষী-দের বিষাক্ত চক্র থেকে মুক্তির আন্দোলনে তাদের সঙ্গে পেয়েছে বেশির ভাগ সাহিত্যিক ও সাংবাদিকদের—এজন্য পূর্ব পাকিস্তানের পত্র-পত্রিকা বিশেষভাবে অভিনন্দনযোগ্য। আজ সেখানে সমগ্র দেশের মধ্যে একটি বৃহত্তর মুক্তির আকাঙ্ক্ষা স্পন্দিত হচ্ছে যেমন হয়েছিল স্বাধীনতার প্রাক্কালে ভারতবর্ষের স্বাধীনতাকামী জনগণের মনে। একে আমি বৃহত্তর মুক্তির আকাঙ্ক্ষা বলছি এ কারণে যে আজকের পূর্ব পাকিস্তানে এ শুধু রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা নয়। এ আন্দোলন কুসংস্কার অন্ধ গোঁড়ামী জাতিবিদ্বেষ ও সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে উদার মানবিক বোধে মানব মুক্তির যথার্থ রূপকে প্রকাশ করার চেষ্টা।

পূর্ব পাকিস্তানে আজ মহাসমারোহে মাইকেল মধুসূদনের জন্মোৎসব হয়; আচার্য পি সি রায়ের জন্মোৎসব হয়, অশ্বিনী দত্তকে শিক্ষা সাংস্কৃতিক জাগরণের প্রতীক মনে করা হয়—এমন কি বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যিক মূল্য তিনি "নেড়ে মার" লিখেছিলেন বলে অস্বীকৃত নয়। সূর্য সেন প্রমুখ বিপ্লবীদের তারা আজ নিজেদের পূর্বসূরী বলেই গ্রহণ করেছে। একটি কবিতায় তাঁকে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে:

"হে বিপ্লবী বন্ধু বীর, তোমাদের প্রতিশ্রুতি আমাদের রক্তে দেয় দোলা—তোমাদের নিঃশঙ্ক মৃত্যু আমাদের উদ্বোধিত করে বাঁচবার স্বাধীনতা, জনতার মুক্তি এনে দিতে।"

পূর্ব ও পশ্চিম বাংলার সাংস্কৃতিক সংযোগের আজকের দিনে প্রধান সেতু হচ্ছেন রবীন্দ্রনাথ—রবীন্দ্রনাথের প্রেরণা সেখানকার জনজীবনে নানাভাবে কাজ করছে—যদিও সরকারী তরফ এজন্য ভীত ও নানারকম নিষেধ আরোপে সচেষ্ট তবু সে চেষ্টা কার্যকরী হয় নি। রবীন্দ্র-জন্মদিবসের, বর্ষবরণের, অর্থাৎ নববর্ষের উৎসবগুলি একেবারে পশ্চিমবঙ্গের মতই। নৃত্যগীতানুষ্ঠানে মুসলিম মেয়েরা একই রকম উৎসাহী। এর একটা বড় তাৎপর্য আছে। ইসলাম সঙ্গীতবিরোধী, নৃত্যের তো বটেই। ভারতে এখনও বোরখার প্রভাব কম নয়—সে ক্ষেত্রে বাঙালী মুসলমান মেয়েরা আজ রবীন্দ্রপ্রদর্শিত উৎসবরীতি নৃত্যগীতে পালন করছে—এ কম কথা নয়—একে নিঃশব্দ বিপ্লব বলা চলে। বৃদ্ধ বটের ছায়ায় ঢাকায় অনুষ্ঠিত নববর্ষ উদ্বোধনের একটি উৎসবের ছবি দেখে মনে হচ্ছিল বুঝি বা শান্তি-নিকেতনেরই ছবি দেখছি।

মুসলিমরা অন্য জাতি, তাদের শিক্ষা সংস্কৃতি হিন্দু সংস্পর্শে বিকৃত হয়ে যাবে এই ধুয়ো যে সব প্রাচীনপন্থী গোঁড়া মানুষরা বিশ্বাস করেছিল আজ তারা কি সে দেশে নেই? নিশ্চয় আছে এবং সম্ভবত তারাই দলে ভারী কিন্তু তাদের মুখের উপর তুড়ি মেরে নবযৌবন তার মুক্তির দৃপ্ত পতাকা উড়িয়ে দিয়েছে। সে আর ইসলামের গণ্ডী, সম্প্রদায়ের গণ্ডী মানতে এমন কি রাজনৈতিক উদ্দেশ্যসাধনের মৃত হাতিয়ার হতে চায় না। মানুষের যা কিছু শ্রেষ্ঠ কীর্তি তা যে ভৌগোলিক সীমাতেই উদ্ভূত হোক না কেন, তার উপর সে তার অধিকার ঘোষণা করেছে। এ বছরও তাই পঁচিশে বৈশাখে প্রদেশব্যাপী আনন্দ অনুষ্ঠান হয়েছে, অনেকগুলি বিশেষ সংখ্যাও প্রকাশিত হয়েছে। বাইশে শ্রাবণও কয়েকটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে। তার মধ্যে '২২শে শ্রাবণ' নামে কালো মলাটে বাঁধান একটি চটি বই বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

পশ্চিম বাংলার সাহিত্যিকদের একটি বৃহৎ গোষ্ঠী যখন রবীন্দ্রনাথকে ভুলবার, লুপ্ত করে দেবার চেষ্টায় ব্যস্ত। একটি দেশের ইতিহাসের যা শ্রেষ্ঠ দান আধুনিক-তার নামে তাকে অস্বীকার করতে প্রবৃত্ত তখন অন্যদিকে আজ পূর্ব পাকিস্তানের নবীন চিত্ত ইতিহাসের সেই হারান ধারাটিকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। বিদ্বেষের মরু বালুর মধ্যে ফল্গুর সেই ধারাটিকে উদ্ধার করে তারা ভবিষ্যতের দিকে প্রবাহিত করতে চায়। পারিপার্শ্বিক অবস্থা সম্বন্ধে তারা উদাসীন নয়, সমাজ রাজনীতি ও বাস্তব জগৎ সম্বন্ধে তাদের ধারণা স্পষ্ট, তাই কোনো যৌনতার ধোঁয়া দিয়ে তাকে বাস্তব সাজাবার দরকার নেই। ভাষাকেও জটিল দুর্বোধ্য ও কৃত্রিম করে বাহাদুরীর প্রয়োজন নেই, কারণ এই নবীন সাহিত্যিকগোষ্ঠীর স্বচ্ছ সমাজচেতনার পটভূমি বর্তমান রয়েছে।

আল মাহমুদ নামে এক কবি ভেলা নামে একটি সাহিত্যপত্রে দুর্দশাগ্রস্ত দেশের বন্ধ্যা পরিস্থিতির মধ্যে রবীন্দ্র-নাথকে উদ্দেশ্য করে একটি কবিতা লিখেছেন। এই কবিতা বক্তব্য ও কাব্য-সম্পদে যেমনই হোক এর মধ্যে একটি স্বীকৃতি রয়েছে যে, পশ্চিমবঙ্গ বা পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রব্যবস্থায় যে বিরোধই থাকুক, সমগ্র বাংলাদেশ রবীন্দ্রনাথের রাজত্ব—খাস তালুক—এ তাঁরই বাংলাদেশ এ তাঁরই ভাষা যা আজ কবি আল মাহমুদের জীবনবেদনায় মন্দ্রিত হচ্ছে:

"এ কেমন অন্ধকার বঙ্গদেশ,
উত্থান রহিত
নৈশঃব্দের মন্ত্রে যেন ডালে
আর পাখীও বসে না।
নদীগুলো দুঃখময়,
নিপিত্যা মাটিতে জন্মায়
কেবল ব্যাঙের ছাতা
অন্য কোনো শ্যামলতা নেই।

বুঝি না রবীন্দ্রনাথ কি ভেবে যে
বাংলাদেশে ফের
(?)ক হয়ে জন্মাবার
অসম্ভব বাসনা রাখতেন
গাছ নেই নদী নেই,
অপুষ্পক সময় বইছে
পুনর্জন্ম নেই,
আর জন্মের বিরুদ্ধে সবাই।

শুনুন রবীন্দ্রনাথ
আপনার সমস্ত কবিতা
আমি যদি পুঁতে রেখে
দিন-রাত পানি ঢালতে থাকি
নিশ্চিত বিশ্বাস এই
একটিও উদ্ভিদ হবে না
আপনার বাংলাদেশ
এ কিরকম নিষ্ফলা ঠাকুর?

অবিশ্বাস্য হাওয়া আছে
নেই কোনো শব্দের দ্যোতনা
দু' একটি পাখী শুধু
অশ্বত্থের ডালে বসে আজও
সঙ্গীতের ধ্বনি নিয়ে ভয়ে ভয়ে
বাক্যালাপ করে
বৃষ্টি বোশেখের,
নিঃশব্দ পঁচিশে তারিখে।"

হায় এখানে আমাদেরও সেই প্রশ্ন, আপনার বাংলাদেশ এ কিরকম নিষ্ফলা ঠাকুর?

রবীন্দ্রনাথ ও সুভাষচন্দ্র

শঙ্করীপ্রসাদ বসু

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

ছাত্রশাসনতন্ত্র : নেতার জন্ম

ভারতবর্ষের ইতিহাসধারা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের এই মূল বক্তব্য। সেই ধারায় ইংরেজের স্থানও তিনি নির্দেশ করলেন। রবীন্দ্রনাথের এ বক্তব্য অনবদ্য কাব্যরূপ পেয়েছে 'ভারততীর্থ' কবিতায়। কবিতায় বিষয়াতীত একটা ব্যঞ্জনা থাকে, সেখানে সত্যের কালোত্তীর্ণ রূপ আভাসিত করার সুবিধা আছে। সেই একই বিষয়বস্তু গদ্যে প্রকাশ করলে, গদ্যের ধর্মানুযায়ী, তা পক্ষে বা বিপক্ষে চিন্তা উদ্রেক করে। ভারতে ইংরেজের অবস্থান সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ যেসব কথা এখানে বলেছেন, তার সবটুকু অংশ, ঐ অপরাধী ছেলেগুলি, যাদের জন্য তাঁর প্রবন্ধ রচনা, মেনে নেবে কিনা সন্দেহ। বিশ্ববিধাতা কোনো বিশেষ উদ্দেশ্য সাধন করবার জন্য ভারতবর্ষে ইংরেজকে নিক্ষেপ করলেও করতে পারেন, কিন্তু ঐ 'নিক্ষিপ্ত' ইংরেজরা সেই ঊর্ধ্বাঙ্গীণ উদ্দেশ্য সম্বন্ধে একেবারেই অনবহিত ছিল। তারা গোড়ায় এসেছিল সোজা লুঠ করতে, কিন্তু দেখল পরিকল্পনানুযায়ী লুঠ করলে আরো বেশি লাভের সম্ভাবনা, সুতরাং সাম্রাজ্যবিস্তারের সূচনা হোল। ব্যাপারটিকে রবীন্দ্রনাথ এক লাইনে ধরে দিয়েছেন—'বণিকের মানদণ্ড দেখা দিল পোহালে শর্বরী, রাজদণ্ড রূপে।' সুতরাং ভারত ইতিহাসে ইংরেজী সভ্যতার দান যে জাতীয়তা চেতনা, (এই প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ যাকে "আমি-র সুস্পষ্ট স্পন্দন" বলেছেন), রবীন্দ্রনাথের সে কথা সত্য, কিন্তু সে দান ইংরেজের অনিচ্ছাতেই আমরা পেয়েছি। ইংলন্ডের পণ্যদ্রব্যের সঙ্গে সে দেশ থেকে কিছু উদারনৈতিক চিন্তার পুস্তক জাহাজে করে ভারতবর্ষের উপকূলে এসে পৌঁছেছিল—বিক্রির সেই মালগুলি যে বৃটিশ সাম্রাজ্যের বনিয়াদে ডিনামাইটের কাজ করবে, ইংরেজ তা বুঝতে পারে নি। আসলে ইংরেজ ভারতবর্ষের সৃজনকার্যে যোগ দিতে ভারতে আসে নি (তা সত্ত্বেও যদি সৃজনকার্য হয়ে যায় সেটা উপজাত অর্থাৎ বাই-প্রোডাক্ট; যাঁদের দৃষ্টি দূরবিস্তৃত তাঁরা বিশ্বাস করেন, সব কিছুই কোনো অদৃশ্য মঙ্গল বিধানের সঙ্গে যুক্ত), এসেছিল ইংলন্ডের মধ্যের ধনভবনগুলির পাথরের গাঁথুনি আরো মজবুত করতে; ভারতবর্ষ তাদের কাছে সত্যই Land of regrets. 'White man's burden'-এর মত নোংরা কথাটা নিজ বিবেকের সঙ্গে তার চাতুরী এবং রবীন্দ্রনাথ যে ইংরেজের হৃদয়কে চেয়েছেন তা রবীন্দ্রনাথের মহত্ত্বকে প্রমাণ করেছে—প্রমাণ করে নি হৃদয়ধনে (অন্তত সাম্রাজ্য সংশ্লিষ্ট ইংরেজ) সে ধনী। ওটেন-প্রহারের দলপতি ঊনিশ বছরের শ্রীমান সুভাষচন্দ্র ইতিমধ্যে রাজনৈতিক চিন্তায় চরমপন্থী হয়ে উঠেছেন, অরবিন্দের পূর্ণ স্বাধীনতা ও বামপন্থী আদর্শকে পছন্দ করলেন, ভারতের রাষ্ট্রশাসনে ইংরেজকে পরিহার করার প্রচেষ্টায় প্রস্তুত হচ্ছেন—তাঁর কাছে রবীন্দ্রনাথের এই মহান সহনশীলতার আবেদন কতখানি জানি না, যেখানে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—'ভারত ইতিহাসের প্রধান সমস্যা এই, ইংরেজকে পরিহার করা নয়, ইংরেজের সঙ্গে ভারতবর্ষের সম্বন্ধকে সজীব ও স্বাভাবিক করিয়া তোলা।' রাষ্ট্রক্ষেত্রে ইংরেজকে পরিহার না করলে ইংলন্ড ও ভারতের সম্পর্ক কোনদিন সজীব ও স্বাভাবিক হয়ে উঠতে পারে না—এ বিশ্বাস সুভাষচন্দ্রের মধ্যে কিভাবে, কোন্ কোন্ অবস্থার তাগিদে জেগেছিল তার ইতিহাস আমরা সুভাষচন্দ্রের নিজের বক্তব্য থেকে জেনে নিয়েছি।

তাই বলে ইংরেজের হৃদয়প্রার্থী রবীন্দ্রনাথ দেশীয় উপন্যাসের নায়িকা নন,—

"ইংরেজ যদি আমাদিগকে অবাধে অনায়াসে অবজ্ঞা করিতে পায়, তাহা হইলেই আমরা তার হৃদয় হারাইব। শ্রদ্ধা আমাদিগকে দাবি করিতেই হইবে, আমরা খৃস্টান প্রিন্সিপালের নিকট হইতেও এক গালে চড় খাইয়া অন্য গাল ফিরাইয়া দিতে পারিব না।"

মারাত্মক। এমন চড়চড়ে প্রেম ইংরেজের কতদূর সহ্য হবে জানি না, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের এক্ষেত্রে এই হোল প্রেমাদর্শ। অতঃপর রবীন্দ্রনাথ ইংরেজ ও ভারতীয়ের জীবনের সম্বন্ধ কোথায় সহজে ঘটতে পারে, সেই বিষয়ে নিজ বক্তব্য নিবেদন করতে গিয়ে বললেন—'বাণিজ্যের ক্ষেত্রে নয়, রাজকীয় ক্ষেত্রেও নয়, তার সর্বোৎকৃষ্ট স্থান বিদ্যাদানের ক্ষেত্র।' এক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের আদর্শবাদের সঙ্গে ইংরেজের বাস্তববাদের পার্থক্য প্রকট হতে দেরি হয় নি।

ভারতীয় য়ুনিভার্সিটিতে ইংরেজ অবশ্যই রাজসিংহাসনের চেয়ে মহত্তর আসন পেতে পারত, যাকে বলা চলে হৃদয়ের সিংহাসন, কিন্তু ঐসব সভ্যজ শ্বেত ব্যক্তিরা হিসেবের খাতা এবং শাসনের বন্দুকের বদলে মাটির সিংহাসনের জন্য মোটেই ব্যস্ত হয় নি। ইংরেজ বেশ জানে, বুনো রামনাথই কোনো না কোনভাবে শিক্ষকের আদর্শ, কিন্তু সে আদর্শের চ্যারিটি যদি করতেই হয়, নিজেদের সমুদ্রঘেরা দ্বীপখণ্ডটি তার অতি যোগ্য স্থান। নিবেদিতারা ইংরেজ সমাজে চিরদিনের 'খ্যাপা' মেয়ে।

অতঃপর রবীন্দ্রনাথের করুণ অভিজ্ঞতার কথা :—

"ব্যর্থতার কারণ আমাদের ছাত্ররাই, একথা আমি কিছুতেই মানিতে পারি না। আমাদের দেশের ছাত্রদের আমি ভাল করিয়াই জানি। ইংরেজ ছেলের সঙ্গে একটা বিষয়ে ইহাদের প্রভেদ আছে। ইহারা ভক্তি করিতে পারিলে আর কিছু চায় না। অধ্যাপকের কাছ হইতে একটুও যদি ইহারা খাঁটি স্নেহ পায় তবে তাঁর কাছে হৃদয় উৎসর্গ করিয়া দিয়া যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচে। আমাদের ছেলেদের হৃদয় নিতান্তই সস্তা দামে পাওয়া যায়।

"এই জন্যই আমার যে একটি বিদ্যালয় আছে, সেখানে ইংরেজ অধ্যাপক আনিবার জন্য অনেকদিন হইতে উদ্যোগ করিয়াছি। বহুকাল পূর্বে একজনকে আনিয়াছিলাম, তিনি সুদীর্ঘকাল ভারতবর্ষের আবহাওয়ায় থাকিয়াছিলেন। তাহাতে তাঁর অন্তঃকরণে পিত্তাধিক্য ঘটিয়াছিল। তিনি তাঁর ক্লাসে ছেলেদের জাতি তুলিয়া গাল দিতেন। তারা বাঙালীর ঘরে জন্মিয়াছে এই অপরাধ তিনি সহিতে পারিতেন না। সেই ছেলেরা যদিচ প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্র নয়, তাদের বয়স নয়-দশ বৎসর

হইবে, তবু তারা তাঁর ক্লাসে যাওয়া ছাড়িল। হেড মাস্টারের তাড়নাতেও কোনো ফল হইল না। দেখিলাম হিতে বিপরীত ঘটিল। এই মাস্টারটিকে White man's burden হইতে সে যাত্রায় নিষ্কৃতি দিলাম।"

দু'-একটি ক্ষেত্রে আশ্বাসজনক অভিজ্ঞতা যে ঘটে নি, তা নয়, রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিবরণও দিয়েছেন; কিন্তু মন্দ নমুনার খোঁচাই তাঁকে জ্বালা দিয়েছে বেশি।

ইংরেজ ও বাঙালীর মধ্যে সম্পর্ক ঘোরালো হবার কারণ রবীন্দ্রনাথ বিশ্লেষণ করেছেন একটি ঘটনার উল্লেখে। ভুল বোঝাবুঝির মূলে যে ইংরেজের একটা কমপ্লেক্স আছে, তা নিজের জীবনের কোন একটি ঘটনার সাহায্যে রবীন্দ্রনাথ পরিস্ফুট করতে চেয়েছেন :—

"ইংরেজ অধ্যাপকের সহিত বাঙালী ছাত্রদের সম্বন্ধ সরল ও স্বাভাবিক হওয়া বর্তমানে বিশেষ কঠিন হইয়াছে। তার কারণ কি, একদিন ইংলণ্ডে থাকিতে তাহা খুব স্পষ্ট করিয়া বুঝিতে পারিয়াছিলাম। রেলগাড়িতে একজন ইংরেজ আমার পাশে বসিয়াছিলেন—প্রথমটা আমাকে দেখিয়া তাঁর ভালই লাগিল। এমন কি তাঁর মনে হইল ইংলণ্ডে আমি ধর্মপ্রচার করিতে আসিয়াছি। য়ুরোপের লোককে সাধু উপদেশ দিবার অধিকার আমাদেরও আছে, এ মত তিনি বিশেষ উৎসাহের সহিত প্রকাশ করিলেন। এমন সময় হঠাৎ তাঁর কৌতূহল হইল, আমি ভারতবর্ষের কোন্ প্রদেশ হইতে আসিয়াছি তাহা জানিবার জন্য। আমি বলিলাম, আমি বাংলা দেশের লোক। শুনিয়া তিনি লাফাইয়া উঠিলেন। কোন দুষ্কর্মই যে বাংলা দেশের লোকের অসাধ্য নহে, তাহা তিনি তীব্র উত্তেজনার সঙ্গে বলিতে লাগিলেন।

"কোনো জাতির উপর যখন রাগ করি তখন সে জাতির প্রত্যেক মানুষ আমাদের কাছে একটা এ্যাবসট্র্যাক্ট সত্তা হইয়া ওঠে। তখন সে আর বিশেষ্য থাকে না, বিশেষণ হয়। আমার সহযাত্রী যতক্ষণ না জানিয়াছিলেন আমি বাঙালী, ততক্ষণ তিনি আমার সঙ্গে ব্যক্তিবিশেষের মত ব্যবহার করিতেছিলেন সুতরাং আদবকায়দার ত্রুটি হয় নাই। কিন্তু যেই তিনি শুনিলেন আমি বাঙালী অমনি আমার ব্যক্তিবিশেষত্ব বাষ্প হইয়া গিয়া একটি বিকট বিশেষণে আসিয়া দাঁড়াইল, সেই বিশেষণটি অভিধানে যাকে বলে 'নিদারুণ'। বিশেষণ পদার্থের সঙ্গে সাধারণ ভদ্রতা রক্ষার কথা মনেই হয় না। কেন না ওটা অপদার্থ বলিলেই হয়।......

"বাঙালী আজ ইংরেজের কাছে বিশেষণ হইয়া উঠিয়াছে। এই জন্য বাঙালীর বাস্তব সত্তা ইংরেজের চোখে পড়া আজ কঠিন। এই জনাই ইচ্ছা করিয়াছিলাম বর্তমান য়ুরোপীয় যুদ্ধে বাঙালী যুবকদিগকে ভলাণ্টিয়াররূপে লড়িতে দেওয়া হয়। ইংরেজের সঙ্গে এক যুদ্ধে মরিতে পারিলে বাঙালীও ইংরেজের চোখে বাস্তব হইয়া উঠিত, ঝাপসা থাকিত না, সুতরাং তারপর হইতে তাহাকে বিচার করা সহজ হইত।"

এইখানে একটু বিবেচনা দরকার। সদ্য উদ্ধৃত রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যবিষয় অবিতর্কে গৃহীত হবার নয়। য়ুরোপীয় যুদ্ধে বাঙালী যুবকদের ভলাণ্টিয়াররূপে রবীন্দ্রনাথ দেখতে চেয়েছিলেন, তার পিছনে কবির সদুদ্দেশ্য এই ছিল যে, 'ইংরেজের সঙ্গে এক যুদ্ধে মরিতে পারিলে বাঙালী ইংরেজের চোখে বাস্তব হইয়া উঠিত'—সে যুগের বিপ্লবীরা এই প্রশ্ন করতে পারতেন—ইংরেজের চোখে বাস্তব হবার জন্য ইংরেজের স্বার্থরক্ষার লড়াইয়ে খামকা তার সঙ্গে এক যুদ্ধে মরতে যাব কেন? 'ইংরেজের চোখে বাস্তব' হওয়া এত কি প্রয়োজন? এ প্রয়োজন তখনই জাগে যখন ভারতবর্ষে ইংরেজ অস্তিত্বকে স্থায়ী বলে মেনে নেওয়া হয়। রবীন্দ্রনাথ এবং গান্ধীজী প্রথম মহাযুদ্ধে ইংরেজপক্ষে ভলাণ্টিয়ার প্রেরণের পক্ষে ছিলেন, এই কার্যে গান্ধীজী পদক পুরস্কারও পেয়েছিলেন—ফল কি হয়েছিল? মহাযুদ্ধের পরে কৃতজ্ঞ ইংরেজ রৌলাট বিল আনল, তার প্রতিবাদ করতে গিয়ে গান্ধীজী জেলে গেলেন; তারপরই জালিয়ানওয়ালাবাগ যার জন্য রবীন্দ্রনাথের নাইটহুড ত্যাগ।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে ইংরেজচরিত্র সম্বন্ধে অনেক বেশি দূরদৃষ্টির পরিচয় দিয়েছিলেন বিপ্লবপন্থীরা, যাঁরা শুভবুদ্ধিসম্পন্ন ইংরেজদের অস্তিত্ব স্বীকার করে নিয়েও সাম্রাজ্য ব্যাপারে তাঁদের বিচ্ছিন্ন কণ্ঠকে বেশি মূল্য দিতে পারেন নি। ওটেনকে প্রহারের সময় সুভাষচন্দ্র এই মানসিকতার অন্তর্বর্তী হয়ে পড়েছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ উচ্চাশের বিশ্লেষণের দ্বারা ইংরেজ-বাঙালীর ভুল বোঝার মূল নির্দেশ করেছেন—বাঙালী ইংরেজের কাছে বিশেষ্য নয়, বিশেষণ, একটা নিদারুণ-কিছু সর্বক্ষেত্রে। এই অবিশ্বাসই ঘৃণার সৃষ্টি করেছে। কিন্তু এই অবিশ্বাসকে দূর করা কি সম্ভব? নিশ্চয় সব বাঙালী রাজবিদ্রোহী নয়, ধরা যেতে পারে মাথা গণতিতে অধিকাংশই নয়, কিন্তু বাঙালীরা যে-সংখ্যায় ইংরেজ-বিরোধী ছিল সক্রিয়ভাবে, সেই সংখ্যা ভারতের অন্য প্রদেশের ইংরেজ-বিরোধী সংখ্যার চেয়ে বৃহত্তর। সেক্ষেত্রে বাঙালীরা যদি তাদের আন্দোলন পরিহার না করে ইংরেজের বাঙালী-বিদ্বেষ ঘুচবার নয়।

রবীন্দ্রনাথ মিলনভূমি দেখেছেন শিক্ষাক্ষেত্রে। ইংরেজ শিক্ষকের সাধারণ চরিত্রও খুলে ধরেছেন ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে। প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্র না হলেও, তাঁর বিদ্যালয়ের নয়-দশ বছরের কতকগুলি ছাত্র জাতি ও দেশের নিন্দা সহ্য করতে না পেরে ক্লাসে যাওয়া ছেড়ে দিল। এই ঘটনার শোচনীয়তা ও এ বিষয়ে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা দেশের অন্যত্র ইংরেজ-শিক্ষকাধীন বাঙালী ছাত্রদের মনের অবস্থা রবীন্দ্রনাথের বুঝতে সাহায্য করেছিল এবং তিনি ঐভাবে সহানুভূতিপরায়ণ হতে পেরেছিলেন প্রেসিডেন্সীর 'অপরাধী' ছাত্রদের বিষয়ে।

আরও একটি কথা। এণ্ড্রুজ ও পিয়ার্সনের মত সহৃদয় ইংরেজ ভারতের ইংরেজচরিত্র সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাস টুটতে দেয় নি একেবারে। কিন্তু ভারতবর্ষে এণ্ড্রুজ-পিয়ার্সন ক'জন? অ্যানী বেশান্ত আরো অল্প, নিবেদিতা মাত্র একজন। বিবেকানন্দ, গান্ধী বা রবীন্দ্রনাথের মত ব্যক্তির সংস্পর্শের ফলে হয়ত কোনো কোনো বিদেশী ভারতের জন্য জীবন উৎসর্গ করেছেন, তাঁদের রক্ত ভারতে ইংরেজের পাপের আবর্জনাকে প্রাণপণে ঠেলেছে,—কিন্তু সমগ্রভাবে ভারতের দুঃখমোচন তাঁরা কতটুকু করতে পেরেছেন, তাঁরা কতখানি ত্বরান্বিত করেছেন ভারতের স্বাধীনতাকে? যে দুটি নাম এক্ষেত্রে এগিয়ে আসে—অগ্নিময়ী 'আক্রমণশীল হিন্দু' নিবেদিতা এবং থিয়জফিস্ট বেশান্ত। অ্যানী বেশান্ত ভারতের মধ্যপন্থী রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এবং নিবেদিতা বিপ্লবী রাজনীতির অন্যতম সংগঠক। কিন্তু 'নিবেদিত' পাশ্চাত্য দেশীয়ের সংখ্যা ভারতে কম হবেই, যেহেতু বেশি সংখ্যায় বিবেকানন্দ-রবীন্দ্রনাথ সম্ভবপর নয়; এই কথাটি

কিস্তিবন্দীতে ট্রানজিস্টার

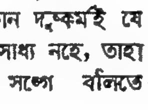

মাসিক ১০৲ টাকার সহজ কিস্তিতে ৩২০৲ টাকা মূল্যের টেলি-ফুইন পোর্টেবল ৩ ব্যাণ্ড, অল ওয়ার্ল্ড ৮ ট্রানজিস্টার। আবেদন করুন:—
Atlas Co. (S. B.—22).
Box No. 1829, Delhi-6.

নিবেদিতা এক স্থানে তীক্ষ্যভাবে জানিয়েছিলেন।৪

এখানে এই সকল কথা উত্থাপনের কারণ—গুপ্ত বিপ্লবী দলের সঙ্গে যুক্ত না হলেও এই সময়ে তরুণ সুভাষচন্দ্র বিপ্লবী চিন্তাধারার ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসেন এবং ইংরেজের সঙ্গে 'সহযোগিতার' সকল সম্ভাবনা মুছে দিয়েছিলেন মন থেকে। রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য বিষয় সম্বন্ধে সুভাষচন্দ্র উপরিউক্তভাবে চিন্তা করতে পারেন, আমার তাই ধারণা।

শুভবুদ্ধির জন্য রবীন্দ্রনাথ প্রবন্ধশেষে আবেদন জানিয়েছেন। 'পশ্চিমের উপহারকে' তিনি ব্যর্থ হতে দেবেন না, দিলে ভারতের মিলন সাধনা ব্যাহত হবে। কবি স্বপ্ন দেখেছেন—ভারতই হোল 'মহামানবের মিলন তীর।' দৈনন্দিন সঙ্ঘর্ষের ক্লিন্নতার উপরে উঠে সেই মহান আশার স্বপ্নটিকে মহাপ্রাণের পক্ষপুটে আশ্রয় দিয়ে রবীন্দ্রনাথ বাঁচাতে চেয়েছেন এবং আঘাত করেছেন তাদের যারা সেই সাধনার শত্রু :—

"কিন্তু এই অন্ধকারটাকে কি কড়া শাসনের ধুলো উড়াইয়াই পরিষ্কার করা যায়? এখানে কি আলোকের প্রয়োজন সবচেয়ে অধিক নয়? সে আলোক প্রীতির আলোক, সে আলোক সমবেদনার প্রদীপে পরস্পর মুখ-চেনাচিনি করিবার আলোক। এই দুর্যোগের সময়েই কি খৃষ্টান কলেজের কর্তৃপক্ষেরা তাঁহাদের গুরুর চরিত ও উপদেশ স্মরণ করিবেন না? এখনি কি charity'-র প্রয়োজন সবচেয়ে অধিক নয়? এই যে দেশব্যাপী সংশয় ঘনাইয়া উঠিয়া সত্যকে আচ্ছন্ন ও বিকৃত করিয়া তুলিতেছে, ইহাকে সম্পূর্ণ কাটাইয়া তুলিবার শক্তি তাঁদেরই হাতে যাঁরা উপরে আছেন। পৃথিবীর কুয়াসা কাটাইয়া দিবার ভার আকাশের সূর্যের। যখন বারিবর্ষণের প্রয়োজন একান্ত, তখন যাঁরা বজ্রবর্ষণের পরামর্শ দিতেছেন তাঁরা যে কেবলমাত্র সহৃদয়তা ও ঔদার্যের অভাব দেখাইতেছেন তাহা নহে, তাঁরা ভীরুতার পরিচয় দিতেছেন। পৃথিবীর অধিকাংশ অন্যায় উপদ্রব ভয় হইতে, সাহস হইতে নয়।

"উপসংহারে আমি এই কথা কর্তৃপক্ষকে বিশেষভাবে স্মরণ করিতে অনুরোধ করি। যে বিদ্যালয়ে ইংরেজ অধ্যাপকের কাছে বাঙালী ছাত্রেরা শিক্ষালাভ করিতেছে সেই বিদ্যালয় হইতে নবযুগের বাঙালী যুবক ইংরেজ জাতির পরে শ্রদ্ধা ভক্তি প্রীতি বহন করিয়া সংসারে প্রবেশ করিবে ইহাই আশা করিতে পারিতাম। যে বয়সে যেক্ষেত্রে নূতন নূতন জ্ঞানের আলোকে ও ভাবের বর্ষণে ছাত্রদের মধ্যে নবজীবনের প্রথম বিকাশ ঘটিতেছে সেই বয়সে ও সেই ক্ষেত্রেই ইংরেজগুরু যদি তাহাদের হৃদয়কে প্রীতির দ্বারা আকর্ষণ করিতে পারেন তবেই এই যুবকেরা ইংরেজের সঙ্গে ভারতবাসীর সম্বন্ধকে সজীব ও সুদৃঢ় করিয়া তুলিতে পারিবে। এই শুভক্ষণে এবং এই পুণ্যক্ষেত্রে ইংরেজ অধ্যাপকের সঙ্গে বাঙালী-ছাত্রের সম্বন্ধ যদি সন্দেহের বিদ্বেষের ও কঠিন শাসনের সম্বন্ধ হয়, তবে আমাদের পরস্পরের ভিতরকার এই বিদ্বেষের বিষ ক্রমশই দেশেই নাড়ীর মধ্যে গিয়া প্রবেশ করিবে, ইংরেজের প্রতি অবিশ্বাস পুরুষানুক্রমে আমাদের মজ্জাগত হইয়া অন্ধ সংস্কারে পরিণত হইয়া থাকিবে। সে অবস্থায় বাংলা দেশের রাষ্ট্রশাসন ব্যাপারে জঞ্জাল কেবলি বাড়িতে থাকিবে বলিয়া যে আশঙ্কা তাহাকেও আমি তেমন গুরুতর বলিয়া মনে করি না,—আমার ভয় এই যে, ইংরেজের কাছ হইতে আমরা যে-দান দিনে দিনে আনন্দে গ্রহণ করিতে পারিতাম সে দান প্রত্যহ আমাদের হৃদয়ের দ্বার হইতে ফিরিয়া যাইতে থাকিবে। শ্রদ্ধার সঙ্গে দান করিলেই শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করা সম্ভব হয়। যেখানে এই শ্রদ্ধার সম্পর্ক নাই সেখানে আদান-প্রদানের সম্বন্ধ কলুষিত হইয়া ওঠে। জেলখানার কয়েদীরা হাতে বেড়ি পরিয়া যে অন্ন খাইতে বসে তাকে যজ্ঞের ভোজ বলা বিদ্রূপ করা। জ্ঞানের ভোজ আনন্দের ভোজ। সেখানেও যে সকল কর্তারা ভোক্তার জন্য আজ লোহার হাতকড়ি ফরমাস দিতেছেন, তাঁরা কাল নিক্রান্ত ভালোমানুষটির মত আশ্চর্য হইয়া বলিবেন, এত করিয়াও বাঙালী ছেলের মন পাওয়া গেল না—কৃতজ্ঞতাবৃত্তি ইহাদের একেবারেই নাই এবং তাঁরা রাত্রে শুইতে যাইবার সময় এবং প্রাতঃকালে জাগিয়া উঠিয়া প্রার্থনা করিবেন—Father, do not forgive them!"

রবীন্দ্রনাথের দীর্ঘ প্রবন্ধটি প্রধানাংশে মন্তব্যসহ উদ্ধৃত করলাম। এতখানি অংশ উদ্ধৃত করার কারণ, এখানে সমসাময়িক ইংরেজ ও বাঙালী মনের চমৎকার উপস্থাপনা আছে। ভারতবর্ষে, যেখানে গুরুকে দেবতার মত শ্রদ্ধা করবার সংস্কার এত প্রবল, সেখানকার ছাত্ররা কোন্ পরিবেশে গুরুকে না প্রহার করে পারে না, এবং সেই প্রহার 'প্রায়' ন্যায়সঙ্গত হয়ে ওঠে—রবীন্দ্রনাথের রচনায় সেই পরিবেশের সত্যরূপ আমরা দেখতে পেয়েছি। রবীন্দ্রনাথের এই সময়কার রাজনৈতিক ধারণার আংশিক প্রকাশও প্রবন্ধটিতে আছে এবং প্রবন্ধটি ছাত্রদের প্রতি রবীন্দ্রনাথের সহানুভূতির অন্যতম প্রমাণ। তাছাড়া আমার ধারণা, প্রবন্ধটি লেখার সময়ে সুভাষচন্দ্রকে বিশেষভাবে মনে রেখেছিলেন (যদিও প্রবন্ধে কোনো নামোল্লেখ নেই) অমন একটা দীপ্ত প্রতিভা অকালে বিনষ্ট হোক—এ তিনি চান নি।

কিন্তু সুভাষচন্দ্রকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কৃত হতে হলই।৫ রবীন্দ্রনাথ প্রমুখের আবেদন নিষ্ফল হোল, ব্যর্থ হল নিরপেক্ষ বিচারের আবেদন,—সুভাষচন্দ্র বিতাড়িত হলেন......বৎসরের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। বিচারকেরা মারটাকেই মূল্যবান করলেন, মূল্যহীন হয়ে গেল কি পরিবেশে মারা হয়েছে তার বিবেচনা। নিরস্ত্র থেকে তবে অস্ত্রচোরকে শাস্তি দেবেন বিচারকেরা, সে সত্যযুগ পৃথিবীতে তখনো হয় নি।

বিচার সম্বন্ধে সুভাষচন্দ্র বলেছেন :—

"কমিটির সভাপতি ছিলেন হাইকোর্টের বিচারপতি এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ভাইস চ্যান্সেলার স্যর আশুতোষ মুখার্জী। কাজেই সুবিচার হবে বলেই আশা হোল। ছাত্রপ্রতিনিধিদের মধ্যে আমিও ছিলাম। আমাকে সরাসরি জিজ্ঞাসা করা হোল—মিঃ ওটেনকে মারা উচিত হয়েছিল বলে আমি মনে করি কি না।

---

৪ "ভারতকে বোঝাবার জন্য বিবেকানন্দকে আমার মত ক'জন পায়?"—ভূপেন্দ্র দত্তকে নিবেদিতা বলেছিলেন।

৫ 'বহিষ্কার' সুভাষচন্দ্রের জীবনের 'প্রতীক' ঘটনা। সুভাষচন্দ্র শাসনকে সহ্য করতে পারতেন না এবং শাসনও সুভাষচন্দ্রকে সহ্য করতে অসমর্থ। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি কর্তৃপক্ষের দ্বারা বহিষ্কৃত, আই সি এস থেকে স্বেচ্ছাবহিষ্কৃত, এবং পুনশ্চ কর্তৃপক্ষের দ্বারা কংগ্রেস থেকে বহিষ্কৃত। যে কোন পুরোনো শাসনের পক্ষে তিনি বৃহৎ অসুবিধা। তাঁর জন্ম শনিবার—কোন লগ্নে জানি না।

মাসিক ৬০০৲ টাকা উপার্জন করুন
অবসর সময়ে বিশ্ব-বিখ্যাত রোমার ঘড়ির অর্ডার বুক করিয়া। বিনামূল্যে সর্তাবলী এবং স্যাম্পেল ঘড়ির জন্য পত্র লিখুন।
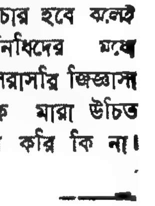
TAJCO (W B C—88)
P. Box 1383, Delhi—6.

জবাবে আমি বললাম, অবশ্যই অন্যায় হয়েছে, কিন্তু ছাত্রদের উপর অত্যাচার যথেষ্ট হয়েছিল বলেই তারা অন্যায়টা করেছিল। এরপর গত কয়েক বছর ধরে প্রেসিডেন্সি কলেজে শ্বেতাঙ্গ অধ্যাপকদের অত্যাচারের কাহিনী ধারাবাহিকভাবে বলে গেলাম। আমার অভিযোগ অকাট্য হলেও, অনেকেই মনে করলেন, মিঃ ওটেনকে মারা যে অন্যায় হয়েছে এ কথাটা বিনাসর্তে মেনে না নিয়ে আমি নিজের ক্ষতি করলাম। আমার কিন্তু মনে হোল, ফলাফল যাই হোক না কেন, আমি উচিত কাজই করেছি।

"শেষ পর্যন্ত সুবিচার পাওয়া যেতে পারে, এই আশায় তখনকার মত কলকাতায় থেকে গেলাম। যথাসময়ে কমিটি রিপোর্ট পেশ করল। রিপোর্টে ছাত্রদের স্বপক্ষে একটি কথাও ছিল না—এবং তাতে একমাত্র আমার নামই উল্লেখ করা হয়েছিল। আমার শেষ ভরসাটুকুও গেল।"

প্রেসিডেন্সি কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কৃত সুভাষচন্দ্র জয়ধ্বনি পেলেন অনেকের, ধিক্কারবাণী অতোধিক জনের,—সামনে ঝোলানো একটা কালো 'না'-এর পর্দা—তার মধ্যে একটা তৃপ্তি পেলেন, একটি আশাপ্রদ সান্ত্বনা—বাড়ির লোক গর্বের সঙ্গে গ্রহণ করেছে সুভাষচন্দ্রের সাহসের 'কলঙ্ককে'। পিতা জানকীনাথ 'কখনো ডেকে জিজ্ঞাসা করেন নি যে, কলেজে কী হয়েছিল বা আমি তার মধ্যে কী করেছিলাম।' বড়ো দাদারা ভাইয়ের আত্মমর্যাদা ও সাহসকে গরিমাময় মনে করলেন। পরিবারের সঙ্গে একগুঁয়ে সুভাষচন্দ্রের সম্পর্ক সুসমঞ্জস ছিল না যেটে, সেক্ষেত্রে, যখন সুভাষচন্দ্র স্বাভাবিক গঞ্জনার বদলে বড়ো ভাইদের কাছ থেকে পেলেন সমর্থন এবং "ছাত্রদের মুখপাত্রের অনিবার্য পরিণতির প্রতি (বাবা, মায়ের) গোপন শ্রদ্ধা", তখন সুভাষচন্দ্র নিজ পরিবারের প্রতি কৃতজ্ঞতাবোধ করলেন, সে কৃতজ্ঞতা তাঁর দেশবাসীরও—বসু পরিবারের মর্যাদাবোধের জন্য।

বহিষ্কারের পরে সুভাষচন্দ্রের একটি অন্তরঙ্গ চিত্র; দিলীপকুমার লিখছেন:—

"বিষাদে আমার মন ছেয়ে গেল। কিন্তু সুভাষ আমাকে বলল, দুঃখ কি ভাই, পরীক্ষা না দিলে কি আর বিদ্যা হয় না? ভালোই হোল একদিক দিয়ে। আমি কলেজের যত সব অপাঠ্য পাঠ্যপুস্তক না পড়ে বাড়িতে খুশখেয়ালে ভালো ভালো বই পড়বার সময় পাব।

ও মুখে এ কথা বলল বটে, কিন্তু ওর চোখের নীচে কালি দেখে বুঝলাম ওকে কত বেজেছে। চোখের জল কোনমতে চেপে আমি পালিয়ে গেলাম।

পরদিনই সুভাষের এক চিঠি—'দিলীপ আমার অনুরোধ তুমি আমার সঙ্গে এখন দেখা করো না। পুলিশ আমার পিছনে লেগেছে, আমি চাই না তারা তোমারও পিছু নেয়'।"

উনিশ বছরের শরীরে ঢাকা একটি মহান্ পুরুষ।

সুভাষচন্দ্রের সবচেয়ে বড় লাভ হোল আত্মবোধ। তীব্রভাবে নিজেকে অনুভব করলেন। নেতৃত্বের প্রথম আস্বাদ, ত্যাগ স্বীকারের উন্মাদনা, বিপদের মুখে

শ্রীদিলীপকুমার রায়

নির্ভয়ের উল্লাস। কলকাতা থেকে কটকে ফিরে যাচ্ছেন সুভাষচন্দ্র:—

"রাত্রে ট্রেনে বাঙ্কের উপর শুয়ে গত কয়েকমাসের ঘটনাবলীর কথা ভাবছিলাম। লেখাপড়া তো এখানেই শেষ, ভবিষ্যৎও অনিশ্চয়তার অন্ধকারে ঢাকা। কিন্তু এজন্য আমি যে দুঃখিত ছিলাম তা নয়, আমি যা করেছি তার জন্য আমার মনে বিন্দুমাত্রও অনুশোচনা ছিল না। বরং কর্তব্য পালনের আনন্দে আমার মনটা ভরে ছিল। একটা মহৎ উদ্দেশ্যে আমার স্বার্থ বিসর্জন দিয়েছি এবং আত্মসম্মান বজায় রাখতে পেরেছি, এই কথা ভেবে মনে গভীর আত্মপ্রসাদ অনুভব করেছিলাম। আমি যে অন্যায় কিছু করি নি সে সম্বন্ধে আমার কোনো সংশয়ই ছিল না।

"১৯১৬ সালের এই ঘটনাবলীর অন্তর্নিহিত ইঙ্গিতটি সে সময়ে আমার কাছে ধরা পড়ে নি। আমাদের অধ্যক্ষ কলেজ থেকে আমাকে বিতাড়িত করলেন বটে, কিন্তু ঘটনাচক্রে ব্যাপারটা আমার পক্ষে শাপে বর হয়ে দাঁড়াল। আমার ভবিষ্যৎ পন্থা পরোক্ষে তিনিই বাতলে দিলেন। সঙ্কটের সময় আমি নির্ভয়ে আমার কর্তব্য পালন করেছি—এই কথা ভেবে নিজের প্রতি আমার বিশ্বাস জন্মাল। এই আত্মবিশ্বাসের জোরেই ভবিষ্যতে বহু সঙ্কট, বহু সমস্যা আমি পার হয়েছি। তাছাড়া এই ঘটনা উপলক্ষেই প্রথম আমি নেতৃত্বের স্বাদ পেলাম। এবং নেতাদের যে কী পরিমাণে আত্মত্যাগ করতে হয় সে সম্বন্ধেও খানিকটা ধারণা হোল। এক কথায় জীবনযুদ্ধের জন্য আমি বেশ তৈরি হয়ে উঠলাম।"

এই সুভাষের বন্দনায় তাঁর শিল্পী বন্ধু লিখছেন পরম সত্যে উজ্জ্বল কয়েকটি বাক্য:—

"এক জাতের মানুষ আছে যাঁরা আঁতুড় ঘরে জন্মায় সেনার টোপর পরে। এদের বিলাতি নাম born leader. এরা জন্মালে যে শাঁখ বাজে সে মামুলি আনন্দের শাঁখ নয়—বিস্ময়ের তূর্যঘোষণা—এলো এলো ক্ষণজন্মা এলো—বরণ করে ঘরে তোলো; যাদের দেখলেই মনে হয় টেনিসনের স্যার গ্যালাহ্যাডের ঘোষণা—My strength is as strength of ten because my heart is pure. ...উৎসবের কৌস্তুভ হয়েই যে এসেছে তারা—তাদের নিয়ে উৎসব করব না তো করব কাদের নিয়ে? তাদের জীবনই একটা জয়যাত্রা। সুভাষ ছিল এই জাতের মানুষ। ঐ টেনিসনের ভাষায়, এ জাতের মানুষকে দেখলে আমাদের প্রাণ যেন গান গেয়ে ওঠে, বলে—Thou lead and I follow."

(স্মৃতিচারণ)

[ক্রমশঃ]

তিনচারটে ঝাপড়া শ্যাওড়াগাছ জড়িয়ে উঠেছে কচুরিপানায় ভর্তি পুকুরটার কোণে। জায়গাটা বড় অন্ধকার। শ্যাওড়ার ছোট ছোট পাতা আর অগুন্তি সরু সরু ডালে বেশ অনেকটা জায়গা জুড়ে গা ছম-ছম অন্ধকার। একটু তফাতে একটা বিশাল মাদারগাছ, বুকের বোঁটার মত ভোঁতা ভোঁতা কাঁটায় ভর্তি মোটা গুঁড়িটা দেখলেই মনে হয় একটা মস্ত মানুষ দাঁড়িয়ে রয়েছে। এই জায়গাটায় খুব ভয় করে। কুজনে বলে এখানে অপদেবতা আছে। রাত-বিরেতে তেনার বাতাস গায়ে লাগলে সমূহ বিপদ। আবেদ আলীর পোয়াতি বৌটার গায়ে হাওয়া লেগেছিল বলেই সকলের ধারণা। বৌটা শেষ পর্যন্ত বাঁচল না।

তবু ওই মাদারগাছেরই ধার ঘেঁসে যে ছোট টিনের ঘর দুখানা। ওখানেই থাকে রহিম আফছার মা চান্দি জাইলানী। রাত্তিরে মাদারগাছের নিচে জাল শুকোতে দেয়। শেষ রাত্তিরে উঠে কুপির আলো হাতে নিয়ে চান্দি জাইলানী জাল গুটিয়ে তুলে নিয়ে রহিম আর আফছাকে পাঠায় মাছ ধরতে। বকসারি বিলে মাছ ধরতে যায় ওরা।

ভজি আর ডেফুলি কতবার জিজ্ঞেস করেছে চান্দি বুড়িকে,—কইলানি দাইমা, রাইত বিরাইতে কোন বিভুৎষি কিছু দ্যাখ নাই ?

চান্দি বুড়ি দোক্তা-খাওয়া দাঁত বার করে হাসে। তারপর খেজুরে গপ্পের কাঁথা খুলে বসে। আছিল দুগা। হ দুজন ছিল, এক শাঁকচুন্নি আর তার সোয়ামী। সোয়ামীটাকে আজ কয়েক সন ধরে দেখা যায় না। এখনো ওই শাঁকচুন্নিটাই আছে, জাল মেলে দিলে মাদারগাছের গোড়ায় নেমে এসে মাছের গন্ধ শোঁকে। ত্যানার নাকখানা কুলার মত। বোঁচা। কিন্তু নাকের গর্ত দুটো যেন আখার মুখা।

চান্দি বুড়ি মাছের চুপড়ির পাশে বসে বিনিয়ে বিনিয়ে গল্প শোনায়। ভজি ডেফুলির ছোট শাড়ির আঁচল চেপে ধরে। ডেফুলি ভজির শাড়ির আঁচল চেপে ধরে। চান্দি বুড়ি আফছাকে ডেকে বলে। ওদের গোটাকতক গাব পেড়ে দিতে। ঘরের পেছনে এক বিরাট গাবগাছ। ওটাও ত্যানাদের বাসস্থান। আফছারুদ্দি সড় সড় করে গাবগাছের প্রায় আগডালে উঠে পড়ে। গাবগাছের ডাল বড় মটকা। একটু ভারে ভেঙে পড়তে চায়। আর ওনাদের বাসস্থান শ্যাওড়াগাছ, গাবগাছ আর নিমগাছ। কয়েকটি বিশেষ গাছেই হাওয়ার মত লেপটে থাকেন তেনারা। ঠিক দুখুর বেলা অথবা অমাবস্যার রাইতে কেউ গাছের নিচু দিয়ে গেলে হয় তার সামনে একটা মোটা ডাল নুয়ে পড়ে। ডালটি ডিঙোতে গেলেই ডাল মানুষ শুদ্ধু ওপরে উঠে যায়। কোন বাঁশ বা ডাল নুয়ে পড়লে কক্ষণো ডিঙোতে নেই।

ভজি এ সব নিয়মকানুন মেনে চলে। বেশি ডেফুলি অত পিট্‌পিট্‌নির ধার ধারে না। বাবুদের বাড়ির আমবাগানে ভরদুখুরে ছোট শাড়ি গাছকোমর বেঁধে কুলগাছে উঠে কোঁচড় ভর্তি করে কুল নিয়ে আসে।

ভজি ধমকে ওঠে।—আলো মালো, তর কোন ঢিশনা নাই। সোনাবাবুগো বাগানে বড়ুই খাইব্যার গেছিলি?

ভজি বলে দিল ওর মাকে। কাদু ঠাকরান ডেফুলির পিঠে বসাল দমাদ্দম, —মাগীর নাম নিসিশ্যা দাদ্য, বড়ুইগাছে উঠছিলা! খাওয়াই বড়ুই তোমারে।

মায়ের কথাগুলো আজও স্পষ্ট মনে আছে ভজির। তাদের ওপর রাগলে নানাভাবে কথা বলতে জানত। মাগীর

বাটোয়ারা

স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়

নাম নৃসিংহ দাদা। খিনকেস্টে গদাধর চণ্ডি। আয়না মহলের নাগাল জ্যাল সিঁথিবাটি কইরা খাড়াইয়া রইছ। কত রকমের ঘুরিয়ে ফিরিয়ে কথা বলতে জানত মা। ভজি ডেফুলি অত জানে না।

আজ দিন বারো হয়ে গেল কাদু ঠাইরান দেহ রেখেছে। ভজি ডেফুলি দুজনেই পনেরোয় পা দিয়েছে। আর ওদের এখানে থাকা চলে না। পাকিস্তান হবার পরে ওরা যায় নি। ক' বছর ধরে রয়েছে। গায়ের ভরসাতে ছিল। কাদম্বিনী ঠাকরুনকে এখানে সবাই মান্য করত, ভয়ও করত। যেমন দুঃসাহসী তেমনি বুদ্ধিমতী ছিল কাদু ঠাকরুন। প্রতি রাত্রে শোবার সময় দু' মেয়েকে দু' পাশে নিয়ে একখানা রামঝকে কাটারি বালিশের তলায় রেখে শুত। ভজি আর ডেফুলি জানত, তাদের ঘরে যদি কেউ ঢোকবার চেষ্টা করে, তবে মায়ের কাটারির কোপ খেতে হবে প্রথমে, তাতেও যদি বাঁচে, তখন বিপদ আপদ হলেও হতে পারে।

তাছাড়া চান্দি বুড়ির দুই ছেলে রহিমুদ্দি আর আফছারুদ্দি এখানকার দুর্ধর্ষ দুটো ছেলে। তারা স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছিল কাদু ঠাইরানের মাইয়াগো। যদি বেইজ্জত করতে চায় কেউ, তবে মাছ ধরা কোচে তাকে বিঁধে ফেলবে ওরা। কোন ক্ষমা করবে না। চান্দি বুড়ির কাছে রোজ যেত কাদু ঠাকরুন। চান্দি বুড়ি আজকাল বিছানা থেকে উঠে ঘরের মাটির দাওয়াতে বসে রোদ পোয়াতে পারে মাত্র। হাঁটাহাঁটি করতে পারে না। কুঁজো হয়ে পড়েছে, তার ওপর বাতের যন্ত্রণা। রহিমুদ্দির বৌ এখন ওদের সংসার দেখাশুনো করে। মাদারগাছের গোড়ায় জাল শুকোতে দেয়। কুপি জ্বালিয়ে শেষ রাত্রে জাল তুলে এনে ওদের ডাক দেয়। নাকে নাকছাবি হাতে দুগাছা রুপোর বালা। পান খাওয়া ঠোঁটে ফিকফিক হাসে রহিমের বৌ। ভজি আর ডেফুলি বিকেলে যায় রহিমের বৌয়ের কাছে কুলমাখা খেতে নয়তো আমের আচার খেতে। গাঁয়ের কাকপক্ষী টের পায় না। রহিমের বৌ ওর বাগান থেকে মোটা মোটা মুলো তুলে দেয় ওদের। মুড়ি দিয়ে কাঁচা মুলো খাবার জন্যে। কেউ জানে না।

আর জানবার মত আছেই বা ক'জন। ক্ষিতীন কাকা, নসু ভাগ্নে আর নিবারণ চক্কোত্তি এই তিন ঘর আর কাদু ঠাকরুনের ঘর। গাঁয়ে আছে মোটে চার ঘর। বাবুদের বাড়ির কেউ নেই। সবাই চলে গেছে কলকাতার কাছে কি একটা জায়গায়। হাঙ্গাম নেই হুজ্জুত নেই। চলে যাবার কি দরকার ছিল। হয়তো এখানকার তেমন কোন ঘটনার চাপে চলে যাবার দরকার ছিল না। কিন্তু ভয় আর অবিশ্বাস। ভয় যেন একটা সংক্রামক রোগের মত বাতাসে বাতাসে ছড়িয়ে পড়ে। ভয়ের কোন কারণ ঘটে নি, তবু ভয়। কেন ভয় করছে ওরা কেউ সঠিক জানে না। কেন ভয় পাচ্ছে তাও বোঝে না। তবু ভয়টা যেন দুরারোগ্য রোগ। দিন দিন বেড়েই চলে। এখানকার মুসলমানরা বার বার অভয় দিয়েছিল; বার বার তাদের যেতে বারণ করেছিল। তবু অন্য কোথাও কোন ঘটনার খবর এলেই ভয়ে কাঠ হয়ে যেতে লাগল হিন্দুরা। ভয়কে তারা কোন মতেই উড়িয়ে দিতে পারল না। একে একে অনেকে পালাল। নির্জন দুপুরে অথবা রাত্রের অন্ধকারে পালাল। এ চার ঘর এখনো রয়ে গেছে। তার একটা কারণ, তাদের যত ভয়ই এখানে থাক না, তার চেয়ে বড় ভয় সাতপুরুষের

ভিটেমাটি ছেড়ে তারা যাবে কোথায়? এ ভয়টাও কিছু কম নয়।

তবু কাদু ঠাকরুন যখন এমন মরা মরল, তখন আরও একবার ভয় পেল ওরা।

একদিন ভোরে দেখা গেল কাদু ঠাকরুন কুয়োতলায় মুখ থুবড়ে মরে পড়ে রয়েছে। ভোর বিয়ানে কাক না ডাকতে উঠে কাদু ঠাকরুন বোধ হয় জল তুলছিল। দেখা গেল মরে পড়ে রয়েছে। কে জানে, কি করে মরেছে? কেউ যে মেরেছে এমন কোন চিহ্ন নেই। মাথায় গায়ে কোথাও আঘাত করার কোন চিহ্ন নেই। তবু এমন হঠাৎ মরে যাবে কেন? কে জানে কেউ হয়তো পেছন থেকে গলা টিপে ধরেছিল। কিন্তু তেমন কোন চিহ্নও নেই।

হলে কি হবে। সেই ভয়ঙ্কর ভয়টা থেকে থেকে চাড়া দিয়ে উঠতে লাগল সকলের মনে।—ব্যারাম হইল না। মইল কি কইব্যা? নিশ্চয় কেউ মাইর‍্যা রাইখ্যা গ্যাছে।

ক্ষিত্যা কাকা বলল। সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও বলল,—আর এয়ানে এক দণ্ড থাকনের কাম নাই। তগো নিয়া কইল-কাতায় যামু। তারপরে যা থাকে কুলে-কপালে।

ভজি আর ডেফুলি ভয়ে আতঙ্কে দুজন দুজনের হাত ধরে দাঁড়িয়ে রইল। নসু ভাগ্নে এলো, নিবারণ চক্কোত্তি এল। কাদু ঠাইরানের পোড়াবার ব্যবস্থা করতে হবে।

কিছু পরে রহিম এল। আফছা এল। ওরাও অবাক হয়ে রইল। কেউ নি মাইরা গ্যাল কাদু ঠাইরানরে। কিন্তু কার এত বুকের পাটা। রহিম আফছা থাকতে কাদু ঠাকরুনকে মেরে যাবে। অসম্ভব। নিশ্চয় ভেতরে কোন রোগ ছিল। রোগেই মরেছে।

ডেফুলির দিকে তাকিয়ে আফছা জানাল, কাদু ঠাকরুনকে পোড়াবার জন্যে ওরা একটা আমগাছ কেটে দেবে। ওনার শ্রাদ্ধশান্তির জন্যে যত চাল দুধ দরকার হয় ওরাই দেবে। কোন ভাবনা করবার কারণ নেই।

ভাবনার কারণ আছে বই কি? ডেফুলির জলে ভরা পিঙ্গল চোখ দুটোর দৃষ্টি চোখা হোল তেরছা হোল। আফছার কথার কোন জবাব দিল না। ক্ষিতীন কাকা ঠিকই বলেছে, আর বিশ্বাস নেই কাউকে। এখান থেকে চলেই যেতে হবে। ওর ফুলো ফুলো চকচকে গাল দুটো চোখের জলে ভেসে গেল।

চান্দি বুড়ির বাগানের গোটা একটা আমগাছ কেটে কাঠ পাঠিয়ে দেবে আফছা। ক্ষিত্যাকাকা ফিসফিস করে বলে উঠল,—ন্যাবকান্ডি আর শ্যাখেগো দাতব্য কাঠে নাই বা পুড়াইল্যা বৌঠাইনরে। তোমাগো বাগানের এউগ্গা কাঠাল গাছ কাইট্যা লই।

ভজি সম্মতি জানাল—তাই লয়েন খুড়ামশায়।

আফছারুদ্দি যখন দুটো লোকের মাথায় কাঠ পাঠিয়ে দিয়েছে। কাদু ঠাকরুনকে পোড়ান তখন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। আফছার কাঠ আর কোন কাজে লাগে নি। বোঝা দুটো পড়েই রইল। আফছারুদ্দি কাঠের বোঝা দুটো আর ফেরত নিয়ে গেল না। বিষণ্ণ চোখে তাকাল ডেফুলির দিকে। ডেফুলির পিঙ্গল চোখ দুটো আকাশের দিকে। দাওয়ার কাঠের খুঁটিতে ঠেস দিয়ে বসে রয়েছে। ভজি ঘরে শুয়ে আছে।

আফছা ডেফুলির কাছে এগিয়ে এল। গলা পরিষ্কার করে একটু কেশে বলল,—মায়ে ডাকছিল তোমাগো। অবসর পাইলে যাইও।

ডেফুলির টাইয়া টাইয়া গাল দুটো শুকনো চোখের জলে চিকচিক করছে। এবারেও তাকাল কোন কথা বলল না। চান্দি বুড়ির কাছে যাবার আর তাদের অবসর হবে না। তারা আর থাকবে না এ গাঁয়ে।

না, এ-ক'দিন একবারও ওরা চান্দি বুড়ির কাছে যায় নি। রহিমের বৌ একদিন এসেছিল। তার সঙ্গে ভাল করে কথাও বলে নি। ভজি আর ডেফুলি অভিমানে থম ধরে আছে। চান্দি বুড়ি থাকতে রহিমভাই আফছাভাই থাকতে তাদের মা এমন অপমৃত্যুতে মরবে কেন? তারা কেন অপমৃত্যুকে স্বীকার করতে চায় না। কেবলি বলে, নিশ্চয় কোন ব্যারাম আছিল।

চলেই যাবে তারা। আর কার ভরসায় থাকবে এখানে?

শুক্রবার রাত-নটা-দশটা নাগাদ বোঁচকা বুঁচকি নিয়ে হাঁটা শুরু করবে কান্দা-পাড়ার দিকে। ৩০ পাক্কা চার ক্রোশ হেঁটে বদনাভাঙা বিল। সেই বিল পার হতে হবে হেঁটে। তারপর আর কোন দুই জংলা রাস্তা। তারপর কান্দাপাড়া। কান্দাপাড়া থেকে রেল ইস্টিশানে রেলে চেপে কলকতা। সব ঠিকঠাক। ক্ষিত্যা কাকার সঙ্গেই চলে যাবে ওরা। যা থাকে কুলে কপালে।

বুধবার রাত্তিরে ক্ষিত্যাকাকা হাঁফাতে হাঁফাতে এসে হাজির।—হায়রে হায়, আর তগো বাচাইবার পারলাম না।

বুকখানের ভেতর ছ্যাঁৎ করে উঠল ভজির। কালো শক্ত সমর্থ দেহখানা কেঁপে উঠল,—অইল কি খুড়ামশায়?

—হওনের আর বাকী আছে কি যা ভাবছিলাম। তাই হইছে।

দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে লণ্ঠনের পলতেটা কমিয়ে দিল ক্ষিতীনকাকা। ডেফুলি ঘরের কোণে ছোট উনুনে শুকনো ডালপাতা জেলে বেগুনবাটি নাড়ছিল ছোট একটা কড়াইয়ে। কড়াইটা নামিয়ে ডেফুলি তাকাল। ক্ষিতীনকাকা ওদের নড়বড়ে চৌকিটার ওপরে বসে বৃত্তান্ত জানাল। সত্যই বড় ভয়ঙ্কর বৃত্তান্ত।

সন্ধ্যেবেলা নাকি আফাছারুদ্দি এসেছিল ক্ষিতীনকাকার কাছে। এসে তাকে ডেকে জিজ্ঞেস করেছে, হুনাহুন শুনলাম, আপনে ভজি ডেফুলিরে লইয়া কাইল রাইতে পলাইব্যান।

তারপর চোখ গরম করে নাকি শাসিয়েছে পালাবার চেষ্টা করলে ক্ষিতীন কাকার গর্দানে মুণ্ডু থাকবে না। অমন কর্ম যেন ক্ষিতীনকাকা করতে না যায়। পরিণাম খুব খারাপ হবে।

ক্ষিতীনকাকা ফিসফিস করে বলে, কথার ভাবখান বুঝলি নি? তগো উপরে দিষ্টি। তগো নিক্যা শাদি কইবার চায়।

ভজি জিভ কামড়ে বলে উঠল,—আই আই, কি কথা কয়েন খুড়ামশাই। রহিম-ভাই এমুন কথা কইব্যার পারে না। অরা জানাল কি কইর‍্যা। কাইল আমরা যামু?

—কাগপক্ষীর মুখে খবর পাইছে। তবে হ, আমার মনে লয়, এ আলায় আবিদ আলীর কাম। আবিদের কাছে জমিজমা দিয়া কয়ডা টাহা চাইছিলাম।

তাই বলো। দোষ তো তবে ক্ষিতীন-কাকার। আবেদ আলীর কাছে জমিজমা বিক্রির বন্দোবস্ত করছিল, তার মুখ থেকেই কথাটা রাষ্ট্র হয়েছে। কি কাম আছিল আবিদ আলীরে কওনের। ভজি নিজেদের জমিজমার কোন বন্দোবস্ত করতে চায় নি পাছে লোক জানাজানি হয়। ক্ষিতীনকাকা সেই লোক জানাজানি করে দিল।

এখন উপায়! ভজির কুচকুচে কালো মুখখানা বিন্দু বিন্দু ঘামে ভিজে উঠল।

—কওন যায় না। আইজ রাইতে তগো ঘরে আগুন লাগাইবার পারে। আমারে কাইট্যা ফালাইবার পারে।

ডেফুলির মুখের রঙটা মাজা-মাজা চকচকে। গালের দুপাশে সামান্য মেছেতার দাগ। ওর ছোট ছোট পিঙ্গল চোখ দুটো চিকচিক করে উঠল।—আকাশ লাথানো কথা কইয়েন না খুড়ামশায়। এয়া হইবার পারে না। আমি যামু চান্দি বুড়ির কাছে। তার পোলারা কেমুন কইর‍্যা আমাগো সব্বনাশ করে দেখুম।

ক্ষিতীন কাকা চোখ বড় বড় করে ভয় পেয়ে বলে,—এয়ার পরেও তাগো ঘরে যাবি?

—যামু। অখনি যামু।

"মুক্তকেশের পুঞ্জ মেঘে
লুকায় অশনি
সাধনার
মহাভৃঙ্গরাজ তৈল
মেঘের মত ঘন কুন্তল কেশদাম নারীদের আভিজাত্যের নিদর্শন। তাই কবি বলেছেন— "চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা" সেইজন্য সৌন্দর্য বিলাসিনী মাত্রেই ব্যবহার করেন সাধনার মহাভৃঙ্গরাজ তেল বিশুদ্ধ আয়ুর্বেদ মতে প্রস্তুত স্নিগ্ধ ও শীতল। কেশ উৎপাদনে ও সংরক্ষণে এর জুড়ি নেই।
সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা
৩৬.সাধনা ঔষধালয় রোড.সাধনা নগর.কলিকাতা-৪৮
অধ্যক্ষ যোগেশচন্দ্র ঘোষ,এম,এ,আয়ুর্বেদশাস্ত্রী,এফ,সি,এস(লণ্ডন). এম,সি,এস(আমেরিকা)ভাগলপুর কলেজের রসায়নশাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক।
কলিকাতাকেন্দ্র-ডাঃ নরেশচন্দ্র ঘোষ,এম,বি,বি,এস(কলি)আয়ুর্বেদাচার্য

লাফিয়ে উঠল ডেফুলি। ভজি উঠে গিয়ে ওকে ধরল,—তর নি মাথা খারাপ অইল।

—ছাড়। আমি যামু। আমি ওয়াগো ডর করি না।

ভজি একটু সময় চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। ডেফুলি চট করে লণ্ঠনটা হাতে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে হনহন করে হাঁটতে শুরু করলো। ক্ষিতীন কাকা আক্ষেপে বিড় বিড় করে উঠল,—মইলরে, মাইয়াডা মইল।

ভজি আর ক্ষিতীন কাকা ঘর থেকে বেরোল। ভজি ঘরের দোরটা ভেজিয়ে দিয়ে লণ্ঠনের আলোর দিকে হনহন করে চলল,—আলো অ ডেফুলি, ডেফুলি লো —ও—ও—

ভজির চিৎকার ডেফুলির কানে পোঁছোল নিশ্চয়। কিন্তু ডেফুলি থামল না। অন্ধকার পুকুর পাড়ের বেতঝোপের পাশে লণ্ঠনের আলোর দোলানি দেখা গেল। ভজি জোরে পা চালিয়ে ডেফুলির কাছাকাছি চলে এল।

—রইস, আমিও যামু।

ডেফুলি পায়ের গতি কমাল। ডেফুলি জানত, ভজিকে আসতেই হবে। ভজির মনের টান ডেফুলি কোনদিন অস্বীকার করতে পারে না। ভজিও ডেফুলির মনের যে কোন আবেগে নিজে জড়িয়ে পড়ে। ওদের দুজনের মনের গতিটা যেন একমুখো। কোনমতেই দুমুখো নয়। যমজ বোন দুজন। মা বলত যমজ হলে এমন হবেই। এর খিদে পেলে ওরও খিদে পাবে, এর মন খারাপ হলে ওরও মন খারাপ হবে।

ভজি আর ডেফুলি যমজ বোন, কিন্তু গায়ের রঙ দুজনের দুরকম। একজন কুচকুচে কালো, একজনের বেতগাছের শাঁসের মত মাজা রঙ। ভজির চোখদুখানা বড় বড়, ভোমরার মত কালো, ডেফুলির ছোট ছোট চোখ দুটো বেতফলের মত সামান্য কটা। তবু দুজনের ভেতরে ভাব-ভাবনার স্রোতটা যেন একমুখো।

ছোট মাঠখানা পেরিয়ে শ্যাওড়াগাছের ঝোপটা চোখে পড়তেই ভজি থমকে দাঁড়ায়। ভয় পায়। ডেফুলিও দাঁড়ায়। ওই শ্যাওড়াগাছ তিনটের নিচে আশে-পাশে এমন ঘুরঘুটি অন্ধকার, দেখলে ছোটবেলা থেকেই ওরা ভয় পায়। আস্তে আস্তে হাত ধরাধরি করে এগোয় ওরা।

না, চান্দি বুড়ির কাছে একবার যেতে পারলে ওদের আর কোন ভয় নেই—ভয় যত এই শ্যাওড়াগাছের ভুতুরে অন্ধকারকে আর মাদারগাছের নিচের ঢিবিটাকে।

পা টিপে টিপে এগোয় ওরা। মাদারগাছের নিচে আঁশটে গন্ধ নাকে লাগে। কে জানে এরি ভেতর জাল মেলে দিয়েছে কিনা রহিমের বৌ। ওই তো চান্দি বুড়ির ঘর। দাওয়ায় একটা কুপি জ্বলছে। কে বসে ওখানে? রহিমের বৌ নাকি?

—অ দাইমা!

ডেফুলি অন্ধকার চিরে সরু গলায় ডেকে ওঠে। বুড়ির ক্ষীণ গলার আওয়াজ যেন কানে আসে। কথা বোঝা যায় না। দাওয়া থেকে সেই ছায়ামূর্তিটা উঠে এগিয়ে আসে। এগিয়ে আসতেই ভজি আর ডেফুলি থমকে দাঁড়ায়।

আফছা এগিয়ে এসেছে। লণ্ঠনের আলোয় ওরা দেখতে পায় আফছার মুখখানা গম্ভীর। অল্প অল্প দাড়ি-ঢাকা গাল দুটি। টিকলো নাকের নিচে সরু গোঁফ। চোখ দুটো বিষণ্ণ।

ভজি আর ডেফুলি আস্তে আস্তে ঘরের দিকে এগোয়। আফছা কোন কথা না বলে পেছন পেছন এগোয়।

ঘরের ঝাঁপ খুলে ভেতরে ঢোকে ওরা। লণ্ঠনের আলোয় দেখতে পায় চান্দি বুড়ি কুঁজো হয়ে বসে রয়েছে কাঁথার বিছানার ওপর। পাশে জ্বলছে একটা ছোট কুপি। রহিমের বৌ একটা এনামেলের বাটিতে কি যেন মেখে দিচ্ছে। বোধ হয় মুড়ির ছাতু। চান্দি বুড়ি অনেকদিন ধরে রাত্রে মুড়ির ছাতু খায়।

চান্দি বুড়ি চোখের পাতায় কুঁচকোন চামড়া টানটান করবার চেষ্টা করে। তারপর খ্যানখেনে স্বরে বলে,—তরা আইছস কি কামে? দূর অইয়া যা। তগো আসনের কি কাম আছিল?

চান্দি বুড়ি কখনো তাদের এমন করে দূর—দূর করে নি। ভজি গিয়ে বুড়ির কাছে বসে। ভারী গলায় বলে,—দূর হইয়া যামু। আর আসমু না। শ্যাষ দেখা দেখতে আইলাম।

চান্দি বুড়ি বিড় বিড় করে।—হুনাহুন হগ্গল কথা কানে আইছে। এট্টু-খিমা পিত্তি নাই লো। কাদুঠাইরান মইল, হুইন্যা কাইন্দা মরি। আমি তো-মইরবার নইছি। একবার খপর নইবার পারলি ন্যা! আ ছাই। ছাই। তগো বুকের দুধ দিয়া বাচাইছিল্যাম কি কামে? তরা কি জানস? হগ্গল খপর জানত কাদুঠাইরান। তরা এক-এউগ্গা গাবকাঠের ঢেঁকি!

ডেফুলি আর ভজি দুজনেই চান্দি বুড়ির কাছে বসে রইল। মুখে ওদের রা নেই।

কথা মিথ্যে নয়। কাদুঠাকরুন কেন ওরাও জানে। শুনেছিল মায়ের কাছে। এই চান্দি বুড়ি না থাকলে তারা বাঁচত না। বুকের দুধ দিয়ে বাঁচিয়েছিল তাদের।

চান্দি বুড়ির গলার স্বরটা ধরে এল, বলল,—তরা এয়ান থিক্যা চইলা যাইবার চাস্ ক্যান কি কামে? আমারে ফালাইয়া যাইবার চাস কোন পরানে। আমারে যদি ছাইড়া যাস, তয় আমার বুকের দুধ বমি কইর‍্যা ফিরাইয়া দিয়া যা। রহিম আফছা যে দুধ খাইছে, তরাও সেই দুধ খাইছস। কাদুঠাইরেন তো বিয়াইয়া খালাস। তগো এই বুকের দুধ খাওয়াইয়া বড় করছি।

চান্দি বুড়ি তার বুকের আঁচল সরিয়ে শুকনো কুঞ্চিত স্তন দুটো দেখায় ওদের।

ওরাও জানে। ওরা যমজ বোন জন্মাবার পরে মা বিছানায় শুয়েছিল ছ' মাস। গ্রহণী রোগে ধরেছিল। সে সময়ে চান্দি বুড়ির আফছা এক মাসের কোলে। মেয়ে দুটো বুকের দুধের অভাবে ভীষণ চিৎকার করত। চান্দি বুড়ি বিয়ান দুপুর সন্ধ্যায় তিনবেলা করে এসে লুকিয়ে ওদের বুকের দুধ খাইয়ে যেত। কাকপক্ষী টের পেত না। সেই থেকে চান্দি বুড়িকে ওরা বলে ধাইমা। আর বুড়িও ভাল মাছটা জালে পড়লে ভাল লাউটা গাছে ফললে ভজি ডেফুলিকে না খাইয়ে প্রাণে তৃপ্তি পায় না।

কাদুঠাকরুন এ সব কথা ভজি ডেফুলিকে বলেছে। সবাইকে বলতে বারণ করেও দিয়েছে।

ডেফুলি আস্তে আস্তে বলে,—দ্যাশ ভাগ হইয়া গ্যাছে দাইমা। আমাগো যাইতেই হইব।

—সগ্গলই ভাগাভাগি হইছে মানলেম কয়, তয় আমার বুকের দুধ ফিরাইয়া দিয়া যা। না পারস আমারে কাইট্যা ভাগ কইর‍্যা অন্দেক রহিম আফছায় রাইখ্যা যা। অন্দেক লইয়া চল তগো সাথে।

চান্দি জাইলানীর চোখের পাতার কুঁচকান চামড়া ভিজে ভিজে ওঠে।

ভজি ডেফুলি থম ধরে বসে থাকে। একটা কথাও বলতে পারে না। জবাব খুঁজে পায় না।

রাত বাড়তে থাকে। পাশে কচুরী-পানা পুকুরের পাড়ে ব্যাঙের ডাক শোনা যায়।

—অ রহিম, অ আফছা—

সু ছেলে ঘরে আসে। চান্দি বুড়ি চোখ মুছে বলে,—ওয়াগো ঘরে আউগাইয়া দিয়া আয়। মাইয়াগো কাইল রেলগাড়িতে তুইল্যা দিবি যেয়ানে যাইবার চায় যাউক। মনে করমু, মাইয়ারা ভাতারের ঘরে চইল্যা গ্যাছে।

ভজি ডেফুলি ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ায়।

আফছা বিষণ্ণ টানাটানা চোখ দুটো মেলে ডেফুলির মুখের দিকে তাকায়।

ডেফুলির বেতফল রঙের চোখ দুটোয় আর চোখা ত্যারছা চিকচিকানি নেই। স্তব্ধ গাঢ় বিষণ্ণ ছায়া নেমে এসেছে।

যা দেখেছি, যা পেয়েছি

স্মৃতিচয়ন

শ্রীসুধীরঞ্জন দাস

[পূর্বপ্রকাশিতের পর]

(২)

জজীয়তী কাজটা যত সহজ মনে হয়েছিল তত সহজ ঠেকল না। বড় কেসে দু পক্ষের বক্তব্য শুনে, নোট করে, রায় মুলতুবি রেখে ভেবেচিন্তে একটা মাঝামাঝি ফয়সালা করা অল্প দিনেই অভ্যেস হয়ে যায়। কিন্তু কর্মব্যস্ত ওরিজিন্যাল সাইডের জুনিয়র জজের ছোটখাট মোসন বা চেম্বার এ্যাপ্লিকেসন শুনেই তক্ষুণি তক্ষুণি একটা হুকুম জারী করাটা প্রথম প্রথম একটু শক্তই মনে হয়। তবে যে ব্যক্তি জজ হবার আগে হাতে-কলমে কৌসুলী অবস্থায় হামেশাই ঐ ধরণের কাজে কোর্টে হাজির হয়েছেন অভিজ্ঞতার ফলে তাঁর অনেকটা ধারণা জন্মে যায় ঐ ধরণের দরখাস্তে কি ধরণের অর্ডার দিতে হবে। কিন্তু অনেক সময় নতুন জজ যদি নিজের মাতব্বরীর উপরে বেশি আস্থাবান হয়ে ওঠেন তবে সে মানসিক ভাবটাও বিপজ্জনক হতে পারে। এই রকম একটা বিপদে আমাকে পড়তে হয়েছিল আমার জজ হবার নয় দিনের দিনেই। H. V. Low & Co. Vs. Pramatha Nath Malia 47 C.W.N. 273 কেসটায়। রাজা প্রমথনাথ মালিয়ার এস্টেট ছিল কোর্ট অব ওয়ার্ডসের তত্ত্বাবধানে। এইচ ভি লো কোম্পানী ঐ এস্টেটের বিরুদ্ধে খুব মোটা রকমের ডিক্রি পেয়েছিল। ঐ ডিক্রি জারী নিয়ে একটা দরখাস্ত হয়েছিল আমার কোর্টে। যতদুর মনে আছে কোম্পানীর তরফে ছিলেন স্যার অশোক রায় এবং কে পি খৈতান ও কোর্ট অব ওয়ার্ডসের পক্ষে ছিলেন শৈলেন ব্যানার্জি ও কুমুদ বোস। বেঙ্গল কোর্ট অব ওয়ার্ডস এ্যাক্টের ৯০মি ধারার কি সত্যার্থ তাই নিয়ে উঠেছিল প্রশ্ন। ঐ ধারায় বলা ছিল যে, যে এস্টেট কোর্ট অব ওয়ার্ডসের ব্যবস্থাধীনে আসবে সে এস্টেটের বিরুদ্ধে টাকার ডিক্রি ৭ বছরের জন্যে জারী করা চলবে না যদি প্রতি বছর নিয়মিতভাবে ডিক্রিতে বরাদ্দ সুদের টাকাটা দেওয়া হয়। এই কেসে এস্টেট কোর্ট অব ওয়ার্ডসের কবজায় আসার পর পাঁচ বছরের সুদ প্রত্যেক বছরেই দিয়ে দেওয়া হয়েছিল কিন্তু কবজায় আসবার আগে যে সুদ বাকী ছিল তা দেওয়া হয় নি। ডিক্রি হোল্ডার কোম্পানীর বক্তব্য হোলো যে কোর্ট অব ওয়ার্ডসের কর্তব্য ছিল সব বকী সুদ উসুল দেওয়া এবং সেটা করা হয় নি বলে এ্যাক্টের ঐ ধারার মধ্যে সে আসতে পারে না ও সাত বছর পার না হলেও ডিক্রি জারী করায় কোন বাধা নেই। এস্টেটের তরফে কোর্ট অব ওয়ার্ডসের বক্তব্য হোলো যে এ্যাক্ট সাত বছরের জন্যে ডিক্রি জারী স্থগিত করেছে এই সর্তে যে প্রতি বছর সুদ উসুল দিতে হবে। প্রতি বছরের সুদ মানে ঐ সাত বছরের প্রতি বছরের সুদ—তার আগের বাকী সুদ নয়। তাড়াহুড়োর মধ্যে এবং খানিকটা চাল করে এস্টেটের স্বপক্ষে রায় দিয়ে ডিক্রি জারীর দরখাস্তটাকে অচল বলে ডিসমিস করে দিলাম। কিন্তু ধোপে টিকল না। আপীল হোলো এবং আপীল কোর্টে আমার রায়টাকে নাকচ করে দিলেন। জজীয়তীর গোড়াতেই এই ধাক্কাটা আমার দরকার ছিল। নতুন জজের পক্ষে হামবড়াটা যে সুবিধের নয় সেটা বেশ মজ্জাগতই হয়েছিল। এর পর খুব সাবধান হয়ে গেলাম। এতটুকুও খটকা থাকলে রায় মুলতুবি রেখে ভেবেচিন্তে অর্ডার দিতাম। এর ফলে এই হোলো যে আমার কলকাতা হাইকোর্টে দীর্ঘ ছয় বছরের জজীয়তী জীবনে এটা ছাড়া আর দুটো কেসে মাত্র আপীল কোর্ট আমার রায় পাল্টে দিয়েছেন।

এই দুটোর মধ্যে প্রথমটা ছিল In re Banwarilal Roy 48 C.W.N. 766.

বাংলা সরকার হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটিকে আর্থিক ও প্রশাসনিক অব্যবস্থার জন্যে বরখাস্ত করে হামিদ হাসান নোমানীকে এ্যাডমিনিস্ট্রেটর পদে নিযুক্ত করে। জনসাধারণের মনে হয়েছিল মুসলিম লীগের প্ররোচনায় ঐ ব্যবস্থা করা হয়েছে। তখন হাওড়ার একজন করদাতা হাইকোর্টের writ জুরিসডিকসনে এই দরখাস্ত করলেন যে নোমানীকে জিজ্ঞাসা করা হোক যে তিনি কি অধিকারবলে ঐ পদে বহাল আছেন এবং সন্তোষজনক জবাব না দিতে পারলে তাঁর নিয়োগ বাতিল করে তাঁকে সরিয়ে দেওয়া হোক। বিষয়টা গুরুতর বলে শুনানীর জন্যে এলো স্যার টরিক আমির আলি (যিনি তখন অস্থায়ী চীফ জাস্টিস) ও আমার কোর্টে। খুব খেটেখুটে আসল রায়টা আমিই লিখেছিলাম। স্যার টরিক অল্প একটুখানি লিখেছিলেন। মামলাটার শুনানী যখন চলছিল তখন জজ এজলী সাহেব খুব ঘন ঘন আমাকে জিজ্ঞাসা করতেন কেমন সেটা চলছে ইত্যাদি। এজলী সাহেবের আগ্রহাতিশয্য দেখে জজ লজ সাহেব বলেছিলেন—"Das, if you are not careful Edgles will write the judgement for you." যাই হোক, আমরা ত' ঘটা করে রায় দিয়ে Quo Warranto রিট বের করে দিলাম। আমি তখনো পাকা জজ হই নি। অনেকে বলেছিলেন সরকারের বিপক্ষে রায় দিলে আমাকে পাকা জজ করবে না। যদি নাই করে, প্র্যাক্টিস ত' আর যাবে না। রায় দিলাম সরকারের বিরুদ্ধে। কিন্তু স্বীকার করতেই হবে তাতে আমার পাকা জজ হবার কোন বাধাই হয় নি। প্রিভি কাউন্সিলে আপীল গেল। সেখানে নোমানীর তরফে শুধু বলা হোলো যে হাওড়া কলকাতার বাইরে এবং সেইজন্যে হাইকোর্টের জুরিসডিকসন ছিল না দরখাস্ত মঞ্জুর করে। স্যার জন বোমণ্ট রায় দিলেন যে তাই বটে। তাঁর রায়ের সত্যার্থ, আমি আজ পর্যন্ত বুঝতে পারি নি।

দ্বিতীয়টি ছিল S. N. Chatterjee V. Auckland Jute Co. 50 C.W.N. 116. এই রেফারেন্স কেসটা হয় অ্যাপেলেট সাইডে। বেঞ্চে ছিলেন [illegible]

বিশ্বাস ও আমি। এ্যাপেলেন্টের তরফে ছিলেন প্রবীণ উকিল অমর বোস মশায়। বিষয়টা ছিল Bengal Land Revenue Assessment (Resumed Lands) Regulation II of 1819-এর মানে কি সে সম্বন্ধে রায়টা লিখেছিলাম আমিই। এ্যাপেলেট সাইডে প্রযোজ্য এই সব পুরানো রেগুলেশনের সঙ্গে আমার কোন পরিচয়ই ছিল না। দু পক্ষের সওয়াল জবাবে যা শুনলাম সেইটুকুই যা জানলাম। রায় দিলাম উনিশ শ' পঁয়তাল্লিশ সালের ২৪শে আগস্ট তারিখে। রায়ের মধ্যে যতদূর মনে আছে এক জায়গায় এও বলেছিলাম যে স্যার আশুতোষ এর আগে যে একটা রায় দিয়েছিলেন তাতে তিনি বোধ হয় ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গীতেই বিষয়টা বিচার করেছিলেন। শুনেছিলাম আপীল হয়েছে তখনকার দিনের ফেডারেল কোর্টে। কবে আপীলের শুনানী হবে কে জানে। পরে আমাকে যখন পাঞ্জাবের চীফ জাস্টিস করে পাঠানো হোলো তখন আমার মনটা স্বভাবতই উৎফুল্ল হয়ে উঠেছিল এবং আত্মগরিমাও যে হয় নি বেশ খানিকটা তা-ও বলতে পারি নে। আমি তখন ছুটলাম দিল্লী হয়ে সিমলা যাবার জন্যে। উত্তর প্রদেশের কোন একটা স্টেশনে সকালের খবর কাগজ কিনে পড়তে লাগলাম। হঠাৎ চোখ পড়ল ফেডারেল কোর্টের একটা কেসের রিপোর্টের উপরে। পড়ে দেখলাম যে তাতে ফেডারেল কোর্ট আমার রায়টাকে একেবারেই নাকচ করে দিয়েছেন। ফেডারেল কোর্টের রায়টা দিয়েছিলেন মান্যবর বন্ধু বিজন মুখার্জী যাঁর বিদ্যাবত্তা সম্বন্ধে কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না। আমি যখন উল্লসিত মনে ধরাকে সরা জ্ঞান করে পাঞ্জাবের চীফ জাস্টিস হতে চলেছি ঠিক সেই সন্ধিক্ষণে এই ধাক্কাটায় আমার উপকারই হয়েছিল বলে মনে করি।

ব্যারিস্টার জজের কাছে ওরিজিন্যাল সাইডের জজীয়তী কাজটা খুবই প্রীতিকর। প্রথম কারণ যে সে কাজগুলিতে তিনি অভ্যস্ত এবং অভিজ্ঞ। দ্বিতীয় কারণ এই যে যে সব এটর্নী ও ব্যারিস্টারেরা সেই সব মামলায় হাজির হন তাঁর সবাই চেনা এবং মোটামুটি বলতে গেলে কেউই বিরুদ্ধভাবাপন্ন নন। আর যে সব ব্যারিস্টারেরা আসেন তাঁদের মধ্যে কেউ বা কৌঁসুলী হিসেবে জজের সিনিয়ার ছিলেন বলে স্বভাবতই জজকে স্নেহ করেন এবং অন্যরা জুনিয়ার বলে তাঁকে সমীহ ও শ্রদ্ধাই করে থাকেন। জুনিয়ার কৌঁসুলীদের কাজ আমার খুব ভালই লাগত। সাধারণত দেখেছি যে জুনিয়াররা যথাসম্ভব তৈরি হয়ে আসতেন এবং তাঁদের বক্তব্যের মধ্যে গলদ থাকলে সেটা ধরিয়ে দিলে তৎক্ষণাৎ বুঝে নিতেন। এতে উপকার হোতো দুজনেরই। জুনিয়ারের আড়ষ্ট ভাবটা কেটে যেতো এবং তিনি সত্যি সত্যি ভালভাবেই কেসটা করতে পারতেন। জুনিয়ারকে বোঝাতে গিয়ে আইনের নীতিটার বিশ্লেষণের ক্ষমতাটা খাটিয়ে আমারও প্রভূত উপকার হোতো। মুস্কিল হোতো যখন জুনিয়ার একেবারেই তৈরি হয়ে আসতেন না বা বোঝালেও বুঝতে চাইতেন না বা বুঝতে পারতেন না। এ ধরণের কৌঁসুলী কমই ছিলেন। কিন্তু এ'দেরও খুব সৌজন্যের সঙ্গে বোঝাবার চেষ্টা করতাম। তাড়াহুড়ো দিলে জুনিয়াররা ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে ঘাবড়িয়ে যাবেনই। জজের অসহিষ্ণু ব্যবহারে জুনিয়ারদের যে কত ক্ষতি হতে পারে তার দু'একটা উদাহরণ দেখেছিলাম বলেই জুনিয়ারদের আমি হাসিমুখে আশ্বস্ত করবার চেষ্টা করতাম। এতে সুফলও পেয়েছি এবং সেই সব জুনিয়াররা যাঁরা পরে বড় হয়েছেন আশা করি তাঁরাও এটা অনুভব করেছেন। কাউকে কাউকে স্পষ্ট স্বীকার করতেও শুনেছি। অবিশ্যি যাঁরা বড় এবং ব্যস্ত কৌঁসুলী তাঁরা একটু অসহিষ্ণু হয়ে উঠতেন, কেন না সময় নষ্ট করে তাঁদের আমার কোর্টে অনেক সময় অপেক্ষা করতে হোতো। কানাঘুষো শুনেছি যে কেউ কেউ টিপ্পনী দিতেন—"দাশটা একেবারে ল কলেজ খুলে বসেছে হে। কাজ এগোবার কোন লক্ষণই নেই। লিস্টটা একেবারে আটকেই গেছে। কি গ্যাঁজায় রে বাবা।"

(৩)

আমি জজ হবার দিন পনেরর মধ্যে আমারই ডেভিল অশোক সেন একটা কেস আমার কোর্টে আরম্ভ করলেন। তাঁর যদি সিনিয়র কেউ সে কেসে থেকে থাকেন তবে তিনি অন্য কোর্টে আটকে গিয়েছিলেন। এবং আমার কোর্টে আসতে পারেন নি। অপরপক্ষে বোধ হয় ছিলেন অরুণ সেন সাহেব। অশোক সেন কেসের ঘটনাগুলি বলে যেতে লাগলেন এবং আমি সবুজ কাপড়ে বাঁধান বড় নোটবইতে নোট লিখে নিচ্ছিলাম। ক্রমশ অশোক সেনের যেন উৎসাহ বেড়ে যেতে লাগল এবং তাঁর মক্কেলের স্বার্থে বেশ জোরের সঙ্গেই অপরপক্ষের দোষত্রুটিগুলি ধরিয়ে দিতে লাগলেন। আমি একবার নোটবই থেকে চোখ তুলে তাঁর (অশোক সেনের) দিকে চেয়ে বিস্ময়ে অবাক হয়ে গেলাম। তাঁর মুখে একটা বুদ্ধির দীপ্তি যেন উছলিয়ে পড়ছিল এবং কেসটার উপরে তিনি যেন মনপ্রাণ ঢেলে দিয়ে আমার মুখের দিকে ব্যাকুল প্রার্থনা জানাচ্ছিলেন। একটা গভীর আগ্রহান্বিত ভাব ফুটে উঠেছিল তাঁর চোখে। আমি এই জুনিয়ার ব্যারিস্টারের কথা ও হাত নাড়া যেন স্বপ্নাবিষ্টের মত দেখে গেলাম। মনে পড়ল আমার জীবনসংগ্রামের কথা। সেইদিনই আমার মনে হয়েছিল যে, এই তরুণ

দেশ সেবায় নিয়োজিত,
এ্যালবার্ট ডেভিড লিমিটেড
কলিকাতা—৫০
নীতি ও বিজ্ঞানানুযায়ী ঔষধ
প্রস্তুতকরণের অগ্রণী
—ব্রাঞ্চ সমূহ—
বোম্বে - মাদ্রাজ - দিল্লী - নাগপুর
বেজওয়াডা - শ্রীনগর - গৌহাটী

ব্যারিস্টারটি পেশার উচ্চ শিখরে উঠবেনই। সেইদিনই তাঁকে ডেকে উৎসাহ দিয়ে যে ভবিষ্যদ্বাণী শুনিয়েছিলাম তার সাফল্য আমি আমার জীবদ্দশায়ই দেখে গেলাম এইটেই আমার আনন্দের কথা।

শেষ পর্যন্ত কেসটার কি হোল মনে নেই। তবে দিন তিনেক পরেই মধ্যাহ্ন বিরতির সময় আমার চেম্বারে এলেন আর একটি তরুণ ব্যারিস্টার—ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়ের ভ্রাতুষ্পুত্র এবং তখনকার প্রবীণ ব্যারিস্টার সুবোধ রায় সাহেবের পুত্র সুবিমল রায়। এই সুবিমল রায় আমার খুবই স্নেহভাজন ছিলেন, পারিবারিক ঘনিষ্ঠতা ছাড়া, অন্য কারণেও। আমার পরে সুবিমল রায়ই লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের এল-এল-বি পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন বলে তাঁর উপরে আমার যথেষ্ট টান ছিল। বসতে বলে জিজ্ঞাসা করলাম—"কি সুবু, খবর কি?" সুবিমল রায় মুখ কাঁচুমাচু করে এক হাতের মুঠোটা অন্য হাতে ঘষতে ঘষতে —"একটা কথা ছিল, স্যার।" বলেই আবার চুপ করে গেলেন। উৎসাহ দিয়ে বললাম—"বেশ ত' কি কথা, বল না।" সুবিমল বললেন—"ও নিজেই বলবে ভেবেছিল, কিন্তু সাহস পায় নি। তাই আমাকে—" বলেই আবার চুপ করে হাত দুটো ঘষতে লাগলেন। কে কি বলতে চেয়ে সংকোচ ও ভয় পেয়ে বলতে পারলেন না তা বুঝতেই পারলাম না। শুধালাম —"সুবু, তুমি কার কথা বলছ?" সমস্ত মনের জোর একত্রে করে সুবিমল রায় বলে ফেললেন—"ছেলেটা খুব ভাল, স্যার।" জবাবে বললাম—"ভাল ত' বুঝলাম। কিন্তু ছেলেটা কে এবং কি তিনি বলতে চেয়ে ভয়ে বলতে পারছেন না সেইটেই ত' বুঝলাম না।" তারপর সুবিমল রায়ের আত্মবশ ফিরে এল এবং তাঁর সঙ্গে যা কথাবার্তা হোল তার সারার্থটুকু হোল যে নতুন ব্যারিস্টার অশোককুমার সেন, যিনি আমারই চেম্বারে ডেভিলিং করতে আরম্ভ করেছিলেন, তিনি নাকি আমার একমাত্র কন্যা অঞ্জনা (কাজল)-এর পাণিগ্রহণেচ্ছু হয়েছেন এবং তাঁর দেখাবার মত কোন বিত্তবৈভব তখন না থাকায় প্রস্তাবটা আমার কাছে করতে খুবই সংকোচবোধ করছেন। তবে তাঁর সম্পদের মধ্যে আছে গভীর কর্মনিষ্ঠা, অদম্য উৎসাহ ও বুকভরা আশা এবং তিনি আমার অনুমতি ও আশীর্বাদ পেলে নিজেকে কৃতকৃতার্থ মনে করবেন। খুবই অপ্রত্যাশিতভাবে কথাটা এলো আমার কাছে। বস্তুত একজন বন্ধুর অনুরোধে আমি নিজে সেই বন্ধুটির কন্যা সম্বন্ধে তাঁর প্রস্তাব আমার সুপারিশসহ অশোকের কাছে পেশ করেছিলাম। আমার নিজের কন্যার বিবাহ সম্বন্ধে কোন প্রশ্নই তখন আমার মাথায় আসে নি। তাই আচমকা কথাটা শুনে কেমন যেন বিভ্রান্ত হয়ে পড়লাম। মনটা ফিরে গেল তিন-চারদিন আগেকার দৃশ্যটায়। এখন বুঝতে পারলাম যে অশোকের মুখে চোখে যে আগ্রহের উদ্দীপনা সেদিন আমারই কোর্টে দেখেছিলাম সেটার উৎস কোথায় ছিল। হেসে সুবিমল রায়কে বললাম—"সুবু, আমি ঠিক এখনই কিছু বলতে পারছি না, কেন না আমার স্ত্রী এখানে নেই এবং কন্যাকেও জিজ্ঞাসা করতে হবে। তবে এটুকু অশোককে বলতে পার যে আমার জীবনেও একদিন এইরকম একটা আকাঙ্ক্ষার উদ্দীপনা এসেছিল বলে আমি তাঁর মনোভাব কিছুটা সহানুভূতিসহ উপলব্ধি করতে পারি।" সুবিমল রায় নমস্কার করে চলে গেলেন। দুই বন্ধুতে কি কথাবার্তা হোল সেদিন সন্ধ্যায় তা আমার জানা নেই।

বুবুর কাছে সেইদিন রাত্রেই খবরটা দিলাম। ক'দিন আগেই অশোকের সেই উদ্দীপ্ত মুখচ্ছবির কথা লিখেছিলাম। তার অব্যবহিত পরেই এই প্রস্তাবটা আসাতে তিনিও কিছুটা আশ্চর্যান্বিতই বোধ করেছিলেন। জবাবে লিখলেন যে ছেলেটিকে দেখে তাঁর ভালই লেগেছিল। তবে প্রথমেই কাজলকে তাঁর মতামত জিজ্ঞাসা করতে হবে। কাজল যেন ঝোঁকের মাথায় কিছু না বলেন। খুবই ধীরভাবে সব দিকটা বিবেচনা করে যেন দেখেন। আমাদের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে আমাদের উভয়েরই বেশ একটা সহজে মেশবার অভ্যেস ছিল। তাঁদের সুখ দুঃখ তাঁরা সব সময়েই আমাদের কাছে অবাধে ব্যক্ত করতেন। বুবুর চিঠি পাওয়ার পর একদিন সন্ধ্যায় হাতে একটু সময় করে কাজলের সঙ্গে লেকের দিকে গেলাম বেড়াতে বেড়াতে। কাজলকে জানালাম যে, এখন তাঁর বিয়ের কথা ভাববার সময় এসেছে। কিরকম ধরণের পাত্র হলে তাঁর মনঃপূত হয়। চাকুরে, না, পেশাদার। কাজল বিনা দ্বিধায় বললেন—"চাকুরে দিয়ে কি হবে, বাবা।" তারপর বললাম—"পেশাদার হলেই কি ভাল হবে? আচ্ছা, কি চাস—ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, না উকিল ব্যারিস্টার?" কাজল এবারও অসঙ্কোচেই বললেন—"কেন, ব্যারিস্টারই ত' ভাল।" বললাম—"তাই ত', ভাল প্র্যাকটিস করে এমন ব্যারিস্টারেরা হয়ত হবে বুড়ো, নয়ত হবে বিবাহিত।" কাজল হেসে বললেন—"বাবা, তুমি এত ব্যস্ত হচ্ছ কেন? আমি কি জলে পড়েছি?" তখন মেয়েকে আদর করে জিজ্ঞাসা করলাম—"আচ্ছা, কাজলী, বলত কি রকম চেহারার ব্যারিস্টার তোর পছন্দ হবে?" কাজলও হাসতে হাসতে বললেন —"লম্বা হওয়া চাই; বেঁটে বাঁটকুল চলবে না। রঙ খুব ফরসা না হলেও ক্ষতি নেই—যদি মুখশ্রী সুন্দর দেখতে হয়।" আমি বললাম—"তোর এই Tall dark and handsome ব্যারিস্টারের দেখা

ভারতের
আদিতম
রসায়ন

চ্যবনপ্রাশ

আয়ুর্বেদোক্ত বিশুদ্ধ উপাদানে প্রস্তুত

চ্যবনপ্রাশ নূতন ও পুরাতন সর্দ্দি কাশি, স্বরভঙ্গ ও শ্বাসযন্ত্রের পীড়ায় বিশেষ উপকারী।

টনিক হিসাবে নিয়মিত ব্যবহারে দেহের দৌর্ব্বল্য ও রুগ্নতা দূর করে ও শরীরের পুষ্টি সাধন করিয়া স্বাস্থ্যশ্রীর পুনরুদ্ধার করে।

বেঙ্গল কেমিক্যাল
কলিকাতা . বোম্বাই . কানপুর

কোথায় পায় ?" কাজল বললেন—"হরেখন, ছাড়া কি?" তখন অশোকের কথা বললাম। কাজল মাথা নিচু করে আমার পাশে ঘেঁষে হাঁটতে লাগলেন। তাঁর মুখের ভাবে যেন স্পষ্ট বুঝলাম তিনি বলছেন—"কাছে আছে দেখিতে না পাও, তুমি কাহার সন্ধানে দূরে যাও।" বিষয়টা একটা সুরাহা হয়ে যাওয়ায় মনটা হাল্কা বোধ করলাম। আমার মেয়েকে একটি উৎসাহী যুবক আগ্রহ করে বিবাহ করতে চেয়েছেন দেখে স্বভাবতই আমার খুবই আনন্দ হয়েছিল। কাজলকে পরখ করবার জন্যে বললাম—"ছেলেটির ত' প্র্যাকটিসই সম্বল। ব্যারিস্টারীতে কার হবে, কার হবে না সে কথা কে বলবে? ওঁদের ত' বিষয়সম্পত্তি কিছুই নেই। পারবে চালিয়ে নিতে ?" কাজল আমার মুখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে বললেন—"সেটা ভগবানের দয়া। তোমারই বা কি বিষয় সম্পত্তি ছিল, বাবা? মাকে ত' কোনদিন দুঃখ করতে শুনি নি।" নিশ্চিন্ত মন নিয়ে বাড়ি ফিরে এসে বুবুকে সব রিপোর্ট দিলাম।

অশোকের পিতা প্রায় আমার পিতারই বয়সী ছিলেন। ত্যাগী ধরণের মানুষ। অতি খাঁটি লোক তিনি ছিলেন। অশোকের মা-ও ছিলেন আমার মায়ের বয়সী এবং একই ধরণের মানুষ। এঁদের প্রথম সন্তানের বয়স ছিল আমারই বয়সের মত। অশোকের মা ছিলেন রত্নগর্ভা। সব ক'টি ছেলেমেয়েদের সুশিক্ষা দিয়ে স্বামী-স্ত্রী তাঁরা দুজনে বেশ মনের আনন্দেই ছিলেন। তাঁরা ছিলেন সনাতন হিন্দু সমাজের লোক। কোলের ছেলেটি ছিটকিয়ে ব্রাহ্মসমাজের কন্যার পাণি গ্রহণ করলে তাঁরা হয়ত মনে কষ্ট পাবেন। আমি খুবই সমস্যায় পড়েছিলাম। অশোককে বলতে হয়েছিল যে বাপ-মায়ের মনে কষ্ট দিয়ে তিনি কাজলকে গ্রহণ করবেন এটা আমরা চাই না। অশোককে বললাম যে, আগে তাঁদের সম্মতি নেওয়া দরকার। অশোক তাঁর পিতামাতা ও ভাইয়েদের সঙ্গে খোলাখুলিভাবেই কথা বলে পরে আমাকে জানালে আমি অশোকের পিতামাতার সঙ্গে দেখা করলাম। শিক্ষিত পরিবার এবং তাঁদের মতের উগ্র গোঁড়ামি ছিল না। কথাটা আমি নিজেই তুললাম। শুনে অক্ষয়-বাবু বললেন—"তোমাদের পরিবারের সঙ্গে আমাদের খুবই ঘনিষ্ঠতা রয়েছে। তোমাদের বংশের একটি কন্যা আমাদের বাড়ি আসেন এটা আমাদের খুবই ইচ্ছা। হারু—অশোকের ডাক নাম—তোমার কন্যাকে পছন্দ করেছে এবং তোমরাও তাকে পছন্দ করেছ—এর উপরে আর ত' কোন কথা নেই। ধর্মমত ব্যক্তিগত জিনিস। তুমি ব্রাহ্ম। সুতরাং তুমি তোমার কন্যাকে ব্রাহ্মমতেই বিবাহ দিও। আমরা আমাদের বাড়িতে আমাদের মতন করে বধূবরণ করে নেব।" আমি বললাম—"দেখুন, এইরকম খিচুড়ি বিয়েতে আমার মন সায় দেয় না। ভগবানের নাম নিয়ে উপাসনা করে যে বিবাহ সম্পন্ন হয়ে গেল পরদিন আবার অন্য বিধানে বিবাহানুষ্ঠান করলে মনে হয় যেন প্রথম অনুষ্ঠানটা অশুদ্ধই রয়ে গেছে। আপনাদের যখন মন খোলাভাবে সায় দিচ্ছে না তখন এ বিষয়ে আর অগ্রসর না হওয়াই ভাল বলে মনে করি।" আমি উঠে দাঁড়াতে বৃদ্ধ আমার দিকে তাকিয়ে ধীরে ধীরে বললেন—"দেখ সুধীরঞ্জন, আমাদের দেশে বিবাহটাকে একটা sacrament বলে গণ্য করা হয়। আসল জিনিস হোল ঈশ্বর সাক্ষী করে বরবধূ নিজেরা উদ্বাহ প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হবেন। সুতরাং তোমার বাড়িতে ব্রাহ্মপদ্ধতি অনুসারে ঈশ্বরের উপাসনা করে যে বিবাহ হবে সেইটেই হবে আসল বিবাহ। তারপরে আর কোন অনুষ্ঠানেরই প্রয়োজন দেখি না।" অশোক পাশেই ছিলেন। তিনি টিপ করে তাঁর বাবা-মাকে প্রণাম করে আমাকেও প্রণাম করলেন। বিষয়টার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হয়ে গেল। অবাক হয়ে গেলাম এই প্রাচীন দম্পতির মনের প্রসার দেখে। আমার বাবামায়ের কথা মনে পড়তে লাগল।

তখন কলকাতায় Blackout, রাস্তায় ঘাটে ঘুটঘুটে অন্ধকার। কিছু দিন আগেই খিদিরপুরের দিকে নাকি জাপানী হাওয়াই জাহাজ বোমা ফেলে গেছে। কলকাতা থেকে লোকজন বাইরে যাবার চেষ্টা করছিল নিরাপত্তার আশায়। অশোকের বাবা মায়ের ইচ্ছে হোল যে বিবাহটা যত শীঘ্র সম্পন্ন করে ফেলা, কেন না কি হবে কে জানে, কে কোথায় ছিটকে পড়বে তার নিশ্চয়তাও নেই। শুভদিন দেখে ঠিক হোল যে উনিশ শ' তেতাল্লিশের ৯ই ফেব্রুয়ারী তারিখে—শ্রীপঞ্চমী তিথিতে—কন্যার বিবাহ হবে। সময় খুবই সংক্ষেপ। বুবু কালিম্পং থেকে নেমে এলেন। বিয়ের বাজার সুরু হোল। বুবু ও আমি গিয়ে শরণাপন্ন হলাম ছুটকী দিদির অর্থাৎ উর্মিলা দেবীর। ছুটকী দিদি খুব আগ্রহের সঙ্গে বিবাহের খাওয়া-দাওয়ার যাবতীয় দায়িত্ব নিলেন। কি সুনিপুণভাবে ছুটকী দিদি যে সব ব্যবস্থা করেছিলেন তা বলে শেষ করা যায় না। তখনো দেশে মাছ মাংস পয়সা দিলে পাওয়া যেত। জেলে গোয়ালা সব ছুটকী দিদির অনুগত ছিলেন। উপাসনা করেছিলেন শ্রদ্ধেয় আচার্য সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী মশায়। অশোকের পিতা উপাসক মণ্ডলীর সর্বাগ্রে আসন পরিগ্রহ করায় বরযাত্রী সবাই সে মঙ্গল অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন বিনা আপত্তিতে। হাইকোর্টের জজ, ব্যারিস্টার, এটর্নী ও উকিল থেকে ওরিজিন্যাল সাইডের কর্মচারী ও চাপরাশীরাও এসেছিলেন আমার কন্যা জামাতাকে শুভেচ্ছা ও আশীর্বাদ জানাতে। অনেকের মুখে এখনো শুনি যে, কাজলের বিয়ের খাওয়াটা নাকি ভোলবার নয়। শুভদিনে শুভক্ষণে অশোক কাজলের বিবাহ নিরাপদে ও সুষ্ঠুভাবে হয়ে গেল। খুবই আদরে অশোকের পিতামাতা ও ভাইবোনেরা কাজলকে বধূরূপে বরণ করে ঘরে তুলেছিলেন। মঙ্গলময় ভগবানের অসীম দয়ায় ও অশোকের পিতামাতার ও আমাদের ও অন্যান্য গুরুজনদের শুভাশীর্বাদে অশোক ও কাজলের বিবাহিত জীবন মধুময় হয়ে রয়েছে। তাঁদের দুটি কন্যা—কৃষ্ণা ও শ্যামলী এবং দুটি পুত্র অনিরুদ্ধ ও আদিত্য। সকলেই সুদর্শন, শিক্ষিত ও স্নেহপ্রবণ। বিয়ের আগে কাজলের সঙ্গে লেকে বেড়াতে অশোকের যে বর্ণনা কাজল দিয়েছিলেন সেই অনুসারে অশোকের একটা ডাকনামই হয়ে গেল T. D. H. (Tall, dark & handsome)। কাজল কথায় ও চিঠিতে এই ডাকনামেই অশোককে এখনো নির্দেশ করে থাকেন।

[ক্রমশঃ]

সাপ্তাহিক বসুমতীর চাঁদার হার

সাপ্তাহিক বসুমতীর বাৎসরিক চাঁদা সডাক ১৮৲ টাকা, ষাণ্মাসিক ৯৲ টাকা ও ত্রৈমাসিক ৪·৫০ টাকা। প্রতি সংখ্যা ৩০ পঃ।

তিন মাসের কমে গ্রাহক করা হয় না। গ্রাহক হতে হলে আপিসে অগ্রিম টাকা জমা দিতে কিংবা মনি অর্ডারে টাকা পাঠাতে হবে।

—কর্মাধ্যক্ষ, বসুমতী

পূর্বপাকিস্তান—একটি দৃষ্টিকোণ থেকে

সাগর বিশ্বাস

> লেখক বাস্তব অভিজ্ঞতার ছাপ রাখতে চেয়েছেন পরিসীমিত এই প্রবন্ধটিতে। বলা বাহুল্য, কিছু বিতর্কিত বিষয় এতে থাকলেও তিনি বাস্তবধর্মী কথা বলতে চেয়েছেন—বাঙালীদের গৌরবে। উপরন্তু প্রবন্ধটিতে আছে, পূর্ব পাকিস্তানে প্রতিক্রিয়াশীল চক্রের বিরুদ্ধে স্বল্প সংখ্যক প্রগতিশীল মানুষের ইতিবৃত্ত। সে কারণে নৌকোর মাঝি, সালাম-বরকত, মোঃ মখদুম-ই-মুলক মাশরাফী ও তোফাজ্জেল হোসেন প্রভৃতি আমাদের নমস্য। এ'রা বাঙালীদের গর্ব।
>
> দুই বাংলার মানুষের আত্মীয়তার সম্বন্ধ আরো নিকটতর করার জন্যে প্রয়োজন সমস্ত প্ররোচনা ও ভেদবুদ্ধির বিরুদ্ধে সংগ্রাম। সেই সংগ্রাম তখনই সার্থক হয়, যখন তা আত্মসমালোচনানিরপেক্ষ নয়। সেই ভেবে আমরা এটি প্রকাশ করলাম, এ-কথা দ্বিধাহীনরে স্বীকার করি।
>
> —সম্পাদিকা।

সাম্প্রতিককালে এদেশে বুদ্ধিজীবী ও সাহিত্যিকসমাজে বঙ্গ-সংস্কৃতি সম্মেলন, সারা বাংলা সাহিত্যপ্রদর্শনী প্রভৃতি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের প্রতি একটা ব্যাপক প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়। কয়েক মাস আগে ন্যাশনাল লাইব্রেরীতে পূর্ব বাংলার সাহিত্য ও সাময়িক পত্র-পত্রিকার বিরাট প্রদর্শনী হয়ে গেল। নিঃসন্দেহে এগুলি সভ্যতা ও সংস্কৃতির পরিচায়ক। কিন্তু পূর্ব বাংলার মানুষ, সাহিত্য, সংস্কৃতি এবং যে কোন গণতান্ত্রিক ধরণের আন্দোলন নিয়ে যেভাবে এদেশে ভাবালু আলোচনা-চক্রের উদ্ভব হয় তা আত্মতৃপ্তির নামে নির্ভেজাল আত্মপ্রবঞ্চনা ছাড়া আর কিছু নয়। আমরা তৃপ্তি লাভ করতে চাই এই ভেবে ওরা বাঙালী, বাঙালীর সংগে ওদের গভীর আত্মিক টান আছে—পার্টিশনের অভিশাপে ভিন্ন রাষ্ট্রের অন্তর্গত হলেও মূলত ওটা বাংলাদেশ—বাংলার প্রাণ-প্রবাহ ওর প্রতিটি শিরা-উপশিরায় প্রবাহিত : আমরা ভুলতে চেষ্টা করি বাংলাদেশের অংশ হলেও ওটা আজ আর পূর্ব বাংলা নয়—পূর্ব পাকিস্তান—মানুষগুলি যতটা না বাঙালী তার থেকে বেশি পাকিস্তানী—আত্মিক টান যতটা না বাঙালীর প্রতি তার থেকে বেশি জাতীয়তা আর 'আজাদী'র প্রতি ; ভুলতে চেষ্টা করি সেই আজাদী-লাভের ইতিহাস—দ্বিজাতি-তত্ত্বের চরম ব্যর্থতার গ্লানি।

১৯৬৫ সালে একটি দীর্ঘকালের শান্তির ও ভ্রাতৃত্বের ধারাবাহিক বিজ্ঞাপনের চরম পরিণতি হয়ে গেছে। তখন থেকেই দুই সহোদরের এতকাল যে-মুখ দেখা-দেখিটুকু অবশিষ্ট ছিল তাও বন্ধ করা সম্ভব হলো বৈরিতার অজুহাতে। র‍্যাডক্লিফের কৃত্রিম সীমারেখার উপর গঠিত হলো অদৃশ্য লৌহপ্রাচীর। এই প্রাচীর অতিক্রম করে এবার আমাকে পূর্ব পাকিস্তানে প্রবেশ করতে হয়েছিল। ১৯৬২ সালেও আমি পাকিস্তানে বাস করেছি। পরেও অনেকবার সেদেশে গেছি। কিন্তু এবারের যাওয়ার সংগে সে-সব বারের যাওয়ার একটা মৌলিক পার্থক্য আছে। পাক-ভারত যুদ্ধের পূর্বে যে কবার আমি পূর্ব পাকিস্তানে গেছি—প্রতিবারই তা হয়েছে পাকিস্তান সরকারের অনুমতিক্রমে।

যেহেতু ১৯৬২ সাল পর্যন্ত আমি পূর্ব পাকিস্তানে বাস করেছি, একমাত্র ১৯৬৪ সালের জানুয়ারী মাসে সংঘটিত দাংগা ছাড়া অনেকগুলি সাম্প্রদায়িক দাংগা প্রত্যক্ষ করবার দুর্ভাগ্য আমার হয়েছে। বিশেষ করে ১৯৬১-৬২ সালে খুলনা, দৌলতপুর, খালিসপুর, সেনহাটির রক্ত-ক্ষয়ী দাংগার কথা আজও বেশ মনে আছে। প্রায়শই এদেশের সংবাদপত্রে এই সকল দাংগার সম্পূর্ণ দায়িত্ব চাপিয়ে দেওয়া হয় একদল অবাঙালী মুসলমানের উপর এবং সেইসঙ্গে প্রচারিত হয় ওখানকার স্থানীয় সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের উদার ভ্রাতৃভাবাপন্ন মনোভাবের কথা—অকৃপণ সহানুভূতি ও আশ্রয়দানের কাহিনী। আমি এগুলিকে সর্বৈব অস্বীকার করি না ; কিন্তু আমি দেখেছি কেমন করে প্রতিটি দাংগা শুরু হবার সংগে সংগে বাঙালী অধ্যুষিত গ্রামাঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছে—কেমন করে গ্রামের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের চোখের সামনে প্রাণের সামনে একটি বিভীষিকার সৃষ্টি হয়েছে।

কিন্তু সব কথা বলবার আগে একটি কথা স্পষ্ট করে নেওয়া দরকার। আমার এই প্রবন্ধের বক্তব্য কি? পাঠক হয়ত মনে করতে পারেন আমি সাম্প্রদায়িক দাংগার ইতিহাস লিখতে বসেছি। না। জীবনের উনিশটি বছর পূর্ব পাকিস্তানে বাস করে এবং আজও সেদেশের সংগে যোগাযোগ রেখে তুচ্ছ-অতুচ্ছ ঘটনার মাধ্যমে যতটা অভিজ্ঞতা আমার হয়েছে তাতে আমার স্বতই মনে হয়—আমরা বাঙালীরা যতটা পূর্ব পাকিস্তানের স্থানীয় সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়কে বাঙালী ভাববার চেষ্টা করি—তার থেকে আনুপাতিক হিসাবে তারা অনেক বেশি পরিমাণে পাকিস্তানী। বড় বড় মানবিক যুক্তি দিয়ে আর বাংলা একাডেমীর উদাহরণ দেখিয়ে তার বিচার করা যায় না—যায় না ভাষা-আন্দোলনের ইতিহাস রচনা করেও। মনোবৃত্তি বুঝতে হলে সেই সমাজ ও সমাজের মানুষের সংগে মিশতে হয়। জিনিসটা নির্ভর করে সম্পূর্ণভাবে understanding-এর উপর। বর্তমান প্রবন্ধ সেই understanding-এরই একটি বিক্ষিপ্ত লেখা চিত্র।

গত ২৩শে মে আমি সীমান্তের লৌহ-প্রাচীর অতিক্রম করে পূর্ব পাকিস্তানে প্রবেশ করি। নামেই শুধু 'লৌহপ্রাচীর'—অতিক্রম করা কিছুই নয়। সীমান্তের দুদিকেই দুই সরকারের স্বরাষ্ট্রবিভাগের নীতি-নিয়মের ধারক-বাহকদের অবস্থান আর এই 'দুই-এর মাঝে এক আশ্চর্য মিল' এর মত অবস্থিতি একদল মিডলম্যানদের—চলতি কথায় যাদের 'দালাল' নামে অভিহিত করা হয়—যাত্রীসাধারণের ভাগ্য যাদের উপর নির্ভরশীল এবং স্বরাষ্ট্রদপ্তরের নীতি-নিয়মের ধারক-বাহকেরা যাদের কথায় ওঠা-বসা করেন। হাজার হাজার টাকার লেনদেন চলে এদের মধ্যে। ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের পরে দুই দেশের সংগে যোগাযোগ বন্ধ করা হলেও লোক চলাচল বন্ধ হয় নি, হতে পারেও না। সংগে সংগে জিনিসপত্র চলাচলও অব্যাহত গতিতে চলছে। এদেশের বাজারে যেমন চীনে-জাপানী কলম, টেরিলিন, ক্যারোলিন পাওয়া যায় (অবশ্যই গোপনে) তেমনি পূর্ব পাকিস্তানের বাজারেও 'বোরোলিন', জবাকুসুম তেল, এভারেডী ব্যাটারী (যদিও খাস কলকাতা তথা পশ্চিমবঙ্গে এভারেডীর বিজ্ঞাপনের যত জৌলুস—জিনিসটার তত নয়।) অমিল নেই। আর এলাচি, লবঙ্গ, সুপারী, বিড়ির পাতা—এগুলি আরো উঁচুস্তরের ব্যাপার। যা হোক—যা বলছিলাম—এই মিডলম্যানদের সহায়তায় অতি সহজেই এপার-ওপারের ব্যবধান অদৃশ্য হয়ে যায়, বিনিময়ে দিতে হয় শুধু টাকা। পাশপোর্ট ব্যবস্থা চালু থাকলে যে টাকাটা উভয় সরকারের আয় হতো তা থেকে সরকারদ্বয় হচ্ছে বঞ্চিত আর তার দশগুণ টাকা জমছে ঐ দালাল-শ্রেণীর হাতে। এছাড়া যে হিংস্রতা আর স্বার্থপরতার হানাহানি সীমান্ত অঞ্চলে চলে তা মানবতাবিরোধী এবং মানুষের সমাজের পক্ষে দুরারোগ্য সংক্রামক ব্যাধি। কিন্তু সে সব অপ্রাসঙ্গিক।

প্রথমে ছাত্রচিন্তার মধ্যে আসা যাক। ১৯৬০-৬২ সালে আমি দৌলতপুর কলেজের ছাত্র ছিলাম। পূর্ব পাকিস্তানের অন্যতম প্রগতিশীল কলেজ বলে দৌলতপুর কলেজের খ্যাতি আছে। একসময়ে এই কলেজের ছাত্রদের extremist বলে কুখ্যাতি হয়েছিল। যার ফলে আমাদের সময়ে কলেজে ছাত্রদের কোনো ইউনিয়ন ছিল না। তৎকালীন প্রিন্সিপাল আবু সাইদ আহমদ নিজের নিরাপত্তার জন্য যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করেছেন, তথাপি ছাত্র-সংগঠন করতে দেন নি। আমার তৎকালীন বন্ধুবান্ধবদের সংগে এখনও পূর্ব পাকিস্তানে গেলে দেখা হয়। তারা কেউ কেউ এখনো ছাত্র, কেউ ব্যবসায়ী, কেউ উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী। শিক্ষিত ছাত্রসমাজে ভারতের চতুর্থ সাধারণ নির্বাচনে রাষ্ট্রপতির নির্বাচন বিশেষভাবে গণতান্ত্রিক স্বীকৃতি লাভ করলেও উক্ত সমাজের আর একটি section-এ এবং অল্পশিক্ষিত সমাজে এ অভিমত প্রায়শই শোনা যায় যে বাস্তবিকপক্ষে, ভারতের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে নেতৃত্ব গ্রহণ করবার উপযুক্ত লোক নেই। তবে নবনির্বাচিত রাষ্ট্রপতি নিঃসন্দেহে অতি যোগ্য ব্যক্তি। প্রসঙ্গত এই মৃদু গর্বটুকুও শোনা যায়—হবে নাই-বা কেন—মুসলমান বাদশাহর জাত!! পাঠক অবাক হবেন না—মনে রাখতে হবে রাজনীতি, সমাজনীতি, গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা নিয়ে তাদের মাথাব্যথা নেই—সে দেশের মাটিতে এগুলির বীজ রোপিত হয় নি। কাজেই অতি সামান্যসংখ্যক সত্যিকার চিন্তাশীল ব্যক্তি ছাড়া বাদবাকী সকলে এইভাবে চিন্তা ও ব্যাখ্যা করে। আমি সুষ্ঠু পরিসংখ্যান না দিতে পারলেও অনুমান করতে পারি এই সামান্যসংখ্যকদের হার শতকরা পাঁচজনের বেশি হবে না। কারণ যে দেশে শতকরা কুড়িজন মানুষ অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন তাদের মধ্যে সত্যিকার চিন্তাশীল এবং নিরপেক্ষ মতাবলম্বী পাঁচজন ধরলে অসংগত অনুমান হবে না।

পূর্ব পাকিস্তানের প্রগতিশীল ছাত্রসমাজ আজ দ্বিধাবিভক্ত। তার একটি শাখা পরিচালিত হচ্ছে মেনন খানের নেতৃত্বে—অন্য শাখাটি পরিচালনা করছেন 'অগ্নিকন্যা' মতিয়া চৌধুরী। এই দুটি শাখার মধ্যে মতভেদ শুধু নয়, মতবিরোধও আছে। যদিও শুভ ও সুস্থবুদ্ধি নিয়ে এই মতভেদের মধ্যে সমন্বয়সাধন করাও অসম্ভব বলে মনে হয় না। এদেশে ছাত্রফেডারেশন যেমন আজ ত্রিধাবিভক্ত—অথচ মতভেদ ও মতবিরোধকে বোধ হয় সমন্বিত করাও অসম্ভব নয়। অবশ্যই সেটা একটি উপর নির্ভরশীল।

গত জুন মাসের প্রথম সপ্তাহে যখন সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্রের উপর ইসরায়েলের আক্রমণ অনেকটা অপ্রতিহত গতিতে এগিয়ে চলেছে, যখন পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আরব যুক্তরাষ্ট্রকে নৈতিক ও বৈষয়িক সাহায্য দানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তখন খুলনায় কয়েকজন ছাত্র ও আঞ্চলিক ছাত্রনেতার সংগে আমার সাক্ষাৎ হয় (প্রত্যেকেই বাঙালী)। তাঁদের সংগে আলোচনার প্রথম সূত্রপাতেই তাঁরা ভারত এবং ভারত সরকারকে (এঁরা ভারতকে প্রায়শই 'হিন্দুস্থান' বলে থাকেন) একচোট গালাগালি করে নিলেন। তাঁদের মতে—ভারতের ধর্মনিরপেক্ষতা ও সমাজতান্ত্রিক সমাজের বুলি কতকগুলি ভাঁওতা ছাড়া আর কিছু নয়; বৃটিশের দালালী করবার অভ্যাস আজও তার ঘোচে নি—আরব-ইসরায়েলের যুদ্ধে ইসরায়েলকে সমর্থন করবার ব্যাপারে সেটা না কি আরো স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। আমি বললাম—"কিন্তু ভারত সত্যিই কি রাজনৈতিক চেতনা লাভ করবার পরে বৃটেনের দালালী করেছে কখনো? আর আরব-ইসরায়েলের মধ্যে ত' যতদূর জানি আরব ভারতের নিকটতর বন্ধু।"

—ওসব কাগজে-কলমে। আসলে জাতক্রোধটা যাবে কোথায়?

এ প্রসংগে তর্ক বাড়ানো অনর্থক বলে মনে হলো। তথাকথিত প্রগতিশীল ছাত্রসমাজের চোখ যে এমনভাবে অবরুদ্ধ সেটা যখন বুঝলাম তখন দুঃখই হলো। আরবের সংগে ভারতের বন্ধুত্ব যারা দেখেও দেখতে চায় না তাদেরকে আরব-ভারত সম্পর্ক নিয়ে কিছু বলতে যাওয়া বাতুলতা হবে বলে নিরস্ত রইলাম। প্রসংগ পরিবর্তন করবার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি পাক-মনোভাবের উল্লেখ করলাম।

—পৃথিবীতে আমেরিকাই আজ মানবতার প্রধান শত্রু। ওদের স্বরূপ একদিন-না-একদিন উদ্ঘাটন আমরা করবোই। দেশের মর্যাদা যেভাবে আমেরিকার হাতে বিলিয়ে দেওয়া হচ্ছে সে সম্পর্কে দেশের মানুষকে অবহিত করানোর দায়িত্ব আমাদেরই। বুর্জোয়া ভারত সরকারের মার্কিন তোষণনীতিও আমরা পছন্দ করি না। ভারতীয়রা যে সরকারকে গণতান্ত্রিক সরকার বলে ব্যাখ্যা করে আমাদের চোখে তা সত্য নয়।

—তাহলে কি আমেরিকার সংগে সংগে ভারতও—

—হ্যাঁ সমাজবিরোধী ও মানবতার শত্রু। হবে নাই-বা কেন? স্বাধীনতার পরে যারা খদ্দর পরে সমাজ-সেবা করতে নেমেছিল তাদের মধ্যে একটা minimum percent-ও সৎ মানুষ ছিল না।

এই নিরাবরণ আক্রমণাত্মক সমালোচনায় আমি একটু অবাক হয়ে পড়েছিলাম। জিজ্ঞেস করলাম—চীনের সংগে পাকিস্তানের যে মিত্রতা—এটা কি পররাষ্ট্রনীতির দু-মুখোনীতির কথা মনে করিয়ে দেয় না?

—না। কেন না পররাষ্ট্রনীতি ত' আর একটা fancy মাত্র নয়, তা হবে বাস্তবানুগ। চীনের সংগে বিচ্ছেদ সৃষ্টি করে পাকিস্তান কেন—গোটা এশিয়ারই কি মঙ্গল হবে? ভারতের সংগে পাকিস্তানের পররাষ্ট্রনীতির মৌল পার্থক্য এখানেই। একটা fancy—আর একটা বাস্তব; একটা ভাবালু আর একটা প্রয়োজনানুগ।

আমার মনে পড়লো জহরলাল নেহরুকে লেখা সুভাষচন্দ্র বসুর একটি চিঠির কথা—"পররাষ্ট্রনীতি হবে বাস্তবধর্মী। প্রধানত জাতির স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি রেখেই নীতি নির্ধারিত হওয়া উচিত। ......ভাবালু আদর্শের পথে এবং সাধু ইচ্ছা প্রকাশ করলেই পররাষ্ট্রনীতি সফল হয় না।" মনে হলো ভারতবর্ষের জাতীয়নেতার policy ভারতের মাটিতে ঠাঁই পায় নি—বিমাতার কোলে স্থান লাভ করেই সে বেঁচে থাকতে চায়।

সেদিন জর্ডনের উপর ইসরায়েলী বিমানবাহিনীর অবিশ্রাম বোমাবর্ষণ চলছে। অত্যাসন্ন হয়ে উঠেছে প্রেসিডেন্ট নাসেরের পদত্যাগ। আমি তখন বাগেরহাটে। নৌকার মধ্যে আমি ছাড়াও ৮।১০ জন যাত্রী। তাঁদের মধ্যে একজন মৌলানা সাহেব ছিলেন। কিছুক্ষণ পরে এই মৌলানা সাহেব বিশ্ব-রাজনীতির প্রশ্ন উত্থাপন করেই জর্ডনের উপর ইসরায়েলী বোমাবর্ষণের তীব্র নিন্দা শুরু করলেন। তাঁর নিন্দাবাদের ভাষা ও আবেদন কোনটাই সুন্দর ছিল না। তাঁর বক্তব্যের সারমর্ম এইরকমই দাঁড়ায় যে, 'মুছলমানের' উপর কাফেরের এই নগ্ন আক্রমণের সাম্প্রতিক নজির একমাত্র পাকিস্তানের উপর ভারতের বিমানবাহিনীর বর্বরোচিত হামলা। সারা দুনিয়ায় ইসলাম আজ বিপন্ন—অথচ মুছলমান দেশগুলি তা দেখেও যেন না দেখার ভান করছে। প্রসঙ্গত তিনি আয়ুব সরকারের খানিকটা সমালোচনা করে নিলেন। 'নৈতিক ও বৈষয়িক' সাহায্য দেবার প্রতিশ্রুতি শুধু মুখে প্রকাশ করলেই হয় না, তা কাজে পরিণত করতে হয়।

আমি সহজাতভাবেই চুপ করে ছিলাম আর মৌলানা সাহেবের অগ্নিগর্ভ বাণী এবং সংগে সংগে অন্যান্য আরোহীদের স্পষ্ট ও অস্পষ্ট সমর্থন শুনতে লাগলাম। আর একটা চিত্র আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠলো। পূর্ব বাংলার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পিছনে বিভেদপন্থী এইসব মৌলানাদের ভূমিকা যেন আমার চোখের সামনে আর

নির্ম্মল বার্ সাবান দিয়ে কাচলে
আপনার কাপড়-চোপড় হবে
ধবধবে ফরসা
হালকা সুগন্ধে ভরপুর
Nirmal
নির্ম্মল
BAR SOAP
নির্ম্মল বার সাবান দিয়ে কাচাও খুব সহজ—নির্ম্মল বার সাবানে চটপট মেণার ফেনা হয় আর সেই ফেনার শক্ত ক'রে এঁটে বসা তেল-কালি ও ধুলো-ময়লা উধাও হয়ে যায়। কাপড়-জামা ধকধকে তকতকে দেখায়, আর নতুন ধোয়ার গন্ধে ভরে থাকে। নির্ম্মল দিয়ে কাচলে খরচও কম। ঢের বেশীদিন চলে; কারণ নির্ম্মল বার সাবান বেশ শক্ত থাকে অনেকদিন টেঁকে।
নির্ম্মল
পূর্ব ভারতে এই বার সাবানই
কাটতিতে সবার ওপরে।
কুসুম প্রোডাক্টস্ লিমিটেড, কলিকাতা-১

একবার সচিত্র হয়ে উঠলো। সাম্প্রদায়িক সম্পর্ক কলুষিত করতে এদের ভূমিকা যে যে নগণ্য নয়—একথা আজ আর কারোই জানতে বাকী নেই। পাকিস্তান সৃষ্টি হবার পর সেখানকার সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের মনে এ ধারণা বদ্ধমূল হয়েছিল যে, মুসলিম লীগ তথা মুসলমানদের অক্লান্ত সংগ্রামের ফলে পাকিস্তান সৃষ্টি হয়েছে এবং এদেশ কেবল তাদেরই। সেই ধারণাতে ঘৃতাহুতি পড়লো যখন সেদেশ 'ইসলামিক রিপাবলিক' বলে ঘোষিত হলো। গ্রাম্য, অশিক্ষিত মানুষের মনে এই ধারণা যে কত বিধ্বংসী হতে পারে তা জানতে হলে গ্রামে গ্রামে ঘুরতে হবে। এই ধারণা ও বিশ্বাস যে কত মানুষের ঘর জ্বালিয়েছে, কত অসহায়ের জীবন নষ্ট করেছে, কত রমণীর মর্যাদাহানি ঘটিয়েছে, কত লোককে ধর্মান্তরিত করেছে—তার হিসাব রাষ্ট্রীয় পরিসংখ্যানে থাকে না, থাকে না সাংবাদিকের রিপোর্টে।

করিমগঞ্জ গ্রামে গুজব রটলো নারায়ণ পরামাণিক 'হিন্দুস্থানে' পাড়ি দিচ্ছে। আর যায় কোথা। পাকড়াও করা হলো। রাতারাতি মোল্লা ডেকে নিষিদ্ধ মাংস খাইয়ে পরম সমাদরে স্বীয় গোষ্ঠীভুক্ত করা হলো। বছরখানেক পরে এই নবজাত জয়নুল ইসলামের দেহান্তর ঘটলে তার সমাধির উপর সৌধ গঠিত হলো—রচিত হলো প্রস্তরফলক। ঘটনাটি ঘটলো পাকিস্তান সরকারেরই জনৈক কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর বসতবাড়ির পাশে। আজও সে প্রস্তর-স্বাক্ষর বর্তমান।

পাকশা গ্রামে জনৈকা হিন্দু গৃহবধূ আত্মহত্যা করেছে। পাশাপাশি আর একটি খবর প্রচারিত হলো—না, আত্মহত্যা নয়, ওর স্বামী ওকে খুন করেছে। অতঃপর ইউনিয়ন কাউন্সিলের চেয়ারম্যান ও কিছু গণ্যমান্য মোড়ল ব্যক্তির আগমন এবং ভয় দেখিয়ে কিছু নগদ ম্যানেজ করে প্রস্থান। জনৈক প্রতিপত্তিশালী খাঁ সাহেবের মর্যাদায় ঘা লাগলো—যেহেতু তাঁর পকেটে কিছু পড়েনি। অতএব তাঁরি থানায় গমন এবং ব্যক্তিটির বিরুদ্ধে নালিশ দায়ের (স্ত্রীহত্যার অভিযোগ)। অতঃপর যথারীতি পুলিশী তৎপরতা। আজও কেষ্ট আর তার মা ফেরার (সর্বশেষ প্রাপ্ত খবরে শুনেছি পুলিশী 'রক্ষণাবেক্ষণে' ওরা আজ সর্বস্বান্ত)।

আমি নিজে একবার গোপালগঞ্জ থেকে নৌকা করে গোলাবেড়ের দিকে যাচ্ছিলাম। আমার সংগে খুলনার এক ভদ্রলোক ছিলেন। তখন পাকিস্তান সরকারের স্বরাষ্ট্রদপ্তর খুলনা, যশোর প্রভৃতি জেলায় ভারতীয় হিন্দুদের বৈধ প্রবেশ নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন। তার কারণ এই যে, পাছে খুলনা, যশোরে মাইনরিটি সম্প্রদায়ের উপর মেজরিটির অপকর্মের চিহ্ন ভারতীয়দের কাছে প্রকাশ হয়ে পড়ে। উক্ত ভদ্রলোক তাই বাধ্য হয়ে ফরিদপুরের ভিসা করে পূর্ব পাকিস্তানে প্রবেশ করেছিলেন। আমাদের নৌকা যখন খালের মাঝখানে তখন লুঙ্গি এবং হাওয়াই শার্ট পরিহিত এক ব্যক্তির আবির্ভাব হলো ঘাটে। তার হাতে একটি বাজারের থলে। লোকটি আমাদের মাঝিকে বললো নৌকা তীরে ফিরিয়ে আনতে। মাঝি জানালো যে রিজার্ভড্ নৌকা, অতএব আর কাউকে নেওয়া সম্ভব নয়। মাঝির এ কথায় লোকটি যেন হঠাৎ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলো। সে চিৎকার করে বললো—"শালা, তুই যাচ্ছিস ত' দুটো হিন্দু নিয়ে—তা আবার রিজার্ভড্। নাও (নৌকা) আন।" বলা বাহুল্য আমাদের পোষাক-পরিচ্ছদ পুরোমাত্রায় হিন্দুয়ানি ছিল।

আমার ভয় করতে লাগলো। আমি মাঝিকে বললাম—নৌকা তীরে ভেড়াতে। মাঝি বললো, "না বাবু, ঝামেলা হবে।" সে দ্রুত নৌকা চালিয়ে দিল। লোকটি ঘাটে দাঁড়িয়ে নিষ্ফল আক্রোশে সমানে চিৎকার করতে লাগলো। ঘাটে তখন আর একটিও নৌকা নেই।

আর একটি কৌতুকাবহ এবং মর্মান্তিক ব্যাপার লক্ষণীয়, ভারতবর্ষের ইতিহাস পাঠ করলে আমরা দেখতে পাই মুসলমান বাদশাহদের প্রলয়ংকর রূপতৃষ্ণা চরিতার্থ করতে কত হিন্দু-ললনাকে ধর্ম-বিসর্জন দিতে হয়েছে, শুধুমাত্র নারীঘটিত ব্যাপারে কত রাজ্য পুড়ে ছাই হয়ে গেছে, অপমানের হাত থেকে রেহাই পেতে কত নারীকে জীবন বিসর্জন দিতে হয়েছে। 'সেই tradition যে আজও সমানে চলেছে' সে প্রমাণের অভাব অন্তত পূর্ব পাকিস্তানে নেই। তাই বুঝি কুমারী শিবানী ভট্টাচার্যকে আজ চোখের জলের মধ্য দিয়ে আজিজুল ইসলামের সন্তান আর সংসার-পরিচর্যা করতে হচ্ছে—তাই বুঝি বিবাহিতা মহামায়া সাহার স্থান হলো না স্বামীর ঘরে, আজও তাকে জীবনধারণ করতে হচ্ছে মুসলমানের অংকশায়িনী হয়ে। কিন্তু উদাহরণ দিয়ে প্রবন্ধকে দীর্ঘ করে লাভ নেই। এ চিত্র খোলা চোখে তাকালে পূর্ব পাকিস্তানের সর্বত্র দেখা যাবে। পল্লীগ্রামের বিদ্যালয়গুলিতে আজ হিন্দু মেয়েদের পড়াশুনা রীতিমত দুঃসাহসিক ব্যাপার। রোমিওদের প্রণয় নিবেদন, অবাঞ্ছিত প্রেজেন্টেশন, পত্রাঘাত কিংবা অতর্কিত আক্রমণের হাত থেকে রেহাই পেতে তাদের ঘরেই আবদ্ধ থাকতে হয়। তাতেও সর্বদা নিষ্কৃতি পাওয়া যায় না। আমার এক আত্মীয়কন্যা (বয়স—১৪ বছর) এমনি উপদ্রবে আতঙ্কিত হয়ে সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতে চলে আসতে বাধ্য হয়েছিল।

ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের উপরও একশ্রেণীর স্বেচ্ছাচারী মানুষের যথেচ্ছাচার মানুষের যুক্তি ও মানবতাবাদের উপর আঘাত হানবে। আমি দেখেছি নামাজের সময়ে অনুষ্ঠানের মাইক বন্ধ করে দিতে, মন্দিরের কাঁসর-ঘণ্টা স্তব্ধ করে দিতে। এগুলি যদি মোল্লাতন্ত্রের আদর্শের পরিপন্থী হয় তবে সিনেমা-থিয়েটার-বার-প্রসটিটিউশনগুলি কেন তা নয়? লাহোর থেকে ত' এমন সব চিত্র (যেগুলি ইসলামিক রিপাবলিকের ইসলাম ধর্মাবলম্বী নায়ক-নায়িকা-প্রযোজক-পরিচালক দ্বারাই নির্মিত) মুক্তি পায় যা পৃথিবীর যে কোন অশ্লীল চিত্রকে লজ্জা দেবে।

আমি আশাবাদী মানুষ। আমি বিশ্বাস করি শিক্ষার অগ্রগতির সংগে সংগে সংস্কারের গ্রন্থি অনেক শিথিল হবে, ধর্মীয় আচারের প্রভাবে উদ্ভূত শ্রেণীবিদ্বেষ অনেক কমবে। ব্রহ্মদেশের প্রতিবেশী পাকিস্তানও যে একদিন ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্রের অসারতা উপলব্ধি করতে পারবে না এমন নৈরাশ্যবাদী আমি নই। হয়ত স্বাভাবিকভাবেই সর্বকিছু পরিবর্তিত হবে। কিন্তু আমার খারাপ লাগে তখনি যখন সত্যকে গোপন করবার প্রচেষ্টা দেখি। এটাকে স্বাভাবিক বলে মেনে নিতে কষ্ট হয়। এ প্রবন্ধের অবাঞ্ছিত সত্য হয়ত অনেককেই পীড়া দেবে, তবুও তা সত্য বলে পাঠকের অনুভূতির দুয়ার উন্মুক্ত রাখবে।

এবার পূর্ব পাকিস্তান থেকে আসবার সময় একটি জিনিস আমি লক্ষ্য করেছি, যা অন্যান্যবার আমার পক্ষে সম্ভব হয় নি। কেন না প্রায়শই আমি গেছি রেলযোগে, ফিরে এসেছিও ঐ একই পথে, এবারের মতো পদব্রজে সীমান্ত অতিক্রম করতে হয় নি। দেখেছি পূর্ব পাকিস্তানের অভ্যন্তরে সীমান্ত থেকে পাঁচ মাইলের মধ্যে হিন্দু-বসতি একপ্রকার নেই বললেই চলে। কেমন করে এটা হলো? হয় তারা ইচ্ছাকৃতভাবে অথবা অনিচ্ছাকৃতভাবে ভারতের মধ্যে চলে এসেছে—না হয় তাদের সীমান্ত অঞ্চল থেকে interior region-এ সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। মোটের উপর স্বরাষ্ট্রবিভাগ তাদেরকে সীমান্তে বাস করতে দেওয়া বিজ্ঞোচিত বলে মনে করেন নি। আপাতদৃষ্টিতে এর একটা নীতিগত দিক আবিষ্কার করা কঠিন নয়—কিন্তু আসল কারণ সম্ভবত একটু গভীরে। গত ১৯৬৪ সালের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময় আমরা পশ্চিমবঙ্গের (বামনগাছি) মধ্যে পাকিস্তানী 'কওমী নিশান' উড়তে দেখেছি, শুনেছে

পেয়েছি স্লোগান—'পাকিস্তান জিন্দাবাদ।' সীমান্ত অঞ্চল বামনগাছিতে মুসলমান না থাকলে হয়ত এটা সম্ভব হতো না। ভারতীয় সীমান্তের শেষ অবধি আমি মুসলমান বসতি দেখে এসেছি। ভারতীয়দের কাছে এর কোন প্রতিক্রিয়া নেই—কারণ সেই সনাতন অহিংসা ও ধর্মনিরপেক্ষতা। কিন্তু পাকিস্তানের এসব ব্যাপারে কোন অবাস্তব নীতি নেই, কোন নীতিকেই তারা fancy করে তোলে না। শুধু দাঙ্গার সময়ে যেখানে বিদেশী পতাকা উড়তে পারে—যুদ্ধকালীন অনুকূল প্রতিবেশে সেখানে আরো বেশি কিছু হওয়া সম্ভব। এদিক দিয়ে পাকিস্তান অনেক বেশি বাস্তবধর্মী। সীমান্তে হিন্দুবসতি না রাখার এটাই হয়ত আসল কারণ। পাকিস্তানের অনেক স্থানে আমি এবার অনেকগুলি শূন্য ট্র্যানসিট ক্যাম্প দেখতে পেয়েছি। শ্রীযুত প্রভাসচন্দ্র লাহিড়ীর এই সম্পর্কিত বক্তব্য তাই বোধহয় সর্বৈব সত্য নয়। আমার মনে হয় পাক সরকারের ধারণা—ভারত থেকে প্রচুর উদ্বাস্তু (মুসলিম) পাকিস্তানে চলে যাবে। তাই স্থানে স্থানে এই সকল ক্যাম্পগুলি করে রাখা হয়েছে। কিন্তু হায়। সেখানে বাস্তুহারা মুসলমানদের পরিবর্তে ঝিঁঝিপোকা, মাকড়সা আর ভেকেদের অবাধ বিচরণ চলছে। পক্ষান্তরে পূর্ব পাকিস্তান হতে আগত উদ্বাস্তু বলতেই সাধারণভাবে যে চিত্র আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে তা হলো—রেলওয়ে প্লাটফর্ম অথবা স্টেশন-সংলগ্ন প্রাঙ্গণ কিংবা ফুটপাথে শতচ্ছিন্ন ন্যাকড়া সম্বল করে শায়িত একপ্রকার জীব, যাদের চারপাশে রুগ্ন কংকালসার বংশধরদের কাঠামো আর মাটির তৈরি দুটো-একটা হাঁড়ি-বাসন।

সর্বশেষে সাহিত্য ও সংস্কৃতি প্রসঙ্গে দুই-একটি কথা বলে বর্তমান প্রবন্ধের সমাপ্তি টানবো। পূর্ব পাকিস্তানের ভাষা-আন্দোলন এবং সেই শহীদ সালাম-বরকতের আত্মোৎসর্গ নিঃসন্দেহে এক গৌরবময় ইতিহাস সৃষ্টি করেছে। ঢাকায় বাংলা ভাষার সেবা ও উন্নতিকল্পে বাংলা একাডেমীর সৃষ্টি আর একটি গৌরবময় পদক্ষেপ। তবুও সে দেশের সাহিত্যে কেমন করে ব্যাপকভাবে আরবী-ফার্সী-উর্দু শব্দের অনুপ্রবেশ বাংলা ভাষার শ্লীলতাহানি করছে সে নিদর্শন দেখাতে গেলে একদিকে যেমন বর্তমান প্রবন্ধ দীর্ঘ হয়ে যাবে, অন্যদিকে সেটা অপ্রাসঙ্গিক হয়ে দাঁড়াবে। সময় ও সুযোগ পেলে ভিন্ন প্রবন্ধে সেই অশ্লীলতার ইতিহাস রচনা করবো। তবে একথা সত্য যে, পূর্ব পাকিস্তানের সাহিত্যিকগোষ্ঠী এখন দুইটি শিবিরে বিভক্ত। একদল বাংলা ভাষার সুষ্ঠু মর্যাদা রক্ষা করে সাহিত্য সৃষ্টির পক্ষপাতী। কিন্তু গরিষ্ঠ দলই এর প্রতিপক্ষে। তাঁদের ধারণা পাকিস্তানের সাহিত্য হবে ইসলামী সাহিত্য এবং তাতে ইসলামিক শব্দ প্রয়োগ অনিবার্য। এই প্রসঙ্গে ঢাকা থেকে প্রকাশিত গত ১৪ই আগস্ট ১৯৬৭ (স্বাধীনতা সংখ্যা), 'জনতা' পত্রিকায় প্রকাশিত মোঃ মখদুম-ই-মুলক মাশরাফীর 'আমাদের সাহিত্য ও সাহিত্যিক' শীর্ষক প্রবন্ধ হতে কিছু অংশ উদ্ধার করা যাক—"সাহিত্য সৃষ্টিতে নিয়োজিত হয়ে কেউ কেউ ভাবছেন তার সাহিত্যটা ইসলামী পরিবেশ ও প্রতিবেশ, ইসলামী নীতি ও আদর্শ, ইসলামী জীবনব্যবস্থা ও নির্দেশ অনুযায়ী হওয়া দরকার। এবং সে অনুযায়ী কলমও চালিয়ে যাচ্ছেন। এঁদের অনেকে সুন্দরের সন্নিকট হলেও অধিকাংশই উগ্রতাকে প্রশ্রয় দিচ্ছেন। কখনও বা প্রাসঙ্গিকতাকে লঙ্ঘনে, কখনও বা স্বেচ্ছাকৃত অপরিচিত শব্দ প্রয়োগ প্রচেষ্টায় এ উগ্রতা প্রকট হয়ে উঠছে। ফলে স্বতঃস্ফূর্ত ঝর্ণাধারার মত তা পাঠকমনে স্নিগ্ধ অনুভূতির সৃষ্টি করতে ব্যর্থ হচ্ছে। তা পাঠ করে পাঠকের মনে তৃপ্তি জন্মাচ্ছে না, বরং জন্ম নিচ্ছে বিরূপ প্রশ্ন। এ প্রশ্ন যতই বাড়ছে, পরিবেশ ততই বিষাক্ত হচ্ছে। দ্বিধান্বিত পাঠক তাই অনেক সময় বিরক্ত হয়ে পঠনই পরিত্যাগ করছে।"

এই হলো সে দেশের সাহিত্যের চেহারা—এই হলো বাংলা একাডেমীর কৃতিত্ব আর এই নিয়েই আমরা 'সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক প্রদর্শনী' করে আহ্লাদিত হই। খাস ঢাকা শহরে কিন্তু কলকাতার সাহিত্য নিয়ে এত মাতামাতি নেই। শুধুমাত্র পাঠকেরা মুখ চেয়ে কিছু কিছু কলকাতার বই সেখানে প্রকাশিত হয়।

আজকের বাংলা ভাষায় তৎসম শব্দের প্রয়োগ অনেক কমে গেছে। তদ্ভব শব্দকে ঝেঁটিয়ে বিদেয় করা কখনোই সম্ভব নয়। তবুও পূর্ব পাকিস্তানের স্বতন্ত্র ইসলামী সাহিত্য সৃষ্টিকারী গোষ্ঠী এই তদ্ভব শব্দসমষ্টিকে 'সংস্কৃত' শব্দ বলে মনে করবার চেষ্টা করছেন কেন? একটি ভাষা নিঃসন্দেহে অন্যান্য ভাষার প্রভাব থেকে মুক্ত হবার চেষ্টা করবে তার স্বকীয় মহিমায় প্রকাশিত হবার জন্য। কিন্ত একটি প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে আর একটি প্রভাবকে স্বীকার করে নেওয়ার মধ্যে তার নিজস্ব বিকাশ ব্যাহত হয় না কি? সংস্কৃতের প্রভাবমুক্ত হয়ে আরবী-ফার্সী-উর্দুর কুক্ষিগত হলেই কি বাংলা ভাষার মঙ্গল হবে? ইসলামী আদর্শ সৃষ্টি করতে কি ভাষার বহিরঙ্গ রূপের পরিবর্তন অপরিহার্য? আদর্শ সৃষ্টি হবে কি ভাষার আক্ষরিক বিন্যাস দিয়ে—না তার অন্তরঙ্গ ভাবের ব্যঞ্জনা দিয়ে? যদি ধরে নেওয়া যায় আক্ষরিক পরিবর্তনেও প্রয়োজন আছে, তবু এ কথাও ত অনস্বীকার্য যে, অন্তত সংস্কৃতের পরোক্ষ প্রভাব থেকে বাংলা ভাষার মুক্ত হওয়া সম্ভব নয়। তবু এই ইসলামীগোষ্ঠী থেকে শুরু করে খোদ গভর্নর সাহেব পর্যন্ত সকলেরই মুখে এক কথা—'সংস্কৃত শব্দ প্রয়োগে বাংলা ভাষার মাধ্যমে ইসলামিক আদর্শ ও ঐতিহ্য প্রতিফলিত হয় না।' (গভর্নর মোনেম খানের বেতার ভাষণ)।

এই আদর্শ ও ঐতিহ্যের (বঙ্গ সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে ইসলামিক ঐতিহ্য বলতে আসলে কি বোঝায় জানি নে) প্রশ্নেই কেমন করে রেডিও পাকিস্তান থেকে রবীন্দ্রসংগীত প্রচার বন্ধ হয়ে গেল এবং এ সম্পর্কে পাক-বেতারমন্ত্রী শ্রীশাহাবুদ্দিনের যুক্তি (?) সকলেরই জানা; অতএব তার পুনরাবৃত্তি অনাবশ্যক।

কিন্তু ১৯৬১ সালে রবীন্দ্রনাথের জন্মশতবার্ষিকী নিয়ে পূর্ব পাকিস্তানে যে অশ্লীল আলোচনা চালিয়েছিল মুসলিম লীগের 'আজাদ', তা যেমন ন্যক্কারজনক তেমনি বিদ্বেষপ্রসূত। আমি তখন খুলনায়। 'আজাদ' পত্রিকার বক্তব্য ছিল—পূর্ব পাকিস্তানে রবীন্দ্র-জন্মশতবার্ষিকী পালন করার কোন অর্থ নেই, রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে মাতামাতি করবারও কোন যৌক্তিকতা নেই; কারণ তিনি ছিলেন হিন্দুকবি—স্বভাবতই মুসলমানদের স্থান তাঁর সাহিত্যে ছিল না ইত্যাদি ইত্যাদি। এই অদ্ভুত যুক্তির বিপক্ষে সেদিন প্রথম যিনি কলম চালিয়েছিলেন, তিনি হলেন 'ইত্তেফাক' পত্রিকার সম্পাদক শ্রীতোফাজ্জেল হোসেন (যতদূর জানি আজও তিনি জেলে এবং তাঁর 'ইত্তেফাক' আয়ুব সরকার কর্তৃক নিষিদ্ধ)। নানা যুক্তিতর্কের মধ্য দিয়ে তিনি এটাই প্রমাণ করেছিলেন যে, যে কবি (মনে রাখতে হবে তিনি 'বিশ্বকবি') 'শাজাহান'-এর মতো কবিতা রচনা করতে পারেন, তিনি যে মুসলমানদের স্থান তাঁর কাব্যে দেন নি—এ ধারণা হয় ভ্রান্ত, না হয় বিদ্বেষপ্রসূত। 'শাজাহান'-এর মতো কবিতা রচনা কি ভারতবর্ষের কোন মুসলমান কবির দ্বারা সম্ভব হয়েছে? সে বছর যে বিক্ষিপ্তভাবে রবীন্দ্র-জন্মশতবার্ষিকী পালিত হয়েছিল তার জন্য যে তোফাজ্জেল হোসেনের এই যুক্তিপূর্ণ প্রগতিশীল লেখনী অনেকাংশে দায়ী এ কথা অত্যুক্তি নয়। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য যে সে দেশে তোফাজ্জেল হোসেনদের সংখ্যা খুবই সীমাবদ্ধ।

রক্তের অক্ষরে লেখা

দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

মায়ের কোলে শিশুর মুখে যে ভাষায় মা মা বুলি ফোটে তাকেই বলে মাতৃভাষা। মাতৃস্তন্যে শিশুর দেহ যেমন পুষ্ট হয়ে দিনদিন বাড়তে থাকে, তেমনি মাতৃভাষায় কথা বলতে শিখে শিশুর মনের বিকাশ ঘটে। সুতরাং মাতৃভাষা মানুষের জন্মগত অধিকার। সেই অধিকারে কেউ আঘাত হানলে পাল্টা আঘাতে তাকে পযুদস্ত হতে হবেই। মায়ের অবমাননা কোনো সন্তানই সহ্য করতে পারে না। পূর্ব পাকিস্তানে এমন ঘটনাই ঘটেছে। লীগ সরকার যেদিন বাংলা ভাষাকে হটিয়ে দিয়ে তার জায়গায় একমাত্র উর্দু ভাষাকে রাজকীয় সম্মানে প্রতিষ্ঠিত করতে উদ্যত হলেন, সেদিন পূর্ববঙ্গের বাঙালী মুসলমান-সমাজ গর্জে উঠলো—রুখে দাঁড়ালো সেখানকার ছাত্রসমাজ—মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষার জন্যে তারা প্রাণ দেবে। দিলেও তারা প্রাণ। ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারী ঢাকায় ছাত্রশোণিতে রাজপথ পিচ্ছিল হয়ে গেল। ইতিহাসের পাতায় পড়লো একটি স্বর্ণস্বাক্ষর। তাই ২১শে ফেব্রুয়ারী শুধু পূর্ব পাকিস্তানেরই নয়, দুই বাংলারই, গোটা বাঙালী জাতিরই একটি গৌরবদীপ্ত স্মরণীয় দিন। পূর্ব-বঙ্গের ছাত্রসমাজ মাতৃভাষার বেদীমূলে শহীদ হয়ে পুণ্য কোরবানির দ্বারা সমস্ত বাঙালী জাতিরই মুখোজ্জ্বল করেছেন। আমরা, বাংলাভাষীরা, বাংলা সাহিত্যের সেবকরা নতজানু হয়ে নতশিরে স্মরণ করি সেই অমর শহীদবৃন্দকে।

পূর্ববঙ্গের ছাত্রসমাজের সেই বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামের স্মৃতি আজো আমাদের চিত্তপটে এতটা উজ্জ্বল যে, মনে হয় এই তো সেদিনের ঘটনা। শাসনকার্যে, বৈষয়িক ক্ষেত্রে লীগ সরকারের বৈষম্যমূলক নীতি যখন পূর্ব পাকিস্তানের সাধারণ মানুষকে ক্ষুব্ধ করে তুলেছে, তখনি এলো তাদের মাতৃভাষার ওপর আঘাত। গোড়া থেকেই বাংলা ভাষার প্রতি লীগ সরকারের তীব্র অবজ্ঞার ভাব ছিল। তারপর বেসিক প্রিন্সিপলস্ কমিটী, অর্থাৎ মৌল নীতি নির্ধারক কমিটী যেদিন ঘোষণা করলো যে, পাকিস্তানে উর্দুই হবে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা সেদিন বাঙালীর মনে আগুন জ্বললো। খাজা নাজিমুদ্দিন সাহেব বেসিক প্রিন্সিপলস কমিটীর সিদ্ধান্ত সমর্থন করলেন। দাবাগ্নির মতো রোষবহ্নি জ্বলে উঠলো ঢাকার ছাত্রসমাজে। ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারী ছাত্ররা বার করলো বিক্ষোভ মিছিল, ডাকলো প্রতিবাদ-সভা। লাঠি চালিয়ে তাদের ছত্রভঙ্গ করার চেষ্টা করলো পুলিশ। কিন্তু ছাত্ররা নির্ভীক, অনড়, দৃঢ়সংকল্প। প্রাণ দেবে তবু মাতৃভাষার অবমাননা সহ্য করবে না। পুলিশ দেখে ভয় পেলো না একটুও, লাঠিকে করলো অগ্রাহ্য, উন্নত-বক্ষে দৃঢ়পদক্ষেপে সামনের দিকে এগিয়ে চললো ছাত্ররা। পুলিশ রাইফেলের মুখ সামনের দিকে তুলে ধরলো ছাত্রদের দিকে। না, তাতেও দমবার নয়, অকুতোভয় ছাত্ররা। তারপর চললো গুলী। ২৬ জন প্রাণ হারালো সেই গুলীতে আর আহত হলো প্রায় ৪০০ জন। বুকের খুনে রক্ততিলক এঁকে দিল মাতৃভাষার ললাটে বীর শহীদবৃন্দ। সেখানেই শুরু হলো পূর্ববঙ্গে লীগ শাসনের কবর খনন।

এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডের ফলে পূর্ব পাকিস্তানের সর্বত্র যুবক ও ছাত্রসমাজের মধ্যে দেখা দিল প্রবল আলোড়ন। তারা শপথ নিল, প্রাণ থাকতে মাতৃভাষা বাংলার অমর্যাদা তারা হতে দেবে না। আরম্ভ হলো প্রতিরোধ আন্দোলন। ঢাকা থেকে একদিকে চট্টগ্রাম ও অন্যদিকে রাজসাহী পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়লো অসন্তোষ আর বিক্ষোভের আগুন। অবস্থা সঙ্গীন দেখে পূর্ব পাকিস্তানের বিধানসভা কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ জানিয়ে এক প্রস্তাব গ্রহণ করলো যে, বাংলাকেও রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দেওয়া হোক। ১৯৫২ সালের এপ্রিলে পাক গণপরিষদে এ নিয়ে আলোচনা হলো বটে, কিন্তু কোনো সিদ্ধান্ত হলো না। কেন্দ্রের লীগ সরকারের এই মনোভাবে পূর্ববঙ্গের মুসলমান তরুণসমাজ দিনদিন আরো জেহাদী হয়ে উঠতে লাগলেন—বুকের রক্ত দিয়েও মাতৃভাষাকে তাঁরা রক্ষা করবেনই।

১৯৫৪ সালের গোড়ার দিকে পূর্ব পাকিস্তানে জন্ম নেয় লীগবিরোধী এক সংযুক্ত মোর্চা। শহীদ দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে সেই সর্বদলীয় মোর্চার প্রথম আত্মপ্রকাশ ঘটে। ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি ঢাকায় যে ২৬ জন ছাত্র মাতৃভাষার জন্যে লীগ সরকারের পুলিশের গুলীতে প্রাণ বিসর্জন দেন তাঁদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের উদ্দেশ্যেই ১৯৫৪ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি শহীদ দিবস উদ্‌যাপনের আয়োজন করা হয়। সেই দিনটিতে ঢাকায় এক মহতী জনসভায় সহস্র সহস্র মানুষ জমায়েত হয়ে শহীদবৃন্দের প্রতি শ্রদ্ধার অর্ঘ্য অর্পণ করে। সারা রাজ্যের বিভিন্ন শহরে কৃষ্ণপতাকা নিয়ে বিক্ষোভ মিছিল বার করে অজস্র মানুষ। শহীদ দিবস উদ্‌যাপনের মধ্য দিয়েই বিভিন্ন রাজনৈতিক দল লীগ শাসনের অবসান ঘটাবার অঙ্গীকারে আবদ্ধ হয়।

তারপর ১৯৫৪ সালের সাধারণ নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তানে মুসলিম লীগের কী শোচনীয় দশা হয়েছিল তা লিখিত আছে ইতিহাসের পাতায়। কিন্তু ভাষা আন্দোলন পূর্ববঙ্গের সাধারণ জীবনে যে কী অভূতপূর্ব উদ্দীপনা এনে দিয়েছিল এবং সেই নির্বাচনে যে কতখানি প্রভাব বিস্তার করেছিল, বিচ্ছিন্নতার দরুণ তা সম্যক অবগত হবার সুযোগ আমাদের হয় নি। তবু যেটুকু খবর আমাদের এ প্রান্তে এসে পৌঁছেছিল তাতেও আমরা কম বিস্মিত হই নি। পূর্ববঙ্গের প্রতিটি বাঙালী কবি সেদিন তাঁর লেখনীকে করেছিলেন সেই নির্বাচন সংগ্রামের তীক্ষ্ণ হাতিয়ার; প্রতিটি গায়কের কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছিল জনতার জয়গান; প্রতিটি চিত্রকরের তুলিকায় ফুটে উঠেছিল জনজাগরণের প্রতিচ্ছবি। শহরে, বন্দরে, জলে, স্থলে, হাটে, বাজারে, পথে, ঘাটে, জনপদে জনপদে সে এক নতুন প্রাণবন্যা। পূর্ববঙ্গের বাঙালী-সমাজ যেন নতুন করে চিনলো নিজের দেশকে, নিজের মাতৃভাষাকে, নিজের শিল্পসাহিত্যকে, বাঙালীর আপন সংস্কৃতিকে। বেশ-ভূষায়, আচার-ব্যবহারে, কথাবার্তায় হয়ে উঠলো তারা খাঁটি বাঙালী। যেন নববস্ত্র পরিধান করে নবজীবন লাভ করলো তারা।

এই প্রাণবন্যাই মাঝে মাঝে পূর্ববঙ্গে উত্তাল হয়ে উঠতে থাকে। তাকে স্তব্ধ করার জন্যে শাসকপক্ষের কত চেষ্টা! কিন্তু বাঙালী মুসলমানসমাজ তাদের ভাষার দাবিতে অটল। অন্যান্য গণতান্ত্রিক দাবির সঙ্গে ভাষার দাবিতেও আন্দোলন চলতেই থাকে। কেবল আন্দোলন করেই তারা ক্ষান্ত হয় না, বাংলা ভাষাকে, বাংলা সাহিত্যকে পুষ্ট করার দিকেও তারা মন দেয়। বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, নজরুলের ঐতিহ্যকে তারা শ্রদ্ধাভরে গ্রহণ করে। মুসলমান রাজত্বের সময় হিন্দু-মুসলিমের সমবেত চেষ্টায় যে সাহিত্য, শিল্পকলা ও

সঙ্গীতের সৃষ্টি হয়েছিল তাই বাঙালীর নিজস্ব সাংস্কৃতিক সম্পদ রূপে মহামূল্যবান হয়ে ওঠে তাদের কাছে। হৃত-গৌরব পুনরুদ্ধারে কৃতসংকল্প হয় তারা। কোথায় কোন্ সম্পদ অবহেলিত হয়ে আছে সেদিকে নজর পড়ে তাদের। চলে গবেষণা, অনুসন্ধান, নতুন সৃষ্টির উন্মাদনা। একটি নবজাত শিশু যেন প্রতিপদের চাঁদের মতো ধীরে ধীরে ষোল-কলায় বেড়ে উঠতে লাগলো।

এই নবোত্থিত শক্তির দাবি ঠেকিয়ে রাখা সম্ভব হলো না শেষ পর্যন্ত। পাকিস্তানের শাসকবর্গ নতিস্বীকারে বাধ্য হলেন। ১৯৫৬ সালে যে সংবিধান প্রবর্তিত হলো তাতে বাংলা ভাষা উর্দুর সমমর্যাদা পেল, অর্থাৎ বাংলাও পেল রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা। শহীদরা শোণিত দিয়ে বঙ্গভাষাজননীর ললাটে যে তিলক এ'কে দিয়েছিলেন তাই পরিণত হলো জয়টীকায়।

কিন্তু পাকিস্তানের প্রতিক্রিয়াশীল শাসকদের মাথা থেকে শয়তানী বুদ্ধি কিছুতেই যায় না। দুষ্ট সরস্বতীর মতো সেটা এসে মাঝে মাঝে তাঁদের ঘাড়ে চাপে। তাই গত বছরের মাঝামাঝি সময়ে পাকিস্তানের প্রচারমন্ত্রী খাজা শাহাবুদ্দিন সাহেব রবীন্দ্রসঙ্গীতের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে বসলেন। রাওয়ালপিন্ডিতে পাক কেন্দ্রীয় আইনসভায় তিনি ঘোষণা করলেন যে, অতঃপর পাক বেতারে আর রবীন্দ্রসঙ্গীত প্রচারিত হবে না। কারণ, রবীন্দ্রসঙ্গীত নাকি পাক-সংস্কৃতির বিরোধী।

পূর্ব পাকিস্তানে যখন তাঁর এই ঘোষণা নিয়ে তুমুল বাদবিতণ্ডার সৃষ্টি হলো এবং প্রতিবাদের ঝড় উঠলো, তখন তিনি আমতা আমতা করে বললেন যে, রবীন্দ্রসঙ্গীতের বেতারপ্রচার তিনি নিষিদ্ধ করেন নি, শুধু যে সব গান পাক-সংস্কৃতির বিরোধী বলে বিবেচিত হবে সেগুলো প্রচার না করার কথাই তিনি বলেছেন।

পাকিস্তানী শাসকবর্গের সঙ্গে পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালী মুসলিমসমাজের এখানেই তো আসল বিরোধ। পূর্ববাংলার মুসলমানরা বিশ্বাস করে না যে পাক-সংস্কৃতি বলে আলাদা কিছু আছে। তারাও বাঙালী এবং বাংলার সংস্কৃতিই তাদেরও সংস্কৃতি। রবীন্দ্রনাথে বাঙালী জাতির সমান অধিকার—যেমন পশ্চিমবঙ্গে তেমনি পূর্ববঙ্গে। পাক-সংস্কৃতির নামে যা দাঁড় করাবার চেষ্টা হচ্ছে তা কৃত্রিম—দেশের জলবায়ুর সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই। তাছাড়া পূর্ববাংলার মুসলমানরা এও জানে যে পাক-সংস্কৃতির নামে আসলে পশ্চিম-পাকিস্তানের হালচাল ও ভাষাকে পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালী মুসলমানসমাজের ওপর চাপিয়ে দেয়ার ষড়যন্ত্র ছাড়া এটা আর কিছু নয়।

পেচকস্বভাব খাজা সাহেবের চোখে রবিদীপ্তি অসহ্য হলেও পূর্ব পাকিস্তানের সাধারণ মানুষ কিন্তু প্রতি প্রভাতেই রবি-কিরণস্নাত হয়ে নবজীবন লাভ করতে চায়। না হলে এই সেদিন ঢাকায় একটি প্রদর্শনীতে রবীন্দ্রনাথের সঞ্চয়িতা কেনার জন্যে হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে নরনারীর ভিড় পড়ে যাবে কেন এবং প্রদর্শনী খোলার সঙ্গে সঙ্গেই অল্প সময়ের মধ্যে কয়েক হাজার বই কর্পূরের মতো উবেই বা যাবে কেন?

রবীন্দ্রনাথ বিশ্ববন্দিত কবি হলেও বাঙালীর নিজস্ব প্রাণের কবি। রবীন্দ্র-নাথের সাহিত্য ও সঙ্গীতকে বাদ দিয়ে বাংলা ও বাঙালীর সংস্কৃতির কথা ভাবা যায় না। পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালী মুসলিমসমাজ তাঁদের বাঙালীত্ব ও জাতীয় সংস্কৃতি সম্বন্ধে খুবই সচেতন। রাজনৈতিক কারণে ভৌগোলিক সীমা নির্ধারিত হলেও তাঁরা অখণ্ড বাংলার সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারী বলেই নিজেদের মনে করেন। সেই স্বাভাবিক বোধ থেকেই রবীন্দ্রনাথও তাঁদের প্রাণের কবি। যে ভাষায় তাঁরা কথা বলেন সে ভাষায় সুন্দর করে মনের ভাব প্রকাশ করতে শিখিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। তাই পূর্ব পাকিস্তানে সম্প্রতি রবীন্দ্রনাথকে জানবার ও বুঝবার জন্যে নতুন আগ্রহ জেগেছে আর সেই আগ্রহ দেখেই আতঙ্কিত হয়ে সম্ভবত খাজা সাহেব এই খাজাবুদ্ধির পরিচয় দেন।

শুধু রবীন্দ্রনাথ কেন, দুই বাংলার যে কোনো সাহিত্যসেবীই বাঙালী জাতির কাছে শ্রদ্ধার পাত্র ও নমস্য ব্যক্তি। পূর্ব পাকিস্তানে আজ যাঁরা সাহিত্যচর্চা করছেন ও বাংলাভাষার সাহিত্যসম্ভার বাড়াচ্ছেন, পশ্চিমবঙ্গের সাহিত্যিকদের তুলনায় তাঁদের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা কি কিছু কম? বরং তাঁদের আন্তরিকতা দেখে, নতুন সংগ্রামী জীবনবোধের পরিচয় পেয়ে আমরা বিস্মিতই হই। দুর্ভাগ্যের বিষয় উভয় বাংলার মধ্যে সাহিত্য ও সংস্কৃতির আদানপ্রদানের সহজ পথ উন্মুক্ত না থাকায় পূর্ব পাকিস্তানের আধুনিক বাঙালী লেখকদের অনেক রচনার সঙ্গেই আমাদের সাক্ষাৎ পরিচয় ঘটে না। তেমনি পশ্চিম-বঙ্গের আধুনিক সাহিত্যের সঙ্গে তাঁদেরও তেমন পরিচয় ঘটবার পথে অন্তরায় আছে। কিন্তু আজ উভয় দিকেরই উভয় দিককে জানবার আগ্রহ যে অত্যন্ত বেশি একথা দিবালোকের মতোই স্পষ্ট।

পূর্ব পাকিস্তানে মাতৃভাষার উন্নতির জন্যে বাংলাসাহিত্য আকাদেমি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সেখানে নানান বিষয়ে যে ধরণের গবেষণা চলেছে, নব বাংলা অভিধান রচনার যে প্রয়াস চলেছে, বলতে গেলে তা আমাদের পক্ষে ঈর্ষার বস্তু। বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষা শিক্ষার বাহনরূপে স্বীকৃত হয়েছে। এক কথায় বলা যায়, পূর্ব পাকিস্তানে মাতৃভাষার সেবায় মুসলিম ভাইরা আমাদের চেয়ে এগিয়ে চলেছেন।

এই নবজাগরণ দেখেই হয়তো পাক-শাসকবর্গ মাঝে মাঝে বিচলিত হয়ে পড়েন এবং 'পাক-সংস্কৃতি গেল গেল' রব তোলেন। রাজনৈতিক অন্ধতাকে দূরে করে সুস্থ শিল্প ও সাহিত্য। যে সাম্প্রদায়িক অন্ধতাকে মূলধন করে পাকিস্তানের সৃষ্টি ও আজকের শাসন, সুস্থ শিল্প-সাহিত্য চিন্তায় সেই অন্ধতা দূরীভূত হয়ে পাছে মানুষের মনে প্রকৃত চেতনা ও কল্যাণবোধ আসে, এই তাঁদের ভয়। ভারত-সংস্কৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন ঐস্লামিক সংস্কৃতি সম্পর্কে তাঁদের থিওরি বা তত্ত্ব বানচাল হয়ে যেতে পারে এই আশঙ্কায়ই পূর্ববঙ্গে মুসলিম-সমাজের বাঙালীয়ানা, ভাষাপ্রেম, সাহিত্য-প্রীতি তাঁদের চক্ষুঃশূল। কিন্তু বাংলার আউল-বাউল-ফকির, শাক্ত-বৈষ্ণব-ইসলাম, দরাদিয়া-সত্যজিয়া এবং পরবর্তীকালে রামমোহন-বিদ্যাসাগর থেকে আরম্ভ করে রবীন্দ্রনাথ-নজরুলের আধুনিক বিজ্ঞান-চিন্তাসম্মত শিল্পকলা ও সাহিত্যেই যে বাঙালীচিত্ত বিকশিত এবং এটাই যে বাঙালীর প্রকৃত সংস্কৃতি, পাকপ্রভুরা তা স্বীকার করতে না চাইলেও পূর্ব পাকি-স্তানের বাঙালী মুসলমানসমাজ তা মনেপ্রাণেই স্বীকার করেন এবং সেই পথ ধরেই নিজেদের আত্মবিকাশে তাঁরা উন্মুখ। গঙ্গার ধারা গঙ্গোত্রীর দিকে যায় না, যায় সাগরের দিকে।

রিস্ট ওয়াচ

মাত্র ৬৲ টাকায়

আমাদের চেন পদ্ধতি স্কীমের মাধ্যমে মাত্র ৬৲ টাকায় ৫ বৎসরের গ্যারান্টী সমেত ৫ জুয়েল্স রিস্ট-ওয়াচ লাভ করুন। ডাকমাশুল ১৲১৫ টাকা অতিরিক্ত। দ্রষ্টব্য : আমাদের মধু-চন্দ্রিমা সেণ্টের বিক্রয় বৃদ্ধির জন্যই এই স্কীম চালু করা হইল। পছন্দ না হইলে মূল্য ফেরৎ।

SWISS WATCH
TRADING CO.
P. B. 87, (WBC) Jullundur
City.

আমি সায়গনে গিয়েছিলাম তিন বছর আগে।

সায়গন। ফরাসীরা বলত এই শহর হচ্ছে প্রাচ্য দুনিয়ার প্যারিস। স্থানীয় লোকেরা বলতে ভালোবাসে প্রাচ্যের মুক্তা।

আমার ভিয়েৎনামী সাংবাদিক বন্ধু লে ভান বিয়াও সানফ্রান্সিসকো ছাড়ার পর থেকে আমাকে সেই কথাই বুঝিয়ে আসছিল। "সায়গন! আঃ সায়গন! সায়গন দেখলে তুমি আর সেখান থেকে আসতেই চাইবে না।"

কিন্তু সে কথা ভাববার মত মনের অবকাশ আমার তখন ছিল না। তিন বছর আগের একটি রৌদ্র-দগ্ধ গ্রীষ্মের দিনে আমার বিমান যখন তান-সন-নুট বিমানবন্দরের ওপর এসে নিচে নামবার জন্যে ঘুরপাক খাচ্ছিল তখন আমার কেবলই মনে হচ্ছিল আমি যেন কোন ঝড়ের কেন্দ্রে প্রবেশ করতে যাচ্ছি।

সাধারণত বিমান নামবার আগে যে-রকমের পাঁয়তারা কষে এই ঘুরপাক ঠিক সেইরকমের ছিল না। আকাশে অনেকগুলি ছোট ছোট অলক্ষ্য বৃত্ত এঁকে অনেকটা সোজাসুজিভাবে নেমে আসছিল বিমানটি।

"ভদ্রমহোদয় ও মহোদয়াগণ!" আমি যখন আমার আসনে খাড়া হয়ে বসে ভাবছিলাম কি ব্যাপার, তখনই ককপিট থেকে জনৈকা বিমান-সেবিকার গলা ভেসে এলো : "তান-সন-নুট আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের আশেপাশে ভিয়েৎ কং গেরিলাদের আক্রমণের সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে, আর সেই জন্যেই সতর্কতার জন্যে আমাদের প্রায় সোজাসুজি নামতে হচ্ছে। কারণ আকাশে বেশি সময় থাকা নিরাপদ নয়।"

জানালা দিয়ে বাইরে তাকালাম। একটু যে ভয় ভয় করছিল না তা নয়। নিচে বিমানবন্দরের চারপাশে শান্ত স্নিগ্ধ-বনাঞ্চল স্বপ্নের মতো বিছিয়ে ছিল। ঐ জংগলের মধ্যে কোথায় লুকিয়ে আছে গেরিলারা কে জানে? কখন তাদের বিমানধ্বংসী কামান গর্জে উঠবে কে বলতে পারে?

চক্ষুকে উৎকণ্ঠিত এবং কর্ণকে উৎকর্ণ করার মতো আরো কারণ ছিল। তান-সন-নুট বিমানবন্দর ঠিক সাধারণ বিমানবন্দরের মত ছিল না। বিরাট এই বিমানবন্দর শুধু বিমানের বন্দরই নয়, বিমানের ঘাঁটিও। সর্বত্র রাইফেলধারী সামরিক পুলিশের আনাগোনা। জংগী বিমানের গাদাগাদি। অগণিত হেলিকপ্টার ওঠা-নামা করছে। সর্বত্র একটা ব্যস্ততা ও ত্রস্ততার ভাব। আমার মনে আছে ঐ সব দেখে আমি ভাবছিলাম মাটিতে নামার সংগে সংগেই আমরা বুঝি সরাসরি যুদ্ধের খপ্পরে গিয়ে পড়ব।

কেন জানি না, প্লেনের দরজা থেকে চারদিকে তাকিয়ে তান-সন-নুট বিমানবন্দরকে আর ততটা ভয়াবহ মনে হয় নি। রাইফেলধারী পুলিশ আর স্কাইরেডার বিমানগুলিও হঠাৎ যেন চোখের সামনে থেকে কোথায় সরে গেল। একটা অগোছালো ভিড়ের মধ্যে আমি মিশে গেলাম। একটা যুদ্ধরত জাতির যে চিত্র আমি মনে মনে কল্পনা করে রেখেছিলাম ঐ ভিড়ের সংগে তার বিরাট অমিল ছিল। দেখলাম চারদিকে সবাই ব্যস্ত, কিন্তু বিশৃংখলভাবে ব্যস্ত। আমার ধারণা ছিল বুঝি পদে পদে পরিচয়পত্র দেখিয়ে এগোতে হবে। তা কিছুই করতে হল না। ভেবেছিলাম, কাস্টমসের চেকিং নিয়ে বুঝি খুব কড়াকড়ি করা হবে। আমার ব্যাগেজ কেউ খুলেও দেখল না। মিনিট পনেরোর মধ্যে আমি বিমানবন্দরের বাইরে। রাস্তায় লোকের ভিড় নিয়ন্ত্রণহীন। জীর্ণ রেনো ট্যাক্সি আর পেডিক্যাবগুলি যাত্রীর অপেক্ষা করছে। আমার সামনে সায়গন।

সায়গন! ঝড়ের কেন্দ্র!

হ্যাঁ, ঝড়েরই কেন্দ্র। আমি আগে ভাবতেই পারি নি সায়গন সম্পর্কে এই উপমা এত চমৎকারভাবে খেটে যাবে। আমার মনে আছে আমি যে গাড়িতে করে শহরে গিয়েছিলাম তার জানালাগুলি ছিল মোটা মোটা তারের জাল দিয়ে আটকানো। এই সতর্কতা, আমাকে বলা হয়েছিল, ভিয়েত কংদের অতর্কিত আক্রমণের বিরুদ্ধে। ডাউনটাউন সায়গনে ট্রুয়ং কং দিন স্ট্রীটে হোটেলে মাইলোয়ান নামে যে হোটেলে আমাকে তোলা হয়েছিল, দেখেছিলাম তার সামনে ছিল কাঁটাতারের বেড়া, দরজায় ছিল রাইফেলধারী প্রহরী। হোটেলের কাছেই ছিল সায়গনের রেল স্টেশন যেখান থেকে হ্যানয় পর্যন্ত একটি লাইন গিয়েছে। ঐ লাইন অনেকদিন হল বন্ধ। তারই অদূরে সায়গনের একটি বড় থানা। তার সামনের ফুটপাথ জুড়ে অনেকগুলি আলকাতরার ড্রাম ঠাসাঠাসি কিন্তু এলোমেলো করে সাজানো রয়েছে, যাতে কোন লোক সহজে এবং তাড়াতাড়ি থানার মধ্যে ঢুকতে না পারে। কিন্তু তার বাইরে শহরের কোথাও কোন অস্বাভাবিকত্ব দেখি নি। সব কিছুই ছিল শান্ত, অনুত্তেজিত: যেমন ঝটিকার কেন্দ্র শান্ত ও অনুত্তেজিত থাকে।

একথা বলার অর্থ এই নয় যে, কাঁটাতার কিংবা আলকাতরার ড্রাম কিংবা রাইফেলধারী প্রহরী আমি আর কোথাও দেখি নি। প্রায় দোতলা সমান উঁচু কাঁটাতারের বেড়া দেখেছিলাম দুসংস্থাপত্র-এ ম্যাকভির (মিলিটারী অ্যাসিস্ট্যান্স কম্যান্ড, ভিয়েতনাম) সদর ভবনের চারপাশে। নুয়েন উয়ে অ্যাভিনিউয়ে মার্কিন তথ্য দপ্তরের সামনে কাঁচের বড় বড় জানালাগুলি ইঁট দিয়ে গেঁথে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। মার্কিন দূতাবাস তখন ছিল হাম নি অ্যাভিনিউতে। মাস খানেক আগে গেরিলাদের বোমায় ভবনটি ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। সতর্কতার জন্যে সেখানে অনেকখানি ফুটপাথ ও রাস্তা আলকাতরার ড্রাম ও

মেয়েদের ছোটবেলা থেকেই
ত্বকের যত্ন নিতে শেখান।
তিনি সুন্দরী, তিনি রূপসী!
প্রতিদিনের ত্বক পরিচর্যায় তাঁর এই অপরূপ সৌন্দর্যের
উৎস-সাধনা বিউটি ক্রীম।
সাধনা বিউটি ক্রীম রূপসাধনায় অনন্য
সাধনা ঔষধালয়-ঢাকা
সাধনা ঔষধালয় রোড, সাধনানগর, কলিকাতা-৪৮
অধ্যক্ষ যোগেশ চন্দ্র ঘোষ, এম.এ.
আয়ুর্বেদশাস্ত্রী, এফ.সি.এস. (লণ্ডন)
এম.সি.এস. (আমেরিকা) ভাগলপুর
কলেজের রসায়ন-শাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক
কলিকাতা কেন্দ্র :
ডাঃ নরেশচন্দ্র ঘোষ,
এম.বি.বি.এস. (কলিঃ)
আয়ুর্বেদাচার্য
SADHANA
Beauty
CREAM
সাধনা
বিউটি
ক্রীম

কাঠের বাক্সের দিয়ে ঘিরে রাখা হয়েছে। এবং আমি থাকতে থাকতেই একদিন জোর গুজব শুনলাম সায়গন নদীর ধারে বিখ্যাত টু ডো (আগেকার রু কাতিনাত) রাস্তার ওপর অবস্থিত খানদানী ম্যাজেস্টিক হোটেলের ওপর গেরিলারা চড়াও হবে। দেখতে দেখতে হোটেল প্রায় খালি।

এবং আরও কিছু কিছু দেখেছিলাম। মার্কিন মিলিটারী পুলিশের গাড়ি মাঝে মাঝে রাস্তায় আনাগোনা করছে। সায়গন বন্দরের প্রবেশপথে সান্ত্রীরা বন্দুক উঁচিয়ে চারদিকে লক্ষ্য রাখছে। বিয়েন হোয়ার রাস্তায় সৈন্যরা একটি ব্রীজ পাহারা দিচ্ছে। কিন্তু তার বাইরে সায়গন শহরে যুদ্ধের চিহ্নমাত্র ছিল না। আমার মনেই হয় নি আমি এমন একটি দেশের রাজধানীতে আছি যে-দেশ গত পঁচিশ বছর ধরে প্রায় সমানে যুদ্ধ করে চলেছে।

রাস্তায় লোকের ভিড়ের সঙ্গে দেখতাম যেন রঙের বন্যা বইছে। রঙচঙা 'আও দাই' (গলা থেকে গোড়ালি পর্যন্ত ঢাকা টিউনিক ধরণের পোষাক) পরা ভিয়েতনামী মেয়েরা সায়গনের সেই চওড়া চওড়া গাছে ঢাকা বুলেভার্ডগুলির চেহারাই দিত পাল্টে। ফুটপাথগুলি যেন এক-একটি মেলা। তারই মধ্যে খোলা রেস্তোরাঁয় দিনভর খাওয়া-দাওয়া চলছে। আমার হোটেলের কাছেই সায়গনের সেণ্ট্রাল মার্কেট। কলকাতার নিউ মার্কেটের মত। জম-জমাট। দোকানে দোকানে জিনিস উপচে পড়ছে। বাইরে ফুটপাথের স্টলে, শেয়ালদার হকার্স কর্নারের মত, মার্কিন ও ফরাসী জামার কাপড়, স্যুটের কাপড় বিক্রি হচ্ছে জলের দরে। পেছনে ফলের ঝাঁপিতে থরে থরে ফল সাজানো : আপেল, আঙুর, কলা। বেলা যতই পড়ে আসত, লোকের ভিড় বাড়ত তত বেশি। লোকেরা যেন কোন উৎসবের আনন্দে মেতে উঠেছে। নুয়েন উয়ে অ্যাভিনিউতে বসত ফুলের হাট। এত জমকালো ফুলের বাজার আমি খুব কম দেখেছি। জোড়ায় জোড়ায় ছেলেমেয়েদের দেখতাম তাদের সবচেয়ে ভালো সান্ধ্য পোষাকে সেজে ফুলের পসরা কিনে চলে যেত সায়গন নদীর ধারে যেখানে তাদের নিভৃত আলাপের কোন ব্যাঘাত ঘটত না। তারপর সন্ধ্যের অন্ধকার ঘনিয়ে আসবার সঙ্গেই সায়গন যেন পাগল হয়ে উঠত। নাচ, গান আর হৈ-হুল্লোড়ে উৎসবের ধুম পড়ে যেত যেন। টু ডো'র বার-গুলি ভরে উঠত একে একে। কালমেত স্ট্রীটের বিখ্যাত ভান কান রেস্তোরাঁয় ফ্লোর শো' চলত পুরোদমে। ডাউনটাউন সায়গন যেন গান-বাজনার সমুদ্রে ভাসত। সায়গনের নৈশ জীবন এমনিতেই বিখ্যাত। তার ওপর মার্কিন সৈন্যদের কৃপায় তার জেল্লা এখন আরও বেড়েছে। আমার হোটেলের ঘরে শুয়ে ঘুমের ফাঁকে ফাঁকে অনেক রাত্ত পর্যন্ত আমি তার পরিচয় পেতাম।

এমন কি আমেরিকানদের মধ্যেও যেন যুদ্ধের মেজাজ ছিল না। তারা অবাধে, নিরস্ত্র হয়েই ঘুরে বেড়াত। আমার হোটেলটি ছিল মার্কিন সৈন্যদের একটি আস্তানা। তার ছাদে ছিল একটি নাইট ক্লাব ও রেস্তোরাঁ। যে জি-আই'রা অন্য কোথাও যেত না তারা রাতের অধিকাংশ সময় কাটাতো সেখানেই, হোটেলের বিজ্ঞাপনের ভাষায় "নিরাপদে ও নিশ্চিন্ত আরামে।" সকালে অনেক বেলা পর্যন্ত দেখা যেত ওরা হোটেলেরই কোন না কোন ভিয়েতনামী মেয়ে-কর্মীকে বগল-দাবা করে কফি ও টোস্টের শ্রাদ্ধ করছে। টু ডোতে একদিন ভর দুপুরবেলা দেখি একজন উন্মত্ত জি-আই একটি বার থেকে বেরিয়ে এসে রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে ধেই ধেই করে নাচছে।

*

তিন বছর পরে সায়গনকে আমি আবার দেখছি—খবরের কাগজের পাতায়। আমার আগের দেখা সায়গনের সঙ্গে এই সায়গনের কোন মিল নেই।

সায়গান এখন জ্বলছে। তার আকাশকে আচ্ছন্ন করে ধোঁয়ার কুণ্ডলী উঠছে। রাস্তার উৎসব থেমে গিয়েছে কখন; এখন সেখানে চলছে হাতাহাতি লড়াই। হেলিকপ্টার নামছে। ট্যাঙ্কের ঘর্ঘর শব্দে বাতাস উচ্চকিত। জি-আই'রা বেরিয়ে পড়েছে পাহারায়। নেহাৎ দায়ে না পড়লে কেউ আর রাস্তায় বেরোচ্ছে না। সায়গনেরই বিমান এসে কখন কাঁকে কাঁকে বোমা ছিটিয়ে যাবে কে জানে। নুয়েন উয়ে অ্যাভিনিউতে ফুলের হাট কি সেই-রকমই বসছে? সায়গনের বেতারকেন্দ্র পুড়ে প্রায় ছাই হয়ে গেছে। নতুন মার্কিন দূতাবাসের বাড়িতে গেরিলাদের সঙ্গে ঘরে ঘরে যুদ্ধ চলেছিল। বাড়িঘর পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে। গেরিলারা দরজায় দরজায় ধাক্কা দিয়ে বলে যাচ্ছে : "আমরা জাতীয় মুক্তিফ্রণ্টের লোক, আমরা সায়গনকে মুক্ত করতে এসেছি।" ভান কান রেস্তোরাঁয় গান-বাজনা বন্ধ। কন্টি-নেণ্টাল হোটেলের খোলা চত্বরে বসে সায়গনের চলমান জীবন দেখবার জন্যে আর কেউ অপেক্ষা করে নেই। শহর থেকে দলে দলে লোক চলে যেতে আরম্ভ করেছে অন্যত্র। কড়া সান্ধ্য আইনে শহরের নৈশ কণ্ঠ স্তব্ধ। যে প্যাগোডাগুলিতে তিন বছর আগেও নিরুপদ্রব পুজারতি চলেছে, আজ সেগুলি বিপন্ন মানুষের আশ্রয় শিবিরে, অনেক ক্ষেত্রে গেরিলাদের ঘাঁটিতে পরিণত। তান-সন-নুট বিমানবন্দরকে ঘিরে প্রচণ্ড লড়াই চলেছে। মার্কিন সৈন্যদের থাকবার কয়েকটি বাড়ি আক্রান্ত হয়েছে। "হায়!" জনৈক ভিয়েতনামী ব্যবসায়ী আক্ষেপ করে বলে উঠলেন, "শেষ পর্যন্ত সায়গনও নিরাপদ রইল না।"

যুদ্ধ শেষ পর্যন্ত সায়গনকেও গ্রাস করতে উদ্যত। ঝড় এখন ঝড়ের কেন্দ্রে প্রবেশ করেছে। ভিয়েতনামে এখন ঝড়ের কোন কেন্দ্র নেই। ৩১শে জানুয়ারী গেরিলারা যেদিন সায়গনে প্রকাশ্য আক্রমণ চালালো, সেদিন তারা দেশের সর্বত্র আরও খানত্রিশেক শহরে চড়াও হয়। এ ঝড় এখন সর্বাত্মক।

মাত্র তিন বছরের ব্যবধানে এই পরিবর্তন চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে ভিয়েতনামের যুদ্ধ কোন্ পথে অগ্রসর হতে চলেছে।

কিন্তু তিন বছর আগে আমি শুধু সায়গন দেখি নি, কালো মেঘে বিদ্যুতের ঝিলিকও দেখেছিলাম। সায়গনের বাইরে শুকনো পাতাগুলি উড়ে যেতে আরম্ভ করেছিল। বুঝেছিলাম ঝড় আসছে।

সায়গন শহরের মধ্যে যদিও তখনই প্রায় ৬০০ সশস্ত্র ভিয়েত কং ও অন্তত তিন হাজার স্বেচ্ছাসেবক ছিল এবং যদিও সায়গন-চোলোন ও নিকটবর্তী জিয়াদিন এলাকার জন্যে একটি বিশেষ প্রস্তুতি কমিটি গঠন করা হয়েছিল, কিন্তু ভিয়েত কংদের তৎপরতা তখন মূলত সীমাবদ্ধ ছিল দক্ষিণ ভিয়েতনামের গ্রামাঞ্চলে ও সায়গনের আশেপাশে।

মার্কিন সামরিক কর্তৃপক্ষ নিজেরাই সেদিন স্বীকার করেছিলেন গেরিলাদের প্রচার ব্যবস্থা, শৃঙ্খলাবোধ, প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ও গতিশীলতা এক কথায় চমৎকার। সারা দক্ষিণ ভিয়েতনামকে ওরা পাঁচটি সামরিক অঞ্চলে ভাগ করে ফেলেছে। সেখান থেকে প্রদেশ, জেলা, গ্রাম ও ক্ষুদ্রতম বসতি এলাকা পর্যন্ত তাদের কার্যকলাপ সুবিন্যস্তভাবে পরিচালিত। সেখানে সায়গনের প্রবেশ প্রায় ছিল না, যেটুকু ছিল তাও সীমাবদ্ধ। কারণ দক্ষিণ ভিয়েতনামের অধিকাংশই ঘন গভীর দুর্ভেদ্য জঙ্গল। মার্কিন সৈন্যরা তো নয়ই, দক্ষিণ ভিয়েতনামী সৈন্যরাও প্রচলিত যুদ্ধবিদ্যা ছাড়া আর কিছু জানত না বলে সেখানে ঢুকতে সাহস পেত না। ঢোকবার মত মেজাজও তাদের ছিল না।

সায়গন থেকে প্রায় ৭০ মাইল দক্ষিণে কিন হোয়া প্রদেশের ট্রুক-ইয়াংয়ে কাঁটা-তার আর মাটির বাঙ্কার দিয়ে ঘেরা একটি সামরিক ঘাঁটিতে দাঁড়িয়ে একজন মার্কিন অফিসার কয়েক শ' গজ দূরের একটা

জঙ্গল দেখিয়ে আমাকে বলছিলেনঃ "ওটা ভিয়েত কং এলাকা।"

জিজ্ঞেস করেছিলাম: "অর্থাৎ ভিয়েত কংরা ওখানে ঘাঁটি করে বসে আছে?"

"না। ওরা রাত্রে আসে।"

"আর দিনের বেলা?"

"দিনের বেলা ওটা সরকারের দখলে।"

"তার প্রমাণ?"

"তার প্রমাণ, আমরা ওর চারপাশে টহল দিয়ে বেড়াই এবং সে সময় কোন ঘটনা ঘটে না।"

এ বড় আশ্চর্য জবাব এবং সন্তুষ্ট হই নি বলেই আমি আবার উক্ত অফিসারকে প্রশ্ন করেছিলামঃ "আপনারা যখন জানেন দিনের বেলা ভিয়েত কংরা ওখানে থাকে না, তখন রাত্রেও যাতে ওরা না ঢুকতে পারে তার জন্যে কড়া পাহারা রাখেন না কেন?"

মুখে হতাশার চিহ্ন টেনে তিনি বলেছিলেনঃ "পাহারা দিয়ে লাভ কি বলুন। ভিয়েত কংদের তো পাব না, মিছিমিছি অনেকগুলো সৈন্য আটকে থাকবে। তাছাড়া জঙ্গল কি একটা? কতগুলি জঙ্গল আপনি পাহারা দেবেন? এত লোকই বা কোথায়? আর ভিয়েত কংদেব চিনবেনই বা কি করে?"

ঠিক এই কথাই বলেছিলেন বিন হোয়া প্রদেশেব কর্তা কর্নেল ট্রান-নক চাও'র একজন মার্কিন উপদেষ্টাঃ "আপনি হয়ত কোন গ্রামের রাস্তা দিয়ে ফিরছেন। যদি কেউ আপনাকে আক্রমণ করে তবে বুঝবেন ওরা ভিয়েত কং, যদি না করে তবে জানবেন ওরা বন্ধু।"

"এ ছাড়া জানবার কোন উপায় নেই?"

"কোন উপায় নেই।"

এবং বলেছিলেন সায়গনের জনৈক মার্কিন মুখপাত্র। প্রশ্ন করেছিলাম, ভিয়েত কং গেরিলাদের দমনের জন্যে এই যে প্রতিদিন শত শত টন বোমা ফেলা হচ্ছে, তাতে প্রকৃত কাজ হচ্ছে কতটুকু?

দু'হাত হতাশভাবে ছড়িয়ে দিয়ে, ঘাড়ে একটা মৃদু ঝাঁকুনি টেনে, মুখটাকে লম্বা করে তিনি বলেছিলেনঃ "কি করে বলি বলুন। যা গভীর জঙ্গল! বোমা পড়ল, উঁচু উঁচু গাছগুলো একটু সরে গিয়ে বোমাটা লুফে নিল। তারপর হবত একটু ধোঁয়া উঠল। ব্যস, আবার যে কে সেই। যেন কিছুই হয় নি। এই অবস্থায় কি করা যায় বলুন।"

ট্রুক-ইয়াং থেকে সুন্দর পিচ-ঢালা রাস্তা চলে গিয়েছে নারকেল গাছেব ঘন জঙ্গলের ভেতর দিয়ে মেকং নদীর ধার পর্যন্ত। এত ঘন যে দিন-দুপুরেও গা ছমছম করে। ভিয়েত কংরা দরকার হলে রাত্রে এসে এইসব জঙ্গলে আস্তানা নেয়। মাঝে মাঝে রাস্তার দু'পাশে সায়গন সরকারের 'সাইকোলজিক্যাল ওয়ারের' সাইনবোর্ড চোখে পড়ছিল। একটি লোক আরেকজনের গলা টিপে ধরেছে আর তার নিচে লেখা রয়েছে: "ভিয়েত কংদের হত্যা কর!"

আমি সঙ্গের একজনকে বলছিলামঃ "ভিয়েত কংদের স্পোর্টসম্যানশিপ আছে বটে, এই সাইনবোর্ডগুলি এখনও উপড়ে ফেলে নি।"

পরে বুঝেছিলাম উপড়ে ফেলার দরকার নেই। কারণ এই সাইনবোর্ডগুলি থাকল, কি থাকল না, তাতে গেরিলাদের কিছু এসে যায় না, মানুষগুলি তাদের সঙ্গেই আছে।

বিয়েন হোয়া এলাকার বড় একটা ছোটখাট গঞ্জের মত। একদিন দুপুরে সেখানকার স্কোয়ারে দাঁড়িয়ে চারদিকের কাজকর্ম লক্ষ্য করছিলাম। ছেলেমেয়েরা রাস্তার খেলা করছে। দোকানে দোকানে ঝলমলে পোষাক-পরা মেয়েরা কেনাকাটায় ব্যস্ত। ফিরিওয়ালারা দোকান সাজিয়ে বসেছে, ফল, ফুল, আইসক্রীম, কোকা-কোলার। কল কল করে কথা বলতে বলতে দলে দলে লোকেরা বাস থেকে নামছে কিংবা বাসে বোঝাই হচ্ছে।

হঠাৎ চারদিক কাঁপিয়ে প্রচন্ড শব্দ করতে করতে পিচ-ঢালা রাস্তাটাকে ছিঁড়ে-খুঁড়ে মেশিনগান উঁচিয়ে গোটা চারেক সাঁজোয়া গাড়ি সাঁ সাঁ করে সেখান দিয়ে ছুটে গেল। শুনলাম মাইল তিন-চার দূরে একটা জায়গায় ভিয়েত কংরা আক্রমণ করেছে। কিন্তু তাতে বন্দরের কাজকর্মে কোন বাধা পড়ে নি। কয়েকটি উৎসুক ছেলেমেয়ে দৌড়তে দৌড়তে এসে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে দেখল। বোঝা কাঁধে এক বুড়ি একটু থেমে উৎকণ্ঠিত চোখ মেলে তাকালো। এধার-ওধার থেকে দু-চারটে মুখ উঁকি মারল কি মারল না। ব্যস! আবার সব চুপচাপ। যেন কিছুই ঘটে নি। ভিয়েতনামী সৈন্যদের সঙ্গে গ্রামবাসীদের মধুর সম্পর্কের কথা জাহির করা হয়ে থাকে তার আভাসটুকুও কোথাও পেলাম না।

ভিয়েত কংদের জোর এইখানেই। তাদের সাফল্যের রহস্য এরই মধ্যে নিহিত।

একটা ছবির কথা মনে পড়ছে।

আমি ট্রুক-ইয়াংয়ে মেকংয়ের তীরে দাঁড়িয়েছিলাম। আমাদের যেমন গঙ্গা, রাশিয়ার ভল্গা, চীনের ইয়াংসি, আমেরিকাব মিসিসিপি, ভিয়েতনামের তেমনি মেকং। বিরাট নদী তার ঘোলা জলের সম্ভার নিয়ে ধীরে ধীবে এগিয়ে যাচ্ছিল। মাঝে মাঝে আমার পা ভিজিয়ে দিয়ে যাচ্ছিল। আমি শিহরিত হচ্ছিলাম। বাঁশ আর বেতের ঘন জঙ্গল জলের বুকে নুয়ে পড়েছিল। অলস বিকেলে দু-চারটে নৌকো মাঝদরিয়ায় গা ভাসিয়ে দিয়েছিল। কলা আর নারকেল বোঝাই হয়ে যাচ্ছিল গঞ্জের ঘাটের দিকে। কয়েকটা বাচ্চা ছেলেমেয়ে আদুড় গায়ে একটা কাৎ করা নৌকার গা ধরে জলের মধ্যে দাপাদাপি করছিল। চারদিকে একটা অখন্ড, প্রশান্ত প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার চিত্র। কোথাও যেন বিন্দুমাত্র ছেদ পড়ে নি। এবং সেই প্রশান্তিকে গভীরতর করে দূরে মেকংয়ের বিস্তৃত বুকের একটা ছোট্ট দ্বীপের বৌদ্ধ মন্দির থেকে বিক্ষিপ্ত ঘন্টার ধ্বনি মাঝে মাঝে বাতাসে ভেসে আসছিল।

আর কিছু নয়। একটি চপল নদ, একটি বিবশ বিকেল, চারদিকে অখন্ড নীরবতা, তারই মাঝে মাঝে চলমান জীবনের কয়েকটি আটপৌরে পদক্ষেপ। একটু অধীর হাওয়া, কয়েকটি অর্ধস্ফুট ঘন্টার শব্দ, সব মিলিয়ে এমন একটা মায়াময় পরিবেশ রচনা করেছিল যার নিজস্ব কোন গৌরব নেই, অথচ যা মনকে এক অনাবিল মাধুর্যে আবিষ্ট করে রাখে।

সেই স্বপ্নাবেশের মুহূর্তে আমার হঠাৎ মনে হল এই প্রশান্তির মধ্যেই বুঝি ভিয়েতনামের বুকের আগুন লুকিয়ে রয়েছে। ঐ যে মাঝি মেকংয়ের উদার বুকে গা ভাসিয়ে দিয়ে ভাটিয়ালীতে গান ধরেছে, কিংবা যে লোকটি আমাকে চা দিয়ে গেল, কিংবা যে মেয়েটি বাঁশের বনে জ্বালানি কুড়োচ্ছে, কিংবা মোড়ের মাথায় যে সিগারেটের দোকান দিয়ে বসেছে, কিংবা যে রাখাল গরু চরিয়ে বাড়ি ফিরছে, কিংবা যে শ্রমিক মাছ-পচানো 'সস'-এর কারখানায় কাজ করছে, সে গেরিলাদেরই একজন কি না?

সেই মুহূর্তে আমি আবিষ্কার করলাম গেরিলারা কোন আলাদা জীব নয়: তারা ভিয়েতনামের জলের সংগে, জঙ্গলের সঙ্গে, মাটির সংগে, মানুষের সঙ্গে মিশে আছে। সেই মুহূর্তে আমি উপলব্ধি করলাম গেরিলারা যারাই হোক, তাদেব ঠেকানো সহজ নয়। তারা একদিন ঝড় তুলবেই।

কি করে ভিয়েতনামের আকাশে একদিন কালো মেঘের সঞ্চার হয়েছিল, তারপব কি করে এখন সেখানে ঝড় উঠেছে, সে কাহিনী যেমন বিস্ময়কর তেমনি রোমাঞ্চকর। সে কাহিনী বুঝতে হলে আমাদের তাকাতে হবে ভিয়েতনামের অতীত ইতিহাসের দিকে। সেই ইতিহাস নিয়েই আমি আমার পরবর্তী লেখার সূত্রপাত করব

[ক্রমশঃ]

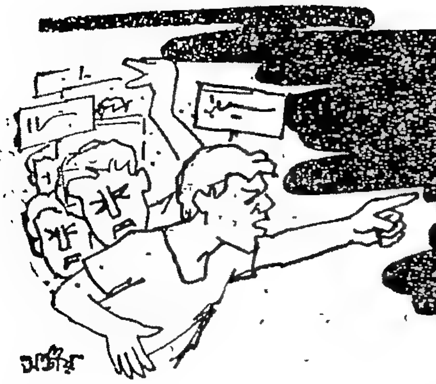

পূর্ববঙ্গের গল্প

পলিমাটি

সিরাজুল ইসলাম

তেইশে ফেব্রুয়ারী।

শহরের নীল আকাশতলে জনসমুদ্রের অশান্ত একটানা গর্জন।

শহরের বাতাসও আজ ভারী। ফিসফিস কথাবার্তার শব্দ ভেসে আসে ফাগুনের বাতাসে। ছোট্ট একটা মিছিল অজগরের মত সর্পিল গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে—শহরের পিচঢালা পথ ধরে। কারো মুখে কথা নেই—নেই অসংলগ্ন বেখাপ্পা আলাপ। মাঝে মাঝে বুকের অসহ্য জ্বালায় চিৎকার করে ওঠে মিছিলের লোকগুলো। দুপুরের রোদ্দুরে মিছিলের মুখগুলোকে দেখাচ্ছে এক-একটা গরম লোহার টুকরোর মত লাল। শুধু আঘাতের দেরী মাত্র। আঘাত পেলেই গরম লোহার মত সম্পূর্ণ ঢঙটাই বদলে যাবে।

পুলিশ অফিসের হলদে দালানটার জানালা দিয়ে চলন্ত মিছিলটাকে দেখছেন আবদুল জহির সাহেব। জাঁদরেল পুলিশ অফিসার বলে আজো যাঁর নামডাক আছে। টেবিলে জি. ই. সি ফ্যানটা ঘুরছে টপ স্পিডে। তবুও গরম লাগছে জহির সাহেবের। অসহ্য দমফাটা গরম। গায়ের সার্টটা ভিজে গেছে ঘামে। জহির সাহেবের মাথাটাও ঘুরছে বোঁ বোঁ করে। চোখের কোলে কালো দাগ পড়েছে। গত রাত্রে ভাল ঘুম হয় নি জহির সাহেবের। আর ঘুম কি করে হবে! দুশ্চিন্তার ঝড় বয়ে গেছে তাঁর উপর দিয়ে। সারারাত শুধু আতঙ্ক আর বিভীষিকার মধ্যে কেটেছে। সকাল হতেই ছুটে এসেছেন অফিসে।

জহির সাহেব ভাবছেন। ভাবনার কূল নেই, কিনারাও নেই। শহরের বুকে পা দিতেও তাঁর আজ ভয় করে। কী হল শহরের লোকগুলোর। প্রতিটি মানুষই যে গুলীখাওয়া বাঘ, যে কোন মুহূর্তে লাফিয়ে পড়তে পারে ঘাড়ে। জানালার পাশ থেকে সরে এসে ঘরের মধ্যে কতক্ষণ পায়চারী করলেন জহির সাহেব। কুমড়োর মত গোল মুখে ঘাম দেখা দিচ্ছে বারে বারে। পকেট থেকে রুমাল বের করে মুখটা ভাল করে মুছে নিলেন। মাথায় অসংখ্য ভাবনা। শহরের অবস্থাকে আয়ত্তে আনতে না পারলে কি যে হবে, খোদাই জানেন। হেড অফিস থেকে নির্দেশ এসেছে—যেভাবেই হোক থামাতে হবে গোলমালকে। একশ' চুয়াল্লিশ ধারা জারী করে হোক, গুলী কিংবা লাঠি চালিয়ে হোক, যেমন করেই হোক রুখতে হবে অশান্ত নাগরিকদের কার্যকলাপকে। হুঁ। জহির সাহেব তাচ্ছিল্যের সংগে একটা শব্দ করে উঠলেন। গুলী চালান মুখের কথা কি না! ছেলের হাতের মোয়া আর কি! ঢাকার কর্তাদের মত দুর্বুদ্ধি জহির সাহেবের হয় নি। মাথাটা তাঁর এখনো বেশ সুস্থই আছে। ঢাকায় তো গুলী চালিয়েছে—তাতে কি হলো! হলো উলটো। যারা গুলী খাওয়ার জন্য তৈরি ছিল না, তারাও তৈরি হল। যত সব উজবুক হুঁ! ক্রিং-ক্রিং-ক্রিং। ফোনে কল এসেছে। কোথা থেকে ডাক পড়ল কে জানে। যতসব। জহির সাহেবের চকচকে সমতল চামড়ার মুখটা কুঁচকে গেল অসীম বিরক্তিতে আর রাগে।

ঃ হ্যালো! কে? ইয়েস এস, পি, স্পিকিং।

ফোনের ওপাশের জবাবে মুহূর্তে জহির সাহেবের মুখটা ঝলমল করে উঠল বিনয়ে আর হাসিতে। গলার চড়া সুর কোমল হয়ে গেল যতটা সম্ভব। তারের ওপাশ থেকে আবার কথা ভেসে এল।

ঃ আপনার শহরের সিচুয়েশন কেমন?

ঃ আপাতত ভালই স্যার। কোন ডিসটার্ব্যান্স এখন আর নেই।

ঃ গুড। খারাপ হলে এ্যাটওয়ান্স ওয়ান-ফরটিফোর এপলাই করবেন। বুঝলেন?

ঃ ইয়েস স্যার'

জহির সাহেব কতক্ষণ থেমে, অনেক ভেবে-চিন্তে বললেন,

ঃ স্যার একটা কথা বলব?

ঃ কি বলুন?

ঃ ঢাকার অবস্থা এখন কেমন স্যার?

ঃ বিশেষ ভাল নয়। তবে শীগগিরই সিচুয়েশন ট্যাকল করা যাবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

ঃ স্যার গুলী না চালালে এত হাঙ্গামা হত না।

ঃ আশা করি ভুলে যাবেন না আমি আপনার বস। যা বললাম তাই করুন। যেভাবেই হোক সিচুয়েশনকে ট্যাক্ল করতেই হবে।

ঃ ইয়েস স্যার।

ট্রাঙ্ক কলের কনেকশনটা কাট-অফ হয়ে গেল। জহির সাহেব গুম হয়ে বসে রইলেন কতক্ষণ। জহির সাহেবের মুখে কে যেন এক খাবলা কালি ছুঁড়ে মেরেছে। এত শক্ত জবাব যে উপরওয়ালা দেবেন, তা তিনি আশা করেন নি। ছিঃ ছিঃ। তাঁর কি প্রয়োজন ছিল ফালতু কথা বলার, ঠিক হয়েছে, উচিত শাস্তি হয়েছে। নিজেকে নিজে ধিক্কার দিলেন জহির সাহেব, ধুত্তোর এত ভাবলে কাজ চলে! অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করতেই হবে। তবুও হঠাৎ কিছু একটা করে ফেলতে পারছেন না জহির সাহেব। ঝানু পুলিশ অফিসার তিনি। এ তো আর রাতারাতি পুলিশের বড় কর্তা হওয়া নয়। এর জন্যে অনেক ত্যাগ, অনেক অপমান, অনেক লাঞ্ছনা সহ্য করতে হয়েছে। কিন্তু দেশের অবস্থা বদলেছে এখন। ইউনিয়ন জ্যাকের পরিবর্তে সাদা-সবুজ রাঙা ঝাণ্ডা উড়ছে ঘরে ঘরে। কয়েক বছর আগের কথা ভেসে উঠল জহির সাহেবের অন্তর-আকাশে। ইংরেজের রাজত্ব। উড সাহেব তখন পুলিশের বড় কর্তা। জহির সাহেব দেখছেন কি করে গরম মানুষকে বরফের মত ঠাণ্ডা করতে হয়। কোথাও আন্দোলন শুরু হয়েছে, দাও দাঙ্গা লাগিয়ে। দাঙ্গার স্বপক্ষে লিফলেট ছড়াও। গুণ্ডা লাগাও। সরকার-বিরোধী লিফলেট ছড়িয়ে এ্যারেস্ট কর বড় বড় চাঁইগুলোকে। এই না বুদ্ধি! আর এখন কথায় কথায় গুলী আর লাঠি! উজবুক সব। বুদ্ধির 'ব' নেই মাথায়—আছে শুধু গোবর। উড সাহেবের একটি কথা আজো জহির সাহেবের মনে পড়ে। উড সাহেব বলেছিলেন—বুঝলে মিঃ

জহির পুলিশের চাকরি করতে হলে ঠাণ্ডা মাথা চাই। ঠাণ্ডা মাথায় সবকিছু বিচার করবে। তারপর অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করবে। মানুষকে বুঝতে দেবে না যে তুমি খাপ্পা। তাহলেই অনেকদিন নিশ্চিন্তে চলতে পারবে। সোজা কথা তোমার নীতি হবে, ডিভাইড এন্ড রুল বুঝলে? জহির সাহেব ভাল করেই বুঝেছেন। তাইতো হঠাৎ কিছু একটা করতে পারেন না। তাই উড সাহেবের নাম মনে পড়লে আপনি নত হয়ে আসে তাঁর মাথা।

ঃ সাহেব আছেন? অফিসের বাইরে গার্ডকে কে যেন জিজ্ঞাসা করল।

জহির সাহেব নড়েচড়ে বসলেন।

ঃ আচ্ছালাম আলায়কুম।

ঘরে ঢুকলেন এস, পি, খয়রাত হোসেন সাহেব। মাঝারী ধরণের লোকটি। ভাদ্রমাসের পাকা তালের মত মসৃণ টাক মাথায়। তাড়াতাড়ি কথা বলতে তিনি অভ্যস্ত।

ঃ ওয়া আলায়কুম আচ্ছালাম। আসুন। তারপর খবর কি?

ঃ আর খবর স্যার। ভয়ে হাত-পা পেটে ঢুকে যাবার অবস্থা। পুলিশের চাকরিতে আর সুখ নেই। সুখ ছিল এক জমানায়।

ঃ কী হল? খুলেই বল না।

ঃ ওদের লিফলেট আর পোস্টারগুলো দেখেছেন?

ঃ কিছু কিছু দেখেছি।

ঃ কী সর্বনাশের কথা। দেখলে চক্ষু চড়কগাছ হয়ে যায়। জালিম সরকারের অবসান চাই। ছাত্র হত্যার প্রতিকার চাই। আরো কত কি। বলে কি না পুলিশ জুলুম বন্ধ কর। কি সর্বনাশের কথা।

জহির সাহেব গুম হয়ে গেলেন। কি হলো লোকগুলোর—নিরীহ লোকগুলো কোন যাদু-মন্ত্রে একেবারে বদলে গেল! এত সাহস ওরা পেল কোথায়! গুলী তো আরও অনেকবার এখানে-ওখানে চলেছে, তবে এবার এমন হলো কেন! কিছুতেই সমস্যার সমাধান হচ্ছে না।

ঃ এখন কি করা যায় স্যার? একটা সিগারেট ধরিয়ে খয়রাত হোসেন সাহেব কথাটা জিজ্ঞাসা করলেন।

ঃ হু-উ। হ্যাঁ।

খয়রাত হোসেন সাহেব অবাক হয়ে গেলেন। জহির সাহেবের গুম-হয়ে-যাওয়া মূর্তি দেখে। জহির সাহেবের নাম শুনলে এখানো অনেকের বুকে কাঁপুনি ধরে। এখনো অনেকের মুখ শুকিয়ে যায়—ভয়ে আর আতঙ্কে। আর এ কি অবস্থা জহির সাহেবের!

ঃ স্যার!

ঃ স্কাউনড্রেলস! ভেবেছে জহির সাহেব ভয় পেয়েছে। ওদের হুমকীতে ভয় পাব আমি! হুঃ! দাঁড়ান না গভর্ণমেন্টটা একটু থামুক, তারপর কেমন করে চাঁইগুলোকে একটা একটা করে এ্যারেস্ট করি।

জহির সাহেব উত্তেজনার দমে করে একটা ঘুষি মারলেন টেবিলে। কেঁপে উঠল টেবিলটা। সঙ্গে সঙ্গে খয়রাত হোসেন সাহেবও ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলেন। নিশ্চল। নিশ্চল সবকিছু। বাইরে গার্ডের বুটের খট খট শব্দ ভেসে আসছে বাতাসে। জহির সাহেব আবার কি যেন ভাবছেন। খয়রাত হোসেন সাহেব টেবিলের উপরে পেপারওয়েটটা নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগলেন।

ঃ হ্যাঁ ঠিক আছে। আপনি এক কাজ করুন। আজ রাত্রেই লিফলেট ছাপিয়ে ফেলুন।

জহির সাহেবের কথা শুনে কিছুই বুঝতে পারলেন না খয়রাত হোসেন সাহেব।

ঃ লিফলেট! কিসের লিফলেট স্যার?

ঃ উর্দুওয়ালাদের গালাগাল দিয়ে লিফলেট ছাপাবেন। আর কাল তো হরতাল, না? হয়ত অনেক উর্দুওয়ালা দোকানপাট বন্ধ করবে না। তার মাঝে লিফলেটগুলো কাজ দেবে। গোলমাল লেগে উঠলেই ওয়ান-ফরটিফোর—ব্যস। আর মোহাজের সমিতির রসিদ সাহেবকে বলবেন, আমার সঙ্গে আজ রাতেই যেন দেখা করেন। কয়েকজন গুণ্ডা, আর আই, পি হায়দর খানকেও কাল কাজে লাগিয়ে দেবেন।

ঃ আচ্ছা স্যার তাই করব। আমি যাই তাহলে। শহরটা একবার ঘুরে আসি।

খয়রাত হোসেন সাহেবের পদধ্বনি মিলিয়ে গেল। জহির সাহেব আরামে

এবার এলো

আপনার ইচ্ছেমত সস্তা বা দামী যে' কোন কলম আপনি পছন্দ করতে পারেন ; কারণ,

কেমিঙ্ক —তাড়াতাড়ি শুকোয়, অবাধে লেখা হয় এবং জমাট বাঁধেনা। সেই জন্য কেমিঙ্ক সব রকম কলমের পক্ষে উপযোগী।

সলভেণ্ট 'এ'—যুক্ত কেমিঙ্ক দিয়ে লিখে আপনার কলমের উপযুক্ত ব্যবহার করুন।

—লিখে আনন্দ কেমিঙ্কে

বেঙ্গল কেমিক্যাল কলিকাতা, কানপুর, দিল্লী, বোম্বাই।

নড়েচড়ে বসলেন চেয়ারটাতে। ধু ধু মরুভূমিতে ঘুরে ঘুরে এতক্ষণে জহির সাহেব যেন ওয়েসিসের সন্ধান পেয়েছেন। ফাইভ-ফিফটিফাইভের টিন থেকে একটা সিগারেট তুলে ঠোঁটের ফাঁকে গুঁজলেন। তারপর সিগারেটটা জ্বালিয়ে আরামে চোখ বুজে একমুখ ধোঁয়া ছাড়লেন। আঃ—হ।

চব্বিশে ফেব্রুয়ারী।

আজকের দিনটা যেন অন্যান্য দিনের চেয়ে সম্পূর্ণ আলাদা। কালবৈশাখীর মত মানুষের মনে জমেছে বিক্ষোভের মেঘ। বোবা হয়ে গেছে সমস্ত শহরটা। পিচ-ঢালা রাস্তাগুলো গাড়ি-ঘোড়া আর মানুষের নিপীড়ন থেকে রেহাই পেয়ে যেন পরম আরামে নিশ্বাস ছাড়ছে। শুধু শুধু-একটা পুলিশ-ভ্যান ঘুরছে এদিক-ওদিক। রাস্তার মোড়ে মোড়ে পুলিশ রাইফেল হাতে দাঁড়িয়ে আছে পাথরের মূর্তির মত। রাইফেলের সঙ্গীনগুলো চকচক করছে রৌদ্রালোকে। স্কুল, কলেজ, অফিস, আদালত ও কারখানা—সব বন্ধ। চাকা বন্ধ। একদিনের জন্য বন্ধ হয়ে গেছে শহরের গতি।

জহির সাহেব ফোন হাতে বসে আছেন অফিসে। ছোট্ট এক টুকরো খবরের জন্য উন্মুখ হয়ে বসে আছেন তিনি। যেমনি করে বাসরঘরে দুলহা দুরু দুরু বুকে অপেক্ষা করে দুলহীনের জন্য ঠিক তেমনি বসে আছেন জহির সাহেব। একটা খবরের মধ্যেই যেন মরণকাঠি আর জীয়ন-কাঠি দুই-ই লুকিয়ে আছে। লিফলেটও ছড়ান হয়েছে সকালে। গুন্ডা আর আই, বি'রাও শহরের অলিতে-গলিতে বেরিয়ে পড়েছে। খয়রাত হোসেন সাহেব বেরিয়ে গেছেন গাড়ি নিয়ে। ক্রিং-ক্রিং-ক্রিং —এসেছে! খবর এসেছে। আনন্দে আর উত্তেজনায় লাফিয়ে উঠলেন জহির সাহেব।

ঃ হ্যালো কে? খয়রাত হোসেন! কি খবর বলুন।

ঃ কমিউনিস্ট বলে সাত-আটটি হিন্দু ছোকরাকে এ্যারেস্ট করেছি স্যার।

ঃ আচ্ছা ঠিক আছে। অবস্থা কিরকম বুঝছেন? ভালোই। শীগগিরই গোল-মাল লাগার চান্স আছে বলে মনে হয়।

ঃ আচ্ছা আমি অন্যদিকে বেরিয়ে পড়ি স্যার।

জহির সাহেব ছেড়ে দিলেন ফোনটা। আশার আলো দেখতে পেয়ে জহির সাহেবের মাথাটা হাল্কা লাগছে অনেকটা।

খয়রাত হোসেন সাহেব গাড়িটা নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লেন শহরের বুকে। এদিক-ওদিক সন্ধানী দৃষ্টিতে দেখছেন খয়রাত হোসেন সাহেব। রাস্তার লোক-গুলো পুলিশের গাড়িটা দেখতে পেয়ে কেমন যেন ঘৃণায় মুখ ঘুরিয়ে নিচ্ছে। খয়রাত হোসেন সাহেব সবই দেখছেন ও বুঝতে পারছেন সবই। গাড়িটা এগিয়ে চলল শহরের আঁকা-বাঁকা পথ ধরে। কোথাও কিছু নেই। নিশ্চল। নিশ্চুপ সবকিছু। মনে হয়, সূচ পড়ার শব্দও হয়ত শোনা যাবে। ভাড়া করা গুন্ডা-গুলো অপদার্থের একশেষ। কী করছে এতক্ষণ! একটা গোলমাল লাগাতে পারছে না! আই-বি'গুলোও ভবঘুরে কুকুরের মত ঘুরছে রাস্তায় রাস্তায়। খয়রাত হোসেন সাহেবের মেজাজটা বিগড়ে যাচ্ছে ক্রমশ। গাড়িটা খানিকটা দূরে এগিয়ে যেতেই খয়রাত হোসেন সাহেব যা দেখলেন, তাতে থমকে গেলেন। গভীর সমুদ্রে ডুবতে ডুবতে যেন পারের সন্ধান তিনি পেয়েছেন।

ঃ রোককে ড্রাইভার!

ক্যাঁচ-চ-চ। আর্তনাদ করে গাড়িটা থেমে গেল। রাস্তার পাশের দোকানটার সামনে অনেকগুলো লোক জমায়েত হয়েছে। উত্তেজিত কণ্ঠের টুকরো টুকরো কথাও ভেসে আসছে বাতাসে। ওই তো গুন্ডার পোষাকে আই-বি হায়দর খানকে দেখা যাচ্ছে। হায়দর খান হাত-পা নেড়ে কী যেন বলছে লোকগুলোকে। আশেপাশের লোকগুলো রেসের ঘোড়ার মত পা ঠুকছে, ছেড়ে দিলেই ছুটে বেরিয়ে যাবে। খয়রাত হোসেন সাহেব কাকে যেন দেখতে পেয়ে চোখের ইঙ্গিতে কাছে আসতে বললেন।

লোকটা এগিয়ে এল।

ঃ কী হালচাল সামাদ?

ঃ ঠিক আছে স্যার। এক্ষুণি দোকানটা লুট হয়ে যাবে। সবাই ক্ষেপে গেছে।

ঃ বহুত আচ্ছা।

খুশিতে ফুলে উঠলেন খয়রাত হোসেন সাহেব। হৃৎপিন্ডটা আনন্দে আর উত্তেজনায় লাফিয়ে উঠছে বারে বারে।

ঃ আমি অফিসের দিকে যাচ্ছি। তোমরা এদিক সামলাও।

ঃ আচ্ছা স্যার।

গাড়ি হাঁকিয়ে অফিসের দিকে চললেন খয়রাত হোসেন সাহেব। এবারে যেন তিনি হাওয়ায় ভর করে চলেছেন—এত হাল্কা লাগছে নিজেকে।

দোকানটার সামনে চেঁচাচ্ছে হায়দর খান, শালা আমাদের দেশে এসে আমাদেরই খাবে আর আমাদের কথামত কাজ করবে না। দোকান তোমার পুড়িয়ে ফেলব না। শালারা আবার মোহাজেরের নাম লাগিয়েছে।

ঃ ঠিক বলেছ ভাই। কে যেন কথাটা বলল।

ঃ এই শালা! দোকান বন্ধ কর।

দোকানী লোকটা ভয় পেয়েছে কিছুটা। তবুও প্রাণপণ শক্তিতে দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে আছে সে। মরতে হয় সে-ও ভাল, তবুও কিছুতেই দোকান সে বন্ধ করতে পারবে না—গতকাল রাত্রে মোহাজের সমিতির রসিদ আহমদ সাহেব যা বলেছেন তা শুনে দোকান বন্ধ করা যায় না। বাঙলামুলুক বলে কোন বাত নেই—সব এক আছে। বাঙালীরা উর্দুওয়ালা-দের বাঙলামুলুক থেকে তাড়াতে চায়। তাইতো এত গোলমাল, হাঙ্গামা, হুজ্জত। উর্দুর পরিবর্তে বাঙলা জবান চালাবার ব্যবস্থা। লেকিন উর্দুওয়ালারা কি আজাদীর জন্য লড়াই করে নি? তবে কেন ওরা মুলুক ছেড়ে যাবে। আর বাঙলা জবান যদি হয়ে যায়, তবে তো উর্দুওয়ালাদের এ মুলুক ছেড়ে যেতেই হবে। সবই চলবে বাঙলা জবানে, সবই বাঙালীরা ছিনিয়ে নিবে। রসিদ সাহেবের কথাগুলো দোকানীর কানে বাজছে। মরতে হয় সে-ও ভাল, তবু সে দোকান বন্ধ করবে না।

ঃ এই শালা! দোকান বন্ধ করবি কি না, বল?

ঃ নেহি।

ঃ আরে শালার তেজ দেখ না! বাঙলা বল শালা।

স্বেচ্ছাসেবকদের খালি ট্রাকটা চালিয়ে যাচ্ছিল হামিদ। লোকজন আর গোলমাল দেখে ট্রাকটা থামিয়ে নেমে পড়ল সে। ট্রাক-ক্লিনার হাফিজকে বলল হামিদ, গাড়িটা দেখিস রে ব্যাটা। হামিদ কথা-বার্তা শুনেই বুঝতে পারল কোথা থেকে কি হচ্ছে। কোথাকার পানি কোথায় যাচ্ছে গড়িয়ে। কলকাতার ছেলে হামিদ। বস্তিতে আর কারখানায় কাটিয়েছে জীবনের অনেকগুলো বছর। অনেক দেখেছে, অনেক জেনেছে সে। দেখেছে কি করে দাঙ্গা লাগিয়ে দালালরা ধর্মঘট বান-চাল করে দেয়। সবই দেখেছে সে। দুঃখের মধ্যে দুঃখ, সেই সাধের কলকাতা ছাড়তে হয়েছে। আর কলকাতাও ওর ঘর নয়, হয়তো পাঞ্জাব না কোথায় যেন। তবে বাড়িঘর নিয়ে বিশেষ মাথা ঘামায় না হামিদ। বিধার বাত উধাব কাত অর্থাৎ যেখানেই রাতের অন্ধকার ঘনিয়ে আসবে সেখানেই নিশ্চিন্ত হয়ে শুয়ে পড়। হায়দর খানের উঁচু গলা শুনেই বুঝতে পারল সে দলের আসল ঘুঘু কে। হামিদ আস্তে আস্তে ভীড় ঠেলে এগিয়ে গেল। দোকানীর হাতটা হঠাৎ চেপে ধরে হামিদ বলল,

ঃ এ ভাইয়া আল্লাহকাওয়াস্তে দোকান বন্ধ কর দে। আরে ভাই ইয়ে লোগকা বাত মানলে।

ঃ নেহি, লোকটা গর্জে উঠল আবার।

নেহি? মুহূর্তে হামিদের দেহের রক্ত ফুটে উঠল টগবগ করে। তবুও প্রাণ-পণ শক্তিতে নিজেকে সামলে রেখে আবার বলল,

ঃ ভাই তুম ভি মোহাজের, হাম ভি

মোহাজের হ্যায়। হামলোগকা ঘর তো এহি মুলুক হোগা। এহি মুলুকমে হাম রহেঙ্গে আওর বোলেঙ্গে উর্দু জবান—ইয়ে ক্যায়াস বাত হ্যায়? উর্দু তো ওলোগ বলেগা যিস্‌কা ঘর বাঙলামুলুককা বাহার হ্যাব? আগার তোম উর্দু বলনে মাংতা হ্যায় তো বলো, কোই নেহি রোকেগা। আব দোকান বন্ধ কর দে ভাই।

মানুষের ভীড় ক্রমেই বেড়ে চলেছে। বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে উত্তেজিত কণ্ঠের কথাবার্তা।

ঃ দেখছেন কী? শালার ঘাড়ে লাগিয়ে দিন দু-চার ঘা। দোকান বন্ধ করবে না—ইয়ার্কি পেয়েছে?

ঃ মার শালাকে।

অনেকে এক সঙ্গে গর্জে উঠল। স্বেচ্ছাসেবক যারা এসেছে, তারাও ক্রুদ্ধ সাপের মত উত্তেজিত জনতাকে শান্ত করতে পারছে না। ওরা হাল ছেড়ে দিয়েছে অনেকেই। জনতার গর্জনকে ছাপিয়ে আর একটি গর্জন ভেসে উঠল বাতাসে। মিছিলের গর্জন। দূরে একটা মিছিল এগিয়ে আসছে, হামিদ বুঝতে পারছে কোথায় এর শেষ। মিছিল যদি এসে পড়ে, তাহলে সবই ওলট-পালট হয়ে যাবে। মিছিলের লোকগুলো দোকান খোলা দেখলেই শিকারী অ্যালসেশিয়ানের মত ঝাঁপিয়ে পড়বে দোকানীর ঘাড়ে, নয়তো দোকানটা পুড়িয়ে ছাই করে দেবে। গোলমাল যদি লেগে যায়, তবে যে কতবড় ক্ষতি হবে তা তখন আর কেউ ভেবে দেখবে না। তখন অন্তরের জ্বালা আর বিক্ষোভকে মিটিয়ে নেবে দোকান পুড়িয়ে আর দোকানীকে মেরে। হামিদ কথাগুলো চিন্তা করে মুষড়ে পড়ল। তবুও হাল ছাড়লে তো চলবে না। রাস্তা তাকে খুঁজে বার করতেই হবে। হামিদ হঠাৎ একটা অভাবনীয় কাজ করে বসল। অকস্মাৎ সে চেপে ধরল দোকানীর পা দুটো।

ঃ এ ভাই! আভি আল্লাহকাওয়াস্তে দোকান বন্ধ কর দে। জলদি বন্ধ কর ভাই।

দোকানী লোকটাকে হঠাৎ পায়ে ধরতে দেখে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল সাময়িকভাবে। উপস্থিত লোকগুলো কিছুই বুঝতে না পেরে হাঁ করে রইল। শুধু হায়দর খানের মুখটা মুহূর্তে ছাই-রঙা হয়ে গেল। দোকানীও যেন কতক্ষণ কি ভাবল, তারপর বলল,

ঃ আচ্ছা হাম দোকান বন্ধ কর দেতা হ্যায়।

ঃ এহি তো চাহ্‌তা হ্যায়। সাবাস ভাই।

হামিদ সফলতা ও বিপদ কেটে যাওয়ার আনন্দে বুকে চেপে ধরল দোকানীকে। দোকান বন্ধ হয়ে গেল কতক্ষণ পরেই। হামিদ এবার খুঁজতে লাগল হায়দর খানকে। অবস্থা বেগতিক দেখে গুটি গুটি সরে পড়বার চেষ্টায় ছিল হায়দর খান। হামিদ হঠাৎ খপ করে ধরল ওর সার্টের কলারটা।

ঃ শালা হারামী ভাগতা কাঁহা?

মোটরের স্টিয়ারিং ধরা শক্ত হাতের একটা ঘুষি এসে পড়ল হায়দর খানের নাকে। হায়দর পড়তে পড়তে সামলে নিল নিজেকে। ঘুষির পর ঘুষি চলল। খানিক পরে চেনবার জো রইল না হায়দর খানকে। ওর নাক দিয়ে, মুখ দিয়ে রক্ত পড়ছে গলগল করে। অনেকেই বুঝতে পারল না কি হয়েছে। সবার চোখ-মুখে ব্যাপারটা জানবার আকুল আগ্রহ উপছে পড়ছে। কেউ কেউ আবার থামিয়ে দিতে চেষ্টা করল হামিদকে।

হামিদ পকেট থেকে ছেঁড়া ময়লা রুমালটা বের করে রক্তাক্ত হাতটা মুছতে মুছতে জবাব দিল,

ঃ শালা দালাল আছে ভাই।

ঃ গোলমাল লাগাতে এসেছিল।

ঃ দালাল! অনেকের মুখ দিয়ে একসঙ্গে কথাটা বেরুল।

ঃ কোথায় গেল শালা?

কোথায় হায়দর খান? চিহ্নও নেই। সুযোগ বুঝে ছিটকে বেরিয়ে পড়ে ছুটেছে সে পুলিশ অফিসের দিকে।

ওদিকে রাইফেলধারী পুলিশ নিয়ে দ্রুতগতিতে গাড়ি হাঁকিয়ে আসছেন খয়রাত হোসেন সাহেব আর জহির সাহেব। প্রয়োজন হলে ফাঁকা আওয়াজ করে সিচুয়েশনকে সিরিয়াস করে তুলতে হবে। তারপর ওয়ান-ফরটিফোর। জহির সাহেবের অন্তর-আকাশে এ মুহূর্তে উড সাহেবের কথাই ভেসে উঠছে। ধন্য উড সাহেব। ধন্য তোমার বুদ্ধি।

ঃ স্যার!

খয়রাত হোসেন সাহেব আঁতকে চিৎকার করে উঠলেন। খয়রাত হোসেন সাহেব যা দেখলেন, তাতে মাথা ঘুরে পড়তে পড়তে সামলে নিলেন নিজেকে। খয়রাত হোসেন সাহেবের আঁতকে ওঠা চিৎকারে চমকে উঠলেন জহির সাহেব।

ঃ কি হলো?

খয়রাত হোসেন বাকশক্তি হারিয়ে ফেলেছেন, কিছুই বলতে পারলেন না। শুধু আঙুল দিয়ে কি যেন দেখিয়ে দিলেন। জহির সাহেব দেখলেন। হৃৎপিণ্ডটা যেন ধপ করে থেমে গেল, কয়েক মুহূর্তের জন্য। আহত, বিকৃত ও রক্তাক্ত চেহারাটা নিয়ে টলতে টলতে হায়দর খান হাত তুলছে গাড়ির সামনে। গাড়ি থামলো। জহির সাহেব সামলে নিলেন সাময়িক ধাক্কাটা।

ঃ কী হয়েছে হায়দর?

ঃ কিছু না। শুধু মার খাওয়াই সম্বল হল—স্যার।

মুহূর্তে দপ করে জ্বলে উঠলেন জহির সাহেব।

ঃ মার খাওয়া? হুঃ।

ঃ আচ্ছা আমিও দেখে নেব ওদের। শিখিয়ে দেব ব্যাটাদের কত ধানে কত চাল আছে। নাও গাড়িতে উঠে পড়...।

কথাটা শেষ করতে পারলেন না জহির সাহেব। মিছিলের চিৎকারে তাঁর কথাটা বুদবুদের মত মিলিয়ে গেল। দূরের মিছিলটা কাছে এসে গেছে এতক্ষণে। থেমে থেমে মিছিলের চিৎকার ভেসে আসছে বাতাসে। সে চিৎকার যেন সমুদ্রের গর্জনের মত শোনাচ্ছে। জহির সাহেব দাঁতে দাঁত চেপে তাকিয়ে রইলেন চলন্ত মিছিলটার দিকে।

রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনা

INDIAN CLASSICAL DANCES	— শ্রীবালকৃষ্ণ মেনন	২৫·০০
THE HOUSE OF THE TAGORES	— শ্রীহিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়	২·০০
STUDIES IN AESTHETICS	— ডঃ প্রবাসজীবন চৌধুরী	১০·০০
TAGORE ON LITERATURE AND AESTHETICS	— ডঃ প্রবাসজীবন চৌধুরী	৮·০০
A CRITIQUE OF THE THEORIES OF VIPARYAYA	— ডঃ ননালাল সেন	১৫·০০
STUDIES IN ARTISTIC CREATIVITY	— ডঃ মানস রায়চৌধুরী	১৫·০০
রবীন্দ্র সুভাষিত	— সংকলক শ্রীবিনয়েন্দ্রনারায়ণ সিংহ	১২·০০
রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে মৃত্যু	— ডঃ ধীরেন্দ্র দেবনাথ	৬·০০
পদাবলীর তত্ত্বসৌন্দর্য ও কবি রবীন্দ্রনাথ	— ডঃ শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য	৫·০০
গান্ধীমানস	শ্রীরতনমণি চট্টোপাধ্যায়, প্রিয়রঞ্জন সেন, শ্রীনির্মলকুমার বসু	৩·০০

রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়। ৬/৪ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা-৭
পরিবেশক ঃ জিজ্ঞাসা, ৩৩ কলেজ রো ও ১৩৩এ রাসবিহারী অ্যাভেনিউ, কলিকাতা

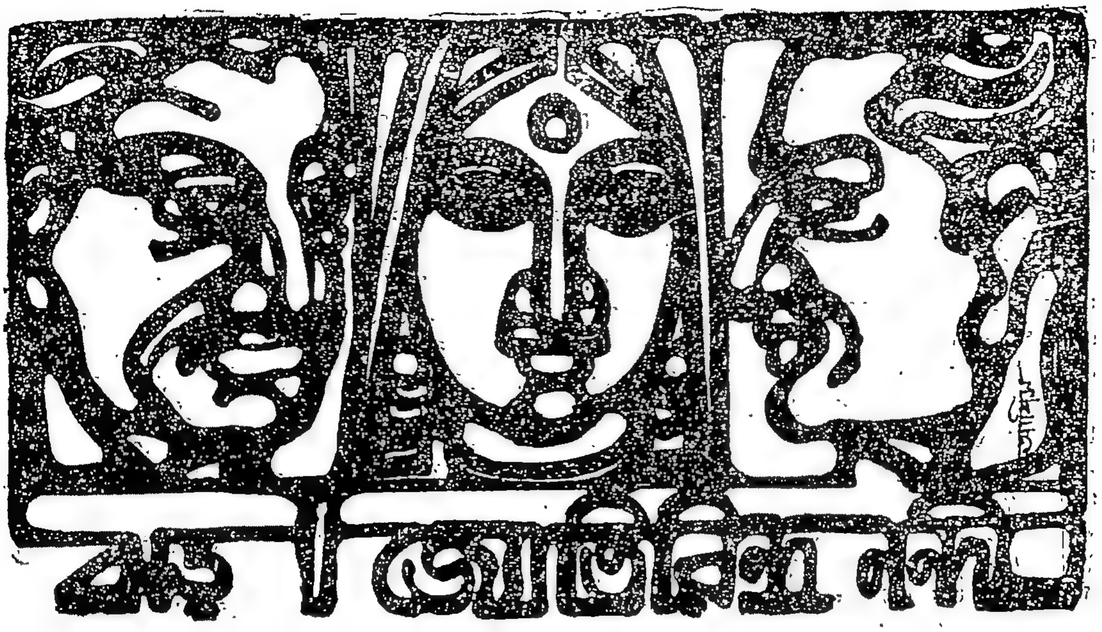

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

এক একটা দিন আসে; এক একটা সকাল এমন চেহারা নিয়ে আমাদের চোখের সামনে উপস্থিত হয় যার সঙ্গে অন্য কোনো দিনের অন্য কোনো প্রভাতের মিল থাকে না।

সীতাংশু তাই ভাবছিল। কেমন করে জানি সেদিন রাত পোহাল।

তখনও সে ঘর থেকে বেরোয় নি। শেষ রাত্রের দিকে ঠান্ডাটা খুবই জাঁকিয়ে পড়েছিল। ভোর হতে দেখা গেল আকাশ পৃথিবী কুয়াশায় কুয়াশায় অন্ধকার হয়ে আছে। ঘুম ভাঙার পরও সীতাংশুর কেমন যেন বিছানা ছেড়ে উঠতে ইচ্ছা করছিল না, হাত পা নাড়তে হবে ভয়ে কম্বলের নিচে কান মাথা গুঁজে হাঁটু দুটো মুড়ে পেটের কাছে নিয়ে বেশ কিছুটা সময় কুকুরের মতন কুন্ডলী পাকিয়ে শুয়ে ছিল, তারপর অবশ্য এক সময় তাকে উঠতেই হল। সুখী এসে দরজার কড়া নাড়ছিল। দরজা খুলে দিল সে। সেই-সঙ্গে টেবিল থেকে ঘড়িটা তুলে চোখের সামনে তুলে ধরে কেমন হতভম্ব হয়ে গেল। সাতটা বেজে গেছে। তার মানে আধঘণ্টা আগেই সূর্যোদয় হয়েছে। কিন্তু বাইরের চেহারা দেখে কে সে কথা বিশ্বাস করত।

তাড়াহুড়ো করে জামাকাপড় চড়িয়ে বেরোবার জন্য সে তৈরি হল। কাঠ জ্বেলে সুখী অবশ্য তখনি চায়ের জল ফুটোতে লেগে গেল। ওদিকে ওরা কাজ আরম্ভ করে দিয়েছে—করাতীদের করাত টানার শব্দ কাঠ কাটার শব্দ—কুলিদের ছুটোছুটি হৈ-হল্লা, সব কিছুই তার কানে আসছিল। সুখীর চা হয়ে গিয়েছিল। চা-এ চুমুক দিতে যাবে এমন সময় এক-জন ছুটে এসে খবরটা দিল। জনার্দন। জঙ্গলে কাঠ কাটছিল জনার্দন। তার মুখে সব শুনে প্রথমটায় সে খুবই ঘাবড়ে গিয়েছিল, ভয় পেয়েছিল। সুখী পাশে দাঁড়িয়ে শুনছিল। সে-ও খুব ভয় পেয়েছিল। রক্তটক্ত শুনলে কার না ভয় হয়। তবে কি না ঈশ্বরের ইচ্ছা—সীতাংশু যে খুব একটা ঈশ্বর-বিশ্বাসী তা নয়; তবে সংসারের পাঁচটা জিনিস দেখে, পাঁচ রকম ঘটনার কথা শুনে এক এক সময় তার ভাবতে ইচ্ছা করত, যেন কোনো কোনো ব্যাপারে সত্যি কারো অদৃশ্য হাত রয়েছে; আর সেই হাতের এমন যাদু, আমাদের ভাবনা চিন্তা ধ্যান-ধারণা চোখের নিমেষে উলটপালট করে দেবার মতন এক একটা কান্ড বাধিয়ে তোলে। হুঁ, ঈশ্বরের হাত.. জনার্দনের সঙ্গে অশোকতলায় ছুটে গিয়েছিল সীতাংশু. সুখীও পিছনে পিছনে গিয়েছিল, ছোটখাট একটা ভিড় জমে গিয়েছিল সেখানে, করাতী কুলি এবং জঙ্গলে যারা কাঠ কাটছিল তারা সকলেই পীতাম্বরকে দেখতে এসেছিল। ঘাসের ওপর শুইয়ে রাখা হয়েছিল মানুষটাকে। শিয়রের কাছে মুরারি ও সনাতন বসে রয়েছে দেখা গেল! যেন পীতাম্বরের জ্ঞান ছিল না, চোখ দুটো আধবোজা হয়ে ছিল। সীতাংশু ভিড় ঠেলে কাছে গিয়ে দাঁড়াতে মুরারি ও লক্ষ্মীচরণ একসঙ্গে উঠে দাঁড়াল। মুরারির মুখে ব্যাপারটা ভাল করে শুনল সীতাংশু।

সকালে পীতাম্বর কাজে আসছিল। হাজিরা দিতে পাছে দেরি হয়ে যাবে ভয়ে সোজা পথ ধরে না এসে ছুটতে ছুটতে সে জঙ্গলের ভিতর দিয়ে আসছিল। ওদিকে সনাতন কুড়াল দিয়ে কেটে একটা গাছ নামাচ্ছিল তখন। আগের দিন বিকালে গাছের অর্ধেকটা কাটা হয়ে গিয়ে-ছিল। বাকি কাজটুকু আজ সকালের মধ্যে শেষ করবে ভেবে বেশ একটু হাত চালিয়ে সে কুড়াল মারছিল। না, কুয়াশার জন্য পীতাম্বরকে সে দেখতে পায় নি। ওপাশ দিয়ে একটা মানুষ আসছে দেখলে সে তখনি হাতের কুড়াল হাতে ধরে রাখত। কেন না সবটা গুঁড়ি কাটা হয়ে গিয়েছিল, গাছটা তখন একদিকে হেলে গিয়ে মাটিতে পড়ি পড়ি করছিল। আর ঠিক তখন পীতাম্বর সেখানে এসে পড়ে। ঠান্ডার দরুণ কানে মাথায় চাদর জড়িয়ে আসছিল। কুয়াশার জন্য যেমন সে কিছু দেখতে পাচ্ছিল না, তেমনি ধারে কাছে গাছ কাটা হচ্ছে সেই শব্দও সে শুনতে পায় নি।

তারপর যা ঘটার ঘটল। কিন্তু এখানেও যে ঈশ্বরের হাত ছিল বিশ্বাস না করে উপায় কি। পীতাম্বর মরে যেত। যদি গাছটা মাথায় পড়ত রক্ষা ছিল না। একটা পায়ের ওপর দিয়ে চোট গেছে। পা ভাঙে নি মচকায় নি। তবে বেশ জখম হয়েছে। দুটো আঙুল থেঁতলে গিয়ে প্রচুর রক্তস্রাব হচ্ছিল। কন্ট্রাক্টরের একটা বাক্সে খানিকটা আইডিন তুলো সব সময়ই রাখা হয়। মুরারি সঙ্গে সঙ্গে তুলোয় আইডিন মাখিয়ে পীতাম্বরের জখমের জায়গাগুলিতে লাগিয়ে দিয়েছে। আনাড়ি হাত, তা হলেও সে যতটা পারে প্রাথমিক শুশ্রূষার ত্রুটি করে নি।

'কিন্তু এভাবে তো এখানে ওকে শুইয়ে রাখলে চলবে না' ডাক্তার ডাকতে হবে।'

যেন কথাটা বলতে গিয়ে রাণীরবাগের ডাক্তারের কথাটাই মনে হয়েছিল সীতাংশুর।।

সনাতন তৎক্ষণাৎ ঘাড় কাত করল।

'আজ্ঞে রাধহরি ট্রাক নিয়ে ইস্টিশনে রওনা হয়ে গেছে, সঙ্গে ইয়াসিন গেছে।'

লজ্জা পেল সীতাংশু। তাই তো, তার আগেই তার কর্মচারীরা ডাক্তারের কথা শুধু চিন্তা করে নি, রেলস্টেশনের পাশ করা ডাক্তার হরিসাধনবাবুকে আনবার জন্য ইয়াসিনকে দিয়ে ট্রাক পাঠিয়ে দিয়েছে। উঁহু, রাণীরবাগের ডাক্তারকে তারা আনতে যাবে কোন্ দুঃখে, এখান থেকে কম করে হলেও তিন মাইলের পথ; আর দেড়-দু মাইলের মধ্যে আকবরপুরের রেলস্টেশন, স্টেশনের গায়েই হরিসাধন-বাবুর ডিসপেনসারী। এই অঞ্চলের মানুষের অসুখ-বিসুখ হলে কি আঘাত পেয়ে জখম-টখম হলে হরিসাধন ডাক্তারের কাছেই তারা তো চলে যায়। হরিসাধনের কথা ভুলে গিয়ে সীতাংশুর কি না রণধীর ডাক্তারকে মনে পড়ল। যেন এই জন্যও কিছুটা লজ্জা পেল সে।

'কুয়াশার দরুণ যদি গাড়ি চালাতে একটু অসুবিধে হয়, তা না হলে ডাক্তারবাবু এখনই হুট করে এসে যাবেন।' মুরারির মুখের দিকে তাকাল সনাতন। তার কথা শুনে মুরারি বুঝি চারদিকের ধোঁয়াটে অবস্থাটা আর একবার দেখতে ঘাড় তুলে এদিক ওদিক তাকাল। ভিড়ের একপাশে সুখীকেও দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল সে। মেয়ের সঙ্গে চোখাচোখি হতে বুড়ো তৎক্ষণাৎ ঘাড় নিচু করে আবার মনোযোগ দিয়ে পীতাম্বরের মুখটা দেখতে লাগল।

আড়চোখে সুখীকে একবার দেখে নিয়ে সীতাংশু একটু কেশে গলাটা পরিষ্কার করে, সকলেই যাতে শুনতে পায়, চড়াসুরে বলল, 'কাঠ কাটা আজ বন্ধ থাকবে, কারখানার কাজও বন্ধ থাক, মিস্ত্রীরাও বাড়ি চলে যেতে পারে।'

তার মানে কারখানা ছুটি হয়ে গেল। একটা অস্ফুট গুঞ্জন শোনা গেল। কর্মচারীরা খুশি হয়েছে বোঝা গেল। কিন্তু তা বলে ভিড় ভেঙে যে তখনি সকলে বাড়ির দিকে ছুটল তা-ও না। যেমন ছিল, দাঁড়িয়ে রইল সব। তারা ইয়াসিনের জন্য অপেক্ষা করবে বোঝা গেল। ডাক্তার-বাবুকে সঙ্গে নিয়ে ইয়াসিন এখনি ফিরে আসবে। অর্থাৎ ছুটি পাওয়ার আনন্দ অপেক্ষা তাদের চোখে-মুখে একটা আশঙ্কা, অনিশ্চয়তা—মাটিতে শোয়ান মানুষের জন্য দুঃখ ও সমবেদনার ভাবটাই বেশি ফুটে উঠছে লক্ষ্য করে সীতাংশু ভিতরে ভিতরে খুশি হল। তার কর্মচারীরা কেউ স্বার্থপর নয়। তারা সরল সহানুভূতিপরায়ণ। অশিক্ষিত মানুষগুলির আন্তরিকতার পরিচয় পেয়ে সে অভিভূত হল।

দূরে ট্রাকের 'হর্ন' শোনা গেল। শব্দটা সকলেরই পরিচিত। 'ইয়াসিন ফিরে এসেছে।' অশোকতলায় আবার গুঞ্জন উঠল। 'ডাক্তারবাবু এসে গেছে।' ভিড় ঠেলে বেরিয়ে সীতাংশু আমলকীগাছটার দিকে এগোতে লাগল। ট্রাক এসে ওখানেই দাঁড়াবে।

যেন একটা ঝড়ের লক্ষণ দেখা গিয়ে-ছিল। শেষ পর্যন্ত আর ঝড়টা এল না। একটু হাওয়া উঠল, দু'ফোঁটা বৃষ্টি পড়ল কি পড়ল না। মেঘটা উড়ে গেল, গাছের পাতাগুলি নড়ে উঠে আবার স্থির হয়ে গেল। অর্থাৎ পীতাম্বরের গাছচাপা পড়া নিয়ে এমন একটা দুর্যোগ টিয়াটুলির জঙ্গলের মাথার ওপর থমথম করছিল। কিন্তু হরিসাধন ডাক্তার পীতাম্বরকে দেখে যাবার পর সকলের ভয়টা কাটল। তখন মুরারি যা বলছিল, পা ভাঙে নি মচ-কায় নি। তবে পায়ে চোট লেগেছে, আর পায়ের দুটো আঙুল থেতলে যাবার দরুণ সামান্য যা রক্তপাত। ডাক্তার পর পর দুটো ইন্‌জেকশন দিতে পীতাম্বরের জ্ঞান ফিরে এল। পা ব্যান্ডেজ করে দিয়ে এবং দুটো মিকশ্চার লিখে 'আর ভয় নেই' বলে হরিসাধন যখন ট্রাকে উঠে আবার ইয়াসিনের পাশে গিয়ে বসল তখন সকলের মুখে হাসি ফুটল। যেন দম বন্ধ হয়ে গিয়েছিল কারখানার মানুষগুলির ডাক্তারবাবুর কথা শুনে এবং পীতাম্বর চোখ মেলে তাকিয়েছে দেখে তারা ভাল করে নিশ্বাস ফেলতে পারল। না, হরিসাধন যা বলে গেল, পীতাম্বরকে হাসপাতালে দেবার দরকার নেই, বাড়িতে থেকে ক'দিন একটু বিশ্রাম নেবে, মিকশ্চার দুটো খেয়ে যাবে, এবং পরশু আর একবার এসে ডাক্তার তার পায়ের ব্যান্ডেজটা খুলে নতুন ব্যান্ডেজ বেঁধে দিয়ে যাবে। ডাক্তারকে স্টেশনে পৌঁছে দিয়ে ফেরার সময় ইয়াসিন ওষুধ নিয়ে আসবে। ট্রাক চলে গেল।

মুরারি সনাতন লক্ষ্মীচরণ ও মঙ্গল—এই চারজন ধরাধরি করে পীতাম্বরকে বাড়ি নিয়ে চলল, সঙ্গে আরও দু-চারজন গেল। বাকি মানুষ যে যার বাড়ির পথে ফিরে গেল। জায়গাটা হঠাৎ কেমন ফাঁকা স্তব্ধ হয়ে গেল।

হুঁ, তখন বেলা দশটা। কুয়াশা কেটে গিয়ে চমৎকার ঝলমলে রোদে আকাশ যেন হেসে উঠল। দূরে একটা চিল ডাকছিল।

কারখানা বন্ধ, যেন এদিকের কাজ-কর্মেও সুখী হাত লাগাতে পারছিল না। যেন এই জন্য সীতাংশুই দায়ী। যেন সে চাইছিল না সুখী এখনি ঘরে গিয়ে বাটনা বাটুক কুয়ো থেকে টেনে টেনে জল তুলুক উনুন ধরিয়ে রান্নার কাজে লেগে যাক।

সুখী দু-একবার কথাটা বলেওছিল। সীতাংশু গ্রাহ্য করে নি। 'এই তো সবে চা খাওয়া হল, তেমন আর কী বেলা হয়েছে—ওসব পরে হবে।' আমলকী-তলার রৌদ্রে দাঁড়িয়ে সুখীর সঙ্গে কথা বলছিল সে। অধিকাংশ কথাই পীতাম্বরকে নিয়ে। যদি লোকটা সত্য গাছচাপা পড়ে মরে যেত তো কী উপায় হত, ঘরে বৌ আছে, দুটো বাচ্চা আছে। আর বুড়ো বাবা। সারাদিন বিছানায় শুয়ে খকখক কাশে আর হাজার রকম ফরমাস করে বৌটাকে কেবল খাটিয়ে মারে। বৌটা বড় সরল, দেখতেও সুন্দর। সীতাংশুকে একবার একটা কাজে ওদিকে যেতে হয়ে-ছিল। পীতাম্বর তখন তাকে ডেকে নিয়ে তার ছোট্ট খড়ের ঘরে বসায়। বাতাসা ও জল দিয়ে সমাদর করে। এক গেলাস জল ও একটা পিতলের রেকাবিতে চার-ছটা বাতাসা সাজিয়ে পীতাম্বরের বৌ তার পায়ের কাছে রেখে 'ঢুর পা ছুঁয়ে প্রণাম করেছিল। তাই মেয়েটিকে সামনাসামনি ভাল করে দেখার সুযোগ হয়েছিল সীতাংশুর।

'রাখে কৃষ্ণ মারে কে।' কথাটা বলে সুখী লম্বা নিশ্বাস ফেলল।

সীতাংশু মাথা নাড়ল। 'তা ছাড়া আর কি—ঈশ্বর না বাঁচালে কেউ বাঁচতে পারে? আসলে মূল গাছটা তার গায়ে পড়ে নি। পড়লে সঙ্গে সঙ্গে চেপ্টা হয়ে যেত। সনাতন যা বলল। ডালপালার ধাক্কা লেগে এক পাশে ছিটকে পড়েছিল পীতাম্বর, তাই রক্ষে, কেবল পাটাই একটা মোটা ডালের নিচে চাপা পড়ে যায়, ফলে দুটো আঙুল থেঁতলে গেল।'

'জনার্দন যেভাবে এসে তখন বলল!' ভুরু দুটো কপালে তুলে সেই সঙ্গে একটু হাসির ভাব ফুটিয়ে সুখী বলল, 'আমি তো ভাবলাম, অশোকতলায় গিয়ে বুঝি মরা মানুষটাকেই দেখব।'

'আমিও সেই ভয়ে মরছিলাম, আমার কর্মচারী, আমার এখানে কাজ করতে এসে এভাবে প্রাণ হারাল, দু' চোখে হঠাৎ অন্ধ-কার দেখলাম—' বলতে বলতে সীতাংশু থেমে গেল। সুখী হঠাৎ ওদিকের ছাতিম-গাছটার দিকে ঘাড় ফেরাতে সে সেদিকে ঘাড় ফেরাল। মাধব আসছে। তাই তো, এতক্ষণ পর সীতাংশুর খেয়াল হল, এতবড় একটা ব্যাপার ঘটে-গেল এখানে, অশোক-তলায় কত বড় ভিড় হল, কিন্তু মাধবকে তো একবারও সেখানে চোখে পড়ে নি, অশোকতলা কেন, আশে-পাশে কোথাও সারা সকালের মধ্যে ওই ছোঁড়ার মুখ দেখা গেছে বলে সীতাংশু মনে করতে পারল না।

'কোথায় ছিলি এতক্ষণ, কোথায়

গিছলি ' ভাই এসে সামনে দাঁড়াতে সুখী ভুরু কুঁচকে তার চোখের দিকে তাকাল।

মাধব তৎক্ষণাৎ চোখে নামিয়ে পায়ের কাছের ঘাস দেখতে লাগল।

সুখী সীতাংশুর দিকে তাকাল।

'আমি বাড়ি থেকে বেরোবার আগে, সেই কখন অন্ধকার থাকতে ও ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছে, ভাবলাম, এখানে এসে দেখতে পাব—কিন্তু এখানে তো সারা সকাল ছিল না?'

'না।' সীতাংশু মাথা নাড়ল।

'মাধব! কোথায় গিয়েছিলি?'

মাধব এবারেও শব্দ করল না। চোখ তুলল না।

'কালা কোথায়?' ভাইয়ের কাঁধে হাত রাখল সুখী। কাঁধ ধরে আস্তে ঝাঁকুনি দিল।

যেন এবার ভয় পেয়ে পর পর দুটো ঢোক গিলল কিশোর। দিদির চোখে চোখ রেখে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইল।

'কি হল, কথা বলছে না কেন ও?'

সুখী আবার সীতাংশুর দিকে তাকাল। 'অশোকতলা থেকে ফিরে এসেই কিন্তু ভেতরে ঢুকে আমি এক নজরে খাঁচাটা দেখে এসেছি। কালাকে দেখতে পাই নি।'

এবার সীতাংশু মাধবের কাঁধে হাত থাখল।

'এত বেলা পর্যন্ত কোথায় ছিলি—কালাকেও তো দেখছি না।'

'ওটাকে রেখে এলাম।'

'কোথায় রেখে এলি?' আর্তনাদের মতন গলার স্বর করল তার দিদি। মাধব দিদির চোখ দেখল না। সীতাংশুর দিকে চেয়ে বড় করে একটা ঢোক গিলল।

'কোথায় রেখে এলি বাচ্চাটাকে?' সীতাংশু সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন করল।

'হেই খেজুর ঢিবিতে।'

সুখী ও সীতাংশু স্তব্ধ হয়ে গেল। চোখের পলক না ফেলে কিশোরের মুখটা দেখতে লাগল।

যেন একসঙ্গে দু'জনের চাউনি সহ্য করতে না পেরে মাধব আবার পায়ের কাছের ঘাস দেখতে লাগল।

'এ্যাঁ, কাউকে বলা নেই কওয়া নেই—বাচ্চাটাকে ছেড়ে দিয়ে এলি!' কান্নার মতন গলার স্বর করল সুখী।

'কিন্তু ওটাকে যে রেখে এলি, তোর পিছু পিছু আবার ছুটে আসতে চাইছিল না?'

মাধব ঘাড় কাত করল। সীতাংশুর মুখের দিকে তাকাল না।

একটু চুপ করে থেকে সীতাংশু আবার বলল, 'তাই তো দেখছিলাম ক'দিন ধরে, জঙ্গলের ভেতর কোথাও কালাকে ছেড়ে দিয়ে চলে আসার উপায় ছিল না, সঙ্গে সঙ্গে তোর পিছু নিয়েছে।'

'এত ভালবাসত তোকে, আর তুই ওকে ওই ঢিবিটার ওপর একলা ফেলে এলি?'

'একলা থাকবে কেন।' এবার মাধব সরাসরি দিদির চোখের দিকে তাকাল।

পরিবার কল্যাণ পরিকল্পনার উদ্দেশ্য কি?

এটা হল এমন একটা ব্যবস্থা যাতেঃ

- কত বৎসর বাদে আপনার ক'জন ছেলেমেয়ে হলে ভাল হয় তা আপনি নিজেই স্থির করতে পারেন।
- আপনার পত্নীর স্বাস্থ্য ভাল রাখতে পারেন।
- আপনার সন্তানদের শিক্ষা ও স্বাস্থ্যরক্ষা ও তাদের ভালভাবে মানুষ করার দিকে বেশী দৃষ্টি দিতে পারেন।
- কোনরূপ দুশ্চিন্তা বা ভয় না করে আপনার বিবাহিত জীবন উপভোগ করতে পারেন।
- বন্ধ্যাত্ব নিবারণের চিকিৎসা গ্রহণ করতে পারেন।

সুখী ও স্বাস্থ্যোজ্জ্বল পরিবার গঠনের জন্য জন্মনিয়ন্ত্রণপদ্ধতি ব্যবহার করে আপনার পরিবারকে ছোট্ট ছিমছাম ও সুন্দর করে গড়ে তুলুনঃ

পুরুষদের জন্য : কনডোম।
স্ত্রীলোকদের জন্য : ডায়াফ্রাম ও জেলী, ফোম টেবলেট, জেলী ও ক্রীম, লুপ।
উভয়ের জন্য : অস্ত্রোপচার

অনেক রকম পদ্ধতিতে 'জন্ম নিয়ন্ত্রণ' করা যায়। আপনি ইচ্ছানুযায়ী সেগুলোর মধ্যে যে কোন একটি বেছে নিতে পারেন।

বিনামূল্যে পরামর্শ ও সেবার জন্য যে কোন হাসপাতাল বা স্বাস্থ্যকেন্দ্রের পরিবার পরিকল্পনা বিভাগে যান।

'পশ্চিমবঙ্গ স্টেট হেলথ এডুকেশন ব্যুরো কর্তৃক প্রচারিত'

মরেস্ক

হেক্স্যাগোনাল ওয়্যারড

হ্যামারো রীডেড

শীট গ্লাস

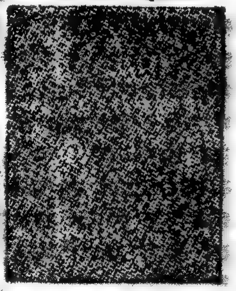
মরক্কো পিনহেড

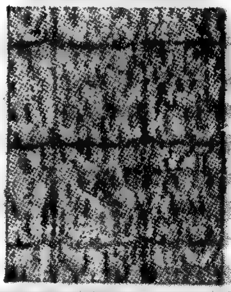
জর্জিয়ান ওয়্যারড

আজকালকার স্থপতিরা গৃহনির্মাণে এইচ পি জি গ্লাস ব্যবহার করেন

আজকের দিনের বাড়ীঘর ও অফিস-কাছারি, কলকারখানা, ইস্কুল ও হাসপাতালে সুদক্ষ ইঞ্জিনিয়াররা সর্বত্রই এইচ পি জি গ্লাস লাগান, কেননা তাঁরা জানেন যে এইচ পি জি গ্লাস উৎকর্ষের নিখুঁত মান বজায় রেখে তৈরী হয়। বিলাতের শতাধিক বৎসরের কাঁচনির্মাণকারী প্রতিষ্ঠান পিলকিংটন ব্রাদার্স-এর কারিগরী কুশলতার সাহায্য নিয়ে হিন্দুস্থান পিলকিংটন গ্লাস ওয়ার্কস এই এইচ পি জি গ্লাস তৈরী করেন।

এইচ পি জি কেনা মানেই নির্ভরযোগ্য ভাল জিনিস কেনা।

হিন্দুস্থান পিলকিংটন গ্লাস ওয়ার্কস লিমিটেড

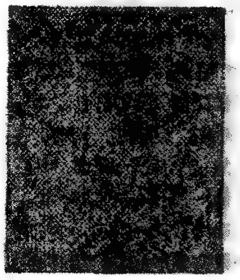
রাফকাস্ট

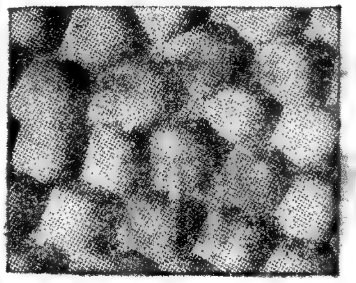
হ্যামার্ড

ম্যানেজিং এজেন্টস
তালুকদার ল' অ্যাণ্ড কোম্পানী প্রাইভেট লিমিটেড
হিন্দুস্থান বিল্ডিংস
৪, চিত্তরঞ্জন অ্যাভেনিউ,
কলিকাতা-১৩

JWTHP 1775A

'ওখানে কালার বাপ-মা ভাই-বোন সবাই আছে, ওর বাড়ি ওটা।'

সীতাংশু অল্প হাসল।

'কিন্তু ওরা তো গর্তের মধ্যে থাকে—কালা কি কাউকে খুঁজে বার করতে পারবে।'

কি ভেবে মাধবও একটু হাসল।

'কালাকে গর্তের ভেতর ঢুকিয়ে দিয়ে এসেছি।'

'দেখুন, দেখুন, ভেতরে ভেতরে কতখানি শয়তানি বুদ্ধি রাখে,' সুখী চিৎকার করে উঠল। 'পাছে কালা তার পিছু নেয় তাই ওকে গর্তের অন্ধকারে ঢুকিয়ে দিয়ে পাজি পালিয়ে এসেছে।'

মাধব ঘাড় গুঁজে হাতের নখ খুঁটতে লাগল। অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে উঠে সুখী ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলছিল। তার থমথমে মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে সীতাংশুর হঠাৎ কেমন ভয় করল।

'তোর ভেতরে কি এক ফোঁটা মায়া-মমতা নেই, এত নিষ্ঠুর এত পাষাণ তুই!' ভাইয়ের মাথার চুল ধরে সুখী ঝাঁকাতে আরম্ভ করল।

'থাক থাক।' সীতাংশু বাধা দিতে গেল।

'আমায় ভালবাসত না কালা, আমি ওটাকে দু'চোখে দেখতে পারতাম না।' মাধব কেঁদে ফেলল।

এক সেকেন্ড স্থির হয়ে শুনল সুখী। তারপর সীতাংশুর দিকে চোখ ফেরাল।

'আমি বলে রাখছি, দেখবেন, বড় হলে হতভাগা কতখানি শয়তান হয় পাষণ্ড হয়—'

সীতাংশু বিমূঢ় হয়ে গেল। যুবতীর দুই চোখে জল টলটল করছিল।

'এই যে পাখির ছানাটাকে আমি পুষেছি, নিজের হাতে চান করাই খাওয়াই আদর করি, ও যদি আমায় নাও ভালবাসে, আমি কি কোনদিন ওকে বনে ছেড়ে দিয়ে আসতে পারব!'

সুখী আর দাঁড়াল না, আর কারো দিকে তাকাল না, আঁচলে চোখ মুছে সীতাংশুর ডেরার দিকে চলে গেল।

'তারপর? এখন কী পুষবি? আর একটা খরগোসের ছানা ধরা হবে রাত্রে?'

মাধব চোখ মুছল না। চোখে জল নিয়ে সজোরে মাথা নাড়ল।

'নুনাঃ, আর খরগোস ধরব না, ধলার মতন বাচ্চা আর ওখানে নেই, সব কটা বদমাস।'

সেই ধলা, ধলার স্মৃতি এখনও তা হলে কিশোরের মন থেকে একেবারে মুছে যায় নি। সীতাংশুর ভাল লাগল। 'তা হলে এখন কী পোষা যায়?' মাধবের চোখ দুটো দেখল সে। দখিনের বাদামগাছটার ওপিঠে বেঁকে গিয়েছে সূর্যটা কত তাড়াতাড়ি পশ্চিমদিকে এগোচ্ছে। শীতের বেলা, কতটুকু তার পরমায়ু। শুকনো খরখরে হাওয়ায় গলগল করে শীত নেমে আসছে।

দুবার ঢোক গিলে গলার ভিতরটা পরিষ্কার করে, নিয়ে মাধব বলল, 'এবার একটা উদ ধরে পুষব।'

তার মানে ভোঁদড়। সীতাংশু অবাক হয়ে কিশোরের মুখটা দেখতে লাগল হাসি পেল তার। কিন্তু হাসল না। ছেলেমানুষ, কী অদ্ভুত এক-একটা ঝোঁক চেপে বসে মাথায়।

যেন হাসি লুকোতে সীতাংশু ঘাড় ঘুরিয়ে পিছনে তাকাল। একটা ধোঁয়ার কুণ্ডলী ঝাউগাছের পেছন দিয়ে দ্রুত আকাশে উঠে হাওয়ায় হাওয়ায় চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছিল। সুখী উনুন ধরাচ্ছে, সীতাংশু বুঝল।

'উদ কোথায় পাওয়া যাবে শুনি?' গম্ভীর হয়ে মাধবের দিকে তাকাল সে।

'হেই নালার ধারে।' মাধব আঙুল দিয়ে দূরের একটা ছাতিমগাছ দেখাল। 'ওখানে বেতজঙ্গলে উদের বাসা আছে, আমি কাল দেখে এসেছি।'

কত ঝাড়জঙ্গলে যে ছেলেটা ঘুরে বেড়ায়। সীতাংশু চিন্তা করল। পাহাড়ি নালার ধারে বেতঝোপ আছে কি না সে মনে করতে পারল না। তবে সেই নালার ওপর বাঁশের সাঁকোর ছবিটা তার চোখের সামনে ভেসে উঠল। ঐ সাঁকো পার হয়ে কতবার সে রাণীরবাগ গেছে। রাণীরবাগের ডাক্তার যখন মোটরবাইক চেপে এদিকে আসে তখন মাঝপথে ঐ নালার জন্য গাড়ি থেকে নেমে যায়। দু'চাকার গাড়িটাকে হাঁটিয়ে নিয়ে সাঁকো পার হওয়া ছাড়া উপায় থাকে না।

'তবে ছাতিমগাছের কাছে তো নালা নয়। ওই রাস্তা ধরেই অবশ্য এগোতে হবে।' সীতাংশু বিড়বিড় করে বলল, 'ছাতিমগাছ পেছনে রেখে আরও এক মাইল হেঁটে গেলে তবে সেই পাহাড়ি খাত।'

সীতাংশু মাধবের দিকে ঘাড় ফেরাল।

'কখন যাবি সেখানে?'

'আমি এখনি চলে যাব।' উৎসাহে কিশোরের চোখ দুটো জ্বলে উঠল।

'দূর পাগলা!' সীতাংশু শব্দ করে হাসল। 'আমিও যে যাচ্ছি তোর সঙ্গে। খাওয়াদাওয়া করে দুজন একসঙ্গে বেরিয়ে পড়ব।'

উৎসাহ বেড়ে গেল মাধবের। এবার দাঁত ছড়িয়ে হেসে সে ঘাড়টা কাত করল। দু'গালে তখনও জলের দাগ চিকচিক করছে।

সীতাংশু আর একজনের চোখের জলের কথা ভাবল। এই মাত্র আঁচল দিয়ে চোখ মুছে সে ঘরে চলে গেল। তার ভয়ানক হাসি পাচ্ছিল ছবিটা মনে পড়ে। মাধবের দিদি হাতে-নাতে ধরা পড়ে গেছে। 'ভালবাসার ধারে-কাছেও আমি নেই, ভাল লাগতে পারে—এই পর্যন্ত, দেখবেন, যখন ভাল লাগবে না খাঁচা খুলে পাখিটাকে একদিন জঙ্গলে উড়িয়ে দেব, কালা কোলে উঠতে চাইলে কানে ধরে কোল থেকে নামিয়ে দেব।' কবে বলেছিল কথাটা সে, কাল? পরশু? যেন সীতাংশু এর মধ্যেই ভুলে গেছে। কিন্তু কথাটা মনে গেঁথে আছে।

'তাই বলো,' সীতাংশু আবার মনে মনে বলল, 'তোমার সবটাই মরুভূমি না, ভালবাসার ফল্গুধারা হৃদয়ের গভীরে লুকানো রয়েছে, মাথাচাড়া দিয়ে ওপরে উঠতে চাইলেই জোর করে চাপা দিতে চাইছ, তাই নিষ্ঠুরতার ভান, তোমার অমন দীঘির মতন কালো ঠাণ্ডা চোখ আচমকা ইস্পাতের মতন কঠিন হয়ে ওঠে।'

আজ? পোষা খরগোসের বাচ্চাটাকে ভাই বনে ছেড়ে দিয়ে এসেছে শুনে যুবতী চোখের জল লুকোতে পারল না। কেঁদে ফেলল।

সীতাংশু বড় তৃপ্তিবোধ করছিল।

[ক্রমশঃ]

প্রকাশিত হল

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত-র নবতম উপন্যাস

চলে নীল শাড়ি

পাপ হতে প্রেমে, শিলা হতে শিল্পে উত্তরণের কাহিনী

দাম : দশ টাকা

ভারবি ॥ ২৬ কলেজ স্ট্রীট (দোতলা), কলকাতা-১২

পূর্ব পাকিস্তানের নাটক

রূপতনু সেনগুপ্ত

কোনো দেশের নাট্যপ্রবাহে প্রাণ ও বেগ সঞ্চার করে তাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হলে চাই : (১) উপযোগী রাষ্ট্রীয়, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থা; (২) কুশলী ও ব্রতশীল নাট্য-শিল্পী ও নাট্যকর্মী; (৩) অতীতের নাট্য অভিজ্ঞতা।

বলা বাহুল্য পূর্ব পাকিস্তানে উপরোক্ত অবস্থাগুলির প্রায় কোনটাই ছিল না। নাটকের বিকাশের পরিস্থিতি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন : 'তটের সঙ্গে তরঙ্গের মৃদু সংঘাতে যেমন নদীর জলে ঐকতান বেজে ওঠে, তেমনি শ্রোতা ও লেখকের মধ্যে একাত্মবোধ থেকেই উচ্চাঙ্গ নাটকের জন্ম হয়।'

এই সর্ত পূরণে সাহায্য করল ভাষা-আন্দোলন। বাংলা ভাষার অধিকার রক্ষার সংগ্রাম পূর্ববঙ্গের জীবনে, সাহিত্যে, নাটকে, সঙ্গীতে ও চারুশিল্পের বিকাশের পথে কিছুটা বাধা ভেঙে দিয়েছে। এই গণজাগরণের দর্পণে পূর্ববঙ্গের বাঙালীরা দেখতে পেয়েছে নিজেদের অবস্থান। বুঝতে পেরেছে সাহিত্য, নাটক, সঙ্গীত ও শিল্প জাতির প্রাণশক্তির প্রকাশ; এবং ভাষা ও গণতান্ত্রিক অধিকার তার মূল চালিকাশক্তি। তাই ভাষার সংগ্রাম পূর্ববঙ্গে এক নবজীবন-চেতনা।

দেশ ভাগের পূর্বে নাটক অনুশীলনের মূল কেন্দ্র ছিল কলকাতা। বাংলা নাটকের যা কিছু বিকাশ কলকাতাতেই হয়েছে। দেশভাগের পরে নাট্যকার ও অভিনেতারা সকলেই কলকাতাতেই রয়ে গেলেন। সুতরাং পূর্ববঙ্গে স্থায়ী নাট্যমঞ্চের কথা তো ওঠেই না, যোগ্যতাসম্পন্ন নাটকের দলও ছিল না বললেও চলে। প্রতিক্রিয়াশীল শাসকশ্রেণীর দাপটে মাতৃভাষার মর্যাদা যেখানে ক্ষুণ্ণ এবং ব্যক্তিস্বাধীনতা বিপন্ন হতে চলেছিল—সেখানে নাটকের বিকাশের গতি স্বচ্ছন্দ হতে পারে না।

বাংলা নাটক আর পূর্ব পাকিস্তানের নাটক এই দুয়ের ভিন্ন সত্তা নির্ণয় করা কঠিন। দেশ ভাগের পূর্বে একই রূপে ও প্রকৃতিতে ছিল বাংলা নাটক। দেশ ভাগের পরে পূর্ব পাকিস্তানের নাটক নামে নব পরিচিতি লাভ করলেও মূল থেকে তাকে স্বতন্ত্র করা সম্ভব নয়।

ভাষার সংগ্রামের পর পূর্ব পাকিস্তানে নাটকের অনুশীলন বহু গুণ বেড়েছে। পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে তুলনীয় না হলেও পূর্ববঙ্গের জীবনে এই নাট্য-বিকাশ একটা বিস্ময়ের সৃষ্টি করতে পারে। দেশ ভাগের প্রথম কালে অভিনয় করা হয়েছে কাজী নজরুল ইসলাম (আলেয়া ও ঝিলিমিলি এবং লোক-কাহিনী ভিত্তিক মধুমালা), মন্মথ রায়ের মহুয়া, রমেশ গোস্বামীর কেদার রায়, শাহাদাৎ হোসেন, ইব্রাহিম খাঁ, বন্দে আলি মিঞা প্রমুখের ঐতিহাসিক নাটক। সামাজিক নাটক অভিনয় করার শক্তি সামর্থ্য তখন ছিল না বলা চলে। ভাষা সংগ্রামের পরে অবস্থা একেবারে পরিবর্তন হয়ে যায়। ১৩৭০ সাল পর্যন্ত এর সমীক্ষায় প্রকাশ : এই ক'বছরে ঐতিহাসিক নাটক প্রকাশিত হয়েছে—২২টি, আর সামাজিক নাটক প্রকাশিত হয়েছে ৭০টি, লোককাহিনী ভিত্তিক ও অন্যান্য ৮টি। ঐতিহাসিক নাটকের তুলনায় সামাজিক নাটকের এই সংখ্যাবৃদ্ধিতে প্রমাণ করে নাট্যকারের শিল্প-চিন্তা হয়েছে বাস্তব-মুখী ও সমস্যাকেন্দ্রিক। কিন্তু পূর্ব-বঙ্গের নাট্য-সমালোচকরা এতে সন্তুষ্ট নন। পূর্ব পাকিস্তানের নাটক প্রসঙ্গে নাট্যকার আসকার ইবনে সাইখ লিখেছেন : 'আমরা এতদিন যে সব নাটক লিখেছি সাধারণভাবে সেগুলোর বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, অধিকাংশেরই আঙ্গিক, অভিনয় ও মঞ্চরীতি পুরনো ও চিরাচরিত। সেগুলোর কাহিনী, চরিত্র, সংলাপ ও দৃশ্য-পরিকল্পনা আমাদের পথ নাট্য অভিজ্ঞতারই ছাপ বহন করে। দেশে, সমাজে, অত্যাচার-অবিচার চলছে। ঘুষখোর, মুনাফাখোর, মামলাবাজ, ফতোয়াবাজ নিরপরাধ জীবনকে অতিষ্ঠ করে তুলেছে। তরুণ নায়ক এসব অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত। একটি ষোড়শী প্রেম তাকে উৎসাহ যোগায়। অনেক কষ্টের পর সে জয়ী হয়।...এই হলো নাটকের মোটামুটি কাঠামো।...... সমগ্র নাটক যেন সংলাপে রচিত পুরনো আঙ্গিকের এক বাংলা উপন্যাস। আমাদের রচিত বেশির ভাগ সামাজিক নাটকের এই মোটামুটি পরিচয়।'

ব্যতিক্রম অবশ্য আছে। কিছুসংখ্যক নাট্যকার নতুন আঙ্গিক নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছেন। এঁদের মধ্যে নূরুল মোমেন, সৈয়দ আলি আহসান, মুনীর চৌধুরী, ফররুখ আহমদ, সিকান্দার আবু জাফর, সাঈদ আহমদ, আসকার ইবনে সাইখ প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। নাটক প্রযোজনার ক্ষেত্রে ড্রামা সার্কেল, সমকাল, সাতরঙ নাট্যসংস্থা উল্লেখযোগ্য সাংস্কৃতিক-চিন্তার পরিচয় দিয়েছেন। নূরুল মোমেনের একটিমাত্র চরিত্র-নির্ভর নাটক 'নেমেসিস', সৈয়দ আলি আহসানের 'কোরবানী' 'সোহরাব রুস্তম' মুনীর চৌধুরীর 'কবর', সিকান্দার আবু জাফরের 'শকুন্ত-উপাখ্যান', সাঈদ আহমদের 'কালবেলা', ফররুখ আহমদের 'নৌফেল ও হাতেম' ইত্যাদি নাটকে আঙ্গিকের বৈশিষ্ট্য রয়েছে। আসকার ইবনে সাইখের বিদ্রোহী পদ্মা, পদক্ষেপ, বিরোধ, দুরন্ত ঢেউ, এপার-ওপার, শওকত ওসমানের তস্কর-

কিস্তিতে ট্রানজিস্টার

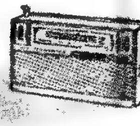

মাসিক ৩০, টাকায় অভঙ্গুর প্লাস্টিক ক্যাবিনেটে 'ন্যাশনাল' পোর্টেবল ৩ ব্যান্ড অল ওয়ার্ল্ড ট্রানজিস্টার।

Jagson Agencies (W.B.M.-88)
P.B. 1212, Delhi-6.

শংকর, এতিমখানা ইত্যাদিতে বক্তব্যের বৈশিষ্ট্য রয়েছে। পূর্ববঙ্গে যাঁরা নাট্যকার হিসাবে পরিচিত হয়েছেন এবং যাঁদের নাটক অভিনীত হয় তাঁদের মধ্যে আরো আছেন ঃ ফররুখ শিয়ার, মোজাহারুল ইসলাম, বসিরুদ্দিন, ইব্রাহিম খাঁ, ওবায়েদুল হক প্রমুখ। তবে অনুবাদ এবং বুদ্ধিদীপ্ত নাটক রচনার জন্য বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করেছেন আসকার ইবনে সাইখ, মুনীর চৌধুরী প্রমুখ। অনুবাদের ক্ষেত্রে দু-বছর আগে পর্যন্ত সফোক্লিস, গলসওয়ার্দি, বার্নার্ড শ', ইবসেন, ক্লিফর্ড ওডেটস, আর্থার মিলার পর্যন্ত।

নাটকের বিকাশের জন্য এবং গণমতের বিচারে নাটকের মান নির্ণয়ের জন্য, মানুষকে নাটকমুখীন করার জন্য নাটক প্রতিযোগিতা, নাট্য মওসুম ইত্যাদির প্রয়োজন। এই প্রয়োজন মেটাবার কাজে সর্বাগ্রে এগিয়ে এসেছে বাংলা একাডেমি। ভাষা সংগ্রামের শিক্ষা ও ত্যাগের মধ্য দিয়ে এই একাডেমির জন্ম। বাংলা একাডেমি পূর্ববঙ্গে সাহিত্য, নাটক ও সংস্কৃতি বিকাশের জন্য যা করছে তা অতুলনীয়। একাডেমি একটি নাট্যমঞ্চের প্রতিষ্ঠা করেছে এবং জাতীয় পুনর্গঠন ব্যুরোর সহযোগিতায় নাটক প্রকাশের ব্যবস্থা করেছে। পাকিস্তান আর্ট কাউন্সিল নামক সংস্থা নাটক মওসুমের আয়োজন করে দীর্ঘদিন লাগাতার নাটক অভিনয়ের ব্যবস্থা করেছে। এতে একনাগাড়ে মাসাধিকব্যাপী দর্শকরা প্রায় সব কয়টি ভাল নাটক দেখার সুযোগ পায় এবং নাটকের বিচার করে। এই ধরণের অনুষ্ঠানে নাট্যসম্প্রদায়গুলির যেমন মঞ্চরূপায়ণে সহায়তা করা হয়, তেমন কিছু অর্থাগমও হয়ে থাকে। নাট্য প্রতিযোগিতা মূলক অনুষ্ঠানও হচ্ছে, এবং তাতে পুরস্কারের ব্যবস্থা থাকছে। এছাড়া ড্রামা সার্কল, সমকাল এবং অন্যান্য নাট্য-সংস্থাগুলি প্রায়শ নাটক মঞ্চস্থ করছে। দেশ ভাগের পূর্বে ঢাকাই ছিল প্রধান স্থান, যেখানে বেশি নাটক অভিনীত হত। বর্তমানে ঢাকা, চট্টগ্রাম এবং জেলা শহরগুলিতে কোন না কোন দল নাটক অভিনয় করছে। তবে এখনো ঢাকা বা চট্টগ্রামে কলকাতার মত পেশাদার থিয়েটার ও নিয়মিত নাটক অভিনয়ের ব্যবস্থা হয় নি।

কয়েকটি বিদেশী নাট্যসংস্থাও গত ১৫ বছরে ঢাকায় ও চট্টগ্রামে নাটক পরিবেশন করেছে। বৃটিশ, আমেরিকান নাটকের বেশ কয়েক বছর আগে কলকাতা থেকেও এক নাট্যসম্প্রদায় গিয়েছিলেন এবং তাঁরা আন্তরিক জনসম্বর্ধনা লাভ করেছিলেন। তা ছিল ভাষা-সংগ্রামের ফলশ্রুতি। কিন্তু বাংলা সংস্কৃতিতে ভীত পাকিস্তানের শাসকশ্রেণী পরবর্তীকালে এ পথ একেবারে বন্ধ করে দিয়েছে। পশ্চিম ও পূর্ববঙ্গের মধ্যে নাটক বিনিময় বন্ধ। অথচ দুই দেশের অভিজ্ঞতায় সমগ্রভাবে বাংলা নাটকের আরো উন্নতি হতে পারত; এবং পূর্ববঙ্গে নাট্যশিল্পের সহায়ক হতো। তবে পশ্চিমবঙ্গের কিছু কিছু নাটক অভিনীত হয়ে থাকে।

গত বছর শাসকশ্রেণী রবীন্দ্রনাথের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করার ঔদ্ধত্য প্রকাশ করেছিল। সারা পূর্ব পাকিস্তানে তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ঝড় উঠেছিল। প্রতিবাদে ঢাকায় ও জেলায় জেলায় রবীন্দ্র-নাটক ও সঙ্গীত অনুষ্ঠান আগের চেয়েও বেশি হয়েছে। বর্তমানে রবীন্দ্র-নাটক অভিনয়েও দর্শকের আগ্রহ আরো বেড়েছে।

ভাষা-সংগ্রামের পরবর্তী পনের বছরের মধ্যে পূর্ব পাকিতানে নাটকের বিকাশ উপেক্ষণীয় নয়, বরঞ্চ আশাপ্রদ। বর্তমানে নাট্যরসিকরা জাতীয় নাট্যমঞ্চের দাবি উপস্থিত করেছেন এবং বলিষ্ঠ নাট্য-আন্দোলনের পথ চিন্তা করছেন।

রঙ্গজগৎ

নাটকের ওপর পৌরকর

কলকাতা কর্পোরেশন আবার নাটকাভিনয়ের প্রতি পৌরকর ধার্য করেছে। এই সংবাদ ইতিপূর্বে সব পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। কর্পোরেশনের আয় বাড়াবার জন্য বহু প্রকার ব্যবস্থার মধ্যে নাটক-কর অন্যতম ব্যবস্থা। সাধারণ নাট্যরসিকরা এতে বিস্মিত হবেন, তাঁরা হয়ত ভেবে কূল পাবেন না নাটকের ওপর কর আরোপ করার মত দুর্বুদ্ধি দেখে। এতদিন পর্যন্ত আমরা শুনে 'নাট্যালয়ে জাতির পরিচয়'। আমরা জানি সাহিত্য এবং নাটকের স্বাধীন বিকাশেই জাতির মানসিক গঠন এবং চেতনা প্রকাশ পায়। নাটকাভিনয়ের সুযোগ-সুবিধা না থাকলে সাহিত্যের বিকাশও যথাযথভাবে হয় না। নাটককে নিছক আনন্দ উপভোগের মাধ্যমরূপে গ্রহণ করার মত চিন্তা আজকাল কেউ করে না। সকলেই জানেন গণশিক্ষার ক্ষেত্রে নাটকের ভূমিকা বিরাট। এ কারণে রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ মনীষীরা নাটক লিখেছেন এবং নিজেরা অভিনয় করেছেন। নাটক অভিনয় করে জনমনে তাঁরা একটা আদর্শের বাণী উপস্থিত করতে চেয়েছেন। নাটকের এই সামাজিক ভূমিকার গুরুত্ব কেউ অস্বীকার করেন না।

কিন্তু কলকাতা কর্পোরেশন দেখা যাচ্ছে এত আদর্শ, জনশিক্ষা ইত্যাদি নিয়ে মাথা ঘামাতে চান না। তাঁরা বোঝে কর্পোরেশনের টাকা দরকার—সুতরাং যেখান থেকে পায় আদায় কর। তাতে নাটক চুলোয় যাক, মানুষের আনন্দ উপভোগ ও জনশিক্ষা ব্যাহত হোক। তাতে কি আসে যায়। মেয়র, কাউন্সিলার হবার ব্যবস্থা থাকলেই যথেষ্ট।

যাঁরা নাটকের ওপর কর ধার্য করেছেন তাঁরা ভুলে গেছেন জাতির সাংস্কৃতিক অগ্রগতিতে বাধা সৃষ্টি করলে—সে বাধা তাঁদেরও পেছনে টেনে নামাবে। উল্লেখযোগ্য যে, ইতিপূর্বে কর্পোরেশন নাটকের পোস্টারের ওপরও কর ধার্য করেছিল, আরো কয়েকবার করের ভয় দেখিয়েছে। কিন্তু নাটকের দলগুলির ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম এবং নাট্যরসিকদের তীব্র প্রতিবাদে প্রতিবারই তাদের পেছনে হটতে হয়েছে। আরোপিত কর প্রত্যাহার করতে হয়েছে।

সুতরাং এবার প্রতিবার নাটক অভিনয়ের জন্য দশটাকা কর (এবং রবীন্দ্রভারতী অনুমোদিত না হলে চল্লিশ টাকা) যে নাটকের দলগুলি মেনে নেবে আমরা তা মনে করি না। মেনে নেওয়া উচিত নয়। প্রসঙ্গত আমাদের মনে হচ্ছে কয়েকজন কাউন্সিলারের কথা। যাঁরা মাঝে মাঝে অপেশাদার মঞ্চে উঠে অভিনয় করেন। এই কর ধার্যের সময় তাঁরা কি ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন জানি না। অন্তত তাঁদের বিরোধিতার কোন প্রকাশ আমরা পত্র-পত্রিকায় দেখি নি।

—সুজন

মঙ্গল চক্রবর্তী পরিচালিত 'আলেয়ার আলো' ছবিতে জ্যোৎস্না বিশ্বাস

চিত্রসমালোচনা

ছোট্ট জিজ্ঞাসা

'ছোট্ট জিজ্ঞাসা' ছবির কাহিনী একটি চার বছরের মাতৃহারা শিশুর মনের জিজ্ঞাসাকে কেন্দ্র করে। জন্মের কয়েক মাস পরে মাতৃহারা শিশুটিকে তার পিতা সর্বক্ষণের সঙ্গী হয়ে মানুষ করেছে। চার বছর বয়সে তার মনে প্রশ্ন জাগলো সবার মা আছে—তার মা নেই কেন? কোথায় তার মা। নানা জনের কাছে নানা জিজ্ঞাসা, ক্রমে মাকে ফিরে পাবার ইচ্ছায় সে ব্যাকুল হয়ে ওঠে। স্বপ্ন দেখে, সে তার মা'র সঙ্গে দেখা করেছে। বিমানবন্দরে অভ্যর্থনাকারিণী যেমন দেখতে—তেমনই তার মা। একদিন দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ি গিয়ে তেমনি দেখতে এক মহিলাকে দেখে সে মা মনে করে সেই মহিলার গাড়িতে উঠে বসে থাকে চুপচাপ। গাড়ির মধ্যে শিশুটিকে মহিলা আবিষ্কার করে বিস্মিত হয়ে যায়। ছেলেটি তাকে মা বলে জড়িয়ে ধরে। তারপরে মহিলা তাকে বাড়ি নিয়ে আসে। সেই থেকে ছেলেটি মহিলার কাছ ছাড়া হয় না। এবং তার এই মাকে খুঁজে পাওয়ার মধ্যে সেই মহিলা স্থায়িভাবেই তার মা হলো।

কাহিনীটি খুবই হৃদয়স্পর্শী। অত্যন্ত কোমল ও সূক্ষ্ম মনের প্রকাশে এই কাহিনীটি রূপলাভ করেছে গতানুগতিক হিন্দীছবির মোটা দাগে। ফলে হিন্দীর অভিজ্ঞ পরিচালনা উপদেষ্টার হাতে পড়ে চার বছরের শিশু কালীবাড়ি থেকে অনেক দূরে এসে গাড়ির দরজা খুলে লুকিয়ে থাকবার মত চিন্তাশক্তি লাভ করেছে। বাবাকে দিয়ে মাকে খাইয়ে দেবার কথা বলেছে। এবং তার আবিষ্কৃত মা গীতাকে তার বাবা সুবিমল একটা বক্তৃতা দিয়েই রাজী করিয়ে নিল তার স্ত্রী হিসেবে তার বাড়িতে থেকে যেতে। একটা শিশুকে কেন্দ্র করে দুজনার মধ্যে ধীরে ধীরে প্রণয়ের উন্মেষে যা স্বাভাবিক ছিল—হিন্দী অভিজ্ঞের কর্কশ হাতে পড়ে তা কেবলমাত্র রাজী অথবা অরাজীর ব্যাপারে পরিণত হয়েছে। প্রেম জিনিসটা ওরা তেমন বোঝে না যে, যতটা মুনাফা বোঝে। তথাপি একটা উপভোগ্য ছবি হিসাবে 'ছোট্ট জিজ্ঞাসা' জনপ্রিয় হবে। বিশেষ করে মফস্বলে এই ছবিটি বিশেষ সমাদৃত হবে তার ভাবপ্রবণ কাহিনীর জন্য। বিভিন্ন আঙ্গিক রচনার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের জুতা আবিষ্কার কবিতার রূপক নাট্যরূপায়ণ অংশটি উল্লেখযোগ্য।

ছবির অভিনয়াংশে শিশু বুমবার চরিত্রে প্রসেনজিৎ পরিচালকের নির্দেশকে এত সুন্দর ও সার্থকভাবে প্রকাশ করেছে যে তার তুলনা হয় না। প্রত্যেক দর্শকের মনকে শিশু প্রসেনজিৎ অভিভূত করবে। এই শিশু চরিত্রটির সার্থকতার জন্যই ছবিটি ভাল লাগতে পারে। গীতার চরিত্রে মাধবী মুখার্জী মোটামুটি সার্থক হলেও কয়েকটি বিশেষ মুহূর্তে পরিচালকের দোষে তাঁর কোন অভিব্যক্তি ছিল না। সুবিমলের ভূমিকায় অভিনয় করেছেন ছবির প্রযোজক বিশ্বজিৎ। অন্যান্য ভূমিকায় সুরুচি সেনগুপ্ত, হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায়, জ্ঞানেশ মুখার্জী, গীতা দে, অনুপকুমার প্রমুখ।

ছবির চিত্রগ্রহণের কাজ এবং সম্পাদনা যথেষ্ট কৃতিত্বপূর্ণ।

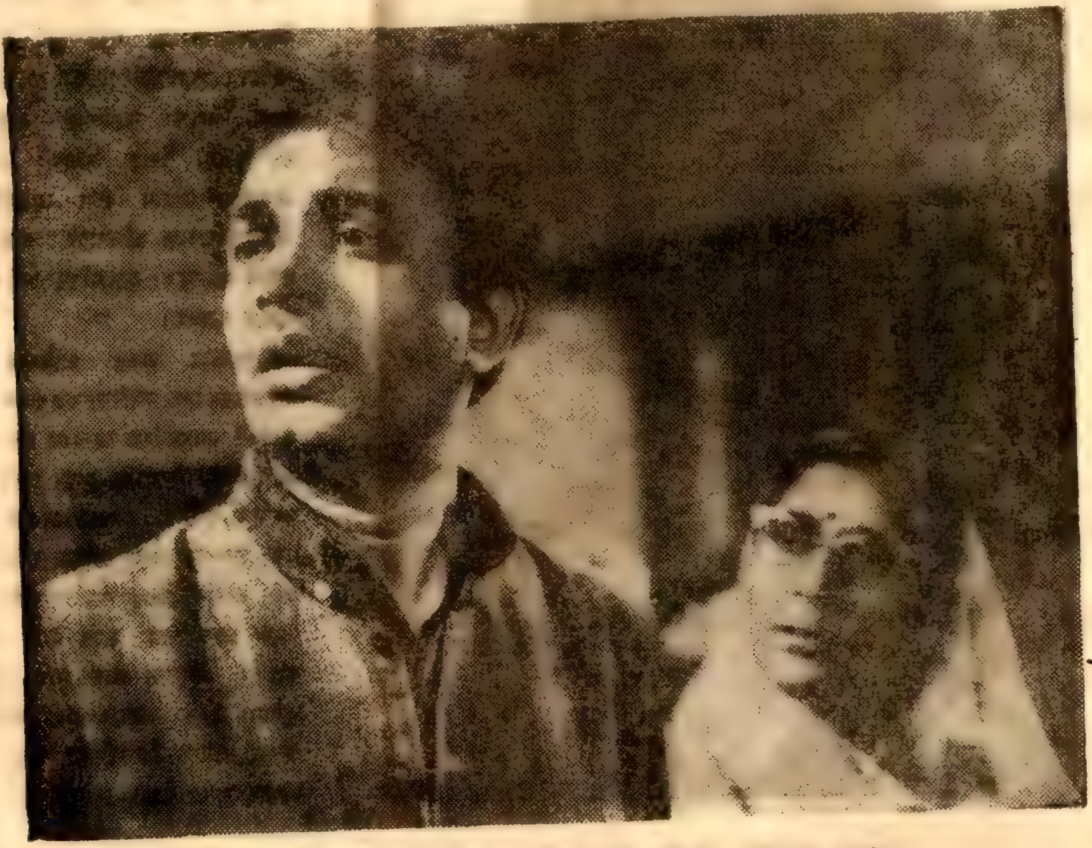

হীরেন নাগ পরিচালিত 'সবরমতী' ছবিতে উত্তমকুমার ও পদ্মা দেবী

নাটকের কথা

বেনজ়

রঙ্গশ্রী প্রযোজিত 'বেনজ়' গত ৭ই জানুয়ারী হতে থিয়েটার সেন্টারে অভিনীত হচ্ছে। নাটকটি রচনা করেছেন প্রখ্যাত নাট্যকার রমেন লাহিড়ী। রমেন লাহিড়ীর অনেক নাটক ইতিপূর্বে আমাদের দেখার সুযোগ হয়েছে, এবং তাঁর কয়েকটি নাটক রসোত্তীর্ণতায় সার্থক; নাট্যরসিকজনকে তৃপ্তিদান করেছে। ইতিপূর্বে অভিনীত তাঁর নাটকগুলি দেখে আমরা যেরূপ সন্তোষ লাভ করেছি—'বেনজ়'কে ঠিক সে পর্যায়ে নিতে পারছি না।

এক নির্মল মন সৈনিক বেনজ় রণক্ষেত্রের বীভৎসতা, তার সহকর্মীর নির্মম মৃত্যুদৃশ্য দেখে শিউরে উঠেছিল, নিজের অজ্ঞাতে পথ চলতে চলতে সে ফ্রন্টের বাইরে চলে গিয়েছিল। রণক্ষেত্র থেকে পলায়নের অভিযোগে তার বিচার হয়। বিচারের সময় তার মানসিক অবস্থা প্রকাশ পায়। একদিকে যেমন রণক্ষেত্রের বীভৎসতা তার নির্মলমন সহ্য করতে পারছিল না, সে সময় সে খবর পেয়েছিল তার বিশ বছরের অনুপস্থিতিতে তার স্ত্রী ঘর ছেড়ে চলে গেছে। অথচ গভীরভাবে ভালবাসে সে তার স্ত্রীকে। বিচারের সময় জানা যায় বেনজ় ভীরু বা কাপুরুষ নয়, আসলে রণক্ষেত্রের নিষ্ঠুরতা, যে নিষ্ঠুরতায় কেবল প্রাণহানি ঘটে না, প্রেম ও মমতাকে হত্যা করে, প্রিয়জন থেকে প্রিয়জনকে দূরে সরিয়ে নেয় এমন পরিস্থিতি ও পরিবেশ থেকে তার অবচেতন মন মুক্তি চেয়েছে। নির্মল আকাশের নিচে উদ্বেগহীন মন নিয়ে সে বাঁচতে চেয়েছে। কিন্তু বিচারে তার প্রাণদণ্ডাদেশ হয়।

নাট্যকারের মনে হয়ত যুদ্ধবিরোধী নাটকের কথাই ছিল। কিন্তু বাহ্যত নাটকটি হয়েছে রণক্ষেত্র বা ফৌজ থেকে পলায়নবিরোধী। যুদ্ধবিরোধী নাটকের সার্থকতা নিশ্চয় আছে, কিন্তু ফৌজ থেকে পলায়ন বা রণক্ষেত্র থেকে পলায়ন বিরোধিতায় নাটকের কোন ব্যাপক আবেদন আছে মনে হয় না। এ দেশ বা সমাজের কোন সমস্যাই নয়, ব্যক্তিগত ব্যাপার। যদি বিচারে প্রাণদণ্ডাদেশ না দেওয়া হত, অথবা বিচারকে যথেষ্ট আমলাতান্ত্রিক ও মানবতাহীন অনুষ্ঠানমাত্র করে দেখান হত, তা হলে হয়ত নাটকে ফৌজত্যাগ-এর ওপর এত প্রাধান্য আরোপিত হত না। পাদ্রীর কার্যকলাপ ইত্যাদিও আচারসর্বস্ব ব্যাপার হিসাবে কিছুটা শ্লেষের দৃষ্টিতে দেখান উচিত। নতুবা সেই দলত্যাগ বা ডেজার্সনের ওপরই জোর পড়ছে। অবশ্য নাট্যকারের যদি অন্তর্নিহিত ইচ্ছা থাকে ডেজার্সন বিরোধিতা —তবে যথার্থভাবেই তা প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু এরূপ আবেদন দর্শকমনে বিশেষ রেখাপাত করবে না—দেশ বা সমাজগত গভীরতা নেই বলে।

নাটকের শেষ দৃশ্যটি খুবই ব্যঞ্জনাময় হয়েছে। এ দৃশ্যে স্বপ্ন ও বাস্তবের

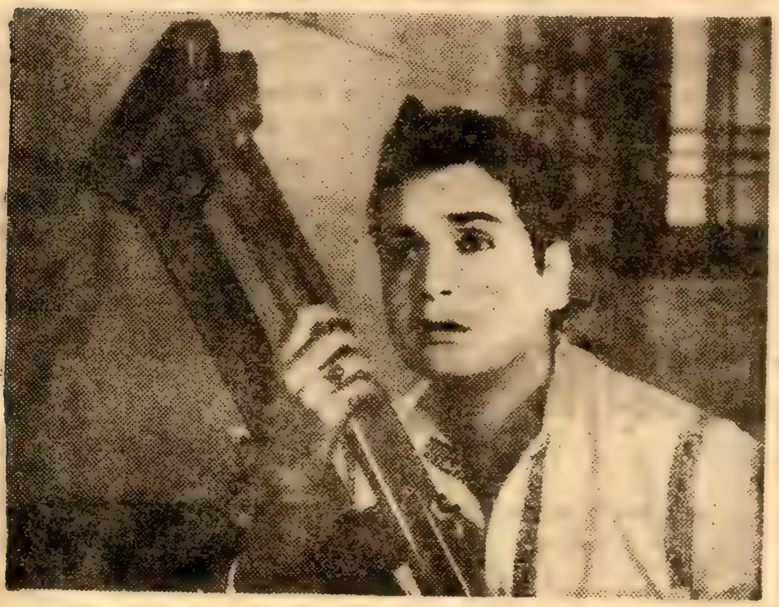

'ছোট জিজ্ঞাসা' ছবিতে বিশ্বজিৎ

নির্মল চৌধুরী পরিচালিত 'চারণকবি মুকুন্দদাস' ছবিতে সবিতাব্রত, শিবেন ব্যানার্জী এবং সমরকুমার

সমন্বয়মূলক দৃশ্য পরিকল্পনা চমৎকার। এখানে আলোর কাজও প্রশংসনীয়। অভিনয়ে বেনজয় চরিত্রে রমেন লাহিড়ী যথাযথভাবে এক সরল মনের যুবক ও সৈনিক চরিত্রের রূপ নিয়েছেন। ইন্দুর চরিত্রে সর্বাণী দে এবং ক্যাপ্টেন শর্মা রূপে নিশীথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রশংসনীয়।

স্টুডিও খবর

অগ্নিযুগের কাহিনী

শ্রীমতী মঞ্জুশ্রী বসু প্রযোজিত দি নিউ এরা পিকচার্সের প্রথম নিবেদন "অগ্নিযুগের কাহিনী" ছবির চিত্রগ্রহণ দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে। ছবিটির কাহিনী রচনা করেছেন লোকসভা সদস্য বীরেন রায়। চিত্রনাট্য রচনা করেছেন—বিপন্নপালক বসু। পরিচালনা করছেন: ভূপেন রায়। চিত্রগ্রহণ ও সম্পাদনায় আছেন যথাক্রমে—অনিল গুপ্ত ও অমিয় মুখার্জী। গোপেন মল্লিক ছবিটির সুরকার। নেপথ্যে কণ্ঠদান করেছেন—সন্ধ্যা মুখার্জী, মান্না দে, অশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায় ও মঞ্জুশ্রী বসু।

চরিত্র চিত্রণে আছেন মাধবী মুখার্জী, সুলতা চৌধুরী, বিকাশ রায়, অজয় গাঙ্গুলী, দিলীপ রায়, মণি শ্রীমানী, শিপ্রা চক্রবর্তী, অনিল মুখার্জী, স্বপনকুমার, সমর চ্যাটার্জী, সুখেন দাস ও অজিতেশ ব্যানার্জী।

মাত্র ২০৲ টাকায় ট্রানজিস্টার

অল ওয়ার্ল্ড ৩ ব্যান্ড সুলভতম ট্রানজিস্টার সমবায় ভিত্তির মাধ্যমে মাত্র ২০৲ টাকায় পাঠানো হয়। ইংরেজীতে আপনার অর্ডার বুক করুন।

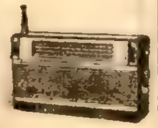

Ceylon Traders (WBC-22)
Post Box 1257, Delhi-6.

সংবাদিকী

গিরীন সঙ্গীত সংসদের বার্ষিক সম্মেলন

গত ১০ই ফেব্রুয়ারী "গিরীন সঙ্গীত সংসদের" প্রথম বার্ষিক সঙ্গীত সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল।

এই অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করেন সর্বশ্রী পরেশ দেব, রথীন সেন, শম্ভু পাল, জ্যোৎস্না দাস, রণজিৎ দে, সন্তোষ চক্রবর্তী, অলোক সরকার, অনুমা সেন, মঞ্জরী চক্রবর্তী, সঞ্চিতা চক্রবর্তী, সুমিতা রায়চৌধুরী, গৌরীন চক্রবর্তী ও শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ।

সংগতে অংশ গ্রহণ করেন সুনীল ব্যানার্জী, তপু রায় ও পটু চক্রবর্তী।

বিশেষ উল্লেখযোগ্য "গিরীনদাদুর ৫ বৎসরের শিশুকন্যা নেলী চক্রবর্তী অপূর্ব সংগীত পরিবেশন করে।

ওস্তাদ চিন্ময় লাহিড়ীর সুযোগ্য ছাত্র ও ছাত্রী যথা রণজিৎ দে ও জ্যোৎস্না দাসের গান বহুদিন উপস্থিত শ্রোতৃবৃন্দের মনে থাকবে। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন "গিরীন সঙ্গীত সংসদের" সম্পাদক শ্রীরঘুবীর দাস।

সিনে সেন্ট্রাল-ক্যালকাটা

ফেব্রুয়ারী মাসের শেষের দিকে সিনে সেন্ট্রাল তিনটি পোলিশ ছবি দেখাবার ব্যবস্থা করেছে। এই তিনটি ছবি যথাক্রমে 'নাইট ট্রেন', 'সাইলেন্স', 'হাউ টু বি লাভড'।

দল ভাঙা-গড়ার খেলা

দল ভাঙা-গড়ার খেলায় এখন মত্ত বাংলা দেশ।

নিজের ঘর সামলানোই দায়। কে যে কখন কোথা দিয়ে দল ছুটকের তালিকায় নাম লেখাবেন তার স্থিরতা নেই। ভুবন-ভরা আজ লোভের ফাঁদ। আর প্রতিনিয়ত স্বার্থান্বেষীরা মৌমাছির মতো গুঞ্জন করে সেই ফাঁদের দিকে টেনে নিয়ে যেতে চাইছেন অতি-প্রয়োজনীয়দের। যাঁদের পেলে শক্তি বাড়বে দলের, সামর্থ্য বাড়বে—আর সমর্থকদের মনে আসবে উৎসাহের জোয়ার।

উৎসাহের সেই জোয়ারে আজ আর লাভ-ক্ষতির খতিয়ান নেই। আছে শুধু দল ভাঙা-গড়ার খেলায় লাভবান হবার প্রচেষ্টা। ক্ষতি সইবে না, দলের ক্ষতি এড়িয়ে লাভের দিকেই আজ শুধু নজর সকলের। আর আজ এই লাভ-লোকসানের পাল্লায় লাভের দিকটা ভারী করার জন্যে যে কোন কাজই করতে দল-নেতারা প্রস্তুত। প্রস্তুত তাঁরা, যাকে প্রয়োজন, তাকে খুন পর্যন্ত করতে। দরকার হলে তাঁরা হয়তো আরো অনেক কিছুই করতে রাজী।

তাই আজ কলকাতা তথা বাংলা দেশে শুধু চলেছে টাকার খেলা। খোলামকুচির মতো টাকা শুধু উড়ছে আর উড়ছে। 'টাকা মাটি, মাটি টাকার' যে এতো দর তা আর আগে কে জানতো। রাশি-রাশি টাকা যেন পাগলা ঘোড়ার মতো এর পেছনে ওর পেছনে শুধু ছুটেই চলেছে। এ ছোটার যেন আর বিরাম নেই। এমন কি এই ছোটার যে মর্মান্তিক ফলাফল তার দিকেও নজর দেবার মতো এতোটুকুও অবসর নেই তাঁদের, যাঁরা আজ শুধু পাগলা হাওয়ার অনাগত বসন্তের নেশায় বুঁদ হয়ে দল ভাঙা-গড়ার খেলায় মেতেছেন।

অথচ এই মত্ততার জন্যে অবস্থাটা যে কোথায় গিয়ে দাঁড়াচ্ছে সে দিকে খেয়াল নেই তাঁদের। থাকলে আর যাই হোক নিজেদের অন্ধকার ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে তাঁরা হয়তো বা, অন্তত কিছুক্ষণের জন্যে, স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে অবস্থাটা একবার যাচাই করে নিতে চাইতেন। কিন্তু বড় দুঃখ আর পরিতাপের বিষয় হলো যে মায়ায়ভরা এই ভুবনে নিজেদের পাতা লোভের ফাঁদে তাঁরা নিজেরাই আজ ধরা পড়ে বসে আছেন খেলায় মত্ত হয়ে। যে খেলার পালা হয়তো আর কোনদিনই ফুরোবে না।

আর তারই ফলশ্রুতিতে আজ আমরা এসে পড়েছি বর্তমানের এই অনিশ্চয়তার মধ্যে। যার দাম এক আনা সে ষোল আনা পকেটে পুরে বুক ফুলিয়ে যাচ্ছে সত্যিকারের যোগ্যতাসম্পন্নদের সামনে দিয়ে। লজ্জা-ঘৃণা-ভয়, তিন থাকতে নয়—তবে ওঁদের মধ্যে এই তিনটি বিষয়ের একটিও যে নেই—সে কথা আমরা হলপ করে বলতে পারি। আর প্রমাণ হিসেবে দেখাতে পারি গাদা গাদা উদাহরণ।

সে উদাহরণগুলো এতো স্পষ্ট আর প্রাঞ্জল যে চোখে আঙুল দিয়ে দেখাবার প্রয়োজন নেই। চোখ খুলে আপনিই আপনি পড়বে চোখে। বেশি দূরে যেতে হবে না—শুধু একবার কলকাতা ময়দানের দিকে তাকান। দেখবেন ভাঙা-গড়ার খেলায় দল বদলের পালাটা এবার জমেছে কেমন!

ময়দানী ফুটবলের আসরে এ বছরের দল বদলের পালা যে শুরু হয়ে গেছে...... !!

—শান্তিপ্রিয়

দর্শকশূন্য মাঠে প্রথম বিভাগীয় হকির উদ্বোধনী খেলার দৃশ্য। খেলছে বাংলা স্পোর্টিং আর মেসারার্স।

ইংলণ্ড বনাম ওয়েস্ট ইণ্ডিজের দ্বিতীয় টেস্ট ম্যাচে ব্যুচারের বিরুদ্ধে এল বি ডবলিউ-এর আবেদন জানাচ্ছেন বোলার জন স্নো আর উইকেটরক্ষক জিম পার্কস।

।। কলঙ্কিত অধ্যায় ।।

আজ আবার নতুন করে ১৯৬৭ সালের ১লা জানুয়ারীর কথা মনে পড়ছে, মনে পড়ছে সেই কলঙ্কিত দিনের স্মৃতি। সি-এ-বি কর্তৃপক্ষের অতি লোভ আর পুলিশের কর্তব্যনিষ্ঠার চরমতম উদাহরণকে কেন্দ্র করে সেদিন ইডেনের বুকে জ্বলেছিল আগুন। মাঠে ঘটেছিলো অতি অভাবনীয় ঘটনা, তুলকালাম কাণ্ড। ভারতীয় ক্রিকেট ইতিহাসের একটি কলঙ্কিত অধ্যায়ের সূচনা হয়েছিলো সেদিন।

তবে সেদিনের সেই ঘটনায় দর্শকদের রাগ গিয়ে পড়েছিলো সি-এ-বি কর্তৃপক্ষের ওপর, পুলিশের ওপর। কিন্তু তাঁরা সযত্নে রক্ষা করেছিলেন পিচ, মাঠের কোন ক্ষতিই তাঁরা করেন নি। নিজেরাই চেয়েছিলেন খেলোয়াড়দের হোটেলে পৌঁছে দিতে। কলকাতার দর্শকদের আচরণে আমরা সেদিন অন্ধকারের মধ্যেও দেখেছিলাম আশার আলো।

সেই ঘটনাই একটু নতুন রূপ ধরে ঘটে গেলো সাবিনা পার্কে ইংলণ্ড বনাম ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের চতুর্থ দিনের খেলায় দ্বিতীয় টেস্টম্যাচে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ফলো অন ইনিংসে বেসিল বুচারের আউটকে কেন্দ্র করেই সমস্ত মাঠে বেধে গেলো দাঙ্গা। হাতের বোতলগুলো তাঁরা প্রাণভরে ছুঁড়লেন মাঠে। বোতলে বোতলে ছেয়ে গেলো মাঠ।

শুধু তাই নয়! খেলোয়াড়রাও বাদ গেলেন না আঘাতের হাত থেকে। ইংলণ্ডের অধিনায়ক কলিন কাউড্রের হাতে এসে লাগলো শূন্যে ছুটে আসা একটি বোতল।

তারপর রাগে অন্ধ দর্শকরা মাঠে নেমে পড়ে খুঁড়তে শুরু করলেন পিচ। পুলিশ শেষ পর্যন্ত সামলাতে না পেরে শুরু দিলো দাঙ্গা-পুলিশকে। তারা এসে তাড়া করলো লাঠি নিয়ে। আর কাঁদুনে গ্যাস ছুঁড়ে দর্শকদের কাঁদিয়ে দিয়ে শান্ত করে ফেললো তাঁদের। আবার আরম্ভ হলো খেলা।

কিন্তু সব থেকে মজার ব্যাপার হলো যে মাঠের ঐ তুলকালাম কাণ্ডের জন্যে নষ্ট হয়েছিলো পঁচাত্তর মিনিট, আর সেই পঁচাত্তর মিনিটের ক্ষতিপূরণের জন্যে খেলার আসর আবার বসেছিলো ষষ্ঠ দিনের সকালে। ক্রিকেট আইনের ইতিহাসে এতোদিন যা হয় নি, এইবার হলো সেই অভাবনীয় কাণ্ড।

তবে প্রথম টেস্টের মতো ইংলণ্ড-ওয়েস্ট ইণ্ডিজের দ্বিতীয় টেস্ট ম্যাচটাও শেষ হলো অমীমাংসিতভাবে। প্রথমে ব্যাটিং করে ইংলণ্ড করেছিলো ৩৭৬ রান। উত্তরে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ইনিংস মাত্র ১৪৩ রানে শেষ হলে তারা ফলো অন করতে

সোবার্স

দ্বিতীয় টেস্ট ম্যাচে সোবার্স একাই পরাজয়ের হাত থেকে বাঁচিয়েছেন ওয়েস্ট ইণ্ডিজকে। তারপর ইংলণ্ডকে জেতার সুযোগ দিয়ে, নিজেরাই যেতে গিয়েছিলেন জয়লাভের দিকে।

বাধ্য হয়। আর ফলো অন ইনিংসে ৯ উইকেটে ৩৯১ রান করে ইংলণ্ডকে পুনরায় ব্যাটিং করার সুযোগ দিয়েছিলেন সোবার্স। কিন্তু জেতার সম্ভাবনা তখন ছিলো সুদূর পরাহত। ঐ পিচে ১৫৫ মিনিটে ১৫৯ রান করা কোন মতেই সম্ভব ছিলো না। সোবার্সের ব্যক্তিগত ক্রীড়ানৈপুণ্যতার জন্যেই ওয়েস্ট ইণ্ডিজ পরাজয়ের হাত এড়াতে পেরেছিলো। সোবার্স ১১৩ রান করে অপরাজিত ছিলেন। ইংলণ্ডের দ্বিতীয় ইনিংস ছিলো ব্যর্থতায় ভরা। পঞ্চম দিন ইংলণ্ড ৪টি উইকেট হারিয়ে করলো ১৯ রান। পরের দিন খেলা শেষ হবার সময় ইংলণ্ড ৮টি উইকেট হারিয়ে করেছিল মাত্র ৬৮ রান। ফলে জয়লাভের সুযোগটা আবার শেষ সময়ে এসেছিল ওয়েস্ট ইণ্ডিজের কাছেও।

।। পরাজয়ের আসর ।।

বার বার কেন যে এমন পরাজয়ের আসর বসে জানি না। অথচ খেলাগুলো হয় শুধু যেন ভারতের মুখে কলঙ্কের কালিমা মাখাতেই। পরাভূত মনোভাব নিয়ে ভারতীয় খেলোয়াড়রা খেলতে নামেন আর পরাজয়ের আশংকা নিয়েই দর্শকরা মাঠে যান খেলা দেখতে—তাই পরাজয়ের জ্বালাটা ঠিক তেমন করে যেন আর গায়ে লাগে না।

যেমন লাগে নি কলকাতার রঞ্জি-ইনডোর স্টেডিয়ামে ভারত-জাপান টেবল-টেনিস টেস্টে ভারতের সর্বাত্মক পরাজয়ের পর। কিন্তু এই পরাজয়ের আসর বসাবার জন্যে গাদা গাদা টাকা খরচ করার কোন প্রয়োজন আছে কি? প্রতিদ্বন্দ্বিতার আসরে অবতীর্ণ হবার আগে নিজেদের খেলার মান উন্নত করার প্রয়োজন যে সব চেয়ে বেশি। কিন্তু এই সহজ-সরল-সত্যটা কেউই আর বুঝতে চান না।

তাই স্বাভাবিকভাবেই কলকাতার তৃতীয় টেবল টেনিস টেস্টে জাপান ৫—০ খেলায় ভারতকে হারিয়ে দিয়েছে। ভারতের সেরা খেলোয়াড়রা অসহায়ের মতো হেরেছেন জাপানী খেলোয়াড়দের কাছে। একমাত্র ভারতের এক নম্বর খেলোয়াড় খোদাইজীর খেলায় পাওয়া গিয়েছিলো কিছুটা নৈপুণ্যের পরিচয়। খোদাইজী ছাড়া আর কারো খেলা চোখে পড়ার মতো হয় নি।

।। খেলাধূলায় রাজনীতি ।।

খেলাধুলায় রাজনীতির স্থান বাংলাদেশে বড় প্রকটভাবে দেখা দিয়েছে। আর এর সব থেকে বড় উদাহরণ হলো পশ্চিমবঙ্গ স্পোর্টস কাউন্সিলের সাম্প্রতিক পুনর্গঠন। মাস কয়েক আগে কংগ্রেস আমলের স্পোর্টস কাউন্সিলকে সংবাদপত্রে বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে রাতারাতি ঢেলে সাজিয়ে ফেলেছিলেন যুক্তফ্রণ্ট সরকার। পুরনো সম্পাদক শ্রীশম্ভুনাথ মল্লিককে কোন নোটিশ না দিয়ে খারিজ করে দেওয়া হয়েছিল। আর শ্রীমল্লিকের স্থানটি লাভ করলেন শ্রীপরিতোষ চক্রবর্তী।

তারপর যুক্তফ্রণ্ট গেলো—এলো কংগ্রেস-পি ডি এফ কোয়ালিশন সরকার। তাই আবার ঢেলে সাজানো হলো পশ্চিমবঙ্গ স্পোর্টস কাউন্সিলকে। এবার শ্রীচক্রবর্তীর স্থান লাভ করেছেন শ্রীকরুণাশঙ্কর ভট্টাচার্য। আর শ্রীশৈবাল গুপ্ত মনোনীত হয়েছেন সভাপতি।

জানি না স্পোর্টস কাউন্সিলের অফিস আলো করে থাকার সুযোগ এঁরা কতদিন পাবেন।

আইন-কানুনের দুনিয়া

গত সপ্তাহের সাপ্তাহিক বসুমতীর খেলাধুলা বিভাগের 'আইন কানুনের দুনিয়া'য় ক্রিকেট আইনের সব থেকে গোলমেলে নিয়ম এল বি ডব্লিউ সম্বন্ধে সচিত্র আলোচনা করা হয়েছে। আর এ সপ্তাহে আবার দেওয়া হচ্ছে চিঠিপত্রের উত্তর। কিন্তু তার আগে একটা কথা বলে রাখা দরকার যে ইতিমধ্যেই আমাদের দপ্তরে এসে পৌঁচেছে অনেক চিঠি। অথচ এই সীমিত পরিসরে সব চিঠির উত্তর খুব তাড়াতাড়ি দেওয়া সম্ভব নয়। তাই চিঠির উত্তর ছাপা হতে হয়তো বা একটু-আধটু দেরি হয়ে যেতে পারে। এ বিলম্ব অস্বাভাবিক নয়, তাই স্বাভাবিকভাবেই আমাদের একে মেনে নিতে হবে। আর ব্যক্তিগতভাবে উত্তর পেতে হলে খাম, স্ট্যাম্প কিম্বা পোস্টকার্ড সংগে থাকা চাই।

নিচে এ সংখ্যার প্রশ্নগুলোর উত্তর দেওয়া হলো :—

সুধীর ভট্টাচার্য (মোহনলাল স্ট্রীট, কলকাতা-৪)

প্রশ্ন : ব্যাটসম্যান একটি বল মারার পর বোলার প্রান্তের ব্যাটসম্যান রান নেবার জন্যে যদি অপর প্রান্তের ক্রীজের মধ্যে পৌঁছে যায়, কিন্তু সেই প্রান্তের অর্থাৎ স্ট্রাইকার ব্যাটসম্যান যদি নিজের ক্রীজের মধ্যেই থাকে, তখন যদি ফিল্ডাররা বল দিয়ে বোলার প্রান্তের কিম্বা স্ট্রাইকার ব্যাটসম্যানের দিককার উইকেট ভেঙে দেন তাহলে কে আউট হবে—স্ট্রাইকার না নন-স্ট্রাইকার ব্যাটসম্যান?

উত্তর : বোলারের দিক্‌কার উইকেট ভেঙে দিলে নন-স্ট্রাইকার ব্যাটসম্যান আউট হবে। কিন্তু স্ট্রাইকারের দিক্‌কার উইকেট ভেঙে দিলে কেউই আউট হবে না। তবে নন-স্ট্রাইকার ব্যাটসম্যান যদি নিজের ক্রীজে ফিরে আসার আগেই তাঁর প্রান্তের উইকেট বল দিয়ে ভেঙে দেওয়া যায় তাহলে তিনিই আউট হবেন।

নারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য (ডাঙাপাড়া, কাঁচরাপাড়া)

প্রশ্ন : ব্যাটসম্যান বল ড্রাইভ করার পর বলটি সোজা গিয়ে অপর প্রান্তের উইকেট ভেঙে দিল। বলটি যখন উইকেট ভেঙে দেয় তখন ব্যাটসম্যান এবং নন-স্ট্রাইকার ব্যাটসম্যান দু'জনেই পাঁপিং ক্রীজের বাইরে ছিলেন। এই অবস্থায় কে আউট হবে? ব্যাটসম্যান না নন-স্ট্রাইকার ব্যাটসম্যান, নাকি কেউই আউট হবে না?

উত্তর : না, এ অবস্থায় কেউ আউট হবে না। এ ক্ষেত্রে ব্যাটসম্যানের আউট হবার প্রশ্ন ওঠে না। আর নন-স্ট্রাইকারও আউট হচ্ছে না, কারণ বলটি উইকেট ভাঙার আগে কোন ফিল্ডসম্যানকে স্পর্শ করে নি। করলে আউট হতেন নন-স্ট্রাইকার ব্যাটসম্যান।

অনিমেষ ঘোষ (মেটেরবাজার, মেদিনীপুর)

প্রশ্ন : একই ওভারে কোন বোলার বা ব্যাটসম্যান ইচ্ছে মতো কোন সময়ে ডান হাতে, কোন সময়ে বাঁ হাতে বল বা ব্যাট করতে পারেন কি?

উত্তর : বোলার পারেন না কিন্তু ব্যাটসম্যান-এর সম্বন্ধে এ বিষয়ে কোন নিয়ম নেই।

অমলকুমার মুখোপাধ্যায়, কে পি কুণ্ডু, শ্যামল অধিকারী ও দেবু কবিরাজ (হরিণঘাটা ফার্ম, নদীয়া)

প্রশ্ন : ব্যাটসম্যান বল মারার পর রান নিতে থাকলে অপর প্রান্তে পৌঁছুবার আগেই ফিল্ডসম্যান বলটা দিয়ে বোলারের দিকের উইকেট ভেঙে ফেললো বটে, কিন্তু অপর প্রান্তের ব্যাটসম্যান অর্থাৎ নন-স্ট্রাইকার যথা সময়ে ক্রীজে পৌঁছুলো অথচ পড়ে গিয়ে উইকেট ভেঙে ফেললো। এ ক্ষেত্রে স্ট্রাইকার আউট হবেন না নন-স্ট্রাইকার আউট হবেন? না কি দুজনেই আউট হবেন?

উত্তর : এ ক্ষেত্রে রান আউটের প্রশ্নে স্ট্রাইকার ব্যাটসম্যানই আউট হবেন। নন-স্ট্রাইকার তাঁর রান শেষ করার পর উইকেট ভেঙে ফেললেও আউটের প্রশ্ন ওঠে না, কারণ ব্যাটসম্যান হিট উইকেট হয়ে আউট হন তখনই যখন বলটা খেলতে গিয়ে তিনি উইকেট ভেঙে ফেলেন।

শ্যামলকুমার সান্যাল ও অপূর্বকুমার মল্লিক (ঠিকানা নেই)

উত্তর : আপনাদের প্রশ্নের উত্তর এই সংখ্যাতেই আছে আশা করি দেখে নিয়েছেন।

তপন মুখার্জী ও রতন দাশ (গৌরদাস রোড, কাঁচরাপাড়া)

প্রশ্ন : ক্রীজের মধ্যে ক্যাচ উঠলে ব্যাটসম্যান ফিল্ডারকে বাধা দিতে পারে কি?

উত্তর : না পারে না। বাধা দিলে ব্যাটসম্যান 'অসুবিধা সৃষ্টির জন্যে আউট' এই নিয়ম অনুসারে আউট হয়ে যেতে পারে। আপনারা এল বি ডব্লিউ সম্বন্ধে যা জানতে চেয়েছিলেন তার উত্তর নিশ্চয়ই এর আগের সংখ্যায় এল বি ডব্লিউ সম্বন্ধে সচিত্র আলোচনায় পেয়েছেন।

স্বপনকুমার মণ্ডল (গুসকরা, বর্ধমান)

প্রশ্ন : বোলার বল করলেন। ব্যাটসম্যান পিছিয়ে এসে বলটা মারতে গিয়ে ভেঙে ফেললেন উইকেট। আবার বলটাও শূন্যে উঠলো—একজন ফিল্ডসম্যান ক্যাচটাও ধরলেন। এ ক্ষেত্রে ব্যাটসম্যান হিট উইকেট না ক্যাচ আউট কি হবেন?

উত্তর : 'হিট উইকেট' হয়ে আউট হওয়াই স্বাভাবিক। তবে হিট উইকেট সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ থাকলে, ক্যাচ আউট দেওয়া হবে।

বেনামা (বাঁশদ্রোণী, রায়নগর)

প্রশ্ন : ব্যাটসম্যান বলটি মারবার পর, বলটা উইকেটের পেছনে যাবার আগেই উইকেটরক্ষক ক্যাচটি ধরে ফেললে ব্যাটসম্যান কি আউট হবে?

উত্তর : আউট হবে! তবে একটা বিষয়ে আম্পায়ারকে নিঃসন্দেহ হতে হবে যে, বলটা ব্যাটসম্যানের ব্যাটে লাগার আগে উইকেটরক্ষকের হাত উইকেটের সামনে আসে নি!

সুব্রত দত্ত (কামাখ্যা ভবন, রাণীগঞ্জ, বর্ধমান)

উত্তর : আপনার প্রশ্নগুলো 'ক্রিকেট খেলার আইন কানুনের' ওপর নয়—ক্রিকেট কোচিং-এর বিষয়ে, তাই আপনার প্রশ্নগুলোর উত্তর ব্যক্তিগতভাবে দেবার ইচ্ছে রইলো।

অঞ্জলি চট্টোপাধ্যায় (কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কলকাতা-৪)

প্রশ্ন : মেয়েরা কি ক্রিকেট খেলে? আমরাও কি প্রশ্ন করতে পারি?

উত্তর : শুধু ক্রিকেট খেলাই নয়, ইংলণ্ড-অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে মেয়েদের টেস্ট খেলাও হয়।

আপনারাও নিশ্চয়ই প্রশ্ন করতে পারেন।

পরিচীয়তে

[বাপু নাদকার্নী]

অস্ট্রেলিয়াগামী ভারতীয় ক্রিকেট দলের খেলোয়াড় তালিকায় নাদকার্নীর নাম দেখে অনেকেই অবাক হয়েছিলেন। কানা-ঘুষো শোনা গেলেও, নাদকার্নী যে ভারতীয় দলে স্থান লাভ করবেন, এ আশা কেউই করেন নি। তাই অবাক হয়েছিলেন অনেকেই।

অবাক হবারই তো কথা!

গত বছর দেড়-দুই ধরে যে খেলোয়াড়টির যোগ্যতা অস্বীকার করে পরম অবহেলায় যাকে সরিয়ে রাখা হয়েছিলো একপাশে—আজ যে তাকেই আবার সাদরে ডেকে আনা হবে, এ কথা আর কে ভেবেছিলেন!

তাই যে দলে জয়সীমা, হনুমন্ত সিং, কুন্দরন, দুরানী প্রমুখের মতো নিপুণ খেলোয়াড়দের যোগ্যতা সম্পূর্ণ অস্বীকার করে অবহেলাভরে সরিয়ে রাখা হলো দূরে—সেই দলে আর একজন অবহেলিত খেলোয়াড়কে হঠাৎই বা কেন যে ডেকে আনা হলো—এ প্রশ্নের জবাব পেতে গিয়েই বোধহয় আরো বেশি অবাক হয়েছিলেন ক্রীড়ারসিকরা।

কারণ তিরিশের ঘরের অর্ধেকটা প্রায় পার হয়ে এলেও নাদকার্নীর যোগ্যতা আজো অনস্বীকার্য। বিশেষ করে অলরাউন্ডার হিসেবে আজো নাদকার্নীর তুলনা মেলা ভার! নাদকার্নী আজ পর্যন্ত যতোগুলি টেস্ট খেলায় অংশ গ্রহণ করেছেন—তার প্রত্যেকটিতে কোন না কোন ভাবে তিনি কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন!

নাদকার্নীর খেলার মধ্যে পেয়েছি একটা সহজ অথচ স্বভাবলব্ধ স্বাবলম্বনের পরিচয়। সাহসের অনুপ্রেরণীয় আক্রমণাত্মক ব্যাটিং করতেই তিনি অভ্যস্ত। ভাবতে সত্যি অবাক লাগে যখন মনে হয় ঐ অদ্ভুতভাবে কনুই বেঁকিয়ে দাঁড়িয়ে তিনি কি করে অতো জোরে বল মারেন।

আর নাদকার্নীর বোলিং।

নতুন যে বোলিং মেশিন বেরিয়েছে সে মেশিনও বোধহয় নাদকার্নীর পাশে দাঁড় করালে বিসদৃশ ঠেকবে। ব্যাটসম্যানদের ঠান্ডা রাখতে একই ধরণের বল করায়

বাপু নাদকার্নী

নাদকার্নীর জুড়ি এই পৃথিবীতে আর আছে কি না সন্দেহ!

আর মেডেন ওভার পেতে নাদকার্নীর মতো আর কোন বোলারই আজ পর্যন্ত অতো কৃতিত্ব দেখাতে পারেন নি।

ভীষণ মারকুটে ব্যাটসম্যান, কোন বোলারকে পরোয়া করে খেলছে না? ঠিক আছে নাদকার্নীকে নিয়ে এসো! সংগে সংগে দেখা যাবে ব্যাটসম্যানের খেলার ধারা পাল্টে গেছে। নাদকার্নীর বোলিং-এর বিরুদ্ধে একটি রান করতে তার মাথার ঘাম পড়ছে পায়ে।

ওদিকে দক্ষ ফিল্ডার হিসেবেও নাদকার্নী যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। রোগা-ছিপছিপে চেহারার নাদকার্নী চোখের নিমেষে বলের পেছনে ছুটে যেতে পারেন। আর তারপর চিলের মতো ছোঁ মেরে বলটা তুলে নিয়ে ছুঁড়ে ভেঙে দিতে পারেন উইকেট।

কিন্তু সেই নাদকার্নী অবহেলায় অবহেলায় নুয়ে পড়েছেন। বড় বেশি প্রয়োজনের সময় নাদকার্নীকে বাদ দিয়ে ভারতীয় ক্রিকেট কর্তৃপক্ষ চেয়েছিলেন বোধহয় তাকে ভুলিয়ে দিতে। কিন্তু যাকে ভোলা যায় না, যার প্রয়োজন প্রতি মুহূর্তে অনুভূত হয় কতোদিন আর তাকে দূরে সরিয়ে রাখা যায়।

নাদকার্নী আবার তাই ফিরে এসেছেন ভারতীয় দলে। গেছেন অস্ট্রেলিয়ার পর নিউজিল্যান্ড সফরে।

কিন্তু অবহেলিত নাদকার্নীর আগের সেই চমক জাগানো বোলিং এখনো আছে কি না কে জানে! হয়তো অবহেলার ভারে হারিয়ে গেছে তাঁর বোলিং-এর সেই ধার। ভারত-অস্ট্রেলিয়ার চারটি টেস্ট খেলার পর সেই কথাই তো মনে হচ্ছে বার বার।

রঘুনাথ নাম হলেও বাপু নামেই নাদকার্নী পরিচিত! নাদকার্নীর জন্ম ১৯৩৩ সালের ১লা এপ্রিল নাসিক শহরে। ছোটবেলা থেকেই ক্রিকেট খেলার ওপর নাদকার্নীর ছিলো প্রচন্ড আকর্ষণ। ভবিষ্যৎ জীবনে ক্রিকেট ছাড়া ব্যাডমিন্টন খেলাতেও নাদকার্নী পারদর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন।

১৯৫১ সাল থেকে নাদকার্নী রনজী ট্রফির খেলায় অংশ গ্রহণ করতে আরম্ভ করেন। ১৯৫৬-৫৭ সালে তিনি সৌরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অপরাজিতভাবে ২০১ রান করে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। সেবার তিনি ছিলেন মহারাষ্ট্রের অধিনায়ক। তারপর ১৯৬০ সালে বম্বের পক্ষে রাজস্থানের বিরুদ্ধে আউট না হয়ে ২৮৩ রান করেন।

১৯৫৫ সালে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে নাদকার্নী তাঁর জীবনের প্রথম টেস্ট খেলায় অংশ গ্রহণ করেন। তারপর নাদকার্নী ছিলেন ভারতীয় দলের একজন পরম নির্ভরযোগ্য অলরাউন্ডার। মাঝে দু-একটা বছর অন্ধকারে কাটালেও নাদকার্নী আবার ফিরে এসেছেন ভারতীয় দলে! জ্ঞানবৃদ্ধ নাদকার্নী পুরনো ফর্মের খেলা দেখার আশাই আমরা রাখি......।

কিস্তিবন্দীতে ট্রানজিস্টার

২৬৫ টাকা মূল্যের বিশ্ববিখ্যাত "উইন্ডবার হিতাচি" ৩ ব্যান্ড অলওয়ার্ল্ড পোর্টেবল ট্রানজিস্টার মাসিক ২৫ টাকা কিস্তিতে লউন।

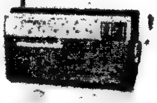

আবেদন করুনঃ—

SWISS TELEVISSION CO.
(B-55) Post Box. 1320,
Delhi-6.

সম্পাদিকা—জয়ন্তী সেন

বসুমতী (প্রাঃ) লিঃ-এর পক্ষে ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীটস্থ কলিকাতা-১২

বসুমতী প্রেস হইতে শ্রীসুকুমার গুহমজুমদার কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বসুমতীতে পাওয়া যাচ্ছে ! একরাশ শিশু-সাহিত্য !

কিশোর-কিশোরীদের পাঠ্য

কিন্তু সমগ্র পরিবার পড়তে পারেন

দামে যেমন সস্তা, তেমনি পাতায় পাতায় রঙীন ছবি।

মনোরম রঙীন প্রচ্ছদ। বোর্ডে বাধাই।

আজই অর্ডার পেশ করুন আপনার পরিবারের সকলের জন্য।

১।	রঘুবংশ	...	মহাকবি কালিদাস	...	পঁচাত্তর পয়সা
২।	শকুন্তলা	...	মহাকবি কালিদাস	...	পঁচাত্তর পয়সা
৩।	এ্যারেবিয়ান নাইটসের গল্প (দুই খণ্ডে সম্পূর্ণ)	...	অনুবাদ—অলকেন্দ্রনাথ ঠাকুর	...	প্রতি খণ্ড এক টাকা পঁচিশ পয়সা
৪।	জুলিয়াস সিজার	...	উইলিয়ম সেক্সপীয়র	...	এক টাকা পঞ্চাশ পয়সা
৫।	ম্যাকবেথ	...	উইলিয়ম সেক্সপীয়র	...	এক টাকা পঞ্চাশ পয়সা
৬।	রোমিও জুলিয়েট	...	উইলিয়ম সেক্সপীয়র	...	এক টাকা পঞ্চাশ পয়সা
৭।	হারকিউলিস	...	হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ	...	এক টাকা বাষট্টি পয়সা
৮।	আষাঢ়ে গল্প	...	হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ	...	এক টাকা পঁচাত্তর পয়সা
৯।	স্নো-হোয়াইট	...	হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ	...	এক টাকা বাষট্টি পয়সা
১০।	কুমারের বাবা গোয়েন্দা	...	হেমেন্দ্রকুমার রায়	...	এক টাকা পঁচিশ পয়সা
১১।	ছোট্ট পমির অভিযান	...	হেমেন্দ্রকুমার রায়	...	এক টাকা পঁচিশ পয়সা
১২।	রতনপুরের যাত্রী	...	হেমেন্দ্রকুমার রায়	...	এক টাকা পঁচিশ পয়সা
১৩।	ডন কুইকসোট	...	সারভেন্টিস	...	এক টাকা পঞ্চাশ পয়সা
১৪।	ওয়ার এ্যান্ড পিস	...	টলস্টয়	...	এক টাকা পঞ্চাশ পয়সা
১৫।	বর্মায় যখন বোমা পড়ে	...	সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়	...	এক টাকা পঁচিশ পয়সা
১৬।	আমার দেশ	...	নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়	...	দুই টাকা পঞ্চাশ পয়সা
১৭।	মোহন সিংয়ের ফাঁসি	...	মন্মথনাথ ঘোষ	...	এক টাকা পঁচিশ পয়সা
১৮।	জন্মজন্মান্তরের কাহিনী	...	নরেন্দ্র দেব	...	দুই টাকা পঞ্চাশ পয়সা
১৯।	রকমারি গল্প	...	নরেন্দ্র দেব	...	দুই টাকা পঞ্চাশ পয়সা
২০।	স্বার্থপর দৈত্য	...	বুদ্ধদেব বসু	...	এক টাকা পঁচাত্তর পয়সা
২১।	সুখী রাজপুত্র	...	বুদ্ধদেব বসু	...	এক টাকা পঞ্চাশ পয়সা
২২।	লক্ষ্মণ সেনের রাজমুকুট	...	—	...	এক টাকা পঁচিশ পয়সা
২৩।	শান্তিপুরে অশান্তি	...	প্রভাবতী দেবী সরস্বতী	...	এক টাকা পঞ্চাশ পয়সা
২৪।	বন্দী জেগে আছো?	...	প্রভাবতী দেবী সরস্বতী	...	এক টাকা পঁচিশ পয়সা
২৫।	প্রেতাত্মার প্রতিহিংসা	...	প্রভাবতী দেবী সরস্বতী	...	এক টাকা পঁচিশ পয়সা
২৬।	মনের মতো গল্প	...	প্রভাবতী দেবী সরস্বতী	...	এক টাকা পঁচিশ পয়সা
২৭।	টিয়ার গ্যাস	...	স্বপন বুড়ো	...	এক টাকা পঁচিশ পয়সা
২৮।	লাফিং গ্যাস	...	স্বপন বুড়ো	...	এক টাকা পঞ্চাশ পয়সা
২৯।	অশরীরী আত্মা	...	স্বপন বুড়ো	...	এক টাকা পঞ্চাশ পয়সা
৩০।	কেনিলওয়ার্থ	...	মন্মথনাথ ঘোষ	...	এক টাকা পঁচিশ পয়সা
৩১।	টোয়েণ্টি ইয়ার্স আফটার	...	সুধীন্দ্রনাথ রাহা	...	এক টাকা পঁচিশ পয়সা
৩২।	টয়লার্স অব দি সী	...	সুধীন্দ্রনাথ রাহা	...	এক টাকা পঁচিশ পয়সা
৩৩।	ডেভিলস আইল্যান্ড	...	বিশু মুখোপাধ্যায়	...	পঁচাত্তর পয়সা
৩৪।	অচিন দেশের রাজকন্যা	...	দীনেশ মুখোপাধ্যায়	...	এক টাকা

শিশু-সাহিত্যের রত্নভাণ্ডার ! স্বপ্নের ময়ূরপঙ্খী ! বসুমতী (প্রাঃ) লিঃ ॥ কলিকাতা-১২

Thursday, 22nd February, 1968 SAPTAHIK BASUMATI Regd. No. C71
Price : 30 Paise Gram : "Basumati" Phone : 34-7771, 72, 73, 74

'কুকমী' গুঁড়ো মশলা বাজারের সেরা !

কৃষ্ণ চন্দ্র দত্ত (স্পাইস) প্রাইভেট লি:

১২৫ বছরেরও অধিক প্রাচীন ও বর্তমানে মশলার বৃহত্তম প্রতিষ্ঠান

আড়তদারি আমদানি রপ্তানি পাইকারি খুচরা

সর্বাধুনিক পদ্ধতিতে গুঁড়ো মশলা • নিজস্ব মিলে প্রস্তুত
পনের লক্ষ প্যাকেট মাসিক বিক্রয়

গ্রাম : "স্পাইসমার্ট" মিল-কাশীপুর ফোন : ৬৩-১২৩২, ৩৩-২৩৮১

২৩১নং ও ২৩৫নং মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড, পোস্তা. কলিকাতা-৭

সাপ্তাহিক বসুমতী

পশ্চিমবঙ্গে রাষ্ট্রপতির শাসন

কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা টিকিয়ে রাখার সব চেষ্টা ব্যর্থ ঃ নেতৃবৃন্দের তর্জন-গর্জনই সার

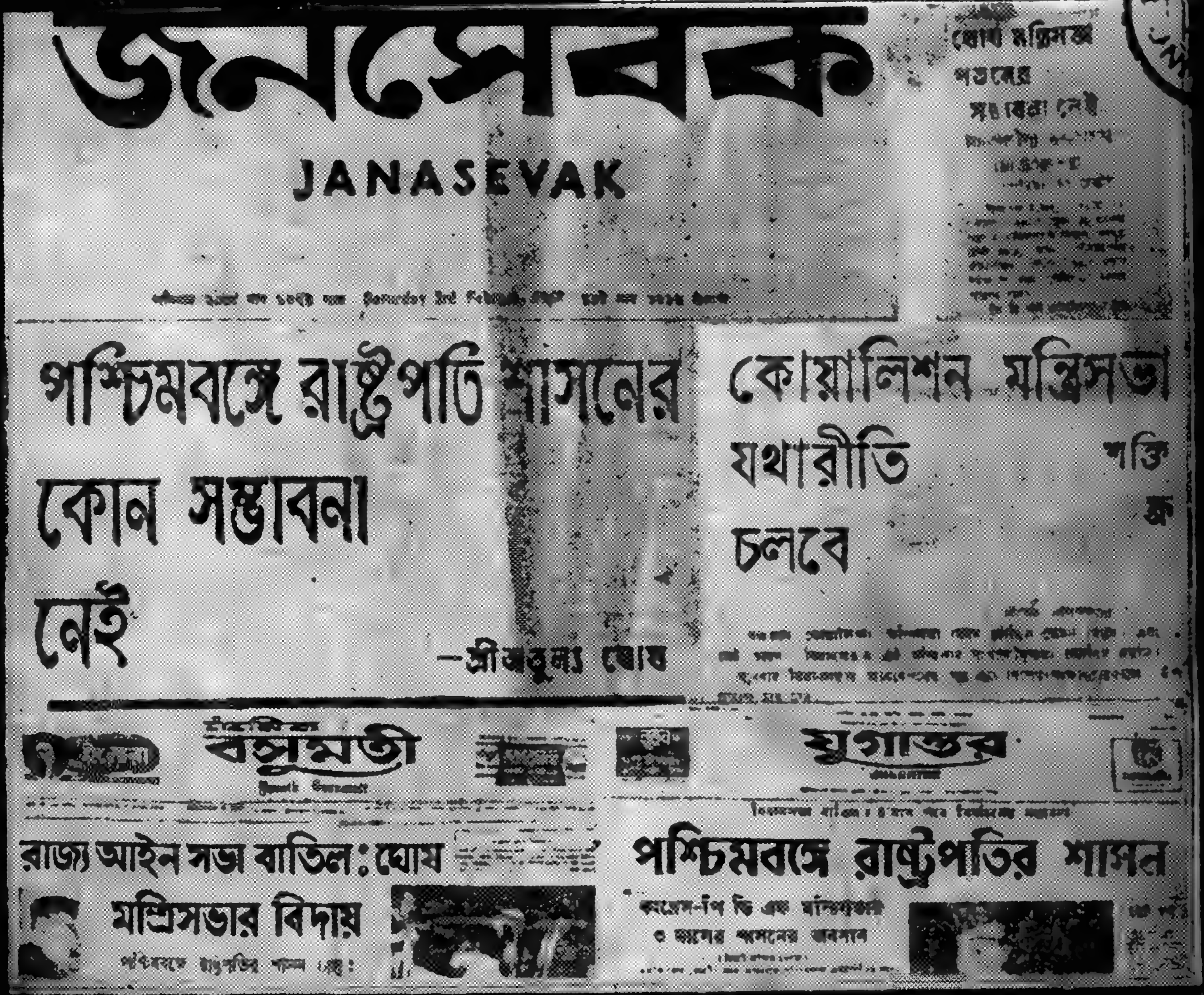

জনসেবক

JANASEVAK

পশ্চিমবঙ্গে রাষ্ট্রপতি শাসনের কোন সম্ভাবনা নেই

—শ্রীঅতুল্য ঘোষ

কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা যথারীতি চলবে

বসুমতী

রাজ্য আইন সভা বাতিল : ঘোষ

মন্ত্রিসভার বিদায়

যুগান্তর

পশ্চিমবঙ্গে রাষ্ট্রপতির শাসন

বর্ষ ঃ ৩৭শ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ১৬ই ফাল্গুন, ১৩৭৪ বঙ্গাব্দ] OLDEST WEEKLY OF NORTH INDIA [72nd year, No. 37, 29th Feb., 1968

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয়		২০০৭
আজকের মানুষ		২০০৮
বঙ্গদর্শন		২০০৯
অবক্তব্য	— চন্দ্রগুপ্ত	২০১২
সপ্তাহের বোঝা	— কৃত্তিবাস ওঝা	২০১৬
ভারতদর্শন		২০১৭
আন্তর্জাতিক		২০২০
ভিয়েৎনাম : ঝড়ের কেন্দ্রে (প্রবন্ধ)	— বরুণ রায়	২০২৩
নক্‌শা—ফাল্গুন (কবিতা)	— নাজমা চৌধুরী	২০২৭
ভাষা (কবিতা)	— মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান	২০২৭
শরৎ বসু—একটি ঘটনা	— শ্রীশশাঙ্কশেখর সান্যাল	২০২৮

কবিকঙ্কণ চণ্ডী

মুকুন্দরাম চক্রবর্তী

(কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর বিভাগের পাঠ্যপুস্তক)
মধ্যযুগের বঙ্গসাহিত্যে কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তীই সর্বশ্রেষ্ঠ কবি। তাঁহার চণ্ডীর কাহিনী বাঙ্গালার বিশিষ্ট জাতীয় জীবনের কাহিনী। তাঁহার কাব্যে পাই মধ্যযুগের বাঙ্গালার সমাজের সুস্পষ্ট আলেখ্য। শাসক সম্প্রদায়ের দ্বারা নির্যাতিত বাস্তুচ্যুত মুকুন্দরাম দুঃখ ও বেদনাক্লিষ্ট বাঙ্গালার প্রতিনিধি কবি—ব্যক্তির দুঃখ কি করিয়া সর্বজনের দুঃখ হইতে পারে বাঙ্গালা সাহিত্যে তাহা মুকুন্দরামই সর্বপ্রথম দেখাইয়াছেন। এই হিসাবে তিনি আধুনিক বাঙ্গালার রোমান্টিক সাহিত্যসাধনায় অগ্রদূত।

—বর্তমান গ্রন্থে আছে—

১। মূল কাব্য, ২। সুবিস্তৃত ভূমিকা, ৩। কবির জীবনী, ৪। কাব্য-পরিচিতি, ৫। কবিকঙ্কণ যুগের বঙ্গভাষা (ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র লিখিত), ৬। অধ্যাপক শ্রীবিজিতকুমার দত্তের সুলিখিত ভূমিকা, ৭। বিস্তৃত কাব্য সমালোচনা এবং ৮। অপ্রচলিত শব্দের অর্থ।

মূল্য সাড়ে চার টাকা

তন্ত্রসাধক, কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেনের
ভক্তিমাধুরী-রঞ্জিত

রামপ্রসাদ গ্রন্থাবলী

শ্রীশ্রীকালী-কীর্তন, বিদ্যাসুন্দর, পদাবলী, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, সীতা-বিলাপ, আগমনী, বিজয়া, অপূর্ব প্রকাশিত কবিতাবলী, কবির জীবনী।

একত্রে মূল্য তিন টাকা

উজ্জয়িনীর সেই বিশ্ব-চিত্তজয়ী বিশ্ববিমোহন মহাকবি—
সারস্বতকুঞ্জের পূর্ণজ্যোৎস্না—সাহিত্য-জগজ্জ্যোতি—
প্রতিভা ও মনীষার অবতার—সরস্বতীর বরপুত্র—
সৌন্দর্যের মহাকবি—

কালিদাসের গ্রন্থাবলী

সর্বাঙ্গসুন্দর রাজাধিরাজ সংস্করণ

অনুবাদক—বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সাহিত্য রস-সুরসিক
পণ্ডিত রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ

প্রথম ভাগে :—রঘুবংশ, মালবিকাগ্নিমিত্র, ঋতুসংহার, পুষ্পবাণবিলাস, শৃঙ্গার-তিলক, শৃঙ্গার-রসাষ্টক। ৮·০০

তৃতীয় ভাগে :—শকুন্তলা, বিক্রমোর্বশী, শ্রুতবোধ, দ্বাত্রিংশৎ-পুত্তলিকা, কালিদাস-প্রশস্তি। ৮·০০

প্রাচীন-সাহিত্যের-গৌরব-মুকুট—
সাহিত্যের চির-সমাদৃত কোকিল—
রায়গুণাকর

ভারতচন্দ্রের গ্রন্থাবলী

অন্নদামঙ্গল, বিদ্যাসুন্দর, মানসিংহ, চোরপঞ্চাশৎ, রসমঞ্জরী, সত্যপীর, খেড়েভেড়ের কৌতুক, ফর্দরফৎ, হিন্দী কবিতালহরী, বলিরাজা, চণ্ডী, নাগাষ্টক, 'সংস্কৃত, পার্শী, হিন্দী' নানা ভাষার কবিতাবলী, কবির জীবনী, ঋতু-বর্ণনা, রাধাকৃষ্ণের প্রেমালাপ, কবিতাবলী।

মূল্য তিন টাকা

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড: ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলি-১২

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
গ্রন্থমেলা		২০২৯
রবীন্দ্রনাথ ও সুভাষচন্দ্র (ধারাবাহিক প্রবন্ধ)	— শঙ্করীপ্রসাদ বসু	২০৩০
যা দেখেছি, যা পেয়েছি (স্মৃতিচারণ)	— সুধীরঞ্জন দাস	২০৩৪
অগ্নিযুগের একটি অধ্যায়	— অনন্ত সিংহ	২০৩৭
ঝড় (ধারাবাহিক উপন্যাস)	— জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী	২০৪২
বিজ্ঞান বিচিত্রা	— ডঃ বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য	২০৪৬
ভয়ের মানে (গল্প)	— সুভাষ সমাজদার	২০৪৮
বিশ্বসাহিত্যের আঙিনায়	— ডঃ নরেন ভট্টাচার্য	২০৫২
রঙ্গমঞ্চ—ওদেশে এবং এদেশে	— শিলাদিত্য	২০৫৪
আকাশবাণী-পরিক্রমা	— মেঘদূত	২০৫৬
রূপজগৎ		২০৫৮
পাঠকমন		২০৬০
খেলাধুলা	— শ্রীশান্তিপ্রিয়	২০৬৪

রহস্য গল্প। ভূতের গল্প। ডাকাতির গল্প। এ্যাডভেঞ্চারের গল্প।

সদ্য প্রকাশিত হইল।

শিশু-সাহিত্যের সম্রাট

হেমেন্দ্রকুমার রায়ের

গ্রন্থাবলী

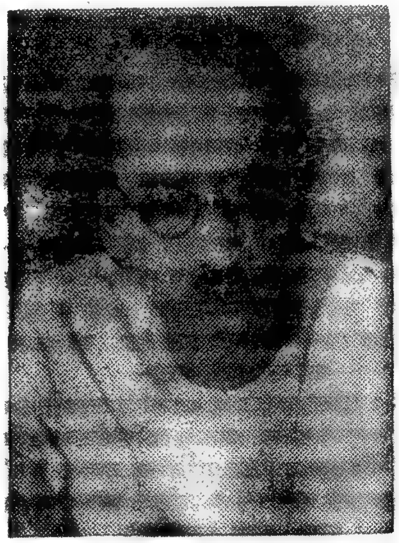

শিশু ও কিশোর-কিশোরীদের জন্য লেখা—কিন্তু হেমেন্দ্রকুমারের রচনা আবালবৃদ্ধবনিতা প'ড়ে থাকেন। হেমেন্দ্রকুমারের সাতখানি সাড়াজাগানো উপন্যাস এই সুবৃহৎ গ্রন্থাবলীতে স্থান পেয়েছে।

১। যকের ধন ২। প্রদীপ ও অন্ধকার ৩। রহস্যের আলোছায়া
৪। ক্ষুদিরামের কীর্তি ৫। চাবি ও খিল
৬। একরাত্তির মাঠ ৭। এক গুপ্ত রহস্য
ও গোয়েন্দা গল্প।

পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৯৬
মূল্য মাত্র ছয় টাকা

বসুমতী প্রাঃ লিঃ
কলিকাতা-১২

অবিলম্বে অর্ডার পেশ করুন !!

CALCUTTA UNIVERSITY
CENTRAL LIBRARY

৭২ বর্ষ : ৩৭শ সংখ্যা—মূল্য : ৩০ পয়সা বাংলা ভাষায় দ্বিতীয় সর্বাধিক প্রচারিত সাপ্তাহিক পত্রিকা
বৃহস্পতিবার, ১৪ই ফাল্গুন, ১৩৭৪ বঙ্গাব্দ
PRICE : 30 Paise
Thursday, 29th February, 1968

রাষ্ট্রপতির শাসনের পরিপ্রেক্ষিতে

বিলম্বে হলেও পশ্চিমবঙ্গে রাষ্ট্রপতির শাসন প্রবর্তিত হয়েছে। যুক্তফ্রন্ট সরকারকে খারিজ করার পর এখানে চরম অনিশ্চয়তার সৃষ্টি হয়েছিল, কোয়ালিশন সরকার জনসাধারণের মুখে অন্ন যোগাবার ভার গ্রহণের পরিবর্তে গদি রক্ষার জন্যে পুলিশী রাজত্ব কায়েম করেছিল। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার নামে যেভাবে একটানা ১৪৪ ধারা জারি করা হয়েছিল, তাতে জনমনে কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা সম্পর্কে তীব্র বিদ্বেষ ও ঘৃণার মনোভাব সৃষ্টি হয়েছিল। সুতরাং যে গণতন্ত্র রক্ষার কথা হামেশাই বলা হয়, সেই গণতন্ত্রের নামমাত্র অবশিষ্ট পশ্চিমবঙ্গে ছিল বলে মনে করা সম্ভব ছিল না। রাজ্যপাল যদি একটু শক্ত হতে পারতেন, হিসেব করে চলতেন, তাহলে যে পরিমাণ খাদ্যশস্য সংগ্রহের পরিকল্পনা যুক্তফ্রন্ট সরকার করেছিলেন তা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সংগ্রহ করা সম্ভব হোত এবং বিরানব্বই দিনের শাসনে ব্যাপক প্রাণহানি ঘটতো না, আইন অমান্যের জন্যে কারাগারগুলি ভর্তি হয়ে উঠত না। সর্বোপরি রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তার অবসান হোত।

হয়তো মনে হতে পারে, এখন এ সবের পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। তবু বলতে বাধ্য যে, আর যাতে কোথাও এই অবস্থার পুনরাবৃত্তি না ঘটে—তার জন্যে কেন্দ্রীয় সরকারকে সচেতন থাকতে হবে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীচ্যবন কোয়ালিশন মন্ত্রিসভাকে বৈধ বলে রায় দিয়েছিলেন, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে এই ধরণের রায় কল্পনীয় হলেও দেশের কল্যাণের ক্ষেত্রে ও গণতন্ত্র রক্ষার উদ্দেশ্যে দেশের দায়িত্বশীল নেতৃবৃন্দের কাছে রাজনীতি অপেক্ষা জনপ্রীতিই অধিক কাম্য।

প্রসঙ্গত, একথাও উল্লেখ্য ১৪ই ফেব্রুয়ারীতে বিধানসভার অধিবেশনে রাজ্যপালের যোগদান উচিত হয় নি, তা এখন পরোক্ষে স্বীকৃত সত্য। কারণ কোয়ালিশন সরকারের সংখ্যালঘুত্ব সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হয়েই তো রাষ্ট্রপতির শাসনের প্রতিষ্ঠা হয়েছে। তা ছাড়া স্পীকারকেও দায়ী করা অনুচিত। মাননীয় স্পীকার গণতান্ত্রিক পথেই এগিয়েছিলেন, তিনি কোনরকম অগণতান্ত্রিক কিছু করলে সংবিধানসম্মতভাবে বিরোধিতা করা সম্ভব ছিল। আর তিনিও প্রথম থেকেই রাষ্ট্রপতির শাসনের কথা বলে এসেছেন। এতদসত্ত্বেও কিছু কিছু রাজনৈতিক নেতা স্পীকারের সম্মানিত পদ সম্পর্কে গর্হিত মন্তব্য করছেন। নিজেদের ত্রুটি ঢাকবার জন্যে ঐ ধরণের মন্তব্যে সংবিধানের মর্যাদা কতোটা রক্ষা করা হচ্ছে। আশা করি, মাননীয় স্পীকারদের মর্যাদা যাতে কোথাও লঙ্ঘিত না হয়, সেদিকে সকলেই দৃষ্টি রাখবেন। যদ্দুর জানা গেছে, পশ্চিমবঙ্গে রাষ্ট্রপতির শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় স্পীকার সম্বন্ধে একটা নতুন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। সংবাদপত্র থেকে জানা গেছিল যে, বিদেশে স্পীকার সম্মেলনে পশ্চিমবঙ্গের স্পীকার বিশেষভাবে আহূত হয়েছিলেন, কেন্দ্রীয় সরকার তাতে রাজী হন নি। এ ব্যাপারে সংবাদপত্রে বিরূপ মন্তব্যও প্রকাশিত হয়েছিল। বর্তমান অবস্থায় মাননীয় স্পীকারের পক্ষে যোগদান করা হয়তো একেবারেই সম্ভব হবে না। এসব ঘটনা থেকে মনে হয়, মুখে গণতন্ত্রের কথা বলা হলেও, গণতন্ত্র এখানে উপহসিত।

যা হোক, রাষ্ট্রপতির শাসন পশ্চিমবঙ্গে শান্তি ফিরিয়ে এনেছে। এবং এই শান্তিশৃঙ্খলার খাতিরেই রাষ্ট্রপতির শাসনের কামনা করা হয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গের বুক থেকে ১৪৪ ধারার আদেশ তুলে নেওয়া হয়েছে। কোয়ালিশন সরকারের আমলে ভর্তি কারাগারগুলি খালি করে দেওয়া হচ্ছে। একমাত্র হিংসাত্মক কারণে যাঁরা আটক আছেন, তাঁদের এখনই ছাড়া হচ্ছে না। এই ব্যাপারে আমরা কোনো মন্তব্য করতে চাই না। তবে শান্তিপূর্ণভাবে আন্দোলন করতে গিয়ে অনেকেই কারাগারে গেছেন। তাছাড়া কোয়ালিশন সরকারের নির্দেশে পুলিশও সদ্-আচরণ করে নি, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রতিশোধমূলক আচরণ করেছে। বাদ-বিবাদের প্রসঙ্গ তুলে গিয়ে একথা আজ সকলেই স্বীকার করবেন যে, নিষেধবিধির দ্বারা রাজ্য রক্ষা করা যায় না, বরং বিধিনিষেধ তুলে নেওয়ার ফলেই পশ্চিমবঙ্গে এখন শান্তি ফিরে এসেছে।

রাজ্যপালের ওপর এখন পড়েছে ভয়ানক দায়িত্ব। ধান-চাল সংগ্রহ, বেকারীত্ব দূরীকরণ, চাকরি থেকে ছাঁটাই কর্মীদের পুনরায় চাকরিতে নিয়োগ করার ব্যবস্থা, দুর্নীতি দূরীকরণ প্রভৃতি গুরুতর দায়িত্ব তাঁরই ওপর। আমরা আশা করি, পশ্চিমবঙ্গকে নানাবিধ অনিশ্চয়তার হাত থেকে রক্ষা করে এই রাজ্যের শাসনভার শীঘ্রই জনগণের হাতে সমর্পণ করা হবে। কারণ রাষ্ট্রপতির শাসন এখন প্রার্থিত হলেও দীর্ঘস্থায়ী হিসেবে তা কাম্য নয়। এবং দ্রুততর নির্বাচন সম্ভব হবে, এই রাজ্যে যদি এখন দ্রুত অনিশ্চয়তা দূর করা সম্ভব হয়।

সম্পাদকীয়

আজকের মানুষ

'দ্যাখো দ্যাখো, ওই ল্যান্ডস্কেপটা দ্যাখো, অপূর্ব! প্রকৃতির সূক্ষ্মতম লীলাবৈচিত্র্যটুকুও শিল্পীর দৃষ্টি এড়ায় নি।...আর দ্যাখো এখানে, এই পোর্ট্রেটটা চেয়ে দ্যাখো। কী অদ্ভুত জীবন্ত, যেন ফ্রেম ছেড়ে বেরিয়ে আসবে রহস্যময়ী নারীমূর্তিটি, না? সত্যি তরুণীটির চোখে-মুখে যেন প্রাণের সঞ্চার করেছেন আর্টিস্ট!'

ছবিতে যিনি প্রাণ প্রতিষ্ঠা করতে পারেন তিনি অবশ্যই মহৎ শিল্পী, তিনি স্রষ্টা। আমরা যাঁর কথা এখানে বলছি তিনি শিল্পী, আক্ষরিক অর্থে তিনি আবার স্রষ্টাও। পি কে সেন জড় দেহে নতুন প্রাণের সঞ্চার করেছেন, প্রদর্শনীতে তাঁর আঁকা ছবিগুলো দেখে ইতিপূর্বেই বিদগ্ধ সমালোচকেরা 'প্রাণবন্ত' আখ্যা দিয়েছেন।

পি কে সেন তবে কী? তিনি শিল্পী, না চিকিৎসক? কী তাঁর পেশা? শ্রীসেন দুই-ই। তিনি আর্টিস্টও বটেন আবার সার্জনও। আসলে তাঁর বুকের ভেতরে রয়েছে এক শিল্পিমন, যার জন্যে তিনি সৃষ্টির তাগিদ অনুভব করেন। বম্বের বহু চিত্রপ্রদর্শনীতে তাঁর শিল্পকৃতী সুধীজনের উচ্চ প্রশংসা লাভ করেছে, একাধিকবার এখানে একক প্রদর্শনীও তিনি করেছেন। দর্শকরা বিমুগ্ধ হয়েছেন তাঁর শিল্পরীতি দেখে, জীবন ও জনতার প্রতি তাঁর সহৃদয় আন্তরিকতা-সহানুভূতির স্বাক্ষর দেখে, তাঁর বলিষ্ঠ বাস্তব ও জীবনবোধের পরিচয় পেয়ে। সমালোচকেরা আরো বিস্মিত হয়েছেন, যখন তাঁরা জানতে পেরেছেন যে, শিল্পকলায় শ্রীসেনের কোনো কেতাবী বিদ্যে নেই, কোন আর্ট কলেজে তিনি শিক্ষালাভ করেন নি, কোনো গুরুও নেই তাঁর।

ডাঃ পি কে সেন এ্যানাটমির ছাত্র, অধ্যাপকও তিনি। মানবদেহের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম খবর তাঁর নখদর্পণে। আর আছে গভীর অন্তর্দৃষ্টি, জীবন ও প্রকৃতি যে-অন্তর্দৃষ্টির আড়ালে কখনো যেতে পারে না। কিন্তু আজকের আলোচ্য বিষয় আর্টিস্ট পি কে সেনের শিল্পকর্ম নয়, সার্জন পি কে সেন স্বদেশে-বিদেশে আলোচনার বিষয়বস্তু হয়েছেন তাঁর ঐতিহাসিক হার্ট অপারেশনের কারণে। গত সপ্তাহে বম্বের কিং এডোয়ার্ড মেমোরিয়াল হাসপাতালে ডাঃ সেন এক তরুণীর হৃৎপিণ্ড কেটে এক মধ্যবয়স্ক চাষীর দেহে জুড়ে দিয়েছেন। হৃৎপিণ্ড সংস্থাপনের ঘটনা পৃথিবীতে এই প্রথম নয় অবশ্য, কিন্তু সমগ্র এশিয়া মহাদেশে এ-ধরণের অপারেশনের গৌরব ডাঃ সেনই প্রথম অর্জন করলেন, সেই সঙ্গে তিনি ভারতমাতারও মুখোজ্জ্বল করলেন। কারণ সারা পৃথিবীতে আর মাত্র দুটি দেশে মানুষের হৃৎপিণ্ড বদলের আশ্চর্য ঘটনা ঘটেছে। দক্ষিণ আফ্রিকা ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ইতিপূর্বে ঐ ধরণের মোট পাঁচটা অত্যাশ্চর্য অপারেশন সম্ভব হয়েছে, ভারতের স্থান তৃতীয়, এখানে ষষ্ঠ অপারেশন হল, করলেন ডাঃ সেন।

'যাকে বাঁচানো সম্ভব, অথচ লোকটা চোখের সামনে অসহায়ভাবে মারা যাচ্ছে—এ-অবস্থার সঙ্গে আমি কখনোই আপোষ

ডাঃ পি কে সেন

করতে পারি নে।' বলেছেন ডাঃ সেন। রাজস্থানের বেচারা গ্রাম্য চাষী বোধন চিত্তন বম্বের কিং এডোয়ার্ড মেমোরিয়াল হাসপাতালে এমনি মরতে বসেছিল। আর ডাঃ সেনকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সে-দৃশ্যই দেখতে হচ্ছিল। রোগ তার হার্টের—চিকিৎসাশাস্ত্রে যার নাম কার্ডিও-মাইয়োপ্যাথি হৃৎপিণ্ড পেশীর দুর্বলতা। এই দুর্বল হৃদযন্ত্র নিয়ে তার জীবনরথ বেশিদিন যে চলতে পারে না সে কথা হাসপাতালের হার্ট স্পেশালিস্টরা সম্যক বুঝতে পেরেছিলেন। হাসপাতালের অপর শয্যায় রয়েছে উনিশ বছরের এক তরুণীর নিষ্প্রাণ দেহ। এক ট্রেন থেকে পড়ে গিয়ে মেয়েটি মাথায় প্রচণ্ড আঘাত পায়, সে আঘাত তার কোমল প্রাণ সহ্য করতে পারে নি, তাকে মৃত্যু ঘোষণা করেছেন ডাক্তাররা। কিন্তু তার দেহের রক্ত চলাচল অব্যাহত রাখার জন্যে সার্জনরা তাকে এক বিশেষ আধারে রেখেছিলেন। ওরই সজীব সতেজ এবং শক্তিশালী হৃৎপিণ্ডটির ওপর নজর পড়ল ডাঃ সেনের। তরুণীর দেহে প্রাণ নেই, তাকে ফেরানোর চেষ্টা বৃথা, কিন্তু তার হৃৎপিণ্ডটা সপ্রাণ রয়েছে। তরুণীর নিশ্চল দেহে ডাক্তারদের কোন প্রয়োজন নেই, কিন্তু তার হৃৎপিণ্ডটা পাওয়া গেলে একটা মুমূর্ষু চাষীর প্রাণ ফিরে পাওয়া যেতে পারে। ডাঃ সেন সংগ্রাম সুরু করলেন ছুরি-কাঁচি নিয়ে, সঙ্গে তাঁর ৩৫ জন সহযোদ্ধা সার্জন। প্রায় তিন ঘণ্টা চলল সে-লড়াই, রাত সোয়া বারোটায় অস্ত্র ধরে আড়াইটেয় ডাঃ সেনের বিজয়বৈজয়ন্তী উড়লো। অপারেশন সাকসেসফুল। একের হৃৎপিণ্ড অন্যের দেহে সংযোজিত হল। যুদ্ধের রসদ যোগাতে কার্পণ্য করে নি কেউ, অল্প সময়ের মধ্যে মেডিক্যাল ছাত্ররা, স্বেচ্ছাসেবকরা মিলে প্রয়োজনীয় ৫০ বোতল রক্ত দান করলেন।

বোধনের নতুন প্রাণের উদ্বোধন করা গিয়েছে, বোধন চিত্তনের অপরিপ্লুত চিত্ত শুদ্ধ করা হয়েছে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাকে বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব হয় নি, তিন ঘণ্টা পরে সে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেছে। কিন্তু সে মৃত্যু তার চাষীদেহ তরুণী 'হৃদয়' প্রত্যাখ্যান করেছে বলে নয়, অপর লোকের হৃৎপিণ্ড তার দেহ রিজেক্ট করে নি, তার নিজের ফুসফুসটা ছিল অত্যন্ত দুর্বল, পালমোনারি হাইপারটেনসনের কারণেই বোধন চিত্তনের চূড়ান্ত মৃত্যু ঘটল।

ডাঃ সেন মনে করেন, তাঁর সার্জারি পদ্ধতি ডাঃ বার্নার্ডের অনুসৃত পদ্ধতির চেয়েও উন্নত, যদিও ডাঃ বার্নার্ডের প্রতি শ্রদ্ধায় মাথা তাঁর সতত অবনত।

৫২ বছরের দীর্ঘদেহী বাঙালী ডাক্তার ডাঃ সেনের সৃষ্টির উন্মাদনা দীর্ঘদিন থেকে। সে উন্মাদনা কখনো তিনি প্রকাশ করেন রঙ তুলি দিয়ে ক্যানভাসের ওপর, কখনো জীবন্মৃতের ওপর। এডোয়ার্ড মেডিক্যাল কলেজ থেকেই তিনি ডাক্তারী পাশ করেছেন, আজ তিনি এই কলেজের একজন যশস্বী অধ্যাপক-ডাইরেক্টর। হৃৎপিণ্ড স্থানান্তর ও সংস্থাপনের চেষ্টায় তিনি নিজেকে নিয়োগ করেছেন সেও বহুদিন। ইতিপূর্বে কুকুরের ওপর পরীক্ষা চালিয়ে তিনি সফল হয়েছেন। ডাঃ বার্নার্ডের অপারেশন তাঁকে উৎসাহিত করেছে মনুষ্য হৃৎপিণ্ডে হাত দিতে। ডাঃ সেন তাঁর লক্ষ্যপথে একটা বিরাট ধাপ অগ্রসর হয়েছেন। শত শত মানুষ তাদের বিকল হৃৎযন্ত্রের কারণে জীবনের আশা ছেড়ে দিয়ে যেদিন কেবল প্রহর গুণবে, ডাঃ সেনের দেওয়া নতুন হৃৎপিণ্ড পেয়ে যেদিন তারা নতুন জীবন ফিরে পাবে, সেদিনের কি খুব দেরি আছে?

সাংবাদিক বৈঠকে রাজ্যপাল শ্রীধর্মবীর

রাষ্ট্রপতির শাসন চালু হবার সংবাদ
... ২০শে ফেব্রুয়ারী সন্ধ্যার
... কাশিত হওয়ামাত্রই
... আনন্দে ও
... দৃশ্যের
... ন

... শহরের জনসাধারণের মধ্যে এক অভূতপূর্ব চাঞ্চল্যের প্লাবন বয়ে যায়। সংবাদপত্রের ও সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠানের অফিসে মুহুর্মুহু টেলিফোন আসে রাষ্ট্রপতির শাসনের সংবাদের সত্যতা যাচাই করার জন্য, শহরের পথেঘাটে অফিসে আদালতে উল্লসিত জনতার ভিড় ও জটলা। সর্বত্র জনসাধারণ আনন্দ-উচ্ছ্বাসের মধ্য দিয়ে রাজ্যের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে রাষ্ট্রপতির শাসনকে স্বাগত জানিয়েছেন।
...ই আনন্দের কারণ বহুবিধ। প্রথমত
...ত্রিসভা ও বিধানসভা বাতিল হয়ে
...ওয়ার ফলে রাজ্যের বর্তমান সাংবিধানিক
...কটের অবসান ঘটল। দ্বিতীয়ত
...পতির শাসন পুরোদস্তুর বলবৎ করার
... দলত্যাগী স্বার্থপর সুবিধাবাদী
...দের স্বরূপ অত্যন্ত নগ্নভাবে
...িত হয়ে গেল। দল ভাঙা রাজ-
...ত বিশ্বাসী অস্থিরমতি বিধানসভার
...দেরকে এবার জনসাধারণের রায়ের
... দাঁড়াতে হবে এবং বলাই বাহুল্য
...রণের রায় তাঁদের স্বপক্ষে যাবে
... জনসাধারণের আনন্দ আরও একটি
... কারণে। বিগত যোম-মন্ত্রিসভার
...িনা ও অবহেলার ফলে সরকারী
...দুর্নীতি নিছক ব্যর্থতায় পর্যবসিত
...। জোতদার-মজুতদাররা ইতিমধ্যেই
...ধান-চাল লুকিয়ে ফেলেছে। অন্য কোন
...ইলে সরকার গঠিত হলে সেই সরকারের
...

পক্ষেও প্রয়োজনীয় খাদ্যশস্য সংগ্রহ অসম্ভব হত। এখন মোটামুটি পশ্চিমবঙ্গকে খাদ্য যোগানের দায়িত্ব কেন্দ্রের।

নেপথ্য কাহিনী

রাষ্ট্রপতির শাসনের পিছন দিককার ইতিহাস সকলেরই প্রায় জানা আছে, কেননা এটা কোন আকস্মিক ঘটনা নয়। বরং তা বহু প্রতীক্ষিত। এ কথা দিবালোকের ন্যায়ই স্পষ্ট যে, বিগত যুক্তফ্রণ্ট সরকারকে অপসারণের জন্য যে চক্রান্তের সৃষ্টি করা হয়েছিল তার পিছনে কোন আদর্শবাদ কাজ করে নি, ব্যক্তিগত উচ্চাকাঙ্ক্ষা পূরণ ও জঘন্য ধরণের সুবিধাবাদই ছিল তার মূলে। গান্ধীজী বলেছিলেন, দু' দল চক্রান্তকারীর মধ্যে কোন প্রকৃত সমঝোতা গড়ে উঠতে পারে না, এ ক্ষেত্রেও ঠিক তাই হয়েছিল। সতেরজন দলছুট সদস্য নিয়ে যে পি ডি এফ-এর সৃষ্টি হয়েছিল, সেখানেও ভাঙন দেখা গেছল এই কারণেই যে ওই সব ক'জনেরই উচ্চাকাঙ্ক্ষা নিবৃত্তি করার মত ব্যবস্থা করে উঠতে পারা যায় নি। এবং সেই একই অবস্থা কংগ্রেসেও ঘটেছে। শ্রীআশু ঘোষ খুব সঙ্গতভাবেই এ প্রশ্ন তুলেছিলেন যে, যে প্রতিষ্ঠান নিজেই গণতান্ত্রিক নয়, সেই প্রতিষ্ঠানের মুখে গণতন্ত্রের বুলি একটা নিছক ভণ্ডামি ছাড়া আর কিছুই নয়। যে সকল

নেতা সাম্প্রতিক নির্বাচনে জনগণের কাছে ঘৃণা ও ধিক্কারের পাত্র হয়েছেন, তাঁরাই যদি সংগঠনের চূড়ায় আজও পর্যন্ত বসে থাকেন তাহলে সেই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখা সম্ভবপর নয়। তাঁর মতে পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস কতিপয় ব্যক্তির ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে রূপান্তরিত হয়েছে, এবং এই কারণেই তিনি দাবি করেছিলেন যে, পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের কাঠামো আগাগোড়া পরিবর্তন করা হোক, নির্বাচনে পরাভূত ব্যক্তিরা রাজনৈতিক অবলুপ্তির অন্ধকারে চলে যেতে বাধ্য হোন এবং তার জায়গায় নতুন নেতৃত্বকে বসানো হোক। শ্রীআশু ঘোষের এই দাবি রক্ষিত না হওয়ায় তিনি তাঁর অনুগামীগণসহ কংগ্রেস-পি ডি এফ কোয়ালিশনের প্রতি তাঁদের সমর্থন প্রত্যাহার করে নেন। শ্রীঅতুল্য ঘোষ গোষ্ঠী অনেক চেষ্টা করেছিলেন শ্রীআশু ঘোষের দলবলকে খোঁয়াড়ে পুনরায় ফিরিয়ে আনার জন্য, কিন্তু সফল হন নি। ভ্রাতিশত্রুতা সব কিছুর ওপরেই বরাবর স্থান পায়। অতুল্য ঘোষ গোষ্ঠী কূট-নৈতিক উপায়ে আশু ঘোষ গোষ্ঠীকে বাগে আনতে না পেরে মধ্যবর্তী নির্বাচনের ভয় দেখালেন। কেন না দলত্যাগীদের পক্ষে নির্বাচন একটু ভয়েরই বস্তু। কিন্তু তাতেও যখন আশু ঘোষ নিরস্ত হলেন না, তখন সহকারী কংগ্রেসের পক্ষে নিজের নাক কেটে পরের যাত্রাভঙ্গ করার মতই কাজে অবতীর্ণ হতে হল, বাধ্য হয়েই রাষ্ট্রপতির শাসন ও মধ্যবর্তী নির্বাচনের সুপারিশ করতে হল। কেন না শ্রীআশু ঘোষের সমর্থন প্রত্যাহারের পর এমনিতেই বিধানসভায় কংগ্রেস-পি ডি এফ সংখ্যা-লঘিষ্ঠ দলে পরিণত হয়েছে। কাজেই কংগ্রেসের পক্ষে কণ্টকর হলেও রাষ্ট্রপতির শাসন ও অন্তর্বর্তীকালীন নির্বাচনের সুপারিশ করা ভিন্ন উপায় ছিল না।

এর ফলে স্বভাবতই সেই ব্যক্তিটির কপাল পুড়ল যাঁকে শ্রীচক্রবর্তী রাজা-গোপালাচারী স্কেপগোট বলে উল্লেখ করে-ছিলেন। মুখ্যমন্ত্রিত্ব বিসর্জন দিতে ডঃ ঘোষের মোটেই ইচ্ছা ছিল না, বরং স্পীকারের রায়ের দোহাই দিয়ে তিনি গদিতে আসীন থাকার চেষ্টা করেছিলেন শেষ পর্যন্ত। যুক্তি দিয়েছিলেন যে, তিনি বিধানসভাতেই নিজ শক্তি যাচাই করে নেবেন, যদিও তিনি জানতেন যে, স্পীকারের রায়ের পর বিধানসভা পুনরায় স্বাভাবিকভাবে চালু হবার আশা আপাতত নেই। কিন্তু শ্রীআশু ঘোষের বিদ্রোহের পর ডঃ ঘোষের প্রতি কংগ্রেসের মোহ কেটে গেছে, কংগ্রেস বুঝে নিয়েছে বর্তমান মন্ত্রিসভার অস্তিত্ব কিছুতেই বজায় থাকবে না। কাজেই তাঁদের নিজেদের সমস্যা নিজেদেরই ভাবতে হবে। এখন ডঃ ঘোষের বোঝা বইবার অবকাশ তাদের নেই, তা বইতে গিয়ে তাঁরা ইতিমধ্যেই অপদস্থ হয়েছেন। আশু ঘোষেরা দল থেকে বেরিয়ে গেছেন, আরও কেউ কেউ বেরিয়ে যাবার চেষ্টা করছেন, কাজেই আরও অপদস্থ হবার আগে নিজেদের ভাঙা ঘর আর একবার গুছোনোর চেষ্টা করাই ভাল। ডঃ ঘোষের গদিতে টিকে থাকার ইচ্ছা থাকলেও, তাঁকে টিকিয়ে রাখার আগ্রহ এখন কংগ্রেসের কাছে অর্থহীন। যে কংগ্রেস একদা সদম্ভে ডঃ ঘোষকে আশ্বাস দিয়েছিল যে, সর্বদাই তাঁর সঙ্গে জোঁকের মত লেগে থাকবেন, যাঁদের ভরসায় ডঃ ঘোষ ক্ষমতার নেশায় বুঁদ হয়েছিলেন, তাঁরাই অর্থাৎ শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন ও শ্রীঅতুল্য ঘোষ তাঁকে শেষ পর্যন্ত পত্র মারফৎ জানালেন, "আপনাকে অনুরোধ করছি আপনি অনুগ্রহপূর্বক মন্ত্রিত্বে ইস্তফা দিন।" এর পর বলাই বাহুল্য পদত্যাগ করা ভিন্ন ডঃ ঘোষের সামনে আর কোন উপায় ছিল না। ৯২ দিনের শাসনের অবসান ঘটল। ডঃ ঘোষের শেষ জীবনের এই মর্মান্তিক অভিজ্ঞতা উচ্চাকাঙ্ক্ষা সুবিধাবাদী নেতাদের শিক্ষণীয় বিষয় হয়ে রইল। 'চক্রান্তকারীদের মধ্যে সত্যই কোন মৌলিক সমঝোতা হয় না'—গান্ধীজীর এই বাণীর তাৎপর্য অনুধাবন করতে গান্ধী-শিষ্য ডঃ ঘোষ একেবারেই ব্যর্থ হয়ে-ছিলেন। যুক্তফ্রন্টের সঙ্গে তাঁর মতভেদের পর তিনি যদি পদত্যাগ করে সরে যেতেন তাহলে কেউই কিছু বলতে পারত না, তিনি তাঁর সুনাম বজায় রেখেই জনগণের চোখে শ্রদ্ধেয় থাকতে পারতেন। কিন্তু তিনি যে পথে গেছলেন, সেটা জনসাধারণ তাঁর কাছে আশা করেন নি। রাজনীতির সঙ্গে সংস্রবহীন যে কোন সাধারণ মানু[illegible] তখন বলেছিলেন যে, প্রয়োজন সিদ্ধ হ[illegible] কংগ্রেস তাঁকে জীর্ণ বসনের মত [illegible] করবে। সেটা যে এত তাড়াতাড়ি [illegible] তা হয়ত ভাবা যায় নি। আজ কংগ্রে[illegible] ডঃ ঘোষকে কোন প্রয়োজন নেই [illegible] নির্মম সত্য। তাঁর রাজনৈতিক [illegible] ঘটে গেল, সেই সঙ্গে শ্রীহুমায়ুন[illegible] এবং আরো অনেকেরই।

বিধানসভা সিদ্ধ নয় এমন [illegible] মন্ত্রিসভা অনির্দিষ্টকাল আস[illegible] থাকতে পারে না। স্পীকারের রুলিং-এর ফলে এমন একটা অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল যাতে কোন মন্ত্রিসভার পক্ষেই বিধানসভা সিদ্ধ হয়ে অবস্থান করাটা সম্ভব ছিল না। স্পীকারের প্রথম রুলিং-এর আসল কথাটি ছিল যে, যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রি-সভা কর্তৃক প্রদত্ত ১৮ই ডিসেম্বর তারিখকে বিধানসভা আহ্বানের দিন না করে তার আগেই সেই সরকারকে বরখাস্ত করে রাজ্যপাল নিজ অধিকারের সীমা লঙ্ঘন করেছেন এবং বিধানসভা তথা স্পীকারের ক্ষমতার সীমা সংকুচিত করে-ছেন। এই বিবেচনাবোধ থেকেই তিনি ২৯শে নভেম্বরের ঐতিহাসিক রুলিং দিয়েছিলেন যে অনুযায়ী তিনি বিধান-সভার অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য মুলতুবী করে দিয়েছিলেন এবং দ্বিতীয়-বারেও ঘোষণা করেছিলেন যে, তাঁর প্রথম রুলিং বদলাবার কোন সঙ্গত কারণ তিনি খুঁজে পান নি এবং তাঁর প্রথম রুলিং-এর ফলে উদ্ভূত পরিস্থিতির কোন সন্তোষ-জনক সাংবিধানিক সমাধান হয় নি। প্রকৃত-পক্ষে বলতে গেলে স্পীকারের এই রুলিংকে এড়িয়ে কোন সরকার আইন-সঙ্গত অস্তিত্ব দাবি করতে পারত না, এবং এই সাংবিধানিক সংকট উত্তরণের জন্য রাষ্ট্রপতির শাসন ভিন্ন কোন প্রকৃত পথ ছিল না। সেটা ঘটতই, আজ না হোক কাল।

তা ছাড়া পূর্ববর্তী যুক্তফ্রন্ট সরকারের পিছনে যে অভূতপূর্ব জনসমর্থন ছিল, কংগ্রেস-পি ডি এফ কোয়ালিশন মন্ত্রিসভার পক্ষে তা কল্পনা করাও অসম্ভব ছিল। ডঃ ঘোষ এবং পি ডি এফ যে পন্থা অবলম্বন করেছিলেন তা অনেক যুক্তফ্রন্ট বিরোধী ব্যক্তিরও নীতি-বোধ ও রুচিকে আহত করেছিল। তা ছাড়া ডঃ ঘোষ সরকারের সার্বিক ব্যর্থতায় অনেকেরই মোহমু[illegible] এফ সরকার [illegible] বৃদ্ধি [illegible] বা[illegible]

[illegible] কিছুই করতে সমর্থ হয় নি। সাপ্তাহিক বসুমতীর পাঠকমাত্রেই নিশ্চয় এটা লক্ষ্য করেছেন যে, বিগত তিন মাসের রাজত্ব-কালে ঘোষ সরকারের একটি কাজেরও প্রশংসা করার সুযোগ আমাদের হয় নি, কেন না তাঁরা এমন একটাও কাজ করেন নি যা প্রশংসার দাবি রাখে। 'দেখে নেবো' 'সোজা করে দেবো' 'দরকার হলে গুলী চালাবো'—এই জাতীয় কথা ছাড়া একটা

তার কথা আমরা তাঁদের মুখ থেকে শুনতে পাই নি। যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা খারিজ হয়েছে ২১শে নভেম্বর। ওই দিনই মধ্যরাত্রি থেকে যে ১৪৪ ধারা জারি হল তার আর কোন নড়চড় হল না। লোকের সমবেত হবার অধিকার, মতামত প্রকাশ করার অধিকারসমূহ কেড়ে নেওয়া হল এবং শুরু হল ব্যাপক গ্রেপ্তারী। পরদিন অর্থাৎ ২২শে নভেম্বর থেকে রাজ্যব্যাপী ঘোষ-মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ শুরু হয়। পুলিশ এই সময় একটি ত্রাসের রাজত্ব সৃষ্টি করে যা গত বিশ বছরের ইতিহাসে অভূতপূর্ব। স্বয়ং সরকারকে পর্যন্ত স্বীকার করতে হয় যে, পুলিশী বাড়াবাড়ি হয়েছে। সাংবাদিকদের যেরকম নির্মমভাবে প্রহার করা হয়েছিল তার নজির সাম্প্রতিককালে খুঁজে পাওয়া যায় না, কেন না ডঃ ঘোষের মতে সাংবাদিককুল চরিত্রভ্রষ্ট, মদ্যপ এবং আরও অনেক কিছু! উত্তরপাড়া কলেজে পুলিশ যে কীর্তি করেছিল তা যে কোন সভ্যদেশের পক্ষেই কলংক স্বরূপ। সে কথা আমরা পূর্বে বহুবার উল্লেখ করেছি। প্রতিদ্বন্দ্বী রাজনীতিকদের শায়েস্তা করতে ঘোষ সরকার সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিলেন। কিন্তু আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার তেমন কোন চেষ্টা করেন নি। বেলঘরিয়ায় প্রকাশ্য গুণ্ডামী আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার ব্যর্থতার একটি নগ্ন উদাহরণ। এই কোয়ালিশন সরকারের আমলে ১৮ জন গুলীতে নিহত হয়েছে, আহতদের সংখ্যা প্রায় ১০০০, তন্মধ্যে যুক্তফ্রন্ট আমলের কয়েকজন মন্ত্রীও ছিলেন। এ পর্যন্ত প্রায় ৪০ হাজারেরও বেশি স্বেচ্ছাসেবক এই সরকারের গদিচ্যুতির দাবিতে কারাবরণ করেছেন। এই সরকারের আমলে বিরোধী দলে বহু নেতা, ছাত্র নেতা ও কর্মীদের পি ডি অ্যাক্টে গ্রেপ্তার করা হয়। যুক্তফ্রন্টের আমলে ঠিক হয়েছিল যে দশ লক্ষ টন খাদ্যশস্য সংগ্রহ করা হবে, ডঃ ঘোষের সরকার সেই লক্ষ্য কমিয়ে ৭ লক্ষ টন করেছিলেন, কিন্তু ১৯শে ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত সংগৃহীত হয়েছে মাত্র ১ লক্ষ ৫২ হাজার টন। এই অবস্থায় রেশনে চালের যোগান বজায় রাখা সম্ভব হবে না। একথা আমরা পূর্বে বহুবার আলোচনা করেছি। এখন কেন্দ্রীয় সাহায্য ভিন্ন আর কোন পথ খোলা নেই। পি ডি এফ মন্ত্রিসভা ইচ্ছা করে দেশকে এমন একটা অবস্থায় ফেলে গেলেন যা থেকে উদ্ধার পাওয়া রীতিমত কঠিন।

রাষ্ট্রপতির শাসন

রাষ্ট্রপতির শাসন শেষ পর্যন্ত যেন আশীর্বাদের মতই পশ্চিমবঙ্গে নেমে এসেছে। অনেকে অবশ্য বলেছেন যে, বিধানসভাকে কিছুদিনের জন্য সাসপেন্ড করে দিয়ে কয়েকদিনের জন্য রা.প.-এর শাসন প্রবর্তনের পর আই-এন-ডি-এফকে যুক্তফ্রন্টের সমর্থনে শাসন করার সুযোগ দিলেই ভাল হত। কিন্তু এটা না হয়ে ভালই হয়েছে। কেন না এখন পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে সাফল্যলাভ করতে গেলে খাদ্যনীতিতে সাফল্যলাভ করতে হবে। ঘোষ-সরকার দেশের খাদ্যাবস্থাকে যে চরম সংকটজনক পর্যায়ে রেখে গেছে, এরপর যে কোন দলই ক্ষমতায় আসুক না কেন, তার পক্ষে কিছুই করা সম্ভবপর নয়। একমাত্র কেন্দ্রীয় বরাদ্দই এখন পশ্চিমবঙ্গবাসীদের মুখে খাদ্য যোগাতে পারে, এবং রাষ্ট্রপতির শাসন প্রবর্তিত হবার পর পশ্চিমবঙ্গকে খাদ্য যোগানোর দায়িত্ব সোজাসুজি কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে গিয়ে পড়েছে। সেদিক থেকে বর্তমান অবস্থায় রাষ্ট্রপতির শাসনকে কেউ কেউ আশীর্বাদ বলে ভাবছেন। রাষ্ট্রপতির শাসনের ফলে সকল শাসন-ক্ষমতা রাজ্যপালের হাতে গিয়ে পড়েছে। এ পর্যন্ত যা দেখা গেছে তাতে রাজ্যপাল মোটামুটি 'গুড স্টার্ট' দিয়েছেন। আইন অমান্য আন্দোলনে ধৃত ব্যক্তিদের ইতিমধ্যেই মুক্তি দেওয়া হয়েছে এবং নিবর্তনমূলক আটক আইনে যাদের ধরা হয়েছিল তাদের অনেককেই মুক্তি দেওয়া হয়েছে। তিন মাসের শ্বাসরোধকারী ১৪৪ ধারা মোটের ওপর প্রত্যাহৃত হয়েছে। ধানচালের গোপন মজুত উদ্ধারে সশস্ত্র পুলিশ নিযুক্ত করা হয়েছে, মজুতদারী কালোবাজারী ও ভেজালের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক অভিযান চালানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। রাজ্যপাল ধর্মবীর অবশ্য পশ্চিমবঙ্গে জনপ্রিয় নন, তবে তিনি যে সকল আদেশ দিয়েছেন সেগুলি যদি তিনি কার্যকর করে তুলতে পারেন তাহলে নিশ্চয়ই দেশবাসী তাঁর নিকট কৃতজ্ঞ থাকবে।

মধ্যবর্তী নির্বাচন

ইতিমধ্যে মধ্যবর্তী নির্বাচনের ঘণ্টা ধ্বনিত হতে শুরু করেছে এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক শিবিরে সাজ সাজ রব পড়ে গেছে। জানা গেল যে ডঃ ঘোষ রাজনীতি ত্যাগ করবেন না। তিনি ইতিমধ্যেই নির্বাচনী প্রচারের উদ্বোধন করেছেন এবং নিজ দলের নাম পরিবর্তন করে 'ভারতীয় লোকদল' এই আখ্যা গ্রহণ করেছেন। কংগ্রেস সম্ভবত এই দলের সঙ্গে নির্বাচনী আঁতাত করবে, যেটা কংগ্রেসের সুনামের পক্ষেও ক্ষতিকর। সর্বভারতীয় সর্বাপেক্ষা শক্তিমান দল বলে কথিত কংগ্রেসকে অন্য দলের সঙ্গে নির্বাচনী বোঝাপড়ায় আসতে হচ্ছে এটাই অনেকের কাছে পরম লজ্জার এবং এটাই হয়ত কংগ্রেসের মধ্যে আরও ডিমর‍্যালিজেশন ঘটাবে। অথচ ডঃ ঘোষ কংগ্রেসকে যথেষ্ট সেবা করেছেন, এবং কংগ্রেসের সাহায্য ব্যতীত এককভাবে একটি আসন সংগ্রহ করাও ডঃ ঘোষের দলের পক্ষে অসম্ভব। এক পার্টি অত্যন্ত ইচ্ছুক আর এক পার্টি স্বজনপরিত্যক্ত হবার আশংকায় দ্বিধাগ্রস্ত—এই রকম বিবাহের ব্যাপারটা কি রকম দাঁড়াবে সেটা এখন থেকে অনুমান করা যাচ্ছে। এদিকে শ্রীআশুতোষ ঘোষ গত বৃহস্পতিবার জানিয়েছেন যে, ডঃ ঘোষ মধ্যবর্তী নির্বাচনে কোন কেন্দ্রে প্রার্থীরূপে দাঁড়ালে সেই কেন্দ্রে তিনি ডঃ ঘোষের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। কংগ্রেসের স্ট্র্যাটেজি অবশ্য ঠিক হয় নি। আগামী নির্বাচনের পূর্বে কংগ্রেসের মধ্যে আরও ভাঙন ধরবে যার সূত্রপাত বেশ কয়েক আগে থেকে হয়েছে। ২৬শে ফেব্রুয়ারী যুক্তফ্রন্ট ভবিষ্যৎ কর্মসূচী নির্ধারণ করবেন। তাঁরা কি সিদ্ধান্তে আসবেন সেটা আমরা এই বঙ্গদর্শন লেখার সময় পর্যন্ত জানি না, তবে তা সংবাদপত্রে নিশ্চয়ই প্রকাশিত হবে। যুক্তফ্রন্টের সকল দলই ফ্রন্টের অন্তর্ভুক্ত হয়ে মধ্যবর্তী নির্বাচনের জন্য লড়বার মনোভাব প্রকাশ করেছেন। জাহাঙ্গীর কবিরের নেতৃত্বে গঠিত নতুন দল যুক্তফ্রন্টের সঙ্গেই আছে। জানা গেছে যে তিনি শীঘ্রই তাঁর দলকে যুক্তফ্রন্টের অন্যতম শরিক হিসাবে গণ্য করার জন্য চিঠি দিচ্ছেন। ফ্রন্টের অন্তর্গত দলগুলি মনে করেন যে এবার আসন ভাগাভাগিতে বিরাট কোন অসুবিধা দেখা দেবে না। মোটামুটি বিগত নির্বাচনের ফলাফলের ভিত্তিতেই আসন ভাগাভাগির ব্যাপারে ঐকমতে আসতে বেগ পেতে হবে না। তবে ফ্রন্টের কয়েকটি দল এবার দাবি তুলেছেন যে, আসন ভাগাভাগির আগেই কর্মসূচী সম্বন্ধে একমত হতে হবে। কোন অস্পষ্ট বা ঘোরাটে দফা লিপিবদ্ধ করে নিম্নতম কর্মসূচী গঠন করলে চলবে না। ফ্রন্ট সরকার গঠন করলে কোন্ কোন্ কাজে হাত দেবেন, কিভাবে ঐ সব কাজে অগ্রসর হতে হবে তা পূর্বেই নির্দিষ্ট করে নিতে হবে। আর কটা দিন না গেলে অবশ্য কিছুই সুস্পষ্ট করে বোঝা যাবে না।

(২৪।২।৬৮)

অবক্তব্য

চন্দ্রগুপ্ত

একটি বাঙালী প্রার্থনা

আজ থেকে প্রায় এক দশক আগে পূর্ব পাকিস্তান থেকে প্রকাশিত একটি কবিতা-সংকলন সমালোচনা প্রসঙ্গে জনৈক সমালোচক বলেছিলেন ঃ 'ইতিহাসের ছুরি বাংলার ভূগোলকে দ্বিধাবিভক্ত করলেও বাংলার সাহিত্য এখনও স্রোতস্বিনীর অবিভাজ্যতায় বহমান। পশ্চিমবঙ্গ ও পূর্ব পাকিস্তান, দু'টি পৃথক রাষ্ট্রীয় সত্তা হলও, সাংস্কৃতিক আত্মীয়তায় একটি যে অপরটির পরিপূরক নৈকট্যে অবস্থিত, বাংলাভাষা ও সাহিত্যই তার সব চেয়ে বড়ো প্রমাণ।'

সেদিন এই মন্তব্য, লেখকের অন্যান্য উক্তির সঙ্গে, পূর্ব পাকিস্তানের কিছু সাহিত্যকার ও সাংবাদিকের বিরক্তির কারণ হয়েছিল। সমালোচককে একদেশদর্শী, উদ্দেশ্যপ্রবণ ও উচ্চমন্য রূপে বর্ণনা করে পূর্ব পাকিস্তানের ক্ষুব্ধ লেখকদের একজন বলেছিলেন ঃ 'এ মন্তব্য ('ইতিহাসের ছুরি' ইত্যাদি) প্রকাশের আগে সমালোচক পেছনের দিকে তাকিয়ে বাংলা সাহিত্যের সামগ্রিক ইতিহাস, বাঙালী মুসলিম মানসের পটভূমি এবং পাকিস্তান আন্দোলনের ঐতিহাসিক তাৎপর্য অনুধাবন করেছেন কি না জানি না। করে থাকলে তিনি এত উচ্চকণ্ঠে ও নিঃশঙ্কচিত্তে হয়তো এ কথাগুলো উচ্চারণ করতে পারতেন না।' তারপর সমালোচককে প্রশ্ন করা হয়েছিল ঃ 'শুধু ইতিহাসের ছুরিই কি বাংলার ভূগোলকে দ্বিধাবিভক্ত করেছে? বাংলার বিভক্তিকরণে এবং পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পেছনে কি বাঙালী মুসলমানের দীর্ঘকালীন সাধনা এবং স্বতন্ত্র সাহিত্য ও সংস্কৃতি-চেতনা ক্রিয়াশীল ছিল না? বাঙালী হিন্দুর সাথে মুসলমানের যে সাংস্কৃতিক যোগাযোগ তা কি পরস্পরের পরিপূরক নৈকট্যে অবস্থিত? বাংলাভাষা ও সাহিত্যের ঐতিহাসিক পর্যালোচনার দ্বারা কি এ সত্য সমর্থিত হয়?'

ঢাকা থেকে প্রকাশিত 'পূবালী' (সম্পাদক ঃ মোহাম্মদ নূরুল ইসলাম) পত্রিকার ১৩৬৭ সনের মাঘ সংখ্যায় (প্রথম বর্ষ পঞ্চম খণ্ড) প্রকাশিত প্রতি-সমালোচনার কোন উত্তর মূল লেখক বোধ করি দেন নি, দেওয়ার প্রয়োজনও সম্ভবত বোধ করেন নি। কারণ ইতিহাস এবং সাহিত্যের সত্যকে অস্বীকারের অপপ্রয়াসে এই প্রতি-সমালোচনার জন্ম এবং বলা বাহুল্য তা বাংলাভাষা-সচেতন পূর্ববঙ্গের সাধারণ মানুষের মনোভাবেরও পরিচয় বহন করে না। উপরি-উদ্ধৃত অংশে যে কণ্ঠস্বর শ্রুত, তা রাজনৈতিকের, ঐতিহাসিকের বা সাহিত্যিকের যুক্তিগুলির দুর্বলতা আদৌ ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না এবং পূর্ববঙ্গের সাধারণ মানুষ ইতিমধ্যে আরও অনেক বেশি ভাষা ও সাহিত্য-সচেতন হয়েছেন, তবু মূল লেখকের পক্ষ থেকে সহজ উত্তর দিয়ে উভয় বঙ্গের গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা বাঞ্ছনীয় মনে করি।

সাহিত্য হিসাবে উত্তীর্ণতাই সাহিত্যের একমাত্র মাপকাঠি, অন্য সমস্ত কিছুই গৌণ। ভাষান্তরে, কোন রচনাই সাহিত্যপদবাচ্য হবে না যদি না তা সহৃদয়-হৃদয়-সংবেদ্য হয়। যে কালে মানুষ মহাকাশ জয়ের পথে এগিয়ে চলেছে, একের হৃৎপিণ্ড অন্যের শরীরে সংস্থাপনের অসাধ্যসাধনে ব্যস্ত, সে কালে জাতি ধর্ম বর্ণ ইত্যাদি নিয়ে কেউ ভাবছেন এ কথা ভাবতেও কষ্ট বোধ হয়। বাংলা সাহিত্য বাঙালীর সাহিত্য, হিন্দু মুসলিম খৃস্টান উচ্চবর্ণ নিম্নবর্ণ সকল বাঙালীর চিন্তা ও আবেগের ফসল। সে কালের সৈয়দ আলাউল বা একালের নজরুল যেমন শুধু মুসলমানের প্রিয় নন, হিন্দুরও, তেমনি মধুসূদন বা রবীন্দ্রনাথ হিন্দু-মুসলমান সকল বাঙালীর। আর ক'জন বাঙালী মুসলমান কতদিন যাবৎ পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার জন্য সাধনা করেছেন, সে তথ্য ইতিহাসের ছাত্রের অজানা নয়! পাকিস্তান মূলত কাদের সৃষ্টি এ তথ্যও আজ সর্বজনবিদিত।

কোনো দেশের শিল্প-সাহিত্য, ব্যাপকভাবে সংস্কৃতি, রাতারাতি জন্মায় না। তার পেছনে থাকে বহু জাতির বহু যুগের সাধনা। বাংলা দেশেও এর ব্যতিক্রম হয় নি। হিন্দু-মুসলমান সকল জাতিধর্মের লেখকের দাক্ষিণ্যে সমৃদ্ধ বাংলা সাহিত্য পড়ার সময় যদি হিন্দু-মুসলমানের প্রশ্ন এসে দাঁড়ায় তাহলে শেক্সপীয়র ও এলিয়টের রচনার আস্বাদ গ্রহণের সময়ও আমাদের মনে রাখতে হয়, এ'রা খৃস্টান।

কিন্তু কোন যথার্থ সাহিত্যপাঠকই আজ পর্যন্ত সাহিত্যে জাতি ধর্ম ইত্যাদিতে চিহ্নিত করেন নি। আবহমান বাঙালীর শিল্প-সাহিত্যের বেলায় রসোত্তীর্ণতা ছাড়া অন্য কোন প্রশ্ন উঠতে পারে না, ওঠা উচিত নয়। পূর্ব পাকিস্তানের যে কবি-সমালোচক পাকিস্তান প্রতিষ্ঠাতে বাঙালী মুসলমানদের দীর্ঘকালীন সাধনা কিংবা বাঙালী মুসলমানদের সংস্কৃতি-চেতনার স্বাতন্ত্র্য অনুসন্ধান করেন, তিনি নিজেই যখন বলেন—

'দেশের মাটির সাথে কবিতার
একাত্ম অন্বয়'

তখন কোন্ দেশের কোন্ মাটির গন্ধ তাঁর কবিতা ও কবিতার মনকে ছুঁয়ে যায় এ দেশ নিশ্চয়ই বাংলাদেশ, এ মাটি নিশ্চয়ই বাংলার মাটি। আর এ বাংলা নিশ্চয়ই আবহমান বাঙালীর বাংলা, রাজনৈতিক ভূগোলের বাইরে যার চিরায়ত অবস্থান।

এই বাংলার মাটিতে দাঁড়িয়েই আমি প্রত্যক্ষ করি বাঙালীকে, ভারতীয়কে, সকল পৃথিবীর মানুষকে। এই বাংলার জবাকুসুম-সঙ্কাশিত আকাশের দিকে তাকিয়েই আমি উচ্চারণ করি রবীন্দ্রনাথের ধ্যানময় কবিতা-পংক্তি ঃ মানুষকে গণ্ডির মধ্যে হারিয়েছি/মিলেছে তার দেখা দেশ-বিদেশের সকল সীমানা পেরিয়ে। এবং এই বাংলার কোলে আমার ঈপ্সিত মৃত্যুর আগে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গেই আমি উচ্চারণ করে যাবো ঃ হে মানুষ/হে চিরকালের মানুষ/পরিত্রাণ করো ভেদচিহ্নের তিলক-পরা সংকীর্ণতার ঔদ্ধত্য থেকে।

■

একজন সাধারণ বাঙালী হিন্দুর সঙ্গে একজন সাধারণ বাঙালী মুসলমানের, তা সে যে-বাংলারই হোক না কেন, পার্থক্য কতটুকু? চিন্তায়-আবেগে-আদর্শে তাঁদের ব্যবধান কতটুকু? হিন্দুস্থানের একজন সাধারণ হিন্দুর সঙ্গে পাকিস্তানের একজন সাধারণ মুসলমানের কি আদৌ কোন বিরোধ আছে? সরকারী ভাষ্যে ভারতবর্ষ ও পাকিস্তান বৈরীভাবাপন্ন রাষ্ট্র, অথচ হিন্দুস্থানের জওহরলাল নেহরুর মৃত্যুতে পাকিস্তানের সাধারণ লোক যে আমাদেরই মতো অভিভূত হয়েছিল, এক বিদেশিনী সাংবাদিকের অভিজ্ঞতা থেকে তা জানতে

পারি।* ১৯৬৪-র ২৭শে মে নেহরু যে-দিন পরলোকগমন করেন সেদিন এই বিদেশিনী তায়া জিনকিন পশ্চিম পাকিস্তানে অবস্থান করছিলেন। শ্রীমতী জিনকিনের অভিজ্ঞতায়, সেদিন প্যাকিস্তানের ওপরওয়ালার খুব কম সংখ্যক মানুষই নেহরুর মৃত্যুতে দুঃখিত বোধ করেছিলেন (few in upper classes felt sorry) অথচ উল্টোদিকে পাকিস্তানের সাধারণ মানুষ যথার্থই বেদনা বোধ করেছিল (there was genuine sorrow amongest the common people)। দৃষ্টান্তস্বরূপ জিনকিন একটি চোদ্দ বছরের বালককে বলতে শুনেছিলেন : 'এই তো সেদিনও আমরা, আজকের ভারত ও পাকিস্তান, এক ছিলাম। আর নেহরু শুধু তাঁর দেশের নয়, গোটা এশিয়ার পক্ষ থেকেই কথা বলতেন। এখন আর এশিয়ার কথা কে শুনতে যাচ্ছে? বাস্তবিক আমরাও এক মহান নেতাকে হারালাম। আমাদের স্কুল একদিনের জন্য ছুটি না দিয়ে আমাদের অধ্যক্ষ মহাশয় অত্যন্ত অন্যায় করেছেন।' একটি দোকানের কর্মচারী বলেছিলেন, 'আমাদের প্রেসিডেণ্ট আয়ুব ভারত-পাকিস্তানের সম্পর্ক উন্নত করার এক মস্ত সুযোগ হারালেন। নেহরুর পারলৌকিক ক্রিয়ানুষ্ঠানে পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে না পাঠিয়ে তাঁর নিজের যাওয়া উচিত ছিল।' আর ম্যালের সেই দরিদ্র ফলওয়ালাটি আরও মর্মস্পর্শীভাবে বলেছিল : 'হাজার হোক, আমরা হিন্দু মুসলমান দুই ভাই, এবং আয়ুব নন, নেহরুই আমাদের সকলের জন্য স্বাধীনতা এনে দিয়েছেন।'

মানব-বিদ্বেষী রাজনীতিজীবীরা যে মানবতাকে হত্যা করতে পারেন না বা কোনদিনই পারবেন না, তায়া জিনকিনের উপরি-উক্ত অভিজ্ঞতা সেইদিকে আরেকবার অঙ্গুলিনির্দেশ করল। দেশবিভাগ 'দু-চারজনের অপকীর্তির স্তম্ভ' এবং রাজনীতির নোংরা হাতের জন্য দুই দেশ তাদের সামান্য বিরোধগুলিও মেটাতে পারছে না। এই বোধ একদিন উভয় রাষ্ট্রের সাধারণ মানুষের মর্মমূলকে নাড়া দেবে, এই বিশ্বাস চন্দ্রগুপ্তের চিত্তের গভীরে প্রসারিত।

•

চন্দ্রগুপ্তের আরও একটি দূরবিস্তৃত বিশ্বাস, আজকের হতভাগ্য বাঙালীই সেদিন ভারততীর্থ রচনার মহাব্রত উদ্‌যাপন করতে এগিয়ে আসবে। সেই ব্রতপারণায় যে উদ্‌গীথ ধ্বনিত হবে, তার ভাষা বাংলা। সেদিন বাংলাভাষীর সংখ্যা কত, রাষ্ট্রভাষা হবার মতো জোর বাংলার আছে কি না, সে প্রশ্ন কেউ তুলবে না। প্রাদেশিকতার মেঘ কেটে গিয়ে সেদিন যে সূর্য বিভাসিত হবে, তার নাম স্বদেশপ্রেম, বিশ্বমানবতা যার পরিণত রূপ। ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি পূর্ব বাংলার আকাশে যে রক্তিম ভোরের আত্মপ্রকাশ ঘটেছে, তাকে স্বাগত জানিয়েছে সমগ্র বাংলার জনসাধারণ, বাংলাভাষা যাদের রক্তের ভাষা। পশ্চিমবঙ্গে বাংলাভাষা অপেক্ষাকৃত অবহেলিত, এখানে বাংলাভাষা এখনও সরকারী ভাষার মর্যাদা পেল না, এই কারণেই বলি, বাংলাভাষাকে স্বমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করার ব্যাপারে পূর্ব বাংলাই আমাদের নেতৃত্ব দেবে এবং তারপর একদিন উভয় বাংলার জনসাধারণের মিলিত হাতের প্রচেষ্টায় গড়ে উঠবে স্বপ্নের ভারততীর্থ।

রাজনৈতিক কারণে পূর্ববঙ্গের সাহিত্যসাধনার খোঁজখবর ও নিদর্শন পশ্চিমবঙ্গের জনসাধারণ সব সময় পান না। মাঝে-মধ্যে যে সব সাহিত্যকৃতি আস্বাদনের সুযোগ ঘটে, তা থেকে পূর্ববঙ্গের সাহিত্যকর্মীদের নিষ্ঠা ও সচেতনতা অনুমান করতে অসুবিধা হয় না। হাতের কাছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ প্রকাশিত 'সাহিত্য পত্রিকা'র কয়েকটি পুরোন সংখ্যা রয়েছে। সংখ্যাগুলি আমি একাধিকবার পড়েছি এবং পত্রিকাটির উদ্যোক্তা ও লেখকদের প্রতি আমার শ্রদ্ধা গভীর হয়েছে। বিভাগীয় অধ্যক্ষ ও পত্রিকা-সম্পাদক মুহম্মদ আবদুল হাই-এর বাংলা ভাষাতত্ত্ব সংক্রান্ত দীর্ঘ ধারাবাহিক আলোচনা বা বিদ্যাপতি প্রাসঙ্গিক প্রবন্ধ, মুনীর চৌধুরীর মীর মশাররফ হোসেন বিষয়ক ধারাবাহিক গবেষণা-নিবন্ধ, কিংবা প্রবীণ মুহম্মদ শহীদুল্লাহর 'বাঙ্গালা ভাষায় পারসী প্রভাব' জাতীয় প্রবন্ধ (প্রবন্ধগুলির অধিকাংশ সুখপাঠ্যও বটে) সাম্প্রতিক প্রবন্ধ-সাহিত্যের গর্বের কারণ। 'সাহিত্য পত্রিকা' যে উভয় বঙ্গের অঙ্গুলিগণ্য মননশীল প্রকাশনার মধ্যে অন্যতম, তাতে সন্দেহ নেই। পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন লেখকের কবিতা ও প্রবন্ধ-গ্রন্থ (এই দুই বিষয়ে চন্দ্রগুপ্তের উৎসাহ) পড়বারও সুযোগ ঘটেছে এবং স্থানাভাবে ঐ সব গ্রন্থের উল্লেখ করতে না পারলেও সামগ্রিকভাবে তারা চন্দ্রগুপ্তের আশা ও উৎসাহের কারণ হয়েছে।

সম্প্রতি পূর্ববঙ্গবাসীদের একটি গবেষণা-কৃতি আমাদের সশ্রদ্ধ বিস্ময়রূপে দেখা দিয়েছে। ১৯৫৮ সালে ঢাকার বাংলা একাডেমি 'পূর্ববঙ্গের আঞ্চলিক ভাষার অভিধান' নামে যে কাজে হাত দিয়েছিলেন, ১৯৬৪ সালে তার প্রথম অংশ ('অ' থেকে 'আনদুর') প্রকাশিত হয়েছে। স্বনামধন্য পণ্ডিত ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহর তত্ত্বাবধানে পূর্ববঙ্গের অধ্যাপক, শিক্ষক, ছাত্র ও ভিন্ন পেশার ভাষাপ্রেমী মানুষ জেলায় জেলায় শব্দ সংগ্রহের কাজে ব্যস্ত। একাধিক পণ্ডিত ও সর্বসাধারণের সমবেত উদ্যমের ফলে ক্রমশ-প্রকাশ্য এই অভিধান বাংলার ও বাঙালীর গৌরবরূপে পরিগণিত হবে (এ সূত্রে রাজনীতি-লোভী সংস্কৃতি-স্বাতন্ত্র্য বিশ্বাসী বাঙালীকে প্রশ্ন করি : এই অভিধানের জন্য পশ্চিমবঙ্গের বাঙালীও কি গর্ববোধ করতে পারে না? ভিন্ন রাষ্ট্রে প্রকাশিত হলেও এ গৌরব কি সমগ্র বাঙালীর নয়?) আলোচ্য অভিধানের প্রথম অংশ সম্পর্কে শুধু চন্দ্রগুপ্তকেই নয়, চন্দ্রগুপ্তের চাইতে কৃতবিদ্য ও ভাষাবিদ্ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডক্টর অমলেন্দু বসুকেও চমৎকৃত করেছে। অধ্যাপক বসু বলেছেন যে, এটি পড়ে তাঁর নিজ ভাষা সম্বন্ধে গর্ব বেড়ে গেছে। ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক বসু যখন বলেন, 'ইংরেজী ডায়ালেক্ট অভিধানের তুলনায় বাংলা ভাষার আঞ্চলিক শব্দসম্পদ ঐশ্বর্যবান' তখন আমাদের আঞ্চলিক ভাষার অভিধান সংকলনের বস্তুত অনারব্ধ কাজ শুরু করার গুরুত্ব আরও বেড়ে যায়। এবং আমাদের আঞ্চলিক শব্দসংগ্রহের আবশ্যকতার উপর গুরুত্ব আরোপ করে তিনি যা বলেছেন তার প্রতি আমি তাবৎ শিক্ষিত বাঙালীর দৃষ্টি আকর্ষণ করি : 'এইসব আঞ্চলিক শব্দের সাহায্যে, বিশেষত কতকগুলি বিশেষ্য, বিশেষণ ও ক্রিয়াপদের ব্যবহারে আমাদের সাহিত্যিক ভাষা সমৃদ্ধ হওয়ার একান্ত সম্ভাবনা। ভাষার জীবন তার প্রবহমানতায়। যে ভাষা শিলীভূত, স্তব্ধ, প্রসারবিমুখ, সে ভাষা মৃত অথবা

---

*Challenges in India by Taya Zinkin, London, 1966, pp. 13-14

মরণোন্মুখ। বাংলা ভাষার প্রবল প্রবাহ প্রবলতর হবে যদি আমরা আঞ্চলিক শব্দের দিকে নজর দিই।'*

•

পূর্ব বাংলার বাঙালীদের মাতৃভাষা-নিষ্ঠার তুলনায় বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দাদের অনুরাগ অকিঞ্চিৎকর। ষোল বছর আগে যখন উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার চেষ্টা হয়, তখন পূর্ব পাকিস্তানের যুবসমাজ রাজনীতি ভুলে গিয়ে বুকের রক্ত দিয়ে মুখের ভাষাকে রক্ষা করে। অথচ এই ভারতবর্ষে হিন্দীকে যখন রাষ্ট্রভাষার মুকুট পরিয়ে জোর করে অন্য ভাষীদের উপর চাপিয়ে দেওয়ার চক্রান্ত চলছে, তখন পশ্চিমবঙ্গে ক্ষীণকণ্ঠে প্রতিবাদও উত্থিত হয় না (দৃষ্টান্তস্বরূপ ইতিপূর্বে একটি 'অবক্তব্য' রেলওয়ে স্টেশনের নাম-স্তম্ভে হিন্দীর পায়ে বাংলা নাম লেখার বিরুদ্ধে সক্রিয় প্রতিবাদ জানাবার জন্য ছাত্রসমাজকে আহ্বান জানিয়েছিলাম, অন্য নানা বিষয়ে ব্যস্ত ছাত্রবন্ধুরা তাতে সাড়া দেন নি!)। পশ্চিমবঙ্গে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বর্তমানে রমণীমোহন গল্প উপন্যাসে সীমাবদ্ধ, গবেষণাজাতীয় গ্রন্থ প্রকাশে প্রকাশকদের অনীহা প্রবাদবাক্যে এসে পৌঁচেছে। শুধু গবেষণাকর্মই বা বলি কেন, একটু নতুন ধরনের যে-কোন রচনারই প্রকাশক পাওয়া দুরূহ। পশ্চিম বাংলায় ক'টি পত্রিকা প্রকাশিত হয় যা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'সাহিত্য পত্রিকা'র সমকক্ষ?† ঢাকা বা রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনায় নানা বিষয়ে পথিকৃৎ প্রবীণ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হঠাৎ পশ্চাদগতিই বা হয়ে পড়ল কেন? কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ কি 'সাহিত্য পত্রিকা'র অনুরূপ কোন পত্রিকা প্রকাশ করতে পারেন না? পূর্ববঙ্গের পণ্ডিত-সমাজ ও শিক্ষানুরাগী জনসাধারণ যদি তিনখণ্ডে সম্পূর্ণ একটি বিজ্ঞানসম্মত অভিধান (প্রথম খণ্ড পূর্বোল্লিখিত আঞ্চলিক ভাষার অভিধান, দ্বিতীয় খণ্ড ব্যবহারিক বাংলা অভিধান, তৃতীয় খণ্ড সাহিত্যকোষ; দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ডের কাজ এখনও শুরু হয় নি) প্রণয়ন সম্ভব করতে পারে, পশ্চিম বাংলাতেই বা অনুরূপ অভিধানের পরিকল্পনা ও রূপায়ণ সম্ভব হবে না কেন? অর্থাভাব? কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকারের শিক্ষা ও অন্যান্য খাতে অপব্যয় আজ প্রবাদসুলভ। কর্মীর অভাব? ইচ্ছা থাকলে অভিজ্ঞ এবং উৎসাহী কর্মী যে খুঁজে পাওয়া অসম্ভব নয়, তারও প্রমাণ পাওয়া গেছে এই দেশেই। ভাষাতত্ত্ব বা অভিধান-সংকলনের কথাই ধরা যাক। সুনীতি-কুমার চট্টোপাধ্যায় এবং সুকুমার সেনের মতো ভাষাতত্ত্ববিদ যে-দেশে আজও বিদ্যমান, সে-দেশে ভাষাতত্ত্বের অধ্যয়ন ও গবেষণা যদি পশ্চাদগতি হয়, তবে তা ঐ দুই আচার্যের সুনামের কারণ হবে না।*

এ সূত্রে স্মরণীয়, পূর্ববঙ্গে অভিধান-সংকলনের কাজ যাঁর তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হচ্ছে, সেই ডক্টর শহীদুল্লাহর বয়স আশি বছরের উপর। পশ্চিম বাংলার আঞ্চলিক ভাষার অভিধান কবে সংকলিত হবে জানি না, তবে আশ্চর্য হবো না যদি কোন-দিন শুনি পূর্ব বাংলার ছাত্র ও অধ্যাপকরা আমাদের এই কলংকমোচনে এগিয়ে এসেছেন।

এই কারণেই বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রসারে ও উন্নয়নে পশ্চিমবঙ্গের উপর চন্দ্রগুপ্তের আস্থা কম, নেই বললেই চলে। এই কারণেই মাতৃভাষা-সচেতন পূর্ববঙ্গের বাঙালীদের কর্মকীর্তিতে চন্দ্রগুপ্ত অধিকতর উৎসাহী। রাজনৈতিক কারণে দুই বঙ্গের মধ্যে প্রত্যক্ষ সাংস্কৃতিক যোগসূত্র অত্যন্ত ক্ষীণ। এই সাংস্কৃতিক সংযোগ ঘনিষ্ঠ করে তোলার জন্য পূর্ববঙ্গের বাঙালী-দের প্রতি চন্দ্রগুপ্ত আবেদন জানিয়েছেন। যাতে দুই বাংলার শিল্পী ও সাহিত্যিকরা বছরে অন্তত একবার মিলিত হতে পারেন এবং দুই বাংলার মধ্যে বইপত্রের আদানপ্রদান যাতে সহজ ও নিয়মিত হয়, আমরা সকলেই যেন সেই চেষ্টা করি।

আদ্যন্ত বাঙালী চন্দ্রগুপ্ত একুশে ফেব্রুয়ারির পুণ্য প্রভাতে উচ্চারণ করেন তাঁর গভীর বিশ্বাস : দুই বাংলা আবার এক হবে। রবীন্দ্রনাথকে স্মরণ করেই তিনি বলেন : বাঙালীর প্রাণ বাঙালীর মন বাঙালীর ঘরে যত ভাইবোন আবার ঐক্যবদ্ধ হবে। এবং ভিন্ন প্রসঙ্গে উচ্চারিত রবীন্দ্রনাথের বাণীতেই শেষ করেন তাঁর প্রতিজ্ঞাগর্ভ বাঙালী প্রার্থনা : 'মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ, সে বিশ্বাস শেষ পর্যন্ত রক্ষা করব। আশা করব, মহাপ্রলয়ের পরে বৈরাগ্যের মেঘমুক্ত আকাশে ইতিহাসের একটি নির্মল আত্ম-প্রকাশ হয়তো আরম্ভ হবে এই পূর্বাচলের সূর্যোদয়ের দিগন্ত থেকে। আর-একদিন অপরাজিত মানুষ নিজের জয়যাত্রার অভিযানে সকল বাধা অতিক্রম করে অগ্রসর হবে তার মহৎ মর্যাদা ফিরে পাবার পথে।'

(২১-২-৬৮)

---

* 'চতুরঙ্গ', মাঘ-চৈত্র ১৩৭০, পৃঃ ২৬৭

† 'বিশ্বভারতী পত্রিকা', 'রবীন্দ্রভারতী পত্রিকা', 'চতুরঙ্গ', 'এক্ষণ' প্রভৃতি কয়েকটি পত্রিকায় মাঝে-মধ্যে গবেষণা-নিবন্ধ বা গবেষণাধর্মী প্রবন্ধের প্রকাশ দেখা যায় সত্য। তবে বিশ্বভারতী বা রবীন্দ্রভারতীর মতো অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের মুখপত্র-গুলির মানোন্নয়নের যথেষ্ট অবকাশ আছে।

*পূর্ববঙ্গের ভাষাতাত্ত্বিক গবেষণা সম্পর্কে ভাষাবিদ ডক্টর অমলেন্দু বসুর প্রাসঙ্গিক মন্তব্য উদ্ধৃত করি। পূর্ববঙ্গের বাঙালী অধ্যাপক ও গবেষকদের সম্পর্কে তিনি বলেছেন : 'তাঁদের নিরলস কাজের ফলে বাংলা ভাষার ভাষাতাত্ত্বিক আলোচনা অধুনা এমন মৌলিকতা এবং সার্থকতার স্তরে পৌঁচেছে যে, ইংরেজি, ফরাসী, জার্মান, রুশ প্রভৃতি কয়েকটি ইওরোপীয় প্রাগ্রসর ভাষা বাদ দেওয়ার পরে অন্য যে কোনও ভারতীয় ভাষার তুলনায় বাংলা ভাষাতাত্ত্বিক আলোচনা সূক্ষ্মতর, সমৃদ্ধ-তর এবং মৌলিকতর সম্ভাবনাশীল।'

দোলে ফাল্গুন-চৈত্রব্যাপী
১৫% কমিশন
ডঃ রাধাগোবিন্দ নাথ-কৃত
শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত
ছ'খণ্ড • ৪র্থ সংস্করণ • ১২৫ স্থলে ১০৩.২৫
শ্রীচৈতন্যভাগবত
ছ'খণ্ড • প্রথম প্রকাশ • ৯৮ স্থলে ৮৩.৩০
মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ
৪০ স্থলে ৩৪.০০
•
রাজমোহন নাথ-কৃত
নাথপন্থের প্রাচীন পুঁথি ৬.৫০
RIGVEDA SUMMARY 8.00
KESHOBKANTO'S
MESSAGE OF THE GITA 12.00
সাধনা প্রকাশনী
[illegible]
ফোন : [illegible]

সপ্তাহের বোঝা

কৃত্তিবাস ওঝা

রাজা নহুষের অতৃপ্ত আত্মার কান্না আজও থামে নি। ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ মন্ত্রিত্ব হারাবার পূর্বদিন দিল্লীতে বলেছিলেন—তাঁর হাতে ক্ষমতা থাকলে তিনি কয়েকজন পত্রিকা সম্পাদক ও সাংবাদিককে জেলে পুরতেন। আর মন্ত্রিত্ব হারাবার পরদিন বলেছেন—সংবাদপত্রগুলিতে এমন সব ব্যক্তি আছেন, যাঁরা দেশের শত্রু। এই কথাগুলি শুনে রাজা নহুষের অতৃপ্ত আত্মার কান্নার কথা মনে পড়ে। নহুষের আত্মাকে শান্তি দিয়েছিলেন রাজা হরিশ্চন্দ্র, কিন্তু ডঃ ঘোষের অতৃপ্ত মনকে শান্তি দেবে কে? কোন মৃতব্যক্তির সমালোচনা হয়তো সব সময় শোভন নয়, কিন্তু যে মানুষের জীবন থেকে শিক্ষা গ্রহণের অবকাশ থাকে সেই মানুষ পরলোকগমন করলেও তাঁর কর্ম থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে হয়। ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ গদিচ্যুত হয়ে বিদায় নিয়েছেন এবং আর কোনদিন তিনি মহাকরণে ফিরে আসবেন না সত্য; কিন্তু প্রায় এক বৎসর রাজ্যের মন্ত্রী হিসাবে যে আদর্শ ও ন্যায়নীতির নজীর রেখে গেলেন তিনি সেই কথা ভুলতে চাইলেও ভোলা উচিত নয়। ডঃ ঘোষের সাংবাদিকদের উপর এত বিদ্বেষ, এত রাগ কেন সে সম্পর্কে বহু সময় মনে মনে ভেবেছি, কিন্তু উত্তর পাই নি। সংবাদপত্র বিশেষ বা কোন সাংবাদিক সম্পর্কে ডঃ ঘোষ ছিলেন ক্রোধে অন্ধ। ক্রোধ এবং বিদ্বেষে তিনি এমনি অন্ধ হয়ে পড়েছিলেন যে, মুখ্যমন্ত্রীর পদমর্যাদা ও দায়িত্বশীলতার কথা ভুলে যেয়ে দু'-চারজন সাংবাদিককে জব্দ করার জন্য সমস্ত শালীনতা ও ন্যায়নীতি বিসর্জন দিতে এতটুকুও কুণ্ঠা বোধ করেন নি। ভাবলে অবাক হতে হয়, মুখ্যমন্ত্রীর মর্যাদার এক ব্যক্তি যুক্তি-তর্কের পথ না ধরে কি করে অনেক চুনোপুঁটি সাংবাদিককে জেলে আটক করে জিঘাংসা নিবৃত্ত পর্যন্ত করতে চেয়েছিলেন! সাপ্তাহিক বসুমতীর কৃত্তিবাস ওঝার কলমটিও তিনি সহ্য করতে পারতেন না কোনক্রমে। সেসব কাহিনী আজ বিবৃত করলে বহু ব্যক্তিগত কাহিনী এসে পড়বে। তবে শুধু এটুকু বলতে চাই—কোন রকম ভয় দেখাতেই ডঃ ঘোষ বাকী রাখেন নি যাতে কৃত্তিবাস ওঝার রচনাটি প্রকাশ বন্ধ হয়। এক সময় এমন দুঃসহ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল যে, দুই সপ্তাহ সপ্তাহের বোঝা প্রকাশ বন্ধ রেখেছিলাম।

আজ এই কথা প্রকাশ করতে কোনো কুণ্ঠা নেই যে, ডঃ ঘোষ জেলে পুরবার জন্য একটি তালিকা পর্যন্ত তৈরি করেছিলেন যার মধ্যে কলকাতার দশজন সাংবাদিকের নাম ছিল।

কিন্তু কেন এই সাংবাদিক-বিদ্বেষ সৃষ্টি হয়েছিল ডঃ ঘোষের মনে—তার কোন উত্তর খুঁজে পাওয়া যাবে না। এই কথা সত্য যে, আজ পর্যন্ত কোন মন্ত্রিসভা কোনদিন ডঃ ঘোষের আমলের মত হোস্টাইল প্রেসের মোকাবেলা করে নি। অথচ এই প্রেসের কয়েকজনই ডঃ ঘোষকে রাজনীতিতে ফেরৎ এনেছিলেন—ডঃ ঘোষের সম্পর্কে এক আকর্ষণীয় "ইমেজ" গড়ে তুলেছিলেন। ১৯৬৬ সালের প্রথম দিকে গড়িয়াহাটার মোড়ের কাছে একটি বাড়িতে একজন সাংবাদিকই সর্বপ্রথম ডঃ ঘোষকে রাজনীতিতে ফিরে আসবার প্রয়োজনীয়তা বোঝান, যার ফলে রাজ্যব্যাপী খাদ্য-আন্দোলনের শেষে রাজ্যে শান্তি স্থাপনে ডঃ ঘোষের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলনেতার সঙ্গে শান্তি আলোচনার রাজনৈতিক দৌত্য শুরু হয়। খাদ্য আন্দোলন শেষ হয়ে গেল। তারপরই ডঃ ঘোষের সঙ্গে শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায়ের সংযোগ স্থাপিত হয়ও একজন সাংবাদিকের চেষ্টায় বলা যায়। পরে একজন সাংবাদিকের উপস্থিতিতে শিলচরে অমরবন্দ চা বাগানে শ্রী পি. সি. চট্টোপাধ্যায়ের বাংলোয় বসে ডঃ ঘোষ ও শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায়ের মধ্যে স্থায়ী চুক্তি হয় রাজ্যে ভবিষ্যৎ নির্বাচনে অংশগ্রহণ ও মন্ত্রিসভা গঠন সম্পর্কে। এই চুক্তি সম্পাদনকালে একজন সাংবাদিক ছাড়া উপস্থিত ছিলেন শ্রীজাহাঙ্গীর কবির। শুধু তাই নয়, যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা গঠিত হবার পর রাজ্যের খাদ্যমন্ত্রিরূপে ডঃ ঘোষকে অনেকের আক্রমণ থেকে রক্ষা করতেও বসুমতী পত্রিকার সম্পাদকীয় ও অন্যান্য লেখাগুলি হয়ত আজও অনেকের মনে আছে। মার্ক্সবাদী কম্যুনিস্ট পার্টির নেতা শ্রী পি. সুন্দরাইয়া দার্জিলিং-এ এক সাংবাদিক সম্মেলনে প্রথম যখন ডঃ ঘোষ সম্পর্কে কটাক্ষ করেন অথবা বর্ধমানে জেলা কৃষক সম্মেলনে শ্রীহরেকৃষ্ণ কোঙার ও শ্রীআবদুল রসুল ডঃ ঘোষ সম্পর্কে জেহাদ ঘোষণা করেন, তখনও নিঃসঙ্গ ডঃ ঘোষকে সমর্থন জানাতে সংবাদপত্র ও কয়েকজন সাংবাদিক ছাড়া কেউই এগিয়ে আসে নি; কিন্তু প্রকৃতির নির্মম পরিহাস ডঃ ঘোষ ক্ষমতার আসনে বসে প্রথমেই এই সাংবাদিককুলকে নিধনে আত্মনিয়োগ করলেন। প্রথম দিন থেকে মুখ্যমন্ত্রিত্ব ছাড়বার দিন পর্যন্ত ডঃ ঘোষ সবচেয়ে বেশি বোধ হয় ভেবেছেন কিভাবে কয়েকটা কাগজকে হাতে ও ভাতে মারা যায়। এমন কি মন্ত্রিত্ব চলে যাবার পরদিনও নাকি তিনি রাজ্যপালের কাছে একটি পত্রিকার সম্পাদকীয় পেশ করে অভিযোগ করেছিলেন।

প্রকৃতপক্ষে সংবাদপত্র ও সাংবাদিকদের ডঃ ঘোষ সম্পর্কে যে কথা বলা উচিত ছিল, যে কথা লেখা উচিত ছিল তার সামান্যই তাঁরা লিখেছেন। গান্ধীবাদী ডঃ প্রফুল্ল ঘোষ কোনদিনই বাংলা দেশে কোন আদর্শ পুরুষ বা খ্যাতিমান জননায়ক ছিলেন না। গান্ধীবাদী নেতারূপে বাংলার বিপ্লবী আন্দোলনের এবং নেতাজীর ঘোরতর বিরোধীরূপে তিনি কোনদিনই সুখ্যাত ছিলেন না। ত্রিপুরী কংগ্রেসের পর কলকাতায় গাধার গলায় নাম লিখে যে শোভাযাত্রা বেরিয়েছিল সেই শোভাযাত্রায় প্রথম সারির একটি গাধার গলায় ডঃ ঘোষের নাম ছিল। কিন্তু ডঃ ঘোষের মলিন অতীতকে মানুষ ভুলে

গেছিল—এমন কি স্বাধীন পশ্চিম বাংলার প্রথম মুখ্যমন্ত্রিরূপে কাজ করার পাশ, শিশির মণ্ডলকে হত্যা করে রাজ্যে প্রথম জনগণের উপর গুলী চালনা, নেতাজীর জন্মদিনে ছুটি দিতে অস্বীকার, পশ্চিম বাংলায় আগত উদ্বাস্তুদের সম্পর্কে চরম অবহেলা ও উদ্বাস্তু সমস্যাকে আমল না দেওয়া—সব কথা লোকে ভুলে গেছিল। সাধারণ মানুষের মনে এমন একটা ধারণা জন্মানো হয়েছিল যে, আটায় তেঁতুল বীজ মেশানো ধরেই বুঝি চোরাবাজারী মিলমালিকদের ষড়যন্ত্রে তিনি মুখ্যমন্ত্রিত্ব হারিয়েছিলেন। লোকে মনে রাখে নি যে, তাঁর দল কংগ্রেস তথা আজকের দিনে তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ বন্ধু শ্রীঅতুল্য ঘোষই তাঁর বিরুদ্ধে অনাস্থা এনে তাঁকে মুখ্যমন্ত্রীর পদ থেকে সরিয়েছিলেন। সাধারণ মানুষ ডঃ ঘোষকে নিষ্ঠাবান, আদর্শবাদী বলে বরণ করেছিল। তাই প্রশ্ন তোলে নি, তিলক মেমোরিয়াল ফান্ড বা হালের গান্ধী স্মারকনিধির টাকা-পয়সা সম্পর্কে। এই সেদিনও যখন রাজ্যের খাদ্যমন্ত্রী থাকাকালে সাধারণ জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত ডঃ ঘোষের রাজভবনের বাড়িতে শুধু জানলা দরজার পর্দা কিনতে প্রায় দুই হাজার টাকা খরচ হতো শুনেও তখনও কেউ প্রশ্ন তোলে নি, বরং বলেছে ডঃ ঘোষ অতি সাধারণ জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত মানুষ।

ডঃ ঘোষ আদর্শবাদী ব্যক্তি—সাধারণ মানুষের মনে এই ধারণা ও বিশ্বাস যে সাংবাদিকদের চেষ্টায় আজ কয়েক যুগ ধরে গড়ে উঠেছে—সেই সাংবাদিকরা কেউ কিন্তু কোনদিন ডঃ ঘোষের কাছে প্রশ্ন তুলে ধরেন নি যে আপনার মত নিষ্ঠাবান গান্ধীবাদী মানুষ কি করে যুক্তফ্রন্ট সরকার পতনের চক্র ও চক্রান্তের শরিক হলেন। রাজনৈতিক ও আদর্শগত মত-পার্থক্য এবং রাজনৈতিক সংগ্রামে যুক্তফ্রন্ট সরকারের পতন হয় নি, যুক্তফ্রন্ট সরকারের পতন হয়েছিল কুৎসিত চক্রান্তে, যে চক্রান্তের নায়ক ছিলেন শ্রীআশুতোষ ঘোষ, শ্রীরবি চৌধুরী ও শ্রীরণবীর বর্মণ। আজ শ্রীআশুতোষ ঘোষ তাঁর কৃতকর্মের প্রায়শ্চিত্ত করেছেন হয়তো কোয়ালিশন সরকারের পতন ঘটিয়ে। শ্রীঘোষ যখন প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকারের পতন ঘটাতে তৎপর হন এবং ডঃ ঘোষের কাঁধে ভর করেন, তখন কিন্তু গান্ধীবাদী, ন্যায়নিষ্ঠ ডঃ ঘোষের মনে একবারও প্রশ্ন জাগে নি—তিনি যে কাজ করছেন সেই কাজ গান্ধীবাদী পথে, সত্য-ন্যায়ের পথে, সততার পথে করছেন তো? ডঃ ঘোষ শ্রীআশু ঘোষকে জানতেন, তাঁর সম্পর্কে অভিযোগসমূহ জানতেন, ডঃ ঘোষ যুক্তফ্রন্টের মন্ত্রিরূপে নিজেকে জানাতেন, তাঁর পদমর্যাদার কথা জানতেন; কিন্তু তখন তিনি একবারও ভাবেন নি—কোথায় সত্য? কোথায় ন্যায়? কোথায় সততা? কোথায় গান্ধীবাদী পথ?

না, এই প্রশ্নগুলি বড় বেশি করে তোলা হয় নি। তোলা হয় নি অনেক কথা। রাজ্যের সাংবাদিককুল ডঃ ঘোষের প্রতি অজস্র করুণা করে বহু সত্য জেনেও চেপে গেছেন হয়তো দেশের সামগ্রিক স্বার্থ বিবেচনা করে—আর ডঃ ঘোষ ক্ষমতার উচ্চ আসনে বসে উচ্চিংড়ে সমান দুই-একজন সাংবাদিককে সমস্ত নখদন্ত দিয়ে আক্রমণ করতে কসুর করেন নি। ডঃ ঘোষের সঙ্গে সাংবাদিকদের এইখানে তফাৎ। যে সাংবাদিকদের নিধন করতে তিনি দিবা-রাত্র পরিতাপ করেছেন, সেই সাংবাদিকরা রাইটার্স বিল্ডিংস-এর করিডরে দেখা হলে তাঁকে যুক্তকরে নমস্কার জানিয়েছে—ডঃ ঘোষের সঙ্গে সাংবাদিকদের তফাৎ এইখানে।

ব্যুমেরাং—

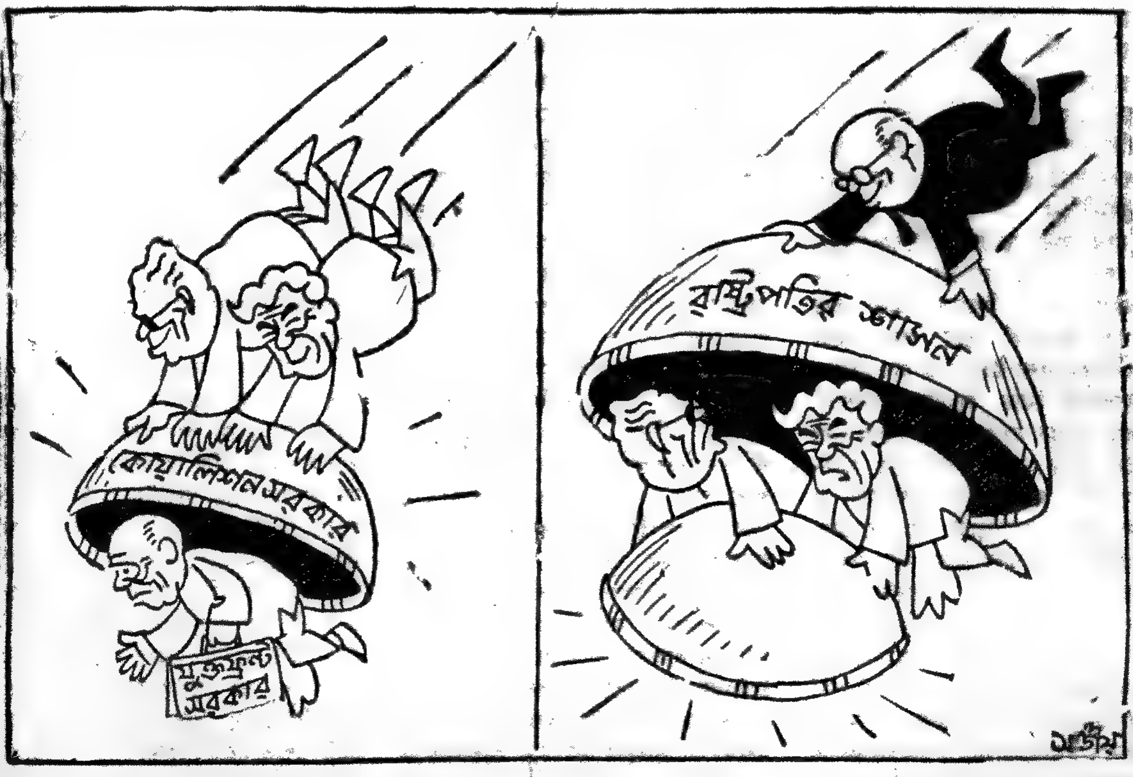

ভারতদর্শন

রাষ্ট্রপতির শাসন

১৯৬৭-৬৮ সালের মধ্যেই, আরও বিশেষ করে বললে ৬৭-র মার্চ থেকে ৬৮-র ফেব্রুয়ারী এই একটি বছরেই চার-চারটি রাজ্যে রাষ্ট্রপতির শাসন প্রবর্তন করতে হল প্রধানত এই চার রাজ্যের অনিশ্চিত রাজনৈতিক পরিস্থিতির মোকাবিলা করার জন্য। সর্বশেষ রাজ্য পশ্চিমবঙ্গ। ইতিপূর্বে ৬৭-র মার্চে রাজস্থানে, অক্টোবরে মণিপুরে ও নভেম্বরে হরিয়ানায় রাষ্ট্রপতি স্বহস্তে শাসনভার গ্রহণ করেন। হরিয়ানায় রাষ্ট্রপতির শাসন এখনও বলবৎ আছে। মণিপুরে সম্প্রতি পুনশ্চ সংসদীয় ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে।

১৯৬৭-৬৮ সে হিসাবে রেকর্ড বছর। বলা বাহুল্য এই রেকর্ড সৃষ্টিতে ভারতের নাগরিকদেরই হাত সর্বাধিক। বিগত নির্বাচনে নাগরিকগণ যদি যথা নিয়মে কংগ্রেসকেই নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা দান করতেন ভোট বাক্সের মাধ্যমে, তাহলে অকংগ্রেসী মন্ত্রিসভা গঠন ও সেই মন্ত্রিসভাগুলিকে গদিচ্যুত করার জন্য দল ভাঙাভাঙি এবং প্রকাশ্য ও নেপথ্য চক্রান্ত রাজ্যে রাজ্যে অনিশ্চিত রাজনৈতিক পরিবেশ রচনা করত না। সংসদীয় গণতন্ত্রের সুস্থ পরিবেশকেও অসুস্থ করে তোলার কারণ দেখা দিত না।

কেরলার দিকে তাকালে ব্যাপারটি আরও স্পষ্ট হবে। এই রাজ্যটিতে কংগ্রেসকে বিশেষ বেগ পেতে হয়েছে পূর্ববর্তী নির্বাচনোত্তর কালেও। ফলত ওখানে রাষ্ট্রপতির শাসন চালু করা প্রয়োজন হয়েছিল। একবার নয়, দু-দুবার কেরলে সংসদীয় পদ্ধতি বাতিল করতে হয়েছে। প্রথমবার, জুলাই ১৯৫৭ সালে। দ্বিতীয় দফা সেপ্টেম্বর ১৯৬৪-তে।

১৯৬৪-তে কেরলায় রাষ্ট্রপতির শাসন কাল বৎসরাধিককাল প্রলম্বিত হয়। এদিক থেকেও কেরলারই রেকর্ড। কিন্তু কেরলার অনিশ্চিত রাজনীতির ফলশ্রুতিতে ক্রমশ কম্যুনিস্টদের হাতেই অধিকতরভাবে রাজ্যবাসী ক্ষমতা তুলে দিতে চেয়েছেন। কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন দল কংগ্রেসকে কেবলই হটে যেতে হয়েছে। সংবাদে প্রকাশ পশ্চিমবঙ্গেও রাষ্ট্রপতির শাসনকাল বেশ প্রলম্বিতই থাকবে। অন্তর্বর্তী নির্বাচন হলে তার ঢের দেরি, এই বছরের শেষে না কি একটা চান্স হতে পারে।

পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেসও অন্তর্দ্বন্দ্বে জর্জরিত। তাছাড়া ডঃ প্রফুল্লচন্দ্রের লৌহহস্ত শাসনের আওতায় রাজ্যবাসী ভীত সন্ত্রস্তভাবে দুঃস্বপ্নের রাত্রি যাপন করে গেছেন। সেই দলছুট নয়া ক্ষমতালোভী পি ডি এফ দলের নেতা ডঃ ঘোষকে মাথায় করে কংগ্রেস স্বল্প দিনের কোয়ালিশনে বসে রাজ্যবাসীর একটি উল্লেখ্য সংখ্যকের শুধুমাত্র বিরাগ ও বিতৃষ্ণাই অর্জন করেছেন। কে বলতে পারে, পশ্চিমবঙ্গের ভবিষ্যৎ কেরালা নয়। এবং তাই-ই যদি হয় তবে সে দায়িত্ব রাজ্য কংগ্রেসের একদল অগ্রপশ্চাৎ-বিবেচনাহীন গদিলোভী নেতার।

ভারতদর্শনে ইতিপূর্বেই বলেছি, বৃদ্ধ নেতৃত্বের সাময়িক আকাঙ্ক্ষা তৃপ্তির জন্য কংগ্রেসকে যাঁরা ব্যবহার করছেন, রাজনৈতিক জগতে কংগ্রেসের তাঁরা বারটা বাজাচ্ছেন। তাঁদের জন্যই কংগ্রেস আজ আন-পপুলার। এই বৃদ্ধ নেতৃত্বের ইহকালের ভোগপূর্তির কাল সংক্ষিপ্ত হয়ে এসেছে। সুতরাং এঁরা দলের ভবিষ্যৎ অপেক্ষা নিজের ভবিষ্যৎ নিয়েই অধিকতর চিন্তিত। তাই স্বজন দেশ ভাসিয়ে আপনার কোলে ঝোল টানার ব্যস্ততা এঁদেরকে আজ রাজনৈতিক চিন্তায় পঙ্গু করেছে। পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেসের পতনের জন্য এঁদের দায়িত্ব তাই অনস্বীকার্য। অনুরূপভাবে ভারতের অন্যান্য রাজ্যেও গদিলোভী কংগ্রেসী নেতারা দল হিসেবে কংগ্রেসের ভবিষ্যৎ অন্ধকার করে ছাড়ছেন। এঁদের রাজনৈতিক বুদ্ধি ভোঁতা হয়ে গেছে। তথাপি দলীয় স্বার্থে সরে দাঁড়াতে যথেষ্ট কার্পণ্য। ফলত রাজ্যে রাজ্যে অসহনীয় রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা সংসদীয় গণতন্ত্রের মুড়ো মুড়িয়ে ছাড়ছে।

বৃদ্ধ নেতৃত্বের বিরুদ্ধে কংগ্রেসেরই একটি অপেক্ষাকৃত তরুণ মহল বহুদিন হল অভিযোগ করে আসছেন। কিন্তু ক্ষমতার বল্গা যাঁদের হাতে তাঁরা কোন কিছুতেই টলবার পাত্র নন।

পরিণাম তাই বিগত নির্বাচনে বেশ ভালভাবেই টের পাইয়ে গেছে। আশ্চর্য, তবু দলের প্রতি মমত্ববোধে সেই বৃদ্ধ নেতৃবৃন্দকে এতটুকু সজাগ হতে দেখা যায় নি। তাঁরা স্বার্থান্ধতার খাপ-খোলা তলোয়ার মাথার ওপর বাঁই বাঁই করে ঘুরিয়ে যাচ্ছেন। ভারতবর্ষের রাজনৈতিক আকাশ ও শুম্ভ নিশুম্ভের দাপাদাপিতে স্থৈর্যহীন ও দিশাহারা হয়ে পড়েছে।

ইতিপূর্বেই বিভিন্ন রাজ্যে রাষ্ট্রপতির শাসন প্রবর্তন করতে হয়েছিল। যেমন, ১৯৫১-র জুনে পাঞ্জাবে। মার্চ ১৯৫৩ সালে পেপসুতে। ৫৪-র নভেম্বরে অন্ধ্রে' '৫৬-র মার্চে ত্রিবাঙ্কুর কোচিনে। ৬১-তে (ফেব্রু) উড়িষ্যায় এবং ১৯৬৬-তে পুনশ্চ পাঞ্জাবে। কিন্তু কেবলমাত্র নিছক ক্ষমতা-কাড়াকাড়ির ফলশ্রুতি বলে সেগুলিকে একবাক্যে চিহ্নিত করা যায় না।

১৯৬৭-৬৮ সালে যা হল এবং ইতিপূর্বে কেরালায় যা হয়েছিল তাতে জনসমক্ষে কংগ্রেসের মর্যাদা ম্লান হয়েছে। কতিপয় কংগ্রেসী নেতার রাজনৈতিক অদূরদর্শিতা রাজ্যে রাজ্যে সুস্থির প্রশাসনের সুযোগ দেয় নি।

রাষ্ট্রপতির শাসন চালু হওয়ার পর পশ্চিমবঙ্গের জ্বরতপ্ত কপালে জলপটি পড়ল। কিন্তু রাজ্য কংগ্রেসের অন্তর্দ্বন্দ্বের উত্তাপ তার ফলেও বাড়ল বই কমল না।

কংগ্রেসের জ্বর ছাড়াতে পারেন এখন তরুণ উদারচেতা কংগ্রেসসেবীরা। রাষ্ট্রপতির শাসনকালে এই চেতনা তাঁদের দল সচেতন করে রাজ্য কংগ্রেসকে স্বার্থান্ধ মাতব্বরীর কবল থেকে রক্ষা করুক।

কচ্ছের কাছা

কচ্ছ ট্রাইবুনালের রায় প্রকাশিত হওয়ার আগে পর্যন্ত কচ্ছের কোনো কাছা ছিল না যা খুলে পড়ার সম্ভাবনা আছে বলে কোনো বিবেচক ব্যক্তি কোনো কালে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। কিন্তু কচ্ছ ট্রাইবুনালের রায়ে জানা গেল, ৮,৪০০ বর্গমাইল কচ্ছ রান অঞ্চলেরও নাকি একটি কথি-বিযুক্ত কাছা আছে যা পাকিস্তানের প্রাপ্য। এই অদ্ভুত রায়ের পরে পাকিস্তান এখন কচ্ছের 'টেন পারসেন্ট' (দশ শতাংশ) কাছাটি যে সাপটে ধরবে এতে আর বিচিত্র কী। পাকিস্তান কাছাটির পরিসর অবশ্য অনেক বাড়িয়েই ধরেছিল, প্রায় এক তৃতীয়াংশ। ৮,৪০০ বর্গমাইলের মধ্যে ৩,৫০০ বর্গমাইলই ছিল তাদের দাবি। কিন্তু ট্রাইবুনাল বিচার করে বলেছেন : না, অতটা নয়। রহিম কি বাজারের কিছু অংশ, পিরোল

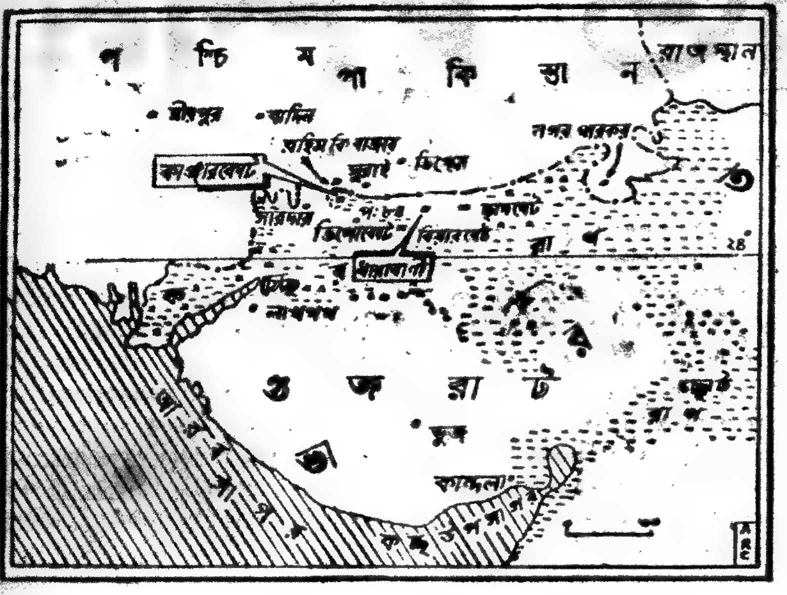

ভালো কুন, ধারা ব্যাস ও ছাদ বেট মিলিয়ে তিনশ বর্গমাইল ভারতকে পাকিস্তানের জন্য খয়রাতি দিতে হবে। অবশ্য ট্রাইবুনালের সকলেই একমত নন।

আন্তর্জাতিক কচ্ছ ট্রাইবুনালের তিন প্রধান ছিলেন, সুইডেনের বিচারপতি লেগারগেন (ট্রাইবুনাল চেয়ারম্যান), ইরানের বিচারপতি নোসের উল্লা এবং যুগোশ্লাভিয়ার বিচারপতি আলেস বেবলার। চেয়ারম্যান এবং পাকিস্তানের মনোনীত বিচারপতি নোসের উল্লার বিপরীতে বিচারপতি আলেস বেবলার ভারতের যুক্তিকেই সর্বাংশে গ্রহণযোগ্য বলে সুচিন্তিত অভিমত ব্যক্ত করেছেন। ভারতের অতি সরল ও ন্যায়সংগত বক্তব্য : ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতার পর বিতর্কিত অঞ্চলের শাসনকর্তা ভারতীয় যুনিয়নে যোগদান করায় আইনত সমগ্র এলাকাই ভারতের ভৌগোলিক রাজনৈতিক সীমানার অন্তর্ভুক্ত অবিচ্ছেদ্য অংশ। কিন্তু বিচারপতি বেবলার এই যুক্তি সর্বাংশে গ্রহণ করলেও সুইডিশ ট্রাইবুনাল চেয়ারম্যান এবং পাক-মনোনীত ইরানের বিচারপতি ভোটাধিক্যে পাকিস্তানকে পাক-ভারত বিরোধকালে পাকিস্তান কর্তৃক অধিকৃত তিনশত বর্গমাইল এলাকা পাইয়ে দিতেই মনস্থ করলেন। ট্রাইবুনালের রায়ে সুতরাং ভারতের ন্যায়সংগত অধিকারকে খর্ব করা হল এক অদ্ভুত যুক্তিবলে। যুক্তি হল : রান অঞ্চলের ঐ তিনশত বর্গমাইল এলাকার চতুর্দিক পাকিস্তানী এলাকার দ্বারা পরিবেষ্টিত। তাই শান্তি ও স্থায়িত্বের জন্য ঐ অঞ্চল পাকিস্তানকে দিয়ে দেওয়াই ভালো।

যুক্তির ভালোত্ব যেমনই থাক, আন্তর্জাতিক ট্রাইবুনালে কেসটা পাঠানোর ভালোমানুষীর খেসারত এখন ভারতবাসীকে দিতেই হবে। ভারত যেহেতু পাকিস্তান নয়, দেশীয় ব্যাপারে যাই হোক, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারত যখন নেহাতই এককথার মর্যাদা রাখে। এবং ব্যাপারটা যখন বিদেশী বিচারকের ভোটাধিক্যে সাব্যস্ত তখন, যায় যাক দেশের মাটি, কথা রাখতেই হবে ভারতকে। বাইরের জগতে ভারতবর্ষের ন্যায়পরায়ণতার বড় নামডাক। তা মাঠে মারা যেতে পারে না।

লোকান্তরিত প্রধানমন্ত্রী লালবাহাদুর যখন কেসটা আন্তর্জাতিক ট্রাইবুনালে জমা করে গোড়াতেই কাঁচিয়ে দিয়ে গেছেন, তখন লালবাহাদুরের সম্মান রক্ষার্থে এবং ভরতের 'এককথা'র মর্যাদা রক্ষার্থে ও তিনশ বর্গমাইল যাক। সবটাই যে (৩,৫০০) পাকিস্তানকে উপঢৌকন দেওয়া হয় নি, এই রক্ষে। না হলে তা-ও যেত। হাজার হোক, আমাদের মতো ভদ্র জাতি দুনিয়ায় সচরাচর ফলে না। ফললে অনেক দেশই অনেক দেশ থেকে দাবি তুলে স্বদেশকে বিদেশীর হাতে তুলে দিত।

আমাদের বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর কাছে অবশ্য মাত্র তিনশত বর্গমাইল এলাকা অতি সামান্য ব্যাপার। তিনি বলেছেন, কচ্ছ সম্পর্কীয় আন্তর্জাতিক ট্রাইবুনালের রায়ে 'সামান্য কিছু' অদল-বদল ছাড়া মূলত ভারতের বক্তব্যই মেনে নেওয়া হয়েছে।

কংগ্রেস পার্লামেণ্টারী পার্টির বৈঠকে শ্রী এ জি কুলকার্নি আন্তর্জাতিক ট্রাইবুনালের রায়ের বিরুদ্ধে হেগের আন্তর্জাতিক আদালতে আপীল করার আবেদন রেখে এক প্রস্তাব তোলেন। কিন্তু শ্রীমতী গান্ধী সাফ জানিয়ে দিয়েছেন যে, ১৯৬৫ সালের পাক-ভারত চুক্তি অনুযায়ী আন্তর্জাতিক ট্রাইবুনালের রায়ই চূড়ান্ত আর দুই দেশের ওপরই তা বাধ্যতামূলক।

দেশে যে যাই বলুক, আন্তর্জাতিক জগতে ভারতের স্থান অবশ্যই চুক্তি-রক্ষী-ন্যায়বাদিনী ভারতবর্ষের। যার কথার নড়চড়টি নেই, বিশেষ তা যদি আবার পাকিস্তান-ঘটিত কোনো ব্যাপার হয়।

পাকিস্তান কিন্তু বড় একটি সুবিধার পাত্র নয়। সে ইতিমধ্যেই প্রচার সুরু করেছে, তিনশ নয় ট্রাইবুনাল সাড়ে তিনশ বর্গমাইল পাক-প্রাপ্য বলে স্বীকার করছেন।

বিষয়টি ভারতের লোকসভায় বিরোধী মহলে ক্ষোভের সঞ্চার করেছে। জনসঙ্ঘের নেতা শ্রীবলরাজ মাধোক এবং শ্রীচাঁদ গোয়েলের একটি অনাস্থা প্রস্তাবের নোটিশ ভারত সরকারের বিরুদ্ধে উত্থাপিত হয়েছে। যাকে সমর্থন জানিয়েছেন পঞ্চাশ জনের অধিক বিরোধী সদস্য। স্বতন্ত্র দল সমর্থন করলেও স্বতন্ত্র মনোভাব পোষণ করেন। এঁদের উক্ত রায়ের বিরুদ্ধে কোনো বক্তব্য নেই।

পাকিস্তানে ভারতের প্রাক্তন হাই কমিশনার শ্রী সি সি দেশাই বলেছেন ভারত কচ্ছের রান অঞ্চলে ট্রাইবুনালের রায়ের ফলে দশ শতাংশ ভূখণ্ড হারালো। তাঁর মতে দেশের মাটি এইভাবে পরের হাতে তুলে দেওয়ার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের পদত্যাগ করা উচিত। বলরাজ মাধোকও সরকারের পদত্যাগ দাবি করেন।

শ্রীমধু লিমায়ে (এস এস পি) বলেছেন, রায় গ্রহণের বিরুদ্ধে তাঁর দল সংসদের ভেতরে ও বাইরে লড়াই চালিয়ে যাবে।

রাজনৈতিক রোয়েদাদ

বিরোধীদের বক্তব্যের সমার্থক বক্তব্য প্রাক্তন পররাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রী এম সি চাগলাও রেখেছেন। তাঁরও মতে, কচ্ছের প্রশ্নটি রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করেছেন ট্রাইবুনালের দুই বিচারক। কিন্তু রোয়েদাদ মেনে নিতে বাধ্য? ভারত নিশ্চয় সেই রায় মেনে নেবে যা আইন অথবা বিচারবিভাগীয় বিবেচনাপ্রসূত। কচ্ছের প্রশ্নটিকে যথাযথ আইনানুগ উপায়ে বিচার করা হয় নি।

ভারতের ওপর ট্রাইবুনাল যে অবিচারই করেছেন উপরোক্ত বক্তব্য এবং বিচারপতি শ্রীবেবলারের অভিমতেই তা

প্রকাশিত। এজন্য শ্রীচাগলাও মনে করেন, ট্রাইবুনালের রায়ের রাজনৈতিক প্রকৃতি বিচার করে এই রায় অবশ্যমান্য কি না ভারত সরকারের সে বিষয় গভীর চিন্তার পর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা উচিত।

কচ্ছের লেজ ধরেই পাকিস্তান এবার যে পুনশ্চ হামলার সৃষ্টি না-করবে, পাক-প্রকৃতি যাঁরা অবগত আছেন তাঁরা তা হলপ করে বলতে পারেন না। বিশেষ পাকিস্তান

শ্রীচাগলা

ইতিমধ্যেই ভারতকে লম্বা লম্বা সতর্ক-বাণী পাঠাতে আরম্ভ করেছে। সুতরাং সময় থাকতে এই বিষয়ে ভারতের সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণেরও প্রয়োজন দেখা দিয়েছে।

যে রাজনৈতিক রোয়েদাদের বলে ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ আজ পাকিস্তানের হাতে তুলে দিতে বলা হচ্ছে, প্রশ্ন উঠতে পারে সেই রোয়েদাদ মেনে নেওয়ার আগে ভারত কি অন্তত এই প্রশ্ন তুলতে পারে না যে, পাক সীমানায় পরিবেষ্টিত এই যুক্তিতে যদি অবিচ্ছেদ্য অংশ তুলে দিতে হয় তবে তো দুনিয়ার কোথাও কোনো ছিটমহলের অস্তিত্বও অন্যায্য বলে মানতে হবে। সেক্ষেত্রে ভারতের পূর্বে পশ্চিমে সমগ্র পাকিস্তানই তো ভারতের সীমানা দ্বারা পরিবেষ্টিত। সুতরাং ঐ যুক্তির মধ্যে সারবস্তুর অভাব আছে।

ট্রাইবুনাল চেয়ারম্যান তাঁর যুক্তির পরিশেষে ভারতের আলোমানুষীয়ানার ওপরই চাপটা বেশি দিয়েছেন। রায়ের উপসংহারে তিনি যে মন্তব্য করেছেন তার নীট বক্তব্য হল শান্তির জন্য পাকিস্তানকে কিছু ছেড়ে দিয়ে তুতিয়ে-বুতিয়ে থাকার চেষ্টা করলে তাতে দুই রাষ্ট্রের মধ্যে ভালো বোঝাপড়া ও জাতিসমূহে শান্তির আশা বর্ধিত হবে। মাননীয় লেগারগ্রেন হাজার হোক দূরের মানুষ। তবে প্রতিবেশী ভারত পাক-প্রকৃতির সঙ্গে হাড়ে হাড়ে পরিচিত। পাকিস্তানের ইচ্ছাপূরণ স্বয়ং মধুসূদনের দই-এর ভাঁড় উজাড় করে ধরলেও অসম্ভব। পাক বায়নাক্কা সুবিধা বুঝলেই আকারে বাড়ে। ভারত নরম হলেও সে হয় গরম। সুতরাং তিনশ' বর্গমাইল ছাড়লেও তাকে সাড়ে তিনশ'য় তুলে নিয়ে যেতে ও তরফের খুব একটা চক্ষুলজ্জা দেখা দেবে কি! সব প্রশ্নের পরেও এই প্রশ্নটি অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করে উপায় নেই।

কচ্ছের প্রতিনিধির হুঁসিয়ারী

কচ্ছ থেকে নির্বাচিত রাজ্যসভা সদস্য ডঃ বি এন এ্যান্টনিও দুঃখ করে বলেছেন ঃ বিগত দুশ শত বৎসর ধরে একটি ছোট্ট দেশীয় রাজ্যের অধীনেও যা হয় নি, শক্তিশালী ভারত তাই-ই করতে চলেছেন। কিন্তু মনে রাখা উচিত, কচ্ছের অধিবাসীরা দেশরক্ষার জন্য যে কোনো ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত। তাঁরা অতীতে সিন্ধু অঞ্চলের আগ্রাসী আক্রমণকে বহুবার প্রতিহত করেছেন। এ্যান্টনিও বলেন, কচ্ছ ট্রাইবুনালের রায় সর্বসম্মত নয়। তাছাড়া তার চরিত্রও বিচারবিভাগীয় নয়। ভারত যে এই রায় মানতে বাধ্য এমনও কোনো কথা নেই।

ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা

বার বার বলেছি আপন দেশের নাগরিকবৃন্দের কাছে কদাচিৎ হলেও আন্তর্জাতিক জগতে, বিশেষ পাকিস্তানের ক্ষেত্রে ভারত সরকার বড় বেশিমাত্রায় নরম ন্যায়বাদী। লোকসভায় ভারতের নীতি ব্যাখ্যা করে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী বলেছেন, কচ্ছ রোয়েদাদ সম্পর্কে ভারত তার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করবেই। একেবারে ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা। পাক পাঁকে ভারত সরকার এমনভাবে পিছলে পড়েছেন স্বাধীনতার কাল থেকেই যে আর উদ্ধার নেই, উত্থান নেই সেই পতন থেকে।

উত্তরপ্রদেশেও রাষ্ট্রপতির শাসন

ভারতভূমিতে কংগ্রেসী ক্ষমতার স্রোতে যেখানে যতটুক বালুচর সৃষ্টি হয়েছিল স্বাভাবিক প্রাকৃতিক নিয়মে, বেশ কাঠ-খড় কেরোসিন পুড়িয়ে কেন্দ্রীয় ক্ষমতায় সমাসীন কংগ্রেস সেই অকংগ্রেসী বালুচরগুলি কেটে-ছেঁটে পুনশ্চ কংগ্রেসী স্রোতের অথৈ পানিকে ভারতব্যাপী প্রবাহিত করবার জন্য রাজনৈতিক এঞ্জিনিয়ারিং সুরু করেছেন। জোড়াই পশ্চিমবঙ্গের পর উত্তরপ্রদেশে রাষ্ট্রপতির শাসন প্রবর্তন করে সরাসরি কংগ্রেসী মন্ত্রিসভার জন্য পথ পরিষ্কার করার এলাটা চেষ্টা এইবার সুরু হবে।

রাজ্যের বর্তমান অনিশ্চিত অবস্থার উল্লেখ করে উত্তর প্রদেশের রাজ্যপাল ডঃ গোপাল রেড্ডি এই রাজ্যে রাষ্ট্রপতির শাসনের পক্ষে পরামর্শ দান করছেন বলে শোনা যাচ্ছে। সংবাদে প্রকাশ, পশ্চিমবঙ্গের মতো এখানে অবশ্য বিধানসভাকে পুরোপুরি ভেঙে না দিয়ে কেবলমাত্র সাসপেণ্ড করা হবে।

চরণ সিং-কে কেন্দ্র করে এস ভি ডি দলে যে মনান্তর সৃষ্টি হয়েছিল এবং চরণ সিং বারম্বার পদত্যাগের হুমকী দিচ্ছিলেন, অবশেষে সত্য-সত্যই চরণ সিং নেতৃত্ব পদে ইস্তাফা দিলে উত্তরপ্রদেশের রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা চূড়ান্ত রূপ গ্রহণ করল। এ রাজ্যে কোনো একটি দল এককভাবে মন্ত্রিসভা গঠনে অক্ষম। সুতরাং এস ভি ডি দলে ভাঙন উপস্থিত হওয়ায় মন্ত্রিসভা নিয়ে ফ্যাসাদ দেখা দিয়েছে। রাজ্যপাল এই অস্থিরতার গুরুত্ব উপলব্ধি করেই রাষ্ট্রপতির শাসন প্রবর্তনের চিন্তা করছেন।

অকংগ্রেসী মন্ত্রিসভা গঠন কাল থেকেই তীর্থের কাকের মত রাজ্য কংগ্রেস ও কংগ্রেসী নেতারা ক্ষমতার গদির দিকে চোখ দিয়ে বসে আছেন। রাজ্যের অনিশ্চিত অবস্থার সুযোগে তাঁরা এবার চাঙ্গা হয়ে উঠবেন।

সি বি গুপ্ত এবং কমলাপতি ত্রিপাঠী উভয়েই দিল্লী অভিমুখে উত্তেজিতভাবে ছোটাছুটিও সুরু করে দিয়েছেন। প্রাক্তন কংগ্রেসী মুখ্যমন্ত্রী শ্রী সি বি গুপ্ত কয়েকজন স্বতন্ত্র সদস্য এবং কয়েকটা দলের সঙ্গে যোগসাজসে নয়া মন্ত্রিসভা গঠন করতে পারবেন বলে বড় মুখে আশা প্রকাশ করেছেন।

আশা আছেও। আছে বলেই বিধানসভা সাময়িকভাবে সাসপেণ্ড করার কথা চিন্তা হচ্ছে, ইতিমধ্যে কংগ্রেস দলবল জোটাতে

শ্রীচরণ সিং

পারলেই উত্তরপ্রদেশেও পুরনো কংগ্রেসী ক্ষমতার উন্মত্ত জলস্রোত কল কল করে প্রবেশ করবে পুনশ্চ।

কংগ্রেসী ক্ষমতার পুনরাধিকারের নেশা নিজলিঙ্গাপ্পা-কংগ্রেসকে এমনভাবে আবিষ্ট করেছে যে, কোনো রন্ধ্রপথে কংগ্রেস ক্ষমতায় প্রত্যাবর্তন করবেই। উত্তরপ্রদেশেও তারই প্রস্তুতিপর্ব রচিত হচ্ছে।

(২০।২।৬৮)

ভিয়েত কং গেরিলাদের বেপরোয়া আক্রমণে সায়গনের তিনশ' মাইল উত্তর পর্যন্ত অঞ্চলে অনেক শহর এবং সামরিক ঘাঁটির প্রচণ্ড ক্ষতি হয়। ছবিতে একটি মার্কিন বিমানের ধ্বংসাবশেষ দেখা যাচ্ছে।

দক্ষিণ ভিয়েতনাম ঃ

দক্ষিণ ভিয়েতনামের যুদ্ধে বিপর্যস্ত মার্কিন সৈন্যদের শক্তিবৃদ্ধি করার জন্য লিন্ডন জনসন আরও ১০,৫০০ মার্কিন সৈন্য পাঠিয়েছেন। ভিয়েতনাম যুদ্ধে ইতিপূর্বে সওয়া পাঁচ লক্ষ মার্কিন সৈন্য মোতায়েন করা হয়েছে। তারপর এই সাড়ে দশ হাজার সৈন্য। এরপরও জনসন বলেছেন, দক্ষিণ ভিয়েতনামে মার্কিন সেনাবাহিনীর প্রধান জেনারেল উইলিয়াম ওয়েস্টমোরল্যান্ড যদি চান, তবে আরও সৈন্য পাঠানো হবে। আরও ৫০ হাজার সৈন্য এখনই যাবার জন্য প্রস্তুত আছে, এক লক্ষ সৈন্যকে প্রস্তুত থাকার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

যত সৈন্য চাই পাঠাব, কিন্তু যুদ্ধে জয়ী হতে হবে। খে সানে হেরে গেলে চলবে না। এই হল জনসনের কথা। সৈন্যদের উৎসাহ দেবার জন্য জনসন স্বয়ং সৈন্যদের বিদায় অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকছেন, ফোর্ট ব্র্যাগে তিনি গিয়েছিলেন বিমানবাহিনীকে বিদায় সম্বর্ধনা জানাবার জন্য। আর এল টোরোতে গিয়েছিলেন নৌ-সৈন্যদের সম্বর্ধনা জানাতে।

কিন্তু এত করেও মার্কিন ও দক্ষিণ ভিয়েতনামী সৈন্যরা ভিয়েত কং গেরিলা ও উত্তর ভিয়েতনামের সৈন্যদের সঙ্গে পেরে উঠছে না। হুয়ে পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হয় নি। খে সানে মার্কিন পক্ষ পিছু হটছে। সায়গনও মুক্তিবাহিনীর প্রায় দখলে এসে গেছে।

নতুন করে ভিয়েতনাম যুদ্ধে সৈন্য প্রেরণের মুহূর্তে জনসন বলেছেন, উত্তর ভিয়েতনামের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা সুরু করার মত কোন সম্ভাবনা তিনি বর্তমানে দেখছেন না। অথচ লণ্ডন থেকে 'গার্ডিয়ান' পত্রিকার সংবাদদাতা জানাচ্ছেন, উত্তর ভিয়েতনামের পররাষ্ট্রদপ্তর তাঁকে জানিয়েছেন, উত্তর ভিয়েতনামে মার্কিন বোমাবর্ষণ বন্ধ ও অন্যান্য আক্রমণাত্মক কার্য বন্ধ করা হলে অন্য কোন সর্ত ছাড়াই তাঁরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে আলোচনায় বসতে প্রস্তত আছেন। বর্তমানে যুদ্ধের যা গতি তাতে উত্তর ভিয়েতনাম বিজয়ীর ভূমিকায় রয়েছে, তবু তারা শান্তিপূর্ণ আলোচনার জন্য উৎসাহী। এরপরেও জনসন সাড়া দেবেন না?

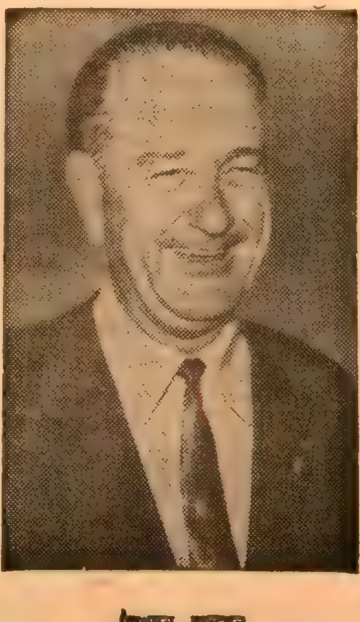

লিন্ডন জনসন

জনসন খুব জোরের সঙ্গে বলেছেন, ভিয়েতনামের যুদ্ধে পরমাণু অস্ত্র ব্যবহারের কথা তিনি একেবারেই ভাবছেন না। কিন্তু মার্কিন বিজ্ঞানীরা বলেছেন, তাঁরা পরমাণু অস্ত্রের ব্যবহারের আশঙ্কা করছেন।

২২শে ফেব্রুয়ারী নিউ ইয়র্কে এক সাংবাদিক সম্মেলনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বহু বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক, শিক্ষাবিদ, ধর্মযাজক ও যুদ্ধবিরোধী নেতা উপস্থিত থেকে পরমাণু অস্ত্র ব্যবহারের বিরুদ্ধে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন। 'যুদ্ধ ও শান্তি সমস্যা সংক্রান্ত বৃহত্তর নিউ ইয়র্ক কমিটি'র সভাপতি অধ্যাপক ফ্র্যাঙ্ক সি কলিন এই সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, জনসন সরকার যাতে ভিয়েতনামে পরমাণু অস্ত্র ব্যবহার করতে না পারে তার জন্য সর্বত্র ব্যাপক প্রচার সুরু করা প্রয়োজন। তিনি সতর্কবাণী উচ্চারণ করেন ঃ পরমাণু অস্ত্র ব্যবহার করলে কেবল ভিয়েতনাম ধ্বংস হবে না, সমগ্র আমেরিকা কবরখানায় পরিণত হবে।

ক্যানাডা ঃ

ফরাসীভাষী কুইবেকের বিচ্ছিন্নতার দাবি ক্যানাডার কাছে আজ এক বড় সমস্যা। গত একশ' বৎসর ধরেই সংখ্যালঘু ফরাসীভাষীদের প্রশ্ন ক্যানাডীয় রাজনীতিতে একটা জীবন্ত সমস্যা রূপে থেকে গেছে। কিন্ত বর্তমানে এই সমস্যাটি খুবই তীব্র আকার ধারণ করেছে। কুইবেকের বিপুল সংখ্যক অধিবাসী দাবি করেছে, ক্যানাডা থেকে বিচ্ছিন্ন একটি স্বতন্ত্র পৃথক রাষ্ট্র রূপে কুইবেককে প্রতিষ্ঠা করতে হবে। কিছুদিন পূর্বে ফ্রান্সের রাষ্ট্রপতি চার্লস দ্য গল কুইবেকে এসে এই আন্দোলনকে আরও উস্কানি দিয়ে গেছেন।

ক্যানাডার প্রধানমন্ত্রী লিস্টার পিয়ারসন বিচ্ছিন্নতার পথ থেকে ফরাসীদের ফিরিয়ে আনার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছেন। ৬০ লক্ষ ফরাসীভাষী ক্যানাডীয়দের মনোভাব বুঝতে হবে, এবং ক্যানাডার অখণ্ডত্ব বজায় রেখে তাদের দাবি যতটা মানা সম্ভব তা মানতে হবে, এই হল পিয়ারসনের কথা।

এই উদ্দেশ্য নিয়ে সম্প্রতি পিয়ারসন রাজধানী অটোয়ায় দশটি প্রদেশের প্রধানমন্ত্রীদের এক সম্মেলন আহ্বান করেছিলেন। তিনদিন ধরে এই সম্মেলন হয়েছে।

সম্মেলনের পরিণতিতে ফরাসীভাষীরা খুশি। কুইবেকের প্রধানমন্ত্রী ডানিয়েল জনসন বলেছেন, সম্মেলনের সিদ্ধান্তে

ইলিয়ট ত্রুদো

ফরাসীভাষীদের প্রতি সুবিচার করা হয়েছে। ইতিপূর্বে কখনও ফরাসীদের প্রতি এতটা উদারতা দেখানো হয় নি।

সম্মেলনে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে—

(১) ক্যানাডার সংবিধানের আমূল পরিবর্তন করা হবে। ফরাসীভাষীদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য সংবিধানের কিরূপ সংশোধন প্রয়োজন তা স্থির করার জন্য অবিলম্বে একটি কমিটি নিয়োগ করা হবে। আগামী কয়েক বৎসরের মধ্যে এই কমিটির কাজ শেষ করতে হবে এবং সংবিধান সংশোধন করতে হবে।

(২) ফরাসীভাষীদের স্বার্থে প্রশাসনিক ক্ষেত্রেও ব্যাপক পরিবর্তন সাধন করা হবে।

(৩) ইংরেজীভাষী প্রদেশগুলিতে যে-সব জায়গায় ফরাসীভাষীরা উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় আছে, সেখানে প্রাদেশিক সরকারের কাজকর্ম ও ইংরেজীর সঙ্গে সঙ্গে ফরাসীতে করা হবে।

(৪) ৮টি প্রদেশ স্থির করেছে, তারা আরও বেশি করে ফরাসী শিক্ষক, অনুবাদক ও সরকারী কর্মচারী নিয়োগ করবে।

ডানিয়েল জনসন অবশ্য কুইবেকের জন্য অপর বিদেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে সরাসরি কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের অধিকারও দাবি করেছিলেন, কিন্তু লিস্টার পিয়ারসন বা অন্য নেতাদের পক্ষে এই দাবি মেনে নেওয়া সম্ভব হয় নি।

ফরাসীভাষীদের সঙ্গে আপোষ-প্রচেষ্টার সূত্রপাত করলেন পিয়ারসন, কিন্তু এ কাজ শেষ করে যাওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব হবে না। কারণ, ৭০ বৎসর বয়স্ক এই প্রবীণ ক্যানাডীয় নেতা রাজনীতি থেকে অবসর গ্রহণের সিদ্ধান্ত করেছেন। আগামী এপ্রিল মাসে তিনি ক্ষমতাসীন লিবারেল পার্টির নেতৃত্বপদ তথা ক্যানাডার প্রধানমন্ত্রিত্ব ত্যাগ করবেন, এবং তাঁর জায়গায় নতুন নেতা নির্বাচন করা হবে।

পিয়ারসনের স্থলাভিষিক্ত কে হবেন, এই প্রশ্নে ইতিমধ্যেই ব্যাপক জল্পনা-কল্পনা সুরু হয়ে গেছে। অটোয়ার প্রধানমন্ত্রী সম্মেলনে পিয়ারসনের দক্ষিণ হস্ত রূপে যে ভদ্রলোক কাজ করেছেন, সেই পিয়ের ইলিয়ট ত্রুদো'র দিকে অনেকের নজর পড়েছে। ৪৬ বছরের ত্রুদো পিয়ারসনের মন্ত্রিসভায় বিচারমন্ত্রীর পদে আছেন। প্রধানমন্ত্রী সম্মেলনে সমস্যাটির যথাযথ উপস্থাপন এবং সকলপক্ষের কাছে গ্রহণযোগ্য সিদ্ধান্তে উপনীত হবার ক্ষেত্রে ত্রুদোর কৃতিত্ব খুবই বেশি। আরও বড় কথা, ত্রুদো নিজে কুইবেকের অধিবাসী—তবে তিনি ইংরেজীও খুব ভাল বলেন,

লিস্টার পিয়ারসন

ইংরেজী কায়দা-কানুনেও খুব রপ্ত। ইংরেজদের আস্থাভাজন একজন ফরাসীকে ক্যানাডার বর্তমান পরিস্থিতিতে প্রধানমন্ত্রী রূপে গ্রহণ সব দিক থেকেই বিচক্ষণতার পরিচায়ক হবে বলে অনেকের ধারণা। ত্রুদো আইনের প্রাক্তন অধ্যাপক ও একজন বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ। আর যাঁদের নাম প্রধানমন্ত্রী পদের জন্য শোনা যাচ্ছে, তাঁরা হলেন অর্থমন্ত্রী মিচেল শার্প, পররাষ্ট্রমন্ত্রী পল মার্টিন ও পরিবহন মন্ত্রী পল হেলিয়ার।

তবে গত ২১শে ফেব্রুয়ারী ইনকাম-ট্যাক্স সারচার্জ বিলের ওপর আলোচনার সময় কমন্সসভায় সরকারী দলের অকস্মাৎ পরাজয়ের পর যে অনিশ্চিত অবস্থার উদ্ভব হয়েছে তাতে শেষ পর্যন্ত কমন্স-সভা ভেঙে দিয়ে এখনই নির্বাচনের ব্যবস্থা করতে হয় কি না, সেটাই আজ বড় প্রশ্ন। কমন্সসভায় সরকারী দলের পরাজয়ের কোন সম্ভাবনা ছিল না। সরকারপক্ষের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল কমন্সসভায়। তবু হঠাৎ ৮২—৮৪ ভোটে সরকারের পরাজয় ঘটে। প্রধানমন্ত্রী পিয়ারসন এই ঘটনাকে সরকারের বিরুদ্ধে অনাস্থা বলে মানতে রাজী হন নি। কারণ, সরকার-পক্ষের ৪৬ জন সদস্য সেদিন কমন্সসভার বৈঠকে অনুপস্থিত ছিলেন।

কিন্তু বিরোধীপক্ষ কনজারভেটিভ পার্টি ও নিউ ডেমোক্রাট দল অবিলম্বে পিয়ারসন মন্ত্রিসভার পদত্যাগ ও নতুন নির্বাচনের দাবি জানিয়েছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র:

রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের দিন যতই এগিয়ে আসছে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সর্বত্র নির্বাচনী উত্তেজনা ততই বৃদ্ধি পাচ্ছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দ্বি-দল ব্যবস্থা রয়েছে। রাষ্ট্রপতি নির্বাচন কিংবা কংগ্রেসের উভয় পক্ষ সেনেট ও প্রতিনিধি-সভার নির্বাচনে প্রধান দুই দল ডেমোক্র্যাটিক পার্টি ও রিপাবলিকান পার্টির প্রার্থীরা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। কালেভদ্রে তৃতীয় কোন দলের প্রতিনিধি অথবা নির্দলীয় কেউ নির্বাচনে দাঁড়াবার চেষ্টা করেন। কিন্তু কেউ সফল হন না। এবারও রাষ্ট্রপতি পদের জন্য দুই প্রধান দলের প্রার্থী দাঁড়াবেন। কিন্তু তৃতীয় দলের প্রার্থীরূপে বিখ্যাত নিগ্রোবিদ্বেষী জর্জ ওয়ালেস তাঁর প্রার্থীপদ ঘোষণা করায় বিভিন্ন মহলে ঔৎসুক্যের সৃষ্টি হয়েছে। আলাবামার প্রাক্তন গভর্নর ওয়ালেস 'আমেরিকান ইন্ডিপেন্ডেন্ট পার্টি' নামে

নিক্সন

একটি নতুন দল গঠন করে তার প্রার্থী রূপে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন।

বর্তমান রাষ্ট্রপতি লিন্ডন জনসন আবার ডেমোক্রাটিক পার্টির প্রার্থী হবেন বলে মনে হচ্ছে। অবশ্য দলের মধ্যে তাঁর বিরুদ্ধে প্রার্থীপদের জন্য দাঁড়িয়েছেন ইউজিন ম্যাকার্থি। মিনেসোটা থেকে সেনেটে নির্বাচিত ম্যাকার্থি জনসন নীতির একজন কট্টর সমালোচক। 'আমেরিকানস ফর ডেমোক্রাটিক অ্যাকসন' বা এ-ডি-এ নামে বিখ্যাত প্রতিষ্ঠানটি ম্যাকার্থিকে সমর্থন করেছে। ভারতের প্রাক্তন মার্কিন রাষ্ট্রদূত জন কেনেথ গলব্রেথ ম্যাকার্থির পক্ষে একজন উৎসাহী প্রচারক। শোনা যাচ্ছে, রবার্ট কেনেডীর সমর্থনও আছে ম্যাকার্থির পেছনে।

রিপাবলিকান পার্টির পক্ষ থেকে প্রার্থী হবার চেষ্টা করছেন প্রাক্তন উপ-রাষ্ট্রপতি রিচার্ড নিকসন। তিনি ইতি-মধ্যেই বিভিন্ন অঞ্চলে নির্বাচনী সফর সেরে ফেলেছেন এবং দলের মনোনয়ন পাবার ব্যাপারে তিনি অনেকটা নিশ্চিন্ত। নিকসনের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী হলেন মিশি-গানের গভর্নর জর্জ রোমনি। যে-সব রিপাবলিকান নিকসনকে পছন্দ করছেন না, তাঁরা নিউ ইয়র্কের গভর্নর নেলসন রকফেলারকে দাঁড় করাবার চেষ্টা করছেন। তাঁদের ধারণা, নিকসনের পক্ষে জনসনকে হারানো সম্ভব হবে না, রকফেলারই জনসনের উপযুক্ত প্রতিদ্বন্দ্বী। তবে এখন পর্যন্ত রকফেলার নিজে প্রার্থী হতে রাজী হন নি, তিনি রোমনিকে সমর্থন করছেন। কিন্তু নিউ হ্যামশায়ারে রিপাবলিকান দলের প্রাথমিক নির্বাচনে রোমনি যদি নিকসনের কাছের পরাজিত হন, তবে হয়তো রকফেলার নির্বাচন দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হবেন।

বাঙলার সর্বশ্রেষ্ঠ কথা-সাহিত্যিক
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের
হৃদয়গ্রাহী উপন্যাস
ঝড় ও ঝরা পাতা
(কাপড় ও বোর্ডে বাঁধা
সুদৃশ্য সংস্করণ)
মূল্য—৩·০০ টাকা
বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড
১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-১২

নিগ্রোদের বিরুদ্ধে জেহাদের জন্য বিখ্যাত বা কুখ্যাত জর্জ ওয়ালেস বর্ণ-বৈষম্যের দাবিকে তুলে ধরার জন্যই রাষ্ট্রপতি পদের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। সম্প্রতি ওয়াশিংটনে এক সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি তাঁর প্রার্থীপদ ঘোষণার সময় বলেন, তাঁর লক্ষ্য হল—'Segregation to-day, Segregation to-morrow, and Segregation for ever.' অর্থাৎ 'বর্ণবৈষম্য আজ, বর্ণবৈষম্য কাল এবং বর্ণবৈষম্য

জর্জ ওয়ালেস

চিরকালের জন্য'—এই ধ্বনি নিয়ে তিনি নির্বাচনে নামছেন। দক্ষিণের রাজ্যগুলির মধ্যে আলাবামা, মিসিসিপি, লুসিয়ানা ও সাউথ ক্যারোলিনায় শ্বেতাঙ্গদের কাছ থেকে তিনি ভাল ভোট আশা করেন। কালিফোর্নিয়াতেও বেশ কিছু ভোট তিনি পাবেন। তাঁর আশা, শীঘ্রই দেশের বিভিন্ন স্থানে নিগ্রোদের সঙ্গে দাঙ্গা সুরু হবে এবং তার ফলে তাঁর ভোট 'জ্যামিতিক হারে' লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়তে থাকবে।

ওয়ালেসের জয়ের বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা নেই এ কথা সবাই জানেন। (যদিও ওয়াশিংটনে সাংবাদিক সম্মেলনে ওয়ালেস জোরের সঙ্গে বলেছেন, তিনি জয়ী হবেন। ওয়ালেসের পাশে তখন তাঁর প্রধান সহকর্মী তাঁর স্ত্রী আলাবামার গভর্নর লার্লিন ওয়ালেস ছিলেন না। তিনি তখন রোগশয্যায়।) তবে তিনি দক্ষিণা-ঞ্চলে রিপাবলিকান পার্টির কিছু ভোট এবং উত্তরে ডেমোক্রাটদের কিছু ভোট নষ্ট করবেন। হিসাবে রিপাবলিকানদের ভোটই বেশি নষ্ট হবে।

তাই রিপাবলিকান মহলে অভিযোগ উঠেছে, ওয়ালেসের দাঁড়াবার পেছনে জনসনের লোকেদের হাত আছে। ফ্লোরিডার রিপাবলিকান গভর্নর ক্লড ক্লার্ক নিজে জনসনের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ করেছেন।

* * *

ওয়ালেস যখন নিগ্রোদের বিরুদ্ধে বর্ণবৈষম্যের জেহাদ ঘোষণা করে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের তোড়জোড় করছেন, ঠিক তখনই দক্ষিণাঞ্চলের নিগ্রোরা মার্কিন যুক্ত-রাষ্ট্রকে বিভক্ত করে নিগ্রোদের জন্য একটি পৃথক স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের সংকল্প ঘোষণা করেছে। এই পরিকল্পনা মত সাউথ ক্যারোলিনা, জর্জিয়া, লুসিয়ানা, মিসিসিপি ও আলাবামা, এই পাঁচটি রাজ্য নিয়ে এই নতুন নিগ্রো রাষ্ট্র গঠিত হবে।

২২শে ফেব্রুয়ারী ডেট্রয়েটে এক সাংবাদিক সম্মেলনে 'ব্ল্যাক ন্যাশনালিস্ট গ্রুপ'-এর একজন নেতা মিল্টন হেনরী এই কথা ঘোষণা করেন। 'ম্যালকম এক্স সোসাইটি'র অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা মিল্টন হেনরী মিসিসিপি রাজ্যের পন্টিয়াকের প্রাক্তন কাউন্সিল সদস্য।

হেনরী ঘোষণা করেন, নতুন রাষ্ট্রের জন্য বিস্তৃত পরিকল্পনা প্রণয়ন, এবং আন্দোলনের কর্মসূচী গ্রহণের জন্য আগামী ৯ই ও ১০ই মার্চ ডেট্রয়েটে নিগ্রো-দের এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে।

নিগ্রোরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকত্ব মেনে নিতে, কিংবা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অখণ্ডত্ব মানতে বাধ্য নয়, আন্তর্জাতিক আইনের নানা যুক্তি উত্থাপন করে হেনরী এই কথা বলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করেন, যখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র স্থাপন করা হয়, তখন কি ক্রীতদাসদের জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, তোমরা আফ্রিকায় ফিরে যাবে, না এখানে নাগরিক হবে?

ছোট দেশ। সরু একফালি দেশ। দক্ষিণ চীন সমুদ্র আর টংকিন উপসাগরের গা ঘেঁষে পড়ে আছে যেন একটা সুতো-ছেঁড়া ফুলের মালা। কিংবা ভিয়েৎনামী কৃষক-রমণীর হাতের কাস্তের মতো যেন, ফসল কাটা আরম্ভ হবার আগে একান্তে পড়ে আছে।

আয়তনে কতটুকুই বা হবে। যদি দক্ষিণ ভিয়েৎনামকে আলাদা করে দেখা হয় তাহলে আমাদের ওড়িশা রাজ্যের চাইতে কিছু বড় কিন্তু বিহার রাজ্যের চাইতে ছোট। যদি উত্তর ভিয়েৎনামের সংগে একসংগে ধরা হয় তাহলেও রাজস্থানের সমান হবে না।

একদিকে সমুদ্র আমি আগেই বলেছি। আর একদিকে পাহাড়। আন্নামী পর্বতমালা। উত্তর থেকে দক্ষিণে একটা বিরাট দেওয়ালের মত মাঝখানের সমতলভূমিকে রক্ষা করছে। কোথাও কোথাও পাহাড়ের চূড়া আপন মুখ দেখছে সাগরের জলে।

আর আছে জংগল। ঘন, গভীর, দুর্ভেদ্য জংগল। উত্তরে যেখানে পাহাড় নেই খুব বেশি সেখানে আছে একশ ফিট কি তারও বেশি উঁচু চিরহরিৎ গাছের জংগল যা পাতার সামিয়ানা খাটিয়ে নিচের মাটিকে আকাশের দৃষ্টি থেকে একেবারে আড়াল করে রেখেছে এবং যা অঝোর ধারায় বৃষ্টি টেনে আনে। দক্ষিণে যেখানে সমতলভূমি জলায় পরিণত সেখানে আছে গরান, নারকেল আর ঘাসের জংগল যার ভেতর দিয়েও বছরের অধিকাংশ সময় যাতায়াত দুঃসাধ্য।

ঐ জংগলের মাঝে মাঝে আছে গ্রাম। ছোট্ট, সুন্দর, কলা আর পেঁপে গাছের সারি দিয়ে ঘেরা এক-একটি গ্রাম। আঁকা-বাঁকা ধূলি-ধূসরিত বলীরেখাঙ্কিত মেঠো রাস্তা। ধারে ধারে কঞ্চির বেড়া, কিংবা রাঙচিতার। ছোট ছোট ধানের ক্ষেত। কিংবা সব্জীর ক্ষেত। নীল রঙের টিউনিক পরে টোকা মাথায় মেয়েরা কাজ করছে। কয়েকটা দোকান। খাল কিংবা পুকুর। আদুড় গায়ে ছেলেমেয়েরা মাখামাখি করছে ধূলোর কিংবা ঝাঁপাঝাঁপি করছে জলে। শান্ত পরিবেশ। চিরন্তন।

এবং আছে নদী। সং কা—যাকে বাইরের দুনিয়া রেড রিভার বলে জানে—আছে উত্তরে। দক্ষিণে আছে মেকং, সায়গন, বাসাক, ডংনাই আর উয়ে, যার অপর নাম সুগন্ধি নদী। বড় বড় পালের নৌকো ভাসে সেই সব নদীতে। দাঁড়ি-মাঝি গান গাইতে গাইতে জিনিসপত্র নিয়ে যায় এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায়। আছে অসংখ্য খাল, বিল, নালা যা দেশটার ওপর জালের মত বিছিয়ে রয়েছে। বর্ষা আসে। বর্ষাই ভিয়েৎনামের প্রধান ঋতু, মে মাসে আরম্ভ হয়ে নভেম্বর পর্যন্ত চলে। বৃষ্টি পড়ে অঝোর ধারায়, প্রবল বেগে। ঐ জলে খাল, বিল, নালা ভরে

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

ওঠে, দুলে ওঠে মেকং, সায়গন, বাসাক, ডংনাই আর উয়ের বুক, রাস্তা-ঘাট, গ্রাম-গ্রামান্তর দেয় ভাসিয়ে, পলির আস্তরণে ঢেকে দেয় মাটির শরীর।

জল, জংগল আর পাহাড় নিয়ে এই যে দেশ যা চীনের সীমান্ত থেকে শ্যাম উপসাগর পর্যন্ত এক হাজার মাইল সমুদ্রোপকূল বেষ্টন করে রয়েছে, পূব থেকে পশ্চিমে যার সর্বোচ্চ বিস্তার ৩৫০ মাইল আর সবচেয়ে কম ৪০ মাইল, সেখানে থাকে সুন্দর, মিষ্টি, বন্ধুত্বপরায়ণ, কর্মঠ একটি জাতি।

সংখ্যায় এরা মাত্র ৩ কোটি ১০ লক্ষের মত, দেড় কোটি দক্ষিণ ভিয়েৎনামে, ১ কোটি ৬০ লক্ষ উত্তরে। এরা শান্ত, নম্র, নির্বিবাদী মানুষ। এরা কাজ করে ধানের ক্ষেতে—ভিয়েৎনামকে বলা হয় এশিয়ার শস্যভান্ডার—কিংবা রবার, চা আর কফির বাগিচায়, মাছ ধরে, গরু-বাছুর চরায়, মাটির ভিতের ওপর বাঁশ আর খড় দিয়ে ঘর বাঁধে, সাপের মাংসের সুপ দিয়ে ভাতের মন্ড মেখে খায়। মাত্র ১০ শতাংশ লোক থাকে শহরাঞ্চলে যেখানে মেয়েরা রঙ-চঙা আও-দাই পরে প্রচুর সংখ্যায় অফিসে কাজ করে কিংবা হাটে-বাজারে দোকান চালায়। এদের ছেলেমেয়েরা পড়া-শুনা করে ১২ হাজার ৩৫০টি প্রাথমিক স্কুলে, ৩৮৫টি মাধ্যমিক স্কুলে, ২৭টি কলেজে, ৪টি বিশ্ববিদ্যালয়ে। এদের শিক্ষিতের হার ৯৫ শতাংশ। এই উঁচু হার এরা অর্জন করেছে যুদ্ধকালীন ব্যবস্থার দ্বারা। ভিয়েৎনামীরা তাদের মুক্ত অঞ্চলে চালু করেছিল গণ-বিদ্যালয়। এমন কি দক্ষিণ ভিয়েৎনামের প্রাক্তন ডিক্টেটর নো দিন জিয়েমও বয়স্ক শিক্ষার ক্লাস চালু করেছিলেন, নির্দেশ দিয়েছিলেন কোন

যদি কোন ব্যক্তি অশিক্ষিত থাকবে তাকে হত্যা করা হবে।

ধর্ম এদের জীবনকে সত্যিই ধরে রেখেছে। দিয়েছে বিনয়, শিখিয়েছে কষ্টকে অস্বীকার করতে, লক্ষ্যে একনিষ্ঠ থাকতে, আদর্শের জন্যে প্রাণ দিতে। এদের সহ্যের ক্ষমতার অজস্র নিদর্শন ছড়িয়ে আছে এদের ইতিহাসের পাতায় পাতায়। এরা বৌদ্ধ, তাওবাদ ও কনফুসীয়বাদের সঙ্গে যা মিশ্রিত। এরা পূর্বপুরুষের পূজো করে। এদের বাড়ীই এক-একটি মন্দির। সেখানে বেদী আছে, বেদীর ওপর দেবতা আছেন। সেখানে তারা প্রতিদিন তাদের পূজো নিবেদন করে। কখনো কখনো যায় প্যাগোডায়, নীরব উপাসনায় ধূপ জেলে দেয়। কিংবা যায় কাও দাই সম্প্রদায়ের মন্দিরে যেখানে বৌদ্ধধর্ম, কনফুসীয়বাদ, তাওবাদ ও খৃস্টধর্ম একত্রিত হয়েছে। কাও দাইরা সংখ্যায় হবে প্রায় কুড়ি লক্ষ। আরেকটি নব্য-বৌদ্ধ সম্প্রদায় হল হোয়া হাও। এদের শিষ্য সংখ্যা প্রায় পনেরো লক্ষ। আর আছে কুড়ি লক্ষের মত খৃস্টান।

এই যে শান্ত, ধর্মভীরু মানুষগুলি, এবং এই যে জল ও জঙ্গলের একফালি দেশ, তার বুকের ভেতর আজ আগুন জ্বলছে। কোন পূজার প্রদীপ জ্বলছে এই আগুনে? কোন যজ্ঞের সাধনা চলছে এর শিখায়? তার উত্তর লেখা নেই কোন বইয়ে। ব্যাখ্যা নেই কোন ধর্মশাস্ত্রে। তার ইতিহাস শুধু লেখা হয়ে চলেছে পাহাড়ের চূড়ায় আর জঙ্গলের গভীরে, শহরে আর গ্রামে, যেখানে রক্ত আর চোখের জল বয়েছে, গত পঁচিশ বছর ধরে প্রতিদিন।

এই ইতিহাস পাঠ করে আমরা রোমাঞ্চিত হব, কিন্তু বিস্মিত হব না। কারণ এই ইতিহাস কেবল গত পঁচিশ বছরে গড়ে ওঠে নি। এই ইতিহাস ভিয়েৎনামী জাতির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে গড়ে উঠেছে। অন্তত আরো এক হাজার বছরের প্রস্তুতি এই ইতিহাসের রাজপথ তৈরি করে দিয়েছে। এই হাজার বছরের সংগ্রামের ঐতিহ্যই ভিয়েৎনামীদের আজকের এই বিপুল প্রতিরোধের পেছনে এতখানি শক্তি জুগিয়েছে।

"আমরা হাজার বছর ধরে যুদ্ধ করেছি", ভিয়েৎনামীরা গর্ব করে বলে থাকে। "দরকার হলে আমরা আরো হাজার হাজার বছর যুদ্ধ করব।"

ভিয়েৎনামীদের এই এক হাজার বছরের ইতিহাস বিদেশী শক্তির বিরুদ্ধে অবিচ্ছিন্ন লড়াইয়ের ইতিহাস। বিদেশী দাসত্ব ও প্রভুত্বকে অস্বীকার করার প্রবণতা যেন ভিয়েৎনামীদের রক্তের সঙ্গে মিশে রয়েছে। ভিয়েৎনাম তখন ছিল চীনের শাসনাধীনে। চীনারা এর নাম দিয়েছিল আন নাম, অর্থাৎ দমিত দক্ষিণ। 'ভিয়েৎনাম' এই নামটি সরকারীভাবে গ্রহণ করা হয় মাত্র ১৮০২ সালে, যখন সম্রাট জিয়া লং ছিলেন শাসনের গদিতে। ভিয়েৎনাম, অর্থাৎ দূর দক্ষিণ, ছিল চীনা ইউয়ে-নান শব্দেরই ভিয়েৎনামী প্রতিশব্দ। ইউয়ে-নান বলতে বোঝাতো 'ইউয়ের (বর্তমান কোয়াং টুং প্রদেশের প্রাচীন নাম) দক্ষিণ।'

মান্দারিন ধরণের সমাজব্যবস্থা আর কনফুসীয় নীতিশাস্ত্র ঐ সময়েই ভিয়েৎনামে আমদানী হয়। তার প্রভাব এক সময় ভিয়েৎনামী বুদ্ধিজীবীমহলকে খুবই আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল এবং তার কিছুটা আজও অবশিষ্ট আছে। কিন্তু একদিকে যখন এই চীনীকরণ চলছিল, অন্যদিকে চীনের শাসনকে উৎখাত করার জন্যে চেষ্টাও চলছিল সমানে। যদিও চীনাদের সঙ্গে ভিয়েৎনামীদের অনেক বিষয়েই মিল ছিল, তবু তাদের শাসন বিদেশী শাসন ছাড়া আর কিছুই ছিল না। এবং কোনরকম বিদেশী শাসন বরদাস্ত করা ভিয়েৎনামীদের চরিত্রের বিরোধী।

৯৩৯ সালে, চীনে যখন তাং যুগের অবসানের পর অরাজক অবস্থা চলেছে, ভিয়েৎনামীরা চীনের প্রত্যক্ষ কর্তৃত্ব উৎখাত করতে সক্ষম হয়। কিন্তু পরোক্ষ প্রভাব তখনও ছিল এবং মাঝে মাঝেই চীনারা হামলা চালিয়ে তাদের প্রভুত্ব পুনরায় কায়েম করার চেষ্টা করছিল। এক সময় তারা হ্যানয় শহরটি আবার দখল করে নিতে সমর্থ হয়েছিল।

এইভাবে চলেছিল প্রায় ৫০০ বছর। ১৪২৭ সালে যোদ্ধা-সম্রাট লে লোই চীনাদের হাত থেকে হ্যানয় পুনরুদ্ধার করেন এবং লে গোষ্ঠীর পত্তন করে নিজেকে সম্রাট ঘোষণা করেন। এই সাম্রাজ্যের পত্তন যদিও তিনি করেছিলেন চীনকে তিন বছর পর পর প্রচুর উপঢৌকন পাঠানোর বিনিময়ে, তবু ভিয়েৎনামে চীনের কার্যকর শাসনের অবসান বলা যায় তাঁর সময় থেকেই ঘটে।

ভিয়েৎনামী ইতিহাসের এই অধ্যায়টুকুর উল্লেখ করা আমি প্রয়োজন মনে করি শুধু এইটে প্রমাণ করবার জন্যে যে, ভিয়েৎনামীরা ঘটনাচক্রে সময় সময় বিদেশী শাসন সহ্য করতে বাধ্য হলেও ঐ শাসনকে তারা কখনই মেনে নিতে পারে নি। ভিয়েৎনামীদের এই অদম্য স্বাধীনতা-স্পৃহার আরো প্রমাণ, তাদের বাগে আনবার জন্যে চীনাদের এক হাজার বছরে অন্তত ১৫ বার ভিয়েৎনামে অভিযান চালাতে হয়েছিল।

এই অন্তর্নিহিত স্বাধীনতা-স্পৃহাই অনেক জোরদার প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল পরবর্তীকালে ফরাসীদের বিরুদ্ধে।

অষ্টাদশ শতকের শেষ ভাগ থেকেই ভিয়েৎনামে ফরাসীদের আনাগোনা আরম্ভ হয়। এবং আরম্ভ হয় যথারীতি মিশনারীদের দিয়েই। ১৮৩৩ সালে সম্রাট মিং মাং এক হুকুমনামা জারি করে জনসাধারণকে এই বলে সাবধান করে দেন যে, যাঁরা খৃস্টধর্ম গ্রহণ করবেন তাঁদের অপরাধের একমাত্র শাস্তি হবে মৃত্যু। "যীশুর ধর্ম আমাদের সর্বাত্মক ঘৃণার পাত্র", তিনি বললেন। "এই ধর্মের উপাসনা-গৃহ এবং যাজকদের বাড়িগুলি ভেঙে ধুলোয় গুঁড়িয়ে দিতে হবে।" এই ফতোয়ার পর মিশনারীদের বিরুদ্ধে যে অভিযান শুরু হয় তা প্রবলতর আকার ধারণ করে পরবর্তী সম্রাট থিউ ত্রি'র আমলে। তারপর সম্রাট তু দুকের সময় এই নিয়ে ফরাসীদের সঙ্গে গুরুতর মনোমালিন্য দেখা দেয়।

সম্রাট তু দুক ভিয়েৎনাম থেকে শুধু ফরাসী নয় সমস্ত বিদেশী মিশনারীকেই নিশ্চিহ্ন করার সঙ্কল্প করেন। এই সঙ্কল্পকে কাজে পরিণত করতে গিয়ে যখন বহু সংখ্যায় ফরাসী ও স্পেনীয় মিশনারীরা নিহত হল, তখন সেই অজুহাতে ১৮৫৮-৫৯ সালে একটি যুক্ত ফরাসী-স্পেনীয় বাহিনী দা নাং আক্রমণ করে, তারপর দক্ষিণ মুখে অভিযান চালিয়ে সায়গন দখল করে। সেখান থেকে আবার অভিযান চালিয়ে ফরাসীরা পার্শ্ববর্তী তিনটি প্রদেশ দখল করে নেয়।

ভিয়েৎনামে ফরাসী শাসন প্রতিষ্ঠার এই হল সূত্রপাত। এই সুসজ্জিত হানাদারদের বিরুদ্ধে তু দুকের বিশেষ কিছু করবার ছিল না। ১৮৬২ সালে এক চুক্তিতে স্বাক্ষর করে তিনি ফরাসীদের এই সাফল্য স্বীকার করে নিতে বাধ্য হলেন। ১৮৮৩ সালে ফরাসীরা হ্যানয় ও হাইফং দখল করে নিয়ে ভিয়েৎনামে তাদের প্রতিষ্ঠাকে পুরোপুরি কায়েম করল। হুয়ের রাজদরবার (হুয়েই ছিল তখন ভিয়েৎনামের রাজধানী) উত্তরে টংকিন, মধ্যে আন্নাম আর দক্ষিণে কোচিন চীন, অর্থাৎ সারা ভিয়েৎনামের ওপরেই আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকার করে নিল ফরাসী আধিপত্যের কথা।

বার, ব্রথেল আর বুলেভার্ড এই তিন 'বি' নিয়ে ফরাসীরা এসেছিল ভিয়েৎনামে। এই তিন 'বি' নিয়েই তাদের ঔপনিবেশিক সভ্যতা। ঐ সভ্যতা নিয়ে তারা ভিয়েৎনামের ভূগোলকেই দখল করতে পেরেছিল, সেখানকার মানুষগুলির মনের দখল নিতে পারে নি।

দেশের স্থানে স্থানে ফরাসীদের বিরুদ্ধে গেরিলা ধরণের লড়াই চলতে

থাকে। হয়ত ঐ লড়াই তখনও সংঘবদ্ধ ছিল না। প্রতিবাদের কণ্ঠও হয়ত ছিল না সোচ্চার। কিন্তু এটা অন্তত এ-থেকে প্রমাণিত যে, ভিয়েৎনামীরা ফরাসী শাসনের একেবারে গোড়া থেকেই এই শাসনের বিরোধিতায় অবতীর্ণ হয়েছিল। ঐ সময় প্রতিরোধের নেতৃত্ব যদিও নেন রাজদরবার ও উচ্চপদস্থ মান্দারিন মহল, তবু ফরাসীদের অনুপ্রবেশের ফলে ভিয়েৎনামের অর্থনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থা যতই ভেঙে যেতে লাগল, ফরাসীদের অত্যাচারের মাত্রা যতই বেড়ে যেতে লাগল, বহুদিনের প্রচেষ্টায় গড়ে-তোলা ভিয়েৎনামের অপূর্ব শিক্ষা-ব্যবস্থার (যে ব্যবস্থায় ভিয়েৎনামের প্রায় প্রতিটি গ্রামে ছিল একাধিক প্রাইভেট স্কুল এবং আগেই বলেছি শতকরা ৯৫ জন ছিল শিক্ষিত) সমাধি ঘটতে লাগল, ততই একদল অপেক্ষাকৃত তরুণ বুদ্ধিজীবী, যাঁরা পশ্চিমী শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে পশ্চিমী ঔপনিবেশিকতার চরিত্র ও প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্যক উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন, ক্রমশ ফরাসী-বিরোধী আন্দোলনের সামনের সারিতে এসে দাঁড়াতে আরম্ভ করলেন।

"ফরাসী শাসনের আশীর্বাদে সাধারণভাবে আন্নামীরা পিষ্ট হচ্ছে", ১৯২৪ সালে ভিয়েৎনামের অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে লিখেছিলেন হো চি মিন। "আন্নামী কৃষকদের দুর্দশা আরো শোচনীয়। আন্নামী হিসেবে তারা নিপীড়িত, কৃষক হিসেবে তারা লুণ্ঠিত, শোষিত ও বিপর্যস্ত। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে পরিশ্রম করে এরাই। একদল পরগাছার জন্যে এরাই উৎপাদন করে খাদ্য। অথচ এরাই থাকে দারিদ্র্যে আর এদের হত্যাকারীরা বাস করে প্রাচুর্যের মধ্যে। যখন ফসল কম বা নষ্ট হয় তখন মরে যাওয়া ছাড়া এদের আর গত্যন্তর নেই। ...আগেকার কালে, আন্নামী শাসনের সময়, চাষের জমি উর্বরতা অনুযায়ী কতকগুলি শ্রেণীতে ভাগ করা ছিল। এই শ্রেণী বিভাগ অনুযায়ীই করধার্য করা হত। বর্তমান ঔপনিবেশিক শাসনে এ সবই বদলে গেছে। কলমের এক খোঁচায় তাঁরা অনুর্বর নিকৃষ্ট জমিকে উর্বর জমিতে পরিণত করেছেন, আর সেই অনুযায়ী কৃষককে বেশি কর দিতে বাধ্য করা হচ্ছে।"

এই শোষণ ভিয়েৎনামীদের মধ্যে যে প্রবল ঘৃণার সঞ্চার করেছিল তা ভাষা পেয়েছিল হো চি মিনের পরের কথাগুলির মধ্যে। তিনি লিখেছিলেন: "গণতন্ত্রের মুখোসের আড়ালে ফরাসী সাম্রাজ্যবাদীরা আন্নামে এক ঘৃণিত মধ্যযুগীয় শাসন প্রবর্তন করেছেন। এমন কি লবণের ওপর কর বসাতেও তাঁরা দ্বিধা করেন নি। পুঁজিবাদী সভ্যতার বেয়োনেটের ডগায় আর খৃস্টধর্মের বেশ্যাবৃত্তির ক্রুশের কাঠে আন্নামী কৃষককে হত্যা করা হচ্ছে।"

ক্রমে যে প্রতিরোধ ছিল মূলত রাজশক্তি পুনরুদ্ধারের আন্দোলন তা জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের রূপ নিতে লাগল। কিছু সংখ্যক মধ্যপন্থী তখনও ছিলেন যাঁরা ফরাসীদের সঙ্গে সহযোগিতার মাধ্যমে সংস্কার সাধনের চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু ফরাসীরা ঐ সহযোগিতার হাত যখন সরাসরি প্রত্যাখ্যান করল তখন হিংসার পথে পা বাড়ানো ছাড়া আর গত্যন্তর রইল না।

ঐ সময়, অর্থাৎ বর্তমান শতাব্দীর গোড়ার দিকে, দক্ষিণ চীনের ক্যান্টনে ভিয়েৎনাম কোয়াং-ফুক হোই (ভিয়েৎনাম পুনরুদ্ধার সমিতি) নামে একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়েছিল। ভিয়েৎনামের মধ্যে ছিল ঐ সমিতির গোপন শাখার একটা বিরাট জাল। ঐ সমিতি ও তার গোপন শাখাগুলির মাধ্যমে ভিয়েৎনামী যুবকদের প্রচুর সংখ্যায় গোপনে পাঠান হতে লাগল চীনে ও জাপানে অস্ত্রবিদ্যায় দীক্ষা নেবার জন্যে। দেশে ফিরে এসে এই যুবকেরা অন্তত তিনবার—১৯১৩, ১৯১৫ ১৯১৭ সালে—সামরিক অভ্যুত্থান ঘটাবার চেষ্টা করে।

রক্তের পিচ্ছিল পথে ভিয়েৎনামের সুদীর্ঘ পদযাত্রা বলতে গেলে সেই থেকেই আরম্ভ হয়।

১৯২৭ সালে হ্যানয়ে স্থাপিত হল ভিয়েৎনাম কুয়োক-দান দাং, অর্থাৎ ভিয়েৎনামী জাতীয় দল। এই দলকে ঘিরে ভিয়েৎনামের জাতীয়তাবাদী শক্তি প্রথম পূর্ণভাবে আত্মপ্রকাশ করল।

তারপর এলো ১৯২৯ সালের সেই দিন, ভিয়েৎনামী জাতীয় আন্দোলনের

মুক্তার মত ঝকঝকে উজ্জ্বল...

আপনার দাঁত হবে সাদা ধবধবে, দাঁতের মাড়ী নীরোগ থাকবে আর মুখের দুর্গন্ধ দূর হবে, আপনি শুধু ডেণ্টনিক দিয়ে দাঁত মাজা অভ্যাস করুন।

ক্লোরোফিল মিশ্রিত ডেণ্টনিক পাইওরিয়া সারাতে সাহায্য করে।

যাঁরা টুথ পাউডারের জায়গায় পেষ্ট ব্যবহার পছন্দ করেন তাঁদের জন্য জনপ্রিয় ডেণ্টনিকের সমস্ত গুণসম্পন্ন টুথ পেষ্ট বাজারে প্রচলন করা হইয়াছে। ধবধবে দাঁত আর মনভোলান হাসি যাঁরা পছন্দ করেন তাঁরাই চান ডেণ্টনিক টুথ পেষ্ট।

বেঙ্গল কেমিক্যাল
কলিকাতা · বোম্বাই · কানপুর · দিল্লী

ইতিহাসে যে দিনটির কথা বিশেষভাবে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। ১৯২৯ সালের ৯ই ফেব্রুয়ারী।

ব্যানে বাজাঁ ছিলেন একজন পদস্থ কর্মচারী, ফরাসী মহলের ঐকজন হোমরা-চোমরা ব্যক্তি। তাঁর কাজ ছিল টংকিন এলাকা থেকে সস্তাদরে শ্রমিক যোগাড় করে দক্ষিণে কোচিন চীন এলাকায় ফরাসীদের রবারের বাগিচাগুলিকে সরবরাহ করা। তাঁর এই শ্রমিক-চালানের মধ্যে কোনরকম সভ্যতা, ভব্যতা বা নীতির বালাই ছিল না। স্বভাবতই তাঁর প্রতি ভিয়েৎনামীদের আক্রোশ ছিল প্রবল।

১৯২৯ সালের ৯ই ফেব্রুয়ারী ব্যানে বাজাঁ সারাদিন কাজ করে সন্ধ্যায় যখন তাঁর বাংলোয় ঢুকতে যাবেন, সেই সময় একজন ভিয়েৎনামী যুবক তাঁর পথরোধ করে দাঁড়াল। হাতে তার একখানি খাম বন্ধ করা চিঠি।

কিছুটা বিস্ময়ের সঙ্গে বাজাঁ চিঠিটি নিলেন। যুবকটিকে তিনি চেনেন না। এইভাবে কোন চিঠিও তাঁর কাছে আসে না। একটু দ্বিধাগ্রস্তভাবে তিনি যখন খাম ছিঁড়ে চিঠিটি বার করছেন, সেই সময় আকস্মিকভাবেই কাণ্ডটা ঘটে গেল। যুবকটি তার পকেট থেকে একটা পিস্তল বার করে আনল এবং বাজাঁ কিছু বোঝবার আগেই অত্যন্ত কাছ থেকে গুলী করল পর পর কয়েকটা।

কোন রকম শব্দ করবার সুযোগ পর্যন্ত পেলেন না বাজাঁ। তার আগেই তাঁর প্রাণহীন দেহ লুটিয়ে পড়ল তাঁর বাংলোর প্রবেশপথের সামনে। চিঠির কাগজটি তখনও তাঁর হাতে ধরা ছিল। পরে পুলিশ এসে দেখল তাতে লেখা রয়েছে: "ভিয়েৎনামীদের রক্ত-চোষা জানোয়ার!"

এই হত্যাকাণ্ড ফরাসী শাসনকর্তাদের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করল। ঐ সময় ভিয়েৎনাম জাতীয় দল ছিল দুটি ভাগে বিভক্ত। একটি প্রকাশ্য, যার কেন্দ্র ছিল হ্যানয়ের একটি হোটেল; অপরটি গোপন। ব্যানে বাজাঁর হত্যাকারীর সন্ধান পুলিশ কোনদিন পায় নি। কিন্তু হত্যাকাণ্ডের খবর পাবার সঙ্গে সঙ্গে তারা ধরে নিল এটা জাতীয় দলেরই কাজ। তারা চড়াও হল হোটেল ভিয়েৎনামের ওপর, তছনছ করল দলের সদরদপ্তর, দলের প্রকাশ্য ভাগের প্রায় সকল সদস্যকেই গ্রেপ্তার করে চালান করল ভিয়েৎনামের আন্দামান পুলো কঁদোর দ্বীপে।

বাজাঁর হত্যা এবং তারপর ফরাসীদের প্রত্যাঘাত যেন ভিয়েৎনামীদের রক্তে একটা অভূতপূর্ব উন্মাদনা এনে দিল। জাতীয় দলের নেতৃবৃন্দ দেখলেন এই সুযোগ। যদি আঘাত হানতে হয় তো এই সময়। দেরি করলে হয়ত উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হবে। দলের প্রকাশ্য শাখা যদিও পুলিশের হাতে আবদ্ধ তবু গোপন শাখার সন্ধান পুলিশ তখন পর্যন্ত পায় নি। সেই শাখার সদস্যদের অনেকেই ছিল সামরিক শিক্ষাপ্রাপ্ত। সেই শাখাকেই এখন নেতৃবৃন্দ পুরোপুরি কাজে লাগিয়ে দিলেন একটা সামরিক অভ্যুত্থান ঘটাবার জন্যে।

দেশ জুড়ে গোপন আস্তায় আস্তায় বোমা তৈরি আরম্ভ হয়ে গেল। এই কাজের ভার ছিল যার ওপর সে তখন সতেরো বছরের একজন যুবক মাত্র। নাম তার ত্রিন ভান ইয়েন, হ্যানয়ের এক মিডল স্কুলে তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্র। এই ইয়েনই পরে ১৯৪৬-৫৪ সালের ভিয়েৎনাম লড়াইয়ে অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ বিশেষজ্ঞ হিসেবে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিল।

১৯৩০ সালের ১০ই ফেব্রুয়ারী অভ্যুত্থানের দিন ঠিক হল। দলের নেতা নুয়েন থাই হক সেই অনুসারে নির্দেশ পাঠালেন গোপন ইউনিটগুলিকে। পরে হঠাৎ একটা জরুরী কারণ ঘটায় তিনি তারিখ ১৫ ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত পিছিয়ে দিয়ে আরেকটি নির্দেশ জারি করলেন।

১৫ই ফেব্রুয়ারী ১৯৩০ সালে কি ঘটতে পারত তা এখন আর বলা যাবে না। শুধু এইটুকু বলা যায় যে, নুয়েন থাই হক তাঁর জাল অত্যন্ত সতর্কতা ও যত্নের সঙ্গে বিস্তার করেছিলেন। কাজ হল না কেবল একটি ভুলের জন্যে।

অভ্যুত্থানের তারিখ পিছিয়ে দেবার খবরটি ইয়েন বে'র সামরিক গ্যারিসনের কাছে সময় মত পৌঁছয় নি। নির্দিষ্ট দিনে নির্দিষ্ট সময়ে বিদ্রোহ করল সেখানকার সৈন্যবাহিনী।

তারা জানতেও পারে নি, জানবার কোন উপায়ও ছিল না যে, তারা একা। সম্পূর্ণ একা। তাদের বিদ্রোহ তাই টিকল না বেশিক্ষণ। তাদের দমন করতেও তাই বিশেষ বেগ পেতে হল না ফরাসীদের। কষ্ট হল না এই বিচ্ছিন্ন ঘটনার সূত্র ধরে জাতীয় দলের উদ্দেশ্য ও কর্মসূচী আবিষ্কার করতে।

বিদ্রোহীদের মধ্যে যারা পেরেছিল পালিয়ে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল কো আম নামে একটি গ্রামে। সেখান থেকে তারা যতক্ষণ পেরেছিল প্রতিরোধ করেছিল ফরাসী বাহিনীর। পারে নি বেশিদিন। ফরাসীদের হাতে ছিল বিমান। আকাশ থেকে বোমাবর্ষণ করে কো আম গ্রাম প্রায় মিশিয়ে দেওয়া হয়েছিল মাটির সঙ্গে।

দলের যেটুকু অংশ তখনও বাইরে ছিল তারাও গ্রেপ্তার হল কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই। ধরা পড়লেন নুয়েন থাই হক। প্রাথমিক স্কুলের একজন শিক্ষক যিনি সেই সময়ের অবিসম্বাদী জাতীয়তাবাদী নেতা হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। অন্যান্য আরো প্রায় কুড়ি জনের সঙ্গে তাঁকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হল।

১৭ জুলাই বিদ্রোহী নেতাদের নিয়ে যাওয়া হল ইয়েন বে'তে। সেখানে ফরাসীর গিলোটিন অপেক্ষা করছিল তাঁদের জন্যে। একসঙ্গে পাশাপাশি থেকে তাঁরা প্রাণ দিলেন ভিয়েৎনামের অসমাপ্ত বিপ্লবের উদ্দেশ্যে। তাঁদের দেহ ছিল অচঞ্চল, কণ্ঠস্বর কাঁপে নি একটুও। হাসিমুখেই তাঁরা বরণ করে নিয়েছিলেন তাঁদের মৃত্যুকে, সেলাম জানাতে জানাতে, অনেকটা উপেক্ষা করতে করতে। ভিয়েৎনামের বীর সেনানীরা। গিলোটিনের ব্লেড তাঁদের গলা স্পর্শ করবার মুহূর্ত পর্যন্ত তাঁরা চীৎকার করে বার বার বলছিলেন: 'ভিয়েৎনাম জিন্দাবাদ!'

দলের একজন ছিলেন যিনি ধরা পড়েন নি। তিনি একজন মহিলা। নাম তাঁর নুয়েন থি ইয়াং।

অনেক সাধ ছিল নুয়েন থি ইয়াংয়ের। অনেক স্বপ্ন। বিপ্লবের স্বপ্ন। থাই হককে নিয়ে ঘর বাঁধবার সাধ। থাই হককে ভালোবাসতেন তিনি। তাঁদের দেখা হয়েছিল থাই হকের স্বগ্রামে এক বটগাছের তলায়। সেই বটগাছের নিচে দাঁড়িয়ে তাঁরা প্রথম শপথ নিয়েছিলেন আজীবন পাশাপাশি থেকে তাঁরা সংগ্রাম করে যাবেন।

ইয়েন বে'তে ১৭ই জুলাই যে ভিড় হয়েছিল বিপ্লবের নেতাদের গিলোটিন দেখবার জন্যে, সেই ভিড়ের মধ্যে ছিলেন থি ইয়াংও। তিনি এসেছিলেন শেষবারের মত বিপ্লবীদের শ্রদ্ধা জানাতে। শেষবারের মত তাঁর প্রিয় নেতাকে আড়াল থেকে দেখে নেবার জন্যে।

তিনি দেখলেন। তারপর আর এক মুহূর্তও দাঁড়ালেন না সেখানে। চলে গেলেন থাই হকের স্বগ্রামে। সেখানে সেই বটগাছের নিচে যেখানে তাঁরা প্রথম পরস্পরকে পরস্পরের কাছে উৎসর্গ করেছিলেন, সেখানে দাঁড়িয়ে তিনি গুলী করেছিলেন নিজেকে।

তখন তাঁর কণ্ঠেও কি এই প্রার্থনা ধ্বনিত হয়েছিল—'ভিয়েৎনাম অমর হোক!'

আমরা জানি না। শুধু জানি, এইভাবে ভিয়েৎনামের জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের একটি গৌরবময় অধ্যায় সমাপ্ত হয়েছিল। কিছু সংখ্যক ব্যক্তি চীনে পালিয়ে গিয়ে জাতীয় দলকে নতুন করে সংগঠিত করতে চেয়েছিলেন বটে, কিন্তু তা সফল হয় নি।

ঠিক এই সময়েই ভিয়েৎনামের রঙ্গমঞ্চে হো চি মিনের আবির্ভাব। জাতীয় আন্দোলনের যে অধ্যায় শেষ হয়েছিল ইয়েন বে'র হত্যাকাণ্ডের মধ্যে, সেইখান থেকেই সম্পূর্ণ নতুন এক অধ্যায়ের সূত্রপাত হয়েছিল হো চি মিনের নেতৃত্বে।

নক্‌শা — ফাল্গুন

নাজমা চৌধুরী

স্মৃতিকে বললাম :—
'তোমার দেহ এত রক্তরাঙানো কেন
স্মৃতি বললো, 'আমি বরকত, রফিক, সালাম,'
তারা কে? 'তোমার ভাষা—প্রণাম!'
স্মৃতিকে আমি উদ্দীপিত করলাম
কিছু বলতে :—
'পলাশেরা এত লাল হয়েছিলো কেন?
ফাল্গুনের সন্ধ্যা কেন বিষণ্ণ সংগীতে ভরেছিলো?
নীড় থেকে নীড়ান্তরে পাখীরা কেন গায়নি গান?
কেন বুলেট ছুটেছিলো তাদের ভালোবাসতে?
কেন দিগন্ত থেকে দিগন্তে রক্তকপোতেরা ডানা মেলেছিলো?
কেন সব তরুণের হৃদয়ে শপথের অগ্নি আজো জ্বলছে?
স্মৃতি ঝাপসা কুয়াশা হয়ে থেকো না—বলো
আমি আবার শ্বেতকপোতের ডানায় রক্ত মাখাব—আমার
রক্তকণিকারা ফুটছে॥

ভাষা

মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান

আমার মুখের ভাষা যে আমার
প্রাণের চেয়েও প্রিয়
জীবনে স্বপনে হাসি কান্নায়
উজ্জ্বল রমণীয়॥

এ ভাষায় শিশু বলেছে মায়ের নাম
দেশের মানুষ জানে এ ভাষার দাম
কবির কণ্ঠে ভাষাই সত্য
মহীয়ান স্মরণীয়॥

জনতার চোখে ভাষার ছবিটি জ্বলে
অযুত মনের আশার কথাই বলে।
ভাষার দীপ্তি দেশের প্রতিটি ঘরে
প্রতিটি প্রাণের স্বপ্ন আকুল করে
এ ভাষা আমার পরম গর্ব
গৌরবে বরণীয়॥

সেই অধ্যায় যেমন রোমাঞ্চকর, তেমনি বিস্ময়কর।

ঠিক ঠিক ধরতে গেলে আবির্ভাবের কাল অবশ্য আরো পাঁচ বছর আগে, ১৯২৫ সালে। ঐ বছর ক্যান্টনে তিনি বিপ্লবী যুব সমিতি নামে একটি জাতীয়তাবাদী সংস্থা গঠন করেন। কিন্তু তাঁর কার্যকর নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল আরো পাঁচ বছর পরে, ১৯৩০ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে যখন ভিয়েৎনাম কম্যুনিস্ট পার্টি গঠিত হয়েছিল। এই দল গঠনের সময় হো'র সহযোগী ছিলেন ফাম ভান ডং যিনি এখন উত্তর ভিয়েৎনামের প্রধানমন্ত্রী এবং ভো নগুয়েন গিয়াপ, যিনি এখন উত্তর ভিয়েৎনামের প্রতিরক্ষামন্ত্রী।

ভিয়েৎনামের জাতীয় আন্দোলন এর পর হো চি মিনের নেতৃত্বে কম্যুনিস্ট পার্টির পতাকাতলে প্রবাহিত হতে লাগল। পার্টির সামনে ছিল দশ দফা একটি কর্মসূচী যার দফাগুলি হল :

(১) ফরাসী সাম্রাজ্যবাদ, সামন্ততন্ত্র ও প্রতিক্রিয়াশীল ভিয়েৎনামী পুঁজিপতি শ্রেণীকে উৎখাত করা:

(২) ভিয়েৎনামকে সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন করা:

(৩) শ্রমিক-কৃষক ও সেনানীর সরকার গঠন করা:

(৪) সাম্রাজ্যবাদীদের ব্যাঙ্ক ও অন্যান্য উদ্যোগ বাজেয়াপ্ত করে ঐ সরকারের নিয়ন্ত্রণে অর্পণ করা:

(৫) সাম্রাজ্যবাদী ও পুঁজিপতি শ্রেণীর অধীনস্থ সমস্ত বাগিচা ও সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে দরিদ্র চাষীদের মধ্যে বিতরণ করে দেওয়া:

(৬) আট ঘণ্টার কাজের দিন প্রবর্তন করা:

(৭) পাবলিক লোন ও পোল ট্যাক্স বাতিল করা:

(৮) জনসাধারণের সমস্ত স্বাধীন অধিকার পুনরুদ্ধার করা:

(৯) সর্বজনীন শিক্ষা প্রবর্তন করা:

(১০) পুরুষ ও নারীর মধ্যে সমতা বিধান করা।

এই কর্মসূচীর মধ্যে যদি গঠনমূলক কর্তব্যের কথাও থেকে থাকে তাহলে সেটা হো চি মিনের রাজনৈতিক দূরদর্শিতারই পরিচায়ক। কারণ তিনি জানতেন শুধু রাজনৈতিক স্বাধীনতা হলেই কোন দেশ স্বাধীন হয় না, সংগে সংগে অর্থনৈতিক স্বাধীনতাও চাই। তা ছাড়া সমগ্র দেশকে তাঁর সংগে পেতে হলে একটা গঠনমূলক কর্মসূচীও সামনে রাখতে হবে।

অথচ পশ্চিমী ঐতিহাসিক ও পর্যবেক্ষকরা এই কর্মসূচীর উল্লেখ করে বলে থাকেন যে, ভিয়েৎনামকে কম্যুনিস্ট রাজ্যে পরিণত করাই ছিল কম্যুনিস্টদের উদ্দেশ্য।

কিন্তু তাঁরা ভুলে যান যে, হো চি মিন যদি কম্যুনিস্ট পার্টির দিকে ঝুঁকে থাকেন তাহলে সে শুধু এই কারণে যে, লেনিন ও তৃতীয় ইণ্টারন্যাশনালের কাছ থেকে তিনি তাঁর দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন পেয়েছিলেন যা তিনি অন্য কোথাও পান নি। পশ্চিমী ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে সর্বাত্মক লড়াইয়ে অবতীর্ণ হবার জন্যে এই সমর্থন ও সাহায্য তাঁর দরকার ছিল। 'কেন আমি লেনিনবাদের প্রতি আকৃষ্ট হলাম' তা ব্যাখ্যা করে হো ১৯৬০ সালে যে প্রবন্ধ লিখেছিলেন তাতে তিনি স্পষ্টই লিখেছিলেন যে, দেশাত্মবোধই তাঁকে প্রথম লেনিনবাদের দিকে নিয়ে গিয়েছিল। কারণ লেনিন তাঁর "জাতীয় ও ঔপনিবেশিক প্রশ্ন সম্পর্কিত থিসিস"-এ পরাধীন জাতির মুক্তির উপায় নির্দেশ করেছিলেন। ঐ প্রবন্ধ হো ফ্রান্সে থাকার সময়েই 'লুমানিতে' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল।

হো বলছেন : "কি আবেগ, কি উৎসাহ, কি দূরদৃষ্টি আর কি বিশ্বাসই না এই প্রবন্ধ আমার মধ্যে সৃষ্টি করেছিল। আনন্দের আতিশয্যে আমি কেঁদে ফেলেছিলাম। একলা আমার ঘরে বসে আমি চীৎকার করে বলে উঠেছিলাম যেন আমি কোন জনসভায় ভাষণ দিচ্ছি : "প্রিয় শহীদ ভাইয়েরা আমার স্বদেশবাসিগণ! আমরা যা চাই তা এ-ই! এ-ই হচ্ছে আমাদের মুক্তির পথ!"

দ্বিতীয়তঃ তাঁরা আরও ভুলে যান যে, যদি আন্তর্জাতিক কম্যুনিস্ট আন্দোলনের গোপন উদ্দেশ্য চরিতার্থ করাই হো চি মিনের উদ্দেশ্য হত, যদি তাঁর আন্দোলন পুরোপুরি জাতীয় আন্দোলন না হত তাহলে সেই আন্দোলন কখনও এত সর্বাত্মক ও এত বিস্ময়কর সাফল্য অর্জন করতে পারত না। ভিয়েৎনাম ক্লুয়ক দান দাং ভেঙে যাবার পর ভিয়েৎনামের মুক্তি সংগ্রাম একমাত্র হো চি মিনের নেতৃত্বেই পরিচালিত হচ্ছিল এ থেকেই বোঝা উচিত যে, ভিয়েৎনামের সাধারণ মানুষের সমর্থন ও বিশ্বাস তাঁর ওপর পুরোপুরি ছিল। স্বাধীনতার জন্যে আন্দোলন চালাবার সংগে সংগে মুক্ত অঞ্চলগুলিতে দশ-দফা কর্মসূচী অনুযায়ী গঠনমূলক কাজ করে গিয়েছিলেন বলেই এই সমর্থন তিনি কোনদিনই হারান নি। আজ পর্যন্ত না। এই সমর্থন ছিল বলেই তাঁর আন্দোলন হয়ে উঠেছিল এত অপ্রতিরোধ্য॥

সেই কাহিনীই হবে আমার পরবর্তী রচনার উপজীব্য। [ক্রমশঃ]

শরৎ বসু—একটি ঘটনা

শ্রীশশাঙ্কশেখর সান্যাল

ইং বৎসর ১৯৪৬। কেন্দ্রে বিধানমণ্ডলীর বাজেট অধিবেশন চলেছে। শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু কংগ্রেসী ও বিরোধী নেতা, আমি তাঁর অনুগামী অন্যতম সদস্য। নয়াদিল্লীর ক্যানিং লেনে তাঁর বাসার পাশেই কুমার দেবেন্দ্রলাল খানের—আমার আস্তানা নাতিদূরে ফিরোজ শা রোডে। প্রায় প্রতি রাত্রেই কুমার বাহাদুরের আতিথ্যে নৈশভোজ সেরে আমাদের বৈঠক বসত। আলোচনা অধ্যয়ন চলত আমাদের নেতার আসন্ন বাজেটবক্তৃতা ও অর্থবিলের সমাপ্তি ভাষণের প্রস্তুতি নিয়ে। ভুলাভাই দেশাই, গোবিন্দবল্লভ পন্থ ইত্যাদি পূর্বসূরীদের প্রাসঙ্গিক ভাষণ থেকে সঞ্চয়-সঙ্কলনভার আমার উপর ছিল। আশে-পাশে মূল্যবান তথ্য সংগ্রহের ভার নিয়েছিলেন বার্লিনে থাকাকালীন সুভাষের বিশ্বস্ত সহকর্মী পুরুষোত্তম মেঘনী কাবালি। হিট্‌লারের সঙ্গেও এঁর যোগাযোগ ছিল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বে—হিটলার তখনও ক্ষমতায় আসেন নি। বার্লিনে এক বাড়ির দ্বিতলে নাকি পার্টির অফিস। তারই নীচতলায় একটা ফ্লাট ভূতুড়ে বাড়ি বলে প্রায়ই খালি পড়ে থাকত সেইখানেই সুভাষচন্দ্র ও কাবালি অন্যান্য ভারতীয়দের মেলামেশার একটা কেন্দ্র গড়ে তুলেছিলেন। এই ভূতুড়ে বাড়ির অলৌকিক কাহিনী অন্য সময় লিখব।

॥ ২ ॥

ক্যানিং লেনের সান্ধ্য বৈঠকে একদা খবর পাওয়া গেল আই এন এ ও নেতাজী ইংরাজমনে বিভীষিকা সৃষ্টি করেছে এবং সৈন্যবাহিনী ও পুলিশের মন চত্বর থেকে এদের প্রভাব মুছে ফেলতে তারা বদ্ধপরিকর। এই উদ্দেশ্যে মেজর জেনারেল ও' ব্রিয়েন শিবিরে শিবিরে বোঝা বোঝা সার্কুলার ছেড়েছেন। কিভাবে সেই নির্দেশনামা হস্তগত করা হবে আলোচনায় স্থির হয়ে গেল। শ্রীকাবালির ঐন্দ্রজালিক দক্ষতায় এবং আমাদের কয়জনের সমবেত উদ্যোগে ২।১ দিনের মধ্যেই দলিলের নকল আমাদের পকেটে পৌঁছে গেল। তার ২।১ দিন পরেই জানা গেল যে দলিল হস্তান্তরের বিষয় বাহিনী অধিনায়কদের গোচরে এসেছে। সকলের অজ্ঞাতে শরৎবাবু ঐ দলিল গোপন রক্ষণের ভার আমাকেই দিলেন। আমি বিস্‌মার্ক ভঙ্গিমায় সেই কাগজ মূল্যহীন অন্য কাগজের মধ্যে অবত্ন করে রাখলাম যদি কেউ চুরির উপর বাটপাড়ি করতে চায় তবে, আমার বাক্সভেঙেই ভাঙবে—পুরাতন ক্যালেন্ডারের ছেঁড়া পাতা হাতড়াবে না। তাছাড়া কদিন পরেই ত' বিরোধী নেতার পরিষদীয় ভাষণকালে এই পত্র প্রচার প্রকাশ পাবে। আমি হর্ষে-গরবে রক্ষীর ভূমিকায় দিন গুণছি।

॥ ৩ ॥

গভীর রাত। দ্বারে মৃদু করাঘাত। ভাগ্যক্রমে প্রথম মনে হল হয়ত সার্কুলার পুনরুদ্ধারের অভিযান। পরেই চিরপরিচিত কোমলগম্ভীর সম্ভাষণ—"শশাঙ্ক আমি" বুঝলাম আমার নেতা। দরজা খুলে তাঁকে ও কাবালিকে ঘরে বসালাম। অল্প আলোচনাতেই জানলাম সার্কুলার অপসারণে আমি ও কাবালি সরাসরি সন্দিগ্ধ এবং যে কোন আক্রমণে এমন কি হত্যা ঘটিয়েও তা ছিনিয়ে নেবার চেষ্টা হতে পারে। কয়মিনিট মধ্যেই এক গাঢ় রঙের মোটর থেকে নেমে এলেন অপূর্ব সুন্দরী এক অপরিচিতা তরুণী—তিনিই একমাত্র আরোহী। এমন অনুপম যৌবনলাবণ্য বেশি চোখে পড়ে নি। আমার হাত থেকে শরৎবাবু এবং শরৎবাবুর হাত থেকে মহিলা সেই কাগজ নিয়ে ছোট্ট এক খামে পুরে গলার মালার লকেটের তলা দিয়ে ব্লাউসের ভিতরে রাখলেন। তার পরেই নিজে গাড়ি চালিয়ে চলে গেলেন। শরৎবাবু কাবালি সহ হাঁটাপারে রওনা। রাত তখন ১২টার এদিক-ওদিক—মহিলা গাইকোয়াড় মহিষী।

রাত তিনটায় আবার দরজায় ঘা। এবারও কাবালিসহ শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র। সংক্ষেপে বললেন, এখানে আমার থাকা চলবে না। ক্যানিং লেনে ওঁর কাছেই থাকতে হবে, সেখানে ত' আজাদ হিন্দ শিবির এবং অপেক্ষাকৃত নিরাপদ। বিভ্রান্ত সেনা গোয়েন্দা দিশেহারা হয়ে ছুটোছুটি করছে এবং ফিরোজ শাহ রোডের আমার বাংলো তাদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টির লক্ষ্য।

কয়দিন ক্যানিং লেনেই কাটল। আমার বাংলোতে তখন আমার এক সাংবাদিক বন্ধু পৃথক এক ঘরে থাকেন।

॥ ৪ ॥

সেদিন শরৎবাবুর বাজেট ভাষণ হবে। সংগৃহীত গোপন সার্কুলার উদ্ধারের তথ্য হিসাবে পরিবেশন অপেক্ষায়। সকাল ৯টায় স্নানাহার অন্তে নাড়াজোল গাড়িতে (দেবেন্দ্র খানের) শরৎ বসু ও আমি গাইকোয়াড় ভবনে। মহারাণীর সযত্নে রক্ষিত দলিল এবার শরৎ বসুর বুকে—এতে সুভাষের কথা, আই এন এ-র কথা। ভরা বুক আরও ভরে উঠেছে। গাড়ি বদলে অন্য গাড়িতে আমরা চলেছি—সেই গাঢ় রঙের গাড়ি, সেই হাতের পরিচালনায়। আমাদের ছেড়ে দেওয়া গাড়ি অন্য পথে—অনুসন্ধানীদের চোখ তারই অনুসরণে। সবটারই প্রয়োজন সম্বন্ধে আমি সম্পূর্ণ সজাগ। তবু বিষয়ের গুরুত্ব আমার হালকা মনে বিশেষ ছাপ ফেলে নি। কিন্তু আমার পাশে বসে-থাকা আমার নেতার অন্য মূর্তি। চোখ দুটি যেন একজোড়া আগ্নেয়গিরি। রসনা নিঃসরণ। হাত বজ্রমুষ্টিতে বন্দী—যেন সম্মুখে মল্লযুদ্ধের আহ্বান।

॥ ৫ ॥

গাড়ি থামল এবং আমাদের ছেড়ে দিয়েই সরে পড়ল। বিধান ভবনের প্রথম ফটক পার হয়ে অলিন্দে উঠেছি। হঠাৎ বিরাট ব্যক্তিত্বের আধার সেই বিশাল দেহ অতিক্রম করে এক শিশু আবেগ উচ্ছ্বাসে হেসে উঠল "শশাঙ্ক—ওদের কেমন ঠকিয়েছি"। কি প্রশান্ত সে উল্লাস—হাসির হাওয়ায় উদ্বেগ উৎকণ্ঠা কোথায় ভেসে গেল। এখন আমরা সম্পূর্ণ নিরাপদ। গোপন সার্কুলারের আঘাতে প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করবার প্রস্তুতি; সুভাষ ও তার ফৌজ বৃটিশ সিংহকে কতখানি নখদন্তহীন করেছে তার প্রমাণ প্রয়োগের মাহেন্দ্র সুযোগ; বিরোধী নেতার ভাষণের মান উচ্চপর্যায়ের স্বীকৃতি পাবে তার সমুজ্জ্বল সম্ভাবনা—এ সবের মাঝেও একজন সাধারণ সহকর্মীর নিরাপত্তা রচনায় এত সজাগ আগ্রহ শরৎচন্দ্রের অপরিমেয় মাতৃহৃদয়ের পরিচায়ক। তাঁর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে না এলে এই হৃদয়ের অজানা ইতিহাস অজানাই থাকত।

গ্রন্থমেলা

হেমচন্দ্রের গ্রন্থাবলী—হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। বসুমতী সাহিত্য-মন্দির, ১৬৬ বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলিঃ-১২। মূল্য ঃ আট টাকা।

বাংলা দেশে বাংলা ভাষায় সুলভ মূল্যে গ্রন্থ প্রচারের একমাত্র কৃতিত্ব বসুমতী-সাহিত্য-প্রকাশনীর। বসুমতীর কর্তৃপক্ষ সেই এক যুগ আগে যে জাতীয় দায়িত্ব পালন করে গেছেন, বর্তমান সময়ের দুর্মূল্যের বাজারেও সে-দায়িত্ব থেকে বসুমতী-সাহিত্য-মন্দিরের কর্ণধার বিন্দুমাত্র বিচ্যুত হন নি। একালের ব্যবসায়িক মনোবৃত্তি যখন শাখা-প্রশাখায় বেড়ে চলেছে, তখন একজন সাহিত্যসেবী হিসেবে উপরিউক্ত কথা বলতে পেরে গর্ব বোধ করছি। হেমচন্দ্রের সমগ্র সাহিত্য-সম্ভার একটিমাত্র গ্রন্থে নিবদ্ধ রেখে তার মূল্য মাত্র আট টাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা সহজসাধ্য ব্যাপার নয়।

হেমচন্দ্র মহাকাব্যের কবি। উপরন্তু আধুনিক কবিতায় যে লিরিকধর্মিতা, তাও তাঁর খণ্ড কবিতায় অনবদ্যভাবে অনুরণিত হয়েছে। হেমচন্দ্রের উপরই একদা ভার অর্পিত হয়েছিল, মহাকবি মধুসূদনকে বাংলাদেশের পাঠকদের কাছে পরিচয় করে দেওয়ার। যদিও একালে মধুসূদনের মহাকাব্য নিয়ে আলোচনার অন্ত নেই, এবং 'বৃত্রসংহার' মহাকাব্যের স্রষ্টা হেমচন্দ্র—মহাকাব্য রচনার অদ্বিতীয় পরিকল্পক হিসেবে বিদ্বৎসমাজে স্বীকৃত, তবু হেমচন্দ্রের অন্যতম পরিচয় এই যে, তিনি তদানীন্তন পরাধীন দেশে জাতীয়তা উদ্বোধনের প্রধান কবি। তাঁর 'ভারত-বিষয়ক' কবিতাবলীর প্রচণ্ড উত্তেজনা, 'ভারত-বিলাপে'র অন্তর্ভেদী বেদনা আজো চিত্ত চঞ্চল করে এবং তাঁর শৃঙ্খল-মুক্তির সুদৃঢ় সংকল্প ভারত-ইতিহাসের বলিষ্ঠ স্বাক্ষর। তাই স্বীকার করে নিতে হবে —হেমচন্দ্র বাংলা সাহিত্যেরই শুধু স্মরণীয় মহাকবি নন, অলিখিত ভারত-ইতিহাসের তিনি গৌরব স্থানীয়। একজন রাজনীতিবিদ যা করতে পারে নি, এক হেমচন্দ্রের লেখনী তাই করতে সক্ষম হয়েছিল। সেই কারণে তদানীন্তন ব্রিটিশ শাসকের কাছে নির্মম অত্যাচারও তাঁকে সহ্য করতে হয়েছিল। এ-যুগের লেখকদের কাছেও এই কারণে হেমচন্দ্র অনুসরণীয়।

হেমচন্দ্রের এই গ্রন্থাবলীতে বৃত্রসংহার (১ম ও ২য়), আশাকানন, বীরবাহু কাব্য, চিন্তাতরঙ্গিণী, ছায়াময়ী, চিত্তবিকাশ, দশমহাবিদ্যা, ভারত বিষয়ক কবিতাবলী, রহস্য বিষয়ক কবিতাবলী, বিবিধ কবিতা, নানা বিষয়ক কবিতা এবং অ-পূর্ব-প্রকাশিত কবিতাবলী—অর্থাৎ সমস্ত রচনাই স্থান পেয়েছে। ভূমিকাংশে কবি-পরিচিতিটিও সুলিখিত ও তথ্যবহুল।

আমরা আশা করি, হেমচন্দ্রের মতো জাতীয় জাগরণের মহাকবির কাব্যগ্রন্থটি বাংলাদেশের ঘরে ঘরে সমাদরে পঠিত হবে। এ-কালের জাতীয় মন নৈরাশ্যে ভরপুর, লেখকরাও দোটানায় ভুগছেন, সর্বোপরি স্বদেশ সম্পর্কে একটা নিদারুণ নিস্পৃহ ভাব দেখা যাচ্ছে; তাই, হেমচন্দ্রের কবিতা নতুন করে অধ্যয়নের সময় এখন সবচেয়ে বেশি—এ-কথা বলা নিষ্প্রয়োজন।

দর্শন কী ও কেন—মনোরঞ্জন রায়। প্রাপ্তিস্থান ঃ ইউ এন ধর এণ্ড সন্স (প্রাঃ) লিঃ, ১৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলি-১২। মূল্য ঃ দেড় টাকা।

মনোরঞ্জন রায়ের দর্শন তত্ত্বের কয়েকটি বই ইতিমধ্যে বেশ চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছে। তাঁর 'দর্শনের ইতিবৃত্ত', 'গৌতম বুদ্ধ', 'আদিম সমাজের ইতিহাস' ও 'ইতিহাসের দর্শন' পাঠকসমাজে পরিচিত।

ভারতবর্ষ দার্শনিকের দেশ। অবশ্য কোন দেশটাই বা একটা বিশেষ দর্শন ছাড়া উন্নতির সোপানে আরোহণ করতে পেরেছে। তবে গোলমাল যতো ঐ 'উন্নতি' শব্দটা নিয়ে এবং দার্শনিকরা বলবেন কিসের উন্নতি, কী ধরণের উন্নতি। আধ্যাত্মিক উন্নতি আজো কোটি কোটি লোকের কাম্য। কিন্তু সত্যি কথা বলতে গেলে বাঁচতে হলে বাস্তব জগৎকে অস্বীকার করা নিরর্থক। আর তাই নিয়ে দর্শনের হেরফের। তখনই ভাববাদ আর বস্তুবাদের কামড়াকামড়ি। ভাববাদীরা বস্তু সম্পর্কে যতোই নিস্পৃহ হন, তাদের তূণ থেকে যা বের হয় তা বস্তু-নিরপেক্ষ বলা মুস্কিল। যাক অতসব কথা। যুগে যুগে ভাববাদীরাও পরস্পর দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হয়ে নতুন মতবাদ স্থাপন করেছে। বলা বাহুল্য এযুগে বস্তুবাদী দর্শনেরই জয়-জয়কার। শ্রীমনোরঞ্জন রায় যুগে যুগে দার্শনিকদের 'তত্ত্বগত দ্বন্দ্ব' এবং 'ভাববাদ ও বস্তুবাদের পার্থক্য' সম্বন্ধে আলোচনা করে এই সিদ্ধান্ত করেছেন "ভাববাদ ও বস্তুবাদের দ্বন্দ্ব শোষক ও শোষিতের দ্বন্দ্ব"। তিনি আরো বলেছেন যে, "শ্রেণী-বিভক্ত দাস-সমাজেই দর্শনের প্রথম উৎপত্তি"। তাছাড়া লেখকের প্রধানতম আলোচ্য বিষয় হচ্ছে—অন্যান্য দর্শনের সঙ্গে মার্ক্সীয় দর্শনের পার্থক্য। তবে দর্শনের আলোচনায় লেখক মানবতার মূল্যবোধকেই শ্রেয় জ্ঞান করেছেন। বহু প্রচলিত 'কারণ ও কার্য', 'আধেয় ও আধার', 'প্রকৃত ও ব্যাহ্যিক রূপ' প্রভৃতি প্রসঙ্গ ভাববাদীদের কাছে তর্কাতীত না হলেও ঐতিহাসিক চেতনাসমৃদ্ধ, বৈজ্ঞানিক বুদ্ধিসম্পন্ন এবং যুক্তিযুক্ত। দর্শন কী ও কেন—জিজ্ঞাসু পাঠকদের এই বইটি প্রাথমিক প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম হবে।

বাংলা বিভাগ ঃ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়—সম্পাদনায় ঃ দীপন চট্টোপাধ্যায়, পার্বতী রায়, শিবশঙ্কর দত্ত।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'বাংলা পাঠচক্রে'র মুখপত্র। এতে গল্প, কবিতা ও সাধারণ প্রবন্ধ স্থান পেয়েছে। বিজনবিহারী ভট্টাচার্য, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, অসিত বন্দ্যোপাধ্যায়, হরপ্রসাদ মিত্র, আশুতোষ ভট্টাচার্য, প্রমথনাথ বিশী প্রমুখ অধ্যাপকগণ ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের ছাত্রছাত্রীরা লিখেছেন। 'বাংলা পাঠচক্রে'র পক্ষে ছাত্রছাত্রীদের প্রচেষ্টা প্রশংসনীয়। প্রসঙ্গত একথাও বলা দরকার, পাঠচক্রের পক্ষ থেকে 'সিরিয়াস' ধরণের একটি পত্রিকা বের হওয়া অবশ্যই প্রয়োজন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষও তাতে অর্থ ও সামর্থ্য দিয়ে উৎসাহিত করবেন বলে আমরা আশা করি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ থেকে যে রকম উচ্চ মানের পত্রিকা বের হয়, সে রকম একটি পত্রিকা বের করা কি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অসম্ভব?

বিজ্ঞানী—মাসিক বিজ্ঞান-পত্রিকা। প্রকাশক—বৈজ্ঞানিকী সংস্থা ঃ ১/৩, হিন্দুস্থান রোড, কলিকাতা-২৯। সম্পাদক—সুধরঞ্জন মৃধা। মূল্য ঃ প্রতি সংখ্যা ১০ পয়সা।

এই পত্রিকার দ্বিতীয় বর্ষের প্রথম তিনটি সংখ্যা (কার্তিক, অগ্রহায়ণ ও পৌষ ১৩৭৪) দেখে আশান্বিত হলাম। আধুনিক বিজ্ঞানের আকর্ষণীয় বহু বিষয় এতে স্থান পেয়েছে এবং বিজ্ঞানবিষয়ক আলোচনাগুলো করা হয়েছে যথাসম্ভব সহজ ও সরল ভাষায়। তবে প্রুফ-সংশোধনে জায়গায় জায়গায় মারাত্মক ভুল-ত্রুটি চোখে পড়ল। এ ব্যাপারে সম্পাদক আর একটু অবহিত হলে ভালো হয়।

আমরা এই পত্রিকাটির বহুল প্রচার কামনা করি এবং সেই সঙ্গে বিশ্বাস করি, স্বল্পমূল্যে এ ধরণের বিজ্ঞান-পত্রিকা প্রকাশিত হলে মাতৃভাষায় বিজ্ঞান-চর্চার পথ প্রশস্ত হবে।

রবীন্দ্রনাথ ও সুভাষচন্দ্র

শঙ্করীপ্রসাদ বসু

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

একই জাহাজে

রবীন্দ্রজীবনীতে আছে—

"প্রাগ্ হইতে (২৯ জুন ১৯২১) কবি স্টুটগার্ট হইয়া প্যারিসে আসিলেন। সেখানে কয়েকদিন থাকিয়া ১ জুলাই ভারতগামী জাহাজ ধরিয়া দেশের দিকে রওনা হইলেন।......১৬ই জুলাই বোম্বাই পৌঁছিলেন।"

[র-জী-৩-৫১]

এখানে একটি কথা লেখা নেই, যা আমাদের আলোচ্য বিষয়ের পক্ষে প্রয়োজনীয়। ঐ একই জাহাজে সুভাষচন্দ্র বসু প্রত্যাবর্তন করেছিলেন, কিরণশংকর রায়ও। সুভাষচন্দ্র আই· সি· এস· ত্যাগ করে রাজনীতিতে যোগদান করবার জন্য দেশে ফিরছেন।

কবির সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের নানা বিষয়ে আলোচনা হয়েছিল। বিশেষ করে বাংলা ও ভারতের রাজনীতির বিষয়ে। রবীন্দ্রনাথ, গান্ধীজীর নৈতিমূলক অসহযোগী মনোভাবের সমালোচনা করেছিলেন।

আলোচনা যে ঐ জাতীয় হয়েছিল তা শ্রীযুক্ত সত্যরঞ্জন বক্সী আমাকে জানিয়েছেন। সুভাষচন্দ্রের মুখে সত্যরঞ্জন অনেকবার ঐ আলোচনার কথা শুনেছেন।

'ছাত্রশাসনতন্ত্র' প্রবন্ধ লেখা হয়েছিল ১৯১৬ সালের মাঝামাঝি। ইউরোপ থেকে একই জাহাজে উভয়ের এই প্রত্যাবর্তন ১৯২১ সালের মাঝামাঝি। মধ্যে পাঁচ বৎসরের ব্যবধান। এই পাঁচ বৎসরে সুভাষচন্দ্রের জীবনে উল্লেখযোগ্য ঘটনা যথেষ্ট ঘটেছিল। রবীন্দ্রনাথের জীবনও কাহিনীশূন্য নয়।

ধরা যেতে পারে ১৯২১ সালে আই· সি· এস·-ত্যাগী ২৪ বৎসরের সুভাষচন্দ্রের মনে রাজনীতিবোধ অধিকতর স্পষ্ট হয়েছে—রাজনৈতিক ধারণার মূল ভিত্তি গঠিত হয়েছে। এবার তিনি শেষ নৌকাটি পুড়িয়ে দিয়ে ঝাঁপ দিয়েছেন সমুদ্রে। ঐ অবস্থায় তিনি রবীন্দ্রনাথের রাজনীতিগত ধারণাকে কতখানি গ্রহণ করতে পারেন বা না পারেন, তার একটা হিসাব দরকার।

তার আগে রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক কর্ম ও ভাবনার একটা সূচীপত্র দেওয়া যাক।

রবীন্দ্রনাথের পরিবারে স্বাদেশিকতার চর্চা ছিল, বাল্যকালে তিনি নবগোপাল মিত্রের হিন্দু মেলায় যোগ দিয়েছিলেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ প্রমুখ ঠাকুরবাড়ির যুবকেরা ঠনঠনের পোড়ো বাড়িতে 'সঞ্জীবনী সভা' নামে গুপ্ত সভা স্থাপন করলে সেখানে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ 'উত্তেজনার আগুন' পোয়াতেন। রবীন্দ্রনাথের বয়স তখন ১৫।১৬।

তারপরে ১৬।১৭ বছর রবীন্দ্রনাথ নিজের সাহিত্য-সাধনা নিয়ে বিশেষ ব্যস্ত থাকলেন, মাঝে মাঝে দু-একটি 'অর্ধ রাজনৈতিক প্রবন্ধ' লিখলেন এবং ব্রাহ্ম-সমাজের পক্ষ নিয়ে নব্য হিন্দুগণের সঙ্গে লিখিত তর্ক করলেন। রবীন্দ্রনাথের 'অর্ধ রাজনৈতিক প্রবন্ধ'গুলিতে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ইত্যাদির দ্বারা পরিচালিত তৎকালীন রাজনৈতিক আন্দোলনের শব্দাড়ম্বর সম্বন্ধে সুতীব্র বিদ্রূপ ছিল।

তারপর সাধনা পত্রিকায় "১৮৯৩ সাল হইতে বৎসরাধিকাল রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক প্রবন্ধ" প্রকাশিত হোল। যথা 'ইংরেজ ও ভারতবাসী', 'ইংরেজের আতঙ্ক', 'রাজা প্রজা', 'সুবিচারের অধিকার', 'রাজনীতির দ্বিধা' প্রভৃতি। এই সময় বালগঙ্গাধর তিলক মহারাষ্ট্রে নতুন আন্দোলন সুরু করেছেন, সার্বজনীন গণপতি পুজা তার অঙ্গ।

১৮৯৬ সালে রবীন্দ্রনাথ কলকাতা কংগ্রেসে 'বন্দেমাতরম্' গাইলেন।

এই সময়েই স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকায় বেদান্ত প্রচার করে প্রত্যাবর্তন করলেন। তাঁর প্রত্যাবর্তন জাতিচিত্তে অপূর্ব শিহরণ সৃষ্টি করল; কলম্বো থেকে আলমোড়া পর্যন্ত ভারতবর্ষ বিবেকানন্দের বজ্রধ্বনিতে নাড়া খেল প্রচণ্ডভাবে। অখণ্ড ভারত চেতনা সৃষ্টিতে বিবেকানন্দের এই ভূমিকা স্মরণ করে তিলক পরে বলেছেন, ইনি দ্বিতীয় শঙ্করাচার্য। আর অ্যানী বেশান্ত বলেছেন, তীব্রতম জাতীয়তাবোধ বিবেকানন্দেরই দান। বিপিনচন্দ্র পালও একই সাক্ষ্য দিয়েছেন।

১৮৯৮ সালে ভারতী পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক প্রবন্ধ বেরুল। ইতিমধ্যে তিলক দেশের নেতৃত্ব নিয়েছেন, গণপতি পুজার সঙ্গে শিবাজী উৎসবের প্রবর্তন করেছেন, পুনার প্লেগ-অফিসার মিঃ র‍্যান্ড, সেই সঙ্গে মিঃ আয়ার্স্টকে দুইজন মহারাষ্ট্রীয় যুবক হত্যা করায় তার পরোক্ষ দায়িত্ব চাপান হয়েছে তিলকের উপর এবং তাঁকে জেলে পাঠানো হয়েছে। এই অন্যায় শাস্তির প্রতিবাদে দেশ মুখর, তাকে দমন করবার জন্য সিডিসন বিলের খসড়া ও প্রেস কমিটির গোপন অধিবেশন। সিডিসন বিল পাস হবার পূর্বদিন টাউন হলে রবীন্দ্রনাথ 'কণ্ঠরোধ' প্রবন্ধ পাঠ করলেন। এবং তিনি ১৩০৫ সালের বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল কনফারেন্সের ঢাকা অধিবেশনে উপস্থিত থেকে সভাপতির ভাষণের সারমর্ম বাংলায় পাঠ করলেন।

ভারতীয় প্রত্নকীর্তির রক্ষক এবং ভারতীয় ঐক্যের ভক্ষক লর্ড কার্জন ভারতের বড়লাট হয়ে এলেন ১৮৯৯ সালের শেষভাগে। কিছুদিন পরে তিনি চ্যান্সেলারের ভাষণে প্রাচ্যদেশীয়দের মিথ্যাবাদী বললেন (যদিও তিনি নিজে কতদূর মিথ্যাবাদী তা দেখিয়ে দিলেন নিবেদিতা) এবং দিল্লীতে বসালেন সম্রাটের দরবার। আহত রবীন্দ্রনাথ 'অত্যুক্তি' প্রবন্ধে কার্জনের দরবারী আতিশয্যের প্রতিবাদ জানালেন। ইংরেজ ও ভারতীয়ের সম্পর্কের তিক্ততা নিয়ে কয়েকটি প্রবন্ধ রচিত হোল। তাতে ভারতীয়ের অবস্থার শোচনীয়তা ফুটে উঠল এবং জানানো হোল আত্মনির্ভরতার আহ্বান।

কার্জনের একটি কাজে বাংলাদেশ প্রতিবাদে জ্বলে উঠল, আরম্ভ হল স্বদেশী আন্দোলন, যা ভারতের প্রথম ব্যাপক জাতীয় আন্দোলন। বাংলাদেশকে বিভক্ত করার পরিকল্পনা প্রকাশিত হোল গেজেটে, ১৯০৩ সালের ৩রা ডিসেম্বর। য়ুনিভার্সিটি বিল রচিত হোল—যাতে উচ্চশিক্ষার পথ রোধ করা যাবে। বিভিন্ন উপভাষাকে কার্যত স্বতন্ত্র ভাষার গুরুত্ব দিয়ে বিভেদ সৃষ্টিরও এক পরিকল্পনা করা হোল সরকার পক্ষ থেকে। প্রতিবাদ আন্দোলনকে রবীন্দ্রনাথ সমর্থন করলেন, আর অংশবিশেষের সমালোচনাও করলেন। তিনি সখারাম গণেশ দেউস্করের 'দেশের কথা' নামক গ্রন্থের আলোচনায় নেশনতন্ত্রের বিরুদ্ধে বক্তব্য জানালেন, আবার দেউস্করের 'শিবাজীর দীক্ষা' পুস্তিকায় 'শিবাজী উৎসব' নামে তাঁর কবিতাও বেরুল। 'স্বদেশী সমাজ' প্রবন্ধের মধ্যে পল্লীসংগঠনের প্রয়োজনীয়তা ব্যক্ত করলেন। কিন্তু ১৯০৫ সালের ৭ই আগস্ট যখন বৃটিশ পণ্য বয়কটের প্রস্তাব উত্থাপিত হোল রাজনীতিকদের পক্ষ থেকে, তখন বয়কট নেতিবাচক বলে রবীন্দ্রনাথ তাকে গ্রহণ করলেন না। 'অবস্থা ও
... প্রবন্ধে তাঁর সেই মত প্রকাশিত

...বাদ সত্ত্বেও বঙ্গ
...লের ১৬ই অক্টোবর
...জ রাজনীতির
...মাস সে
...। দান—
...ন তিনি
... ভাষা
... দিন
...থে
...জাতীয়
...নার জন্য।
...তিস্থাপন
...র তর্জমা
...। এই

...টার
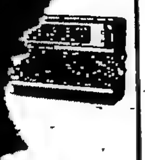
(WBC-22)
...Delhi-6.

সময়কার জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গেও তিনি যুক্ত হলেন।

পরবর্তী উল্লেখযোগ্য ঘটনা বরিশালে যজ্ঞভঙ্গ। সেখানে আয়োজিত প্রাদেশিক সম্মেলন তছনছ করে দিল সরকারী মুষল। সাহিত্যসভার সভাপতি রবীন্দ্রনাথ ফিরে এলেন। এই সময় সুরেন্দ্রনাথকে 'দেশনায়ক' করবার জন্য আবেদন জানালেন।

বাংলাদেশের রাজনীতি বিভক্ত হয়ে গেল দুই দলে—নরম ও চরম। সুরেন্দ্রনাথ নরমদের নেতা। চরমদের নেতা ছিলেন বিপিনচন্দ্র, সে নেতৃত্ব ক্রমে গিয়ে পড়ল অরবিন্দ ঘোষের উপর। অরবিন্দ ঘোষ বরোদা থেকে এসেছেন (১৯০৭ মার্চ) জাতীয় শিক্ষা পরিষদের ভার নিয়ে। তিনি 'বন্দেমাতরম্' ইংরেজী দৈনিকেরও দায়িত্ব নিলেন। উগ্র মত প্রচার করছিল সঞ্জীবনী ও অমৃতবাজার। বহুগুণে উগ্রতর মত প্রচারিত হতে লাগল 'যুগান্তর' সাপ্তাহিক ও ব্রহ্মবান্ধবের দৈনিক 'সন্ধ্যার'।

ভগিনী নিবেদিতা নরম ও গরম, প্রকাশ্য ও গোপন—সর্বপ্রকার আন্দোলনে 'শিখাময়ী'র ভূমিকা নিলেন।

'বন্দেমাতরমের' এক প্রবন্ধের জন্য বিপিনচন্দ্র জেলে গেলেন, এবং সন্ধ্যায় রাজদ্রোহের প্রবন্ধ লেখার জন্য ব্রহ্মবান্ধবের বিরুদ্ধে মামলা চলতে লাগল। ইংরেজের কারাগার তাঁকে আবদ্ধ করতে পারবে না, ব্রহ্মবান্ধবের এই কথা সত্য প্রমাণিত হোল বিচারাধীন অবস্থায় তাঁর সহসা দেহত্যাগে।

রবীন্দ্রনাথ অরবিন্দের উদ্দেশ্যে 'নমস্কার' কবিতায় শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করলেন।

১৯০৭ সালের ডিসেম্বর মাসে নরম ও চরম বিরোধে সুরাট কংগ্রেস লণ্ডভণ্ড হয়ে গেল। এর পরে পাবনায় প্রাদেশিক সম্মেলন বসল। রবীন্দ্রনাথ সভাপতি হলেন এবং বাংলায় ভাষণ দিলেন।

দেশের বেদনা এবার গুপ্ত বিপ্লবের পথে বিস্ফোরিত হোল। মজঃফরপুরের ব্যারিস্টার কেনেডি ও তাঁর কন্যা কলকাতার ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ডের বদলে ভ্রমক্রমে নিহত হলেন ক্ষুদিরাম প্রফুল্লচাকীর বোমায় (১৯০৮, মার্চ—১)। ক্ষুদিরামের ফাঁসী হোল। অল্প পরেই মাণিকতলার বোমার কারখানার আবিষ্কার এবং বিপ্লবীদের গ্রেপ্তার।

রবীন্দ্রনাথ বিপ্লববাদকে সমর্থন করতে পারলেন না, তাঁর 'পথ ও পাথেয়' এবং 'সমস্যা' প্রবন্ধে সেই অসমর্থন ফুটে উঠল। এরই কাছাকাছি সময়ে রচিত প্রায়শ্চিত্ত নাটকে রূপায়িত হল ধনঞ্জয় বৈরাগীর মধ্যে অহিংস অসহযোগীর আদর্শ। ১৯০৮ সালের ১৩ই অক্টোবর যখন '১৮১৮ তিন রেগুলেশনে' বিশিষ্ট কর্মীরা অন্তরায়িত হলেন তখন রবীন্দ্রনাথ নীরব রইলেন।

রবীন্দ্রনাথ নোবেল পুরস্কার পেলেন নভেম্বর, ১৯১৩-তে, এবং স্যার উপাধিতে ভূষিত হলেন জুন, ১৯১৫ খৃস্টাব্দে।

১৯১৩ সালের পর থেকে রবীন্দ্রনাথ দক্ষিণ আফ্রিকায় সত্যাগ্রহী মোহনদাস গান্ধী সম্বন্ধে আগ্রহী হলেন এবং গান্ধীজী আফ্রিকা থেকে ইংলণ্ড যাওয়ার কালে তাঁর ফিনিক্স বিদ্যালয়ের ছাত্রদের পাঠিয়ে দিলেন শান্তিনিকেতনে। ১৯১৫ সালের মার্চ মাসে শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজী মিলিত হলেন।

'ঘরে বাইরে' প্রকাশিত হোল এই সময়—বিপ্লববাদ সম্বন্ধে তাঁর মানসিক বিরূপতা এই উপন্যাসে পুনশ্চ দেখা গেল।

১৯১৬ সালে রবীন্দ্রনাথ—জাপান আমেরিকায় ভ্রমণ করলেন; আমেরিকায় 'ন্যাশনালিজম্' সম্বন্ধে কতকগুলি বক্তৃতা দিলেন। বক্তৃতাগুলি, ন্যাশনালিজমের দ্বারা লাভবান পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদীদের ভাল লাগল না, অপরদিকে সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে সংগ্রামের জন্য যাঁরা স্বদেশে ন্যাশনালিজমের উদ্বোধন চাইছেন, সেই ভারতীয় বিপ্লবী বা দেশকর্মীরাও নিতান্ত অপছন্দ করলেন। গদর দলের পক্ষ থেকে রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতার প্রতিবাদ করা হোল, প্রতিবাদ করলেন বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনে সভাপতির ভাষণে চিত্তরঞ্জন দাশ।

দেশের রাজনৈতিক অবস্থা ঘোরালো। ১৯১৫ সালের ভারতরক্ষা আইনে হাজার হাজার যুবক কারাগারে বা অন্তরীণে; শ্রীমতী অ্যানী বেসান্ত ১৯১৭ সালের জুন মাসে জেলে গেলেন। দেশের অবস্থা বিশ্লেষণ করে রবীন্দ্রনাথ 'কর্তার ইচ্ছায় কর্ম' লিখলেন।

কলকাতায় কংগ্রেসে বেসান্তকে সভানেত্রী করতে চাইছিল চরমপন্থীরা। নরমপন্থীরা বাধা দিল। রবীন্দ্রনাথ বিবাদ মীমাংসার চেষ্টায় অংশ নিলেন।

১৯১৮ সালের ২১শে নভেম্বর মহাযুদ্ধের বিরতি ঘটল। ভারতবাসী শাসনসংস্কারের পরিবর্তে পেল রৌলট আইন, যাতে বিপ্লবীদের দমনব্যবস্থাসহ নানাবিধ নিপীড়ন ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে; প্রতিবাদ উঠল নানাস্থানে, মহাযুদ্ধের সময়ে ইংরেজের 'অনুগত' গান্ধীজী আইনটি প্রত্যাহার করা না হলে আন্দোলনের ঘোষণা দিলেন, দেশের সর্বত্র বিক্ষোভ, মার্শাল-ল জারি হোল পাঞ্জাবে, সেখানে জালিয়ানওয়ালাবাগে ইংরেজের জেনারেল মহিমা প্রকাশ পেল মানুষ

নে, উজ্জ্বল হয়ে উঠল চরিত্রমহিমা নারীর উপর অত্যাচারে।

১৯১৯ খৃস্টাব্দের ১৩ই এপ্রিল জালিয়ানওয়ালাবাগে নর ও নারীমেধ। সামরিক আইন চুইয়ে যেটুকু রক্ত এসে পৌঁছল বাংলাদেশে, তারই দর্শনে ক্রোধে বেদনায় উন্মত্ত হয়ে উঠলেন বাংলাদেশের কবি। ভাইসরয়ের কাছে ২৯শে মে'র পত্রে রবীন্দ্রনাথ নাইট উপাধি ত্যাগ করলেন।

মানুষের বেদনাকে রবীন্দ্রনাথ যে ভাষা দিলেন তা রবীন্দ্রনাথেরই যোগ্য।

১৯২০ সালের মে মাসে রবীন্দ্রনাথ বিদেশ যাত্রা করলেন। তাঁর বিদেশবাসকালেই ভারতে অসহযোগ আন্দোলনের বিস্তৃতি। সেই আন্দোলন সম্বন্ধে তাঁর মনোভাব ছড়িয়ে রইল নানা ব্যক্তিগত পত্রে।

১৯২১ সালের জুন মাসে যখন তিনি য়ুরোপ থেকে ভারতগামী জাহাজ ধরছেন, আগেই বলেছি, সেই জাহাজে ছিলেন আই· সি· এস· ত্যাগী তরুণ সুভাষচন্দ্র। আরো বলেছি রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে সুভাষচন্দ্র অনেক কিছু শুনেছিলেন।

সুভাষচন্দ্র গ্রহণ করেছিলেন কতখানি?

সুভাষচন্দ্রের জীবনের ঘটনাকে যেখানে ত্যাগ করে এসেছি, তারপরে পাঁচ বছর কেটেছে। এই পাঁচ বছরে তাঁর ধারণার কিছু কিছু পরিবর্তন ঘটেছে। ওটেন-শাসনের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কৃত সুভাষচন্দ্র কটকে প্রস্থান করেছেন। যে দলের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, তার সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক শিথিল হয়েছে, কারণ তিনি ওটেন-ব্যাপারে দলের সঙ্গে পরামর্শ করেন নি, করলেও সম্মতি পেতেন কি না সন্দেহ, এক কলকাতা ছাড়বার সময় দলকে সংবাদ পর্যন্ত দেন নি, যদিও কিছুকাল আগেও তাঁদের সঙ্গে দিনরাত্রি কাটিয়েছেন। কটকে গিয়ে সুভাষচন্দ্র একদিকে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের মতি পরিবর্তনের প্রতীক্ষা করতে লাগলেন, অন্যদিকে সমাজসেবা চলল, (কলেরার সেবা পর্যন্ত), জীবিতের সেবা এবং মৃতের সৎকার, যুবসংগঠন, অস্পৃশ্যতা নিবারণ, বন্ধুদের সঙ্গে দেশ ও তীর্থভ্রমণ, বারোয়ারী পুজোর আয়োজন এবং অবসর সময়ে আত্মবিশ্লেষণ।

বছরখানেক পরে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সদয় হলেন, এবং সুভাষচন্দ্র ভর্তি হলেন স্কটিশ চার্চ কলেজে দর্শনের অনার্স নিয়ে। সেটা ১৯১৭ সালের জুলাই মাস। সামরিক শিক্ষার প্রতি আগ্রহে য়ুনিভার্সিটি ট্রেনিং কোরে ভর্তি হলেন, সামরিক কুর্তা পরে মার্চ করবার ও রাইফেল চালাবার সময়ে রোমাঞ্চিত হলেন ক্ষণে ক্ষণে, পল্টনগিরির উত্তেজনার মধ্যে থার্ড ইয়ার কাটিয়ে ফোর্থ ইয়ারে যখন ভাল করে পড়াশুনা সুরু করলেন, তখন সেই এক বছরের পরিশ্রম বোধ হয় তাঁকে ফার্স্ট করবার পক্ষে যথেষ্ট ছিল না—দর্শনে হলেন প্রথম শ্রেণীতে দ্বিতীয়। এদিকে, দর্শন সম্বন্ধে আগ্রহ ইতিমধ্যেই হ্রাস পেয়েছে, কারণ দর্শন সমস্যার বিশ্লেষণ করতে সাহায্য করে, সমস্যার সমাধান সেখানে কোথায়? সুতরাং ঠিক করলেন পরীক্ষামূলক মনস্তত্ত্বে এম· এ· পড়বেন।

এমন সময়ে একদিন পিতার কাছ থেকে ইংলণ্ডে আই· সি· এস· পড়তে যাবেন কি না স্থির করবার জন্য ২৪ ঘণ্টার নোটিশ পেলেন।

সুভাষচন্দ্র ঠিক করলেন ইংলণ্ড যাবেন। আই· সি· এস· হয়ে ইংরেজের চাকরি করার মন নেই, কিন্তু সেকথা এখনি বললে ইংলণ্ডে যাওয়া যায় না। আর ইংলণ্ডে না গেলে ইংরেজকে জানাও যায় না, অথচ শত্রুর সঙ্গে লড়াই করবার আগে তাকে জানা উচিত। সুভাষচন্দ্র নিশ্চিত ছিলেন পরীক্ষায় পাশ করতে পারবেন না, কারণ এবারের পরীক্ষার জন্য আট মাস সময় বাকি আছে, পরের বার পরীক্ষার আগে বয়স পেরিয়ে যাবে। আলাদা পথ তৈরির স্বপ্নে বিভোর সুভাষচন্দ্র দলের সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে ইংলণ্ড যাত্রা করলেন ১৯১৯ সালের ১৫ই সেপ্টেম্বর।*

আট মাস পড়েই সুভাষচন্দ্র পাশ করলেন চতুর্থ হয়ে, ইংরেজী রচনায় প্রথম। ১৯২০ সালের মাঝামাঝি আই· সি· এস· পরীক্ষার ফল বেরুল। কয়েকদিন পরে ২২শে সেপ্টেম্বর মেজদা শরৎচন্দ্র বসুকে পত্রে জানালেন, আই· সি· এস· পদ গ্রহণে তাঁর মন সায় দিচ্ছে না। সমর্থন চাইলেন একান্ত প্রিয় ও শ্রদ্ধেয় মেজদার কাছে।

তিনি আই· সি· এস· ত্যাগ করলেন যে, ১৯২১ খৃস্টাব্দে। পারিবারিক বাধার সম্মুখীন হয়ে মনস্থির করতে কিছু সময় লেগেছিল।

[ক্রমশঃ]

সাপ্তাহিক বসুমতীর চাঁদার হার

সাপ্তাহিক বসুমতীর বাৎসরিক চাঁদা সডাক ১৮ টাকা, ষাণ্মাসিক ৯ টাকা ও ত্রৈমাসিক ৪·৫০ টাকা। প্রতি সংখ্যা ৩০ পঃ।

তিন মাসের কমে গ্রাহক করা হয় না। গ্রাহক হতে হলে আপিসে অগ্রিম টাকা জমা দিতে কিংবা মনি অর্ডারে টাকা পাঠাতে হবে।

—কর্মাধ্যক্ষ, বসুমতী

* সুভাষ-দিলীপ সংবাদ ঃ—দিলীপকুমার লিখছেন—

“আমি বললাম—আমি অবিলম্বে বিলেত রওনা হচ্ছি, সেখানে ট্রাইপস নেব গণিতে আর আই· সি· এস· পরীক্ষার জন্য তৈরি হব।

সুভাষ বলল......আমিও কেম্ব্রিজ থেকে আই· সি· এস· পরীক্ষা দেব ঠিক করেছি। তবে শুনেছি কেম্ব্রিজে ভারতীয় ছাত্রদের জন্য সীট বেশি নেই। তা তুমি আগে যাচ্ছ, ভালোই হল। কেম্ব্রিজে পৌঁছে আমার জন্য
পেয়ে অর করলেই

আমি কান
পারলাম ন
সুভাষ
পরীক্ষা

সু
বাবা
পাঠ
দি
আমি
যাওয়ার
কথা দি

আমি
কিন্তু
আই·

সু
কেন
কথা
করব

আমি
সুভাষ
মধ্যে চা
মনসা চি
মন্ত্রগুপ্তি ন

যা দেখেছি, যা পেয়েছি

স্মৃতিচয়ন

শ্রীসুধীরঞ্জন দাস

।পূর্ব-প্রকাশিতের পর।

...প্র্যাকটিসের ...ট মিলের ...যা সংক্রান্ত ...তাতে আমি ...তখন ...ড়িতে ...প্রতি- ...শ্যামদাস ...তিনি বেশ ...র মানুষ ...তি পাঞ্জাবী ...র্তা এবং পায়ে ...র চোখে তাঁর একটা ...দীপ্তি লক্ষ্য করেছিলাম। ...াপ খুব মোলায়েম ধরণেরই ছিল। পবে যখন আমি রাসবিহারী এ্যাভেনিউয়ে বাড়ি করে সেখানে উঠে গেলাম, তখন প্রায় নিতাই ভোরবেলা লেকের ধারে খানিকক্ষণ বেড়িয়ে আসতাম। জ্যোতিষ মৈত্র ও ভূপেন দত্ত রায় সাহেব ও আমি প্রায়ই একসঙ্গে বেড়াতাম। মাঝে মাঝে দেখতাম উল্টো দিক থেকে ঘনশ্যামদাসজী ও দুই একজন মাড়োয়ারী বন্ধু হেঁটে আসছেন। যাঁরা তাঁর সঙ্গে থাকতেন তাঁদের প্রায় সবাইকেই আমি জানতাম, কেন না কোন না কোন মামলায় তাঁরা আমার মক্কেল ছিলেন। যখন আমরা কাছাকাছি আসতাম তখন চেনা ভদ্রলোক-দের সঙ্গে নমস্কার বিনিময় হোত। এতগুলি চেনা লোক যাঁকে শ্রদ্ধা করে সেই ভদ্রলোকটিকে জানবার বেশ ইচ্ছে হোত। একদিন প্রভুদয়াল হিম্মতসিংকা ঘনশ্যামদাসজীর সঙ্গে বেড়াচ্ছিলেন। আমরা যেই বিপরীত দিক থেকে কাছা-কাছি এসেছি তখন প্রভুদয়ালবাবু দাঁড়িয়ে পড়লেন এবং তিনি ঘনশ্যামদাসজীর সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দিলেন। আমরা তখন একই সঙ্গে হাঁটতে আরম্ভ কবলাম। ঘনশ্যামদাসজী হেসে বললেন যে, প্রায়ই যখন আমরা পাশ কাটিয়ে যেতাম তখন তিনি তাঁর সঙ্গীদের জিজ্ঞাসা করতেন আমার কথা। সেই সব সঙ্গীজনেরা নাকি পৃথকভাবে প্রত্যেকেই বলতেন—“এ ত' দাশসাহেব—বহুত আচ্ছা আদমী।” এই সাধুবাদ শুনতে শুনতে তাঁরও নাকি খুব ইচ্ছে হোত এই বহুত আচ্ছা আদমী অর্থাৎ আমার সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করার। দুপক্ষের ইচ্ছা-পূরণ হোল প্রভুদয়ালবাবুর সৌজন্যে। তারপর নানা জায়গায় আমাদের দেখা হয়েছে। বিশেষ করে আমি যখন পাঞ্জাবের চীফ জাস্টিস পদ ছেড়ে সিমলা থেকে দিল্লী এলাম তখন ঘনশ্যামদাসজীর সঙ্গে বেশ ঘনিষ্ঠতা ও আলাপ হয়ে-ছিল। তিনি আসতেন আমার বাড়ি খোঁজখবর নিতে এবং আমিও তাঁর বাড়ি যেতাম। এ'দেব ব্যবসা ও রাজনীতির সঙ্গে আমার কোন সম্পর্কই ছিল না। কিন্তু লোকটিকে যেটুকু জেনেছি তাতে মানুষ হিসেবে তিনি অবশ্যই সম্মানার্হ। দেশের বহু মঙ্গল কাজে তাঁর ও তাঁদের পরিবারের প্রচুর অবদান রয়েছে। অমায়িক ও নিরহঙ্কারী মানুষ বলেই আমার কাছে তিনি প্রতিভাত হয়েছেন। তেমনি সদাশয় এই পরিবারেব ছেলে কর্মটি—লক্ষ্মীনিবাস, কৃষ্ণকুমার, মাধবপ্রসাদ ও বসন্তকুমার। যেমন এ'রা কর্মঠ তেমনি এ'রা বিনয়ী ও সৎস্বভাবসম্পন্ন। এই পরিবারের সঙ্গে আমার একটি প্রীতির সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। এই ছেলেদের বধূরাও সুশিক্ষিতা ও সুনিপুণা গৃহিণী।

আমার জজ হবার দু বছরের মধ্যেই রাসবিহারী এ্যাভেনিউয়ের উপর ঠিক আমাদের বাড়ির সামনে গোটা দুই মোটর দুর্ঘটনা ঘটেছিল। পাড়ার ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা তাদেব ঝিয়ের সঙ্গে রাস্তা পার হয়ে দেশপ্রিয় পার্কে যাচ্ছিল খেলবার জন্যে। এমন সময় মিলিটারী লরিতে সেই সব শিশুদের একেবারে পিষে মেরে দিয়ে গেল। উপর্যুপরি বার দুই এরকম হওয়ায় এবং সেই সব শিশুদের বাপ-মায়ের মর্মন্তুদ কান্নার আওয়াজে আমার স্ত্রী একেবারে অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন ও তিনি ঐ বাড়িতে আর থাকতে পারছিলেন না। তা ছাড়া জজীয়তী হওয়ার পর আমার এটর্নী ও মক্কেলের সুবিধার কোন প্রশ্ন রইল না এবং দূরে টালিগঞ্জে গিয়ে থাকলে কোন অসুবিধে হবে না বলে মনে হোলো। সুতরাং ঠিক করলাম যে আমাদের বাড়িটা বেচে দিয়ে টালিগঞ্জের জমিতে বাড়ি করে থাকব। হাতের কাছে একজন খদ্দের জুটে গেল। কিন্তু টালিগঞ্জে যতদিন বাড়ি না হয় ততদিন থাকি কোথায়? তখন মনে হোলো যিনি আমাদের বাড়ি কিনবেন তিনি রসা রোডের উপরে প্রায় টালিগঞ্জের রেলওয়ে ব্রীজের কাছাকাছি যে বাড়িটায় থাকতেন সে বাড়িটাতে গিয়ে উঠলে পারি। সে বাড়ির মালিক ছিলেন জি সি চন্দর কোম্পানীর মক্কেল। জি সি চন্দর কোম্পানীর তৎকালীন সিনিয়র পার্টনার রবি দেবকে বললাম তাঁর মক্কেলকে বলে ঐ বাড়িটাতে আমার থাকবার ব্যবস্থা করে দিতে, যতদিন না আমাদেব টালিগঞ্জের বাড়িটা তৈরি হয়ে যায়। রবিবাবু বললেন—“বলেছিলাম, স্যার, জজীয়তী নেবেন না। শুনলেন না তখন। এখন দেখলেন ত' বছর দুই যেতে না যেতেই পথে দাঁড়াতে হোলো।” বলেই চোখ দুটি মটকিয়ে একটু মৃদু হাসলেন যেমন ছিল রবিবাবুর অভ্যেস। যাই হোক তিনি বাড়িটার ব্যবস্থা করে দেওয়ায় আমরা সেখানে উঠে গেলাম এবং তারপর আমাদের টালিগঞ্জের বাড়ি তৈরি হলে উনিশ শ' ছেচল্লিশ সালের গোড়ায়। রসা রোডের ভাড়া বাড়ি ছেড়ে টালিগঞ্জের বাড়িতে উঠে গেলাম।

এই সময় বরাবর আমাদের জ্যেষ্ঠপুত্র সুরঞ্জন হাওয়াই ফৌজে ঢুকে গেছেন এবং সে বিষয়ে উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য ক্যানাডা গিয়েছিলেন। তিনি নিজেই তাঁর বিবাহ ঠিক করেছিলেন জ্ঞানাঙ্কুর দে, আই-সি-এস মশায়ের কনিষ্ঠা কন্যার

সংগে। আমরা খবর পেয়ে কন্যার পিতা-মাতাকে আমাদের সম্মতি জানিয়ে দিলাম। নির্দিষ্টকালে সুরঞ্জন দেশে ফিরে এলে তাঁদের বিবাহ হয়ে গেল এবং আমাদের টালিগঞ্জের নূতন বাড়িতে নববধূকে বরণ করে নেওয়া-হোলো মোটামুটি বেশ ঘটা করেই। এর অল্পকাল পরেই জ্ঞানাঙ্কুরের মৃত্যু হোলো ভয়াবহ পারিস্থিতির মধ্যে। সুরঞ্জনের এই বিবাহে দুটি সন্তান হয়েছে—বড়টি মেয়ে—রঞ্জিতা এবং ছোটটি ছেলে যাকে ভাইটি বলে ডাকা হয়। দুর্ভাগ্যক্রমে সুরঞ্জনের এই বিবাহটি মঙ্গলপ্রসূ হয় নি। স্বামী-স্ত্রীতে বনিবনাও না হওয়ায় তাদের বিবাহবিচ্ছেদ হয়ে গেল। বিচ্ছেদের পর উভয়েই আবার বিবাহ করেছেন। স্বামী-স্ত্রীতে বিচ্ছেদ ঘটলে সন্তানেরাই দুঃখ পায়। এক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয় নি। অপরাধ কার এবং কেন এমন হোলো সে বিচার ভগবানই করবেন।

(৫)

কলকাতা হাইকোর্টে জজীয়তী করবার সময় অনেক মামলা ও মোকদ্দমা ও মোসন—দেওয়ানী ও ফৌজদারী—এবং অনেক আপীলের ফয়সালা আমি করেছি। আইনের অনেক কূটতর্ক শুনে অনেক রায়ও দিয়েছি। Arbitration Act, Companies Act, High Court-এর Letters Patent Hindu Law-এর দেবোত্তর, High Court Taxation Rules—ইত্যাদি নানা বিষয়ের কেস আমার সামনে এসেছে। যখন আমি ওরিজিন্যাল সাইডে কোম্পানী জজ হয়ে বসতাম তখন কত যে ভুঁইফোড় ব্যাঙ্কের নমুনা দেখেছি তার ইয়ত্তা নেই। বহু সহায়হীন বিধবা বেশি সুদের আশায় ঐ সব ব্যাঙ্কে তাদের জীবনের সম্বল টাকা কয়টি রেখে পরে দেখলেন যে সে ব্যাঙ্ক লালবাতি জেলে দিল। কত মর্মন্তুদ হাহাকারে ভরা চিঠি আমি পেতাম। আমার কলকাতা হাইকোর্টের জজীয়তীর ছয় বছর মেয়াদের মধ্যে নানা বিষয়ে অন্তত একশটা রায় নানা ল রিপোর্টে ছাপা হয়েছে। যাঁরা আইনজ্ঞ এবং আইনই যাঁদের পেশা তাঁরা সে সব রায় হয়ত পড়েছেন এবং তার ভালমন্দ তাঁরাই বিচার করবেন। কিন্তু সে সব মামলা সাধারণ পাঠকদের কাছে গল্পের মত করে বলবার মতন নয়। তবে ওরই মধ্যে একটা কেসের কথা মনে আছে যা হয়ত গল্প বলে মনে হতে পারে। সে কেসটা আমার কাছে হতে পারে। সে কেসটা আমার কাছে এসেছিল শুনানীর জন্যে উনিশ শ তেতাল্লিশের মার্চ মাসে অর্থাৎ আমি জজ হবার মাস চারেকের মধ্যে। এই কেসটা In the matter of Lovejoy Patel & anr, নামে I.L.R. (1943) 2 Cal 554-এ ছাপা আছে। ইয়াকুব প্যাটেল সুরাটের একটি মুসলমান পরিবারের সন্তান। উনিশ শ' দশ সালে তিনি জাইনব নাম্নী একটি ইহুদী মেয়েকে বিবাহ করেছিলেন। বিবাহের সময় জাইনবের বয়স ছিল মাত্র বার। ইয়াকুব তাঁর ভাইয়েদের সংগে রেঙ্গুনে উনিশ শ' ষোল সাল থেকে কারবার করতেন লোহা-লক্কড় ও নানা জাতীয় হার্ডওয়ার মালের। দরখাস্তকারিণী ক্ল্যারিস গ্রেস রাহা ছিলেন একজন ভারতীয় খৃস্টান ধর্মাবলম্বী মহিলা। তিনি পাশ করা ডাক্তারও ছিলেন। তিনি এলিয়স সলোমন নামক একটি ইহুদী ভদ্রলোককে বিবাহ করেন। এলিয়স সলোমন সাহেব রেঙ্গুনে বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অধ্যাপক ছিলেন। ক্ল্যারিস গ্রেস রাহা তাঁর স্বামীর সংগে রেঙ্গুনেই থাকতেন এবং ডাক্তারীও করতেন। এঁদের কোন সন্তান ছিল না। উনিশ শ' আটাশ সালে এই দুই পরিবারে জানাশোনা হয়েছিল। সেই সময়ে জাইনব প্যাটেলের স্বাস্থ্য খুবই খারাপ ছিল এবং তার উপর তাঁর সন্তানসম্ভাবনা হওয়ায় ক্ল্যারিস গ্রেস রাহাকে ডাক্তার হিসাবে জাইনবকে দেখবার জন্যে ডাকা হয়। জাইনব প্যাটেলকে খুব ভাল করে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে ডাক্তার ক্ল্যারিস গ্রেস রাহা মন্তব্য করলেন যে জাইনবের যমজ সন্তান হবে। এই কথা শুনেই ইয়াকুব ও জাইনব হেসেই খুন এবং কিছুতেই বিশ্বাস করবেন না। ডাক্তার রাহা তবু জোর করে বলায় তাঁরা দুজনেই প্রতিশ্রুতি দিলেন যে সত্যই যদি যমজ সন্তান হয় তবে তার মধ্যে একটিকে তাঁরা দরখাস্তকারিণীকে দিয়ে দেবেন এবং দরখাস্তকারিণী সেইটিকে আপন সন্তানের মত মানুষ করে তুলবেন। এতে ইয়াকুব ও জাইনবের কোনো ওজর আপত্তি থাকবে না। উনিশ শ' উনত্রিশ সালের তেসরা মার্চ মাসে জাইনবের সত্যি সত্যিই দুটি যমজ সন্তান হোলো—একটি হোলো ছেলে যার নাম হোলো সেলিম অন্যটি হোলো মেয়ে যার নাম পরে হোলো লাভজয়। জন্মাবার অল্প কদিন পরেই মেয়েটিকে তার বাপ-মা দরখাস্তকারিণীর হাতে তুলে দিলেন এবং ছেলে সেলিম রয়ে গেলেন তার বাপ-মায়ের কাছে। দুই পরিবারের প্রীতির বন্ধন অটুটই ছিল উনিশ শ' তেতাল্লিশ সালের ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত।

উনিশ শ' আটত্রিশ সালে দরখাস্তকারিণী যখন মোটর দুর্ঘটনায় আহত হয়ে ৫ মাস শয্যাগত ছিলেন সেই পাঁচ মাস ছাড়া জন্ম ইস্তক চোদ্দ বছর লাভজয় দরখাস্তকারিণীর কাছেই থেকে বড় হয়ে উঠেছেন। মেয়েটি দরখাস্তকারিণীকে ডাকতেন "মামি" এবং দরখাস্তকারিণীর স্বামীকে ডাকতেন "ড্যাডি"। এই চোদ্দটি বছর দরখাস্তকারিণী কি রকম স্নেহ ও যত্নের সংগে যে মেয়েটিকে পেলেছিলেন তার যে বিশদ বৃত্তান্ত তাঁর আর্জির মধ্যে লিখেছিলেন তার খুব সংক্ষিপ্ত সারাংশ এইরকম। উনিশ শ' বত্রিশ সালে তিনি মেয়েটিকে কাশ্মীরে হাওয়া বদলিয়ে নিয়ে এসেছিলেন। উনিশ শ' তেত্রিশ সালে মেয়েটির নিউমোনিয়া হওয়ায় শীতের শেষে দরখাস্তকারিণী তাকে সুইটজারল্যান্ড নিয়ে সুস্থ করিয়ে আনেন। উনিশ শ' ছত্রিশ সালে মোটর গাড়িতে মেয়েটিকে আগ্রা বেড়িয়ে নিয়ে আসেন। উনিশ শ' সাঁইত্রিশ সালের এপ্রিল মাসে তাকে নিয়ে বিলেতে বেড়াতেও গিয়েছিলেন এবং সেই বছরের শেষে দেশে ফিরে মেয়েটিকে দিল্লীর একটি ভাল ইস্কুলে রেখে পড়ান। উনিশ শ' আটত্রিশ সালে পাঁচ মাস দরখাস্তকারিণী মোটর দুর্ঘটনায় শয্যাগত থাকাকালে মেয়েটি তাঁর মায়ের কাছে প্রথমে রেঙ্গুনে এবং পরে কলকাতায় থাকেন। সেই বছর সেপ্টেম্বর মাসে মেয়েটি আবার দরখাস্তকারিণীর কাছে ফিরে আসেন এবং কলকাতার লোরেটো ইস্কুলে তাঁকে ভর্তি করান হয়—লাভজয় সলোমন নামে। মেয়েটির যাবতীয় খরচা দরখাস্তকারিণীই দিয়ে এসেছেন। উনিশ শ' একচল্লিশের ফেব্রুয়ারী ও মার্চ মাসে দরখাস্তকারিণী মেয়েটিকে নিয়ে ভূপাল, গোয়ালিয়র, ইন্দোর, আজমীর ও অন্যান্য জায়গায় দেশভ্রমণ করে ফিরলেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ যখন পূর্ণোদমে চলেছে এবং জাপানও যখন তাতে যোগ দিল তখন কলকাতায় বোমা পড়বে বলে রব ওঠায় অনেকে কলকাতা ছেড়ে পালাতে লাগলেন। সেই সময়ে দরখাস্তকারিণী মেয়েটিকে দার্জিলিংয়ের লোরেটো কনভেন্টে ভর্তি করে দিলেন এবং মাঝে মাঝে গিয়ে তাকে দেখে আসবেন

মাসিক ৬০০৲ টাকা উপার্জন করুন
অবসর সময়ে বিশ্ব-বিখ্যাত রোমার ঘড়ির অর্ডার বুক করিয়া। বিনামূল্যে সর্তাবলী এবং স্যাম্পেল ঘড়ির জন্য পত্র লিখুন।
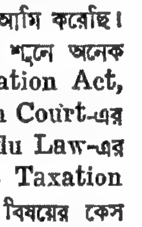
TAJCO (W B C—88)
P. Box 1383, Delhi—6.

বৈজ্ঞানিকদের আবিষ্কার

ব্যথা-বেদনা তাড়াতাড়ি দূর করবার আধুনিক উপায়

(নতুন) মাইক্রোফাইণ্ড 'অ্যাসপ্রো'

এখন আমাদের দেশে পাওয়া যাচ্ছে।

যে কোনো ব্যথা-বেদনাই আমাদের সমস্যা: 'অ্যাসপ্রো' রিসার্চ ইনস্টিটিউটের বৈজ্ঞানিকরা অনেক গবেষণার পর ব্যথা-বেদনা দূর করবার জন্য আবিষ্কার করেছেন নতুন মাইক্রোফাইণ্ড 'অ্যাসপ্রো'—আরো তাড়াতাড়ি ব্যথা-বেদনা দূর করার নতুন উপায়।

মাইক্রোফাইণ্ড বলতে কি বোঝায়? মাইক্রোফাইণ্ড বলতে বোঝায় যে, ব্যথা-বেদনা দূর করবার যে উপাদানগুলি 'অ্যাসপ্রো'-তে মেশানো হয়, তা ৩০ গুণ বেশী সূক্ষ্ম করা হয়েছে। এক বিশেষ পদ্ধতিতে তৈরী এই নতুন ট্যাবলেটে এখন প্রায় ১৫ কোটি সূক্ষ্ম কণা রয়েছে। এর ফলে বেদনা নাশ করবার শক্তি তিনগুণেরও বেশী দ্রুত শরীরে ছড়িয়ে পড়ে এবং মুহূর্তের মধ্যে ব্যথা-বেদনা দূর করে।

মুহূর্তের মধ্যে কাজ শুরু হয়ে যায়—অনেকক্ষণ ধরে কাজ চলতে থাকে: নতুন মাইক্রোফাইণ্ড 'অ্যাসপ্রো'-র ব্যথা দূর করবার সক্রিয় উপাদানটি অতি সহজেই এবং খুবই শীগগির শরীরের সঙ্গে মিশে গিয়ে ৫ থেকে ৭ ঘণ্টা পর্যন্ত শরীরের মধ্যে থাকে। সেইজন্যেই মাইক্রোফাইণ্ড 'অ্যাসপ্রো' আরও তাড়াতাড়ি ব্যথা-বেদনা দূর ক'রে দেয় এবং তার ফল অনেকক্ষণ স্থায়ী হয়।

অতি সহজেই আপনি খেতে পারেন: নতুন মাইক্রোফাইণ্ড 'অ্যাসপ্রো' আপনি যেভাবে খুশী খেতে পারেন—শুকনো, জলের সঙ্গে মিশিয়ে অথবা এক গ্লাস জল বা যে কোনো গরম পানীয়ের সঙ্গে।

নিম্নোক্ত প্রকারের যন্ত্রণায় নতুন মাইক্রোফাইণ্ড 'অ্যাসপ্রো' খাবেন: ব্যথা-বেদনা • মাথাধরা • গা-ব্যথা • দাঁতব্যথা • গাঁটে বেদনা • জ্বর-জ্বর-ভাব • ডেঙ্গু জ্বর • গলাব্যথা।

মাত্রা: প্রাপ্তবয়স্ক: দুইটি ট্যাবলেট। প্রয়োজন হলে আবার খাবেন। শিশুদের জন্য: একটি ট্যাবলেট বা আপনার ডাক্তারের নির্দেশমত।

নতুন মাইক্রোফাইণ্ড 'অ্যাসপ্রো' কিভাবে কাজ করে দেখুন

ট্যাবলেটের কণাগুলির আকার যত বড় হয়, ততই শরীরের সঙ্গে মিশে যেতে দেরী হয়—আপনার আরাম পেতেও সময় লাগে।

'অ্যাসপ্রো' মাইক্রোফাইণ্ড হওয়ার ফলে নতুন মাইক্রোফাইণ্ড 'অ্যাসপ্রো'-র প্রতিটি ট্যাবলেটে প্রায় ১৫ কোটি সূক্ষ্ম কণা রয়েছে। তাই শরীরের সঙ্গে সঙ্গে-সঙ্গে মিশে যায় এবং খুব তাড়াতাড়ি ব্যথার উপশম হয়।

নতুন মাইক্রোফাইণ্ড 'অ্যাসপ্রো' ব্যথা-বেদনা দূর করার সর্বাধুনিক উপায়।

(নতুন) মাইক্রোফাইণ্ড

'অ্যাসপ্রো'

তাড়াতাড়ি ব্যথা-বেদনা দূর করে

নিকোলাস-এর তৈরী

(ক.৩৫.৫৭ ৯৯০)

স্থলে নিজের জন্যেও একটা ফ্ল্যাট ভাড়া করে রাখলেন। ওদিকে উনিশ শ' আটত্রিশের মার্চ ও এপ্রিল মাসে রেঙ্গুনে দাঙ্গা-হাঙ্গামা শুরু হওয়ায় ইয়াকুব ও জাইনব তাঁদের ছেলে সেলিমকেও কলকাতায় দরখাস্তকারিণীর কাছে পাঠিয়ে দেন। ছেলেটিকে প্রথমে সেন্ট মার্কস এবং পরে সেন্ট জেভিয়ার্সে ভর্তি করিয়ে দেওয়া হোলো। উনিশ শ উনচল্লিশের জানুয়ারী থেকে উনিশ শ' একচল্লিশ সালের অক্টোবর মাস পর্যন্ত ইয়াকুব দরখাস্তকারিণীর কাছে প্রথমে মাসে দেড় শ' এবং পরে এক শ' টাকা করে পাঠাতেন। ছেলেটিকেও দার্জিলিংয়ে পাঠান হয়েছিল বোমার ভয়ে। জুলাই—উনিশ শ' বেয়াল্লিশ পর্যন্ত ইয়াকুব টাকা দিয়েছেন কিন্তু তার পর তিনি আর কিছু দেন নি এবং দরখাস্তকারিণী ছেলে ও মেয়ে দুজনেরই যাবতীয় খরচ বহন করেছেন। উনিশ শ' তেতাল্লিশ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে দুই পরিবারের মধ্যে মন কষাকষি শুরু হোলো। ঠিক কি নিয়ে যে লাগল সেটা সঠিক বোঝা গেল না। ইয়াকুব বলে বসলেন যে মেয়ে তাঁর এবং তিনিই তাঁর রক্ষণাবেক্ষণের মালিক। তাঁরা মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষ এবং তাঁদের সংস্কার অনুসারে মেয়ের বিয়ের বয়েস হয়েছে এবং তাঁর বিবাহের বন্দোবস্ত তাঁকেই করতে হবে। একটু প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত ছিল যে দরখাস্তকারিণী নিজে খৃস্টান বলে মেয়েকে আইবুড়ো রেখে পরে হয়ত খৃস্টানমতেই বিয়ে দেবেন। ইয়াকুব পাছে জোর করে মেয়েকে কেড়ে নিয়ে যায় সেই ভয়ে দরখাস্তকারিণী মেয়ে ও ছেলে উভয়েরই আইনগত গার্জেন হবার জন্যে এই দরখাস্ত করলেন।

দরখাস্তকারিণীর তরফে কৌঁসুলী ছিলেন ন্যাথানিয়েল বারওয়েল সাহেব এবং ইয়াকুব ও জাইনবের কৌঁসুলী ছিলেন খুব সম্ভব শম্ভু ব্যানার্জি সাহেব। বহুতর কূটকচালে আইনের তর্ক উঠেছিল—যেমন হাইকোর্টের জুরিসডিকসনে কেসটা পড়ছে কি না ; নাবালক যদি সাধারণত কলকাতার বাসিন্দা হয় কিন্তু দরখাস্তের তারিখে যদি সে সাময়িকভাবে কলকাতার বাইরে থাকে তবু তার গার্জেনশীপের জন্যে হাইকোর্টে দরখাস্ত চলতে পারে কি না; হাইকোর্টের লেটার্স প্যাটেন্টের ক্ষমতাপরিধি কি সারা বাংলাদেশময়, না, শুধু কলকাতা শহরের মধ্যেই নিবদ্ধ, মুসলমান আইনে কি বয়সে ছেলে ও মেয়ে সাবালক বলে গণ্য হয় ইত্যাদি। ঐ সব আইনের তর্ক সাধারণ পাঠকের চিত্তাকর্ষক হবে না। আমার কাছে দুটি প্রশ্ন মোক্ষম বলে মনে হোলো। প্রথম কথা হোলো যে পিতামাতার রক্তের টানে যে স্বাভাবিক দাবি থাকে সন্তানের উপর সে দাবিটা কি তাঁরা স্বেচ্ছায় ও স্বচ্ছন্দচিত্তে দরখাস্তকারিণীর কাছে ছেড়ে দিয়েছেন? এবং সর্বোপরি মূল প্রশ্ন হোলো কার কাছে থাকা নাবালকদের পক্ষে শুভকর হবে? আগে যে সকল ঘটনা বলেছি তাতে করে স্পষ্ট বোঝা গেল যে মেয়ের সমস্ত ভার দরখাস্তকারিণীকে দেওয়ায় মেয়ের বাপ-মা সেই মেয়ের উপর দাবি ছেড়েই দিয়েছেন এবং দরখাস্তকারিণী যে মেয়েটির প্রায় জন্ম ইস্তক তাকে আপন মেয়ের মত নিজের অন্তরের সমস্ত স্নেহ মমতা দিয়ে ঘিরে রেখেছেন তা স্পষ্ট বোঝা গেল তাঁর চোখের করুণ চাহনীতেও। কিন্তু ছেলের বেলা সেটা বলা চলে না, কেন না বাপ-মা তার খরচা মোটামুটি নিজেরাই বহন করেছেন। অর্থাৎ কোর্টের সামনে যে সব ঘটনা প্রকাশ পেয়েছে তার থেকে এই সিদ্ধান্তে আসা অন্যায় নয় যে মেয়ে সম্বন্ধে তাঁরা কোন দায়িত্বই পালন না করায় তার উপরে পিতামাতার স্বাভাবিক দাবি বিসর্জনই দিয়েছেন। কিন্তু ছেলে সম্বন্ধে তাঁদের সে মনোভাব ছিল বলা চলে না। সুতরাং ছেলে সম্বন্ধে তাঁদের দাবি অগ্রাহ্য করা চলে না। মেয়ে সম্বন্ধে শেষ প্রশ্ন হোলো এই যে সকল পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিবেচনা করে তাকে কার হেপাজতে রাখলে তার ভবিষ্যতে মঙ্গল হবে। বারওয়েল সাহেব বললেন যে, কোর্ট হুকুম দিলে দরখাস্তকারিণী মেয়ের ভবিষ্যৎ ভরণপোষণের জন্যে জামিন দিতে পারেন। ছেলে ও মেয়ে দুজনেরই বয়স তখন চোদ্দ বছর। সুতরাং তাঁদের নিজেদের কিসে ভাল হবে সেটা অন্তত খানিকটা বোঝার বয়স তাঁদের হয়েছিল। কোর্ট থেকে উঠে গিয়ে চেম্বারে পৃথকভাবে তাঁদের ডেকে কথাবার্তা বললাম। চমৎকার ফুটফুটে ছেলেমেয়ে দুটি। দুজনেই বুদ্ধিমান বলে মনে হোলো। বিশেষ করে মেয়েটির মুখে একটা বুদ্ধির দীপ্তি ও সৌন্দর্যের লাবণ্য ছিল। তাঁকে জিজ্ঞাসা করায় দ্বিধাহীনভাবে মেয়েটি বললেন যে তিনি দরখাস্তকারিণীকেই মা বলে জানেন এবং তাঁর সঙ্গেই তিনি থাকতে চান। ছেলেটি কিন্তু বলেছিলেন যে তিনি তাঁর বাপ-মায়ের কাছে থাকলেই সুখী হবেন। রায় মুলতুবী রেখে ভাল করে ভেবেচিন্তে রায় দিলাম। যেটা I.L.R. (1943) Cal 554 ... ... ও অন্যান্য ল রিপোর্টে ছাপা হয়েছে।

দরখাস্তকারিণীকে মেয়ের গার্জেন করলাম এবং ছেলের সম্বন্ধে তাঁর দরখাস্তটা নামঞ্জুর করলাম। দু পক্ষই রায়টা মেনে নেওয়ায় আপীল আর হয় নি এবং মনে মনে অনুভব করলাম যে হুকুমটা বোধ হয় ঠিকই হয়েছে। একটা কথা এইখানে বলে রাখি। এই ফয়সালা দেবার পর বহু বছর পর্যন্ত মেয়েটি আমাকে খৃস্টমাস ও নববর্ষের অভিনন্দন জানিয়ে কার্ড পাঠিয়ে দিতেন। কার্ড পেলেই তাঁর বুদ্ধিদীপ্ত সুকোমল মুখচ্ছবি মনে পড়ত এবং মেয়েটি যে সুখী হয়েছে তার নিদর্শন দেখে আমারও আনন্দ হোতো।

[ক্রমশঃ]

রবীন্দ্রভারতী পত্রিকা

ষষ্ঠ বর্ষ প্রথম সংখ্যা | মাঘ-চৈত্র ১৩৭৪

সম্পাদক : রমেন্দ্রনাথ মল্লিক

লেখকসূচী। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (চিঠিপত্র), হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় (রবীন্দ্র-শিল্পতত্ত্ব). সমীরণচন্দ্র চক্রবর্তী (ঋগ্বেদে বৈদিক যজ্ঞের নিদর্শন), যতীন্দ্রমোহন দত্ত (কালকেতুর উপাখ্যান কবিকল্পনা না জনশ্রুতির অনুসরণ?)· প্রফুল্লকুমার গুহ (নাটক ও নাটকের মূল্যায়ন), রণজিৎকুমার সেন (ওয়াল্ট হুইম্যান), সাধনকুমার ভট্টাচার্য (অধিকারতত্ত্ব), কালিদাস দত্ত (বৈদিক ভরতের লোকায়তিক মতবাদ), সুখরঞ্জন রায় (কবি সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের কাব্যবিচার), কালিদাস রায় (দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'মন্দ্র'), অমলেন্দু মিত্র (রাঢ়ে ধর্মপূজা), হেরম্ব চক্রবর্তী, কালীকুমার দত্ত ও অজিতকুমার ঘোষ (গ্রন্থসমালোচনা)।

চিত্রসূচী। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর (হারুন-অর্-রসিদ ও উষ্ট্রচালক)।

ত্রৈমাসিক সাহিত্যপত্র। প্রতি সংখ্যা এক টাকা। পুরাতন সংখ্যাও পাওয়া যায়। বার্ষিক চাঁদা। চার টাকা (হাতে ও সাধারণ ডাকে), সাত টাকা (রেজিস্ট্রি ডাকে)।

রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়। ৬/৪ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা—৭

অগ্নিযুগের একটি অধ্যায়

অনন্ত সিংহ

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

স্বীকারোক্তিটির চূড়ান্ত প্রত্যাহার

মামলার দ্বিতীয় দিন—জেলের অভ্যন্তরে আদালত বসেছে। সশস্ত্র পুলিশ, অভিযুক্ত রাজদ্রোহী যুবকদল, স্বীকারোক্তিকারী, উকিল-ব্যারিস্টার ও আদালতের কর্মচারিবৃন্দ স্ব স্ব স্থানে উপবিষ্ট। ট্রাইব্যুনালের বিচারকেরা এখনও আসন গ্রহণ করেন নি। প্রতিদিনের মতই ঠিক দশটা তিরিশ মিনিটের সময় তাঁরা তাঁদের আসন অলংকৃত কববেন। কয়েক মিনিটের মধ্যেই জজদের শূন্য আসন পূর্ণ হল।

পাবলিক প্রসিকিউটার খাঁ সাহেব আব্দুল সত্তর তাঁর গত দিনের মামলা সংক্রান্ত অসমাপ্ত প্রারম্ভিক বক্তৃতা দিতে উঠে দাঁড়ালেন। সমবেত সকলের দিকে একটু তাকিয়ে একটু কেশে তিনি ট্রাইব্যুনালেব বিচারপতিদের সম্বোধন করলেন—"মাননীয় বিচারপতি...... !" তাঁর মুখের কথা মুখেই বইল—সরকারী উকিল বক্তৃতার শুরুতেই বাধাপ্রাপ্ত হলেন।

আদালতের নিস্তব্ধতা ভেদ করে উপস্থিত সকলকে সচকিত বিস্মিত করে এবং সরকারী পক্ষকে স্তম্ভিত করে তরুণ কণ্ঠের উচ্চস্বর ধ্বনিত হল—

"Your honour ! I like to make a statement."

স্বীকাবোক্তিকারী তার কাঠগড়ায় একেবারে একা। সেখান থেকেই সে ট্রাইব্যুনালের প্রেসিডেন্টকে সম্বোধন করে বলছে—"আমি একটি বয়ান দিতে ইচ্ছুক।" আইন-আদালতের বিধি অনুসারে "আসামী" যে কোনো সময়ে তার বিরুদ্ধে মামলার Proceedings (কার্যধারা) স্থগিত রাখবার অনুরোধ জানিয়ে স্বপক্ষে স্টেটমেন্ট দেবার সুযোগ দাবি করতে পারে এবং বিচারক আইনত অভিযুক্ত ব্যক্তিকে সেই সুযোগ দিতে বাধ্য। কাজেই মামলার Proceedings, অর্থাৎ, সরকারী উকিলের প্রারম্ভিক বক্তৃতা, সাময়িকভাবে বাধাপ্রাপ্ত হল। জজ সাহেবকে স্বীকারোক্তিকারীর নতুন বয়ান লিপিবদ্ধ করার জন্য কাগজ কলম টেনে নিতে হল।

জজ সাহেব বললেন—"Well, speak out."

স্বীকারোক্তিকারী—"The statement I made to the S.D.O. is not a voluntary one. I beg to withdraw the statement here and now !"

[আমি S.D.O. মহাশয়ের কাছে যে স্বীকারোক্তিটি দিয়েছি তা স্বেচ্ছাকৃত নয়। আমি সেই স্বীকারোক্তিটি এখনই প্রত্যাহার করতে চাই।]

এ কি হল ! এ যে বিনা মেঘে বজ্রাঘাত ! প্রায় দেড়মাস মামলা চলার পর স্বীকারোক্তিকারী হঠাৎ আজ কেন বলছে স্বীকারোক্তিটি সে স্ব-ইচ্ছায় দেয় নি এবং তা-ও আজ একেবারে প্রত্যাহার করতে চাইছে ? অন্যেরা আগেই স্বীকারোক্তি প্রত্যাহার করেছে, এখন সরকারপক্ষের হাতের শেষ ঘুটিটিও বানচাল হল।

আমার চেষ্টায় এতদিন পর্যন্ত স্বীকারোক্তিকারী আদালতের কাছে বলেছে—"পুলিশের কাছে যে স্বীকারোক্তি দিয়েছি তা প্রত্যাহার করলাম।" কিন্তু ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে দেওয়া স্বীকারোক্তিই আদালতে গৃহীত হয়, পুলিশের কাছে যে স্বীকারোক্তি দেওয়া হয় আদালতে বিচারকের কাছে তার কোনো মূল্যই নেই। S.D.O. মহাশয়ের কাছে লিপিবদ্ধ রাজদ্রোহীর যে স্বীকারোক্তিটি আমাদের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করবে বলে সরকারপক্ষ এতদিন আশা পোষণ করছিল তা স্বীকারোক্তিকারীর তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বরে মুহূর্তে মিলিয়ে গেল।

আমার চেষ্টায় যা এতদিন পুরোপুরি সম্ভব হয় নি তা সার্থক ও সফল রূপ নিল আনন্দের (আনন্দপ্রসাদ গুপ্ত) প্রভাবে। চন্দননগরের যুদ্ধ-প্রত্যাগত বালক আনন্দ আদালতে স্বীকারোক্তিকারীর সামনেই দাঁড়িয়ে। তার দেহে রিভলভারের গুলীর ক্ষতস্থান তখনও ব্যান্ডেজ করা। আনন্দের ব্যক্তিত্ব ও বন্ধুত্বের প্রভাব তারই মত আর একজন বালক স্বীকারোক্তিকারীকে প্রভাবান্বিত করেছে—দুর্বলতা জয় করে সে ঘোষণা করল—"আমি স্বীকারোক্তি প্রত্যাহার করছি।" সরকারী উকিল ও মামলার ভারপ্রাপ্ত পুলিশের Investigation Officer মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে নীরব রইলেন। নিরাপত্তার ভারপ্রাপ্ত এডিশনাল পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্ট মিঃ বি, জে, সুটার মনে ভাবলেন—এ যেন তাঁর ব্যক্তিগত পরাজয়—ক্রোধে অধর দংশন করে পরাভবের গ্লানিমুক্ত হতে চেষ্টা করলেন তিনি। অবশেষে ট্রাইব্যুনাল প্রেসিডেন্ট মিঃ জে, ইউনী গত্যন্তর নেই দেখে উদাস নয়নে স্বীকারোক্তিকারীর দিকে একবার তাকিয়ে তার Statement লিপিবদ্ধ করলেন—".. আমার স্বীকারোক্তি প্রত্যাহার করলাম।"

আকস্মিকভাবে শেষ স্বীকারোক্তিটিও প্রত্যাহৃত হল। সরকারী উকিল আবার তাঁর প্রারম্ভিক বক্তৃতা শুরু করলেন—

"In February, 1929, as has already been stated, a District Congress Committee was formed of which Surjya Sen became Secretary and Ananta Lal Singh, Ganesh Ghosh, Lokenath Bal, Ambica Chakravarty and Nirmal Sen became members. About the same time a Youth Association (Juba Samity) was formed with Ganesh Ghosh as

secretary (P. W. 149). About the same time also Ganesh Ghosh became the Secretary of the Sadarghat Physical Cultural Club.

"In March, a volunteer organisation was formed by these six ex-detenus. ...References to these parades of the volunteers are to be found in Ananta's report for March (Ex. 261 (4)). ...At the same time members of the students' committee were attracted by displays of physical feats given by Lokenath Bal and Ananta Singh. The former used to stop motor cars in motion and the latter used to twist iron rods.

"Thus by the end of March these six ex-detenus, by prominently associating themselves with every movement calculated to appeal to the youth of the town, and particularly the student community, had come into close touch with them and acquired manifold facilities for securing recruits to a secret revolutionary organisation of their own under the cloak of these ostensibly innocent activities.

"On 11th, 12th and 13th May, four conferences, viz., a District Congress Conference, a Youth Conference, a Student's Conference and a Ladie's Conference were held in the organisation of which these six ex-detenus took a leading part. Surjya Sen and Ganesh Ghosh were Secretaries of the District Congress and Youth Conference respectively while Lokenath Bal was President of the Reception Committee of the Student's Conference. Immediately before the conferences posters, bearing slogans such as 'Paradhinter Bedana' were exhibited at prominent places throughout the town. Starting with the invitation "Come come young men" and a quotation from Tagore "Shall the altar of the Goddess of Bondage remain erect for ever" goes on to state in extravagantly rhetorical language that to-day all over the world the youth have awakened like a dormant volcano to sweep away all existing evils and usher in a golden age, that the power of youth has changed the fate of China, has awakened new aspirations in the hearts of the Turks and has infused new life into the weak and decaying body of Russia and concludes with the moral "To-day your unhappy mother-land eagerly awaits the employment of energy slumbering in you. Join at once the Chittagong Youth Association which is the meeting place of all servants of the country."

"Inside the Conference pandal were displayed other placards bearing mottos of a similar character and one with the inscription *"Age Desh—para nyay ebang dharma"* (The country first and thereafter right and religion). On the 12th May the concluding portion of this motto was torn off. That day, the presidential speech was delivered by Mr. Subhas Bose, *its tenor being that he had faith in Mahatma Gandhi but he could not see how the country could be freed by non-violence.* The volunteers, wearing khaki khaddar shirts and shorts, were present in force at the Conference under the command of Ganesh Ghosh who was styled G.O.C. and wore a military uniform similar to that worn by Subhas Bose at the Calcutta Congress, 'Majors' Naresh Roy and Sudhir Chatterjee, 'Captain' Ananta Lal Singh and 'Lieutenant' Tripura Sen

"On the afternoon of the 12th the volunteers appeared armed with heavy cane lathis ... A case was instituted in which on 23.10.29 Ananta Singh was convicted and sentenced to undergo four month's rigorous imprisonment while Lokenath Bal, Naresh Roy and Tripura Sen were fined. ..On the 2nd March, 1929, Rohimdad (P.W. 307) ... noticed on the carrier of the cycle a book he thought resembled the 'Agnibina', stolen from his desk at the college two months previously. He challenged Ardhendu about it whereupon Ardhendu made off with the book leaving behind his cycle which Rohimdad deposited at Kotwali P.S. at the time of lodging his first information. That same evening Rohimdad and his two companions on their way home from Kotwali were set upon and beaten by Ganesh Ghosh, Lokenath Bal, Ananta Singh, Ardhendu Dastidar and two or three others. ... This incident and that of the conference indicate, according to the prosecution, the existence of a mentality prone to violence and that even then these ex-detenus had gathered round them a number of followers and were prepared to deal violently and summarily with anybody offering any kind of opposition to them, either individually or collectively.

"Then on the 15th September, 1929, a procession took place in honour of Jatin Das who had died shortly before in Lahore Central Jail. The procession was led by Ganesh Ghosh, Ambika Chakravarty, Lokenath Bal, Ananta Lal Singh, Surjya Sen, Nirmal Sen and others. The processionists carried banners bearing inscriptions such as '*Bir Jatindranather Mahaprayan*' (Death

(of the hero Jatindra Nath): '*Du paye dale gelo maran shankare sabare deke gelo shikal jhankare*' (he trampled upon death and gave a call to all to rise), and raised shouts of 'Bande Mataram', 'Long live Revolution, Down with Imperialism', 'Up with Revolution', etc. The procession was followed by a meeting in the compound of the J. M. Sen Hall which was addressed by several speakers including Lokenath Bal, Ananta Lal Singh and Ganesh Ghosh who seized the opportunity to inflame the minds of their youthful listeners. Lokenath Bal said that the bloody memory of Jatindra Nath had raised a fire in their hearts for the destruction of the *British Government.* There could never be any co-operation with them. Ananta Singh said: "Our blood boils at fever pitch—the oppressive Government had killed him', and Ganesh Ghosh's contribution was 'Let the blood of Jatin Das, flowing in our veins, create the strength of hundreds and thousands of Jatin Dases and strike terror in the heart of the tyrannical Government" (P.Ws. 149, 150 and 270). Two photographs of Jatin Das in uniform were found, as we shall see, at the Congress office, one of them bearing underneath it the lines,

A soldier's life is the life for me;
A soldier's death; so India's free."

"A few days later on the 21st September a meeting was held in the J. M. Sen Hall for the election of office-bearers of the District Congress Committee. On the day of the meeting Surjya Sen and his supporters arrived first and packed the hall. After the meeting fresh trouble ensued on the road and hearing of it Abdul Azim, S.I., proceeded to the Congress office, where he found Ganesh Ghosh, Ambika Chakravarty, Ananta Lal Singh, Tripura Sen, Naresh Roy, Bidhu Bhattacharji and outside on the road and in the neighbouring field some 300 Hindu youths, all armed with lathis. They

found Sukhendu Bikash Dutta lying seriously wounded. Sukhendu was stabbed by some one. Azim sent Sukhendu to hospital. They called their supporters who formed up in the road in two rows and under Azim's direction deposited their lathis in the Congress office and proceeded to their homes. A considerable number of these youths had come in from villages outside the town. Sukhendu subsequently died of his injuries.

"These September incidents, according to the prosecution, afford us glimpses of the mentality of Ganesh Ghosh, Ananta Lal Singh, Surjya Sen etc., of their increasing tendency to violence for the crushing of any opposition offered to them and their increasing following among the youth of the town.

"From the beginning of 1930 the activities and movements of the six ex-detenus and their associates began to increase in a manner which intensified the suspicions of the police. They were seen to be constantly meeting together at all hours of the day at Ganesh Ghosh's shop, the Congress office, and the Sadarghat Club and also moving about the town either on foot or in Ananta Lal Singh's Baby Austin Car No. 24666. Elaborate arrangements were made by the D.I.B. Staff for watching their movements. Members of the Party were seen from time to time wearing different styles of dress, sometimes khaki uniform, sometimes European dress and sometimes Indian dress. It was noticed also that youths were being deputed to watch the houses of the D.I.B. officers and note their movements by way of counter-espionage. The D.I.B. Inspector Sarada Bhattacharji spoke to several parents and guardians about the undesirability of allowing their boys to abandon their studies and spend their days associating with these six ex-detenus. On the 27th February, Ganesh Ghosh and Ananta Singh, accompanied by Jiban Ghoshal and Bidhu Bhattacharji, came to Sarada Babu and remonstrated with him for warning guardians against them (P.Ws. 70, 220 and 149).

"... Next we come to the 14th March (Doljatra day). Until then Ramkrishna Biswas had been living in Chittagong at the house of his brother-in-law ... Some minutes later, she (Ramkrishna's sister) heard a noise in her uncle's room and hastening there found Ramkrishna with his face and hands and chest all burnt and the room filled with smoke. Half an hour later four or five youths came to the house and carried Ramkrishna off in a motor car. The next evening about 6 p.m. Ganesh Ghosh arrived in a Baby Austin car at the house of Dr. Jogada Biswas (P.W. 170) and asked him to attend a case of burning injuries. The circumstances in which Ramkrishna's injuries were caused, his hasty removal from his brother-in-law's house and concealment in one house after another in different parts of the town, the arrangements made for his medical treatment and nursing by Ganesh Ghosh and his associates, his subsequent complete disappearance, all indicate according to the prosecution, that Ramkrishna had been injured while engaged in a criminal activity on behalf of the party, viz., the preparation of a bomb.

"On the 5th April Azim called Ganesh Ghosh, Ananta and Bidhu Bhattacharji, to Kotwali P.S. and questioned them about Ramkrishna's whereabouts. They came accompanied by Naresh Roy and Lokenath Bal. From Kotwali Ganesh, Ananta, Lokenath and Naresh Roy went on to the D.I.B. Inspector and questioned him regarding the policy of the Government towards them (P.Ws. 70 and 314).

"Then on the 8th April ... a complaint to the Deputy Superintendent of Police (P. W. 52), which was treated as a first information (Ex. 46) and a case under Section 380 I.P.C., was instituted against Fakir. Abdul Azim searched for Fakir at Ganesh Ghosh's house, Sadarghat Club and many other places in the town but could get no trace of him. On the 17th April printed leaflets with the heading *Chattal Bashider Prati* (to the people of Chittagong) and the names of Surjya Sen, Ambika Chakravarty and Ganesh Ghosh as signatories were distributed in the town. The following morning Abdul Azim obtained one from Ganesh Ghosh (Exh. CDLV 4). The leaflet states that the trumpet-call of independence has been heard throughout the land, and on every side the war of civil disobedience has commenced, that it is a matter of regret and shame that Chittagong, the pioneer of the independence movement in 1921 should lag behind in the struggle; and that about a month previously a Satyagraha Committee had been formed for the purpose of disobeying the Salt Law.

"'We shall wait some days more', the leaflet goes on, 'to see what that committee does'. But in Calcutta and other places disobedience of laws

other than the Salt Law—for example, the law of sedition—has begun. We want to commence disobedience of the sedition law in Chittagong also without delay.

" 'For this purpose we require the sympathy of the public of all classes—we want Satyagrahi soldiers. We hope the public will help us with men and money. Those willing to be volunteers should see any of the undersigned by the 21st April next'."

সরকারী উকিল অবশেষে বাকচাতুর্যের অভিব্যক্তি দিয়ে তাঁর বক্তৃতা শেষ করলেন—

"...The six ex-detenus having extraordinary organising ability successfully evaded the elaborate watch system of the police, and ultimately with the full advantage of the diversionary leaflet purporting the disobedience of the Sedition Law on the 21st April, they actually a few days before, on the 18th April, broke the criminal law of the country as they rose in arms to raid against the police and AFI Head quarters, as well as destroyed the communication system to isolate the town."

মামলার সূচনায় পাবলিক প্রসিকিউটার আমাদের সংগঠন, কর্মধারা ও বিভিন্ন ষড়যন্ত্রের আদ্যোপান্ত বৃত্তান্ত তাঁর বক্তৃতার মাধ্যমে যেরকম ধারাবাহিকভাবে উপস্থাপিত করেছেন তারই সারাংশ ট্রাইব্যুনালের প্রেসিডেন্ট তাঁর জাজমেন্টে উল্লেখ করেছেন। পাবলিক প্রসিকিউটার খাঁ সাহেব আব্দুল সত্তর আমাদের দলের ইতিহাস বলতে গিয়ে ১৯২১-২২ সাল থেকে শুরু করেছিলেন। পড়ইকোরা ডাকাতি, রেলের টাকা লুঠ, নাগারখানা পাহাড়ের যুদ্ধ, সুলুকবাহার ষড়যন্ত্র, আমাকে গ্রেপ্তারের অপরাধে আই-বি সাব-ইন্সপেক্টার প্রফুল্ল রায়ের হত্যা, আমাদের বিরুদ্ধে ১৯২৪ সালের মামলা, তারপর Bengal Ordinance-এর প্রয়োগ, প্রভৃতির সুদীর্ঘ বর্ণনা তিনি দিয়েছেন। সেই সবকিছু লিখতে গেলে রচনাটির কলেবর অত্যন্ত বৃদ্ধি পাবে, তাই আমি আবার তার উল্লেখ করতে চাইলাম না। যুব-বিদ্রোহের প্রস্তুতিপর্ব ১৯২৯ সালের ফেব্রুয়ারী মাস থেকে যে গতিপথে চলেছে এবং ইংরেজ সরকার যেভাবে বা যে দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে দেখেছে তার কোনো ব্যতিক্রম না করে তাদেরই দলিল থেকে তা উল্লেখ করলাম।

সরকারের বক্তব্য—(১) আমরা ছ'জন—মাস্টারদা, অম্বিকাদা, নির্মলদা, লোকনাথ এবং আমি ও আমার বন্ধু গণেশ ঘোষ জেল থেকে বেরিয়ে জেলা-কংগ্রেস ছাত্র-সঙ্ঘ, যুব-সমিতি, শরীরচর্চার ক্লাব ও ভলান্টিয়ার দল গড়ে তুলি; (২) আমরা সন্দেহাতীতভাবে ছাত্র-যুবকদের নিয়ে সঙ্ঘ, সমিতি প্রভৃতি গড়ে তুলে এমন একটা পরিবেশ সৃষ্টি করেছিলাম যার মাধ্যমে বিপ্লবী যুবকদের আকৃষ্ট করতে সমর্থ হই। (৩) ১৯২৯ সালের মে মাসে চট্টগ্রামে জেলা-কংগ্রেস কনফারেন্স এবং সেই সঙ্গে ছাত্র, যুবক ও মহিলা কনফারেন্সও অনুষ্ঠিত হয়। সেই সব কনফারেন্সের সুযোগ নিয়ে আমরা বিভিন্ন প্রচারপত্র মারফৎ ছাত্র ও যুবকদের বৈপ্লবিক প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করেছি। (৪) 'আগে দেশ পরে ন্যায় ও ধর্ম'—এইরূপ শ্লোগান লিখিত পোস্টারে কনফারেন্স প্যান্ডেল সাজিয়েছি আমরা। কনফারেন্স প্রেসিডেন্ট সুভাষ বোস গান্ধীজীর অহিংস নীতির সমালোচনা করেছেন এবং G.O.C. গণেশ ঘোষের কম্যান্ডে সেই সব কনফারেন্সের শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। (৫) এই সব কনফারেন্সে খুব গোলযোগ হয় এবং আমরা বিপক্ষ দলের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হই। আমাদের মধ্যে কারও কারও বিচারে সাজা হয়েছে। (৬) রহিমদাদ আমাদের বিরুদ্ধে একটি Proscribed পুস্তক নিয়ে প্রতিবাদ করতে চেষ্টা করেছিল বলে তাকে লাঠিপেটা করি এবং এইভাবে চট্টগ্রামবাসীর মনে বিভীষিকার সৃষ্টি করি যে আমরা কোন বিপক্ষ দলকেই সহ্য করব না। (৭) লাহোর জেলে দীর্ঘ অনশনের পর যতীন দাসের মৃত্যু ঘটে। সেই উপলক্ষে আমরা চট্টগ্রামে আলোড়ন সৃষ্টি করি এবং এই প্রথম চট্টগ্রামের রাজপথ প্রকম্পিত করে শ্লোগান তুলি—"Long live Revolution, Down with Imperialism, Up with Revolution, etc. etc." (৮) কিছুদিন পর যাত্রামোহন হলে জেলা-কংগ্রেসের কার্যনির্বাহক কমিটির নির্বাচন সমাধা হয়। এই নির্বাচন-দ্বন্দ্বে বিপক্ষ দলের সঙ্গে আমাদের প্রচণ্ড সংঘর্ষ হয়; আমাদের সাথী সুখেন্দু দত্ত বিপক্ষ দলের কারও ছুরিকাঘাতে প্রাণ হারায়। এই অভিযোগে জাজকোর্টে জুরীদের সামনে অনেকের বিরুদ্ধে বিচার শুরু হয়। তবু আমরা তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষী দিতে যাই নি; কারণ, ১৮ই এপ্রিল যুব-বিদ্রোহের প্রস্তুতির ব্যাপারে আমরা লিপ্ত ছিলাম। (৯) সুখেন্দুর শ্রাদ্ধবাসরে কেবল আমরা ক'জন মিলিত হই—অন্যান্য কেউই সেখানে উপস্থিত ছিল না। (১০) ১৯২৯ সালে ২৪শে ডিসেম্বর (খুব সাধারণ ঘটনা হলেও সরকারপক্ষ এর উল্লেখ করেছে) নরেশ ব্যানার্জীকে গণেশ ঘোষের দোকান থেকে এসে হঠাৎ আমরা আক্রমণ করেছি (পুলিশের গুপ্তচর সন্দেহে তাকে প্রহার করা হয়েছিল)। (১১) ১৯৩০ সালের প্রথম থেকেই আমাদের কার্যক্রম ও তৎপরতা বেড়ে যায়। ঘোড়ায় চড়া, মোটর চালানো প্রভৃতি আমরা পুরোদস্তুরভাবে শুরু করি। পুলিশের ওপরেও আমাদের কড়া নজর ছিল। কোনো কোনো পুলিশ অফিসারের বাড়ি গিয়ে তাঁদের শাসিয়ে আসি যেন তাঁরা আমাদের পেছনে না লাগেন। (১২) 'অসির চাইতে মসীর শক্তি অনেক বেশি'—এই বিষয়ে স্কুলে বিতর্ক সভা ডাকা নিয়ে আমাদের সাথীদের সঙ্গে বিপক্ষ দলের কলহ ও মারামারি হয়। আমাদের দল লেখনী অপেক্ষা তরবারির প্রাধান্য অনেক বেশি—এটা প্রমাণে সচেষ্ট ছিল। দুই পক্ষ থেকেই মামলা রুজু করা হল। গণেশ ঘোষের প্রভাব পুলিশ বুঝতে পারলো যখন তার এক কথায় যুবক সাথীরা থানা অফিসারের কাছে উপস্থিত হল।

এই সব তথ্য ধারাবাহিকভাবে সাজিয়ে সরকারপক্ষ বলতে চাইল যে, আমরা হিংসাত্মক কার্যকলাপে ব্যস্ত ছিলাম এবং শেষ পর্যন্ত যুব-বিদ্রোহ সম্ভব করে তুলেছি।

[ক্রমশঃ]

আপনিও পাইতে পারেন

আমাদের অতি জনপ্রিয় মিনী—৬৮ পোর্টেবল ৩ ব্যান্ড অল ওয়ার্ল্ড ট্রানজিস্টার যাহা এখন ৩২ টাকায় মাসিক সহজ কিস্তিতে দেওয়া হইতেছে। সারা ভারতে অর্ডার বুক করিয়া কমিশনও অর্জন করুন।

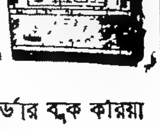

J. L. SANSON & CO.
P.B. 1288, (W.B.C.) Delhi-6.

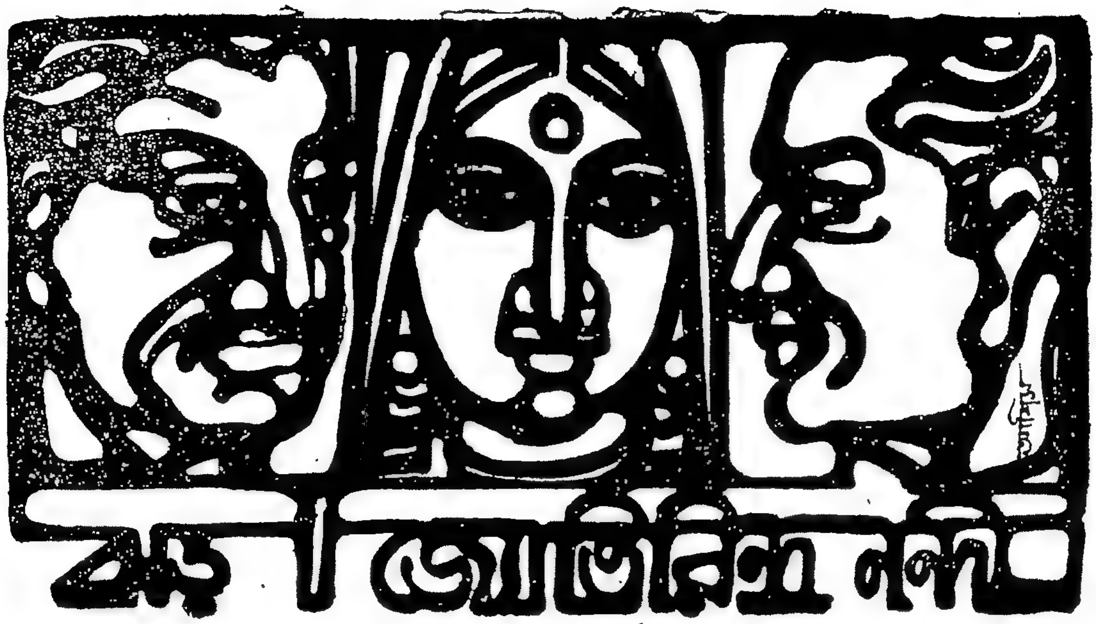

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর

দূরে পাশাপাশি দুটো দেবদারুগাছ দাঁড়িয়ে আছে, দুটো গাছের মাঝখান দিয়ে সূর্যটা নেমে যাচ্ছে। এখন আর তেজ থাকবে কী। তা-ও শীতের সূর্য। বেলা বারোটা পর্যন্ত যা একটু ঝলমল করে, খানিকটা জ্বালাপোড়া থাকে—তারপর থেকে কেমন একটা ফ্যাকাশে কমলা রং ধরে। যেন তাপ কমে যায়, ভিতরের আগুন মিইয়ে আসে। এখন তো কথাই নেই। অস্ত যাবার মুখে। তবে কি না যাবার সময় মিষ্টিমতন যে লাল আভাটুকু ছড়িয়ে যাচ্ছিল তাকিয়ে দেখবার মতন। আর সেই নরম আলোয় ঘাস লতাপাতা গাছের ডাল—সব কিছুই যেন লাল হয়ে উঠেছিল।

বাঁশের সাঁকোটাকেও লাল করে দিয়েছিল।

দেবদারুগাছ দুটোর দিকে মুখ করে তিনজন একটা ছোট ঢিবির ওপর বসে বিশ্রাম করছিল। কাজেই মাধবের দিদির মুখের অত্যধিক ফরসা চামড়া সেই লাল আভা লেগে কেমন রং ধরেছিল সেটা বোঝা যায়। তেমনি মাধবের মাথার লালচে চুল। যেন আর এক পোঁছ লাল রং লেগে মাথাটা হোলি খেলার দিনের মাথা হয়ে গিয়েছিল।

সীতাংশু নিজের হাতের দিকে তাকাল। আঙুলগুলি দেখল। তার চামড়া ফরসা না। তা হলেও বিকেলের চমৎকার আলো লেগে আঙুলের নখগুলি বেশ একটু লাল রং ধরেছে।

কিন্তু কতক্ষণ থাকল এই আবির ছড়ানো খেলা। টুপ করে সূর্যটা ডুবে গেল। দেখতে দেখতে আকাশ পৃথিবী কালো হয়ে গেল। ভাল করে না তাকালে সাঁকোটা যেন আর চোখেই পড়ছিল না। দেবদারুগাছের ওপারের আকাশের সিঁদুরে রংটুকু যখন একেবারে মুছে গেল তখন গাছপালা সব কেমন ঝাপসা হয়ে গেল।

একটু আগে সুখী, তখনও বেশ আলো ছিল, একা একা সাঁকোটা দুবার এ-পার ও-পার হয়েছে। এমনি। ছেলেবেলায় না কি তার সাঁকো পার হতে খুব ভাল লাগত। বাবার হাত ধরে সাঁকো পার হয়েছে, বাবার সঙ্গে পিয়ালীছড়ার মেলায় গেছে, রাণীরবাগের চা বাগানও দেখে এসেছে একবার। বড় হয়ে আর সাঁকো পার হয় নি।

সাঁকো দেখতেই ভাইয়ের সঙ্গে এসেছিল সে। সকালে ভাইয়ের চুল ধরে টেনেছিল। কালাকে খেজুর ঢিবিতে ছেড়ে দিয়ে এসেছিল বলে তার খুব দুঃখ হয়েছিল। রাগও হয়েছিল, এইজন্য ভাইকে মারতে গিয়েছিল। কিন্তু তারপর অবশ্য রাগটা আর থাকে নি। শত হোক ছোট ভাই। বরং সীতাংশুকে নিয়ে নালার ধারের বেতজঙ্গলে উদ ধরতে যাবে শুনে দুপুরে সে খুব হেসেছিল। হঠাৎ তার এই হাসি দেখেই সীতাংশু বুঝতে পেরেছিল মাধবের দিদি রাগ করে খুব বেশি সময় থাকতে পারে না, রাগটা আপনা থেকে এক সময় জুড়িয়ে জল হয়ে যায়। তাই তো হবে, মনে মনে বলেছিল সীতাংশু, মানুষটার ভিতরটা মায়া মমতায় ভরা, কিন্তু মমতা দেখাবার মতন তেমন কাউকে পেল না বলে আজ সীতাংশুর এখানে চাকরি করতে এসেছে।

হুঁ, উদ ধরবার কথা শুনে হেসে গড়াগড়ি যাবার মতন অবস্থা তখন মাধবের দিদির। উদ যে পোষ মানে এই কথাটায় মাধব তার দিদিকে বিশ্বাস করাতে পারছিল না। নালার কাছে বেতজঙ্গলে উদের বাসা আছে। মাধব নিজের চোখে দেখে এসেছে। ফাঁক পেলেই জঙ্গল থেকে বেরিয়ে নালার মধ্যে নেমে পড়ে ওরা। সেখানে মাছ ধরে খায়। দিদিকে সে অনেক কিছু বোঝাচ্ছিল। কাজেই যদি একটা উদের ছানা ধরে এনে ওটাকে রোজ একটু একটু করে মাছ খেতে দেওয়া হয় তো সেই ছানা পোষ মেনে যাবে কোথায়। মাধব আরও বলছিল, যদি বাঘ সিংহের বাচ্চাকে বন থেকে ধরে এনে লোকে পোষ মানাতে পারে তো উদের বাচ্চাকেও পোষ মানান যাবে, বরং সেটা সহজ হবে, বাঘ সিংহের মতন ওরা মানুষ ধরে খায় না ইত্যাদি।

যাই হোক, হয়তো ভাইয়ের কথা শেষ পর্যন্ত সুখী বিশ্বাস করেছিল, কিন্তু মুখে বলছিল, সাঁকো দেখতে সে তাদের সঙ্গে যাবে, কথাটা বলার সময় সীতাংশুর দিকে মুখ ঘুরিয়ে সে সুন্দর করে হেসেছিল। পাহাড়ি খাতের ওপর সেই সাঁকোটা কতদিন সে দেখে নি। শুনে সীতাংশু খুশি হয়েছিল।

দুপুরে আজ মাধব ও তার দিদি সীতাংশুর এখানেই ভাত খেয়েছে। সীতাংশু দুজনকে বাড়ি যেতে দেয় নি। কেন না পীতাম্বরের সেই ঘটনার পর সীতাংশুর জন্য রান্না চাপাতে যখন অনেক বেলা হয়ে গেল তখন সীতাংশু মাধবের দিদিকে ও মাধবকেও তার এখানে খেতে বলল এবং সেভাবেই মাধবের দিদিকে রান্না করতে বলল, এত বেলায় বাড়ি ফিরে গিয়ে

তারা কখন খেত। তাতে অবশ্য মাধবের দিদি আপত্তি করে নি, কিন্তু প্রথমটায় খুবই সঙ্কুচিত হয়ে পড়েছিল, তারপর সঙ্কোচটা আস্তে আস্তে কাটিয়ে ওঠে। সীতাংশুর এখানে ভাত খাবে শুনে মাধব অবশ্য খুবই খুশি হয়েছিল।

যাই হোক, খেতে বসেই সুখী মাধবের উদ শিকারে বেরোতে যাবার কথাটা প্রথম শোনে। শুনে সে হেসেছিল যেমন, অবাকও কম হয় নি। মাধব ছেলেমানুষ, শেয়াল বানর কাঠবিড়াল কত কী ধরে পুষবার পরিকল্পনা রাতদিন তার মাথায় ঘুরে বেড়ায়, সুতরাং উদের চিন্তাটাও যদি সেই সঙ্গে এসে জোটে তো তাকে দোষ দেওয়া যেত কি, কিন্তু এই ব্যাপারে যে সীতাংশুর মতন একটি বয়স্ক মানুষের পুরো সমর্থন রয়েছে সেটাই মাধবের দিদির কাছে অদ্ভুত ঠেকছিল। সীতাংশুকে এই নিয়ে সরাসরি কোন প্রশ্ন করছিল না, কিন্তু তার তাকানো দেখে সীতাংশু মনের ভাবটি বুঝতে পেরেছিল। এবং সাঁকো দেখার নাম করে যুবতী যে শেষ পর্যন্ত তাদের সঙ্গে চলে এল, নিশ্চয় সীতাংশু সম্পর্কে কৌতূহলটা দমন করতে পারছিল না সে, হুঁ মাধবের সঙ্গে বেতঝোপের ভিতর ঢুকে পড়ে এতবড় মানুষটা কেমন করে উদ ধরে একবার দেখতে দোষ কি— এই জন্য সীতাংশুও ভিতরে ভিতরে কম কৌতুকবোধ করছিল না।

কিন্তু কোথায় উদ, এতটা সময় মাধব জঙ্গলের ভিতর উঁকিঝুঁকি মারছিল, অর্থাৎ কোথাও একটু ফাঁক, কোথাও ঝোপটা একটু পাতলা আছে দেখলে খানিকটা খানিকটা ভিতরেও ঢুকে পড়ছিল সে, কিন্তু জঙ্গল এত গভীর এবং কাঁটার দাঁত মেলে বেতগাছগুলি এমনভাবে গলা বাড়িয়ে আছে—একটু অসাবধানে পা বাড়াও কি ঝাড় ফেরাও, চারদিক থেকে বেতকাঁটা বিঁধে গায়ের চামড়া ঝাঁঝরা করে দেবে। কাজেই মাধবের পিছনে থেকে সীতাংশু অবিরাম তাকে সাবধান করে দিচ্ছিল, এই আর না, আর ভেতরে ঢুকতে হবে না—উঁহু ওখানে সাপ আছে, বিছা আছে, ওদিকে গেলে পাগলা শেয়ালে কামড়ে দেবে...' কিশোরের দুরন্ত সাহস খর্ব করে দিতে যতরকম ভয়ের জিনিস আছে সীতাংশু ক্রমাগত সেগুলি উল্লেখ করছিল। কিন্তু তাতেও কি মাধবকে নিবৃত্ত করা যেত, আরও খানিকটা ভিতরে ঢুকে পড়ত সে, কিন্তু কাঁটার জন্য শেষ পর্যন্ত পিছনে হটে এসেছে। নাকে কপালে হাতে পায়ে কাঁটার আঁচড়ও কম লাগল না। 'তবে কি না, মস্ত একটা ভুল হয়ে গেছে বাবু।' জঙ্গলের বাইরে এসে সে বলছিল, 'তখন মোটেই খেয়াল করি নি।' 'কি আবার মস্ত ভুল হল?' একটু থমকে গিয়ে সীতাংশু মাধবের চোখের দিকে তাকিয়েছিল। গম্ভীর হয়ে কিশোর মাথাটা একপাশে হেলিয়ে দিয়েছিল। 'আঃ, একবার যদি কথাটা মনে পড়ত—' বিড়বিড় করে উঠল সে। 'আমার কাছে বলুন না, যদি এখন ব্যবস্থা করা যায় কিছু।' সীতাংশু ঠিক হাসতে গিয়েও হাসতে পারছিল না। পাতার ওপর তখনও কিছু কিছু রোদের ছিটা লেগে আছে, কিন্তু জঙ্গলের ভিতর চাপ চাপ অন্ধকার জমে উঠেছে। শীতের শুকনো হাওয়ায় বেতঝোপ সরসর করে কাঁপছিল।

'একটা কাটারি সঙ্গে আনলে আর ভাবনা ছিল না। আপদ কেটে সাফ করে দিতাম।' মাধব ফোঁস করে একটা নিশ্বাস ফেলল।

'হুঁ, তা হলে খুবই সুবিধে হত, ভেতরে ঢুকে পড়া যেত।' মাধবের আক্ষেপের কারণটা সীতাংশু বুঝতে পারল। 'তা এক কাজ করলে হয় না।'

তার কৌতুকটা কিশোর হঠাৎ বুঝতে পারল না, ফ্যালফ্যাল করে সীতাংশুর মুখটা দেখল। বস্তুত এই ভয়ংকর কাঁটা-ঝোপের ভিতর ঢুকে একটা উদের বাচ্চা ধরে ফেলার আশা নিয়ে এখনও যে সে জ্বলছিল তার চোখ দেখে সীতাংশু বুঝতে পারল। আস্তে আস্তে বলল, 'এক কাজ করলে হয়, ছুটে গিয়ে ঘর থেকে আমার কাটারিটা নিয়ে এলে হয়।'

'আমি চলে যাব!' কিশোর লাফিয়ে উঠল।

'পাগল!' সীতাংশু তার কাঁধ চেপে ধরল। 'এখন গিয়ে কাটারি নিয়ে ফিরে আসতে আসতে রাত হয়ে যাবে যে।'

এবার কিশোর দমে গেল। চোখ তুলে আকাশ দেখল। ঘাড় ঘুরিয়ে দেবদারু গাছ দুটো দেখল। রোদের শেষ ঝিকিমিকিটুকু মুছে দিয়ে সূর্যটা কত তাড়াতাড়ি ডুবে যাচ্ছে।

'ঠিক আছে।' ঠোঁট দুটো হঠাৎ শক্ত করে চেপে ধরল বালক। মাটির দিকে চোখ নামিয়ে এক সেকেণ্ড ভাবল। তারপর মাথা ঝাঁকিয়ে সীতাংশুর মুখের ওপর জ্বলজ্বলে চোখ দুটো মেলে ধরল। 'আজ আর হল না—কাল, কাল কাটারিটা সঙ্গে করে আনব, তারপর দেখা যাবে বেত-কাঁটা কেমন আমার পথ আটকায়।'

স্তব্ধ হয়ে রইল সীতাংশু। যেন খুঁটকুন ছেলের কানে কানে কেউ বলে দিয়েছে, আশা ছাড়তে নেই, আশা নিয়ে বাঁচতে হবে, আজ যদি না পার কাল আবার দেখো।

'হুঁ, তাই হবে।' আর কৌতুক করল না সে। গাঢ় গলায় বলল, 'কাল কাটারি নিয়ে আসব, একটা মশালও সঙ্গে আনব। অন্ধকার হলেও আমরা ঠিক ভেতরে ঢুকে পড়ব।'

সেইমুহূর্তে সুখী সাঁকো থেকে নেমে এসে দুজনের পিছনে দাঁড়ায়। যেন সে আশা করেছিল একটা উদের বাচ্চা ধরে তারা তার জন্য অপেক্ষা করবে। কিন্তু দুজনকে শূন্যহাতে জঙ্গলের কিনারে শুকনো মুখ করে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ব্যাপারটা চট করে বুঝে ফেলল। হয়তো হতাশই হল সে, বলা যায় না, বুদ্ধিমতী মনের ভাবটা পুরুষ দুটিকে বুঝতে না দিয়ে খুক করে হাসল।

হাসি শুনে মাধব ও সীতাংশু চমকে উঠে ঘাড় ফেরাল। যুবতী এভাবে তাদের দিকে তাকিয়ে হাসছে কেন, সঙ্গে সঙ্গে তারা ধরে ফেলল বৈকি। কিন্তু মাধব বেপরোয়া ছেলে, লজ্জাটজ্জা জানে না। সীতাংশুর কান দুটো লাল হয়ে উঠল।

'পারলেন না একটাও ধরতে?' সুখী সরাসরি তার চোখের দিকেই প্রথম তাকাল।

'হুঁ, খুবই চেষ্টা করা হয়েছে।' রীতিমত থতমত খেয়ে বড় করে একটা ঢোক গিলল সীতাংশু, যেন তারপর কী বলতে হবে বুঝতে না পেরে চোখ আড় করে মাধবের দিকে তাকাল।

মাধবের মুখে উত্তর তৈরি ছিল। আকাশের দিকে মুখ করে বেশ গম্ভীর গলায় বলল, 'না পারার আছে কী, ভুল

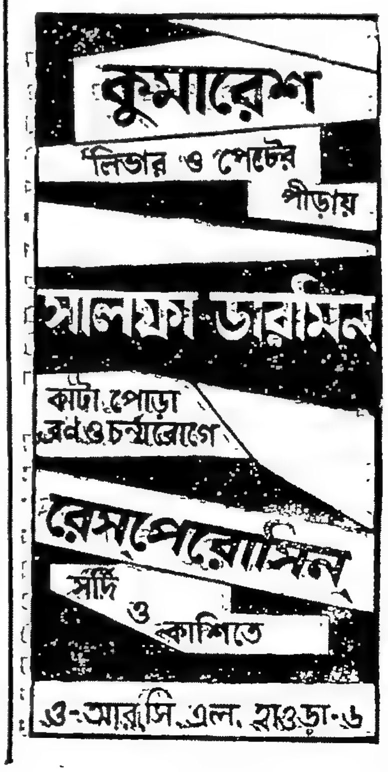

ঘুরে কাটারিটা আনা হয় নি। তা না হলে, একটা কেন, তেনটে বাচ্চা ধরে আনা যেত।'

'কি রকম?' এবার সুখী থতমত খেল। ঢোক গিলল। 'কাটারি দিয়ে কী হত!'

'জঙ্গল কেটে আরো খানিকটা ভেতরে ঢোকা যেত।' সীতাংশু এবার অনেকটা সহজ গলায় বলল, 'কাঁটার জন্যে এগোনো যাচ্ছিল না।'

'তাই বলুন!' সুখী আবার একটু হাসল। 'আমি ভাবলাম কাটারি দিয়ে বুঝি ধাড়িগুলোকে কেটে ফেলে বাচ্চা-গুলোকে ধরে আনতেন। মানে হাতে অস্ত্র থাকলে ওদের ধরা সহজ হত।'

দিদি ঠাট্টা করছে। এবার মাধব চট করে বুঝল। কিন্তু গায়ে মাখল না, যেন মেয়েছেলে এসব শিকার-টিকারের কিছু বোঝে না, তাদের দিয়ে তো কোনো সাহায্যই হয় না, বরং সঙ্গে থাকলে তারা আবোল-তাবোল বকে—চোখে-মুখে একটা উপেক্ষার ভাব ফুটিয়ে দিদির দিকে সে সম্পূর্ণ পিছন ফিরে দাঁড়াল।

এক কাজ করলে হয় বাবু।'

'কী কাজ।' সীতাংশু সঙ্গে সঙ্গে স্তব করল।

'এটা উত্তর, কাল আমরা আর ইদিক দিয়ে জঙ্গলে ঢুকবো না, পুব দিক দিয়ে ঢুকতে চেষ্টা করব।'

'ওদিকে ঝোপঝাড় কম বুঝি?'

'আমার যেন তাই মনে হল।'

'তবে তাই করব।' এক সেকেন্ড থেমে থেকে গলায় আর একটু বেশি জোর দিয়ে সীতাংশু বলল, 'হুঁ, তাই আমাদের করতে হবে।

এবার মাধব বীরদর্পে দিদির দিকে ঘুরে দাঁড়াল, চোখ বড় করে দিদিকে দেখল, দিদির হাসি ও ঠাট্টা সীতাংশুও যে গায়ে মাখল না বরং একটি ছোট ছেলের উৎসাহ দেখে তার মতন একটি বয়স্ক মানুষের মধ্যেও উৎসাহ জেগে উঠেছে, কাল আবার মাধবকে নিয়ে সে উদ শিকার করতে আসবে—চিন্তাটা কিশোরকে গর্বিত করে তুলল। হয়তো এই গর্ব নিয়ে সে হেসে উঠে দিদিকে বলল, 'আমরা আমাদের কাজ ঠিক করে যাব, এখন সাঁকোর ওপর তোর কেমন লাগল শুনি, অনেকক্ষণ তো ছিলি?'

অন্য সময় হলে ভাইয়ের পাকামি দেখে সুখী হাসত। কিন্তু বেতঝোপের ভিতর থেকে উদ খুঁজে বার করাব ব্যাপারটা হঠাৎ কেমন যেন জব্দ করে দিল তাকে। যেন সে আশা করতে পারছিল না একটা বাচ্চা ছেলেব খেয়ালখুশির সঙ্গে তাল রেখে সীতাংশু তার সুরে সুর মিলিয়ে এভাবে হুঁ হ্যাঁ করবে। আজকের এই শিকার পর্বটা প্রথম থেকে সুখীর কাছে কৌতুকের মতন ঠেকছিল, নিশ্চয় সীতাংশুর মনের ভাবও অনেকটা তাই হবে ধরে নিয়েছিল সে, কেবল মাধবের মন রাখতে সীতাংশু তার সঙ্গে নালার ধারে চলে এসেছে হয়তো, যেমন সুখী এসেছে, বেড়ানো হবে সাঁকো দেখা হবে—কিন্তু মাধবের মতন উদ ধরার চিন্তা নিয়ে এত বড় মানুষটাও যে মেতে উঠবে সুখীর ধারণা ছিল না। কাজেই অপ্রস্তুত হল সে, লজ্জা পেল এবং ছোটভাইয়ের প্রশ্নের কোনো উত্তর না দিয়ে চুপ করে দুটো দেবদারুগাছের ফাঁকে সূর্যাস্তের ছবিটা দেখতে লাগল।

যুবতীর এই স্তিমিত ভাবটা সীতাংশু লক্ষ্য করল। একটু কষ্ট হল তার মেয়েটির জন্য। তাইতো, হাসিখুশি মানুষ যদি হঠাৎ বিষণ্ণ হয়ে ওঠে, চুপ করে থাকে তো যারা ধারেকাছে থাকে তাদের খুব খারাপ লাগে। একটু জোর করে হেসে মাধবের দিদির মুখে হাসি ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করল সীতাংশু।

'কৈ, দুবার সাঁকো পার হলে, কেমন লাগল বললে না তো!'

সুখী সামান্য হাসল, কিন্তু বড় শুকনো দেখাল তার হাসি। 'মন্দ না।' সংক্ষেপে উত্তর সেরে পায়ের কাছের ঢিবিটার ওপর আস্তে আস্তে বসে পড়ল সে। বেশ একটু ক্লান্তি এসেছে তার বোঝা যাচ্ছিল। দেখাদেখি সীতাংশু ঢিবির একপাশে বসল। মাধবও বসল।

না, তারপর আর উদ শিকারের বিষয় নিয়ে একটা কথাও বলল না তারা। সীতাংশু ইচ্ছা করেই প্রসঙ্গটা উঠতে দিল না। কাজেই মাধবও চুপ করে রইল তারপর, যতক্ষণ না সূর্য ডুবে আকাশ বন অন্ধকার হয়ে গেল, সীতাংশু ও সুখী শুধু এই নালার গল্পই করল। বড় গভীর এই পাহাড়ি খাদ। দুধারে আশস্যাওড়া ও বাবলার জঙ্গল নিয়ে পাড় দুটো এত খাড়া হয়ে নেমে গেছে—সাঁকোর ওপর থেকে নিচের দিকে তাকালে, একমাত্র সাঁকোর ওপর থেকেই ভিতরটা যা হোক তবু কিছু চোখে পড়ে, তা-ও দিনেব বেলা, তাছাড়া সব সময়ই সেখানটা অন্ধকার, কান পাতলে জলের একটা ক্ষীণ শব্দ শোনা যায় শুধু—হুঁ, সাঁকোর ওপর দাঁড়িয়ে নিচের দিকে তাকালে রীতিমত ভয় করে, মাথা ঝিমঝিম কবে—লোকে পাতালেব কথা বলে, মনে হয় ঐ বুঝি পাতাল, পাতালের দিকে চেয়ে আছি, জলটাকে জল মনে হয না, কেমন একটা চাপা গভীর কলকল শব্দ করে কিসের একটা কালো স্রোত যেন কোন্ জগৎ থেকে ছুটে এসে আবার কোথায় হারিয়ে যাচ্ছে।

'ছেলেবেলার যখন সাঁকো পার হতে তখন ভয় কবত না?'

'না।' মাধবের দিদি মাথা নাড়ল।

সীতাংশু একটু অবাক হল উত্তরটা শুনে। তেমনি সুখী। হঠাৎ ছেলেবেলার প্রশ্ন কেন বুঝতে না পেরে ঘাড় ফিরিয়ে সীতাংশুকে দেখল। সঙ্গে সঙ্গে সীতাংশুও সুখীর মুখটা দেখল। এভাবে হঠাৎ চোখ চোখ পড়তে দুজন নিঃশব্দে হাসল। হাসিটা মাধব দেখল না। একটা ঢিল কুড়িয়ে নিয়ে কেন জানি অন্ধকার জঙ্গলের দিকে সে হঠাৎ ছুঁড়ে মারল। দূরে গাছের পাতার অস্পষ্ট শব্দ হল। শব্দটা সুখী শুনল, সীতাংশুও শুনল

'তাই হয়।' সীতাংশুর চোখে চোখ রেখে মাধবের দিদি ছোট করে একটা নিশ্বাস ফেলল। যেন ইতিমধ্যে চিন্তা করে উত্তরটা সে খুঁজে পেয়েছে। 'কত-গুলো ভয় আছে যা ছোটবেলায় আমাদের পায় না, কিন্তু বড় হলে মাথায় ঢোকে। বুকের ভেতর তখন কেমন গুবগুব করে।'

'পাতালের ভয়?'

'হুঁ,' সুখী অল্প শব্দ করে হাসল। 'নরকের ভয়, পাতাল বলতে আমরা নরককেই বুঝি—কথায় বলে নরকযন্ত্রণা।'

'তাই তো।' কথাটা শুনে সীতাংশু খুশি হল।

'যখন বড় হই, যখন আমাদের বয়স বাড়ে তখন আমরা নবকের কথা ভাবি, কেন না তখনই পাপচিন্তা আমাদের মাথায় ঢুকতে থাকে, পাপ কাজও সময় সময় করে ফেলি।'

সুখী আর শব্দ করল না। হাসল না।

আর একজন মনোযোগ দিয়ে কথাটা শুনল। সীতাংশু চুপ করতে মাধব বলল,

'যেমন দিদির বর, ও বেটা ঠিক নবক-ভোগ কববে।'

সীতাংশু ও সুখী একসঙ্গে চমকে উঠে তার দিকে তাকাল।

'কেন, নরকভোগ করবে কেন?' ভাই-য়ের মুখ থেকে কথাটা না শুনে যেন পারছিল না সুখী। 'কি করেছে ও শুনি?'

'তোকে মেরে তাড়িয়ে দিয়েছে।' গম্ভীর হয়ে মাধব উত্তর করল।

শুনে সুখী একঝলক হেসে সীতাংশুর দিকে ঘাড় ফেরাল।

'বাবা রোজই একবার করে কথাটা বলছে কি না, মাধবও এখন তাই বলছে। আসানসোলের ওই মানুষটার পাপের তুলনা নেই, তাকে নরকভোগ করতে হবে।'

'তা তো বটেই। অন্যায় করেছে, তার শাস্তিভোগ তাকে করতে হবে।' অন্ধ-কারে সাঁকোটা ঝাপসা দেখাচ্ছিল। সীতাংশু সেদিকে চোখ ফেরাল।

'কিন্তু আমার ভয় করছিল কেন ওটার ওপর দাঁড়িয়ে। আমি কি কোনো পাপ করেছি!'

যুবতীর এই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারল না সীতাংশু।

অন্ধকাব বন লক্ষ্য করে মাধব আর একটা ঢিল ছুঁড়ল। [ক্রমশঃ]

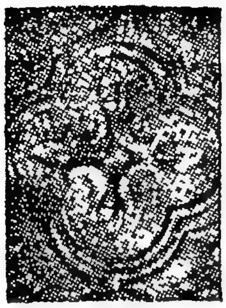

মরেস্ক

স্যারো রীডেড

মরকো পিনহেড

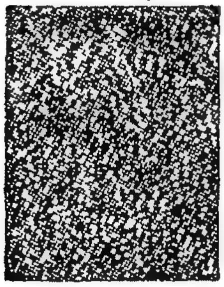

রাফকাস্ট

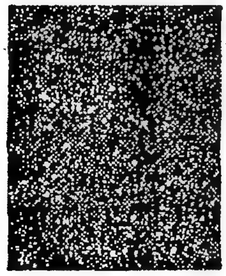

আজকালকার স্থপতিরা গৃহনির্মাণে

এইচ পি জি গ্লাস

ব্যবহার করেন

আজকের দিনের বাড়ীঘর ও অফিস-কাছারি, কলকারখানা, ইস্কুল ও হাসপাতালে সুদক্ষ ইঞ্জিনিয়াররা সর্বত্রই এইচ পি জি গ্লাস লাগান, কেননা তাঁরা জানেন যে এইচ পি জি গ্লাস উৎকর্ষের নিখুঁত মান বজায় রেখে তৈরী হয়। বিলাতের শতাধিক বৎসরের কাঁচনির্মাণকারী প্রতিষ্ঠান পিলকিংটন ব্রাদার্স-এর কারিগরী কুশলতার সাহায্য নিয়ে হিন্দুস্থান পিলকিংটন গ্লাস ওয়ার্কস এই এইচ পি জি গ্লাস তৈরী করেন।

এইচ পি জি কেনা মানেই নির্ভর-যোগ্য ভাল জিনিস কেনা।

হিন্দুস্থান পিলকিংটন গ্লাস ওয়ার্কস লিমিটেড

হ্যামার্ড

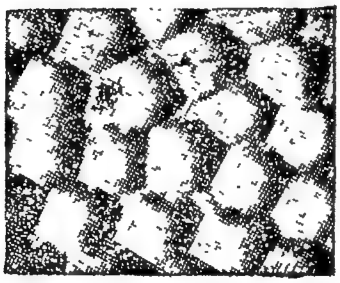

হেক্সাগোনাল ওয়্যারড

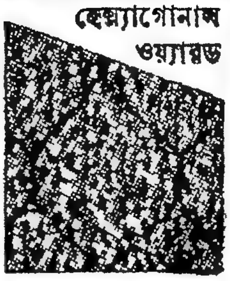

শীট গ্লাস

জর্জিয়ান ওয়্যারড

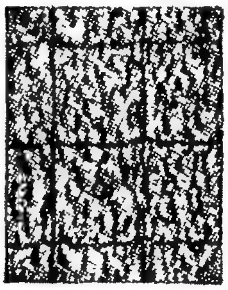

ম্যানেজিং এজেন্টস
তালুকদার ল' অ্যাণ্ড কোম্পানী প্রাইভেট লিমিটেড
হিন্দুস্থান বিল্ডিংস
৪, চিত্তরঞ্জন অ্যাভেনিউ,
কলিকাতা-১৩

JWTHP 1778A

বিজ্ঞান-বিচিত্রা

ডঃ বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য

ঘুম-প্রসঙ্গে

সম্প্রতি ঘুম নিয়ে মনস্তাত্ত্বিক মহলে জোর জল্পনা-কল্পনা সুরু হয়েছে। আমরা ঘুমোই কীভাবে, তা দেখে মনস্তাত্ত্বিকেরা নাকি আমাদের চরিত্র ও ব্যক্তিত্বের অনেক কিছু বলে দিতে পারেন। জানি না পারেন হয়তো এবং হয়তো এই বিশেষ বিদ্যেটা পর্যবেক্ষণ-সংক্রান্ত মনোবিজ্ঞানের কোঠায় পড়ে।

অবিশ্যি একটি বিষয়ে বিজ্ঞানীদের সকলেই একমত। সকলেই স্বীকার করেন, যখন ঘুমোই আমরা, তখন মাতৃগর্ভের খুব কাছাকাছি অবস্থায় ফিরে যাই। অতএব ঘুমন্ত অবস্থায় আমাদের চালচাল লক্ষ্য করলে মানবপ্রকৃতির অনেক কিছু গোপন রহস্য ভেদ করা যেতে পারে।

শোনা গেল, কিছুদিন থেকে মনোবিজ্ঞানীরা এইভাবে রহস্য ভেদ করার চেষ্টা করছেন। ওঁরা বলছেন, কুণ্ডলী পাকিয়ে ঘুমোন যাঁরা অথবা যাঁরা ঘুমোতে ঘুমোতে পা ও মাথা পেটের দিকে গুটিয়ে আনেন তাঁদের মধ্যে আত্মবিশ্বাসের অভাব দেখা যায়। তাঁদের ঘুমোবার এ ধরণটা মাতৃগর্ভের শিশুর সঙ্গে তুলনীয়। শিশু যেমন জঠরের মধ্যে পরম নিশ্চিন্তে অবস্থান করে, ওদেরও অবচেতন মন যেন ঠিক তেমনি নিশ্চিন্তির জন্যে উন্মুখ হয়। ওরা চট করে কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারে না; জীবনসংগ্রাম চালাতে গিয়ে পদে পদে হোঁচট খায়।

অনেকে আবার চিৎ হয়ে শোয় এবং ঘুমনোর সময় মাথাটাকে এক পাশে ঘুরিয়ে দেয়। এই শ্রেণীর লোকেরা বন্ধুবৎসল, চটপটে ও আদর্শবাদী হয়ে থাকে। এদের ব্যক্তিত্ব সহজেই আকর্ষণ করে অপরকে এবং এদের প্রচুর বন্ধু জোটে। তবে এদের মধ্যে কেউ কেউ আবার মেজাজী হয়ে থাকে; কারও কাছে বশ্যতা বা পরাজয় স্বীকার করার প্রশ্ন উঠলে অভিমানে ফেটে পড়ে।

অপর এক শ্রেণীর লোক হাত-পা ছড়িয়ে ঘুমোতে পছন্দ করে। এরা সব কিছু নিজেদের নিয়ন্ত্রণাধীনে রাখতে চায়; সর্বক্ষণ চায় অপরের ওপর প্রভুত্ব বিস্তার করতে। এই শ্রেণীর লোকেরা সাধারণত আমুদে হয়; তবে এদের একটু দমিয়ে না রাখলে কাজকর্মে বিশৃঙ্খলা অবধারিত।

কেউ কেউ আবার বালিশ জাতীয় কিছু একটা জড়িয়ে না ধরলে আরামে ঘুমোতে পারে না। কোলবালিশ পেলে এদের খুব সুবিধে; আর তা যদি না পায় তো শিয়রের বালিশের তলা দিয়েই এরা হাত ঢুকিয়ে দেবে। মনোবিজ্ঞানীরা বলছেন, এই শ্রেণীর লোকেরা খুব স্নেহশীল হয়ে থাকে। এদের কিছু একটা জড়িয়ে ধরার বা আলিঙ্গন করার প্রবৃত্তি শৈশবজীবনের কোনো না কোনো স্মৃতির সঙ্গে জড়িত।

অনেকে চিৎ হয়ে শুয়ে বালিশ ছাড়াই ঘুমনো পছন্দ করে। এই শ্রেণীর লোকেরা নিজেদের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে খুব বেশি সচেতন। অন্য সব বিষয়েও অতিরিক্ত ভাবনা-চিন্তা করে এরা।

ঘুম সম্বন্ধে ওপরে যা কিছু বলা হল, তার প্রায় সবটুকুই মনোবিজ্ঞানীদের অনুমান এবং এ অনুমান চলছে অল্প কিছুদিন ধরে। তবে ঘুম নিয়ে যথার্থ বিজ্ঞাননির্ভর গবেষণাও আজ অবধি বড় কম হয় নি। প্রসঙ্গত সেই সব গবেষণার কয়েকটি দিক নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে।

আলোচনার সুরুতেই ঘুমনোর বিভিন্ন ভাবভঙ্গীর কথা ধরা যাক। সেই সব ভাবভঙ্গী আমাদের স্বাস্থ্যের ওপর কী প্রতিক্রিয়া করে তা নিয়ে আলোচনা করা যাক। বিজ্ঞানীরা বলছেন, বয়স্করা ওদের খুশিমাফিক যে কোনো ভঙ্গীতে ঘুমোতে পারেন; ওতে খুব একটা এসে-যায় না। তবে হাত-পা ছড়িয়ে চিৎ হয়ে ঘুমনো সবচেয়ে ভালো। আর বয়স্করা পাশ-ফিরে শোবেন না যেন। এতে ওঁদের হৃৎপিণ্ডের কাজে ব্যাঘাত সৃষ্টি হতে পারে। তাই ঘুমের মধ্যে অস্বস্তি বোধ করতে পারেন ওঁরা; কখনও আবার দুঃস্বপ্ন দেখে জেগে উঠতে পারেন।

শিশুদের বেলায় ঘুম সম্বন্ধে নিয়মকানুনটা বয়স্কদের তুলনায় একটু কঠোর। উপুড় হয়ে ঘুমোলে ওদের স্বাস্থ্যের প্রভূত ক্ষতি হতে পারে। কেন না এতে চাপ পড়ে পেটের ওপর এবং নিশ্বাস-প্রশ্বাসের কাজ ভালোভাবে চলে না।

অনেকে আবার শিশুরা ঘুমনোর সময় ওদের আশপাশ দিয়ে পা টিপে টিপে চলেন। যাতে সামান্যতম শব্দও শিশুর নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটাতে না পারে, লক্ষ্য রাখেন সেদিকে। কখনও আবার শিশুকে দোলনায় চাপান ওঁরা; দোলনার চারিদিকে ঘুরে ঘুরে গান করেন এবং যেই শিশু ঘুমিয়ে পড়ল, অমনি সন্ত্রস্তভাবে চলাফেরা করতে সুরু করেন। বিজ্ঞানীদের ধারণা, এই ধরনের অতি-সতর্কতা মঙ্গলের চেয়ে অমঙ্গলই করে বেশি। কেন না, অস্বাভাবিক সাধ্য-সাধনার ফলে এইসব ক্ষেত্রে শিশুদের ঘুম পাৎলা হয়ে পড়ে; সহজেই জেগে ওঠে ওরা এবং কান্নাকাটি করে পাড়া মাথায় তোলে। অথচ ঘুম পাড়ানীরা অতি-উৎসাহী না হলে বেশ স্বাভাবিকভাবেই ঘুমোতে পারত ওরা। কারণ, ছোট-খাটো গোলমালে শিশুদের ঘুম ভাঙবার কথা নয়। সাধারণ ঘরোয়া পরিবেশে বেশ সহজভাবেই ঘুমোতে পারে ওরা এবং ওদের এই ক্ষমতাটা জীববিজ্ঞাননির্ভর সত্য। অতএব, দেখা যাচ্ছে, আমরা বয়স্করা অতি-সাবধানী হতে গিয়ে এই সত্যের গোড়ায় কুঠারাঘাত করি এবং এমন একটা পরিবেশ গড়ে তুলি, যাতে শিশুর ঘুম গাঢ় হবার অবকাশ না পায়। এদিকে ঘুমটা শিশুদের বেলাতেই সবচেয়ে বেশি প্রয়োজনীয়। নবজাত শিশুদের দিনে ২২ ঘণ্টা আর দুই থেকে চার বছর বয়স্ক শিশুদের দিনে ১৫ থেকে ১৬ ঘণ্টা করে ঘুম দরকার। শিশুর ঘুমের সময় এত বেশি হবার কারণ শারীরবিজ্ঞানীরা ব্যাখ্যা করেছেন। ওঁদের অভিমত, শিশুদের স্নায়ুতন্ত্র খুব বেশি প্রতিক্রিয়াশীল ও দুর্বল থাকে। তাই সহজেই ক্লান্ত হয়ে পড়ে ওরা এবং বয়স্কদের তুলনায় ওদের বেশি ঘুম দরকার হয়। এ ছাড়া ঘুমনোর সময়েই বাড়ে শিশুরা; ওদের দেহ তখন পরিপুষ্টি লাভ করে।

এইখানে, বয়স্কদের প্রশ্ন ওঠে। অনেকেই শুধোন, ওঁদের কত ঘণ্টা করে ঘুমনো দরকার? দিনে কত ঘণ্টা করে ঘুমোলে বয়স্ক কোনো ব্যক্তির স্বাস্থ্য অটুট থাকবে?

এ প্রশ্নের সরাসরি কোনো জবাব দেন নি বিজ্ঞানীরা। 'বয়স্কদের ঘুম' নামক প্রসঙ্গটিকে ওঁরা বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করেছেন। বলেছেন, ঘুম তার গাঢ়ত্ব, পারিপার্শ্বিক এবং ঘুমন্ত

ব্যক্তির স্বাস্থ্য ও প্রয়োজনের ওপর অনেকখানি নির্ভরশীল। তবে এ সম্পর্কে সবচেয়ে সাধারণ নিয়ম হল এই যে, মানুষের বয়স যত বাড়ে, তার ঘুমের প্রয়োজনও তত কমে। তাই বুড়োরা যুবক ও প্রৌঢ়দের তুলনায় কম ঘুমোন। বয়স্করা কত ঘণ্টা করে ঘুমোবেন, সে সম্পর্কে ধরাবাঁধা কোনো নিয়ম নেই। কেউ কেউ ৬ ঘণ্টা ঘুমিয়েও দিব্যি সুস্থ থাকেন; কারও আবার ৮ ঘণ্টা ঘুম না হলে চলে না। তবে সাধারণত দেখা যায়, বয়স্করা দিনে ৫ থেকে ৮ ঘণ্টা করে ঘুমিয়ে থাকেন।

দেশ, কাল ও পাত্রবিশেষে ঘুমোনোর কায়দাকানুনও আবার বিচিত্র। গত মহাযুদ্ধের সময় সৈন্যরা অনেক সময় যুদ্ধক্ষেত্রের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়ত। আশেপাশে হয়তো গুলীগোলা চলছে; হয়তো বোমা পড়ছে খুব নিকটবর্তী কোনো অঞ্চলে। কিন্তু সৈন্যরা প্রায়ই সে সব কিছু ভ্রূক্ষেপ করে নি। কারণ, সময় সময় এত ক্লান্ত ও অবসন্ন হয়ে পড়ত ওরা যে এমন কি প্রতিকূল পারিপার্শ্বিকও ওদের ঘুম আটকাতে পারত না। এছাড়া প্রায়ই শোনা যায়, সৈন্যরা কুচকাওয়াজ করতে করতে ঘুমিয়েছে এবং ঘোড়সওয়াররা ঘুমিয়েছে ঘোড়ার ওপর। জনৈক উত্তরমেরু অভিযাত্রীর কাছে শোনা গেছে, দীর্ঘক্ষণ ধরে স্কী করবার সময় তিনি ও তাঁর সহযাত্রীরা ঘুমিয়ে পড়তেন। আমেরিকা-প্রবাসী ভারতীয়দের গোড়ার দিকে দিনের বেলায় ঘুম পায়। অর্থাৎ স্বদেশে থাকতে যে সময়ে ঘুমোতেন ওঁরা, বিদেশে গিয়েও প্রথম প্রথম ঠিক সে সময়েই ঘুমোতে চান। মনে রাখতে হবে, আমেরিকায় যখন দিন, আমাদের ভারতবর্ষে তখন রাত্রি, তাই অসময়ে ঘুম পাবার জন্যে কারও ওপর দোষ দেওয়া উচিত হবে না। বরং উচিত হবে মনে রাখা যে, দীর্ঘদিনের অভ্যেস রাতারাতি কাটিয়ে ওঠা সকলের পক্ষেই খুব কঠিন।

এইখানে প্রশ্ন উঠবে, যাঁরা রাতে কাজ করেন এবং ঘুমোন দিনের বেলায় তাঁদের স্বাস্থ্য খারাপ হতে পারে কি? এর উত্তর হল,—না, পারে না। কারণ, গোড়ার দিকে অসুবিধে হলেও ধীরে ধীরে তাঁরা অভ্যস্ত হয়ে পড়েন।

প্রসঙ্গত বলে রাখি, 'অভ্যেস' নামক বস্তুটি জীবজগতের ক্ষেত্রে খুব একটা বড় কথা। মানুষ যেমন জীবজন্তুরাও তেমনি নিজেদের প্রয়োজন ও পারিপার্শ্বিকের দিকে লক্ষ্য রেখে এই অভ্যেস গড়ে তোলে। মানুষ প্রতি ২৪ ঘণ্টায় একবার কী বড় জোর দু'বার ঘুমোয়; কিন্তু কুকুর বা বেড়াল ঘুমোয় বেশ কয়েকবার। কুকুরের কথাই ধরুন না কেন; ঘুমোতে যেমন জাগতেও তেমনি সময় লাগে না তার। এই দেখলেন, কারও পেছনে সে ছুটছে; অথবা চিৎকার করছে তারস্বরে; পর মুহূর্তেই দেখবেন, কুণ্ডলী পাকিয়ে বেশ- নিশ্চিন্তে সে ঘুমিয়ে পড়ল। অতএব বলা যায়, এই কুকুর-বেড়াল জাতীয় জীবরা প্রতিদিন বহুবার করে ঘুমোনোর দলে। এ ছাড়া ঘুমের অভ্যেস এক এক জীবের বেলায় এক এক রকম। পেঁচা রাত্রে ঘুময় না; আর খট্টাস ও নেংটি ইঁদুর জাতীয় প্রাণীরা একনাগাড়ে বছরের একটা দীর্ঘ সময় ঘুমিয়ে কাটিয়ে দেয়।

মানুষের ঘুম নিয়ে সাম্প্রতিককালে বহু-বিচিত্র গবেষণা হয়ে গেছে। বিজ্ঞানীরা বলছেন, ঘুমোনোর সময় আমাদের কেন্দ্রীয় স্নায়ুমণ্ডলে অদ্ভুত একটা পরিবর্তন সূচিত হয়। আমাদের চিন্তা করবার ক্ষমতা, ইন্দ্রিয়ের শক্তি ও বাইরের প্রতিক্রিয়ায় সাড়া দেবার ক্ষমতা স্তিমিত হয়ে পড়ে অথবা লোপ পেয়ে যায় সাময়িকভাবে।

ঘুম যে আসছে, তা' শরীরের প্রায় সমস্ত মাংসপেশীর শিথিলতা অনুভব করেই ঠাওর করা যায়। এই শিথিলতা সুরু হয় ঘাড়ের মাংসপেশী থেকে। কারও ঘুম এলে প্রথমেই ঢুলতে সুরু করবে সে। তার ঘাড় ও মাথা হয় একপাশে, আর না হয় সামনের দিকে নুয়ে পড়বে। তারপর ঘুম গাঢ় হবে যত, শরীরের অন্যান্য মাংসপেশীও ততই এলিয়ে পড়বে। তার চোখের গোলাকার মাংসপেশী সঙ্কুচিত হবে ক্রমেই; এবং ক্রমেই চোখের পাতা বুজে আসবে। অর্থাৎ যেন দেখতে দেখতে চোখের দরজা বন্ধ হয়ে যাবে।—আলো পৌঁছবে না সেখানে। বাইরের কোনো বস্তু বা আঘাত সহজে সেখানে কোনো প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারবে না। মনে রাখা দরকার, দেহযন্ত্রের স্বাভাবিক নিয়মবশেই হয় এমন। অর্থাৎ, ঘুমোনোর সময় দেহ যেন তার একটি বিশিষ্ট ইন্দ্রিয় চোখকে নিজের তাগিদেই রক্ষা করে। এছাড়া মূত্রাধার ও মলনালীর পথও রুদ্ধ হয়ে যায় তখন। এমনভাবে রুদ্ধ হয়, যাতে স্বেচ্ছাচালিত হয়ে মল বা মূত্র দেহের বাইরে বেরিয়ে আসতে না পারে। ঘুমোনোর সময় দেহের অন্যান্য অংশের কাজকর্মেও উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হয়ে থাকে। হৃৎস্পন্দন অপেক্ষাকৃত ঢিমে তালে চলে। পারদের মাপ-মাফিক রক্তের চাপ ২০ থেকে ২৫ মিলিমিটারে নেমে যায়। শরীরের সমস্ত অংশেই এবং বিশেষ করে মস্তিষ্ক, যকৃৎ এবং মূত্রগ্রন্থিদ্বয়েও রক্ত-সঞ্চালন মন্থর হয়ে আসে। চামড়ামধ্যস্থ ধমনীগুলো আগের তুলনায় বেশি জায়গা দখল করে এবং ওদের মধ্য দিয়ে অপেক্ষাকৃত বেশি রক্ত প্রবাহিত হয়। এরই ফলে আগের তুলনায় বেশি গরম হয়ে ওঠে চামড়া। তবে ঘুমোনোর সময় দেহের তাপাঙ্ক কিছুটা নেমে যায়; নিশ্বাস-প্রশ্বাসের কাজ জাগ্রত অবস্থার তুলনায় ধীরভাবে চলে, দেহের অক্সিজেন-সংযুক্তি ও পরিপাকের কাজ মন্থর হয়ে আসে, মূত্রাধারে দুই থেকে চারগুণ পরিমাণ কম মূত্র নিঃসৃত হয়, বিভিন্ন গ্রন্থির এবং বিশেষ করে মুখমণ্ডলের কিছু গ্রন্থির কর্মক্ষমতা অনেকটা কমে আসে। সে কারণেই ঘুম থেকে উঠলে মুখ শুকনো মনে হয়; চোখের পাতা জ্বালা করতে থাকে।

অনেকেই লক্ষ্য করেছেন হয়তো, ছোটরা ঘুম পেলে অথবা ঘুম থেকে উঠলে চোখ ঘষতে থাকে। হাত দিয়ে ওরা চোখের পাতা চুলকায়। এর ফলে কয়েকটি গ্রন্থি থেকে একপ্রকার রস ক্ষরিত হয় এবং চোখ খানিকটা আর্দ্র হয় বলে ছোটরা স্বস্তি বোধ করে। বলা বাহুল্য, ছোটরা নিজেদের সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারেই করে এমন এবং প্রকৃতির এমন বিচিত্র ব্যবস্থায় বড়রাও অনেক সময় অজ্ঞাতসারেই সাড়া দেয়।

এই সাড়া দেওয়া, এই ঘুমিয়ে পড়া, এই সব কিছুর মধ্য দিয়ে বিশ্বজগতের যে বিচিত্র বিধান উদ্ভাবিত হচ্ছে, তা' হল এই যে, ঘুম মানুষের পক্ষে অপরিহার্য। ঘুমনো মানেই জীবনীশক্তিকে জমা করা; আর জেগে থাকা মানেই সেই শক্তিকে খরচ করা। এদিকে বেঁচে থাকতে গেলে শুধু খরচ করলে কাজ চলে না, জমার প্রশ্নটাও খুব জরুরী। তাই বাঁচার তাগিদেই ঘুময় মানুষ; জীবনের এক-তৃতীয়াংশ সময় ঘুমিয়ে কাটিয়ে দেয়। কিন্তু ট্র্যাজিডি হল এই যে, এত করেও জমার ব্যবস্থাটা পাকাপাকি করা যায় না। খরচ করতে করতে শেষ অবধি জীবনীশক্তিতে এমন টান পড়ে যে জমা দাঁড়িয়ে যায় শূন্য। তখন আরও বড়রকমের ঘুমের দরকার হয় এবং সে ঘুমের নামই মৃত্যু।

কিস্তিবন্দীতে ট্রানজিস্টার

মাসিক ১৫ টাকার সহজ কিস্তিতে ৩২০ টাকা মূল্যের টেলি-কুইন পোর্টেবল ৩ ব্যান্ড, অল ওয়ার্ল্ড ৮ ট্রানজিস্টার। আবেদন করুন:—

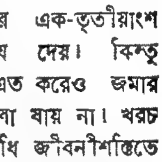

Atlas Co. (S. B.—22).
Box No. 1329, Delhi-6.

ভয়ের মানে

সুভাষ সমাজদার

যুদ্ধ চলছে।

লাহোরে, শিয়ালকোটে আগুন জ্বলছে। বোমা পড়ছে আম্বালায়, পাঞ্জাবের অন্যান্য জায়গায়।

পশ্চিম ভারতের রণাঙ্গনে যখন যুদ্ধ ঘনঘোর হয়ে উঠেছে, অবিরাম লোকক্ষয় চলছে ঠিক সেই সময় পূর্ব সীমান্ত থেকে স্পেশাল ট্রেনে সৈন্যরা যাচ্ছিল পাঞ্জাবের দিকে।

আসামের গৌহাটী রাঙাপাড়া রঙ্গিয়া, ঢেকিয়াজুলি যে কোন স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে তাকাও দেখবে শুধু সবুজ শেওলা রঙের পোষাক পরা শত শত জওয়ান ইতস্তত ঘুরে বেড়াচ্ছে।

স্টেশনের সাইডিং-এ কোন ট্রেন অপেক্ষা করছে, কোন ট্রেন দূরপাল্লার যাত্রার আয়োজন করছে—কোনটা হয়তো বমডিলা থেকে কি মিছামারি থেকে কোহিমা থেকে জওয়ানদেব বহন করে নিয়ে এসে জংশন স্টেশনে দাঁড়িয়ে হাঁফ নিচ্ছে।

এইরকম একটা স্পেশাল মিলিটাবী ট্রেন রঙ্গিয়া জংশনে এসে দাঁড়াল। সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন কামরা থেকে বাঁধভাঙা বন্যার মত হুড় হুড় করে নামতে লাগল জওয়ানের দল। প্ল্যাটফর্মের দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ল তারা।

ওরা কথায় কথায় হো হো করে হাসছে। চীনারাদাম কি কলা খেয়ে তার খোসা কুকুরের গায়ে ফেলছে আর ছেলেমানুষের মত আনন্দে হাততালি দিয়ে উঠছে। বুকস্টলের সামনে কোন সুন্দরী সিনেমাভিনেত্রীর ছবি দেখে কেউ গান গেয়ে উঠছে, আবার কেউ মুখে আঙুল পুরে জোরে সিটি বাজাচ্ছে। মোটের ওপরে ওদের প্রত্যেকের ভেতরে উদ্দাম প্রাণের আবর্ত ভেঙে ভেঙে পড়ছে।

কেন? আমি প্ল্যাটফর্মের এককোণে একটা বেঞ্চে বসে আছি। রাঙাপাড়ার ট্রেনের জন্য অপেক্ষা করছি আর ভাবছি—কেন—কেন এরকম হয়—কেমন করে হয়?

ওরা যেখানে যাচ্ছে সেখানে তুমুল যুদ্ধ চলছে। আকাশে বোমারু বিমান গর্জন করছে, বোমা পড়ছে, স্পিণ্টার ছুটছে, অব্যর্থ মৃত্যুব নিশানা নিয়ে শত্রুসৈন্যের গুলী ছুটে আসছে পাহাড়ের অলক্ষ্য কোণ থেকে।

মৃত্যুর মুখোমুখি যাচ্ছে বলেই কি পার্থিব এই সংসারের স্বার্থচিন্তা, ভয়, দুশ্চিন্তা থেকে মুক্ত হয়ে ওদের মনটা মহৎ, উদার ও আনন্দময় অনুভূতির ভেতরে প্রসারিত হয়ে গিয়েছে?

না—সারা দেশের জন্য জীবন উৎসর্গ করতে যাচ্ছে, বিপ্লবব্যাপ্ত এদেশের বিশাল জনসাধারণের গভীর সহানুভূতি রয়েছে—এই জন্যেই কি গর্বে আনন্দে ওদের মন ভরে গিয়েছে?

আরে-আরে উ কেয়া কর রহা হ্যায় রে—ওভারব্রীজের ওপরে একটা হট্টগোল উঠল।

আমি তাকিয়ে দেখি, এক লম্বা-চওড়া জওয়ানকে চার-পাঁচজন জাপটে ধরেছে। আর ব্রীজের নিচ দিয়ে একটা ট্রেন ধীর গতিতে প্ল্যাটফর্মে ঢুকছে।

দেখেছেন মিলিটারীটাব কাণ্ড! ট্রেনের ছাদে লাফ দিতে যাচ্ছিল। ভাগ্যিস ওর সঙ্গীরা ধরে ফেলল—

আমাকে চেনে না। আমার সঙ্গে বাজী ধরা, সেই দুর্দান্ত স্বভাবের জওয়ানটি চিৎকার করে বলছে—আমি ঢাকার ছেলে। ঝড়ের ভেতরে বন্যায় ভরা পদ্মা পার হয়েছি কতবার—

প্রায় ছয় ফুটেরও বেশি লম্বা। কালো কুচকুচে গায়ের রঙ। যেন মনে হয় কালো পাথর কুঁদে কুঁদে কোন ভাস্করের নিপুণ হাতের তৈরি মূর্তি। বিশাল দুটো উজ্জ্বল চোখ।

তোমবা আমাকে ধরতে এলে কেন। দেখতে ওর দশটা টাকাই গচ্চা যেত, তখনো ভেতরে ভেতরে প্রচণ্ড উত্তেজনায় ফুঁসছে।

সবসময় এরকম গোঁয়ার্তুমি ভাল নয় চক্রবর্তী। কর্নেল দেখতে পেলে হয়তো—

আরে আরে রাখো। তাই বলে বাজী হারবো! বুক চিতিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ালো। সঙ্গীদের চোখে ভয়ের ছায়া পড়ল।

আমার মনে পড়ে গেল রঞ্জনের কথা—'রক্তকরবী'র রঞ্জন। যার সম্বন্ধে নন্দিনী বলতো, দুই হাতে দুই দাঁড় ধরে সে আমাকে তুফানের নদী পার করে দেয়। বুনো ঘোড়ার কেশর ধরে আমাকে বনের ভেতর দিয়ে ছুটিয়ে নিয়ে যায়। লাফ দেওয়া বাঘের দুই ভুরুর মাঝখানে তীর মেরে সে আমার ভয়কে উড়িয়ে দিয়ে হো হো করে হাসে।...প্রাণ নিয়ে সর্বস্ব পণ করে সে হার-জিতের খেলা খেলে—

এই রঞ্জনের মতই ঘরছাড়া সৈনিকটির ভেতরেও উদ্দাম কোন প্রাণের আগুন জ্বলছে!

রাত বাড়ে। সমস্ত রঙ্গিয়া স্টেশন আস্তে আস্তে ঝিমিয়ে পড়ে। আমারও তন্দ্রা এল। তন্দ্রার ঝাপসা চেতনার ভেতরে এই যুবক সৈনিকটির প্রদীপ্ত মুখখানা ছবির মত ভেসে ভেসে উঠতে লাগল।

ঢং-ঢং-ঢং—কামরূপ এক্সপ্রেসের ঘণ্টা হলো। মুহূর্তে যেন সারা স্টেশন চঞ্চল হয়ে উঠল। কিন্তু—

সেই স্পেশাল মিলিটারী ট্রেনটা তখনো দাঁড়িয়ে আছে। কলকাতা থেকে গাড়ি আসছে দেখেই সেই জওয়ানদের দল আবার এসে দাঁড়ালো প্ল্যাটফর্মে।

ফোঁস ফোঁস করে ক্লান্ত নিশ্বাস ফেলতে ফেলতে এল কামরূপ এক্সপ্রেস! সেই বেপরোয়া স্বভাবের চক্রবর্তী তার দলবল নিয়ে ট্রেনের কামরায় কামরায় কি যেন দেখতে লাগল। ওদের উৎসুক চোখের আকুল দৃষ্টি এমন করে কি খুঁজছে—কাকে খুঁজছে!

বুঝতে পারলাম না। কিন্তু মনে সন্দেহের ছায়া পড়ল। আর সঙ্গে সঙ্গে মনে হলো সেই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় পোড়াদহ স্টেশনের একটি ঘটনার কথা।

রাত আড়াইটার সময়ে ঢাকা মেল এল। কয়েকটি শ্বেতাঙ্গ সৈনিক প্রত্যেক কামরায় উঁকি দিয়ে দিয়ে কি দেখতে শুরু করল।

গভীর রাত্রির ট্রেন। যাত্রীরা ঘুমন্ত। বেশির ভাগ জানালারই কাঁচ ফেলে দেওয়া হয়েছে। পুরু কাঁচের আড়ালে আলোকিত জানালার ফ্রেমে আঁকা ঘসা ঘসা ছবির মত কোন তরুণীর মুখ দেখতে পেলেই ওরা অশ্লীল অঙ্গভঙ্গী করছে। শিস দিয়ে উঠছে।

মিলিটারীর কঠোর ডিসিপ্লিনের ভেতর থাকতে থাকতে একটু ফাঁক পেলেই ওদের ভেতরের আদিম রিপুটা উগ্র ক্ষুধায় জ্বলে ওঠে। সেই শ্বেতাঙ্গ বিদেশী সৈনিকদের মত আমাদের জওয়ানরাও কি আদিম কোন নেশায় মেতে উঠেছে?

না। তা নয়। অনেক জানালাতেই তরুণী মেয়ের মুখ উঁকি দিচ্ছে। কিন্তু তাদের কারো দিকেই ফিরেও তাকাচ্ছে না চক্রবর্তী। কিন্তু আকুল আগ্রহে কি যেন দেখছে!

দেখতে দেখতে ট্রেনের শেষ মাথায় চলে এল। ম্লান হয়ে গেল চক্রবর্তীর মুখ।

তুমি কি দেখছ—কাকে খুঁজছো? সঙ্গীরা প্রশ্ন করে। বিরক্ত হয়।

তোমরা সে বুঝবে না। চুপ করে থাকো—কেমন রূঢ় শোনায় তার গলার স্বর। নিজের মনেই বিড় বিড় করে বলল, বিশির ভাগই চা-বাগানের কুলি-কামিন ভদ্রলোক বেশি আছে বলে মনে হলো না—

মাঝ রাতের গাড়ি। তবুও প্রচণ্ড ভিড়। রাতের মত গোহাটীতে যাওয়ার শেষ ট্রেন। ঠেলাঠেলি, ধস্তাধস্তি করে গাড়িতে উঠছে যাত্রীরা।

মিলিটারীরা দাঁড়িয়ে দেখছিল যাত্রার এই পর্ব। ত্রিশ-বত্রিশ বছরের এক ভদ্রলোক তার নবপরিণীতা স্ত্রীকে নিয়ে তাড়াতাড়ি করে গাড়িতে উঠতে যেতেই ট্রাঙ্কের কোণটা লাগিয়ে দিল এক বুড়ির মাথায়।

উঃ মা গো!—আর্তনাদ ছেড়ে বসে পড়লেন বৃদ্ধা।

কি মশাই নতুন বিয়ে করা বৌ নিয়ে যাচ্ছেন বলে কি লায়েক হয়ে গেছেন, চক্রবর্তী রুখে গিয়ে তার সামনে দাঁড়ালো। খপ করে শক্ত হাতে গলা টিপে ধরল সেই ভদ্রলোকের। দাঁতে দাঁত চেপে ধরে বলল, আপনার মা'র বয়সী। কোথায় তাকে আপনি উঠিয়ে দেবেন—

আচ্ছা-আচ্ছা দিচ্ছি—বড় অন্যায় হয়ে গেছে—

সে কি বলছে যেন শুনতে পেল না চক্রবর্তী। বৃদ্ধা মহিলাকে খুব যত্ন করে তুলে দিল গাড়িতে। বসিয়ে দিল একেবারে জানালার ধারে ভাল জায়গায়।

আপনি কি একা যাচ্ছেন—সঙ্গে কেউ নেই?

না বাবা! তোমরা না থাকলে উঠতেই পারতাম না—

কোন কথা বলল না চক্রবর্তী। কিন্তু খর চোখে বৃদ্ধার দিকে তাকিয়ে রইল। মনের ভেতরে কিসের যেন নড়াচড়া চলতে লাগল।

দেখ নিশ্চয়ই ছেলের বৌয়ের সঙ্গে ঝগড়া করে বাড়ি থেকে বেরিয়েছে। বৌগুলো এত ঝগড়া করতে পারে, দু'চোখ থেকে যেন অদ্ভুত একটা জ্বালা ঠিকরে পড়ে!

আবার দলবল নিয়ে প্রত্যেক কামরার ভেতরে উঁকি দিতে দিতে এগোতে লাগল।

কি খুঁজছো বলো তো?

তোমাদের ভাল না লাগে তোমরা এস না; খুব রূঢ় শোনালো তার গলা।

ঢং-ঢং-ঢং—গাড়ি ছাড়ার ঘণ্টা হলো। এখুনি ট্রেনটা নতুন উদ্যমে যাত্রা শুরু করবে কামরূপ অর্থাৎ গোহাটীর দিকে। দূরাগত মেঘের ডাকের মত গুম গুম শব্দ তুলে পার হয়ে যাবে ব্রহ্মপুত্রের

দেশ সেবায় নিয়োজিত,

এ্যালবার্ট ডেভিড লিমিটেড

কলিকাতা—৫০

নীতি ও বিজ্ঞানানুযায়ী ঔষধ প্রস্তুতকরণের অগ্রণী

—ব্রাঞ্চ সমূহ—

বোম্বে - মাদ্রাজ - দিল্লী - নাগপুর
বেজওয়াডা - শ্রীনগর - গোহাটী

সেই বিশাল সেতু, ছাড়িয়ে যাবে নর্থ-ফ্রন্টিয়ার রেলওয়ে হেড কোয়ার্টার পাণ্ডু, গিয়ে পৌঁছবে দেবী মহামায়ার পীঠস্থান কামাখ্যার সেই নীলাভ পাহাড়ঘেরা আশ্চর্য সুন্দর দেশে। কত দূর-দূরান্তর থেকে হাজার হাজার মানুষ কত অতৃপ্ত আশা, কত কামনা নিয়ে ছুটে চলেছে সেখানে।

আমার হঠাৎ মনে হল, গোটা ট্রেনটাই যেন কত অজস্র কামনা-বাসনা স্বার্থের অনুভূতি বহন করে নিয়ে চলেছে। যাত্রীরা কামাখ্যায় গিয়ে দেবী দর্শন করবে। পুজো দেবে। কেউ শান্তি পাবে। কেউ পাবে না। একটু শান্তির আশায় এক তীর্থ থেকে আর এক তীর্থে ঘুরে ঘুরে বেড়াবে।

কিন্তু কোন না কোন কারণে তীব্র বিক্ষুব্ধ এই বাঙালী সৈনিকটি কামাখ্যার পাহাড়ে যেতে পারবে না, যেতে পারবে না অনেক—অনেক ওপরে নির্জন ভুবনেশ্বরীতে, পারবে না স্নেহ মায়া মমতা ঘেরা সংসারে। তাকে যেতে হবে সেইখানে যেখানে যুদ্ধ। যেখানে প্রচণ্ড শব্দে বোমা পড়ছে। যেখানে পদে পদে মৃত্যুর আশঙ্কায় চারিদিক থম থম করছে—

গোঁ-গোঁ-গোঁ—ক্যানাডিয়ান ইঞ্জিনের বাঁশীর গম্ভীর শব্দ শোনা গেল। তখনো গার্ডসাহেব সবুজ আলোর সংকেত দিয়ে চলেছে।

গাড়িটা চলে যাবে—এইবার তোমার মন আবার ভাল হয়ে যাবে চক্রবর্তীর সঙ্গীরা মন্তব্য করবে।

তাহলে কি স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়া করে যুদ্ধে নাম লিখিয়েছে—না কি আর কোন প্রিয়জনের ওপরে অভিমান করে চলে এসেছে এই বিপদসঙ্কুল জীবনের ভেতরে। যেমন এদেশে আর পাঁচজন সৈনিকের জীবনে ঘটে! এইজন্যই বোধহয় ট্রেন জুড়ে কত দম্পতি, কত মা-ছেলে ভাই-বোন যে রয়েছে, সেই টুকরো টুকরো সংসারের ছবি সে একেবারেই সহ্য করতে পারছে না—

ঝিক-ঝিক-ঝিক শব্দ করে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে কামরূপ এক্সপ্রেস যাত্রা শুরু করল। চক্রবর্তী জ্বালা ধরা চোখে তাকিয়ে রইল অপসৃয়মাণ ট্রেনটির দিকে। যেন তার জীবনের একটা ভয়ঙ্কর অভিশাপের মূর্তি ধীরে ধীরে বিদায় নিচ্ছে।

এখুনি—এখুনি দৃষ্টির বাইরে চলে যাবে গাড়িটা। আর ওর মনের যন্ত্রণাটাও কমে যাবে মনে হয়।

কিন্তু হঠাৎ প্ল্যাটফর্মের এক কোণে বেঞ্চে আমার ওপরে নজর পড়ল তার। আমার ধুতি চাদর পাঞ্জাবীর দিকে তীক্ষ্ণ-দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল—আপনি বাঙালী?

হ্যাঁ।

আমিও বাঙালী। নাম করুণাকান্ত চক্রবর্তী, বলতে বলতে আমার পাশে বসে পড়ল। মুখের কাছে ঝুঁকে পড়ে জিজ্ঞাসা করল—কোথায় যাচ্ছেন জানতে পারি কি?

আপাতত রাঙাপাড়ায়। সেখান থেকে কলকাতায় ফিরব—

কলকাতায়! চমকে উঠল। বলল, জানেন, আমি এতক্ষণ ধরে একটা কলকাতার লোক খুঁজছিলাম—

বলুন মিঃ চক্রবর্তী, কাউকে কিছু বলতে হবে কিছু দিতে হবে?

সঙ্গীরা উৎসুক হয়ে ব্যাপারটা লক্ষ্য করছিল। তাদের ধমকে বলল, এই তোমরা গাড়িতে উঠে পড়ো—যাও—

তারা চলে গেল। হয়তো তার মত উদ্ধত আর দুর্দান্ত স্বভাবের লোকেরও যে কোন দুর্বলতা আছে, কি থাকতে পারে—তা ওদের জানতে দিতে চায় না।

কিন্তু সে কিছু বলল না। শুধু মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল। আর একটু একটু করে একটা দারুণ যন্ত্রণার চিহ্ন ফুটে উঠতে লাগল মুখে। বেশ বোঝা যাচ্ছে, ভেতরে ভেতরে অসহ্য একটা কষ্ট চাপতে চেষ্টা করছে। শেষ পর্যন্ত খুব আস্তে আস্তে বলল, আমার একটা কাজ করে দেবেন—বলুন—পারবেন—

নিশ্চয়ই পারবো। আপনি জওয়ান। দেশের জন্য যুদ্ধ—

বাজে কথা রাখুন, প্রায় ধমকে উঠল। বলল, আমার একটা জিনিস—

ঢং-ঢং-ঢং মিলিটারী স্পেশালের ঘণ্টা হলো।

মুহূর্তে জওয়ানদের ভেতরে হুড়োহুড়ি পড়ে গেল। যে যেদিক দিয়ে পারে তাদের ট্রেনের দিকে ছুটতে লাগল। মুহূর্তের জন্য তার মুখে ব্যথার ছায়া ভেসে উঠল। বলল, আসবেন—আসবেন আমার ট্রেনের কাছে—বলেই সে ছুটতে লাগল তার স্পেশাল গাড়ির দিকে।

আকাশ-বাতাশ কাঁপিয়ে জওয়ানরা জয়ধ্বনি দিয়ে উঠল—জয়হিন্দ—জয়হিন্দ!

সে তাড়াতাড়ি 'কীটসব্যাগ' খুলে কাগজের একটা মস্ত বড় মোড়ক আর ছোট একটা পুঁটলি বের করল।

আপনি অনুগ্রহ করে টালিগঞ্জের দুই বাই এক ভবানী বিশ্বাস লেনের ঠিকানায় এ দুটো জিনিস দিতে পারবেন?

ঢং-ঢং-ঢং—গাড়ি ছাড়ার সেকেণ্ড বেল পড়ল। আমার মা-র জন্য একটা আসামী মুগার চাদর আছে, আর তিন বৌদির জন্য তিনটি শাড়ি আছে—বলুন, আপনার কষ্ট হবে না তো? একটু থেমে আবার বলল, ও হ্যাঁ, এই পুঁটলির ভেতরে আছে কামাখ্যার প্রসাদ। বাড়ির প্রত্যেকের মঙ্গল-কামনা করে পুজো দিয়েছিলাম—

এই যে যেখানে আছো উঠে পড়ো—দুইজন কর্নেল প্ল্যাটফর্মের দুই মাথায় দাঁড়িয়ে হাঁক ছাড়ছে।

এগুলো দেবেন। বলবেন ভাল আছি—বলবেন—আমার কোন কষ্ট—কোন কষ্ট নেই—বলতে বলতে ভারি—খুব ভারি হয়ে এল তার গলার স্বর।

যুদ্ধ থামলেই তো আপনিও বাড়ি ফিরবেন—যুদ্ধ থেমে যাবে! হঠাৎ যেন চাপা গলায় সে আর্তনাদ করে উঠল। ভয়ের ছায়া পড়ল চোখে। অস্ফুটস্বরে নিজের মনেই বলল, যুদ্ধ থামলে বাড়ি যেতে হবে ভাবলে খুব ভয় হয়—খুব ভয় হয়—

ভেতরে ভেতরে যে যন্ত্রণার আগুনে জ্বলছিল, তার উত্তাপটুকু মুছে গেল। সেই উদ্ধত স্বভাবের জওয়ানের লম্বা চওড়া বলিষ্ঠ চেহারার ভেতরে এক অসহায় ও করুণ মূর্তি ফুটে উঠল।

ঢং-ঢং-ঢং—দ্রুত বেজে চলল গাড়ি ছাড়ার শেষ সঙ্কেত। সঙ্গে সঙ্গে ট্রেনের বাঁশী শোনা গেল ভোঁ—ভোঁ—ভোঁ—

ট্রেন চলতে সুরু করল। আমিও জানলায় হাত রেখে সঙ্গে সঙ্গে হাঁটতে লাগলাম। চোখের দিকে তাকিয়ে দেখি, সেই বেদনাচ্ছন্ন মেদুর ভাবটা কেটে গিয়ে সেখানে আগের মত খুশির আলো ঝকঝক করছে। তার আশেপাশের সঙ্গী জওয়ানেরা যাতে না শুনতে পায় তাই চাপা গলায় বলল, একেবারে বসে বসে খেতাম, লেখাপড়াও শিখি নি তাই দাদা-বৌদিরা আমাকে, মা-কে উঠতে-বসতে খোঁটা দিত। সেদিন সংসারের প্রত্যেকটা লোককে খুব স্বার্থপর আর নিষ্ঠুর মনে হয়েছিল—

একটু থামল। অদ্ভুত একটা প্রশান্তিতে তার মুখখানা স্নিগ্ধ হয়ে উঠল। যেন স্বপ্নের ঘোরে বিড়বিড় করে বলল, দেখুন বাড়ি ছেড়ে অনেক—অনেক দূরে আছি বলে বাড়ির প্রত্যেকটা লোককে কেমন ভালো মনে হচ্ছে, মনে হচ্ছে, কত উদার, কত মহৎ—কিন্তু ফিরে গেলে আবার যদি তাদের সংকীর্ণ—তার বাদবাকী কথাগুলো চলন্ত ট্রেনের আওয়াজ আর জওয়ানদের উল্লসিত জয়ধ্বনির ভেতরে ডুবে গেল।

গাড়ির গতি বাড়তে লাগল। শেষ হয়ে এল প্ল্যাটফর্মের সীমা। আমি দাঁড়িয়ে পড়লাম।

দূর-অন্ধকার দিগন্তে মিলিয়ে যাওয়া ট্রেনটির দিকে তাকিয়ে আমার মনে হল, সংসারে কত রকমের ভয় যে আছে। সে যুদ্ধে যাচ্ছে। মৃত্যুভয়ের লেশ নেই। কিন্তু—

আর একটা ভয়কে, আশঙ্কাকে ভুলে থাকার জন্যই হয়তো অমনি উদ্দাম আর দুর্দান্ত আচরণ করে। আর সেই ভয়ই তাকে তাড়িয়ে নিয়ে চলেছে অনেক—অনেক দূরে সেইখানে—

যেখানে যুদ্ধ চলছে। বোমা পড়ছে। চারিদিক মৃত্যুর আশঙ্কায় থম থম করছে।

মেয়েদের ছোটবেলা থেকেই
ত্বকের যত্ন নিতে শেখান।
তিনি সুন্দরী, তিনি রূপসী!
প্রতিদিনের ত্বক পরিচর্যায় তাঁর এই অপরূপ সৌন্দর্যের
উৎস-সাধনা বিউটি ক্রীম।
সাধনা বিউটি ক্রীম রূপসাধনায় অনন্য
সাধনা ঔষধালয়-ঢাকা
সাধনা ঔষধালয় রোড, সাধনানগর, কলিকাতা-৪৮
অধ্যক্ষ যোগেশ চন্দ্র ঘোষ, এম.এ.
আয়ুর্বেদশাস্ত্রী, এফ.সি.এস. (লণ্ডন)
এম.সি.এস. (আমেরিকা) ভাগলপুর
কলেজের রসায়ন-শাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক
কলিকাতা কেন্দ্র :
ডাঃ নরেশচন্দ্র ঘোষ,
এম.বি.বি.এস. (কলিঃ)
আয়ুর্বেদাচার্য
SADHANA
Beauty
CREAM
সাধনা
বিউটি
ক্রীম

বিশ্বসাহিত্যের আদিপর্ব

ডঃ নরেন ভট্টাচার্য

॥ উনচল্লিশ ॥

ইংরাজী সাহিত্যের কথা

১৩৬০ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত অর্থাৎ সম্রাট তৃতীয় এডওয়ার্ডের আমল পর্যন্ত ইংলণ্ডে একটি জাতীয়তাবাদী চেতনা এসেছিল, কিন্তু মিনোটের দেশপ্রেমমূলক সঙ্গীতগুলি ছাড়া সাহিত্যক্ষেত্রে বিশেষ কোন অবদান যুক্ত হয় নি। ১৩৬০ থেকে ১৪০০ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত ইংলণ্ডের জাতীয় জীবনে নানাবিধ দুর্যোগের সৃষ্টি হয়েছিল। ব্ল্যাক প্রিন্সের মৃত্যু, দ্বিতীয় রিচার্ডের দুর্ভাগ্যজনক রাজত্বকাল, ব্ল্যাক ডেথ নামক বিখ্যাত মড়ক, ওয়াট টাইলারের নেতৃত্বে কৃষক বিদ্রোহ, ধর্মজগতে ওয়াইক্লিফের অভ্যুত্থান, সমস্ত কিছু মিলিয়ে সমাজজীবনে বিরাট একটি চাঞ্চল্য এসেছিল যার প্রভাব সাহিত্যজগতেও পড়েছিল। শুধু তাই নয়, এই পরিবেশের মধ্যেই যেন ইংরাজী সাহিত্য নতুনভাবে বিকশিত হবার সুযোগ পেয়েছিল।

গদ্যসাহিত্য (১৩৫০—১৪০০)

চতুর্দশ শতকের দ্বিতীয় অর্ধেই ইংরাজী গদ্যসাহিত্যের একটি বিশিষ্ট রূপের বিকাশ দেখা যায়। কিন্তু পরিমাণের দিক থেকে তা খুব বিশাল নয়, এবং সাহিত্যগুণের বিচারেও সেখানে ঘাটতি যথেষ্ট। মনে রাখতে হবে এই সময়ে ইউরোপের অপরাপর অংশে গদ্যসাহিত্যের রীতিমত উন্নতি ঘটেছে। এই প্রসঙ্গে ফ্রান্সের ফ্রোয়াসার্ত এবং ইটালীর বোকাসিওর নাম উল্লেখযোগ্য। ইংলণ্ডেও প্রতিভার অভাব ছিল না, কিন্তু তখনো ল্যাটিন ভাষার কৌলীন্য ছিল প্রচুর এবং শিক্ষিতসমাজে ল্যাটিনের কদরই ছিল বেশি। এখানে আমরা হিগডেন নামক একজন প্রতিভাবান লেখকের কথা উল্লেখ করছি যিনি ১৩৬৩ খৃস্টাব্দের পূর্বে পলিক্রনিকন নামক একটি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন যার সাহিত্যমূল্য সমকালীন ইউরোপের যে কোন শ্রেষ্ঠ রচনার চেয়ে কম ছিল না। কিন্তু এই মূল্যবান গ্রন্থটি রচিত হয়েছিল ল্যাটিনে। অনুরূপভাবে আমরা সেন্ট আলবানসের ওয়ালসিংহামেরও উল্লেখ করতে পারি যাঁর বৈদগ্ধ ল্যাটিন ভাষার সীমানা লংঘন করতে পারে নি।

হিগডেন পলিক্রনিকনের ইংরাজী অনুবাদ করেছিলেন ট্রেভিসার জন যিনি গ্লসেস্টারসায়ারের একজন পুরোহিত ছিলেন এবং এই অনুবাদ সম্পূর্ণ হয়েছিল ১৩৮৭ খৃস্টাব্দে। উক্ত গ্রন্থে হিগডেন কয়েকটি চিত্তাকর্ষক তথ্য দিয়েছেন। কেন তিনি ল্যাটিনকে তাঁর রচনার মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করেছেন তার কৈফিয়ৎ দিতে গিয়ে তিনি বলেছেন যে, স্থানীয় ইংরাজী ভাষার রূপ সর্বজনগ্রাহ্য নয়, এক জায়গার ভাষার সঙ্গে অপর জায়গার ভাষার কোন মিলই নেই, একেবারে চাটগাঁ-পুরুলিয়া ব্যবধান। তা ছাড়া বিদ্যালয়ে পড়ানো হয় ল্যাটিন ও ফরাসী। কিন্তু ট্রেভিসার জন কর্তৃক হিগডেনের অনুবাদে দেখা গেছে যে মূল ও অনুবাদের তিরিশ বছরের ব্যবধানের মধ্যেই সর্বজনগ্রাহ্য ইংরাজী ভাষার সৃষ্টি অনেকটা এগিয়ে গেছে, এবং ইতিমধ্যে বিদ্যালয়সমূহে ইংরাজীর প্রবেশলাভ ঘটেছে ও ফরাসী বহুলাংশে পরিত্যক্ত হয়েছে।

কিন্তু তা সত্ত্বেও চতুর্দশ শতকের ইংরাজী গদ্য অনুবাদের কার্যেই বিশেষভাবে প্রযুক্ত হয়েছে। এই প্রসঙ্গে আমরা ট্রাভেলস অফ স্যর জন ম্যাণ্ডেভিলের কথা উল্লেখ করতে পারি। এই গ্রন্থটি ফরাসী থেকে ইংরাজীতে অনূদিত হয়েছিল ১৩৭৭ খৃস্টাব্দে। কাহিনীটি হচ্ছে জন ম্যাণ্ডেভিল নামক জনৈক ইংরাজ নাইটের প্রাচ্যদেশ ভ্রমণ। তিনি ১৩২২ খৃস্টাব্দে যাত্রা শুরু করেছিলেন এবং বহু এডভেঞ্চারের পর ১৩৫৬ খৃস্টাব্দে স্বদেশে ফিরে আসেন। আসলে কিন্তু ওই নামের কোন লোকই ছিলেন না এবং ভ্রমণ-কাহিনীটি সম্পূর্ণ কাল্পনিক, গালিভারের ভ্রমণ বা রবিনসন ক্রুশোর মত। তবে কাহিনীর নায়ক ইংরাজ হবার দরুণ বইটির জনপ্রিয়তা হয়েছিল, কেন না বইটির বহু ধরণের অনুবাদের পাণ্ডুলিপি পাওয়া গেছে।

কবি চসারও বেশ কিছু গদ্য লিখেছিলেন, কিন্তু তাও অনুবাদমূলক। ১৩৮১ খৃস্টাব্দে তিনি বোথিয়াস রচিত কনসোলেসন গ্রন্থটি ল্যাটিন থেকে অনুবাদ করেন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে-গ্রন্থটি পূর্বে সম্রাট আলফ্রেড কর্তৃক অ্যাংলো-স্যাকসনে অনূদিত হয়েছিল। তাঁর বিখ্যাত ক্যাণ্টারবেরী টেলসের দুটি গল্প গদ্যে লিখিত, যে দুটির মধ্যে একটি ল্যাটিন ও অপরটি ফরাসী থেকে নেওয়া। চসার অ্যাস্ট্রোলাব নামক জ্যোতিষশাস্ত্রের একটি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন, এটিও ল্যাটিন থেকে অনুবাদ। পণ্ডিতদের মতে অনুবাদের সামগ্রী পছন্দ করার ব্যাপারে চসার আশ্চর্যরকম ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছেন।

এরপর আমরা যাঁর নাম করব তিনি একই সঙ্গে অনুবাদক ও মৌলিক গদ্য লেখক। ইনি হচ্ছেন জন ওয়াইক্লিফ। ধর্মের ক্ষেত্রে ইনি একটি বিপ্লব আনতে সক্ষম হয়েছিলেন। বলতে গেলে ইনিই ইংলণ্ডের আদিতম প্রোটেস্টান্ট, পোপতন্ত্রের ইনি ছিলেন আজন্ম শত্রু। ওয়াইক্লিফের জন্ম ১৩২৪ খৃস্টাব্দে। আইন ও ধর্মশাস্ত্রে তিনি ছিলেন অগাধ পণ্ডিত। ধর্মের নামে ব্যভিচারের বিরুদ্ধে তিনি রুখে দাঁড়িয়েছিলেন এবং অগ্নিময়ী রচনার দ্বারা তিনি পোপতন্ত্রকে নির্মমভাবে আঘাত করেন। তাঁর বলিষ্ঠ মতবাদের জন্য তিনি তাঁর স্বজন ও বন্ধুবান্ধব কর্তৃক পরিত্যক্ত হন, কিন্তু কোন কিছুই তাঁকে আদর্শচ্যুত করতে পারে নি। ১৩৮০ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি ল্যাটিনেই লিখেছিলেন, পরে তিনি ইংরাজীকেই তাঁর ভাবপ্রকাশের মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করেন। তিনিই প্রথম বাইবেলের ইংরাজী অনুবাদ করেছিলেন যাতে ধর্মরাজ্যের মাতব্বরদের কথা না শুনে জনসাধারণ মাতৃভাষার মাধ্যমে ধর্মের প্রকৃত তত্ত্ব অবগত হতে পারে। এ ছাড়া ওয়াইক্লিফের প্রচারমূলক রচনাবলীর কথাও উল্লেখযোগ্য যা ইংলণ্ডের অধিবাসীদের পুরাতন প্রথার মায়া ত্যাগ করে নতুন চিন্তায় উদ্বুদ্ধ করতে যথেষ্ট সহায়তা করেছে।

কাব্যসাহিত্য

ইংরাজী সাহিত্যের ইতিহাসে আমাদের আলোচ্য যুগে (১৩৫০—১৪০০) কবিতারই বেশি উৎকর্ষ ঘটেছিল গদ্যের চেয়ে। ইংরাজী ভাষা এই যুগে চারটি আঞ্চলিক বাকভঙ্গীর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, উত্তর ও দক্ষিণ এবং মধ্যাঞ্চলের পূর্ব ও পশ্চিম দিকের ভাষা। কালক্রমে অবশ্য এই চারটি উপাদানের মধ্যে মিলন

ঘটতে শুরু করে। তা ছাড়া ইংরাজী ভাষার মধ্যে ইতিমধ্যেই অনেক বিদেশী শব্দ, বিশেষ করে জার্মান শব্দের অনুপ্রবেশ ঘটতে শুরু করেছিল। কবিতার ছন্দের ক্ষেত্রেও পরিবর্তন আসতে আরম্ভ করেছিল।

এই যুগে রচিত কবিতাসমূহের মধ্যে সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য **জোসেফ অফ এরিমাথি** যা কেল্টীয় হোলি গ্রেলের একটি কাহিনীর ছন্দে রূপায়ন। বর্তমান রচনাটির উৎস অবশ্য ফরাসী। আরও পাওয়া গেছে **আলেকজান্ডার** নামক একটি রোমান্সের কিছু কিছু খণ্ডিত অংশ।

পরবর্তী কাব্যগ্রন্থটি হচ্ছে **উইলিয়ম এন্ড দি ওয়েরউলফ**। এটি ওই নামেরই একটি ফরাসী রোমান্সের তর্জমা যার রচনাকাল ১৩৫৫ খৃস্টাব্দ। এটি আসলে একটি রূপকথা স্পেনের জনৈক রাজপুত্র কিভাবে তার বিমাতার যাদুমন্ত্রে নেকড়ে বাঘে রূপান্তরিত হয়েছিল এবং কিভাবে তার রাহুমুক্তি ঘটল সেই কাহিনী। অনুবাদ হলেও এখানে সর্বত্র মূলকে অন্ধের মত অনুসরণ করা হয় নি।

একটি পাণ্ডুলিপিতে একসঙ্গে চারটি কবিতা পাওয়া গেছে যেগুলির রচনাকাল ১৩৬০—৭০। এই চারটি রচনা হচ্ছে **পার্ল**, **পিউরিটি**, **পেসেন্স** এবং **সার গওয়াইন এন্ড দি গ্রীন নাইট**। কবিতাগুলির লেখক সম্ভবত একজনই। **পার্ল** কবিতাটি একটি রূপক। কবি তাঁর রত্নকে হারিয়েছেন একটি বাগানে, অর্থাৎ তাঁর দু' বছর বয়স্ক কন্যাকে হারিয়েছেন। সে গীর্জার প্রাঙ্গণে সমাধিস্থ রয়েছে। সেই বাগানে ঘুরতে ঘুরতে কবি অকস্মাৎ স্বপ্নাবিষ্ট হলেন, দেখলেন তিনি স্বর্গে গেছেন এবং সেখানে অপরূপ সাজে সজ্জিতা তাঁর পার্লকে দেখলেন। সে তাঁর সঙ্গে কথাবার্তাও বলল, কিন্তু উভয়ের মধ্যে একটি নদীর ব্যবধান যা মৃত্যু ভিন্ন অতিক্রম করা যায় না। **পিউরিটি** কবিতাটি বর্ণনাধর্মী এতে আছে ওল্ড টেস্টামেন্টের কয়েকটি কাহিনী, যেমন দেবদূতের পতন, বন্যা ও মহাপ্রলয়, আব্রাহামের নিকট দেবদূতের আগমন, বেলসাজারের ভোজসভা, নেবুকাডনেজারের পতন। **পেসেন্স** কবিতাটির বিষয়বস্তু হচ্ছে জোনাহর জীবনকাহিনী। তিনটি কবিতায়ই খৃস্টীয় আদর্শসমূহ ব্যক্ত করার প্রচেষ্টা রয়েছে। চতুর্থ কবিতাটি, অর্থাৎ **সার গওয়াইন এন্ড দি গ্রীন নাইট**, কিছুটা ভিন্নধর্মী। এর কাহিনীটি কেল্টীয়, আর্থার চক্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। রাজা আর্থার তাঁর গোল টেবিলে অনুগত বারোজন নাইট নিয়ে বড়দিন পালন করেছেন, এমন সময় জনৈক দৈত্য, যার নাম **গ্রীন নাইট**, সেই ঘরে প্রবেশ করল। তার হাতে একটি কুঠার। সে জানাল যে এই কুঠার দিয়ে কেউ তার শিরশ্ছেদ করুক কিন্তু একবছর পরে একটি নির্দিষ্ট দিনে যে তার শিরশ্ছেদ করল তাকে সেই কুঠারের সম্মুখীন হবার প্রতিশ্রুতি দিতে হবে। তখন মর্যাদা রাখার জন্য সার গওয়াইন নামক একজন নাইট সেই কুঠার দিয়ে গ্রীন নাইটের শিরশ্ছেদ করলেন। গ্রীন নাইট কাটা মাথাটিকে তুলে নিয়ে যথাস্থানে বসিয়ে ঘোড়ায় চড়ে সকলকে অবাক করে দিয়ে বেরিয়ে গেল। পর বৎসর কথা রাখার জন্য সার গওয়াইন বহু দেশ পরিভ্রমণ করে গ্রীন নাইটের রাজ্যে উপস্থিত হলেন। সেই দৈত্য তাঁকে সাদরে অভ্যর্থনা করল এবং সার গওয়াইন বেশ কিছুদিন তার অতিথি হয়ে রইলেন। দৈত্যের সুন্দরী পত্নী তাঁকে প্রলুব্ধ করার চেষ্টা করল কিন্তু সম্পূর্ণ প্রলুব্ধ করতে সক্ষম হল না। তখন সে একটি সবুজ সিল্কের উপর সোনা বসানো মালা তাকে দিল এবং এই মালার গুণেই যখন সার গওয়াইনকে পূর্বচুক্তি অনুযায়ী দৈত্যের কুঠারের সম্মুখীন হতে হল তিনি অনাহত রয়ে গেলেন। পরে জানা গেল যে সমগ্র বিষয়টি সার আর্থার এবং তাঁর অনুগামী নাইটদের পরীক্ষা করার জন্য। সে যাই হোক তদবধি আর্থার ও তাঁর অনুচরেরা এবং তাঁদের ঘরণীরা হাতে একটি করে সবুজ ফিতা বাঁধতেন, সার গওয়াইনের প্রতি সম্মান দেখানোর জন্য। স্পেন্সারের **ফেয়ারী কুইনের** একটি কাহিনীর উপর বর্তমান কবিতাটির প্রভাব আছে।

পরবর্তী উল্লেখযোগ্য রচনা হচ্ছে উইলিয়াম ল্যাঙ্গলান্ডের **পিয়েরস প্লাউম্যান**। এটি খুবই জনপ্রিয় কাব্য হতে পেরেছিল। লেখকের জন্ম ১৩৩০ খৃস্টাব্দে স্রোপসায়ারে। কবিতাটি একটি সামাজিক স্যাটায়ার। কবি একজন পশুপালক যিনি মে মাসের একটি প্রভাতে মালভের্ন পাহাড়ে অকস্মাৎ ঘুমিয়ে পড়ে স্বপ্ন দেখছেন যে বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষ, ধনী এবং দরিদ্র, অলস ও কর্মঠ, সামন্ত এবং দরিদ্র পুরোহিত এবং ভাঁড় সকলে মিলে সামনের প্রান্তরে সমবেত হয়ে চীৎকার করছে এবং 'লেডি হোলিচার্চ' বলছেন যে একমাত্র সত্য পথই তাদের স্বর্গে নিয়ে যেতে সক্ষম। এই সত্য পথটি খুঁজে পাবার জন্য যখন কাড়াকাড়ি পড়ে গেছে তখন নায়ক পিয়েরস প্লাউম্যান তাদের পথ দেখাতে এগিয়ে এল। প্রথমেই সে পথের দুরূহতার কথা বলল, এতে বহু লোকই ফিরে গেল। যারা এগিয়ে যেতে রাজী হল তাদের প্লাউম্যান প্রত্যেককে আধ একর করে জমি চাষ করতে আদেশ দিল, এমন কি সুন্দরী মহিলাদেরও তা করতে হবে। অর্থাৎ শ্রম ও কর্মের মধ্য দিয়ে মুক্তি আসে এই সত্যটিকেই বর্তমান কবিতায় প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করা হয়েছে। কবিতাটির তিনটি কপি পাওয়া গেছে এবং তিনটিরই বর্ণনা ও বক্তব্যের মধ্যে পার্থক্য আছে। সম্ভবত কবি লিখে খুব সন্তুষ্ট হন নি, যে কারণে বারবার বিভিন্নভাবে লিখেছিলেন। তা ছাড়া মূল কাহিনীর সঙ্গে আরও কয়েকটি শাখা কাহিনী আছে যেমন, 'লেডি মীডের বিবাহ', 'সাতটি পাপের স্বীকৃতি' ইত্যাদি। কিন্তু পণ্ডিতদের মতে **পিয়েরস প্লাউম্যান** খুব সার্থক রচনা নয়।

এরপর চসারের যুগে পৌঁছনোর আগে আমরা জন গোয়ার-এর কথা উল্লেখ করব। তার আগে আরও দু' একটি কথা বলার প্রয়োজন আছে। ইংরাজী সাহিত্যের ইতিহাসে লক্ষ্য করলে দেখা যায়, ইংরাজী ভাষা প্রাথমিক পর্যায়ে ইংলণ্ডের বিভিন্ন অঞ্চলের অ্যাংলো-স্যাকসন-নর্মান সংযুক্ত স্থানীয় ভাষা ছাড়া আর কিছুই ছিল না। এ কথা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। এই সকল আঞ্চলিক ভাষাসমূহের পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতায় শেষ পর্যন্ত মধ্য-পূর্বাঞ্চলের ভাষাই জয়ী হয়, যেমন বাংলাভাষার ক্ষেত্রে হয়েছে নিম্ন গাঙ্গেয় অঞ্চলের ভাষা।

এবার গোয়ারের প্রসঙ্গে আবার ফিরে আসা যাক। জন গোয়ার চসারের সমকালীন। চসারের মৃত্যুর আট বছর পর তিনি মারা যান ১৪০৮ খৃস্টাব্দে। তবে তাঁর জন্মের তারিখটা পাওয়া যায় না। তিনি ছিলেন কেন্টের অধিবাসী এবং তাঁর একটি বিশেষত্ব হচ্ছে এই যে তিনি তিনটি ভাষায় লিখেছিলেন—ফরাসী (অ্যাংলো-নর্মান), ল্যাটিন ও ইংরাজী। অ্যাংলো-নর্মান ভাষায় তিনিই ছিলেন শেষ লেখক এবং এই ভাষায় তিনি অনেক প্রেমের কবিতা লিখেছেন। এ ছাড়া অ্যাংলো-নর্মানে তিনি একটি দীর্ঘ নীতিমূলক কাব্যও লিখেছিলেন। ল্যাটিন ভাষায় তিনি একটি বিখ্যাত গ্রন্থ রচনা করেন **ভোকস ক্লামানটিস** যা ওয়াট টাইলারের কৃষি-বিদ্রোহের প্রতিক্রিয়ায় রচিত। এই বিদ্রোহকে তিনি অবশ্য সুনজরে দেখতে পারেন নি, কেন না তিনি নিজেও সামন্তশ্রেণীর লোক ছিলেন। ১৩৮৩—৮৪ খৃস্টাব্দে তিনি ইংরাজীতে প্রথম একটি দীর্ঘ কবিতা লেখেন, **কনফেসিও অ্যামানটিস**। সম্ভবত চসারের সাফল্যে উদ্বুদ্ধ হয়ে এটি তিনি রচনা করেছিলেন। অষ্টমাত্রিক ছন্দে চল্লিশ হাজারেরও বেশি শ্লোকে রচিত এই কবিতাটি অজস্র কাহিনীর সংকলন। অবশ্য কাহিনীগুলির উৎস ল্যাটিন সাহিত্যের বিপুল গল্পসম্ভার। গোয়ারের প্রতিভা ছিল মাঝামাঝি ধরণের। বিদ্বান ও পরিশ্রমী হওয়া সত্ত্বেও তিনি চসারের সমতুল্য হতে পারেন নি।

রঙ্গমঞ্চে ওদেশে
শিলারের পরে ব্রেশট

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

বেরটল্ট ব্রেশট—আগেই বলেছি ১৯২১ সালে ব্রেশট কয়েকবার বার্লিনে গেলেন—উদ্দেশ্য ওখানকার থিয়েটারে যদি নিজের জন্য পাকাপাকি বন্দোবস্ত করে নিতে পারেন। বার্লিনে ১৯২২ সালের প্রথমদিকে আলাপ হয়ে গেল আরনোল্ট ব্রোনেনের সঙ্গে। সাম্প্রতিক জার্মান সাহিত্যে ব্রোনেন হচ্ছেন একজন অসাধারণ এবং বিতর্কমূলক ব্যক্তিত্ব। তাঁর বাবা ব্রোনার ছিলেন ইহুদী-অস্ট্রীয়ান স্কুলমাস্টার। অভিব্যক্তিবাদী (এক্সপ্রেসনিস্ট) আন্দোলনের নেতা হিসাবেই তিনি প্রথম নাম করেন। পরে তিনি তাঁর বামপন্থী বন্ধুদের ত্যাগ করে তাঁর অপরিসীম শক্তিকে নাৎসীদের সাহায্যার্থে কাজে লাগান—অবশ্য এর আগে তাঁকে রেশিয়াল পিওরিটি প্রমাণ করবার জন্য মাকে আদালতে দাঁড় করাতে হয়েছিল এবং তিনি হলফ নিয়ে বলেছিলেন যে ব্রোনেন আসলে তাঁর ইহুদী স্বামীর সন্তান নন—একজন সত্যিকার জার্মানই তার পিতা। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষ দিকে ব্রোনেন নাৎসী-বিরোধী আন্ডারগ্রাউন্ড আন্দোলনে যোগ দেন; কমিউনিস্ট হন এবং একটি মাউন্টেন ভিলেজের বারগোমাস্টারের (প্রধান ম্যাজিস্ট্রেট বা মেয়র) পোস্টে কাজ করেন কিছুকালের জন্য। সোভিয়েট সৈন্যরা অস্ট্রিয়া ছেড়ে চলে যাবার পর ব্রোনেন ইস্ট জার্মানীতে চলে যান।

১৯২২ সালে ব্রোনেন ছিলেন বার্লিনের একটি ডিপার্টমেন্ট স্টোরের কেরানী—এই সময় তিনি চাইছিলেন লেখক হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে।

কিস্তিবন্দীতে ট্রানজিস্টার

৩২০, টাকা মূল্যের বিশ্ব-বিখ্যাত "এসকর্ট" ৩ ব্যান্ড অল-ওয়ার্ল্ড পোর্টেবল ট্রানজিস্টার মাসিক ১০, টাকার কিস্তিতে নিন।

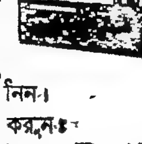

আবেদন করুন :

Japan Agencies (B—10)
Post Box 1194, Delhi—6.

এই সময়কার ব্রোনেনের বিবৃতি থেকে জানা যায় একদিন বিকেলে লেখক এবং সাংবাদিক অটো জারেকের ঘরে তাঁর চায়ের আমন্ত্রণ ছিল—জারেকের উদ্দেশ্য ছিল ব্রোনেনের সঙ্গে তাঁর কয়েকজন সাহিত্যিক বন্ধুর আলাপ করিয়ে দেবার। ব্রোনেন ড্রয়িং রুম থেকে বেরিয়ে বড় ফ্ল্যাটের এদিকে-ওদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন :

"একটি ঘরের ভেতর থেকে গীটারের বাজনা কানে এল......ঘরটির ভেতরে গেলাম। খুব অন্ধকার। মনে হল—প্রথমটায় একটা কর্কশ গলার আওয়াজ পেলাম.........তারপর গায়ককে দেখতে পেলাম : চব্বিশ বছরের এক শীর্ণ যুবক। চোখে স্টীল রিমের চশমা। নোংরা কাল চুল কপালের ওপর এসে পড়েছে। তার দিকে চেয়ে রইলাম। আমার মনে হচ্ছিল সে যেন আমাকে সম্মোহিত করে ফেলেছে.....

"ঘরটিতে আরও চারটি যুবক উপস্থিত ছিল—গায়কটি কখনও গান করছিল, কখনও কথাবার্তা বলছিল, আবার কখনও চিৎকার করে পড়ছিল। গায়ক ছাড়া অন্য কারোর দিকে আমার দৃষ্টি পড়ে নি। পরে অটো জারেক আমাকে বলেছিল যে ওই যুবক গায়কটির নাম বেরট ব্রেশট।"

অল্প দিনের ভেতরই ব্রেশট এবং ব্রোনেনের ভেতর ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব হয়ে গেল। ব্রোনেনের নাটক ভাটারমোরড (প্যারিসাইড—তা ছাড়া প্রথম নাটকের আর কিই বা নাম দেবেন ব্রোনেন) সেই সময় মরিটজ শীলার মঞ্চস্থ করবেন বলে নিয়েছিলেন। মরিটজ শীলারের একটি পরীক্ষা-নিরীক্ষামূলক ম্যাটিনি থিয়েটার ছিল—নাম ইয়ুঙ্গে বুয়েনে। তাছাড়া ব্রোনেন অভিব্যক্তিবাদী নাটকের একজন পথিকৃৎ হিসাবে সে সময় পরিচিতি লাভ করেছিলেন। ব্রেশট জোর দিয়ে ঘোষণা করলেন যে তিনিই একমাত্র লোক যিনি ব্রোনেনের নাটক প্রডিয়ুস করবার ক্ষমতা রাখেন। ব্রোনেনও এ ব্যাপারে আপত্তি করলেন না। কিন্তু ব্রেশট এরপর পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে এত অসুস্থ হয়ে পড়লেন যে তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হল। ব্রোনেন তাঁর স্বল্প আয়ের থেকে যতোটা সম্ভব অর্থ সাহায্য করতে লাগলেন ব্রেশটকে। তিনি অধীরভাবে অপেক্ষা করছিলেন কবে ব্রেশট সুস্থ হয়ে তাঁর নাটকের রিহার্সাল শুরু করবেন।

এদিকে শীলার ব্রোনেনের নাটকের প্রধান দুটি চরিত্রের মঞ্চরূপায়ণের জন্য হাইনরিখ জর্জ এবং এ্যাগনেস স্ত্রব নামে দুজন বিখ্যাত শিল্পীকে যোগাড় করলেন। এই দুজন বিখ্যাত অভিনেতা কিন্তু অপরিচিত যুবক প্রডিউসার ব্রেশটের ব্যাভারিয়ান কথার টান এবং তিক্ততাপূর্ণ বিদ্রূপ শুনতে শুনতে শঙ্কিত হয়ে উঠলেন। ব্রোনেনের নাটকটি লেখা হয়েছিল বিস্ফোরক আবৃত্তি আশ্রিত অভিব্যক্তিবাদী রীতিতে। কিন্তু ব্রেশট এটিকে শান্ত এবং স্বাভাবিকভাবে প্রডিয়ুস করতে চাইছিলেন। প্রডিউসার হিসাবে এই প্রথম অবস্থা থেকেই ব্রেশট স্টেজের ওপর হৈ-চৈ আবেগপ্রবণতা ইত্যাদি ব্যাপার ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখতেন। কিন্তু ঐ তারকাশ্রেণীর শিল্পী দুটি জোর করতে লাগলেন যে, যে নাটকে তাঁরা অভিনয় করছেন তার সঙ্গে আবেগ-উচ্ছ্বাস অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। শেষকালে একদিন হাইনরিখ জর্জ এতবেগের সঙ্গে তাঁর পার্টটি ছুঁড়ে দিলেন যে সেটি স্টলের পঞ্চদশ পংক্তির সামনে গিয়ে পড়ল। আর এ্যাগনেস স্ত্রব? রাগে তিনি কাঁপছিলেন—কোনোরকমে তাঁকে ধরে বাইরে নিয়ে যাওয়া হোল। ভাটারমোরডের শুভ উদ্বোধন রজনীর দিন পেছিয়ে গেল। ব্রেশট ব্রোনেনকে সম্বর্ধনা জানিয়ে বললেন—"ঐ সব অভিনেতা দিয়ে এ নাটক করালে সাফল্যলাভ হোতো না!"

ব্রেশট ফিরে এলেন মিউনিখে। ব্রোনেন দাবি জানালেন যে এবার ব্রেশট তাঁর নামের অংশবিশেষ চুরি করেছেন—ব্যাপারটা ঘটেছিল এইভাবে। ব্রোনেন তাঁর কৃশ্চান নেমকে একটু কড়া, পুরনো-পন্থী এবং মৌলিক করবার জন্য আরনল্ড থেকে বদলিয়ে আরনল্ট করেছিলেন। এর অনুকরণ করেই ব্রেশট নাকি তাঁরও প্রথম নামটা বেরথল্ড থেকে বেরটল্ট করে নিয়েছিলেন। যাক নামে আর কি পাল্টায় বলুন? শেক্সপীয়ার যে নামেই লিখতেন সেই নামই জগদ্‌বিখ্যাত হয়ে যেত। স্রষ্টার আসল পরিচয় তাঁর সৃষ্টির ভেতর দিয়ে। সাহিত্যসম্রাট শরৎচন্দ্রের সময় আর এক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় উপন্যাস লিখতেন। কিন্তু নামের ঐক্য থাকলেও পাঠকেরা কোনদিন তাঁদের লেখা নিয়ে অসুবিধা অনুভব করেন নি।

যাই হোক বার্লিনের আর একজন প্রোডিউসারের সাহায্যে ব্রোনেনের নাটকটি ফ্র্যাঙ্কফার্টে মঞ্চস্থ করা হোল। ব্রেশটের 'ড্রামস ইন দি নাইট' প্লে'টির ওয়ার্ল্ড প্রিমিয়ারের কথা চলছিল এই সময়। ১৯২২ সালের ২২শে সেপ্টেম্বরের একটি

চিঠিতে ব্রেশট বার্লিনের বিখ্যাত নাট্য-সমালোচক হারবার্ট ইহেরিংকে নাটকটির প্রথম রাত্রির অভিনয় দেখবার জন্য মিউনিখে আসবার আমন্ত্রণ জানালেন:

"শুভ উদ্বোধন রজনী ২৯শে সেপ্টেম্বর (শুক্রবার)। আমি জানি আপনাকে এভাবে আসতে অনুরোধ করাটা আমার পক্ষে অসঙ্গত। কিন্তু আপনার আসার ওপর সত্যিই অনেক কিছু নির্ভর করছে। যেদিন থেকে বার্লিনের রঙ্গমঞ্চ পরীক্ষা-নিরীক্ষার ব্যাপার বন্ধ করে দিয়েছে। আমাদের পক্ষে ভয়ানক অসুবিধা হয়েছে দরকার মত সুবিবেচনা-প্রসূত নাট্যসমালোচনা আদায় করবার।"

ব্রেশটের চিঠি থেকে এই কথাটাই স্পষ্টভাবে বোঝা যাচ্ছে যে, ভাল শিল্পী তাঁর কাজের সত্যিকার সুক্ষ্ম বিচারের জন্য সুদক্ষ সমালোচকের প্রতীক্ষা করে থাকেন। আমাদের দেশে এই সমালোচনা বস্তুটিরই যথার্থ অভাব। সেই কারণেই জনসাধারণের রুচি এদেশে ঠিকমত গড়ে উঠতে পারে না। কোনটা শিল্পসঙ্গত সৃষ্টি এবং কোনটা অনাসৃষ্টি এ বিচার-বোধ সাধারণ মানুষ আপনা থেকে পায় না। শিল্পবোধ তাঁদের মনে জাগিয়ে তোলেন সমালোচকেরা। আমাদের দর্শক-দের ভেতর যদি সত্যিকার শিল্পবোধ থাকতো তাহলে শ্রীসত্যজিৎ রায়ের ছবির পাশাপাশি তৃতীয় শ্রেণীর হিন্দী-মার্কা ছবি বাংলাতে তোলা হোতো না। কিন্তু ওই ধরণের ছবি তোলা হয় এবং সে ছবি দেখতে লোকে লাইন দিয়ে টিকেট নেবার জন্য উদগ্রীবভাবে প্রতীক্ষা করতে থাকে। এ থেকেই প্রমাণ হয় যে ওই তৃতীয় শ্রেণীর ছবির এদেশে চাহিদা আছে—অর্থাৎ সাধারণ লোকের শিল্পরুচি এখনও স্বাভাবিকভাবে শিল্পানুমোদিত-রূপে গড়ে উঠতে পারে নি।

আর শিশিরোত্তর যুগে রঙ্গমঞ্চের ক্ষেত্রেও তাই ঘটেছে। গিরিশ যুগে, শিশির যুগে বাস্তবধর্মী, সামাজিক, ঐতিহাসিক, পৌরাণিক সব কাহিনীর ওপর ভিত্তি করে নাটক লেখা হোত—ঐ সব নাটকে অস্বাভাবিকতা বা উদ্ভট কোনো কিছুর স্থান হোতো না। আর আজকাল দেখবেন কিছু অনুবাদ নাটক বাদে আর ভাল নাটকই দেখা যায় না। মৌলিক নাটক মানেই কোন না কোন ইজম নিয়ে জিগির তোলা—আর আছে নানাভাবে স্টাণ্ট দেবার প্রচেষ্টা। কেউ কেউ স্টেজের বিভিন্ন লেভেলে অভিনয় দেখিয়ে প্রমাণ করবার চেষ্টা করছেন এ ধরণের অভিনয় সারা পৃথিবীতে প্রথম—যেন সেইটেই নাটকের বড় কথা। কেউ একই সঙ্গে দশটি রোলে অভিনয় করছেন বলে প্রচারপত্র দিচ্ছেন—অর্থাৎ এক সঙ্গে দশটি রোলে অভিনয় করলেই সে নাটক লোককে দেখতে হবে। আবার এ্যাবসার্ড নাটকও নাকি দেখা দিয়েছে বাংলার রঙ্গ-মঞ্চে। একটি দল সেদিন বলছিলেন তাঁরা নাকি এ্যালবির 'জু স্টোরী' মঞ্চস্থ করছেন। জিজ্ঞেস করলাম—এ নাটক যে করছেন, এর অর্থ তো বোঝা যায় না। ভদ্রলোক কোন মন্তব্য করলেন না। আর করবেনেই বা কি? 'জু স্টোরী' পড়ে আমার ইওনেস্কোর 'দি লেশন' নাটকের ছাত্রীর মত দাঁত ব্যথা শুরু হয়েছিল। এ'রা বোধহয় "না-বোঝার-আনন্দ" দিতে চান দর্শকদের এবং পেতে চান নিজেরা।

আসলে আমাদের জীবনে এখন সত্যিকার ডেকেডেন্স এসে গেছে, রাজ-নীতিক জীবনের এবং শিল্প-সংস্কৃতির ক্ষেত্রের সর্বস্তরে। দেশের অর্থনৈতিক ভারসাম্য নষ্ট হয়ে গেলেই এমনটা ঘটে থাকে। সাধারণ মানুষ অর্ধমৃত অবস্থায় কোনরকমে দিনযাপন এবং প্রাণধারণ করছে—স্বাভাবিক কিছু দেখলে তার মন ভরে না। বরং উদ্ভট বা অস্বাভাবিক বস্তুর সামনা সামনি হলে একটু কৌতূহল জাগ্রত হয়।

সুতরাং আমার মনে হয় দেশের বর্তমান অবস্থার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে দেশের শিল্পকলারও পুনরুজ্জীবন হবে। নচেৎ নয়। একজন সেদিন বলছিলেন সম্প্রতি রাজনীতির ক্ষেত্রে যে বিরাট ওলোট-পালট দেখা দিয়েছে তার ওপর ভিত্তি করে তো নাটক লেখা চলে। আমি বললাম—কি ওলোট-পালট বলুন তো? সর্বত্র শুধু একটি ব্যাপারই দেখছি—সেটা হোল "বিশ্বাসঘাতকতা"। কিন্তু সবাই যদি বিশ্বাসঘাতক হয়, তাহলে বৈপরীত্যের দিকটা দেখাবেন কাকে দিয়ে। মীরজাফর, জগৎশেঠ, রাজবল্লভের পাশাপাশি ছিলেন সিরাজ, মোহনলাল, মীরমদন, জয়চাঁদের পাশে পৃথ্বীরাজ—মীরমদন যুদ্ধক্ষেত্রে বীরের মৃত্যু বরণ করলেন, আর মীরজাফর কুষ্ঠব্যাধিতে অন্তিমনিশ্বাস ত্যাগ করেন—চমৎকার কন্ট্রাস্ট দেখানো চলে।

সবাই যদি মীরজাফর হয় তাহলে তো রঙ্গমঞ্চে লেপার-এসাইলামের আবির্ভাব ঘটাতে হয়—তাতে কি নাটক হবে? তাছাড়া মীরজাফর বা বিভীষণের দিক থেকেও একটা বক্তব্য ছিল—সে হচ্ছে সিরাজ বা রাবণের অত্যাচারের দিকটা। আজকালকার বিভীষণদের কোন সে ধরণের বক্তব্য আছে কি? নাটক সাহিত্যের মাধ্যমে জীবনেরই প্রতিফলিত রূপ। আমাদের জীবনেরই সর্বাঙ্গে বিষাক্ত ঘা দেখা দিয়েছে—সুতরাং এই জীবনের ওপর ভিত্তি করে ভাল নাটক লেখা হবে কি করে?

প্রশ্ন করতে পারেন যে সমাজের দোষ-ত্রুটি থাকে বলেই তো সমাজ সমস্যামূলক নাটক রচিত হয়—যেমন লিখেছেন বার্নার্ড শ বা গলসওয়ার্দি। কিন্তু যে সব সমাজ নিয়ে ওঁরা লিখেছেন সেখানে একটা নিম্ন-তম মান বা স্ট্যাণ্ডার্ড রয়েছে। আমাদের সে সব ঢেলে বদল করতে হবে—যার মূলে কোন কিছুই নেই তাকে কি গড়ে তোলা যায়?

ভাষার ব্যাপারটাই দেখুন না? দেশের নানা জায়গায় এই প্রশ্ন নিয়ে আগুন জ্বলে উঠেছে। এ নিয়ে কি নাটক রচনা করা সম্ভব? কে এর উত্তর দেবে? যদি হিন্দীর জিগির তুলে নাটক লিখি, তবে কি সত্যিকার দেশপ্রেম দেখানো হবে? আমরা বাঙালী জাতি—আমাদের মাতৃভাষা বাংলা—মাইকেল, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎ-চন্দ্রের রচনা যে ভাষায়, সে ভাষাকে ছেড়ে আমরা হিন্দীভাষী হতে যাব কেন? তবে এ দেশে সবই সম্ভব—আমাদের ভাত ছেড়ে আটা ধরতে হয়েছে, এর পর হয়তো পরিণতি হবে ছাতুতে।

[ক্রমশঃ]

ফোল্ডিং ৫০ গুলির পিস্তল

লাইসেন্সের প্রয়োজন নেই। আমেরিকান মডেল। চোর এবং বন্য জন্তুর হাত থেকে নিজেকে বাঁচান। পিকনিক, ভ্রমণ এবং নাটকের পক্ষে উপযোগী। ৫০ গুলীর ব্যবস্থা-সহ অটোমেটিক। হাল্কা ওজন এবং চোখ ধাঁধান আগুন আপনাকে বিপদ থেকে রক্ষা করবে।

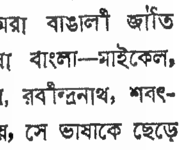

মূল্য ৫০ গুলীসহ নং ৩৩ টাঃ ১৩·৫০। জার্মান মডেল নং ৯৯ টাঃ ১৫·৫০। ভি, পি, পি, চার্জ টাঃ ২·৫০। চামড়ার কেস ৭, টাকা। অতিরিক্ত প্রতি একশত গুলী ৫, টাকা।

GEM ARTS (WBM—15)
P.B. 1325, Delhi—6.

আকাশবাণী পরিক্রমা

মেঘদূত

ঐতিহাসিক একুশে ফেব্রুয়ারি। সারা পূর্ববাংলা জুড়ে হরতাল। মাতৃভাষা বাংলাকে বাঁচাতে হবে। মাতৃভাষার মান রক্ষা হলো রক্তের বিনিময়ে। একুশে ফেব্রুয়ারী! তোমাকে প্রণাম জানায় ওপারের বাঙালি এপারের বাঙালি। একুশে ফেব্রুয়ারি। তুমি বাঙালিকে শেখালে জীবন তুচ্ছ মাতৃভাষার কাছে।

মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষা করতে ও-পারের বাঙালি ক্রমাগত লড়াই করে চলেছেন। ঢাকা বেতারকেন্দ্রে ফিরিয়ে এনেছেন রবীন্দ্রসংগীতের প্রচার। ও-পার বুঝেছে, বাঙলা ভাষা এবং রবীন্দ্রনাথ—বাঙালি সংস্কৃতির মূলমন্ত্র। বাঙলা ভাষাকে কেন্দ্র করে প্রতিদিন নোতুন নোতুন কাজের খবর পাই। ঢাকা থেকে প্রকাশিত আঞ্চলিক অভিধানের একটি খণ্ড যে কেউ দেখলে বুঝবেন পূর্ববঙ্গ-বাসীরা কী কাজই না করছেন। এবার খোঁজ করুন মাতৃভাষার জন্য আমরা কে কী কাজ করছি।

আমরাও কিছু করেছি বইকি—রবীন্দ্রনাথকে করেছি ব্যবসার উপচার। কথাটা সত্য কিনা পঁচিশে বৈশাখ তো এসে গেলো তখন মিলিয়ে নেবেন। আরও বলি তবে, শুনুন রবীন্দ্রসংগীতের রেকর্ডগুলি। সব রেকর্ডই কী রবীন্দ্র-রীতিসম্মত! রবীন্দ্রসংগীত প্রচারের নামে কোন মনোবৃত্তি কাজ করছে তা জানতে ইচ্ছা হয়। রেকর্ডগুলিকে বাজারে মুখ দেখাবার পূর্বে যতদূর জানি বিশ্বভারতী মিউজিক বোর্ড থেকে সার্টিফিকেট পেতে হয়।

কলকাতা বেতারকেন্দ্রকে অনুরোধ করি, তাঁরা রবীন্দ্রসংগীত বিশেষজ্ঞদের নিয়ে একটি সভা ডাকুন। এবং সেই সভায় রবীন্দ্রসংগীত রীতি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়া হোক। এমন কি এ সিদ্ধান্তও নেওযা অন্যায় হবে না—কোন কোন রবীন্দ্রসংগীত শিল্পী বেতারে অংশ গ্রহণ করবেন এবং কাদের রেকর্ড বেতারে বাজানো হবে। আকাশবাণীর সংগীত বিভাগের খেয়ালীপনার ওপর আর নির্ভর করা যায় না।

বেতার কর্তৃপক্ষকে এই প্রসঙ্গে অনুরোধ করি, আকাশবাণীর মাধ্যমে বাংলা ভাষা ও তার ভাষাতাত্ত্বিক দিক নিয়ে বিশদ আলোচনা সূচীর ব্যবস্থা হোক। তবে আলোচনা সরস এবং প্রাণবন্ত হওয়া প্রয়োজন। আমাদের মনে রাখতে হবে, সাহিত্য ও ভাষা এক নয়। সাহিত্যের আলোচনা রয়েছে কিন্তু ভাষার আলোচনার কোন ব্যবস্থাই নেই। কালে-ভদ্রে কোন আলোচনার ব্যবস্থা হলেও তা তুলে দেওয়া হয় সাহিত্য ব্যবসায়ীদের হাতে; যাঁদের ভাষাতত্ত্বের প্রাথমিক জ্ঞান সন্দেহাতীত নয়।

২১শে ফেব্রুয়ারীর পুণ্যদিনে আকাশবাণীকে স্মরণ করাই বাংলাভাষার প্রতি উদার মনোভাবের পরিচয় দেওয়া হোক। বাংলাভাষার গতি-প্রকৃতি সম্পর্কে আলোচনা আকাশবাণী থেকে পেতে চাই।

*

কলকাতা বেতারকেন্দ্র থেকে প্রতিদিন ইংরেজি এবং বাঙলায় বেশ কয়েকবার সংবাদ প্রচার করা হয়। তাছাড়া রাত ৭-৪৫ এবং ১০-০০টায় 'সংবাদ সমীক্ষা' ও 'সংবাদ পরিক্রমা' নামক দুটি বটিকা বিলির ব্যবস্থাও রয়েছে। জনে জনে অনুরোধ জানায় মেঘদূতের কাছে:—আচ্ছা, পিলগুলো কী নিতান্তই অপরিহার্য, জোর করে গেলানো কী বন্ধ করা যায় না! মেঘদূত তাদের সংক্ষেপে বলেছিল, রেডিওটা বন্ধ করে রাখবেন ওই সময়ে। এ হলো আকাশবাণীর দেবদুলালী রোগের ছোঁয়াচ এড়াবার একমাত্র উপায়। মেঘদূতের ব্লাডপ্রেশর বেড়ে গেল বলে সে তো অনেকদিন হলো সমীক্ষা-পরিক্রমার ধারেকাছে ঘেঁষে না।

এই যখন অবস্থা এমন সময়ে একদিন বেতার জগৎখানা ওলটাতে পালটাতে হঠাৎ চোখে পড়লো, সন্ধ্যে ৭-৪৫ মিনিটের 'সংবাদ সমীক্ষা' হয়ে গেছে 'সমীক্ষা'। কী ব্যাপার ছাপার ভুল হয়তো। রেডিও-টাতো একবার শুনতে হয় তাহলে—দিলাম খুলে। শুনলাম, আলোচনা হচ্ছে খেলাধুলা সম্পর্কে। শুনতে লাগলাম পর পর ক'টা দিন। বাঙালি জীবনের চিত্রশিল্প, নাটক, সাহিত্য, সংগীত-সংস্কৃতির নানা-দিক নিয়ে প্রতিদিন আলোচনার ব্যবস্থা করা হয়েছে। আলোচনাগুলি সংক্ষিপ্ত তথাপি মনোজ্ঞ এবং শ্রোতাদের আকৃষ্ট করার ক্ষমতা রাখে।

সংবাদ-নামী দুটি বিষফোড়ার অন্তত একটি কাটা পড়লো কোন্ ডাক্তারের হাতে। খবর নিয়ে জানা গেল যে, নবনিযুক্ত অবাঙালি বেতার অধিকর্তার চেষ্টায় এটি নাকি সম্ভবপর হয়েছে। একই সংবাদ ঘুরিয়ে ফিরিয়ে প্রচারের ফলে শ্রোতাদের কান ঝালাপালা হয়ে যাচ্ছিলো; এই যন্ত্রণা থেকে যিনি আমাদের আংশিক মুক্তি দিতে পেরেছেন এবং নিজে অবাঙালি হওয়া সত্ত্বেও বাঙালি সংস্কৃতির প্রতি যিনি শ্রদ্ধাশীল মনোভাব পোষণ করেন আকাশবাণীর সেই অধিকর্তা ধন্যবাদার্হ।

আকাশবাণীর অন্যান্য অনুষ্ঠানেও আমরা পরিবর্তন লক্ষ্য করছি। একঘেয়ে অনুষ্ঠান, দলীয়চক্র এসব দেখেশুনে মেঘদূত তো আকাশবাণী সম্পর্কে হতাশ হয়ে পড়ে। অধিকর্তা যদি ধীরে ধীরে আকাশবাণীর অচলায়তন ভাঙতে পারেন তবে বাঙলাদেশের সদাজাগ্রত শ্রোতারা তাঁকে চিরদিন স্মরণে রাখবেন। এও শুনেছি, তিনি নাকি অনেকদিন থেকে কলকাতায় আসবার জন্য সাগ্রহে প্রতীক্ষা করে ছিলেন। বাঙালি সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত হতে চান। আকাশবাণীর অনুষ্ঠানসূচীতে পরিবর্তন আনতে তিনি নাকি উঠেপড়ে লেগেছেন। আবার অন্য-রকমের কথাও কানে আসছে, শ্রীকৃষ্ণ-মূর্তিকে নাকি কলকাতা বেতারকেন্দ্র থেকে চলে যেতে হবে।

যাদের কাছে সংস্কৃতির আভিধানিক অর্থ যৌনতা আমরা সেদলের নই। যারা বিদেশী অর্থপুষ্ট হয়ে বিকৃত সংস্কৃতির প্রচারে ছেলেমেয়েদের মাথা খাবার মন্ত্র নিয়েছে আমরা সেদলেরও নই। আমরা চাই মুক্ত বাতাস মুক্ত প্রাণ মুক্ত মনের মানুষ। আমাদের আদর্শকে যারা সম্মান করবেন তাঁরা বাঙালি, অবাঙালি, অভারতীয় যেই হোন তাঁদের আমরা শ্রদ্ধা করবো। বাঙালিকে যে-বাঙালি মারতে চায় তাকে আমরা ঘৃণা করবো। বাঙালিকে যে-অবাঙালি শ্রদ্ধা করে তাকে বন্ধু বলে মনে করি। নানাদিক বিবেচনা করে শ্রীকৃষ্ণমূর্তিকে কলকাতা আকাশবাণীর অধিকর্তার পদে স্থায়িভাবে নিয়োগ করতে কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ করছি। কেন্দ্রীয় তথ্য ও বেতারমন্ত্রী আশা করি সমস্যাসঙ্কুল কলকাতা বেতারকেন্দ্র সম্পর্কে সুবিবেচনার পরিচয় দেবেন।

*

১৩, ২, ৬৮-তে হরেন চৌধুরীর কণ্ঠে রবীন্দ্রসংগীত শুনে বিস্মিত হলাম। আশাকরি শ্রী চৌধুরীকে ভবিষ্যতে আর

কোন প্রোগ্রাম দেওয়া হবে না। রবীন্দ্রসংগীতকে যারা বলি দিতে চান মনে হয় ইনি সেই দলভুক্ত।

*

১৬ ফেব্রুয়ারি রবীন্দ্রসংগীত পরিবেশন করলেন **সন্তোষ সেনগুপ্ত**। মেঘদূত অত্যন্ত বেদনাভারাক্রান্ত মনে জানাতে বাধ্য হচ্ছে যে, শিল্পীর গায়কী রবীন্দ্ররীতি অনুসরণ করে না। কথা কটি বলতাম না যদি না জানতাম যে, তিনি গ্রামোফোন কোম্পানির বাঙলা গানের পরিচালক। আধুনিক গান সম্পর্কে তাঁর কাছে মেঘদূতের কোন অভিযোগ নেই। কিন্তু রবীন্দ্রসংগীতের সুর, কথা, ভঙ্গী, উচ্চারণ এবং ভাবটি ঠিকমতো শ্রদ্ধার সঙ্গে যিনি প্রকাশ করতে পারবেন না তাঁর গানকে গ্রহণ করা যেতে পারে না। রবীন্দ্রসংগীতের রেকর্ডেও আমরা বেসুর পাই হামেশা, জানি না সেজন্য কি শুধুই শিল্পী দায়ী না শিল্পীকে যাঁরা পরিচালনা করেন তাঁরাও দায়ী।

*

গত ১৮ ফেব্রুয়ারি **'পুনশ্চ'** অনুষ্ঠানে 'মায়ার খেলা'র রেকর্ডের অংশ বাজানো হলো। অংশ বাজানোর পেছনে কী উদ্দেশ্য কাজ করছে তা জানতে ইচ্ছে করে। যদি ঘোষক এবং মহিলা প্রযোজক বাহবা পেতে চান তবে ব্যবস্থা অতি উত্তম। আর যদি শ্রোতাদের মতামতের প্রতি তাঁদের বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা থাকে তবে বলি, নিজেদের অজ্ঞতার সঙ্গে শ্রোতাদের তুলনা না করলেই ভালো হয়। যদি কোন নৃত্যনাট্য বা গীতিনাট্য শোনাতে চান তো ভালো করে বাজান। খাপছাড়া বাজনা আর তার ফাঁকে ফাঁকে কিছু কথা পুরে দিয়ে জগাখিচুড়ী শোভন নয়। 'পুনশ্চ' নামক কাণ্ডজ্ঞানহীন অনুষ্ঠানটি বেতার কর্তৃপক্ষ আরো কতকাল চালাবেন? এ সম্পর্কেও আমরা অধিকর্তার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

*

১৯, ২, ৬৮ সন্ধ্যা ৭-৩০ মিঃ বাঙলা সংবাদের সঙ্গে আবহসংগীতের মতো আবহ গোলযোগ চলতে লাগলো! আজকাল যখন তখন কত রকমের যান্ত্রিক ত্রুটি কানে আসে যার খেই খুঁজে পাওয়া যায় না। গান চলতে চলতে অন্য বাজনা বেজে উঠলো, হয়ত গান থেমে গেল,—এসব ভৌতিক ক্রিয়াকলাপগুলি ঝাড়ফুঁকের আশ্রয় নিয়ে তাড়াতে পারেন তেমন ওঝা কী আকাশবাণীতে ইদানিং বিরল হয়ে এলো!

*

২১, ২, ৬৮-তে **কৃষ্ণা হাজরার** কণ্ঠের রবীন্দ্রসংগীত বেশ ভালো লাগলো, বিশেষ করে শিল্পীর গলাটি বড়ো মিষ্টি।

*

প্রতি শুক্রবার রাত্রি ৯-৩০ মিঃ অনুরোধের আসরে রবীন্দ্রসংগীতের রেকর্ড বাজানো হয়। লক্ষ্য করলে দেখা যায়, যেসব শিল্পী আধুনিক গান গেয়ে থাকেন তাঁদের কণ্ঠের রবীন্দ্রসংগীতের অনুরোধ আসছে অনবরত। শ্রোতাদের যখন অনুরোধ, আকাশবাণীর করার কিছু নেই। অনুরোধের রেকর্ড বাজাতে হবে নিশ্চয়ই। তবে আকাশবাণী কর্তৃপক্ষেরও করণীয় কিছু আছে। বাতাসের গতি লক্ষ্য করে দয়া করে আধুনিক গানের শিল্পীদের রবীন্দ্রসংগীতের প্রোগ্রাম দেওয়া বন্ধ করুন। আধুনিক গানের শিল্পীরা যতকাল বেতারে রবীন্দ্রসংগীত গাইবার সুযোগ পাবেন ততকাল শ্রোতাদের রুচি পরিবর্তনের কোন আশা নেই। সাংস্কৃতিক রুচি গড়ে তোলার দায়িত্ব আকাশবাণীরও। সস্তা জনপ্রিয়তা অর্জন করতে তো সকলেই পারেন কিন্তু সাংস্কৃতিক মানকে তুলে ধরতে প্রয়োজন সংযম এবং নিষ্ঠার। আকাশবাণীর সংগীত বিভাগ রবীন্দ্রসংগীতের ব্যাপারে আরো সচেতন হলে জাতি বাধিত হবে।

*

এক রবিবারের দুপুরে পল্লীগীতি শিল্পী **গিরীন চক্রবর্তী** (টেপ রেকর্ড)-র সঙ্গে সাক্ষাৎকার শোনা গেল : নজরুল সংগীত ও নজরুলের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব সম্পর্কে। নজরুল সংগীতের বৈচিত্র্যের তিনি বর্ণনা দিলেন—নিজের কণ্ঠসংগীতে। গজল, শ্যামাসংগীত, ইসলামী সংগীত থেকে ধ্রুপদ, খেয়াল-এ নজরুলের গানের স্বাতন্ত্র্য তিনি প্রকাশ করলেন। শেষ কথা বললেন : নজরুল নামে মুসলমান—আসলে তাঁর মধ্যে সর্বধর্ম সমন্বয় হয়েছে। তাঁর ধর্ম মানবতার ধর্ম।

অনুষ্ঠানটি যেমন শিক্ষাপ্রদ তেমন উপভোগ্য। বেতার কর্তৃপক্ষ টেপ রেকর্ড করে রেখে প্রশংসনীয় কাজ করেছেন।

*

টেলকো, জামসেদপুর থেকে অমিতাভ ঘোষ লিখেছেন : মেঘদূতের বেতারালোচনার সব মতামত সম্পর্কে সম্পূর্ণ একমত হতে না পারলেও তা যে বেতার শ্রোতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে তা বলা বাহুল্য। রবীন্দ্রসংগীত সম্পর্কে আপনার নিরপেক্ষ ও যুক্তিপূর্ণ আলোচনা রীতিমত আকর্ষণীয়। তবে একটি বিষয়ে আপনার উদাসীনতা আমাদের বিশেষভাবে চোখে পড়েছে। আপনি আধুনিক গানকে একেবারেই বাদ দিয়েছেন। কিন্তু একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে বাংলার সংগীতের এক বিপুল অংশই আধুনিক গান। পনেরো আনা আধুনিক গানই যে আলোচনার যোগ্য নয়, তা স্বীকার করি। কিন্তু এক আনা গান নিয়ে আলোচনা করুন। অন্তত তাতে আধুনিক গানের উন্নতির ও শ্রীবৃদ্ধির সম্ভাবনার পথ উন্মুক্ত হবে। কিছু আধুনিকগানের রেকর্ড সম্প্রতি বার হয়েছে। সে সম্পর্কে কিছু আলোচনা করলে বাধিত হবো।

*

আসানসোল, কুলটি থেকে অনুপ দাশগুপ্ত লিখছেন, 'রবীন্দ্রসংগীতের মতো রজনীকান্ত বা অতুলপ্রসাদের গান জনপ্রিয় না হলেও শ্রোতার অভাব নেই। যদিও অতুলপ্রসাদের গান নিয়মিত গাওয়া হয়। রজনীকান্তের গান আমরা শুনতে পাই না কেন? রজনীকান্তের গানগুলি ভাবে ভরা। গানগুলি বাঙালী সংস্কৃতির বাহকও। এদের একেবারে বাদ দেওয়া কী ঠিক হচ্ছে? শ্রীদিলীপকুমার রায় কোথায় গেলেন? তিনি এবং তাঁর ছাত্রছাত্রীরা তো মাঝে মাঝে আমাদের রজনীকান্তের গান শোনাতে পারেন। আশা করি বেতার কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে চিন্তা করে দেখবেন।

'মেঘদূতকেও স্মরণ করাই, তাঁর হুল আমরা উপভোগ করি। তাঁর সততার প্রশংসা করি। তিনি অত্যন্ত সাহসী। সুচিত্রা মিত্রের মত অতি বিখ্যাত শিল্পীকেও সবিনয়ে তাঁর ত্রুটি দেখাতে পেরেছেন। সৎসাহস ও জ্ঞানের প্রকাশ এইভাবে হওয়া উচিত। মেঘদূত রজনীকান্ত সম্পর্কে লিখলে উপকৃত হই।

*

সাঁইথিয়া থেকে অলকানন্দা চন্দ লিখছেন, '...আকাশবাণী-পরিক্রমায় মেঘদূত সুচিত্রা মিত্রের গান সম্পর্কে যে সমালোচনা করেছেন তা সম্পূর্ণ না বুঝলেও আংশিক বুঝেছি। নামকরা শিল্পীদের দোষ-ত্রুটিগুলো দেখিয়ে দিলে আমরা যারা গান শিখি তাদের উপকার করা হয়। শুধুমাত্র রবীন্দ্রসংগীত কেন আধুনিক গানেও তো ত্রুটি থাকে মেঘদূত যদি তা ধরে দেখিয়ে দেন আমাদের শেখবার সুবিধা হয়।

*

যুগীপাড়া, চুঁচুড়া থেকে অলকা মজুমদার লিখছেন, 'আকাশবাণী কর্তৃপক্ষ অনুযোগ করেন, আকাশবাণীর শ্রোতারা নাকি অত্যন্ত ছিদ্রান্বেষী, অনুষ্ঠানের সামান্য ভুলত্রুটি নিয়ে তাঁরা বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় তিলকে তাল করেন। কিন্তু ছোট ছোট ত্রুটিও অনেক সময় সত্যিই অত্যন্ত কানে বাজে। গত ৯ ফেব্রুয়ারি সংবাদ পরিক্রমায় শুনলাম, প্রধানমন্ত্রী নাকি সম্প্রতি আন্দামান-নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ সফর শেষ করে—"ভারতে" ফিরে এসেছেন। ওই দ্বীপপুঞ্জ দুটিকে আকাশবাণী কবে ভারত থেকে বহিষ্কৃত করলেন বুঝতে পারলাম না।'

*(২৫।২।৬৮)

রঙ্গজগৎ

একটি সিনেমার অভ্যন্তরে

গত ১৬ই ফেব্রুয়ারী উত্তর কলকাতার রাধা সিনেমায় 'চারণকবি মুকুন্দদাস' ছবি দেখতে গিয়েছিলাম। মূল ছবির পূর্বে যথারীতি বিজ্ঞাপনচিত্র, সরকারী প্রচার-চিত্র এবং সংবাদচিত্র ইত্যাদি দেখান হচ্ছিল। এক সময় দেখান হল 'অমৃত-বাজার পত্রিকা' শতবার্ষিকী উপলক্ষে এক প্রচার (বিজ্ঞাপন ?)-চিত্র। দেশ-বিদেশ থেকে এই পত্রিকা কত লোকের শুভেচ্ছা পাচ্ছে, তার মধ্যে কত রাষ্ট্রনেতা রয়েছেন দেখান হচ্ছিল। এক সময় দেখান হল ডঃ প্রফুল্ল ঘোষের ছবি এবং তিনিও যে শুভেচ্ছা পাঠিয়েছেন সে কথা বলা হল। বিদ্যুৎস্পর্শের মুহূর্তের মত সমস্ত প্রেক্ষাগৃহ প্রচন্ড শব্দে কেঁপে উঠল। চারদিক থেকে কি তীব্র ধিক্কারধ্বনি। যে সব মন্তব্য শোনা গেল তা এখানে লেখা সম্ভব নয়। আর তারই সংগে দেখা গেল পরদার দিকে কয়েক পাটি চটি-জুতো গিয়ে পড়ল। বহু লোক উঠে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে ডঃ ঘোষের প্রতি ধিক্কার দিতে লাগল। সমস্ত ব্যাপারটা মুহূর্তের মধ্যে ঘটে গেল—তড়িতাহত হবার মত গতিতে। সম্ভবত অপারেটর ব্যাপারটা চট করে বুঝে নিয়ে দ্রুত ছবিটিকে সরিয়ে ফেললেন, উত্তেজিত দর্শকদের ক্রোধ থেকে সিনেমার পরদা বাঁচাবার জন্য। সবেমাত্র কয়েক পাটি জুতো ছুঁড়ে মারা হয়েছে—পরদা ছিঁড়ে ফেলতে কতক্ষণ!

এবার শোনা গেল জ্যোতি বসুর কণ্ঠ; সংগে সংগে বিপরীত ধ্বনি। তার পরে পরদায় দেখা গেল জ্যোতি বসুর ছবি। সেই উত্তেজিত জনতার প্রচন্ড হাততালিতে প্রেক্ষাগৃহ মুখরিত হয়ে উঠলো। মুহূর্ত পূর্বে যে দর্শকরা উত্তেজিত হয়ে ধিক্কার দিয়েছিল, সেই দর্শকরা হাততালিতে অভিনন্দন জানাল। পরস্পর-বিরোধী দুটো অভিব্যক্তি প্রকাশ করলেন দর্শকরা। এবার পরদায় দেখা গেল অজয় মুখোপাধ্যায়ের ছবি। আবার দর্শকদের প্রচন্ড হাততালি। আরো বেশি দর্শক এবার অংশ গ্রহণ করলেন। তারপর যেই প্রফুল্ল সেনের ছবি দেখান হলো, সংগে সংগে আবার সেই বিদ্যুৎস্পর্শের মত প্রচন্ড ধাক্কা। আবার কয়েক পাটি জুতো উত্থিত হতে দেখা গেল।

সমস্ত ব্যাপারটা ঘটে গেল নিচের তলায়। আমরা বসেছিলাম ব্যালকনিতে। এখানে উচ্চমধ্যবিত্ত বা ভদ্রলোকরা বেশি দামের টিকেট কিনে বেশি বসেন। সুতরাং এই ঘটনার কোন অভিব্যক্তি এখানে ছিল না। নিচের তলার দর্শকরা মেহনতি মানুষ। তাদের জীবনে ছলাকলা বা মুখোস নেই। তারা যা বোঝে তা প্রকাশ করে। সিনেমা দেখতে গিয়েও তারা নীরব থাকতে পারে নি। প্রাত্যহিক জীবনের অভিজ্ঞতাকে প্রকাশ করেছে।

মাঝখানে বিরতির সময় কয়েকজন সাংবাদিক ও চিত্রসমালোচক বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম তাঁদের মতামত। পয়সা খরচ করে দর্শকরা আনন্দ উপভোগ করতে এসেছেন—খোলা মন নিয়ে। সিনেমায় তাঁরা বিক্ষোভ জানাবার মন নিয়ে আসেন নি, কেউ তাঁদের পয়সা দিয়ে পাঠায় নি। কিন্তু এই আনন্দ উপভোগের স্থানেও তাঁরা মনের চেতনা হারান নি, তাঁদের স্পর্শকাতর মন মুহূর্তে সজাগ হয়ে উঠেছে। দেশের মানুষ কি চায়? মানুষ কোন পক্ষে এই ঘটনা তারই এক সংকেত। এ থেকেও যাঁরা বোঝেন না তাঁদের প্রতি একটা কথাই বলা চলে, দেওয়ালের লেখা পড়তে চেষ্টা করুন!

—সুজয়

জনৈকা চেকোস্লোভাক অভিনেত্রী

চিত্র-সমালোচনা

নাবিক প্রোডাকসন্সের 'দিবারাত্রির কাব্য' ছবির একটি দৃশ্যে বসন্ত চৌধুরী, স্বপন রায় ও মাধবী মুখার্জী।

চারণকবি মুকুন্দদাস

[পরিচালনাঃ নির্মল চৌধুরী]

মুকুন্দদাসের স্বদেশী যাত্রাগান সমগ্র বাংলায় এককালে বিশেষ জনপ্রিয় হয়েছিল। এই জনপ্রিয়তায় মুকুন্দদাসের নামও শহর থেকে গ্রাম পর্যন্ত সুপরিচিত ছিল। স্বাধীনতার আন্দোলনে গণজাগরণে এই স্বদেশী যাত্রার এক বিশিষ্ট ভূমিকা ছিল। মুকুন্দদাস শহরে গ্রামে যাত্রাগান করে মানুষের মনে স্বাধীনতার চেতনা জাগিয়ে তুলতেন এবং দেশবিমুখতা, গড্ডালিকা প্রবাহে চলা বা বিলাসিতা ইত্যাদির বিরুদ্ধে নৈতিক বোধ সৃষ্টির চেষ্টা করতেন। সাধারণত সেকালের সমাজের মানুষের চিন্তা, জীবনযাপন ইত্যাদিকে ভিত্তি করে তাঁর নাটকগুলি রচিত হত। বলিষ্ঠ নৈতিকতাবোধ ছিল সেই নাটকগুলির অবলম্বন এবং দেশাত্মবোধ জাগিয়ে তোলা ছিল নাট্যকারের উদ্দেশ্য। কথিত আছে এরূপ নাটক রচনা ও অভিনয়ের জন্য তিনি বিখ্যাত দেশপ্রেমিক অশ্বিনীকুমার দত্তের কাছ থেকে প্রেরণা পেয়েছিলেন। ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ বিরোধী গণ-আন্দোলনের কাল থেকে ১৯৩৪ সাল পর্যন্ত মুকুন্দদাস স্বদেশী যাত্রা গেয়েছেন। প্রথম দিকে তাঁর গানে দেশবাসীর মনে উন্মাদনা সৃষ্টি হত।

এই মুকুন্দদাসের জীবনীচিত্র নিঃসন্দেহে দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করবে, এই চিত্র নির্মাণ প্রশংসনীয় উদ্যোগ। তিন দশকের মানুষ এবং আজকের মানুষ, উভয়ের কাছেই এই ছবি আকর্ষণীয় হবে। একদল নিজেদের স্মৃতি থেকে ছবিটি দেখতে আগ্রহী হবেন, আর একদল নতুন করে জানতে চাইবেন সেই স্বদেশী যাত্রা কি ছিল এবং কেন মুকুন্দদাস জনপ্রিয় হয়েছিলেন। ছবিটি দেখতে জনসাধারণকে আগ্রহী করার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রমোদকর থেকে রেহাই দিয়েছেন।

ফিল্ম ক্লাসিক-এর এই ছবির কাহিনীকার, চিত্রনাট্যকার এবং পরিচালক নির্মল চৌধুরী। ইতিপূর্বে তিনি 'চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন' নামে একটি ছবি করেছিলেন। পরিচালক ছবিটিকে জনপ্রিয় করার দিকে খুবই সতর্ক দৃষ্টি রেখেছেন এবং ব্যবসায়িক সার্থকতার প্রতি নজর রাখার জন্য মাত্রাতিরিক্ত ভাব-প্রবণতাকে অবলম্বন করেছেন। মুকুন্দদাস (যজ্ঞেশ্বর দাস) একজন সাধারণ মানুষই ছিলেন। দেশের হাজার হাজার মানুষ যেমন স্বাধীনতার জন্য আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করেছেন, দুঃখবরণ করেছেন এবং বিভিন্ন ধারায় দেশসেবা করেছেন তিনিও তাঁদেরই একজন। সাধারণ মানুষকে অসাধারণ করে তোলা আমাদের চিত্রনাট্যকারদের স্বভাব। তাঁরা মনে করেন অলৌকিকতা বা অসাধারণত্ব কিছু না থাকলে দর্শকরা বুঝি মুগ্ধ হবেন না। সুতরাং এখানেও প্রায় কৈশোর থেকে মুকুন্দদাসকে একটু অসাধারণ করেই উপস্থিত করা হয়েছে। এদিকে চিত্রনাট্যকারের নজর বেশি থাকার জন্য সমগ্র ছবিতে মুকুন্দদাসের যাত্রা নাটক সম্পর্কে ধারণা করার কোন সুযোগ ঘটে নি। তিনি যে কি রকম পালাগান গাইতেন—তার কয়েকটি দৃশ্য বা কোন বিশেষ একটি নাটকের অংশ উপস্থিত করলে একালের দর্শকদের ধারণা করতে সুবিধা হত। ছবি দেখে মনে হবে, মুকুন্দদাসের দল কেবল মেক-আপ নিয়ে বুঝি দেশাত্মবোধক গানই গাইতেন। গানগুলি যে পালার অঙ্গ এবং মুকুন্দদাসের ভূমিকা যে অনেকটা যাত্রাপালার বিবেকের মত ছিল সে ধারণা করা যাবে না। দেশাত্মবোধক গানের উত্তেজনায় পরিচালক দর্শকদের মুগ্ধ করতে চেয়েছেন। এই ভাব প্রবণতায় সাময়িক ফল হয় কিন্তু পরে দর্শকেরা যখন চিন্তা করেন তখন কেবল গান ছাড়া আর কিছু পান না। পরিচালক একস্থানে ভীষণ অন্যায় করেছেন অবনীন্দ্রনাথের বিখ্যাত ভারতমাতা ছবিটি বিনা স্বীকৃতিতে ব্যবহার করে। ছবিটি উপস্থিত করা হয়েছে এ ভাবেঃ ছবিটির গায়ে মুকুন্দদাস তুলি লেপন করছেন। যাঁরা এই বিখ্যাত ছবির সম্পর্কে জানেন না, এ থেকে তাঁদের মনে ধারণা হওয়া অসম্ভব নয় যে ছবিটি মুকুন্দদাস এঁকেছেন। ছবির কোন সংলাপে অন্তত এমন কথা থাকা উচিত ছিল যাতে বোঝা যায় অবনীন্দ্রনাথের 'ভারতমাতা' মুকুন্দদাসের প্রেরণা এবং তিনি তা কপি করেছেন। এমন কি ছবির পরিচয় লেখনে অথবা প্রচার পুস্তিকায় পর্যন্ত এই বিখ্যাত ছবি ব্যবহারের স্বীকৃতি বা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ নেই। এ যে কত বড় ধৃষ্টতা—পরিচালক সম্ভবত তা বুঝতে পারেন নি!

মুকুন্দদাসের কৈশোর, অর্থাৎ ছাত্রকাল থেকে শুরু হয়ে, তাঁর গানের প্রতি আসক্তি, পরহিতব্রতী, বাল্যকাল থেকে সংসারের প্রতি নিরাসক্তি এবং ধর্মের প্রতি আসক্তি, বৈষ্ণব ধর্ম থেকে শাক্ত মতে উত্তরণ এবং বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়া থেকে মৃত্যুকাল পর্যন্ত ছবিতে দেখান হয়েছে। ছবি রূপায়ণে পরিচালক বহির্দৃশ্যের সুযোগ গ্রহণ করেছেন, এতে ছবিটি ভাল লাগবে। ছবির সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য সঙ্গীত। পবিত্র চট্টোপাধ্যায় সঙ্গীতের দিকটিকে ভরাট করে তুলেছেন। সুগীত স্বদেশী গানগুলি দর্শকদের আনন্দ দান করবে।

ছবির ক্যামেরার কাজ (রামানন্দ সেনগুপ্ত) উন্নত। বিশেষ করে রাত্রির সময় নির্দেশে তিনি ভাল চিত্র গ্রহণ করেছেন। দুলাল দত্তের সম্পাদনা গুণে ছবির গতিবৃদ্ধি হয়েছে।

দি পন ব্রোকার

মেট্রোয় গত ২৩শে ফেব্রুয়ারী 'দি পন ব্রোকার' মুক্তি লাভ করেছে। ছবিটি শ্রেষ্ঠ অভিনয়ের জন্য বার্লিন আন্তর্জাতিক

'পরিশোধ' ছবির একটি দৃশ্যে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ও মাধবী মুখার্জী

চলচ্চিত্র উৎসবে পুরস্কার লাভ করেছে। এই শ্রেষ্ঠ অভিনেতা রড স্টেইগার।

সিডনী লুমেট পরিচালিত এই ছবি রূপায়ণরীতি, ক্যামেরার কাজের বৈশিষ্ট্য এবং সম্পাদনা ও সঙ্গীতের জন্য সাধারণ বিদেশী ছবির চেয়ে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র শুধু নয়, অনন্যসাধারণ বলা চলে। যদিও ছবিটি বিষাদাত্মক এবং জীবনের তিক্ততায় ভরা, তথাপি বাস্তবনিষ্ঠায় এবং সত্যকে প্রকাশ করার সাহস ও বুদ্ধিদীপ্তিতে অবশ্য দর্শনীয় ছবি। এই ছবি দর্শককে চিন্তা করাবে, দর্শক দৃষ্টির সামনে বহু সত্যকে তুলে ধরবে, যার দর্পণে সে নিজেকেও দেখবে। আত্মানুসন্ধান করবে।

এই ছবিতে পন ব্রোকার-এর মাধ্যমে মানুষের জীবনের দুঃসহ বেদনা, সেই বেদনার অন্ধকার ভেদ করে বাঁচার আগ্রহ এবং কেবল বেঁচে থাকার জন্য সংগ্রামের কথা বলা হয়েছে। কৈশোরের স্বপ্ন, তারুণ্যের উজ্জ্বলতা, জীবনের আদর্শ এবং উদ্দেশ্য সবই যেন ঘুলিয়ে যায়। আদর্শকে পেছনে ফেলে পরাজয়ের দারুণ যন্ত্রণার মধ্যে মানুষকে বেঁচে থাকতে হয়। ছবির নায়কের জীবিকা তার আদর্শ ও চিন্তার সঙ্গে সঙ্গতিসম্পন্ন নয়। তার জন্য পরিবারে চাপা অসন্তোষ রয়েছে। রোগশয্যায় শায়িত বৃদ্ধ পিতা তার হাতে ওষুধ খেতে অস্বীকার করে বলে, 'তুমি মানুষের স্বপ্নগুলি গ্রহণ কর, বিনিময়ে টাকা দাও।' দরিদ্র মানুষ তাদের সখের জিনিষগুলি দু-একটা টাকার জন্য বন্ধক রেখে যায় যেন তাদের হৃৎপিন্ডটাকে রেখে যাচ্ছে। নায়ক সব বোঝে। সে বলে কি করবো, আমাকে তো বাঁচতে হবে! গত যুদ্ধের সময় ইহুদীদের ওপর নাৎসী-দের ভয়ঙ্কর অত্যাচারের কথা অহরহ তার মনকে ভারাক্রান্ত করে আছে; মানবসমাজের সে ভয়ঙ্কর দিনগুলিই তো তার স্বপ্নকে কেড়ে নিয়ে, ভেঙে দিয়েছে। ভাগ্যের এমনই পরিহাস অতীতের সেই ভয়ঙ্কর স্মৃতির ওপর বসে তাকেই সহযোগী হতে হয়েছে এক বস্তিমালিক ও ফাটকাবাজের, যার পার্টনার হিসাবে সে পন ব্রোকার। ধনবান ও ক্ষমতাগর্বীদের হাতে মানব-সমাজ লাঞ্ছিত। বেঁচে থাকার জন্য মানুষ কি না করছে। শুধু শরীরটাকে বাঁচাবার জন্য তাজাপ্রাণ তরুণী মনকে হত্যা করছে, নগ্নদেহ খুলে ধরেছে ক্রেতার সামনে। প্রেম, স্বপ্ন, সব পয়মাল হয়ে গেল বিকৃত বাসনা, অর্থশিকারীদের হাতে পড়ে। এক সময় নায়ক চিৎকার করে ওঠে, টাকা! টাকাই সব! টাকা ছাড়া আর কিছু নেই! অসহ্য এই পরিবেশ। বিকৃত বাসনাগুলি সুস্থ মানুষের স্বপ্নকে প্রতিদিন হত্যা করছে। এই যন্ত্রণা মাথায় নিয়ে স্বপ্ন ও আদর্শ বিসর্জন দিয়ে নায়ক এতদিন মনে করেছে সে বেঁচে আছে। কিন্তু এক সময় বুঝতে পারলো তার দেহ বেঁচেছে, আসলে সে মৃত। আদর্শ ও স্বপ্নকে হত্যা করে বাঁচার নাম জীবন নয়।

ছবির সংলাপ বুদ্ধিদীপ্ত এবং উপ-ভোগ্য। এই ছবিতে রড স্টেইগারের সঙ্গে অভিনয় করেছেন জেইম সানচেজ (সহকারী), জেরালডিন ফিৎজেরাল্ড প্রমুখ।

নাটকের কথা

যাত্রিক-এর দুটি নাটক

যাত্রিক নাট্যসংস্থা গত ২০শে ফেব্রু-য়ারী সন্ধ্যায় মুক্তাঙ্গন মঞ্চে দুটি নাটক অভিনয় করেছেন। এই একাঙ্ক নাটক দুটি যথাক্রমে রবীন্দ্র ভট্টাচার্য লিখিত 'অশান্ত বিবর' ও 'কালো মাটির কান্না'। এই দুটি নাটক ইতিপূর্বে 'মুক্তাঙ্গন'-এ এবং অন্যত্র অভিনয় করে যাত্রিক নাট্যরসিকদের প্রশংসা লাভ

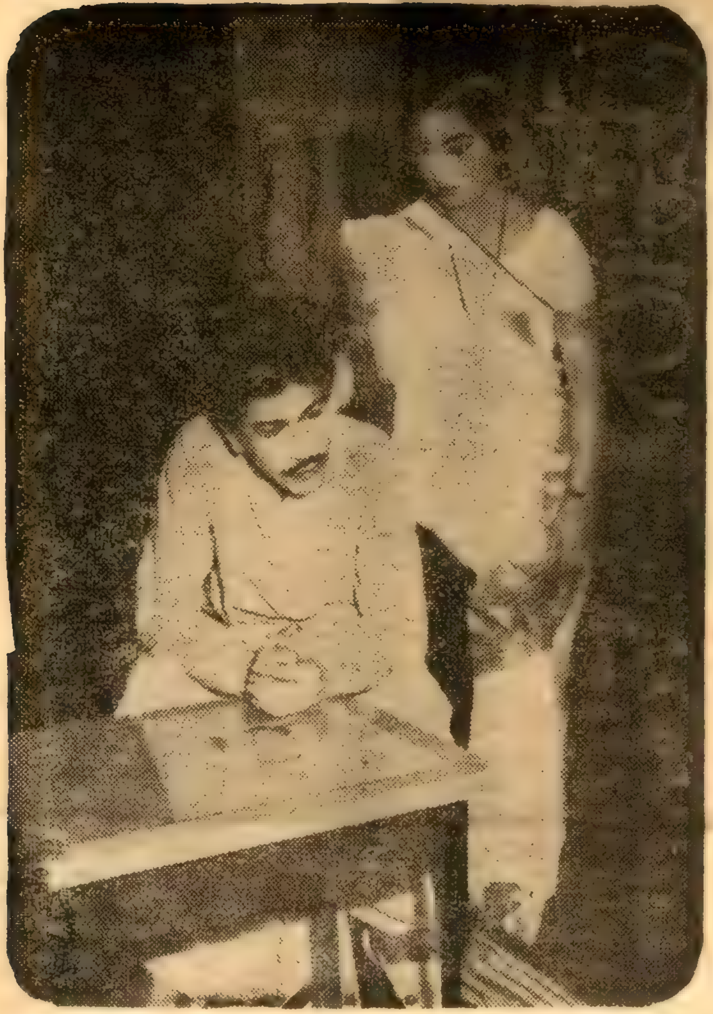

বাঁকুড়ার অগ্রদূতগোষ্ঠীর 'নৌকাডুবি' নাটকে অরুণ মিত্র ও প্রতিমা চক্রবর্তী

করেছে। এই দিনও পরিচালনা-দক্ষতা ও অভিনয় গুণে নাটক দুটি দর্শকদের সন্তুষ্ট করেছে।

প্রথমে অভিনীত হয় 'অশান্ত বিবর'। এই একাঙ্কিকায় সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের সঙ্গে শিল্পে অশান্তির যোগসূত্র দেখিয়ে মালিক শ্রেণীর একই মানসিকতা দেখান হয়েছে। যুদ্ধে যেমন নিরপরাধরা প্রাণ হারায়, বিভ্রান্ত হয়ে জীবন বলি দেয়, তেমনি পুঁজিবাদী মালিকরা মুনাফার অঙ্ক বাড়াবার জন্য শ্রমিকদের বিভ্রান্ত করে, ভাড়াটিয়া সৈন্যের মত গুন্ডা পোষণ করে। যুদ্ধবাদীরা যেমন দেশে অনৈক্য সৃষ্টি করে, অবিশ্বাস জিইয়ে রাখে, মিলমালিকরাও শ্রমিকে শ্রমিকে বিভেদ সৃষ্টি করে। তাদের শেষ অস্ত্র সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। যুদ্ধবাদী এবং মিল-মালিক একই শ্রেণীস্বার্থের শরিক। এই শ্রেণীস্বার্থরক্ষার জন্য মিলমালিক আনন্দ ও শেঠজীর বিভেদ ও বিভ্রান্তির শিকার হয় রহমান, জ্যোতির মত মেহনতি মানুষ, সমাজের নিচের তলার মানুষ। নাট্যকার এই চক্রান্তের মুখোস খুলে মেহনতি মানুষকে সাবধান করে দিয়েছেন।

নাটকটি পরিচালনা করেছেন স্বয়ং নাট্যকার। আলো এবং মঞ্চসজ্জা ইত্যাদির কাজ যথাযথ। সার্থক অভিনয়ে নাটকের বক্তব্য প্রতিষ্ঠা করেছেন তুষার মজুমদার, জ্যোতিভূষণ চৌধুরী, অমলেন্দু দত্ত, মদন চ্যাটার্জী, লোকনাথ ব্যানার্জী, বিমান গুপ্ত, শান্তি ব্যানার্জী, নির্মল চক্রবর্তী, সুনীল রায়।

দ্বিতীয় নাটক 'কালো মাটির কান্না' ইতিপূর্বে বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক অভিনীত হয়েছে। এই নাটকে 'কয়লা'-খনিতে শ্রমিকশোষণ-এর এক নিষ্ঠুর চিত্র উপস্থিত করা হয়েছে। এখানে মালিকের প্রতিনিধিরূপে এসেছে ম্যানেজার এবং শ্রমিকরা অসংগঠিত, তাদের হয়ে লড়ছে বড়বাবু ও তাঁর ইঞ্জিনিয়ার ছেলে। বড়বাবু সারাজীবন কয়লাখনিতে কাটিয়ে বুঝেছে পেরেছেন নীরবে অন্যায় সহ্য করে গেলে সে অন্যায় তাকেও পাকে জড়াবে। কয়লা-খনির শ্রমিকজীবন নিয়ে নাটক মঞ্চস্থ করার প্রচেষ্টা প্রশংসনীয়। কিন্তু নাটকে বাস্তব অবস্থা ও টেকনিক্যাল ব্যাপারগুলি যথার্থভাবে উপস্থিত করা যায় নি। কল্পনা ও ভাবপ্রবণতা এখানে বেশি প্রশ্রয় পেয়েছে।

এই নাটকে বিভিন্ন চরিত্র রূপায়ণে অংশ গ্রহণ করেছেন, রবীন্দ্র ভট্টাচার্য, নিখিল ভট্টাচার্য, স্বপন ভট্টাচার্য, সৌরীন্দ্র ভট্টাচার্য, গোপাল রক্ষিত, কবিতা বিশ্বাস, বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, হরিমোহন ঘোষ, দেবীকুমার ভট্টাচার্য, সন্দীপ ভট্টাচার্য প্রমুখ। প্রত্যেকেই আন্তরিকতার সঙ্গে অভিনয় করেছেন। নাটকটি পরিচালনা করেছেন নিখিল ভট্টাচার্য।

রবীন্দ্র ভট্টাচার্যের এই দুটি নাটকে উদার মানবিকতাবাদের বাণী ধ্বনিত হয়েছে।

অগ্রদূত-এর দশম বর্ষ পূর্তি উৎসব

বাঁকুড়ার নাট্যসংস্থা অগ্রদূতগোষ্ঠীর দশম বর্ষ পূর্তি উৎসব উপলক্ষে স্থানীয় হাজরা মুক্তাঙ্গনে গত ১৩ই জানুয়ারী এবং ১৪ই জানুয়ারী দু দিনব্যাপী নাটক অভিনীত হয়েছে। প্রখ্যাত নট ও নাট্য-পরিচালক জ্ঞানেশ মুখার্জী নাটক দুটি পরিচালনা করেন। প্রথম দিনে মঞ্চস্থ হয় রবীন্দ্রনাথের 'নৌকাডুবি'। দ্বিতীয় দিনে অভিনীত হয় জরাসন্ধের 'লোহ-কপাট'। উভয় দিনের নাটক পরিচালনা ও অভিনয় গুণে এবং প্রয়োগপদ্ধতির নৈপুণ্যে দর্শকদের আনন্দদানে সার্থক হয়েছে।

উভয় দিনে বিভিন্ন ভূমিকায় অংশ গ্রহণ করেছিলেনঃ ডাঃ লালমোহন গাঙ্গুলী, অসিত দরিপা, শমিতা বিশ্বাস, অরুণ মিত্র, সাধন সেনগুপ্ত, অংশুপ্রকাশ মুখোপাধ্যায়, অশ্বিনী কর্মকার, প্রতিমা চক্রবর্তী, শেফালী ব্যানার্জী, ফণীভূষণ সেন, অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়, উমা পাল-চৌধুরী, মলিনা দেবী, জ্ঞানেশ মুখার্জী, রাজেন দাস, করুণা দরিপা, বাসু সেন, দুঃখভঞ্জন দত্ত, শান্তিপদ কুন্ডু, রামমোহন মুখার্জী, অর্ধেন্দু রক্ষিত, মুকুন্দ শীল, অসিত সামন্ত, দীপালী চক্রবর্তী, ভোলা-নাথ চৌধুরী। আলোকসম্পাতে ছিলেন অসিত দরিপা ও জলসাঘর।

স্টুডিও খবর

এই করেছো ভাল

লাইট এন্ড শেডের 'এই করেছো ভাল' ছবির কাজ নিউ থিয়েটার্স-এর এক নম্বর

নৃত্যবিদ নীরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের পরিচালনায় 'চণ্ডালিকা' নৃত্যনাট্যে কুমারী পাপড়ি বোস।

স্টুডিও'তে চলছে। ছবিটি পরিচালনা করছেন : অজিত ব্যানার্জী। বিধায়ক ভট্টাচার্যের 'তাই তো' নাটক অবলম্বনে চিত্রনাট্য লেখা হয়েছে। ছবিতে অভিনয় করছেন : অনুপকুমার, জহর রায়, লিলি চক্রবর্তী, শমিতা বিশ্বাস, যূই ব্যানার্জী, শুভেন্দু চ্যাটার্জী, রবি ঘোষ, কানু বন্দ্যোপাধ্যায়, নৃপতি চ্যাটার্জী, জ্ঞানেশ মুখার্জী এবং নবাগত সমরজিৎ ও অম্বুজ মল্লিক। ছবিটি আর, ডি, বি-র পরিবেশনায় মুক্তিলাভ করবে।

দিবারাত্রির কাব্য

নাবিক প্রোডাকসন্সের 'দিবারাত্রির কাব্য' ছবির কাজ দ্রুতগতিতে অগ্রসর হচ্ছে। সাহিত্যিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস অবলম্বন করে চিত্রনাট্য রচনা করেছেন—বিমল ভৌমিক ও নারায়ণ চক্রবর্তী। সুরারোপের দায়িত্ব নিয়েছেন—বিখ্যাত তিমিরবরণ। চিত্র গ্রহণ করছেন কৃষ্ণ চক্রবর্তী। বিভিন্ন চরিত্রে রূপদান করছেন : বসন্ত চৌধুরী, মাধবী মুখার্জী, কানু ব্যানার্জী, অনুভা গুপ্তা, অঞ্জনা ভৌমিক ও নবাগত স্বপন রায়।

সংবাদকণা

বলাকা-র উদ্যোগ

বলাকা নাট্যসংস্থা আগামী মার্চ মাসে প্রতি রবিবারে যোধপুর পার্কের নিকটে এ্যাণ্ড্রুজ হলে রবীন্দ্রনাথের 'মাল্যদান', বিধায়ক ভট্টাচার্যের 'মাটির ঘর' অভিনয় করবে।

দশরূপক-এর নতুন নাটক

দশরূপক নাট্যগোষ্ঠী আগামী ৩ই মার্চ মিনার্ভা মঞ্চে নাট্যকার মন্মথ রায়ের সোভিয়েত দেশ পুরস্কারপ্রাপ্ত 'মেজচেংকো' অভিনয় করবে।

শতাব্দীর উদ্যোগ

শতাব্দীর নাট্যসংস্থা ৩রা মার্চ থেকে প্রতি রবিবার রবীন্দ্রসরোবর স্টেডিয়াম হলে বাদল সরকার রচিত 'কবি কাহিনী' নাটক মঞ্চস্থ করবে। 'শতাব্দী' নিজেকে একটি গ্রুপ থিয়েটার বলে দাবি করে, এবং বাদল সরকারের নাটকের ওপর বিশেষ আস্থাশীল। তাঁর নাটকগুলি নিয়ে তাঁরা পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রয়াসী। গত ২০শে ফেব্রুয়ারী মেট্রোপোল হোটেলে এক সাংবাদিক সম্মেলনে এই কথাগুলি ঘোষণা করেন।

নজরুল কবিতা আবৃত্তি প্রতিযোগিতা

পশ্চিমবঙ্গ নজরুল একাডেমির উদ্যোগে এক আবৃত্তি ও সঙ্গীত প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে। এই প্রতিযোগিতায় সার্থক প্রতিযোগীদের অভিজ্ঞানপত্রসহ পুরস্কার দেওয়া হবে।

সাধারণ বিভাগ : ১৬ বছরের ঊর্ধ্বে বয়স্ক মহিলা ও পুরুষদের জন্য : 'আগমনী' কবিতার প্রথম দুটি স্তবক এবং 'রক্তাম্বরধারিণী মা' হবে।

পুরুষ বিভাগ : ১৬ বছরের ঊর্ধ্বে পুরুষদের জন্য 'চোর ডাকাত' এবং 'সাত-ইল-আরব'।

মহিলা বিভাগ : ১৬ বছরের ঊর্ধ্বে —'সর্বহারা' এবং 'ফাল্গুনী'। সকল বিভাগে উভয় কবিতা আবৃত্তি করতে হবে।

কিশোর বিভাগ : ১১ বছর থেকে ১৬ বছরের নিম্নবয়স্ক কিশোর-কিশোরীদের জন্য—'সৃষ্টি সুখের উল্লাসে' এবং 'প্রলয়োল্লাস' কবিতার প্রথম ছয়টি স্তবক।

প্রতিযোগিতা মার্চ মাসের শেষ সপ্তাহে হবে। নাম তালিকাভুক্ত করার জন্য এক টাকা ফি দিতে হবে। টাকাসহ নিম্ন ঠিকানায় নাম, ঠিকানা, (জন্ম তারিখসহ) পাঠাতে হবে। সাধারণ সম্পাদক, পশ্চিমবঙ্গ নজরুল একাডেমি, ৬, এণ্টনীবাগান লেন, কলিকাতা-৯। সাক্ষাৎ নিষ্প্রয়োজন।

শোক-সংবাদ

প্রমোদ পরিবেশকের জীবনাবসান

প্রমোদ পরিবেশক ধীরেন্দ্রনাথ ঘোষের গত ১৫ই ফেব্রুয়ারী কঠিন রোগভোগের পর জীবনাবসান হয়েছে। কৌতুকশিল্পী রূপেও তিনি পরিচিত ছিলেন। অধুনালুপ্ত 'নাচঘর' পত্রিকার সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন।

সঙ্গীত কথা

শুভলক্ষ্মী বড়ুয়ার ভরত নাট্যম্

গত ১৮ই ফেব্রুয়ারী সকালে রবীন্দ্র-সদনে আসামের কুমারী শুভলক্ষ্মী বড়ুয়া ভরত নাট্যম প্রদর্শন করেছে। শুভলক্ষ্মী আসামের বিখ্যাত সঙ্গীতরসিক পরিবারের কন্যা। তাঁর পিতামহ ছিলেন সঙ্গীতাচার্য লক্ষ্মীরাম বড়ুয়া। শুভলক্ষ্মী ও তাঁর ভগ্নীগণ মণিপুরী ও নাগা নৃত্যে পারদর্শিতা লাভের পর মাদ্রাজে শ্রীমতী রুক্মিণী দেবী অরুণ্ডেলের বিখ্যাত কলাক্ষেত্রে ভরত নাট্যম্ শিক্ষালাভ করেন। পাঁচ বছর শিক্ষালাভান্তে কলাক্ষেত্রের শিল্পীরূপে তিনি ভারতের বিভিন্ন স্থানে নৃত্য পরিবেশন করেন। কলকাতায় এইবার প্রথম একক নৃত্য প্রদর্শন। এই অনুষ্ঠানে কলাক্ষেত্র-র সঙ্গীতশিল্পীরা সহযোগিতা করেন।

পাঠক মন

আপনাদের সাপ্তাহিক বসুমতীর একটি সাধারণ সংখ্যা সম্প্রতি আমার হাতে এসেছে, পত্রিকাটি আমার ব্যক্তিগতভাবে খুবই ভালো লেগেছে।

পাক-ভারত যুদ্ধের পর থেকে আমরা এই বাংলার লোকেরা পশ্চিমবঙ্গের শিল্প, সাংস্কৃতিক ও সাহিত্য সম্বন্ধে প্রায় অন্ধকারেই আছি। সাপ্তাহিক বসুমতীর মাধ্যমে অন্ধকারে আলো দেখলাম এবং ভবিষ্যতেও দেখতে চাই।

শুনেছি পশ্চিমবঙ্গের ভাইয়েরাও নাকি এই বাংলার সাহিত্য সম্বন্ধে জানতে খুবই উৎসুক।

এ চিঠির সংগে আপনাদের দফতরে ভাষা আন্দোলন স্মরণে লেখা নাজমা চৌধুরীর "নক্‌শা—ফাল্গুন" ও মোহাম্মদ মনিরুজ্জামানের "ভাষা" শীর্ষক কবিতা দুটি পাঠালাম। অনুগ্রহপূর্বক কবিতা দুটি আপনাদের "সাপ্তাহিক বসুমতী"তে ছাপালে বিশেষ উপকৃত হবো। আশা করি আপনাদের এটুকু সহানুভূতিলাভে বঞ্চিত হবো না। আপনাদের কাছ থেকে সাড়া পেলে ভবিষ্যতে আরো ভালো লেখা পাঠাতে পারবো। লেখা ছাপা হলে যথাসময়ে আমার ঠিকানায় 'বুক-পোস্ট' করে এক কপি পত্রিকা পাঠালেই চলবে।

অনেক আশা আর কৌতূহল নিয়ে আপনাদের চিঠির অপেক্ষায় থাকবো। ইতি

শ্রদ্ধান্তে আপনাদের
সিরাজুল হক

পাইকপাড়া, ব্রাহ্মণবেড়িয়া, কুমিল্লা—পূর্ব পাকিস্তান।

[কবিতা দুটি অন্যত্র প্রকাশ করা হোল।—সম্পাদিকা]

*

সাপ্তাহিক বসুমতীর কর্তৃপক্ষ শ্রদ্ধেয় শ্রীপ্রভাংশু ধরচৌধুরী মহাশয়ের খোলা চিঠির প্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। আমি প্রভাংশুবাবুর সংগে সত্যিই এক মত—'গুপ্ত সমিতির ঘটনাবলী সকলের পক্ষে সবটুকু জানা সম্ভব নয় বলিয়াই জ্ঞান বিশ্বাস মতে যাহার যতটুকু জানা আছে একত্র সন্নিবেশিত হওয়া প্রয়োজন।' তিনি অমর শহীদ নরেশ রায়ের জীবনবৃত্তান্ত জানাইয়া বাংলার বিপ্লবী যুগের ইতিহাসকে সমৃদ্ধিশালী করতে সাহায্য করেছেন তাতে কোনো সন্দেহ নেই। শহীদ নরেশ রায় মেডিকেল স্কুলে পড়তে যাওয়ার আগেই 'যুগান্তর বিপ্লবী দলের কর্মী হিসেবে বিপ্লবমন্ত্রে দীক্ষা নিয়েছিলেন'—এই তথ্যটি সত্যিই আমার জানা ছিল না। নরেশের সংগে আমাদের, বিশেষ করে আমার, প্রায় তিন বছর খুবই ঘনিষ্ঠভাবে দিন কেটেছে। চট্টগ্রামে প্রতিদিনই মেডিকেল স্কুল-হোস্টেল ও সেই সংলগ্ন গণেশের বাড়িতে ঘন্টার পর ঘন্টা কাটিয়েছি। অন্তরের বৈপ্লবিক প্রেরণা দিয়ে দিনের পর দিন নরেশ, বিধু ও অন্যান্য তরুণ বন্ধুদের সংগে কথা বলেছি আর মুষ্টিযুদ্ধ, জাপানী কুস্তি, জিমনাস্টিক ক্লাব প্রভৃতি সম্বন্ধে আলোচনা করেছি। এই সুদীর্ঘ দিনের ঘনিষ্ঠতার মধ্যেও নরেশের থেকে আমার জানবার সৌভাগ্য হয় নি যে, বহু পূর্বেই যুগান্তর দলে তার বিপ্লবমন্ত্রে দীক্ষা হয়েছে। প্রভাংশুবাবুর এই চিঠি দেখার পর আমি শ্রীগণেশ ঘোষের সংগে দেখা করে তাঁর কাছ থেকে জানতে চেয়েছি তিনি অমর শহীদ নরেশের কাছে সেইরূপ দীক্ষার কথা শুনেছিলাম কি না। শ্রীগণেশ ঘোষও নরেশের কাছে সেইরূপ কোনো কথা শুনেছিলেন বলে মনে করতে পারেন নি।

আমি ও গণেশ নরেশের মুখে উপরোক্ত কথা কিছুই শুনি নি বলে শ্রদ্ধেয় প্রভাংশুবাবুর শহীদ নরেশ রায়ের বিপ্লবী জীবনপ্রভাতের সত্য উদ্‌ঘাটনকে আমি বিন্দুমাত্র অস্বীকার করছি না। শহীদ নরেশ রায়ের বৈপ্লবিক জীবনবৃত্তান্ত দেশবাসীর সঠিক অবগতির জন্য প্রভাংশুবাবু যে তথ্য প্রকাশ করেছেন তার যথার্থতা অস্বীকার করার কোনো যৌক্তিকতা থাকতে পারে না। কারণ, এই সত্য পরিবেশনের মধ্যে তাঁর কোনো ব্যক্তিগত স্বার্থ নেই।

আর একটি কথা—শহীদ নরেশ রায়কে 'চূড়ান্তভাবে বিপ্লবী দলে গ্রহণ করি'—এই কথা লিখে মিথ্যে বড়াই করার ইচ্ছে আমার ছিল না এবং নেইও। "দীক্ষা দিয়েছি"—এই ধরণের কথা আমার জীবনে কখনও কাউকে বলি নি। বহুকালব্যাপী কথাবার্তা বলার পর যাদের আমি দলভুক্ত করেছি তাদের সর্বশেষে বলতাম—"...তাহলে তুমি আমাদের বিপ্লবী সঙ্ঘের মত ও কর্মসূচী মেনে নিয়েছ। তবে তুমি আজ হতে আমাদের বিপ্লবী দলের সভ্য পদে গৃহীত হলে..." ইত্যাদি। "তোমাকে দীক্ষা দিলাম" বা "তুমি দীক্ষিত হলে"—এইভাবে কাউকে বলি নি, এতে আমার স্বাভাবিক সঙ্কোচ ছিল। নরেশকে আমি কখনও দীক্ষা দিই নি এবং সে কথা লিখিও নি। তাকে চূড়ান্তভাবে আমাদের দলে গ্রহণ করলাম—এই কথাই লিখেছি। অমর শহীদ নরেশের সান্নিধ্যে আসার সুযোগ হয়েছিল বলে আমি নিজেকে ধন্য মনে করি।

শ্রীঅনন্ত সিং

*

১৮ই জানুয়ারীর সাপ্তাহিক বসুমতীতে প্রকাশিত শ্রীঅনন্ত সিংহের "অগ্নিযুগের এক অধ্যায়" শীর্ষক রচনায় বাংলার দুজন বিপ্লবী দরদী নির্ভীক দেশপ্রেমিক নেতার বিবরণ পেয়ে মুগ্ধ হয়েছি।

শরৎচন্দ্র বসু সম্বন্ধে যে অভাবনীয় ঘটনার বর্ণনা লেখক দিয়েছেন সেই জন্য তিনি দেশবাসীর অভিনন্দন লাভ করবেন। ৩৮ বছর পূর্বে "শ্রেষ্ঠ বিপ্লবী সূর্য সেনকে শরৎবাবুর বোমা ও দুই হাজার টাকা উপহার দেওয়ার" যে ঘটনা এতদিন যবনিকার অন্তরালে লুক্কায়িত ছিল অনন্তবাবু আজ তা উন্মোচন করে বাংলার এক বিশিষ্ট নেতার চরিত্রের এক বিস্ময়কর দিক উদ্ঘাটিত করলেন। সাপ্তাহিক বসুমতীর পাঠকমনে এক অভূতপূর্ব চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করলেন।

সেই সংখ্যায় ১৯২৯।৩০ সালে চট্টগ্রামের রাজনৈতিক অবস্থার বর্ণনা প্রসঙ্গে অনন্তবাবু বিপ্লবীদের প্রতি স্নেহশীল ডাঃ মহিমচন্দ্র দাশগুপ্তের প্রতি তাঁর অন্তরের শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। ডাঃ মহিমবাবু চট্টগ্রামে সুপরিচিত হলেও বাংলার জনসাধারণের নিকট খুব পরিচিত নন। অনন্তবাবুর লেখায় তাঁর বিবরণ খুব সংক্ষিপ্ত হলেও ইহা বোঝা যায় চট্টগ্রামের বর্ষীয়ান রাজনৈতিক নেতাদের ভিতর একমাত্র তিনিই ছিলেন সুভাষচন্দ্রের সমর্থক ও সূর্য সেন পরিচালিত বিপ্লবী-দলের দরদী বন্ধু। চারুবিকাশ দত্তের 'চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন'-এর পাতায় দেখতে পাই বিপ্লবীরা ডাঃ মহিমবাবুর কাছ থেকে নানা প্রকার সাহায্য পেয়েছেন। শুনেছি তাঁর মত স্নেহশীল, আপনভোলা, পরোপকারী চিকিৎসক চট্টগ্রামে ছিল না বললে অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু দুঃখের বিষয় এমন এক মহাপ্রাণ ব্যক্তির সম্বন্ধে বিস্তারিত কিছু জানা যায় নি। তাঁর সম্বন্ধে কোনও ঘটনা যা তাঁর দেশপ্রীতি, স্নেহশীলতা, পরোপকার ও মহত্ত্বের পরিচয় বহন করে যদি কোনও ব্যক্তির জানা থাকে এবং যদি তিনি সাপ্তাহিক বসুমতীর 'পাঠকমনে' চিঠির মাধ্যমে প্রকাশিত করেন, তা হলে খুবই আনন্দিত হবো। ইতি

শ্রীশঙ্কর সেন
ঢাকুরিয়া

খেলাধুলা

দাদুদের দৌড়

পশ্চিম জার্মানীর ব্যাড হুর্কোনউতে অস্ট্রিয়া, সুইজারল্যান্ড, সুইডেন, কর্মাম্বিয়া ও পশ্চিম জার্মানীর দাদুরা (৫৫ থেকে ৭৮ বছর বয়স পর্যন্ত) এক আন্তর্জাতিক দৌড় প্রতিযোগিতায় মিলিত হয়েছিলেন। মোট ৯৫ জনের মধ্যে ৮৯ জন প্রতিযোগীই পৌঁছেছিলেন শেষ সীমায়। ছবিতে দাদুদের দৌড় শুরু করতে দেখা যাচ্ছে।

॥ যদি ডুনেডিন না হয়ে মেলবোর্ন হতো ॥

সেদিন সকাল থেকেই আকাশের মুখটা ছিলো ভার। কালো কালো মেঘগুলো বর্ষাকালের মতো আকাশময় ঘুরে বেড়াছিলো মনের আনন্দে দূর-দূরান্ত থেকে উড়ে-আসা মরশুমী পাখিগুলোর মতো!

ওদিকে দুপুর গড়াতে না গড়াতে খবর এলো বিদেশের মাটিতে ভারত প্রথম টেস্ট খেলায় জয়লাভ করেছে। জয়লাভ করেছে ভারতের বাইরে ৪৩টি টেস্ট খেলায় অংশ গ্রহণ করার পর। যে সোনার হরিণ এতোকাল ধরা দিতে দিতেও দেয় নি, সেই সোনার হরিণ এবার বড় আচমকাভাবে ধরা পড়ে গেলো! বিদেশের মাটিতে ভারত প্রথম জিতলো!

কিন্তু জয়লাভের সেই উন্মাদনা, সেই উচ্ছ্বাস কই! কোথায় গেলো সেই আনন্দের আবেগে উদ্বেলিত হৃদয়ের উল্লাস! সব যেন কোথায় হারিয়ে গেছে! কিন্তু এই জয়লাভটা যদি নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে না হয়ে হতো অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে, যদি ডুনেডিন না হয়ে মেলবোর্ন হতো, যদি সেদিন ভারত আর মাত্র ৩৯টি রান করতে পারতো—তাহলে?

তাহলে যে আনন্দের বন্যা বইতো সারা দেশ জুড়ে—তার সিকি ফোঁটাও তো দেখা গেলো না ডুনেডিনে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ভারতের ৫ উইকেটে জয়লাভ করার পর। কিন্তু কেন এই উদাসীনতা, কেন এই অবহেলা? তবে কি এর পেছনে অন্য কোন কারণ আছে?

সে কারণ আর কিছু নয় পর পর পরাজয়ের জ্বালা। বিদেশের মাটিতে পর পর সতেরোটি টেস্ট ম্যাচে পরাজয়ের যে জ্বালায় জ্বলছে আমাদের মন, নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে জয়লাভ সেই জ্বালার প্রাণান্ত প্রদাহে পারে নি এতোটুকুও স্নিগ্ধতার প্রলেপ লাগাতে। তাই মনের মধ্যে জয়লাভের সেই উল্লাস বোধ, আনন্দ-উন্মাদনার ভাব এতোটুকুও জাগছে না। জাগবেও না—যতোদিন না এই জয়লাভ ডুনেডিন না হয়ে হবে মেলবোর্ন, লর্ডস কিম্বা সাবিনা পার্কে, যতোদিন না আমরা ওদের নিজেদের দেশে অস্ট্রেলিয়া, ইংলণ্ড কিম্বা ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলকে হারাতে পারবো।

তাই ডুনেডিনের এই জয়লাভে উল্লসিত হবার কিছুই নেই। বরঞ্চ এই জয়লাভকে স্বাগত জানিয়ে ভবিষ্যতের সাফল্যের দিকে নজর দিয়ে পথ প্রশস্ত করাই বুদ্ধিমানের কাজ। আর সেই কাজই আজ করার দরকার। বিশ্ব ক্রিকেটাঙ্গনে সাম্প্রতিক ব্যর্থতাগুলোর জন্যে ভারত আজ যেখানে নেমে গেছে—সেই অবমানিত, সেই অপদস্থ স্থান থেকে সবার আগে যে টেনে আনতে হবে ভারতীয় ক্রিকেটকে! যশ এবং প্রতিপত্তির আসনে আবার যে বসাতে হবে তাকে। বিদেশের মাটিতে ভারতীয় দলের এই জয়লাভের প্রথম স্মৃতিই ভারতকে যদি দেখাতে পারে সেই পথ—তাহ'লে স্বীকার করবো যে বহু প্রত্যাশিত ভারতের এই জয়লাভে উল্লসিত আনন্দের জোয়ারে গা ভাসানো চলতে পারে।

আই সেদিনের সেই বৃষ্টি-ঝঞ্ঝা দিনে ভারতের প্রথম জয়লাভকে কেন্দ্র করে দেখা যায় নি ক্রিকেটউৎসাহীদের উদ্বেলিত হৃদয়ের আনন্দ-উচ্ছ্বাস। আর সে উচ্ছ্বাসে বাদ সেধেছিলো ঘোষমন্ত্রিসভার পদত্যাগ আর পশ্চিমবঙ্গে রাষ্ট্রপতির শাসন প্রতিষ্ঠার জোরালো খবর। ভারতের জয়লাভ, ঘোষমন্ত্রিসভার পদত্যাগ আর রাষ্ট্রপতির শাসন —এই তিনে মিলে কলকাতার নাটকটি সেদিন জমেছিলো খুব। তবু সারাদিন, সারা রাত আকাশের মুখটা সেদিন ছিলো ভার।

—শান্তিপ্রিয়

হরিণ বছর পরে

কোথায় সেই ১৯৩২ সাল, আর কোথায় এই ১৯৬৮। ১৯৩২ সালে ভারত ইংলণ্ড সফরে গিয়ে খেলেছিলো

প্রসন্ন

ডুনেডিনের নায়ক প্রসন্ন! প্রসন্নর প্রশংসনীয় বোলিং ভারতকে জয়লাভের পথে টেনে এনেছিলো।

তার প্রথম টেস্ট খেলা। তারপর থেকে বারবার ভারত গেছে ইংলণ্ডে, গেছে অস্ট্রেলিয়ায়, ওয়েস্ট ইণ্ডিজে, পাকিস্তানে আর এবার এই প্রথম গেছে নিউজিল্যাণ্ডে।

এক নজরে ভারতের মোট খেলা ও তার ফলাফল

মোট টেস্ট	ভারতের জয়	ভারতের পরাজয়	ড্র
১০৫	১১	৪৪	৫০

টেস্ট খেলা শুরু করার কুড়ি বছর পরে ১৯৫২ সালে মাদ্রাজের চীপক মাঠে ভারত ইংলণ্ডকে হারিয়ে সর্বপ্রথম লাভ করেছিলো টেস্ট খেলায় জয়লাভের আনন্দ। তার পরের বছর পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ২—১ টেস্টে জয়লাভ করে আমরা প্রথম 'রাবার' লাভ করলাম। এরপর ১৯৫৫-৫৬ সালে নিউজিল্যাণ্ড ক্রিকেট দল আসে ভারত ভ্রমণে। নিউজিল্যাণ্ডকে হারিয়ে আবার 'রাবার' লাভ করলো ভারত। তারপর আমরা হারিয়েছি অস্ট্রেলিয়াকে। রাবার ছিনিয়ে নিয়েছি ইংলণ্ডের কাছ থেকে।

কিন্তু সবই দেশের মাটিতে। সব জয়লাভ, সব কৃতিত্ব সবই ভারতের ক্রিকেট মাঠগুলোতে! এর পর বিদেশের মাঠগুলোতে আমরা শুধু দেখেছি জমাট ধরা পরাজয়ের পালা। জিততে-জিততে বার-বার আমরা হেরে গেছি। আশার ছলনায় ভুলিয়ে বিজয়লক্ষ্মী আমাদের চোখে চকিতে চমক লাগিয়ে পরমুহূর্তে আবার কুহকিনীর রূপ ধরে চলে গেছে আমাদের নাগালের একেবারেই বাইরে।

এতোদিন পরে এবার সেই সোনার হরিণ ধরা দিয়েছে আমাদের কাছে। বিদেশের মাটিতে প্রথম জয়লাভে ভারত নিউজিল্যাণ্ডকে হারিয়েছে পাঁচ উইকেটে।

নিউজিল্যাণ্ড প্রথম ইনিংসে করেছিলো ৩৫০ রান। তার মধ্যে ছিলো ডাউলিং-এর ১৪৩ আর কংডনের ৫৮ রান। ভারতের আবীদ আলী ২৬ রানের বিনিময়ে পেয়েছিলেন ৪টি উইকেট। প্রত্যুত্তরে ভারত মাত্র ৯ রানে এগিয়ে থাকলো প্রথম ইনিংসে ওয়াদেকার ৮০ আর ইঞ্জিনিয়ার ৬৩ রান করায়। ৮৬ রান দিয়ে নিউজিল্যাণ্ডের মোজ পেয়েছিলেন ৫টি উইকেট!

নিউজিল্যাণ্ডের দ্বিতীয় ইনিংসে ভারতের স্পিন বোলার প্রসন্ন ধরলেন সংহার মূর্তি। ৯৪ রানের বিনিময়ে প্রসন্ন ৬টি উইকেট পাওয়ায় নিউজিল্যাণ্ডের দ্বিতীয় ইনিংস শেষ হলো ২০৮ রানে। বিজয়লক্ষ্মী তখন ভারতের মুঠোর মধ্যে। তবু ভারতের ব্যাপারে তো—না আঁচালে বিশ্বাস নেই। তবু সে বিশ্বাস রেখে ভারত শেষ পর্যন্ত ৫ উইকেটে করে ফেললো ২০০ রান। এ ইনিংসেও খেলার মতো খেলে ওয়াদেকার করেছিলেন ৭১ রান।

বোম্বাই-এর বিশ্ব রেকর্ড

শেষ পর্যন্ত বোম্বাই দল ক্রিকেট খেলায় বিশ্ব রেকর্ড স্থাপন করলো! রনজি ট্রফি ক্রিকেট প্রতিযোগিতার ফাইন্যালে মাদ্রাজকে প্রথম ইনিংসের ফলাফলে পরাজিত করে বোম্বাই দল পর পর দশবার রনজি ট্রফি লাভ করে এতোকাল বিশ্বের আর কোন দল যা পারে নি সেই অসাধ্য সাধন করে বিশ্ব রেকর্ড স্থাপন করলো। বিশ্বের ক্রিকেট ইতিহাসে এ এক অনন্য কৃতিত্ব।

এর আগে অস্ট্রেলিয়ার নিউ সাউথ ওয়েলস দল পর পর ন' বার শেফীল্ড শীল্ড লাভ করে যে বিশ্ব রেকর্ড প্রতিষ্ঠা করেছিলো, বোম্বাই দল এবার সেই রেকর্ড ভেঙে দিতে সমর্থ হয়েছে।

বোম্বাই-এর কৃতিত্ব এবার আরো বেশি কারণ ধরতে গেলে এক রকম ভাঙা দল নিয়েই বোম্বাই এবার রনজি ট্রফি লাভ করার সম্মান অর্জন করেছে। বোম্বাই দলের নামকরা খেলোয়াড়রা এখন ভারতীয় দলের সঙ্গে নিউজিল্যাণ্ড ভ্রমণে গেছেন।

তবু সময় থাকলে হয়তো বা শুধু প্রথম ইনিংসের ফলাফলেই নয়—সরাসরি বোম্বাই হারাতে পারতো মাদ্রাজকে রনজি ট্রফি ক্রিকেট প্রতিযোগিতার ফাইন্যাল খেলায়।

মাদ্রাজ প্রথম ইনিংসে করেছিলো ২৫৮ রান। উত্তরে বোম্বাই-এর ইনিংস শেষ হয় ৩১২ রানে। দ্বিতীয় ইনিংসে মাদ্রাজ

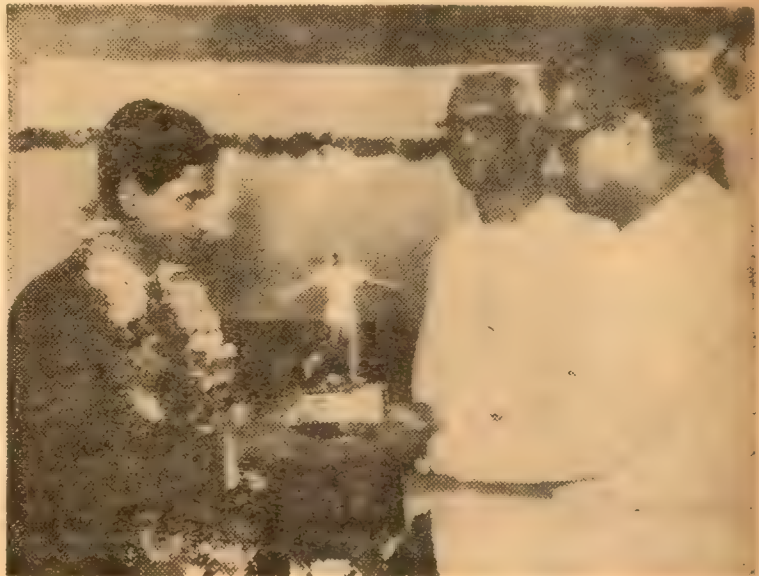

ডুরাণ্ড ও রোভার্স কাপ বিজয়ী ইস্টবেঙ্গল ক্লাবকে এক পৌর-সম্বর্ধনায় সম্বর্ধনা জানানো হয়। ছবিতে ইস্টবেঙ্গলের অধিনায়ক প্রশান্ত সিংহকে মেয়র শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দের কাছ থেকে বিশেষ উপহারটি নিতে দেখা যাচ্ছে।

করলো ৩০২ রান। জয়লাভের জন্যে বোম্বাই-এর তখন দরকার ২৪৯ রান। কিন্তু ১০৯ রানের মধ্যে ৫টা উইকেট পড়ে গেলে বোম্বাই সম্মুখীন হয়েছিলো কিছুটা সংকটের। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দলের অধিনায়ক হারাডিকার ৬২ আর সোলকার ৫৫ রান করে অপরাজিত থাকায় শেষ দিনের খেলার শেষে দেখা গেলো যে ৫টি উইকেট হারিয়ে বোম্বাই করেছে ২২৫ রান। ফলে বোম্বাইকে জিততে হলো প্রথম ইনিংসের ফলাফলেই।

সমাচার দর্পণ

দেশে

বিশ্ব রেকর্ড প্রতিষ্ঠার পর বোম্বাই দলের অধিনায়ক মনোহর হারাডিকার প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেট খেলা থেকে অবসর গ্রহণ করলেন। অবশ্য তিনি শুধু একাই অবসর গ্রহণ করলেন না; তাঁর সঙ্গে আছেন বোম্বাই দলের আরো দুজন খেলোয়াড় মাধবলাল আপ্তে ও বি পি গুপ্তে।

* * *

দর্শকশূন্য মাঠে এখন অনুষ্ঠিত হচ্ছে কোলকাতার প্রথম বিভাগীয় হকি লীগের খেলাগুলো! উতকামণ্ডে জাতীয় হকি প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হচ্ছে আর কোলকাতার নামী দলের খেলোয়াড়রা বাংলা দলের প্রতিনিধিত্ব করার জন্যে গেছেন সেখানে, তাই কোলকাতা ময়দানের দুই প্রধান এখন হকি মাঠে অনুপস্থিত—সুতরাং মাঠে এখন নেই ভীড়, নেই এতোটুকুও চাঞ্চল্য।

হারাডিকার

বিশ্ব রেকর্ড প্রতিষ্ঠার পর বোম্বাই দলের অধিনায়ক হারাডিকার অবসর গ্রহণ করার কথা ঘোষণা করেছেন।

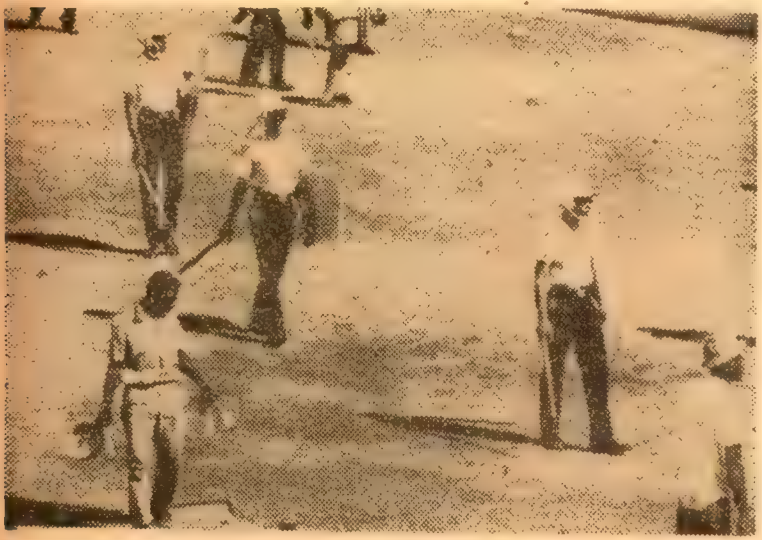

ক্রিকেটের আর এক কলঙ্কিত অধ্যায়

সাবিনা পার্কে শুধু খেলোয়াড়দেরই নয়—ঢাল-তলোয়ার (লাঠি) হাতে পুলিশকেও দেখা গিয়েছিলো ইংলন্ড-ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের প্রথম টেস্ট ম্যাচের সময়......!

বিদেশে

বর্ণবৈষম্য নীতির গোঁড়া সমর্থক দক্ষিণ আফ্রিকাকে মেকসিকো অলিম্পিকে যোগদান করতে দেবার সংবাদে বিভিন্ন দেশে উঠেছে প্রতিবাদের ঝড়। ইতিমধ্যেই ১৪টি দেশ মেকসিকো অলিম্পিক বর্জন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে—আর তাদের সেই সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে দিয়েছে অলিম্পিক কমিটিকে! যে চোদ্দটি দেশ অলিম্পিক বর্জন করবে বলে জানিয়েছে তারা হলো—ইরাক, ইথিওপিয়া, সুদান আলজিরিয়া, উগান্ডা, তানজিয়া ঘানা, গামবিয়া, গিনি, মালি, কেনিয়া, সোমালিয়া, সিরিয়া আর ইউনাইটেড আরব।

* * *

খ্যাতনামা ক্রিকেট খেলোয়াড় ও ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ভ্রমণকারী এম সি সি ক্রিকেট দলের সহ-অধিনায়ক ফ্রেড টিটমাসের বাঁ পায়ের চারটি আঙুল বাদ দিতে হয়েছে। কাউড্রে আর হবসের সঙ্গে স্নান করার সময় একটি মটর চালিত বোটের পাখা লেগে টিটমাসের বাঁ পায়ের দুটি আঙুল দু টুকরো হয়ে যায়। পরে হাসপাতালে বাদ দিতে হয় আরো দুটি আঙুল। তবে অস্ত্রোপচারের পর জানা গেছে যে আগামী মরশুমে টিটমাস আবার ক্রিকেট খেলতে পারবেন।

* * * *

বিশ্ববিখ্যাত ফুটবল খেলোয়াড় পেলে সোনার তলোয়ার লাভ করলেন। আন্তর্জাতিক ফুটবল বার্ষিকী পুস্তকের তরফ থেকে ব্রাজিলের পেলেকে সোনার তলোয়ার উপহার দেওয়া হয়েছে। পেলে পৃথিবীর দ্বিতীয় ফুটবল খেলোয়াড় হিসেবে এই গৌরবজনক পুরস্কার লাভ করলেন। এর আগে এই তলোয়ার লাভ করেছিলেন আর একজন মাত্র ফুটবল খেলোয়াড়—ইংলণ্ডের স্যার স্ট্যানলী ম্যাথুজ।

আইন-কানুনের দুনিয়া

রান আউট, স্টাম্পড আউট কিম্বা উইকেটকীপারের ব্যাটসম্যানকে আউট করার বিষয় নিয়ে যথেষ্ট মতভেদ দেখা যায়। অবশ্য এ মতভেদ বড় খেলায় নয়, ছোট-খাটো খেলার সময়ই হয়ে থাকে। ফলে অনেক সময়ই হয় গোলমাল আর গোলমাল থেকে ঘটে অপ্রীতিকর ঘটনা।

সেই সব ঘটনার হাত থেকে রেহাই পেতে হলে ক্রিকেট খেলার আইন-কানুন-গুলোকে আমাদের ভালোভাবে জানতে হবে।

নিচে চিত্র সহকারে সেই রকম কয়েকটি আউটের কথা আলোচনা করা হচ্ছে।

প্রথমেই আমাদের জানতে হবে যে উইকেটের পতন কখন হয়। ক্রিকেট আইনের ৩১নং নিয়মে বলা হয়েছেঃ

বল লেগে, কিম্বা ব্যাটসম্যানের ব্যাটে বা গায়ে লেগে উইকেটের ওপর থেকে বেল পড়ে গেলে অথবা উইকেট উপড়ে গেলে উইকেটের পতন হয়েছে বলা হয়। যে কোন খেলোয়াড় উইকেট ঠিকভাবে উপড়ে বা উইকেটের ওপর বেল নাড়াতে পারে।

উইকেটের পতনের সংগে ব্যাটসম্যানের আউট হবার সম্পর্ক বড় কাছাকাছি। অর্থাৎ ব্যাটসম্যান পপিং ক্রীজের বাইরে থাকার সময় উইকেটরক্ষক কিম্বা অন্য কোন ফিল্ডার বল হাতে নিয়ে উইকেটের পতন ঘটাতে পারেন তাহলেই ব্যাটসম্যানের আউট হবার প্রশ্ন ওঠে। সুতরাং ব্যাটসম্যানকে আউট করতে হলে উইকেটের পতন ঘটাতেই হবে।

প্রথমেই ধরা যাক এক নম্বর অর্থাৎ নিচের ছবিটির বিষয়।

এ ক্ষেত্রে ব্যাটসম্যানের আউট হবার কোন প্রশ্নই ওঠে না। ব্যাটসম্যান তাঁর ক্রীজ ছেড়ে যদি মাঠে থাকলেও না। কারণ এ ক্ষেত্রে আইনসংগতভাবে উইকেটের পতন ঘটানো হয় নি। উইকেটরক্ষক সম্পূর্ণ বেআইনীভাবে উইকেট ভেঙে দিয়েছেন। তিনি এক হাতে বল নিয়ে অন্য হাত দিয়ে উইকেট ভেঙে দিয়েছেন। সুতরাং এ ক্ষেত্রে ব্যাটসম্যান কোন মতেই আউট হবেন না।

এই ছবি থেকে আমরা একটা বিষয়ে নিশ্চিত হতে পারি যে ব্যাটসম্যানকে আইন-সংগতভাবে আউট করতে হলে যে হাতে বল আছে সেই হাত দিয়েই উইকেট ভাঙতে হবে অর্থাৎ উইকেটের পতন ঘটাতে হবে। অবশ্য ব্যাটসম্যান তাঁর ক্রীজের বাইরে থাকতে থাকতে বল উইকেটে ছুঁড়ে মেরে যদি উইকেটের পতন ঘটানো হয় তাহলেও ব্যাটসম্যান আউট হবে।

দু' নম্বর ছবির বেলাতেও ব্যাটসম্যান আউট হবে না। কারণ এ ক্ষেত্রেও আইন-সংগতভাবে উইকেটের পতন ঘটানো হয় নি। আইনের মত হলো, হাতে বল নিয়ে তবে উইকেট ভাঙতে হবে! কিন্তু ছবিতে তো সে নিয়ম মানা হয় নি।

আর নিয়ম মানা হয় নি বলেই ব্যাটস-ম্যান আউট হবে না। কারণ বল হাতে আসার আগেই উইকেটরক্ষক বেল ফেলে দিয়ে উইকেটের পতন ঘটিয়েছেন। উইকেট-রক্ষক নিয়ম মানেন নি। তাই ব্যাটসম্যানও আউট হবেন না!

দু' নম্বর ছবি থেকে সেই একই কথা প্রমাণিত হয়। প্রমাণিত হয় যে হাতে বল নিয়ে তবে অথবা বল ছুঁড়ে মেরে উইকেটের পতন ঘটানো যায়। আর সেই সময় যদি ব্যাটসম্যান তাঁর ক্রীজের বাইরে থাকেন—তাহলেই তিনি আউট হবেন।

নিচের ছবিটি হলো আইনসংগতভাবে উইকেটের পতন ঘটিয়ে ব্যাটসম্যানকে আউট করার দৃশ্য। ব্যাটসম্যান যখন ছিলেন ক্রীজের বাইরে তখনই উইকেটরক্ষক বল হাতে নিয়ে উইকেট ভেঙে দিয়ে ঘটিয়েছেন উইকেটের পতন। তাই এ ক্ষেত্রে ব্যাটসম্যানও আউট হবেন।

(এক)

নট আউট। উইকেটরক্ষক এক হাতে বল নিয়ে অন্য হাত দিয়ে উইকেট ভেঙে দিয়েছেন।

(দুই)

এবারও ব্যাটসম্যান আউট হবেন না। হাতে বল আসার আগেই উইকেট-রক্ষক উইকেট থেকে বেল ফেলে দিয়েছেন।

(তিন)

ব্যাটসম্যান আউট। হাতে বল নিয়ে উইকেটরক্ষক উইকেট ভেঙে দিলেন। উইকেটের পতন হলো।

পরিচীয়তে

অজিত ওয়াদেকার

শেষ পর্যন্ত বিদেশের মাটিতে ভারত সর্বপ্রথম টেস্ট ম্যাচ জেতার গৌরব লাভ করলো। লাভ করলো অনেক দিনের অনেক ব্যর্থতার বোঝা মাথায় নিয়ে। তবু এই জয়লাভকে ঐতিহাসিক সাফল্য হিসেবে আখ্যা দিতেই হবে!

তবে এই সাফল্যের পেছনে যে ক'জন খেলোয়াড়ের কৃতিত্বের কথা লেখা থাকবে তার মধ্যে সবার ওপরের স্থানটি বোধহয় পাবেন অজিত ওয়াদেকার।

ওয়াদেকার আজ আর শুধু ভারতের পরম নির্ভরযোগ্য ব্যাটসম্যান হিসেবেই পরিচিত নন, তিনি আজ ভারতীয় দলের পরিত্রাতার ভূমিকায় বিরাজমান।

অথচ টেস্ট খেলায় চান্স পাবার জন্যে ওয়াদেকারকে কতো কাঠ-খড়ই না পোড়াতে হয়েছে। হয়েছে কতো কসরৎ করতে, যোগ্যতা প্রমাণ করবার জন্যে বারবার নৈপুণ্য প্রদর্শন করতে হয়েছে তাঁকে।

কিন্তু কৃতিত্বের কথা ধরলে তিনি তো কোন অংশেই কম ছিলেন না। গত দশ বছর ধরে বিভিন্ন খেলাগুলো যে তাঁর সাফল্যের জয়গানে মুখর হয়ে আছে!

ধরা যাক সেই ১৯৫৮-৫৯ সালের কথা। আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় বোম্বাই দলের পক্ষে খেলতে নেমে দিল্লীর বিরুদ্ধে তিনি করেছিলেন ৩২৪ রান। তারপর আবার ১৯৬১-৬২ সালে রণজি ট্রফির খেলায় রাজস্থানের বিরুদ্ধে করেছিলেন ২৩৫ রান। শুধু তাই নয় রণজি আর দলীপ ট্রফির খেলায় একটার পর একটা সেঞ্চুরী করলেও টেস্ট জগতের লৌহদ্বার তাঁর কাছে রুদ্ধই রইলো। রুদ্ধ রইলো দীর্ঘ দিন ধরে।

তবু হতাশ হন নি ওয়াদেকার। নৈরাশ্যের বেদনায় ভেঙে পড়েন নি তিনি। নিজেকে আরো যোগ্য করে তোলার সাধনায় তিনি রইলেন মেতে। নিজের যোগ্যতা সুচারুরূপে প্রমাণিত করতেই বোধহয় চেয়েছিলেন ওয়াদেকার।

আর শেষ পর্যন্ত সাফল্যই লাভ করলেন ওয়াদেকার, দলীপ ট্রফির খেলায় ১০৩ রান করায় ১৯৬৬-৬৭ সালে ভারত সফরকারী ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের বিরুদ্ধে টেস্ট খেলার জন্যে ডাক পড়লো ওয়াদেকারের।

কিন্তু অতো পরিশ্রম আর অতো প্রচেষ্টার পর কি হলো...?

ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিরুদ্ধে বোম্বাই-এ

ওয়াদেকার

জীবনের প্রথম টেস্ট ম্যাচ খেলতে গিয়ে ওয়াদেকার প্রথম ইনিংসে ৮ আর দ্বিতীয় ইনিংসে করলেন ৪ রান। রণজি আর দলীপ ট্রফির খেলায় যাঁর সেঞ্চুরীর অভাব নেই, সেই ওয়াদেকার তাঁর জীবনের প্রথম টেস্টে দু' ইনিংস মিলে করলেন ১২ রান। শুধু কি তাই? ফিল্ডিং করতে গিয়ে আবার আঘাত লাগিয়ে বসলেন হাতে।

শুধু সেই শুরু। তারপর থেকে যে টেস্ট জগতের দুয়ার ওয়াদেকারের কাছে খুলে গেলো, আজো সে দ্বার অবারিত। আপন কৃতিত্বের নৈপুণ্যে ওয়াদেকার আজ ভাস্বর।

গত বছর ভারতীয় ক্রিকেট দলের সঙ্গে গিয়েছিলেন ইংলণ্ড ভ্রমণে আর এ বছর অস্ট্রেলিয়া ভ্রমণ শেষ করে ওয়াদেকার এখন নিউজিল্যাণ্ডে! আর নিউজিল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে প্রথম টেস্ট ম্যাচে ভারতের জয়লাভের পেছনে আছে ওয়াদেকারের অসামান্য অবদান। ভারতীয় দলের জয়লাভের অনেকখানি কৃতিত্বই তাঁর।

টেস্ট খেলার সুযোগ না পেলেও, ওয়াদেকারকে আমরা অনেকদিন আগে থেকেই চিনি। অবশ্য ওয়াদেকারের বয়েস খুব একটা বেশি হয় নি। জন্ম বোম্বাই-এ ১৯৪১ সালের ১লা এপ্রিল।

ছোটবেলা থেকেই ক্রিকেট খেলার ওপর ঝোঁক থাকলেও, কলেজ জীবনেই ওয়াদেকারের নাম ছড়িয়ে পড়ে। বিশেষ করে আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিযোগিতার খেলাগুলোয় তাঁর ভারী ভারী স্কোরগুলোই তাঁকে তাঁর খেলোয়াড় জীবনের সাফল্যের পথে অনেকখানি এগিয়ে দেয়।

ওয়াদেকারের খেলা সৌন্দর্যে ভরা। সহজ সরল ভঙ্গিমায় ওয়াদেকার সাবলীল। উইকেটের চারদিকে প্রচণ্ড জোরে মারতে পারেন তিনি।

অনেকেই আজকাল ওয়াদেকারকে অস্ট্রেলিয়ার প্রাক্তন ন্যাটা ব্যাটসম্যান নীল হার্ভের সঙ্গে তুলনা করে থাকেন! কিন্তু আমরা অতোটা যেতে চাই না! ওয়াদেকারের খেলা সুন্দর—এ কথা ঠিকই। কিন্তু ওয়াদেকার কোনদিনই হার্ভে হতে পারবেন না। হার্ভে—হার্ভেই! আর ওয়াদেকার চিরকাল ওয়াদেকারই থাকবেন।

ভারতীয় দলের অন্যতম শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় হিসেবে ওয়াদেকার আজ তাঁর খেলোয়াড় জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত! ভবিষ্যৎ তাঁর উজ্জ্বল। আমরা সেই উজ্জ্বল ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে ওয়াদেকারকে আরো নিপুণ খেলোয়াড় হিসেবে দেখতে চাই!

সম্পাদিকা—জয়ন্তী সেন
বসুমতী (প্রাঃ) লিঃ-এর পক্ষে ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীটস্থ কলিকাতা-১২
বসুমতী প্রেস হইতে শ্রীসুকুমার গুহমজুমদার কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বসুমতীর কালজয়ী গ্রন্থরাজি

॥ গ্রন্থনসৌষ্ঠবে নয়নাভিরাম ॥

কালিদাস গ্রন্থাবলী—	১ম	৮-০০
কালিদাস গ্রন্থাবলী—	২য় (যন্ত্রস্থ)	৬-০০
কালিদাস গ্রন্থাবলী—	৩য়	৮-০০
মাইকেল গ্রন্থাবলী—	১ম	৪-৫০
মাইকেল গ্রন্থাবলী—	২য়	৪-০০
বঙ্কিম গ্রন্থাবলী (উপন্যাস)—	১ম	৪-৫০
বঙ্কিম গ্রন্থাবলী (উপন্যাস)—	২য়	৪-৫০
বঙ্কিম গ্রন্থাবলী (উপন্যাস)—	৩য়	৪-৫০
বঙ্কিম গ্রন্থাবলী (সাহিত্য)—	১ম	৪-৫০
বঙ্কিম গ্রন্থাবলী (সাহিত্য)—	২য়	৪-৫০
বঙ্কিম গ্রন্থাবলী (সাহিত্য)—	৩য়	৪-৫০
দ্বিজেন্দ্রলাল গ্রন্থাবলী—	১ম	৬-০০
" "	২য়	৬-০০
" "	৩য়	৮-০০
সেক্সপীয়র গ্রন্থাবলী—	১ম খণ্ড	৪-৫০
সেক্সপীয়র গ্রন্থাবলী—	২য় খণ্ড	৪-৫০
ত্রৈলোক্য গ্রন্থাবলী—	১ম	৩-০০
ত্রৈলোক্য গ্রন্থাবলী—	২য়	৩-০০
দীনবন্ধু মিত্র গ্রন্থাবলী—	১ম	৩-০০
দীনবন্ধু মিত্র গ্রন্থাবলী—	২য়	৩-০০
মানিক গ্রন্থাবলী—	১ম	৪-০০
মানিক গ্রন্থাবলী—	২য়	৪-০০
দামোদর গ্রন্থাবলী—	১ম	৪-৫০
দামোদর গ্রন্থাবলী—	৪র্থ	৪-০০
অমৃতলাল গ্রন্থাবলী—	১ম	৪-০০
অমৃতলাল গ্রন্থাবলী—	২য়	৪-০০
অমৃতলাল গ্রন্থাবলী—	৩য়	৪-০০
যোগেশ গ্রন্থাবলী—	২য়	৩-০০
বিহারীলাল গ্রন্থাবলী—		৩-৫০
রঙ্গলাল গ্রন্থাবলী—		৩-০০
উপেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় গ্রন্থাবলী—		৩-০০
রামপ্রসাদ সেন গ্রন্থাবলী—		৩-০০
হরপ্রসাদ শাস্ত্রী গ্রন্থাবলী—		৫-০০
ঈশ্বরগুপ্তের গ্রন্থা:—	১ম ও ২য় খণ্ড	৫-০০
ভারতচন্দ্র গ্রন্থাবলী—		৩-০০
স্কট গ্রন্থাবলী—	২য়	৩-০০
স্কট গ্রন্থাবলী—	৩য়	৩-০০

দীনেন্দ্র রায় গ্রন্থাবলী—	১ম	৪-৫০
দীনেন্দ্র রায় গ্রন্থাবলী—	২য়	৪-৫০
নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ের গ্রন্থা:—		৪-০০
প্রভাবতী দেবী গ্রন্থাবলী—		৩-৫০
বিভূতিভূষণ মুখো: গ্রন্থাবলী—		৪-৫০
রামনাথ বিশ্বাস গ্রন্থাবলী—		৩-৫০
শিবরাম চক্রবর্তী গ্রন্থাবলী—		৩-৫০
শৈলজা গ্রন্থাবলী—	১ম	৩-৫০
শৈলজা গ্রন্থাবলী—	২য়	৩-৫০
মণিলাল বন্দ্যো: গ্রন্থা:—	১ম	৩-৫০
মণিলাল বন্দ্যো: গ্রন্থা:—	২য়	৩-৫০
অসমঞ্জ গ্রন্থাবলী—		৪-০০
সৎসাহিত্য গ্রন্থাবলী—	১ম	৪-০০
সৎসাহিত্য গ্রন্থাবলী—	২য়	৪-০০
সৎসাহিত্য গ্রন্থাবলী—	৩য়	৪-০০
সৎসাহিত্য গ্রন্থাবলী—	৪র্থ	৩-০০
রামপদ মুখার্জী গ্রন্থাবলী—		৪-০০
হেমেন্দ্র রায় গ্রন্থাবলী—		৪-০০
মতিলাল দাসের গ্রন্থাবলী—		৩-০০
জগদীশ গুপ্তের গ্রন্থাবলী—		৩-৫০
বিভূতিভূষণ ভট্টের গ্রন্থাবলী—		৩-৫০
যদুনাথ ভট্টা: গ্রন্থা:—	৩য় খণ্ড	৩-০০
শচীশ চট্টো: গ্রন্থা:—	২য় ভাগ	৩-০০
সৌরীন্দ্রমোহন মুখো: গ্রন্থা:—	৩য়	৪-০০
সৌরীন্দ্রমোহন মুখো: গ্রন্থা:—	৫ম	৪-০০
বিদ্যাসুন্দর গ্রন্থাবলী—		৬-৫০
কথাসরিৎসাগর—	১ম ভাগ	৪-০০
কথাসরিৎসাগর—	২য় ভাগ	৪-০০
চারণকবি মুকুন্দদাসের গ্রন্থা:—		৩-০০
অরবিন্দ দত্তের গ্রন্থাবলী—		৩-০০
জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের গ্রন্থাবলী—	১ম, ২য়, ৩য়—প্রতি খণ্ড	৪-০০
ক্ষীরোদ গ্রন্থাবলী ৪র্থ হইতে	৮ম খণ্ড—প্রতি খণ্ড—	৩-৫০
ডিকেন্সের গ্রন্থাবলী—		৩-৫০
চারু বন্দ্যোপাধ্যায়ের গ্রন্থাবলী—		৪-০০
বিলাতী গুপ্তকথা—	২য়ভাগ	৫-০০

নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের গ্রন্থাবলী—	১ম ও ২য় ভাগ—প্রতি ভাগ	৩-[illegible]
হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষের গ্রন্থাবলী—		৩-[illegible]
নারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্যের গ্রন্থাবলী—	৩য় খণ্ড ও ৬ষ্ঠ খণ্ড—প্রতি খণ্ড	৩-[illegible]
যোগেন্দ্র বিদ্যাভূষণের গ্রন্থাবলী—	২য় ভাগ	৩-[illegible]
ভারতীয় সঙ্গীতের ইতিহাস—		
গোপেশ্বর বন্দ্যো:—	১ম ও ২য় ভাগ প্রতি খণ্ড	[illegible]
কবিকঙ্কণ চণ্ডী—		৪-[illegible]
জ্যোতিষ রত্নাকর—		৩-[illegible]
পরলোক—		৪-[illegible]
পরলোক রহস্য—		২-[illegible]
পরলোক ও প্রেততত্ত্ব—		৪-[illegible]
দৃশ্যকাব্য পরিচয়—		১০-[illegible]
নাড়ীজ্ঞান প্রদীপিকা—		৩-[illegible]
ভারত প্রতিভা—		৫-[illegible]
নেপোলিয়ন বোনাপার্ট—		৫-[illegible]
সাধক কমলাকান্ত—		২-[illegible]
মহারাজ নন্দকুমার—		৩-[illegible]
ছত্রপতি শিবাজী—		৩-[illegible]
জালিয়াৎ ক্লাইভ—		৩-[illegible]
বিক্রমাদিত্য—		৩-[illegible]
বিসমার্ক—		২-০০
সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তীর আত্মজীবনী—		৩-০০
যৌন-মনোদর্শন		
২য় ভাগ : স্বয়ং রতি		৪-০০
৩য় ভাগ : কামাবেগের বিশ্লেষণ		৪-০০
৪র্থ ভাগ : প্রেম ও পীড়া		৪-০০
৫ম ভাগ : কামাবেগের নিয়ন্ত্রণ-কালিকম্বের ব্যাপার সমূহ		৪-০০
৬ষ্ঠ ভাগ : রমণীর যৌন আবেগ		৪-০০
কুট্টনীমতম্ —		৪-০০
ANANDAMATH (শ্রীঅরবিন্দ কর্তৃক ইংরেজী অনুবাদ)		৪-০০
DAVID HARE		৪-০০

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড ॥ ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলি-১

১২৫ বৎসরের অধিক প্রাচীন ও বর্তমানে মশলার বৃহত্তম প্রতিষ্ঠান

কৃষ্ণচন্দ্র দত্ত (স্পাইস) প্রাঃ লিঃ

২০১নং ও ২০৫নং মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড, পোস্তা, কলিকাতা-৭

ফোন : ৩৩-১২৩২, ৩৩-২০৪১ গ্রাম : "স্পাইসমার্ট" মিল-কাশীপুর

সাপ্তাহিক বসুমতী

রাষ্ট্রপতি-শাসিত পশ্চিমবঙ্গের বিগত সপ্তাহের একটি চিত্ররূপ

বর্ষ ঃ ৩৮শ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ২৩শে ফাল্গুন, ১৩৭৪ বঙ্গাব্দ] OLDEST WEEKLY OF NORTH INDIA [72nd year, No. 38, 7th Mar., 1968

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয়		২০৭১
আজকের মানুষ		২০৭২
বঙ্গদর্শন		২০৭৩
সপ্তাহের বোধ	— কৃত্তিবাস ওঝা	২০৭৭
অবক্তব্য	— চন্দ্রগুপ্ত	২০৮০
ভারতদর্শন		২০৮৩
আন্তর্জাতিক		২০৮৬
ভিয়েৎনাম : ঝড়ের কেন্দ্র (প্রবন্ধ)	— বরুণ রায়	২০৮৮
বাজিকর (গল্প)	— নির্মলেন্দু গৌতম	২০৯৫

সাহিত্য-সম্রাট—বন্দেমাতরম্ মন্ত্রের ঋষি

বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থাবলী

—উপন্যাস—

প্রথম খণ্ড :—রাজসিংহ, বিষবৃক্ষ, যুগলাঙ্গুরীয়, মৃণালিনী, রজনী। [সচিত্র] মূল্য—তিন টাকা

দ্বিতীয় খণ্ড :—দুর্গেশনন্দিনী, কৃষ্ণকান্তের উইল, ইন্দিরা, রাধারাণী, সীতারাম। মূল্য—তিন টাকা

তৃতীয় খণ্ড :—আনন্দমঠ, চন্দ্রশেখর, কপালকুণ্ডলা, দেবী চৌধুরাণী। [সচিত্র] মূল্য—৩, টাকা।

—সাহিত্য—

প্রথম খণ্ড :—কৃষ্ণচরিত্র, লোকরহস্য, বিবিধ প্রবন্ধ (১ম)। মূল্য—তিন টাকা

দ্বিতীয় খণ্ড :—(১ম ভাগ অনুশীলন), মুচিরাম গুড়, বিবিধ প্রবন্ধ (২য়), বিজ্ঞান রহস্য। মূল্য—তিন টাকা

সুদৃশ্য কাপড় ও বোর্ডে বাঁধা (রাজ সংস্করণ)

মূল্য প্রতিখণ্ড ৪·৫০ টাকা মাত্র

মাইকেল মধুসূদন দত্তের

মাইকেল গ্রন্থাবলী

প্রথম ভাগ :—মেঘনাদবধ কাব্য, বীরাঙ্গনা কাব্য, পদ্মাবতী নাটক, বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ, একেই কি বলে সভ্যতা? (বোর্ড বাঁধাই)—সাড়ে চার টাকা।

দ্বিতীয় ভাগ :—কৃষ্ণকুমারী নাটক, শর্মিষ্ঠা নাটক, তিলোত্তমা-সম্ভব কাব্য, ব্রজাঙ্গনা কাব্য, চতুর্দশপদী কবিতাবলী, বিবিধ কাব্য, মায়া কানন, হেক্‌টর বধ। (বোর্ড বাঁধাই) চার টাকা

কবি বিহারীলাল চক্রবর্তীর গ্রন্থাবলী

রবীন্দ্রনাথ বলেন—"আধুনিক বঙ্গসাহিত্যে প্রেমের সঙ্গীত এরূপ সহস্রধারে উৎসের মত কোথাও প্রোৎসারিত হয় নাই। এমন সুন্দর ভাবের আবেগ, কথার সহিত এমন সুরের মিশ্রণ আর কোথাও পাওয়া যায় না।"

বাঙ্গালার নব গীতিকবিতার প্রবর্তক, রবীন্দ্রনাথ, অক্ষয় বড়াল, রাজকৃষ্ণ রায় প্রভৃতির কাব্যগুরু ঋষি কবি বিহারীলাল চক্রবর্তীর রচনার সমাবেশ।

কবির জীবনী, সুবিস্তৃত সমালোচনা সহ সুবৃহৎ গ্রন্থ মূল্য তিন টাকা

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড, ১৬৬ বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলিকাতা—১২

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
পূর্ব পাকিস্তান ও আমরা (প্রবন্ধ)	বসুধা চক্রবর্তী	২৩৯৯
রবীন্দ্রনাথ ও সুভাষচন্দ্র (ধারাবাহিক প্রবন্ধ)	শঙ্করীপ্রসাদ বসু	২৪০১
[illegible] দেখেছি, [illegible] পেয়েছি (স্মৃতিচয়ন)	সুধীরঞ্জন দাস	২৪০৯
[illegible] (কবিতা)	[illegible]	২৪১৩
[illegible] (ধারাবাহিক উপন্যাস)	জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী	২৪১৪
[illegible]—ওদেশে এবং এদেশে	শিলালি	২৪১৯
[illegible]জগৎ		২৪২১
[illegible]		২৪২৭
খেলাধুলা	শান্তিপ্রিয়	২৪২৮

[illegible] পাঠককে তৃপ্তি দেয় : পাঠাগারের গৌরব বৃদ্ধি করে

[illegible]কুমার মিত্রের নূতন উপন্যাস

ওঁতাবিবাহ কথা 3.00

বনফুল-এর উপন্যাস

প্রচ্ছন্ন মহিমা 4.00

নবদিগন্ত 9.00

বাংলা কথাসাহিত্যে পরীক্ষা-নিরীক্ষায় সিদ্ধহস্ত বনফুল এই উপন্যাস দু'খণ্ডতে [illegible] তাঁর [illegible]।

স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস

যখন তরঙ্গ 7.00

[illegible] যতই কঠিন [illegible] হোক না কেন, এ জীবনে প্রেম-প্রীতি মিথ্যে নয়, তারই একটি [illegible] কাহিনী

বাণী রায়ের উপন্যাস

আরো কথা বলো (২য় মুঃ) 3.00

আশাপূর্ণা দেবীর

কাঁচ পুঁতি হীরে 9.00

সাধারণ মধ্যবিত্ত বাঙালী ঘরের চেনা মানুষের কাহিনী। প্রতিটি পৃষ্ঠা যশস্বিনী লেখিকার প্রতিভার স্বাক্ষর বহন করে।

অজিতকৃষ্ণ বসুর উপন্যাস

প্রজ্ঞাপারমিতা 10.00

অজিতবাবু তাঁর সাহিত্যসাধনার দীর্ঘকালের মধ্যে অনেক গ্রন্থই রচনা করেছেন, কিন্তু প্রজ্ঞাপারমিতার মতো প্রতিভার দীপ্তি তাঁর আর কোন রচনাতেই পাওয়া যায় না। একটি আশ্চর্য মেয়ের অত্যাশ্চর্য রোমান্টিক কাহিনী।

মহাশ্বেতা ভট্টাচার্যের

অমৃত সঞ্চয় (২য় মুঃ) 10.00

[ঐতিহাসিক উপন্যাস]

সুনীলকুমার নাগের উপন্যাস

মনের আলোয় দেখা ৫.০০

পাপপুণ্যের বাসা মানবমনের যে-গভীরে, তা মন্থন করলে কখনো ওঠে গরল, কখনো সুধা। [illegible] মর্মস্পর্শী কাহিনী। সাপ্তাহিক অমৃত এ গ্রন্থের রচনা-শৈলী সম্পর্কে বলেন—কাহিনী পরিবেশনের নতুন ভঙ্গী [illegible] করবার মতো।

বোধিসত্ত্ব মৈত্রেয়-র উপন্যাস

সেই প্রেম আস্বাদন ৩.০০

[illegible] প্রেমের কাহিনী [illegible] হৃদয়গ্রাহীভাবে পরিবেশিত হয়েছে এ গ্রন্থে।

অজিতকৃষ্ণ বসুর

[illegible] 4.00

(রোমাঞ্চ উপন্যাস)

ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাঃ লিঃ

গ্রাম : কালচার (বি) ৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭ ফোন : ৩৪-২৬৪১

সাপ্তাহিক বসুমতী

সম্পাদিকা
জয়ন্তী সেন

CALCUTTA UNIVERSITY
CENTRAL LIBRARY

১২ বর্ষ : ৩৮শ সংখ্যা—মূল্য : ৩০ পয়সা বাংলা ভাষায় দ্বিতীয় সর্বাধিক প্রচারিত সাপ্তাহিক পত্রিকা
বৃহস্পতিবার, ২৩শে ফাল্গুন, ১৩৭৪ বঙ্গাব্দ

PRICE : 30 Paise
Thursday, 7th March, 1968

রাজ্যশাসনের তৃতীয়াঙ্ক

রাষ্ট্রপতির শাসন পশ্চিমবঙ্গে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর রাজনীতির হাওয়া কোন দিকে বইছে, তা নিয়ে জল্পনা-কল্পনা থাক। তবে রাষ্ট্রপতির শাসন চিরন্তন নয়, দিন স্থির না হলেও দিন গত হওয়া মানেই অন্তর্বর্তী নির্বাচনের দিনও এগিয়ে আসা। এই পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে জনগণকে এখন যতোটা সম্ভব খুদকুঁড়ো নৈবেদ্য দিয়ে সন্তুষ্ট রাখা দরকার। নচেৎ জনমনে বর্তমানে যে রকম বিরোধী প্রতিক্রিয়া, তাতে ভোট-পারাবার কারো কারো পক্ষে পার হওয়াই অসম্ভব হবে। এখন তো এমনিতেই কেউ কেউ মুখ দেখাতে লজ্জা পাচ্ছেন। বিশেষভাবে দলত্যাগীরা হা-হুতাশ করছেন এবং দলত্যাগ যাঁরা ঘটিয়েছেন তাঁরাও কোনোরূপে নিশ্চিন্ত মনে নেই। অথচ বিগত তিনটি মাস দলত্যাগীরাই পশ্চিমবঙ্গের ভাগ্য নির্ধারণ করেছে। লালদীঘির পান থেকে তখন চুণ খসাবার (না, চুণকাম করার?) পালাটাকেই হাসিল করার চেষ্টা চলছিল। কাজের কাজ কিছুই হয় নি। সেই অন্নাভাব অর্থাৎ লেভির চাল আদায় করেছে নামমাত্র, কারণ জোতদারদের গায়ে হাত দেওয়া হয় নি। ছাঁটাই শ্রমিকের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছিল, কারণ বড় বড় শিল্পপতিরা কারখানার দরজা খোলে নি। ঘেরাও ছিল না, তবু শিল্পপতিরা ঘাড় বাঁকা করেন নি।

নতুন ফসল কাটার সময় যুক্তফ্রন্ট সরকার যখন শাসন করছেন তখন পশ্চিমবঙ্গের জনগণ আশা করেছিল যে, এবার দুমুঠো জুটবে। তবু জুটলো কই? যুক্তফ্রন্টকে সরাবার ব্যবস্থা হচ্ছে দেখে, বলা হোল, এ সময় পটপরিবর্তন হলে লেভির চাল আদায় করা যাবে না, পড়াশুনার ক্ষতি হবে।

কিন্তু যুক্তির কথা কে শোনে, কেন্দ্রীয় সরকার আছেন, রাজ্যপাল আছেন, আছেন রাজনীতির ব্যস্ত মুরুব্বীগণ। চতুর্থ নির্বাচনের পর রাজ্যশাসনের প্রথমাঙ্কের হঠাৎ যবনিকা পাত। দ্বিতীয়াঙ্কে কংগ্রেস সমর্থিত পি ডি এফ, পরে পি ডি এফ ও কংগ্রেসের কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা। রাজ্যের খাদ্যাবস্থা হোল শোচনীয়, ছাঁটাই সমস্যার সমাধান, চাকরিতে নিয়োগের ব্যবস্থা প্রভৃতির কোনো সমাধান হোল না। কারণ মন্ত্রিসভা রক্ষা করাই বড় দায়। হঠাৎ যাদের গদিতে আসীন করা হয়েছিল, বাস্তবক্ষেত্রে তারা সংখ্যালঘুতে পরিণত।

কিন্তু এই যে রাজনৈতিক পটপরিবর্তনজনিত রাজ্যশাসনের চাকা স্থির হয়ে থাকল, তার দায়িত্ব পড়ল যাদের ওপর তারা বেকসুর খালাস। এবং তৃতীয়াঙ্কে এল পশ্চিমবঙ্গে নতুন ভাগ্যবিধাতা।

লেভির চাল সংগ্রহ কি পরিমাণ হবে তা রাজ্যপালের কথা থেকেই অনুমান করা যায় না কি? তিনি এখন খুব বেশি ধান চাল সংগ্রহ করার ওপর বিশ্বাস রাখতে পারছেন বলে মনে হয় না। যদিও কর্ডনিং-এর খুব কড়াকড়ি, রেশনের চাল বৃদ্ধি না পেলেও এবং অনেক দোকানে চালের বদলে খুদ দেওয়া হলেও এটাই আমরা ধরে নেবো এবার অতিরিক্ত ধান-চাল হওয়া সত্ত্বেও পশ্চিমবঙ্গের লোকজন আধপেটা থাকতে বাধ্য। ন্যায্য সময়ে যদি ধান-চাল সংগ্রহ করার পথে বিঘ্ন না ঘটতো তাহলে ধরে নিতে পারি, রেশনের চাল বৃদ্ধি করা সম্ভব হোত। এখন হয়তো কেন্দ্রের দিকে ঊর্ধ্বমুখ হয়ে চেয়ে থাকা ছাড়া আমাদের গত্যন্তর নেই।

এ সত্ত্বেও বলা যায়, পশ্চিমবঙ্গে বর্তমানে কোনো কোনো জিনিসপত্রের দর কমতির দিকে। যদি এই কমতি করার লক্ষ্য অন্তর্বর্তী নির্বাচনের মুখ চেয়ে না হয়, তাহলে সুখের কথা। তেমনি সুখের কথা হবে, এখনই যদি কারখানাগুলির বন্ধ দরজা খোলা হয়। এ সবের মধ্য দিয়ে অবস্থা আরো স্বাভাবিকই হবে।

রাজ্যপাল জনগণের মুখ চেয়ে পণ্যদ্রব্যের সর্বোচ্চ মূল্য বেঁধে দেবার যে কথা বলেছেন, তাতে কোনো সুফলই আশা করা যায় না। ঐ ব্যাপারে কার না অভিজ্ঞতা আছে? বাজারে ত' বহু জিনিসের দাম বেঁধে দেওয়া আছে, সে সব জিনিস কি বাঁধা দরে কেনা সম্ভব হয়! আর পরিবর্ত রূপে ব্যবহারোপযোগী জিনিস না থাকলে প্রয়োজনীয় জিনিস বেশি দর দিয়ে কেনা ছাড়া গত্যন্তর কোথায়? তবে লুকানো মালের হদিস কিংবা মুনাফালোভীদের শায়েস্তা করার ব্যবস্থা সরকার যদি হাতে-কলমে করতে পারেন তাহলে এমনিতেই জিনিসের বাজার দাম কমে যাবে, তখন ঢাক-ঢোল পিটিয়ে বাজার দর ঘোষণা করতে হবে বলে মনেও হয় না। রাজ্যপাল কালোবাজারীদের কি নখদন্তহীন করতে পারবেন? তাহলে তৃতীয়াঙ্ক চরম পরিণতি লাভ করবে। দর্শকরা তারই জন্যে প্রতীক্ষা করছেন।

সম্পাদকীয়

আজকের মানুষ

বোমেক-জার্জির নিস্তব্ধ দুপুরে মা যখন নিশ্চিন্তঘুমে অচেতন, বড়রা নিজ নিজ কাজে বেরিয়েছেন, তখন বালক অধর কি ঘরের মেঝের বসে পরম উৎসাহে একটার পর একটা কাগজের নৌকো তৈরি করে যায় নি? বাড়ি থেকে গ্রামের নদী তো কাছেই। তার বুক বেয়ে কত নৌকোই না পাল তুলে পাখনা মেলে তর্‌তর্‌ ছোটে! বালক অধরের মন তাই দেখে উদাসী হয়ে থাকবে। মাঝি-মাল্লারা যখন গুণ টেনে উজান ঠেলে নৌকো নিয়ে যেত, তখন অধরেরও কি ইচ্ছে হত তার ছোট্ট দুটি মুঠো দিয়ে কাঁধে গুণ তুলে নিতে, ক্লান্ত, ধনুকের মতন বাঁকা পিঠের মাঝিদের একটু সাহায্য করতে? মাঝিরা কেমন দাঁড় বেয়ে যেখানে খুশি যায়, অধরেরও কি সাধ যেত না, অমনি একখানা ডিঙি নিয়ে হেইয়ো-হো করে দেশ-দেশান্তরে ভেসে বেড়াতে?

খোকা অধরের সে বিচিত্র সাধ সেদিন হয়তো অপূর্ণই থেকে গিয়েছে, কিন্তু আজ অধর চ্যাটার্জীর অঙ্গুলি সংকেতে দেশের তাবৎ নৌযান যাবে-আসবে এবং থামবে। বরিশালের নদীর ধারে ধারে একটিবার নৌকো চড়ার এবং চালানোর জন্যে হেঁটে হেঁটে শ্রান্ত-ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল সেই অধর চ্যাটার্জী আজ ভারতের নৌবহরের সর্বাধিনায়ক। তিনি এ্যাডমিরাল। ডিঙি নৌকো, জেলে নৌকো, সাম্পান বা ভুবিমাল-বোঝাই নৌকো এখন তাঁর কাছে তুচ্ছ, তিনি সাবমেরিন, ডেস্ট্রয়ার, ক্রুজার যুদ্ধজাহাজ ইত্যাদি কুলীন নৌযানগুলির অধীশ্বর আজ।

বাবা মধুসূদন চ্যাটার্জী ছিলেন কৃতী ইঞ্জিনীয়ার। তাঁর কাজ আজ এখানে তো কাল আবার সেখানে। আজ উড়িষ্যা তো কাল বিহার। দ্বিতীয় পুত্র অধরকুমারকে তিনি সঙ্গে রাখতেন। দুঃসাহসিক অভিযানের দিকে অধরকুমারের ঝোঁকও এই দৌড়-ঝাঁপ করার ফলে বেড়ে গেল। পাটনার স্কুলে পড়লেন কিছুদিন। তারপর নেতাজী সুভাষের স্মৃতিবিজড়িত কটকের র‍্যাভেনশ' কলেজিয়েট স্কুলে। কিন্তু কেতাবী বিদ্যের দিকে অধরকুমারের আগ্রহ খুব একটা ছিল না, তবুও পড়তে হবে। পড়লেন, ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করলেন। দেশে ফিরে বরিশালের বিখ্যাত বি-এম-কলেজ থেকে আই-এস-সিও পাশ করলেন। আবার কলকাতা এসে প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্তিও হলেন। কিন্তু আর না। শুধু শুধু ডিগ্রি নিয়ে কী হবে? গতানুগতিক পথ তাঁর জন্যে তো নয়।

নতুন পথ ধরলেন তিনি, যে পথে জনতার ভিড় নেই, কিন্তু নিত্য-নতুন রোমাঞ্চের স্বাদ আছে। প্রতি পদে মৃত্যুর আশংকা, প্রতি পদে জীবন ফিরে পাওয়ার অদ্ভুত রোমাঞ্চ। নাবিকজীবন। অধরকুমার প্রতিযোগিতামূলক যোগ্যতার পরীক্ষা দিলেন, সসম্মানে উত্তীর্ণ হলেন, নির্বাচিত হলেন নৌবিদ্যায় ট্রেনিং নেবার জন্যে। ভারতীয় নৌবাহিনীতে যে বছর তিনি যোগ দিয়েছিলেন, সেটা ছিল ১৯৩০ সন। সাবমেরিন বা ডুবোজাহাজের অপার ধ্বংস-ক্ষমতা দেখে লোকে তখন বিস্মিত, বিমূঢ়। স্বভাবতই ২১ বছরের

এ্যাডমিরাল চ্যাটার্জী

তরুণ অধরকুমারের রোখ চাপল সাবমেরিনের বিরুদ্ধে লড়বার কৌশল রপ্ত করার। বৃটিশ সরকার অধরকুমারকে পাঠালেন ইংল্যাণ্ডে। এ্যান্টি-সাবমেরিন বা ডুবোজাহাজ-বিরোধী সমরনীতিতে তিনি দক্ষ হয়ে উঠলেন, পরে আরো একবার বিলেতের রাজকীয় নৌ কলেজ থেকে ১৯৪৭ সালে স্টাফ কোর্স শেষ করে দেশে ফিরলেন।

কিন্তু পাঠ সমাপ্ত করে উঁচু পদে পুরোদস্তুর কাজে নামার আগেই অধর চ্যাটার্জী সঞ্চয় করেছেন অভিজ্ঞতার মণিমুক্তা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধটা পুরোপুরি দেখার এবং বোঝার সৌভাগ্য তাঁর হয়েছিল। জার্মান নৌবাহিনীর সাবমেরিন-[illegible] যুদ্ধজাহাজ তাদের মনে ত্রাসের সঞ্চার করছিল, যখন-তখন যুদ্ধজাহাজে জাহাজে কামানের মারাত্মক লড়াই চলছিল তখন অধর চ্যাটার্জীকে কখনো দেখা গিয়েছে আতলান্তিক সাগরের বুকে, কখনো বা ভারতমহাসাগরের প্রহরার কাজে। যুদ্ধের পর তাঁর ভূমিকা ছিল রণতরীর অধিনায়কের। সে রণতরী ছিল কখনো 'কাথিয়াবাড়', কখনো বা 'চমক'।

দেশ স্বাধীন হবার ফল অধরকুমারও পেলেন। নৌবাহিনীর হেড কোয়ার্টার্সে এই আধুনিক শিক্ষাধারায় শিক্ষিত তরুণকে নৌ-পরিকল্পনার ডাইরেক্টর পদ দেওয়া হল। ১৯৫০ সনে তিনি আই-এন-এস 'দিল্লী' ফ্ল্যাগশিপের দায়িত্বভার পেলেন, পদমর্যাদায়ও তাঁর উন্নতি হল। অধরকুমার এখন থেকে ক্যাপ্টেন এ, কে, চ্যাটার্জী। তারপর আবার লণ্ডন। এবার আর জলে নয়, ডাঙায়, হাতে-কলমে কোনো নৌসংক্রান্ত কাজও ঠিক নয়, তাঁর ওপর প্রশাসনিক দায়িত্বভার পড়লো, হলেন লণ্ডনস্থ ভারতের হাই কমিশনারের নৌ-উপদেষ্টা। তিন বছর বাদে দেশে ফিরে এসে আই-এন-এস 'দিল্লী'-র কর্তৃত্বভার নিলেন আবার। সেখান থেকে বোম্বাই, উচ্চতর পদ অবশ্যই, কমোডোর-ইন-চার্জ। তারপরের পদোন্নতি ঘটল '৫৮ সনে, নৌবাহিনীর ডেপুটি চীফ বা সহ-প্রধান। পরের বছরই বহু-আকাঙ্ক্ষিত রিয়ার-এ্যাডমিরালের দুর্লভ পদ পেলেন এ, কে, চ্যাটার্জী। ১৯৬৪ সনে ন্যাশনাল ডিফেন্স কলেজের কম্যাণ্ডান্টের পদে অভিষিক্ত হলেন তিনি। আর ১৯৬৬ সনে সমগ্র নৌবাহিনীর প্রধান—চীফ অফ দি ন্যাভাল স্টাফ! সম্মান পেলেন ভাইস-এ্যাডমিরালের এবং সর্বশেষে সর্বোচ্চ পদ। এখন থেকে তাঁর পরিচয় এ্যাডমিরাল এ, কে, চ্যাটার্জী।

এ্যাডমিরালের পদগৌরব ইতিপূর্বে কোনো ভারতীয়েরই হয় নি, চ্যাটার্জী তাই অর্জন করলেন। স্থলবাহিনীর সর্বাধিনায়কের পদে ছিলেন আরেকজন বাঙালী : জেনারেল জে, এন, চৌধুরী; বিমানবাহিনীতে ছিলেন আরো একজন বঙ্গগৌরব : এয়ার-মার্শাল সুব্রত মুখার্জী। প্রতিরক্ষার অন্য স্তম্ভ নৌবাহিনীর সর্বাধিনায়কের পদ দখল করার পর বাংলাদেশ ও বাঙালীর গৌরব ও মর্যাদা যথেষ্ট বেড়ে গেল। কারণ মর্যাদা হিসেবে এ্যাডমিরালের পদ স্থল এবং বিমানবাহিনীর প্রধানেরই সমান।

কিশোর অধরের ডাগর চোখের স্বপ্ন আজ আশাতীতভাবে সফল হয়েছে, পারানি নৌকোর হাল ধরার সুযোগ যদি তাঁর সেদিন না-ও ঘটে থাকে আজ সারা ভারতের সমগ্র নৌবাহিনীর হাল তাঁরই শক্ত মুঠিতে। সে মুঠি যেমনি সবল, তেমনি নিরাপদও।

বঙ্গদর্শন

রাষ্ট্রপতির শাসন প্রবর্তিত হবার পর কয়েকটা দিন কেটে গেল। ইতিমধ্যে মধ্যবর্তী নির্বাচনের জন্য বিভিন্ন রাজনৈতিক দল তৎপর হয়ে উঠেছেন। মধ্যবর্তী নির্বাচনের তারিখ এখনো পর্যন্ত স্থির হয় নি, তবে যুক্তফ্রণ্ট দাবি করছেন যে নির্বাচন যতদূর সম্ভব শীঘ্র করতে হবে, অযথা বিলম্ব করা চলবে না। নির্বাচন যে করে অনুষ্ঠিত হবে—সে কথা এখন বলা সম্ভব নয়, আরও দু-চারদিন না গেলে তা বোঝা যাবে না। আগামী নির্বাচনে যুক্তফ্রণ্টের শরিক দলগুলি আরও কাছাকাছি আসবে বলেই মনে হয়। তার লক্ষণও দেখা যাচ্ছে। এবারে আসন নিয়ে বিশেষ কোন গোলযোগের সম্ভাবনা নেই, কেন না বিগত নির্বাচনের ফলাফলের মাধ্যমেই সেটা নির্ণয় করতে কোন অসুবিধা নেই। যুক্তফ্রণ্টের পক্ষে যেটা সর্বাগ্রে প্রয়োজন সেটা হচ্ছে সকল দলের গ্রহণযোগ্য একটি বাস্তবসম্মত কর্মসূচী। তা না হলে, এবারেও যদি যুক্তফ্রণ্ট সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়, তাহলেও কার্য রূপায়ণ নিয়ে বিভিন্ন দলের মধ্যে সংঘাত লাগতে পারে। সংবাদে প্রকাশ যে ইতিমধ্যেই যুক্তফ্রণ্ট এই সব নিয়ে চিন্তা করতে সুরু করেছেন। গতবারের নির্বাচনের সময় কংগ্রেস যে সংখ্যালঘু হবে যুক্তফ্রণ্টের শরিক দলগুলি তা অনুধাবন করতে পারে নি, কিন্তু এখন আর সে অবস্থা নেই, হাওয়া যে যুক্তফ্রণ্টের অনুকূলে সেটা সকলেই উপলব্ধি করছেন। পক্ষান্তরে কংগ্রেসের এখন শনির দশা পড়েছে। কংগ্রেসের বর্তমান নেতৃত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের লক্ষণ এখন থেকেই দেখা দিচ্ছে। দেড় বছর আগে অজয়বাবু কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে আসার পর থেকেই ওই প্রতিষ্ঠানে যে ভাঙন ধরতে সুরু করেছে সর্বশেষ আশুবাবুদের দলত্যাগের পরেও তার নিবৃত্তি ঘটবে না। যদি বর্তমান নেতৃত্ব রাজ্য কংগ্রেসের ঘাড়ে চেপে থাকে তাহলে আরও বহু লোক কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে আসবেন। তা ছাড়া যদি আগামী নির্বাচনে কংগ্রেসকে পি ডি এফের সঙ্গে নির্বাচনী আঁতাত করতে হয় সেটা কংগ্রেসের মর্যাদাবিরোধী হবে বলে অনেক কংগ্রেসী মনে করছেন। এ'দের বক্তব্য যারা নিজেদের ব্যক্তিগত লাভের আশায় একদা কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে গিয়ে বাংলা-কংগ্রেসে ঢুকেছিল, এবং সেখানে নিজেদের স্বার্থ রক্ষিত না হওয়ায় দল থেকে বেরিয়ে এসে আবার কংগ্রেসেরই হাত ধরে নিজেদের রাজনৈতিক অস্তিত্ব বজায় রাখতে চাইছে, এই সব উপাদানকে কিভাবে প্রশ্রয় দেওয়া যায়? কিন্তু কংগ্রেসের হয়েছে সাপের ছুঁচো গেলার অবস্থা। কংগ্রেসের কাছে ডঃ ঘোষ ও তাঁর দলের প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে। কিন্তু বর্তমান অবস্থাটা এমনই যে এ বোঝা ঘাড় থেকে নামাবারও কোন উপায় নেই। এ সমস্তের ফলে কংগ্রেসের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব বেড়েই চলেছে। যুক্তফ্রণ্ট এর কতটা সুযোগ নিতে পারে সেটা হয়ত নির্বাচনেই বোঝা যাবে।

কেরোসিন সংকট

সারা পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে কেরোসিন তেলের যে সংকট দেখা গেছে তা ১৯৬৬ সালের কয়েকটি মাসের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। এ বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই যে, এই সংকটের সঙ্গে উৎপাদনের কোন সম্পর্ক নেই। কেরোসিন তেলের ক্ষেত্রে আর যাই হোক খরা বন্যার অজুহাত টেকে না। এই অভাব সম্পূর্ণ কৃত্রিম। এবং এর মূলে আছে কতিপয় বৃহৎ ব্যবসায়ীর চক্রান্ত। একথা স্মরণে রাখতে হবে যে, ১৯৬৬ সালের আগে কেরোসিনের যা দাম ছিল, ১৯৬৬-র কৃত্রিম অভাব সৃষ্টির পর তার দাম দ্বিগুণ হয়েছে, আবার দু' বছর পর ১৯৬৮-তে নতুন করে কৃত্রিম অভাব সৃষ্টির দ্বারা আরও এক দফা দাম চড়ানো হবে। দুঃখের বিষয় সরকারী তরফ থেকে এই অপচেষ্টার বিরুদ্ধে কোন কিছুই কার্যকর ব্যবস্থা অবলম্বিত হয় নি। পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসীদের শতকরা আশি ভাগই কেরোসিন নির্ভর। এদিকে তৈলাভাবে রাত্রে ঘরে আলো জ্বলছে না, ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনা বন্ধ; সামনে ইস্কুল ফাইনাল, হায়ার সেকেণ্ডারী পরীক্ষা, আজ আলোর অভাবে গ্রাম ও মফস্বলের ছেলেমেয়েদের রাত্রের পড়াশোনা বন্ধ। বিগত পি ডি এফ সরকার এই সমস্যার দিকে বিন্দুমাত্র দৃষ্টি দেবার অবকাশ পায় নি। গদি রক্ষার জন্য বিরানব্বই দিন চব্বিশ ঘণ্টা ব্যস্ত ছিল এবং সেই ব্যর্থতার সুযোগ অতিমুনাফালোভী ব্যবসায়ীরা বড় বড় তৈলপ্রতিষ্ঠানগুলি সহজেই নিয়েছে। মজা হচ্ছে কি বাজার থেকে কখনো পেট্রল অদৃশ্য হয় না কেন না সেটা বন্ধ হলে উচ্চবিত্ত সমাজেরই অসুবিধা বেশি। দরিদ্রের ব্যবহার্য পণ্যের উপরই মুনাফাখোরদের নজরটা বেশি।

কেন্দ্রীয় বাজেট

কেন্দ্রীয় বাজেটের সর্বাধিক প্রতিক্রিয়া বোধ হয় পশ্চিমবঙ্গের উপরেই হয় কেন না ভারতীয় অর্থনীতির অনেকটা অংশই পশ্চিমবঙ্গের উপর নির্ভরশীল। যদিও বর্তমান সংখ্যার অন্যত্র বাজেট সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা আছে তথাপি আমরা মোটের উপর পশ্চিমবঙ্গের নিম্ন আয়সম্পন্ন অধিবাসীদের প্রতিক্রিয়ার কথা, সাধারণ খুচরো বাজারের কথা এখানে

কিছুটা উল্লেখ করব। সংবাদপত্রে কলকাতা শেয়ার মার্কেটের মানসিক প্রতিক্রিয়ার ছবি প্রকাশিত হয়েছে, কিন্তু সে প্রতিক্রিয়া তো পশ্চিমবঙ্গের জনমানসের ছবি নয়। অর্থনৈতিক পর্যবেক্ষকগণ দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করেছেন যে, এই বাজেটে ধনিকশ্রেণীকে প্রভূত সুবিধা দেওয়া হয়েছে, এবং পরোক্ষ করের তামাম বোঝাটাই চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে দরিদ্রের ঘাড়ে। ভারতীয় শিল্পপতিদের মুখপাত্রগণের তারস্বরে বাজেটের গুণাবলীর বন্দনা এবং মোরারজীকে সাহসী পুরুষ খেতাবদানের মধ্যে স্পষ্টই প্রমাণিত হলো যে, এ বাজেট উপরতলার মানুষদের প্রভূত সুবিধা দিয়েছে। বস্তুত ভারতীয় অর্থনীতি ও কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব প্রতিনিয়ত দক্ষিণপন্থী হয়ে উঠছে এবং তারই ফলে শিল্পপতির সুযোগ-সুবিধার পরিসর যত বেশি বৃদ্ধি পাচ্ছে দরিদ্রের ঘাড়ে করের বোঝা ততই বাড়ছে। ডাক ও তার বিভাগের মাশুল যেভাবে চড়ানো হয়েছে তার পিছনে কোনরকম সুস্থ চিন্তা ও নৈতিকতার চিহ্ন নেই; পোস্টকার্ডের দাম ছয় পয়সার জায়গায় দশ পয়সা, অর্থাৎ শতকরা ৮০ ভাগ মূল্যবৃদ্ধি। নিত্যব্যবহার্য সাধারণ সামগ্রীগুলির উপর যে আন্দাজ কর বসেছে তা যে কোন মানুষেরই সহ্যের সীমার বাইরে। বাজেটের ক'দিন আগে থেকেই কয়েকটি নিত্য-প্রয়োজনীয় বস্তু বাজার থেকে উধাও হয়ে গেছল এই আশায় যে যদি সেগুলির উপর কর বসে তাহলে সেগুলি অতিরিক্ত মুনাফা দেবে। বাঙালীর জীবনে ইতিমধ্যেই নাভিশ্বাস দেখা গেছে। সার্বিক মূল্যবৃদ্ধি রোধ হয় নি, মূল্যমান কমে নি, বেতন বাড়ে নি, কারখানায় লক আউট, এই সেদিন রেশনের চাল-গমের দাম ডঃ প্রফুল্ল ঘোষ দেড়া করে দিয়ে প্রতিটি পরিবারের বাজেটে ৩০-৪০ টাকা বাড়িয়ে দিলেন, রেশনের চিনির বরাদ্দ কমিয়ে দিয়ে বাইরে থেকে বেশি দামে তা' কিনতে মানুষকে বাধ্য করা হল, এই সেদিন রেলের ভাড়া বাড়ল, রাষ্ট্রীয় পরিবহন ভাড়া বাড়াবার পাঁয়তারা ভাঁজছে, ইতিমধ্যে পেট্রোলের উপর ট্যাক্স ধার্য হওয়ায় তাদের যুক্তি আরো জোরদার হবে, দেখাদেখি অপরাপর পরিবহন প্রতিষ্ঠানগুলিও ভাড়া বাড়াবে, তদুপরি রয়েছে এই বাজেটের ধাক্কা। এইভাবে এই হতভাগ্য দেশটাকে শাসকেরা কোথায় টেনে নামাচ্ছেন?

পূর্ব রেলওয়ে কর্তৃপক্ষের উদ্দেশ্যে

রেলপথের নতুন টাইমটেবল প্রণয়নের সময় উপস্থিত হয়েছে দেখে পূর্ব রেলওয়ে কর্তৃপক্ষের নিকট আমরা অনুরোধ করছি যে শিয়ালদহ ডিভিশনের হতভাগ্য রেলযাত্রীদের জন্য তাঁরা অন্তত এবার কিছু করুন। এই বিভাগটি দীর্ঘকাল ধরেই উপেক্ষিত এবং যাত্রীর তুলনায় গাড়ির সংখ্যা অত্যন্ত কম। সেই কারণেই অত্যন্ত ভিড়, নিরত অশান্তি এই লাইনে লেগেই আছে। লোকাল ট্রেনের যাত্রীদের যদি প্রতিনিয়ত বাদুড়ঝোলা হয়ে রাণাঘাট শান্তিপুর পর্যন্ত যেতে হয় তার চেয়ে দুরবস্থার কথা আর কল্পনা করা যায় না। একটি উদাহরণ দিলেই বিষয়টির গুরুত্ব বোঝা যাবে। মেন লাইনের কথাই ধরা যাক। তিনটে ২১ মিনিটে একটি গাড়ি ছাড়ে, তার পরবর্তী লোকাল গাড়ি চারটে ২৫ মিনিটে। এই এক ঘণ্টার অবসরে শিয়ালদহ স্টেশন থেকেই শেষোক্ত গাড়িটিতে তিলধারণের স্থান থাকে না, এবং এই গাড়িটি ছাড়ার পর পরবর্তী স্টেশনগুলি থেকে যাত্রীদের এই গাড়িতে ওঠা একেবারে অসম্ভব। পরবর্তী গাড়ি ছাড়ছে চারটে ৪৫ মিনিটে, সে গাড়িতেও শিয়ালদহ থেকে এত ভিড় হয় যে মাঝপথের যাত্রীদের পক্ষে গাড়িতে উঠতে পারা সম্ভবপর হয় না। শিয়ালদহ বিভাগের ডেলি প্যাসেঞ্জারের সংখ্যা হাওড়া বিভাগের চেয়েও বোধ হয় বেশি, অথচ তাঁদের সুখসুবিধার দিকে বিন্দুমাত্র নজর দেওয়া হয় না। এই মুহূর্তেই কয়েকটি লোকাল ট্রেন বাড়ানো দরকার, আর তা যদি একান্তই সম্ভব না হয় তাহলে ব্যারাকপুর লোকালগুলিকে নৈহাটি পর্যন্ত, নৈহাটি লোকালগুলিকে কল্যাণী পর্যন্ত, কল্যাণী লোকালগুলিকে রাণাঘাট পর্যন্ত এবং রাণাঘাট লোকালগুলিকে শান্তিপুর ও কৃষ্ণনগর পর্যন্ত বর্ধিত করা হোক।

হুগলী :

হুগলী-চুঁচুড়া মিউনিসিপ্যালিটি

কোন প্রতিষ্ঠানের অকর্মণ্যতার জন্য যদি কোন পুরস্কার প্রতিযোগিতার আয়োজন করা যায়, তাহলে সম্ভবত এই প্রতিষ্ঠানটি প্রথম পুরস্কার লাভ করবে। বয়সের ভারে প্রাচীন এই দুর্নীতিগ্রস্ত প্রতিষ্ঠানটি কয়েকজন ব্যক্তির ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে পরিণত হয়েছে। বোধ হয় দল ভাঙাভাঙি রাজনীতির শিক্ষা এই প্রতিষ্ঠানটির কাছ থেকেই উপরতলার রাজনীতিকরা গ্রহণ করেছিলেন। পৌরসভার বিগত নির্বাচনের পর থেকেই এখানে দল ভাঙাভাঙির খেলা অব্যাহত ধারায় চলছে, ফলে প্রতিনিয়তই মিউনিসিপ্যাল বোর্ডের চেহারার রদবদল হচ্ছে। কখন কে যে চেয়ারম্যান থাকেন সেটাই বুঝে উঠতে পারা যায় না, বলতে গেলে এক মাস অন্তর অন্তর চেয়ারম্যান পাল্টায়। এ-হেন অবস্থায় গত কয়েক বছর ধরে এই পৌরসভার যাবতীয় কাজকর্ম শিকেয় উঠে রয়েছে। পৌরসভার স্থায়ী কর্মচারীরাই সব এবং পৌরসভাটি তাদের একটি মধুচক্র। মাসিক বেতন নেওয়া এবং নরক গুলজার করা ছাড়া তাদের আর কোন কাজকর্ম নেই। আপনি কোন কাজে মিউনিসিপ্যালিটিতে যান, হেড ক্লার্ক মোলায়েম হাসি হেসে বলবে, আজ্ঞে এখন তো ওভারসিয়ার নেই—তিনি না আসা পর্যন্ত তো কিছু হতে পারে না। আপনি অনেক সন্ধানে ওভারসিয়ার কখন আসেন জেনে তাঁর সংগে দেখা করলেন। তিনিও মোলায়েম হেসে বললেন, এখন তো হেড ক্লার্ক নেই, আপনার কাজ কিভাবে হবে বলুন? এবং এমনই বিধান তাঁরা গড়ে তুলেছেন যে, ওই দুজনের কোনদিন সাক্ষাৎ হবে না, এবং আপনার কাজও সিদ্ধ হবে না। তবে হতে পারে যদি আপনি কিছু ব্যয় করতে রাজী থাকেন। যেহেতু মিউনিসিপ্যালিটির পরিচালকমণ্ডলী অনিশ্চিত, কখন কারা বোর্ডে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করবে তাই নিয়েই পৌরসভার সদস্যরা প্রমত্ত, তখন অধস্তন স্থায়ী কর্মচারীদের পোয়া বারো। তাদের নামে আপনি চেয়ারম্যানের কাছে অভিযোগ করলেন, চেয়ারম্যান হয়ত আপনাকে আশ্বাস দিলেন যে, তিনি তদন্ত করবেন, পরদিন গিয়ে শুনলেন তিনি নেই—অন্য লোক চেয়ারম্যান হয়ে গেছেন। এখন রাষ্ট্রপতির শাসন চালু হয়েছে, এই কারণেই বলছি যে, বর্তমান বোর্ড বাতিল করে দিয়ে এখানে কিছুকালের জন্য একজন অ্যাডমিনিস্ট্রেটর নিযুক্ত করা হোক। এই মিউনিসিপ্যালিটির কর্মদক্ষতার একটি নিদর্শন দিই। শহরের ১৯ নং ওয়ার্ডের একটি রাস্তার উপর বছর দুয়েক আগে মিউনিসিপ্যালিটি একটি জলের কল বসিয়েছেন। যেখানে প্রয়োজন সেখানে না বসিয়ে একজন বিশেষ ব্যক্তিকে অনুগৃহীত করার জন্যই নাকি এই ব্যবস্থা। কল বসানো হয়েছে কিন্তু জল নিকাশের কোন নর্দমা সেখানে নেই। তাতে কিছু আসে যায় না, কেন না ওই বিশেষ ব্যক্তিটি নাকি একটি বাগান করেছেন, এবং কলের জল তাঁর বাগানে যাবে। কিন্তু ক'দিন পরেই সেই বাগানে জলের প্রয়োজন ফুরিয়ে গেল এবং তিনিও বাগানের নালাটি বুজিয়ে দিলেন। এর পর জল রাস্তাকে প্লাবিত করতে আরম্ভ করল। কাঁচা রাস্তায় এক হাঁটু জল জমল, ওই রাস্তার সংগে অপরিচিত বহু লোক রাত্রে পা পিছলে পড়ে হাত-পা ভাঙলেন।

শক্তি ও উৎসাহের জন্য—বোর্নভিটা !

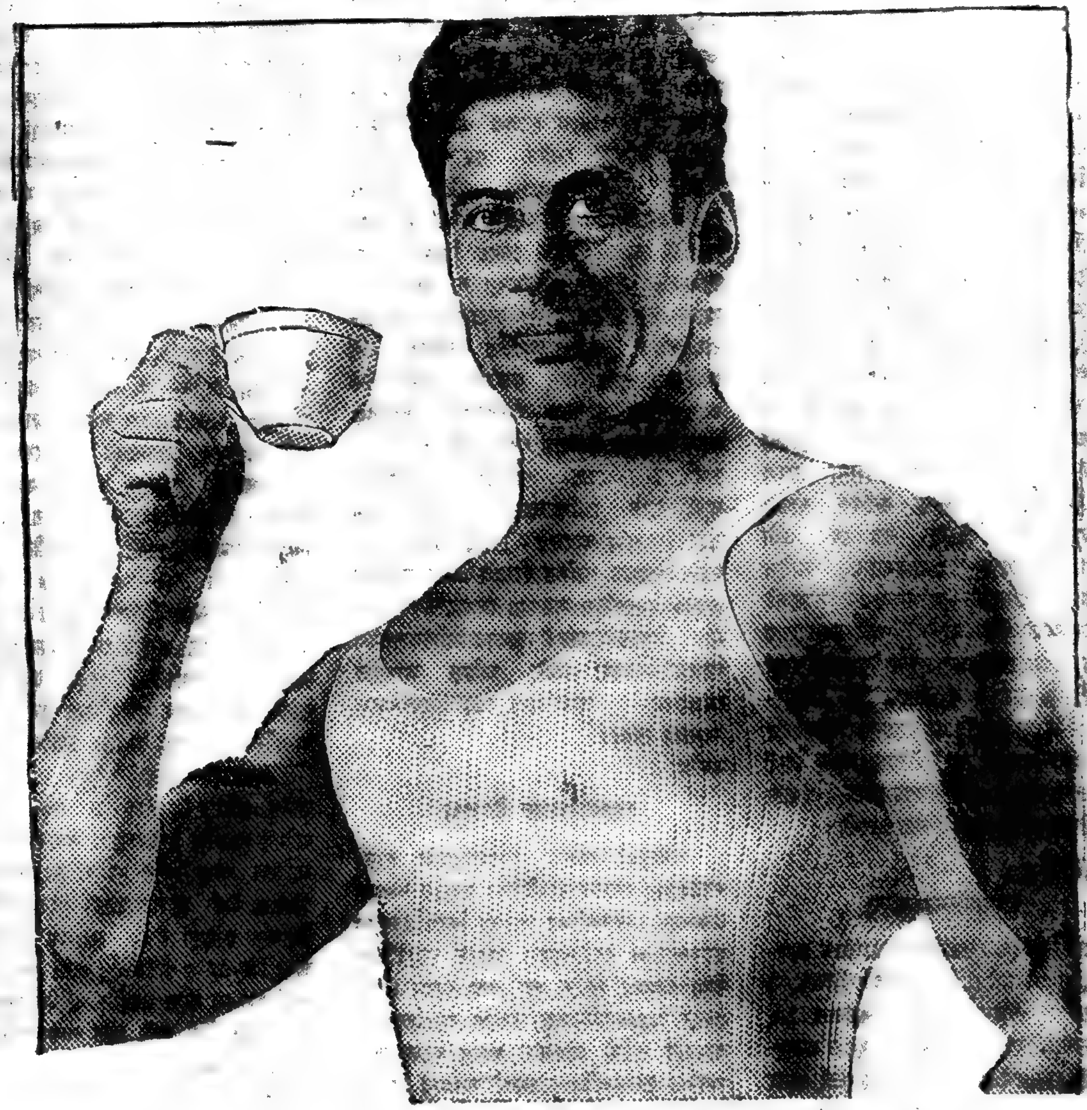

বোর্নভিটার স্বাদ অতুলনীয়...
ওর রহস্য হচ্ছে—কোকো !

কোকো, দুধ, চিনি, ও মল্ট বিধিসম্মতভাবে মেশাবার ফলে—অতি শক্তিবর্দ্ধক পানীয় বোর্নভিটা ! বোর্নভিটা গরম দুধে মিশিয়ে নেবেন—এই সুস্বাদু পানীয় থেকে শক্তি ও উৎসাহ পাবেন।

শক্তি, উৎসাহ ও স্বাদের জন্যে
ক্যাডবেরিস বোর্নভিটা

2296AII-Ben

গত দু' বছর ধরে ওই অঞ্চলের অধিবাসীরা মিউনিসিপ্যালিটির নিকট আকুল আবেদন করলেন একটা ব্যবস্থা করার জন্য, কিন্তু মিউনিসিপ্যালিটি নির্বিকার। শেষ পর্যন্ত ওই অঞ্চলের কয়েকজন উৎসাহী ব্যক্তি নিজেদের খরচায় একটি পাকা ড্রেন নিজেরাই তৈরি করে নিতে মনস্থ করলেন, এবং অনুমতির জন্য মিউনিসিপ্যালিটির নিকট আবেদন করলেন। গত ১২ই ডিসেম্বর তারিখে অনুমতি পাওয়া গেল। চেয়ারম্যানের স্বাক্ষরিত অনুমতিপত্র। এঁরা কাজ আরম্ভ করতে গিয়ে দেখলেন যে, মিউনিসিপ্যালিটি আবার তাদের মত বদলে ফেলেছে। চেয়ারম্যান সাহেব মুখে জানালেন যে, সেই অর্ডার বাতিল হয়ে গেছে, কিন্তু কেন হল তার কারণ দর্শাতে পারলেন না। ওয়ার্ড কমিশনার যিনি স্বয়ং অনুমতিপত্র রেকমেন্ড করেছিলেন, তিনিও হঠাৎ মত পরিবর্তনের কারণটা বলতে পারলেন না। পরে জানা গেল যে, মিউনিসিপ্যালিটির জনৈক ধাওড় খাটানেওয়ালার ইচ্ছে নয় যে এটা হোক। আসলে চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান, ওয়ার্ড কমিশনার সকলেই যখন কার্যত ওই ধাওড় খাটানেওয়ালার অধীন তখন সেই মহাপ্রভুর ইচ্ছার মর্যাদা অবশ্যই রাখতে হবে, তাতে যদি চেয়ারম্যানকে নিজের লিখিত আদেশ নিজেকেই অস্বীকার করতে হয়, উপায় আর কি? করদাতারা গোল্লায় যাক বয়ে গেছে। এ তো শত উদাহরণের মধ্যে মাত্র একটা।

জলপাইগুড়ি :

চা-বাগানের ঘটনা

গত ২৭শে ফেব্রুয়ারী তারিখে জলপাইগুড়ি জেলার ধূপগুড়িতে কাঁটালগুড়ি টি এস্টেটে শ্রমিকদের উপর পুলিশ ১২ রাউন্ড গুলীবর্ষণ করেছে যার ফলে ঘটনাস্থলেই তিনজন শ্রমিকের মৃত্যু ঘটে, এবং আরও চারজনের অবস্থা সংকটজনক। ঘটনাটির কোন বিস্তৃত বিবরণ দেবার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না। তবে ঘটনাটি একটি সত্যকে বেশ স্পষ্ট করেই চিনিয়ে দিতে সাহায্য করছে। আমরা একটা কথা এই বঙ্গদর্শনেই বারবার বলে এসেছি, এ-দেশে চিরকালই শ্রমবিরোধের ক্ষেত্রে পুলিশ মালিকপক্ষের লোক হিসাবে কাজ করেছে। গত বিশ বছরে মালিকশ্রেণীর স্বার্থে পুলিশ ব্যবহারের, মালিকপক্ষের নির্দেশে শ্রমিকদের উপর পুলিশের গুলীবর্ষণের প্রভূত নিদর্শন পাওয়া গেছে, বর্তমান ঘটনা আর একটি বাড়তি সংযোজন মাত্র। পাঠকদের নিশ্চয়ই একথা স্মরণ আছে, বিগত যুক্তফ্রন্ট সরকার শ্রমবিরোধের ক্ষেত্রে পুলিশকে মালিকপক্ষের ভাড়াটে লোক হিসেবে কাজ থেকে বিরত হবার জন্য নির্দেশনামা জারী করেছিলেন। এবং এই ঘোষণাতেই শিল্পপতিমহলে দারুণ বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছিল। সরকার না কি শ্রমিকদের কারখানার ল এন্ড অর্ডার ভাঙতে প্ররোচিত করছেন। অথচ মালিকপক্ষের প্ররোচনায় পুলিশ শ্রমিকদের পেটালে, গুলী চালালে কোন অন্যায় হয় না! বোধ হয় একেই গণতন্ত্র বলে। কাজেই জলপাইগুড়ির ঘটনাটি অত্যন্ত দুঃখজনক হলেও এতে বিস্মিত হবার কিছুই নেই। বহুশত শ্রমিক হত্যার ঘটনার সঙ্গে এটাও একটা সংযোজন মাত্র। আইন যখন মালিকশ্রেণীর স্বার্থেই সে ক্ষেত্রে কিছুই করা সম্ভবপর নয়। আমাদের যা কিছু শ্রম আইন তা কেবল শ্রমিক কল্যাণের নাম-কা-ওয়াস্তে। মালিকপক্ষের স্বার্থে সে আইনের শত ছিদ্র বর্তমান, এমন কি আদালতের রায়কে অস্বীকার করলেও মালিকপক্ষের কেশাগ্র স্পর্শ করা যাবে না। শ্রম আদালতের রায়কে মালিকপক্ষ বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়েছেন এই রকম বহু নিদর্শন আছে। কিন্তু তার জন্য মালিকপক্ষের শাস্তি হয়েছে এমন বোধহয় একটি নিদর্শনও সরকার দেখাতে পারবেন না। বিগত যুক্তফ্রন্ট সরকার মালিকপক্ষের স্বার্থে সামান্য একটু আঁচড় লাগাতে গেছলেন। তার ফল তো হাতে-নাতে পাওয়া গেল।

নদীয়া :

স্বাস্থ্যদপ্তরের উদ্দেশ্য

কল্যাণী নেহরু মেমোরিয়াল হাসপাতালের অনেক দুর্নীতির সংবাদ আমরা একসময় বঙ্গদর্শনের পাতায় লিখেছিলাম। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের অজস্র দুর্নীতির কথা আমরা প্রমাণ সহ এবং কোন কোন ক্ষেত্রে আলোকচিত্রসহ প্রকাশ করেছিলাম। বারবার দৃষ্টি আকর্ষণ করার ফলে শেষ পর্যন্ত তৎকালীন যুক্তফ্রন্ট সরকার বিষয়টির উপর দৃষ্টিপাত করেন এবং তৎকালীন স্বাস্থ্যমন্ত্রী শ্রীননী ভট্টাচার্য গত ২৪।১০।৬৭ তারিখে আমাদের এক পত্রে জানান যে, তিনি এ বিষয়ে তদন্তের আদেশ দিয়েছেন, এবং তার ফলাফলের কথাও যথাসময়ে জানাবেন। ইতিমধ্যে আমরা বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হয়েছিলাম যে, তদন্তের কাজ মোটামুটি চলছে এবং ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষসহ বেশ কয়েকজন কর্মচারীকে অন্যত্র বদলির আদেশ দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু আশ্চর্যজনকভাবে দেখা গেল পি ডি এফ সরকারের আমলে সমগ্র আদেশটারই রদবদল করা হল। এবং যাদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ ছিল তাদের বহাল তবিয়তেই রেখে দেওয়া হল এবং যাঁরা সংশ্লিষ্ট দুর্নীতিপরায়ণ কর্মচারীদের সঙ্গে সহযোগিতা করেন নি তাঁদের মধ্যে একজনকে বদলি করা হল। সুন্দর ব্যবস্থাই বটে। এ যেন এক সরকারের আমলে পুলিশ চোর ধরল, অপর সরকারের আমলে সেই চোরকে খালাস করে পুলিশকেই জেলে পোরা হল। স্বাস্থ্যদপ্তরের ভারপ্রাপ্ত সচিব মহাশয় কি বিষয়টি আর একবার তদন্ত করবেন? রাষ্ট্রপতির শাসনের আমলে এখন তো কোন পক্ষ থেকে তাঁর উপর চাপ পড়ার সম্ভাবনা নেই। এই কারণেই আমরা তা পুনর্বার নিবেদন করছি। আমরা এ বিষয়ে যে সকল তথ্য ইতিপূর্বে বঙ্গদর্শনে প্রকাশ করেছিলাম সেগুলি নিশ্চয়ই তাঁর দপ্তরে আছে।

কৃষ্ণনগর থেকে এক ভদ্রলোক দক্ষিণপাড়া প্রাথমিক হেলথ সেণ্টারের অনেকগুলি দুর্নীতির তথ্য দিয়েছেন যেগুলি আমরা স্বাস্থ্যবিভাগের সচিবের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য পেশ করছি। গত ১৯৬৭ সালের জানুয়ারীতে ওই হেলথ সেণ্টারের বিরুদ্ধে একটি গণদরখাস্ত পড়লে গত ২৮।৩।৬৭ তারিখে বিভাগীয় তদন্ত হয় এবং ডঃ কিশোরীমোহন সরকারকে বদলীর নির্দেশ দেওয়া হয়। গত ৪।১।৬৮ তারিখে ডিরেক্টরেট থেকে নির্দেশ পেয়ে ডঃ এ কে রায় ডঃ সরকারের কাছ থেকে হাসপাতালের চার্জ নিতে আসেন, কিন্তু ডঃ সরকার তাঁকে চার্জ দিতে অস্বীকার করেন। সেই অস্বীকৃতির জের আজও চলছে।

এখানেও নাকি অদৃশ্য রাজনীতির খেলা রয়েছে। পি ডি এফ সরকারের জনৈক মন্ত্রীর হস্তক্ষেপে সমুদয় রিপোর্ট বাতিল করে দিয়ে নাকি ডঃ সরকারকে আবার উক্ত হাসপাতালে বহাল থাকবার নির্দেশ দেওয়া হয়। হেলথ ডিরেক্টরেট তথা সি-এম-ও-এইচ-এর ট্রান্সফার অর্ডারে কর্ণপাত না করে মন্ত্রীর খুঁটির জোরে যা ইচ্ছা তাই কি করে করা যায় আমরা তা ভেবে পাচ্ছি না।

বর্তমানে ওই হাসপাতালের যন্ত্রপাতিগুলি ব্যবহার করা হয় না, পরিবার-নিয়ন্ত্রণের কাজ বন্ধ, ইস্কুল হাইজিন বিভাগের কাজকর্ম নেই অধিকাংশ প্রসূতিকে সদরে পাঠানো হয়, হাসপাতালের ক্ষেত্রজাত সামগ্রী বিক্রয়ের টাকা সরকারী ট্রেজারীতে জমা পড়ে না। সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা, গত ৩।১।৬৮ তারিখে সি-এম-ও-এইচ হাসপাতালের স্টোর ভিজিট করতে চাইলে তাঁকে নাকি অপমান করা হয়। এই স্বেচ্ছাচারিতা কেন, তার উৎস কি, সংশ্লিষ্ট দুর্নীতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের শাস্তি হয় না কেন, কিসের জোরে সরকারী নির্দেশনামাকে অস্বীকার করা হয়—এই প্রশ্নগুলির জবাব চাইবার অধিকার নিশ্চয়ই জনসাধারণের আছে।

সপ্তাহের বোঝা

কৃত্তিবাস ওঝা

"কড়ি দিয়ে কিনলাম,
দড়ি দিয়ে বাঁধলাম,
হাতে দিলাম মাকু
ভ্যাঁ করতো বাপু।"

পশ্চিমবংগ কংগ্রেসের বিদ্রোহী আর ঝাঁঝালো গোষ্ঠীর শেষ পরিণতি হল "ভ্যাঁ" করা। কড়ি আর দড়ির বশে বিদ্রোহীদের সকল তর্জন-গর্জন হাতে মাকু নিয়ে ভ্যাঁ করাতেই শেষ হয়। কিন্তু এবার নতুন এক ঝাঁঝালো গোষ্ঠী মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছেন, যাঁদের সম্পর্কে গত সপ্তাহকাল সংবাদপত্রে কিছু কিছু টুকরো খবর বেরিয়েছে। বেশ কিছুদিনের প্রস্তুতি নিয়ে এই ঝাঁঝালো গোষ্ঠী আগামী ১১ই মার্চ ময়দানে নামবেন বলে কর্মসূচী স্থির করেছেন। এই গোষ্ঠী সম্পর্কে যতটুকু খবর প্রকাশিত হয়েছে তাতে মনে হচ্ছে গোষ্ঠীটি বেশ বাড়ন্ত আর এ'দের দৃষ্টি-ভঙ্গী বেশ কিছুটা সুদূরপ্রসারী। হয়তো কংগ্রেসের আভ্যন্তরীণ অন্য সব সংগ্রামের মত এ'দের সংগ্রাম শুধু স্কন্ধকাটা শহীদ হবার সংগ্রামে শেষ হবে না, অনেকগুলো পোড়-খাওয়া মানুষ এবারকার সংগ্রামে কিছু নতুনত্বের বার্তা বহন করে আনছেন বলে অনুমান করা যায়। প্রথম কথা এই সংগ্রামের কোন একজন নেতা নেই—ফলে নেতৃত্ব নিয়েছে একটা কালেকটিভ লীডার-শীপ। দ্বিতীয় কথা এ'দের দাবির মধ্যে কোন বড় কথা নেই, আছে সহজ ও সরল-ভাবে কংগ্রেসকে শক্তিশালী ও শোধন করবার কথা। এই গোষ্ঠী কারো মুণ্ডু কেটে নিতে চান না, কারো বিরুদ্ধে কোন দুর্নীতির অভিযোগ এনে আসর জমাতে চান না, কাউকে হটিয়ে কাউকে ক্ষমতার বসাতে চান না। সব মিলিয়ে এ'দের এ্যাপ্রোচের মধ্যে একটা অভিনবত্ব আছে বলা যায়। তবে প্রশ্ন হতে পারে, কংগ্রেসের কোনো গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে কোনো এক গোষ্ঠীর সংগ্রাম সে-তো আবহমান কাল থেকে চলে আসছে। স্বাধীনতার পূর্বকালের কথা বাদ দিলে হাল আমলেও শ্রীঅজয় মুখার্জীর সংগ্রাম দেখা গেল, শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেনের নেতৃত্বে এ্যাডহক-পন্থীদের সংগ্রাম দেখা গেল আবার শ্রীআশুতোষ ঘোষের সংগ্রামও দেখা গেল। যদি ধরে নেওয়া যায় এই সংগ্রাম ছিল শ্রীঅতুল্য ঘোষের ক্ষমতা খর্বের সংগ্রাম—তবে বুঝতে হবে সেই সংগ্রামে এক ইঞ্চি জয়লাভ কারো হয় নি। শ্রীঅতুল্য ঘোষ বা তাঁর দখলের কংগ্রেস যেখানে ছিল সেখানে আছে। বরং যাঁরা তাঁর বিরুদ্ধে সংগ্রামে নেমেছিলেন, তাঁরাই এখন তাঁর সব চেয়ে বড় সমর্থক। অধ্যাপক প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র পশ্চিমবাংলার কংগ্রেসের সোস্যালিস্ট ফোরাম বলুন, ঝাঁঝালো গোষ্ঠী বলুন আর শ্রীঅতুল্য ঘোষের বিরোধী বলুন—সব কিছুরই প্রথম সারির নেতা ছিলেন। কিন্তু আজ শ্রীঅতুল্য ঘোষের সবচেয়ে বড় সমর্থক বলতে যদি কাউকে বোঝায় তবে তিনি হলেন অধ্যাপক প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র। শ্রীসিদ্ধার্থশঙ্কর রায়—তাঁর ওপরেও অনেকে অনেক আশা রেখেছিলেন—কিন্তু তিনিই তো এখন শ্রীঅতুল্য ঘোষের সর্বশেষ আইন উপদেষ্টা। শ্রীপ্রফুল্ল-চন্দ্র সেন—গত নির্বাচনের পর অনেক খেলা দেখিয়েছিলেন, প্রকৃতপক্ষে শ্রীসেনকে নেতৃত্বে বরণ করে কংগ্রেসের গোষ্ঠীতন্ত্র উচ্ছেদকামীরা অনেক দূর এগিয়ে গেছিলেন; কিন্তু শ্রীসেনের বিরুদ্ধে তাঁর অনুগামীদের অভিযোগ—শ্রীপ্রফুল্ল-চন্দ্র সেনের আর যে গুণই থাকুক, শেষ রক্ষা করার মত সাহস নেই।

নতুন সংগ্রামীদের কথা হল আর কোনো একজনকে সামনে রেখে বা একজনের মেরুদণ্ডের ওপর নির্ভর করে এগোনো চলবে না। অনেকগুলি মাথা আর অনেক-গুলি মেরুদণ্ড এক সংগে করে এগুতে হবে। এই দলে যাঁরা আছেন তার মধ্যে খুব বড়দরের নেতা কেউ অবশ্য নন, তবে জেলা ভিত্তিতে এই ব্যক্তিদের প্রভাব-প্রতিপত্তি অনস্বীকার্য। উত্তর কলকাতায় আছেন শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দে, শ্রীসুশীল পাল। শ্রীগোবিন্দ দে একটি উজ্জ্বল তারকা সন্দেহ নেই। কলকাতা কর্পোরেশনের মেয়র বলেই নয়, নেতৃত্ব দেবার অনেকগুলি গুণেই শ্রীদের আছে। কম কথা বলা মানুষ শ্রীদে সহজ কথা সহজভাবে বোঝেন আর বোঝাতেও পারেন। সেই সংগে আছে বিদ্যা ও পয়সা। শ্রীদে ইতিমধ্যে অনেক দূর এগিয়ে গেছেন। রাজ্যে কংগ্রেসকে সমচিন্তার দলসমূহের সংগে আঁতাত করতে হবে এই থিওরীর জনক শ্রীদে, পরে অবশ্য অধ্যাপক প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র এই থিওরী প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করতে তৎপর হয়েছেন। শ্রীদে বিগত দিনে শ্রীআশুতোষ ঘোষ, শ্রীশঙ্করদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীকাজেম আলি মির্জার সংগে অনেক মেলামেশা করেছেন—এমন কি শ্রীআশু-তোষ ঘোষকে সংগে করে রাজ্যপালের সংগে দেখাও করেছিলেন। এই গোষ্ঠীর অপর শক্তিশালী নেতা শ্রীকৃষ্ণকুমার শুক্লা। শ্রীশুক্লা শক্তিশালী বক্তা এবং দীর্ঘকাল ধরে বিধানসভার সদস্য ছিলেন। বাংলা, হিন্দি ও ইংরেজীতে যে কোন বিষয়ে ভাল বলতে পারেন এমন বক্তা শ্রীশুক্লা ছাড়া বিধানসভায় কংগ্রেস দলের খুব কম সদস্য ছিলেন। কিন্তু শ্রীশুক্লার এমনি দুর্ভাগ্য যে, যখন রাজ্যে এক সময় ৩০ জন মন্ত্রী গ্রহণ করা হয়েছিল, তখনও শ্রীশুক্লার ভাগ্যে শিকা ছেঁড়ে নি। শ্রীশুক্লা অবশ্য একবার মন্ত্রিত্বের জন্য কংগ্রেস ভবনে অনশন করতে উদ্যোগী হয়েছিলেন। সম্প্রতি আবার বিধানসভার সদস্যপদ ত্যাগ করার অনুমতি চেয়ে প্রদেশ কংগ্রেসের

কাছে এক চরমপত্র দিয়েছিলেন, কিন্তু বিধানসভা বাতিল হওয়ায় শ্রীশুক্লা আর বিধানসভার সদস্যপদ ত্যাগের সুযোগ পান নি। সম্প্রতি কংগ্রেসের এক সভায় শ্রীঅতুল্য ঘোষের চোখে জল এনেছিলেন শ্রীশুক্লা। শ্রীশুক্লার সঙ্গে শ্রীগোবিন্দ দের একটা মৌলিক তফাৎ কিন্তু আছে। শ্রীশুক্লা জানেন টিটাগড় কেন্দ্রে পায়ে ধরে হলেও কংগ্রেসের তাঁকে মনোনয়ন দিতে হবে এবং তিনি ছাড়া উক্ত কেন্দ্রে কংগ্রেস-প্রার্থীরূপে জয়যুক্ত হবার অন্য কেউ নেই। শ্রীগোবিন্দ দে জানেন, তাঁর শ্যামপুকুর কেন্দ্রে তিনি নিতান্ত ভাগ্য জোরে জয়যুক্ত হয়েছিলেন শ্রীঅমর বসুকে পরাজিত করে, তবে ভবিষ্যৎ নির্বাচনে মনোনয়ন পাবেন কি না সেটাও যেমন জানা নেই, আবার মনোনয়ন পেলে জয়যুক্ত হবেন কি না সেটাও স্থিরনিশ্চয় নয়। কিন্তু শ্রীদে যদি কংগ্রেসের মধ্যে শ্রীঅতুল্য ঘোষ-বিরোধী হয়ে এক প্লাগ্যার সৃষ্টি করতে পারেন, তবে প্রগতিশীল কংগ্রেসীরূপে কিছুটা জয়ের পথ সুগম করতে পারেন।

এই গোষ্ঠীর অপর নেতা শ্রীনারায়ণ চৌধুরী। শ্রীনারায়ণ চৌধুরী দীর্ঘ-দিনের একটি বিতর্কিত চরিত্র। পশ্চিম-বঙ্গে শ্রীঅতুল্য ঘোষের বিরোধিতা করতে গিয়ে যে কয়েকজন অনেক মূল্য দিয়েছেন

ওর বর ও ইঞ্জিনিয়ার হবে। আপনি কি ওর সে আশা মেটাতে পারবেন? আপনি সত্যিই তা পারেন, যদি আপনি পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কে একটি সেভিংস একাউন্ট খোলেন।

আজই একটি একাউন্ট খুলে ওর জন্য টাকা জমাতে সুরু করুন। তাছাড়া আমাদের রেকারিং ডিপোজিট পরিকল্পনার আকর্ষণীয় সর্তাবলীও জেনে নিন।

পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক

আমি ইঞ্জিনিয়ার হ'তে চাই

শ্রীনারায়ণ চৌধুরী তাঁদের অন্যতম। তবে দীর্ঘদিন নানা পরাজয়ের গ্লানি হজম করে আবার শ্রীঅতুল্য ঘোষের কিছুটা মন জয় করে পাদপ্রদীপে ফিরে এসেছেন। শ্রীচৌধুরীর স্বপক্ষে এবং বিপক্ষে বর্ধমান জেলায় অনেক কথা চালু আছে। তবে এই কথা সত্য—নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটিতে হোক অথবা বিধানসভাতে, অথবা কংগ্রেসের কোন জনসভায়ই হোক শ্রীনারায়ণ চৌধুরী কথা বলেন এবং এই কথা মনে দাগ কাটবেই। এ ছাড়া শ্রীচৌধুরীর জীবনে উত্থান-পতন অনেক হয়েছে, কিন্তু বর্ধমান জেলায় তাঁর প্রভাব একরকমই আছে। বাম কম্যুনিস্ট প্রভাবের বর্ধমানে শ্রীনারায়ণ চৌধুরী কংগ্রেসের একজন শক্তিশালী স্তম্ভ এবং এই স্তম্ভ ভাঙতে কংগ্রেস-বিরোধীরা যেমন চেষ্টা করেছে, কংগ্রেসের মধ্যেও একদল তেমন চেষ্টা করেছে এবং করছে। শ্রীআনন্দগোপাল মুখোপাধ্যায়কে দিয়ে স্বয়ং শ্রীঅতুল্য ঘোষ নাকি কিছু কিছু চেষ্টা করেছেন বলে স্বয়ং শ্রীচৌধুরী সম্প্রতি কংগ্রেসের এক সভায় অভিযোগ এনেছিলেন। সাম্প্রতিককালে প্রদেশ কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ যে কয়েকজন সদস্যের কাছে নানাভাবে নাকানী-চুবানী খেয়েছেন তার মধ্যে শ্রীনারায়ণ চৌধুরী আর শ্রীকৃষ্ণকুমার শুক্লার নাম সবার আগে করতে হয়।

শ্রীমতী পূরবী মুখোপাধ্যায় বহুকাল মন্ত্রী ছিলেন, কিন্তু কংগ্রেস-পি ডি এফ কোয়ালিশন সরকারের ৩৫ দিনের পরমায়ুতে শ্রীবিনোদ মাঝিকে মন্ত্রী নিয়োগ করায় খুশি হতে পারেন নি। শ্রীমতী মুখোপাধ্যায়ও কংগ্রেস দলের অন্যতম সুবক্তা। তাঁর বক্তৃতায় ঝাল ও ঝাঁঝ দুই আছে। তিনিও বহুদিন খুঁৎ খুঁৎ করে এবার সরবে ময়দানে নেমেছেন। খুব সহজে ধরাছোঁয়া দিতে চান নি, অনেকেই অনেকদিন তাঁর বাড়ি গেছেন, মনের কথা বলেছেন; কিন্তু শ্রীমতী মুখোপাধ্যায় সহজে নিজের মনের কথা যেমন প্রকাশ করেন নি, তেমনি ছোটখাটো কোন সভাতেই নিজেকে জড়ান নি। তবে ২৮শে ফেব্রুয়ারী অমৃতবাজার পত্রিকা ভবনে এক সভায় যোগদান করে তিনিও আসরে নেমেছেন।

শ্রীতরুণকান্তি ঘোষ অনেকবারই শ্রীঅতুল্য ঘোষের বিরোধিতায় নেমেছেন, তবে কখনও শেষ রক্ষা করেন নি। রাজ্য মন্ত্রিসভায় থাকা কালে যুগান্তর পত্রিকায় একটি সংবাদ প্রকাশ নিয়ে শ্রীঅতুল্য ঘোষ শ্রীতরুণকান্তি ঘোষকে মন্ত্রিত্ব ছাড়তে বলেছিলেন। কিন্তু সেই মান-অভিমান কেটে গিয়েছিল। মাঝে শ্রীঘোষকে দেখা গেল রাজ্যে এ্যাডহক কংগ্রেস গঠনে অন্যতম হোতারূপে সক্রিয় হয়ে উঠেছেন। শ্রীগুলজারীলাল নন্দাকে কলকাতা আনা, আপ্যায়ন করা ও সর্বোপরি শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায়কে যুক্তফ্রণ্ট ত্যাগে উদ্বুদ্ধ করার কাজে শ্রীঘোষ ছিলেন প্রধান কর্মী। ২রা অক্টোবর শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায় যদি যুক্তফ্রণ্ট মন্ত্রিসভার মুখ্যমন্ত্রীর পদ ত্যাগ করতেন, তবে সেটার পিছনে শ্রীঘোষের অবদান সর্বাধিক বলে চিহ্নিত হতো। শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায়ের ২রা অক্টোবর তারিখের বিবৃতির মূল কপিটি আজও শ্রীঘোষের কাছে সযত্নে রক্ষিত আছে। শ্রীতরুণকান্তি ঘোষ বর্তমান পত্রিকা শতবার্ষিকী উৎসব নিয়ে যদিও ভয়ানক ব্যস্ত, তবু তার মধ্যেও বাগবাজার রিডিং লাইব্রেরীতে চব্বিশ পরগনা জেলার বিদ্রোহী কংগ্রেসীদের সভায় প্রথম প্রকাশ্য মঞ্চে আসেন আর ২৮শে নিজের বাড়িতে বিক্ষুব্ধ কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের সভা অনুষ্ঠানের হোস্ট হয়ে একেবারে বিদ্রোহী গোষ্ঠীর প্রথম সারিতে এসেছেন।

এইভাবে আরো অনেকগুলি নাম করা যায়, যার মধ্যে আছেন শ্রীবৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীগোপালদাস নাগ, শ্রীশান্তিমোহন রায়, শ্রীআবদুল গফুর, শ্রীমিহির উপাধ্যায় সহ অনেকে। তবে এই ব্যক্তিগণকে শুধু প্রকাশ্য মঞ্চে নানা সময়ে দেখা গেছে। কিন্তু মঞ্চে অভিনয় করেন একদল, নেপথ্যেও থাকেন অনেকে। নেপথ্যে কারা আছেন সেটা পরে দেখা যাবে।

(১।৩।৬৮)

কৃষ্ণলীলা—

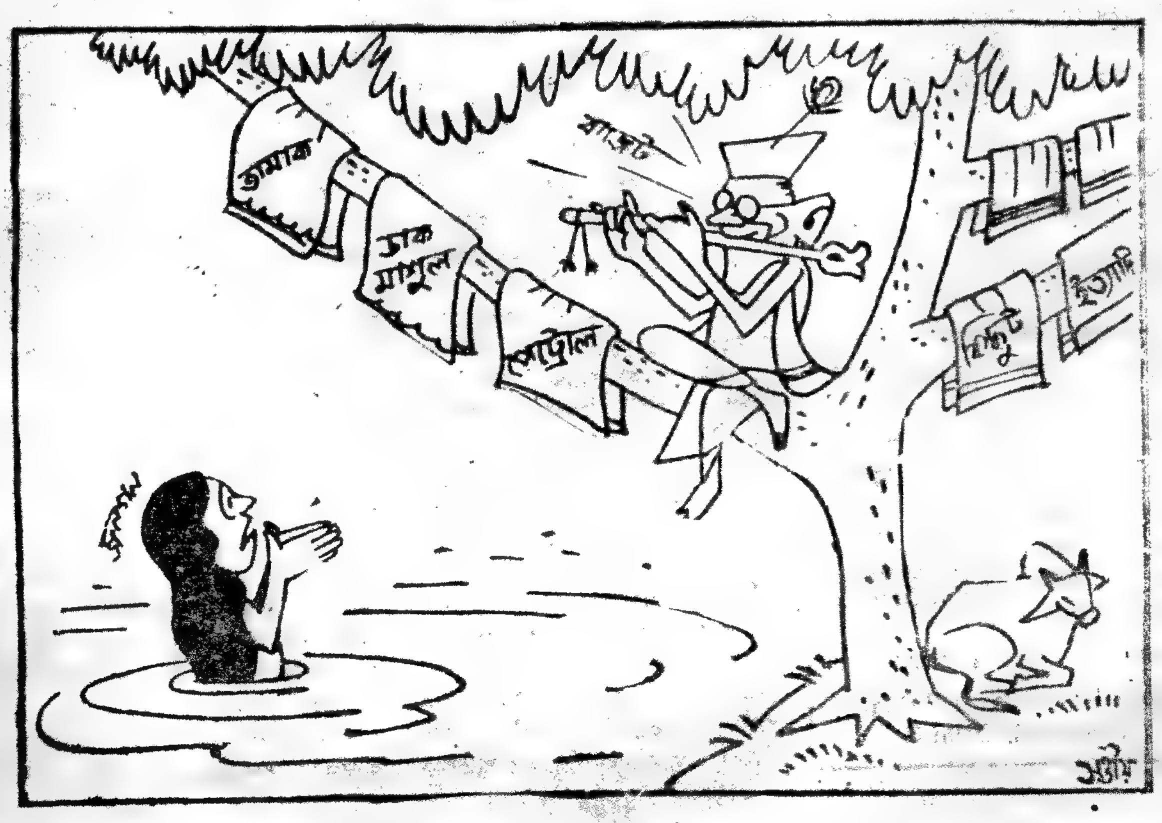

অবক্তব্য

চন্দ্রগুপ্ত

অন্তত একজন সৎ সাংবাদিক...'

'অমৃতবাজার পত্রিকা'র জন্মশতবর্ষ-পূর্তি উৎসবের শুরুতে একটি সহযোগী দৈনিক সংবাদপত্র লিখেছিল : অমৃতবাজার পত্রিকার ইংরেজীর এতই সুনাম ছিল যে, রিপন কলেজের খ্যাতিমান ইংরেজ অধ্যাপক হামফ্রে হাউস না কি বলেছিলেন, আমি পত্রিকা পড়ি আমার বাংলাকে উন্নত করার জন্য!

হামফ্রে হাউস সেদিন কাকে কি বলেছিলেন জানা নেই, কিন্তু একটি সহযোগী পত্রিকার শুভ উৎসবের সূচনাতে সব্যঙ্গ মন্তব্য প্রকাশ কতখানি শিষ্টাচারসম্মত এই প্রশ্নই আলোচ্য পত্রিকার কর্তৃপক্ষ ও পাঠকসাধারণের কাছে রাখছি।

'অমৃতবাজার পত্রিকা'র ইংরেজী 'কিংস ইংলিশে'র পরিবর্তে যদি ভারতীয় ইংরেজী হয়ে থাকে, তাতে সাংবাদিকতা কতখানি ক্ষতিগ্রস্ত হয়? ভারতীয় সংবাদপত্রের প্রধানতম কর্তব্য ভারতবর্ষের স্বার্থ সংরক্ষণ। কোন ভারতীয় সংবাদপত্র যদি এই কর্তব্যপালনে নিষ্ঠা ও সাফল্য দেখাতে পেরে থাকে, তবে তা নিঃসন্দেহে আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন। আর এই কারণেই 'অমৃতবাজার পত্রিকা' জাতির কৃতজ্ঞতা অর্জনে সমর্থ হয়েছে।

সংক্ষেপে 'অমৃতবাজার পত্রিকা'র ইতিহাস এই : যশোহর জেলার 'পলুয়া মাগুরা' গ্রামের বিখ্যাত ঘোষ পরিবারের বসন্তকুমার, হেমন্তকুমার ও শিশিরকুমার নামে তিন ভাই 'অমৃতপ্রবাহিনী' নামে একটি পাক্ষিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। কিছুদিন পরে বসন্তকুমারের মৃত্যু হলে 'অমৃতপ্রবাহিনী' উঠে যায়। অন্য দুই ভাই কিন্তু হাল ছাড়েন না, আর-একটি পত্রিকা প্রকাশের উদ্যোগ আয়োজন করতে থাকেন। তাঁরা দুজনেই তখন সরকারী আয়কর দপ্তরের উচ্চ বেতনের কর্মচারী। শেষ পর্যন্ত তাঁরা সচ্ছল আয়ের নিরাপদ রাস্তা ছেড়ে দু' ভাই অনিশ্চিত সাংবাদিক-বৃত্তিকে গ্রহণ করাই শ্রেয় মনে করলেন : মঙ্গলবার ২০ ফেব্রুয়ারি ১৮৬৮ প্রকাশ করলেন 'অমৃতবাজার পত্রিকা'।

'অমৃতবাজার পত্রিকা' প্রথমে সাপ্তাহিকরূপে আত্মপ্রকাশ করে। প্রকাশের বছরখানেক পর থেকে পত্রিকার কিছু কিছু অংশ ইংরেজীতে বেরোতে থাকে। ১৮৭১ সালের অক্টোবর মাসে 'অমৃতবাজার পত্রিকা'র অফিস যশোহর থেকে কলকাতায় স্থানান্তরিত হয় : কিছুকাল বহুবাজারে হিদারাম ব্যানার্জী লেনে থাকার পর পরে স্থায়িভাবে বাগবাজারের আনন্দ চ্যাটার্জী লেনে পত্রিকার অফিস স্থাপিত হয়। কলকাতায় আসার কিছুকাল পরে সাময়িকভাবে পত্রিকার প্রকাশ স্থগিত থাকে। এ সময় শিশিরকুমার একটি মুদ্রাযন্ত্র কেনার চেষ্টা করছিলেন, তিনি ঋণও পেয়েছিলেন কিন্তু ঋণ করে কিছু কেনার বিরোধী ছিলেন বলে তিনি অপেক্ষা করলেন। পরে স্বীয় অর্জনে মুদ্রাযন্ত্র কিনে ১৮৭২ সালের ফেব্রুয়ারি মাস থেকে 'অমৃতবাজার পত্রিকা'র পুনঃপ্রকাশ শুরু করলেন। ইংরেজী ও বাংলা উভয় ভাষার লেখা নিয়ে পত্রিকা সাপ্তাহিকরূপে বেরোতে লাগল। সংবাদ ও বিষয়-বৈচিত্র্যে পত্রিকা ক্রমশ জনপ্রিয় হতে থাকে।

'অমৃতবাজার পত্রিকা'র প্রাণশক্তি শিশিরকুমার নতুন ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন। এক সময় তিনি ছিলেন সচ্ছল বেতনের সরকারী কর্মচারী। স্বীয় পত্রিকার মাধ্যমে এখন তিনি দেশপ্রেমিক বৃটিশ-বিরোধী রূপে আত্মপ্রকাশ করলেন। দেশবাসীর দুঃখ-দুর্দশা ও বৃটিশ শাসকের অন্যায় অবিচারের কথা লিখতে লাগলেন। বাংলাদেশের তদানীন্তন লেফটেনাণ্ট-গভর্নর স্যার অ্যাশলী ইডেন চিন্তিত হয়ে ডেকে পাঠালেন শিশিরকুমারকে। ইতি-পূর্বে স্যার অ্যাশলী অন্যতম বিশিষ্ট পত্রিকা 'হিন্দু পেট্রিয়টে'র সম্পাদক কৃষ্ণদাস পালকে সরকারপন্থী করেছেন। বাকি শিশিরকুমারকে হাত করতে পারলেই তাঁর উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় : 'হিন্দু পেট্রিয়ট' ও 'অমৃতবাজার পত্রিকা'র মতো দুই প্রভাবশালী সংবাদপত্রের বিদ্রোহী কণ্ঠ-স্বরকে নীরব করে বৃটিশ শাসনকে তিনি অপ্রতিহত করতে পারবেন। শিশির-কুমারকে স্যার অ্যাশলী ইডেন বললেন, 'আসুন আমরা তিনজন—আমি আপনি ও কৃষ্ণদাস—বাংলাদেশ শাসন করি। কৃষ্ণদাস আমার নির্দেশ অনুসারে কাগজ চালাতে রাজী হয়েছেন। আপনাকেও তাই করতে হবে। 'হিন্দু পেট্রিয়টে'র মতো আপনার পত্রিকাতেও আমি লিখব। আর আপনি সরকারের সমালোচনামূলক কোন লেখা ছাপার আগে আমাকে পাণ্ডুলিপি-খানা একবার দেখিয়ে নেবেন। এর জন্য বিনিময়ে সরকার আপনার পত্রিকার অনেক খণ্ড কিনবেন। আর প্রদেশের শাসন-ব্যাপারে কৃষ্ণদাসের মতো আপনার সঙ্গেও আলোচনা করব।'

এমন লোভনীয় আপাতসম্মানজনক প্রস্তাবে শিশিরকুমার কি বলেছিলেন? দোর্দণ্ডপ্রতাপ বৃটিশ শাসকের অন্যতম প্রতিনিধির এই প্রস্তাব সরাসরি প্রত্যাখ্যান করে শীর্ণকায় শিশিরকুমার ঋজুকঠিন উত্তরে বলেছিলেন : 'মহামান্য লাট-বাহাদুর, দেশে অন্তত একজন সৎ সাংবাদিক থাকুন' (Your Excellency, let there be at least an honest Journalist in this country).

বলা বাহুল্য, শিশিরকুমারের এই দৃপ্ত উত্তর সেদিন ইংরেজ শাসককে ক্রুদ্ধ করে তুলেছিল। আহতগরিমা ইডেন ভাইসরয় লর্ড লিটনকে (১৮৭৬-৭৯) 'ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাক্ট' প্রণয়নে উৎসাহিত করলেন। ১৮৭৮ খৃস্টাব্দে প্রবর্তিত এই আইনে বলা হোল, দেশীয় ভাষায় সরকার-বিরোধী এবং সরকারের সমালোচনামূলক যে-কোন লেখার প্রকাশ অতঃপর দণ্ডযোগ্য অপরাধ বলে গণ্য হবে। স্বভাবতই এই আইন প্রণয়নের অন্যতম বিশিষ্ট লক্ষ্য ছিল দ্বিভাষিক 'অমৃতবাজার পত্রিকা'. বিচক্ষণ শিশিরকুমার পূর্বাহ্নেই এই আইন প্রবর্তনের আভাস পেয়েছিলেন। ফলে আইন পাশ হবার দিন সকালে 'অমৃতবাজার পত্রিকা' দেখে ইডেন সাহেব বিস্ময় ও ক্রোধে নির্বাক। তিনি দেখলেন পত্রিকার কোথাও একটি বাংলা হরফ নেই। বুঝলেন, শিশিরকুমার রাতারাতি তাঁর

কিস্তিতে ট্রানজিস্টার

মাসিক ৩০, টাকায় অভঙ্গুর প্লাস্টিক ক্যাবিনেটে 'ন্যাশানাল' পোর্টেবল

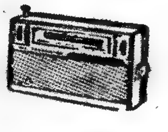

৩ ব্যান্ড অল ওয়ার্ল্ড' ট্রানজিস্টার।

Jagson Agencies (W.B.M.-88)
P.B. 1212, Delhi-6.

শরীর যদি ভাল থাকে তাহলে ভ্রমণের জন্য মানুষ আনন্দে মেতে ওঠে প্রকৃতির সৌন্দর্য উপভোগ করবার জন্য।

আপনিও স্বাস্থ্য ভাল রাখার জন্য সাধনার অব্যর্থ মহৌষধ প্রতিদিন আহারের পর দুইবার করে দু'চামচ মৃতসঞ্জীবনীর সঙ্গে চার চামচ মহাদ্রাক্ষারিষ্ট (৬ বৎসরের পুরাতন) খাবেন। এতে ক্লান্তি দূর করে, খিদে ও হজমশক্তি বাড়ে, সর্দি কাশি থেকে রেহাই পাবেন।

অধ্যক্ষ ডাঃ যোগেশ চন্দ্র ঘোষ, এম-এ, আয়ুর্বেদশাস্ত্রী, এফ,সি,এস, (লণ্ডন), এম,সি,এস, (আমেরিকা), ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক।

কলিকাতা কেন্দ্র ডাঃ নরেশ চন্দ্র ঘোষ, এম-বি, বি-এস, আয়ুর্বেদাচার্য্য।

সাধনা ঔষধালয় ঢাকা

৩৬, সাধনা ঔষধালয় রোড
সাধনা নগর, কলিকাতা ৪৮

দ্বিভাষিক পত্রিকাকে ইংরেজী পত্রিকাতে রূপান্তরিত করে আইনের হাত এড়িয়ে গেছেন ও যাবেন। সুতরাং তাঁরা 'অমৃত-বাজার পত্রিকা' ও তার সহকর্মীদের দমনে নতুন রাস্তা খুঁজতে তৎপর হলেন।

•

এর পর আরও তেরো বছর সাপ্তাহিক-রূপে বেরোবার পর অবশেষে ১৮৯১ খৃস্টাব্দের ১৯ ফেব্রুআরি 'অমৃতবাজার পত্রিকা' দৈনিক পত্রিকারূপে প্রকাশিত হতে শুরু করে। শিশিরকুমারের পর তাঁর ভাই মতিলাল পত্রিকার হাল ধরেন। বস্তুত স্বাধীনতা সংগ্রামের রক্ত-রাঙা দিনগুলিতে শিশিরকুমার-মতিলালের 'অমৃত-বাজার পত্রিকা' 'ভারতীয় ইংরেজী'-তে (ইংরেজীগর্বী ভারতীয়দের কথা মনে রেখে!) জাতীয়তাবোধ ও দেশপ্রেমকে অনির্বাণ রাখতে সাহায্য করেছিল, তা নিঃসন্দেহে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়।

'অমৃতবাজার পত্রিকা'র শতবর্ষের ইতিহাস জাতীয়তামন্ত্রের মন্ত্রে সুরে অনুরণিত। অ্যাশলী ইডেনের প্রস্তাবের উত্তরে শিশিরকুমারের দৃপ্ত মন্তব্যে জাতীয় আদর্শের যে ভিত্তিভূমির সাক্ষাৎ মেলে, তারই ওপর এই পত্রিকার বনিয়াদ নির্মিত হয়েছে। পত্রিকার দীর্ঘ ইতিহাসে বর্ণিত অসংখ্য ঘটনার মধ্যে শিশিরকুমার-কথিত সৎ সাংবাদিকের ব্রতের উদ্‌যাপনের চেষ্টা আদৌ দুর্লক্ষ্য নয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ, ১৮৮২ খৃস্টাব্দে ইলবার্ট বিল প্রবর্তিত হলে এদেশের ইংরেজ কর্মচারীরা আন্দোলন শুরু করেন, কারণ ঐ বিলে ভারতীয় জেলা ম্যাজিস্ট্রেটদের ওপর ইউরোপীয়ানদের বিচারের ভারও দেওয়া হয়েছিল। ১৮৮৩ সালের ১ মার্চ ইংরেজ কর্মচারীদের এই বর্ণবৈষম্যভিত্তিক প্রতিবাদকে আক্রমণ করে 'অমৃতবাজার পত্রিকা' লেখেন : 'যারা প্রত্যক্ষ ও নিরপেক্ষ বিচারের মুখোমুখি হতে সাহস পায় না, যারা অপরাধী-বিশেষের জন্য বিশেষ সুযোগ-সুবিধা চায়, যারা তাদের জাতের অপরাধীদের জন্য লঘুদণ্ডের, আর অন্যদের জন্য গুরু-দণ্ডের দাবি করে, আমরা তাদের কাপুরুষ আখ্যা দিচ্ছি।' অন্যবার ১৮৯১ খৃস্টাব্দে সরকার-বিরোধিতার জন্য বৃটিশ শাসক 'বঙ্গবাসী' পত্রিকার কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু প্রমুখ কর্ণধারদের আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করালে 'অমৃত-বাজার পত্রিকা' অভিযুক্তের পক্ষাবলম্বন করেন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, সে সময় এদেশের অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি ও সাংবাদিক 'বঙ্গবাসী'র বিরুদ্ধে সরকারকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সমর্থন করেছিলেন। 'বঙ্গবাসী'র সমর্থক 'অমৃত-বাজার পত্রিকা'র ১৮৯১-র ১৫ অগাস্ট-এর সংখ্যায় লেখা হয় : 'সারা শহরে বঙ্গবাসীর মামলা উত্তেজনাকর আলোচনার বিষয়বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছে।......সরকারের উচিত বঙ্গবাসীকে পক্ষ সমর্থনের সুযোগ দেওয়া, আর এরকম গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে যেন তড়িঘড়ি কোন সিদ্ধান্ত না নেওয়া হয়।' ঐ বছরের ৯ সেপ্টেম্বর 'অমৃত-বাজার পত্রিকা' লেখেন : 'আমাদের লণ্ডনস্থ সংবাদদাতা জানাচ্ছেন ওখানকার জনমতও বঙ্গবাসীকে শাস্তি দেওয়ার বিরোধী। বস্তুত, ওখানকার সব মতাদর্শের পত্রিকাতেই এই মামলার সমালোচনা করা হয়েছে।' সংক্ষেপে, যে-কয়েকটি পত্রিকা সেদিন 'বঙ্গবাসী'র পক্ষে ও সরকারের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার সাহস দেখিয়েছিল 'অমৃতবাজার পত্রিকা' তাদের অন্যতম।

•

'অমৃতবাজার পত্রিকা'র আর-একটি কৃতিত্ব 'ঘোষণাপূর্ব খবর' বা 'স্কুপ নিউজ' (Scoop news) পরিবেশনে। নানা সময়ে অনেক গুরুত্বপূর্ণ খবর এই পত্রিকা অন্যান্য পত্রে বেরোবার আগেই প্রকাশ করে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছে। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ, গোপন চুক্তির দ্বারা কাশ্মীরের গুরুত্বপূর্ণ গিলগিট অঞ্চলে ইংরেজদের অধিকার স্থাপনের উদ্যোগ-আয়োজনের কথা 'অমৃতবাজার পত্রিকা'-ই প্রথম প্রকাশ করে দেয়। এই খবর সেদিন যথেষ্ট আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। আর একবার ১৯৩৬ সনে সম্রাট অষ্টম এডওয়ার্ডের সিংহাসন ত্যাগের সিদ্ধান্ত যখন কেউই জানত না, তখন 'অমৃতবাজার পত্রিকা'-ই সর্বপ্রথম এই চাঞ্চল্যকর খবর প্রকাশের কৃতিত্ব অর্জন করে।

ইতিপূর্বে শিশিরকুমার কর্তৃক অ্যাশলী ইডেনের লোভজনক প্রস্তাব প্রত্যাখ্যানের উল্লেখ করা হয়েছে। শিশিরকুমারের এই আদর্শ পরবর্তীকালেও অক্ষুণ্ণ থাকতে দেখেছি। উদাহরণত, স্বরাজ্য পার্টি যখন প্রভূত পরিমাণ অর্থের বিনিময়ে 'অমৃত-বাজার পত্রিকা'-কে দলীয় মুখপত্রের গোপন ভূমিকায় অবতীর্ণ হবার প্রস্তাব দিয়েছিল, তখনও এই পত্রিকা সরাসরি সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিল।

•

'অমৃতবাজার পত্রিকা'র শুভ জন্ম-শতবর্ষ পূর্তির উৎসবের প্রান্তে দাঁড়িয়ে চন্দ্রগুপ্ত শিশিরকুমার, মতিলাল ও পত্রিকার স্মৃত-বিস্মৃত কর্মীদের উদ্দেশে শ্রদ্ধা নিবেদন করছেন। পত্রিকার জয়-যাত্রার পথ সহজ ও স্বচ্ছন্দ হোক এই প্রার্থনা জানিয়ে চন্দ্রগুপ্ত 'অমৃতবাজার পত্রিকা' তথা ভারতীয় সাংবাদিকদের স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন শিশিরকুমারের সেই স্মরণযোগ্য উক্তি : দেশে অন্তত একজন সৎ সাংবাদিক থাকুন। 'অমৃতবাজার পত্রিকা' ও অন্যান্য ভারতীয় সংবাদপত্র একজন অগ্রণী সাংবাদিকের এই শুভ-কামনা পূরণ করতে সমর্থ হলে তবেই 'অমৃতবাজার পত্রিকা'র শতবর্ষ উৎসব সার্থক হয়ে উঠবে।

শ্রীরামচরিত-মানস

ভক্তকবি তুলসীদাস

অধ্যাপক শিবপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় কর্তৃক বঙ্গানুবাদ

শ্রীরামচন্দ্রের বন্দনা-গানে ভারতবর্ষের বহু গুণী ও জ্ঞানীজন লেখনী ধারণ করিয়া আত্মোৎসর্গ করিয়াছেন। সেই সকল অমর লেখনীর প্রতিভা-নির্ঝরে ভারতবর্ষের মহাকাব্য পৃথিবীর সাহিত্যে স্বীয় বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল। ভক্তকবি গোস্বামী তুলসীদাস তন্মধ্যে অন্যতম—যিনি সহজ সরল ভাষায় পতিতপাবন সীতা-রামের চরিত্র বর্ণনা করিয়াছেন সুমধুর সঙ্গীতের মাধ্যমে। তুলসীদাসের জীবনসর্বস্ব মহামানব শ্রীরাম-চন্দ্রের সেই বন্দনা-গানের সুললিত বাংলা অনুবাদ এই প্রথম—বসুমতী সাহিত্য মন্দিরের অপূর্ব কীর্তির নূতন এক পরিচয় এই শ্রীরামচরিত-মানস। বহু রঙীন চিত্রে সুশোভিত।

মূল্য—১ম খণ্ড তিন টাকা, ২য় খণ্ড তিন টাকা

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড: ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলি-১২

কচ্ছ রায় মানতেই হবে

কচ্ছ রায় সম্পর্কে জনসঙ্ঘ-আনীত অনাস্থা প্রস্তাবটি টিঁকল না। টিকবেই বা কী করে। সঙ্গে সমর্থক প্রায় ছিল না বললেই চলে। ডি এম কে আর দুই কম্যুনিস্ট পার্টি তো ভোটে অংশ গ্রহণই করে নি। ২০৩—৭২ ভোটে প্রস্তাবটি অগ্রাহ্য হয়ে গেলেও জনসঙ্ঘ নেতা শ্রীবলরাজ মাধোক সরকার পক্ষকে বেশ দু'কথা শুনিয়ে দিয়ে মনের ঝাল মিটিয়ে নিয়েছেন। তবে কথায় কী আর চিঁড়ে ভেজে। ভাগ করে দিতে দিতে ভারতকে পাকিস্তানের ক্ষুধা মেটাতে আরও কত জমিন ছাড়তে হবে তা ভবিষ্যতের গর্ভেই অপেক্ষমাণ আছে। কংগ্রেসের মতো আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে অতি ভদ্রতানার লোক আরও যতেক দলের আছে, তাঁরাও বসে বসে দেশের মাটি বিদেশের মানচিত্রে ভরে দিতে দ্বিরুক্তি করবেন না। অবশ্য কচ্ছের যে দশ শতাংশ জমি পাকিস্তানকে ভারত অবশ্যই ছেড়ে দেবে বলে 'প্রতিজ্ঞাবদ্ধ', কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের এবং স্বয়ং প্রধান মন্ত্রীর মন্তব্যে সে জমি যথার্থ ভারতের কি না তা এখন বুঝতে বেশ বেগ পেতে হবে। কেন না এঁরা বার বারই বলছেন, ঐ অঞ্চল বিরোধপূর্ণ। তাইতেই ট্রাইব্যুনালে পাঠিয়েছিলেন তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রী। ট্রাইব্যুনাল ট্রায়াল গ্রহণ না করলে যুদ্ধটাই চালিয়ে যেতে হত। তাই ঐ ব্যবস্থাই গ্রহণ করতে হয়।

শ্রীমতী গান্ধী এবং শ্রীচাবন দুজনেই বলেছেন, কচ্ছ সীমান্তে ভারত পাকিস্তানের মধ্যে প্রকৃতই বিরোধ ছিল। বিরোধ যদি নাই থাকত, তবে দ্বিপাক্ষিক আলোচনাই বা কেন আর যুদ্ধই বা কেন? অকাট্য যুক্তি। সুতরাং বিরোধপূর্ণ অঞ্চলের মাত্র দশ শতাংশ ভারতকে ত্যাগ করতে হচ্ছে, প্রধানমন্ত্রী তাই ব্যাপারটা সামান্য বলে গ্রহণ করেছেন এতে আর অন্যায়টা কোথায়। ট্রাইব্যুনালে প্রেরণের জন্য ভারতের পাক-তোষণ নীতিই দায়ী, শ্রীমাধোকের এবম্বিধ অভিযোগ চাবন সরাসরি অস্বীকার করেন।

শ্রীমাধোক কিন্তু এই সব যুক্তির কোনটাই মানতে রাজী হন নি। তিনি বলেছেন, দেশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় সরকার ক্রমাগত অক্ষমতার পরিচয় দিয়ে আসছেন। এমন সরকারের গদি ছেড়ে অবসর গ্রহণই শ্রেয়।

কচ্ছের জমি সংক্রান্ত ব্যাপারে জনসঙ্ঘ, এস এস পি এবং পি এস পি মনোগত বিরাগ প্রকাশ করেছেন। কিন্তু অনাস্থা প্রস্তাব আলোচনায় ডি এম কে এবং কম্যুনিস্টরা মাথা ঘামিয়েছেন অন্যপ্রান্তে সরকার নিয়ে। ভাষাসমস্যা নিয়ে। শেষ পর্যন্ত যা হবার তাই হয়েছে। কেন্দ্রে

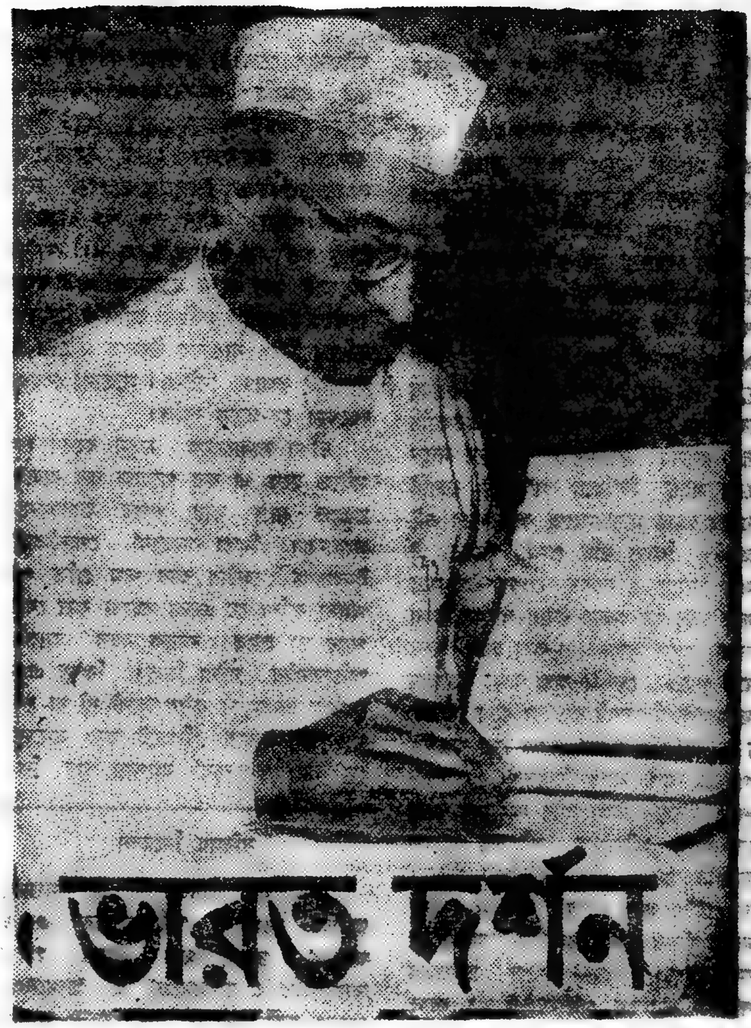

সংসদে বাজেট পেশ করার আগে বাজেটের ওপর শেষবারের মত চোখ বুলিয়ে নিচ্ছেন, অর্থমন্ত্রী শ্রীদেশাই.

কংগ্রেসী মন্ত্রিসভার ঘট উল্টে যায় নি। ফলত কচ্ছের ওপর ট্রাইব্যুনালের নির্দেশ লোকসভায় বহালই হয়ে গেল। রোয়েদাদটি এখন মেনে নেওয়ারই কথা। এজন্য সংবিধান সংশোধনের প্রয়োজন বলে শ্রীমাধোক যে দাবি তুলেছিলেন তাও টেকে নি, চাবন সাহেব সে দাবি নাকচ করে দিয়েছেন।

কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারী নেতারা যে যতই নীতিবাগীশ বনে যান না কেন বাইরের দুনিয়ার দাপটের সামনে, আসলে সকলেই, কানা মনে মনে জানা। অর্থাৎ কচ্ছের প্রশ্নে, আরও সঠিকভাবে বললে, ভারতের নিজস্ব ভূমির প্রশ্নে কোনও আন্তর্জাতিক ট্রাইব্যুনালের দ্বারস্থ হওয়াই যে চরম নির্বুদ্ধিতা তথা দুর্বলতার কারণ হয়েছে, তা বিলম্বে হলেও অনেকে স্বীকার পেয়েছেন। অমন যে শক্ত মানুষ মোরারজী দেশাই, তিনিও বলেছেন, কাজটা ভালো হয় নি। ভবিষ্যতে এইভাবে আর কোনোও আন্তর্জাতিক সালিশীর কৃপাভিক্ষু হবে না ভারতবর্ষ। অর্থাৎ তিনি বুঝেছেন, নেড়া একবার বেলতলায় গিয়ে বেশ চোটই খেয়েছে 'পুনশ্চ যাইবে না।'

কেন্দ্রীয় বাজেট

আমাদের অর্থমন্ত্রী এই সবে বাহাত্তর বছর বয়সে পা দিলেন, কিন্তু এদেশের বাজেট পেশে বাহাত্তুরে ধরেছে অনেকদিন আগেই। বাজেট তৈরি করতে হলেই কর্তাদের মাথাটি খারাপ হয়ে যায়। দেশের যাঁরা প্রকৃত শাসক, সেই দেশীয় পুঁজিপতি ও ধনিকশ্রেণীর মন যুগিয়ে বাজেট তৈরি করতে গিয়ে তথাকথিত শক্ত মানুষ অর্থমন্ত্রীদেরও নাজেহাল হতে হয়। প্রতি বছর ধনিককুলের কোলে ঝোল টেনে গরীব-মারা বাজেট উপস্থাপন করা চাট্টিখানি কথা নয়। এতে দেশময় কথা বাড়ে। প্রত্যেকটি মানুষ সাময়িকভাবে কয়েক ঘণ্টা সরকারের দারিদ্র্যসৃষ্টির নীতির [illegible] করেন। তবে একটা মহৎ সুবিধে এই যে এদেশে যত কথা বলে অর্থাৎ যত গর্জায় তত বর্ষায় না। সরকারপক্ষও তাই গর্জনে বিশেষ [illegible]

চেঁচিয়ে, তুমি তোমার নিজের কাজ করে যাও।

বাজেট মানেই নতুন করের বোঝা এবং বাজেট মানেই নতুন উদ্যমে চাঙ্গা হয়ে উঠে নতুনভাবে মুনাফা লোটার সুযোগ। এই একই পথে চলতে চলতে বাজেটে বাহাত্তুরে ধরেছে, আর কী আশ্চর্য, অর্থ-মন্ত্রী (একাধিকবার অভিজ্ঞ) শ্রীমোরারজী দেশাই-ও ঠিক বাহাত্তরের মাথায় ১৯৬৮-’৬৯-এর বাজেট পেশ করলেন। বলা বাহুল্য, এ বাজেটও পরোক্ষ করের বোঝা নিয়ে দরিদ্র জাতির পিঠে আরও এককাঠি হয়ে বসল। দারিদ্র্যের শরীরে নতুন বছরের ‘সূচ’ বিঁধিয়ে পঁয়ষট্টি কোটি পরিমাণ রক্তাক্ত মুদ্রা সংগ্রহ করা যাবে এই বাজেটে। কিন্তু যদি প্রশ্ন করেন, ঐ টাকাটা দেশের ও দশের কোন্ উপকারে লাগবে তবে বড় গলায় উত্তর পাবেন, কেন দেশরক্ষা খাতে সদ্ব্যবহার করা হবে। প্রশ্ন করতে পারেন, দেশটা আর রক্ষা কোথায় হচ্ছে মশাই, বিদেশী কর্তারা বলে দিলেই তো দেশের জমি-জায়গা ছেড়ে চলে আসেন আপনারা, মায় যুদ্ধ জিতেও পশ্চাদপসরণ। গুচ্ছের টাকা আর মানুষের জান ধ্বংস হয়। সীমান্তে সীমান্ত পারের রাহাজানি, সে-ও তো নৈমিত্তিক ঘটনা। তবে দেশরক্ষার বুলি কপচান কেন? শুনবেন উত্তর হচ্ছে, কতটুকু বোঝো বা জানো বাপু। বিরাট ভূখণ্ড ভারতের বিপুল সীমান্তের গজ-ফুট-ইঞ্চির জ্ঞান আছে। তা ছাড়া আশে-পাশে শত্রু বৈ মিত্র কেউ নেই। দূরে দূরেও যাঁরাও বা আছেন কার্যকালে তাঁদের মৈত্রীর চেহারাটা কেমন যেন পাংশুটে মেরে যায়। যদি বলেন, এসবই তো তোমাদের ব্যর্থ পররাষ্ট্রনীতির কুফল বাপু। উত্তর পাবেন, জেলা বকবেন না, ক্ষমতা থাকে অনাস্থা প্রস্তাব ভোটে উৎরে নিন। যদি তাই-ই না পারেন তবে বাজেটের গুঁতো নির্বিবাদে প্রতি বছর হজম করে যান।

বস্তুতই গুঁতো। যে পঁয়ষট্টি কোটি টাকা বেশির ভাগ ক্ষেত্রে পরোক্ষ কর চাপিয়ে দেশাই তুলতে চলেছেন তার পঁয়তাল্লিশ কোটিই যাবে দেশরক্ষায়। দেশরক্ষা কর্মিগণের (বলা বাহুল্য প্রধানতই অফিসার শ্রেণীর) ভাতা বৃদ্ধির জন্যই এই এলাহি ব্যবস্থা। ওদিকে দেশের উন্নয়নমূলক পরিকল্পনাদি লাটে উঠতে বসেছে। কংগ্রেসের মধ্যে ইদানীং যে সমাজতন্ত্রভীতি গোকুলে বাড়ছে, তাতে পরিকল্পনার ফাঁদে আর পা বাড়ানোর ইচ্ছে কর্তাদের উৎসাহ দিচ্ছে না। কর্তারা সকলেই প্রায় বৃদ্ধ হয়েছেন। এই বয়সে রাষ্ট্রকে কোনো সামাজিক আর্থিক বিবর্তনে তাঁরিয়ে নিয়ে যাওয়ার উৎসাহ তাঁদের না থাকারই কথা। নেই-ও। সুতরাং নেহরু-স্বপ্নের সে-গুড়ে বালি।

দরিদ্র সাধারণকে নতুন করের চাপ সইতে হবে, এ কর পরোক্ষ কর বলেই। প্রত্যক্ষ চাপ তার ওপর ডাকমাশুল সংক্রান্ত। নিত্য ব্যবহার্য পোস্টকার্ড, ইনল্যান্ড লেটার আর খাম প্রতি পাঁচ পয়সা বৃদ্ধি যে এতো সহজে করা যেতে পারে তা হয়ত কয়েক বছর আগেও অচিন্তনীয় ঘটনা ছিল। কিন্তু এখন যেহেতু জনগণের কাঁধে লাস্ট স্ট্র বা শেষ খড়-কুটো বলতে কিছুই আর অনুভূত হয় না। (আশ্চর্য ব্যাপার নয় কি?

সবিনয় নিবেদন

অনিবার্য কারণবশত এ সপ্তাহে অনন্ত সিংহের ‘অগ্নিযুগের একটি অধ্যায়’ প্রদ্যোৎকুমার রায়ের প্রবন্ধ ‘রাজনীতি ও ছাত্রসমাজ’ ও ‘গ্রন্থমেলা’ প্রকাশ করা গেল না, এর জন্যে আমরা দুঃখিত। —সম্পাদিকা

ক্রমাগত মূল্যবৃদ্ধির চাপটা সইছে কি করে, সকলেই কি কালোবাজারী করেন? এ প্রশ্ন সাধারণ মানুষের। উত্তর, না, তা নয়, এঁরা উদয়াস্ত বিভিন্নভাবে পরিশ্রম করে কেবলমাত্র পেটের ভাতটি জোগাড় করেন। সংসারে স্বামী, স্ত্রী, ছেলে, মেয়ে কেউ আর পড়ে নেই। ভোর থেকে রাত এগারটা অবধি পেট-ভাত জোগাড়ের ধান্দায় এঁদের ছুটিয়ে মারা হচ্ছে। অবসর এবং আত্মিক চিন্তার সুদিন গেছে।) তা, এই গরীব সাধারণের ওপরেই মোরারজীর যা পড়ল প্রত্যক্ষভাবে ডাকমাশুল ও পরোক্ষভাবে অন্যান্য ক্ষেত্রে। মাদকদ্রব্যের ওপর কর চাপানোয় স্বাভাবিকভাবে আপত্তির কোনই কারণ নেই, বিশেষ যখন বিদেশী মদই গণ্য। কিন্তু সিগারেট? এই বস্তুটি সর্বসাধারণের আবশ্যিক দ্রব্যের মধ্যে আজ গণ্য হয়ে পড়েছে।

অন্যদিকে ছাড় এবং পার পেয়ে গেলেন পুঁজিপতিরা। তাঁদের কোম্পানীগুলির ধার্য ট্যাক্সের ওপর সারচার্জ এবং ডিভিডেন্ট ট্যাক্স অর্থমন্ত্রী ‘সুচিন্তিত’ বদান্যতায় কমিয়ে দিয়েছেন।

দেশের ট্যাক্সো-চারত নবাবী আমলের চেয়ে খারাপ হতে বসেছে। এক জিজিয়া ইতিহাস কুখ্যাত হয়ে আছে, কিন্তু মোরাজীয়া ট্যাক্স কি ইতিহাস-খ্যাত হবে?

নতুন বাজেট প্রস্তাবকে কোন মহলই স্বাগত জানাতে পারেন নি। যে দেশাই সাহেব বড় লোকের সুস্বাদু পোলাও-ক্যালিয়া রন্ধনের মশলাপাতির ওপরও (গরীবে ভাতে সেদ্ধর বেশি কী আর খাবে) ট্যাক্স চাপালেন, বাহাত্তর বছর বয়সে তত করেও তিনি বাহবা পেলেন না। পুঁজিপতি-শাসিত দেশের অর্থমন্ত্রীদের কপালই এই রকম। গরীব টেনে বাজেট বানালে মন্ত্রিত্বই চাটি হয়ে যায়। সুতরাং শুধু দেশাই সাহেবকে দোষারোপ করলে প্রকৃত সত্য স্বীকৃত হয় না। পুঁজিপতি-প্রাধান্য এবং ধনিক-শাসিত দেশের বাজেট অনুৎপাদক হতেও বাধ্য। ১৯৬৮-৬৯-এর বাজেটের প্রকৃতিও তাই।

বাজেট বিষয়ে বিশিষ্ট মত

সি. সি. দেশাই (স্বতন্ত্র): প্রচুর (উদ্বৃত্ত) ফলনে দেশ যেখানে পুনরুজ্জীবিত হতে পারত, এই বাজেট সে-ক্ষেত্রে সে সম্ভাবনা বিনষ্ট করেছে।

বলরাজ মাধোক (জনসঙ্ঘ): ডাকমাশুল বৃদ্ধি অন্যায়, তবে বাজেট বাস্তবধর্মী।

কে, এল, গুপ্ত (জনসঙ্ঘ): আমরা নিঃস্ব হতে চললাম। সাধারণের বোঝা বাড়বে।

নির্দলীয় প্রকাশবীর শাস্ত্রী: সরকারী ব্যয় হ্রাসের কোনো চেষ্টা নেই বাজেটে। যে সরকার সমাজতন্ত্রের কথা বলেন সেই সরকারের কাছে এ-জাতীয় বাজেট অপ্রত্যাশিত।

ডি-এম-কে আনরাজ খান: শ্রীদেশাই-এর ‘প্লাস্টিক সার্জারিতে’ সুবিধে হবে ধনিক সম্প্রদায়ের।

পি, কে, বিড়লা: এর চেয়ে ভালো বাজেট আর কিছুই হতে পারত না।

এন, জি, রঙ্গ (স্বতন্ত্র): দেশাই-এর বাজেটকে প্রগতিশীল বলা যায় না।

কংগ্রেস পরিষদীয় দলের উপনেতা এস, এন, মিশ্র বাজেটের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যই উপলব্ধি করতে পারেন নি।

নির্দলীয় এন. সি, চ্যাটার্জী বলেন: অর্থমন্ত্রীর সার্জারিটা বেশ ‘কড়া’ হয়েছে এখন রোগী বাঁচলে হয়।

সারা ভারত ব্যাঙ্ক কর্মচারী প্রতীক ধর্মঘট

ব্যাঙ্ক কর্মীরা দেশাই সাহেবের ব্যাঙ্কের ওপর সামাজিক নিয়ন্ত্রণের ব্যাখ্যা করে বলেছেন, সামাজিক নিয়ন্ত্রণের

মাসিক ৬০০৲ টাকা উপার্জন করুন

অবসর সময়ে বিশ্ব-বিখ্যাত রোমার ঘড়ির অর্ডার বুক করিয়া। বিনামূল্যে সর্তাবলী এবং স্যাম্পেল ঘড়ির জন্য পত্র লিখুন।

TAJCO (W B C—88)
P. Box 1383, Delhi—6.

বন্দীলটা নেহাতই 'চোখ মোছানো' (আই ওয়াশ) ব্যাপার। আসলে উদ্দেশ্য হল ব্যাঙ্ক মালিক স্বার্থের পরিপুষ্টি সাধন করা। শুধু তাই নয়, পুঁজিপতিদের স্বার্থে মোরারজীর সরকার ব্যাঙ্ক কর্মীদের বহু-সংগ্রাম-লব্ধ ট্রেড য়ুনিয়ন অধিকারও সংহরণ করে নিতে যাচ্ছে। ব্যাঙ্কের ভবনে বা দশ মিটারের মধ্যে সভাসমাবেশ এমন কি পোস্টার প্রদর্শন পর্যন্ত নিষিদ্ধ করা হচ্ছে যে ধারায়, সেই ধারাটি শ্রমিক স্বার্থকে বিপর্যস্ত করার জন্যই বেশ ভেবেচিন্তে সংযুক্ত করা হয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই তাই সমগ্র ভারতের ব্যাঙ্ক কর্মচারীরা প্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠেছিলেন গত বুধবার, ২৮শে ফেব্রুয়ারী। একদিনের জন্য। ভারত-ব্যাপী ব্যাঙ্ক কর্মীদের প্রতীক ধর্মঘট এই প্রথম। বাধা সত্ত্বেও ধর্মঘট সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে। কোথাও কোথাও কংগ্রেসী কর্মী-সংস্থা কর্মীদের অধিকার রক্ষার এই সংগ্রামে প্রতিবাদীর ভূমিকায় প্রতিপক্ষের শক্তি নিয়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু ব্যাঙ্ক কর্মীদের ভারতব্যাপী ঐক্য সে বাধাকে অনায়াসেই উত্তীর্ণ হতে পেরেছে।

বোম্বাই শহরে এ নিয়ে একটি সংঘর্ষ এবং তারপর পুলিশের লাঠি-চালনা হয়ে গেছে। রাজধানীর কতিপয় স্থানে কর্মীরা গ্রেপ্তারও হয়েছেন।

কর্মিগণের দাবি ছিল ব্যাঙ্কের ওপর মোরারজী দেশাইয়ের অভিনব সামাজিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা বাতিল করা ও ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ করা, অটোমেশন চালু করার ষড়যন্ত্র প্রত্যাহারের দাবিও তাঁদের।

ব্যাঙ্ক আইন (সংশোধন) বিলের বত্রিশ ধারায় কর্মচারীদের ট্রেড য়ুনিয়ন অধিকার খর্ব করার প্রয়াসের বিরুদ্ধে তাঁরা প্রতিবাদধ্বনি তুলেছেন। সরকার সরকারী কর্মচারীদের প্রায় নাগরিক অধিকারেই হস্তক্ষেপ করেছেন। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের কোন কাজের বা নীতির বিরূপ সমালোচনা করার বিষয়ে কর্মচারী সংস্থাগুলির ওপর কেন্দ্রীয় সরকার নিষেধাজ্ঞামূলক সতর্কীকরণ নির্দেশ জারি করেছেন। ব্যাঙ্ক আইনে ব্যাঙ্ক কর্মীরা মালিকের বিরুদ্ধেও যাতে আওয়াজ তুলতে না পারেন স্বাধীন দেশের জাতীয় সরকার তারও ব্যবস্থা গ্রহণ করতে চলেছেন। অর্থাৎ দুনিয়ার শ্রমজীবী ও কর্মী মানুষেরা দীর্ঘদিনের লড়াইয়ের ফলে যে অধিকার অর্জন করেছেন, ভারতের অতি ন্যায়বাদী সরকার তা প্রত্যাহার করে নিতে চান। কর্মী-বিক্ষোভ তাই স্বাভাবিক রূপ গ্রহণ করেছে। কিন্তু প্রগতি-বিরোধী কর্মীসংস্থার অপপ্রয়াস সত্ত্বেও সারা ভারত ব্যাঙ্ক কর্মীরা কিন্তু এই অন্যায় ও অবিচারের প্রতিবাদে সঙ্ঘবদ্ধ ঐক্য প্রদর্শনে ২৮শে ফেব্রুয়ারী সম্পূর্ণ সফল হয়েছেন।

সরকার যদি কর্মীস্বার্থহানিকর ব্যাঙ্ক বিল প্রত্যাহার না করেন, তবে সারা ভারত ব্যাঙ্ক কর্মী সংগঠন আরও জোরদার এবং ব্যাপক আন্দোলনে নামতে বাধ্য হবেন এবং বলাই বাহুল্য জন-সমর্থনলাভে তাঁরা বঞ্চিত হবেন বলে মনে হয় না।

আন্দোলন সমর্থন

ইতিমধ্যেই ব্যাঙ্ক কর্মীদের অভিনন্দন জানিয়ে তাঁদের আন্দোলনে পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন করেছেন রাজ্য ও কেন্দ্রীয় কর্মচারী (সরকারী) সংস্থাসমূহের নেতৃবৃন্দ, এল-আই-সি কর্মী ফেডারেশন, জীবন-বীমা কর্মী সমিতি, সওদাগরী কর্মচারী

মাসানী

য়ুনিয়নগুলির ফেডারেশন এবং বিভিন্ন শিক্ষক সংস্থা।

মালিকী উল্লাস

সরকারী বিলের পক্ষে অভিনন্দন মিলেছে শুধু মালিক সংস্থাগুলির তরফ থেকে। তাঁরা আশা-আনন্দে এমনি ডগমগ যে বলেই ফেলেছেন, বিলে কর্মচারীদের যে সমস্ত 'অপরাধ'-এর উল্লেখ আছে, সেই প্যাঁচে কর্মীদের ফেলতে পারলে তাঁদের শাস্তি দেওয়ার মালিকানা মালিক-গোষ্ঠীই ভোগ করবেন। সুতরাং আর কী চাই। এতবড় মালিকানা যখন নেহরুজীর স্বপ্নের আধা-সমাজতান্ত্রিক (অধুনা এ চিন্তা বিতাড়িত) সরকারই মালিকপক্ষের শক্ত হাতে তুলে দিচ্ছেন, তখন মা ভৈঃ! মালিকরা তাই বলছেন, এমন একটা নির্দোষ বিলের প্রতিবাদে ধর্মঘট অবশ্যই বে-আইনী।

মাসানীর মাথাব্যথা

স্বতন্ত্র দলের নেতা এম, আর, মাসানী ব্যাঙ্কের আমানতকারীদের উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ বলে হাঁক দিয়ে ডাক দিয়েছেন। তিনি সারা ভারত আমানত-কারীদের একটি সংস্থার জন্মলগ্নে পৌরোহিত্য করবার কালে মালিক-স্বার্থের পক্ষে লম্বা বক্তৃতা দিয়ে বলেছেন, সঙ্ঘবদ্ধভাবে মালিক-স্বার্থ সঙ্কোচনের বিরুদ্ধে দুর্বার আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে।

কেন্দ্রে প্রতিষ্ঠিত সরকার তাঁর মতে ভয়ানক দুর্বল। মালিকের স্বার্থরক্ষা তাঁরা বুক চিতিয়ে করতে ভয় পান। আসলে মাসানীর ভয়, ব্যাঙ্ক নিয়ন্ত্রণ বিলের আবডাল দিয়ে শেষ পর্যন্ত ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের মতলবটাই না হাসিল হয়ে যায়। তিনি বলেছেন, জাতীয়করণের অপচেষ্টা একেবারে স্তব্ধ করে দিতে হবে।

মাসানী সাহেবের সমস্ত রাগটা গিয়ে পড়েছে মার্ক্সবাদী কম্যুনিস্টদের ওপর। যত নষ্টের গোড়া ঐ মেঠো দলটা। মাসানীর দেশের শত্রু তাই মাঃ কম্যুনিস্টরা। মাসানী বলেছেন, ঐ দলটাকে আগে বে-আইনী ঘোষণা করার দরকার। কিন্তু সরকার হয়েছে অপোগণ্ড দুর্বল। আজ অবধি এই শুভ কাজটি সরকারের দ্বারা করিয়ে নেওয়া সম্ভব হল না।

মাসানী তাঁর স্ট্যাটিসটিক্স শাস্ত্রে অগাধ পাণ্ডিত্যও প্রচার করেছেন ঐ সভায়। বলেছেন, দেখুন কী কাণ্ড। আশিটা আমানতকারীর পেছনে মাত্র একজন ব্যাঙ্ক কর্মী। এই রেশিও। তাতেই আবার কর্মীদের দাবি।

মাসানী সাহেব পণ্ডিত ব্যক্তি। তবে গণনাকালে তিনি গুণতে ভুলেছেন আরও লক্ষ লক্ষ খেটে-খাওয়া মানুষের হিসেব, যাঁরা ব্যাঙ্ক কর্মীদের পেছনে কোটি কণ্ঠের সমর্থন নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। মাসানীর স্বতন্ত্রীরা সেই রেশিওয় নস্যবৎ নয় কি!

(১।৩।৬৮)

মাত্র ২০, টাকায় ট্রানজিস্টার
অল ওয়ার্ল্ড ৩ ব্যাণ্ড
সুলভতম ট্রানজিস্টার
সমবায় ভিত্তির মাধ্যমে
মাত্র ২০, টাকায়
পাঠানো হয়। ইংরেজীতে
আপনার অর্ডার বুক করুন।
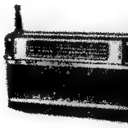
Ceylon Traders (WBC-22)
Post Box 1257, Delhi-6.

কেনিয়া থেকে এশীয়দের এই প্রতিনিধি দলটি অভিবাসন বিল পাশ স্থগিত রাখার জন্য বৃটিশ সরকারকে বৃঝিয়ে বলতে লন্ডন ছুটে গিয়েছিলেন।

বৃটেন:

প্রবল বিরোধিতা সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত বৃটিশ পার্লামেন্টে 'কমনওয়েলথ ইমিগ্রান্টস বিল' পাশ হয়েছে এবং রাণীর সম্মতি লাভ করে ১লা মার্চ তা বিধিবদ্ধ আইনে পরিণত হয়েছে।

কেনিয়া থেকে দলে দলে বৃটিশ পাশপোর্টধারী এশীয়রা বৃটেনে চলে আসছিল বলে কৃষ্ণাঙ্গ বহিরাগতদের আগমন নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে এই অভিবাসন আইন। ইদানীং প্রতি সপ্তাহে যেখানে গড়ে দু' হাজার করে কেনিয়াবাসী এশীয়রা আসছিল, সেখানে নতুন আইনের ফলে সারা বছরে দেড় হাজারের বেশি আসতে পারবে না। কেবল কেনিয়া নয়, কমনওয়েলথের সব দেশ মিলিয়ে বছরে সাড়ে আট হাজারের বেশি লোক বৃটেনে বসবাসের জন্য আসতে পারবে না। এতদিন যেকোন বৃটিশ নাগরিকের বৃটেনে অবাধ প্রবেশাধিকার ছিল। কিন্তু নতুন আইনে নানা রকম সর্ত আরোপ করা হয়েছে। কেবল নিজে বৃটিশ নাগরিক হলেই চলবে না, যারা বৃটেনে জন্মেছে, অথবা যাদের পিতা-মাতা কিংবা পিতামহ-পিতামহী অথবা মাতামহ-মাতামহী বৃটেনে জন্মেছে, কেবলমাত্র সেই সব কেনিয়াবাসীই নতুন আইনে বৃটেনে প্রবেশের অনুমতি পাবে। যে সব ব্যক্তি বৃটেনে আগের থেকে কাজ সংগ্রহ করতে পারবে, তারা 'ওয়ার্ক ভাউচার' দেখালে তবে প্রবেশাধিকার পাবে।

১৯৬৩ সালে যখন কেনিয়া স্বাধীনতা লাভ করে তখন এশীয় বংশোদ্ভূত কেনিয়াবাসীদের বৃটিশ নাগরিকত্ব গ্রহণের সুযোগ দেওয়া হয়েছিল। এই সুযোগ গ্রহণ করে অনেক এশীয়ই বৃটিশ নাগরিকত্ব গ্রহণ করে—এদের মধ্যে ভারতীয় ও পাকিস্তানীদের সংখ্যাই বেশি। গত বছর থেকে কেনিয়া সরকার কর্ম ও ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে এশীয়দের প্রতি বৈষম্যমূলক নীতি গ্রহণ করার পর থেকে বৃটিশ নাগরিক এই সব এশীয়দের অনেকে কেনিয়া ত্যাগ করে বৃটেনে যাওয়া শুরু করে। সম্প্রতি এই আগমন অত্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছে।

বৃটেনে কৃষ্ণাঙ্গের সংখ্যা বর্তমানে প্রায় দশ লক্ষের মত। অনেক ইংরেজ এতে বিচলিত। বর্ণসচেতন শ্বেতাঙ্গরা মাঝে মাঝেই এই বিষয়ে তাদের ক্ষোভ প্রকাশ করে। তার ওপর কেনিয়া থেকে এইভাবে দলে দলে এশীয়দের বৃটেনে আগমনে এই বর্ণবিদ্বেষীরা তারস্বরে চিৎকার শুরু করে। শেষ পর্যন্ত যদি কেনিয়ার ১ লক্ষ ৬৭ হাজার এশীয়ই এসে পড়ে? সর্বনাশ! সুতরাং, এদের আগমন বন্ধ করে আইন পাশ করো। রক্ষণশীল দলের প্রথম সারির নেতা এনক পাওয়েল, সিরিল ওসবোর্ন ও ডানকান স্যান্ডস এই আন্দোলনের নেতা। কেনিয়ার স্বাধীনতার সময় ডানকান স্যান্ডস কমনওয়েলথ দপ্তরের মন্ত্রিরূপে এশীয়দের যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, আজ সুবিধামত সে সবই তিনি ভুলে গিয়েছেন।

কেবল ওসবোর্ন, পাওয়েল, স্যান্ডসই নন, পার্লামেন্টের ১০৭ জন সদস্য একযোগে দাবি করলেন, এশীয়দের আগমন বন্ধ করা হোক। এঁদের মধ্যে শ্রমিক দলেরও ১৫ জন সদস্য ছিলেন।

শেষ পর্যন্ত স্বরাষ্ট্রদপ্তরের মন্ত্রী জেমস কালাহান ২৩শে ফেব্রুয়ারী কমন্সসভায় এই বিল উত্থাপন করেন। ২৯শে ফেব্রুয়ারী কমন্সে বিলটি ১৪৫—৩১ ভোটে গৃহীত হয়। সেদিনই রাত্রে লর্ডসভা বিলটিকে পাশ করে। ভারতবন্ধু লর্ড ফেনার ব্রকওয়ে বিলটিকে বাধা দেবার আপ্রাণ চেষ্টা করেন, কিন্তু তিনি সফল হন নি। ১লা মার্চই রাণী বিলে স্বাক্ষর করেন।

বিল উত্থাপন করতে গিয়ে কালাহান বলেছেন, 'দেশের জনসাধারণের সামাজিক প্রয়োজনের' দিকে তাকিয়ে তাঁকে এই বিল আনতে হয়েছে। কিন্তু এটা যে পুরোপুরি বর্ণবিদ্বেষ-প্রসূত তাতে কোন সন্দেহ নেই। কৃষ্ণাঙ্গরা যাতে অধিক সংখ্যায় বৃটেনে আসতে না পারে, তার জন্যই এই সব নিয়ন্ত্রণ।

এই বর্ণবৈষম্যের নীতির বিরুদ্ধে বৃটেনে শুভবুদ্ধিসম্পন্ন ইংরেজদের মধ্যেও তীব্র বিক্ষোভ ও ঘৃণার সৃষ্টি হয়েছে। অনেকেই দুঃখের সঙ্গে বলেছেন, শেষ পর্যন্ত শ্রমিক দলও রক্ষণশীলদের মত বর্ণবিদ্বেষে অন্ধ হল। শ্রমিক দলের বিশিষ্ট নেতা ডিংলে ফুট এবং মন্ত্রিসভার অন্যতম সদস্য জেনি লি বিলের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেছেন। রক্ষণশীল দলের ম্যাকলিয়ড, মডলিং, বয়েল প্রমুখ বিলের বিরোধিতা করেছেন। আর উদারনৈতিক দলের সবাই বিলের বিরোধী। ক্যান্টারবেরীর আর্চবিশপ ডঃ মাইকেল র‍্যামজে এই বিলের পরিবর্তনের দাবিতে কালাহানের সঙ্গে কথা বলেছেন। অ্যাংলিকান চার্চের আর একজন বিশিষ্ট নেতা উলউইচের বিশপ ডঃ জন রবিনসন তো উইলসন সরকারের এই অভিবাসন বিল ও ভিয়েৎনাম নীতির প্রতিবাদে শ্রমিক দলের সদস্যপদ ত্যাগ করে উদারনৈতিক দলেই যোগদান করেছেন। বৃটেনের 'মানবিক অধিকার বৎসর (১৯৬৮) কমিটি'র চেয়ারম্যান স্যার রবার্ট বার্লি 'বর্ণের জন্য প্রবেশে বাধাদানের' এই বিলকে মানবিক অধিকারের ওপর এক মস্ত আঘাত বলে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, বিলে যে ব্যবস্থা করা হয়েছে তা রাষ্ট্রসংঘের মানবিক অধিকার সনদের বিরোধী। উইলসন ও বিরোধী দলনেতা হিথ, দুজনেই এই কমিটির অনারারি প্রেসিডেন্ট! নাইরোবি বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৬ জন ইংরেজ অধ্যাপক এই বিলকে লজ্জাজনক বর্ণবৈষম্যমূলক আচরণ বলে বর্ণনা করেছেন। লন্ডনের বিশিষ্ট দৈনিক পত্রিকা 'গার্ডিয়ান' এই বিলের তীব্র সমালোচনা করে বলেছে, এর ফলে কমনওয়েলথ ভেঙে পড়বে।

কেবলমাত্র গায়ের রং কালো বলে পূর্ব থেকে বৃটিশ নাগরিক হওয়া সত্ত্বেও কেউ বৃটেনে প্রবেশ করতে পারবে না, এ স্পষ্টতই বর্ণবৈষম্যমূলক আচরণ এবং অদৃষ্টের পরিহাস সমাজতন্ত্রের আদর্শে বিশ্বাসী হ্যারল্ড উইলসনের শ্রমিক সরকার আজ এই আইন পাশ করছেন। তার চেয়েও বড় কথা, এর দ্বারা বৃটেনের

সুস্পষ্ট প্রতিশ্রুতি ভংগ করা হয়েছে। কেনিয়ার এশীয় বংশোদ্ভূতদের এই প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল যে, তারা বৃটিশ নাগরিক হলে বৃটেনে প্রবেশাধিকার সহ সকল সুযোগ-সুবিধা পাবে। তাই এদের অনেকে কেনিয়ার নাগরিকত্বের জন্য দরখাস্ত করে নি, এমন কি ভারত বা পাকিস্তানেরও নাগরিক হয় নি, বৃটেনের নাগরিকত্ব গ্রহণ করেছে। আর আজ যখন তারা অসহায় হয়ে নিজেদের বহু দিনের উপার্জিত সম্পত্তি বাড়িঘর সব ছেড়ে দিয়ে লণ্ডন পৌঁচেছে, তখন তারা দেখছে তাদের প্রবেশদ্বার বন্ধ। প্রতিশ্রুতিভংগের এত বড় দৃষ্টান্ত ইতিহাসে কমই আছে।

যখন বৃটিশ পার্লামেণ্টে তাড়াহুড়ো করে অভিবাসন বিলটি পাশের চেষ্টা চলছিল, তখন কেনিয়া থেকে চারজন এশীয়ের একটি প্রতিনিধিদল ছুটে গিয়েছিলেন লণ্ডনে বৃটিশ সরকারকে তাঁদের পুরনো প্রতিশ্রুতির কথা স্মরণ করিয়ে দিতে এবং কোন্ অবস্থায় কিভাবে তাঁরা কেনিয়া ত্যাগে বাধ্য হচ্ছেন তা বুঝিয়ে বলতে। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী হ্যারল্ড উইলসন, কিংবা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কালাঘানের সময় হয় নি তাঁদের সংগে কথা বলার। স্বরাষ্ট্রদপ্তরের একজন সহকারী মন্ত্রী ডেভিড এলানস তাঁদের সংগে দেখা করেছিলেন। কোন দাবি অবশ্যই মানা হয় নি।

বিলের বিরুদ্ধে ডাউনিং স্ট্রীটে প্রধানমন্ত্রীর বাড়ির সম্মুখে যে বিক্ষোভ প্রদর্শন হয় তাতে ভারতীয়, পাকিস্তানী, আফ্রিকীয়, ওয়েস্ট ইণ্ডিজ প্রভৃতির সংগে অনেক ইংরেজও ছিলেন। সেদিনও উইলসনের সাক্ষাত পাওয়া যায় নি।

এশীয় বংশোদ্ভূতদের প্রতি বৃটিশ সরকারের এই ব্যবহারে ভারত সরকার ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। ভারতীয় সংসদে প্রতিমন্ত্রী শ্রীবলিরাম ভগত বলেছেন, পাল্টা ব্যবস্থার কথা ভাবা হচ্ছে। কিন্তু বৃটিশ পাশপোর্টধারীদের ওপর কড়াকড়ি বাড়ালে তাতে কিছুই হবে না। এই ঘৃণ্য বর্ণবৈষম্যের প্রতিবাদে ভারত যদি কমনওয়েলথ থেকে বেরিয়ে আসতে পারে, এবং ভারতের সকল বৃটিশ মূলধন বাজেয়াপ্ত করতে পারে, তবেই বৃটেনের উচিত শিক্ষা হয়। কিন্তু সে পথে ভারত সরকার যাবেন না, এ কথা নিশ্চিত হয়েই বলা যায়।

দক্ষিণ ভিয়েতনাম:

ভিয়েতনাম যুদ্ধের খবর যাতে ঠিক মত বহির্বিশ্বে এসে পৌঁছতে না পারে তার জন্য মার্কিন কর্তৃপক্ষ সংবাদের ওপর কিছুটা নিয়ন্ত্রণ আরোপের চেষ্টা করছেন। তা সত্ত্বেও যে সব খবর আসছে তাতে দেখা যায় মার্কিন তথা দক্ষিণ ভিয়েতনাম সরকারের অবস্থা খুবই শোচনীয়। সায়গনের ৫৫ মাইলের মধ্যে ভিয়েত কং গেরিলা বাহিনী একেবারে ট্যাঙ্ক নিয়ে উপস্থিত। বিয়েন হোয়া বিমান ঘাঁটির ওপরেও রকেট আক্রমণ চলছে।

মার্কিন জয়েণ্ট চীফ অব স্টাফের চেয়ারম্যান জেনারেল আর্ল জি হুইলার ভিয়েতনাম গিয়েছিলেন যুদ্ধের অবস্থা নিজের চোখে দেখে আসার জন্য। দক্ষিণ ভিয়েতনামের রাষ্ট্রপতি নুয়েন ভান থিউ, উপরাষ্ট্রপতি নুয়েন কাও কি, মার্কিন রাষ্ট্রদূত এলসওয়ার্থ বাঙ্কার, মার্কিন সেনাবাহিনীর অধ্যক্ষ জেনারেল উইলিয়াম ওয়েস্টমোরল্যাণ্ড, সকলের সংগেই তিনি কথা বলেছেন। এখনই আরও ৫০ হাজার মার্কিন সৈন্য প্রেরণের প্রতিশ্রুতিও তিনি দিয়ে এসেছেন। তবে তিনি আশ্বস্ত হয়ে ফিরতে পারেন নি।

আজ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কর্তৃপক্ষ মহলের সর্বত্র—পেণ্টাগন, হোয়াইট হাউস, কংগ্রেস—এই আলোচনাই হচ্ছে, ভিয়েতনামের যুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে জয়লাভ করা বোধ হয় সম্ভব হবে না।

তাই কি মরিয়া হয়ে এবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সর্বত্র নাপাম বোমা ফেলছে? অনেক দিন ধরেই ভিয়েতনামে ভয়ঙ্কর নাপাম বোমার ব্যবহার চলছে। ইদানীং তার ব্যবহার বেড়েছে। উত্তর ভিয়েতনাম সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়েছে, উত্তর ভিয়েতনামের বেন থৈ, মাই থে, চাউ ডক, কিয়েন ডুং প্রভৃতি প্রদেশের রাজধানীতে গত কয়েক দিনে নাপাম বোমা ফেলা হয়েছে। মার্কিন বোমারু বিমান থেকে এই বোমা ফেলার ফলে বহু বাড়ি ভস্মীভূত হয়েছে, হাজার হাজার লোক মারা গেছে।

যুদ্ধের ভয়ঙ্কর-বীভৎস পরিস্থিতির মধ্যেও মাঝে মাঝে হাস্যরসের সন্ধান পাওয়া যায়। এ রকম একটি খবর পাওয়া গেছে নিউজিল্যাণ্ডের রাজধানী ওয়েলিংটন থেকে। 'অ্যানজাস' গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত নিউজিল্যাণ্ড ভিয়েতনামের যুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দোসর, নিউজিল্যাণ্ডের কিছু সৈন্য এখানে যুদ্ধে লিপ্ত রয়েছে। রক্তক্ষয়ী ভিয়েতনাম যুদ্ধে উভয়পক্ষে এত যে লক্ষ লক্ষ লোক এবং তাদের মধ্যেও আবার অধিকাংশ নিরীহ নারী ও শিশু প্রতিদিন মারা যাচ্ছে, তার জন্য নিউজিল্যাণ্ডের লোকেদের বিশেষ কোন মাথাব্যথা না হলেও, সেখানে হাতীর বড় কষ্ট হবে ভেবে প্রাণীপ্রেমীদের রাত্রির নিদ্রা দূর হয়েছে!

ভিয়েতনামের যুদ্ধে মার্কিন কর্তৃপক্ষ প্যারাসুটে করে হাতী নামাবে, এই প্রস্তাব শুনে নিউজিল্যাণ্ডের জন্তু-জানোয়ারের প্রতি নিষ্ঠুরতা নিবারণকারী সমিতির সভাপতি ই এন সিনকক অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়েছেন। প্যারাসুটে করে তিন টন ওজনের এক-একটা হাতী নামানোর চেষ্টা হলে তাদের হাড়গোড় যে ভেঙে যাবে। আমেরিকান হিউমান অ্যাসোসিয়েশনের কাছে তাই তাঁরা চিঠি লিখেছেন, এরূপ নিষ্ঠুর কাজ যেন মার্কিন সামরিক কর্তৃপক্ষ না করেন!

ইথিওপিয়া:

আফ্রিকা সংহতি সংস্থা বা 'অরগানাইজেশন অব আফ্রিকান ইউনিটি'র (ও এ ইউ) মন্ত্রিপরিষদের এক বৈঠক আদ্দিস আবাবায় বসেছিল। ২৪শে ফেব্রুয়ারী এই বৈঠক শেষ হয়েছে।

আফ্রিকার বিভিন্ন দেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীরা আদ্দিস আবাবার এই বৈঠকে সর্বসম্মতিক্রমে অনেকগুলি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। পাঁচ বছর পূর্বে এই সংহতি সংস্থা গঠিত হবার পর কখনও কোন বৈঠকে এতটা ঐক্যমত দেখা যায় নি।

বৈঠকে ঠিক হয়েছে, মেক্সিকোয় যে আন্তর্জাতিক অলিম্পিক স্পোর্টস আহ্বান করা হয়েছে, তাতে যদি দক্ষিণ আফ্রিকাকে যোগ দিতে দেওয়া হয় তবে কোন আফ্রিকীয় দেশ এই অলিম্পিকে যোগ দেবে না। কেবল আফ্রিকা নয়, আরও অনেক দেশ একই কথা বলেছে, বর্ণবৈষম্যবাদী দক্ষিণ আফ্রিকা থাকলে তারাও মেক্সিকো অলিম্পিক বর্জন করবে। সর্বশেষ খবরে জানা যায়, দক্ষিণ আফ্রিকার যোগদানের প্রশ্নটি পুনর্বিবেচনার জন্য আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটির এক জরুরী বৈঠক ডাকা হয়েছে।

আরব রাষ্ট্রগুলির যে সকল জমি ইসরায়েল গত জুন মাসের যুদ্ধে দখল করে নিয়েছে, সেখান থেকে অবিলম্বে ইসরায়েলী সৈন্য ফিরিয়ে নেবার দাবি জানিয়ে প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছে আদ্দিস আবাবা বৈঠকে। কেবল তাই নয়, ইহুদী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে আরবদের সর্বপ্রকার রাজনৈতিক, নৈতিক ও বৈষয়িক সাহায্য দেবার জন্য আফ্রিকার রাষ্ট্রগুলির প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছে প্রস্তাবে। আফ্রিকার পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের বৈঠকে সর্বসম্মতিক্রমে এই প্রস্তাব গ্রহণের গুরুত্ব খুব বেশি। কারণ, অনেক অমুসলমান আফ্রিকীয় রাষ্ট্র আরবদের প্রতি সহানুভূতিশীল নয়, এদের মধ্যে অনেকে রাষ্ট্রসংঘে আরবদের পক্ষ অবলম্বন করে নি। তাই আজ আরবদের প্রতি এদের অকুণ্ঠ সমর্থন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

দক্ষিণ আফ্রিকাকে অস্ত্র-বিক্রয় করার জন্য আদ্দিস আবাবা বৈঠক থেকে ফ্রান্স ও পশ্চিম জার্মানীর নিন্দা করা হয়েছে।

সংহতি সংস্থার কাজকে ঠিক মত চালাবার বিষয়েও বৈঠকে বিশেষভাবে আলোচনা হয়, এবং সংস্থার জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ বাজেট গ্রহণের পক্ষে সকলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

ভিয়েৎনাম: ঝড়ের কেন্দ্রে

বরুণ রায়

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

চোখের সামনে থেকে তীরভূমি মিলিয়ে যেতে লাগল ক্রমে, সন্ধ্যার অন্ধকারে দিনের শেষ আলো যেমন করে মুছে যায়। জাহাজের ডেকে দাঁড়িয়ে অপলক দৃষ্টিতে সেই দিকে তাকিয়ে ছিল বাইশ বছর বয়েসের এক যুবক।

১৯১২ সাল। এস-এস 'লা টুশ-ট্রেভিল' যাচ্ছিল সায়গন থেকে মার্সাইয়ে। পালের জাহাজ লা টুশ-ট্রেভিল। সেই জাহাজে যাত্রী ছিল ঐ যুবক।

যাত্রী বললে ভুল হয়। আরোহী। আরোহীও ঠিক নয়। জাহাজের পাচকের সাহায্যকারীর এই কাজটি যদি না জুটত তাহলে এই জাহাজে তার ওঠাই হত না। তার সমস্ত পরিকল্পনাই তাহলে রূপায়িত হত না, হয়ত অন্যভাবে রূপায়িত হত।

এর জন্যে তাকে তিন মাস ধরে ট্রেনিং নিতে হয়েছিল। কি করে পাকা রাঁধুনী হতে হয় তার ট্রেনিং।

বুদ্ধিটা দিয়েছিলেন তার বাবাই। বাবা ছিলেন সায়গনের একজন ডাক্তার। চীনা চিকিৎসাশাস্ত্রের ডাক্তার। ওষুধ দিতেন কিন্তু পয়সা নিতেন না। রোগীর বাড়াবাড়ি দেখলে সারাদিনই হয়ত থেকে যেতেন রোগীর বাড়িতে, সেখানেই কিছু খেয়ে নিতেন। সায়গনে তাঁর নাম-ডাক প্রচুর।

কিন্তু কেবল সেই জন্যে সে বাবার কাছে যায় নি। আরো কারণ ছিল। ফরাসীদের বিরুদ্ধে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েছিলেন তার বাবা। ফরাসীরা তাঁকে চালান করে দিয়েছিল ভিয়েৎনামের আন্দামান পুলো কোঁদোর দ্বীপে। মুক্তি দেবার পরেও তাঁকে স্বগৃহে বন্দী করে রাখা হয়েছিল সায়গনে। বিদ্রোহ ছিল যুবকের রক্তেও। চোখে ছিল বিপ্লবের স্বপ্ন। কিন্তু সে তখনও জানত না কোন্ পথে ঐ বিপ্লবের দিকে যাত্রা করবে।

সেই জন্যেই সে বাবার কাছে গিয়েছিল পরামর্শের জন্যে।

"আমাকে বলে দিন আমি কি করব ?" ছেলে জিজ্ঞেস করেছিল বাবাকে।

"তুমি কি করতে চাও ?"

"বিপ্লব।" দ্বিধাহীন, দ্ব্যর্থহীন জবাব। "ফরাসীদের উৎখাত করতে হবে, দেশকে স্বাধীন করতে হবে।"

চমকে উঠেছিলেন বাবা ছেলের কথা শুনে। বলে কি ? ফরাসীদের সমূলে উৎখাত করবে ? এ যে সন্ত্রাসবাদীর মত কথাবার্তা। তিনি নিজে একজন জাতীয়তাবাদী সন্দেহ নেই, কিন্তু চরমপন্থী তিনি কখনই নন। দেশে সংস্কার আসুক, ভিয়েৎনামীদের ফরাসীরা আরো বেশি অধিকার দিক, এটা তিনিও চান। কিন্তু এই পরিবর্তন, তিনি চান, আসুক ফরাসীদের সংগে সহযোগিতার মাধ্যমে। ফরাসীদের সংগে হাত মিলিয়ে।

কিন্তু মুখে তিনি বললেন না কিছুই। ছেলেকে সামনা-সামনি বাধা দিতে গেলে তার জেদকেই হয়ত উস্কে দেওয়া হবে। কয়েকদিন সময় চেয়ে নিলেন ছেলের কাছে। এরপর তাঁর পরামর্শ করার পালা। বন্ধু-বান্ধবদের সংগে আলোচনা চলল। শেষে সবাই মিলে ঠিক করলেন ছেলেকে ফ্রান্সে পাঠিয়ে দেওয়া হোক। সেখানে সমাজ অন্য, আবহাওয়া অন্য। সেখানকার পরিবেশে আছে বৃহত্তর মুক্তি। ঐ মুক্তির হাওয়ায় একবার যদি সে নিশ্বাস নিতে পারে তাহলে হয়ত তার দৃষ্টিভঙ্গি নরম হবে। বুঝতে শিখবে। তাছাড়া ফ্রান্সে আছে তাঁর এক ঘনিষ্ঠ বন্ধু। তাঁরই মত মধ্যপন্থী জাতীয়তাবাদী। ফরাসীদের সংগে শান্তিপূর্ণ সহযোগিতার নীতিতে বিশ্বাসী। একবার তাঁর তত্ত্বাবধানে গিয়ে পড়তে পারলে আর চিন্তা নেই। তিনিই তাকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ঠাণ্ডা করতে পারবেন।

তাই ছেলেকে তিনি বললেন, "তোমার ফ্রান্সে যাওয়া উচিত। সেখানেই তুমি তোমার পথের সন্ধান পাবে।"

তা-ই সে চলেছে। রাঁধুনী হিসেবেও নয়, রাঁধুনীর সহকারী হিসেবে। সামান্য চাকরী। জাহাজের খাতায় লেখা তার নামটিও অত্যন্ত সাধারণ : শুধু ছোট্ট একটি 'বা'। তার সম্বলও সামান্য : একটি মাত্র ছোট স্যুটকেশ। তার দেহও মোটেই অসামান্য নয়। রোগা, তোবড়ানো গাল, ছোটখাটো একটি মানুষ যে ভিড়ের মধ্যে সহজেই হারিয়ে যায়।

কেবল তার চোখ দুটি ছিল অসামান্য। কি গভীর আবেগে যেন সব সময় জ্বলজ্বল করছে। সে চোখের দৃষ্টি শাণিত, সে চোখের দৃষ্টি স্বপ্নময়।

ঐ চোখ নিয়েই সে তাকিয়েছিল বিলীয়মান তটরেখার দিকে। দূরে, অনেক দূরে, দিগন্তের ঐ একটি রেখার মধ্যে নিবিড় হয়ে রয়েছে তার দেশ, পাহাড়, নদী, জঙ্গল, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, অনেক ইতিহাস, অত্যাচার, অনেক ব্যথা ও বেদনা, অনেক আশা ও আকাঙ্ক্ষা, অনেক স্বপ্ন।

ক্রমে শেষ রেখাটুকুও বিলীন হয়ে গেল।

ঐ চোখে কি জল ছিল ?

আমরা জানি না। তবে পরে জেনেছি, ইতিহাস জানিয়েছে, ঐ চোখে ছিল আগুন। কারণ ১৯১২ সালের গোড়ার দিকে লা টুশ-ট্রেভিল জাহাজ যে শীর্ণকায়, অখ্যাত, সামান্য এক রাঁধুনীর সাহায্যকারীকে নিয়ে মহাসমুদ্রের বুকে পাড়ি জমিয়েছিল, সে-ই পরে ফিরে এসেছিল ভিয়েৎনামের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সর্বশ্রেষ্ঠ নেতা, মুক্তিযুদ্ধের বীর সেনানী রূপে। ১৯৪১ সালে। তখন তাঁর নাম নুয়েন আই কুয়োক। পরে হো চি মিন।

*

হো চি মিন একটি বিস্ময় ও বিশ্বাসের অপর নাম। হো চি মিন একটি স্বপ্নের প্রতীক। হো চি মিন ভিয়েৎনামের অন্তরের কামনার ভাবমূর্তি। হো চি মিন আর ভিয়েৎনাম আজ সমার্থক।

এ শুধু শোনা কথা নয় বা বইয়ে পড়া কথা নয়।

"দক্ষিণ ভিয়েৎনামে তোমরা কাকে তোমাদের নেতা বলে মনে কর ?" আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম সায়গন বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজনীতি বিজ্ঞানের কয়েকজন ছাত্রকে।

আশ্চর্য জবাব দিয়েছিল ঐ ছাত্ররা :

"দক্ষিণ ভিয়েৎনামে কোন নেতা নেই। দক্ষিণ বলুন উত্তর বলুন, আমাদের একমাত্র নেতা হলেন হো চি মিন।"

এই প্রশ্নই আমি করেছিলাম আরো অনেককে। দোকানদার, পথচারী, রেস্তোরাঁর বয়, ট্যাক্সি চালককে। তাদের সকলেরই একই উত্তর : তাদের জাতীয় নেতা একজনই, তাঁর নাম হো চি মিন।

বিগত অর্ধ শতাব্দী ধরে যাঁর ছায়া ভিয়েৎনামের পাহাড়-পর্বত, জল ও জঙ্গল পেরিয়ে কালের স্বাক্ষরের মত ইতিহাসের বুকে প্রলম্বিত রয়েছে, তিনি হো চি মিন। এই ছায়া ভোরের প্রথম উদ্ভাসের মত, সর্বব্যাপী। ইতিহাস লিখিত হয়েছে তাঁরই অঙ্গুলিহেলনে। তাঁরই নির্দেশে একটি জাতি পরিচালিত হয়েছে। তাঁরই কথায় আজও ঐ জাতির আশা ও আকাঙ্ক্ষা উদ্বেলিত হয়ে থাকে।

হো চি মিন!

হো একটি সাধারণ ভিয়েৎনামী পারিবারিক নাম। 'চি' মানে আকাঙ্ক্ষা। আর 'মিন' অর্থ প্রজ্ঞা। অর্থাৎ প্রজ্ঞার জন্যে আকাঙ্ক্ষা যাঁর বৈশিষ্ট্য তিনিই হো চি মিন।

দেশকে তিনি পরাধীনতার অচেতনতা থেকে স্বাধীনতার চেতনায় উদ্বুদ্ধ করতে চেয়েছেন, তাই তাঁর নাম হো চি মিন।

হো চি মিনের নেতৃত্বের তুলনা নেই। ত্রিশ বছর তিনি দেশের বাইরে ছিলেন, কিন্তু ভিয়েৎনামের মুক্তি-আন্দোলনের গতি একদিনের জন্যেও শিথিল হয় নি। নিজে তিনি বন্দুক ধরেন নি একদিনও কিংবা পরিচালনা করেন নি কোন কম্যান্ড। কিন্তু ভিয়েৎনামের মুক্তিযুদ্ধের তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ স্ট্র্যাটিজিস্ট। এত অনমনীয়, অদ্ভুত ও বিপজ্জনক বিপ্লবী জাতীয়তাবাদী আর ভিয়েৎনামে আর দ্বিতীয় নেই, এই অভিমত প্রায় সকল পশ্চিমী পর্যবেক্ষকেরই। ১৯৪৭ সালে ফরাসী সরকার হো চি মিনের সংগে দেখা করে মীমাংসা আলোচনা আরম্ভ করবার জন্যে যাঁকে পাঠিয়েছিলেন, সেই পল মুস ফিরে গিয়ে বলেছিলেন : "তিনি একজন আপোষহীন ও দুর্নীতির স্পর্শমুক্ত বিপ্লবী, ঠিক সেন্ট যাস্টের মত।"

পল মুস একটুও বাড়িয়ে বলেন নি। ভিয়েৎনামের মানুষের কাছে আজও তিনি দেবতার মতই পূজিত হন। ঘরে ঘরে তাঁর ছবি 'ঠাকুরের আসনে' দেবতার পাশেই রেখে দেয় তারা। সেই ছবির সামনে আনত হয়ে চাষীরা মাঠে কাজ করতে যায়, শ্রমিকরা কল-কারখানায়।

ভিয়েৎনামে একটি মায়া ঝাঁপির উপাখ্যান প্রচলিত আছে। যদি কেউ কখনো কোন বিরাট সমস্যার সম্মুখীন হয়, তাহলে ঐ ঝাঁপি খুললেই সংগে সংগে তার সমাধান পেয়ে যাবে।

ভিয়েৎনামীদের কাছে হো চি মিন হচ্ছেন সেই মায়া ঝাঁপি। ঐ ঝাঁপি খুললেই সকল বিপদ, সকল সংকটের অবসান। ভিয়েৎনামীরা এ-কথা বিশ্বাস করে। তাঁর নামের মধ্যেই একটা আশ্চর্য যাদু আছে। ঐ যাদু একটা গোটা জাতিকে অর্ধ শতাব্দী ধরে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। গ্রামে গ্রামে শহরে শহরে তরুণ ও তরুণীরা ঐ যাদুর প্রেরণায় চঞ্চল হয়ে জেগে উঠেছে, লড়াই করেছে, প্রাণ দিয়েছে।

তাঁর নাম উচ্চারিত হত ভয়ে, ভীতিতে, ফিসফিস করে, যখন ফরাসীরা ছিল ভিয়েৎনামে। তাঁর উপস্থিতি ছিল ফরাসীদের কাছে বাতাসের মত, অদৃশ্য কিন্তু অনুভূত। কেঁপে উঠত তারা। শঙ্কিত হত। কিন্তু কিছু করার ছিল না। তাঁকে দেখা যেত সর্বত্র, আবার তাঁকে দেখা যেত না কোথাও। ফরাসীর কারাগার তাঁকে বন্দী করার জন্যে তৈরি

হয় নি। অনেকবারই তিনি হাতের কাছে ধরা দিয়েছেন, কিন্তু কোনদিনই ধরা পড়েন নি। পরণে খাকি হাফপ্যান্ট, গায়ে সাধারণ কুর্তা, পায়ে পুরনো মোটরের টায়ারের চটি, এই পরে তিনি ঘুরে বেড়াতেন পাহাড়ে-পর্বতে, বনে-জঙ্গলে, শহরে-গ্রামে। ডাক দিয়ে যেতেন একটা জাগ্রত কিন্তু নিরুপায় জাতিকে। স্বেচ্ছাসেবক সংগ্রহ করতেন। তাদের পাঠাতেন চীনে। অস্ত্রশস্ত্রে দীক্ষা দিয়ে আবার ফেরৎ পাঠাতেন ভিয়েৎনামে। লড়াই চলতে থাকত।

একবার ধরা পড়েছিলেন হো। চীনাদের হাতে। চীনে তখন কুয়োমিন্টাংদের রাজত্ব। তারা তাঁকে ফরাসীদের গুপ্তচর হিসেবে গ্রেপ্তার করেছিল। প্রায় দু' বছর তাঁকে ঘোরানো হয় এক জেল থেকে অন্য জেলে। একবার তাঁকে ক্রমাগত আশিদিন ধরে হাঁটানো হয়েছিল পাহাড়ী রাস্তায়, পায়ে বেড়ি, হাত পিছমোড়া করে বাঁধা। ঐ নিদারুণ অত্যাচারে তাঁর চোখের দৃষ্টি প্রায় নষ্ট হতে বসেছিল। "আমার দাঁত পড়ে যেতে আরম্ভ করে", তিনি পরে বলেছিলেন। "একবার আমি আয়নায় আমার দিকে তাকিয়েছিলাম, তারপর আর তাকাতে ইচ্ছা করে নি। অস্থিচর্মসার যাকে বলে আমি হয়ে পড়েছিলাম তা-ই। সারা শরীর পচা ঘায়ে ভরে গিয়েছিল।"

ঐ নিঃসঙ্গতার ও অত্যাচারের মুহূর্তে যখন তাঁর বেদনা শরীরের ওপর ভার হয়ে ভেঙে পড়তে চাইত, তখন তাঁর চোখের জল রূপান্তরিত হত কবিতায়। কবিতার মধ্যে তিনি মুক্তি খুঁজতেন কারাগার থেকে। কবিতার মধ্যেই তিনি ঘনিষ্ঠ হতে চাইতেন তাঁর দেশের সঙ্গে, দেশের মানুষের সঙ্গে, পাহাড়, নদী আর বনানীর সঙ্গে। তাঁর দেশপ্রেমের মতই সহজ ছিল তাঁর কবিতা, একটি বেদনাহত মনের অন্তস্তল থেকে উৎসারিত, পাহাড়ী হাওয়ার মতই স্বতঃস্ফূর্ত।

"ফটকের সামনে রক্ষী দাঁড়িয়ে আছে
তার রাইফেল নিয়ে।
ওপরে, এলোমেলো মেঘ ভাসিয়ে
নিয়ে চলেছে চাঁদকে।
ছারপোকার দঙ্গল ভিড় করে আছে
চারদিকে,
যেন শত্রুর ট্যাঙ্ক কোন যুদ্ধক্ষেত্রে।
আর মশারা গড়ছে স্কোয়াড্রন,
আক্রমণ করছে
ঠিক যেন জঙ্গী বিমানের মত।
আমার হৃদয় ছুটে চলেছে
এক হাজার 'লি' অতিক্রম
করে আমার দেশের মাটির
স্পর্শ নেবার জন্যে।
আমার স্বপ্ন
জড়ানো রয়েছে বিষণ্ণতার
হাজার সুতোর জটের মতো।
অপরাধী নই,
তবু পুরো একটি বছর আমার
কেটে গেল কারাগারের অন্তরালে।
চোখের জলের কালি দিয়ে আমার
ভাবনাগুলিকে আমি রূপ দিচ্ছি
কবিতায়।"

ঐ প্রচণ্ড অত্যাচারের ধাক্কা হো আজও কাটিয়ে উঠতে পারেন নি। তাঁর শরীর আজও শীর্ণ। মুখের ভাঙন প্রায় তেমনিই আছে। ভাঙে নি কেবল তাঁর মনের দৃঢ়তা, তাঁর সংকল্প।

"আমার দেশই আমার দল", তিনি বলেছিলেন একবার। "আমার কার্যসূচী হল স্বাধীনতা।"

এই কথা তিনি এখনও বলতে

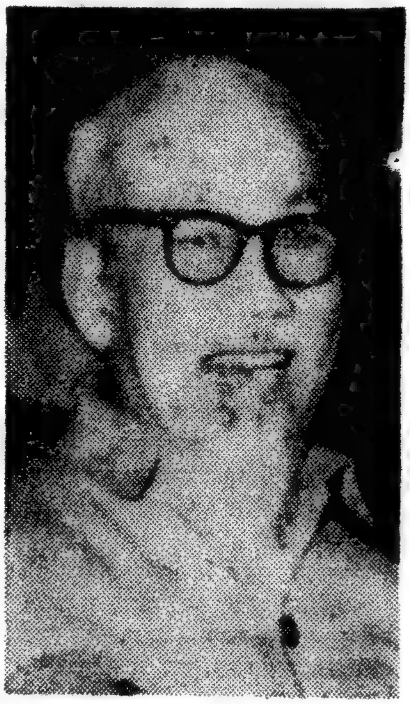

হো চি মিন

পারেন। কারণ তাঁর দেশের স্বাধীনতা আজও পূর্ণ হয় নি।

এবং বলেওছেন। "আমরা আত্মসমর্পণ করব না, কখনও না। কারণ এই যুদ্ধ দেশপ্রেমের যুদ্ধ, ন্যায়ের যুদ্ধ, এবং আমরা এই যুদ্ধ চালিয়ে যেতে দৃঢ়-সংকল্প। যদি পাঁচ, দশ, কুড়ি কি তার চেয়েও বেশি সময় লাগে তবুও।"

আমরা অবাক না হয়ে পারি না, যখন ভাবি হো চি মিনের বয়েস এখন আটাত্তর।

*

১৯১২ সালের গোড়ার দিকে একদিন এই লোকই একটি মালবাহী ফরাসী জাহাজে রাঁধুনীর সহকারীর কাজ নিয়ে ফ্রান্সের পথে রওনা হয়েছিল। তার পকেটে বাবার লেখা একটি চিঠি, প্যারিসে তাঁর এক বন্ধুর উদ্দেশে।

ফ্রান্সে পৌঁছে হো তাঁর পিতৃবন্ধুর ওখানেই উঠলেন। কিছুদিন থাকলেনও। কিন্তু শীগ্‌গিরই বুঝতে পারলেন, ওখানে বেশিদিন থাকা চলবে না। কারণ পিতৃবন্ধু ফান চু ত্রিনের রাজনৈতিক মতবাদের সঙ্গে তাঁর মনের কোন মিল খুঁজে পাচ্ছেন না। ফান চু ত্রিন বিশ্বাস করেন ফ্রান্সের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ সহযোগিতার পথেই ভিয়েৎনামের স্বার্থ রক্ষা করা যাবে। হো মনে করেন ঐ পথে কোনদিন স্বাধীনতা আসবে না।

হতাশ হয়ে আরো কিছুদিন জাহাজে জাহাজে ঘুরে বেড়ালেন হো চি মিন খয়ের কাজ নিয়ে। ঘুরে বেড়ালেন দেশে দেশে, ইয়োরোপে, আমেরিকায়, আফ্রিকায়।

এমনিভাবে ঘুরে বেড়াবার ফাঁকে একবার তিনি এসেছিলেন সায়গনে, বাবার সঙ্গে দেখা করবার জন্যে। দেখা হয়েছিল, কিন্তু তার ফল হয়েছিল অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক। দেখা মাত্রই বাবা একটা বেত নিয়ে তেড়ে এসেছিলেন ছেলেকে। ফান চু ত্রিন এক চিঠিতে তাঁকে লিখে জানিয়েছিলেন ছেলের রাজনৈতিক মতবাদের কথা।

ছেলে সেই যে বেরিয়ে গিয়েছিল পিতৃগৃহ থেকে তারপর আর কোনদিন ফিরে আসে নি। পরিবারের সঙ্গেও সম্পর্ক রাখে নি আর কোন। সেদিন সেই মুহূর্তে সে বুঝে নিয়েছিল যে, যে-পথে সে চলতে চাইছে সে পথে তাকে চলতে হবে একাই।

ঐ পথ এরপর যেখানে নিয়ে গিয়েছিল হো চি মিনকে, সেটা লণ্ডন। ১৯১৩ সালে। ১৯১৭ সাল পর্যন্ত তিনি ছিলেন লণ্ডনে, বিখ্যাত কার্লটন হোটেলে আরো বিখ্যাত ফরাসী রাঁধুনী এস্কোফিয়ে'র সাহায্যকারী হিসেবে। কার্লটন হোটেলের রান্নাঘরে আলু-পেঁয়াজ কাটতে কাটতে তিনি ভাবতেন কিভাবে কাজ আরম্ভ করা যায়। তখনো কোন ধারণা তাঁর মনে দানা বাঁধে নি। কেবল মাঝে মাঝে চীনা ও ভারতীয় শ্রমিকদের গুপ্ত সংস্থা ওভারসীজ ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের সভা-সমিতিতে যোগ দিতেন।

১৯১৭ সালের পর তিনি আবার গেলেন ফ্রান্সে। তাঁর নিজেরই ভাষায় "কখনো ফটোগ্রাফারের দোকানে রি-টাচার হিসেবে, কখনো চীনা পুরাদ্রব্যের (ফ্রান্সে তৈরি!) গায়ে রঙ লাগানোর কাজ নিয়ে আমি জীবিকা নির্বাহ করতাম। আর ভিয়েৎনামে ফরাসী ঔপনিবেশিকদের অপরাধের নিন্দা করে প্রচারপত্র বিলি করতাম।"

প্যারিসে তখন প্রায় ৬০ হাজার প্রবাসী ভিয়েৎনামী ছিল। হো তাদের

বৈজ্ঞানিকদের আবিষ্কার
ব্যথা-বেদনা তাড়াতাড়ি দূর করবার আধুনিক উপায়

নতুন মাইক্রোফাইণ্ড 'অ্যাসপ্রো'

এখন আমাদের দেশে পাওয়া যাচ্ছে!

যে কোনো ব্যথা-বেদনাই আমাদের সমস্যা: 'অ্যাসপ্রো' নিকোলাস ইনস্টিটিউটের বৈজ্ঞানিকরা অনেক গবেষণার পর ব্যথা-বেদনা দূর করার জন্য আবিষ্কার করেছেন নতুন মাইক্রোফাইণ্ড 'অ্যাসপ্রো'—আরো তাড়াতাড়ি ব্যথা-বেদনা দূর করার নতুন উপায়।

মাইক্রোফাইণ্ড বলতে কি বোঝায়? মাইক্রোফাইণ্ড বলতে বোঝায় যে, ব্যথা-বেদনা দূর করার যে উপাদানগুলি 'অ্যাসপ্রো'-তে মেশানো হয়, তা ৩০ গুণ বেশী সূক্ষ্ম করা হয়েছে। এক বিশেষ পদ্ধতিতে তৈরী এই নতুন ট্যাবলেটে এখন প্রায় ১৫ কোটি সূক্ষ্ম কণা রয়েছে। এর ফলে বেদনা নাশ করবার শক্তি বিশেষভাবে বেশী মাত্রা শরীরে ছড়িয়ে পড়ে এবং মুহূর্তের মধ্যে ব্যথা-বেদনা দূর করে।

মুহূর্তের মধ্যে কাজ শুরু হয়ে যায়—অনেকক্ষণ ধরে কাজ চলতে থাকে: নতুন মাইক্রোফাইণ্ড 'অ্যাসপ্রো'-র ব্যথা দূর করবার সক্রিয় উপাদানটি অতি সহজেই এবং খুবই শীঘ্রই শরীরের সঙ্গে মিশে গিয়ে ৫ থেকে ৭ ঘণ্টা পর্যন্ত শরীরের মধ্যে থাকে। সেইজন্যেই মাইক্রোফাইণ্ড 'অ্যাসপ্রো' আরও তাড়াতাড়ি ব্যথা-বেদনা দূর ক'রে দেয় এবং তার ফল অনেকক্ষণ স্থায়ী হয়।

অতি সহজেই আপনি খেতে পারেন: নতুন মাইক্রোফাইণ্ড 'অ্যাসপ্রো' আপনি যেভাবে খুশী খেতে পারেন—শুধু জলে, জলের সঙ্গে মিশিয়ে অথবা এক গ্লাস জল বা যে কোনো গরম পানীয়ের সঙ্গে।

নিম্নোক্ত প্রকারের বেদনায় নতুন মাইক্রোফাইণ্ড 'অ্যাসপ্রো' খাবেন: ব্যথা-বেদনা • মাথাব্যথা • দাঁতব্যথা • বাতব্যথা • পিঠে বেদনা • সর্দি-জ্বর-তাপ • ফ্লু ডেঙ্গু জ্বর • গলাব্যথা।

মাত্রা: প্রাপ্তবয়স্ক: দুইটি ট্যাবলেট। প্রয়োজন হলে আবার খাবেন। শিশুদের জন্য: একটি ট্যাবলেট বা আপনার ডাক্তারের নির্দেশমত।

নতুন মাইক্রোফাইণ্ড 'অ্যাসপ্রো' কিভাবে কাজ করে দেখুন

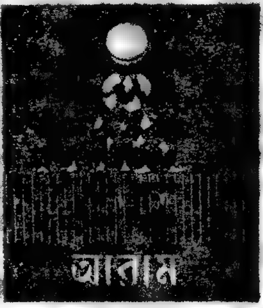

ট্যাবলেটের কণাগুলির আকার বড় বড় হয়, তাই শরীরের সঙ্গে মিশে যেতে দেরী হয়—আপনার আরাম পেতেও দেরী লাগে।

'অ্যাসপ্রো' মাইক্রোফাইণ্ড হওয়ার ফলে নতুন মাইক্রোফাইণ্ড 'অ্যাসপ্রো'-র প্রতিটি ট্যাবলেটে প্রায় ১৫ কোটি সূক্ষ্ম কণা রয়েছে। তাই শরীরের সঙ্গে সহজে-সহজে মিশে যায় এবং খুব তাড়াতাড়ি আরাম উপলব্ধ হয়।

নতুন মাইক্রোফাইণ্ড 'অ্যাসপ্রো' ব্যথা-বেদনা দূর করার আধুনিক উপায়

নতুন মাইক্রোফাইণ্ড
অ্যাসপ্রো
তাড়াতাড়ি ব্যথা-বেদনা দূর করে

নিকোলাস-এর তৈরী

R.G.6.67 BEN

মধ্যে কাজ আরম্ভ করে দিলেন। তাদের কয়েকজনকে নিয়ে বার করলেন ল্য পারিয়া ও ভিয়েৎনাম হন নামে দুটি কাগজ। ফরাসী জাহাজে যে সব ভিয়েৎনামী কর্মী কাজ করত তাদের সাহায্যে ঐ কাগজ পাচার করা হত ভিয়েৎনামে।

ঐ সময়েই তিনি ফ্রান্সের বিশিষ্ট বামপন্থী নেতাদের সঙ্গে পরিচিত হন ঃ লেঁয় ব্লুম, মার্সেল কাসাঁ, মারিয়াস মুতে, এবং আরো অনেকে। তাঁদের প্রভাবেই তিনি ফরাসী সোস্যালিস্ট পার্টিতে যোগ দেন।

কিন্তু এই যোগদানের পেছনে, এটা লক্ষ্য করা দরকার, অন্য কোন রাজনৈতিক কারণ ছিল না। "আমি যোগ দিয়েছিলাম", তিনি লিখেছেন, "কারণ এই ভদ্রমহোদয়া ও ভদ্রমহোদয়গণ আমার প্রতি সহানুভূতি দেখিয়েছিলেন, উৎপীড়িত মানুষের সংগ্রামের প্রতি সমর্থন জানিয়েছিলেন।"

১৯২০ সালের ২৫ থেকে ৩০ ডিসেম্বর তুর-এ ফরাসী সোস্যালিস্ট পার্টির যে অষ্টাদশ জাতীয় কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়েছিল, হো চি মিন তাতে ভিয়েৎনামের প্রতিনিধি হিসেবে যোগ দেন। ঐ অধিবেশনেই ফ্রান্সে কম্যুনিস্ট পার্টি স্থাপন করার এবং লেনিনের তৃতীয় আন্তর্জাতিকে যোগদানের প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল। পশ্চিমী পর্যবেক্ষকেরা এই ঘটনার উল্লেখ করে প্রচার করে থাকেন যে, এরপর থেকে হো চি মিন জাতীয় স্বাধীনতার সংগ্রামকে পরিত্যাগ করে আন্তর্জাতিক কম্যুনিস্ট আন্দোলনের স্বার্থরক্ষার কাজে আত্মনিয়োগ করেন।

কিন্তু তুর কংগ্রেসে হো চি মিন যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন তা উদ্ধৃত করেই দেখিয়ে দেওয়া যায় যে, এই বিশ্লেষণ অপব্যাখ্যা ছাড়া আর কিছু নয়। দেশপ্রেম ছাড়া তখনও হো'র দ্বিতীয় কোন চিন্তা ছিল না।

"আজ", তিনি পরিষ্কারভাবেই বলেছিলেন, "আপনাদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে বিশ্ব বিপ্লবের সেবা করার বদলে আমি এখানে এসেছি গভীর বেদনা নিয়ে সোস্যালিস্ট পার্টির সদস্য হিসেবে আমার দেশের বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদীদের ঘৃণিত অপরাধের বিরুদ্ধে বলবার জন্যে।...... আমাদের ওপর কেবল নির্লজ্জ অত্যাচার আর শোষণই চালানো হয় নি, আমাদের জীবনকে নির্দয়ভাবে বিষাক্ত করে তোলা হয়েছে।"

এর পর হো সংক্ষেপে ফরাসীদের অত্যাচারের একটা আভাস উপস্থিত সদস্যদের দেন। তার বিস্তারিত কাহিনী তিনি পরে লিখেছিলেন ল্য পারিয়া কাগজে। চোখের জলে লেখা সেই সব কাহিনী। সে সব কাহিনী ভয়াবহ। হো'র পক্ষে তা ভুলে যাওয়া কিছুতেই সম্ভব ছিল না। এর প্রতিকারের চাইতে গুরুত্বপূর্ণ আর কোন চিন্তা তাঁর থাকতেই পারে না।

কাহিনীর কি শেষ আছে?

কেবল কয়েক সেকেন্ডের জন্যে একজন আন্নামী তাকিয়েছিল জানালা দিয়ে একজন ফরাসী বাড়ির ভেতরে। উক্ত ফরাসীর বুলেটের গুলী তার মাথার খুলি ভেদ করে চলে গিয়েছিল।

ম' রে নামে একজন বিল্ডিং কণ্ট্রাকটর একজন আন্নামীকে হাত-পা বেঁধে কুকুর দিয়ে কামড়িয়ে লাথি মেরে খতম করে দিয়েছিল।

একদিন হাইফং-এর একজন ফরাসী মেকানিক ম' অঁরি রাস্তায় একটা গোলমাল শুনে দরজা খুলে বেরিয়ে এসে দেখলেন, একটি আন্নামী মেয়ে একটি পুরুষের তাড়া খেয়ে দৌড়চ্ছে। মিঃ অঁরির দরজা খোলা পেয়ে মেয়েটি তাড়াতাড়ি সেখানে ঢুকে পড়ল।

ম' অঁরি ভাবলেন বুঝি কোন নেটিভ মেয়েটিকে তাড়া করেছে। তিনি সঙ্গে সঙ্গে তাঁর শিকারের বন্দুকটি নিয়ে এসে গুলী করলেন। লোকটি সঙ্গে সঙ্গে মরে পড়ে গেল।

তখন দেখা গেল যে, সে একজন ইয়োরোপীয়। পরে ম' অঁরিকে প্রশ্ন করা হয়েছিল: "আপনি গুলী করলেন কেন?"

উত্তরে বলেছিলেন ম' অঁরি: "আমি ভেবেছিলাম লোকটা একজন নেটিভ।"

একবার ফরাসী সৈন্যরা একটি গ্রামে গিয়ে হাজির হলে গ্রামের সমস্ত লোক ভয়ে পালিয়ে গেল। কেবল পড়ে রইল দুজন বৃদ্ধ, একজন তরুণী এবং বুকে একটি দুধের শিশু এবং হাতে আট বছরের একটি মেয়েকে ধরে একজন মা। এরা পালাবার সময় পায় নি।

সৈন্যরা এসে তাদের কাছে টাকাপয়সা চাইল, মদ আর আফিং দিতে বলল। গ্রামের মেয়ে ওরা, ফরাসীদের ভাষা বুঝবে কেন। আর তাইতে সৈন্যরা গেল ক্ষেপে। রাইফেলের কুঁদা দিয়ে একজন বৃদ্ধকে মেরেই ফেলল ওরা। আর অপর বৃদ্ধকে ওরা পুড়িয়ে মারল ধীরে ধীরে, কাঠের আগুন জেলে। তারপর মহিলা দু'জন আর আট বছরের মেয়েটির ওপর অত্যাচার করল পাশবিকভাবে।

তারপর? হ্যাঁ, তারও পর আছে।

ক্লান্ত সৈন্যরা এরপর হত্যা করল তরুণীটিকে। মা তার দুধের শিশুটিকে নিয়ে সেই ফাঁকে পালিয়ে যেতে পেরেছিল কয়েক শ' গজ দূরে একটা ঝোপের মধ্যে। সেখানে বসে বসে সে দেখল তার আট বছরের মেয়েটি চিৎ হয়ে মাটিতে পড়ে আছে। সারা শরীর বাঁধা, মুখে কাপড় গোঁজা। আর একজন সৈন্য ধীরে ধীরে তার বেয়োনেটটি একবার মেয়েটির পেটের মধ্যে ঢোকাচ্ছে আরেকবার বার করছে। এইভাবে কিছুক্ষণ করার পর সে মৃত মেয়েটির আঙুল কেটে আংটি খুলে নিল। শেষে গলাটা কেটে ফেলে তার নেকলেসটি বার করে নিল।

এই ছিল ফরাসী অত্যাচারের ধরণ। এই অত্যাচারের তুলনা পাওয়া ভার। হো চি মিন লিখেছেন: "গান্ধী ও ডি ভ্যালেরারা যদি কোন ফরাসী উপনিবেশে জন্ম নিতেন তাহলে তাঁরা অনেক আগেই স্বর্গে আরোহণ করতেন।"

এই অত্যাচারের কথা মনে রেখেই তিনি তুর কংগ্রেসের প্রতিনিধিদের উদ্দেশে বলেছিলেন ঃ "সমগ্র মানবজাতির পক্ষ থেকে, সোস্যালিস্ট পার্টির সকল সদস্যের পক্ষ থেকে আমরা আপনাদের কাছে আবেদন জানাচ্ছি! কমরেডগণ, আমাদের বাঁচান!"

যদি কেউ এর পরেও এই প্রশ্ন করেন যে, হো সোস্যালিস্ট পার্টির কাছে সাহায্য চাইতে গিয়েছিলেন কেন, তাহলে কেবল একটিই উত্তর দেওয়া যায়। অত্যন্ত সোজা এবং অত্যন্ত সরল উত্তর। তিনি অন্য কোথাও সাহায্যের প্রতিশ্রুতি পান নি বলে।

একথা বিশেষভাবে মনে রাখা দরকার যে, ভার্সাই শান্তি চুক্তিতে সই করবার জন্যে মার্কিন প্রেসিডেণ্ট উইলসন যখন ফ্রান্সে এসেছিলেন তখন হো চি মিন ভিয়েৎনাম সম্পর্কে একটি আট-দফা কার্যসূচী তাঁর কাছে পেশ করার জন্যে চেষ্টা করেছিলেন। হো'র দাবি ছিল স্বায়ত্তশাসনের অধিকার দেওয়া হোক, গণতান্ত্রিক স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করা হোক, রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি দেওয়া হোক, ফরাসী ও ভিয়েৎনামীদের অধিকার সমান করা হোক এবং বাধ্যতামূলক শ্রম, লবণ কর এবং বাধ্যতামূলক মদ খাওয়া বাতিল করা হোক।

কিন্তু হো চি মিন চেষ্টা করেও প্রেসিডেন্ট উইলসনের সঙ্গে দেখা করতে পারেন নি। ভিয়েৎনামী স্বাধীনতা সংগ্রামে মার্কিন সমর্থন পাবার জন্যে তাঁর আশা ধূলিসাৎ হয়ে গিয়েছিল।

*

এর পর থেকে হো যদি মার্ক্সবাদ লেনিনবাদের সঙ্গে জড়িয়ে গিয়ে থাকেন তাহলে সেটা অস্বাভাবিক কিছুই নয়। ঔপনিবেশিক জাতিগুলির মুক্তিসংগ্রাম সম্পর্কে লেনিন ও তৃতীয় আন্তর্জাতিক-এর একটা সুস্পষ্ট বক্তব্য ছিল যা হো'কে অভিভূত করেছিল।

আমরা জানি, কম্যুনিস্ট আন্তর্জাতিকের চতুর্থ কংগ্রেসে যোগ দেবার জন্যে হো ১৯২২ সালে মস্কো গিয়ে-

ছিলেন। তারপর ১৯২৩ সালে আবার গিয়েছিলেন আন্তর্জাতিক কৃষক কংগ্রেসে যোগ দেবার জন্যে। ১৯২৪ সালে তিনি আরো দীর্ঘ সময়ের জন্যে যান এবং মার্কসবাদ-লেনিনবাদ ও বলশেভিক কলা-কৌশলের পাঠ নেবার জন্যে ইস্টার্ন ওয়ার্কার্স ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হন।

সেখান থেকে ১৯২৫ সালে চীনে। প্রথম প্রথম চীনেও তাঁর করবার বেশি কিছু ছিল না। তিনি সিগারেট আর খবরের কাগজ ফিরি করে তাঁর জীবিকা নির্বাহ করতেন।

তারপর তিনি এলেন ক্যান্টনে, বোরোদিনের সেক্রেটারী-দোভাষী হয়ে। সান ইয়াৎ-সেনকে সাহায্য করার জন্যে কমিনটার্ন থেকে যে উপদেষ্টা-মিশন পাঠানো হয়েছিল, বোরোদিন ছিলেন তার প্রধান। তখন কুয়োমিন্টাং ও কম্যুনিস্টদের মধ্যে মধুচন্দ্রিমার যুগ চলছে। ক্যান্টনে একটি বিপ্লবী সরকার স্থাপিত হয়েছে। ক্যান্টনের কাছেই হোয়ামপোয়ার সামরিক অ্যাকাডেমি থেকে বিপ্লবের যোদ্ধারা অস্ত্র-শস্ত্রে দীক্ষা নিয়ে বেরিয়ে আসছে।

ক্যান্টনের ঐ বিপ্লবী আবহাওয়ায় হো তাঁর পথের সন্ধান পেয়েছিলেন। সান ইয়াৎ-সেনের বিপ্লবের উৎসস্থল ক্যান্টন তখন ছিল এশিয়ার বিপ্লবীদের মিলনের স্থান। তা ছাড়া ক্যান্টন ছিল ভিয়েৎনামের বাইরে ভিয়েৎনামী জাতীয়তাবাদীদের প্রধান আশ্রয়স্থল। হো এদের মধ্যে কাজ আরম্ভ করে দিলেন। এশিয়ার উৎপীড়িত জাতি সংগঠন নামে একটি প্রতিষ্ঠানের পত্তন করলেন তিনি। গঠন করলেন ভিয়েৎনামী বিপ্লবী যুব-সমিতি। এই সমিতির কাজ ছিল হোয়ামপোয়ার সামরিক অ্যাকাডেমিতে ট্রেনিং দিয়ে ভিয়েৎনামে ফেরৎ পাঠানো। সেখানে তারা গঠন করত গোপন সেল, বিপ্লবের ক্ষেত্র প্রস্তুত করবার জন্যে।

কিন্তু ক্যান্টনের এই কার্যকলাপ চলতে পারল না বেশিদিন। ১৯২৭ সালে কুয়োমিন্টাং ও কম্যুনিস্টদের সম্পর্কে ধরল ভাঙন। চিয়াং কাই-শেক কম্যুনিস্টদের দমন করবার জন্যে এক রক্তাক্ত অভিযান আরম্ভ করলেন। ক্যান্টন ও সাংহাইয়ে হাজার হাজার কম্যুনিস্ট নিহত হল। মাইকেল বোরোদিন ও তাঁর উপদেষ্টা মিশন কোনমতে প্রাণ নিয়ে মস্কো ফিরে গেলেন।

বাধ্য হয়ে ক্যান্টনের পাট ওঠাতে হয় হো'কেও। কিন্তু বিপ্লবী যুব-সমিতির কাজ যাতে বন্ধ না হয় তার জন্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি তিনি করে গিয়েছিলেন। এবং যাবার সময় বলে গিয়েছিলেন তাঁর সহকর্মীদের কাছেঃ "এই আকস্মিক বিপর্যয়ে আমাদের ভেঙে পড়লে চলবে না। মনে রাখবেন, ঝড় না বইলে পাইন আর সাইপ্রেস গাছের শক্তির পরীক্ষা হয় না।"

হো চি মিনকে আমরা এর পর দেখি থাইল্যান্ডে। সেখানে থেকে তিনি প্রবাসী ভিয়েৎনামীদের মধ্যে তাঁর কার্যকলাপ চালিয়ে যেতে লাগলেন, যেমন চালিয়েছিলেন ক্যান্টনে। এই সময় তাঁর প্রচারের হাতিয়ার ছিল থান্‌নিয়েন নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা এবং কাজের মাধ্যম ছিল ভিয়েৎনামী পারস্পরিক সহায়তা সমিতি নামে একটি সংগঠন।

এরপর দৃশ্যপট পরিবর্তিত হল হং-কং-এ। সেখানেই ১৯৩০ সালের ৩রা ফেব্রুয়ারী এক ঐতিহাসিক সম্মেলনে আনুষ্ঠানিকভাবে ইন্দোচীন কম্যুনিস্ট পার্টি স্থাপন করা হয়েছিল।

হো এবং তাঁর সহকর্মীদের পক্ষে সময়টা ছিল অত্যন্ত অনুকূল। ১৯৩০ সালের ফেব্রুয়ারীতে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের চেষ্টা ব্যর্থ হবার পর জাতীয়তাবাদীদের মধ্যে যখন একটা গভীর হতাশা ও শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছিল, সেই সময়েই ভিয়েৎনামী কম্যুনিস্ট পার্টির আত্মপ্রকাশ। স্বভাবতই গোড়া থেকেই এর প্রতি জনসাধারণের সহানুভূতি সহজাতভাবে এসে পড়েছিল। এই সহানুভূতি এসেছিল আরো একটা গভীর কারণ থেকে। ফরাসী

সাপ্তাহিক বসুমতীর মালিকানা ও অন্যান্য তথ্য

১। প্রকাশের স্থান—কলিকাতা।

২। প্রকাশের কাল—সাপ্তাহিক।

৩। মুদ্রাকরের নাম—সুকুমার গুহ-মজুমদার, জাতি—ভারতীয়, ঠিকানা—১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলিকাতা—১২।

৪। প্রকাশকের নাম—সুকুমার গুহ-মজুমদার, জাতি—ভারতীয়, ঠিকানা—১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলিকাতা—১২।

৫। সম্পাদিকার নাম—জয়ন্তী সেন, জাতি—ভারতীয়, ঠিকানা—১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলিকাতা—১২।

৬। শতকরা ১ ভাগের অধিক মূলধনের মালিক—

(১) শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়
১৩২, নগেন্দ্রনাথ রোড, সাতগাছি, দমদম, কলিকাতা—২৮।

(২) শ্রীহরেন্দ্রনাথ ঘোষ—৪৮, হিন্দুস্থান পার্ক, কলিকাতা।

(৩) শ্রীকৃষ্ণকিশোর কর
১১।বি, রমেশ মিত্র রোড,
কলিকাতা।

(৪) শ্রীমুরারিমোহন দত্ত
১১।এ, নিবেদিতা লেন,
কলিকাতা।

(৫) শ্রীহৃষীকেশ ঘোষ
৬১।৬।এ, মুর এভেনিউ
কলিকাতা।

(৬) শ্রীমতী লতিকা সান্যাল
৯৬।১।এ, ল্যান্সডাউন রোড,
কলিকাতা।

(৭) শ্রীপ্রাণতোষ ঘটক
১১১, বৈঠকখানা রোড,
কলিকাতা।

(৮) শ্রীশম্ভুনাথ মুখার্জী
শ্রীশশাঙ্কশেখর মুখার্জী
৫০।এ, সুরী লেন,
কলিকাতা।

(৯) শ্রী এস, জি, মজুমদার
শ্রীসুধাংশু রায়
৪৫।এ, কড়েয়া রোড
কলিকাতা।

(১০) শ্রীপঙ্কজ চোংদার
গুস্করা, বর্ধমান।

(১১) শ্রীধীরেন্দ্রনাথ দাস
শ্রীদেবকুমার চক্রবর্তী
৫, শাঁখারীটোলা স্ট্রীট,
কলিকাতা।

(১২) শ্রীআদিত্যনারায়ণ রায়
শ্রীপ্রবোধ চ্যাটার্জী
৭১, আপার চিৎপুর রোড,
কলিকাতা।

(১৩) শ্রীবিশ্বনাথ দত্ত
শ্রীপ্রভাতকুমার মুখার্জী
১৩৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলিকাতা।

(১৪) কুমারী কৃষ্ণা সেন
৯, রাইসিনা রোড, নিউ দিল্লী

(১৫) কুমারী শ্যামলী সেন
৯, রাইসিনা রোড, নিউ দিল্লী।

(১৬) শ্রীঅনিন্দ্য সেন
৯, রাইসিনা রোড, নিউ দিল্লী।

(১৭) শ্রী এস, এন, বোস
৬০।এ, চক্রবেড়িয়া রোড—নর্থ,
কলিকাতা।

আমি, শ্রীসুকুমার গুহ মজুমদার, এতদ্বারা ঘোষণা করিতেছি যে, উপরে প্রদত্ত তথ্য আমার জ্ঞান ও বিশ্বাসমত সত্য।

(স্বাক্ষর)
সুকুমার গুহ মজুমদার
প্রকাশক

শোষণের দরুণ এবং বিশ্বব্যাপী মন্দার ফলে ভিয়েৎনামী কৃষক সম্প্রদায় দারিদ্র্যের চরমতম সীমায় পৌঁছেছিল। এবং ভিয়েৎনামের আশি শতাংশ লোকই হচ্ছে কৃষিজীবী। ট্যাক্স দেওয়া তো দূরের কথা, খাবার কেনার মত পয়সাও তাদের হাতে ছিল না। অথচ খাবার ছিল হাস্যকর রকমে সস্তা। এই বৈপরীত্য গ্রামাঞ্চলে একটা বিস্ফোরক অবস্থার সৃষ্টি করে তুলেছিল। কম্যুনিস্ট পার্টির দশ দফা কর্মসূচীতে যখন কৃষকদের এই অসহনীয় অবস্থার প্রতিকারের দাবি জানানো হল তখন স্বভাবতই এই সংগঠনের পেছনে এসে দাঁড়াতে তাদের দ্বিধা হয় নি।

তার প্রমাণ পাওয়া গিয়েছিল ১৯৩০ সালের মে দিবসে, যেদিন গ্রামে গ্রামে দরিদ্র চাষী, নিম্ন চাষী, বুভুক্ষু চাষীর দল কাতারে কাতারে মিলিত হয়েছিল বিরাট বিরাট জনসভায়, দৃপ্ত প্রতিবাদে। তারপর বার করেছিল ভুখা মিছিল, ঘিরে ফেলেছিল ফরাসী শোষণের কেন্দ্রগুলিকে। অচল করে দিতে চেয়েছিল তাদের শাসনের ব্যবস্থা।

উত্তরে ফরাসী শাসক মেশিনগানের গুলী চালিয়ে প্রতিবাদের কণ্ঠকে চেয়েছিল নিস্তব্ধ করে দিতে। পারে নি। নে-আন প্রদেশে যেখানে হো চি মিনের জন্ম হয়েছিল ১৮৯০ সালে, তারা চীনাদের দৃষ্টান্তে গঠন করেছিল কয়েকটি কৃষক সোভিয়েট। নিপীড়নকে উপেক্ষা করে দিয়ে ফরেন লিজিয়ন ভেঙে দিয়েছিল ঐ সোভিয়েটগুলিকে। কিন্তু আন্দোলনকে ভাঙতে পারে নি। আন্দোলন চলেছিল অব্যাহত গতিতে, প্রবল নিপীড়নের মধ্যে যেভাবে চলতে পারে।

ভিয়েৎনামী কম্যুনিস্ট পার্টির এই পর্যায়ের কার্যকলাপের উল্লেখ করে হো চি মিনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করা পশ্চিমী সরকারী পর্যবেক্ষকদের একটা বৈশিষ্ট্য। কিন্তু তাঁরা ভুলে যান যে, যে কারণে হো মার্কসবাদ-লেনিনবাদের দিকে ঝুঁকে পড়েছিলেন ঠিক সেই কারণেই দেশের মানুষকে সঙ্গে নেবার জন্যে তাঁকে কম্যুনিস্ট আদর্শে কিছু কিছু সংস্কারের কাজ করতেই হয়েছিল। এটা নিছক লোক-দেখানো বা উদ্দেশ্যপ্রণোদিত সংস্কার ছিল না। এই সংস্কার ছিল ভিয়েৎনামের পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজন ও জরুরী। কারণ ফরাসী শাসন দেশটাকে নিংড়ে, চুষে প্রায় ছিবড়ে করে ফেলেছিল। একটা বাস্তব পুনর্গঠনের পরিকল্পনা যদি তাঁরা সেই সময় হাতে না নিতেন তাহলে জনসাধারণকে তাঁরা এত ব্যাপকভাবে তাঁদের আন্দোলনের মধ্যে পেতেন না। কত ব্যাপকভাবে তা বোঝা যাবে এই থেকে যে, এক সময় অধিকাংশ ভিয়েৎনামী আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করত যে, ভিয়েৎনামী কম্যুনিস্ট পার্টিই তাদের একমাত্র ভরসা, হো চি মিন-ই তাদের একমাত্র আশা।

কিন্তু তাঁর আসল লক্ষ্য সম্পর্কে হো'র কোনদিন সংশয় ছিল না। জাতীয় স্বাধীনতার লক্ষ্য থেকে তিনি কোনদিন বিচ্যুত হন নি। স্বাধীনতা লাভের পর অন্য একটি দেশের হাতে তিনি নিজের দেশকে তুলে দেবেন এমন কোন দূরতম কল্পনাও তাঁর ছিল বলে আমরা জানি না। বরং এটাই জানা যায় যে, কৃষক সোভিয়েট সংগঠনের বেলায় পুরোপুরি রুশ বা চীনা আদর্শ গ্রহণ করতে তাঁর আপত্তিই ছিল। এই নিয়ে এবং অন্যান্য নানা কারণে কমিণ্টার্নের সঙ্গে যে তাঁর প্রায়ই মতবিরোধ দেখা দিচ্ছিল এটাও জানা কথা। আর সেই জন্যেই যে স্তালিন ভিয়েৎনামী কম্যুনিস্ট পার্টির ওপর খবরদারী করার জন্যে ফরাসী কম্যুনিস্ট নেতা মোরিস তোরেকে নিযুক্ত করেছিলেন সে বিষয়েও কোন সন্দেহ নেই। এবং অনেকেই সন্দেহ করে থাকেন যে, ১৯৩৩ সালে হো যে হংকং-এর একটি হাসপাতাল থেকে হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিলেন তার পেছনেও স্তালিনের হাত ছিল।

হো হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন ক্ষয়রোগের চিকিৎসার জন্যে। তার আগে ১৯৩১ সালে হংকং-এ একবার এবং ১৯৩২ সালে সিঙ্গাপুরে আরেকবার তিনি বৃটিশের হাতে গ্রেপ্তার হয়েছিলেন। হাসপাতালেও তিনি ছিলেন বৃটিশের হেফাজতে। সেখান থেকে তিনি কিভাবে বেমালুম উধাও হয়ে গেলেন তা এক অত্যন্ত রহস্যজনক ব্যাপার।

আট বছর তাঁর আর কোন খোঁজ পাওয়া যায় নি।

আট বছর পর, ১৯৪১ সালে, একদিন সকালে হো চি মিনকে হঠাৎ দেখা গেল মস্কোয় তাঁর বন্ধু নুয়েন কান তোয়ানের বাড়ির দরজায় করাঘাত করতে। তোয়ান ছিলেন মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিয়েৎনামী ভাষার অধ্যাপক। ১৯২৭ সাল থেকেই রাশিয়ায় আছেন। হো'র বিষয় যে তিনিও আগে থেকে জানতেন না সেটা বোঝা যায় হঠাৎ এইভাবে হো'কে তাঁর বাড়িতে আসতে দেখে। তাঁর ঐ বিস্ময়ের কথা তিনি পরে বন্ধু-বান্ধবদের কাছে বলেছিলেন।

হো বললেন তোয়ানকে তাঁর সঙ্গে ভিয়েৎনামে ফিরে যেতে। কারণ মুক্তি-সংগ্রাম আরম্ভ করার এই-ই সুযোগ। ১৯৪০ সালে জার্মানীর হাতে ফ্রান্সের পরাজয়ের তিন মাসের মধ্যে জাপানীরা ভিয়েৎনাম দখল করে নিয়েছিল। ফরাসীরা এখন বিপর্যস্ত, জাপানীরা এখনো সংহত হতে পারে নি। সুতরাং এই হচ্ছে উপযুক্ত সময়।

এই কথাই তিনি বলেছিলেন ভিয়েৎনামী জাতীয়তাবাদীদের উদ্দেশে এই সময়ে লেখা এক খোলা চিঠিতে। বলেছিলেন : "আমার স্বদেশবাসী ভাই-বোনেরা! জেগে উঠুন তাড়াতাড়ি! চীনের জনগণের বীরত্বপূর্ণ দৃষ্টান্ত অনুসরণ করুন। ফরাসী ও জাপানীদের বিরুদ্ধে লড়াই করবার জন্যে আসুন আমরা একটি জাতীয় মুক্তি সংস্থা গঠন করি।"

বলেছিলেন : "ধনী, সৈনিক; শ্রমিক, কৃষক; বুদ্ধিজীবী, কর্মচারী, ব্যবসায়ী, যুবক ও মহিলাবৃন্দ যাঁরা দেশকে গভীরভাবে ভালোবাসেন! জাতীয় মুক্তিই হচ্ছে এখনকার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা। আসুন আমরা ঐক্যবদ্ধ হই। মনে ও শক্তিতে এক হতে পারলে আমরা জাপানী আর ফরাসীদের আর তাদের তল্পিবাহকদের উৎখাত করতে পারব-ই; জনসাধারণকে ফুটন্ত জল আর জ্বলন্ত আগুনের সঙ্কট থেকে রক্ষা করতে সমর্থ হব-ই।"

মনে করিয়ে দিয়েছিলেন কয়েক শ' বছর আগে ট্রান যুগের কথা যখন দেশের মানুষ মঙ্গোল আক্রমণ প্রতিরোধের জন্যে সমবেত হয়েছিল। উদ্ধৃত করেছিলেন ফরাসীদের বিরুদ্ধে পূর্বসূরী শহীদদের দৃষ্টান্ত। ডাক দিয়েছিলেন এঁদের মহান পদাঙ্ক অনুসরণ করে স্বাধীনতার সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়বার জন্যে।

এই কথাই তিনি বলেছিলেন তোয়ানকে।

রাজী হলেন তোয়ান। ব্যবস্থাদি সব সম্পূর্ণ হল। কয়েকদিন পর হো চি মিন আর নুয়েন কান তোয়ান ট্রান্স-সাইবেরিয়ান রেলে চেপে বসলেন ইয়েনানের পথে।

ইয়েনানে পৌঁছে তিনি তোয়ানকে রেখে দিলেন সেখানেই, কারণ সামনে যে কষ্টের পথ, যে অনিশ্চিত জীবন, তোয়ানের পক্ষে তার সঙ্গে আর খাপ খাইয়ে চলা সম্ভব ছিল না। ট্রেনে আসতে আসতেই হো সেটা বুঝে নিয়েছিলেন।

তারপর একদিন তিনি গোপনে রওনা হয়ে গেলেন কুয়োমিণ্টাং অধিকৃত এলাকা অতিক্রম করে ভিয়েৎনাম সীমান্তের দিকে। সেখানে ফাম ভান ডং, ভো নুয়েন গিয়াপ এবং আরো কয়েকজন ঘনিষ্ঠ সহকর্মীর সঙ্গে মিলিত হয়ে তিনি গঠন করলেন ভিয়েৎনাম ডক লাপ ডং-মিন নামে একটি প্রতিষ্ঠান, সংক্ষেপে ভিয়েৎমিন, যার অর্থ ভিয়েৎনাম স্বাধীনতা সংগঠন।

লক্ষ্য করা দরকার হো চি মিন কম্যুনিস্ট পার্টির পতাকাতলে তাঁর আসন্ন সংগ্রামকে পরিচালিত করতে চান নি। আরও লক্ষ্য করা দরকার যে, ভিয়েৎমিন সংগঠনের মধ্যে কেবল কম্যুনিস্টরাই ছিল না, ছিল কম্যুনিস্ট পার্টির সদস্য নন এমন অনেক লোক।

[ক্রমশঃ]

বাজিকর

নির্মলেন্দু গৌতম

সমস্ত ব্যাপারটা এতো দুর্বোধ্য এবং বিশ্রী. মনে হলো যে নীলমণিবাবু আলোচনা থেকে দূরে থাকবার জন্য অন্যমনস্ক হবার চেষ্টা করলেন। একটা সিগ্রেট ধরালেন অত্যন্ত মনোযোগের সঙ্গে। মনে মনে ভাবতে চেষ্টা করলেন, সিগ্রেট ধরানোটাই এখন তাঁর একমাত্র মনোযোগ দেবার বিষয়।

কিন্তু আলোচনাটা শুধু দুর্বোধ্য এবং বিশ্রীই নয়, এতো জোরে জোরে আলোচনা চলছিলো, যে নীলমণিবাবু অন্যমনস্ক থাকতে পারলেন না। নীলমণিবাবুকে সমস্ত আলোচনাটা শুনতে হলো আবার।

নীলমণিবাবু হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে সবার উদ্দেশ্যেই যেনো বললেন, 'আমার একটু কাজ আছে। আমি আর থাকতে পারছি না।'

'বসুন, বসুন।' সবাই একসঙ্গে বলে উঠলো।

নীলমণিবাবু সিগ্রেটটা নামিয়ে সামান্য হাসলেন। তারপর দারুণ একটা মিথ্যে কথা বললেন, 'বসতে আমার খুবই ইচ্ছে হচ্ছে। কিন্তু যে কাজে যাচ্ছি সেটা অত্যন্ত জরুরী কাজ। না হলে আলোচনার মাঝখানে উঠে যাই।'

আলোচনার মাঝখান থেকে উঠে যাওয়াটা যে নীলমণিবাবুর পক্ষে অত্যন্ত দুঃখের ব্যাপার তা যেনো সভার সবাই বুঝতে পারলো। বুঝতে পেরে খুশি হলো। বিশেষ করে শক্তিবাবু খুশি হলেন বেশিরকম। কারণ আলোচনার সব থেকে বড়ো অংশ তাঁর। এবং সেজন্যেই তিনি মুখে অসহায়তা ফুটিয়ে বললেন, 'তাহলে আর বসতে বলবো না আপনাকে।'

মুক্তিটা সহজসাধ্য হওয়ায় নীলমণিবাবু একমুখ হাসি ছড়িয়ে দিলেন। তারপর কথা না বাড়িয়ে আস্তে আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে গলিতে নামলেন।

গলিটা তেমন প্রশস্ত না হলেও, অন্ধকার নয়। কম দৈর্ঘ্যের এই গলিটার মধ্যে তিনটে লাইটপোস্ট রাত্রে যথেষ্ট বলেই মনে হয়।

আলোচনা থেকে মুক্তি পেয়ে গলি দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে নীলমণিবাবু যথেচ্ছভাবে ভাবতে থাকলেন। ভাবতে ভালো লাগলো সিগ্রেটটা এখনও তাঁর দু' আঙুলের মধ্যে পুড়ছে। সিগ্রেট ধরাবার যে খুব একটা আগ্রহ হচ্ছিলো তা নয়। কেবল সেই আলোচনার মধ্যে থেকেও আলোচনার বাইরে থাকাই সিগ্রেট ধরাবার উদ্দেশ্য ছিলো। কাজে কাজেই বাইরে আসবার পর থেকে সিগ্রেটটা তাঁর আঙুলেই পুড়ছে। তবু সিগ্রেটটা ছুঁড়ে ফেলে দিতে ইচ্ছে হলো না নীলমণিবাবুর। হাতের দু' আঙুলে সিগ্রেটটাকে জ্বলতে দিয়েই যেনো সুখ পাচ্ছেন।

গলিটা পার হয়েই ট্রাম রাস্তায় পড়ে একবার ঘড়ি দেখলেন নীলমণিবাবু। আটটা বাজে।

দাঁড়িয়ে কয়েকমুহূর্ত ভেবে নীলমণিবাবু মনে মনে স্থির করে ফেললেন, এখন সোজা সুধাময়ের কাছে যাবেন তিনি। ট্রামটা এখুনি পেলে মিনিট পনেরো লাগবে সুধাময়ের কাছে পৌঁছুতে।

ভেবেই এগিয়ে নীলমণিবাবু ট্রাম স্টপে এলেন। সঙ্গে সংগে ট্রাম পেয়ে গেলেন একটা।

তাড়াতাড়ি উঠে পড়লেন নীলমণিবাবু। ফাঁকাই ট্রামটা। একটা জানালার ধারে বসে বাইরের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

শক্তিবাবুর মুখটা ভাসলো মনের মধ্যে।

সমস্ত আলোচনারই সূত্রপাত করতে চেষ্টা করেন শক্তিবাবু। মাঝে মাঝে বিশেষভাবে সাফল্যলাভ করেন। আলোচনাটা গড়িয়ে নামবার সংগে সংগে যে চার-পাঁচজন বসে থাকে, তাদের মধ্যে দারুণ একটা আন্দোলন শুরু হয়ে যায়।

নীলমণিবাবু নীরবে শুনে যান। এখানে আসবার ইচ্ছে তাঁর কোনদিনই হয় না। কিন্তু তবু আসতে হয়। শক্তিবাবু তাঁকে একটা লোভের আকাশ দেখিয়েছেন। সেই আকাশে উঠবার হাউই রেখে দিয়েছেন নিজের হাতে। হাউইটা পেলে নীলমণিবাবু আর যে এ পথ মাড়াচ্ছেন না, শক্তিবাবু সে কথাটা জানেন। জানেন বলেই হাউইটাকে নীলমণিবাবুর চোখের সামনে ধরে রেখেছেন।

আজকেও অবশ্য নীলমণিবাবু থাকলে সেই একই খেলা চলতো। আলোচনা শেষ হলে একে একে যখন সবাই চলে যেতো, শক্তিবাবু তখন হাউইটাকে নীলমণিবাবুর সামনে দোলাতেন। সামান্য হেসে বলতেন, 'ইয়ে, কি বলে, অনেকটা সময় আলোচনা হলো কিন্তু।'

নীলমণিবাবু বলতেন, 'তা হলো।'

শক্তিবাবু বলতেন, 'আপনি তো এখন বাড়ি যাবেন সোজা।'

নীলমণিবাবু বলতেন, 'আর কোথায় যাবো এখন।'

'আপনি কিন্তু ভাববেন না আপনাকে কেবল আশা দিচ্ছি। যা বলেছি তা করবোই। একদিন জায়গাটা দেখে আসবো দুজনে গিয়ে। এতো ভালো জায়গা এতো কম দামে আজকাল পাওয়া যায় না। আপনি নাকি বলেই পেয়ে গেলেন।'

নীলমণিবাবু হেসে বলতেন, 'পেলাম আর কোথায়?'

শক্তিবাবু হেসে বলতেন, 'আমি যখন বলেছি, তখন না পেয়ে থাকেন?'

ভিড় ছিলো বটে, কিন্তু দুটো স্টপ এগোতেই ভিড় বেড়ে উঠলো। নীলমণিবাবুও বাইরে থেকে মুখ ভেতরে ফেরালেন। যেচেই টিকিটের পয়সা দিলেন তিনি। পেছন দিকে তাকিয়ে একজন ভদ্রলোককে অবিকল শক্তিবাবু মনে হলো। মনে হলো শক্তিবাবু তাঁকে অনুসরণ করে চলেছেন।

কেন শক্তিবাবু তাঁকে অনুসরণ করবেন, একথাটা ভাবতে গিয়ে নীলমণিবাবুর মনে হলো, শক্তিবাবুর তাঁকে অনুসরণ করা উচিত। অথবা শক্তিবাবুর চেহারাটা খানিকটা স্পাইয়ের মতো। স্পাই হলে শক্তিবাবু নিশ্চয়ই জীবনে উন্নতি করতে পারবেন। অবশ্য জীবনে অনেক উন্নতিই করেছেন তিনি।

ভূয়ো শক্তিবাবুর দিক থেকে নীলমণিবাবু চোখ ঘুরিয়ে নিলেন। কারণ ভদ্রলোক কেমন যেনো অস্বস্তিবোধ করছেন নীলমণিবাবু তাকিয়ে থাকবার জন্য।

ফের বাইরের দিকে তাকালেন নীলমণিবাবু। ঘর্ ঘর্ করে ট্রাম চলেছে। বাইরের আলোয় আর মানুষে আশ্চর্য সুন্দর লাগছে। আলোর মধ্যে আনন্দের চেহারা মানুষের। অন্ধকারে গেলেই মানুষের চেহারার মধ্যে নিষ্ঠুরতা আসে, কুশ্রীতা বাসা বাঁধে। কাজে কাজেই আলোর দিকে তাকিয়ে মানুষের আনন্দের চেহারাকে স্পষ্ট করে দেখতে থাকলেন নীলমণিবাবু।

দেখতে দেখতে সেই বড়ো বাড়িটা চোখে পড়লো নীলমণিবাবুর। এখানেই নামতে হবে। উঠে পায়ে পায়ে দরজার সামনে এসে দাঁড়ালেন নীলমণিবাবু। কনডাক্টার একবার বললো, 'ভাড়া!'

'হয়ে গেছে।' নীলমণিবাবু স্টপটার জন্য অপেক্ষা করতে থাকলেন কথাটা বলে।

ট্রাম থেকে নেমে খুব তাড়াতাড়ি হাঁটতে থাকলেন নীলমণিবাবু। মিনিট দুয়েক হাঁটতে হবে মাত্র। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলেন আটটা দশ বাজে।

দু'মিনিট ধরে ফের সেই আলোচনার কথা ভাবলেন। শক্তিবাবুর বাড়ির সেই আলোচনার কথা। আলোচনার মাথামুণ্ডু কিছুই তিনি বুঝতে পারেন নি। বুঝতে চানও না। তবে বিশ্রী কিছু আলোচনা যে চলছিলো তা বুঝতে অসুবিধে হয় নি নীলমণিবাবুর।

ভাবতে ভাবতে নীলমণিবাবু সুধাময়ের বাসার দরজায় পৌঁছুলেন।

সুধাময় বাড়িতেই ছিলো। নীলমণিবাবুকে দেখেই বললো, 'হঠাৎ? শক্তিবাবু এর মধ্যে আপনার কথা শেষ করে দিলেন না কি?'

'উঁহু!'

'তাহলে উঠে এলেন যে?

'আচ্ছা, তোমার কি মনে হয় শক্তিবাবু আশার কথাই শুধু শোনাবেন!' একটু যেনো চিন্তিত হলেন নীলমণিবাবু। সুধাময় কখনোই শক্তিবাবুকে বিশ্বাস করে না।

'আমি কিছু বলবো না। দেখতেই পাবেন।' হাসলো সুধাময়।

'তুমি বললে আর দেখতে চাই না। কারণ তোমার কথায় বুঝতে পারছি, দেখাটা ভালো নয়।' নীলমণিবাবু বললেন।

সুধাময় হাসতে থাকলো নীরবে।

একটু পরে সুধাময় বললো, 'চা খাবেন?'

চা হলে মন্দ হয় না। নীলমণিবাবু একটা সিগ্রেট ধরিয়ে বললেন, 'হলে মন্দ কি!'

সুধাময় ভেতরে বলে আসবার অল্পক্ষণ পরেই চা এলো।

চায়ে চুমুক দিয়ে সুধাময় বললো, 'একটা কাজ করুন আপনি। ওকে বলুন জমি দেখতে চাই।'

'সে তো দেখাতে রাজী আছে।'

ফের হাসলো সুধাময়, বললো, 'কিন্তু দেখাচ্ছে না তো!'

'দেখতে চাই নি বলে হয়তো দেখাচ্ছে না।' নীলমণিবাবু বললেন।

সুধাময় বললো, 'যা ভাবছেন তা নয়। লোকটার স্বভাবটা ওইরকম। লোককে নাচিয়ে সুখ পায়। আসলে হয়তো জমিটমি কিছু নেই।'

নীলমণিবাবু যে নাচছেন এটা নীলমণিবাবুর নিজেরই কেমন খারাপ লাগল। চায়ের কাপে সিগ্রেটটা ঝাড়লেন। তারপর সিগ্রেটে কয়েকটা দীর্ঘ টান দিয়ে সিগ্রেটটা বাইরে ছুঁড়ে ফেললেন নীলমণিবাবু। লোভের আকাশটা ক্রমাগত ছোটো হয়ে যাচ্ছে যেনো। নীলমণিবাবু কিছুটা বিষণ্ণ হলেন, ক্লান্ত হলেন। মনে হলো, তিনি যেনো অর্থহীন শব্দের অর্থ খুঁজে বেড়াচ্ছেন।

সুধাময় বললো, 'কী হলো?' মনে হচ্ছে রেগে গেলেন আমার ওপর। জায়গাটা যদি সত্যি সত্যি দেন শক্তিবাবু, আপনাকে যে কথা দিয়েছি তা নিশ্চয়ই রাখবো।'

নীলমণিবাবু বললেন, 'তোমার ওপর রাগ করবো কি জন্যে। রাগ নয়। হতাশ হয়ে গেছি। হতাশ মানে, ভেবেছিলাম, সে জায়গাটা পেলে বেশ ভালো হবে। তা তুমি শক্তিবাবু সম্পর্কে যা বলছো, তাতে ভরসা হারিয়ে ফেলেছি।'

সুধাময় বললো, 'একেবারে ভরসা হারাতে বলি না আপনাকে। তবে একেবারেই আশা করবেন না এটুকু বলি। কালকে সত্যি সত্যি একবার জায়গা দেখবার কথা বলুন না।'

'নিশ্চয়ই বলবো।' নীলমণিবাবু

বললেন। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'আজকের মতো যাই সুধাময়। ব্যাপারটা কি দাঁড়ালো যদি পারি কাল রাত্তিরেই জানিয়ে যাবো।'

সুধাময়ের বাড়ি থেকে বেরিয়ে শ্লথ-পায়ে হাঁটতে থাকলেন নীলমণিবাবু। চলতে চলতে যেনো সেই দুর্বোধ্য আর বিশ্রী আলোচনার মুখোমুখি হলেন। অত্যন্ত জোরে জোরে সেই আলোচনা চলতে থাকল। এড়াতে গিয়ে নীলমণিবাবু ফের সিগ্রেটে মনোযোগ দিতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু পারলেন না। কাজেই আরো বেশি-রকম বিপন্ন হলেন।

হঠাৎ স্পষ্টই যেনো দেখতে পেলেন লোভের আকাশটা একখানা শেলেটের মতো সীমাবদ্ধ হয়ে গেছে।

আপিসে বিকেলবেলায় বসে বসে গতকালের সমস্ত বিষয়টাকে ভাবলেন নীলমণিবাবু।

সুধাময়ের সঙ্গে তার সম্পর্ক অনেক-দিনের। পল্লবিত একটা আত্মীয়তাও আছে সুধাময়ের সঙ্গে। অবশ্য আত্মীয়তা-টাই বড়ো নয়, অথবা আত্মীয়তাটাকে কেন্দ্র করেও সুধাময়ের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে ওঠে নি। একটা গভীর বন্ধুত্ব অলক্ষ্যে রচনা হয়ে গেছে। যদিও সুধাময়ের সঙ্গে বয়সে তাঁর পার্থক্য আছে।

সুধাময় শক্তিবাবুর জমি দেবার ব্যাপারে সন্দেহ করছে। শক্তিবাবুকে সুধাময় ভালো করেই জানে। সন্দেহ-টাকে তাই সত্যি বলেই মেনে নিয়েছেন নীলমণিবাবু।

কী খেয়াল হলো হঠাৎ, নীলমণি-বাবু উঠে গিয়ে ফোন তুলে ডায়াল করলেন সুধাময়ের নম্বরে। ফোনটা একটু সময় বাজবার পর কে যেনো ধরলো।

নীলমণিবাবু সুধাময়কে চাইতে, সে ডেকে দিচ্ছি বলে ফোনটা টেবিলে রেখে ডাকতে গেলো সুধাময়কে।

জমির টাকাটার বেশি অংশটাই সুধাময় এখন ধার হিসেবে দিচ্ছে। নীলমণিবাবু আস্তে আস্তে সে'টা শোধ করে দেবেন। সুধাময় যেচেই দিতে চেয়েছে টাকাটা। সে জন্যে অনেক পরামর্শই নীলমণিবাবু সুধাময়ের সঙ্গে করে থাকেন। সুধাময়ের বয়স বেশি নয়। কিন্তু পড়াশুনো আর বিচিত্র অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে জীবনের পথকে চিনেছে। চিনেছে বলে তার পরামর্শ প্রায়ই চুলচেরা হয়ে থাকে।

সুধাময় ফোন ধরেছে।

নীলমণিবাবু শুনলেন সুধাময় উদ্বিগ্ন গলায় শুধোচ্ছে, 'কী হলো, হঠাৎ এমন অসময়!'

নীলমণিবাবু কী বলবেন ভেবে পেলেন না। তাই তাড়াতাড়ি বলে ফেললেন, 'আজকে তাহলে জমি দেখবার কথাটা বলি।'

'বলুন।'

'তুমি আসবে?'

'আমার যাবার কোনো দরকার নেই। যদি দেখিয়ে আনবার কথা দেয়, তাহলে পরে যে কোনো একদিন আপনার সঙ্গে গিয়ে দেখে আসা যাবে।'

'সেই ভালো। তুমি সন্ধ্যের পর বাড়ি থেকো।'

'সন্ধ্যের পর? আচ্ছা থাকবো।' একটু সময় ভেবে বললো সুধাময়।

নীলমণিবাবু বললেন, 'সন্ধ্যের পর থাকতে বললাম কেনো জানো? তোমাকে আজকেই ফলাফলটা জানিয়ে দেবো।'

'ফলাফলের জন্য আমিও কৌতূহল-বোধ করছি।'

'দেখা যাক কী দাঁড়ায় শেষ পর্যন্ত। আচ্ছা ছেড়ে দিলাম এবার।' নীলমণিবাবু ফোনটা রিসিভারের ওপর নামিয়ে রাখলেন।

আপিস ছুটি হতেই সোজা ফিরে এলেন বাড়িতে।

মুহূর্তগুলো কেমন উত্তেজিতভাবে কাটছে। সুধাময় শক্তিবাবুকে বিশ্বাস করে না। আজকে জমি দেখাবার কথা বললে শক্তিবাবু যা বলবে, সুধাময়ের তা জানা। জানে বলেই ওকথা নিজে বলতে চাইছে না। আজকেই শক্তিবাবুকে জমি দেখাবার কথা বলতে বলেছে। অর্থাৎ সমস্ত বিষয়টা নীলমণিবাবুর কাছে পরিষ্কার হয়ে উঠবে আজকেই। লোভের আকাশটা সীমাবদ্ধ হয়ে একখানা শেলেটের মতো হয়ে গেছে, আজকে সেখানা একে-বারেই হয়তো মুছে যাবে।

ঘরের মধ্যে না বসে বারান্দায় চেয়ারটা টেনে বসলেন নীলমণিবাবু। তপু চা আর খাবার নিয়ে এলো।

নীলমণিবাবু তপুর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'সে জায়গাটা যদি না হয় তপু?'

তপু একটু যেনো চমকে উঠলো। নীলমণিবাবু লক্ষ্য করলেন। জায়গাটার খোঁজ পাবার পর তপুই বেশি লাফিয়ে-ছিল। অবাক চোখে তাকিয়ে তপু বললো, 'না হবার কোনো কারণ ঘটেছে নাকি বাবা?'

'উঁহু! তবে জায়গাজমি না কেনা পর্যন্ত ভরসা করতে নেই।'

'তা নেই। কিন্তু দেবেই যখন বলেছে তখন ভরসা হারাবার কি আছে!' ফের বললো তপু।

নীলমণিবাবু খেতে খেতে বললেন, 'তা সত্যি!'

তপু একটু সময় চুপ থেকে বললো, 'তুমি তো কালও গিয়েছিলে শক্তিবাবুর ওখানে, কী বললেন তিনি?'

'বলেছে, দেবে।' সুধাময়ের কথাটা আর বললেন না নীলমণিবাবু।

'তাহলে আর কি!'

ডিসটাকে নামিয়ে তপু ভেতরে চলে গেল।

চায়ে চুমুক দিয়ে নীলমণিবাবু তপুর

দেশ সেবায় নিয়োজিত,

এ্যালবার্ট ডেভিড লিমিটেড

কলিকাতা—৫০

নীতি ও বিজ্ঞানানুযায়ী ঔষধ প্রস্তুতকরণের অগ্রণী

—ব্রাঞ্চ সমূহ—

বোম্বে - মাদ্রাজ - দিল্লী - নাগপুর

বেজওয়াডা - শ্রীনগর - গৌহাটী

মতোই ভরটাকে নামাতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু পারলেন না। বুঝতে পারলেন, তপুর মতো নির্ভর করবার কেউ নেই তাঁর। এই অবস্থায় কারো ওপর নির্ভর করতে পারলে নীলমণিবাবু দীর্ঘস্থায়ী একটা সুখ, একটা মুক্তি পেতে পারতেন। দীর্ঘ করে একটা নিশ্বাস নিলেন নীলমণিবাবু।

এই মুহূর্তে কৈশোরটাকে ফিরে পেতে ইচ্ছে হচ্ছে নীলমণিবাবুর। অথবা প্রথম যৌবনটাকে। কৈশোরে বাবার ওপর ছিলো তাঁর প্রয়োজনের পৃথিবীর ভাবনা। আর প্রথম যৌবনে নির্ভরতাকে নিজের ওপর চাপিয়ে দিয়ে তিনি সর্বোত্তম সুখ পেতেন।

প্রতিমা এসে সামনে দাঁড়াল। নীলমণিবাবু প্রতিমার দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারলেন তপু কথাটা বলেছে তাকে।

প্রতিমা শূন্য খাবারের প্লেটটা হাতে তুলে বললো, 'জমির ব্যাপারে শক্তিবাবু কিছু বলেছেন নাকি তোমায়?'

'না না। কিছু বলেন নি। কাল রাতে যে কথা হয়েছে তাতো তোমাকে বলেইছি।'

'তা বলেছো। কিন্তু তপুর কাছে যা শুনলাম তাতে কেমন সন্দেহ হচ্ছে।'

প্রতিমাকে সুধাময়ের কথাটা বলে ফেলবেন নাকি নীলমণিবাবু। ভেবে দেখলেন না বলাই সঙ্গত। বললেন, 'খদির কথা বললাম। সব কাজের মধ্যে একটা যদি টেনে আনলে দুঃখ কম পাওয়া যাবে।'

প্রতিমা বললো, 'ওসব আমার বুদ্ধির বাইরে। মোট কথা জায়গাটা হয়ে গেলেই হয়।'

বলে প্রতিমা চলে গেলো।

নীলমণিবাবুর আবারও মনে হলো, কারো ওপর যদি তিনি এই মুহূর্তে প্রতিমা এবং তপুর মতো নির্ভর করতে পারতেন। ফের একটা দীর্ঘনিশ্বাস সুদীর্ঘ হয়ে বেরিয়ে এলো।

আস্তে আস্তে চা খাওয়া শেষ করলেন নীলমণিবাবু।

কিস্তিবন্দীতে ট্রানজিস্টার

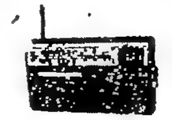

মাসিক ১০্ টাকার সহজ কিস্তিতে ৩২০্ টাকা মূল্যের টেলি-ফুইন পোর্টেবল ৩ ব্যান্ড, অল ওয়ার্ল্ড ৮ ট্রানজিস্টার। আবেদন করুন:—

Atlas Co. (S. B.—22).
Box No. 1329, Delhi-6.

কাপ রেখেই বেরোবার জন্য উঠে পড়লেন তারপর। বসবার সময় নেই।

তপু বেরিয়ে বললো, 'রোজ দেরি করে ফিরছো আজকাল। আজ একটু তাড়াতাড়ি ফিরবে কিন্তু।'

পা বাড়িয়ে নীলমণিবাবু বললেন, 'আচ্ছা।'

বাসস্টপে এসে ঘড়ি দেখলেন নীলমণিবাবু। এখন শক্তিবাবুকে একলা পাওয়া যাবে নিশ্চয়ই। এখনও অন্যান্য কেউ নিশ্চয়ই এসে পৌঁছয় নি।

কিন্তু বাস নেই। দুটো অন্য নম্বরের বাস গর্জন করতে করতে বেরিয়ে গেলো। নীলমণিবাবু অস্থির হলেন। দেরি সহ্য হচ্ছে না। উত্তেজিত হয়ে উঠছেন আপনা থেকেই।

অন্যান্য কেউ আসবার আগে পৌঁছুলে তাড়াতাড়ি ফেরা যাবে সুধাময়ের ওখান হয়ে।

এতো উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলেন নীলমণিবাবু, যে বাস আসতে প্রায় লাফিয়ে উঠলেন। ভিড়ে ভেতরে ঠাসাঠাসি। দরজার কাছেই দাঁড়িয়ে রইলেন নীলমণিবাবু। যদিও কনডাকটার চীৎকার করে সবাইকে ভেতরে ঢুকবার জন্য বলছিলো।

আরো দুটো স্টপ ছুঁতেই অনেকটা ভেতরে আসতে হলো নীলমণিবাবুকে।

নীলমণিবাবু বেশ গরম বোধ করতে থাকলেন। এতো ঠাসাঠাসি যে নীলমণিবাবুর আর বাসের মধ্যে থাকতে ইচ্ছে হলো না। পায়ে পায়ে দরজার দিকে তাই এগোতে থাকলেন।

বাস থেকে নেমে দেখলেন একটা স্টপ আগে নেমেছেন তিনি।

অত্যন্ত দ্রুত এবার হাঁটতে থাকলেন। তারপর সেই আলোকিত গলিটা পেরিয়ে শক্তিবাবুর বাড়ির সামনে দাঁড়ালেন। না, কেউ এখনও আসে নি।

আস্তে আস্তে দরজার কড়া নাড়লেন নীলমণিবাবু।

খানিক সময় পরে শক্তিবাবুই দরজা খুললেন। ঘরের মধ্যে উজ্জ্বল সেই আলোটা জ্বালা হয়েছে।

শক্তিবাবু বললেন, 'আসুন।' বলে তাড়াতাড়ি চলে গেলেন—

নীলমণিবাবু বললেন, 'জরুরী কাজ ছিলো কি না।'

'বসুন।' শক্তিবাবু একটা চেয়ারে বসলেন।

নীলমণিবাবু সিগ্রেটের প্যাকেটটা বের করে একটা নিজে ধরিয়ে আরেকটা এগিয়ে দিলেন শক্তিবাবুর দিকে। শক্তিবাবু সিগ্রেটটা ধরালেন।

বাইরে ঘন হয়ে উঠেছে অন্ধকার। আলোটা তাই অনেক বেশি উজ্জ্বল।

শক্তিবাবুকে সেই কথাটা বলতে হবে। জমি দেখাবার কথাটা। এখুনি কি বলবেন নীলমণিবাবু? নীলমণিবাবু একবার ভাবলেন। এখুনি বলতে হবে। কেউ আসে নি এখনও। ঘড়ি দেখলেন। দু'চার মিনিটের মধ্যে সবাই এসে পড়বে।

একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে শক্তিবাবু বললেন, 'আপনি খুব তাড়াতাড়ি এসে পড়েছেন আজকে।'

'হ্যাঁ, মানে আজকে জমিটা সম্পর্কে একটা কথা বলবো।'

'আমি যখন বলেছি, তখন নিশ্চয়ই পাবেন।'

'না না, পাওয়া সম্পর্কে কোনো কথা নয়। আমি জমিটা একবার দেখতে চাই। কালকেই দেখতে চাই। কাল কখন আপনার সময় হবে?' একবারে এবং অত্যন্ত দ্রুত কথাগুলো বলে ফেললেন নীলমণিবাবু।

শক্তিবাবু এবার অদ্ভুতভাবে হাসতে থাকলেন। তাঁর হাতের মধ্যে যেনো একরাশ সুতো। সেই সুতোগুলো নীলমণিবাবুর হাত, পা ইত্যাদি প্রত্যেকটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সঙ্গে বাঁধা। নীলমণিবাবুর মনে হলো গত এক মাস ধরে এই সুতোগুলো শক্তিবাবুর হাতে ছিলো। আর এই সুতোর টানে টানেই নেচে চলছিলেন তিনি।

নীলমণিবাবু এবার স্পষ্ট চোখে দেখলেন শক্তিবাবু অদ্ভুতভাবে হাসতে হাসতে সুতোগুলো দিয়ে তাঁকে নাচাতে চাইলেন। কিন্তু পারলেন না। তাঁর শরীর একটু নড়লো না পর্যন্ত। শক্তিবাবুর কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম ফুটে উঠলো। দ্রুত নিশ্বাস নিতে থাকলেন তিনি। উত্তেজনায় ঘরের আলোটা পর্যন্ত কাঁপতে থাকলো। ক্রোধে দিশেহারা হয়ে নিজের হাতেই হঠাৎ শক্তিবাবু ছিঁড়ে ফেললেন সুতোগুলো। সেই সুতোগুলোই জালের মতো অত্যন্ত দ্রুত জড়িয়ে ফেললো শক্তিবাবুকে। শক্তিবাবুর নিষ্ফল ক্রোধটা আকাশপাতাল ব্যাপ্ত হতে চাইলো সেই মুহূর্তে।

নীলমণিবাবু বললেন, 'জমিটা আমার দরকার নেই শক্তিবাবু। অন্যদিকে জমির খোঁজ করছি।'

বাজীকর এবার নিজের জালের মধ্যেই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অসহায় ক্রোধে মুঠো মুঠো ছাই হয়ে গেলো।

নীলমণিবাবু তা থেকে দু' মুঠো ছাই তুলে নিলেন। তারপর সমস্ত শক্তি দিয়ে লোভের আকাশটার দিকে ছিটিয়ে দিলেন। তারপর আস্তে আস্তে শক্তিবাবুর ঘরের চৌকাঠ অতিক্রম করলেন।

অত্যন্ত নিশ্চিন্তভাবে, দীর্ঘ এক মাস পরে এবার তিনি বাড়িতে ফিরবেন।

পূর্ব পাকিস্তান ও আমরা

বসুধা চক্রবর্তী

পূর্ব পাকিস্তানের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধে কিছুটা এ্যাম্বিভ্যালেন্সের সৃষ্টি হয়েছে, অর্থাৎ যুগপৎ অনুরাগ ও বিরাগের লক্ষণ দেখা দিয়েছে। অনুরাগের ভিত্তি বিশদ করে বোঝাবার প্রয়োজন নেই : বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির প্রতি পূর্ব পাকিস্তানবাসীর দুর্বার দরদ, রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে তাকে চেপে রাখবার যে চেষ্টা হয়েছিল তার দুর্দম প্রতিরোধ এবং সে প্রতিরোধ করেকটি তরুণ প্রাণের আত্মবলিদান পশ্চিমবঙ্গবাসীর সবিস্ময় প্রশংসা ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছে ; তাইতে আশা জেগেছে যে দুই বাংলার অধিবাসীর মধ্যে ঐক্য যদি বা না-ই থাকলো, মৈত্রীর অভাব হবে না এবং সে লক্ষ্যের প্রতি লক্ষ্য রেখে পূর্ব পাকিস্তানের আশা-আকাঙ্ক্ষা, সংগ্রাম-দ্বন্দ্বের প্রতি আমাদের অবহিত থাকা দরকার। এই মনোভাবকেই খানিকটা বাড়িয়ে নিয়ে কেউ কেউ একে রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও সক্রিয় করতে চান : পূর্ব পাকিস্তানবাসী বর্তমানে যে গণতান্ত্রিক সংগ্রাম করছেন ও স্বায়ত্ত শাসনের দাবি উপস্থাপিত করেছেন তাকে পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হবার আন্দোলন মনে করেন—যদিও তা মনে করার কোনো কারণ নেই। পূর্ব পাকিস্তানের গণতান্ত্রিক সংগ্রামের প্রতি ঐ দেশ থেকে অত্যুৎসাহী সমর্থন জানালে যে তার ক্ষতিই করা হয়, পাকিস্তানের রাষ্ট্রশক্তি অপপ্রচার দ্বারা সে সংগ্রাম দুর্বল করার সুযোগ পান, সে বিষয়ে তাঁরা সচেতন নন। ঐ দেশের অভ্যন্তরেও তাঁদের বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয়—যে প্রকার বিরোধিতা প্রকাশ পেয়েছে গত ৯ই ফাল্গুনের সাপ্তাহিক বসুমতী-তে প্রকাশিত শ্রীসাগর বিশ্বাসের নিবন্ধে। নিবন্ধকার তাতে তাঁর ব্যক্তিগত ও সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতা থেকে বলছেন যে পূর্ব পাকিস্তানের অনেক মহলেই এখনও তীব্র ভারতবিরোধী মনোভাব বর্তমান এবং সাম্প্রদায়িক মনোভাবেরও অনটন নেই। তা তো নেই-ই : উভয়বিধ মনোভাব ভারতেও যথেষ্ট আছে, কিন্তু তা আছে বলেই যেদিক দিয়ে যেটুকু ভালোর লক্ষণ, আশার লক্ষণ রয়েছে তাতে অভিনন্দিত করার প্রয়োজন কমে না—বরং বেড়েই যায়। পরস্পরবিরোধী ও সাম্প্রদায়িক মনোভাবের জের আমরা এখনও বহন করে চলেছি এবং তারই দরুণ রাষ্ট্রিক স্বাতন্ত্র্য সুষ্ঠু প্রতিবেশীসুলভ সম্বন্ধে প্রতিষ্ঠিত হতে পারছে না—অথচ সে স্বাতন্ত্র্য এখন স্থায়ী ঐতিহাসিক সত্য, দিন দিন তা শুধু পরিণতিই লাভ করছে, তার ব্যত্যয় ঘটছে না। ভারতে ও পাকিস্তানে আমরা যারা বিভাগপূর্ব কালের লোক তারা একদিকে যেমন বিদ্বেষের জের টেনে চলেছি তেমনি অন্য দিকে স্বাতন্ত্র্যকেও শেষ সত্য বলে গ্রহণ করতে মানসিক দ্বিধা বোধ করি এবং সে কারণে পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্ত শাসন আন্দোলনকেও ভারতের প্রতি অনুকূল আন্দোলন মনে করে ভুল করে বসি। স্বাতন্ত্র্যকে শেষ কথা বলে মেনে নিতে বাধা ভারতীয় আমাদেরই বেশি; কারণ, মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চল বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়াতে আমরা মন থেকে সায় দিতে পারি নি; পারি নি এক জাতীয়তার নীতিতে উদ্বুদ্ধ ছিলেম বলে—তা ছাড়া বিচ্ছিন্নতায় আমরাও অনেকে বাস্তুহারা হচ্ছিলুম ও হয়েছি বলে এবং সর্বভারতীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে হিন্দু প্রাধান্যের মনোভাব থেকে। পাকিস্তানবাসীর সে সমস্যা নেই বললেই হয়; কারণ স্বাতন্ত্র্য চান নি এমন লোকের সংখ্যা সেখানে একান্তই সীমিত। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর সেখানে যারা জন্মেছে বা বড় হয়েছে তারা স্বাতন্ত্র্যকেই স্বাভাবিক মনে করতে শিখেছে : সেখান থেকে কেউ কলকাতা এলে তারা বলে যে সে ভারতে গেছে; অথচ তাদের পূর্বরতীরা কলকাতাকে কলকাতাই বলে, ভিন্ন রাষ্ট্রের অন্তর্গত স্থান বলে মনে করা তাদের সহজে আসে না। স্বাতন্ত্র্যই সুষ্ঠু প্রাতিবেশীত্বের বুনিয়াদ রচনা করতে পারতো যদি তার সঙ্গে বৈরিতাব খাদ মিশে না থাকতো। কিন্তু তা হচ্ছে না : অন্তহীন বিবাদ-বিসম্বাদ নবাগতদের সুস্থ মনোবৃত্তি গড়তে দিচ্ছে না। বর্তমান লেখকের এক বন্ধুপুত্র তাকে সম্প্রতি এক চিঠিতে লিখেছে : 'কাকা, আপনারা আমাদের মায়া ছেড়ে এক শত্রুভাবাপন্ন দেশে চলে গেছেন।'

এই অবস্থায় সাংস্কৃতিক যোগসূত্রই একমাত্র জিনিস যা রাষ্ট্রিক ও অর্থনৈতিক সম্বন্ধ স্বাভাবিক হওয়া সাপেক্ষে দুই বাংলার—তথা দুই দেশের সম্পর্ক উভয়ের প্রীতিপ্রদ ও মঙ্গলজনক হওয়ার আশা জাগিয়ে রাখতে পারে। শ্রীবিশ্বাস পূর্ব পাকিস্তানে আরবী, ফার্সী শব্দ প্রবর্তন চেষ্টার উল্লেখ করে ভাষা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তানীর কৃতিত্ব উড়িয়ে দেয়ার চেষ্টা করেছেন—কিন্তু তাঁর বক্তব্য প্রমাণ করার জন্য যে উদ্ধৃতি তিনি দিয়েছেন তা সে চেষ্টার সম্পূর্ণ প্রতিকূল এবং পূর্ব পাকিস্তানে ভাষা ও সাহিত্যের গতিপ্রকৃতির কিছুমাত্র খবর যাঁরা রাখেন তাঁরাই জানেন যে সে চেষ্টা সেখানে সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়েছে; ভাষার কাঠামোর বিকাশে পশ্চিমবঙ্গ থেকে পূর্ব পাকিস্তানের কোনোই পার্থক্য সূচিত হয় নি। গল্পে উপন্যাসে মুসলমান জনজীবন প্রতিফলিত করতে অল্প মুসলমানী শব্দ যদিই বা এসে থাকে তা স্বাভাবিকভাবেই এসেছে এবং সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে। এক-ভাষাভিত্তিক হলেও দেশভেদে সাহিত্য ও সংস্কৃতি অপেক্ষিত স্বতন্ত্র রূপ নিতে পারে—যেমন স্বাতন্ত্র্য মার্কিন ও ইংরাজী সাহিত্যে রয়েছে—কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানে এখনও সেরূপ লক্ষণ দেখা দেয় নি। গল্প ও উপন্যাসের বিকাশপদ্ধতি, কবিতার ভাবগত ও শব্দগত রূপ বাংলার উভয় অঞ্চলে এখনও এক বলেই প্রতিভাত। নাট্য-সাহিত্যের

বি, সি, মাইতি এণ্ড কোং

—ইলেকট্রো প্লেটিং সামগ্রী—

নিকেল ভ্যাট ও ব্যারেল * ডাইনামো * পলিশিং মেসিন এবং প্লেটিং করিবার জন্য যাবতীয় সামগ্রীর আদি সরবরাহক।

শো রুম :—৯৭, প্রেমচাঁদ বড়াল স্ট্রীট, কাল-১২। ফোন : ৩৪-৩১৭৩

৩, রামমোহন পাল লেন, কলি-১২ : অফিস-ফোন—৩৪-৪৮৪৬

২০৯১

প্রয়োজন তো এখনও অনেকটা পশ্চিমবঙ্গের নাটক দিয়েই মেটানো হচ্ছে—অল্প কিছু নাটক যা সেখানে রচিত হচ্ছে তার আংগিকও স্বতন্ত্র নয়। কাজেই পূর্ব পাকিস্তানের ভাষা ও সাহিত্যকে নস্যাৎ করে দেবার প্রশ্নই ওঠে না—যা শ্রীবিশ্বাস করতে চেয়েছেন। তারপর তিনি বলেছেন, পূর্ব পাকিস্তানের সাহিত্য নিয়ে কলকাতায় যে মাতামাতি দেখা যায়, পশ্চিমবঙ্গের সাহিত্য সম্বন্ধে পূর্ব পাকিস্তানে তেমন কোনো মাতামাতি নেই। এর উত্তরে বলা যায়, সেখানে মাতামাতির অবকাশ নেই: কারণ, পশ্চিমবঙ্গের সাহিত্য সম্বন্ধে পূর্ব পাকিস্তানের আগ্রহ স্বাভাবিকভাবেই পরিতৃপ্ত হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গে একে তো পূর্ব পাকিস্তানের সাহিত্য সম্বন্ধে তেমন কোনো আগ্রহ নেই, বরং উন্নাসিক অবজ্ঞাই আছে এবং সেহেতুই তার সম্বন্ধে এখানে শিক্ষিত জনসাধারণকে অবহিত করার প্রয়োজন আছে। একে মাতামাতি বলে অযথা বিদ্রূপ করেও এর সম্প্রীতি হ্রাস করা যাবে না। পূর্ব পাকিস্তানের সাহিত্যিকদের এমন অভিযোগও আছে যে সেখানকার পাঠক সম্প্রদায় তাঁদের লেখার তেমন কদর দেন না, শিক্ষিত মুসলমানেরাও মনে করেন যে মুসলমান লেখকেরা তেমন কিছু লিখতে পারেন না—পশ্চিমবঙ্গের লেখকদের লেখার প্রতিই তাঁদের আকর্ষণ বেশি। কাজেই মাতামাতির প্রশ্ন সেখানে নেই। পাকিস্তান আন্তর্জাতিক কপিরাইট আইন মেনে নেন নি বলে পশ্চিমবঙ্গের নামকরা লেখকদের বই সেখানে অবাধে ছাপা ও বিক্রি হয়, লেখকেরা তাঁদের প্রাপ্য রয়ালটি থেকে বঞ্চিত হন। তারাশঙ্কর, নজরুল, বনফুল, জরাসন্ধ প্রমুখ অনেকের ক্ষেত্রেই এমন হয়েছে। ইদানীং পাকিস্তান গভর্নমেন্ট-এর বিরুদ্ধে কিছুটা ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন—পশ্চিমবঙ্গের লেখকদের প্রতি সুবিচারের তাগিদে নয়, পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক যোগসূত্র ছিন্ন করার উদ্দেশ্যে। ঠিক সে কারণেই গত বৎসর 'কম্পাস' পত্রিকার উদ্যোগে উভয় বঙ্গের ভাষা ও সাহিত্য সেমিনার অনুষ্ঠানের পরই পূর্ব পাকিস্তানে সে পত্রিকার প্রবেশ নিষিদ্ধ হয়েছে। পাকিস্তানে রবীন্দ্র শতবার্ষিকী উৎসবে সরকার ও সরকার সমর্থকদের প্রতিকূলতার প্রতিবাদ করেছিলেন শুধু 'ইত্তেফাক' সম্পাদক তোফাজ্জল হোসেন (তোফাজ্জল হোসেন এখন আর বন্দী নন; 'ইত্তেফাক' এখনও বন্ধ আছে)। ঐ তথ্যও ঠিক নয়। সেখানে বিরাট উৎসব কমিটি গড়ে উঠেছিলো: তার সভাপতি ছিলেন ঢাকা হাইকোর্টের তদানীন্তন প্রধান বিচারপতি মিঃ জাস্টিস মোরশেদ। সরকার ও সরকার সমর্থকদের ভ্রূকুটি ও বিরোধিতা সত্ত্বেও উৎসব শহরে ও গ্রামে যে উদ্দীপনায় অনুষ্ঠিত হয়েছিলো তা পশ্চিমবঙ্গ থেকে কোনো অংশে কম ছিল না। এমন কি, তারপর সরকার সমর্থকগণও এক অনুষ্ঠান করেন—যদিও তাঁরা বলেন যে এক বিদেশী মহাকবি হিসেবেই তাঁরা রবীন্দ্রনাথের জন্ম-শতবার্ষিকী পালন করছেন। রবীন্দ্রনাথ যে পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষিত জনসাধারণের সত্তা অধিকার করে আছেন অসংখ্য প্রবন্ধ ও কবিতায় তার প্রমাণ আছে এবং সে প্রবন্ধ ও কবিতা প্রবাহের আজও বিরাম নেই। পাক বেতারে রবীন্দ্র-সঙ্গীত নিষিদ্ধ করার বিরুদ্ধে সোচ্চার ও কিছুটা সফল প্রতিবাদও তার প্রমাণ।

পূর্ব পাকিস্তানের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ উন্নয়নের জন্য সাংস্কৃতিক যোগসূত্রের ওপর নির্ভর করবার সুযোগ বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি পূর্ব পাকিস্তানবাসীর সক্রিয় অনুরাগ থেকেই আমরা পেয়েছি। বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে ও উর্দুর সর্বাত্মক আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করার প্রতিবাদে ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারী তারিখে পূর্ব পাকিস্তানের তরুণেরা যে প্রাণ দান করেছিলো তাতে ছিল শুধু ভাষার টান নয়, ছিল মাটির টান—যাকে বলে আকরের টান; মাটি থেকে, মাটির স্পর্শ থেকে, প্রধানত কৃষকসমাজ থেকে উদ্ভূত সেই উদীয়মান মধ্যবিত্ত শ্রেণীর তরুণ-তরুণীদের মাতৃভাষার প্রতি আকর্ষণ দুর্বার; নেই তার মধ্যে সেই সফিস্টিকেশন যা, আছে পশ্চিমবঙ্গের ইংরাজী শিক্ষিত বাঙালী আমাদের মধ্যে—যারা মনে করি বাংলা পরীক্ষা পাশ করতে বেশি পড়াশুনা করার দরকার নেই, বাংলা তারিখ না জানাই গর্বের বিষয় বলে মনে করি। 'কম্পাস' পত্রিকার উদ্যোগে অনুষ্ঠিত ঐ বৎসরের ২১শে ফেব্রুয়ারী স্মরণসভাতে অধ্যাপক আশুতোষ ভট্টাচার্য ঐ আশঙ্কা প্রকাশ করেন যে প্রাক্-বিভাগকালের শিক্ষক ও ছাত্রদের সম্বন্ধের মাধ্যমে যে পারস্পরিক পরিচয় ও সহযোগিতার সুযোগ এখনও কিছুটা রয়েছে পরে হয়তো তা-ও থাকবে না এবং তার ফলে গবেষণা ও অনুশীলনের অত্যন্ত ক্ষতি হবে। ঐ আশঙ্কা সত্য হবে না বলে ভরসা করার কারণ এখানে যে পূর্ব পাকিস্তানে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি আগ্রহ শুধু রবীন্দ্র-নজরুলে সীমাবদ্ধ থাকে নি; সুধীন্দ, জীবনানন্দ, সুকান্ত প্রমুখ সবাইতে ব্যাপ্ত হয়ে সম্মুখ বিকাশের সঙ্গে সযত্ন ও সক্রিয় যোগ রক্ষা করে চলেছে। সেই সঙ্গে প্রাচীন ঐতিহ্যের সঙ্গে যোগসূত্র স্মরণ ও রক্ষা করার আগ্রহ প্রত্যক্ষ হয়েছে। কয়েক দিন পূর্বে ঢাকাস্থ পাবনা সমিতি সাহিত্য-কীর্তির জন্য পুরস্কৃত পাবনা জেলার অধিবাসী কয়েকজন সাহিত্যিককে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করেন। সম্বর্ধনা সভায় এই আশা প্রকাশ করা হয় যে সম্বর্ধিত সাহিত্যিকগণ জেলার পূর্বসূরী সাহিত্যিক কান্ত কবি রজনীকান্ত সেন, প্রমথ চৌধুরী (বীরবল), অঙ্ক শাস্ত্রজ্ঞ যাদবচন্দ্র চক্রবর্তী এবং ইসমাইল হোসেন শিরাজীর সাহিত্যকীর্তির গৌরবোজ্জ্বল ধারা যোগ্যতা সহকারে বহন করতে সমর্থ হবেন। ধারাবাহিকতার প্রতি এহেন অবধানই পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে পূর্ব পাকিস্তানের সাংস্কৃতিক যোগসূত্র রক্ষা করবে বলে আশা করা যেতে পারে। তা যদি করে তবে অনন্ত ভবিষ্যতে প্রতিবেশী হিসেবে বাস করে সাময়িক বিবাদ-বিসম্বাদ যখন আমাদের মেটাতেই হবে তখন এক ভাষা ও সংস্কৃতির আশ্রয়ে উভয় দেশের জনজীবন ও ব্যক্তিজীবন দিন দিন সমৃদ্ধতর হবে এবং সাক্ষাৎ যোগ রক্ষার পথে বাধা-বিঘ্নও তখন আর থাকবে না, উভয় বাংলার শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ ঐ কামনাই করবেন, সন্দেহ নেই।

ফোল্ডিং ৫০ গুলির পিস্তল

লাইসেন্সের প্রয়োজন নেই। আমেরিকান মডেল। চোর এবং বন্য জন্তুর হাত থেকে নিজেকে বাঁচান। পিকনিক, ভ্রমণ এবং নাটকের পক্ষে উপযোগী। ৫০ গুলীর ব্যবস্থা-সহ অটোমেটিক। হাল্কা ওজন এবং চোখ ধাঁধান আগুন আপনাকে বিপদ থেকে রক্ষা করবে।

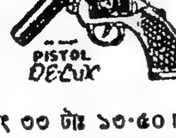

মূল্য ৫০ গুলীসহ নং ৩৩ টাঃ ১৩·৫০। জার্মান মডেল নং ৯৯ টাঃ ১৫·৫০। ভি, পি, পি, চার্জ টাঃ ২·৫০। চামড়ার কেস ৭, টাকা। অতিরিক্ত প্রতি একশত গুলী ৫, টাকা:

GEM ARTS (WBM—15)
P.B. 1325, Delhi—6.

রবীন্দ্রনাথ ও সুভাষচন্দ্র

শঙ্করীপ্রসাদ বসু

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

একই জাহাজে

সুভাষচন্দ্রের আই. সি. এস. ত্যাগের ব্যাপারে একটি আকর্ষণীয় তথ্য পেয়েছি শ্রীযুক্ত সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়ের কাছ থেকে। তিনি লিখেছেন ঃ—

"কিরণবাবুর কাছে শুনেছি, আই. সি. এস. পাশ করে সুভাষচন্দ্র হাকিমী করার নিয়োগপত্র পেয়েই কাজে ইস্তফা দেন—এর মূলে ছিল প্রধানত রবীন্দ্রনাথের প্রেরণা।"

(সুভাষচন্দ্র ও নেতাজী সুভাষচন্দ্র—২৭)

তথ্যটি সত্য হলে সুভাষচন্দ্রের জীবনের সন্ধিক্ষণে রবীন্দ্রনাথের বিশেষ দানকে স্বীকার করতে হয়।

রবীন্দ্রনাথের প্রেরণা সম্ভবপর হতে পারে দুটি কারণে, প্রথম, রবীন্দ্রনাথ জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে নাইটহুড ত্যাগ করেছিলেন; কবির সেই কীর্তি সুভাষচন্দ্রের কাছে প্রেরণা। দুই, সুভাষচন্দ্রের আই. সি. এস. পরীক্ষায় পাশ করার সময়ে রবীন্দ্রনাথ ইংলণ্ডে ছিলেন, সুভাষচন্দ্র ভবিষ্যৎ জীবনের কর্মপথ সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথের কাছে, তখন রবীন্দ্রনাথ তাঁকে আই. সি. এস. ত্যাগ করতে নির্দেশ দেন।

সুভাষচন্দ্র বা সুভাষচন্দ্রের বন্ধু দিলীপকুমারের কোনো রচনায় কিন্তু (যিনি সুভাষচন্দ্রের বিলেতি জীবন নিয়ে সবচেয়ে বেশি লিখেছেন) এই তথ্যের কোন সমর্থন পাই না। সুভাষচন্দ্রের অপর বন্ধু, ঐ সময়ে ইংলণ্ড-প্রবাসী শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় আমাকে বলেছিলেন, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের সাক্ষাৎ জাহাজে ফেরবার সময়েই হয়। শ্রীযুক্ত সত্যরঞ্জন বক্সীও আমাকে বলেছেন যে, একই জাহাজে উভয়ের প্রত্যাবর্তন থেকে পূর্বকথিত ধারণার উদ্ভব।

নাইট উপাধি ত্যাগের পর রবীন্দ্রনাথ যখন ইংলণ্ডে গেলেন তখন তাঁকে রাজভক্ত ইংরেজ কোথাও ভাসা-ভাসা অভ্যর্থনা করল, কোথাও প্রত্যাখ্যান করল স্পষ্ট বিরূপতায়। ইংলণ্ডে বসে রবীন্দ্রনাথ 'ছোটো ইংরেজে'র চেহারাটা দেখলেন, দেখলেন—'নারীঘাতী শিশুঘাতী বীভৎস' ডায়ারকে কেমন করে টাকার তোড়া দিয়ে সাম্রাজ্যসুখী ইংরেজ অভিনন্দন জানাল, কেমনভাবে অত্যাচারের বিরুদ্ধে কিছু মন্তব্য করে লাঞ্ছিত হলেন লর্ড সভায় মিঃ মন্টেগু। রবীন্দ্রনাথের মন বিষিয়ে গেল। ১৯২১ সালের ২২শে জুলাই এন্ড্রুজকে এক পত্রে লিখলেন ঃ—

"ভারতের প্রতি এদেশের শাসক সম্প্রদায়ের প্রকৃত মনোভাব নিদারুণরূপে প্রতিফলিত হয়েছে—পার্লামেন্টের দুটি কামরাতেই [জেনারেল] ডায়ার সংক্রান্ত সাম্প্রতিক আলোচনা ও বিতর্কমুখে। এর থেকে যে কথাটি অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে উঠেছে তা এই যে, এদেশে যাদের মধ্য থেকে আমাদের শাসনকর্তারা নির্বাচিত হয়ে থাকেন, তাঁদের আমলারা আমাদের উপর যত দানবীয় অত্যাচারই করুক না কেন তাতে তাঁদের মনে কোনরকম বিক্ষোভের সঞ্চার হয় না।

"তাঁদের বক্তৃতায় পাশবিকতা যে-রকম নির্লজ্জভাবে প্রকাশ পেয়েছে, এবং তাঁদের খবরের কাগজগুলোতে তারই প্রতিধ্বনি যেভাবে ঝংকৃত হয়ে উঠেছে, তা অতি ভয়াবহরূপেই কুৎসিত।......আমাদের একটিমাত্র সান্ত্বনা ছিল ইংরেজ জাতির ন্যায়ানুরাগের প্রতি আস্থা। আমরা ভেবেছি যে, সহজলভ্য যদৃচ্ছ ক্ষমতা ও প্রভুত্বের শক্তিমত্ততায়, অধীনস্থ দেশের সমগ্র জনমণ্ডলীর মনুষ্যত্ব নিতান্ত নিঃসহায়ভাবে দলিত মথিত করলেও, তার মারাত্মক গরল ইংরেজ সাধারণের আত্মাকে ক্লেদাক্ত করতে পারে নি।

"কিন্তু বেশ দেখা যাচ্ছে যে, সে-বিষ আমরা যা ভাবি নি তার চেয়ে অনেক বেশি গভীরে প্রবেশ করেছে ; বৃটিশ জাতির নাড়ীতে ঘুণ ধরেছে ; তার মজ্জা এই দারুণ বিষের প্রতিক্রিয়ায় জর্জরিত হতে চলেছে। আমি অনুভব করছি যে, ওদের মহদনুভূতির উদ্দেশে আমাদের আবেদন প্রতিদিনই ক্রমশ ক্ষীণতর সাড়া দেবে।......

"সাম্প্রতিক ঘটনাবলী স্পষ্টই প্রমাণ করেছে যে, আমাদের সত্যকার মুক্তি রয়েছে আমাদের আপন হাতে ;......শুধু আত্মত্যাগ ও নিরতিশয় দুঃখবরণ দ্বারাই আমরা পাব সাফল্যের সন্ধান—তা ছাড়া আর অন্য পথ নেই।"

(র. জী.—৩—৪০, ৪১)

ইংরেজ জাতির ন্যায়বোধে একান্ত আস্থাশীল রবীন্দ্রনাথের পরিবর্তিত ধারণার রূপ এই। সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে এই কথাগুলি নিশ্চয় তিনি তাঁকে বলতেন যে—সুভাষচন্দ্র অপমানের পৃথিবী-ফাটা আগ্নেয়গিরি।

জালিয়ানওয়ালাবাগ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মনোভাবের একটি ভিন্ন দিক ছিল। তিনি আমলাতন্ত্রের বর্বরতার প্রতিবাদ করেছিলেন, কিন্তু অপরপক্ষে অত্যাচারিত ভারতীয়দের আচরণ তাঁর কাছে গৌরবজনক মনে হয় নি। পাশবিকতার সামনে পরাজিত পশুর মতই ব্যবহার করেছিল ভারতবর্ষের একাংশ। সে লজ্জা তাঁর মনে বিঁধেছিল। তাই জালিয়ানওয়ালাবাগের ঘটনা নিয়ে ঢাক পিটোবার কথায় সায় দেন নি। জালিয়ানওয়ালাবাগে স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণের ঘোর বিরোধী ছিলেন। ইংলণ্ডে লর্ড সিংহ ও স্যর কৃষ্ণগোবিন্দ কবির সঙ্গে দেখা করতে এলেন। "কবির মতে লর্ড সিংহ সায় দিয়া বলিলেন, পাঞ্জাবে যে কাণ্ড ঘটিয়াছিল এবং লোকে যেভাবে অপমান সহ্য করিয়াছিল. তাহা বাংলাদেশে কখনও সম্ভব হইত না। বাংলা প্রতিবাদ করিতই।" ১ রবীন্দ্রনাথের রচনাংশ (রবীন্দ্রনাথের লেখা বলে প্রভাতকুমার দ্বারা অনুমিত) সামান্য পরিমাণে উদ্ধৃত করা যায়—

"পীড়ন যতই কঠিন হউক সহিব, কিন্তু আত্মাবমাননা কিছুতেই সহিব না—পাঞ্জাবে এইরূপ পৌরুষের বাণী শুনিবার

১—র.জী.৩—৪০

আশা করিয়াছিলাম। কিন্তু যখন শুনিলাম না, তখন সর্বাগ্রে, আপনাদিগকেই ধিক্কার দিতে হইবে। এই কারণেই আমরা বলি, কোনো চিহ্নের দ্বারা পাঞ্জাবের এই ঘটনা চিরস্মরণীয় করা আমাদের পক্ষে গৌরবের নহে। বীরত্বই স্মরণের বিষয়, কাপুরুষতা নৈব নৈব চ।......যেখানে পীড়নকারী ও পীড়িত কোন পক্ষেই বীর্যের কোন লক্ষণ দেখা গেল না, সেখানে কোন্ কথাটা সমারোহপূর্বক স্মরণ করিয়া রাখিব? আমাদের রাজপুরুষেরা কানপুরে ও কলিকাতায় দুষ্কৃতির স্মৃতিচিহ্ন স্থাপন করিয়াছেন। আমরা কি তাঁহাদেরই অনুকরণ করিব?"

রবীন্দ্রনাথের একটি অবিস্মরণীয় চিত্র উদ্ধার করেছেন দিলীপকুমার। চিত্রটির জন্য তাঁর কাছে আমরা কৃতজ্ঞ। ১৯২০-২১ সালে য়ুরোপপ্রবাসী রবীন্দ্রনাথের কথা। জীবনের এক সিদ্ধান্ত-সঙ্কটের কালে দিলীপকুমার দেখা পেলেন রবীন্দ্রনাথের—

"এই সময়ে দেখা হোল এমন এক মহাকীর্তিমানের সঙ্গে, দীনদুনিয়ায় যাঁর কীর্তির জুড়ি মেলা ভার।......তাঁর বহুমুখী কীর্তি; ব্যক্তিরূপ, প্রতিভাদীপ্ত মুখ, কথার ভঙ্গি—সবই আমার যেন চোখ খুলে দিল, মন উঠল গান গেয়ে—এই তো চাই, এরই তো নাম সার্থকতা। পরে রোলাঁ আমাকে একটি পত্রে কবির সম্বন্ধে লিখেছিলেন—Quelle harmonie—কী সুষমা।......রবীন্দ্রনাথকে দেশের পরিবেশে দেখে মুগ্ধ হয়েছিলাম তাঁর রূপে, মধুর কণ্ঠে, মৃদু রসিকতায়। কিন্তু বিলেতে তাঁকে গৌরবে অচলপ্রতিষ্ঠ দেখলাম।......কী আত্মমর্যাদা জ্ঞান ছিল তাঁর।......

"আত্মমর্যাদার কথা বলতে একদিনের কথা মনে পড়ে গেল। আমি সেদিন তাঁর ওখানে সাউথ কেনসিংটনে বসে তাঁর সঙ্গে গল্প করছি, এমন সময়ে কয়েকটি ভারতীয় ছেলে এল দরবার করতে। কী? না, জালিয়ানওয়ালাবাগে হাজার-বারশো নিরস্ত্র নরনারী জেনারেল ডায়ারের গুলীতে মরেছে, তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সভায় তাঁকে সভাপতি হতে হবে। রবীন্দ্রনাথের গৌর আনন লাল হয়ে উঠল বিরক্তিতে। তিনি উদ্দীপ্তকণ্ঠে বললেন—'তোমাদের কি লজ্জা করে না একটুও? জালিয়ানওয়ালাবাগে আমরা পশুর মত মার খেয়েছি—হামাগুড়ি দিয়ে হেঁটে অনেকে প্রাণ বাঁচিয়েছিল—এই কথা এখানে হাটেবাজারে প্রচার করতে চাও? আমাদের চরম অপমানের কথা ঘোষণা করবে বড় গলা করে? ভাবো কি ঐ ধরনের আন্দোলনে সুফল ফলবে,—ফলতে পারে কখনো? এরা শুনে বলবে—যারা এহেন পাশবিক অত্যাচার মুখ বুজে সয়, হামাগুড়ি দিয়ে আর্তনাদ করতে করতে কোনোমতে প্রাণ বাঁচায়, তারা অমানুষ—কাজেই তাদের জন্তুর মত গুলী করা ঠিকই হয়েছে। যাও তোমরা, দেশের গ্লানি ঢাক পিটিয়ে প্রচার করতেই যদি কোমর বেঁধে থাকো, তবে সে ঢাকীদের মুখ্যে আমাকে ভর্তি করবার মিথ্যে চেষ্টা কোরো না।'

"কবির ক্রুদ্ধ রাঙা মুখ আজও মনে পড়ে। এত তীক্ষ্ন ভৎর্সনা তাঁর মুখে কখনও শুনি নি। ওরা চলে যাবার পরে আমাকে বললেন,—'দিলীপ, পেট্রিয়ট হলে কি জাঁক করে বোকা বনতেই হবে? আমরা এ স্বাধীন দেশে এসেও কি আমাদের জাতীয় অগৌরব, লজ্জা, হীনতা, ভীরুতা প্রচার করে এদের আদর কাড়তে ছুটব? এ হয় কখনো? এরা আর যাই পারুক না কেন, কাপুরুষকে শ্রদ্ধা করতে পারবে না নিশ্চয় জেনো। এখানে এসে যদি ভারতের কথা বলতে হয় তবে আমরা যেন কেবল সেই সেই গুণ, সেই সেই সম্পদ, সেই সেই সাধনার কথাই বলি যাদের দৌলতে ভারত বড় হয়েছিল—যেমন বিবেকানন্দ বলেছিলেন। তাই তো তিনি এদের শ্রদ্ধাও পেয়েছিলেন। তিনি এদের এসে ডাক দিয়েছিলেন 'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত' বলে—কাঁদুনি গান নি আমাদের হাজারো দুর্দশার কথা জানিয়ে। আমার মনে আছে নিবেদিতাকে তিনি কিভাবে দীক্ষা দিয়েছিলেন ভারতের সত্যকীর্তির তত্ত্বে, তার কাছে একবারও বলেন নি—আমরা বড় আর্ত, বড় দীনহীন। বলতেন, ভারতের বড় দিকটার পানে চোখ তুলে তাকাও, তার বাইরের দারিদ্র্যকে বড় করে দেখো না। আমেরিকানদের সামনে এসে তিনি মাথা উঁচু করেই বলেছিলেন ভারতের ধর্মতত্ত্বের কথা; যদি কেঁদে ভাসাতেন 'দুটি ভিক্ষে দাও গো' বলে, তাহলে না পেতেন ভিক্ষা, না সমাদর।'"২

দেশের জন্য সর্বস্বত্যাগে প্রস্তুত সুভাষচন্দ্রের কাছে রবীন্দ্রনাথের উপাধি

২—জালিয়ানওয়ালাবাগে ভারতীয়দের কাপুরুষতায় রবীন্দ্রনাথ নিতান্ত আহত হয়েছিলেন এবং সেজন্য তা নিয়ে ঢাক পিটানোয় ঘৃণা করেছিলেন। সেটা প্রখর আত্মমর্যাদার প্রমাণ। এই আত্মমর্যাদাই, বিদেশী যখন ঐ কাপুরুষতা নিয়ে ব্যঙ্গ করতে গেছে, তাদের বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথকে আক্রমণমুখী করে তুলেছে; তীক্ষ্ন উত্তরে জানিয়েছেন, ঐ কাপুরুষতার ঐতিহাসিক পটভূমিকা কি? এ বিষয়ে ১৯৪১ সালে মিস্ রাথবোনকে লেখা চিঠির অংশবিশেষ উল্লেখ করা যায়। রবীন্দ্রনাথ বলছেন—

"I look round and see riots raging all over the country. When scores of Indian lives are lost, our property looted, our women dishonoured, then mighty British arms stir in no action, only the British voice is raised from overseas to chide for our unfitness to put our house in order.

"Examples are not wanting in history when even fully armed warriors have shrunk before superior might and contigencies have arisen in the present war when even the bravest among the British, French and Greek soldiers have had to evacuate the battlefield in Europe because they were overwhelmed by superior armaments,—but when our poor, unarmed and helpless peasants, encumbered with crying babes, flee from homes, unable to protect them from armed goondas, the British officials perhaps smile in contempt at our cowardice!

"Every British civilian in England is armed to-day for protecting his hearth and home against the enemy, but in India, even lathi-training was forbidden by decree. Our people has been deliberately disarmed and emasculated in order to keep them perpetually cowed and at the mercy of their armed master."

জাতীয় আত্মমর্যাদার প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বিবেকানন্দের ভূমিকার উল্লেখ করেছেন। বিবেকানন্দের সঙ্গে তাঁর বহু বিষয়ে মতভেদ থাকলেও এবং যথাসম্ভব বিবেকানন্দের উল্লেখে তিনি বিরত থাকলেও, রবীন্দ্রনাথ স্বামীজীর আত্মশক্তিময় পৌরুষবীর্যের অকুণ্ঠ প্রশংসা করতেন বলে শোনা যায়। রবীন্দ্রনাথ নাকি বলেছিলেন—ভারতকে যদি জানতে চাও, বিবেকানন্দকে জানো, কারণ তাঁর মধ্যে নেতি বলে কিছু নেই—সবই ইতিবাচক। আমার মনে হয়, ১৯২০-২১ সালেই, উপরি উক্ত মনোভাবের পটভূমিকায় তিনি ঐ ধরনের কথা বলেছিলেন।

ত্যাগ এবং ঐ প্রখর আত্মসম্মানবোধ বরণীয় আদর্শ বলে মনে হবার কথা। কিন্তু বিস্ময়ের কথা, সুভাষচন্দ্র জালিয়ানওয়ালাবাগের উল্লেখ যেখানে করেছেন (বেশি করেন নি), সেখানে রবীন্দ্রনাথের কথা নেই। তিনি যখন ইংলন্ড যাচ্ছেন, তখনই জালিয়ানওয়ালাবাগের ঘটনা ঘটে গেছে এবং রবীন্দ্রনাথ উপাধি ত্যাগও করেছেন। অথচ তাঁর মনে ঐ ঘটনাটা বিশেষ আলোড়ন তোলে নি। সুভাষচন্দ্র আত্মজীবনীতে লিখছেন—

"যখন ভারতবর্ষ ছাড়ি, তার কিছুদিন আগেই জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু পাঞ্জাবের বাইরে তার খবর প্রায় পৌঁছয় নি। কারণ গোটা পাঞ্জাব তখন সামরিক আইনের কবলে, খবরাখবরের ব্যাপারে প্রবল কড়াকড়ি। সুতরাং লাহোরে ও অমৃতসরে নানা ভয়াবহ ঘটনার ভাসাভাসা গুজবমাত্র আমাদের কানে এসেছিল।......মোটের উপর উত্তর-পশ্চিম ভারত সম্বন্ধে সাধারণ ছিল অজ্ঞ। সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত মন নিয়ে য়ুরোপ যাত্রা করলাম।"

সুভাষচন্দ্রের স্মৃতির উপর নির্ভর করলে বলতে হবে, জালিয়ানওয়ালাবাগের ঘটনা বাংলাদেশে বিশেষ কোন আন্দোলন সৃষ্টি করে নি; এমন কি, সেই সঙ্গে যোগ করে দেওয়া যায়, রবীন্দ্রনাথের উপাধি ত্যাগ পর্যন্ত। শেষোক্ত ব্যাপারটি আমাদের কাছে বিস্ময়কর ঠেকেছে। যতই সামরিক আইনের বেড়াজালে ঢাকা থাকুক পাঞ্জাব, রবীন্দ্রনাথ কি মিছে উপাধি ত্যাগ করেছিলেন? কবির এমন একটা সাহসিক কাজ সুভাষচন্দ্রের স্পর্শকাতর মনকে চঞ্চল করতে পারল না কেন? সে কি এই জন্য যে, উপাধি ত্যাগের মত ব্যাপারকে অতিরিক্ত বড় ব্যাপার বলে সুভাষচন্দ্র দেখেন নি? সুভাষচন্দ্র, যিনি অপমানের প্রতিবাদে ছাত্রজীবনে বহিষ্কার বরণ করতে পারেন, তাঁর কাছে রবীন্দ্রনাথের তুল্য বিরাট পুরুষের পক্ষে নাইটহুড ত্যাগের কাজ বিরাট কিছু মনে হয় নি, অপরপক্ষে রবীন্দ্রনাথের নাইট থাকাটাই কি অস্বাভাবিক মনে হয়েছিল? এর আগে রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক চিন্তার যে সূচী দিয়েছি, এমনও হতে পারে, তার অনেকখানি অংশ সুভাষচন্দ্র পছন্দ করেন নি। কলেজজীবনের শেষ দিকে তিনি বিপ্লবীদের সংস্পর্শে আসতে সুরু করেন; এ ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের বিপ্লববাদ-বিরোধিতা এবং ন্যাশনালিজমকে পাপ বলে ঘোষণা করা ভাল না লাগতেও পারে, এবং সেই কারণেই হয়ত রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক চিন্তা ও কর্ম সম্বন্ধে উদাসীন ছিলেন: কিংবা সুভাষচন্দ্র ইংলণ্ড যেতে এমনই উদ্‌গ্রীব ছিলেন যে, মনের ভারসাম্য নষ্ট করতে চাইছিলেন না কোনোমতে? ঠিক উত্তর দেওয়া আমার পক্ষে কঠিন।

ইংলণ্ড যাওয়ার পরে কিন্তু তিনি জালিয়ানওয়ালাবাগের ব্যাপার সম্বন্ধে অধিকতর সচেতন হয়ে ওঠেন। এর মূলে কি ইংলণ্ডে রবীন্দ্রনাথের উপস্থিতি? স্যর উপাধি ত্যাগের জন্য ইংলণ্ডে রবীন্দ্রনাথের প্রতি শীতল ব্যবহারের সংবাদ নিশ্চয় সুভাষচন্দ্রের কাছে পৌঁছেছিল। কেম্ব্রিজের বিতর্ক সভায় শ্রমিকদলীয় স্যর অসওয়াল্ড মসলে ('যিনি পরে ভোল পালটান') ডায়ার-ও'ডয়োর নীতিকে তীব্রভাবে আক্রমণ করে বলেছিলেন, অমৃতসরের ঘটনা জাতিগত বিদ্বেষের পরিচায়ক,—যাতে ইংলণ্ডে বিষম চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়,—সুভাষচন্দ্র কৃতজ্ঞতার সঙ্গে সেই বক্তৃতার স্মরণ করেছেন। সুভাষচন্দ্র বলেছেন — "যুদ্ধপরবর্তী ঘটনাবলী, বিশেষত অমৃতসরের বিপর্যয়ের পর আত্মসম্মান ও জাতীয় সম্মান সম্বন্ধে স্বভাবতই একটু সজাগ (হয়তো একটু অতিরিক্ত সজাগ) ছিলাম। মধ্যবিত্ত ইংরেজ মহলে জেনারেল ডায়ারের প্রতি সহানুভূতি দেখে আরো দুঃখ হোত।" ইংলণ্ডবাসকালে নানা ঘটনা থেকে (কতকগুলি দৃষ্টান্ত তিনি আত্মজীবনীতে দিয়েছেন) তিনি এইটেই বুঝেছিলেন, "বৃটিশ ও ভারতীয়ের মধ্যে বন্ধুত্বের কোন ভিত্তি ছিল না।"

এখন আমরা সাবিত্রীপ্রসন্ন-প্রদত্ত তথ্যটির আলোচনায় ফিরে আসতে পারি: সুভাষচন্দ্রের আই·সি·এস ত্যাগের পিছনে সত্যই কি 'মূল প্রেরণা' রবীন্দ্রনাথের? ঘটনাগতভাবে আমরা বলতে পারি, প্রত্যাবর্তনের জাহাজে ওঠবার আগে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের 'সম্ভবত' সাক্ষাৎ হয় নি। অন্যদিক দিয়েও দেখলাম, জালিয়ানওয়ালাবাগের ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথের উল্লেখে তিনি বিরত। এ ক্ষেত্রে আত্মজীবনীতে তিনি যেসব কারণের উল্লেখ করেছেন, সেগুলিকেই 'মূল কারণ' রূপে গ্রহণ করা উচিত। কলেজে থাকতেই সুভাষচন্দ্রের মনের যে-গঠন, তদনুযায়ী আই· সি· এস পদগ্রহণ তাঁর পক্ষে কতখানি অসম্ভব ছিল, তা তাঁর অন্যতম বন্ধু দিলীপকুমারের লেখা থেকে পূর্বেই দেখেছি। ইংলণ্ডে গিয়ে দেখলেন ইংলণ্ডবাসী-ইংরেজদের মধ্যেও (ইংরেজ নাকি স্ব-দ্বীপে সুন্দর!!) 'বাহ্য রঙচঙের আড়ালে প্রচ্ছন্ন একটা শ্রেষ্ঠত্বের অহংকার' এবং অনেক মহলে 'প্রবল ভারতীয়-বিদ্বেষ।' ফলে সুভাষচন্দ্রের মনে 'নীরব ঘৃণার ও রাগের কিছুমাত্র অভাব ঘটে নি।' অন্যদিকে সুভাষচন্দ্র স্বাধীন দেশে স্বাধীনতার মাহাত্ম্য দেখলেন। দেখলেন 'ছাত্রদের স্বাধীনতা ও সম্মান', জনসাধারণের সঙ্গে পুলিশের মানুষের ব্যবহার। 'যা খুশি বলার ও যাকে খুশি আক্রমণ করার অবাধ স্বাধীনতা' তাকে মোহিত করল, পীড়িত করল ভারতবর্ষে এর বিপরীত অবস্থার চিন্তা। আয়র্ল্যাণ্ডের মতই ভারতের অবস্থা, কিংবা তারো চেয়ে শোচনীয়, নিশ্চয় কল্পনাতীতভাবে শোচনীয়, একদিকে আছে, 'Forces of Law and order', অন্যদিকে 'Law and disorder', একদিকে আইন ও শৃঙ্খলার রাজত্ব, অন্যদিকে আইন ও বিশৃঙ্খলার রাজত্ব।

এই অবস্থায় সুভাষচন্দ্রের মন বেড়ে উঠল স্থির প্রতিজ্ঞায়। ইংলণ্ডে থাকাকালীন তাঁর কঠোর নিয়মব্রত, শুদ্ধাচার, ব্যক্তিত্ব, চরিত্রের আভিজাত্য এবং লক্ষ্যে অনন্যগতির কথা সকল প্রত্যক্ষদর্শীই স্বীকার করেন। আই· সি· এস পাশ করার পর তাকে ত্যাগ করা ছাড়া যে গত্যন্তর ছিল না, তার সাক্ষ্যরূপে তাঁর কয়েকটি অন্তরঙ্গ চিত্র উদ্ধৃত করা যায়। পুনশ্চ দিলীপকুমারের কাছে ঋণ স্বীকার করা যাক—

"সুভাষ যখন ইংলণ্ডে এসে পৌঁছল তখনো কেম্ব্রিজের কলেজ খোলে নি। তাই কয়দিন আমরা লণ্ডনে কাটাই একত্রে। আমি চাইতাম ওকে থিয়েটার, সিনেমা, হিপোড্রাম প্রভৃতি প্রদর্শনীতে নিয়ে যেতে। কিন্তু ও কি আমোদপ্রমোদ করার পাত্র? যাবে কেবল এখানে-ওখানে ঐতিহাসিক স্থান দেখতে কিংবা বৃটিশ মুাজিয়ামে।......

"কেম্ব্রিজে স্থিতিশীল হতে না হতে ওর সেই একই অবস্থা।...বলবে—আমরা বিদেশে এসেছি দেশের কাজের জন্য প্রস্তুত হতে, বিদ্যা জ্ঞান সঞ্চয় করতে—মিথ্যে হাসি গল্প তামাসায় সময় নষ্ট করতে নয়।"

"কলেজ খুলতেই সুভাষ আই· সি· এস-এর একরাশ বই নিয়ে পড়ল—সঙ্গে সঙ্গে 'মেন্টাল এন্ড ময়্যাল সায়েন্স' ক্লাসে যাওয়া—একটি লেকচারও না বাদ দিয়ে। তারপর সে কী বিষম পড়া—শুধু পড়া আর পড়া!......"

"একদিন ওর ওখানে গিয়ে দেখি ও গিবনের বিরাট 'ডিক্লাইন এন্ড ফল অব দি রোমান এম্পায়ার' পড়ছে। এ দুর্ধর্ষ গ্রন্থটি কেম্ব্রিজ লাইব্রেরির গ্রন্থতালিকায় দেখেছিলাম বটে, কিন্তু একবার একটি খণ্ড দেখেই রেখে দিই 'ও-বাবা' বলে।

এ হেন বিলিতি মহাভারত সুভাষ যে শুধু পড়ছে তাই নয় কিনে পড়ছে। শুধু কি এই, গ্যারিবলডি, ম্যাটসিনি, মেটারনিখ, লেনিন, ক্রপটকিন প্রমুখ দেশধুরন্ধদের বই। আমি ওকে বালজাক কি ডস্টয়েভস্কি কি টুর্গেনিভ পড়তে দিলে ও বলত, ওসব পরে পড়া যাবে হে, এখন কাজের বই পড়াই ভালো।"

"আর একটি চিত্র। ওর ওখানে দেখি কয়েকটি আইরিশ ছাত্র। কেম্ব্রিজে তখন আইরিশরা মোটেই পপুলার ছিল না। কিন্তু ও খুঁজে খুঁজে তাদের সঙ্গেই আলাপ করছে। তারা প্রস্থান করলে জিজ্ঞাসা করাতে ও চুপি চুপি বলল—সিন্ ফিন্ হে! খবর নিচ্ছি। ওদের কাছে বিপ্লবের টেকনিক কত যে শিখবার আছে।"

এমন যাঁর মানসিক গঠন, জীবন-সাধনা, তাঁর পক্ষে আই. সি. এস পূর্বাহ্নেই বাতিল সিদ্ধান্ত। তবু সিদ্ধান্ত করতে সময় লেগেছিল, কারণ উত্তেজনার মাথায় কোন কিছু করে ফেলতে তিনি চাই-ছিলেন না, বিশেষত ব্যাপারটা যখন সমগ্র জীবননীতির সঙ্গে যুক্ত। আরামের শয্যাতল ত্যাগ করার পরে তাতে ফিরে ওঠার সম্ভাবনাকে তিনি মনে প্রাণে ঘৃণা করতেন। সিদ্ধান্তঘটিত বিলম্বের মূল কারণ কিন্তু স্নেহের বিপরীত টান। পিতামাতা ও আত্মীয়বর্গের মনে এতে নিদারুণ আঘাত দেওয়া হবে, এবং কাজটা করতে হবে তাঁদের সম্পূর্ণ অসম্মতিতে। ভারতীয় মহাকাব্যের এই নতুন নায়ক পিতৃসত্য পালন করতে পারেন নি।৩

পারেন নি এই জন্য যে, তা করলে নিজ স্বার্থকেই রক্ষা করা হোত—কেন না পিতা, পুত্রের নিরাপত্তার জন্যই তাকে হাকিম দেখতে চাইছিলেন, কোন ব্যক্তিগত উচ্চা-কাঙ্ক্ষায় নয়।

আই. সি. এস পদপ্রাপ্তির পর সুভাষ-চন্দ্র তাঁর সংকল্প জানিয়ে মেজদা শরৎচন্দ্র বসুকে অনেকগুলি চিঠি লিখেছিলেন—সেগুলিতে তিনি পদত্যাগের কারণ জানিয়েছেন।৪ প্রথমে খারিজ করছেন আমলাতন্ত্রের মধ্য থেকে দেশসেবার সম্ভাবনীয়তাকে। রমেশ দত্ত? নিশ্চয় তিনি অনেক কাজ করেছিলেন, কিন্তু আমলাতন্ত্রের বাইরে থাকলে অনেক বেশি করতে পারতেন। সুরেন্দ্রনাথ? তিনি যে "জীবনান্তে উপাধির মুকুট পরিয়া মন্ত্রিত্বের গদীতে আসীন হইয়াছেন, তাহার কারণ তিনি বার্ক বর্ণিত সুবিধা-বাদের দর্শনে বিশ্বাসী।" এ বিষয়ে শেষ কথা—চাকুরির আইনকানুনের সঙ্গে "জীবনের উচ্চ আদর্শকে মানাইয়া লইবার চেষ্টা ভণ্ডামি ভিন্ন কিছু নয়।"

দেশে ফিরে পদত্যাগ করার প্রস্তাবের উত্তরে বক্তব্য—পদত্যাগ যখন করতেই হবে, এখনি নয় কেন, বিশেষত 'চাকুরির প্রশস্ত কোলে একবার ঠাঁই করিয়া লইবার পর যখন সমস্ত তেজ উবিয়া যাইবার' সম্ভাবনা আছে। 'চাকুরির ক্ষয়কারী প্রভাব' নিজের উপর পড়তে না দিতে সুভাষচন্দ্র দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ, বিশেষত চাকুরির প্রয়োজন যখন তাঁর নেই, কারণ বিয়ে করে সংসারে জড়াবার ইচ্ছে নেই।

সুভাষচন্দ্রের মনে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে দুজনের কথা—অরবিন্দ ও চিত্তরঞ্জন। যথেষ্ট পরিণত বয়সে চিত্তরঞ্জন 'সংসারের সব কিছু ছাড়িয়া অনিশ্চয়তার ভূমিতে' এসে দাঁড়িয়েছিলেন। আর অরবিন্দ? সারা মন জুড়ে আছে তাঁরই দৃষ্টান্ত,—'অরবিন্দ ঘোষের পথই আমার নিকট মহৎ ও নিঃস্বার্থ অনুপ্রেরণার পথ, যদিও সে পথ রমেশ দত্তের পথ অপেক্ষা কণ্টকাকীর্ণ।' —'আমার মনশ্চক্ষুতে অরবিন্দ ঘোষের দৃষ্টান্ত সর্বদা উজ্জ্বল রহিয়াছে। ক্রমেই বোধ করিতেছি যে, এই আত্মত্যাগের দ্বারা সেই দৃষ্টান্তের দাবি মিটাইতে পারিব।'৫

---

৩ সুভাষচন্দ্রের মনের ছবি—

"ওর পিতৃদেব বিষম উদ্বিগ্ন হয়ে ওকে লিখলেন দীর্ঘ পত্র। তার মর্ম এই—ওটেন সাহেবকে মারার পর থেকেই ও পুলিশের নজরবন্দী হয়ে আছে। তার উপর যদি আই. সি এস-এ ইস্তফা দেয় তবে বোম্বেতে জাহাজ থেকে নামতে না নামতে ওঁকে বালা হাতে পরে হরিণবাড়ি রওনা হতে হবে, বাপের বাড়ি হয়ে দাঁড়াবে অতীতের স্মৃতি।...সুভাষ অন্তত দেশে ফেরার আগে চাকরি না ছাড়ে।...ওর এক দাদা লিখলেন, তার মর্ম এই,—সুভাষের পিতৃদেব অসুস্থ, সে দেশে ফিরেই ফের জেলে গেলে তাঁর অকালমৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে।" সুভাষ শুষ্ক মুখে একদিন আমার বাসায় এসে এ-চিঠিটা দেখাল।

আমি (একটু চুপ করে থেকে)—তাহলে কি করবে এখন?

সুভাষ (আশ্চর্য হয়ে)—কী করব? মানে?

আমি (ইতস্তত করে)—মানে...এখনো সময় আছে...তোমার...ইয়ে...ইস্তফাপত্র প্রত্যাহার......

সুভাষ (উদ্দীপ্ত)—মানে চাকরির গোয়ালে মাথা মুড়োবো? দিলীপ! এমন কথা তুমি উচ্চারণ করতে পারলে?

আমি—কিন্তু তোমার পিতৃদেব যে অসুস্থ—

সুভাষের চোখ চিক্ চিক্ করে উঠল, কিন্তু সামলে নিয়ে বলল, জানি ভাই। কিন্তু আমাদের আত্মীয়স্বজন প্রিয় পরিজনের কথা ভেবে পদে পদে আদর্শ ঠিক করতে হলে সে আদর্শ যে কেমনতর হবে একবার ভেবে দেখেছ কি? না আমি সে কথা ভাবছি না।

আমি—তবে?

সুভাষ—ভাবছি; আমি এখন ফিরে যাব কেমন করে? এর উপরে বাবার কাছে আর এখন জাহাজের ভাড়া চাইতে পারি না।"

দিলীপকুমার জাহাজের ভাড়া ধার দিয়েছিলেন।

তাই বলে পরিবার ও প্রিয়জনদের কাছ থেকে বিচ্ছেদের সম্ভাবনা সুভাষ-চন্দ্রের মনে ছায়াপাত করে নি এমন নয়।

দিলীপকুমার লিখছেন—

"বিলেতে আমাদের সেই অবিস্মরণীয় শেষ রাতটির কথা আমি কোনদিন ভুলব না। আমাকে ও অনেকক্ষণ ধরে বলল ওর নানা স্বপ্নের কথা। শেষে বলল, 'আমি জানি দিলীপ, আমাকে ওরা সহজে রেহাই দেবে না। এদেশের পুলিশরা কিছু করতে না পারলেও তাদের কর্তারা ওদেশের পুলিশকে বলে দিয়েছেই দিয়েছে, আমারা কী ব্যবস্থা করতে হবে। প্রথম কয়েক বৎসর হয়ত আমাকে জেলেই কাটাতে হবে—হয়ত...', বলতে বলতে ওর গলা ধরে এল—'হয়ত আমি বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছতেই পারব না, বন্দরে নামামাত্র আমাকে ওরা বেআইনি আইনে পুলি-পোলাও চালান দেবে। কিন্তু তোমাকে বলে রাখছি দিলীপ, আমি ভাঙলেও মচকব না।'"

৪ পত্রগুলি শরৎচন্দ্র বসুকে লেখা এই জন্য যে, পরিবারের মধ্যে সুভাষচন্দ্রের জীবনাদর্শের তিনিই সমর্থক। ওটেন-শাসনের সময়ে শরৎচন্দ্র ভাইয়ের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। সুভাষচন্দ্র কৃতজ্ঞচিত্তে জানিয়েছেন—'আপনার আদর্শবাদে আমার আস্থা আছে।...পাঁচ বৎসর পূর্বে এই সময়ে আমার আরেক বিপজ্জনক প্রচেষ্টায় আপনার নৈতিক সমর্থন পাইয়াছিলাম।' এই সমর্থন ছিল 'স্বেচ্ছায় ও সহজভাবে।'

৫ শ্রীঅরবিন্দের প্রথম জীবনের বহিরঙ্গ রূপের সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের জীবনের ঘটনাগত কিছু ঐক্য লক্ষ্য করা যায়। গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরীর লেখা থেকে উদ্ধৃত করছি:

"অরবিন্দ আই. সি. এস. পরীক্ষায়

আর এইখানে সুভাষচন্দ্র সকল ভারতীয় নেতার শীর্ষে,—মাথা নোয়ায়নি না কখনো ইংরেজের পায়ে—সুভাষচন্দ্র গৌরবের সঙ্গে বলতে পারেন, প্রাপ্তবয়স্ক হবার পর কখনো মাথা নামান নি।—

"যেদিন আমি চাকুরির প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করিব সেদিন হইতে আমি স্বাধীন মানুষ থাকিব না, ইহাই আমার বিশ্বাস।"

"গোলামির প্রতীকস্বরূপ প্রতিজ্ঞাপত্রে সহি করা আমার পক্ষে অতি কঠিন হইবে।"

"সার্ভিসে যোগ দেওয়ার বিরুদ্ধে আমার প্রধানতম যুক্তির ভিত্তি ছিল এই যে প্রতিজ্ঞাপত্রে সহি করিয়া আমাকে এমন এক বৈদেশিক আমলাতন্ত্রের বশ্যতা

চিত্তরঞ্জন দাশ

স্বীকার করিতে হইবে যাহার এদেশ শাসন করিবার বিন্দুমাত্র অধিকারকে আমি স্বীকার করি না। একবার প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করিলে তিন বৎসর বা তিনদিন কাজ করি তাহাতে কিছু আসে যায় না।"

আসল কথা যুদ্ধের আহ্বান এসেছে। 'এসেছে আদেশ বন্দরে বন্ধনকাল এবারের মত হোল শেষ।' সুভাষচন্দ্র শুনেছেন তাঁর ভাব গুরুর গর্জন—'জাগো বীর ঘুচায়ে স্বপন, শিয়রে শমন, ভয় কি তোমার সাজে?'—

"কেবল আত্মত্যাগ ও দুঃখবরণের ভিত্তিতেই জাতীয় সৌধ প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। যদি আমরা সকলে নিজের নিজের চাকুরির খুঁটি আঁকড়াইয়া বসিয়া থাকি... তবে পঞ্চাশ বৎসরেও স্বায়ত্তশাসন মিলিবে না।......প্রত্যেক পরিবারকে আজ দেশমাতার চরণে অর্ঘ্য আনিয়া দিতে হইবে।"

'ভারতবর্ষের বিরুদ্ধে যুদ্ধের আহ্বান আসিয়াছে অথচ কেহ তাহার সমুচিত জবাব দেয় নাই। আরো অগ্রসর হইয়া বলিতে পারি সমগ্র বৃটিশ ভারতের ইতিহাসে একজন ভারতীয় স্বেচ্ছায় দেশসেবার জন্য সিভিল সার্ভিস ত্যাগ করে নাই। দেশের সর্বোচ্চ কর্মচারীদের নিম্নতর শ্রেণীর লোকদের নিকট দৃষ্টান্ত দেখাইবার সময় আসিয়াছে।"

"ঠিক এই মুহূর্তে যথেষ্ট সাড়া না পাওয়ার ফলে আন্দোলন দমিয়া যাইতে পারে।......আমার বিশ্বাস আরেকটি এ জাতীয় আন্দোলন আরম্ভ করিতে বহু বৎসর লাগিয়া যাইবে। সুতরাং বর্তমান আন্দোলনের ঢেউকে যতদূর সম্ভব কাজে লাগানোর চেষ্টা করাই সমীচীন। যদি আমাকে পদত্যাগ করিতে হয়......দেরি করিলে আন্দোলনের পক্ষে ক্ষতি হইতে পারে।"

"আমার এই বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে

চতুর্থ স্থান অধিকার করিয়া সম্মানের সহিত উত্তীর্ণ হইলেন। গ্রীক ও ল্যাটিন ভাষায় অরবিন্দ প্রথম স্থান অধিকার করিলেন।...অরবিন্দ কিন্তু ঘোড়ায় চড়ার পরীক্ষায় পাস করিতে পারিলেন না।... আমরা পূর্বাপর বিবেচনা করিয়া এই সিদ্ধান্তে আসিয়াছি যে, যেহেতু অরবিন্দ দেশে ফিরিয়া ইংরাজের অধীনে চাকরি করিবেন না স্থির করিয়াছেন, সুতরাং তিনি ইচ্ছা করিয়াই ঘোড়ায় চড়া পরীক্ষায় উপস্থিত হন নাই। **কেবল তাঁহার পিতার আগ্রহাতিশয্যেই আই সি এস পরীক্ষা দিয়াছিলেন।**

কথিত আছে, ডাঃ কে ডি ঘোষ অরবিন্দের এই ঘোড়ায় চড়া পরীক্ষায় ফেলের কথা শুনিয়া এতদূর মর্মাহত হইয়াছিলেন যে; তাঁহাকে অবিলম্বে দেশে ফিরিবার জন্য চিঠি দিয়াছিলেন। এবং ইহার পরে কেম্ব্রিজে থাকাকালীন আর কোন খরচপত্র পাঠান নাই।......

অরবিন্দ কিন্তু দমিবার পাত্র ছিলেন না। **তিনি কেম্ব্রিজে ট্রাইপস পরীক্ষা দিতে প্রস্তুত হইলেন।**" (শ্রীঅরবিন্দ ও বাংলার স্বদেশী যুগ)

দুই জীবনের এই অংশে ঐক্য প্রায় 'আক্ষরিক।' মহান আইরিশ নেতা পার্নেলের প্রতি অরবিন্দের ভক্তি সম্বন্ধে—

"অরবিন্দ আগাগোড়াই পার্নেলের গুণমুগ্ধ—পার্নেলের দ্বারা অতিমাত্রায় প্রভাবান্বিত।......এই বৎসর (১৮৯১) পার্নেলের মৃত্যু হয়। মৃত্যুর পরে অরবিন্দ তৎক্ষণাৎ এই কবিতাটি লিখিয়াছিলেন—কবিতাটি আগুনে ভরা, যার মধ্যে ছিল, পার্নেল ইংরেজদের কাছে—'Most feared, most hated, Hated because feared, who smot'st them with an edge surpassing swords!"।...

সরকারের সহিত সকল সম্পর্ক ছেদ করিবার সময় আজ উপস্থিত।......সরকারের অবসান করিবার শ্রেষ্ঠ উপায় তাহার নিকট হইতে সরিয়া আসা।"

যুদ্ধের আগুনের দর্পণে সুভাষচন্দ্র নিজের রূপ দেখে নিলেন—

'চাকুরিতে সাংসারিক সুখ পাওয়া যাইবে কিন্তু সেটা কি আত্মার মূল্য দিয়া ক্রয় করিব ?'

"আমার মত মনোবৃত্তির লোক যে চিরকাল 'উদ্ভট' জিনিসেরই পূজা করিয়া আসিয়াছে তাহার পক্ষে স্রোতে গা ভাসাইয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হওয়াটাই বাঞ্ছনীয় নহে। সংগ্রাম ভিন্ন, বিপদ ভিন্ন জীবনের স্বাদ অনেকখানি অন্তর্হিত হইয়া যায়।"

সুভাষচন্দ্রের কৃতজ্ঞ বন্ধু দিলীপকুমারকে আবার স্মরণ করতে হয়, তিনিই এই মানুষটির সুমহান যৌবনরূপকে উদ্ধার করে এনেছেন।—

"রবীন্দ্রনাথের বলাকার শেষ কবিতাটি ওর অত্যন্ত প্রিয় ছিল, প্রায়ই উদ্ধৃত করত সংবত উচ্ছ্বাসে—

ঘরের মংগলশঙ্খ নহে তোর তরে,
নহেরে সন্ধ্যার দীপালোক,
নহে প্রেয়সীর অশ্রুচোখ।
পথে পথে অপেক্ষিছে কালবৈশাখীর আশীর্বাদ,
শ্রাবণরাত্রির বজ্রনাদ।

স্বামীজীর Song of the Sannysin থেকেও ও প্রায়ই উদ্ধৃত করত একটি চরণ— 'Have thou no home, what home can hold thee, friend ?'... ফরাসী বিপ্লবের অন্যতম নেতা Danton-এর মতন সুভাষেরও জীবনের একটি মহামন্ত্র ছিল—Audace, audace, toujours l'andace! প্রিন্স ক্রপটকিনের Memoirs of a Revolutionist ছিল ওর একটি অত্যন্ত প্রিয় বই। প্রায়ই বলত আমাকে, তিনি সত্যই ছিলেন a giant among men, তাই না পেরেছিলেন দেশের জন্য দেশছাড়া হতে।......ও একবার লিখেছিল একটি অটোগ্রাফের খাতায়......সে অংগীকারটি ছিল তার আত্মার একটি রক্তস্বাক্ষর—

There is nothing that lures me more than a life of adventure away from the beaten track and in search of the unknown. In this life there may be suffering, but there is joy as well; there may be hours of darkness but there are also hours of dawn. To this path I call my countrymen...

আমরণ ছিল সে শক্তিসাধক—কৈশোরেও গঙ্গাজলে নেমে আবৃত্তি করত স্বামী বিবেকানন্দের Kali the Mother—

Who dares misery, loves
And hugs the form of
Death,
Dances in Destructions
dance,
To him the mother
Comes."

আই· সি· এস.-ত্যাগী তরুণ সুভাষচন্দ্রের মনোরূপের যথাসম্ভব পূর্ণাঙ্গ চিত্র গ্রহণের চেষ্টা করলাম। এতে বিস্তৃত স্থান লেগেছে। কিন্তু প্রয়োজন আছে তার, কারণ সুভাষচন্দ্রের পরবর্তী জীবন পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে, যে-আদর্শবাদ এবং কর্মনীতিকে তিনি এখানে গ্রহণ করেছিলেন, তা সাধারণভাবে অব্যাহত ছিল উত্তরকালে। যেটুকু পরিবর্তন, তা বাস্তব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে, এবং তা সামান্যই। ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীদের চরিত্র সম্বন্ধে ধারণা, বিশ্বরাজনীতি ও ইতিহাস সম্বন্ধে সক্রিয় আগ্রহ, ত্যাগে তৃপ্তি, বিপদে উল্লাস, যৌবনশক্তির উপর আস্থা, আপোষহীন আদর্শবাদ৬—এ সবই সুভাষচন্দ্রের মনে দৃঢ় প্রোথিত হয়ে গেছে। আরো একটি বিষয় যোগ করা যায়—বিপদের প্রতি আকর্ষণের মত বিপ্লবের প্রতি আকর্ষণ তাঁর মনে জেগেছে। বিবেকানন্দ অরবিন্দের ভক্তের পক্ষে অহিংসবাদী হওয়া কঠিন। ইংলণ্ড যাওয়ার আগেই তিনি বিপ্লবীদের সংস্পর্শে এসেছিলেন। দুই একটি অত্যাচারীর অপসারণে দেশ স্বাধীন হবে, এমন ধারণা তাঁর না হতে পারে, কিন্তু তিনি বিপ্লবীদের চরিত্রকে শ্রদ্ধা করতে পেরেছিলেন মনে-প্রাণে, এবং তাঁদের কৃতকর্মকে অন্যায় বলার আগ্রহও ছিল না। এই সঙ্গে তাঁর আরও বিশ্বাস হয়েছিল, গুপ্তবিপ্লবের দ্বারা সম্ভব না হলেও ভারতের মুক্তি কিন্তু প্রকাশ্য বিপ্লবে, দরকার হলে সশস্ত্র বিপ্লবে। সিন্ ফিন্ আন্দোলনকারী আইরিশদের সম্বন্ধে তাঁর আগ্রহের রূপ আমরা আগেই দেখেছি। আই· সি· এস. ত্যাগের সময়ে তিনি গান্ধী-প্রবর্তিত অসহযোগ আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়বার সংকল্প করলেও সরকারের সঙ্গে অসহযোগের সেই প্রেরণা তিনি গান্ধীজীর কাছ থেকে পান নি। শরৎচন্দ্র বসুর কাছে লেখা পত্রে সেই কথাই আছে—"সরকারের অবসান করিবার শ্রেষ্ঠ উপায় তাহার নিকট হইতে সরিয়া আসা। আমি টলস্টয়ের নীতির কথা শুনিয়া বা গান্ধীর প্রচারে মুগ্ধ হইয়া একথা বলিতেছি না, নিজে উপলব্ধি করিয়া বলিতেছি।" গান্ধীজীর বদলে তিনি চিত্তরঞ্জনকে অনুসরণ করবার ইচ্ছাই সাধারণভাবে পোষণ করেছিলেন, চিত্তরঞ্জনকে সে বিষয়ে পত্রও লিখেছিলেন ইংলণ্ড থেকে, এবং দেশে ফিরে প্রথম দিকে শিক্ষকতা ও সাংবাদিকতা নিয়ে থাকবার ইচ্ছা ছিল তাঁর, যে-পথ একদিন অরবিন্দ নিয়েছিলেন, যার দ্বারা তিনি দেশে বামপন্থী আন্দোলনকে জাগ্রত করে তোলেন।

সুতরাং অসহযোগ আন্দোলনের নেতা মহাত্মা গান্ধী—যে-অসহযোগে ঝাঁপ দিতে সুভাষচন্দ্র দেশে ফিরছেন—সুভাষচন্দ্রের আদর্শ নেতা কোনোকালেই নন। গান্ধী দেশময় জাগরণ এনেছেন—এইটে তাঁর সম্বন্ধে প্রধান কথা—সেই জাগরণের সুযোগ নিতে হবে—গান্ধী-নীতি না মেনেও গান্ধীজীকে ব্যবহার করতে হবে অধিকতর আন্দোলন সৃষ্টির কাজে—সুভাষচন্দ্রের মনোভাব ছিল এই ধরনের। এই মনের ছবি দিলীপকুমারের রচনায় পাই। তাঁর স্মরণশক্তিকে ধন্যবাদ। তিনি অবিকৃতভাবে সেই সময়কার সুভাষকে এঁকেছেন (দিলীপকুমারের রচনার সত্যতা সুভাষচন্দ্রের রচনার দ্বারা সমর্থিত)। বিপ্লবীদের এবং গান্ধীজী ও তাঁর অহিংসনীতি সম্বন্ধে সুভাষচন্দ্রের ধারনার সংবাদ এখানে পাচ্ছি।

ইংলণ্ড থেকে ফিরবার আগের একটি রাতের আলোচনা—

"কিন্তু ওরা তোমাকে পুলিপোলাও চালান দেবে বলছ কেন? গান্ধীজীকে তো দেয় নি?

"সুভাষ হেসে বলল, গান্ধীজীকে ওরা জানে।......তোমাকে বলছি দিলীপ, ওরা যে ভয় করে না অহিংসা, সত্যাগ্রহ চরখাকে। ওরা ডরায় শুধু ঐ বোমারুদেরকে, যারা এক কথায় প্রাণ দিতে পারে,—বাঘা যতীন, কানাই দত্ত, বারীন ঘোষ, যাদুগোপাল মুখুজ্জে, সাবারকর, কৃষ্ণ বর্মা, মাদাম কামা, শ্রীঅরবিন্দ......

৬ শরৎচন্দ্র বসুকে লিখিত পত্রে সুভাষচন্দ্র লিখেছিলেন—"আমরা জাতি-গঠন করিতে আসিয়াছি, হ্যাপডেন ও ক্রমওয়েলের আপোষহীন আদর্শবাদ ভিন্ন তাহা সম্ভব নহে।"

এঁদের। আজ ওরা আমাদের যেটুকু অল্পস্বল্প রাশ ছেড়ে দিয়েছে সে এঁদেরই জন্য।"

অন্যান্য দিনের আলোচনা—

"আমাকে প্রায়ই বলত, দিলীপ, আমিও চাই না তুমি পলিটিক্সে ঢুকে সরাসরি জেলে যাও। অবশ্য জেলে এক-দলকে যেতে হবেই হবে; কিন্তু তাঁদের কারাবরণ নিষ্ফল হবে জেলের বাইরে যাঁরা দেশসেবক থাকবেন তাঁদের দল পুরু না হলে। এইজন্যই আমি মহাত্মাজীকেও কাজে লাগাতে চাই—তাঁর অহিংসাবাদে সায় দিতে না পারা সত্ত্বেও। অহিংসায় কোন দিন কোনো দেশ স্বাধীন হয় নি দিলীপ, কোনোদিন হবেও না।

"আমি—হয় নি হয়ত, কিন্তু যা কখনো হয় নি তা যে কখনোই হবে না—

"সুভাষ—'আমি একথা অতটা স্পষ্টভাবে বলি নি। কেবল আমি দেখি এদের পুলিস ফৌজের সুব্যবস্থতা, ডিসিপ্লিন। এদের বিরুদ্ধে অহিংসার নামাবলী গায়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে পর পর দু'গাল পেতে দিলে দুটোর একটাও নিষ্কৃতি পাবে না। যারা নিজেদের জাতকেই রেহাই দেয় নি তারা আমাদের রেহাই দেবে? তুমি কি মনে কর আমরা আজ যেটুকু শক্তি অর্জন করেছি সেটুকু আমাদের স্বায়ত্ত হোত যদি না একদল বোমারু বন্দেমাতরম্ গাইতে গাইতে প্রাণ দিত? দিলীপ তুমি এই বিপ্লবীদের সঙ্গে মেশো নি, কিন্তু আমি এই ওদের চক্রব্যূহের মধ্যে ছিলাম কিছুদিন। তাই তোমাকে অকুণ্ঠে বলতে পারি যে, আমাদের দেশে শ্রেষ্ঠ মনুষ্যত্ব শ্রেষ্ঠ ত্যাগ, শ্রেষ্ঠ বীর্যের যদি পরিচয় পেতে হয়, তবে সন্ধান করতে হবে নামজাদা রাজনৈতিকদের মধ্যে নয়, এই অখ্যাত লাঞ্ছিত নিরাশ্রয় দেশমিত্রদের মধ্যে—কারণ এ ঘুমের দেশে এরাই শুধু জেগেছিল সবার আগে—আর এরা জেগেছিল বলেই বাকি কোটি কোটি তন্দ্রালুরা পুরোপুরি না জাগুক, তবু একটু-আধটু আড়মোড়া ছাড়তে সুরু করেছে।'"

এই মন নিয়ে সুভাষচন্দ্র জাহাজে উঠলেন—যে জাহাজে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ এই ভ্রমণে এক বৎসর য়ুরোপে ও আমেরিকায় কাটিয়েছেন, কন্টিনেন্টের স্থানে স্থানে বিপুল সংবর্ধনা পেলেও ইংলণ্ড 'স্যার'-ত্যাগীকে মনের সঙ্গে ক্ষমা করতে পারে নি। তাঁর মন ক্লিন্ন হয়ে আছে নানা উদ্বেগে নানা চিন্তায় বিপর্যস্ত তা। দুটি চিন্তা প্রধান—এক, শান্তিনিকেতন, দুই ভারতবর্ষ।

রেনী
'ড্রিপ ডোসেজ'
বদহজমের যন্ত্রণা
তাড়াতাড়ি
বন্ধ করে

বেশীমাত্রায় খাওয়া... তাড়াতাড়ি খাওয়া ... যা আপনার সয় না, এমন খাদ্য খাওয়া... এই সবের ফলেই পাকস্থলীতে অতিরিক্ত অ্যাসিড সৃষ্টি হয়। এই অত্যধিক অ্যাসিডই বদহজমের কারণ—সেই পেট 'ভার-ভার' অস্বস্তিবোধ, পেট কামড়ানোর যন্ত্রণা, পেটে জ্বালাবোধ। ডাইজেস্টিফ্ রেনী ট্যাবলেট বদহজমের যন্ত্রণা ও অস্বস্তি তাড়াতাড়ি দূর করে।

কিভাবে রেনী 'ড্রিপ ডোসেজ' বদহজমের যন্ত্রণা বন্ধ করে :

আপনি যখন ডাইজেস্টিফ্ রেনি ট্যাবলেট চুষে খেতে থাকেন তখন এর শক্তিশালী অ্যাসিডনাশক উপাদানগুলি আপনার মুখে গলে গিয়ে ধীরেধীরে আপনার পাকস্থলীতে গিয়ে পৌঁছয়। এই নিয়ন্ত্রিতভাবে ধীরেধীরে পড়ার ফলে স্বাভাবিক ভাবে অতিরিক্ত অ্যাসিডকে নিষ্ক্রিয় ক'রে ফেলে, তাতে অ্যাসিডের কোন প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় না এবং তাড়াতাড়ি আরাম এনে দেয়।

সবসময় রেনী সঙ্গে রাখবেন :

বদহজমের যন্ত্রণা যে কোন সময় শুরু হতে পারে। তাই সবসময় ডাইজেস্টিফ্ রেনী ট্যাবলেট কাছে রাখা ভাল।

বদহজমের
যন্ত্রণায়
ভুগবেন না—
ডাইজেস্টিফ্
রেনী
ট্যাবলেট
ব্যবহার করুন—

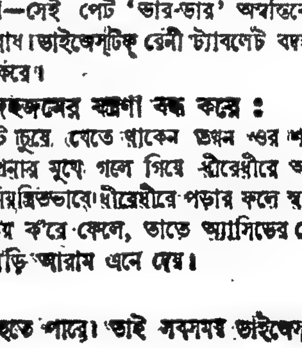

নিকোলাস্-এর (N) তৈরী
RG.3-6789

ভারতবর্ষে অসহযোগ আন্দোলন প্রবলবেগে সুরু হয়ে গেছে। সেই আন্দোলনের ঢেউ শান্তিনিকেতনের স্বতন্ত্র আদর্শকে ভেদ করে স্পর্শ করেছে। রাজনীতি থেকে দূরে রাখতে চেয়েছিলেন নিজের প্রতিষ্ঠানকে কবি, চেয়েছিলেন বীরভূমের একটি ভূ-দ্বীপে নিরপেক্ষ বিশ্ব-সাধনার প্রতিষ্ঠা। ইংরেজকে চিনলেও এবং তার পশুত্বের নিন্দা করলেও, অসহযোগে তাঁর সমর্থন নেই, কারণ ইংরেজ মনুষ্য সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। এই চিন্তায় ব্যথিত, প্রায়-বৃদ্ধ এই কবি এবং আত্মদহনের সর্বনাশা কামনায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ তরুণ মুখোমুখি হলেন ভারতগামী জাহাজে।

জাহাজে ফিরবার সময় রবীন্দ্রনাথের ভয় 'পাছে দেশে লোকের সঙ্গে সুর না মেলে।' অসহযোগ আন্দোলন তাঁর গোটা মন সায় দিচ্ছে না—'দেশের উপর দিয়া উত্তেজনার যে ভাবাবেগ চলিয়া যাইতেছে তাহার সহিত আমার মনের সুর মিলাইবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিতেছি; কিন্তু আমার অন্তরে কেন এই বাধার ভাব? আমি ইহার পরিষ্কার জবাব পাইতেছি না।' অসহযোগকে তিনি সমর্থন করতে অসমর্থ তার প্রথম কারণ, এর দ্বারা পূর্ব-পশ্চিমের মিলন সাধনা ব্যাহত হবে। 'অসহযোগ একপ্রকার আধ্যাত্মিক আত্মঘাত।' এই অসহযোগ ন্যাশনালিজমের ভূতকে জাগিয়ে তুলবে। এর দ্বারা "আমাদের দেশে দেয়াল গাঁথা সুরু" হয়ে যাবে। "অসহযোগ নীতি সত্যকে অনর্থক আঘাত করিতেছে। ইহা আমাদের গৃহ ও পাকশালা উভয়কে ভস্মীভূত করিবে।" এই অসহযোগ "শিক্ষার সঙ্গে বিরোধ, জ্ঞানের সঙ্গে অসহযোগ।" এই আন্দোলনের আদর্শবাদকে অবশ্য তিনি অস্বীকার করেন নি, তিনি হিংস্রতায় বিশ্বাস করেন না, তাই অহিংস অসহযোগকে আইডিয়ামূলক মনে হয়েছিল, অহিংস সংগ্রামের জন্য গর্ববোধ করেছিলেন। দেখেছিলেন এর মধ্যে 'আত্মার শক্তি, পেশীর শক্তি নয়,' দেখেছিলেন এর 'অত্যুচ্চ নৈতিকতা.' কারণ কবির কাছে 'রাজনৈতিক স্বরাজলাভই মোক্ষ নহে, আমাদের সংগ্রাম আত্মার —মানুষের মুক্তির সংগ্রাম—কেবলমাত্র রাজনৈতিক স্বাধীনতা নহে।' এ-সব সত্ত্বেও তাঁর মনে একটি আশঙ্কা জেগে থেকেছিল সর্বসময়, এ অহিংসা সত্যকার অহিংসা নয়; অহিংসার এই আড়ম্বর, যাকে সবচেয়ে তিনি ঘৃণা করেন সেইটেকেই জাগিয়ে তুলবে—'I refuse to waste my manhood in lighting the fire of anger and spreading it from house to house.' রবীন্দ্রনাথ বুঝেছিলেন, যে-অহিংসাকে ধর্মবীরেরা প্রচার করে গেছেন আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য, তাকে বাইরে থেকে চাপ দিয়ে অতিবৃহৎ জনসাধারণের মধ্যে পাইকারীহারে জাগিয়ে তোলা যায় না, ঐ পাইকারী প্রয়োজনে সৃষ্ট অহিংসার দ্বারা রাজনৈতিক সুবিধা আদায় তিনি সম্ভবপর মনে করতেন না, উচিতও নয়। কবি অনুভব করেছিলেন, অহিংসসংগ্রাম ব্যর্থ হতে বাধ্য।

কবির শেষ কথা যা তিনি সত্য বলে জানেন—the poet will be defeated—কবির পরাজয় অনিবার্য।

১৯২১ সালের মধ্যবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ ও সুভাষচন্দ্র উভয়ের-মনের অবস্থা দেখলাম। আলোচনাকালে উভয়েই নিজের মনের কথা নিশ্চয় প্রকাশ করেছিলেন। নিশ্চয় রবীন্দ্রনাথ বেশি বলেছিলেন,... সুভাষচন্দ্র বেশি শুনেছিলেন। আমরা সহজেই বুঝতে পারছি এই দুজন সম্পূর্ণ ভিন্ন জগতে বাস করছেন। বাইরের দিক থেকে রবীন্দ্রনাথ ও সুভাষচন্দ্রের আদর্শে মিল হওয়া কোনোমতে সম্ভব নয়। রবীন্দ্রনাথ বিপ্লববাদ-বিরোধী, অহিংসার সমর্থক (যদিও তার প্রয়োগ-সাফল্য সম্বন্ধে তাঁর সন্দেহ আছে), গান্ধীজীর অনুরাগী, অসহযোগ-আন্দোলনের শুভরূপ সম্বন্ধে দ্বিধান্বিত। অপরপক্ষে সুভাষচন্দ্র বিপ্লবপ্রিয়, অহিংসায় অবিশ্বাসী, গান্ধীজী সম্বন্ধে অনুচ্ছ্বসিত, এবং অসহযোগ আন্দোলনে ঝাঁপ দেবার জন্য সুখী ভবিষ্যৎ ত্যাগ করে ভারতে ফিরছেন। এই দুজনের মধ্যে চিন্তাগত ঐক্য কিভাবে সম্ভব, একমাত্র অহিংসার সম্ভাব্য ব্যর্থতা সম্বন্ধে উভয়ের ধারণার বহিরঙ্গ ঐক্য ছাড়া? তবু কোথায় একটা ঐক্য ছিল—পবিত্র প্রেরণায় উজ্জ্বল, ত্যাগে দ্বিধাহীন, ভারতের ভবিষ্যতে আস্থাশীল, আত্মবিশ্বাসে ভরপুর যুবকটির নির্মলদীপ্ত শরীরে রবীন্দ্রনাথ নিশ্চয় ভাবী আলোকের শিখা দেখেছিলেন, নিশ্চয় দেখেছিলেন, কারণ তিনি ঋষি-কবি; এবং সুভাষচন্দ্রও এক পরমাশ্চর্য প্রতিভার পাদমূলে বসে অনুভব করেছিলেন, কোনো বিরোধই শেষ পর্যন্ত সত্য নয় যদি ত্যাগে প্রেমে শুদ্ধ থাকে আদর্শ, অনুভব করেছিলেন যে, সত্তার গভীরতর ঐক্যে মহৎ মানুষেরা ভিন্ন ভূমিতে দাঁড়িয়েও করস্পর্শ করতে পারে,—এই জ্যোতির্ময় পরমায়ুজীবীর আশীর্বাদ পাবই, যতক্ষণ ভিতরে জ্বলবে আগুন, হিরন্ময় পাত্র থেকে যা সংগৃহীত।

সুভাষচন্দ্রের পিছনে পড়ে রইল কতকগুলো প্রমত্ত করতালির টুকরো,[৭] ভিতরে রইল স্থির প্রতিজ্ঞার বজ্র, সামনে রইল 'কলরবমুখরিত খ্যাতির প্রাঙ্গণ, আর রইল, সব কণ্ঠ যেখানে স্তিমিত এমন রুদ্ধ কারাগার।

রবীন্দ্রনাথ সুভাষচন্দ্রকে নিয়ে জাহাজ ভেসে এল ভারতের কূলে। [ক্রমশঃ]

---

৭ আই-সি-এস ত্যাগে জয় জয় করে উঠেছিল ইংলণ্ডের ভারতীয় সমাজ। এত বড় ত্যাগ!! ঘুম ভেঙে উঠে সুভাষ দেখলেন গলায় ধরে না এত মালা, কানে ধরে না এত স্তুতি, মাথা টন টন করবে এমন ভারী যশের মুকুট। লণ্ডনে কেম্ব্রিজে অক্সফোর্ডে এডিনবরায় ভারতীয় ছাত্রবৃন্দ একজোট হয়ে অভিনন্দন পাঠালো ফ্রেমে বাঁধিয়ে টেনিসনের ঢঙে একজন স্তুতি গাইল ইংরেজি ভাষায় যা সকলের চোখে 'দেশপ্রেমাশ্রু' বইয়েছিল এবং সুভাষচন্দ্র রাগ করলেও দিলীপকুমার তার দুটি স্তবক রক্ষা করতে পেরেছিলেন—

Bullets all round him hiss
But fall his feet to kiss
The occasion we never
can miss
To thee, O hero, we bow!
On, on the tyrants to fight!
Behold: Gone gone is the
night!
Trample on them in
delight!
Hark: Calls the new
sunglow!

এমন কি সুভাষচন্দ্রকে রথে চড়িয়ে বাকিংহ্যাম প্যালেসের সামনে দিয়ে শোভাযাত্রা করার প্রস্তাব পর্যন্ত উঠেছিল।

সুভাষচন্দ্র এই সব সংবর্ধনাকে ঠাণ্ডা মাথায় নিয়েছিলেন, বয়সের তুলনায় তিনি চিন্তায় পরিণত ছিলেন, একটা দুঃসাহসিক কিছু করে ফেলবার পরে (বিশেষত বাড়ির অসম্মতিতে) মানসিক শক্তি বজায় রাখার জন্য যখন যশোমদ্যের বিশেষ প্রয়োজন তখনো সুভাষচন্দ্র যে সব ভারতীয় যুবক হ্যামস্টেডহীথে সতৃষ্ণ নয়নে যুগল মিলন দেখে বাড়ি ফিরে ল্যাণ্ডলেডিদের মেয়েদের নিয়ে পড়ে, তাদের বাহবার বেশি মূল্য দিতে পারেন নি।

যা দেখেছি, যা পেয়েছি

স্মৃতিচয়ন

শ্রীসুধীরঞ্জন দাস

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

ঊনত্রিংশ অধ্যায়
পাঞ্জাব হাইকোর্টের চীফ জাস্টিসগিরি

(১)

ঊনিশ শ' আটচল্লিশ সালের ডিসেম্বর মাস প্রায় কাবার হতে চলেছে। আমি তখন কলকাতা হাইকোর্টের চীফ জাস্টিস স্যার ট্রেভর হ্যারিসের সঙ্গে আপীল কোর্টে বসছিলাম। এর উপর কোর্টের বাইরে কলকাতা ট্রামওয়ে কোম্পানীর ট্রামভাড়া বাড়ানর দাবি ন্যায্য কি অন্যায় সে সম্বন্ধে একটা কমিশনের চেয়ারম্যানের কাজও করতে হচ্ছিল। স্যার ট্রেভরের সঙ্গে বসলে রায় দেবার দায়িত্বটা ভাগা-ভাগি করে নিতে হোত। অর্থাৎ একটা আপীলের রায় দেবেন তিনি এবং পরেরটির রায় দেবার ভার পড়বে আমার উপর। কাজেই আমার হাতে তখন অজস্র কাজ এবং বলতে গেলে আমি সে সময়ে বেশ ব্যস্তই ছিলাম। এইরকম পরিস্থিতিতে একদিন আমরা যখন আপীল কোর্টে বসে আপীল শুনছি, তখন চীফ জাস্টিসের সচিব পলসেট সাহেব কার্ণিক খেতে খেতে আমাদের এজলাসের নিচে যেখানে বসেন এ্যাসিস্ট্যান্ট রেজিস্টার ও বেঞ্চ-ক্লার্করা সেইখানে এসে দাঁড়িয়ে ঢিপ করে মাথাটা নুইয়ে খবর দিলেন যে, তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার বি সি রায় কি একটা জরুরী ব্যাপারে চীফ জাস্টিসের সঙ্গে কথা বলতে চান। আমি ত' শুনে অবাক। কোর্টের কাজ চলেছে। উকিল কৌসুলীরা তাঁদের অন্যান্য কোর্টের কাজের ব্যবস্থা করে চীফ জাস্টিসের ঘরে সওয়াল-জবাব করছেন। এইসব বন্ধ করে কি না মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে টেলিফোনে কথা কইতে হবে। কাণ্ডটা কি। কিন্তু স্যার ট্রেভর বললেন যে, কথাটা যদি সত্যিই জরুরী হয় তবে না শুনলে হয়ত কিছু গোলমাল হয়ে যাবে। কি করা যায়। অগত্যা আমরা উঠে পড়লাম। চীফ জাস্টিস সাহেব গেলেন তাঁর খাস কামরায়—আমি গেলাম আমার চেম্বারে। অল্পক্ষণ পরে খবর পেলাম যে টেলিফোনটা কেটে গেছে। আপদ গেছে। আমরা গিয়ে আবার কোর্টে বসলাম। কাজ আবার সুরু হতে না হতেই পলসেট এসে জানালেন যে আবার টেলিফোন এসেছে। কি উৎপাত রে বাবা। দু' দুবার যখন টেলিফোন এল তখন ব্যাপারটা গুরুতরই হবে। আবার আমরা উঠে পড়লাম। বেশ খানিকক্ষণ বসবার পর পলসেট সাহেব এসে হাস্যমুখে খবর দিলেন যে, চীফ জাস্টিস সেলাম দিয়েছেন। গাউনটা পরে নিয়ে চললাম চীফ জাস্টিসের খাস কামরায়। ঘরে ঢুকতেই স্যার ট্রেভর বলে উঠলেন—“Das, they want a Chief Justice for the Punjab High Court.” আমার একটু বিরক্তিই বোধ হোল। তাই জবাব দিলাম—“Fancy interrupting the work of the Court for that reason! What have we got to do with that business.?” স্যার ট্রেভর উচ্চ হেসে বললেন—“They want you, my dear fellow!” বলে কি লোকটা! মাথা খারাপ হোল নাকি! স্যার ট্রেভর হাত বাড়িয়ে আমার সঙ্গে করমর্দন করলেন। বললেন—“বোস।” কথা যা হোল তা এই—পঞ্জাবের চীফ জাস্টিস দেওয়ান রামলালের জানুয়ারী মাসের ১৯শে তারিখে ৬০ বছর পূর্ণ হলে তাঁর জায়গায় একজন চীফ জাস্টিস বহাল করতে হবে। পাঞ্জাব হাইকোর্ট তখন ইস্ট পাঞ্জাব নামে সিমলা পাহাড়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। পাঞ্জাবে তখনো গোলমাল চলেছে। জজেদের মধ্যেও নাকি তেমন সম্প্রীতি নেই। তা ছাড়া মাস্টার তারা সিংয়ের হুমকি খুবই প্রবল হয়ে উঠছে। তার উপর মহাত্মা গান্ধীর হত্যাকারীর আপীলের শুনানীর বন্দোবস্ত করতে হবে। এই সব নানা কথা ভেবে ভারত সরকার সাব্যস্ত করেছেন যে, বাইরের থেকে এমন একজন সুযোগ্য ব্যক্তিকে সেখানে পাঠান প্রয়োজন যিনি হিন্দু ও শিখ উভয় সম্প্রদায়েরই শ্রদ্ধা আকর্ষণ করতে পারবেন। তাঁরা ঠিক করেছেন ঐ পদে বসাবার প্রস্তাবটা আমাকেই প্রথম দেবেন এবং আমাকে অবিলম্বে জবাব দিতে হবে। আমি ত' খানিকটা হকচকিয়ে গিয়েছিলাম। স্যার ট্রেভর বললেন যে কোর্ট ফেরতা ডাক্তার বি সি রায়ের সঙ্গে সেদিনই তাঁর আফিসে দেখা করলে সুবিধে হবে। আমি স্যার ট্রেভরকে জানালাম যে, আমি কস্মিন-কালেও সেক্রেটারিয়েটে যাই নি এবং সেখানে আমার যাবার ইচ্ছেও নেই। তা ছাড়া আমার স্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ না করে আমি তাঁকে ত' কোন কথা দিতে পারব না। স্যার ট্রেভর তখন ডাক্তার রায়ের কাছে টেলিফোন করলেন এবং ঠিক হোল যে সেদিনই সন্ধ্যায় চিত্তরঞ্জন সেবাসদনে আমাদের কথাবার্তা হবে। সে সময়ে সেবাসদনে আমার স্ত্রীর পরিচিতা একটি মহিলা ছিলেন এবং আমার স্ত্রীর কথা ছিল তাঁকে দেখতে যাবার। ডাক্তার রায়ও যাবেন সেই মহিলাটিকেই দেখতে। সুতরাং এই ব্যবস্থায় উভয়পক্ষেরই সুবিধে হোল। আমরা আবার গিয়ে কোর্টে বসলাম। আবার উকিল কৌঁসুলীরা কেঁচে গণ্ডূষ করে সওয়াল-জবাব সুরু করলেন। আমার কাছে এই আপীলের সওয়াল-জবাবটা যেন কেমন অলীক বোধ হতে লাগল।

কোর্ট ফেরতা বাড়ি ফিরেই বুবুকে সব ঘটনাটা বিস্তারিত বললাম। চীফ জাস্টিস হবার জন্যে হাঁকপাঁক করে সিমলা যাবার কি দরকার? কলকাতায় থাকলে এখানেই ত' চীফ জাস্টিস হওয়া যাবে বিজন মুখার্জি ও অমরনাথ সেনের পর। তাছাড়া ভালভাবে কাজ করতে হলে ল লাইব্রেরী দরকার। শুনেছিলাম পাঞ্জাব হাইকোর্টে তখনো সব ল রিপোর্ট সংগ্রহ হয়ে ওঠে নি। আমার অভ্যেস নিজের বাড়িতে নিজের লাইব্রেরীর বই নিয়ে কাজ করা। এতগুলি বই ও আলমারী সিমলা পাহাড়ে নিয়ে যাবার

খরচা কে দেবে? সেখানে উঠবই বা কোথায় এবং থাকবই বা কোথায়?' এই সব ভেবে ঠিক হোল যে ডাক্তার রায়ের সঙ্গে আলাপের সময় আমায় কয়েকটা জিনিস পরিষ্কার করে নিতে হবে। সন্ধ্যার পর গেলাম চিত্তরঞ্জন সেবাসদনে। সেখানে একটি কেবিনে সেই ভদ্রমহিলা ছিলেন। তাঁর সঙ্গে আমার স্ত্রীর কথাবার্তা শেষ হতে না হতেই ডাক্তার বি সি রায় তাঁর অভ্যাসমত বেশ সোরগোল করতে করতেই সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে এলেন। তাঁর সঙ্গে আলাপ হোল। তিনি বেশ জোর করেই বললেন যে, আমাকে যখন নেহরু ও সর্দার প্যাটেল চাচ্ছেন তখন আমার যাওয়াই কর্তব্য। এতে করে বাংলা দেশেরও সুনাম হবে। আমি বললাম—"দেখুন, ডাক্তার রায়, আপনি যখন পরামর্শ দিচ্ছেন তখন আমি যাব। কিন্তু তিনটি শর্তে।" তিনি হেসে বললেন—"ঐ রে, শর্ত এলো বুঝি? যাক, বলেই ফেল কি চাও।" বললাম—"প্রথম শর্ত হচ্ছে যে কলকাতা হাইকোর্টে আমার চীফ জাস্টিস হবার যখন দান আসবে তখন আমাকে এখানে চীফ জাস্টিস করে ফিরিয়ে আনতে হবে। দ্বিতীয় শর্ত এই যে আমার সমস্ত ল-লাইব্রেরীটি আলমারী সহ প্যাক করে সিমলা পৌঁছে দিতে হবে সরকারী খরচায় এবং তৃতীয় শর্ত হোল যে সিমলায় আমাকে থাকবার ভাল বাড়ি দিতে হবে।" ডাক্তার রায় বললেন—"শর্তগুলি খুব কঠিন নয়। তবে দেখি সর্দার আবার কি বলে।" তক্ষুণি জরুরী টেলিফোন গেল সর্দারের কাছে। অবিলম্বে টেলিফোন বেজে উঠল। ডাক্তার রায় আমার শর্তগুলি একে একে বলে যেতে লাগলেন এবং প্রত্যেকটার শেষে তিনি "agreed? Very good" বলতেই বুঝলাম যে অপর প্রান্তে সর্দার শর্তগুলি মেনে নিতে সম্মত হচ্ছেন। সব যখন ঠিক হয়ে গেল তখন আর গত্যন্তর নেই—সিমলায় যেতেই হবে চীফ জাস্টিস হয়ে।

তোড়জোড় সুরু হোল। যারা বই প্যাক করে তারা বড় বড় কাঠের বাক্সে বই ভরে পেরেক মেরে বন্ধ করে তার উপরে লোহার পাত সেঁটে স্টেনসিল দিয়ে নাম লিখতে সুরু করল। সারা বাড়িময় ঠক্ ঠক্ আওয়াজে কান ঝালাপালা হয়ে এল। খুব তাড়াহুড়ো করে ট্রামওয়ে ভাড়া বাড়ানোর কমিশনের রিপোর্ট শেষ করতে লাগলাম। প্যাকিং শেষ হয়ে লরি বোঝাই করে প্যাক করা বই ও বইয়ের আলমারীগুলি নিয়ে গেল রেলে চড়িয়ে দেবার জন্যে। অফিস ঘর, লাইব্রেরী ঘর একেবারে খালি হয়ে গেল। জজেরা চা খাইয়ে আপ্যায়িত করলেন জজের লাইব্রেরীতে। স্যার ট্রেভর খুশিতে গদ গদ—সব জজেদের হয়ে শুভেচ্ছা জানালেন। তিনি অবিভক্ত পাঞ্জাবের চীফ জাস্টিস ছিলেন বলে সেখানকার জজ ও সব এ্যাডভোকেটদের জানতেন এবং তাদের মধ্যে কে কেমন, কার কি গুণপনা সব আমাকে বাৎলে দিলেন। বললেন যে রেলে যেতে যেতে পিন্যাল কোডের ৩০২ ও ৩৪ ধারা দুটো ভাল করে যেন পড়ে নিই, কেন না পাঞ্জাবে—"there is no such thing as simple hurt—Murder or nothing!" সময় খুব কমই ছিল হাতে বলে ব্যারিস্টারেরা বার লাইব্রেরীতেই "high tea"-এর ব্যবস্থা করলেন। কলকাতার বাসিন্দা পাঞ্জাবীরা গ্র্যাণ্ড হোটেলে মধ্যাহ্নভোজ দিয়ে অভিনন্দন জানালেন। বেশ লোকসমাগম হয়েছিল সে ভোজে। একজন বক্তা "Bengali brain and Punjabi brawn"-এর সংমিশ্রণের উল্লেখ করে আনন্দ প্রকাশ করলেন। সে সময়ে পাঞ্জাব হাইকোর্ট শীতের সময় বন্ধ হয়ে গেছে। কিন্তু ছুটির মধ্যেই আমাকে গিয়ে চার্জ নিতে হবে ১৯শে জানুয়ারী। সুতরাং ঠিক হোলো যে আমি একাই যাব এবং চার্জ নিয়ে বাড়ি ঠিক করে ফিরে এসে ছুটির পর বুবুকে নিয়ে সিমলা চলে যাব। আরো ঠিক হোল যে আমি দিল্লীতে একদিন থেকে নেহরু ও সর্দার প্যাটেলের সঙ্গে দেখা করে পাঞ্জাবের হালচাল বুঝে নিয়ে পরের দিন সিমলা যাব। যত দূর মনে আছে উনিশশ' উনপঞ্চাশ সালের ১৫ই জানুয়ারী আমি রওনা হলাম সিমলার পথে। সেদিনই আমাদের মেজদাদা প্রফুল্লরঞ্জন পাটনা থেকে টেলিগ্রাম করলেন—"Why this imbecility". টেলিগ্রাম পেয়ে মনটা বেশ একটু দমে গেল—এ আবার কি করে বসলাম। কিন্তু নিরুপায়—ফেরবার পথ তখন আর নেই। পরদিন ভোরে খবরের কাগজে পড়লাম যে Auckland Jute Co.-এর কেসে আমি যে রায় দিয়েছিলাম সেটা ফেডারেল কোর্ট উল্টে দিয়েছে। এটা পড়ে মনটা গেল আরো দমে। সুতরাং আমি যখন দিল্লী পৌঁছলাম তখন আমি ইংরেজীতে যাকে বলে in a chastened mood"!

(২)

প্রভুদয়ালবাবু ব্যবস্থা করেছিলেন যে, আমি দিল্লীতে বিড়লা হাউসে এক রাত থেকে তার পরদিন নেহরু ও সর্দারের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ সেরে রাত্রের ট্রেনে সিমলা রওনা হব। রাত্রিতে দিল্লী স্টেশনে নেমেই দেখি প্রীতিভাজন শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি দাঁড়িয়ে আছেন হাসিমুখে আমাকে অভ্যর্থনা করতে। বিড়লা হাউসের একজনা লোকও আমাকে বিড়লা হাউসে নেবার জন্যে গাড়ি নিয়ে এসেছেন। শ্যামাপ্রসাদ বললেন যে, সেটা হয় না। তিনি থাকতে আমার অন্য জায়গায় ওঠা হতেই পারে না। শ্যামাপ্রসাদের সৌজন্যে খুবই মুগ্ধ হয়েছিলাম, কেন না তখন পর্যন্ত মুখ চেনা ছাড়া তাঁর সঙ্গে আমার তেমন অন্তরঙ্গতা ছিল না। শ্যামাপ্রসাদের সঙ্গেই তাঁর বাড়ি—২ নং কিং এডওয়ার্ড রোডে গিয়ে উঠলাম। রাত্রে খেয়ে দেয়ে তাড়াতাড়িই শুয়ে পড়লাম। পরদিন হাসি গল্পের মধ্যে প্রাতরাশ সেরে প্রথমে গেলাম সর্দার প্যাটেলের বাড়ি ঔরঙ্গজেব রোড ও পৃথ্বীরাজ রোডের সংযোগস্থলে। যাওয়া মাত্র একটি বর্ষীয়সী মহিলা—পরে শুনলাম তিনি সর্দারের প্রিয় কন্যা মণিবেন—এসে আমাকে নিয়ে গেলেন বাড়ির সামনের বৈঠকখানা ঘরে যেখানে সর্দার বসেছিলেন। ভদ্রলোকের তখন বয়স হয়েছে এবং শরীরও একটু যেন অবসন্ন হয়ে আসছে বলে মনে হোল। চোখের দৃষ্টি সুতীক্ষ্ণ। সদাচারের পর বসতে বললেন। ধীরে ধীরে বলতে লাগলেন কেন বাইরে থেকে পাঞ্জাবের চীফ জাস্টিস পাঠাবার প্রয়োজন হোল। পাঞ্জাব প্রদেশ পাকিস্তানের গায়ে লাগা সীমান্ত দেশ বলে ভারত সরকারকে খুবই সতর্ক থাকা দরকার। মাস্টার তারা সিংহের আকালী দল যতরকমে পারে সরকারকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলবার চেষ্টায় আছে। হিন্দু ও শিখে যাতে মৈত্রীভঙ্গ না হয় সেটা সর্বাগ্রে দেখতে হবে। বাংলা দেশের সঙ্গে পাঞ্জাবের একটা সৌহার্দ্য বন্ধন আছে অনেককাল থেকেই। তিনি আমার কথা অনেক বন্ধুজনেদের কাছে থেকে শুনেছেন এবং তাঁর বিশ্বাস হয়েছে যে আমি এই দায়িত্বপূর্ণ কাজ বেশ সুষ্ঠুভাবেই করে নিতে পারব। তারপর তিনি বললেন যে, মহাত্মা গান্ধী হত্যার আপীলটার শুনানীর সব বন্দোবস্ত আমাকে করতে হবে এবং অত গুরুত্বপূর্ণ কেসে আমারই বসা উচিত হবে। সর্বশেষে বললেন যে, আমার যখন যা প্রয়োজন হবে তাঁকে অসঙ্কোচে তা জানালেই তিনি সব ব্যবস্থা করে দেবেন এবং আমার প্রত্যেক কাজে তাঁর ব্যক্তিগত সমর্থন আমি পাবই। বেশিক্ষণ কিন্তু কথাবার্তা হোল না। সর্দারকে এই প্রথম দেখলাম। তাঁর ওজন করা কথাবার্তা এবং বলার ভঙ্গিতে তাঁর মনের ভিতরকার বলিষ্ঠতা দেখে খুবই ভাল লেগেছিল। এক পেয়ালা চা খেয়ে বিদায় নিলাম। মণিবেন আমাকে গাড়িতে তুলে দিলেন। ভদ্রমহিলাটিকেও এই প্রথম দেখলাম। বাপ ও মেয়ের রুক্ষ কথাবার্তার কথা আগে শুনেছিলাম কিন্তু আমার সঙ্গে তাঁদের ভদ্রতার কোন ত্রুটি

পুরাতন লাঙ্গলের বদলে ট্রাকটর

হ্যাঁ। এবং এই সঙ্গে অন্যান্য সরঞ্জাম। এবং উন্নত ধরণের সার ও বীজ। কৃষিকাজের, আধুনিকীকরণে, উৎপাদন বৃদ্ধি করতে এবং উৎপন্ন দ্রব্যকে অর্থনীতির অন্যান্য বিভাগের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখতে কৃষকের এসবই প্রয়োজন।

কৃষির উন্নতি, জমির উন্নয়ন, জলসেচনের সুযোগসুবিধার সংস্থান এবং প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি জোগাড়ের জন্য, বিভিন্ন স্থানে ছড়ানো অসংখ্য অফিসের মাধ্যমে, ষ্টেট ব্যাঙ্ক অর্থ সাহায্য করে। এছাড়া ষ্টেট ব্যাঙ্ক উদ্যান-পালন, বীজ বোনা, গোপালন, হাঁস-মুরগীর চাষ, মাছের চাষ এবং অন্যান্য আবাদের জন্যও অর্থসাহায্য করে।

সকলের সেবায়
ষ্টেট ব্যাঙ্ক

S. 349 BN

দেখি নি বা অনুভব করি নি। আর সব চেয়ে বড় কথা হোল যে এই প্রথম দিন থেকেই এ'দের দুজনের কাছ থেকে আমি সর্বরকমে উৎসাহ ও সহানুভূতি পেয়েছি। ন' মাসে ছ' মাসে মনিবেনের সঙ্গে দিল্লীতে দেখা হলে মনটা খুশি হয় পুরনো দিনের কথা স্মরণ করে।

সর্দার প্যাটেলের বাড়ি থেকে সোজা চলে গেলাম নেহরুর আফিসে সাউথ ব্লকে এক্সটারন্যাল এ্যাফেয়ার্স দপ্তরে। ভাগ্যে নিচে লোক দাঁড়িয়ে ছিল নইলে কত যে ঘুরতে হোত সে গোলকধাঁধার মধ্যে তা কে জানে। দোতালায় উঠে পণ্ডিতজীর আফিসের বাইরে তাঁর নিজস্ব সচিবের ঘরে বসলাম। সচিব টেলিফোনে কি বললেন। অচিরে দরজা খুলে গেল। বেরিয়ে এলেন জওহরলাল নেহরু ফিটফাট কাপড়চোপড় পরা—মোটা খাদির যোধপুর ব্রীচেসের উপরে চমৎকার ছাঁটকাট সেরওয়ানীতে তাঁকে দেখাচ্ছিল খুব সম্ভ্রান্ত। প্রশান্ত মুখে হাসি লেগেই ছিল। জোড়হাতে নমস্কার করে এগিয়ে এসে আমার হাত ধরে "Come in Justice Das" বলে নিজের ঘরের ভিতর নিয়ে গিয়ে বসালেন। এই ভদ্রলোকের হাবভাব কথাবার্তা বলবার ধরণ সর্দার প্যাটেলের চেয়ে সম্পূর্ণ ভিন্নরকম মনে হোল। এ'র দৃষ্টি যেন দূরনিবদ্ধ। কি যেন একটা ভাবছেন—এবং মনে মনে তলিয়ে দেখছেন। কথাবার্তা নরম। বেশ কিছুক্ষণ ধরে আমাকে বোঝালেন কেন পাঞ্জাবে বাইরে থেকে চীফ জাস্টিস পাঠান দরকার হয়েছে। পাঞ্জাবীদের সামাজিক জীবনের কথা, তাদের দৈনন্দিন সুখ-দুঃখের বিবরণ বলে যেতে লাগলেন। কি করে তারা বাস্তুহারা হয়ে পাকিস্তান থেকে চলে এসে নিজেদের পুনর্বাসন করে নেবার প্রয়াস করছে এবং তাদের চরিত্রের সদ্গুণরাজি ও দুর্বলতা সব কিছুরই আলোচনা করলেন। পণ্ডিতজীর সঙ্গে বেশ কিছুক্ষণ ছিলাম। কথা সাঙ্গ হতে নমস্কার করে ফিরে গেলাম শ্যামাপ্রসাদের বাড়ি।

দুপুরের ভুরিভোজনের পর একটু বিশ্রাম করে শ্যামাপ্রসাদের সঙ্গে বসে বিশ্রম্ভালাপ করতে লাগলাম। শ্যামাপ্রসাদ তখন নামকরা মন্ত্রী ভারত সরকারের। কত লোক যে এলো গেলো তার সংখ্যা নেই। কতরকমের আলাপ হোল তাদের সঙ্গে। বিকেল হতে না হতেই দেখি শ্যামাপ্রসাদের বাড়ির পেছনের প্রশস্ত বাগানে সবুজ ঘাসের উপর ছোট ছোট টেবিল ও চেয়ার পাতা শুরু হোল। উর্দি পরা ওয়েটাররা নানারকমের জলযোগের মুখরোচক খাবারভরা প্লেট টেবিলের উপর সাজিয়ে রাখছে। ব্যাপার কি? শ্যামাপ্রসাদ [illegible] বললেন যে আমার সঙ্গে আলাপ করবার জন্যে কয়েকজন বন্ধুবান্ধবদের চায়ে ডেকেছেন। কত রকম দূরদৃষ্টি ও স্নেহপ্রবণতা ছিল শ্যামাপ্রসাদের তা ভাবলেও বিস্মিত হতে হয়। কলকাতা ভবানীপুরের লোক তাঁরা এবং আমরাও। পারিবারিক ঘনিষ্ঠতার এইটুকু ক্ষীণ বন্ধন। কিন্তু শ্যামাপ্রসাদের হৃদয়ের প্রসারতা ছিল বিস্তর এবং ভদ্রতাজ্ঞানও ছিল অসাধারণ। এই সময় থেকে তাঁর অকাল মৃত্যু পর্যন্ত তাঁর সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত ঘনিষ্ঠতা কিছু বেড়েছিল। দিল্লী থাকবার সময় আমাদের যাতায়াত ছিল সৌজন্য বিনিময়ের খাতিরে। ধীরে ধীরে নিমন্ত্রিতেরা আসতে আরম্ভ করলেন—বাঙালী ও অবাঙালী কত মাননীয় অতিথিবৃন্দ। ডাক্তার সুরেন সেন বোধ হয় তখন দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য। তিনি এসেছিলেন স্পষ্ট মনে আছে। জীবনলাল কাপুর বলে পাঞ্জাবের একজন ব্যারিস্টার যিনি তখন ইউনিয়ন পাব্লিক সার্ভিস কমিশনের সদস্য—তাঁর সঙ্গেও আলাপ হোল। দিল্লী কালীবাড়ির অনেকে এসেছিলেন। সবাইকে এখন স্মরণ করতে পারছি না। খুব জমেছিল সেই চা পার্টিটা। বাঙালী যাঁরা তাঁরা সবাই খুশি যে একজন বাঙালী জজের ডাক পড়েছে পাঞ্জাবের হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির আসনে। পার্টি শেষ হলে আমার জিনিসপত্র গাড়িতে বোঝাই দিয়ে গেলাম দিল্লীর বড় স্টেশনে রাত্রের কালকা মেল ধরবার জন্যে। আমার একটা কুপে রিজার্ভ করা ছিল। তাতে গিয়ে উঠে বসলাম। দেখলাম একটি মাঝবয়সী লোক প্লাটফরমে দাঁড়িয়ে আমার দিকে চেয়ে রয়েছেন। দরজাটা খুলে তাঁর সঙ্গে কথা বললাম। শুনলাম তাঁর নাম ঈশ্বরদেব দুয়া এবং তিনি পাঞ্জাব হাইকোর্টের একজন এ্যাডভোকেট। খুবই ভদ্র ছিল তাঁর ব্যবহার এবং শান্ত সমাহিত ছিল তাঁর অবয়ব। প্রথম আলাপেই ভদ্রলোকটিকে ভাল লাগল। সুখের বিষয় যে তিনি এখন পাঞ্জাব হাইকোর্টের বিচক্ষণ জজ। যথাসময়ে ট্রেন ছাড়ল—আমি চললাম সিমলা পাহাড়ের উদ্দেশে।

পথে স্মরণীয় কোন ঘটনা ঘটে নি। খুব ভোরে হিমালয়ের পাদদেশে ট্রেন থামল। সিমলা থেকে আমাকে অভ্যর্থনা করবার জন্যে এসেছিলেন হাইকোর্টের একজন কর্মী—নাম তীরথ সিং ও দু' একজন চাপরাশী যাদের মধ্যে জমাদার বা প্রধান ছিলেন দেবীচাঁদ। এই দেবীচাঁদ আমার সঙ্গে জমাদাররূপে কাজ করেছেন যতদিন আমি পাঞ্জাবের চীফ জাস্টিস ছিলাম। তীরথ সিংকে আমার সঙ্গে প্রাতরাশ করবার জন্যে আমন্ত্রন করায় প্রথমে তিনি যেন একটু সংকোচ বোধ করলেন। শুনলাম যে পাঞ্জাবে চীফ জাস্টিসের সঙ্গে বসে খাবার কথা নিম্নস্থ কোন কর্মচারীই ভাবতে পারতেন না। আমার নির্বন্ধাতিশয্য দেখে অগত্যা তীরথ সিং আমার সঙ্গে বসে প্রাতরাশ সমাপন করে নিলেন।

তারপর আমরা একটি রেলমোটরে চেপে সিমলার পাহাড়ে উঠতে লাগলাম। ছোট্ট একটি ডাব্বা—চারিদিকেই বড় বড় কাঁচের জানালা। চারিদিকের দৃশ্য অতি মনোরম লাগছিল। মাঝে মাঝে বেশ বড় বড় সুড়ঙ্গের ভিতর পাতা লাইন দিয়ে রেল মোটরটি হু হু করে ছুটে যাচ্ছিল। কালকা স্টেশনে ও সিমলার পথে তীরথ সিংয়ের কাছে পাঞ্জাব বিভাগের কথা এবং কি করে জনগণ মায় জজ ব্যারিস্টার ও অন্যান্য এ্যাডভোকেটরা পশ্চিম পাঞ্জাব ছেড়ে এদিকে এলেন। কি করে হাইকোর্টের কর্মচারীরা থাকবার জায়গার কোন বন্দোবস্ত না থাকার দরুণ সিমলার রেল প্ল্যাটফরমের উপর দারুণ শীতে নিশি যাপন করলেন—এই সব ঘটনার রোমাঞ্চকর বিবরণ শুনে গেলাম। পাঞ্জাবীরা যে কষ্টসহিষ্ণু এবং দৃঢ়প্রতিজ্ঞ মানুষ সে বিষয়ে কোন সন্দেহই রইল না আমার মনে। এই সকল বাস্তুহারা মানুষ—কি হিন্দু কি শিখ—সবাইকে প্রসন্নভাবে আনন্দ করে রাখবার কতকটা দায়িত্ব আমারও উপরে বর্তেছে বুঝে নিজেকে প্রস্তুত করে নেবার সংকল্প তখন থেকেই আমার মনে বেশ দানা বাঁধছিল। এক পথে সোলান বলে একটা জায়গায় গাড়ি অনেকক্ষণ দাঁড়াল। সেখানে আমরা আবার একসঙ্গে প্রাতর্ভোজন সেরে নিলাম। কথাবার্তায় এই তীরথ সিং লোকটিকে আমার বেশ ভালই লাগল। এঁর কথা আমার [illegible] কাছে শুনেই এসেছিলাম। তাই এঁকে চাক্ষুষ দেখে মনটা বেশ প্রসন্নই হোল। পরে এই তীরথ সিংকে আমি প্রমোশন দিয়ে আমার সচিব (সেক্রেটারী) করে নিয়েছিলাম। খুব কাজের লোক তিনি ছিলেন এবং তাঁর মতামত বা উপদেশ অনেকক্ষেত্রে বেশ নিরপেক্ষই মনে হয়েছে।

বিকেলের দিকে সিমলা পৌঁছলাম। হাইকোর্ট তখন শীতের জন্য বন্ধ ছিল। সুতরাং স্টেশনে উকিল কৌঁসুলী ও কর্মচারীদের সমাগম মোটেই ছিল না। রাজ্যপাল চন্দুলাল ত্রিবেদীর একজন এ-ডি-সি মিলিটারী কায়দায় সেলাম করে জানালেন যে রাজ্যপাল ট্যুরে বেরিয়ে গেছেন কিন্তু বিশেষ করে অনুরোধ রেখে গেছেন যেন আমি অবশ্য অবশ্য বার্নস কোর্টে রাজভবনে উঠি এবং সেইজন্যে তিনি গাড়ি নিয়ে এসেছেন। আমি পাঞ্জাবে নতুন

ছড়া

[illegible]

[illegible] কাঙালি
তবে কেন লোক হাসালি।
[illegible]
এতটা কেন কাঙালি?
উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে
করে তো দেশ জ্বালালি।
কত না তোর রঙ্গ।
[illegible] জোড়াস অঙ্গ।

[illegible]
[illegible] চাঁদ তোমাই [illegible]
[illegible] যে কুলাঙ্গ।
কানা খোঁড়ার দেশে
কেন জন্মেছিস এসে।
এমনি করে চলবে কদিন
রইবি কদিন ভেসে?
সময় আছে দেখবে চেয়ে
বন্যা সর্বনেশে॥

আগন্তুক। চীফ জাস্টিসের পক্ষে রাজভবনে ওঠাটা হয়ত সরকারের সঙ্গে দহরম মহরম করা বলে জনসাধারণের মনে হতে পারে। আমারও সেটা ভাল লাগল না। সেই এ-ডি-সি-কে বললাম যে, আমি ত' শুধু একদিন এক রাত বই থাকব না, সুতরাং অত দূরে বার্নস কোর্টে না যাওয়াই ভাল। আমি একটা রাত হোটেলেই থাকব বলে স্থির করলাম। সিমলায় তখন প্রচণ্ড শীত। হাইকোর্টের কাছাকাছি নামকরা হোটেলটা ছিল হোটেল সেসিল। সেটা অক্টোবরের শেষেই শীতের জন্যে বন্ধ হয়ে যায়। একমাত্র হোটেল যা খোলা ছিল সেটা হোল ক্লার্কস হোটেল। শুনলাম হোটেলটা পুরনো এবং ছোট। রায়বাহাদুর ওবেরয় ঐ ক্লার্কস হোটেল কিনেই তাঁর হোটেলের ব্যবসায় সুরু করে এখন ভারতের বহু নামকরা বড় হোটেলের মালিক হয়েছেন। চলে গেলাম ক্লার্কস হোটেলে। সেখানকার ম্যানেজার বেশ আদর-আপ্যায়ন করে আমায় ঘরটির সব দেখিয়ে দিলেন। তাঁকে বলে দিলাম যে পরদিন সকালে স্নানাদির যেন ব্যবস্থা শীগ্‌গির শীগ্‌গির করা হয়, কেন না খেয়ে দেয়ে সকাল দশটার মধ্যে আমাকে হাইকোর্টে গিয়ে চার্জ বুঝে নিতে হবে। ম্যানেজার নতমস্তকে নমস্কার করে বিদায় নিলেন।

পরদিন ১৯শে জানুয়ারী সকাল বেলায় স্নানাহার সেরে তীরথ সিংয়ের সঙ্গে হাইকোর্টের দিকে হেঁটেই চললাম। শীতের রোদটা বেশ ভালই লাগছিল। তীরথ সিং বললেন যে, আমার নিয়োগের খবরটা বের হবার আগেই রাজ্যপাল ট্যুরে চলে গিয়েছেন এবং শীতের লম্বা ছুটিতে দু'জন ছাড়া অন্য সব কজন জজ এবং এ্যাডভোকেটরা আর রেজিস্ট্রার ও বহু কর্মচারীবৃন্দ নিচে নেমে গিয়েছেন। জজেদের মধ্যে সিমলায় রয়েছেন কেবলমাত্র জি ডি খোসলা এবং সর্দার হরনাম সিং। এঁদের মধ্যে সিনিয়ার হলেন জি ডি খোসলা এবং রাজ্যপাল তাঁকেই ভার দিয়েছেন আমাকে শপথ দেবার জন্যে। কথা বলতে বলতে এসে পড়লাম চৌরাস্তায়। বাঁদিকে দেখলাম দরজা জানালা সেঁটে বন্ধ করা প্রকাণ্ড হোটেল সেসিল। সেইটে ছাড়িয়ে খানিকটা হেঁটে চলে আসতেই দেখলাম একটা বাড়ির ফটকের গায়ে নাম লেখা—"পিটার হফ"। তীরথ সিং বললেন—"This is our High Court". এটা ত' একটা বড় বসত বাড়ি মাত্র—এটা কি করে হাইকোর্ট হোল? আমার মুখের আশ্চর্যভাব দেখে তীরথ সিং বললেন যে, সিমলায় হাইকোর্ট বসানর প্রস্তাবটা চীফ জাস্টিস দেওয়ান রামলাল ও পাঞ্জাব সরকার হঠাৎ ঠিক করায় আর কোন জায়গা না পাওয়ায় এই বাড়িতেই কোন রকমে হাইকোর্ট প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। হাইকোর্টের যে চিত্র আমার মনের মধ্যে ছিল তার সঙ্গে এই হাইকোর্টের একেবারেই মিল হোল না। পাটনায় নতুন হাইকোর্ট হবার পর জজ সরফুদ্দীন ও হাসান ইমামের কথাবার্তার কথা যা শুনেছিলাম তা মনে পড়ল। ইমাম সাহেব দুঃখ করে বলেছিলেন যে, কোথায় কলকাতার হাইকোর্ট আর কোথায় পাটনার হাইকোর্ট। সেই কথা শুনে জজ সরফুদ্দীন সাহেব নাকি বলেছিলেন—"তেরা মাফিক কৌঁসুলী আউর মেরা মাফিক জজ হোনেসে ইসসে বড়িয়া ক্যা হোগা।" অবশ্য কথাটা তাঁরা হাইকোর্টের সৌধ সম্বন্ধে বলেন নি এবং কৌতুকের জন্যেই বলেছিলেন। কিন্তু পাঞ্জাব হাইকোর্টের চেহারা দেখে আমার মনে হতে লাগল—"মেরা মাফিক চীফ জাস্টিস হোনেসে ইসসে বড়িয়া ক্যা হোগা।" কি আর করা যায়। ঢুকলাম সেই গেট দিয়ে পাঞ্জাব হাইকোর্টের মধ্যে।

রাস্তাটা গিয়ে যেখানে শেষ হোল তার ডান হাতে বেশ সুবৃহৎ অট্টালিকা। বাঁদিকে একটু নিচে প্রশস্ত একটি ময়দান সবুজ ঘাসে ঢাকা। তার পরই এক সার উচ্চ সরল বৃক্ষরাজি। তার তলায়, নিচে কয়েকসার ব্যারাকের মত লম্বা টানা টিনের চালওয়ালা ঘর। বড় বাড়িটার প্রবেশদ্বারেই দাঁড়িয়ে ছিলেন কালো কোট, ব্যান্ড ও গাউন পরা দুই জজ—খোসলা ও হরনাম সিং এবং তাঁদের পেছনে ছিলেন একইরকম পোষাকে তদানীন্তন এ্যাডভোকেট জেনারেল বসন্তকিষণ খান্না ও সহকারী এ্যাডভোকেট জেনারেল কর্তার সিং চাওলা এবং কয়েকজন কর্মচারী। দুজন এ্যাডভোকেটও ছিলেন বলে মনে পড়ে একজনের নাম সর্বমিত্র সিকরী এবং অপরটির নাম বিষণ নারায়ণ। সমাগত সকলের সঙ্গে নমস্কার ও করমর্দন করে জজ খোসলা ও হরনাম সিংয়ের পিছু পিছু বাড়িতে ঢুকে মস্ত বড় একটা ঘরের মধ্যে দিয়ে বেশ চওড়া সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে গিয়ে ছোট একটি আফিস ঘরের মত সাজান ঘরে গিয়ে উঠলাম। পাশেই যে ছোট বাথ ও ড্রেসিংরুম ছিল সেখানে গিয়ে আমিও কাল কোট, ব্যান্ড ও গাউন পরে নিলাম। বেরিয়ে এসে টেবিলটার সামনে দাঁড়াতেই পাঞ্জাব সরকারের একজন সেক্রেটারী—বোধ হয় স্বরাষ্ট্র সেক্রেটারী—যাঁর নাম শুনলাম এম আর সচদেব—তিনি আমার নিয়োগপত্রটি পাঠ করলেন। পাঠ শেষ হতে জজ জি ডি খোসলা আমার হাতে শপথের মন্ত্রটা দিয়ে অনুরোধ জানালেন যে, তিনি যেমন যেমন পড়ে যাবেন আমিও যেন সঙ্গে সঙ্গে তাই আওড়িয়ে যাই। বিধি মতে শপথ গ্রহণ করবার পর শপথের কাগজে সই করে জজ সাহেবদের ও উপস্থিত সকলের সঙ্গে আবার করমর্দন করে আমি পাঞ্জাব হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির আসনে বহাল হলাম।

[ক্রমশঃ]

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

টেবিলের ওপর হ্যারিকেনটা বসান। দপদপ করে সলতেটা জ্বলছে। যাবার সময় আলোটা একটু বেশি চড়িয়ে দিয়ে গেছে সুখী। আর ঠিক টেবিলের ওপাশে দেওয়ালের হুকে খাঁচাটা ঝুলছে। সীতাংশু একদৃষ্টে সেদিকে তাকিয়ে রইল। বাতির আলো সরাসরি খাঁচার ওপর গিয়ে পড়েছে। তাই যেন পাখির ছানাটা ঘুমোতে পারছে না। ঘাড় উঁচু করে টলটল করে সীতাংশুর দিকে চেয়ে আছে। কালো পুঁতির মতন খুদে চোখ দুটো কী অসম্ভব চিকচিক করছে!

কিন্তু সীতাংশু ভাবছিল, আজও সুখী ঘরে ফেরার সময় খাঁচাটা সঙ্গে নিয়ে গেল না, রেখে গেল। যেমন কাল রাতে রেখে গিয়েছিল।

কাল তবু একটা কারণ ছিল। রাণীর-বাগের মানুষ দুটি বেড়াতে এসেছিল। পাছে তারা চলে যাবার পরও সীতাংশু একলা ঘরে বসে ঐ দুটি মানুষের কথা ভাবে তাই বুদ্ধি করে সুখী পাখিটা রেখে গিয়েছিল। পাখি দেখলে মাজাঘষা মুখ দুটো সীতাংশু ভুলে থাকবে। তখন শুধু বনের কথা এই জঙ্গলের কথা ভাববে সে। পাখি মানেই বন।

সেটা অবশ্য একটা কথা নয়, সীতাংশু পরে চিন্তা করেছে, খাঁচাসুদ্ধ পাখিটা ঘরে না থাকলেও একলা বসে বসে সে এই জঙ্গলের কথাই চিন্তা করত, জঙ্গলের গভীর নৈঃশব্দ কান পেতে অনুভব করত। এই জঙ্গল ছেড়ে তার মন তার আত্মা কখনই ডাক্তারের লাল মোটরবাইকটার পিছু পিছু ছুটত না।

যা হোক, কাল মাধবের দিদি যা করেছিল ভালই করেছিল, মনে মনে তার কাজের প্রশংসা করেছিল।

কিন্তু আজ খাঁচাটা এখানে কেন?

ভুরুর মাঝখানে চুলের মতন একটা সূক্ষ্ম রেখা নিয়ে সীতাংশু পাখির ছানাটাকে দেখছিল। যেন বাচ্চা পাখিটার চোখের মধ্যে সুখীর মনের কথা লেখা রয়েছে। কিন্তু তা আর কেমন করে সম্ভব, বরং কালো কুচকুচে চোখ দুটোর মধ্যে সীতাংশু গাছের পাতার ছবি দেখছিল, খড়কুটো দেখছিল, ফলমূল পোকামাকড় শস্যকণা—কত কিছু মনে পড়ছিল তার। রৌদ্র আকাশ রাত্রির ঘুটঘুটে অন্ধকার অথবা গোলাপের মতো রক্তিম ঊষা—এসব ছাড়া সীতাংশু আর কিছু ভাবতেই পারছিল না।

খাঁচা থেকে চোখদুটো তুলে সে অন্যদিকে তাকাল। আর একদিকের বেড়ার গায়ে চোখ দুটো ধরে রাখল। যেন সেখানে একটা স্থির বিন্দু খুঁজে পেল সে। বিন্দুটাকে কেন্দ্র করে তার চিন্তা এবার ক্রমাগত পাক খেতে লাগল। বিশ্বাস করতে ইচ্ছা করছিল না, তবু যেন বিশ্বাস না করে সে পারছিল না। পাখিটাকে সুখীর ভাল লাগছে না। হুঁ, কাল থেকে ভাল লাগছে না, তাই এখানে ফেলে রেখে গেছে, কাল যা করেছিল ও।

আশ্চর্য, হুট করে মাধব যদি সীতাংশুর কানে কথাটা না তুলত তখন। তারা দুজনে বেতঝোপের ভেতর উদ খুঁজছিল তখন। সুখী একা সাঁকোর ওপর থেকে নুয়ে পাতালের অন্ধকার দেখছিল।

অথচ কাল কোন ফাঁকে যে রণধীর মাধবের দিদিকে কথাটা বুঝিয়েছিল। পাকা চুল খোঁজার মতন সেই সময়টার মিনিট সেকেন্ডগুলি তন্নতন্ন করে নেড়েচেড়ে দেখতে লাগল সে। অর্থাৎ যতক্ষণ গিন্নীকে নিয়ে ডাক্তার এ ঘরে ছিল। সুখী রান্না করছিল, পরিবেশন করছিল, একটা সময় তাদের সামনে এসেছিল, এতটা সময় বারান্দায় গিয়ে সে ধোয়ামোছা করছিল। এবং সীতাংশু নিজে কতক্ষণ ঘরে ছিল, কখন বা ঘরের বাইরে গেল। সময়ের চুলচেরা হিসাব করল সে। এমন একটা সময় সে মনে করতে পারছিল না, যখন সে সামনে ছিল না, অথচ সুখী ছিল রণধীর ছিল। আর তখন রণধীর সুখীকে তার খাঁচার পাখিটা নিয়ে এত সব কথা বলে গেল। বড় হলে মোটেই এটা দেখতে ভাল পাখি হবে না। গলার স্বর মোটা হবে কর্কশ হবে, চোখ দুটো গাঁজাখোরের চোখের মতন লাল টকটকে হয়ে যাবে, একটা পালকও নীল সবুজ কি সোনালি রং ধরবে না, এখন যেমন আছে তার চেয়েও খারাপ রং হয়ে যাবে তখন, পোড়া মাটির মতন কটকট করবে পাখা ঠোঁট পায়ের নখ। মানে যতটা হতকুচ্ছিত হয় তাই হবে দেখতে এই পাখি। সেই জাতের পাখির ছানা এটা। হয় পাখিওয়ালা চেনে নি, নয়তো ইচ্ছে করে ভাল জাতের পাখি বলে সুখীকে ঠকিয়ে দিয়ে গেছে।

কেবল কি এই।

ডাক্তার আরও বলে গেছে, যদি সুখীর পাখি পোষার শখ থাকে তো আবার যেদিন টিয়ার্টুলির জঙ্গলে বন্ধুর ডেরায় সে বেড়াতে আসবে, সুখীর জন্য একটা ময়না

টিয়া, চন্দনা বা ঐ জাতের অন্য পাখির ছানা নিয়ে আসবে।

সঙ্গোপনে বলার মতন কথা, নিবিড় করে বলার মতন বিষয় সন্দেহ কি। তখন ব্রততী সামনে ছিল কি না, সীতাংশু জানে না। সেই সম্পর্কে মাধব কিছু বলল না। কাল রাত্রে এখান থেকে ঘরে ফিরে গিয়ে দিদি তাকে পাখির কথাটা বলেছিল। পাখিটা তার পছন্দ হচ্ছে না, ডাক্তারবাবু আর একটা ভাল পাখি নিয়ে আসবে।

হয়তো মাধবও কথাটা ভুলে থাকত। একটা পাখি একজনের ভাল লাগতে পারে, না-ও পারে। যেমন কালুকেও মাধবের ভাল লাগে নি। কিন্তু কালুকে জঙ্গলে ছেড়ে দিয়ে এসে দিদির হাতের মার খেয়েই যেন মাধব পাখির কথাটা মনে রেখেছিল। উদের বাচ্চা ধরতে গিয়ে সীতাংশুর কানে কথাটা না তুলে সে পারল না, যেন মাধবের গলায় একটা অভিযোগের সুর ছিল। শুনে সীতাংশু বেতঝোপের ভেতর দাঁড়িয়ে শব্দ করে হেসেছিল এবং মাধবকে বুঝিয়েছিল, তা পাখিটাকে ভাল না লাগলেও তার দিদি ওটাকে বনে ছেড়ে দিয়ে আসত না, তখন নিজের মুখে সুখী বলেছিল, মাধবের নিশ্চয় মনে আছে। কালুকে সে ঢিবির গর্তে রেখে এসেছে বলে না তার দিদির রাগ দুঃখ।

শুনে মাধব চুপ করে ছিল।

হয়তো তারপর কথাটা আর সে মনে রাখে নি। সীতাংশুও ভুলে গিয়েছিল। উদের চিন্তা ছাড়া দুজনের মাথায় তখন আর কিছু ছিল না যে।

এখন ঘরে এসে খাঁচাটা দেখে সীতাংশুর মনে পড়ল। তা-ও যেন মনে পড়ত না। পাখি ঘরেই আছে, ভাল না লাগলেও বনে ছেড়ে দিয়ে আসে নি সুখী। কেবল রাত্রে শোবার সময় নিজের কাছে না রেখে সীতাংশুর ঘরে ওটাকে রেখে গেছে এই যা।

কিন্তু রাণীরবাগের ডাক্তার? তার মুখটা মনে পড়ছে কেন। ডাক্তারগিন্নীকেও বড় বেশি মনে পড়ছে। এই জন্যই কি সীতাংশু বিব্রতবোধ করছিল। বেড়ার গায়ের স্থির বিন্দুটার ওপর চোখ রেখে সে গাঢ় নিশ্বাস ফেলল। তারপর একটা সিগারেট ধরিয়ে হঠাৎ নিজের মনে হাসল। দেশলাইয়ের কাঠিটা যেমন ফস্ করে জ্বলে উঠল, তেমনি, তখন বেত-ঝোপের পাশে ঢিবির ওপর বসে সূর্যাস্তের লাল রং ছিটানো বাঁশের সাঁকোটা দেখতে দেখতে সুখী যত কথা বলেছিল, তার একটা কথা তার চোখের সামনে জ্বলে উঠল।

'এই সাঁকোর ওপর দিয়ে ডাক্তারবাবু বৌকে নিয়ে রাণীরবাগ ফিরে গেছে।'

'হুঁ, তাই তো।' চমকে উঠেছিল সীতাংশু কথাটা শুনে। সুখীর চোখের দিকে তাকিয়েছিল। সেই চোখের ভেতর কিছু খুঁজেছিল কি সে। মনে নেই, কিছু মনে করতে পারল না সে এখন, কিন্তু হেসেছিল। হেসে মাথা নেড়ে বলেছিল, 'রাণীরবাগ যাবার শর্টকাট রাস্তা এটা, এখান দিয়ে তাড়াতাড়ি পৌঁছান যায়, অন্য রাস্তাও আছে, ঘুরে যেতে হয়, অনেক সময় নেয়, অবশ্য বড় সড়ক সেটা ঠিক, নারী, চলে।' একটু থেমে থেকে সীতাংশু আবার বলেছিল, 'এই রাস্তা ধরেই তো ছেলেবেলায় বাবার সঙ্গে তুমি পিয়ালিতলার মেলায় যেতে, রাণীরবাগও গিয়েছিলে, তাই না? হেঁটে সাঁকো পার হয়েছিল।'

সুখী কথা না বলে মাথা নেড়েছিল। কিন্তু তবু এমন স্থির বিহ্বল চোখে সাঁকোটা দেখছিল, যেন জীবনে আর কোনোদিন সে এই জিনিস দেখে নি, এই প্রথম দেখছে, নতুন দেখছে।

ঠিক এমন সময় বুঝি মাধব দূরের একটা গাছে তাক করে ঢিল ছুঁড়েছিল। পাতার অস্পষ্ট শব্দ হয়েছিল।

আর সীতাংশু দেখছিল, সুখী তখনও চুপ করে আছে, চুপ করে কিছু ভাবছে। সীতাংশু অস্বস্তিবোধ করছিল। 'হঠাৎ এত ভাবনা উপস্থিত হল কেন তোমার, না কি ছেলেবেলার কথা সাঁকোটার গায়ে লেখা আছে।' যুবতীর হাত ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে প্রশ্ন করতে ইচ্ছা হয়েছিল তার। কিন্তু তা সে করে নি, একটু জোরে শব্দ করে কেশেছিল। তাতে কাজ হয়েছিল। সুখী এদিকে ঘাড় ফিরিয়েছিল।

'আমি ভাবছি—' যেন ভাবনাটা সীতাংশুকে না শুনিয়ে মাধবের দিদি শান্তি পাচ্ছিল না। 'আমি চিন্তা করছি, ডাক্তারবাবুর গিন্নী সাঁকোটা পার হবার সময় না জানি কত ভয় পেয়েছিল।'

'নিশ্চয়ই পেয়েছিল।' যেন চোখ বুজে পড়া মুখস্থ বলেছিল সীতাংশু। 'সাঁকোর নিচে পাতালের অন্ধকার, যদি ভদ্রমহিলার মনে পাপ থেকে থাকে তো সাঁকো পার হবার সময় ভয়ে তিনি কাঠ হয়ে গিয়েছিলেন, তাঁর হৃৎপিণ্ড হিম হয়ে গিয়েছিল।'

আকাশ ও চতুর্দিকের বনভূমি তখন কালো হয়ে গিয়েছিল। পশ্চিমের তাম্র আলোটা কখন জানি নিশ্চিহ্ন হয়ে মুছে গিয়েছিল। কিন্তু সেই অস্পষ্ট আলোয়, সীতাংশু লক্ষ্য করল, সুখীর মুখটা হঠাৎ কেমন ফ্যাকাসে হয়ে উঠেছে। খুব অল্প সময়ের জন্য যদিও। তা হলেও সীতাংশুর চোখে তা এড়াল না। হতে পারে, তখন সে চিন্তা করল, এই মাত্র সাঁকো থেকে নেমে এসে সুখী বলেছিল সাঁকোর ওপর তার খুব ভয় করছিল, আর সেই ভয়ের কথাটাই ব্রততীকে দিয়ে আবার কি না তাকে শুনিয়ে দিল সীতাংশু। তা না হয় শোনাল, কিন্তু পাপের কথাটা সে উত্থাপন করতে গেল কেন। এই জন্য সীতাংশুর অনুতাপও কম হল না।

তাই কতকটা নিজের দোষ স্খালনের জন্য, অথবা মাধবের দিদি প্রফুল্ল হয়ে উঠুক, তার মুখের স্বাভাবিক রং ফিরে আসুক—ভেতরে ভেতরে এমন একটা ইচ্ছা নিয়ে সীতাংশু অকস্মাৎ হেসে উঠেছিল।

'আসলে এটা হল গিয়ে যাকলেই-বাঘ বাঘের ভয় পাওয়ার মতন। আমি কোনো পাপ কাজ করলাম না, অথচ পাপের ভয়ে মরে যাচ্ছি—মনের দুর্বলতা ছাড়া আর কী বলা যায় একে। আমি নিষ্পাপ, আমি পবিত্র—এই মন নিয়ে এই সাহস নিয়ে ডাক্তারগিন্নী যদি সাঁকো পার হয়ে থাকে তো নিশ্চয়ই সে ভয় পায় নি, বরং যতক্ষণ সাঁকোর ওপর ছিল, তার ভালই লেগেছিল, চারদিকের গাছপালা আকাশ মাটির দৃশ্যটা উপভোগ করেছিল, হয়তো সাঁকোর কিনারে ঝুঁকে খাতের ভেতরের চমৎকার অন্ধকার ছবিটা দেখার লোভ তার হয়েছিল এবং দেখেওছিল।'

ব্রততীকে দিয়েই কথাটা বুঝিয়েছিল সীতাংশু। শুনে সুখীর মন হাল্কা হয়েছিল কি-না বোঝা যায় নি। কেন না তার পরও কিছুক্ষণ চুপ থেকে সাঁকোটার দিকেই তাকিয়ে ছিল সে। মাধব আর একটা ঢিল ছুঁড়েছিল তখন।

তারপর তিনজন ঢিবি ছেড়ে উঠে আসে। সারা আকাশে যূঁই ফুলের মতন তারা ফুটে উঠেছিল। সাঁকোটা পিছনে রেখে তিনজন টিলাটুলির রাস্তা ধরল। রাস্তায় কেউ বড় একটা কথা বলে নি।

একটা একটা করে সব এখন মনে পড়ছিল সীতাংশুর।

বাতির সলতেটা দপদপ করছিল। হয়তো তেল ফুরিয়ে এসেছে, শানিকটা তেল ভরে নিল সে। আলো আবার উজ্জ্বল হল স্থির হল।

না, নতুন করে আর নারীর দিকে চোখ ফেরাতে তার ইচ্ছা করল না। পাখার পট-পট শব্দ শোনা গেল। বোঝা গেল পাখিটা ছটফট করছে। সম্ভবত সুখীকে দেখছে না বলে।

যদি এ জিনিস কাল হত, খাঁচা খুলে পাখিটাকে ভেতর থেকে টেনে এনে সীতাংশু বুকের কাছে নিয়ে আদর করত চুমু খেত। অর্থাৎ মাধবের দিদি সারা দিন যেভাবে ওকে আদর করে গেছে, সীতাংশু এখন তাই করত।

কিন্তু আর যেন আদর দেখিয়ে এই টুকুন বাচ্চা পাখির সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা

করতে তার ইচ্ছা হল না। যার পাখি সে যদি অন্তর থেকে ওকে ভাল না বাসল, সঙ্গে করে বাড়ি বয়ে নিয়ে যাবার অসুবিধা ভেবে এখানে ওকে ফেলে রেখে গেল, তো সীতাংশু এখন কোলে নিয়ে আদর করলেই কি পাখির বুকের যন্ত্রণা কমবে, মোটেই না। একজনের ভালবাসার ক্ষতিপূরণ আর একজনকে দিয়ে হয় না। বনের পশু-পাখিরাও এ জিনিস বোঝে।

খাঁচার দিকে সম্পূর্ণ পিছন ফিরে সে আস্তে আস্তে দরজার কাছে সরে গেল। ঠাণ্ডার জন্য কপাট ভেজিয়ে রেখেছিল। একটা কপাট টেনে খুলে ধরতে কনকনে হাওয়ার সূঁচ এসে চোখে-মুখে বিঁধল। তাড়াতাড়ি আবার সেটা বন্ধ করে দিয়ে ঘরের মাঝখানে ফিরে এল সে।

বস্তুত এই মুহূর্তে কী করা যায় সীতাংশু ভেবে ঠিক করতে পারছিল না। সিগারেট খেতেও আর ইচ্ছা করছে না। মুখের ভেতরটা কেমন বিস্বাদ ঠেকছিল। এখন শুয়ে পড়লেও যে চোখে ঘুম আসবে তাতে যথেষ্ট সন্দেহ ছিল। বিছানায় শুয়ে ছটফট করা কোনদিনই সে পছন্দ করত না। তবু তার চেয়ে জেগে বসে থাকা ঢের ভাল। তার মধ্যে একটা সান্ত্বনা আছে বলে সীতাংশুর বিশ্বাস। কাজেই চেয়ারটা টেনে সে বসে পড়ল।

বলতে কি, তার যেন তখনই জানতে ইচ্ছা করছিল রাণীরবাগের ডাক্তার কবে থেকে আবার পাখিবিশারদ হয়ে গেল। যেন এই মুহূর্তে ডাক্তারকে পেলে কথাটা সে জিজ্ঞেস করে।

এবং এ-ও সে চিন্তা করল, সত্যি রাণীর মাধবের দিদির জন্য একটা পাখি নিয়ে উপস্থিত হবে কি না। সেদিন কি ডাক্তার একলা আসবে, না কি ব্রততীও সঙ্গে আসবে। নিশ্চয় আবার একটা খাঁচার মধ্যে পুরে পাখিটাকে এখানে আনতে হবে। ডাক্তার মোটর-বাইক চালিয়ে আসছে। গাড়ির পিছনে ব্রততী বসে আছে। ব্রততীর চুল উড়ছে আঁচল উড়ছে। কিন্তু হাত দিয়ে সে সব সামলাবার উপায় নেই। কেন না পাখির খাঁচাটা কোলের ওপর রেখে দু'হাতে সাবধানে সেটা চেপে ধরেছে। তা না হলে মোটরবাইক যখন ঝাঁকুনি দিয়ে ছুটবে খাঁচাটা কোল থেকে ছিটকে পড়ে যেতে পারে।

চেয়ারের পিঠে মাথা রেখে চোখ দুটো মুদ্রিত করে সীতাংশু সেই চমৎকার ছবিটা কল্পনা করল। সুখীর জন্য খাঁচায় করে একটা পাখি বয়ে আনছে রাণীর-বাগের মাজাঘষা গিন্নী।

সকালে ঘুম থেকে উঠেই সীতাংশু সকলের আগে লোক পাঠিয়ে পীতাম্বরের খবর নিল। মোটামুটি ভাল আছে সে। রাত্রে ঘুমিয়েছিল। পীতাম্বরকে ফলটল কিনে দেবার জন্য লোক মারফৎ তার বৌয়ের কাছে ক'টা টাকা পাঠিয়ে দিয়ে সীতাংশু অনেকটা নিশ্চিন্ত হতে পারল।

বেলা দশটা সাড়ে দশটা পর্যন্ত করাতঘরে ঘুরে করাতীদের কাজ দেখল সে, মিস্ত্রীদের কাজ দেখল, জঙ্গলের দিকেও একবার যেতে হল তাকে। গাছ কাটা হচ্ছিল। কুড়ালের ঘা লেগে শাল-সেগুন থরথর করে কাঁপছিল। ঠিক এই সময়টায় সীতাংশু চিবুক তুলে গাছের বিস্তৃত শাখা-প্রশাখা ও পাতার দিকে চোখ দুটো ধরে রাখে। যেন প্রকাণ্ড গাছটার সমস্ত আকুতি-মিনতি বেদনা ও শিহরণ ওদিকে তাকালে সহজেই তার চোখে ধরা পড়ে। তাই তো গাছতলায় দাঁড়িয়ে তখন সে চিন্তা করে, কত দীর্ঘ-দিনের আলো বাতাস রৌদ্র শিশির বর্ষার জল মাথায় নিয়ে একটা গাছ বড় হয়, বনস্পতি আখ্যা পায়। আর মানুষে কত সহজে কুড়াল চালিয়ে একে ভূতলশায়ী করে। সবটা গুঁড়ি কাটা হয়ে যাবার পর গাছটা যখন শব্দ করে মাটিতে আছাড় খেয়ে পড়ে সীতাংশুর তখন মনে হয়, গাছটা তো লুটিয়ে পড়ল না, দীর্ঘদিনের সঞ্চিত সাধ স্বপ্ন আশা ও বিশ্বাসের মূলোচ্ছেদ করা হল। বেশি সময় দাঁড়িয়ে সীতাংশু এ জিনিস দেখতে পারে না, কেমন কষ্ট হয় তার। জঙ্গল থেকে বেরিয়ে আসে।

আজ জনার্দনকে দেখে তার কিন্তু খুবই হাসি পেয়েছিল। কুড়ালের একটা কোপ বসিয়ে পাঁচবার সে ডাইনে বাঁয়ে সামনে পিছনে তাকিয়েছে, মানুষ গরু ছাগল এমন কি শালিক চড়ুইটিকেও দেখতে পেলে যতক্ষণ না সেটি দূরে সরে যাচ্ছে হাতের কুড়াল তুলে দ্বিতীয় আর একটি গাছ হয়ে চুপটি করে দাঁড়িয়ে রয়েছে, তারপর আবার কোপ বসিয়েছে, এবং কোপ বসিয়েই চোখ তুলে আবার চারদিকে তাকিয়েছে। আজ কিন্তু কুয়াশা ছিল না। পরিষ্কার রৌদ্র নিয়ে বনের ভেতর ঝলমল করছিল। তা হলেও জনার্দনের সতর্কতার শেষ ছিল না। আগের দিন পীতাম্বর তার কাটা গাছের নিচে চাপা পড়েছিল। এই জন্য জনার্দন আজ অত্যধিক ভয়ে ভয়ে গাছ কাটছিল। তার চেহারাটা সত্যি দেখবার মতন ছিল তখন। একটু সময় দাঁড়িয়ে দেখে সীতাংশু সেখান থেকে সরে এসেছে।

মাধব সেই ভোর থেকে তার পিছনে ঘুরে ঘুরে করছিল। হয়তো রাত্রে ছেলেটা ভাল করে ঘুমোতে পারে নি। আজ আবার কখন নালার ধারে বেতঝোপে ঢুকে উদের বাচ্চা ধরতে যাবে সেই চিন্তা তাকে অস্থির করে তুলছে। একটু আগে সীতাংশুর বড় কাটারিটা ঘর থেকে বের করে নিয়ে আমলকীতলায় বসে একটা পাথরের ওপর ঘষে ঘষে আচ্ছা করে শাণ দিচ্ছে। আজ আর বেতকাঁটা তার পথরোধ করতে পারবে না, কাটারি দিয়ে কেটে সব সাফ করে দেবে—কিশোরের চোখে-মুখে একটা দৃঢ় সংকল্প একটা প্রত্যয় ঝিলিক দিয়ে উঠতে দেখেছে সীতাংশু, রোদ লেগে তার হাতের কাটারিটাও বুঝি এত ঝকঝক করছিল না।

হুঁ, তারপর থেকে সে সীতাংশুর পিছনে ঘুরছে। বাঁশের মাথায় কেরোসিন মাখান ন্যাকড়া জড়িয়ে একটা মশালও তৈরি করে ফেলেছে। সময় মতন ওটা জ্বালান হবে।

'কখন রওনা হব আমরা?'

'এই তো খাওয়াদাওয়ার পর।'

'বেশি দেরি করলে ওদিকে আবার অন্ধকার হয়ে যাবে।' অধৈর্য হয়ে মাধব বলে ফেলেছিল।

সীতাংশু তার চোখে চোখ রেখে হেসেছিল।

'হুঁ, তা বটে, শীতের বেলা। দেখি রান্নাবান্নার কদ্দুর হল।'

ঘরে ঢুকে সীতাংশু বড় সুন্দর একটা দৃশ্য দেখল। যেন রান্না করতে করতে মাঝখানে উঠে এসেছে মাধবের দিদি। উনুনের আঁচ লেগে রাঙা টুকটুকে হয়ে আছে মুখখানা। কাঁধের আঁচল কোমরে জড়ান। খোঁপার আধখানা ঘাড়ের ওপর ভেঙে পড়েছে; কপালটা ঈষৎ ঘেমে উঠে চকচক করছে। দরজার দিকে মুখ করে দাঁড়িয়েছিল যুবতী। বুকের কাছে পাখিটাকে নিয়ে আদর করছে। খাঁচাটা পায়ের কাছে খোলা অবস্থায় পড়ে আছে। বোঝা গেল এই মাত্র পাখিটাকে বের করে আনা হয়েছে। বুকের কাছে মুখ নুইয়ে পাখির ঠোঁটে চুমু খাচ্ছিল বলে সীতাংশু মাধবের দিদির কপাল ও মাথার পিছন এক সঙ্গে দেখতে পেল। কপালের ঘাম ও ভাঙা খোঁপা একই সময়ে তার চোখে পড়ল। কিন্তু কথা সেটা নয়।

সীতাংশু অবাক হল অন্য জিনিস দেখে।

সুখীর চোখের কোণায় জলের ফোঁটা। আর কেমন একটা অস্থির আবেগ নিয়ে পাখিটাকে বার বার চুমু খাচ্ছে। তার শ্বাস-প্রশ্বাস যে কত দ্রুত বইছিল বুকের ওঠানামা দেখে সীতাংশু বুঝতে পারল।

চমৎকার একটা ছবি। তাকিয়ে দেখার মতন দৃশ্য। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সীতাংশুর হৃৎপিণ্ড মোচড় দিয়ে উঠল। এটা সত্য, পাখিটাকে বুকে নিয়ে এমন মত্ত হয়ে উঠেছিল যুবতী—সীতাংশুর পায়ের শব্দ সে শুনল না। এই জন্য সীতাংশু পুরো একটা মিনিট দরজার সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে পেরেছিল। হুঁ, তার হৃৎপিণ্ডে মোচড় লাগল এই ভেবে, হয়তো শেষবারের

মেয়েদের ছোটবেলা থেকেই
ত্বকের যত্ন নিতে দেখতাম।
তিনি সুন্দরী, তিনি রূপসী!
প্রতিদিনের ত্বক পরিচর্যায় তাঁর এই অপরূপ সৌন্দর্যের
উৎস-সাধনা বিউটি ক্রীম।
সাধনা বিউটি ক্রীম রূপসাধনায় অনন্য
সাধনা ঔষধালয়-ঢাকা
সাধনা ঔষধালয় রোড, সাধনানগর, কলিকাতা-৪৮
অধ্যক্ষ যোগেশ চন্দ্র ঘোষ, এম.এ.
আয়ুর্বেদশাস্ত্রী, এফ.সি.এস. (লণ্ডন)
এম.সি.এস. (আমেরিকা) ভাগলপুর
কলেজের রসায়ন-শাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক
কলিকাতা কেন্দ্র :
ডাঃ নরেশচন্দ্র ঘোষ,
এম.বি.বি.এস. (কলিঃ)
আয়ুর্বেদাচার্য
SADHANA
Beauty
CREAM
সাধনা
বিউটি
ক্রীম

মতন আদর করে চুমুটুমু খেয়ে মাধবের দিদি পাখিটাকে এখন জঙ্গলে উড়িয়ে দেবে। আর খামকা খাঁচায় পুরে রাখবে না। ভাল করে এখনও পোষ মানে নি, একবার উড়ে গেলে এই পাখি আর ফিরে আসবে না। তাই চাইছে সুখী। রাণীর-বাগের ডাক্তারবাবু নতুন পাখি নিয়ে আসছে, ভাল পাখি।

কিন্তু চোখে জল?

তবে কি সবটাই ছলনা নয়, মায়াকান্না নয়। হতে পারে। সীতাংশু একটা গাঢ় নিশ্বাস ফেলল। কদিন নিজের হাতে সেবাযত্ন করেছে, বুকে নিয়ে আদর করেছে। একটু কষ্ট তো লাগবেই ছেড়ে দিতে। মানুষটির বুকের ভেতরটা একেবারে মরুভূমি হয়ে যায় নি। মুখে যা-ই বলুক, ভালবাসার ফল্গু এখনও ঝিরঝির করে বইছে।

তা হলেও, আদরটা যেন একটু বাড়াবাড়ি মনে হল।

সীতাংশু আর চুপ থাকতে পারল না। ইচ্ছা করে গলা ঝেড়ে বেশ শব্দ করল।

সুখী চোখ তুলে প্রথম একটু থতমত খেল, তারপর সামলে নিয়ে হাসল।

চোখে জল মুখে হাসি। এ-ও এক ছবি।

'খুব আদর খাওয়ান হচ্ছে ছোট্ট পাখিকে?' সীতাংশুও হাসল।

'জানেন কাল সারারাত আমার কী কান্না পাচ্ছিল।' গালের কাছে পাখির ঠোঁট ঠেকিয়ে সুখী ঈষৎ বেঁকে দাঁড়াল।

'কেন, কান্না কেন।' একটু অবাক হবার ভান করে সীতাংশু বলল, 'পাখি তো এখানেই ছিল। খাঁচার ভেতর দিব্যি ঘুমোচ্ছিল।' ছটফট করছিল কথাটা সে আর [illegible] না।

'কি জানি, সঙ্গে করে বাড়ি নিয়ে যাই নি বলে হয়তো এত কষ্ট পেয়েছি। শোবার সময় বুকটা কেমন খাঁখাঁ [illegible] ঠেকছিল।'

'পরশু রাত্রেও খাঁচাটা রেখে গিয়েছিলে।' সীতাংশু মনে করিয়ে দিল।

'পরশু ইচ্ছে করে রেখে গেছি, কাল ভুলে গিয়েছিলাম।'

'আজ নিয়ে যেও, আজ আবার ভুল করে ফেলে যেও না।' পরশু কি সীতাংশুর মনের দিকে তাকিয়ে খাঁচা রেখে গিয়েছিল, কাল ভুল করল কেন? অপলক চোখে সীতাংশু মাধবের দিদির মুখ দেখল, যেন মুখের রং পরীক্ষা করল।

'না, না, আর ভুল করব না, আর কখনো ভুল করি! তার জন্য সারারাত শাস্তিও পেয়েছি খুব। আমার মণি, আমার ছোট্ট পাখি।' টুকটুকে লাল ঠোঁট পাখির ঠোঁটে ঠেকিয়ে মাধবের দিদির কেমন দিশেহারা হয়ে যাবার মতন অবস্থা।

মাধব ধারেকাছে নেই। যেন তখনও আমলকীতলায় বসে কাটারি শাণ দিচ্ছিল। সীতাংশু চোখ ঘুরিয়ে পিছনটা দেখল।

কতকটা নিশ্চিন্ত হল সে। রাগ করে মাধব কাল বেতঝোপে দাঁড়িয়ে দিদির নামে মিছে কথা বলছিল বোঝা গেল। অথবা আগের দিন রাত্রে নিশ্চয় ভাইয়ের মন পরীক্ষা করেছে সুখী। এটা ভাল পাখি নয়। খাঁচা খুলে বনে উড়িয়ে দেবে। কালাকে যদি মাধবের ভাল না লাগে, একশবার জঙ্গলে ছেড়ে দিয়ে আসার কথা বলে, তো খাঁচা খুলে পাখিটাকেই বা তার দিদির ছেড়ে দিতে দোষ কি।

'পীতাম্বর এখন সেরে উঠবে, আর ভয় নেই।' হালকা গলায় সীতাংশু বলল, 'তার বাড়িতে লোক পাঠিয়েছিলাম। একটু আগে খবর নিয়ে এসেছে।'

'খুব ভাল।' আনন্দে যুবতীর চোখ ঝলমল করে উঠল। 'ঐ মানুষটার জন্যেও রাত্রে আমার দুশ্চিন্তার শেষ ছিল না, কতবার যে মনে মনে ঈশ্বরকে ডেকেছি।'

'আই।' সীতাংশু ঘাড় নাড়ল। 'একটা ভয়ংকর দুশ্চিন্তার হাত থেকে এবারের মতন রেহাই পেলাম।' একটু থেমে থেকে আবার বলল, 'আজ আমরা নালার ধারে যাচ্ছি।'

সুখী হাসল।

'হুঁ, উদ্যোগ-আয়োজন দেখে বুঝতে পারছি, সকাল থেকে ভাইটি আমার কাটারি শাণ দিচ্ছে; মশাল তৈরি করছে।'

সীতাংশু হাসল।

'মনে হয় ছোঁড়া সারারাত কেবল উদের বাচ্চার স্বপন দেখেছে।'

এ কথার পর দুজন বুঝি এক সঙ্গে শব্দ করে হেসে উঠত, থমকে গেল। দরজায় জুতোর শব্দ হল, একটি মানুষের ছায়া পড়ল। সেদিকে চোখ পড়তে দুজন স্তম্ভিত হয়ে গেল। [illegible]

স্মলেখা
প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা

(সারা ভারত কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য)

বিষয়:

ভারতের জাতীয় সংহতি

এই একই বিষয়ে বাংলা, হিন্দী ও ইংরাজী ভাষায় প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হইবে।

বিচারকমণ্ডলীর সভাপতি

ইংরাজী : অধ্যাপক [illegible] ভট্টাচার্য এম-এল-সি
বাংলা : অধ্যাপক ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
হিন্দী : অধ্যাপক [illegible], কলিঃ বিশ্ববিদ্যালয়

প্রতিযোগিতার জন্য প্রবন্ধ দাখিল করিবার শেষ তারিখ ১৪ই এপ্রিল, ১৯৬৮। কমিটির সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

পুরস্কার

প্রথম পুরস্কার : উপরোক্ত প্রতিটি ভাষায় : একটি স্বর্ণপদক, প্রতি মাসে ১৬ টাকা করিয়া এক বৎসর স্টাইপেণ্ড ও ৫০ টাকার বই।
দ্বিতীয় পুরস্কার : উপরোক্ত প্রতিটি ভাষায় : একটি স্বর্ণখচিত রৌপ্যপদক প্রতি মাসে ১২ টাকা করিয়া এক বৎসর স্টাইপেণ্ড ও ৩০ টাকা মূল্যের বই।
তৃতীয় পুরস্কার : উপরোক্ত প্রতিটি ভাষায় : একটি রৌপ্যপদক, প্রতি মাসে ৮ টাকা করিয়া স্টাইপেণ্ড এক বৎসরের জন্য ও তৎসহ ২০ টাকা মূল্যের বই।

এতদ্ব্যতীত প্রতিটি ভাষায় অতিরিক্ত দশটি করিয়া যোগ্যতানুসারী সার্টিফিকেট অব মেরিট (প্রশংসাপত্র) ও ২৫ টাকা নগদ পুরস্কার দেওয়া হইবে।

বিশদ বিবরণ ও এনরোলমেন্ট ফরমের জন্য লিখুন :
সম্পাদক
স্মলেখা প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা কমিটি
স্মলেখা পার্ক, কলিকাতা-৩২

রঙ্গমঞ্চ ওদেশে এবং এদেশে

শিলালি

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

কামেরস্পিলের উদ্বোধন রজনী হল বিরাট সাফল্যমণ্ডিত। দর্শকদের সম্বর্ধনা জানানো হল পতাকা আন্দোলন করে—সে সব পতাকায় লেখা ছিল 'এমন রোমান্টিক দৃষ্টিভঙ্গিতে চেয়ে দেখো না', অথবা 'প্রত্যেক মানুষই নিজের চামড়ার তলায় সবথেকে ভালভাবে অনুভব করে'।

তারপর দর্শকরা দেখলো অ-বাস্তব সেটিং-এ নাটক এগিয়ে চলেছে। একটি শহর দেখানো হোল ইঙ্গিতের সাহায্যে—অর্থাৎ কতকগুলো ঘরের দেয়ালের সাজে-শচেন দেওয়া হয়েছিল পর্দার অপর দিক থেকে—সৈনিক ক্র্যাগলার ঠিক করলো তার শপ্‌-সয়ালড্‌ব্রাইডকে বিয়ে করবে এবং বিপ্লবকে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে চলে আসবে। ওপরে একটি লাল রঙের চাঁদ ঝুলছিল—দেখতে চাইনিজ লণ্ঠনের মত লাগছিল।

ইহেরিং মিউনিখে এসেছিলেন। বার্লিনার বোয়েরসেন কোরিয়ারে তাঁর অত্যন্ত সূক্ষ্ম এবং উদ্দীপনাপূর্ণ সমালোচনা প্রকাশিত হল :

"চব্বিশ বছরের ছেলে বের্‌ট ব্রেশট রাতারাতি জার্মান সাহিত্যের চেহারা পাল্টিয়ে দিয়েছেন। তিনি নতুন টোন, নতুন মেলডি এবং নতুন দৃষ্টিভঙ্গির সৃষ্টি করলেন। ব্রেশটের রক্তকণিকায় এবং শিরায় শিরায় বইছে এ-যুগের সব কিছু বিভীষিকা। এই বিভীষিকা সৃষ্টি করেছে একটা স্তিমিত পরিবেশ এবং মানুষ এবং বস্তুর চারদিকে রয়েছে অস্পষ্ট আলো। ব্রেশট্‌ যেন সর্বাঙ্গ দিয়ে অনুভব করেছেন আজকের দিনের সমাজের শৃঙ্খলাহীনতা এবং পচনশীল ক্ষয়িষ্ণুতা। এই সব কারণেই তাঁর সৃষ্ট আলেখ্যগুলো এত শক্তিশালী বলে মনে হয়। ব্রেশটের ভাষার জোর দর্শকেরা সর্বাঙ্গ দিয়ে অনুভব করেন। এ ভাষা পাশবিকভাবে ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য এবং বিষাদাচ্ছন্নভাবে কোমল। এ ভাষায় হিংস্রতা আছে, আছে গভীর বেদনা, ঠাট্টা-বিদ্রূপ আছে এবং আছে বিষণ্ণতামাখানো সংগীত।"

এরপর ইহেরিং হলেন ১৯২২ সালের ক্লাইস্ট পুরস্কার দেবার বিচারক—প্রতি বছর এই পুরস্কারটি দেওয়া হোত সেরা প্রতিভাসম্পন্ন যুবক নাট্যকারকে। প্রথমে তিনি ঠিক করেছিলেন যুগ্মভাবে ব্রেশট্‌ এবং ব্রোনেনকে এই পুরস্কার দেবেন। কিন্তু শেষে একলা ব্রেশটকেই পুরস্কারটি দিলেন। উদীয়মান নাট্যকার হিসাবে ব্রেশটের যশও প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল এর ফলে।

তবুও ব্রেশটের সাফল্যের পথ খুব সুগম হয় নি। জার্মানীর প্রধান রঙ্গগৃহ, রাইনহার্টের ডয়ট্‌সে থিয়েটার পরিকল্পনা করছিল ১৯২২-এর ডিসেম্বরে 'ড্রামস ইন দি নাইট' মঞ্চস্থ করবে।

জার্মান থিয়েটারের বিরাট ব্যক্তি ম্যাক্স রাইনহার্ট ব্রেশটের নাটকটি সম্বন্ধে এতো চমৎকৃত হলেন যে ক্রমান্বয়ে তিন সপ্তাহ ধরে প্রতিদিন নাটকের রিহার্সাল দেখতে আসতেন—অতি শান্তভাবে প্রেক্ষাগারে ঢুকে তিনি পেছন দিককার একটি সিটে বসে নাটকের প্রস্তুতি নিবিষ্টতার সঙ্গে লক্ষ্য করতেন। কাস্টিং এবং ডেকর নিয়ে মতবিরোধ দেখা দিল ব্রেশট এবং ফেলিক্স হলেণ্ডারের ভেতর—হলেণ্ডার এই সময় রাইনহার্টের তরফে ডয়েটসে থিয়েটারের পরিচালক ছিলেন। শেষ পর্যন্ত বার্লিনে ড্রামস্‌ ইন দি নাইট অসফল হল। ব্রেশট মিউনিখ থেকে ইহেরিংকে লিখলেন :

"হলেণ্ডারই ড্রামস্‌-এর হত্যার জন্য দায়ী। লোকটার বুকের তলায় হৃৎপিণ্ডটা কি কুচকুচে কাল! ঈশ্বর এ জন্য ওর বিচার করবেন এবং ওকে তখন জবাবদিহি করতে হবে। আমিও ওর বিচার করবো—সে বিচার হবে আরও নির্মম।"

মিউনিখে স্টেট থিয়েটার ব্রেশটের আর একটি নতুন নাটক মঞ্চস্থ করতে উদ্যত হলেন—এটির ইংরাজী নাম 'ইন দি জাংগল অভ দি সিটিজ'। কোন কোন সমালোচকের মতে এই অদ্ভুত নাটকটির সংজ্ঞা দেওয়া চলে 'উদ্দেশ্যহীন রচনা'—এতে যেন ব্রেশর্ট, বেকেট, ইওনেস্কো এবং আডামভের আবির্ভাবের সংকেত দিচ্ছিলেন। ব্রেশটের নাটকটি মিউনিখে মঞ্চস্থ হল ১৯২৩ সালের মে মাসে—দর্শকরা নাটক দেখে ভালভাবে কিছুই বুঝতে পারল না। এ নাটকের এখন পর্যন্ত কোন ইংরাজী অনুবাদ হয় নি। সুতরাং নাটকটি সম্বন্ধে কোন বিশদ আলোচনা করা সম্ভব নয়। তবে ব্রেশটের লেখা পড়ে বা তাঁর নাটকের অভিনয় দেখে তাঁর সম্বন্ধে যে ধারণা আমার হয়েছে, তা থেকে আমি জোর দিয়ে বলতে পারি ব্রেশট্‌ কোনক্রমেই বেকেট, ইওনেস্কো বা এ্যাবসার্ড-অবস্থার আডামভের অগ্রদূত হতে পারেন না। নিশ্চয় তাঁর নাটকটিতে কোন না কোন ইঙ্গিত ছিল যা উপরি উক্ত সমালোচকদের চোখে পড়ে নি। আডামভ যখন এ্যাবসার্ড প্লে লেখা ছেড়ে দিয়ে স্ট্রেইট প্লে'র রচনায় মন দিলেন, তখন তিনি ব্রেশটকেই গুরুর আসনে বসিয়ে তাঁর প্রদর্শিত পথে নাট্য-রচনায় মন দিলেন—তাই এখন অনেকে মনে করেন আডামভ বর্তমানে ব্রেশটের শিষ্য।

১৯২৩ সালের ডিসেম্বর মাসে লাইপজিগে 'বাল' নাটকের প্রথম প্রদর্শনী হয়। অনেকে নাটকটির খুব দুর্নাম রটিয়েছিল। ব্রেশট্‌ কিন্তু তাতে এত-টুকু ভয় পেলেন না, বা কুণ্ঠিত হলেন না—তিনি নতুন নাটক রচনার কাজে উঠে পড়ে লাগলেন। মিউনিখ কামেরস্পিলের সঙ্গে চুক্তির সর্ত অনুযায়ী তাঁর নাটক প্রডিউস করবারও কথা—তাঁকে ম্যাকবেথ নিয়ে কাজ করতে বলা হল—কিন্তু তিনি মনে করলেন এ কাজ তাঁর ক্ষমতার অতিরিক্ত হবে। সুতরাং প্রথমেই শেক্সপীয়ারের নাটকে হাত না দিয়ে তিনি মারলোর এডওয়ার্ড দি সেকেণ্ড ধরলেন। মারলোর নাটকটির যে জার্মান অনুবাদটি তখন বাজারে পাওয়া যেতো সেটি পছন্দ না হওয়াতে ব্রেশট্‌ নিজেই এডওয়ার্ড দি সেকেণ্ডের ভাবানুবাদ করে নিলেন। লায়ন ফয়েস্টভ্যাঙ্গার তাঁকে এ কাজে সাহায্য করেছিলেন। ব্রেশট্‌ লিখে নিয়ে আসতেন—ফয়েস্টভ্যাঙ্গার রচনার সংগঠনে ঠাসবুনোনীর দিকটা ঠিক করে দিতেন। যেখানে কাব্যপ্রবাহ বড় সহজ গতিতে চলতে থাকতো সেখানে পৌরুষ এবং কর্কশতার মিশ্রণে বীর্যবত্তার সৃষ্টি করতেন। শেষে ফল দাঁড়ালো এই রকম—মারলোর প্লটটি প্রায় ঠিকমতই বজায় রইল, কিন্তু আকৃতি এবং ভাষার দিক থেকে এক সম্পূর্ণ মৌলিক রচনার সৃষ্টি হোল। ব্রেশট্‌ নিজেই এড্‌ওয়ার্ড দি সেকেণ্ড প্রডিয়ুস করলেন ১৯২৪ সালের মার্চ মাসে। এই নাটক থেকেই ব্রেশটের এপিক থিয়েটারের সুরু। প্রডাকসনটি বেশ সোজা-সাপ্টাভাবেই সফিশটিকেটেড এবং স্টাইলাইজড্‌ ধরণের হয়েছিল। পরবর্তী জীবনে ব্রেশট্‌ অনেক সময়েই গল্পচ্ছলে বলতেন কিভাবে একটি 'যুদ্ধের দৃশ্য' নিয়ে তিনি মহা বিপদে পড়েছিলেন। প্রায় প্রত্যেককেই এ বিষয়ে প্রশ্ন করতে করতে শেষ পর্যন্ত এলেন কার্ল ভ্যালেনটিনের কাছে। ভ্যালেনটিন ছিলেন মিউনিখের মিয়াল হলের বিখ্যাত ক্লাউন—বিরাট গণ-শিল্পী হিসাবে তাঁর প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা ছিল ব্রেশটের। এই কুইক্‌শেটিক হাস্য-

রস্যাভিনেতাকে ব্রেশট্ প্রশ্ন করেছিলেন : 'যুদ্ধের সময় সৈনিকেরা কি করে?'

ভ্যালেনটিন উত্তর দিয়েছিলেন : "তারা খুব ভয় পায়।" একথা শুনে ব্রেশট্ যুদ্ধের দৃশ্যে তাঁর সৈনিকদের মুখের মেক-আপ করালেন চক্-হোয়াইট। এ দৃশ্য দর্শকদের মনে অদ্ভুত প্রভাব সৃষ্টি করেছিল।

মিউনিখ এবং বার্লিনের এই প্রথম-কার দিনগুলোতেই ব্রেশটের শিল্পসত্তা বেশ সুনির্দিষ্টভাবে গঠিত হয়ে গেছিল। জার্মানদের কবি বলতে চিরকাল যে ধারণা ছিল ব্রেশট্ ছিলেন তার সম্পূর্ণ বিপরীত। সাধারণ মানুষের থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে নিজের ব্যক্তিত্বের পবিত্র সারবস্তুকে কথার জাল বুনে কাব্য তৈরি করা তাঁর ধাতে পোষাতো না। তিনি থাকতে ভালবাসতেন সমষ্টির মাঝে। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে তাঁর বিশ্বাস ছিল না—সমষ্টিবাদেই মানবসমাজের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি হবে এই ছিল ব্রেশটের সুচিন্তিত অভিমত। বার্লিনের চ্যারিটি হাসপাতালে ব্রেশট যখন গুরুতর পীড়িত অবস্থায় রয়েছেন—লিখেছেন ব্রোনেন—তখনও তাঁর চারপাশে জড় হয়ে থাকতো সঙ্গী-সাথীর দল—অবশ্য সবসময়েই সবাইকে ছাপিয়ে উঠতো তাঁর নিজের ব্যক্তিত্ব।

ব্রোনেন বলেছেন : 'ব্রেশটের কাজের ধারাটি ছিল এইরকম—সম্পূর্ণভাবে মনকে তিনি আলগা এবং শিথিল করে ফেলতেন—বেশ আরাম সহকারে চুরুট টানতেন, দৃঢ়, দীর্ঘ সদম্ভ পদক্ষেপে ঘরময় পায়চারি করতেন, সমবেত সবার তর্কবিতর্ক শুনতেন, মাঝে মাঝে ঠাট্টা-তামাসাও যে না করতেন তা নয়, কিন্তু তাঁর কাজের প্রধান সূত্রের খেই হারাতেন না। চিন্তাধারাটা মনে একটা সুন্দর আকৃতি নেবার পরে তিনি সহকারীদের কাছে তা ডিক্টেট করতেন।

নিজের কাজকে তিনি মেটাফিজিক্যাল অনুভূতি বলে ধরতেন না কখনও, ভুল-ভ্রান্তি, এবং প্রচেষ্টার ফল হিসাবে বিবেচনা করতেন। নিজের লেখার অদল-বদল করবার জন্য ব্রেশট্ সবসময়েই প্রস্তুত থাকতেন।

ফয়েস্টভ্যাঙ্গারের মতে—একই কাজ নিয়ে ব্রেশট্ বহুবার লিখতেন। যে কোনও শিল্পকাজের যে একটা শেষ পরিণতি থাকতে পারে একথা তিনি সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করতেন। ফয়েস্টভ্যাঙ্গারের মতে—তিনি তাঁর যে কোন রচনাকে বহুবার অদল-বদল করতেন। যে কোন রচনা সমাপ্ত করবার পর তার আর অদল-বদল করবার সুযোগ থাকবে না একথাও ব্রেশট্ স্বীকার করতেন না। দশবার যে নাটক ছাপা হয়েছে একাদশ সংস্করণ ছাপার সময়েও তাকে দরকার মত বদলাতে ব্রেশটের আপত্তি থাকতো না। প্রকাশক এবং প্রডিউসারের এজন্য ব্রেশট্ প্রে সম্বন্ধে সবসময়েই ব্যতিব্যস্ত থাকতেন। বার্নাডি রাইস যিনি ব্রেশটের সঙ্গে মিউনিখ কামেরস্পিলে একসঙ্গে কাজ করেছেন এই প্রসঙ্গে তাঁর মন্তব্য প্রাণিধানযোগ্য : "প্রডিউসার ব্রেশট্ যদি মনে করতেন যে একজন অভিনেতা ভাল অভিনয় করছেন। তাহলে তাঁকে প্রচুর সুযোগ-সুবিধা

ব্রেশটের 'দি মাদার' নাটকের একটি দৃশ্যে

দিতেন। সে সময় নিজের নাটক নিয়ে কাজ করতে থাকলে তো কথাই নেই—ওই অভিনেতার জন্য নতুন করে পার্ট লিখে দিতেন। এইভাবে ড্রেস রিহার্সালের সময় হয়তো ব্রেশট্ এসে হাজির হলেন অভিনেতাদের জন্য নতুন নতুন সংলাপযুক্ত পার্ট নিয়ে তাঁকে ঘিরে সব সময়েই একটা চক্র গড়ে উঠতো। এ থেকে বোঝা যায় তাঁর বন্ধুভাগ্য খুব ভাল ছিল। কিশোর-কিশোরীদের ব্রেশট্ অগাধ স্নেহ করতেন।"

চিরকাল ভাবাবেগকে যুক্তির দ্বারা সংযত অবস্থায় রাখবার চেষ্টা করতেন ব্রেশট্।

ফয়েস্টভ্যাঙ্গার—যাঁর সঙ্গে ব্রেশট্ একসঙ্গে কাজ করেছেন এবং যাঁর সঙ্গে ব্রেশটের বেশ ঘনিষ্টতা গড়ে উঠেছিল—তাঁর উপন্যাস এর্‌কোলগে ব্রেশটের মডেল করে মোটর কার ডিজাইনার ক্যাসপার প্রোয়েকেলের চরিত্র এঁকেছেন—এই চরিত্রটি থেকে ব্রেশটের অন্তরের অন্তস্তলের বিভিন্ন স্তরগুলিকে বেশ বোঝা যায়—যুদ্ধের মর্মান্তিক আঘাতে ব্রেশট্ কিভাবে আহত এবং মর্মাহত হয়েছিলেন তাও বোঝা যায়। ফয়েস্টভ্যাঙ্গার প্রোয়েকেলকে কবি না করে ইঞ্জিনিয়ার করেছেন—the designer of a people's car and expression of Brecht's attitude to art as a kind of mental engineering. Proeckl, like Brecht, is talkative, yet reticent about his own personality and thoughts.

প্রোয়েকেল নিজের এক জীবনদর্শন তৈরি করে নিয়েছিলেন—যার ফলে তিনি যে সব লোকের সংস্পর্শে আসতেন তাদের ব্যাপার নিয়েই আলোচনা করতেন—নিজের বিষয় বা সাধারণ ব্যাপার নিয়ে কখনও কথাবার্তা বলতেন না। সাধারণ মানুষ নিজেদের নিয়েই ব্যস্ত থাকে—সুতরাং তাদের থেকে কিছু জানতে হলে ঐ সব বিষয়েই আলোচনা করতে হয়। বাইরে এই কঠিন বুদ্ধিসর্বস্ব মনোভাব দেখালেও প্রোয়েকেলের (অর্থাৎ ব্রেশটের) অন্তরে ছিল একটা ভাবাবেগের ক্ষীণ ধারা—আর এই ভাবাবেগকে সংযত করে রাখার জন্য দরকার হোত ক্ষুরধার বুদ্ধি এবং বিচক্ষণতার—তার ফলে মনের ওপর অসম্ভব চাপ পড়তো। অর্থাৎ বাইরে নিস্পৃহতার ভাব দেখালেও ভেতরে ভেতরে ব্রেশটের যথেষ্ট ভাবাবেগ ছিল, সেই কথাটাই বোঝাতে চেয়েছেন ফয়েস্টভ্যাঙ্গার। এর ভেতরে অবশ্য কোন অদ্ভুত বা অস্বাভাবিক কিছু নেই। গরীব বা দুঃখীদের জন্য অন্তরে দুঃখ অনুভব করতেন বলেই ব্রেশট্ তাদের করুণ জীবনের নানাধরনের চিত্র দেখিয়েছেন নিজের নাটকে—কিন্তু তিনি ছিলেন সত্যিকারের বুদ্ধিবাদী—তাই মনে-প্রাণে বিশ্বাস করতেন ভাবাবেগ প্রকাশের দ্বারা শোষিতদের অবস্থার উন্নতি ঘটানো যাবে না। তার জন্য দরকার হবে যথার্থভাবে সমাজের ক্ষতগুলোকে আরোগ্য করবার এবং সেই চেষ্টাই তিনি করে গেছেন নিজের রচনার ভেতর দিয়ে। [ক্রমশঃ]

রঙ্গজগৎ

চলচ্চিত্র উপলব্ধি

কলকাতায় যেভাবে ব্যাঙের ছাতার মত ফিল্ম সোসাইটি গজাচ্ছে—সে খবর বিলেতেও পৌঁছেছে।...লন্ডন থেকে এক বন্ধু লিখেছেন: "কলকাতায় নাকি নয়টির পরে আরো দুটি ফিল্ম সোসাইটি হয়েছে। এ খবরে বিলেতের ফিল্ম সোসাইটি মুভমেণ্টের অনেকে বিস্মিত।...ফিল্ম এপ্রেশিয়েশন বা ফিল্মকে যথাযথ উপলব্ধি করার এত লোক বেড়েছে, না জানি বাংলা ছবির কত উন্নতি হচ্ছে।" পত্রলেখক নিজের মন্তব্য লিখেছেন: "এঁরা তো জানেন না যে এসব ফিল্ম সোসাইটি গজিয়ে ওঠার আসল কারণ আনসেন্সরড ছবি দেখার সুযোগ লাভ। নিরীক্ষার নাম করে নির্মিত য়ুরোপের ন্যুড দৃশ্যসম্বলিত ছবিগুলি দেখার আগ্রহে অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলে-মেয়েরা এবং অধিক বয়স পর্যন্ত অবিবাহিত ভদ্রলোকেরা এসব সমিতির পেছনে ভিড় করে। ফিল্ম এপ্রেশিয়েশনের নামে এক দল স্নব তৈরি হচ্ছে।" পত্রলেখক বাঙালী। কলকাতায় ফিল্ম সোসাইটি মুভমেণ্টের সঙ্গে ছিলেন, এখন বিলেতেও ফিল্ম ইনস্টিটিউটের সঙ্গে যুক্ত আছেন। দূরে থেকে তিনি যে ধারণা করেছেন তা একেবারে নাকচ করে দেওয়া যায় না।

বাস্তবিক যে শহরে এগারটি ফিল্ম সোসাইটি ও ক্লাব রয়েছে এবং প্রায় পনের হাজার সদস্য রয়েছে, অর্থাৎ ফিল্মের গুণাগুণ বুঝতে পারা, যথাযথ উপলব্ধি করতে পারার মত পনের হাজার লোক রয়েছে—স্বাভাবিকভাবে বাংলা দেশের ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে তার একটা প্রভাব পড়বে। কিন্তু বাংলা ছবিতে ফিল্ম সোসাইটি মুভমেণ্টের কোন প্রভাব পড়েছে কি? পড়েছে একমাত্র ক্যামেরার কাজে এবং কিছুটা সম্পাদনার ক্ষেত্রে। ক্যামেরাম্যান এবং ফিল্ম এডিটররা আর্ট ছবিগুলি থেকে কিছু শিখবার চেষ্টা যে করছেন তার নিদর্শন কিছু কিছু পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু চিত্রনাট্য ও পরিচালনার ক্ষেত্রে বাংলা ছবি এগুচ্ছে বলা কি সম্ভব? তা যদি হতো তা হলে বাংলায় যাঁরা প্রথম শ্রেণীর পরিচালক, যাঁরা নতুন কিছু সৃষ্টি করতে পারেন বলে সকলে মনে করে তাঁদের বেকার বসে থাকতে হতো না। পনের হাজার দর্শক এঁদের পেছনে আছে এই ভরসায় প্রযোজকরা ভাল ছবি করতে এগিয়ে আসতেন। ছবি যথার্থ উপলব্ধি করতে পারেন এমন পনের হাজার লোক একটা শহরে থাকা খুবই বড় কথা।

কিন্তু কার্যত দেখা যায় শহরে কোন ভাল ছবি এলে তা দেখার লোক হয় না। সম্প্রতি মেট্রোয় 'পন ব্রোকার' নামে একটি ছবি এসেছিল। ছবিটি অভিনয়ের জন্য বার্লিন উৎসবে পুরস্কৃত হয়েছে। ছবির আঙ্গিক, মেজাজ এবং বক্তব্যের কিছু ভিন্নতা আছে, যা সাধারণ বিদেশী ছবিতে দেখা যায় না। অথচ ছবিটি এক সপ্তাহ প্রেক্ষাগৃহে রাখা যায় নি। সপ্তাহের মাঝখানে তুলে দিতে হয়েছে দর্শকের অভাবে। এখানে প্রশ্ন আসে তাহলে ফিল্ম এপ্রেশিয়েশন করার লোক কারা? শুধু কমার্শিয়াল ছবি প্রদর্শনের ক্ষেত্রে নয়, ফিল্ম সোসাইটি বা ক্লাবগুলির ক্ষেত্রেও ইতিপূর্বে আমি দেখেছি গোর্কির ছবি দেখার জন্য হাউসে অর্ধেকের বেশি লোক হয় নি, 'নাইন ডেজ ইন এ ইয়ার'-এর মত সোভিয়েট ছবি দেখতে তেমন আগ্রহ নেই, জাপানী ছবির প্রদর্শনকালে দর্শক উঠে যাচ্ছে অথচ এরাই লোকেরা অর্থাৎ ফিল্ম সোসাইটি বা ক্লাবের মেম্বাররা সদাব্যস্ত ভিড় করছেন ফরাসী ছবি দেখার জন্য, তাও বিশেষ দু-একটি ছবি দেখার জন্য—যেগুলিতে যৌনসংগম বা নগ্নদেহ দৃশ্য আছে বলে শোনা গেছে। বন্ধু-বান্ধবের জন্য একটা অতিরিক্ত আসন সংগ্রহের জন্য সমিতির সদস্যদের কি অসাধারণ ব্যস্ততা। একই রকম ভিড় দেখেছি চেকোশ্লোভাক 'ব্লণ্ডস লাভ' বা ফরাসী 'হিরোসিমা মন আমোর' দেখতে। এসব ছবির রাজনৈতিক, সামাজিক বক্তব্য এবং দার্শনিক তত্ত্বের সঙ্গে কি এই দর্শকরা একমত? তাহলে ব্যাপারটা অন্যরকম করে ভাবতে হবে।

ফিল্ম সোসাইটি ও ক্লাবের সংখ্যাবৃদ্ধি নিশ্চয় অভিনন্দনযোগ্য ব্যাপার। কিন্তু তার প্রতিফলন বাংলা ছবির জগতে কি রকম হচ্ছে এবং ভাল ছবি দেখার দর্শক কিরকম বাড়ছে তা দিয়ে এসব সমিতির কর্মকারিতা বোঝা যাবে। এদিক থেকে বিচার করলে এত সমিতির দিন দিন বৃদ্ধি দেশে-বিদেশে আমাদের ফিল্ম অনুভূতি ক্ষমতা সম্পর্কে কিছুটা যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করছে না এমন নয়; এবং বিলেতের বন্ধুর মন্তব্য একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। —সুজন।

সুপ্রিয়া চৌধুরী

চিত্র-সমালোচনা

পরিশোধ

[পরিচালনা: অর্ধেন্দু সেন]

স্বাতি এক সময় ছিল ধনীর দুলালী। বন্ধু কর্তৃক প্রতারিত হয়ে সর্বস্ব হারিয়ে তার পিতা কন্যাকে নিয়ে পরিচিত জনের অনেক দূরে প্রায় নিভৃতে জীবনযাপন করছে। প্রায় অপ্রকৃতিস্থ পিতা আজ আর দুনিয়ার কাউকে বিশ্বাস করে না। একদিন ঝড় জলে পথ হারিয়ে ইঞ্জিনীয়ার প্রশান্ত স্বাতিদের বাড়িতে আশ্রয় চেয়েছিল; তার বাবা আপত্তি করলেও স্বাতি তাকে আশ্রয় দিয়েছিল। তারপরে প্রশান্তর ডাক্তার বন্ধু ও তার বোন বিশাখার সহযোগিতায় দিনে দিনে এই পরিচয় ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে। তাদের বিয়ের কথা পাকা হয়ে যায়, প্রশান্তর মা'র সম্মতিতে আশীর্বাদপর্বও অনুষ্ঠিত হয়।

এমন সময় এক ছেঁড়া দলিলের লেখা পড়ে স্বাতিদের প্রতারিত হবার রহস্য উদ্‌ঘাটন করে প্রশান্ত। ছুটে সে তার মায়ের কাছে চলে যায়। জানতে পারে স্বাতিদের এই দুর্ভাগ্যের কারণ তার বাবা। তাদের সৌভাগ্য ও সম্পত্তি সবই আসলে স্বাতিদের। যে প্রতারকের বিরুদ্ধে স্বাতি ও তার বাবার মনে এত ঘৃণার আগুন জ্বলছে। সুতরাং এই পরিচয় নিয়ে সে ওদের সামনে দাঁড়াবে কি করে, ওরাই বা তাকে গ্রহণ করবে কেন?

শেষ পর্যন্ত প্রশান্তর ডাক্তার বন্ধুর

মাধ্যমে এই মানসিক অশান্তি ও সাময়িক বিচ্ছেদের অবসান হয়। স্বাতির বাবা প্রশান্তকে গ্রহণ করে। প্রশান্ত তার পিতার ঋণ পরিশোধ করে।

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় রচিত কাহিনী চিত্রনাট্যের অবলম্বন। চিত্রনাট্য লিখেছেন মনোজ ভট্টাচার্য। বিশেষত্বহীন গতানুগতিক এই কাহিনীর চিত্ররূপে পরিচালক তেমন কোন নৈপুণ্যের পরিচয় রাখতে পারেন নি। ছবিটির একমাত্র আকর্ষণ নরেশ মিত্রের অভিনয়। দীর্ঘদিন পরে নরেশ মিত্রকে পর্দায় দেখতে পাওয়া কৌতূহলজনক। স্বাতির প্রায় অপ্রকৃতিস্থ পিতার চরিত্রে তিনি চমৎকার অভিনয় করেছেন, উচ্চারণ ও অভিব্যক্তিতে পুরনো শিল্পীরা যে কত সতর্ক নরেশ মিত্রের অভিনয়ে তা বোঝা যায়। তার পরে অভিনয়-নৈপুণ্যের জন্য সুলতা চৌধুরী, মাধবী মুখার্জী, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের নাম উল্লেখযোগ্য। দিলদরিয়া ডাক্তার বন্ধুর চরিত্রে তরুণকুমার এবং বিশ্বস্ত পরিচারকের ভূমিকায় জহর রায় অভিনয় করেছেন। অন্যান্য ভূমিকায় রয়েছেন: মলিনা দেবী, দিলীপ রায়, শীতল, নৃপতি চট্টোপাধ্যায়, শিশির বটব্যাল, বীরেন চ্যাটার্জী প্রমুখ। ছবিতে হেমন্ত মুখার্জী সুরারোপিত কয়েকটি গান রয়েছে। গানগুলি সুগীত। ছবির চিত্রগ্রহণের কাজ সন্তোষজনক নয়।

হামরাজ

[পরিচালনা : বি আর চোপরা]

পরিচালক চোপরা হিন্দী চলচ্চিত্র জগতে খ্যাত; তাঁর পূর্ববর্তী কয়েকটি ছবি বৈশিষ্ট্যের দাবি রাখে। 'হামরাজ' ছবি অবশ্য গতানুগতিক ফর্মুলায় আবদ্ধ। প্রেম, রহস্য, যুদ্ধ, অপরাধ ইত্যাদি পাঁচমেশালী ঘটনার সঙ্গে ছবিকে রসসিক্ত করার জন্য নাচ, নাটক, প্রাকৃতিক দৃশ্য-সৌন্দর্য ইত্যাদি যোগ করা হয়েছে। এরপরেও একটি শিশুচরিত্রকে নিয়ে আরো কৌতূহল সৃষ্টির চেষ্টা হয়েছে। তার ওপর ছবিটি রঙীন। কাজেই দর্শকরা এই ছবি না দেখে পাশ কাটাতে পারবেন না, এই ভেবেই হয়ত পরিচালক ছবিটির পরিকল্পনা করেছেন। ফলে কোন কোন দর্শকের মনের ওপর অত্যধিক দৈর্ঘ্যের ক্লান্তি এলেও সাধারণ দর্শকরা খুশি হতে পারেন।

ছবির নায়িকা এক মিলিটারী-ঠিকাদারের একমাত্র কন্যা। দার্জিলিঙ-এ এক মিলিটারী অফিসারের সঙ্গে তার গোপন প্রণয় এবং বিয়ে হয়। চীন ভারত সীমান্তে যুদ্ধ করতে গিয়ে অফিসার

নির্মল মিত্র পরিচালিত 'প্রথম বসন্ত' ছবিতে অঞ্জনা ভৌমিক

নিহত হয়েছে বলে খবর আসে। কিছুকাল পরে এক শিল্পী সদলে বোম্বাই থেকে ফৌজদের আনন্দ পরিবেশন করতে এলে সে এই ঠিকাদারকন্যার বিরহীমনে স্থান করে নেয়। বোম্বাইতে তাদের জীবন যখন সুখে ভরে উঠেছে এমন সময় তার প্রথম স্বামী সেখানে উপস্থিত হয়ে জানায় সে মরে নি চীনাদের হাতে বন্দী হয়েছিল। এর মধ্যে আবার আর একটি উপকাহিনী এসে উপস্থিত হয়। তাদের কন্যাসন্তানকে ঠিকাদার এক অনাথ আশ্রমে রেখেছিল—একথা নিজের মেয়ের কাছেও এতদিন গোপন ছিল। মৃত্যুর পূর্বে কথাটা কন্যাকে বলে যায়। সে কন্যাকে এক অপরাধী অনাথ আশ্রম থেকে নিয়ে এসে বিক্রি করে দেয় এবং তারই গুলীতে ঠিকাদারকন্যা নিহত হয়। এবার আসে পুলিশ এবং পুলিশকে ফাঁকি দেওয়ার অহেতুক চেষ্টা। তারপরে বাঙ্গালোরে অপরাধীর সঙ্গে মোকাবেলা এবং গুলীতে প্রথম স্বামীর মৃত্যু। এই কাহিনীতে সঙ্গতি-অসঙ্গতির প্রশ্ন না তোলাই ভাল। কারণ এসব ছবির দর্শকরাও জানেন যে তাঁরা সিনেমা দেখছেন। ছবিতে নাচ, গানের উপভোগ্যতার সঙ্গে জৌলুসপূর্ণ আসবাব এবং ইঙ্গ-ভারতীয় স্টাইলে পোষাক-পরিচ্ছদ দিয়ে বিলাসী জীবনের চমক দেখাবার চেষ্টা হয়েছে। তাতেও যদি কিছু অপূরণ থাকে তাই এক দৃশ্যে স্নানের শেষে টাওয়েল পরিহিতাকেও দেখান হয়েছে।

প্রধান নায়িকা চরিত্রে উপস্থিত করা হয়েছে নবাগতা [illegible]। অন্যান্য চরিত্রে রয়েছেন: সুনীল দত্ত, রাজকুমার, বলরাজ সাহানী, মমতাজ, এম এম কৃষ্ণা, অচলা সচদেব, আনওয়ার হোসেন, দেবেন ভার্মা, মুবারক, জীবন এবং বেবি সরিকা। সঙ্গীত পরিচালনা করেছেন রবি। চিত্র

গ্রহণের কাজে এম এন মালহোত্র প্রশংসনীয়।

পোলিশ চলচ্চিত্র সেসন

গত ২১শে থেকে ২৭শে ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত ফাইন আর্টস একাডেমি হলে পোলিশ চলচ্চিত্র সেসন অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই সেসনের উদ্যোক্তা ছিল ভারতস্থ পোলিশ দূতাবাস ও সিনে সেণ্ট্রাল ক্যালকাটা। এবারের সেসনে দেখান হয়েছে ঃ ক্যাসিমিরেজ কুৎস-এর 'সাইলেন্স' জের্জি কাওলেরেউজ-এর 'নাইট ট্রেন' এবং ওঝসিয়েক জে হ্যাজ-এর 'হাউ টু বি লাভড'।

শেষোক্ত দুটি ছবি ইতিপূর্বে কলকাতায় দেখান হয়েছে। দুটি ছবিই আঙ্গিকে ও বক্তব্যে দর্শকদের অকুণ্ঠ প্রশংসা লাভ করেছে। বিশেষত নাইট ট্রেনে রাত্রির নৈঃশব্দতায় যে মেজাজ সৃষ্টি হয়েছে তাতে দর্শকমনকে মুগ্ধ করে। পোলিশ ছবি যুদ্ধোত্তর কালের কয়েক বছরের মধ্যেই আপন বৈশিষ্ট্যে দর্শক-মনে বিশেষ স্থান করে নিয়েছে। এবারের নতুন ছবি 'সাইলেন্স' আর একটি নতুন নিরীক্ষামূলক ছবি। এখানে দুর্ঘটনায় দৃষ্টিশক্তিহীন এক তরুণ তার জগৎকে খুঁজে বেড়াচ্ছে, অবস্থাকে আয়ত্ত করতে চাচ্ছে, আর একদিকে এক গীর্জার মধ্যে পুরোহিত আপন সীমাবদ্ধতার মধ্যে থেকে সেও তার জগৎকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। অথচ পার্থিব জগতে থেকেও সে একদিকে অন্ধ। পাশাপাশি এই দুজনকে উপস্থিত করে পরিচালক একটি বাণী উপস্থিত করেছেন। গত মহাযুদ্ধের পরবর্তী পটভূমিকায় কাহিনী বিশ্লেষিত, তাতে সময়, মানুষ এবং সমস্যা যথেষ্ট বাস্তবসম্মতভাবে চিত্রায়িত হয়েছে, এবং ছবির বক্তব্য প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করেছে। ছবিটির নেপথ্য সংগীত বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

নবেন্দু চ্যাটার্জী পরিচালিত 'অদ্বিতীয়া' ছবিতে লিলি চক্রবর্তী

নাটকের কথা

নিহত নিয়তি ॥ বিভাব

অহীন্দ্র মঞ্চ। নটসূর্য অহীন্দ্র চৌধুরী নামাঙ্কিত। নড়বড়ে স্টেজ, আসবাবপত্র প্রায় শূন্য, টিনের ছাউনি, পাটাতনে ঘেরা দর্শক গ্যালারি। তবু টিকিট কেটে দর্শক আসেন। ভাঙা চেয়ারে বসেন। পরম তৃপ্তিটুকু শুধু এই—এমন মঞ্চে মাঝে মাঝে এমন নাটক মঞ্চস্থ হয়—যা দেখে স্বচ্ছন্দে বলা যায়, মামুলী পথ পরিত্যাগ করে এখনো কিছু নাট্যসম্প্রদায় আমাদের আলোড়িত করতে পারে। নাটক শেষ হলে বেরিয়ে আসার সময় মনে হয়, সরকারের দৃষ্টি থেকে বঞ্চিত বলেই কি মঞ্চটির এমন দুরবস্থা। ভাল নাটক আছে, সাহসী অভিনেতা ও অভিনেত্রী আছে, অর্থাভাবও এ সবের কাছে তুচ্ছ, তবু বেহালার মতো একটি অবহেলিত অঞ্চলের নাটমঞ্চটির দুর্দশার কথা কি সেখানের পৌরপ্রতিষ্ঠান কিংবা আমাদের সরকারের একেবারেই অজ্ঞাত!

গত সপ্তাহে অনুভব প্রযোজিত 'নিহত নিয়তি' ও 'বিভাব' মঞ্চস্থ হোল। দুটিই একাঙ্ক-নাটিকা। কাঁটায় কাঁটায় সন্ধ্যে সাতটায় সুরু। মাঝখানে কয়েক মিনিট বিরাম। পৌনে ন'টায় শেষ। নিহত নিয়তি'র অভিনেতা মোট ছ'জন, অভিনেত্রী একজন। প্রথম নাটিকার বিষয়বস্তুর জন্যে ঋণ রয়েছে আনাতোল ফ্রাঁর কাছে। কিন্তু সম্পূর্ণ ঋণ নেই। 'নিহত নিয়তি'র ফল্গুধারায় সিরিয়াসনেস থাকলেও বহিরাবরণে আছে অবাস্তবতা। নিহত নিয়তির আবেদন পারিবারিক শুধু তা সার্বিক। বিয়ে করা নতুন বৌ নির্বাক হয়ে গেছে হঠাৎ। তার দাবি-দাওয়া এক মুহূর্তে স্তব্ধ। স্বামী আইন ব্যবসায়ী। ব্যবসায়ে এখন বীতস্পৃহ। বিদেশ ফেরৎ ডাক্তার বড়ি খাইয়ে কথা বলালেন নতুন বৌকে। কিন্তু এমনই দুর্ভাগ্য কথার স্রোত আর বন্ধ হয় না। এখন উপায়? সবাই খেলো বধিরতার বড়ি। এমন সময় নতুন বৌ কিন্তু স্বাভাবিক হয়ে গেলেন। দেখা গেল, বধিরতার বড়ি যারা খেয়েছিল তারা কেউ বধির হয়ে যায় নি। কারণ, তারা ভুল করে খেয়েছে সালফা কোয়াডিন। এদিকে বাড়ির চাকর কেষ্ট, যে নাটক সুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে বেলুনে ফুঁ দিতে দিতে বলছিল বাড়িটা ঠং ঠং (শব্দটা যুতসই হয় নি) করে উঠুক এবং নাটকের অব্যাহত গতিতে যার প্রয়োজনীয়তা সর্বত্রই অনুভূত হচ্ছিল, নাটকের শেষ মুহূর্তে তার কাজের

বেলুনটা গেল ফেটে। বস্তুত নাটকটিতে একমাত্র স্বাভাবিক চরিত্র—কেল্টই। নতুন বৌ-এর ভূমিকায় মায়া ঘোষ যেমন সংযত, তেমনি দ্রুতগতিসম্পন্ন।

অন্য ভাবের ও অন্য জাতের নাটক 'বিভাব'। এটি জাপানী কাবুকী ফর্মে রচিত। আমাদের মনে হয়েছে অহীন্দ্র নাট্যমঞ্চের পক্ষে এমন একাঙ্কিকা যথোপযুক্ত। অভিনয় করার জন্যে অভিনেত্রী থেকে সুরু করে আসবাবপত্র (এমন কি চাল ডালেরও) প্রভৃতি সব কিছুরই অভাব নিয়ে মঞ্চস্থ 'বিভাব'। আসলে 'বিভাব' অর্থে "রসোদ্দীপক আলম্বনাদি" কাবুকী অর্থে—'কা' অর্থাৎ সঙ্গীত 'বু' অর্থাৎ নৃত্য। নাটকটি পরীক্ষা-নিরীক্ষামূলক এবং বলা যায় অনুভব এ নাটক নিয়ে গৌরব করতে পারেন। তবে গোড়ার দিকে দর্শকদের যে সব উপদেশ দেওয়া হয়েছে—তা বিরক্তিকর। আশা করি, যে কোনো নাট্য-রসিক এটি দেখবেন। 'নিহত নিয়তি'র অভিনেতারাও এতে অংশ গ্রহণ করেছেন। যেমন, তাপস দত্তগুপ্ত, সত্যপ্রিয় ঘোষ, অসীম ভাদুড়ী। শান্তিজিত সেনগুপ্ত, মোহন চৌধুরী। বিশেষভাবে বিভাবে তাপস-সত্যপ্রিয় ও অসীমবাবু কঠিন পরীক্ষায় সফল হয়েছেন। অন্যান্য অভিনেতারাও স্থলবিশেষে প্রশংসনীয়। অবশ্য দুটি নাটকই অনেক হাততালি, বিস্ময় ও হাসি কুড়ালেও ছোটখাটো খুঁতগুলি এখনো পর্যন্ত নির্মূল হয় নি। সেই খুঁত কখনো বাচনভঙ্গিতে, কখনো বা অঙ্গচালনার সূক্ষ্ম কৌশলেই অন্তর্নিহিত।

রামরাজ্য হিন্দী ছবিতে বীণা রায়

প্রতিটি নরনারীর হৃদয়ে যে পুণ্য শ্লোকগাথা জন্ম-জন্মান্তরের পূজা পেয়ে এসেছে

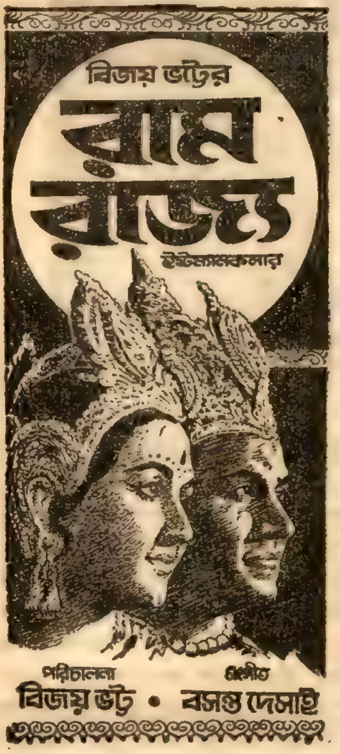

প্রত্যহ ৩, ৬, ৯টায়
হিন্দ : গণেশ : খান্না
কালিকা : ভবানী
পুষ্পশ্রী ○ কল্পনা ○ পার্বতী ○ বিভা
লক্ষ্মী ○ উদয়ন ○ রামকৃষ্ণ ○ শ্রীকৃষ্ণ
চিত্রালয় ○ নিউ সিনেমা (শিলিগুড়ি)
বাটা সিনেমা
৮ই থেকে পিকাডিলি (শালকিয়া)

"নহবত"

রঙমহলের নতুন নাটক "নহবত" আগামী শনিবার ৯ই মার্চ সুরু হবে। নট ও নাট্যকার সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় নাটকখানি রচনা এবং পরিচালনা করেছেন। নাটকের বিভিন্ন চরিত্রে আছেন: জহর রায়, সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, হরিধন, অজিত চট্টোপাধ্যায়, মৃণাল মুখার্জী, অমর নাথ, নির্মল চ্যাটার্জী, দীপিকা দাস, শিখা ভট্টাচার্য, ইন্দিরা দে ও সরযূবালা। "নহবত"-এর নায়িকা চরিত্রে এক নতুন অভিনেত্রী অংশ গ্রহণ করছেন।

সংবাদিকী

চিত্র বীক্ষণ

সিনে সেন্ট্রাল ক্যালকাটার মুখপত্র 'চিত্র বীক্ষণ'-এর ফেব্রুয়ারী সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে। ফিল্ম সোসাইটিগুলির পত্রিকার মধ্যে একমাত্র 'চিত্র বীক্ষণ' নিয়মিত প্রতি মাসে প্রকাশিত হয়। এই সংখ্যায় রয়েছে পোলিশ ও চেকোস্লোভাক চলচ্চিত্র সম্পর্কে প্রবন্ধ এবং চলচ্চিত্র সমালোচনা।

পাঠকদের আলোচনা। সংখ্যাটি খুবই দুর্বল। এ ধরণের সমিতির মুখপত্রে চলচ্চিত্র পর্যালোচনাগুলি আরো তথ্য-বহুল, বিস্তৃত, বলিষ্ঠ দৃষ্টিসম্পন্ন ও নির্ভীক হতে কোন বাধা নেই। কিন্তু এই সংখ্যার সমালোচনাগুলি উন্নতমানের হয় নি। চিত্র বীক্ষণ-এর দাম ষাট পয়সা। সিনে সেণ্ট্রাল কলকাতা, ২, চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা-১৩ থেকে প্রকাশিত হয়।

নজরুল সঙ্গীত প্রতিযোগিতা

পশ্চিমবঙ্গ নজরুল একাডেমি মার্চ মাসের শেষ সপ্তাহে নজরুল সঙ্গীত প্রতি-যোগিতার আয়োজন করেছে। প্রতি-যোগিতায় উত্তীর্ণদের পুরস্কারসহ একাডেমি ডিপ্লোমা দেওয়া হবে।

'ক' বিভাগ ঃ ১৬ থেকে ৪০ বছর।

'খ' বিভাগ ঃ ১২ থেকে অনূর্ধ্ব ১৬ বছর। উভয় বিভাগে মহিলা ও পুরুষ এক যোগে অংশ গ্রহণ করতে পারবেন।

বিষয় ঃ রাগপ্রধান, আধুনিক, গজল, ধর্মসঙ্গীত, পল্লীসঙ্গীত এবং সমবেত কণ্ঠে দেশাত্মবোধক সঙ্গীত।

প্রতিযোগিতায় প্রতি বিভাগের জন্য এক টাকা করে প্রবেশমূল্য দিতে হবে, সমবেত সঙ্গীতের ক্ষেত্রে দুই টাকা। ডাকযোগে ঠিকানা ও বয়স উল্লেখে নাম পাঠাতে হবে। নাম পাঠাবার ঠিকানা ঃ সাধারণ সম্পাদক, পশ্চিমবঙ্গ নজরুল একাডেমি: ৬, এণ্টনীবাগান লেন, কলিকাতা-৯।

"তাসের দেশ"

গত ১৮ই ফেব্রুয়ারী বালিগঞ্জ শিক্ষা সদন হলে আয়োজিত সুরমঞ্জরীর তাসের দেশ নৃত্যনাট্য উল্লেখের দাবি রাখে। হরতনীর ভূমিকায় মিতা রায়চৌধুরীর নৃত্য ও অভিনয় এবং রাজপুত্রের ভূমিকায় শাশ্বতা সানা ও রুইতনের ভূমিকায় শিবানী মিত্রের অভিনয় কৃতিত্বের দাবি রাখে। এ ছাড়া রুণা চক্রবর্তী, সুস্মিতা সোম, সম্পূর্ণা লাহিড়ী প্রমুখের স্ব স্ব ভূমিকার অভিনয় সাবলীল। সংগীত পরিচালনায় সৌরেন রায় শ্রেষ্ঠত্বের দাবি রাখেন। সঙ্গীতে কুঞ্জবিহারী সিংহ, সৌম্যেন ঘোষ, স্বাগতা সানা ও জয়শ্রী সেনগুপ্ত প্রমুখের গান সুন্দর। স্মৃতি চক্রবর্তী, সুপ্রীতি চক্রবর্তী, মঞ্জু গুহ ও সীমা ব্যানার্জী প্রমুখের গানও সুন্দর। মঞ্চসজ্জা মোটামুটি। আবহসঙ্গীত ভাল।

মস্কোয় আইজেনস্টেইন জন্মবার্ষিকী

বিশ্ববিখ্যাত চলচ্চিত্র-পরিচালক ও সোভিয়েত চলচ্চিত্রের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সেগেই আইজেনস্টেইনের ৭০তম জন্ম-বার্ষিকী (জন্ম ঃ ১৮৯৮, মৃত্যু ঃ ১৯৪৮), সম্প্রতি সোভিয়েত ইউনিয়নে ব্যাপকভাবে উদ্‌যাপিত হয়েছে। মস্কো থেকে এ-পি-এন এ সংবাদ জানাচ্ছে।

আইজেনস্টেইনের শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্রগুলি, যেমন "স্ট্রাইক", "ব্যাটলশিপ পোটিওমকিন", "অক্টোবর", "আলেকসান্দার নেভেস্কী", ও "ইভান দি টেরিবল" (দু'খণ্ড)—সারা বিশ্ব জুড়েই প্রদর্শিত হয়েছে। পোটিওমকিন যুদ্ধজাহাজের বিদ্রোহী নৌ-সেনাদের অভ্যুত্থান নিয়ে রচিত তাঁর অন্যতম চিরায়ত চলচ্চিত্রসৃষ্টি "ব্যাটলশিপ পোটিওমকিন", বিগত ৪০ বছরের মধ্যে পৃথিবীর প্রায় সর্বদেশেই বারংবার দর্শকদের বিমুগ্ধ করে রেখেছে।

আজ থেকে ৪০ বছর আগে মস্কো আর্ট সিনেমা থিয়েটারে হয়েছিল "ব্যাটল-শিপ পোটিওমকিন" ছবির উদ্বোধনী রজনী। মস্কোর এই সিনেমা থিয়েটারেই এ বছর তাঁর ৭০তম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপিত হল। সভায় আইজেনস্টেইনের কয়েকজন বিশিষ্ট সহযোগী ও সহকর্মী ভাষণ দেন। এরপর প্রদর্শিত হয় তাঁর একটি অসমাপ্ত চলচ্চিত্র 'বেঝিন মিডো'। খ্যাতনামা সোভিয়েত পরিচালক সেগেই য়ুৎকেভিচ ও চলচ্চিত্র সমালোচক নাউম ক্লেইমানের নেতৃত্বে একদল চলচ্চিত্রকর্মী বহু অধ্যবসায় ও পরিশ্রমে আইজেন-স্টেইনের তোলা পুরনো ফিল্ম ও চিত্র থেকে পুনরুদ্ধার করে ছবিটি এখন সম্পূর্ণ করেছেন।

সঙ্গীত কথা

ঝংকার মিউজিক সার্কলে
ওস্তাদ আমিনুদ্দিন ডাগর

গত ২৫শে ফেব্রুয়ারী রবিবার বিকালে ঝংকার মিউজিক সার্কলের বার্ষিক সমাবর্তন উৎসব এবং অষ্টাদশ কংগ্রেস

বেঙ্গল কেমিক্যালের

সুবাসিত ব্রাহ্মী
হেয়ার অয়েল
আধুনিক বিজ্ঞান-সম্মত উপায়ে
আয়ুর্বেদ-নির্দেশিত উপকরণে প্রস্তুত

বেঙ্গল কেমিক্যাল
কলিকাতা • বোম্বাই • কানপুর • দিল্লী

রবীন্দ্র মঞ্চে 'নিহত নিয়তি' নাটকের একটি দৃশ্যে তাপস দত্তগুপ্ত, শান্তজিত সেনগুপ্ত, মায়া ঘোষ, মোহন চৌধুরী।

৩য় হাস্য-মুখর সপ্তাহ!
প্রমোদের অফুরন্ত সম্ভারে পরিপূর্ণ
সঙ্গীতমুখর প্রণয় চিত্র—

তাহ ৩, ৬, ৯টায়
রূপবাণী : ভারতী : অরুণা
যোগমায়া (৩য়) ০ বম্পা (২য়)
জয়শ্রী ০ গৌরী ০ শ্রীমা
প্রামানিক (রাণাঘাট)

ফাইন আর্টস একাডেমি হলে অনুষ্ঠিত হয়েছে। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন প্রাক্তন বিচারপতি শ্রীফণিভূষণ চক্রবর্তী প্রধান অতিথি রূপে উপস্থিত ছিলেন শ্রীযশোদারঞ্জন রায়। অভিজ্ঞানপত্র দান করেন রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার শ্রীভবরঞ্জন দে।

অনুষ্ঠানে প্রধান আকর্ষণ ছিল বিখ্যাত সংগীতজ্ঞ ওস্তাদ আমিনুদ্দিন ডাগরের ধ্রুপদ সংগীত। প্রধান অতিথির অপ্রয়োজনীয় বক্তৃতা পাঠ এবং সভাপতির অসংগতিপূর্ণ, অবান্তর ও দীর্ঘ বক্তৃতার বিরক্তির মধ্যেও বহু সংগীতরসিক শ্রীডাগরের গান শোনার জন্য অপেক্ষা করে ছিলেন। রাত ৮টায় তিনি আসরে আসার সুযোগ পান। তিনি শোনালেন একটি নতুন সংগীত—যার নাম দিয়েছেন 'অদ্ভুত কল্যাণ'। 'ম' এবং 'প' বর্জন করে কল্যাণ রাগ বিস্তারিত হয়েছে এক নতুন রাগরূপে। অবতরণ এবং আরোহণের পথে 'র' এবং 'ন'র ওপর একটু বেশি ভর করে সুর তার নিজের মহিমায় আপনাকে প্রকাশ করেছে। ওস্তাদজী আলাপে খাদের কাজে বিস্ময়কর নিয়ন্ত্রণশক্তির পরিচয় দিয়ে সুরের বৈচিত্র্য সৃষ্টির বর্ণনায় যে শক্তির পরিচয় দিয়েছেন তা সংগীতরসিকদের জীবনে মনে রাখার মত। প্রায় দুইঘণ্টাকাল ওস্তাদজীর বৈশিষ্ট্যপূর্ণ কণ্ঠনিঃসৃত এই সংগীত দর্শকদের মুগ্ধ করে রাখে। সংগীত শেষে অসংখ্য শ্রোতা ওস্তাদ আমিনুদ্দিন ডাগরকে অভিনন্দন জানান এই স্মরণীয় সন্ধ্যা সৃষ্টির জন্য।

নজরুল সন্ধ্যা

গত ২৮শে ফেব্রুয়ারী বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলামের গৃহে নজরুল সন্ধ্যার অধিবেশন হয়েছে। এই অধিবেশনে সুপরিচিত সংগীত শিল্পী শ্রীবেচু দত্ত এবং শ্রীমতী নীলিমা ব্যানার্জী কবির সামনে বসে বহু নজরুল সংগীত পরিবেশন করেন। পরিবেশিত গানগুলির মধ্যে অনেকগুলি পুরনো নজরুল সংগীত গেয়ে শিল্পীদ্বয় শ্রোতাদের মুগ্ধ করেন। বিশেষত শ্রীমতী ব্যানার্জীর সুমধুর কণ্ঠে নজরুল সংগীত খুবই উপভোগ্য হয়েছিল। তাঁদের পরে লোকশিল্পী মণীন্দ্র নজরুলের একটি ভাওয়াইয়া গান শোনান। কাজী সব্যসাচী ইসলাম ও আবুল কাসেম রহিমউদ্দিন যুগ্মভাবে 'বিদ্রোহী' কবিতা আবৃত্তি করেন।

পাঠক মন

"সাপ্তাহিক বসুমতী"র নিয়মিত পাঠকবর্গের অনেকেই হয়তো লক্ষ্য করে থাকবেন আমাদের দেশের স্বাধীনতা-সংগ্রামী ও মহান সন্তানদের জীবনী রচনার তথ্য সঙ্কলনের ব্যাপারে সহানুভূতি ও সহযোগিতা কামনা করে আমার কয়েকটি পত্র "পাঠকমন" কলমে ইতিপূর্বে প্রকাশিত হয়েছে। আনন্দের ও কৃতজ্ঞতার সঙ্গে জানাই কয়েকজন পাঠক আমাকে পত্র দিয়ে সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছেন।

বস্তুত সকলের সহযোগিতা ছাড়া উক্ত তথ্য সংকলন কার্য সুসম্পূর্ণ হতে পারে না। দেশের অনেক রাজনীতিক ও মহান সন্তানদের কর্মময় জীবনের তথ্যাদি আজো অনেক ক্ষেত্রেই সাধারণের নিকট প্রায় অজ্ঞাত। এঁদের কয়েকজনের নাম উল্লেখ করছি যাঁদের সম্পর্কে আমি অতি অল্প তথ্য সংগ্রহ করতে পেরেছি—তারকনাথ দাস, বৈকুণ্ঠনাথ সেন, মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা, আব্দুল হালিম গজনবী, খাজা আব্দুল গণি, মৌলবী লিয়াকৎ হোসেন প্রমুখ। এঁদের কারো সম্পর্কে আপনার অগণিত পাঠক-পাঠিকার কেউ যদি আলোকপাত করেন তো বিশেষ উপকৃত হবো। আপনার বহুল প্রচারিত ও বিশেষ জনপ্রিয় পত্রিকার মাধ্যমে এ বিষয়ে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

শ্রীফণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
২৪ই, নদার্ন এভিনিউ
কলিকাতা—৩০

•

সাপ্তাহিক বসুমতীর ৩৬শ সংখ্যার (৯ই ফাল্গুনের) শ্রীসাগর বিশ্বাসের "পূর্ব পাকিস্তান—একটি দৃষ্টিকোণ থেকে শীর্ষক রচনায় দেখলাম, তিনি আমার লেখা "পাক-ভারতের রূপরেখা"-র প্রতিবাদ করে লিখেছেন যে—"পাকিস্তানের অনেক স্থানে এবার আমি অনেকগুলি শূন্য ট্রানসিট ক্যাম্প দেখতে পেয়েছি। শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র লাহিড়ীর এই সম্পর্কিত বক্তব্য তাই বোধহয় সর্বৈব সত্য নয়।" শ্রীবিশ্বাসের একদিনের চলার পথে-দেখা এই বক্তব্য কিন্তু যাঁরা পাকিস্তানে দীর্ঘদিন থেকে এসেছেন তাঁদের কেউ-ই বোধহয় মেনে নিতে পারবেন না। আমি তো পাকিস্তানে চোদ্দ বছর থেকে এসেছি। সম্প্রতি অবসরপ্রাপ্ত একজন পুলিশ-কর্মচারী অবসর গ্রহণের পর তাঁর নিজ জেলা ফরিদপুরে (পূর্ব পাকিস্তান) বেশ কিছুকাল বাস করে চিরতরে ভারতে ফিরে এসে মুর্শিদাবাদ জেলার খাগড়া অঞ্চলে এসেছেন। যাঁরাই পাকিস্তানে বাস করে এসেছেন তাঁদের অভিজ্ঞতা কিন্তু বলে অন্যরকম। সম্প্রতি যে পুলিশ-কর্মচারীটি ফরিদপুর থেকে ফিরে এসেছেন, তাঁর কাছেও শুনলাম যে, তিনি দেখে এলেন, পূর্ব পাকিস্তান সরকার এখন তাঁদের নীতি বদলেছেন। এখন আর দাঙ্গা-হাঙ্গামা না করে হিন্দুর শরিকানা বাড়ির কোনও শরিক হয়তো ভারতে চলে এসেছেন, তাঁর অংশও অপর শরিকেরা দেখাশোনা ও ভোগ-দখল করছেন। এখন গ্রামপঞ্চায়েতরা সেই সব অংশে মুসলমান বাস্তুত্যাগীদের ঢুকিয়ে দিচ্ছেন; ফলে, ঐ বাড়ির অপর হিন্দু শরিকদের বাড়ি ও দেশ ছেড়ে বাস্তুত্যাগী হয়ে ভারতে আসতে হচ্ছে। এটাই হচ্ছে পাকিস্তানের হিন্দুদের বর্তমান অবস্থা। চলার পথে একদিনের দেখায় শ্রীবিশ্বাসের কথা তাই, সম্পূর্ণভাবে মেনে নিতে না-পারায় আমি দুঃখিত। তাই এই প্রতিবাদপত্রটি দিতে বাধ্য হলাম। আমার স্বাস্থ্যের বর্তমান অবস্থায় ডাক্তারের নির্দেশে আমাকে সব লেখা-পড়া বন্ধ করতে হয়েছে, তবু দায়িত্ব ও কর্তব্যের অনুরোধেই এই প্রতিবাদটি পাঠালাম।

শ্রীপ্রভাসচন্দ্র লাহিড়ী

•

গত ১-২-৬৮-এর সাপ্তাহিক বসুমতীর ৩৩শ সংখ্যায় "অবক্তব্য"-এ "একটি স্মরণীয় সংবাদ"-এর পরিবেশনের জন্য শ্রদ্ধেয় চন্দ্রগুপ্তকে ধন্যবাদ জানাই। রচনাটি পাঠ করে পরম পরিতৃপ্তি লাভ করলাম। লেখক সুললিত ভাষায় সাবলীলভাবে বাংলা সাহিত্য জগতের এক অজ্ঞাত মূল্যবান অধ্যায়ের কথা প্রকাশ করে অসংখ্য পাঠকের পরম উপকার করেছেন।

মাত্র উনিশ বছর বয়সে তৎকালীন নানা প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যে প্রথম সাপ্তাহিক পত্রিকা "সংবাদ প্রভাকরের" সম্পাদনা করা ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের এক মহান প্রতিভার স্বাক্ষর। বর্তমানে তা অকল্পনীয়।

সম্পাদকের প্রধান কর্তব্য—"রুচিবান পাঠক সৃষ্টি, ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতি এবং নতুন লেখক ও সাংবাদিকের আবিষ্কার"—একথা অত্যন্ত সত্য। এছাড়া সম্পাদককে হতে হবে স্পষ্টবাদী, প্রত্যয়নিষ্ঠ, নির্দলীয় ও গুণগ্রাহী। যা সত্য তা যতই অপ্রিয় হোক তাই তিনি প্রকাশ করবেন। বর্তমান অবস্থায় এ ধরণের সম্পাদক সত্যই স্বল্প।

লেখক ঠিকই বলেছেন যে, ঈশ্বরচন্দ্রের নির্ভীকতা, নির্দলীয়তা ও স্পষ্টবাদিতা "বর্তমান পরিস্থিতিতে তাঁর উত্তরবর্তীদের বিস্মৃতির কারণ হয়েছে"। এ আমাদের পরম লজ্জা।

পরিশেষে এ ধরণের রচনা প্রকাশ করার জন্য আপনাকে অভিনন্দন জানাই।

বিদ্যুৎকুমার চট্টোপাধ্যায়
আমতা, হাওড়া

•

নিয়মিত পড়ি আপনার সাপ্তাহিক পত্রিকা। ভাল লাগে "সপ্তাহের বোঝা"। সাবাস্ কৃত্তিবাস ওঝা! সাপ্তাহিক বোঝার গুরুভার কাঁধে নিয়ে ঘোরেন। জোয়ানো কাঁধ বটে। কে এই ছদ্মবেশী? নাম জানতে চাই না, কৃত্তিবাস সুকৃতির উচ্চশিখরে উঠুক—"বসুমতী"র অভিযাত্রা হয়ে।

শ্রীঅমিয়কুমার সাঁই
এ্যাডভোকেট, বর্ধমান আদালত

•

৭২ বর্ষ ৩৩শ সংখ্যা (১লা ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৮ ইং) সাপ্তাহিক বসুমতীতে প্রকাশিত জীবন সরকারের "কালো-হাঁস" গল্পটি পড়ে সত্যিকারই খুশি হয়েছি। এ ধরণের গল্প প্রকাশিত হওয়ার জন্য পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলীকে অভিনন্দন জানাই। বসুমতীর নিয়মিত পাঠক হিসেবে আমি ব্যক্তিগতভাবে নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে নিশ্চয়ই বলব যে, অনেকদিন পর একটি সত্যিকারের সর্বাঙ্গসুন্দর ছোটগল্প বসুমতীতে পড়লাম। "কালো-হাঁস" গল্পটির বিষয়বস্তু, প্রকাশের ভাবভঙ্গী এবং ভাষার গঠন-শৈলী এক কথায় চমৎকার। এ ধরণের ছোটগল্প যে কারও ভাল লাগবে। লেখকের হাতটি সত্যিই মিষ্টি। আমার ধারণা, এ ধরণের সম্ভবত পূর্ব বাংলার পটভূমিকায় লেখা ছোটগল্প সাপ্তাহিক বসুমতীতে প্রকাশিত হলে পত্রিকার মান বাড়বে ছাড়া কমবে না।

উদয়ন ভৌমিক
ময়নাগুড়ী (জলপাইগুড়ি)

•

সাপ্তাহিক বসুমতীতে মাও-মারলো সংবাদ প্রকাশের জন্য আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। জাতীয় অধ্যাপক বিজ্ঞানাচার্য সত্যেন বোস লেখাটা যে অনুবাদ করেছেন তার জন্য জাতি কৃতজ্ঞ থাকবে। এই লেখা মানুষকে অবস্থা বুঝতে সাহায্য করেছে। আপনার উদার সাংবাদিকতার জন্য আবার ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

রেণু রায়চৌধুরী
৩০ রাইট স্ট্রীট, কলিকাতা

অলিম্পিক বিজয়ের আনন্দ-উৎসব। শীতকালীন অলিম্পিক ভালোয় ভালোয় শেষ হয়েছে, কিন্তু মেক্সিকো অলিম্পিকের বরাতে কি আছে কে জানে।

খেলা ধুলা

ছেলেখেলারও সীমা আছে

ছেলেখেলারও একটা সীমা আছে, সীমা আছে দেশের সম্মান নিয়ে বার বার এইভাবে ছেলেখেলা খেলার।

নিউজিল্যাণ্ডের কাছেও ভারত হারলো। হারলো ভারতীয় দলের অধিনায়ক পাতৌদির নবাবের খামখেয়ালীপনার খেসারত দিতে গিয়ে। তাই আজ এ কথা, একটুকুও চিন্তা না করে বলা যায় যে, নিউজিল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় টেস্টে ভারতের এই পরাজয়ের সমস্ত দায়িত্বটাই পাতৌদির নবাবের। ক্রিকেট মাঠকে দাবার বোর্ড ভেবে বার বার তিনি একইভাবে ভুল চাল দিয়ে ভারতকে ঠেলে দিচ্ছেন নিশ্চিত পরাজয়ের মুখে।

ফাস্ট বোলার ভীতি ভারতীয় ব্যাটসম্যানদের কাছে কিছু আর নতুন নয়। আর পাতৌদির মধ্যে সে ভয়ের পরিমাণটা মনে হচ্ছে হয়তো বা একটু বেশিই। তাই আমরা দেখেছি কয়েক সপ্তাহ আগে টসে জিতেও অস্ট্রেলিয়াকে ব্যাটিং করার সুযোগ দিয়ে পরাজয়কে মেনে নিতে, আর এবার সেই একই চালের পুনরাবৃত্তি দেখা গেলো নিউজিল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় টেস্টম্যাচেও। ফলে ফলাফল সেই পরাজয়ই!

প্রথম টেস্টে জয়লাভ করে পাতৌদি আর তাঁর দলবল কি ধরাকে সরা জ্ঞান করেছিলেন? মনে হয় তাই। তা না হলে দ্বিতীয় টেস্টে ভারতীয় দলের এই হাল হতো না। কি আশ্চর্য ফলাফল। ডুনেডিনের পর ক্রাইস্টচার্চ, জয়লাভের পরেই পরাজয়! তবু সইতো যদি এই পরাজয় খেলার মতো খেলার পর ভারতীয় দল বরণ করতো। কিন্তু তা তো হয় নি। সহজ সরলভাবে, খেলার দিন গড়াতে না গড়াতেই যা আঁচ করা গিয়েছিলো—সেই ফলাফলই বর্তালো। নিউজিল্যাণ্ড দলের প্রথম ইনিংসের মস্ত বড় রান সংখ্যা দেখে ভারতীয় ব্যাটসম্যানরা শুরু করলেন চোখে সরষের ফুল দেখতে। আর সেই ফুলই তাঁদের ফলো অনের পর ফয়সালায় নিয়ে গিয়ে হাজির করলো। পরাজয়ের মুখোমুখি। ভারত নিউজিল্যাণ্ডের কাছেও হারলো। সত্যি হলো জন রীডের ভবিষ্যদ্বাণী।

এর পরেও কি ভারতীয় দলের আর খেলা উচিত? অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে পর পর চারটি টেস্টে পরাজয়ের পর আমরা ভারতীয় খেলোয়াড়দের কোর্ট মার্শাল দাবি করেছিলাম। কিন্তু এবার কি করবো? অথচ চুপ করে বসে থাকারও উপায় নেই। একটা কিছু করা উচিত। কিন্তু এই উচিত-অনুচিত বোধটা যাদের হওয়া উচিত তাঁরা কানে দিয়েছেন তুলো আর পিঠে বেঁধেছেন কুলো! আর চোখে কি তাঁদের কালো কাঁচের চশমাও আছে? বোধ হয় আছে, তা না হলে যা সহজ, যা সরল, যা একান্ত স্বাভাবিক সেগুলোর দিকেও কেন তাঁদের নজর পড়ে না!

তাই যদি এতোকাল পড়তো তাহলে আর যাই হোক বিদেশের মাটিতে ভারতীয় দলের এই হাল হতো না। বার বার দেশের সম্মান নিয়ে এইভাবে ছেলেখেলা চলতো না। তাই আজ আমরা সবার আগে চাই ভারতীয় ক্রিকেট কনট্রোল বোর্ডের সম্পূর্ণ পরিবর্তন। ভারতীয় ক্রিকেটের হর্তা-কর্তা-বিধাতাদের মানে মানে বিদায় করে তাঁদের জায়গায় আনা হোক পলি উমরিগড়, ভিনু মানকাদ, বিজয় মার্চেন্ট, হিমু অধিকারী প্রমুখের মতো নাম করা প্রাক্তন খেলোয়াড়দের—যাঁরা ক্রিকেটাঙ্গনে পলিটিক্সকে দূর করে ভারতীয় ক্রিকেটকে অন্তত কিছুটা এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবেন।

কিন্তু জানি কিছুই হবে না! ভারতীয় দল আবার পরাজিত হবে, দেশের সম্মান ধুলোয় লুটোবে, ভারত আবার বিদেশে যাবে খেলতে, বিদেশী দল আসবে ভারত সফরে—যেমন চলছে, সব কিছু চলবে ঠিক সেই একইভাবে একই গতিতে। আর আজ যাঁরা পায়ের ওপর পা তুলে ভারতীয় ক্রিকেটের কর্মকর্তা হয়ে বসে আছেন—সেদিনও তাঁরা থাকবেন সেই সিংহাসনে সমাসীন। মধ্যে পড়ে এঁদের খামখেয়ালীপনার জন্যে বিশ্ব ক্রীড়াঙ্গনে ভারত দিনের পর দিন শুধু ছোটই হবে।

কিন্তু কেন? আর কতোকাল চলবে এই অনাচার......?

—শান্তিপ্রিয়

আবার পরাজয়

পর পর সতেরোটি টেস্টে পরাজয়ের পর কোথা থেকে এক পলকের জন্যে জয়লাভের আনন্দ এসে আমাদের মাতিয়ে দিয়ে আবার চোখের নিমেষে টেনে নিয়ে গেলো পরাজয়ের অতল অন্ধকারে। নিউ-জিল্যাণ্ডের কাছেও ভারত হারলো। হারলো বড় বিশ্রীভাবে, বড় অপ্রত্যাশিত-ভাবে—ছ' উইকেটে। অথচ এমনটি তো হবার কথা ছিলো না।

হতোও না, যদি পাতৌদি বার বার ক্রিকেট খেলার সময় নিজের পলায়নী মনোবৃত্তির পরিচয় দিতে গিয়ে বরণ করে নিতেন পরাজয়কে। পাতৌদির পালিয়ে বেড়াবার মনোভাব আমরা আগেই দেখেছি। মাত্র কিছুদিন আগেও অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে টেস্ট খেলায় আমরা তাকে দেখেছি টসে জিতে প্রতিপক্ষ দলকে ব্যাটিং করার সুযোগ দিতে।

কিন্তু পাতৌদি কেন এমন করেন? টসে জিতে প্রথমে ব্যাটিং করার অমূল্য সুযোগ লাভ করেও, কেন বার বার সে সুযোগ ভারতীয় দলের অধিনায়ক পাতৌদির নবাব হেলায় হারান? এর পেছনে কি এমন অজানা যুক্তি থাকতে পারে যার উপর নির্ভর করে পাতৌদি বার বার ঐ একইভাবে পালিয়ে বেড়াতে চান?

তবে কি আমরা এই কথাই ভাববো যে, প্রতিপক্ষ দলে জোরে ফাস্ট বোলার থাকলে আর তাদের সংখ্যা যদি একটু বেশি হয় তাহলেই পাতৌদির মনে সেই ভয়-ভয় ভাবটা একটু বিশিরকম মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে—আর সঙ্গে সঙ্গে পাতৌদি টস জিতেও প্রতিপক্ষ দলকে ব্যাটিং করতে পাঠাবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

প্রথম টেস্টে জয়লাভের পর নিউজি-ল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় টেস্ট ম্যাচে মজ, কলিনজ আর বার্টলেটকে দেখে পাতৌদি সেই একই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। টস জিতেও ব্যাটিং করার সুযোগ দিলেন নিউজিল্যাণ্ডকে।

আর পাতৌদির দেওয়া সেই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে নিউজিল্যাণ্ড প্রথম ইনিংসে করলো অনেক রান—৫০২। এর মধ্যে ডার্ডলিং একাই করেছিলেন ২৩৯ রান আর তাঁর সঙ্গে তাল দিয়ে মারে করলেন ৭৪ আর টমসন ৬৯ রান।

প্রতিপক্ষ দলের মস্ত বড় রান সংখ্যার সামনে দাঁড়ালেই ভারতীয় ব্যাটসম্যানদের মনোবল মুহূর্তের মধ্যে ভেঙে খান খান হয়ে যায়। ফলে ফলো অন করতে বাধ্য হয় ভারত। নিউজিল্যাণ্ডের বিরুদ্ধেও এর কোন ব্যতিক্রম হলো না। মাত্র ২৮৮ রানে শেষ হয়ে গেলো ভারতের প্রথম ইনিংস। সুর্তি ৬৭, বোরদে ৫৭ আর পাতৌদি করলেন ৫২ রান। মজ ৬০ রানে ৬টি আর কলিনজ ৪৩ রানের বিনিময়ে পেলেন ৪টি উইকেট।

ফলো অন করে ভারত দ্বিতীয় ইনিংসে করলো ৩০১ রান। এই ইনিংসে ইঞ্জিনিয়ার ৬৩, পাতৌদি ৪৭ আর সুর্তির ৪০ রান ছাড়া ভারতীয় ব্যাটস-ম্যানদের মধ্যে আর কেউই এতটুকুও সুবিধে করতে পারলেন না। ফলে ভারতকে বরণ করতে হলো নিশ্চিত পরাজয়।

মাত্র ৮৮ রান করলে জিতবে এই অবস্থায় খেলতে নেমে নিউজিল্যাণ্ড ৪টি উইকেট হারিয়ে তুলে ফেললো জয়লাভের জন্য প্রয়োজনীয় রান। ভারত পরাজিত

ডাউলিং
এঁর জন্যেই ভারতকে হারতে হয়েছে নিউজিল্যাণ্ডের কাছে।

হলো ৬' উইকেটে। খেলার ফলাফল দাঁড়ালো ১—১। প্রথম টেস্টে জিতে-ছিলো ভারত, দ্বিতীয় টেস্টে জিতলো নিউজিল্যাণ্ড।

তৃতীয় টেস্ট ম্যাচ খেলা এখন চলছে, দেখা যাক শেষ পর্যন্ত এ খেলার ফলাফল কি হয়।

অস্ট্রেলিয়ার তরুণ দল

আগামী এপ্রিল মাসে অস্ট্রেলিয়া ক্রিকেট দল ইংলণ্ড ভ্রমণে যাবে। ইংলণ্ড ভ্রমণকারী অস্ট্রেলিয়া দলের খেলোয়াড়দের নাম ঘোষণা করা হয়েছে। অস্ট্রেলিয়ার খেলোয়াড়দের গড় বয়স ২৭। তাই দলটি অস্ট্রেলিয়ার তরুণ দল বলাই সঙ্গত।

অস্ট্রেলিয়া দলের অধিনায়ক আর সহ-অধিনায়কের নাম এখনো ঘোষণা করা হয় নি। তবে অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেট বোর্ডের চেয়ারম্যান শ্রীবব প্যারিশ অস্ট্রেলিয়া দলের ম্যানেজার মনোনীত হয়েছেন। অস্ট্রেলিয়া দল ৩রা সেপ্টেম্বর ইংলণ্ড সফর শেষ করবে।

নিচে অস্ট্রেলিয়ার খেলোয়াড়দের নাম দেওয়া হলো :—

আই চ্যাপেল, এ কনোলী, আর কাউপার, ই ফ্রিম্যান, জে গ্লীসন, এন হক, জে ইনভ্যারিটি, বি জারম্যান, ডাব্লিউ লরী, এ ম্যালেট, জি ম্যাকেঞ্জি, আই রেডপাথ, পি শিহান, বি টেবার, ডি ওয়ালটারস, এল জনসন ও কে রেনেবার্গ।

এবার ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিরুদ্ধে ইংলণ্ড দল যেরকম খেলছে আর ভারতের বিরুদ্ধে অস্ট্রেলিয়ার সাম্প্রতিক খেলার ধারা বিচার করে এ কথা স্পষ্টই বোঝা যায় যে, এবার এ্যাসেজ লড়াই-এ ইংলণ্ডের জেতার সম্ভাবনা থাকবে বেশি। কারণ ভারতের সঙ্গে খেলার সময়ই প্রমাণ হয়ে গেছে দল হিসেবে অস্ট্রেলিয়া এমন কিছু আর শক্তিশালী নয়। অপর দিকে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিরুদ্ধে ইংলণ্ডের খেলার ধারা সত্যিই বিস্ময়কর।

সমাচার দর্পন

দেশে

সাইকেলে বিশ্ব পরিক্রমায় চলেছেন হাবড়ার অজিত দে। হাবড়া থেকে কলকা-তায় আসার পর শ্রীদে দিল্লীর পথে যাত্রা করেন। শ্রীদের পরিকল্পনা অনুযায়ী

কিস্তিবন্দীতে ট্রানজিস্টার

৩২০, টাকা মূল্যের বিশ্ব-বিখ্যাত "এস-কর্ট" ৩ ব্যাণ্ড অল ওয়ার্ল্ড পোর্টেবল ট্রানজিস্টার মাসিক ১০, টাকার কিস্তিতে নিন।

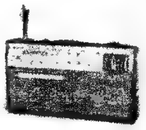

আবেদন করুন:
Japan Agencies (B—10)
Post Box 1194, Delhi—6,

প্রায় সাড়ে এগারো বছর লাগবে তাঁর সাইকেলযোগে বিশ্ব পরিক্রমায়, অর্থাৎ আজ থেকে প্রায় সাড়ে এগারো বছর পরে এঁদে আবার ফিরে আসবেন।

নিঃসন্দেহে বড়ই অভাবনীয় এই

অজিত দে

প্রায় সাড়ে এগারো বছর পরে সাইকেলে চেপে পৃথিবীটা ঘুরে বেড়াতে বেরিয়েছেন।

অভিযান। এতোকাল আমরা এ সমস্ত অভিযানের কথাই শুধু শুনতাম—এবারে নিজেদের মধ্যে একজনকে দেখলাম সব কিছু ছেড়ে-ছুড়ে এক অভাবনীয় আকর্ষণের আশায় বিশ্ব পরিক্রমায় বেরিয়ে পড়তে। তাই আজ সবার আগে আমরা এঁদের সাফল্য কামনা করি।

*

ফুটবল খেলোয়াড়দের দল পরিবর্তন নিয়ে কলকাতার খেলার বাজার এখন গরম। আই এফ এ'র সুতারকিন স্ট্রীটের অফিস আর আই এফ এ' সভাপতির অফিসের সামনে এখন দেদার ভিড়। আর বাজারে গুজবের ছড়াছড়ি। বড় বড় ক্লাবগুলো এখন নামী খেলোয়াড়দের নিয়ে মেতে উঠেছে টাগ অফ ওয়ারের দুরন্ত মাতামাতিতে। টাকা, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের লোভ আর চাকরীর প্রলোভনে খেলোয়াড়দের চোখে ধাঁধা লাগাতে চাইছেন ক্লাব কর্তৃপক্ষরা। একদিকে নিজেদের দলের খেলোয়াড়দের আটকে রাখার সমস্যা, অন্যদিকে অন্য ক্লাব থেকে নামী খেলোয়াড়দের দলে টেনে আনার প্রচণ্ড প্রচেষ্টা এখন চলেছে। আর তাই নিয়ে উৎসাহীদের উৎসাহে ফুটবলের বাজার এখন বেজায় গরম।

বিদেশে

১৯৭০ সালের এশিয়ান গেমস ভারতে অনুষ্ঠিত হবার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। আগামীবারের এশিয়ান গেমস অনুষ্ঠিত হবার কথা ছিলো দক্ষিণ কোরিয়ার সিউলে। কিন্তু গত সপ্তাহে দক্ষিণ কোরিয়ার অলিম্পিক কমিটি জানিয়ে দিয়েছে যে তারা ১৯৭০ সালের এশিয়ান গেমস পরিচালনা করতে রাজী নয়। তাই এখন ভারতেই ঐ ক্রীড়ানুষ্ঠান হবার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে।

১৯৬৬ সালের এশিয়ান গেমস অনুষ্ঠিত হয়েছিলো জাপানে। আর ১৯৭৪ সালে মালয়েশিয়ায় অনুষ্ঠিত হবে এই ক্রীড়ানুষ্ঠান। তাই ১৯৭০ সালের প্রতিযোগিতা যে কোথায় হবে এই নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে সিউলের এশিয়ান গেমস-এর সভায়।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো যে, বিগত ১৯৫১ সাল থেকে এশিয়ান গেমস অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। আর এই ক্রীড়া-প্রতিযোগিতার প্রথম আসর বসেছিলো ভারতে।

*

টনি লককে আবার ডেকে নিয়ে যেতে হলো। ৩৮ বছর বয়েসের লকের কাছে এই ডাক শুধুমাত্র অপ্রত্যাশিতই নয়—বড় বেশি উৎসাহকর। কারণ, লকের খেলার মান যথেষ্ট উন্নত থাকা সত্ত্বেও, ক'য়েক বছর আগে ইংলণ্ড দল থেকে বাদ দেওয়া হয়েছিলো তাঁকে! এই অবিচার বড় বেশি বেদনাহত করে তুলেছিলো লককে। তাই তিনি ঠিক করেছিলেন, দেশ ছেড়ে অস্ট্রেলিয়ায় গিয়ে থাকবেন।

লক এবার শেফিল্ড শীল্ড বিজয়ী ওয়েস্টার্ন অস্ট্রেলিয়া দলের অধিনায়ক ছিলেন। শীল্ডের শেষ খেলার আগেই ডাক পড়লো লকের। যেতে হবে ওয়েস্ট ইণ্ডিজে। ইংলণ্ডের সহ-অধিনায়ক টিটমাসের স্থানটা নিতে হবে তাঁকেই। সে ডাকে সাড়া দিয়েছেন লক।

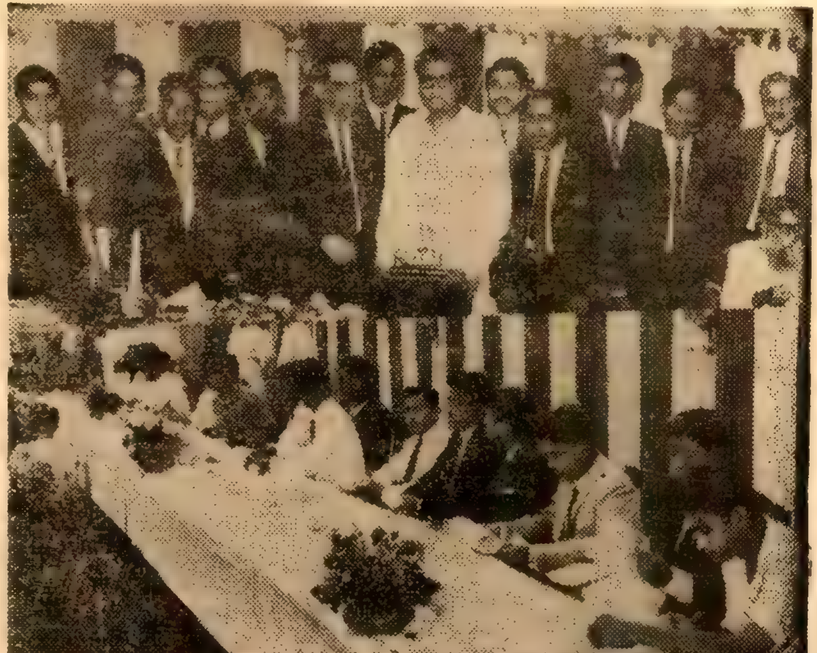

— পৌর সম্বর্ধনা —

কলকাতা পৌর প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে সম্বর্ধনা জানানো হয়েছিলো ১৯৬৭ সালের অপরাজিত লীগ চ্যাম্পিয়ান মহামেডান স্পোর্টিং আর আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় রোহিণ্টন বারিয়া ট্রফি বিজয়ী কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ক্রিকেট দলকে। ছবিতে ওপরের সারিতে দেখা যাচ্ছে মহামেডান স্পোর্টিং দলের খেলোয়াড়দের আর নিচে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় দলের ক্রিকেটারদের।

আইন-কানুনের দুনিয়া

হিমাংশু সেন (কলকাতা-২০)

প্রশ্নঃ একটা বল ব্যাটসম্যান মারার পর অপর প্রান্তের আম্পায়ারের গায়ে গিয়ে লাগল—তারপর বলটি গড়িয়ে গিয়ে উইকেটে লাগায় উইকেটের পতন ঘটালো। নন-স্ট্রাইকার ব্যাটসম্যান তখন তাঁর ক্রীজের বাইরে ছিলেন। এ ক্ষেত্রে নন-স্ট্রাইকার ব্যাটসম্যান কি আউট হবেন?

উত্তরঃ না হবেন না।

কাজল বসু (রামকৃষ্ণ শিক্ষাপীঠ, বীরভূম)

প্রশ্নঃ ব্যাটসম্যান বল মারার পর বলটি উঁচু হয়ে ঠিক ব্যাটসম্যানের মাথার ওপরে উঠলো, তখন উইকেটকীপার দৌড়ে এসে যদি উইকেট লাইন অতিক্রম করে বলটি লুফে নেয়, তাহলে কি ব্যাটসম্যান আউট হবে?

উত্তরঃ হ্যাঁ, ব্যাটসম্যান আউট হবে! ব্যাটসম্যান বলটা খেলার পর উইকেটকীপার উইকেটের সামনে আসতে পারে।

সিরাজ উদ্দীন আহম্মদ ও আখলে মাজিদ (বারাসাত, ২৪ পরগনা)

প্রশ্নঃ স্ট্রাইকার ব্যাটসম্যান একটা উঁচু ক্যাচ তুললেন। রান না নিয়ে অথবা ক্রীজে না থেকে তিনি তাঁবুর দিকে চললেন। তিনি বেশ কিছু দূরে চলে গেলে ফিল্ডার ক্যাচটি ফেলে দিলেন। তা দেখে ব্যাটসম্যান পুনরায় ফিরে আসছিলেন। কিন্তু তিনি ফিরে এসে ক্রীজে পৌঁছুবার আগেই ফিল্ডার তৎপরতার সঙ্গে বলটা কুড়িয়ে উইকেট ভেঙে দিলেন। এ ক্ষেত্রে ব্যাটসম্যান কি আউট হবেন? হলে কি আউট?

উত্তরঃ হ্যাঁ, ব্যাটসম্যান আউট হবেন। 'আউট অফ হিজ গ্রাউন্ড' নিয়ম অনুসারে ব্যাটসম্যান এ ক্ষেত্রে আউট হবেন।

স্বপন মণ্ডল (গেসকয়া, বর্ধমান)

প্রশ্নঃ ব্যাটসম্যান বলটি মারলেন। কিন্তু বলটি ব্যাটে লাগার পর উইকেট ভেঙে দেয়। ওদিকে আবার উইকেটকীপার বলটি মাটিতে পড়ার আগেই ধরে ফেললেন। এ ক্ষেত্রে ব্যাটসম্যানকে কি আউট দেওয়া হবে?

উত্তরঃ এ ক্ষেত্রে ব্যাটসম্যান প্লে-অ্যাটন হয়ে আউট হবেন!

উতথ্য চক্রবর্তী (রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীট, কলকাতা-৬)

প্রশ্নঃ একজন ওপেনিং ব্যাটসম্যান নিজ দলের ইনিংসের প্রথম থেকে শেষ উইকেট অবধি খেলে যদি অপরাজিত থাকেন, তাহলে তাঁর নিজের রানের সঙ্গে অথবা দলের রানের সঙ্গে কি কোন বেশি রান যোগ করা হবে?

উত্তরঃ না—কোনমতেই হবে না।

অজিতকুমার ঘোষ (হিঙ্গলগঞ্জ, ২৪ পরগনা)

প্রশ্নঃ ক্রীজের মধ্যে দাঁড়িয়ে ব্যাটসম্যান বল মারার পর বলটি ঠিক ব্যাটসম্যানের সামনে উঁচু হয়ে উঠলো। সেই ক্যাচ লোফার জন্যে একজন ফিল্ডারও সেখানে এলেন। ফিল্ডারটি যখন ক্যাচ ধরতে যাচ্ছেন ঠিক সেই সময় ব্যাটসম্যান তাঁর ব্যাট উঁচু করে দ্বিতীয়বার বলটি মারবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু বল তাঁর ব্যাটেও লাগলো না আর যিনি ক্যাচ ধরতে এসেছিলেন তিনিও ধরতে পারলেন না। তখন বলটা মাটিতে পড়লো। ফিল্ডিং পক্ষ তখন আউটের আবেদন জানালো! এ ক্ষেত্রে ব্যাটসম্যান কি আউট হবে?

উত্তরঃ ফিল্ডিং পক্ষ আবেদন জানালে ব্যাটসম্যান এ ক্ষেত্রে 'অসুবিধে সৃষ্টির জন্যে আউট' এই নিয়ম অনুসারে আউট হবে।

অজিতনাথ সাহা (গভঃ কলোনী নং ২, মালদা)

প্রশ্নঃ ব্যাটসম্যানের ব্যাটে বলটা লেগে উইকেটের দিকে গেলে ব্যাটসম্যান তখন পা দিয়ে বল আটকিয়ে দিলে আউট হয় না। কিন্তু হাত দিয়ে বা ব্যাট দিয়ে বল আটকালে কি আউট হবে আর কেনই বা হবে?

উত্তরঃ ব্যাটসম্যান হাত বা ব্যাট দিয়ে বলটা আটকাতে পারবে না। শুধু পারবে পা দিয়ে। হাত দিয়ে আটকালে 'হ্যান্ডল দি বল' আর ব্যাট দিয়ে আটকালে 'হিট দি বল টোয়াইজ' নিয়ম অনুসারে ব্যাটসম্যান আউট হবে।

আশীষ মুখার্জী (দীজাপুর, উত্তর প্রদেশ)

উত্তরঃ আপনার প্রশ্নের উত্তর নিশ্চয়ই আগের প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে পেয়ে গেছেন।

অমর দত্ত (আজাদগড়, কলকাতা-৪০)

প্রশ্নঃ রান আউট অথবা স্টাম্প আউট করার সময় কোন ফিল্ডসম্যান বলটা হাতে রেখে (মাটিতে না ফেলে) উইকেটে আঘাত করলে ব্যাটসম্যান কি আউট হবে?

উত্তরঃ উইকেটের পতন ঘটলে ব্যাটসম্যান আউট হবে। তবে উইকেটের পতন আইনসংগতভাবে ঘটানো চাই।

সুবীর রায় (পার্ল রোড, কলকাতা-১৭)

প্রশ্নঃ বোলার একটি বল করলো, ফিল্ডার ফিল্ডিং করছিলো দূরে দূরে, ব্যাটসম্যান আস্তে করে বলটি ব্লক করে রান নেওয়ার চেষ্টা করলো, কিন্তু দৌড়তে গিয়ে তার পায়ে লেগে বলটা অপর প্রান্তের স্টাম্পে লেগে উইকেটের পতন ঘটালো। ব্যাটসম্যান তখনো ক্রীজে পৌঁছয় নি। এ ক্ষেত্রে সে কি আউট হবে?

উত্তরঃ না, আউট হবে না।

সুদেব দে (রহড়া, ২৪ পরগনা)

প্রশ্নঃ নো বল কখন হয়? নো বল হলে আম্পায়ারের কর্তব্য কি? সব সময়ই কি নো বল হলে একটি বল বেশি দেওয়া হয়? নো বলের নিয়ম সব জায়গাতেই কি এক?

উত্তরঃ বল ছুঁড়ে, ঝাঁকানি দিয়ে, ক্রীজ ছেড়ে বেরিয়ে গিয়ে কিম্বা অন্য কোনভাবে নিয়ম ভেঙে বোলিং করলে নো বল দেওয়া হবে! হ্যাঁ, নো বল হলেই একটা বেশি বল দেওয়া হবে। হ্যাঁ নো বলের নিয়ম সবখানেই এক। নো বল সম্বন্ধে ভবিষ্যতে বিস্তারিত আলোচনা করার ইচ্ছে রইলো।

ইন্দ্রনীল ভট্টাচার্য (রহড়া, ২৪ পরগনা)

প্রশ্নঃ বাংলা এবং ইংরেজী কোন বইয়ে বর্তমানের ক্রিকেটের সমস্ত নিয়ম ভালোভাবে পাওয়া যাবে? বইগুলো কোথায় পাওয়া যাবে?

উত্তরঃ বাংলায় আমার (শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের—ক্রিকেট খেলার আইন-কানুন) আর ইংরেজীতে 'লজস অফ ক্রিকেট' বইতে পাওয়া যাবে। সমস্ত বইয়ের দোকানেই পাওয়া যাবে বোধহয়, না পেলে তাঁরা আনিয়ে দিতে পারবেন।

পরিচীয়তে

আর বি দেশাই

এখনো দশটি বছরও পোরে নি—দিশটা মরশুমও কাটলো না।

অথচ দশ বছর আগে ভারতীয় ক্রিকেটের টেস্ট জগতের আসরে দেশাই যখন আত্মপ্রকাশ করলেন—তখন তাঁকে নিয়ে আনন্দ-হাসি-গানে মেতে উঠেছিলো ভারতের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত।

হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছিলেন অনেকেই। স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বলেছিলেন, অনেক দিনের একটা বড় অভাব বুঝি মিটলো এতোদিনে। ফাস্ট বোলারহীন ভারতীয় দলে এবার থেকে অন্তত একজন খেলোয়াড়কে পাওয়া যাবে, যিনি জোরে বল করতে পারেন। যাঁর বাম্পার খেলতে গিয়ে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ব্যাটসম্যানেরও মাথার কার্ডাপ্ট উড়ে যায় বলের আঘাতে।

তাই ভারতীয় ক্রিকেট উৎসাহীদের অনেক আশা, অনেক আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে দেশাই নেমেছিলেন টেস্ট ক্রিকেটের আসরে।

১৯৫৯ সালে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ক্রিকেট দল ভারত সফর করছে। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলে আছেন হল-গিলক্রীস্টের মতো জোরালো বোলাররা। তাঁদের সেই জোরালো বোলিং-এ ভারতীয় শিবিরে পড়ে যায় ত্রাহি মধুসূদন ডাক। তবু ভারতীয় ব্যাটসম্যানরা ঠুক-ঠাক করে খেলছিলেন।

কিন্তু বোলিং-এ ওঁদের সঙ্গে পাল্লা দেবার মতো ছিলেন না কেউই! স্পিন বোলিং-এ ভারত শক্তিশালী চিরকাল। কিন্তু পেস বোলারের অভাব যেন আর ঘুচবে না। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের জোরালো বোলিং-এর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বোলিং করার মতো যেন কেউই নেই ভারতীয় দলে! পেস বোলারহীন ভারতীয় দল!

আর ঠিক সেই মুহূর্তে ভারতীয় দলের পক্ষে দিল্লীর শেষ টেস্টে আত্মপ্রকাশ করলেন ভারতের ছোট্টখাট্টো জোরালো বোলার আর বি দেশাই!

আর জীবনের প্রথম টেস্টেই দেশাই করলেন বাজীমাৎ। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের জোরালো বোলারদের সঙ্গে সমানে সমানে পাল্লা দিয়ে দেশাই বোলিং করলেন—ফোয়ারা ছোটালেন বাম্পার আর বিমারের।

সে খেলায় মোট ৪৯ ওভার বোলিং করে ১৬৯ রানের বিনিময়ে দেশাই পেয়েছিলেন ৪টি উইকেট।

প্রথম খেলায় সাফল্য দেশাইকে এনে দিলো ভবিষ্যতের সাফল্য-উজ্জ্বল সোনালী খেলোয়াড়-জীবনের স্বীকৃতি।

সেই বছরই ইংলণ্ডগামী ভারতীয় দলে স্থান লাভ করলেন রামকান্ত দেশাই। ইংলণ্ডের নরম মাঠ আর বৃষ্টি-ভেজা দিনের খেলাগুলোতে দেশাই ভারতীয় ক্রিকেট উৎসাহীদের আরো বেশি উৎসাহিত

দেশাই

করে তুললেন একের পর এক উইকেট পেয়ে।

লর্ডস টেস্টের কথা এখনো মনে আছে আমাদের। খুব সম্ভব পংকজ রায় ছিলেন সেই টেস্টে ভারতের অধিনায়ক। সেই খেলায় এক সময় ইংলণ্ড দল ৭টি উইকেট হারিয়েছিলো ১০০ রানের মধ্যে। তবু সে টেস্টে ভারত পরাজিত হয়েছিল। তবে সে কথা থাক এখন, বলি দেশাই-এর কথা।

ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে লর্ডস টেস্টে দেশাই একাই ৮৯ রানের বিনিময়ে পেয়েছিলেন ৫টি উইকেট।

১৯৫৯-৬০ সালে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে প্রথম, চতুর্থ ও পঞ্চম টেস্ট ম্যাচে অংশ গ্রহণ করেছিলেন দেশাই। শেষের দুটি টেস্টে দেশাই পেয়েছিলেন ৪টি করে উইকেট।

এরপর ১৯৬০-৬১ সালে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ৫টি টেস্টেই খেলেছিলেন দেশাই আর লাভ করেছিলেন অভাবনীয় সাফল্য। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ৫টি টেস্টে দেশাই পেয়েছিলেন মোট ২১টি উইকেট।

শুধু বোলিংই নয়, ব্যাটিং করতে নেমেও দ্রুত রান করতে ওস্তাদ দেশাই। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে প্রথম টেস্টে দেশাই ৮৫ রান করেছিলেন আর উইকেটরক্ষক যোশীর সঙ্গে নবম উইকেটে যোগ করেছিলেন ১৪৯ রান।

তবু ভারতীয় ক্রিকেটের চিরাচরিত প্রথা অনুযায়ী দেখতে দেখতে এক সময়, ভারতীয় ক্রিকেট-রসিকদের প্রিয় খেলোয়াড় ছোট্টখাট্টো দেশাই, অবহেলিত খেলোয়াড়-তালিকায় স্থান লাভ করলেন। শুধু তাই নয় ভারতীয় দল থেকে বাদ পড়তে শুরু করলেন দেশাই!

বোলিং-এ জোর থাকলেও, ব্যাটিং-এ দুরন্ত মার থাকতেও বাদ দেওয়া হলো দেশাইকে! ভারতীয় দলের ইংলণ্ড ভ্রমণে স্থান লাভ করতে পারলেন না দেশাই।

সেই শুরু, তার পর থেকে দেশাইকে শুধু বাদই দেওয়া হচ্ছে! তাঁর যোগ্যতা সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করা হলো। ঠিক যেমনভাবে এবার ভারতীয় দল থেকে বাদ পড়েছেন কুন্দরন, হনুমন্ত সিং, দুরানী প্রমুখের মতো খেলোয়াড়েরা।

কিন্তু ১৯৬৭-৬৮ সালে ভারতীয় ক্রিকেট দলের অস্ট্রেলিয়া আর নিউজিল্যাণ্ড ভ্রমণে আবার হঠাৎ ডাক পড়লো দেশাই-এর। আবার ভারতীয় দলে প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ পেলেন দেশাই।

কিন্তু এবার আর সাফল্যের উচ্চতম শিখরে সমাসীন হতে পারেন নি দেশাই! তবু দেশাই-এর যোগ্যতা এখনো অনস্বীকার্য...।

সম্পাদিকা—জয়ন্তী সেন
বসুমতী (প্রাঃ) লিঃ-এর পক্ষে ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট্‌স কলিকাতা-১২
বসুমতী প্রেস হইতে শ্রীসুকুমার গহমজুমদার কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বসুমতীর শাস্ত্র-প্রচার গ্রন্থরাজি

যজুর্বেদ :

কাশীরাজ পণ্ডিত শ্যামাকান্ত তর্কপঞ্চানন সম্পাদিত। বহু আয়াসে তাঞ্জোরের প্রাচীন দুষ্প্রাপ্য পুথির সংগ্রহশালা, কাশীর কুইন্স কলেজ লাইব্রেরী, কাশী মহারাজার বিশাল গ্রন্থাগার হতে সংগৃহীত। মূল্য—২-০০ টাকা।

বেদান্তসার :

শ্রীমদ্ পরমহংস সদানন্দ যোগীন্দ্র বিরচিত : ধর্মশাস্ত্র প্রচার-ব্রতী উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় অনূদিত (সুবোধিনী-টীকা সংযুক্ত)। বেদের এই অংশেই জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান ব্রহ্মবিদ্যার দিব্যজ্যোতি: বিবস্বিত। মূল্য—২-০০ টাকা।

মানসোল্লাস :

বশিষ্ঠানন্দ পুরী (অনুবাদ)।

মূল্য—২-০০ টাকা।

বিবরণ-প্রমেয়-সংগ্রহ :

ভারতীতীর্থ বিরচিত। সুপণ্ডিত শ্রীপ্রমথনাথ তর্কভূষণ অনূদিত। (১ম নাই) চারি খণ্ডে সম্পূর্ণ। মূল্য—প্রতি খণ্ড—৩-০০ টাকা।

শঙ্করাচার্যের গ্রন্থমালা :

পণ্ডিতপ্রবর পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত। সুবিস্তারিত ব্যাখ্যা ও বিবৃতি সন্নিবেশিত। মূল্য—১ম খণ্ড—৫-৫০ টাকা। ৩য় খণ্ড ৪-০০ টাকা।

যোগশাস্ত্র :

শিবসংহিতা, ঘেরণ্ডসংহিতা, বুদ্ধসংহিতা, অষ্টাবক্র-সংহিতা, ষট্চক্রনিরূপণম্, দত্তাত্রেয়প্রোক্ত যোগরহস্যম্, পরাশরপ্রোক্ত যোগোপদেশ। দুষ্প্রাপ্য সাতখানি যোগ গ্রন্থের সমাবেশ। কাপড় ও বোর্ডে বাঁধা। মূল্য—৫-০০ টাকা।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণবাণী :

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের শ্রীমুখনি:সৃত অমিয় নিস্যান্দিনী বাণী ভক্তপ্রবর উমাপদ মুখোপাধ্যায় সঙ্কলিত। মহামূল্য রত্নের সন্নিবেশ। বোর্ড বাঁধাই মূল্য—২-৫০ পয়সা।

শাণ্ডিল্যসূত্রম্ :

উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় অনূদিত—২-০০ টাকা।

ক্রিয়াকাণ্ড-বারিধি :

(ত্রিবেদ, উপনিষদ, স্মৃতি ও সর্বতন্ত্র হইতে সঙ্কলিত। সংবর্ধিত সংশোধিত ও সুসংস্কৃত সংস্করণ)।

বহু আয়াস ও অধ্যবসায় আহৃত এবং প্রচুর অর্থব্যয়ে মুদ্রিত আর্য সৎকর্মানুষ্ঠান সম্বন্ধীয় যাবতীয় তথ্যাপূর্ণ এই বিরাট গ্রন্থশাস্ত্র প্রচারোদ্দেশ্যে এখনও স্বল্পমূল্যে বিক্রয় হইতেছে। দীক্ষা প্রকরণ, নিত্যকৃত্য প্রকরণ, পূজা প্রকরণ, ধ্যানাদি প্রকরণ, ন্যাস প্রকরণ, ব্রত প্রকরণ, যাত্রা প্রকরণ, আসন ও মুদ্রা প্রকরণ-সমন্বিত মূল বিষয়-সমূহে ৮৬৩ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ প্রথম খণ্ড। মূল্য—১০-০০ টাকা

দ্বিতীয় খণ্ড। মূল্য—৮-০০ টাকা (যন্ত্রস্থ)।

তৃতীয় খণ্ড। মূল্য—৮-০০ টাকা (যন্ত্রস্থ)।

পবন-বিজয়-স্বরোদয় :

বায়ু জয়ই যে সব শ্রেষ্ঠ সাধনা। অলৌকিক সত্য নির্দেশক যোগক্রিয়ার গ্রন্থ। মূল্য—৩-০০ টাকা।

হিন্দুধর্ম পরিচয় :

ধর্মশাস্ত্রবিশারদ শ্রীসনৎকুমার রায়চৌধুরী প্রণীত। দ্বিতীয় সংস্করণ। মূল্য—৩-০০ টাকা।

আত্মানুসন্ধান :

শ্রীসুশীলকুমার ঘোষাল প্রণীত। প্রতিটি ধর্মপ্রাণ নর-নারীর অবশ্যপাঠ্য গ্রন্থ। মূল্য—২-৫০ পয়সা।

পুরশ্চরণ রসোল্লাস :

(দুর্লভ তান্ত্রিক গ্রন্থ। মূল সংস্কৃত ও বঙ্গানুবাদ)। মূল্য—৩-০০ টাকা।

যোগী যাজ্ঞবল্ক্যম্ :

যোগীপ্রবর মহর্ষি শ্রীযাজ্ঞবল্ক্য বিরচিতম্। মূল সংস্কৃত, বঙ্গানুবাদ ও ব্যাখ্যাসমন্বিত। মূল্য—২-০০ টাকা।

পঞ্চতীর্থ মাহাত্ম্য :

শ্রীকাশীমাহাত্ম্যম্, শ্রীগয়ামাহাত্ম্যম্, শ্রীবৈদ্যনাথ মাহাত্ম্যম্ শ্রীপ্রয়াগ মাহাত্ম্যম্, শ্রীবৃন্দাবন মাহাত্ম্যম্। মূল সংস্কৃত ও পণ্ডিতপ্রবর শ্রীকালীপ্রসন্নকৃত বঙ্গানুবাদ। মূল্য—৩-০০ টাকা।

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড ॥ ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কালকাতা - ১২

8 MAR 1968

গ্রাম : "স্পাইসমার্ট" মিল-কাশীপুর ফোন: ৩৩-১২৩২, ৩৩-২৩৮১

নিজস্ব মিলে বৈজ্ঞানিক প্রথায় প্রস্তুত

'কুক্‌মী'—সর্বাধিক বিক্রীত গুঁড়ো মশলা

পনের লক্ষ প্যাকেট মাসিক বিক্রয়

১২৫ বৎসরের অধিক প্রাচীন ও বর্তমানে মশলার বৃহত্তম প্রতিষ্ঠান

কৃষ্ণচন্দ্র দত্ত (স্পাইস) প্রাঃ লিঃ ২৩১নং ও ২৩৫নং মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড, পোস্তা, কলিকাতা-৭

াপ্তাহিক বসুমতী

চালচিত্রে কলকাতা

মহাকরণে রাজ্যপাল ঃ ধর্মঘট-বিক্ষোভ-মিছিল

: ৩৯শ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ৩০শে ফাল্গুন, ১৩৭৪ বঙ্গাব্দ] OLDEST WEEKLY OF NORTH INDIA [72nd year, No. 39, 14th Mar., 1968

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
[illegible]		২৪৩৫
[illegible]		২৪৩৬
[illegible]		২৪৩৭
[illegible]	সমর চট্টোপাধ্যায়	২৪৪১
[illegible]	কৃত্তিবাস ওঝা	২৪৪২
[illegible]	চন্দ্রগুপ্ত	২৪৪৪
[illegible]		২৪৪৬
আন্তর্জাতিক		২৪৫০
চিত্রকথন : যক্ষের কেন্দ্রে (প্রবন্ধ)	বরুণ রায়	২৪৫৩
এই অন্ধকার (কবিতা)	বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	২৪৫৫
হুগলী বাংলার কবিকে (কবিতা)	দুর্গাদাস সরকার	২৪৫৫

রহস্য গল্প। খুনের গল্প। ডাকাতির গল্প। অ্যাডভেঞ্চারের গল্প।

সদ্য প্রকাশিত হইল।

শিশু-সাহিত্যের সম্রাট

হেমেন্দ্রকুমার রায়ের

গ্রন্থাবলী

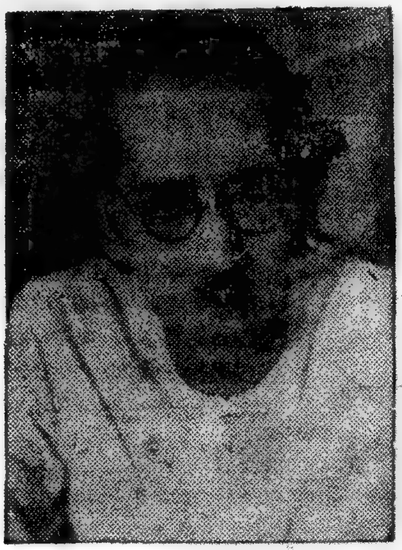

শিশু ও কিশোর-কিশোরীদের জন্য লেখা—কিন্তু হেমেন্দ্রকুমারের রচনা আবালবৃদ্ধবনিতা পড়ে থাকেন। হেমেন্দ্রকুমারের ছয়খানি সাড়াজাগানো উপন্যাস এই সুবৃহৎ গ্রন্থাবলীতে স্থান পেয়েছে।

১। যকের ধন ২। প্রদীপ ও অন্ধকার ৩। রহস্যের আলোছায়া
৪। ক্ষুদিরামের কীর্তি ৫। চাবি ও খিল
৬। একরত্তি মাঠ ৭। এক গুপ্ত রহস্য
ও গোয়েন্দা গল্প।

পৃষ্ঠা সংখ্যা ২১৬
মূল্য মাত্র ছয় টাকা

বসুমতী প্রাঃ লিঃ
কলিকাতা-১২

অবিলম্বে অর্ডার পেশ করুন !!

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
একটি কণ্ঠস্বরের প্রার্থনা (গল্প)	— মনোতোষ সরকার	২৪৬১
গ্রন্থমেলা	...	২৪৬৪
রাজনীতি ও ছাত্রসমাজ	— প্রদ্যোৎকুমার রায়	২৪৬৬
অগ্নিযুগের একটি অধ্যায়	— অনন্ত সিংহ	২৪৭১
যা দেখেছি, যা পেয়েছি (স্মৃতিচয়ন)	— সুধীরঞ্জন দাস	২৪৭৩
কন্ধ (ধারাবাহিক উপন্যাস)	— জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী	২৪৭৮
সাতাতামাসির পরে : কংগ্রেস ও যুক্তফ্রন্টের ইমেজ	— মনোজ হালদার	২৪৮১
আকাশবাণী-পরিক্রমা	— মেঘদূত	২৪৮৫
রঙ্গজগৎ	...	২৪৮৭
খেলাধূলো	— শান্তিপ্রিয়	২৪৯২
মজার খেলা ক্রিকেট	— শ্রীঅমিতাভ	২৪৯৬

কবিকঙ্কণ চণ্ডী

মুকুন্দরাম চক্রবর্তী

(কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর বিভাগের পাঠ্যপুস্তক)

মধ্যযুগের বঙ্গসাহিত্যে কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তীই সর্বশ্রেষ্ঠ কবি। তাঁহার চণ্ডীর কাহিনী বাঙ্গালার বিশিষ্ট জাতীয় জীবনের কাহিনী। তাঁহার কাব্যে পাই মধ্যযুগের বাঙ্গালার সমাজের সুস্পষ্ট আলেখ্য। শাসক সম্প্রদায়ের দ্বারা নির্যাতিত বাস্তুচ্যুত মুকুন্দরাম দুঃখ ও বেদনাক্লিষ্ট বাঙ্গালার প্রতিনিধি কবি—ব্যক্তির দুঃখ কি করিয়া সর্বজনের দুঃখ হইতে পারে বাঙ্গালা সাহিত্যে তাহা মুকুন্দরামই সর্বপ্রথম দেখাইয়াছেন। এই হিসাবে তিনি আধুনিক বাঙ্গালার রোমান্টিক সাহিত্যসাধনার অগ্রদূত।

—বর্তমান গ্রন্থে আছে—

১। মূল কাব্য, ২। সুবিস্তৃত ভূমিকা, ৩। কবির জীবনী, ৪। কাব্য-পরিচিতি ৫। কবিকঙ্কণ যুগের বঙ্গভাষা (ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র লিখিত), ৬। অধ্যাপক শ্রীবিজিতকুমার দত্তের সুলিখিত ভূমিকা, ৭। বিস্তৃত কাব্য সমালোচনা এবং ৮। অপ্রচলিত শব্দের অর্থ।

মূল্য সাড়ে চার টাকা

ভক্তসাধক কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেনের

ভক্তিমাধুরী-রঞ্জিত

রামপ্রসাদ গ্রন্থাবলী

শ্রীশ্রীকালী-কীর্তন, বিদ্যাসুন্দর, পদাবলী, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, সীতা-বিলাপ, আগমনী, বিজয়া, অপূর্ব প্রকাশিত কবিতাবলী, কবির জীবনী।

একত্রে মূল্য তিন টাকা

উজ্জয়িনীর সেই বিশ্ব-চিত্তজয়ী বিশ্ববিমোহন মহাকবি—
সারস্বতকুঞ্জের পূর্ণজ্যোৎস্না—সাহিত্য-জগজ্জ্যোতি—
প্রতিভা ও মনীষার অবতার—সরস্বতীর বরপুত্র—
সৌন্দর্যের মহাকবি—

কালিদাসের গ্রন্থাবলী

সর্বাঙ্গসুন্দর রাজাধিরাজ সংস্করণ

অনুবাদক—বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সাহিত্য রস-সুরসিক

পণ্ডিত রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ

প্রথম ভাগে :—রঘুবংশ, মালবিকাগ্নিমিত্র, ঋতুসংহার, পুষ্পবাণবিলাস, শৃঙ্গার-তিলক, শৃঙ্গার-রসাষ্টক। ৮·০০

তৃতীয় ভাগে :—শকুন্তলা, বিক্রমোর্বশী, শ্রুতবোধ, দ্বাত্রিংশৎ পুত্তলিকা, কালিদাস-প্রশস্তি। ৮·০০

প্রাচীন-সাহিত্যের-গৌরব-মুকুট—
সাহিত্যের চির-সমাদৃত কোকিল—
রায়গুণাকর

ভারতচন্দ্রের গ্রন্থাবলী

অন্নদামঙ্গল, বিদ্যাসুন্দর, মানসিংহ, চৌরপঞ্চাশৎ, রসমঞ্জরী, সত্যপীর, খেড়েজেড়ের কৌতুক, ফর্দরফং, হিন্দী কবিতালহরী, বলিরাজা, চণ্ডী, নাগাষ্টক, 'সংস্কৃত, পার্সী', হিন্দী নানা ভাষার কবিতাবলী, কবির জীবনী, ঋতু-বর্ণনা, রাধাকৃষ্ণের প্রেমালাপ, কবিতাবলী।

মূল্য তিন টাকা

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেডঃ ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলি-১২

৪২ বর্ষ : ৩১শ সংখ্যা—মূল্য : ৩০ পয়সা বাংলা ভাষায় দ্বিতীয় সর্বাধিক প্রচারিত সাপ্তাহিক পত্রিকা
বৃহস্পতিবার, ৩০শে ফাল্গুন, ১৩৭৪ বঙ্গাব্দ
PRICE : 30 Paise
Thursday, 14th March, 1968

আইনের চোখে ধুলো !

ঘটনাটি নতুন নয়। তবু সেই ঘটনার মধ্যে একটা অদ্ভুত অভিনবত্ব আছে। এবং ঘটনাটি অভিনব হওয়ার মূলে আছে পাকা মাথার বুদ্ধি। যে বুদ্ধি খরচ করলে টাকাকড়ি পকেটে আসে।

ঘটনাটি হচ্ছে এই যে, কেন্দ্রীয় পৌর-ভবনের দেওয়ালে বিকৃত বই টাঙিয়ে রেখে অসামাজিক কাজে লিপ্ত যে সব ব্যবসায়ী ঘুঘু বাসা বেঁধেছে—তাদের শায়েস্তা করার জন্যে নির্দেশ দেন স্বয়ং কলকাতার মেয়র। নির্ধারিত দিনে সুনির্দিষ্ট সময়ে সেখানে যখন হানা দেওয়া হয়, তখন দেখা যায়—কিছু লোভী লোকের কাছে অগ্রিম সংবাদ পেয়ে ব্যবসায়ী ঘুঘুগুলি দেওয়ালে টাঙানো বই-পত্র কয়েক ইঞ্চি সরিয়ে ফুটপাতের ওপর রেখে ব্যবসা চালাচ্ছে। যেহেতু ফুটপাত পৌরসভার পূর্তবিভাগের অন্তর্গত নয়, সেই কারণে আইনের চোখে ফুটপাতের ধুলো দিয়ে ঘুঘু ব্যবসায়ীরা নিরাপদ হোল।

আইনের চোখে ঐ ঘুঘুরাই শুধু রক্ষা পাচ্ছে না—যদি খোলা চোখ নিয়ে দেখা যায়—তাহলে দেখতে পাওয়া যাবে যে, কী সিনেমা, কী সাহিত্য, সর্বত্রই এক শ্রেণীর ঘুঘু ব্যবসায়ী বিকৃত ও সমাজবিরোধী বই-এর প্রচার চালিয়ে অর্থ উপার্জনের কাজে লিপ্ত। তাদের দ্বিতীয় কাজ—দেশকে সর্বনাশের দিকে নিয়ে যাওয়া। সব চেয়ে লক্ষণীয় ব্যাপার, তারা মনে করে বিকৃতির বিরুদ্ধে যারা বলে—পরোক্ষে তারাও তাদের সহায়ক। কারণ তার সাহায্যেও তাদের প্রচার হয়। এমন মনে হবার অন্য কারণও আছে—তারা ধরে নিয়েছে, আইনের চোখে হয়তো তারা নিরাপদ। এ ছাড়াও হয়তো তাদের ধারণা—জনসাধারণ যখন চোখ বুজে ঐ জাতীয় সিনেমা দেখছে, জঘন্য বই পাঠ করছে, ট্রামে বাসে যেতে যেতে সপরিবারে নোংরা সিনেমা-পোস্টার হজম করছে, বুকস্টলগুলিতে দু' দণ্ড দাঁড়িয়ে অজস্র রকম রুচিবিকৃত পুস্তিকা দেখছে—তখন এসব জিনিস জনসাধারণের প্রিয় হয়ে উঠছে। এমন কি, এ ভেবেও তারা আনন্দ পায় যে, স্কুল কলেজের কিছু ছেলেরাও যেহেতু এ সব দেখতে চাইছে, তাহলে তাদের উদ্দেশ্য সার্থকতার পথে।

ঠিক এই অবস্থার মধ্যে জনগণের রক্ষকও ডামাডোলের বাজারে হয়তো এ কথাই ভাবেন যে, অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান করা যখন সম্ভব নয়, তখন যুবক সম্প্রদায় চাকরি খোঁজা বা খাদ্য দাবি করার পরিবর্তে যদি দুটো নোংরা জাতীয় বই পড়ে জাহান্নামে যায়—তা যাক গে। ওপর-মহলের তাতে ক্ষয়ক্ষতি নেই।

উপরন্তু সাগরপারের এমন গুরু-মশায়ের দলও আছেন যাঁরা ভাবছেন, দেশটাতে বিপ্লব-টিপ্লব হোল বুঝি—অতএব লেখক যতো টাকা নেয় নিক গে, প্রচারক প্রচার করার জন্যে ব্যাঙ্ক ব্যালান্স ক্রমাগত বৃদ্ধি করুক তাও উত্তম—যৌব-শক্তিকে বেপথে চালিত করাই মহত্তম কর্তব্য!

সুতরাং ভাড়াটে লেখক কলম ধরে। তখন তার কাছে দেশের বড় রকম কোনো সমস্যা—সমস্যাই নয়। জীবনে আছে রাজনীতির প্রাবল্য, সঙ্কুচিত অর্থনীতির প্রকোপ,—এ সব তার বিষয়বস্তুর উপ-জীব্য নয়। দুর্নীতিপরায়ণ লেখক সাহিত্যের নামে বেসাতি শুরু করে। এবং সভা ডেকে বলে—এর বিচার হবে আগামীকালে।

আমরাও জানি, আগামীকালের দোহাই দিয়ে অনেক সময় কড়ি ফাঁকি দিয়ে বৈতরণী পার হওয়া যায়। কিন্তু এই আগামীকালের ভাঁওতায় জনসাধারণ কি চুপ করে থাকবে? আগামীকালের ওজর দিয়ে রাষ্ট্রবিরোধী কোনো বই লিখিত হলে সরকার কি রেহাই দেবে? মারাত্মক কথা এই যে, জ্ঞানপাপী লেখক—যে সমাজ নিয়ে রাষ্ট্র—সেই সমাজের সর্বনাশ করার জন্যে আজ অর্থপুষ্ট। অর্থের মহিমা এমনি যে, এরা সত্য প্রচারের নামে একমাত্র জীবনের নগ্নদিকের কারবারী। এবং কারবার গুছিয়ে নিয়ে স্কুল-কলেজের সরলমতি ছেলেদের অন্যায়ের পথে পা বাড়াবার প্ররোচনা দিচ্ছে। অথচ এর বিরুদ্ধে কার্যকর প্রতিকার নেই। অবশ্য প্রতিকার একেবারেই যে নেই, তাও ঠিক নয়। কিছুদিন আগেই কলেজ স্ট্রীটে একটি বই-এর দোকানে গেছিলেন জনৈক ভদ্রলোক বই কিনতে। তাঁকে একটি একটি করে বই দেওয়া হয় যাতে তিনি পছন্দমতো বই কিনতে পারেন। শোনা গেছে, জনৈক বিকারগ্রস্ত লেখকের একটি বই আনা হলে—ক্রয়েচ্ছু ভদ্রলোক তৎক্ষণাৎ সবেগে দোকান পরিত্যাগ করেন। পরে আরো জ্ঞাত, বই-এর দোকানের মালিক উক্ত লেখকের বইগুলি লুকিয়ে ফেলতে বাধ্য হয়েছেন। হয়তো বা পুড়িয়ে ফেলবেন।

আমরা মনে করি, এ ব্যাপারে একজন নয়, সহস্রজনকে এগিয়ে আসতে হবে। সাহিত্যে জীবনে নগ্নতার দিক আছে ঠিকই, কিন্তু সংযমের দিকটা আরো সত্য, যা দু' পায়ের জীবকে মানুষ করে তোলে। যার লেখায় তা নেই তা পরিত্যাজ্য। আইনের চোখে ধুলো দিলেও তা যেন জনসাধারণের চক্ষুকে ধুলো দিতে কোনো দিন সাহসী না হয়। তাই আগামী-কলের জন্য জনসাধারণের আর অপেক্ষা করার প্রয়োজন নেই, এখনি তার বিচার হোক।

সম্পাদকীয়

আজকের মানুষ

"বৌদ্ধ ভিক্ষুদের সঙ্গে সেনাবাহিনীর (বা সরকারের) আপোষ-রফার কোনো আশা নেই। এখন হয় আমাদের থিক ত্রি কোয়াঙকে খতম করতে হবে, নয়তো কোয়াঙ-ই আমাদের শেষ করে দেবেন।" কথাটা দু বছর আগে, '৬৬ সালের মে মাসে জনৈক ভিয়েতনামী জেনারেল বলেছিলেন, হুয়ে শহরের বৌদ্ধরা যখন কাও কাই সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল তখন। জেনারেলটির দূরদৃষ্টি আছে বলতে হবে। বৌদ্ধ ভিক্ষুনেতা থিক ত্রি কোয়াঙকে সেনাবাহিনী খতম করতে সাহস করে নি সেদিন, কিন্তু আজ কোয়াঙ-অনুরাগীদের রোষের আগুনে দগ্ধ হচ্ছে কাও কাই সরকার। সেদিনের ওই জেনারেলের ভবিষ্যদ্বাণীকে স্মরণ করেই বোধ হয় সরকার আজ কোয়াঙের স্বাভাবিক মুক্ত জীবন খতম করতে উদ্যত হয়েছেন, কোয়াঙকে গ্রেপ্তার করেছেন। সরকারের আশংকা, ভিয়েত কংদের হাতে নিশ্চিহ্ন হবার আগে হয়তো ত্রি কোয়াঙের নেতৃত্বে বৌদ্ধরাই সরকারের সর্বনাশ ঘটাবে।

ভগবান তথাগতের ভক্ত ত্রি কোয়াঙ। বুদ্ধকে তিনি শরণ নিয়েছেন, নিয়েছেন ধর্মকে, সংঘকে। মধ্য ভিয়েতনামের হুয়ে প্রদেশে এক বৌদ্ধ পরিবারে তাঁর জন্ম, প্রবজ্যাও নিয়েছেন। কিন্তু তাঁর ধর্মকে তিনি নিরুপদ্রবে রক্ষা করতে পারছেন কৈ? ধর্মরক্ষার খাতিরে, বৌদ্ধ জনসাধারণের নাগরিক সুখ-সুবিধার দিকে নজর রাখতে গিয়ে থিক ত্রি কোয়াঙকে রাজনীতির মঞ্চে আসতে হয়েছে। কোয়াঙ আজ দক্ষিণ ভিয়েতনামের কেবল একজন ধর্মীয় গুরুই নন, তিনি একজন প্রথম শ্রেণীর রাজনৈতিক নেতাও বটেন। বাস্তবিক, দক্ষিণ ভিয়েতনামে আজ একমাত্র থিক ত্রি কোয়াঙ জাতীয় নেতার মর্যাদা পাচ্ছেন।

প্রব্রজ্যা নিয়ে, গায়ে গেরুয়া বসন ধারণ করেও কোয়াঙ রাজনৈতিক বক্তৃতামঞ্চে দাঁড়ান কেন, কেন তিনি হুয়ে সায়গনের রাজপথে বিক্ষোভ শোভাযাত্রা পরিচালনা করেন? সরকারই বা কেন কোন রাজনৈতিক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নে কোয়াঙের পরামর্শ বা মতামত চান আগে? কারণ কোয়াঙ কেবল নিজের মোক্ষ লাভের প্রতি আগ্রহী নন, তিনি সমস্ত নির্যাতিত বৌদ্ধ জনসাধারণ, সমস্ত ভিয়েতনামীদের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক এবং মুখপাত্র আজ। ভিয়েতনামীদের ওপর তাঁর প্রভাব প্রতিপত্তি যে-কোন রাজনৈতিক নেতাকে ঈর্ষান্বিত করবে।

কিন্তু কোয়াঙ আজ ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান, ধ্যান-সমাধি, তাঁর প্যাগোডা ছেড়ে রাজপথে জড়বাদী দাবিদাওয়া নিয়ে কেন আন্দোলনে মেতেছেন? মেতেছেন এ জন্যেই যে, দক্ষিণ ভিয়েতনামে সাধারণভাবে বৌদ্ধদের শোচনীয় দুরবস্থা দেখে

থিক ত্রি কোয়াঙ

তিনি স্থির থাকতে পারেন নি বলে, তাঁর ধ্যান-সমাধি, তাঁর ভগবৎ চিন্তাস্রোত বার বার বাধা পেয়েছে বলে। বৌদ্ধরা দক্ষিণ ভিয়েতনামে সংখ্যাগুরু, এখানে শতকরা ৮৫ জনেরও বেশি বৌদ্ধধর্মাবলম্বী, কিন্তু তা সত্ত্বেও এখানে সরকারী বেসরকারী অফিস আদালতে সংখ্যালঘু ক্যাথলিকদের একাধিপত্য। মোট অধিবাসীদের শতকরা মাত্র ১২ জন ক্যাথলিক হলেও সরকারী অফিস এমন কি প্রতিরক্ষা বিভাগ, সেনাবাহিনীতে পর্যন্ত ক্যাথলিকদের হাতেই সব বড় বড় পদগুলি, বড়কর্তাদের কাছে ক্যাথলিকদেরই কদর বেশি, বৌদ্ধরা সেখানে অধস্তন পদই পেতে পারেন, কর্তাদের কাছে তাঁরা প্রায় অপাংক্তেয়। কোয়াঙ এই বৈষম্যের বিরুদ্ধেই প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছেন। এ বৈষম্য চলে আসছে ফরাসী আমল থেকে। দিয়েম সরকারের আমলে কোয়াঙ সারা দেশে তুমুল আন্দোলন সৃষ্টি করেছিলেন। বস্তুত দিয়েম সরকারের পতনের একটা প্রধান কারণ বৌদ্ধদের সমর্থন তাঁরা হারিয়েছেন বলে।

শুধু দিয়েম সরকারই নন, দক্ষিণ ভিয়েতনামে চারটি সরকারের পতনের জন্যে থিক ত্রি কোয়াঙের নেতৃত্বের অবদান অসামান্য। দাবি আদায়ের জন্যে বৌদ্ধরা এখানে এক অভূতপূর্ব দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন: প্রজ্বলিত অগ্নিতে আত্মাহুতি দান। সারা গায়ে গ্যাসোলিক বা পেট্রল ঢেলে তারপর তাতে জ্বলন্ত দেশলাই কাঠি সংযোগ করে জীবন দিয়েছেন বৌদ্ধ ভিক্ষু ভিক্ষুণী, যুবক-যুবতী। সমগ্র বিশ্ববাসী অবাক বিস্ময়ে দেখেছে সে-অভাবনীয় দৃশ্য, ধর্ম সত্য ও বিশ্বাস রক্ষার কারণে বুদ্ধশিষ্যদের এই চরম আত্মত্যাগের কাহিনী পড়েছে তারা সংবাদপত্রে, শ্রদ্ধায় মাথা নত করেছে। কিন্তু কাও কাই সরকার তবু তাদের উদ্ধত মাথা নোয়াতে রাজী হন নি।

থিক ত্রি কোয়াঙ আজ দক্ষিণ ভিয়েতনামের অবিসম্বাদী নেতা। অপূর্ব তাঁর বাগ্মিতা, তাঁর রাজনৈতিক প্রজ্ঞা তাঁকে সহজেই নেতৃপদে উন্নীত করেছে। বস্তুত সমগ্র দক্ষিণ ভিয়েতনামে তাঁর মত সুচতুর রাজনীতিজ্ঞ যে আর নেই একথা তাঁর শত্রুরাও অস্বীকার করে না। কোয়াঙ চান শান্তি। এবং তিনি মনে করেন সে-শান্তি তখনই কেবল প্রতিষ্ঠিত হতে পারে যখন ভিয়েতনামের সমস্যা সমাধানের ভার ভিয়েতনামীদের হাতে ছেড়ে দেওয়া হয়। সামরিক শাসনের তিনি ঘোর বিরোধী। কিন্তু তিনি গোড়ায় মার্কিন-বিরোধী ছিলেন না, বরং আশা করেছিলেন কাও কাই'র সামরিক শাসন উচ্ছেদ করতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাঁকে সাহায্য করবে। কিন্তু মার্কিন সরকার সম্পর্কে তাঁর মোহভঙ্গ হয়েছে। এখন তিনি চান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র উত্তর ভিয়েৎনামের ওপর বোমাবর্ষণ বন্ধ করুক, ভিয়েৎনাম ছেড়ে তারা চলে যাক। কোয়াঙ কমিউনিস্ট-বিরোধী ছিলেন। কিন্তু বরাবরই মনে করতেন ভিয়েত কংদের বাদ দিয়ে এখানে স্থায়ী সরকার প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না, শান্তি আসবে না।

মার্কিনীরা থিক ত্রি কোয়াঙকে আজ কমিউনিস্ট হিসেবে চিত্রিত করতে চাইছেন। কিন্তু তাঁর মতাদর্শ সম্পূর্ণ আলাদা। আজ সরকার কোয়াঙকে বন্দী করেছেন। কিন্তু '৬৬ সনে হুয়ে প্রদেশে যিনি সরকারী সৈন্যদের নাজেহাল করেছিলেন, দেশের তরুণ ও ছাত্রসমাজের ওপর যাঁর প্রভাব অসামান্য তাঁকে শৃঙ্খলে আবদ্ধ করে সরকার গণ-আন্দোলন স্তব্ধ করতে পারবেন কি?

পশ্চিমবঙ্গে রাষ্ট্রপতির শাসনের কয়েকটি সপ্তাহ অতিবাহিত হল। এখন আর সেই চাঞ্চল্য নেই, দল ভাঙাগড়ার খেলা আপাতত শেষ। অন্তর্বর্তীকালীন নির্বাচনের সম্ভাব্য তারিখ নিয়ে অবশ্য প্রতিদিনের সংবাদপত্রেই কিছু কিছু জল্পনা-কল্পনা করা হয়, কিন্তু নির্বাচন প্রসঙ্গ এখনো কোন উত্তাপের সৃষ্টি করতে পারে নি। অবশ্য সকল রাজনৈতিক দলই ইতিমধ্যে পাঁয়তারা ভাঁজতে শুরু করেছে, মাঠে ময়দানে কিছু কিছু বক্তৃতারও আওয়াজ শোনা যাচ্ছে, কিন্তু এখনো পালে বাতাস লাগে নি। আমরা সাংবাদিকেরাও কিছুটা রেহাই পেয়েছি, বস্তুত বিগত কয়েকটি মাস আমাদের এক মুহূর্তও অবকাশ জোটে নি। বঙ্গদর্শনের পাতাগুলি ব্যয়িত হয়েছে শুধুমাত্র রাজনৈতিক পরিস্থিতির আলোচনায়, দেশের আরও পাঁচটা কথা ছিল, জনসাধারণের অভাব-অভিযোগের নানা প্রসঙ্গ ছিল। কিন্তু সেগুলিকে যথাযথভাবে ফুটিয়ে তোলার অবকাশ ছিল না; কেন না শাসনই যেখানে স্থিতিশীল ছিল না সেখানে কাদের উদ্দেশ্যে আমরা জনগণের বক্তব্য জানাবো, কাদেরই বা দৃষ্টি আকর্ষণ করব।

এখন সমগ্র প্রশাসনিক দায়িত্বই রাজ্যপাল তথা আমলাতন্ত্রের কাঁধে পড়েছে। রাজ্যপাল জনসাধারণকে অনেকগুলি আশ্বাস দিয়েছিলেন, যার মধ্যে একটি হচ্ছে প্রশাসনিক দুর্নীতি, চোরাকারবারী ও মুনাফাবাজি দমন করা হবে। যদি তিনি সত্যই তাঁর ঘোষিত বক্তব্য কাজে পরিণত করতে পারেন, তাহলে তিনি পশ্চিমবঙ্গবাসীর চিরকালের কৃতজ্ঞতাভাজন হবেন। রাজ্যপাল এখানে খুব জনপ্রিয় নন। নানান কারণে জনসাধারণের বেশির ভাগ অংশ মনে করেন যে, তিনি পশ্চিমবঙ্গে সক্রিয় রাজনীতি করেছেন যেটা তাঁর পদমর্যাদার উপযুক্ত নয়। এখন অবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে, তাঁকে কাজের দ্বারাই জনমনে প্রতিষ্ঠিত হতে হবে।

রাষ্ট্রপতির শাসন প্রবর্তিত হবার অত্যল্পকাল পরেই ব্যাপক ফেরিওয়ালা উচ্ছেদ শুরু হয়েছিল, বিশেষ করে যাঁরা শহরে বিভিন্ন ফুটপাতে দোকান সাজিয়ে বসেন। এতে অবশ্য পথচারীর অসুবিধা হয় এবং নগরীর সৌন্দর্যের হানি ঘটে, কিন্তু যেহেতু তাঁদের ফুটপাতে দোকান দেওয়াটার মধ্যে কোন অনৈতিকতা নেই সেই হেতু রাজ্যপালের এই আদেশের আমরা সমালোচনা করেছিলাম। সুখের বিষয়, এই আদেশটি প্রত্যাহৃত হয়েছে, এবং রাজ্যপাল ঘোষণা করেছেন যে, এঁদের রুজিরোজগারের বিকল্প কোন ব্যবস্থা না করা পর্যন্ত উচ্ছেদ করাটা অনুচিত। এই ঘোষণা বাস্তবতাসম্মত এবং গভীর বিবেচনাবোধ প্রসূত হয়েছে।

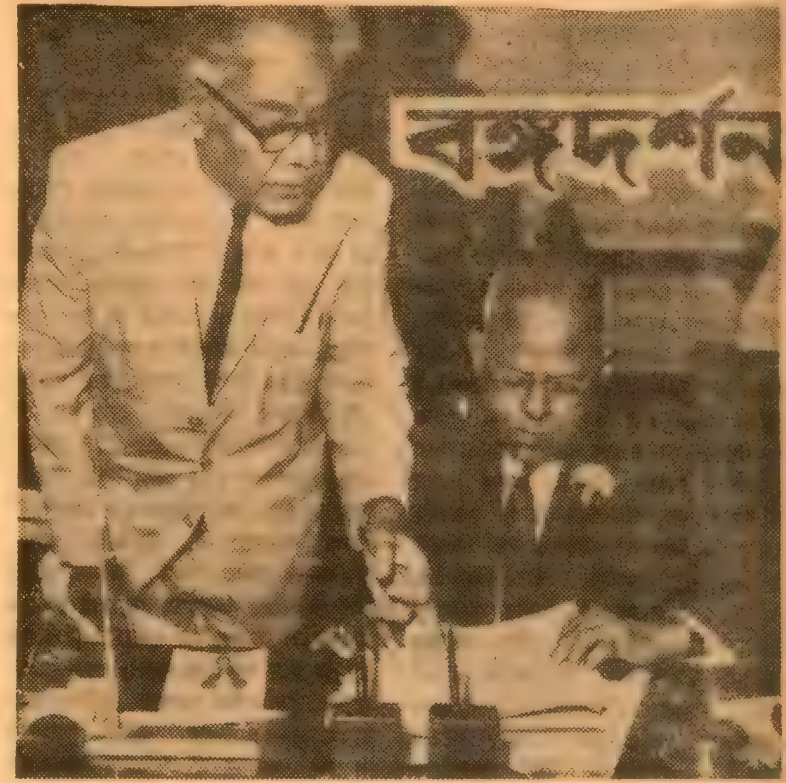

মহাকরণে কর্মরত রাজ্যপাল

কিন্তু সবচেয়ে বড় যে সমস্যাটার সম্মুখীন রাজ্যপালকে হতে হয়েছে সেটি হচ্ছে চাল সংগ্রহের সমস্যা। খুব ঘটা করে সর্বত্র পুলিশী অভিযান চালানো হয়েছে, গোপন মজুত উদ্ধারের চেষ্টাও নাকি চলছে, কিন্তু এই বঙ্গদর্শন লেখার সময় পর্যন্ত তা থেকে কোন সুফললাভ হয়েছে এমন কোন সংবাদ আমরা পাই নি। বস্তুত এই একটি কাজ যাতে সাফল্যলাভ করা বিশেষ কঠিন, কেন না যারা সরকারের সঙ্গে অসহযোগিতা করছে, তা তারা করছে সুপরিকল্পিত পদ্ধতিকে ভিত্তি করে। মনে রাখতে হবে বিগত পি-ডি-এফ মন্ত্রিসভার পিছনে জোতদার-মজুতদারদের সমর্থন ছিল এবং ওই সরকার গদিতে আসীন হবার পরই তাদের প্রতি অনুগ্রহ বিতরণ করতে বিলম্ব করেন নি। আমরা এই বঙ্গদর্শনের পৃষ্ঠার প্রায় প্রতি সংখ্যাতেই দেখিয়েছি যে, কিভাবে বিগত সরকার এই শ্রেণীর ওপর অনুগ্রহ বিতরণ করেছে, লেভির ছাড় দিয়েছে, এমন কি যাঁরা লেভি দিতে প্রস্তুত ছিলেন তাঁদের কাছ থেকেও নেওয়া হয় নি। এখন দেখা যাক রাষ্ট্রপতির শাসনে খাদ্যাবস্থার কতটুকু উন্নতি হয়।

আরও একটি বৃহৎ সমস্যার সম্মুখীন রাজ্যপালকে হতে হবে। সেটি হচ্ছে কারখানা বন্ধ হয়ে যাবার সমস্যা। লক আউট এবং লে-অফ একটা রীতিতে দাঁড়িয়ে গেছে। এর ফলে একদিকে যেমন উৎপাদন কমছে, অপর দিকে তেমনি বেকারের সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে। নামকরা প্রতিষ্ঠানগুলি পর্যন্ত তালা বন্ধ করছে। যুক্তফ্রন্টের আমলে মালিকপক্ষ ঘেরাও-এর অজুহাতে যা নয় তাই করেছে। ঘেরাও বে-আইনী ঘোষিত হবার পরেও কিন্তু কারখানার বন্ধ দরজা খোলে নি, অজুহাত হয়েছে মন্দার। প্রাইস-ইন্ডেক্স গত বছরের তুলনায় দ্বিগুণ হয়েছে অথচ শ্রমিকদের বেতনবৃদ্ধির দাবি করাটা মালিকপক্ষ কেন কিছুতেই সহ্য করতে পারছে না। কয়েক বছর আগেও শ্রমিকদের যেটুকু ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার স্বীকার করা হত, আজ সেগুলিকে অস্বীকার করার প্রবণতা বেড়ে গেছে এবং এই বিষয়ে এরা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে প্রশ্রয়ই পেয়ে এসেছে। এখন বন্ধ কারখানাগুলি খোলবার ব্যাপারে রাজ্যপাল কতদূর কি করতে পারবেন সেটা অবশ্যই একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। বস্তুত কর্তৃপক্ষের স্বৈরাচার আজ কি পর্যায়ে পৌঁচেছে সেটি আমরা কয়েকটি উদাহরণের সাহায্যে দেখাচ্ছি।

কাশীপুর গান এণ্ড শেল ফ্যাক্টরী

গত সোমবার ৪ঠা মার্চ কাশীপুর গান এণ্ড শেল ফ্যাক্টরীর দুজন কর্মীর উপর সাময়িক বরখাস্তের নোটিশ জারি

হওয়ায় সারাদিন কারখানার অভ্যন্তরে তুমুল শ্রমিক বিক্ষোভ চলে এবং সন্ধ্যার পর কর্তৃপক্ষ লক আউট ঘোষণা করে কারখানার ভার সামরিক বাহিনীর হাতে তুলে দেন। ক্যান্টিনে খাদ্য সরবরাহের ব্যাপার নিয়ে গোলযোগের সূত্রপাত হয়। খাদ্য সরবরাহের ব্যাপারে শ্রমিক কর্মচারিগণ ক্ষোভ প্রকাশ করলে কর্তৃপক্ষ তাদের দুজনের উপর বরখাস্তের নোটিশ জারি করেন। এই ঘটনার পর কারখানার শ্রমিক কর্মচারিগণ কারখানার মধ্যেই নোটিশ-প্রত্যাহারের দাবিতে বিক্ষোভ জানাতে থাকেন। সন্ধ্যার পর কর্তৃপক্ষ মিলিটারী তলব করেন এবং পুনরাদেশ না হওয়া পর্যন্ত কারখানার লক আউট ঘোষণা করে নোটিশ টাঙিয়ে দেন। অবশ্য পরে অবস্থার কিছু পরিবর্তন হয়েছে। ডিরেক্টর জেনারেল অফ অর্ডিনান্সের উপস্থিতিতে ইউনিয়নের নেতাদের সঙ্গে এক উচ্চ পর্যায়ের আলোচনার পর আবার কারখানা চালু করার সিদ্ধান্ত করা হয়েছে। বর্তমান ঘটনাটি কর্তৃপক্ষের স্বৈরাচারের একটি নগ্ন দৃষ্টান্ত। এটি কোন শ্রমবিরোধেরও ঘটনা নয়। অতি তুচ্ছ ঘটনার ভিত্তিতেও লক আউট ঘোষণার এই দৃষ্টান্তটি শ্রমিকদের প্রতি যে মনোভাবের পরিচয় দিচ্ছে তা মোটেই সুস্থ দৃষ্টিভঙ্গি নয় এবং এই দৃষ্টিভঙ্গিই আজ সর্বত্র।

বার্ন কোম্পানী

হাওড়ার বার্ন কোম্পানীর মালিকেরা গত সেপ্টেম্বর মাস থেকে অর্থাৎ যুক্তফ্রন্টের আমলে কারখানার লক আউট ঘোষণা করেন। এই কারখানায় শ্রমিক সংখ্যা হল সাড়ে আট হাজার। বোনাস সংক্রান্ত বিরোধে শ্রমিকেরা ধর্মঘট করলে এই কারখানায় লক আউট ঘোষণা করা হয়। এটি অবশ্য একটি শ্রমবিরোধের ঘটনা। তবে নিছক শ্রমবিরোধই বার্ন কোম্পানীর লক আউটের কারণ নয়। কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ বাইরের কোন অর্ডার না পাওয়ার অজুহাতে তিন হাজার শ্রমিককে কর্মচ্যুত করতে চেয়েছিলেন। এই প্রসঙ্গে লোকসভায় একটি প্রশ্নের উত্তরে কেন্দ্রীয় শ্রমমন্ত্রী শ্রী জে এল হাতী জানিয়েছেন যে, অর্ডার ও আর্থিক সাহায্যের প্রশ্ন বিবেচনা করা যেতে পারে, কিন্তু লোক ছাঁটাই-ই আসল বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। তিনি এটাও স্বীকার করেছেন যে, কারখানা বন্ধ করে রাখা কর্তৃপক্ষের উচিত হয় নি। ব্যাপারটি বিশ্লেষণ করলে যে কটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে ওঠে তার মধ্যে মালিকপক্ষের সুবিধাবাদী মনোভাব ছাড়া আর কিছুই খুঁজে পাওয়া যায় না। প্রথমত শ্রমিকেরা বোনাস বৃদ্ধির দাবি জানিয়েছিলেন, কিন্তু সেই অজুহাতে লক আউট ঘোষণা করার কোন যৌক্তিকতা খুঁজে পাওয়া যায় না, কেন না পৃথিবীর সকল শিল্পপ্রধান দেশেই বোনাস প্রসঙ্গে শ্রমবিরোধের ঘটনা ঘটে। কারখানা বন্ধ করার আগে মালিকপক্ষের এটা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করার দরকার ছিল যে, শ্রমিকদের দাবিটা অযথার্থ। বোনাসটা কোন উৎকোচ নয়, শ্রম আইনের স্বীকৃত প্রদেয় বস্তু। কোম্পানী কত লাভ করেছে, তা থেকে কতটুকু ছিটেফোঁটা শ্রমিকদের দিতে চায়, শ্রমিকদের চাওয়াটি মাত্রাধিক কি না, কিসের ভিত্তিতেই বা তারা দাবি করছে, এগুলি সম্বন্ধে সুস্পষ্ট তথ্যাবলী জনসাধারণের নিকট পেশ না করা পর্যন্ত, এই সিদ্ধান্ত অনিবার্য হয়ে ওঠে যে, কোম্পানী অতিলাভের প্রেরণাতেই শ্রমিকদের ন্যায়সঙ্গত দাবি মেনে নিতে নারাজ, এবং যেহেতু নিজ অভিজ্ঞতায় কোম্পানী একথা বুঝেছে যে, শ্রমআইন লঙ্ঘন করলেও রাষ্ট্রশক্তির পক্ষে মালিকস্বার্থের বিপক্ষে যাওয়া সম্ভবপর নয়, সেই কারণেই লক আউট ঘোষণা করা হয়েছে এই আশায় যে বহুকাল কর্মচ্যুত থাকার পর পেটের জ্বালায় শ্রমিকেরা আবার মালিকপক্ষের চরণে দাসখত লিখে কাজে যোগদান করবে। অর্ডার না পাওয়ার অজুহাতে তিন হাজার শ্রমিককে ছাঁটাই করার পিছনেও কোন যৌক্তিকতা খুঁজে পাওয়া যায় না, অর্ডার না পাওয়ার দোষটা নিশ্চয়ই শ্রমিকের নয়, উৎপাদিত পণ্যের উৎকর্ষের অভাবই তার কারণ। এই উৎকর্ষের অভাবের জন্য দায়ী আমাদের শিল্পপতিদের অতি মুনাফার প্রবণতা, এমন তো ঘটনা অনেক ঘটেছে, যেখানে প্রেরিত নমুনার সঙ্গে অর্ডার দেওয়া পণ্যের মিল হয় নি, পণ্য ফেরত পাঠানো হয়েছে, অর্ডার বাতিল করা হয়েছে। ভারতীয় পণ্য বিদেশের বাজার যে ক্রমাগত হারিয়ে ফেলছে তার জন্য দায়ী নিশ্চয়ই ভারতীয় শ্রমিক নয়। কিন্তু যেখানে মালিকগোষ্ঠী শুধুমাত্র অতি মুনাফা লোটার মনোভাব নিয়ে চলছে সেখানে শ্রমিকদেরই বলি হতে হচ্ছে, শুধু বেতনের দিক থেকেই নয়, কর্মসংস্থান বা কর্ম বজায় রাখার ক্ষেত্রেও। পশ্চিমবঙ্গে যুক্তফ্রন্ট আমলে 'যত দোষ নন্দ ঘোষ' এই দোহাই দিয়ে শ্রমিকদের ঘাড়ে যত রাজ্যের বদনাম চাপিয়ে মালিকপক্ষ যা ইচ্ছা তাই করেছে, তাদের প্রচারে বিভ্রান্ত হয়ে অনেকেই মনে করেছিলেন যে, শ্রমিকদের 'ঘেরাওই' যত অনর্থের মূল। কিন্তু পি-ডি-এফ ও শ্রীধর্মবীরের আমলে যখন অবস্থার কোন পরিবর্তন ঘটল না, তখন ব্যাপারটাকে উল্টো দিক থেকে বিচার করার সময় এসেছে।

সওদাগরী কর্মচারীদের প্রতীক ধর্মঘট

কর্মী ছাঁটাই ও অটোমেশনের প্রতিবাদে এবং শ্রমজীবীদের জন্য সংশোধিত ব্যয়সূচীর পরিবর্তনের দাবিতে বুধবার ৬ই মার্চ কলকাতার সর্বস্তরের সওদাগরী কর্মচারীরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রতীক ধর্মঘট পালন করেন। "অটোমেশন রুখতে হবে", "কর্মী ছাঁটাই চলবে না" "ন্যূনতম জীবিকার উপযোগী বেতন দিতে হবে" ইত্যাদি ধ্বনিতে ডালহৌসী স্কোয়ার ও এসপ্লানেড এলাকা মুখরিত হয়ে ওঠে। সওদাগরী কর্মচারীদের সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের দাবির প্রতি সমর্থন জানানোর জন্য সরকারী কর্মচারী, ব্যাঙ্ক ও জীবনবীমার কর্মচারিগণ ছোট বড় অসংখ্য মিছিল বার করেন। ১৪৫টি সংস্থার ৪৫ হাজার সওদাগরী কর্মচারী ছাড়াও প্রায় একশতটি অফিসের দেড় লক্ষাধিক কর্মচারী ধর্মঘটে যোগ দিয়েছিলেন। এঁদের আন্দোলনকে জোরদার করে তোলবার জন্য এইদিন অপরাহ্নে সরকারী কর্মচারী, ব্যাঙ্ক বীমার শ্রমিক কর্মচারী, রাষ্ট্রীয় সংগ্রাম সমিতি ও কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন সংস্থার শ্রমিক কর্মচারীরা মিছিল করে নেতাজী সুভাষ রোডস্থ বেঙ্গল চেম্বার অফ কমার্সের অফিসের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। কর্মচারীদের এই প্রতীক ধর্মঘট ও বিক্ষোভ মিছিল আসলে একটি আতঙ্কগ্রস্ত মনোভাবেরই প্রকাশ। বস্তুত এমন একটি অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে যাতে কেউই কর্মক্ষেত্রে নিরাপদ বোধ করছেন না। পশ্চিমবঙ্গ কর্মসংস্থানের সমস্যা যখন সবচেয়ে জরুরী তখন অটোমেশনের দ্বারা সেই সমস্যাতে জটিলতা সৃষ্টির যে চক্রান্ত চলছে এই প্রতীক ধর্মঘট তারই বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। খেয়ালখুশি মত ছাঁটাইয়ের যে হিড়িক পড়েছে, প্রতীক ধর্মঘটের দ্বারা কর্মচারীরা তার বিরুদ্ধেও প্রতিবাদ জানিয়েছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে বিগত সপ্তাহে সারা ভারতবর্ষে ব্যাঙ্ক কর্মচারীরাও অনুরূপ কারণে একদিনের জন্য প্রতীক ধর্মঘট পালন করেছেন। বস্তুত অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সরকারের ভ্রান্ত নীতির ফলাফল বর্তমান অবস্থার দ্বারা শোচনীয়ভাবে সূচিত হচ্ছে। এই সমস্যার সমাধান হয়ত অসম্ভব নয়, কিন্তু তার প্রচেষ্টার কোন পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে না।

অনাচার বন্ধ হোক

রাষ্ট্রপতির শাসন প্রবর্তিত হবার পর থেকেই পুলিশের দাপট বহুলাংশে বেড়েছে। আইন তার হাতে যে শক্তি দিয়েছে পুলিশ তার ষোল আনাই ব্যবহার করুক এতে আমাদের কোনই আপত্তি নেই। কিন্তু আপত্তি তখনই ওঠে, যখন দেখা যায় পুলিশ তার অধিকারের অপব্যবহার করছে। যদি পুলিশ তার পদকে ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ব্যবহার করে

তিনি সুন্দরী, তিনি রূপসী!
সাধনা বিউটি ক্রীম রূপসাধনায় অনন্য
সাধনা ঔষধালয়-ঢাকা
সাধনা
বিউটি
ক্রীম
SADHANA
Beauty
CREAM

তাহলে এর চেয়ে আফশোষের বিষয় আর কিছুই থাকে না। গত বুধবারের কাহিনীটির কথাই উল্লেখ করা যাক। একজন সাদা পোশাক পরিহিত পুলিশ কর্মচারী ট্রামে টিকিট কাটতে অস্বীকার করে, ফলে কণ্ডাক্টরের সঙ্গে তার বচসা হয়, যার পরিণতি শেষ পর্যন্ত অনেক দূর গড়ায় এবং সেদিন যানবাহন চলাচল ব্যবস্থা পর্যন্ত বিপর্যস্ত হয়। এই ঘটনার পর থেকেই পুলিশ আরও ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে এবং ইচ্ছাকৃতভাবে কলকাতার বিভিন্ন স্থানে ট্রাম ও রাষ্ট্রীয় পরিবহন কর্পোরেশনের কর্মীদের উপর সংঘবদ্ধভাবে হামলা চালায়। এই অত্যাচারের প্রতিবাদে রাষ্ট্রীয় পরিবহনের কর্মীরা শনিবার ৯ই মার্চ তারিখে ধর্মঘট পালন করেন। জানি না ইউনিফর্ম পরে থাকলেই পুলিশ টিকিট কাটার হাত থেকে রেহাই পায় কি না, অথবা সেই মর্মে কোন আইন আছে কি না। তথাপি এই সাদা পোশাক পরা লোকটি পুলিশ পরিচয়ে যে সুযোগের প্রত্যাশা করেছিল তা কত দূর ন্যায্য সেটা এই মুহূর্তে বিচার করা প্রয়োজন। পুলিশ শব্দেরও পুলিশ বলেই জিনিস কিনে দাম দেবে না (বড় বড় দোকানদারদের অবশ্য ঘাঁটাতে সাহস পায় না, তবে ছোটখাট দোকানদার ফেরিওয়ালাদের নিকট এটা একটা প্রতিদিনের যন্ত্রণা), ট্রেনে-বাসে-ট্রামে টিকিট কাটবে না এইরকম যে ঐতিহ্য বৃটিশ আমল থেকেই এরা গড়ে তুলেছে এর অবসান হওয়া এই মুহূর্তে প্রয়োজন। কোন সভ্যদেশের পক্ষেই পুলিশের এই আচরণ শোভন নয়। সেদিন একটি মফস্বল শহরের বাসে দেখা গেল যে, প্রায় এক ডজন পুলিশ সীটগুলিতে জাঁকিয়ে বসেছে, সবাই বিনা টিকিটের যাত্রী এবং এর ফলে যাঁরা টিকিট কেটে বাসে উঠেছেন তাঁদের সারা পথ দাঁড়িয়েই যেতে হল। সেদিন দেখি জন-পঁচিশ আসামী নিয়ে কয়েকজন পুলিশ ট্রেনে করে মহকুমা বিচারালয় অভিমুখে যাচ্ছে এবং তাদেরই মধ্যে একজন বেশ গর্বের সঙ্গে জানালো যে, অদের টিকিট দরকার হয় না, এমন কি আসামীদের জন্যও টিকিট কাটা হয় নি। অথচ নিশ্চয়ই এই আসা-যাওয়ার খরচটা বিল করে আদায় করা হবে। গত বিশ বছরে এই অনাচার সমানে চলেছে, যে নেতৃবর্গ রাজনৈতিক প্রয়োজনেই পুলিশকে ব্যবহার করেছেন তাঁদের সে নৈতিক শক্তি ছিল না এই অনাচার দমন করার। রাষ্ট্রপতির শাসনে পুলিশের এই দাপট আরও বর্ধিত হয়েছে। রাজ্যপাল শাসন দুর্গত সরকারী কর্মচারী ও পুলিশ নির্ভর। এবং সেখানে যদি পুলিশ প্রকাশ্যভাবে এইরকম স্বেচ্ছাচারী হয়ে ওঠে তাহলে তার প্রতিক্রিয়া খুবই খারাপ হবে।

আগামী নির্বাচন

বিভিন্ন সূত্র থেকে প্রকাশিত সংবাদে যা প্রকাশ পুজোর পরেই বোধ হয় সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। অবশ্য এ বিষয়ে এখনো চূড়ান্ত কিছু সিদ্ধান্ত হয় নি। আগামী ১২ই মার্চ নির্বাচন কমিশনার বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের সঙ্গে এই বিষয়ে আলোচনা করবেন, তার আগেই আমাদের বঙ্গদর্শন লেখা হয়ে যাচ্ছে, কাজেই তার ফলাফল কি হবে সে কথা এখন বলা যাচ্ছে না। আসন্ন নির্বাচনে কংগ্রেসী স্ট্র্যাটেজি কি হবে তা এখনো জানা যায় নি, ভেতরকার অন্তর্দ্বন্দ্ব কিভাবে চাপা দেওয়া হবে বা আদৌ তা সম্ভবপর হবে কি না আরও কিছুদিন অতিবাহিত না হলে তা বোঝা যাবে না। যুক্তফ্রণ্টমহলের সংবাদ এই যে, তাঁরা এবারে ঐক্যবদ্ধ হয়েই নির্বাচন সমরে অবতীর্ণ হবার পরিকল্পনা করছেন, তবে শ্রীজাহাঙ্গীর কবিরের বাংলার জাতীয় দলকে নিয়ে অসুবিধা দেখা গেছে। ভারতীয় ক্রান্তি দল (পূর্বতন বাংলা কংগ্রেস) শ্রীকবিরের জাতীয় দলকে ফ্রণ্টভুক্ত করার ঘোরতর বিরোধী। তাদের এই বিরোধিতার সমর্থনে কিছু যুক্তি থাকলেও এই বিরোধিতা যে শ্রীকবিরের প্রতি ক্রান্তি দলের, জনৈক নেতার ব্যক্তিগত আক্রোশ চরিতার্থ করার একটা আছিলা মাত্র, তা ক্রান্তি দলের হাঁড়ির খবর যাঁরা রাখেন, তাঁদের কারো অজানা নয়।

যুক্তফ্রণ্টের সব দলই জাতীয় দলকে ফ্রণ্টভুক্ত করার ইচ্ছা প্রকাশ করায় ক্রান্তি দল শেষ অস্ত্র প্রয়োগ করেছে, জাতীয় দলকে গ্রহণ করলে ক্রান্তি দল যুক্তফ্রণ্ট ত্যাগ করবে—এই হুমকিতে কাজ হাসিল করা সম্ভব হয়েছে। কারণ জাতীয় দলের জন্য ক্রান্তি দল এবং ক্রান্তি দলের তথা যুক্তফ্রণ্টের নেতা শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায়কে ফ্রণ্টের পক্ষে পরিত্যাগ করা সম্ভব নয়।

গ্রাম-গ্রামান্তরে

কেরোসিন নেই, কেরোসিন চাই

গ্রামাঞ্চলে এখন সব চেয়ে বড় সমস্যা দাঁড়িয়েছে কেরোসিন সঙ্কট। বাংলাদেশে বোধহয় এমন কোন গ্রাম নেই যেখানে এ সঙ্কট নেই। সহরে বিদ্যুতের আলো আছে, কেরোসিন না হলেও কাজকর্ম চালিয়ে নেবার উপায় আছে। কিন্তু গ্রামের অসুবিধে বুঝবে কে? মাথার ওপর স্কুল ফাইন্যাল, হায়ার সেকেন্ডারী পরীক্ষা, গ্রামের হাজার হাজার ছেলেমেয়ে এবার পরীক্ষা দেবে, কিন্তু কেরোসিনের অভাবে রাতে পড়াশুনা একেবারে বন্ধ। তারা ফেল করলে দায়ী কে হবে? অথচ একটু খুঁজলেই তেল পাওয়া যাবে—১·৫০ টাকা, দু' টাকা, এমন কি ২·৫০ টাকা পর্যন্ত লিটার। কালোবাজারীদের শায়েস্তা করতে সরকার না কি উঠে পড়ে লেগেছেন, কেরোসিনের কালোবাজারীদের একটিরও টিকি ধরে সরকার নেড়েছেন বলে কোন খবর নেই।

হাটবাজার থেকে চাল উধাও

চাল নিয়ে চালাকীর খেল্ আবার সুরু হয়েছে। রাষ্ট্রপতির শাসন কায়েম হবার পর সব জেলাতেই চালের দর বেশ কমেছিল; বীরভূম, পুরুলিয়ার কোন কোন গ্রামে এক টাকা কে জির নিচে চাল বিক্রি হতে দেখে অনেকেই আশা করেছিলেন সব খাদ্যের দামই এবার কমবে, কমে নি যে তা বলবো না। কিন্তু দুদিন যেতে না যেতেই বোধহয় ব্যাপারীরা সরকারের কড়াকড়ি শাসনের ছিদ্র খুঁজে নিয়েছে: সেই ছিদ্র দিয়ে প্রথমেই সুরু হয়েছে চাল পাচার। গ্রামের যে সব হাটে বস্তা বস্তা চাল বিক্রি হচ্ছিল হঠাৎ রাতারাতি সেসব চালের বস্তা হাওয়া;—হাটবাজার হ'ল চাল শূন্য। সুন্দরবন, রায়গঞ্জ, শেওড়াফুলি, করিমপুর, শান্তিপুর, পুরুলিয়া, পলাশী, বহরমপুর, চণ্ডীতলা, মেখলীগঞ্জ, কৃষ্ণনগর, কাটোয়া ও কালনার বহু গ্রাম থেকে খবর আসছে—চাল উধাও হয়ে যাচ্ছে।

আলুর তীর্থযাত্রা

চালের সঙ্গে সঙ্গে আলুও তীর্থযাত্রা সুরু করেছে। তীর্থ হ'ল ঐ ঠাণ্ডা গুদাম। হাটেবাজারে আলুর দর চড়ে চড়ুক, লোকে খেতে পাক না পাক কিছু এসে যায় না—আলু গুদামজাত করতে হবে; লোকের যখন খুব অসময় হবে, সব জিনিসের দাম চড়া হবে সেই সময় ছাড়লেই চলবে—দাম—দু' টাকা, তিন টাকা—যা খুশি করলেই হল; সরকারের কড়া-শাসনকে ওরা চেনে; তা না হলে যে সময় আলুর দর ২৫ থেকে ৩০ পয়সা কে জির মধ্যে থাকা উচিত, সে সময় দর উঠেছে ৭৫ থেকে ৮৫ পয়সা! তেলের দাম ৩·৩০-এ কোন কোন গাঁয়ে নেমেছিল এখন আবার ৪৲ টাকায় উঠে দাঁড়িয়েছে। চিনি সেই যে ৪৲ টাকায় উঠেছে নামবার কোন নামই নেই।

হাটবাজারের হাল

বিয়ের লগ্নসা বাদ দিলে হাটে-বাজারে মাছ অঢেল; কিন্তু দাম কলকাতাতেও যা দূর-দূরান্তের গ্রামের হাটেবাজারেও তাই। ভাবতে বা শুনতে আশ্চর্য লাগে কলকাতা থেকে এত দূরে নিভৃত পল্লীর হাটবাজারে সব জিনিসের দাম এত আক্রা কেন? কারণ আর কিছু নয় ফড়েদের উৎপাত। আগে চাষীরা নিজেদের পয়সা নিয়ে হাটেবাজারে কেনা-বেচার জন্যে যেতো। আজকাল আর প্রায় যেতেই হয় না; ফড়েরা এসে বজরা সুদ্ধ মাল নিয়ে চলে যায়—চড়া দামে বাজারে বেচে। পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, বিষ্ণুপুর, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ, সিউড়ি, সাঁইথিয়া বোলপুর প্রভৃতি বাংলা দেশের সহর বা হাটে যান; সর্বত্রই এই দৃশ্য চোখে পড়বে। কাছাকাছি গ্রামের ফসলের চেয়ে চালানী আনাজ-কোনাজে মফস্বলের হাটবাজার সরগরম; মাছও আসে অনেক হাত ডিঙিয়ে ট্রেনে, ট্রাকে, বাসে। কাজেই দর কলকাতা আর মফস্বলে বিশেষ কোন তফাৎ নেই, বরং কলকাতায় অনেক জিনিসের দাম তুলনায় সস্তা। গ্রাম থেকে প্রতিদিন বহু লোক চাকরি করতে কলকাতা বা কাছাকাছি শহরে যান, ফেরার সময় বাজার করে নিয়ে আসেন। তাঁদের মুখে শুনেছি গ্রামের হাটবাজারের চেয়ে কলকাতায় সস্তা।

সীমান্তের গাঁয়ের দিকে একটু তাকান

পূর্ব পাকিস্তান সীমান্তের অবস্থা যা দাঁড়িয়েছে তাতে বলা যেতে পারে মানুষের ধন-প্রাণ এখন আর নিরাপদ মোটেই নয়। যখন-তখন পাকিস্তানী দুর্বৃত্তরা ভারতীয় এলাকায় ঢুকে পড়ছে, যা সামনে পাচ্ছে লুটপাট করে নিয়ে ফিরে যাচ্ছে। বোধহয় এমন দিন যায় না, যেদিন গরু চুরি হয় না। গত তিন-চার মাসে কয়েক হাজার গরু পাকিস্তানীরা টেনে নিয়ে গেছে—আর তাদের এ অপকর্মে হাত বাড়িয়ে সহযোগিতা করছে সীমান্তের গ্রামে বসবাসকারী কিছুসংখ্যক পাকিস্তানী মনোবৃত্তিসম্পন্ন ভারতীয় নাগরিক। শুধু কি গরু চুরি? প্রকাশ্য দিবালোকে মানুষ চুরি পর্যন্ত হয়ে যাচ্ছে। চারদিকে ভারতীয় সীমান্ত ফাঁড়ির জাগ্রত চোখকে ফাঁকি দিয়ে ভারতেরই ওপর দিয়ে ডাহা-গ্রামের কোন কুখ্যাত ডাকাত ও পুলিশ সেখানকার হিন্দুদের নিয়ে পাকিস্তানে চালান কিভাবে দিতে সক্ষম হল তা আজ সকলেরই বিস্ময়। এই তো সেদিন মেখলীগঞ্জের খড়খাড়িয়ায় একদল পাকিস্তানী পুলিশ ৩০০ গজ পর্যন্ত ভেতরে ঢুকে বহু গরু নিয়ে চলে গেলো, ডাহা-গ্রামের অধিবাসীদের ওপর অকথ্য নির্যাতন চালালো সাড়োহাটি অঞ্চল থেকে বস্তা বস্তা ধান-চাল পাচার করে দিলো। তাছাড়া আরও উদ্বেগজনক খবর—সীমান্তের ওপারে রংপুর, লালমণিরহাট, বাউড়া, বেরুবাড়ি, নদীয়া জেলার পাক এলাকায়, দিনাজপুরে সীমান্ত বরাবর পাক সেনার সমাবেশও সেখানকার অধিবাসীদের মনে দারুণ উদ্বেগের সঞ্চার করেছে।

—সমর চট্টোপাধ্যায়

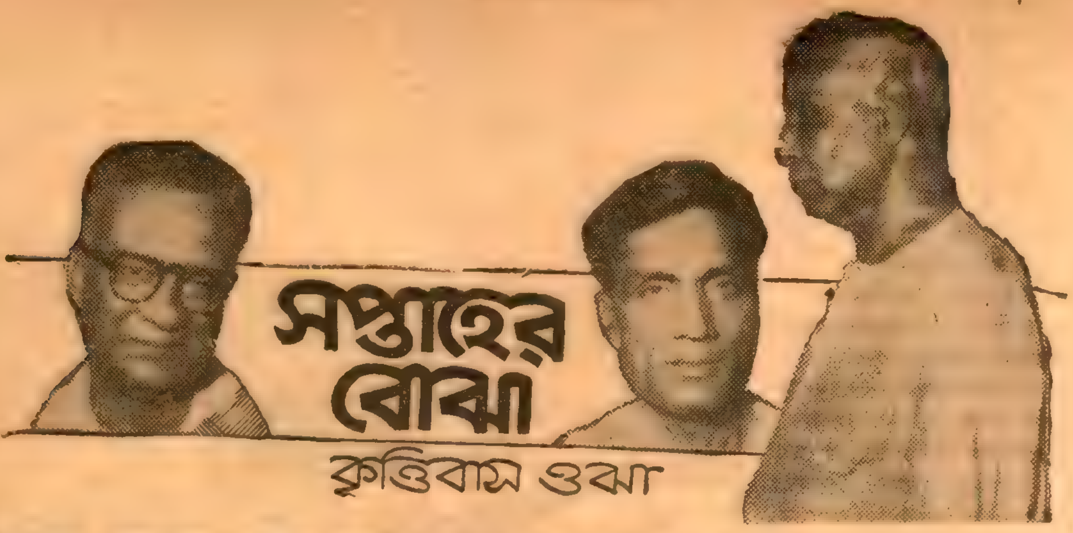

সপ্তাহের বোঝা

কৃত্তিবাস ওঝা

পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে পুনরায় ঝড়ো হাওয়া বইতে শুরু করেছে। এই রাজনীতির ঝড়ো হাওয়ায় যে ঘটনা ঘটে, তা হল ধুলো উড়ে সর্বদিক অন্ধকার করে দেয় এবং সহজে কিছু দেখা যায় না। সব সময় ভয়ে ভয়ে থাকতে হয় এই বুঝি কোন গাছ ভেঙে পড়লো, এই বুঝি কোন খড়ের চাল উড়ে গেল। বুদ্ধিমান পথিক এই সময়টা শুধু শান্তভাবে অপেক্ষা করে, কারণ অন্ধকার ধুলোপথ অতিক্রমের কোন চেষ্টা নিরাপদ নয়। গত এক বৎসরে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে যে মেঘ জমেছিল, এই ঝড় সেই মেঘেরই পরিণতি—এই কথা যে পথিকের জানা আছে তার পথে শান্তভাবে কিছু সময় অপেক্ষা করা কোন অসুবিধা সৃষ্টি করে না; কিন্তু যে পথিক এই ঝড়ের মধ্যেও তাড়াতাড়ি পথ পেরুবার চেষ্টা করে, বিপদ হয় সেই পথিককে নিয়ে। প্রায় এগার মাস দু'জন মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে দুইটি কোয়ালিশন সরকার পশ্চিমবঙ্গ শাসন করে রাজ্যের মানুষকে বুঝবার সুযোগ দিয়েছে ভবিষ্যৎ রাজ্য-শাসনভার কোন্ জাতীয় সরকারের হাতে দেওয়া নিরাপদ, কোন্ দল কিভাবে দেশ শাসন করলে রাজ্যবাসীর স্বার্থ সর্বাপেক্ষা নিরাপদ হয়। এই সত্য বুঝতে হলে এই ধুলো-ঝড়ের মুহূর্তটিতে শান্তভাবে অপেক্ষা করাই সর্বাপেক্ষা বুদ্ধিমানের কাজ।

গত এক বৎসরে পশ্চিমবঙ্গবাসী প্রায় ৪০ জন রাজনৈতিক নেতাকে প্রাক্তন মন্ত্রী এই খেতাব উপহার দিয়েছেন, আর কম করে চারটি রাজনৈতিক দলের জন্মগ্রহণ দেখেছেন। পরিবারে বহু সন্তানের বিড়ম্বিত জনকের মত রাজ্যবাসীর জীবন বিড়ম্বিত করে তুলবে এই দলগুলি এবং সেই বিড়ম্বনা শুরুও হয়েছে। **এই সপ্তাহের খাস খবর হল শ্রীজাহাঙ্গীর কবিরের জাতীয় দলকে যুক্তফ্রণ্টে গ্রহণ বা বর্জন প্রসঙ্গ। শ্রীজাহাঙ্গীর কবির ছয়জন** বিধানসভা সদস্য নিয়ে জাতীয় দল নামে একটি রাজনৈতিক দল গঠন করে আজ যুক্তফ্রণ্টের শরিক হতে চান, আর যুক্তফ্রণ্টের অন্যতম প্রধান শরিক ভারতীয় ক্রান্তি দল (প্রাক্তন বাংলা কংগ্রেস) জাতীয় দলকে যুক্তফ্রণ্টে গ্রহণ করার ঘোরতর বিরোধী। যুক্তফ্রণ্টের নিজের বেসামাল ঘরে এই নতুন সমস্যা আরো এক বাড়তি বিপদের সৃষ্টি করেছে।

শ্রীজাহাঙ্গীর কবির রাজ্যের একজন প্রবীণ রাজনৈতিক নেতা এবং তাঁর দল যত ক্ষুদ্রই হোক, যুক্তফ্রণ্টের এক দুর্দিনে সহায়তা করেছে। যুক্তফ্রণ্টের অন্যান্য দলপতিদের সঙ্গে শ্রীকবিরের সম্পর্ক ভাল। এই অবস্থায় অনেকেই চান শ্রীকবিরের দল যুক্তফ্রণ্টের শরিক হোক কিন্তু তার জন্য আবার শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায়ের ক্রান্তি দলকে ত্যাগ বা অখুশি করা সম্ভব নয়। এই যে জটিল পরিস্থিতি এর সমাধান এই মুহূর্তে যে সূত্রে হোক না কেন, ভবিষ্যতে এর অনেক জের চলবে। এই সম্পর্কে অনেক কথাই আছে যেগুলি গত দু-এক বৎসরে ঘটে গেছে এবং আমরা তা অনেকেই ভুলতে বসেছি।

পশ্চিম বাংলায় কংগ্রেসের মধ্যে গোষ্ঠীতন্ত্র-বিরোধী যে গোষ্ঠী দীর্ঘদিন কাজ করছিল, তারই একজন নায়ক হিসাবে শ্রীজাহাঙ্গীর কবির শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে কংগ্রেস ত্যাগ করে বাংলা কংগ্রেস গঠনে যুক্ত হন। রাজ্যে যুক্তফ্রণ্ট সরকার গঠিত হবার পর শ্রীকবিরের সঙ্গে বাংলা কংগ্রেস সম্পাদক শ্রীসুশীল ধাড়ার মতান্তর শুরু হয় এবং ১৯৬৭ সালের জুলাই মাস থেকে যুক্তফ্রণ্টের অভ্যন্তরে কম্যুনিস্ট-বিরোধী উপদলে শ্রীকবির একজন প্রভাবশালী নেতা হিসেবে কাজ করেন। ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ ১৯৬৭ সালের ২৬শে জুলাই যখন একবার যুক্তফ্রণ্ট ত্যাগ ও মন্ত্রিসভার পতন ঘটাতে উদ্যোগী হন, তখন পি. জি. হাসপাতালে শয্যাশায়ী অবস্থায় থেকে শ্রীগঙ্গাধর প্রামাণিকের সহায়তায় শ্রীকবির ডঃ ঘোষের প্রচেষ্টা রোধ করেন। ডঃ ঘোষের সঙ্গে শ্রীকবিরের অনেক মিল ছিল সত্য, কিন্তু একটি অমিল ছিল এত বেশি যে, যে কারণে আজ ডঃ ঘোষ কংগ্রেসের সঙ্গে একাত্ম হয়ে গেছেন আর শ্রীকবির যুক্তফ্রণ্টের সঙ্গে একাত্ম হতে চাইছেন। ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ কম্যুনিস্ট বিরোধী, শ্রীকবিরও কম্যুনিস্ট বিরোধী—তবে তার চেয়ে বেশি কংগ্রেস বিরোধী। তাই ডঃ ঘোষ আজ কম্যুনিস্ট বিরোধিতা করতে যেয়ে কংগ্রেসের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছেন, কিন্তু শ্রীকবির কম্যুনিস্ট বিরোধী হয়েও নিজের কংগ্রেস বিরোধী ভূমিকা বজায় রেখেছেন।

শ্রীকবির কংগ্রেস বিরোধী বলেই ২রা অক্টোবর শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায়ের পদত্যাগ সম্পর্কিত ঘটনায় বিরক্ত হয়ে শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায়কে ত্যাগ করেছিলেন আবার ২রা নভেম্বর ডঃ ঘোষ যখন পদত্যাগ করা ঠিক করে শ্রীকবিরকে নিজের বাসায় ডেকে বলেছিলেন, 'আমি পদত্যাগ করলাম, তুমিও কর', তখন জবাবে শ্রীকবির বলেছিলেন, 'আপনি পদত্যাগ করতে চান করুন, আমি করবো কেন'। শ্রীজাহাঙ্গীর কবির সেদিন থেকে ডঃ ঘোষের সঙ্গও ত্যাগ করেছিলেন।

বাংলা জাতীয় দল প্রসঙ্গে তিনটি মত এবং কোন মতই কিন্তু ফেলনা নয়। প্রথম মত যুক্তফ্রণ্টের। যুক্তফ্রণ্ট বলছে—যুক্তফ্রণ্টের নীতি, আদর্শ ও কর্মসূচী যে দল গ্রহণ করবে, সে দলকেই যুক্তফ্রণ্ট গ্রহণ করতে পারে। তবে হ্যাঁ, শ্রীকবির তাঁর দল গঠনকালে কিছু কিছু কথা বলেছেন যেগুলি একটু বিবেচনা করা দরকার। যেমন শ্রীকবিরের বাংলার জাতীয় দল রাজ্যে একটি জাতীয় সরকার গঠনের কথা বলেছেন। এই জাতীয় সরকার হল কংগ্রেস সহ সকল দলকে সঙ্গে নিয়ে সরকার, না যুক্তফ্রণ্টের মার্কসবাদী দলগুলিকে বাদ দিয়ে জাতীয়তাবাদী দলগুলিকে নিয়ে সরকার সেটা বোঝা দরকার। জাতীয় সরকার গঠনের শ্লোগান যদি কোন দলের

আদর্শ হয়, তবে সে সম্পর্কে বলার কিছু থাকতে পারে না; কিন্তু যুক্তফ্রণ্টে থাকব আবার যুক্তফ্রণ্টের মধ্যে কোন কোন দলকে বাদ দিয়ে সরকার গঠনের চেষ্টা করব এই নীতি বরদাস্ত করা যায় না। এক দলের দুই শরিককে যুক্তফ্রণ্টে ঠাঁই দেওয়াও কোন অন্যায় নয় যুক্তফ্রণ্টের পক্ষে। যুক্তফ্রণ্টে যদি দুই কম্যুনিস্ট পার্টি থাকতে পারে, দুই ফরওয়ার্ড ব্লক থাকতে পারে, এস এস পি, পি এস পি থাকতে পারে, তবে প্রাক্তন বাংলা কংগ্রেসেরই দুই শরিক—ভারতীয় ক্রান্তি দল ও জাতীয় দল থাকতে পারবে না কেন? অতএব যুক্তফ্রণ্টে জাতীয় দলের স্থান হতে পারে। আর তাছাড়া শ্রীহুমায়ুন কবিরের বিরুদ্ধে লড়াই করতে শ্রীজাহাঙ্গীর কবির যুক্তফ্রণ্টের একটি শক্তিশালী অস্ত্র হবে।

ভারতীয় ক্রান্তি দলের বক্তব্য সম্পূর্ণ ভিন্ন সুরের। ক্রান্তি দলের নেতা শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায় ও শ্রীসুশীল ধাড়া বলছেন—দলত্যাগীদের যুক্তফ্রণ্টে ঠাঁই দেওয়া চলবে না। কারণ এই দলত্যাগীরাই প্রকৃত পক্ষে বাংলা কংগ্রেসে ভাঙনের পথ সৃষ্টি করে যুক্তফ্রণ্ট সরকারের পতন ঘটিয়েছে। যুক্তফ্রণ্টকে এবার সংগ্রাম করতে হবে একদিকে দলত্যাগীদের বিরুদ্ধে, অপরদিকে কংগ্রেসের সঙ্গে। তাছাড়া যুক্তফ্রণ্ট বরাবর বলেছে যারা দলত্যাগ করবে, তাদের বিধানসভার সদস্যপদও ত্যাগ করতে হবে। আর আজ যদি এই দলত্যাগীদেরই যুক্তফ্রণ্ট আশ্রয় দেয় তবে ভবিষ্যতে আরো দলত্যাগীকে প্রশ্রয় দিতে হবে। যুক্তফ্রণ্টের উচিত সর্বপ্রকার দলত্যাগের উৎস রোধ করা—ভবিষ্যতে দলত্যাগের প্রচেষ্টা নির্মূল করা। এই অবস্থায় একদল দলত্যাগীকে যদি সম্মানের আসন দিয়ে গ্রহণ করা হয় তবে যে দল থেকে সদস্যরা চলে গেছে, সে দলের কোন মর্যাদা থাকে না। আর তাছাড়া যে সব আসন থেকে ঐ দলত্যাগীরা নির্বাচিত হয়েছে, সে সব আসন সে-ই দলের, যে দলের নামে উক্ত সদস্যরা গতবার নির্বাচিত হয়েছে। কাজেই আজ যদি উক্ত দলকে যুক্তফ্রণ্টে গ্রহণ করা হয়, তবে ক্রান্তি দলকে অনেক দলত্যাগীর আসন ছেড়ে দিতে হবে এবং এইভাবে আসন ছাড়লে ক্রান্তি দলের ভাগে সামান্য কয়েকটি মাত্র আসনই থাকবে। ক্রান্তি দল চায় দলত্যাগীদের আসনগুলিতে এবার তারা নতুন প্রার্থী দেবে এবং কংগ্রেস ও দলত্যাগীদের বিরুদ্ধে লড়াই করবে। ব্যাপারটি সম্পূর্ণ আদর্শের, এই আদর্শের ক্ষেত্রে কোন আপোষ চলে না! আরো কথা আছে, যুক্তফ্রণ্টের অভ্যন্তরে যাঁরা একদা সংকট সৃষ্টি করেছিলেন, শ্রীজাহাঙ্গীর কবিরও তো তাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন। ডঃ ঘোষের সঙ্গে ঘোঁট পাকানো, শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায়কে একসময় মুখ্যমন্ত্রিরূপে না মানা, মন্ত্রিসভার সদস্য থেকেও নেতাকে অগ্রাহ্য করা, নেতার বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে বিবৃতি দেওয়া এবং মন্ত্রিসভার বৈঠক বর্জন করা এসব কথা পুরনো হলেও ভুলে যাওয়া চলে না।

জাতীয় দল তথা শ্রীজাহাঙ্গীর কবিরের বক্তব্যও কিন্তু কম যুক্তিপূর্ণ নয়। শ্রীকবির বলেন—দলত্যাগ আর ঘোঁট পাকানো যদি অপরাধ হয়, তবে শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায় ২রা অক্টোবর কংগ্রেসের সঙ্গে হাত মিলিয়ে যে কাজ করতে চেয়েছিলেন, তার চেয়ে বড় অপরাধ আর কি হতে পারে? আর তিনি তো যুক্তফ্রণ্ট বিরোধী কাজ করেন নি, বরং যুক্তফ্রণ্ট পরিষদ দলের সদস্য থেকে যুক্তফ্রণ্টের সব দায়িত্ব তিনি পালন করেছেন। এই সেদিনও যখন শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায় আর শ্রীজ্যোতি বসু রাজ্যপালের কাছে বিধানসভা সদস্যদের এক তালিকা পেশ করে শ্রীশঙ্করদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে নতুন সরকার গঠনের সুযোগ দেওয়ার জন্য দাবি জানিয়েছিলেন, তখন সে তালিকাটিতে তাঁরাও তো সই করেছিলেন। কংগ্রেস-পি ডি এফ কোয়ালিশন সরকারের পতন ঘটাতে তাঁরাও সাধ্যমত কাজ করেছেন। আর তাঁরা তো দলত্যাগী ন'ন। শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায় কংগ্রেস ত্যাগ করে যদি অপরাধ না করে থাকেন, তবে তিনিও বাংলা কংগ্রেস ত্যাগ করে কোন অপরাধ করেন নি। তিনি তো দলত্যাগী ন'ন, সম্পূর্ণ নতুন আদর্শে রাজ্যে একটি নতুন দল গঠন করেছেন। আদর্শের ভিত্তিতে নতুন দল গঠন কখনই দলত্যাগের চোখে দেখা সঙ্গত নয়। যাঁরা বলছেন দলত্যাগীদের ঠাঁই দেবেন না, প্রশ্রয় দেবেন না, তাঁরা কি শ্রীআশুতোষ ঘোষকে প্রশ্রয় দেন নি। কাজেই শ্রীআশুতোষ ঘোষের সঙ্গে যদি আপোষ করা যায় তবে তাঁর দলের সঙ্গে আপোষে বাধা কোথায়? তাঁর দল অথবা তিনি কি শ্রীআশুতোষ ঘোষ অপেক্ষা অপাংক্তেয়?

উপরের এই প্রশ্নগুলির মীমাংসা সহজসাধ্য নয়। আজ বাংলার জাতীয় দলকে যুক্তফ্রণ্টে গ্রহণ অথবা বর্জন করলেও ভবিষ্যতে বাংলার জাতীয় দল ও ভারতীয় ক্রান্তি দলের বিরোধ মেটানো সহজসাধ্য হবে না। আজ বাংলার জাতীয় দলকে যুক্তফ্রণ্টে গ্রহণ করলে ভবিষ্যতে জাতীয় দলের চাহিদা পূরণ করতে ক্রান্তি দল ও যুক্তফ্রণ্টকে অনেক ত্যাগ স্বীকার করতে হবে, আবার বর্জন করলে নতুন একটি শত্রুশিবির খোলায় সহায়তা করা হবে। কারণ তখন বাংলার জাতীয় দল নিশ্চয়ই রাজ্যে একটি তৃতীয় শক্তি সৃষ্টিতে তৎপর হবে এবং যে শক্তি সৃষ্টি করতে ইতিমধ্যে দিল্লীতে শ্রীহুমায়ুন কবির তৎপর হয়ে উঠেছেন। তাই যুক্তফ্রণ্ট পিছনে শত্রু রেখে যুদ্ধযাত্রা নিরাপদ মনে করে না বলেই জাতীয় দলকে ফ্রণ্টে রাখতে চায়, আবার ফ্রণ্টে রাখলেও ভবিষ্যৎ অন্তর্বিরোধের পথ প্রশস্ত হয়। (৭।৩।৬৮)

M&H M&H M&H M&H M&H M&H M&H
BI-COLATES
REGISTERED TRADE MARK
STEARNS
M&H
পিত্তরস প্রবাহ, পাকস্থলির সুষ্ঠু ক্রিয়া ও কোষ্ঠকাঠিন্য নিয়ন্ত্রণে দীর্ঘদিনের প্রশংসাধন্য একটি অব্যর্থ ঔষধ।
MARTIN & HARRIS
PRIVATE LTD.
MERCANTILE BUILDING, LALLBAZAR
CALCUTTA-1
M&H M&H M&H M&H M&H M&H M&H

অবক্তব্য

চন্দ্রগুপ্ত

ভিজে মেঘের দুপুর

বন্ধু বললেন, এরই মধ্যে আমরা জীবনানন্দকে ভুলে গেলাম, ৬ ফাল্গুন তাঁর জন্মদিন, অথচ বাংলাদেশের কোন পত্র-পত্রিকায় বা সভা-সমিতিতে সেই দিনটিকে স্মরণ করা হলো না।

আমি বললাম, জীবনানন্দের সৌভাগ্য এখনও তিনি সভাসমিতিতে সর্বজনীন তাঁর হয়ে ওঠেন নি, তিনি যে ব্যাপক উপস্থিত নামমাত্রে পর্যবসিত হন নি এটা আপনার আমার মতো জীবনানন্দ-অনুরাগীদের পক্ষেও তৃপ্তিকর।

মৃদু হেসে তিনি বললেন, জীবনানন্দের মতো নির্জন কবি অরসিক জনতার হাতে এখনও বিপর্যস্ত হন নি এটা অবশ্য আশা ও আনন্দের বিষয়।

বাড়ি ফেরার পথে ভাবছিলাম : শুধু জীবনানন্দ কেন, পৃথিবীর সব মহৎ কবিই তো নির্জন নিঃসঙ্গ, বিষাদ তাঁদের নিত্য সহচর; দৈনন্দিন সংসারে তাঁরা এমনই বেখাপ, সাধারণ মানুষের কাছে তাঁরা প্রায় প্রতি পদে নির্বোধ কিংবা দুর্বোধ—করুণার কিংবা বিরক্তির পাত্র। জীবনানন্দকে যাঁরা ঘনিষ্ঠভাবে জানতেন, তাঁদের কারো কারো কাছ থেকে কবি-এবং মানুষ-জীবনানন্দের একাত্মতার কথা শুনেছি। আজকের সভ্যশিক্ষিতদের নিয়ম-নির্দিষ্ট পথে আমাদের কবিকেও চলতে হয়েছিল ঃ জন্মস্থান বরিশালের ব্রজমোহন স্কুল ও ব্রজমোহন কলেজ এবং পরে কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে শিক্ষাগ্রহণ করেছিলেন, বিবাহ করেছিলেন, এবং সিটি কলেজ, ব্রজমোহন কলেজ, হাওড়া গার্লস কলেজ প্রভৃতি বিভিন্ন কলেজে ইংরেজি সাহিত্যে অধ্যাপনার মাধ্যমে তিনি সাংসারিক প্রয়োজন মেটাবার চেষ্টা করেছিলেন। অর্থাৎ তিনি যথাসম্ভব সাধারণ হবার চেষ্টা করেও 'নক্ষত্রের দোষে' শেষ পর্যন্ত যথেষ্ট অসাধারণ রয়ে গেলেন। কেন তিনি অসাধারণ? কারণ তিনি আদ্যন্ত কবি। আর এই বোধ কি তাঁকে কখনও আলোড়িত করে নি? 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র একটি নির্জন মুহূর্তে তিনি এই বোধের মুখোমুখী হয়েছিলেন ঃ

জন্মিয়াছে যারা এই পৃথিবীতে
সন্তানের মতো হ'য়ে—
সন্তানের জন্ম দিতে দিতে
যাহাদের কেটে গেছে অনেক সময়,
কিংবা আজ সন্তানের জন্ম দিতে হয়
যাহাদের; কিংবা যারা পৃথিবীর
বীজখেতে আসিতেছে চ'লে
জন্ম দেবে—জন্ম দেবে ব'লে;
তাদের হৃদয় আর মাথার মতন
আমার হৃদয় না কি? তাহাদের মন
আমার মনের মতো না কি?
—তবু কেন এমন একাকী?
তবু আমি এমন একাকী।
(শ্রেষ্ঠ কবিতা, ২২)

এই একাকিত্বের আনন্দ-বেদনা সারা জীবন বহন করেছেন জীবনানন্দ। দেশ-কাল পার হয়ে হাজার বছর ধরে পৃথিবীর পথে তিনি পথ হেঁটেছেন, নির্জন পথের প্রান্তে ক্লান্ততম মুহূর্তে সাক্ষাৎ পেয়েছেন আবহমান অমর্ত্য প্রেমের, মর্ত্যছায়ায় যার নাম বনলতা সেন। এই বনলতা সেন কবির অন্তরতমা, জীবনের ক্লান্ত অন্ধকার মুহূর্তগুলিতে কবির আশ্রয়। এই আশ্রয়ের শান্তি স্বল্পস্থায়ী হলেও অনুভবে অন্তহীন, দেশকাল-ধৃত হয়েও দেশ-কালোত্তর।

ক্লান্তি বিষাদ শূন্যতাবোধ জীবনানন্দ-কাব্যের মূল সুর, কবির ভাষা ধার করে বলতে ইচ্ছা হয়, তাঁর কাব্যে এরা জলের মতো ঘুরে ঘুরে একা কথা কয়। গ্রন্থের নাম, বিশিষ্ট কয়েকটি শব্দ ও শব্দবন্ধের পৌনঃপুনিক ব্যবহার, উপমা, বাক্‌প্রতিমা সমস্ত কিছুতেই কবির মনঃস্বভাব অনায়াস অনুভববেদ্য। 'ঝরা পালক', 'ধূসর পাণ্ডুলিপি', 'সাতটি তারার তিমির' বা 'মৃত্যুর আগে', 'স্বপ্নের হাতে', 'অন্ধকার', 'শব', 'হায় চিল' প্রভৃতি গ্রন্থ-ও কবিতা-নামগুলিতেই এই স্বভাবের স্বয়ংপ্রভ প্রকাশ। 'অন্ধকার' বা 'অন্ধকার'-দ্যোতক শব্দাবলী তাঁর কবিতায় অসংখ্যবার দেখা দিয়েছে, একটি কবিতায় তিনি স্পষ্টই ভোরের আলোর মূর্খ উচ্ছ্বাস আর কোটি কোটি শুয়োরের আর্তনাদের মতো রৌদ্রে আক্রান্ত পৃথিবীকে ত্রস্তভাবে এড়িয়ে অন্ধকারের কাছে আশ্রয় চাইছেন। প্রাসঙ্গিক পংক্তি ঃ

আমি অনেক দিন—অনেক অনেক দিন
অন্ধকারের সারাৎসারে অনন্ত মৃত্যুর
মতো মিশে থেকে
হঠাৎ ভোরের আলোর মূর্খ উচ্ছ্বাসে
নিজেকে পৃথিবীর জীব ব'লে
বুঝতে পেরেছি আবার;
ভয় পেয়েছি,
পেয়েছি অসীম দুর্নিবার বেদনা;
হৃদয়ের অবিরল অন্ধকারের ভিতর
সূর্যকে ডুবিয়ে ফেলে
আবার ঘুমোতে চেয়েছি আমি,
অন্ধকারের স্তনের ভিতর যোনির
ভিতরে অনন্ত মৃত্যুর মতো মিশে
থাকতে চেয়েছি।
('অন্ধকার' ঃ শ্রেষ্ঠ কবিতা, ৫৮)

আপাতদৃষ্টিতে এই অন্ধকারে মিশে থাকার আকাঙ্ক্ষা মর্বিডিটি বা এক ধরনের মানসিক অসুস্থতার পরিচায়ক। কিন্তু মনস্তত্ত্বের চূড়ান্ত বিচারে এই

মাসিক ৬০০ টাকা উপার্জন করুন

অবসর সময়ে বিশ্ব-বিখ্যাত রোমার ঘড়ির অর্ডার বুক করিয়া। বিনামূল্যে সর্তাবলী এবং স্যাম্পেল ঘড়ির জন্য পত্র লিখুন।

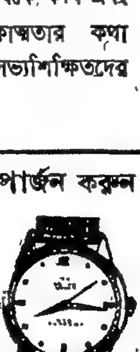

TAJCO (W B C—88)
P. Box 1383, Delhi—6.

তথাকথিত মর্বিডিটি অত্যন্ত সহজ ও স্বাভাবিক যার দ্বারা প্রত্যেক সুস্থ মানুষই তাঁর জীবনে একাধিকবার আচ্ছন্ন হন। জীবনানন্দের কাব্যের সহবেদনশীল পাঠকের পক্ষে কবির স্পর্শকাতর মনকে অনুভব করতে অসুবিধা হয় না। দৈনন্দিনের গ্লানি কুশ্রীতা অমানবিকতা কবিকে এমনই পীড়িত করেছে যে, কবির পক্ষে অন্ধকারমুখী বা স্বপ্নাতুর হওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। এই একটি নয়, অনেকগুলি কবিতাতেই কবির চোখে আজকের অমানবিক পৃথিবীর ভয়াবহ শূন্যতা নিষ্করুণ হয়ে ধরা পড়েছে। প্রমাণ :

অদ্ভুত আঁধার এক এসেছে
এ-পৃথিবীতে আজ,
যারা অন্ধ সবচেয়ে বেশি আজ
চোখে দেখে তারা;
যাদের হৃদয়ে কোনো প্রেম নেই—
প্রীতি নেই—করুণার আলোড়ন নেই
পৃথিবী অচল আজ তাদের
সুপরামর্শ ছাড়া।
যাদের গভীর আস্থা আছে
আজো মানুষের প্রতি
এখনো যাদের কাছে
স্বাভাবিক বলে মনে হয়
মহৎ সত্য বা রীতি,
কিংবা শিল্প অথবা সাধনা
শকুন ও শেয়ালের খাদ্য আজ তাদের হৃদয়।

(অদ্ভুত আঁধার এক শ্রেষ্ঠ কবিতা, পৃঃ ১৫৬)

অন্য একটি কবিতায় ('এই সব দিন-রাত্রি' : শ্রেষ্ঠ কবিতা, ১২৭—৩০) এই একই ধরনের নৈরাশ্যধূসর চিত্রের শেষে কবির প্রশ্ন : 'এ-আগুনে এত রক্ত মধ্যযুগ দেখেছে কখনো?' 'মনে হয় এর চেয়ে অন্ধকারে ডুবে' এই কবিতার শুরুতেই নিরাশানির্মম বেদনার্ত কণ্ঠ—'এর চেয়ে অন্ধকারে ডুবে যাওয়া ভালো'—শোনার পর বুঝতে অসুবিধা হয় না অন্ধকারের প্রতি জীবনানন্দের অসহায় আকর্ষণ জীবন-পলাতক না জীবনাকাঙ্ক্ষী কবির?

প্রকৃতির অন্তহীন সৌন্দর্য অকৃপণ দান আর মানুষের অমেয় স্নেহ-ভালোবাসা যে জীবনানন্দ মর্মে মর্মে অনুভব করেন কবির পাঠকের কাছে তা বিস্তারিত প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। নিসর্গ-প্রকৃতির বর্ণগন্ধ জীবনানন্দের সামগ্রিক কাব্যকৃতিতে যে-প্রত্যক্ষতায় উপস্থিত তার তুলনা বাংলা কাব্যে বিরল। এবং প্রকৃতিকে যে ভালোবাসে, সহজভাবেই মানবজীবন তার অত্যন্ত প্রিয়, জীবনানন্দের কাব্যে এই সত্যের প্রতিষ্ঠা আছে বলেই জীবনানন্দ আর যাই হোন, জীবন-পলাতক 'মর্বিড' নন। যে-সংবেদশীল সতর্ক পাঠক অন্তত একবার শুনেছেন সেই দীপ্র বলিষ্ঠ উচ্চারণ : 'মানুষের মন জানে জীবনের মানে : সকলের ভালো করে 'জীবনযাপন', তিনি কখনই জীবনানন্দকে জীবনবিমুখ অপবাদে ভূষিত করতে চাইবেন না। তিনি জানেন, জীবনের খণ্ডতায় ও বিকৃতিতে আহত হয়েই কবি লিখেছেন এমন সব কবিতা বা পংক্তিনিচয়, সাধারণ ব্যাখ্যায় সেগুলি- অসুস্থমন মর্বিড। জীবনানন্দের জীবনলিপ্সার একাধিক দৃষ্টান্তের মধ্যে অল্পবিস্তর পরিচিত – নিচের পংক্তিগুলি দিয়ে প্রসঙ্গান্তরে যাই :

মাটি-পৃথিবীর টানে, মানবজন্মের ঘরে
কখন এসেছি,
না এলেই ভালো হতো অনুভব করে;
এসে যে গভীরতর লাভ হলো
সে-সব বুঝেছি
শিশির শরীর ছুঁয়ে সমুজ্জ্বল ভোরে;
দেখেছি যা হলো হবে মানুষেব
যা হবার নয়—
শাশ্বত রাত্রির বুকে সকলি
অনন্ত সূর্যোদয়।
('সুচেতনা' : শ্রেষ্ঠ কবিতা, ৬২)

মনঃস্বভাবের মিলের জন্য স্বাভাবিকভাবেই জীবনানন্দ চন্দ্রগুপ্তের প্রিয় কবি। জীবনানন্দের কিছু কিছু কবিতা চন্দ্রগুপ্তের এবং নিশ্চয় আরও বহু পাঠকের অনেক নিঃসঙ্গ মুহূর্তে মর্মের মূল ধরে টানে। 'স্বপ্নের হাতে' 'বোধ' বা 'আট বছর আগের একদিন'-এর মতো অনন্য কবিতার বহু পংক্তি কেন অনেক সময় মনের মধ্যে অস্বস্তিকর ঢেউ তোলে সে ব্যাখ্যা মনস্তাত্ত্বিকের, কিন্তু এটুকু অনুভব করি এই পংক্তিগুলিতে বা এই কবিতাগুলিতে যে-আবহমান বিশ্ববেদনা প্রমূর্ত আমার অস্তিত্ব তারই একটি বড় অংশ। জীবনানন্দ যখন বলেন 'মাথার ভিতরে/স্বপ্ন নয়—প্রেম নয়—কোনো এক বোধ কাজ করে' কিংবা 'আরো এক বিপন্ন বিস্ময়/আমাদের অন্তর্গত রক্তের ভিতরে খেলা করে' তখন আমি অনুভব করি 'অর্থ নয় কীর্তি নয় সচ্ছলতা নয়', আমাদের রক্তান্তর্গত এই বিপন্ন বিস্ময়ই বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রূপে দেখা দেয়—কখনও গৃহত্যাগী রাজপুত্র গৌতম কখনও বা আত্মহত্যাকারী সাধাবণ পুরুষ। আজও অনন্য অতৃপ্তি দুরন্ত নিঃসঙ্গতার জন্যই মানুষ ব্যাখ্যাতীত মানুষ, নির্মন যন্ত্র নয়। এবং জীবনানন্দ সেই অপরূপ মানুষের কবি।

মানুষের এই অনন্য অতৃপ্তি ও দুরন্ত নিঃসঙ্গতা জীবনানন্দের কবিতায় সবচাইতে অনুভববেদ্যরূপে পাই বলে জীবনানন্দ আমাদের প্রিয় কবি। এই অতৃপ্তি ও নিঃসঙ্গতা থেকে যে-কান্নার জন্ম, তাও মানবজন্মের মতোই পুরোনো ও আবহমান। বাংলা সাহিত্যের একটি শ্রেষ্ঠ নিটোল লিরিকে জীবনানন্দের 'হায় চিল' কবিতায়—অন্তহীন এই কান্না চিরদিনের মত বাণীবন্ধ হযে আছে :

'হায চিল সোনালি ডানাব চিল,
এই ভিজে মেঘের দুপুরে
তুমি আর উড়ে উড়ে কেঁদো নাকো
ধানসিঁড়ি নদীটিব পাশে!
তোমার কান্নার সুরে বেতের ফলের মতো
তার ম্লান চোখ মনে আসে;
পৃথিবীর রাঙা রাজকন্যাদের মতো
সে যে রূপ নিযে চলে গেছে দূরে;
আবার তাহারে কেন ডেকে আনো?
কে হায় হৃদয় খুঁড়ে
বেদনা জাগাতে ভালোবাসে!
হায় চিল, সোনালি ডানার চিল,
এই ভিজে মেঘের দুপুরে
তুমি আর উড়ে উড়ে কেঁদো নাকো
ধানসিঁড়ি নদীটির পাশে॥

'ভিজে মেঘের দুপুব' আমাদের প্রত্যেকের জীবনে অসীম সত্য অথচ বাঙালী পাঠক এ-দুপুর একবারই দেখতে পেয়েছে। সেই অনন্যপূর্ব ভিজে মেঘের দুপুব কবির কবিতা না কি জীবনানন্দ স্বয়ং?

ডাক্তার হউন

ডাকযোগে হোমিওপ্যাথী শিক্ষা করিয়া এম, ডি, এইচ, ডিপ্লোমা লাভ করুন। বিনামূল্যে প্রসপেক্টাস পাইবার জন্য লিখুন—

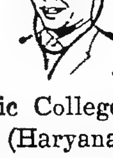

Hind Homeopathic College
(WBM) Sonepat (Haryana)

ভারতদর্শন

একফোঁটা এক দ্বীপ

একফোঁটা এক দ্বীপ ছিল ভারত-সিংহলের মধ্যবর্তী এক প্রণালীর জলরাশির মধ্যে নিশ্চিন্তে মাথা তুলে। জনমনিষ্যি নেই, আছে কাঁটাঝোপ। রক্ষণাবেক্ষণের দায়দায়িত্ব নেই, আছে দ্বীপের মালিকানা নিয়ে দুই রাষ্ট্রের বাক্যদ্বন্দ্ব। প্রায় অর্ধ শতাব্দীকাল এই বাক্যদ্বন্দ্ব চলে আসছে ভারত আর সিংহলের মধ্যে। এ বলে দ্বীপ আমার, ও বলে, মালিক আমি। দ্বীপের নাম, কচ্ছতিভু। দ্বীপের শরীর দৈর্ঘ্যে মাইলটাক প্রস্থে আরও পাঁচ ভাগের এক ভাগ। এ হেন দ্বীপ নিয়ে কথা।

সিংহলের প্রধানমন্ত্রী শ্রীযুত ডাডলে সেনানায়ক সম্প্রতি ভারতীয় হাই কমিশনারকে বলেছেন, দ্বীপের স্বত্বাধিকারী সিংহলবাসী। এদিকে ভারতের দাবি, কচ্ছতিভু ছিল বর্তমান মাদ্রাজ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত রামনাদের রাজার জমিদারীভুক্ত। সেই সূত্রে এ দ্বীপের মালিকানা অবশ্যই ভারতের। ভারত সরকার সেই ১৯২১ সাল থেকে এই নিয়ে বাক্যালাপ চালিয়ে আসছেন। স্বাধীন ভারত উক্ত দাবি পেশ করেছিল ১৯৫৬ সালে। বর্তমানে দাবি ও পাল্টা দাবির উত্তাপ লোকসভায় ব্যস্ত বাকান্তরের সৃষ্টি করেছে।

ভারতের প্রধানমন্ত্রী উক্ত বিষয়ে সিংহলের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশে আলোচনা হবে বলে যে আশা প্রকাশ করেছেন, তামাম ভারতবাসী সেইমত আশা রাখেন। সিংহলের সঙ্গে ভারতের বন্ধুত্ব মাঝে মধ্যে বৈষয়িক কারণে হয়ত চিড় খেয়েছে, কিন্তু প্রতিবেশিনীসুলভ সে কোন্দল কখনো দীর্ঘস্থায়ী হয় নি। ওটা বসবাসজনিত প্রাকৃতিক নিয়মেই হয়েছে আবার মিটেও গেছে। কচ্ছতিভুর বিতর্কও শান্ত পরিবেশে মিটে যাবে, এই আশা ভারতের মতো সিংহলীরাও পোষণ করেন।

সিংহলের দাবি, সেন্ট অ্যান্টনির গির্জা নিয়ে। পঞ্চাশ বছর ধরে ঐ গির্জাটি নাকি সিংহলের জাফনার বিশপের কর্তৃত্বাধীনে আছে। সেন্ট অ্যান্টনির উৎসবের সময় সিংহলের শুল্ক বিভাগীয় কর্মচারীরাও নাকি কচ্ছতিভু দ্বীপে টহলদারি করে থাকেন। বছরে একবার এই উৎসব মেলা হয়।

কিন্তু সে উৎসবে সিংহলের মতো ভারতের ক্যাথলিক সম্প্রদায়ও ঐ ছোট্ট দ্বীপে তীর্থ করতে যান। উভয় দেশের এই তীর্থপর্যটনে এখনো পর্যন্ত কোন তরফ থেকেই অবশ্য কোনো বাধানিষেধ আরোপিত হয় নি।

এই তর্কের অবসান আলোচনার মাধ্যমেই সম্ভব, এবং সেই শুভ ইচ্ছা দু'তরফেই আছে। উভয় দেশের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের একটি বৈঠকেও প্রস্তাবিত হয়েছে। এই বসতিহীন ক্ষুদ্র দ্বীপের সমস্যা বৈঠকেই একটা সমাধান খুঁজে পাবে, মৈত্রীভাবাপন্ন দুই দেশের নাগরিকগণ সেটাই আন্তরিকভাবে কামনা করেন।

দুষ্ট সেনা

'ভারতদর্শন' আলোচনায় বারম্বার আমরা একটি বিষয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে আসছিলাম। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ক্ষুদ্র আঞ্চলিকতাবাদী এক-একটি ক্ষিপ্ত সংস্থার উত্থানে ভারতের এক জাতি এক প্রাণ একতার স্বপ্ন বিধ্বস্ত হতে চলেছে। অথচ রাজনৈতিক স্বার্থে এইসব ক্ষুদ্র স্বার্থান্বেষীদের ঠেকিয়ে রাখার জন্য শক্তি প্রয়োগ দূরের কথা, ক্ষমতাসীন জাতীয়তাবাদী কংগ্রেসদলও তাঁদের উৎসাহ এবং অভয় দান করে গেছেন বলে অভিযোগ। আমরা বলেছিলাম, এঁদের বাড়তে দিলে পরবর্তী আঘাত সামগ্রিকভাবে ভারতের স্বার্থেরই পরিপন্থী হয়ে দাঁড়াবে।

বোম্বাই-এ নির্বাচনী ডামাডোলে ভি কে কৃষ্ণমেনন-বিরোধী রাজনৈতিক স্বার্থ সেদিন সাময়িক লাভের আশায় আঞ্চলিকতাবাদের গরম মনোভাবে ইন্ধন যুগিয়ে শিব সেনার সেনাপতি বাল ঠাকরেকে হিরো বানিয়েছিলেন। মহারাষ্ট্রে অ-মহারাষ্ট্রীয়, বিশেষত দক্ষিণ ভারতীয় বিতাড়নের প্রকাশ্য তাণ্ডব অবাধ উচ্ছৃঙ্খলতায় উন্মত্ত হয়ে ওঠার সুযোগ পেয়েছিল। অভিযোগ, এই বাড়াবাড়ির জন্য স্থানীয় পুলিশ এবং প্রভাবশালী স্থানীয় কংগ্রেসী নেতাদের দায়িত্ব ছিল।

আসামে লাচিত সেনার সাম্প্রতিক কার্যকলাপ উত্তরোত্তর ভীতিপ্রদ হয়ে উঠেছে। লাচিত সেনার বিচ্ছিন্নতাবাদী চিন্তায় অতঃপর স্বয়ং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পর্যন্ত উদ্বেগ বোধ করতে সুরু করেছেন।

লোকসভায় উঠতি-সেনাদের কার্যকলাপে উদ্বেগ প্রকাশ করা হলে শ্রীচাবন ঐসব সংস্থাকে 'প্রতিক্রিয়াশীল ও ক্ষতিকারক' বলে বর্ণনা করেছেন। বিশেষত লাচিত সেনাকে (আসাম) তিনি বিচ্ছিন্নতাবাদী চিন্তার বাহক বলে চিহ্নিত করতেও দ্বিধা করেন নি। শ্রীচ্যবন বলেছেন, দেশের কোনো অংশকে ভারতবর্ষ থেকে বিচ্ছিন্ন করার চেষ্টা করছে এই মর্মে মহারাষ্ট্রের শিব সেনার বিরুদ্ধে কোনো প্রমাণ নেই। কিন্তু আসামের লাচিত সেনা প্রচারের মাধ্যমে এই ব্যাপারে প্রকাশ্য প্ররোচনা দান করছে।

তিনি অভয় দিয়ে বলেছেন মহারাষ্ট্রে দক্ষিণীদের নিরাপত্তার গ্যারান্টি তিনি নিজেই রইলেন। আসামে অন-অসমীয়া বিদ্বেষী লাচিত সেনার বিরুদ্ধে কী ব্যবস্থা অবলম্বন করা যায় আসাম সরকার তা পর্যালোচনা করে দেখছেন বা আসাম সরকার যে লাচিত সেনার বিরুদ্ধে কোনরূপ ব্যবস্থা গ্রহণে নারাজ একথা সত্য নয়।

জাতীয়তাবিরোধী আঞ্চলিক ভেদবুদ্ধির দ্বারা লালিত এই ধরণের ক্ষুদ্র সংস্থাগুলি রাতারাতি কেমন করে শহর নগর গ্রাম তছনছ করার মতো শক্তি অর্জন করে, কেনই বা এদের প্রকাশ্য মারমুখী অভিযানে লাঠি-গুলী, বর্ষণে অকৃপণ ভারতীয় পুলিশবাহিনী অকস্মাৎ নীরব দর্শকে পরিণত হয়, কেনই বা ঐ সব সময় রাজ্যের প্রশাসনিক যন্ত্র বানপ্রস্থ গ্রহণ করেছে বলে ভ্রম হয় তার অবশ্য সন্তোষজনক ব্যাখ্যা শ্রীযুত চ্যবন রাখতে পারেন নি।

বিগত নির্বাচনের অব্যবহিত পূর্বকাল থেকে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে এক শ্রেণীর গুণ্ডামী কোনো অলক্ষ্য শক্তির প্রশ্রয়পুষ্ট হয়ে অবাধে লালিত হচ্ছে, ঘটনাপরম্পরায় তার যথেষ্ট সাক্ষ্যপ্রমাণও পাওয়া গেছে। যেখানে সেনাবাহিনী নেই, সেখানেও গুণ্ডাবাহিনী সক্রিয় আছে। এরা প্রকাশ্য রাজপথে স্টেনগান নিয়ে হাজির হচ্ছে, ছুরিকাঘাত করছে, বোমা ফাটাচ্ছে, কিম্বা মিছিল করে যেতে যেতে হঠাৎ রোষবশত চলন্ত ট্রাম-বাসের যাত্রী নামিয়ে মারপিট করছে। মোট কথা, রাজনৈতিক পাপচক্রে পুষ্ট কতিপয় দল দেশে অরাজকতার সৃষ্টি করছে আর অনেক ক্ষেত্রেই সরকার ও তথাকথিত সান্ত্রীবাহিনী আছেন নীরব দর্শকের ভূমিকায়। নাগরিকদের প্রতি প্রাণ ও সম্পত্তিরক্ষার সাংবিধানিক প্রতিশ্রুতি অবহেলায় লাঞ্ছিত হচ্ছে। এই অবস্থা চলতে দেওয়া অনুচিত যে কোনো

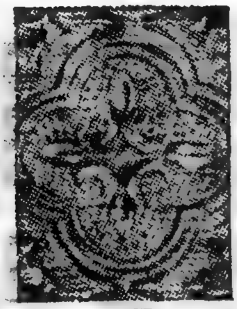

মরেস্ক

আজকালকার স্থপতিরা গৃহনির্মাণে এইচ পি জি গ্লাস ব্যবহার করেন

আজকের দিনের বাড়ীঘর ও অফিস-কাছারি, কলকারখানা, স্কুল ও হাসপাতালে সুদক্ষ ইঞ্জিনিয়াররা সর্বদাই এইচ পি জি গ্লাস লাগান, কেননা তাঁরা জানেন যে এইচ পি জি গ্লাস উৎকর্ষের নিখুঁত মান বজায় রেখে তৈরী হয়। বিলাতের শতাধিক বৎসরের কাঁচনির্মাণকারী প্রতিষ্ঠান পিলকিংটন ব্রাদার্স-এর কারিগরী কুশলতার সাহায্য নিয়ে হিন্দুস্থান পিলকিংটন গ্লাস ওয়ার্কস এই এইচ পি জি গ্লাস তৈরী করেন।

এইচ পি জি কেনা মানেই নির্ভরযোগ্য ভাল জিনিস কেনা।

হিন্দুস্থান পিলকিংটন গ্লাস ওয়ার্কস লিমিটেড

হেক্সাগোনাল ওয়্যারড

স্ট্যারো রীডেড

শীট গ্লাস

সরকো পিনহেড

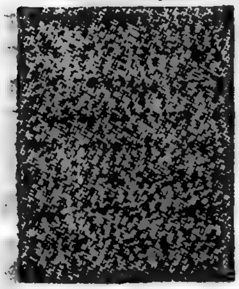

জর্জিয়ান ওয়্যারড

রাফকাস্ট

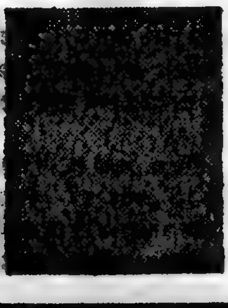

হ্যামার্ড

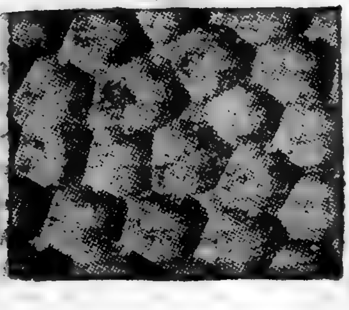

ম্যানেজিং এজেন্টস
ডানুকদার ল' অ্যাণ্ড কোম্পানী প্রাইভেট লিমিটেড
হিন্দুস্থান বিল্ডিং
৪, চিত্তরঞ্জন অ্যাভেনিউ
কলিকাতা-১৩

JWTHP 1778A

দূরদৃষ্টিসম্পন্ন রাজনীতিবিদই তা স্বীকার করবেন। কেন না শয়তান শেষ পর্যন্ত প্রভুর ওপরেই চড়াও হয়। কিন্তু এই অবস্থা বর্তমান রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে অবশ্যম্ভাবী এমন কথাও হয়ত কেউ কেউ নিম্নকণ্ঠে বলবেন।

বিগত নির্বাচনের পর একটি নিশ্চিন্ত ক্ষমতাচক্র আবহমানের অনায়াসলব্ধ প্রশান্তি থেকে বঞ্চিত হয়েছেন এবং অপর কোনো কোনো চক্র সেই ক্ষমতা করায়ত্তের স্বপ্ন দেখছেন। যদিও গণতন্ত্রে সেটাই স্বাভাবিক এবং স্বাস্থ্যকর এবং ইংলণ্ডের মতো গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের রাজনৈতিক স্পোর্টসম্যান স্পিরিটের দিকে তাকালে সেই স্বাস্থ্যের প্রত্যক্ষ পরিচয়ও মেলে। কিন্তু ভারতের অবস্থাটা অন্যরকম। গণতন্ত্রের প্রথম পাঠও আজও আমাদের আত্মস্থ হয় নি। সামন্ততান্ত্রিক দেশীয় কাঠামোও বিদেশী রাজতান্ত্রিক শক্তির শাসন প্রত্যাহৃত হলে, কংগ্রেস ক্রমান্বয়ে শাসনক্ষমতা অধিকার করায় দেশের গণতান্ত্রিক স্বাস্থ্যের শ্রীবৃদ্ধি ঘটে নি। কংগ্রেসের এক শ্রেণীর নেতা দেশের মাটিকে জমিদারসুলভ মালিকানার দৃষ্টিতেই দেখতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন। সুতরাং প্রকৃত গণমুক্তি সেই অর্থে হয় নি। শক্তি হাত বদলের সময় যে রাজনৈতিক গুণ্ডামীর দেখা পাওয়া যায়, বিগত নির্বাচনের পর থেকেই আমরা যেন তারই আভাস পাচ্ছি। গণতান্ত্রিক ভারতে এ হেন গুণ্ডামী লজ্জাকর অসুস্থতার লক্ষণ। অথচ এই সব লক্ষণ অবাধে গোকুলে বাড়ছে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সম্প্রতি অভয়বাণী দান করেছেন এই মর্মে যে, অতঃপর এই সব গজিয়ে-ওঠা সেনাদের উৎপাত যাতে বন্ধ হয়, কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকার সেদিকে লক্ষ্য রাখবেন।

কেউ কেউ বলতে পারেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর অভয়বাণীতে পূর্ণ আস্থা রাখা কি সম্ভব! যখন প্রয়োজন প্রশাসনযন্ত্র নিষ্ক্রিয়ভাবে এঁদের বাড়তে দেবে, কাজ হাসিল হলে চোখ রাঙাবে দুটো ব্যাপার তো এক তালে চলে না। গুণ্ডামীকে অঙ্কুরে বিনাশের ব্যবস্থা করাই যেখানে উচিত সেখানে গুণ্ডাবাহিনীর পত্তনের পর মন্ত্রীমহোদয়দের এই সব বিবৃতির মূল্য প্রায় নাস্তি।

আসামে সম্প্রতি যে কাণ্ড হয়ে গেছে তাতে লজ্জিত হয়ে আসাম সরকারের পদত্যাগ করা উচিত ছিল। কিম্বা ল' এণ্ড অর্ডার সম্পর্কে অতি-সচেতন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সেখানে কেন্দ্রীয় হস্তক্ষেপের প্রয়োজন স্বাভাবিকভাবেই অনুভব করতে পারতেন। সে সব কিছুই হয় নি।

সুতরাং সব ব্যাপারটাই সাজানো এবং অস্বাভাবিক ঠেকে। সেজন্য নাগরিক নিরাপত্তার ব্যাপারে বর্তমান শাসকদের ওপর ভারতের সাধারণ মানুষ সত্যিই কি নির্ভর করতে পারেন! তাঁদের জীবন ও সম্পত্তি সম্পর্কে নিরাপত্তাবোধ ক্রমেই শিথিল হয়ে পড়ছে; স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সভাগৃহে যতই আশ্বাসের বাণী শোনান না কেন।

শাসন সংকটের কবলে পাঞ্জাব

পশ্চিমবঙ্গের অনুকরণে পাঞ্জাবের স্পীকার শ্রীযোগীন্দর সিং মান এক রুলিং জারি করে বিধানসভার অধিবেশন মাস দুয়েকের জন্য স্থগিত ঘোষণা করলে, পাঞ্জাবে সাংবিধানিক সংকটের সূত্রপাত হয়। অবশ্য পশ্চিমবঙ্গ এবং পাঞ্জাবের ঘটনায় চরিত্রের তফাৎ আছে। পশ্চিমবঙ্গের স্পীকার শ্রীবিজয় ব্যানার্জীর রুলিং ছিল বৈধতার প্রশ্নে। পাঞ্জাবে বিধানসভার অধিবেশন প্রচণ্ড হল্লায় ব্যাহত হওয়ায় স্পীকার সভার অধিবেশন বন্ধ করে দিয়েছেন।

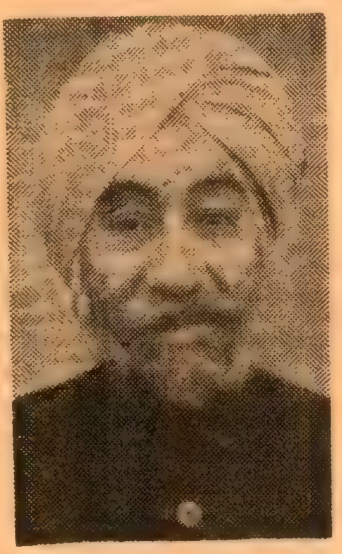

শ্রীযোগীন্দর সিং মান

কংগ্রেস-জনতা পার্টির ছাপ্পান্ন জন সদস্য স্পীকারের প্রতি উষ্মাবশত তাঁর বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব উত্থাপন করেন। স্পীকারের অপরাধ, সভায় গণ্ডগোল করার জন্য তিনি যুক্তফ্রন্টের যে সদস্যের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেন পরে ফ্রন্টের প্রতিশ্রুতি (ভবিষ্যতে অনুরূপ ঘটনার পুনরাবৃত্তি হবে না) পাওয়ার পর তিনি সেই নির্দেশ প্রত্যাহার করে নিয়েছিলেন। স্পীকারের পক্ষে এটা খুবই সাধু কাজ হয়েছিল সন্দেহ নেই, কিন্তু প্রতিপক্ষ কংগ্রেস পার্টিকে স্পীকারের এই বদান্যতা আঘাত করে। তাঁরা অমন স্পীকার চান না, যিনি সুযোগ পেয়েও বিরোধী যুক্তফ্রন্টকে জব্দ করতে কার্পণ্য করেন।

কিন্তু প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী গুরনাম সিং অনাস্থা প্রস্তাবটিকে সংবিধানবিরোধী বলে তর্ক তুললে গোলমাল পাকিয়ে ওঠে। ফ্রন্টের গুরনাম সিং বলেছেন, স্পীকারের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনা যায় না, আনা যেতে পারে স্পীকারকে অপসারিত করার জন্য কোনও প্রস্তাব। তা সে ক্ষেত্রেও চোদ্দ দিন আগে নোটিশ দেওয়ার নিয়ম আছে।

ফাঁপরে পড়ে কংগ্রেস-জনতা পার্টি তুমুল হট্টগোলের সৃষ্টি করলে সভা মুলতুবি হয়ে যায়।

কী থেকে কী। ধন্য বিজয় ব্যানার্জী। শ্রীব্যানার্জী এমনি এক জবরদস্ত পন্থা দেখিয়ে দিয়েছেন, যে অস্ত্রে পাঞ্জাবের স্পীকার রাজ্যে কেন্দ্রে কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থার সৃষ্টি করে গেল মন্ত্রিসভাকে প্রায় পথে বসিয়ে দিয়েছেন।

লছমন সিং গিল এখন, তাই তো তাই তো করছেন এবং বলে বেড়াচ্ছেন, পশ্চিমবঙ্গের আর পাঞ্জাবের ঘটনায় তফাৎ আছে। হুট করে সভা স্থগিত করে স্পীকার সুবিচার করেন নি। কিন্তু এখন আর ছোড়া তীর ফেরানোর উপায় নেই। স্পীকার সময় মেপে দিয়েছেন। স্বয়ং রাজ্যপালেরও করণীয় কিছু নেই।

সংকট রীতিমত অচলাবস্থার সৃষ্টি করেছে। টনক নড়ে গেছে দিল্লী পর্যন্ত। বিধানসভা বাতিল হয় নি, অধিবেশন স্থগিত হয়েছে। এখন মুস্কিল হল বাজেট পাশ করানো নিয়ে।

ওদিকে মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা। রাজ্যপাল ভবন অভিমুখে সরকারী আর বিরোধী নেতাদের গাড়ি ছুটেছে। সরকারপক্ষ স্পীকারকে বরখাস্ত করার জন্য উন্মুখ। কিন্তু যুক্তফ্রন্ট নেতা গুরনাম সিং এই সংকটে গিল মন্ত্রিসভাকেই বরখাস্ত করে রাজ্যে রাষ্ট্রপতির শাসন চালু করার প্রস্তাব ঝুলিয়ে দিয়েছেন। তাঁর মতে গিল মন্ত্রিসভাকে রাজ্য চালাতে দিলে সংকট তীব্রতা লাভ করবে।

লছমন সিং গিল এমন বিপাকে পড়বেন কে জানত। শ্রীগিল এখন সকলকে বুঝিয়ে বেড়াচ্ছেন, রাষ্ট্রপতির শাসন অমনি হলেই হল। তাঁর মন্ত্রিত্ব কাড়ে কে। পশ্চিমবঙ্গে সরকারপক্ষীয়দের সংখ্যাগরিষ্ঠতায় সন্দেহ ছিল তাই, কিন্তু শ্রীযুক্ত গিল কংগ্রেসের সঙ্গে হাত মিলিয়ে যুক্তফ্রন্টকে নো-হোয়ার করে ছেড়ে দিয়েছেন, সেখানে কেন রাষ্ট্রপতির শাসন চালু হবে।

শ্রীযুক্ত গিল যতই উচ্চবাচ্য করুন, অবস্থায় এখন জট পড়েছে। পাঞ্জাব কংগ্রেসেও উপদলীয় কোন্দলের দুই ফ্রন্টে দুই নেতার আবির্ভাব হয়েছে, প্রবোধচন্দ্র এবং রাড়েওয়ালা। কংগ্রেস-জনতা পার্টির মধ্যেও যে সম্ভাব গলায় গলায় এমন সন্দেহ কেউ পোষণ করেন না। তবে স্বয়ং স্পীকারের সন্দেহ আছে, বস্তুত গিল মন্ত্রিসভা বর্তমানে সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থনপুষ্ট কি না।

কিন্তু সেদিক দিয়েও যদি গিল মন্ত্রিসভার গায়ে আঁচড়টি নাও লাগে, তবু বিধানসভা খোলানো নিয়ে সমস্যার জট ছাড়াতে বেশ বেগ পেতে হবে।

দলছুট সদস্যর মুখ্যমন্ত্রিত্ব অধিককাল ধোপসই হবে এমন চিন্তাও হ'ল বাড়িয়ে ভাবা। শ্রীগিলের দুর্ভাবনার রাত্রি তাই চক্রাকারেই বাড়বে। কেন না কংগ্রেসের মধ্যেও অনেকে আছেন, যাঁরা উটকো দলের নেতৃত্বে এবং কংগ্রেসী সমর্থনে মন্ত্রিসভা চালাতে নারাজ। এবং সেটাই স্বাভাবিক।

আসাম :

করিমগঞ্জের হাঙ্গামা

গৌহাটি হাঙ্গামার পরেই সীমান্ত রাজ্য আসাম পুনরায় নতুন হাঙ্গামার কবলস্থ হয়েছিল। কাছাড় জেলার মহকুমা শহর করিমগঞ্জে অকস্মাৎ দুই বিবদমান সম্প্রদায় হাঙ্গামায় লিপ্ত হয়ে পড়েন। হাঙ্গামার সূত্রপাত হয় স্থানীয় একটি পৌর নির্বাচনের প্রচারকার্যকে কেন্দ্র করে। ছুরিকাঘাত ও গৃহে অগ্নিসংযোগ, পুলিশের ওপর আক্রমণ, কারফিউ, ১৪৪ ধারা প্রভৃতি আনুষঙ্গিক এবং সভ্য ভারতবর্ষে দৈনন্দিন গা-সওয়া ব্যাপারগুলিও ঘটে যায়। আসামে এই নিয়ে মাসান্তের মধ্যে দু-দুবার বড় রকমের ল এন্ড অর্ডার পর্যুদস্ত হল। এবং আসাম একটি সীমান্ত রাজ্য। তাছাড়া করিমগঞ্জ পূর্ব পাকিস্তানের লাগোয়া শহর। অবশ্য গৌহাটির ঘটনার মতো প্রশাসন বিভাগ করিমগঞ্জ হাঙ্গামায় নীরব দর্শক ছিলেন না। শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য এখন চেষ্টা চলছে।

মুখ্যমন্ত্রী শ্রীচালিহার আমলেই আসামে উপর্যুপরি প্রকাশ্য সংঘর্ষ ঘটে গেছে একের অধিকবার। কিন্তু করিমগঞ্জের ঘটনার গুরুত্ব পূর্ববর্তী রক্তপাত ও সম্পত্তি নাশ অপেক্ষা বেশি। কেন না পাক-সীমানায় এই দাঙ্গা দুষ্ট মতলববাজীর সহায়ক হতে পারে। আসাম বিধানসভার জনৈক সদস্যও অনুরূপ আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন। হাঙ্গামা বিস্তার লাভের সংবাদও পাওয়া যাচ্ছে। স্বয়ং কেন্দ্রীয় কর্তারাও চিন্তিত। এই অবস্থায় দ্রুত ঘটনাস্রোতকে আয়ত্তে আনার জাতীয় প্রয়োজন সকলেই অনুভব করেন। শ্রীচালিহা সেই প্রয়োজনের কথা শ্লেষাত্মক ভঙ্গিতে রাজ্য বিধানসভায় উত্থাপিত করে অবস্থার গুরুত্বকে খাটো করেছেন। তিনি বিরোধীদের উদ্দেশ্যে উপদেশবাণী বর্ষণ করেছেন যা তাঁর পক্ষে সাজে না। তিনি বলেছেন, সরকারের সমালোচনায় বিরত হয়ে বিরোধীদের উচিত সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে জনমত গঠন করা। প্রশ্ন হতে পারে যে চালিহা-মন্ত্রিত্বকালে আসাম আঞ্চলিক বিভীষিকার শিকার হয়, যে চালিহা-মন্ত্রিত্ব এ জাতীয় উগ্র আঞ্চলিক বিদ্বেষকে কঠোর হস্তে দমনে যে কোনো কূট কারণেই হোক অক্ষম, সেই চালিহা সাহেবের মুখে শ্লেষাত্মক উপদেশ বক্তাকেই কি বিদ্ধ করে না। কিন্তু চালিহা সাহেবদের বোধে আজ এই সত্য বিলুপ্ত যে ঢিলটি মাথার ওপর ছুঁড়লে তা নিজের গায়েই পড়ে। তাঁরা নিজেদের ক্ষমতাগর্বে অন্ধ, তাই বিদ্বেষের বীজ বপন করার মারাত্মক ভবিষ্য প্রতিক্রিয়ার কথা চিন্তায় রাখতে অপারঙ্গম। নিজেদের সর্বদোষমুক্ত ভেবে অকারণেই আত্মপ্রসাদ লাভ করে থাকেন। বিরোধীরা অবশ্যই সরকারের দুর্বলতার সমালোচনা করবেন। কেন না চালিহা সরকার রাজ্যে ক্ষুদ্র স্বার্থের দাপট দমনে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছেন।

করিমগঞ্জের ঘটনা আর গৌহাটির ঘটনা, দুই বিদ্বেষপ্রসূত। উভয় ক্ষেত্রেই সরকারের সজাগ মোকাবিলাই প্রত্যাশিত ছিল। চালিহা সরকার সেই প্রত্যাশা পূরণে ব্যর্থ, একথা সোচ্চারে উত্থাপন করার সুস্থ মনোবৃত্তিকে ব্যঙ্গ করে শ্রীযুত চালিহা নিজের দুর্বলতা ঢাকতে পারেন না।

যাই হোক করিমগঞ্জের ঘটনায় বিস্তৃতি কারও কাম্য নয় এবং চালিহা সরকারের দুর্বলতা ঐ ঘটনার পশ্চাতে মদত দান করেছে এমন কথাও কেউ বলবেন না। তবে একটি বক্তব্য থাকবেই তা হল, শাসক যদি ন্যায়নীতির সঙ্গে সর্বদা না থাকেন, যদি কোনও দুর্বল মুহূর্তে সরকারকে একটি দুষ্কার্য দমনে ব্যর্থ করে তবে অরাজকতা প্রশ্রয় পায় এবং তা যে কোনরূপেই আত্মপ্রকাশের সুযোগ খোঁজে। দেশের ক্ষমতান্ধ ক্ষমতাশালী ব্যক্তিদের এই কথাটা স্মরণে থাকলে দেশব্যাপী নৈরাজ্যের বিভীষিকার মুখে হয়ত শেষ পর্যন্ত বল্গা লাগানো সম্ভব হতে পারে। এই দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হলে কেন্দ্রীয় সরকারের সে বিষয়ে অবশ্যই অবহিত হওয়ার প্রয়োজন আছে।

বিহার :

গঙ্গার জলে দোষ

অবশেষে গঙ্গার জলও দূষিত হ'ল। জনসঙ্ঘ নেতা আক্ষেপ করে বলেছেন : হাজার হাজার বছর যে গঙ্গা বয়ে চলেছে, কংগ্রেসী শাসনে সেই গঙ্গার জলও দূষিত হ'ল।

শ্রীবাজপেয়ীর বক্তব্যের আলঙ্কারিক অর্থ যা-ই হোক এটা খুবই দুঃখের কথা যে মুঙ্গেরের নিকট গঙ্গার জলে বিষাক্ত তৈলের আবির্ভাবে সমগ্র মুঙ্গের শহর বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। জল দূষিত হওয়ার পর সপ্তাহকাল জল সরবরাহ বন্ধ হয়েছে এবং পূতিগন্ধে সমগ্র মুঙ্গের শহর বিবমিষা বোধ করছে। সেখানে স্কুল-কলেজ হোটেল-ভোজনালয় বন্ধ, জনগণ দারুণ জলকষ্টে ম্রিয়মাণ।

স্বভাবতই ক্ষুব্ধ বক্তব্য উঠেছে, সরকার উপযুক্ত সময়ে পরিস্থিতি সম্পর্কে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে অক্ষম হয়েছেন।

বারৌণী তৈল শোধনাগারের পেট্রোল গঙ্গায় পড়েই এই বিভ্রাট সৃষ্টি করে। বর্তমানে তৈল শোধনাগারটিকে তাই সাময়িকভাবে বন্ধ রাখতে হয়েছে।

ইতিমধ্যে জল দূষিত হওয়ার ফলে ছ'জনের মৃত্যু হয়েছে বলে পাটনা থেকে যে সংবাদ প্রকাশিত হয় বিহার-সরকার তার প্রতিবাদ করেছেন।

গঙ্গার জলের গ্যাস ও পেট্রোল মিশ্রণে আগুন জ্বলে ওঠায় কেন্দ্রীয় সরকার তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন। তেল উপচে পড়া সম্পর্কে কিন্তু সন্দেহের নিরসন হয় নি। অনেকের ধারণা, শোধনাগারের যে সমুদয় আবর্জনা গঙ্গায় বিসর্জিত করা হয় সেই আবর্জনার সঙ্গেই অতিরিক্ত পরিমাণ তৈলও নিক্ষিপ্ত হয়ে থাকবে। এই অসতর্কতা কী করে কেমনভাবে ঘটল তদন্তে তা প্রকাশিত হবে।

তৈল বিভ্রাটে প্রজ্বলন্ত অগ্নিশিখায় কয়েকখানি নৌকা ও গাধাবোট পুড়ে ছাই হয়েছে। জলকষ্টে সমগ্র শহর আকণ্ঠ পিপাসু। দুর্গন্ধে মানুষের প্রাণ ওষ্ঠাগত। বিপর্যয়ে কল-কারখানা, পড়াশুনা লাটে উঠেছে।

এমন ভয়াবহ দুর্ঘটনা কে বা কাদের অসতর্কতার ফল তদন্তে তা আশু নির্ধারিত হওয়া উচিত। যে ব্যাপারের সঙ্গে সমগ্র উপকূলবর্তী স্নান ও জল সরবরাহ ব্যবস্থা বিজড়িত সেই বিষয়টিতে কেমন করে সতর্কতার অভাব হতে পারে তা ভাবতে সত্যিই তাজ্জব লাগে। আমাদের দায়িত্ববোধ কি সর্বক্ষেত্রেই এইভাবে শিথিল হয়ে পড়েছে? আমরা কি দেশ ও জাতি সম্পর্কে বস্তুতই কেউ অন্তরের [illegible] অনুভব করি না। দুর্ঘটনা অবশ্যই ঘটতে পারে, কিন্তু যে দুর্ঘটনা কারিগরী অসতর্কতার ফল, প্রশাসনিক নির্লিপ্ততার ফল এবং যার জন্য অসংখ্য মানুষের জীবন বিপন্ন হয়ে পড়ে তেমন দুর্ঘটনার জন্য দায়াবদ্ধ, তাঁদের প্রতি কঠোর ব্যবস্থা জাতীয় স্বার্থেই গৃহীত হওয়া উচিত।

সরকার তদন্তের ভার গ্রহণ করেছেন। এদেশে তদন্ত একটি নৈমিত্তিক ব্যাপার। এতো বিচ্যুতি এতো অনায়াসে ঘটছে যে তদন্তও তাকে অনুসরণ করছে সমান তালে। ফলত বিচ্যুতির অপরাধও যেমন তদন্তের গুরুত্বও তেমনি লঘু হয়ে আসছে। বারৌণী তদন্তের ফলাফল অতঃপর সাগ্রহে লক্ষ্য করার বিষয়।

(৯।৩।৬৮)

আয়ান স্মিথ

দক্ষিণ রোডেশিয়াঃ

শ্বেতাঙ্গ জল্লাদরা তিনজন আফ্রিকীয় দেশপ্রেমিককে হত্যা করেছে। দক্ষিণ রোডেশিয়ার বিদ্রোহী ও সংখ্যালঘু শ্বেতাঙ্গ প্রধানমন্ত্রী আয়ান স্মিথের সরকার সকল সতর্কবাণী ও বিশ্ব জনমত উপেক্ষা করে ৬ই মার্চ মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত তিনজনকে ফাঁসি দিয়েছে। এই তিনজন হলেন ঃ ভিক্টর সিফেরানি মানাম্বো, জেমস ডেভিড ঢালামিনি ও ডুলি স্যাডরেক। কেবল দক্ষিণ রোডেশিয়া বা আফ্রিকা নয়, সমগ্র বিশ্বে এই জঘন্য হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে তীব্র বিক্ষোভ ও ঘৃণার সৃষ্টি হয়েছে।

মানাম্বো ও ঢালামিনির বিরুদ্ধে অভিযোগ, এ'রা পেট্রোল বোমা দিয়ে একজন শ্বেতাঙ্গ চাষীকে হত্যা করেছেন। আর স্যাডরেক নাকি একজন উপজাতীয় নেতাকে হত্যা করেছেন। আসলে এ'রা দক্ষিণ রোডেশিয়ার বর্ণবৈষম্যমূলক অত্যাচারী ও সংখ্যালঘু শ্বেতাঙ্গ শাসন উচ্ছেদের সংগ্রামের কর্মী। সন্ত্রাসবাদী কর্মপন্থায় এ'দের আস্থা নেই। যে অভিযোগ এ'দের বিরুদ্ধে আনা হয়েছে, তা হয়তো এমনিতে সত্য। কিন্তু রাজনৈতিক আন্দোলনের পটভূমিকায় এবং এখানকার বিশেষ পরিস্থিতি বিবেচনায় এর জন্য মৃত্যুদণ্ড হতে পারে না। এই প্রশ্নে বিচারকদের মধ্যেই মতভেদ দেখা দিয়েছে। একজন বিচারপতি এই রায়ের সঙ্গে একমত না হতে পেরে পদত্যাগ করেছেন, আর অপর একজন (জন ডেভিড ইয়ং) প্রাণদণ্ড বন্ধ করার জন্য আবেদন করেছেন। অনেক চেষ্টা করেও যখন প্রাণদণ্ড বন্ধ করা গেল না, এমন কি প্রিভি কাউন্সিলে আপীল করারও অনুমতি পাওয়া গেল না, তখন দণ্ডিতদের পক্ষ থেকে তাঁদের আইনজীবীরা বৃটেনের রাণীর কাছে ক্ষমাপ্রদর্শনের জন্য আবেদন করেন।

১৯৬৫ সালের নভেম্বর মাসে দক্ষিণ রোডেশিয়া একতরফাভাবে স্বাধীনতা ঘোষণা (ইউ-ডি-আই, বা ইউনিল্যাটেরাল ডিক্লারেশন অব ইনডিপেন্ডেন্স) করা সত্ত্বেও আয়ান স্মিথের সরকার বৃটেনের রাণীর প্রতি আনুগত্য বজায় রেখেছে, এবং এখনও ইউনিয়ন জ্যাক দক্ষিণ রোডেশিয়ার সরকারী ভবনের ওপর উড়ছে। তাই স্মিথদের ব্যবস্থানুসারেও রাণীর ক্ষমাপ্রদর্শনের অধিকার আছে। আর বৃটেনের নিজের বিচারে তো আছেই। বৃটেন রোডেশিয়ার ১৯৬৫-র একতরফা স্বাধীনতা স্বীকার করে নি। তার কাছে স্মিথরা বিদ্রোহী। দক্ষিণ রোডেশিয়া এখনও বৃটেনের অধীন।

শেষ পর্যন্ত ২রা মার্চ বৃটিশ মন্ত্রিসভার, বিশেষ করে কমনওয়েলথ দপ্তরের মন্ত্রী জর্জ টমসনের পরামর্শে রাণী দ্বিতীয় এলিজাবেথ তিনজন মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত আফ্রিকীয়ের প্রাণদণ্ড মকুব করে অনুজ্ঞা জারি করেন এবং কেব্‌ল করে আয়ান স্মিথকে এই খবর জানিয়ে দেওয়া হয়। বৃটিশ সরকারের পক্ষ থেকে এই বলে সতর্ক করে দেওয়া হয় যে, রাণীর ক্ষমাপ্রদর্শনের পরও যদি জোর করে ফাঁসি দেওয়া হয়, তবে তা হত্যাকাণ্ড বলে গণ্য করা হবে এবং তার জন্য কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

এর পর কেউ কেউ হয়তো ভেবেছিলেন, আয়ান স্মিথ থমকে দাঁড়াবেন। দক্ষিণ রোডেশিয়ার প্রধান বিচারপতি স্যার হ্যাগ বিড্‌ল্ রায় দিলেন, ১৯৬১ সালের পর রাণীর আর ক্ষমাপ্রদর্শনের অধিকার নেই, তবে স্মিথ সরকার ইচ্ছা করলে প্রাণদণ্ড মকুব করে দিতে পারেন। এই রায়ের পরও আলোচনা হয়েছে, স্মিথ নিজেই উদ্যোগী হয়ে প্রাণদণ্ড বন্ধ করবেন। কিন্তু তা তিনি করেন নি।

স্মিথ তা করতে পারেন না। যে-দেশে চল্লিশ লক্ষ আফ্রিকীয়, আর মাত্র বিশ হাজার শ্বেতাঙ্গ সেখানে ন্যায়, ধর্ম, যুক্তির ভরসায় স্মিথ থাকেন নি, উগ্র বর্ণবিদ্বেষ আর কামান-বন্দুকের জোরে তিনি বেপরোয়া শাসন চালিয়ে যাচ্ছেন। এই তিন হতভাগ্য আফ্রিকীয় শ্বেতাঙ্গ শাসন উচ্ছেদের চেষ্টা করেছেন, বর্ণবৈষম্যের বিরুদ্ধে এ'রা অস্ত্র ধারণ করেছেন। একবার যদি এ'দের ক্ষমা করতে হয়, তবে স্মিথদের দাঁড়াবার জায়গা থাকবে কোথায়? তাই তাঁকে কঠোর হতে হয়েছে। ফাঁসি দিতে হয়েছে।

কিন্তু এখন বৃটেন কি করবে? খাস রাণীর অনুজ্ঞা অগ্রাহ্য করে ফাঁসি! এটি নিছক হত্যাকাণ্ড ছাড়া আর কিছু নয়। কোন আইনের সমর্থন নেই এর পশ্চাতে। জেনেভা থেকে আন্তর্জাতিক আইন কমিশনও এই কথাই বলেছেন। এই নরহত্যার বিরুদ্ধে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বৃটিশ সরকার বাধ্য।

তবে বৃটিশ সরকার খুব একটা কিছু করে উঠতে পারবে বলে মনে হয় না। শেষ পর্যন্ত তর্জন-গর্জনই সার হবে। একতরফা স্বাধীনতা ঘোষণার সময় বৃটেন অনেক কথা বললেও আয়ান স্মিথ ও তাঁর দলবল বেশ বহাল তবিয়তেই আছেন। বরং ইদানীং আয়ান স্মিথের সঙ্গে একটা মিটমাট করে নেবার জন্য আগ্রহ দেখা দিচ্ছে বৃটিশ সরকারের কোন কোন মহলে। তাই এবারও যথেষ্ট সন্দেহ আছে, দু-চারটি গরম বক্তৃতা ছাড়া বৃটিশ সরকার আর কিছু করবেন না। রাষ্ট্রসঙ্ঘের সাহায্যে পূর্ণ অর্থনৈতিক বয়কট এবং তারপর দক্ষিণ রোডেশিয়ার জল্লাদ আয়ান স্মিথ সরকারের অপসারণের জন্য সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণ, এই আজ একমাত্র পথ। কিন্তু তার কোন লক্ষণই দেখা যাচ্ছে না।

আর যাবেই বা কি করে? বৃটিশ

সরকার নিজেই তো এখন বর্ণবৈষম্য মেনে নিয়েছেন। কৃষ্ণাঙ্গদের বৃটেনে আগমন নিয়ন্ত্রণ করে যে আইন ক'দিন আগে বৃটিশ পার্লামেন্টে পাশ হয়েছে, তার পর হ্যারল্ড উইলসন আর আয়ান স্মিথের মধ্যে খুব কি একটা মৌলিক পার্থক্য আছে?

তাই রাণীর সম্মানহানিই হোক, আর বিদ্রোহী স্মিথ সরকার বৃটিশ সরকারের দুই গালে দুই চড়ই মারুক, এর প্রতিকার বৃটেনের কাছ থেকে আশা করলে ভুল করা হবে।

ইতিমধ্যেই আফ্রো-এশীয় রাষ্ট্র-গোষ্ঠীর পক্ষ থেকে বিষয়টি রাষ্ট্রসংঘ নিরাপত্তা পরিষদে তোলার কথা হয়েছে।

কিন্তু প্রতিকারের প্রকৃত পথান‍ুসন্ধান দিয়েছেন রোডেশিয়ার নিষিদ্ধ আফ্রিকীয় জাতীয় কংগ্রেসের নেতারা। তাঁরা বলেছেন, আফ্রিকীয়রা এই হত্যার প্রতিশোধ নেবে। রক্তের বদলে রক্ত চাই, এই ধ্বনি তাঁরা দিয়েছেন। এই হত্যাকাণ্ড আফ্রিকীয় মুক্তি-সংগ্রামীদের আরও বেশি করে অনুপ্রাণিত করবে এবং তাঁরা আরও হাজারে হাজারে শ্বেতাঙ্গ শাসন উচ্ছেদের সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়বেন। জাম্বিয়ার সীমান্তে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে বহুসংখ্যক আফ্রিকীয় সন্ত্রাসবাদী তৈরি হয়ে রয়েছে।

সঞ্চয় দ্বিগুণ হয়ে যাবে

আপনি যদি ইউনিট কিনে থাকেন তাহলে

পুনর্নিয়োগ পরিকল্পনায়

যোগ দিয়ে আপনি আপনার সঞ্চয় দ্বিগুণ করতে পারেন।

আপনি শুধু আমাদের জানিয়ে দেবেন যে ইউনিট থেকে আপনার যে আয় হয় তা যেন আবার ইউনিটেই লগ্নি করা হয়—তাহলেই হয়ে যাবে। সেই ক্ষেত্রে আপনি একটা বিশেষ মূল্যে নতুন ইউনিট পাওয়ার অধিকারী হবেন এবং ১০ বছর বা তার কম সময়ের মধ্যেই আপনার প্রাপ্য দ্বিগুণ হয়ে যেতে পারে। ১৯৬৮ সালের ৩০শে জুনের পূর্বেই যাতে এই সম্পর্কে আপনার আবেদনপত্র আমাদের কাছে পৌঁছায় সেই ব্যবস্থা করুন।

ইউনিটে লগ্নি করাই হ'ল সৌভাগ্য অর্জনের প্রশস্ত পথ। বিস্তারিত বিবরণের জন্য আপনার নিকটবর্তী ইউনিট ট্রাষ্ট অব ইণ্ডিয়ার অফিসে লিখুন।

ইউনিট ট্রাষ্ট অব ইণ্ডিয়া
১৩, বীর নরীমান রোড, বোম্বাই-১

অন্যান্য অফিস: ৮, কাউন্সিল হাউস স্ট্রীট, কলিকাতা-১; রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বিল্ডিং, ফোর্ট গ্লাসিস, মাদ্রাজ-১; ৬, পার্লিয়ামেন্ট স্ট্রীট-নূতন দিল্লী-১

67/509

[illegible], [illegible], [illegible] রক্তের ঋণ এরা শুধবেই। আরও একশ'র বেশি দেশপ্রেমিক এখন সলিসবেরীর সেন্ট্রাল জেলে ফাঁসির দিন গুনছেন। এঁদের সবাইকে হত্যা করেও আয়ান স্মিথের শাসনের বনিয়াদ শক্ত হবে না, বরং ক্রমেই তার ভিত ভেঙে পড়বে।

হাঙ্গেরী :

বিশ্ব কমিউনিস্ট সম্মেলনের প্রস্তুতি-পর্ব হিসাবে বুডাপেস্টে ৬৭টি দেশের কমিউনিস্ট পার্টির নেতাদের আলোচনা বৈঠক শেষ হয়েছে। প্রধানত দলের সাধারণ সম্পাদকরা এই বৈঠকে যোগদান করছেন।

আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনে সংহতিসাধন এবং আদর্শগত প্রশ্নে বিভিন্ন দেশের কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে যে-সব মতভেদ দেখা দিয়েছে আলোচনার দ্বারা তার মীমাংসার ব্যবস্থা করার জন্য একটি আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট সম্মেলন অনুষ্ঠানের জন্য সোভিয়েট ইউনিয়ন অনেক দিন ধরে বলে আসছে। তাছাড়া ভিয়েতনামের ব্যাপারে সম্মিলিত ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজনীয়তাও আছে। এর পূর্বে এইরূপ সম্মেলন ১৯৬০ সালে মস্কোতে হয়েছিল। কিন্তু রুশ-চীন মতবিরোধের জন্য এই সম্মেলন এতদিন হতে পারে নি। অনেক পার্টির মত, চীনের সংগে আদর্শগত বিরোধ মিটিয়ে ফেলার পর এই সম্মেলন ডাকতে হবে। চীনকে বাদ দিয়ে কোন কমিউনিস্ট সম্মেলন অনুষ্ঠিত হলে তা বাস্তবতা-সম্মত হবে না, বরং তার ফলে আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনে নতুন নতুন সমস্যার উদ্ভব হবে।

তবু শেষ পর্যন্ত সোভিয়েট ইউনিয়ন ও তার সহযোগী কয়েকটি দেশের বিশেষ চাপে সম্মেলনের জন্য একটি প্রস্তুতি বৈঠক বসেছে। কবে, কোথায় এই সম্মেলন বসবে এবং সম্মেলনের আলোচ্য সূচী কি হবে সে সম্পর্কে এই বৈঠকে দীর্ঘ আলোচনা হয়েছে।

মস্কো সম্মেলনে যে ৮১টি দেশের পার্টি যোগ দিয়েছিল, তাদের সবাইকেই বুডাপেস্ট বৈঠকে যোগ দেবার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। কিন্তু তাদের মধ্যে অনেকেই আমন্ত্রণ গ্রহণ করে নি। যারা আসে নি, তাদের মধ্যে উল্লেখ-যোগ্য—চীন, আলবানিয়া, কিউবা, উত্তর ভিয়েতনাম ও উত্তর কোরিয়া। সুইডেন ও হল্যান্ড থেকেও কেউ আসেন নি। ভারত ও জাপানের কমিউনিস্টদের এক বড় অংশ চীনাপন্থী, তাঁরাও সম্মেলনে অনুপস্থিত ছিলেন। আগের থেকেই ঠিক ছিল, ভিয়েতনাম ও কোরিয়ার প্রশ্ন বৈঠকে বিশেষভাবে আলোচিত হবে, তবু এই দুটি দেশ বৈঠকে যোগদান থেকে বিরত থেকেছে। [illegible] হো চি-মিন ও উত্তর কোরিয়ার কমিউনিস্ট নেতা কিম ইল সুং বুডাপেস্ট বৈঠকের সাফল্য কামনা করে বাণী প্রেরণ করেছেন। এঁদের হয়েছে মুশকিল, নিজেদের স্বার্থে সোভিয়েট ইউনিয়ন ও চীন উভয়ের সংগেই তাঁদের সম্পর্ক রক্ষা করা প্রয়োজন, কাউকেই চটাতে পারেন না।

বুডাপেস্ট বৈঠকে সোভিয়েট প্রতিনিধিদলের নেতা সোভিয়েট কমিউনিস্ট পার্টির তত্ত্ববিদ মিখাইল সুসলভ তাঁর বক্তৃতায় বিভিন্ন দেশের কমিউনিস্ট পার্টির স্বাধীন সত্তার ওপর বেশি করে জোর দিলেও রুমানিয়া, ইতালী প্রভৃতি তাতেও খুশি নয়—তারা আরও বেশি স্বাধীনতা চায়।

রুমানিয়া বর্তমান পরিস্থিতিতে আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট সম্মেলন অনুষ্ঠানেরও বিরোধী। চীনের সংগে চূড়ান্ত নিষ্পত্তির পূর্বে কোন সম্মেলন করা চলবে না, এই তাদের বক্তব্য। এই প্রশ্নে বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিদের সংগে রুমানিয়ার প্রতিনিধিদের বেশ কথা কাটাকাটি হয়েছে। শেষ পর্যন্ত আরবদের বিরুদ্ধে ইসরায়েলী যুদ্ধের ব্যাপারে রুমানিয়ার ভূমিকা সম্পর্কে সিরিয়ার প্রতিনিধির একটি মন্তব্যকে উপলক্ষ করে ২৯শে ফেব্রুয়ারী রুমানিয়া বৈঠক ত্যাগ করে চলে যায়। রুমানিয়াকে বৈঠক বর্জন থেকে নিবৃত্ত করার জন্য অনেক চেষ্টা হয়েছে, কিন্তু তা সফল হয় নি। রুমানিয়া প্রতিনিধিরা দেশে ফিরে গিয়েছেন।

সিরিয়ার কমিউনিস্ট নেতা খালেদ বেকদাসের মন্তব্যের প্রতিবাদে রুমানিয়া প্রতিনিধিদলের নেতা পল নিকুলেসকু-মিজিল সহ প্রতিনিধিদলের সবাই বৈঠক, এমন কি হাঙ্গেরী ত্যাগ করে চলে গিয়েছেন এ কথা সত্য। আসল কারণ কিন্তু বেকদাসের এই বিচ্ছিন্ন মন্তব্য নয়। বুডাপেস্ট আসার পর থেকেই রুমানিয়ার প্রতিনিধিরা বুঝেছিলেন, তাঁরা হেরে গিয়েছেন। সোভিয়েট ইউনিয়নের নির্দেশে অধিকাংশ দল ঠিকই করে এসেছে, এ বছরের শেষে মস্কোতে আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট সম্মেলন ডাকা হবে এবং সেই মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে। তাই রুমানিয়া একটা ছুতো খুঁজছিল বৈঠক থেকে চলে যাবার জন্য। বেকদাসের বক্তৃতা সেই সুযোগ করে দিয়েছে। তবে বৈঠক বর্জনের পূর্বে বুখারেস্ট থেকে রুমানিয়ার প্রধান কমিউনিস্ট নেতা নিকোলাই চৌসেসকুর টেলিফোন এসেছিল। নিকুলেসকু-মিজিল নেতার নির্দেশমতই কাজ করেছেন।

রুমানিয়া চলে গেলেও বৈঠক হয়েছে। বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়েছে, আগামী নভেম্বর অথবা ডিসেম্বর মাসে মস্কোতে আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। [illegible] কমিউনিস্ট দলকে সম্মেলনে যোগদানের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হবে। বুডাপেস্ট বৈঠকের চূড়ান্ত ইস্তাহারে বলা হয়েছে, মস্কো সম্মেলনের জন্য যে কমিশন গঠন করা হয়েছে, যে-সব দল তাতে যোগ দিতে চায় তারা সবাই এর সদস্য বলে গণ্য হবে।

ইন্দোনেশিয়া :

মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী টুংকু আবদুল রহমান পাঁচদিন ধরে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় ইন্দোনেশিয়া সফর করে কুয়ালালামপুর ফিরে গিয়েছেন। মালয়েশিয়ার সংগে ইন্দোনেশিয়ার সংঘর্ষের পর এই প্রথম টুংকু জাকার্তা এলেন। অবশ্য এর মধ্যে ইন্দোনেশিয়ার রাজনীতির গুরুতর পরিবর্তন হয়েছে। সোয়েকার্নোর রাজত্ব শেষ হয়েছে। কমিউনিস্টদের প্রাধান্য সম্পূর্ণ লোপ পেয়েছে। জেনারেল সুহার্তোর সামরিক শাসন এখন ইন্দোনেশিয়ায়।

দুই নেতার আলোচনার শেষে যে যুক্ত ইস্তাহার প্রচার করা হয়েছে, তাতে উভয় দেশের মধ্যে মৈত্রী সম্পর্ক বৃদ্ধির ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে দুই দেশের মধ্যে সহযোগিতা বৃদ্ধি করা হবে। আর ঠিক হয়েছে, ইন্দোনেশীয় ও মালয়ী, এই দুই সহযোগী ভাষার একইরূপ বানান সংস্কারের জন্য উভয় দেশের পক্ষ থেকে একযোগে চেষ্টা করা হবে।

অনেকেই ভেবেছিলেন, টুংকু তাঁর পরিকল্পিত 'নিরপেক্ষ' দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় গোষ্ঠীর ব্যাপারে সুহার্তোর সংগে কথা বলবেন। দুজনের মধ্যে এ বিষয়ে কথা হয়েছে কিনা জানা যায় নি। তবে ইস্তাহারে তার কোন উল্লেখ নেই। ফিলিপাইনস, ইন্দোনেশিয়া, থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া ও সিংগাপুর, এই পাঁচটি রাষ্ট্র নিয়ে 'এশীয়ান' বা 'অ্যাসোসিয়েশন অব সাউথ-ইস্ট এশিয়ান নেসনস' (ASEAN) গঠিত হবে। প্রধানত অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সহযোগিতা এই সংস্থার উদ্দেশ্য হলেও প্রতিরক্ষার ব্যাপারও বাদ যাবে না। ১৯৭১ সালের ভেতরে বৃটেন সিংগাপুর ও মালয়ের ঘাঁটি থেকে সব সৈন্য সরিয়ে নিলে কি হবে, এ কথা ভেবে টুংকু এখন থেকেই চিন্তিত। চিন্তিত সিংগাপুরের প্রধান-মন্ত্রী লি কুয়ান ইউও।

তবে অন্যদের বাদ দিয়ে টুংকু আবদুল রহমান যেভাবে একাকী জেনারেল সুহার্তোর সংগে বন্ধুত্ব পাতাবার চেষ্টা করছেন, তাতে অস্ট্রেলিয়া, থাইল্যান্ড, ফিলিপাইনস, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বেশ চটেছে। মালয়েশিয়া এদের সংগে আবার 'সিয়াটো'তে রয়েছে। (৭।৩।৬৮)

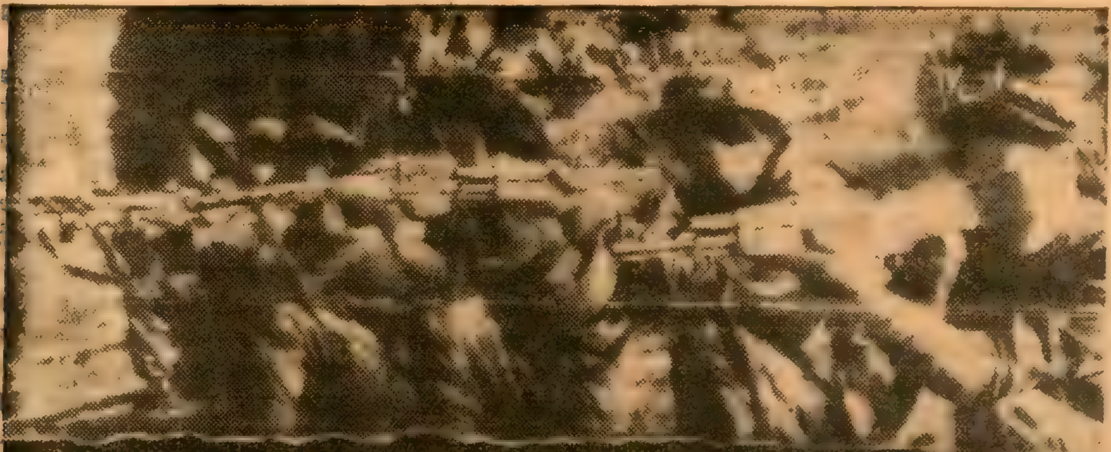

ভিয়েৎনামঃ ঝড়ের কেন্দ্রে

বরুণ রায়

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

সেদিন হ্যানয়ের আকাশে একটি নতুন তারা উঠেছিল। রক্তিম আকাশে একটি হল্দ তারা।

অবাক বিস্ময়ে হ্যানয়ের মানুষ তাকিয়েছিল তার দিকে। কি আশ্চর্য উজ্জ্বল! বাতাসে বাতাসে অসংখ্য হয়ে ছড়িয়ে পড়েছিল সারা শহর জুড়ে। রাস্তায়-ঘাটে, গাছের মাথায়, বাড়ির ছাদে, লোকের হাতে তারাগুলি তারাবাতি হয়ে যেন উৎসবের বন্যায় ডুবিয়ে দিতে চাইছিল সবকিছু।

লাল জমির ওপর হল্দ তারা। ভিয়েৎনাম মুক্তিবাহিনীর পতাকা, সংগ্রামের প্রতীক।

২ সেপ্টেম্বর ১৯৪৫ এক নতুন হ্যানয় এই পতাকাকে অভিবাদন জানিয়েছিল এক ঐতিহাসিক উন্মাদনার সঙ্গে। ঐ রক্ত পতাকা ছিল তাদের ইতিহাসের স্বাক্ষর! ঐ হলুদ তারা উজ্জ্বল হয়েছিল তাদের স্বপ্নে।

শত শত শহীদের বুকের রক্তে আর চোখের জলে যে স্বপ্ন তারা রচনা করেছিল তিলে তিলে।

সেদিন তাই তাদের আবেগ অশান্ত হয়ে উঠেছিল বারবার। হ্যানয়ের রাস্তা সংখ্যহীন মানুষের পদভরে কেবলই কেঁপে কেঁপে উঠেছিল সকাল থেকে সন্ধ্যা—সন্ধ্যা থেকে রাত্রি।

হ্যানয় অবশেষে মুক্ত। দীর্ঘ আশি বছর পর বিদেশীর শাসন থেকে শোষণ থেকে অত্যাচার থেকে হ্যানয় অবশেষে ভিয়েৎমিন মুক্তিবাহিনীর করায়ত্ত!

শুধু হ্যানয় নয়, সারা টংকিন। এবং শুধু টংকিন নয়, আন্নাম আর কোচিন-চীনও। সারা ভিয়েৎনাম।

সারা ভিয়েৎনাম সেদিন ঘোষণা করেছিল তার স্বাধীনতা। ১৯৪৫ সালের ২ সেপ্টেম্বর, যেদিন হো চি মিনের নেতৃত্বে ভিয়েৎনাম গণতান্ত্রিক রিপাবলিক কায়েম হয়েছিল।

বা দিন স্কোয়ার সেদিন লোকে লোকারণ্য।

হ্যানয়ের সাহেবপাড়ার মাঝখানে এই বা দিন স্কোয়ার। মস্কোর যেমন রেড স্কোয়ার কিংবা পিকিংয়ের তিয়েন আন মেন, তেমনি হ্যানয়ের বা দিন, যেখান থেকে প্রাক্তন ফরাসী গভর্ণর-জেনারেলের প্রাসাদ মাত্র এক ঢিলের দূরত্ব।

সেই প্রাসাদের ঔদ্ধত্যকে উপেক্ষা করে লাল জমির ওপর হলুদ তারা যে পতাকা সগর্বে উড়ছিল, তার তলায় সেদিন সমবেত হয়েছিল অগণিত মানুষ। তারা তাকিয়েছিল মঞ্চের ওপর আরেকটি বিস্ময়ের দিকে, যার নাম হো চি মিন। জীর্ণ-শীর্ণ, কাঠির মত সরু সরু পা, ভাঙা মুখে পাতলা কয়েকগাছা দাড়ি, পরনে খাকি হাফ প্যাণ্ট আর বুক-খোলা সাদা শার্ট, আর চওড়া পায়ে টায়ারের স্যাণ্ডেল এই যে মানুষটি, এঁর জন্যেই তারা এতদিন অপেক্ষা করছিল।

সেই মানুষটিই আজ বা দিন স্কোয়ারে মঞ্চের ওপর তাদের চোখের সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন, পাহাড় ডিঙিয়ে, জঙ্গল পেরিয়ে, নদী অতিক্রম করে, ধীরে ধীরে,

এক-পা এক-পা করে, কিন্তু দৃঢ় গতিতে।

কাটা ঘায়ে তাঁর পা দু'টি ভরে গিয়েছিল।

শোনা যায় সেই সময় তাঁর স্বাস্থ্য এত দুর্বল হয়ে পড়েছিল যে, অবসরের সময় তিনি পাথর ছুঁড়ে যেতেন ঘণ্টার পর ঘণ্টা দু'হাতে শক্তি ফিরিয়ে আনবার জন্যে।

কিন্তু তাঁর সংকল্পে শক্তির কোন অভাব ছিল না।

সংকল্পের সেই শক্তিকেই ভাষা দিয়েছিলেন হো চি মিন যখন ১৯৪৫ সালের ২ সেপ্টেম্বর বা দিন স্কোয়ারে লাল জমি আর হলুদ তারা পতাকার নিচে দাঁড়িয়ে ভিয়েৎনামের স্বাধীনতার সনদ ঘোষণা করেছিলেন পৃথিবীর কাছে।

"আমরা শিকল ছিন্ন করেছি," তিনি উচ্চকণ্ঠে জানিয়েছিলেন, "যে শিকল প্রায় শতাব্দীকাল ধরে আমাদের আবদ্ধ রেখেছিল। আমরা স্বাধীনতা এনেছি আমাদের পিতৃভূমির জন্যে।......ভিয়েৎনামের সমস্ত মানুষ তাদের সমস্ত শক্তি দিয়ে, সম্বল দিয়ে, এমন কি প্রাণ দিয়েও এই স্বাধীনতা রক্ষা করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।"

বলেছিলেন: "স্বাধীন ও মুক্ত দেশ হিসেবে বেঁচে থাকবার সমস্ত অধিকার ভিয়েৎনামের আছে, কারণ আশি বছরেরও বেশি কাল ধরে এই দেশ ফরাসী প্রভুত্বের বিরোধিতা করে এসেছে।"

বলেছিলেন: "আশি বছরের বেশি সময় ধরে ফরাসী সাম্রাজ্যবাদীরা আমাদের দেশকে শোষণে জর্জরিত করেছে...... আমাদের সমস্ত স্বাধীনতা কেড়ে নিয়েছে তারা। বর্বর আইন চাপিয়ে দিয়েছে আমাদের ওপর......স্কুল গড়েছে যত, জেলখানা গড়েছে তার চাইতে বেশি...... আমাদের ধানখেত, আমাদের বনাঞ্চল তারা তছনছ করেছে......রক্তের বন্যায় ডুবিয়ে দিতে চেয়েছে আমাদের বিপ্লবকে।......এই কারণে আমরা, অস্থায়ী সরকারের সদস্যগণ, ভিয়েৎনামের সকল মানুষের প্রতিনিধি হিসেবে ঘোষণা করছি যে, এর পর থেকে সাম্রাজ্যবাদী ফ্রান্সের সঙ্গে আমাদের কোন সম্পর্ক থাকবে না; ভিয়েৎনাম সম্পর্কে ফ্রান্স যতগুলি চুক্তি সম্পাদন করেছে সবগুলি বাতিল করছি; আমাদের দেশে ফরাসীরা যেসব সুবিধা ভোগ করত সবগুলি বাতিল করা হচ্ছে।"

বলেছিলেন: "আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস মিত্র শক্তিবর্গ, যারা তেহেরানে ও সানফ্রান্সিস্কোয় আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার ও দেশে দেশে সমানাধিকারের নীতি স্বীকার করে নিয়েছে, ভিয়েৎনামের স্বাধীনতাকে স্বীকার করে নিতে অস্বীকার করবে না।"

সে এক পরম গৌরবের মুহূর্ত, সেদিন ছিল এক ঐতিহাসিক পরিবর্তনের দিন।

রাস্তায় রাস্তায় যেখানে যত ফরাসী নাম লেখা সাইনবোর্ড ছিল সেগুলি টেনে নামানো হল। তার জায়গায় টাঙানো হল আন্নামী নামের সাইনবোর্ড। এই জয়ের মুহূর্তে পুরনো ইতিহাসের কোন পরিচয়ই তারা রাখতে চায় না, শোষণের কোন চিহ্ন। বুলেভার্ড অঁরি রিভিয়ের, রু আমিরাল কুর্বে, রু মিরিলেশ, ফরাসী হোমরা-চোমরাদের নামে যেসব রাস্তার নাম হয়েছিল সেগুলি এখন বহন করতে লাগল ভিয়েৎনামী বিপ্লবী কিংবা প্রাচীন আন্নামী রাজাদের স্মৃতি। ফরাসী দোকানের বিরাট বিরাট সৌখীন জানালাগুলি গেঁথে দেওয়া হল কাঠের টুকরো দিয়ে। চারদিকে শুধু উন্মত্ত জনতার ভিড়। উদ্বেল মানুষ চিৎকার করে বলে উঠছিল:

"স্বাধীনতা অথবা মৃত্যু!"
"ভিয়েৎনাম ভিয়েৎনামীদের!"
"মৃত্যুও ভালো, তবু দাসত্ব আর নয়!"

বাড়ির দেয়ালে, ট্রামের গায়ে, রাস্তা-জোড়া বিরাট বিরাট ব্যানারে লেখা হয়ে চলেছিল এক অভূতপূর্ব নতুন ইতিহাসের কাহিনী। সে ইতিহাসের নায়ক হো চি মিন।

যে দিকে তাকানো যায় শুধু হো চি মিনের ছবি: তোবড়ানো গাল, মুখে পাতলা কয়েকগাছা দাড়ি, মুখে বিষণ্ণ হাসি। শুধু লাল জমি আর হলুদ তারা। যেখানে কান পাতা যায় শুধু সেই শ্লোগান:

"স্বাধীনতা অথবা মৃত্যু!"
"ভিয়েৎনাম ভিয়েৎনামীদের!"
"মৃত্যু, তবু দাসত্ব নয়!"

•

সে ইতিহাসের স্রোত আবর্তিত হয়েছিল অত্যন্ত দ্রুত। এত দ্রুত যে ভিয়েৎমিনরাই তার জন্যে প্রস্তুত ছিল না।

বাও দাই নিজেই পদত্যাগ করেছিলেন হো চি মিনের অনুকূলে।

সম্রাট বাও দাই, যিনি প্রায় কুড়ি বছর ধরে আন্নামের শাসনতক্তে অধিষ্ঠিত ছিলেন ফরাসীদের হাতে পুতুল-রাজা হয়ে। যিনি পরে জাপানীদের উৎসাহে ১৯৪৫ সালের ১১ মার্চ 'তাঁর দেশের' স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিলেন।

১৭ আগস্ট ভো নুয়েন গিয়াপ যখন একদল ভিয়েৎমিন সৈন্যের অগ্রভাগে হ্যানয়ে প্রবেশ করলেন, এবং ১৮ আগস্ট যখন একটি অস্থায়ী ভিয়েৎমিন কমিটি শহরের দায়িত্ব গ্রহণ করল, তখন পদত্যাগ করা ছাড়া বাও দাই'র আর কিছু করণীয় ছিল না।

কারণ তাঁকে মদত দেবার মত কেউ আর অবশিষ্ট ছিল না। ফরাসীরা জাপানীদের দ্বারা আগেই পর্যুদস্ত হয়েছিল। এবার মিত্রশক্তির কাছে আত্মসমর্পণের দ্বারা জাপানও শক্তিহীন। তাই ২৫ আগস্ট এক ঘোষণার দ্বারা তিনি নিজেই শাসনতক্ত থেকে নেমে দাঁড়ালেন।

ঐ ঘোষণায় তিনি বললেন: "আমার কুড়ি বছরের শাসনকালের কথা মনে করে আমি দুঃখিত না হয়ে পারছি না। ঐ সময়ের মধ্যে আমি দেশের কোন উল্লেখযোগ্য কল্যাণ সাধন করতে পারি নি।...... অনেক তিক্ততার অভিজ্ঞতা আমার হয়েছে। এর পর থেকে একটি স্বাধীন দেশের একজন স্বাধীন নাগরিক হিসেবে থাকতে পেরে আমি সুখি। দীর্ঘস্থায়ী হোক ভিয়েৎনামের স্বাধীনতা। দীর্ঘজীবী হোক গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র!"

২৯ আগস্ট হো প্রবেশ করলেন হ্যানয়ে।

এ যেন ভিনি, ভিডি, ভিসি! এলাম, দেখলাম, আর জয় করলাম! প্রতিরোধ ছিল না বিশেষ, রক্তপাতও হয় নি তেমন। সারা আগস্ট মাসে মাত্র একজন ফরাসী নিহত হয়েছিল হ্যানয়ে একটি রাস্তার সংঘর্ষে। এবং গিয়াপ ডবল মার্চ করতে করতে নেমে এসেছিলেন চীনের সীমান্তবর্তী কাও বাং প্রদেশের পাহাড় আর জঙ্গল থেকে সংকা'র উপত্যকা অতিক্রম করে হ্যানয়ের দ্বারপ্রান্ত পর্যন্ত।

কত সহজে তার প্রমাণ পাওয়া যাবে গিয়াপের এই সময়কার একটি কার্যতালিকা থেকে:

১১ আগস্ট: হা তিন প্রদেশ মুক্ত করা হল।

১২ আগস্ট: ভিয়েৎ বাক স্বাধীন অঞ্চলের মুক্তি সম্পূর্ণ হল।

১৩ আগস্ট: কোয়াং নাই প্রদেশ মুক্ত হল।

১৫ আগস্ট: তাই নুয়েন প্রদেশ মুক্ত।

১৭ আগস্ট: হ্যানয়ে ভিয়েৎমিন অনুপ্রবেশ।

১৯ আগস্ট: হ্যানয়ে ভিয়েৎমিন বিদ্রোহ।

২৯ আগস্ট: আনুষ্ঠানিকভাবে হ্যানয়ে প্রবেশ।

দেখতে দেখতে সারা উত্তর ভিয়েৎনাম ভিয়েৎমিনদের করায়ত্ত হয়েছিল। এমনিতেই সেখানে ফরাসীদের কার্যকর প্রভাব বিশেষ ছিল না। তার ওপর জাপানীদের দখল এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরিণতি যে সুযোগ এনে দিয়েছিল ভিয়েৎমিনরা তা গ্রহণ করেছিল পুরোপুরি।

তাছাড়া ছিল তাদের চমৎকার সংগঠন যার ফলে কাজ অনেকটা সহজ হয়ে গিয়েছিল।

১৯৪১ সালের মে মাসে দক্ষিণ চীনের চিংসিতে ভিয়েৎনাম ডক-লাপ ডং মিন-এর পত্তন হবার পর ফরাসীদের বিরুদ্ধে গেরিলা লড়াই চালাবার জন্যে হো চি মিন গিয়াপের ওপর যে দায়িত্ব অর্পণ করেছিলেন, গিয়াপ সে-দায়িত্ব উৎসাহের সঙ্গে পালন করেছিলেন।

চিংসি থেকে মাইল ষাটেক নেমে এসে কাও বাং প্রদেশের পাহাড়ের ওপর গিয়াপ স্থাপন করেছিলেন তাঁর প্রথম গেরিলা শিবির। কিন্তু প্রথমেই তিনি ফরাসীদের সঙ্গে সশস্ত্র সংঘর্ষে লিপ্ত হ'তে চাইলেন না। কারণ তাঁর অস্ত্রবল তখনো সীমিত।

তার বদলে তিনি ভিয়েৎমিন প্রভাব বিস্তারের কাজে আত্মনিয়োগ করলেন। তাঁর লোক ছড়িয়ে পড়ল গ্রাম থেকে গ্রামে, সেখান থেকে শহরে। ফরাসীদের গতিবিধি সংক্রান্ত খবরাখবর পাঠাতে লাগল গিয়াপের পর্বত-শিবিরে। সেই সঙ্গে গ্রামে গ্রামে গড়ে তোলা হ'তে লাগল প্রতিরোধ কমিটি। ঐ কমিটির মাধ্যমে কাজ চলল শিক্ষা বিস্তারের। একথা বিচিত্র মনে হতে পারে কিন্তু ভিয়েৎমিনদের গোড়ার দিককার প্রধান কাজই ছিল শিক্ষার বিস্তার। যুদ্ধকালীন অবস্থার মত দ্রুতগতিতে তারা এই কাজ চালিয়ে যেতে লাগল। অজস্র বয়স্ক শিক্ষার স্কুল গজিয়ে উঠল চারদিকে। কৃষক টোকা মাথায় কাজ করতে যাচ্ছে মাঠে, তাকে থামিয়ে তার অক্ষরজ্ঞান যাচাই করা হতে লাগল। বাজারে যাবে কেউ, তাকে দাঁড় করিয়ে বানান জিজ্ঞেস করা হল। পারল তো ভালোই, না পারলে সঙ্গে সঙ্গে বাজারের দরজা থেকে ফেরত। এইভাবে কয়েক বছরের মধ্যে যেখানে ৮০ শতাংশই ছিল অশিক্ষিত সেখানে ৮০ শতাংশই হল স্বাক্ষর।

শিক্ষা বিস্তারের এই পরিকল্পনা সবচেয়ে আগে হাতে নেওয়া দরকার ছিল ভিয়েৎমিনদের। কারণ তা না হলে তাদের বক্তব্য সাধারণ মানুষের কাছে ভালোভাবে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হত না। এই বক্তব্য এখন দূর গ্রাম পর্যন্ত পৌঁছতে লাগল হাজার হাজার প্রচারপত্রের আর রঙ আর চকখড়ি দিয়ে দেয়ালের গায়ে লেখা শ্লোগানের মাধ্যমে।

এইভাবে জমি তৈরি করার পরেও কিন্তু গিয়াপ কাজ আরম্ভ করে দিলেন না। তার বদলে হো'র নির্দেশে তিনি গেলেন ইয়েনানে, মাও সে-তুংয়ের গেরিলা যুদ্ধের তালিম নেবার জন্যে।

গেরিলা যুদ্ধই বেছে নিয়েছিলেন তো ফরাসীদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য, কারণ সামনা-সামনি যুদ্ধ করে লোকক্ষয় করার মত অবস্থা তাঁদের ছিল না। তাছাড়া তখন চীনে মাও সে-তুংয়ের লাল ফৌজ গেরিলা যুদ্ধের মাধ্যমেই সাফল্যের পর সাফল্য অর্জন করে চলেছে। কাজেই সেই দৃষ্টান্ত থেকে তারা অনুপ্রাণিত হবে এতে অস্বাভাবিক কিছু নেই।

১৯৪২ সালের প্রায় অধিকাংশ সময়ই গিয়াপ ইয়েনানে ছিলেন। বছরের শেষে তিনি যখন ফিরে এলেন; তখন তাঁর মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হয়েছিল যে, ফরাসীদের বিরুদ্ধে যদি সাফল্য অর্জন করতে হয় তাহলে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব একটি সশস্ত্র ফৌজ তাঁকেও গড়ে তুলতে হবে।

তুললেনও। মাত্র চৌত্রিশজন সশস্ত্র লোক নিয়ে। একটি বিরাট সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে মাত্র চৌত্রিশজন লোক নিয়ে কাও বাংয়ের পাহাড়ে গিয়াপ তাঁর সংগ্রাম আরম্ভ করেছিলেন।

দেখতে দেখতে সে-সংখ্যা বেড়ে চলল। পাঁচ শ' ছাড়িয়ে হাজারে গিয়ে পৌঁছল। ফরাসী ঔপনিবেশিক বাহিনীর ভেঙে-দেওয়া ইউনিটগুলিতে যেসব ভিয়েৎনামী সৈন্য ছিল, গিয়াপ তাদের টেনে নিলেন। সেই সঙ্গে কোয়াংসির লিউচোয় একটি ট্রেনিং ক্যাম্প খোলা হল নতুন নতুন গেরিলা তৈরি করবার জন্যে। টাকা এল চিয়াং কাইশেকের সরকারের কাছ থেকে। এলো মাল-মশলা, অস্ত্রশস্ত্র। চিয়াংয়ের দরকার ছিল জাপানীদের কার্যকলাপ সম্পর্কে নিয়মিত গোপন খবরাখবর জানবার। ভিয়েৎমিনদের পক্ষে সে-খবর জোগাড় করা মোটেই দুঃসাধ্য ছিল না। তারই বিনিময়ে তারা এখন সাহায্য পাচ্ছিল চুংকিংয়ের।

কাও বাং প্রদেশ পুরোপুরি ভিয়েৎমিনদের হাতে আসতে বেশি সময় লাগল না। সেখান থেকে বাক কান ও থাই নুয়েন। ভিয়েৎমিনদের ডাকে গ্রাম কমিটিগুলি জেগে উঠল নিমেষে। দু'-চার জায়গায় বাধা দেবার চেষ্টা করেছিল ফরাসীরা, কিন্তু চোরাগোপ্তা আক্রমণে অভ্যস্ত না থাকায় তারা পেরে উঠছিল না গেরিলাদের সঙ্গে।

ফ্রান্সে তখন একদিকে মার্শাল পেতাঁর ভিচি সরকার, অন্যদিকে জেনারেল দ্য-গলের নেতৃত্বে 'স্বাধীন ফরাসী' আন্দোলন। ভিয়েৎনামের ফরাসী মহলও সেই অনুসারে দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। অনেকেই ছিল 'স্বাধীন ফরাসী'দের প্রতি সহানুভূতিশীল। চুংকিংয়ে একটি 'স্বাধীন ফরাসী' মিশনও স্থাপিত হয়েছিল। তারা 'স্বাধীন ফরাসী' স্বেচ্ছাসেবক পাঠাতো ভিয়েৎনামে হাজারে হাজারে। প্যারাসুট দিয়ে নামিয়ে দিত পাহাড়ে, জঙ্গলে। উদ্দেশ্য প্রধানত ছিল জাপানীদের ওপর নজর রাখা।

ভিয়েৎমিনরা এই 'স্বাধীন ফরাসী' স্বেচ্ছাসেবকদের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করেছিল। দুজনেরই বিরুদ্ধপক্ষ

সুসংবাদ সুসংবাদ

জিনিষ ভাল হচ্ছে—দামও অনেক কমেছে।

এইচ, এম, ভি

"কেলিপ সো"

রেকর্ড প্লেয়ার, রেডিওর সাথে বাজাতে পারবেন।

"ফিয়েস্টা"

রেকর্ড রিপ্রডিসর—রেডিও ছাড়াই বাজান চলবে।

নগদ ও কিস্তিতে বিশদ বিবরণের জন্য নিম্ন ঠিকানায় আজই অনুসন্ধান করুন।

রেডিও এণ্ড ফটো ষ্টোরস্

৬৫নং গণেশচন্দ্র এভিনিউ। কলিকাতা-১৩।

ফোন ঃ—২৪-৪৭৯৩।

যখন জাপানীরা তখন হাত মিলিয়ে কাজ করলে সুবিধে হবে এই ছিল তাদের বক্তব্য। কিন্তু স্বাধীন ফরাসী'রা ঐ প্রস্তাবে রাজী হয় নি। বলেছিল ঃ "এখন আপনারা জাপানীদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্যে অস্ত্র চাইছেন। পরে ঐ অস্ত্রই আমাদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করবেন। অসম্ভব!"

ভিয়েৎমিনরা তার প্রত্যুত্তর দিয়েছিল চোরাগোপ্তা আক্রমণের মাত্রা বাড়িয়ে দিয়ে। এইভাবে অস্ত্র যোগাড় হতে লাগল। যোগাড় হল গোলা-বারুদ, রসদ, রেডিও ট্রান্সমিটার। ধীরে, ধীরে কিন্তু অপ্রতিহত গতিতে গিয়াপ শক্তি সঞ্চয় করতে লাগলেন।

এই শক্তি দুর্বার হয়ে উঠল এর সঙ্গে জন-সমর্থন যুক্ত হবার সঙ্গে সঙ্গে। অত্যন্ত ধৈর্যের ও যত্নের সঙ্গে ভিয়েৎমিনরা এই সমর্থন আদায় করেছিল। তাদের আদর্শ ছিল মাও সে-তুংয়ের প্রবর্তিত সেই আটটি অবশ্য-গ্রাহ্য নীতি যা তিনি সফল গেরিলা যুদ্ধের মূল ভিত্তি বলে বর্ণনা করেছেন ঃ

এক, জনসাধারণের প্রতি ভদ্র ব্যবহার করতে হবে:

দুই, তাদের সঙ্গে কাজ-কারবারে ন্যায়সঙ্গত থাকতে হবে;

তিন, যদি কিছু ধার নিতে হয় তাহলে তা ফিরিয়ে দিতে হবে;

চার, যদি কিছুর ক্ষতি হয় তাহলে তার দাম দিয়ে দিতে হবে;

পাঁচ, জনসাধারণের ওপর হম্বি-তম্বি করা চলবে না;

ছয়, ফসলের ক্ষতি করা চলবে না;

সাত, মহিলাদের সঙ্গে ঠাট্টা-তামাসা করা চলবে না;

আট, বন্দীদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করা চলবে না।

গিয়াপ তাঁর গেরিলাদের মনের মধ্যে এই নীতিগুলি একেবারে গেঁথে দিলেন। এই নির্দেশের একটুও নড়চড় হবার জো ছিল না। সেই সঙ্গে মুক্ত অঞ্চলগুলিতে ১৯৩০ সালে গৃহীত সামাজিক ও অর্থনৈতিক সংস্কারের দশ-দফা নীতিগুলি রূপায়িত করতে লাগলেন।

তার ফলও তিনি পেতে লাগলেন সঙ্গে সঙ্গে। গ্রামের মানুষ গেরিলাদের স্বাগত জানালো সসম্মানে। তাদের আশ্রয় দিল শত্রুপক্ষের হাত থেকে রক্ষা করার জন্যে। তাদের রসদ যোগাড় করে দিতে লাগল। টাকা-পয়সা গয়না-গাঁটি যা সম্ভব তা-ই দিয়ে সাহায্য করতে লাগল। শত্রুপক্ষের গতিবিধির খবরা-খবর পৌঁছে দিতে লাগল। ক্রমে সাধারণ গ্রামবাসীরাও যোগ দিতে লাগল ভিয়েৎমিনদের দলে।

তাদের কলেবর দ্রুত বাড়তে লাগল।

১৯৪৪ সালের অক্টোবরে হো চি মিন পা দিলেন ভিয়েৎনামের মাটিতে। তাই নুয়েন প্রদেশের এক দুর্গম পাহাড়ের গুহায় তিনি স্থাপন করলেন তাঁর সদর দপ্তর। তারপর গিয়াপের গেরিলাদের একত্রিত করে গড়লেন ভিয়েৎমিন সশস্ত্র বাহিনীর প্রথম প্ল্যাটুন। নাম দেওয়া হল স্যালভেশন প্ল্যাটুন, মুক্তি ফৌজ। গেরিলা বাহিনী এই প্রথম একটি সংগঠিত রূপ পেল। আনুষ্ঠানিকভাবে ভিয়েৎমিন বাহিনীর পত্তন হল।

হাতে তখন তাদের ১৭টি বোল্ট রাইফেল, ১৪টি ফ্লিন্টলক আর দুটি রিভলভার।

কিন্তু এই নিয়েই অসাধ্য সাধন করেছিল গিয়াপের বাহিনী। বাক কান, লাং সন, তুয়েন কোয়াং, হা জিয়াং, থু লাং তুয়ং, প্রকৃতপক্ষে উত্তর টংকিনের এক বিস্তীর্ণ পার্বত্য অঞ্চলে ভিয়েৎমিনদের প্রভুত্ব কায়েম হল।

এই সময়ে এমন একটি ঘটনা ঘটল যা ভিয়েৎমিনদের কাজকে অপেক্ষাকৃত সহজ করে দিয়েছিল। ১৯৪৫ সালের ৯ মার্চ জাপানী কর্তৃপক্ষ এক চরমপত্র জারি করে সমস্ত ফরাসী সৈন্যকে তাদের ব্যারাকে আটকে রাখলেন। তাদের সরাসরি জাপানী কম্যাণ্ডের আওতায় আনা হল। জাপানী সৈন্যরা বন্দুক আর সাঁজোয়া গাড়ি নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ জায়গাগুলিতে পাহারার জন্যে মোতায়েন হয়ে গেল। কিন্তু ফরাসীরা ভিয়েৎনামের ভূগোলের সঙ্গে যতটুকু পরিচিত ছিল জাপানীরা তা-ও ছিল না। তাছাড়া তাদের কার্যকর প্রভাব নিজেদের ঘাঁটির বাইরে মোটেই বিস্তৃত ছিল না। এর ফলে গেরিলারা মাঠ প্রায় ফাঁকাই পেয়েছিল।

চুংকিংয়ে সেই সময় ছিল মার্কিন স্ট্র্যাটিজিক সার্ভিসের দপ্তর। সেখানকার কর্তারা দেখলেন ফরাসীরা অকেজো হয়ে যাবার পর একমাত্র ভিয়েৎমিন গেরিলারাই সক্রিয়ভাবে জাপানীদের বিরুদ্ধে লড়ছে। আর ভিয়েৎমিন সূত্র ছাড়া জাপানীদের উদ্দেশ্য ও গতিবিধি সম্পর্কে টাটকা খবরাখবর পাবার আর কোন সূত্রই খোলা নেই। সুতরাং......।

সুতরাং মার্কিন স্ট্র্যাটিজিক সার্ভিসের দপ্তর থেকে ভিয়েৎমিনদের জন্যে মূল্যবান সামরিক সাহায্য আসতে লাগল। আজ এটা বিচিত্র বলে মনে হ'তে পারে, কিন্তু সেই সময়, সেই ১৯৪৫ সালে, যখন ভিয়েৎনামে ফরাসীরা অস্তগামী আর জাপানীরাও প্রতিষ্ঠিত নয়, তখন আমেরিকা এগিয়ে এসে দরাজ হাতে সাহায্য করে হো চি মিনের হাত শক্ত করেছিল। হো'র সেনারা ইয়েনানে গিয়ে গেরিলা যুদ্ধের তালিম নিয়েছিল, মাও সে-তুংয়ের 'গেরিলা যুদ্ধ' বইটি ছিল তাদের গীতা, তা সত্ত্বেও চুংকিংয়ের মার্কিন কর্তৃপক্ষ সেদিন তাঁকে একজন জাতীয়তাবাদী নেতা এবং ভিয়েৎমিন সংগ্রামকে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন বলেই মেনে নিয়েছিলেন।

মার্কিন সাহায্য—অস্ত্রশস্ত্র, গোলা-বারুদ, রসদ—প্যারাসুট দিয়ে পৌঁছে দেওয়া হল তাই নুয়েন প্রদেশে তাঁর দুর্গম গুহা-শিবিরের একেবারে দ্বারপ্রান্তে। তার সূত্র ধরে এলো এক দল মার্কিন প্রশিক্ষক ও বিশেষজ্ঞ। তাদের সহায়তায় গিয়াপ তাঁর বাহিনীকে সম্প্রসারিত করলেন। ভাগ করে দিলেন ছোট ছোট ইউনিটে। উত্তরে, পশ্চিমে, দক্ষিণে তারা ছড়িয়ে পড়ল, গ্রামের পর গ্রামে, একেবারে সং কা'র (রেড রিভার) বদ্বীপ এলাকা পর্যন্ত।

গিয়াপের হাতে তখন ৫ হাজারেরও বেশি সশস্ত্র, সুশিক্ষিত গেরিলা।

তার পরের ইতিহাস খুবই দ্রুত। ৬ আগস্ট হিরোশিমার ওপর পারমাণবিক বোমা নিক্ষিপ্ত হবার পর মহাযুদ্ধে জাপানের পরাজয় অনিবার্য হয়ে পড়ল। হো চি মিনের পক্ষে তা অনুমান করে নেওয়া মুস্কিল ছিল না। পরের দিনই তিনি একটি ভিয়েৎনাম গণ মুক্তি কমিটি গঠনের কথা ঘোষণা করলেন। যে-কোন মুহূর্তে দেশের শাসনভার গ্রহণের জন্যে কমিটি প্রস্তুত হ'তে লাগল।

১৬ আগস্ট যখন জাপানীরা দেশের কর্তৃত্ব সরকারিভাবে আন্নামে বাও দাইর হাতে এবং কোচিন-চীনে ইউনাইটেড পার্টি নামক একটি দলের হাতে অর্পণ করছিল, তখন হো চি মিন তুয়েন কোয়াং প্রদেশের তান ত্রাও গ্রামে ভিয়েৎমিন কেন্দ্রীয় কমিটির সঙ্গে এক জরুরী বৈঠকে মিলিত হলেন। ঐ বৈঠকেই স্থির করা হল আর অপেক্ষা করার দরকার নেই। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব জাপানীদের নিরস্ত্র করতে হবে, তাদের অস্ত্রশস্ত্র আটক করতে হবে, এবং গণ মুক্তি কমিটিকে হ্যানয়ে স্থানান্তরিত করতে হবে।

এবং ঐ বৈঠক থেকেই হো চি মিন গণ মুক্তি কমিটির নেতা হিসেবে দেশবাসীর প্রতি স্বাধীনতার জন্যে বিদ্রোহ করবার আহ্বান জানালেন।

ঐ আহ্বান ভিয়েৎনাম মুক্তি সংগ্রামের এক উদ্দীপনাময় দলিল।

তিনি বললেন ঃ "জাপানী সৈন্যবাহিনী এখন বিধ্বস্ত। জাতীয় মুক্তি আন্দোলন সারা দেশে ছড়িয়ে পড়েছে। সমাজের সর্বস্তরের লক্ষ লক্ষ মানুষ, বুদ্ধিজীবী, কৃষক, শ্রমিক, ব্যবসায়ী,

'মুক্তকেশের পুঞ্জ মেঘে
লুকায় অশনি'
সাধনার
মহাভৃঙ্গরাজ তৈল
মেঘের মত ঘন কুঞ্চিত কেশদাম নারীদের আভিজাত্যের নিদর্শন। তাই কবি বলেছেন— "চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা" সেইজন্য সৌন্দর্য বিলাসিনী মাত্রেই ব্যবহার করেন সাধনার মহাভৃঙ্গরাজ তেল বিশুদ্ধ আয়ুর্বেদ মতে প্রস্তুত স্নিগ্ধ ও শীতল। কেশ উৎপাদনে ও সংরক্ষণে এর জুড়ি নেই।
সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা
৩৬, সাধনা ঔষধালয় রোড, সাধনা নগর, কলিকাতা-৪৮
অধ্যক্ষ যোগেশচন্দ্র ঘোষ, এম, এ, আয়ুর্বেদশাস্ত্রী, এফ, সি, এস (লণ্ডন). এম, সি, এস (আমেরিকা) ভাগলপুর কলেজের রসায়নশাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক।
কলিকাতা কেন্দ্র-ডাঃ নরেশচন্দ্র ঘোষ, এম, বি, বি, এস (কলিঃ) আয়ুর্বেদাচার্য

সৈনিক, ভিয়েৎমিনদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে।......

'প্রায় শতাব্দীকাল ধরে আমাদের জনগণ তাদের মুক্তির জন্যে যে সংগ্রাম করে এসেছে তার ইতিহাস এখন এক বিরাট ধাপ এগিয়ে গেল।

"এই ঘটনায় আমার দেশবাসীর সঙ্গে আমিও অভিভূত।

'তাই বলে আমরা সন্তুষ্ট হতে পারি না। আমাদের সংগ্রাম হবে দীর্ঘ ও কঠিন। জাপানীরা পরাজিত হয়েছে বলেই আমরা রাতারাতি স্বাধীন হয়ে যাব না। আমাদের আরও চেষ্টা করতে হবে. সংগ্রামকে চালিয়ে যেতে হবে। কেবল ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের দ্বারাই আমরা স্বাধীনতা পেতে পারি।

"ভিয়েৎমিন ফ্রন্ট বর্তমানে এই সংগ্রাম ও ঐক্যের ভিত্তি। ভিয়েৎমিন ফ্রন্টে যোগ দিন, একে সমর্থন করুন, একে আরো বিরাট, আরো দুর্বার করে তুলুন।

"যে জাতীয় মুক্তি কমিটি গঠন করা হল, বর্তমানে সেটাই আমাদের অস্থায়ী সরকার। এর পাশে দাঁড়ান; এর নীতি ও নির্দেশাবলী সারা দেশে কার্যকর করুন।

"এইভাবে আমাদের পিতৃভূমি স্বাধীনতা অর্জন করবেই, শীগ্‌গিরই।

"আমাদের জনগণের ভাগ্যের পরমতম লগ্ন সমুপস্থিত। আসুন আমরা উঠে দাঁড়াই; সর্বশক্তি দিয়ে নিজেদের স্বাধীন করবার জন্যে চেষ্টা করি।......

"চলুন! এগিয়ে চলুন!' ভিয়েৎমিন ফ্রন্টের পতাকাতলে সাহসের সঙ্গে সামনের দিকে এগিয়ে চলুন!"

তার পরের ঘটনা : ২৫ আগস্ট বাও দাই'র পদত্যাগ, ২৯ আগস্ট হো চি মিনের হ্যানয়ে প্রবেশ, ২ সেপ্টেম্বর ভিয়েৎনামের স্বাধীনতা ঘোষণা। সে-কথা আমি আগেই উল্লেখ করেছি।

*

কিন্তু ২ সেপ্টেম্বর আরও কিছু ঘটেছিল যা ভিয়েৎনামের ইতিহাসের গতিই দিয়েছিল পাল্টে, যার জন্যে ভিয়েৎমিনরা স্পষ্টতই প্রস্তুত ছিল না।

ঘটেছিল সায়গনে।

হো চি মিন যখন ক্ষমতা দখলের জন্যে প্রস্তুত হচ্ছিলেন উত্তরে, তখন স্বাধীনতার জোয়ারে আন্দোলিত হচ্ছিল সায়গনও।

জাপানীদের পোষকতা-পুষ্ট ইউনাইটেড পার্টি যদিও তখন সায়গনে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত, তবু তার নেতৃত্বে যিনি ছিলেন, ত্রান ভান ইয়াউ, ভিয়েৎমিন আন্দোলনের প্রতি তাঁর পূর্ণ সমর্থন ছিল। তাঁর সক্রিয় সহায়তায় এবং গেরিলাদের তৎপরতায় টংকিন ও আন্নামের মত কোচিন-চীনেও ভিয়েৎমিন প্রভাব দ্রুত কায়েম হয়েছিল।

হ্যানয়ের অনুকরণে একটি ভিয়েৎমিন গণ-কমিটি গঠিত হয়েছিল সায়গনেও। ঐ কমিটির ডাকে ২৫ আগস্ট প্রায় এক লক্ষ লোকের এক বিপুল শোভাযাত্রা এক অভূতপূর্ব বিক্ষোভে বেরিয়ে এসেছিল সায়গনের রাস্তায়। মুখে আকাশ-ফাটানো চিৎকার, হাতে বিরাট বিরাট ফেস্টুন; চোখে আসন্ন স্বাধীনতার স্বপ্ন।

ঐ কমিটিই ডাক দিয়েছিল ২ সেপ্টেম্বর বিপুলতর আরেক সমাবেশের। উদ্দেশ্য যেমন ছিল ভিয়েৎমিন শক্তি ও জনপ্রিয়তার পরিচয় দেওয়া তেমনি মিত্র-শক্তিকে স্বাগত জানানো।

মহাযুদ্ধের শেষে পট্‌স্‌ডাম সম্মেলনে জাপানের কাছ থেকে ভিয়েৎনামের দখল বুঝে নেবার জন্যে ষোড়শ সমান্তরাল বরাবর দেশকে দুভাগে ভাগ করা হয়েছিল। উত্তরের অংশের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল চিয়াং কাইশেকের চীনকে, আর দক্ষিণের দায়িত্ব পড়েছিল বৃটেনের ওপর। তাদের ওপর নির্দেশ ছিল অত্যন্ত স্পষ্ট : পরাজিত জাপানী সৈন্যদের এক-জায়গায় জড়ো করে, নিরস্ত্র করে দেশে ফেরৎ পাঠাবার ব্যবস্থা করা। আভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ করার কোন অধিকার তাদের দেওয়া হয় নি।

সেই অনুসারে আগস্টের শেষ থেকেই বৃটিশ প্রতিনিধিরা সায়গনে আসতে আরম্ভ করেছিল। বিংশতিতম ভারতীয় ডিভিশনের বৃটিশ ও ভারতীয় ইউনিটগুলিকে নিয়োগ করা হল এই কাজের জন্যে। ভিয়েৎমিনরা তাদের কখনই শত্রুপক্ষ বলে মনে করে নি, বরং তাদের কাজে নানাভাবে সহায়তাই করেছিল।

২ সেপ্টেম্বর সকাল থেকে সারা শহর সাজানো হল মিত্রশক্তির পতাকা দিয়ে। বড় বড় ফেস্টুন টাঙানো হল রাস্তা জুড়ে : তাতে মিত্রশক্তিকে অভ্যর্থনা জানিয়ে স্লোগান লেখা।

বিকেলে কয়েক লক্ষ লোকের এক প্রকাণ্ড মিছিল বেরোল শহর পরিক্রমায়। এক উদ্বেল জনসমুদ্র। চওড়া চওড়া বুলেভার্ডগুলিতে মানুষের ঠাসাঠাসি, গাদাগাদি, কল্লোলিনী স্রোতস্বিনী যেন। কিংবা কোন প্রকাণ্ড সরীসৃপ যেন ফুলে-ফুলে ফেঁপে-ফেঁপে, দুলে-দুলে উঠছে। যানবাহন অনেক আগেই বন্ধ। দোকানে-বাজারে আজ কোন কাজ নেই। অফিস-কাছারিতে কোন প্রশ্নই ওঠে না। আজ শুধু উৎসাহ আর উদ্দীপনা। শুধু উন্মত্ত গৌরব। স্লোগান উঠছে ঘন ঘন : স্বাধীন ভিয়েৎনাম জিন্দাবাদ!' কেঁপে উঠছে রু কাতিনাত, বড়লাটের প্রাসাদ, প্রাসাদ-সংলগ্ন বিস্তীর্ণ বাগান, ব্যাঙ্ক অব ইন্দোচীনের পাথরের দেয়ালগুলো।

হঠাৎ......।

বিকেল তখন পাঁচটা। ঘণ্টা তিনেক ধরে শহর পরিক্রমা করার পর শোভাযাত্রীরা সবেমাত্র ছত্রভঙ্গ হতে আরম্ভ করেছে। একটা নিশ্চিন্ত পরিতৃপ্তির ভাব লোকের চোখে-মুখে। আজ তারা স্বাধীন। আজ তারা মুক্ত। মিত্রশক্তি সাহায্যের হাত নিয়ে এগিয়ে এসেছে সেই স্বাধীনতাকে নিরাপদ করার জন্যে।

শান্তি ও শৃঙ্খলার সঙ্গে যে-যার ঘরে ফিরে যাচ্ছিল তারা।

হঠাৎ সন্ধ্যার আকাশ খান খান হয়ে গেল গুলীর শব্দে। বিনা প্ররোচনায়, বিনা কারণে, শান্তিপূর্ণ, নিরস্ত্র, উৎসব-মুখর মানুষের ওপর চলল গুলীর পর গুলী। দেখা গেল ভিড়ের প্রান্তদেশে তুমুল উত্তেজনা ও ছোটাছুটি।

গুলী করেছিল ফরাসীরা।

মহাযুদ্ধের বিপর্যয় এবং পট্‌স্‌ডামের বৈঠকের নির্দেশ উপেক্ষা করে ভিয়েৎনামে আবার আধিপত্য বিস্তারের জন্যে ফরাসীরা তলায় তলায় চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিল বেশ কিছুদিন ধরেই। সেই চেষ্টার একটা স্থান ছিল কলকাতারও। কলকাতায় তখন স্বাধীন ফরাসীদের একটি মিশন। সেখান থেকে কিছুসংখ্যক ফরাসী অফিসারকে পাঠানো হয়েছিল ভিয়েৎনামে। প্যারাসুট দিয়ে নামানো হয়েছিল গোপন স্থানে। কিন্তু প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই কিছু ধরা পড়েছিল জাপানীদের হাতে, কিছু উধাও হয়েছিল ভিয়েৎমিনদের বন্যায় মুখে। আরেকটি অগ্রবর্তী দলকে সমুদ্র-পথে পাঠানো হয়েছিল সায়গনে। কিন্তু তাদের গতিবিধি... গোড়া থেকেই এত নিয়ন্ত্রিত ছিল যে, তাদের পক্ষে কিছুই করা সম্ভব ছিল না।

সে সুযোগ এলো এতদিনে। বেশ কিছুসংখ্যক বৃটিশ সৈন্য তখন সায়গনে উপস্থিত। সুতরাং বিপাকে পড়লে একেবারে রাস্তায় দাঁড়িয়ে মার খেতে হবে না। এতে তাদের সাহস গেল বেড়ে। স্থানীয় বৃটিশ কর্তৃপক্ষও তাদের উৎসাহ দিয়ে থাকতে পারে। সেই সুযোগের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করে ফরাসীরা এখন একটা গোলমাল পাকিয়ে তুলতে চাইল।

ভিয়েৎনামের মানুষের পক্ষে এই ষড়যন্ত্র অনুমান করে নিতে কোন অসুবিধা হল না। ক্রুদ্ধ ভিয়েৎমিনরা সেদিন সন্ধ্যায় ফরাসীদের আস্তানায় হানা দিয়ে প্রায় ২০০ ফরাসীকে গ্রেপ্তার করল।

তাদের এই ক্রোধ মোটেই অন্যায় বা অস্বাভাবিক ছিল না। বরং যদি এই ক্রোধের প্রকাশ আরো রক্তাক্ত পথ বেছে নিত তাহলেও অবাক হবার কিছু থাকত না।

পরে অবশ্য মার্কিন মহলের অনুরোধে—মার্কিন যুদ্ধবন্দীদের দায়িত্ব নেবার জন্যে একটি ছোট মার্কিন প্রতিনিধিদল সে সময় সায়গনে ছিল—তাদের সকলকেই ছেড়ে দেওয়া হয়।

কিন্তু বৃটিশ ও ফরাসী চক্রান্তকারীরা সুযোগ কোনমতেই হাতছাড়া হতে দিতে চাইল না। মেজর-জেনারেল ডগলাস গ্রেসি, বৃটিশ কম্যান্ডার, পটস্‌ডাম সম্মেলনের নির্দেশ উপেক্ষা করে জাপানীদের দমন করার বদলে ভিয়েৎনামীদের দমন করার জন্যে অগ্রসর হলেন।

সামরিক আইন জারী করা হল। ভিয়েৎনামী খবরের কাগজগুলি বন্ধ করে দেওয়া হল। ভিয়েৎমিন মিলিশিয়া ও পুলিশকে নিরস্ত্র করার জন্যে নির্দেশ গেল। সেই সঙ্গে জাপানীদের দ্বারা যে হাজার পাঁচেক ফরাসী সৈন্য অন্তরীণ হয়েছিল তাদের আবার অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত করা হল।

এবং শুধু তাদের নয়। যে জাপানীদের নিরস্ত্র করে দেশে ফেরৎ পাঠাবার দায়িত্ব নিয়ে বৃটেন এসেছিল ভিয়েৎনামে, সেই জাপানীদেরও—হ্যাঁ, সেই জাপানীদেরও—মেজর-জেনারেল গ্রেসি আবার সশস্ত্র করেছিলেন ভিয়েৎনামীদের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেবার জন্যে।

এত নির্লজ্জ, এত জঘন্য, এত ঘৃণিত সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্ত কেউ কল্পনাও করতে পারে নি। প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের এত নিকৃষ্ট উদাহরণ ইতিহাসে খুব কমই আছে। দীর্ঘ, রক্তাক্ত সংগ্রামের পর যে-স্বাধীনতা ভিয়েৎনামের মানুষের করায়ত্ত হয়েছিল, তাকে রক্ষা করার নামে তাকে গ্রাস করার মধ্যে যে নিম্নস্তরের ব্যভিচারী মনোবৃত্তির পরিচয় রয়েছে, কোন সভ্য জাতির চরিত্রের সঙ্গে আমরা তাকে যুক্ত করি না।

"আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস," হো চি মিন বলেছিলেন তাঁর স্বাধীনতার ঘোষণায়, "মিত্র শক্তিবর্গ, যারা তেহেরানে ও সানফ্রান্সিস্কোয় আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার ও দেশে দেশে সমানাধিকারের নীতি স্বীকার করে নিয়েছে, ভিয়েৎনামের স্বাধীনতাকে স্বীকার করে নিতে অস্বীকার করবে না।"

সেই বিশ্বাস রূঢ় আঘাতে ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। যারা একদিন "আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার ও দেশে দেশে সমানাধিকারের নীতি" স্বীকার করে নিয়েছিল, আজ তারাই সেই বিশ্বাসকে ধুলায় গড়িয়ে যেতে দিল। যে মার্কিন মহল ২০০ জন ফরাসী বন্দীকে মুক্তি দেবার জন্যে অনুরোধ করতে পেরেছিল, মেজর-জেনারেল গ্রেসির ঔদ্ধত্যকে বাধা দেওয়া তাদের পক্ষে সম্ভব হল না।

আজ যাঁরা ভিয়েৎনাম কম্যুনিস্ট হয়ে যাচ্ছে বলে বিলাপ করছেন, যাঁরা ভিয়েৎনামে কম্যুনিজম ঠেকাবার ধর্মযুদ্ধে আত্মনিয়োগ করেছেন, তাঁদের আমি ইতিহাসের এই অধ্যায়ের কথা স্মরণ করিয়ে দিতে চাইছি। একটা ছোট্ট জাতি সেদিন তাঁদের মুখের দিকে তাকিয়েছিল। একটি জাতীয়তাবাদী সংগ্রাম তাঁদের সমর্থনের জন্যে অপেক্ষা করছিল। প্রতিশ্রুতি দিয়েও সেই জাতির সঙ্গে, সেই সংগ্রামের প্রতি তাঁরা অত্যন্ত নগ্নভাবে বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন। তারপরেও তাঁরা কি করে আশা করেন ভিয়েৎনামের মানুষ তাঁদের হাতের পুতুল, অনুগ্রহের পাত্র হয়ে থাকবে?

ভিয়েৎনামীদের চরিত্রে সে কথা লেখা নেই। সুতরাং তারা তা থাকেও নি।

জেনারেল গ্রেসির দমননীতি যতই প্রবল হতে লাগল, প্রতিরোধও ততই প্রবলতর হ'তে লাগল।

১২ সেপ্টেম্বর আরো সৈন্য—প্রায় সকলেই ভারতীয়—সায়গনে এসে পৌঁছবার সঙ্গে সঙ্গে জেনারেল গ্রেসি ভিয়েৎমিন সরকারকে উচ্ছেদের জন্যে অগ্রসর হলেন। সরকারী বাড়িগুলি ঘিরে ফেলে সেখান থেকে ভিয়েৎমিনদের বহিষ্কার করা হল। থানাগুলি দখল করে নেওয়া হল। ব্যাঙ্কের লেন-দেন বৃটিশ কর্তৃপক্ষের তত্ত্বাবধানে আনা হল। দুষ্প্রাপ্য খাদ্যসামগ্রীর জন্যে রেশন ব্যবস্থা প্রবর্তন করে ভিয়েৎনামীদের তা থেকে বাদ দেওয়া হল। এককথায়, শাসনক্ষমতা দখল করার জন্যে যা যা করা দরকার সবই করা হল। এবং করা হল ফরাসীদের আবার ভিয়েৎনামে ফিরিয়ে আনবার জন্যে।

২৩ সেপ্টেম্বর সকাল হবার আগেই ফরাসী অধিনায়ক কর্নেল সেদিলের নেতৃত্বে ফরাসী সৈন্যদল হোটেল দ্য ভিল আক্রমণ করল। হোটেল দ্য ভিল ছিল স্থানীয় ভিয়েৎমিন সরকারের সদর দপ্তর।

সেদিন সায়গনের রাস্তা রক্তে প্লাবিত হয়েছিল। অতর্কিত আক্রমণে রক্ষীরা প্রত্যাঘাতের সময় পেল না। গুলী করে তাদের একে একে হত্যা করা হল। হত্যা করা হল বাড়ির অধিকাংশ লোককে। সেখান থেকে সৈন্যরা গেল জেনারেল পোস্ট অফিসে ও ফরাসী আমলের রাজনৈতিক পুলিশের দপ্তরে। সেখানেও চলল হত্যা আর হত্যা। বাড়ি বাড়ি তল্লাসী চালিয়ে গ্রেপ্তার করা হল শত শত লোককে।

সকাল ন'টা নাগাদ দেখা গেল ফরাসী ত্রিবর্ণ পতাকা সায়গনের আকাশে আবার পত পত করে উড়ছে।

কিন্তু প্রতিরোধ দানা বাঁধতে সময় লাগে নি বেশি। সায়গনের রাস্তায় আজকের মতই হাতাহাতি লড়াই চলেছিল সেদিনও। সাধারণ ধর্মঘটে অবশ হয়ে গিয়েছিল শহরের জীবন। দোকান-পাট বন্ধ। ট্রাম-বাস নেই। রিক্সা উধাও। সায়গন যেন মৃতের শহর। কেবল মাঝে মাঝে নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে শোনা যাচ্ছে গুলীর আওয়াজ কিংবা বোমা ফাটার গর্জন।

অক্টোবরের মাঝামাঝি আরো ফরাসী সৈন্য এসে পৌঁছবার সঙ্গে সঙ্গে বৃটিশ, ফরাসী ও জাপানী সৈন্যরা একযোগে সায়গনের চারপাশে আক্রমণ সুরু করল।

আরম্ভ হল খোলাখুলি যুদ্ধ। স্বাধীনতালাভের মাসখানেকের মধ্যে ভিয়েৎনামীদের আবার নতুন করে স্বাধীনতার যুদ্ধ আরম্ভ করতে হল।

দোলে ফাল্গুন-চৈত্রব্যাপী

১৫% কমিশন

ডঃ রাধাগোবিন্দ নাথ-কৃত

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

ছ'খণ্ড • ৪র্থ সংস্করণ • ১২৫ স্থলে ১০৬.২৫

শ্রীচৈতন্যভাগবত

ছ'খণ্ড • প্রথম প্রকাশ • ১৮ স্থলে ৮৩.৩০

মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ

৪০ স্থলে ৩৪.০০

রাজমোহন নাথ-কৃত

নাথপন্থের প্রাচীন পুঁথি ৬.৫০

RIGVEDA SUMMARY 8.00

KESHOBKANTO'S
MESSAGE OF THE GITA 12.00

সাধনা প্রকাশনী

৩১ সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীট: কলি ৯

ফোন: ৩৪-৩১৬৬

কবিতা

এই অন্ধকার

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

('সাতটি তারার তিমির'-এর কবিকে)

রুগ্ন সপ্তর্ষির তিমিরে তোমার মুখ
মনে হয়েছিল
কবিতার শোক। অসুস্থতা। রুগ্ন এক গরিলার মতো
কিংবা কুষ্ঠরোগী, হাইড্রান্ট থেকে চেটে নেয় জল,
আর লক্ষ লক্ষ শূকরীর প্রসবের আর্তনাদ...
এইসব!

রূপসী বাংলার নবান্নের দিনগুলি, গানগুলি
আজ লাসকাটা ঘরে শুয়ে
উটের গ্রীবার মতো অন্ধকার দেখে। সোনালি ডানার চিল,
হায় চিল! হায় বাংলা দেশ। 'কেঁদে কেঁদে ফিরো নাকো
ধানসিড়ি নদীটির পাশে!'
নেই আর।

হায় স্মৃতি! মুখোমুখি বসিবার বনলতা সেন!
নাটোরের। কোথায় নাটোর? বিভক্ত স্বদেশে শুধু রহিমের,
বিপিনের
মৃতদেহ জলে ভাসে। তুমি দ্রষ্টা। মহাপৃথিবীর
প্রচণ্ড রৌদ্রের মধ্যে মাথা রাখতে গিয়ে অন্ধ। ক্রমে
সপ্তর্ষিও অন্ধকার।

হেমন্তের বাংলা দেশে নিরন্নের কান্না, আর্তনাদ
ভেসে আসে। আর গরিলার মতো জ্যেষ্ঠ সহোদর
আর কুষ্ঠরোগী। কে কবি রূপসী জন্মভূমি বুকে রেখে
এসময় সভা আলো করতে পারে?

তুমি অক্ষমতা জানিয়েছ। কেননা ঊর্ধ্বে মুখ রাখতে গেলে
আজ শুধু ঋষিদের শোক।

[ফাল্গুন, ১৩৭৪]

রূপসী বাংলার কবিকে

দুর্গাদাস সরকার

এখনো কজন দেখি তর্ক করে
লণ্ডন লেবানন অনেক কিছুই।
কখনো দ্যাখে নি তারা রূপশালি, হরিয়াল,
হোগলার বন—দেখে নি কিছুই।

একালের সমস্ত যুবক
শুনেছে কি সুরঞ্জনা নাম?
একালের প্রতিটি লেখক
জেনেছে কি জীবন-সংগ্রাম?

সেই মুখ মনে পড়ে। উঁচু হাসি সরল দু'চোখ।
একই কথা বারবার। হে সোনালি চিল,
সারাটা দুপুর ধরে মনে এতো ছড়ালে পালক
তবু টেবিলে ধুসর পাণ্ডুলিপি। স্তব্ধ পেনসিল!

কী দিয়েছে বাংলা দেশ। রূপসী বাংলা বুদ্ধি মত্ত।
একালের কেউ কেউ মহিমের ঘোড়া।
কবির ভণিতা করে শাড়ির দোকানে পরিবৃত।......
মনে পড়ে সেই মুখ, নীল ঠাণ্ডা ভুরু এক জোড়া।

একটি কণ্ঠস্বরের প্রার্থনা

মনোতোষ সরকার

'বাবা এই বাচ্চাটাকে কিছু খেতে দেবেন? মা, আমার বাচ্চাটাকে কিছু সাহায্য করুন। দাদাবাবু দিদিমণিরা তোমরা কিছু দেবে আমার এই বাচ্চাটাকে?' থেমে গেল মেয়েটা। আর কচি বাচ্চাটাকে বুকের উষ্ণতার মধ্যে আরও আড়াল করে রাখল।

আমি কেমন যেন আকৃষ্ট হচ্ছিলাম। ওর অপূর্ব বাচনভঙ্গি আমাকে মুগ্ধ করছিল প্রতিদিন। আমাদের বাস শ্যামবাজারের কফি হাউসের কাছে এসে দাঁড়ালেই আমি কেমন উসখুস করতাম। আর ওকে খুঁজে বেড়াতাম। ওর সেই কথাগুলো যা আমাদের উদ্দেশ্য করে ছুঁড়ত তাই শোনার অপেক্ষায় থাকতাম। আর ভাবতাম এত ভাল গল্প ও পেল কোথায়? তবে ও অভিনয় করে না কেন? কেন?

এই নয়নতারাকে নিয়ে শেষ পর্যন্ত গল্প লিখব ভাবতে পারি নি কোন দিন। আমার মনের ডায়রীতে ত' অনেক নাম এবং সেই অনেক নামের মুখের ছবি লিখে রাখি সযতনে। কিন্তু ওই পর্যন্ত। ওদের সবাইকে নিযে তেমন কিছু লিখতে পারি না। লেখাও যায় না। এবং লেখার কোন অনুপ্রেরণা পাই না শেষ পর্যন্ত। কিন্তু নয়নতারা যেন ব্যতিক্রম। সেই অনেক নাম এবং অনেক নামের মুখের ছবিগুলোর মধ্যে। যাদের কথা, যাদের ছবি প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তে লিখে রাখছি আমার এই মনের ডায়রীতে।

কেন লিখছি? কেন লিখি? তাই হয়ত ভাবি মনে মনে। এতে কি লাভ হবে আমার? জানি না—তবে লিখতে ত' হয় আমায়। কাউকে না কাউকে আঁকতে হয়। সে যেই হোক। তাই লিখছি। তাই লিখি। কিন্তু যাকে নিয়ে আমার এখন লেখার এত উৎসাহ তার জীবনের কোন লাভের অঙ্কর মাত্রা বাড়িয়ে দিতে কি এমন সাহায্য করতে পারব আমি? জানি না—

অথচ অনেকগুলো মুখের মধ্যে তখন ওই একটি মুখই প্রথম অনেক বেশি স্পষ্ট। আমার দৃষ্টি-সাগরে ডুবতে ডুবতে ওই একমাত্র ভেসে রয়েছে তবু। ভাসছে—ওর চোখে মুখে কি কোন প্রার্থনা রয়েছে? আমি তখন সেটাই ভাবছিলাম বেশি করে। কি প্রার্থনা? কিসের প্রার্থনা?

শ্যামবাজারের মোড়ে কফি হাউসের সামনে বাসগুলো এসে দাঁড়াত। তখন বিভিন্ন বয়সের কতকগুলো মেয়ে-পুরুষ এসে ভিক্ষে চাইত। পয়সা চাইত। তাদের দলের বলে নয়নতারাকে মনে হলেও আমি আলাদা চোখে দেখতাম। সকলের মধ্যে ওকে আলাদা বলে মনে হত কেবল। বাস এসে দাঁড়ালে অন্যান্যদের সঙ্গে ওকে হুড়োহুড়ি করতে দেখতাম না কোন সময়ে। কিসের একটা অহঙ্কার সব সময়ে ওকে আড়াল করে রাখত। পরে অহঙ্কারী মেয়েটা থেমে-থাকা বাসগুলোর সামনে একসময় এসে দাঁড়াত। কচি বাচ্চাটাকে বুকের উষ্ণতার মধ্যে আরও আড়াল করে রাখত। বলত, 'এই বাচ্চাটাকে কিছু দিন আপনারা। আমাকে কিছু দিতে বলছি না, অন্তত এই বাচ্চাটার প্রতি আপনারা দয়াবান হোন।'

অদ্ভুত কথা বলার ভঙ্গি এবং সুরেলা স্বরবিন্যাস বাসের সকলকে তখন আকৃষ্ট করত বেশি করে। কেউ দিয়েছে কিছু। কেউ আবার দেয় নি এমনও হয়েছে। যারা দিয়েছে তাদের মধ্যে কেউ কেউ রুগ্ন বাচ্চাটার কথা চিন্তা করেই দিয়েছে। কেউ হয়ত শুধু ওকে দেখেই দিয়েছে রুগ্ন বাচ্চাটা পর্যন্ত নজর তাদের মোটেই যায় নি। থেমে থেকেছে। শুধু ওকে ঘিরে, ওর দেহটা ঘিরে চক্রাকারে ঘুরতে চেয়েছে। চেয়েছে বলেই ও পেয়েছে। হাত পেতে সবটুকু গ্রহণ করেছে। আর খুচরো যত পয়সা সব হাতের তালুতেই রেখে দিয়েছে। করুণা আদায় করেছে। করতে চেয়েছে। ওই রুগ্ন বাচ্চাটাকে সম্বল করে। দেহের প্রতি টুকরো টুকরো লোভের ইশারাকে সম্বল করে। কথা বলার ভঙ্গি ও স্বরবিন্যাসের ক্ষমতাকে সম্বল করে।

কেমন যেন আকৃষ্ট হয়ে পড়ছিলাম আমি। শ্যামবাজারের দিকে কোন কারণে এলেই খুঁজতাম ওকে। ওর সেই একই ভঙ্গি। রুগ্ন বাচ্চাটাকে বুকের কাছে রেখেছে। এ যেন এক মমতাময়ী মায়ের ছবি। যা আমি দেখেছি বড় বড় শিল্পীদের

আঁকা ছবিতে। সেই ছবি আর এই ছবিতে বুঝি কোন তফাৎ নেই। ওই সব মুহূর্তগুলোতে আমিও যেন কোন তফাৎ খুঁজে পেতাম না। তাই দেখতাম আর মুগ্ধ হতাম। মুগ্ধ থাকতাম। সেই সব শিল্পীদের চোখ দিয়ে বুঝি আমিও দেখতাম। আর তাই মাতৃত্বের এমন ছবি আঁকতে চেয়েছিলাম কাগজের পাতায়। সেই সব শিল্পীদের মতই। তবে আমি তাদের মত তুলি টানতে চাই না। কোন রেখা দিয়ে বোঝাতে চাই না এই মাতৃত্বকে। শব্দ দিয়ে, ভাষা দিয়ে, অলঙ্কার দিয়ে আঁকতে বুঝি-চেয়েছিলাম এই ছবিকে। যা আমার একান্ত নিজস্ব তাই দিয়েই। ভিন্ন সুরে ভিন্ন মেজাজে এবং ভিন্ন পদ্ধতিতে। আমিও এই মাতৃত্বকে আঁকতে চাই—আমার যত কিছু ক্ষমতা সব উজাড় করে দিতে চেয়েছিলাম। আমিও আর এক মাইকেল এ্যাঞ্জেলো হতে চেয়েছিলাম। মাইকেল এ্যাঞ্জেলোর মত সৃষ্টি করতে চেয়েছিলাম। তাই ত' সৃষ্টির বেদনায় চঞ্চল হয়ে উঠেছিলাগ তখন। চঞ্চল হচ্ছিলাম।

সেদিন কেন যেন আমার বন্ধু রণজিতের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। শ্যামবাজারের মোড়ে। কফি হাউসের সামনে। ওই জোর করে টেনে নিয়ে গেল কফি হাউসে চা খাওয়াবে বলে। আমার কিন্তু চা খাবার ইচ্ছে ছিল না মোটেই। কারণ ওই একটাই আকর্ষণ তখন আমাকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে এই শ্যামবাজারেই হাজির করাত। আর আমি হাজির হতাম। ওই একটি কণ্ঠস্বর, ওর মাতৃত্ব আর মেয়েটার অহঙ্কার সব আমাকে প্রলুব্ধ করেছিল, মুগ্ধ করেছিল। কিন্তু তখনও কোন নামে ওকে আমি চিনতাম না। সাধারণ একটা মেয়ে অন্যান্য অনেকের মত ছেলে বুকে করে ভিক্ষে করে এটাই ছিল ওর বড় পরিচয়।

আমাকে বুঝি অন্যমনস্ক দেখেছিল রণজিৎ। তাই জিগ্যেস করেছিল, 'তোর কি কিছু হয়েছে?'

মাত্র ২০, টাকায় ট্রানজিস্টার

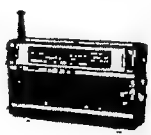

অল ওয়ার্ল্ড ৩ ব্যাণ্ড সুলভতম ট্রানজিস্টার সমবায় ভিত্তির মাধ্যমে মাত্র ২০, টাকায় পাঠানো হয়। ইংরেজীতে আপনার অর্ডার বুক করুন।

Ceylon Traders (WBC-22)
Post Box 1257, Delhi-6.

কেন?'

'চা ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে তবু মুখে দিচ্ছিস না।'

চায়ের কাপটা তুলে নিয়েছিলাম এবার। তারপর একনিমেষে সেই ঠাণ্ডা-হয়ে-যাওয়া চা চুমুকে চুমুকে শেষ করেছিলাম।

এটাও বুঝি এক অভিনব ব্যাপার মনে হয়েছিল রণজিতের। তখনকার মত আমার উপস্থিতির প্রতিটি মুহূর্তের ওপর রণজিতের শ্যেনদৃষ্টি একরকম অস্ত্রোপচার করে যাচ্ছিল যেন। চা গরম থাকতে খেলাম না অথচ সেই ঠাণ্ডা চা চুমুকে চুমুকে শেষ করাটার মধ্যে ও কি যেন খুঁজে বেড়াচ্ছিল। তাই বলতে চেয়েছিল আবার, 'তুই এমন ত' করিস নি কোন দিন? আজ তবে এমন করছিস কেন? কি যেন হারিয়ে ফেলেছিস মনে হচ্ছে অথবা হারাচ্ছিস?' রণজিৎ তখনও তাকিয়ে থাকতে চেয়েছে আমার মুখের দিকে। চোখের দিকে। আর এই মুহূর্তের হঠাৎ সৃষ্টি হওয়া রণজিতের ধারণার জাল ছুঁড়ে দিয়েছে মাছ ধরার মত করে। আমার মনে। তাই একটু একটু করে টানা শুরু করে দিয়েছে। হয়ত তাতেই বুঝি আমার মনের সব কিছু ধরা পড়বে রণজিতের কাছে। তাই ত' রণজিৎ চেয়েছে। তাই রণজিৎ জানতে চাচ্ছে। এই মুহূর্তে। আমার মনের মধ্যের সব কিছু।

কফি হাউসের সব টেবিলেই ভিড় তখন। কাঁটা, চামচ, কাপ, প্লেট এমন কি জলের গেলাস ভিড়-করে-থাকা প্রতিটি মানুষের প্রতীক হিসেবে সেই সব টেবিলে শোভা পাচ্ছিল। আর চেয়ার টানার শব্দ, বেয়ারাগুলোর ছুটোছুটি আমার ও রণজিতেব যুগ্ম সৃষ্ট মুহূর্তগুলোর ওপর অযথা ফাটল ধরাচ্ছিল। আমি কেমন যেন বিরক্ত বোধ করছিলাম। আব বণজিৎকেও এই সময়ে ভাল লাগছিল না। উঠতে যাচ্ছিলাম। পালাতে চাইছিলাম এখান থেকে। সত্যি কি আমি হারিয়ে ফেলেছি কিছু অথবা হারাচ্ছি?

রণজিৎ বুঝি বুঝতে পারছিল কিছু। তাই বলল, 'চল বাইরে যাই।' রণজিৎ কাউণ্টারের দিকে এগিয়ে গেল।

আমি তখনও সেখানেই দাঁড়িয়ে থেকেছিলাম। অথচ দৃষ্টিটা তখনও আমাদের চায়ের টেবিলে। যেখানে তখনও রণজিতের এবং আমার শূন্য চাযের কাপ দুটো ঘেঁষাঘেঁষি কবে কিছু হাবিয়ে গেছে অথবা হারাচ্ছে তারই ব্যথায় এখনও কেমন যেন মূক।

হারিয়ে ফেলি নি এখনও তবে হারাচ্ছিলাম এটাই মনে হচ্ছিল যেন বেশি করে। আমার মনের চেতনার দেয়ালে পরম বাসনার সেই একমাত্র কামনা ওই একটি কণ্ঠস্বর ধ্বনি প্রতিধ্বনিতে নতুন এক সঙ্গীতের জন্ম দিচ্ছিল। আমি আরও বেশি একক তখন। আরও নিঃসঙ্গ।

চায়ের দাম মিটিয়ে রণজিৎ আমাকে ডেকেছিল। ওকে অনুসরণ করতে চেয়েছিলাম। অনুসরণ করে বাসস্টপে দাঁড়িয়েছিলাম। চা খাবার আগের মুহূর্তের সেই একই ভাবনা নিয়ে তখনও লোফালুফি করছিল রণজিৎ। 'কিরে কি হয়েছে তোর?'

'কিছুই না।'

'নিশ্চয় কিছু হয়েছে তোর?'

কেন যেন সেই নিঃসঙ্গতা আমার ভেঙে যাচ্ছিল তখন। যা ভাঙতে চাই না। আমার নিঃসঙ্গতা আমার থাকুক। তাই চীৎকার করে বলতে ইচ্ছা করছিল, না-না-না। কিন্তু তখন সত্যি কিছুই বলতে পারি নি রণজিৎকে। বলতে চাই নি। সেই কণ্ঠস্বরকে খুঁজে পেয়েছি যে আবার। আর মাতৃত্বকে দেখছি প্রাণভরে।

রণজিৎ বুঝি সেই সময় আমাকে অনুসরণ করছিল। আমার দৃষ্টিকে অনুসরণ করছিল। তাই বলতে পেরেছিল আবার, 'মেয়েটাকে দেখতে বেশ সুন্দর তাই না?'

কোন জবাব দিই নি আমি। ইতিমধ্যে ও ঘুরে-গেছে আমাদের পাশ দিয়ে। পকেটে হাত দিয়েছিলাম। হাতে যা খুচরো পয়সা ঠেকেছিল তাই তুলে দিয়েছি ওর হাতে।

'গলাটাও খুব সুরেলা।' রণজিৎ সোজা আমার চোখের দিকে তাকিয়ে বলেছিল।

এবারও কোন জবাব নেই আমার।

'জানিস ত' ওই বাচ্চাটা কিন্তু নয়নতারার নিজের নয়।'

'কে বললে?' আমি যেন কেমন ভেঙে গুঁড়িয়ে যাচ্ছি তখন। এ-ও কি সম্ভব? পরের বাচ্চাকে নিয়ে এভাবে নিজেকে মা সাজাতে পারে? কেউ এভাবে মাতৃত্ব রচনা করতে পারে? তাহলে আমি কি লিখব? কি আঁকব? নয়নতারার চোখে তবে কিসের প্রার্থনা আমি দেখেছিলাম? ওর সুরেলা কণ্ঠস্বর আমাকে এত আকৃষ্ট করেছিল কেন? ওর এই সাজানো মাতৃত্ব আমাকে মাইকেল এ্যাঞ্জেলোর শ্রেষ্ঠ কীর্তিকে স্মরণ করাচ্ছিল কেন? কেন-কেন-কেন? আর কি করেই বা নয়নতারা এই রুগ্ন বাচ্চাটার স্তনদাত্রী হতে পেরেছিল?

রণজিৎ তখনও বলতে চেয়েছে, বলেছে, 'আমি জানি ওকে। আমি চিনি ওদের। ওরা ত' ওই গ্যালিফ স্ট্রীটের ট্রাম ডিপোর ওদিকের বস্তিতে থাকে।'

রণজিৎ কি করে নয়নতারাকে চিনেছিল অথবা ওদের পরিচয় জানতে পেরেছিল আমি জানি না। এবং এ সম্বন্ধে রণজিৎকে জিজ্ঞেস করি নি কিছু। অথচ আমিও কেমন করে সব জানতে পেরেছিলাম। কিন্তু কেন জানলাম? আমি ভাবতে লাগলাম—ওর সুরেলা কণ্ঠস্বর যা আমাকে প্রলুব্ধ করেছিল, মমতাময়ী মাতৃত্ব যা আমাকে মুগ্ধ করেছিল তা নিয়েই যদি আমি নিশ্চিন্ত থাকতাম এবং তা দিয়েই যদি আমার ছবি লেখা শেষ করতাম তা হলে কি এমন ক্ষতি হত তাতে? তাই ভাবছিলাম—তাই ভাবতে লাগলাম।

তবুও প্রতিদিন ছুটে আসি এই শ্যামবাজারে। ওই সুরেলা কণ্ঠস্বরের মুখোমুখি হতে চাই, মমতাময়ী মাতৃত্বকে প্রত্যক্ষ করতে চাই। তাই খুঁজে ফিরি নয়নতারাকে। কিন্তু একদিন দুদিন করে কয়েকদিন আর খুঁজে পেলাম না নয়নতারাকে। জানি না ও আসে না কেন? ও আসছে না কেন?

আমার শিল্পিমনটা তখন আকুলি-বিকুলি করে। ছবি আঁকতে গেলেও কলম থমকে থাকে। থেমে থেমে যায়। থেমেই থাকে। এক চরম অস্বস্তি তখন। এই অস্বস্তি তখন মনটাকে ছোটাতে চায়। ছুটিয়ে নিয়ে যেতে চায় নয়নতারাদের গ্যালিফ স্ট্রীটের বস্তির আশে-পাশে। ওখানে গেলে কি খুঁজে পাওয়া যাবে নয়নতারাকে? হয়ত খুঁজে পাওয়া যাবে নয়নতারাকে। কিন্তু সেই কণ্ঠস্বর আর মাতৃত্ব তাও কি পাওয়া যাবে?

তারপরেই ছুটে গিয়েছিলাম গ্যালিফ স্ট্রীটে। কিন্তু কি খুঁজে পেলাম সেখানে? আমি ভাবছি আর ভাবছি। এই কি আমি চেয়েছিলাম?

নয়নতারা তখন ওরই বয়সী আর একটি মেয়ের মুখোমুখি। আর দুজনের কথাবার্তা কেমন বিপরীতমুখী।

'তুই আমার মেয়েকে আর নিবি না। আফিম খাইয়ে খাইয়ে আমার মেয়েটাকে মেরে ফেলবি তুই!'

'বিশ্বাস কর ফুলি, আমি আর আফিম খাওয়াব না। শুধু ওকে নিয়ে শ্যামবাজারে গিয়ে মা সেজে ভিক্ষে করব তাতে যা পাব তোকে সব দিয়ে দেব। আমি আর একপয়সাও নেব না তার থেকে।'

'তোকে আর বিশ্বাস নেই, দুটো পয়সা দিস বলে আমার মেয়েটাকে মেরে ফেলছিস। কিন্তু ডাক্তার বলেছে আমার মেয়ের শরীরে এত আফিম রয়েছে তাতে করে ও আর ভাল হবে না কোন দিন—।'

'আমি চিকিৎসা করাব তোর মেয়ের যত টাকা লাগে সব দেব আমি। তবু তুই না করিস না ফুলি, তা হলে যে আমি বাঁচব না আর, মরে যাব।'

'আমার মেয়েও ত' মরে যাবে। বাঁচবে না, তখন আমার, তোর টাকা দিয়ে কি হবে?'

'না তোর মেয়ে মরবে না। আমি বলছি, তোর মেয়েকে আমি মরতে দেব না। দে ফুলি তোর মেয়েকে দে—' হাত পেতে ভিক্ষে চাইছে নয়নতারা। এখানে সেই সুরেলা কণ্ঠস্বর হারিয়ে ফেলেছে বুঝি। শুধু কান্না—কান্না দিয়ে ভিক্ষে চাইছে, করুণা চাইছে, ফুলির মেয়েকে ফিরে পেতে চাইছে। 'ভগবানের নামে দিব্যি করে বলছি, আর একটা পয়সাও আমি নেব না, সব তোকে দেব, সব তোর মেয়েকে দেব—'

'তুই একটা সাঙা কর নয়ন, তা হলে তুইও আমার মত মেয়ে পাবি, তাকে নিয়ে ভিক্ষে করতে পারবি।'

'না তা আমি পারব না, তা আমি করব না।'

'আমার মেয়েকে আর আমি দেব না। কিছুতেই দেব না। কোনদিন দেব না।'

জানি ফুলি আর তোমাকে মেয়ে দেবে না। এখন তবে কি করবে নয়নতারা? যদিও সব দিতে চেয়েছে—মেয়ের চিকিৎসা, রোজগারের সব অর্থ, তবু না, তবুও না।

তবে কেন তুমি পরের মেয়েকে আফিম খাইয়ে নিজে মা সেজেছ নয়নতারা? আমি বুঝতে পারছি না। কিছুতেই বুঝতে পারছি না। কেন এ পাপের খেলা তুমি খেলেছ? এইভাবে মা সাজতে গেছ? কেন তোমাদের বস্তির অন্যান্যদের মত, ফুলির মত মা হতে কি তুমি চাও না?

তবু বলব তোমার অভিনয়ের কোন তুলনা হয় না। তুমি যে কোন শ্রেষ্ঠা অভিনেত্রী থেকেও শ্রেষ্ঠা। তোমার অভিনয়ের জন্য কোন সাজানো মঞ্চ নেই, আলোর যাদু নেই, সাজ-সজ্জার বাহার নেই। মুক্ত আকাশের তলায় শ্যামবাজারের মোড়ই তোমার এখন মঞ্চ। অগণিত এই পথযাত্রী তোমার দর্শক। তাদেরই দেখাও তোমার এই নাটক।' করুণা আদায় করাতে, পয়সা আদায় করতেও তোমার কোন কষ্ট নেই।

পালিয়ে এসেছিলাম আমি। ফিরে এসেছিলাম। সেই শ্যামবাজারের মোড়ে। কফি হাউসের সামনে। যেখানে বাস দাঁড়ায়। একটি সুরেলা কণ্ঠস্বর আমাকে প্রলুব্ধ করেছিল। একটি মাতৃত্ব আমাকে মুগ্ধ করেছিল।

তোমাকে নিয়ে আমি আর গল্প লিখতে পারলাম না নয়নতারা। তোমার কণ্ঠস্বর যদি হারিয়ে গেল, মাতৃত্বও ফুরিয়ে গেল তবে কি নিয়ে আমি আমার ছবি আঁকা শেষ করব?

দেশ সেবায় নিয়োজিত,
এ্যালবার্ট ডেভিড লিমিটেড
কলিকাতা—৫০
নীতি ও বিজ্ঞানানুযায়ী ঔষধ
প্রস্তুতকরণের অগ্রণী
—ব্রাঞ্চ সমূহ—
বোম্বে – মাদ্রাজ – দিল্লী – নাগপুর
বেজওয়াডা – শ্রীনগর – গৌহাটী

গ্রন্থমেলা

শ্রীচৈতন্যভাগবত—শ্রীরাধাগোবিন্দ নাথ। সাধনা প্রকাশনী, ৬৯, সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট, কলিকাতা—৯।

শ্রীচৈতন্যদেবের প্রথম বাংলা জীবনীগ্রন্থ বৃন্দাবনদাসের শ্রীচৈতন্যভাগবত। ষোড়শ শতাব্দীতে বাংলা ভাষার যাবতীয় গ্রন্থ কাব্যেই লিখিত হোত, এবং যে জীবনীকাব্য শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনাবলম্বনে ও তাঁর তত্ত্বনিরূপণে ষোড়শ শতাব্দীতে বিরচিত তার ব্যাখ্যা একালের পাঠকদের কাছে সর্বক্ষেত্রে সহজ বলে মনে হয় না। সেজন্যে প্রয়োজন—যথার্থ ভূমিকা, শব্দ ও শব্দার্থের টীকা এবং পঙক্তিতে পঙক্তিতে যথোপযুক্ত ব্যাখ্যা।

শ্রীচৈতন্যভাগবতের টীকা-টিপ্পনী ইতিপূর্বেও রচিত হয়েছে। বৃন্দাবনদাসের জীবনবৃত্তান্ত নিয়েও পণ্ডিত মহলে প্রচুর তর্কবিতর্ক রয়েছে। শ্রীচৈতন্যভাগবতের তত্ত্ব নিয়েও চুলচেরা বিচার হয়েছে। ঐ সব টীকা-টিপ্পনী, জীবনবৃত্তান্ত ও তত্ত্বের সাহায্যে গবেষকরা নতুন বক্তব্য উপস্থাপনে উৎসাহী হয়েছেন, উচ্চ ডিগ্রি লাভেচ্ছু ছাত্ররা পরীক্ষার জন্যে নতুন তথ্য সংগ্রহ করেছেন এবং ঐতিহাসিক চেতনাসম্পন্ন ও বর্তমান যুগের নতুন চিন্তাধারায় উদ্বুদ্ধ বাস্তববাদী পণ্ডিত চড়া সুরের মন্তব্যে ভক্তদলকে হকচকিয়ে দিয়েছেন।

শ্রীরাধাগোবিন্দ নাথও পূর্বসূরীদের গ্রন্থগুলি থেকে সাহায্য নিয়েছেন। কিন্তু মনে রাখতে হবে তিনি শুধু বৈষ্ণবসমাজেই নন, বাংলাদেশের পণ্ডিতসমাজে প্রখ্যাত পণ্ডিত। তাঁর সম্পাদিত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শন বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের গৌরবোজ্জ্বল নিদর্শন। সুতরাং তাঁর সম্পাদিত সর্বাধুনিক শ্রীচৈতন্যভাগবত গ্রন্থ [illegible] পণ্ডিতমহলে প্রচুর কৌতূহল জাগা স্বাভাবিক। শুধু পাণ্ডিত্যই নয়—অপরিসীম অধ্যবসায় তার সঙ্গে যুক্ত না হলে মোট প্রায় আড়াই হাজার পৃষ্ঠার এই অমূল্য খণ্ডগুলি আমরা পেতাম না। মোট ছ'টি খণ্ডে তাঁর সম্পাদিত শ্রীচৈতন্যভাগবত সমাপ্ত। প্রতিটি খণ্ডের পৃষ্ঠা সংখ্যা ন্যূনাধিক ৩২০ থেকে ৪৯৬। সম্পূর্ণ গ্রন্থের মোট মূল্য ৯৮·০০। পৃথক পৃথক খণ্ডের মূল্য নির্ধারিত হয়েছে এইভাবে : ভূমিকা—১২·৫০ আদিখণ্ড—১৮·৫০, মধ্যখণ্ড (প্রথমার্ধ)—১৯·৫০, মধ্যখণ্ড দ্বিতীয়ার্ধ—১৫·২৫, অন্ত্যখণ্ড—১৫·০০, পরিশিষ্ট—১৭·২৫।

বর্তমান স্বল্পপরিসর আলোচনায় প্রতিটি খণ্ডের বিশদ পরিচয় দান অসম্ভব ব্যাপার। তবে আদিখণ্ড থেকে অন্ত্যখণ্ড পর্যন্ত বৃন্দাবনদাসের শ্রীচৈতন্যভাগবতের প্রায় প্রতিটি পঙক্তির এবং প্রায় প্রতিটি অপ্রচলিত বা দুর্বোধ্য শব্দের টীকা-টিপ্পনী দিয়ে গ্রন্থের অর্থ বা ব্যাখ্যা সহজ ও সরল করা হয়েছে। প্রসঙ্গত তথ্যের সাহায্যে তত্ত্বেরও বিচার-বিশ্লেষণ করা হয়েছে। কিন্তু উপরি-উক্ত খণ্ডগুলি পড়ার আগে পড়া উচিত 'ভূমিকা'খণ্ডটি। বহু বৈষ্ণবাচার্যের মতামত কিংবা এযাবৎ গৃহীত মতামতের ভুল-ত্রুটির তিনি নিরসন করেছেন। শ্রীচৈতন্যভাগবতে কোনো তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে কি না এ সম্বন্ধে বলতে গিয়ে শ্রীরাধাগোবিন্দ নাথ বলেছেন যে, "শ্রীচৈতন্যভাগবত সম্বন্ধে স্থল বিশেষে কতকগুলো প্রতিকূল ধারণার কথা শোনা যায় বলিয়া,......সে-সমস্ত ধারণার নিরসনের জন্য, একটু বিস্তৃতভাবেই এই গ্রন্থের একটি ভূমিকা লিখিত হইয়াছে। শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দের লীলা-মহিমা বর্ণনেই পরম ভাগবত গ্রন্থকারের পরম আবেশ ছিল। একই স্থলে ধারাবাহিকভাবে কোনও তত্ত্বের বর্ণন-বিষয়ে তাঁহার অভিনিবেশ ছিল না। কিন্তু বিভিন্ন স্থলে, বিভিন্ন উপলক্ষে, লীলা-মহিমাবর্ণনের প্রসঙ্গে, তিনি শ্রীগৌরের মুখে, শ্রীনিত্যানন্দের মুখে, ভক্তবৃন্দের স্তবে এবং নিজের উক্তিতে যাহা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা হইতে বিভিন্ন তত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁহার অভিমত পরিষ্কারভাবে জানা যায় এবং ইহাই জানা যায় যে, তত্ত্ববিষয়ে পরবর্তী আচার্যদের সহিত এবং মহাপ্রভুর পরবর্তী উক্তির সহিত, কোনও অংশেই তাহার অনৈক্য নাই। গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্যদের মধ্যে শ্রীল বৃন্দাবনদাসই সর্বপ্রথমে বিভিন্ন তত্ত্ব প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন।" আমরা আশা করি, শ্রীরাধাগোবিন্দ নাথের তথ্যসহ যুক্তি ও ব্যাখ্যা বৈষ্ণবদের মধ্যে ভুল ধারণা দূর করতে সাহায্য করবে। বিশেষভাবে তিনি ডঃ বিমানবিহারী মজুমদারের বহু মতামতকে অগ্রাহ্য করেছেন—যদিও স্থানবিশেষে ডঃ মজুমদারের বহু মতের সমর্থনও তিনি করেছেন (পৃঃ ভূ—১২৭-১২৮, ভূ—১০)। শ্রীচৈতন্যভাগবতের ঐতিহাসিক মূল্য যেখানে ডক্টর মজুমদারের অভিমতে ক্ষুণ্ণ হয়েছে সেখানে শ্রীরাধাগোবিন্দ নাথ প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে, ডঃ মজুমদার কর্তৃক গৃহীত ভুল তথ্যই তাঁকে ভুল পথে চালিত করেছে। এতদসত্ত্বেও বলা দরকার, আলোচ্য গ্রন্থটিতে বিরুদ্ধমতাবলম্বীদের বিরুদ্ধে কোথাও উষ্মা নেই, বরং আছে উচিত শ্রদ্ধা। বর্তমানকালে এ জিনিসটি প্রায় বিরল হয়ে উঠেছে। যে সব তত্ত্ব নিয়ে শ্রীরাধাগোবিন্দ নাথ যুক্তিসহ আলোচনা করেছেন—তার মধ্যে আছে গৌরতত্ত্ব, অদ্বৈততত্ত্ব, শ্রীবাসাদি ভক্তগণের তত্ত্ব, সাধ্যসাধনতত্ত্ব প্রভৃতি। প্রসঙ্গক্রমে তন্ত্র সম্বন্ধে আলোচনায় আছে অনেক নতুন তথ্য। এই তথ্যের সর্বশেষ অভিমত 'তান্ত্রিক দেবদেবীগণ তান্ত্রিকদেরই কল্পিত, তাঁহাদের কোনও বাস্তব অস্তিত্ব নাই।' এছাড়া আছে (যা শ্রীচৈতন্যভাগবত থেকে জানা যায়) তৎকালীন দেশের শাসনব্যবস্থা, আর্থিক অবস্থা, ব্যবহার্য দ্রব্য ও রীতিনীতি, বিদ্যাচর্চা, সামাজিক অবস্থা, তৎকালীন ধর্মকর্মের অবস্থা প্রভৃতির পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ।

শ্রীচৈতন্যভাগবতের 'ভূমিকা' খণ্ডে বৃন্দাবনদাসের পিতৃপরিচয় ও জন্মস্থান সম্পর্কিত আলোচনা আমাদের কৌতূহল কিছুটা নিবৃত্ত করতে পেরেছে। বহু মতামতের খণ্ডন করে শ্রীরাধাগোবিন্দ নাথ প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে, বৃন্দাবনদাসের পিতার নাম বৈকুণ্ঠনাথ (বা বৈকুণ্ঠদাস) বিপ্র। এবং বৃন্দাবনদাসের জন্মস্থান হচ্ছে মায়াপুর (নদীয়ার অন্তর্গত একটি পল্লী)।

পরিশেষে বলা উচিত, শ্রীরাধাগোবিন্দ নাথ সম্পাদিত এই গ্রন্থের অভিমত ও সিদ্ধান্তগুলি স্বচ্ছ—যদিও তিনি পণ্ডিতসমাজকে আবার একটা নাড়া দিলেন বলেই আমাদের ধারণা। তত্রাচ একথা স্বীকার করতেই হবে— তাঁর যুক্তি অত্যন্ত ধারালো হলেও তাঁর লিখিত প্রতিটি পঙক্তি সবিনয়ে উপস্থাপিত।

আশা করি, এই গ্রন্থ বৈষ্ণবসমাজে অভ্যর্থিত, পণ্ডিতসমাজে সমর্থিত এবং ছাত্র-গবেষকদের কাছে বিশেষ সহায়ক হয়ে উঠবে।

কিস্তিবন্দীতে ট্রানজিস্টার

মাসিক ১০ টাকার সহজ কিস্তিতে ৩২০ টাকা মূল্যের টেলিফুইন পোর্টেবল ৩ ব্যান্ড, অল ওয়ার্ল্ড ৮ ট্রানজিস্টার। আবেদন করুন:—

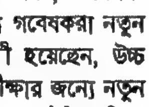

Atlas Co. (S. B.—22).
Box No. 1329, Delhi-6.

রাজনীতি ও ছাত্রসমাজ

প্রদ্যোৎকুমার রায়॥

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

প্রথম পর্যায়

॥ ৫ ॥

১৯১৬ সালের ১০ই জানুয়ারী ও ১৫ই ফেব্রুয়ারী প্রেসিডেন্সি কলেজে পর পর দুটি এমন ঘটনা ঘটল যাতে বাংলাদেশ স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল। জনৈক ইংরেজ অধ্যাপকের দুর্ব্যবহারের প্রতিবাদে ছাত্ররা ধর্মঘট করতে বাধ্য হয়েছিল। পরে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে ব্যাপারটা মোটামুটি মিটমাট হয়ে গেলেও ছাত্ররা কিন্তু পুরোপুরি খুশি হতে পারে নি। তাদের মধ্যে উত্তেজনা রয়েই গিয়েছিল। এই হল ১০ই জানুয়ারীর ঘটনার মোটামুটি বর্ণনা। ১৫ই ফেব্রুয়ারী যা ঘটল—তা কেউ কখনও আশাই করতে পারেন নি। উক্ত অধ্যাপকটি ছাত্রদের প্রতি আবার দুর্ব্যবহার করেন। ছাত্ররা বুঝতে পেরেছিল কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন নিবেদনের মাধ্যমে সুষ্ঠু বিচার পাওয়া অসম্ভব। বিবেচকের মন ছাত্রদের কাছে আশা করা যায় না। বাস্তব-বুদ্ধির পরিপক্কতাও তাদের বয়সে আশা করা বৃথা। তাদের কাছে দেশপ্রেম, স্বাজাত্যবোধ, আত্মত্যাগ এগুলিই সবার চেয়ে বড় বলে প্রতিভাত হয়। বাংলাদেশের জাতীয় জীবন ১৯০২ থেকে ১৯১৬ এই সময়ের মধ্যে বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে এগিয়েছে। দেশপ্রেমের বান ডেকেছে; দেশকর্মী 'বন্দেমাতরম্' বলে হাসি মুখে ফাঁসির মঞ্চে উঠেছেন: নেতৃবৃন্দ পুলিশের অত্যাচারে জর্জরিত হয়েছেন: জেলখানা আর অপমান বা ভীতিকর কোনও স্থান নয়; নেতৃবৃন্দের চরণধূলিতে তা তীর্থক্ষেত্রের মর্যাদালাভ করেছে। এই যখন দেশের পরিস্থিতি সেখানে তরুণ ছাত্রদের বিজাতীয় অধ্যাপকের পুনঃপুনঃ দুর্ব্যবহার মুখ বুজে সহ্য করা খুবই কঠিন। প্রকৃতপক্ষে ছাত্রবৃন্দ নিরুপায় হয়েই ঐ অধ্যাপকটিকে উত্তম-মধ্যম দিতে বাধ্য হয়েছিল। এবং এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে সে যুগে বাংলাদেশে তর্ক-বিতর্কের ঝড় প্রবল আকার ধারণ করেছিল। একদিকে আমলাতন্ত্র ও রাজভক্তের দল, অন্যদিকে ক্ষুব্ধ ছাত্রদল ও দেশের নেতৃবৃন্দ। এই বাক্-বিতণ্ডার মধ্য দিয়ে প্রতিক্রিয়াশীল মনোভাবের জঘন্য রূপটি যেমন প্রকাশিত হয়েছে—তেমনি এই দামাল ছেলেদের রক্ষা করতে নেতৃবৃন্দের হৃদয়ের ব্যাকুলতাও কিছু কম প্রকাশ পায় নি। যে অধ্যাপকটিকে কেন্দ্র করে এই কাণ্ড ঘটল—তাঁর নাম মিঃ ওটেন। মিঃ ওটেন ১৯১০—১৬ ও ১৯১৯ সালে প্রেসিডেন্সি কলেজে ইতিহাসের অধ্যাপক হিসাবে কাজ করেছিলেন। ওটেন এক অদ্ভুত চরিত্রের লোক ছিলেন। শিক্ষক হিসাবে তিনি অযোগ্য ছিলেন না। কিন্তু তাঁর ধারণা ছিল, তিনি এসেছেন এই অসভ্য দেশের মানুষগুলোকে সভ্য করতে। তা ছাড়া কোনও রকম শব্দই তিনি সহ্য করতে পারতেন না। ১৯১৬ সালের ২৫শে ফেব্রুয়ারী অমৃতবাজার পত্রিকায় একটি সুন্দর চিঠি প্রকাশিত হয়েছিল। এই পত্রে ওটেনের উৎকট আচার-আচরণ সুন্দরভাবে বর্ণনা করা হয়েছিল। পত্রলেখক তাঁর নাম প্রকাশ করেন নি। পত্রটি এইরূপ ঃ—

"Here is a Constitutional defect in Mr. Oaten which unfits him to manage young students. He is little too sensitive to noise of any kind and has no sufficient control over his tongue. Two years back Mr. Oaten was lecturing in a room next to another in which Dr. Mukerjee was to lecture. Some students of Dr. Mukerjee's class were talking. Oaten perceived it and so far forgot himself that he entered Dr. Mukerjee's class without any consideration of courtesy to that learned man, and demanded of Dr. Mukerjee to mark those students absent. Dr. Mukerjee is a very obliging gentleman and acted according to the demand.

"On another Mr. Oaten was so much upset by a few students talking in the adjacent room,—that was the third year class and we are talking of an event three years back—that he instantly entered the room and called them "howling beasts." It is a well known fact that Mr. Oaten had to apologise for this discourteous conduct. The recent event in which the alleged noise was created by some students disturbed him so much that he roughly pushed some of them.

"What do all these incidents prove? Any scientifically-minded man will conclude that the cause is to be sought in the temper of Mr. Oaten. In fact the conclusion is irresistible that the reason is a physiological one—Mr. Oaten is neurotic. His history students also have often told us that the noise created by the tram often makes him cryout "nuisance", "nuisance".

* * * *

one who knows"

অতএব দেখা যাচ্ছে ছাত্রদের প্রতি ওটেন সাহেব শুধু দুই-একবার নয়, অনেকবারই দুর্ব্যবহার করেছেন। তবু এ কথা ভুললে চলবে না যে, সে যুগটা পুরো ইংরেজ যুগ, ওটেন সাহেব দিশী সাহেব নন, খাস বিলিতি, কলেজ হল প্রেসিডেন্সি—পুরোপুরি সরকারী স্নেহ-চ্ছায়ায় লালিত। আর যারা ওটেনকে প্রহার করল—তারা সকলেই ছাত্র এবং খাঁটি নেটিভ।

'স্টেটসম্যান' পত্রিকায় ২০শে ফেব্রুয়ারী প্রেসিডেন্সি কলেজ প্রসঙ্গে একটি দীর্ঘ ও জোরাল সম্পাদকীয় প্রকাশিত হল। উক্ত নিবন্ধে বলা হল সব ব্যাপারটাই পূর্বপরিকল্পিত, ছাত্ররা কাপুরুষের ন্যায় ওটেনকে আক্রমণ করেছে এবং তাদের এমন শাস্তি হওয়া উচিত, যা দেখে ভবিষ্যতে ছাত্রসমাজ নিজেদের সংযত করতে বাধ্য হয়। 'স্টেটসম্যান' পত্রিকা এখানেই ক্ষান্ত হন নি। আমাদের পারিবারিক জীবন, সামাজিক জীবন যে

একেবারে রসাতলে গিয়েছে—সে কথাও এই সুযোগে স্মরণ করিয়ে দেওয়া হল। ঐ প্রবন্ধের অংশ বিশেষ তুলে দিচ্ছি:

"It is wholly immaterial whether Mr. Oaten did or did not give some provocation to these youths. Even if he called one of boys "rascal" or caught hold of his arm a shade too roughly the remedy lay in an appeal to the Principal of the College. The idea that students have a right to retaliate for a wrong, real or imaginary, cannot even be discussed and would not find expression in any country except this. If, therefore, offenders can be discovered the authorities are bound to inflict an exemplary punishment.

* * * *

"In England the strike and the assault would have been settled by the application of cane and the expulsim of the chief offenders. But in Bengal schoolboys are apparently to be treated as an important political factor etc. etc."

১৯ তারিখে বাংলা সরকার প্রেসিডেন্সি কলেজের ঘটনা তদন্তের জন্য একটি কমিটি নিয়োগ করেন। স্যার আশুতোষ এই কমিটির সভাপতি ছিলেন। স্টেটসম্যান এই কমিটি প্রসঙ্গে বলছেন:

"The appointment of a committee looks like a triumph for the youthful forces of disorder and a rebuff for the college authorities, and doubtless the Bengali Press will wax enthusiastic over the prowess of their "young hopefuls."

এতেও স্টেটসম্যানের গায়দাহ মেটে নি। যেমন করেই হোক ছাত্রদের ঠান্ডা করতেই হবে।

"Means ought to be devised by which these silly ungovernable youths can be quickly brought to hell."

২২ তারিখে স্টেটসম্যানে সম্পাদকীয় লেখা হল আবার। তদন্ত কমিটির কোনও প্রয়োজনীয়তা স্টেটসম্যান পেলেন না। কলেজ কর্তৃপক্ষই ছাত্রদের ঠান্ডা করে দিতে পারত ইত্যাদি, ইত্যাদি। এই সুযোগে স্যার আশুতোষ যে এই কমিটির সভাপতি হবার মোটেই যোগ্য নন, এ কথাও স্টেটসম্যানে স্মরণ করিয়ে দেওয়া হল। সর্বশেষ বক্তব্য হল:

"On the whole, then we cannot congratulate the Bengal Govt. on the manner in which they have handled this unfortunate affair or on the impression which they have contrived to give that they have yielded to the terrors of a schoolboy agitation."

অমৃতবাজার পত্রিকায় ২২শে ফেব্রুয়ারী একটি পত্র প্রকাশিত হল। লেখক অত্যন্ত বেদনাহত হয়ে চিঠিটি লিখেছিলেন। তিনি লিখেছেন:

* * * "I would ask people who talk glibly about the discipline of the English Universities, to remember the Bump Supper nights at Oxford or Cambridge. India, for it is only here that a Professor would ever think of calling a student rascal or catching hold of his arms roughly as it is alleged he has done. Punish the offenders by all means but an enquiry as to whether Professor Oaten's was the cause of the two recent outbreaks of lawlessness in the college will not be quite out of place."

* * *

অমৃতবাজার পত্রিকা প্রেসিডেন্সি কলেজ নিয়ে ২৩শে, ২৪শে ও ২৫শে ফেব্রুয়ারী পর পর তিনটি সম্পাদকীয় প্রকাশ করেন। ২৩ তারিখের সম্পাদকীয়তে বলা হল যে, অনঙ্গমোহন দাস ও সুভাষচন্দ্রের ন্যায় দুটি মেধাবী ছাত্রকে কলেজ থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। অথচ তাদের বক্তব্যই শোনা হয় নি। আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সম্পর্কে স্টেটসম্যানের বক্তব্যের নিন্দা করা হল। এবং বলা হল যে, তদন্ত কমিটি এটাও দেখবেন যে, অধ্যাপক ওটেনের ব্যবহার ও অধ্যক্ষ জেমস-এর নিষ্ক্রিয়তা ছাত্রদের এ ধরণের একটা কান্ড করতে বাধ্য করেছে কি না। দোষীর শাস্তি হওয়া উচিত এবং এ নীতি শুধু একতরফা প্রয়োগ করলে চলবে না। অমৃতবাজারের নিম্নলিখিত অংশটি সবিশেষ উপভোগ্য।

"The committee will have to enquire into the above points and apportion punishment to both parties impartially. The "Statesman" like the "Englishman" proposes the application of the 'rod' for the offending boys. They, however, don't suggest any punishment for the college authorities if it be found that they have not discharged their duties properly."

২৪ তারিখে অমৃতবাজার বক্তব্য রাখলেন যে, আমাদের দেশের পারিবারিক এবং সামাজিক জীবনের শৃঙ্খলা পাশ্চাত্যের অশুভ প্রভাবের কবলে পড়েও আজও অক্ষুণ্ণ আছে।

"It is a perverse paper like the 'Statesman' which alone can express such sentiments; for it is universally known that nowhere else in the world is domestic discipline, in spite of the demoralising influence of the so-called civilisation of the West, where the younger have very little respect for their parents or elders, so perfect as in India."

ঐ প্রবন্ধে আরও বলা হল,

"In spite of this Un-Hindu and Un-Mussalman arrangement in modern educational institution, the Indian students or their guardians have not yet gone so low as to think that a pupil has a right to retaliate for a wrong received by him from his tutor unless he is grossly maltreated. Such an idea, however, exists in the country from which the editor of the 'Statesman' comes. * * Here is a concrete case which will, we hope, open his eyes to the disagreeable fact that it is in England and not in India that a student with the advice of his parent, runs to the court of law for getting his tutor punished and securing damages from him, even for a trifling injury."

ছোটদের উত্তেজনার ফলে প্রেসিডেন্সি কলেজে এ ধরণের একটা ঘটনা ঘটেছে। ইংলন্ডেও এ ধরণের ঘটনার নজির আছে। কাজেই অমৃতবাজার বলছেন, যে এই

ঘটনায় ("* * needed no serious action from the authorities") কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থার কোনও প্রয়োজন নেই।

২৫ তারিখে অমৃতবাজার 'বেঙ্গলী' পত্রিকা থেকে একটি দৃষ্টান্ত তুলে দিলেন যাতে দেখান হল বিলেতেও ছাত্র কর্তৃক অধ্যাপক প্রহৃত হয়েছেন। এবং ছাত্রদের ছেড়েও দেওয়া হয়েছে। ঐ প্রবন্ধের শেষে বলা হল, ওটেন সাহেব যখন শব্দ সহ্য করতে পারেন না, তখন তাঁর জেলসুপারের কাজ নেওয়াই ভাল। সেখানে কোনও গণ্ডোগোল নেই। সাহেব ঠান্ডায় ঠান্ডায় থাকবেন ভাল। তবে আমাদের ছেলেদের কথা বলতে গেলে বলব, তারা অবশ্যই কথা বলবে, প্রয়োজন হলেই বলবে।

সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এই সময় 'বেঙ্গলী' পত্রিকার সম্পাদক। ২২শে ও ২৩শে ফেব্রুয়ারী সুরেন্দ্রনাথ তাঁর পত্রিকায় প্রেসিডেন্সি কলেজ প্রসঙ্গে মন্তব্য করেন। ২২ তারিখে তদন্ত কমিটিতে স্যার আশুতোষের নিয়োগের তিনি প্রশংসা করেন এবং স্টেটসম্যানের কিছু কিছু মন্তব্যের তীব্র বিরোধিতা করেন। প্রবীণ সুরেন্দ্রনাথ বোধ হয় কিছুটা অধৈর্যই হয়ে পড়েছিলেন। ইংলন্ডের বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা শিক্ষককে অনেক বেশি সম্মান দেখায় আর আমাদের দেশের ছেলেরা অত্যন্ত উচ্ছৃঙ্খল—স্টেটসম্যানের এই উক্তির প্রতিবাদে তিনি ২৩ তারিখে একটি নজির উপস্থিত করেন। ঘটনাটি এইরূপ: বুয়োর যুদ্ধ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, এমন সময়ে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন জার্মান অধ্যাপক দক্ষিণ জার্মানীর একটি পত্রিকায় ইংরেজ সৈন্যের নৈতিক চরিত্র সম্পর্কে আলোচনা করেন এবং কিছু নিন্দাবাদও করেন। যেদিন ঐ পত্রিকাটি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে এল সেইদিনই ছাত্রদের এক বিরাট দল ঐ অধ্যাপককে আক্রমণ করে। প্রাণভয়ে ভীত অধ্যাপক ছুটে কোনও মতে অন্য আর এক অধ্যাপকের গৃহে আশ্রয় নেন। সন্ধ্যার সময় যখন অধ্যাপকটি নিজগৃহে ফিরছিলেন—সেই সময় ছাত্ররা আবার তাঁর উপর আক্রমণ চালায় ও তাঁকে মারধর করে। আশ্চর্যের বিষয় যে, এই সংবাদটি ইংলন্ডের 'টাইমস' পত্রিকায় পরিবেশিত হল, কিন্তু উক্ত পত্রিকাটি ছাত্রদের আচরণের বিন্দুমাত্র নিন্দা করলেন না। এবং কোনও ছাত্রকেও কোনও রকম শাস্তি দেওয়া হল না। সুরেন্দ্রনাথ লিখছেন,

"We, however, warn our youngmen not to imitate the conduct of English College students. Respect for the Guru and absolute submission to his authority is a part of the invaluable moral asset of our race."

বাংলা সরকারের ডি পি আই ১৯১৫-'১৬ সালে যে রিপোর্ট দেন তাতে অত্যন্ত দুঃখ করে বলা হল হায়, হায়, বর্তমানে প্রেসিডেন্সি কলেজ বাংলাদেশের আর গৌরবের বস্তু নয়। ডি পি আই-এর রিপোর্টের এই অংশ তুলে দিচ্ছি:

"* * But the Presidency College is not at present a Credit to Bengal. One of the acts of the late Principal was to establish a Students' Representative Committee. * * * The Committee, as constituted by the votes of the students, was, in the words of the present Pricipal, "largely composed of undesirable characters, whose intentions were vicious and their actions, and the ease with which the general body of students was misled by them, suggest the desirability of paying greater attention to education in personal and collective resposibility in both school and colleges."

তৎকালীন প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্র-প্রতিনিধি সভা সম্পর্কে ডি পি আই অধ্যক্ষ ওয়ার্ডসওয়ার্থের রিপোর্টের একটি অংশ তুলে ধরেছেন। সরকারী দৃষ্টিতে ছাত্র-প্রতিনিধি সভার চরিত্র কিরূপ তা এতে ফুটে উঠেছে। ছাত্র-প্রতিনিধি সভা, "an obstacle, if not an enemy, to the authority in time of difficulty."

ছাত্র-প্রতিনিধি সভার এই সময় সম্পাদক ছিলেন শ্রীভোলানাথ রায়। এবং সুভাষচন্দ্র এই সভার একজন সভ্য ছিলেন। আত্মসম্মান রক্ষার প্রচেষ্টার সরকারী নাম হল কাজে বাধা সৃষ্টি করা। এ অবস্থায় সরকার এ-সভাকে কিছুতেই টিকিয়ে রাখতে পারেন না। অতএব এ সভাকে তুলে দেওয়া হল।

১৯১৬ সালের ১১ই মার্চ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসব হয়। এই সময়ে উপাচার্য ছিলেন ডঃ দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী। বাংলার লাটসাহেব, যিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন 'রেকটর' ছিলেন, ভারতীয় দৃষ্টিতে গুরু-শিষ্য সম্পর্ক কী হওয়া উচিত—সে সম্পর্কে দীর্ঘ উপদেশ বর্ষণ করেন। সর্বাধিকারী মহাশয়ও ঐ সুরে ভাষণ দেন। তিনি বলেন, আমাদের উত্তরাধিকার হল অত্যাচারিত হলে কর্তৃপক্ষের নিকট বিচারের জন্য আবেদন জানানো।

"Our traditions, as well as civic and moral laws, forbid our taking the law into our own hands. Where unfortunately there is a just grievance, the redress must be left to the judgment of the authorities. If this great lessen be not learnt aright and assiduously applied in life all round, we shall never really graduate in true self-government."১

উপাচার্য মহাশয় ছাত্রদের উচ্ছৃঙ্খলতা মোটেই সহ্য করতে রাজী নন এবং সর্বশক্তি দিয়ে তিনি উচ্ছৃঙ্খলতা বন্ধ করবেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের এই নাকি ইচ্ছা।

"The university in which control and discipline are vested by law, cannot tolerate such a deplorable state of affairs and is determined sternly to put down disorder and violation of discipline in all shapes."২

শেষের দিকে তিনি বললেন: "Needless to add that when misguided students further transgress and prove themselves guilty of positive lawlessness, as some have done, their conduct can on no account be condoned."৩

পরিষ্কার বোঝা গেল, উপাচার্য শাসকদের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়েই কথা বলছেন।

রবীন্দ্রজীবনীকার শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় লিখছেন: "এই সময় কলিকাতায় প্রেসিডেন্সি কলেজে একটি অত্যন্ত কুশ্রী ঘটনা ঘটিল। তথাকার জনৈক ইংরেজ অধ্যাপক ছাত্রদের ক্লাশে ভারতীয়দের সভ্যতা সম্পর্কে কোন অপমানসূচক কথা বলেন; ছাত্রেরা তাঁহার কথায় প্রতিবাদ করে ও তাঁহাকে ঐ উক্তি প্রত্যাহার করিবার জন্য বলে। অধ্যাপক মহাশয় তাহা না করায়, সিঁড়ির পথে নামিবার

১ Convocation Addresses. —Vol. 5. 1915-23, P. 107.

২ Convocation Addresses. Vol. 5, 1915-23. P. 107.

৩ Convocation Addresses. Vol. 5. 1915-23. P. 110.

সময় কয়েকজন ছাত্র মিলিয়া তাঁহাকে প্রহার করে। এই লইয়া কলিকাতায় বেশ একটু চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। রবীন্দ্রনাথ বহু বৎসর বিদ্যায়তনের সহিত যুক্ত, বাংলার হৃদয়কে তিনি জানেন, কেন তাহারা এইরূপ কাপুরুষোচিত কার্য করিল—তদ্বিষয়ে তিনি চিন্তা করিয়া 'ছাত্রশাসন' নামে প্রবন্ধ লিখলেন। এই প্রবন্ধের ইংরেজী করাইয়া মডার্ন রিভিউ পত্রিকায় প্রকাশ করিলেন ও উহার এক খণ্ড বাংলার গভর্নর লর্ড কারমাইকেলের নিকট পাঠাইয়া দিলেন; কবির আশা কারমাইকেল চ্যান্সেলার হিসাবে যদি অপরাধী ছাত্রদের সম্বন্ধে বিচার করিবার পূর্বে সমস্ত বিষয়টি ভাল করিয়া দেখিবার সুযোগ পান। ছাত্রদের প্রতি রবীন্দ্রনাথের স্নেহ যে কি অকৃত্রিম ছিল, তাহা যাঁহারা প্রত্যক্ষভাবে জানিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন, তাঁহারাই সাক্ষ্য দিবেন।

"এই প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য ছিল যে ছেলেরা যে বয়সে কলেজে পড়ে সেটা একটা বয়ঃসন্ধিকাল। তখন শাসনের সীমানা হইতে স্বাধীনতার এলাকায় সে পা বাড়াইয়াছে। মনোরাজ্যে সে ভাষার খাঁচা ছাড়িয়া ভাবের আকাশে ডানা মেলিতে শুরু করিয়াছে। এই সময়ে অল্পমাত্র অপমান মর্মে গিয়া বিঁধিয়া থাকে এবং আভাসমাত্র প্রীতি জীবনকে সুধাময় করিয়া তোলে।"৪

প্রভাতকুমার আরও বলেছেন, "মোট কথা রবীন্দ্রনাথ ছাত্রদের দ্বারা গুরুপ্রহারকে সমর্থন করেন নাই, কিন্তু উপদ্রুত হইয়া ছাত্রেরা যে কাণ্ডটা করিয়াছিল—তাহাকে নিন্দা করিয়াও—তাহাদের পক্ষে ইহা অস্বাভাবিক, একথা বলিতে পারিলেন না। অপমানকে সহ্য করিবার জন্য তিনি কোনওদিন বাঙালীর ছেলেকে উপদেশ দেন নাই।"৫ রবীন্দ্রনাথ 'ছাত্রশাসনতন্ত্র' নামে একটি প্রবন্ধ লেখেন ১৩২২ সালের চৈত্র মাসে। এই প্রবন্ধটি প্রসঙ্গে প্রভাতকুমারের মন্তব্য পূর্বে দেওয়া হয়েছে। এখন প্রবন্ধটির কিছু কিছু অংশ তুলে দিচ্ছি : "প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্রদের সহিত য়ুরোপীয় অধ্যাপকের যে বিরোধ ঘটিয়াছে—তাহা লইয়া কোনও কথা বলিতে সঙ্কোচ বোধ করি। তার একটা কারণ, ব্যাপারটা দেখিতেও ভাল হয় নাই, শুনিতেও ভাল নয়। * * *

"বিচারসভা বসিয়াছে। ইতিমধ্যেই ছাত্রদের সম্বন্ধে শাসন কড়া করিবার জন্য কোনও মিশনারী কলেজের কর্তা কর্তৃপক্ষের নিকট আবদার প্রকাশ করিয়াছেন। কথাটা শুনিতেও হঠাৎ সঙ্গত বোধ হয়। কারণ ছাত্রেরা অধ্যাপকদের অসম্মান করিলে সেটা যে কেবল অপরাধ হয় তাহা নহে—সেটা অস্বাভাবিক হইয়া ওঠে। যেখান হইতে আমরা জ্ঞান পাই, সেখানে আমাদের শ্রদ্ধা যাইবে, এটা মানব প্রকৃতির ধর্ম। তাহার উল্টা দেখিলে বাহিরের শাসনে এই বিকৃতির প্রতিকার করিতে হইবে, সে কথা সকলেই স্বীকার করিবেন।

"কিন্তু, প্রতিকারের প্রণালী স্থির করিবার পূর্বে ভাবিয়া দেখা চাই স্বভাব উল্টায় কিসে।"

* * *

"জেলখানার কয়েদী নিয়মের নড়চড় করিলে তাহাকে কড়া শাসন করিতে কাহারও বাধে না; কেন না তাহাকে অপরাধী বলিয়াই দেখা হয়, মানুষ বলিয়া নয়। অপমানের কঠোরতায় মানুষের মনে কড়া পড়িয়া তাকে কেবলই অমানুষ করিতে থাকে, সে হিসাবটা কেহ রাখিতে চাহে না, কেন না মানুষের দিক দিয়া তাকে হিসাব করা হয় না। * * * কিন্তু ছাত্রকে জেলের কয়েদী বা ফৌজের সিপাহী বলিয়া আমরা তো মনে ভাবিতে পারি না। আমরা জানি তাহাদিগকে মানুষ করিয়া তুলিতে হইবে। মানুষের প্রকৃতি সূক্ষ্ম এবং সজীব তন্তুজালে বড় বিচিত্র করিয়া গড়া। এই জন্যই মানুষের মাথা ধরিলে মাথায় মুগুর মারিয়া সেটা সারান যায় না; অনেক দিক বাঁচাইয়া প্রকৃতির সাধ্য-সাধনা করিয়া তার চিকিৎসা করিতে হয়। এমন লোকও আছে এ সম্বন্ধে যারা বিজ্ঞানকে খুবই সহজ করিয়া আনিয়াছে; তারা সকল ব্যাধির একটি-মাত্র কারণ ঠিক করিয়া রাখিয়াছে—সে ভূতে পাওয়া। এবং তারা মিশনারী কলেজের ওঝাটির মত ব্যাধির ভূতকে মারিয়া ঝাড়িয়া গরম লোহার ছ্যাঁকা দিয়া, চিকিৎসা করিয়া তাড়াইতে চায়। তাহাতে ব্যাধি যায়। এবং প্রাণ পদার্থেরও প্রায় পনের আনা তার অনুসরণ করে। * * *

"অতএব যাহাদের উচিত ছিল জেলের দারোগা বা ড্রিল সার্জেন্ট বা ভূতের ওঝা হওয়া তাদের কোনওমতে উচিত হয় না ছাত্রদিগকে মানুষ করিবার ভার লওয়া। ছাত্রদের ভার তাহারাই লইবার অধিকারী—যাঁরা নিজের চেয়ে বয়সে অল্প, জ্ঞানে অপ্রবীণ ও ক্ষমতায় দুর্বলকে সহজেই শ্রদ্ধা করিতে পারেন; যাঁরা জানেন, শক্তস্য ভূষণং ক্ষমা; যাঁরা ছাত্রকেও মিত্র বলিতে কুণ্ঠিত হন না।

"শ্রদ্ধার সঙ্গে দান করিলেই শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করা সম্ভব হয়। যেখানে সেই শ্রদ্ধার সম্পর্ক নাই—সেখানে আদান-প্রদানের সম্পর্ক কলুষিত হইয়া ওঠে। জেলখানায় কয়েদীরা হাতে বেড়ি পরিয়া যে অন্ন খাইতে বসে তাহাকে যজ্ঞের ভোজ বলা বিদ্রূপ করা। জ্ঞানের ভোজ আনন্দের ভোজ। সেখানেও যে সকল কর্তারা ভোজের জন্য আজ লোহার হাতকড়ি ফরমাস দিতেছেন—তাঁরা কাল নিতান্ত ভাল মানুষটির মত আশ্চর্য হইয়া বলিবেন, "এত করিয়াও বাঙালীর ছেলের মন পাওয়া গেল না—কৃতজ্ঞতা বৃত্তি ইহাদের একেবারেই নাই।' এবং তাঁরা রাত্রে শুইবার সময় এবং প্রাতঃকালে জাগিয়া উঠিয়া প্রার্থনা করিবেন : Father, do not forgive them !"৬

এই সময়ে শ্রদ্ধেয় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় 'প্রবাসী' পত্রিকায় 'বিবিধ প্রসঙ্গ'-তে প্রেসিডেন্সি কলেজের ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করেন। তিনি বলেন, "*** মানুষকে বিশেষ করিয়া গুরুস্থানীয় ব্যক্তিকে, মারা অনুচিত। এ বিষয়ে কোনই মতদ্বৈধ নাই। কিন্তু বিশ্বের কতকগুলি প্রাকৃতিক নিয়ম আছে, যাহা ব্যক্তিনির্বিশেষে খাটিয়া থাকে। কেহ যদি মাথা দিয়া তাল ঠুকিয়া দেওয়াল ভাঙ্গিতে চায়, দেওয়ালও তাহার মাথাকে ভাঙ্গিতে চেষ্টা করে। কেহ যদি প্রতিধ্বনিকে বলে, "তুই বর্বর", প্রতিধ্বনিও তাহাকে বলে "তুই বর্বর।" কেহ যদি অপরকে বিদ্বেষ বা অবজ্ঞা করে, অপরেও তাহাকে বিদ্বেষ বা অবজ্ঞা করিবে। বিশ্বে এইরূপ ঘাত-প্রতিঘাত, ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার নিয়ম আছে। উহার হাত হইতে কাহারও নিষ্কৃতি নাই। অধ্যাপক ওটেন আপনই আপনাকে এই নিয়মের অধীন করিয়া ফেলিয়াছেন কিনা, অনুসন্ধান কমিটির রিপোর্ট বাহির হইলে হয়ত তাহা জানা যাইবে।"৭

গুরু-শিষ্য সম্পর্ক নিয়ে সে সময় যথেষ্ট আলোচনা হয়েছিল। রামানন্দ এই প্রসঙ্গে বললেন, "শিষ্যের যে গুরুকে ভক্তি করা উচিত—ইহা বলাই বাহুল্য। কিন্তু গুরুর পদে অধিষ্ঠিত মানুষটি যত অপদার্থ, অভদ্র বা দুষ্ট হউক, তাহাকে ভক্তি কর ও তাহার বাধ্য হও, ইহা খুব উচ্চ উপদেশ হইলেও সে ক্ষেত্রে ভক্তি ও বাধ্যতা কি স্বাভাবিক ? উপদেশ বড় হইতে পারে, কিন্তু স্বভাব সর্বোপরি।

৪ রবীন্দ্র-জীবনী—প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, ২য় খণ্ড। পৃঃ ৪০৮।

৫ রবীন্দ্র-জীবনী—প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, ২য় খণ্ড। পৃঃ ৪০৯।

৬ ছাত্রশাসনতন্ত্র—রবীন্দ্রনাথ, জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ, একাদশ খণ্ড। পৃঃ ৬৪৭-৬৫৭।

৭ প্রবাসী—চৈত্র, ১৩২২। পৃঃ ৫৪৬-৫৪৮।

অধিষ্ঠিত। এক পক্ষের চরিত্র, মনের ভাব, আচরণ যদি গুরুর মতো না হয়, তথাপি অপর পক্ষের ব্যবহার শিষ্যের মত হইবে, ইহা কি আশা করা যায় ? গুরু ও শিষ্যের সম্বন্ধ কৃত্রিম সম্বন্ধ। পিতা-মাতা ও সন্তানের সম্বন্ধ স্বাভাবিক ; তথাপি কোনও কোনও সভ্য দেশে শিশুর প্রতি নিষ্ঠুরতা নিবারণের জন্য সভা ও আইন করিতে হইয়াছে। কেন না, ঐরূপ স্নেহপূর্ণ স্বাভাবিক সম্পর্ক সত্ত্বেও পিতা-মাতা কখনও কখনও নিষ্ঠুর হয়। গুরুপদে অধিষ্ঠিত ব্যক্তিও যে কখন কখন নিষ্ঠুর, অভদ্র, অপমানকারী হইবে, তাহা আশ্চর্যের বিষয় নহে। সেরূপ ক্ষেত্রে অধ্যাপকের নিষ্ঠুরতা, অভদ্রতা বা অপমান নিবারণের ব্যবস্থা চাই কি না বিবেচ্য। যদি চাই, তাহা হইলে তেমন স্থলেও কি

আমি
ডাক্তার
হ'তে চাই

...আর ওকে সে শিক্ষার সুযোগ দেওয়ার দায়িত্ব আপনার। এর জন্য চাই টাকা। সুপরিকল্পিত সঞ্চয়ের মাধ্যমেই টাকার সংস্থান হয়। পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের সেভিংস ও রেকারিং ডিপোজিট পরিকল্পনায় টাকা জমান। ওর আশা আপনি অবশ্যই পূর্ণ করতে পারবেন।

পাঞ্জাব
ন্যাশনাল
ব্যাঙ্ক

শিষ্যের মনের ভাব স্বভাবতঃ ভক্তির মত কিছু হইতে পারে ?

"আমাদের মনে হয় ইংরেজ অধ্যাপক যদি আপনাকে উৎকৃষ্ট ও প্রভুজাতীয়, এবং ছাত্রকে নিকৃষ্ট ও দাসজাতীয় বলিয়া মনে করেন, তাহা হইলে গুরু-শিষ্য সম্পর্ক যথাযথ হইতে পারে না। বর্তমানে এইরূপ মনে করিবার কারণ আছে।"৮

সমাবর্তন উৎসবে উপাচার্য যে কড়া ভাষণ দিয়েছিলেন, তার উত্তরে রামানন্দ লিখলেন, "আমরা মনে করি ছাত্রদের নিয়মাধীন হওয়া খুবই উচিত এবং তাহাদের কোনও দুঃখ-কষ্ট অভিযোগ থাকিলে তাহা কর্তৃপক্ষকে জানাইয়া প্রতিকার প্রার্থনা করা উচিত। কিন্তু প্রতিকার না পাইলে, কারখানার মজুর ও গরুর গাড়ির গাড়োয়ানদের ধর্মঘটরূপ যে আইনসঙ্গত উপায় আছে, তাহা হইতে তাহারা কেন বঞ্চিত হইবে ? প্রিন্সিপাল ও অধ্যাপকেরাও ত' রাগ-দ্বেষ-ভুল-ভ্রান্তির অধীন ? ছাত্রদিগকে নিয়মের নিগড়ে একেবারে হাতেপায়ে বাঁধিয়া তাঁহাদের হাতে ফেলিয়া দিলে চলিবে কেন ? সর্বাধিকারী মহাশয় ভ্রান্ত বা বিপদগামী ছাত্রদের দিকে তাঁহার রুদ্রমুখ ফিরাইয়াছেন, কিন্তু অন্যায়াচারী অধ্যাপক-দিগের সম্বন্ধে ত' কোনও কথা বলেলেন না। শক্তের ভক্ত নরমের যম হওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সাজে না। সব কলেজের ছেলেরা ধর্মঘট করিবে, ইহা সম্ভবপর নয়, এবং বাঞ্ছনীয়ও নয়। কিন্তু অসম্ভবও ত' নয়। সব কলেজের সব ছেলেকে তাড়াইয়া দিলে কলেজ গৃহগুলিতে ও সেনেটের গৃহে, "এই বাটী ভাড়া দেওয়া যাইবে," লিখিতে হইবে।"৯

স্বাধীনতা আন্দোলনে বঙ্গবাসী কলেজের দান অসামান্য। সুভাষচন্দ্রের জীবনের এক অতি সঙ্কটময় মুহূর্তে প্রাতঃস্মরণীয় অধ্যক্ষ গিরিশচন্দ্র বসুকে এগিয়ে আসতে দেখা যায়। বাংলার শিক্ষককুল চিরদিন এই দামাল ছেলেদের সস্নেহে সমস্ত ঝড়-ঝঞ্ঝা থেকে রক্ষা করতে চেষ্টা করেছেন। গিরিশচন্দ্র সেই আদর্শেরই ধারক। স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের চেষ্টায় সুভাষচন্দ্র আবার কলেজে ভর্তি হতে পেরেছিলেন—এ কথা সত্য। কিন্তু এ বিষয়ে গিরিশচন্দ্রের দান অল্প হলেও মূল্যে তাঁর কিছু কম ছিল না।

১৯১৭ সালের ২০শে জুলাই-এর সিন্ডিকেটের সভায় সুভাষচন্দ্রের উপর যে বহিষ্কার আজ্ঞা ছিল—তা নাকচ করা হয় এবং তাঁকে বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদিত কলেজে ভর্তি হওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়। সুভাষচন্দ্রের আবেদনপত্রের সহিত অধ্যক্ষ গিরিশচন্দ্রের মন্তব্য সংযোজিত ছিল। তিনি লিখে-ছিলেন, যে সিন্ডিকেট ছাত্রটিকে যথাযথ আদেশ দিলে তিনি তাঁকে নিজের কলেজে ভর্তি করে নেবেন। বিষয়টি যেভাবে সিন্ডিকেটের সভায় উপস্থাপিত হয়েছিল—তা নিম্নরূপ :

"2449. Read an application from Subhaschandra Basu, who was a student in the 3rd-year class of the Presidency Collage, Calcutta, who was expelled by the Governing Body of the college on the 19th February, 1916, on the charge of having taken part in the assault on Prof. Oaten, and who was informed in this office letter No. 877, dated the 20th July, 1916, that he could not be permitted to continue his study in any college affiliated to this University, praying that, as he has already lost one year, he may be permitted to continue his study in some college affiliated to this University during the session 1917-18, and enclosing a note from the Principal, Bangabasi College, who states that he has no objection to admit the student to his college if the Syndicate grants the student the necessary permission.

"Resolved— that Subhaschandra Basu be informed that he is permitted to take his admission during the session 1917-18 to a college affiliated to this University."১০

বিপ্লবীদের সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের যোগাযোগ ছিল। শ্রদ্ধেয় হেমন্তকুমার সরকার মহাশয়ের 'সুভাষের সঙ্গে বার বছর' গ্রন্থে সে কথা সুন্দরভাবে বর্ণিত হয়েছে। ওটেন-প্রহার প্রসঙ্গ বিপ্লবীদের মনে কিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল শ্রদ্ধেয় যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়ের বক্তব্য থেকেই তা স্পষ্ট হবে।

"১৯১৩ সালে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হয় কলকাতার মির্জাপুর স্ট্রীটের একটি মেডিকেল ছাত্রদের মেসে। ডাঃ সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তখন মেডিকেল ছাত্র ছিলেন। তাঁর একটি ছেলে ধরার আড্ডা ছিল। উদ্দেশ্য মহৎ। ভবিষ্যৎ দেশকর্মীর সংখ্যা বাড়ানো। সুরেশবাবু সুভাষচন্দ্রকে আমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেন। নেতাজী তখন সবে কটক থেকে ম্যাট্রিক (matric) পাশ করে কলকাতায় প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হয়েছেন।

"১৯১৬ সালে, বোধ হয় মার্চ বা এপ্রিল মাস হবে, আমি গা ঢাকা অবস্থায় কলকাতায় ছিলাম। * * *

"ঐ রকম সময়ে একদিন শুনলাম ছাত্রদের প্রতি অসভ্য ব্যবহারের জন্য অনঙ্গ দাস সহ কয়েকটি ছাত্র প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রফেসর ওটেনকে উত্তম-মধ্যম লাগিয়ে দিয়েছেন। নেতাজী এই দলে ছিলেন, ইচ্ছা হল নিজে গিয়ে এঁদের অভিনন্দিত করে আসি। কিন্তু অবস্থায় পড়ে কোন একটি লোক মারফত অভিনন্দন পাঠাই। * * *"১১

সুভাষচন্দ্র আত্মজীবনীতে লিখেছেন, "* * * এই ঘটনা উপলক্ষেই প্রথম আমি নেতৃত্বের স্বাদ পেলাম। এবং নেতাদের যে কী পরিমাণে আত্মত্যাগ করতে হয় সে সম্বন্ধেও খানিকটা ধারণা হল। এক কথায়, জীবনযুদ্ধের জন্য আমি বেশ তৈরি হয়ে উঠলাম।"

শতবর্ষ পার হয়ে এসেছে প্রেসিডেন্সি কলেজ। কলেজের ইতিকথা বিবৃত করে স্মারকগ্রন্থ প্রকাশ করেছেন কর্তৃপক্ষ। বহু মনীষী, দেশনেতা শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়েছেন এই বিদ্যায়তনে। কলেজ তাঁদের জন্য গর্বিত। "Many distinguished students read as the Presidency College during the period (1901—1917) under review..it would not be invidious to mention only three.. Subhas Chandra Bose to whose untiring efforts the freedom achieved in 1947 was largely due..."১২ মনে রাখতে হবে সুভাষচন্দ্র কিন্তু প্রেসিডেন্সি কলেজের বহিষ্কৃত ছাত্র।

[ক্রমশঃ]

---

৮ প্রবাসী, চৈত্র, ১৩২২। ৫৪৬-৫৪৮ পৃঃ।

৯ প্রবাসী, চৈত্র, ১৩২২। ৫৪৬-৫৪৮ পৃঃ।

১০ Minutes of the Syndicate —1917, Part III, Page 1178-79.

১১ বিপ্লবী জীবনের স্মৃতি—যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়। পৃঃ ৪৯।

১২ Presidency College Cyentenary Volume, 1955 ; Ch. 5.

অগ্নিযুগের একটি অধ্যায়

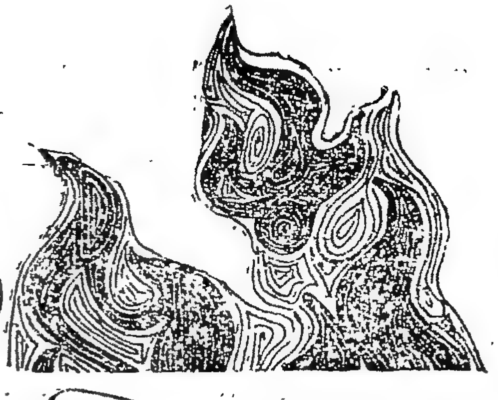

অনন্ত সিংহ

[পূর্ব প্রকাশিতের পর]

আদালতকে আমরা বিলম্বিত করার চেষ্টা

"Gain Time by Space"—প্রবল শত্রুকে জায়গা ছেড়ে দিয়ে পশ্চাদপসরণ করে সময় সঞ্চয় করার রণনীতি অনুসরণ করে চীনের বিপ্লবী সমরনায়কেরা মাও সে-তুংয়ের সুদূরপ্রসারী বৈপ্লবিক দৃষ্টির সাহায্যে সাম্রাজ্যবাদী চক্রের পৃষ্ঠপোষকতায় পরিপুষ্ট চিয়াং কাইশেকের বিরাট সমরশক্তির পরাজয় ঘটিয়েছে। সাম্রাজ্যবাদী জাপান ব্রহ্মদেশ অধিকার করার পর জেনারেল ওয়েভেলও এই একই রণনীতি অনুসরণ করে বলেছিলেন—'শত্রু যখন শক্তিশালী তখন তাকে বড় এক টুকরো মাংস দিতে হয় এবং সে তা নিয়েই ব্যস্ত থাকে। সেই সুযোগে নিজেদের সংহত করে প্রতি-আক্রমণ চালাতে হয়।'

আমরা প্রবল শত্রুর কারাগারে আবদ্ধ। মিলিটারীর কড়া শাসনের চাপে চট্টগ্রাম শহর, গ্রাম ও কারাগার বিপ্লবী morale প্রায় হারাতে চলেছে। এই সময়েও আমরা মনে প্রাণে অনুভব করেছি আমাদের সীমিত শক্তি নিয়েও শত্রুকে আবার আঘাত করতে হবে—জেল ভাঙতে হবে এবং শহরে ভয়াবহ বিস্ফোরণের সাহায্যে শত্রুধ্বংসের তাণ্ডব সৃষ্টি করা চাই-ই। এই জন্যে চাই প্রস্তুতি। কিন্তু কোনো প্রস্তুতিই সম্ভব নয় যদি প্রয়োজন অনুযায়ী সময় পাওয়া না যায়।

কাজেই, "Gain Time by Space" (স্থান ছেড়ে দিয়ে সময় নেওয়া)—আমাদের বিশেষ ক্ষেত্রে এই রণনীতি আমরা প্রয়োগ করি এইভাবে—Gain time by delaying the proceedings of the Court (আদালতের কর্মসূচীর বিলম্ব ঘটিয়ে সময় লাভ করতে হবে)।

সময় যদি পাওয়া যায় তবে জেলের অভ্যন্তরে ও বাইরে যুগপৎ আক্রমণ চালাবার প্রোগ্রাম গ্রহণ করতেই হবে। তাই আমাদের প্রথম পর্যায়ের কাজ হল, যে কোনো উপায়ে হোক না কেন সরকারের Denovo Trial-এর পূর্ণ সুযোগ নেব—যতভাবে পারি সহজ ও শান্ত পরিবেশে মামলা চালাতে দেব না—প্রতি পদে বাধা দেব, প্রতি-স্তরে জটিলতার সৃষ্টি করবো এবং প্রতিটি সরকারী সাক্ষীকে যতদিন পারি জেরা করে সাক্ষীর কাঠগড়ায় আবদ্ধ রেখে আদালতের কর্মসূচী বানচাল করবো।

লোকনাথ, গণেশ ও আমি আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য কোনো ব্যারিস্টার নিযুক্ত করি নি। নিজেরাই আত্মপক্ষ সমর্থনের পূর্ণ সুযোগ নিলাম। বলা বাহুল্য মামলায় আত্মপক্ষ সমর্থন করে আমরা মুক্তি পাবো বা আমাদের প্রাণদণ্ড রহিত হবে—এইরূপ ভুল ধারণায় আমাদের মন বিন্দুমাত্রও আবিষ্ট হয় নি। আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য প্রত্যেকটি সাক্ষীকে কি করে কয়েক সপ্তাহ বা কয়েক মাস ধরে জেরা করা যায় এবং এইভাবে মামলা সুদীর্ঘ বছর পর্যন্ত টেনে নেওয়া যায়।

ট্রাইব্যুনাল বিচার পদ্ধতি অনুযায়ী সরকার পক্ষের সাক্ষীদের জবানবন্দীর পরেই সঙ্গে সঙ্গে তাদের জেরা করার রীতি। সাক্ষী কি বলবে তা আগে জানবার কোনো উপায় নেই। সাধারণ বিচারে বা জুরীর বিচারে সাক্ষীর বক্তব্য বিষয় আগে থেকে জানা সম্ভব। কারণ, ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতেই সাক্ষীর জবানবন্দী সম্পন্ন হয়ে থাকে। যা হোক, যস্মিন্ দেশে যদাচারঃ—ইংরেজ সরকারের ট্রাইব্যুনাল পদ্ধতির বিরুদ্ধে আমি কোনো অভিযোগ করছি না। সাম্রাজ্যবাদী নীতি বজায় রাখতে তারা তাদের স্বার্থে সব কিছুই করবে। মোট কথা আমাদের Extempore জেরা করতে হবে। অসুবিধে প্রচুর। আমরা কিন্তু তবু দমে যাই নি।

সাক্ষীর জবানবন্দী শেষ হওয়ার পর আমাদের পক্ষের ব্যারিস্টার মহোদয়গণ জেরা শুরু করতেন। বাংলা দেশের সুবিখ্যাত আইনবিদ্‌রা সাক্ষীকে জেরা করতেন মামলা জেতার উদ্দেশ্যে। কাজেই তাঁদের তীক্ষ্ণ প্রশ্ন ও সুচিন্তিত জেরা যে গতি নিয়ে চলত তাতে অবান্তর প্রশ্নের স্থান ছিল না। কোনো উকিল ব্যারিস্টারই প্রয়োজনের অতিরিক্ত প্রশ্ন করে বিচারকের বিরক্তির উদ্রেক করেন না। কাজেই আমাদের উকিল ব্যারিস্টারেরা স্বল্প সময়ের মধ্যেই জেরা শেষ করে ফেলতেন। তারপর আসতো আমাদের পালা। সাক্ষীদের জেরা করবার ভঙ্গী ও উদ্দেশ্য অবশ্য আমাদের একেবারে ভিন্ন—মামলা জেতার আশা নয়, মামলার পরিসমাপ্তি যতদূর সম্ভব বিলম্বে ঘটানো এবং সেই সুযোগে ব্যাপক ও তীব্র আক্রমণ চালাবার উদ্দেশ্যে প্রস্তুত হওয়া।

এই সময়ে আমাদের বয়স, জ্ঞান-বুদ্ধি ও বিচক্ষণতাই বা কতখানি? মামলা সম্বন্ধে আমরা বুঝিই বা কতটুকু? কোর্ট-কাছারী এবং আইন-কানুন সম্বন্ধে আমাদের অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানের তো কোনো কথাই ওঠে না। অবশ্য Criminal Case-এ সাক্ষীদের জেরা করার মধ্যে আইন জানবার অতটা প্রয়োজন হয় না যতটা প্রয়োজন হয় প্রশ্ন করে fact (বাস্তব ঘটনা) উদ্‌ঘাটন করার।

চোখের সামনে দিনের পর দিন, ঘণ্টার পর ঘণ্টা বাংলার বিখ্যাত আইনজ্ঞদের দেখেছি। দেখেছি কিভাবে তাঁরা প্রশ্ন করেন, কিভাবে বিচারকের কাছে কোনো বিষয় উত্থাপন বা নিবেদন করেন এবং কখন কিভাবে পাবলিক প্রসিকিউটারের সঙ্গে বাক্‌বিতণ্ডায় অংশ গ্রহণ করেন। ১৯২৪

গ্রাসে ডাকাতি ও ষড়যন্ত্রের অভিযোগে মাস্টারদা, অম্বিকাদা ও আমার বিরুদ্ধে মামলা চলার সময় দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহনকে দেখেছি কি দক্ষতা, কতখানি বিচক্ষণতা ও কৌশলের সঙ্গে মামলা চালিয়ে শেষ পর্যন্ত সরকারী পক্ষকে কি নিদারুণভাবে বিপর্যস্ত করেছেন। জুরী ও জজসাহেবের সামনে অপূর্ব ভঙ্গীতে দাঁড়াতেন যতীন্দ্রমোহন। কি অপরিসীম ব্যক্তিত্ব—সরকারী উকিল, জুরী, জজসাহেব সকলেই যেন তাঁর কাছে শিশু! তাঁর ক্ষুরধার তীক্ষ্ণ দৃষ্টির সামনে দেখেছি সাক্ষীরা সম্মোহিত হয়ে পড়েছে। কখনও শান্ত স্বরে, কখনও তীব্রকণ্ঠে আবার কখনও বা মুচকি হেসে সুমিষ্ট ভাষায় সাক্ষীদের প্রশ্নবাণে বিধ্বস্ত করেছেন তিনি। মনে হোতো রঙ্গমঞ্চে কোনো অভিনেতা বুঝি বা অভিনয় করছেন। সে এক অপূর্ব দৃশ্য ? তাঁর চেয়ারে একটা পা তুলে দাঁড়াবার ভঙ্গী, কখনও বা টেবিলে বসবার এবং রিমলেস চশমাটি খুলে জজের সঙ্গে কথা বলবার ভঙ্গী—সবই যেন খুব স্বাভাবিক। কিন্তু আমার মনে হোতো এইসব "অভিনয়" তাঁর ইচ্ছাকৃত। এর একটাই উদ্দেশ্য—তিনি চাইতেন সরকার পক্ষকে ঘাবড়ে দিয়ে বিচারকের মনে অভিযুক্তদের প্রতি অনুকূল প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে। পুলিশ সুপারিনটেন্ডেন্ট মিঃ শ্যালোকে তিনি হাসতে হাসতেই জেরা করলেন। ডি এস পি মিঃ ব্রাউনকে বাইবেলের নামে দোহাই দিয়ে উপহাস করে নানারকম জিজ্ঞাসাবাদ করলেন। আই বি অফিসার মনোরঞ্জনবাবু ও ডি এস পি ব্রজবিহারী বর্মণের কাছ থেকে তাঁদের দুটি সাইকেলই বিপ্লবীদের গুলীর আওয়াজ শুনে একই সঙ্গে বিকল হয়ে পড়লো—এইরূপ উত্তর আদায় করে আদালত কক্ষে যথেষ্ট হাসির খোরাক জোগালেন। রাইফেলধারী যে দুজন কনেস্টবল গুলীবিদ্ধ করে মাস্টারদা ও অম্বিকাদাকে ধরেছিল, তারা দুজনও সাক্ষী দিল। তাদের যতীন্দ্রমোহন জেরা করলেন—সে যেন এক মেশিনগান ফায়ার করা! সাক্ষীদের নিশ্বাস ফেলবার সময় না দিয়ে একটার পর একটা প্রশ্ন করলেন তিনি—সাক্ষী ধরাশায়ী হল। Argument-এর সময় আমাদের পক্ষে জবাব দিতে উঠে বিচারক, জুরী, সরকারী উকিল ও সমস্ত আদালত কক্ষকে স্তম্ভিত করে যতীন্দ্রমোহন তাঁর গোপনে সংরক্ষিত আইনের তূণ থেকে একটি অব্যর্থ তীক্ষ্ণ বাণ সযত্নে নিক্ষেপ করলেন—"Your honour ? Section 19F can't go."

যতীন্দ্রমোহন খুব ধীরে ধীরে আইনের এই ধারাটি পড়ে শোনালেন। গভর্নমেন্টের আর্মারী থেকে যদি কোনো অস্ত্র অপহৃত হয় তবে তা' এক মাসের মধ্যে সরকারী record থেকে আদালতকে জানাতে হয়। আমাদের "সুলুকবাহার" বাড়িতে গভর্নমেন্টের তীর মার্কা রাইফেল পাওয়া গেছে বলে আমাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল। আমাদের তিনজনের বিরুদ্ধে এই ধারাটি প্রথমেই বাতিল হয়ে গেল। পার্মাসিক প্রসিকিউটার বিরক্ত বোধ করলেন—লজ্জায় মাথা হেঁট করে রইলেন।

যতীন্দ্রমোহনকে নকল করতে আমার খুব ভাল লাগতো। বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়স্বজনের কাছে যতীন্দ্রমোহনকে নকল করে আমি অভিনয় করেছি। তারপর ছ' বছর পরে ট্রাইব্যুনাল ট্রায়ালের সময় আমরা দেখেছি সদ্য বিলেত ফেরত মিঃ এন আর দাশগুপ্তকে। মাত্র তিন-চার বছরের প্র্যাকটিস তাঁর। অপূর্ব বলেন—মুখে যেন খৈ ফুটছে। আর সঙ্গে সঙ্গে retort দিতে কখনও ছাড়েন না তিনি। এস পি মিঃ জনসনকে জেরা করছিলেন তিনি—পুলিশ সাহেব তাঁর record প্রভৃতি না দেখলে উত্তর দিতে পারবেন না জানালেন। জজসাহেব মিঃ ইউনী নিজে ইংরেজ; কাজেই তিনি বেচারা জনসন সাহেবের পক্ষ নিয়ে খুব উষ্মার সঙ্গে মিঃ এন আর দাশগুপ্তকে বললেন— "Well, how can Mr. Jhonson anticipate your questions in advance and can come prepared with his different files ?"—(কি করে মিঃ জনসন আগে থেকে আপনার প্রশ্নের বিষয়বস্তু ভেবে নিয়ে তাঁর বিভিন্ন ফাইলপত্র নিয়ে উপস্থিত থাকবেন)।

সঙ্গে সঙ্গে মিঃ এন আর দাশগুপ্ত উত্তর দিলেন— "That's strange, how can I anticipate in advance what the witness will depose in the examination-in-chief ?—(এ তো অদ্ভুত! আমিই বা কি করে আগে ভাগে জানবো সাক্ষী কি সাক্ষ্য দেবে এবং আমাকে কি প্রশ্ন করতে হবে ?)।

ব্যারিস্টার মিঃ জে কে ঘোষাল (মাখন ঘোষালের জ্যেঠামশাই)—দীর্ঘ সুঠাম দেহ, অতি গৌরবর্ণ, দেখে মনে হয় যেন পুরোদস্তুর আমেরিকান সাহেব। তাঁকে বলতে শুনেছি— "The latter part is not the answer to my question —it must be expunged."—(শেষ ক'টি কথা আমার প্রশ্নের উত্তর নয় —তাই তা' বাদ দিতে হবে)।

প্রখ্যাত উকিল ও বাংলার সংগ্রামী কংগ্রেস নেতা 'অখিল দত্ত যখন জেরা করতে উঠতেন, তখন তাঁর তেজোদৃপ্ত চেহারা দেখে সাক্ষীরা কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে রীতিমত কাঁপতো। তাঁর কঠোর প্রশ্ন, সাক্ষীর থেকে তিনি সেই প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত উত্তর দাবি করছেন— "Well, answer me yes or no— did you see it or not ?—অদ্ভুত, "হ্যাঁ" ও "না" জবাবের বাইরে সাক্ষীকে তিনি যেতে দিলেন না।

ব্যারিস্টার 'শ্রীশ বোস শরৎবাবুর সঙ্গে এসেছিলেন এবং তাঁর কলকাতা High-Court-এর Practice বন্ধ রেখে আমাদের মামলা শেষ হওয়া পর্যন্ত প্রায় দুটি বছর আমাদের ওখানেই ছিলেন। তিনিও অপূর্ব বলতেন—যেমন সুন্দর ইংরেজী তেমনি চমৎকার বাচনভঙ্গী। যতীন্দ্রমোহনের মত তাঁর চোখেও রিমলেস চশমা। বলবার ভঙ্গী, দাঁড়াবার কায়দা, যথাসময়ে যথাস্থানে সংযত ও কঠোর ভাষার প্রয়োগ তাঁরও বৈশিষ্ট্য। একদিন ট্রাইব্যুনাল প্রেসিডেন্ট মিঃ ইউনী তীক্ষ্ণ স্বরে ও কঠোর ভাষায় মিঃ শ্রীশ বোসকে শাসিয়ে বললেন— "Why you are trying to influence the witness—I have noticed you are repeatedly hinting him to answer your question..."— (কেন সাক্ষীকে প্রভাবান্বিত করতে চাইছেন—আমি লক্ষ্য করেছি আপনি বারবার সাক্ষীকে ইঙ্গিত করছেন)।

বিচারপতির ঐরূপ দোষারোপে শ্রীশবাবুর আত্মসম্মানে খুব কঠোর আঘাত লাগে। এত বড় বদনাম মুখ বুজে সহ্য করা শ্রীশবাবুর পক্ষে একেবারে অসম্ভব। তিনি তীব্র ভাষায় প্রতিবাদ জানালেন— "..Being the member of an English Bar I am not prepared to put up with such an insinuation. Unless your honour withdraws the remark I am the last person to participate to defend my client."—(আমি ইংলিশ বারের একজন সদস্য হয়ে আপনার এই ধরণের বদনাম সহ্য করতে প্রস্তুত নই। যতক্ষণ আপনি আপনার মন্তব্য প্রত্যাহার না করছেন ততক্ষণ আমি আমার মক্কেলকে ডিফেন্ড করা থেকে বিরত থাকবো)। এই বলে শ্রীশবাবু Dramatic pose-এ বসে পড়লেন। অগত্যা ইউনী সাহেব তাঁর মন্তব্য প্রত্যাহার করতে বাধ্য হয়েছিলেন।

মামলার শেষে argument করার জন্য 'বি এন শাসমল ও 'সন্তোষকুমার বাবু এসেছিলেন। তাঁদের কথা এখন

আর উত্থাপন করলাম না। মোট কথা, আমরা তিনজন—লোকনাথ, গণেশ ও আমি, ওকালতি শিক্ষার এপ্রেণ্টিস নিযুক্ত হলাম। আইন শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অপেক্ষা প্রখ্যাত আইনজ্ঞদের কায়দা-কানুন অনুকরণেই বেশি সচেষ্ট হলাম। এই বিদ্যায় কিছুটা রপ্ত হবার পর আমাদের আর পায় কে?

সাক্ষীর জবানবন্দী ও আমাদের পক্ষের উকিল ব্যারিস্টারদের জেরা শেষ হবার পর আমাদের জেরা করবার পালা এলে আমাদের একমাত্র চেষ্টা হোতো সেই দিনটিতে সেই সাক্ষীর জেরা যে কোনো-মতে অসমাপ্ত রাখা। সেই দিনটি extempore জেরা করে যদি একবার সাক্ষী ধরে রাখা যেত তবে কাজ হয়ে গেল—সহজে সে আর ছাড়া পেতো না। পরের দিন আমরা সারাদিনের জন্য প্রশ্ন তৈরি করে নিয়ে আসতাম। প্রেসিডেন্ট মিঃ ইউনী সাহেব আমাদের কৌশল বুঝে ফেললেন। তাই তিনি চেষ্টা করতেন নতুন নতুন সরকার পক্ষীয় সাক্ষী-দের জবানবন্দী নেওয়া এবং আমরা তিন-জন বাদে অন্যান্যরা আদালতের কাজ শেষ হওয়ার দু'-এক ঘণ্টা আগেই যেন তাঁদের জেরা শেষ করেন। প্রেসিডেন্টের ধারণা হয়েছিল এই ক্ষেত্রে আমরা হয়ত extempore জেরা চালিয়ে যেতে পারবো না—তাহলেই সেই সাক্ষী পার পেয়ে গেল। কিন্তু দু'-একটা ক্ষেত্র ছাড়া আমরা অন্যান্য সাক্ষীদের গুরুত্ব আছে কি নেই, সে ছোট কি বড় অথবা সে কতটুকু কি জানে—এ সব নিয়ে একে-বারেই মাথা ঘামাই নি, আমাদের কাছে সে সাক্ষী হলেই হল। সাক্ষী যদি ইংরেজ কর্মচারী বা পুলিশ হোতো তবে মনের ঝাল মিটিয়ে তাদের প্রশ্ন করে নাজেহাল করে ছাড়তাম। Hand-writing expert মিঃ বেনেট, Ex-plosive expert ডঃ শেলডন, Arms expert মিঃ ডেভিস, পুলিশ সাহেব মিঃ জনসন, মিঃ স্টার, মিঃ লুইস, ডি আই জি, মিঃ ফারমার প্রভৃতিকে যখন সাক্ষীর কাঠগড়ায় পেয়েছি, তখন দিনের পর দিন আমরা তাদের cross-examine করেছি। আমাদের যে time gain করতে হবে।

আমাদের এই delaying tactics-এ বাধা দিতে বিচারপতি প্রায় রোজই নানাভাবে চেষ্টা করতেন। মিঃ জে ইউনী প্রশ্ন করতেন—"Why do you ask the question? What's the relevancy?"—(কেন প্রশ্ন করছ? প্রশ্নের যৌক্তিকতা কি?)। আমরা ইতি-মধ্যে ব্যারিস্টারদের কাছ থেকে কৌশল শিখে নিয়েছি। তাই বেশ একটু pose নিয়ে জজ সাহেবকে বললাম—"This particular question has a significance. Oh yes, I will explain the relevancy but the witness must go out of the Court-room first." (হ্যাঁ, নিশ্চয়ই যৌক্তিকতা সম্বন্ধে বলবো; কিন্তু তার আগে সাক্ষীকে আদালতকক্ষ পরিত্যাগ করতে হবে)।

'কোনো কোনো দিন আবার ট্রাইব্যুনাল জজ প্রথম থেকেই খুব কড়া মনোভাব নিতেন। প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে চলেছি, আর প্রতিবারই তিনি বলছেন—"The question is disallow-ed." "Next question." "Dis-allowed." ... ইত্যাদি।

তবু আমরা প্রশ্ন করে করে কেবল time gain করেছি। তবে সাক্ষীদের এইভাবে প্রশ্নের উত্তর দিতে না দিলে সেই দিনের জন্য যেসব প্রশ্ন তৈরি সেগুলি তো সব ফুরিয়ে যাবে। তাই এইরূপ বাধাদানের counter-tactics-ও আমরা ইতিমধ্যে আমাদের ব্যারিস্টারদের কাছ থেকে শিখে নিয়েছি। আমাদের মধ্যে কেউ জজ সাহেবকে সম্বোধন করে বললো—"It is a life and death question to me. I am trying hard to extract the truth from the witness. It will be a great injustice to me if the question be disallowed."

কয়েকটি প্রশ্ন বাতিল করার পর জজ সাহেবের সঙ্গে এইভাবে বাক্-বিতণ্ডা করতাম। তারপর জজ সাহেবের ঐরূপ মনোভাবের প্রতিবাদ জানিয়ে কেউ বলেছি—"This is impossible to get

এবার এলো

কেমিঙ্ক
পছন্দ
করলে

আপনার ইচ্ছেমত সস্তা বা দামী যে' কোন কলম আপনি পছন্দ করতে পারেন; কারণ,

কেমিঙ্ক—তাড়াতাড়ি শুকোয়, অবাধে লেখা হয় এবং জমাট বাঁধেনা। সেই জন্য কেমিঙ্ক সব রকম কলমের পক্ষে উপযোগী।

সলভেন্ট 'এ'—যুক্ত কেমিঙ্ক দিয়ে লিখে আপনার কলমের উপযুক্ত ব্যবহার করুন।

—লিখে আনন্দ কেমিঙ্কে

বেঙ্গল কেমিক্যাল কলিকাতা, কানপুর, দিল্লী, বোম্বাই।

a fair chance of defence. I must file an affidavit."

এইভাবে আমাদের শেখা শেষ অস্ত্র প্রয়োগ করে আরো কিছু সময় নষ্ট করতাম।

আমাদেব এই time gain করার tactics-টি কর্তৃপক্ষ ঠিক আন্দাজ করতে পেরেছিল এবং বিচারপতি মিঃ ইউনী আইন বাঁচিয়ে ও আদালতের সম্মান রক্ষা করে যতটুকু সম্ভব আমাদের cross-examination process-টিকে খর্ব করতে চাইতেন। তিনি যেমন নতুন নতুন পদ্ধতিতে আমাদের বাধা দিতেন আমরাও ঠিক তেমনি প্রতিদিন বিলম্ব ঘটাবার নতুন নতুন কৌশল উদ্ভাবনের চেষ্টা করতাম।

ইতিমধ্যে একদিন আমরা বিশেষ একটা তৈরি হয়ে কোর্টে যেতে পারি নি। অথচ যে সাক্ষী সেদিন আসছে তাকে ধরে রাখা প্রয়োজন। কাজেই প্ল্যান হল কোনো-রকমে আদালতের কর্মসূচী সেদিনের জন্য বন্ধ করতে হবে। এই উদ্দেশ্যে রণধীরকে একটু অভিনয় করতে শেখালো গণেশ। স্থির হল রণধীর আসামীর কাঠগড়ায় হঠাৎ "অজ্ঞান" হয়ে পড়বে আর আমরা সকলে তাকে ঘিরে ব্যস্ততার ভান করবো। ব্যস, প্ল্যান পুরোপুরি ঠিক হয়ে গেল। রণধীর "অজ্ঞান" হয়ে পড়েছে—আমবা প্রেসিডেন্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করলাম। হঠাৎ এই ঘটনায় অভিভাবকেরা চিন্তিত ও উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়েছেন। প্রেসিডেন্টের আদেশে মিঃ সুটার রণধীরকে ডকের বাইরে নিয়ে গেলেন। আমাদের মধ্যেও দু-একজন সাহায্যের জন্য বাইরে গেল। রণধীরের "জ্ঞান" সহজে ফিরে আসছে না। বহুক্ষণ বাদে ধীরে ধীরে সে "জ্ঞান" ফিরে পেল। প্রেসিডেন্ট সেইদিনের মত আদালতের কাজ বন্ধ করলেন—আমাদের আবার জেলে ফিরিয়ে নেওয়া হল।

তারপর আর একদিন লোকনাথ বল আসরে নামলো। আজও আদালতের কাজ বন্ধ করা চাই। প্ল্যান মত ঠিক সময়ে লোকনাথ "অজ্ঞান"। আবার হৈ-চৈ পড়ে গেল। আমরা সকলেই ব্যস্ত হয়ে পড়লাম লোকনাথকে নিয়ে। আগের দিনের মত আবার সেদিনও আদালতের কাজ বন্ধ হল—আমরা জেলে ফিরে গেলাম।

সুবোধ বিশ্বাস (গোপাল) খুবই expert অভিনেতা। এটা মঞ্চের অভিনয় নয়—বাস্তব অভিনয় ও নিখুঁতভাবে ভান করা। এই অভিনয়ে পুলিশের শ্যেন-দৃষ্টিকে বিভ্রান্ত করতে হবে। রণধীর ও লোকনাথ এইরূপ পর পর অজ্ঞান হয়ে পড়ায় পুলিশ ও মিঃ ইউনীর মনে বেশ সন্দেহ হয়েছে যে, আমরা এইরূপ ভান করেই বোধ হয় court-proceeding-এর বিলম্ব ঘটাচ্ছি। তাই তৃতীয়বারের জন্য আমাদের বেছে নিতে হয়েছিল গোপালকে। গোপালের বাল্যকসুলভ সৌন্দর্যের একটা আকর্ষণ ছিল। নিরীহ শান্ত অপরূপ রূপলাবণ্যের অধিকারী এই বালক কি মিথ্যে মিথ্যে জ্ঞান হারাতে পারে? কোনমতেই যাতে মনে বিন্দুমাত্রও সন্দেহের উদ্রেক না হয় সেই জন্য গোপালকে বেছে নেওয়া হল। সার্থক অভিনয় করলো গোপাল। পুলিশ সুপারিনটেন্ডেন্ট স্বয়ং তার চোখে-মুখে জল দিতে লাগলেন। তারপর গোপাল ধীরে ধীরে "জ্ঞান" ফিরে পেল। সেদিনের মত আবার কোর্টের খেলা সাঙ্গ করে আমবা কারাগারে ফিরে এলাম।

সব সময় এই রকম হাস্যকাভাবে চেষ্টা করে আমরা পুরো দুটি বছর মামলা টেনে যেতে সক্ষম হয়েছিলাম বলে যদি কারও ধারণা হয় তবে খুবই ভুল হবে। অত সহজে মামলার proceedings সুদীর্ঘ করা সম্ভব হতো না যদি দীর্ঘদিন ধরে জেরা করে সাক্ষীদের ধরে রাখা না যেত।

আমাদের মামলার Judgment থেকে নিচে একটু উদ্ধৃতি দিচ্ছি—

"In the course of his examination under Section 342 Cr. P.C., the accused made no attempt to explain any of the circumstances appearing in the evidence against him but indulged instead in theatrical vituperation (which he calls the arrogant braggadocio of his letters) characterising the trial as mockery, the court as prejudiced and the Government as tyrannical and unjust."

(৩৪২ ধারা অনুসারে বয়ান দিতে গিয়ে সে (অনন্ত সিং) তার বিরুদ্ধে কোনো সাক্ষ্য সম্বন্ধে পরিষ্কার কিছু বলতে চেষ্টা না করে নাটকীয় ভঙ্গীতে নিন্দা করে বলল—বিচার একটা প্রহসন, আদালত প্রভাবদুষ্ট এবং সরকার অত্যাচারী ও অবৈধ—এতে আমাদের স্বতই স্মরণ করিয়ে দেয় তার সেই উদ্ধত দম্ভপূর্ণ চিঠিগুলির কথা)।

জাজমেন্টের পরিসমাপ্তিতে শেষ পাতায় ট্রাইব্যুনালের প্রেসিডেন্ট মিঃ জে, ইউনী লিখছেন—

"The case has lasted much longer that it ought to have done, either on account of its importance or the number of the incidents dealt with. For this we think both sides are responsible, though not equally. The prosecution have introduced a number of incidents and witness that might have been dispensed with without any appreciable detriment to the case for the Crown. *And the three accused who on 27th April last gave up the Counsel who had previously represented them and undertook their own defence, have since then subjected each successive witness to minute and protracted cross-examination which would have been just as effective if it had been reduced by ninty percent."*

মামলা যে এত দীর্ঘস্থায়ী হয়েছে সেই জন্য উভয় পক্ষকেই বিচারপতিরা যদিও দায়ী করেছেন, তবু আমাদের ওপর দায়িত্বের বোঝা বেশি চাপিয়েছেন। তাঁরা বলেছেন, সরকার পক্ষ অনেক অবান্তর সাক্ষী হাজির করেছে। আরও বলেছেন যে, তিনজন "অভিযুক্ত আসামী" (আমরা তিনজন) নিজেরাই আত্মপক্ষ সমর্থন করেছে এবং পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে জেরা করে বিলম্ব ঘটিয়েছে—আমরা যা জেরা করেছি তার নব্বই ভাগ কমও যদি করতাম তবু পুরোপুরি জেরায় যা ফল হয়েছে তার থেকে কিছুমাত্র কম ফলপ্রসূ হোত না।

[ক্রমশঃ]

কিস্তিবন্দীতে ট্রানজিস্টার

৩২০, টাকা মূল্যের বিশ্ববিখ্যাত "উইন্ডসর হিতাচী" ৫ ব্যান্ড অলওয়ার্ল্ড পোর্টেবল ট্রানজিস্টার মাসিক ১০, টাকার কিস্তিতে নিন।

আবেদন করুন:—
SWISS TELEVISSION CO.
(B-10) Post Box 1320,
Delhi-6.

যা দেখেছি, যা পেয়েছি

স্মৃতিচয়ন

শ্রীসুধীরঞ্জন দাস

[পর্ব-প্রকাশিতের পর]

(৩)

তারপর আরম্ভ হোলো বিশ্রম্ভালাপ। কথাবার্তা যখন চলছিল তখন আমি পকেট থেকে সিগারেট কেসটা বের করে একটা সিগারেট নিয়ে আমার পাশে বসেছিলেন কর্তার সিং চাওলা তাঁর সামনে খোলা সিগারেট কেসটা বাড়িয়ে ধরতেই তিনি খুব সঙ্কুচিত হয়ে বিনয় করে নিচু গলায় জানালেন যে শিখেরা ধূমপান করেন না। তাড়াতাড়ি হাতটা সরিয়ে নিয়ে খুট করে বন্ধ করে একটু অপ্রস্তুত হাসি হেসে কেসটা পকেটে পুরে ফেললাম। ভবিষ্যতে এই ভুল আর কখনো করি নি। তবে সেদিন উপস্থিত সজ্জনেরা আমার অজ্ঞতা দেখে কি ভেবেছিলেন তা কে জানে।

খানিকটা আলাপ-আলোচনা হবার পর উঠে বাড়িটা ঘুরে দেখে আসবার ইচ্ছে জানালাম। জজ খোসলা সাহেব ঘরগুলির পরিচয় করিয়ে দিতে লাগলেন। বাড়িটা নাকি এক কালে বড়লাট সাহেবের গ্রীষ্মাবাস ছিল। যে ছোট ঘরটাতে বসে শপথ নেওয়া হোলো সেটা বাড়ির সামনে হওয়ায় নিচের বড় ময়দানটা এবং সেটা পেরিয়ে পাহাড়ের দৃশ্যের চমৎকার ছবি দেখা যায়। সেই ঘরটা নাকি আগে ছিল বড়লাটের "স্টাডি" অর্থাৎ আফিসের কাজ-কর্ম তিনি সেখানে বসেই করতেন। এক্ষণে চীফ জাস্টিস সেখানে বসেন এবং তাঁর এজলাসও হয় ঐটুকুরই মধ্যে। একটি বাথরুম ছাড়া জজের চেম্বার বলে আলাদা আর কিছু ছিল না। বাড়ির সামনের দিকে এই স্টাডি ঘরের পাশেই ছিল মস্ত বড় একটা ঘর এবং তার সংলগ্ন ছোট একটা ঘর এবং সেটা পেরিয়ে বেশ একটা স্নান পায়খানার ঘর। খোসলা সাহেব বললেন যে, ঐ বড় ঘরটাই ছিল বড়লাটের শোবার ঘর। পাশের ছোট-ঘরটা ছিল তাঁদের ড্রেসিংরুম এবং তার পরের ঘরটা ছিল তাঁদের বাথরুম। খোসলা সাহেব আরো জানালেন যে লর্ড লিটন যখন ভারতের বড়লাট ছিলেন তখন ওই ঘরেই তাঁর একটি ছেলে হয় যিনি পরে লর্ড লিটন হয়ে প্রথমে বম্বে ও পরে বাংলাদেশের রাজ্যপাল হয়েছিলেন। অধুনা ওই ঘরে একটি ডিভিশন বেঞ্চ বসে এবং সেই বেঞ্চের সিনিয়ার জজ হলেন লালা অশ্রুরাম বা পাঞ্জাবী উচ্চারণে অছ্রুরাম। লাটসাহেবের ড্রেসিংরুমটি হোলো জজ অছ্রুরাম সাহেবের খাসকামরা। নিচে নেমে প্রথমেই যে বড় ঘরটা দেখেছিলাম তার দেয়ালের গায়ে চমৎকার কাঠের প্যানেল ছয় সাত ফুট উঁচু এবং সমস্ত ঘরটা জুড়ে। সেই সুন্দর প্যানেলগুলি ঢেকে দাঁড়করান ছিল বইয়ের রঙচটা কতকগুলি আলমারী। ঐ ঘর নাকি এক কালে ছিল বড়লাটের বৈঠকখানা এবং বলরুম। মাঝে মাঝে নৃত্যগীতাদি হোতো সেই ঘরে। এক্ষণে সেইটেই হয়েছে হাইকোর্টের লাইব্রেরী। শুনলাম যে বই খুব কমই আছে এবং ল রিপোর্টের সেটের মাঝে মাঝে কোন কোন সংখ্যার পাত্তাই নেই। শোনা গেল যে পাকিস্তান সরকারের কাছ থেকে হাই-কোর্টের আসবাবপত্র ও বই বাঁটোয়ারার সময়ে আমাদের ন্যায্য অংশ পাওয়া যায় নি। এই বলরুমের পাশেই একটু ছোট কিন্তু ঠিক একই রকম কাঠের প্যানেল দেওয়া ছিল খাবার ঘর ও তৎসংলগ্ন প্যান্ট্রি। মোটামুটি বাড়িটা দেখা হয়ে গেলে ময়দানটা পেরিয়ে নিচে নেমে গেলাম ঐ একহারা টানা ব্যারাকে। সেগুলি আগে ছিল বড়লাটের নানা কর্মচারীদের বাসস্থান। এখন তার মধ্যে হয়েছে বার এ্যাসোসিয়েশনের বিশ্রামকক্ষ ও লাইব্রেরী। বার এ্যাসোসিয়েশনে সেদিন বিশেষ কেউ ছিলেন না দু-চারজন ছাড়া। কিন্তু পরে শুনেছি যে নতুন চীফ জাস্টিস এসেই যে বার এ্যাসোসিয়েশনের ঘরে গিয়েছিলেন সে ঘটনাটা এ্যাডভোকেটদের মনস্তুষ্টির কারণ হয়েছিল।

সেদিন দুপুরের খাওয়াটা, যতদূর মনে পড়ে, হয়েছিল জজ হরনাম সিংহের বাড়িতে। সেই শীতের সময় সিমলা পাহাড়ে যে সব হোমরা-চোমরা ব্যক্তিরা ছিলেন প্রায় সবাইকেই জজ সাহেব আমন্ত্রণ করেছিলেন আমার সঙ্গে পরিচিত হবার জন্যে। সেইখানেই দেখলাম বহু বৎসর পরে তেলিরবাগের মধ্যের বাড়ির জ্যোতিষ দাদার বড় মেয়ে রমা ও তাঁর স্বামী কর্নেল প্রফুল্ল দত্তকে যিনি তখন সিমলার সিভিল সার্জেন। বিদেশে অচেনাদের মধ্যে রমার সদাপ্রফুল্ল হাসিটি দেখে ভাল লাগল। আপনজনের সান্নিধ্যে মনে বললাভও করলাম। ভোজনান্তে হোটেলে গিয়ে একটু বিশ্রাম সেরে বিকেলের দিকে চললাম জজ খোসলার বাড়ি চায়ের নিমন্ত্রণে। যাবার পথেই পড়ল রিট্রিট বাড়িটি যেখানে থাকতেন চীফ জাস্টিস রামলাল। মনে হোলো যে সৌজন্যের খাতিরে তাঁর সঙ্গে দেখা করা উচিত। দেখা হতে তিনি বেশ খুশিই হলেন। নতুন চীফ জাস্টিস যে গমনোন্মুখ চীফ জাস্টিসের বাড়ি বয়ে দেখা করতে আসবে সেটা বোধ হয় তিনি আশাই করেন নি। এর একটু কারণও ছিল বলে মনে হোলো, কেন না সেই সময়ে তিনি তত জনপ্রিয় ছিলেন না। তাতে আমার ত' কিছু আসে যায় না। আমি বেশ স্বাভাবিকভাবেই তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা বললাম এবং পাঞ্জাব হাইকোর্টের জজেরা এবং এ্যাডভোকেটরা কে কেমন সে সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করলাম এবং হাইকোর্ট সম্পর্কে আমার আশু করণীয় কিছু আছে কি-না সে বিষয়ে তাঁর পরামর্শ চাইলাম। সেই সাক্ষাৎকারে দেওয়ান রামলাল ও তাঁর সহধর্মিণীর সঙ্গে যেটুকু ঘনিষ্ঠতা হোলো সেটা একেবারে ক্ষণস্থায়ী মাত্র হয় নি। দেওয়ান সাহেবের বিদেশে আকস্মিক মৃত্যুর পরও তাঁর সহধর্মিণীর সঙ্গে আমাদের পরিবারের হৃদ্যতা অটুটই ছিল।

কথাবার্তা যখন চলেছে তখন একটি ভদ্রমহিলা ঘরে ঢুকলেন দেওয়ান গৃহিণীব

সঙ্গে। মহিলাটি দেখতে সুন্দরী এবং মুখে হাসি লেগেই আছে। পরে জানলাম যে তিনি সুবিখ্যাত বিপ্লবী ও চরিত্রবান দেশসেবক হরদয়াল-এর একমাত্র কন্যা এবং উদীয়মান ব্যারিস্টার বিষণ নারায়ণের পত্নী—শান্তি দেবী। দেওয়ান সাহেবের দিকে চেয়ে হাস্যোজ্জ্বল মুখে মহিলাটি ইংরেজীতেই বললেন—"Many, many happy returns of the day". আরে, আজকে দেওয়ান সাহেবের জন্মদিন! আমার ত' তাঁকে শুভেচ্ছা জানান হয় নি! কি অভদ্রতা হয়ে গেছে! ঝোঁকের মাথায় বলে ফেললাম—"Many happy returns of the day, Dewan Sahib. Sorry that I didn't know that to-day was your birthday". এবং হাত বাড়িয়ে তাঁর সঙ্গে আবার করমর্দন সেরে নিলাম। করমর্দন করতে করতেই দেওয়ান সাহেব মুচকী হেসে বললেন—"Had it not been my birthday you would not have been here to-day." তাও ত' বটে, একটা অপ্রস্তুত থেকে আর একটা অপ্রস্তুতে গিয়ে পড়লাম। ব্যাপারটা পাছে আরো গুলিয়ে যায় এই ভয়ে কাষ্ঠ হাসি দিয়েই সেটাকে ঢেকে ফেলতে হোলো। কিন্তু মনের মধ্যে গ্লানি রয়েই গেল যে একটা আহাম্মকের মত কথা বলা হয়ে গেছে।

নমস্কারান্তে চলে গেলাম জজ খোসলার বাড়ি চা খেতে। সেই একই লোকজনেদের সঙ্গে আবার দেখা হোলো। পরদিন সকালে সিমলা ছেড়ে চলে এলাম, কেন না হাইকোর্ট তখন বন্ধ থাকায় আমার করণীয় কিছু ছিল না। রিট্রিট ও নকাড্রিন দুটো বাড়ির মধ্যে যেটা খুশি আমি নিতে পারি। রিট্রিট বাড়িটা ছিল দুটোর মধ্যে বড় এবং সিমলায় নামকরা বাড়ি। দেওয়ান সাহেবের সঙ্গে দেখা করবার সময় দেখেছিলাম যে রিট্রিটের দেয়ালের গায়ে ব্র্যাকেটের মধ্যে জোড়া জোড়া আলো। সেখানে বইয়ের আলমারী রাখার খুবই অসুবিধে, কেন না সব আলোই যাবে ঢেকে। তা ছাড়া ওটার ভাড়াও ছিল খুবই চড়া। ঠিক করলাম নকাড্রিনটাই নেব। তীরথ সিং বললেন যে নকাড্রিন বাড়িটি তিনি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিয়ে আমার বইয়ের আলমারীগুলি সাজিয়ে ঠিক করে রাখবেন। এই সব বন্দোবস্ত করে ঠিক করলাম যে আগ্রা ঘুরে যাব, কেন না আমাদের বড় ছেলে সুরঞ্জন (খোকন) তখন সেখানে মোতায়েন ছিলেন। তার আগেই খোকনের বড় মেয়ে রঞ্জিতা হয়ে গিয়েছিলেন কলকাতায়। মেয়েটি কত বড়টি হয়েছেন দেখবার খুব ইচ্ছে হোলো। তাই আগ্রা হয়ে যাব ঠিক করলাম। আগ্রাতে গিয়ে খোকন, তাঁর স্ত্রী ও কন্যার সঙ্গে দেখা হোলো। রঞ্জিতা তখনও খুব ছোট এবং তাঁকে ঠেলাগাড়িতে বসিয়ে রাখা হোতো। একলা তিনি বেশ খেলা করতেন। কখনো ঠেলাগাড়ি থেকে উল্টে পড়ে যান নি এত সতর্ক ও সেয়ানা ছিলেন তিনি। সেই সময়ে খোকন যে সিনেমার রঙিন ছবি তুলেছিলেন পরে সেটা দেখে খুবই ভাল লাগত।

(৪)

মার্চ মাসের শেষে হাইকোর্ট খুলবার ক'দিন আগে আমি আবার গেলাম সিমলায়। এবার বুবু ও মাণিক চললেন আমার সঙ্গে। এবার বোধ হয় দিল্লীতে থাকি নি। একেবারে সোজাই চলে গিয়েছিলাম সিমলায়। এবার সিমলা স্টেশনে অনেক লোক এসেছিলেন আমাকে অভ্যর্থনা করে আপ্যায়িত করবার জন্যে। সকলের সঙ্গে করমর্দন ও অল্প আলাপ করে রিক্সা চেপে গিয়ে উঠলাম নকাড্রিন বাড়িতে। তীরথ সিং বাড়িটির রঙ ও পালিশ করিয়ে বেশ সাজিয়ে গুছিয়েই রেখেছিলেন। আমার আফিস ঘরেও বইয়ের আলমারী ইতিমধ্যেই বসানই ছিল। সঙ্গে কলকাতা থেকে গিয়েছিল পাচক সুরেন ও সত্যবাদী বেহারা। ঠিক মনে নেই, সেদিন রাত্রের খাবারটা বোধ হয় ভ্রাতুষ্পুত্রী রমাই পাঠিয়েছিলেন। পরদিন তাঁরা স্বামী-স্ত্রী এসে খোঁজ-খবর নিয়ে গেলেন। কোর্ট খুলতে তখনো দু-একদিন বাকী। কিন্তু শুনলাম যে জজেরা সব এসে গেছেন। তাঁরা উপযাচক হয়ে আমার বাড়ি দেখা করতে আসবেন এবং তারপর আমি তাঁদের বাড়িতে পাল্টা দেখা দিয়ে আসব—এই নাকি রীতি। কিন্তু আমার মনে হোলো যে আমি বিদেশী এবং আমিই যখন দলের সর্দার তখন আমারই উচিত দলের অন্যান্যদের সঙ্গে আড়ষ্ট ভাবটা কাটিয়ে নেওয়া। হাঁটতে হাঁটতে চলে গেলাম জজ লালা অছরুরাম সাহেবের বাড়ি। তিনি তখন জজেদের মধ্যে সিনিয়র। ছিপছিপে তাঁর চেহারা। চোখের চশমাটা খুললে চোখ দুটি পিট পিট করে একটু ট্যারা মনে হোতো। তাঁকে চীফ জাস্টিস না করে তাঁর ঘাড়ের উপর দিয়ে সুদূর বাংলা দেশ থেকে আমাকে নিয়ে এসে গদিতে বসানতে যদি কারো রাগ বা বিরক্তি হতে পারত তবে তিনি হতেন লালা অছরুরাম সাহেব। সেইজন্যে তাঁর উপরে আমার খুবই মায়া ছিল। কথাবার্তায় কিন্তু তাঁর মনে কোন বিকারই লক্ষ্য করলাম না। বেশ স্বাভাবিকভাবে হৃদ্যতার সঙ্গেই কথা বললেন। তাঁর পত্নী—ইনি ছিলেন দ্বিতীয়া পত্নী—তাঁকে ডেকে বুবুর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। তাঁরা দুজনে বোধ হয় ঘরকন্নার কথাই বলতে লাগলেন। লালাজীর সহধর্মিণী অতি মিষ্টস্বভাবা ও ঘরোয়া গৃহিণী ছিলেন এবং আমার স্ত্রীর সঙ্গে ঐ প্রথম দিন থেকেই বেশ একটু সৌহার্দ্য হয়ে গেল যা অটুট ছিল তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত। অছরুরাম সাহেবকে বললাম যে স্যার গ্রেভর হ্যারিসের কাছে তাঁর অনেক সুখ্যাতি শুনেছি এবং বিশেষ করে পাঞ্জাবের স্থায়ী রেওয়াজ (কাস্টম) সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার কথা। আমি ত' সে বিষয়ে খুবই অনভিজ্ঞ। তাঁর সঙ্গে বেঞ্চে বসলে আমার খুব উপকার হবে। অছরুরাম সাহেব উৎসাহিত হয়ে বললেন যে, তার আর কথা কি। এবার সিমলা যাবার আগে নাকি আমার নিয়োগ নিয়ে কানাঘুষো কিছু অসন্তোষও দেখা দিয়েছিল এই লালা অছরুরামের উপর অন্যায় করা হয়েছে বলে। কিন্তু লালা অছরুরামের কোনো ব্যবহারে তা আমার মনেই হয় নি। সেই যে তাঁর সঙ্গে আলাপ হোলো তারপর থেকে আজ পর্যন্ত আমি তাঁর সহযোগিতা ও শ্রদ্ধা পেয়ে আসছি। সুখে দুঃখে এখনো তাঁর সস্নেহ সহানুভূতি পাই। এঁরই জ্যেষ্ঠ পুত্র হলেন প্রেম সাইগল যিনি বিবাহ করেছেন নেতাজীর আই. এন. এ. ফৌজ দলের ক্যাপ্টেন লক্ষ্মীকে। দ্বিতীয় পুত্র সুরেশকুমার আই. এ. এস. পাশ করে এখন বোধ হয় উত্তরপ্রদেশের একজন পুরোসচিব বা যুক্তসচিব পদে উন্নীত হয়েছেন। ছোট ছেলে বিনোদ ছিলেন আমাদের হাওয়াই ফৌজে এবং উনিশ শ' বাষট্টি সালে চীনা আক্রমণের সময় শত্রুহস্তে বন্দী হবার পর আর কোন খবরই তাঁর সম্বন্ধে পাওয়া যায় নি। বৃদ্ধ বয়সে লালাজীর এ আঘাত মর্মন্তুদ হয়েছে সন্দেহ নেই কিন্তু প্রকৃত পাঞ্জাবী বীরের মতই তিনি এ শোক বহন করে চলেছেন।

তারপর গেলাম জজ অমরনাথ ভাণ্ডারীর বাড়িতে। ভাণ্ডারী সাহেব ছিলেন আই. সি. এস. জজ। কথায়-বার্তায় বেশ অমায়িকই মনে হোলো। তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিলেন। মহিলাটির কাপড়চোপড় পরার ধরণ থেকেই তাঁর সুরুচির প্রত্যক্ষ পরিচয় পাওয়া গেল। চুল ছেঁটে ফ্যাসান করার কোন প্রচেষ্টা দেখলাম না। মাথায় কাপড় একবারও ফেলে দিলেন না। সুন্দরী রমণী না হলেও বেশ কমনীয়ই লাগল। সাক্ষাৎকারের সময় দেখলাম যে মহিলাটি বেশি কথাবার্তা বললেন তাঁর স্বামীর চেয়ে। পরম্পরায় শোনা গেল যে ভাণ্ডারী সাহেবের দ্রুত উন্নতির জন্যে তদীয়

গ্যাহপার কৃতিত্ব নাকি অনেকখানিই ছিল। এই পরিবারের সঙ্গে এই যে আলাপ-পরিচয় হোলো তা এখনো অক্ষুণ্ণই আছে। এই দম্পতির আতিথ্য ও সৌহার্দ্য খুবই আন্তরিক বলে অনুভব করেছি।

জজ খোসলা সাহেবের কথা আগেই বলেছি। একটু কড়া মেজাজের লোক। সকলের সঙ্গে তেমন সহজে মিশতে পারতেন না এবং তাদের সকলকেই একটু অবজ্ঞার চোখেই হয়ত দেখতেন। লেখা-পড়ায় ভাল ছিলেন। আইন-আদালতের কাজ ছাড়াও তাঁর অন্য বিষয়েও আগ্রহ ও ঔৎসুক্য ছিল। ইংরেজীতে তাঁর ছোট গল্প প্রায়ই বের হোতো রবিবারের স্টেটস্ম্যান কাগজে। পরে একবার একটা গল্প নিয়ে মানহানির দায়ে ফ্যাসাদেও পড়েছিলেন। তবে সেটা মিটমাট হয়ে গিয়ে সব দিক রক্ষা পেল। কয়েকখানা বই-ও ছাপিয়েছেন। পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরে বেড়াতে খুবই ভালবাসেন। সিমলাতে বরফে স্কেটিং করায় খুবই উৎসাহী ছিলেন। আদালতের কাজকর্মে বেশ চট্পটেই দেখেছি।

খোসলা সাহেবের বাড়ি থেকে গেলাম ইংরেজ আই· সি· এস· জজ ডোনাল্ড ফ্যাল্স সাহেবের বাড়ি। তখন তাঁর স্ত্রী বোধ হয় এ দেশে ছিলেন না। ফ্যাল্স সাহেব ছিলেন বেঁটেখাটো-কুল মানুষ— কিন্তু তাঁর স্ত্রী, যাঁকে পরে দেখেছি, তিনি ছিলেন বেশ মোটা ও লম্বা। ফ্যাল্স সাহেবের রসিকতাজ্ঞান বেশ ছিল এবং রসিকতা করে নিজেই হেসে ফেলতেন। দেশ ভাগ হবার সময় তিনি ভারতেই কাজ করবেন বলে ইচ্ছা প্রকাশ করায় তিনি পূর্ব পাঞ্জাবের নতুন হাইকোর্টের জজ হয়ে এলেন। কাজে-কর্মে খুবই তৎপর ছিলেন। পরে শুনেছি যে দিনের কর্মতালিকায় যে সব মামলা থাকত, তিনি একের পর এক সব কটা শুনতেন প্রায় একটা পর্যন্ত। তক্ষুণি তক্ষুণি রায় দিতেন না। মধ্যাহ্নবিরতির পর যখন কৌসুলীরা কেউ থাকতেন না তখন ফ্যাল্স সাহেব নিজের এজলাসে একলা বসে সব মামলাগুলির রায় বলে যেতেন ও স্টেনোগ্রাফার তা লিখে নিত। এই কাজ সেরে তিনি কোর্ট উঠবার আগেই বাড়ি চলে যেতেন। সন্ধ্যায় ফ্যাল্স সাহেব টুইডের নাইটক্যাপ মাথায় দিয়ে সিমলার ম্যাল—যেখানে গ্রীনরুম বলে একটা ছোটখাট ক্লাব ছিল সেইখানে বেশ কয়েকটি হুইস্কী পেগ সেবন করে বাড়ি ফিরতেন। এই ছিল তাঁর দৈনিক কর্মসূচী। ইনি ছিলেন এ্যাডিশন্যাল জজ। এঁর পাকা হওয়ার ব্যাপারে কিছু মতভেদ হয়েছিল। কিন্তু আমার মনে হয়েছিল যে ইনি স্বেচ্ছায় যখন ভারতে কাজ করবেন বলে এসেছেন এবং যখন কলকাতায় স্যার ট্রেভর হ্যারিস ও এলাহাবাদে মল্লথাম সাহেব চীফ জাস্টিস রয়েছেন তখন এঁকে পাকা না করাটা ন্যায়সঙ্গত হবে না। আমি এঁর স্বপক্ষে মত দেওয়ায় সর্দার প্যাটেলও রাজী হয়ে গেলেন এবং আমিই তাঁকে পাকা জজীয়তীর শপথ গ্রহণ করিয়েছিলাম। এইখানে বলা যেতে পারে যে, কালক্রমে ডোনাল্ড ফ্যাল্স সাহেব পাঞ্জাবের চীফ জাস্টিসও হয়েছিলেন।

সর্বকনিষ্ঠ জজ হরনাম সিংয়ের সঙ্গে আগেই পরিচয় হয়েছিল এবং উনিশে জানুয়ারীতে তাঁর বাড়িতে মধ্যাহ্নভোজেও গিয়েছিলাম। দেওয়ান রামলাল যখন এ্যাডভোকেট জেনারেল পদে ইস্তফা দিয়ে জজ হলেন তখন হরনাম সিং তাঁর জায়গায় এ্যাডভোকেট জেনারেল হয়েছিলেন। কথা উঠল নতুন পাঞ্জাব হাইকোর্টে একজন শিখ জজ না থাকলে চলে না, তখন হরনাম সিং-কেই জজ করা হয়। এটা আমি পাঞ্জাবে যাবার কিছু আগেই হয়েছিল। সর্দার হরনাম সিং কোর্টের কাজে বেশ চৌখসই ছিলেন। পাঞ্জাবের নানাবিধ অ্যাক্টের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। অসাধারণ ছিল তাঁর স্মরণশক্তি। খেতে এবং খাওয়াতে ভালবাসতেন। আমি যাবার পর সিমলাতে একটা বড় পার্টি দিয়েছিলেন। তাতে রাজ্যপাল চন্দুলাল ত্রিবেদী এবং তাঁর সহধর্মিণীকেও আহ্বান করেছিলেন। সর্দারনী হরনাম সিং বেশ স্বাভাবিকভাবেই মাননীয় অতিথিদের আদর-আপ্যায়ন করলেন। পরে শুনে অবাক হলাম যে তার আগের রাত্রে তিনি একটি সন্তান প্রসব করেছিলেন। সর্দার হরনাম সিং-এর মনে একটা ধারণা খচ্খচ্ করত যে শিখেরা আইন-আদালতে পাত্তা পায় না। তাঁর মনোদুঃখের কথা শুনে হিন্দু জজ ও আইনজীবীরা বলত যে হরনাম সিং নাকি খুবই সাম্প্রদায়িক। লোকে আরো বলত যে, হরনাম সিং নাকি ছিলেন মাস্টার তারা সিংয়ের চেলা এবং আকালী দলের সলা-পরামর্শ নাকি তাঁরই বাড়িতে বসে হোতো। জজের নামে এ অভিযোগ যে গুরুতর তাতে সন্দেহমাত্রও নেই। কিন্তু আমার নাতিদীর্ঘ কার্যকালে এমন যে কোন বৈঠক হয়েছে তাঁর বাড়িতে তা শুনি নি। পরে হরনাম সিংয়ের বয়েস নিয়ে কিছু কথা উঠেছিল। তাঁর ম্যাট্রিকুলেশন সার্টিফিকেটে নাকি বয়সটা একটু বেশিই লেখা হয়েছিল। তিনি একটি ঠিকুজী-কুষ্ঠি ও তাঁর বড়দিদির বাক্য উদ্ধারও করেছিলেন। কিন্তু আমার সঙ্গে কথাবার্তা হবার পর তিনি ম্যাট্রিকুলেশন সার্টিফিকেটের বয়স অনুসারেই অবসর-গ্রহণ করেন। শেষ বয়সে সর্দার হরনাম সিংয়ের পক্ষাঘাত হয়েছিল এবং বেশ কিছুদিন শয্যাগত ছিলেন। তেজীয়ান মানুষটার এই ব্যারাম করুণার উদ্রেক করে। দিল্লী গেলেই আমি মাঝে মাঝে তাঁর সঙ্গে দেখা করতাম ও পুরনো দিনের গল্প করে আসতাম।

[ক্রমশঃ]

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

সুখী তাড়াতাড়ি ইজিচেয়ারটা টেনে এনে বিছিয়ে দিল।

'তুমি বসো, তুমি বসে পড় রণধীর।' সীতাংশু হাত ধরে ডাক্তারকে বসিয়ে দিল। 'তুমি কি অসুস্থ, তোমার চেহারা এত খারাপ হয়েছে কেন!' বন্ধুর মুখের সামনে ঝুঁকে দাঁড়াল সীতাংশু।

রণধীর কথা বলছিল না। দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে সে ধুঁকছিল। যেন ভেতরে ঢুকে বসতে পেরে একটু স্বস্তি পেল, আরাম বোধ করল।

সীতাংশু আর একবার বাইরে চোখ ফেরাল। 'কই, তোমার গাড়ি কোথায়, তোমার লাল মোটরবাইকটা তো দেখছি না!'

মাথাটা মাটির দিকে নামিয়ে দু হাতে চোখ ঢাকল রণধীর।

'তা হলে তুমি এতটা পথ হেঁটে এসেছ!'

সীতাংশু ঘাড় ঘুরিয়ে বন্ধুকে দেখল। মাথার চুল উস্কখুস্ক, পোষাকটা মলিন হয়ে গেছে, জুতোয় ধুলো লেগে আছে, মোজায় শুকনো কাদার দাগও দেখা যাচ্ছে। এই জন্যও সীতাংশু কম বিস্মিত হল না। পোষাকপরিচ্ছদে যে মানুষ সর্বদা নিখুঁত পরিপাটি থাকে, মাথার একটি চুল এদিক থেকে ওদিকে যে নড়তে দেয় না।

ব্যাপার কি! সীতাংশু ঢোক গিলল। 'একটু চা খাবে রণধীর?'

'বরং একটু গরম দুধ এনে দিই ডাক্তারবাবুকে।' সুখী এই প্রথম কথা বলল। 'খুব পরিশ্রম করে এসেছেন যেন।'

'তাই তো দেখছি।' বিড়বিড় করে সীতাংশু বন্ধুর কাঁধে হাত রেখে আস্তে ঝাঁকুনি দিল। 'রণধীর, কথা বলছ না কেন।'

রণধীর মুখ তুলল না। তাকাল না। চোখ থেকে হাতটা সরিয়ে নিল শুধু। তেমনি ঘাড় গুঁজে থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

'বরং চা করেই নিয়ে এসো।' সীতাংশু সুখীর দিকে তাকাল। 'একটু গরম চা খেয়ে নিক, তারপর কথা বলবে।'

সুখী চা তৈরি করতে রান্নাঘরের দিকে ছুটে গেল। তা ছাড়া তার রান্নারও কিছু বাকি পড়ে আছে। রান্না ফেলে রেখে এসে পাখিকে আদর করছিল, তারপর সীতাংশুর সঙ্গে কথা বলতে বলতে ওদিকে দেরি করে ফেলেছে।

কিন্তু সীতাংশু যেন অন্য কারণে মাধবের দিদিকে সরিয়ে দিল। ডাক্তার যে চা খাবে তার স্থিরতা ছিল না। কিন্তু তা হলেও, বলা যায় কি, হয়তো মেয়েটি সামনে আছে বলে ডাক্তার কিছু বলতে পারছে না। বা বলতে চাইছে না।

'এই, রণধীর, কী হয়েছে শুনি?' আর কোনোরকম দ্বিধা বা সঙ্কোচ করার কারণ দেখল না সীতাংশু, গলার স্বরটাও একটু রুক্ষ করে তুলল। 'তুই কি রাণীরবাগ থেকে সোজা এখানে চলে এসেছিস, না অন্য কোথাও গিয়েছিলি, খুব টায়ার্ড দেখাচ্ছে তোকে, মাথা ধরেছে?'

এবার ডাক্তার মুখ তুলল। ফ্যালফ্যাল করে সীতাংশুকে দেখল। সীতাংশু অস্বস্তি বোধ করল। অন্যদিকে চোখ সরিয়ে নিল। রণধীরের তাকানোর মধ্যে একটু যেন অস্বাভাবিকতার গন্ধ খুঁজে পেল সে।

'ব্রততী কেমন আছে?' সীতাংশু হঠাৎ প্রশ্ন না করে পারল না। প্রশ্ন করার সঙ্গে সঙ্গে তীক্ষ্ণ চোখে ডাক্তারের মুখ দেখল। চোখ দেখল। ডাক্তার তৎক্ষণাৎ যেমন আগে ছিল মাথাটা হেঁট করে রইল। মাটি দেখতে লাগল।

সীতাংশু ভুরু কুঁচকোল। দরজাটা একবার দেখল। তারপর আগের চেয়েও একটু বেশি ঝুঁকে দাঁড়িয়ে প্রায় রণধীরের কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিস করে উঠল, 'তুই নাকি ওকে একটা নতুন পাখি এনে দিবি বলে গেছিস? ওর এই পাখিটা ভাল না?'

রণধীর ঘরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে সুখী, খাঁচাসুদ্ধ পাখিটাকে বেড়ার গায়ে ঝুলিয়ে রেখেছিল। সীতাংশু আঙুল দিয়ে দেখাল। রণধীর চোখ তুলে খাঁচাটা দেখল, চুপ করে রইল।

'আমি কাল শুনলাম।' সীতাংশু আস্তে বলল।

'বলেছিলাম কি?. হয়তো বলেছিলাম।' সীতাংশুর চোখের দিকে চোখ রেখে ডাক্তার একটা চাপা নিশ্বাস ফেলল। মুখ থেকে তার এই প্রথম কথা বেরোল। 'এখন আর তেমন কিছু ভাল মনে করতে পারছি না।'

'কেন, কী হয়েছে তোর? গাড়ি ছাড়া হঠাৎ অসময়ে এভাবে চলে এসেছিস কেন, এত খারাপ লাগছে কেন চেহারা? ব্রততী সুস্থ আছে?' সীতাংশু নতুন করে বন্ধুর মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ল।

রণধীর একটু সময় দরজার বাইরে চোখ রেখে চুপ করে রইল। আর একটা গাঢ় নিশ্বাস ফেলল। তারপর সীতাংশুর চোখে চোখ রাখল।

'কি হল, কথা বল!' সীতাংশু তার কাঁধে ঝাঁকুনি দিল।

'ও নেই। অনেক চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু বাঁচাতে পারলাম না। দুটো কলার-বোন ভেঙে গিয়েছিল। মাথায়ও শক্ত চোট লেগেছিল।'

'কি করে এমন হল!' কথাটা সীতাংশু বলল বটে, কিন্তু তার মুখ দিয়ে একটা হিসহিস শব্দ ছাড়া কিছুই প্রায় বেরোল না। শ্বাস বন্ধ করে রণধীরের মুখটা দেখতে লাগল।

সুখী চা নিয়ে এল। একটা টিপয় টেনে এনে কাপ দুটা বসিয়ে দিল।

'সিগারেট দে, তোর কাছে সিগারেট আছে?' রণধীর হাত বাড়াল। সীতাংশু তার হাতে সিগারেট ও দেশলাই তুলে দিল।

'তোমার রান্না হয়েছে?' সীতাংশু সুখীর দিকে চোখ তুলল।

'সামান্য একটু বাকি আছে।' চা দিয়ে সুখী দরজার পাশে সরে গিয়েছিল। আবার এক পা এদিকে সরে এল।

সীতাংশু আর তার দিকে তাকাল না। আস্তে আস্তে বলল, 'তা হলে বাকি রান্না-টুকু সেরে ফেল, ডাক্তারবাবু এখানে খাবেন।'

সুখী আর দাঁড়াল না। ঘাড় কাত করে রান্নাঘরের দিকে চলে গেল। যেন এবার সে বুঝতে পারল তার সামনে বাবুরা কিছু বলতে চাইছেন না। তাই কি? সীতাংশু এই নিয়ে অবশ্য মাথা ঘামাল না। তৎক্ষণাৎ রণধীরের দিকে চোখ ফেরাল। রণধীর সিগারেট ধরিয়ে চায়ে চুমুক দিয়েছে। সীতাংশু কিছু প্রশ্ন করার আগেই অবশ্য সে চোখ তুলল।

'পিয়ালীছড়ার হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হল। কিন্তু আর সেন্স ফিরে আসে নি। আধ ঘণ্টার মধ্যে এক্সপায়ার করল। হুঁ, হসপিটালে নিয়ে যাবার পর ঠিক উনত্রিশ মিনিট ছিল—'

'কিন্তু কি করে এমন হল!' সীতাংশু এবার স্পষ্ট গলায় প্রশ্ন করল। 'আঘাত পেয়েছিল? কোথায়? ওকে মোটরবাইকে তুলে নিয়ে রাস্তায় কোথাও তুই অ্যাকসি-ডেন্ট বাধিয়েছিলি না তো?'

রণধীর নিঃশব্দে মাথা নাড়ল।

'তবে কী হয়েছিল? বলছিস মাথায় চোট লেগেছিল কলারবোন ভেঙে গিয়েছিল—' সীতাংশু হঠাৎ থেমে গেল। যেন আর এসব বলে কাজ নেই এমন ভঙ্গিতে ডান হাতটা নেড়ে রণধীরই সীতাংশুকে থামিয়ে দিল। কিন্তু তারপর রণধীরও চুপ। জোরে জোরে সিগারেট ফুঁকল এবং নিঃশব্দে পেয়ালার বাকি চাটুকু শেষ করল। সীতাংশুর চা যেমন ছিল পড়ে রইল। স্পর্শও করল না সে।

চা শেষ করে রণধীর জামার হাতা দিয়ে ঠোঁট মুছল। যেন তার পকেটে আজ রুমালটিও নেই, অথবা রুমাল দিয়ে মুখ মোছা সে ভুলে গেছে। সীতাংশুর চোখে জিনিসটা অদ্ভুত ঠেকল। তাড়াতাড়ি সে অন্যদিকে চোখ সরিয়ে নিল।

'তুই হঠাৎ আমার খাওয়ার কথা বললি কেন?' রণধীর বিড়বিড় করে উঠল। 'মেয়েটির কষ্ট হবে, নতুন করে রাঁধতে হবে।'

'আর রাঁধতে হবে না, যা রেঁধেছে তাতে দুজনের হয়ে যাবে।' পাখির খাঁচাটার দিকে চোখ রেখে সীতাংশু উত্তর করল। রণধীরের মুখের দিকে তাকাল না।

'নিয়তি অদৃষ্ট—এসব তুই বিশ্বাস করিস সীতাংশু?'

'করি বৈকি। সময় সময় বিশ্বাস করতে হয়।' ইজিচেয়ারে পিঠ এলিয়ে দিয়ে রণধীর শুয়ে পড়েছিল। দুদিন দাড়ি কামাচ্ছে না বলে তার মুখটা কত নোংরা দেখাচ্ছে। দৃষ্টি আড় করে সীতাংশু বুঝি তাই লক্ষ্য করছিল, রণধীরের চোখের সঙ্গে চোখ আটকে গেল। অগত্যা ভাল করে ডাক্তারের দিকে তাকে তাকাতে হল। 'কেন, হঠাৎ নিয়তির কথা যে!'

সরাসরি একথার জবাব দিল না রণধীর। ঘরের চালের দিকে চোখ দুটো তুলে দিয়ে অল্প হাসল, যেন নিজের মনে হাসল, একটা লম্বা নিশ্বাস ফেলল সেই সঙ্গে। একজন বড় দার্শনিকের মতন দেখাচ্ছিল তাকে হঠাৎ। যেন কেমন করে সে হাসল, নিশ্বাস ফেলল।

সীতাংশুর অস্বস্তি লাগল।

'ব্রততীর অকালমৃত্যু নিয়ে তুই এসব বলছিস নিশ্চয়?'

'হ্যাঁ, তাই, শোন।' রণধীর সোজা হয়ে বসল। 'ঘটনাটা যে শুনবে সে তাই বলবে, যারা শুনেছে তারা তাই বলছিল। একুশ বছরের পরমায়ু নিয়ে ব্রততী এই পৃথিবীতে এসেছিল, তারপর তার নিয়তি তাকে এখান থেকে তুলে নিয়ে গেল।'

সীতাংশু কথা বলল না।

'আমি ডাক্তার, বিজ্ঞানের ছাত্র', রণধীর বলল, 'নিয়তি-টিয়তি আমি বিশ্বাস করব কেন। বলব ব্রততীর অসতর্কতা, তার ছেলেমানুষী তার এই শোচনীয় পরিণতি ডেকে নিয়ে এল। অথবা বলব, যেহেতু অত্যধিক রোমান্টিক মন নিয়ে সে সর্বদা বেঁচে থাকতে চেয়েছিল, শেষ পর্যন্ত তার মনের সেই রং সেই স্বপ্নই তাকে মৃত্যুর পথে টেনে নিয়ে গেছে।'

চোখ বড় করে সীতাংশু তাকিয়ে রইল। যেন শ্বাস ফেলতে ভুলে গেল সে।

রণধীর সময় দেখতে হাতের কব্জি তুলে চোখের সামনে ধরল। কিন্তু দেখা গেল সেখানে ঘড়ি নেই, ঘড়ি ফেলে এসেছে। নিজের এই ভুলের জন্য ডাক্তার অপ্রস্তুত হল না বা সীতাংশুকেও কিছু বলল না। একটা ছোট নিশ্বাস ফেলে হাতটা নামিয়ে রাখল।

'দশটা বেজে গেছে।' সীতাংশু বিড়বিড় করে সময় বলে দিল।

'হুঁ, রোমান্টিক মন, ব্রততীকে আমার চেয়ে কে আর বেশি চিনেছিল।' রণধীর আবার বলল, 'তোর এখান থেকে পরশু রাত্রে যখন রওনা হলাম, এত বড় একটা তামাটে রঙের চাঁদ উঠল শেষটায়, মনে আছে নিশ্চয়? একটু বেশি রাত করে ব্রততীকে নিয়ে আমি বেরিয়ে পড়লাম।'

'হুঁ, তারপর?' সীতাংশু বলল, 'কুয়াশাও খুব পড়ছিল তখন।'

'তাই তো!' রণধীর চোখ বড় করে চিবুকটা ঈষৎ নাড়ল। 'এদিকে কুয়াশা ওদিকে চাঁদের আলো, তা বলে রাস্তায় চলতে কিন্তু আমাদের মোটেই কষ্ট হচ্ছিল না, কুয়াশাটা যেন দূরে দূরে ছিল, চাঁদের আলোয় দুধের রং ধরেছিল চারদিক।'

'তারপর?' সীতাংশু ধৈর্য রাখতে পারছিল না। 'রাস্তার কোন্ খানটায় অ্যাকসিডেন্ট বাধিয়েছিলি?

'শোন শোন, বলছি।' রণধীর আবার দার্শনিকের মতন হাসল। 'আমি

ফোল্ডিং ৫০ গুলির পিস্তল

লাইসেন্সের প্রয়োজন নেই। আমেরিকান মডেল। চোর এবং বন্য জন্তুর হাত থেকে নিজেকে বাঁচান। পিকনিক, ভ্রমণ এবং নাটকের পক্ষে উপযোগী। ৫০ গুলীর ব্যবস্থা-সহ অটোমেটিক। হাল্কা ওজন এবং চোখ ধাঁধান আগুন আপনাকে বিপদ থেকে রক্ষা করবে।

মূল্য ৫০ গুলীসহ নং ৩৩ টাঃ ১৩·৫০। জার্মানি মডেল নং ৯৯ টাঃ ১৫·৫০। ভি, পি, পি, চার্জ টাঃ ২·৫০। চামড়ার কেস ৭৲ টাকা। অতিরিক্ত প্রতি একশত গুলী ৫৲ টাকা।

GEM ARTS (WBM—15)
P.B. 1325, Delhi—6.

অ্যাকসিডেণ্ট করি নি। আমি ঠিকই বাইক চালিয়ে যেতে পেরেছিলাম। তারপর সাঁকোর কাছে গিয়ে বাইক থেকে নেমে পড়লাম, ব্রততীকে নামিয়ে দিলাম।'

'ওখানটা হেঁটে পার হওয়া ছাড়া উপায় নেই।'

'হেঁটে আমরা সাঁকোর ওপর উঠলাম। আমি গাড়ি নিয়ে পেছনে হাটছিলাম, ব্রততী আগে আগে হাটছিল। সাঁকোর ওপর উঠে দুজন দাঁড়ালাম।'

'কেন।' সীতাংশু ভুরু কুঁচকোল।

'ব্রততী আর হাটছিল না, কাজেই আমাকে দাঁড়াতে হল। দৃশ্যটা সত্যি সুন্দর ছিল, গাছপালা দূরের বাড়িঘর কিছুই আর দেখা যাচ্ছিল না, আমাদের ডাইনে বাঁয়ে সামনে পেছনে, মনে হচ্ছিল, একটা দুধের সমুদ্র টলমল করছে, তামাটে রং কেটে গিয়ে একটা রুপোর ডেলা হয়ে চাঁদটা মাথার ওপর ঝুলছিল। আর আমাদের পায়ের তলায় সাঁকোর নিচের সেই দৃশ্য। মনে হচ্ছিল একটা ধোঁয়ার রঙের ধূসর নীল পর্দা পাতালের দিকে নেমে গেছে। কুয়াশা মেশানো খানিকটা খানিকটা জ্যোৎস্না কিছুদূর পর্যন্ত পৌঁছোতে পেরেছিল বলে খাদের ভেতরটা এমন চমৎকার দেখাচ্ছিল। এই জন্যই সাঁকোর নিচে অন্ধকার এত ভয়ঙ্কর লাগছিল না। বরং মিটমিট করে এখানে ওখানে জোনাকি উড়ছিল বলে অন্ধকারটাকে মনে হচ্ছিল সোনালি চুমকি বসান একটা রহস্যের নীল পর্দা। যেন পর্দাটা সরিয়ে দিলে আমরা আরো কত কী দেখতে পেতাম।'

এক দমে কথাগুলি বলে রণধীর একটা স্বাদ নিশ্বাস ফেলল। সীতাংশু মাথা নাড়ল।

'মনে হয় সেই রাত্রে সাঁকোর ওপর উঠে তুইও অতিমাত্রায় রোমান্টিক হয়ে উঠেছিলি।'

'তা একটু হয়েছিলাম', সীতাংশুর কুঁচকানো চোখের দিকে চেয়ে রণধীর ঘাড় নাড়ল। 'শীতের জ্যোৎস্না ও চাঁদের আলো আমার মনেও রং ধরিয়েছিল, কিন্তু কতটা ধরিয়েছিল, কতখানি রোমান্টিক হতে পারতাম আমি। ব্রততীর তুলনায় এই ব্যাপারে আমাকে শিশু বলতে পারিস। দৃশ্যটা আমার ভাল লেগেছিল —এই পর্যন্ত, কিন্তু ও কী করছিল, যেন পাগল হয়ে গেল সাঁকোর ওপর উঠে। বলছিল, এতকাল ভালবাসার সমুদ্রে আমরা সাঁতার কেটেছি, এখন মনে হচ্ছে ভালবাসার দ্বীপে পৌঁছে গেলাম দুজন।'

'তুলনাটা মন্দ দেয় নি, তারপর?' ভুরু দুটো তেমনি কুঁচকে রাখল সীতাংশু। 'এসব তোদের স্বামী-স্ত্রীর সেণ্টিমেণ্টের কথা, এসব আমায় শুনিয়ে কী হবে, আমি জিজ্ঞেস করছি তোকে—অ্যাকসিডেণ্ট কিভাবে হয়েছিল, কখন হল?'

'আহা, শোন, সব বলব।'

রণধীর চোখ বুজে মাথা ঝাঁকাল। 'হু, সেণ্টিমেণ্ট, তোকে শোনাব বলে বলছি না, বলছিলাম শীতের কুয়াশা ও জ্যোৎস্না আমার সহধর্মিণীকে কেমন আকুল করে তুলেছিল সেই রাত্রে, হঠাৎ আমার কানের কাছে মুখ এনে বলল, এখন তোমাকে কথাটা বলব, কদিন থেকে বলব বলব করছিলাম, কিন্তু কোথায় বললে জিনিসটা সব চেয়ে সুন্দর হয়, কখন বললে তোমার আমার দুজনেরই ভাল লাগবে ঠিক করতে পারছিলাম না।'

'তারপর? কিছু বলেছিল কি তোর কানে কানে?'

'হু, এবার তিনি মা হবেন।'

এক সেকেণ্ড স্তব্ধ হয়ে রইল সীতাংশু। তারপর একটা সিগারেট ধরিয়ে নিয়ে চাপা গলায় বলল, 'তা তোকে, এমন দামী কথাটা শোনাবার উপযুক্ত জায়গাই খুঁজে পেয়েছিল বটে তোর স্ত্রী, সময়টাও চমৎকার ছিল, তাই না?'

'আমার ঘড়িতে বারোটা বেজে গিয়েছিল তখন। নিশুতি রাত খাঁ খাঁ করছিল। ব্রততী আমার দু কাঁধে দুটো হাত তুলে দিয়ে বলছিল, কাজেই এখন বুঝে নাও, এতকাল ভালবাসার সমুদ্রে সাঁতার কেটে এখন আমরা বিশ্বাসের, বন্ধনের শক্ত মাটিতে এসে দাঁড়ালাম কিনা, সত্যিকার প্রেমের দ্বীপে পৌঁছে গেছি কিনা দুটিতে।' কথা শেষ করে রণধীর দাঁত ছড়িয়ে হাসতে লাগল।

সীতাংশু জ্বলে উঠল।

'এসব পারিবারিক কথা, তোদের স্বামী-স্ত্রীর জীবনের ভেতরের কথা, এখন এগুলো আমাকে না শোনালে কি তোর চলছিল না, আমি জানতে চাইছি কখন অ্যাকসিডেণ্ট হয়েছিল, কেমন করে ব্রততীর মাথায় চোট লাগল কলারবোন—'

'শোন শোন, ভয়ানক অধৈর্য হয়ে উঠেছিস তুই।' সীতাংশুর ডান হাতটা চেপে ধরল ডাক্তার। 'সাঁকোর ওপর উঠে ও যে কতটা ছেলেমানুষ হয়ে গিয়েছিল, না বললে তুই বুঝবি কেমন করে। দামী খবরটা আমার কানে তুলে দিয়ে ও গুন্‌গুন্ করে গান গাইতে লাগল। হাবভাব দেখে বুঝলাম ভেতরের অসহ্য সুখটা বেচারা কিছুতেই যেন ধরে রাখতে পারছে না। পাখনা মেলে দেওয়া পাখির মতন কাঁধের আঁচলটা ছড়িয়ে দিয়ে সাঁকোর কিনারে রেলিংটার ওপর ঝুঁকে দাঁড়াল।'

'তারপর।' সীতাংশু একটা চাপা নিশ্বাস ফেলল।

'বললাম, অত কিনারে যাবে না, বাঁশটা নরম হয়ে গেছে পুরনো হয়ে গেছে।'

চোখ দুটো ছোট করে ফেলল সীতাংশু।

'রেলিং-এর গায়ে ঝুঁকে কী দেখছিল ও?'

'বলল, দ্বীপে পৌঁছে এখন আবার সমুদ্রকে দেখছি সুখের মাটিতে দাঁড়িয়ে আমাদের এই ক'বছরের ভালবাসায় কত ঢেউ উঠেছিল পড়েছিল নতুন করে তার হিসাব নিচ্ছি। বলে খিলখিল করে হাসতে আরম্ভ করল।'

'পাগলের মতন কথা।' সীতাংশু বিড়বিড় করে উঠল। 'তারপর।'

'আর একটু ঝুঁকে দাঁড়াল সে। বললাম ওকি হচ্ছে? বলল, রুপোর চুমকি বসান নীল পর্দাটা দেখছি।'

'আশ্চর্য।' সীতাংশুর মুখের চামড়া সলা পাকিয়ে গেল। 'তবু তুই চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলি, ও যে খাদের ভেতরটা দেখতে চাইছিল।'

'তাই। মোটরবাইকটা আমার হাতে ধরা। চেঁচিয়ে বললাম, এভাবে ঝুঁকতে আরম্ভ করলে—একটা বিপদ ঘটিয়ে তুমি ছাড়বে দেখছি।'

'কি বলল তার উত্তরে?'

'বলল, তুমি কাছে থাকতে আমার কোনো বিপদ নেই। বলল, সুখের দ্বীপে দাঁড়িয়ে আমরা আমাদের ভালবাসার গভীরতা দেখছি, পরস্পরকে এতদিন কত ভালবেসেছি আজ এই সাঁকোর ওপর দাঁড়িয়ে তা বুঝতে পারছি।'

'কী বিচ্ছিরি আদিখ্যেতা।' নাকের ডগাটা কুঁচকে উঠল সীতাংশুর। 'যেন এর আগে পৃথিবীতে কোনো মেয়ে কোনো স্ত্রী মা হয় নি, তারপর?'

'আমি বুঝতে পারছিলাম, আনন্দে ও দিশেহারা হয়ে গেছে, কোথায় দাঁড়াচ্ছে কতটা ঝুঁকছে খেয়াল নেই। গাড়িটা দাঁড় করিয়ে রেখে পেছন থেকে ওর হাত টেনে ধরব কিনা তখনি ভাবতে আরম্ভ করলাম—'

'ও, তখনো তুই ভাবছিলি', যেন একটা বিদ্রূপের হাসি সীতাংশুর গলার ভিতর মোচড় দিয়ে উঠল। 'তারপর?'

'হঠাৎ একটা শব্দ করে রেলিং-এর বাঁশটা ভেঙে গেল, আর সঙ্গে সঙ্গে অন্ধকার খাদের ভেতর—'

'চুপ কর, থাম রাস্কেল—' সীতাংশু গর্জন করে উঠল। রণধীর দু হাতে মুখ ঢাকল।

সীতাংশু অন্যদিকে মুখটা ফিরিয়ে নিল।

[ক্রমশঃ]

সালতামামির পটে

কংগ্রেস ও যুক্তফ্রন্টের ইমেজ

মনোজ হালদার

আরও একটা বছর চলে গেল। ফেব্রুয়ারী থেকে ফেব্রুয়ারী। গত বছর এই সময়েই ইতিহাস রচনা হয়েছিল। সে ইতিহাস ছিল যেমনি বহু ঈপ্সিত তেমনি ছিল হঠাৎ আলোর ঝলকানিতে আচমকা। আজ থেকে গত চতুর্থ সাধারণ নির্বাচনের উদ্যোগপর্বে ফিরে গেলে যে ঘটনাগুলি চোখে পড়বে সেগুলি একটি একটি করে হিসাব করে দেখলে দেখা যাবে—পরবর্তী সময়ে যা ঘটল, তা ঘটা যদিও স্বাভাবিক ছিল কিন্তু প্রস্তুতি বা বিশ্বাসের রীতিমত অভাব ছিল। বলা বাহুল্য প্রসঙ্গটি উত্থাপন করা হচ্ছে গত নির্বাচনে কংগ্রেসের পরাজয় ও যুক্তফ্রন্ট সরকারের আবির্ভাব সম্পর্কে।

নির্বাচনের পূর্বে কেউ কি মনে করেছিলেন যে পশ্চিমবাংলায় একটা বিকল্প সরকার গঠিত হবে? সর্বজনগ্রাহ্য যে স্লোগানটি তখন শোনা গিয়েছিল তা হচ্ছে কংগ্রেসের শক্তি খর্ব করতে হবে। পুরোপুরি বিকল্প সরকারের কথা চিন্তার মধ্যেই আসে নি। না আসার কারণ সম্পর্কে অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে : অনৈক্যই তার বড় কারণ। অনৈক্যের জমি কখনো শক্ত হতে পারে না এবং সেই জমিতে কস্মিনকালেও ভবিষ্যৎ সৌধ নির্মাণের বনিয়াদ খোঁড়া যায় না। অবশ্য এখানে বলে রাখা দরকার—এই অনৈক্যের কথাও যেমন সত্য তেমনি ঐক্য যে হয়েছিল সেকথাও সত্য। কথাটা পরস্পর-বিরোধী সন্দেহ নেই। তাই পরিষ্কারভাবে বলতে গেলে বলতে হয় সার্বিক ঐক্য হয় নি। সার্বিক ঐক্য না হওয়া অর্থে পরিপূর্ণ ঐক্যের অনুপস্থিতি এবং তা আংশিক হতে বাধ্য। ঐক্যের আংশিক বাস্তবতা অনৈক্যের সংজ্ঞাকেই সমর্থন করে।

তাই ঠিক নির্বাচনের পূর্বে দেখা গেল—মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টি, আর-এস-পি, আর-সি-পি-আই, এস-ইউ-সি, এস-এস-পি, ওয়ার্কার্স পার্টি, মার্ক্সবাদী ফরোয়ার্ড ব্লক প্রভৃতি বামপন্থী দলগুলি মিলে একটি ফ্রন্ট গঠন করলেন। এই ফ্রন্টের নাম হ'ল ইউ-এল-এফ। আরেকটি ফ্রন্ট গঠন করলেন কমিউনিস্ট পার্টি (দক্ষিণ), বাংলা কংগ্রেস, ফরোয়ার্ড ব্লক প্রভৃতি মিলে এবং সে ফ্রন্টের নাম হল পি-ইউ-এল-এফ। পি-এস-পি ছিলেন এই দুই ফ্রন্টেরই বাইরে। এ থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় কংগ্রেসবিরোধী শক্তি মোটামুটি দুই ফ্রন্টে বিভক্ত হয়ে গেলেন। এর ফল দাঁড়ালো এই যে, ত্রিমুখী সংগ্রামে কংগ্রেসেরই সুবিধা হবে বেশি, এই চিন্তাধারা দেশময় ছড়িয়ে পড়ল। অবশ্য এ সম্বন্ধে প্রশ্ন আছে। সর্বক্ষেত্রেই ত্রিমুখী সংগ্রামে যে শাসকদলের সুবিধা হয়, তা নয়। কিন্তু সে যাই হোক আপাতদৃষ্টিতে সার্বিক ঐক্য না হওয়ার ফলে তিনটি জিনিস ঘটল। সে তিনটি হচ্ছে এই—(১) সার্বিক ঐক্য না হওয়ার দরুণ সমস্ত কংগ্রেসবিরোধী বামপন্থী দলগুলির ভরসা বাড়ল না (২) বিকল্প সরকারের স্লোগান বেরিয়ে এল না এবং (৩) নির্বাচকমণ্ডলীর মধ্যে হতাশার ছায়া নেমে এল।

কিন্তু এসব সত্ত্বেও যে মোদ্দা কথাটি উভয় ফ্রন্ট থেকেই বেরিয়ে এল সেটি হল—কংগ্রেসের ক্ষমতা খর্ব করা। কংগ্রেসের ক্ষমতা খর্ব করার দিকে তখন সমগ্র নির্বাচকমণ্ডলীর দৃষ্টি নিবদ্ধ—যদিও নির্বাচনের উদ্যোগপর্বের গোড়ার দিকটায় মানুষের মনে হতাশা বিদ্যমান ছিল।

কিন্তু এই হতাশা শেষ পর্যন্ত স্থায়ী রূপ নেয় নি। তবে সেকথা বোঝাও যায় নি। এখানেও যা ঘটেছে তা রাজনীতির ছাত্রদের চিরকাল স্মরণে রাখবার মত। অনেককেই বলতে শোনা গেছে এবার নির্বাচকমণ্ডলীর মনের কথা কেউই বুঝতে পারছেন না। একজন নির্বাচন-বিশেষজ্ঞ অফিসারের সঙ্গে আলোচনাকালে তিনিও একথা না বলে পারেন নি। বাস্তবিকপক্ষে ব্যাপারটা অক্ষরে অক্ষরে সত্য। একটা লক্ষণ শুধু দেখতে পাওয়া গিয়েছিল, সে হচ্ছে বিভিন্ন ফ্রন্ট, এমন কি শাসকদলের নির্বাচনী সভাগুলিতে প্রচণ্ড জনসমাগম। এতেকরে নির্বাচকমণ্ডলী যেন বলতে চাইছিলেন : "আমরা তিন-তিনটি সাধারণ নির্বাচনে ভোট দিয়েছি। তোমরা আমাদের বোকা ভেব না। আমাদের অভিজ্ঞতা হয়েছে। সেই অভিজ্ঞতার আলোকে ভেবেচিন্তে আমরা যা ঠিক করব, তাই হবে। তোমাদের কথায় আমরা ভুলব না।" অবশ্য এটুকুও তখন কোন রাজনৈতিক নেতা ধরতে পেরেছিলেন বলে মনে হয় না। পরে ঘটনাটা বুঝতে পারা গেছে বলেই একথা তখনকার সম্বন্ধে আজ লেখা যাচ্ছে। আশা-আকাঙ্ক্ষায় ভরা জনমন যা চেয়েছিলেন বিরোধী শক্তিগুলির কাছ থেকে তা' তাঁরা পান নি : তাই প্রথম অনৈক্যজনিত আঘাতে কিছুটা হতাশ হলেও দায়িত্বটা তুলে নিয়েছিলেন তাঁরা নিজহাতে কিন্তু অতীব সন্তর্পণে!

কি করে জনমনে এ জোয়ার এল

কিন্তু নির্বাচকমণ্ডলী এই উদ্যোগ (initiative) নেবার প্রেরণা পেলেন কোথা থেকে? বিরাট একটা দেশের ততোধিক বিরাট জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের অভিজ্ঞতা এবং দীর্ঘকালের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের শিক্ষা তাঁদের মনে উপ্ত হয়েছিল একথা অস্বীকার করা যায় না। সরকার থেকে দীর্ঘ একটানা বিশ বছর ধরে কংগ্রেস দেশের শাসনভার চালিয়ে এসেছে। তার মধ্যে তিনটি পরিকল্পনা কার্যকরী হয়েছে। অনেক সমাজতান্ত্রিক ধাঁচ, অনেক সমাজতন্ত্র, মিশ্র অর্থনীতি, শিল্পায়ন আর খাদ্যে স্বয়ং সম্পূর্ণতার কথা বলা হয়েছে—জাতীয় আয় বৃদ্ধির বাস্তবচিত্রও অঙ্কিত হয়েছে কিন্তু সাধারণ মানুষ তার অভিজ্ঞতায় যা পেয়েছে সে হচ্ছে 'ধনী আরও ধনী হয়েছে—গরীব হয়েছে আরও গরীব।' কথার সংগে কাজের পার্থক্য না থাকলে কখনও এমনটা হয় না। এই রাজনীতিটুকু ধরতে সাধারণ মানুষের বিশেষ অসুবিধা হয় নি। এইখানে ছিল জমি তৈরি।

দ্বিতীয়ত, যে জিনিসটা এই তৈরি জমিতে ফসল ফলিয়েছে সেটা স্বাধীনোত্তর বছরগুলিতে স্থানীয় দাবি-দাওয়ার ভিত্তিতে ক্রমাগত আন্দোলন। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হিসাবে নাম করা যেতে পারে (১) ১৯৫২ সাল থেকে প্রতিটি সাধারণ নির্বাচনে কোন না কোনরকমের ঐক্য (২) ১৯৫৩ সালে এক পয়সা ট্রাম-ভাড়া বৃদ্ধির বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন (৩) উপর্যুপরি বোনাস, এবং খাদ্যের দাবিতে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম (৪) বঙ্গ-বিহার সংযুক্তিকরণ বিরোধী আন্দোলনে ঐক্যবদ্ধভাবে ঝাঁপিয়ে পড়া (৫) পরিশেষে ভারতরক্ষা আইনের অপপ্রয়োগে শ্বাসরোধকারী

অবস্থার প্রাক্কালে বামপন্থী রাজনৈতিক দলগুলির বাইরেও দেশের বুদ্ধিজীবী, আইনবিদ ও গণতন্ত্রকামী সকল মানুষের জমাট ঐক্য। এগুলি সবই তলে তলে নির্বাচনোত্তর পরিস্থিতিতে রূপায়িত করতে অপরিমেয় সাহায্য করেছে। অর্থাৎ বামপন্থী দলগুলিরে ঐক্যস্থাপন করতে পারে নি, বামপন্থী দলগুলির কাছ থেকে শিখে দেশের জনগণই সে শিক্ষাকে কার্যকরী করেছে।

এক কথায় বলতে গেলে বলা যায় বামপন্থী ফ্রণ্ট দু'টির মধ্যে দলগুলির দলীয় 'ইলেকশন ম্যানিফেস্টো' বা ফ্রণ্টাল ম্যানিফেস্টো নিয়ে যখন এবং একে অপরকে নিজের চশমার রঙে দেখার আগ্রহে আচ্ছন্ন-দৃষ্টির পরিচয় দিচ্ছেন, নির্বাচকমণ্ডলী তখন একটি ম্যানিফেস্টোকেই রূপায়িত করতে নীরব-ব্যস্ততায় গুরু-গম্ভীর। সে গাম্ভীর্যের মধ্যে থেকে উৎসারিত হয়ে আসছে একটি কথা—"They must be driven out of the office" অর্থাৎ কংগ্রেসকে গদিচ্যুত করো।

॥ দুই ॥

কংগ্রেস সত্যিই গদিচ্যুত হল। বিস্ময়ে শুধু পশ্চিমবাংলার মানুষ নয়—সারা ভারত এমন কি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশও অভিভূত হয়ে গেল। বৃটিশ ও বিদেশী পুঁজির ঘাঁটি কলকাতা তথা বাংলা দেশ, এখানে মানুষের মনে ছিল এত পুঞ্জীভূত ক্ষোভ। বজ্রকঠিন এমন দৃঢ়তা লুকোনো ছিল মানুষের বুকে। কেউ কেউ বললেন ব্যালট বক্সের মধ্যে নীরব বিপ্লব হয়ে গেলো যেন! কেউ কেউ আবার বললেন, এটাই স্বাভাবিক ছিল।

বিরোধী রাজনৈতিক পার্টিগুলি চেয়েছিলেন শাসকদের ক্ষমতা খর্ব করতে কিন্তু পরিবর্তে হল তার চেয়েও অধিকন্তু। তাই যারা দ্বিধাবিভক্ত ফ্রন্ট-গুলির মধ্যে থেকে নির্বাচন সংগ্রাম পরিচালনা করছিলেন তাঁরা প্রথম বিস্ময়ের ঘোর কাটিয়েই নিজেদের বাস্তব-অবস্থার সঠিক মূল্যায়ন যে ইতিপূর্বে হয় নি তা' বুঝতে পারলেন এবং বামপন্থী দল-গুলি লেনিনের সেই চিরসত্য বাণী 'learn from the people অর্থাৎ 'জনগণের কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করো' নীতিকে কার্যকরী করতে এগিয়ে এলেন। ১৮ই ফেব্রুয়ারী নির্বাচনপর্ব অনুষ্ঠিত হয়েছিল। ফলাফল বেরিয়েছিল ২৩শে তারিখের মধ্যে। একদিন আগেই বোঝা গিয়েছিল দলগত অবস্থানে কংগ্রেসের স্থান কোথায়। একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসাবে কংগ্রেস যদিও সাফল্যলাভ করতে পেরে-ছিল কিন্তু নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে সে এবার ব্যর্থ হয়েছে। অপরদিকে দুই ফ্রণ্টের মিলিত অবস্থান এইরকম ছিল :—

সি-পি-আই (এম)—	৪৪
বাংলা কংগ্রেস—	৩৪
সি-পি-আই—	১৬
ফরোয়ার্ড ব্লক—	১৩
ঐ (মাঃ)—	১
এস-এস-পি—	৭
পি-এস-পি—	৭
লোকসেবক সঙ্ঘ—	৫
আর-এস-পি—	৬
এস-ইউ-সি—	৪
ওয়ার্কার্স পার্টি—	২
স্বতন্ত্র (প্রগ্রেসিভ)—	৩
স্বতন্ত্র	৪
	১৪৯

এ ছাড়াও ছিলেন গোর্খালীগের ২ জন, জনসঙ্ঘের ১ জন এবং স্বতন্ত্র পার্টির ১ জন

মোট ১৫৩

দু'শো আশি জনের বিধানসভায় নিঃসন্দেহে এই সংখ্যা গরিষ্ঠতার দাবি রাখে এবং কংগ্রেসের ১২৭ জন সদস্যের চেয়ে সংখ্যা অনেক বেশি।

দুই ফ্রন্টের মধ্যেকার দলগুলির এই অবস্থানটুকু প্রতিভাত হতেই সমগ্র দেশ-ব্যাপী এক অভূতপূর্ব আলোড়ন সৃষ্টি হয়ে গেল। মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্ল সেনকে পরাস্ত করে শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায় যখন বিজয়ীর বেশে কলকাতা এলেন—তখন সুদীর্ঘ মিছিলে তাঁকে যে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়েছিল স্বর্গত নেহরুর জন্যও এমন সম্বর্ধনা কলকাতায় কখনো অনুষ্ঠিত হয় নি। এর থেকে মানুষের তখনকার মেজাজ অনুমেয়। বিভিন্ন দলের নেতারা তখন ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে পরস্পরের সঙ্গে কথাবার্তা চালাতে সুরু করলেন। ভুলে গেলেন ক'দিন আগে তাঁরা যে পরস্পরের সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধে সামিল ছিলেন। বাস্তব অবস্থা তাঁদের ভুল ভেঙে দিয়ে মিলিত হবার সুযোগ এনে দিয়েছে। কাজেই চুপ করে বসে থাকা তাঁদের সাজে না।

উপর্যুপরি কয়েকটি বৈঠক হল বিভিন্ন দলনেতাদের। একটা খসড়া কর্মসূচীও তৈরি হল। এটিই সেই বিখ্যাত কিন্তু আদৌ ভারিক্কে নয়—আঠারো দফা কর্মসূচী বলে পরিচিত। সাংবিধানিক সীমাবদ্ধতার মধ্যে জনগণের যতটুকু কল্যাণ করা যায় তারই বিনম্র অঙ্গীকার মাত্র। ভারত মহাসভা হলে, বিভিন্ন দলের এম-এল-এ'রা এসে অনুমোদন করলেন এই কর্মসূচী। রাজ্যপাল পদে তখন শ্রীমতী পদ্মজা নাইডু। তিনি তখন একে একে বিভিন্ন দলনেতাদের সঙ্গে দেখা করে ভবিষ্যৎ মন্ত্রিসভা কোন দল গঠন করতে পারবেন, তারি বোধহয় হিসাব নিচ্ছিলেন। কিন্তু এতে সময় অতি বাহিত হয়ে যাচ্ছিলো অথচ কাজের কাজ কিছু হচ্ছিল না। তাছাড়া এর প্রয়ো-জনীয়তাই বা কি ছিল তখন? ইউ-এল-এফ এবং পি-ইউ-এল-এফ দুটি ফ্রন্টে বিভক্ত হয়ে নির্বাচন অভিযান চালিয়েছিল ঠিকই কিন্তু তাই বলে কি যে সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে নির্বাচনোত্তর ঘটনাবলীর মাধ্যমে বিকল্প সরকার গঠনের, সে সম্ভাবনা কি অনৈক্যের আবর্তে আর কখনো তলিয়ে যেতে পারে? সেদিন সে আশা যদি কেউ করে থাকেন তবে তাঁর সে আশাকে অবাস্তব বলতে হবে। ১৪৯ জন এম-এল-এ সেদিন সই করে রাজ্য-পালকে জানিয়ে দিলেন যে তাঁরা সরকার গঠন করতে সক্ষম। আগেই দলনেতাদের মধ্যে স্থির হয়েছিল দলপতি হবেন কে। শ্রীহুমায়ুন কবির সেদিন ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষকে দলপতি করতে চান এবং এ সম্বন্ধে তিনি প্রেসের কাছে মন্তব্যও করেন। কিন্তু অজয়বাবু সর্বদলগ্রাহ্য হওয়ায় তাঁকেই দলপতি করা হয় এবং এই সম্মিলিত দলের নামকরণ হয় যুক্তফ্রন্ট।

আঠারো দফা কর্মসূচীর ভিত্তিতে চৌদ্দটি দলের সম্মিলিত ব্যক্তির সমন্বয়ে নবগঠিত যুক্তফ্রন্ট অজয়বাবুর মুখ্যমন্ত্রিত্বে মন্ত্রিসভা গঠন করবে, সারা দেশ যেন আনন্দোচ্ছ্বাসে ফেটে পড়ল। এতদিন যে ঐক্য সংগঠিত হয় নি, এতদিন যে স্বপ্ন রূপায়িত হয় নি, পশ্চিমবাংলার জনগণের ঐকান্তিক আগ্রহে এবং তাঁদের সুস্পষ্ট রায়ে এবার তা সম্ভব হল। তাই সেদিন জনতা ও যুক্তফ্রন্ট একাকার হয়ে গেল—যুক্তফ্রন্ট হল জনগণের যুক্তফ্রন্ট। তার প্রকাশ দেখা গেল ২রা মার্চ ময়দানের সভায়। অফুরন্ত জনস্রোত আসছে তো আসছেই। জনতা, দল ও নেতা সবাই এক-সূত্রে বাঁধা। সেদিন ময়দানে ঘোষণা করা হল কর্মসূচী, ঘোষণা করা হল নতুন মন্ত্রিসভা গঠনের কথা।

পরদিন ৩রা মার্চ রাজভবনে শপথ নিলেন অজয়বাবুর নেতৃত্বে সর্বশ্রী জ্যোতি বসু, সোমনাথ লাহিড়ী, হেমন্ত বসু, ডঃ প্রফুল্ল ঘোষ। রাজভবন থেকে রাইটার্স বিল্ডিংস পর্যন্ত সেদিন লোকে লোকারণ্য। আকাশ-বাতাস মুখরিত করে নতুন যুক্তফ্রন্ট-সরকারের জয়ধ্বনি। এ সরকার জন-সাধারণের নিজের সরকার। জনতার চোখে আনন্দাশ্রু, নেতৃবৃন্দের চোখেও

তাই। দেশ স্বাধীন হয়েছে ১৯৪৭ সালে। সেদিনের কথাও লোকে ভোলে নি। কিন্তু সে আনন্দ আর উচ্ছ্বাসের চেয়ে ৩রা মার্চের আনন্দোচ্ছ্বাস আরও অনেক বেশি এবং নতুনও বটে। ১৯৪৭ সালে ছিল বেদনামিশ্রিত আনন্দ—দেশবিভাগের যন্ত্রণাটা সদ্য সদ্য বলে লোকে ভুলতে পারে নি। কিন্তু ১৯৬৭ সালের ৩রা মার্চ একটি মাত্রই আনন্দের বিষয়বস্তু দেশের কাছে : দেশে জনতার দ্বারা জনতার সরকার হয়েছে। অন্তত লোকে নিজহাতে এই সরকারকে সৃষ্টি করেছে।

এই আনন্দোচ্ছ্বাসের আরও অভিব্যক্তি দেখা গেল ৮ই মার্চ বিধানসভা বসলে। স্বাধীন ভারতবর্ষের কোন বিধানসভায় এ দৃশ্য আর কখনো দেখা যায় নি। বিশ বছর একটানা ১৪৪ ধারার রাহুগ্রাসে বিধানসভা যেন নির্জীব হয়ে পড়েছিল, হঠাৎ রাহুমুক্ত হয়ে 'শেকল ছেঁড়া আফ্রিকার মত' উদয়দিগন্তে সে আবির্ভূত হল। ১৪৪ ধারা আর নেই। হাজার হাজার দর্শকের ভিড় বিধানসভা চত্বরে। বিধানসভার খুলে গেছে সমস্ত কক্ষদ্বার। কৌতূহলী উদ্বেলিত জনতা অনুভব করছেন এ তাঁদের নিজেদের বিধানসভা। শ্রীমতী পদ্মজা নাইডু আসছেন তাঁর উদ্বোধনী ভাষণ দিতে। সুশৃঙ্খল জনতা হাতে হাত দিয়ে বেষ্টনী রচনার মাধ্যমে পথ করে দিচ্ছেন তাঁকে। ধ্বনি উঠছে যুক্তফ্রন্ট সরকারের জয়ধ্বনি—রাজ্যপাল পদ্মজা নাইডুর জয়ধ্বনি। অশ্রুধারায় উজ্জ্বল হয়ে উঠছে তাঁর চোখ দুটি। করজোড়ে তিনি অভিনন্দন গ্রহণ করছেন উত্তাল অথচ সুশৃঙ্খল জনতার। জীবনে এমন অভিনন্দন তিনি কখনো পান নি। তখন কে জানত আরেক বছর পরে আরেকজন রাজ্যপালকে ঠিক এর বিপরীত পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হবে। জনগণের বিরোধী শক্তির বিয়োগান্ত অধ্যায় হয় তো এমনিভাবেই অভিনীত হয়।

॥ তিন ॥

এবার আমরা একবার ফিরে যাই কংগ্রেস শিবিরে। দেখা যাক সেখানের প্রতিক্রিয়াটা কি। চতুর্থ সাধারণ নির্বাচনে শুধু যে পশ্চিমবাংলায় কংগ্রেস নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে পারে নি তা নয়—এমনিতরো আট-আটটা প্রদেশে সে ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। তাছাড়া এবার লোকসভাতেও কংগ্রেসের শক্তি অনেক কমে যায়।

এই ঘটনা একদিকে যেমন কংগ্রেসের শক্তি হ্রাসের প্রমাণ তেমনি আরেকদিকে গণতন্ত্রকামী শক্তির বিরাট অভ্যুদয়। স্বাধীনতালাভের পর ভারতবাসী গণতন্ত্রের পরীক্ষায় সাবালকত্ব প্রমাণ করতে চায়। ইংরেজের বহু উচ্চারিত উক্তি, ভারতবাসী স্বদেশের শাসন পরিচালনা করার দিক থেকে যোগ্য নয়—এই কলঙ্ককর প্রচারকে সে চিরদিনের মত মুছে দিতে চায়। তাই বোধ করি এরই প্রতিধ্বনি শোনা গিয়েছিল ভারতের সর্বোচ্চ বিচারালয়ের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি শ্রীগজেন্দ্র গদকরের কণ্ঠে। তিনি বলেছিলেন—'এবারের নির্বাচন ভারতের গণতান্ত্রিক চেতনার প্রকাশ।' প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরাও বাধ্য হয়ে বলেছিলেন—'চতুর্থ সাধারণ নির্বাচন গণতান্ত্রিক চেতনার এক উজ্জ্বল স্বাক্ষর।' এই সমস্ত তথ্যগুলি মিলিয়ে যে বিষয়টি মূর্ত হয়ে ওঠে সেটি হল গণতন্ত্রের একটি মূলকথা। অর্থাৎ রাষ্ট্র থাকবে কিন্তু শাসকদল পরিবর্তনীয় এবং সুশাসনের আশায় তাকে মেনে নিতে হবে।

কিন্তু তবুও এবারের নির্বাচন কংগ্রেসের কাছে একটা প্রচণ্ড শক্ বলেই অনুভূত হল। কারণ কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ কখনই আশা করেন নি, আট-আটটা প্রদেশ তাঁদের হাতছাড়া হয়ে যাবে। তাছাড়া তাঁরা এও আশা করেন নি— আশ্চর্য-দাওয়াই কামরাজ-পরিকল্পনার রচয়িতা স্বয়ং কংগ্রেস সভাপতি কামরাজ, ইলেকশন বিশারদ (যিনি একদা অন্ধ্রের নির্বাচন পরিচালনায় দক্ষতা দেখিয়েছিলেন) দুর্ধর্ষ পাতিল সাহেব কিম্বা পশ্চিমবাংলার লৌহমানব অতুল্যবাবু এবং তাঁর আজীবন গুরুস্থানীয় সহকর্মী মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন ভোটযুদ্ধে পরাজিত হবেন। অথচ এটাই বাস্তবে ঘটে গেল। বাংলাদেশে এটা যেন একটা 'নোবল রিট্যালিয়শনের' মত প্রতিভাত হল। যে অতুল্যবাবু-প্রফুল্লবাবুরা অজয় মুখার্জীকে কংগ্রেস থেকে বিদায় দিয়েছিলেন—বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ যেন অজয়বাবুদের পিছনে দাঁড়িয়ে গিয়ে সেই অতুল্যবাবু-প্রফুল্লবাবুদের রাইটার্স বিল্ডিংস থেকে পর্যন্ত বিদায় করে দিলেন। এ ঘটনা কল্পনাতীত ছিল কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের কাছে।

তাই সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে কংগ্রেস নেতারা এবারের পরাজয়কে যেখানে অন্তত মুখেও মেনে নিয়েছিলেন সেখানে পশ্চিমবাংলার নেতারা বোধকরি সেটুকুও পারলেন না। সেজন্য যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠিত হওয়ার আদিপর্বে তাঁরা 'বিরোধী দল হিসাবে কাজ করবেন' বলে ফেলেও, কথাটা চৌরঙ্গীভবনের চৌকাঠ অতিক্রম করেছেন কি না করেছেন এমন সময়ে আবার বলে উঠলেন, 'ছ' মাসের মধ্যে আমরা ক্ষমতায় ফিরে আসব।' এর থেকে সহজেই পশ্চিমবাংলার কংগ্রেস শিবিরের প্রতিক্রিয়াটা অনুমান করা যায়।

'ছ' মাসের মধ্যে কংগ্রেস আবার ক্ষমতায় ফিরে আসবে : পশ্চিমবাংলার মানুষ সচকিত হয়ে উঠলেন। তাঁদের সামনে ছিল কেরালার অভিজ্ঞতা, সমকালীন রাজস্থানের ঘটনাবলী। মুখে 'গণতন্ত্রের উজ্জ্বল স্বাক্ষর' কিম্বা 'বিরোধী দল হিসাবে কাজ করব' এসব কথা বললেও আসলে পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেস ক্ষমতা না পেলে থাকতে পারবে না এবং যেমন করে হোক্ ক্ষমতা তার চাই-ই চাই। এখানকার কংগ্রেসের কাছে দেশ বড় নয়, তার নিজের প্রতিশ্রুতি বড় নয়, গণতন্ত্রের যে বিপুল পরীক্ষা চলছে তাও বড় নয়—বড় শুধু ক্ষমতা এই মনোভাব নগ্নভাবে প্রকাশ হয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে—নির্বাচনে পরাজয়ের মাধ্যমে কংগ্রেসের যে ক্ষতি হয় নি, সেই ক্ষতি এবার সুরু হ'ল। গণতন্ত্রের নিয়মে দল আসবে যাবে—কংগ্রেস পরাজিত হয়েছে কি হয়েছে তাতে, পরের বার যুক্তফ্রন্টও পরাজিত হতে পারে। আবার হয়ত কংগ্রেসই ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হতে পারে। এবং দেশের জনগণ তো সেইটাই দেখতে চায়। কিন্তু ক্ষমতালিপ্সা প্রকট হয়ে পড়ায় এই সর্বপ্রথম কংগ্রেসের 'ইমেজ' দেশের গণতন্ত্রকামী মানুষের কাছে জিজ্ঞাসু মনোভাবের সৃষ্টি করে দিলো। যুক্তফ্রন্ট সরকার তখন সবেমাত্র গঠিত হয়েছে। চোদ্দটা দল জনসাধারণের আশা-আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে এক হয়ে গিয়ে সরকার গঠন করেছে। তাই সে সরকার ও জনসাধারণ একাকার হয়ে গেছে। নিজের সরকার মনে করে তাই সাধারণ মানুষ কংগ্রেসকে রীতিমত সন্দেহের চোখে দেখতে সুরু করল। বহু সংগ্রামের জাতীয় যোদ্ধা এবং অপরিমেয় ঐশ্বর্য ঐতিহ্যমণ্ডিত কংগ্রেস গোটা একটা প্রদেশের সাধারণ মানুষের চোখে নিজের মর্যাদাকে প্রশ্নের অবকাশ দিয়ে বসলেন।

এই ঘটনার পর কংগ্রেস নেতৃত্বের সাবধান হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু সেদিক দিয়ে কোন কিছু দেখা গেল না—না প্রাদেশিক নেতৃত্ব না কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের পক্ষ থেকে। অবশ্য কেন্দ্রীয় নেতৃত্বই বা কি করবেন? সেখানে তখন শ্রীমতী গান্ধী ও শ্রীমোরারজীর পাঞ্জা কষাকষি সবে মাত্র শেষ হয়েছে। শ্রীকামরাজের গৌরব-দীপ্ত রাজনৈতিক জীবনের সূর্য ঢলে পড়েছে পশ্চিমাকাশে। ভারতের সর্ববৃহৎ রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হয়ে উঠেছে মুষ্টিমেয় কয়েকটি নেতার সমষ্টি—আত্মানুসন্ধান, আত্মসমালোচনা বা পর্যালোচনার ব্যাপক কোন আয়োজন বা প্রয়োজন তাঁদের নেই। কাজেই কেন্দ্র কি সাবধানবাণী উচ্চারণ করবেন পশ্চিমবাংলার সহকর্মীদের প্রতি! বরং পশ্চিমবাংলার বন্ধুরা যে পথে যাচ্ছেন দেখুন না তাঁরা সেই পথ অনুসরণ করে। তার অনুকূলে সমর্থনের

জন্য কোন অসুবিধাও ছিল না কারণ অতুল্যবাবু তখন ইন্দ্রপ্রস্থে বানপ্রস্থ অবলম্বন করে নির্বিঘ্নচিত্তে ধ্যানমগ্ন। তাঁর সে সাধনা কি বৃথা যাবে?

তবু ওরি মধ্যে শ্রীজগন্নাথ কোলে প্রমুখ কিছু কিছু কংগ্রেস নেতারা পরিষদীয় গণতন্ত্রের মধ্যে থেকেই যুক্তফ্রন্ট সরকারের সঙ্গে মোকাবিলা করবার কথা ভাবছিলেন। কিন্তু বেশ বোঝা গেল তাঁদের পথে অন্তরায় প্রধানত দুটি: একটি হল পরিষদীয় রণাঙ্গনে ব্যূহ রচনা করতে গিয়ে যাঁদের সামনে দাঁড় করানো হল তাঁরা এবং অপরটি হল রাজনৈতিক তত্ত্বের সংজ্ঞাধীন নয় এমন ধরণের extra-parliamentary activities-এর প্রবণতা।

বিধানসভায় বিরোধী দলের ভূমিকায় কংগ্রেস

বিধানসভায় বিরোধী দল হিসাবে কংগ্রেসের ভূমিকা কিরকম ছিল একটু হিসাব করে দেখা যাক। পরিষদীয় রীতি-নীতি অনুযায়ী বিধানসভায় বিরোধী দলের কতকগুলি সুবিধা আছে। তাঁরা সময় বেশি পাবেন। যে কোন বিতর্ক তাঁরাই উদ্বোধন করতে পারবেন। বিধানসভার অধ্যক্ষ তাঁদের অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখবেন। এগুলি সুষ্ঠুভাবে কাজে লাগাতে পারলে পরিষদীয় কার্যক্রমের মধ্যে দিয়ে দেশবাসীর কাছে পৌঁছনো খুব প্রত্যক্ষ হয়ে উঠতে পারে এবং সঙ্গে সঙ্গে শাসকদলকে বে-কায়দায় ফেলে দেয়া যেতে পারে।

কিন্তু কংগ্রেস কি এগুলি ঠিক ঠিক-ভাবে কাজে লাগাতে পারলেন? ৩রা মার্চ যুক্তফ্রন্ট সরকারের মন্ত্রীরা প্রথম দল শপথ গ্রহণ করেন। ৮ই মার্চ বিধান-সভার অধিবেশন বসে। মাত্র পাঁচদিনের মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে কংগ্রেস দল অভিযোগ আনলেন, দেশে আইন ও শৃঙ্খলা ভেঙে পড়েছে। কংগ্রেস পরিষদ দলের নেতা শ্রীখগেন দাশগুপ্তের মত অত্যন্ত পুরনো বিধানসভা সদস্য এর সমর্থনে একটা টেলিগ্রাম পর্যন্ত পড়ে বসলেন।

তারপর কংগ্রেসের মুখপাত্ররূপে যাঁরা বক্তব্য উপস্থাপিত করলেন, তাঁদের মধ্যে শ্রীপ্রতাপ চন্দ্র ও শ্রীসিদ্ধার্থ রায় প্রধান। বিধানসভার গত দশ-পনেরো বছরের ইতিহাসে সকলেই লক্ষ্য করেছেন: এঁদের দুজনের বক্তৃতায় যথেষ্ট জোর থাকলেও তা প্রায় 'সাউন্ড অফ ফিউরির' মত শোনায়। দুজনের মধ্যে শুধু তফাৎ এইটুকই যে প্রতাপবাবু বলেন আটপৌরে ভাষায় আর সিদ্ধার্থবাবু 'এ্যাংগ্রি ইয়ং-ম্যানের' মত এবং সস্তায় কিস্তিমাৎ করার প্রবণতাও তাঁর প্রচুর। এ দুজনকেই বরাবর কায়দামাফিক আয়ত্তের মধ্যে রেখে-ছেন অপর পক্ষের দুজন। একজনের ভাষা প্রতাপবাবুর চেয়েও আটপৌরে এবং তীক্ষ্ণ—তিনি সোমনাথ লাহিড়ী। আরেকজন জ্যোতি বসু—যাঁর ধারালো খোঁচায় সিদ্ধার্থবাবুর ভাষা ও যুক্তির ফানুস বারে বারে চুপসে গেছে। তবু এঁদের দিয়েই কংগ্রেস দল প্রথম আক্রমণ সুরু করলেন।

রাজ্যপালের ভাষণে ও ভোট অন এ্যাকাউন্টের আলোচনায় 'প্রতাপবাবুদের যুক্তি ছিল আইন ও শৃঙ্খলা ভেঙে পড়েছে। জ্যোতি বসু বাজেট তৈরির জন্য সময় পান নি—তার কারণ তিনি ময়দানে মালা গ্রহণ করবেন না বাজেট তৈরি করবেন? সিদ্ধার্থবাবু কৌশলটা নিয়েছিলেন—১৯৬৭ সালের নির্বাচনের পরে প্রথম বাজেট অধিবেশনে প্রতাপবাবু যে বক্তৃতা করেছিলেন হুবহু সেই ধরণের। প্রতাপবাবু সেবারে বলেছিলেন—"আট বদ্যি (বামপন্থী জোট তখন আটটি দল নিয়ে ছিল) মিলে বাংলাদেশের চিকিৎসা করবে ভেবেছিল কিন্তু এক বদ্যি ডাঃ রায়ের হাতেই তার চিকিৎসা হবার রায় দিয়েছে জনগণ। কেন না আট বদ্যিদের কারো সঙ্গে কারো মিল নেই। বারো রাজপুতে তেরো হাঁড়ি।" সিদ্ধার্থবাবু এই অধিবেশনে বক্তৃতা করতে গিয়ে শুধু 'আটের' জায়গায় বললেন 'চোদ্দ' আর ডাঃ ঘোষকে, অজয়বাবু ও বাংলা কংগ্রেসকে এবং পি-এস-পি'কে আলাদা করে নিয়ে মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টি ও সমাজ-তান্ত্রিক দলগুলিকে বেছে বেছে আক্রমণ করলেন। অর্থাৎ এ সেই প্রতাপবাবুর মতই চোদ্দ দলের মধ্যে কারো সঙ্গে কারো মিল নেই সেই কথাই বোঝাবার চেষ্টা।

আরেকটি হাস্যকর কথা: বাজেটকে অনেকেই আক্রমণ করে বসলেন কংগ্রেস বেঞ্চ থেকে। অবশ্য, পরে যখন যুক্ত-ফ্রন্টের হাসাহাসিতে বুঝতে পারলেন তখন সেটা শুধরে নেবার চেষ্টা করে-ছিলেন তাঁরা। সাংবিধানিক নিয়মানুযায়ী এটা বিদায়ী কংগ্রেস সরকারেরই বাজেট ছিল। তাই কংগ্রেস দলকে তার আপন বাজেটকে আপনি আক্রমণ করতে দেখলে কার না হাসি পাবে?

এরপর কংগ্রেসের পরিষদীয় দল যে কিরকম ছন্নছাড়া এবং নেতৃত্বহীন তারও দৃষ্টান্ত ভূরি ভূরি পাওয়া গেল মফস্বল সদস্যদের বক্তব্যে। অনেকেই একপক্ষকালও বয়স নয় যে সরকার তাকে জল, কষ্টের জন্য, বেকারীর জন্য, চিকিৎসার জন্য এমন কি শিক্ষাহীনতার জন্যও দায়ী করতে লাগলেন তীব্রভাবে। সদস্যদের এই আক্রমণাত্মক অভিব্যক্তি শেষ পর্যন্ত কোথায় গিয়ে লাগবে সেটুকু বুঝিয়ে দেবারও যেন কেউ নেই। এ-তো বিশ বছরের কংগ্রেসী শাসনেরই নীট ফলাফল—একথা কে না বলবে?

অথচ বিধানসভায় কংগ্রেসের কি বিপুল সম্ভাবনাই না ছিল। ১২৭ জনের একটা একক পার্টি এবার বিধানসভায় ছিল বিরোধী দলের ভূমিকায়। এ বিধান-সভার ইতিহাসে সম্পূর্ণ মৌলিক পরি-বর্তন। তাকে সমীহ না করে চলবে এমন কোন সরকার থাকতে পারে? চাপের পর চাপ দিয়ে কংগ্রেস নিজের আদর্শানু-যায়ী জনসেবার প্রোগ্রামকে সরকারের মধ্যে দিয়ে কার্যকরী করতে পারতেন। কিন্তু ব্যর্থ হলেন তাঁরা সেদিক থেকে। যুক্ত-ফ্রন্টের জনৈক সদস্য বিধানসভায় বক্তৃতা করার সময় বলেছিলেন—"আপনারা দীর্ঘ-কাল সরকার পরিচালনা করেছেন। আপনা-দের অভিজ্ঞতা অনেক। আপনাদের কাছ থেকে আমরা কিছু শিখব। এই আশা আমাদের ছিল। কিন্তু আপনারা আমাদের নিরাশ করলেন।" একথা বস্তুত শুধু যুক্তফ্রন্টের বিধানসভা সদস্যেরই নয়—সারা দেশের, এমন কি অনেক নিষ্ঠাবান কংগ্রেস সদস্যেরও। এর ফলে কংগ্রেসের ইমেজের ওপর ধীরে ধীরে কালো ছায়া নেমে আসতে সুরু করল।

কংগ্রেস বিধানসভায় বিরোধী দলের ভূমিকা পালনে যে ব্যর্থ হলেন সে শুধু অক্ষমতাই নয়। প্রথমত দীর্ঘকাল শাসক দলের ভূমিকায় থেকে তার অভ্যস্ত ভাবকে সে পরিবর্তন করতে পারে নি। দ্বিতীয়ত সেই মেজাজ বিরোধী দলের ভূমিকায় খাপ খায় না। তৃতীয়ত কংগ্রেস দলে রাজ-নৈতিক অনুশীলন বহুদিন আগেই অন্তর্হিত হয়েছিল। অনুশীলনের অভাব সরকারী দলে থাকার সময় ব্রুট মেজরিটি দিয়ে ঢাকা যেত কিন্তু বিরোধী দলে থাকতে গেলে তা তো আর চলে না; অনুশীলনের দরকার হয়।

এছাড়াও আরেকটি কারণ মনে হয় কংগ্রেস দল ধরবার চেষ্টাই করলেন না। বিরোধী দলের ভূমিকা পালন করবার পথে যুক্তফ্রন্টের বিভিন্ন শরিক দলগুলি কংগ্রেসের জন্য কোন সুযোগ রাখেন নি। যুক্তফ্রন্টের শরিক দলগুলি নিজেদের সরকার হলেও বাস্তব দাবির ভিত্তিতে সরকারের সমালোচনার কোন সুযোগ ছেড়ে দেন নি। এর ফলে কংগ্রেস দল আরও নিষ্প্রভ হয়ে গেছে। তা ছাড়া এর চাপটাও অসম্ভব। সরকারী দল একই সঙ্গে সরকারপক্ষকে সমর্থন করছে আবার সরকারকে সমালোচনাও করছে। সংসদীয় রীতিনীতির ক্ষেত্রে এ এক নতুন পরীক্ষা। এ পরীক্ষার সামনে কংগ্রেস ভেঙে পড়তে বাধ্য। বারান্তরে এ বিষয়ে বিশদ আলোচনা করার ইচ্ছা রইল।

আকাশবাণী পরিক্রমা

মেঘদূত

এ-মাসের গানে সুর দিয়েছেন শ্রীকৃষ্ণমূর্তি, আকাশবাণীর (বিদায়ী?) অধিকর্তা। (অন্তত আকাশবাণী-পরিক্রমা লেখবার সময় পর্যন্ত অধিকর্তা পদে তিনি বহাল আছেন এবং এও শুনেছি যে, এ-মাসেই তিনি বিদায় নিচ্ছেন।) তামিল সুর। বাংলাদেশ থেকে তামিলনাদ পর্যন্ত দীর্ঘ তটভূমিব্যাপী বঙ্গোপসাগরের ছোঁয়াচ লেগেছে গানের কলিতে কলিতে। বাংলা গানে ভারতবর্ষের নানা জায়গার নানা সুর সংগ্রহ করে লাগাতে পারলে আধুনিক বাংলা কাব্যসংগীতের ঐশ্বর্য বাড়বে।

আকাশবাণী-পরিক্রমার পাঠকদের জানি না স্মরণে আছে কি না, মনে থাকা সম্ভব নয় মেনে নিয়ে ৯।১১।৬৭-র আধুনিক গান সম্পর্কে স্বলিখিত মতামতের অংশ উল্লেখ করছি, 'আমাদের বিশাল দেশে কত না জাতি কত সংস্কৃতি চারদিকে ছড়িয়ে রয়েছে। বিভিন্ন জাতির সংগীতের সুরের মধ্যে কত বৈচিত্র্য লক্ষ করা যায়। আদিম জাতিগুলির লোকসংগীত মনকে কি দোলাই না দেয়। সাঁওতাল খাসী নাগা নানান জাতির গানের সুরের আকর্ষণীয় দিক থেকে কিছু কিছু অনায়াসে বাংলা গানে প্রয়োগ করা যেতে পারে।......এমনি করে সংগীতের মাধ্যমে সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান সংহতির সহায়ক হবে। ....

'আবিষ্কাবের ঝোঁক কমে আসছে, চলছে অনুকরণের মাতামাতি। অন্ধ অনুকরণে সংস্কৃতির থলিটা ভরে ওঠে না; কেবল সম্ভাবনা থেকে যায় ফুটো হবার।'

আমার কথাগুলি কাজে রূপান্তরিত করা যে সম্ভবপর তা প্রমাণ করলেন তামিলনাদের শ্রীকৃষ্ণমূর্তি। ইনি একজন সুরকার। এঁর জন্ম ব্রহ্মদেশে এবং দশ বছর বয়স থেকে কলকাতা বেতার কেন্দ্রে শ্রীপঙ্কজকুমার মল্লিকের 'সংগীত শিক্ষার আসরের' নিয়মিত শ্রোতা ছিলেন। ওই বয়সে তাঁর প্রথম শেখা বাঙলা গান 'একটুকু ছোঁয়া লাগে'। বাঙালির ভাটিয়ালি, কীর্তন, বাউল তাঁর অতিপ্রিয়।

বাংলাদেশে আসবার জন্য গভীর আগ্রহে অপেক্ষা করেছিলেন; এলেনও, তবে স্বল্পকালের জন্য। ২০শে ডিসেম্বর আকাশবাণী কলকাতায় যোগ দেন। শুনেছি কলকাতা কেন্দ্রের জন্য যখন কাউকে পাওয়া যাচ্ছিল না অর্থাৎ এখানে আসতে কেউ সহজে রাজী হচ্ছিলেন না, তখন শ্রীকৃষ্ণমূর্তি সানন্দে এখানের পদটি গ্রহণ করলেন। কি কারণে তাঁকে এখানে রাখা হচ্ছে না তা জানতে ইচ্ছে হয়।

অল্পদিনের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণমূর্তি কলকাতা বেতার কেন্দ্রের অচলায়তনে কিছু পরিবর্তন ঘটাতে পেরেছেন যা হয়তো শ্রোতাদের কানে ধরা পড়েছে। কিছুকালের জন্য থাকলে কলকাতা বেতার কেন্দ্র উপকৃত হতো। এ বিষয়ে কেন্দ্রীয় বিভাগীয় মন্ত্রীমহোদয় ভেবে দেখলে ভালো হয়।

*

প্রতিমাসে 'এ মাসের গান' নামে একখানি নতুন গান পাঁচ মিনিটের জন্যে শোনানো হয়। 'এ মাসের গানে'র কি বৈশিষ্ট্য কি তার চরিত্র? শুধুমাত্র কি একখানা নতুন গান শোনানো, না তাছাড়া অপর কোন মহৎ উদ্দেশ্য আছে? যদি নতুন একখানি গান শোনানো উদ্দেশ্য হয় সেজন্য তো আধুনিক গানের অনুষ্ঠানসূচী রয়েছে। তারা কি অপরাধ করলো! 'মাসের গান' ঋতুসংগীতও নয়, অন্তত এ-মাসের গান তো নয়ই। শ্রোতারা এ মাসের গানের কোন অর্থ খুঁজে পান না।

প্রসঙ্গত বলা যায়, এবারের 'এ মাসের গানের' কথা দুর্বল। কে না জানে বাঙলা গান কথা ও সুরের মিলন-সেতু। 'তুমি দেহো মোরে কথা, তুমি দেহো সুর'—তাই তো সংগীত। কথা ও সুরের সমন্বয় কদাচিৎ আধুনিক কাব্যসংগীতে পাওয়া যাচ্ছে। আধুনিক সংগীতের ত্রুটি তো এখানে। এমন কি আধুনিক পল্লী বা লোকসংগীতগুলোও প্লাসটিকের ফুলের মতো কৃত্রিমতায় ভরে গেছে। বিকৃত ঢঙ-এ শব্দগুলিকে উচ্চারণ করলেই যদি লোকসংগীত হয় তবে আব্বাসউদ্দীন, গিরীন চক্রবর্তী কবে ফুরিয়ে যেতেন। কৃত্রিমতাকে কেউ স্মরণে রাখে না।

লিরিকের কথাগুলি হবে হীরকখণ্ডের মতো ঝকঝকে। কথা ও তার ভাব যদি স্রষ্টাকে আবিষ্ট করতে না পারলো তো সৃষ্টি মাঠে মারা গেল।

*

২৫শে ফেব্রুয়ারী কৃষ্ণা চট্টোপাধ্যায় রজনীকান্তের গান শোনালেন। রজনীকান্তের গান আকাশবাণীতে কম শোনা যায়। যে-ক'জন শিল্পী রজনীকান্তের গানে খ্যাতি অর্জন করেছেন শ্রীমতী চট্টোপাধ্যায় তাঁদেরই একজন। আকাশবাণী কর্তৃপক্ষ এই শিল্পীকে মাঝে মাঝে রজনীকান্তের গান পরিবেশনের সুযোগ দিলে বাধিত হবো।

*

২৭শে ফেব্রুয়ারী রবীন্দ্রসংগীত পরিবেশন করলেন স্বপ্না ঘোষাল।। শিল্পীর গান অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করতে পেরেছিল।

*

'তুমি কিছু দিয়ে যাও' গানখানি গাইলেন ৩রা মার্চ কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়। শিল্পীর অতুলনীয় কণ্ঠস্বর, অননুকরণীয় ভঙ্গি মোহজাল ছড়িয়ে দিল, মন আবেশে ভরে গেল। কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায় বা সুচিত্রা মিত্রের মতো শিল্পী আজও সুদুর্লভ। এঁরা শিল্পীজীবনের স্বপ্ন। এঁদের পিছনের সারিতে যাঁরা রয়েছেন তাঁদের সঙ্গে এ-সুজনের বিরাট ব্যবধান। কেন এই ব্যবধান? সর্বশ্রী বন্দ্যোপাধ্যায় এবং মিত্র যে-যুগে রবীন্দ্রসংগীত শিক্ষা করেছিলেন আজ তো সে-যুগ নেই। তখনকার দিনে গান শেখার ব্যবস্থা ছিল কতটুকু আজ রয়েছে দুটি বৃহৎ প্রতিষ্ঠান (বিশ্বভারতী, রবীন্দ্রভারতী), তাছাড়া অলিতে-গলিতে গানের স্কুল। অস্বীকার করা যায় না কলকাতায় বিশেষত দক্ষিণে কটি অত্যন্ত উচ্চমানের সংগীত শিক্ষায়তন রয়েছে। শিখতে উৎসাহ দিতে সরকারী বে-সরকারী নানান বৃত্তির ব্যবস্থা। ছেলেমেয়েদের উৎসাহও আছে, তথাপি জাতশিল্পী জন্মাচ্ছে কটি।

একটা কথা অনেকে বলে থাকেন, তখনকার দিনে এত রেডিও-রেকর্ড মেলা-জলসা ছায়াচিত্রে প্লে-ব্যাক এসবের হুজুগ ছিল না। সাধনাও ব্যাহত হতো না। সেদিনের ছোট ছোট আসরগুলিতে গান শুনিয়ে আনন্দ দেওয়া-পাওয়ার মধ্যে এক্সাইটমেন্ট থাকতো কম। মাথাটাও গরম হতো কম। সেদিন বিগত। এখন একটু নাম হয়েছে কি হাঁকডাক পড়ে গেল। অভিভাবক-শিক্ষক সকলে কোমরে ফেট্টি বেঁধে লেগে গেলেন 'শিল্পী'কে রাতারাতি টেনেটুনে লম্বা করতে। শিক্ষানবীশ ভেবে নিল, 'আমি তো এখন শিল্পী'। 'শিল্পী'র কথাবার্তা পোষাক-আশাক বেমালুম উল্টে-পাল্টে গেল। কাঁচা শিল্পীর পাকা চলনে পাকা শিল্পীরা লজ্জায় মাথা হেঁট করলেন। এই দাঁড়ালো—যার মধ্যে শিল্পচেতনা গড়ে উঠেছিল ধীরে ধীরে যে ফুটতে পারতো সে ফুটলো না—অকালে ঝরে গেল। এমনি করে

শহরে শহরে কতো প্রতিভাসম্পন্ন শিল্পী যে সকলকে নিরাশ করে বিদায় নিচ্ছে সে খবর কে রাখে। তাই বলি, যে-শিল্পী ভাবীকালে কিছু দেবে বলে আশা আছে তাকে ভীড় থেকে দূরে রাখা শিক্ষক এবং অভিভাবকদের একান্ত কর্তব্য। অকালে মাতামাতি শিল্প সৃষ্টির সম্ভাবনা কমিয়ে আনে। প্রবীণ সংগীত শিক্ষকদের এ নিয়ে দুঃখ প্রকাশ করতে শুনেছি। তাঁদের বলি, এই ব্যর্থতার জন্য আংশিক দায়ী তো স্বয়ং তাঁরাও।

শিল্পী তৈরি না হওয়ার অপর কারণ হলো শিক্ষার্থীর অনুকরণপ্রিয় মন। বহু তরুণ শিল্পী তাঁদের প্রিয় শিল্পীদের অন্ধের মতো অনুকরণ করে ফেলেন। গান শুনে অক্লেশে বলে দেওয়া যায়, কে কার ছাত্র ইত্যাদি। অনুকরণের ফলে স্বকীয়তা পূর্ণতায় রূপায়িত হলো না। এমন ক'জন বেতার-শিল্পীও রয়েছেন যাঁরা নবীন, প্রতিভাভাস্বর এবং আপন আপন বিশিষ্ট ভঙ্গি ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করছেন। এঁদের সম্পর্কে মেঘদূত আশান্বিত আবার ভয়ও পায়—কবে না হারিয়ে যায়।

*

৪ঠা মার্চ দেবব্রত বিশ্বাস গাইলেন 'মনের সুরের আসনখানি'। গানখানির শেষ লাইনে 'দাঁড়িয়ো আমার মেঘলা গানের বাদল-অন্ধকারে'; শিল্পী গাইলেন 'দাঁড়িয়ে......'। অর্থের সম্পূর্ণ পরিবর্তন ঘটে গেল। মনে হয়েছিল, হয়তো অসাবধানজনিত ত্রুটিটি দেবব্রতবাবু দ্বিতীয়বার সংশোধন করে নেবেন। শেষবারও তাঁকে 'দাঁড়িয়ে' উচ্চারণ করতে শুনে দুঃখ পেলাম। রবীন্দ্রসংগীতে উচ্চারণ কথা সুর খেয়ালখুশি মতো পরিবর্তিত হচ্ছে। শিল্পীদের সজাগ করে দিতে আকাশবাণী থেকে নির্দেশ এলো বছরখানেক পূর্বে। অবশ্য নির্দেশ বি-গ্রেড শিল্পীদের জন্য; এ-গ্রেড শিল্পীরা যেন ভুল করেন না। নির্দেশটি ছিল—

We have been receiving recently criticisms from noted scholars of Rabindra Sangeet on the quality of our Rabindra Sangeet broadcasts ....

Firstly, it has been stated that artists distort the words of the original, substituting the correct word by one of their own choice. An error of this kind is of course a very serious matter...

You are, no doubt, aware that there is a wide and critical audience for the Rabindra Sangeet broadcts of this station... Every effort is being made on our part to ensure the attendance of a qualified member of the staff at the time of your recording in order to assist you.

আকাশবাণী কর্তৃপক্ষ বিশেষজ্ঞদের একটি সভাও ডেকেছিলেন। একবছর পূর্বেব নির্দেশ। গানের ত্রুটি-বিচ্যুতি সংশোধনের আজও কোন ব্যবস্থা হয়েছে বলে মনে করি না। শিল্পীরা না হয় ভুল করলেন কিন্তু কর্তৃপক্ষ যে বড়ো গলায় জানালেন 'a qualified member of the staff' রেকর্ডিং-এর সময়ে সাহায্য করবেন—শিল্পীজনোচিত ভুলের সময় তাঁরা কি নাকে সরষের তেল ঢেলে ঘুমোন? কর্তৃপক্ষ এবং শিল্পীরা কি জানেন না—নামী শিল্পীদের কাছে শ্রোতারা এতটুকু ভুল প্রত্যাশা করেন না। তার একটি বড়ো প্রমাণ অনেক শিক্ষার্থী মেঘদূতকে অনুরোধ জানিয়ে চিঠি লেখেন, সে যেন প্রখ্যাত শিল্পীদের গানের সমালোচনা করে। তার কারণ এই সব শিক্ষার্থী আকাশবাণী থেকে এঁদের গান শুনে শিখে থাকেন।

সংগীত বিভাগের কাজ শুধু প্রোগ্রাম দেওয়া এবং নির্দিষ্ট প্রোগ্রাম রেকর্ড করা নয়। এসব ছাড়াও যে বড়ো দায়িত্ব তাঁদের ওপর ন্যস্ত রয়েছে তা-কি ঠিক-মতো পালিত হচ্ছে?

*

৫ই মার্চ বুলবুল চৌধুরী নজরুল ও অতুলপ্রসাদের গান গাইলেন। অতুলপ্রসাদের গান সুরেলা হলো তবে নজরুলগীতি তিনি জমাতে পারলেন না। আমাদের দেশে ছ' জাতের বুলবুল আছে বলে জানি—। নজরুলের গান শোনাতে বুলবুল চৌধুরী কেবলি লড়াই করে গেলেন।

*

৭ই মার্চ রাধারাণী লোকসংগীত ও ভক্তিমূলক গান গাইলেন। এঁর গান আরও ঘন ঘন দিলে মন্দ কি। এ জাতীয় শিল্পী তো আমাদের দেশ থেকে লোপ পেতে চলেছে।

*

৭ই মার্চ অর্ঘ্য সেন রবীন্দ্রসংগীতের সঙ্গে আধুনিকও গাইলেন। আধুনিক গানের আসরে তিনি নামলেন—তাঁর যাত্রা শুভ হোক।

*

কোন্নগর থেকে রমেন দত্ত লিখছেন, 'মেঘদূতের সঙ্গে আমি সম্পূর্ণ একমত যে-সব শিল্পীরা আধুনিক গানের জন্য বিখ্যাত তাঁদের রবীন্দ্রসংগীত থেকে 'ব্যান' করা হোক। গুরুদেবের গানের শুচিতা রক্ষা করতে হলে শিল্পীকে কিছু ত্যাগ স্বীকার করতে হবে। সে ত্যাগ হলো দুটো পয়সার জন্য হরেক রকমের ভাজা চিবান বন্ধ করা। রবীন্দ্রসংগীত এবং আধুনিক সংগীত এক দরের নয়, এক ঢঙ-এরও নয়। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে বাবার মুখে শুনেছি, একবার অমিতা সেনকে একখানি আধুনিক গান গাইতে বলায় তিনি বলেছিলেন 'গুরুদেবের গান ভিন্ন অন্য গান আমি গাই না।' অমিতা সেন এ-লোকে নেই, কিন্তু তাঁর সংগীত চিরকাল থাকবে, কারণ শিল্পীর ছিল শিল্পের স্রষ্টার প্রতি অসীম শ্রদ্ধা। এ শ্রদ্ধা আজকের শিল্পীদের ক'জনার মধ্যে দেখা যায় তা জানি না।'

*

ডানকুনি থেকে চন্দনা দত্ত লিখছেন, 'বেতার জগতে কি শুধুমাত্র যাঁরা গান-বাজনা করেন তাঁদের ছবি ছাপানো হবে? যাঁরা টাকার প্রভৃতি তাদের ছবি ছাপলে ক্ষতি কিসের। যেসব শিল্পীদের ছবি ছাপানো হয় তাঁরা সকলে নিশ্চয়ই সুন্দর দেখতে নয়। অনেক ছবির দিকে একবারের বেশি তাকানো যায় না। তবুও শিল্পীদের ছবি চাই। আকাশবাণীর সবটাতেই আদিখ্যেতা। টকারদের মধ্যে সকলে সুদর্শন না হোন একেবারে কুৎসিত নন। বেছে বেছে তাঁদের ছবিও কখনো কখনো ছাপানো যায় না কি। ঠিক-ঠিক এবার মনে পড়েছে টকারদের লেখা শিল্পী-দের ছবি। কো-একজিসটেন্স!

*

উল্টাডাঙ্গা (কলকাতা-৪) থেকে শ্রীদিলীপ দত্ত লিখছেন, 'আকাশবাণী পরিক্রমা' মারফত আপনি যা উপকার করেন তার জন্য সর্বপ্রথমেই আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ জানাই। ২৩-২-৬৮ তারিখের সাপ্তাহিক বসুমতীতে আবহ গোলযোগ সম্পর্কে আপনি যা লিখেছেন সত্যিই আকাশবাণীর পক্ষে তা খুব ভয়াবহ। আজকাল যান্ত্রিক গোলযোগের সঙ্গে সংবাদ পরিবেশনার ভুল আকাশবাণীর একটা নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। নিউজিল্যান্ডে, ভারতের সঙ্গে নিউজিল্যান্ডের খেলার ফলাফল জানার জন্য নিঃসন্দেহে সমস্ত ভারতবাসী অধীর আগ্রহে আকাশবাণীর দিকে চেয়ে থাকে। ২-৩-৬৮ তারিখে রাত ৯-২০ মিনিটের সংবাদে আকাশবাণী ভুল সংবাদ পরিবেশন করে তৃতীয় টেস্টে ভারতের প্রথম ইনিংসের রান সংখ্যা জানালেন ২২৭—আসলে প্রথম ইনিংসে ভারতের রান সংখ্যা হয়েছিলো ৩২৭।

সুচিত্রা মিত্র ও দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়ের মতো শিল্পীরও ত্রুটি দেখিয়ে মেঘদূত তরুণ শিল্পীদের অনেক উপকার করেছেন—এজন্য মেঘদূতকে আমার ধন্যবাদ জানাই। ৫-৩-৬৮

রঙ্গজগৎ

দেউলিয়া সিনেমা

আগামী ২৮শে মার্চ বিশ্ববিখ্যাত বিপ্লবী মানবতাবাদী লেখক ম্যাক্সিম গোর্কির জন্মশতবর্ষ পূর্ণ হবে। শতবার্ষিকী উদ্‌যাপনের জন্য পশ্চিমবঙ্গেও প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। এ সময় গোর্কির কয়েকটি বই নাড়াচাড়া করবার সময় হঠাৎ একটা প্রবন্ধে দৃষ্টি নিবদ্ধ হল। এই প্রবন্ধের এক স্থানে গোর্কি লিখেছেন : 'উচ্চদরের মঞ্চ-শিল্পকে ক্রমে ক্রমে ধ্বংস করছে সিনেমা। বুর্জোয়া সিনেমার দুষ্ট প্রভাব এতই স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ যে তা আর বিশদভাবে বলার প্রয়োজন নেই। ভাবালুতার প্রতিটি বিষয়বস্তু চর্বিতচর্বণ করে এখন তারা দৈহিক বিকলাঙ্গতা দেখাতে শুরু করেছে।'

'মেট্রো গোল্ডুইন মেয়ারের হলিউড স্টুডিওগুলি ফিল্মের 'খেয়াল' দেখাবার জন্য একটি মৌলিক দল জোগাড় করেছে। এতে আছে কু-কু নামে বিহঙ্গবালা, যার চেহারা সারস পাখীর মতো; আছেন কঙ্কাল-মানুষ পি রবিনসন; মার্থা নামে একটি মেয়ে আছে, জন্ম হতেই তার একটি হাত এবং পা দিয়ে সে নিপুণভাবে লেপ সেলাই করে। সিলজে নামে একটি 'পিনমাথা' মেয়েও জোগাড় হয়েছে, যার দেহটি স্বাভাবিক, কিন্তু মাথাটি অস্বাভাবিক রকমের ছোট—ঠিক একটি পিনের মত। ওলগা বলে আর একটি মেয়ে জোটান হয়েছে যার সারা মুখে পুরুষের মত দাড়ি ভর্তি: আর আছে আধা-পুরুষ আধা-মেয়ে জোসেফ-জোফেসিন, শ্যাম দেশীয় যমজ ভগ্নী, বামনবীর, খুদে মানুষ ইত্যাদি।'

মার্কিন বুদ্ধিজীবীদের এক চিঠির উত্তরে ১৯৩২ সালে গোর্কি "সংস্কৃতির প্রভুরা আপনারা কার পক্ষে?" শিরোনামায় একটি দীর্ঘ চিঠি লিখেছিলেন। সে চিঠিতে উদ্ধৃত লাইনগুলি রয়েছে।

গোর্কি ১৯৩২ সালে মার্কিন মুল্লুকের চলচ্চিত্র-শিল্পের যে দৈন্যের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন, আজ ১৯৬৮ সালে ভারতীয় প্রযোজকরা সেই দৈন্যকে সগর্বে অনুসরণ করছে। চলচ্চিত্র জগতে মোটামুটি ছকে-বাঁধা একটি চক্রবেড় গতি চলেছে। হলিউড আজ যা করে ভারত কাল তা অনুকরণ করে: পাকিস্তান ভারতকে অনুকরণ করে পরশু। কারণ এদের কারো মৌলিক কিছু কার শক্তি নেই। মৌলিক কিছু করতে হলে মুনাফার ব্যাপারে ঝুঁকি এসে পড়ে। সে ঝুঁকি নিয়ে এরা কাজ করতে পারে না তো। তাই হলিউডে যখন বিকলাঙ্গ, বিকৃতদের দিয়ে ছবি হচ্ছিল, ভারতেও তার প্রভাব দেখা গেল। আবার এ যুগে হলিউড সব দিক হারিয়ে রাজনৈতিক গোয়েন্দাদের 'পপুলার' করার কাজে লেগেছে। এতে অর্থের দিকটা প্রায় নিশ্চিন্ত থাকা যায়। টিকেট ঘর যদি অনুগ্রহ নাও করে, 'সি-আই-এ' নামক গোয়েন্দা সংস্থাটির আর্থিক সাহায্য পাওয়া যাবে। তাতে পুষিয়ে যায়। তার আগের পর্যায় ছিল নাইটক্লাব, অর্থাৎ পৃথিবীতে কত রকমে নারীদেহ বেচাকেনা হয় তার সিনেমা-বিবরণ, এবং অপরিণত মনে প্ররোচনা দান। ব্যস, বোম্বাইয়ের ছবিতে এসে গেল—তারই কদর্য অনুকরণ। তা দেশের জীবনের সঙ্গে সংগতি অসঙ্গতির প্রশ্ন নেই, একটা কিছু দেখালেই হল। এবার এসেছে স্পাই ছবি। হলিউডের অনুকরণে ভারতের স্পাইরা এখন উঠে-পড়ে লেগেছে দেখছি। তবে এই স্পাইদের জন্য প্রযোজকরা সি-আই-এর অর্থ পাবে কি না জানি না।

তাই আমাদেরও মনে প্রশ্ন জাগছে, আমাদের সিনেমা-প্রভুরা কার পক্ষে? তাঁরা মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের ও তাদের প্রাণশক্তিহীন সংস্কৃতির পক্ষে—না, ভারতীয় জনগণের পক্ষে। মুনাফার অপদেবতার পায়ে দেশের ইজ্জত সম্মান বিসর্জন দিয়ে শিল্পের আর কত বিকৃতি ঘটাবেন, মানুষকে আর কত বিভ্রান্ত করবেন?

—সুজন।

আলেকজান্দার ডবজেঙ্কো

চিত্র আলোচনা

দুটি বিশ্ববিখ্যাত ছবি
'আর্থ' ও 'চাপায়েভ'

বিশ্বে সর্বকালের বারটি শ্রেষ্ঠ ছবির অন্যতম 'আর্থ' বা 'ল্যান্ড' দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর দেখার সুযোগ হল। বিশ্ববিখ্যাত পরিচালক ডবজেঙ্কোর এই ছবিটি ভারতে এই প্রথম দেখান হল। দীর্ঘকাল যাবৎ চলচ্চিত্র-ইতিহাসে এই ছবির কথা আমরা পড়ে আসছি, বিভিন্ন আলোচনায় চলচ্চিত্র পর্যালোচকরা (ভারতের বা কলকাতার তথাকথিত সিনেমা এডিটররা অবশ্য নন) এই ছবির কথা উল্লেখ করে আসছেন, এই ছবিকে আদর্শ হিসাবে রেখে চলচ্চিত্র নির্মাণে ব্রতী হয়েছেন অসংখ্য পরিচালক। যাঁরা বিশ্ব-চলচ্চিত্রের খবরাখবর রাখেন তাঁরা গভীর আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করছিলেন 'আর্থ' দেখার জন্য। 'আর্থ' দেখার সুযোগ করে দেবার জন্য নর্থ ক্যালকাটা ফিল্ম সোসাইটি চলচ্চিত্র-রসিকদের ধন্যবাদভাজন হয়েছে। নর্থ ক্যালকাটা ফিল্ম সোসাইটি গত ৭ই মার্চ ফাইন আর্টস একাডেমি হলে 'আর্থ' এবং আর একটি বিখ্যাত ছবি 'চাপায়েভ' দেখিয়েছে।

'আর্থ' ছবিটি ১৯৩০ সালে

'দিবারাত্রির কাব্য' ছবিতে মাধবী মুখার্জী ও স্বপন রায়

সোভিয়েত ইউনিয়নে মুক্তি লাভ করে সারা জগৎকে চমকিত করে। আজ পৃথিবীর এমন কোন দেশ নেই যে দেশের ফিল্ম লাইব্রেরীতে 'আর্থ' নেই। বহুমূল্য সম্পত্তির মত চলচ্চিত্র ও শিল্পচিন্তা বিকাশের নিদর্শন এই চিত্রটি প্রত্যেক দেশ ফিল্ম আরকাইভে সযত্নে রক্ষা করছে। এই ছবিতে কবির কাব্যদৃষ্টি অত্যন্ত সার্থকভাবে সেলুলয়েডে প্রকাশিত হয়েছে। কবির কাব্যিক ধারণাগুলি জীবন আর প্রকৃতির চিত্রে উপস্থিত হয়েছে আশ্চর্য সুন্দর হয়ে। একক চরিত্র চিত্রণে পোট্রেট অবলম্বনে জীবনের সঙ্গে প্রকৃতির সম্পর্ক; প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের জীবনের ঘনিষ্ঠতা, প্রেম ও চিরন্তন জীবনের আর্তি দেখান হয়েছে। শ্রেণী সংগ্রামকে দার্শনিকতার জেনেরালিজেশনে দেখান হয়েছে। এই শ্রেণী সংগ্রাম জীবনের সহজ প্রকাশ। ধর্ম ও বুর্জোয়া দর্শনের অন্ধতা থেকে মোহমুক্তি এখানে সহজ সরল হয়ে একটা নতুন পথের সন্ধান দিয়েছে। ছবির বাণী এমন ধীরভাবে সহজ গতিতে প্রকাশ হয়েছে যে মানুষের জীবনের তাই সত্যরূপ। এখানেই ছবিটির শক্তি। এই শক্তির জন্যই বছরের পর বছর ছবিটি তার শিল্পসম্মত আবেদন রক্ষা করে চলেছে। আটত্রিশ বছর পরেও নতুন ছবির মত রূপে রসে দর্শকমনকে পরিতৃপ্ত করছে।

১৯১৭ সালে নভেম্বর বিপ্লবের পরে বিশ্বের শিল্পজগতের শিল্পরীতির মধ্যে আর একটি নতুন শিল্পরীতি সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। এই শিল্পরীতি সোস্যালিস্ট রিয়্যালিজম বা সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা নামে বিকশিত হয়ে ওঠে। এ পর্যন্ত পৃথিবীতে যত শিল্পরীতি সৃষ্টি হয়েছে তার সমৃদ্ধতম রূপ সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা। ডবঝেঙ্কোর 'আর্থ' সমাজ-তান্ত্রিক বাস্তবতার একটি মনোহর নিদর্শন। যেখানে জীবন, প্রকৃতি এবং দার্শনিক তত্ত্ব সূক্ষ্ম শিল্পরুচির মধ্যে আশাবাদে প্রকাশিত হয়েছে। বলিষ্ঠ আশাবাদের ধ্বনিতে মানুষের জয়যাত্রার কথা ঘোষিত হয়েছে। মৃত্যু যেমন একমাত্র সত্য নয়—নতুন জীবন এসে মৃত্যুকে মুছে দেয়; প্রকৃতির নিয়মে আপেল ফল পেকে ঝরে পড়ে, আবার নতুন পত্রপুষ্পোদ্গম হয়—আবার ফল ধরে। তেমনি শোষণ ও বঞ্চনা একমাত্র সত্য নয়—একদিন জীবনের নিয়মে সেও শেষ হবে, নতুন জীবন আসবে। এই নতুন জীবনের পথকে কেউ ঠেকাতে পারবে না। তার জন্য দরকার কেবল একটা শক্তি—যেমন সন্তান জন্মের জন্য প্রয়োজন ধাত্রী।

'আর্থ' ছবির পটভূমি রুশ বিপ্লবোত্তর কালে উক্রেনিয়ার কৃষকসমাজ, তাদের গ্রাম, তাদের ধ্যান-ধারণা এবং একটা নতুন দিনের সূচনাকাল। তখন দিকে দিকে চলেছে সোভিয়েত সরকার ও কমিউনিস্ট পার্টির পরিকল্পনায় নতুন সমাজব্যবস্থা সংগঠনের উদ্যোগ, আর একদিকে কুলাক বা জোতদার শ্রেণীর লোকরা কৃষিজীবনে বিপর্যয় সৃষ্টি করছে। তারা নতুন সরকারকে জব্দ করার জন্য জমি চাষ না করে অনাবাদী রেখে দিয়েছে, গরু-ঘোড়াগুলিকে মেরে ফেলে চাষ অচল করে দিয়েছে, ধান গম লুকিয়ে রেখেছে। এমন কি বিষ প্রয়োগ করতেও ইতস্তত করছে না। পুরনো আর নতুন জেনারেশনের মানুষ দ্বিধাবিভক্ত। নতুনরা সমবায় খামার ও চাষ করে ভূমিব্যবস্থার পরিবর্তন করবার জন্য ট্রাক্টর আনল। ক্রমে যন্ত্র কৃষিব্যবস্থায় বিপ্লব সাধন করলো, ব্যক্তিগত জমি ও সংকীর্ণ সীমার পরিবর্তে যৌথ চাষব্যবস্থা সাফল্য লাভ করল, গ্রামে বিদ্যুৎ এল। গ্রামের কৃষকজীবনে বিরাট পরিবর্তন ঘটে গেল। এই পরি-বর্তনের অন্যতম উদ্যোগী তরুণ ভাসিলিকে কুলাকরা হত্যা করল। এই হত্যার পরে যথারীতি গীর্জার পুরোহিত উপস্থিত ধর্মীয় আচার আচরণের জন্য। ভাসিলির বাবার তখন অন্ধকার ঘুচে

গেছে। ধর্মের সঙ্গে পুরাতন সমাজ-ব্যবস্থার সম্পর্ক তিনি বুঝতে পেরেছেন। ভগবানের অস্তিত্ব সম্পর্কে তাঁর তখন সংশয় উপস্থিত হয়েছে। তিনি পুরোহিতকে বিদায় করে দিয়ে—গ্রামের লোকদের বললেন আবার ছেলের শেষকৃত্য কর—নতুন নিয়মে নতুন দিনের গান করে। সমস্ত গ্রামের ছেলেবুড়ো জমায়েত হলো অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায়, তাদের মধ্যে ভাসিলির অসমাপ্ত কাজকে সার্থক করার দুর্জয় প্রতিজ্ঞা। এক ভাসিলির স্থানে তখন হাজার ভাসিলি উদয় হয়েছে। আর একদিকে গ্রামের সব মানুষের এই সমুদ্র উচ্ছ্বাসের মত জমায়েত দেখে ভাসিলির হত্যাকারী কুলাক নিজে এসে স্বীকারোক্তির জন্য ছটফট করছে। যারা নতুন দিনের আগমনীকে বরণ করছে, সে সম্পর্কে আত্মপ্রত্যয়শীল তাদের ওসব ছোট ব্যাপারে কান দেবার মত মনের অবস্থা আর নেই।

প্রথম থেকে শেষ ডবঝেঙ্কো ক্লোজ শটে কখনো মানুষ, কখনো প্রকৃতিকে উপস্থিত করেছেন। মানুষগুলি এসেছে একক পোট্রেট হয়ে। এই পোট্রেটে তাদের ভাবনা, মুড প্রতিফলিত হয়েছে কৃতী শিল্পীর তুলিতে আঁকা ছবির মত। ঠিক এভাবেই গমের ক্ষেত, বাতাসে হিল্লোলিত শস্যক্ষেত্র; নীল আকাশে সাদা মেঘের মেলা; ফলভারে নত আপেলশাখা; বৃষ্টিজলে ধৌত পরিপুষ্ট আপেলগুলি জীবনের অপরাজেয়তা ঘোষণা করছে। সমগ্র ছবিতে কেবল ক্লোজ শটে তিনি জীবন ও প্রকৃতিকে দর্শকদের কাছে ঘনিষ্ঠ করে তুলেছেন। তার প্রত্যেকটি পোট্রেট এক-একটি জীবনের প্রতীক, অথচ সহজে চেনা যায়। মানুষের প্রতি বিশ্বাস এবং নতুন সমাজব্যবস্থার প্রতি গভীর প্রত্যয় ডবঝেঙ্কোর বৈশিষ্ট্যরূপে ছবিতে ফুটে উঠেছে। ভাসিলির মৃত্যুর পর শোকে উন্মাদ তাঁর বাগদত্তাকে দেখান হয়েছে সম্পূর্ণ নগ্ন করে। অথচ আশ্চর্য সুন্দর সেখানে শিল্পীর দৃষ্টি; দর্শকদের এতটুকুও বিভ্রান্ত করেন নি। গ্রাফিক আর্টের রূপরেখা ফুটে উঠেছে। অথচ মহিলা উন্মাদ হয়ে ছটফট করছে, আছড়ে পড়ছে। এখানেই শিল্পীর সংযমশক্তি। কোনরূপে ভাবপ্রবণতাকে প্রশ্রয় না দিয়ে সংযত শিল্পীর তুলিতে আঁকা ছবির মত ডবঝেঙ্কো একটি জীবনদর্শন এই ছবিতে উপস্থিত করেছেন।

'আর্থ'-এ ডবঝেঙ্কো কবি, শিল্পী, চিন্তানায়ক, ইতিহাসবিদ এবং নতুন সমাজ ও শিল্পচিন্তার প্রবক্তা। তাঁর শিল্পব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ প্রকাশ ঘটেছে এই ছবিতে। আলেকজান্দার ডবঝেঙ্কো (জন্ম ১৮৯৪) এক উক্রেনীয় কৃষক সন্তান। কৃষকজীবনকে তিনি খুব ভালভাবেই জানেন। জীবনে শিক্ষকতা, কার্টুন শিল্পী এবং কূটনৈতিক কাজ এবং ফ্যাসিস্ট-বিরোধী মহাযুদ্ধের সময় রণক্ষেত্রে সংবাদদাতার কাজ করেছেন। জার্মানীতে সোভিয়েত দূতাবাসের কাজ ছেড়ে নিয়োজিত হয়েছিলেন ফিল্মের কাজে। কারণ তিনি বুঝেছিলেন তাঁর চিন্তাধারাকে মানুষের মধ্যে নিয়ে যাবার উপযুক্ত মাধ্যম হবে ফিল্ম। তাঁর 'আর্থ' ছবি স্টুডিওতে দেখে বিখ্যাত আইজেনস্টাইন বলেছিলেন: "কি ছবি দেখলাম! উক্রাইন থেকে এক বিরাট প্রতিভা এসেছে।" 'আর্থ'-এর আগে ডবঝেঙ্কো আরও দুটি ছবি করেছিলেন। তাঁর প্রথম ছবি 'লাভ-বেরি' (১৯২৬)। এ ছাড়া তিনি 'ডিপ্লোমেটিক কুরিয়েরস' ব্যাগ' 'ঝেনিগোরা', 'আর্সেনাল', 'আইভান', 'এরোগ্রাড' প্রভৃতি ছবি করেছিলেন। এ ছাড়া তিনি যুদ্ধের সময় ফ্রন্টে থেকে বহু চিত্রনাট্য লিখেছেন। কিন্তু মৃত্যুর আগে সেগুলিকে চিত্ররূপ দিয়ে যেতে পারেন নি। তাঁর স্ত্রী সলোনেৎসেবা 'ফ্লেমিং টাইমস'কে চিত্ররূপ দিয়েছেন।

'আর্থ'-এর ফটোগ্রাফি অতুলনীয়। ১৯২৯ সালে সোভিয়েত ফটোগ্রাফি কি পরিমাণ উন্নত ছিল তা ভাবতে আজকের দিনেও অবাক লাগে। এই ফটোগ্রাফির কৃতিত্ব ডানিলো ডেমুৎস্কির। পরিচালকের সঙ্গে ফটোগ্রাফারের চিন্তার সমন্বয় অত্যন্ত সার্থকরূপে এখানে প্রকাশ পেয়েছে। 'আর্থ'-এ যাঁরা অভিনয় করেছেন তাঁদের নাম উল্লেখ করা প্রয়োজন। সেমিনিয়ন সাসেঙ্কে (ভাসিলি), স্টেপান সুকার্স্ট (পিতা), মিকোলা নাডেমস্কি (পিতামহ), ইয়েলেনা মাক্সিমোভা (বাগদত্তা), পিওতর মাসোখা (ফোমা), নিকোলাই মিখাইলভ (পুরোহিত)।

চিত্রভারতীর 'তীরভূমি'-র একটি দৃশ্যে মঞ্জু দে ও বিকাশ রায়

চাপায়েভ

একই সন্ধ্যায় 'আর্থ'-এর পরে 'চাপায়েভ' দেখান হয়। 'চাপায়েভ' একটি বিশ্ববিখ্যাত ছবি। ১৯৩৪ সালে সোভিয়েত চলচ্চিত্রে শব্দ, ফটোগ্রাফি এবং সম্পাদনা কিরূপ উন্নত হয়েছিল তার একটি নিদর্শন এই ছবি। 'চাপায়েভ' ছবিটি সোভিয়েত রাশিয়ায় এত জনপ্রিয় হয়েছিল যে বছরের পর বছর ছবিটি চলেছিল। ছবি দর্শনার্থীরা বিভিন্ন অঞ্চল, কারখানা ও পাড়া থেকে মিছিল করে সিনেমায় আসত, তাদের হাতে থাকত পোস্টার: 'আমরা 'চাপায়েভ' দেখতে চলেছি।' চাপায়েভ দেখার জন্য স্বতঃস্ফূর্তভাবে সারা দেশে উন্মাদনা সৃষ্টি হয়েছিল। খুব কম সংখ্যক ছবি এত জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। যদিও বিপ্লব-পরবর্তী গৃহযুদ্ধের অনেক পরে ছবিটি নির্মিত হয়েছে, কিন্তু গৃহযুদ্ধের সময়ের সোভিয়েতের পক্ষের এই নায়ককে দেশবাসী তাদের হৃদয় দিয়ে গ্রহণ করেছে।

চাপায়েভ একজন বীর সেনানায়ক। গৃহযুদ্ধের সময় হোয়াইট রাশিয়ান ও সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে তিনি অসীম বীরত্বের সঙ্গে লড়াই করেছিলেন। একদিকে তাঁর নাম লালফৌজ ও দেশের জনসমাজে প্রেরণা সৃষ্টি করত, আর একদিকে তাঁর নামে শত্রুশিবিরে ত্রাস সৃষ্টি হতো। একজন সাধারণ কৃষক সন্তান, দু বছর আগেও যিনি ছিলেন নিরক্ষর, বিপ্লবের প্রেরণায় তিনিই হলেন সুদক্ষ সেনাপতি। তাঁরই সঙ্গে পলিটিক্যাল কমিশার রূপে ছিলেন ফুরমানভ। ফুরমানভের লেখা একটি আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস অবলম্বনে চিত্রনাট্য

'মহাবিপ্লবী অরবিন্দ' ছবিতে অরবিন্দ (দিলীপ রায়) ও ভগিনী নিবেদিতা (মিসেস ডিগনাম)।

লিখেছেন জর্জ ও সেগেই ভাসিলিয়েভ। ভাসিলিয়েভ ভ্রাতৃদ্বয় গৃহযুদ্ধে সোভিয়েতের পক্ষে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। নিজেদের অভিজ্ঞতায় তাঁরা চিত্রনাট্য এবং পরিচালনা সার্থকভাবে করেছেন।

চাপায়েভের সৈন্যবাহিনীর বীরত্বগাথার সঙ্গে ১৯১৯ সালের দিকের পরিস্থিতি উপস্থিত করা হয়েছে। সেই সঙ্গে এই কৃষক সেনাবাহিনীর জীবন, দেশের সাধারণের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক এবং মনোভাব, মানুষের প্রতি দায়িত্ববোধ এবং ব্যক্তিজীবন ছবিতে উপস্থিত করা হয়েছে। ছবি শুধু গৃহযুদ্ধের কথাই বলে নি, বরঞ্চ বেশি করে বলেছে জনজীবনে নতুন সমাজব্যবস্থা ও বলশেভিকদের চিন্তাধারার কথা। এই চিন্তাধারা প্রতিষ্ঠার জন্য চিত্রনাট্যকার ছোট ছোট কয়েকটি চরিত্র সৃষ্টি করেছেন, যেমন এক থানার মেয়ে ও তার আত্মসম্মানবোধ, শত্রু শিবিরের আর্দালী, গ্রামের কৃষকদের শূকর চুরির ঘটনা ইত্যাদি। এসব ঘটনার মধ্য দিয়ে তৎকালীন বলশেভিকদের কেবল নয়, সর্বকালের সাম্যবাদীদের দৃষ্টিভঙ্গী প্রকাশিত হয়েছে। অথচ একটি যুদ্ধচিত্র হিসাবেও চাপায়েভের তুলনা হয়, বিভিন্ন রণকৌশলের দৃষ্টান্তমূলক কয়েকটি যুদ্ধদৃশ্য ছবিতে সংযোজিত হয়েছে।

চাপায়েভের নিজস্ব কাহিনী বলতে ছবিতে তেমন কিছু নেই, কাহিনী গড়ে উঠেছে সমবেত চরিত্রগুলিকে নিয়ে। ছবি দেখতে দেখতে চাপায়েভের সঙ্গে দর্শকরা একাত্ম হয়ে যান। তাকে ভালবাসেন। তাই রাত্রির অন্ধকারে অতর্কিতে আক্রান্ত হয়ে চাপায়েভ যখন উরাল নদী সাঁতরে পার হচ্ছিল তখন শত্রুর বুলেট বৃষ্টিতে তার মৃত্যুতে সারা প্রেক্ষাগৃহে দীর্ঘশ্বাস পড়ে।

...টির সঙ্গীতের কাজ বিস্ময়কর সুন্দর। এতকাল আগে যে এমন উন্নত সঙ্গীতের কাজ হতে পেরেছে তা সোভিয়েত ছবির গর্বের কথা। সমভাবেই চিত্রগ্রহণের বাহাদুরীতে ও সম্পাদনায় আমরা মুগ্ধ হয়েছি। এবার অভিনয়ের কথায় আসা যাক। চাপায়েভের চরিত্রে অভিনয় করেছেন সোভিয়েতের একজন বিখ্যাত অভিনেতা বাবোচকিন। তিনি চরিত্রটির সঙ্গে এত মিশে গেছেন যে চাপায়েভ আর এই অভিনেতাকে আলাদা করা অসম্ভব। অন্যান্য চরিত্রে অভিনয় করেছেন বি ব্লিনভ (ফুরমানভ), এন সিমোনোভ (ঝিকারেভ), চিরকভ (কৃষক)।

চাপায়েভ ছবিটিকে বিখ্যাত আইজেনস্টাইন সোভিয়েত চলচ্চিত্র-শিল্পে তৃতীয় পর্যায়ের একটি মডেল চিত্র হিসাবে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। বাস্তবিক সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার শিল্পরীতিতে নির্মিত এই ছবিটি এদেশের দর্শকরাও আন্তরিকভাবে গ্রহণ করবেন, এদেশের দর্শকদের মনেও সাড়া জাগাবে।

নাটকের কথা

সংলাপ-এর বার্ষিক সম্মেলন

মধ্যমগ্রামের প্রগতিশীল নাট্যসংস্থা 'সংলাপ'-এর বার্ষিক সম্মেলন গত ১০ই ও ১১ই ফেব্রুয়ারী অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রথম দিনের অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক শ্রীসত্যসাধন চক্রবর্তী। এই দিন ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘের 'সাম্প্রতিক' শাখা কর্তৃক সঙ্গীত পরিবেশন ও 'সাঁওতাল বিদ্রোহ' নাটক অভিনীত হয়। 'সংলাপ'গোষ্ঠীর সদস্যরা উদ্বোধন সঙ্গীত করেন এবং সমরেশ বসুর ছোট গল্প অবলম্বনে বরুণ দাশগুপ্তের নাট্যরূপ 'আবর্ত' অভিনয় করেন।

দ্বিতীয় দিনের অনুষ্ঠানে গণনাট্য সঙ্ঘের কলাকার শাখার 'মুক্তির অন্তরালে' নাটকটি সকলের প্রশংসা লাভ করে। এই দিন 'সংলাপ'গোষ্ঠী অভিনয় করে রবীন্দ্র ভট্টাচার্যের 'থেকে রোয়ে যান' ও 'অশান্ত বিবর'। এই দুই দিনের অনুষ্ঠানে 'সংলাপ'-গোষ্ঠীর প্রচেষ্টা মোটামুটি সার্থক বলা চলে। মধ্যমগ্রামের সকল মানুষ এই নাট্য প্রচেষ্টায় সহযোগিতা করেছেন। বিপুল দর্শক সমাগম এই প্রচেষ্টাকে উৎসাহ দিয়েছে। কিন্তু দ্বিতীয় দিন স্থানীয় চারণ সাহিত্যচক্রের ভূমিকায় অনেকে ক্ষুব্ধ হয়েছেন।

স্টুডিও খবর

'গুপী গায়েন বাঘা বায়েন'

সত্যজিৎ রায় 'গুপী গায়েন বাঘা বায়েন' ছবির বহির্দৃশ্য গ্রহণের জন্য তাঁর ইউনিটের লোকজন নিয়ে রাজস্থান গেছেন। মার্চ মাসের শেষ সপ্তাহ পর্যন্ত তাঁর রাজস্থানে থাকার ইচ্ছা আছে। সেখানে রাজস্থানের বিরাট বিরাট প্রাসাদের ও দুর্গের পটভূমিকায় গুপী গায়েন বাঘা বায়েন-এ উল্লিখিত দুই রাজার যুদ্ধের চিত্র তুলবেন। ছবির এটি একটি বিশেষ দৃশ্য হবে। এই দৃশ্যের জন্য কয়েক সহস্র এক্সট্রা এবং উট সংগ্রহ করা হয়েছে। সত্যজিৎ রায়ের আর কোন ছবিতে এত বেশি সংখ্যক লোককে কাজে লাগান হয় নি। এই ছবির আর একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় বিখ্যাত কবি হারীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়কে দেখা যাবে যাদুকরের ভূমিকায়। রাজস্থানের বহির্দৃশ্যে শিল্পীদের মধ্যে থাকছেন, নবাগত তপন চ্যাটার্জী, রবি ঘোষ, জহর রায়, চিন্ময় চ্যাটার্জী, সন্তোষ দত্ত, শান্তি চ্যাটার্জী, গোবিন্দ চক্রবর্তী, অশোক মিত্র, রতন ব্যানার্জী, রাজকুমার লাহিড়ী, কানু মুখার্জী, শঙ্কর ব্যানার্জী প্রমুখ। এই ছবিটি প্রযোজনা করেছেন নেপাল দত্ত এবং অসীম দত্ত। চিত্রনাট্য লেখা, পরিচালনা এবং সঙ্গীত পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন সত্যজিৎ রায়।

'বিলম্বিত লয়'

বলাকা পিকচার্স সত্যজিৎ রায়ের 'চিড়িয়াখানা'-র পরে অগ্রগামী গ্রুপের 'বিলম্বিত লয়' পরিবেশনার দায়িত্ব গ্রহণ করেছে। সাহিত্যিক নরেন্দ্রনাথ মিত্র লিখিত কাহিনী এবং চিত্রনাট্য অবলম্বনে ছবিটি পরিচালনা করবেন অগ্রগামী গ্রুপ। প্রধান ভূমিকায় অভিনয় করবেন উত্তমকুমার ও মাধবী মুখার্জী। সঙ্গীত পরিচালনা করবেন নচিকেতা ঘোষ। মার্চ মাসে সঙ্গীত গ্রহণের কাজ হবে।

'পরিণীতা'

অনেকদিন পরে পরিচালক অজয় কর একটি ছবির কাজে হাত দিয়েছেন। চিত্রলিপি ফিল্মসের 'পরিণীতা' ছবিটি তিনি পরিচালনা করছেন। নিউ থিয়েটার্স এক নম্বর স্টুডিওতে চিত্রগ্রহণের কাজ অগ্রসর হচ্ছে। এই ছবিতে অভিনয় করছেন মৌসুমী চ্যাটার্জী (বালিকাবধূ-খ্যাতা), সৌমিত্র চ্যাটার্জী, বিকাশ রায়, ছায়া দেবী এবং তিনজন নবাগত সমিত ভঞ্জ, রোমি চৌধুরী, রত্না ঘোষাল। মৌসুমী চ্যাটার্জী চিত্রলিপি ফিল্মসের নিজস্ব শিল্পিরূপে নিযুক্ত হয়েছেন। সঙ্গীত পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছেন হেমন্ত মুখার্জী। ছবিটি প্রযোজনা করেছেন অজয় কর ও বিমল দে যুগ্মভাবে।

'পদ্মাবতী জয়দেব'

সান সাইন পিকচার্স প্রাঃ-এর গীতিবহুল ধর্মমূলক ছবি "পদ্মাবতী জয়দেব" এই মাসের মাঝামাঝি শহর ও শহরতলীর একাধিক চিত্রগৃহে মুক্তিলাভ করবে। চিত্রদূত ছবিটির পরিচালনা করেছেন, বিজন পাল সুর দিয়েছেন, চিত্রনাট্য ও সংলাপ রচনা করেছেন—দেবনারায়ণ গুপ্ত, গীত রচনাঃ পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়, গোপীকৃষ্ণ নিজে কয়েকটি নৃত্য পরিবেশন করেছেন ও নৃত্যপরিচালনা করেছেন। নেপথ্য সঙ্গীতে আছেনঃ মান্না দে, ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য, মানবেন্দ্র মুখার্জী, আরতি মুখার্জী, তরুণ ব্যানার্জী, শিপ্রা বসু, গীতা দাস, ঘণ্টশালা ও সুশীলা। লাইফ পিকচার্স প্রাঃ লিঃ ছবিটির পরিবেশক।

'বালুচরী'

কার্তিক বর্মণ প্রযোজিত রাধারাণী পিকচার্সের "বালুচরী" শ্রী, প্রাচী, ইন্দিরা-র পরবর্তী ছবি। কাহিনী রচনা করেছেন—আশাপূর্ণা দেবী। পরিচালনা করেছেন প্রতিভাবান তরুণ পরিচালক অজিত গাঙ্গুলী। সুর দিয়েছেন রাজেন সরকার। গীত রচনা করেছেনঃ পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়। চিত্রগ্রহণে আছেনঃ বিজয় ঘোষ ও সম্পাদনা করেছেন—বৈদ্যনাথ চ্যাটার্জী। নেপথ্য সঙ্গীতে আছেন—হেমন্ত মুখার্জী, শ্যামল মিত্র ও সন্ধ্যা মুখার্জী। ছবির প্রধান চরিত্রে আছেনঃ সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, অনিল চ্যাটার্জী, অনুপকুমার, পাহাড়ী সান্যাল, অজয় গাঙ্গুলী, প্রসাদ মুখার্জী, জহর রায়, লিলি চক্রবর্তী, জ্যোৎস্না বিশ্বাস, মলিনা দেবী, রেণুকা রায়, গীতা দে, দীপিকা দাস, গঙ্গাপদ বসু, নৃপতি, মিন্টু, মৃণাল, অমিয় প্রমুখ। শ্রেয়সী, নতুন জীবন-খ্যাত প্রযোজকের এটি তৃতীয় ছবি। আশা করা যায় 'বালুচরী' পূর্বের চেয়ে আরও জনপ্রিয় ছবি হবে। নর্মদা চিত্র ছবিটির পরিবেশন দায়িত্ব নিয়েছেন।

'বৌদি'

পূর্ণেন্দু প্রোডাকসন্সের 'বৌদি' ছবিটি বর্তমানে মুক্তি-প্রতীক্ষায়। কাহিনী রচনা ও পরিচালনা করেছেন—দিলীপ বসু। চিত্রনাট্য, সংলাপ ও গীত রচনা করেছেন—প্রণব রায়। সংগীত পরিচালনা করেছেন—রবীন চ্যাটার্জী। চিত্রগ্রহণ ও সম্পাদনায় আছেন যথাক্রমে দেওজীভাই ও অমিয় মুখার্জী।

চরিত্র চিত্রণে আছেন—সন্ধ্যারাণী, কালী ব্যানার্জী, অনুপকুমার, বিকাশ রায়, কমল মিত্র, পাহাড়ী সান্যাল, তরুণকুমার, জহর রায়, সুখেন দাস, নৃপতি চ্যাটার্জী, মণি শ্রীমানী, অশোক মুখার্জী, অমূল্য সান্যাল, শ্রীমান শঙ্কর, শ্রীমান বাপী, বনানী চৌধুরী, মলিনা দেবী, রাজলক্ষ্মী দেবী, পদ্মা দেবী, কালীপদ চক্রবর্তী, প্রসাদ মুখার্জী এবং অনিল চ্যাটার্জী ও লিলি চক্রবর্তী। এস, বি, ফিল্মস্ ছবিটির পরিবেশক।

ভারতীয় নৃত্যকলা মন্দিরের 'চণ্ডালিকা' নৃত্যনাট্যের একটি মুহূর্ত

পর পর দু'টি টেস্টে টসে জেতার পর তৃতীয় টেস্টের টসে পরাজিত হয়ে ইংলণ্ডের অধিনায়ক কাউড্রে বিস্মিত হয়ে দেখছেন টসিং কয়েনটিকে। কাউড্রের অবস্থা দেখে পাশে দাঁড়িয়ে হাসছেন ওয়েস্ট ইণ্ডিজের অধিনায়ক সোবার্স।

খেলাধূলা

মান নিয়ে টানাটান

দ্বিতীয় টেস্টে পরাজয়ের পর তৃতীয় টেস্টে ভারত আবার জিতেছে। শুধু জিতেছে বললেই বোধহয় সবটা বলা হবে না—বলতে হবে, ভারত শোচনীয়ভাবে নিউজিল্যাণ্ডকে পরাজিত করেছে আট উইকেটে। ফলে ভারত এখন ২—১ টেস্টে এগিয়ে থাকলো।

ভারতের এই জয়লাভে আমরা আনন্দিত। স্বীকার করতে আজ সকলে বাধ্য যে এই জয়লাভ সহজ-সরল এবং সংগতভাবেই হয়েছে। এই জয়লাভের কথা বলতে গিয়ে কোন রকম প্রশ্ন তোলাই বাঞ্ছনীয় নয়। কিন্তু একটি প্রশ্ন বারবার আজ মনের কোণে উঁকি দিচ্ছে। আর সেই প্রশ্নটির হাত থেকে রেহাই পাবার কোন উপায় কারো আছে কি না জানি নে।

প্রথম আর তৃতীয় টেস্টে ভারত কতো সহজে হারিয়ে দিয়েছে নিউজিল্যাণ্ডকে। কিন্তু দ্বিতীয় টেস্টে ভারত কেন অমনভাবে পরাজিত হলো? দ্বিতীয় টেস্টে ভারতের অমনভাবে পরাজিত হবার কোন সংগত কারণ আছে কি? আজ ভারতের এই জয়লাভের পর সেই প্রশ্নটাই বড় বেশি বিব্রত করে তুলেছে ক্রিকেট উৎসাহীদের। তারা দিশেহারা হয়ে ভাবছেন, কিভাবে ভারত দ্বিতীয় টেস্টে পরাজিত হলো!

এ থেকে তাহলে একটি কথাই কি প্রমাণিত হয় না যে ভারতীয় ক্রিকেটের কোন মান অর্থাৎ স্ট্যাণ্ডার্ড নেই! তবে এ কিছু আর নতুন কথা নয়। ভারতীয় ক্রিকেটের যদি স্ট্যাণ্ডার্ড থাকতো তাহলে খেলোয়াড়রা দেশের মাটিতে এক রকম আর বিদেশের মাটিতে আর এক রকম খেলতেন না। শুধু তাই নয়—পর পর কোন খেলায় তাঁরা দিচ্ছেন সাফল্যের পরিচয়—তারপরই হঠাৎ আসে ক্রমাগত ব্যর্থতার পালা! পাঞ্জাবের মতো সে ব্যর্থতা লেগেই থাকে—ছাড়তে যেন আর চায় না।

তাই মনে হয় ভারতীয় ক্রিকেট বুঝি দুরারোগ্য এক ক্রনিক ব্যাধিতে ভুগছে। সে রোগের প্রকোপে মরণাপন্ন ভারতীয় ক্রিকেট অদ্ভুত পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়ে আজ দাঁড়িয়ে আছে হতাশার মাঝ সমুদ্রে।

জানি নে অতি দূর সমুদ্রের 'পর হালভাঙা নৌকোর মতো ভারতীয় ক্রিকেট আর কতকাল দারুচিনি দ্বীপের দিকে তাকিয়ে থাকবে। আর কতকাল সন্ধ্যা-সকাল ভারতীয় ক্রিকেট দল শুধু এই খেলাধোলা-খেলা খেলবে?

কিন্তু এই খেলাধোলা-খেলার শেষ সীমায় আমরা যে আজ উপস্থিত হয়েছি—এই কথাটা ভারতীয় ক্রিকেট কর্তৃপক্ষ আর খেলোয়াড়দের মনে রাখা উচিত। ভারত তৃতীয় টেস্টে জিতেছে—এ বড় খুশির কথা। আজ তাই আমাদের আনন্দের দিন। কিন্তু এই আনন্দের দিনে দ্বিতীয় টেস্টে ভারতের পরাজয়ের স্মৃতিটি মনের মণিকোঠায় বার বার জ্বালা ধরাচ্ছে। পাতৌদির হঠকারিতায় ভারত বে-কায়দায় পড়েছিলো ঠিকই, কিন্তু শুধু একটি ভুল সিদ্ধান্তের জন্যে ভারতকে যে হারতেই হবে—এমন কোন বাধ্যবাধকতা নেই—ভারতীয় দলের খেলোয়াড়রা তাহলে কি করছিলেন? জয়লাভ চাই নি—পরাজয়টিও কি তাঁরা মনে-প্রাণে চেষ্টা করলে ঠেকাতে পারতেন না......?   —শান্তিপ্রিয়

গতিহীন অগ্রগতি

নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে প্রথম ও তৃতীয় টেস্টে ভারতের জয়লাভ যদি ভারতীয় ক্রিকেটের অগ্রগতির পরিচায়ক হয়—তাহলে শুধু একটি কথাই বলতে হয় গতিহীন ভারতের এই অগ্রগতি। আর

প্রসন্ন

তৃতীয় টেস্টে ভারতের জয়লাভের পেছনে ছিলো প্রসন্নের অনবদ্য বোলিং নৈপুণ্য।

যে দল হোক ভারত যদি নিউজিল্যান্ডকে হারিয়ে অগ্রগতির বড়াই করতে যায় তাহলে আর আপশোষের সীমা থাকবে না, থাকতে পারে না।

কারণ ভারতীয় ক্রিকেট দল বিদেশের মাটিতে ক্রমাগত যে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়ে চলেছে—সেই ব্যর্থতার মাঝে ভারতের এই জয়লাভ মরুভূমিতে মরুদ্যানের মতো দিশাহারা পথিককে আশার আলোর ইশারা দেখায়—তাহলেই বুঝতে হবে যে ভারতীয় দলের এই জয়লাভ সার্থক হয়েছে। হোক নিউজিল্যান্ড তবু বিদেশের মাটিতে ভারতীয় দলের এই জয়লাভ যদি আত্ম-বিশ্বাসে ভারতীয় খেলোয়াড়দের বিশ্বাসী করে তুলতে পারে, তাহলেই বুঝতে হবে যে ভারতের এই জয়লাভে আশা করার মতো অন্তত কিছু ভবিষ্যৎ সাফল্যের সম্ভাবনা আছে।

তাই ভারতীয় ক্রিকেটের গতিহীন এই অগ্রগতির যুগে আজ আমরা কিছুটা আশান্বিত—আজ যেন আশার আলোর ইশারা দেখতে পাচ্ছি।

তৃতীয় টেস্টে ভারত নিউজিল্যান্ডকে হারিয়েছে আট উইকেটে। ভারতের এই জয়লাভ নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয় ক্রীড়া-নৈপুণ্যের পরিচায়ক। তবে ভারতের এই জয়লাভের পেছনে দলগত নৈপুণ্যের চেয়ে অনেক বেশি আছে ব্যক্তিগত ক্রীড়ানৈপুণ্য।

ভারতীয় বোলারদের মধ্যে প্রথম ইনিংসে প্রসন্ন আর দ্বিতীয় ইনিংসে নাদকার্নীর মারাত্মক বোলিংই ভারতকে জয়লাভের পথে এগিয়ে দিয়েছে সব থেকে বেশি। আর ব্যাটিং-এ অভাবনীয় নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়ে ওয়াদেকার জয়-লাভের সেই পথ করেছিলেন প্রশস্ত।

শুধু মাত্র শত রানই করেন নি ওয়াদেকার, যখন আউট হলেন তখন দেখা গেলো ওয়াদেকারের পেছনে আছে ১৪৩ রানের একটা মস্ত বড় ইনিংসের স্মৃতি।

যাই হোক তৃতীয় টেস্টে টসে জিতে প্রথম ব্যাটিং করার সুযোগ পেয়েছিলো নিউজিল্যান্ড। কিন্তু সে সুযোগ তারা কাজে লাগাতে পারলো না। খারাপ আবহাওয়ার মধ্যে প্রথম দিনে তারা ৫টা উইকেট হারিয়ে করেছিলো ১৪৪ রান। কিন্তু দ্বিতীয় দিনে খেলার ধারা গেলো একদম পাল্টে। প্রসন্নর মারাত্মক বোলিং ডেকে আনলো বিপর্যয়। দ্বিতীয় দিন সকালে প্রসন্ন ধরলেন মারাত্মক মূর্তি—ফলে মাত্র ১৮৬ রানে শেষ হয়ে গেলো নিউজিল্যান্ডের প্রথম ইনিংস। প্রসন্নর বোলিং-এর বিরুদ্ধে নিউজিল্যান্ডের ব্যাটসম্যানরা মোটে খেলতেই পারেন নি।

সেইদিনই অর্থাৎ খেলার দ্বিতীয় দিনেই ভারত ৫টা উইকেট হারিয়ে করলো ২০০ রান। তৃতীয় দিন ভারত ৩২৭

নাদকার্নী

অনেকদিন পরে নাদকার্নী আবার আক্রমণাত্মক বোলারের ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন।

রানে শেষ করলো তার প্রথম ইনিংস। খেলা তখন মোটামুটিভাবে ভারতের মুঠোর মধ্যে। খেলার ফলাফল আরো পরিষ্কার হয়ে গেলো যখন ১৯৩ রানের মধ্যে পড়ে গেলো নিউজিল্যান্ডের ৪টি উইকেট। প্রথম ইনিংসে প্রসন্নর মতো দ্বিতীয় ইনিংসে নাদকার্নী ধরলেন সংহার মূর্তি। নাদকার্নীর বোলিং এ্যাভারেজ দাঁড়ালো ৩০ ওভার ১২টি মেডেন, ৪৩ রান ৬টি উইকেট। ফলে ১৯৯ রানে শেষ

ওয়াদেকার

শত রানের মুখ দেখে ভারতকে জয়লাভের পথে এগিয়ে দিয়েছিলেন ওয়াদেকার।

হয়ে গেলো নিউজিল্যান্ডের দ্বিতীয় ইনিংস।

জয়লাভের জন্যে ভারতের তখন দর-কার মাত্র ৫৯ রান। ইঞ্জিনিয়ার আর আবিদ আলীকে হারিয়ে ভারত তুলে ফেললো জেতার জন্যে প্রয়োজনীয় রান। ফলে তৃতীয় টেস্টে ভারত ৮ উইকেটে হারিয়ে দিলো নিউজিল্যান্ডকে!

এই লেখা যখন আপনাদের হাতে পড়বে তখন ভারত-নিউজিল্যান্ড চতুর্থ টেস্ট ম্যাচও শেষ হয়ে যাবে! জানি না সে খেলায় ভারতের বরাতে কি আছে! যাই হোক ভারতীয় দলের খেলোয়াড়দের বিশ্বাস করার উপায় নেই—কারণ তাঁদের খেলার ধারা অনেকটা সেই না আঁচালে বিশ্বাস নেই গোছের......!!

দল বদলের পালা

শুধু কলকাতা ময়দান, আই এফ এ অফিসের সামনে কিম্বা হাইকোর্টের কাছা-কাছি একটি বিশেষ অঞ্চলে তীব্র উত্তে-জনার জোয়ার বইছে না—এ উত্তেজনার

ছোঁয়া লেগেছে বাংলা দেশের প্রতিটি শহরে, প্রতিটি গ্রামে।

ফুটবল খেলোয়াড়দের দল বদলের পালাগানে কলকাতা ময়দান এখন প্লাবিত। গুজবে গুজবে ছেয়ে যাচ্ছে বাংলা দেশের আকাশ-বাতাস, জল্পনা-কল্পনার যেন আর সীমা-পরিসীমা নেই। দামী খেলোয়াড়দের নিয়ে নামী দলগুলোর মধ্যে চলেছে টাগ অফ ওয়ার।

সেই টাগ অফ ওয়ারে এখন দেখা যাচ্ছে মোহনবাগানের জয়জয়কার। ইস্টবেঙ্গলের ঘর ভেঙে মোহনবাগান ইতিমধ্যেই নঈম আর হাবিবের মতো খেলোয়াড়কে দলে আনতে সমর্থ হয়েছেন। আর এই দু'জন খেলোয়াড়কে নিয়েই বাংলা দেশের ফুটবল জগতে গুজব ছড়িয়েছিলো সব থেকে বেশি।

কিন্তু একটা বিষয় কিছুতেই বোধগম্য হচ্ছে না যে মোহনবাগানেরও তো অনেক নামকরা খেলোয়াড় আছেন। এখনো পর্যন্ত তাঁরা দলত্যাগও করেন নি—তার ওপর ইস্টবেঙ্গল ক্লাব থেকে আরো নামকরা খেলোয়াড়দের দলে আনা হলো—তাহলে এঁরা খেলবেন কোথায়? টিম তো মোহনবাগানের একটাই হবে!

এর ওপর আবার লীগের খেলার ফিরতি খেলাগুলো যদি অনুষ্ঠিত না হয়—তাহলে আর দেখতে হবে না। কোথাকার জল যে কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে তা এখন থেকেই বলা যেমন সম্ভব নয়, তেমনি সংগতও নয়।

তবে শেষ পর্যন্ত ভালোয় ভালোয় লীগের খেলা হলে হয়। আর যাই হোক গতিক বিশেষ সুবিধে নয়—কখন যে কোথা দিয়ে কি হয়ে যাবে, আগে-ভাগে সে কথা জানা আজ আর বোধহয় শিবের বাবারও সাধ্য নয়......।

না পায় হালে পানি

কলকাতার হকি লীগের খেলা সুরু হয়েছে পুরোদমে কিন্তু খেলাগুলো যেন ঠিক আর হালে পানি পাচ্ছে না। খেলা যেন জমেও জমছে না। অথচ কলকাতা ময়দানের প্রধান দলগুলো ইতিমধ্যেই প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হয়েছে। মাঠে নেমেছে ইস্টবেঙ্গল, নামছে মোহনবাগান।

তবু যে এবারের হকি লীগ দর্শকদের ঠিক টানতে পারছে না। ইস্টবেঙ্গল কিম্বা মোহনবাগান ক্লাবের খেলা থাকলে তবু দর্শক আসনে কিছু মুখ দেখা যায়—অন্য খেলাগুলোর বেলায় সে গুড়ে বালি! মাঠ থাকে একদম ফাঁকা।

হকি খেলার সময় কলকাতা ময়দানের অবস্থা দেখলে স্পষ্ট বোঝা যায় যে হকি খেলা কলকাতার দর্শকদের এতোটুকুও আকর্ষণ করতে পারে না। কলকাতা ময়দানে হকি খেলার এতটুকুও দাম নেই। বাংলা দেশের দর্শক আর

হাবিব
মোহনবাগান দলের আক্রমণভাগের নবাগত খেলোয়াড়।

খেলোয়াড়রা হকি খেলাকে ঠিক যেন মনে-প্রাণে গ্রহণ করতে পারছেন না!

তাই দেখা যায় ভারতীয় দলে বাংলা দেশের দু-একজন খেলোয়াড়ের ঠাঁই হলেও, বাঙালী খেলোয়াড় একজনও স্থান পান না। অথচ একমাত্র হকি খেলাই খেলাধুলার আন্তর্জাতিক ক্রীড়াঙ্গনে ভারতকে বার বার এনে দিয়েছে অমূল্য সম্মান। হকি খেলাতেই শুধু ভারত অলিম্পিক প্রতিযোগিতায় স্বর্ণপদক লাভ করতে সমর্থ হয়েছে।

তবু হকি খেলার সেই আকর্ষণ বাংলা দেশের ছেলেদের মধ্যে দেখা যায় না—ক্লাবগুলোকে দেখা যায় না ফুটবলের মতো হকিকে নিয়ে মাতামাতি করতে—আর বি এইচ এ বলে প্রতিষ্ঠানটি আছে তার কাজ শুধু কর্তামি করা ছাড়া যেন আর কিছুই নয়......।

অথচ বাংলাদেশেও যে আজ হকি খেলার উন্নতি করার প্রয়োজন এ কথা বোধহয় না বললেও চলে। সর্বভারতীয় দলে বাংলার

নঈম
ইস্টবেঙ্গল ছেড়ে নঈমও এবার চলে এসেছেন মোহনবাগানে।

এবং বাঙালী খেলোয়াড়দেরও যে স্থান পাবার যোগ্যতা অর্জন করতে হবে—এ কথাটা আমরা যেন বুঝেও বুঝি না......!!

সমাচার দর্শন

ভারতীয় এ্যাথলেট দল পশ্চিম জার্মানীতে আমন্ত্রিত হয়েছেন। এ আমন্ত্রণ শুধু মাত্র প্রতিযোগিতার জন্যেই নয়—শিক্ষার জন্যেও! পশ্চিম জার্মানীর এ্যাথলেটিক ফেডারেশন ভারতীয় এ্যাথলেটদের প্রতিযোগিতা ও শিক্ষাব্যবস্থা করবেন। বিষয়টি ভারতীয় স্পোর্টস কাউন্সিলের অনুমোদনের জন্যে জানানো হয়েছে!

অলিম্পিকের ভারতীয় এ্যাথলেটদের এই প্রশিক্ষণ-প্রতিযোগিতাটি হয়তো যথেষ্ট কাজে লাগবে মেক্সিকো অলিম্পিক ক্রীড়ানুষ্ঠানে আন্তর্জাতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতায়।

* * * *

পাকিস্তান বনাম কমনওয়েলথ দলের প্রথম বে-সরকারী টেস্ট ম্যাচে পাকিস্তান ক্রিকেট দল ১০৫ রানে জিতেছে। পাকিস্তান প্রথম ইনিংসে ৩৬৬ আর দ্বিতীয় ইনিংসে ৫ উইকেটে ১৬৯ রান করে। উত্তরে কমনওয়েলথ দলের প্রথম ইনিংস ২৯৮ আর দ্বিতীয় ইনিংস ১৩২ রানে শেষ হয়ে যায়।

* * * *

গত বছর ইংলণ্ড সফরকারী ভারতীয় স্কুল ক্রিকেট দলের প্রত্যেক খেলোয়াড়কে একশ' টাকা করে পুরস্কার হিসেবে দেওয়া হবে। ইংলণ্ড ভ্রমণের সময় ভারতীয় স্কুল দলের খেলোয়াড়রা মাঠের মধ্যে এবং বাইরে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়ে দেশের সুনাম বাড়িয়ে এসেছেন!

এই প্রসংগে ভারতীয় শিক্ষামন্ত্রক আরো একটি বিষয় বিবেচনা করছেন। বিষয়টি হলো—যে সমস্ত ছাত্র খেলোয়াড়রা আর্থিক অসচ্ছলতার জন্যে পড়াশোনা চালিয়ে যেতে অসুবিধা ভোগ করছেন তাঁদের আর্থিক সাহায্য দেওয়া হবে। নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয় এই প্রয়াস।

আইন-কানুনের দুনিয়া

কট আউট নিয়ে মতভেদ হবার মতো অনেকগুলো সংগত কারণ আছে। বাউন্ড ক্যাচ, গ্রাউন্ড ক্যাচ প্রভৃতি কত রকম ক্যাচের কথাই তো আমরা শুনি—কিন্তু তার অনেকগুলোই ক্রিকেট খেলার আইন-কানুনের মধ্যে পড়ে না। তাই এই বিষয়টি নিয়ে গোলমাল মিটিয়ে ফেলার দরকার সবার আগে। এই সংখ্যায় তাই 'কট আউট' সম্বন্ধে আলোচনা করা হলো।

ক্রিকেট খেলার আইন-কানুনের ৩৫ নং নিয়মটি হলো কট আউটের। সেই নিয়মে বলা হয়েছে—

ব্যাটসম্যান কট আউট হবে যদি তার ব্যাটে লেগে অথবা ব্যাট ধরে থাকা

ফিল্ডসম্যানের হাত মাটির ওপর আছে ঠিক, কিন্তু বল ফিল্ডারের হাতের মধ্যে। বল মাটি স্পর্শ করে নি। সুতরাং ব্যাটসম্যান আউট।

অবস্থায় দুহাতের কব্জীর শুরু পর্যন্ত (কব্জীর নয়) যে কোন স্থানে লেগে বলটি শূন্যে ওঠে এবং মাটিতে পড়ে যাবার আগে কোন ফিল্ডসম্যান সেটা লুফে নেয় যদিও বলটি সে তার শরীরের সংগে জাপ্টিয়ে ধরে কিম্বা বলটি হঠাৎ তার পোষাকের মধ্যে এসে পড়ে। ক্যাচ ধরার সময় এবং তার অব্যবহিত পর পর্যন্ত ঐ ফিল্ডারের শরীরের কোন অংশই কোনমতেই সীমানার বাইরে যেতে পারবে না।

নিম্নলিখিত অবস্থায় ব্যাটসম্যান কট আউট হয়ে আউট হবে—

১) ক্যাচ লোফার পর হাত মাটিতে ঠেকলেও অথবা ক্যাচ লোফার সময় যে হাতে ক্যাচ ধরা হচ্ছে সেই হাত মাটির ওপর থাকলেও কোন ক্ষতি হবে না—যদি বলটা মাটি না স্পর্শ করে থাকে।

২) ব্যাটে লেগে শূন্যে ওঠার সময় বল যদি ব্যাটসম্যানের দেহ কিম্বা পোষাক স্পর্শ করে, তাহলেও কোন ক্ষতি হবে না—অর্থাৎ বলটা লুফে নিতে পারলে ব্যাটসম্যান আউট হবে।

৩) হাত দিয়ে না ধরলেও ব্যাটসম্যান আউট হবে, যেমন ব্যাটে লাগার পর বলটা যদি উইকেট-রক্ষকের প্যাডের মধ্যে আটকে যায়।

৪) বাউণ্ডারী লাইনের ওপর হেলান দিয়ে মাঠের সীমানার মধ্যে দাঁড়িয়ে থেকে বলটি যদি বাউণ্ডারী লাইনের ওপর থেকেও লোফা হয়, তাহলেও ব্যাটসম্যান আউট হবে। তবে মাঠের মধ্যে থেকে বলটি লুফতে হবে, ফিল্ডসম্যান বাউণ্ডারী লাইন অতিক্রম করে লুফলে চলবে না।

৫) ব্যাট দিয়ে বল মারার পর এবং বলটি মাটিতে পড়ার আগে অর্থাৎ বলটির মাটি স্পর্শের পূর্বে ব্যাটসম্যান যদি আইনসংগতভাবে দ্বিতীয়বার ব্যাট দিয়ে বলটিকে আঘাত করে তাহলেও ব্যাটসম্যান এই নিয়ম অনুসারে আউট হতে পারে।

৬) বাউণ্ডারী লাইন অতিক্রম করার আগে বলটি যদি মাঠের মধ্যে শূন্যে কোন স্থানে আটকে যায়, তাহলে সে বল নিয়ে ফিল্ডারদের আবেদনে আম্পায়ার ব্যাটসম্যানকে আউটের নির্দেশ দেবেন—যদি না সেই স্থানটা আগে থেকে বাউণ্ডারী বলে স্থির হয়ে থাকে।

তবে নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে ব্যাটসম্যান আউট হবে না—

যখন ব্যাট ধরা নেই, অর্থাৎ ব্যাটের হ্যাণ্ডেলে হাত নেই, তখন সেই হাতে বল লেগে শূন্যে উঠলে ক্যাচ হবে না। যেমন কোন বাম্পার বলের আঘাত থেকে মুখ রক্ষা করার জন্যে ব্যাটসম্যান একটা হাত মুখের সামনে ধরলো আর বলটা সেই হাতে লাগার পর শূন্যে উঠলো। কোন ফিল্ডার সে বলটা লুফে নিলেও ব্যাটসম্যান এক্ষেত্রে আউট হবে না।

মজার খেলা ক্রিকেট

ম্যারাথন টেস্ট ম্যাচ

ক্রিকেট ইতিহাসের পাতায় পাতায় ছড়িয়ে আছে নানান চিত্তাকর্ষক কাহিনীর মালমশলা। একটি মালায় এদের গেঁথে তুললে রাজার খেলা ক্রিকেটকে হয়ত বলে বসবেন মজার খেলা ক্রিকেট। ক্রিকেটের বৈশিষ্ট্য এর বৈচিত্র্যতায়; ক্রিকেটের আকর্ষণ তার অনিশ্চয়তায়। ক্রিকেটের এই অনিশ্চয়তার আবরণ উন্মোচন করতে গিয়ে কি এক মজার কাণ্ড ঘটেছিল, সেই কাহিনী দিয়েই শুরু করছি আমার গল্পের কথামালা।

শুনেছেন কখনো দশদিনের টেস্ট খেলার কথা; অনেকেই হয়ত ভাবছেন, একি অনাসৃষ্টি—দশদিনের টেস্ট ম্যাচ আবার কি? সকলেই জানেন যে টেস্ট ক্রিকেট মানেই ব্যাটে-বলে পাঁচ দিনের

মাইক স্মিথ

যুদ্ধ; হোক সে 'ছাইয়ের লড়াই' বা 'রাবার-যুদ্ধ'। হ্যাঁ তিনদিনের টেস্ট খেলার কথা অবশ্য একবার উঠেছিল, বছর কয়েক আগে ১৯৫৯ সালে। ভারতীয় ক্রিকেট দল সেবার ইংলণ্ড সফরে গিয়েছিল গাইকোয়াড়ের নেতৃত্বে। পাঁচটি টেস্টেই ভারতের ভাগ্যে জুটেছিল শোচনীয় পরাজয়ের আস্বাদ। আর প্রায় সব ক'টি টেস্টই খেলার পঞ্চমদিন পর্যন্ত গড়ায় নি। ইংলণ্ডের ক্রিকেটের কর্মকর্তাদের একাংশ তখন মনে হয় ব্যঙ্গ করেই রব তুলেছিলেন যে ভারতের সঙ্গে টেস্ট খেলাগুলি তিনদিনেরই হওয়া উচিত। সেদিন নীরবে এই অপমানবাণী সহ্য করা ছাড়া ভারতের আর কোন উপায় ছিল না। পরের বারই যখন টেড ডেক্সটার তাঁর দলবল নিয়ে ভারত সফরে এলেন তখন পূর্বের অপমানের যোগ্য প্রত্যুত্তর ভারত দিয়েছিল। দুটি টেস্টে ইংলণ্ডকে পরাজিত করে ভারত সেবার 'রাবার' ছিনিয়ে রাখল। মাইক স্মিথও দলবল নিয়ে এসে সে 'রাবার' উদ্ধার করতে পারেন নি। সেই ১৯৬১-৬২ সিরিজের পর এবার ১৯৬৭ সালে দেশের মাটিতে ইংলণ্ড আবার 'রাবার' ভারতের কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছে। কিন্তু যাই হোক ইংলণ্ডের ক্রিকেটের কর্তাব্যক্তিদের মুখ থেকে তিনদিনের টেস্ট খেলার বুলি আর নিঃসৃত হয় নি।

ইংলণ্ডকেই বলা হয় ক্রিকেটের জনক। যখন বৃটিশ সাম্রাজ্যে সূর্য অস্ত যেত না তখন ক্রিকেটের প্রচার এবং প্রসার করেছে ইংরেজরাই। যেখানেই ইংরেজদের উপস্থিতি সেখানেই শোনা গিয়েছে ব্যাট-বলের মধুর আলাপন। ক্রিকেটের প্রথম বীজ যেমন রোপিত হয়েছে ইংলণ্ডের মাঠে; ক্রিকেটের আইন-কানুনও সব রচিত হয়েছে ইংলণ্ডের মাটিতেই।

হঠাৎ ইংলণ্ডের ক্রিকেট ভাগ্যবিধাতাদের মাথায় এক খেয়াল চাপল, ক্রিকেটের অঙ্গ থেকে অনিশ্চয়তাকে দূরে সরাতে হবে। পথ হল সময়ের সীমাকে উপেক্ষা করা ; স্থির হল "টাইমলেস টেস্ট" খেলতে হবে। সে বছর সামনেই ছিল এম-সি-সি দলের দক্ষিণ আফ্রিকা সফর। ঠিক হল এম-সি-সি এবং স্প্রিং বকের পঞ্চম টেস্টটি হবে অনির্দিষ্ট সময়ের টেস্ট। ইংলণ্ড দলের অধিনায়ক ছিলেন সেবার ক্রিকেটের সেই বিখ্যাত চরিত্র ওয়ালী হ্যামণ্ড। দক্ষিণ আফ্রিকার দলপতি এ্যালান মেলভিল। ১৯৩৯ সালের প্রথম দিকে এক সকালে ডারবানে শুরু হল বিচিত্র টেস্ট ম্যাচটি; ম্যারাথন টেস্ট বললেও ভুল বলা হবে না। শুরু হল খেলা, প্রথমে ব্যাট করতে মাঠে নামল দক্ষিণ আফ্রিকা। প্রথম ইনিংসে ৫৩০ রান করে তারা সকলে প্যাভেলিয়নে ফিরল। দুজন খেলোয়াড় করলেন সেঞ্চুরী। এরপর ব্যাট ধরল ইংলণ্ড: কিন্তু অনেক টেনে-টুনে দলীয় রান সংখ্যা হল মাত্র ৩১৬। দ্বিতীয় ইনিংসেও দক্ষিণ আফ্রিকার ব্যাটসম্যানরা জোর খেললেন। এই ইনিংসে ৪৮১ রান সংগ্রহ করে এগিয়ে থাকল দক্ষিণ আফ্রিকা মোট ৬৯৫ রানে। ইতিমধ্যে কিন্তু দুটি দিন অতিক্রান্ত হয়েছে।

সময়ের কোন সীমা নেই, কিন্তু জয়ের জন্য ইংলণ্ডকে তুলতে হবে ৬৯৬ রান। সকলেই ভাবল পরাজয় ইংলণ্ডের নিশ্চিত। অনিশ্চয়তা অলক্ষ্যে চুপি চুপি বুঝি বসে মুচকি হাসছিল। ইংলণ্ডের ব্যাটসম্যানেরা উইকেটে দাঁড়িয়ে হয়ে উঠলেন অজেয়। সপ্তম দিন ইংলণ্ড হারাল মাত্র একটি উইকেট সারাদিন খেলে; আর অষ্টম দিন ভাসিয়ে দিল বৃষ্টি। নবম দিনের শেষে স্কোরবোর্ডে দেখা গেল লেখা ইংলণ্ড ৪৯৬ রান তিন উইকেটের বিনিময়ে। গীবস সেঞ্চুরী করলেন আর বিল এডারিচ ব্যাট ছাড়লেন ডাবল সেঞ্চুরী করে। দশম দিন অধিনায়ক ওয়ালী হ্যামণ্ড করলেন শতরান। চা পানের বিরতির সময় দেখা গেল ইংলণ্ড প্রায় লক্ষ্য সীমায় পেঁৗছে গিয়েছে! ইংলণ্ড ৬৫৪ রান সংগ্রহ করেছে পাঁচ উইকেটে। জয় ইংলণ্ডের হাতের মুঠোর মধ্যে: প্রয়োজন মাত্র ৪২ রানের, হাতে পাঁচটি উইকেট;

ডেক্সটার

কিন্তু বিধাতা বিরূপ; চা-পানের পর শুরু হল প্রচণ্ড বৃষ্টি। এদিকে ইংলণ্ড দলের পক্ষে আর থাকা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছে। কারণ ইংলণ্ডগামী জাহাজ ডারবান বন্দরে আর বিলম্ব করতে পারছে না; একেই ক্রিকেট দলের জন্য যাত্রার সময় বিলম্বিত হয়েছে। দুই অধিনায়ক এবং ওদেশের কর্মকর্তাদের মধ্যে সভা বসল, অবশেষে স্থির হল খেলা পরিত্যক্ত বলে ঘোষণা করা হবে। ইংলণ্ডের দলবল প্রায় মাঠ থেকেই গিয়ে উঠে বসলেন জাহাজে। "টাইমলেস টেস্ট" পরিকল্পনার এখানেই অপমৃত্যু ঘটল। তবে ম্যারাথন টেস্ট হিসাবে ইতিহাস হয়ে রইল ডারবানের এই দশ দিনের টেস্ট ম্যাচটি।

—শ্রীঅমিতাভ

সম্পাদিকা—জয়ন্তী সেন
বসুমতী (প্রাঃ) লিঃ-এর পক্ষে ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীটস্থ কলিকাতা-১২
বসুমতী প্রেস হইতে শ্রীসুকুমার গুহমজুমদার কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বসুমতীর কালজয়ী গ্রন্থরাজি

॥ গ্রন্থনসৌষ্ঠবে নয়নাভিরাম ॥

কালিদাস গ্রন্থাবলী---	১ম	৮-০০
কালিদাস গ্রন্থাবলী---	২য় (যন্ত্রস্থ)	৬-০০
কালিদাস গ্রন্থাবলী--	৩য়	৮-০০
মাইকেল গ্রন্থাবলী---	১ম	৪-৫০
মাইকেল গ্রন্থাবলী---	২য়	৪-০০
বঙ্কিম গ্রন্থাবলী (উপন্যাস)---	১ম	৪-৫০
বঙ্কিম গ্রন্থাবলী (উপন্যাস)---	২য়	৪-৫০
বঙ্কিম গ্রন্থাবলী (উপন্যাস)---	৩য়	৪-৫০
বঙ্কিম গ্রন্থাবলী (সাহিত্য)---	১ম	৪-৫০
বঙ্কিম গ্রন্থাবলী (সাহিত্য)---	২য়	৪-৫০
বঙ্কিম গ্রন্থাবলী (সাহিত্য)---	৩য়	৪-৫০
দ্বিজেন্দ্রলাল গ্রন্থাবলী---	১ম	৬-০০
" "	২য়	৬-০০
" "	৩য়	৮-০০
সেক্সপীয়র গ্রন্থাবলী---	১ম খণ্ড	৪-৫০
সেক্সপীয়র গ্রন্থাবলী---	২য় খণ্ড	৪-৫০
ত্রৈলোক্য গ্রন্থাবলী---	১ম	৩-০০
ত্রৈলোক্য গ্রন্থাবলী---	২য়	৩-০০
দীনবন্ধু মিত্র গ্রন্থাবলী---	১ম	৩-০০
দীনবন্ধু মিত্র গ্রন্থাবলী---	২য়	৩-০০
মানিক গ্রন্থাবলী---	১ম	৪-০০
মনিক গ্রন্থাবলী---	২য়	৪-০০
দামোদর গ্রন্থাবলী---	১ম	৪-৫০
দামোদর গ্রন্থাবলী---	৪র্থ	৪-০০
অমৃতলাল গ্রন্থাবলী---	১ম	৪-০০
অমৃতলাল গ্রন্থাবলী---	২য়	৪-০০
অমৃতলাল গ্রন্থাবলী---	৩য়	৪-০০
যোগেশ গ্রন্থাবলী---	২য়	৩-০০
বিহারীলাল গ্রন্থাবলী---		৩-৫০
রঙ্গলাল গ্রন্থাবলী---		৩-০০
উপেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় গ্রন্থাবলী---		৩-০০
রামপ্রসাদ সেন গ্রন্থাবলী---		৩-০০
হরপ্রসাদ শাস্ত্রী গ্রন্থাবলী---		৫-০০
ঈশ্বরগুপ্তের গ্রন্থা:---	১ম ও ২য় খণ্ড	৫-০০
ভারতচন্দ্র গ্রন্থাবলী---		৩-০০
স্কট গ্রন্থাবলী---	২য়	৩-০০
স্কট গ্রন্থাবলী---	৩য়	৩-০০

দীনেন্দ্র রায় গ্রন্থাবলী---	১ম	৪-৫০
দীনেন্দ্র রায় গ্রন্থাবলী---	২য়	৪-৫০
নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ের গ্রন্থা:---		৪-০০
প্রভাবতী দেবী গ্রন্থাবলী---		৩-৫০
বিভূতিভূষণ মুখো: গ্রন্থাবলী---		৪-৫০
রামনাথ বিশ্বাস গ্রন্থাবলী---		৩-৫৫
শিবরাম চক্রবর্তী গ্রন্থাবলী---		৩-৫০
শৈলজা গ্রন্থাবলী---	১ম	৩-৫০
শৈলজা গ্রন্থাবলী---	২য়	৩-৫০
মণিলাল বন্দ্যো: গ্রন্থা:---	১ম	৩-৫০
মণিলাল বন্দ্যো: গ্রন্থা:---	২য়	৩-৫০
অসমঞ্জ গ্রন্থাবলী---		৪-০০
সৎসাহিত্য গ্রন্থাবলী---	১ম	৪-০০
সৎসাহিত্য গ্রন্থাবলী---	২য়	৪-০০
সৎসাহিত্য গ্রন্থাবলী---	৩য়	৪-০০
সৎসাহিত্য গ্রন্থাবলী---	৪র্থ	৩-০০
রামপদ মুখার্জী গ্রন্থাবলী---		৪-০০
হেমেন্দ্র রায় গ্রন্থাবলী---		৪-০০
মতিলাল দাসের গ্রন্থাবলী---		৩-০০
জগদীশ গুপ্তের গ্রন্থাবলী---		৩-৫০
বিভূতিভূষণ ভট্টের গ্রন্থাবলী---		৩-৫০
যদুনাথ ভট্টা: গ্রন্থা:---	৩য় খণ্ড	৩-০০
শচীশ চট্টো: গ্রন্থা:---	২য় ভাগ	৩-০০
গৌরীন্দ্রমোহন মুখো: গ্রন্থা:---	৩য়	৪-০০
গৌরীন্দ্রমোহন মুখো: গ্রন্থা:---	৫ম	৪-০০
বিদ্যাসুন্দর গ্রন্থাবলী---		৬-৫০
কথাসরিৎসাগর---	১ম ভাগ	৪-০০
কথাসরিৎসাগর---	২য় ভাগ	৪-০০
চারণকবি মুকুন্দদাসের গ্রন্থা:---		৩-০০
অরবিন্দ দত্তের গ্রন্থাবলী---		৩-০০
জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের গ্রন্থাবলী---	১ম, ২য়, ৩য়---প্রতি খণ্ড	৪-০০
ক্ষীরোদ গ্রন্থাবলী ৪র্থ হইতে	৮ম খণ্ড---প্রতি খণ্ড---	৩-৫০
ডিকেন্সের গ্রন্থাবলী---		৩-৫০
চারু বন্দ্যোপাধ্যায়ের গ্রন্থাবলী---		৪-০০
বিলাতী গুপ্তকথা---	২য়ভাগ	৫-০০

নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের গ্রন্থাবলী---	১ম ও ২য় ভাগ---প্রতি ভাগ	৩-০০
হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষের গ্রন্থাবলী---		৩-০০
নারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্যের গ্রন্থাবলী---	৩য় খণ্ড ও ৬ষ্ট খণ্ড---প্রতি খণ্ড	৩-০০
যোগেন্দ্র বিদ্যাভূষণের গ্রন্থাবলী---	২য় ভাগ	৩-০০
ভারতীয় সঙ্গীতের ইতিহাস--- গোপেশ্বর বন্দ্যো:---	১ম ও ২য় ভাগ প্রতি খণ্ড	৫-০০
কবিকঙ্কণ চণ্ডী---		৪-৫০
জ্যোতিষ রত্নাকর---		৩-৫০
পরলোক---		৪-৫০
পরলোক রহস্য---		২-০০
পরলোক ও প্রেততত্ত্ব---		৪-৫০
দৃশ্যকাব্য পরিচয়---		১০-০০
নাড়ীজ্ঞান প্রদীপিকা---		৩-০০
ভারত প্রতিভা---		৫-০০
নেপোলিয়ন বোনাপার্ট---		৫-০০
সাধক কমলাকান্ত---		২-৫০
মহারাজ নন্দকুমার---		৩-০০
ছত্রপতি শিবাজী---		৩-০০
জালিয়াৎ ক্লাইভ---		৩-০০
বিক্রমাদিত্য---		৩-০০
বিসমার্ক---		২-০০
সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তীর আত্মজীবনী---		৩-০০
যৌন-মনোদর্শন		
২য় ভাগ : স্বয়ং রতি		৪-০০
৩য় ভাগ : কামাবেগের বিশ্লেষণ		৪-০০
৪র্থ ভাগ : প্রেম ও পীড়া		৪-০০
৫ম ভাগ : কামাবেগের নিয়ন্ত্র- কালিকত্বের ব্যাপার সমূহ		৪-০০
৬ষ্ঠ ভাগ : রমণীর যৌন আবেগ		৪-০০
কুমারীতন্ত্র ---		৪-০০
ANANDAMATH (শ্রীঅরবিন্দ কর্তৃক ইংরেজী অনুবাদ)		৪-০০
DAVID HARE		৪-০০

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড ॥ ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলি-১

চিনতে পেরেছেন নিশ্চয়ই

হাঁ, আমি (কুকমী) গুঁড়ো মশলা !

কেন আমাকে দিয়ে
রান্না করবেন,
জানেন তো ?

① আমি প্রথম শ্রেণীর
বাছাই ও বাছাই
মশলায় প্রস্তুত

② আমি সময়, পরিশ্রম
ও অপচয় বাঁচাই

③ আমি বৈজ্ঞানিক প্রথায়
সর্বাধুনিক মেশিনে
প্রস্তুত এবং নির্ভেজাল

④ আমাকে শিশু ও রুগীর
পথ্যে নির্ভয়ে ব্যবহার
করতে পারবেন

⑤ আমি রান্নার
স্বাদ বৃদ্ধি করি

16 MAR 1968

২৩১ } মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড, কলিকাতা ৭, ফোন { ৩৩-১২০২ ৩৩-২০৮১ মিল-কাশীপুর
২৩৫ } "গ্রাম-স্পাইস মার্ট"

নিজস্ব মিলে প্রস্তুত

'কুকমী'—সর্বাধিক বিক্রীত গুঁড়ো মশলা

পনের লক্ষ প্যাকেট মাসিক বিক্রয়

১২৫ বৎসরের অধিক প্রাচীন ও বর্তমানে মশলার বৃহত্তম প্রতিষ্ঠান

কৃষ্ণচন্দ্র দত্ত (স্পাইস) প্রাঃ লিঃ

সাপ্তাহিক বসুমতী

কলকাতায়

অধ্যাপকদের মৌন মিছিল

রাজ্যপাল ও নির্বাচনী কমিশনার

সিনেমা কর্মীদের ধর্মঘট

বর্ষ: ৪০শ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ৭ই চৈত্র, ১৩৭৪ বঙ্গাব্দ] OLDEST WEEKLY OF NORTH INDIA [72nd year, No. 40, 21st Mar., 1968

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয়		২৪৯৯
আজকের মানুষ		২৫০০
রঙ্গদর্শন		২৫০১
সপ্তাহের বোঝা	— কৃত্তিবাস ওঝা	২৫০৫
ভারতদর্শন		২৫০৭
আন্তর্জাতিক		২৫১০
কবে হাওয়া দেবে	— বিষ্ণু দে	২৫১৪
আবির্ভাব	— দুর্গাদাস সরকার	২৫১৪
অগ্নিযুগের একটি অধ্যায়	— অনন্ত সিংহ	২৫১৬
ভিয়েৎনাম : ঝড়ের কেন্দ্র (প্রবন্ধ)	— বরুণ রায়	২৫১৯
আবুল কাশেম ফজলুল হক (প্রবন্ধ)	— শ্রীশশাঙ্কশেখর সান্যাল	২৫২৭

সাহিত্য-সম্রাট—বন্দেমাতরম্ মন্ত্রের ঋষি

বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থাবলী

—উপন্যাস—

প্রথম খণ্ড :—রাজসিংহ, বিষবৃক্ষ, দুর্গেশনন্দিনী, মৃণালিনী, রজনী। [সচিত্র] মূল্য—তিন টাকা

দ্বিতীয় খণ্ড :—দুর্গেশনন্দিনী, কৃষ্ণকান্তের উইল, ইন্দিরা, রাধারাণী, সীতারাম। মূল্য—তিন টাকা

তৃতীয় খণ্ড :—আনন্দমঠ, চন্দ্রশেখর, কপালকুণ্ডলা, দেবী চৌধুরাণী। [সচিত্র] মূল্য—৩, টাকা।

—সাহিত্য—

প্রথম খণ্ড :—কৃষ্ণচরিত্র, লোকরহস্য, বিবিধ প্রবন্ধ (১ম)। মূল্য—তিন টাকা

দ্বিতীয় খণ্ড :—(১ম ভাগ অনুশীলন), মুচিরাম গুড়, বিবিধ প্রবন্ধ (২য়), বিজ্ঞান রহস্য। মূল্য—তিন টাকা

সুদৃশ্য কাপড় ও বোর্ডে বাঁধা (রাজ সংস্করণ)
মূল্য প্রতিখণ্ড ৪·৫০ টাকা মাত্র

মাইকেল মধুসূদন দত্তের

মাইকেল গ্রন্থাবলী

প্রথম ভাগ :—মেঘনাদবধ কাব্য, বীরাঙ্গনা কাব্য, পদ্মাবতী নাটক, বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ, একেই কি বলে সভ্যতা? (বোর্ড বাঁধাই)—সাড়ে চার টাকা।

দ্বিতীয় ভাগ :—কৃষ্ণকুমারী নাটক, শর্মিষ্ঠা নাটক তিলোত্তমা-সম্ভব কাব্য, ব্রজাঙ্গনা কাব্য, চতুর্দশপদী কবিতাবলী, বিবিধ কাব্য, মায়া কানন, হেক্টর বধ। (বোর্ড বাঁধাই) চার টাকা

কবি বিহারীলাল চক্রবর্তীর গ্রন্থাবলী

রবীন্দ্রনাথ বলেন—"আধুনিক বঙ্গসাহিত্যে প্রেমের সঙ্গীত এরূপ সহস্রধারে উৎসের মত কোথাও প্রোৎসারিত হয় নাই। এমন সুন্দর ভাবের আবেগ, কথার সহিত এমন সুরের মিশ্রণ আর কোথাও পাওয়া যায় না।"

বাঙ্গালার নব গীতিকবিতার প্রবর্তক, রবীন্দ্রনাথ, অক্ষয় বড়াল, রাজকৃষ্ণ রায় প্রভৃতির কাব্যগুরু ঋষি কবি বিহারীলাল চক্রবর্তীর রচনার সমাবেশ।

কবির জীবনী, সুবিস্তৃত সমালোচনা সহ সুবৃহৎ গ্রন্থ
মূল্য তিন টাকা

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড, ১৬৬ বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলিকাতা—১২

৭২ বর্ষ : ৪০শ সংখ্যা—মূল্য : ৩০ পয়সা বাংলা ভাষায় দ্বিতীয় সর্বাধিক প্রচারিত সাপ্তাহিক পত্রিকা PRICE : 30 Paise
বৃহস্পতিবার, ৭ই চৈত্র, ১৩৭৪ বঙ্গাব্দ Thursday, 21st March, 1968

পঞ্চম বর্ষ

নব পর্যায় সাপ্তাহিক বসুমতী পঞ্চম বর্ষে পদার্পণ করলো। এই উপলক্ষে আমরা আমাদের পাঠক, গ্রাহক, অনুগ্রাহকে, অনুরাগী, শুভানুধ্যায়ী, বিজ্ঞাপনদাতা ও পৃষ্ঠপোষকদের জানাই আমাদের আন্তরিক অভিনন্দন। কারণ সাপ্তাহিক বসুমতী নব পর্যায়ে যখন প্রকাশিত হয় তখন কেউ কেউ পত্রিকাটির অনন্যধর্মী বৈশিষ্ট্য দেখে এর স্থায়িত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ পোষণ করেছিলেন। আজ আমরা আনন্দের সঙ্গে বলতে পারি, সহস্র সহস্র পাঠকের শুভেচ্ছায় সাপ্তাহিক বসুমতী এই পাঁচ বছরে যে কাজ করেছে, তার ফলে বাংলাদেশে ও বাংলাদেশের বাইরে আন্তরিক প্রশংসা লাভ করেছে। আমরা আজ অকুণ্ঠভাবে একথাও বলতে পারি, জনসাধারণের স্বার্থে এই পত্রিকা সত্য প্রকাশের পথ থেকে কোনোদিন বিচ্যুত হবে না। প্রসঙ্গত বলা দরকার, কে শত্রু কে মিত্র—এ জাতীয় বাছবিচারে আমাদের অনীহা সুস্পষ্ট, দেশের ও দশের কল্যাণে প্রত্যেকের ও সকলের সহযোগিতাই আমরা সর্ব সময় কামনা করি।

নব পর্যায় সাপ্তাহিক বসুমতীর প্রকাশ লাভ হবার বহু আগে এই পত্রিকার উদ্দেশ্যও আজ আমরা স্মরণ করতে পারি।

১৩০৩ বঙ্গাব্দের ভাদ্র মাসে প্রথম প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক বসুমতীর প্রথম সংস্করণ। আজ থেকে একাত্তর বছর আগে। প্রথম সংখ্যার সম্পাদকীয় প্রবন্ধে ঘোষণা করা হয়েছিল—

"প্রতিদিনই বাংলা সংবাদপত্রের গ্রাহক সংখ্যার হ্রাসবৃদ্ধি দেখিয়া বোধ হয় অতৃপ্ত হৃদয় পাঠকবৃন্দ যেন কোন্ পত্রে মনোমত প্রবন্ধ পাইবেন তাহাই খুঁজিয়া বেড়াইতেছেন। এই অভাব যথাসাধ্য মোচনার্থে চেষ্টা করিবার জন্যই 'বসুমতী' প্রচারিত হইল। সংবাদপত্রের আলোচ্য বিষয় রাজনীতিও ইহাতে থাকিবে—দেশের অভাব-অভিযোগাদির কথাও থাকিবে। তদ্ভিন্ন ইতিহাস, দেশনগরাদির বিবরণ, চাষবাসের কথা, ব্যবসা-বাণিজ্যের কথা,...উপন্যাস, রঙ্গরহস্য প্রভৃতি সুখপাঠ্য বিষয় থাকিবে। অন্নপ্রাণ বাঙালী অবসন্ন প্রাণে যাহাতে দুটা সুখের কথা, দুটা অর্থের কথা, দুটা উপায়ের কথা, দুটা আশার কথা, দুটা হাসির কথা পড়িতে পায়, বসুমতীতে প্রধানত তাহারই চেষ্টা করা হইবে।"

উপরি উক্ত সম্পাদকীয় পাঠের পর নব পর্যায় সাপ্তাহিক বসুমতীর অনুরাগিগণ একথা হয়তো স্বীকার করবেন যে, আমরা আমাদের পূর্বসূরীদের মহৎ আদর্শ থেকে যেমন বিচ্যুত হই নি তেমনি ঐতিহ্যানুসরণের অর্থ হুবহু অনুকরণ নয়, তা অনুধাবন করে যুগোপযোগী চিন্তাধারার সমাবেশ ঘটিয়েছি। বিপ্লবী জীবনের ইতিহাস প্রকাশ তারই অন্যতম। একালে একদল উৎকোচাশ্রয়ী লেখক দেশের যুবশক্তিকে ধ্বংস করার জন্যে তৎপর, দেশ থেকে সততা, সরলতা, আদর্শবোধ এবং জাতীয় চরিত্রকে বিদায় দিতে পারলেই যেন তাদের উদ্দেশ্য সার্থক হতে পারে। সাপ্তাহিক বসুমতী একাধিক প্রবন্ধ লিখে তার প্রতিবাদ করেছে, আমার জীবনধর্মী বলিষ্ঠ লেখা তুলে ধরেছে। সাপ্তাহিক বসুমতীর বিপুল জনপ্রিয়তা দেখে আমরা বলতে পারি তাঁদের সমর্থন আমাদের দিকে। এবং আমরা আজ আশা করবো, এখনো পর্যন্ত যাঁরা নানা কারণে সহযোগিতা করতে পারেন নি, তাঁরা তাঁদের উদার ও বলিষ্ঠ সমর্থন আমাদের দেবেন।

প্রসঙ্গত আর একটি কথা বলা প্রয়োজন, নব পর্যায় সাপ্তাহিক বসুমতীর জনপ্রিয়তা লক্ষ্য করে একশ্রেণীর ব্যবসায়ী এই পত্রিকার অনুকরণে পত্রিকা প্রকাশ করতে প্রলুব্ধ হচ্ছে। বঙ্গদর্শন, ভারতদর্শন, আন্তর্জাতিক প্রভৃতি প্রায় প্রতিটি প্রচণ্ড আকর্ষক ফিচারের নকল করার অত্যাগ্রহ সকৌতুকে লক্ষণীয়। বলাবাহুল্য, পরানুকরণবৃত্তির কোনো মূল্য নেই। ময়ূরপুচ্ছ গ্রহণ করেও কাক—কাকই। ঐ সব অনুকারী পত্রিকাগুলির মূল উদ্দেশ্য জনসাধারণের মঙ্গলসাধন নয়। তার প্রমাণ পাওয়া যাবে ঐ সব পত্রিকার নগদ মূল্য লক্ষ্য করলেই। এখানেও সাপ্তাহিক বসুমতীর সঙ্গে তাদের মৌলিক পার্থক্য। এসব কারণে পাঠকদেরও সতর্ক থাকতে হবে। যাহোক, শেষ বিচারের ভার পাঠকদেরই ওপর। আমরা আমাদের জয়যাত্রার পথে তাঁদের আনন্দের অংশভাগী হতে পারলেই যথার্থ গৌরব বোধ করবো।

সম্পাদকীয়

আজকের মানুষ

নির্যাতিত প্রবীণ নেতা প্রেসিডেন্ট নোভোৎনির এন্তেকাল ঘনিয়ে এসেছে, চেকোশ্লোভাকিয়ার রাষ্ট্রপ্রধানের পদে তিনি আর বেশিদিন থাকতে পারবেন বলে মনে হয় না। দু' মাস আগেই তাঁর পায়ের তলার মাটি ভীষণভাবে নড়ে উঠেছিল। পার্টিপ্রধানের পদ হারিয়েছিলেন সেদিন, তাঁকে সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছিল প্রেসিডেন্টের আলংকারিক পদটি নিয়ে। কিন্তু এবার বোধ হয় ৬৩ বছরের প্রৌঢ় নেতাকে সেখান থেকেও সরে দাঁড়াতে হবে। অন্তত চেক কমিউনিস্ট পার্টি এবং সরকারী স্তরে গত কদিনে যে ঘটনাগুলো নাটকীয় দৃশ্যের মত দ্রুত ঘটে গেল তাতেই এ ইঙ্গিত সুস্পষ্ট যে আন্তোনিন নোভোৎনির বিদায় আসন্ন।

গত জানুয়ারী মাসে যখন চেক কমিউনিস্ট পার্টির সেক্রেটারীর পদ থেকে নোভোৎনিকে অপসারণ করে আলেকজান্ডার ডুবচেককে তাঁর আসন দেওয়া হলো তখন অনেকেই মনে করেছিলেন যে, রাষ্ট্রপ্রধান ও পার্টিপ্রধানের দুটো গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব একই লোকের কাঁধে থাকায় কাজের ক্ষতি হয় বলেই এ পরিবর্তন সাধন করা হয়েছিল। আরেকটা কারণও এই পরিবর্তনের পেছনে ছিল বলে বিদেশী পর্যবেক্ষকরা অনুমান করেছিলেন। সেটা হল, শ্লোভাক-জাতীয় ডুবচেককে ক্ষমতার আসনে এনে উপেক্ষিত শ্লোভাকিয়ার মনে সান্ত্বনা দান সহায়তা করা। কিন্তু নোভোৎনির ক্ষমতা খর্ব করার কারণ যে আরো গভীরে ছিল তা এখন পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে।

চেক কমিউনিস্ট পার্টিতে তো বটেই, চেক জাতীয় পরিষদ (পার্লামেন্ট)-এর প্রেসিডিয়ামে পর্যন্ত দাবি উঠেছে: 'প্রেসিডেন্ট নোভোৎনি গদি ছোড়ো, আভি ছোড়ো, জলদি ছোড়ো!' প্রেসিডেন্ট একাই নন, নোভোৎনি-সমর্থকদের বিরুদ্ধে সমালোচনায় দেশ আজ মুখর। আভ্যন্তরীণ মন্ত্রী জোসেফ কুদ্রালা এবং এ্যাটর্নি জেনারেল জান বার্তুস্কার পদত্যাগের দাবি সোচ্চার হয়েছে, কারণ তাঁরা নোভোৎনির সমর্থক বলে পরিচিত। এমন কি অন্যতম নোভোৎনি-অনুরাগী প্রতিরক্ষামন্ত্রী কর্নেল জেনারেল বহুমির লমস্কিরও অপসারণ দাবি করা হয়েছে। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়েছে গত জানুয়ারী মাসে পার্টি সেক্রেটারীর পদ যাতে নোভোৎনিকে ছাড়তে বাধ্য করা না হয় সেজন্য তিনি সম্মেলনকক্ষের বাইরে সৈন্য মোতায়েন করে সন্ত্রাস সৃষ্টির চেষ্টা করেছিলেন। সে অভিযোগ অবশ্য লমস্কি অস্বীকার করেছেন।

এক এক করে নোভোৎনি-সমর্থকদের পতনের দৃশ্য দেখেও স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে এবার নেতার পতনও বেশিদিন ঠেকানো যাবে না। নোভোৎনি-ভক্ত শ্লোভাকিয়ার প্রধানমন্ত্রী মাইকেল

নোভোৎনি

চুড়িককে বরখাস্ত করা হয়েছে, ডেপুটি প্রতিরক্ষাসচিব ভ্লাদিমির জাঙেকা আত্মহত্যা করে পদচ্যুতি এবং অপমানের হাত থেকে নিজেকে বাঁচিয়েছেন। নোভোৎনির অন্যতম প্রধান অনুরাগী ও সমর্থক মেজর জেনারেল জান সেইনী আমেরিকা পালিয়ে গিয়েছেন অসম্মানের হাত থেকে আত্মরক্ষা করার জন্যে। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল তিনি ২০ হাজার ডলার মূল্যের সরকারী খামারের পশুখাদ্য গোপনে বিক্রি করেছেন। এ ছাড়া চেকোশ্লোভাকিয়ার ট্রেড ইউনিয়নগুলোর কেন্দ্রীয় কমিটির চেয়ারম্যান এবং দুজন সেক্রেটারীও আগেভাগে পদত্যাগ করেছেন।

কিন্তু আন্তোনিন নোভোৎনির কী এমন অপরাধ যার জন্যে তাঁকে ঝাড়ে-বংশে উচ্ছেদ করতে চেক কমিউনিস্ট পার্টি ও সরকার উঠে-পড়ে লেগেছে। নোভোৎনি একজন প্রধান দেশকর্মী দেশসেবার কারণে তাঁকে নির্যাতনও কম ভোগ করতে হয় নি। এক শ্রমিক পরিবারে নোভোৎনির জন্ম এবং নিজেও মেকানিক হবার জন্য বিশেষ ট্রেনিং নিয়েছিলেন। বিশ দশকে তিনি কমিউনিস্ট পার্টির সংস্পর্শে আসেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় যখন জার্মানী চেকোশ্লোভাকিয়া দখল করে নেয়, তখন নাৎসীদের বিরুদ্ধে চেক প্রতিরোধবাহিনী গড়ে তোলার ব্যাপারে নোভোৎনির উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল। জার্মানদের হাতে বন্দী হয়ে নোভোৎনিকে চার বছর হিটলারের কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পে দুঃসহ নির্যাতন সহ্য করতে হয়। দেশ মুক্ত হবার পরে ১৯৫৩ সালে তিনি চেক কমিউনিস্ট পার্টির প্রধান সেক্রেটারীর পদ লাভ করেন।

নোভোৎনি পার্টিতে একজন ওল্ড গার্ড বা প্রবীণ সৈনিক হিসেবে সম্মানিত হতেন। বাস্তবিক নোভোৎনিই একমাত্র কমিউনিস্ট নেতা যিনি স্ট্যালিনের আমল থেকে ক্রুশ্চেভ, ব্রেজনেভ এবং কোসিগিনের আমল পর্যন্ত সমান সম্মানের সঙ্গে নিজের আসনে টিকে থাকতে পেরেছেন। সোভিয়েট য়ুনিয়নসহ য়ুরোপের বিভিন্ন কমিউনিস্ট পার্টি এবং সরকারী স্তরে যখন বিরাট ওলট-পালট হয়ে গিয়েছে তখনও আন্তোনিন নোভোৎনি দিব্যি দেশের দুটো সর্বোচ্চ পদ দখলে রাখতে পেরেছিলেন।

কিন্তু জানুয়ারীতে একটা পদ হারাবার পর এখন আরেকটা তাঁর যে কোনো মুহূর্তে ফসকে যেতে পারে। যাবার কারণ কি? কারণ এই যে, পার্টি ও প্রেসিডিয়াম মনে করে যে, আন্তোনিন নোভোৎনির প্রয়োজন ফুরিয়েছে। তিনি সেকেলে, রক্ষণশীল, সময়ের গতির সঙ্গে তিনি তাল রেখে চলতে পারছেন না যে কারণে দেশের কোন অগ্রগতি হচ্ছে না, অগ্রগতি ব্যাহত হচ্ছে। বুদ্ধিজীবীরা মনে করেন নোভোৎনি তাঁদের স্বাধীন শিল্প-সাহিত্য সাধনায় ব্যাঘাত ঘটাচ্ছেন, ছাত্ররাও মনে করে তাদের স্বাধীন ছাত্রজীবন পদে পদে বাধা পাচ্ছে নোভোৎনির রক্ষণশীল মনোভাব এবং কঠোর ও প্রাচীনপন্থী বিধিনিষেধের জন্যে। নোভোৎনিকে তাই যেতে হবে। এবং মজা হচ্ছে, এই পুরনো দেশভক্ত নেতার জন্যে আজ চোখের জল ফেলার লোক খুব বেশি নেই।

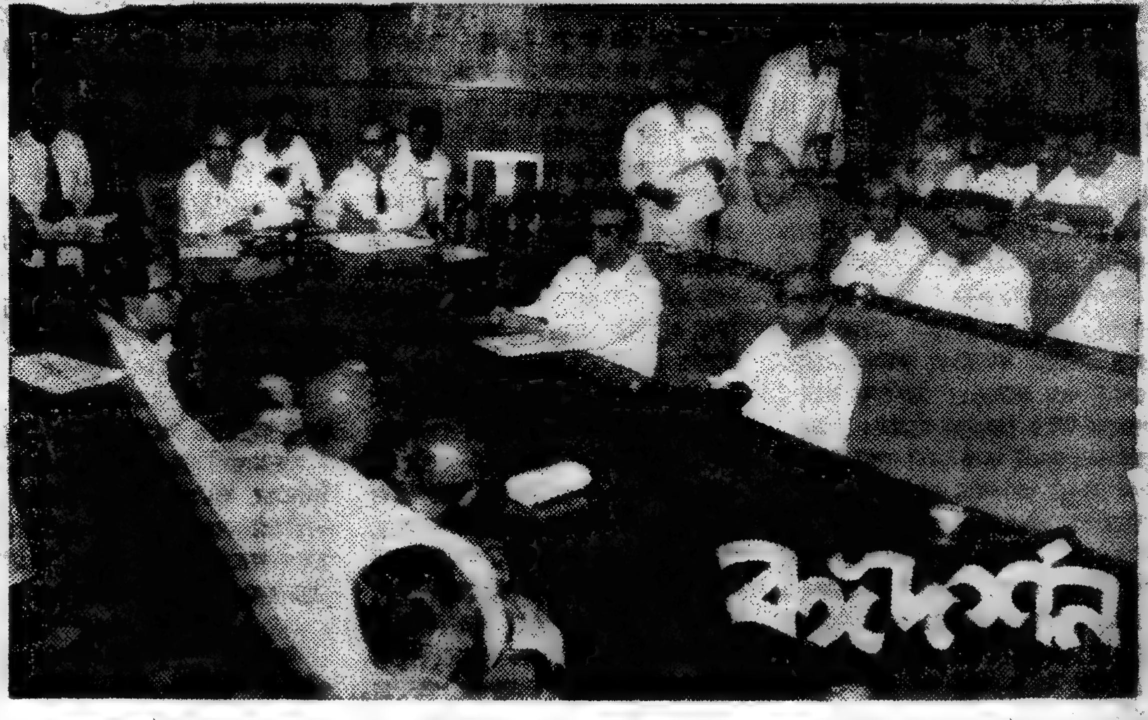

পশ্চিমবঙ্গে অন্তর্বর্তী নির্বাচনের দিন ধার্য করার ব্যপারে নির্বাচন কমিশনার ও বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের আলোচনা-বৈঠকে।

পশ্চিমবঙ্গে অন্তর্বর্তী নির্বাচনের দিন ধার্য করা হয়েছে আগামী ৩রা অথবা ১০ই নভেম্বর। ভারতের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার শ্রী এস পি সেনবর্মা বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও গোষ্ঠীর মতামত নিয়ে উক্ত দিন ধার্য করেন। শ্রীসেনবর্মা কলকাতা ত্যাগের পূর্বে পশ্চিম বাংলার প্রধান নির্বাচনী অফিসারকে অবিলম্বে ভোটার তালিকা সংশোধনের কাজ শুরু করার নির্দেশ দেন। সাংবাদিকদের তিনি জানান যে, নির্বাচনের দিন স্থির করার ব্যাপারে সংবিধানগতভাবে মুখ্য নির্বাচন কমিশনারই পূর্ণ ক্ষমতার অধিকারী। রাজ্যপাল বা কেন্দ্রীয় সরকারের এই বিষয়ে সুপারিশ করার কিছু নেই। নির্বাচনের আগে ভোটার তালিকা সংশোধন করা বাধ্যতামূলক এবং তা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সকল দলই দ্রুত নির্বাচনের পক্ষপাতী। দিন ধার্য করার ব্যাপারে মোটামুটি সকল দলই একমত হয়েছিলেন।

নির্বাচনের দিন ধার্য হবার পরেই বিভিন্ন রাজনৈতিক মহলে সাজ সাজ রব পড়ে যায়। কংগ্রেসের নির্বাচনী অভিযান আগামী সপ্তাহ (অর্থাৎ পাঠকের দৃষ্টিতে বর্তমান সপ্তাহ) থেকেই শুরু হবে বলে ঘোষণা করা হয়েছে। ১৯শে মার্চ কলকাতার নয়টি জেলা কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দের এবং ২৮শে মার্চ শিলিগুড়িতে উত্তরবঙ্গের পাঁচটি জেলা কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দের সম্মেলনের অনুষ্ঠান হবে। এই দুটি সম্মেলনে প্রধানত কংগ্রেসের বিভিন্ন জেলায় প্রার্থী মনোনয়নের প্রশ্ন আলোচিত হবে। সংবাদে প্রকাশ যে গত নির্বাচনে কংগ্রেস যে সকল আসনে পরাজিত হয়েছিল সেখানে নবাগত প্রার্থীদের প্রাধান্য দেওয়া হবে।

পি ডি এফ শিবিরেও তৎপরতা লক্ষণীয়। আগামী ২৩শে ও ২৪শে মার্চ পি ডি এফ-এর প্রাদেশিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে কলকাতায়। এই দলটির সামনে একটি প্রধান সমস্যা দেখা গেছে। তা হচ্ছে আগামী নির্বাচনে কংগ্রেসের সংগে এই দলের সম্পর্ক কি রকম হবে। কংগ্রেস আজও এককভাবে সর্বাপেক্ষা শক্তিমান দল। তার পক্ষে পি ডি এফ (ভারতীয় লোকদল)-এর সংগে নির্বাচনী আঁতাত করাটা অশোভন ও অমর্যাদাকর, অথচ পি ডি এফ-এর প্রতি কংগ্রেসের কিছুটা কৃতজ্ঞতাবোধও আছে। হয় নির্বাচনে কংগ্রেস-পি ডি এফ আঁতাত হবে না পি ডি এফ-কে কংগ্রেসে ভিড়তে হবে না হয় পৃথকভাবে লড়তে হবে। এই কারণেই শোনা যাচ্ছে যে, ডঃ ঘোষ দলবল সহ নাকি কংগ্রেসে যোগদান করবেন। এই দল কোন্ রাস্তা বাছাই করবে সেটা অবশ্য এখন বলা যাচ্ছে না।

শ্রীআশু ঘোষের আই এন ডি এফ-কেও সংকীর্ণ ও বিপজ্জনক পথ দিয়ে চলতে হবে। এই দল যুক্তফ্রন্টের সমর্থন পাচ্ছেন না এবং কংগ্রেসের সংগেও এঁদের কোন সমঝোতা হবার আশা নেই। তবে শ্রীঘোষ জানিয়েছেন যে, তাঁর দল পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি আসনেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। অবশ্য শেষ পর্যন্ত কি হবে তা বলা সম্ভব নয়।

শ্রীজাহাঙ্গীর কবিরের জাতীয় দলও সমস্যায় পড়েছেন। এই দল যুক্তফ্রন্টে স্থান চেয়েছিলেন, কিন্তু পান নি, কেন না তাহলে ভারতীয় ক্রান্তি দলের সংগে যুক্তফ্রন্টের বিচ্ছেদ ঘটত এবং যুক্তফ্রন্টও এঝুঁকি নিতে রাজী নন। তবে জাতীয় দলের প্রতি যুক্তফ্রন্টের অনেকগুলি সদস্য দলেরই কিছুটা সফট কর্নার আছে, কাজেই ফ্রন্টভুক্ত না হলেও কয়েকটি আসনে যুক্তফ্রন্ট এঁদের হয়ত সমর্থন করবেন।

যুক্তফ্রন্টের অন্তর্ভুক্ত সকল দলই আসন ভাগাভাগি সহ প্রার্থী মনোনয়নের সকল কাজ এপ্রিলের মধ্যেই শেষ করতে চান। আসন ভাগাভাগির বিষয়টি এইভাবে দেখা হয়েছে (১) বিজয়ী প্রার্থীদের আসন বজায় রাখা, (২) পরাজিত আসনে দ্বিতীয় প্রার্থীর দলকে আসন দেওয়া এবং (৩) দলত্যাগীদের ক্ষেত্রে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন। এছাড়া আরও কয়েকটি বিষয় নিয়ে যুক্তফ্রন্টে আলোচনা হয়েছে যেমন (১) জয়লাভের দিকে লক্ষ্য রেখে এবং দলত্যাগের ঘটনা বিবেচনা করে প্রত্যেক দলের প্রার্থী সম্বন্ধেও সকল দলের মতামত গ্রহণ প্রয়োজন। (২) কংগ্রেসের জাঁদরেল প্রার্থীদের মোকাবিলা করার জন্য ফ্রন্টের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের সেই কেন্দ্রে মনোনয়ন দান। এবং (৩) একান্তভাবেই জয়লাভের দিকে দৃষ্টি রেখে বাস্তব অবস্থার সংগে সামঞ্জস্যপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ। বিগত নির্বাচন ও

যুক্তফ্রন্টের বিগতকালীন অভিজ্ঞতা থেকে প্রাপ্ত শিক্ষা এঁরা আগামী নির্বাচনে কাজে লাগাতে এখনো পর্যন্ত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

পশ্চিমবঙ্গের বাজেট

গত ১০ই মার্চ তারিখে কেন্দ্রীয় পার্লামেণ্টে পশ্চিমবঙ্গের বাজেট পেশ করা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের ইতিহাসে এই ঘটনা সর্বপ্রথম। রাষ্ট্রপতির শাসনের পরিপ্রেক্ষিতেই এই ব্যবস্থা। এই বাজেট অবশ্যই কোন নতুন বার্তা আমাদের সামনে নিয়ে আসে নি। কোনগতিকে কাজ চালাবার উদ্দেশ্যেই বর্তমান বাজেট প্রণয়ন করা হয়েছে। সামগ্রিক বাজেটে সামান্য উদ্বৃত্ত দেখানো হয়েছে। উদ্বৃত্ত বাজেটের অর্থই হচ্ছে কোন নতুন ব্যাপারে অর্থ লগ্নী করা হবে না বা কোন নতুন পরিকল্পনাতেও হাত দেওয়া হবে না। অথচ সমস্যাসঙ্কুল পশ্চিমবঙ্গে সেটারই প্রয়োজন সবচেয়ে বেশি। ১৯৬৮-৬৯ সালের বাজেটে রাজস্বখাতে অনুমিত আয় হবে ২১৪ কোটি ২৯ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় হবে ২১৫ কোটি ৪৭ লক্ষ টাকা। তাহলে আয় ও ব্যয়ের ফারাক হচ্ছে ১ কোটি ১৮ লক্ষ টাকা। তা সত্ত্বেও মূলধন খাতে ১ কোটি ৩২ লক্ষ টাকা অব্যবহৃত থাকার দরুণ ১৪ লক্ষ টাকা সামগ্রিকভাবে উদ্বৃত্ত থেকে যাচ্ছে। এতে অবশ্য সরকারী তরফ নিশ্চিন্ত, কেন না বাড়তি খরচ পশ্চিমবঙ্গের জন্য কিছুই করা হচ্ছে না। অপরাপর রাজ্য যেখানে এক বছরের জন্য কয়েকটি নির্দিষ্ট প্রকল্পে হাত দিতে পেরেছে, পশ্চিমবঙ্গে সেখানে কিছুই হবে না। পরিকল্পনা খাতে যেভাবে বরাদ্দ হ্রাস করা হয়েছে তাতে এই রাজ্যটির প্রতি চরম অবহেলা প্রদর্শন করা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের বাজেট প্রসঙ্গে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীর বক্তৃতায় পশ্চিমবঙ্গের অর্থনৈতিক সংকটের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, কিন্তু অবস্থার উন্নতির জন্য কোন কার্যকরী ব্যবস্থার প্রতিফলন বাজেটে অনুপস্থিত। পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচনোত্তর সরকার গঠিত না হওয়া পর্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকার গতানুগতিকভাবেই কাজ চালাতে মনস্থ করেছেন একথা সত্য হওয়া সত্ত্বেও পশ্চিমবঙ্গের প্রতি কিছুটা দরদও আমরা বাজেটে আশা করেছিলেম, সে আশাই বলাই বাহুল্য, পূর্ণ হয় নি।

পরীক্ষা পর্ব

গত সোমবার ১১ই মার্চ তারিখ থেকে স্কুল ফাইনাল পরীক্ষা শুরু হয়েছে, হায়ার সেকেণ্ডারী পরীক্ষাও শুরু হল বলে। গত কয়েক বছর ধরেই পরীক্ষা সমাচার সংবাদপত্রের শীর্ষস্থান অধিকার করে আসছে, কেন না নির্বিঘ্নে পরীক্ষা হওয়াটা যেন একটা বিস্ময়কর সংবাদে পরিণত হয়েছে। এবারেও প্রচলিত রীতির ব্যতিক্রম হয় নি। স্কুল ফাইনাল পরীক্ষার প্রথম দিনেই কলকাতা ও হাওড়ার ১০টি কেন্দ্রে পরীক্ষা ভণ্ডুল হয়েছে। কয়েকটি স্কুলও বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। পরীক্ষা ভণ্ডুলকারীদের মধ্যে তিন শ্রেণীর মানুষ ছিল, কিছু ছাত্র যারা সেদিনকার যানবাহনের গোলযোগে সময়মত হাজির হতে পারে নি; কিছু বখাটে ছাত্র যারা পূর্বোক্ত শ্রেণীর ছাত্রদের ক্ষোভ ও ক্রোধের সুযোগ নিয়েছে এবং কিছু সমাজবিরোধী লোক যারা এই অবসরে বিভিন্ন স্কুলের কিছু কিছু মূল্যবান সামগ্রী অপহরণ করেছে। মোটের উপর ছাত্রদের মধ্যে যারা এই অপকর্মের পক্ষে ছিল তারা একটি অত্যন্ত কুদৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। এবং এদের এই দুষ্কৃতির প্রতিক্রিয়া প্রাইভেট পরীক্ষার্থীদের উপরেই বর্তাবে, যদিও তাদের মধ্যে অনেক ভালো ছেলেও আছে, যারা অন্যত্র কাজকর্ম করে অনেক কষ্টে পড়াশোনা করেছে। মধ্যশিক্ষা পর্ষদ পরীক্ষা কেন্দ্রগুলি দূরে দূরে স্থাপন করায় ছাত্র ও অভিভাবক মহলে বিশেষ ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। মফস্বল অঞ্চলের অবস্থাও খুব শোচনীয়, ১২।১৪ মাইল দূরে দূরেও পরীক্ষাকেন্দ্র পড়েছে, যা ছাত্রছাত্রীদের বিশেষ অসুবিধার কারণ হয়েছে। পরীক্ষাকেন্দ্রগুলিকে দূরে দূরে বসাবার দুর্বুদ্ধি এ বছর কেন বোর্ডের কর্তাদের মাথায় চাপল জানি না। চিড়িয়ার মোড়ে সেদিনই আবার বাসকর্মী ও পুলিশের হাঙ্গামার ফলে বাস চলাচল বন্ধ হয়ে এক বিশ্রী অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল। সুখের বিষয় যে তারপর দিন থেকে আর কোন গণ্ডগোল হয় নি। আমরা অবশ্যই আশা করব যে স্কুল ফাইনাল পরীক্ষার অবশিষ্ট অংশ নির্বিঘ্নেই সম্পন্ন হবে এবং সেই সঙ্গে হায়ার সেকেণ্ডারী পরীক্ষাও।

সিনেমা ধর্মঘট

গত মঙ্গলবার ১২ই মার্চ থেকে পর্যায়ক্রমে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে সিনেমাগৃহের কর্মচারীরা ধর্মঘট শুরু করেছেন। সমগ্র পশ্চিমবাংলায় ৬৬০টি সিনেমা হল আছে এবং এইগুলিতে কর্মীর সংখ্যা এগার হাজার। এই ধর্মঘট সম্পর্কে সিনেমাকর্মীদের বক্তব্য হল যে, সিনেমা মালিকপক্ষ ও সিনেমাকর্মীদের মধ্যে যে পূর্বে চুক্তি হয়েছিল, সিনেমা মালিকপক্ষ তা অদ্যাবধি কার্যকরী না করায় সিনেমা কর্মীদের বেতনের হার মহার্ঘ ভাতা, চাকুরীর সর্তাদি কোন কিছুরই উন্নতি হয় নি। বলাই বাহুল্য তাঁদের এ কথার মধ্যে যুক্তি আছে। এদেশে মালিকপক্ষ, সে যে কোন শিল্পেরই হোক না কেন, যে কোন সময়ই অধস্তন কর্মীদের প্রবঞ্চিত করতে বদ্ধপরিকর, তাদের এটাই রীতি। মালিক পক্ষ বলছেন, সিনেমাকর্মীদের সঙ্গে তাঁদের যে চুক্তি হয়েছিল সেই চুক্তির মেয়াদ ১৯৬৯ সালের ৩০শে জুন পর্যন্ত এবং ওই মেয়াদ শেষ না হওয়া পর্যন্ত ধর্মঘট বে-আইনী। কিন্তু চুক্তি তো হলেই হল না, যার জন্য চুক্তি সেটা হয়েছে কি? চুক্তির বিষয়বস্তু কি কাজে পরিণত হয়েছে? কর্মীদের কি বর্ধিত বেতন ভাতা ইত্যাদি দেওয়া হয়েছে? না, তেমন কিছু হয় নি, মালিক-শ্রমিক চুক্তি হয়েছিল, কিন্তু মালিকপক্ষ সেই চুক্তি কার্যকরী করতে পকেট থেকে কিছুই ব্যয় করেন নি। মালিকপক্ষ কেন চুক্তি পালন করে নি, তার কারণ দেখানো হচ্ছে ব্যবসায়ে মন্দা। কলকাতার পাঁচটি হল কিন্তু যথারীতি চলছে, কেন না সেগুলির মালিকরা কর্মীদের দাবী-দাওয়াগুলি মেনে নিয়েছেন, অর্থাৎ পূর্বের চুক্তি তাঁরা কার্যকরী করেছেন। এই একটি ঘটনাই প্রমাণ করছে যে সিনেমা কর্মীরাই ন্যায্য কথা বলছেন, মালিকেরা নয়।

সংগ্রহ প্রসঙ্গ

ব্যাপক মজুত উদ্ধার অভিযান চালিয়ে পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ ১লা মার্চ হতে ১০ই মার্চ পর্যন্ত বিভিন্ন জেলায় প্রায় ২৫ হাজার টন ধান-চাল উদ্ধার করেছে। কিন্তু এই উদ্ধারকার্যকে একটি বিরাট সাফল্য বলে চিহ্নিত করতে আমরা দ্বিধাগ্রস্ত। তার কারণ সংগ্রহ পদ্ধতি। বর্তমান সংগ্রহকার্য বহুক্ষেত্রে জুলুমবাজিরই নামান্তর হয়েছে, কেন না এক্ষেত্রে কোন জোতদার, মজুতদার বা বৃহৎ কারবারীর গায়ে হাত দেওয়া হয় নি, গ্রামের সাধারণ গৃহস্থবাড়ি থেকে, তাদের বছরের খোরাকী ধান-চালের মোটা অংশ বলপূর্বক নেওয়া হচ্ছে। একে মজুত উদ্ধার বলে না। আর তা ছাড়া ধান-চাল মিলিয়ে ২৫ হাজার টন, পরিমাণের দিক থেকে একান্তই নগণ্য, যার জন্য বিশেষ কোন কৃতিত্ব দাবি করা চলে না। পুলিশী সূত্রের সংবাদে প্রকাশ যে পশ্চিমবঙ্গের ধান-চাল চোরাই চালানের পিছনে কলকাতার বেশ কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যবসায়ীর মদৎ আছে এবং পুলিশ এর কয়েকটি সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়ায় তাদের বিরুদ্ধে অবিলম্বে পি-ডি অ্যাক্ট প্রয়োগের সুপারিশ করা হয়েছে। কিন্তু এই বক্তদর্শন লেখার সময় পর্যন্ত তা কার্যকরী হয় নি, কবে হবে, বা আদৌ হবে কি না, সে কথা আমরা বলতে পারি না।

কেরোসিন

পশ্চিমবঙ্গে গত কয়েক মাস ধরে কেরোসিন তেলের যে সংকট সমানে চলছে তার কোন সুরাহা হবার লক্ষণ নেই এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকার তথা রাজ্যপাল এই ব্যাপারে একেবারেই নিশ্চুপ। কেরোসিনের অভাবে লোকের বাড়িতে রাত্রে আলো জ্বলে না, ছেলেমেয়েদের পড়াশোনা শিকেয় উঠেছে, স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষা চলছে, এহেন

[illegible] লোকের [illegible] সাধারণ [illegible] বাড়ছে, দুর্গতি আজ চরম সীমায় এসে পৌঁছেছে। অথচ যারা এভাবে কেরোসিনের কৃত্রিম অভাবের সৃষ্টি করে মুনাফা লুটছে, তাদের বিরুদ্ধে সরকারের যেন কোন কর্তব্যই নেই। কেরোসিনের অভাব যে সম্পূর্ণই তৈরি করা অভাব তার প্রমাণ হিসাবে এই কথাই বলা যায় যে পেট্রোলিয়ামজাত অপর কোন দ্রব্যের তো অভাব বাজারে নেই। একই পেট্রোলিয়াম থেকে কেরোসিন, পেট্রল ন্যাপথা এবং আরও জ্বালানীর উদ্ভব হয়। সেগুলির সব কটিই বাজারে যথেষ্ট পরিমাণেই পাওয়া যায়, শুধু পাওয়া যায় না কেরোসিন। এ থেকেই সিদ্ধান্ত অনিবার্য হয়ে ওঠে যে কেরোসিন সঙ্কট, উৎপাদন বা আমদানীর সঙ্কট নয়, কেন না তাহলে অপরাপর জ্বালানীগুলির ক্ষেত্রেও একই সঙ্কট দেখা দিত। দরিদ্রের ব্যবহার্য এই অত্যাবশ্যক সামগ্রীটিকে নিয়ে মুনাফা শিকারের যে পালা শুরু হয়েছে প্রকৃতপক্ষে ১৯৬৬ সাল থেকে, তার শেষ হবার কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। সরকারও এ বিষয়ে উদাসীন। আমরা এই ক্ষেত্রে রাজ্যপালের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করছি।

পানীয় জলের সমস্যা

সারা বাংলাদেশ জুড়ে গরম পড়েছে। গ্রামীণ মানুষ সারা বছরের মধ্যে এই সময়টাই নানা দুর্ভাবনায় কাটায়। যদি একটানা গরম চলতে থাকে তাহলে খরা অবশ্যম্ভাবী; পুকুর, কুয়ো শুকিয়ে যাবে, টিউবওয়েলেও জল উঠবে না, দুই-একটি নদী ছাড়া বাকী নদীগুলি তো এখনই মরুভূমি। গ্রামবাসীদের সাত্য-কারের ভরসা 'বাবুদের' বড় বড় দীঘি বা জলসত্র। প্রতি বছরই গরম পড়ে, প্রতি বছরই জলকষ্ট হয়, প্রতি বছরই জলের জন্য চিৎকার, দাবি-দাওয়া সবই হয়, কিন্তু কার্যত প্রতিকার কিছুই হয় না। খুব বেশি হৈ হৈ হলে ট্রাক বোঝাই জলের ড্রাম ছুটবে গ্রামের দিকে, ছেলেমেয়ে, বুড়ো-বুড়িরা আসবে ঘটি-বাটি নিয়ে জলের জন্যে লাইন দিতে, যারা জল পাবে না তারা শুকিয়ে মরবে; প্রতি বছরই তো এমন কত শত মরে; তাতে কার কি এসে যায়! যারা সরকারের বিরোধী তাদের কানে খবরটা এলে সভা হবে, বিক্ষোভ হবে, আন্দোলন হবে, সরকার হয়তো শেষ পর্যন্ত একটা তদন্তের ব্যবস্থা করে রিপোর্ট দেবেন—'লোকটা অনেকদিন ধরেই নানা রোগে ভুগছিল, তাতেই ওর মৃত্যু হয়েছে'। ব্যস, সকলের সব কর্তব্য শেষ। খবর নিয়ে জানুন গ্রামে হাজার হাজার টিউবওয়েল অকেজো হয়ে পড়ে আছে। গরম পড়ার আগেই সেগুলো যদি মেরামতের ব্যবস্থা হতো তাহলেও না হয় বোঝা যেতো সরকার জলকষ্ট যাতে কিছুটা কমে তার চেষ্টা করছেন। কিন্তু করবে কে? এতদিন এম এল এ-রা ছিলেন। তাঁরা আর কিছু করুন আর নাই করুন, প্রতিকার হোক আর নাই হোক, কোন্ গ্রামে কোথায় টিউবওয়েল বসানো দরকার, মেরামত করা দরকার সে বিষয়ে সরকারী দপ্তরে খবর তাঁরা যথাসময়েই পৌঁছে দিয়েছেন। কিন্তু এখন এই রাষ্ট্রপতির শাসনে কি হবে? সরকারী আমলারা এই প্রচণ্ড গরমে একহাঁটু ধুলো-বালি ঘেঁটে, টেরিলিনের সার্ট-প্যান্ট নষ্ট করে কি ছুটবেন গ্রামের সেবা করতে? কাজেই এবারে যে জলকষ্ট আরও প্রকট হবে তা এখন থেকেই বোঝা যাচ্ছে।

কিছুদিন আগে পুরুলিয়ার একটি সরকারী উপনগরী থেকে খবর এসেছিল পাম্প করেও কুয়ো থেকে জল তেমন উঠছে না, ফলে জল সরবরাহ তাঁরা কমিয়ে দিয়েছেন। যদি সরকারী উপনগরীর এই অবস্থা হয় তাহলে কল্পনা করুন আর সব হাজার হাজার গ্রাম এখন কি অবস্থায় দিন কাটাচ্ছে? রাজ্যপালের কাছে আবেদন জানাই—সরকারী আমলাদের এখনই গ্রাম-গ্রামান্তরে ঠেলে পাঠান—টিউবওয়েলগুলো মেরামতের ব্যবস্থা হোক, পাতকুয়োগুলি ঝালিয়ে দিন, যেখানে দরকার সেখানে নতুন করে টিউবওয়েল বা পাতকুয়ো যেটা সুবিধে হয় তাড়াতাড়ি করিয়ে দিন।

বর্ধমান :

বর্ধমানের শিল্পাঞ্চল ও কয়লাখনি

গত ৯ই মার্চ আকস্মিকভাবে কুলটির ইস্পাত কারখানার একটি অংশ আকস্মিকভাবে মাটিতে বসে যাওয়ায় একটি অভূতপূর্ব সঙ্কটের সৃষ্টি হয়েছে। তদুপরি কুলটির ইস্পাত কারখানার সাম্প্রতিক ঘটনা তদন্ত করতে গিয়ে খনি বিশেষজ্ঞরা একটি চাঞ্চল্যকর তথ্য আবিষ্কার করেছেন। সমগ্র রাণীগঞ্জ শহরটাই ফাঁপা ও পরিত্যক্ত কয়লাখনিগুলির উপর দাঁড়িয়ে আছে এবং ইতিমধ্যেই নাকি ওই শহরের কিছু অংশ মাটিতে বসে গেছে। এই অবস্থার জন্য অসাধু কয়লাখনির মালিকরাই সর্বতোভাবে দায়ী। কেন না নিয়ম আছে যে, খনি থেকে কয়লা উত্তোলিত হয়ে যাবার পর বালি দিয়ে সমস্ত খনি ভরাট করে দিতে হয়। খরচের ভয়ে খনির মালিকেরা তা যে করে নি এখন তা স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে এবং মুষ্টিমেয় কয়েকটি লোকের অতি মুনাফার প্রেরণাই লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবনসংকটের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এখন সরকারের কর্তব্য হচ্ছে রাণীগঞ্জ ও তৎসংলগ্ন অঞ্চলের বর্তমান ও ভূতপূর্ব কয়লাখনিগুলির মালিকদের শূন্য গহ্বরগুলি ভরাট করতে বাধ্য করা।

ইসকোর বার্নিস্ট ফাউন্ড্রি রবিবার রাত্রে এক ফুট পরিমাণ এবং সোমবার আরও দুই ইঞ্চি নিমজ্জিত হয়েছে। এরপরে অবশ্য আর নিমজ্জিত হয় নি। এই ফাউন্ড্রিতে মোট সাড়ে আট হাজার লোক কাজ করে। এই ঘটনার পর ৫৪০ জনকে লে অফ করা হয়েছে। ১৯৫৮ সালে এই ফাউন্ড্রির কাজ শুরু হয়। ১৯০৫ সালের পর এই অঞ্চলে খনির কোন কাজ হয় নি। এই ফাউন্ড্রির নিচে একটি পরিত্যক্ত খনি রয়েছে এবং পরিত্যক্ত খনির ওপর কিছু করলে তা ভূগর্ভে নিমজ্জিত হবার আশংকা থাকে। বরাকরের নিকটে একটি কারখানা কয়েক বছর পূর্বে ভূগর্ভে নিমজ্জিত হয়েছিল। একই কারণে জামুরিয়া, বরাকর ও রাণীগঞ্জের একাংশ ভূগর্ভে নিমজ্জিত হবার আশংকা রয়েছে।

হুগলী :

হিমঘর সমস্যা

হুগলী জেলার সিঙ্গুরে একটি হিমঘরে আগুনে লক্ষ লক্ষ টাকার আলু ও কয়েকটি অমূল্য প্রাণ বিনষ্ট হয়েছে। এ দেশে সম্প্রতি যত্রতত্র ব্যাঙ-এর ছাতার মত হিমঘর গড়ে উঠেছে, যদিও সেগুলিতে পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা ও প্রয়োজনীয় সকল যন্ত্রপাতির অভাব আছে। সরকারী তরফ থেকেও বোধ হয় এই হিমঘরগুলির ভিতরকার অবস্থা পর্যবেক্ষণের কোন ব্যবস্থাই নেই। হিমঘরগুলি ইন্সিওর করা থাকে, কাজেই তা কোন কারণে নষ্ট হয়ে গেলে মালিকের কোন অসুবিধা নেই। কিন্তু যারা হিমঘরে নিজেদের পণ্য জমা রাখে তাদেরই সর্বনাশ। বর্তমান যে হিমঘরটি দুর্ঘটনায় পতিত হয়েছে তার ফলে যেসব চাষীরা ওখানে আলু জমা রেখেছিলেন তাঁরা মাথায় হাত দিয়ে বসেছেন। আকস্মিক দুর্ঘটনায় হিমঘরে রক্ষিত পণ্যের কোন ক্ষতি হলে কর্তৃপক্ষ দায়ী নয় এই শর্তেই কৃষকেরা সেখানে ফসল রাখতে বাধ্য হন। কেন না মালিকপক্ষ শক্তিশালী ও সঙ্ঘবদ্ধ এবং দুর্বল কৃষকের পক্ষে তাদের বিরুদ্ধে কিছুই করার নেই। বর্তমান ক্ষেত্রে সরকারকেই এগিয়ে আসতে হবে এবং যাঁদের পণ্য হিমঘরে আগুন লাগার ফলে নষ্ট হয়েছে তাঁরা যাতে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ পান সে ব্যবস্থা করতে হবে, কেন না বিনা পয়সায় তাঁরা হিমঘরে পণ্য রাখেন নি। এই সঙ্গে এই মর্মে হিমঘর সংক্রান্ত কয়েকটি আইনও প্রণয়ন করা দরকার, বিশেষ করে যারা হিমঘরে নিজেদের পণ্য গচ্ছিত রাখছে তাদের স্বার্থ যাতে সর্বতোভাবে রক্ষিত হয় সেই ব্যবস্থা করা দরকার। এই ঘটনাটি অনেকগুলি সমস্যার কথা তুলে ধরেছে, যেগুলির সমাধান যত শীঘ্র পারা যায় করা প্রয়োজন।

(১৬।৩।৬৮)

সপ্তাহের বোঝা

কৃত্তিবাস ওঝা

তর্ক-বিতর্কের অবসান ঘটিয়ে আগামী নভেম্বর মাসে নির্বাচনের তিথি নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন ভারতের প্রধান নির্বাচনী কমিশনার শ্রী এস· পি· সেন-বর্মা। আর এই তিথি ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনী ঢাক বেজে উঠেছে দ্রুত তালে, দ্রুত লয়ে। ভোট মৃগয়ার প্রস্তুতিতে রাজনৈতিক শিবিরের শিকারীরা নিজেদের প্রস্তুত করছেন তীর, ধনুক, টাঙ্গী, বল্লম, হাওদায়। সময় হাতে বড় কম—তাই ঘর সামলাবার ভাবনা চাপা দিয়ে সকলেই চান যত শীঘ্র সম্ভব ভোটবনে পৌঁছোতে। কারণ এপ্রিল-মে দু' মাস ভোটবনে বিচরণ সহজ হবে, কিন্তু জুন মাস থেকে বর্ষা, আর বর্ষার পরই বেজে উঠবে পুজোর ঢাক। পুজোর ঢাক বাদ্যির আওয়াজে ভোটের বাদ্য জমবে না—তাই একেবারে বিজয়ার কোলাকুলি লক্ষ্মীর আরাধনা শেষ করে মুণ্ডমালিনীর চরণে প্রণাম জানিয়ে দেওয়ালীর আলোতে ভোট শিকারে নামতে হবে। যুদ্ধ অথবা মৃগয়া সবেরই প্রশস্ত সময় প্রাচ্যদেশে শরৎকাল আর সেই শরৎকালেই পশ্চিমবঙ্গের ভোট যুদ্ধের সময় নির্দিষ্ট করে রাজ্যের রাজনৈতিক দল নেতৃবৃন্দ এবং নির্বাচনী কমিশনার সেনবর্মা যোগ্য রণনীতিবিদেরই পরিচয় দিয়েছেন।

এ তো গেল ভোট যুদ্ধের বা ভোট মৃগয়ার দিন-ক্ষণের অবস্থা, কিন্তু মূল যুদ্ধ শিবিরের সেনানায়কদের অবস্থা কিন্তু মোটেই ভাল নয়। সবচেয়ে বড় যুদ্ধ শিবির কংগ্রেস ভবন, দ্বিতীয় বড় শিবির যুক্তফ্রণ্ট এবং দলছুটদের নিয়ে অধ্যাপক হুমায়ুন কবিরের দল, শ্রীজাহাঙ্গীর কবিরের বাংলা জাতীয় দল আর শ্রীশঙ্করদাস বন্দ্যোপাধ্যায়-শ্রীআশুতোষ ঘোষের দল—কারো কিন্তু ঘরোয়া অবস্থাটা এই মুহূর্তে যুদ্ধে নামবার মত নয়। কম-বেশি ঝগড়া বিবাদ আর অন্তর্দ্বন্দ্ব শিবিরগুলির অভ্যন্তরে গৃহযুদ্ধের পরিস্থিতি সৃষ্টি করে রেখেছে, সেই গৃহযুদ্ধের টাল সামলিয়ে শত্রুর সঙ্গে সার্বিক যুদ্ধে নামা অনেক দলের পক্ষেই দুরূহ হয়ে উঠবে।

প্রথমেই বলতে হয় কংগ্রেস দলের কথা। ১৯৬৭ সালের নির্বাচনের ছয় মাস আগের অবস্থার সঙ্গে ১৯৬৮ সালের নির্বাচনের ৬ মাস আগের অবস্থা তুলনা করলে কংগ্রেসের যে চিত্র চোখে পড়ে সেই চিত্রটি মোটেই কংগ্রেসের পক্ষে আনন্দদায়ক নয়। গত নির্বাচনে শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায় ও অধ্যাপক হুমায়ুন কবির কংগ্রেসের যথেষ্ট ক্ষতি করলেও কংগ্রেসের ভোট হ্রাসে মারাত্মক কোন ধস নামাতে পারে নি। কংগ্রেসের '৬৭ সালের নির্বাচনে '৬২ সালের নির্বাচনের তুলনায় মাত্র শতকরা ৩ থেকে ৫টি ভোট হ্রাস পেয়েছিল। কংগ্রেস রাজ্যের নির্বাচনে মোট ভোটের শতকরা ৪১টি ভোট পেয়েছিল। কংগ্রেসের তুলনায় কংগ্রেস-বিরোধী দলের কথা বাদ দিলেও ফ্রণ্টগত ভোটলাভ কংগ্রেসের কাছে যায় নি। কিন্তু এবারের অবস্থা হবে আরো কঠোর ও কঠিন। কোন প্রকার জ্যোতিষী বা গণৎকারের চোখে বা বিদ্যায় নয়, নিছক বাস্তব অবস্থা বিচার করলেই এই সত্য চোখে পড়ে যে, গত নির্বাচনের ভোটের হার রক্ষা বা সেই হার বৃদ্ধি করা কোন অঘটন ছাড়া কংগ্রেসের পক্ষে সম্ভব নয়। কেন? সেই কথায় প্রথম বলতে হয়—এই বিশ বৎসরে কংগ্রেস নিছক রাজনৈতিক শাসক দল হিসেবে নয়, নিছক রাজনৈতিক দল হিসেবে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে এবং এবারই সর্বপ্রথম সর্বশক্তিমান প্রশাসন যন্ত্রটি নির্বাচনের সময় কংগ্রেসের পিছনে ছায়ার মত অবস্থান করে কংগ্রেসকে শাসন তক্তে বসাতে সহায়তা করবে না। প্রশাসন যন্ত্রের সক্রিয় সহায়তা যে একটি দলের পক্ষে কত বড় সহায়ক, সেটা যে দল এই সহায়তার স্বাদ না পেয়েছে সে বুঝবে না আর কংগ্রেস এইবার সর্বপ্রথম বুঝবে সে কি হারিয়েছে। বিগত নির্বাচনগুলিতে সরকারী প্রশাসন যন্ত্রের ক্ষমতাসীন দলের প্রতি নগ্ন সমর্থনে কোন সংকোচ বা ভয়ের কারণ ছিল না, কারণ সরকারী আমলারা, পুলিশ বা নির্বাচনী অফিসার সকলেই জানতো, যে ঘটনাই ঘটুক না কেন, কংগ্রেসই ক্ষমতায় ফিরে আসবে; কাজেই তাদের গত অপরাধ-ত্রুটি সবই তাঁদের গুণ ও যোগ্যতায় পরিণত হবে। কিন্তু এবার সরকারী আমলারা অতি ভয় ও সংকোচে পদক্ষেপ করবে। কারণ, ১৯৬৭ সালের নির্বাচন প্রমাণ করে দিয়ে গেছে শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায়, শ্রীজ্যোতি বসু, শ্রীবিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীহেমন্ত বসুও মন্ত্রী হতে পারেন—তাঁদের দেখলেও খটাশ শব্দে সেলাম ঠুকতে হতে পারে। গত ১৯৬৭ সালের নির্বাচনের শেষ মুহূর্তে যখন প্রায় স্থির নিশ্চিত হয়ে গেছে কংগ্রেস পরাজিত হবে, তখন দক্ষিণ কলকাতায় অফিসারদের এক ক্লাবে বসে রাজ্যের কয়েকজন সর্বোচ্চ পদস্থ অফিসার যুক্তফ্রণ্ট নেতৃবৃন্দের উল্লেখ করে বলেছিলেন—আঃ ছো এই সব লোকেরা আবার মন্ত্রী হবে, তবে হাতের তালুতে চুল গজাবে। এর মাত্র ক'দিন পরে ১৯৬৭ সালের ২৪শে ফেব্রুয়ারী শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায় হাওড়া স্টেশন থেকে নেমে দশ হাজার মানুষের শোভাযাত্রা নিয়ে যখন লালবাজারের পাশ দিয়ে রাইটার্স বিল্ডিংসের সামনে দিয়ে ১৪৪ ধারা পদদলিত করে এগিয়ে গেলেন, তখন পরম নির্বিবাদে আমলারা ও পুলিশ এত বড় বে-আইনী কাজকে হজম করলো। আবার এই আমলাদের ও পুলিশকে দেখা গেল ১৯৬৭ সালের ২২শে নভেম্বর—যখন একদিন মাত্র আগে যুক্তফ্রণ্ট সরকারের পতন হয়েছে—তখন ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউণ্ডে দশ হাজার নয় মাত্র দশজন মানুষসহ দুই-জন মন্ত্রী শ্রীবিশ্বনাথ মুখার্জী আর শ্রীঅমরপ্রসাদ চক্রবর্তীকে এমন মার মারলো যে, শ্রীঅমরপ্রসাদ চক্রবর্তী ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের রাজত্বের আমলে হাসপাতালের বাইরের আলো দেখতে পান নি। শ্রীঅমর চক্রবর্তী যুক্তফ্রণ্ট সরকারের পতনের পরদিন হাসপাতালে গিয়েছিলেন আর রাষ্ট্রপতির শাসন কায়েম হলে হাসপাতাল তথা জেল থেকে মুক্ত হয়েছেন। শুধু তাই নয়, শ্রীঅমরপ্রসাদ চক্রবর্তী যখন মেডিক্যাল কলেজে চিকিৎসাধীন ছিলেন তখন তাঁকে ডাক্তাররা পর্যন্ত একজন সাধারণ কয়েদী-রোগীর বেশি মর্যাদা দেয় নি। এই হল সরকারী আমলা-চরিত্র। একজন অতি পদস্থ পুলিশ অফিসার রাষ্ট্রপতির শাসন কায়েম হবার পরদিন থেকে যুক্তফ্রণ্ট সরকারের মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির নানা অলীক অভিযোগের কাহিনী শুনিয়ে রাজভবন ও মহাকরণ সরগরম করে তুলেছেন এবং কোন একটি রাজনৈতিক দলের পেটোয়া হতে চেষ্টা করছেন। অথচ যুক্তফ্রণ্ট সরকারের আমলে এই পুলিশ অফিসারকে দেখা যেত, সগর্বে বলে বেড়াচ্ছেন—তার কোন শ্যালক ছাত্র ফেডারেশন করতো, তার জায়গা, যিনিও পুলিশের অতি উচ্চ-

পদস্থ অফিসার, তার সঙ্গে তার কত মতবিরোধ। এমন কি তিনি যে মনে মনে একজন কম্যুনিজমের ভক্ত সেটা হাবে-ভাবে বুঝিয়ে দিতেন, তবে কংগ্রেসের দুঃশাসনে তার এই মনোভাব প্রকাশ ও প্রস্ফুট হবার সুযোগ পায় নি। এই হল পুলিশী চরিত্র। এই অফিসাররা আগামী নির্বাচনে মনে শত বাসনা থাকলেও কংগ্রেস দলের হয়ে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কোন সমর্থনেই কাজ করতে পারবেন না, ভয় ও দ্বিধা সরকারী প্রশাসন যন্ত্রকে কিছুটা অকেজো, কিছুটা নিরপেক্ষ করে রাখবে। কংগ্রেস দলের এই প্রশাসন যন্ত্রের সহায়তা না পাওয়া যে কত বড় ক্ষতি সেটা অন্য কোন দলের পক্ষে বোঝা সম্ভব নয়।

সরকারী প্রশাসন ছাড়া শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত দল হিসেবে কংগ্রেস শিল্পপতি ধনী ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে বেশ অর্থ আনুকূল্য পেয়ে থাকেন। এই অর্থ আসে কখনও ব্যক্তিগতভাবে, কখনও সংগঠনগত ভাবে। কিন্তু এবার ব্যবসায়ীরা অর্থ নিয়োগ বা লগ্নী করবে খুব সতর্কভাবে। কারণ ব্যবসায়ীরা যদি একটু বুঝতে পারে, কংগ্রেসের খুব "ফেয়ার চান্স" নেই, তখন তারা দ্বিগুণ উৎসাহে অন্য কোন দলের পেছু নেবে। এই কারণে বিগত নির্বাচনসমূহে কংগ্রেস তার সব ঘাটতি পূরণ করতো টাকা দিয়ে, কংগ্রেসের এই টাকা খরচের উৎসমুখ এই নির্বাচনে দুর্বল হয়ে যাবে। এ ছাড়া কংগ্রেসের নির্বাচন প্রার্থীরা এইবারই সর্বপ্রথম বেকার ব্যক্তি হিসেবে নির্বাচন লড়বেন। অন্য নির্বাচনে কংগ্রেসের নির্বাচন প্রার্থীরা বেশির ভাগ ছিলেন গত পাঁচ বৎসরের নির্বাচিত এম-এল-এ, অর্থাৎ সব এম-এল-এ'র পাঁচ বৎসরে উপার্জিত অর্থের বেশ কিছু পরিমাণ ব্যয় হত নির্বাচনের কাজে। কিন্তু এবার '৬৭ সালের পর একটি বৎসরের জন্য এম-এল-এ থেকে গত নির্বাচনে ব্যয়িত অর্থের উসুল পর্যন্ত অনেকের হয় নি, নতুন জমা দূরে থাক। তাই বেকার বিধানসভা সদস্যরা শুধু নিজ নির্বাচন কেন্দ্রে থানা, পুলিশ, বি-ডি-ও, অঞ্চল পঞ্চায়েত, দফাদার-চৌকিদার প্রভৃতিকে কাজে লাগাতে পারবেন না তাই নয়—অর্থের দিকেও অনেক বেশি কমজোরী অবস্থায় নির্বাচন লড়বেন।

এর পর কংগ্রেসের সংগঠনগত অবস্থার কথা বিবেচনা করলে দেখা যায় '৬৭ সালের তুলনায় '৬৮ সালে কংগ্রেস সংগঠনগতভাবেও বহু বিচিত্র সমস্যার সম্মুখীন। '৬৭ সালের নির্বাচনের আগে কংগ্রেস থেকে দলত্যাগ করেছিলেন শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক হুমায়ুন কবির, শ্রীসুশীল ধাড়া, কিন্তু এবার সেই বিয়োগের সঙ্গে আরো বিয়োগ হয়েছে শ্রীশঙ্করদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, নবাব কাজেম আলি মির্জা সহ প্রায় ডজন এম-এল-এ। শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায়ের দলত্যাগী সঙ্গী ছিলেন শ্রীরজনী প্রামাণিক, শ্রীমহতাব দাস, শ্রীজাহাঙ্গীর কবির সহ ছয়-সাতজন বিধানসভা সদস্য, কিন্তু শ্রীশঙ্করদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, নবাব কাজেম আলি মির্জা যাত্রা সুরু করেছেন প্রায় এক ডজন বিধানসভা সদস্য নিয়ে। শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায়ের দলত্যাগের সময় তার সঙ্গী ছিলেন মাত্র মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, ২৪-পরগণা, নদীয়ার কয়েকজন। কিন্তু শ্রীশঙ্করদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গীরূপে যেমন এক প্রান্তের জেলা পুরুলিয়ার নেপাল বাউরী, সতীশ বাউরী আছেন আবার অপর প্রান্তের জেলা কোচবিহারের শ্রীমহেন্দ্র ডাকুয়া, শ্রীশঙ্কর সেন ইসোর আছেন। শুধু তাই নয়, কংগ্রেসের সঙ্গে "শঠে শাঠ্যম্ সমাচরেৎ"—এই নীতিতে শ্রীঅজয় মুখো-

শ্রীজগন্নাথ কোলে

পাধ্যায় অপেক্ষা শ্রীশঙ্করদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীকাজেম আলি মির্জা অনেক বেশি পটু, অনেক বেশি ধূর্ত, অনেক বেশি "রিসোর্সফুল"।

এই সব হল বাইরের কথা, কংগ্রেসের ঘরের খবরটাও কিন্তু '৬৭ সালের তুলনায় '৬৮ সালে মোটেই ভাল নয়। '৬৭ সালের নির্বাচনের সময় শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায় একটি দল নিয়ে বেরিয়ে গেছিলেন, কিন্তু কংগ্রেসের কর্তাব্যক্তিরা তথা কংগ্রেস দল ছিল সংহত, আত্মবিশ্বাসী ও জয়লাভ সম্পর্কে সুনিশ্চিত। নিজের প্রতি তথা দলের প্রতি দৃঢ় আস্থা ছিল বলেই শ্রীঅতুল্য ঘোষ আরামবাগে দাঁড়িয়ে শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায়কে বঙ্গোপসাগরে নিক্ষেপ করতে চেয়েছিলেন, জয়ে সুনিশ্চিত ছিলেন বলেই, নির্বাচন শেষ হবার একদিন পরও বলেছিলেন, কংগ্রেস জয়যুক্ত হবেই, আর শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন হবেন মুখ্যমন্ত্রী। এবারও হয়তো জয়ের কথা বলবেন, কারণ সেটা বলতেই হবে। তবে সেই জোর কি আছে মনের বা সংগঠনের? রাষ্ট্রপতির শাসন কায়েম হবার পর এবং নির্বাচনের দিন ঘোষণার পর কংগ্রেসের নয়া বিদ্রোহী গোষ্ঠী একটু সংযত হয়েছেন আর ক্ষমতাসীন গোষ্ঠীও একটু সহনশীল হয়েছেন; কিন্তু এটা নিতান্তই বাহ্য ও লোক দেখানো। একটু কান পাতলেই শোনা যাবে কংগ্রেসের আভ্যন্তরীণ অবস্থার অবনতি ছাড়া সামান্যও উন্নতি হয় নি। নয়া বিদ্রোহী-গোষ্ঠীর নেতা শ্রীগোবিন্দ দে মেয়র নির্বাচনের একটা ফয়সালা না হওয়া পর্যন্ত প্রকাশ্যে বেশি কিছু করবেন না ঠিক করেছেন; কিন্তু শ্রীতরুণকান্তি ঘোষ, শ্রীনারায়ণ চৌধুরী—তাঁরা কি বসে আছেন? পত্রিকা শতবার্ষিকী উৎসবের দরুণ ব্যস্ত শ্রীতরুণকান্তি ঘোষ চরম সংগ্রামের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করছেন। আর শ্রীনারায়ণ চৌধুরী—তিনি তো পুরোপুরি যুদ্ধে নেমেছেন। বর্ধমান জেলা কংগ্রেসের ১৪০ জন সদস্যের মধ্যে ৯১ জন সদস্য একযোগে শ্রীচৌধুরীর বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাবের নোটিশ দিয়ে বসে আছেন। শ্রীপুরঞ্জয় প্রামাণিক, শ্রীমদন চৌধুরী, শ্রীশান্তিময় হাজরা, শ্রীআকবর হোসেন, শ্রীকার্তিক ঘোষ প্রমুখ যাঁরা শ্রীচৌধুরীর গত কয়েক বৎসরের ঘনিষ্ঠ সহকর্মী বন্ধু, তাঁরা চৌধুরীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ধ্বজা উড়িয়েছেন আর শ্রীচৌধুরীর পক্ষে ময়দানে নেমে শ্রীধ্বজাধারী মন্ডল, শ্রীপ্রমথ ধীবর, শ্রীজয়নারায়ণ শর্মা, শ্রীমতী নুরুন্নেসা সাত্তার ধ্বজা উড়িয়েছেন।

এই প্রসঙ্গে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য খবর হলো—শ্রীজগন্নাথ কোলে দীর্ঘদিন অসুস্থ থেকে সুস্থ হয়ে উঠেছেন। শ্রীকোলে বর্তমানে শুধু সন্ধ্যাবেলায় বাড়ি থেকে বেরিয়ে কালীঘাট টেন্টে হাওয়া খেতে যাবার জন্য ডাঃ সুনীল বসুর কাছ থেকে অনুমতি পেয়েছেন, কিন্তু তার মধ্যেই তিনি একদিন বাঁকুড়ার কোতুলপুর ঘুরে এসেছেন। শ্রীকোলে ইতিমধ্যে আভাসে যে কথাটি প্রকাশ করেছেন, তা হলো তিনি কংগ্রেস মনোনয়ন নিয়ে নির্বাচনে দাঁড়াবেন না আর বাঁকুড়া জেলায় বা তার আশেপাশে কংগ্রেসের নির্বাচন প্রার্থী দল যাতে না জোটে সেটা দেখবেন। জেলার বাইরেও শ্রীকোলে নজর দিচ্ছেন। খুব শীঘ্রই শোনা যাবে শ্রীকোলে কংগ্রেসের বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠীদের নিয়ে বসেছেন আর কি করা যায় সেটা ভাবতে সুরু করেছেন।

এবার শুধু কংগ্রেসের দুই-একজন নেতা আর দুই একটি জেলার কথা বললাম, পরে বিস্তৃত বলা যাবে।

তবে কংগ্রেসের বিরোধী শক্তিসমূহের অবস্থা কি খুব ভাল? সে কথাও কিন্তু সত্য নয়। ঘর যেমন কংগ্রেসের ভাঙছে, অশান্তির আগুন তেমনি যুক্তফ্রন্ট ও অন্য শিবিরেও কিছু কিছু জ্বলছে। সেই আগুনের খবরও বারান্তরে বলার ইচ্ছা আছে।

ভারত দর্শন

নিরাপত্তার প্রশ্ন

ভারতবর্ষে বিশেষ নিরাপত্তা আইন-বলে কেন্দ্রীয় সরকার বিশেষ ক্ষমতা করায়ত্ত করেছেন। ঐ আইন প্রয়োগের বিভিন্ন সংবাদও প্রায়ই চোখে পড়ে। কিন্তু তা এই সীমান্তেই হোক বা জনজীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রেই হোক ভারতের নাগরিক-বৃন্দের মনে ক্রমেই জীবন ও সম্পত্তি সম্পর্কে নিরাপত্তাবোধ শিথিল হয়ে পড়ছে।

সীমান্তবাসী ভারতীয় নাগরিকবৃন্দ প্রায়ই পাক সীমান্তবাসী কিছু দুর্বৃত্তের কবলে লাঞ্ছিত হচ্ছেন। তাঁদের আত্মীয়-পরিজন গবাদি পশু এবং অস্থাবর সম্পত্তি লুণ্ঠিত হচ্ছে। সীমান্তের প্রহরা তুচ্ছ করে পাক অনুপ্রবেশ এবং হামলা আজ একটি সাধারণ সংবাদরূপে সংবাদপত্রের কোলে স্থান পাচ্ছে।

সাম্প্রতিক সংবাদে প্রকাশ, বিগত ৪ঠা মার্চ ভারতীয় নাগরিক আবু সিদ্দিক মিঞাকে তার কয়েকটি গবাদি পশু সহ পাক রাইফেল বাহিনীর জনাচারেক সশস্ত্র ব্যক্তি আগরতলার গ্রাম জয়পুর থেকে অপহরণ করে নিয়ে গেছে।

মেখলীগঞ্জের সংবাদ, আলোচ্য মহ-কুমার বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে পাক দুর্বৃত্তদের অত্যাচারের লীলাভূমি বিস্তৃত হয়েছে। কোথাও কোথাও তারা ভারতীয় এলাকার এক মাইল পর্যন্ত ভেতরে এসে দৌরাত্ম্য এবং অত্যাচার করছে বিনা বাধায়। কিছু পাক অনুপ্রবেশকারীর সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে পূর্ব সীমান্তের মেখলীগঞ্জ, তিস্তা নদের পরস্থী, লোথামারি, পানি-শালা, ভোটবাড়ি, গোলাপাড়া, ফকিরের ডাঙা প্রভৃতি অঞ্চলে। এরা শুধু যে অপহৃত মালই পাচার করে তাই নয়, এরা মূল্যবান সংবাদও সীমান্তের পরপারে পাঠিয়ে দিচ্ছে। এই সংবাদবাহীদের কেউ কেউ নাকি আবার পরিচয় ভাঁড়িয়ে পাক চক্রান্তের জাল বিছিয়ে আসছে শহর শিলিগুড়ি পর্যন্ত।

প্রকাশ, কোনও বৈদেশিক সংস্থার সংগে নাকি উক্ত অনুপ্রবেশকারীদের যোগা-যোগ আছে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য ভারতীয় অঞ্চল তিস্তার পরস্থীর এক বিস্তীর্ণ এলাকা পাক সম্পত্তি বলে পাক সেক্টর কমাণ্ডারের তরফে একটি উদ্ভট দাবি উত্থাপিত হয়েছিল যার প্রতিবাদ করেছেন ভারতীয় সেক্টর কমাণ্ডারের দপ্তর।

এ তো গেল সীমান্তের একটি দিকের খবর। কিন্তু ভারতের বিস্তীর্ণ সীমান্ত এলাকা জুড়ে পাক অনুপ্রবেশকারীর ও হামলার খবর প্রায় আকাশবাণীর প্রোগ্রাম কিম্বা বাজারদরের তালিকার মতই দৈনিক সংবাদপত্রে একটি স্থায়ী জায়গা জুড়ে আছে। এই তো গত ৫ই মার্চ কচ্ছ সীমান্তে দু'জন পাক অনুপ্রবেশকারী টহলদার পুলিশের নজরে পাকড়াও হয়েছে। কিন্তু সংবাদের অন্তরালেও পাক বর্গীর হামলা আরও কত জায়গায় জনজীবনকে অতিষ্ঠ করে তুলছে, দৈনিক প্রকাশিত সংবাদের বহর দেখেই তা অনুমান করা যায়।

সীমান্তের অপর পার থেকে যখন ক্রমাগত বর্গীর উৎপাত আজও পর্যন্ত ঠেকানো সম্ভব হল না, তখন গোদের ওপর বিষফোড়া হয়েছে শেখ আবদুল্লা সাহেবের মুক্তি। তিনি স্বাধীনভাবে ভারতের মাটিতে দাঁড়িয়েই ভারতের নিরাপত্তা বিঘ্ন-কারী বক্তৃতার ফুলঝুরি অবাধে জ্বালিয়ে চলেছেন।

তিনি সরাসরি কাশ্মীরী মুসলিমদের উত্তেজিত করার পথ বেছে নিয়েছেন এবং সঙ্ঘবদ্ধভাবে গ্রামে গ্রামে মুসলিম গণফ্রন্ট গঠনের আহ্বান জানাচ্ছেন। গণভোটের আওয়াজে ভারতের বুকে আরও একবার সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি সৃষ্টির প্রকাশ্য প্রয়াস তাঁর আচরণে লক্ষণীয় হয়ে উঠেছে। বলা বাহুল্য, ভারতীয় নাগরিক জীবনকে বিপর্যস্ত এবং নিরাপত্তাহীন করতে সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি একটি ধারাল অস্ত্র। শেখ সাহেব মুক্তির পরদিন থেকেই নিশ্চিন্তে এবং প্রকাশ্যে সেই অস্ত্র শাণাতে শুরু করেছেন।

এ সমস্ত ব্যাপারেই কেন্দ্রীয় সরকারের নীরব দর্শকতুল্য ভূমিকা ভারতীয় জন-জীবনে নিরাপত্তাবোধকেই ক্ষুণ্ণ হতে সাহায্য করছে, অথচ সেদিকটা কেউ যে গুরুত্ব দিয়ে ভাবছেন এমন আশ্বাসও সাধারণ মানুষের মনে অনুপস্থিত।

ভারতের পাশে পাকিস্তান এবং ভারতের বুকে কাশ্মীর এই দুটি স্থায়ী ক্ষতের প্রদাহে ভারতের সর্বাংগে সর্বদা জ্বালা ধরে আছে।

এ সমস্যা যেন দ্রৌপদীর শাড়ির মতো অনন্ত, অন্তহীন।

সম্প্রতি আরও লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে ভারতের স্বার্থ-বিরোধী মনোভাব আবার মাথা তুলতে চেষ্টা করছে এবং সুযোগ পেলেই জন-জীবনে নিরাপত্তাহানির চেষ্টা করছে: করিমগঞ্জে যে হাঙ্গামা মাথা তুলছিল তাকে অঙ্কুরে বিনষ্ট করার চেষ্টা হয়েছে খুবই তৎপরতার সংগে, কিন্তু উত্তেজনা পার্শ্ব-বর্তী অঞ্চলেও থিতিয়ে আছে যা সীমান্ত রাজ্যের ক্ষেত্রে ভয়াবহ।

কলকাতায় একটি পুকুরে স্নান করাকে কেন্দ্র করে দুটি দল দাঙ্গায় ঝাঁপ দেওয়ার প্রয়াস পেয়েছিল। দুর্ঘটনায় তিন ব্যক্তি নিহত, তিনজন গুরুতরভাবে আহত এবং ডজনখানেক ব্যক্তি আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছেন। ঘটনাবলী অবশ্য যেমনি দ্রুত দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়তে উদ্যত হয়েছিল, দুই দলেরই প্রচেষ্টায় সেই মারমুখী অপচেষ্টা অল্পক্ষণের মধ্যেই আয়ত্তে আসে, পুলিশও এ-বিষয়ে যথেষ্ট সহায়কের ভূমিকা নিয়ে এগিয়ে এসেছিলেন।

হোলিকে কেন্দ্র করেও ছোটখাটো সঙ্ঘর্ষ ইতস্তত বিস্তারলাভের চেষ্টা করে, কিন্তু স্থায়ী গণ্ডগোল উভয়পক্ষের শুভেচ্ছার দানা বাঁধতে পারে নি।

কলকাতার ঘটনা থেকেই বেশ বোঝা যায় যে কিছু দুষ্কৃতকারীর অহরহ চেষ্টা আছে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে সঙ্ঘর্ষ গড়ে তোলা, কিন্তু ভারতের নাগরিকবৃন্দের আন্তরিক শুভেচ্ছা সেই অপচেষ্টাকে তৎক্ষণাৎ প্রতিরোধেও সজাগ আছে।

এই সমস্ত হাঙ্গামায় ছোরা লাঠি প্রভৃতি মারাত্মক অস্ত্রের অবাধ ব্যবহার দেখেও আতঙ্ক জাগে। মানুষের মনে নিরাপত্তাবোধ কমে গেলে এবং আত্মরক্ষার ব্যাপারে আস্থার অভাব ঘটলে সে আপন-প্রাণ বাঁচানোর হাতিয়ার সংগ্রহ করে রাখে। কিন্তু হাঙ্গামাস্থলে যাঁরা অস্ত্র ব্যবহার করছেন তাঁদের ক্ষেত্রে এ যুক্তি অসার। তাঁরা দুষ্কার্যের জন্যই গোপনে অস্ত্র লুকিয়ে রাখছেন প্রয়োজন মত অকস্মাৎ তার ব্যবহারের ভয়ঙ্কর সংবাদ পাচ্ছি আমরা। কিন্তু বস্তুতপক্ষে যাঁরা শিষ্ট নাগরিক তাঁরা এই সমস্ত হাঙ্গামার অংশী-দার না হয়েও শুধু মার খাচ্ছেন। বলতে বাধা নেই, সেক্ষেত্রে আমাদের শান্তিরক্ষক বাহিনী খুব যে তৎপরতার সংগে নাগরিক-বৃন্দের পাশে এসে দাঁড়াতে পেরেছেন এমন নয়, বরং জনগণ এসব ব্যাপারে

হতাশই হয়েছেন। এ কারণেও জনমন থেকে ধীরে ধীরে নিরাপত্তাবোধ শিথিল হতে বসেছে।

আজ সভ্য গণতান্ত্রিক ভারতবর্ষে একটিও নাগরিক কি যথার্থভাবে ভাবতে পারেন যে বাড়ির বাইরে পা দিয়ে তিনি নির্বিঘ্নে আবার বাড়িতে ফিরতে পারবেন সেই দিন। যদি দুর্বৃত্তের কবলেও না পড়েন, যে-কোন মিছিলকে কেন্দ্র করে পুলিশের লাঠি গুলীও তাঁর ভবলীলা সাঙ্গ করে দিতে পারে। ভারতীয় নাগরিক তাই আজ মনুষ্যকৃত (ম্যানমেড) দুর্ঘটনা বা এ্যাক্সিডেণ্টকে ছায়ার মতো নিজের সঙ্গে নিয়ে ঘুরছেন। বেশি কি, বাড়ির নিরাপদ আশ্রয়ে থেকেও নিশ্চিন্ত নেই, ভোররাত্রে দুর্বৃত্তের স্টেনগান গর্জে উঠতে পারে। জীবনের সর্বস্ব ঢেলে একটা দোকান বা স্টল খাটিয়েও দরিদ্রতম ব্যবসাদার যে-কোন মুহূর্তে সর্বস্বান্ত হয়ে যেতে পারেন। ইদানীং হামলাকারীরা নির্বিচারে দোকানপাট লুণ্ঠন ও অগ্নিদগ্ধ করছে যা রক্ষার দায়িত্বও এ দেশের সিপাই-সান্ত্রী যথার্থ পালনে অক্ষম। এহেন অবস্থায় নিরাপত্তাবোধ সার্বিকভাবে ধ্বংস হতে চলেছে। দেশ নৈরাজ্য এবং অরাজকতার কবলে সর্বদা তটস্থ হয়ে আছে।

বিচারপতি গ্রোভারের ওপর ছুরিকাঘাত

কেবলমাত্র সাধারণ মানুষের জীবনই নিরাপত্তাহীন এমন নয়, সুপ্রীম কোর্টে প্রধান বিচারপতির এজলাসও দুর্বৃত্তের দ্বারা আক্রান্ত হয়। বিচারপতিগণের সঙ্গে দুর্বৃত্তের লড়াই চলে বেশ কিছু সময় নিয়েই অথচ কোনো নিরাপত্তাবাহিনীর টিকিটিও দেখা যায় না। এমন মগের মুল্লুক এক সভ্য ভারতবর্ষ ছাড়া আর কোথাও আছে কিনা সন্দেহ।

সুপ্রীম কোর্টে প্রধান বিচারপতির ওপর আক্রমণ প্রতিহত করতে গিয়ে বিচারপতি গ্রোভার নির্মমভাবে ছুরিকাহত হয়েছেন প্রকাশ্য দিবালোকে বিচারালয়ের সুরক্ষিত কক্ষে। সুরক্ষিত? এ শুধু ধারণা এবং কথার কথা। কিন্তু বিরাট অপ্রিয় দায়িত্ব যে বিচারালয়কে পালন করতে হয়, সরকার যে সেই বিচারালয়ের সংরক্ষার কোনই উপযুক্ত বন্দোবস্ত রাখেন নি বিচারপতি গ্রোভারের ওপর আক্রমণই তার প্রমাণ। বড় প্রমাণ এই যে, আততায়ী বিচারকগণের প্রবেশপথ ধরেই বিচারকক্ষে প্রবেশ করে এবং পথে তাকে কোনও বাধার সম্মুখীন হতে হয় নি। আততায়ীর সঙ্গে ধস্তাধস্তি করতে হয়েছিল মাননীয় বিচারকবর্গকে, সেখানে কোনো নিরাপত্তার ব্যবস্থা না থাকার জন্যই। দিল্লী পুলিশের অকৃতকার্যতা এর বেশি আর কি প্রমাণ রেখে যেতে পারত!

পুলিশী নিষ্ক্রিয়তা দেখা যায় কেবল তার ওপর ন্যস্ত কর্তব্য পালনে। কিন্তু পুলিশ যেখানে অত্যাচারীর রূপ ধরে সাধারণ মানুষের ওপর বীর-বিক্রমে ঝাঁপিয়ে পড়ে কিম্বা কোনও পুলিশের ব্যক্তিগত বচসার মীমাংসা যখন তারা করে বচসাকারীকে ব্যারাকে আটকে মারধোর করে, তখন তাদের তৎপরতায় খুঁৎ ধরে এমন সাধ্য কার। সুতরাং ভারতে রক্ষকই ভক্ষকের আকারে যখন আবির্ভূত তখন তার মূর্তি দেখি রণোন্মাদ, কিন্তু যখন নাগরিকজীবন রক্ষার কর্তব্যের আহ্বান আসে তখনই তারা নিষ্ক্রিয়। এমতাবস্থায় সাধারণের মনে নিরাপত্তাবোধ যে টেকসই হতে পারে না তা সহজবোধ্য। আমাদের শাসকবর্গের দৃষ্টিতে এই অনাচার ধরা পড়ে না। পড়লেও সে বিষয়ে তাঁদের ইতিকর্তব্যও তাঁরা পালন করেন না। তাঁদের কর্তব্যবোধ টের পাওয়া যায় যখন প্রতিরক্ষা বা পুলিশীখাতে রাজস্বের মোটা অংশ ব্যয় করার জন্য তাঁরা বাজেট তৈরি করেন তখন। শাসকবর্গ যেন মধ্যযুগের জমিদারী নায়েবের মতো পাইক পোষার গাম্ভীর্যেই মেতে আছেন, পাইক-ব্যবহারের রীতিনীতি তাঁদের হয় অজ্ঞাত নয় তাঁরা সে সম্পর্কে দায়িত্বহীন। এই সামগ্রিক দায়িত্বহীনতা দেশব্যাপী অরাজকতা সৃষ্টির অবাধ সুযোগ দান করে আসছে, যে সম্পর্কে আত্মমগ্ন নেতৃত্বের অবিলম্বে অবহিত হওয়া উচিত।

সেনাদল এবং নিরাপত্তা

পুলিশী নিষ্ক্রিয়তা এবং স্থানীয় ক্ষমতাশালী ভি আই পি-দের পৃষ্ঠপোষকতা ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে এক শ্রেণীর তথাকথিত মস্তান বাহিনীকে প্রকৃতপক্ষে শাসকের ক্ষমতার অধিষ্ঠানের সুযোগ করে দিচ্ছে। এই মস্তান বাহিনী রাজ্যে রাজ্যে বিশেষ বিশেষ সেনাদল তৈরি করেছে যাদের কাজ হচ্ছে আঞ্চলিক ভেদবুদ্ধিকে হাতিয়ার করে ভারতীয়দের নাগরিক অধিকারের ওপর আক্রমণ চালানো। পুলিশ এসব ক্ষেত্রে নীরব দর্শকমাত্র। কোথাও কারও নিরাপত্তার দায়িত্ব সাধারণের রক্ত জল করা পয়সায় পরিপুষ্ট পুলিশ আজ আর গ্রহণ করে না। সেজন্যই শিবসেনার হুমকীতে বোম্বের প্রেক্ষাগারগুলি সভয়ে মাদ্রাজে-নির্মিত হিন্দী ছায়াচিত্রের প্রদর্শনী বাতিল করতে বাধ্য হয়, আসামে লাচিত সেনা প্রচারপত্র বিলি করে অন-অসমীয়াদের আসাম ত্যাগের আদেশ দিতে পারে। এ সবই তারা করে কেন না আমাদের কেন্দ্রীয় শাসকবর্গ নাগরিকগণের নিরাপত্তা রক্ষার দায়িত্ব পালন অপেক্ষা দলীয় ক্ষমতা রক্ষার প্রতিই অধিক আকৃষ্ট। দেশের মাটি অরাজকতার পদভারে নিষ্পিষ্ট হোক ক্ষতি নেই, তাঁদের চিন্তা কেমন করে প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করা যায়। শিবসেনার দৌরাত্ম্য দিন দিন বাড়লেও কেন্দ্রীয় সরকার এই সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণে অনিচ্ছুক। কেন না শিবসেনা শুধু যে কৃষ্ণ মেননের পরাজয় আনয়নে সহায়তা করেছিল বোম্বাই নির্বাচনে তাই নয়, শিবসেনা ঘোর কম্যুনিস্ট-বিরোধী। শিবসেনার অত্যাচার দরিদ্র নাগরিক উৎখাতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ।

নজির বাড়িয়ে লাভ নেই। উদ্ধৃত উদাহরণই যথেষ্ট। ভারতের বর্তমান শাসকবর্গ সাময়িকভাবে জমিদারী রক্ষায় এমনই ব্যস্ত যে, দূরদৃষ্টির বালাই তাঁরা রাখছেন না, দুধকলা দিয়ে কালসাপ পুষে যাচ্ছেন। আশা, কালসাপে শুধু প্রতিপক্ষকেই ছোবল মারবে। কিন্তু কালনাগিনী-চরিত্রে কস্মিনকালেও প্রভুভক্তির নজির নেই, দেশের বর্তমান শাসকমণ্ডলীর সে বিষয়েও সতর্কতার প্রয়োজন আছে। প্রকাশ্যে ভারতীয় নাগরিক জীবনকে নিরাপত্তাহীন এবং সাংবিধানিক রক্ষাকবচ থেকে বঞ্চিত হতে দেখেও যে শাসকবর্গ আজ উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণে কৃপণ, সেই শাসনের ভবিষ্যৎও যে ক্রমেই অনুজ্জ্বল হয়ে পড়ছে। নেতৃবৃন্দ সে বিষয়ে কবে সচেতন হবেন তাতে সন্দেহ আছে। যদি না হন, দুর্ভাগ্য ভারতবর্ষের অবধারিত। আমরা অন্ধকার ভবিষ্যৎকে স্বেচ্ছায় আলিঙ্গন করে আনছি।

পাঞ্জাবে ১৭৪ ধারা

স্পীকারের বিরুদ্ধে আনীত অনাস্থা প্রস্তাব সংবিধান-বিরোধী বলে ফ্রণ্ট নেতার আপত্তির পর ক্ষমতাসীন গিল-মন্ত্রিসভা সমর্থক কংগ্রেসী সদস্যবর্গের হট্টগোলে দুই মাসের জন্য স্পীকার যোগীন্দ্র সিং মান বিধানসভার অধিবেশন বন্ধ রাখলে

কিস্তিবন্দীতে ট্রানজিস্টার

মাসিক ১০ টাকার সহজ কিস্তিতে ৩২০ টাকা মূল্যের টেবিল-কুইন পোর্টেবল ৩ ব্যাণ্ড, অল ওয়ার্ল্ড ৮ ট্রানজিস্টার। আবেদন করুন:—

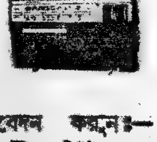

Atlas Co. (S. B.—22).
Box No. 1329, Delhi-6.

পাঞ্জাবের রাজ্যপাল ডঃ পাভাতে অকস্মাৎ ১৭৪ ধারা বলে বিধানসভা প্ররোগ করে দিয়েছেন। যদিও স্বয়ং মান রাজ্যপালের এই ক্ষমতা ব্যবহারের যোগ্যতা আছে বলে স্বীকার করেছেন, বিভিন্ন মহলের ধারণা কিন্তু অন্য রকম।

বিরোধী যুক্তফ্রণ্টের নেতৃবৃন্দ রাজ্যপালের ক্ষমতা প্রয়োগকে অগণতান্ত্রিক এবং পক্ষপাতদুষ্ট বলে অভিহিত করেন। তাঁদের মতে, অনির্দিষ্ট কালের জন্য বিধানসভা বন্ধ করা হলে একমাত্র সেক্ষেত্রেই রাজ্যপাল বিশেষ ক্ষমতাবলে সভা 'প্ররোগ' করতে পারেন, অন্যথা নয়।

কিন্তু তর্ক যেখানেই গড়াক, বর্তমানে পাঞ্জাবে যে শাসন-সঙ্কট ঘনীভূত হয়েছে, শুধুমাত্র রাজ্যপালের ১৭৪ ধারা প্রয়োগেই তার অবসান সম্ভব বলে বিশ্বাস হয় না।

সভা প্ররোগ করে রাজ্যপাল এখন পুনশ্চ সভা আহ্বানের অধিকারী। এইভাবে তিনি বাজেটও পাশ করিয়ে নিতে বা সভায় তা উত্থাপনের আয়োজন করতেও পারেন। শ্রীযুত লছমনসিং গিল (মুখ্যমন্ত্রী) রাজ্যপালকে যথাশীঘ্র সভা আহ্বানের জন্য পীড়াপীড়িও করছেন। কিন্তু সভা আহূত হলেই যে গিল-মন্ত্রিসভার সঙ্কট দূর হচ্ছে এমন মনে করার যথার্থ কারণ নেই। গিয়ান সিং রাড়েওয়ালার নেতৃত্বে একদল কংগ্রেসী এবং সন্ত আকালী দল গিল-মন্ত্রিসভার কার্যকাল সম্প্রসারণের বিরোধী। অন্যদিকে যুক্তফ্রণ্ট জানিয়েছেন সংখ্যালঘু গিল-মন্ত্রিসভাকে গদিতে টিঁকিয়ে রাখলে রাজ্যের ভবিষ্যৎ ক্রমশ অনিশ্চিত এবং অবনতির সম্মুখীন হতে বাধ্য। কংগ্রেসীদের আর এক শাখা অবশ্য গিলকে স্বর্গত কায়রন সিং-এর ন্যায় লৌহদৃঢ় নেতারূপে গণনা করেন।

গিল ক্ষমতাসীন হওয়ার পর থেকেই রাজ্যের রাজনৈতিক আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হয়েছিল। স্পীকার মানকে তড়িঘড়ি সরাতে গিয়ে সেই মেঘাবৃত অন্ধকারে গিল-মন্ত্রিসভা এখন আকণ্ঠ নিমজ্জিত হল। গত চার মাসের শাসনকালেও গিল মন্ত্রিসভা কায়দা করে উঠতে পারেন নি, বর্তমানে তাঁদের পক্ষে নয়া সংকট কাটিয়ে ওঠা কতদূর সম্ভব তাও বড় রকম সন্দেহের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

গিল এ পর্যন্ত এক গোষ্ঠী স্বার্থবিলাসী রাজনীতিককে কেবলমাত্র প্রলো-

ডঃ পাভাতে

ভনের চারে আটক রাখতে পেরেছেন। নচেৎ রাজ্য কংগ্রেসের একটি উল্লেখযোগ্য অংশই গিল-মন্ত্রিসভার প্রতি বিরূপ এমন কি রুষ্ট।

একদল কংগ্রেসী সরাসরি গিলের অপসারণ এবং পুরোপুরি কংগ্রেসী মন্ত্রিসভার পত্তনের দাবিদার। তাঁদের আশা, সেক্ষেত্রে গিল-মন্ত্রিসভার অন্তত জনা ছয়েক সদস্য কংগ্রেসী শিবিরে মেঝে-ঝাঁপ (ফ্লোর-ক্রশ) করে চলে আসবেন। এঁরা গিলকে বরদাস্ত করতে না-পারার একটি পার্টিগত কারণও বর্তমান। গিল-মন্ত্রিসভা অধিককাল ক্ষমতাসীন থাকলে শিখ

লছমন সিং গিল

কৃষিজীবী মহলে অসন্তোষ বৃদ্ধির সমূহ সম্ভাবনা। শিখ অধ্যুষিত অঞ্চল থেকে নির্বাচিত কংগ্রেস নেতৃবর্গ তাই গিলের মেয়াদ হ্রাসে উদ্গ্রীব। না হলে তাঁদের নিজস্ব এলাকা হাতছাড়া হয়ে যাবে বলে আশঙ্কা। এঁদের মধ্যে রাড়েওয়ালা ছাড়াও দরবারা সিং, মোহনলাল বা বৃষভানের মতো নেতৃবর্গও আছেন। কিন্তু কেন্দ্রীয় নেতারা কংগ্রেসের উক্ত উপদলের মতে সায় দিতে ইতস্তত করছেন। চ্যবন সাহেব তো এ ব্যাপারের ঘোরতর বিরোধী। তাছাড়া গিল-মন্ত্রিসভা অপসারণের পরবর্তী অধ্যায়টিও কংগ্রেসীদের সবার পক্ষে অনুকূল হবে না। অনেকে মনে করেন, নতুন পরিস্থিতিতে অন্তর্বর্তী নির্বাচনের পথ পরিষ্কার হলে তাঁদের পুনরায় বিধানসভায় ফিরে আসার সৌভাগ্য না-ও ঘটে উঠতে পারে।

এমন এক অস্থির অবস্থায় গিল-মন্ত্রিসভাকে টিঁকিয়ে রাখা মানে কংগ্রেসের মধ্যে দলীয় ভাঙন এবং জন-অপ্রিয়তার ঝুঁকি বহন করা। সুতরাং পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে গিল-সমর্থক কংগ্রেসীরাও তাঁদের জিদ শিথিল করে আনবেন কি না তাও এই মুহূর্তে চূড়ান্তভাবে বলা যায় না। সন্ত আকালী দল মুখে অন্তর্বর্তী নির্বাচনের দাবি তুললেও, একটি কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা গঠনের সম্ভাবনা দেখা দিলে কংগ্রেসী তরফেই যে সমর্থন জানাবেন রাড়েওয়ালার গিল-বিরোধী বক্তব্যে সেই আশ্বাসের ইঙ্গিতও পাওয়া যাচ্ছে। তাছাড়া পুনরায় ক্ষমতায় প্রত্যাবর্তনের জন্য এক শ্রেণীর কংগ্রেসী নেতা তো মুখিয়েই আছেন।

অবস্থা দৃষ্টে লছমন সিং গিলের অদৃষ্ট সুতরাং মন্দ বলেই আশঙ্কা হয়।

স্বাগত নে উইন

রাজধানীতে সম্মানিত অতিথি এলেন জেঃ নে উইন, ব্রহ্মের বিপ্লবী পরিষদের সভাপতি। তাঁর সফরকালের মেয়াদ ছয়-দিন। সঙ্গে এসেছেন শ্রীমতী নে উইন।

সস্ত্রীক জেঃ নে উইনকে স্বাগত জানানোর সময় ভারত-ব্রহ্মের দীর্ঘকালের বন্ধুত্ব-বন্ধনের কথা স্মরণে আসে। জেঃ নে উইনের ভারত সফরে সেই মৈত্রীবন্ধন দৃঢ়তর হল।

—১৬।৩।৬৮

রোডেশিয়ার জল্লাদ এডওয়ার্ড মিল্টন

চেকোস্লোভাকিয়া ঃ

চেকোস্লোভাকিয়ার কমিউনিস্ট শাসন আজ বড় রকমের পরিবর্তনের মুখে। অ্যান্টোনিন নভোটনির নেতৃত্বে এতদিন যে সোভিয়েট ঘেঁষা নীতি অনুসরণ করা হয়েছে তার আমূল পরিবর্তন করে স্বাধীন ও উদারনৈতিক পথে চলার চেষ্টা সুরু হয়েছে। গত জানুয়ারী মাসে নভোটনিকে চেক কমিউনিস্ট পার্টির সম্পাদক পদ থেকে অপসারণ করা হয়—১৯৫৩ সাল থেকে নভোটনি একটানা এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এখনও নভোটনি রাষ্ট্রপতির পদে থাকলেও প্রকৃত ক্ষমতা আর তাঁর কিছু নেই। পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সভায় বিভিন্ন সদস্য নভোটনির তীব্র সমালোচনা করেন। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ—তিনি স্ট্যালিনীয় পন্থা অনুসরণ করেছেন ও চেকোস্লোভাকিয়ার স্বাধীন বিকাশের পথে বাধার সৃষ্টি করেছেন; তাঁর নীতির ফলে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বিপর্যয় হয়েছে; এবং তিনি স্লোভাক সংখ্যালঘুদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ করেছেন।

নভোটনির বিরুদ্ধে বিক্ষোভ এত তীব্র হয়েছিল যে তাঁর মৃত্যুদণ্ডের কথা হয়েছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সোভিয়েট কমিউনিস্ট পার্টির সম্পাদক লিওনিদ ব্রেজনেভের হস্তক্ষেপে তাঁর প্রাণ রক্ষা হয়। কিন্তু তাঁর সকল ক্ষমতা কেড়ে নেওয়া হয়। তাঁকে নামমাত্র রাষ্ট্রপতি পদে রাখা হয়েছে। নভোটনির জায়গায় যিনি দলের নতুন সম্পাদক হয়েছেন, তিনি হলেন আলেকজান্ডার ডুবসেক। এখন তিনিই চেকোস্লোভাকিয়ার প্রকৃত নেতা।

নভোটনি কিন্তু সহজে তাঁর এই ক্ষমতাচ্যুতি স্বীকার করে নেন নি। দলের মধ্যে তাঁর অনুগামীদের নিয়ে তিনি ক্ষমতা ফিরে পাবার চেষ্টা করেছেন।

এখন জানা গেছে, জানুয়ারীতে দলের কেন্দ্রীয় কমিটির অধিবেশনের সময় প্রতিরক্ষা দপ্তরের সংগে যুক্ত উচ্চপদস্থ রাজনৈতিক অফিসার ও প্রতিরক্ষা দপ্তরের দলীয় শাখার সম্পাদক মেজর জেনারেল জান সেজনা দলের সর্বোচ্চ প্রেসিডিয়ামের কয়েকজন সদস্যকে গ্রেপ্তার করে নভোটনির বিরুদ্ধ ভোট কমানোর চেষ্টা করেন। কিন্তু তিনি সফল হন নি। সৈন্যবাহিনীর মধ্যে যারা নভোটনির অনুগত তারা ক্ষমতা দখলের জন্য প্রাগ্ অভিযানের আয়োজনও করেছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাদের এই 'ক্যু'-এর চেষ্টা ব্যর্থ হয়।

গত সপ্তাহে সেজনা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পালিয়ে গেছেন। সেজনার পলায়ন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আশ্রয় গ্রহণে চেক সরকার খুবই বিচলিত। কারণ, সামরিক বিভাগে উচ্চপদে থাকার জন্য সেজনা অনেক গোপন তথ্য জানেন। তাঁর সঙ্গে নাকি একটা সুটকেসে অনেক গোপন কাগজপত্রও ছিল। চেক সরকার অবশ্য অভিযোগ করেছেন, বিশ হাজার ডলার মূল্যের পশুখাদ্য নিয়ে চোরাবাজার করার অপরাধে সেজনা অপরাধী। সুতরাং অপরাধী সেজনার বিচারের জন্য অবিলম্বে সেজনাকে চেক সরকারের হাতে ফিরিয়ে দেবার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছে চেকোস্লোভাকিয়া দাবি জানিয়েছে। কিন্তু মার্কিন সরকার এই দাবি নিশ্চয়ই মানবেন না।

নভোটনিকে ক্ষমতায় ফিরিয়ে আনার চক্রান্ত ফাঁস হবার পর চেকোস্লোভাকিয়া জুড়ে ব্যাপক ধর-পাকড় ও শাস্তিদান সুরু হবে, এই ভয়েই সেজনা পালিয়েছেন।

ইতিমধ্যেই চক্রান্তকারী তথা নভোটনি সমর্থকদের বিরুদ্ধে ব্যাপক ব্যবস্থা গ্রহণ সুরু হয়ে গেছে। নিরাপত্তা বাহিনীর প্রধান মিরোস্লাভ মামুলাকে পদচ্যুত করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী মাইকেল চৌদিকের পদত্যাগপত্র গ্রহণ না করে জাতীয় পরিষদের সভায় তাঁকে পদচ্যুত করা হয়েছে। চৌদিক নভোটনির একজন প্রধান সমর্থক বলে পরিচিত। দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সভায় তিনি বলেছিলেন, সোভিয়েট ইউনিয়নের সংগে বন্ধুত্বের সম্পর্ক রাখতে হলে দলের সম্পাদক পদে নভোটনিকেই রাখা উচিত। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ডঃ জোশেফ কুদরনা ও অ্যাটর্নি জেনারেল ডঃ জান বারটুসকাকেও বরখাস্ত করা হয়েছে। নভোটনির আর একজন সমর্থক সহকারী প্রতিরক্ষামন্ত্রী ভ্যাদিমির জাংকো আত্মহত্যা করেছেন। 'ক্লিমেন্ট গটওয়াল্ড পলিটিক্যাল কমিসারস স্কুল অব দি চেক আর্মি'র অধ্যাপকরা প্রতিরক্ষামন্ত্রী কর্নেল জেনারেল বহুমির লোমস্কিরও পদচ্যুতি দাবি করেছেন। দলের রাজনৈতিক আদর্শ বিভাগের সম্পাদকের গুরুত্বপূর্ণ পদ থেকে জিরি হেনড্রিচকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে

মেয়েদের ছোটবেলা থেকেই
ত্বকের যত্ন নিতে শেখান।
তিনি সুন্দরী, তিনি রূপসী!
প্রতিদিনের ত্বক পরিচর্যায় তাঁর এই অপরূপ সৌন্দর্যের উৎস-সাধনা বিউটি ক্রীম।
সাধনা বিউটি ক্রীম রূপসাধনায় অনন্য
সাধনা ঔষধালয়-ঢাকা
সাধনা ঔষধালয় রোড, সাধনানগর, কলিকাতা-৪৮
অধ্যক্ষ যোগেশ চন্দ্র ঘোষ, এম.এ.
আয়ুর্বেদশাস্ত্রী, এফ.সি.এস. (লণ্ডন)
এম.সি.এস. (আমেরিকা) ভাগলপুর
কলেজের রসায়ন-শাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক
কলিকাতা কেন্দ্র:
ডাঃ নরেশচন্দ্র ঘোষ,
এম.বি.বি.এস. (কলিঃ)
আয়ুর্বেদাচার্য
SADHANA
Beauty
CREAM
সাধনা
বিউটি
ক্রীম

দাবি উঠেছে, নভোটনিকে রাষ্ট্রপতির পদ থেকেও অপসারণ করা হোক।

নভোটনি এখনও স্ট্যালিনপন্থায় বিশ্বাস করেন কি না, এ নিয়ে তর্কের অবকাশ থাকলেও এ কথা সবাই জানেন যে, তিনি বরাবর সোভিয়েট ইউনিয়নের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রক্ষা করে চলেছেন। আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট শিবিরে সোভিয়েট ইউনিয়নের অন্যতম প্রধান সমর্থক চেকোস্লোভাকিয়া। সুতরাং নভোটনির ক্ষমতাচ্যুতির অর্থ একদিকে যেমন আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে অধিকতর গণতন্ত্রের প্রসার, অপরদিকে তেমনি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সোভিয়েটের প্রভাবমুক্ত স্বাধীন নীতি অনুসরণের সম্ভাবনা।

চেক্ শাসন ব্যবস্থায় ইতিমধ্যেই কিছুটা উদারনীতির হাওয়া বইতে সুরু করেছে। সংবাদপত্রের ওপর যে সেন্সরের ব্যবস্থা ছিল, ডুবসেক তা তুলে দিয়েছেন। রাইটার্স ইউনিয়নকে তাদের নতুন সাপ্তাহিক পত্রিকা 'লিটেরার্নি লিস্টি' প্রকাশ করতে দেওয়া হয়েছে। ১লা মার্চ এই পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় আলেকজান্ডার ক্লিমেন্ট লিখেছেন, তাঁদের দাবি হল : স্বাধীন নির্বাচন, বিরোধী দলের অস্তিত্ব সহ একটি কার্যকরী পার্লামেন্ট, একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় রাষ্ট্র ব্যবস্থা, নিজেদের দেশের উপযোগী এবং নিজেদের প্রয়োজন, সম্ভাবনা ও পছন্দ মত সমাজতন্ত্র। ("Socialism of our type, according to our needs, according to our possibilities and according to our choice").

দক্ষিণ রোডেশিয়া :

এগারোই মার্চ আরও দুজন আফ্রিকীয় দেশপ্রেমিকের ফাঁসি হয়েছে। এঁদের নাম হল—টাকাইরুরে জেরোমিয়া ও ফ্র্যান্সিস চিরিসা। পোপ পল যে দুজনের প্রাণদণ্ড মকুবের জন্য অনুরোধ জানিয়েছিলেন, এঁরা তাঁদের অন্যতম।

আয়ান স্মিথ সরকার আজ সব কিছুর বাইরে চলে গেছে। মহামান্য পোপের আবেদনেও কষাই-এর প্রাণে কোন সাড়া জাগাতে পারে নি। স্বাভাবিকভাবেই সারা বিশ্বে এর বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। রাষ্ট্রসংঘের সেক্রেটারী জেনারেল উ থান্ট এই ঘটনাকে 'বর্বর আচরণ' বলে নিন্দা করেছেন।

এদিকে বৃটিশ সরকারের ওপরেও খুব চাপ পড়ছে। হ্যারল্ড উইলসনের শ্রমিক দলের সদস্যদের মধ্যে বিক্ষোভ ক্রমেই বাড়ছে। দক্ষিণ রোডেশিয়ার বিরুদ্ধে অবরোধ ব্যবস্থা আরও দৃঢ় করার জন্য তাঁরা উইলসনের ওপর চাপ দিচ্ছেন। সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যও অনেকে দাবি করছেন।

রাষ্ট্রসংঘের আফ্রিকীয় সদস্যরা নিরাপত্তা পরিষদের অধিবেশন আহ্বানের জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন। ৩৬টি আফ্রিকীয় রাষ্ট্রের পক্ষে ইতিমধ্যেই আনুষ্ঠানিকভাবে এই অনুরোধ জানানো হয়েছে। দক্ষিণ রোডেশিয়ার বিরুদ্ধে অবরোধ ব্যবস্থা স্বরূপ নিরাপত্তা পরিষদ ১৯৬৬ সালে যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল তা যথেষ্ট নয়। কৃষ্ণাঙ্গ আফ্রিকীয় দেশপ্রেমিকদের বিরুদ্ধে দক্ষিণ রোডেশিয়ার বর্তমান বর্বর আচরণ ও হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে আরও কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। মানবসভ্যতার কলঙ্ক আয়ান স্মিথ সরকারের উচ্ছেদের জন্য সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানাবেন আফ্রিকা ও এশিয়ার সদস্যরা। অন্যরাও অনেকে তাঁদের এই দাবি সমর্থন করবেন।

স্বর্ণ-সংকট

সারা ইয়োরোপ আবার পাগল হয়ে উঠেছে : সোনা আরো সোনা চাই। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে যে দৃশ্য এখানে দেখা গিয়েছিল সেই 'গোল্ড রাশ' বা সোনা সংগ্রহের হিড়িক এখানে আবার দেখা দিয়েছে। মাত্র কদিনের মধ্যে ব্যাঙ্ক অফ ইংল্যান্ড ১০০ টন সোনা বেচে দিতে বাধ্য হয়েছে, পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম স্বর্ণভাণ্ডার জুরিখ হাতছাড়া করেছে ৬০ টন এবং প্যারিস ১৬ টন। তাছাড়াও ফ্রাঙ্কফুর্ট থেকে সিঙ্গাপুর হংকং পর্যন্ত সর্বত্র ফাটকাবাজার যেন ক্ষেপে গিয়েছে, এক তাল না মেলে তো এক তিল ভর সোনা তার চাই, এবং তার জন্যে বাজার-ছাড়া দাম কবুল করতেও সে প্রস্তুত।

চাহিদা এমনিধারা লাগাম-ছাড়া হওয়ায় সোনার দাম স্বভাবতই গিয়েছে বেড়ে। যদিও সোনার আন্তর্জাতিক মূল্যমান আউন্স প্রতি ৩৫ ডলার, কিন্তু বিভিন্ন রাজধানীতে ৩৫ ডলারের জায়গায় ৪৫ ডলার ধরে দিতেও ফাটকাবাজরা কিছু পেছ-পা হয় নি। প্যারিসে তো এক কিলোগ্রাম ওজনের একটা সোনার বাটের দাম ১৩০০ ফ্রাঁ থেকে রাতারাতি যেন রকেট-ঝাঁপ দিয়ে ৭০০০ ফ্রাঁ চড়ে গিয়েছে। কিন্তু ব্যাঙ্কগুলিকে বা স্বর্ণ-ব্যবসায়ীদের যদি ফাটকাবাজদের এ অস্বাভাবিক সোনার চাহিদা মেটাতে হয় তবে তো তাদের কয়েকদিনের মধ্যেই ফতুর হয়ে যেতে হবে। আর ব্যাঙ্ক, সোনার ব্যাপারী বা শেয়ার মার্কেট ফতুর হবার মানেই তো স্বর্ণ-নির্ভর মুদ্রাব্যবস্থা ভেঙে পড়া অর্থাৎ সংশ্লিষ্ট সরকারের পতন।

কিন্তু নিজের সে সর্বনাশকে ডেকে আনে কোন্ নির্বোধ সরকার? মার্কিন ডলার স্বর্ণ-সমর্থিত বলে তার যেমন একটা ইজ্জৎ আছে তেমনি সোনা কেনার হিড়িকের চোট তাকেই সবচেয়ে বেশি ভোগ করতে হচ্ছে। ডলারই পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী মুদ্রা কারণ প্রতিটি ডলারের পেছনে স্বর্ণপিণ্ডের জোর সমর্থন রয়েছে এ ধারণা গোটা ধনতন্ত্রবাদী দুনিয়া এবং তার বন্ধুরাষ্ট্রদের মনে দীর্ঘ দিন থেকেই রয়েছে। সে জন্যেই ডলার সংগ্রহের দিকে—হোক তা কাগজের মুদ্রা—একটা সাধারণ ঝোঁক এসব দেশে প্রায় বরাবরই ছিল। কিন্তু এখন সেই কাগজের ডলার কাগজে বাঘের মতই শক্তিহীন মনে করছে ফাটকাবাজরা, তারা ঘরে যত ডলার ছিল তা উজাড় করে ফেলছে ব্যাঙ্কের কাউন্টারে—এমন কি কম দামে ডলার কিনে বা ধার করে সে ডলারের বদলে থলে ভর্তি করে সোনা কিনছে।

মার্কিন সরকার এবং ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষকে শঙ্কিত হতে হয়েছে বৈ কি! কিন্তু সে শঙ্কা প্রকাশ করা মানে ডলারের প্রতি, সরকারের প্রতি জনসাধারণের অনাস্থা অর্জন করা। তাই ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ একটা পোজ নিয়েছেন যেন ডলারের কিছুই হয় নি, সে সম্পূর্ণ সুস্থ, দিব্যি বহাল তবিয়তে আছে। ডলারের প্রতি আস্থা অটুট রাখার উদ্দেশ্যে ব্যাঙ্কিং কর্তৃপক্ষ কয়েকটি ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন। প্রথমত তাঁরা ব্যাঙ্কের সুদের হার শতকরা সাড়ে চার ভাগ থেকে পাঁচ ভাগে চড়িয়ে দিয়েছেন যাতে লোকে ব্যাঙ্ক থেকে সোনা বা ডলার না নিয়ে বেশি সুদ পাবার আশায় জমা দেয়, দেশে লগ্নীর পরিমাণ বেড়ে যায়। জনসাধারণ বা ফাটকাবাজরা যাতে ইচ্ছেমত আর সোনা কিনতে না পারে সে জন্য ব্যাঙ্ক এবং বাজারে সোনার অবাধ বেচাকেনা বন্ধ করে দিয়েছেন। প্রেসিডেন্ট জনসনের অনুরোধে প্রধানমন্ত্রী উইলসন ব্যাঙ্ক অফ ইংল্যান্ডে সোনা বেচা বন্ধ করে দিয়েছেন। শুধু ওয়াশিংটন বা লণ্ডনই নয়, প্যারিস ছাড়া ডলারের সঙ্গে জোটবদ্ধ পৃথিবীর প্রতিটি রাজধানীর বাজারেই সোনা বেচাকেনা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। আবার অন্যদিকে এটাও দেখানো হয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হাতে অফুরন্ত সোনা রয়েছে, ফাটকাবাজরা তা কখনই নিঃশেষ করতে পারবে না। তার জন্যে একদিকে যুক্তরাষ্ট্রের স্বর্ণভাণ্ডার ফোর্ট নক্স থেকে তাল তাল সোনা কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থার ব্যাঙ্ক অফ ইংলন্ডে চাহিদা মেটানোর জন্যে পাঠানো হচ্ছে এবং অন্যদিকে

বাজারে চালু মোট ডলারের শতকরা ২৫ ভাগ সোনা মজুত করার যে আইন যুক্তরাষ্ট্রে দীর্ঘদিন থেকে রয়েছে তা বাতিল করা হয়েছে। ফলে ১১৪০ কোটি ডলার মূল্যেব সোনা বিধিমুক্ত হয়েছে।

শুধু ফাটকাবাজরাই নয়, বিশ্বের বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদরা ডলার ডিভ্যালুয়েশন অবশ্যম্ভাবী মনে করলেও যুক্তরাষ্ট্র যেন ডলারের মর্যাদা রক্ষার জন্যে মরিয়া হয়ে উঠেছেন এবং সোনার বর্তমান আন্তর্জাতিক মূল্যমানেও (১৯৩৪ সালে নির্ধারিত আউন্স প্রতি ৩৫ ডলার) তাঁরা কোন পরিবর্তন ঘটতে দেবেন না। কিন্তু কেবল ব্যাঙ্কে সুদের হার চড়িয়ে যুক্তরাষ্ট্র তার ডলারের মান বাঁচাতে পারবে কি না যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে। কারণ সঙ্কটটা কেবল ডলার মুদ্রার কিম্বা ডলারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত পাউন্ড স্টার্লিং-এরই নয়, সঙ্কট সমুপস্থিত আজ সমগ্র ধনতান্ত্রিক দুনিয়ার সামনে। এবং এ বিপদ হঠাৎ উপস্থিত হয় নি, পাপের বোঝা দিন দিন ভারী হচ্ছে যা ঘাড় থেকে চট করে নামানো ধনতন্ত্রবাদী রাষ্ট্রগুলির পক্ষে শক্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে। বস্তুত এ সঙ্কট ধনতান্ত্রিক সমাজ, রাষ্ট্র বা আর্থনীতিক ব্যবস্থায় অনিবার্য। অনিবার্য এজন্যে যে, ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যেই একটা স্ববিরোধিতা বর্তমান রয়েছে যা থেকে সে স্থায়ীভাবে কখনোই মুক্তি পায় না।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর যখন একদিকে সোভিয়েট য়ুনিয়নে সমাজতান্ত্রিক সমাজ, রাষ্ট্র ও আর্থনীতিক ব্যবস্থা গড়ে ওঠে তখন সে রাষ্ট্র বেশিদিন স্থায়ী হতে পারে না বলে ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রনেতারা এবং বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদরা ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন অন্যদিকে ধনতান্ত্রিক আর্থিক বনিয়াদই অনেক শক্তিশালী এবং শেষ পর্যন্ত টিকে থাকবে বলে তারস্বরে প্রচার করা হতে থাকে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ধনতান্ত্রিক দুনিয়ার আর্থিক অবস্থার সত্যিই কিছু কিছু উন্নতি হতে থাকে। কিন্তু সে ক'দিনের জন্যে? তারপরেই তো প্রতিযোগিতা দেখা গেল ধনতান্ত্রিক দেশগুলোর মধ্যেই। শুল্কে প্রাচীর তোলা হল, বৃটেন ব্যাঙ্কের সুদ চড়াল, গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড বাতিল করল এবং শেষ পর্যন্ত পাউণ্ডের মূল্য হ্রাস করতে বাধ্য হল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে সেদিন বৃটেন বিপদে ফেলতে পেরেছিল ঠিকই কিন্তু আর্থিক সঙ্কট এমন ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ল যে শেষ পর্যন্ত ১৯২৯ সনের গ্রেট ডিপ্রেসন বা মহা সঙ্কট সারা বিশ্বকে ছেয়ে ফেলেছিল। সে সঙ্কট থেকে ধনতান্ত্রিক দুনিয়া যে আজো পুরোপুরি মুক্ত হতে পারে নি তারই অভ্রান্ত প্রমাণ আজকের ডলার সঙ্কট।

কারণ ডিপ্রেসনের নাগপাশ থেকে মুক্তি পাবার জন্যে ধনতান্ত্রিক বৃহৎ রাষ্ট্রগুলিতে রিআর্মামেণ্ট বা পুনরস্ত্রীকরণের কর্মসূচী নেওয়া হয়, উৎপাদন বাড়ানো হতে থাকে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে সে উৎপাদন কাজেও লেগে যায় ঠিকই, কিন্তু যুদ্ধের পর কি ওই অতি উৎপাদনের পরিমাণ কিছু কমেছে? কমে নি বলেই উৎপাদন ও ব্যবহারের মধ্যে বিরোধ, কমে নি বলেই সঙ্কট। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একাই যখন মোট উৎপাদনের ৬০ ভাগ উপহারের ভার নিল সারা দুনিয়া আমেরিকান পণ্যদ্রব্যে ছেয়ে ফেলেও তা উদ্বৃত্ত থেকে যেতে লাগল। তখন মার্শাল প্ল্যানের মারফৎ সে বাড়তি পণ্য ও অঢেল সাহায্য দিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধ-বিধ্বস্ত ইয়োরোপের পুনর্গঠনে সহায়তা করল, অর্থাৎ নিজেই নিজের ধনতান্ত্রিক প্রতিদ্বন্দ্বী সৃষ্টি করল। ফলে পশ্চিম জার্মানী, জাপান, ফ্রান্স শুধু নতুন করে গড়েই উঠল না, প্রতিদ্বন্দ্বিতার কারণে এখানেও অতি-উৎপাদন বা অর্থনৈতিক সঙ্কট-দেখা দিল। কোরিয়ার যুদ্ধে সে অতি-উৎপাদন কিছুটা ব্যবহৃত হবার সুযোগ পেল বটে কিন্তু সে যুদ্ধ ইচ্ছেমত দীর্ঘস্থায়ী করা গেল না। তাই ভিয়েতনামে যুদ্ধ দরকার। কিন্তু ভিয়েতনামে যুদ্ধের খোরাক মিটিয়েও পণ্যদ্রব্য উদ্বৃত্ত থাকে যে, সঙ্কট তাই গেল আর কখন?

আজকের সঙ্কট ১৯২৯ সালের মহাসঙ্কটের চেয়েও মারাত্মক. সে সঙ্কটের সঙ্গে তার গুণগত পার্থক্যও রয়েছে। প্রথমত ১৯২৯ সনে কোন যুদ্ধ ছিল না, কাজেই শান্তির সময়ে মন্দা দেখা দিতেই পারে, কিন্তু আজ ভিয়েতনামে যখন পুরোমাত্রায় যুদ্ধ চলছে তখন এ সঙ্কট সাংঘাতিক নিশ্চয়ই। দ্বিতীয়ত ১৯২৯ সনে সুগঠিত ও স্বাধীন কোন সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক দুনিয়া ছিল না, ধনতান্ত্রিক দুনিয়াই সমগ্র বিশ্বের নিয়ামক ছিল। আজ কিন্তু ইয়োরোপ, এশিয়া, আফ্রিকা লাতিন আমেরিকার ওপর সমাজতান্ত্রিক শিবিরের প্রভাব অনস্বীকার্য।

কিন্তু এ আর্থিক সঙ্কট, ডলার সঙ্কট থেকে মুক্তি মিলবে কোন্ পথে? যুক্তরাষ্ট্র সরকার কয়েকটি ব্যবস্থার কথা উল্লেখ করেছেন। তার আন্তর্জাতিক লেন-দেনে ঘাটতি, মুদ্রাস্ফীতি সরকারী ব্যয়ভার কমাবার জন্যে কয়েকটি ব্যবস্থা অবলম্বনের কথা বলা হয়েছে। প্রথমত সরকারী ব্যয় কমাবার জন্যে বিদেশ সফর, বিদেশে লগ্নীর পরিমাণ হ্রাস করার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। আয়ের ওপর শতকরা ১০ ভাগ সারচার্জের কথাও বলা হচ্ছে। কিন্তু যে কারণে সরকারের কোটি কোটি ডলারের অপব্যয় ঘটছে এবং যে কারণে মার্কিন অর্থনীতিতে চরম মন্দা এবং সঙ্কট দেখা দিয়েছে সেই ভিয়েতনাম যুদ্ধ কি তাঁরা থামাবেন? ব্যাঙ্ক রেট বাড়িয়ে যে যুক্তরাষ্ট্র সরকার তাঁর লক্ষ্যে পৌঁছুতে পারবেন না, ডলারকে ডিভ্যালুয়েশন বা মূল্যহ্রাসের কোপ থেকে বাঁচতে পারবেন না তা সব দেশের অর্থনীতিবিদরাই প্রকাশ্যে বলছেন। কিম্বা বৃটেন, পশ্চিম জার্মানী, ইতালি, বেলজিয়াম, নেদারল্যাণ্ড, সুইটজারল্যান্ড ইত্যাদি দেশকে নিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যে স্বর্ণ-তহবিল গড়ে তুলেছে তার ওপর ভরসা করেও সোনার দাম স্থিতিশীল রাখতে পারবে না। সোনার সরকারী বে-সরকারী দু'-দরের নীতিও শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়ে যাবার সম্ভাবনা রয়েছে। এমন কি এই স্বর্ণভাণ্ডারটাই ভেঙে পড়তে বসেছে।' তাই বাঁচতে হলে ভিয়েতনাম যুদ্ধের অবসান ঘটানো দরকার, আর দরকার উন্নয়নশীল দেশে সাহায্যের পরিমাণ বাড়ানো, শুল্কগত বাধা তুলে দিয়ে বা শিথিল করে তাদের সঙ্গে উদার বাণিজ্য সম্পর্কে গড়ে তোলা। নইলে অতি-উৎপাদনের বোঝা, তার দীর্ঘদিনের পাপের বোঝা যুক্তরাষ্ট্র ঘাড় থেকে নামাতে পারবে না। আজকের সঙ্কট প্রেসিডেন্ট জনসনের সামনে নির্বাচনে হারজিতের প্রশ্ন এনে দিয়েছে।

—রামেন্দু মুৎসুদ্দি

সেই সাহিত্যজগজ্জ্যোতি—প্রতিভা ও মনীষার অবতার—সাহিত্য-তপস্যানিষ্ঠ—
মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর

হরপ্রসাদ গ্রন্থাবলী

কাঞ্চনমালা, বেণের মেয়ে, মেঘদূত, বাল্মীকির জয়, ভারত-মহিলা, বাঙ্গালা সাহিত্য সমালোচনা, ঐতিহাসিক নিবন্ধ-মালা, শিক্ষাসন্দর্ভ, সমাজসংস্কার নিবন্ধরাজি, মোহিনী।

এই জাতীয় সাহিত্য-জয়ন্তী দুই ভাগ একত্রে পাঁচ টাকা।

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড
১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট,
কলিকাতা-১২

কবিতা

কবে হাওয়া দেবে

বিষ্ণু দে

ন্যায়যুদ্ধের বর্তমানের কুটিল হিংস্র ফাঁদে
পাদমেকম্ না গলাবে, ঘরোয়া গলায়
জড়ায়ে মাতবে তবু প্রতিদিন দৈনিক সংবাদে।
রাক্ষসীমায়া বাঁধে কতই না ছলায়।

জনগণকে পাবে কি খালি বাইরে জনতায়?
নিজের মুখে দেখলে কাকে একাত্ম?
দেখ আবার দেখ তাকেই মমতা—নির্মমতায়।

ওটাকে দেখলে মানবজন্ম মুখ্য!
কীর্তিকলাপ শুনলেও এই জীবনেই হয় রিখা।
ইঁদুরে-শৃগালে জন্ম দিয়েছে যাকে তার থাকে লাগি
এমনি পাপের গুপ্তি গর্তে। তাই দেশ শতচ্ছিন্ন।

নাবিক আমরা নামিয়েছি কবে প্রাণের বহর,
কতকাল ধরে গুণি শতশত জোয়ার-ভাঁটার প্রহর,
কবে হাওয়া দেবে কপিলগুহায় দুলবে বেগের লহর!

অত চুপিচুপি কেন কথা কও ওগো মরণ! মানবজীব
বাঁচাই তো প্রেম, মরণের ছলা হিংস্র,
উভয়ত কেন পরো এক আবরণ?
তুমি বিদ্যুতে ধূম্রে রূপ দাও, স্বচ্ছ তোমার স্বরূপে
স্পষ্টের ঝড়ে বজ্রকে হানো মারণ।
মানবমনের সারাজীবনের হোমালোকে করি বরণ!

আবির্ভাব

দুর্গাদাস সরকার

চতুর্দিকে দুয়ার বন্ধ,
ঘুটঘুটে কী অন্ধকার!
জাগো জাগো হাঁকে হঠাৎ
লাঠির আওয়াজ ঠকাঠক।
মধ্যরাতে ডাক দিয়ে আর
ফিরবে না ঐ চৌকিদার।
লকলকে জিভ বাড়িয়ে দাঁড়ায়
অশথতলায় আহাম্মক।

খড়ের চালা, মাটির দেওয়াল,
হঠাৎ পাখির কিচিরমিচির,
ঘরের মধ্যে নিভলো লম্প,
কাঠের সিঁড়ি দুরারোহ।
ঘুমের মধ্যে খেলতে খেলতে
বলছে খোকা ইকিড়-মিকিড়,
এরই ভিতর নতুন মুখের
আবির্ভাবের সমারোহ।

অগ্নিযুগের একটি অধ্যায়

অনন্ত সিংহ

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

আমাদের পরিকল্পনায় মাস্টারদার সম্মতি

মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন! পুলিশ কর্তৃপক্ষ, ট্রাইব্যুনালের জজ, সরকারী উকিল, আমাদের কাউন্সেল এবং আত্মীয়-স্বজন ও সমর্থকগণ কেউই বুঝতে পারলেন না কেন আমরা তিনজন নিজেরাই মামলা পরিচালনা করছি এবং কেনই বা সুদীর্ঘ জেরাতে সাক্ষীদের ব্যতিব্যস্ত করে কালক্ষয় করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছি! মামলা দীর্ঘকাল স্থায়ী করার পেছনে যে অভিসন্ধি বা বৈপ্লবিক ষড়যন্ত্রের কৌশল বা উদ্দেশ্য ছিল তার সামান্যতম ধারণাও কেউ করতে পারেন নি। আজ হয়ত বলা যায়, বোধ হয় সফলতার সঙ্গেই শত্রুপক্ষের মনে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিলাম। তার প্রধান কারণ প্রথম থেকে শেষ দিন পর্যন্ত খুব গুরুত্বের সঙ্গে মামলা লড়ে যাওয়ার অভিনয় করেছিলাম।

মাস্টারদার সঙ্গে পরামর্শ করে গণেশ ও আমি যেরূপ চূড়ান্তভাবে যুব-বিদ্রোহের পরিকল্পনা গ্রহণ ও স্থির করেছিলাম—আমাদের দীর্ঘায়ু মামলার সুযোগে আমরা আর একটি ঠিক সেইরূপ সক্রিয় ও বাস্তব বৈপ্লবিক প্ল্যান প্রস্তুত করি। সেই প্ল্যানের চূড়ান্ত রূপ দানের জন্য আমরা মাস্টারদার অনুমোদনের একান্ত প্রয়োজন অনুভব করি। মাস্টারদার অবগতি ও অনুমোদনের জন্য প্ল্যানের বিস্তারিত খসড়া তাঁর কাছে না পৌঁছানো পর্যন্ত তিনি যে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারবেন না তা বলাই বাহুল্য।

আগেই বলেছি—যুব-বিদ্রোহের পরবর্তী পর্যায়ের এই দ্বিতীয় প্ল্যান কার্যকরী করার অভিপ্রায়ে আমাদের মধ্যে বয়সে যে সব চেয়ে ছোট তাকেই বেছে নিয়েছিলাম। এই দায়িত্বপূর্ণ ভূমিকা অর্ধেন্দু গুহ অতি সফলতার সঙ্গে পালন করেছে। প্রস্তুতির প্রতিটি স্তরে—প্রতি পদক্ষেপে অর্ধেন্দু যেরূপ বুদ্ধিমত্তা, দৃঢ়তা ও অবিচলিত বৈপ্লবিক নিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছে তার তুলনা বিরল। ঘটনার বর্ণনার মাধ্যমে আমরা অর্ধেন্দুর অপরিহার্য ভূমিকার বৃত্তান্ত জানতে পারব।

অর্ধেন্দু আর পাঁচজন সাথীর সঙ্গে জামিনে মুক্ত ছিল। মামলার শুনানীর সময় প্রতিদিন তারা আদালতকক্ষে কাঠগড়ায় আমাদের সঙ্গে উপস্থিত থাকত। দিনের কাজ শেষ হওয়ার পর ট্রাইব্যুনালের জজেরা যখন বিচারকক্ষ পরিত্যাগ করতেন—তখন শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় আমাদের নিয়ে যাওয়া হতো কারাগারের দুর্ভেদ্য প্রাচীরের অন্তরালে—আর জামিনে মুক্ত এই ছয়জন নিজ নিজ বাড়ি ফিরে যেতো।

এই নাটক প্রতিদিন অভিনীত হতো। পুলিশ কর্তৃপক্ষ দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ, মাসের পর মাস অতি ধৈর্যের সঙ্গে অপেক্ষা করেছে—বিড়ালের মত তপস্যা করেছে যদি একবার তাদের ভাগ্যে মাছের শিকেটি ছেঁড়ে! পুলিশ অতি সংগোপনে জামীনে মুক্ত এই সব অভিযুক্তদের পেছন নিত এবং আশায় আশায় থাকতো যদি কোন ষড়যন্ত্রমূলক পরিকল্পনা জানতে পারে বা গোপন চিঠিপত্র কিছু হস্তগত করতে পারে। বঁড়শির ছিপটি হাতে এক লক্ষ্যে টোপের দিকে তাকিয়ে আছে—যদি কোন মতে মাস্টারদার বা বিপ্লবীদের কোন গোপন আস্তানার সন্ধান পাওয়া যায়! বৃটিশ আমলের পুলিশ তাদের অফুরন্ত শক্তি নিয়ে বুদ্ধি ও কৌশলের সঙ্গে বিপ্লবীদের পিছনে যখন গাছের ডালে ডালে ঘুরেছে—আমরা তখন গাছের পাতায় পাতায়!

প্ল্যান যদি কার্যকরী করতে হয় তবে তার গোপনীয়তা সম্বন্ধে আমাদের নিশ্চিত হতে হবে এবং শত্রুকে অসাবধান অবস্থায় হতবাক্ করে অতর্কিতে আক্রমণ করা চাই। তাই আমরা প্রাথমিক কাজ হিসাবে স্থির করলাম যে—যে কোন উপায়ে হোক্ না কেন যত শীঘ্র সম্ভব প্ল্যানের ড্রাফট্টি মাস্টারদার কাছে বিস্তারিত লিখে পাঠাবো। যদিও আমরা অর্ধেন্দুর মাধ্যমে মাস্টারদার সঙ্গে এ বিষয়ে সকল প্রকার আলোচনা করেছি তবু পাছে মুখের কথায় কিছু ব্যতিক্রম ঘটে তার জন্য লিখিতভাবে প্ল্যানটি তাঁকে দেওয়া উচিত মনে করি।

লিখিতভাবে প্ল্যানটি পাঠানো খুবই বিপজ্জনক—পাছে তা শত্রুপক্ষের হস্তগত হয়। সেইজন্য আমাদের এমন একটি উপায় বার করতে হয়েছে যাতে প্ল্যানটি মাস্টারদার হাতেই পৌঁছয় এবং কেউ যদি কোন উপায়ে তা হস্তগত করেও বা—বিষয়বস্তু কিছুই যেন বুঝতে না পারে।

প্রয়োজনীয়তা অনুভব করা গেলে—উপায়ও উদ্ভাবন করা সম্ভব! স্থির হলো cypher-এ সাঙ্কেতিক অক্ষর বা শব্দের ব্যবহারে প্ল্যানটি লেখা হবে এবং সেই লেখাটি কিভাবে decode করা যায় বা তার প্রকৃত অর্থে অনুবাদ করা সম্ভব সেই "চাবিটি" মাস্টারদার কাছে আগেই গোপনে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। এটি অতি সামান্য একটি বিষয় খুব একটা অসাধারণ কিছু করেছিলাম তা নয়। তবে এইরূপ সামান্য বিষয়ও উপেক্ষণীয় নয়।

বিস্তারিত ইতিহাস লিখছি বলে এই সামান্য তথ্যটিও লিপিবদ্ধ থাকুক—হয়ত ভবিষ্যতে ইতিহাসবিদ্‌রা তাঁদের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে গবেষণাকার্যে এর প্রয়োগ করলেও করতে পারেন।

মাস্টারদার কাছে প্রথমে invisible ink-এর (দেখা না যায় এরকম সাদা কালি) সাহায্যে সাঙ্কেতিক অক্ষরগুলি

লিখে পাঠানো হলো। এই সাধারণ কাজটিও রীতিমত একটি প্ল্যান করে করতে হয়েছে। অর্ধেন্দুকে বলেছিলাম সে আদালতে আসার সময় যেন একটি গীতা নিয়ে আসে। একটি গীতা একেবারে নির্দোষ একটি ধর্মপুস্তক—পুলিশ কর্তৃপক্ষের আপত্তি করার কিছুই নেই—এক-আধটুকু ওলোট-পালট করে দেখে তারা গীতাটি অর্ধেন্দুকে ফেরৎ দিল। কাঠগড়ায় বসে বসে অর্ধেন্দু খুব ভক্তি-সহকারে মন দিয়ে সারাদিন গীতাটি পড়ল—কিন্তু বাড়ি ফেরার সময় গীতাটি সংগে নিল না—আমাদের কেউ সেটি জেলে নিয়ে গেল। আবার পরেরদিন আর একটি গীতা হাতে নিয়ে অর্ধেন্দু কাঠগড়ায় প্রবেশ করল। আমাদের একজন জেল হাজত থেকে আদালতে আসার সময় সেই গীতাটি নিয়ে এসে গভীর মনোযোগ দিয়ে পুলিশের দৃষ্টি আকর্ষণ করে সারাদিন পাঠ করল। এই অভিনয় যখন বিনা বাধায় কয়েকদিন চলল তখন পরবর্তী কাজটি সহজ হয়ে গেল।

নিম্নলিখিত ধরণের *cypher* প্রস্তুত করি—

A—ট	H—দ	O—য	V—হ
B—ঠ	I—ধ	P—র	W—ং
C—ড	J—ন	Q—ল	X—ঃ
D—ঢ	K—প	R—ব	Y—ˆ
E—ণ	L—ফ	S—শ	Z—অ
F—ত	M—ভ	T—স	
G—থ	N—ঘ	U—ষ	

২৬টি ইংরেজী অক্ষরের পরিবর্তে ২৬টি বাংলা অক্ষর সাঙ্কেতিক অর্থে প্রয়োগ করা হবে বলে স্থির হলো। কিন্তু এতেও অনেক দুর্বলতা থাকে—সাঙ্কেতিক লেখা উদ্ধার করার সরকারী দফতর এই-রূপ সাধারণ cypher-এ লেখার মর্ম অতি সহজে বিশ্লেষণ করতে পারে।

১৯২৪ সালে মাস্টারদা যখন আমার সঙ্গে জেল হাজতে ছিলেন, তখন সাঙ্কেতিক চিঠি লেখার পদ্ধতি নিয়ে গবেষণা করেন। ইংরেজী ভাষায় বাংলা সাঙ্কেতিক অক্ষরে লিখলেও বিশ্লেষণ-কারীরা কতকগুলি বাছাইকরা শব্দের মাধ্যমে সাঙ্কেতিক alphabets গুলি উদ্ধার করতে সমর্থ হয়। যেমন নাকি "I" একটি অক্ষর ইংরেজীতে তার অর্থ 'আমি'। "I" অক্ষরটি লেখার অংশ থেকে একটু চেষ্টা করলেই উদ্ধার করা যায়। তারপর ধরুন "The" "And" প্রভৃতি অতি আবশ্যক তিন অক্ষরের ব্যবহারিক ইংরেজী শব্দের প্রয়োগ জানা আছে বলে একটু বিশ্লেষণ করলেই সেইরূপ শব্দ cypher-এ লেখা চিঠির অংশ থেকে উদ্ধার করা সম্ভব। ধরুন "I" সাঙ্কেতিক অক্ষরটি উদ্ধার করা হয়েছে। তারপর তিন অক্ষর যুক্ত "The" "And" প্রভৃতি শব্দগুলির কোন বিশেষ অক্ষরটি "I"-এর সঙ্গে যুক্ত হলে ইংরেজী অর্থ হওয়ার মত শব্দের বিন্যাস পাওয়া যায় তা খুঁজে বার করা শক্ত নয়। "The" শব্দের 'T' টি "I"-এর সঙ্গে যোগ দিলে "It" হয়। এই-ভাবে সরকারী decypher করার department গবেষণা করে সাঙ্কেতিক দলিল বা চিঠিপত্রের অর্থ উদ্ধার করে।

শত্রুপক্ষের শত চেষ্টা সত্ত্বেও আমাদের সাঙ্কেতিক লেখার অর্থ যাতে উদ্ধার করা না যায় তার জন্য বিশেষ পদ্ধতি অবলম্বন করা হল। (১) ইংরেজী ভাষায় প্রতিটি শব্দের মধ্যে সাধারণত যা gap থাকে তা বাদ দেওয়া গেল।

(২) দাঁড়ি, কমা, সেমিকোলন প্রভৃতির ব্যবহার বাতিল হলো।

(৩) চিঠির আরম্ভ ও সমাপ্তির সাধারণ পদ্ধতির—যেমন নাকি—'my dear' 'yours smcerely' প্রভৃতির প্রয়োগ সম্পূর্ণ তুলে দেওয়া হলো।

(৪) ২৬টি প্রয়োজনীয় সাঙ্কেতিক alphabets ছাড়া আরো প্রায় দশ বারোটা অর্থহীন alphabets ব্যবহার করা হলো—যেমন নাকি—ক, খ, গ, ঘ, ঙ, চ, ছ, জ প্রভৃতি।

সাঙ্কেতিক চিঠি বা প্ল্যানের ড্রাফট পাঠাবার জন্য এইরূপ চিন্তা করে cypher-এ মাস্টারদার কাছে লেখা হবে স্থির করা হলো। ধরুন আমরা লিখবো—

"Masterda we have planned to blow up the Jail wall on Monday at 10 P.M."

আমাদের cypher-এ তা লেখা হবে —"ক ঙ ট শ স ট ব ত ট গ চ ং ণ চ ছ দ ট ক হ ক ণ র ফ ট ম ম ণ ঢ ঘ ছ ক স য ঙ ঠ ফ য ং ছ ঙ ষ র ফ গ স দ ন ক গ ন ট ধ ক চ ছ ং ট ফ ফ গ ঙ য ম ক ঙ ভ য ম চ ট ˆ ছ ফ ট স ক চ স ণ ম খ চ র গ ভ ক ক"

এই cypher-এ লেখাটির মর্ম উদ্ধার করার জন্য—যার জানা আছে সেই অর্থহীন অক্ষরগুলি বাদ দেবে এবং নির্ধারিত alphabets গুলি লিখে নিলেই প্রকৃত অর্থ জানতে পারবে।

গীতা দুটি নিয়ে অভিনয়পর্ব শেষ করার পর একটি নির্দিষ্ট পৃষ্ঠার সাদা মার্জিনে ভাতের ফ্যান বা ভাত চটকে জলে গুলে ফ্যানের মত করে নিয়ে সেটাতে মোটা নিব ডুবিয়ে cypher-গুলি লেখা হলো। খুব গবেষণার চোখে নিরীক্ষণ না করলে কোন লেখা আছে তা বোঝা যায় না। গীতাটি অর্ধেন্দুর মারফৎ মাস্টারদার কাছে পাঠানো হলো। মাস্টার-দার চিঠিতে প্রাপ্তিসংবাদ জানলাম (মাস্টারদার হাতের লেখা,—ও বিশেষ reference দিয়ে তিনি লিখেছেন কাজেই তাঁর চিঠির যাথার্থ্য সম্বন্ধে সন্দেহের কোন কারণ নেই। তাঁর কাছ থেকে প্রাপ্তিসংবাদ পাওয়ার পর আমরা বিশেষ ক'টি পৃষ্ঠার সাদা অংশটুকু তুলি দিয়ে একটি সাধারণ রাসায়নিক জলীয় দ্রব্যে ভিজিয়ে নিয়ে লেখাগুলি পড়তে হবে তা জানালাম। এক আউন্স জলে দু'এক ফোঁটা টিনচার আইওডিন মিশিয়ে সেই লোশনের সাহায্যে অলক্ষ্য লেখার আবিষ্কার পদ্ধতি মাস্টারদার জানা ছিল। কাজেই cypher-এ লেখা পড়ার জন্য তাঁকে কোন বেগ পেতে হয় নি।

আজ এই কথা লিখতে গিয়ে মনে মনে হাসছি। প্রথম যখন cypher-এ চিঠি লেখার পদ্ধতি আবিষ্কার করলাম তখন বালক সুলভ বুদ্ধিতে প্রেমানন্দদার কাছে cypher-এ চিঠি লিখলাম—"My dear Premananda", এবং শেষ করতাম "Yours Sincerely" প্রভৃতি দিয়ে। এতগুলি অক্ষর যে অতি সহজে বুঝে ফেলা যায় তা তখন ভাবিই নি। আর এখন যা লিখলাম এইরূপ cypher decode করা সম্ভব নয়। তবু প্রতিটি দেশ Deplomatic channal-এ যেরূপ code ও cypher ব্যবহার করে থাকে সেই তুলনায় আমাদের cypher বিশেষ একটা কিছু তা ভেবে নেওয়া ভুল হবে। এই লেখার মাধ্যমে মাত্র এইটুকু জানা যাবে যে, তখনও আমাদের অল্পবুদ্ধি ও জ্ঞান নিয়ে অতি সাবধানতার সঙ্গে ষড়যন্ত্রমূলক কাজ করেছি বলেই আমাদের পক্ষে কিছুটা সফলতা অর্জন করা সম্ভব হয়েছে।

যুববিদ্রোহের দ্বিতীয় পর্যায়ের দ্বিতীয় প্ল্যানটির সারমর্ম এইরূপ।

(১) মামলা দীর্ঘস্থায়ী করে সময় পাওয়া চাই। তার জন্য যা করা সম্ভব

কিস্তিতে ট্রানজিস্টার

মাসিক ৩০ টাকায় অভঙ্গুর প্লাস্টিক ক্যাবিনেটে 'ন্যাশা-নাল' পোর্টেবল ৩ ব্যান্ড অল ওয়ার্ল্ড ট্রানজিস্টার।

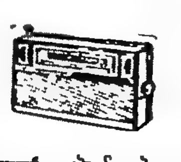

Jagson Agencies (W.B.M.-88)
P.B. 1212, Delhi-6.

আদালতের কর্মসূচী ও বিচারপদ্ধতির বিঘ্ন ও বিলম্ব ঘটিয়ে আমরা তা করব।

(২) মাস্টারদা ও নির্মলদা জেলে আমাদের কাছে পাঠাবার জন্য কয়েকটি রিভলবার, দু'তিন ডজন শাণিত ছোরা, দু'তিন ডজন ডিনামাইট বা তা সম্ভব না হলে অন্তত আধ মণ দেশী বারুদ টর্চের কয়েক ডজন ব্যাটারী, মোটর গাড়ির আলোর বালব এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি তাঁরা যোগাড় করে রাখবেন।

(৩) আমরা জেলের সেপাইদের হাত করে সেই সব অস্ত্রশস্ত্র ও বিস্ফোরক দ্রব্যাদি কারাপ্রাচীরের অভ্যন্তরে আনাবার ব্যবস্থা করব।

(৪) জেলের অভ্যন্তরে সরকারী ব্যবস্থার কড়াকড়ি শিথিল করবার জন্য যেমন করে ধীরে ধীরে তাদের মনে ভরসা ও বিশ্বাস স্থাপন করে অগ্রসর হওয়া প্রয়োজন তা আমরা করব। জেলে আমরা প্রায় ত্রিশজন আছি বলে অস্ত্রশস্ত্র ও বিস্ফোরক দ্রব্যাদি জেলের মধ্যে লুকিয়ে রাখবার সুযোগ নেবো। ত্রিশজনের মধ্যে দশ-বারোজনকে আমরা এই কাজে বেছে নেবো।

(৫) অর্ধেন্দু গুহ আমাদের সঙ্গে ও মাস্টারদার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সংযোগ রাখবে আর মাস্টারদার নির্বাচিত আর কোন দলের সভ্যের সঙ্গে সে যুক্ত থাকবে। আমাদের নির্দেশ মত অর্ধেন্দু আমাদের নিযুক্ত জেল সেপাই বা সার্জেন্টকে ব্যবস্থা অনুযায়ী অস্ত্র ও বিস্ফোরক দ্রব্য সরবরাহ করবে।

(৬) আমাদের যেখানে রেখেছে সেখানে পুলিশ ও জেল সেপাইদের অতন্দ্র পাহারা। জেলপ্রাচীরের কাছে গিয়ে LAND MINE বা ডিনামাইট পুঁতে রাখা খুব সহজ নয়। তবু আমাদের বিশ্বাস সেপাইদের সাহায্যে তা করা সম্ভব।

(৭) প্রাচীরের বাইরে মিলিটারী পাহারা দিচ্ছে। জেলের চারিটি কোণে তাঁবু খাটিয়ে সব সময়ের জন্য পাহারার ব্যবস্থা। সৈন্যদের বিশেষ তাঁবু দুটিকে zero hour-এ বোমা বা অস্ত্র ব্যবহার করে engage রাখতে হবে। সেই জন্য চার বা ছয়জন যুবককে মাস্টারদা প্রস্তুত রাখবেন।

(৮) জেলপ্রাচীরের বাইরে মিলিটারী কায়দায় যেভাবে প্রায় দশ বারো ফুট পরিধি জুড়ে কাঁটাতারের বেড়া আছে তা অতিক্রম করবার ব্যবস্থা আমরাই করব। আমাদের ব্যবহারের জন্য ছোবড়ার মোটা তোষক ছিল—সেই সব তোষক কাঁটা-তারের ওপর ফেলে সেই বাধা অনায়াসে পেরিয়ে যেতে পারবো।

(৯) জেলপ্রাচীরের বাইরে যাওয়া এই উপায়ে যদি সম্ভব না হয়—তবে বিকল্প ব্যবস্থা করা আছে—যে সব পুলিশ রাইফেল নিয়ে হাজত ঘরের প্রাঙ্গণে আমাদের পাহারায় নিযুক্ত থাকে অতর্কিত আক্রমণ করে তাদের রাইফেল ছিনিয়ে নেবো। এইভাবে অস্ত্র দখল করা আমাদের পক্ষে অতি সহজ। তাদের রাইফেল নিয়ে আমরা কয়েদী রাখবার বড় দোতলার একটি ঘর দখল করবো—এবং দু'তিন দিন, সম্ভব হলে আরো বেশি কয়েকদিন সেখানে পাকা আড়ালের পশ্চাতে থেকে যুদ্ধ চালাব। কামান দিয়ে উড়িয়ে বা শূন্য থেকে বোমা নিক্ষেপ করে যদি সেই ঘর ধ্বংস করা না যায় তবে সেইরূপ সুরক্ষিত স্থান থেকে শত্রুসৈন্য আমাদের স্থানচ্যুত করতে পারবে না।

(১০) জেলের এই প্ল্যানের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বাইরেও বিস্ফোরক দ্রব্যের ব্যবহারে এক ব্যাপক আক্রমণের strategy নেওয়া স্থির করা হয়। যদি ডিনামাইট পাওয়া যায় ভালো। যদি বর্তমানে ডিনামাইট যোগাড় করা সম্ভব না হয় তবু চেষ্টার ত্রুটি যেন না থাকে। ডিনামাইটের অভাব আমাদের মেটাতে হবে বন্দুকের দেশী বারুদ দিয়ে। সেই জন্য অর্ধেন্দুর সঙ্গে পরামর্শ করে আমরা বুঝেছি বন্দুকের ১০।১২ মণ বারুদ তৈয়ারি করা আমাদের পক্ষে সম্ভব। শত্রুর কড়া পাহারা, শত বিপদ, বিবিধ ধরণের হাজারটি সমস্যা উপেক্ষা করেও ১০।১২ মণ বারুদ তৈয়ারি করা যে যায় সে বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ।

(১১) ইতিমধ্যে আমরা ল্যান্ডমাইন তৈয়ারি করবার একটি কার্যকরী ডিজাইন করেছি। ইলেকট্রিকের সাহায্যে খুব সহজ উপায়ে এই সব land mine ব্যবহার করা সম্ভব হবে। তৈয়ারি করা ও সেই-গুলি শত্রুপক্ষীয় বিশেষ বিশেষ target-এর বিরুদ্ধে খুব নির্ভুলভাবে প্রয়োগ করা যাবে।

(১২) আপাতত শহরের দশটি স্থানে আমরা সেইরূপ ল্যান্ডমাইন ব্যবহার করার প্ল্যান করতে পারি। ট্রাইব্যুনালের জজেরা, পুলিশ সাহেব তিনজন, মিলিটারী কমান্ডার, সেইরূপ উচ্চপর্যায়ের অফিসারদের—D.I.G. ও বিভাগীয় কমিশনারকে আঘাত হানতে পারি।

(১৩) অর্ধেন্দুর কাছ থেকে শহরের সংবাদ যা সংগ্রহ হয়েছে তা বিচার করে বোঝা যাচ্ছে শত বাধা থাকা সত্ত্বেও বিশেষ বিশেষ স্থানে ল্যান্ডমাইন পুঁতে রাখা সম্ভব।

(১৪) আরো অনেক বিশদভাবে আলোচনা করা যাবে—মাস্টারদা যদি এই প্ল্যান অনুমোদন করেন।

(১৫) এই প্ল্যান কার্যকরী করার জন্য অর্থের প্রয়োজন। তা পাওয়া যাবে বলেই বিশ্বাস। দিদিকে দিয়ে শরৎবাবুর কাছ থেকে যেন পাঁচ হাজার টাকা নিয়ে আসা হয়, প্ল্যান অনুমোদন করলে যেন কাজ সুরু করতে পারি।

এই প্ল্যানটি invisible ink-এর ধর্ম সম্বন্ধীয় কোনো পুস্তকের কতকগুলি নির্দিষ্ট পাতায় লেখা হল এবং সেই গ্রন্থটি অর্ধেন্দুর মারফৎ মাস্টারদাকে পাঠানো হল। অর্ধেন্দু প্রতি মাসে দু'-তিনবার মাস্টারদার সঙ্গে দেখা করতো। আগে থেকেই অর্ধেন্দু মাস্টারদার নতুন আস্তানা জানতো। আমাদের সঙ্গে (গণেশ ও আমি) পরামর্শ করে প্রয়োজন বোধে অর্ধেন্দু মাস্টারদার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যেত। আমরা কখনও মনে করি নি যে সুচতুর পুলিশ অর্ধেন্দুকে অনুসরণ করবে না। কাজেই অর্ধেন্দু শহর ছেড়ে দূর গ্রামে মাস্টারদার সঙ্গে কিভাবে দেখা করতে যাবে তার সুনির্দিষ্ট নির্দেশ তাকে দেওয়া হ'ত। সে রাত্রে গোপনে বাড়ির পেছনের দরজা দিয়ে সবার অগোচরে শোবার ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বাড়ির সামনে প্রহরারত ইনটেলিজেন্স ব্রাঞ্চের সাদা পোষাক পরিহিত পুলিশের কর্তব্য-পরায়ণতায় কোনরূপ ব্যাঘাত সৃষ্টি না করেই মাস্টারদার উদ্দেশ্যে গ্রামে চলে যেত।

সবিনয় নিবেদন

কিছু কিছু প্রবন্ধ, যা অনেক সময় ধারাবাহিক বলে মনে হয়, সেগুলি মাঝে মধ্যে আমরা বন্ধ রাখতে বাধ্য হচ্ছি। অনিবার্য কারণস্বরূপ এটুকু বলা উচিত যে, ঐ সব প্রবন্ধ খুব আকর্ষক হলেও সংবাদ সাপ্তাহিক হিসেবে সাপ্তাহিক বসুমতীর অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে পাঠক-দের চলতি বিশ্বসংবাদগুলির সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করিয়ে দেওয়া। তাই স্থানাভাববশত কখনো কখনো ধারাবাহিক রচনাগুলির প্রকাশ দু'-এক সংখ্যায় বন্ধ রাখতে হলেও, তা আমাদের অনিচ্ছাকৃত। পাঠকদের অনুরোধে অবশ্য জ্ঞাতব্য বিশেষ বিশেষ প্রবন্ধের সংযোজন—পাঠকেরাই লক্ষ্য করছেন, আশা করি।

—সম্পাদিকা

গোপনে ঘর থেকে বেরোতে কেউ দেখুক না দেখুক অথবা কেউ পেছু নিল কিনা সেটা বড় কথা ছিল না। তার প্রতি আমাদের সুস্পষ্ট নির্দেশ ছিল যে নৌকোয় চড়বার আগে অর্ধেন্দু filtered হয়ে বেরিয়ে আসবে, অর্থাৎ, এমন এমন গলি দিয়ে বেরোবে এবং বেরিয়ে যখন নিশ্চিত হবে তার পেছনে কেউ-ই তাকে অনুসরণ করছে না, তখনই সে নৌকোয় উঠবে। এমন কি যদি কোনো নিরীহ কানা খোঁড়া, অসুস্থ বৃদ্ধ বা বৃদ্ধাও কাউকে তার পেছনে বা ধারে কাছে দেখে তবে সে যাত্রায় তার নৌকোয় চাপা স্থগিত থাকবে। এই সম্বন্ধে নিশ্চিত হয়ে যদি সে গ্রামের পথে মাস্টারদার গোপন আস্তানার দিকে অগ্রসর হয় তখন অর্ধেন্দু আরো কঠোর-ভাবে এই নীতি অনুসরণ করবে—এই আদেশ তার ওপর ছিল। এও বলা ছিল যে, যদি একজন কোনো লোকও তার পেছনে আছে দেখতে পায়, তবে সেদিন আর সে মাস্টারদার সঙ্গে দেখাই করবে না। এ কথা গর্ব করেই বলা যায় যে, প্রতি মাসে অন্তত দু'বার অর্ধেন্দু মাস্টার-দার সঙ্গে দেখা করেছে, কিন্তু পুলিশ তাকে অনুসরণ করতে পারে নি ; এমন কি তার বিভিন্ন ষড়যন্ত্রমূলক কাজও জানতে পারে নি। আবার আমার সেই কথাই প্রমাণিত হল—ঘরে বিভীষণ না থাকলে মন্ত্রবলে পুলিশ কিছু করতে পারে না।

মাস্টারদা আমাদের লিখিত প্ল্যানটি পেয়ে অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছিলেন এবং অর্ধেন্দুকে বলেছিলেন আমাদের জানাতে —"গণেশ ও অনন্তের এই প্ল্যান যদি সার্থক হয় তবে যুব-বিদ্রোহের প্রথম পর্যায়ের তুলনায় এইরূপ ব্যাপক ও অভি-নব আক্রমণের কর্মসূচী এক নতুন ইতি-হাস রচনা করবে।"

আমরা জানতাম মাস্টারদা আমাদের প্ল্যানটি অনুমোদন করবেন এবং তার বাস্তব রূপ দিতে পরাঙ্মুখ হবেন না। তিনি দ্বিধাহীনচিত্তে মত জানালেন—"এগিয়ে যাও। উল্কাপিন্ডের মত ছুটে যাও। সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ শত্রুকে আঘাতের পর আঘাত করতেই হবে। তোমরা চেষ্টা করে যাও আর আমি নির্মলবাবু ও অম্বিকাবাবুর সঙ্গে পরামর্শ করে যা' যা' করা সম্ভব তা' করে যাব। অর্ধেন্দুর সঙ্গে তোমাদের যখন রোজ ছ'টি ঘণ্টা করে দেখা হয় তখন তার মারফৎ তোমা-দের প্রস্তুতির কাজ চালানো অনেক সহজ-সাধ্য। আর যখন Preparation শহরে করতে হবে তখন তোমাদের সুবিধে আছে। অবশ্য অর্ধেন্দু জামীনে মুক্ত না থাকলে এইরূপ ভাবা যেত না। এখন যখন আমাদের এই সুবিধে আছে, তখন পূর্ণ-মাত্রায় তার সুযোগ নেবো।"

কাগজে কলমে প্ল্যান করা এক কথা আর তার বাস্তব রূপ দেওয়া সম্পূর্ণ অন্য কথা। কি ব্যাপক আয়োজন, কি নিদারুণ পরীক্ষা—মুখে ও মনে একই ভাষার প্রতিধ্বনি শোনা চাই। দুর্বলতার সঙ্গে কোনো আপোষ নয়। সাহস ও আত্মত্যাগের ডঙ্কা বাজিয়ে অস্ত্রে সাজ সব তুলেছি। এখন সর্বতোভাবে প্রস্তুত হতে হবে।

কিন্তু আমাদের প্রতিটি পদক্ষেপে, আমাদের এই পথের প্রতিটি বাঁকে বাঁকে গুপ্ত সর্পের গূঢ় ফণা অধীর প্রতীক্ষায় আছে—সুযোগ পেলেই ছোবোল বসাবে। লোকনাথ ও গণেশ চন্দননগরে দোসরা সেপ্টেম্বর ধরা পড়ায় আমরা সাময়িকভাবে বাধা পেয়েছি। এখন আবার নিজেদের সংহত করে ব্যাপক প্ল্যান নিয়ে এগিয়ে যাব। মাস্টারদার কাছ থেকে এগিয়ে যাবার নির্দেশও পেয়েছি কিন্তু আবার বাধা। ৯ই অক্টোবর ১৯৩০ সাল, অম্বিকাদাকে খাঁ বাহাদুর আসানুল্লা গ্রেপ্তার করল। পটিয়ার কোনো গ্রামে অম্বিকাদা থাকতেন। কোনো নির্দিষ্ট সংবাদের ভিত্তিতে—আমার বিশ্বাস কোনো বিশ্বাসঘাতকের কাছ থেকে জেনে, আসানুল্লা সদলবলে গিয়ে অম্বিকা-দাকে বন্দী করেছে।

ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে আমরা অস্ত্র ধরেছি, কাজেই তাদের চর আমাদের ধর-বার জন্য সারাক্ষণ ওৎ পেতে থাকবে এতে আশ্চর্যের কি আছে। কিন্তু আশ্চর্য বা আফশোষের কথা নয়, কথা হচ্ছে কি নিদারুণ প্রতিশোধ স্পৃহা—প্রয়োজনের অতিরিক্ত রাজভক্তি দেখিয়ে অম্বিকাদার অসুস্থ শরীরের ওপর পশুর মত অকথ্য অত্যাচার চালিয়েছে তারা। সভ্যসমাজের রুচি বহির্ভূত, এমন কি নিকৃষ্টতম অসভ্যতার কল্পনাকেও ম্লান করে দিয়ে আসানুল্লা অম্বিকাদার ওপর বর্বরোচিত ব্যবহার করেছে।

অম্বিকাদাকে গ্রেপ্তারের পর আসানুল্লা বীর পদে অভিষিক্ত হল। খাঁ সাহেব উপাধিতে তাকে আর মানাচ্ছিল না, খাঁ বাহাদুর উপাধি দেওয়া হল আসানুল্লাকে, আর সেই সঙ্গে তার দাপটে চট্টগ্রামবাসী হল ভীত, ত্রস্ত ও নানা অত্যাচারে জর্জরিত।

অত্যাচারী আসানুল্লার শাস্তি চাই—তার অত্যাচারের প্রতিবিধান চাই—প্রতিকার চাই। চট্টগ্রামবাসীর ক্ষুব্ধ মনের প্রতি-ক্রিয়া আদালত গৃহে আমাদের কাঠগড়ায় প্রতিধ্বনিত হল। অভিভাবকেরা আমার কাছে অভিযোগের সুরে বললেন—

"তোমরা এখনও চুপ করে আছ কেন? আমরা আর সহ্য করতে পারছি না। আসানুল্লার অত্যাচার দিনের পর দিন বেড়েই চলেছে। আর তাকে বাড়তে দেওয়া উচিত নয়। তোমরা যদি না পার তবে আমাদের একটি রিভলভার দাও, আমরাই তার প্রতিশোধ নেব।"

তখনই বুঝেছিলাম চট্টগ্রামবাসীর ধৈর্যের সীমা অতিক্রম করেছে—এর প্রতি-বিধান চাই—চাই প্রতিশোধ।

[ক্রমশঃ]

যোগসাধনার নিগূঢ় রহস্য সুপ্রকাশ—যোগ-সাধনায় দীর্ঘজীবন লাভের নির্দেশ

যোগশাস্ত্র

সিদ্ধযোগিগণপ্রণীত পুঁথিদৃষ্টে সুসংস্কৃত বড় অক্ষরে মূল—সরল বিশদ বঙ্গানুবাদ সম্বলিত পরিবর্ধিত প্রামাণ্য অষ্টম সংস্করণ দীর্ঘকাল পরে বহু সাধনায় প্রকাশিত। ১। শিবসংহিতা, ২। ঘেরণ্ডসংহিতা, ৩। ব্রহ্ম-সংহিতা, ৪। অষ্টাবক্রসংহিতা, ৫। ষটচক্র-নিরূপণম্, ৬। দত্তাত্রেয় যোগরহস্যম্, ৭। পরাশরপ্রোক্ত যোগোপদেশ। অতি দুষ্প্রাপ্য সাতখানি যোগগ্রন্থের অভাবনীয় সমাবেশ। যে সকল গুহ্য সাধনতত্ত্ব এতদিন হিমালয়ের নিভৃত গুহায় নিহিত ছিল—যে সকল মহা-পুরুষের উপদেশ—সাধন নির্দেশ উপেক্ষা—অবহেলা করিয়া আমরা দিন দিন ক্ষীণ, নানা রোগাক্রান্ত স্বল্পজীবী, অল্পভোগী হইতেছি, একমাত্র যোগশাস্ত্র পাঠে—অনুশীলনে—সাধনায় তাহার প্রতিকার সম্ভব। হিন্দু সন্তান আবার আর্যগণের বলবীর্য, প্রতিভা-দীর্ঘায়ুর অধি-কারী হইয়া নীরোগ, সুস্থ শরীরে জীবন-সংগ্রামে সাফল্য লাভ করিয়া মোক্ষসাধনায় আত্মনিবেদন করিবে। যোগের প্রভাবে মানুষ দেবতা হয়। প্রথমে সহজ ক্রিয়া, সংযম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধ্যানধারণা, ধৃতি, শুদ্ধি, শৌচাচার, দেহতত্ত্ব অবগতি, মনঃ-শুদ্ধি, বাহ্য ও অন্তরশুদ্ধি প্রভৃতি সকল প্রক্রিয়ার অনুষ্ঠানের পর জ্যোতিঃ ধ্যানে—দর্শনে আত্মার সহিত পরমাত্মার সংযোগ সাধনে সিদ্ধিলাভ সুনিশ্চিত। অশেষ মঙ্গল-নিলয় দেবাদিদেব মহাদেব উপদিষ্ট—সিদ্ধ-ঋষিগণ অনুষ্ঠিত যোগশাস্ত্র অনুশীলনে—সাধনায় যোগের অতুল বিভূতিলাভ সম্ভব হইবে। তুলট কাগজে সুন্দর নির্ভুলভাবে মুদ্রিত প্রামাণ্য অষ্টম সংস্করণ। মূল্য : পাঁচ টাকা।

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড : ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

ভিয়েৎনাম: ঝড়ের কেন্দ্রে

বরুণ রায়

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর

"আমরা মৃত্যুকে ভয় করি না, কারণ আমরা বাঁচতে চাই!"

সারা ভিয়েৎনামের মানুষ যেন ক্রোধে, বিক্ষোভে, প্রতিজ্ঞায় গর্জে উঠেছিল ফরাসীদের বিরুদ্ধে হো চি মিনের সেদিনের এই কথাগুলির মধ্যে।

হত্যা করবে? অত্যাচার করবে? পীড়ন করবে? দেখি তোমরা কত হত্যা, কত অত্যাচার, কত পীড়ন করতে পার। "আমাদের লক্ষ লক্ষ সৈনিক তৈয়ার," হো হুঁশিয়ার করে দিয়ে বলেছিলেন। "যদি দরকার হয় তারা নিজেদের প্রাণ বিসর্জন দেবে, প্রতিরোধ যত দীর্ঘ হোক সে প্রতিরোধ তারা চালিয়ে যাবে, তবু ভিয়েৎনামের স্বাধীনতা আমরা বিপন্ন হ'তে দেব না, তার শিশুদের আমরা দাসত্ব থেকে উদ্ধার করবই।"

আসন্ন সংগ্রামের জন্যে দেশবাসীকে ডাক দিয়েছিলেন জাতীয়তাবাদের চারণ-কবি ঃ "ভাই সব! ওরা আমাদের হত্যা করছে হাজারে হাজারে। আমাদের বাড়ি-ঘর-দোর জ্বালিয়ে ছারখার করে দিচ্ছে। গ্রামের পর গ্রাম ভেঙে চুরমার করে দিচ্ছে। এই হানাদারদের হাত থেকে আমাদের পরিবারবর্গকে, আমাদের পিতৃভূমিকে রক্ষা করতেই হবে।"

বলেছিলেন ঃ "একজন স্বাধীন মানুষ হিসেবে যদি মরতেও হয় তবু একজন ক্রীতদাস হয়ে বাঁচব না, এই হোক আমাদের ব্রত। যদি সমস্ত মানুষ এই প্রতিজ্ঞার পেছনে জড়ো হয় তবে আমাদের কেউ ঠেকাতে পারবে না। কারণ এই লড়াই ন্যায়ের লড়াই।"

মানুষ দূরে থাকে নি এর পর। থাকতে পারে নি। এসেছিল কৃষক, মজুর, কর্মচারী, ছাত্র ও অধ্যাপক, ব্যবসায়ী, সৈনিক, লেখক ও বুদ্ধিজীবী। ফরাসীদের ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে, মিত্র শক্তির জঘন্য বিশ্বাসঘাতকতার বিরুদ্ধে সেদিন ভিয়েৎনামে জাতীয়তাবাদের যে জোয়ার এসেছিল, তাতে রাজনীতির কোন ছাপ, নরমপন্থী-চরমপন্থী, কম্যুনিস্ট-অকম্যুনিস্ট ভেদাভেদের কোন স্থান ছিল না। এক-লক্ষ্য, এক-মন ও এক-ব্রত হয়ে ভিয়েৎনামের মানুষ ফরাসীদের উৎখাতের জন্যে হো চি মিনের নেতৃত্বে প্রস্তুত হয়েছিল।

কাঁটার পথে, আঁধার রাতে সেদিন তাদের সঙ্গে ছিল না কেউ, কোন বাইরের সম্বল। কার ওপর নির্ভর করতে পারত তারা? চীন? এক প্রচণ্ড গৃহযুদ্ধে সে নিজেই তখন বিপর্যস্ত, অপরকে সাহায্য করবে কি।

রাশিয়া? একটি মুক্তি-সংগ্রামী দেশের প্রতি তার সমর্থন এতই জোরালো সমর্থন ছিল যে হো চি মিনের গণতান্ত্রিক রিপাবলিককে সমর্থন করার আগে তাকে

পাঁচ বছর ধরে ভাবতে হয়েছিল। লেনিনের যে রাশিয়ার কাছ থেকে তিনি এই সংগ্রামের প্রেরণা পেয়েছিলেন, এই আচরণের পর তার সম্পর্কে হো'র কোন মধুর ধারণা থাকার কথা নয়।

আর ফরাসী কম্যুনিস্ট? ভিয়েৎনামীরা ফরাসী কম্যুনিস্টদের আগে উপনিবেশিক ও পরে কম্যুনিস্ট বলে মনে করত। ওরা কি করে ভুলবে যে, সায়গনে ঐ সময় যে কুড়িজন ফরাসী কম্যুনিস্ট ছিল, তাদের মধ্যে মাত্র একজনের সহানুভূতি ছিল ভিয়েৎনামী সংগ্রামের প্রতি, এবং তারা এই সংগ্রামে চুপ করে থাকবার জন্যে ফরাসী শাসকগোষ্ঠীর সঙ্গে একটি বোঝাপড়ায় এসেছিল?

সুতরাং হো চি মিনকে সেদিন তাঁর নিজের শক্তির ওপরই নির্ভর করতে হয়েছিল, তার স্বদেশবাসী ভাই-বোনেদের মিলিত শক্তির ওপর। এটা তাদেরই সংগ্রাম, কাজেই তাদেরই জয় করতে হ'বে। আর কেউ এসে তাদের জন্যে জয় করে দিয়ে যাবে না। এটা তিনি পরিষ্কার বুঝতে পেরেছিলেন। তাই কোন্ দল কোন্ পতাকার নিচে দাঁড়িয়ে লড়াই করছে এটা তাঁর কাছে আর বড় ছিল না। পরাধীন মানুষ, শোষিত মানুষ, অত্যাচারিত মানুষ তাদের জাতীয় মুক্তির জন্যে লড়াই করছে এটাই ছিল একমাত্র সত্য।

সেই সত্যের উপলব্ধি থেকেই তাঁর দীর্ঘ, নিঃসঙ্গ অভিযান আরম্ভ করার প্রাক্কালে জাতীয়তাবাদী ছাড়া আর কোন পরিচয় তিনি নিজের জন্যে রাখতে চান নি। ১৯৪৫ সালের নভেম্বর মাসে, প্রায় পনেরো বছর পর, তিনি ভিয়েৎনাম কম্যুনিস্ট পার্টির পৃথক অস্তিত্ব ভেঙে দিয়েছিলেন।

"এখন থেকে আমার দেশই হল আমার দল," তিনি বলেছিলেন।

"আমার কার্যসূচী হল দেশের স্বাধীনতা।" এখন থেকে দল ও মত নির্বিশেষে সকলের একমাত্র পরিচয় হল তারা জাতীয়তাবাদী। এবং এখন থেকে দল ও মত নির্বিশেষে দেশের মানুষ সামিল হ'তে লাগল এই জাতীয়তাবাদী সংগ্রামের সঙ্গে। যাদের সংশয় ছিল তারা সংশয়মুক্ত হল। যাদের দ্বিধা ছিল তাদের দ্বিধা কেটে গেল। যারা পেছনের সারিতে ছিল তারা সামনে এগিয়ে এল। যারা ছিল সাধারণ ছা-পোষা মানুষ, তারাই হয়ে উঠল অসাধারণ যোদ্ধা। যা ছিল এক দল অসমসাহসী মানুষের বিদ্রোহ, তা হয়ে উঠল সমগ্র জাতির অপ্রতিরোধ্য সংগ্রাম।

লড়াই দ্রুত ছড়িয়ে পড়ল। সায়গনের বিমানঘাঁটিতে রয়াল এয়ারফোর্সের পেট্রোলের ডিপোগুলি উড়ে গেল গেরিলাদের বোমায়। সায়গনের ফরাসী এলাকাটি ঘিরে ফেলল তারা। শহরে আসবার সমস্ত সড়ক ও সড়ক-সেতু কেটে দেওয়া হল। এইভাবে আসার ও যাওয়ার সমস্ত পথ রুদ্ধ করে সেদিন রক্তাক্ত প্রতিশোধ নিয়েছিল গেরিলারা ফরাসীদের ওপর।

অক্টোবরের গোড়ার দিকে একটি সাঁজোয়া ও দু'টি পদাতিক রেজিমেন্ট এবং একটি কম্যান্ডো ব্যাটেলিয়ান ফরাসী সৈন্য এসে পৌঁছল। সেই সঙ্গে এসে পৌঁছলেন লে ক্লার্ক, একজন স্বাধীন ফরাসী জেনারেল। তিনি এসেই জাপানী, ভারতীয় ও বৃটিশ সৈন্যদের পুরোপুরি লাগিয়ে দিলেন কাজে।

ক্রমে সায়গন থেকে গেরিলারা ছড়িয়ে পড়ল গ্রামাঞ্চলে, সায়গন নদীর ব-দ্বীপ এলাকায়, জলায়, জঙ্গলে আর পাহাড়ে। সেখানে তারা আত্মগোপন করল।

লে ক্লার্কের ছিল সাঁজোয়া গাড়ি, আর তাঁদের দখলে ছিল সুন্দর, বাঁধানো, দূরপাল্লার সড়কগুলি। সেই সড়ক বেয়ে লে ক্লার্ক এক শহর থেকে অন্য শহরে যেতে লাগলেন, এবং এইভাবে একদিন ষোড়শ সমান্তরালের প্রান্তে গিয়ে পৌঁছলেন।

তিনি ভাবলেন, গোটা দক্ষিণ ভিয়েৎনাম থেকে তিনি ভিয়েৎমিন গেরিলাদের তাড়িয়ে ছেড়েছেন। কিন্তু তিনি জানতেন না, শহরে থেকে সম্মুখ সমরে লোকক্ষয় করার প্রয়োজন গেরিলাদের ছিল না। গেরিলা যুদ্ধের নীতিই তাই। লে ক্লার্ক যখন শহরগুলি দখল করে আত্মসন্তুষ্ট হচ্ছিলেন, তখন গেরিলারা গ্রামাঞ্চলে নিজেদের সংগঠিত করছিল।

দক্ষিণে গেরিলাদের নেতা গ্রেন ভান ইয়াউ'র প্রথম কাজ হল গেরিলাদের ছোট ছোট প্ল্যাটুনে ভাগ করে বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে দেওয়া। সেই সঙ্গে সংগ্রহ করা হ'তে লাগল আঞ্চলিক সৈন্য। গ্রামে গ্রামে তৈরি হল মিলিশিয়া। একটি ভিয়েৎমিন নিরাপত্তা বাহিনীও গঠিত হল যার ওপর বিশেষ দায়িত্ব ছিল সম্ভাব্য পঞ্চম বাহিনীর লোকেদের ওপর নজর রাখা।

এবং গঠিত হল বিশেষ বিশেষ কম্যান্ডো বাহিনী, সুইসাইড স্কোয়াড, গেরিলা লড়াইয়ে এর পর থেকে যা একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে লাগল।

যেরকম দ্রুত গতিতে ভিয়েৎমিনরা তখন তাদের স্বেচ্ছাসেবক সংগ্রহ করত এবং এখনও ভিয়েৎ কংরা করে থাকে, তা রীতিমত বিস্ময়ের ব্যাপার। তাদের উচ্চমানের সংগঠন শক্তি ও গভীর জনপ্রিয়তা ছাড়া আর কোনভাবে এই সাফল্যের ব্যাখ্যা করা যায় না।

মার্কিন মুখপাত্রেরা, যাঁরা অনেক আগে থেকেই দক্ষিণ ভিয়েৎনামের সরকারী সৈন্যদের ট্রেনিং দেবার কাজে লিপ্ত আছেন, নিজেরাই সেকথা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেন। এমনি একজন আমাকে গভীর হতাশার সঙ্গে বলেছিলেন: "ওরা এক-একজন আনাড়ীকে ধরে আনে এবং কয়েক মাস পরে তারা বেরিয়ে আসে যেন এক-একটি বাঘ। আর আমাদের অনিচ্ছুক সৈন্যরা ছ' মাস ট্রেনিং নেবার পরেও অনিচ্ছুক সৈন্যই থেকে যায়।"

*

ওদিকে ষোড়শ সমান্তরালের উত্তরে জেনারেল গিয়াপও প্রস্তুত হচ্ছিলেন। থাক কান, কাও বাং, লাং সন, হা ইয়াং, তুয়েন কোয়াং ও তাই নুয়েন এই ছ'টি প্রদেশে ভিয়েৎমিনদের প্রাধান্য আগেই স্থাপিত হয়েছিল। গিয়াপ এখন ঐ বিরাট এলাকা জুড়ে তাঁর মূল ঘাঁটি স্থাপন করলেন। পাহাড়ে পাহাড়ে গুহা কেটে বা বড় করে স্থাপিত হল কোথাও অফিস, কোথাও রসদের ভাণ্ডার, কোথাও বা ওয়ার্কশপ, ফ্যাক্টরী ও স্কুল। ঐ সব গুহা ছিল এত দুর্ভেদ্য ও সংগুপ্ত যে বাইরের কারো পক্ষে সেগুলি খুঁজে বার করা সম্ভব ছিল না। সেখানে জঙ্গল এত গভীর যে যদি কোন ব্যাটেলিয়ন সেখান দিয়ে রুট মার্চ করেও যায় তবু দূরে থেকে তা বোঝার উপায় নেই। সেখানকার ভূগোল ছিল এত অনুকূল যে তা রক্ষা করতে খুব বেশি প্রয়াসের দরকার ছিল না। আর সেখানকার মানুষের সর্বাত্মক সমর্থন ছিল ভিয়েৎমিনদের প্রতি। গেরিলাদের পক্ষে এর চাইতে আদর্শ পরিস্থিতি আর হ'তে পারে না। গিয়াপ তার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করলেন। সেইখানে নিভৃত, নিরুপদ্রব শান্তিতে তিনি তাঁর "আঞ্চলিক" সৈন্যদের নিবিড় ট্রেনিং দিয়ে "নিয়মিত" গেরিলায় পরিণত করতে লাগলেন।

সেই সঙ্গে দ্বিতীয় আরেকটি ঘাঁটি অঞ্চল গড়ে তুললেন রেড রিভারের বদ্বীপ এলাকায়, তান হোয়া, নে আন ও হা তিন প্রদেশ নিয়ে। সমুদ্রের কাছে থাকায় এই এলাকাটিও ছিল অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। এই সময় গিয়াপের নিয়মিত সৈন্যদের সংখ্যা ছিল ৩০ হাজারের মত। তাদের জন্যে যে সব অস্ত্রশস্ত্রের প্রয়োজন হত, তা আমদানী করা হত আশেপাশের দেশ থেকে ঐ সমুদ্রপথ দিয়ে।

এইভাবে উত্তরে ও দক্ষিণে ভিয়েৎমিন প্রস্তুতি যখন সাঁড়াশীর চাপ সৃষ্টি করে

যেখানেই যান
সকলেরই মুখে বাটা
স্যানডাকের সুখ্যাতি
বাটা স্যানডাক পায়ে দেয়া মাত্রেই পাবেন নতুন ও পরিতৃপ্ত এক
অভিজ্ঞতা। এর গড়ন আর উপকরণ, নির্মাণ আর নকশা
সব কিছুতেই অনন্ত সজীবতা। তাই
যেখানেই জনপদ, দেখবেন স্যানডাক সকলের পুরোভাগে।
বাটার উন্নত বিশিষ্ট সংমিশ্রণ কেমিলনে তৈরি,
এতে জুতোর গড়ন আর উজ্জ্বলতা বরাবরই একরকম থাকে,
সব সময়েই মনে হয় যেন নতুন কেনা,
ধুলো-ময়লা-কাদায় একটুও মলিন হয় না।
সদ্য-কেনার উজ্জ্বলতা ফিরিয়ে আনতে মোটেই
ঝামেলা নেই, ভেজা কাপড়ের দু-এক ঝাপটা, ব্যস্‌,
ধুলো-কাদা, ময়লা দাগ নিমেষে উধাও।
নতুন যুগের এই নতুন জুতো আপনাদের সকলকে চমৎকার
মানাবে। আজই সপরিবারে আসুন বাটার দোকানে।
লীলা সাইজ ২ থেকে ৬
৯.৫০
রাজা সাইজ ৫ থেকে ৮ ৬.৯৫
৯ থেকে ১২ ৭.৯৫
Bata স্যানডাক
কেমিলন *
নতুন যুগের নতুন জুতো
* রেজিস্টার্ড ট্রেড মার্কস্‌
বাটা-অনুমোদিত-বিধিমতে
বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে প্রস্তুত
লীলা
সাইজ ১০ থেকে ১ ৭.৯৫

চলছিল, তখন লে ক্লার্ক ভাবছিলেন তিনি দেশটাকে বাগে আনতে পেরেছেন।

তাঁকে দক্ষিণ ভিয়েৎনামে চরে খাবার জন্যে সায়গনে বসিয়ে দিয়ে বৃটিশ সৈন্যরা ইতিমধ্যে প্রস্থান করেছিল এখন তিনি নিজের অবাধ ক্ষমতাকে ইচ্ছামত প্রয়োগ করবার জন্যে অগ্রসর হলেন।

স্বভাবতই ষোড়শ সমান্তরাল পর্যন্ত এসে থেমে থাকতে তিনি রাজী হলেন না। তিনি চাইলেন ফরাসী শাসন টং কিনেও সম্প্রসারিত হোক।

সেই সুযোগ এলো ১৯৪৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে যখন জাতীয়তাবাদী চীনও হো চি মিনের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতায় প্রবৃত্ত হল। ফ্রান্সের সঙ্গে এক বোঝা-পড়ার মাধ্যমে কুয়োমিন্টাংরা রাজী হল টং কিন থেকে সরে যেতে। তারা এই কথাও বলল যে, তাদের শূন্যস্থান ফরাসীরা পূরণ করতে পারে।

লে ক্লার্ক এর চাইতে ভালো কিছু আশা করতে পারতেন না। একটি ষড়-যন্ত্র তাঁকে সায়গনে গদিয়ান করেছিল, আর একটি ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে তিনি হ্যানয়ে অধিষ্ঠিত হবার স্বপ্ন দেখতে লাগলেন।

সঙ্গে সঙ্গে কয়েকটি জাহাজ বোঝাই করে তিনি একদল ফরাসী সৈন্য রওনা করে দিলেন। ৬ মার্চ তাদের নিয়ে জাহাজ নোঙর ফেলল হাইফং বন্দরে।

কিন্তু লে ক্লার্ক সেই মুহূর্তেই বুঝতে পারলেন যে, কাজটা যত সহজ হবে মনে করেছিলেন আসলে ততটা সহজ নয়। হাইফং ছিল ভিয়েৎমিনদের রেড রিভার বদ্বীপ ঘাঁটির একটা গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র। তাদের প্রস্তুতিও ছিল ব্যাপক। হাইফং দিয়েই প্রধানত অস্ত্রশস্ত্র ও গোলা-বারুদ আমদানী হ'ত বাইরে থেকে। তাই গেরিলাদের সম্বলও এখানে কিছু কম ছিল না।

তীরে তৈরি ছিল গেরিলারা। ফরাসী সৈন্যরা ডাঙায় ওঠবার জন্যে যেই জাহাজ ছেড়ে নামল, অমনি ভিয়েৎমিন কামান গর্জে উঠল একসঙ্গে।

এই আক্রমণের জন্যে ফরাসীরা প্রস্তুত ছিল না। থমকে দাঁড়াল যারা নামবার চেষ্টা করছিল। যারা নেমেছিল তাদের রক্তে রাঙা হয়ে গিয়েছিল দক্ষিণ চীন সমুদ্রের জল।

প্রথম বিহ্বলতাটুকু কেটে যাবার পর ফরাসীরাও আক্রমণ সুরু করেছিল জাহাজ থেকে। এদিকে তীর থেকেও গোলাবর্ষণের বিরাম নেই। দক্ষিণ চীন সমুদ্রের জল টাল-মাটাল। টাল-মাটাল বুঝি গেরিলাদের প্রতিরোধের সঙ্কল্পও। ওরা প্রাণপণে ফরাসী সৈন্যদের বাধা দিয়েছিল। নামতে দেয় নি যতক্ষণ সাধ্য ছিল। এবং সাধ্য তাদের ছিল বহুক্ষণ।

সেদিন ফরাসী সৈন্যরা শেষ পর্যন্ত হাইফংয়ের মাটিতে অবতরণ করেছিল ঠিকই, কিন্তু সেই অবতরণ ছিল বিভী-ষিকাময়। এবং ঐ অবতরণ একটুও দমন করতে পারে নি ভিয়েৎমিন প্রতিরোধের শক্তিকে। সঙ্গে সঙ্গে আরো সৈন্য এনেছিলেন লে ক্লার্ক, আরো অস্ত্রশস্ত্র, কিন্তু দশ দিন, পুরো দশ দিন তাদের আটকে থাকতে হয়েছিল হাইফংয়ে।

আটকে হয়ত থাকতে হত আরো বহুদিন যদি না বিপর্যস্ত ফরাসী কর্তৃ-পক্ষ দশ দিন পর যুদ্ধ-বিরতি ঘোষণা করতে এবং হো চি মিনের সরকারের সঙ্গে একটি চুক্তিতে আসতে রাজী হতেন।

এই চুক্তিতে ফরাসীদের পক্ষে স্বাক্ষর করেন, হাঁ সাঁতেনি এবং ভিয়েৎমিনদের পক্ষে হো চি মিন ও ভু হুয়ং কান। ফরাসী সরকার এর দ্বারা হো'র ডেমো-ক্র্যাটিক রিপাবলিককে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকার করে নিয়েছিলেন। পরি-বর্তে হো'ও রাজী হয়েছিলেন ইন্দোচীন ফেডারেশন ও ফরাসী ইউনিয়নের অংশ হিসেবে থাকতে। টং কিন, আন্নাম ও কোচিন চীন এই তিনটি অংশের একত্রী-করণ সম্পর্কে স্থির হয়েছিল যে, গণভোটের দ্বারা জনসাধারণের রায়েই তা নির্ধারিত হবে।

সেই সঙ্গে আরও ঠিক হয়েছিল যে, উত্তর ভিয়েৎনাম ও চীনের সীমান্ত বরাবর কয়েকটি নির্দিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটিতে ফরাসীদের মোতায়েন থাকতে দেওয়া হবে।

হো চি মিনের পক্ষে ফরাসীদের বিশ্বাস করে এই চুক্তি করা সঙ্গত হয়েছিল কি না তা নিয়ে প্রশ্নের অবকাশ থাকতে পারে। তবে চুক্তি যে তিনি করে-ছিলেন, এবং গণভোট সাপেক্ষে ফরাসী সৈন্যদের যে আবার টং কিনে প্রবেশ করতে দিয়েছিলেন, এ থেকেই সন্দেহবাতিক-গ্রস্ত পশ্চিমী রাষ্ট্রগোষ্ঠীর, বিশেষ করে আমেরিকার বোঝা উচিত যে কোন বিজাতীয় মতলব হো চি মিনের ছিল না।

বরং বদ মতলব ছিল ফরাসীদেরই। এই চুক্তি যে তারা নিজেদের কাজ গোছাবার জন্যেই করেছিল এবং হো চি মিনের বিশ্বাসের সুযোগ নিয়ে তলায় তলায় তাঁর সর্বনাশের জন্যে চেষ্টা করে যাওয়াই যে তাদের উদ্দেশ্য ছিল, সেটা কয়েক মাসের মধ্যেই স্পষ্ট হয়ে উঠল।

চুক্তির সর্ত ও সীমা লঙ্ঘন করে তারা একের পর এক গ্যারিসন পোস্টগুলি দখল করে নিতে লাগল। এলো সৈন্য, এলো রসদ অবারিত ধারায়। টং কিনে ফরাসী সামরিক শক্তি দ্রুত উদ্বেগজনক-ভাবে গড়ে উঠতে লাগল। উদ্বিগ্ন হলেন হো, চিন্তিত হলেন গিয়াপ। তাঁরা পারষ্কার বুঝতে পারলেন, তাঁদের দোদুল্যমানতার সুযোগ নিয়ে ফরাসীরা মতগুলি সম্ভব ঘাঁটি দখল করে টং কিনে ক্ষমতা দখলের জন্যে তৈরি হচ্ছে।

আরও একবার হো বিশ্বাসঘাতকতার শিকার হলেন।

এর পর আর এই চুক্তি মেনে চলার কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না। ফরাসীরা নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্যে এই চুক্তিকে ছোঁড়া কাগজে পরিণত করেছিল। সুতরাং নিজেদের নিরাপত্তার স্বার্থেই হো'র পক্ষে এই চুক্তি সম্পর্কে সতর্ক না হয়ে উপায় ছিল না। বিশ্বাসঘাতকের কথার ওপর আস্থা অব্যাহত রেখে দেশের স্বাধীনতাকে বিপন্ন হ'তে দেবার জন্যে নিশ্চয়ই তিনি এই সংগ্রাম গড়ে তোলেন নি।

ঘাঁটি দখলের ব্যাপার নিয়ে বিক্ষিপ্ত সংঘর্ষ আগেই সুরু হয়েছিল। এবার প্রত্যাঘাত পুরোদস্তুর আরম্ভ হয়ে গেল।

ফরাসীদের অনেকদিনের চেষ্টা ছিল হাইফং বন্দরের ওপর তাদের আধিপত্য কায়েম করার। কারণ এই বন্দর শুধু যোগাযোগের একটি প্রধান সূত্রই নয়, টং কিন ও আন্নামের প্রায় মাঝামাঝি হওয়ায় এখান থেকে ঐ দুটি এলাকায় প্রভুত্ব বিস্তার করা সহজ। নিঃসন্দেহে এই বন্দরটি হাতে ছিল বলেই ভিয়েৎ-মিনরা ঐ সময় ফরাসীদের ওপর এতটা প্রাধান্য বিস্তার করতে পেরেছিল।

অক্টোবরের মাঝামাঝি ফরাসী সৈন্যরা হাইফংয়ের কাস্টম্‌স দপ্তরটি দখল করে নিল। ফরাসীদের পক্ষে এটি ছিল মস্ত লাভ, কারণ কাস্টমসের ব্যাপারটা নিজে-দের হাতে চলে আসার পর ভিয়েৎমিনদের অস্ত্রশস্ত্র আমদানী নিয়ন্ত্রণ করতে কোন অসুবিধা ছিল না।

বিস্ফোরণ এলো সেই নিয়েই। ২০ নভেম্বর ১৯৪৬ সাল।

ছোট্ট একটি ডিঙ্গি নৌকা সেদিন ভিয়েৎমিনদের জন্যে কিছু অস্ত্র নিয়ে আসছিল বন্দরে। খবর পেয়েই কর্নেল দেবে. হাইফংয়ে ফরাসীদের ভারপ্রাপ্ত অফিসার, নির্দেশ দিলেন নৌকা আটক কর।

একটি টহলদার বোট সঙ্গে সঙ্গে রওনা হয়ে গেল ডিঙ্গির গতিরোধ করবার জন্যে।

গম্ভীর আওয়াজে জবাব এলো ডিঙ্গি থেকে।

"কর্নেল দেবে'র আদেশ, ডিঙ্গি থামাও, নইলে বিপদ হবে।" বোট থেকে চিৎকার করে জানালো ফরাসী সৈন্যরা।

এবার জবাব এলো পেছন থেকে, এবং এবারও গুলীর আওয়াজে। ফরাসীরা চকিতে পেছনের দিকে তাকিয়ে দেখল একদল ভিয়েৎমিন আঞ্চলিক সৈন্য দ্রুত এগিয়ে আসছে। প্রতিরোধের জন্যে তৈরি হবার আগেই তারা অতি সহজেই ধরা পড়ে গেল ঐ সৈন্যদের হাতে।

কিন্তু ব্যাপারটা সেইখানেই মেটে নি। কারণ কর্নেল দেবে মেটাবার জন্যে ইচ্ছুক ছিলেন না। দুরাত্মার যেমন ছলের অভাব হয় না, তেমনি তাঁরও সেদিন ছলের অভাব হয় নি। কয়েকজন ফরাসীর গ্রেপ্তারকে উপলক্ষ করে তিনি তাঁর সৈন্যদের নির্দেশ দিলেন ভিয়েৎমিনদের ওপর চালাও আক্রমণ আরম্ভ করার জন্যে।

হাইফংয়ের মানুষ এই ঔদ্ধত্য নীরবে মেনে নেয় নি সেদিন। ওরা বেরিয়ে এসেছিল হাজারে হাজারে। রাস্তার রাস্তায় ব্যারিকেড তৈরি করেছিল। সেই সব ব্যারিকেড পাহারা দেবার জন্যে ভিয়েৎমিন নিয়মিত সৈন্যরা দাঁড়িয়ে গেল মর্টার নিয়ে। গোলায় গোলায় ফরাসী বাহিনী নিদারুণভাবে জর্জরিত হল। রাস্তার পর রাস্তা যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হল। সাঁজোয়া গাড়ি নিয়ে আঘাত হানল ফরাসীরা। কিন্তু সাধারণ মানুষের মিলিত প্রতিরোধের সামনে ফরাসী সাঁজোয়া শক্তিও এতটুকু অগ্রসর হ'তে পারে নি।

সম্মুখ সমরে ব্যর্থ হয়ে কাপুরুষ দেবে তাই পেছনের দরজা দিয়ে শোধ নেবার চেষ্টা করেছিলেন। তিন দিন পর। ভিয়েৎনামীদের তিনি চরমপত্র দিয়ে বললেন তাদের হাইফং ছেড়ে চলে যেতে হবে। মেয়াদ মাত্র দু' ঘণ্টা। কিন্তু ঐ দু' ঘণ্টা সময় পার হ'তে দেবার মত ধৈর্য্যও দেবের ছিল না। তার আগেই ক্রুজার সুফ্রাঁ থেকে গোলাবর্ষণ আরম্ভ হয়ে গিয়েছিল শহরের ওপর। উন্মত্ত, অন্ধ গোলাবর্ষণ। যেন শহরের ভিয়েৎনামী অঞ্চলকে ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়াই কর্নেল দেবের উদ্দেশ্য।

অন্তত ৬ হাজার ভিয়েৎনামী এই অভাবিত আক্রমণে নিহত হয়েছিল। আহত হয়েছিল এর দ্বিগুণ।

কিন্তু তবু ভিয়েৎমিন বাহিনীকে তাদের জায়গা থেকে নড়ানো যায় নি একটুকু। হাইফং বিধ্বস্ত হয়েছিল তবু কর্নেল দেবের করায়ত্ত হয় নি সঙ্গে সঙ্গে। মৃতদেহ আর ধ্বংসস্তূপের ওপর দিয়ে ফরাসীরা যখন শহরের দখল নেবার জন্যে ঢুকছিল, তখন ঝাঁকে ঝাঁকে গুলী এসে তাদের জানিয়ে দিয়েছিল যে, প্রতিরোধ এখনও নিঃশেষ হয়ে যায় নি।

আরো পাঁচদিন ওরা লড়াই করেছিল হানাদারদের বিরুদ্ধে। পাঁচদিন পরে যখন আর সাধ্যে কুলালো না, তখন ওরা শহর থেকে সরে এলো, ছড়িয়ে পড়ল গ্রামাঞ্চলে

*

হাইফংয়ের সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে ফরাসীরা এবার নজর দিল হ্যানয়ের দিকে। ৬ মার্চের চুক্তির সুযোগে একদল ফরাসী সৈন্য আগেই হ্যানয়ে উপস্থিত হয়েছিল। ১৯ ডিসেম্বর তারা হো চি মিনকে জানালো, ভিয়েৎমিন সৈন্যদের নিরস্ত্র করতে হবে।

বোঝা গেল ওরা কি চায়।

"ভাই সব!" পরের দিন দেশবাসীর উদ্দেশে এক আবেদনে বলেছিলেন হো, "আমরা শান্তি চেয়েছিলাম, তাই ফরাসীদের কিছুটা সুবিধা দিতে কুণ্ঠিত হই নি। কিন্তু আমরা যতই সুবিধা দিয়েছি ওরা ততই পেয়ে বসেছে। ওরা এখন আবার আমাদের দেশ আক্রমণ করতে চায়!...

"কিন্তু আমরা তা হ'তে দেব না। ভাই সব, আপনারা জাগুন, উঠুন!...যাঁদের হাতে রাইফেল আছে তাঁরা রাইফেল ছুঁড়ুন। যাঁদের হাতে তরোয়াল আছে তাঁরা চালান তরোয়াল। আর যাঁদের এসব কিছুই নেই তাঁরা কোদাল, লাঠি যা পারেন তা নিয়েই হানাদারদের ঠেকান। দেশকে বাঁচান!"

বেলা এগারোটা নাগাদ তিনি কর্তব্য ঠিক করে ফেললেন। জাপানীরা এর আগে যেভাবে ফরাসী সৈন্যদের তাদের ব্যারাকে নিরস্ত্র করে বন্দী করেছিল, এবার তাঁদেরও তাই করতে হবে। ফরাসী বিষদাঁত সমূলে উৎপাটিত করতেই হবে।

খবর দিলেন গিয়াপকে। বললেন গিয়াপ যেন যতগুলি সম্ভব ইউনিটকে সজ্জিত করে শহরে হাজির রাখেন। সেই সঙ্গে স্থানীয় ফরাসীদের জানিয়ে দিলেন যে, ভিয়েৎমিন সরকার ফরাসীদের গতিবিধির ওপর নিয়ন্ত্রণ শিথিল করছেন। ফরাসী সৈন্যরা ইচ্ছা করলে ব্যারাক ছেড়ে শহরে অবাধে ঘুরে বেড়াতে পারে।

হো'র পরিকল্পনা ছিল এই রকম : নিয়ন্ত্রণ শিথিল করায় ফরাসীরা স্বভাবতই আমোদ-ফুর্তির জন্যে বাইরে বেরিয়ে আসবে। আর যারা ব্যারাকে থাকবে তারাও থাকবে ছুটির মুডে। সুতরাং ভিয়েৎমিনদের সুপরিকল্পিত আক্রমণ রোধ করার শক্তি তাদের থাকবে না।

বেলা দুটো নাগাদ গিয়াপ খবর দিলেন তাঁর প্রস্তুতি সম্পূর্ণ।

রাত তখন আটটা। ব্যারাকগুলিতে লোকজন বিশেষ ছিল না। যারা ছিল তারাও তখন খাওয়া-দাওয়ায় ব্যস্ত। ঐ সময় ভিয়েৎমিনরা অতর্কিতে তাদের আক্রমণ শুরু করল।

প্রথমে এক প্রচণ্ড বিস্ফোরণে উড়ে গেল পাওয়ার হাউস। ফরাসী হ্যানয় ডুবে গেল অন্ধকারে। তারপর একে একে বোমা ফাটল ফরাসী বাড়িগুলিতে, অনেকগুলি দখল করে নিল গেরিলারা। তার পর চড়াও হল ব্যারাকগুলিতে। প্রচণ্ড হাতাহাতি লড়াইয়ে বহু ফরাসী নিহত হল, আহত হল আরো অনেকে।

কিন্তু প্রত্যাঘাত আসতে বেশি দেরি হল না। কারণ শেষ মুহূর্তে একজন মীরজাফরের মারফৎ ফরাসী কর্তৃপক্ষ হো'র পরিকল্পনার কথা জানতে পেরেছিলেন। ভিয়েৎমিন বাহিনী যখন ব্যারাকগুলি আক্রমণ করছিল তখন যে সব ফরাসী সৈন্য বাইরে ছিল তারা খবর পেয়ে ফিরে আসছে।

পরাজয় চূড়ান্ত হবার আগেই তাই ফরাসীরা সামলে নিতে পেরেছিল। এবং তারপর যে পাল্টা আক্রমণ করেছিল তা ছিল হাইফংয়ের আক্রমণের মতই সমান উন্মত্ত। তাদের হাতে ছিল ট্যাঙ্ক, এবং ছিল বিমান। সেই আক্রমণের মুখে ভিয়েৎমিন বাহিনী বাধ্য হয়েছিল পিছু হটতে। তা সত্ত্বেও চূড়ান্তভাবে পশ্চাদপসরণ করার আগে আরেকবার রুখে দাঁড়িয়েছিল তারা। হ্যানয়ের চীনা এলাকায় ফরাসীদের অগ্রগতি কিছুদিন তারা ঠেকিয়ে রেখেছিল সেখানে। কিন্তু শেষ রক্ষা করতে পারে নি।

এই দ্বিতীয়বার হো চি মিনকে ফরাসীদের হাতে পরাজয় স্বীকার করতে হল।

কিন্তু এতে আশ্চর্যের কিছু ছিল না। কারণ ফরাসীদের হাতে ছিল আধুনিক, উন্নত এবং অপর্যাপ্ত অস্ত্রসম্ভার। আর ভিয়েৎমিনদের সম্বল তখনও ছিল সীমিত। সম্মুখ সমরে তাই তাদের পক্ষে পেরে ওঠা ছিল অসুবিধাজনক।

গেরিলা যুদ্ধের নীতিও, যতদূর-সম্ভব সামনা-সামনি লড়াই এড়িয়ে যাবারই পরামর্শ দেয়। কারণ এতে লোকক্ষয় প্রচুর, সুবিধা প্রায় কিছুই হয় না। হো চি মিনও এতদিন সম্মুখ যুদ্ধ এড়িয়েই এসেছিলেন। কিন্তু ফরাসীরা যখন হাইফং দখল করতে উদ্যত হল, তখন তিনি বাধা না দিয়ে পারেন নি। কেন না হাইফং ছিল তাদের যুদ্ধ-প্রচেষ্টার একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। তা ছাড়া, তিনি ভেবেছিলেন, টং কিনে ফরাসীরা তখনও স্থিতিশীল হ'তে পারে নি। সুতরাং এই মুহূর্তে আঘাত করলে তাদের পর্যুদস্ত করা সম্ভব। আর হ্যানয় ছিল ভিয়েৎমিনদের রাজধানী। তাকে রক্ষা করতে চাওয়ার একটা মনস্তাত্ত্বিক মূল্যও ছিল।

কিন্তু এখন বুঝতে পারলেন হো যে, শহর রক্ষার জন্যে শক্তিক্ষয় করে কোন

লাভ নেই। তাদের সম্বল সীমাবদ্ধ, কাজেই সেই সম্বলকে হিসেব করে খরচা করতে হবে। সেই সঙ্গে আরো অস্ত্রশস্ত্র জোগাড় করতে হবে, সৈন্যদের ট্রেনিং আরো নিখুঁত করতে হবে। এক কথায়, নিজেদের আরো ভালোভাবে সংগঠিত করতে হবে। এবং করতে হবে গ্রামাঞ্চলে। কারণ গ্রামাঞ্চলে ফরাসীদের প্রভাব প্রায় সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। অপরপক্ষে ভিয়েৎমিনদের সেখানে অবাধ রাজত্ব। গ্রামাঞ্চল যদি পুরোপুরি দখলে আনা যায় তাহলে শহরগুলি ফরাসীদের অধিকারে থাকলেও কোন ক্ষতি নেই।

"শিকড় যদি শক্ত না হয় তবে
গাছ বাঁচতে পারে না বেশিদিন;
দেশের মানুষ যদি ভিত্তি হয়
জয়ের সৌধ তবেই রচিত হ'তে পারে।"

হো এব সময় একটি কবিতায় লিখে-ছিলেন এই কথা। এখন তিনি সেই ভিত্তি রচনার কাজে আত্মনিয়োগ করলেন।

লোকজন ও দপ্তরগুলি গুটিয়ে নিয়ে ভিয়েৎমিনরা আবার ফিরে গেল উত্তর টং কিনের প্রত্যন্ত জঙ্গলে, পাহাড়ে, চুণা পাথরের গুহার অভ্যন্তরে।

১৯৪৭, ১৯৪৮ ও ১৯৪৯ এই তিন বছর ধরে চলল ভিয়েৎমিন শক্তিকে সঙ্ঘবদ্ধ ও স্থিতিশীল করার পন্থা। চলল গ্রামে গ্রামে নিজেদের দুর্ভেদ্য করে প্রতিষ্ঠিত কবাব নিরলস সাধনা।

*

ক্ষেত্র আগেই প্রস্তুত হয়েছিল, সুতবাং কাজ আবম্ভ করতে কোন অসুবিধাই হল না। ভিয়েৎমিনবা শুধু অস্ত্র আর সৈন্য সংগ্রহই করে নি, চাষের উন্নতির জন্যে হাতে-কলমে কাজ করেছিল মাঠে। জীর্ণ হযে পড়েছিল যেসব বাঁধ সেগুলি তারা সারিয়ে দিয়েছিল। বাতিল কবেছিল কুখ্যাত পোল ট্যাক্স, লাঘব করে-ছিল অন্যান্য করের বোঝা। মানুষকে বাঁচিযেছিল অনাহারের হাত থেকে, এমন কি তাদের জীবনের মানও উন্নত করতে পেরেছিল কিছুটা। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ওরা মানুষকে দিযেছিল গণতান্ত্রিক অধিকার। ১৯৪৬ সালের জানুয়ারীতে হো চি মিনের অস্থায়ী কোয়ালিশন সরকারকে স্থায়ী রূপ দেবার জন্যে জাতীয় পরিষদেব যে নির্বাচন হয়েছিল তাতে ভিয়েৎনামেব ইতিহাসে সেই প্রথম সাধারণ মানুষ ভোট দিয়েছিল। এ বড় কম কথা নয়।

শিক্ষার ক্ষেত্রে ভিয়েৎমিনদের সাফল্য ছিল এক কথায় চমকপ্রদ। ওদের অসুবিধা ছিল অনেক। তার ওপর যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত থাকতে হত প্রতি মুহূর্তে। তা সত্ত্বেও দু' বছরের মধ্যে প্রায় ৪০ লক্ষ মানুষকে ওরা শিখিয়েছিল লিখতে ও পড়তে। কোন কোন গ্রামে—এমন অনেক গ্রাম ছিল—অশিক্ষার 'অ' বলতে কিছু অবশিষ্ট ছিল না।

এখন সেই কাজকেই বৃহত্তর সাফল্যের দিকে নিয়ে যাবার জন্যে তৎপব হল তারা। ১৯৪৯ সাল নাগাদ সাক্ষরেব সংখ্যা গিয়ে পৌঁছল ৬৫ লক্ষে। এবং ঐ বছরই কৃষকদের দেওয়া হল জমির অস্থায়ী অধিকার। বহু শতাব্দীর শোষণ ও অত্যাচারের ইতিহাসের পর এই সংস্কার ভিয়েৎমিনদের সামনে জনপ্রিয়তার এক নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছিল।

হো চি মিনের নির্দেশ ছিল কড়া এবং স্পষ্ট। জমির বা ফসলের ক্ষতি হতে পারে কিংবা মানুষের ঘরবাড়ি ও বিষয়-সম্পত্তি নষ্ট হতে পাবে এমন কিছু করা চলবে না। সাধারণ মানুষ যা স্বেচ্ছায় বিক্রি করতে বা ধার দিতে রাজী হবে না তা কেনা বা ধার করা চলবে না। পাহাড়ী মানুষের সংস্কারে যাতে আঘাত না লাগে সেজন্যে কোন পাহাড়ীর বাড়িতে জ্যান্ত মুরগী নিয়ে যাওয়াও নিষিদ্ধ। নিষিদ্ধ কথা দিয়ে কথার খেলাপ করাও। মানুষের ধর্মে ও সামাজিক প্রথায় আঘাত দেওয়া তো একেবারেই বারণ ঃ যেমন, ঠাকুব বেদীর সামনে কেউ শোবে না, উনুনের ওপর পা তুলতে পারবে না, বাড়িতে গান-বাজনা করা চলবে না, ইত্যাদি। এমন কোন কথা বলা বা এমন কোন কাজ করা চলবে না যাতে লোকে মনে করে তাদের ঘৃণার বা অনুকম্পার চোখে দেখা হচ্ছে।

অপর পক্ষে মানুষের দৈনন্দিন কাজে-কর্মে, যেমন ফসল কাটায়, জ্বালানী কাঠ জোগাড় করে আনায়, জল তোলায়, সেলাইয়ের কাজে, সাহায্য করতে হবে। যাদের বাড়ি থেকে বাজার অনেক দূরের পথ যখনই সম্ভব তাদেব হয়ে কেনা-কাটা করে দিতে হবে। জাতীয় লিপির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে হবে লোকের, প্রাথমিক স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কে ওয়াকেবহাল কবে তুলতে হবে। ধীরে ধীরে, গভীর সহানুভূতির সঙ্গে সাধারণ মানুষেব মন থেকে কুসংস্কার দূর করার চেষ্টা করতে হবে। নিজেরা যে নির্ভুল, পরিশ্রমী ও শৃঙ্খলাপরায়ণ তা শুধু দেখালে চলবে না, সব সময় কাজে তার প্রমাণ দিতে হবে।

এই নির্দেশ থেকে একচুলও বিচ্যুত হবার উপায় ছিল না কারো। শৃঙ্খলা এবং নিয়ম অত্যন্ত কঠোরভাবে প্রয়োগ করা হত। এর মধ্যে যদি কেউ রেজি-মেণ্টেশানের গন্ধ পান তবে তিনি তা পেতে পারেন, কিন্তু ভিয়েৎমিনরা যে সংগ্রামে নেমেছিল তাতে কোন রকম শৈথিল্যের স্থান ছিল না। অতন্দ্র, নিরলস প্রয়াসই ছিল তাদের সাফল্যের মূলমন্ত্র।

এইভাবে জনপ্রিয়তার একটা দৃঢ় ভিত্তি স্থাপন করার পর হো চি মিন তাঁর সামরিক প্রয়াসকে সংহত করার দিকে নজর দিলেন এবং কঠিন পরিশ্রমের দ্বারা তিনি যে ব্যবস্থা গড়ে তুলেছিলেন তা-ই ভবিষ্যতে ভিয়েৎমিনদেব দুর্বার, দুর্মর ও অপ্রতি-রোধ্য করে তুলেছিল, ফরাসীর পর্যুদস্ত সাম্রাজ্যবাদেব ওপব বিপ্লবের বিজয়-বৈজয়ন্তী উড়িয়ে দিয়েছিল। ভিয়েৎমিন-দের উত্তরসাধক ভিয়েৎ কংরা প্রতিরোধের যে ভাস্বর, গৌরবময় ও বীরত্বপূর্ণ পরি-চয় দিনের পর দিন দিয়ে চলেছে, তার রহস্যের সূত্রও খুঁজতে হবে ঐ ব্যবস্থার মধ্যেই।

হো চি মিন প্রথমে চোদ্দটি সামরিক অঞ্চলে ভাগ করেছিলেন দেশটাকে এবং প্রত্যেক অঞ্চলের জন্যে একটি কমিটি, এক-জন কম্যাণ্ডার ও একজন রাজনৈতিক অফিসার নিয়োগ করেছিলেন। কিন্তু কর্তৃত্বকে আবো কেন্দ্রীভূত ও ব্যবস্থাকে আরো দৃঢ়নিবদ্ধ করার জন্যে কাঠামোয় কিছু পরিবর্তন করলেন।

এবার দেশ বিভক্ত হল ছ'টি আন্তঃ-অঞ্চল বা 'লিয়েন খু'-তেঃ উত্তর-পশ্চিম টং কিন, উত্তর-পূর্ব টং কিন, বেড রিভার বদ্বীপ, উত্তর আন্নাম (উয়ে শহরের উত্তরাঞ্চল), দক্ষিণ আন্নাম (উয়ে শহরের দক্ষিণাঞ্চল), ও কোচিন চীন।

প্রত্যেকটি 'লিয়েন খু'-র তত্ত্বাবধানের ভার দেওয়া হল একটি কমিটির ওপর। কমিটিগুলিতে যেমন সদর দপ্তরেব পাঠানো লোক থাকল তেমনি স্থানীয় লোকদেরও নেওয়া হল। এর দ্বারা কেন্দ্রের নির্দেশ ও স্থানীয় প্রয়োজনেব মধ্যে সমন্বয় সাধিত হল এবং এই লোকও নেওয়া হল যেমন সামরিক তেমনি রাজনৈতিক ক্যাডারের ভেতর থেকে। অর্থাৎ রাজনৈতিক ও সামরিক কম্যাণ্ডকে আগের মত আলাদা না রেখে একই কমিটির মধ্যে ঐক্যবদ্ধ কবা হল। গঠনমূলক কাজের পাশাপাশি সামবিক সংগঠনের কাজ চালিযে যাবার যে নীতি হো গ্রহণ করেছিলেন তার রূপায়ণের জন্যে এটা ছিল একান্ত আবশ্যক।

'লিয়েন খু'-র পববর্তী পর্যায়ে ছিল আন্তঃ-প্রদেশ বা 'লিয়েন তিন' এবং তার পর আন্তঃ-গ্রাম বা 'লিয়েন জা'। এগুলির পরিচালনার পদ্ধতিও ছিল 'লিয়েন খু'-র মতই।

একইভাবে সামরিক বাহিনীও বিভক্ত হল তিনটি অন্তর্খণ্ডিত পর্যায়ে। প্রথম পর্যায়ে থাকল নিয়মিত সৈন্য দল যারা উত্তর টং কিনের মূল ভিয়েৎমিন শিবির থেকে রাইফেল, কামান ছোড়া, হাতবোমা

ও বিস্ফোরকের ব্যবহার, নৈশ চলাফেরা, টহলদারী, অনুপ্রবেশের কৌশল, আক্রমণের কায়দা ইত্যাদি বিষয়ে কঠোর ট্রেনিং নিয়ে আসত।

দ্বিতীয় পর্যায়ে ছিল আঞ্চলিক সৈন্য যারা বিভিন্ন প্রদেশ থেকে সংগৃহীত হত এবং যাদের এক একটি বিশেষ আক্রমণের কাজে নিয়োগ করা হত। চলাফেরাকে সহজ এবং অপসারণকে দ্রুত করার জন্যে এরা সব সময়েই ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে থাকত। তবে অপরাপর দলের সঙ্গে যোগসূত্র কখনই হারাত না। তার ফলে যদি বৃহত্তর প্রতিরোধের দরকার হত তাহলে অল্প সময়ের মধ্যে তার আয়োজন করতে কোন অসুবিধা হত না।

তৃতীয় পর্যায়ে ছিল গ্রামরক্ষী বাহিনী, মিলিশিয়া। ভিয়েৎমিনদের চেষ্টায় গ্রাম মিলিশিয়া দ্রুত গড়ে উঠতে লাগল। ফরাসীরা কোন এলাকায় হানা দিতে এলে তাদের ঠেকানোর প্রাথমিক দায়িত্ব ছিল এদেরই ওপর। রাস্তা কেটে সৈন্য চলাচলে বাধা সৃষ্টি করত এরাই। এরাই 'বুবি ট্র্যাপ' পেতে রাখত। শত্রু সৈন্যের গতিবিধির ওপর নজর রাখা এবং সে সম্পর্কে খবরাখবর দেবারও দায়িত্ব ছিল এদের। অস্ত্রশস্ত্র ও মাল-মশলা লুকিয়ে রাখার জন্যে গ্রামে গ্রামে খুঁড়ত সুড়ঙ্গ, বানাতো বাঙ্কার। সুড়ঙ্গ খোঁড়ার রেওয়াজ ভিয়েৎনামে সেই সময়েই প্রথম দেখা দেয়। এইভাবে অনেক সুড়ঙ্গ ওরা খুঁড়েছিল। এগুলিই এখন ভিয়েৎ কংদের কাজে লাগছে। মাটির ওপর যখন ফরাসীরা দাপাদাপি করে বেড়াচ্ছিল তখন মাটির নিচে চলছিল ভিয়েৎমিনদের অলক্ষ্য যুদ্ধ প্রস্তুতি।

একদিকে যুদ্ধ প্রচেষ্টা যেমন বিস্তৃত হচ্ছিল মাটির নিচে, তেমনি অন্যদিকে শক্তি সঞ্চয় করছিল রাতের অন্ধকারে। প্রকৃতপক্ষে গোটা ব্যাপারটাই যেন ছিল অন্ধকারের অভিসার।

দিনের বেলা ফরাসীরা টহল দিত সড়কে সড়কে, নজর রাখত গ্রামে গ্রামে। ঐ সব সড়ক বরাবর এবং নৌবহ সমস্ত নদীর ধারে ধারে ওরা তৈরি করেছিল বহু ওয়াচ-টাওয়ার। দুর্গের মত করে গড়ে তুলেছিল সেগুলিকে। সে-সব টাওয়ারের মাথায় দাঁড়িয়ে বহু দূর পর্যন্ত গ্রামাঞ্চলের ওপর নজর রাখা চলত। ওরা দেখত, চারদিকে সব শান্ত। টোকা মাথায় ধানের খেতে কাজ করছে কৃষক। ধুলো পায়ে লোকেরা চলেছে হাটের পথে। জঙ্গলের মধ্যে শুধু পাখির কিচিরমিচির উচ্চকিত। সন্ধ্যায় ওরা ফিরে আসত শিবিরে, কিংবা শহর কাছে থাকলে শহরে।

অথচ প্রত্যেক দিন ভোরবেলায় ওদের শুনতে হত এখানে রাস্তা কাটা, ওখানে ব্রীজ উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, আবার কোথাও ওয়াচ-টাওয়ার বেদখল, অস্ত্রশস্ত্র লোপাট, এক গাদা মৃতদেহ এধার-ওধার ছড়িয়ে আছে।

ফরাসীদের দুর্বলতাই ছিল এখানে। দিনের বেলা ওদের টহল ছিল ব্যাপক ও বিস্তৃত। কিন্তু রাতকে ওরা ভয় করত। দেশের ভূগোলের সঙ্গে ওদের পরিচয় ছিল না অন্তরঙ্গ। তাছাড়া এই যুদ্ধও ছিল না মামুলী ধরণের। কোথায় কোন পথের বাঁকে জঙ্গলের আড়ালে গেরিলারা অপেক্ষা করছে কে জানে। সেক্ষেত্রে যত উন্নত অস্ত্রবলই থাকুক সুবিধে করে ওঠা কঠিন। তাই নিশ্চিত লোকক্ষয়ের দিকে তাদের আগ্রহ ছিল না।

অপরপক্ষে ভিয়েৎমিনদের শক্তির উৎসই ছিল রাতের অন্ধকার। সে সময় ওদের বাধা দেবার কেউ ছিল না। ওরা সেই সুযোগে চড়াও হত শত্রুর শিবিরে মালপত্র বয়ে নিয়ে যেত এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায়। এইভাবেই মূল দপ্তরের নির্দেশ পৌঁছনো হত এক ঘাঁটি থেকে অন্য ঘাঁটিতে। রেডিও সংযোগ অবশ্য ছিল. কিন্তু রাত্রিবেলা পায়ে হেঁটে দিনের বেলায় লুকিয়ে থেকেই প্রধানত কাজ করতে হত ভিয়েৎমিনদের। অসাধারণ ক্ষিপ্রতা ওরা অর্জন করেছিল এই কাজে। নিযুক্ত ছিল হাজার হাজার স্বেচ্ছাসেবক। 'রিলে' পদ্ধতিতে লোক-পরম্পরায় অল্প সময়ের মধ্যেই নির্দেশ বা সরবরাহ পৌঁছে যেত যথাস্থানে।

আর যদি দিনের বেলায় চলাফেরা কখনও দরকার হয়ে পড়ত তাহলেও ফরাসীদের পক্ষে তার সন্ধান পাওয়া সহজ ছিল না। কারণ ওরা আত্মগোপন বা ক্যামোফ্লেজের কৌশল আয়ত্ত করেছিল নিখুঁতভাবে। প্রত্যেক মানুষের পিঠে লাগানো থাকত একটা করে জাল। তার পেছনের লোকের অন্যতম কাজই ছিল গাছের ডাল ও লতাপাতা ছিঁড়ে ঐ জালে আটকে দেওয়া। কাজেই ক্যামোফ্লেজ নিখুঁত হল কিনা সেটা বোঝা যেত পরিষ্কার। শুধু তাই নয়। চারদিকের দৃশ্যপটের ওপরেও সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হত ওদের। দৃশ্যপট যেই বদলে যেত অমনি আগের ক্যামোফ্লেজ ফেলে দিয়ে দৃশ্যপটের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে নতুন লতা-পাতা লাগাতে হত সেখানে। সুতরাং ভুল ক্যামোফ্লেজের দরুণ ধরা পড়বার কোন উপায়ই ছিল না।

সেই সঙ্গে আরো নিখুঁত করে গড়ে তোলা হয়েছিল তথ্য সংগ্রহের ব্যবস্থাটিকে। কোন্ রাস্তায় কতজন ফরাসী পাহারা দিচ্ছে, কোন্ ওয়াচ-টাওয়ারের প্রতিরক্ষার অবস্থা কি রকম, কবে কখন কোথায় ফরাসী সৈন্যরা চড়াও হবে, ফরাসী সামরিক ও রাজনৈতিক চিন্তার ধারা কোন্‌দিকে বইছে, সে সব খবর সঙ্গে সঙ্গে ভিয়েৎমিন শিবিরে পৌঁছে যেত। অপরপক্ষে পশ্চিমী সামরিক পর্যবেক্ষকরাও স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন যে, ভিয়েৎমিন মহলের ছিঁটে-ফোঁটা খবরও ফরাসীরা পেত না। যেটুকু পেত তা-ও ছিল ভুল ও বিকৃত।

একবার শুধু ভিয়েৎনামের ফরাসী মহলই নন গোটা ফরাসী সরকার ভিয়েৎ-মিনদের এই নিখুঁত ব্যবস্থার কাছে বোকা বনেছিলেন।

১৯৪৯ সালের মে মাসে ফরাসী জেনারেল স্টাফের সর্বাধিনায়ক জেনারেল রেভার্সকে ভিয়েৎনামে পাঠানো হয়েছিল সেখানকার সামরিক পরিস্থিতি তদন্ত করে ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা সুপারিশ করে একটা রিপোর্ট দেবার জন্য। জেনারেল রেভার্স যে রিপোর্ট দিয়েছিলেন তা ছিল অত্যন্ত গোপন এবং একান্তভাবেই ফরাসী সরকারের উচ্চতম মহলের ব্যক্তিগত পাঠের জন্যে। অথচ সকলকে এবং সবচেয়ে বেশি জেনারেল রেভার্সকে অবাক করে দি। ভিয়েৎমিন বেতার থেকে তার সারাংশ প্রচার করা হয়েছিল।

এবং উদ্ভাবন করা হয়েছিল সরবরাহের একটি নিজস্ব সূত্র। ক্ষতিগ্রস্ত অস্ত্রশস্ত্র সারাবার জন্যে ওয়ার্কশপের একটা জাল ওরা তৈরি করে ফেলেছিল বিভিন্ন স্থানে। পাহাড়ের গুহায় গুহায় বসিয়েছিল ছোট ছোট কারখানা, সেখানে তৈরি হত সাবান, কাগজ, কাপড়। ফরাসীর দৃষ্টি সেখানে পৌঁছবার কোন উপায়ই ছিল না, ফরাসীর বোমা সেখানে ছিল নিতান্ত নিরুপায়।

*

এইভাবে ভিয়েৎমিনরা যখন নিজেদের সুপ্রতিষ্ঠিত করে তুলছিল, তখন ফরাসীরা উদ্ভট পরীক্ষা নিয়ে ব্যস্ত ছিল। তারা প্রাক্তন সম্রাট বাও দাইকে আবার ফিরিয়ে

য়ুরোপের বিদ্বৎ সভায় শিলালি

শিলালি (অশোক সেন) বার্লিনের ব্রেশট-আলোচনা সভায় যোগদান করার পর সেখানে আরো কিছুদিন রাষ্ট্রীয় অতিথি হিসেবে অবস্থান ও বিভিন্ন বিদ্বৎ সভায় যোগদান করেছিলেন বলে সংবাদ এসেছে। এখন তিনি লণ্ডনে, সেখানে গুণীজন সভায় নাট্যালোচনার পর আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে মস্কো রওনা হবেন।

প্রতিটি স্থানে তাঁকে নাটক ও সাহিত্যের অন্যান্য বিষয়ে লিখিত ভাষণ পড়তে হচ্ছে অথবা আলোচনা সভায় যোগ দিতে হচ্ছে। তাঁর কাজের চাপ বেশি হওয়ায় তিনি রঙ্গমঞ্চ—ওদেশে এবং এদেশের প্রকাশ কিছুদিন স্থগিত রাখতে বাধ্য হচ্ছেন। —সম্পাদিকা

এনে তাঁকে দিয়ে একটি পাল্টা ভিয়েৎনাম সরকার গঠনের তাল কষছিল।

বাও দাই, আমরা জানি, ১৯৪৫ সালে হো চি মিনের অনুকূলে ভিয়েৎনামের শাসন-গদী থেকে নেমে দাঁড়িয়েছিলেন। প্রতিদানে হো তাঁকে ভিয়েৎমিন সরকারের পরামর্শদাতার পদে নিযুক্ত করেছিলেন। ১৯৪৬ সালের মার্চ মাসে ঐ পদাধিকারী হিসেবেই বাও দাই হো'র প্রতিনিধি হয়ে গিয়েছিলেন চীনে। কিন্তু সেখান থেকে তিনি আর ফিরে আসেন নি।

ফরাসীরা যখন তাঁকে ব্যবহার করার কথা ভাবছিল তখন বাও দাই ছিলেন হংকংয়ে, মদির আলস্যে দিন কাটিয়ে নাইট ক্লাবে নাইট ক্লাবে ফূর্তি লুটে। ঐ মজা ছেড়ে তিনি প্রথমে দেশে ফিরতে চান নি। পরে ইন্দোচীনে ফরাসী হাই কমিশনার ম' বোলার-এর প্ররোচনায় এবং ১৯৪৭ সালের জুনে ফরাসীরা ভিয়েৎনামের স্বাধীনতা স্বীকার করে একটি চুক্তি করলে ও আগস্টে ফরাসী প্রধানমন্ত্রী আঁদ্রে মারি ঐ চুক্তি অনুমোদন করলে তিনি প্রলুব্ধ হলেন। ১৯৪৯ সালের ২১ মে ফরাসী জাতীয় পরিষদ কোচিন-চীনের ঔপনিবেশিক মর্যাদার অবসান ঘটিয়ে বাকী ভিয়েৎনামের সঙ্গে যুক্ত করল।

১৪ জুন সায়গনে এক অনুষ্ঠানে বাও দাই নতুন হাই কমিশনার লেয়' পিনোঁর কাছ থেকে দায়িত্ব বুঝে নিয়ে ভিয়েৎনামের স্ব-কল্পিত অধিপতি হিসেবে অধিষ্ঠিত হলেন।

ফরাসীদের বিপর্যয় আরো এক ধাপ ত্বরান্বিত হল।

কারণ বাও দাই লোকটি শুধু অপদার্থ ছিলেন তাই নয়, তিনি ছিলেন হাড়ে হাড়ে চরিত্রহীন এবং সেই কারণে ভিয়েৎনামের মানুষের কাছে ছিলেন গভীর অশ্রদ্ধা ও অবজ্ঞার পাত্র। ১৯৩২ সালে ফরাসীদের হাতের পুতুল হিসেবে তিনি আন্নামের সিংহাসনে আরোহণ করেছিলেন। তার পর থেকে মদ আর মেয়েমানুষ ছাড়া আর কিছুর চর্চা করেন নি। দালাতের শৈল শিখরে একটি কুঞ্জবন তাঁর ছিল। যতদিন রাজত্ব করেছিলেন রাজকার্য ছেড়ে সেখানেই পড়ে থাকতেন বেশির ভাগ সময়। স্বজন-পোষণ, দুর্নীতি, মোসাহেবী, মুনাফাবাজী এসব ছিল তাঁর রাজত্বের একমাত্র বৈশিষ্ট্য, প্রধান ভূষণ। দুর্বৃত্তেরা প্রকাশ্যে ও বিনা বাধায় হামলা করে বেড়াতো। অত্যাচারী জমিদারেরা এক একটি বিকল্প সরকার হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেছিল। আইন ছিল না, শাসন ছিল না, শৃঙ্খলা ছিল না, শুধু ছিল শোষণ।

এর প্রতিকার করা দূরে থাক, বাও দাই নিজেই এর মধ্যে জড়িয়ে পড়েছিলেন। তাঁর প্রধান সাকরেদ ও পরামর্শদাতা ছিল লে ভান ভিয়েন (বে ভিয়েন) নামে কুখ্যাত বিন জুয়েন গুণ্ডা দলের কুখ্যাততর সর্দার। সায়গনের চীনা এলাকা চোলোন-এ বে ভিয়েনের একটি জুয়ার আড্ডা ছিল, ঐ আড্ডার মুনাফা সে ভাগ করে নিত বাও দাই'র সঙ্গে।

এইরকম একজন নীতিভ্রষ্ট লোককে ফরাসীরা এখন দাঁড় করাতে চাইল এমন একজন নেতার বিরুদ্ধে যার ব্যক্তিগত আচরণ সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীর মত, কলঙ্ক যার চরিত্রে কোনদিন বিন্দুমাত্র ছাপ ফেলতে পারে নি, দুর্নীতির অপবাদ যাকে অতি বড় শত্রুও কোনদিন দিতে পারে নি।

অন্ধকার আর আলোর তফাতের এই দুজনের মধ্যে পার্থক্যটা পাশাপাশি থাকায় লোকের চোখে এত স্পষ্টভাবে ধরা দিল যে ভুল করার আর কোন উপায়ই রইল না।

সুতরাং ঐ পরীক্ষা সফল হবার কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না। বাও দাই'র সাধ্য কি হো চি মিনের স্থান অধিকার করে?

তার প্রমাণ পাওয়া গেল পরের বছর ১৯৫০ সালে, যখন তিন বছর ধরে নিজেদের শক্তিশালী করে তোলার পর ভিয়েৎমিনরা ফরাসীদের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক অভিযানে ঝাঁপিয়ে পড়ল। (ক্রমশঃ)

শক্তি শ্রী—

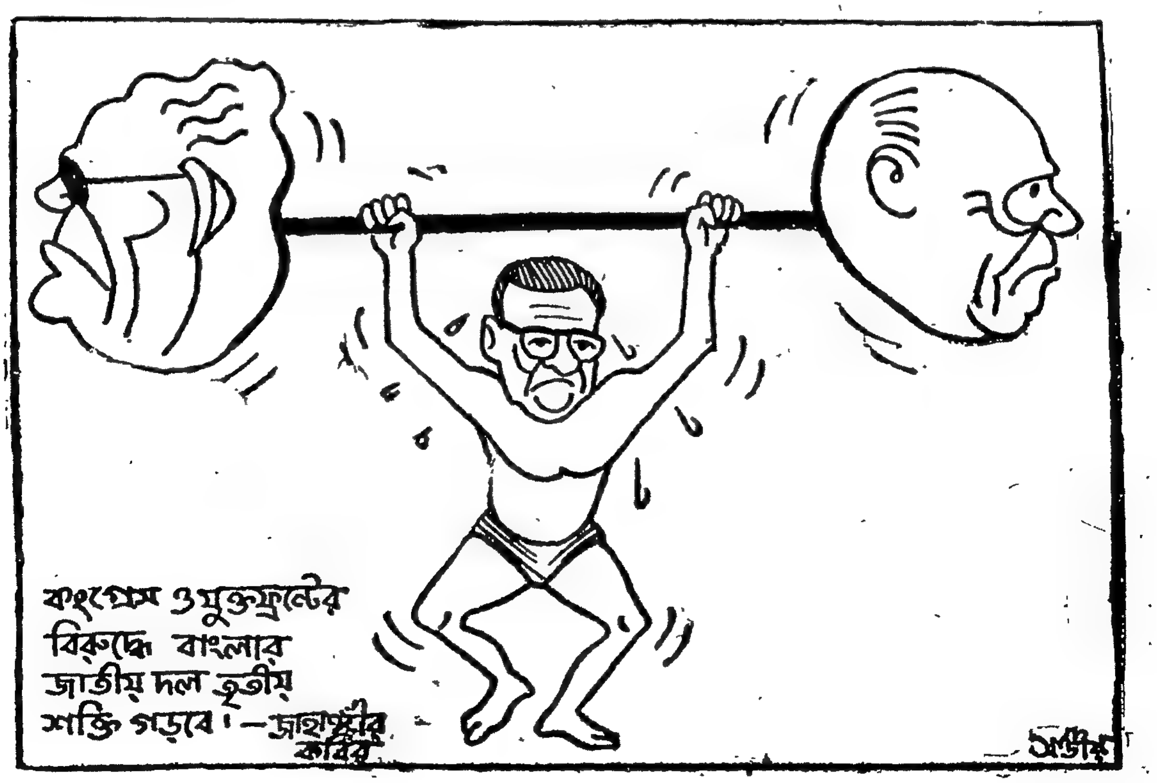

আবুল কাশেম ফজলুল হক

শ্রীশশাঙ্কশেখর সান্যাল

পূর্ব পাকিস্তান—ঢাকা। শের-এ-বাংগাল, ব্যক্তিত্ব মোড়া দীর্ঘদেহ অন্তিম শয্যা বিছিয়ে আখেরের মুখোমুখি, সম্বিতে আধা সম্বিতে সময়ে কথা কইছেন—কখনো আল্লার পানে চেয়ে, কখনো যেন ফেলে আসা জীবনের পাতা উল্টিয়ে। চকিতে বলে উঠলেন "বদরুদ্দোজা বাংলা দেশ কি ফজলুল হককে মনে করে? বাঙালী কি আমার কথা বলে? শশাঙ্করা আমাকে ভুলে যায় নি?"

আমার বাড়ির ছোট্ট মজলিসে পুরাতন প্রসংগে হক সাহেবের মানসদুলাল সৈয়দ বদরুদ্দোজা তাঁর নিজস্ব ভংগিমায় দরদী হৃদয় উপছে এই সব ছবি এঁকে চলেছেন। শ্রোতা আমার ছেলে-মেয়েরা—আমি একটু-আধটু খেই টেনে দিচ্ছি মাত্র। সৈয়দ সাহেবের মন মজানো ও প্রাণ মাতানো খোলা মঞ্চের ভাষণ যাঁরা শুনেছেন এবং শুনে মুগ্ধ ও অভিভূত হয়েছেন তাঁদের অনেকেই হয়ত জানেন না গৃহকোণে ক্ষুদ্র বৈঠকে তাঁর স্বচ্ছ ও নির্ভুল স্মৃতি-নির্ভর কথোপকথন কত উপাদেয় হৃদয়গ্রাহী—যেন মহাকাব্যের অন্তরালে সূক্ষ্ম গীতিস্নিগ্ধ ঝরনা।

পুণ্যে বিশাল জেলা বরিশাল অনেক পুণ্যশ্লোক কীর্তিমানের জন্মভূমি। আবুল কাশেম ফজলুল হক তাঁদের অন্যতম। পাঠানের বিলম্বিত দেহ, জননীর নিবিড় অন্তর, সেবকের আনুগত্য প্রেরণা, সহজাত নেতৃত্বের অফুরন্ত উৎস, নিষ্কলঙ্ক চরিত্র, নির্ভীক চিত্ত অনন্য মেধা—এই সব এবং আরো অনেক বৈচিত্র্য বৈশিষ্ট্য মাধুর্যের অধিকারী হক সাহেব দীর্ঘ পাঁচ দশক ধরে বাংলা দেশের ভাঙাপথের রাস্তা ধুলোয় যে সন্দেহাতীত পদচিহ্ন রেখেছিলেন তার স্বীকৃতি ও মূল্যায়ন বিস্মৃতির পথে। একদা কলকাতার আত্মপ্রতিষ্ঠিত মেয়র—তাঁর নামে কোন সরণি বা ভবন পরিচয় পায় নি। গোল টেবিল সদস্য এবং পরে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন পর্যায়ে বাংলা দেশের প্রথম মুখ্যমন্ত্রী (তথা শিক্ষামন্ত্রী) ফজলুল হকের স্মৃতিধারক বা স্বীকৃতিবাহক কোন বিদ্যামন্দির বা ছাত্রবৃত্তিও প্রচলিত হয় নি। রাজনীতির জীবনে সুরুতে কংগ্রেসী, পরে কৃষক প্রজা পার্টির জনক ও হোতা। আরো পরে বাংলা দেশে মুসলিম লীগ বিষবৃক্ষ রোপণ করে সেই বৃক্ষ জাতির বৃহত্তর স্বার্থে স্বহস্তে ছেদনে উৎসাহী ও প্রয়াসী, আরো পরে দেশ বিভাগে পাকিস্তান সৃষ্টি সম্বন্ধে সুস্পষ্ট বিরূপ চিন্তাশ্রয়ী ফজলুল হকের প্রতি মর্যাদা জ্ঞাপনে তাঁর মৃত্যু অন্তে বাংলা দেশ শোক নিদর্শনে কোন উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠান পালন করে নি। বিধানসভার সদস্যগণ কর্তৃক শোক সংজ্ঞাপক দুই মিনিটকাল দণ্ডায়মান—এর একমাত্র ক্ষুদ্র বা বৃহৎ ব্যতিক্রম। সরকারী বা বেসরকারী প্রতিষ্ঠান দুই ঘণ্টা ছুটি পায় নি। তাঁর জন্ম-মৃত্যুবার্ষিকী ধরে কোন প্রশস্তি সভাও হয় নি। মহাজাতি সদনে বৃহৎ পরিসর দেওয়ালে আজও তাঁর প্রতিকৃতির জন্য স্থান নির্ধারণ নেই। তাঁর মূল্যবান জীবনের স্মরণীয় ও উল্লেখযোগ্য ঘটনা সংকলনেরও কোন চেষ্টা হয় নি।

স্টেটসম্যান কাগজের সম্পাদকীয় শোক নিবন্ধে এবং পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভার স্পীকার শ্রীযুক্ত কেশব বসুর শোকবার্তায় বলা হয়েছিল, "ফজলুল হক ছিলেন বদান্য এবং বদান্যতা দোষে দুষ্ট।" হিন্দু বিধবার কন্যাদায় মুক্তির জন্য যে মুসলমান (তিনি যতই সৎ ও হৃদয়বান হোন না কেন) কাবুলিওয়ালার কাছে উচ্চ হারে সুদের কড়ারে টাকা কর্জ করতে পারেন বদান্য হলেও নিশ্চয়ই তিনি অপরাধী। কম পক্ষে তিনি সাধারণ ব্যাকরণে নিজের ও নিজের পরিবারের কাছে অপরাধী। কিন্তু এই অপরাধ শ্রেষ্ঠ মানবের ভালের তিলক। বিশ্বসমাজে ভিন্ন ভিন্ন ধর্মের প্রাণ ও রূপ প্রতিষ্ঠা যাঁরা করেছেন তাঁরাই এই অপরাধে অপরাধী। "ধনানি জীবিতংচৈব পরার্থে প্রাজ্ঞ উৎসৃজেৎ"—এই তাঁর জীবনযজ্ঞের পত্র ও পতাকা। অভিজাত বংশোদ্ভূত হয়েও তিনি সর্বতোভাবে আভিজাত্যবিহীন ছিলেন। জনতার নেতা এটা তাঁর আংশিক রূপ মাত্র—সামগ্রিক পরিচয়ে তিনি ছিলেন জনতার অবিচ্ছেদ্য অংশ। তাঁর বাল্যবন্ধু ভীম হালদার আমরণ সহচর। তাঁর চেয়ে অন্তরঙ্গ সুহৃদ হক সাহেবের আর কেউ ছিলেন না। হক সাহেবও তাঁর একাত্ম প্রাণ। দরিদ্র ভীম, কৃষক ভীম, মূর্খ ভীম, সমাজের পিছনের সারির ভীম ফজলুল হকের কৃষ্টিপুষ্ট জীবন-পুঁথির অবিচ্ছেদ্য আবরণ ও প্রচ্ছদ। অনগ্রসর মুসলমান সমাজের অবিসম্বাদী নেতা ফজলুল হক নিজেকে বলতেন সার্কাস দলের রিং মাস্টার। সাম্প্রদায়িক আবেদন ও অবদানে নাচতেন ও নাচাতেন; কিন্তু এর সুরু ও শেষ আনুষ্ঠানিক মঞ্চে সীমাবদ্ধ। বাকিটা তাঁর প্রশস্ত হৃদয়ের বিরাট হলঘর সকলের আসনের জন্য উদার উন্মুক্ত। সাময়িক তিক্ততা ও তীব্রতার পর বিরক্তি নিয়ে তাঁর হৃদয়ে আতিথ্যে প্রবেশ করে দেখেছি অকুণ্ঠ নিরপেক্ষতা ও প্রশান্ত একাত্ম ভাব। তিনি বলতেন—"আমাকে অভিনয় করতে হয়, অভিনীত চরিত্রের ওপর বিরূপ হই, কিন্তু অভিনেতাকে ঠেলে ফেলিস না" শিশুর সারল্য ও সন্ন্যাসীর অকপটতা—একটু আঁচড়ে দিলে এই তাঁর রূপ ও চরিত্র। বিশ্ববিদ্যালয়ের নামকরা মেধাবী ছাত্র আমার স্বর্গত পিতা প্রেসিডেন্সি কলেজে তাঁর সহপাঠী ছিলেন। আরো কেউ কেউ যেমন জাস্টিস চারু ঘোষ, স্যার পি সি মিত্র প্রমুখ। বাবার কাছে শুনেছি ফজলুলের যেমন অঙ্কে ব্যুৎপত্তি তেমনি ইংরাজীতেও অবিসম্বাদী উৎকর্ষ। বিধানসভায় ও রাজনীতিতে তাঁর সংস্পর্শে ও সংঘাতে এসে দেখেছি ইংরাজী ও বাংলায় যে কথাটা ব্যবহার দরকার সেটা কত অনায়াসে তাঁর জিহ্বায় ফুটে উঠত। যেন মা সরস্বতী স্বয়ং তাঁকে সরবরাহ দিচ্ছেন।

তখন তিনি বরিশালের উকিল। এমারসন সাহেব আই-সি-এস—জেলার শাসনকর্তা। বঙ্গভঙ্গ প্রতিরোধ আন্দোলনে বাংলা দেশ প্রাণচঞ্চল। সভা মিছিল নিয়মিত চলছে। এমারসন সাহেব হক সাহেবকে প্রশ্ন করেন—এ সবের পরিণতি কোথায়? হক সাহেব আত্মপ্রত্যয়ে জবাব দেন—"সময়ে বিধিব্যবস্থা না হলে পরিণতি শুভ নয়"। সাহেবও বক্র বিদ্রূপে বিষোদ্গার করে বলে উঠলেন—"আমরা দেড় শো বছর ধরে এখানে রাজত্ব করছি, কি করে রাজত্ব রাখতে হয় তা আমরা জানি"। নিমেষে অচঞ্চল মৃদু হাস্য ভেদ করে হক সাহেবের উত্তর—"আমরা মুসলমানরা সাড়ে সাতশো বছর রাজত্ব করে রাজত্ব হারিয়েছি এবং আমরা জানি রাজত্ব কি করে হারাতে হয়।"

সুচতুর ইংরেজ সুনিয়ন্ত্রিত নীতির পরিচালনায় মুসলমান সমাজের উচ্চশিক্ষিত যুবকদের জন্য আকর্ষণীয় চাকরীর বিস্তীর্ণ জাল ফেলেছেন। তবুও সহজলভ্য রোজগারী জীবনের মোহ কাটিয়ে ফজলুল হক সাধারণ মানুষের পাশে এসে দাঁড়ালেন। নিজেকে, এবং জনতাকে আশ্বাস দিলেন—ডুবি তো একসংগে ডুবব, যদি সাঁতরে উঠি, তাও একসংগে। আইন ব্যবসায়ে অনায়াসলব্ধ উচ্চ স্থান তাঁকে আটকে রাখে নি। জনতার বৃহত্তর আদালত তাঁকে টেনে পথে নামাল। শেষ পর্যন্ত স্বচ্ছলতা ও দারিদ্র্যের ঘাত-প্রতিঘাতে আলোছায়ায় উত্তীর্ণ হয়ে তিনি পথের পথিক হয়েছিলেন—পথভ্রষ্ট হন নি। ইংরাজী, বাংলা, হিন্দী, উর্দু, ফার্সি—এতগুলি ভাষায় সমান পারদর্শিতা নিয়ে হাজার হাজার শ্রোতাকে নাচাতে

কাঁদাতে হাসাতে ভাসাতে কজন পারেন জানি না। ফজলুল হককে দেখেছি এই ভূমিকায়। যেন কোন অশরীরী শক্তি তাঁকে আশ্রয় করে তাঁর রসনার মাধ্যমে রিলে করছে। নির্ভীক ফজলুলের আত্ম-প্রত্যয়-এর দুই-একটি ঘটনা :—হকসাহেব লীগ মন্ত্রী প্রধান। শরৎবাবুর নেতৃত্বে আমরা বিরোধী দলে। সুভাষ তখন বৃটিশের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী, এমন কি মহাত্মা গান্ধী অপেক্ষাও—অন্তত ইংল্যান্ডের হিসাবে তাই। যদিও ভারতবর্ষে তা নিয়ে অপ্রয়োজনীয় মতভেদ ছিল। সেই সময় সুভাষ রাজদ্রোহের অপরাধে বিচারাধীন আসামী। প্রাসঙ্গিক ব্যাপারে বিতর্ক-কালে, আমরা সুভাষের কথা তুলে নিজ নিজ ক্ষমতা ও এক্তিয়ার মত জ্বালাময়ী বাক্যবাণ ছুঁড়েছি। সরকারপক্ষও সেই বাক্যচ্ছটায় উত্তপ্ত উত্তেজিত এবং প্রতিশোধ-পরায়ণে আক্রমণোন্মুখী। বিতর্কের সমাপ্তির পর্যায়ে উঠলেন মুখ্যমন্ত্রী—জনাব ফজলুল হক। উন্নত বপু আরো উঁচু করে প্রশস্ত বক্ষ বিস্ফারিত। না জানি বাগ্দেবীর বরপুত্র আজ কি তীক্ষ্ণ বাক্যবাণে আমাদের যুক্তি তর্ক ভেদ করবেন। আমরা ধারাবাহিক বিরক্তিকর বাধা সৃষ্টির জন্য কূটকৌশল প্রয়োগে, প্রস্তুত হচ্ছি। স্বপ্নলোক থেকে অভাবনীয় সুর নেমে এল—"আমি কাহারো সহিত কলহ করিব না। আমি সেই মহান্ ব্যক্তিকে ভালবাসি এবং শ্রদ্ধা করি—সেই মহান্ ব্যক্তি ও নেতা যাঁর নাম শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু"। আমরা স্তম্ভিত। তৎকালীন বিরোধীপক্ষ এর চেয়ে বেশি পরাজয় বরণ করে নি। এই পরাজয় আমাদের সামগ্রিক গৌরব। ইংরেজ বেঞ্চে অস্বস্তির চাঞ্চল্য। নাজিমুদ্দিন ইত্যাদি সাথী মন্ত্রিবর্গ বিক্ষোভ বিস্ময়ে বিমূঢ়, সরকার-সমর্থক সদস্যরা কেউ তৃপ্তিতে, কেউ বেদনায় নির্বাক। মুখ্যসচেতক ফজলুর রহমান বিরক্ত-চঞ্চল হয়ে বদরুদ্দোজাকে বলেন—"আপনার নেতা এ কি করলেন?" চাপা আনন্দ আরো চেপে সৈয়দ সাহেব বলেন—"আপনারও তো নেতা"। এই নিয়ে অবশ্য কেউ তাঁকে ঘাঁটাতে সাহস করে নি—এমন কি ইংরেজরাও না।

আমাদের বাংলা কংগ্রেস ও কৃষক প্রজা পার্টি মিলে যে নতুন মিলিত মন্ত্রী হলো—তার প্রথম মূল্য শ্রীযুক্ত শরৎ বসু তিনি নির্বাসিত হলেন। এরপর একে একে আমরা ভারত ছাড়ো আন্দোলনে জেলে ঢুকেছি। মেদিনীপুরে সেনাবাহিনী কর্তৃক হিন্দুদের ওপর চরম নির্যাতন—পশুসুলভ। সেই পরিপ্রেক্ষিতে শ্রীযুক্ত কিরণশঙ্কর রায়ের নেতৃত্বাধীনে সরকারী কংগ্রেস কর্তৃক তদন্ত কমিশনের দাবিতে বিতর্ক উপস্থিত। এই বিতর্কের শেষে হকসাহেব নিজ দায়িত্বে তদন্ত কমিটি বসাতে রাজী হয়ে ঘোষণা করলেন। ইংরেজকুল অসন্তুষ্ট ও বিদ্রোহী। মুসলিম লীগ ক্রূরভাবে তামাসা উপভোগ করছে। গভর্নর স্যার জন হার্বার্ট একখানা জরুরী পত্র লিখে তাঁকে ডেকে পাঠালেন এবং কৈফিয়ৎ চাইলেন—কেন তিনি তাঁর সম্মতি ব্যতিরেকে এই তদন্তে রাজী হয়ে দায়িত্ব-জ্ঞানহীনতার কাজ করলেন। তৎক্ষণাৎ ইংরেজীতে উত্তর গেল—"স্যার জন, আমার দায়িত্ব আমার সভার কাছে—তোমার কাছে নয় এবং সেই দায়িত্ব আমি আমার জ্ঞান-বুদ্ধি মতে স্বাধীনভাবে পালন করেছি। তোমাকে কৈফিয়ৎ দিতে আমি বাধ্য নই। তোমাকে সতর্ক করতে চাই যেন ভবিষ্যতে তুমি মুখ্যমন্ত্রীকে এইরূপ বেয়াদপি পত্র না লেখ। আপাতত তোমার সঙ্গে দেখা করা অপ্রয়োজন।" অবশ্য এর ফলে কিছুদিন পরে তাঁকে মন্ত্রিত্ব হারাতে হয়েছিল। যেমন সাম্প্রতিক পশ্চিম বাংলার যুক্তফ্রন্ট সরকারের ভাগ্যে ঘটেছে।

এই সেই নির্ভীক নির্লোভ দেশব্রতী যাঁর হিন্দু-মুসলমান মৈত্রী প্রচেষ্টাকে অভিনন্দন জানিয়ে শ্রীসুভাষ পূর্বে এক প্রসঙ্গে স্বাগত করেছিলেন—"হকসাহেব আপনি যদি বাংলাদেশে হিন্দু-মুসলমানের জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন, তবে ইতিহাস আপনাকে অমর করে রাখবে। আপনার স্থান জিন্নার উচ্চে, এমন কি মহাত্মা গান্ধীরও উর্ধ্বে উঠবে।" হকসাহেব করেও ছিলেন তাই। কিন্তু শেষ রক্ষা হলো না। ভারতের তথা বাংলার দুর্ভাগ্য—ইতিহাসের বোঝা হয়ে থাকলো। কিন্তু এই দুর্ভাগা দেশের দুর্ভাগ্য যে ব্যক্তি রোধ করতে বীর বিক্রমে এগিয়ে এসেছিলেন, তাঁকে ভারত তথা পশ্চিমবাংলা ভুলতে বসেছে। দেশ বিভাগ ও পাকিস্তান সৃষ্টি—এতে তাঁর বিরূপ মত সক্রিয় ছিল না এবং এ সম্বন্ধে ও শরৎ বসুর সহায়তায় শেষ চেষ্টা করেছিলেন যাতে অঘটন না ঘটে। কিন্তু নিয়তি দুর্বার। সাম্প্রদায়িক উম্মাদনার চাপে সব ভেঙে গেল। ওপারের বলি আবুল কাশেম ফজলুল হক—আর এপারের বলি শরৎবাবু ও তাঁর অনুচর আমরা। তবু মাথা নিচু হয় নি।

ফজলুল হকের গণতান্ত্রিক চেতনার একটি নমুনা :—বহু বিতর্কিত মধ্যশিক্ষা বিল সাম্প্রদায়িকতা ও ধর্মান্ধতা ভারাক্রান্ত সমাজের প্রতিক্রিয়ায় নতুন শক্তি সঞ্চার করছে। আমরা বিরোধীপক্ষ—অবিভক্ত কংগ্রেস ও ভাঙা কৃষক-প্রজা পার্টি—প্রতিরোধে বদ্ধপরিকর। প্রস্তাবিত আইনের প্রতিটি দফা ও ছত্র সম্বন্ধে আমরা সংশোধন প্রস্তাব এনে বুদ্ধি ও বাক্যের দ্বারা অক্লান্ত আক্রমণ ও প্রতিরোধ চালিয়ে যাচ্ছি। আমাদের পিঠ দেওয়ালে ঠেকে গেল। দীর্ঘ দুই মাসের খণ্ড ও অখণ্ড যুদ্ধে আমরা পরাজিত ও পর্যুদস্ত। বিপুল ভোটাধিক্যে সরকারপক্ষের তুমুল হর্ষধ্বনির মধ্যে বিলের তৃতীয় পর্যায়ের পাঠ সমাপ্তি। এবার সামগ্রিকভাবে সভার অনুমোদন পেল। ইংরেজ সদস্যদের চাপা ক্রূর হাসি ও লীগমহলে উত্তাল পরিতৃপ্তি সমস্ত জাতির প্রতি আঘাতের ওপর অপমান। এবার প্রশাসনিক মঞ্জুরীসাপেক্ষ বিল আইনের আসনে বসবে। ফজলুল হক বিলের প্রণেতা ও বিলের প্রধান সমর্থক। প্রতিটি বিতর্কের মোকাবিলায় তাঁর দৃপ্ত বীর্য-মুখর বাণী—ক্ষুরধার ও দুর্বার। শেষ পরিণতি তাঁর নিজস্ব একান্ত ব্যক্তিগত জয়। কিন্তু তার চেয়ে বেশি বিজয়ী হলেন হকসাহেব—সংখ্যালঘুর প্রাণের বেদনার কাছে, সংখ্যালঘুর প্রাণের জাতীয় বেদনার কাছে উদার নতিস্বীকার করে বিল প্রত্যাহার করলেন। সেই সময় তিনি বলেছিলেন ভোটের সংখ্যাধিক্য সব গণতান্ত্রিক সরকারের গোড়ার কথা, কিন্তু সেটা শেষ কথা নয়। সংখ্যালঘুর মনে আশ্বাস সঞ্চার করতে না পারলে সে সরকার বৈধ হলেও অগণতান্ত্রিক ও স্বৈরাচারী।

তাঁর উদ্যোগে ও কৃষক-প্রজা পার্টির প্রেরণায় এবং কংগ্রেসের অকুণ্ঠ সমর্থনে আমাদের সেই আমলে বঙ্গীয় কৃষি ঋণ আইন ও মহাজনী আইন প্রবর্তন এবং সমবায় আইন পরিবর্তন—শ্রীফজলুল হকের সুবর্ণ কীর্তি। এর ফলে মরণোন্মুখ ঋণগ্রস্ত চাষী মজুর ও মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় বিনাশের হাত থেকে রক্ষা পেল। মৃত সমাজে নতুন প্রাণের সঞ্চার। ধৃষ্টতার আব্দার নিয়ে বলতে চাই যে একটা লোক বিপন্ন বাংলাদেশকে ধ্বংসের পঙ্ক থেকে দু' হাতে টেনে তুলে বুক দিয়ে রক্ষা করেছেন। বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইনের যে আমূল পরিবর্তন তাঁর নেতৃত্বে হয়েছিল তাকে বলা যেতে পারে জমিদারী বিলোপ সাধনের পূর্বগামিনী ছায়া।

পূর্ববঙ্গে কি হয়েছে জানি না। পশ্চিমবঙ্গে এঁর কোন জীবনী লেখা হয় নি—কোন প্রবন্ধও সম্ভবত প্রকাশ পায় নি। অথচ তাঁকে দেখেছেন, তাঁর মহিমা-দীপ্ত প্রতিভার সম্যক পরশ পেয়েছেন, তাঁর দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছেন—এমন লোক এখনও পশ্চিম বাংলায় আছেন। সরকারী উদ্যোগে—এই সব লোককে কাজে লাগিয়ে প্রামাণ্য পুস্তক রচনার অবকাশও একান্ত প্রয়োজন।

পটুয়াখালির ওয়াটার্লু বিজয়ী আবুল কাশেম ফজলুল হক পশ্চিম বাংলার ইতিহাসে উপেক্ষিত। তবে মহাজাতি ভবনের চিলেকোঠায় তাঁর স্থান অমর অব্যয় ও অম্লান ভাস্বর। ...

রাজনীতি ও ছাত্রসমাজ

প্রদ্যোৎকুমার রায়

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

॥ ৬ ॥

১৯২০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে কলকাতায় কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ প্রস্তাব গৃহীত হয়। কোর্ট কাছারী, কাউন্সিল, সরকারী ও সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুল-কলেজ এবং উপাধি প্রভৃতি বর্জনের মাধ্যমে অসহযোগ নীতি প্রয়োগ করতে বলা হয়। "১৫ বৎসর পূর্বে বাংলায় যাহা প্রাদেশিক আন্দোলনের আকারে পরিচালনা করা হইয়াছিল এবং যাহাকে তৎকালীন কংগ্রেস কর্তৃপক্ষ সহজে অনুমোদন করিতে চাহেন নাই তাহাই এইবার কংগ্রেসের প্রোগ্রাম হইয়া সর্বভারতীয় আকারে উপস্থিত হইল একথা বলিলে কিছুমাত্র অত্যুক্তি হইবে না।"১ স্বদেশী আন্দোলনের যুগে ছাত্র-সমাজের সাহায্যে নেতৃবৃন্দ আন্দোলন পরিচালনা করতে সক্ষম হয়েছিলেন। সকল কাজের বাহন ছিল—ছাত্রসমাজ। ১৯২১ সালের জানুয়ারী মাস থেকে কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ ছাত্রসমাজকে দেশের কাজে আহ্বান জানাতে থাকেন। সীতারামায়া জাতীয় কংগ্রেসের ইতিহাসে লিখছেন: "The fact was Mahatma Gandhi's appeal to the finer instincts of the youth of the country to devote themselves to its service and to shun the institutions which had been created and maintained to kill all manliness in them, was responded to with enthusiasm. * * * About the middle of January, on an appeal by Deshbandhu C. R. Das, thousands of students left their Colleges and examinations."২

অসহযোগ আন্দোলনের যুগে বাংলা দেশে কংগ্রেসের ধারক ও বাহক ছিলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ। অধ্যাপক বিনয় সরকার দেশবন্ধু প্রসঙ্গে লিখছেন, "Chittaranjan had behind him a full fifteen years' struggle for self-assertion on the part of Young Bengal (1905-1920). The 'ideas of 1905' had been associated in India with the loftiest Gospel of self-sacrifice and martyrdom, epoch-making ambitions and world-defying idealism. The subsequent speculations and energisings of Indian patriots both at home and abroad had established a steady and continuously growing tradition of political methods and ideals. A "Greater India" of modern culture and politics had also to a certain extent made its appearance in and through the active and first-hand affiliations of Indian thinkers and politicians with some of the most powerful currents of life and thought in Europe, America, Asia and Africa. A post-war phenomenon as Chittaranjan happens to be, he is necessarily a child of Young Bengal, the result of a spiritual evolution. * * * Chittaranjan * * * when he began (1920-21), had all the time to think of trying to be great enough for the standard already set by Young Bengal during 1905-10."৩

চিত্তরঞ্জনের ঐতিহ্যের কথা বলা হল। তিনি সর্বত্যাগী হয়ে দেশের কাজে আত্ম-নিয়োগ করলেন। পট্টভি সীতারামায়া

১ কংগ্রেস সংগঠনে বাংলা—চপলাকান্ত ভট্টাচার্য। পৃঃ ৩৪।

২ The History of the Indian National Congress—by B. Pattabhi Sitaramayya P. 335

৩ Political Philosophies Since 1905—By Prof. B. K. Sarkar, P. 335-336.

॥ প্রকাশিত হল ॥

রবীন্দ্রনাথ ও বৌদ্ধসংস্কৃতি

শ্রীসুধাংশুবিমল বড়ুয়া এম· এ·, ডি. ফিল,
অধ্যাপক, সুরেন্দ্রনাথ কলেজ, কলকাতা প্রণীত।

ভূমিকা লিখিয়াছেন সুখ্যাত পণ্ডিতপ্রবর অধ্যাপক প্রবোধচন্দ্র সেন। বইটিতে আলোচিত হইয়াছে: বাংলায় বৌদ্ধধর্মের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, রবীন্দ্রচেতনায় বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতির কালানুক্রমিক সংক্ষিপ্ত বিবরণ, রবীন্দ্রদৃষ্টিতে বুদ্ধদেব ও অশোক, রবীন্দ্রদৃষ্টিতে বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতি, রবীন্দ্রনাথের ধর্মাদর্শ ও বৌদ্ধধর্ম এবং রবীন্দ্রসাহিত্যে বুদ্ধপ্রসঙ্গ।

রবীন্দ্র অনুরাগী পাঠকের পক্ষে একটি অনন্য গ্রন্থ। লাইনো টাইপে ঝরঝরে ছাপা, চারটি আর্টপ্লেট, মনোরম প্রচ্ছদ, শোভন সংস্করণ।

মূল্য: দশ টাকা মাত্র

সাহিত্য সংসদ

৩২এ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড :: কলকাতা ৯

জাতীয় কংগ্রেসের ইতিহাসকে যতদূর সম্ভব বিকৃত করেছেন। দেশবন্ধুকেও রেহাই দেন নি। কিন্তু ইতিহাস কখনই একথা বিস্মৃত হবে না যে, ১৯২০-২১ সালে বাংলা দেশে অসহযোগ আন্দোলনের প্রধান পুরোহিত মহাত্মা গান্ধী নন, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন। মহাত্মাজীর কর্মপদ্ধতিকে বাংলা দেশের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ মেনে নিতে পারেন নি। অনেক ক্ষেত্রেই মহাত্মাজীর মতামতকে বাংলা দেশের মনীষীবৃন্দ ত্যাগ করাই কর্তব্য বলে বিবেচনা করেছেন। এই সময়কার বাংলা দেশের মানসিক অবস্থা সম্পর্কে অধ্যাপক বিনয় সরকারের নিম্নলিখিত বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য। "That Young Bengal of patriotism and self-sacrifice is the creation of Bipin Chandra Pal and Aurobindo Ghosh, especially of the former. In 1919-21 Gandhi could not contribute a single new item to the spirituality or religion of patriotism already engendered in the ideas of 1905. That is why Gandhism fell virtually flat upon the energists of Young Bengal, except to a certain extent upon those who happened to be some fifteen years too backward."৪

দোলে ফাল্গুন-চৈত্রব্যাপী
১৫% কমিশন
ডঃ রাধাগোবিন্দ নাথ-কৃত
শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত
ছ'খণ্ড। ৪র্থ সংস্করণ। ১২৫ স্থলে ১০৬.২৫
শ্রীচৈতন্যভাগবত
ছ'খণ্ড। প্রথম প্রকাশ। ৯৮ স্থলে ৮৩.৩০
মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ
৪০ স্থলে ৩৪.০০
রাজমোহন নাথ-কৃত
নাথপন্থের প্রাচীন পুঁথি ৬.৫০
RIGVEDA SUMMARY 8.00
KESHOBKANTO'S
MESSAGE OF THE GITA 12.00
সাধনা প্রকাশনী
৬১ সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীট: কলি৯
ফোন: ৩৪-৩১৬৬

অতএব দেশবন্ধুর পক্ষে অসহযোগ আন্দোলন পরিচালনা করা যে কী কঠিন ব্যাপার ছিল সেকথা সহজেই অনুমেয়। দেশবন্ধু একথা বুঝেছিলেন যে, প্রবীণ নেতৃবৃন্দের বাধা সত্ত্বেও এই আন্দোলনকে রূপ দিতে হলে তরুণদের সাহায্য ভিন্ন গত্যন্তর নেই। দেশবন্ধু একথা জানতেন যে, তাঁর আহ্বানে ছাত্রসমাজ কিছুতেই নীরব থাকতে পারবে না। অচিরেই বিডন স্কোয়ারে ও ওয়েলিংটন স্কোয়ারে দুইটি সভা আহূত হয়। আবেগভরে তিনি ছাত্রগণকে আহ্বান করে বলেন, "বাংলার তরুণগণ, তোমরাই তো দেশের একমাত্র আশা, তবে এখনও নিশ্চেষ্ট কেন? তোমরা যদি বাস্তবিকই মানুষ হও, যদি মনুষ্যের আত্মা তোমাদের হৃদয়ে থাকে, যদি মানুষের রক্ত তোমাদের ধমনীতে প্রবাহিত হয়, তবে স্বরাজ সংগ্রামে কেন তোমরা পরাঙ্মুখ? জানিও স্বরাজ লাভের ব্রতে যদি তোমরা প্রতিবন্ধক হও, যদি তোমাদের ঔদাসীন্যে আমরা স্বরাজ লাভে বঞ্চিত হই, তোমাদের এই কাপুরুষের বৃত্তি-কাহিনী ইতিহাসের পৃষ্ঠা কলঙ্কিত করিবে। আর তর্ক করিও না, মুক্তি চাও তো আর যুক্তি চাহিও না, ছাড়িয়া এস গোলামখানা, মুক্তির সন্ধানে অগ্রসর হও।"৫

দেশবন্ধুর এই আহ্বানের পর ছাত্রসমাজ নীরব থাকতে পারে নি। অসহযোগ আন্দোলনে তারা এগিয়ে এল। প্রথম যেদিন তারা কলেজ ছেড়ে বেরিয়ে এল—সেদিনকার ঘটনা একজন প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনা থেকে খুব সুন্দর জানা যায়। বর্ণনাটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৫ই জানুয়ারী তারিখের অমৃতবাজার পত্রিকায়। বর্ণনাটি নিম্নরূপ:—"ট্রামে করে এসপ্লানেড যাচ্ছিলাম। বন্দেমাতরম্ ধ্বনি শুনে ট্রাম থেকে শঙ্কর ঘোষ লেনের মুখে নেমে পড়লাম। শুনলাম বঙ্গবাসী কলেজের ছেলেরা কলেজ ছেড়ে বেরিয়ে রিপন কলেজে গিয়েছিল এবং ছাত্রদের ক্লাশ ছেড়ে বেরিয়ে আসতে বলেছিল। তারপর বঙ্গবাসী ও রিপন কলেজের ছেলেরা একত্র হয়ে সিটি কলেজে যায়। সিটি কলেজের জনৈক অধ্যাপক কলেজের সদর দরজা বন্ধ করে দিলেও বেশ কিছু ছাত্র বেরিয়ে আসে।

এরপর ছাত্রেরা বিদ্যাসাগর কলেজে এসে হাজির। 'বন্দেমাতরম্', 'গান্ধীজী কী জয়', 'হিন্দু-মুসলমান কী জয়' ইত্যাদি ধ্বনি শুনেই কৌতূহলী হয়ে আমি এখানে ট্রাম থেকে নেমে পড়ি। এবং ছাত্রদের সঙ্গ নিই। বিদ্যাসাগর কলেজের উপাধ্যক্ষ জে, আর, ব্যানার্জী মহাশয় ছাত্রদের কলেজের সামনে থেকে চলে যেতে বলেন। ছাত্ররা তাঁর আদেশ শিরোধার্য করে নিল। কিন্তু বিদ্যাসাগর কলেজের বেশ কিছু সংখ্যক ছাত্র ইতিমধ্যে বেরিয়ে এসে অন্যান্য ছাত্রদের সঙ্গে যোগ দিল। এই ছাত্রবাহিনী এরপর স্কটিশ চার্চ কলেজে যায়। ঐ কলেজের ডঃ জে, ডব্লিউ ওয়াট্স তাঁর ছাত্রদের বেরিয়ে আসতে নিষেধ করেন। স্কটিশের ছেলেরা ডঃ ওয়াট্সের আদেশ মেনে নিল। ছাত্রদল তখন চলল সেণ্ট্রাল কলেজে। সেণ্ট্রাল কলেজে দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্রদের তখন নির্বাচনী পরীক্ষা হচ্ছিল। বহিরাগত ছাত্ররা সেই জন্য কোনও গণ্ডগোল করে নি। সেণ্ট্রাল কলেজের প্রথম বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্রবৃন্দ বেরিয়ে এল এবং অপেক্ষমাণ ছাত্রবৃন্দের সঙ্গে যোগ দিল। তখন ছাত্রদের সংখ্যা প্রায় দু' হাজারে দাঁড়িয়েছে।

ছাত্র-মিছিলটি এবার আবার বিদ্যাসাগর কলেজে এল এবং 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি তুলতে লাগল। উপাধ্যক্ষ মহাশয় কলেজের সদর দরজা বন্ধ করে দিলেন এবং ছাত্রদের শান্তভাবে চলে যেতে বললেন। তিনি ছাত্রদের স্মরণ করিয়ে দিলেন যে, কলেজের সামনে হৈ-হট্টগোল করা বে-আইনী। ছাত্ররা তখন উপাধ্যক্ষের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে সিটি কলেজের দিকে অগ্রসর হল। এর পর আমি কলেজ স্কোয়ারে আসি। বহু ছাত্র ভিড় করেছে কলেজ স্কোয়ারে। তাদের মুখে শুনলাম, বাবু চিত্তরঞ্জন দাশের সভাপতিত্বে সেখানে ছাত্রদের একটি সভা হবে। বিকেল ৪টেয় শুনলাম ছাত্রদের ভিড় অত্যধিক হওয়ায় এই সভা হবে মির্জাপুর স্কোয়ারে। ছাত্ররা মির্জাপুর স্কোয়ারে চলল।

মির্জাপুর স্কোয়ারে ছাত্রদের এব বিরাট সভা হল। সভাপতি হলেন বাবু শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। কারণ বাবু চিত্তরঞ্জন দাশ সভায় উপস্থিত হতে একটু বিলম্ব করে ফেলেছিলেন।"

হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত লিখছেন, "আজ একটা অপূর্ব আশায় তাঁহার (দেশবন্ধুর) বক্ষস্থল স্ফীত, তাঁহার মুখ সহর্ষ, আজ স্বরাজ সংগ্রামে তাঁহার সৈন্যের অভাব দূর হইল। তিনি আস্তে আস্তে বলিতে লাগিলেন, 'আজ তোমাদিগকে আমার সঙ্গে পাইয়া আমি স্বরাজ লাভে নিঃসন্দেহ হইলাম। আজ আমি অনুভব করিতেছি যে, স্বরাজ লাভের উদ্দেশ্য সাধনে এই জীবনটা উৎসর্গ করিতেও আমার একটু

৪ Political Philosophies Since 1905—By Prof. B. K. Sarkar P. 369.

৫ দেশবন্ধু স্মৃতি—হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত। পৃঃ ১৮৮।

শরীর যদি ভাল থাকে তাহলে ভ্রমণের জন্য মানুষ আনন্দে মেতে ওঠে প্রকৃতির সৌন্দর্য উপভোগ করবার জন্য।

আপনিও স্বাস্থ্য ভাল রাখার জন্য সাধনার অব্যর্থ মহৌষধ প্রতিদিন আহারের পর দুইবার করে দু'চামচ মৃতসঞ্জীবনীর সঙ্গে চার চামচ মহাদ্রাক্ষারিষ্ট (৬ বৎসরের পুরাতন) খাবেন। এতে ক্লান্তি দূর করে, খিদে ও হজমশক্তি বাড়ে, সর্দি কাশি থেকে রেহাই পাবেন।

সাধনা ঔষধালয় ঢাকা

অধ্যক্ষ ডাঃ যোগেশ চন্দ্র ঘোষ, এম-এ; আয়ুর্বেদশাস্ত্রী, এফ,সি,এস, (লণ্ডন), এম,সি,এস, (আমেরিকা), ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক।

কলিকাতা কেন্দ্র ডাঃ নরেশ চন্দ্র ঘোষ, এম-বি, বি-এস, আয়ুর্বেদাচার্য্য।

৩৬, সাধনা ঔষধালয় রোড
সাধনা নগর. কলিকাতা ৪৮

দ্বিধাবোধ হইবে না।' অনেকে বলিলেন, 'আমাদিগের জন্য জাতীয় বিদ্যায়তন প্রতিষ্ঠা করুন।' তিনি উত্তর করিলেন—তোমাদের অনেক কাজ করিতে হইবে। গ্রামে গ্রামে স্বরাজের বার্তা বহন করিতে হইবে, পল্লীজীবন গঠনের কার্যে ব্রতী হইতে হইবে। তবে যাহারা বিদ্যায়তনে পড়িতে চাও, তাহাদের জন্য জাতীয় শ্রেষ্ঠ বিদ্যামন্দিরও প্রতিষ্ঠিত হইবে।"৬

১৬ই জানুয়ারী ১৯২১ সালের অমৃতবাজার পত্রিকায় ছাত্রদের দ্বিতীয় দিনের ধর্মঘটের পর মির্জাপুর স্কোয়ারে যে সভা হয় তার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। ঐ দিনের সভাপতি ছিলেন 'মুসলমান' পত্রিকার সম্পাদক মৌলবী মুজিবর রহমান। প্রায় আট হাজার ছাত্র এই দিনের সভায় যোগদান করে। চিত্তরঞ্জন দাশ ছাত্রদের বললেন যে, হুজুগে মেতে ইস্কুল-কলেজ ছেড়ে বেরিয়ে আসা এক কথা আর দেশমাতৃকার সেবায় পুরোপুরি আত্মনিয়োগের জন্য বেরিয়ে আসা অন্য কথা। তিনি বলেন যে বাংলা দেশের আশা-আকাঙ্ক্ষা সব কিছু তাদের উপর নির্ভর করছে। যেসব ছাত্র ইস্কুল-কলেজ ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে, তারা হৃদয়ের গভীরে এই বিশ্বাস নিয়ে এসেছে যে দেশের স্বাধীনতার পতাকা বহনের শক্তি তাদের আছে। ছাত্রদের উচিত দ্বিধা-দ্বন্দ্ব মুক্ত হয়ে, মুক্ত প্রাণে দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে এগিয়ে আসা। বক্তৃতার শেষে তিনি আবেদন জানান যে যেসব ছাত্র এখনও ইস্কুল-কলেজ ছেড়ে বেরিয়ে আসতে দ্বিধা করছে, তারা যেন অবিলম্বে চিরদিনের জন্য ঐসব প্রতিষ্ঠান ছেড়ে বেরিয়ে আসে। "* * * he appealed once more to those, who were still hesitating to come out and leave the University once for all* * *" এইদিন অমৃতবাজার যে সম্পাদকীয় প্রকাশ করেন তা নিঃসন্দেহে যুগান্তকারী। সম্পাদকীয় শিরোনামা হল "Education may wait but Swaraj cannot." এতে বলা হল যে, বর্তমানে ছাত্র-আন্দোলনের গতিপ্রকৃতি দেখে সকলেই গভীরভাবে অভিভূত হয়েছেন। প্রতিটি ধর্মঘটী ছাত্র দৃঢ় মনোবল নিয়ে আদর্শে আস্থা রেখে এগিয়ে এসেছে। ছাত্রদের মধ্যে কলেজ ছাড়ার জন্য যে খুব একটা প্রচার চালানো হয়েছে—একথা সত্য নয়। ছাত্ররা নেতৃবৃন্দের বক্তব্য শুনেছে তারপর গভীরভাবে চিন্তা করেই এই আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করতে এগিয়ে এসেছে। এই আন্দোলনের গতিপ্রকৃতি দেখে আমাদের এই কথাই মনে হয় যে বর্তমান তরুণ সমাজ স্বরাজ লাভের জন্য গভীর নিষ্ঠা নিয়েই নিজেদের স্বার্থকে সম্পূর্ণ জলাঞ্জলি দিয়ে অহিংস আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। জাতীয় মহাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হলে কলকাতার অন্যান্য কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয় অপেক্ষা উন্নততর শিক্ষাপ্রাপ্তি সম্ভব, এই মানসিকতা তাদের না থাকাই বাঞ্ছনীয়। তারা স্বাধীনতার সৈনিক এবং দেশের স্বাধীনতার জন্যই তারা লড়ছে—এই বিশ্বাস তাদের অবশ্যই থাকতে হবে। শিক্ষার জন্য অপেক্ষা করে থাকা সম্ভব, কিন্তু স্বরাজ অনতিবিলম্বেই পেতে হবে।

হেমেন্দ্রনাথ লিখছেন, "ক্রমে মফস্বলেও এই জাগরণের বন্যা প্রবাহিত হইল। ১৭ই তারিখে চারিদিকের পত্র, টেলিগ্রাম হইতে বুঝিতে পারা গেল যে ৩০ হাজার ছাত্র অসহযোগ করিয়াছে। ছাত্রগণের উদ্দীপনা, সংগীত ও জয়ধ্বনিতে বাংলা আলোড়িত হইল, সর্বত্রই বন্দেমাতরম্‌, উল্লাসতান ও চিত্তরঞ্জনের জয় বিঘোষিত হইল। প্রতি সন্ধ্যায় কলকাতার ছাত্রগণ মির্জাপুরে পার্কে সম্মিলিত হইয়া দেশবন্ধুর উপদেশানুযায়ী কার্য করিতে প্রবৃত্ত হইল।"৭

এই সময় বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন পরীক্ষা আরম্ভ হলে ছাত্ররা পরীক্ষার্থীদের বাধা দেয়। অনেক পরীক্ষার্থীই 'সত্যাগ্রহী' ছাত্রদের পদদলিত করে পরীক্ষা দিতে যায় নি। ৫৬০ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে মাত্র ১৭৮ জন পরীক্ষা দিয়েছিল। ২৪শে জানুয়ারী মহাত্মা গান্ধী, মৌলানা সৌকত আলী ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দসহ কলকাতায় আসেন। হাওড়া স্টেশনে ৫ হাজারের বেশি ছাত্র গান্ধীজীকে সম্বর্ধনা জানাবার জন্য উপস্থিত ছিল। গান্ধীজী চান নি যে, হাওড়া স্টেশনে তাঁকে নিয়ে হৈ চৈ করা হোক। কাজেই হাওড়ায় এসে তিনি বামবাজোতলার স্টেশনে নেমেছিলেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন বামবাজোতলায় উপস্থিত হয়ে নেতৃবৃন্দকে সম্বর্ধনা জানান ও তাঁদের নিজালয়ে নিয়ে যান। রবিবার দিন মির্জাপুর পার্কে দেশবন্ধু, গান্ধীজী ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দ ছাত্রদের নিকট বক্তৃতা করেন। দেশবন্ধু বললেন, "তোমাদের সম্মুখে বর্তমানে শুধু একটি মাত্রই কর্তব্য। তোমরা যারা কলেজ ছেড়ে বেরিয়ে এসেছ—তারা আর কলেজে ফিরে যেও না। কারণ তাতে শুধু বাংলা দেশের নয়, সমগ্র ভারতবর্ষেরই কলঙ্ক। এই আন্দোলনকে সার্থক করার দায়িত্ব তোমাদের—এ কথা আমি পূর্বেও বলেছি—এখনও বলছি। আমরা অসহযোগ নীতিতে বিশ্বাসী। আমরা চাই সরকারী ইস্কুল-কলেজ ও সরকারী অন্যান্য সংস্থা ভারতবাসী বর্জন করুক। এ-কথা কখনই বিশ্বাস কোর না যে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় একটি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়। এ সম্পর্কে কোনও যুক্তিতর্কের অবকাশ রেখ না। অধ্যাপকবৃন্দ ভারতীয় কী ইউরোপীয় তার উপর কোনও বিশ্ববিদ্যালয় স্বদেশীয়, কী বিদেশীয় তা নির্ভর করে না। সরকারী আমলাতন্ত্রের সম্পর্ক থেকে সম্পূর্ণ বিযুক্ত হলেই বর্তমানে তাকে মোটামুটি জাতীয় প্রতিষ্ঠান বলা চলতে পারে। বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয় তোমাদের ধ্বংসের দিকে নিয়ে চলেছে। কলকাতার কিছু কিছু কলেজ যেমন বিজ্ঞান কলেজ বা ঐ ধরণের অন্যান্য প্রতিষ্ঠানসমূহ ভারতীয়দের দ্বারা পরিচালিত হলেও আমি ঐ প্রতিষ্ঠানগুলিকে দেশীয় প্রতিষ্ঠান বলে মনে করি না। ঐ প্রতিষ্ঠানগুলো সবই আমলাতন্ত্রের সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যুক্ত। বাংলা দেশের তরুণগণ এই সব প্রতিষ্ঠান ত্যাগ করে যথার্থ কাজ করেছে। এবং এই বর্জননীতি চালিয়ে যেতে হবে। * * * এক বছর জাতির জীবনে মোটেই দীর্ঘ সময় নয়। এক বছর লেখাপড়া বন্ধ রেখে দেশের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করা কর্তব্য বলেই আমি বিবেচনা করি।"

২৫ তারিখের অমৃতবাজার পত্রিকায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর শ্রেণীর ছাত্রদের সম্পর্কে একটি সংবাদ বেরোল। শনিবার দিন সেনেট হলে স্নাতকোত্তর শ্রেণীর ও আইন কলেজের ছাত্রদের নিয়ে এক সভা হয়। উপস্থিতির সংখ্যা প্রায় ১৪০০ ছিল। এই সভায় উপস্থিত হবার জন্য ছাত্রদের কাছে যে আমন্ত্রণপত্র পাঠান হয়েছিল—তাতে কিন্তু আলোচনার বিষয় কিছু উল্লেখ করা ছিল না। তবে গোপনে বলা হয়েছিল যে, ছাত্রদের ইস্কুল-কলেজ বর্জননীতি সম্পর্কেই আলোচনা চলবে। ছাত্রদের ছোট ছোট দলে ভাগ করে অধ্যাপকেরা অসহযোগ আন্দোলনে ইস্কুল-কলেজ বর্জনের নীতির অসারত্ব সম্পর্কে বক্তৃতা করেন।

গৌরাঙ্গনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, সুরেন্দ্রনাথ সেন, নির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ ছাত্রদের বিশ্ববিদ্যালয় ত্যাগ না করতে উপদেশ দেন। আশুতোষ মুখোপাধ্যায় নিজেও ছাত্রদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রেখেছিলেন। স্যার আশুতোষ

৬ দেশবন্ধু স্মৃতি—হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত। পৃঃ ১১৮।

৭ দেশবন্ধু স্মৃতি—হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত।

ইংরেজীতে প্রায় দু' ঘণ্টা ছাত্রদের নিকট বক্তৃতা করেন। তিনি বলেন, ছাত্রসমাজ জাতীয় শিক্ষা চায় না। কারণ তিনি চেষ্টা করেও 'প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি' এবং 'দেশীয় ভাষা-সাহিত্যের' প্রতি ছাত্রদের যথাযথভাবে আকৃষ্ট করতে পারছেন না। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর সরকারী কর্তৃত্ব কোথায়, তাও তিনি বুঝে উঠতে পারছেন না। বিশ্ববিদ্যালয় নিজেই অধ্যাপকদের নিয়োগ করছেন, ছাত্রদের ভর্তি করছেন—এ সব ব্যাপারে সরকারের কিছুই করণীয় নেই। সরকারের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের যে নামমাত্র সম্পর্ক আছে, তা না রেখে উপায় নেই। কারণ সরকারের কাছ থেকে বিশ্ববিদ্যালয়কে আর্থিক সাহায্য নিতে হয়। বিশ্ববিদ্যালয়কে সরকারী আওতা থেকে মুক্ত করতে হলে তাকে আত্মনির্ভরশীল করতে হবে এবং তিনি তাই চান। সেই জন্যেই পরীক্ষার ফী বাড়াতেও তিনি প্রস্তুত। প্রয়োজনীয় অর্থ পাওয়া গেলে তিনি সরকারী সাহায্য ত্যাগ করারই পক্ষপাতী। বিশ্ববিদ্যালয়কে 'গোলামখানা' বলা হচ্ছে। স্যার আশুতোষ প্রশ্ন করেন যে, স্যার রমেশচন্দ্র—যিনি বাংলার গৌরব এবং যিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন স্নাতক—তিনি কি গোলাম? দেশের স্বাধীনতার জন্য উৎসর্গীকৃত প্রাণ আনন্দমোহন বসু—যিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক, তিনি কি একজন গোলাম? নবীনচন্দ্র সেন, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, স্যার গুরুদাস সকলেই এই বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক। এ'রা যদি গোলাম হন, স্যার আশুতোষ নিজেকেও গোলাম বলে আখ্যাত করতে গৌরব বোধ করেন। এবং তিনি আশা করেন—এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা সকলেই এই সব মহামনীষীর পদাঙ্ক অনুসরণ করবে। অমৃতবাজারের সংবাদদাতা লিখছেন যে, সিনেট হাউসের এই সভা শেষ হলে ছাত্রবৃন্দ 'বন্দেমাতরম্' ও 'গান্ধীজী কী জয়' প্রভৃতি ধ্বনি তুলতে থাকে। ঘটনাটি নিঃসন্দেহে উপভোগ্য।

মেডিকেল কলেজের ছাত্রদের উদ্দেশে দেশবন্ধু বলেন যে, দু-দশজন রোগীর সেবা নয়—সমস্ত দেশ জুড়ে যে অভাব, রোগ বিরাজ করছে—তা দূর করার প্রচেষ্টাই বর্তমানে ছাত্রদের মুখ্য উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। মাতৃভূমির পুনর্জাগরণের জন্য আত্মনিয়োগ কি বিরাট জনসমষ্টিকে সেবা করার পথ উন্মুক্ত করে দেবে না? তিনি বলেন, কলকাতা মেডিকেল কলেজ চিকিৎসা বিজ্ঞানে এমন কিছু উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে পারে নি। বিদেশী ধারার নকলনবিশী করে চলেছে কলকাতা মেডিকেল কলেজ। তিনি ছাত্রদের বলেন যে, বর্তমান পরিস্থিতিতে তাদের হয় সহযোগী, না হয় অসহযোগী হতে হবে। দু' নৌকায় পা রাখা সম্ভব নয়। তিনি তাদের একথাও স্মরণ করিয়ে দেন যে তাদের জন্য দেশের আহ্বান অপেক্ষা করে থাকবে না। কারণ তিনি জানেন যে, জনসাধারণ এই আন্দোলনের পক্ষে আছেন। এরপর যারা আন্দোলনের পক্ষে তাদের হাত তুলতে বলা হয়। অধিকাংশ শ্রোতাই হাত তোলে। আবার অসহযোগী বিরোধীদেরও হাত তুলতে বলা হল। কিন্তু শ্রোতাদের মধ্য থেকে কোনও সাড়া পাওয়া গেল না।

তিনি বলেন, স্যার গুরুদাস বা স্যার প্রফুল্লচন্দ্রের দোহাই দিয়ে অনেকে অনেক কথা বলছেন। গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বা প্রফুল্লচন্দ্র রায় দাস-মনোবৃত্তির মানুষ নন, এ কথা সকলেই জানেন। তাঁদের ব্যতিক্রম বলেই ধরে নিতে হবে। এ রকম দু-চারটি ব্যতিক্রম ছাড়া কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হবার পর থেকে আজ পর্যন্ত 'গোলাম তৈরির কারখানা' হিসাবে কাজ করে যাচ্ছে। তিনি ছাত্রদের নিকট আবেদন করেন যে, মুহূর্ত বিলম্ব না করে তারা যেন ইস্কুল-কলেজের শ্বাসরোধী আবহাওয়া থেকে বেরিয়ে আসে। এই সব প্রতিষ্ঠানগুলি তাদের বুদ্ধিবৃত্তিকে পঙ্গু করে দিচ্ছে। দাসত্ব মনোভাব সৃষ্টি করছে। কাজেই যত তাড়াতাড়ি তারা বেরিয়ে আসবে, তাদের পক্ষে ততই মঙ্গল। এরপর এই সভায় ষষ্ঠ বার্ষিক শ্রেণীর একজন মেডিকেল ছাত্র নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তটি গ্রহণের জন্য সভাকে অনুরোধ করে। দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীর একজন ছাত্র এই সিদ্ধান্তকে সমর্থন জানায়।

"Resolution :—It is resolved at this meeting of the medical students held in the Halliday Park that the students should forthwith withdraw from their colleges in response to the country's call."৮

বিপুল ভোটে এই সিদ্ধান্তটি গৃহীত হয়। এরপর ২৮শে জানুয়ারীর অমৃতবাজার পত্রিকার মাধ্যমে চিত্তরঞ্জন দাশ ছাত্রদের নিকট বিশেষ আবেদন জানান। এই আবেদনটি শুধুমাত্র অমৃতবাজার পত্রিকাতেই প্রকাশিত হয়েছিল। আমলাতন্ত্রকে পর্যুদস্ত করতে হলে সর্বপ্রকার অসহযোগ একান্ত বাঞ্ছনীয়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এই আমলাতন্ত্রকে শক্তিশালী করার কাজে নিয়োজিত। ছাত্রদের সর্বপ্রথম কর্তব্য হবে, দ্বিধাহীনভাবে বিভিন্ন ইস্কুল-কলেজ বর্জন করা। সে মেডিকেল কলেজই হোক বা ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজই হোক—সবই ত্যাগ করে চলে আসা উচিত। সমস্যাটি মূলত শিক্ষা সম্পর্কিত নয়। মূল কথা হল অসহযোগ আন্দোলনকে সার্থক করে তুলতে হবে। এই আন্দোলনকে সার্থক করে তোলাই যদি উদ্দেশ্য হয়—সে ক্ষেত্রে ছাত্রদের মধ্যে শ্রেণীবিভাগ হাস্যকর।

দেশবন্ধুর এই দীর্ঘ আবেদনটিতে তাঁর তৎকালীন মনোভাব স্পষ্ট। এই আবেদনটির অংশবিশেষ তুলে দিচ্ছিঃ

* * * Do not listen to those who make careful calculations and tell you that this movement is bound to fail. I warn you against such doubts and hesitations. Even if the students do not realise their rights and their duty, the work of Non-co-operation will go on. But I admit that you may make it more difficult by refusing to join us.

এই আবেদনের শেষে দীপ্তকণ্ঠে দেশবন্ধু ছাত্রসমাজকে জেগে উঠতে আহ্বান জানিয়ে বললেনঃ

"I repeat again—wake up, wake up, wake up. We have slept too long. Realise the sense of your bondage and and stand out boldly and firmly on the road to freedom."

৮ The Amrita Bazar Patrika—January 26th 1921.

কিস্তিবন্দীতে ট্রানজিস্টার

৩২০৲ টাকা মূল্যের বিশ্ব-বিখ্যাত "এসকর্ট" ৩ ব্যান্ড অল ওয়ার্ল্ড পোর্টেবল ট্রানজিস্টার মাসিক ১০৲ টাকার কিস্তিতে নিন।

আবেদন করুনঃ
Japan Agencies (B—10)
Post Box 1194, Delhi—6.

বিকেল না গড়াতেই বস্তীটায় আঁধার নেমে আসে। দিনের বেলাতেও আলো এখানে ঢুকতে পারে না বললেই চলে। বস্তীর ঘরগুলো এতই গায়ে গায়ে লাগানো যে সূর্যের আলো ঢুকবার পথ খুঁজে পায় না। শিরা-উপশিরার মতো বস্তীর ভেতর দিয়ে যে সর্পিল পথগুলো এঁকেবেঁকে গেছে তা এতোই অপ্রশস্ত যে পথের দুধারের ঘরগুলো চালে-চালে ছোঁওয়াছুঁয়ি করে আলোর সামান্যতম পথ-টুকুও রুদ্ধ করে রেখেছে। আলো নেই, বাতাস নেই, তবু মানুষের বসতি। আলো বোধ হয় বস্তীর প্রাণীগুলি চায়ও না। আঁধারে থাকতেই যেন ওরা ভালবাসে। সকালে ঘুম ভাঙতে না ভাঙতেই বস্তীর মানুষগুলো ছোটে কারখানায়। ওরা মজ-দুর। সারাদিন কাটে কারখানায়। ঘরে ফেরে সেই অনেক রাতে। বেহুঁস হয়ে। দিনের বেলায় ভাঙা হাটের মতো নীরব নিঝুম হয়ে পড়ে থাকে যে বস্তীটা, রাত বাড়তে না বাড়তেই কোন্ অদৃশ্য যাদু-মন্ত্রে বস্তীটা আবার মুখর হয়ে ওঠে। প্রাণ ফিরে পায়। যেন রাতের হাট। অশ্রাব্য গালিগালাজ, আর হট্টগোলে বস্তীটা যেন ক্ষণে ক্ষণে শিউরে ওঠে। অনেকের চোখ বাঁচিয়ে সন্তর্পণে কামুক লোকগুলোর চলে এ-ঘর থেকে ও-ঘরে আনাগোনা। বাইরের থেকেও রাতের মানুষগুলো গা ঢাকা দিয়ে আসে। রাতের আসর এক সময় স্তব্ধ হয়। কিন্তু তখন রাতের দ্বিপ্রহর বয়ে যেতে চলেছে। ক্লান্ত মানুষগুলো আর পারে না। অবসন্ন হয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। আবার সকাল হোতে না হোতেই কারখানার 'সিটি' বেজে উঠবে। ছুটতে হবে কারখানায়। দিনে বস্তীর মেয়েরা কেউ বা লাইনের ধারে কাজ করতে যায়। কেউ বা ছেলেপুলে নিয়ে ঘর আগলায়। কেউ বা গতরাত্রির ক্লান্তির কালিমা ঘোচাতে বেহুঁস হয়ে ঘুমায়।

জন্মান্তর

সুধীর কুমার সরকার

আবার তো রাতের আসর সাজাতে হবে। শরীরটা তো আর লোহার নয়। অসার দেহখানাকে একটু চাঙা না করে নিলে কি চলে!

সবে সন্ধ্যা গড়িয়েছে। বিমান এগিয়ে চলেছে বস্তীর সরু পথ দিয়ে। বস্তীর প্রাণকেন্দ্র এখনও চঞ্চল হয়ে ওঠে নি। এখনও আরো অনেক সময় বাকী। রাত গভীর হবে তবে তো। বিমান আজ অনেক সকাল সকাল ঘরে ফিরছে। এগিয়ে চলেছে আঁকাবাঁকা পথ ধরে। পা দুটো তার ভীষণভাবে টলছে। কোন রকমে টাল সামলিয়ে নিজের অসার দেহখানাকে টেনে নিয়ে চলেছে। ভেবেছিল, আজ ওসব ছাইপাঁশ গিলবে না। চেষ্টাও করেছিল। কিন্তু পারে নি। মনের ক্ষতস্থানটা ঘিন্-ঘিন্ করে উঠতেই আর নিজেকে ঠিক রাখতে পারে নি। পেট পুরে ওই ছাইপাঁশ গিলেছে। তবুও তো কিছুক্ষণের জন্য বিস্মৃতি।

বিমান এই বস্তীর নতুন অতিথি। দু' মাসও হয় নি এই বস্তীর বাসিন্দা হয়েছে। কারখানাতেই স্টোর-কীপারের নতুন কাজ নিয়ে এখানে এসেছে। কার-খানার আর এই বস্তীর লোকেরা বলে—নতুন গুদামবাবু।

বিমানকে কেন্দ্র করে বস্তীর মানুষ-দের কৌতূহলের শেষ নেই। কতো জল্পনা-কল্পনা আলোচনা। ছেলেটি কে, কোথা থেকে এলো, পরিচয় কি, ছেলেটির আর কে আছে—এমনিধারা কতো প্রশ্ন সকলের মনের কোণে উঁকিঝুঁকি দেয়। কিন্তু যাকে নিয়ে এতো আলোচনা, এতো কৌতূহল, সে কিন্তু নির্বিকার। কারো সাথে কথা বলে না। নিতান্ত কেউ কথা বলতে গেলে, দু'-চারটে কথা বলে। সবাইকে সে যেন এড়িয়ে চলতে চায়। কেউ তার সাথে বেশি কথা বলতে থাকলে, মুখে তার বিরক্তির রেখা ফুটে ওঠে। কতোই বা বয়েস হবে বিমানের। আটাশ, ঊনত্রিশ,—নয়তো বড়জোর ত্রিশ। এর বেশি কিছুতেই নয়। কিন্তু এ জীবনের সকল আনন্দ যেন ওর এরই মধ্যে ফুরিয়ে গেছে। এখন কোনোক্রমে জীবনটাকে টেনে নিয়ে চলা মাত্র। সকাল না হোতেই বিমানও ছোটে কারখানায়। সে-ও প্রায়ই অনেক রাতে ফেরে। মাতাল হয়ে। নিঃশব্দে সোজা নিজের খুপরীতে ঢুকে দরজা বন্ধ করে সারারাত পড়ে থাকে। আবার সকালে ছোটে কাজে। এইভাবে একটি একটি করে বিমানের দিনগুলি এগিয়ে চলেছে। দেখতে না দেখতে এখানে দেড়টা মাসও কেটে গেলো।

বস্তীর মালিক মুখিয়া প্রায়ই বিমানকে বলে,—আপনাকে দেখলে তো জরুর কই বড় ঘরের আদমী মালুম হোয়। লেকিন বলুন তো বাবু, এখানে কেন মরতে এলেন।

বিমান কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে। কোনো উত্তর দেয় না। তারপর এক সময় গম্ভীরকণ্ঠে জবাব দেয়,—কে বললে আমি মরতে এসেছি। আমি এসেছি বাঁচতে।

সত্যিই কি তাই? এক এক সময় বিমান ভাবতে বসে। সবকিছুকে তলিয়ে দেখতে চায়। ভাবে, কেন এমন করে আমার জীবনটাকে নষ্ট করছি! একটি নারীর কি এতই মোহিনী শক্তি যে আমার জীবনটাকে ছন্নছাড়া করে দেবে! আর পুরুষ হয়ে আমি কিনা সেই শক্তির কাছে হার মানবো! কোথায় গেল আমার বিবেক, আমার পৌরুষ! রীতা আমার সাথে প্রতারণা করেছে! কিন্তু সে প্রতারণার শোধ নিতে পারলাম কই! প্রতারণার প্রতিহিংসা নিতে গিয়ে শুধু কিনা নিজের সাথেই প্রতারণা করে চলেছি। রীতার মতো কতো মেয়ে ঘরে-ঘরে ছড়িয়ে আছে। রীতা কুশ্রী নয়, তবে এমন কিছু অপূর্ব সুন্দরীও তো নয়। কিন্তু তবু তাকে কেন জানি না ভীষণ ভালো লেগেছিল। কিন্ত এতো বড় প্রবঞ্চনা। এত বড় ছলনা! না, না, এভাবে নিজের সর্বনাশ করবো না। নিজেকে আর ক্ষয় করবো না তিলে তিলে। আমাকে বাঁচতে হবে। হাত বাড়ালে রীতার মতো কতো রীতা আমার কাছে ধরা দেবে। আমার বয়স কম, আমি শিক্ষিত। তাতে আবার ধনী পিতার একমাত্র সন্তান আমি। কেন তবে এক রীতার প্রবঞ্চনার আগুনে নিজের সুন্দর জীবনটাকে তিলে তিলে দগ্ধ করছি! কেন, কেন? না, না, আমাকে বাঁচতে হবে। ভুলতে হবে রীতাকে। আবার নতুন করে জীবন শুরু করতে হবে। পড়াশুনা শুরু করতে হবে। এম-এ পরীক্ষাটা দিয়ে আমাকে পাশ করতেই হবে।

কিন্তু মনের এই জোর বিমানের বেশি-ক্ষণ স্থায়ী হয় না। জলের বুদ্বুদের মতো মুহূর্তে কোথায় মিলিয়ে যায়। মন আবার ভেঙে পড়ে। স্মৃতির অ্যালবামের সোনালী ছবিগুলো ফুটে ওঠে মনের মুকুরে এক এক করে। রীতা ছাড়া তখন সে আর কিছুই ভাবতে পারে না। দু চোখ ছলছল করে ওঠে বিমানের। কেন মন নিয়ে এ প্রতারণা! কিন্তু পরমুহূর্তে প্রতারণার কথা মনে হতেই সমস্ত মুখখানা আবার তার কঠিন হয়ে ওঠে। সজোরে দাঁতে দাঁত চাপে। চোখের জল বাষ্প হয়ে উড়ে যায়। মনে পড়ে সেদিনের কথা। মনে হয় যেন গতকালের কথা। সেদিনই বিমান প্রথম মদ গিলেছে। পেট পুরে। সমস্ত বিশ্ব-সংসার যেন তার চোখের সম্মুখে ঘুরছিল। পায়ের তলার মাটি যেন তলিয়ে যাচ্ছিল অতলে।

পথের মাঝে অরিন্দমের সাথে দেখা। অনেক বছর বাদে দেখা। অরিন্দম বিমানের

স্কুলজীবনের পুরনো বন্ধু। অরিন্দমের কাছে কথাটা শুনে বিমান গর্জে উঠেছিল।

—What!

অরিন্দম নির্বিকার। হাসতে হাসতে অরিন্দম বলেছিল,—হ্যাঁ রে। যাকে বলে মন্ত্র উচ্চারণ করে সাতপাক ঘুরে বিয়ে করেছিলাম। কিন্তু তবুও টিকলো না ভাই। বনের পাখি কি আর খাঁচায় থাকতে চায়! ছট্‌ফট্‌ ছট্‌ফট্‌ করতে শুরু করলো। ভীষণ মায়া হোলো আমার। তাই তো একদিন উড়িয়ে দিলাম। তা রীতার সাথে তোর পরিচয় হোলো কি করে? খুব সাবধান বন্ধু। বড় সাংঘাতিক মেয়ে। হাসতে হাসতে যার তার বুকে ছুরি বসিয়ে দিতে পারে।

এক নাগাড়ে এতোগুলো কথা বলে অরিন্দম সশব্দে হেসে উঠেছিল। সেই হাসি এখনও শূলের মতো বিমানের বুকে যেন বিঁধতে চায়।

বিমান এগিয়ে চলেছে। পা দুটো তার ভীষণভাবে টলছে। আজ অনেকটা মদ গিলেছে। তাই তো বেসামাল। পা দুটো থামের মতো ভারী মনে হচ্ছে। মাথাটা ঝিমঝিম করছে। ঘরের কাছে এসে গেছে। ঘর বলতে তো ছোট্ট খুপরী। মাটির দেওয়াল, আর টালির ছাউনি। বিমান প্রথমে খেয়াল করে নি। নজরে আসতেই সে থমকে দাঁড়ায়। আজও সে এসেছে। তার ঘরের দুয়ারে আবছা আলো-আঁধারের মাঝে আজও এসে সে বসে রয়েছে। যেন একটি ছায়ামূর্তি।

বিমান নিজেকে সামলে নেয়। ধীরে ধীরে দরজার আগে এগিয়ে যায়। ছায়া-মূর্তিও উঠে দাঁড়ায়। এগিয়ে বিমানের কাছটিতে এসে দাঁড়ায়।

ফোল্ডিং ৫০ গুলির পিস্তল

লাইসেন্সের প্রয়োজন নেই। আমেরিকান মডেল। চোর এবং বন্য জন্তুর হাত থেকে নিজেকে বাঁচান। পিকনিক, ভ্রমণ এবং নাটকের পক্ষে উপযোগী। ৫০ গুলীর ব্যবস্থা-সহ অটোমেটিক। হাল্কা ওজন এবং চোখ ধাঁধান আগুন আপনাকে বিপদ থেকে রক্ষা করবে।

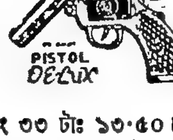

মূল্য ৫০ গুলীসহ নং ৩৩ টাঃ ১৩·৫০। জার্মান মডেল নং ৯৯ টাঃ ১৫·৫০। ভি, পি, পি, চার্জ টাঃ ২·৫০। চামড়ার কেস ৭্ টাকা। অতিরিক্ত প্রতি একশত গুলী ৫্ টাকা।

GEM ARTS (WBM—15)
P.B. 1325, Delhi—6.

কোন কথা না বলে সে বিমানের জামার পকেটে হাত ঢুকিয়ে দেয়। হাতড়িয়ে একটা চাবি বের করে। বিমান কিছু বলে না। তাকিয়ে থাকে মেয়েটির দিকে। দরজা খোলে মেয়েটি। আবার বিমানের পকেটে হাত ঢুকায়। দেশলাইটা বের করে। ঘরের ভেতর জমাট অন্ধকার। কিছু দেখা যাচ্ছে না। মেয়েটি ঘরে ঢুকে অন্ধকারে হাতড়িয়ে হ্যারিকেনটা বের করে আলো জেলে দেয়। টিমটিম করে কোন রকমে কালি-পড়া হ্যারিকেনটা জ্বলতে থাকে। আলোর জোর নেই। তবু অন্ধকার ভেদ করে সবকিছু তো দেখা যায়।

বিমান আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না। পা কাঁপছে। ধীরে-ধীরে ঘরের ভেতর ঢোকে। পড়ে যাচ্ছিল দরজার চৌকাঠে হোঁচট খেয়ে, মেয়েটি ছুটে এসে জাপটে ধরে বিমানকে। মেয়েটির শরীরে ভর দিয়ে বিমান নিজের দেহের টাল সামলায়।

—আজও তুই ওসব গিলে এসেছিস!

প্রশ্ন নয়, অনুযোগ। করুণ সকাতর দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে থাকে মেয়েটি। বিমান কি উত্তর দেবে! রোজই মেয়েটি আসে। আর এসে সেই এক কথা। বলে,—আমায় ছুঁয়ে বল্, আর মদ খাবি না।

বিমান ছোঁয় না। তবে বলে,—চেষ্টা করবো।

তাতেই মেয়েটির আনন্দ।

বিমান যে চেষ্টা না করে, তা নয়। বড়জোর দু' দিন কি তিনদিন ভালো হয়ে থাকে। কিন্তু আবার বোতলের পর বোতল গলায় ঢালে। তিন দিনেরটা একদিনে উশুল করে নেয়।

আর মেয়েটির সেই এক কথা: আজও তুই ওসব ছাইপাঁশ গিলেছিস?

প্রশ্ন ঠিক নয়, অনুযোগ।

—এ কি! তোর গা যে পুড়ে যাচ্ছে! ভীষণ জ্বর!

বিমানের গায়ে নিজের গা লাগতেই মেয়েটি আঁৎকে ওঠে। কপালে হাত দিয়ে দেখে। হ্যাঁ, অনেক জ্বর।

মেয়েটি দ্রুত মাদুরটা মাটিতে বিছিয়ে বিছানা পেতে বিমানকে শুইয়ে দেয়। তারপর কোনো কিছু না বলে দ্রুত ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

মেয়েটির নাম মহুয়া। কতোই বা বয়েস হবে মেয়েটির! আঠারো কি উনিশ হবে। এই বস্তীরই একটি ঘরে ওরা থাকে। ও আর ওর মা-বাবা। কোন্ ঘরটিতে ওরা থাকে, বিমান তাও জানে না। জানতে চায়ও না। কিন্তু যতো মেয়েটিকে দেখছে, ততই সে অবাক হয়ে যাচ্ছে। প্রথম যেদিন বিমান এখানে আসে, সেদিনও মেয়েটি দরজার কাছটিতে চুপ করে দাঁড়িয়েছিল। মহুয়াকে বিমান প্রথম দেখলো সেই প্রথম দিনেই।

তারপর থেকে মেয়েটি রোজ আসে। দরজার কাছে নীরবে দাঁড়িয়ে থাকে। কিন্তু কেন যে আসে, কী চায়, কিছুই বুঝতে পারে না বিমান। একদিন মেয়েটি দরজা পেরিয়ে ঘরের ভেতর ঢুকে পড়ে। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে নিজেই কথা বলে ওঠে,—আমার নাম মহুয়া।

বিমান কোন কথা বলে না। বরং একটু বিরক্তই হয়। মেয়েটির এই বেহায়াপনা তার ভাল লাগে না।

মেয়েটি অপর পক্ষের থেকে কোনো সাড়া না পেয়ে কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আবার বলে ওঠে,—তুই মদ খাস কেন?

বিমান বিস্মিত হয়। অচেনা বস্তীর একটা সামান্য মেয়ের মুখে একথা শোনার জন্য সে প্রস্তুত ছিল না। বিমান মহুয়ার দিকে তাকিয়ে থাকে। মেয়েটির এতো ঔদ্ধত্য হোলো কি করে! মহুয়া আড়ষ্ট-ভাবে দাঁড়িয়ে থাকে। ভীতিবিহ্বল চোখ দুটো মেলে বার বার বিমানের দিকে তাকায়।

সময়ের ব্যবধানে লজ্জা, ভীতি, আড়ষ্টতা সবই কেটে যায়। মহুয়ারও হোলো তাই। এখন তার আর কোনো দ্বিধা নেই, সঙ্কোচ নেই, ভীতি নেই। এমন যেন বিমানের কতো পরিচিত আপনার জন।

মহুয়া আসে। প্রত্যহই আসে। ক্ষণিকের জন্য হোলেও একবার তার বিমানের ঘরে আসা চাই। একবার দেখা দেওয়া চাই।

বিমান একদিন বলে,—তুই কি কচি খুকী! যখন-তখন আমার ঘরে আসতে লজ্জা করে না তোর?

মহুয়া হাসে। বিমানের বিস্ময় আরও বেড়ে যায়। বলে।—আবার হাসছিস! যদি আমি তোর কোনো ক্ষতি করি?

মহুয়া নির্বিকার। বলে,—আমি মানুষ চিনি গো। তোর মতো মানুষ পরের ক্ষতি করতে পারবে না। পরের ক্ষতি করতে গিয়ে নিজেরই ক্ষতি করে।

বিমান দমে যায়। ভাবে, মহুয়ার কথাই কি সত্যি? পরে ক্ষতি করতে গিয়ে কি নিজেরই ক্ষতি করে চলেছি। কিন্তু যা সে কাউকে বলে নি, তার জীবনের সেই একান্ত গোপনীয় কথা মহুয়া জানলো কী করে! কী করে জানলো তার জীবনের ব্যর্থতার কথা! প্রতারণার কথা!

মহুয়া বলে,—আমরা মেয়েমানুষ, না বললেও আমরা মানুষের মনের কথা সব বুঝি।

আশ্চর্য মেয়ে এই মহুয়া। গালমন্দ করলেও ওর কিছু হয় না। নির্বিকার। শুধু হাসে। আসতে বারণ করলেও কানে তোলে না। ভয় দেখালে ভয় পায় না। রোজ রাতেই বিমান ঘরে ফিরলে ও

শক্তি ও উৎসাহের জন্য-বোর্নভিটা !

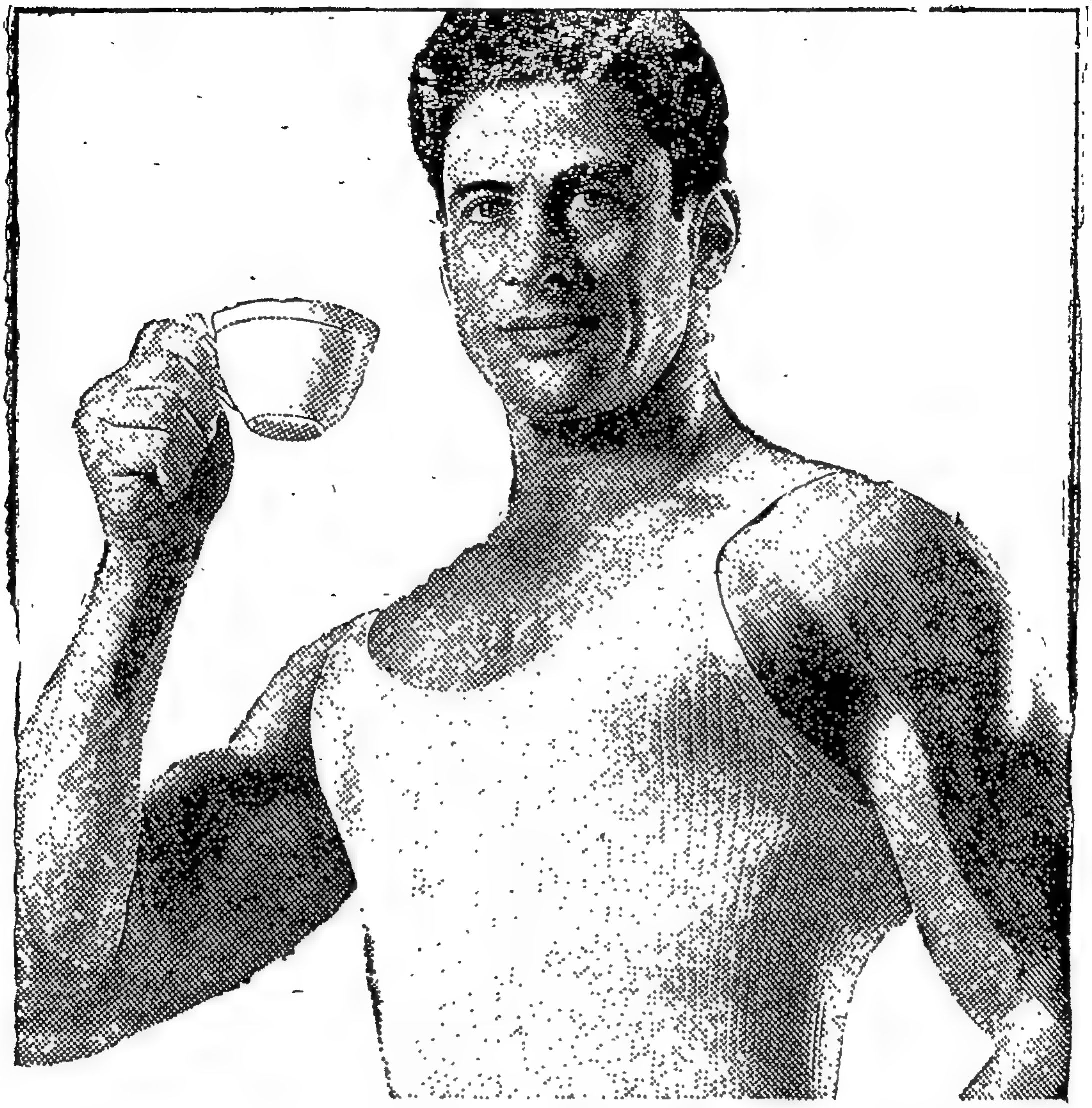

বোর্নভিটার স্বাদ অতুলনীয়..
ওর রহস্য হচ্ছে-কোকো !

কোকো, দুধ, চিনি, ও মল্ট বিধিসম্মতভাবে মেশাবার ফলে—অতি শক্তিবর্দ্ধক পানীয় বোর্নভিটা ! বোর্নভিটা গরম দুধে মিশিয়ে নেবেন—এই সুস্বাদু পানীয় থেকে শক্তি ও উৎসাহ পাবেন।

শক্তি, উৎসাহ ও স্বাদের-জন্যে
ক্যাডবেরিস্ বোর্নভিটা

2296A/1-Ben

এসে হাজির হয়। বিছানা পেতে বিমানকে শুইয়ে দিয়ে এক সময় মহুয়া চলে যায়।

একদিন বিমান কঠিনকণ্ঠে বলে উঠলো,—রোজ রাতে কেন তুই আমার ঘরে আসিস?

মহুয়া উত্তর দেয়,—তুই কি রাত্রি ছাড়া অন্য সময় ঘরে থাকিস যে অন্য সময় আসবো!

বিমান গলা চড়িয়ে বলে,—আমার কাছে আসবার দরকার কি তোর! কি চাস আমার কাছে? জানিস, এ নিয়ে যা-তা কথা উঠেছে! মান-সম্মান তোর না থাকতে পারে, আমার আছে।

মুহূর্তে মহুয়ার দু' চোখ জলে ভরে ওঠে। দ্রুত চোখে আঁচল চাপা দিয়ে ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে যায়।

এরপর দু' দিন কেটে গেলো। মহুয়ার দেখা নেই। বিমানের মনটা বড়ো খারাপ হয়ে যায়। কিছুই ভালো লাগে না। কারখানা থেকে তাড়াতাড়ি ঘরে ফেরে। প্রতীক্ষা করে। হয়তো আজ সে আসবে! কিন্তু কোথায়! খোলা দরজা দিয়ে শুধু হাওয়াই আসে। সে তো আসে না। মহুয়ার মুখ তো ভেসে ওঠে না। বিমানের মন কেবল গুমরে কেঁদে মরে। কোনো কিছুর প্রার্থী হয়ে তো মহুয়া তার কাছে আসে নি, তবে কেন গালমন্দ করে তাকে তাড়িয়ে দিল। কিন্তু এ কি মায়ার বন্ধনে বিমান নিজেকে আবার জড়িয়ে ফেললো। মন থেকে মায়া-মমতা, প্রেম-প্রীতি সব-কিছু মুছে ফেলে সকল বন্ধন ছিন্ন করে সম্পূর্ণ একা সংগোপনে পড়ে থাকবার জন্যই তো সে এখানে এসেছে! কিন্তু এখানেও মন, প্রেম, প্রীতির খেলা! দীর্ঘ প্রতীক্ষার এক সময় অবসান হয়। মহুয়া আসে। ঘরে ঢুকে দরজার কাছটিতে চুপটি করে দাঁড়িয়ে থাকে।

নিজের দুর্বলতা ঢেকে বিমান বলে,—আবার এসেছিস যে?

মহুয়া বড় বড় গোল গোল চোখ আরও বড় করে বলে,—বা রে, আসবো না কেন! আমার যে ভীষণ অসুখ করেছিল।

—অসুখ! কী অসুখ?

—ভীষণ জ্বর হয়েছিল।

বিমান মহুয়ার দিকে তাকায়। দরজার কোণে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে মহুয়া। সত্যি, মহুয়াকে ভীষণ বিষণ্ণ দেখাচ্ছে। রোগা রোগা লাগছে। মুখ শুকনো। চোখ দুটো যেন ফ্যাকাসে।

—জ্বর কমে গেছে?

—হ্যাঁ। মহুয়া ছোট্ট করে জবাব দেয়।

হঠাৎ মহুয়ার কাজল-মাখা দু' চোখের কোল চিকচিক করে উঠলো। বোধ হয়, চোখে জল এলো। বিমান কাছে এগিয়ে আসে। বলে,—কি হোলো?

—এখান থেকে পালিয়ে যাবো আমি। মা ভীষণ অত্যাচার করে। খেতে দেয় না ঠিকমতো। কেবল কাজ করায়। একটু কিছু হলেই ধরে ধরে মারে। আমার তো আপনার কেউ নেই, তাই—

কথা শেষ করতে পারে না। কণ্ঠ অশ্রুরুদ্ধ হয়ে আসে মহুয়ার। দু' চোখ দিয়ে ঝর ঝর করে অঝোরে জল পড়তে থাকে। বিমানের ভীষণ মায়া হয়।

বিমান বলে,—তোর কেউ নেই বলছিস কেন! মা আছে, বাবা আছে—

কথা কেড়ে নিয়ে মহুয়া বলে ওঠে,—ও যে আমার সৎ মা। আমার নিজের মা হোলে আমার সাথে কি এমন করতো? আর বাবা তো সব সময় মদ খেয়ে বেহুঁস হয়ে পড়ে থাকে। আমি আর পারছি না। পালিয়ে যাবো।

সস্নেহে বিমান বলে,—পাগলামি করিস না। যা, ঘরে যা।

সেদিন থেকে অসহায়া এই মেয়েটির ওপর বিমানের মায়া যেন আরও বেড়ে যায়।

জ্বরটা বোধ হয় বেড়েই চলেছে। থর-থর করে কাঁপছে বিমান। মহুয়া কোথায় গেলো!

একটু বাদেই মহুয়া ফিরে এলো। হাতে তার কাপড়ের একটা টুকরো। কুঁজো থেকে একটা পাত্রে জল গড়িয়ে নেয়। কাপড়ের টুকরোটা জলে ভিজিয়ে বিমানের উষ্ণ কপালে বার বার দিতে থাকে। বিমান ক্লান্ত দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে থাকে বস্তীর এই মেয়েটার দিকে। উষ্ণ কপালে ঠাণ্ডা জলের পরশে শরীর জুড়িয়ে যাচ্ছে। কখন যে চোখের পলকে গভীর ঘুম নেমে এসেছে, বিমানের মনে নেই। যখন ঘুম ভাঙলো, তখন অনেক রাত্রি। দেখে, মহুয়া তার পায়ের কাছে বিছানার এক প্রান্তে শুয়ে আছে। বিমান হঠাৎ অনুভব করে তার কপালে একটা কাপড়ের টুকরো। জলপট্টি। জল শুকিয়ে গেছে অনেকক্ষণ। কাপড়ের টুকরোটা মাথার কাছে রাখা ছোট্ট জলের পাত্রে রেখে দেয়। হ্যারিকেনের আলোটা ঘরের এক কোণে টিমটিম করে জ্বলছে, ঊষার আগমন জানিয়ে যাব কাজ হবে শেষ।

হস লএকটাবীষ

M&H M&H M&H M&H M&H M&H M&H

BI-COLATES
REGISTERED TRADE MARK
STEARNS

M&H

পিত্তরস প্রবাহ; পাকস্থলির সুষ্ঠু ক্রিয়া ও কোষ্ঠকাঠিন্য নিয়ন্ত্রণে দীর্ঘদিনের প্রশংসাধন্য একটি অব্যর্থ ঔষধ।

MARTIN & HARRIS
PRIVATE LTD.
MERCANTILE BUILDING, LALLBAZAR,
CALCUTTA.

M&H M&H M&H M&H M&H M&H M&H

যা দেখেছি, যা পেয়েছি

স্মৃতিচয়ন

শ্রীসুধীরঞ্জন দাস

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

(৫)

আমি সিমলায় যাবার পরই শুরু হোলো অ্যাডভোকেটদের যাতায়াত। নতুন চীফ জাস্টিসের সঙ্গে সবাই চান আলাপ করতে। একজন প্রাচীন ব্যারিস্টার এলেন সুমের চাঁদ মোটাসোটা মানুষ, চলতেন একটু দুলে দুলে পা ঘসটিয়ে। কোর্টে, দেখেছি তাঁর বিস্তর কাজ ছিল। তাঁর সঙ্গে প্রায়ই কোর্টে আসতেন তাঁর এক ভাই। পাঞ্জাবের লোকেদের নাম ও পদবীর হদিস করতে আমার সময় লেগেছিল। বড় ভাই হলেন সুমের চাঁদ। এঁর উকিল ভাই হলেন প্রকাশ চাঁদ জৈন। তৃতীয় ভ্রাতা যিনি প্রাদেশিক বিচার বিভাগে কাজ করে ডিস্ট্রিক্ট জজ হয়েছিলেন তাঁর নাম ছিল হরিশচন্দ্র মিন্ধন। আমি সিমলা থাকতে থাকতেই সুমের চাঁদের প্র্যাকটিসের পঞ্চাশ বর্ষ পূর্তি হওয়ার বার এ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে সুবর্ণ জয়ন্তীর আয়োজন হয়েছিল। ঈশ্বরেচ্ছায় তারও প্রায় পঁচিশ বছর পর পর্যন্ত কোর্টে কাজ করে সুমের চাঁদ এই সেদিন দেহত্যাগ করেছেন। পাঞ্জাবীদের দৈহিক ক্ষমতার তারিফ করতেই হয়। আরো দেখা হোলো একজন ব্যারিস্টার অ্যাডভোকেটের সঙ্গে। নাম তাঁর জয়গোপাল শেঠী। ফিট্‌ফাট্ পোষাক পরা। মাথায় একটু খাটো। চুলে একটু টাক পড়তে সুরু হয়েছিল কিন্তু এখন পর্যন্ত তা পাশের দিক থেকে বুরুশ করা চুল দিয়ে ঢাকাই থাকে। ফৌজদারী প্র্যাকটিসে পাঞ্জাবে তাঁর সমকক্ষ সে সময়ে কমই ছিলেন। জে. জি. শেঠীর কোর্টের কাজ আমার খুবই পছন্দ হোতো। সুন্দর-ভাবে ঘটনা বিন্যাস করে তিনি আদালতের সামনে মক্কেলের বক্তব্যটা পেশ করতে পারতেন। দেওয়ানী কেসও যে না কর-তেন তা নয়। আমি একবার তাঁকে অ্যাডভোকেট জেনারেল পদে নিয়োগের কথা প্রসঙ্গত তুলেছিলাম। তিনি সেটা নিতে রাজী হন নি, কেন না পাঞ্জাবে দেওয়ান রামলালের আমল থেকেই নাকি ঐ পদটা চব্বিশ ঘণ্টার চাকরি। অর্থাৎ পাঞ্জাবের অ্যাডভোকেট জেনারেল অন্যান্য প্রদেশের অ্যাডভোকেট জেনারেলের মত নিজস্ব প্র্যাকটিস করতে পারতেন না এবং তাঁকে বাঁধা মাইনেতে সরকারী কাজই খালি করতে হোতো। জে. জি. শেঠী বিবাহ করেছেন একটি আইরিশ মহিলাকে। জয়গোপাল শেঠী ও তাঁর সহধর্মিণী খাওয়াতে খুব ভালবাসতেন এবং অনেক-বার তাঁদের অতিথি সংকার ব্যক্তিগতভাবে উপভোগ করেছি। শেঠী সাহেবের সঙ্গে শেষ সাক্ষাৎ হয় পাঞ্জাবের তৎকালীন মুখ্য-মন্ত্রী শ্রীপ্রতাপ সিং কাঁয়রোর সম্বন্ধে যে তদন্ত কমিশন বসেছিল, যার একমাত্র সদস্য ছিলাম আমি, সেই কমিশনের অধিবেশনে। শেঠী সাহেব সর্দার প্রতাপ সিং কাঁয়রোর কৌসুলী হয়ে সেই কমিশনে আদ্যোপান্ত হাজির হয়েছিলেন। সেই কমিশনের রিপোর্ট দাখিলের পর আর তাঁর সঙ্গে দেখা হয় নি।

আর একজন কৌসুলীর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল আমি যেদিন প্রথম চার্জ নিতে যাই সেইদিনই। তাঁর নাম বিষণ নারায়ণ। এঁর পিতা সুরষ নারায়ণও ছিলেন দিল্লীর নামকরা উকিল। তিনি পাবলিক প্রসিকিউটার হয়েছিলেন। অবসর নিয়ে তিনি কাগজের কারবারও করেছিলেন। মৃত্যু পর্যন্ত নিত্য ক্লাবে গিয়ে বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে গল্প-গুজব করে ও পেগ সহ তাস খেলে বাড়ি ফিরতেন। বিষণ নারায়ণের দেওয়ানী কাজই ছিল বেশি এবং তা আসত দিল্লী থেকে। বিষণ নারায়ণ বিয়ে করেছিলেন খ্যাতনামা বিপ্লবী হরদয়ালের দুহিতা শান্তি দেবীকে- যাঁকে প্রথম দেখি দেওয়ান রামলালের বাড়িতে তাঁর জন্মদিনে। এই পরিবারের সঙ্গে আমাদের বেশ ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল। এঁদের সর্বকনিষ্ঠ সন্তানের ডাক নাম ছিল বিনু—সুন্দর ফুটফুটে লাবণ্যময়ী ফ্রক পরা মেয়েটি। প্রথম যেদিন মেয়েটিকে দেখলাম বিষণ নারায়-ণের বাড়িতে সেদিন মেয়েটির রূপ-লাবণ্যের প্রশংসা করেছিলাম। বসবার ঘরে এক কোণায় একটি বর্ষীয়সী মহিলা মৃদু হেসে বলে উঠলেন যে ঐ বয়সে তাঁর মেয়ে ঐ মেয়ের চেয়েও সুন্দর ছিল। ফিরে চাইতেই দেখি সবাই খুবই হাসছেন। জানতে পারলাম যে মহিলাটি পরলোকগত বিপ্লবী বীর হরদয়ালের সহধর্মিণী ও বিনুর দিদিমা। তাঁর মেয়ে যে সে মেয়ের চেয়েও সুন্দরী ছিলেন সে কথাটা না বলে তিনি থাকতে পারেন নি। মাতৃ-স্নেহের এই অনুপম উদাহরণ দেখে খুবই ভাল লেগেছিল। আমার প্রশংসাবাদটা বোধ হয় একটু বেশি উচ্ছ্বসিতই হয়ে উঠেছিল। এই বিষণ নারায়ণ পরে পাঞ্জা-বের জজ হয়ে সুখ্যাতির সঙ্গে কাজ করে অবসর নিয়েছেন।

আর একটি দম্পতির সঙ্গে আমাদের খুবই হৃদ্যতা হয়েছিল। তাঁরা হলেন জীবনলাল কাপুর ও জ্ঞানবন্তী কাপুর। জীবনলাল কাপুরের সঙ্গে প্রথমে দেখা হয় সিমলার পথে যখন আমি শ্যামা-প্রসাদের দিল্লীর বাড়িতে একদিন ছিলাম সেখানে। কাপুর সাহেব তখন ছিলেন কেন্দ্রীয় পাবলিক সার্ভিস কমিশনের এক-জন সভ্য। লাহোরে নাকি বেশ প্র্যাকটিস ছিল। কংগ্রেসকর্মী ফৌজদারী মামলায় পড়লে তাদের পক্ষ সমর্থনের জন্যে বেগারও দিয়েছেন অনেক। একবার সিমলা এসে জানান যে তিনি পাবলিক সার্ভিসের কাজ ছেড়ে দিয়ে আবার কোর্টে বের হবেন। কিছুদিন এসেও ছিলেন। কিন্তু অল্প পরে আমার আমলেই তিনি পাঞ্জাবের জজ হয়ে যান। তারপর তিনি সুপ্রিম কোর্টেরও জজ হন। অবসর নেবার আগেই বোধ হয় তিনি ল কমিশনের চেয়ারম্যান হয়েছেন। এখনো সেই পদে বহাল আছেন। এ ছাড়া ইনি নানা কমিটি ও কমিশনের চেয়ারম্যান হয়েছেন। এঁর সহধর্মিণী বিলেতে পড়াশুনা করে ফিরেছিলেন। খুবই শিক্ষিতা মহিলা। নম্র মধুর ব্যবহার। সুখ-দুঃখে সমভাগী হয়ে পড়েছিলেন। কাপুর সাহেবে

ব্যারিস্টারদের উপর খুব উচ্চ ধারণা। তাঁর বড় ছেলে দলীপ ব্যারিস্টার হয়ে দিল্লী ও চণ্ডীগড়ে ভাল প্র্যাকটিস করছেন।

আমি সিমলা যাবার পর পাঞ্জাব হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি মেহেরচাঁদ মহাজন যাঁকে সর্দার প্যাটেল কাশ্মীরের মহারাজকে ভারতবর্ষে যোগ দিতে রাজী করার জন্যে সেখানে দেওয়ানরূপে পাঠিয়েছিলেন, তিনি একটা বিরাট ভোজ দেন আমাকে অভিনন্দন জানাবার জন্যে। মহাজন সাহেব ইতিমধ্যেই দিল্লীর ফেডারেল কোর্টের জজ হয়ে গিয়েছিলেন। সেই ভোজে দেখলাম এবং পরে বহু বহুবার দেখেছি মহাজন সাহেবের আতিথ্যের বহর। লনের উপর সুন্দর করে সাজান টেবিলে কত রকমের মুখরোচক খাবার তা আর কি বলব। ভোজনবিলাসী আমি নিজেও কিছুটা কিন্তু আমার ধারণা হার মেনেছে মহাজন সাহেবের কাছে। লোকেরা খাচ্ছে ত' খাচ্ছেই। পরিবেশন আর শেষই হয় না। তারপর যখন দু'পদ মিষ্টি—গাজর কি হালুয়া আর পুরু পুরু চৌকোণা লাল ও সাদা আইসক্রিম এলো তখন হিমাচল প্রদেশের তৎকালীন আই· সি· এস· চীফ কমিশনার মেহতা সাহেব বললেন যে, মহাজন সাহেবের কি অধঃপতনই না হয়েছে—মোটে দু' রকমের মিষ্টির ব্যবস্থা করেছেন!"

মহাজন সাহেবের সঙ্গে এই যে আলাপ হোলো তা আজ পর্যন্তও অটুট হয়ে রয়েছে। মহাজন সাহেবের বড় ছেলে দয়াকীষণ পাঞ্জাব হাইকোর্টের জজ হয়েছিলেন যখন আমি ছিলাম ভারতের প্রধান বিচারপতি।

এই ভোজেই আলাপ হোলো অবিভক্ত পাঞ্জাবের তিনটি নামকরা প্রাক্তন জজের সঙ্গে। স্যার জয়লাল ছিলেন রোগা ছিপ্‌ছিপে মানুষ। কথাবার্তা একটু কমই বলতেন। এঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র দিন্যানাথ বেশ কিছুদিন ব্যারিস্টারি করবার পর এক্ষণে পাঞ্জাব হাইকোর্টের জজ হয়েছেন। দ্বিতীয়জনের নাম বকসী টেকচাঁদ। স্যার ট্রেভর হ্যারিসের কাছে এঁর সুখ্যাতি শুনেছিলাম। যখন চীফ জাস্টিস স্যার ডগলাস ইয়াং-এর আমলে পাঞ্জাব হাইকোর্টে খুবই গোলমাল চলছিল এবং ইংরেজ ও ভারতীয় জজেদের বাক্যালাপ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল তখন এই বকসী টেকচাঁদ সাহেবই নাকি ভারতীয় জজেদের মুখপাত্র হয়ে সেই চীফ জাস্টিসের কার্যকলাপের তীব্র সমালোচনা করেছিলেন। বকসী টেকচাঁদ ছিলেন বেশ লম্বাচওড়া মানুষ। আইনের জ্ঞান ছিল তাঁর গভীর। কথাবার্তা বলতেন কম এবং ধীরভাবে। তাঁর ছেলে ছিল না, ছিল পাঁচটি না ক'টি কন্যা। লোকে বলত যে সেইজন্যে তিনি মেয়েদের উত্তরাধিকারের দাবি তাঁর নানা রায়ে জোর দিয়ে সমর্থন করেছেন। অবসর নিয়ে তিনি রাজনৈতিক ও সমাজ কল্যাণের অনেক কাজ করেছেন। বোধ হয় তিনি কন্‌স্টিট্যুয়েন্ট অ্যাসেম্বলীর সদস্যও হয়েছিলেন এবং আমাদের বর্তমান ভারতীয় সংবিধানের রূপায়ণে সাহায্য করেছিলেন। তিনি আর্য সমাজের লোক ছিলেন। শেষ বয়সে শারীরিক অসুস্থতায় দীর্ঘকাল ভুগে তিনি দিল্লীতেই দেহরক্ষা করেছেন। তাঁর কাছে আমি নানা রকম সদুপদেশ পেয়েছি এবং তিনি আমাকে বরাবরই স্নেহ করেছেন। তৃতীয় প্রাক্তন জজ যাঁর সঙ্গে মহাজন সাহেবের ভোজে আলাপ হোলো তিনি হলেন কাপুরথালার রাজবংশের স্যার দলীপ সিং। ইনি যৌবনকালে খেলাধুলোয় ভাল ছিলেন, বিশেষ করে টেনিস খেলায়। ছিপ্‌ছিপে রোগা, গায়ের রঙ ময়লাই বলতে হবে। খুব প্রখর ছিল এঁর বুদ্ধিমত্তা। কোর্টের কাজ করতেন খুব তাড়াতাড়ি। কৌঁসুলীরা বাজে কথা বলে সময় নষ্ট করলে বিরক্ত হতেন। অনেকে বলেন যে ভদ্রলোকের মেজাজটি একটু খিট্‌খিটেই ছিল। এঁর সম্বন্ধে যে একটা গল্প শুনেছি সেটা বলেই ফেলি। একদিন বেশ নামকরা একজন অ্যাডভোকেট এঁর কোর্টে কি যেন একটা কেসে সওয়াল জবাব করছিলেন। জজ দলীপ সিং মাঝে মাঝে "ননসেন্স", "রাবিস" ইত্যাদি মন্তব্য করে অসন্তোষ প্রকাশ করছিলেন। বার তিনেক এইরকম করে সওয়াল জবাবে বাধা পেয়ে সেই অ্যাডভোকেটটি খুব গম্ভীর মুখ করে বললেন—"How is it that nothing but "nonsense" or "rubbish" comes out of your mouth this morning my Lord?" কোর্টসুদ্ধ সবাই হোঃ হোঃ করে হেসে উঠল। শুনেছি এর পর জজ সাহেব আর সেদিন সেই অ্যাডভোকেটের সওয়াল জবাবে বাধা দেন নি। এই জজ সাহেবটি বিবাহ করেছেন নামকরা আই· সি· এস· বি. এল. গুপ্ত মশায়ের পুত্র সতীশ গুপ্তের কন্যা রেবাকে। আমরা সিমলা ও দিল্লীতে যখন ছিলাম তখন এখানে ওখানে এঁদের সঙ্গে প্রায়ই সাক্ষাৎ হোতো।

কুন্দনলাল গোঁসাইকে বেশ মনে আছে। তাঁর প্র্যাকটিস বেশ ভাল ছিল। তার কমার্সিয়াল ও কোম্পানী আইনের কাজও ছিল। তিনি পরতেন নাকে চিমটি দেওয়া স্প্রীংয়ের চশমা। বাঁ হাতে ল' রিপোর্ট ধরে ডান হাতে চশমাটার দুটো স্প্রীং ধরে নাক থেকে চশমাটা বের করে তিনি নজির পড়তেন ও চশমাটা দিয়ে পাতাটার উপরে ঠোকা দিতেন যাতে বক্তব্যটা জজের মাথায় ঢোকে। তার বয়েস হয়েছিল এবং জজীয়তী নিলে পেন্সন বিশেষ কিছু পাবেন না জেনেও যে কেন তিনি জজীয়তী নিলেন তা আমি আজ পর্যন্ত বুঝতে পারলাম না। আর একজন ছিলেন জগন্নাথ শেঠ। মোটাসোটা মানুষ—একটুতেই যেন হাঁপিয়ে পড়তেন। তাঁকে মনে রাখবার অন্য একটা কারণ আছে। সিমলায় আমি যখন হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে শয্যাগত হয়েছিলাম তখন শ্রীশেঠের সহধর্মিণী আমাকে একটা বড় হাতার মজবুত পুলওভার বুনে উপহার দিয়েছিলেন। সেই স্নেহের দান এখনো আমার কাজে আসে। শীতকালে যখনই সেটা পরিধান করি মনে পড়ে যায় স্নেহশীলা সেই রমণী ও তাঁর স্বামীর কথা। আর সি সোনিরও বেশ ভাল প্র্যাকটিস ছিল। তিনি পরে পাঞ্জাব হাইকোর্টের জজ হয়েছিলেন। তিনি ও তাঁর গৃহিণী মধ্যে মধ্যে আসতেন আমাদের খোঁজখবর নিতে। পাঞ্জাবের যে এ্যাডভোকেটটিকে প্রথম দেখি দিল্লী রেল স্টেশনে, ইন্দ্রদেব দুয়া, তাঁর সঙ্গে পরে বেশ আলাপ জমেছিল। তিনি ছিলেন তাঁর বোনেদের খুব আদরের ভাই এবং ঘটা করে তাঁর বিয়ে দিয়েছিলেন। ইন্দ্রদেব দুয়াও পরে হাইকোর্টের জজ হয়েছিলেন। এঁর ছেলেটির নাম দিয়েছেন চিত্তরঞ্জন। এই নামকরণের মাধ্যমে এঁদের সঙ্গে আমার সম্বন্ধটা বেশ ঘনীভূতই হয়েছিল। সর্বমিত্র সিকরীর পিতা ছিলেন নামকরা ডাক্তার। ইনি সরকারের তরফে ইনকাম ট্যাক্সের কাজই করতেন। পরে এ্যাডভোকেট জেনারেল হয়েছিলেন বসন্তকীষণ খান্নার জায়গায়। বসন্তকীষণ খান্নার চাকরীটি গেল পাঞ্জাবের মন্ত্রিসভা বদলের সঙ্গে সঙ্গে। লোকটি বেশ অমায়িক ছিলেন। সিকরী সম্প্রতি সুপ্রিম কোর্টের জজ হয়েছেন। বার থেকে সরাসরি সুপ্রিম কোর্টে ইনিই হলেন প্রথম জজ। এই নতুন পরীক্ষার ফলাফল ভবিষ্যতেই জানা যাবে। গ্রোভার বলে একটি যুবক ব্যারিস্টারের কথা বেশ মনে পড়ে। তাঁর আর্থিক অবস্থা বেশ স্বচ্ছলই ছিল। তার উপরে তাঁর নিজের প্র্যাকটিসও বেশ জমে উঠেছিল। তিনিও জজ হয়ে গেলেন পাঞ্জাব হাইকোর্টের। রামপ্রসাদ খোসলার ফৌজদারী কাজকর্ম ছিল এবং তিনিও হাইকোর্টের জজ হয়ে কাজ করছেন। পেপসু হাইকোর্টের চীফ জাস্টিস সর্দার তেজা সিং যিনি আরো আগে পাঞ্জাব হাইকোর্টের জজ ছিলেন তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র গুরুদেব সিং প্রথমে ডিস্ট্রিক্ট জজ হয়ে পরে হাইকোর্টে প্রোমোসন পেয়ে এসেছিলেন। সর্দার হরবন্স সিং বলে আর একটি শিখ যুবক ব্যারিস্টারের কথা মনে পড়ছে। তিনি

বার ফাইনালে এবং লণ্ডনের এল এল বি পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়ে বার্সটো স্কলারশিপ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের বৃত্তিও পেয়েছিলেন। এত ভাল ছেলেকে স্বভাবতই আমি খুবই সমাদর করতাম। তাঁকে জজ করা নিয়ে কিছুটা বেগ পেতে হয়েছিল, কেন না পাঞ্জাবের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী সর্দার প্রতাপ সিং কায়রোঁর তাঁর উপরে ভাল ভাব ছিল না। শেষ পর্যন্ত আমার সুপারিশ বলবৎ হয়েছিল। মেহের চাঁদ মহাজন সাহেবের জ্যেষ্ঠ পুত্র দয়ালবিণ এবং আরো কিছু পরে স্যার জবলালের পুত্র জিন্দ্রলালও পাঞ্জাব হাই-কোর্টের জজ হন নিজেদেরই কৃতিত্বের দরুণ। এ্যাডভোকেট বেদব্যাস ছিলেন লম্বাচওড়া মানুষ। তিনি বেশির ভাগ সময় দিল্লীতেই প্র্যাকটিস করতেন। মধ্যে মধ্যে বি আর তুলী তাঁকে সিনিয়ার করে সিমলায় নিয়ে এসেছেন। এঁর কমার্সিয়াল ও কোম্পানী প্র্যাকটিস ছিল বেশ ভালই। সর্দার প্রতাপ সিং কায়রোঁর তদন্ত কমিশনে ইনি ছিলেন অভিযোগকারীদের মুখ্য এ্যাডভোকেট। এঁরই ভাগনে এবং ডেভিল এস কে কাপুর ছিলেন অন্য তরফে অর্থাৎ কায়রোঁর কৌসুলীদের মধ্যে একজন। এস কে কাপুর এখন পাঞ্জাবের জজ হয়ে কাজ করছেন। সর্দার গুরবচন সিংকে খুব মনে আছে। জ্ঞানী ও গুণী ব্যক্তি বলে সকলেরই শ্রদ্ধেয় তিনি হয়ে উঠেছিলেন। তিনি শিখ ছিলেন কিন্তু দাড়ি বা লম্বা চুল তাঁর ছিল না—বোধহয় কোন অসুখের জন্যে। পাঞ্জাব ভাগ হবার পরে তিনি দিল্লীতেই বসে যান। সিমলা তিনি যেতে পারেন নি রক্তের চাপ বেশি হওয়ার জন্যে। এঁর সহধর্মিণী অতি অমায়িক ও শান্তশিষ্ট মহিলা। আমাদের এঁরা অত্যন্ত স্নেহ করতেন। রণজিৎ সিং নারুলা ও প্রীতম সিং সফীর গোড়ার দিকে সর্বদা এক সঙ্গেই চলাফেরা করতেন। সকলের সঙ্গে খুব মেলামেশা করতে পারতেন। কিন্তু এক যাত্রায় পৃথক ফল হয়ে গেল। নারুলা পাঞ্জাবের জজ হলেন। সফীরও এতদিনে কিছু একটা হয়েছেন নিশ্চয়। বিদ্যাধর মহাজন বলে একটি এ্যাডভোকেট কেবল বই লিখেই চলেছেন। আরো কত এ্যাডভোকেটদের কথা স্মরণ হয়। কিন্তু এই স্মৃতিচয়ন পাছে এ্যাডভোকেটদের নামের তালিকা হয়ে দাঁড়ায় এই ভয়ে অনেকের নাম উল্লেখ করলাম না।

(৬)

সিমলায় এসেই ব্যবস্থা করলাম যে পিটার হপের বলরুম থেকে লাইব্রেরী অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে ঐ ঘরে উঁচু বেদী তৈরি করে তিন কি পাঁচজন জজ একত্রে বসতে পারেন এই রকম একটি এজলাস তৈরি করা হোক। মহাত্মা গান্ধীর হত্যার জন্যে অভিযুক্ত ও দণ্ডিত আসামীদের আপীল শুনানীর সময় কোর্টে খুবই ভিড় হবে এবং সেই জন্যেই বড় এজলাসের দরকার ছিল। কথা হলো আমি এবং আর দু'জন জজ বসে ঐ আপীলটি শুনব। খুব তোড়জোড় করে কাজ আরম্ভ হয়ে গেল। অন্তরালে ভবিতব্য বোধ হয় মৃদু হাসলেন সামান্য মানুষের এইসব ব্যবস্থা করবার ধৃষ্টতা দেখে।

মার্চের শেষে কিংবা এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে সিমলা বার এ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে একটা অভিনব পার্টি হলো। শুনেছি এটা আরম্ভ হয় মেহেরচাঁদ মহাজন যখন পাঞ্জাব বার এ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট ছিলেন তখন থেকে। এই পার্টির নাম ছিল Mango Party—এ্যাসোসিয়েশনের সভ্যরা এবং জজেরা সকলে একত্র হতেন এবং খোসগল্পের ফাঁকে ফাঁকে সুস্বাদু আম খেতেন যে যত পারেন। আমি তখন সেখানে নতুন গেছি। আমাকে সনির্বন্ধ অনুরোধ করে গেলেন এ্যাসোসিয়েশনের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট মুকুন্দলাল পুরী। লোকটি ছিলেন ধীর-স্থির, সকলের শ্রদ্ধেয়। পাঞ্জাবের মুখ্য-মন্ত্রী শ্রীভীমসেন সাচারের শ্বশুর। সেই পার্টিতে গিয়ে বহু এ্যাডভোকেটদের সঙ্গে আলাপপরিচয় করে নিলাম এবং বহু বাছা বাছা সুস্বাদু আম খাওয়া গেল।

ঠিক এই সময় বরাবর শোনা গেল যে সর্দার তেজা সিং সিমলাতে আসছেন। তিনি পাঞ্জাবের ডিস্ট্রিক্ট জজ থেকে হাই-কোর্টে জজ হয়ে আসেন এবং অল্প ক'দিন আগে তিনি পেপসু হাইকোর্টের চীফ জাস্টিস হয়ে যান। স্বভাবতই বার এ্যাসোসিয়েশনের সভ্যেরা তেজা সিং-এর সম্মানার্থে সিমলা ম্যালে নামকরা রেস্তোরাঁ ড্যাভিকো-তে একটি সম্বর্ধনা সভার আয়োজন করলেন ১২ই এপ্রিল তারিখে। আমারও নিমন্ত্রণ হলো। কিন্তু সেদিনই বিকেলে কলকাতা থেকে আমার পরম সুহৃদ প্রভুদয়াল হিম্মতসিংকা সিমলা এসে আমারই বাড়ি উঠবেন বলে জানিয়ে-ছিলেন। এমতাবস্থায় আমাকে বার এ্যাসো-সিয়েশনের নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করতে হয়ে-ছিল। সেদিন আবার কোর্টে জজেদের মিটিং ছিল। সেই মিটিং সেরে অন্যান্য জজেরা চললেন ম্যালের দিকে পার্টিতে যোগ দেবার উদ্দেশ্যে। আমি ফিরলাম বাড়িতে প্রভুদয়ালবাবুকে অভ্যর্থনা করতে। হঠাৎ মনে হলো যে প্রভুদয়ালবাবুর সঙ্গে ত' আমার ভদ্রতার সম্পর্ক নয়, তা ছাড়া তিনি ত' আমারই বাড়িতে দিন কয়েক থাকবেন এবং তাঁর সঙ্গে কথা বলবার যথেষ্ট সুযোগ ও সুবিধে হবে। বার এ্যাসোসিয়েশনের সভ্যদের সঙ্গে একত্রে মিলিত হওয়া ত' যখন-তখন হয়ে ওঠে না। অতএব পার্টিতে গেলেই ভাল হয়। কে জানত যে নিয়তি আমাকে তখন টানছে ড্যাভিকো-র দিকে। একটু ভেবে পার্টিতে যাওয়াই ঠিক করলাম। সামনে অছরুরাম, ভাণ্ডারী ও হরনাম সিং হনু হনু করে হেঁটে যাচ্ছিলেন। আমার জমা-দারকে বললাম যে একটু এগিয়ে গিয়ে জজ সাহেবদের যেন বলে যে আমিও আসছি। অন্য একজন চাপরাশিকে বল-লাম আমার বাড়ি গিয়ে যেন খবর দেয় আমি ড্যাভিকো-র পার্টি হয়ে বাড়ি ফিরব। এই বলে আমিও বেশ তাড়া-তাড়িই হাঁটতে শুরু করলাম। আমার সতীর্থরা আমাকে পেছনে আসতে দেখে দাঁড়ালেন এবং আমি পেঁছে যেতে আমরা চারজন জজই বেশ ক্ষিপ্রগতিতে হাঁটতে শুরু করলাম। সেইটেই হলো আমার দুষ্ট গ্রহের ফের। কি রকম যেন হাঁপিয়ে উঠলাম। আমি রাস্তার পাশে যে রেলিং ছিল তাতে ঠেসান দিয়ে দাঁড়িয়ে বন্ধুদের বললাম যে তাঁরা এগিয়ে চলুন, আমি একটু দম নিয়ে শীগ্‌গিরই আসছি। বলতে বলতেই বোধ হলো যেন সব আলো নিভে গেল। বোধ হয় আধ মিনিটের জন্যে এই রকম অন্ধকার দেখেছিলাম। চোখ খুলে দেখি বন্ধু তিনজনই দাঁড়িয়ে রয়েছেন আমার পাশে। আমার মুখ-চোখের ভাবগতিক দেখেই তাঁরা আমায় ছেড়ে চলে যান নি। আমি বললাম—"এ কি, আপনারা যান নি? আপনারা এগোন, আমি আসছি।" আমরা তখন প্রায় ম্যাল পর্যন্ত এসে গেছি। টেলিগ্রাফ আফিসের সামনে যেখানে বড় ঘড়িটা আছে তারই প্রায় নিচ পর্যন্ত পেঁছে গিয়েছিলাম। অছরুরামবাবু বললেন—"চীফ, আপনার যাওয়া হবে না। আপনাকে বাড়ি ফিরতেই হবে।" ঠিক এই সময় একটা খালি রিক্সা নেমে আসছিল। অছরুরাম বললেন—"আপনি এটাতে চড়ে বাড়ি ফিরে যান।" শরীরটা কেমন লাগছিল বলে আমি বাড়ি রাজী হলাম। বললাম, "সর্দার তেজা সিংকে আমার নমস্কার দেবেন।" বলে যেই একটা পা রিক্সাতে দিয়ে উঠতে যাব অমনি সব অন্ধকার হয়ে গেল।

মাসিক ৬০০৲ টাকা উপার্জন করুন

অবসর সময়ে বিশ্ব-বিখ্যাত বোমার ঘড়ির অর্ডার বুক করিয়া। বিনামূল্যে সর্তাবলী এবং স্যাম্পেল ঘড়ির জন্য পত্র লিখুন।

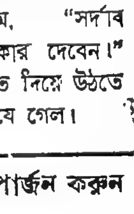

TAJCO (W B C—88)
P. Box 1383, Delhi—6.

কতক্ষণ পরে জ্ঞান ফিরে এল জানি না। চোখ খুলতেই দেখলাম যে আমার একটা হাতের কব্জীতে আঙুল দিয়ে নাড়ী ধরে আছেন আমারই ভ্রাতুষ্পুত্রী রমা দত্ত এবং অন্য হাতটার কব্জী ধরে আছেন কলকাতার প্রবীণ এ্যাডভোকেট অমর বোস মশায়ের ইঞ্জিনীয়ার পুত্রের ইংরেজ বধূ। রাস্তায় লোকারণ্য। কে যেন বলে উঠল—"Chief is coming round." রাস্তার উপরে আমি টান হয়ে শুয়ে আছি। অনেকগুলি কুশন দিয়ে আমার পা দুটো উঁচু করে রাখা এবং চমৎকার নরম একটি রাগ্ দিয়ে আমার সর্বাঙ্গ ঢাকা। এ রকম সুন্দর নরম রাগ্ ও কুশন আমি জীবনে কখনো ব্যবহার করি নি। আমাদের জামাতা কর্নেল দত্ত—সিমলার সিভিল সার্জেন্ট—তখন বাড়িতেও ছিলেন না এবং হাসপাতালেও ছিলেন না। বোধ হয় রোগী দেখতে বের হয়েছিলেন। এমন সময় একটা এ্যাম্বুলেন্স এলো। কে যেন আমার বাড়িতে আমার অসুখের খবর দিয়ে দিয়েছিলেন আমার স্ত্রীকে। তিনিও এসে পড়লেন। আমাকে তুলে এ্যাম্বুলেন্সে ওঠাবার বন্দোবস্ত হচ্ছে দেখে আমি বললাম যে আমি বাড়িতেই যাব। ততক্ষণে সিভিল সার্জেনও এসে গেলেন। তিনি বললেন যে আমাকে হাসপাতালেই যেতে হবে। বুবুরও তাই মত হলো। আমি নিজেই স্ট্রেচারে উঠে বসলাম সিভিল সার্জেনের আপত্তি সত্ত্বেও। এ্যাম্বুলেন্স আমাকে নিয়ে গেল রিপন হাসপাতালে। সেখানে আমাকে স্ট্রেচারে করে উপরে একটা ঘরে নিয়ে গেল। অফিসের কাপড়-চোপড় ছেড়ে রাত-কাপড় পরে বিছানায় শুয়ে পড়লাম। কোন রকম অসুস্থভাব বোধ করছিলাম না তখন। জিজ্ঞাসা করতে জামাতা, সিভিল সার্জেন বললেন যে, নিদেনপক্ষে তিন সপ্তাহ হাসপাতালে থাকতে হবে। রিপন হাসপাতালে ইলেকট্রোকার্ডিওগ্রাম করবার যে যন্ত্রটা ছিল সেটা তখন অব্যবহারে বিকল হয়েছিল সুতরাং হৃদ্‌যন্ত্রের ছবিতোলা সম্ভব হলো না। বেশ ভালই ছিলাম। হঠাৎ তিন দিনের দিন ১৪ই এপ্রিল রাত্রিতে আমার নিশ্বাসের কষ্ট হতে লাগল। চোখ খুলে দেখি চারিদিকে অক্সিজেনের ফানেল। ১৫ই সকালে ট্রাঙ্ক কল গেল অমৃতসরে। এসে পড়লেন ডাক্তার ভিগ ও ডাক্তার মালহোত্রা। কি একটা ইনজেকশন দিলেন নাড়ীর মধ্যে ফোঁটা ফোঁটা করে অনেকক্ষণ ধরে। ঐতেই যেন আমি সামলিয়ে উঠলাম। আমার যখন নিশ্বাসের কষ্ট হচ্ছিল আমি ভেবেছিলাম যে রাস্তায় অনেকক্ষণ ঠাণ্ডায় শুয়েছিলাম বলে বোধ হয় ব্রংকাইটিস হয়েছে। আসলে শুনলাম যে আমার হৃদ্‌যন্ত্র ঠিকমত কাজ না করায় আমার সর্বাঙ্গে জল জমে যাচ্ছিল এবং ফুসফুস দুটোই নাকি প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ জলে ভরে গিয়েছিল এবং সেই জন্যে হাওয়ার অভাবে আমার শ্বাস রোধ হয়ে আসছিল। সে সময়টাতে আমি নাকি জীবনমরণের সীমানার কাছেই পৌঁছে গিয়েছিলাম। আমাদের জামাতা সিভিল সার্জেন কর্নেল পি, সি, দত্ত বুবুর হাত দুখানি ধরে বলেছিলেন—"খুড়িমা, ভগবানকে ডাকুন—আমার যে করবার আর কিছুই নেই।" সেই দুর্দিনে তাঁর ও আমাদের ভ্রাতুষ্পুত্রী রমার যে স্থৈর্য, সমবেদনা ও সেবা-যত্ন আমি দেখেছি ও পেয়েছি তার তুলনা নেই। ডাক্তার মালহোত্রার ইনজেকশনে আমি সেরে উঠলাম। কিন্তু আমাকে ডাক্তাররা হাসপাতাল থেকে ছাড়লেন না প্রায় তিন সপ্তাহের উপর। পরে তাঁরা আমাকে ছাড়লেন এই শর্তে যে বাড়িতে আমাকে আরো তিন সপ্তাহ বিছানায় শুয়ে থাকতে হবে।

মহাত্মা গান্ধী হত্যার আপীলের দিন প্রায় এসে পড়ছিল। কি করা যায়? সর্দার প্যাটেলকে সবিস্তারে চিঠি লিখলাম এবং জিজ্ঞাসা করলাম আমাকে ছুটি দিতে পারবেন কি-না। সর্দার প্যাটেল পত্রপাঠমাত্র দুঃখ জানিয়ে জবাব দিলেন যে আমার ছুটি নেবার কোন দরকার নেই। বাড়ি বসে অফিসের ফাইল দেখলেই চলবে। এতখানি সহানুভূতির পর আর সিমলা ছেড়ে চলে যাওয়া ঠিক হবে না। গান্ধী হত্যার আপীলের শুনানীর ভার দিলাম তিনজন সিনিয়ার জজের উপর—যথাক্রমে অছরুরাম, ভাণ্ডারী ও খোসলা। নতুন এজলাসে তিনজনের সামনে আপীল আরম্ভ হলো। দিল্লী থেকে সলিসিটার-জেনারেল সি. কে. দপ্তরী এলেন সরকার তরফে। আসামীদের তরফে ছিলেন অনেকজন এ্যাডভোকেট। এজলাসে জায়গা ধরে না। পাঞ্জাবী মহিলারা সেজেগুজে সারাদিন বসে থাকতেন কোর্টে এবং সমানে পশম দিয়ে কিছু-না-কিছু বুনতেন। মধ্যাহ্ন বিরতির সময় বাইরের লনে সে কি খাওয়া-দাওয়ার ধুম যেন এক মেলা বসে গেছে। কেউ কেউ নাকি বন্ধু-বান্ধবদের নিমন্ত্রণও করেছিলেন আপীল শুনে মধ্যাহ্নভোজন করবার জন্যে। একটি মেয়ে নাকি সোয়েটার বুনে মুখ্য আসামীকে জজেরা আসবার আগে কোর্টেই তাঁর শ্রদ্ধার্ঘ্য উপহার দিয়ে বসলেন। দিল্লীতে সব খবর পৌঁছে গেল। আমার কাছেও অনুরোধ এলো যে এইসব ভাবাতিশয্যগুলি বড়ই দৃষ্টিকটু হয়ে উঠেছে এবং এগুলিতে সংহত করা প্রয়োজন। অছরুরাম সাহেবকে ডাকিয়ে সব বললাম। তিনি যথাবিহিত ব্যবস্থা করলেন।

ওদিকে আমি শয্যাশায়ী। হাইকোর্টের জজেরা ও এ্যাডভোকেটেরা এবং অন্যান্য লোক-যাঁদের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল তাঁরা প্রত্যহ আমার খোঁজ নিতে আসতেন এবং আমাকে ব্যতিব্যস্ত না করে নিচে থেকেই চলে যেতেন। বার এ্যাসোসিয়েশনের ১৪ই এপ্রিল যে রেজল্যুশন পাশ করেছিলেন তাতে লেখা ছিল:—"At a meeting of the members of the High Court Bar Association held on the 14th April, 1949 prayers were offered for the speedy recovery of Hon'ble the Chief Justice of the East Punjab High Court who has won universal affection and esteem.

"It is further resolved that a sum of Rs. 200/- may be spent for distributing alms amongst the poor people as a mark of thanks giving for the saving of the life of our Chief Justice."

শিখেরা গুরুদ্বারে আমার আরোগ্যলাভের জন্যে চব্বিশ, না, আটচল্লিশ ঘণ্টা গ্রন্থ সাহেব থেকে অখণ্ড পাঠের ব্যবস্থা করলেন। সিমলা কালীবাড়িতে হিন্দুরাও পূজা দিলেন। অসুখের সময় বন্ধুজনাদের শুভেচ্ছা দেহে মনে বল সঞ্চার করে। আমার এই অসুখের সময় পাঞ্জাবের জনসাধারণের কাছ থেকে আমি যে মমতা ও সহানুভূতি পেয়েছি তা সব সময়ে রাজার ভাগ্যেও ঘটে না। পাঞ্জাবীদের গভীর হৃদ্যতার যে স্পর্শ পেয়েছিলাম সেই দুর্দিনে তা আমার জীবনে অক্ষয় সম্পদ হযে সঞ্চিত রয়েছে।

কত রকম গল্পও শুনেছি। যমদূতেরা নাকি কোন এক প্রাক্তন চীফ জাস্টিসকে ধরে নিয়ে আসবার হুকুম পেয়ে আকাশ থেকে দেখল যে একজন চীফ জাস্টিস চলেছেন ড্যাডিকোর দিকে। অমনি ছোঁ মেরে আমার ঘাড়ে পড়েই দেখল যে আমি ত' সেই দুষ্ট চীফ জাস্টিস নই যাকে ধরে আনতে বলা হয়েছিল। তখন নিজের ভুল বুঝে যমদূত আমাকে ফেলেই চলে গেল। তাই নাকি আমি বেঁচে গেলাম সে যাত্রায়! একবার হাইকোর্টের একটি বাঙালী কর্মচারীর কি অসুখ করেছিল। তিনি আমার কাছে এসে তাঁর দুঃখ জানাতে আমি তাঁকে রিপন হাসপাতালে গিয়ে চিকিৎসা করাতে উপদেশ দিলাম। সে উপদেশ শুনেই ভদ্রলোক জিভ কেটে মাথা নেড়ে বললেন—"ওখানে, স্যার, One way trafic—আপনি পুণ্যবান—তাই আপনি ছাড়া আর কেউ সেখান থেকে ফেরে নি।"

এখনো হাসপাতাল সম্বন্ধে মানুষের বিভীষিকা দেখে অবাক হলাম। যাই হোক, বাড়িতে তিন সপ্তাহ বিছানায় কাটানর পর ডাক্তাররা অনুমতি দিলেন বাড়িতে বসে এক তরফা ছোট ছোট মামলা শুনতে। বাড়ির সামনের দিকে কাঁচ দিয়ে ঘেরা একটা ছোট্ট ঘরে ইলেকট্রিক হীটার জ্বালিয়ে কোমর পর্যন্ত পায়ে কম্বল চাপা দিয়ে বসে ছোট ছোট মামলা শুনে সেই-খানে বসেই ফয়সালা করে দিতাম। অর্থাৎ আমার বাড়িতেই কোর্ট বসতে শুরু হোলো। এটা সর্দার প্যাটেলের সৌজন্যেই সম্ভব হয়েছিল। এইরকম কিছুদিন চালিয়ে তারপর ডাক্তারদের অনুমতি নিয়ে রিক্সা করে কোর্টে গিয়ে একতলায় খানা কামরায় যে এজলাস করা হয়েছিল সেখানে কোর্টের কাজ করতাম। পাশের যে চিলতে ঘরটা আগের আমলে বড়লাটের প্যান্ট্রী ছিল সেটা আমার আমলে হোলো চীফ জাস্টিসের খাস কামরা।

[ক্রমশঃ]

সানলাইটে

প্রতিবার

আপনার জামাকাপড়

আরো ঝলমলে ক'রে কাচে

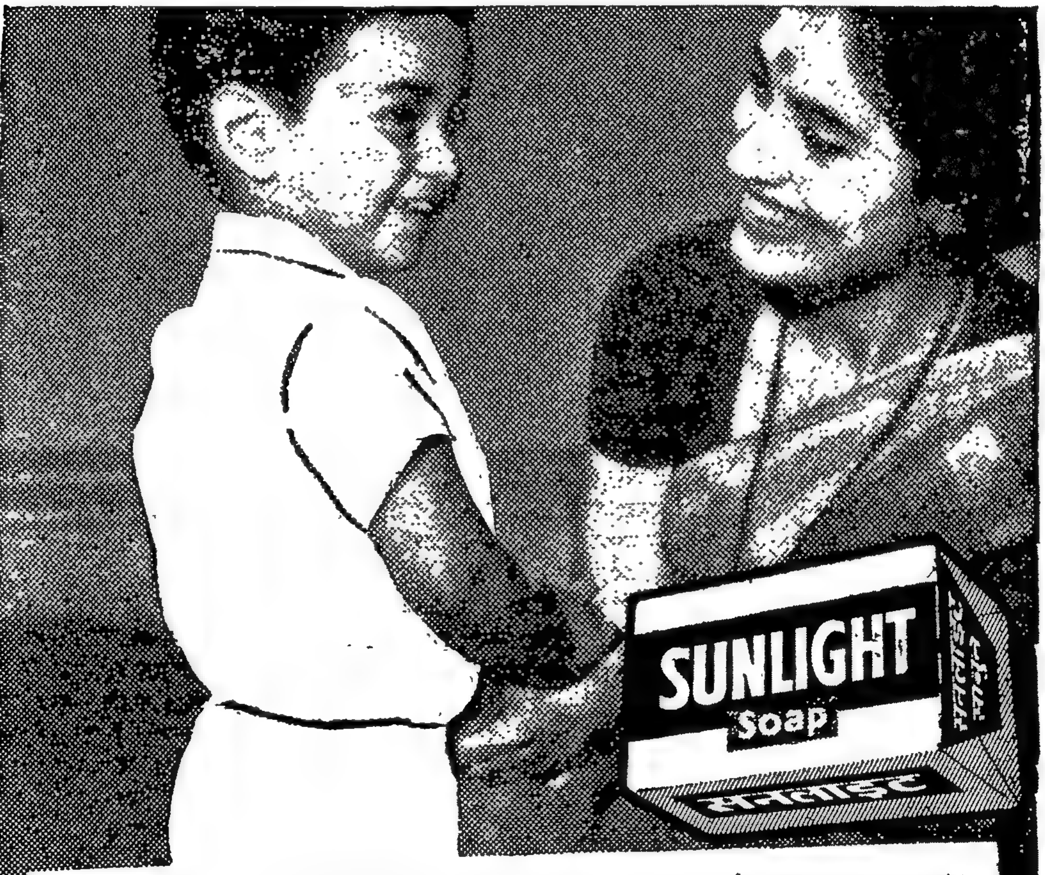

সানলাইট সাবান একবার নিজেই ব্যবহার ক'রে দেখুন···কী চমৎকার ঝলমলে হয় কাপড়চোপড়। দেখবেন, প্রতিবার কাচার সঙ্গে সঙ্গে আপনার জামাকাপড় কেমন আরো বেশী উজ্জ্বল হ'য়ে ওঠে। অল্প একটু ঘষলেই অজস্র ফেনা হবে, আর সেই ফেনা কাপড়চোপড় অনায়াসে সুন্দর পরিষ্কার ঝলমলে ক'রে দেবে। বাড়ীতে সব কাপড়চোপড়ই সানলাইটে কাচুন।

সানলাইটে আপনার

প্রতিদিনের সব জামাকাপড় কাচুন

লিনটাস-S. 62-140 BG (R)

হিন্দুস্থান লিভারের তৈরী

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

প্রায় পনেরো মিনিট এভাবে কাটল। ইতিমধ্যে মাধব দরজায় এসে দাঁড়িয়েছিল। তার হাতে শাণ দেওয়া কাটারিটা ঝকঝক করছিল। দুটি মানুষকে এমন গম্ভীর চেহারা করে বসে থাকতে দেখে ভিতরে ঢুকতে সে সাহস পায় নি। এক মিনিট দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে থেকে আস্তে আস্তে সেখান থেকে সরে পড়েছে। তারপর এসেছিল মাধবের দিদি। রান্না হয়ে গেছে, বাবুরা স্নান করবেন খাবেন। যেন এই কথাই বলতে এসেছিল যুবতী। কিন্তু এমন চুপ করে আছে মানুষ দুটি —নিশ্চয় গুরুতর কোনো ব্যাপার ঘটেছে —অনুমান করে তখুনি সে আবার রান্না-ঘরের দিকে ফিরে গেছে।

'এই রণধীর!' সীতাংশু ডাকল। তেমনি চাপা গর্জনের মতন শোনাল গলার স্বর। 'আমার দিকে তাকা।'

রণধীর চোখ থেকে হাত সরাল. সীতাংশুকে দেখল। সঙ্গে সঙ্গে মুখটা ফ্যাকাশে করে ফেলল। যেন তৎক্ষণাৎ আবার ঘাড় গুঁজে দু' হাতে মুখটা ঢাকতে চেষ্টা করল সে।

'উঁহু, এদিকে তাকা।' সীতাংশু ফের ধমক দিয়ে উঠল।

রণধীর ভয়ে ভয়ে বন্ধুকে দেখল।

'কি হয়েছে, এমন করছিস কেন!' সীতাংশু ঝুঁকে বসল। কটমট করে ডাক্তারের চোখের দিকে তাকাল।

রণধীর বিড়বিড় করে বলল, 'আমার মনে হয়. আমার মনে হচ্ছে তুই আমার একটা কথাও বিশ্বাস করছিস না।'

'কেন!' সীতাংশু প্রায় হেসে উঠল। চোখ দুটো ঝকঝকে হয়ে গেল তার। 'হঠাৎ তোর এমন ধারণা হল কেন শুনি?'

'তোর চোখ দেখে মনে হচ্ছে. তাকানো দেখে মনে হচ্ছে।'

'ও, আমার চোখ দেখে!' এবার সীতাংশু শব্দ করে হাসল। বস্তুত সেই মুহূর্তে তার হাসিটা যে কত ভয়ংকর হয়ে উঠেছিল তার মুখের দিকে তাকালে ডাক্তার বুঝত। কিন্তু তখনি ডাক্তার ঘাড় ঘুরিয়ে নিয়েছে। সীতাংশু বুঝল, তার তাকানো তার হাসি রণধীর সহ্য করতে পারছে না। ঘাড় ঘুরিয়ে পাখির খাঁচা দেখছে।

একটু চিন্তা করল সীতাংশু। তার-পর মুখের হাসি মুছে ফেলে গম্ভীর হয়ে বলল, 'তোর কথা বিশ্বাস করছি না, সবটাই বানানো গল্প, যদি এমন একটা সন্দেহ আমার মনে হয়েই থাকে তো অন্তত এই মুহূর্তে সেটা যে আমি তোকে. বুঝতে দেব না, তোর কাছে গোপন করব· ততটা বুদ্ধি আমার আছে নিশ্চয়ই বিশ্বাস করিস?'

সঙ্গে সঙ্গে রণধীর কোনো উত্তর করল না।

সীতাংশু আবার বলল, 'তা ছাড়া, তোদের স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যে ভালবাসা ছিল, সেটা ভালবাসা না, নেহাত একটা অভিনয় ছিল—কৈ. কোনদিন কি আমি এধরণের কিছু ইঙ্গিত করেছিলাম, না আমার মুখ থেকে এই জাতের কোনো কথা এক আধদিন শুনেছিলি তুই?'

যেন এর পর কী বলতে হবে ডাক্তার বুঝতে পারছিল না। মাথা ধরলে লোকে যেভাবে মাথা ঝাঁকায় সেভাবে দু'বার জোরে সে মাথাটা ঝাঁকাল।

'না, বলছি এই জন্য,' ধীর গম্ভীর গলায় সে বলল, 'কেউ সাক্ষী ছিল না. চতুর্দিকে বনজঙ্গল, এমনি তো ভয়ংকর নির্জন জায়গাটা, তার ওপর নিশুতি রাত, আমার ঘড়িতে তখন বারোটা বেজে দশ—'

'তুই থাম, চুপ কর।' সীতাংশু মুখ বেঁকাল। 'নিশুতি রাত, তোরা দুজন ছাড়া সেখানে আর কেউ ছিল না, কাজেই তোর স্ত্রী কেমন করে হঠাৎ সাঁকো থেকে পড়ে গিয়ে গলার হাড় ভাঙল মাথায় চোট পেল তাই নিয়ে আমি তোকে চুলচেরা জেরা করতে লেগে গেছি—তাই না?'

'না, আমি কেন আগে তোর কাছে ছুটে এলাম না, মোটরবাইকটা সঙ্গেই ছিল, এসে তোকে খবর দিতে পারতাম. তোর লোকজন ছিল, একা আমার পক্ষে খাদের ভেতর নেমে একটা মানুষকে খুঁজে বার করা কি সেখান থেকে তাকে টেনে তোলা যখন সম্ভব ছিল না. তা ছাড়া কুয়াশার অন্ধকারে কোথায় ও ছিটকে পড়েছে—খাদের কতটা নিচে চলে গেছে বোঝা মুশকিল ছিল, আমার সঙ্গে আলো ছিল না। ভাবলাম, যদি লোকজন ডাকতেই হয় সাঁকো পার হয়ে খানিকটা এগিয়ে যাওয়াই ভাল, কেন না ওদিকে আমার এক পেশেণ্ট থাকে সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে গেল। পাঁচ-সাত মিনিটের মধ্যে তার বাড়ি পৌঁছে যেতে পারব, তোর কাছে এসে তোকে খবর দিয়ে লোকজন জোগাড় করে নিয়ে যেতে দেরি হয় যেত।'

'তারপর?' সীতাংশু আবার একটা চাপা নিশ্বাস ফেলল। 'লোকজন এসে-ছিল?'

'হুঁ, অনুকূল তার দু' ভাই এবং এক ভাগ্নেকে আমার সঙ্গে দিল। অনুকূল

মণ্ডল। আমার অনেকদিনের পেশেণ্ট। জাতে ছুতোর। জাতব্যবসা করে না এখন তারা। সবাই আজ প্রায় চা-বাগানের কাজে লেগে গেছে। সেখান থেকে দুটো মশাল জেবলে নিয়ে চারজন ঊর্ধ্বশ্বাসে সাঁকোর কাছে ফিরে এলাম। গাড়িটা অনুকূলের বাড়িতে রেখে এলাম। অনুকূলের দু' ভাই একটা মশাল নিয়ে খাদের ভেতর নেমে গেল। ভাগ্নে ও আমি আর একটা আলো নিয়ে পাড়ে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগলাম। আমার ধারণা ছিল ঢালু বেয়ে তারা অনেকটা নিচে নেমে যাবে, কিন্তু দেখললাম, খানিকটা নেমে তারা যেন থেমে গেল। কেন না তাদের হাতের মশালটা এক জায়গায় স্থির হয়ে আছে। কুয়াশার জন্য ওপর থেকে মানুষজন কিছু বোঝা যাচ্ছিল না, কেবল আলোটাই চোখে পড়ছিল। হঠাৎ যেন তারা তাদের ভাগ্নের নাম ধরে চিৎকার করে ডাকছিল। হুঁ, নারান। নারানের সঙ্গে আমিও ঢালু বেয়ে নালার ভেতর নেমে গেলাম। তুই তো কতবার সাঁকোটা পার হয়েছিস। নিশ্চয় লক্ষ্য করে থাকবি দুটো পাড়ই খাড়া হয়ে নিচের দিকে নেমে যায় নি. তোদের দিকে মানে টিয়াটুনির দিকের পাড়টা খুব খাড়া. যেন হঠাৎ নিচের দিকে চলে গেছে. কিন্তু ওধারটা বেশ গড়ানে, এবং ঢালুর সবটাই মাদার ও আশস্যাওড়ার ঝোপঝাড়ে ভরতি।'

'একটু সংক্ষেপ কর রণধীর, একটু ছোট করে বল।' সীতাংশুর ভিতরটা যে কত উত্তেজিত অসহিষ্ণু হয়ে আছে তার চোখ দেখে বোঝা যাচ্ছিল। ঐ অবস্থায় নূতন করে সে হাসল। 'অতশত বর্ণনা না দিলেও আমি তোর কথা বিশ্বাস করতাম তোদের স্বামী-স্ত্রীর ব্যাপার, আমি বিশ্বাস না করার কে বল্ তো ?

শিশুর মতন ফ্যালফ্যাল করে বন্ধুর দিকে তাকিয়ে রইল ডাক্তার। মুখটা আবার পাংশু হয়ে গেল।

'মানে ঝোপঝাড়ের ভেতর আটকে রইল মানুষটা, গড়িয়ে খাদের একেবারে তলায় চলে যায় নি, এই বলতে চাইছিস তো?' সীতাংশু তীক্ষ্ণ চোখে রণধীরকে দেখছিল।

রণধীর ঘাড় নেড়ে আস্তে আস্তে বলল. 'তা হলেও ওখানটায় কিছু পাথর-টাথর পড়ে ছিল. এই জন্যই ঘাড়ে মাথায় এতটা চোট লাগল। তা না হলে. শুধু ঘাস মাটির ওপর পড়লে—'

'বুঝলাম, বুঝলাম. তারপর ?'

'চারজন ধরাধরি করে ওকে সেখান থেকে তুলে আনলাম, সেন্স ছিল না. অনুকূলের ভাইয়েরা তখনি আবার ছুটে গিয়ে ওদের ওদিক থেকে একটা ট্রাক জোগাড় করে নিয়ে এল। তখন রাত দুটো। ব্রততীকে গাড়িতে তুলে নিয়ে চারজনই পিয়ালীছড়া রওনা হয়ে গেলাম। ছোট হাসপাতাল, এসব অঞ্চলের ব্যাপার কিছু কিছু জানিস তুই, ডাক্তারও সব আমার মতন। কেস্‌টা অত সিরিয়াস না হলে ব্রততীকে আমি রাণীরবাগ নিয়ে যেতাম, বাড়িতে রেখে শুশ্রূষাটুশ্রূষা করে নিজেই চেষ্টা করে দেখতাম, কতটা কী করা যায়, কিন্তু সাহস পেলাম না।'

'হুঁ, তারপর ?'

'ঐ তো বললাম, হাসপাতালে নিয়ে যাবার পর মাত্র আধঘণ্টা প্রাণটা ছিল, ঠিক ঊনত্রিশ মিনিট, জ্ঞান আর ফিরে আসে নি যদিও, ঘড়িটা চোখের সামনেই ধরে রেখেছিলাম। হুঁ, ও এক্সপায়ার করল আর সেই মুহূর্তে পূর্ব দিকটা লাল হয়ে উঠল।'

'চমৎকার !' যেন পূব আকাশের মতন উজ্জ্বল হাসির ছটায় সীতাংশুর চোখ মুখও লাল হয়ে উঠল। 'ঠিক ঊষালগ্নে ব্রততী স্বর্গে চলে গেল, তাই না ?'

হঠাৎ এই হাসি দেখে চোখ বড় করে বন্ধুর দিকে তাকিয়ে রইল রণধীর। এই হাসির মধ্যে কতটা আনন্দ কতটা ক্রোধ ছিল বুঝতে না পারার মতন শিশু ছিল না সে। আস্তে আস্তে আবার মাটির দিকে চোখ নামিয়ে একটা গাঢ় নিশ্বাস ফেলল। যেন কপালের রগ টিপে ধরতে হাতটা তুলতে চেয়েছিল, কিন্তু কি ভেবে নিরস্ত হল।

'শোন শোন্ !' সীতাংশু ডাকল। 'এদিকে তাকা।'

রণধীর চোখ তুলল না। কাঠের মতন শরীরটা শক্ত করে রেখে পায়ের কাছের মাটি দেখতে লাগল।

'দুঃখ করে লাভ নেই।' সীতাংশু সোজা হয়ে বসল। দরজার দিকে চোখ ফিরিয়ে বেশ দরাজ গলায় বলল. 'নিয়তি, নিয়তি ছাড়া আর কী বলা যেতে পারে একে, হুঁ, ব্রততীর এই মৃত্যু। বলছিস, বেচারা সাংঘাতিকরকম রোমাণ্টিক ছিল, ওদিকে আবার অসতর্কও ছিল, সাঁকোর ওপর উঠে জ্যোৎস্না আর কুয়াশা দেখে ছেলেমানুষ হয়ে গিয়েছিল, আমি বলব ওর নিয়তি ওকে এমন করে দিয়েছিল, তা না হলে পচা বাঁশের ওপর ঝুঁকতে যাবে কেন। কাজেই, আমি যা মনে করি, এখন আর শোক করে দুঃখ করে লাভ নেই—একুশ বছরের পরমায়ু নিয়ে বেচারা আমাদের মধ্যে এসেছিল, দুদিন হেসে-খেলে তারপর যেখানে যাবার—'

যেন ডাক্তারকে প্রবোধ দিতে, তার মনে সান্ত্বনা দিতে সীতাংশু বিশেষ যত্নবান হয়ে উঠল। সেরকম শোনাল তার গলার স্বর।

কিন্তু ডাক্তার তৎক্ষণাৎ দু' হাত দিয়ে মুখ ঢাকল।

সীতাংশু খুব একটা বিস্মিত হল না।

দরজার বাইরে মাধব আবার ঘুরঘুর করছিল। তার দিদিও রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এসে আর একবার এখানে উঁকি দিয়েছিল। কিন্তু দু'টি মানুষকে ঠিক একভাবে চুপচাপ বসে থাকতে দেখে ফিরে গেছে। অঘ্রাণের সূর্য ইতিমধ্যে ঢলে পড়েছে। চৌকাঠের কাছে রোদের রেখা দেখে সীতাংশু বুঝতে পারল।

'এই রণধীর !' ডাক্তারের কাঁধে হাত রাখতে গিয়ে চমকে উঠল সে। 'কী আশ্চর্য। তুই কাঁদছিস ? শোন্, আমার দিকে তাকা।' সীতাংশু তার মুখের সামনে ঝুঁকে পড়ল।

রণধীর তাকাল না। মুখ থেকে হাত সরাল না।

'তুই সত্যি আমায় অবাক করলি।' গলা দিয়ে আক্ষেপের মতন একটা সুর বার করল সীতাংশু। 'বৌ মরে গেলে পুরুষমানুষ এভাবে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে আমি জানতাম না।' একটু থেমে থেকে চৌকাঠের হলদে রোদের রেখাটা

বি. সি. মাইতি এণ্ড কোং

—ইলেকট্রো প্লেটিং সামগ্রী—

নিকেল ভাট ও ব্যারেল * ডাইনামো * পলিশিং মেসিন এবং প্লেটিং করিবার জন্য যাবতীয় সামগ্রীর আদি সরবরাহক।

শো রুম :—৯৭, প্রেমচাঁদ বড়াল স্ট্রীট, কাল-১২। ফোন : ৩৪-৩১৭৩

৩, রামমোহন পাল লেন, কলি-১২ : অফিস-ফোন—৩৪-৪৮৪৬

দেখতে দেখতে অনেকটা স্বগতোক্তির মতন করে আবার বলল, 'আরে, কথায় আছে, ভাগ্যবানের বৌ মরে, শুনিস নি?' —

'ও, তা হলে তুই বলতে চাস ব্রততী মরে যাওয়াতে আমি সুখী হয়েছি, তোর কথার ধরণে মনে হয়, যেন তার সঙ্গে এতকাল আমার এমন সম্পর্কই ছিল, রাত্তদিন আমি কেবল তার মৃত্যু কামনা করেছি—'

'আহা-হা তা কেন হবে, এমন কথা আমি বলব কেন।' রণধীর এভাবে রুখে উঠবে, কান্নায় তার গলার স্বর এমন বিকৃত হয়ে উঠবে, সীতাংশু ঠিক আশা করে নি, কিছুটা অপ্রস্তুত হল সে, লজ্জা পেল না,—তা হলেও খুব যেন লজ্জা পেয়েছে এমন ভান করে ডাক্তারের হাত দুটো তাড়াতাড়ি জড়িয়ে ধরল। 'ছি, তোর ও ব্রততীর সম্পর্কে এমন ধারণা আমার কোনোদিনই ছিল না, আদর্শ স্বামী-স্ত্রী বলতে তোদের দুজনকেই আমি জানতাম, জেনেছি। না, বলছি এই জন্য, যে মানুষ চলে গেল—এখন কেঁদে খুন হলেও সে আর ফিরে আসবে না, এসেছে কি কেউ কোনোদিন? এখন কথা হচ্ছে, তুই এবার নিজের দিকে তাকা, নিজেকে দ্যাখ, চেহারাটা কী করেছিস। পোষাক-আসাকের এই অবস্থা, আমি তো দেখে প্রথম চিনতেই পারি নি, যেন কতকাল চান নেই, খাওয়া নেই, ঘুম নেই, সারা মুখে দাড়ি—'

'আমার যে কিছুই করতে ইচ্ছে করছে না সীতাংশু।' রণধীর এবার শিশুর মতন হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল। 'খেতে ইচ্ছে করছে না, মাথায় চিরুনি চালাতে ভুলে গেছি, দু'দিন দাড়ি কামাই নি। আমি যে সব সময় চোখের সামনে ওর মুখটা দেখতে পাচ্ছি, ওর হাত—আমার জুতোর লেস্ বেঁধে দিচ্ছে, গায়ের কোট এগিয়ে দিচ্ছে, আমার খাবার নিয়ে বসে আছে, চোখে ঘুম না এলে কপালে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। কতদিন ইচ্ছে করে মাথা এলো-মেলো করে রেখেছি, সঙ্গে সঙ্গে ও ধমক দিয়েছে, চিরুনি তুলে নিয়ে নিজের হাতে চুল পাট করে দিয়েছে, যেন আমি একটি শিশু, ও ছাড়া আমাকে কেউ দেখার ছিল না। শিয়রের জানালার কোন পাল্লাটা খুলে রাখতে হবে কোনটা বন্ধ করতে হবে ও ঠিক করে দিয়েছে, টিনের সিগারেট ফুরিয়ে গেলে নতুন করে সিগারেট ভরে দিয়েছে—'

'হুঁ, তাই তো!' এই পর্যন্ত শুনে সীতাংশু একটা গাঢ় নিশ্বাস ফেলল। 'তোদের দাম্পত্য প্রেমের তুলনা ছিল না।'

'কিন্তু আজ? আমার ঘর শূন্য আমার সংসার মরুভূমি, আমি নিঃসঙ্গ, কেউ আমাকে দেখবার নেই।' হাতের মুঠি দিয়ে রণধীর কপাল ঠুকল। 'আর আমার বাঁচতে ইচ্ছে করছে না, ইচ্ছে করছে, ইচ্ছে করছে—' কপাল ছেড়ে বুক চাপড়াতে লাগল সে।

'কী আশ্চর্য। তুই এমন আরম্ভ করলি!'

সীতাংশু তার হাত চেপে ধরল। 'এতটা উতলা হলে তো চলবে না রণধীর, শোন্ আমার কথা—'

'আমার ইচ্ছে করছে ওই সাঁকোর ওপর থেকে লাফিয়ে পড়ে নিজেকে শেষ করে দিই—আমার আর বেঁচে থাকার কোনো অর্থ হয় না। কী নিয়ে আমি বাঁচব, কাকে দেখে বাঁচব—'

'তবু তোকে বাঁচতে হবে। ছেলে মরে গেলে মানুষ শোক করে, ভাই মরে গেলে শোক করে, স্বামী মরে গেলে শোক করে—' সীতাংশু বোঝাল। 'কিন্তু শেষ পর্যন্ত সবাইকে বেঁচে থাকতে হয়, কাজ-কর্মও করতে হয়, খাওয়া-পরা ঘুম বিশ্রাম—পৃথিবীর নিয়মগুলো আবার আগের মতন না মেনে চলে তার উপায় থাকে না। হয়তো শোক ভুলতে সময় লাগে, বিচ্ছেদের ক্ষত শুকোতে দেরি হয়। কিন্তু—'

ঠিক সেই সময় মাধবের দিদি এসে ঘরে ঢুকল।

মাধব এসে দরজায় দাঁড়াল। তারা অধৈর্য হয়ে উঠেছিল। মাধব তেমন কিছু আঁচ করতে না পারুক, তার দিদি ঠিক বুঝতে পেরেছিল, একটা বিপদ ঘটেছে ডাক্তারবাবুর; যেন কেউ মারা গেছে। ইতিমধ্যে একবার একটু সময় দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে কান পেতে থেকে একটা দুটো কথা সে শুনেও ফেলেছে। যেন এই জন্যই একটা অস্বস্তি ও উদ্বেগ নিয়ে শেষ পর্যন্ত সুখী দুজনের সামনে এসে দাঁড়াল। সীতাংশু তাকে দেখে আর চুপ করে থাকল না। এবং মাধবের দিদিকে দেখে রণধীর, এটা সীতাংশু লক্ষ্য করল; যেন আরও বেশি অস্থির শোকাকুল হয়ে উঠল। 'আমায় মরতে দে, এখনি আমি ছুটে গিয়ে ওখান থেকে লাফিয়ে পড়ি—' যেন সীতাংশুর হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বাইরে ছুটে যাবার জন্য সে ধস্তা-ধস্তি আরম্ভ করে।

'এবার আমি মারব কিন্তু রণধীর।' সীতাংশু এবার চোখ লাল করে। 'আমার এখানে যখন এসে গেছিস—এভাবে কিছুতেই তোকে মরতে দেব না, এটা তুই ভাল করে জানিস।'

মাধবের দিদিকে দেখে সীতাংশু একটু স্বস্তিবোধ করে।

'ডাক্তারবাবুর স্ত্রী মারা গেছেন। পরশু রাত্রে সেই বাঁশের সাঁকোটা পার হতে গিয়ে বিপদ ঘটে। ডাক্তারবাবুর স্ত্রী সাঁকো থেকে নিচে পড়ে যান। মাথায় শক্ত চোট লাগে। রাত্রেই পিয়ালী-ছড়ার হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ভদ্রমহিলাকে বাঁচান গেল না।'

মাধবের দিদিকে হেঁয়ালীর মধ্যে রাখল না সীতাংশু। খুঁটিয়ে সব বলল।

'এ্যাঁ, কী বলছেন, কেমন করে পড়ে গেল!' অস্ফুট আর্তনাদের মতন একটা শব্দ করে সুখী পরমুহূর্তে স্তব্ধ হয়ে গেল। যেন আর কিছু সে বলতে পারছিল না, মুখ দিয়ে কথা সরছিল না।

বিমূঢ় ভাবটা কাটিয়ে উঠতে একটু সময় লাগল তার। তারপর আঁচলের কোণা দিয়ে সে চোখ মুছল এবং সীতাংশুর দেখাদেখি, অস্থির শোকার্ত মানুষটাকে সান্ত্বনা দিতে প্রবোধ দিতে রণধীরের সামনে ঝুঁকে দাঁড়াল।

'না, এমন করবেন না, এতটা উতলা হলে তো আপনাকে চলবে না ডাক্তার-বাবু! একটু শক্ত হোন, একটু ধৈর্য ধরুন।'

সীতাংশু অবাক হল, সঙ্গে সঙ্গে রণধীর যেন ধৈর্য ধরল, চুপ থেকে মাধবের দিদির মুখটা দেখল।

সুখী আর একবার আঁচল দিয়ে চোখ মুছতে মুছতে অনেকটা নিজের মনে বলল, 'আহা, সোনার মানুষ ছিলেন, এমন অকালে সোনার সংসার অন্ধকার করে দিয়ে চলে গেলেন।'

তার কথা শুনে দুজন পুরুষ এক সঙ্গে দীর্ঘশ্বাস ফেলল। এতক্ষণ যেন থেকে থেকে এ-ঘরে শোকের ঘূর্ণি হাওয়া উঠছিল, হঠাৎ হাওয়াটা বন্ধ হয়ে গিয়ে ঘরের ভিতরটা কেমন থমথম করতে লাগল। আর একটি পুরুষ এসে পা টিপে টিপে তিনজনের পিছনে দাঁড়ায়। মাধব। কিন্তু তাকে দেখেও তার সঙ্গে কেউ কথা বলল না।

'উনি সতী ছিলেন, তাই সিঁথির সিন্দুর নিয়ে স্বর্গে চলে গেলেন।' সুখী এবার আঁচল দিয়ে নাকের ডগাটা মুছল। রণধীরের দিকে চোখ রেখে বলল, 'কিন্তু আপনাকে তো বুক বাঁধতে হবে, উনি আর ফিরে আসবেন না ঠিকই, কিন্তু আপনাকে তো এভাবে শরীর মন নষ্ট করলে চলবে না।'

'আমার আর একবিন্দু ইচ্ছে নেই বেঁচে থাকার।' রণধীর এবার সোজা হয়ে বসল। ক্লান্ত চোখ দুটো সুখীর মুখের ওপর মেলে ধরে আস্তে আস্তে বলল, 'আমার গায়ের পোষাকের অবস্থা দেখছ, কাল থেকে আমার স্নান নেই, খাওয়া নেই, ঘুম নেই, আর—আর আমার ঘরে গিয়ে যদি দেখ, আমার সেই সাজান ঘর—আমার সেই তক্‌তকে ঝক্‌ঝকে

গোছান ঘর দু'দিনের মধ্যে কেমন এলো-মেলো ছত্রখান হয়ে গেল—' এই পর্যন্ত বলে রণধীর আর বলতে পারল না। নূতন করে তার শোক উথলে উঠল। চোখে হাত চাপা দিয়ে ঘাড় গুঁজে কাঁদতে আরম্ভ করল।

যেন ঠিক সেই মুহূর্তে ডাক্তারবাবুর মাথায় হাত রেখে সান্ত্বনা দিতে পারলে সুখীর ভাল লাগত, তা অবশ্য সে আর করল না, তা হলেও যতটা সম্ভব নুয়ে মুখের কাছে মুখ নিয়ে করুণ সুরে বলল, 'আপনি চান করে দুটি ভাত খান, তারপর বিশ্রাম করুন। আমার রান্না হয়ে গেছে। আর আপনার ঐ পোষাকটা ছেড়ে ফেলুন। আমি জামাকাপড় দিচ্ছি।'

'হুঁ, তাই তো।' সীতাংশু ঘাড় নাড়ল। 'বাক্সে অতিরিক্ত জামাকাপড় তোলা আছে। মাধবের দিদি ধুয়ে ভাঁজ করে আমার জন্য সব সময় রেডি রাখে। স্নান করে সেসব পরতে পারবি। আর তোর গায়ের ময়লা জিনিসগুলো ছেড়ে দে—এ-বেলা কিছু রাণীরবাগ ফিরে যাচ্ছিস না, মাধবের দিদি সাবান দিয়ে কেচে আবার ইস্ত্রীটিস্ত্রী করে দেবে।'

'এবেলা কেন, আমার তো মনে হয় এখানে ডাক্তারবাবুর অন্তত দুটো দিন থেকে যাওয়াই ভাল। ওখানে কে তাঁর দেখাশোনা করে, যত্ন নেয়। চেহারাটা কী ভীষণ খারাপ হয়েছে।' সরাসরি ডাক্তারবাবুকে প্রস্তাবটা না দিয়ে সীতাংশুর মুখের দিকে মুখ ফিরিয়ে সুখী কথাটা বলল।

'তাই তো।' সীতাংশু খুশি হল। 'খুব ভাল কথা।' ডাক্তারের দিকে ঘাড় ফেরাল সে। 'সেখানে কে তোর দেখাশোনা করবে, কে নিয়মমত রেঁধে খাওয়াবে। এখানে তুই দুদিন তিনদিন কেন—যে ক'দিন ভাল লাগে থেকে যা।'

'আমার তো মনে হয় বনজঙ্গল হলেও আপনার খারাপ লাগবে না এখানে।' সুখী সঙ্গে সঙ্গে বলল।

'খারাপ লাগবে কেন।' সীতাংশু সামান্য হাসল। 'নতুন জায়গা না, কবারই তো আমার ডেরায় এসেছিস।' বন্ধুর হাত ধরে আস্তে ঝাঁকুনি দিল সে। 'নে, এইবেলা উঠে চানটান কর্, হুঁ, আগে মুখটা কামিয়ে নে. টেবিলে সাবান রেজার আয়না সব রয়েছে।'

কিন্তু তাতে কি রণধীর সন্তুষ্ট হল. তার মনে সান্ত্বনা ফিরে এল? কাতর চোখ মেলে সীতাংশুকে একটু সময় দেখল সুখীকে দেখল. তারপর দু' হাতে চোখ ঢেকে মাথাটা ঝাঁকাতে আরম্ভ করল, কাঁদতে আরম্ভ করল।

'কী হল! আবার এমন করছিস!' সীতাংশু রুষ্ট হল।

'আমার ঘর, আমার রাণীরবাগের সাজান বাংলো।'

'হুঁ, দুদিন এখানে বিশ্রাম কর্, তারপর বাংলোয় ফিরে যাবি। এত অস্থির হচ্ছিস কেন।'

'কিন্তু আমার ঘর যে আজ কাটাবন হয়ে আছে সীতাংশু, সেখানে কেমন করে আমি ফিরে যাব।'

'আশ্চর্য।' এবার সুখী কথা বলল। 'এই নিয়ে এখন আপনি মাথা ঘামাচ্ছেন, ঘর আবার গোছানো হবে সাজান হবে, কাটাবন আবার বাগান হবে, আগে নিজের শরীর দেখুন স্বাস্থ্যের কথা ভাবুন।'

সীতাংশু আর কিছু বলল না। খাঁচার পাখিটাকে দেখতে লাগল। বড় বেশি ছটফট করছে. যেন বনে উড়ে যেতে চাইছে। অথচ একটু আগে সুখী আদর করল বুকে নিয়ে চুমু খেল।

'আমি একদিন গিয়ে ঘরটা গুছিয়ে দিয়ে আসব, হয়তো ও'র মতন পারব না, আপনার স্ত্রী যেমন করে গুছোত, তা হলেও আমার কাজ আপনার খারাপ লাগবে না।' ডাক্তারকে বোঝাচ্ছিল, প্রবোধ দিচ্ছিল মাধবের দিদি।

(ক্রমশঃ)

মুক্তার মত ঝকঝকে উজ্জ্বল…

আপনার দাঁত হবে সাদা ধবধবে, দাঁতের মাড়ী নীরোগ থাকবে আর মুখের দুর্গন্ধ দূর হবে, আপনি শুধু ডেণ্টনিক দিয়ে দাঁত মাজা অভ্যাস করুন।

ক্লোরোফিল মিশ্রিত ডেণ্টনিক পাইওরিয়া সারাতে সাহায্য করে।

যাঁরা টুথ পাউডারের জায়গায় পেষ্ট ব্যবহার পছন্দ করেন তাঁদের জন্য জনপ্রিয় ডেণ্টনিকের সমস্ত গুণসম্পন্ন টুথ পেষ্ট বাজারে প্রচলন করা হইয়াছে। ধবধবে দাঁত আর মন-ভোলান হাসি যাঁরা পছন্দ করেন তাঁরাই চান ডেণ্টনিক টুথ পেষ্ট।

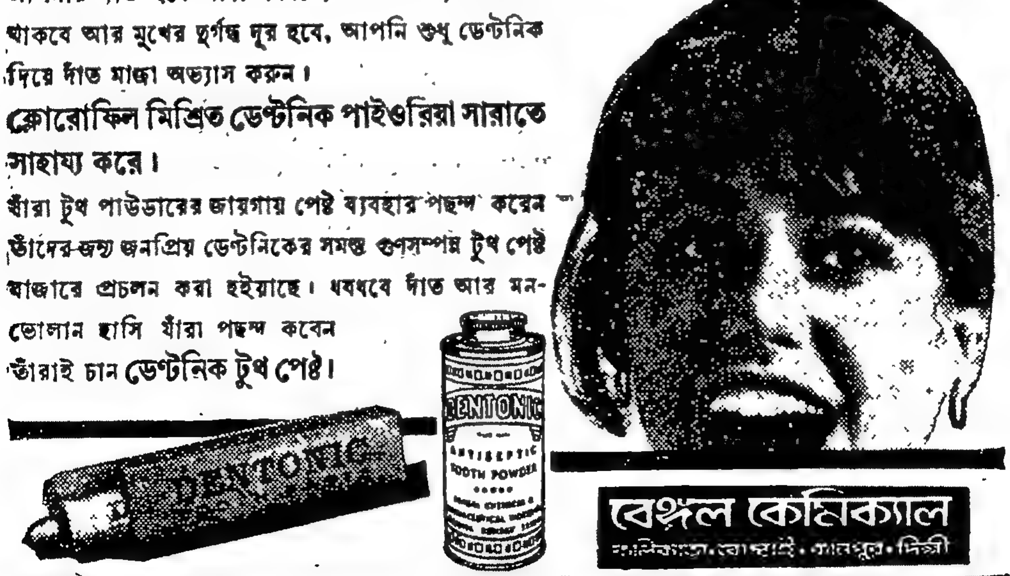

ইয়োরোপা / হিরন্ময় ভট্টাচার্য

টোরি পার্টি পুরোনো সাম্রাজ্যবাদী। ওদের কোডে উদারতা বলে কোন কথা নেই। প্রয়োজনই সব। সেই ছাঁচে ঢেলে আইন পাশ হবে। ওরা ত' চার্চিলের দল। ভারতের স্বাধীনতার কথা উঠলেই তিনি অগ্নিশর্মা হতেন। দেউলে হবার জন্যে তাঁরা গদি দখল করেন নি। গত মহাযুদ্ধের পর লেবার পার্টির ক্লেমেণ্ট এটলি হলেন প্রধানমন্ত্রী। ভারত স্বাধীন হল। আমরা গরীব। গরীব ও মধ্য-বিত্তের জন্যে লেবার পার্টি। তাই তাদের সঙ্গে আমাদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ। টোরি পার্টির সঙ্গে আমাদের ঠিক খাপ খায় না।

১৯৬২ সালে টোরি পার্টি বহিরাগত নিয়ন্ত্রণের জন্যে ইমিগ্রেশন বিল পাশ করেন। লেবার পার্টির নেতা গেটস্কেল তখন জোর গলায় বলেন, তাঁরা গদি ফিরে পেলে এ বিল নাকচ করবেন। বর্ণ-বৈষম্যের তাঁরা ঘোর বিরোধী। আদর্শ-বাদে তাঁদের পরম আস্থা।

১৯৬৪ সালে সাধারণ নির্বাচনের আগে ছড়া বেরিয়েছিল, "If you want a neighbour Nigger vote Labour"—নিগ্রো প্রতিবেশী চাইলে লেবারকে ভোট দাও। মনে আছে, হ্যারল্ড উইলসন তখন লেবার পার্টির নেতা। এক নির্বাচনী সভায় গেছেন, শ্রোতারা অধিকাংশ বৃদ্ধ। তাঁরা লেবার পার্টির "কৃষ্ণ"প্রীতির কথা উল্লেখ করেন। উইলসন উত্তর দেন, কমনওয়েলথের ডাক্তাররা যদি এদেশে না আসত, শ্রোতাদের মধ্যে অনেকেই হয়ত চিকিৎসার অভাবে মারা যেত।

টোরি পার্টির পিটার গ্রিফিথস পার্লামেন্টের সভ্য হন পেট্রিক গর্ডন ওয়াকারকে হারিয়ে। ওয়াকার লেবার পার্টির একজন কর্ণধার। বর্ণবৈষম্যের ভিত্তিতেই মিঃ গ্রিফিথস-এর জয়। উইলসন তাঁকে পার্লামেন্টের কুষ্ঠরোগ বলে ঘোষণা করেন।

সে লেবার পার্টি কি ইতিহাসের পাতায় উঠে গেছে। ক্ষমতাশালী লেবারের রূপ বদলেছে। উদারতা আর জাতীয়তা-বোধ দুটোই ভালো। কিন্তু একটার সঙ্গে অন্যটার যদি সংঘাত হয়—কোনটা বেছে নেওয়া সঙ্গত। কঠিন সমস্যা। রায় দেওয়া মুস্কিল। বিশেষ করে জন-সাধারণের ভোটের ওপর যাদের পরমায়ু, শুধু আদর্শবাদ ভাঙিয়ে চলে না।

বর্ণবৈষম্যবিরোধী পেট্রিক গর্ডন ওয়াকার। দু'বার নিরাপদ লেবার পার্টি নির্বাচনী এলাকা থেকে হেরে গেলেন। লেবার পার্টি ঠেকে শিখল। ইমিগ্রেশন আইন উঠল না। বরং আইনের বাঁধন আরও শক্ত হল। আরও অনেক আইন হল যাকে ঠিক উদারতার পরিপন্থী বলা যায়।

এখন টোরি পার্টি ও লেবার পার্টির মধ্যে রেষারেষি, কে কাকে টেক্কা দিতে পারে। কালা আদমিদের ওপর কে কত কড়া হতে পারে। এই ভাঙিয়ে তাদের ভোট সংগ্রহ।

বর্তমান সমস্যায় আসি। টোরি পার্টির দুজন নেতা, মিঃ ডানকান স্যান্ডস ও মিঃ ইনক পাওয়েল শুরু করলেন হৈ হৈ। সর্বনাশ হয়ে গেল। কালো লোকে ছেয়ে গেল দেশটা, ১৯৬৩ সালে কেনিয়া স্বাধীন হয়। তখন সে দেশের বহু ভারতীয় ও পাকিস্তানী বৃটেনের নাগ-রিকতা গ্রহণ করে। সুতরাং, তারা সর-কারী ইমিগ্রেশন আইনের আওতায় পড়ে না। যখন খুশি এদেশে আসতে পারে।

কেনিয়াও ইমিগ্রেশন আইন করেছে। ব্যবসা-বাণিজ্য শিল্প-প্রতিষ্ঠান অফিস-আদালত কেনিয়ার নাগরিক দিয়ে চলবে। নামে কেনিয়ানাইজেশন আসলে আফ্রিকা-নাইজেশন। শুধু কালো হলে চলবে না। সুবিধে কুড়োতে হলে ঘোর কালো হতে হবে। কেনিয়ার আদিবাসী ছাড়া অন্য কেউ সুখে-স্বচ্ছন্দে থাকতে পারবে না। বৃটেনের নাগরিকরা সেখানে নিরা-পত্তার অভাব অনুভব করে। আস্তে আস্তে ব্যবসা-বাণিজ্য গুটিয়ে বিলেতে চলে আসছে। দু-চারজন ভারতেও ফিরে যাচ্ছে। একটা কথা বলা খুব সঙ্গত। এদের অধিকাংশ সুশিক্ষিত, অভিজ্ঞ ব্যবসায়ী, কর্মঠ ও বিত্তবান। কেনিয়ার অধিকাংশ ব্যবসা-বাণিজ্য এদের হাতে ছিল।

ডানকান স্যান্ডস গেলো গেলো রব তুললেন। দেশটা আর সাদা থাকবে না। কালোয় ভরে যাবে। আরও মজার কথা ১৯৬৩ সালে কেনিয়া স্বাধীন হয়। তখন ডানকান স্যান্ডস ছিলেন কমনওয়েলথ বিভাগের মন্ত্রী অর্থাৎ তাঁরই হাত থেকে কেনিয়াবাসী এশিয়ানরা বৃটেনের নাগ-রিকতা পায়। তিনি চাইছেন ইমিগ্রেশন আইন বদলান হোক। এই বৃটেনের নাগরিকদেরও বিদেশীর দলে ফেলা হোক।

এদেশের জনসাধারণ তাই চায়। দুদিনে স্যান্ডস-এর সমর্থক বেড়ে গেল। অধিকাংশ কাগজ সেই সুরে সুর মেলাতে লাগল। অসত্য অর্ধসত্য ঘটনা দিয়ে লোককে সন্ত্রস্ত করে তুলল।

লেবার সরকার আদর্শ ও উদারতা অনেক দিন জলাঞ্জলি দিয়েছে। তবু লোকের আস্থা ছিল, জলজ্যান্ত আইনকে কি করে অস্বীকার করবে। এ তো Fundamental Right-এর অন্যতম। পৃথিবীর সমস্ত দেশ তা মেনে চলে। নাগরিক যে কোন সময় তার নিজের দেশে যেতে পারে। কেনিয়ার বৃটিশ নাগরিক-দের পাসপোর্টে লেখা আছেঃ Her Britainnic. Majesty's Principal Secretary of State for Foreign Affairs requests and requires in the name of Her Majesty all those whom it may concern to allow the bearer to pass freely without let or hin-drance, and to afford the bearer such assistance and pro tection as may be necessary."—তুমি কি শুধুই কথা—অর্থহীন। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কলমের এক খোঁচায় নাকচ হয়ে গেল এই প্রতিশ্রুতি। ও কাগজ এখন ভূর্জপত্র। নদীর জলে ভাসিয়ে দেওয়া যায়।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মিঃ কালাঘান পার্লামেন্টে উঠে বললেন, তাদের নাগরিকতার অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে না। তবে বাস্তবের দিকে চোখ ঠেরে থাকলেও চলবে না। এখানকার অর্থনৈতিক অবস্থা এখনও সুস্থ হয় নি। অসংখ্য বেকার, শিক্ষার সমস্যা।

একদিনে সবাই এসে হাজির হলে দেশের অবস্থা আয়ত্তের বাইরে চলে যাবে। বর্ণবৈষম্য নিয়ে লড়াই বেধে যেতে পারে। তাই সংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করতে চান। সবাই আসতে পারবে তবে লাইন দিতে হবে।

বছরে ১,৫০০ জনকে আসার অনুমতি

দেওয়া হবে। বৃটিশ প্রেসের মতে ১০০ থেকে ২০০ হাজার বৃটিশ নাগরিক আছে কেনিয়ায়। ধরা গেল তাদের সংখ্যা ১৫০,০০০। তাহলে দেখা যাচ্ছে শেষ দলের একশ বছর অপেক্ষা করতে হবে এদেশে আসার জন্য, ২০৬৮ সাল হবে তাদের জীবনের স্মরণীয় দিন। 'ডেলি টেলিগ্রাফ' গোঁড়া কাগজ তার কি মতি-গতি হল, তারাও বলেছে এ হিপক্রেসির নামান্তর। যাদের বাপ-ঠাকুরদা বৃটেনের নাগরিক ছিল তাদের জন্যে এ আইন নয়। অর্থাৎ দুরকম বৃটিশ পাশপোর্ট হল। কাল লোকের জন্যে কালো বৃটিশ পাশ-পোর্ট, সাদা লোকের জন্যে সাদা বৃটিশ পাশপোর্ট। একজনের জন্যে প্রবেশ নিষেধ আর একজনের জন্যে অবারিত দ্বার।

'গার্ডিয়ান'-এর মত উদারপন্থী কাগজ বলল, সরকারের বদান্যতা বলতে হবে। সারা কমনওয়েলথের জন্যে বছরে বরাদ্দ সাড়ে আট হাজার আর ছোট্ট কেনিয়ার জন্যে বছরে দেড় হাজার। তবে 'সানডে টাইমস' গোড়া থেকে এর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছে। লিবারাল পার্টি এর বিরুদ্ধাচরণ করে এসেছে। লিবারাল পার্টির এক ভদ্রমহিলা হোয়াইট হলের সামনে দাঁড়িয়ে তার বৃটিশ পাশ-পোর্ট ছিঁড়ে ফেলেন। তিনি বলেন, লেবার সরকার পাউণ্ডের মূল্যমান কমিয়েছে এখন পাশপোর্টের মূল্যমান কমাল।

সব চেয়ে জোর গলায় প্রতিবাদ জানাচ্ছেন আইন বিশারদ লেবার পার্টির সভ্য স্যার ডিংগল ফুট। তাঁর মতে এ আইন বে-আইনী। তিনি পার্লামেণ্টে এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ভোট দেবেন। ক্যাণ্টারবেরির আর্চবিশপ ডঃ র‍্যামসে এর ঘোর বিরোধী। তিনি কালাধানের সংগে দেখা করছেন যদি কোন ফল হয়। তবে আশা কম। লেবার পার্টির ইনটেলেক-চুয়াল দল বলেছেন এ বিল পাশ হলে তারা দল ছেড়ে দেবেন। এদের আপ্রাণ চেষ্টায় লেবার পার্টি আজ সরকারী গদি দখল করে বসেছে। তাদের মধ্যে আছেন লণ্ডন স্কুল অফ ইকনমিক্স-এর প্রফেসার রিচার্ড টিটমাস। প্রফেসার পিটার টাউনসেণ্ড। আরও ১৪ জন মিলে এই বিল-এর প্রতিবাদ করে চিঠি ছাপিয়েছেন টাইমস পত্রিকায়।

গত রবিবার এখানকার বহু প্রতিষ্ঠান মিলে হাইড পার্কে বিরাট সভার আয়োজন করে সেখান থেকে মিছিল করে যায় প্রধানমন্ত্রীর বাড়ি ১০নং ডাউনিং স্ট্রীটে তাদের প্রতিবাদ জানাতে। সে দলে অনেক ইংরেজ ছিল। তাদের সম্পূর্ণ সহানুভূতি কেনিয়ার বৃটিশ নাগরিকদের ওপর। তবে তার চেয়ে বেশি সংখ্যক ইংরেজ রাস্তায় ভিড় করে দাঁড়িয়ে ছিল যাদের মতবাদ উল্টো। তারা গলা ফাটিয়ে শ্লোগান দিয়েছে "Send them back" "Send them back" "Ian Smith" "Ian Smith" "Get your hair cut, Go back where you belong."

তাদের বক্তব্য স্পষ্ট, কালো আর বাদামী লোকরা নিজেদের দেশে ফিরে যাক। আমরা চাই রোডেশিয়ার প্রধান-মন্ত্রী স্মিথকে। আবার দুই দেশের মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্যের লেন-দেন হোক।

দুই প্রধান পার্টি লেবার এবং টোরি এ বিষয়ে মোটামুটি একমত। তবে দু-চারজন সভ্যের বিবেকের দংশন বেশি। তাই আপত্তি তুলেছেন। লিখছি বসে। খবর শুনলাম: নতুন ইমিগ্রেশন বিল দ্বিতীয় দফায় পার্লামেণ্টে পাশ হল। লিবারাল পার্টি ও অন্য দুই পার্টির কয়েকজন সভ্য মোট ৬২ জন এর বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছেন। তবে দুজন সভ্য আসর গরম করেছিলেন একজন স্যার ডিংগল ফুট তিনি বলেছেন এ বর্ণবৈষম্যমূলক নীতি। অন্যজন ডানকান স্যাণ্ডস। তিনি কেনিয়ার ইমিগ্রাণ্টদের হয়ে একটু চোখের জলও ফেলেছেন—এরই নাম হয়ত কুম্ভীরাশ্রু।

হাতে দুদিন সময়। বৃহস্পতিবার মাঝরাতে কেনিয়ার বৃটিশ নাগরিকদের জন্যে বৃটেনের দরজা বন্ধ হবে। মাথা খুঁড়লেও আর সে দরজা খুলবে না। গত কয়েক দিন কয়েক হাজার লোক হাজির হয়েছে এখানে। বহু প্লেনচার্টার্ড করেছে। সোজা পথে প্লেন না পেয়ে কেউ অন্যান্য দেশ ঘুরে এসেছে। কেউ বা চার-পাঁচ গুণ ভাড়া দিয়ে প্লেনের একটা আসন যোগাড় করেছে।

এখন সব থেকে বড় প্রশ্ন আইনগত-ভাবে কোন দেশ কি তার নাগরিকদের অস্বীকার করতে পারে? বৃটেনের নাগরিক হয়েও বৃটেনে তারা আসতে পারবে না। দুদিন বাদে কেনিয়ায় তারা চাকরী পাবে না। যতদূর মনে হয় ভারতবর্ষ তাদের ফিরিয়ে নেবে না। এই stateless বৃটিশ নাগরিকের দল যাবে কোথায়? অথচ এরা করিৎকর্মা লোক, এদের প্রচুর টাকা আছে। কেনিয়ার ব্যবসা-বাণিজ্য এরাই চালিয়েছে? আন্তর্জাতিক বিচারা-লয়ে যাবার তোড়জোড় করছে। কিন্তু কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর এক্তিয়ার সেখানে নেই। তাদের হাত পা আইন দিয়ে বাঁধা। তাদের টেবল পর্যন্ত এ আবেদন পেঁছিবে না। তবে ভারত বা পাকিস্তান যদি এ নিজের দায় বলে মনে করে এবং আন্ত-র্জাতিক বিচারালয়ে হাজির করে। তখন প্রমাণ হবে ইংরেজ সত্যি আইন বিরোধী কাজ করেছে কি না? না হলে আইনের ইতিহাসে মানুষের মৌলিক অধিকারের বিরুদ্ধে নজির থেকে যাবে।

সম্প্রতি প্রকাশিত : ইতিহাস রচনায় একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন

ভারতের শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাস

গোপাল ঘোষ

দাম : চার টাকা পঞ্চাশ পয়সা

ভারতে ধনতন্ত্রের বিকাশকাল থেকে শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রামের কাহিনী

আনন্দবাজার পত্রিকা : আমাদের শ্রমিক আন্দোলনের শতবর্ষ পূর্ণ হলেও এখন পর্যন্ত পূর্ণাঙ্গ কোন ইতিহাস লেখা হয় নি।......বইটিতে লেখক বিশেষ করে পুরানো সংবাদপত্রের তথ্যের ওপর ভিত্তি করে একটি ধারাবাহিক ইতিহাস লেখার চেষ্টা করেছেন।......তিনি যে তথ্য সংগ্রহ করেছেন তা অবশ্যই নির্ভরযোগ্য।

যুগান্তর : "ভারতের শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাস" শীর্ষক বইটি বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের ইতিহাসে একটি অভিনব সংযোজনা।

দৈনিক বসুমতী : ইতিপূর্বে এই বইয়ের সময়সূচীর ভিত্তিতে আর কেউ ইতিহাস রচনা করেন নি।

মনীষা গ্রন্থালয় প্রাঃ লিঃ

৪/৩ বি, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট
কলিকাতা—১২

রঙ্গজগৎ

সিনেমা-সংকট

কলকাতায় সিনেমাগৃলি অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ রয়েছে। সিনেমার সামনে এতকাল নিওন আলোর রোশনাই ছড়িয়ে দর্শক আকর্ষণের যে রীতি ছিল এখন তা অন্ধকারে ঢেকে গেছে। তার পরিবর্তে বিরাট পোস্টার ঝুলছে সিনেমা কর্মচারী সমিতির নামে। চিত্রতারকাদের মনোহারী ছবির পরিবর্তে প্রেক্ষাগৃহের সম্মুখভাগে শোভিত হচ্ছে সমিতির পতাকা। কলকাতার পাঁচটি সিনেমা বাদে সারা পশ্চিমবঙ্গব্যাপী প্রায় সাড়ে তিনশত সিনেমা নীরব প্রতিবাদের এই রূপ ধারণ করেছে। পথ চলতে চলতে যে পথিকরা সিনেমার হাতছানিতে মুগ্ধ হয়ে দাঁড়াতেন, এবং সারাদিনের কর্মবিরতির অবসরে আনন্দ উপভোগের জন্য একটা টিকেট খরিদ করে হলে প্রবেশ করতেন এখন তাঁরা হতাশ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকছেন। কবে এই প্রতিবাদস্তব্ধ হলগুলিতে আবার বাতি জ্বলবে কে জানে?

সংবাদে প্রকাশ সিনেমা কর্মচারীদের সঙ্গে মালিকদের যে চুক্তি হয়েছিল সে চুক্তি তাঁরা মানেন নি। মাত্র পাঁচটি প্রেক্ষাগৃহের মালিক এই চুক্তি অনুযায়ী কাজ করেছেন। সুতরাং এই পাঁচটি প্রেক্ষাগৃহে আলো জ্বলছে এবং যথারীতি ছবি প্রদর্শিত হচ্ছে। দর্শকদের মধ্যে তাই প্রশ্ন উঠেছে পাঁচটি প্রেক্ষাগৃহের মালিক—যাঁরা কেবলমাত্র বিদেশী ছবি দেখান তাঁরা যদি চুক্তি অনুযায়ী কাজ করতে পারেন বাকি প্রেক্ষাগৃহের মালিকরা পারেন না কেন? দেশী ছবিঘরে হাউস গ্যারান্টির রীতি আছে, এবং তাঁদের বিরুদ্ধে প্রযোজকদের আরো অভিযোগ আছে। বাস্তবিকপক্ষে তাঁদের মুনাফা-ক্ষুধায় প্রযোজকরা অথৈ জলে বাস করেন। ছবির প্রযোজকদের ঝুঁকি নিয়ে ছবি করতে হয়। প্রদর্শকদের মুনাফাটা প্রায় নিশ্চিত থাকে। এই অবস্থায়ও দর্শকদের সুখ-সুবিধার দিকে বিদেশী ছবিঘরগুলি যে রকম নজর রাখে এ'রা তা রাখেন না। অধিকাংশ সিনেমায় দর্শকদের আরামের বিষয়টাকে উপেক্ষা করা হয়। অথচ এ'রা কর্মচারীদের ব্যাপারেও উদাসীন। এই অভিজ্ঞতায় দর্শকদের সহানুভূতি স্বাভাবিকভাবেই কর্মচারীদের দিকে থাকবে। তাঁদের আনন্দ উপভোগের পথে বাধা সৃষ্টির জন্য প্রেক্ষাগৃহের মালিকদেরই দায়ী করবেন।

পশ্চিমবঙ্গে মালিক-কর্মচারী বিরোধে সিনেমা বন্ধ; দক্ষিণ ভারতে চলেছে হিন্দীছবি প্রদর্শন বন্ধ। দক্ষিণ ভারতের প্রেক্ষাগৃহগুলি দর্শকদের চাপে পড়ে হিন্দীছবি প্রদর্শনে বিরত রয়েছে। তার প্রতিবাদে মাদ্রাজে নির্মিত ছবিগুলি প্রদর্শন বন্ধ করেছে বোম্বাই ও উত্তর ভারতের কোন কোন প্রেক্ষাগৃহ। যদিও মাদ্রাজে নির্মিত ছবি প্রদর্শন বন্ধ করার পেছনে যুক্তি অত্যন্ত দুর্বল। কিন্তু জিদের বশবর্তী হয়ে তাঁরা একাজ করেছেন। ফলে সারা ভারতে সিনেমার ক্ষেত্রে একটা সংকট সৃষ্টি হয়েছে। যাঁরা লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করে ছবি নির্মাণ করেছেন, তাঁরা এই দ্বন্দ্বের শিকার হয়ে মাথায় হাত দিয়ে বসেছেন। আসলে এই সংকট জাতীয় সংকটেরই একটা প্রতিরূপ।

সিনেমার এই সংকট সমাধানের জন্য সরকারের সঙ্গে দেশবাসীরও একটা ভূমিকা আছে। সিনেমাগুলি যথাশীঘ্র খোলার ব্যবস্থা করা দরকার। কর্মচারীদের জীবিকার সঙ্গে দর্শকদের আনন্দ উপভোগের ব্যাপারটা চিন্তা করা দরকার। মানুষের কর্মশক্তিতে আনন্দ উপভোগের যে ভূমিকা আছে তাকে উপেক্ষা করা চলে না। আমরা আশা করব মালিকপক্ষ কর্মচারীদের সঙ্গে সম্পাদিত চুক্তির মর্যাদা দিয়ে দর্শকদের আনন্দ উপভোগের সুযোগ যথাশীঘ্র করে দেবেন। —সুজন।

সুচিত্রা সেন
অভিনয় করছেন 'কমললতা' ছবিতে।

চিত্রসমালোচনা

চঞ্চল কা সপ্না

[পরিচালনা: সচ্চিদানন্দ সেনমজুমদার]

ভারতে শিশুচলচ্চিত্র নির্মাণের কাজ এখনো নিতান্ত প্রাথমিক স্তরে। যদিও চিলড্রেনস্ ফিল্ম সোসাইটির বয়সের দিক থেকে বিচার করলে এতদিনে আরো উন্নত ছবি নির্মাণ হওয়া উচিত ছিল। বিশেষত সোভিয়েট ইউনিয়ন, জার্মানী ও চেকোশ্লোভাকিয়া এবং মার্কিন যুক্তরাজ্যের শিশুচলচ্চিত্রগুলি দেখেও ভারতের শিশুচলচ্চিত্র সমিতি কিছুটা শিক্ষা লাভ করতে পারত। কিন্তু অত্যন্ত ধীরগতি ও তৎপরতাহীনতার মধ্যে এই সমিতির কাজ চলেছে। ফলে শিশু ও কিশোরেরা ছবি দেখার আনন্দ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। কিশোররা সাধারণ ছবি দেখে নিষিদ্ধ রস আহরণের চেষ্টা করে।

শিশুচলচ্চিত্র সমিতির ছবি সংখ্যার দিক থেকে নেহাৎ কম নয়। কিন্তু যোগ্য পরিবেশনের অভাবে ছবিগুলি দেখার সুযোগ শিশু-কিশোররা পায় না।

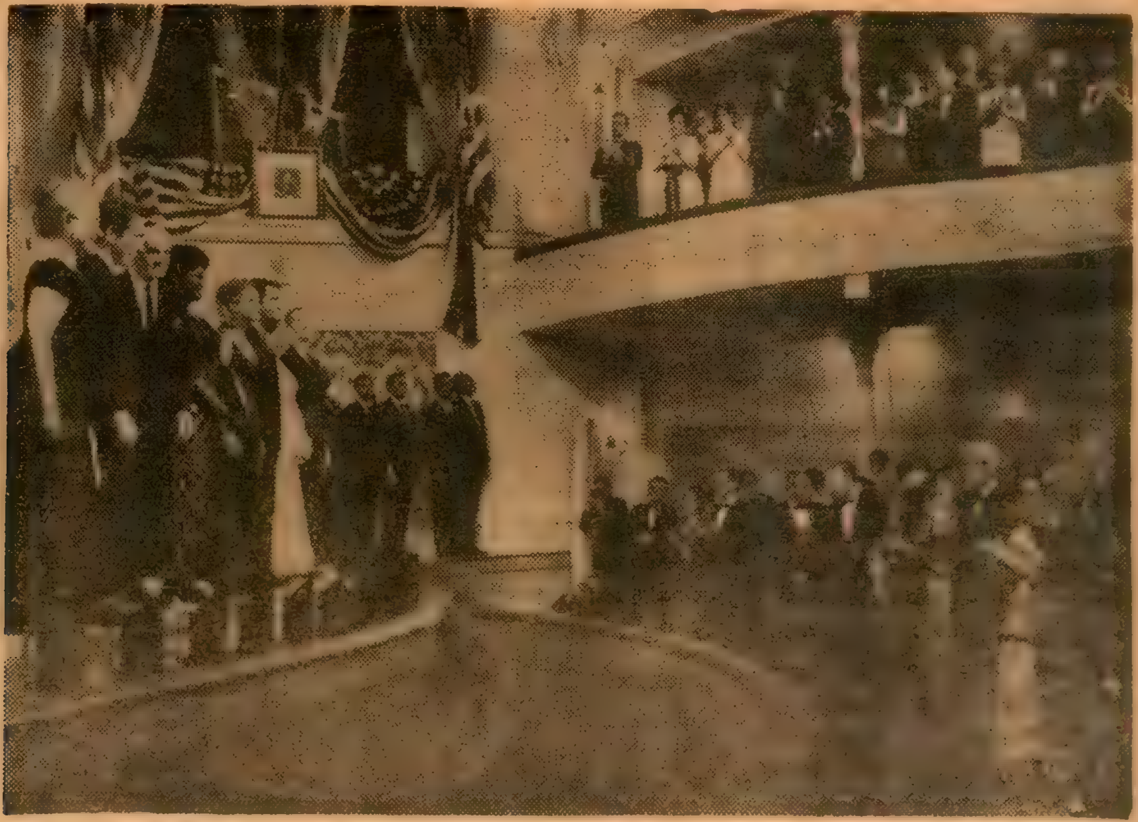

ফোর্ড থিয়েটারের উদ্বোধন। ১৮৬৫ সালে প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিংকনকে এই থিয়েটারের উপরের বক্সে (পতাকা ও প্রতিকৃতি শোভিত) গুলী করা হয়েছিল। তারপর থেকে থিয়েটারটি বন্ধ ছিল। গত ৩০শে জানুয়ারী এই থিয়েটারের পুনরুদ্বোধন করা হয়েছে। অনুষ্ঠানে বাঁদিকে মঞ্চে দাঁড়িয়েছেন : হেলেন হায়েস, অ্যান্ডি উইলিয়ামস, ফ্রেডারিক মার্চ, ওডেতা, জুলি হ্যারিস, রিচার্ড ক্রেনা, পেট্রিসিয়া ব্রুকস, হেনরি ফন্ডা প্রমুখ।

সাধারণ প্রেক্ষাগৃহের কথা তো ভাবাই যায় না, একমাত্র মিশনারী স্কুল ছাড়া সাধারণ সরকারী বে-সরকারী স্কুলগুলিতেও ছাত্রদের ছবি দেখাবার ব্যবস্থা করা হয় না। সম্প্রতি এস, এম, ফিল্ম ইউনিট শিশু-চলচ্চিত্র পরিবেশনার দায়িত্ব গ্রহণ করেছে। এদের চেষ্টায় এবং স্কুল কর্তৃপক্ষের ও সাধারণ প্রেক্ষাগৃহের সহযোগিতায় শিশু-চলচ্চিত্রগুলি প্রদর্শনের ব্যবস্থা সহজ হতে পারে। হলে তা আনন্দেরই হবে।

গত ৯ই মার্চ এস, এম, ফিল্ম ইউনিট ফাইন আর্টস একাডেমি হলে 'চঞ্চল কা সপ্না' ছবিটি নিমন্ত্রিত দর্শকদের দেখাবার ব্যবস্থা করেছিলেন। এই ছবিটির প্রযোজক নিরঞ্জন সেন (গণনাট্য সঙ্ঘ)। এই অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথিরূপে আমন্ত্রিত হয়ে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল শ্রীধরমবীর।

ছবিটি পরিচালনা করেছেন সচ্চিদানন্দ সেনমজুমদার, ইতিপূর্বে যিনি 'যাত্রী' নামে একটি ভ্রমণকাহিনী-নির্ভর ছবি করেছিলেন। এই ছবিটি চঞ্চল নামে একটি ছেলের জন্মদিনে উপহার আন্দামান ভ্রমণের টিকেট প্রাপ্তি এবং জাহাজে আন্দামান সফরকে অবলম্বন করে রচিত। ছবির বিষয়বস্তু চমৎকার ছিল, যা শিশু-মনকে আকৃষ্ট করতে পারত, শিক্ষামূলকও হত। সাগরে ভাসমান জাহাজে শিশু-কৌতূহলের অনেক ব্যাপার ছিল। কিন্তু চিত্রনাট্যকার ও পরিচালক সেদিক থেকে ব্যর্থ হয়েছেন। মূল কৌতূহল থেকে সরে গিয়ে একটি কাকাতুয়া পাখি এবং নার্সের সঙ্গে চঞ্চলের স্নেহের সম্পর্কের দিকে অধিক মনোনিবেশ করে শিশু-কৌতূহলের জগৎ থেকে দূরে সরে গেছেন। তার ওপর আবার বোম্বাই ছবির প্যাঁচে একটি ক্লাউন-চরিত্র এনে স্থূল করে তুলেছেন। ছবির চিত্রগ্রহণ খুবই খারাপ, বহুস্থানে ওভার এক্সপোজার হয়েছে।

নাটকের কথা

এক পেয়ালা কফি

গত ১লা মার্চ স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া সেন্ট্রাল স্টেশনারী রিক্রিয়েশন ক্লাবের প্রযোজনায় বিশ্বরূপা থিয়েটারে 'এক পেয়ালা কফি' নাটকটি অভিনীত হয়েছে। অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করেছেন : সুধাংশু গঙ্গোপাধ্যায়, ভূপাল বসু, কল্যাণ বসু, শিবপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়, পঙ্কজ মুখার্জি, সাধন বড়াল, সুধেন্দু বসু, কৃষ্ণকান্ত ঘোষ, অটল মণ্ডল, মঞ্জুলা মুখোপাধ্যায়, বিপাশা গোস্বামী, সুপর্ণা চট্টোপাধ্যায়।

বন্দর

ন্যাশনাল এণ্ড গ্রীণ্ডলেজ ব্যাঙ্ক এমপ্লয়িজ ইউনিয়নের (চার্চ লেন শাখা) সদস্যরা বিশ্বরূপা মঞ্চে বীরু মুখোপাধ্যায়ের 'বন্দর' নাটকের অভিনয় করেছেন। অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করেছেন ঃ সুধীর চক্রবর্তী, নৃত্যগোপাল চন্দ্র, অজয় ব্যানার্জী, সুশীল নন্দী, সুধীন রায়, দেবকী গাঙ্গুলী, দীপক রায়, তড়িৎ বসু, শচীন সিংহ এবং দীপালী ঘোষ, রূপা রায়চৌধুরী, ইন্দিরা দে। নাটক পরিচালনা করেছেন পুলিন মণ্ডল।

মুকুলবীথির বার্ষিক উৎসব

গত ১০ই মার্চ কাশী বিশ্বনাথ মঞ্চে মুকুলবীথির দ্বাদশ বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী উৎসব অনুষ্ঠিত হোল। শিশুদের সঙ্গে অভিভাবক, শিক্ষিকা ও কর্মিবৃন্দকেও বিভিন্ন বিষয়ে পারদর্শিতার জন্য পুরস্কৃত করা হয়। এই উপলক্ষে তিন বছর থেকে দশ বছর বয়সের শিশুরা কথাকলি নৃত্য, অস্কার ওয়াইল্ড-এর "স্বার্থপর দৈত্য" নৃত্যনাট্য এবং রবীন্দ্রনাথের "ইচ্ছাপূরণ" নাটকটি অভিনয় করে, অভিভাবকবর্গ এবং বিশিষ্ট অতিথিবৃন্দকে মুগ্ধ করে।

অনুষ্ঠানে সভানেত্রীর আসন গ্রহণ করেন—"সেণ্ট মারগারেটস্" বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষা শ্রীমতী লাবণ্য মল্লিক। প্রধান অতিথি এবং বিশেষ অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন যথাক্রমে বঙ্গবাসী কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীপ্রশান্তকুমার বসু ও "স্বপনবুড়ো"। অন্যান্য অতিথিবর্গের মধ্যে উপস্থিত হয়েছিলেন শ্রীমতী শ্যামমোহিনী দেবী ও বিভিন্ন স্কুল-কলেজের শিক্ষক-শিক্ষিকাবৃন্দ।

পশ্চিম জার্মানীর অভিনেত্রী হালোলোর এলসনোর (সংবাদকথা দেখুন)

স্টুডিও খবর

অগ্নিযুগের কাহিনী

শ্রীমতী মঞ্জুশ্রী বসু ও শ্রীমতী ধীরা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রযোজিত দি নিউ এরা পিকচার্সের "অগ্নিযুগের কাহিনী" ছবির চিত্রগ্রহণ নিউ থিয়েটার্স এক নম্বর স্টুডিওতে দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে। স্বাধীনতা সংগ্রামের পটভূমিকায় ছবিটির কাহিনী রচনা করেছেন—বীরেন রায় (এম-পি) চিত্রনাট্য রচনা করেছেন—বিপ্লবপালক বসু। পরিচালনা করেছেন—"বধূ" ও "মহাতীর্থ কালীঘাট" খ্যাত ভূপেন রায়। চিত্রগ্রহণ ও সম্পাদনায় আছেন যথাক্রমে অনিল গুপ্ত ও অমিয় মুখার্জী। গোপেন মল্লিকের সুরে সংগীতাংশে কণ্ঠদান করেছেন—মান্না দে, সন্ধ্যা মুখার্জী, অশোকতরু ব্যানার্জী ও মঞ্জুশ্রী বসু। চরিত্রচিত্রণে আছেন—বিকাশ রায়, অজয় গাঙ্গুলী, দিলীপ রায়, মাধবী মুখার্জী, সুলতা চৌধুরী, অজিতেশ ব্যানার্জী, সীমন্তিনী রায়, মণি শ্রীমানী, আনন্দ মুখার্জী, সমরকুমার, সুখেন দাস ও স্বপনকুমার প্রমুখ।

শেষ থেকে সুরু

কমলকুমার সাহা, সুধীরকুমার সাহা ও সন্তোষকুমার সাহা প্রযোজিত সাহা চিত্রপীঠের চিত্রপ্রয়াস "শেষ থেকে সুরু" ছবির চিত্রগ্রহণ সম্প্রতি শেষ হয়েছে। সত্য ব্যানার্জীর নাটক অবলম্বনে ছবিটির চিত্রনাট্য রচিত হয়েছে। পরিচালনা করেছেন—চিত্রসাথী ছদ্মনামের অন্তরালে একদল অভিজ্ঞ কলাকুশলী। সুরসৃষ্টি করেছেন—অনিল বাগচী ও নচিকেতা ঘোষ। নেপথ্যে কণ্ঠদান করেছেন—কিশোরকুমার, সবিতাব্রত দত্ত ও প্রতিমা ব্যানার্জী। চিত্রগ্রহণ ও সম্পাদনায় আছেন যথাক্রমে—রামানন্দ সেনগুপ্ত ও অর্ধেন্দু চ্যাটার্জী। ছবিটির চরিত্রচিত্রণে আছেন—"শেষ থেকে সুরু" নাটকে অংশগ্রহণকারী "ইংগিত" গোষ্ঠীর যশস্বী শিল্পিবৃন্দ এবং সবিতাব্রত দত্ত, বিদ্যা রাও, মণি শ্রীমানী, নৃপতি ব্যানার্জী ও স্বপনকুমার। সাহা স্ক্রীনিং ছবিটির পরিবেশক।

[illegible]

ইউনিট প্রোডাকসন্স অব ইণ্ডিয়ার

প্রথম ছবি "আলেয়ার আলো" ছবিটির চিত্রগ্রহণ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। ছবিটির কাহিনী, চিত্রনাট্য, সংলাপ রচনা ও পরিচালনা করেছেন—মঙ্গল চক্রবর্তী। সুরসৃষ্টি করেছেন—গোপেন মল্লিক। চিত্রগ্রহণ ও সম্পাদনায় আছেন যথাক্রমে—রামানন্দ সেনগুপ্ত ও বিশ্বনাথ নায়ক। চরিত্রচিত্রণে আছেনঃ সৌমিত্র চ্যাটার্জী, সাবিত্রী চ্যাটার্জী, অনুপকুমার, সন্ধ্যারাণী, রাধামোহন ভট্টাচার্য, কালী ব্যানার্জী, জহর রায়, ভানু ব্যানার্জী, মঞ্জু দে, শেখর ব্যানার্জী, বনানী চৌধুরী, অজিতেশ ব্যানার্জী, মৃণাল মুখার্জী, সাধনা রায়চৌধুরী ও জ্যোৎস্না বিশ্বাস। বি, পি, পিকচার্স ছবিটির পরিবেশক।

ভানু গোয়েন্দা জহর এ্যাসিস্ট্যান্ট

বাদলরাজ সিন্‌হা প্রযোজিত জয়দীপ পিকচার্সের গোয়েন্দা ও হাসির ছবি "ভানু গোয়েন্দা জহর এ্যাসিস্ট্যান্ট" বর্তমানে মুক্তি প্রতীক্ষায়। ছবিটির কাহিনী, চিত্রনাট্য, সংলাপ ও গীতরচনা করেছেন—প্রণব রায়। পরিচালনা করেছেন পূর্ণেন্দু রায়চৌধুরী। সংগীত পরিচালনা করেছেন—শ্যামল মিত্র। নেপথ্যে কণ্ঠদান করেছেন—সন্ধ্যা মুখার্জী, শ্যামল মিত্র ও লীনা ঘটক।

স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া সেণ্ট্রাল স্টেশনারী ডিপার্টমেণ্টের রিক্রিয়েশন ক্লাব সদস্যদের অভিনীত 'এক পেয়ালা কফি' নাটকের দৃশ্য।

শ্রেষ্ঠাংশে অভিনয় করেছেন—ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় ও জহর রায়। অন্যান্য বিশিষ্ট চরিত্রে আছেন—পাহাড়ী সান্যাল, বীরেন চ্যাটার্জী, নৃপতি চ্যাটার্জী, বঙ্কিম ঘোষ, শীতল ব্যানার্জী, শ্যাম লাহা, চিত্তজিৎ, রূপক মজুমদার, পদ্মা দেবী, কল্যাণী ঘোষ এবং শুভেন্দু চ্যাটার্জী ও লিলি চক্রবর্তী।

আরো একটু কাছে

সমর চৌধুরী পরিচালিত চৌধুরী প্রোডাকসন্সের 'আরো একটু কাছে' ছবির বহির্দৃশ্য গ্রহণ করা হয়েছে গত ৩০শে জানুয়ারী উল্টাডাঙা স্টেশনের নিকটে। অংশ গ্রহণ করেছেন—জহর রায়, পুষ্প মুখার্জী, স্বর্ণালী গাঙ্গুলী, মায়া ঘোষ, শিপ্রা চ্যাটার্জী, বেণু সেনগুপ্ত, মাঃ মেঘনাদ প্রমুখ। ছবির কাহিনী রচনা করেছেন নমিতা চৌধুরী। চিত্র গ্রহণ করছেন গণেশ বসু।

মুকুলবীথি উৎসবে পুরস্কারপ্রাপ্ত শিশুদের সঙ্গে জাতীয় শিক্ষিকা শ্রীমতী লাবণ্য মল্লিক।

সংবাদিকা

এক কৃতী অভিনেত্রীর কথা

রূপ. পর্দা ও টেলিভিশনে বর্তমানে

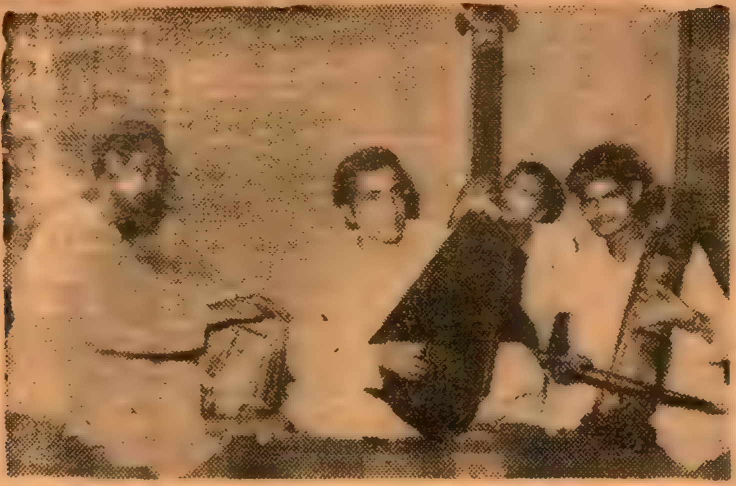

মধ্য ইণ্টালী সংস্কৃতিক সম্মেলনে খেয়াল পরিবেশন করছেন গৌতম রায়।

সবচেয়ে কৃতী তারকা হলেন হানোলোর এলসনোর। হানোলোরের বয়স এখন পঁচিশ, দেখতেও তারকার মত নয় এবং সবসময় তার ডাকও পড়ে না। তবে বিশেষ বিশেষ ভূমিকায় হানোলোরকে না হলে চলে না।

হানোলোরের বিশেষ খ্যাতি বারাঙ্গনার ভূমিকায়। অথচ বছর আট আগে এই ভূমিকার মহড়ার সময় সে লজ্জায় আরক্তিম হয়ে উঠেছিল। এই ধরণের ভূমিকায় তার প্রথম সফল নাটক হোল "অসীম"।

অল্পদৈর্ঘ্যের দুটি পরীক্ষামূলক চলচ্চিত্র

ডিজাইনি সংস্থা বর্তমানে কলকাতায় ৮, ১৬ ও ৩৫ মিঃ মিঃ-এর পরীক্ষামূলক অল্পদৈর্ঘ্যের চলচ্চিত্র নির্মাণে ব্রতী হয়েছেন। এক্সপেরিমেন্টাল সিনে এসোসিয়েশনের সহযোগিতায় এঁদের প্রথম পরীক্ষামূলক ছবি "দি আর্টিস্ট এ্যান্ড হিজ কালারস" ছবিটির কাজ গত ২৬শে জানুয়ারী থেকে শুরু হয়েছে। কলকাতা এবং গ্রামের বিভিন্ন দর্শনীয় স্থানের স্টিল বা স্থিরচিত্র তুলে ছবিটির কাজ চলছে এবং এই সমস্ত দৃশ্যই সিম্বলিক হবে এবং সকল চলচ্চিত্রানুরাগীদের ছবিটি বুঝতে সাহায্য করবে। ৮ ও ১৬ মিঃ এই ছবির চিত্রনাট্য ও পরিচালনার দায়িত্ব বহন করছেন দিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায়। মূল কাহিনী ও তত্ত্বাবধানের কাজ করছেন অশোক মজুমদার ও সোমেন ঘোষ. সম্প্রতি এঁরা এঁদের দ্বিতীয় পরীক্ষামূলক ছবি "গুডবাই ক্যালকাটা"-র চিত্রনাট্যের কাজ শেষ করে, কলকাতার বিভিন্ন প্রাকৃতিক পরিবেশে দুদিনের লোকেসান সুটিং করেছেন। ছবির সঙ্গে এ ছবিতেও স্টিল বা স্থিরচিত্রের সমাহার ঘটবে প্রচুর। দুটি ছবিরই আলোকচিত্র গ্রহণের কাজ করছেন এ্যামেচার বাসব সিন্‌হা।

জঙ্গীপুর সম্মিলনীর বসন্তোৎসব

গত ১৪ই মার্চ স্টুডেন্টস্‌ হলে জঙ্গীপুর সম্মিলনী কর্তৃক বসন্তোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনের মূল সভানেত্রী ডাঃ শ্রীমতী প্রতিমা চট্টোপাধ্যায়ের ভাষণ পাঠে বলা হয় : 'কলকাতার বুকে আমরা একটি বৃহৎ একান্নবর্তী পরিবার গড়ে তুলেছি।' সভাপতি শ্রীবিষ্ণু সরস্বতী বসন্তোৎসবের তাৎপর্য বর্ণনান্তে আহ্বান জানান তাদের সবাইকে সম্মেলনে যোগ দিতে, তাকে সার্থক করে তুলতে, জঙ্গীপুরের কথা ভাবতে। প্রধান অতিথি ভবরঞ্জন দে ও বিশিষ্ট অতিথির ভাষণের পূর্বে ও পরে পরিবেশিত হয় সংগীত, হাস্য-কৌতুক। এতে অংশ গ্রহণ করেন : হেনা চট্টোপাধ্যায়, অহীন মজুমদার প্রমুখ শিল্পিবৃন্দ। "রবীন্দ্রসংগীত পরিষদে"-র বিশেষ সংগীতালেখ্য 'বসন্তোৎসব' প্রশংসনীয়। অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে আছেন : সমর ঘোষ, মাধুরী ঘোষ, চিত্রা বক্‌সী, দীপালী দত্ত, রঞ্জিতা বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবপ্রসাদ সেনগুপ্ত প্রমুখ। সভা পরিচালনা করেন ডাঃ অমিয়কুমার হাটি।

সঙ্গীত কথা

মধ্য ইস্টালী সাংস্কৃতিক সম্মেলন

দীর্ঘ এগার বছর পরে আবার উচ্চাঙ্গ সংগীতের আসর বসিয়েছিলেন "মধ্য ইণ্টালী সাংস্কৃতিক সম্মেলন" দেবনারায়ণ দেবের বাড়ির প্রাঙ্গণে। প্রথম দিনে যখন শিল্পী মালবিকা কানন 'বাগেশ্রী' পরিবেশন করছিলেন সেই মুহূর্তে হঠাৎ বৃষ্টি নামে। কিন্তু সেই বৃষ্টিকে উপেক্ষা করে শ্রোতারা সংগীত উপভোগ করেন।

"মধ্য ইণ্টালী সাংস্কৃতিক সম্মেলন"-এর তিন দিনের অনুষ্ঠানসূচীতে ছিলেন বহু নামী ও অনামী শিল্পী। নতুনদের মধ্যে প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় শ্রীলা চক্রবর্তীর নাম। ইনি সংগীতাচার্য তারাপদ চক্রবর্তীর কন্যা। গাইলেন 'চন্দ্রকোষ' রাগে খেয়াল ও পরে ঠুংরী। অপূর্ব সুরেলা গলা। আলাপ ও তানের কাজে প্রতিভার স্বাক্ষর মেলে। তারপরে গাইলেন গৌতম রায়। 'রাগেশ্রী' রাগে খেয়াল ও পরে ঠুংরী। প্রণতি বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ভূপালী' ও গৌরাঙ্গ সাহার 'বাগেশ্রী' রাগে খেয়াল উল্লেখযোগ্য।

বিখ্যাত শিল্পী তারাপদ চক্রবর্তী পরিবেশন করেন 'শুদ্ধ টোরী' ও 'ভৈরবী তরানা'। এদিন তিনি শ্রোতাদের সুরের মায়াজালে মোহিত করে রেখেছিলেন। কিভাবে দীর্ঘ সময় কেটে গিয়েছে তা কেউ উপলব্ধি করতে পারেন নি। এ, কানন প্রথমে 'মারু বেহাগ' ও পরে 'হংসধ্বনি' রাগে খেয়াল গেয়ে শোনান। সব শেষে 'ঠুংরী' বিলম্বিত ও দ্রুতলয়ে তান-সহযোগে রাগরূপ প্রকাশ প্রশংসনীয়। শিপ্রা বসু 'বিলাসখানি টোড়ী', 'ভৈরবী ঠুংরী' ও 'ভজন' পরিবেশন করেন। মানস চক্রবর্তী গেয়ে শোনান 'ললিত পঞ্চম' 'যোগীয়া ঠুংরী' ও 'বাংলা খেয়াল।' শিল্পীর গায়কী বৈশিষ্ট্যতার পরিচয় পাওয়া যায়।

যন্ত্রসঙ্গীতের আসরে কাশীনাথ মুখোপাধ্যায় প্রথমে সেতারে 'আহিরী ভৈরোঁ' ও পরে 'ভৈরবী ধুন' পরিবেশন করেন। হাতের নিখুঁত টোকায় রাগবিস্তারে সুরের অপূর্ব পরিবেশ সৃষ্টি করেন। মিয়া বিসমিল্লার সুযোগ্য পুত্র নায়ার হোসেন সানাইয়ে মালকোষ ও ধুন পরিবেশন করে শিল্পী তাঁর অপূর্ব সুরকৃতির ছাপ রেখে যান।

প্রতিমা চৌধুরী সেতারে রাগ 'হেমন্ত' এবং ব্যোমকেশ বোসের বেহালায় 'মারু বেহাগ' রাগে আলাপ এবং 'যোগ' ও 'বসন্ত' রাগে গৎ বাজিয়েছেন।

দ্বিতীয় আসরে বন্দনা সেনের কথক নৃত্য দর্শকদের আনন্দ দিয়েছে। এ ছাড়া আরো দুজন নৃত্য-শিল্পী ছিলেন বৈদেহী বন্দ্যোপাধ্যায় ও মিতা চৌধুরী।

খলিফা ওয়াজেদ হোসেন খানের তবলা লহরা এক মনোগ্রাহী অনুষ্ঠান। সত্তর বছর অতিক্রান্ত করেও শিল্পীর হাতের কাজ অপূর্ব। বিচিত্র লয় ও ছন্দে সুরের কাজে বৈচিত্র্য অনবদ্য।

সঙ্গতে আফাক হোসেন, সন্দীপ দেব ও দ্বিজেন ঘোষ প্রশংসার দাবি রাখে। সারেঙ্গীতে সহযোগিতা করেন কেদার মিশ্র, মহেশ মিশ্র ও রমেশ মিশ্র।

পাঠক মন

কল্যাণী জওহরলাল নেহরু হাসপাতালে দুর্নীতি

কল্যাণী জওহরলাল নেহরু মেমোরিয়াল হাসপাতালের দুর্নীতির সংবাদ (ফটোস্টাট কপিসহ) ইতিপূর্বে আপনার পত্রিকায় (৫ই আগস্ট, ১৯৬৭) প্রকাশিত হওয়ার পর এখানে কর্তৃপক্ষের মধ্যে বিশেষ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছিল। রাইটার্স বিল্ডিংসের কর্তাব্যক্তিরাও এই সব দুর্নীতির সংবাদে উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলেন, এমন কি তদানীন্তন স্বাস্থ্যমন্ত্রী এ সম্পর্কে তদন্তের আদেশ দিয়েছিলেন বলে আমরা নির্ভরযোগ্যসূত্র থেকে খবর পেয়েছিলাম। এই হাসপাতালের কর্তাব্যক্তিদের অনেকেই এই দুর্নীতিমূলক কার্যকলাপের সঙ্গে জড়িত থাকায় উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের যোগসাজসে অভিযোগের সমস্ত প্রামাণ্য কাগজপত্র সরিয়ে নিয়ে বিষয়টি ধামাচাপা দেওয়া হয়।

জনৈক এম, এল, এ (প্রাক্তন) বহুবার তাঁর প্রভাব খাটিয়ে রাইটার্স বিল্ডিংসের কর্তৃপক্ষকে ভুল বুঝিয়ে কোনরূপ তদন্ত যাতে না হয় বা দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের বদলী না করা হয় তারই ব্যবস্থা করেছেন। ফলে জনসাধারণের উপকারার্থে এই প্রতিষ্ঠানটি আরও দুর্নীতির কবলে প্রেরিত হচ্ছে। এই এম, এল, এ ভদ্রলোকটির স্বার্থে হচ্ছে কর্তৃপক্ষ তাঁর মনোনীত ২।৪ জনকে চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীর পদে নিযুক্ত করে, যাদের দ্বারা হাসপাতালের ইউনিয়ন সংগঠন করা হয়। এই এম, এল, এ ভদ্রলোকের মনোনীত ব্যক্তিগণ হাসপাতালের কাজ ছাড়া আর সবই করে থাকেন। এই রাজনীতির খেলায় হাসপাতালের অবস্থা এমন পর্যায়ে পৌঁচেছে যে, প্রয়োজনমত ওয়ার্ড বয়দের খুঁজে পাওয়া যায় না। এই অবস্থা দৈনিক বসুমতীর 'দূরবীণের চোখেও ধরা পড়েছে। কয়েকদিন আগে একজন ওয়ার্ড বয়ের অভাবে একজন গুরুতর রোগীর সংবাদ ডাক্তারকে পৌঁছন যায় নি, যার ফলে রোগীটি মারা গেছে। কর্তৃপক্ষের অপদার্থতা এমন চরম সীমায় পৌঁচেছে যে, হাসপাতালে এ্যাডমিনিস্ট্রেশন বলে আর কিছুই নেই। যার ফলে সেখানে গুরুতর রোগীর বাঁচাই অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। আমার এম, এল, এ ভদ্রলোকটির নিকট জিজ্ঞাস্য তিনি রাজনীতি করেন বলে কি দল করার সুবিধার বিনিময়ে দেশের অসুস্থ ও আর্ত জনসাধারণের ভবিষ্যৎ মঙ্গলের কথা একটিবারও তাঁর বিবেকে জাগে নি? কোথায় তিনি অব্যবস্থা ও দুর্নীতির প্রতিকার করবেন, তা না করে তিনি তারই সহায়তা করছেন। স্থানীয় জনসাধারণ আশা করেছিলেন আপনার পত্রিকায় এই হাসপাতালের দুর্নীতির প্রামাণ্য অভিযোগ প্রকাশিত হওয়ার পর রাইটার্স বিল্ডিংসের কর্তৃপক্ষ নিশ্চয়ই ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন এবং হাসপাতালটি উন্নতির দিকে যাবে, কিন্তু কার্যত দেখছি তার বিপরীত। উক্ত নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে আপনাদের প্রস্তাবিত উচ্চতম কমিটির দ্বারা তদন্ত করান তো হলোই না, কোনরূপ তদন্তের ব্যবস্থা না করেই কিম্বা নাম মাত্র তদন্ত করে (ফিতার অভিযোগের তদন্তের জন্য একজন এসেছিলেন, কিন্তু তিনি এই হাসপাতালের কর্তা ব্যক্তিদের ঘরে বসে তদন্ত করে গেছেন। জিনিসটি কোথায় গেল, জিনিসটি কিরূপ, দামই বা কত হতে পারে সে সম্পর্কে কিছুই অনুসন্ধান করেন নি। আমরা বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হয়েছি যে, জিনিসটি দেখলেই যে কোন মানুষ বুঝতে পারবে এর পেছনে কি আছে।) বিষয়টি ধামাচাপা দেওয়ার ব্যবস্থা করে গেছেন।

পরিস্থিতি এমন হয়ে পড়েছে যে, বর্তমানে এখানে কোন সৎ ও বিবেকবান কর্মী আর থাকতে সাহস পাচ্ছেন না। হাসপাতালের মাত্র দেড় বৎসর বয়সের মধ্যে অনেক ডাক্তার এবং তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারী এই হাসপাতালের অসাধু ব্যক্তিদের অপকর্মের সহায়ক না হওয়ার অপরাধে পাকে-চক্রে বদলী হয়ে গেছেন, কেউ বা ভয়ে নিজেরাই চেষ্টা করে বদলী হয়েছেন। বিপরীত পক্ষে আপনার পত্রিকাতে প্রকাশিত কর্তৃপক্ষের দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত জনৈক কর্মচারীর বদলীর আদেশ হওয়া সত্ত্বেও তার সম্বন্ধে লম্বা সার্টিফিকেট দিয়ে না কি তার বদলীর আদেশ স্থগিত করান হয়েছে—এ দৃষ্টান্তও আছে। যে প্লাস্টিক সার্জারী, নিউরো সার্জারী অর্থোপেডিকের স্পেশালিস্ট যাঁরা কলকাতা থেকে আসেন তাঁরা এখানকার দুর্নীতি ও অব্যবস্থার জন্য অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে উঠেছিলেন।

যুক্তফ্রন্টের শাসনকালে স্বাস্থ্যমন্ত্রী শ্রীযুক্ত ননী ভট্টাচার্য হাসপাতাল পরিদর্শন করতে এলে কল্যাণীর জনসাধারণের পক্ষ থেকে একটি এ্যাম্বুলেন্সের দাবি করা হয়েছিল। তিনিও আশ্বাস দিয়েছিলেন, কিন্তু হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের চেষ্টায় ঐ এ্যাম্বুলেন্স না এসে এল একটি "এ্যাম্বাসাডার কার"। আমরা শুনতে পেয়েছি, ঐ গাড়িটি না কি স্টেশন হতে স্পেশালিস্ট ডাক্তারদের হাসপাতালে আনা-নেওয়ার জন্য গভর্নমেন্ট অর্ডারে নির্দিষ্ট আছে। আশ্চর্যের বিষয়, ঐ গাড়িটি হাসপাতালের কর্তাব্যক্তির কলকাতা যাতায়াত ও সপরিবারে প্রমোদভ্রমণের জন্য ব্যবহৃত হচ্ছে এবং এর জন্য গভর্নমেন্টের প্রতিমাসে পেট্রল খরিদ বাবদ শত শত টাকা ব্যয় হচ্ছে। ক্ষমতা অপব্যবহারের দ্বারা জনসাধারণের অর্থের এরূপ অপব্যয় কি বন্ধ হবে না?

আমরা বিশ্বস্তসূত্রে জানতে পেরেছি আপনার পত্রিকার উক্ত ৫ই আগস্টের সংখ্যায় প্রকাশিত ১" ইঞ্চি সাদা কাপড়ের সরু ফিতা ১০১৲ টাকা করে। ২·১০ পয়সার চিড়া ৩·০০ দরে কেনা, রোগীর খাদ্য চুরি প্রভৃতির অভিযোগ সম্পূর্ণ সত্য। আমরা আরও জানতে পেরেছি ল্যাবরেটরীর জন্য (এখনও চালু হয় নি) কয়েক হাজার টাকার দ্রব্যসামগ্রীর কেনার মধ্যেও না কি গুরুতর দুর্নীতি আছে। পূর্বনির্দিষ্ট কোন প্রতিষ্ঠানের এবং আর দুইটি ভুয়া প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে "কোটেশন" নিয়ে না কি ঐ সকল মাল কেনা হয়। টেন্ডারদাতা প্রতিষ্ঠানগুলি সম্বন্ধে নিয়মানুসারে কোন খোঁজও করা হয় নি।

বর্তমানে যুক্তফ্রন্ট সরকার অথবা পি ডি এফ কংগ্রেস সরকার আর নেই। এঁদের প্রত্যেকেরই দুর্নীতি দমন সম্বন্ধে প্রতিশ্রুতি ছিল। এখন জনসাধারণের দুর্গতি দূর করার সকল দায় রাজ্যপাল শ্রীধরমবীরের ওপর পতিত হয়েছে। তিনি একজন শক্তিমান প্রশাসক হিসাবে সুপরিচিত। আমরা মনে করি তাঁর শত সদিচ্ছা থাকলেও তা পরিপূরণ হওয়া সম্ভব নয় যতক্ষণ পর্যন্ত দুর্নীতিপরায়ণ কর্মচারিগণের হাতে ক্ষমতা থাকবে।

হরেন্দ্রনাথ মৈত্র
পৌরসদস্য নৈহাটী পৌরসভা
(২৪ পরগনা)

সাপ্তাহিক বসুমতীর চাঁদার হার

সাপ্তাহিক বসুমতীর বাৎসরিক চাঁদা সডাক ১৮৲ টাকা, ষাণ্মাসিক ৯৲ টাকা ও ত্রৈমাসিক ৪·৫০ টাকা। প্রতি সংখ্যা ৩০ পঃ।

তিন মাসের কমে গ্রাহক করা হয় না। গ্রাহক হতে হলে আপিসে অগ্রিম টাকা জমা দিতে কিংবা মনি অর্ডারে টাকা পাঠাতে হবে।

—কর্মাধ্যক্ষ, বসুমতী

খেলা ধুলো

ইডেন উদ্যানে এ বছরও কি ফুট-বল খেলা হবে? এই প্রশ্নটি ক্রিকেট উৎসাহীদের মনের কোণে অনেক দিন থেকেই উঁকিঝুঁকি মারছে। এই প্রশ্ন-টির সংগে জড়িয়ে আছে অনেক সংশয়, অনেক আশঙ্কা আর অনেক দিনের স্মৃতি জড়ানো একটি ঐতিহাসিক ক্রীড়াংগনের অপমৃত্যুর ভয়।

অপমৃত্যু ছাড়া আর কিই বা বলবো। গত বছর ইডেন উদ্যানে বসেছিলো মাত্র গুটি কয়েক ফুটবল খেলার আসর। কিন্তু তাতেই আজ মাঠের যে হাল হয়েছে তা আর কহতব্য নয়। ইডেন আজ আর সে ইডেন নেই। নেই আর ইডেনের সেই ভেলভেটের মতো সবুজ চিক্কণ ঘাসের আস্তরণ। ইডেন আজ সর্বাংগে ক্ষত-চিহ্ন নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে মাথা তুলে। জল-কাদার মরশুমে ফুটবল খেলার দীপ্ত পদক্ষেপে ইডেন আজ বিবরে-বিবরে বিপর্যস্ত।

অথচ ইডেন আজো ভারতের সেরা মাঠ তো বটেই—ইডেনের স্থান সম্ভবত এখনো ইংলন্ডের লর্ডস গ্রাউন্ডের পরেই। তাই ইডেন ভারতীয় ক্রিকেটের নন্দনকানন। কিন্তু সেই নন্দনকানন, সেই সাজানো বাগান আজ শুকিয়ে যেতে বসেছে। ইডেনের সেই মন ভোলান রূপ আর নেই। ভারতের গর্ব ইডেনের চেহারা দেখে আজ বড় দুঃখ হয়, বড় কষ্ট হয়।

অথচ এমনটি যে হবে—একথা তো জানাই ছিলো। তাই আজ মনে প্রশ্ন জাগে যে জানা থাকা সত্ত্বেও কেন ইডেনে ফুটবলের আসর বসানো হলো! অস্বীকার করবো না যে বড় ফুটবল খেলায় দেশী দর্শকের উপস্থিতির প্রয়োজন আছে, হয়তো বা ইডেনে ফুটবল খেলার জন্যে হাজার হাজার ফুটবল উৎসাহী খেলা দেখার সুযোগ পেয়ে উৎসাহিত হয়ে উঠেছেন, মোহনবাগান-ইস্টবেংগলের খেলা দেখার সুযোগ পেয়ে আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে উঠেছিলেন তাঁরা! তাই আর ইডেনে ফুটবলের আসর বসাবার ভালো আর মন্দ দিকটার কথা চিন্তা করার অবসর পান নি তাঁরা। তাঁরা কল্পনাও করতে পারেন নি যে ইডেনে ফুটবল খেলা হলে মাঠের এমন ভয়াবহ অবনতি ঘটবে—সর্বাংগে ক্ষতচিহ্ন নিয়ে ক্রিকেটের নন্দনকানন ইডেন উদ্যানকে মাথা উঁচু করেই দাঁড়িয়ে থাকতে হবে।

আরো একটা দিক আছে যার কথাও তাঁরা চিন্তা করেন নি। হয়তো বা চিন্তা করার অবসর অথবা প্রয়োজন-টুকুও বোধ করেন নি। বিষয়টি আর কিছুই নয়—কলকাতা ময়দানের অতি পুরনো একটি চাহিদা একটি পূর্ণাংগ ফুটবল স্টেডিয়াম। ইডেন উদ্যানে ফুট-বলকে চালান দিয়ে কর্তৃপক্ষ বোধহয় সময়ে এবং অতি বুদ্ধিমানের মতো সেই চাহিদাটিকে পাশ কাটিয়ে যেতে চেয়ে-ছিলেন।

তাই বড় জানতে ইচ্ছে করছে যে এবারও কি ইডেন উদ্যানে ফুট-বলের আসর বসবে? এবারও কি ইডেনের আকাশ বাতাস ফুটবলানন্দে মেতে উঠবে—ফুটবলরসিকদের উচ্ছ্বসিত উচ্ছ্বাসে ইডেনের বটগাছগুলো কেঁপে কেঁপে উঠবে! সেই সংগে তাল দিয়ে কবর খোঁড়া হবে বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ক্রিকেটাংগন ইডেন উদ্যানের। ভারতীয় ক্রিকেটের স্মৃতি বিজড়িত অনেক সাধের এই মাঠ—একে এইভাবে নষ্ট হতে দেওয়া কোনমতেই বাঞ্ছনীয় নয়।

ইডেন উদ্যানে তাই সাংগ হোক ফুটবলের পালা। আবার সেই মন ভোলান রূপে ইডেন সেজে উঠুক—আবার বিশ্বশ্রেষ্ঠ সম্মান অর্জন করুক ইডেন। আর আমরাও ফুটবল স্টেডিয়ামের জন্যে আন্দোলন গড়ে তুলি। যতদিন না কলকাতায় ফুটবল স্টেডিয়াম হচ্ছে—ততদিন খেলাগুলো না হয় রবীন্দ্র সরো-বরেই হোক! ইডেন নয় রবীন্দ্র সরো-বরেই বসুক এবার থেকে ফুটবলের আসর।

—শান্তিপ্রিয়

যুগের হাওয়া ও ব্রাইট ক্রিকেট

আজ আমরা এসে দাঁড়িয়েছি এ্যাটম বোমা আর জেট প্লেনের যুগে। এ যুগের হাওয়ায় খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলা বড়ই অবাস্তব। তাই আজ সব জায়গাতেই ব্যস্ততার ছোঁয়া; চাঞ্চল্যের লক্ষণ। ক্রিকেট

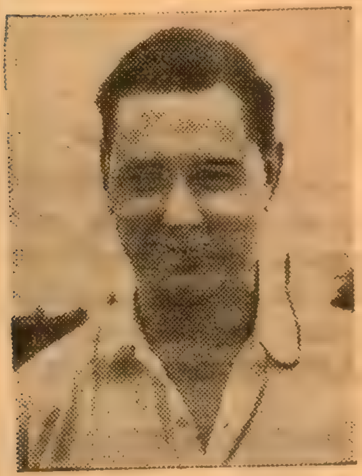

কলিন কাউড্রে

খেলাকেও তাই আজ আর ঢিমে-তেতালে এগিয়ে চললে চলবে না। যুগের হাওয়ায় ক্রিকেটকেও গা-মেলাতে হবে।

ব্রাইট ক্রিকেট অর্থাৎ উজ্জ্বল ক্রিকেট নয়—প্রাণবন্ত ক্রিকেট। কথাটা শুনতে মন্দ লাগে না, বোধহয় বলতেও! কিন্তু কাজের বেলায় দেখা যায় যে ব্রাইট ক্রিকেট খেলতে গিয়ে সকলের প্রাণান্ত। দর্শকদের আনন্দ দিতে গিয়ে খেলার মাঠে সত্যি-কারের ব্রাইট ক্রিকেট কেউই খেলেন না।

খেলতে নেমে সবাই সবার আগে চান জান বাঁচাতে। সব দলেরই মনোভাব এক—আগে তো পরাজয়ের হাত থেকে রেহাই পাই, তার পরে অন্য কথা। কিন্তু খেলার মাঠে জয়লাভের সংগে পরাজয়ের প্রশ্নটাও যে একান্তভাবে স্বাভাবিক, এ কথাটা কারো যেন আর মনেই থাকে না!

মনে নেই বিশ্বের অন্যতম সেরা দল ওয়েস্ট ইণ্ডিজেরও। ইংলণ্ড বনাম ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের এখনকার টেস্ট মর-শুমে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ক্রিকেটাঙ্গনে যেমন তার কৌলীন্য হারাচ্ছে, তেমনি সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে ইংলণ্ড ক্রিকেট দলের তার পুরনো সম্মান ফিরে পাবার।

ক্রিকেট খেলায় যোগ্য নেতৃত্বের মূল্য যে কতখানি ইংলণ্ডের অধিনায়ক কলিন কাউড্রে এবার তার যৌক্তিকতা যথার্থ-ভাবেই প্রমাণ করে দিয়েছেন। আজকের ইংলণ্ড দলের সংগে ব্রায়ান ক্লোজ কিম্বা মাইক স্মিথের দলের কতো তফাৎ।

টিম স্পিরিট বলে একটা কথা আছে। ক্রিকেটের আসরে এর মূল্য অপরিসীম। কাউড্রেকে অধিনায়ক হিসেবে পাওয়ায় ইংলণ্ডের খেলোয়াড়রা আবার ফিরে পেয়েছে তাদের টিম স্পিরিট। তাই আজ ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে খেলতে নেমে, বিশ্ব চ্যাম্পিয়ান যাদের বলা হতো সেই ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলেরও ঐ হাল। তারা যেন আর হালে পানি পাচ্ছে না। বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ফাস্ট বোলার হলকে বাদ দিতে হচ্ছে দল থেকে। এমন কি সোবার্সের মতো ব্যাটসম্যানও আগে ব্যাটিং করতে নামতে ভরসা পাচ্ছেন না।

কারণটা অবশ্য সহজেই অনুমান করা যায়। সোবার্স আগে ব্যাটিং করতে নেমে আউট হয়ে গেলে পুরো ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলই কোলাপ্স করবে। কিন্তু এমন কেন

পতৌদি

হলো? ঠিক এমনটি তো হবার কথা ছিল না! পর পর তিনটি খেলা অমীমাংসিতভাবে শেষ করার পর, আজ ক্রিকেট খেলাকে তাঁরা কোথায় এনে হাজির করেছেন? ব্রাইট ক্রিকেটের কবর কি তাঁরা খুঁড়ছেন না?

তবে সব থেকে বেশি অবাক হয়েছেন সকলে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের অবস্থা দেখে। ব্যাটিং, বোলিং আর ফিল্ডিং-এ যে দল ছিলো অতুলনীয় তারা আজ হঠাৎ বড় অপ্রত্যাশিতভাবে তুলনামূলক বিচারে এসে গেছে ইংলণ্ড দলের অনেক নিচে!

এ কথার সব থেকে বড় প্রমাণ হলো ইংলণ্ড বনাম ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের তিনটি অমীমাংসিত টেস্ট ম্যাচ। ঐ তিনটি টেস্টই ছিল ইংলণ্ড দলের শ্রেষ্ঠত্ব। এমন কি ইংলণ্ড দলের জয়লাভের সম্ভাবনাও দেখা দিয়েছিলো কয়েকটি ক্ষেত্রে।

রাবার ভারতেরই থাকল

নিউজিল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে রাবার ভার-তেরই থাকলো। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে পর পর পরাজয়ের পরও নিউজিল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে রাবার বজায় রাখা হয়তো বা কিছুটা কৃতিত্বের পরিচায়ক। কিন্তু সব কৃতিত্বই ফোলো মনে হয় যখন নিউজিল্যাণ্ডের কাছে দ্বিতীয় টেস্টে ভারতের পরাজয়ের কথা মনে পড়ে।

প্রথম, তৃতীয় ও চতুর্থ টেস্টে ভারত জিতলো। এ জয়লাভ থেকে একটা কথাই প্রমাণিত হচ্ছে যে দলগত শক্তির বিচারে নিউজিল্যাণ্ড ভারতের তুলনায় কিছুই নয়।

বিদেশের মাটিতে ভারতের এই প্রথম রাবার লাভ। পতৌদির নবাবের অধিনায়কতায় ভারত এই সম্মান লাভ

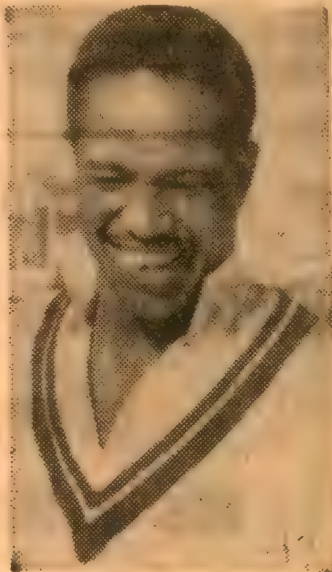

সোবার্স

করলো। ভারতীয় খেলোয়াড়দের কাছে এ এক অতুলনীয় কৃতিত্ব। কয়েকজন ভারতীয় খেলোয়াড়ের ব্যক্তিগত নৈপুণ্যই এই সম্মান লাভের পথ প্রশস্ত করে দেয়।

চতুর্থ টেস্টে ভারতের জয়লাভের পেছনে আছে সুর্তি, পতৌদি, বোরদে, ইঞ্জিনীয়ার, প্রসন্ন প্রমুখ খেলোয়াড়দের ব্যক্তিগত নৈপুণ্য। দুর্ভাগ্য সুর্তির।

প্রসন্ন

মাত্র এক রানের জন্যে তিনি পারেন নি শতরান পূর্ণ করতে।

ভারত প্রথম ইনিংসে ২৫২ ও দ্বিতীয় ইনিংসে ৫ উইকেটে ২৬১ রান করে। প্রত্যুত্তরে নিউজিল্যাণ্ড প্রথম ইনিংসে ১৪০ ও দ্বিতীয় ইনিংসে ১০১ রান করায় ভারত ২৭২ রানে জয়লাভ করে।

এই জয়লাভের স্মৃতিকে সামনে রেখে ভারত যদি ভবিষ্যৎ অগ্রগতির দিকে এগিয়ে যেতে পারে—অন্তত চেষ্টা করে তাহলেই ভারতের এই জয়যাত্রার পথ সুগম হবে আর সার্থক হবে। আজ আমরা সেই আশা নিয়ে ভারতীয় দলের খেলোয়াড়দের স্বাগত জানাই।

সমাচার দর্পন

বিশ্ব ক্রিকেট দলে এবার স্থান পেয়েছেন ভারতের তিনজন খেলোয়াড়। অধিনায়ক পতৌদির নবাবের সংগে বিশ্ব একাদশের পক্ষে মনোনীত হয়েছেন ভারতের উইকেটরক্ষক-ওপনিং ব্যাটসম্যান ফারুক ইঞ্জিনীয়ার আর অলরাউণ্ডার রুসি সুর্তি। সুস্থ থাকলে হয়তো চন্দ্রশেখর দলে স্থান পেতেন। কিন্তু ভাবতে অবাক লাগে যে কেন প্রসন্ন দলে এলেন না?

* * *

এক ইনিংসে দশ জন খেলোয়াড়কে ক্যাচ লুফে আউট করা বড় সহজ কথা নয়। কিন্তু ভারতীয় ক্রিকেটাররা সেই অসম্ভবকে সম্ভব করেছেন। তৃতীয় টেস্ট ম্যাচের দ্বিতীয় ইনিংসে তাঁরা নিউজিল্যাণ্ডের দশজন খেলোয়াড়কে আউট করেছিলেন ক্যাচ লুফে। ক্যাচ ফেলাতেই ভারতীয় খেলোয়াড়রা এতোকাল ছিলেন বিশ্বশ্রেষ্ঠ, সেই তাঁরাই এবার ক্যাচ লুফে করলেন বিশ্ব রেকর্ড। আশ্চর্য হবার কথাই বটে......!!

* * *

এশিয়ান অলস্টার দলে ভারত থেকে এবার মাত্র একজন খেলোয়াড় স্থান পেয়েছেন। জলন্ধরের লীডারস ক্লাবের ইন্দার সিং-এর ভাগ্যে এবার শিকে ছিঁড়েছে। কিন্তু এই একজন মাত্র খেলোয়াড়ের মনোনয়নের খবরটা মোটেই

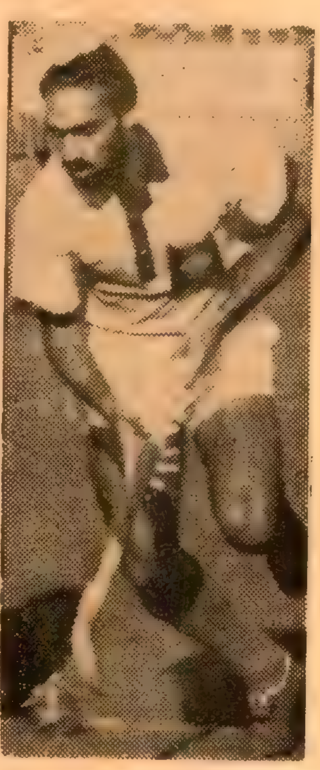

ইন্দার সিং

আশাপ্রদ নয়। এই মনোনয়ন থেকে অন্তত একটা কথাই তো মনে হচ্ছে—এশীয় ফুটবলের ক্ষেত্রেও ভারত তাহ'লে পিছিয়ে পড়ছে......!!

দেশ সেবায় নিয়োজিত,

এ্যালবার্ট ডেভিড লিমিটেড

কলিকাতা—৫০

নীতি ও বিজ্ঞানানুযায়ী ঔষধ
প্রস্তুতকরণের অগ্রণী

—ব্রাঞ্চ সমূহ—

বোম্বে - মাদ্রাজ - দিল্লী - নাগপুর
বেজওয়াডা - শ্রীনগর - গৌহাটী

নাকের বদলে নরুন

ক্যাঙ্গারুদের কাত করতে পারে নি, কিন্তু কিউইসদের যে কাবু করতে পেরেছে পতৌদির দলবল এই আমাদের সান্ত্বনা! অবশ্য দ্বিতীয় টেস্টে কিউইসদের কামড় আমরা ভুলেছি ৩—১ খেলায় সিরিজ জয়ের আনন্দে। বাংলাদেশের প্রচলিত ছড়াটি যদি পতৌদি জানতেন তবে হয় ত' মনের আনন্দে দলবল নিয়ে তান তুলতেন 'নাকের বদলে নরুণ পেলাম।' ক্যাঙ্গারুর দেশে নাক গিয়েছে কাটা, কিন্তু নিউজিল্যাণ্ডে নরুণ লাভ হয়েছে।

পতৌদির নবাবের ভাগ্য ভালই বলতে হবে। ভূপালের জঙ্গলে বাঘ শিকার করছিলেন। জরুরী ডাকে বোম্বাইয়ে এলেন শিকার শিকেয় তুলে রেখে; বাঘ ভাগ্যে না জুটলেও, সহজেই বাগিয়ে নিলেন অস্ট্রেলিয়া-নিউজিল্যাণ্ড সফরে অধিনায়কত্বের সম্মান। অস্ট্রেলিয়ায় রাবার

বাপু নাদকার্নি

শিকারে নাজেহাল হলেন। ক্যাঙ্গারুর ল্যাজের ঝাপটায় রাবার আর মান-সম্মান দুই গেল। তবু রক্ষে যে নিউজিল্যাণ্ডের কাছে আমাদের রাবার লাভ হয়েছে। কারণ আমাদের যত বীরত্ব নিউজিল্যাণ্ডের মত ক্রিকেট দলের কাছেই। কয়েক বছর আগে একবার দেশের মাটিতে নিউজিল্যাণ্ডকে বাগে পেয়ে অনেকগুলো রেকর্ডও আমাদের ক্রিকেটাররা করে নিয়েছে, এর মধ্যে আবার একটা আছে বিশ্ব রেকর্ড।

ভারত টেস্ট ক্রিকেটের আসরে প্রবেশ করেছে বহুদিন আগে ১৯৩২ সালে। কিন্তু জয় ছিল ভারতের কাছে আলেয়ার মত; দেশের মাটিতে ১৯৫২ সালে দীর্ঘ বিশ বছর পর ইংলণ্ডের বিপক্ষে মাদ্রাজের মাঠে হল ভারতের প্রথম টেস্ট বিজয়। দেশের মাটিতে এরপর দশটি টেস্ট বিজয় ভারত সংগ্রহ করেছে ইতিমধ্যে, কিন্তু বিদেশের মাটিতে জয় ভারতের কাছে ছিল সোনার হরিণ। ডুনেডীনে নিউজিল্যাণ্ডকে হারিয়ে ভারত সেই সোনার হরিণকে ধরল, কিন্তু পরের টেস্টেই ক্রাইস্টচার্চে আবার পরাজয়ের কালোছায়া ভারতকে স্পর্শ করল। শেষ পর্যন্ত ওয়েলিংটন আর অকল্যাণ্ডে শেষ দুটি টেস্টে জয়ী হয়ে ৩—১ খেলায় ভারত রাবার করায়ত্ত করল; বুলিতে উঠল বিদেশের মাটিতে মহামূল্যবান রাবার। কানপুরের গ্রীন পার্কে হাত ঘুরিয়ে ভেল্কি দেখিয়ে জেসু প্যাটেল পদ্মশ্রী বাগিয়ে নিয়েছিলেন। আর নিউজিল্যাণ্ডের মাঠে কেরামতির জন্যে অন্তত দলপতির ভাগ্যে কি একটা পদ্মশ্রী জুটবে না!

অকল্যাণ্ডের ইডেন পার্কে ভারতের খেলোয়াড়েরা ভেল্কি দেখিয়েছেন। খেলার প্রথমদিন আর দ্বিতীয়দিন বৃষ্টির উৎপাতে বেশ কিছু সময় গেল ভেসে। কিন্তু এর মধ্যেও জয়ের পেছনে সাফল্যের সঙ্গে ছুটেছে ভারতীয় খেলোয়াড়েরা। ভারতীয় দলের প্রথম ইনিংসে ২৫২ রানের উত্তরে যখন নিউজিল্যাণ্ড ১৪০ রানের বেশি তুলতে পারল না তখন মনে হল আশা আছে। অবশ্য ভারতীয় দলকে বিশ্বাস করতে মন চায় না; কারণ বহুবার দেখা গিয়েছে বিজয়ের ভরা পানপাত্র ঠোঁটের কাছে উঠেও ফস্কে পড়ে ভেঙে চুরমার হয়ে গিয়েছে। দ্বিতীয় ইনিংসে পাঁচ উইকেটে ২৬১ রান সংগ্রহ করে খেলার শেষ দিন মধ্যাহ্ন ভোজের বিরতির অল্প সময় আগে ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করলেন পতৌদি। রুসী সুর্তিকে প্রথম টেস্ট সেঞ্চুরী করার সুযোগ দেবার জন্যে জয়ের প্রচেষ্টাকে একটু দূরেই সরিয়ে রেখেছিলেন। কিন্তু সুর্তির দুর্ভাগ্য নড়বড়ে নব্বইয়ের বলি হলেন তিনি; স্নায়ুযুদ্ধে পরাভূত সৈনিকের মত নিরানব্বই রানে ক্যাচ তুলে প্যাভেলিয়ানে ফিরলেন।

সময় পুঁজিতে অল্প; দশটি উইকেটের পতন ঘটান কি সহজ কথা। কিন্তু সেই অসম্ভবকে সম্ভব করলেন দুই স্পিনার প্রসন্ন আর বেদী কুটিল স্পিনের চালে। ব্যাটসম্যানদের প্যাভেলিয়ানে ফেরার শোভাযাত্রা সুরু হয়ে গেল। মাত্র সত্তর মিনিটে ৪০ রানের মধ্যে ৭টি উইকেটের পতন ঘটল। শুধু ডার্ভালিং মাটি কামড়ে ৩৭ রান করলেন, কিন্তু একক প্রচেষ্টায় কি আর ভরাডুবি রোধ করা যায়। মাত্র ১০১ রানে সব শেষ হল আর ভারত জিতল ২৭২ রানে।

ভারতীয় দলের বোলারদের সাফল্য প্রশংসনীয়, ব্যাটসম্যানদের সাহায্যকেও অস্বীকার করা চলে না। অবশ্য অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে দলের ব্যর্থতার জন্য দায়ী প্রধানত ছাপমারা ব্যাটগুলির ব্যর্থতা। নিউজিল্যাণ্ড সফরে প্রসন্ন সংগ্রহ করেছেন ২৪টি উইকেট; ব্যাটিং তালিকার শীর্ষে স্থান পেয়েছেন অজিত ওয়াদেকার মোট ৩৩০ রান সংগ্রহ করে ৪৭·১৪ রানের গড়পড়তায়, বোলিং তালিকার শীর্ষে আছেন বাপু নাদকার্নি ১৭·৯২ রানের গড়পড়তায়।

যাই হোক ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন ভারতীয় টেস্ট ক্রিকেটের কনিষ্ঠতম অধিনায়ক পতৌদির নবাব মনসুর আলি খাঁ। গত বছর ইংলণ্ডে যাই ঘটে থাকুক না কেন; অথবা অস্ট্রেলিয়ার মাটিতেও এবার যাই ফলাফল হোক না কেন, নিউজিল্যাণ্ড

ওয়াদেকার

সফরের শেষে যদি পতৌদি তাঁর দলবলের সঙ্গে সুর মিলিয়ে বলেন যে "সব ভাল যার শেষ ভাল" তবে কি আর বলার কিছু থাকবে!

—শ্রীঅমিতাভ

মাত্র ২০. টাকায় ট্রানজিস্টার

অল ওয়ার্ল্ড ৩ ব্যাণ্ড সুলভতম ট্রানজিস্টার সমবায় ভিত্তির মাধ্যমে মাত্র ২০৲ টাকায় পাঠানো হয়। ইংরেজীতে আপনার অর্ডার বুক করুন।

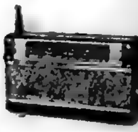

Ceylon Traders (WBC-22)
Post Box 1257, Delhi-6.

পরিচীয়তে

রুসি সুর্তি

সাম্প্রতিককালে ভারতীয় ক্রিকেটের সব চেয়ে উদ্ভাসিত নামটি হলো, রুসি সুর্তির। ক্রিকেট জগতে সুর্তি আজ একটি নাম। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে সুর্তির ক্রীড়ানৈপুণ্য তাঁকে অনেক ওপরে তুলে দিয়েছে। সুর্তি আজ শুধু আর মাত্র ভারতের নন, তাঁর প্রভাব বিশ্ব ক্রিকেটাঙ্গনেও।

চাঁদু বোরদে বোলিং করা ছেড়ে দেবার পর ভারতীয় ক্রিকেটে সত্যিকারের অলরাউন্ডার ধরতে গেলে বিশেষ কেউ ছিলেন না। এক ডুরানী—কিন্তু তাঁর খেলাও তো কর্তৃপক্ষের মর্জির ওপরে!

কিন্তু সুর্তি ভারতের সেই অভাব আজ মিটিয়েছেন। শুধু মিটিয়েছেন বললে সবটা বলা হবে না। সুর্তি আজ নিজেকে ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ অলরাউন্ডার হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত করে নিয়েছেন!

ব্যাটিং, বোলিং আর ফিল্ডিং—এই তিনটি বিষয়ে সুর্তি অনন্য। ব্যাটিং-এ সুর্তির হাতে আছে রকমারী মার আর কব্জীতে আছে জোর। তাই ব্যাট নিয়ে সুর্তি ক্রীজে দাঁড়ালে, মাঠে ডাকে রানের বান!

আর বোলিং! সে কথা না বলাই ভালো। তুলনাহীন সুর্তির বোলিং। নতুন বল নিয়ে সুর্তি যেমন বোলিং-এর সূচনা করতে পারেন, তেমনি বলের পালিশ উঠে গেলে পারেন সেই বলকেই অফ আর অনের দিকে স্পিন করাতে। সুর্তি একাধারে পেস বোলার আর অন্য ধারে সুর্তি স্পিনার!

সেই সঙ্গে আছে সুর্তির নয়নাভিরাম গ্রাউন্ড ফিল্ডিং! ব্যাটসম্যানের কাছে দূরে যেখানে খুশি দাঁড় করানো যায় সুর্তিকে! আর যেখানেই দাঁড় করানো হোক না কেন —সুর্তি তাঁর অনন্য ফিল্ডিং প্রতিভার পরিচয় সেইখানেই দেবেন!

এমনটি আর হয় না। সুর্তির মতো নিখুঁত এবং নিপুণ অলরাউন্ডার ভারতে আর দ্বিতীয়টি নেই! আর নেই বলেই সুর্তির আজ এতো দাম!

এ দামের স্বীকৃতি যে সুর্তি অস্ট্রেলিয়া থেকেও পেয়েছেন। সুর্তির খেলা দেখে অস্ট্রেলিয়াবাসীরা মুগ্ধ, আর কর্তৃপক্ষরা চমৎকৃত। তাঁরা যেন একটি মানুষের মধ্যে এতো রূপের কল্পনাও করতে পারছেন না!

তাই গুণের আদর করতে তাঁরা ধরে রাখতে চাইছেন সুর্তিকে! আমরা সকলেই জানি যে ক্রিকেট শিক্ষক হিসেবে সুর্তিকে পাবার জন্যে অস্ট্রেলিয়া কতো ব্যগ্র। সুর্তির কাছে সেইজন্যে এসেছে কতো লোভনীয় প্রস্তাব।

এই প্রস্তাবকে শুধু মাত্র লোভনীয় বলে ধরে নিলেই চলবে না। এই প্রস্তাবকে

রুসি সুর্তি

নিতে হবে সুর্তির অনন্য প্রতিভার স্বীকৃতি হিসেবে!

অথচ এই সুর্তিও ধরতে গেলে এতোদিন ছিলেন ভারতের অবহেলিত খেলোয়াড় তালিকায়। সুর্তিকে খেলার সুযোগ দেওয়া হতো না, বসিয়ে রাখা হতো, টুয়েলভথ ম্যান করে রাখা হতো!

তবু তারই ফাঁকে একটু-আধটু করে টেস্ট খেলায় সুযোগ পেতে পেতে হঠাৎ আজ এতোকাল পরে সুর্তির খেলোয়াড়-জীবন ফলে ফুলে ভরে উঠেছে।

অনেক অবহেলা সইতে সইতে সুর্তি আজ আর নিজেকে নিয়ে বিশেষ চিন্তা করেন না। চ্যান্স পেলেও যা, না পেলেও তাই—সুর্তির খেলোয়াড়জীবন সম্বন্ধে এমনি ধারণা ছিলো তাঁর।

হয়তো বা সাধারণ ঘরের ছেলে বলে সুর্তি চান্স পেতেন না। হয়তো বা তাঁর সম্ভাবনাপূর্ণ খেলা দেখে কেউ হয়তো চেয়েছিলেন সুর্তিকে চেপে দিতে।

কিন্তু আগুন কখনো আর চাপা দেওয়া যায়? তাই সুর্তি আজ এসে দাঁড়িয়েছেন বিশ্ব ক্রিকেটের প্রথম সারিতে। সুর্তি আজ প্রথম সারির খেলোয়াড়!

টেস্ট ক্রিকেটের জগতে সুর্তি এসেছেন অবশ্য অনেকদিন আগেই। ১৯৬৩ সালে ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে প্রথম টেস্ট খেলার সুযোগ পান সুর্তি। পরের বছর অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে কলকাতার দ্বিতীয় টেস্টে সুর্তি খুব সুন্দর বোলিং করেছিলেন। প্রথম ইনিংসে অস্ট্রেলিয়া করেছিলো মাত্র ১৭৪ রান। এর মধ্যে সুর্তি পেয়েছিলেন ৩টি উইকেট। এ্যাভারেজ দাঁড়িয়েছিলো ২১ ওভার, ৭টি মেডেন, ৩৮ রান, ৩টি উইকেট।

প্রথম দিকে সুর্তির বোলিং আর ফিল্ডিং ছিলো অতুলনীয়। তারপর ধীরে ধীরে পাল্টাতে লাগলো সময়। সেই সঙ্গে তাল দিয়ে পাল্টালো সুর্তির খেলার ধারাও। বোলিং আর ফিল্ডিং-এর সঙ্গে তাল দিয়ে সুর্তি নামী ব্যাটসম্যান হিসেবে নিজেকে জাহির করলেন।

আর সুর্তির প্রতিভার অনন্য প্রকাশ দেখা গেলো ভারতীয় দলের সাম্প্রতিক অস্ট্রেলিয়া ভ্রমণের সময়। ভারতীয় ব্যাটসম্যানদের মধ্যে যখন প্রায় সকলেই অসহায়ের মতো আউট হয়ে হয়ে ফিরে আসছিলেন তখনই সুর্তি বার বার সামলিয়ে ধরেছিলেন ব্যাটিং-এর হাল!

ব্যাটিং, বোলিং আর ফিল্ডিং—এই তিনটি বিষয়ে অসামান্য কৃতিত্ব দেখাবার জন্যে ভারতীয় দলের সাম্প্রতিক অস্ট্রেলিয়া সফর শুধু সুর্তির কাছেই নয় আমাদের কাছেও চিরকাল উজ্জ্বল হয়ে থাকবে!

সুর্তিকে যে আমরা নতুন রূপে, নতুন ভাবে খুঁজে পেয়েছি এবার...!!

সম্পাদিকা—জয়ন্তী সেন

বসুমতী (প্রাঃ) লিঃ-এর পক্ষে ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীটস্থ কলিকাতা-১২
বসুমতী প্রেস হইতে শ্রীসুকুমার মুখোপাধ্যায়/মজুমদার কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বসুমতীতে পাওয়া যাচ্ছে! একরাশ শিশু-সাহিত্য!

কিন্তু সমগ্র পরিবার পড়তে পারেন

দামে যেমন সস্তা, তেমনি পাতায় পাতায় রঙীন ছবি।

মনোরম রঙীন প্রচ্ছদ। বোর্ডে বাধাই।

আজই অর্ডার পেশ করুন আপনার পরিবারের সকলের জন্য।

(পাঠাগার ও সংস্থাসমূহের জন্য শতকরা পনেরো টাকা কমিশন!)

১। রঘুবংশ	...	মহাকবি কালিদাস	...	পঁচাত্তর পয়সা
২। শকুন্তলা	...	মহাকবি কালিদাস	...	পঁচাত্তর পয়সা
৩। এ্যারেবিয়ান নাইটসের গল্প (দুই খণ্ডে সম্পূর্ণ)	...	অনুবাদ—অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর	...	প্রতি খণ্ড এক টাকা পঁচিশ পয়সা
৪। জুলিয়াস সিজার	...	উইলিয়াম সেক্সপীয়র	...	এক টাকা পঞ্চাশ পয়সা
৫। ম্যাকবেথ	...	উইলিয়াম সেক্সপীয়র	...	এক টাকা পঞ্চাশ পয়সা
৬। রোমিও জুলিয়েট	...	উইলিয়াম সেক্সপীয়র	...	এক টাকা পঞ্চাশ পয়সা
৭। হারকিউলিস	...	হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ	...	এক টাকা বাষট্টি পয়সা
৮। আষাঢ়ে গল্প	...	হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ	...	এক টাকা পঁচাত্তর পয়সা
৯। স্নো-হোয়াইট	...	হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ	...	এক টাকা বাষট্টি পয়সা
১০। কুমারের বাঘা গোয়েন্দা	...	হেমেন্দ্রকুমার রায়	...	এক টাকা পঁচিশ পয়সা
১১। ছোট্ট পমির অভিযান	...	হেমেন্দ্রকুমার রায়	...	এক টাকা পঁচিশ পয়সা
১২। রতনপুরের যাত্রী	...	হেমেন্দ্রকুমার রায়	...	এক টাকা পঁচিশ পয়সা
১৩। ডন কুইকসোট	...	সারভেন্টিস	...	এক টাকা পঞ্চাশ পয়সা
১৪। ওয়ার এ্যান্ড পিস	...	টলস্টয়	...	এক টাকা পঞ্চাশ পয়সা
১৫। বর্মায় যখন বোমা পড়ে	...	সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়	...	এক টাকা পঁচিশ পয়সা
১৬। আমার দেশ	...	নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়	...	দুই টাকা পঞ্চাশ পয়সা
১৭। মোহন সিংয়ের ফাঁসি	...	মন্মথনাথ ঘোষ	...	এক টাকা পঁচিশ পয়সা
১৮। জন্মজন্মান্তরের কাহিনী	...	নরেন্দ্র দেব	...	এক টাকা পঞ্চাশ পয়সা
১৯। রকমারি গল্প	...	নরেন্দ্র দেব	...	দুই টাকা পঞ্চাশ পয়সা
২০। স্বার্থপর দৈত্য	...	বুদ্ধদেব বসু	...	এক টাকা পঁচাত্তর পয়সা
২১। সুখী রাজপুত্র	...	বুদ্ধদেব বসু	...	এক টাকা পঞ্চাশ পয়সা
২২। লক্ষ্মণ সেনের রাজমুকুট	...	—	...	এক টাকা পঁচিশ পয়সা
২৩। শান্তিপুরে অশান্তি	...	প্রভাবতী দেবী সরস্বতী	...	এক টাকা পঞ্চাশ পয়সা
২৪। বন্দী জেগে আছো?	...	প্রভাবতী দেবী সরস্বতী	...	এক টাকা পঁচিশ পয়সা
২৫। প্রেতাত্মার প্রতিহিংসা	...	প্রভাবতী দেবী সরস্বতী	...	এক টাকা পঁচিশ পয়সা
২৬। মনের মতো গল্প	...	প্রভাবতী দেবী সরস্বতী	...	এক টাকা পঁচিশ পয়সা
২৭। টিয়ার গ্যাস	...	স্বপন বুড়ো	...	এক টাকা পঁচিশ পয়সা
২৮। লাফিং গ্যাস	...	স্বপন বুড়ো	...	এক টাকা পঞ্চাশ পয়সা
২৯। অশরীরী আত্মা	...	স্বপন বুড়ো	...	এক টাকা পঞ্চাশ পয়সা
৩০। কেনিলওয়ার্থ	...	মন্মথনাথ ঘোষ	...	এক টাকা পঁচিশ পয়সা
৩১। টোয়েন্টি ইয়ার্স আফটার	...	সুধীন্দ্রনাথ রাহা	...	এক টাকা পঁচিশ পয়সা
৩২। টয়লার্স অব দি সী	...	সুধীন্দ্রনাথ রাহা	...	এক টাকা পঁচিশ পয়সা
৩৩। ডেভিলস আইল্যান্ড	...	বিশু মুখোপাধ্যায়	...	পঁচাত্তর পয়সা
৩৪। অচিন দেশের রাজকন্যা	...	দীনেশ মুখোপাধ্যায়	...	এক টাকা

শিশু-সাহিত্যের রত্নভাণ্ডার! স্বপ্নের ময়ূরপঙ্খী! বসুমতী (প্রাঃ) লিঃ। কলিকাতা ১২

Thursday, 21st March, 1968 SAPTAHIK BASUMATI Regd. No. C11
Price : 30 Paise Gram : "Basumati" Phone : 34-7771, 72, 73, 74

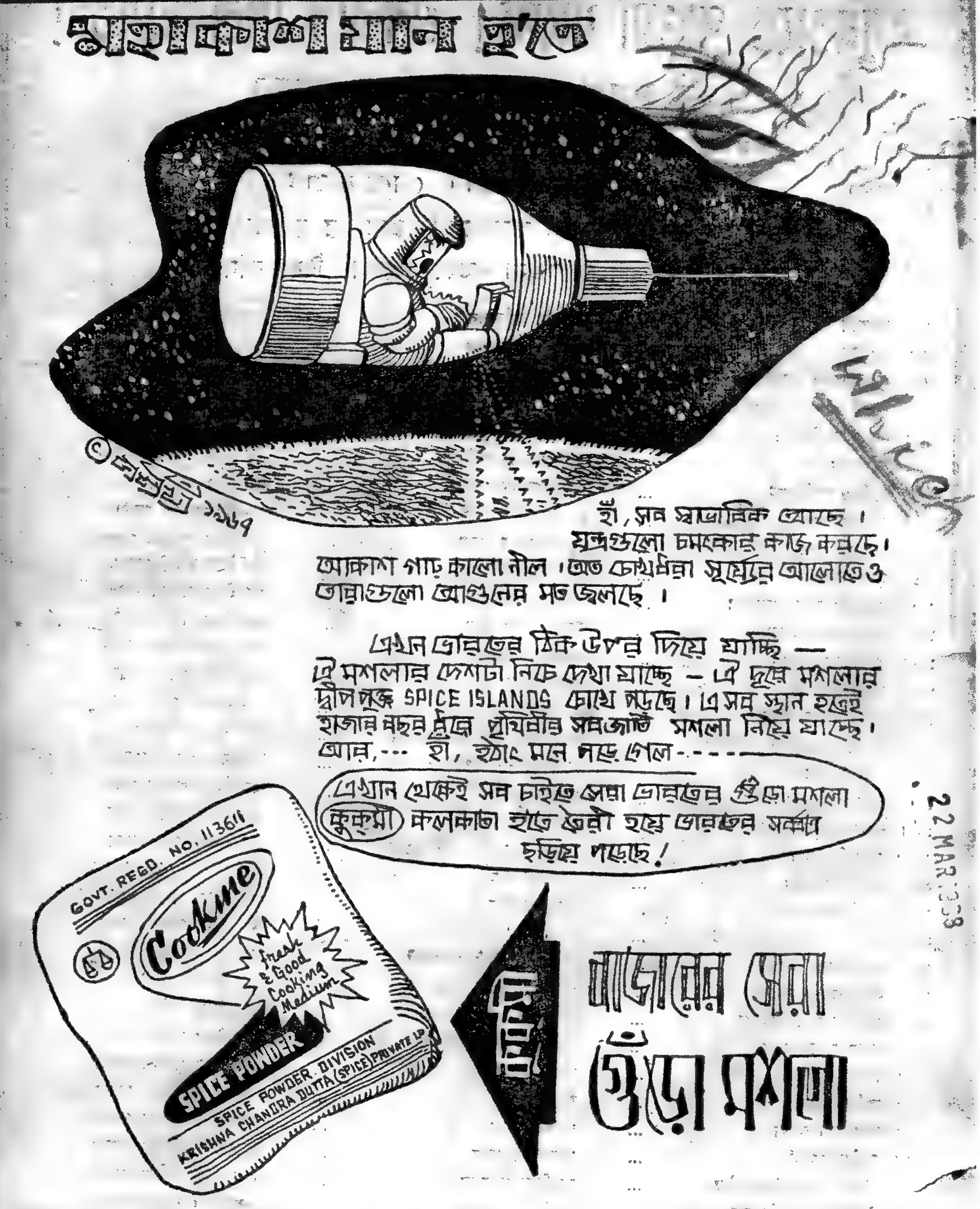

গ্রাম : "স্পাইসমার্ট" মিল-কাশীপুর ফোন : ৩৩-১২০২, ৩৩-২০৮১

নিজস্ব মিলে বৈজ্ঞানিক প্রথায় প্রস্তুত
'কুকমী'—সর্বাধিক বিক্রীত গুঁড়ো মশলা
পনের লক্ষ প্যাকেট মাসিক বিক্রয়
১২৫ বৎসরের অধিক প্রাচীন ও বর্ত্তমানে মশলার বৃহত্তম প্রতিষ্ঠান
কৃষ্ণচন্দ্র দত্ত (স্পাইস) প্রাঃ লিঃ ২০১নং ও ২০৫নং মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড, পোস্তা, কলিকাতা-৭

সাপ্তাহিক বসুমতী

মানবাত্মার কারিগর ম্যাক্সিম গোর্কির

জন্মশতবর্ষপূর্তি স্মরণে

র্ষ: ৪১শ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ১৪ই চৈত্র, ১৩৭৪ বঙ্গাব্দ] OLDEST WEEKLY OF NORTH INDIA [72nd year, No. 41, 28th Mar., 1968

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয়		২৫৬৩
আজকের মানুষ		২৫৬৪
বঙ্গদর্শন		২৫৬৫
সপ্তাহের বোঝা	কৃত্তিবাস ওঝা	২৫৭০
অবক্তব্য	চন্দ্রগুপ্ত	২৫৭২
তেতো মানুষের গান (কবিতা)	রাণী চট্টোপাধ্যায়	২৫৭৪
ভারতদর্শন		২৫৭৫
আন্তর্জাতিক		২৫৭৮
ঝড়ের পাখীর গান (অনুবাদ কবিতা)	সিদ্ধেশ্বর সেন	২৫৮২
কালের কণ্ঠস্বর : ম্যাক্সিম গোর্কি (প্রবন্ধ)	রজত রায়চৌধুরী	২৫৮৩
গোর্কির নাটক	কল্পতরু সেনগুপ্ত	২৫৮৫
গোর্কির কাছে যা পেয়েছি (প্রবন্ধ)	মনোরঞ্জন হাজরা	২৫৮৮
গোর্কির সাহিত্যে মানবতাবাদ (প্রবন্ধ)	দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	২৫৯৩

রহস্য গল্প! খুনের গল্প! ডাকাতির গল্প! এ্যাডভেঞ্চারের গল্প!

সদ্য প্রকাশিত হইল।

শিশু-সাহিত্যের সম্রাট

হেমেন্দ্রকুমার রায়ের

গ্রন্থাবলী

শিশু ও কিশোর-কিশোরীদের জন্য লেখা—কিন্তু হেমেন্দ্রকুমারের রচনা আবালবৃদ্ধবনিতা পড়ে থাকেন। হেমেন্দ্রকুমারের ছখানি সাড়াজাগানো উপন্যাস এই সুবৃহৎ গ্রন্থাবলীতে স্থান পেয়েছে।

১। যকের ধন ২। প্রদীপ ও অন্ধকার ৩। রহস্যের আলোছায়া।
৪। ক্ষুদিরামের কীর্তি ৫। চাবি ও খিল
৬। একরত্তি মাটি ৭। এক গুপ্ত রহস্য
ও গোয়েন্দা গল্প।

পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৯৬
মূল্য মাত্র ছয় টাকা

বসুমতী প্রাঃ লিঃ
কলিকাতা-১২

অবিলম্বে অর্ডার পেশ করুন !!

সূচীপত্র

	লেখক	পৃষ্ঠা
কমরেড (অনুবাদ-গল্প) ...	— জয়ন্তী সেন	২৫৯৭
ম্যাক্সিম গোর্কি (প্রবন্ধ) ...	— দীপঙ্কর সেন	২৬০১
যা দেখেছি, যা পেয়েছি (স্মৃতিচয়ন) ...	— সুধীরঞ্জন দাস	২৬০৪
ভিয়েৎনাম : ঝড়ের কেন্দ্রে (প্রবন্ধ) ...	— বরুণ রায়	২৬০৮
আকাশবাণী-পরিক্রমা ...	— মেঘদূত	২৬১৩
রঙ্গজগৎ ...	... ...	২৬১৬
খেলাধুলো ...	— শান্তিপ্রিয়	২৬১৯
পরিচয়ীতে ...	... ...	২৬২৪

প্রচ্ছদ পরিচয়: (১) রোমাঁ রোলাঁর সঙ্গে গোর্কি, (২) লেনিনের সঙ্গে দাবাখেলারত গোর্কি, (৩) সপুত্র গোর্কি (১৮৯১ সালে তোলা ছবি)

কবিকঙ্কণ চণ্ডী

মুকুন্দরাম চক্রবর্তী

(কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর বিভাগের পাঠ্যপুস্তক)

মধ্যযুগের বঙ্গসাহিত্যে কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তীই সর্বশ্রেষ্ঠ কবি। তাঁহার চণ্ডীর কাহিনী বাঙ্গালার বিশিষ্ট জাতীয় জীবনের কাহিনী। তাঁহার কাব্যে পাই মধ্যযুগের বাঙ্গালার সমাজের সুস্পষ্ট আলেখ্য। শাসক সম্প্রদায়ের দ্বারা নির্যাতিত বাস্তুচ্যুত মুকুন্দরাম দুঃখ ও বেদনাক্লিষ্ট বাঙ্গালার প্রতিনিধি কবি—ব্যক্তির দুঃখ কি করিয়া সর্বজনের দুঃখ হইতে পারে বাঙ্গালা সাহিত্যে তাহা মুকুন্দরামই সর্বপ্রথম দেখাইয়াছেন। এই হিসাবে তিনি আধুনিক বাঙ্গালার রোমান্টিক সাহিত্যসাধনার অগ্রদূত।

—বর্তমান গ্রন্থে আছে—

১। মূল কাব্য, ২। সুবিস্তৃত ভূমিকা, ৩। কবির জীবনী, ৪। কাব্য-পরিচিতি, ৫। কবিকঙ্কণ যুগের বঙ্গভাষা (কবি বঙ্কিমচন্দ্র লিখিত), ৬। অধ্যাপক শ্রীবিজিতকুমার দত্তের সুলিখিত ভূমিকা, ৭। বিস্তৃত কাব্য সমালোচনা এবং ৮। অপ্রচলিত শব্দের অর্থ।

মূল্য সাড়ে চার টাকা

তন্ত্রসাধক, কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেনের গীতাবলী-রচিত

রামপ্রসাদ গ্রন্থাবলী

শ্রীশ্রীকালী-কীর্তন, বিদ্যাসুন্দর, পদাবলী, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, সীতা-বিলাপ, আগমনী, বিজয়া, অপূর্ব প্রকাশিত কবিতাবলী, কবির জীবনী।

একত্রে মূল্য তিন টাকা

উজ্জয়িনীর সেই বিশ্ব-বিজয়ী বিশ্ববিমোহন মহাকবি—
সারস্বতকুঞ্জের পূর্ণজ্যোৎস্না—সাহিত্য-জগজ্জ্যোতি—
প্রতিভা ও মনীষার অবতার—সরস্বতীর বরপুত্র—
গৌরবের মহাকবি—

কালিদাসের গ্রন্থাবলী

সর্বাঙ্গসুন্দর রাজাধিরাজ সংস্করণ

অনুবাদক—বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সাহিত্য রস-সুরসিক

পণ্ডিত রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ

প্রথম ভাগে :—রঘুবংশ, মালবিকাগ্নিমিত্র, ঋতুসংহার, পুষ্পবাণবিলাস, শৃঙ্গার-তিলক, শৃঙ্গার-রসাষ্টক। ৮·০০

তৃতীয় ভাগে :—শকুন্তলা, বিক্রমোর্বশী, শ্রুতবোধ, দ্বাত্রিংশৎ-পুত্তলিকা, কালিদাস-প্রশস্তি। ৮·০০

প্রাচীন-সাহিত্যের-গৌরব-মুকুট—
সাহিত্যের চির-সমাদৃত কোহিনুর—
রায়গুণাকর

ভারতচন্দ্রের গ্রন্থাবলী

অন্নদামঙ্গল, বিদ্যাসুন্দর, মানসিংহ, চোরপঞ্চাশৎ, রসমঞ্জরী, সত্যপীর, খেড়েভেড়ের কৌতুক, গঙ্গাষ্টক, হিন্দী কবিতালহরী, বলিরাজা, চণ্ডী, নাগাষ্টক, সংস্কৃত, পার্শী, হিন্দী নানা ভাষার কবিতাবলী, কবির জীবনী, ঋতু-বর্ণনা, রাধাকৃষ্ণের প্রেমালাপ, কবিতাবলী।

মূল্য তিন টাকা

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেডঃ ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলি-১২

৭২ বর্ষ : ৪১শ সংখ্যা—মূল্য : ৩০ পয়সা
বৃহস্পতিবার, ১৪ই চৈত্র, ১৩৭৪ বঙ্গাব্দ
বাংলা ভাষায় দ্বিতীয় সর্বাধিক প্রচারিত সাপ্তাহিক পত্রিকা
PRICE : 30 Paise
Thursday, 28th March, 1968

একালের ও চিরকালের সাহিত্য

বাংলা ভাষা তার ধ্রুপদী-সাহিত্য নিয়ে গৌরবান্বিত। একদিন এমন ছিল, যখন এ ভাষার লেখার গৌরবের সঙ্গে লেখকের গৌরব বৃদ্ধি পেয়েছিল।

সাহিত্যিকের সৃষ্ট সাহিত্য কখনোই দেশকালে সীমাবদ্ধ হতে পারে না। হয়তো এমন লেখক থাকতে পারেন—যিনি স্বকালে কিছুটা নাম 'কিনেই' ক্ষান্ত। পেশাদার সাংবাদিকের মতো একদিন বেলাশেষে তাঁর খ্যাতির ক্ষীণ রশ্মিটুকু অস্তমিত হয়। একেবারে হালের বাংলা সাহিত্যে এই ধরণের কিছু সাহিত্যিক নামধারী লেখকের আবির্ভাব হয়েছে। তাঁরা কালোত্তীর্ণ হবার প্রত্যাশী নন।

বাংলা সাহিত্য সত্যের পথে এগিয়ে চলুক—সুস্থচিত্ত পাঠকের কাছে—এটাই কাম্য। সাহিত্যের উপজীব্য কী হবে—এ নিয়েও একালে বেশ আলোচনা চলছে। চোখে দেখা ঘটনাকে কেউ কেউ পাঠকদেরও চেখে দেখাতে চায়—এবং চেখে দেখার জিনিসটাই না কি সাহিত্য! চমৎকার যুক্তি! পাঠকদেরও ধন্দ লাগে! সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়তে পারে যা ঘটে তা সব সত্য নয় এবং কবির মনোভূমিই রামের জন্মস্থান—আমাদের কবির এই যুক্তি এক নিমেষেই মিথ্যা!

অবশ্য সমাজের ঘটনাকে কেন্দ্র করে মহৎ সাহিত্য সৃষ্টি অনেক হয়েছে। আসল কথা হচ্ছে—যিনি লেখেন তাঁর উদ্দেশ্য কি? লেখক যদি জীবননিষ্ঠ ও মানবতাবাদী হন—তাহলে সমাজের যাবতীয় গ্লানি লক্ষ্য করে লাঞ্ছিত মানুষের পথপ্রদর্শনে সহায়তা করা তাঁর অন্যতম উদ্দেশ্য। সমাজের বা রাষ্ট্রের চরম দুরবস্থা লক্ষ্য করেই একদা ভিক্টোর হিউগো, টলস্তয়, হুইটম্যান, ম্যাক্সিম গোর্কি প্রমুখ স্মরণীয় সাহিত্যিকদের মহৎ সাহিত্য আমরা লাভ করেছিলাম। সেকালেও তো ছিল দেহধারী মানুষ। এক শ্রেণীর মানুষের কাছে অন্নই সার সত্য হলেও সাহিত্যিকের কাছে ছিল সমগ্র মানুষের জীবনের আশা-নিরাশার ঘাত-প্রতিঘাত, রাজধর্মের বিরুদ্ধে প্রবল বিদ্রোহ, সমাজ-বিপ্লবের স্বপ্ন তুলে ধরা। খণ্ড জীবনকে বৃহৎ জীবনের সঙ্গে যুক্ত করাই ছিল সাহিত্যিকদের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য। আর একালে দেখছি—জীবন-জিজ্ঞাসা যদিও আরো বহুমুখী হয়েছে, তবু এক শ্রেণীর ব্যবসায়ী লেখক এক জায়গায় স্থবিরের মতো বসে যথেচ্ছাচার চালাচ্ছে মানুষকে সত্যপথ থেকে ভ্রষ্ট করতে।

রাষ্ট্র যখন তথাকথিত নিম্নমানের সাধারণ মানুষগুলির প্রতি অবহেলাই দেখিয়ে যাচ্ছে, তখন হালের নোংরা লেখার জয়নিনাদের প্রতি বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ না করে, ম্যাক্সিম গোর্কি প্রমুখ লেখকের সৃষ্টির দিকেই পাঠকদের অধিকতর আকৃষ্ট করে তোলা উচিত।

অবশ্য, ম্যাক্সিম গোর্কি পশ্চিমী দুনিয়ার কোনো পুরস্কারে ভূষিত হন নি। তবু তিনি সম্মানের শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করেছেন নিপীড়িত মানুষের চিত্তে। বাংলা দেশে বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে যাদের সামান্যতম যোগ আছে তাদের কাছে ম্যাক্সিম গোর্কি—অতি পরিচিত নাম। বাংলা দেশের স্মরণীয় কোনো কোনো সাহিত্যিকও স্বীকার করে গেছেন যে, ম্যাক্সিম গোর্কির কাছে তাঁদের ঋণও সামান্য বা তুচ্ছ নয়। বর্তমানে জনসাধারণের যে দুরবস্থা—তার অবসান একমাত্র গোর্কির ন্যায় সাহিত্যিকের পরিকল্পিত পথেই সম্ভব। জনসাধারণের মধ্যে শালীনতা বোধ সৃষ্টি করা এখন প্রয়োজন। সেই শালীনতা ও সাহিত্যের সংযম নিষ্প্রয়োজন—সভা ডেকে ঘোষণা করলেও—আমরা জানি, পাঠকরা একালের অপসৃষ্টির পরিবর্তে ধ্রুপদী-সাহিত্যকেই প্রতিদিন গ্রহণ করছে।

আজ ম্যাক্সিম গোর্কির জন্মশতবার্ষিক উৎসব। এ উৎসব কোনো রকম নতুন ঘটা করে পালনের জন্য লোক ডাকবার কথা ভাবতে হয় না। কারণ জনচিত্তে যাঁর আসন চিরপ্রতিষ্ঠিত, তিনি প্রতিদিনই স্মরণীয় হচ্ছেন। তবু বলা প্রয়োজন, এ-দেশে গোর্কির জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে ডাক টিকিট বের করেই সরকার যেন তার দায়িত্ব শেষ না করে। গোর্কির সমগ্র সাহিত্য সুলভে জনসাধারণের কাছে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করাও সরকারের অন্যতম দায়িত্ব হওয়া উচিত। আর এ কাজে অগ্রসর হতে পারে সাহিত্য অকাদেমি। অধিকন্তু শেষ কথাই সার কথা : গোর্কি সাধারণ মানুষকে দুঃখ ও দারিদ্র্যের হাত থেকে উদ্ধারের জন্য যে মহতী ভাবনা রেখে গেছেন—আমাদের জনহিতৈষী সরকার সে বিষয়েও সচেতন তো? দুঃখ ও দারিদ্র্যের অবসানের পর সৌন্দর্যভূমিতেই পৃথিবীর জনসাধারণকে ম্যাক্সিম গোর্কি প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন—এ কথা আমরাও যেন কোনদিন না ভুলি; আর এ কারণেই তাঁর সাহিত্য সর্বদেশে সর্বকালে এমন স্থায়িত্ব অর্জন করতে পেরেছে।

সম্পাদকীয়

আজকের মানুষ

সেদিন ছিল ওরা লণ্ঠনবেয়ারা। জমিদারবাবুরা যখন গভীর নিশীথে গহন অরণ্যে শিকারে যেতেন তখন তারা আগে আগে লণ্ঠনের আলোয় তাঁদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যেত। বন্দুক-হাতে বীর শিকারী বহু পেছনে, হিংস্র শার্দুলের প্রথম নজর পড়তো অগ্নিবাহীর ওপর। ঘাড়টি মটকাতো বাঘ ওই অগ্রবর্তীরই। তাতো মরবেই, বেঘোরে প্রাণ হারাবার জন্যেই তো জন্ম তার। নইলে তার জীবনের আবার অন্য কোন দাম আছে নাকি? ও যে দুসাদ। অত্যন্ত "নিচু" সম্প্রদায়।

কিন্তু আজ দিন পাল্টেছে। যে নিম্ন-বর্ণের দুসাদরা একদিন উচ্চবর্ণদের মৃগয়ায় মাথা নিচু করে লণ্ঠনবেয়ারার কাজ করে জীবন ধন্য করছিলো, আজ সেই দুসাদদেরই বুক গর্বে ফুলে উঠেছে। তাদেরই সম্প্রদায়ভুক্ত ভোলা পাশোয়ান শাস্ত্রী আজ উচ্চ-নীচ সমস্ত বিহার-বাসীকেই অনিশ্চয়তার অন্ধকার থেকে আলোকে নিয়ে যাবার দায়িত্বভার নিয়েছেন। ভোলা শাস্ত্রী আজ বিহারের নতুন মুখ্যমন্ত্রী। সরকারের নেতৃত্বপদ পাবার অধিকার যদিও তিনি সরকারীভাবে মাত্র আজই পেলেন, কিন্তু ভোলা শাস্ত্রীর রক্তে নেতৃত্বের ধারা বংশপরম্পরায় চলে আসছে। তিনি সেই পরিবারের লোক যাঁরা পূর্ণিয়া জেলায় 'পাশোয়ান' খ্যাতি অর্জন করেছেন বহু অতীতেই। তাঁরা 'পাশোয়ান'—যে-কোন মিছিলের পুরোভাগে থেকে মিছিলের নেতৃত্ব দেবার অধিকার তাঁদের স্বীকৃত, প্রতিষ্ঠিত।

পূর্ণিয়া জেলার বাহিরগাছ গ্রামে ভোলা পাশোয়ানের জন্ম। দুসাদের ঘরে জন্ম নিয়েও ভোলার সুযোগ ঘটেছিল স্কুলে পড়ার। গ্রামে একটা প্রাথমিক বিদ্যালয় যখন রয়েইছে, তখন সেখানে না যাওয়াই বা কেন? প্রাথমিক থেকে উচ্চ প্রাথমিক, সেখান থেকে মাধ্যমিক স্কুলে। তারপর স্কুলস্তর ছাড়িয়ে বেনারসের কাশী বিদ্যাপীঠে। এখানে ভোলা দুসাদ পড়লেন ইতিহাস, দর্শন, অর্থনীতি। আধুনিক চীন প্রসঙ্গ নিয়ে ভোলা দুসাদ 'থিসিস' পেশ করার দুঃসাহস দেখালেন। সে থিসিস উচ্ছ্বসিত প্রশংসা অর্জন করল, গৃহীত হল। ভোলা দুসাদ দুর্লভ ডিগ্রি পেলেন, সেই থেকে তিনি ভোলা পাশোয়ান 'শাস্ত্রী'। পরলোকগত প্রধানমন্ত্রী লাল-বাহাদুরের মত ভোলা পাশোয়ানের নামের পরে শাস্ত্রী জন্মগত পদবীসূচক নয়, বিদ্যা অর্জনের ফলমাত্র।

বিহারের গত ৪০ বছরের রাজনীতির সঙ্গে ভোলা শাস্ত্রী জড়িত, মুখ্যমন্ত্রিত্ব তাঁর অভিজ্ঞতা বা দেশসেবার সময়কালের দিক থেকে বরং দেরিতেই এসেছে। হরি-জন উন্নয়নে গান্ধীজীর আন্দোলন সহজেই তরুণ ভোলা পাশোয়ানের চিত্ত জয় করে-ছিল, কংগ্রেসের নেতৃত্বে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে ভোলা পাশোয়ান একাত্ম

ভোলা পাশোয়ান শাস্ত্রী

হলেন। ৩০-৩২ সনের আইন অমান্য আন্দোলন লবণ সত্যাগ্রহে অংশ গ্রহণ করার দায়ে ভোলা পাশোয়ানকে কারারুদ্ধ হতে হয়েছিল, ৪২-এর ভারত ছাড় বা আগস্ট আন্দোলনে যোগ দেবার কারণে একুশ মাসের জন্যে আরো একবার কারা-বাস করতে হয়েছে।

কিন্তু মুক্তিলাভ করার পর সঙ্গে সঙ্গেই তিনি সক্রিয় রাজনীতিতে ফিরে না গিয়ে কিছুদিন সাংবাদিকতা করলেন। প্রথমে পূর্ণিয়া থেকেই 'রাষ্ট্র সন্দেশ' নামে এক সাপ্তাহিকের সম্পাদনা করলেন। তার-পর পাটনার হিন্দী দৈনিক রাষ্ট্রবাণীর সহকারী সম্পাদক। বাংলা দেশেও ভোলা শাস্ত্রী কাটিয়ে গিয়েছেন কিছুকাল, হিন্দী 'লোকমান্য' দৈনিকের সহকারী সম্পাদকের পদে তাঁকে দেখা গিয়েছে।

প্রতিনিধিমূলক সংস্থায় ভোলা শাস্ত্রীর প্রথম আবির্ভাব পূর্ণিয়া জেলা বোর্ডের সদস্য হিসেবে। এখানে এসে তিনি একজন নেতা ও সহকর্মীকে পেয়ে-ছিলেন যিনি আজো তাঁর পাশে রয়েছেন। ডাঃ লক্ষ্মীনারায়ণ সুধাংশু ছিলেন সেদিন ওই জেলা বোর্ডেরই চেয়ারম্যান। তাঁরই নেতৃত্ব ও পরিচালনায় ভোলা শাস্ত্রী প্রশা-সনিক রাজনীতিতে প্রথম পাঠ গ্রহণ করেন। কিন্তু রাজনীতির বৃহত্তর ক্ষেত্রে ভোলা পাশোয়ানের প্রথম পদক্ষেপই আশাতীত সাফল্যমণ্ডিত। তিনি ১৯৪৬ সনে বিহার বিধানসভার প্রথম সদস্য নির্বাচিত হন—এবং বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায়। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে পেয়ে গেলেন পার্লামেণ্টারী সেক্রেটারীর দায়িত্বপূর্ণ পদ।

স্বায়ত্তশাসন, আবগারী, বন ইত্যাদি বিভিন্ন দপ্তরের ভার নিয়ে ভোলা শাস্ত্রী মন্ত্রিত্ব করে আসছেন প্রায় ১২ বছর ধরে। বস্তুত বিহার রাজনীতিতে তিনি অন্যতম প্রবীণ কংগ্রেস নেতা হিসাবে স্বীকৃতি পেয়ে আসছেন। সততা ও সরল ব্যব-হারের জন্যেও তিনি সকলের শ্রদ্ধা অর্জন করেছেন। কিন্তু গোল বাধিয়েছে ওঁর পারিবারিক পশ্চাৎপট। বিহারের মুখ্যমন্ত্রী তিনি বহু আগেই হতে পার-তেন। কিন্তু 'হরিজন' বলে যেন সে যোগ্যতা তাঁর ছিল না। ১৯৬৩ সনে মুখ্যমন্ত্রী কে, বি, সহায় তাঁকে মন্ত্রিসভা থেকে বাদ দেন। তিনি সবিনয়ে তাই মেনে নিয়েছেন, প্রতিবাদ করেন নি। কিন্তু যে বর্ণভেদ নীতির (casteism) যূপ-কাষ্ঠে হরিজনদের বার বার বলি দেওয়া হয়েছে সেই মনোভাবই বিহারে কংগ্রেসের পতনের অন্যতম কারণ। কংগ্রেস যাঁকে অবজ্ঞাভরে প্রত্যাখ্যান করেছে তিনিই আজ কংগ্রেস ত্যাগ করে মুক্তিলাভ করেছেন, যুক্তফ্রন্টের নেতৃত্ব গ্রহণ করে রাজ্যের মুখ্য-মন্ত্রিত্ব লাভ করেছেন।

চতুর্থ নির্বাচনের পর ভোলা পাশো-য়ান শাস্ত্রী বিহারের চতুর্থ মুখ্যমন্ত্রী। প্রকৃতপক্ষে তিনিই এ রাজ্যের প্রথম হরি-জন মুখ্যমন্ত্রী। অত্যন্ত সামান্য অবস্থা থেকে ভোলা শাস্ত্রী আজ বড় হয়েছেন, কিন্তু নির্যাতিতদের তিনি কখনো ভুলতে পারেন না। সামাজিক এবং রাজনৈতিক দিক থেকে যারা নিপীড়িত নিষ্পেষিত হয়ে আসছে লণ্ঠনবেয়ারাদের বংশধর ভোলা পাশোয়ান কি তাদের সামনে আলোকবর্তিকা ধারণ করবেন না?

বঙ্গদর্শন

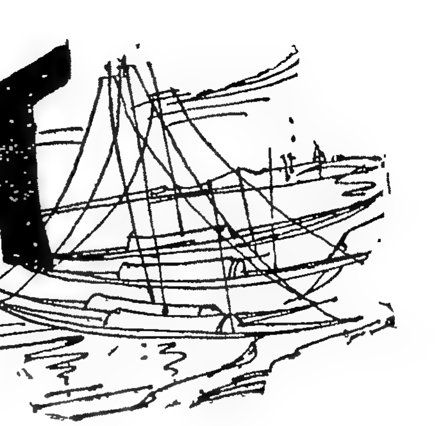

বেশ কিছুকাল ধরেই ভারতের সর্বত্র, বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গে, একটা অদৃশ্য সংগ্রাম চলছে। সে সংগ্রাম মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার; মেহনতী মানুষ এই সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছেন, সর্বক্ষেত্রেই যে সজ্ঞানে তা অবশ্য নয়। তথাপি এই সংগ্রাম চলছে, মানুষ আত্মসচেতন হচ্ছেন এবং অনুভব করছেন যে মুষ্টিমেয় কয়েক-জনের কৃপার উপর ভাগ্যকে সমর্পণ করে থাকার দিন শীঘ্রই ফুরোতে চলেছে। বিগত নির্বাচনে বিশ বছরের একটানা ব্যবস্থাকে তাঁরা উল্টে দেবার চেষ্টা করেছিলেন। বিগত এক বছরের নানা রাজনৈতিক উত্থান-পতনের ঘটনা থেকে তাঁরা অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করছেন, এবং এই অভিজ্ঞতার আলোকেই তাঁরা নিজেদের পথ খুঁজে নেবার প্রয়াস পাচ্ছেন। পাশাপাশি কায়েমী স্বার্থও নিজেদের অবস্থা সম্বন্ধে সচেতন হচ্ছে এবং ইতিহাসের অমোঘ গতিকে বাধা দেবার চেষ্টা তারা নানাভাবে করছে। এবং এই প্রচেষ্টার একটি অঙ্গ হল সাধারণ খেটে-খাওয়া মানুষের ঐক্যে ফাটল ধরাও, তা যেমন করেই হোক এবং সেই পথটা যতই ঘৃণ্য হোক না কেন। এই জন্যই সুকৌশলে ছড়ান হয় সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ, প্রাদেশিকতার বিষবাষ্প এবং যাবতীয় বিচ্ছিন্নতাকামী প্রবণতা। রাম্য কৈবর্ত আর হাসিম শেখ যেন নিজেদের চাষী হিসাবে একাত্মবোধ না করে; বরং তারা মনে করুক তারা দুটি পৃথক ধর্মীয় সম্প্রদায় এবং তা ভেবে তারা মারামারি কাটাকাটি করুক। এইভাবে যতই সাধারণ মানুষের মধ্যে ভেদাভেদ ও সংঘর্ষের সৃষ্টি করা যাবে, কায়েমী স্বার্থের লাভ ততই বেশি হবে। এবং দেশের বেশিরভাগ মানুষকে প্রকৃত শিক্ষার আলোক থেকে বঞ্চিত করে তাদের একের বিরুদ্ধে অন্যকে তাতিয়ে, ক্ষেপিয়ে উসকিয়ে কায়েমী স্বার্থ এতাবৎকাল পরমসুখে ফলাহার করে এসেছে। এবং এখনো তারা এই একই রাস্তা অবলম্বন করে চলেছে. তোলির দিন থেকে যে দুচারদিন কলকাতায় কয়েকটি দুঃখজনক ঘটনা ঘটল এগুলি তারই প্রমাণ। সুখের বিষয় জনসাধারণের চোখ ফুটছে, তাঁরা পারস্পরিক হানাহানি করে কায়েমী স্বার্থের সুবিধা করে দিতে নারাজ। পশ্চিমবঙ্গে গত বছর যুক্তফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হবার অত্যল্পকাল পরেই এই রকম একটি চক্রান্তের খেলা শুরু হয়েছিল এবং তৎকালীন মন্ত্রিবর্গ নিজেদের জীবনের মায়া ত্যাগ করে ঘটনাস্থলে গিয়ে কিছুক্ষণের মধ্যেই অবস্থাকে আয়ত্তে এনে চক্রান্ত ব্যর্থ করেছিলেন। এবারেও তা ব্যর্থ হয়েছে এবং সেই সঙ্গে এটাও প্রমাণিত হয়েছে যে, কায়েমী স্বার্থের এই অতি নিকৃষ্ট ধরণের অস্ত্রটি প্রায় ভোঁতা হয়ে এসেছে। জাতি, প্রদেশ, ভাষা, সম্প্রদায়, ধর্ম ইত্যাদির নাম করে মেহনতী মানুষের ঐক্যে ফাটল ধরাবার দিন আজ আর নেই।

সমাজবিরোধী কার্যকলাপ ও পুলিশ

প্রচলিত অর্থে আইন ও শৃঙ্খলা বলতে আমরা যা বুঝি, রাষ্ট্রপতি শাসিত পশ্চিমবঙ্গে তার শোচনীয় অবনতি ঘটেছে। সমাজবিরোধী কার্যকলাপের তীব্রতা এত বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে যে মনে হয় যেন তা সকল মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে। যুক্তফ্রণ্টের আমলে আইন ও শৃঙ্খলা ভেঙে পড়েছে বলে খুব সোরগোল তোলা হয়েছিল, কিন্তু আমাদের যতদূর স্মরণ আছে সে আমলে প্রধান সমস্যা ছিল শ্রম-বিরোধের, ঘেরাও-এর, যেগুলিকে বিরোধী-মহল আইন ও শৃঙ্খলার সমস্যা বলে চালানোর চেষ্টা করেছিলেন। সমাজবিরোধীদের দৌরাত্ম্য তখন কিছুটা কম ছিল, কেন না যুক্তফ্রণ্ট সরকার পুলিশ-নির্ভর ছিলেন না এবং দ্বিতীয়ত জনসাধারণ অনেক কিছুই নিজেদের হাতে গ্রহণ করার সুযোগ পেয়েছিলেন, অনেক সময় তাঁরাই দলবদ্ধভাবে সমাজবিরোধীদের মোকাবিলা করার চেষ্টা করেছিলেন। যদিও সেটা আবার অনেকের পছন্দ হয় নি। পি ডি এফ আমলে সমাজবিরোধীদের দমন করার কোন ব্যবস্থাই করা হয় নি। পুলিশকে সম্পূর্ণভাবেই রাজনৈতিক প্রয়োজনে নিযুক্ত করা হয়েছিল এবং হাজার হাজার মানুষকে রাজনৈতিক কারণে বন্দী করে "আইন ও শৃঙ্খলা" বজায় রাখা হয়েছে এইরকম দাবি করা হয়েছিল। কিন্তু সেই আমলেই বেলঘরিয়ার বুকে এবং দুর্গাপুরে সমাজবিরোধীদের যে নারকীয় ক্রিয়াকলাপ আমরা দেখেছি তার তুলনা মেলা ভার।

রাষ্ট্রপতির শাসন প্রবর্তিত হবার পর আশা করা গিয়েছিল যে, অতঃপর এই সব সমাজবিরোধী ব্যক্তিদের দমন করা হবে। কিন্তু কার্যত সেই আশায় ছাই পড়েছে, বরং সমাজবিরোধী ব্যক্তিরা অধিকতর শক্তিমান হয়েছে। এর কারণ একটিই। রাষ্ট্রপতির শাসন মূলত আমলা-তন্ত্র ও পুলিশ নির্ভর এবং রাষ্ট্রপতির শাসন প্রবর্তিত হবার পর পুলিশের দাপট শতগুণে বর্ধিত হয়েছে। প্রতিটি পুলিশ কর্মচারী নিজেকে এক-একটি ধর্মবীর বলে মনে করছে এবং এদের মধ্যে অনেকেরই ব্যবহার সহ্যের সীমার বাইরে চলে গেছে। যে কোন অজুহাতেই সাধারণ মানুষকে পীড়া ও সেইভাবে পয়সাকড়ি ছিনতাই থেকে শুরু করে যে কোন কুকর্মেই তাদের অরুচি নেই. এই সেদিন বাস ভাড়াকে কেন্দ্র করে কত কাণ্ড হয়ে গেল। এরা মনে করছে যেন রাজ্যটা এদেরই যা ইচ্ছা তাই করবে।

একটা কথা আমরা বরাবর উল্লেখ করে এসেছি এই বঙ্গ-দর্শনের পাতায়, বহুক্ষেত্রে প্রমাণ-পত্র সহ জোর গলায় বলে এসেছি যে, সমাজবিরোধী শক্তিগুলির সঙ্গে পুলিশের যোগাযোগ থাকে এবং তাদের অপকর্মজাত লাভের কড়ির কিছু ভাগ পুলিশ বরাবরই পেয়ে থাকে। যে কোন থানায় গেলেই দেখতে পাবেন শহরের কোন নামজাদা গুণ্ডা দারোগা সাহেবের সামনে

দলে দলে সহযোগে খোসগল্প করছে। এদের গায়ে পুলিশ কদাচ হাত তোলে না, বরং সব প্রকারে এদের রক্ষা করার চেষ্টা করে। এবং সবচেয়ে যা ট্রাজেডি তা হচ্ছে এই পুলিশের কাছে কোন অভিযোগ পড়লে, অভিযোগকারীকেই বহুক্ষেত্রে নাকালের একশেষ হতে হয়। অনেক ক্ষেত্রে ফরিয়াদীকেই আসামী বানিয়ে দেওয়া হয়। আপনি পথে সমাজবিরোধীদের হাতে মার খেলেন, আপনার উপর উৎপীড়ন চলল, তাদের কাউকে হয়ত আপনি চিনতে পারলেন, স্থির করলেন থানায় গিয়ে অভিযোগ করবেন, তার আগেই আপনাকে পুলিশ এসে গ্রেপ্তার করল, আপনাকে থানায় নিয়ে যাওয়া হল, সেখানে গিয়ে দেখলেন যে যারা আপনাকে মারধোর করেছিল তারাই আপনার নামে আগেভাগে থানায় গিয়ে মিথ্যা এজাহার দিয়েছে, আপনার নামে মারপিটের চার্জ আনা হয়েছে, এবং সেই অপরাধে আপনাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তারপরে কোর্টে গিয়ে বছরখানেক ধরে বিচারের ধাক্কা সামলান, উকিল-মোক্তার মুহুরী-পেশকার এমন কি কোর্টের টিকটিকির পিছনেও টাকা ঢালুন, এবং শেষ পর্যন্ত ওই সমাজবিরোধীদেরই পায়ে গিয়ে পড়ুন যাতে তারা দয়া করে মামলা তুলে নেয়। এই ঘটনা প্রতিনিয়ত ঘটছে হাজারে হাজারে, কোন প্রতিকার নেই। আমরা এই বঙ্গদর্শনেই এই জাতীয় ঘটনার অনেক উদাহরণ দিয়েছি। এই প্রসঙ্গে আরও দু-একটা দিচ্ছি।

মধ্যমগ্রাম অঞ্চলের সমাজবিরোধীদের ত্রাসমূলক কার্যকলাপ সম্পর্কে ইতিমধ্যেই পত্র-পত্রিকায় সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। স্থানীয় জনসাধারণের পক্ষ থেকে পুলিশ ও প্রশাসন কর্তৃপক্ষের নিকট সমাজবিরোধীদের দমন করবার জন্য অবিলম্বে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য বারংবার আবেদন-নিবেদন করা হয়েছে। প্রতিকার তো কিছু হয়ই নি, বরং প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে স্থানীয় পুলিশ সমাজবিরোধী এই গুণ্ডাদের প্রশ্রয় দিয়েছে, এমন কি থানায় অভিযোগকারী অথবা সংবাদদাতার নাম-ঠিকানা পর্যন্ত পুলিশ এই গুণ্ডাদের কাছে প্রকাশ করে দিয়েছে। তদন্তের নামে পুলিশ এসেছে, বসুনগরে অনেক বিত্তশালী ব্যক্তির বিলাসভবনে গুণ্ডাদের সঙ্গে যথারীতি খানাপিনা, মহরম মহরম, টাকা পয়সার লেনদেন চলেছে, এমন বহু প্রামাণ্য তথ্য নিরপেক্ষ তদন্ত হলে উপস্থাপিত করা যেতে পারে বলে স্থানীয় জনসাধারণ দাবি করেছেন। গত ১৪ই মার্চ মধ্যমগ্রামের কালীবাড়ির পিছনে এক ভদ্রলোকের বাড়িতে স্থানীয় একটি বাগানবাড়ির তদারককারী ব্যক্তির (১৯৬৪ সালের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময় এই ব্যক্তিকে সমাজবিরোধী গুণ্ডা বলে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।) নেতৃত্বে সমাজবিরোধীরা মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে চড়াও হয় এবং একজন মহিলাসহ কয়েকজনকে জখম করে। জনসাধারণের অভিযোগ, এই দুর্বৃত্তরা স্থানীয় পুলিশের বিশেষ অনুগৃহীত। সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা এই যে, যদিও এই জাতীয় ঘটনা আমাদের কাছে বিশেষ পরিচিত, পুলিশ যথারীতি এক্ষেত্রে অপরাধীদেরই প্রশ্রয় দিয়েছে ও দিচ্ছে এবং যাদের উপর এই দলবদ্ধ হাঙ্গামা ঘটল তাদেরই নাকি জব্দ করার চেষ্টা হচ্ছে।

এটাই হয়, অন্তত ভারতের পুলিশ ব্যবস্থা এই ট্রাডিশনটি দীর্ঘকাল ধরেই সৃষ্টি করে রেখেছে। এই কারণেই চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ এ দেশের পুলিশ-বাহিনীকে সুসংগঠিত গুণ্ডাবাহিনী আখ্যা দিয়ে থাকেন। বিচারালয়ের দারস্থ হলে অবশ্য শেষ পর্যন্ত যদি ঠিকমত মামলা চালানো যায়, অর্থাৎ যদি মামলা চালানোর উপযোগী সাক্ষ্যপ্রমাণ ইত্যাদি হাতের কাছে থাকে, অর্থাৎ যদি এমন লোক সাক্ষ্য দিতে এগিয়ে আসেন যিনি সমাজবিরোধীদের রক্তচক্ষুকে অগ্রাহ্য করার মত শক্তিসম্পন্ন, অর্থাৎ যাঁর ধনবল জনবল প্রচুর আছে (কেন না আপনি ছা-পোষা নিরীহ মানুষ, যদি আপনাকে গুণ্ডা এসে শাসিয়ে যায় যে ন্যায়ের পক্ষে সাক্ষ্য দিলে আপনাকে দেখে নেওয়া হবে, আপনি তৎক্ষণাৎ পশ্চাদপসরণ করতে বাধ্য) এবং সর্বোপরি যদি আদালতের বিপুল ব্যয়ভার বহন করার ক্ষমতা ফরিয়াদীর থাকে, তবেই সে রেহাই পেতে পারে, কিন্তু সে অবস্থা ক'জনের? কাজেই বেশির ভাগ মানুষকেই কিল খেয়ে কিল হজম করতে হয়, সমাজবিরোধীদের দ্বারা নিগৃহীত হবার পরেও তাদেরই পায়ে গিয়ে পড়তে হয়, পুলিশ আপনার নিরাপত্তার কোন গ্যারান্টি দেবে না, বরং আপনি যে থানায় এসে কোন মহাত্মা সমাজবিরোধীর নামে অভিযোগ করেছেন সেই খবরটি তার কানে তুলে দিয়ে তাকে উপদেশ দেবে যে আপনার এই 'অভ্যাসটি'র সমুচিত জবাব যেন সে দেয়।

মধ্যমগ্রামের ঘটনাটি কোন বিক্ষিপ্ত ঘটনা নয়, এই ঘটনা প্রতিনিয়ত সর্বত্রই অভিনীত হচ্ছে। আবার যদি এই সব সমাজবিরোধী ব্যক্তিদের সঙ্গে কোন রাজনৈতিক শক্তির যোগাযোগ থাকে তাহলে ব্যাপারটা আরও মারাত্মক আকার ধারণ করে।

এই প্রসঙ্গে আমরা একটি ঘটনার উল্লেখ করছি যাতে বোঝা যাবে যে সাধারণ সৎ মানুষের অবস্থাটা কোথায় এসে দাঁড়িয়েছে। গত সংখ্যার আগের সংখ্যায় আমরা হুগলী-চুঁচুড়া মিউনিসিপ্যালিটির কথা লিখেছিলাম। ওই মিউনিসিপ্যালিটির ১৯ নং ওয়ার্ডে এক ভদ্রলোক বাড়ি করেছেন, পেশায় তিনি অতি নিরীহ অধ্যাপক, কোন সাতে-পাঁচে থাকেন না। উক্ত অঞ্চলে একজন মাতব্বর ব্যক্তি আছেন, যিনি আবার একটি রাজনৈতিক দলেরও (যে দল বর্তমানে মিউনিসিপ্যালিটি চালাচ্ছে) একজন বড় সমর্থক, এবং সেই হিসাবে ওই পাড়ায় উক্ত দলের সমর্থক কিছু ব্যক্তির উপরও তাঁর প্রভাব আছে। ওই এলাকায় একটি নালা নিয়ে সমস্যা আছে, এবং উক্ত বিশেষ ব্যক্তি তাঁর অনুগামীদের সহায়তায় ওই সমস্যার সমাধান করলেন ওই নালাটিকে নিরীহ অধ্যাপকের বাড়ির সামনে রাস্তার উপর দিয়ে বইয়ে দিয়ে সম্পূর্ণ জবরদস্তি করে। মিউনিসিপ্যালিটি ১২।১২।৪৭ তারিখে ওই নালা সম্বন্ধে যে আদেশ দিয়েছিল, এই কাজ সেই আদেশের বিরোধী, অথচ তা সংঘটিত হল চেয়ারম্যানের সামনেই, তাঁরই নির্দেশে এবং তাঁর স্বহস্ত-স্বাক্ষরিত নির্দেশনামাটি উপেক্ষা করে, কেন না আইনের চেয়ে দল বড় এবং দলকে যারা মদত দেয় তাদের বেআইনী কাজকে সমর্থন করতে হবে। স্থানীয় ওয়ার্ড কমিশনার সাহেব চেঁচামেচি শুরু করলেন বেআইনী কাজ হচ্ছে বলে, কিন্তু চেয়ারম্যান সাহেব তাঁর কানে মন্ত্র দিলেন, 'তুমি করছ কি, ওরা যে আমাদের দলের খুঁটি, ওদের কি চটাতে আছে', কমিশনার সাহেব ঠাণ্ডা হলেন। নিরীহ অধ্যাপকটি আর কোন উপায় না দেখে আদালতের শরণাপন্ন হলেন, মিউনিসিপ্যালিটির লিখিত নির্দেশনামাটি দেখিয়ে বললেন যে তাঁর বাড়ির সামনে কিছু গুণ্ডা প্রকৃতির লোকের প্ররোচনায় বেআইনীভাবে নালা কাটা হচ্ছে। কোর্ট তদন্ত সাপেক্ষে নালা কাটা বন্ধ করতে নির্দেশ দিলেন এবং ৫।৪।৬৮ পর্যন্ত এই নির্দেশনামা বহাল রাখার আদেশ দিলেন। ইতিমধ্যে ২।৩।৬৮ তারিখে উক্ত ব্যক্তিগণ প্রকাশ্যভাবে আদালতের নির্দেশ ভঙ্গ করলেন। থানা থেকে প্রেরিত একজন পুলিশ অফিসারও না কি ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন। উক্ত অফিসার আইন ও আদালতের দোহাই দিয়ে তাদের এই বেআইনী ব্যাপার থেকে নিরস্ত হতে অনুরোধ জানালেন, তারা গায়ের জোরেই কোর্টের নির্দেশ ভঙ্গ করল। এই ঘটনা থেকেই একটি বিষয়ই স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, সাধারণ সৎ মানুষ বিপদে পড়লে

মেয়েদের ছোটবেলা থেকেই
ত্বকের-যত্ন নিতে শেখান।
তিনি সুন্দরী, তিনি রূপসী!
প্রতিদিনের ত্বক পরিচর্যায় তাঁর এই অপরূপ সৌন্দর্যের
উৎস-সাধনা বিউটি ক্রীম।
সাধনা বিউটি ক্রীম রূপসাধনায় অনন্য
সাধনা ঔষধালয়-ঢাকা
সাধনা ঔষধালয় রোড, সাধনানগর, কলিকাতা-৪৮
অধ্যক্ষ যোগেশ চন্দ্র ঘোষ, এম.এ.
আয়ুর্বেদশাস্ত্রী, এফ.সি.এস. (লণ্ডন)
এম.সি.এস. (আমেরিকা) ভাগলপুর
কলেজের রসায়ন-শাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক
কলিকাতা কেন্দ্র :
ডাঃ নরেশচন্দ্র ঘোষ,
এম.বি.বি.এস. (কলিঃ)
আয়ুর্বেদাচার্য
SADHANA
Beauty
CREAM
সাধনা
বিউটি
ক্রীম

আইনের আশ্রয় নিয়েও তার বাঁচা অসম্ভব।

অর্থাৎ এই জাতীয় ঘটনাগুলি থেকে যে সিদ্ধান্তটি অনিবার্যভাবে নিঃসৃত হয় তা' হচ্ছে এই যে, সত্যিকারের আইন ও শৃংখলা এ দেশে নেই। বিশেষ করে রাষ্ট্রপতির শাসন প্রবর্তিত হবার ফলে অন্তত এই দিকে মানুষের কিছু ভরসা জেগেছিল। কিন্তু হায়, সমস্তই ব্যর্থ হতে চলেছে।

সমাজবিরোধী ব্যক্তিরা কিছুতেই এত তৎপর হতে পারত না যদি না কোন কোন রাজনৈতিক দল এই সব ব্যক্তিদের প্রশ্রয় দিত। এমনও ঘটনা গত বিশ বছরে অসংখ্য ঘটেছে যেখানে পুলিশ কোন সমাজবিরোধী ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে খোদ মন্ত্রীমশাই-এর টেলিফোন পেয়ে তাকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছে। পাঠকের হয়ত স্মরণে আছে প্রায় বছর দেড়েক আগে একজন দায়িত্বশীল পুলিশ অফিসার সাসপেন্ড হয়েছিলেন, কোন বিশেষ রাজনৈতিক দলের নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করতে অসম্মত হয়েছিলেন বলে, শেষ পর্যন্ত হাইকোর্টে মামলা লড়ে অবশ্য তিনি স্বপদে পুনর্বহাল হতে পেরেছিলেন। এই নিয়ে তখন বেশ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছিল, কেন না তিনি প্রকাশ্যভাবেই বড় বড় পুলিশ অফিসারের রাজনীতি করা নিয়ে বিরুদ্ধ সমালোচনা করেছিলেন, বিশেষ করে একজন ডি· আই· জি'র রাজনৈতিক ভূমিকার বিরুদ্ধে তিনি আই. পি. এস. দে'র একটি সভায় একটি প্রস্তাব পাশ করিয়ে নিতেও সমর্থ হয়েছিলেন। পুলিশী আইন অনুযায়ী তিনি অবশ্য ইনসাবর্ডিনেশনেব অপরাধে অপরাধী বলে ঘোষিত হয়েছিলেন। কিন্তু প্রকাশ্যে অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার সৎ সাহস তিনি দেখিয়েছিলেন। এই রকম উদাহরণ অবশ্য বেশি নেই। সে যাই হোক পুলিশকে গত বিশ বছর ধরে তার স্বাভাবিক কাজ থেকে সরিয়ে এনে রাজনৈতিক প্রয়োজনে নিযুক্ত করা হয়েছে, এবং তারই ফলে পুলিশের সামগ্রিক চরিত্রেরই আজ বদল হয়েছে। আজ যেখানে কিছু নগদ প্রাপ্তির সম্ভাবনা আছে সেখানে যাবার জন্য পুলিশ বড়ই তৎপর। শোনা যায়, এবং বোধ হয় তা খুব মিথ্যা নয়, কোন কোন থানায়, যেখানে লাভের ভাগটা বেশি, বদলি হবার জন্য উপরিওয়ালাকে মোটা টাকা সেলামী দিতে হয়। যারা রক্ষক তারাই যদি লাভের আশায় সমাজবিরোধীদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখে তাহলে আইন-শৃঙ্খলা ও সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা কিভাবে বজায় থাকতে পারে?

কৃষ্ণনগরে উপনির্বাচন

শ্রীহরিপদ চট্টোপাধ্যায়ের মৃত্যুতে কৃষ্ণনগব লোকসভা কেন্দ্রের আসন্ন উপনির্বাচন নানান কারণে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। এই উপনির্বাচনের প্রভাব আগামী বিধানসভা নির্বাচনের উপর বিশেষভাবে পড়বে। এই উপনির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের তরফ থেকে দাঁড়াচ্ছেন শ্রীশশাংকশেখর সান্যাল।

সবিনয় নিবেদন

ম্যাক্সিম গোর্কির জন্মশতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে কতকগুলি বিশেষ লেখার জন্য এই বিশেষ সংখ্যাটিতে স্থানাভাব বশত কিছু নিয়মিত লেখা প্রকাশ করা সম্ভব হোল না। —সম্পাদিকা

এদিকে প্রদেশ কংগ্রেস নির্বাচনী কমিটি শ্রীমতী ইলা পালচৌধুরীকে উক্ত কেন্দ্রের প্রার্থী হিসাবে মনোনয়ন দান করেছেন। এই মনোয়নরে ফলে পি· ডি· এফ (ভারতীয় লোকদল) ও কংগ্রেসের মধ্যে সম্পর্কের বেশ কিছুটা ফাটল ধরেছে। অধ্যাপক হুমায়ুন কবির স্বর্গত হরিপদ চট্টোপাধ্যায়ের স্ত্রী শ্রীমতী প্রীতি চট্টোপাধ্যায়কে কৃষ্ণনগর কেন্দ্রের প্রার্থী হিসাবে কংগ্রেস দলের সমর্থন চেয়েছিলেন, কিন্তু কংগ্রেস শ্রীমতী পালচৌধুরীকে মনোনয়ন দেওয়ায় কবিরের প্রত্যাশা পূর্ণ হল না। শ্রীমতী চট্টোপাধ্যায় পি· ডি· এফ-এর তরফ থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন বলে শোনা যাচ্ছে। এদিকে বাংলার জাতীয় দলও ওই কেন্দ্রে প্রার্থী দেবেন স্থির করেছেন। ভারতীয় জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের সহকারী নেতা শ্রীআশু ঘোষও বলেছেন যে ওই কেন্দ্রে তাঁরা প্রার্থী দেবেন। অর্থাৎ কম-সে কম পাঁচজন ওই কেন্দ্র থেকে লোকসভায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। বিজয়লক্ষ্মী কার উপর ভর করবেন সেটা অন্য কথা, কিন্তু এই নির্বাচন থেকেই বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলি নিজেদের শক্তির সীমা সম্বন্ধে সচেতন হবেন। সব মিলিয়ে, এই উপনির্বাচনের দিকে সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের জনসাধারণেরই দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে।

কেরোসিন

পর পর কয়েক সপ্তাহ ধরে আমরা পশ্চিমবঙ্গে কেরোসিন তেলের তীব্র সংকট সম্বন্ধে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করছি, কিন্তু দুঃখের সঙ্গে এটা জানাতে বাধ্য হচ্ছি যে, কেরোসিন সংকটের বিন্দুমাত্র সুরাহা এখনো পর্যন্ত হয় নি। সরকার কি চান যে এই কেরোসিন নিয়েই একটা হাঙ্গামা বেধে উঠুক, কেন না এই ব্যাপারে সরকারী নিষ্ক্রিয়তা দেখে মনে হচ্ছে যে দাঙ্গা-হাঙ্গামা না হলে, ট্রাম বাস না পুড়লে সরকারের চৈতন্য হবে না। ১৯৬৬ সালে কেরোসিন নিয়ে কি কান্ড ঘটেছিল তা কি সরকারী কর্তারা ইতিমধ্যেই বিস্মৃত হয়েছেন? কেরোসিন সংকট সারা পশ্চিমবঙ্গে যে কি ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে, যে বাড়িতে বৈদ্যুতিক আলো নেই (এইরকম বাড়ির সংখ্যাই সবচেয়ে বেশি) তারা কিভাবে রাত কাটাচ্ছেন, কিভাবে তাদের ছেলে-মেয়েরা লেখাপড়া করছে, এ সব কোন কিছুতেই সরকারেব কোন মাথা ব্যথা আছে বলে মনে হয় না। একটা দেশের শতকরা আশি ভাগেরও বেশি অংশ যদি রাত্রে নিষ্প্রদীপ থাকে, যদি সেখানে রাত্রের সমস্ত কাজকর্ম বন্ধ হয়, যদি কেরোসিনের অভাবে দেশের অধিকাংশ ছেলে-মেয়েরা রাত্রে পড়াশোনা করতে না পারে তাহলে সেই দেশ কোন হিসাবে সভ্যদেশরূপে পরিচয় দেয় তা আমরা অনুধাবন করতে অক্ষম। আমরা বার বার বলেছি যে, কেরোসিনের বর্তমান সংকট সম্পূর্ণ কৃত্রিম সংকট, কিছু মুনাফাখোরের অতি-মুনাফা পেটার তাল ছাড়া আর কিছুই নয়। কেন না যদি উৎপাদন বা আমদানীর কোন সমস্যা থাকত তাহলে পেট্রোলিয়ামজাত অপরাপর পদার্থেরও দুষ্প্রাপ্যতা ঘটত। কিন্তু তা ঘটছে একমাত্র কেরোসিনের বেলায়। রাজ্যপালের নাকের ডগায় যদি এরকম কান্ড দিনের পর দিন ঘটে যেতে থাকে, বিশেষ করে সেই রাজ্যপাল যিনি মুনাফাখোরী দমন করবেন বলে ঘোষণা করেছেন, তাহলে এর চেয়ে দুঃখের বিষয় আর কি হতে পারে? এখনো ব্যবস্থা অবলম্বনের সুযোগ আছে। জনসাধারণের ক্ষোভ ভয়াবহভাবে ফেটে পড়ার আগেই সেদিকে দৃষ্টি দেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ হবে।

চ শেখর

নাট্যকার—অমৃতলাল বসু

ইংরেজের আইনে নিষিদ্ধ অংশগুলি নাট্যকারের মূল পান্ডুলিপি হইতে সংগৃহীত।

উদ্ধৃতি—

শৈবালিনী—ইংরেজ ধরে নে গেছল—

গুরগণ—ইংরেজ? একবার পেলে হয়—মীরকাশেম মসনদে থাক, তার সহায় হয়ে বাংলা হতে ইংরেজ নাম লোপ করব।—

মীরকাশেম—পাপাত্মা এই রাজ্য ইংরেজদের বিক্রয় করবে।

প্রতাপ—ইংরেজকে বাংলা থেকে তাড়াতে হবে—

অভিনব সংস্করণ—মূল্য : দুই টাকা

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড : ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

ছোট সেচের কাজ সুরু করুন

পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল ছোট ছোট সেচ-পরিকল্পনার ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন। পরিকল্পনার ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন। শুধু মুখের কথাতেই চলবে না, এ ব্যাপারে রাজ্যপালের যদি আন্তরিক ইচ্ছা থাকে তাহলে এখনই কাজে হাত দেওয়া উচিত। যাতে চাষের আগে সেচের কাজ শেষ হয় তার জন্যে যা ব্যবস্থা করা দরকার তা অবশ্যই করতে হবে। যে দেশ খাদ্যে ঘাটতি, বিদেশ থেকে খাদ্য না এলে যাদের কাল হাঁড়ি চড়বে না, সে দেশের কবে বৃষ্টি হবে সেদিকে তাকিয়ে এখনও চাষ-বাস করা শোভা পায় না। টাকার জন্যে বড় পরিকল্পনা না হোক, ছোট পরিকল্পনা-গুলোও যদি কাজে লাগানো যায় তাহলে ঘাটতি অনেকটা পূরণ হবে। যেমন ধরুন মেদিনীপুর জেলার পাঁশকুড়া ব্লক এলাকা। এখানে আউশ, আমন ফসলের জমির পরিমাণ প্রায় ৫২ হাজার একর। এর মধ্যে বর্তমানে সব রকম মিলিয়ে ৭ হাজার একর জমিতে সেচের ব্যবস্থা আছে। বাকী ৪৫ হাজার জমির চাষ-বাস বৃষ্টির ওপর নির্ভরশীল। অথচ কংসাবতী নদী এখানে এমন অনুকূল অবস্থায় রয়েছে যে কেবল 'নদী থেকে জল তুলে সেচের পরি-কল্পনা' কার্যকরী করলে কমপক্ষে ৭।৮ হাজার একর জমিতে সারা বছর জল সরবরাহের ব্যবস্থা হয়। যুক্তফ্রন্ট সরকার এ ব্যাপারে এগিয়েছিলেন, কৃষি কমিশনার শ্রীগুরুদাস গোস্বামী বিজাহার-পুর, রাণীহাড়া, ধর্মপুর, সেরহাটি, রাণী-হাটি ও পশ্চিমচিংকার পরিকল্পনাগুলি নিজে তদন্ত করে রিপোর্টও দিয়েছিলেন। কিন্তু সব ক্ষেত্রেই প্রায় যা হয় এ ক্ষেত্রেও সেই ধামাচাপাই পড়লো। শুধু মেদিনী-পুর কেন, হাওড়া, হুগলী, ২৪ পরগনা, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া এবং উত্তরবঙ্গের কয়েকটি জেলায় অসংখ্য ছোট ছোট সেচ পরিকল্পনা রয়েছে যেগুলি কার্যকারী হলে খাদ্যের ব্যাপারে পশ্চিম বাংলাকে আর পরমুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হবে না। গড়িমসি না করে আগামী মরশুমের আগেই যাতে কাজ শেষ হয় তার জন্যে সেচদপ্তরকে এখনই তৎপর হতে হবে।

সাপ্তাহিক বসুমতীর পঞ্চবর্ষ পূর্তি

নবপর্যায়ে সাপ্তাহিক বসুমতীর পঞ্চ-বর্ষ পূর্তি উপলক্ষে গত ২০শে মার্চ সাপ্তাহিক বসুমতীর সম্পাদকীয় দপ্তরে এক ঘরোয়া অনুষ্ঠানে দৈনিক বসুমতীর সম্পাদক শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় পৌরোহিত্য করেন।

প্রারম্ভে শ্রীবনমালী ভট্টাচার্যের মংগলা চরণের পর সম্পাদিকা শ্রীমতী জয়ন্তী সেন সমাগত অতিথিদের সাদর অভ্যর্থনা জানিয়ে নবপর্যায় সাপ্তাহিক বসুমতীর অনন্য বৈশিষ্ট্য ও বিপুল জনপ্রিয়তার কথা উল্লেখ করেন।

শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় তাঁর ভাষণে বলেন, পাঁচ বছর আগে প্রথম যখন নব-পর্যায়ে সাপ্তাহিক বসুমতী প্রকাশিত হয়, তখন তাঁর মনে সংশয় ছিল পত্রিকাটির ভবিষ্যৎ নিয়ে। দীর্ঘকালের সাংবাদিক জীবনের অভিজ্ঞতা থাকায় হঠাৎ কোন কাজে তিনি নামেন না—অগ্র-পশ্চাৎ ভেবে দেখেন। পত্রিকাটির যাত্রা শুরু হয়েছিল অনিশ্চিত অবস্থার মধ্যে—মাকড়সার জাল ছিঁড়ে, ধুলোবালি পরিষ্কার করে। এই স্বল্পকালেই সাপ্তাহিক বসুমতীর অগ্রগতি অত্যন্ত সন্তোষজনক ও উৎসাহব্যঞ্জক।

আগামী সপ্তাহে "গ্রাম-গ্রামান্তরে"-র আকর্ষণ

॥ নয়া নীলকর সাহেবের কীর্তি, পল্লী-বাংলার ক্রমবর্ধমান অপরাধ-মূলক কার্যকলাপ ও সমাজবিরোধী-দের অত্যাচার সম্পর্কে নানা তথ্যপূর্ণ কাহিনী ॥

এই সাফল্যের কারণ বিশ্লেষণ করে তিনি বলেন যে, **সাপ্তাহিক বসুমতীর** একটা character আছে—আর পাঁচ-দশটা **পত্র-পত্রিকার ভিড়ে হারিয়ে যায় নি। কোন পত্রিকার পক্ষে এই character-ই বড় কথা— এবং এই নিয়েই পত্রিকার ঐতিহ্য গড়ে ওঠে। অতি অল্প সময়ে সাপ্তাহিক বসুমতী এই স্বাতন্ত্র্য অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে।**

সাপ্তাহিক বসুমতীর সম্পাদিকা অভি-জাত ঘরের মেয়ে। তাঁর সংশয় ছিল, ওঁর হাতে এটি হয়ত একটি সৌখীন পত্রিকা হয়ে উঠবে। জীবনের গভীরে প্রবেশ করা, তার মর্মবাণী প্রকাশ করা দুরূহ হবে। কিন্তু তাঁর এ সংশয়ও আজ দূরীভূত। সম্পাদিকা ও তাঁর সুযোগ্য সহকর্মীদের তিনি ভূয়সী প্রশংসা করেন। পত্রিকাটির যা কিছু গৌরব—তা এঁদের আজ প্রাপ্য। এঁদের অক্লান্ত পরিশ্রম, সততা ও সত্যনিষ্ঠাই—পত্রিকাটির প্রতিষ্ঠা এনে দিয়েছে।

শুধু Circulation-এর উপরেই কোন পত্রিকার প্রতিষ্ঠা বা ইজ্জত নির্ভর করে না। এই প্রসংগে তিনি 'প্রবাসী' **পত্রিকা ও তার সম্পাদক শ্রীরামানন্দ চট্টো-**পাধ্যায়ের উল্লেখ করেন। প্রবাসীর প্রচার **সংখ্যা সেই সময় সর্বাধিক ছিল না—কিন্তু প্রতিষ্ঠায় এবং ঐতিহ্যে প্রবাসী** ছিল **ভারতের সমস্ত পত্র-পত্রিকার শীর্ষে।**

তিনি বলেন যে ব্যবসায়িক সাফল্যের জন্যে পত্রিকার দুটি দিক দরকার—রসবস্তু আর মননশীলতা। সাপ্তাহিক বসুমতীতে এই দুটি দিকই রয়েছে—গংগা-যমুনার সংগম হয়েছে। শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন—আমাকে রসেবশে রাখিস। মা—শুকনো সন্ন্যাসী করিস না। জীবনরস এবং চিন্তা অনুভূতির যুগপৎ সমাবেশ আছে সাপ্তাহিকে। শুধু ব্যবসায় ভিত্তিক হলে বা শুধু মননশীলতা থাকলে কোন পত্রিকাই প্রতিষ্ঠা অর্জন করতে পারে না। সাম্প্রতিক ২।১টি পত্র-পত্রিকার সংগে সাপ্তাহিক বসুমতীর তুলনা দিয়ে তিনি তাঁর উপরোক্ত উক্তির সারবত্তা প্রমাণ করেন।

সাপ্তাহিকের আর একটি বৈশিষ্ট্যেরও তিনি সগর্ব উল্লেখ করেন। তা হল পত্রিকাটির নিরপেক্ষ স্বাধীন একদেশ-দর্শীহীন দৃষ্টিভংগী। তিনি বিশেষ করে উল্লেখ করেন সম্পাদকীয় স্তম্ভের কথা, বঙ্গদর্শন, ভারতদর্শন, সপ্তাহের বোঝা প্রভৃতি মননশীল ক্ষুদ্র বলিষ্ঠ রচনার কথা, যা দেশের জনসাধারণের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে ফুটিয়ে তুলেছে, রূপ দিয়েছে।

এই পত্রিকাটি সাংবাদিকতার মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রেখেছে—কোন গোষ্ঠী, সম্প্রদায় বা দলের কাছে মাথা নত করে নি, বা কারুর তাঁবেদার হয় নি। এ বিষয়ে অন্যান্য পত্র-পত্রিকার সংগে সাপ্তাহিক বসুমতীর পার্থক্য সহজ দৃষ্টিগোচর। এও একটা স্বাতন্ত্র্য।

সাহিত্যিকদের সংগে পত্রিকাটির প্রীতি ও সহযোগিতার সম্পর্ক। কিন্তু চিরদিন এ রকম চলতে পারে না। ভাল লেখা যোগাড় করতে হলে পরিচালকগোষ্ঠীকে তৎপর হতে হবে। লেখার যোগ্য পারি-শ্রমিক দেবার ব্যবস্থা করতে হবে।

প্রচলিত পত্র-পত্রিকাগুলির মধ্যে বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল সাপ্তাহিক বসুমতী অন্যতম। তিনি এই শুভেচ্ছা ও আশীর্বাদ জানিয়ে তাঁর ভাষণ শেষ করেন যে, সাপ্তাহিক বসুমতী এদেশের শ্রেষ্ঠ সাপ্তাহিকে পরিণত হবে।

অনুষ্ঠানে বসুমতী প্রাইভেট লিমি-টেডের অন্যতম ডিরেক্টর শ্রীবীরেন দে-ও বক্তৃতা করেন।

(২২।৩।৬৮)

সপ্তাহের বোঝা

কৃত্তিবাস ওঝা

"ব্রুটাস তুমিও"

কলকাতার বিক্ষোভ শোভাযাত্রায় হাল-ফ্যাসানে একটি নতুন ধ্বনি সংযোজিত হয়েছে। মহরমের শোভাযাত্রার অনুকরণে বুকে করাঘাত করে একদল ব্যক্তি হাসান-হোসেন কারবালা ঢং-এ চীৎকার করেন—হায় হায় এ কি হল। এর পর যুক্ত হয় প্রয়োজন মত শব্দ। যেমন যুক্তফ্রণ্টের আইন-অমান্য আন্দোলন চলাকালে কংগ্রেস-পি ডি এফ মন্ত্রিসভার পতন হলে বিক্ষোভ শোভাযাত্রার পুরোভাগে থেকে একদল বুকে করাঘাত করে চীৎকার করেছিলেন, "হায় হায় এ কি হল—কংগ্রেস-পি ডি এফ মন্ত্রিসভা কোথায় গেল!" আবার বলেছিলেন, "হায় হায় এ কি হল—প্রফুল্ল ঘোষের মন্ত্রিসভা কোথায় গেল!" ঠিক আজ যদি কোন বিক্ষোভ শোভাযাত্রা বের হত, তবে তার প্রধান ধ্বনি হত "হায় হায় এ কি হল হুমায়ুন কবির-প্রফুল্ল ঘোষ কোথায় গেল!" ডঃ ঘোষ ও অধ্যাপক কবিরের হাল যে কি বেহালে পরিণত হয়েছে সেটা সত্যই অনুধাবনযোগ্য ও শিক্ষাপ্রদ। পশ্চিম বাংলার কিং মেকার কবির আজ শুধু বেকার নন, তিনি প্রায় নিরাকারে পরিণত হয়েছেন। কিছুকাল আগে পর্যন্ত অধ্যাপক কবির অতি উচ্চকণ্ঠে বলতেন—পশ্চিম বাংলায় যুক্তফ্রণ্ট সরকার তিনি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন আবার তিনিই যুক্তফ্রণ্ট সরকারকে আপদ বিবেচনা করে বিতাড়ন করে সেখানে ডঃ ঘোষের মন্ত্রিসভাকে বসিয়েছেন। এই দম্ভোক্তি এমন বিকারের প্রলাপে পরিণত হয়েছিল যে, ডঃ ঘোষের মন্ত্রিসভার পতনের কয়েক ঘণ্টা আগেও অধ্যাপক কবির রাজনৈতিক দার্শনিক দূরদর্শীর ঢং-এ বলেছিলেন—কোয়ালিশন সরকারের পতন হবে না। ১৯৭২ সাল পর্যন্ত এই মন্ত্রিসভা টিকে থাকবে। অধ্যাপক কবিরের আশায় ছাই পড়ে ডঃ ঘোষের মন্ত্রিসভা বিদায় নিল, চালু হল রাষ্ট্রপতির শাসন আর এই সময় থেকে ঘোষ-কবিরের ভাগ্যরবি পশ্চিম পথে যাত্রা শুরু করলো।

অধ্যাপক কবির ও ডঃ ঘোষের দল আজ তিনদিক থেকেই আক্রান্ত। যে কংগ্রেসের কাঁধে চেপে ঘোষ-কবির নিশ্চিন্ত বিহারের স্বপ্ন দেখেছিলেন, সেই কংগ্রেস চপেটাঘাত করে তাঁদের কাঁধ থেকে নামিয়ে দিয়েছে; যাদের নিয়ে কবির জবরদস্ত রাজনৈতিক দল করবেন ভেবেছিলেন, সেই দলে সৃষ্টির মুখে ভাঙন সৃষ্টি হয়েছে; আর যে জনগণকে তিনি সুবোধ বালকের ন্যায় নিজ অভিরুচিমত চালাতে চেয়েছিলেন, সেই জনগণ এখন অধ্যাপক কবিরের সভায় ঢিল ছুঁড়তে শুরু করেছে।

সাপকে ছুঁচো খেতে দেখলে বুঝতে হয়, সাপের বড় দুর্দিন। ঠিক এমনি দুর্দিন মনে হয়েছিল যখন দেখা গিয়েছিল পশ্চিম বাংলার রাজনীতিতে শ্রীঅতুল্য ঘোষ ও অধ্যাপক হুমায়ুন কবিরের মধ্যে মিতালী হয়েছে। কিন্তু আজ বোঝা যাচ্ছে সাপ তার দুর্দিন কাটিয়ে উঠে ছুঁচোকে মুখ থেকে ফেলে দিয়ে যথারীতি ব্যাঙের নাগাল পেয়েছে আর ছুঁচোকে মুখে নেওয়া শুধু অভিনয় ছিল এবং ছুঁচো নিয়ে ব্যস্ত থাকা শুধু ব্যাঙ ধরবারই তাল ছিল। পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেসের সম্পাদক শ্রীসুহৃদ রুদ্র কর্তৃক প্রকাশিত শ্রীঅতুল্য ঘোষের 'আমাদের কথা' নামে একখানি পুস্তিকা আছে। 'আমাদের কথা' পুস্তিকার ২০ পৃষ্ঠায় শ্রীঅতুল্য ঘোষ অধ্যাপক হুমায়ুন কবির সম্পর্কে অনেক কথা বলেছেন, যে কথাগুলি পড়বার পর আবার যখন ঘোষ-কবিরে মিলন দেখা যেত, তখন বিস্ময়ে হতবাক্ হওয়া ছাড়া উপায় থাকতো না। কিন্তু আজ বোঝা যাচ্ছে শ্রীঅতুল্য ঘোষ সম্পর্কে প্রচলিত একটি কথা কত সত্য। সেই কথাটা হল শ্রীঘোষ যাঁকে একবার বন্ধু বলে আশ্রয় দেন, কোন অবস্থায় তাঁকে ত্যাগ করেন না, আর যাঁকে একবার শত্রু বলে আক্রমণ করেন তাঁকে আর কখনও বন্ধু বলে বরণ করেন না। 'আমাদের কথা' পুস্তকে শ্রীঅতুল্য ঘোষ অধ্যাপক কবির সম্পর্কে বলেছেন "কেন্দ্রীয় সরকারের ভূতপূর্ব মন্ত্রী হুমায়ুন কবির সম্প্রতি বাংলা কংগ্রেসে যোগদান করেছেন। তিনি এখন বলে বেড়াচ্ছেন যে ভারতবর্ষে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকদের কোন সুখ বা নিরাপত্তা নেই। তিনি যতদিন মন্ত্রী ছিলেন ততদিন এই ধরণের কথা বলেন নি, অভিযোগ করেন নি। ইচ্ছা করলে সেই অভিযোগে তিনি মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করতে পারতেন। এখন তিনি নির্বাচনে জয়লাভের জন্য সর্বত্র সাম্প্রদায়িকতার বিষ ছড়াতে শুরু করেছেন। কিন্তু ভারতে মুসলমানেরা যে সুখে নেই—এই কথা কবির সাহেব জানলেন কি করে। মন্ত্রী থাকাকালীন তিনি ক'টা গ্রামে ঘুরেছেন, ক'টা লোকের সঙ্গে মিশেছেন? কংগ্রেস সম্পর্কে তাঁর জ্ঞানই বা কতটুকু? তিনি তো কোনদিনই কংগ্রেসে ছিলেন না, পার্টিশানের পর সরকারী চাকুরী করতেন পরে মন্ত্রী হবার জন্য কংগ্রেসের সদস্য হয়েছিলেন। কাজেই সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সম্পর্কে ভারত সরকারের মনোভাব সম্বন্ধে তিনি যে বিদ্বেষপূর্ণ উক্তি আরম্ভ করেছেন, তা কেবল নির্বাচনে জয়লাভের জন্য। এই জন্য তা বিশেষ কুরুচিপূর্ণ ও দুর্নীতিযুক্ত" কিন্তু কঠোর নিয়তি আর স্বার্থের নিগূঢ় টানে শ্রীঅতুল্য ঘোষ এহেন কবির সাহেবের সঙ্গে মিতালী করেছিলেন আর অধ্যাপক কবিরও সব ভুলে শ্রীঅতুল্য ঘোষের খুব কাছের মানুষ হতে চেষ্টা করেছিলেন। গত অক্টোবর মাসের পর থেকে মার্চ মাস পর্যন্ত এই অহিনকুলের মিতালী দেখে আলিবাবার সেই গানটি মনে পড়তো—

"আয় বাঁদী তুই বেগম হবি
খোয়াব দেখেছি
আমি বাদশা বনেছি
আমি বেগম হয়েছি
বাদশা বেগম ঝম ঝমাঝম
বাজিয়ে চলেছি।"

কিন্তু হায়! কোথায় গেল বাদশা! কোথায় গেল বেগম! অধ্যাপক কবিরের

ভাগ্যের ছাতুর হাঁড়ি স্বপ্নের ঘোরে পায়ের ঘায়ে ভেঙে ছত্রখান হয়ে গেছে।

ডঃ ঘোষ ও অধ্যাপক কবিরের সমুচ্চে চড়ানো আশালতা প্রথম ছিঁড়ে পড়ল সদ্য অনুষ্ঠিত প্রদেশ কংগ্রেসের চোদ্দটি জেলা কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তে। এই সভায় কংগ্রেস আগামী নির্বাচনের নীতি হিসাবে গ্রহণ করেছে যে, কংগ্রেস কোন দলের সংগেই নির্বাচনী সমঝোতা বা আঁতাত করবে না। অথচ কয়েকদিন আগেও কংগ্রেস রাজ্য কমিটির সভায় গৃহীত প্রস্তাবে বলা হয়েছে "গণতন্ত্র রক্ষার সংগ্রাম গণতন্ত্রে বিশ্বাসী আপামর জনসাধারণের সংগ্রাম, গণতন্ত্র-প্রেমী প্রতি-রাজনৈতিক অ-রাজনৈতিক দলের সংগ্রাম। এই জাতীয় সংগ্রামেও শুধুমাত্র কংগ্রেস নহে, সকলকেই অংশীদার হইতে হইবে।" প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি অধ্যাপক চন্দ্র বলেছিলেন—কংগ্রেস সমচিন্তা ও সম-আদর্শের রাজনৈতিক দলের সংগে যুক্তফ্রন্ট করবে। এমন কি তিনি এই প্রসংগে পি-এস-পি, ফরোয়ার্ড ব্লক দলের নাম করেছিলেন এবং অনেকের সংগে কথা হয়েছে এই কথাও বলেছিলেন। আবার অধ্যাপক চন্দ্র বলেছিলেন পশ্চিমবংগে গণতন্ত্র রক্ষার সংগ্রাম ও দায়িত্ব কংগ্রেসের একার পক্ষে পালন সম্ভব নয়, তাই পরিষদীয় গণতন্ত্রে বিশ্বাসী দলগুলির সংগে হাত মেলাতে হবে আর কংগ্রেস রাজ্যের শাসন ক্ষমতা ভোগ "মনোপলী" করে রাখতে চায় না। হায় হায়! কোথায় গেল যুক্তফ্রন্ট, কোথায় গেল গণতন্ত্র রক্ষার সংগ্রামে সংযুক্ত মোর্চা, কোথায় গেল সকলে মিলে শাসন ক্ষমতা পরিচালনার আহ্বান। ১৯শে প্রদেশ কংগ্রেস ভবনে সভার পর শ্রীঅতুল্য ঘোষ স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন—কারো সংগে মিতালি বা আঁতাত করবার কোন অবকাশই সৃষ্টি হয় নি। তবে হ্যাঁ, দুই-একজন লোক যে দুই-একটা আসন সে তো কংগ্রেস আগেও দুই-একবার ছেড়েছে, দরকার হলে এবারও ছাড়বে।

২০শে মার্চ সন্ধ্যাবেলা অধ্যাপক হুমায়ুন কবির গভর্নমেন্ট হোস্টেলে, পরে পার্ক স্ট্রীটের অফিসে বসে এবং গাড়িতে করে 'চতুরংগ' অফিসে আসতে অনেকক্ষণ ধরে শুনলেন কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত আর বললেন নিজের কথা। হয়তো তখনও ভাবছিলেন—"শুধু কি মুখের বাক্য শুনেছ দেবতা, শোন নি কি জননীর অন্তরের কথা।" অধ্যাপক কবির ভেবেছিলেন কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত বুঝি মুখের কথা, অন্তরের কথা নিশ্চয়ই অন্য হবে। এই আশার অবশ্য কারণও অনেক ছিল। ভবিষ্যৎ নির্বাচন সম্পর্কে অধ্যাপক কবির ও ডঃ ঘোষ, শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন ও অধ্যাপক প্রতাপচন্দ্র চন্দ্রের সংগে অনেক আলাপ করেছেন। সেই আলাপে অধ্যাপক কবির ধরে নিয়েছিলেন কংগ্রেস কিছু না হোক, চল্লিশটি আসন তাঁকে ছেড়ে দেবে আর তিনি উক্ত আসনগুলিতে জয়লাভ করে রাজ্যের রাজনীতিতে ব্যালান্সিং পাওয়ার হয়ে সকলের মাথার উপর ছড়ি ঘোরাতে পারবেন। এই আশার অন্য একটি কারণও সৃষ্টি হয়েছিল কৃষ্ণনগর লোকসভা কেন্দ্রের উপ-নির্বাচন উপলক্ষ করে। তিনি ভেবেছিলেন নিজের শ্যালিকা স্বর্গত হরিপদ চট্টোপাধ্যায়ের স্ত্রী ও শহীদ অভিজিৎ জননীকে কৃষ্ণনগর কেন্দ্রে প্রার্থী করা হলে কংগ্রেস খুবই বিকলে পড়বে। কারণ কংগ্রেস আর যাই করুক এক্ষুণি অধ্যাপক কবিরের দেওয়া প্রার্থীর বিরুদ্ধে প্রার্থী দিয়ে লোক হাসাতে সাহস পাবে না। তাই কিছুদিন আগে সর্বপ্রথম ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ ডেকে পাঠালেন অধ্যাপক প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র ও শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেনকে। এই দুইজনের কাছে প্রস্তাব করে বললেন—কৃষ্ণনগরে শ্রীমতী প্রীতি চট্টোপাধ্যায়কে প্রার্থী দেওয়া হচ্ছে, তোমরা সমর্থন করো। অধ্যাপক চন্দ্র ও শ্রীসেন ডঃ ঘোষকে বললেন প্রীতি চট্টোপাধ্যায়কে সমর্থন করতে কংগ্রেসের আপত্তি নেই, তবে যুক্তফ্রন্টের সংগে মর্যাদার লড়াইয়ে সাতটি বিধানসভা কেন্দ্রের কংগ্রেস কর্মীদের নামাতে হলে শ্রীমতী চট্টোপাধ্যায়কে কংগ্রেসের মনোনয়ন নিতে হবে। ডঃ ঘোষ এই কথা শুনে প্রথম হোঁচট খেলেন। তিনি বোঝাতে চেষ্টা করলেন কংগ্রেস কেন এখন শুধু শুধু সাধারণ নির্বাচনের আগে একটি লোকসভা আসনে লড়াইতে নেমে নিজের প্রেস্টিজ ইনভলভ করবে—প্রীতি চট্টোপাধ্যায় জিতলে লোকে জানবে কংগ্রেস জিতেছে, আর হারলে বলতে পারবে অন্য দলের প্রার্থী হেরেছে, কংগ্রেস সমর্থন করেছে বৈ তো নয়। কিন্তু ভবি ভুলবার নয়, মড়ক পথ দিয়ে যাক—এই নীতি গ্রহণ করতে রাজী হল না কংগ্রেস। কলকাতায় এলেন অধ্যাপক কবির—তিনি আবার বসলেন অধ্যাপক চন্দ্র ও শ্রীপ্রফুল্ল-চন্দ্র সেনের সংগে। দীর্ঘ আলোচনা হল। অধ্যাপক কবির বললেন—মধ্যবর্তী নির্বাচনে আমরা এক হয়ে লড়বো, কাজেই এই আসনেও আমাদের এক হয়ে থাকা দরকার। মধ্যবর্তী নির্বাচনে এক হয়ে লড়ার খবর বলতে অধ্যাপক কবির জানালেন, যে আসনগুলো নিয়ে কংগ্রেসের সংগে তাঁর গোলমাল, তা প্রায় মিটে গেছে। তিনি শ্রীতরুণকান্তি ঘোষের সংগে কথা বলেছেন এবং তাঁকে বলেছেন শ্রীজয়ন্তী-প্রসন্ন মুখোপাধ্যায়কে বুঝিয়ে ডঃ ঘোষ যদি সরিয়ে দিতে পারেন, তবে তাঁর আপত্তি নেই। অর্থাৎ কংগ্রেসের সংগে পি ডি এফ-এর নির্বাচনে এক হওয়ার প্রধান বাধা হল শ্রীতরুণকান্তির ঘোষ, শ্রীস্মরজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় ও ডাঃ পি কে গুহের আসন। এই আসনগুলিতে শ্রীজয়ন্তী মুখার্জী, ডাঃ নলিনাক্ষ সান্যাল ও শ্রীদাশরথি তা জয়ী হয়েছিলেন। এর মধ্যে শ্রীতরুণকান্তি ঘোষের আসন শ্রীজয়ন্তী মুখোপাধ্যায় ছেড়ে দেবেন। আর শ্রীস্মরজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় গত নির্বাচনে বিশ হাজারের বেশি ভোটে হেরেছিলেন, কাজেই সে আসন কংগ্রেস চাইবে না নিশ্চয়ই। ডাঃ পি কে গুহ—তিনি তো এখন কংগ্রেসের সদস্যই হন নি। কাজেই গোলমাল মিটে গেল। কিন্তু অধ্যাপক চন্দ্র ও শ্রীসেন বললেন, সে যা হবার হবে, কিন্তু প্রীতি চট্টোপাধ্যায় কংগ্রেস প্রার্থী না হলে সুবিধা হবে না। বহু আলোচনার পর স্থির হল ঠিক আছে শ্রীমতী চট্টোপাধ্যায় নির্দল প্রার্থী হবেন। তিনি কংগ্রেসেরও না, পি ডি এফ-এরও না—দুই দলই তাঁকে সমর্থন করবো। অধ্যাপক চন্দ্র ও শ্রীসেন প্রতিশ্রুতি দিলেন কংগ্রেসের নির্বাচনী সমিতির সভায় তাঁরা সব বক্তব্য রাখবেন। ২১শে মার্চ কংগ্রেস ভবনে অধ্যাপক চন্দ্র ও শ্রীসেন নির্বাচনী সমিতির সভায় সব বক্তব্য রাখলেন, কিন্তু একটি কথাও ধোপে টিকল না। এইদিন নির্বাচনী সমিতির সভার শেষে শ্রীঅতুল্য ঘোষ বললেন অধ্যাপক কবিরের সংগে তাঁর অনেকদিন দেখা হয় নি, আর ভবিষ্যতে দেখা হবার সম্ভাবনা সুদূরপরাহত।

আর অধ্যাপক কবির বললেন, বুঝলাম, কংগ্রেসে শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন ও অধ্যাপক প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র কেউ নন। ঠিকই অধ্যাপক কবির হয়ত সত্য বুঝেছেন, কিন্তু বড় লেটে আর এই লেট আওয়ারে অনেক কিছুই গুবলেট হয়ে গেছে। আসানসোল কংগ্রেসের বড় ঘাঁটি, ডাঃ গোপী মিত্র, শ্রীশিবদাস ঘটক সেখানকার কর্তাব্যক্তি, কিন্তু সেখানেও সভা করতে গিয়ে ঢিল খেয়ে আসতে হল অধ্যাপক কবিরকে। পি ডি এফ দলের অন্যতম হোতা ২৪ পরগনা জেলার শক্তিশালী নেতা শ্রীশক্তি সরকার ও নকশালবাড়ির শ্রীসম্পত রায় সদলে অধ্যাপক কবিরকে ছেড়ে গেছেন। শ্রীশক্তি সরকার পার্ক স্ট্রীটের পি ডি এফ-এর সুন্দর প্রসাদ ছেড়ে হুজুরীমল লেনে পশ্চিমবংগ কৃষকসমাজ নামে দল খুলেছেন এবং ঘোষণা করেছেন, পি ডি এফ দল ২৪ পরগনা, নদীয়া, মুর্শিদাবাদ—যেখানে যেখানে প্রার্থী দেবে, কৃষকসমাজও সেখানে প্রার্থী দেবে। অধ্যাপক কবিরের বুঝি আজ সিজারের মত মাত্র একটি কথাই শোভা পায়—"ব্রুটাস তুমিও।"

অবজ্ঞ

চন্দ্রগুপ্ত

পরিবার-পরীকল্পনা

না, বানান ভুল নয়, 'পরিকল্পনা'র উপর্যুক্ত বানান স্বেচ্ছাকৃত। কারণ আমাদের সরকারের পরিকল্পনাগুলি (পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনাসহ) চূড়ান্ত বিশ্লেষণে পরীরাজ্যের কল্পনা ছাড়া বিশেষ কিছু নয়। পরিবার-পরিকল্পনাও এমনই একটি পরিকল্পনা, প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে জনসাধারণের সম্পর্কের মতোই বাস্তব জগতের সঙ্গে যার সম্পর্ক।

সংবাদে প্রকাশ, এই পরিকল্পনা অনুসারে সম্প্রতি হাজার হাজার মানুষকে নির্বীজীকৃত করা হচ্ছে। বলির পাঁঠা কাটতেও যে সময় লাগে তার চেয়ে কম সময়ে হাজার হাজার মানুষের এই নির্বীজীকরণ বা ভাসেকটমি অপারেশান হচ্ছে। এ মন্তব্য চন্দ্রগুপ্তের নয়, জনৈক বিশিষ্ট চিকিৎসকের অভিজ্ঞ খেদোক্তি। ভারতবর্ষের গ্রামে গ্রামে সেই বার্তা ক্রমে রটে গেছে, ভাসেকটমি অপারেশান বা নির্বীজীকরণ হলে পুরুষ তার যৌবন হারায় না, বরং যৌবন তার দ্বিগুণিত হয় আর যে পুরুষ নির্বীজ হবেন তিনি ক্ষতিপূরণ কিংবা উপহারস্বরূপ আঠারো টাকা পাবেন। তিনি একা শুধু নন, তাঁর বন্ধুও কিছু পাবেন।

তাঁর বন্ধু? তিনি কোন্ মহাশয়? নির্বীজকরণের মন্ত্র যিনি তাঁর কানে কানে বলে দিয়েছেন, যিনি তাঁকে ধরে-বেঁধে চিকিৎসকের হাতে সমর্পণ করেছেন, সেই ভদ্রলোক তিন টাকা দস্তুরী পাবেন। সরকারী ভাষায় এই ভদ্রলোক 'প্রোমোটার', সাধারণ ভাষায় 'দালাল'।

হরির লুটে চিকিৎসকই বা বাদ পড়েন কেন, আমাদের সরকার তাঁর জন্যও ব্যবস্থা রেখেছেন। অস্থায়ী চিকিৎসক, যাঁরা দিনে দু' ঘণ্টার মতো কাজ করবেন, তাঁরা তাঁদের নির্দিষ্ট মাইনে ছাড়া, ত্রিশটি অপারেশান সম্পূর্ণ করার শেষে, প্রতি অপারেশান পিছু সাত টাকা পাবেন। আর যাঁরা স্থায়ী চিকিৎসক, স্বাভাবিকভাবেই যাঁদের মাইনে বেশি, তাঁরা একশ'টি অপারেশানের পরে প্রতি অপারেশান পিছু সাত টাকা পাবেন। অতএব চিকিৎসকদের মধ্যেও কে কত তাড়াতাড়ি ছুরি চালাতে পারেন তারই প্রতিদ্বন্দ্বিতা লেগে গেছে। এক একজন চিকিৎসক দিনে যে কত অপারেশান করছেন তার হিসাব সরকারী অর্থদপ্তর ছাড়া অন্য কেউ রাখেন ব'লে মনে হয় না।

ডাক্তার ও দালালদের যুগ্ম প্রচেষ্টায়, বিপুল অর্থব্যয়ে, আবালবৃদ্ধ অনেকেই ইতিমধ্যে ভাসেকটমি অপারেশানের বলি হয়েছেন। 'বলি' বলছি এজন্য, অপারেশান-কৃত লোকদের মধ্যে কতজন (বিশেষত গ্রামাঞ্চলে) স্বতঃপ্রবৃত্তভাবে নির্বীজীকৃত হয়েছেন, সে তথ্য সরকারের স্বাস্থ্যদপ্তর পরিবেশন করতে পারেন। স্বাস্থ্যদপ্তর কি অস্বীকার করতে পারেন, যে হাজার হাজার দরিদ্র অর্ধশিক্ষিত অশিক্ষিত লোক অপারেশান করিয়েছেন, অর্থপ্রাপ্তির আশাতেই তাঁরা তা করিয়েছেন? ভাসেকটমির মতো এত গুরুত্বপূর্ণ অপারেশান করার জন্য যে মানসিক প্রস্তুতির প্রয়োজন, ক'জন অপারেশান-কাঙ্ক্ষীর ক্ষেত্রে তা বিচার ক'রে দেখা হয়? অর্থাৎ শুধুমাত্র কয়েকটি টাকা হাতে গুঁজে দিয়ে যাকে অপারেশান করা হচ্ছে, সে মানসিক এবং শারীরিকভাবে অপারেশানের যোগ্য কি না তা কি আমাদের পরিবার-পরিকল্পনা কেন্দ্রগুলিতে বা চিকিৎসাকেন্দ্রগুলিতে (বিশেষত গ্রামাঞ্চলে) আদৌ বিচার করে দেখা হয়?

*

এ কথা কেউ অস্বীকার করছেন না জনসংখ্যার স্ফীতি রোধের উপায় নিয়ে ভাববার দিন সমুপস্থিত। ইতিমধ্যে পরিসংখ্যান-বিজ্ঞানীরা জানিয়ে দিয়েছেন, এ শতাব্দী শেষ হবার আগে পৃথিবীর জনসংখ্যা সাতশ' কোটিতে গিয়ে দাঁড়াবে। প্রাকৃতিক সম্পদ যত পর্যাপ্তই হোক জনসংখ্যা-বৃদ্ধির হারের সঙ্গে তাল রাখতে অক্ষম। পৃথিবীর চিন্তাশীল ব্যক্তি ও রাষ্ট্রনেতারা তাই জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে চিন্তামগ্ন।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েট রাশিয়া, গ্রেট বৃটেন, জাপান, চীন এই সব দেশ **কি করছে? চীন জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে আদৌ দুশ্চিন্তিত ব'লে মনে হয় না, কারণ জনসম্বলকে সে ধনসম্বল মনে করে।** যুদ্ধোত্তর জাপান গর্ভপাতকে আইনসিদ্ধ ক'রে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রিত করেছিল, কিন্তু এখন আবার জনসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য সচেষ্ট হয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সোভিয়েট রাশিয়া ইত্যাদি প্রগতিশীল দেশগুলিতে পরিবার-পরিকল্পনা সংক্রান্ত কোন সরকারী উদ্যোগ অদ্যাবধি আত্মপ্রকাশ করে নি। ভারতবর্ষই একমাত্র দেশ যেখানে সরকার জন্মনিয়ন্ত্রণ-পরিকল্পনায় ডাকসাইটে গৃহকর্তার ভূমিকা নিয়েছেন। ইতিমধ্যে এ ব্যাপারে কয়েক কোটি টাকা খরচ হয়েছে এবং চতুর্থ পরিকল্পনায় আমাদের জাতীয় আয়ের একটি বড়ো অংশ—দু' শ' উনত্রিশ কোটি টাকা—জন্মনিয়ন্ত্রণবাবদ খরচ করা হবে ব'লে ঘোষণা করা হয়েছে।

পরিবার-পরিকল্পনায় এমন পরিকল্পিত (!) খরচের বহরে ভারতবর্ষ উন্নত যুক্তরাষ্ট্র বা রাশিয়ার চেয়েও অনেক বেশি উন্নতিশীল।

*

পরিকল্পনা-রচনায় আমাদের সরকারের উৎসাহ অন্তহীন, কিন্তু একটি জাতীয় পরিকল্পনার রচনা ও রূপায়ণে যে-চিন্তা ও বাস্তববুদ্ধি এবং কর্মনৈপুণ্যের প্রয়োজন, অদ্যাবধি তার প্রমাণ খুব কমই পাওয়া গেছে। আমাদের 'জাতীয় পরিবার-পরিকল্পনা' তেমনই একটি পরিকল্পনা চিন্তার অভাবে যার জন্ম, আর ত্রুটিযুক্ত পরিচর্যার ফলে যার মৃত্যু সন্নিকট।

বিষয়টি বিশদ করলে যা দাঁড়ায় তা এই : ১৯৫২-৫৩ সালে নেহাতই এলোমেলোভাবে খসড়াধর্মী এই পরিকল্পনা যখন পরীক্ষামূলকভাবে রূপায়ণের চেষ্টা হয়, রাজধানীর কর্মকর্তারা তখন 'ইন্ডিয়ান মেডিকেল এসোসিয়েশন'-এর কাছে কোন সাহায্য বা পরামর্শ গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা বোধ করেন নি। যে চিকিৎসকদের সহযোগিতা ছাড়া এই পরিকল্পনার রূপায়ণ সম্ভব হয় না, সরকারী মহল তাঁদের প্রায় সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেছিলেন। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে জন্মনিয়ন্ত্রণের গুরুত্ব অনুভবের সঙ্গে পরিবার-পরিকল্পনার বিষয়টি স্পষ্টতর আকার লাভ করে এবং স্বভাবতই তাকে কার্যকরী করে তোলার জন্য সরকার ১৯৬৫ সালে সর্বপ্রথম 'ইন্ডিয়ান মেডিকেল এসোসিয়েশন'-এর সাহায্য ও পরামর্শ প্রার্থনা করেন। অতঃপর সরকার জনসাধারণকে জন্মনিয়ন্ত্রণে উৎসাহী ক'রে তোলার জন্য লুপ প্রভৃতি গর্ভনিরোধক সরঞ্জাম ও অন্যান্য ব্যবস্থার সাড়ম্বর

প্রচারে নেমে পড়লেন। শহরে গঞ্জে গাঁয়ে হাজার হাজার পরিবার-পরিকল্পনা-কেন্দ্র হেলথ সেণ্টার ইত্যাদি খুলে বললেন, মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী তোমরা তোমাদের সন্তান-সংখ্যা কমাও কিংবা নিঃসন্তান হও। সাধারণ মানুষ সাধারণ বুদ্ধির মানুষ সরকারের ডাকে বিশেষ সাড়া দিল না। তখন সরকার আবার ডাক দিয়ে বললেন, দরিদ্র ভারতবাসী, নিজেদের নির্বীজ ক'রে সন্তান জন্মের পথ বন্ধ করলে তোমরা টাকা পাবে। কিছু সংখ্যক দরিদ্র টাকার লোভে অগত্যা সে-ডাকে সাড়া দিল, আর সেই সাড়াকে সক্রিয়তব ক'রে তোলার জন্য সরকার দালাল ও ডাক্তারদের জন্যও প্রাপ্তিযোগের বন্দোবস্ত করলেন। সমস্ত পরিবার-পরিকল্পনা এখন একমাত্র টাকাকে কেন্দ্র ক'রে আবর্তিত হচ্ছে।

প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় তাই দেখা যাচ্ছে ঃ বেশির ভাগ পরিবার-পরিকল্পনা-কেন্দ্র হেলথ সেণ্টার হাসপাতাল ইত্যাদিতে ভাসেকটমির মতো গুরুত্বপূর্ণ অপারেশ্যা দিনে শতাধিক সংখ্যায় হচ্ছে, এবং সব মিলিয়ে দু' ঘণ্টার ব্যয়ে যে-অপারেশান সম্ভব নয়, তা আধ ঘণ্টার মধ্যে সারা হচ্ছে। ডাক্তারবাবুরা কীভাবে কেন এই অত্যল্প সময়ে এত বড় অপারেশান করছেন? 'কীভাবে'র জবাব না দেওয়া বাঞ্ছনীয়, 'কেন'র জবাব দিতে গেলে বলতে হয়, স্রেফ টাকার জন্যে ; অর্থাৎ নির্দিষ্ট সীমা অতিক্রম ক'রে যেতে পারলে প্রতি অপারেশান পিছু তাঁরা সাত টাকা পাবেন। 'প্রোমোটার' বা দালালরা জন পিছু তিন টাকা ক'রে পান, অতএব টাকার জন্য তাঁরা বালক বৃদ্ধ যুবক বিবাহিত অবিবাহিত যাকে পারছেন, ধরে আনছেন। শতকরা নিরানব্বই জন দালাল 'আনট্রেন্ড্' বা অশিক্ষিত এবং আদর্শহীন তাতে সন্দেহ করার কোন কারণ নেই, আর তারই ফলে অধিকাংশ ভাসেকটমি অপারেশান স্বতঃপ্রবৃত্ত না হয়ে বাধ্যতামূলক হয়ে দাঁড়াচ্ছে। বারুইপুরের ষোড়শবর্ষীয় বালকটির মতো আরও কত হতভাগ্য যে বাংলাদেশে ও অন্যত্র ইতিমধ্যে নির্বীজীকৃত হয়েছেন, কে তার হিসাব রাখে?

সরকারী স্ট্যাটিস্টিকস যাই বলুক, জনস্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে আমাদের সরকার (কেন্দ্রীয় ও রাজ্য) গত কুড়ি বছরে শোচনীয় ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে। আমাদের সরকারী ও আধা-সরকারী হাসপাতালগুলির দুরবস্থা প্রবাদবাক্যে পৌঁছে গেছে। শহরের হাসপাতালগুলির তুলনায় গ্রামের হাসপাতালগুলির অবস্থা-ব্যবস্থা আরও খারাপ। গ্রামের হাসপাতাল বা হেলথ সেণ্টারগুলিতে যে ডাক্তার নার্স ও ওষুধপত্রের অভাব সে কথা সরকারও একাধিকবার স্বীকার করেছেন। এমতাবস্থায় ভাসেকটমি ইত্যাদি অপারেশান কতটা নিখুঁতভাবে সম্পন্ন হয় সে সম্পর্কে সন্দেহ থেকে যেতে বাধ্য। অপারেশানের আগে ও পরে অপারেটেড ব্যক্তিটির যে সেবাযত্নের প্রয়োজন ক'টা হাসপাতালে সেদিকে মনোযোগ দেওয়া হয়? কিংবা আদৌ হয় কি? খাস শহর-কলকাতায় মেডিকেল কলেজ ও অন্যান্য হাসপাতালের কাছে ক্লিনিক বা ছোট চিকিৎসাকেন্দ্র খোলার প্রস্তাব আছে। প্রস্তাব অতি উত্তম। কিন্তু এই বড় বড় হাসপাতালগুলি যেখানে নিজেদের ন্যূনতম কর্তব্য পালনেই হিমসিম খাচ্ছে, সেখানে আবার প্রতিবেশী ক্লিনিকগুলির দায়িত্ব নিতে পারবে কি?

প্রস্তাব বলতেই মনে এলো, সরকার ভাসেকটমি অপারেশানের জন্য একটি স্থায়ী দপ্তর খোলার কথা ভাবছেন। আর আমাদের দেশে দু'চার জন রাজপুরুষের ভাবার উপরই যখন একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, তখন এটাও প্রায় নিশ্চিত নিকট ভবিষ্যতে শহরে গঞ্জে গ্রামে হাজার হাজার ভাসেকটমি দপ্তর স্থাপিত হবে। উপরের সংক্ষিপ্ত আলোচনা থেকে এ প্রস্তাব রূপায়ণের ফল কি হবে তা ভাবতেও শঙ্কা হয়। হাসপাতালগুলিতে ব্যাপকহারে ভাসেকটমি অপারেশান প্রবর্তন এবং পুনশ্চ ভাসেকটমির জন্য স্বতন্ত্র হাসপাতাল স্থাপনের মাধ্যমে জন্মনিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থাকে সফল করার জন্য সরকারী কর্মকর্তাদের আপ্রাণ চেষ্টাকে করুণা করা চলে, প্রশংসা নৈবচ। এত বহ্বারম্ভের আগে তাঁরা কি এই প্রশ্নটি নিয়ে একবারও ভেবেছেন ঃ ব্যাপকহারে ভাসেকটমি অপারেশান আদৌ সম্ভব কি? যেখানে ব্যক্তিবিশেষের শারীরিক যোগ্যতা নির্ণয় ও মানসিক প্রস্তুতি নিরূপণের পরই এ অপারেশান করণীয় সেখানে ব্যাপকহারে নির্বিচারে যদি ভাসেকটমি প্রযুক্ত হয়, তবে তার ফল কি হয় বা হবে ভাবতেও শঙ্কিত বোধ করি।

ভবিষ্যতের কথা ছেড়ে বর্তমান প্রসঙ্গে ফিরে আসি। বিভিন্ন পরিবার-পরিকল্পনা-কেন্দ্র হেলথ সেণ্টার হাসপাতাল সরকারী প্রচার ইত্যাদি সংক্রান্ত তথ্যাবলী বিশ্লেষণ ক'রে চন্দ্রগুপ্ত যে-সমস্ত প্রশ্নের মুখোমুখী হয়েছেন, সেইগুলি (কয়েকটি পূর্বে প্রসঙ্গত আলোচিত) তিনি সরকার ও জনসাধারণের সামনে রাখছেন ঃ

এক ॥ যে-হারে শহরে গ্রামে (বিশেষত গ্রামে) ভাসেকটমি অপারেশান হচ্ছে তার মধ্যে ক'টি অপারেশান সর্বাংশে ত্রুটিমুক্ত? অপারেশানের সর্বোচ্চ সীমা না থাকার ফলে ডাক্তারবাবুরা যদি তাঁদের ক্ষমতার অতীত সংখ্যায় অপারেশান করেন, তবে তাঁদের কাজে ত্রুটি কি অনিবার্য নয়?

দুই ॥ অপারেশানের আগে ব্যক্তিটির কোন দীর্ঘমেয়াদী বা দুরারোগ্য অসুখ আছে কি না তা কি পরীক্ষা ক'রে দেখা হয়? হ'লে শতকরা ক'টি ক্ষেত্রে হয়? এই প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করি, আজ পর্যন্ত শারীরিক বা মানসিক কারণে ক'জন অপারেশান-কাঙ্ক্ষীকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে?

তিন ॥ অপারেশানের আগে ব্যক্তি-বিশেষের বয়স বিচার ক'রে দেখা হয় কি? বারুইপুরের কিশোরটির মতো বহু কিশোর (এবং হয়তো বৃদ্ধও) যে-প্রায় বাধ্যতামূলকভাবে নির্বীজীকৃত হয় নি, এ কথা কি পরিবার-পরিকল্পনার কর্তা-ব্যক্তিরা অস্বীকার করতে পারেন?

চার ॥ ছেলেদের ভাসেকটমি প্রয়োগের মতো মেয়েদের লুপ পরানোর সময়েও নির্দিষ্ট মহিলার স্বাস্থ্যগত যোগ্যতা বয়স মানসিক অবস্থা ইত্যাদি বিচার করার প্রয়োজন। ক'টি ক্ষেত্রে এই সব বিচার হয়? কোন মেয়ে যদি পরে লুপ খুলে ফেলতে চান (শারীরিক ক্ষতি বা সন্তান কামনা হেতু চাওয়া অস্বাভাবিক নয়), হাসপাতাল বা স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ডাক্তার, যিনি ঐ লুপ প্রয়োগ করেছিলেন, তিনি কি সহজে তা খুলে দিতে রাজী হন? কিংবা অধিকাংশ ক্ষেত্রে অক্ষমতা জানিয়ে তিনি কি সরাসরি মহিলাটিকে বিদায় দেন না?

পাঁচ ॥ জন্মনিয়ন্ত্রণের জিনিসপত্র নিয়ে ইতিমধ্যে যে চোরাকারবার শুরু হয়ে গেছে, সরকার তার প্রতিরোধের কি উপায় অবলম্বন করেছেন? 'দালাল'দের স্বার্থে 'লুপ' খুলে আবার পরানো কিংবা বিনামূল্যে প্রাপ্য রবারদ্রব্য সংগ্রহ ক'রে বাজারে বিক্রী করার ঘটনা তো ইতিমধ্যে সুবিদিত হয়ে গেছে। এই ধরনের অসাধুতা দূরীকরণের উপায় কি?

ছয় ॥ পরিবার-পরিকল্পনার কাজে স্বতঃপ্রণোদিত অনেক শিক্ষিত সমাজ-কর্মী ও ডাক্তার আছেন। সরকার তাঁদের অর্থসাহায্য করেন না বা অন্যবিধ উৎসাহ দেন না, অথচ অশিক্ষিত দালালদের অর্থলোভ দেখিয়ে অপারেশানের জন্য 'যাকে পারো তাকে ধরে আনো'র মতো সমাজবিরোধী নীতি পরোক্ষভাবে

তেতো মানুষের গান

(ম্যাক্সিম গোর্কিকে মনে রেখে)

বাণী চট্টোপাধ্যায়

অভিজ্ঞতা জ্বলে যেন অনল জঠরে
কিংবা দুয়োরাণীর ছেলে, জলে ডুবলে কোথাও নেই ডাঙা।
ভালবাসা ঘণ্টা বাজায় স্কুলের ছাতে, গীর্জার মীনারে
যেই দিয়েছ মাটিতে পা, ঈশ্বরও নেন চোখ ফিরিয়ে,
কেন না তোমার চরণদুটি নাঙা।

জন্ম থেকে সাপের ছোবল, ছেঁড়া পিরান শীতের নখে
ছিঁড়তেই থাকে;
ঈশ্বরও নেন চোখ ফিরিয়ে, তারও দৃষ্টি ঊর্ধ্ব থেকে
ঊর্ধ্বে মহীয়ান।

মনুষ্যত্ব, করুণা, প্রেম—এ সব কথা পাঠ্য বইয়ে খুবই
মানায় হে;
কিন্তু জীবন বিষের পাত্র যতদিন না মানুষ নিজের রক্তকে
দেয় সামান্য সম্মান।

অনেক দেরি, অনেক দেরি, অনেক দেরি নরক থেকে উত্তরণের;
তাই তো আমরা তেতো মানুষ, গান গেয়ে যাই গাছতলার,
উলঙ্গের॥

সমর্থন করছেন। এই রূঢ় সত্য সরকার কি অস্বীকার করতে পারেন?

সাত ॥ পরিবার-পরিকল্পনাকে সার্থক ক'রে তোলার জন্য যে 'ফীল্ডওয়ার্ক' বা সরেজমিনে কাজ করা দরকার, সে কাজ কতখানি হচ্ছে? এ ফীল্ড-ওয়ার্ক কি ত্রুটিযুক্ত বা অসম্পূর্ণ নয়? কর্মীদের পর্যাপ্ত শিক্ষার-অভাব বা সাধারণ ঔদাসীন্যের ফলে পরিবার-পরিকল্পনার কাজ অনেকাংশে ব্যাহত হচ্ছে এ কথা কি সত্য নয়?

আট ॥ যে-ভাবে ঢাকঢোল পিটিয়ে পরিবার-পরিকল্পনার কথা প্রচার করা হচ্ছে তা কি সুরুচিসম্মত? তাছাড়া একাধিক বিজ্ঞাপনে কি অশালীনতা সোচ্চার নয়? যাদের জন্য জন্মনিয়ন্ত্রণ-পরিকল্পনা, তারা ছাড়া আর যারা বিষয়টি জানছে সেই অপরিণত কিশোর-কিশোরীর মানসিক স্বাস্থ্য কি এই প্রচারের আঘাতে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে না?

•

জনসংখ্যা হ্রাসের জন্য জন্মনিয়ন্ত্রণের গুরুত্ব অস্বীকার করার মূঢ়তা চন্দ্রগুপ্তের নেই। সরকারের সঙ্গে চন্দ্রগুপ্তও ভারত-বর্ষের প্রত্যেক পিতা-মাতাকে নিয়ন্ত্রিত পরিবারের মাধ্যমে সুখী ও নিশ্চিন্ত জীবন-যাপন করতে অনুরোধ জানাচ্ছেন। বর্তমান নিবন্ধ সরকারের পরিবার-পরি-কল্পনাগত নীতি কার্যক্রম ও ব্যর্থতার সংক্ষিপ্ত সমালোচনা মাত্র।

যে-সব কথা চন্দ্রগুপ্তের মতো সাধারণ লোক বুঝতে পারে, অসাধারণ সরকারী মহাজনদের কাছে প্রায়শই তা দুর্বোধ। চতুর্থ পরিকল্পনায় দু শ' ঊনত্রিশ কোটির মতো যে বিরাট অঙ্কের টাকা খরচের জন্য ধরা হয়েছে, তার সামান্য অংশ যদি দেশের শিক্ষাখাতে ব্যয়িত হয়, তবে পরিবার পরিকল্পনা অনেক বেশি সফল হবার সম্ভাবনা। শিক্ষার আলো পেলে জন-সাধারণ নিজে থেকেই পরিবার-পরিকল্পনা সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠবে। অর্থ-নৈতিক মনোন্নয়নের সঙ্গে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের প্রশ্ন ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। আজ-কের দরিদ্র ও নিরক্ষর ব্যক্তি যদি আগামী-কাল সচ্ছল ও শিক্ষিত হয়ে ওঠে, তবে তাকে জন্মনিয়ন্ত্রণের গুরুত্ব সম্পর্কিত বক্তৃতা গলাধঃকরণ করানোর প্রয়োজন হবে না। অতএব সরকার দেশে শিক্ষা-বিস্তারে ও সাধারণ অর্থনৈতিক মনোন্নয়নে সচেষ্ট হলে প্রস্তাবিত পরিকল্পনা রূপা-য়ণে অধিকতর সাফল্য অর্জন করবেন।

পরিবার-পরিকল্পনার জন্য সরকারকে দুটি বাস্তবসম্মত পন্থা অবলম্বন করতে অনুরোধ করি। প্রথম, ভাসেকটমি অপা-রেশান লুপ প্রয়োগ ইত্যাদি জন্মনিয়ন্ত্রণ-মূলক ব্যবস্থা অবলম্বনে জনসাধারণকে উৎসাহী করার জন্য যে আর্থিক পুরস্কার দানের প্রথা বর্তমানে প্রচলিত তাতে দুর্নীতির সম্ভাবনা অত্যধিক। অতএব প্রোমোটার বা দালাল শ্রেণীর সম্পূর্ণ অব-লোপের সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তারদের নির্দিষ্ট সংখ্যক অপারেশানের পর অপারেশান পিছু সাত টাকা পুরস্কার দানের প্রথাও রহিত হওয়া দরকার। লুপ-গ্রহণে বা অপারেশানে আগ্রহী স্ত্রী-পুরুষকে এবং তাদের ভারপ্রাপ্ত চিকিৎসককে আর্থিক পুরস্কার দানে আপত্তি নেই, কিন্তু প্রত্যেক ক্ষেত্রেই এই ভারপ্রাপ্ত চিকিৎসক যেন জন্ম-নিয়ন্ত্রণকামী স্ত্রী-পুরুষের পরিচিত হন। শুধুমাত্র অর্থের জন্য কোন ডাক্তার তাঁর চিকিৎসার্থী বা ব্যক্তিগত পরিচিতকে ভাসেকটমি অপারেশান বা লুপ গ্রহণে বাধ্য করবেন, এ কথা বিশ্বাস করতে পারি না, এবং যদি কোন ডাক্তার তা করেন তবে তা ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত বলে পরিগণ্য। জন্মনিয়ন্ত্রণের পদ্ধতি-বিশেষ গ্রহণের আগে যে শারীরিক ও মানসিক যোগ্যতা বিচারের প্রশ্ন ওঠে এবং অপারেশান ইত্যাদির জন্য নির্দিষ্ট ব্যক্তির যে সেবাযত্নের প্রয়োজন, তা চিকিৎসক ও চিকিৎসিত ব্যক্তির ব্যক্তিগত পরিচয়ের ক্ষেত্রেই সম্ভব। অতএব পরি-বার-পরিকল্পনার জন্য স্বতন্ত্র চিকিৎসক মণ্ডলী সৃষ্টি না করে সাধারণভাবে প্রত্যেক অভিজ্ঞ চিকিৎসককেই (প্রধানত গাইনোকলজিস্টকে) অধুনা প্রচলিত আর্থিক উৎসাহ দেওয়া সমীচীন।

দ্বিতীয়ত, ছোট-বড় সর্বজনসমক্ষে পরিবার-পরিকল্পনার সাড়ম্বর প্রচার অবি-লম্বে বন্ধ করা দরকার। এ ধরনের প্রচার রহিত হলে তরুণমতি কিশোর-কিশোরী-দের মানসিক স্বাস্থ্য ক্ষতিগ্রস্ত হবার সম্ভাবনা (বলা বাহুল্য, যৌন আবেদন-মূলক চলচ্চিত্র ইত্যাদি অন্য কারণগুলির ত্বরিত দূরীকরণ সম্পর্কে অন্যান্যদের মতো চন্দ্রগুপ্তও চিন্তিত) হ্রাস পাবে আর সেই সঙ্গে সরকারের আর্থিক অপব্যয়ও কমে যাবে। ইতিপূর্বে একটি নিবন্ধে বলে-ছিলাম, পরিবার-পরিকল্পনাকে প্রকাশ্যে সাড়ম্বরে বিজ্ঞাপিত করার পরিবর্তে শিক্ষিত সমাজকর্মীরা শহরে-গ্রামে প্রত্যেক পরিবারের পিতা-মাতার সঙ্গে ব্যক্তিগত-ভাবে যোগস্থাপন করতে পারবেন। যেভাবে আজ কলেরার বা বসন্তের টীকা দেওয়া হয়ে থাকে, পরিবার-পরিকল্পনার উপ-যোগিতা ব্যাখ্যান বা প্রত্যক্ষ সাহায্য দানও সেই পদ্ধতিতে হতে পারে। প্রথম প্রথম যদি আশানুরূপ সাড়া না মেলে তাতে হতাশ হবার কারণ নেই, কালক্রমে পরিবার-পরিকল্পনা জনপ্রিয় হতে বাধ্য।

পরিবার-পরিকল্পনার জনপ্রিয়তার সম্ভাবনা যে-ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে, সেই ভিত্তির নাম শিক্ষা। আজও যে অজ্ঞান-অন্ধকার আমাদের দেশের একটি বড় অংশকে আবৃত করে আছে, সার্বিক শিক্ষার সাহায্যে তাকে বিদূরিত করতে না পারলে, পরিবার-পরিকল্পনা কেন, কোন পরিকল্পনাই সফল হবে না, কিছুতেই সফল হবে না।

ভারত দর্শন

হঠাৎ হাঙ্গামার হাওয়া

ঝড় করে না হলেও ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে অকস্মাৎ একটা হাঙ্গামার হাওয়া আবর্তিত ঘূর্ণির সৃষ্টি করেছে। প্রায় বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতই এই সব ছুটকো হাঙ্গামা বিনা কারণে দপ দপ করে এখানে সেখানে আগুনের ফুলকি ছুটিয়ে দিচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী কলকাতা সফর শেষ করেই এলাহাবাদ দৌড়েছিলেন। সফরান্তে তিনি অন্তত একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, বিক্ষিপ্ত হাঙ্গামার পিছনে বৈদেশিক উস্কানি নেই। কিন্তু কী আছে? কেন এই হাঙ্গামা? কে বা কারা স্ফুলিঙ্গ বিচ্ছুরণে নেপথ্য চক্রান্ত করছেন, প্রধানমন্ত্রী সে সব প্রশ্নের উত্তর দেন নি। এলাহাবাদের সাংবাদিক সম্মেলনটি খুব তড়িৎ ঘড়িৎ ডাকা হয়েছিল। শ্রীমতী গান্ধী স্বভাবতই এখানে পদাধিকার বলে কিছু চিরন্তন উপদেশাবলী সহজে বলেছেন, শক্ত প্রশ্নগুলির উত্তর এখনো সরলীকরণের অপেক্ষায় আছে।

ইতিপূর্বে আমরা শেখ আবদুল্লা সাহেবের উত্তেজনামূলক ভাষণগুলি সম্পর্কে উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলাম। তিনি শান্ত তৃপ্ত ভারতীয় নাগরিকগণের একাংশের মনে বিষাক্ত সূচ বিদ্ধ করবার জন্য উঠে পড়ে লেগেছেন। এবং কোনো যোগসূত্র প্রামাণিকভাবে বর্তমান, একথা যোগসূত্র বলতে মন ইতস্তত করলেও, ভারতের নানা স্থানে অকস্মাৎ হাঙ্গামার পেছনে শেখ সাহেবের গরম গরম ভাষণগুলি কিছু প্রভাব বিস্তার করেও থাকতে পারে।

সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার স্মৃতি আমরা যখন প্রায় ভুলতে বসেছি, তখন আবার তাকে চাগিয়ে তোলার জন্য যে সূত্র ইন্ধন যোগান দিচ্ছে, সরকারী অনুসন্ধানে তার গোপন আস্তাগুলি অবিলম্বে আবিষ্কার করা দরকার।

প্রধানমন্ত্রী বা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী যতই সতর্কীকরণ ভাষণ দিয়ে পরিস্থিতির মোকাবিলা করবার চেষ্টা করুন, পরিস্থিতি তাতে জটিলতার জট ছাড়াবে বলে ভরসা হয় না। কেন না, জনসাধারণকে সতর্ক করা বা উপদেশ দেওয়ার অর্থ ভাষণের অপব্যয়। জনসাধারণ সাম্প্রতিক হাঙ্গামাগুলির কোথাও কোনো অংশ যে গ্রহণ করেন নি তা ঘটনার সীমাবদ্ধতা লক্ষ্য করলেই বোঝা যাবে। দুষ্টমতি কিছু লোক একটা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির ফিকিরে আছে যাদের সঙ্গে সাধারণ শান্তিপ্রিয় নাগরিকদের সামান্যতম যোগাযোগ নেই। কলকাতার ঘটনা যদি উদাহরণ করি, তবে বলা যায়, যে অঞ্চলে হাঙ্গামা হয়েছে সেই অঞ্চলেরই ভদ্র পরিবারবর্গ হাঙ্গামার সংবাদ পেয়েছেন খবরের কাগজ বা বেতার-বার্তা মারফৎ। অর্থাৎ অনেকেই নিরুপদ্রব জীবনে আশ্বস্ত ছিলেন। হাঙ্গামার সংবাদটুকুও জানতে পারেন নি। মুষ্টিমেয় দুষ্ট লোক বিশেষ অঞ্চলে উত্তেজনা বাধিয়েছিল। কিন্তু এই উত্তেজনাকে দীর্ঘস্থায়ী এবং প্রসারিত করার দুরভিসন্ধি তাদের ধোপে টেকে নি। টেকে নি তার কারণ এই হাঙ্গামার সঙ্গে সাধারণ মানুষের সম্পর্ক ছিল না। এলাহাবাদ বা অন্যত্রও হাঙ্গামা ছড়িয়ে পড়তে পারে নি একই কারণে। নাগরিক মনোভাব হাঙ্গামা প্রতিরোধে বিশেষ সজাগ না হলে এমনটি সম্ভব ছিল না। হাঙ্গামা যে অঙ্কুরে বিনষ্ট হয়েছে এজন্য তাই পুলিশ বা প্রশাসনের ততটা নয়, যতটা প্রশংসা উভয় দলীয় সাধারণ নাগরিকগণের প্রাপ্য।

সেজন্যই বলছিলাম, হাঙ্গামা যেখানে ব্যাপক নয়, নেতৃবৃন্দের বড় বড় বক্তৃতা এবং সংবাদপত্রে তারই ফলাও বিবৃতি বরং সেখানে তিলকে তাল করছে। এই সব দুষ্কৃতকারী-প্রবোচিত হাঙ্গামাকে সাম্প্রদায়িকতার রঙে চুবানোর মধ্যেও কি যাথার্থ্য আছে! এ হাঙ্গামার মোকাবিলায় উপদেশ বা সতর্কীকরণের চাইতে গোয়েন্দা বিভাগীয় অনুসন্ধানই অধিকতর কার্যকরী হতে পারে। বিবৃতি কেবলমাত্র ঘটনাকে ব্যাপকতা দান করতে পারে। কিন্তু চক্রান্তকারীদের ধরিয়ে দিতে পারে না।

হাঙ্গামার বহর দেখে যখন এটা স্পষ্টই প্রতীয়মান হচ্ছে যে, এক ধরণের ভারত-বিরোধী চক্রই নতুন করে এবং বিভিন্ন ছিদ্রপথে হাঙ্গামা তৈরির ফিকিরে ফিরছে তখন, তাদের সেই আস্তাগুলিকে খুঁজে বার করাই এখন প্রধান কর্তব্য। এই সব হাঙ্গামাকে সাম্প্রদায়িকতার দৃষ্টিকোণ থেকে না দেখে, প্রতিরক্ষার দৃষ্টিকোণ থেকে দেখাই বাঞ্ছনীয়। তাহলে হয়ত হাঙ্গামার মূলে গিয়ে পৌঁছানো সম্ভব। কিন্তু পাশে পাকিস্তানের অস্তিত্ব থাকায় এবং আমাদের ধর্মনিরপেক্ষতার প্রশ্নে অতি সচেতনতার (প্রয়োজনের অধিক পরিমাণ) জন্যই আমরা কি চিরকালই সম্প্রদায় বিশেষের যে কোনো ছোট সঙ্ঘর্ষকেও সাম্প্রদায়িক বলে চিহ্নিত করব? স্ব সম্প্রদায়ের মধ্যেও ছোটখাটো সঙ্ঘর্ষ ঘটতে পারে। এবং ভারতবর্ষ বিরাট দেশ। কোনো ঘটনাকে সাম্প্রদায়িক বলার আগে বোধ হয় এই সব প্রশ্নও অতঃপর আমাদের ভেবে দেখা উচিত। তা ছাড়া ভারতবর্ষে যখন সম্প্রদায় বিশেষের মধ্যে কোনরূপ পার্থক্যই টানা হয় না, (সম্প্রদায়গত সুবিধা পুরোপুরি বিলুপ্ত হওয়া উচিত) তখন হাঙ্গামাগুলিকেও সাধারণ হাঙ্গামার কষ্টিপাথরে সরকারিভাবে বিবেচনা করার প্রয়োজন। অন্যথা ভারতবাসীর মন থেকে 'সাম্প্রদায়িকতা' শব্দের অবলোপ ঘটানো কি শুধু উপদেশের মাধ্যমে সম্ভব!

যে কোনো হাঙ্গামাকে সাধারণ হাঙ্গামার স্তরেই বিচার করতে হবে। সেই হাঙ্গামাকে কোনো নাগরিক সাম্প্রদায়িকতার পচা আস্তাকুঁড়ে নিমজ্জিত করতে চাইলে তাকে দেশদ্রোহীর পর্যায়ে গণনা করে তার পাওনা শাস্তিও মিটিয়ে দিতে হবে।

আমাদের সংবিধান যখন কোনো বিশেষ সাম্প্রদায়িক পক্ষপাত বরদাস্ত করে না, আমাদের সর্বোচ্চ রাজনৈতিক, সামরিক, প্রশাসনিক বা বিচার বিভাগীয় পদাধিকারে যখন বিশেষ কোনও সম্প্রদায়ের মৌরসী পাট্টা অস্বীকৃত, তখন আমাদের চিন্তাতেই বা তার স্বীকৃতি থাকবে কেন।

আমরা সম্প্রদায় অথবা ধর্মের বিভেদ মানি না। যদি তাই-ই হয়, তবে হামলা বা হাঙ্গামায় সাম্প্রদায়িকতাকে চিহ্নিত করার জন্য আমাদের এই মূঢ় ব্যস্ততা কিসের? অনেক সময় সংখ্যাগুরুর অতি-সচেতন সুবুদ্ধিই ফ্যাসাদ সৃষ্টি করে সংখ্যালঘুকে প্রয়োজনের অতিরিক্ত আশ্বাস দিতে গিয়ে।

কিন্তু এ সমস্ত কিছুরই প্রয়োজন নেই। যদি সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তির অস্তিত্বকেই আমরা প্রাধান্য না দেই ও হাঙ্গামাকে দুষ্কৃতকারীর সমাজবিরোধী কার্যকলাপ রূপেই গণ্য করি। এবং তাই-ই করা উচিত। এইভাবে আমাদের অভ্যাসে পরিবর্তন না আনা হলে ভেদবুদ্ধির বিষও সম্মার্জিত করা অসম্ভব।

দক্ষিণ রেলপথ দুর্ঘটনা

দক্ষিণ রেলপথে ইয়ালভিগি স্টেশনে অপেক্ষারত একটি যাত্রী রেলযানের ওপর ডেকান এক্সপ্রেস ঝাঁপিয়ে পড়ে (৫৪)

চুয়ান্নজন যাত্রীর প্রাণ হরণ করল, আঘাত পেলেন প্রায় অর্ধশত ভ্রমণকারী (কত যে লাস এ পর্যন্ত বেহিসাব কে জানে) এবং সংসদের উত্তরকক্ষে দাবি উঠল, কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী সি এম পুনাচার পদত্যাগ চাই। রেলে কলিশন নিয়ে স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করেছিলেন লালবাহাদুর শাস্ত্রী রেলমন্ত্রী থাকাকালে। বহুবার রেল-দুর্ঘটনার দায়িত্বকে জাতীয়তাবিরোধী কার্যকলাপের অভিযোগে অভিযুক্ত করে পদত্যাগ তথা আপন দায়িত্ব এড়িয়ে গেছেলেন প্রাক্তন রেলমন্ত্রী এস. কে পাতিল। শ্রীপুনাচা এখন কী সিদ্ধান্ত নেবেন তিনিই জানেন। তবে রেলে কলিশনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীমহোদয়ের পদত্যাগের বস্তুতই কোন সম্পর্ক আছে কিনা অধীনের তাতে যথেষ্ট সন্দেহ থেকে গেছে। রেলে কলিশন যদি রেলমন্ত্রীকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করে তাহলে তো বিভাগীয় অপদার্থতার জন্য খুব কম মন্ত্রীরই স্বপদে বহাল থাকা উচিত। ভারতব্যাপী অরাজকতার জন্য তবে কি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পদত্যাগ করবেন নাকি স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী বলবেন, হল না, হল না; চললাম। উপযুক্ত খাদ্য পরের ঘরে ভিক্ষে করেও ক্ষুধার্ত জাতির ক্ষুন্নিবৃত্তি বিনি করতে অপারগ সেই খাদ্যমন্ত্রী, কেন্দ্রে বা রাজ্যে কবে আর পদত্যাগ করাটা প্রয়োজন বলে ভাবেন। ভাষার প্রশ্নে মনের সায় না থাকায় চাগলা সাহেব সরে দাঁড়িয়েছিলেন। শিক্ষার মাধ্যম নিয়ে এবং সেই সূত্রে চাকরীর সংস্থান নিয়ে আজ উত্তরে দক্ষিণে পূবে পশ্চিমে যে ঝড় বইছে, তার দায়িত্ব ঘাড়ে করে মন্ত্রিত্ব ছেড়ে যাবেন কে? আর কোনো একজন মন্ত্রীর পদত্যাগ কি সমস্ত মন্ত্রিসভাটিকেই অকর্মণ্যতার অভিযোগে অভিযুক্ত করবে না? মন্ত্রিসভার দায়িত্ব যখন যৌথ। সকল বিভাগীয় ত্রুটিবিচ্যুতি কি স্বয়ং প্রধানমন্ত্রীর পদত্যাগকে ত্বরান্বিত করে?

অর্থ নিয়ে যে অনর্থ, মুদ্রামূল্যের অবনতি এ সমস্ত দায় থেকে মোরারজী দেশাই তাহলে কীভাবে পার পান। ইতিপূর্বে তাঁর কয়েকটি সিদ্ধান্তে তো লক্ষ লক্ষ নাগরিক পথে বসেছিলেন। আজও দেশের অর্থনীতি বেসামাল দেশাই সাহেব কোথায় যাবেন।

ফিরিস্তি বাড়িয়ে লাভ নেই। একটা কথা সাদা এবং সত্য, খুটিনাটি বিষয়ে পদত্যাগের দায় নিয়ে কেউ অত কাঠ খড় কেরোসিন পুড়িয়ে মন্ত্রী হতে আসেন না। এতো সংক্ষিপ্ত মন্ত্রিত্বলীলা জানলে এরপর মন্ত্রী পাওয়াই ভার হবে। কেন না, এম এল এ হতেই বেশ ধকল পোয়াতে হয়, মন্ত্রী হতে তো কথাই নেই। পুনাচাই হন আর দেশাই চ্যবনই হন, এ'দের অত সেন্টিমেন্টাল হলে চলে না।

রেল যখন গড়িয়ে চলে এবং যখন তা গাড়ি-বিশেষ তখন দুর্ঘটনাও ঘটতেই পারে। এর ওপর মন্ত্রীমহোদয়ের হাত নেই। হাত থাকতেও হাতের ব্যবহার না করার জন্য বরং সংশ্লিষ্ট রেল-কর্তৃপক্ষেরই সাজা হতে পারে।

হুবলীর দুর্ঘটনা প্রশাসনিক শৈথিল্যের একটি নিকৃষ্টতম প্রমাণ। রাত দশটা চল্লিশে যে প্যাসেঞ্জার ট্রেনটি ইয়ালভিগি স্টেশনে নিশ্চিন্ত দাঁড়িয়ে আছে তার ওপর রাক্ষুসে ক্ষুধা নিয়ে একটি এক্সপ্রেস ট্রেন কোত্থেকে এসে পড়ে! স্টেশনের বাইরে সিগন্যাল পোস্টগুলি কি প্যাসেঞ্জার ট্রেনটিকে প্যাশ না করিয়েই ডেকান এক্সপ্রেসকে ছুটে এসে অনর্থ ঘটাতে দিয়েছিল। পোস্ট ছাড়াও জীবন্ত মানুষ, পয়েনটসম্যানরা ছিলেন, তবু এতো বড় একটা দুর্ঘটনা এড়ানো গেল না? অনুরূপ দুর্ঘটনা এড়ানো যায় নি বিহারের লক্ষ্মীসরাই স্টেশনে। কিন্তু লক্ষ্মীসরাই স্টেশনের মর্মান্তিক অভিজ্ঞতাও যে কর্তব্যরত রেলকর্মীদের কিছুমাত্র সচেতন করে নি, দক্ষিণ রেলপথের ইয়ালভিগি স্টেশন তার প্রমাণ দিল।

ডেকান এক্সপ্রেসের দুটি যাত্রীবাহী বগী চুর্ণবিচুর্ণ হয়েছে সঙ্ঘর্ষের প্রচণ্ডতা এমনই। রেলের ক্ষতি ঠেকেছে পাঁচ লক্ষ টাকায়। কিন্তু যে যাত্রীজীবন কয়েকটি অকর্মণ্য কর্মী ও ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত অক্ষম কর্তার জন্য মুহূর্তমাত্রে বিধ্বস্ত হয়ে গেল সে ক্ষতি তো টাকায় পূরণ করা যাবে না। সরকার অবশ্য যাত্রী সাধারণের জীবনের বিনিময়ে দেড়শত থেকে পাঁচশত টাকা দানের ব্যবস্থা দিয়েছেন। অর্থাৎ নিহতের পরিজনবর্গ যাতে রেলের টিকিট কাটার পরও মৃতদেহ সংকারের জন্য পুনরায় গাঁটের কড়ির যোগাড করতে না বাধ্য হন সরকার দয়াপরবশ হয়ে তারই ব্যবস্থা দিয়েছেন। দেড়শ।পাঁচশ টাকার সাহায্যটা ঘাট-খরচ ছাড়া আর কিছুই নয় এবং তা উল্লেখযোগ্য কোনো বিষয়ও নয়। তাছাড়া প্রাপককে ঐ টাকা সংগ্রহ করতে কত দূর বেগ পেতে হবে তার প্রাসঙ্গিক আলোচনার পরিবেশও এখন নয়। প্রশ্ন হল জীবনহরণের পর কোনো ক্ষতিপূরণই ক্ষতিপূরণ নয়। মৃতজীবনের ক্ষতিপূরণ হয় না।

যা হতে পারে তা হল, মুহুর্মুহু দুর্ঘটনা নিবারণের জন্য সতর্কতামূলক ব্যবস্থা। সরকার এ কাজে বারম্বার ক্ষমাহীনভাবে ব্যর্থ হয়েছেন। অথচ একই লাইনের গাড়ি কিভাবে সঙ্ঘর্ষে লিপ্ত হয় (বিশেষ সে গাড়ি যখন একটি কর্মমুখর স্টেশনে অপেক্ষারত) তা বুঝতে সত্যই কষ্ট হওয়ার কথা। একমাত্র যাত্রী সাধারণের নিরাপত্তা সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের চরম গাফিলতিই একাধিক রেল দুর্ঘটনার কারণ হয়ে আসছে। ইয়ালভিগির দুর্ঘটনার সঙ্গে জাতীয়তাবিরোধী কার্যকলাপের অজুহাত টেনে চিরাচরিত উপায়ে দায়িত্ব এড়ানোর উপায় নেই। রেল প্রশাসনকে যে শ্রীযুক্ত পুনাচাও কর্তব্যপরায়ণ করে তুলতে পারেন নি, পাতিল সাহেবের উত্তরাধিকারই তিনি বহন করছেন মাত্র ইয়ালভিগি তারই সাক্ষ্য রেখেছে। সে হিসেবে শ্রীপুনাচার পদত্যাগের জন্য সংসদ সদস্য কণ্ঠের দাবিও সুতরাং অযৌক্তিক কিম্বা বিরোধীপক্ষের রাজনৈতিক বাড়াবাড়ি এমন কথা বলা যায় না। তবু পুনাচা যে পদাধিকার ছাড়বেন না সেটা অবশ্য অনায়াসে ভবিষ্যদ্বাণী করে রাখা যায়।

আসলে গলদ অন্যত্র। আজকের ভারতীয় নাগরিকজীবন যে কী অসহায়ভাবে নিরাপত্তাহীনতার অভিশাপে বিপর্যস্ত, পূর্ববর্তী সংখ্যাতেই তার আলোচনা করেছিলাম। প্রসঙ্গত ভারতীয় রেলপথের উল্লেখ সেখানে রাখা হয় নি। ইয়ালভিগি প্রসঙ্গটি স্মরণে আনল। গলদ ঐখানে। জনজীবনের নিরাপত্তা রক্ষার দায়িত্ব আমাদের শাসককুল তথাকথিত নেতৃবর্গের চেতনাকে প্রভাবিত করে না। দায়িত্ব তাঁরা যৎসামান্য বহনেই তৃপ্ত। লক্ষ্য তাঁদের মসনদে স্থির। কপালে আমাদের তাই দুঃখের লিখন শুধুমাত্র লেখালেখি গালিগালাজের মাধ্যমে মুছে ফেলার নয়।

দায়িত্ব-অসচেতন নেতৃবর্গের হাতে জীবন ও সম্পত্তির নিরাপত্তা রক্ষার ভার থাকলে যা হয়, আমাদেরও তাই-ই হচ্ছে।

অরণ্যে রোদনে তাই পৃষ্ঠা ভারাক্রান্ত করে লাভ নেই।

বিহার :

শোষিত দলের শোষণাবসান

বিহারে দলত্যাগী বি পি মণ্ডল নিজের জন্য মুখ্যমন্ত্রীর এবং সহযোগীদের জন্য মন্ত্রিত্বের গদী পরিস্থিতির সুযোগে লুঠে নেওয়ার অভীপ্সায় রাতারাতি যে দল গঠন করেন, আশ্চর্যের বিষয় তার নাম রাখা হয়েছিল শোষিত দল। শ্রীমণ্ডল তাঁর অনুচরবর্গসহ কবে কোথায় কখন কাদের দ্বারা শোষিত হয়েছিলেন ইতিহাস তার খবর জানে না। কিন্তু শ্রীমণ্ডল বহুতর ভোজবাজির সাহায্যে প্রান্তিক (মার্জিনাল) ভোটের খেলা দেখিয়ে মন্ত্রিত্ব হাতাবার পরই যে বিহারে শ্রেণী শোষণের পোক্ত ব্যবস্থা ফিরিয়ে আনার প্রয়াস চলছিল, শ্রীমণ্ডলের মাত্র সাতচল্লিশ দিনের রাজত্বের ইতিহাসে তা নথিবদ্ধ হয়ে গেছে। বিহারের নবগঠিত লোকতান্ত্রিক কংগ্রেস দলের নেতারাও সাতচল্লিশ দিনের

শোষণপ্রিয় শোষিত দল (কংগ্রেস সমর্থিত) মন্ত্রিসভাকে বরদাস্ত করতে পারলেন না। মাত্র সাতচল্লিশ দিন মুখ্যমন্ত্রিত্ব করে বিন্ধ্যেশ্বরীপ্রসাদ মণ্ডল শুধু নিজেকে এবং তাঁর তথাকথিত শোষিত পরিষদ-বর্গকেই নয়, বিহার রাজ্য কংগ্রেসকেও ডুবিয়ে এবং পথে বসিয়ে গেলেন।

কত কষ্ট কত কসরতই না করেছিলেন বিন্ধ্যেশ্বরীপ্রসাদ। কিন্তু কপালে টিকল না মুখ্যমন্ত্রিত্ব। এক অনাস্থা প্রস্তাবের চোট মণ্ডল মন্ত্রিসভার বিপক্ষে ১৬৫—১৪৮ ভোটে ভারি হয়ে গদীচ্যুত করল বিন্ধ্যেশ্বরীকে। বিন্ধ্যেশ্বরীর পতন একই সঙ্গে পেড়ে ফেলল মহেশপ্রসাদ—রাজেন্দ্র মিশ্রের বিহার কংগ্রেসকেও। কংগ্রেস পরিষদীয় দলনেতা মহেশপ্রসাদ সিংহ এবং বিহার প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি রাজেন্দ্র মিশ্র হয়ত ধাক্কাটার ওজন পূর্বাহ্ণে যথাযথ টের পান নি। ভেবেছিলেন, এম এল এ বেচাকেনার বাজার চড়াই আছে, টাকা ছড়িয়েই গদীরক্ষা হবে। শুধু যদি অকংগ্রেসী জোটের যুক্তফ্রণ্টের অনাস্থা ঠেকাতে হত, তাহলে 'টাকায় না হয় কী', বলে হয়ত কে বি সহায়ের কংগ্রেসী সহচরবৃন্দ ঠিক কাত করে ফেলতেন যুক্তফ্রণ্টকে। কিন্তু বিপদ যে ঘরের মধ্যে সত্য সত্যই শক্তিশালী ঘোঘের বাসা বেঁধে তুলেছে, গদীর টানে গৃহবাসীরাই তা ধরতে অসক্ষম হলেন। ফলে বিহার কংগ্রেস ভেঙে তছনছ হয়ে গেল। বেরিয়ে এলেন ডঃ লক্ষ্মীনারায়ণ সুধাংশুর সঙ্গে বাছা বাছা নেতা, মায় শ্রীবিনোদানন্দ ঝাও।

বিহার কংগ্রেসের যে অংশ বি পি মণ্ডলের নীতিহীন মসনদারোহণে আপত্তি তুলেছিলেন, বিহার কংগ্রেস তো বটেই, সঙ্গে কেন্দ্রস্থ কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দ, যথা, সর্বশ্রী চ্যবন, জগজ্জীবন রাম, রামসুভগ সিং প্রমুখ সে আপত্তিতে কর্ণপাত করেন নি। বরং বিদ্রোহী কংগ্রেসীদের কণ্ঠস্বর চেপে ধরতে চেয়ে একটা ঐতিহাসিক ভুলের ঐতিহাসিক খেসারত দিয়ে গেলেন তাঁরা। বহু বাসনায় প্রাণপণে-চাওয়া মন্ত্রিত্বের গদীটি মাত্র দেড় মাসের মধ্যে পুনশ্চ যুক্তফ্রণ্ট মন্ত্রিসভার করায়ত্ত হল। যদিও এ মন্ত্রিসভার নেতৃত্বে জনগণ তাঁদের প্রিয় নেতা যুক্তফ্রণ্টের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মহামায়াপ্রসাদকে ফিরে পেলেন না। নতুন মন্ত্রিসভা গঠন করতে ডাকা হল শ্রীযুত ভোলা পাশওয়ান শাস্ত্রীকে। শ্রীশাস্ত্রীও নিঃসন্দেহে জনপ্রিয় হরিজন (কং) নেতা ছিলেন। অন্যায়ের সঙ্গে আপোষ করতে গররাজি হওয়ায় তিনি সদলবলে আজ কংগ্রেস ছেড়ে নবগঠিত লোকতান্ত্রিক কংগ্রেস দলের পরিষদীয় নেতারূপে নতুন মন্ত্রিসভায় নেতৃত্ব গ্রহণ করলেন।

লোকতান্ত্রিক কংগ্রেস দল

শ্রীশাস্ত্রীর বিহার লোকতান্ত্রিক কংগ্রেস দলের সভাপতি ডঃ লক্ষ্মীনারায়ণ সুধাংশু বিহারের আর এক নেতা, যাঁর প্রতি জনগণের আস্থা ও শ্রদ্ধা অবিচল আছে। কিন্তু ডঃ সুধাংশু মন্ত্রিসভায় আসছেন না, মন্ত্রিসভার মধুচাকের বাইরে থেকেই তিনি তাঁর সহযোগিতা এবং আশীর্বাদে শাস্ত্রী-মন্ত্রিসভাকে পুষ্ট করে তুলবেন।

এই দলের হরিনাথ মিশ্র বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখেন। কেন না মণ্ডল-মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে তিনিই সর্বপ্রথম অকুতোভয়ে সোচ্চার হয়ে ওঠেন। শ্রীমিশ্রের পরিচয়, তিনি প্রভাবশালী কংগ্রেসী নেতা এবং জনৈক প্রাক্তন মন্ত্রী। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীবিনোদানন্দ ঝা-ও শ্রীযুত শাস্ত্রীর পেছনে তাঁর প্রভাব এবং অভিজ্ঞতার শক্তি প্রদান করে যাবেন বলে ঘোষিত আশ্বাস রেখেছেন। অবশ্য শ্রীঝা প্রথমটায় দোটানা কাটিয়ে উঠতে পারেন নি। বর্তমানে তিনি নির্দ্বন্দ্ব। লোকতান্ত্রিক দলের শক্তি এখন সতেরজন এম এল এ-র ভোট এবং জনগণের আস্থা। শ্রীশাস্ত্রী মোট ১৭৩ জনের সমর্থন দাবি করেন। তাঁর মন্ত্রিসভার স্থায়িত্বের ব্যাপারে সুতরাং তিনি নিশ্চিন্ত।

কংগ্রেস পরিষদীয় দলের নেতা মহেশ-প্রসাদ সিং অবশ্য বলেছেন। এ মন্ত্রিসভাও টিকবে না। উত্তরে প্রাক্তন যুক্তফ্রণ্ট মন্ত্রিসভার সহকারী নেতা কর্পূরী ঠাকুর এম-পি সিংহের দাবি নস্যাৎ করে দিয়ে বলেছেন: আসুক অনাস্থা প্রস্তাব, ঢের বেশি ভোটে সে প্রস্তাব পরাভূত হবে।

লোকতান্ত্রিক কংগ্রেস দলের সম্পাদক শ্রীকৃষ্ণকান্ত সিং নতুন মন্ত্রিসভা সম্পর্কে বলেছেন: শাস্ত্রী-মন্ত্রিসভা হবে নিষ্কলুষ, সংহত, স্থায়ী এবং শক্তিশালী।

আর এসব যে কেবলই কথার কথা নয় তা সহজেই অনুমান করা যায়। কেন না লোকতান্ত্রিক কংগ্রেস দলের নেতৃবৃন্দ বিহার রাজ্যের এক রাজনৈতিক সন্ধিক্ষণে কংগ্রেস-শোষিত দলের অপ্রিয় এবং অশুভ আঁতাতের আওতা থেকে বার হয়ে আসতে পেরেছেন কয়েকজন বাছাই করা প্রবীণ ও শ্রদ্ধেয় নেতাকে সঙ্গে নিয়ে। জনগণের জন্য যে যুক্তফ্রণ্ট মন্ত্রিসভা বস্তুতই উল্লেখ্য কাজ করছিলেন, লোকতান্ত্রিক কংগ্রেস দলের সহায়তায় তাঁরা পুনরায় জনগণের কল্যাণকামী সরকার প্রতিষ্ঠায় সুযোগ পাচ্ছেন। সুতরাং নতুন সরকারও গণ-আস্থায় বঞ্চিত হবেন না।

বিহার বিন্ধ্যেশ্বরীপ্রসাদ মণ্ডলের গ্রহণ-গ্রাস থেকে রক্ষা পেলো।

শ্রীযুত আবদুল গফুর একজন প্রাক্তন উপমন্ত্রী। বিহার কংগ্রেসের ভাঙন সম্পর্কে তাঁর উক্তি মনে রাখার মতো।

তিনি বলেন, এমন এক পর্যায়ে আজ উপনীত হওয়া গেছে যখন বিহার কংগ্রেসের ভাঙন একটি ঐতিহাসিক প্রয়োজনের অনিবার্য ফসলরূপে দেখা দিয়েছে। অতঃপর ন্যায়পরায়ণ সৎ লোকেরা কংগ্রেস ছাড়বেন চিরতরে।

বিহার কংগ্রেসে এই ধাক্কা কি অনিবার্য ছিল

ধাক্কাটা বিহার কংগ্রেস সামলে যেতে পারতেন যদি এম পি সিংহ এবং রাজেন্দ্র মিশ্র রাজ্য কংগ্রেসের ক্ষমতার দণ্ডটি ত্যাগ করে ইন্দিরা গান্ধীর পরামর্শ মেনে নিয়ে সাংগঠনিক কাজে আত্মনিয়োগ করার মতো ঔদার্য দেখাতে পারতেন এবং তদ্দ্বারা প্রমাণ করতেন গদীপ্রীতি অপেক্ষা দলের প্রতিই তাঁরা অনেক বেশি প্রীতিপরবশ। কিন্তু তাঁরা গদী ছাড়লেন না। হাই কমাণ্ডও তেমন করে কমাণ্ড করলেন না। পরন্তু কয়েকটি প্রান্তিক ভোটের অধিকারী বিন্ধ্যেশ্বরীকে ভাঙিয়ে বিহার কংগ্রেস খাড়া থাকতে চাইল। চ্যবন সাহেব বিদ্রোহীদের ভীতিপ্রদর্শন করতে চাইলেন রাষ্ট্রপতির শাসনের জুজুবুড়ি দেখিয়ে (পশ্চিমবঙ্গের প্রসঙ্গ স্মরণীয়)। ডঃ রামসুভগ সিং দিল্লী-পাটনা দৌড়ঝাঁপ করলেন। কিন্তু টলানো গেল না মণ্ডল-বিরোধী বিদ্রোহী কংগ্রেসীদের। ফল হল, বিন্ধ্যেশ্বরীর মান রাখতে গিয়ে কংগ্রেসেরই বাঁধানো চাতালে ফাট ধরল। ওদিকে বিন্ধ্যেশ্বরীপ্রসাদও কেন্দ্রের তাপে তাততে লাগলেন। কংগ্রেস-শোষিত দল সমর্থকরা নিশ্চিন্ত ছিলেন এই ভেবে যে, ভাত ছড়ালে কাকের অভাব হবে না। টাকা ছড়ালে অনেক এম এল এ-ই পুনশ্চ কংগ্রেসী বিবরে ফেরৎ আসবে। চাই কি যুক্তফ্রণ্টের কিছু এম এল এ-ও বাদ যাবেন না। কিন্তু এম এল এ খরিদের খেলা বেশিকাল ধোপসই হয় না। বিশেষ যদি রাজনীতিটা পাক্কা এবং সীরিয়স নেতৃবৃন্দের শক্ত মুঠিতে খেলতে পায়।

লোকতান্ত্রিক কংগ্রেস দলের সামর্থ্য সম্পর্কে যথার্থ মূল্যায়নের অভাবই বিহারে কংগ্রেস দলের পতনকে অপ্রতিরোধ্য করে তুলল। এই ভাঙনের ক্ষতিপূরণ সাধন করা যে সহজ ব্যাপার নয়, এখন সম্ভবত এম এল এ বাজারের স্পেকুলেটররা তা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছেন।

(২২-৩-৬৮)

ওপরে : মার্কিন রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে ডেমোক্র্যাটিক পার্টির মনোনয়ন প্রার্থী রবার্ট কেনেডী
নিচে : লণ্ডনে ভিয়েতনাম যুদ্ধের বিরুদ্ধে বিক্ষোভের একটি দৃশ্য

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র :

আগামী নভেম্বরের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের জন্য রবার্ট কেনেডী ডেমোক্র্যাটিক পার্টির মনোনয়ন চান, গত সপ্তাহে কেনেডী নাটকীয়ভাবে এই কথা ঘোষণা করেছেন।

জন এফ কেনেডীর ভাই বব্ কেনেডী মার্কিন রাজনীতিতে এক উল্লেখযোগ্য চরিত্র। তিনি যে একদিন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সর্বোচ্চ রাষ্ট্রপতি পদের জন্য দাঁড়াবেন, এ কথা সবাই জানেন। কিন্তু এবার এত দেরিতে তিনি রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হবেন, এ কথা অনেকেই ভাবতে পারেন নি।

কেনেডী বলেছেন, কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়াবার জনাই তিনি দাঁড়াচ্ছেন না। তিনি একটা আদর্শের জন্য দাঁড়াচ্ছেন। জনসনের শাসনের ফলে দেশের যে সর্বনাশ হয়েছে, তার প্রতিকার করাই তাঁর উদ্দেশ্য। তিনি ভিয়েতনামে শান্তি চান, দেশে সকলের সঙ্গে সহযোগিতা চান এবং হতাশার পরিবর্তে সকলের কাছে এক সুন্দর জীবনের আশা তুলে ধরতে চান।

কিন্তু কেনেডীর নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার সিদ্ধান্তের ফলে প্রগতিশীল শক্তির মধ্যে ভাঙন দেখা দেবে। জনসনের যুদ্ধনীতির বিরুদ্ধে প্রায় প্রকাশ্য জেহাদ ঘোষণা করে শান্তির ধ্বনি নিয়ে ডেমোক্র্যাটিক পার্টিতে জনসনের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নেমেছেন ইউজিন ম্যাকার্থি। মিনেসোটা থেকে নির্বাচিত সেনেট সদস্য ম্যাকার্থি যখন তাঁর প্রার্থীপদ ঘোষণা করেন, তখন অনেকেই হেসেছিলেন। প্রবল পরাক্রান্ত জনসনের বিরুদ্ধে তিনি মোটেই সুবিধা করে উঠতে পারবেন না, এই ছিল সকলের ধারণা। কিন্তু সামান্য সময়ের মধ্যে তিনি যেরূপ সমর্থন পেয়েছেন, তাতে জনসনের শিবিরে রীতিমত আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে।

১২ই মার্চ নিউ হ্যামশায়ারে যে প্রাথমিক নির্বাচন হয়ে গেল তাতে ম্যাকার্থি আশাতীত সাফল্য লাভ করেছেন। জনসন-সমর্থকরা মনে করেছিলেন, ম্যাকার্থি এখানে খুব জোর শতকরা ৩টি ভোট পাবেন। রাজনৈতিক ভাষ্যকারেরা বলেছিলেন, ম্যাকার্থি যদি শতকরা ২৫টি ভোটও পান তবে বুঝতে হবে, জনসনের বিপদ রয়েছে। সকলের সব কল্পনা ছাপিয়ে ম্যাকার্থি হ্যামশায়ারে শতকরা ৪২টি ভোট পেয়েছেন; জনসন পেয়েছেন ৪৮টি।

ম্যাকার্থির পক্ষে এত বেশি সমর্থন লাভ করা সম্ভব হয়েছে, কারণ তিনি স্পষ্টভাবে শান্তির বাণী নিয়ে উপস্থিত হয়েছেন। তিনি পরিষ্কার বলেছেন, যেভাবে হোক ভিয়েতনামের যুদ্ধ শেষ করতে হবে। ভিয়েতনামে একটা পক্ষরূপে কমিউনিস্টদের স্বীকার করে নিয়ে তাদের সঙ্গে আলোচনার দ্বারা মীমাংসা করতে হবে, এই তাঁর বক্তব্য। অন্যান্য প্রশ্নেও তিনি জনসন-নীতির ঘোর সমালোচক। দলে দলে মার্কিন নাগরিক, বিশেষ করে তরুণ সম্প্রদায় ম্যাকার্থির সমর্থনে এগিয়ে আসছে। সাধারণ মার্কিন নাগরিক যে যুদ্ধ চায় না, ম্যাকার্থির এইভাবে সমর্থন পাওয়া তারই প্রমাণ। বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজের ছাত্রছাত্রীরা দাঁড়িয়েছে ম্যাকার্থির পেছনে। এদের জোর প্রচারের ফলেই হাওয়া ঘুরেছে।

ম্যাকার্থি-সমর্থকরা খুবই উল্লসিত। তারা এখন দ্বিগুণ উৎসাহে ২রা এপ্রিল ওয়াশিংটন প্রাথমিক নির্বাচনের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। এই অবস্থায় কেনেডীর নির্বাচনদ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হওয়ায় তারা খুবই ক্ষুব্ধ হয়েছে।

কেনেডীর দাঁড়ানোর অর্থ জনসন-বিরোধী প্রগতিশীল ভোট ভাগ হওয়া। এতে শেষ পর্যন্ত জনসনেরই লাভ হবে। ম্যাকার্থি-সমর্থকদের বক্তব্য, কেনেডী যদি দাঁড়াবেনই, তবে আগে বলেন নি কেন? এখন ম্যাকার্থি একটা অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছেন। এখন কেনেডীর দাঁড়াবার কোন অর্থই হয় না। তাঁরা কেনেডীকে সুবিধাবাদী বলতেও ছাড়েন নি।

ম্যাকার্থি জানিয়ে দিয়েছেন, তিনি কেনেডীর পক্ষে তাঁর প্রার্থীপদ প্রত্যাহার করবেন না। কেনেডী কি করবেন? তিনি কি প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে সরে দাঁড়াবেন এবং ম্যাকার্থিকে সমর্থন করবেন?

দক্ষিণ রোডেশিয়া :

আয়ান স্মিথের জল্লাদ শাসনের অবসানের জন্য জাতীয়তাবাদী আফ্রিকীয়রা ব্যাপক গেরিলা যুদ্ধের প্রস্তুতি করছে।

দক্ষিণ রোডেশিয়া সরকারও এই সংবাদে অত্যন্ত বিচলিত। সরকারের পক্ষ থেকে ব্যাপক পুলিশী ব্যবস্থা করা হয়েছে, সীমান্তে কড়া পাহারা রাখা হয়েছে।

জাম্বিয়ার সীমান্ত বরাবর গেরিলারা প্রস্তুত হচ্ছে। জাম্বিয়া ও তানজানিয়ায় রোডেশিয়ার মুক্তিসংগ্রামীদের শিক্ষা দেবার জন্য বেশ কয়েকটি কেন্দ্র খোলা হয়েছে। শোনা যাচ্ছে, পূর্ব য়ুরোপের কয়েকটি দেশ, এমন কি চীন থেকেও এই মুক্তি-

ম্যাকার্থি—নিউ হ্যামশায়ারে প্রাথমিক নির্বাচনে আশাতীত সাফল্য লাভ করেছেন।

সংগ্রামীদের জন্য অস্ত্র সরবরাহ করা হচ্ছে।

আফ্রিকীয়রা বুঝেছে, স্মিথরা দেশপ্রেমিকদের ফাঁসি দেবার ফলে বিশ্বে যে প্রতিক্রিয়ারই সৃষ্টি হোক না কেন, শেষ পর্যন্ত সংখ্যালঘু ও বর্বর এই শ্বেতাঙ্গ শাসনের অবসানের জন্য তাদেরই সংগ্রাম করতে হবে। এবং এই সংগ্রাম হবে রক্তক্ষয়ী। আর স্মিথও ব্রিটেনের হুমকী কিংবা নিরাপত্তা পরিষদের আলোচনায় ভয় পান না, তিনি এই সন্ত্রাসবাদীদের জন্যই চিন্তিত।

কিন্তু মুশকিল হয়েছে, এই মুহূর্তেও রোডেশিয়ার সকল জাতীয়তাবাদী ঐক্যবদ্ধ হতে পারেন নি। জাতীয়তাবাদীরা এখনও দু'টি বিরোধী শিবিরে বিভক্ত—তাঁদের দুই প্রতিদ্বন্দ্বী দল 'জিম্বাবোয়ে আফ্রিকান পিপলস্ ইউনিয়ন' (জাপু) ও 'জিম্বাবোয়ে আফ্রিকান ন্যাশনাল ইউনিয়ন' (জানু) এখনও পৃথকভাবে কাজ করছে, একে অপরের বিরোধিতা করছে। জাম্বিয়ার রাষ্ট্রপতি কেনেথ কাউণ্ডা এই দুইপক্ষের মধ্যে ঐক্য স্থাপনের চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু তিনি সফল হন নি।

ব্রিটেন :

স্বর্ণসংকট উপলক্ষ করে ব্রিটেনে এক মন্ত্রিত্ব সংকটের উদ্ভব হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত পররাষ্ট্রমন্ত্রী জর্জ ব্রাউন পদত্যাগ করেছেন এবং তাঁর জায়গায় নতুন পররাষ্ট্রমন্ত্রী হয়েছেন মাইকেল স্টুয়ার্ট।

বিশ্বব্যাপী স্বর্ণসংকটের মুখে হ্যারল্ড উইলসনের শ্রমিক সরকার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চাপের কাছে নতি স্বীকার করেন। সব ব্যাপারেই তাঁরা মার্কিন চাপ মেনে নিচ্ছেন, এ ব্যাপারেই বা নতুন কি! বিশ্বের বাজারে যে বিপর্যয় দেখা দিয়েছে, তা সামলে ওঠার জন্য সোনার বাজার নিয়ন্ত্রণের জন্য ১৫ই মার্চ দেশের সর্বত্র ব্যাঙ্ক বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন উইলসন সরকার। এই ব্যাপারে যখন মন্ত্রিসভার সদস্যরা প্রধানমন্ত্রী হ্যারল্ড উইলসন ও অর্থমন্ত্রী প্যাট্রিক শোরের নেতৃত্বে গভীর রাত্রে রাণীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যান, এবং প্রিভি কাউন্সিলের সভা করেন তখন জর্জ ব্রাউনকে ডাকা হয় নি। অথচ, ব্রাউন পররাষ্ট্রমন্ত্রী, এবং এই সিদ্ধান্তের সঙ্গে পররাষ্ট্র সম্পর্ক ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত।

এই সংবাদ জানার সঙ্গে সঙ্গে ব্রাউন ক্ষেপে ওঠেন। সেই রাত্রেই উইলসনের সঙ্গে দেখা করে তিনি তাঁর পদত্যাগপত্র পেশ করেন। সেদিন কোনরকমে তাঁকে নিরস্ত করা সম্ভব হলেও পরদিন তিনি পদত্যাগ করেন। উইলসন তাঁর পদত্যাগপত্র গ্রহণ করে সঙ্গে সঙ্গেই স্টুয়ার্টকে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করেন।

পরে ব্রাউন কমন্সসভাতেও তাঁর পদত্যাগের কারণ জানিয়ে বক্তৃতা করেন। তিনি স্পষ্ট অভিযোগ করেন, লণ্ডনের

নিত্য
নতুন
বই পড়ুন

বিশ্ববিধানের সন্ধানে
রিচার্ড এন গার্ডনার
অনুবাদ ॥ অনিলরঞ্জন গুহ
৩·০০

মানব ইতিহাসের সন্ধানে
কার্লটন এস কুন
অনুবাদ ॥ রবীন্দ্রনাথ সরকার
প্রথম পর্ব ৬·০০ ॥
দ্বিতীয় পর্ব ৬·০০

ভারত ও পাশ্চাত্ত্য
বারবারা ওয়ার্ড
অনুবাদ
নিরঞ্জন হালদার ও অমলিন গুপ্ত
৫·০০

চীনের সামাজিক রূপান্তর
চু চাই ও উইনবার্গ চাই
অনুবাদ ॥ রবীন্দ্রনাথ সরকার
৫·০০

পরিপ্রেক্ষিতের বিচারে কম্যুনিস্ট চীন
এ ডোক বারনেট
অনুবাদ ॥ অমিতাভ চৌধুরী
১·০০

ভিয়েৎনামের যুদ্ধ : কেন ?
এম শিবরাম
অনুবাদ ॥ মণি গঙ্গোপাধ্যায়
২·০০

আত্মকাহিনী
ইলিনর রুজভেল্ট
অনুবাদ ॥ পশুপতি চট্টোপাধ্যায়
২·৫০

সাম্যবাদ
বিষয়বস্তু ও কার্যপদ্ধতি
ইনা শ্লেসিঙ্গার ও জোনা রাস্টেইন
অনুবাদ ॥ অমরনাথ দত্ত

একত্রে দশ টাকার অর্ডার দিলে এবং টাকা অগ্রিম পাঠালে ডাকখরচা লাগবে না। পূর্ণাঙ্গ তালিকার জন্য লিখুন।

এশিয়া পাবলিশিং কোম্পানি
কলেজ স্ট্রীট মার্কেট
কলিকাতা-বারো ॥ ফোন : ৩৪-২০৮৬

সোনার বাজার বন্ধ করার সিদ্ধান্তের আগে উইলসন টেলিফোনে জনসনের কাছ থেকে নির্দেশ পেয়েছেন।

স্বর্ণসিদ্ধান্তের ব্যাপারে ব্রাউন চটেছেন এবং ব্যাপারটাকে তিনি ব্যক্তিগত অসম্মান বলে গ্রহণ করেছেন। সত্যি, উইলসন তাঁকে খুঁজে পান নি এটা কোন অজুহাতই নয়। তিনি তখন কমন্স-সভাতেই ছিলেন। তবে ব্রাউনের পদত্যাগের কারণ কেবলমাত্র এই ঘটনা নয়, অনেকদিন ধরেই উইলসন ও মন্ত্রিসভার অন্য সহকর্মীদের সঙ্গে তাঁর মনোমালিন্য চলছিল।

পদত্যাগের পরই ব্রাউন ঘোষণা করেছেন, শ্রমিক দল আদর্শচ্যুত হয়েছে। দলকে ঢেলে সাজতে হবে। ব্রাউন নিজে বামপন্থী না হলেও উইলসনকে জব্দ করার জন্য তিনি বামপন্থীদের সঙ্গে হাত মেলাবেন, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। আর শ্রমিক দলে ব্রাউনের যথেষ্ট প্রভাব রয়েছে। এখনও তিনি শ্রমিক দলের সহকারী নেতা।

মাইকেল স্টুয়ার্ট এর আগেও একবার বিশ মাসের জন্য পররাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন। ধীর স্থির বলে পরিচিত হলেও স্টুয়ার্টের মধ্যে উদ্যোগের অভাব আছে। দেখা যাক, এবার তিনি কি করেন।

গত সপ্তাহে পশ্চিম য়ুরোপের বিভিন্ন দেশ থেকে বহু ছাত্র লণ্ডনে এসেছিল ভিয়েতনাম যুদ্ধের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাবার জন্য। সুইডেন, ফ্রান্স, জার্মানী ও বেলজিয়াম থেকে ছাত্ররা এসেছিল। এদের মধ্যে কিছু মার্কিন ছাত্রও ছিল।

ভিয়েতনামের ব্যাপারে মার্কিন নীতির বিরোধিতা করার জন্যই ছাত্রদের উদ্যোগে বিক্ষোভ মিছিলের আয়োজন করা হয়েছিল। ট্রাফালগার স্কোয়ার থেকে মার্কিন দূতাবাসের দিকে মিছিলটি পরিচালনা করা হয়।

ছাত্রদের এই বিক্ষোভ প্রদর্শন বিশেষ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছে। ব্রিটেনের ছাত্ররাও বিপুল সংখ্যায় এই বিক্ষোভে যোগ দিয়েছে। এ কেবল জনসন-নীতির বিরোধিতাই নয়, ভিয়েতনামের ব্যাপারে উইলসনের ক্লীব নীতির বিরুদ্ধেও এই বিক্ষোভ।

কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের মুখপাত্র 'ভার্সিটি' পত্রিকায় এই বিক্ষোভের সাফল্য সম্পর্কে বলা হয়েছে, "ব্রিটেনের সাম্প্রতিককালের ইতিহাসের এটি হল সবচেয়ে বড় উল্লেখযোগ্য মিছিল।"

পানামা

পানামার ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলী রাষ্ট্রপতি মার্কোস অরেলিয়ো রোবলেসের বিরুদ্ধে মহাবিচারের (ইমপীচমেন্ট) সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। ১৫ই মার্চ ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলীতে ৩০—১২ ভোটে মহাবিচারের প্রস্তাব পাশ হয়েছে। ২৪শে মার্চ এই মহাবিচার হবে। ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলীতেই বিচার হবে। বিচারে শাস্তিদানের অর্থ রাষ্ট্রপতি পদ থেকে অপসারণ।

রোবলেসের বিরুদ্ধে অভিযোগ : (১) আসন্ন রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে তিনি সংবিধান ভঙ্গ করে একজন প্রার্থী অর্থমন্ত্রী ডেভিড সামুদিওকে সমর্থন করেছেন; (২) সামুদিওকে ভোট দেবার জন্য তিনি তাঁর দলীয় সমর্থকদের কাছে চিঠি লিখেছেন; (৩) সরকারী ছাপাখানায়

রোবলেস

সামুদিও'র জন্য পোস্টার ছাপা হয়েছে; (৪) সামুদিও-সমর্থকদের জন্য জাল ভোটার কার্ড দেওয়া হয়েছে; এবং (৫) যে-সব সরকারী কর্মচারী সামুদিওকে সমর্থন করছেন না তাঁদের বরখাস্ত করা হচ্ছে।

রোবলেস অবশ্য এই সব অভিযোগই অস্বীকার করেছেন। শত্রুরা তাঁকে অপদস্থ করার জন্য এই সব মিথ্যা অভিযোগ এনেছে। কিন্তু তবু তাঁর বিরুদ্ধে প্রস্তাব পাস হয়েছে এবং সম্ভবত শাস্তিদানের সিদ্ধান্তও গৃহীত হবে।

চার বছর আগে রোবলেস রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচিত হন। আগামী ১২ই মে নতুন রাষ্ট্রপতি নির্বাচন হবে। পানামার সংবিধান অনুসারে রোবলেস এবার নির্বাচনপ্রার্থী হতে পারবেন না।

যে আট দলের কোয়ালিশন সরকার নিয়ে রোবলেস কাজ করছিলেন, তার মধ্য থেকে ৪টি দল বেরিয়ে যাওয়াতেই এই অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে।

রোবলেসের বিরুদ্ধে মহাবিচারের আয়োজনের নায়ক ডঃ আরনুলফো আরিয়াস। আরিয়াস এর আগে দু'বার পানামার রাষ্ট্রপতি ছিলেন। ১৯৫১ সালে আরিয়াসকেও মহাবিচারের দ্বারা রাষ্ট্রপতি পদ থেকে অপসারণ করা হয়। তখন তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল, তিনি ক্ষমতার সুযোগ নিয়ে স্বৈরতন্ত্রী শাসন প্রতিষ্ঠা করছেন। আর তখন, আইনসভার যে কমিটি আরিয়াসের মহাবিচারের ব্যবস্থা করে আজকের রাষ্ট্রপতি রোবলেস তার সদস্য ছিলেন। তাই দেখা যাচ্ছে, রোবলেস ও আরিয়াস পরস্পর দীর্ঘদিনের শত্রু।

এবার আবার আরিয়াস রাষ্ট্রপতি পদের জন্য দাঁড়াচ্ছেন। রোবলেসকে রাষ্ট্রপতি পদ থেকে সরাতে পারলে উপ-রাষ্ট্রপতি ম্যাক্স ডেভান এই অল্পদিনের জন্য রাষ্ট্রপতি হবেন। ডেভান আরিয়াসের সমর্থক। তাই একদিকে রোবলেসের মর্যাদাহানি এবং অপরদিকে ক্ষমতায় নিজের সমর্থক ডেভানকে বসাতে পারলে নির্বাচনে আরিয়াসের সুবিধাই হবে।

রোবলেসের বিরুদ্ধে কোয়ালিশনের অধিকাংশের বিক্ষোভের কারণ কিন্তু আসন্ন রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে রোবলেসের সামুদিওর পক্ষাবলম্বন নয়। রোবলেস মোটামুটি দেশের প্রভাবশালী ধনী ও ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের সমর্থনেই ক্ষমতায় বসেছিলেন। কিন্তু তিনি কিছুটা উদারনৈতিক ও সংস্কারপন্থী নীতি গ্রহণের চেষ্টা করেন। আয়করের পরিমাণ কিছুটা বাড়িয়ে দেন। এতেই ধনিক সম্প্রদায় ক্রুদ্ধ। এই অবস্থায় রোবলেসের অর্থমন্ত্রী ডেভিড সামুদিও আবার রাষ্ট্রপতি হোন, এ তারা চায় না। তাই এই ব্যাপার।

রোবলেস কিন্তু ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলীর সিদ্ধান্তকে বেআইনী বলে ঘোষণা করেছেন। তিনি ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলীর অন্যায় কাজের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার জন্য ন্যাশনাল গার্ডকে আহবান করেছেন।

এখন চার হাজার ন্যাশনাল গার্ডের প্রধান ব্রিগেডিয়ার জেনারেল বোলিভার ভ্যালেরিনো কোন দিকে যান, তার ওপরেই পানামার রাজনীতির গতি নির্ভর করছে। এখন পর্যন্ত ভ্যালেরিনো রোবলেস বা আরিয়াস কারও দিকেই ঝোঁকেন নি।

মরেস্ক
হ্যামো
রীডেড
মরক্কো পিন্‌হেড
রাফকাস্ট
হেক্স্যাগোনাল
ওয়্যারড
শীট গ্লাস
জর্জিয়ান ওয়্যারড
হ্যামার্ড
আজকালকার
স্থপতিরা
গৃহনির্মাণে
এইচ পি জি
গ্লাস
ব্যবহার করেন
আজকের দিনের বাড়ীঘর ও অফিস-কাছারি, কলকারখানা, স্কুল ও হাসপাতালে সুদক্ষ ইঞ্জিনিয়াররা সর্ব্বত্রই এইচ পি জি গ্লাস লাগান, কেননা তাঁরা জানেন যে এইচ পি জি গ্লাস উৎকর্ষের নিখুঁত মান বজায় রেখে তৈরী হয়। বিলাতের শতাধিক বৎসরের কাচনির্মাণকারী প্রতিষ্ঠান পিলকিংটন ব্রাদার্স-এর কারিগরী কুশলতার সাহায্য নিয়ে হিন্দুস্থান পিলকিংটন গ্লাস ওয়ার্কস এই এইচ পি জি গ্লাস তৈরী করেন।
এইচ পি জি কেনা মানেই নির্ভরযোগ্য ভাল জিনিস কেনা।
হিন্দুস্থান
পিলকিংটন
গ্লাস ওয়ার্কস
লিমিটেড
ম্যানেজিং এজেন্টস
তালুকদার ল'
অ্যাণ্ড কোম্পানী
প্রাইভেট লিমিটেড
হিন্দুস্থান বিল্ডিংস
৪, চিত্তরঞ্জন অ্যাভেনিউ,
কলিকাতা-১৩
JWTHP 1775A

কালের কণ্ঠস্বরঃ ম্যাক্সিম গোর্কি

রজত রায়চৌধুরী

কেবল রুশ-সাহিত্যে নয়, পৃথিবী-সাহিত্যে গোর্কি সেই বিরলতম ব্যক্তি যিনি কর্মে মেহনতী মানুষের জীবনের শরিক এবং কথায় তাদের সঙ্গে সত্য আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ। নিচুতলার জীবনের বিষকে তিনি আকণ্ঠ পান করেছেন বাল্যকাল থেকে। বুদ্ধির ও চেতনার উন্মেষলগ্ন থেকেই ঘৃণার ও নিষ্ঠুরতার পরিচয় হয়েছে সংসারের অভিভাবকের ব্যবহারে। তারপর থেকে পথ। এ-পথ সে-পথ ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত হন নি গোর্কি, তিক্ত অভিজ্ঞতার পশরা নিয়ে তিনি যাযাবরের মত ঘাট থেকে ঘাটে ভেসে গেছেন। কখনও এসেছে জীবনের প্রতি বিতৃষ্ণা। হৃদয়বেদনার দুঃসহ জ্বালা-যন্ত্রণায় অস্থির উদ্‌ভ্রান্ত আলেক্সি ম্যাক্সিমোভিচ পেশকভ্। সুতীব্র মর্মযাতনায় আত্মহত্যার পথে নেমে গেলেন তিনি। কিন্তু শ্রমিক-কৃষাণের জীবনের শরিক হয়ে তাদের দুঃখের কথাকে, হৃদয়ের উত্তাপকে ব্যক্ত করতে হবে যাঁকে তাঁর স্বেচ্ছামৃত্যু প্রত্যাশিত নয়। তাই পেশকভ্ মরলেন না। হৃদয়ক্ষত হৃদয়ে নিয়েই তিনি ফিরে এলেন মানুষের মধ্যে। দেহের ক্ষত তাঁর যায় নি কোনদিন, হৃদয়-ক্ষত কি গিয়েছিল? কে জানে?

নির্যাতিত মানুষের শেকল ছেঁড়ার বন্দনাগান গেয়েছেন রুশ-সাহিত্যে সর্বপ্রথম পুশকিন্। জনবিরল সাইবেরিয়ার মরু-প্রান্তরের অন্ধকারসমাচ্ছন্ন খনিতে নির্বাসিত যে সব মানুষ নির্বিচার অত্যাচারে জর্জরিত, তাতে নির্বিকার থাকেন নি পুশকিন্। তিনি চেয়েছিলেন তাদের হাতেই তলোয়ার তুলে দিতে :

ওই ভারী শেকলগুলো ছিঁড়ে পড়বে
ধ্বসে পড়বে চারদিকের উঁচু উঁচু
দেওয়াল
মুক্ত আলো তোমাদের জানাবে
স্বাধীন অভিবাদন
ভাইসব, তোমরা ফিরে পাবে
তোমাদের তলোয়ার।

গোর্কির প্রাণে পুশকিনের কাব্য নিঃসন্দেহে জোর করেছিল প্রেরণা। গোর্কি তাঁকেই বলেছেন, রুশ কাব্যের জনক, “The beginning of all beginnings.”

এসেছেন নিকোলাই গোগোল। কশাকরা পরাধীনতার নাগপাশ ছিন্ন করতে উৎসুক—তা যেমন রূপায়িত করলেন তিনি, তেমনি তাঁর সেই বিখ্যাত ‘ওভারকোট’ গল্পটির দরিদ্র কেরানীর নির্বিচার অত্যাচারের প্রতিশোধস্পৃহা। জীবনের সমগ্র আকাঙ্ক্ষার পরাজয় নেই, অপমানিত মানুষ প্রতিশোধ নেবেই। তবেই সে হবে তৃপ্ত। তৎকালীন শাসকগোষ্ঠী তাঁকে সুনজরে দেখেন নি। ‘ইনস্‌পেক্টর জেনারেল’ নাটকের জন্য তাঁকে নির্বাসিত করতে চেয়েছিল। তলস্তয়, বন্দনা করেছেন শ্রমিক-কৃষককে পবিত্রতায় আর ভক্তিনম্র অভিব্যক্তিতে। তবে তলস্তয় জানতে পেরেছিলেন আগামীদিনের ইতিহাসের উত্তরাধিকার শ্রমিক-কৃষকেরাই। তাদেরই হাতে তুলে দিতে হবে বিশ্বের হাল।

গোর্কি তখন পেশকভ্। জীবনের উত্তাপকে তিনি দেখছেন রুটির কারখানায়, জুতোর দোকানে, ভল্‌গার স্টীমার বোটে, স্টুডিওতে, পথে পথে। সর্বহারাদের একজন হয়েই তাদের জীবনকে মুখোমুখি দেখলেই তাদের আবেগ ও উত্তাপ, ঘৃণা ও দ্বন্দ্ব, চাওয়া ও পাওয়া, ঈর্ষা ও প্রেম, বেদনা ও অপমানকে বুঝতে পারা যায়। পেশকভ্ জানতেন তাদের। তাদের মর্মবেদনাকে। তাই তিনিই পেরেছিলেন সর্বহারাদের জীবনের পূর্ণাঙ্গ চিত্র আঁকতে—একথা অস্বীকার করবার উপায় নেই গোর্কিই গণজীবনের প্রথম সার্থক স্রষ্টা। তাঁর লেখনীতেই প্রথম বাঙ্ময় হয়েছে নগরে-বন্দরে-মাঠে-প্রান্তরে-কলে-কারখানায় খেটে-খাওয়া মানুষের চিত্র।

ঊনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের রাশিয়ায় পুঁজিতন্ত্রের বিকাশে অবৈধ মিলন হয়েছে জারের সঙ্গে বিদেশী মালিকানার। তার-পর থেকে রাজনৈতিক তৎপরতা ক্রমবর্ধমান। সমস্যা বিবিধ। কৃষকের হাত থেকে চলে গেছে জমি, বেকারি বাড়ছে—খেটে-খাওয়া মানুষেরা শ্রমের বদলে পাচ্ছে তাচ্ছিল্য অপমান অত্যাচার। এ অবস্থায় কেউ চাইছেন আন্দোলনের মাধ্যমে গণতন্ত্রী সরকার গঠন করতে, কারুর অভিমত কৃষি-বিপ্লবই সকল সমস্যার সমাধানের একমাত্র পথ। কেউ সমাজবাদী গণতন্ত্রে বিশ্বাসী। পেশকভ এ যুগের মর্ম অন্তরে অন্তরে উপলব্ধি করেছেন। তাঁর মতন এমনভাবে কেউ দেখেন নি জীবনকে। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে জীবিকার শরিক যে জন, সে জীবনেরও শরিক। এই জনজীবনের সংস্পর্শই গোর্কির লেখায় প্রতিভাত। তাতে শিল্প-কর্ম হয়তো ব্যাহত হয়েছে, হয়তো প্রচারধর্মী তা, কিন্তু একথা নির্দ্বিধায় বলা যেতে পারে, এমন জীবনাভিজ্ঞতা আর কারুর ছিল না, তাই কমিউনিস্টদের বিরোধী হয়েও গোর্কি যেমন লিখেছেন তাদের কাগজে, তারাও গোর্কিকে গ্রহণ করেছে মূলত তাঁর [illegible] বিপ্লববাদ, বস্তুত সংগ্রামের পথ ও বাস্তববাদের জন্য। জীবনের পানপাত্রের তিক্ত গরল তিনি পরিবেশন করেছেন কড়া মেজাজে, চড়া সুরে। নির্যাতিত মানুষ, সর্বহারা মানুষ—যারা সমাজের নিচুতলার বাসিন্দা, তারা তাঁর কলমে অনিবার্যভাবে সহৃদয় সহানুভূতিতে অঙ্কিত। শ্রদ্ধায় তিনি তাদের চিত্রিত করেছেন, অনুরাগ তাদের প্রতি তাঁর অসীম, বিশ্বাস অখণ্ড। খেটে-খাওয়া মানুষের সংস্কৃতিকে সৃষ্ট করবার দাবি তিনি সোচ্চার কণ্ঠে জানিয়ে গেছেন। তাই রুশ-সাহিত্যে বিপ্লবের যুগে যে ঐতিহ্য গড়ে ওঠে তার লক্ষণ গোর্কির কলমে স্পষ্টোচ্চার। গোর্কিই তার প্রথম উদ্গাতা। মন্ত্রহীন ব্রাত্যদের তিনি এনেছেন সাহিত্যে—গোটা মানুষরূপে—মোটা তুলিতে।

উপরতলার মানুষদের হাতে নাড়া-খাওয়া নিচের তলার মানুষ সাড়া পেয়েছে তাঁর লেখনীতে। অথচ বিচিত্র এক সংযোগে সাহিত্যজগতে তাঁর আগমন। পেশকভ্ তখন তিফ্‌লিসে। পরিচয় হল কাল্যুঝ্‌নির সঙ্গে। কথায় কথায় পেশ-কভের অভিজ্ঞতার ঝুলি থেকে বেরুতে লাগল নানা মানুষের সংবাদ। যাযাবর-জীবনের পুঁথি থেকে বেরিয়ে এল এক বুড়ো জিপ্‌সী। তাকে নিয়ে গল্প লিখলেন পেশকভ্ ‘মাকার চুদ্রা’। কাভ্‌কাস পত্রিকার সম্পাদক সে গল্প পড়ে মুগ্ধ হল। জিজ্ঞেস করল, লেখকের নাম। পেশকভ, যার জীবনের অভিজ্ঞতায় তিক্ত-তার আর যন্ত্রণার গরলকুম্ভ, তিনি নাম সই করলেন ম্যাক্সিম গোর্কি। যার অর্থ ‘চরম তিক্ত’। সেই তিক্ততার স্বাদ তাঁর প্রায় সকল লেখায়। বুড়ো জিপসী কামনা করেছিল অবাধ স্বাধীনতা। যা গোর্কির জীবনের কাম্য। সেমিনভের রুটির কার-খানায় কাজ করেছিলেন কিছুকাল, তাই নিয়ে রচিত হল ‘ছাব্বিশজন পুরুষ আর একটি মেয়ের’ নাটক। ‘চেলকাসে’র পট-ভূমি তাঁর নিজের জীবনেই। আর যখন কারারুদ্ধ হয়েছিলেন, সেই কারাগারের স্মৃতি নিয়ে লিখলেন The trotting Ordeal. এমনিভাবেই জীবনের হিংস্রতা, বাসনা-কামনা মোহ শক্তির প্রাবল্য, নিষ্ঠুরতা আভাসিত হল তাঁর গল্পে। তিরিশ বছর পর্যন্ত গোর্কি রাশিয়ার নিচের তলার জনসাধারণের

দুর্দশা দারিদ্র্য আর হতাশাকে গভীর সহানুভূতির সঙ্গে নানা গল্পে চিত্রিত করেন। গোর্কি তাদের জঘন্য ও বিবর্ণ জীবনের ভেতর কিছু পরিমাণে মহত্ত্বের মূল্যায়ন করেছিলেন এবং শোষিত মানুষের এই মূল্যায়নজনিত বিশ্বাসই শ্রমিক-কৃষাণের মুক্তির দ্বার উন্মোচনে সহায়ক হবে, এ প্রত্যয় তাঁর ছিল।

বিপ্লবী ছাত্র-শোভাযাত্রাকে পুলিশ পিটোচ্ছে ১৯০১ সালে। গোর্কির কলমে তা লক্ষ্য করে এল উদ্দীপনাময়ী ঝড়ের বাণী। Song of the Stormy Petrol. ঝড়ের পাখি আগুনের ফুলকি ছড়াল চিত্তে চিত্তে। The storm! The storm will be soon breaking. বুদ্ধিজীবীদের কথার ধোঁয়ার ধোঁকাবাজিতে অবিশ্বাসী গোর্কি জনজীবনের শরিক হলেন মুহূর্তে। ঝড় আসুক। Let us break it in all its fury. গণজীবনের নোংরামি, ইতরামি ও কদর্যতার মধ্যেও আছে অমরত্ব। কয়েকটি নাটকের মধ্যে জন-জীবনের প্রতিভূ কয়েকটি চরিত্রের মাধ্যমে গোর্কি তাদের জীবনের মানে খুঁজতে সচেষ্ট হয়েছেন। "নিচের মানুষ" নাটকের অভিনয় হচ্ছে তখন মস্কো আর্ট থিয়েটারে। যে নাটকের গতি স্তিমিত, চরিত্র ক্রমবিকশিত নয়। কিন্তু সমাজের তলের যারা অধিবাসী, যারা সমাজের বুনিয়াদ, তাদের মৃত্যুকে দেখে-ছেন তিনি। দেখেছেন তাদের জীবনের হীনমন্যতাকে, সামান্য কারণে ঝগড়া বাধাতে, মদ খেয়ে স্নায়বিক অবসাদে ভুগতে; দেখেছেন বেশ্যার প্রেমে পড়ার অলীক স্বপ্নকে. মানুষের বঞ্চনার ইতি-বৃত্তকে। গণজীবনের নিচের তলার মানুষের জীবনে এসব নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। তাদের জীবনের সংগে তা সম্পৃক্ত। কিন্তু এই নিচের তলার মানুষদের মধ্যে অকস্মাৎ আসে এক বিচিত্র মানুষ। সে কথা বলে নরম সুরে,

কিস্তিবন্দীতে ট্রানজিস্টার

৩২০. টাকা মূল্যের বিশ্ববিখ্যাত "উইন্ড-সর হিতাচী" ৩ ব্যান্ড অলওয়ার্ল্ড পোর্টেবল ট্রান-জিস্টার মাসিক ১০, টাকার কিস্তিতে নিন।

আবেদন করুন:—
SWISS TELEVISSION CO.
(B-10) Post Box 1320,
Delhi-6.

সহানুভূতি ঢালে গলায়; সত্য বলে, মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে এদের সামনে তুলে ধরতে চায় জীবনের অর্থকে। প্রকৃত সুখবোধকে। অকস্মাৎ আবির্ভূত এই আশ্চর্য মানুষটি উধাও হয়ে যায় আচম্বিতে। কিন্তু রেখে যায় নিচের তলার মানুষদের কাছে একটি প্রত্যয়ের বাণী, অনাগত দিনের আশার রেশ। গোর্কি নিজেই বলেছেন, 'লেখক হচ্ছেন তাঁর দেশের ও শ্রেণীর ভাবপ্রবণ মুখপাত্র; তাদের চোখ কান ও হৃদয় তিনি, তিনি তার কালের কণ্ঠস্বর।'

এল বিপ্লবের ঝড় ১৯০৫ সালে। গোর্কি, জনজীবনের উদ্গাতা, কারারুদ্ধ হলেন। মুক্তি পেলেন বিশ্ববাসীর আবে-দনে। ভগ্নস্বাস্থ্য উদ্ধারের জন্য আশ্রয় নিলেন ইতালির কাপ্রি দ্বীপের স্বাস্থ্য-নিবাসে। রচিত হল 'মা'। 'মা' শুধুমাত্র একটিমাত্র শ্রমজীবীর ইতিবৃত্ত নয়, তা সমগ্র শ্রমজীবীদের ভাগ্যকে যেন প্রবল-ভাবে অভিব্যক্ত করেছে। সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার বিচারে 'মা'-ই পৃথিবীর প্রথম পুস্তক, যা অনন্যসাধারণ প্রভাব বিস্তারে সক্ষম। Lady Zhuikov-এর কাছ থেকে 'মা'র পাণ্ডুলিপি নিয়ে পড়েছিলেন লেনিন। গোর্কি তাড়াতাড়ি এটা লিখেছেন শুনে মন্তব্য করেছিলেন, তাড়াতাড়িতে ভালোই হয়েছে। অনেক শ্রমিক এ-বই পড়ে বিদ্রোহ করবার জন্য অনুপ্রেরণা বোধ করেছে। সময়োপযোগী গ্রন্থ এটি—বলেছিলেন লেনিন।

কী 'শৈশব', কী মাই এ্যাপ্রেনটিশ-সীপ' কী 'পৃথিবীর পাঠশালায়' কিংবা ডায়ারির নোটস্-এ চরিত্রের মিছিল চলেছে, কেউ নোংরা বিবর্ণ যাযাবর-বৃত্তিসম্পন্ন, সে কখনও স্বপ্ন দেখে পারস্য যাবে, ধর্মশালায় উঠবে, কিংবা আরণ্যকজীবন পছন্দ করবে নয় তো রাত্রির প্রহরী হবে অথবা রেলওয়ে গার্ড হবে। কেউ বা বিচক্ষণ, জ্ঞানী, পড়ুয়া। সে সংগ্রাম করবে আত্মনির্ভরতার জন্য। আসলে গোর্কির নিজের জীবনটাই চমকপ্রদ। শৈশবে দেখেছেন পৃথিবীতে দ্বিধা-বিভক্ত মানবসত্তা। মাতামহ নিষ্ঠুর, জল্লাদ, জঘন্য প্রবৃত্তির মানুষ আর দিদিমা মানুষকে ভালোবাসেন, গান গান, পরী-দের গল্প বলেন। এই দুই পৃথিবীর মধ্যে যেখানে গান নেই, সুর নেই, সেই পৃথিবীর কক্ষপথেই পরিভ্রমণ করেছেন তিনি দীর্ঘদিন। জুতোর দোকানের বার্তাবাহক থেকে ড্রাফটস্ম্যানের শিক্ষা-নবিশ, ভালগার স্টিমার বোটে ডিশ ধোবার কাজ, ও স্টুডিওতে প্রতিকৃতি অঙ্কনের কর্মনবিশী পর্যন্ত। মধ্যবিত্ত-জীবনের কুৎসিত সাধারণ জীবনযাত্রায় অসহ্য হয়ে এবং চারপাশের বিষিয়ে যাওয়া জীবনযাত্রার নির্জন মূঢ় বিদ্বেষ থেকে তিনি নিরন্তর অন্বেষণ করেছেন উত্তম কোন পরিবেশ। Aman is born নাটকে গোর্কির মানসঅভিলাষ ব্যক্ত হয়েছে নতুন জীবন নূতন আলোকে জাগবে নূতন দেশে।' 'মা'তে যেমন, 'ফোমা গরদেয়েভ', 'একটি স্বীকারোক্তি' এবং 'তিনজন' উপন্যাসে গোর্কি সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতাকে গ্রহণ করেছেন। তার মতে "রীতিরাস্তা কাব্য" নয়। শিল্পী যিনি, তিনি সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতাকেই গ্রহণ করে তাকে বাঙ্ময় করবেন।

মেহনতী মানুষের ওপর তাঁর অগাধ আস্থাই জীবনবৃত্তের কেন্দ্রস্থলে ধ্রুব। তিনি জীবনের অবাধ স্বাধীনতাপিয়াসী—যা কমিউনিস্ট পার্টির কঠোর শাসনের বিপরীত। গৃহযুদ্ধে বিপ্লবীরা জয়যুক্ত হোক্ তা চেয়েছিলেন গোর্কি। লেনিনও সোভিয়েট সংস্কৃতি রক্ষায় সহযোগিতা চেয়েছিলেন গোর্কির। মাতালের আব্রু খুলে যাওয়া পাশ্চমী সভ্যতার নগ্ন বর্বরোচিত প্রথম বিশ্বযুদ্ধের মধ্যপথে এল রুদ্রদিনের রক্তে মাতাল উদয়প্রভাত। সেই রক্তে লাল ভাঙনের পথ ধরে দুর্গমকে পেরিয়ে যাবার বিঘ্নজয়ী রথে চেপে গোর্কির আবির্ভাব। বিপ্লবের পূর্বাপর কালের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সহযোগ তাঁর। বিপ্লবীরা তাঁর প্রশ্বাস, তাঁর রক্তকণিকা। গোর্কি সেই কালের ব্যথা-বেদনা অপমান তাচ্ছিল্য দীনতা ঘৃণা লোভ মোহ, অর্থ-গৃধ্নুতাকে যেমন এঁকেছেন, তেমন তাদের ভেতর অত্যাসন্ন সুপ্রভাতের ইঙ্গিত দান করে গেছেন। সত্য মূল্য দিয়ে তিনি অঙ্কন করেছেন সর্বহারাদের বেপরোয়া জীবনের কড়া মেজাজের চিত্র-গুলি। মনে রাখা দরকার মাটির মানুষের কাছাকাছি এতখানি নিবিড় ঘনিষ্ঠতা সমকালীন রুশ-সাহিত্যে কারুর ছিল না। পুশকিনের নয়, গোগোলের নয়, তল-স্তয়ের নয়, ডাস্টয়েভস্কির নয়, চেকভের নয়। গোর্কিই সর্বপ্রথম মেহনতী মানু-ষের পূর্ণাঙ্গ চিত্রায়ন করেছেন। শ্রমিক তার পরিপূর্ণ সত্তায়, কৃষাণ তার গোটা চেহারা ও জীবন নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে গোর্কির রচনায়। গোর্কিই বিশ্বের মেহনতী মানুষের সর্বপ্রথম সার্থক শিল্পী। সর্বহারাদের সার্বিক অধিকার তাঁর লেখনীতে সর্বপ্রথম স্পষ্টোচ্চারিত। তিনি সত্যই শ্রেণীহীন ব্রাত্যদের চোখ কান ও হৃদয়। তিনি তাঁর কালের কণ্ঠস্বর।

গোর্কির নাটক

কল্পতরু সেনগুপ্ত

আমাদের স্বাধীনতা-সংগ্রামে ম্যাক্সিম গোর্কি নামটি একটি বিশেষ প্রেরণা সৃষ্টি করত। গোর্কির লেখা 'মা' পড়িয়ে বিপ্লবীরা ছেলেমেয়েদের বিপ্লবমন্ত্রে অনুপ্রাণিত করতেন। গোর্কির সঙ্গে আমাদের এত আত্মীয়তা। আমরা গোর্কির প্রবন্ধ, গল্প, উপন্যাসের সঙ্গে পরিচিত ছিলাম—কিন্তু নাটকের সঙ্গে ছিলাম না।

•

দেশ স্বাধীন হবার অনেক পরে ১৯৫৩ সালের ৬ই ফেব্রুয়ারী মিনার্ভা মঞ্চে গোর্কির 'মা'র নাট্যরূপ দেখার আমার সৌভাগ্য হয়েছিল। বেহালার 'মায়ামঞ্চ'র উদ্যোগে এই নাটক অভিনীত হয়েছিল। মূল উপন্যাস থেকে নাট্যরূপ দিয়েছিলেন শ্রীদ্বারিকাদাস গঙ্গোপাধ্যায় এবং শ্রীঅধীর মুখোপাধ্যায়। নাটকটি আরো এক কারণে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল, বাংলার প্রথিতযশা অভিনেত্রী শ্রীমতী মলিনা দেবী মা'র ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন। তাঁর সঙ্গে সহযোগিতা করেছিলেন লিটল রাশিয়ান রূপে 'নীতিশ মুখোপাধ্যায় এবং মারিয়ানার ভূমিকায় আশা দেবী। নাটকটি অভিনয়-সার্থকতায় প্রত্যেক দর্শককে মুগ্ধ করেছিল। মায়ের অনবদ্য অভিনয় এবং মে দিবসের ও শেষ দৃশ্যটির কথা এখনো আমার স্মৃতিতে উজ্জ্বল হয়ে আছে। যে দৃশ্যে পুলিশের চাবুকের তীব্র আঘাতের মধ্যে মা প্রাণপণ শক্তিতে রক্তপতাকার সম্মান রক্ষা করলেন, যে ভঙ্গীতে গ্রামের কৃষকদের উদ্দেশ্যে বাণী উচ্চারণ করলেন আর পুলিশের উদ্দেশ্যে ধিক্কার দিলেন মলিনা দেবীর সে কথাগুলি আজো যেন শুনতে পাচ্ছি। সম্ভবত ভারতে এই প্রথম 'মা'র পূর্ণাঙ্গ নাট্যরূপ অভিনীত হয়েছে। তারপরে আরো দুটি নাট্যসম্প্রদায় কেবলমাত্র মে দিবসের দৃশ্যটি বিভিন্ন জনসমাবেশে অভিনয় করেছে।

গোর্কির নিজের লেখা নাটক লোয়ার ডেপথ প্রথম অভিনয় করেছে লিটল থিয়েটার গ্রুপ। শ্রীউমানাথ ভট্টাচার্য নাটকটি 'নীচের মহল' নাম দিয়ে অনুবাদ করেছেন। নাটকের বিষয়বস্তু বৈশিষ্ট্য ছাড়াও প্রয়োগরীতি, অভিনয় এবং মঞ্চসজ্জা নৈপুণ্যের জন্য এই নাটক বিশেষ উল্লেখযোগ্য হয়ে আছে। বলা যেতে পারে 'নীচের মহল'-এর সার্থকতায় বাংলার মঞ্চে সমাজতন্ত্রী বাস্তবতার পথে অনুপ্রেরণা সৃষ্টি করে। গোর্কি ১৯০২ সালে নাটকটি লিখেছিলেন। মস্কো আর্ট থিয়েটারে সে বছরই ১৮ই ডিসেম্বর প্রথম অভিনয় হয়। 'মা'র মত এই নাটকটিও বিশ্বের নানা ভাষায় সর্বাধিক অনূদিত হয়েছে। নিউ ইয়র্ক থেকে জাপান-এ অভিনীত হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এই নাটকই গোর্কিকে সারা বিশ্বে নাট্যকারের স্বীকৃতি দেয়। সমাজতান্ত্রিক মানবতাবাদী গোর্কি যে একজন সার্থক নাট্যকার 'লোয়ার ডেপথ'-এ তিনি তা প্রতিষ্ঠা করেন। বিংশ শতকের নাট্য উদ্যোগে 'লোয়ার ডেপথ' একটি নতুন পথের দিক-নির্দেশ করেছে। সমাজের নিচের স্তরের মানুষের জীবন ও চিন্তা, আশা ও ভবিষ্যৎ এই নাটকে যেভাবে উদ্ভাসিত হয়েছে এভাবে পূর্বে কেউ লেখেন নি। নিচের তলার মানুষের মধ্যে রয়েছে ভবঘুরে, মাতাল, চোর ইত্যাদি। উচ্চ-মহলের বিচারের মানদণ্ডে এদের কোন চরিত্র নেই, নৈতিকতার বাঁধন নেই। কিন্তু এদেরও আত্মসম্মানবোধ আছে, এদের চোখেও ভবিষ্যতের স্বপ্ন জেগে আছে, ভাল জীবনের আগ্রহ নিয়ে বেঁচে থাকে একথা গোর্কি আশাবাদের সুরে ফুটিয়ে তুললেন। জীবনের নির্মম সত্যের সঙ্গে মিথ্যা ও আশ্বাসবাক্যের ছলাকলার সংঘাত বাধে, এবং জীবনের অবমাননা ঘটে। এই সংঘাতের মধ্যে গোর্কি অত্যন্ত সতর্কভাবে রিয়্যালিজম অথবা মানবিকতাবাদের গতানুগতিকতা থেকে নাটককে উত্তরণ করে এনেছেন সমাজতান্ত্রিক মানবতায়। ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার সামাজিক রাজনৈতিক অবস্থাকে ফুটিয়ে তুলেছেন। এমন এক সমাজব্যবস্থা, যেখানে অর্থনৈতিক দাসত্ব মানুষের জীবন ও আত্মাকে পঙ্গু করে দেয়; তার বিরুদ্ধে অত্যন্ত স্পষ্ট অথচ জোরালো প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছে এই নাটকে। এই নাটকের মঞ্চরূপায়ণ অত্যন্ত জটিল। প্রতিটি দৃশ্যসজ্জা এবং চরিত্র অর্থবহ। চরিত্রগুলির সংলাপ ভিন্ন ভিন্ন, কিছুটা প্রতীকধর্মী।

'চীন যুদ্ধে পরাজয়ের দায়িত্ব' কার?

লেঃ জেনারেল কল-এর বহু বিতর্কিত

THE UNTOLD STORY-র

সম্পূর্ণ বঙ্গানুবাদ

অকথিত কাহিনী

—কুড়ি টাকা—

একটি ঘোষণা : নয়াদিল্লী, ৪ঠা মার্চ, ১৯৬৮ :

'অকথিত কাহিনী' গ্রন্থে গুপ্ত তথ্য ফাঁস করা সত্ত্বেও শ্রীনেহরু এবং শ্রীমেননের 'প্রিয়পাত্র' লেঃ জেনারেল কলের বিরুদ্ধে কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় নি,—সংসদে আজ অর্ধ ঘণ্টাব্যাপী বিতর্কে এই অভিযোগের উত্তরে প্রতিরক্ষামন্ত্রী শ্রীস্বরণ সিং বলেন, "জনস্বার্থের খাতিরে জেনারেল কলের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত হবে না কারণ তাতে আরও গুপ্ত তথ্য প্রকাশিত হয়ে পড়বার সম্ভাবনা রয়েছে।"

—দি স্টেট্‌সম্যান

সান্যাল এণ্ড কোম্পানী

১।১এ, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা—১২ [ফোনঃ ৩৪-৭৫২১]

বাংলায় নাট্যমঞ্চের পর্যায় কথা যে নাটকটি সার্থকভাবে মঞ্চস্থ হয়েছে, এবং শতাধিক রজনী অভিনীত হয়েছে।

গোর্কির আরো নাটক রয়েছে। যে নাটকগুলির মধ্যে 'এনিমিজ' এবং 'দি পেটি বুর্জোয়া' বাংলায় অনূদিত হয়েছে। মঞ্চস্থ করার জন্য প্রস্তুতিও চলেছিল, সম্ভবত মঞ্চস্থ হয় নি। গোর্কির প্রথম নাটক 'ফিলিস্টাইনস' ১৯০১ সালে প্রকাশিত হয়। ১৯০২ সালের ২৫শে অক্টোবর মস্কো আর্ট থিয়েটারে নাটকটি প্রথম অভিনয় হয়েছিল। এটি তাঁর প্রথম নাটক রচনা হলেও নাটকীয় উৎকর্ষের দিক থেকে সার্থক বলেই অভিনন্দিত হয়েছে। সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য যে এই নাটকে তিনিই সর্বপ্রথম একজন শ্রমিককে নায়করূপে উপস্থিত করেন। নাটকের প্রচলিত রীতি ও নায়ক-ধারণা থেকে এখানে তিনি ব্যতিক্রম ঘটালেন। এখানে তিনি এমন একজন মানুষ উপস্থিত করতে চাইলেন—যা থেকে আগামী দিনের মানুষ যা কি রকম মানুষ হওয়া উচিত তা বোঝা যাবে। এই মানুষ হবে আত্মিক দিক থেকে পবিত্র, সব দিক থেকে সমভাবে উন্নত, জ্ঞানী, বেঁচে থাকার অর্থ ও তাৎপর্য যে জানে এবং সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ হলো যে জীবনকে পরিবর্তনের ক্ষমতা রাখে। এখানে তাঁর নায়ক শ্রমিক স্পষ্টবাদী, আত্মবিশ্বাসসম্পন্ন কিছুটা রুক্ষ, তার সীমাবদ্ধতাও আছে। গোর্কি তার ব্যর্থতা গোপন করেন নি, কিন্তু তিনি বিশ্বাস করেছেন যে এ ধরণের মেহনতি মানুষরাই জগৎকে নাড়া দিতে, নতুন করে গড়তে পারবে; মধ্যবিত্ত শ্রেণীর দোদুল্যমানতা দূর করতে পারবে। ১৯০০ সালের রাশিয়ার পটভূমিকায় ভবিষ্যৎ বিপ্লবের সংকেত তিনি বুঝতে পেরেছিলেন; কার্ল মার্ক্সের শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্ব কথাটার শিক্ষা চমৎকারভাবে তিনি নাট্যসাহিত্যে রূপায়িত করতে পেরেছেন। 'ফিলিস্টাইন' নাটকে গোর্কি অত্যন্ত মর্মস্পর্শিভাবে দেখিয়েছেন জনজীবনে বিশৃঙ্খলা, জীবনের ব্যর্থতা ও হতাশা এবং ভবঘুরে ও নৈতিক অবনতির জন্য দায়ী কারা। কিরূপে সমাজ পরিস্থিতিতে মানুষের জীবনের এত দুর্ভোগ ঘটে। বিশ্ববিখ্যাত অভিনেতা ও পরিচালক কনস্টান্টিন স্টানিস্লাভস্কি এবং ভ্লাদিমির এন ডানচেঙ্কো এই নাটকটি প্রযোজনা করেছিলেন। রুশ মঞ্চে তখন তাঁরা সবে মাত্র স্বীকৃতি লাভ করেছেন, নাটকটি তখন খুব সার্থকভাবে অভিনীত না হলেও গোর্কির নামের জন্য দর্শক আকর্ষণ করেছিল।

গোর্কির তৃতীয় নাটক 'সামার ফোক' সেন্ট পিটার্সবার্গের (বর্তমান লেনিনগ্রাড) ড্রামা থিয়েটারে ১৯০৪ সালে মঞ্চস্থ হয়। বিখ্যাত রুশ অভিনেত্রী ভেরা কমিসার জেভস্কায়া এই থিয়েটার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং তিনি খুবই গুরুত্ব দিয়ে নাটকটি প্রযোজনা করেছিলেন। বারবারার ভূমিকায় অভিনয়কালে ভেরা কমিসারস্কায়া দর্শকদের উদ্দেশ্যে কথা বলে নাটককে রোমান্টিক ভাবাবেগপূর্ণ নাটকে রূপান্তরিত করতেন, তিনি দর্শকদের বলতেন জনগণের সেবার কাজে লাগতে, মানুষের শক্তিকে জাগ্রত করতে—যা আগামী বিপ্লবকে সফল করবে। এই অভিনয়রীতিতে ভেরা কমিসারস্কায়া আরো জনপ্রিয় হয়েছিলেন। 'সামার ফোক' নাটক নিয়ে তখন দু'টি মত সৃষ্টি হয় এবং তুমুল আদর্শগত আলোচনার ঝড় বয়ে যায়। এই নাটকে গোর্কি সেই শ্রেণীর বুদ্ধিজীবীদের নিন্দা করেছেন যারা জনগণের শিবির ছেড়ে উচ্চাসন ও আরামের জীবন লাভ করে। নিজেদের সুখী মনে করেছে। অথচ তারা জানে না যে তারা বালুচরে ঘর বেঁধেছে, ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা তা টিকিয়ে রাখতে পারবে না। সুতরাং জনগণের সঙ্গে থাকাই উচিত এবং বিপ্লবকে সার্থক করার মধ্যেই ভবিষ্যৎ নিরাপত্তা। তুমুল তর্কবিতর্ক সত্ত্বেও এই নাটক অভিনয় করে ড্রামা থিয়েটার জার স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে বিশিষ্ট এক ভূমিকা পালন করে নাট্যশিল্পের ইতিহাসে বিশিষ্ট স্থান লাভ করেছে।

গোর্কির চতুর্থ নাটক 'চিলড্রেন অব দি সান' বুদ্ধিজীবীদের নিয়ে পেটার এন্ড পল দুর্গে আটক থাকাকালীন লিখেছিলেন। ১৯০৫ সালে প্রবল জনমতের চাপে জার সরকার তাঁকে মুক্তি দিলে সে বছরই ১২ই অক্টোবর ড্রামা থিয়েটারে প্রথম নাটকটি মঞ্চস্থ হয়। সেদিন সকালের দিকে এবং বিকালের দিকে রাস্তায় পুলিশের সঙ্গে শ্রমিকদের সংঘর্ষ বাধে, শহরময় তুমুল উত্তেজনা। অথচ তারই মধ্যে ড্রামা থিয়েটারের সামনে এবং ভিতরে প্রচণ্ড ভিড়। বর্তমান পরিস্থিতি মানুষের জীবন এবং ভবিষ্যৎ এবং মুক্তির পথ নিয়ে উত্তপ্ত আলোচনা, তর্ক-বিতর্ক। তারপরে ২৪শে অক্টোবর আবার মস্কো আর্ট থিয়েটারে নাটকটি অভিনীত হয়েছিল, কিন্তু নাটকের বিষয়ে মতাদর্শগত বিরোধের জন্য মস্কো আর্ট থিয়েটারে নাটকটি বেশিদিন অভিনীত হতে পারে নি। আর এক কারণ গোর্কিকে সে বছর জারের পুলিশ সেন্ট পিটার্সবার্গ ত্যাগ করতে বাধ্য করেছিল। এই নাটকের নায়ক একজন বিজ্ঞানী, কিন্তু তার মানসিক গঠন কিছুটা জটিল। একদিকে সে প্রতিভাবান, চিন্তাশীল এবং সৃষ্টিশীল, আর একদিকে সে জীবনবিমুখ—মানুষ থেকে দূরে। এই নিয়ে শ্লেষের মধ্যে নাটকীয়তা গড়ে উঠেছে। নাটকে আবেদন করা হয়েছে রুশ দেশকে (সমাজকে) পুনর্গঠিত করার জন্য। বুদ্ধিজীবীদের প্রতি শ্লেষের জন্য একদিকে বিরোধিতা এবং আর একদিকে জার পুলিশের দমননীতির দরুণ গোর্কির নাটক ১৯০৫ সালের পরে দীর্ঘদিন অভিনীত হতে পারে নি। দীর্ঘ বিরতির পর একমাত্র নভেম্বর বিপ্লবের পরেই আবার তার সঙ্গে মঞ্চের যোগাযোগ ঘটে। ১৯৩৫ সালে মস্কো আর্ট থিয়েটার গোর্কির 'এনিমিজ' মঞ্চস্থ করে। সে সময় গোর্কির নাটকের জন্য প্রচণ্ড চাহিদা সৃষ্টি হয়েছিল। এই নাটকটি গোর্কি লিখেছিলেন ১৯০৬ সালে। যখন তিনি দেশের বাইরে ছিলেন, আর ১৯০৫ সালের বিপ্লবের ব্যর্থতার দরুণ দেশে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। নাটকটি লেখা হয়েছে বিপ্লবী সর্বহারাদের কেন্দ্র করে, যারা শোষিত শ্রেণীর সুখের জন্য সংগ্রাম করছে। এদের শত্রু হচ্ছে ধনতান্ত্রিক দুনিয়া এবং উদারনৈতিক বুর্জোয়ারা যারা মানবতার কথার আড়ালে নিজেদের (শোষণের) ভূমিকা গোপন করে। এই নাটকে সর্বপ্রথম সর্বহারা শ্রেণীকে ইতিহাসের পরিবর্তনকারী শক্তি হিসাবে উপস্থিত করা হয়েছে।

১৯১০ সালে তিনি লিখেছিলেন 'ক্রাণ্কস' এবং 'ভাসা ঝেলেঝনোভা' নামে দুটি নাটক। এই নাটকটিও ১৯৩২ সালের পরে মস্কোতে অভিনীত হয়েছে। এই নাটকের নায়িকা ভাসা জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত সেই সমাজকেই সমর্থন করে

ডাক্তার হউন

ডাকযোগে হোমিওপ্যাথী শিক্ষা করিয়া এম. ডি. এইচ. ডিপ্লোমা লাভ করুন। বিনামূল্যে প্রসপেক্টাস পাইবার জন্য লিখুন—

Hind Homeopathic College
(WBM) Sonepat (Haryana)

গোর্কির 'সামার ফোক' নাটকের একটি দৃশ্য

গেছে যে সমাজ তাকে কোন মর্যাদা দেয় নি; তার জীবনকে অর্থহীন করেছে মাত্র। কিন্তু এই দৃঢ়, বুদ্ধিমতী চরিত্রচিত্রণে দর্শকমনে তার জন্য গভীর বেদনাবোধ হয় শ্রেণিগত অন্ধতা এবং অর্থের প্রাধান্যে যার জীবন ব্যর্থ হয়ে গেল।

গোর্কির লেখা শেষ নাটক 'ইগোর বুলিচেভ' ১৯৩২ সালে প্রকাশিত হয়। এ বছরই বিখ্যাত ইয়েভগেনি ভাখতানগভ থিয়েটারে নাটকটি সার্থক অভিনয়ে আবার প্রমাণ করে নাট্যকার গোর্কির প্রতিভা। এই নাটকে প্রধান ভূমিকায় রূপ দিয়েছিলেন বরিস শ্চুকিন। তাঁর অভিনীত বুলিচেভ জীবনের অর্থ যখন বুঝেছিল, তখন আর সময় ছিল না। এই ট্রাজেডি ফুটে উঠেছে নাটকে। যেমন করে জীবনযাপন উচিত বুলিচেভ সেভাবে চলে নি, যা করা উচিত ছিল তা সে করে নি, দেশ ও সমাজের কোন কাজেই সে লাগে নি। যখন এই কথা বুঝল মৃত্যু তখন তার শিয়রে উপস্থিত, শোধরাবার আর সময় ছিল না। বরিস শ্চুকিন এই ভূমিকা অভিনয় করে দারুণ নাম করেছিলেন। পরবর্তীকালে লেনিনের চরিত্ররূপদাতা হিসাবে বরিস শ্চুকিন আরো বিখ্যাত হয়েছেন। এই নাটকের অভিনয় এত সার্থক হয়েছিল যে সারা রাশিয়ায় দারুণ সাড়া পড়ে গিয়েছিল। নাটকটি প্রযোজনা করেছিলেন বিখ্যাত নেমিরোভিচ-ডানচেঙ্কো। গোর্কির জীবিতকালে 'ইগোর বুলিচেভ' শেষ অভিনীত নাটক।

তাঁর মৃত্যুর পরে তার গল্প ও উপন্যাসকে নাট্যরূপ দিয়ে অভিনয়ের ব্যবস্থা হয়েছে, এবং এখনো হচ্ছে। একদা রুশীয় মঞ্চের ঐন্দ্রজালিক রূপদাতা স্টানিস্লাভস্কি, ডানচেঙ্কো, ভেরা কমিসায়জেভস্কায়া প্রমুখ গোর্কি-নাটকে তাঁদের প্রতিভা বিকশিত করেছেন, আজ তরুণরা নতুন করে নিজেদের বিকশিত করছেন গোর্কির নাটকের মাধ্যমে। গোর্কির 'ক্লিমস সামগিন'-কে নাট্যরূপ দেওয়া হয়েছে শুনেছি; 'বারবারিয়ানস'কে নাট্যরূপ দিয়ে অভিনয় হচ্ছে। 'ফিলিস্টাইন' ও 'সামার ফোক' নাটক আবার অভিনীত হচ্ছে রুশ মঞ্চে। জারের রাশিয়ার কাল থেকে সোভিয়েত রাশিয়ায় গোর্কির নাটকের প্রভাব অক্ষুন্ন থেকে তার কালজয়িতা প্রমাণ করেছে।

আমাদের বাংলা সাহিত্যে যেমন তেমন মঞ্চেও গোর্কির প্রভাব স্বীকার করতেই হবে। গোর্কির সাহিত্য ও নাটক বাংলা মঞ্চকে সমৃদ্ধ করেছে। 'মা' 'নীচের মহল' ছাড়াও 'মনিব' 'দুষমন' (এনিমিজ), 'পাতি-বুর্জোয়া' ইত্যাদির কথা আগে উল্লেখ করেছি। গোর্কি জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে আবার নতুন নাট্য-প্রচেষ্টা চলেছে। থিয়েটার লাইবার অভিনয় আয়োজন করছে 'ওল্ডম্যান'-এর; গণনাট্য সঙ্ঘের কলাকার শাখা প্রস্তুতি চালাচ্ছে ছোট গল্প 'বে-ঈমানের মা'র নাট্যরূপ নিয়ে। এই দুটিই বাংলার মঞ্চে নতুন সংযোজন।

গোর্কির কাছে যা পেয়েছি

মনোরঞ্জন হাজরা

একখানি স্টীমার ভেসে চলেছে। কেবিনে ছেলেটির পিতৃবিয়োগোত্তর নবজাত ভাইটির মৃতদেহ। ওকে কবর দেয়া হবে কোথাও। ক'দিন আগেকার আরেক কবরের দৃশ্য ভেসে উঠল চোখের সম্মুখে। সেই যে দুটো ব্যাঙ, বাবার কবরটায় মাটি চাপা পড়ে গেল—আর তো তারা উঠতে পারল না। বাবাকে কবর দেয়া হয় মৃত্যু হলে, ভাইকেও তাই, কেন না এটা দেশ প্রচলিত শাশ্বত নিয়ম—কিন্তু ঐ যে দুটো ব্যাঙ জীবন্ত মাটি চাপা পড়ে গেল তাদের কি হবে ? প্রাণের সমাধি কি এমনিভাবেই চলবে? শিশুমনের এই বিরাট জিজ্ঞাসাই বোধ করি নিজনীনোভোগোরদের সুমহান শিল্পীকে স্টীমারের কেবিন হতে ঢেউয়ের দোলায় দোলায় তাঁর জীবনের প্রথম যাত্রাপথে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলো। দূরে ক্রমপ্রকাশমান তটপ্রান্তে তারই যেন প্রতিধ্বনি।

এরপর জীবনের দুস্তর পথ যখন অতিক্রান্ত হল, সেই জিজ্ঞাসা যখন জীবনে আর অনুত্তরিত রইল না—অথবা যখন সেই শিশুটির মত সমস্ত মানুষের এই একই জিজ্ঞাসার জবাব পাওয়া গেল তখন এই মানুষটিকে উদ্দেশ করে বিখ্যাত লেখক হপম্যান লিখলেন, "You were always a fighter, and your life has been an endless stubborn struggle." "তুমি চিরসংগ্রামী, তোমার জীবন নিরবচ্ছিন্ন কঠোর সংগ্রামে ভরা।" মনীষী রল্যাঁ লিখলেন, "You are like a high rainbow, uniting two worlds the past and the future." "তুমি বিস্তীর্ণ রামধনু, বন্ধনে বেঁধেছো দুই পৃথিবীকে, বিগত আর অনাগতকে।"

সত্যিই তিনি ছিলেন যেমন সংগ্রামী, তেমনি দুই পৃথিবীকে বেঁধেছিলেন তাঁর সুমহান মন্ত্র দিয়ে। এক শতাব্দী আগেকার পৃথিবীকে স্মরণ করলে চোখের সামনে ভেসে উঠবে, ফরাসী বিপ্লবের তরঙ্গাঘাতে সারা পৃথিবী তখন ব্যস্ত চঞ্চল। রুশো, ভল্টেয়ার আর ওদিকে ম্যাজিনি ও গ্যারিবল্ডীর লেখনী থেকে বেরিয়ে এসেছে তখন জাতীয়তাবাদের অগ্নিস্ফুলিংগ। খাস ইংলণ্ডে বয়ে গেছে শিল্প-বিপ্লবের ঢেউ। ইতিহাসের এই বক্রচঞ্চল অভিযাত্রাকে কঠিন কঠোর শৃঙ্খলার মধ্যে নিয়ন্ত্রণ করবার সাধনা চলেছে তখন বিতাড়িত জার্মান ও ফরাসী দার্শনিক কার্ল মার্ক্স ও ফ্রিডরিশ এঙ্গেলসের প্রগাঢ় সখ্যতার মধ্যে দিয়ে। 'কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো' প্রকাশিত হয়েছে ১৮৪৮ সালে। সমগ্র ইউরোপ তখন কমিউনিজমের ভূত দেখছে। পৃথিবীতে পাশাপাশি চলেছে দুটি ধারা—জাতীয়তাবাদ ও আন্তর্জাতিকতাবাদ। কট্টর জাতীয়তাবাদীরা সন্দেহ করছেন আন্তর্জাতিকতাবাদকে। কিন্তু আন্তর্জাতিকতাবাদীরা কোন গোঁড়ামি থেকে বিষয়টাকে গ্রহণ করলেন না—তাঁরা মেনে নিলেন দুটিকে—একটিকে আরেকটির পরিপূরক হিসাবে। এমনি সময়ে শতবর্ষ আগে এলেন এ্যালেক্সী ম্যাক্সিমোভিচ পেশকভ—যিনি মানুষের জীবনের তিক্ততায় ব্যাকুল হয়ে নামগ্রহণ করেছিলেন গোর্কি। গোর্কি শব্দের অর্থ হল তিক্ত। মানুষের জীবন-জিজ্ঞাসা আর তিক্ততা মিলিয়ে গোর্কিকে হতে হল বিপ্লবী এবং একই সংগে আন্তর্জাতিকতাবাদী।

একটা কথা না বললে গোর্কির অভ্যুদয়কে বুঝতে ভুল হবে—সেটা হচ্ছে রুশ সাহিত্যের বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্য। গোর্কির নিজের ভাষায়—"আমাদের সাহিত্যের 'মৌলিকতা' (originality) এবং 'দৃঢ়তা' (forcefulness) বিশ্বসাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে।" তাই আমরা দেখি, টলস্টয় যখন পুরাতন ঘুণধরা সমাজের পূতিগন্ধময় ব্যবস্থাগুলিকে শিল্পীর তরবারি দিয়ে নির্মমভাবে অস্ত্রোপচার করে গেছেন, যখন ডস্টয়েভস্কী, টুর্গেনিভ প্রভৃতি তৎকালীন সভ্যতার প্রবাহধারাকে অনাবৃত করে দিয়েছেন—তখন গোর্কি চট করে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে নিয়েছেন তারই ধারাবাহিকতার অবশ্যম্ভাবী স্থানটিতে। এ সম্পর্কে দু-একটি উদাহরণ দেয়া যেতে পারে। ধরা যাক 'রেসারেকশনের' কথা। এতবড় একটা ঐশ্বর্যমণ্ডিত রচনায় সকল ঘটনার পরেও নায়ক নেখলিউডভ সব কিছুর প্রতিকার খুঁজছেন ঈশ্বরের কাছে আত্মসমর্পণ করে। ডস্টয়েভস্কীর 'ক্রাইম এ্যান্ড প্যানিশমেন্টের' নায়ক রাস্কনলিকভ প্রাণের-দায়ে-অভিসারিকা-সোনিয়ার পায়ে ধরে বলছে "I did not bow down to thee but to suffering humanity in your person." আমি তোমার কাছে নতি জানাচ্ছি না—নতি জানাচ্ছি তোমার মধ্যে দিয়ে নিপীড়িত মানবাত্মাকে।' কেন, কিসের জন্য এ আকুতি ? সামনে কি পথ নেই ? এইখানেই গোর্কির দুঃসাহস আর আমিত্ব-চেতনার সুস্পষ্ট স্বীকৃতি পাওয়া যায়। তিনি দেখালেন 'দি বার্থ অফ এ ম্যান'-এ মানুষ জন্মালো, 'টোয়েন্টিসিক্স মেন এ্যান্ড এ গার্ল'-এ দেখালেন মানুষের জীবন-সংগ্রামের অসম্ভব প্রয়াস,—তারপর 'মাদার'-এ দেখালেন প্যারী-কমিউনের অভিজ্ঞতায় পাওয়া লালঝাণ্ডা নিজ হাতে তুলে নিচ্ছেন পাভেলের মা, যে মা পৃথিবীর সকল দেশের শ্রমিক শ্রেণীর মা। এই তো পথ। ঈশ্বরভক্তির পরাকাষ্ঠা বা দরিদ্রনারায়ণের পূজোয় আত্মোৎসর্গের কথা তুলে তিনি কোন পলায়নীবৃত্তি দেখান নি।

গোর্কি'র রচনায় এই গুণ লক্ষ্য করে টলস্টয় ১৯০০ সালের ৯ই ফেব্রুয়ারী তাঁকে লিখেছিলেন—"I have liked your writings but I have found you better than your writings." অর্থাৎ "আমি তোমার লেখা পছন্দ করেছি কিন্তু তোমার লেখার চেয়ে তোমাকে আমার ভাল লেগেছে।" গোর্কি বুঝলেন টলস্টয় তাঁকে কোন কথা বলতে চেয়েছেন। তাই তিনি এর পর লিখলেন—"I do not know whether I am better than my books but I do know that any writer must be better and stand higher than what he writes." অর্থাৎ "আমি জানি না আমার লেখার চেয়ে আমি ভাল কি না—তবে এ আমি জানি যে, যে কোন লেখককে তার লেখার চেয়ে অবশ্যই ভাল এবং উচ্চস্তরের হতে হবে। এর পর গোর্কি আরও লিখলেন—"ভাল লেখা বলতে আমরা কি বুঝি—সত্যের দিকে ইঙ্গিত করা কতকগুলি নিষ্প্রাণ কথার কালো ছায়া যে তা নয়। কিন্তু মানুষ—মানুষই হচ্ছে জীবন্ত ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি এবং আমি ঈশ্বর বলতে বুঝি ন্যায়বিচার, সত্য ও সম্পূর্ণতার জন্য অদম্যভাবে সংগ্রাম করে যাওয়া। এই কথার জের টেনে টলস্টয়কে তিনি জানালেন—Even a bad man is better than a good book." অর্থাৎ "একটা ভাল বইয়ের চেয়ে একটা খারাপ লোকও ভাল হয়।" ঈশ্বরবিশ্বাসী মানুষের কাছে মানুষকে ঈশ্বররূপে অথবা সত্য শিব ও সুন্দরকে প্রতিষ্ঠিত করার সংগ্রামী প্রয়াসকেই যদি অনুরূপে মর্যাদা দেওয়া হয় তবে সে বিদ্রোহ নয় তো কি? কিন্তু তাই বলে গোর্কি টলস্টয়কে কখনো ছোট করে দেখেন নি এবং গোর্কিচরিত্র থেকে সেকথা কেউ মনে করলে রীতিমত ভুলই হবে। এ সম্বন্ধে গোর্কি'র নিজের কথা একটু বলা দরকার। স্টেফান জুইগকে (Stefan Zweig) তাঁর একটি রচনা সম্পর্কে লিখেছেন—"Will you be hurt if I say that you were less successful with your appraisal of Lev Tolstoy?" অর্থাৎ "আপনি কি মর্মাহত হবেন যদি আমি বলি আপনি টলস্টয়ের যথাযথ মূল্যায়নে অপেক্ষাকৃত কম সাফল্য অর্জন করেছেন।

(২)

নিপীড়িত মানুষের এই মহান শিল্পীকে আজ তাঁর জন্ম শতবার্ষিকীতে স্মরণ করলে, আমরা তাঁর কাছ থেকে কি পেয়েছি তা একটু দেখার জন্য আমরা আমাদের অতীত দিনে একটু ফিরে যাই।

জালিয়ানওয়ালাবাগের ঘটনার পর দেশের আপামর জনসাধারণের মাঝে এক বিরাট আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল। সম্মানের উচ্ছিষ্ট পাত্ররূপে রবীন্দ্রনাথের নাইট পদবী পরিত্যাগ, ভাইসরয় কাউন্সিল থেকে জিন্নার পদত্যাগ এবং পরিশেষে ১৯২০ সালে নাগপুর কংগ্রেসে অসহযোগ আন্দোলনের সিদ্ধান্ত হওয়ায় সমগ্র জাতি উদ্দাম হয়ে উঠল। ১৯২১ সালে অসহযোগ আন্দোলনকে দমন করবার জন্য তৎকালীন ভাইসরয় লর্ড রিডিং প্রচণ্ড দমননীতি চালাবার ব্যবস্থা করলেন। এই সময় আরও একটি ঐতিহাসিক ঘটনা ঘটে। সেটি হচ্ছে মুজাফফর আহমদ, এম এন রায় প্রভৃতি ভারতে কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে তোলার চেষ্টা করেন। এজন্য কানপুর ষড়যন্ত্র মামলা বলে একটি মামলারও সৃষ্টি হয়।

অসহযোগ আন্দোলন যখন পুরোদমে চলছিল তখন গোরক্ষপুর জেলার চৌরী-চৌরায় সংগ্রামী জনতা বাইশজন কনেস্টবল সহ একজন দারোগাকে পুড়িয়ে মারে। এই ঘটনায় হিংসার অভিব্যক্তি দেখে গান্ধীজী আন্দোলন প্রত্যাহার করেন। এতে দেশের মধ্যে দুরকমের প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। কংগ্রেসের একদল নেতা এতে বিরক্ত হয়ে অন্য পথ অর্থাৎ আইনসভায় প্রবেশ ও সেখানে সরকারকে বাধাদানের নীতি গ্রহণ করেন। এর পুরোভাগে থাকেন দেশবন্ধু ও মতিলাল। ওদিকে দেশের যুবসমাজ চলে যান বৈপ্লবিক আন্দোলনের দিকে। এরই পরে দেখা গেল বাছা বাছা যুব নেতৃবৃন্দকে বিনাবিচারে আটক করা হল। অনেককে বাংলা দেশের বাইরের জেলে নিয়ে যাওয়া হল। সুভাষবাবুকে নিয়ে যাওয়া হল বর্মামুলুকের মান্দালয় জেলে। এঁরা তখন বাংলাদেশে Flowers of Bengal নামে পরিচিত।

এ সময়ে জাতীয় আন্দোলনে যুবসমাজ ছাত্রসমাজ পথ খুঁজছে। ১৯১৭ সালে বলশেভিক পার্টির নেতৃত্বে রাশিয়ায় বিপ্লব হয়েছে এবং সে বিপ্লব সাফল্যলাভও করেছে। সে কথা ঝড়ের বেগে ছড়িয়ে পড়ছে সারা পৃথিবীতে। রাশিয়ার বিপ্লবী অভিজ্ঞতা এবং বিপ্লবী সাহিত্য নানা পথ ঘুরে ঘুরে আসছে ভারতবর্ষে। ভারতবর্ষের তরুণসমাজ তখন তাকে আবেগ-আনন্দে অভ্যর্থনা করছে। একে একে Flowers of Bengal-রা জেল থেকে মুক্তি পেতে লাগলেন। আগেই টুকরো টুকরো সন্ত্রাসবাদী দলে তাঁরা বিভক্ত হয়েছিলেন (Sedition Committee report)—এ সময়েও সেই রকমই রয়ে গেলেন। কিন্তু সকলেই তাঁরা অনুসন্ধিৎসু।

১৯২৭ সালে সাইমন কমিশন ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ করতে আসবেন ঠিক হয়। তাকে বয়কট করা হল। কলকাতার সে স্মরণীয় হরতাল ইতিহাস হয়ে আছে। এর পরের বছরে ১৯৬৮ সালে কলকাতায় পণ্ডিত মতিলাল নেহরুর সভাপতিত্বে কংগ্রেসের অধিবেশন হয়। একটি ঘটনা এই কংগ্রেসে ঘটেছিল—যা আজ অনেকেই ভুলে গেছেন বা অনেকে ইচ্ছা করে ভুলে থাকেন—সে হচ্ছে কংগ্রেসের অধিবেশনে হাজার হাজার শ্রমিকের মিছিল করে আগমন। এই মিছিলের পুরোভাগে ছিলেন স্বর্গত অনুকূল মুখার্জী, কালী সেন, বঙ্কিম মুখার্জী প্রভৃতি। সে মিছিলকে কংগ্রেসে ঢুকতে দেওয়া হয় নি। তারপর কি ঘটেছিল তা সেদিনকার প্রত্যক্ষদর্শীরা জানেন। এবারে ২২শে নভেম্বর ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউণ্ডে জনতার উপর যেমন অশ্বারোহী পুলিশবাহিনীকে ছুটিয়ে দেওয়া হয়েছিল, তেমনি ১৯২৮ সালে পার্ক সার্কাসে শ্রমিক-মিছিলের উপর তারই প্রাক্-মহড়া হয়ে গিয়েছিল নেতৃবৃন্দের পক্ষ থেকে। সেই সময়ে বাংলার বিপ্লবী যুবশক্তি রুশো, ভল্টেয়ার, ম্যাজিনি, ল্যাস্কি প্রভৃতির রচনার সঙ্গে সঙ্গে আইরিশ বিপ্লবী ডি-ভ্যালেরা, মাইকেল কলিন্স প্রভৃতির জীবনী, এবং ড্যান ব্রীনের 'মাই ফাইট ফর আইরিশ ফ্রীডম' প্রভৃতি বইগুলি আকণ্ঠ গলাধঃকরণ করছেন। । তাছাড়া নিহিলিস্ট আন্দোলনের চমকপ্রদ তথ্যাবলী, অস্কার ওয়াইল্ডের 'ভেরা' প্রভৃতি রচনাগুলি আগেকার যুগের 'গীতার' মত হয়ে উঠেছে তাঁদের কাছে। কলকাতা কংগ্রেসে তাই হাজার হাজার শ্রমিকের মিছিল করে আসার ঘটনাটা তাঁদের মনকে গভীরভাবে নাড়া দিলো। পথ কোথায়—কোন দিকে? রক্ত-উজ্জ্বল জীবনের বেদীতে আত্মদানে, না এই হাজার হাজার শ্রমিকের অভিযানে—যাকে অঙ্কুরে বিনাশ করতে চেয়েছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা কানপুর ষড়যন্ত্র মামলা সৃষ্টি করে? বর্তমান প্রবন্ধ লেখক এই শ্রমিক-মিছিলের দ্বারা কি হতে পারে তা জানবার জন্য স্বর্গত বঙ্কিম মুখার্জীকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি তখন একখানি খবরের কাগজে মোড়া বই দিয়ে বললেন, 'এটা পড়ে দেখো।' সেই বইখানি ছিল গোর্কির বিখ্যাত বই 'মাদার'। বইখানি পড়ার পর কলকাতা কংগ্রেসে আগত শ্রমিক-মিছিলটি আমার কাছে রূপান্তরিত হয়ে গিয়েছিল 'মাদার'-এ বর্ণিত মে-দিবসের মিছিলে।

এখানে একটা কথা বলে রাখা দরকার যে আমার এই ব্যক্তিগত ঘটনা থেকে কেউ যেন মনে না করেন আমি আমাদের জাতীয় আন্দোলনে গোর্কির প্রভাব দেখাবার চেষ্টা করছি এবং আমি সেকথা বলতে চাইছি

শক্তি ও উৎসাহের জন্য-বোর্নভিটা !

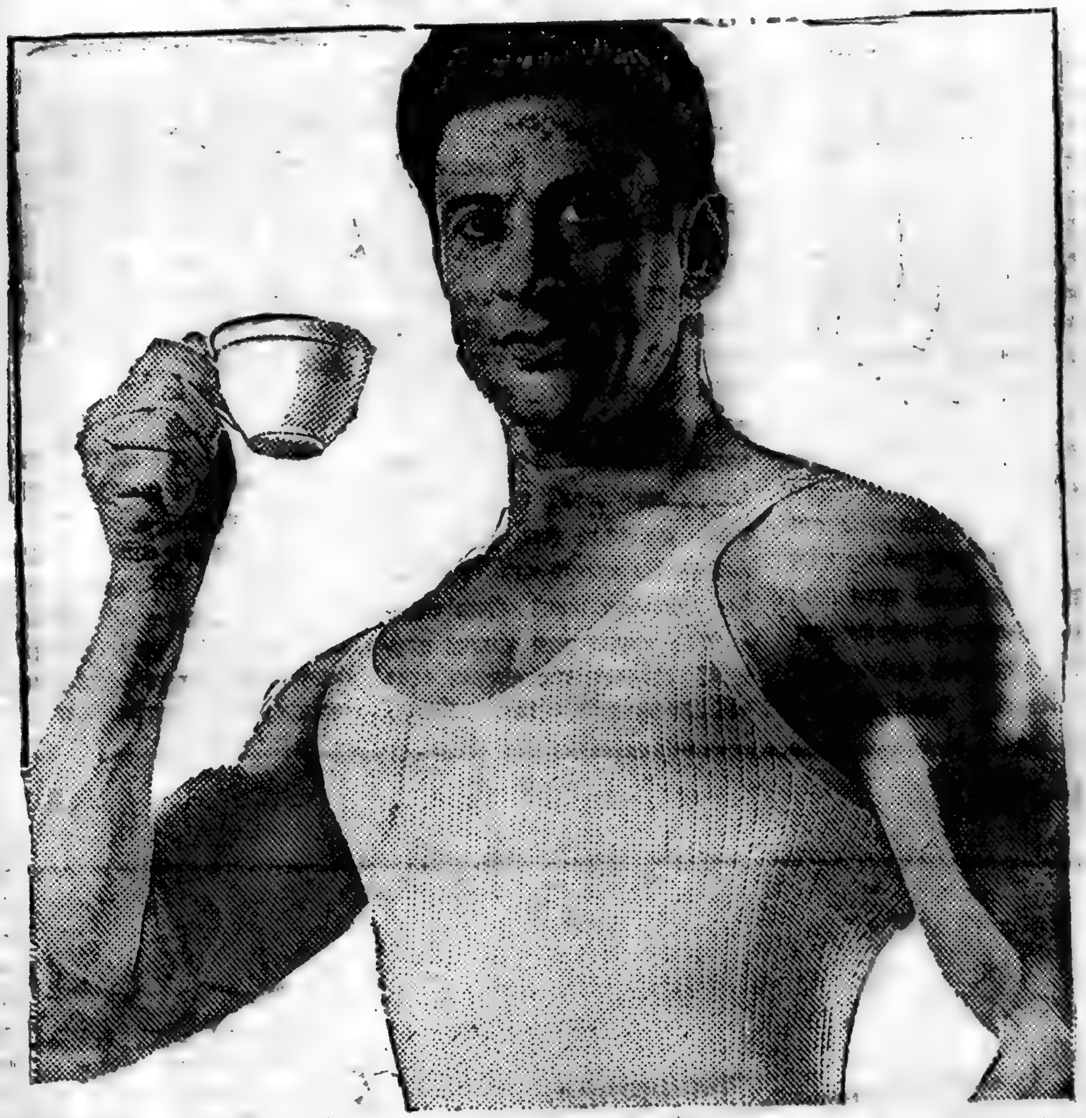

বোর্নভিটার স্বাদ অতুলনীয়....
ওর রহস্য হচ্ছে-কোকো !

কোকো, দুধ, চিনি, ও মল্ট বিধিসম্মতভাবে মেশাবার ফলে—অতি শক্তিবর্দ্ধক পানীয় বোর্নভিটা ! বোর্নভিটা গরম দুধে মিশিয়ে নেবেন—এই সুস্বাদু পানীয় থেকে শক্তি ও উৎসাহ পাবেন।

শক্তি, উৎসাহ ও স্বাদের জন্যে

ক্যাডবেরিস্ বোর্নভিটা।

2296/All-Ben

পড়ে নিচ্ছিলাম। এ ভাষণে স্বামীজী ট্রটস্কির প্রচুর উদ্ধৃতি দিয়েছিলেন। তাই তাঁর সঙ্গে কিছুটা আলোচনা করছিলাম। আলোচনা প্রসঙ্গে গোর্কির কথা এসে পড়ল। স্বামীজী উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে উঠলেন, "Oh yes, he was a great man. ভগবান সম্পর্কে আমি তাঁর কথার বিশেষ মূল্য দিই।" একথা যে স্বামীজীর কতখানি আন্তরিক তা শুধু আমিই নই, কুমিল্লা অধিবেশনের লক্ষ কৃষক সেদিন তাঁর মুখে শুনেছিলেন যখন তিনি তাঁর উদ্বোধনী ভাষণে বললেন—"বিশ বছর আমি বনে বনে জঙ্গলে জঙ্গলে পাহাড়-পর্বতে ঘুরে বেড়িয়েছি, ভগবানকে কোথাও পাই নি—তারপর আজ আমি তা পেয়েছি এই শোষিত নিপীড়িত কৃষক শ্রমিকের সংগ্রামের মধ্যে।"

এই সব ঘটনাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে যদি বলা যায় গোর্কি আমাদের জাতীয় সংগ্রামই শুধু নয়—আমাদের চিন্তাধারার পর্যন্ত তাঁর অবদান রেখে গেছেন তাহলে কি ভুল বলা হবে?

বারে বারে গোর্কির 'মাদার'-এর কথা উল্লেখ করা হয়েছে কিন্তু গোর্কির সৃষ্টি শুধু তো তাই নয়। ছোট গল্পে যেমন তাঁর অশেষ অবদান, তেমনি তাঁর উপন্যাসে, তেমনি তাঁর নাটকে। তাঁর ছোট গল্প 'দি বার্থ অফ এ ম্যান', 'টোয়েন্টিসিক্স মেন এ্যান্ড এ গার্ল', 'চেলকাস', 'ওয়ান নাইট' প্রভৃতি যেমন বিখ্যাত তেমনি উপন্যাসের মধ্যে 'ডিকাডেন্স', 'ম্যাগনেট', 'আদার ফায়ার্স' প্রভৃতিও ভোলা যায় না। তাঁর নাটক 'পেটি বুর্জোয়া' 'লোয়ার ডেপথ', 'সামার ফোক', 'এনিমিজ', 'ওল্ড ম্যান' প্রভৃতি মস্কো আর্ট থিয়েটারে রাতের পর রাত অভিনীত হয়েছে। বিদেশেও এসব নাটকের শুধু অনুবাদ নয়, মঞ্চাভিনয় পর্যন্ত সমাদৃত হয়েছে। আমরাও এর অবদান থেকে বঞ্চিত হই নি।

আমরা রবীন্দ্রনাথের দেশের মানুষ। রবীন্দ্রনাথের পত্রগুচ্ছ সম্বন্ধে আমরা অত্যন্ত সচেতন। রবীন্দ্রনাথের চিঠি পেলে বিস্ময়ে আনন্দে আমরা না পড়ে থাকতে পারি না। তেমনি দেখা গেছে গোর্কির জীবনে। গোর্কি সংগ্রহশালায় বিশ হাজার চিঠি সংরক্ষণ করা হয়েছে। এসব চিঠিগুলি পৃথিবীর বহু মনীষীর কাছে ও কাছ থেকে লেখা চিঠি। একদিন আসবে যখন এই চিঠিগুলি থেকেই গোর্কির সকল দিকে যথাযথ মূল্যায়ন হবে। এর পরেও বোধ করি গোর্কির মনে শিল্পীর অসন্তুষ্ট আত্মা শান্তি পায় নি। কোন মহৎ শিল্পী জীবনে কখনো এ শান্তি পান না কারণ সমুখের হাতছানিই বারে বারে তাঁর ধ্যানভঙ্গ করে। তাই দেখা যায় যতই দিন কেটেছে জীবনের, গোর্কি ততই যেন সক্রিয় হয়ে উঠেছেন।

ছোট গল্পে নিজেকে ফুরিয়ে ফেলছেন দেখে লেনিন একবার তাঁকে বলেন—"তোমার জীবনের অভিজ্ঞতাকে টুকরো টুকরো করে ছোট গল্পের মধ্যে চিত্রিত করে লাভ কি? তুমি বই লেখো বড় বই, মাদারের মত বই।"

গোর্কি শুরু করেছিলেন, শেষ করতে পারেন নি। এর পর দুটি ঘটনায় মহৎ শিল্পীকে আমরা আরও চিনলাম। তিনি লেনিনের মৃত্যুতে কাঁদলেন—এমন কান্না তাঁর চোখে টলস্টয়ের মৃত্যুতেও দেখা যায় নি। অথচ এই মানুষটা নিজের সম্বন্ধে রলাঁকে লিখেছিলেন—If I had to write a critical essay about Gorkey, I think it would be a most devastating and merciless criticism.

* * *

তাই এ বছর যখন এই মহান শিল্পীর জন্মশতবার্ষিকী পালিত হবে তখন সারা পৃথিবীর মানুষের সঙ্গে কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে আমরা বলব গোর্কি তোমার কাছে আমরা ঋণী। তুমি আমাদের অনেক দিয়েছ। তবু আরও আশা করেছিলাম। আজ তুমি নেই কিন্তু আছে তোমার অমর সৃষ্টি। তোমার সেই সৃষ্টির আলোয় আমাদের প্রত্যাশা পূর্ণ হোক।

বিহার-নাটক

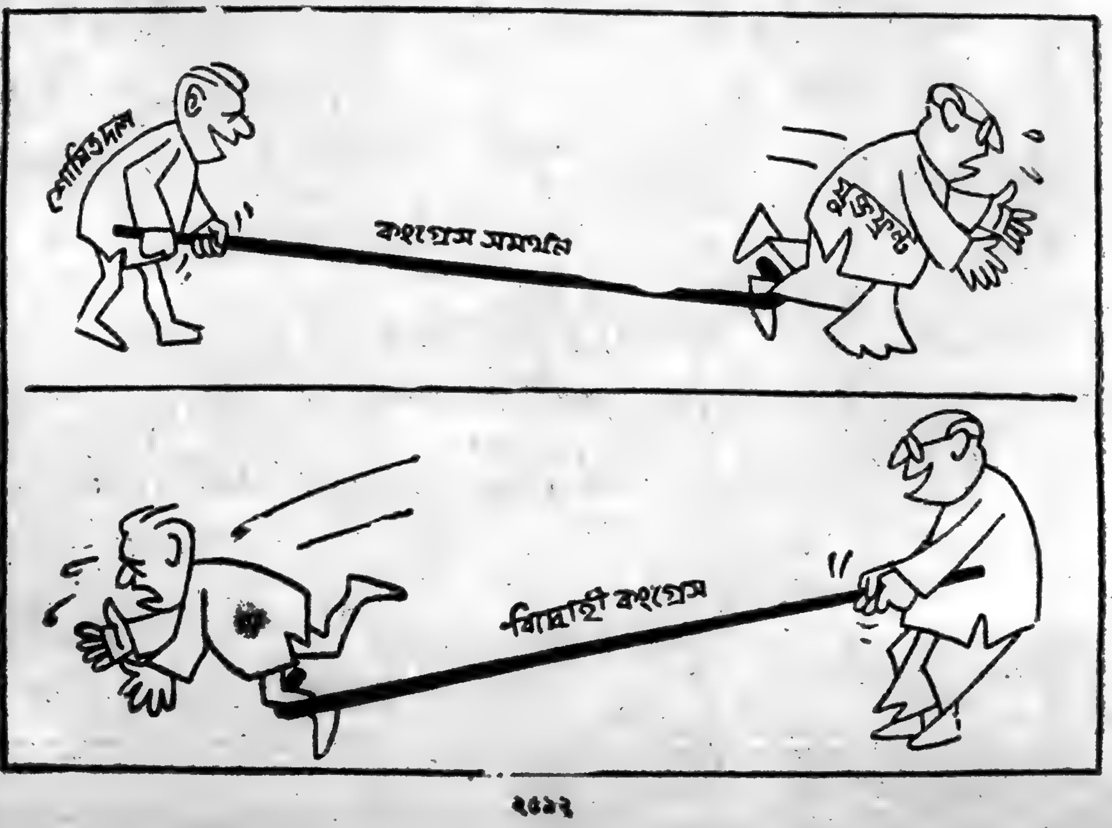

গোর্কির সাহিত্যে মানবতাবাদ

দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

শতবর্ষ আগে একটি মহৎ জীবন এসেছিল এই পৃথিবীতে। মানবতার মহিমায় উজ্জ্বল সেই জীবন নিজেকে অবিনশ্বর করে রেখে গেছে অমর সাহিত্যকীর্তিতে যার বিকীর্ণ আলোকছটায় আমরাও সমুজ্জ্বল। বর্তমান শতকের প্রথম পাদ থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত গর্কির সাহিত্য পড়ে অনুপ্রাণিত হন নি, আমাদের দেশে এমন লেখক বোধ হয় কমই আছেন। রাজনৈতিক মতভেদের দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর মুহূর্তে ধূলিসাৎ হয়ে যায় সাহিত্যের মানবিক আবেদনে। গর্কির সাহিত্য সেই মানবিক আবেদনে পরিপূর্ণ বলেই বিশ্ববাসীর চিত্তজয়ে সক্ষম। তরুণ সোভিয়েত শক্তির আবির্ভাবে পশ্চিম দুনিয়ার বুর্জোয়া রাজনীতিক মহল যখন শংকিত, সন্ত্রস্ত ও বিক্ষিপ্ত তখন গর্কির সাহিত্য কিন্তু সেখানকার তরুণ বুদ্ধিজীবী মহলে প্রেরণার উৎস। পরাধীন ভারতে গর্কির সাহিত্য পড়ে আমরাও বিদেশীর নাগপাশ ছিন্ন করার প্রেরণা লাভ করেছি এবং কাদের জন্যে স্বাধীনতা কাদের জন্যে লেখনী ধারণ করতে হবে, তা বুঝতে শিখেছি। প্রায় পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ বছর আগে গর্কির মাদার উপন্যাসের ইংরেজি অনুবাদ যেদিন পড়লাম সেদিন নিজের মাকে যেন নতুন করে চিনলাম। আমার মাও ছিলেন এমনি লাঞ্ছিতা, অবহেলিতা, চিরদুঃখিনী আর গর্কির মতোই আমার শৈশবও কেটেছে চরম দারিদ্র্যের মধ্যে। তবে আমি ভাগ্যবান এদিক থেকে যে, গর্কির মতো শৈশবেই আমি মাকে হারাই নি; বাপকে হারিয়েছিলাম আমার জন্মের আগেই। তাই বুঝি "মাদার" আমার সেই তরুণ মনে এমনভাবে দাগ কেটে দিয়েছিল যে উত্তরজীবনেও তা গভীরভাবে অঙ্কিত হয়ে আছে। মা যখন অম্লানবদনে অক্লেশে আমার রাজনৈতিক কাজে সাহায্য করতেন তখন আমার চোখের সামনে গর্কির মা ও পাভেলের চিত্রই ফুটে উঠতো। সেই স্মৃতিচারণে আজো আমার রোমাঞ্চ হয়, প্রাণে আনন্দের হিল্লোল বয়ে যায়। "মাদার" পড়ে শুধু নিজের মাকেই চিনি নি, চিনেছি আশেপাশে যত লাঞ্ছিতা, নিগৃহীতা, অপমানিতা মা রয়েছে তাদের আর দেখতে পেয়েছি তাদের সেই করুণাময়ী মূর্তিটিকে। দেখেছি সেই ঝঞ্ঝাতাড়িত জীবনের শতসহস্র আঘাতেও ভেঙে না পড়ার অমিত স্থৈর্য, দেখেছি মাতৃপ্রাণের মহান বহ্নিশিখাকে নিষ্কম্প ও অনির্বাণ রাখার নিয়ত প্রয়াস। তাই গর্কির সাহিত্যে কেবল আনন্দই দেয় না, জীবনে চেতনা সঞ্চারও করে আর এনে দেয় জীবন সম্পর্কে, মানুষ সম্পর্কে, সমাজ সম্পর্কে নতুন বোধ।

গর্কির মানবপ্রেম যে কতখানি গভীর ছিল, তাঁর একটি চিঠি থেকে খানিকটা উদ্ধৃতি দিলেই তা বোঝা যাবে। ১৯০০ সালের ৯ই ফেব্রুয়ারী রুশ সাহিত্য-সম্রাট লিও তলস্তয় গর্কিকে একটি চিঠিতে লেখেন: "তোমার লেখা আমার ভালো লাগে, তবে তোমার লেখার চাইতে তোমাকে আরো বেশি ভালো লাগে।"

তার উত্তরে তলস্তয়কে গর্কি যে চিঠি দেন তার গোড়ায়ই তিনি লেখেন:

"লিও নিকোলায়েভিশ, আপনার ছবি ও আমার সম্বন্ধে আপনার সহৃদয় ও সৌজন্যসূচক উক্তির জন্যে আপনাকে ধন্যবাদ। জানি নে আমার বইগুলির চেয়ে আমি বেশি ভালো কি না, তবে একথা আমি জানি যে, যে কোনো লেখককেই তাঁর লেখার চেয়ে নিজেকে আরো বেশি ভালো ও উন্নত করতে হবে। আসলে বইটা কী? এমন কি, একটি অত্যুৎকৃষ্ট বইও শব্দসমষ্টির প্রাণহীন অন্ধকার ছায়াপাত, সত্যের প্রতি তাতে ইংগিত থাকে মাত্র; আর মানুষ হলো জীবন্ত দেবতার আধার এবং ঈশ্বর বলতে আমি বুঝি সত্য, ন্যায় ও পূর্ণতার জন্যে অবিচল সাধনা। এই কারণেই এমন কি একটি খারাপ মানুষও একটি ভালো বইয়ের চেয়ে উৎকৃষ্টতর। আপনি কি তা মনে করেন না?"

এখানেই গর্কি থামেন নি। মানবজীবনের প্রতি তাঁর গভীর প্রত্যয়কে আরো স্পষ্ট করে তিনি প্রকাশ করেছেন তাঁর সেই চিঠিতে। তিনি বলেছেন যে, পৃথিবীতে মানুষের চেয়ে বড়ো আর কিছু নেই। তাঁর স্পষ্ট ঘোষণা দেখুন:

"I even say—twisting Democritus' sentence to suit my own ends—that only man really exists, all the rest being merely opinion. I have always been, and will

always be a Man-worshipper, only I am incapable of expressing this properly."

লিও তলস্তয়ও ছিলেন মানবপ্রেমিক। কিন্তু ম্যাক্সিম গর্কি ও লিও তলস্তয়ের জীবনদৃষ্টিতে পার্থক্য ছিল। গর্কি দোষগুণে মিশ্রিত গোটা জীবনকে গ্রহণ করতে পারতেন। মানুষের প্রতি ভালোবাসায় তলস্তয় দোষগুণের বিচার করতেন, এবং সেই বিচারবোধ থেকে তিনি মানবসমাজকে দু' শ্রেণীতে বিভক্ত করতেন। তাঁর ধারণা ছিল এক মানুষ ভগবানের সৃষ্টি, অন্য মানুষ শয়তানের সৃষ্টি। শয়তানের সৃষ্ট মানুষ তাঁর কাছে ঘৃণ্য ছিল। গর্কি তা না করে মানুষ মাত্রকেই ভালোবেসে ফেলেছিলেন।

দুই মানবতাবাদীর জীবনদৃষ্টিতে এই পার্থক্য কেন ঘটেছিল, খানিকটা বিশ্লেষণ না করলে তা উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। গর্কির সাহিত্যচিন্তাকে হৃদয়ঙ্গম করতে হ'লে তাঁর পারিপার্শ্বিক ও যুগটিকে বিচার করতে হয়। একথা ঐতিহাসিকভাবেই সত্য যে, যত যুগন্ধর লেখক এসেছেন, দেখা গেছে তাঁদের অধিকাংশেরই আবির্ভাব হয়েছে কোনো একটা বিরাট সমাজ পরিবর্তনের মুখে—অর্থাৎ এককথায় যাকে বলা যায় কালান্তর। সেই সামাজিক রূপান্তরের চিত্রই ফুটে ওঠে যুগন্ধর সাহিত্যিকদের রচনায়।

সস্ত্রীক ম্যাক্সিম গোর্কি (১৯০৫ সালে গৃহীত চিত্র)

লিও তলস্তয় এবং ম্যাক্সিম গর্কি দু'জনই দু' শতকের লেখক। ঊনবিংশ শতকের শেষার্ধে তাঁদের সাহিত্যজীবন শুরু ও বিংশ শতকের প্রথমার্ধে শেষ। তবে লিও তলস্তয়কে বলা যায় গর্কির পূর্বসূরী। নাগরিকজীবনের কৃত্রিমতায় বিতৃষ্ণ হয়ে কৃষকদের মধ্যে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিলেন তলস্তয় এবং কৃষকজীবনের সরলতাকেই তিনি ধরে নিয়েছিলেন মানুষের আদর্শরূপে। কৃষকরা হবে স্বয়ম্ভর অথচ অনাড়ম্বর। কৃষিজীবনের প্রাচুর্যের স্বপ্ন তাঁর ছিল; কিন্তু তার সঙ্গে মিশ্রিত ছিল বিজ্ঞানবিমুখতা। বিজ্ঞানের সাহায্যে মানুষ প্রকৃতিকে জয় করে যে অগ্রসর হচ্ছে এবং সেই বিজ্ঞানের উন্নতির ওপরই যে কৃষকদেরও উন্নতি নির্ভর করছে, এ কথা তলস্তয় বিশ্বাস করতেন না। তিনি মনে করতেন, বিজ্ঞান নিয়ে যারা মাতে তারা শয়তানের সৃষ্ট জীব—বুদ্ধি খাটিয়ে মানুষকে শোষণ ও পীড়ন করাই তাদের ধর্ম। তিনি বিশ্বাস করতেন, এক শ্রেণীর মানুষের স্বভাবেই এই প্রবণতা রয়েছে এবং তার পরিবর্তন হওয়া সম্ভব নয়। এখানেই মানবপ্রকৃতি সম্পর্কে একটা চিরন্তনতার সংজ্ঞা দেবার চেষ্টা তিনি করেছেন এবং দলিত-নিপীড়িতদের দরদী হয়ে উঠেছেন। এই দরদে কোনো কৃত্রিমতা ছিল না—সত্যনিষ্ঠ হয়ে তিনি তাদের বেদনাকে রূপ দিয়েছেন তাঁর অমর সাহিত্যে। কিন্তু তাদের দুঃখের কারণ নিরূপণ করতে গিয়ে তিনি দায়ী করেছেন বিজ্ঞানকে এবং জীবনদৃষ্টিতে সেই কারণেই বিজ্ঞান সম্পর্কে একটা বিচ্ছিন্নতাবোধ রয়েছে তাঁর সাহিত্যে।

জীবনদৃষ্টিতে তলস্তয়ের সঙ্গে গর্কির এখানেই পার্থক্য। সমাজের এক সামগ্রিক রূপান্তরের চিন্তা করেছেন তিনি এবং সেই রূপান্তরের সম্ভাবনাও তাঁর অজ্ঞাত ছিল না। মানুষের দুঃখের জন্যে বিজ্ঞানকে দায়ী না করে সেই বিজ্ঞান করায়ত্ত করে যারা মানুষের দুঃখের নিমিত্ত হয়ে উঠেছে তাদেরকেই তিনি দায়ী করেন। দায়ী করলেও কিন্তু মানববিদ্বেষ তাঁর মনের কোণে কখনো স্থান পায় নি। বরঞ্চ তিনি তাদের করুণার পাত্র মনে করতেন। তিনি বিশ্বাস করতেন ঐ অবস্থার আমূল পরিবর্তন করা সম্ভব এবং সেই পরিবর্তিত সমাজব্যবস্থায় মানুষেরও পরিবর্তন হবে। হয়তো পুরনো পাপ বেঁচে থাকার চেষ্টা করবে কিছু সংখ্যক মানুষের মধ্যে; কিন্তু নব প্রজন্ম হবে সেই পাপ থেকে মুক্ত। এমনই এক নির্মল নিষ্কলুষ মানবজাতির স্বপ্ন

দেখতেন গর্কি। এই নতুন পৃথিবীর স্বপ্নই তাকে বিশ্বপ্রেমিক করে তোলে। মানুষের পাপের সঙ্গে তার স্বভাবকে যুক্ত করে দেখেন নি বলেই গর্কি হয়ে উঠতে পেরেছিলেন এক অখণ্ড মানবতা-বোধের অধিকারী এবং সেই অখণ্ড মানবতাবোধই সমাজের সামগ্রিক রূপান্তর সম্পর্কে তাঁর প্রত্যয়কে দৃঢ় করে। তিনি দেখতে পেয়েছিলেন বিজ্ঞানকে শোষক-শ্রেণীর কবল থেকে মুক্ত করে জনসাধারণের করায়ত্ত করতে পারলেই মানুষ জীবন-ধারণের দুঃখ থেকে মুক্তি পাবে এবং সেই গণশাসিত রাষ্ট্রে ব্যক্তিমানুষের শোষণের প্রবৃত্তিও ধীরে ধীরে লুপ্ত হবে। তলস্তয় যেটাকে মানুষের স্বভাব বলেছেন গর্কি সেটাকে বলেছেন সমাজের প্রভাব। সমাজ-ব্যবস্থাটাকে পাল্টে দিতে পারলেই সেই প্রভাবটাও চলে যাবে।

লিও তলস্তয় প্রকৃতির পূজারী হয়েও প্রকৃতিকে জয় করার সংকল্প পরিহার করেছেন। অথচ প্রকৃতিকে জয় করার দুর্জয় সংকল্প মানুষের সেই আদিকাল থেকে এবং সেই সংকল্পকে কার্যে পরিণত করার যে প্রয়াস তাই বিজ্ঞান। গর্কি মানবসমাজের এই অন্তর্নিহিত সত্যটিকে ধরতে পেরেছিলেন এবং তা পেরেছিলেন বলেই একটি বৈপ্লবিক পরিবর্তনকে হৃদয়ংগম করতে সক্ষম হয়েছিলেন। সেই পরিবর্তন যারা আনবে এবং তার জন্যে যারা সংগ্রাম করছে তাদের তিনি দেখতে পেয়েছিলেন। প্রোলেতারিয়েত বা সর্বহারা শ্রেণী আনবে সেই পরিবর্তন এবং সেই সংগ্রামের পুরোভাগে রয়েছে তারাই। সর্বহারা শ্রেণীর নেতৃত্বে যে পরিবর্তন আসবে তাতেই মুক্তি পাবে শোষিত কৃষক শ্রেণী এবং বিজ্ঞান তখন আর শোষণযন্ত্রে পরিণত না হয়ে হবে সর্বসাধারণের কল্যাণে নিয়োজিত। কেবল বিষয়-সম্পদই নয়, শিল্প-সাহিত্য অর্থাৎ যাবতীয় সাংস্কৃতিক সম্পদও যে শ্রমার্জিত ফলই, এই দৃঢ় প্রত্যয় গর্কির ছিল বলেই তিনি বলেছেন :

> "We must realise that it is the masses' labour that is the chief organiser of culture and the creator of all ideas."

এই উক্তি করেন তিনি ১৯৩৪ সালে নিখিল সোভিয়েত লেখক সংঘের প্রথম সম্মেলনে। ইতিহাসের ব্যাখ্যা যে অসম্পূর্ণ এবং অনেক ক্ষেত্রে বিকৃত সে সম্বন্ধেও হুঁসিয়ার করে তিনি বলেন :

> "The role of the labour processes which transformed the erect animal into Man and laid down the foundations of culture has never been as thoroughly and profoundly studied as the subject deserves."

তলস্তয়ের সাহিত্যের ওপর আলোক-পাত করতে গিয়ে লেনিন বলেন যে, তলস্তয় যখন এসেছিলেন তখন রাশিয়ায় চলেছিল এক চরম দুর্যোগ। পুঁজিবাদের দাপটে কৃষক ও জমিদারদের পুরনো রাশিয়া ভেঙে পড়ছিল। রাশিয়ার কৃষকেরাই ছিল দিনের বীর, কিন্তু সেই অগ্রসিত

[illegible] বিলগুলোতে তারা ছিল নিষ্ক্রিয় দর্শকের ভূমিকায়। তাই সেই নিষ্ক্রিয় কৃষককুলের বেদনাকাতর মূর্তিই পরম সহানুভূতি ও মমতার স্পর্শে ফুটিয়ে তুলেছেন লিও তলস্তয়। কিন্তু তাতে বিদ্রোহের কোনো সুর নেই। শিল্প-সৌকর্যে, মমত্বে, করুণায় তলস্তয়-সাহিত্য অমর ও বিশ্বজয়ী ; কিন্তু সমাজচিন্তা ও দার্শনিক দৃষ্টিতে তা দুর্বল।

তলস্তয় শুনেছেন কৃষকদের হাহাকার, দেখেছেন অশ্রুর বন্যা, উপলব্ধি করেছেন তাদের অসহায় অবস্থা। কৃষককুলের সেই শোচনীয় দুর্গতি তাঁকে বিচলিত করেছিল ; কিন্তু তাদের মুক্তির যথার্থ পথ তিনি দেখতে পান নি। অভিজাত শ্রেণীও তখন ভেঙে পড়ছিল। নিজে অভিজাত বংশোদ্ভব হ'লেও অভিজাত শ্রেণীর প্রতি ছিল তাঁর তীব্র ঘৃণা। নাগরিকজীবনের প্রতিও ছিল তাঁর প্রবল বিতৃষ্ণা। রাশিয়ায় বুর্জোয়া সমাজ তখন উন্নতির দিকে—কিন্তু পশ্চিম দুনিয়ার মতো পুঁজিবাদের নিরঙ্কুশ বিকাশ রাশিয়ায় সম্ভব হচ্ছিল না—অভিজাত শ্রেণীর সঙ্গে হাত মিলিয়ে তাকে খুঁড়িয়ে-খুঁড়িয়ে এগুতে হচ্ছিল। সেই পঙ্গু বুর্জোয়া সমাজের প্রতিও আস্থা ছিল না তলস্তয়ের। এই কারণেই তিনি বুর্জোয়া বিজ্ঞান ও বুর্জোয়া শিল্পকলার ওপর ছিলেন খড়্গহস্ত। অথচ বুর্জোয়াদের তখন ঠেকানো সম্ভব ছিল না। তারাই ক্ষমতা দখল করে বসেছিল। বুর্জোয়া শ্রেণীর প্রতি বিদ্বেষবশত তিনি বিজ্ঞান ও শিল্পকলার দানকেই অস্বীকার করে বসলেন। এ সম্বন্ধে সোভিয়েত রাশিয়ার প্রথম শিক্ষামন্ত্রী আনাতোলি লুনাচারস্কি একটি সুন্দর উপমা দিয়েছেন :

"He (Lev Tolstoi) has cast out the child with the bath water. And the child, no matter how badly brought up by the ruling classes, is nevertheless hardy and viable."

গর্কি কিন্তু এ ভুল করেন নি। তলস্তয় যাদের সঙ্গে মিশেছিলেন এবং যাদের মধ্যে থেকে জীবনের শেষার্ধ কাটিয়েছিলেন তারা অর্থাৎ কৃষক শ্রেণী ছিল পুরনো জগতের মানুষ। বিজ্ঞান ও শিল্পকলার প্রতি অনাগ্রহ এবং সন্দেহের ভাব তাদের মনে থাকা স্বাভাবিক। যন্ত্রবিজ্ঞানে এগিয়ে যাবার কথা তারা সেদিন চিন্তা করে নি বা উপলব্ধি করতে পারে নি। কিন্তু আরেক দিকে যে নতুন সর্বহারা শ্রেণী ধীরে ধীরে বেড়ে উঠছিল তারা কিন্তু যন্ত্রবিজ্ঞান ও শিল্পকলাকে নিজের করে নিয়েছিল। তাদের মধ্যে এ বোধ জেগে উঠেছিল যে, একমাত্র সমাজতান্ত্রিক কাঠামোতেই বিজ্ঞানের উৎকর্ষ ও সংস্কৃতির বিকাশ হওয়া সম্ভব।

সর্বহারা শ্রেণীর মনের এই খবর রাখতেন গর্কি। মহান শিল্পী হয়েও তলস্তয় ইতিহাসের যে নির্দেশকে ধরতে পারেন নি, ম্যাক্সিম গর্কি তা ধরতে পেরেছিলেন। এখানেই গর্কির দূরদর্শিতা ও দৃষ্টির ব্যাপকতা। বিজ্ঞান ও শিল্পকলার প্রতি গর্কির যতখানি আগ্রহ ছিল ততখানি আগ্রহ খুব কম সংখ্যক লেখকের মধ্যেই দেখতে পাওয়া যায়। সৌন্দর্য-পূজারী গর্কির একটি মনোরম উক্তি এখানে উদ্ধৃত করা যেতে পারে। ১৯২৮ সালে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের উত্তরে গর্কি বলেন :

"I, for my part, do not write any poetry, but we need poetry in one form or another. Everyone is fond of music and songs, and as far as I know you all like beautiful words and beautiful women. So how can one do without poetry? All culture has originated from it, and the work we are doing, dear comrades, has a poetry of its own."

পূর্বেই বলেছি, লিও তলস্তয় একজন প্রকৃতি-উপাসক ছিলেন। জীবনের অধিকাংশ কাল তিনি প্রকৃতির মধ্যেই কাটিয়েছেন। তাঁর সাহিত্যে প্রকৃতির সৌন্দর্য বর্ণনা অতুলনীয়। কিন্তু গর্কি যেমনভাবে মানুষকে প্রকৃতির সাঙ্গীকৃত করেছেন তলস্তয় তেমনভাবে করেন নি। বরং লেখক ও দার্শনিক হিসেবে তলস্তয়ের মনে যেন একটা ভীতির ভাবই ছিল প্রকৃতি সম্বন্ধে। বিজ্ঞানভীতিই সেই প্রকৃতি-ভীতির প্রসূতি। প্রকৃতিকে জয় করে মানুষের কল্যাণে নিয়োজিত করতে হ'লে বিজ্ঞানই পথ। তলস্তয় মনে করতেন বিজ্ঞান শয়তানের হাতের ক্রীড়নক। পৃথিবী-বন্দনা করেছেন তিনি বড়ো জোর এই আশায় যে, হলকর্ষণ করে, প্রচুর ফলন ফলিয়ে কৃষকরা সুখী হতে পারবে। প্রকৃতির কাছে এর চেয়ে বড়ো কোনো দাবি তাঁর ছিল না।

আর গর্কির প্রকৃতিবন্দনা দেখুন। তাঁর সর্বহারা বলে : হ্যাঁ, মা প্রকৃতি, তুমি মহীয়সী, তুমি বিস্ময়, তুমি নির্মম, তুমি অন্ধ মা, তবু তুমি সৎ ; তোমার বিশ্ব ও তোমার জীবনধারা শুভ। জ্ঞানী ও সংঘবদ্ধ মানবজাতির হাতে পড়ে, আমরা সমস্ত প্রয়াস দিয়ে যে বিশ্ব মানবগোষ্ঠী গড়ে তুলব তার হাতে পড়ে তোমার বিপুল সম্পদভাণ্ডার এমন চরমোৎকর্ষ লাভ করবে যা আমাদের সমস্ত আশাকে ছাড়িয়ে যাবে। এবং আমরা এও জানি কী করে তা জয় করতে হবে, কীভাবে তাকে গড়ে তুলতে হবে। হে প্রকৃতি, ভাবীকাল যে বিস্ময়কর নতুন মানুষের জন্ম দেবে তাদের কাছে সত্যি তুমি কী অপরূপ স্বর্গরাজ্য হয়ে উঠবে! এই কারণেই প্রকৃতি, আমি তোমাকে ভালবাসি।

গর্কি বলেছেন, "প্রকৃতিকে যে আমি ভালোবাসি তার কারণ এই।"

এ যেন বিশ্বজয়ের স্বপ্ন। প্রকৃতি মানুষের কল্যাণে লাগে ; সেই কারণেই গর্কির প্রগাঢ় প্রকৃতিপ্রেম। বলা বাহুল্য, গভীর মানবপ্রীতিই গর্কিকে প্রকৃতিপ্রেমিক করে তোলে। মানুষকে বাদ দিয়ে তাঁর কাছে প্রকৃতি জড়, নিষ্প্রাণ। মানব জাতিকে তিনি স্বর্গরাজ্যে উন্নীত করার স্বপ্ন দেখেছেন। প্রকৃতিকে জয় করে মানুষই সেই স্বর্গ রচনা করবে এবং সেই স্বর্গের সোপান রচনা করতে করতেই মানুষ নীচতা, হীনতা, অসূয়া, ঘৃণা, স্বার্থপরতা থেকে মুক্ত হয়ে ধীরে ধীরে দেবত্ব লাভ করবে।

গর্কির জন্মশতবার্ষিকীতে আজ তাঁর দীপ্ত ঘোষণা স্মরণ করে স্বতই শ্রদ্ধায় মস্তক অবনত হয়।

ফোল্ডিং ৫০ গুলির পিস্তল

লাইসেন্সের প্রয়োজন নেই। আমেরিকান মডেল। চোর এবং বন্য জন্তুর হাত থেকে নিজেকে বাঁচান। পিকনিক, ভ্রমণ এবং নাটকের পক্ষে উপযোগী।

৫০ গুলির ব্যবস্থা-সহ অটোমেটিক। হাল্কা ওজন এবং চোখ ধাঁধান আগুন আপনাকে বিপদ থেকে রক্ষা করবে।

মূল্য ৫০ গুলীসহ নং ৩৩ টাঃ ১৩·৫০। জার্মান মডেল নং ৯৯ টাঃ ১৫·৫০। ভি, পি, পি, চার্জ টাঃ ২·৫০। চামড়ার কেস ৭, টাকা। অতিরিক্ত প্রতি একশত গুলী ৫, টাকা।

GEM ARTS (WBM—15)
P.B. 1325, Delhi—6.

কমরেড

ম্যাক্সিম গর্কি

॥ এক ॥

এ আজব শহরের সব কিছুই ছিলো অবিশ্বাস্য—মানুষের ধারণার অতীত। গীর্জার রঙ-বেরঙের গম্বুজ আকাশ ছুঁয়ে গেলেও কলকারখানার প্রাচীর ও চিমনির সারি ঘণ্টাঘর আড়াল করে আরও উঁচুতে মাথা তুলে উঠেছে। ব্যবসাকুঠির বড় বড় দেওয়াল আর পাথরে গাঁথা প্রাচীরের গোলক-ধাঁধায় সে গীর্জাগুলো যেন চোখেই পড়ে না। ধুলো আর ধ্বংসস্তূপের মধ্যে যেমন ফুটন্ত সুন্দর ফুল তলিয়ে যায়। প্রার্থনার ডাকে মুখর ঘণ্টার যাতন স্বর নিরেট লোহার ছাদে প্রতিধ্বনিত হয়ে ইমারতের ঘিঞ্জি আবহাওয়ার মধ্যে কোথায় হারিয়ে যায়।

ইমারতগুলো চোখ ধাঁধানো, কিন্তু এখানকার মানুষগুলো দেখতে কুৎসিত ও স্বভাবে অপ্রিয়। ধূসর রঙা ইঁদুরের মত সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত এরা ছটফটে গতিতে শহরের সঙ্কীর্ণ আঁকা-বাঁকা গলির মধ্যে ঘুরে বেড়াতো। লোভের আগুনে জ্বলা চোখের দৃষ্টি তাদের একমুঠো অন্নের খোঁজে অথবা ফূর্তির সন্ধানে রত। দুর্বল সবলের কাছে নতি স্বীকার করে কি না, সেদিকেও সতর্ক কুটিল নজর রাখা হোত। যারা ধনী ক্ষমতা তাদেরই একচেটিয়া। সাধারণ লোকের বিশ্বাস একমাত্র অর্থই মানুষকে লোক ও স্বাধীনতার আস্বাদ দিতে পারে। এই ক্ষমতার মোহই ক্রীতদাস ভাবসম্পন্ন মানুষগুলোকে উন্মাদ করে তুলত। ধনীদের বিলাস-ব্যসন দারিদ্র্যকে করতো ঈর্ষান্বিত। টাকার ঝঙ্কারই ছিল এদের কানে সুমিষ্ট সঙ্গীত—তাই পরস্পরের শত্রুতা করে নিষ্ঠুরতার রাজত্ব অবাধে চালাতো সকলে।

শহরের আকাশে ভোরের সূর্য আলোয় ঝলমল করে উঠলেও অতলতলে জীবনের গভীর অন্ধকারের আস্তানা। মানুষগুলো যেন ছায়ার মিছিল। রাত্রিবেলা অসংখ্য উজ্জ্বল আলো জ্বালা হলেও তখন পথে ভিড় করে নামতো সেই সব ক্ষুধার্ত মেয়েরা, যারা অর্থের বিনিময়ে ভালো-বাসার বেসাতি করে। ভোজ্যবস্তুর ভেসে-আসা সুগন্ধ নাকে পেয়ে উপবাসী মানুষের বিদ্রোহী চোখ তীব্র ক্ষুধায় জ্বলে উঠত। হাজার দুঃখের আঘাতেও প্রতি-বাদহীন ব্যথায় চাপা গোঙানী শহরের দিকে দিকে ক্ষীণ প্রতিধ্বনিতে পড়ত ছড়িয়ে।

জীবন ছিলো দুর্বিষহ ও নানা উৎকণ্ঠার জ্বালায় তিক্ত। মানুষ মানুষের শত্রু। সবাই ভুল পথ ধরে চলেছে। হয়তো আঙুলে গোনা যায় এত নগণ্য কয়েক-জনকে সম্পূর্ণ অমানুষ বলা চলে না, কিন্তু তারা প্রায় পশুর মতো অসহায়—তারা বাকিদের তুলনায় আরও নিষ্ঠুর...।

সবাই বেঁচে থাকতে চায়, কিন্তু কেমন করে বাঁচবে, স্বাধীন ইচ্ছাকে প্রশ্রয় দেওয়ার ক্ষমতা তাদের নেই। সামনে এগিয়ে যাওয়ার পথে তাদের দৃষ্টি আপনা থেকেই আবর্তিত হোত বর্তমানের দিকে—যে যুগ একটি লুব্ধ দানবের শক্তিশালী আপোষহীন হাতে প্রগতির উদ্যমকে থামিয়ে দেয়—চটচটে আঠার মতো আলিঙ্গনের জালে বন্দী করে রাখে।

কুৎসিত বাস্তবের বিকৃত মুখভঙ্গিমার দিকে চেয়ে অসহায় আর দিক্‌ভ্রান্ত মানুষ স্থাণুর মত অচল হয়ে দাঁড়িয়ে হাজার হাজার বিবর্ণ চোখ মেলে জীবন যখন অব্যক্ত ভাষায় আবেদন জানায়, তখন কোথায় সেই ভবিষ্যতের সুখী সমুজ্জ্বল

সেদিন থেকেই এমনি সুন্দর ছবি তুলবেন

...যেদিন আপনি কিনে নেবেন Agfa ক্লিক III

- শুধু ঠিকমত তাক ক'রে কলটি টিপে দিন।
  কোনো হিসেবের ঝামেলা নেই—ভুল হবার ভয় নেই।
- প্রত্যেক '১২০' রোলে ১২টি বড় ছবি (৬ × ৬সেন্টিমিটার)
- এভার-রেডি কেস্, পোর্ট্রেট লেনস্ ও ফ্ল্যাশ গান
  আলাদা দামে পাওয়া যায়।

আগফার তত্ত্বাবধানে প্রস্তুতকারক : দি নিউ ইণ্ডিয়া ইণ্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড, বরোদা।

একমাত্র পরিবেশক :

AGI আগফা-গেভার্ট ইণ্ডিয়া লিমিটেড

বোম্বাই • নিউ দিল্লী • কলিকাতা • মাদ্রাজ

MAG-103-203 BEN

অপ্রতিভ হাসিতে মুখ ভরে গেলেও কথাটি ফিরে উচ্চারণ করার সাহস ছিলো না তার। এর আগে কোনদিন এ-পথে নামে নি এমন একটি লোক কাছে এসে কাঁধে হাত রেখে আত্মীয়তার সুরে বলল—'কমরেড।'

ঘা-খাওয়া হৃদয় আগে কোনদিন উপলব্ধি করে নি এমন আনন্দে কান্না চাপতে গিয়ে জোর করে সলজ্জ মৃদুহাসি মুখে ফুটিয়ে তুলল মেয়েটি। কালকে যে চোখ ক্ষুধার্ত নির্লজ্জ দৃষ্টি নিয়ে পৃথিবীর দিকে তাকিয়েছিলো, আজ সে চোখে সদ্যোজাত পবিত্র আনন্দের অশ্রু ঝলমল করে উঠছে। দুনিয়ার মেহনতী মানুষের বিশাল পরিবারভুক্ত ছন্নছাড়া দলের উল্লাস তখন শহরের রাস্তায় রাস্তায় উদ্দীপিত। বিদ্বেষ ও বিরূপ মনোভাব নিয়ে সেদিকে চেয়ে রইলো ইমারতের ঘোলাটে চোখগুলো।

কালই ভিখারীটার হাত থেকে মুক্তি পাবার আশায় আর বিবেকের দংশন মেটাতে একটা সামান্য পয়সা ওরা ছুঁড়ে ফেলেছিলো। শব্দটা সেই ভিখারীর কানেও গেলো। এই প্রথম এমন ভিক্ষা সে পেলো যাতে তার দারিদ্র্যের কশাঘাতে দীর্ণ হৃদয়ে বেজে উঠছে আনন্দের ও কৃতজ্ঞতার স্পন্দন।

সহিসকে এতকাল ওরা পিঠে খোঁচা দিয়েছে যাতে করে সে সেই খোঁচা অভুক্ত ক্লান্ত ঘোড়াগুলোর পিঠে ফিরে লাগায়। লোকটি মার খেতে অভ্যস্ত, পাথরের রাস্তায় চাকার একঘেয়ে শব্দে তার সব অনুভূতি ভোঁতা হয়ে গেছে। এক গাল হেসে সেও একজন পথচারীকে ডেকে বলল—

'কোথাও পৌছে দেব—কমরেড?'

শব্দটা উচ্চরণ করে কিন্তু ভয় পেলো সে। তাড়াতাড়ি সরে পড়ার চেষ্টায় লাগাম টেনে সে আর একবার পথিকের দিকে তাকালো। চওড়া লাল টকটকে মুখে হাসির রেশ তখনও মুছে যায় নি।

পথিকও কোমল দৃষ্টি বিনিময় করে ঘাড় নেড়ে বলল—

'ধন্যবাদ কমরেড—বেশি দূরে আমি যাব না।'

হেসে খোস মেজাজে চোখ পিট পিট করতে করতে সহিস মুখ ঘুরিয়ে রাস্তা দিয়ে প্রচণ্ড শব্দ করে এগিয়ে গেল।

মানুষ দলবেঁধে ফুটপাত দিয়ে হাঁটছিলো। যার আবির্ভাব সমস্ত পৃথিবীতে ঐক্য স্থাপনের উদ্দেশ্যে সেই মহান শব্দটি বিদ্যুতের ঝলকের মত ওদের মধ্যে আনাগোনা করছিল।

'কমরেড।'

গভীর, উচ্চপদস্ত দাড়িগোঁফে আচ্ছন্ন এক পুলিশ অফিসার এমন একটি দলের দিকে এগিয়ে এলো। রাস্তার কোণে দাঁড়িয়ে একটি বড়ো বক্তৃতা নিয়ে চলেছে, তা কিছুক্ষণ শুনে আস্তে আস্তে বলল—

'রাস্তায় মিটিং করা বে-আইনী—মশাইরা সরে পড়ুন—'

আর এক মুহূর্ত থেমে দৃষ্টি নত করে মৃদু কণ্ঠে আরো যোগ দিলো—

'কমরেডরা—।'

যারা বুকের ভেতরে কথাটি নীরবে বয়ে চলেছিলো, রক্ত-মাংসে যারা কথাটিকে সজীব করে তুলছিলো—যুদ্ধ আহ্বানের মত উদাত্ত স্বরে ঐক্য সাধনের কথা স্মরণ করে তাদের মুখ নবীন স্রষ্টার গর্বোচ্ছল আনন্দে ঝলমল করতে লাগলো। যে শক্তি তারা জুগিয়েছে এই কথাটির মধ্যে, তার বিনাশ নেই, তার অবসান নেই।

তাদের বিরুদ্ধে ইতিমধ্যেই নীরবে সারি সারি বৈচিত্র্যহীন মোহান্ধ অস্ত্রবাহিনী জড়ো হচ্ছিল। অত্যাচারীদের উষ্মা বিচারের দাবিতে মুখর বিদ্রোহীদের উপর পড়ল বলে।

বিশাল শহরে সরু কানাগলির মধ্যে, অজানা কারিগরের হাতে-গড়া হিমশীতল স্তব্ধ প্রাচীরের অন্তরালে মানুষের মৈত্রী ও সাম্যবাদের প্রতি সুদৃঢ় বিশ্বাস একটু একটু করে ছড়িয়ে পড়ছে—

'কমরেডরা—।'

এখানে-ওখানে আগুনের স্ফুলিঙ্গ জ্বলছে, যা একদিন লেলিহান শিখায় মানুষের প্রতি মানুষের আত্মীয়তার বন্ধন বিস্তার করে সমস্ত পৃথিবীকে গ্রাস করে ফেলবে।' পৃথিবীকে গ্রাস করার পরে বিকৃত মানসের ঈর্ষা, ঘৃণা আর নিষ্ঠুরতাকে পুড়িয়ে ছাই করে দেবে। সকলের মনে কোমল সুর তুলে হৃদয়কে একটি হৃদয়ে পরিণত করবে। সৎ মহৎ নর-নারীর সেই হৃদয় বন্ধুত্বে ঘনীভূত, স্বাধীন মেহনতী মানুষের সুখী পরিবারের সঙ্গে একাত্ম।

ক্রীতদাসের তৈরি মত মহানগরীর রাস্তায় এতকাল ছিলো নির্মমতার রাজত্ব—এখন জন্ম নিলো এবং শক্তি সঞ্চয় করল মানুষের প্রতি মানুষের বিশ্বাস, আত্মসুখ ও অন্যায়কে জয় করার প্রবল ক্ষমতা।

অনিশ্চিত নিরানন্দ অস্তিত্বে ভবিষ্যতের দিকে ফেরা একটি উজ্জ্বল উচ্ছ্বসিত তারার মত দীপ্ত সেই শব্দটি যেন মশাল হয়ে জ্বলে উঠল—

'কমরেড।'

অনুবাদ—জয়ন্তী সেন

দেশ সেবায় নিয়োজিত,

এ্যালবার্ট ডেভিড লিমিটেড

কলিকাতা—৫০

নীতি ও বিজ্ঞানানুযায়ী ঔষধ

প্রস্তুতকরণের অগ্রণী

—ব্রাঞ্চ সমূহ—

বোম্বে - মাদ্রাজ - দিল্লী - নাগপুর

বেজওয়াডা - শ্রীনগর - গোহাটী

ম্যাক্সিম গোর্কি

দীপঙ্কর সেন

সোভিয়েট ইউনিয়নের সাহিত্যিকেরা ষাটটি ভাষায় গ্রন্থ রচনা করে থাকেন। এর মধ্যে চল্লিশটি অধিজাতীয় ভাষাও উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করে আছে। তবে সে দেশের জনসাধারণের উপর প্রভাবের দিক থেকে বিচার করতে গেলে এইগুলির মধ্যে রুশ-সাহিত্যকেই প্রাধান্য দিতে হয়। পুশকিন এবং লেরমন্তোভের যুগ থেকেই রুশ-সাহিত্য আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি এবং সমাদর লাভ করেছে এবং সোভিয়েট ইউনিয়নের অন্যান্য সাহিত্যের বিকাশের ধারাকে অসাধারণভাবে প্রভাবিত করেছে। উনিশ শতকের রুশীয়-সাহিত্যে যে 'সমালোচনাত্মক বাস্তবতা' রুপায়িত হয়ে উঠেছিল তার প্রতিনিধি স্থানীয় ছিলেন গোগোল, তুর্গনেভ, তলস্তয়, দস্তোয়েভস্কি প্রমুখ দিকপালেরা। এ'দের অবদান রুশ-সাহিত্যের অংগনেই সীমিত থাকে নি বিশ্ব-সাহিত্যের ভান্ডারকেও এ'রা নানাপ্রকার সম্পদে পরিপূর্ণ করে তুলেছিলেন। পরবর্তীকালে বহু খ্যাতনামা সাহিত্যিক রাশিয়ার মানুষের জীবনের এবং মুক্তি সংগ্রামের সমস্যাগুলিকে তাঁদের রচনার মাধ্যমে রুপায়িত করেছিলেন। এ'দের মধ্যে ম্যাক্সিম গোর্কির নাম বিশেষভাবে স্মরণীয়। তিনি তাঁর সৃজনশীল কর্ম-পদ্ধতির সাহায্যে 'সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার' ভিত্তি সার্থকভাবে স্থাপন করতে পেরেছিলেন। সোভিয়েট এবং বিশ্ব-সাহিত্যে সে পদ্ধতি আজ আরও বিকশিত হয়ে উঠেছে।

বাংলা দেশের পাঠকসমাজে গোর্কির 'মা' উপন্যাসটি সুপরিচিত। আর পাঁচখানা উপন্যাসের মত এটি শুধু একটি গল্প বলেই থেমে যায় নি। আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় গোর্কির এই অমর গ্রন্থ এদেশের বহু বিপ্লবী যুবককে অদ্ভুতভাবে অনুপ্রাণিত করেছে। 'মা' উপন্যাসটি মূলত জার-শাসিত রাশিয়ার শ্রমিক আন্দোলনের এক চিত্র। আমাদের দেশের মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের কাছে এটি এত সমাদর লাভ করল কেমন করে একথা ভেবে অনেকেই খুব বিস্ময় বোধ করেন। এ প্রসঙ্গে একটি কথাই বলা চলতে পারে। মানুষের প্রতি এত বড় শ্রদ্ধার কথা এবং এত বড় আশার কথা খুব কম লেখকই বলতে পেরেছেন। লাঞ্ছিত এবং অপমানিত মানুষের চরমতম আশা এবং পরমতম অধিকারের কথা এমন বলিষ্ঠ ভঙ্গীতে কেউ আমাদের শোনাতে পারেন নি। নির্যাতিত মানুষকে গোর্কি যে পথের সন্ধান দিয়েছিলেন, সে পথ সহজ নয়। কিন্তু ইতিহাস বলে যাঁরা মানুষকে দুর্গম পথে ডাকেন, মানুষ তাঁদেরই শ্রদ্ধা করে। দৈনন্দিন জীবনে মানুষের যত দুর্বলতা, যত মূঢ়তাই প্রকাশ পাক না কেন, শক্তিহীনতাই মানবজাতি সম্পর্কে শেষ কথা নয়। এই সত্যই গোর্কির রচনার ভিতর দিয়ে নতুন করে ঘোষিত হওয়ায় পরাধীন ভারতের মানুষ তাঁকে অত্যন্ত আপনজনের মতন করে গ্রহণ করেছিল। সমাজের নিচের তলার মানুষকে তিনি একদিন দুর্গম পথের ভিতর দিয়ে পরিপূর্ণতার দিকে আহবান করেছিলেন। দুঃখের মধ্য দিয়ে এবং তপস্যার মধ্য দিয়ে বাংলার বিপ্লবী তরুণেরা সে আহবানে সাড়া দিয়েছিল। গোর্কি তাঁর পাঠকগোষ্ঠীকে ভাবের ললিত রাজ্য থেকে বহু দূরে সরিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন এবং কর্মক্ষেত্রে তাদের সক্ষম এবং স্বাধীন হবার নির্দেশ দিয়েছিলেন।

ম্যাক্সিম গোর্কির প্রকৃত নাম আলেক্সি ম্যাক্সিমোভিচ পেশকফ। ১৮৬৮ খৃস্টাব্দে অর্থাৎ আজ থেকে এক শ' বছর আগে তাঁর জন্ম হয়েছিল। রুশ ভাষায় 'গোর্কি' শব্দটির অর্থ তিক্ত। জীবনে নানাপ্রকার তিক্ত অভিজ্ঞতা লাভ করার পরই তিনি এই নামটি গ্রহণ করেছিলেন। গোর্কি নিতান্ত শিশু বয়সে পিতৃহীন হন এবং তারপর তাঁর মা দ্বিতীয়বার বিবাহ করার জন্য মাতামহীর আশ্রয়ে লালিতপালিত হতে থাকেন। মাতামহ মানুষটি ছিলেন অত্যন্ত সুরাসক্ত এবং নানা অছিলায় তিনি গোর্কির উপর অকথ্য অত্যাচার করতেন। রাশিয়ার এই বিশ্ববিখ্যাত সাহিত্যিক মাত্র পাঁচ মাস একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করার সুযোগ পান এবং আট বছর বয়স থেকেই জীবিকা অর্জন করতে বাধ্য হয়েছিলেন। নানা রকমের কাজ করতে করতে তিনি রাশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে ঘুরে বেড়িয়েছেন এবং নানা ধরনের লোকের সঙ্গে মেলামেশা করেছেন। এমনি করে তিনি যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে পেরেছিলেন তা তাঁর ভবিষ্যৎ জীবনের সাহিত্য সৃষ্টির প্রয়াসকে সার্থক করে তুলেছিল। প্রথম যৌবনে নিদারুণ এক হতাশার মুহূর্তে পিস্তল দিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিলেন তিনি। এতে তাঁর মৃত্যু না হলেও শ্বাসযন্ত্রটি সাংঘাতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। এর জনাই পরবর্তীকালে তিনি যক্ষ্মারোগাক্রান্ত হয়েছিলেন।

বড় হয়ে মানুষকে সর্বপ্রকারে সাহায্য করবেন এবং তাদের সেবা করবেন, বাল্যকালে এমন এক প্রতিজ্ঞা তিনি করেছিলেন। তাঁর সমস্ত রচনাই এই মানবতার সংকল্পে পরিপূর্ণ। গোর্কির প্রথম লেখা প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৯২ খৃস্টাব্দে। এর পরের বছর একটি সংবাদপত্রের প্রতিষ্ঠানে তাঁর একটি চাকরী জুটে যায়। প্রথম বড় গল্প 'চেলকাস' প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৯৫ খৃস্টাব্দে এবং ঠিক তার পরের বছর শ্বাসযন্ত্রে যক্ষ্মারোগ দেখা দেয়। ১৮৯৭ খৃস্টাব্দে তাঁর গল্পসংগ্রহ প্রকাশিত হবার পর পাঠকসমাজে এক প্রবল উদ্দীপনা দেখা দেয়। সামান্য কয়েকদিনের মধ্যেই এই গ্রন্থের লক্ষাধিক খন্ড অনায়াসে বিক্রী হয়ে গিয়েছিল। উনিশ শতক শেষ হবার আগেই তিনি অসাধারণ লোকপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন। ১৯০১ খৃস্টাব্দে মস্কো আর্ট থিয়েটারে তাঁর 'নাদনে' (নীচের মহল) নাটকটি দেখবার জন্য প্রচন্ড ভিড় হতো। কিন্তু জারের অধীনস্থ শাসকসম্প্রদায় কোনদিনই তাঁকে ভাল চোখে দেখেন নি।

এর অব্যবহিত পরের যুগটি রুশ-ইতিহাসের এক অতি তাৎপর্যময় যুগ। ১৯০৪ খৃস্টাব্দে রুশ-জাপান যুদ্ধ শুরু হল। এক বছরের উপর এই যুদ্ধ চলার পর পোর্ট আর্থারের যুদ্ধে জাপানের কাছে রাশিয়া শোচনীয়ভাবে হার স্বীকার করতে বাধ্য হল। এই পরাজয়ের পর জারের অধীনস্থ শাসকসম্প্রদায়ের অক্ষমতা সম্পর্কে কোন সন্দেহের অবকাশ রইল না। তাছাড়া এই যুদ্ধের অর্থনীতিক প্রতিক্রিয়ায় মানুষ বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠল। শাসকসম্প্রদায়ের লোকেরা গুলী চালিয়ে এই বিক্ষোভকে দমন করার চেষ্টা করলেন। এক দিনের গুলী চালনার ফলে ১৯০৫ খৃস্টাব্দের ৯ই জানুয়ারী এক হাজার লোক নিহত হন এবং আরো এক হাজার আহত হয়েছিলেন। রুশ-ইতিহাসে এই দিনটির নাম 'রক্তাক্ত রবিবার'। লেনিন বলেছেন রাশিয়ার বীর শহীদদের এই রক্তের স্রোত থেকেই রুশ-বিপ্লবের সূচনা। ১৯০৫ খৃস্টাব্দের বিপ্লব শুরু হতে না হতেই গোর্কি কারারুদ্ধ হলেন। সারা বিশ্বের শিল্পী এবং সাহিত্যিকেরা তাঁর মুক্তির জন্য আবেদন করলে তিনি মুক্তি লাভ করেন। এরপর তিনি কিছুদিনের জন্য আমেরিকা সফরে গিয়েছিলেন। সেখান থেকে ফিরে ইটালীর কাপ্রি দ্বীপে হৃতস্বাস্থ্য উদ্ধারের প্রচেষ্টায় তিনি একটি বাড়ি করেন। কাপ্রিতে তিনি একসঙ্গে ছ' বছর কাটান এবং সেই সময়েই তাঁর অন্যান্য বহু রচনার সঙ্গে 'মা' উপন্যাসটি প্রকাশিত হয়। রাশিয়ার জনসাধারণ চিরদিনই তাঁর লেখাগুলিকে

১৯৩৪ সালে সোভিয়েট লেখক সংস্থার প্রথম অধিবেশনে ভাষণরত গোর্কি

অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করেছে এবং স্বয়ং লেনিনও এই উপন্যাসটি পাঠ করে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন।

সাধারণভাবে কমিউনিস্ট বলতে যাদের বোঝায় গোর্কিকে ঠিক সেই দলে ফেলা যায় না। প্রকৃতপক্ষে তিনি কোনদিন কোন রাজনৈতিক দলে যোগদান করেন নি। তবে সমাজের নিচের তলার মানুষেরও উপর তাঁর অগাধ বিশ্বাস ছিল। এই স্তরের মধ্যে তিনি কেবল কৃষক এবং মজুর সম্প্রদায়কেই ফেলতেন না—এর মধ্যে ছিল বহু ছন্নছাড়া নামগোত্রহীন মানুষ ও নীতিজ্ঞানশূন্য বারবনিতা। এইখানে আমাদের দেশের শরৎচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর অসাধারণ মিল খুঁজে পাওয়া যায়। ইংরাজ কবি সেক্সপীয়রের হ্যামলেট নাটকটিতে এক জায়গায় আছে—What a piece of work is a man! How noble in reason! How infinite in faculty! in form and moving how express and admirable! In action how like an angel! in apprehension how like a God! একই সুর বারবার গোর্কির লেখার ভিতর দিয়ে ধ্বনিত হয়ে উঠেছে। তাঁর সাহিত্যিকজীবনের প্রথম পর্যায়ে রাশিয়ার ভ্রাম্যমাণ বেদে সম্প্রদায়ের মানুষদেরও তিনি অত্যন্ত দরদের সঙ্গে বুঝবার চেষ্টা করেছিলেন। তাঁদের অবাধ স্বাধীন জীবনধারা তাঁকে এতদূর আকৃষ্ট করেছিল যে তাঁর প্রথম লেখা 'মাকার চুদ্রা'-য় এক বুড়ো বেদের মুখ দিয়ে তিনি ঘোষণা করেছিলেন—'সভ্য সমাজে মানুষকে ক্রীতদাসের মত জীবনযাপন করতে হয়।' সে জীবন অতি নিরানন্দ জীবন। বিপ্লবী রোমাণ্টিকতার শিল্পী গোর্কি, দস্তোয়েভস্কি কিম্বা তলস্তয়ের মত, মানুষ ঈশ্বরের কৃপায় ধন্য বলেই তাকে সবচেয়ে বড় স্থান দেন নি। সেদিক থেকে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর চিন্তাধারার সামঞ্জস্য লক্ষণীয়। রবীন্দ্রনাথকে এক সাক্ষাৎকারে আইনস্টাইন জিজ্ঞাসা করেছিলেন—Do you believe in Divinity as apart from humanity? কবি বলেছিলেন মানুষকে বাদ দিয়ে কোন প্রকার দৈবসত্তায় তাঁর কোন আগ্রহ নেই। গোর্কিরও বিশ্বাস ছিল মানুষ নিজের মহিমায় মহিমান্বিত। তিনি বলেছেন—"Man ... That's tremendous! It includes all beginnings and all endings. All things are part of Man; all things are for Man. Only Man exists; the rest is merely the work of his hands and his mind. How marvellous is Man. How proud the word rings—Man. A man should be respected. Not pitied—pity is degrading. Respected!

কোন totalitarian রাষ্ট্রই এমন একজন মানুষের মনঃপূত হতে পারে না। গোর্কি সেদিক থেকে বরং কিছুটা কমিউনিস্ট বিরোধী-ই ছিলেন। তিনি ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য এবং মতের স্বাধীনতায় বিশ্বাস করতেন। রুশ-বিপ্লবের পরেও কমিউনিস্টদের কঠোর দমননীতিকে তিনি কোনদিন সমর্থন করেন নি। তবে কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে এই মতান্তর কোনদিন মনান্তরে পরিণত হয় নি। অবশ্য এ ব্যাপারে লেনিনের কৃতিত্বও বড় কম নয়। গুণের আদর জানতেন বলেই গোর্কিকে তিনি সম্পূর্ণভাবে দেশপ্রেমিক বলে মেনে নিয়েছিলেন।

গোর্কির জীবনের আরেকটি বড় দিক হল তিনি রুশ-সাহিত্যের ভিন্ন ভিন্ন পর্বের মাঝেও নিজের সাধনা অব্যাহত রাখতে পেরেছিলেন। সোভিয়েট পর্বে তাঁর নেতৃত্বের কথা সুধীজন স্বীকৃত। ১৯৩২ খৃস্টাব্দে রাশিয়ায় যে শিল্প এবং সাহিত্যের সম্মেলন হয়েছিল তিনিই ছিলেন তার সভাপতি। এই সম্মেলনেই 'সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার' ভিত্তি সার্থকভাবে স্থাপিত হয়েছিল। এর আগে রাশিয়ায় বহু সাহিত্যগোষ্ঠী এবং সঙ্ঘ ছিল। গোর্কির প্রচেষ্টায় এই সম্মেলনের পর সেগুলি মিলিত হয়ে 'সোভিয়েট লেখক সঙ্ঘ' প্রতিষ্ঠিত হয়। আজও এই প্রতিষ্ঠানটিই সোভিয়েট ইউনিয়নের লেখকদের একমাত্র সংস্থা। সে হিসাবে গোর্কিকে সোভিয়েট যুগের রুশ-সাহিত্যের জনক বলেও অভিহিত করা যেতে পারে। অধ্যাপক গোপাল হালদার এ প্রসঙ্গে বলেছেন—'সোভিয়েট যুগের সাহিত্যের কথা গোর্কিকে ছাড়া বলাই চলে না। বরং গোর্কিকে দিয়েই সোভিয়েট সাহিত্যের ঐতিহাসিকেরা তা আরম্ভ করেন—যেমন লেনিনের কর্মজীবন থেকে সোভিয়েট শক্তির বিকাশ, তেমনি যেন গোর্কির সাহিত্যকর্মেই (খৃঃ ১৮৯২) সোভিয়েট সংস্কৃতির বীজ রোপণ।'

কিছু কিছু সমালোচকেরা গোর্কির রচনায় নানাপ্রকার দোষ-ত্রুটি আবিষ্কার করেছেন। তাঁর লেখার সুর নাকি বড়ই চড়া, মেজাজও নাকি বিশেষ গরম। এ ছাড়া তিনি প্রচারবাদী, আঙ্গিকবিমুখ এবং রচনাশৈলীতে অমনোযোগী এমন অভিযোগও কেউ কেউ করেছেন। তাঁর আত্মজীবনী, Diaries and Notes এবং তাঁর নাটকগুলি পড়ে মনে হয় এই সব সমালোচকেরা তাঁর প্রতি অবিচার করেছেন। মস্কো আর্ট থিয়েটারের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ভি নেমিরোভিচ ডান্চেনকো তাঁর নীচের মহল নাটকটি সম্পর্কে বলেছিলেন—The Lower Depths had a sort of 'explosive' brilliance. Without exaggeration I may say that the Russian stage had never before presented such a dazzling combination of artistic delight and political prophecy, impregnated with unwavering faith in the coming emancipation. অনুবাদের মাধ্যমে তাঁর লেখা ছোট গল্প, উপন্যাস এবং অন্যান্য রচনাবলী পড়বার সময় একথাই বারবার মনে হয় যে তিনি কালাতিক্রমণকারী শিল্পী।

যা দেখেছি, যা পেয়েছি

স্মৃতিচয়ন

শ্রীসুধীরঞ্জন দাস

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

(৭)

ঊনিশ শ' ঊনপঞ্চাশ সালের ১২ই এপ্রিলে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে প্রায় তিন মাসাবধিকাল আপন বাড়িতে আবদ্ধ থাকার পর যখন একটু সুস্থ হয়ে উঠলাম তখন ভারতের শেষ গভর্নর জেনারেল সি রাজাগোপালাচারী সিমলা -ভাইসরিগ্যাল লজে বেশ একটি মধ্যাহ্নভোজের আয়োজন করেছিলেন বলে মনে আছে। সেই তাঁকে প্রথম খুব কাছাকাছি দেখেছিলাম। হাইকোর্ট সম্বন্ধে নানা কথা তাঁর সঙ্গে হয়েছিল। তারপর আমি কোর্টে বসে অল্প অল্প কাজ করতে শুরু করলাম। কিন্তু পাঞ্জাব হাইকোর্টে এক বছরে খুব বেশি ভারী মামলা আমি করতে পারি নি। ওরই মধ্যে দু-চারটে যাতে বেশ আইনগত বিতর্ক হয়েছিল তা ল রিপোর্টেই ছাপা হয়ে আছে। একটা কেস ছিল সম্পত্তি বাঁটোয়ারা সম্পর্কে। বাদী ছিলেন পিতার একপক্ষের সন্তান এবং প্রতিবাদী দুজন ছিলেন অন্যপক্ষের দুই ছেলে। এঁরা লুধিয়ানা জেলার দিয়ালপুরা নিবাসী হিন্দু জাট। বাদীর দাবি হোলো পিতার সম্পত্তির বাঁটোয়ারা হবে চুণ্ডাওয়াল নীতি প্রয়োগে এবং তাতে করে তিনি পিতার সম্পত্তির অর্ধেক পাবেন। তাঁর এই দাবির সমর্থনে তিনি ১৮৫২ সালের ওয়াজিব-উল-আরজের উপর নির্ভর করলেন। ওয়াজিব-উল-আরজে যে সিদ্ধান্ত রেকর্ড করা হয়, তার সত্যতা প্রামাণিক বলেই মানতে হয়। কিন্তু অপর দিকে বিবাদীরা বললেন—না, তা নয়. ভাগবাঁটোয়ারা হবে পাকওয়ান্ড নীতি অনুসারে অর্থাৎ ওয়ারিসদের মাথা গুণে এবং তাঁরা দেখালেন ১৮৮২ সালের রেওয়াজ-ই-আম। রেওয়াজ-ই-আমের মধ্যে যে সিদ্ধান্ত রেকর্ড করা হয় তারও সত্যতা প্রামাণিক বলে ধরতে হয়। পাঞ্জাবে এই সব বিষয়ে স্থানীয় প্রথারই (কাস্টম) প্রাধান্য। এ ক্ষেত্রে একই গ্রামে একই জাতের লোকেদের প্রথা দু রকমে রেকর্ড হয়েছে। কোন্ রেকর্ডটা মান্য হবে? ফয়সালা করতে হোলো যে ১৮৫২ সালের ওয়াজিব-উল-আরজে লিখিত প্রথার প্রামাণিকতা ১৮৮২ সালের রেওয়াজ-ই-আমের লিখিত প্রথার প্রামাণিকতা দ্বারা নষ্ট হয়ে গেছে এবং শেষোক্ত প্রথাই বলবৎ থাকবে। সুতরাং ভাইয়েরা পাগড়ী বা মাথা গুণতি করেই উত্তরাধিকারী হবেন অর্থাৎ তিন ভাইয়ে প্রত্যেকে এক-তৃতীয়াংশ হিস্যা পাবেন।

আমার অসুখের ঠিক আগেই একটা কেসে যে রায় দিয়েছিলাম তা নিয়ে খবরের কাগজ মহলে বেশ উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছিল এবং আমরা কিছু বাহবাও পেয়েছিলাম। দিল্লী থেকে "প্রতাপ" বলে একটা দৈনিক উর্দু কাগজ বের হোতো। সেই কাগজের সম্পাদক ছিলেন কে নরেন্দ্র। ৩রা ফেব্রুয়ারী ১৯৪৮ সালে দিল্লীর তদানীন্তন চীফ কমিশনার এস খুরসীদ হুকুম দিলেন যে ঐ কাগজের প্রকাশককে তিন হাজার টাকা জমানত দিতে হবে। তিন হাজার টাকা জমা দেওয়া হোলো ১৮ই ফেব্রুয়ারী। একজন উদ্বাস্তু সেই কাগজের সম্পাদকের কাছে যে একখানা চিঠি লেখেন তা ঐ কাগজে ৬ই মে ১৯৪৮ সালে ছাপা হোলো। পুঁজিবাদীদের ইহুদী বেনিয়া, হৃদয়হীন চামার ইত্যাদি বলে বর্ণনা করা হয়েছিল। পশ্চিম পাকিস্তানের মুসলমানেদের জবরদস্ত অত্যাচারী (tyrant) বলা হয়েছিল। চিঠিখানার চুম্বক হোলো যে আমরা যাদের সন্তানেরা দেশের জন্য প্রাণ দিয়েছি, যাদের সর্বস্ব খোয়া গিয়েছে, যাদের সন্তান গেছে, ভদ্রাসন গেছে, অর্থ হারিয়েছে এবং যারা ফকির হয়ে পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছি আমাদের কথা কেউ ভাবেনই না। দেশের নেতারা যাঁদের আমরা প্রায় ভগবানের আসনে বসিয়েছিলাম তাঁরা আমাদের ভিক্ষুকের সমান জ্ঞান করেন। এর পর বলা হয়েছিল যে যতদিন সরকার আমাদের কাছে ঋণ শোধ না করেন ততদিন অন্য কারো প্রতি দাক্ষিণ্য দেখাবার অধিকার সরকারের নেই। মনে রাখতে হবে একদিন নিয়তি মামুদ গাজনভির খড়্গের মত ঘাড়ে এসে পড়বে। বাস্তুহারাদের মর্মন্তুদ বেদনা জানিয়ে, পুঁজিবাদীদের অসহানুভূতি, পশ্চিম পাকিস্তানের মুসলমানদের নির্মম ব্যবহার এবং সরকারের ঔদাসীন্যের উল্লেখ করে পত্রলেখক সম্পাদকের কাছে আবেদন করেন যে তিনি তাঁর জ্বালাময়ী লেখনী চালিয়ে যেন সরকারের দৃষ্টি এই সব দুর্গতদের দুঃখ দূরীকরণের দিকে আকর্ষণ করবার জন্যে যত্নবান হন। লেখাটার মধ্যে স্থানে স্থানে বেশ উষ্মার পরিচয় ছিল এবং কোন কোন অংশে শ্লেষ ও বিদ্রুপেরও অভিব্যক্তি প্রকাশ পেয়েছিল। এই চিঠি প্রকাশিত হয়েছিল "এক দুখী দিল কি পর দরদ পুকার" নামের শীর্ষে। এর ঠিক আগে অর্থাৎ ২রা মে ১৯৪৮ "প্রতাপ" কাগজে একটি খবর বের হয় "মৌলানা আজাদ আউর কিদোয়াই ওয়ার্কিং কমিটি সে ওয়াক আউট কর গয়ে" এই শিরোনামায়। ওয়ার্কিং কমিটির মিটিংয়ে যা ঘটেছিল তা লিখে বলা হয়েছিল যে হিন্দু ও শিখ সভ্যেরা সে মিটিংয়ে বলেছিলেন যে মুসলমানেদের আর বিশ্বাস করা চলে না, কেন না তাঁরা দুমুখো নীতি অনুসরণ করছেন এবং তাঁরা হয় মুসলিম লীগ ছাড়ুন, নয়ত কংগ্রেস ছেড়ে চলে যান।

যেই না এই দুটি জিনিস প্রকাশিত হোলো তার অব্যবহিত পরেই অর্থাৎ ১৫ই মে ১৯৪৮ সালে দিল্লীর চীফ কমিশনার হুকুম দিলেন যে জমানতের তিন হাজার টাকাই Press (Emergency Powers) Act 1931-এর Sec. 8(1)-র বলে বাজেয়াপ্ত করা হোলো। সম্পাদক এই অর্ডারের বিরুদ্ধে দরখাস্ত করলেন। স্পেশাল বেঞ্চে বসলাম আমি, অছরুরাম ও ফ্যালশ। দরখাস্তকারীর তরফে ছিলেন মহাজন সাহেবের ছেলে দরাকিষণ এবং সরকারের তরফে ছিলেন সর্দার কর্তার সিং চাওলা যিনি তখন এ্যাডভোকেট জেনারেলের পদে অস্থায়ীভাবে কাজ করছিলেন। দু পক্ষের জবাব শুনে আমরা

তিনজন জজই একমত হয়ে রায় দিলাম। রায়টা আমিই লিখেছিলাম। তাতে পিনাল কোডের ১২৪এ ধারা ও ডিফেন্স অফ ইণ্ডিয়া রুলের চেয়ে এই প্রেস (ইমার্জেন্সী পাওয়ার্স) এ্যাক্টের পরিধি যে বেশি বিস্তৃত সেটা বলে, দিশী ও বিলাতী নানা নজির উল্লেখ করে চিঠিখানার মর্মার্থ বিবেচনা করে সাব্যস্ত করা গেল যে লেখাটায় লেখকের মনের ঝাল নানা বর্ণে রঞ্জিত করে বলা হলেও সেটা ঠিক আইনের মধ্যে পড়ছে না। তা ছাড়া বলা হোলো যে দরকার হলে Sedition আইনেরও পরিবর্তন করা দরকার। জামানত বাজেয়াপ্তের হুকুম নাকচ করে দিলাম। বলতেই হবে যে ইংরেজ আই সি এস জজ ফ্যালশ সাহেবও সর্বান্তঃকরণে আমাদের দুজনের সঙ্গে একমত হতে পেরেছিলেন।

এরপর আরো কয়েকটা বড় কেস করেছিলাম। একটাতে প্রশ্ন উঠেছিল পাক্কা আড়তিয়ার সঙ্গে মফস্বলের ব্যাপারীর আইনগত সম্বন্ধ নিয়ে। এটা ছিল তিনজন জজের ফুল বেঞ্চ। আর একটা ফুল বেঞ্চ করেছিলাম পুরনো Companies Act 1913-এর Sec. 153A নিয়ে। Dominion of India Vs. Rai Bahadur Sohon Lal-এ খুব চিত্তাকর্ষক প্রশ্ন উঠেছিল রেল স্টেশনে বুক স্টল করবার লাইসেন্স-এর পরিধি ও মর্মার্থ নিয়ে। এই সব কেসই ল রিপোর্টে পাওয়া যাবে

(৮)

দেখতে দেখতে উনিশ শ' উনপঞ্চাশের ডিসেম্বর মাস এসে পড়ল। হাইকোর্ট ছুটি হয়ে আসছে। দুর্জয় শীত পড়ে গেল। জানালার কাঁচের মধ্যে দিয়ে দেখলাম আকাশ ঘন মেঘাচ্ছন্ন এবং অন্ধকার হয়ে আসছে। মাঝে মাঝে পেঁজা তুলোর মত দু'-চারটে তুষারকণার ঝাঁক হাওয়ায় উড়ে আপনিই গলে যাচ্ছে। ঠিক তুষারপাতের পূর্বাভাস। ডাক্তারদের পরামর্শ হোলো যে এই সময়ে আমার পক্ষে সিমলা ছেড়ে নিচে নেমে যাওয়াই বিধেয়। কোর্ট ছুটি হবার যে ক'টা দিন বাকী আছে সে ক'টা দিন দিল্লীর ডিস্ট্রিক্ট কোর্ট পরিদর্শন করলেই চলবে। বাড়িঘর সব গুছিয়ে বন্ধ করে আমি সস্ত্রীক নেমে গেলাম সিমলা থেকে দিল্লী অভিমুখে। সঙ্গে এলেন তীরথ সিং যাঁকে ইতিপূর্বেই আমি আমার ব্যক্তিগত সচিবপদে নিয়োগ করেছিলাম। পথে স্মরণীয় কিছু ঘটে নি। আমরা দিল্লী এসে উঠলাম ওয়েস্টার্ন কোর্ট-এ। তারপর শুরু হোলো অবিরাম জনস্রোত। পাঞ্জাব হাইকোর্টে নাম লেখান যত এ্যাডভোকেট দিল্লী জজ কোর্ট কিংবা আশেপাশের কোর্টে প্র্যাকটিস করতেন তাঁরা একে একে আমার স্বাস্থ্য সম্বন্ধে অনুসন্ধান নিয়ে আমাকে তাঁদের শুভেচ্ছা জানিয়ে যেতে লাগলেন। আমার উপর এ'দের গভীর সম্প্রীতি দেখে খুবই মুগ্ধ হয়েছিলাম। এই সূত্রেই প্রথম আলাপ হয় রণজিৎ সিং নারুলা এবং প্রীতম সিং সফীরের সঙ্গে।

প্রথমেই গেলাম গুরগাঁও কোর্ট দেখতে। দিল্লী থেকে জায়গাটা বেশি দূরে নয়। পালাম বিমানঘাটি ছাড়িয়ে খানিকটা দূরে গেলেই পৌঁছান যায় গুরগাঁও ডিস্ট্রিক্ট ও সেসন্স জজের আদালত। সেখানে সমাগত মুন্সেফ, সাবজজ ও ডিস্ট্রিক্ট জজের সঙ্গে আলাপ হয়ে কোর্টের সুবিধে ও অসুবিধের কথা জেনে নিলাম। তারপর গেলাম ওখানকার বার এ্যাসোসিয়েশনে। দেখলাম যে সভ্য সংখ্যা কম নয়। পাঞ্জাব বিভাগের পর অনেক বাস্তুহারা এ্যাডভোকেট গুরগাঁও কোর্টেই প্র্যাকটিস করতে বসে গেছেন বলে শুনলাম। জলযোগ ও চা-পান সেরে গুরগাঁও সহরটা ঘুরে দেখে এলাম। সহরটি ছোট্ট কিন্তু বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন বলেই মনে হোলো। সহরের গণ্ডীর ঠিক বাইরে এবং দিল্লী যাবার পথের ধারে ধারে অনেকগুলি ছোট ছোট পাতা দিয়ে বানান ঝুপড়ি দেখলাম। জিজ্ঞাসা করে জানলাম যে সেগুলিতে থাকে "মিও" বলে একশ্রেণীর পাঞ্জাবী মুসলমান—খানিকটা বেদে জাতীয় মানুষ।

গুরগাঁও থেকে ফিরে আসবার দু'-এক দিন পরেই গেলাম দিল্লীর ডিস্ট্রিক্ট কোর্ট পরিদর্শনে। কোর্টঘরের যে অবস্থা দেখলাম তা বর্ণনা করা শক্ত। চারদিক

আমার স্বাস্থ্যের উপর আর বেশি চোট না পড়ে। যখন শুনলেন যে আমি দু'-একদিনের মধ্যেই কলকাতায় ফিরে যাব তখন আমার দিকে চেয়ে বললেন—"এত তাড়া কিসের; দিল্লীতে কয়েকদিন আরো বিশ্রাম করে গেলে হয় না? সময়টা ত' এখানে এখন বেশ ভালই।" সর্দারের মেয়ে মণি বেন ঘরে ঢুকতেই মনে হোলো যে তিনি আমাকে ওঠাবার জন্যেই এসেছেন, কেন না শুনেছিলাম যে ভদ্রমহিলার ট্যাঁকঘড়িতে নির্ধারিত ক' মিনিট গেলেই তিনি আগন্তুকদের উঠে পড়বার ইঙ্গিত করেন তাঁর পিতা ক্লেশ লাঘব করবার জন্যে। মণি বেন ঘরে ঢুকতেই আমি উঠে পড়লাম। দেখে তিনি বললেন—"না, না, উঠবেন না। একটু চা আনতে বলেছি।" ব্যাপার কি? বেশ অনুভব করলাম যে সর্দারের আমার উপর যেন একটু মমতা হয়ে গিয়েছে এবং সেইটে মেয়েও জানেন। বসে পড়লাম। চা খেয়ে এবং সঙ্গে সঙ্গে খোসগল্প করে অল্প পরেই উঠে পড়লাম। পরেও মণি বেনের সঙ্গে দেখা হয়েছে দিল্লীতে অনেকবার। তিনি যে তাঁর ট্যাঁকঘড়ি দেখিয়ে আমাকে সেবার উঠতে বলেন নি সে কথা নিয়ে অনেকবার হাসাহাসিও হয়েছে।

ওয়েস্টার্ন কোর্টে ফিরে গিয়ে বুবুকে সব কথা জানালাম। তিনি বললেন—"সর্দার যখন বলেছেন ক'দিন বিশ্রাম করে যেতে তখন ক'দিন না হয় থেকেই যাওয়া যাক।" তা-ই ঠিক হোলো। তখন আমার দিল্লী ও তার আশেপাশে যে সব দেখবার জিনিস আছে তা দেখে বেড়াতে লাগলাম। বন্ধু শ্যামাপ্রসাদের সঙ্গে মধ্যে মধ্যে দেখা হয়, তাঁর বাড়িতে কিংবা আমার ওয়েস্টার্ন কোর্টের ঘরে। শীতের দিনে প্রাতর্ভ্রমণ করে বেশ সুখ বোধ হোতো। দিল্লীতে প্র্যাকটিস করেন এমন অনেক এ্যাডভোকেটদের সঙ্গে দেখা ও আলাপ-পরিচয় হতে লাগল। তা ছাড়া ফেডারেল কোর্টের জজ বিজন মুখার্জীর সঙ্গে তাঁর ২নং হেস্টিংস রোডের বাড়িতে বেশ গল্পগুজব করা যেতো। কিন্তু দিন আর যেন কাটে না। জানুয়ারী মাসের দশ দিন বয়ে গেল। আর কতকাল দিল্লীতে বসে থাকব?

ওয়েস্টার্ন কোর্টে সে সময়ে থাকতেন কলকাতা হাইকোর্টের জজ সত্যেন মল্লিক মশায়ের তৃতীয় পুত্র বি· সি· মল্লিক ওরফে খচু মল্লিক ও তাঁর সহধর্মিণী। আর থাকতেন দিল্লীর সেণ্ট স্টিফেন কলেজের নামকরা অধ্যক্ষ রেভারেণ্ড রুদ্রর জামাতা ডাঃ জি· সি· চ্যাটার্জী ও তাঁর স্ত্রী। আর একজন অসাধারণ লোক থাকতেন ওয়েস্টার্ন কোর্টে। তিনি ছিলেন বিখ্যাত সাংবাদিক স্যার উষানাথ সেন। তাঁর সঙ্গে প্রথম আলাপ হয় সিমলা পাহাড়ে। সেই থেকে কেন জানি না তিনি আমাকে খুবই সৌহার্দ্য দিয়েছেন। শেষ বয়সে তিনি পক্ষাঘাত রোগে অনেক ভুগে মারা যান। সেই সময় সেখানে এসে জুটেছিলেন রেভারেণ্ড মাইকেল স্কট মহাত্মা গান্ধীর বিশ্বস্ত দূত শ্রীঘোষের বন্ধুরূপে। হঠাৎ একদিন শ্রী এইচ· ভি· আর· আয়েঙ্গার যিনি তখন স্বরাষ্ট্রসচিব—ওয়েস্টার্ন কোর্টে সস্ত্রীক বেশ খানিকক্ষণ গল্প করে গেলেন। বেশ ইঙ্গিত পেলাম যে আমাকে দিল্লীর ফেডারেল কোর্টে বদলী করা হবে যত শীঘ্র সম্ভব। আমি যখন সিমলায় ছিলাম তখন এই ভদ্রলোক আমার অসুখের সময় আমাকে দেখতে গিয়েছিলেন। পরে ইনি রিজার্ভ ব্যাংকের গভর্নর হয়েছিলেন। বেশ বুদ্ধিমান অমায়িক লোক। এই রকম করে আরো ক'দিন কেটে গেলে ১৫ই জানুয়ারী ১৯৫০ সালে পেলাম শ্রীআয়েঙ্গারের চিঠি যে বড়লাট বাহাদুর আমার ফেডারেল কোর্টের জজ হবার প্রস্তাব মঞ্জুর করেছেন এবং আমাকে অবিলম্বে মেডিক্যাল সার্টিফিকেট দাখিল করতে হবে। পরদিনই দিল্লীর সিভিল সার্জেনের কাছ থেকে সার্টিফিকেট পেয়ে তা' সেইদিনই দাখিল করলাম। তারপর এলো আর একটি ১৯শে জানুয়ারী আমার জীবনে। সকালের কাগজে খবর বের হোলো যে ভারতের গভর্নর জেনারেল সি· রাজাগোপালাচারী আমাকে ফেডারেল কোর্টের জজ নিয়োগ করেছেন যেদিন থেকে আমি আসন গ্রহণ করব সেই দিন থেকে এবং আমার জায়গায় সিন্ধু দেশের জুডিসিয়াল কমিশনার এরিক ওয়েস্টন পাঞ্জাবের চীফ জাস্টিস হবেন। বুবুর মন থেকে একটা জগদ্দল ভার যেন নেমে গেল, সিমলা পাহাড়ে আমাকে আর যেতে হবে না বলে। কিন্তু বললেই ত' হয় না। পাঞ্জাবের কার্যভার বুঝিয়ে না দিলে ত' ফেডারেল কোর্টে বসতে পারা যাবে না। মনে আছে সেদিনকার উত্তেজনা। সর্দার প্যাটেলের বাড়িতে গেলাম তাঁকে ধন্যবাদ দেবার জন্যে। যখন সেখানে বসে আছি তখনই সর্দারের নির্দেশ অনুসারে তাঁর একান্ত সচিব ভি· শংকরকে সিন্ধু প্রদেশের জুডিসিয়াল কমিশনার এরিক ওয়েস্টন সাহেবকে ট্রাংক টেলিফোনে যোগাযোগ করে ব্যবস্থা করলেন যে পরদিন অর্থাৎ ২০শে জানুয়ারী দুপুরের আগে তারযোগে তিনি পাঞ্জাবের চীফ জাস্টিস পদের চার্জ নেবেন এবং আমি সেই দিনই ফেডারেল কোর্টে আসন গ্রহণ করব। সর্দারের বাড়ি থেকে ন্যায় হীরালাল কানিয়া—যিনি তখন ভারতের মুখ্য ন্যায়াধীশ—তাঁকে জানিয়ে দেওয়া হোলো যে আমি অবিলম্বেই তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসছি। সর্দারের বাড়ি থেকে সোজা চলে গেলাম ১০ নং এ্যালবুকার্ক রোডে যেখানে কানিয়া সাহেব থাকতেন। সে রাস্তাটার পরে নামকরণ হয়েছে তিশ জানুয়ারী মার্গ বলে। কানিয়া সাহেব খুবই হৃদ্যতার সঙ্গে আমাকে সম্বর্ধনা করে বসালেন। তাঁর কাছে শুনলাম যে সর্দার প্যাটেল তাঁকে ডিসেম্বরের শেষ ভাগে নাকি বলেছিলেন যে ফেডারেল কোর্টের কাজ যখন বেড়েছে তখন আর একজন জজ নিলে তিনজন করে জজ দু'টি বেঞ্চে বসতে পারবেন। কানিয়া সাহেব যদি চান তবে আর একজন জজের ব্যবস্থা সর্দার নিশ্চয়ই করে দেবেন। কানিয়া সাহেব তৎক্ষণাৎ রাজী হয়ে চিঠি দিলেন যে ফেডারেল কোর্টে আরো একজন জজ দরকার হয়ে পড়েছে জরুরীভাবে। সে চিঠি পাওয়ামাত্র সর্দার প্রধানমন্ত্রী নেহরুকে রাজী করিয়ে আমার নিয়োগের ব্যবস্থা করেছেন। কানিয়া সাহেব তখনি ফেডারেল কোর্টের তদানীন্তন রেজিস্ট্রার পি· এন· মূর্তিকে টেলিফোন করে আনিয়ে নির্দেশ দিলেন যে পরদিনই অর্থাৎ ২০শে জানুয়ারী সকালেই আমার অভিষেক হবে এবং মূর্তি সাহেব যেন সব কাগজপত্র ঠিক করে রাখেন।

হৃষ্টচিত্তে ওয়েস্টার্ন কোর্টে ফিরে এসে বুবুকে সব সমাচার জানালাম। তাঁর মুখখানা একটা অনির্বচনীয় উজ্জ্বলতায় কমনীয় হয়ে উঠল। উনিশ শ' পঞ্চাশ সালের উনিশ তারিখ জানুয়ারীতে আমার পাঞ্জাব হাইকোর্টের এক বছরের চীফ জাস্টিসগিরি শেষ হোলো।

[ক্রমশঃ]

মাসিক ৬০০৲ টাকা উপার্জন করুন

অবসর সময়ে বিশ্ব-বিখ্যাত রোমার ঘড়ির অর্ডার বুক করিয়া। বিনামূল্যে সর্তাবলী এবং স্যাম্পেল ঘড়ির জন্য পত্র লিখুন।

TAJCO (W B C—88)
P. Box 1383, Delhi—6.

ভিয়েৎনাম: ঝড়ের কেন্দ্রে

বরুণ রায়

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

"গুড গড! এবার বোধহয় আমাদের আর নিস্তার নেই!"

মর্টারের গোলায় তাঁর পায়ের কাছের মাটি উপড়ে চোখে-মুখে ছিটিয়ে পড়তেই আতঙ্কে প্রায় চীৎকার করে উঠলেন ডং খে গ্যারিসনের ফরাসী কম্যান্ডার।

ওদিকে কয়েকটি ব্যারাকে আগুন জ্বলছে দাউ দাউ করে। ব্যারাক বলে আর চেনা যায় না সেগুলিকে। দুমড়ে মুচড়ে আছড়ে পড়েছে মাটির বুকে। যেন কেউ শুকনো পাতাগুলি একসঙ্গে জড়ো করে রেখে তাতে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে।

এতো নিখুঁত টিপ গেরিলাদের! কম্যান্ডিং অফিসার অবাক হয়ে ভাবলেন।

কিন্তু ভাববার সময় আর নেই। ঝাঁকে ঝাঁকে গোলা এসে পড়ছে ক্যাম্পের ভেতর। অব্যর্থ গোলা। অব্যর্থ আর ভারী। ধোঁয়ায় ভরে গেছে চারদিক। তার ওপর কুয়াশা পড়েছে এত ঘন হয়ে যে মাটি পর্যন্ত প্রায় দেখা যাচ্ছে না। বোঝা যাচ্ছে বর্ষা শেষ হয়ে আসছে। কিন্তু তাতে কি। এত জঘন্য মাটি কামড়ানো কুয়াশা যে ভালোভাবে কিছু ঠাহর করা যাচ্ছে না।

এর চাইতে বর্ষাই যেন ভালো ছিল। তবু গেরিলারা একটু চুপ ছিল। নিশ্চিন্তে একটু বিশ্রাম করার সুযোগ ছিল।

চার মাস আগে ভিয়েৎমিন গেরিলারা আরেকবার ডং খে দখল করবার চেষ্টা করেছিল। দখল করেও নিয়েছিল। কিন্তু মাত্র দু'দিনের জন্যে। দু'দিন পরে ফরাসী ছত্রী সৈন্যরা নেমেছিল আকাশ থেকে, আবার দখল করে নিয়েছিল ঘাঁটিটি।

তারপর থেকে সব চুপচাপ। ফরাসীরা ভাবল গেরিলাদের মেরুদণ্ড ভেঙে গেছে, তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়েছে, সুতরাং অন্তত কিছুকালের জন্যে নিরাপদ।

কিন্তু তারা এটা বুঝতে পারে নি যে গেরিলারা আসলে বর্ষা শেষ হবার জন্যে অপেক্ষা করছিল। যখন বুঝতে পারল তখন আর উঠে দাঁড়িয়ে প্রস্তুত হবার সময়টুকুও নেই।

কম্যান্ডিং অফিসার আকাশের দিকে তাকালেন। আকাশ একটানা সাদা। কোথাও এতটুকু ছিদ্র নেই যেখান দিয়ে সাহায্য আসতে পারে গতবারের মত। আকাশ থেকে মাটিও দেখা যায় একটানা সাদা। এই অবস্থায় সাহায্যের কোন প্রত্যাশা করা বৃথা। নিচের দিকে তাকালেন তিনি। ডং খে জায়গাটা একটা পাহাড়ের পিঠের ওপর। দু'দিকে পাহাড়ের গা ঢালু হয়ে নেমে গেছে, তারপর আবার উঠে গেছে আরো দুটি সমান্তরাল পাহাড়ের পিঠ পর্যন্ত। সেখান থেকে, কুয়াশার চাদর ভেদ করে ঝাঁকে ঝাঁকে গোলা এসে পড়ছে। গোলা আর গোলা।

এই আক্রমণের জন্যে ওরা প্রস্তুত ছিল না মোটেই। এত ব্যাপক আক্রমণের জন্যেও না। দেখতে দেখতে উঠোন ভরে উঠল হত আর আহতে। এত গোলা-গুলী গেরিলারা পেল কোত্থেকে? গ্যারিসন কম্যান্ডার অবাক হয়ে ভাবলেন।

কিন্তু ভাববার সময় নেই। গোলা যেন আরও জোর হয়ে উঠেছে। গেরিলারা যেন আরও কাছে এগিয়ে এসেছে। ডং খে রক্ষা করতেই হবে, যে করেই হোক।

"গুলী!" চীৎকার করে উঠলেন তিনি। "গুলী আরম্ভ কর!"

ফরাসী ফরেন লিজিয়নের দু' কম্পানী সৈন্য একযোগে ঝাঁপিয়ে পড়ল লড়াইয়ে।

যে পাহাড়ের পিঠের ওপর ডং খে, তার ওপর দিয়ে একটি বাঁধানো সড়ক চলে গিয়েছে উত্তরে কাও বাং এবং দক্ষিণে লাং সন পর্যন্ত। ফরাসীরা এই সড়কের নাম দিয়েছিল রুট কলোনিয়াল নাম্বার ফোর। উত্তর-পূর্ব টংকিনের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সড়ক এই চার নম্বর রুট। চীনের সীমান্তের প্রায় পাশাপাশি বিছানো। ঐ সীমান্তের ওপর পাহারা রাখার জন্যে সড়কটি ফরাসীদের হাতে থাকা একান্ত দরকার। আরো দরকার এই সড়কের ওপর অবস্থিত তিনটি ঘাঁটিকে রক্ষা করার। উত্তরে কাও বাং, মাঝে ডং খে ও দক্ষিণে লাং সন। তার মধ্যে মাঝখানে বলে ডং খের গুরুত্বই সবচেয়ে বেশি। কারণ ডং খে উত্তর ও দক্ষিণের মধ্যে যোগসূত্র হিসেবে কাজ করছে। এই যোগসূত্র যদি ছিন্ন হয়ে যায় তাহলে যেমন কাও বাং তেমনি লাং সন'ও বিপন্ন হয়ে পড়বে। কারো পক্ষেই তখন অপরের সাহায্যে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে না।

সেই ডং খেই এখন গেরিলারা আক্রমণ করেছে। ১৬ সেপ্টেম্বর, ১৯৫০।

পেছনে আগুন আর আগুন। গর্তে গর্তে ছেয়ে গেছে মাটির বুক। গোলা ফাটছে ফট্ ফট্ শব্দে, আর সেই আওয়াজের সঙ্গে মিশে যাচ্ছে আহতের আর্তনাদ। কুয়াশায় আর ধোঁয়ায় ভালো ঠাহর হয় না কিছু। মাটির চারপাশে যেখানে কাঁটাতারের বেড়া সেখানে ট্রেঞ্চের ভেতর ও বাঙ্কারের পেছনে আশ্রয় নিয়ে ফরেন লিজিয়নের দু' কম্পানী সৈন্য হাল্কা অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে প্রাণপণে গুলী চালিয়ে যাচ্ছে।

কিন্তু গেরিলারা সংখ্যায় কত? গ্যারিসন কম্যান্ডার বিস্মিতভাবে দেখলেন পাহাড়ের গা বেয়ে ওরা উঠে আসছে সমুদ্রের জলে যেমন করে ঢেউ ওঠে একের পর এক। কত লোককে খতম করবে ফরেন লিজিয়নের গুলী? করতে পারে? যদি গুলী লেগে একজন পড়ে যায় তো কমসে কম আরো আটজন সামনে এগিয়ে আসে। এ স্রোতের যেন শেষ নেই, অন্ত নেই। এই স্রোতের সঙ্গে কতক্ষণ লড়াই করা যেতে পারে?

তবু একদিন, একথা স্বীকার করতেই হবে, ঠেকিয়ে রেখেছিল ফরাসীরা গেরিলাদের কিন্তু শুধু একদিনই। ঢেউয়ের পর ঢেউয়ের মত গেরিলারা যেভাবে আছড়ে পড়ছিল পাহাড়ের গায়ে তাতে তাদের চূড়ান্তভাবে প্রতিহত করার কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না।

ফরাসীদের গুলীর বেড়াজাল ভেদ করে গেরিলারা এগিয়ে এসেছিল অব্যর্থ গতিতে। ওদের সঙ্গে পারবে কেন তারা যুদ্ধ যাদের কাছে একটা অর্থকরী পেশা মাত্র? গেরিলাদের কাছে যুদ্ধ যে একটা নেশা, একটা উন্মাদনা! ওরা যে জাতীয় মুক্তির বেদীমূলে বলিপ্রদত্ত। হাত ভেঙে গেছে একজনের, ভাঙা হাত নিয়ে চলতে অসুবিধা হচ্ছে, তবু সে আহত বলে পড়ে থাকে নি পেছনে। হাতখানা কেটে ফেলে দিয়ে এগিয়ে গিয়েছিল। তাকে ঠেকাবে তেমন সৈন্য ফরাসীরা কোথায় পাবে?

দ্বিতীয় দিন চলেছিল হাতাহাতি লড়াই। নিছক সংখ্যাবলের কাছে পর্যুদস্ত হয়ে দু'কম্পানী ফরাসী সৈন্য প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল। যে ক'জন বেঁচেছিল তারা পালিয়ে গিয়েছিল অন্যদিকে পাহাড়ের গা দিয়ে নেমে।

মাত্র দু'দিনের লড়াইয়ে ডং খে ভিয়েৎমিনদের করায়ত্ত হয়েছিল।

তিন বছরের প্রস্তুতির পর হো চি মিন ফরাসীদের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক আক্রমণের যে নির্দেশ দিয়েছিলেন, তারই সূত্রপাত হয়েছিল ডং খে'তে। এইখানেই প্রথম ভিয়েৎমিনরা 'জন-তরঙ্গে'র পদ্ধতি ব্যবহার করেছিল, যে পদ্ধতির সাহায্যে পরে তারা অনেক অসাধ্য সাধন করেছে। এবং এইখানেই প্রথম তারা ব্যাপকভাবে আধুনিক ও উন্নত সমরাস্ত্র ব্যবহার করে।

ডং খের পতন গোটা উত্তর-পূর্ব টংকিনে ফরাসী প্রতিপত্তিকে বিপন্ন করে তুলল। ভিয়েৎমিনরা যে এইভাবে প্রকাশ্যে সম্মুখ লড়াইয়ে অবতীর্ণ হবে তা তাদের ধারণায় ছিল না। জেনারেল গিয়াপ হয়ত এইভাবে তাঁর সৈন্যদের নিয়ন্ত্র করতেনও না। করেছিলেন কেবল ডং খের গুরুত্ব উপলব্ধি করে। ডং খে দখল করতে পারলে এক ঢিলে তিনটি পাখি মারা যাবে।

হ'লও তাই। ফরাসী সামরিক কর্তৃপক্ষ কাও বাং থেকে তাদের বাহিনীকে সরিয়ে আনার সিদ্ধান্ত করলেন।

৩ অক্টোবর সামরিক ও অ-সামরিক ব্যক্তি মিলিয়ে কাও বাং গ্যারিসনের প্রায় তিন হাজার লোক তাদের লট-বহর ও সাজ-সরঞ্জাম নিয়ে চার নম্বর সড়ক ধরে রওনা হল লাং সনের পথে। সেই সঙ্গে ডং খে'র মাইল চোদ্দ দক্ষিণের তাট খে গ্যারিসন থেকেও সাড়ে তিন হাজারের মত সৈন্য রওনা হল কাও বাং সৈন্যদের নিরাপত্তা রক্ষার জন্যে।

কিন্তু দু'টি দলই রাস্তায় অতর্কিতে আক্রান্ত হয়েছিল গেরিলাদের দ্বারা। ঐ আক্রমণের মুখে ওরা ভেসে গিয়েছিল বন্যার জলে খড়ের কুটোর মত, ছড়িয়ে পড়েছিল পাহাড়ে জঙ্গলে।

এই খবরে ফরাসীরা আতঙ্কিত হয়ে পড়ল। ১৭-১৮ অক্টোবরের রাত্রে গোপনে ও খুব অল্প সময়ের মধ্যে তারা লাং সন ঘাঁটি ফেলে পালিয়ে গেল। এত তাড়াতাড়ি যে, অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদ, রসদ ও যানবাহন পর্যন্ত নিয়ে যাবারও ফুরসৎ ছিল না। বিনা যুদ্ধে, বিনা রক্তপাতে, বিনা আয়াসে লাং সন ঘাঁটি ও প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র ভিয়েৎমিনদের দখলে এসে গেল।

চার নম্বর সড়কের যুদ্ধ যখন শেষ হল তখন দেখা গেল অন্তত ৭ হাজার ফরাসী সৈন্য ভিয়েৎমিনদের হাতে নিহত হয়েছে।

চার নম্বর সড়কে এখন ভিয়েৎমিনদের আধিপত্য, এবং সড়কটি বেদখল হওয়ায় টংকিনের একটা বিরাট অংশ ফরাসীদের হাতছাড়া। চীনের দরজা এখন গেরিলাদের জন্যে নিষ্কণ্টক হল। চীনা অস্ত্রশস্ত্র গেরিলাদের হাতে পৌঁছবার পথে এখন আর কোন বাধাই রইল না।

সে সম্ভাবনাও এখন আগের চাইতে অনেক বেশি উজ্জ্বল। কারণ আগের বছর, অর্থাৎ ১৯৪৯ সালে, চীনে মাও সে-তুংয়ের নেতৃত্বে কম্যুনিস্ট রাষ্ট্রের পত্তন হয়েছে, এবং মাও সে-তুং হো চি মিনের সংগ্রামের প্রতি গভীর সহানুভূতিশীল।

•

চার নম্বর রুটের যুদ্ধে ভিয়েৎমিনদের বিপুল জয় যেন বাঁধের দেয়ালে ফাটল ধরিয়ে দিল। আবদ্ধ জলরাশি বিপুল বিক্রমে ও গৌরবে ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে। ভাসিয়ে নিয়ে গেল সামনের যা কিছু সব।

ভিয়েৎমিনরা যেন খুঁজে পেল নিজেদের। খুঁজে পেল নিজেদের শক্তিকে। জয়ের উন্মাদনায় তারা হয়ে উঠল দুর্বার, অপ্রতিরোধ্য।

লাং সন থেকে তারা রাস্তা নিল দক্ষিণ-পূর্বে রেড রিভারের বদ্বীপ এলাকার দিকে। ঘাঁটির পর ঘাঁটি হাতছাড়া হ'ল ফরাসীদের। পতন ঘটল গুরুত্বপূর্ণ দিন লাপ কেন্দ্রের। মাত্র ছ'সপ্তাহের মধ্যে একশ' মাইল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সামরিক সড়ক চলে গিয়েছিল ভিয়েৎমিনদের দখলে।

বন্যার স্রোতের মতই তারা এগোতে লাগল সেই সব রাস্তা ধরে। এবং সমুদ্রের স্রোতের মত গ্রামবাসীরা ভেঙে পড়ল পথের দুধারে তাদের স্বাগত জানাবার জন্যে। সে এক অবিস্মরণীয় দৃশ্য। উদ্দাম, উত্তাল। লাল জমি হলুদ তারা পতাকা উড়ল শত শত। দুদিকে রাস্তা জোড়া লাল কাপড়ের ব্যানার। আকাশ যেন আগুন হয়ে জ্বলে উঠল। সেই আগুনে রঞ্জিত হল পথের ধুলোও। হাজার হাজার মানুষের পদভারে কেঁপে উঠল টংকিনের মাটি।

ঘর ছেড়ে দলে দলে ছুটে বেরিয়ে এলো মহিলারা, কি তরুণী কি বৃদ্ধা। যার যা ছিল তাই এনে তুলে দিল ভিয়েৎমিন সৈন্যদের হাতে। তাদের আনন্দিত, বিগলিত চিত্তের অকুণ্ঠ উপহার। কেউ আনল মালা, কেউ ছিটিয়ে দিল ফুল। মুক্তির অগ্রদূত ওরা। ওদের আজ সবকিছু উজাড় করে দেওয়া যায়। কেউ নিয়ে এলো এ্যাকর্ডিয়ান, কেউ গিটার, কেউ বা মাউথ-অর্গান। গানে, বাজনায়, নাচে উৎসবের ধুম লেগে গেল যেন।

"হো চু তিচ মুয়েন নাম!" ওরা আকাশ ফাটিয়ে চীৎকার করে উঠল। হো চি মিন হাজার বছর বেঁচে থাকুন!

দরজায় দরজায় আজ সাজানো হো'র ছবি। বাড়ির মাথায় আজ টাঙানো লাল জমি হলুদ তারা ভিয়েৎমিন পতাকা। দেয়ালে দেয়ালে লাল অক্ষরে লেখা:

হো চি মিন জিন্দাবাদ!

প্রতিরোধের লড়াই জয়যুক্ত হবেই!

ফরাসীর তাঁবেদারেরা ঐ সময় ঠাট্টা করে প্রায়ই বলত ভিয়েৎমিনদের সম্পর্কে: এ যেন হাতির সঙ্গে লড়াই করছে পঙ্গপাল।

উত্তরে বলেছিলেন হো চি মিন: "হ্যাঁ, আজ হাতির সঙ্গে লড়াই করছে বটে পঙ্গপাল, কিন্তু আগামীকাল এরাই টেনে বার করে আনবে হাতির নাড়ীভুঁড়ি।"

সেই আগামীকালেরই সূচনা হয়েছিল চার নম্বর কলোনিয়াল রুটের ধারে, ১৯৫০ সালের সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে।

গিয়াপের হাতে একমাত্র টংকিনেই তখন ছিল ২ লক্ষ ২০ হাজার সৈন্য। তার মধ্যে ১ লক্ষ ২০ হাজার ছিল নিয়মিত, খাস। তাদের ভেতর থেকে সেই সময়েই গড়ে তোলা হয় পাঁচটি পদাতিক ডিভিসন: ৩০৪, ৩০৮, ৩১২, ৩১৬ ও ৩২০ নম্বর। এদের মধ্যে ৩২০ নম্বর ডিভিসনকে রাখা হয়েছিল দক্ষিণ বদ্বীপ ঘাঁটিতে, বাকিগুলি ছিল উত্তর টংকিনের জঙ্গলে ভিয়েৎমিনদের মূল ঘাঁটিতে। এবং গড়া হল চারটি পদাতিক রেজিমেণ্ট: ৯, ৫৭, ৬৬ ও ৮৪০ নম্বর। ডিসেম্বরের মধ্যে ছটি গোলন্দাজ ব্যাটেলিয়নও যুক্ত হল।

চীন-ভিয়েৎনাম সীমান্ত এবং টং-

কিনের একটা বিরাট অঞ্চল ফরাসীদের কবল থেকে মুক্ত করার পর ভিয়েৎমিনরা এখন শ্লোগান দিল "টেট (বৌদ্ধ নববর্ষ) নাগাদ হ্যানয় !"

ওদের মনোবল বেড়েছিল চীনে একটি সহানুভূতিশীল রাষ্ট্রের পত্তন হওয়ায়। সেই মনোবল এখন গভীর আত্মবিশ্বাসে পরিণত হল একাধিক বিদেশী রাষ্ট্র হো চি মিনের সরকারকেই ভিয়েৎনামের একমাত্র বৈধ সরকার বলে স্বীকার করে নেওয়ায়।

১৯৫০ সালের গোড়াতেই হো সরকার কূটনৈতিক স্বীকৃতির জন্যে নতুন করে সকল দেশের কাছেই আবেদন জানিয়েছিলেন। ঘটনাচক্রে দেখা গেল যে, কেবল সেই দেশগুলিই হো চি মিনকে তাঁর সংগ্রামের মুহূর্তে নৈতিক সমর্থন দিয়েছিল পশ্চিমী গোষ্ঠী যাদের কম্যুনিস্ট বলে চিহ্নিত করে থাকে। ১৮ জানুয়ারী স্বীকৃতি দিল লাল চীন, ৩১ জানুয়ারী রাশিয়া। ফেব্রুয়ারী মাসে স্বীকৃতি এল পোল্যাণ্ড, রুমানিয়া, হাঙ্গেরী ও উত্তর কোরিয়ার কাছ থেকে। এরা যদি স্বীকৃতি দিয়ে থাকে আর পশ্চিমী রাষ্ট্রবর্গ না দিয়ে থাকে তাহলে সেটা হো চি মিনের দোষ নয়।

অথচ ভিয়েৎনামের সীমান্তে লাল চীনের অভ্যুদয় এবং পর পর কয়েকটি কম্যুনিস্ট রাষ্ট্র কর্তৃক হো চি মিনের সরকারকে স্বীকৃতি দানের ঘটনাকে অজুহাত হিসেবে ব্যবহার করে পশ্চিমী রাজনীতির চক্রান্ত ভিয়েৎমিন স্বাধীনতা সংগ্রামের বিরুদ্ধে দানা বাঁধতে আরম্ভ করেছিল। যখন দরকার ছিল নৈতিক সমর্থনের তখন যারা উদ্যত হয়েছিল আঘাত হানবার জন্যে, আজ তারা কি করে আশা করতে পারে ভিয়েৎনামের মানুষ তাদেরই মুখের দিকে তাকিয়ে ভরসা করবে ?

পঞ্চাশ সালের নভেম্বরে ফরাসী জাতীয় পরিষদে সরকারের ভিয়েৎনাম নীতি—অর্থাৎ বাও দাইকে শিখণ্ডী দাঁড় করিয়ে দেশ শাসনের এবং ভিয়েৎমিনদের দমন করার জন্যে যুদ্ধ চালিয়ে যাবার নীতি—গৃহীত হল।

ডিসেম্বরে ভিয়েৎনামে নতুন হাই-কমিশনার ও সুপ্রীম কম্যাণ্ডার হয়ে এলেন জেনারেল জাঁ দ্য লাত্র দ্য তাসিনি।

কঠোর মানুষ হিসেবে জেনারেল দ্য তাসিনির সুনাম বা বদনাম যাই বলুন ছিল। তিনি এসেই যুদ্ধ পরিচালনার ভার নিজের হাতে গ্রহণ করলেন।

তাঁকে এই কাজে মদত দেবার জন্যে এগিয়ে এল আমেরিকা।

আমেরিকার সাহায্য ছাড়া এই যুদ্ধ চালানো ফ্রান্সের পক্ষে দুঃসাধ্য হয়ে উঠছিল ক্রমেই। ক্ষয়-ক্ষতি বাড়ছিল বিপজ্জনকভাবে, বাড়ছিল আর্থিক বোঝা। ঐ সময় ফরাসী সরকারই যে হিসাব পেশ করেন তাতে দেখা যায় ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৫০ পর্যন্ত প্রায় ১১ হাজার ফরাসী নিহত কিংবা নিখোঁজ হয়েছে। আর খরচা হয়েছে ১৪০ থেকে ২২০ কোটি ডলার। এই বিপুল বোঝা বইবার মত শক্তি তখন ফ্রান্সের ছিল না।

সুতরাং ফ্রান্সকে চাইতেই হল আমেরিকার সাহায্য। আর আমেরিকাও একটা সুযোগ পেয়ে হাত বাড়িয়ে এগিয়ে এলো।

কারণ একটি বিপন্ন পশ্চিমী সহ-রাষ্ট্রকে বাঁচানো ছাড়াও আরেকটি তাগিদ ছিল আমেরিকার। কম্যুনিজম ঠেকাবার তাগিদ। বছর তিনেক আগে কম্যুনিস্ট ঠেকাবার একটা নীতি সাধারণভাবে গ্রহণ করেছিল আমেরিকা।

হ্যারি এস ট্রুম্যান তখন আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট। ১৯৪৭ সালের ১২ মার্চ তিনি মার্কিন কংগ্রেসের কাছে এক প্রস্তাব পাঠিয়ে বললেন : "আমি বিশ্বাস করি, সশস্ত্র সংখ্যালঘুর ক্ষমতা দখলের কিংবা বাইরের চাপের বিরুদ্ধে যে সব মুক্ত জাতি প্রতিরোধ চালিয়ে যাচ্ছে, তাদের সমর্থন করাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নীতি হওয়া উচিত।"

তিনি কংগ্রেসের কাছ থেকে গ্রীসে ও তুরস্কে কম্যুনিস্ট বিরোধিতার জন্যে সাহায্য চেয়েছিলেন। কংগ্রেস ঐ সাহায্যের অনুমোদন দিতে দেরি করে নি।

আমেরিকার কম্যুনিজম ঠেকাবার পররাষ্ট্র নীতির এই হল সূত্রপাত।

১৯৪৯ সালে যখন চীনে কম্যুনিস্ট রাজত্ব কায়েম হল তখন থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভিয়েৎনামকে অন্য চোখে দেখতে আরম্ভ করল। পঞ্চাশ সালে যখন পর পর কয়েকটি কম্যুনিস্ট রাষ্ট্র হো চি মিনের সরকারকে স্বীকৃতি দিল, তখন আমেরিকা ভাবল ভিয়েৎনাম বুঝি কম্যুনিস্ট হয়ে যায়। তারা বেমালুম ভুলে গেল যে, হো চি মিন ফরাসীদের সঙ্গে সহযোগিতার জন্যে একাধিকবার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। এমন কি এক সময় ফ্রেঞ্চ ইউনিয়নের মধ্যে থাকতেও রাজি হয়েছিলেন। আমেরিকা প্রভৃতি পশ্চিমী রাষ্ট্রবর্গের কাছ থেকে সমর্থন তো চেয়েছিলেনই। ফ্রান্স ও আমেরিকা তাঁর ঐ মনোভাবের প্রতি কোন মর্যাদা তো দেখায় নি, বরং পদে পদে তাঁর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল। অথচ নিতান্ত বাঁচার তাগিদে হো চি মিন যখন কম্যুনিস্ট দুনিয়ার দিকে তাকালেন, তখন ডীন অ্যাচিসনের (সেই সময় আমেরিকার পররাষ্ট্রসচিব) বলতে বাধল না : "হো চি মিনের 'জাতীয়তাবাদী' লক্ষ্য সম্পর্কে যদি কোন রঙীন ধারণা কারো থেকে থাকে তবে এরপর তা দূর হওয়া উচিত। এর দ্বারা হো তাঁর আসল চেহারায় ইন্দোচীনের স্বাধীনতার শত্রু হিসেবে আবির্ভূত হলেন।"

এর পর ওয়াশিংটন ফরাসীদের হাতের পুতুল বাও দাইকে সক্রিয়ভাবে সমর্থন জানাতে আরম্ভ করল। মিঃ অ্যাচিসন এক বার্তা পাঠিয়ে বাও দাইকে জানালেন, আমেরিকা তাঁর সরকারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন করতে আগ্রহী।

৭ ফেব্রুয়ারী, ১৯৫০ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বাও দাই সরকারকে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি দিল।

এই স্বীকৃতির পরেই মার্কিন কর্তৃপক্ষ হো চি মিনের বিরুদ্ধে লড়াই চালাবার জন্যে ফ্রান্সকে সামরিক ও অর্থনৈতিক সাহায্য পাঠাবার সিদ্ধান্ত নেন। মে মাসে প্যারিসে ফ্রান্স ও আমেরিকার মন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠকে মিঃ অ্যাচিসন এই মর্মে আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করলেন। তিনি বললেন : "মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মনে করে যে, রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা পুনরুদ্ধার এবং প্রকৃত জাতীয়তাবাদের বিকাশের ওপরেই ইন্দো-চীনের সমস্যার সমাধান নির্ভরশীল। এই প্রধান লক্ষ্যগুলি অর্জনে আমেরিকা সাহায্য করতে পারে ও করা উচিত।"

২৫ জুন কম্যুনিস্ট উত্তর কোরিয়া ৩৮ অক্ষরেখা অতিক্রম করে দক্ষিণ কোরিয়া আক্রমণ করলে মার্কিন সরকার এই সংকল্পে দৃঢ়তর হলেন। ২৭ জুন প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান ঘোষণা করলেন যে, আমেরিকা ভিয়েৎনামে দ্রুততর সাহায্য পাঠাবে।

সাহায্য অবশ্য এসেছিল ঐ ঘোষণার আগেই। মার্চ মাসে দুটি মার্কিন জাহাজ ভিড়েছিল সায়গনের বন্দরে। তাতে এসেছিল অস্ত্রশস্ত্র, কিছু বিশেষজ্ঞ।

ফরাসী কর্তৃপক্ষ নিশ্চয়ই হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছিলেন। কিন্তু ভিয়েৎনামীরা ?

"ওরা (মার্কিনীরা) গোটা ইন্দো-চীনকেই পুরো দখল করতে চায়", জনসাধারণকে সাবধান করে দিয়ে বলেছিলেন হো চি মিন। "সেই জন্যেই ওরা প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে—কি সামরিক, কি রাজনৈতিক, কি অর্থনৈতিক—প্রভাব বিস্তারের জন্যে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।......

"ইন্দোচীনের মানুষকে হত্যা করার জন্যে ওরা তাদের তাঁবেদারদের হাতে তুলে দিচ্ছে অস্ত্র। স্থানীয় শিল্প যাতে বিকশিত হতে না পারে তার জন্যে ওরা নিজেদের মালপত্র এনে ফেলে দিচ্ছে এখানে। যুবসমাজের মনকে বিষাক্ত করে তোলার জন্যে ছড়াচ্ছে যৌন-সাহিত্য। টাকা দিয়ে, প্রতারণা করে, ভেদবুদ্ধি ছড়িয়ে তারা দেশের মানুষকে করতে চাইছে দুর্বল।"

সুতরাং সায়গন নদীর জলে ঐ দুটি

জাহাজকে ভাসতে দেখে প্রসন্ন বোধ করার কোন কারণই ছিল না ভিয়েৎনামীদের। তাদের কাছে ওগুলি সাম্রাজ্যবাদের প্রতীক ছাড়া আর কিছুই ছিল না। জাহাজ দুটি আসেও নি অন্য কোন উদ্দেশ্য নিয়ে। একটি অত্যাচারী ও কলঙ্কিত ঔপনিবেশিক শক্তিকে আরো ভালোভাবে অত্যাচার চালাতে ও শোষণ করতে সাহায্য করার জন্যেই এরা এসেছিল। একটি স্বাধীনতাকামী জাতির সংগ্রামের কণ্ঠরোধ করবার জন্যে এগিয়ে এসেছিল সেই দেশ যার নিজের জন্ম হয়েছিল প্রতিরোধের ঘণ্টাধ্বনির মধ্যে, যে নিজেকে স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের পূজারী বলে প্রচার করে থাকে, স্বাধীনতার নামে যে দেশ মূর্তি গড়িয়ে দুনিয়ার দেখবার জন্যে দাঁড় করিয়ে রেখেছে তার প্রবেশপথের সামনে। কি চমৎকার!

হাজার হাজার মানুষ সেদিন জমায়েত হয়েছিল সায়গন নদীর ধারে। তীর বিক্ষোভে ফেটে পড়েছিল। হাতে হো চি মিনের ছবি, মাথার ওপর ভিয়েৎমিনদের লাল পতাকা, ওরা চীৎকারে চীৎকারে আকাশ ভরাট করে বলে উঠছিলঃ

'ইয়াঙ্কি সাম্রাজ্যবাদ ফিরে যাও!'

'আমরা আর কারো পরাধীন হব না!'

'প্রতিরোধকে আমরা জয়যুক্ত করবই!'

বন্দরের কাজ অচল হয়ে গিয়েছিল। অচল হয়েছিল যানবাহনের চলাচল। এক ক্রুদ্ধ জনতা কেবলই দুলে দুলে ফুঁসে ফুঁসে উঠছিল এই নগ্ন সাম্রাজ্যবাদী হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে। আক্রান্ত হয়েছিল দোকানপাট, বিশেষ করে যেগুলি ছিল ফরাসী। আক্রান্ত হয়েছিল ফরাসীর অফিস, বাড়ি। জনতাকে সামলাবার জন্যে হাজির ছিল ফরাসী ও বাও দাই সরকারের পুলিশ। কিন্তু ভিয়েৎনামী পুলিশ সেদিন ফরাসীদের সাহায্যে এগিয়ে আসে নি। ওরা ঠায় দাঁড়িয়েছিল একদিকে। নির্দেশ উপেক্ষা করে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিল জনতার ক্রোধ কিভাবে ছড়িয়ে পড়ছিল ক্রমে।

সেদিন বিক্ষোভ দমন করতে হয়েছিল কেবল ফরাসী পুলিশকেই, একা।

সায়গনে যে মার্কিন মহল সেই সময় ছিল, কিংবা ওয়াশিংটনে যাঁরা পরে এই বিক্ষোভের খবর পেয়েছিলেন, এই ঘটনা থেকে তাঁরা যদি সেদিন শিক্ষা গ্রহণ করতেন তাহলে হয়ত আজ তাঁদের ভিয়েৎনামের জলে ও জঙ্গলে এতটা অসহায়ভাবে জড়িয়ে পড়তে হত না। আজ ফরাসীদের পরিত্যক্ত আসনে তাঁরা অধিষ্ঠিত হয়েছেন এই মাত্র। কিন্তু ভিয়েৎনামের পরিস্থিতি তখন যা ছিল এখনও তাই আছে। এখন আমেরিকা যখন সক্রিয়ভাবে যুদ্ধ করছে, প্রায় একা, তখন ভিয়েৎনামী সরকারী সৈন্যরা দূরে দাঁড়িয়ে মজা দেখছে। এটা তাদের দোষ নয়, দোষ আমেরিকার যে বুঝতে চায় নি ভিয়েৎনামীদের মনোভাব কি, তাদের সহানুভূতি কোনদিকে।

যে মাসে যখন ভিয়েৎমিনরা চীনের সীমান্তবর্তী ঘাঁটিগুলি থেকে ফরাসীদের উৎখাত করার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছিল, তখন একটি মার্কিন সামরিক মিশন এসে উপস্থিত হল। উদ্দেশ্য মার্কিন সাহায্য ও সাহায্য বিতরণের ব্যবস্থাদি বিবেচনা করে দেখা।

আগের বছর বাও দাই-র প্রধানমন্ত্রী নুয়েন ফান লং একটি ভিয়েৎনামী জাতীয় সৈন্যবাহিনী গঠন করার এবং অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের জন্যে আমেরিকার কাছে ১৪ কোটি ৬০ লক্ষ ডলার সাহায্য চেয়েছিলেন। ফরাসীরা তো শুনে রেগে-মেগে আগুন। ভিয়েৎনামীদের হাতে টাকা? কখনই না। যেসব ভিয়েৎনামীকে নিয়ে ফরাসীরা হো চি মিনের বিরোধিতা করতে চায়, তাদের সম্পর্কে ধারণা তাদের এতই উঁচু যে, আমেরিকানদের তারা সোজাসুজি জানিয়ে দিল, সাহায্য যা দিতে হবে সরাসরি তাদের হাতেই দিতে হবে।

আমেরিকা এখন সেই উদ্দেশ্যেই সামরিক মিশন পাঠিয়েছে। সাহায্য বিতরণের এমন একটা ব্যবস্থা তারা করতে চায় যাতে কোন সাহায্য ভিয়েৎনামীদের হাতে গিয়ে পৌঁছতে না পারে।

দুনিয়ার স্বাধীনতার স্ব-ঘোষিত রক্ষাকারী এইভাবে একটি ছোট্ট দেশের স্বাধীনতার সংগ্রামকে দমন করবার জন্যে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

*

ওদিকে জয়ের পর জয় করায়ত্ত করে গিয়াপের বাহিনী তখন দ্রুত এগিয়ে চলেছে রেড রিভারের বদ্বীপের দিকে। ওদের সঙ্কল্প, 'টেট' উৎসবের আগেই হ্যানয় দখল করতে হবে।

ছোট ছোট ইউনিটে গিয়াপ ভাগ করে দিলেন তাঁর বাহিনীকে। যাতে ওরা তাড়াতাড়ি চলাফেরা করতে পারে। যাতে দরকার হলে জঙ্গলের মধ্যে আত্মগোপন করতে সুবিধে হয়। তারা ছড়িয়ে পড়ল বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে। তারপর বিভিন্ন গোপন পথে, অনেকটা জঙ্গলের ভেতর দিয়ে চুঁইয়ে চুঁইয়ে, এগিয়ে আসতে লাগল বদ্বীপ এলাকার দিকে।

ডিসেম্বরের গোড়ার দিকে গেরিলারা বদ্বীপের প্রান্তদেশে এসে উপস্থিত হল। গিয়াপ কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই কোন ব্যাপক আক্রমণ আরম্ভ করলেন না। তিনি নির্দেশ দিলেন, আশেপাশে ছোটখাটো যেসব ফরাসী ঘাঁটি আছে সেগুলিতে হঠাৎ হঠাৎ হানা দিয়ে ফরাসীদের উত্যক্ত করতে ও ব্যস্ত রাখতে হবে। সেই সুযোগে মূল ডিভিসনগুলি আক্রমণের জন্যে প্রস্তুত হবে।

গিয়াপের এই স্ট্র্যাটিজিতে কাজ হচ্ছিল চমৎকার। বিভিন্ন জায়গা থেকে বিচ্ছিন্নভাবে হামলার খবর পেয়ে ফরাসীরা বুঝতেই পারছিল না আক্রমণ কোন্ দিক দিয়ে আসবে। বিভ্রান্ত হয়ে কেবল হাতড়ে বেড়াচ্ছিল ওরা। আনল প্লেন। ফরাসী বিমান বহর ক্রমশ বেশি মাত্রায় অংশ নিতে শুরু করল যুদ্ধ-প্রচেষ্টায়। আকাশ থেকে খুঁজতে লাগল কোথায় আছে গেরিলারা। কিন্তু সাধ্য কি খুঁজে পায়। বর্ষা ছিল না, আকাশও পরিষ্কার। কিন্তু তাতে কি। কুয়াশা তো রয়েছেই। সেই মাটি-কামড়ানো কুয়াশা। আকাশ থেকে যা ভেদ করে দৃষ্টি সহজে চলে না।

গেরিলারা ঐ কুয়াশার আবরণে ঢেকে রাখত নিজেদের। তার ওপর ছিল ক্যামোফ্লেজ। তারও ওপর ছিল সতর্কতা, সাবধানতা, কৌশল। কুয়াশার আবরণ যদিও ছিল, তবু গেরিলারা দিনের আলোকে ব্যবহার করত না সাধারণত। ওদের চলাফেরা, ওদের রসদের সরবরাহ, ওদের জমায়েত, ওদের আক্রমণ বেশির ভাগই হত রাত্রে। যন্ত্রপাতি, অস্ত্রশস্ত্র, মাল-মশলা সরবরাহও হত না ভারী ভারী ট্রাকে, লরীতে। হত মানুষের কাঁধে, মাথায়, কিংবা সাইকেলের পেছনে। আর সেসব রসদ জমা থাকত না মাটির ওপর। থাকত যেখানে পাহাড় সেখানে পাহাড়ের গুহায়, যেখানে জঙ্গল সেখানে মাটির নিচে।

ফরাসীদের সাধ্য কি ওরা গেরিলাদের খুঁজে পায়।

অবশ্য ফরাসীদের বোমায় গেরিলারা যে কয়েকবার আক্রান্ত ও ক্ষতিগ্রস্ত না হয়েছে তা নয়। যেমন একবার হয়েছিল তিন ইয়েন-এ। ১৯৫০ সালের ২২ ডিসেম্বর।

আলং উপসাগরের উত্তরে উপকূলের কাছে তিন ইয়েন একটি ছোট আধা-শহর। বদ্বীপে অনুপ্রবেশের অসংখ্য পথের মধ্যে

মাত্র ২০৲ টাকায় ট্রানজিস্টার

অল ওয়ার্ল্ড ৩ ব্যাণ্ড
সুলভতম ট্রানজিস্টার
সমবায় ভিত্তির মাধ্যমে
মাত্র ২০৲ টাকায়
পাঠানো হয়। ইংরেজীতে
আপনার অর্ডার বুক করুন।

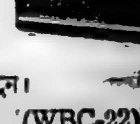

Ceylon Traders (WBC-22)
Post Box 1257, Delhi-6.

ভিন ইয়েনেও ছিল একটি। গেরিলারা সেখানে জড় হয়েছিল বেশ কিছু সংখ্যায়।

ফরাসীরা জানতে পারল এই জমায়েতের কথা। ওরা ভাবল গিয়াপ বুঝি এই পথেই তাঁর প্রধান আক্রমণ আরম্ভ করবেন। জেনারেল দ্য তাসিনি সঙ্গে সঙ্গে সেখানে একটি ছত্রী ইউনিট পাঠাবার নির্দেশ দিলেন। পেছনে পেছনে গেল জঙ্গী বিমানের বহর।

জাঁদরেল জেনারেল দ্য তাসিনি। ভিয়েৎনামে আসার পর এই প্রথম তিনি প্রকাশ্যে ভিয়েৎমিন প্রতিরোধের সম্মুখীন। এ প্রতিরোধ ভাঙতেই হবে, তিনি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলেন।

প্রতিজ্ঞা তিনি রেখেছিলেন, কিন্তু এক জঘন্য ধরণের বর্বরতার আশ্রয় নিয়ে।

আকাশ থেকে নামল ছত্রীরা। কিন্তু তাদের একার সাধ্য ছিল না ভিয়েৎমিনদের ছত্রভঙ্গ করা। মাটি স্পর্শ করার আগেই ওদের বেশ কিছু প্রাণ হারাত। গেরিলাদের গুলীতে। যারা শেষ পর্যন্ত মাটিতে এসে নামত তারা সহজেই ভেসে যেত গেরিলাদের সংখ্যাবলের মুখে।

তাই কোন ঝুঁকি নেয় নি ফরাসীরা। যে মুহূর্তে ছত্রীরা ঝাঁপ দিল প্যারাসুট নিয়ে, সেই মুহূর্তে সঙ্গের জঙ্গী বিমান থেকে ছিটিয়ে দেওয়া হয়েছিল—নেপাম।

নেপাম হচ্ছে এক ধরণের পেট্রোলিয়াম জেলি। তরলও নয়, ঘনও নয়, থকথকে। মাটির সঙ্গে যেই সংস্পর্শে আসে অমনি তাতে আগুন জ্বলে ওঠে। ভয়ঙ্কর আগুন। নেপামের ছিটকে-পড়া প্রতিটি কণার সঙ্গে সঙ্গে সে আগুন ছড়িয়ে পড়ে। পুড়িয়ে দেয় সামনে যা কিছু থাকে সব। গায়ের চামড়া, বাড়ি-ঘর, গাছ-পালা সব। সহজে ছড়িয়ে পড়ে বলে একটুখানি নেপামে কাজ হয় অনেকখানি।

জীবন্ত নরক সৃষ্টি করে নেপাম।

সাপ্তাহিক বসুমতীর চাঁদার হার

সাপ্তাহিক বসুমতীর বাৎসরিক চাঁদা সডাক ১৮ টাকা, ষাণ্মাসিক ৯ টাকা ও ত্রৈমাসিক ৪·৫০ টাকা। প্রতি সংখ্যা ৩০ পঃ।

তিন মাসের কমে গ্রাহক করা হয় না। গ্রাহক হতে হলে আপিসে অগ্রিম টাকা জমা দিতে কিংবা মনি অর্ডারে টাকা পাঠাতে হবে।

—কর্মাধ্যক্ষ, বসুমতী

সেই নেপাম ফরাসীরা ব্যবহার করেছিল ভিন ইয়েনে। প্লেনের ডানায় ট্যাঙ্ক ভর্তি করে ওরা নিয়ে গিয়েছিল ঐ ভয়ঙ্কর পদার্থ। ঢেলে দিয়েছিল ভিন ইয়েনের ওপর বৃষ্টির ধারার মত।

ভিয়েৎনামে সেই প্রথম নেপামের ব্যবহার।

ভিয়েৎমিনরা পরিচিত ছিল না এই বর্বরতার সঙ্গে। মানুষ যে এত উন্মত্তভাবে বর্বর হতে পারে তা তারা ভাবতে পারে নি। নেপাম হচ্ছে গণহত্যার অস্ত্র। সেই অস্ত্র এখন তাদের ওপর প্রয়োগ করা হল। সেই হু-হু করা আগুনের সামনে তাদের করবার কিছু ছিল না। করতে যাওয়াটাই হত বোকামী।

তারা ছত্রভঙ্গ হল।

জেনারেল দ্য তাসিনি ভাবলেন তিনি গেরিলাদের মেরুদণ্ড ভেঙে দিয়েছেন। কিন্তু ভিন ইয়েনে গেরিলাদের একটা সামান্য অংশই ছিল। প্রধান অংশ ছিল অন্যত্র, প্রস্তুত হচ্ছিল একটা বড় রকমের আক্রমণের জন্যে।

এই আক্রমণ এল ১৯৫১ সালের ১৩ই জানুয়ারী ভিন ইয়েনে।

গিয়াপ আক্রমণের জায়গা আর সময়টা বেছেছিলেন অনেক চিন্তা করে। ফরাসীরা ভেবেছিল লাং সন দখল করার পর গেরিলারা সোজা দক্ষিণে বদ্বীপ এলাকা পর্যন্ত নেমে আসবে। কিছু কিছু অংশ সেভাবে নেমে এসেওছিল। সুতরাং ফরাসীরা এই দক্ষিণমুখী অনুপ্রবেশ রোধ করার জন্যেই প্রধানত তৎপর হয়েছিল এবং তাদের সামরিক শক্তিকে সেইভাবেই মোতায়েন করেছিল।

সেই ফাঁকে পশ্চিমদিকে অগ্রসর হওয়াই ছিল গিয়াপের পক্ষে অনেক সুবিধাজনক।

কিন্তু কেবল পশ্চিমদিকে অবস্থিত বলেই নয়, ভিন ইয়েনকে লক্ষ্যবস্তু করার পেছনে আরো কারণ ছিল। এই শহর হ্যানয় থেকে মাত্র মাইল চল্লিশেক উত্তর-পশ্চিমে। তা ছাড়া এই শহর ছিল রেড রিভারের কাছাকাছি এবং শহর ও নদীর মাঝখানে ছিল বেশ কিছু গভীর জঙ্গলে ঢাকা ছোট-বড় পাহাড় যা শহরকে অনেকটা ঘিরে রেখেছিল। কাজেই আক্রমণের পক্ষে এই জায়গার সুবিধা অনেক এবং ফরাসীরা যেহেতু ভিন ইয়েনকে হ্যানয়ের অন্যতম প্রধান প্রতিরক্ষা-ঘাঁটি বলে মনে করে সেজন্যে এই শহর দখল করে নিতে পারলে হ্যানয় পর্যন্ত পৌঁছে যেতে কোন অসুবিধাই হবে না।

গিয়াপের পরিকল্পনার কোন ত্রুটি ছিল না। ভিন ইয়েন আগলে ছিল যে হাজার তিনেক ফরাসী সৈন্য, তাদের বিরুদ্ধে তিনি পুরো দু' ডিভিসন সৈন্য (সংখ্যায় প্রায় বাইশ হাজার) মাঠে নামিয়ে দিলেন। ১৩ জানুয়ারী সন্ধ্যায় তারা আক্রমণ আরম্ভ করেছিল। একটি ডিভিসন রেড রিভারের পূর্ব তীরের পাহাড় থেকে নেমে এসে নদী পার হয়ে পশ্চিম তীরের পাহাড়গুলি দখল করে নিয়েছিল। আরেকটি ডিভিসন এগিয়ে এসেছিল শহরের উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে

এই সাঁড়াশীর চাপের মুখে ফরাসীরা নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত প্রথম ধাক্কাতেই। কিন্তু জেনারেল দ্য তাসিনি তখন নতুন অস্ত্রের সন্ধান পেয়ে গেছেন। এবং ঐ অস্ত্র প্রয়োগ করে তিনি একবার জয়ীও হয়েছেন। সুতরাং......

সুতরাং ভিন ইয়েন যুদ্ধের পরিচালনার দায়িত্ব ব্যক্তিগতভাবে গ্রহণ করলেন জেনারেল দ্য তাসিনি। ভিয়েৎনামে যেখানে যত প্লেন ঐ মুহূর্তে ছিল সব—হ্যাঁ, গুণে গুণে প্রত্যেকটি—তিনি আনালেন ভিন ইয়েনে। তাদের ট্যাঙ্কগুলি কানায় কানায় ভরে দিলেন নেপামে। বন্যার ধারার মত উজাড় করে ঢেলে দিলেন সেই তরল আগুন ভিন ইয়েনের পাহাড়ে-জঙ্গলে। নির্বিচারে। আগুনের বেড়াজালে ঘিরে ফেললেন ভিন ইয়েন।

ভিয়েৎমিন মুক্তি যোদ্ধারা তবু উপেক্ষা করতে চেয়েছিল ঐ আগুনকে। এ প্রমাণ আছে আগুন ভেদ করে ওরা এগিয়ে গিয়েছিল আক্রমণের জন্যে। অগ্নিশুদ্ধ মৃত্যুঞ্জয়ী ঐ বীরেরা। আরো বড় আগুনের জ্বালা—পরাধীনতার জ্বালা—জ্বলছিল তাদের বুকে। দ্য তাসিনির নেপামে তারা ভয় পাবে কেন?

কিন্তু নিরস্ত করলেন গিয়াপ। মরতে তাঁদের বিন্দুমাত্র দ্বিধা নেই। কিন্তু এই মুহূর্তে এত ব্যাপক লোকক্ষয় হতে দেবার মত অবস্থা তাঁদের ছিল না।

পাঁচ দিনের যুদ্ধে অন্তত ছয় হাজার গেরিলা নিহত হয়েছিল। এর আগে আর কখনো ভিয়েৎমিনদের কোন একটি যুদ্ধে এত বেশি লোকক্ষয় হয় নি।

গিয়াপ তাই কোন ঝুঁকি নিতে চাইলেন না। তিনি সৈন্যদের নির্দেশ দিলেন ছত্রভঙ্গ হবার জন্যে।

এই দ্বিতীয়বার ভিয়েৎমিনবাহিনী ফরাসীদের কাছে সাময়িকভাবে পরাজয় স্বীকার করল।

[ক্রমশঃ]

আকাশবাণী পরিক্রমা

মেঘদূত

'প্রযোজক-পরিচালক'

আকাশবাণীর বেতনভোগী কর্মীদের অনেকে কখনো পরিচালক কখনো প্রযোজকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। বর্তমানে বেতারের অনুষ্ঠানে হামেশা একজন-না-একজনের প্রযোজকের নাম ঘোষণা করা একটা ফ্যাশনে দাঁড়িয়ে গেছে। এমন কি সাধারণ টকস-এর সঙ্গেও কখনো কখনো একজন বেতনভোগী শিল্পীর নাম এ'টে দেওয়া হচ্ছে প্রযোজকরূপে। মন্ত্রী শ্রীফুলরেণু গুহ মহিলা মহলে 'পরিবার পরিকল্পনা' সম্পর্কে আলোচনা করলেন। তাঁর বলা শেষ হলে এক মহিলার নাম শোনা গেল না। কোন আলোচনাচক্রে একজন প্রযোজকের কোন্ প্রয়োজন ছিল তা বোঝা গেল না। কোন আলোচনা চক্রে একজন পরিচালকের প্রয়োজন বুঝি। যেমন, শ্রীলীলা মজুমদারের পরিচালনায় 'পরিবার পরিকল্পনা' আলোচিত হলো। এখানে পরিচালনার প্রয়োজনীয়তা বোঝা যায়। তা ছাড়া কথা আছে, শ্রীমতী মজুমদার বেতারকর্মী নন।

বেতারের সরকারী চাকুরিজীবীরা বেতারকে আত্মপ্রচারের জন্য ব্যবহার করতে পারেন কিনা শ্রোতা এবং দেশের করদাতাদের তা জানার অধিকার থাকতে পারে। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত ক'টা নাম কারণে-অকারণে কেন শুনতে হবে? বাঁধাধরা নামগুলো শুনলে মনে হয়, কলকাতা বেতার কেন্দ্রে একটি চক্র তৈরি হয়েছে, জানি না হয়তো একজন চক্রাধিপতিও আছেন যাঁর সুপরিচালনায় এইসব অপকীর্তি চলছে। কর্তৃপক্ষ এমনতরো একটি নির্দেশ দিলে কেমন হয়, বেতনভোগী কর্মী বিশেষ জরুরী প্রয়োজন ছাড়া বেতার মারফৎ নাম প্রচারের সুযোগ পাবেন না। কর্মী যদি শিল্পী বা সাহিত্যিক হন তবে তাঁর ব্যক্তিগত অনুষ্ঠান ছাড়া প্রযোজক-পরিচালকের ভূমিকা থাকলেও নাম প্রচার করা হবে না। এটি হচ্ছে শৃঙ্খলা এবং রুচির প্রশ্ন। হাতে ক্ষমতা আছে বলে যা খুশি তাই করতে হবে! নামের মোহ পেয়ে বসলে বিজ্ঞাপনীয় কক্ষে কি মন বসে! এক সিপাই অভিযোগ করেছিল, এক হাতে তলোয়ার অপর হাতে ঢাল ; লড়ে কেমন করে! আমাদের আকাশবাণীর কিছু কর্মীরও দুর্দশা তেমনতরো। প্রযোজক পরিচালকের পোষাক খুঁজবে না আপন কাজ করবে।

আকাশবাণীর কর্তৃপক্ষের কাছে মেঘদূতের একটি বিনীত নিবেদন রয়েছে ঃ গণতন্ত্র বলে মাত্র ক'টি কর্মী কেন বেতারে নাম প্রচারের অন্যায় সুযোগ পাবেন? কলকাতা কেন্দ্রে যত কর্মী আছেন তাঁরা সকলেই হপ্তায় নিদেন একবার নিজেদের নামগুলো মাইকের সম্মুখে ঘোষণা করার সুয়োগ পান যেন।

*

৬ই মার্চ সপ্তপর্ণীর পিকনিক-মার্কা রবীন্দ্রসংগীত শোনা গেল। রবীন্দ্রসংগীতের গোত্র রীতি যদি এত নামিয়ে আনা হয় তবে তো ইতিহাস একদিন আমাদের খুনী বলে গালাগাল করবে। অভিযানের মাধ্যমে প্রোগ্রাম সংগ্রহ করতে হয়েছে সত্য, তা বলে কি অরাজকতার অধিকার পেতে হবে!

*

৮ই মার্চ গীতা সেন, রবীন্দ্রসংগীত পরিবেশন করলেন। শ্রীমতী সেন ভালোই গেয়ে থাকেন তবে এদিন তিনি জমাতে পারলেন না। তাঁর কণ্ঠে 'আমার পাত্রখানা যায় যদি যাক ভেঙে-চুরে' গানখানি শুনতে শুনতে মনে পড়লো একদিনের কথা, অবান্তর হলেও উল্লেখ করতে সাধ যাচ্ছে। ১৯৫৪ সালের পুজোর ছুটিতে বেড়াতে গেছি দার্জিলিং-এ। বিকেলে ম্যাল-এ বেড়াচ্ছি, দেখছি, পড়ন্ত সূর্য কাঞ্চনজঙ্ঘাকে রঙ-বেরঙ-এর আলোয় ঘিরে ফেলেছে। রঙের পাহাড় যেন খসে খসে পড়ছে। এমনি এক পরিবেশে নারীকণ্ঠে 'আমার পাত্রখানি.....' গানখানি ভেসে এলো। গান শেষে আলাপ হলো, জানতে পারলাম—গায়িকা গুজরাটের মেয়ে। বাংলা ভাষাকে মাতৃভাষার মতো আয়ত্ত করে ফেলেছেন: রবীন্দ্রসংগীত তাঁর সব হতে প্রিয়। গুজরাট-নন্দিনীর সৌন্দর্যবোধ এবং সময়োপযোগী গানখানি বেছে নেওয়ার ক্ষমতা সেদিন আমাকে মুগ্ধ করেছিল।

*

১১ই মার্চ বাণী ঠাকুর রবীন্দ্রসংগীত গাইলেন। তিনি গাইলেন, 'সে কিভাবে গোপন রবে', এই গানের অন্যত্র রয়েছে, 'তারে দেখি নয়ন ভরে' (ভোরে=ভরিয়া)। অথচ, শ্রীমতী ঠাকুর গাইলেন, 'তারে দেখি নয়ন ভরে'। 'ভ'রে এবং 'ভরে' একার্থক শব্দ নয়; দুয়ের উচ্চারণও এক নয়। শিল্পী এবং আকাশবাণীর কর্তৃপক্ষ উভয়ের কাছে গান রেকর্ডিং-এর সময়ে নিষ্ঠা ও সততা প্রত্যাশা করা যেতে পারে না কি! রেডিওতে যখন-তখন ভুল গাওয়া হলে মেলা-জলসায় তো রবীন্দ্রসংগীতের ক্যারিকেচর চলবে। বেতার প্রতিষ্ঠানের কাজ সংস্কৃতিকে রক্ষা এবং তার মান উন্নয়নের চেষ্টা করা। এবার প্রশ্ন করি, বেতার-প্রচারিত সমগ্র সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান কি এ আদর্শের অনুবর্তী?

*

১৪ই ও ১৬ই মার্চ রবীন্দ্রসংগীতের আসরে বুলবুল দাশ ও অনুরাধা গুপ্ত গাইলেন মন্দ নয়। যান্ত্রিক গোলযোগের দরুণ শ্রীমতী গুপ্তের গানের শেষটুকু রাতে শোনা গেল না।

*

দোলপূর্ণিমায় নীহারবিন্দু সেনের পরিচালনায় গীতবিতানের রাতের অনুষ্ঠানের সমবেত কণ্ঠের গানগুলি শ্রুতিমধুর হয়েছিল।

*

১৫ই মার্চ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মানদীর মাঝি' বেতারে বোধহয় এই প্রথম অভিনীত হলো। উপন্যাসটি গোয়ালন্দের মাঝিদের Jargon এবং উপভাষায় লেখা। এর কতটুকু Jargon এবং কতটুকু উপভাষা তা বলা শক্ত। মেঘদূতের মতো কলকাতার খাস ঘটির পক্ষে পূর্ববঙ্গের বাঙাল ভাষা বোঝা শক্ত। হয়তো ভাষাতাত্ত্বিক পণ্ডিতরা বুঝতে পারেন, তবে ভাষাতত্ত্ববিদের যদি ঢাকার ভাষা জানা না থাকে, তিনিই বা কতটুকু বুঝবেন। ভাষা না বুঝলেও নাটকটি আকর্ষণীয় হয়েছিল। উপন্যাসের মূল সুর বেতার নাটকে ঠিকমতো রক্ষা না পেলেও সময়ে সময়ে মনে হচ্ছিল, শুধু শুনছি, না দু' চোখ ভরে দেখছিও। বেতার নাটকের সার্থকতা তো এখানেই!

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে মালয়ালম ভাষায় রচিত এক উপন্যাসের কথা (চিংড়ি ঃ তাকাষি শিবশঙ্কর পিল্লাই। অনুবাদক ঃ বোম্মানা বিশ্বনাথম ও নিলীনা আব্রাহাম। প্রকাশক ঃ সাহিত্য আকাদেমী) যা পড়তে পড়তে মনে পড়ে যায় মানিকবাবুর 'পদ্মানদীর মাঝি'র ঘটনাবলী। 'ভারতের দুটি প্রত্যন্ত প্রদেশের জেলেদের

ও সৃষ্টি শিল্পে বর্তমান থাকলে তা 'শিল্প' অভিধায় অন্তর্গত হতে পারে—আধুনিক বাংলা গানে তার পরিমাণ স্বল্প। এবং শিল্পের এই একটি শাখা যে আজ বুদ্ধি-দীপ্ত শ্রোতার কাছে অপাংক্তেয় অশ্রাব্য হয়ে উঠেছে তার অন্যতম কারণও এই যে যোগানদার সম্ভবত এই কাজে ব্রতী নন।

আধুনিক কবিতার বিরুদ্ধে দুর্বোধ্য-তার অভিযোগ আছে। তা আংশিক সত্য। বিবেচক ব্যক্তি জানেন, মানসিক অভিযোগ থাকা সত্ত্বেও নিতান্ত উন্নাসিক ও অজ্ঞ ব্যক্তি ছাড়া আধুনিক কবিতা সকলের কাছেই দুর্বোধ্য ও দুর্গম, পণ্ডিতজনের স্বীকৃতিতে ধন্য, পৃথিবীর আধুনিক কবিতার পরিপ্রেক্ষিতে উজ্জ্বল। এবং তার চেয়েও বড় কথা, যাঁরা এই কাব্য আন্দো-লনের সংগে যুক্ত তাঁরা আন্তরিকতায় বলিষ্ঠ, নিষ্ঠায় অবিচল। আধুনিক চিত্র-শিল্পও দুর্বোধ্য আকারে নিন্দিত, জন-প্রিয় কোন অর্থেই নয়, কিন্তু আধুনিক চিত্রশিল্পীদেরও নিষ্ঠা শ্রদ্ধার্হ। এঁরা যা আঁকছেন, তা অন্তরের তাগিদে, কোথাও কোথাও সস্তায় বাজিমাৎ করার প্রচণ্ড প্রচেষ্টা প্রকট, কিন্তু সব মিলিয়ে, রসজ্ঞ ব্যক্তি জানেন, সমস্ত বিশ্বের আধুনিক শিল্প আন্দোলনের সংগে এর যোগ আছে, বিচ্ছিন্ন কিছু নয়।

আধুনিক চলচ্চিত্র, যা সত্যজিৎ রায়, ঋত্বিক ঘটক ইত্যাদির সুপরিচালনায় বিশ্বে স্বীকৃত, আধুনিক নাট্য-আন্দোলন যা শম্ভু মিত্র, উৎপল দত্ত, অজিতেশ বন্দ্যো-পাধ্যায় ইত্যাদির শ্রমে নিষ্ঠায় এক আশ্চর্য সম্ভাবনায় দীপ্ত—এসব কিছুর অন্তরালে প্রধানতই আছে 'শিল্প' সৃষ্টির আন্তরিক প্রেরণা—আধুনিক বাংলা গানের ক্ষেত্রে, অনুমান করি, মূলত এই জিনিসটিরই অভাব। এই নিষ্ঠার। ব্যতিক্রম যে কিছু না আছে এমন নয়, শিল্প সৃষ্টির আন্তরিক তাগিদে কোন গানই সৃষ্টি হয় নি একথাও অসত্য, কিন্তু তা সংখ্যায় এত কম যে নিয়মিত গান না শুনলে রসজ্ঞ ব্যক্তিও বিরূপ মন্তব্য করতে পারেন অনায়াসে। এখন প্রশ্ন ওঠে কেন এমন হলো?

রবীন্দ্রনাথ, অতুলপ্রসাদ, দ্বিজেন্দ্রলাল, নজরুল এঁরা মূলতই ছিলেন কবি এবং তারপর সুরকার। ফলে কাব্য ও সংগীত একসূত্রে গ্রথিত হয়েছিল। যথার্থ কাব্য-সংগীত সৃষ্টি হয়েছিল।

কিন্তু নজরুলের পর, আমার মনে হয়েছে নজরুলই প্রথম এই পথ দেখিয়ে-ছিলেন, গীতিকার, সুরকার ও গায়ক এই শ্রেণী বিভাগ শুরু হলো।

নজরুলই প্রথম, এ অনুমান এই কারণে, শোনা যায়, নজরুল অজস্র গান লিখতেন এবং নানাজনকে দিতেন সুর দেবার জন্য। এবং সেই গান পরিবেশন করতো আর একজন। অবশ্য গান তাতে কিছু খারাপ হতো না, কেন না, আগেই লিখেছি, নজরুল মুখ্যত কবি ছিলেন এবং তারপর সুরকারও।

কিন্তু নজরুলের পর যাঁরা গান লিখতে শুরু করেছেন তাঁরা কেউ কবি নন। ব্যতি-ক্রম এক্ষেত্রেও আছে তবে তা এই সত্যকেই প্রতিষ্ঠিত করার জন্য। ফলত এই অ-কবি গীতিকারেরা যা রচনা করেন, তা কাব্য-গুণান্বিত নয়, তাঁদের অনুভূতিলব্ধ কোন বাণী নয়। কতকগুলি বহু ব্যবহৃত ভাব, শব্দ এবং উপমা সাজিয়ে-গুছিয়ে পরি-বেশন করা।

আর যেহেতু, এইসব গান কোন অনু-ভূতি বা ভাবের প্রকাশ নয়, সে কারণে, যেসব সুরকার সুরারোপ করেন তাঁরাও যান্ত্রিকভাবে করছেন, যন্ত্রের প্রভূত সহায়তা নিয়ে করছেন এবং এক্ষেত্রেও অনুভূতির প্রকাশ ঘটছে না। আবার সেই গান পরি-বেশন করছেন তৃতীয় আর একজন, যিনি গায়ক। কিন্তু এই অনুভূতিশূন্য সাজানো বানানো গান তাঁর অনুভূতিতে কি কোন ঝংকার তোলে? ফলত তিনিও তা পরি-বেশন করেন গলার মাধুর্য ও কারুকার্যের মাধ্যমত সহযোগিতায় এবং যন্ত্রের নিরাপদ আশ্রয়ের আড়ালে থেকে। এবং এ সবকিছুর অনিবার্য ফল শিল্প হিসেবে এই গানের কোন স্বীকৃতি না পাওয়া। আধুনিক গান, চলচ্চিত্র বা নাটকের মতো যৌথশিল্প হতে পারত কিন্তু এই আন্তরিকতার অভাবে ও নিতান্ত ব্যবসায়িক কারণে তা আর হতে পারছে না। এদেশে আধুনিক শিল্প আন্দোলনের পাশাপাশি একটি গড্ডালিকা স্রোত প্রবাহিত যাতে জনরুচি অবগাহন করে তৃপ্তি পায়। সৎ দর্শক পাঠক সৎ শিল্প আন্দোলনে মগ্ন। কোথাও আপোষ নেই। অথচ আধুনিক গানের আসরে এমন কোন আন্দোলন নেই। ক্ষমতাবান সুরকার আছেন, প্রথম শ্রেণীর গায়কও অনেক কিন্তু প্রথম শ্রেণীর গীতিকারের অভাবে সবই ব্যর্থতার সুর বাজিয়ে চলেছে।

গান রচিত হচ্ছে, কিন্তু কাব্য হিসেবে তার কোন স্বতন্ত্র মূল্য নেই। 'আধুনিক' নামধেয় গানের উপমা আশ্চর্যভাবে অনা-ধুনিক। আধুনিক গানের উদ্ভবের সময় থেকে সেই যে 'আলো আর আলেয়া' 'ফুল চেয়ে ভুল করেছি' 'কাঁটা বেঁধে চরণে' 'শপথের মালা—গাঁথা' শুরু হয়েছে—আজ অবধি তার বিরাম নেই না, এবং এই পরিপ্রেক্ষিতে আধুনিক কবিতায় উপমায় কি ঐশ্বর্য!

এইসব কারণে মনে হয়েছে, আধুনিক গানের ক্ষেত্রে যাকে কাব্যসংগীত আখ্যা দেওয়াই সমীচীন, একটি সঙ্ঘবদ্ধ আন্দো-লন দরকার। এবং এ আন্দোলন শুরু করা যেতে পারে এইভাবে:

(১) নজরুল পরবর্তী যেসব কবির গান সংগীতে রূপায়িত হয় নি, অথচ হওয়া সম্ভব, সেসব রচনার সংগ্রহ প্রকাশ করে সুর সংযোজন করা। কয়েকজন আধুনিক কবির গান যে সংগীতে রূপায়িত না হয়েছে এমন নয়। সুরকারদের উচিত কবি হিসেবে খ্যাত ব্যক্তিদের শরণাপন্ন হওয়া। কবিদের উচিত সহযোগিতায় হাত বাড়িয়ে দেওয়া।

(২) নজরুলের পর এবং সমসাময়িক যেসব সুরকার ও গীতিকার কাব্যসংগীতে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আনতে চেয়ে-ছিলেন, সেই হিমাংশু দত্ত, অজয় ভট্টা-চার্য, সুধীরলাল, শ্রীশচীন দেববর্মণ, শ্রীকমল মিত্র প্রমুখেরা যে গান সৃষ্টি করেছিলেন তার ধারাবাহিক ইতিহাস দৃষ্টান্ত সহযোগে কোন উপযুক্ত প্রতিষ্ঠান মারফৎ পরিবেশন করা। অবশ্য সম্প্রতি শ্রীজ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ মহাশয় বেতারে এই উল্লেখযোগ্য বিবরটি পরিবেশন করতে শুরু করেছেন—এ কারণে তিনি রসিক-জনের কৃতজ্ঞতা লাভ করবেন।

(৩) আধুনিক গানে শুধু প্রেম-ভাবনা ছাড়াও, অন্যান্য যেসব অনুভূতি সংগীত মাধ্যমে প্রকাশযোগ্য সেইগুলিকেও পরিবেশন করা।

(৪) যথার্থ আধুনিক উপমা সম্বলিত আধুনিক মনের উপযোগী গান রচনা করা ও উপযুক্ত সুর আরোপ করে পরিবেশন করা।

(৫) এ পর্যন্ত যেসব আধুনিক গান রসিকজনের স্বীকৃতি লাভ করেছে তার একটি সংকলনগ্রন্থ স্বরলিপি সহযোগে পরিবেশন করা।

(৬) এবং প্রকৃত সহানুভূতি নিয়ে আধুনিক গানের যথাযথ মূল্যায়নে অগ্রসর হওয়া।

সাময়িক পত্র-পত্রিকাতে আধুনিক কবিতা, গল্প, ছবি, নাটক, চলচ্চিত্র নিয়ে চিন্তিত ব্যক্তিদের মতামত প্রভৃত পরিমাণে দেখা যায় কিন্তু আধুনিক গান নিয়ে নয়। যদি বা কখনো চোখে পড়ে, তা হয় নিখাদ নিন্দা নয় নিশ্ছিদ্র প্রশংসা। এ দুয়ের কোনটাই আকাঙ্ক্ষিত নয়। অবশ্য সম্প্রতি সাপ্তাহিক বসুমতীতে 'মেঘদূত' এ বিষয় নিয়ে উল্লেখযোগ্য আলোচনা করছেন। শিল্পের এই শাখাটি সম্ভাবনায় অথচ অবহেলায় ক্রমশই রসিকজনের কাছে পরিবেশনের অযোগ্য হয়ে উঠছে।

এই অচল অবস্থার অবসান এই মুহূর্তেই প্রয়োজন—সংগীতের বাংলা দেশের নচেৎ সমূহ ক্ষতি।"

ও সৃষ্টি শিল্পে বর্তমান থাকলে তা 'শিল্প' আভিধায় অন্তর্গত হতে পারে—আধুনিক বাংলা গানে তার পরিমাণ স্বল্প। এবং শিল্পের এই একটি শাখা যে আজ বুদ্ধি-দীপ্ত শ্রোতার কাছে অপাংক্তেয় অশ্রাব্য হয়ে উঠেছে তার অন্যতম কারণও এই যে যোগাজন সম্ভবত এই কাজে ব্রতী নন।

আধুনিক কবিতার বিরুদ্ধে দুর্বোধ্যতার অভিযোগ আছে। তা আংশিক সত্য। বিবেচক ব্যক্তি জানেন, নানাবিধ অভিযোগ থাকা সত্ত্বেও নিতান্ত উন্নাসিক ও অজ্ঞ ব্যক্তি ছাড়া আধুনিক কবিতা সকলের কাছেই সুবোধ্য ও সুন্দর, পণ্ডিতজনের স্বীকৃতিতে ধন্য, পৃথিবীর আধুনিক কবিতার পরিপ্রেক্ষিতে উজ্জ্বল। এবং তার চেয়েও বড় কথা, যাঁরা এই কাব্য আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত তাঁরা আন্তরিকতায় বলিষ্ঠ, নিষ্ঠায় অবিচল। আধুনিক চিত্রশিল্পও দুর্বোধ্য বিচারে নিন্দিত, জনপ্রিয় কোন অর্থেই নয়, কিন্তু আধুনিক চিত্রশিল্পীদেরও নিষ্ঠা প্রশ্নাতীত। এঁরা যা আঁকছেন, তা অন্তরের তাগিদে, কোথাও কোথাও সস্তায় বাজিমাৎ করার প্রচণ্ড প্রচেষ্টা প্রকট, কিন্তু সব মিলিয়ে, রসজ্ঞ ব্যক্তি জানেন, সমস্ত বিশ্বের আধুনিক শিল্প আন্দোলনের সঙ্গে এর যোগ আছে, বিচ্ছিন্ন কিছু নয়।

আধুনিক চলচ্চিত্র, যা সত্যজিৎ রায়, ঋত্বিক ঘটক ইত্যাদির সুপরিচালনায় বিশ্বে স্বীকৃত, আধুনিক নাট্য-আন্দোলন যা শম্ভু মিত্র, উৎপল দত্ত, অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় ইত্যাদির শ্রমে নিষ্ঠায় এক আশ্চর্য সম্ভাবনায় দীপ্ত—এসব কিছুর অন্তরালে প্রধানতই আছে 'শিল্প' সৃষ্টির আন্তরিক প্রেরণা—আধুনিক বাংলা গানের ক্ষেত্রে, অনুমান করি, মূলত এই জিনিসটিরই অভাব। এই নিষ্ঠার। ব্যতিক্রম যে কিছু না আছে এমন নয়, শিল্প সৃষ্টির আন্তরিক তাগিদে কোন গানই সৃষ্টি হয় নি একথাও অসত্য, কিন্তু তা সংখ্যায় এত কম যে নিয়মিত গান না শুনলে রসজ্ঞ ব্যক্তিও বিরূপ মন্তব্য করতে পারেন অনায়াসে। এখন প্রশ্ন ওঠে কেন এমন হলো?

রবীন্দ্রনাথ, অতুলপ্রসাদ, দ্বিজেন্দ্রলাল, নজরুল এঁরা মূলতই ছিলেন কবি এবং তারপর সুরকার। ফলে কাব্য ও সংগীত একসূত্রে গ্রথিত হয়েছিল। যথার্থ কাব্য-সংগীত সৃষ্টি হয়েছিল।

কিন্তু নজরুলের পর, আমার মনে হয়েছে নজরুলই প্রথম এই পথ দেখিয়েছিলেন, গীতিকার, সুরকার ও গায়ক এই শ্রেণী বিভাগ শুরু হলো।

নজরুলই প্রথম, এ অনুমান এই কারণে, শোনা যায়, নজরুল অজস্র গান লিখতেন এবং নানাজনকে দিতেন সুর দেবার জন্যে। এবং সেই গান পরিবেশন করতো আর একজন। অবশ্য গান তাতে কিছু খারাপ হতো না, কেন না, আগেই লিখেছি, নজরুল মুখ্যত কবি ছিলেন এবং তারপর সুরকারও।

কিন্তু নজরুলের পর যাঁরা গান লিখতে শুরু করেছেন তাঁরা কেউ কবি নন। ব্যতিক্রম এক্ষেত্রেও আছে তবে তা এই সত্যকেই প্রতিষ্ঠিত করার জন্য। ফলত এই অ-কবি গীতিকারেরা যা রচনা করেন, তা কাব্য-গুণান্বিত নয়, তাঁদের অনুভূতিলব্ধ কোন বাণী নয়। কতকগুলি বহু ব্যবহৃত ভাব, শব্দ এবং উপমা সাজিয়ে-গুছিয়ে পরিবেশন করা।

আর যেহেতু, এইসব গান কোন অনুভূতি বা ভাবের প্রকাশ নয়, সে কারণে, যেসব সুরকার সুরারোপ করেন তাঁরাও যান্ত্রিকভাবে করছেন, যন্ত্রের প্রভূত সহায়তা নিয়ে করছেন এবং এক্ষেত্রেও অনুভূতির প্রকাশ ঘটছে না। আবার সেই গান পরিবেশন করছেন তৃতীয় আর একজন, যিনি গায়ক। কিন্তু এই অনুভূতিশূন্য সাজানো বানানো গান তাঁর অনুভূতিতে কি কোন ঝংকার তোলে? ফলত তিনিও তা পরিবেশন করেন গলার মাধুর্য ও কারুকার্যের সাধ্যমত সহযোগিতায় এবং যন্ত্রের নিরাপদ আশ্রয়ের আড়ালে থেকে। এবং এ সবকিছুর অনিবার্য ফল শিল্প হিসেবে এই গানের কোন স্বীকৃতি না পাওয়া। আধুনিক গান, চলচ্চিত্র বা নাটকের মতো যৌথশিল্প হতে পারত কিন্তু এই আন্তরিকতার অভাবে ও নিতান্ত ব্যবসায়িক কারণে তা আর হতে পারছে না। এদেশে আধুনিক শিল্প আন্দোলনের পাশাপাশি একটি গড্ডালিকা স্রোত প্রবাহিত যাতে জনরুচি অবগাহন করে তৃপ্তি পায়। সৎ দর্শক পাঠক সৎ শিল্প আন্দোলনে মগ্ন। কোথাও আপোষ নেই। অথচ আধুনিক গানের আসরে এমন কোন আন্দোলন নেই। ক্ষমতাবান সুরকার আছেন, প্রথম শ্রেণীর গায়কও অনেক কিন্তু প্রথম শ্রেণীর গীতিকারের অভাবে সবই ব্যর্থতার সুরে বাজিয়ে চলেছে।

গান রচিত হচ্ছে, কিন্তু কাব্য হিসেবে তার কোন স্বতন্ত্র মূল্য নেই। 'আধুনিক' নামধেয় গানের উপমা আশ্চর্যভাবে অনাধুনিক। আধুনিক গানের উদ্ভবের সময় থেকে সেই যে 'আলো নয় আলেয়া' 'ফুল ভেবে ভুল করেছি' 'কাঁটা বেঁধে চরণে' 'শপথের মালা—গাঁথা' শুরু হয়েছে—আজ অবধি তার বিরাম ঘটল না, এবং এই পরিপ্রেক্ষিতে আধুনিক কবিতার উপমায় কি ঐশ্বর্য!

এইসব কারণে মনে হয়েছে, আধুনিক গানের ক্ষেত্রে যাকে কাব্যসংগীত আখ্যা দেওয়াই সমীচীন, একটি সঙ্ঘবদ্ধ আন্দোলন দরকার। এবং এ আন্দোলন শুরু করা যেতে পারে এইভাবে:

(১) নজরুল পরবর্তী যেসব কবির গান সংগীতে রূপায়িত হয় নি, অথচ হওয়া সম্ভব, সেসব রচনার সংগ্রহ প্রকাশ করে সুর সংযোজন করা। কয়েকজন আধুনিক কবির গান যে সংগীতে রূপায়িত না হয়েছে এমন নয়। সুরকারদের উচিত কবি হিসেবে খ্যাত ব্যক্তিদের দ্বারস্থ হওয়া। কবিদের উচিত সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেওয়া।

(২) নজরুলের পর এবং সমসাময়িক যেসব সুরকার ও গীতিকার কাব্যসংগীতে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আনতে চেয়েছিলেন, সেই হিমাংশু দত্ত, অজয় ভট্টাচার্য, সুধীরলাল, শ্রীশচীন দেববর্মণ, শ্রীকমল মিত্র প্রমুখেরা যে গান সৃষ্টি করেছিলেন তার ধারাবাহিক ইতিহাস দৃষ্টান্ত সহযোগে কোন উপযুক্ত প্রতিষ্ঠান মারফৎ পরিবেশন করা। অবশ্য সম্প্রতি শ্রীজ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ মহাশয় বেতারে এই উল্লেখযোগ্য বিষয়টি পরিবেশন করতে শুরু করেছেন—এ কারণে তিনি রসিকজনের কৃতজ্ঞতা লাভ করবেন।

(৩) আধুনিক গানে শুধু প্রেম-ভাবনা ছাড়াও, অন্যান্য যেসব অনুভূতি সংগীত মাধ্যমে প্রকাশযোগ্য সেইগুলিকেও পরিবেশন করা।

(৪) যথার্থ আধুনিক উপমা সম্বলিত আধুনিক মনের উপযোগী গান রচনা করা ও উপযুক্ত সুর আরোপ করে পরিবেশন করা।

(৫) এ পর্যন্ত যেসব আধুনিক গান রসিকজনের স্বীকৃতি লাভ করেছে তার একটি সংকলনগ্রন্থ স্বরলিপি সহযোগে পরিবেশন করা।

(৬) এবং প্রকৃত সহানুভূতি নিয়ে আধুনিক গানের যথাযথ মূল্যায়নে সচেষ্ট হওয়া।

বাস্তবিক, পত্র-পত্রিকাতে আধুনিক কবিতা, গল্প, ছবি, নাটক, চলচ্চিত্র নিয়ে চিন্তিত ব্যক্তিদের মতামত প্রভূত পরিমাণে দেখা যায় কিন্তু আধুনিক গান নিয়ে নয়। যদি বা কখনো চোখে পড়ে, তা হয় নিখাদ নিন্দা নয় নিশ্ছিদ্র প্রশংসা। এ দুয়ের কোনটাই আকাঙ্ক্ষিত নয়। অবশ্য সম্প্রতি সাপ্তাহিক বসুমতীতে 'বোধদত্ত' এ বিষয় নিয়ে উল্লেখযোগ্য আলোচনা করছেন। শিল্পের এই শাখাটি সম্ভাবনাময় অথচ অবহেলায় ক্রমশই রসিকজনের কাছে পরিবেশনের অযোগ্য হয়ে উঠছে।

এই অচল অবস্থার অবসান এই মুহূর্তেই প্রয়োজন—সংগীতহীন বাংলা দেশের নচেৎ সমূহ ক্ষতি।"

রঙ্গজগৎ

কত রঙ্গ জান

পণ্ডিত রবিশংকর সম্প্রতি মার্কিন মুলুকে তাঁর অভিজ্ঞতার কথা প্রসঙ্গে বলেছেন যে দেশে নাকি ভারতীয় সেতার শিক্ষার দস্তুরমত হিড়িক পড়ে গেছে। এই সেতার শিক্ষার্থীদের মধ্যে অগ্রণী 'হিপি' গোষ্ঠী। হিপিরা লম্বা চুল মাথায় ঘুরে বেড়াচ্ছে,—আর সেতার বাজাচ্ছে, দৃশ্যটি কল্পনা করতে চমৎকার। এই 'হিপি'-দের কেউ কেউ এ দেশেও এসেছে। তাদের সম্পর্কে শোনা যায় ওরা নাকি অদ্ভুত পোষাকে ঘুরে বেড়ায় আর গাঁজা টানে। আর একদিকে লন্ডনের নাইট সম্মানপ্রাপ্ত বিটল অধিনায়করা তো মহেশ যোগীর আশ্রমে যোগাভ্যাস করছে। কয়েকটি পত্রিকায় তার রঙিন ছবিও উঠেছে। যোগের সঙ্গে গাঁজিকার কতদূর সম্পর্ক আছে এবং গাঁজিকার সঙ্গে গীটার ছেড়ে সেতার শেখার উন্মাদনা কোন্ যোগাযোগের ফলে ঘটেছে কে জানে?

আরো খবরে প্রকাশ, মার্কিন মুলুকের নরনারী এখন কৃষ্ণপ্রেমে মাতোয়ারা হয়ে উঠেছে দস্তুরমত খোল-করতাল নিয়ে কীর্তন শুরু হয়েছে। ছবিতে দেখলাম মার্কিনী তরুণী নামাবলী গায়ে ফোঁটা তিলক মেখে খঞ্জনী বাজিয়ে ভজন গাইছে। যদিও ছবির ক্যাপশনে ভক্তিভরে গদগদ লেখা হয়েছে কিন্তু ছবি দেখে তেমন মনে করা যায় না। বাংলার একদল বাউলও আমেরিকা গিয়েছিলেন। তাঁরা এসে বললেন—বাউলের টানেও মার্কিন যুবক-যুবতীরা ক্ষেপা হয়ে উঠেছেন। ওঁরা কত ক্ষেপা বাউল হয়েছেন জানি না তবে যে বাউলরা গিয়েছিলেন তাঁরা যে মার্কিন প্রেমে গদগদ হয়েছেন তা বোঝা গেল। তাঁরা খবরের কাগজে বিটলের সঙ্গে বাউলের যোগাযোগ টানার চেষ্টা করেছেন। তাঁরা বলছেন 'বিটলের পূর্বসূরী বাউল'। কি অপূর্ব কথা! বাউলের একটা দার্শনিক তত্ত্বকথা আছে বলে জানি। বাউলের মধ্যে দিয়ে আত্মিক মুক্তির গভীর আকুতি উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। কিন্তু বিটলের কি এরকম কিছু আছে? লোক-সঙ্গীতের ঢং ও সুরের মিশ্রণে বিটলের দৈহিক দিকটাই তো বড়। কিন্তু বাউল ধর্মকে ছেড়ে যারা বিটলের সঙ্গে যোগাযোগ খোঁজে তাদের কি আর বলা যাবে?

তবে মার্কিন মুলুকে সেতার, কৃষ্ণ কীর্তন, বাউল-এর এত প্রচারে আর কিছু অর্থ বা তাৎপর্য থাকুক না থাকুক রবিশংকর, আলাউদ্দিনের পকেটে দু'-পয়সা আসছে, এবার খোল, খঞ্জনী, নামাবলী, দোতারা রপ্তানী ব্যবসার সম্ভাবনা নেহাৎ মন্দ হবে না।

মার্কিন মুলুকে এই সব খেয়াল ও হি পি হুজুগের বিষয়ে বিখ্যাত মার্কিন নিগ্রো অভিনেত্রী—আর্থা কিট কিছুদিন আগে মিসেস জনসনের পার্টিতে উচ্চৈস্বরে কয়েকটি কথা বলেছিলেন যা নিয়ে পত্র-পত্রিকায় তোলপাড় হয়েছিল। তাঁর বক্তব্য ছিল, মার্কিনরা যেভাবে পররাজ্যের ব্যাপারে নাক গলাচ্ছে, ভিয়েতনামে আগুন জেলে রেখেছে তার ফলে নিজ দেশে অর্থসংকট বাড়ছে এবং ছেলে-মেয়েরা জীবনের পথ খুঁজে পাচ্ছে না। তারা হিপি হয়ে যাচ্ছে। হুজুগের পেছনে ছুটছে।

ভারতীয় সেতার, কীর্তন আর বাউল চর্চা হয়ত ওরকমই একটা ব্যাপার। প্রত্যেকে দেশের সংস্কৃতি তার নিজস্ব দেশের জল বায়ু, জীবনযাত্রা ও মানসিক গঠনে সৃষ্টি হয়। এক দেশের সংস্কৃতিকে আরেক দেশে হুবহু অনুকরণ বা চালান দেওয়া যায় না। তা হয় টবে বাগান করার মত কৃত্রিম, মাটিতে তার শিকড় থাকে না। —সুজন

দিলীপ বসু পরিচালিত 'বৌদি' ছবিতে অনিল চ্যাটার্জী।

'চাপায়েভ' প্রসঙ্গে

বরিস বাবোচকিন

'চাপায়েভ' ছবি মুক্তিলাভের ২৬ বছর পরে ১৯৬১ সালে চাপায়েভ ভূমিকাভিনেতা বরিস বাবোচ্‌কিন সোভিয়েট ফিল্ম পত্রিকায় লিখেছিলেন:

'চাপায়েভ' এক ঐন্দ্রজালিক শক্তির মত মুক্তিলাভ করেছিল। ছাব্বিশ বছর পরেও ছবিটি লোকগাথার মত আলোচিত হচ্ছে। বাস্তবিকই ছবিটি দর্শকদের ঐন্দ্রজালিক শক্তির মত আকৃষ্ট করেছিল।

ভলগা নদীর পাড়ে ছবিটির দৃশ্য গ্রহণ করা হয়েছিল। সে সময় সেখানে বিরাট সৈন্যবাহিনীর ছাউনি পড়েছিল। আমাদের সঙ্গে সৈন্যদের খুব শীঘ্রই বন্ধুত্ব হয়ে গেল। ওদের মধ্যে এমন কয়েকজন ছিলেন যাঁরা চাপায়েভের সহযোদ্ধা ছিলেন। আমরা তাঁদের কাছ থেকে অনেক পরামর্শ এবং চাপায়েভের জীবন সম্পর্কে অনেক কথা জানতে পেরেছি। তাঁদের কথায় আমাদের ধারণা ও মেজাজ পরিবর্তিত হয়েছে, যখন সত্যিই ছবি-তোলা শুরু হল তখন কেবল অভিনেতা হিসাবে নয়, চিত্রগ্রহণের দর্শক হিসাবেও আমরা আনন্দ উপভোগ করেছি। এক সহকর্মী আমাকে যখন জিজ্ঞাসা করেছিল কেমন লাগছে—আমি নতুন অভিনেতা—সরলতায় বলেছিলাম—এমন মজার ব্যাপার আমি আর দেখি নি।

মুক্তিলাভের পরে প্রথম দিকে দর্শকদের ছবিটি ভাল লাগলেও খুব উচ্ছ্বাস দেখা যায় নি। কিন্তু যখন সারা দেশে ছবিটি দেখান শুরু হল তখন। উচ্ছ্বাসের

যেন প্লাবন শুরু হল। মস্কোতে ভোরের বেলা দেখলাম বিরাট কিউ। আমার গাড়ির চালককে জিজ্ঞাসা করে জবাব পেলাম—'চাপায়েভ' ছবি দেখতে টিকেট কেনার জন্য এত লোকের ভিড়। আর একটি ঘটনার কথা আমার মনে পড়ছে। ১৯৩৫ সালের শীতকালে আমি এক ছোট শহরে গিয়েছিলাম। সাধারণত যেরকম হয়ে থাকে, সে শহরের মাঝখানে ছিল শাসন কর্তৃপক্ষের অফিস, টাউন ক্লাব এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কার্যালয়গুলি। দেখলাম সেখানে লোকে লোকারণ্য, আর উচ্চ কলরব। জিজ্ঞাসা করে জানলাম গ্রাম থেকে দলে দলে কৃষকরা এসে জমায়েত হয়েছে 'চাপায়েভ' দেখবার জন্য, এবং টিকেট পাওয়ার অপেক্ষায় তাঁরা সেখানে অপেক্ষা করছেন ভোর থেকে।

ছবিতে নির্মাতারা চাপায়েভের জীবনের ঘটনা বেশি দেখায় নি, কিন্তু শিল্পের শক্তি কখনো কখনো বাস্তব ঘটনার চেয়েও বেশি শক্তিশালী হয়ে থাকে। এই ছবিতে বাস্তবিকপক্ষে দর্শকরা নিজেদের জীবনের প্রতিবিম্ব দেখেছে। এক বৃদ্ধ যোদ্ধা আমার পাশে বসেছিলেন, তিনি বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বললেন—কমরেড বাবোচকিন, ছবিতে দেওয়ালের পাশে ঐ যে লাল ফৌজের লোকটিকে দেখছেন, সে আমি। মহাযুদ্ধের সময় সৈনিকদের মনে চাপায়েভের কথা পুনর্জাগ্রত হয়, সেই নৈতিক শক্তি নিয়ে তাঁরা যুদ্ধক্ষেত্রে এগিয়ে যান। আমি শুনেছি যখন স্টালিনগ্রাড অবরুদ্ধ হয়েছিল তখন ধ্বংসস্তূপের এবং তীব্র বোমাবর্ষণের মধ্যেও 'চাপায়েভ' দেখান হয়েছিল—এক পাল্টা আক্রমণের পূর্ব মুহূর্তে। ছবি দেখান শেষ হলে একজন নৌ-অফিসার উঠে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন, ভাসিলি চাপায়েভ, আমরা প্রতিজ্ঞা করছি এক পাও আমরা পিছু হটে আসবো না। এবং সেই সৈনিকরা ফ্রণ্টে গিয়েছিলেন ও আমরণ যুদ্ধ করেছিলেন।

'চাপায়েভ' সোভিয়েটের বাইরেও দেখান হয়েছিল এবং সকল দেশে জনগণের প্রশংসা লাভ করেছিল। এই ছবির মাধ্যমে নবজাত সোভিয়েট জনগণের সাহস ও ত্যাগ, তাদের শত্রুদের এবং দেশের পরিস্থিতি বুঝতে পেরেছে। 'চাপায়েভ' ১৯৩৫ সালে মস্কো চলচ্চিত্র উৎসবে এবং প্যারিসে ১৯৩৫ সালে সর্বোচ্চ পুরস্কার লাভ করেছে।

অনেক, অনেক বছর অতীত হয়ে গেছে, অথচ ছবিটি আজো দর্শকমনে নতুন ছবির মত আগ্রহ সৃষ্টি করছে। প্রসঙ্গত আমার মনে পড়ছে একটি ছেলের কথা, সে 'চাপায়েভ' দেখেছিল—একবার, দুবার, তিনবার; তার পরেও দেখবার জন্য অপেক্ষা করছিল। আমি

বিশ্ববিখ্যাত 'চাপায়েভ' ছবির একটি দৃশ্য

তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম 'তুমি বাড়ি যাও না কেন?' সে বলেছিল, 'আমি অপেক্ষা করছি।' কিসের জন্য অপেক্ষা করছো? সে জবাব দিয়েছিল, 'হতেও পারে যে চাপায়েভ সত্যিই নদীতে ডুবে যান্ নি; তিনি আবার উঠেও তো আসতে পারেন।'

নাটকের কথা

পথের দাবী

গত ১৩ই মার্চ সন্ধ্যায় রংমহল মঞ্চে পঃ বঃ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ কলিকাতা বিভাগ প্রমোদ সংস্থার তৃতীয় বার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে 'পথের দাবী' নাটক অভিনীত হয়। অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করেছেন—সুনীল চক্রবর্তী, সন্তোষ দত্ত, রতন চট্টোপাধ্যায়, বিজয় কুণ্ডু, শিপ্রা সাহা, যূথিকা ভট্টাচার্য, ছবি ঘোষ, গোষ্ঠ দাস, বিমল গাঙ্গুলী, রজনী দেবনাথ, বিমল ব্রহ্ম, নীলকান্ত পাঠক, অমিত রায়, গৌর হাজরা প্রমুখ।

"বলাকার নাট্যাভিনয়"

গত ৩রা মার্চ (রবিবার) ১৯৬৮ 'বলাকা' নাট্যগোষ্ঠী যোধপুর পার্কের নিকটে 'অ্যানড্রুজ হলে' রবীন্দ্রনাথের 'মাল্যদান' ও বিধায়ক ভট্টাচার্যের 'মাটির ঘর' অভিনয় করেন। রবীন্দ্রকাহিনী 'মাল্যদানের' নাট্যরূপ ও নির্দেশনায় ছিলেন অরুণকান্তি সাহা ও 'মাটির ঘরে' দিলীপ চৌধুরী। এ দুটি নাটকের অভিনয়াংশে ছিলেন—সুপ্রিয় সাহা, প্রদ্যুৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, নবকুমার, কৃষ্ণেন্দু আঢ্য, প্রফুল্ল রায়, অর্ধেন্দু মণ্ডল, ভবেশ ঘোষ, কনক সাহা, শেখর কুমার, সূর্য রক্ষিত, সুতপা চক্রবর্তী, নন্দিতা দাস, মলি মুখার্জী, কৃষ্ণা ভট্টাচার্য ও গীতা দাস।

শক্তি সঙ্ঘের নাট্যানুষ্ঠান

গত ১৫ই ও ১৬ই মার্চ '৬৮ নারায়ণ পল্লী শক্তি সঙ্ঘের (দক্ষিণ নিমতা, কলি—৪৯) দুদিন ব্যাপী নাট্যানুষ্ঠান সাফল্যের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষে সঙ্ঘের সদস্যবৃন্দ কর্তৃক শ্রীবীরু মুখোপাধ্যায়ের 'বন্দর' ও শ্রীশচীন ভট্টাচার্যের 'সম্রাটের মৃত্যু' বিপুল দর্শক সমাগমে অভিনীত হয়। পরিচালনা করেন শ্রীশতদল বড়ুয়া। অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করেন : সন্তোষ চট্টোঃ, নীলমণি বর্মণ, স্বপন দাস, অরবিন্দ গুহরায়, অমল বর্মণ, জীতেন্দ্রনাথ দাস, সতীশ দাস, দিলীপ চন্দ, পরিমল দেভৌমিক, শতদল বড়ুয়া, অমল পোদ্দার, প্রফুল্ল দাস, অসীম চৌধুরী, আশু দত্ত, প্রাণকুমার চট্টোঃ, অবনী বর্মণ ও মাঃ অসীম। স্ত্রী চরিত্রে অভিনয় করেন মেনকা ভট্টাঃ, রীণা ঘোষ, মমতা মুখোঃ ও তৃপ্তি মুখোঃ।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'দিবারাত্রির কাব্য' ছবির একটি দৃশ্যে বসন্ত চৌধুরী, মাধবী মুখাজী নবাগত স্বপন রায়।

স্টুডিও খবর

"দাদু" ছবির সংগীত গ্রহণ

গত ১২ই মার্চ টেকনিসিয়ান্স স্টুডিও-র সংগীত গ্রহণ কেন্দ্রে কণ্ঠশিল্পী অনিল দত্তের সুরে "দাদু" ছবির জন্যে দুটি গান রেকর্ড করা হয়েছে। গানগুলিতে কণ্ঠদান করেছেন—সন্ধ্যা মুখাজী ও সুরকার অনিল দত্ত। এর আগে কালীপদ সেনের সুরে আরও দুটি গান রেকর্ড করা হয়েছে। গান দুটি গেয়েছিলেন আরতি মুখাজী। শ্রীরঞ্জিৎমল কাঁকারিয়া প্রযোজিত "দাদু" ছবিটির কাহিনী, রচনা ও পরিচালনা করেছেন—অজিত গাঙ্গুলী। চরিত্র চিত্রণে আছেন—বিকাশ রায়, সন্ধ্যা রায়, অনুপকুমার, অজয় গাঙ্গুলী, জ্যোৎস্না বিশ্বাস, সবিতা চ্যাটার্জী, সত্য ব্যানাজী, অনুভা গুপ্তা, জহর গাঙ্গুলী, পদ্মা দেবী, ভানু ব্যানাজী, প্রসাদ মুখাজী, হরিধন মুখাজী, বঙ্কিম ঘোষ ও কল্যাণী ঘোষ। শ্রীরঞ্জিৎ পিকচার্স ছবিটির পরিবেশক।

দীঘায় 'অগ্নিযুগের কাহিনী'র বহির্দৃশ্য গ্রহণ

শ্রীমতী মঞ্জুশ্রী বসু প্রযোজিত দি নিউ এরা পিকচার্সের "অগ্নি যুগের কাহিনী" ছবির বহির্দৃশ্য গ্রহণের জন্যে পরিচালক ভুপেন রায় শিল্পী ও কুশলীদের নিয়ে গত ১৮ই মার্চ দীঘা রওনা হয়েছেন। ২৫শে মার্চ পর্যন্ত এই চিত্রগ্রহণ চলবে। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের পটভূমিকায় এ ছবির কাহিনী রচনা করেছেন—বীরেন রায় এম, পি। গোপেন মল্লিক ছবিটির সুরকার। নেপথ্যে কণ্ঠদান করেছেন—মান্না দে, সন্ধ্যা মুখাজী, অশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায় ও মঞ্জুশ্রী বসু। চরিত্র চিত্রণে আছেন—বিকাশ রায়, মাধবী মুখাজী, অজয় গাঙ্গুলী, দিলীপ রায়, অজিতেশ ব্যানাজী, সুলেতা চৌধুরী, আনন্দ মুখাজী, বিজন ভট্টাচার্য, সীমন্তিনী রায়, সুখেন দাস, সমর চ্যাটাজী, স্বপন কুমার, ভানু ব্যানাজী ও শিপ্রা চক্রবর্তী। ছবিটির চিত্রগ্রহণ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে।

'আঁধার সূর্য'র বহির্দৃশ্য

পরিচালক সুধীর মুখাজী সদলে শিলং গেছেন 'আঁধার সূর্য' ছবির বহির্দৃশ্য গ্রহণের জন্য। রীণা ঘোষ ও মৃণাল মুখাজী বহির্দৃশ্য গ্রহণে অংশ গ্রহণ করবেন। চেরাপুঞ্জিতে বৃষ্টির দৃশ্য, ওয়ার্ড হ্রদে নৌকা বিহার এবং শিলং-এ ছবি তোলা হবে। ইতিমধ্যে পরিচালক মেডিক্যাল কলেজ ল্যাবরেটরি, দক্ষিণেশ্বর মন্দির এবং কলকাতার এক বিপণিতে চিত্রগ্রহণ করেছেন। এই ছবিতে অভিনয় করছেন—দীপ্তি রায়, ছায়া দেবী, রীণা ঘোষ, কমল মিত্র, অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, তরুণকুমার, দীপক মুখাজী, অজিত চ্যাটাজী প্রমুখ। কাহিনী ও চিত্রনাট্য লিখেছেন গৌরাঙ্গপ্রসাদ বসু। রবীন চ্যাটাজী সঙ্গীত পরিচালনা করছেন। আর, ডি, বি এণ্ড কোং-এর পরিবেশনায় ছবিটি মুক্তি পাবে।

সংবাদ কণিকা

বৃটিশ ফিল্ম পুরস্কার

কলাম্বিয়া পিকচার্স পরিবেশিত চারটি ছবি বৃটিশ ফিল্ম একাডেমির ষোলটি পুরস্কার লাভের জন্য মনোনীত হয়েছে। একাডেমি থেকে একথা ঘোষণা করা হয়েছে। ফ্রেড জিনেম্যানের 'এ ম্যান ফর অল সীজন'—যে কোন পর্যায়ে সেরা ছবি বলে বিবেচিত হয়েছে। দ্বিতীয় বিবেচিত হয়েছে সিডনী লুমেৎ-এর 'দি ডেডলি এফেয়ার'। 'দি টেমিং দি শ্রু' ছবিতে অভিনয়ের জন্য রিচার্ড বার্টন ও এলিজাবেথ টেলর শ্রেষ্ঠ অভিনেতা ও অভিনেত্রী মনোনীত হয়েছেন। রঙিন ছবি ও পোষাক পরিকল্পনার জন্য সেরা বিবেচিত হয়েছে 'কাসিনো রয়্যাল'।

সিনে সেণ্ট্রাল—ক্যালকাটা

'সিনে সেণ্ট্রাল, ক্যালকাটা'র উদ্যোগে সরলা রায় মেমোরিয়াল কমিউনিটি হলে আগামী ১৬ই থেকে ২১শে এপ্রিল চারটি ফরাসী চলচ্চিত্র—'আদিউ ফিলিপিন' (জাক রোজিরে), 'ক্রোনিক দাঁনেতে' (এদগার মোর ও জাঁ রুশ), 'মাদাম স্যঁ' (ম্যাক্স ওপুল্স) এবং 'হিরোশিমা মনামুর' (অ্যালাঁ রেনে) প্রদর্শিত হবে।

মেলবোর্ন চলচ্চিত্র উৎসবে 'ছুটি'

নেপাল দত্ত প্রযোজিত অরুন্ধতী দেবী পরিচালিত 'ছুটি' আগামী সপ্তদশ মেলবোর্ন চলচ্চিত্র উৎসবে যোগদানের জন্য ভারত সরকার কর্তৃক নির্বাচিত হয়েছে। এই আন্তর্জাতিক উৎসব আগামী ৩১শে মে থেকে ১৫ই জুন পর্যন্ত মেলবোর্নে অনুষ্ঠিত হবে। একটি প্রতিনিধি দলও এই উৎসবে যোগদান করবেন বলে আশা করা যায়।

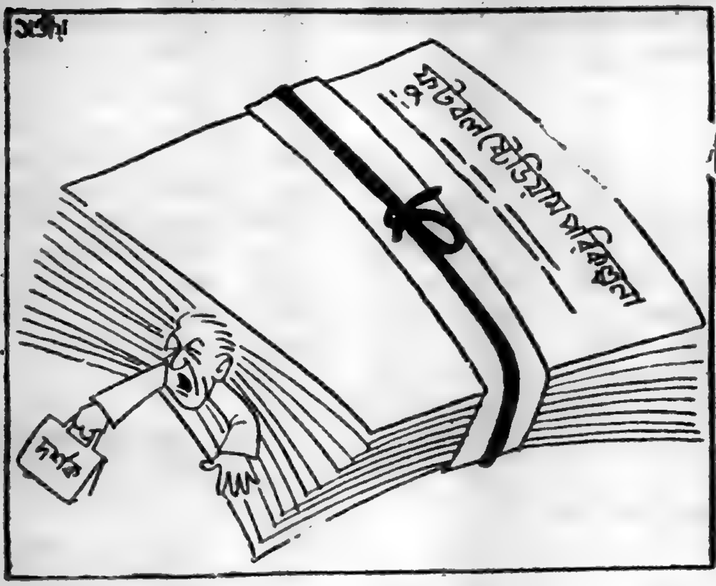

খেলাধুলা

কলকাতার স্টেডিয়াম

কুহকিনী আশা ছলনাময়ী। আজ আবার নতুন করে মনে পড়ছে—আশার ছলনে ভুলি কি ফল লভিনু হায়, তাই ভাবি মনে...। কণপ্রভা প্রভা দানে বাড়ায় মাত্র আঁধার পথিকে ধাঁধিতে! আজকের আলোচ্য বিষয়ের ধাঁধাটি আর কিছুই নয়—কলকাতা ময়দানে অতি পুরাতন একটি প্রসঙ্গ, কলকাতার স্টেডিয়াম। কিন্তু কলকাতার স্টেডিয়ামের কথা বললেই সবার আগে এই কথাটাই মনে আসে—হায় স্টেডিয়াম তুমি শুধু ছলনা......!

বছরের পর বছর ছলনাময়ী আশা ছলে-বলে-কৌশলে আমাদের বারবার আশার আলো দেখিয়ে পরমুহূর্তে আবার গা ঢাকা দিয়েছে হতাশার অতল অন্ধকারে। লাল ফাইলের অন্ধ গর্ভে এই প্রসংগটি হাজারবার মাথা খুঁড়ে মরলেও সেই লাল ফাইলের ফাঁস আলগা করে আজ পর্যন্ত তাকে উদ্ধার করার সত্যিকারের কোন প্রচেষ্টা হয়েছে বলে মনে হয় না। হলে আর যাই হোক প্রসংগটি এইভাবে বছরের পর বছর ক্রীড়ারসিকদের আশা আর হতাশার দোলায় দোলাতে পারতো না!

পারতো যে না, সে বিষয়ে কোন সন্দেহই নেই। থাকলে সেই কংগ্রেস সরকারের আমল থেকে আজ পর্যন্ত সেই একই প্রসংগ বাংলা দেশের ক্রীড়ারসিকদের বার বার হতাশার সাগরে ডোবাতে পারতো না। আজ থেকে বেশ কয়েক বছর আগে স্বর্গত ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় যখন মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন তখন থেকে আরম্ভ হয়ে পার হয়েছে প্রফুল্লচন্দ্র সেনের আমল, অজয় মুখোপাধ্যায়ের পর প্রফুল্ল ঘোষের যুগ। আর প্রত্যেকের সময়েই একটি বিষয়ে দেখা গেছে অদ্ভুত মিল। সবাই-ই এই অবহেলিত বিষয়টি নিয়ে মাথা ঘামিয়েছেন, আলাপ-আলোচনা করেছেন তারপর মিথ্যে প্রলোভনে বাংলা দেশের ক্রীড়ারসিকদের ভুলিয়ে আবার লাল সুতোর বাঁধনে ফাইলের মধ্যে পুরে ফেলেছিলেন কলকাতার স্টেডিয়াম প্রসংগটিকে।

ফলে বারবার এই একই বিষয়ের জন্যে খরচ হয়েছে হাজার হাজার টাকা। আর এখন পর্যন্ত সে খরচের পরিমাণ কয়েক লক্ষ টাকার ওপরে। অথচ কাজের কাজ কিছুই হলো না—কাজের কাজ আজ পর্যন্ত কিছুই হয় নি! তবু যে-টুকু হয়েছিলো সে সেই ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের আমলে। তারপর থেকে আজ পর্যন্ত অন্য সকলে মুখের জোরেই জগৎটাকে দেখতে চেয়েছিলেন। তাই কাজ কিছুই হয় নি। শুধু বেড়েছে খরচের অংকটা! আর বাংলা দেশের, আমাদের মতো সাধারণ ক্রীড়া উৎসাহীরা বারবার হতাশার সাগরে নিমজ্জিত হয়েও মুখ বুজে সহ্য করে চলেছি সব রকমের খামখেয়ালিপনা।

অথচ এমনটি তো হবার কথা ছিলো না। ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের আমলে প্রসংগটি এগিয়েছিলো অনেকদূর। বিদেশ থেকে এসেছিলেন নামকরা স্থপতি ট্রীভেটোলজ্জি। লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে তৈরি হলো নক্সা, তৈরি হলো কলকাতা ফুটবল স্টেডিয়ামের মডেল। সেই মডেলটি আজো পড়ে আছে শহর কলকাতার কোন একটি নামকরা আস্তানায়।

ভেটোলজ্জি সাহেব ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে যেখানে স্টেডিয়াম তৈরি হবার কথা সেই স্থানটি দেখে বানিয়েছিলেন মডেলটি। তখনো শোনা গিয়েছিলো যে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিরক্ষা দপ্তরের অনুমোদন পাওয়া গেছে। অর্থাৎ মিটে গেছে জমির সমস্যা। কিন্তু হবে হবে করেও শেষ পর্যন্ত হলো না কলকাতার স্টেডিয়াম। তারপর বারবার জমির সমস্যা নিয়ে সৃষ্টি হয়েছিলো জটিলতা। কিন্তু এখন আবার শোনা যাচ্ছে যে কলকাতার দ্বিতীয় সেতু নির্মাণের জন্যে স্টেডিয়ামের জন্যে নির্দিষ্ট ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডের জমি পাওয়া যাবে না। স্টেডিয়াম না কি হবে অন্য কোথাও।

কিন্তু আজ এতো কাণ্ডের পর শুধু একটা কথাই মনে হচ্ছে যে কলকাতার ফুটবল স্টেডিয়াম বোধহয় কোনদিনই গড়ে উঠবে না—কোনদিনই কলকাতার বুকে শোভা পাবে না একটি পূর্ণাঙ্গ ফুটবল স্টেডিয়াম।

তবু ছলনাময়ী আশার মতো কলকাতার স্টেডিয়াম প্রসংগটি বারবার আমাদের আশা-নিরাশার দোলায় দোলাবে—কিন্তু কাজের মতো কাজ কোনদিনই হবে না। স্টেডিয়াম-স্টেডিয়াম করে হাজার চীৎকার করে গলা ফাটালেও কলকাতার ফুটবল স্টেডিয়াম কি কোনদিন তৈরি হবে......?

—শান্তিপ্রিয়

প্রত্যাবর্তন

অবশেষে ভারতীয় ক্রিকেট দলের সফরের পালা শেষ হলো। ঘরের ছেলেরা মাসকয়েক অস্ট্রেলিয়া আর নিউজিল্যাণ্ড ঘুরে ফিরে এসেছেন ঘরে। সেই সঙ্গে—সংগে করে নিয়ে এসেছেন এক অমূল্য

গোলাম আমেদ

সম্মান। বিদেশের মাটিতে প্রথম ভারতীয় দল হিসেবে 'রাবার' জিতে এসেছেন তাঁরা।

এতোদিন যা সম্ভব হয় নি, সেই অসম্ভবকে সম্ভব করে ভারতীয় ক্রিকেট ইতিহাসের এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করে দেশে ফিরে এসেছেন ভারতীয় খেলোয়াড়রা।

শুধুমাত্র ক্রিকেটরসিকই নন, সমস্ত ভারতবাসী আজ তাঁদের এই সাফল্যে আনন্দিত। কিন্তু আনন্দের বান ডাকে নি সারা দেশ জুড়ে। কারণ ভারতের এই 'রাবার' লাভ করে ফিরে আসাকে বিশেষ মূল্য দিতে চাইছেন না কেউই।

কিন্তু একটা কথা আমাদের ভুললে চলবে না, হোক না নিউজিল্যাণ্ড, তবু বিদেশের মাটিতে ভারতের তো এই প্রথম 'রাবার' লাভ! যদিও আজ ক্ষতির খতিয়ানে পাল্লা ভারী, তবুও এই লাভটুকুও কিছু আর ফেলনা নয়। বলা যায় না এই হয় তো ভবিষ্যৎ সাফল্যের শুভ সূচনা!

তাই আজ আমরা আনন্দিত মনে স্বাগত জানাই ভারতীয় দলের খেলোয়াড়-যাই আমরা, নিউজিল্যাণ্ডে সাফল্যের দের। অস্ট্রেলিয়ায় পরাজয়ের কথা ভুলে স্মৃতিই আবার দিক আমাদের নতুন পথের সন্ধান, দেখাক আশার আলো।

কিন্তু আজ এই আলোচনা প্রসঙ্গে ভারতীয় ক্রিকেট দলের অস্ট্রেলিয়া আর নিউজিল্যাণ্ড ভ্রমণের সময়কার ম্যানেজার গোলাম আমেদের সম্বন্ধে কিছু বলা দরকার। বলা দরকার এই কারণে যে, গোলাম আমেদের মন্তব্য শুনে আমরা কোন মতেই সন্তুষ্ট হতে পারি না। আমরা তাঁর কাছ থেকে জানতে চাই যে কেন ভারতীয় দলের খেলোয়াড়রা অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ঐ রকম ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছেন, কেন তাঁরা প্রয়োজনের মুহূর্তে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারেন নি?

গোলাম আমেদ ভারতীয় দলের প্রাক্তন খেলোয়াড়, এক সময় অধিনায়কও ছিলেন। খেলার খুঁত এবং খেলোয়াড়দের দোষ-গুণের বিচার মনে হয় তিনি ভালোভাবেই

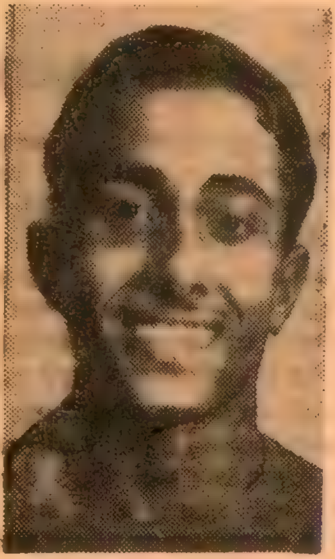

বলাই দে

করতে পারবেন। তাই তাঁর কাছ থেকে আমরা শুধু মন্তব্য শুনতে চাই না, চাই সমালোচনামূলক বিশ্লেষণ।

গোলাম আমেদ প্রসঙ্গে আরো একটি বিষয় উল্লেখ করার প্রয়োজন। দেশে ফিরেই বোম্বাই বিমান বন্দরে গোলাম আমেদ এমন সব কথা বলেছেন যা বলা হয়তো যা তাঁর পক্ষে সংগত হয় নি! বিমান বন্দরে তিনি শুধু নিউজিল্যাণ্ডের বোলার মারলেট সম্বন্ধে বিরূপ মন্তব্য করেই সন্তুষ্ট ছিলেন না—নিউজিল্যাণ্ডের আম্পায়ারিং সম্বন্ধেও যা-তা বলেছেন। ভারত নিউজিল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে ৩—১ টেস্টে জয়লাভ করে দেশে ফিরে এসেছে। নিউজিল্যাণ্ড দুর্বল দল সন্দেহ নেই, তবু ভারতীয় দলের খেলোয়াড়রাও নিঃসন্দেহেই উন্নত ক্রীড়ানৈপুণ্যের পরিচয় দিয়ে এসেছেন সেখানে। তাই এই মুহূর্তেই আম্পায়ারিং সম্বন্ধে অমন মন্তব্য বোধহয় না করলেও চলতো।

গোলাম আমেদ আরো বলেছেন যে পার্থ থেকে শুরু না হয়ে ভারতীয় দলের সফর যদি ব্রিসবেন থেকে আরম্ভ হতো তাহলে ভারতীয় খেলোয়াড়রা অস্ট্রেলিয়ায় আরো ভালো খেলতে পারতেন! সত্যিই কি তাই? আশা করি গোলাম আমেদ ভবিষ্যতে এই বিষয়ে বিস্তারিতভাবে বলবেন! দ্বিতীয়ত গোলাম আমেদ বলেছেন যে অস্ট্রেলিয়ার পিচগুলো ফাস্ট বোলারদের সুবিধের দিকে নজর দিয়ে বানানো—আর সেই জন্যেই ভারতীয় খেলোয়াড়রা হয়েছিলেন অসুবিধার সম্মুখীন। কিন্তু শুধু যদি তাই হবে—তাহলে অস্ট্রেলিয়ার স্পিন বোলাররা অতোগুলো করে উইকেট পেলেন কি করে, আর ভারতীয় খেলোয়াড়রাই বা কেন স্পিন বোলারদের হাতে আউট হলেন?

যাই হোক এই সফর থেকে ভারতের মোটামুটিভাবে লাখখানেক টাকা লাভ হয়েছে। তবে লাভ লোকসানের দিকে নজর না দিয়ে ভারত যদি এই সফর থেকে নিজের দোষ আর খেলোয়াড়রা যদি নিজেদের খুঁতগুলো ধরতে পেরে থাকেন আর ভবিষ্যতে সেই দোষ শোধরাতে সমর্থ হন, তাহলেই বলা যাবে যে ভারতীয় দলের এই সফর সার্থক হয়েছে।

দল বদলের পালা এবারের মতো শেষ হয়ে গেলো। শেষ হয়ে গেলো নামী দলগুলোর দামী খেলোয়াড়দের নিয়ে টাগ-অফ-ওয়ারের জোরাল পর্ব। এবার

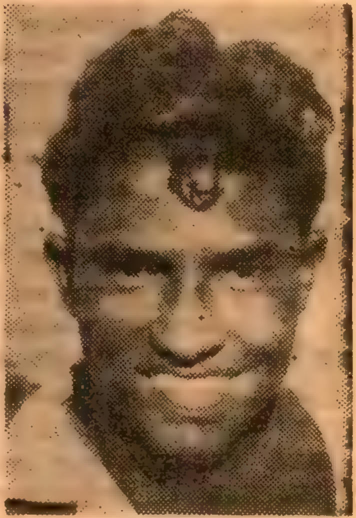

এণ্টনি

দল বদলের পালা

দল বদলের আসরে পালা বদল করেছেন ৬৪০ জন খেলোয়াড়। গত বছর অবশ্য আসরে নেমেছিলেন এবারের থেকে ৪০

জন কম খেলোয়াড়। তবে এবারের রেকর্ড হলো আই এফ এ অফিসে রাইফেলধারী (আর্মড) পুলিশ পাহারার ব্যবস্থা। সাম্প্রতিককালে এ ঘটনাটি আর ঘটে নি।

দল বদলের পালায় এবার সব থেকে বেশি লাভবান হয়েছে মোহনবাগান। মোহনবাগান দল আরো শক্তিশালী হয়েছে ইস্টবেঙ্গল থেকে নঈম আর হাবিব, এরিয়ান্স থেকে বলাই দে আর বি এন আর-এর কে সাহা প্রমুখের যোগদানে। নঈম আর হাবিব দল ছেড়ে গেলেও ইস্ট-বেঙ্গল টানতে পেরেছেন বি এন আর-এর অরুণ ঘোষ ও এন্টনি, মোহনবাগান থেকে এম কর্মকার, বি এন আর থেকে পি মজুমদার ও ইস্টার্ন রেল থেকে এন গাঙ্গুলী প্রমুখ খেলোয়াড়দের। দল বদ-লের পালায় এবার সব থেকে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বি এন আর। তারা এবার দলে পেয়েছে। এরিয়ান্সের মোহন সিং আর কালীঘাটের এস দাশ ও মহামেডান স্পোর্টিং-এর এস সেন প্রমুখ খেলোয়াড়কে।

ঐতিহাসিক জয়লাভ

শেষ পর্যন্ত অমীমাংসিত পর্যায়ের অবসান ঘটলো। পর পর তিনটে টেস্ট অমীমাংসিতভাবে শেষ করার পর চতুর্থ টেস্ট ম্যাচে ইংলণ্ড নাটকীয়ভাবে সাত উইকেটে হারিয়ে দিয়েছে ওয়েস্ট ইণ্ডিজকে।

সোবার্স ১৬৫ মিনিটে ২১৫ রান করে জেতার যে সুযোগ ইংলণ্ডকে দিয়ে-ছিলেন, কাউড্রে সেই সুযোগ হেলায় হারান নি। বয়কট আর কাউড্রের প্রাণ-বন্ত ব্যাটিংই অসম্ভবকে সম্ভব করে ইংলণ্ডকে জয়লাভের পথে এগিয়ে নিয়ে গেলো। বয়কট ৮০ রান করে অপরাজিত থাকলেন, আর কাউড্রে আউট হয়েছিলেন ৭১ রান করার পর।

প্রথম ইনিংসে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ৭ উইকেটের বিনিময়ে ৫২৬ রান করে ইনিংস সমাপ্তি ঘোষণা করে। কিন্তু ইংলণ্ডের প্রথম ইনিংস শেষ হয় ৪০৪ রানে। ১২২ রানে এগিয়ে থেকে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দ্বিতীয় ইনিংস শুরু করে এবং ২ উইকেটে ৯২ রান করার পর ইংলণ্ডকে খেলার সুযোগ দেয়। কিন্তু জয়লাভের জন্যে প্রয়োজনীয় ২১৫ রান ইংলণ্ড করে ফেলে মাত্র ১৬৫ মিনিটেরও কম সময়ে অর্থাৎ খেলা শেষ হবার ৩ মিনিট আগে।

ইংলণ্ডের এই ঐতিহাসিক সাফল্যই হলো চতুর্থ টেস্টের একমাত্র জয়লাভ যে খেলায় প্রতিপক্ষ দল ইনিংস সমাপ্তি ঘোষণা করেছিলেন। এর আগে ১৯৪৮ সালে লীডস মাঠে অস্ট্রেলিয়া ৭ উইকেটে পরাজিত করেছিলো—ইংলণ্ড দল ইনিংস সমাপ্তি ঘোষণা করার পর। ১৯৪৮-৪৯ সালে পোর্ট এলিজাবেথ মাঠে একই অবস্থায় ইংলণ্ড সাউথ আফ্রিকাকে হারিয়ে দিয়েছিলো ৩ উইকেটে। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দল এইভাবে আর একবার ইংলণ্ডের কাছে পরাজিত হয়েছিলো ১৯৩৪-৩৫ সালে ব্রিজটাউনের টেস্ট ম্যাচে।

সমাচার দর্পণ

ডেভিস কাপ টেনিস প্রতিযোগিতায় আমেরিকার দলের নেতৃত্ব করার ভার পড়েছে ডোনাল্ড ডেলের ওপর। ২৯ বছর বয়েসের ডেল হলেন ওয়াশিংটনের এটর্নী। ১৯৬০ সাল থেকে ডেল টেনিস প্রতিযোগিতায় শিরোনামায় এসেছেন। ডেলের আগে আমেরিকার অধিনায়ক ছিলেন জর্জ ম্যাককল।

*

অনেকগুলো দেশ যদি অলিম্পিক প্রতিযোগিতায় যোগদান না করে তাহলেও মেক্সিকো অলিম্পিক ঠিক-ভাবেই অনুষ্ঠিত হবে। অলিম্পিক প্রতিযোগিতায় সাউথ আফ্রিকাকে যোগদান করতে দেওয়ার সিদ্ধান্তে চারিদিকে যে প্রতিবাদের ঝড় উঠেছে, সে বিষয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে এ কথা বলেছেন মেক্সিকান অলিম্পিক অর্গানাইজিং কমিটির সভাপতি সেনর পেড্রো রেমিরেজ ভ্যাজকুয়াজ।

*

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের বুচারও বোলার-রূপে দেখা দিলেন ইংলণ্ড বনাম ওয়েস্ট ইণ্ডিজের চতুর্থ টেস্ট ম্যাচে। অমীমাংসিত পর্যায়ের চতুর্থ খেলায় বুচার ৩৪ রানের বিনিময়ে পেয়েছেন ৫টি উইকেট। আর ইংলণ্ডের অধিনায়ক কাউড্রে করেছেন ১৪৮ রান। অবশ্য ওয়েস্ট ইণ্ডিজের নার্স আর কানহাইও সেঞ্চুরী করেছেন।

ইংলণ্ড ও ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের চতুর্থ টেস্ট খেলায় রডবিগসের একটি বলে ইংলণ্ডের জি বয়কট বাউণ্ডারী করছেন।

ধরতে না পেরে বাউণ্ডারী লাইন অতিক্রম করে যায়—তাহলে কি ব্যাটসম্যান আউট হবে?

উত্তর: না, এ ক্ষেত্রে ব্যাটসম্যান আউট হবে না।

অসিতকুমার হালদার (কাশীনগর, ২৪ পরগনা)

প্রশ্ন: ব্যাটসম্যান বলটি মারার পর সেটি উঁচু হয়ে লেগ আম্পায়ারের গায়ে লাগলো। আম্পায়ারের পেছনে ফিল্ডার ছিলো। কিন্তু আম্পায়ারের গায়ে লাগার জন্যে ফিল্ডার ক্যাচটি ধরতে পারলো না। এ ক্ষেত্রে ব্যাটসম্যান কি আউট হবে?

উত্তর: না, হবে না। তবে আম্পায়ার চেষ্টা করবেন বল যাতে তাঁর গায়ে লেগে খেলার ব্যাঘাত সৃষ্টি করতে না পারে।

বেচুরাম নাউ (গোপালনগর, সিঙ্গুর, হুগলী)

প্রশ্ন: কোন ব্যাটসম্যান খুব উঁচু করে একটি বল মারলো। বলটা উঁচু হয়ে বাউণ্ডারী লাইন অতিক্রম করে যাবার পরই একজন ফিল্ডসম্যান বাউণ্ডারী লাইনের মধ্যে অর্থাৎ মাঠের মধ্যে দাঁড়িয়ে বলটা লুফে নিলো। কিন্তু লোফার সময় মাটিতে পড়ে যায় ফিল্ডসম্যানটি। তখন তার পা দুটো ছিলো মাঠের মধ্যে, কিন্তু শরীরের বাকী অংশ ছিলো সম্পূর্ণভাবে মাঠের বাইরে। তবে হাত দুটো বল সমেত মাটি থেকে উঁচুতে ছিলো। এভাবে ক্যাচ ধরলে ব্যাটসম্যান কি আউট হবে?

উত্তর: না হবে না।

অজয় শৈক্য (মালিগাঁও রেলওয়ে কলোনী, গৌহাটী, আসাম)

প্রশ্ন: কোন বোলার যদি এক ওভারে তিনটি কিম্বা তার বেশি নো বল করে তাহলে তার কি হবে?

উত্তর: যতোগুলো নো বল হলো ততোগুলো বল আবার করতে হবে বোলারকে।

এম আজিজুর রহমান ও এম হোসেন (কাপাসহাড়িয়া, হুগলী)

প্রশ্ন: ব্যাটসম্যানের ব্যাটে লেগে বলটা পিচের ওপর পড়লো। ব্যাটসম্যান তখন বলটা হাত দিয়ে তুলে নিয়ে ছুঁড়ে দিলো। একজন ফিল্ডসম্যান বলটা লুফে নিলো। ব্যাটসম্যান কি তাহলে আউট হবে? হলে কি আউট হবে?

উত্তর: এ ক্ষেত্রে ব্যাটসম্যান 'হ্যাণ্ডলড দি বল' নিয়ম অনুসারে আউট হতে পারে—কারণ ব্যাটসম্যান প্রতিপক্ষ দলের অনুরোধ ছাড়া কোন সময়েই হাত দিয়ে বল ধরতে পারে না।

অজয়কুমার সেন (তারাবাগ, বর্ধমান)

প্রশ্ন: একটি খেলার ব্যাটসম্যানের খুব সামনে একজন ফিল্ডারকে দাঁড়াতে দেখে ব্যাটসম্যান আম্পায়ারের কাছে এর জন্যে আবেদন জানায়। ফিল্ডারটি পিচের বাইরে ছিলো, তাই আম্পায়ার ব্যাটসম্যানের কথায় কর্ণপাত করলেন না। খেলার সময় একটি বল ব্যাটসম্যান ঠিকমতো খেলতে না পারায় পিচের ঠিক ওপরে ক্যাচ উঠলো। সেই ফিল্ডার তখন ক্যাচটি ধরতে পিচের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। কিন্তু সেই মুহূর্তে ব্যাটসম্যান রান নেবার ভঙ্গিতে ফিল্ডারটিকে বিশ্রীভাবে আঘাত করে। ফলে দেখা যায় ফিল্ডারের সঙ্গে বলটিও মাটিতে গড়াচ্ছে। পরে ফিল্ডারটিকে হাসপাতালে পর্যন্ত পাঠাতে হয়েছিলো। এ ক্ষেত্রে ব্যাটসম্যানকে কি আউট দেওয়া যাবে?

উত্তর: যাবে—অসুবিধা সৃষ্টির জন্যে আউট, এই নিয়ম অনুসারে ব্যাটসম্যান আউট হয়ে যেতে পারেন যদি ফিল্ডিং পক্ষ সে আবেদন জানায়।

সৈয়দ মহিউদ্দিন (বোলপুর, বীরভূম)

প্রশ্ন: ব্যাটসম্যান একটি বল ব্যাট দিয়ে মারার পরই বলটি ঘুরে গিয়ে আঘাত করে ব্যাটসম্যানের দিককার উইকেটে। এ ক্ষেত্রে উইকেটে যদি বল লাগে তাহলে কি ব্যাটসম্যান আউট হবে?

উত্তর: হবে—বো ডাউন নিয়ম অনুসারে, যদি বলের আঘাতে উইকেটের পতন ঘটে।

আনোয়ার রহমান (বেলডাঙা, মুর্শিদাবাদ)

প্রশ্ন: নো বল সম্বন্ধে বিস্তারিত (ছবি দিয়ে) যদি আলোচনা করেন, তাহলে খুব ভালো হয়—বিশেষ করে যদি এখনকার এই পরীক্ষামূলক ফ্রণ্ট ফুট রুলের বিষয়টি থাকে।

উত্তর: ছবি দিয়ে নো বলের আলোচনা শীঘ্রই দেখতে পাবেন।

হেমন্ত ব্যানার্জী (তেলিনীপাড়া, চন্দননগর)

প্রশ্ন: ৩৬নং নিয়ম—হ্যাণ্ডলড দি বল ঠিক মতো বুঝতে পারলাম না। যদি আইনটি একটু বিস্তারিতভাবে জানান তাহলে খুব ভালো হয়।

উত্তর: বল ডেড হওয়ার আগেই বলে হাত দিলে এই নিয়মের প্রশ্ন আসে। ভবিষ্যতে এই বিষয়ে চিত্র সহকারে বিস্তারিত আলোচনা করার ইচ্ছে রইলো।

অঞ্জলি চ্যাটার্জী (কর্নওয়ালিস স্ট্রীট, কলকাতা-৪)

প্রশ্ন: নো বলের পরই অর্থাৎ আম্পায়ার নো বল ডাকার পরই কি বল ডেড হয়ে যায়? এ বিষয়ে নিয়ম কি বলে একটু জানাবেন।

উত্তর: ক্রিকেট খেলার আইন কানুনের ২৭নং নিয়মে বলা হয়েছে—

আম্পায়ার 'নো বল' বলার পরও বলটি ডেড হবে না। ব্যাটসম্যান নো-বল মেরে রান নিতে পারেন, এবং সেই রান তাঁর রানের সংগে যুক্ত হবে। কিন্তু হিট না করলে বা হিটে রান না হলেও অন্য উপায়ের রানগুলো 'নো-বল' হিসেবে ব্যাটিং দলের অতিরিক্ত রানের সংগে যুক্ত হবে।

কিস্তিবন্দীতে ট্রানজিস্টার

৩২০, টাকা মূল্যের
টেলিকুইন, পোর্টেবল
৩ ব্যাণ্ড অল ওয়ার্ল্ড
৮ ট্রানজিস্টার মাসিক
১০, টাকার সহজ
কিস্তিতে। আবেদন করুন:

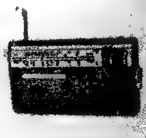

ATLAS CO. (S.B.—22)
Box No. 1329, Delhi—6.

পরিচীয়তে

প্রসন্ন

অলরাউন্ডার হিসেবে স্বার্ত যেমন এখন সুখ্যাতির উচ্চতম শিখরে উঠে গেছেন—ভারতের শ্রেষ্ঠ অফ স্পিন বোলার হিসেবে তেমনি প্রসন্ন আজ নিজের স্থানটি নিশ্চিতভাবে পাকা করে নিয়েছেন।

ভারতীয় ক্রিকেট দলের সাম্প্রতিক অস্ট্রেলিয়া আর নিউজিল্যান্ড ভ্রমণই তার সব চেয়ে বড় আর জোরালো উদাহরণ। আর বর্তমান ভারতের সেরা অফ স্পিন বোলার প্রসন্নর মনে এই সফরটির স্মৃতি চিরকাল অম্লান হয়ে থাকবে।

প্রসন্ন আজ ভারতের অদ্বিতীয় অফ স্পিন বোলার, প্রসন্ন অতুলনীয়, প্রসন্ন অভাবনীয়। আঙুল আর কব্জির কায়দায় বল ঘোরাতে প্রসন্নর জুড়ি মেলা ভার।

ভারতের অপর অফ স্পিন বোলার ভেংকটরাঘবনের সংগে প্রসন্নর অনেক তফাৎ। তরুণ ভেংকটরাঘবনের বলে আছে পেস আর সেই পেসের সংগে বলগুলো বড় ভয়াবহভাবে ঘোরে। কিন্তু ভেংকটরাঘবনের সব থেকে বড় অসুবিধে তার লেংথের গোলমাল আর এ্যাক্যুরেসির অভাব! ফলে সময়ে সময়ে ভেংকটরাঘবনকে প্রচন্ড মার খেতে হয়।

কিন্তু প্রসন্নর বলে পেস নেই। বলগুলো আলতোভাবে ঝুলিয়ে উইকেট লক্ষ্য করে ছুঁড়ে দেন প্রসন্ন। মাপা লেংথে ডাইরেকশান আর ফ্লাইট কেবলই পরিবর্তিত হয়, ফলে ব্যাটসম্যানকে বারবার পড়তে হয় বে-কায়দায়। আর সেই বে-কায়দার হাত থেকে নিস্তার পেতে একসময় আউট হয়ে গিয়ে ব্যাটসম্যানকে ফিরে যেতে হয় প্যাভেলিয়নে।

তাই দেখা যায় মাঠে নামলেই প্রসন্ন দু-চারটে করে উইকেট পাচ্ছেনই। উইকেট প্রসন্ন পাবেনই, কারণ প্রসন্নর বোলিং-এ আছে অদ্ভুত স্বাবলম্বিতা।

সাপের মতো ফণা মেলে ছোবল মারতে ছুটে আসে প্রসন্নর হাত থেকে ছাড়া পাওয়া বলগুলো! আর সেই প্রচন্ড আক্রমণের হাত থেকে কিছুতেই রেহাই পেতে পারেন না ব্যাটসমান—আউট যে তাঁকে হতেই হবে!

প্রসন্নর বোলিং-এর এই তীক্ষ্ম ধারই আজ তাঁকে তুলে এনেছে এতো ওপরে! ভারতে স্পিন বোলারের অভাব নেই। ভারতে ফাস্ট বোলার তৈরি হয় না, কিন্তু তৈরি হয় গাদা গাদা স্পিন বোলার।

কিন্তু প্রসন্নকে এই সহজ সরল স্পিন বোলারদের তালিকায় ফেলা যায় না। প্রসন্নর মধ্যে আছে অদ্ভুত একটা স্বাতন্ত্র্যতার ভাব, আছে অদ্ভুত এক আত্মবিশ্বাসী মনোভাব। বল হাতে নামী ব্যাটসম্যানের বিরুদ্ধে প্রসন্ন একাই একশ'।

টেস্ট ক্রিকেটের জগতে প্রসন্ন প্রবেশ করেছেন অনেকদিন আগেই। কিন্তু বর্তমানের এই অতি প্রত্যাশিত স্থানটি লাভ করতে তাঁর লাগলো অনেক সময়। অনেক পথ পেরিয়ে এসে, তবে আজ প্রসন্ন হাজির হয়েছেন আজকের এই পরম নির্ভরযোগ্যতার স্থানে।

১৯৬১ সালে ইংলন্ডের বিরুদ্ধে প্রসন্ন প্রথম টেস্ট খেলার সুযোগ পান।

প্রসন্ন

কিন্তু প্রথম আবির্ভাবে তিনি খুব যে একটা সুবিধে করতে পেরেছিলেন এ কথা বলা যায় না। তাই পরের বছর অর্থাৎ ১৯৬২ সালেও ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে মাত্র একটি টেস্টে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ পেয়েছিলেন তিনি!

কারণ প্রসন্নর খেলা তখন ছিলো মাঝারীয়ানার মধ্যে সীমাবদ্ধ। ভারতের অগণিত স্পিন বোলারদের মধ্যে প্রসন্ন সহজ সরল অতি সাধারণ একজন!

প্রসন্ন যে অসাধারণ এ কথা তো তখনো প্রমাণিত হয় নি! তখন কেন—প্রসন্নর অনন্য প্রতিভার কথা জানা গেলো মাত্র কিছুদিন আগে।

গত বছর ওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেট দলের ভারত সফরের সময় থেকেই প্রসন্ন অতি প্রশংসনীয়ভাবে খেলতে শুরু করেন।

তবে প্রসন্নর প্রতিভার সর্বশ্রেষ্ঠ প্রকাশ দেখা গেলো ভারতীয় ক্রিকেট দলের সাম্প্রতিক অস্ট্রেলিয়া আর নিউজিল্যান্ড ভ্রমণের সময়। এই সফর দু'টির অনেক খেলাতেই প্রসন্ন একাই বারবার ঘুরিয়ে দিয়েছিলেন খেলার মোড়।

ধরা যাক ভারত বনাম নিউজিল্যান্ড দলের তৃতীয় টেস্টের কথা! এই খেলায় প্রসন্ন যে ভয়ানক রূপ ধরেছিলেন তার তুলনা মেলা ভার। খেলার প্রথম দিনে নিউজিল্যান্ড করেছিলো ৪ উইকেটে ১৪৭ রান। কিন্তু দ্বিতীয় দিন সকালে প্রসন্ন ১০·২ ওভার বোলিং করে ১৮ রানের বিনিময়ে দখল করলেন ৫টি উইকেট। ফলে নিউজিল্যান্ডের প্রথম ইনিংস শেষ হয়ে গেলো ১৮৬ রানে। ঐ খেলার প্রথম ইনিংসে প্রসন্নর বোলিং হিসেব ছিলো ১৮·২ ওভার—৬ মেডন ৩২ রান ৫টি উইকেট।

শুধু তাই নয় টেস্ট জয়ের ইতিহাসেও প্রসন্নর নাম অক্ষয় হয়ে থাকবে। বিদেশের মাটিতে ভারতের প্রথম টেস্ট জয়ের অন্যতম নায়ক ছিলেন ভারতের এই অফ স্পিন বোলারটি। প্রসন্নর মারাত্মক বোলিংই নিউজিল্যান্ডের ব্যাটসম্যানদের নাজেহাল করে তুলে তাঁদের টেনে এনে হাজির করেছিলো নিশ্চিত পরাজয়ের সম্মুখে।

কিন্তু ভারতীয় ক্রিকেট কনট্রোল বোর্ডকে বিশ্বাস নেই। তাঁদের বিচারে প্রসন্ন হয় তো বা বাতিল হয়ে যাবেন। খরচের খাতায় লেখা হবে প্রসন্নর নাম, ভারতের নামী অথচ অবহেলিত খেলোয়াড় তালিকায় স্থান পাবেন তিনি।

তবে তাতেও প্রসন্নর দুঃখ করার বিশেষ কিছু থাকবে না। কারণ প্রসন্নর প্রতিভার সর্বশ্রেষ্ঠ পরাকাষ্ঠা তিনি এরই মধ্যে দেখিয়েছেন—দেখিয়েছেন শুধু দেশের মাটিতেই নয়—বিদেশেও। বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ স্পিন বোলার হিসেবে প্রসন্ন যে স্বীকৃতি পেয়ে গেছেন......!!

সম্পাদিকা—জয়ন্তী সেন

বসুমতী (প্রাঃ) লিঃ-এর পক্ষে ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীটস্থ কলিকাতা-১২

বসুমতী প্রেস্ হইতে শ্রীসুকুমার গুহমজুমদার কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বসুমতীর শাস্ত্র-প্রচার গ্রন্থরাজি

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা :

(মূল, ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত)

প্রামাণ্য অনুবাদ—সহজ, সরল, প্রাঞ্জল, প্রাণময়। বিশুদ্ধ সংস্করণ। সুন্দর বোর্ডে বাঁধা। মূল্য : ২-০০ টাকা।

গীতা গ্রন্থাবলী :

(পঞ্চবিংশতি গীতার সমাহার)

মূল সংস্কৃত ও সরল বঙ্গানুবাদ। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা যেমন মহাভারতের সার, এই গীতাগুলি তেমনি সর্বশাস্ত্রের সারাৎসার। হারীত, দেবী, যম বৈষ্ণব, তুলসী, অবধূত, জীবন্মুক্তি, ষড়্‌জ, হংস, মঙ্কি, গীতাসার, পিতৃ, পৃথিবী, সপ্তশ্লোকী, রাম, পরাশর, শান্তি, শিব, ভগবতী, বোধ্য, গর্ভ, পাণ্ডব, উত্তর, ব্যাস, শ্রীমদ্গীতাসার—এই পঞ্চবিংশতি গীতার সমাবেশ, প্রতিটি ধর্মপ্রাণ ব্যক্তির অবশ্যপাঠ্য গ্রন্থ। রেক্সিন ও বোর্ডে বাঁধা। মূল্য : ৫-০০ টাকা।

উপনিষদ গ্রন্থাবলী :

১ম খণ্ড : ঐতরেয়, কৈবল্য, কণ্ঠিকা, নৃসিংহতাপনী।

২য় খণ্ড : শ্বেতাশ্বতর, পরমহংস, সন্ন্যাস, নীলরুদ্র, চূলিকা, আরুণেয়, কণ্ঠশ্রুতি, জাবাল, পিণ্ড, আত্ম, ষটচক্র, ভৃগু, শিক্ষা, ব্রহ্মবিদ, নারদ, পরিব্রাজক, পৈঙ্গল, তুরীয়াতীত, বাসুদেব, শাণ্ডিল্য, নারায়ণ (ক), নারায়ণ (খ)।

৩য় খণ্ড : ঈশ, কেন, প্রশ্ন, মুণ্ডক, মাণ্ডুক্য, তৈত্তিরীয়, পাশুপত-ব্রহ্ম, প্রাণাগ্নিহোত্র, ভাবন, গরুড়, শ্রীরামপূর্বতাপনীয়, শ্রীরামোত্তরতাপনীয়, পঞ্চব্রহ্ম, কালাগ্নিরুদ্র, যাজ্ঞবল্ক্য, রামরহস্য, গোপালপূর্বতাপনীয়, গোপালোত্তরতাপনীয়, কৌষীতকী, অমৃতবিন্দু, কালিকা, সর্বসার ও অমৃতনাদ। কাপড় ও বোর্ডে বাঁধা। মূল্য : প্রতি খণ্ড—৪-০০ টাকা।

ছান্দোগ্য-উপনিষদ :

সামবেদের তাণ্ড্যশাখার ছান্দোগ্যব্রাহ্মণের অন্তর্গত। মূল সংস্কৃত ও বঙ্গানুবাদ। মূল শ্রুতি ও শ্রুতির অনুবাদ। শঙ্করাচার্যের মহাভাষ্য, শাঙ্কর ভাষ্যের সরল অনুবাদ। তথ্যপূর্ণ-জ্ঞানগর্ভ ভূমিকা সম্বলিত বৃহদায়তন গ্রন্থ। ৮১২ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। শাস্ত্র প্রচারোদ্দেশ্যে এখনও নামমাত্র মূল্যে বিক্রয় হইতেছে। মূল্য—৬-০০ টাকা।

সাংখ্য-দর্শন :

মহর্ষি কপিলকৃত : উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় অনূদিত। সাংখ্যদর্শন সর্ব দর্শনের সার বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। মূল্য—২-০০ টাকা।

বৈশেষিক দর্শন :

মহর্ষি কণাদ প্রণীত। বোর্ড বাঁধাই। মূল্য—৩-০০ টাকা।

জৈমিনির মীমাংসা-দর্শনম্ :

॥ পরমর্ষি জৈমিনি বিরচিত : মূল ও বঙ্গানুবাদ ॥

প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডে—পারমর্ষ সূত্র, পূর্ব মীমাংসা, বেদার্থবিচার, ধর্ম মীমাংসা, জৈমিনি সূত্র, পূর্বতন্ত্র, জৈমিনি সূত্রের আক্ষরিক অর্থ, শ্রীমৎ শবর স্বামীর ভাষ্যের ভাবার্থানুবাদ, কর্মকাণ্ডের পুনঃ প্রবর্তক কুমারিল ভট্টের শ্লোকবার্তিক ও তন্ত্রবার্তিক টীকা-বিষয়ক পাদটীকা-সমন্বিত। পণ্ডিত ভূতনাথ সপ্ততীর্থের দীর্ঘকালের সাধনায় অনূদিত, দুই খণ্ডে সম্পূর্ণ এই বৃহদায়তন গ্রন্থের মূল্য প্রতি খণ্ড—৮-০০ টাকা।

শ্রীশ্রীগুরুশাস্ত্রম্ :

(বিবিধ তন্ত্র ও পুরাণাদি হইতে গুরু-শিষ্যের কর্তব্যাকর্তব্যাদি, দীক্ষা প্রণালী, গুরুপূজা, স্তোত্র, পুরশ্চরণ প্রভৃতির অপূর্ব সঙ্কলন।)

গুরুগীতা, গুরুতন্ত্রম্, দীক্ষাপদ্ধতি, শ্রীগুরু, মন্ত্রমালা প্রভৃতি অধ্যায়ে বিভক্ত। মূল্য—৩-০০ টাকা।

মহানির্বাণতন্ত্র :

(সর্ব দেবদেবীর মন্ত্রকোষ ও শিবতত্ত্ব-প্রদীপিকা-সম্বলিত)

মূল সংস্কৃত, বঙ্গানুবাদ, ব্যাখ্যা, পাদটীকা-সমন্বিত বৃহদায়তন দুর্লভ গ্রন্থ। তন্ত্রশাস্ত্রের সার। পঞ্চমকার সাধনার নিগূঢ় মর্ম, তন্ত্রসাধনার গুহ্যতত্ত্ব উদ্‌ঘাটিত। কাপড় ও বোর্ডে বাঁধা। মূল্য—১০-০০ টাকা।

হঠযোগ প্রদীপিকা :

(যোগশাস্ত্রের হঠযোগ সাধন গ্রন্থ মূল ও সরল বঙ্গানুবাদ। শ্রীমৎ স্বাত্মারাম যোগীন্দ্র প্রণীত ও শ্রীমৎ জ্ঞানানন্দ স্বামী সম্পাদিত।) মূল্য—৩-০০ টাকা।

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড ॥ ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কালকাতা - ১২

Thursday, 28th March, 1968 SAPTAHIK BASUMATI REGD. No. C71
PRICE : 30 Paise GRAM : "BASUMATI" PHONE : 34-7771, 72, 73, 74

30 MAR 1968

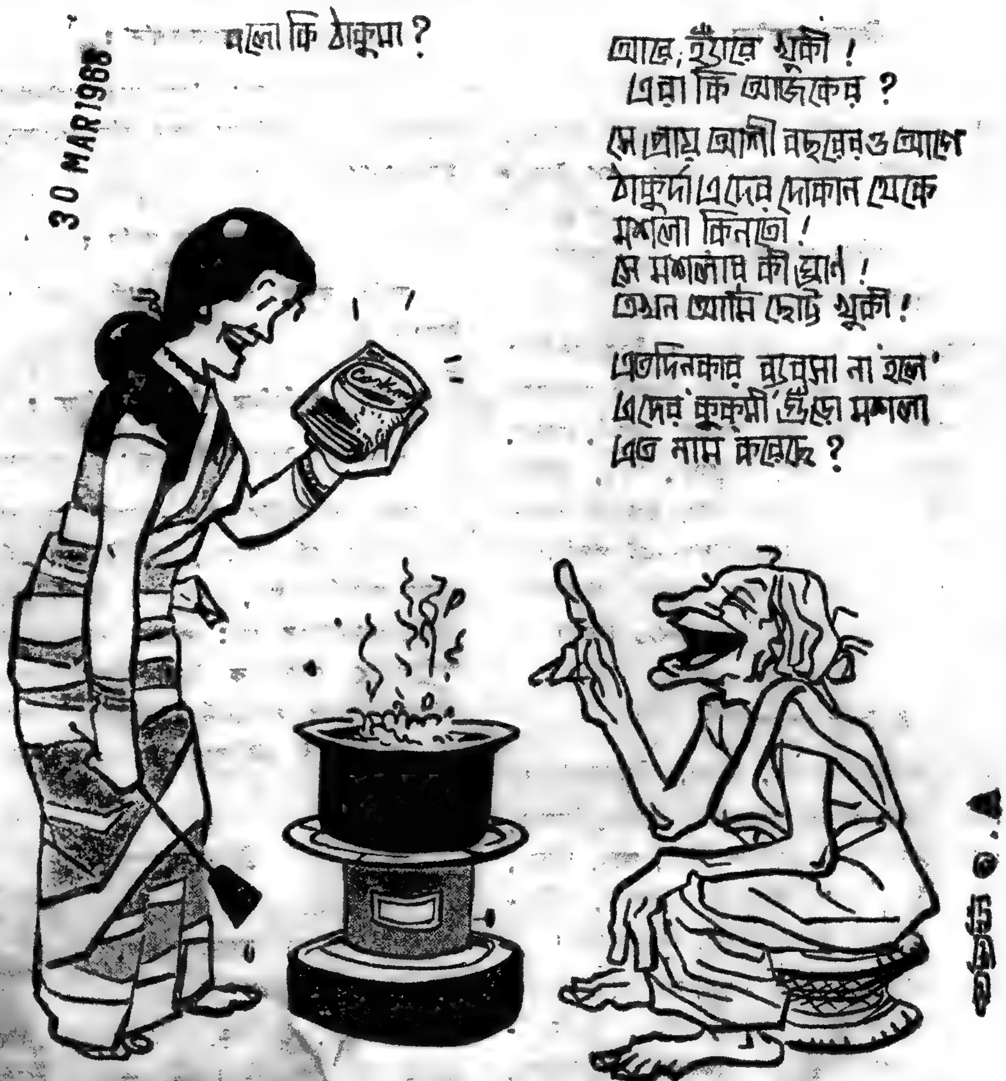

'কুকুমী' গুঁড়ো মশলা বাজারের সেরা !
কৃষ্ণ চন্দ্র দত্ত (স্পাইস) প্রাইভেট লি:
১২৫ বছরের ও অধিক প্রাচীন ও বর্তমানে মশলার বৃহত্তম প্রতিষ্ঠান
আঁড়তদারি আমদানি রপ্তানি পাইকারি খুচরা
সর্বাধিক বিক্রীত গুঁড়ো মশলা • নিজস্ব মিলে প্রস্তুত
পনের লক্ষ প্যাকেট মাসিক বিক্রয়
গ্রাম : "স্পাইসমার্ট" মিল-কাশীপুর ফোন : ৬৩-১২৩২, ৩৩-২৩৮১
২৩১নং ও ২৩৫নং মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড, পোস্তা, কলিকাতা-৭

সাপ্তাহিক বসুমতী

দিল্লীতে পশ্চিমবঙ্গের প্রাথমিক শিক্ষকদের বিক্ষোভ

দেশব্যাপী গোর্কির জন্মশতবর্ষপূর্তি উৎসব

বর্ষ : ৪২শ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ২১শে চৈত্র, ১৩৭৪ বঙ্গাব্দ] OLDEST WEEKLY OF NORTH INDIA [72nd year, No. 42, 4th April, 1968

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয়		২৬২৭
আজকের মানুষ		২৬২৮
বঙ্গদর্শন		২৬২৯
সপ্তাহের বোঝা	— কৃত্তিবাস ওঝা	২৬৩৪
অবক্তব্য	— চন্দ্রগুপ্ত	২৬৩৬
ভারতদর্শন		২৬৩৮
আন্তর্জাতিক		২৬৪০
গ্রন্থমেলা		২৬৪২
রবীন্দ্রনাথ ও সুভাষচন্দ্র (ধারাবাহিক প্রবন্ধ)	— শঙ্করীপ্রসাদ বসু	২৬৪৩
[illegible] (কবিতা)	— শ্রীসুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায়	২৬৪৬

সাহিত্য-সম্রাট—বন্দেমাতরম্ মন্ত্রের ঋষি

বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থাবলী

—উপন্যাস—

প্রথম খণ্ড :—রাজসিংহ, বিষবৃক্ষ, যুগলাঙ্গুরীয়, মৃণালিনী, রজনী। [সচিত্র] মূল্য—তিন টাকা

দ্বিতীয় খণ্ড :—দুর্গেশনন্দিনী, কৃষ্ণকান্তের উইল, ইন্দিরা, রাধারাণী, সীতারাম। মূল্য—তিন টাকা

তৃতীয় খণ্ড:—আনন্দমঠ, চন্দ্রশেখর, কপালকুণ্ডলা, দেবী চৌধুরাণী। [সচিত্র] মূল্য—৩, টাকা।

—সাহিত্য—

প্রথম খণ্ড :—কৃষ্ণচরিত্র, লোকরহস্য, বিবিধ প্রবন্ধ (১ম)। মূল্য—তিন টাকা

দ্বিতীয় খণ্ড :—(১ম ভাগ অনুশীলন), মুচিরাম গুড়, বিবিধ প্রবন্ধ (২য়), বিজ্ঞান রহস্য। মূল্য—৪·৫০ টাকা।

সুদৃশ্য কাপড় ও বোর্ডে বাঁধা (রাজ সংস্করণ)
মূল্য প্রতিখণ্ড ৪·৫০ টাকা মাত্র

মাইকেল মধুসূদন দত্তের

মাইকেল গ্রন্থাবলী

প্রথম ভাগ :—মেঘনাদবধ কাব্য, বীরাঙ্গনা কাব্য, পদ্মাবতী নাটক, বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ, একেই কি বলে সভ্যতা? (বোর্ড বাঁধাই)—সাড়ে চার টাকা।

দ্বিতীয় ভাগ :—কৃষ্ণকুমারী নাটক, শর্মিষ্ঠা নাটক তিলোত্তমা-সম্ভব কাব্য, ব্রজাঙ্গনা কাব্য, চতুর্দশপদী কবিতাবলী, বিবিধ কাব্য, মায়া কানন, হেক্টর বধ। সাড়ে তিন টাকা

কবি বিহারীলাল চক্রবর্তীর গ্রন্থাবলী

রবীন্দ্রনাথ বলেন—"আধুনিক বঙ্গসাহিত্যে প্রেমের সঙ্গীত এরূপ সহস্রধারে উৎসের মত কোথাও প্রোৎসারিত হয় নাই। এমন সুন্দর ভাবের আবেগ, কথার সহিত এমন সুরের মিশ্রণ আর কোথাও পাওয়া যায় না।"

বাঙ্গালার নব গীতিকবিতার প্রবর্তক, রবীন্দ্রনাথ, অক্ষয় বড়াল, রাজকৃষ্ণ রায় প্রভৃতির কাব্যগুরু ঋষি কবি বিহারীলাল চক্রবর্তীর রচনার সমাবেশ।

কবির জীবনী, সুবিস্তৃত সমালোচনা সহ সুবৃহৎ গ্রন্থ
মূল্য তিন টাকা

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড, ১৬৬ বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলিকাতা—১২

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
বিস্মৃতির অন্ধকারে (গল্প)	দেবব্রত মুখোপাধ্যায়	২৬৪৭
যা দেখেছি, যা পেয়েছি (স্মৃতিচয়ন)	সুধীরঞ্জন দাস	২৬৫৪
[illegible] পটে ঃ		
কংগ্রেস ও যুক্তফ্রন্টের ইমেজ	মনোজ হালদার	২৬৫৭
অগ্নিযুগের একটি অধ্যায়	অনন্ত সিংহ	২৬৬৩
ভিয়েৎনাম ও কঙ্গোর সংকট (প্রবন্ধ)	বরুণ রায়	২৬৬৭
ঝড় (ধারাবাহিক উপন্যাস)	জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী	২৬৭৬
রঙ্গজগৎ		২৬৭৯
পাঠকমন		২৬৮৪
খেলাধুলা	শান্তিপ্রিয়	২৬৮৫

আমাদের বই পাঠককে তৃপ্তি দেয় ঃ পাঠাগারের গৌরব বৃদ্ধি করে

সদ্য প্রকাশিত গ্রন্থসমূহ ঃ

গজেন্দ্রকুমার মিত্রের উপন্যাস

শুভবিবাহ কথা ৩·০০

স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস

যখন তরঙ্গ ৭·০০

'বনফুল'-এর উপন্যাস

প্রচ্ছন্ন মহিমা ৪·০০

আশাপূর্ণা দেবীর মহোত্তম সৃষ্টি

কাঁচ পুঁতি হীরে ৯·০০

উপহারযোগ্য কয়েকখানি গ্রন্থঃ

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর উপন্যাস

নীল রাত্রি ৩·৫০

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস

সসেমিরা ৩·০০

'বনফুল'-এর উপন্যাস

স্থাবর ৮·০০

সঞ্জয় ভট্টাচার্যের উপন্যাস

সৃষ্টি ৫·৫০

দীপক চৌধুরীর উপন্যাস

ললিতা প্রসঙ্গ ৮·০০

আশাপূর্ণা দেবীর উপন্যাস

মেঘপাহাড় ৩·৩০

স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস

অপরাহ্নের আলো ৪·০০

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের

কোকিল ডেকেছিল ৩·২৫

দেবেশ দাশের

রোম থেকে রমনা ৩·৫০

সে-যুগের মননশীল লেখক

অক্ষয়চন্দ্র সরকারের

অক্ষয় সাহিত্য সম্ভার

১ম খণ্ড ১০·০০ ঃ ২য় খণ্ড ১৩·০০

প্রখ্যাত সাহিত্যিক ও সাংবাদিক

হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ-এর

গবেষণামূলক গ্রন্থ

বঙ্কিমচন্দ্র ৫·০০

কানাই সামন্তর

রবীন্দ্র প্রতিভা ১০·০০

মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের

দক্ষিণের বারান্দা ৪·৭৫

নটসূর্য অহীন্দ্র চৌধুরীর

নিজেরে হারায়ে খুঁজি ২০·০০

প্রখ্যাত বিপ্লবী

যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়ের

বিপ্লবী জীবনের স্মৃতি ১২·০০

ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোম্পানী প্রাইভেট লিঃ

৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা—৭

৭২ বর্ষ : ৪২শ সংখ্যা—মূল্য : ৩০ পয়সা
বৃহস্পতিবার, ২১শে চৈত্র, ১৩৭৪ বঙ্গাব্দ

বাংলা ভাষায় দ্বিতীয় সর্বাধিক প্রচারিত সাপ্তাহিক পত্রিকা

PRICE : 30 Paise
Thursday, 4th April, 1968

বড় গলা—

আসামকে বিচ্ছিন্ন করার সংবাদে রাজনৈতিক আবহাওয়া বেশ উত্তপ্ত। ঐ সংবাদ দিয়েছেন রাজ্যসভায় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীচ্যবন। আসামকে বিচ্ছিন্ন করার ষড়যন্ত্র নাকি মার্কসবাদী কম্যুনিস্ট দলের। এই দলের কার্যকলাপের তীব্র নিন্দা করে তিনি বলেছেন, দলটিকে আসামীর কাঠগড়ায় তোলা হয়েছে এবং তাদের অভিসন্ধি কী দেশবাসীর কাছে তার জবাবদিহি করতে হবে। কোন কোন সদস্য দলটিকে নিষিদ্ধ করার প্রশ্ন তুললে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জানান,—কোনো রাজনৈতিক দলকে নিষিদ্ধ করার প্রশ্নে সতর্ক বিবেচনা ও রাজনৈতিক সমীক্ষা প্রয়োজন।

বৈরী নাগাদের যোগসাজসে বর্তমান আসাম সরকারকে গদিচ্যুত করার মতো ঘটনা সামান্য নাশকতামূলক কাজ নয়। কিন্তু আজ পর্যন্ত ষড়যন্ত্রের সামান্য কাহিনীই, (যদিও প্রথম পর্যায়ে তা গোয়েন্দা গল্পের মতোই রোমহর্ষক) প্রকাশিত হয়েছে। মার্কসবাদী কম্যুনিস্ট দলকে দায়ী করে শ্রীচ্যবন বলেছেন, ধৃত ব্যক্তিদের কয়েকজন মার্কসবাদী দলভুক্ত; তবে দলের আসাম শাখার তথ্য অনুযায়ী দল থেকে তারা বহিষ্কৃত। ২৭শে মার্চের এই সংবাদের পর ২৯শে মার্চ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীচ্যবন লোকসভায় জানান যে, আসামে গোয়েন্দা বিভাগ ২৬শে জানুয়ারীর ঘটনার প্রাক্কালে পরিস্থিতির গুরুত্ব যথাযথভাবে উপলব্ধি করতে পারে নি। অবশ্য গোয়েন্দা বিভাগ সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে বলেও তিনি মনে করেন না। ঐদিন লোকসভায় তিনি আরো বলেন, একদল মার্কসবাদী কম্যুনিস্ট আসামে একটা স্বাধীন রাজ্য গড়ে তুলতে চাইছেন এমন কোনো খবর তিনি পান নি। আবার এমন কথাও তিনি জানান, আসামে যেসব মার্কসবাদী কম্যুনিস্টকে গ্রেফতার করা হয়েছে বহু আগেই তাদের দল থেকে বার করে দেওয়া হয়েছে বলে যে কথা বলা হয়েছে সে সম্পর্কে তাঁর সন্দেহ আছে।

তাহলে আমাদের প্রশ্ন : রাজ্যসভায় মার্কসবাদী কম্যুনিস্ট দলের প্রতি দোষারোপ করে তিনি যে বাগাড়ম্বর করলেন—তার তথ্যপ্রমাণ তাঁর কাছে নেই। প্রথম কথা হচ্ছে : প্রকৃত দোষী কে—তা নির্ণয় করার ভার পড়েছে বিচারবিভাগীয় তদন্ত কমিশনের উপর। কমিশনের রায় না জানা পর্যন্ত—সংবাদপত্রের খবরের কিংবা রাজ্যসরকারের মামুলি রিপোর্টের ওপর নির্ভর করে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর মতো একজন দায়িত্বশীল ব্যক্তি তথ্যহীন কথা কিভাবে বলতে পারেন এটাই আশ্চর্যজনক ব্যাপার! দ্বিতীয়ত, যে কোনোরকম নাশকতামূলক কাজের অগ্রিম সংবাদ দেবার জন্যে রয়েছে গোয়েন্দা বিভাগ—যাদের জন্যে বছরে কোটি কোটি টাকা ব্যয় হচ্ছে। অথচ সেই গোয়েন্দা দপ্তরের কথা বলতে গিয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছেন,—আসামে গোয়েন্দা বিভাগ ২৬শে জানুয়ারীর ঘটনার প্রাক্কালে পরিস্থিতির গুরুত্ব যথাযথভাবে উপলব্ধি করতে পারে নি। গোয়েন্দা দপ্তরের প্রতি এ ধরণের সার্টিফিকেটে একটি সরল শিশু পর্যন্ত লজ্জিত হবে। কারণ সীমান্ত অঞ্চলে অবস্থিত আসামের গুরুত্ব কি গোয়েন্দা দপ্তরের অজ্ঞাত? বৈরী নাগা ও মিজোদের আক্রমণ ও উপদ্রব কি নতুন? চৈনিক শত্রুতার কি অবসান ঘটেছে? এসব ঘটনা সম্পর্কে সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল কি গোয়েন্দা দপ্তর নয়? তা যদি না হয়ে থাকে তাহলে কেন্দ্রীয় সরকার নাগরিকদের উপর করের বোঝা চাপিয়ে ঐ অকর্মণ্য দপ্তর পুষছে কোন কারণে?

সারা ভারতে বিচ্ছিন্নকামীরা মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে, তার বিরুদ্ধে আইনও আছে—কিন্তু সরকার সঠিক প্রমাণের ভিত্তিতে ক'টাকে ধরতে পেরেছেন? সরকারের হাতে আইন আছে, সুতরাং বিনা বিচারে আটক করে রাখাতেই সরকার ভাবছে তাদের দায়িত্ব যেন শেষ। বর্তমান সময়ে কয়েকটি রাজ্যে যখন অন্তর্বর্তী নির্বাচন হবার কথা তখন কোনো বিশেষ দলকে বিনা প্রমাণে গালিগালাজ করলে সেই দলই 'ত' হিরো হয়! সরকারেরও কি ঐ উদ্দেশ্য? বিচ্ছিন্নকামীদের উৎখাত করা প্রয়োজন। ভারতের সার্বভৌমত্ব ও সংহতি রক্ষা সর্বাগ্রে দরকার—যে কোনো শুভবুদ্ধিসম্পন্ন ভারতবাসীর এটাই প্রাণের কথা। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সার্বভৌমত্ব ও সংহতি রক্ষার স্বার্থে আমাদের ভাবতে হবে—বিচ্ছিন্নকামী কারা এবং কেনই বা তারা প্রবল? আমাদের সরকার মুখে বড় বড় কথা বললেও হিন্দী ভাষার সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে কি সংহতি অটুট রাখতে সক্ষম হচ্ছে? অথবা যে মিজো ও বৈরী ফিজো—বিষাক্ত ঘায়ের মতো দগদগ করছে—তার নিরাময় কি সম্ভব হয়েছে? কিংবা যে শেখ আবদুল্লাকে জামাই আদরে দীর্ঘদিন তথাকথিত কারান্তরালে রাখা হয়েছিল—তাঁর মুখেই এখন বা কোন্ বার্তা? কেন্দ্রীয় সরকারের ভুল ধারণাবশেই আজ বিচ্ছিন্নকামীরা কি প্রবল নয়? হাতে-নাতে যেখানে প্রমাণ রয়েছে সেখানে কেন্দ্রীয় সরকার নীরব, আর প্রমাণ যেখানে নেই—সেখানেই বড় গলা। এভাবে জনসাধারণের মনোযোগ আকৃষ্ট করা সাময়িকভাবে সহজ হলেও, ভারতের সার্বভৌমত্ব ও সংহতি রক্ষার পবিত্র উদ্দেশ্যে তা নির্ভুল নীতি নয়—একথা অরাজনৈতিক নাগরিকও বোঝেন।

সম্পাদকীয়

আজকের মানুষ

জনসন আর কোসিগিন। কিম্বা সুহার্তো আর স্ববোদা। বা নোভোৎনি আর (বব) কেনেডি। এ ছজনের মধ্যে মিল কোথায় আছে? এদের প্রথম দুজন দুটি প্রধান দেশের রাষ্ট্রপ্রধান। সুহার্তোও তাই হলেন। বব কেনেডি হতে চাইছেন। নোভোৎনি রাষ্ট্রপ্রধানের গদি হারিয়েছেন, আর চেকোশ্লোভাকিয়ার সেই রাষ্ট্রপ্রধানের শূন্য পদে স্ববোদার নাম প্রস্তাবিত হয়েছে। ছজনের মধ্যে মিল এখানে যে ছজনই রাষ্ট্রপতির পদের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। আর একটা অদ্ভুত মিল দেখতে পাবেন ইংরেজিতে ওদের surname বা পদবী বানান করলে। প্রত্যেক নামের বানানে ৭টি করে অক্ষর আছে—লাকি সেভেন।

চেকোশ্লোভাকিয়ার রাজনীতিতে গত কিছুদিন ধরে তুমুল তোলপাড়, ওলট-পালট চলছে। সে ওলট-পালটে কেউ উঁচু ক্ষমতার আসন থেকে পদত্যাগ করেছেন, কেউ বিদেশে পালিয়ে গিয়েছেন, কেউ বা আত্মহত্যা করে বেঁচেছেন। মৃত ব্যক্তির প্রাণ ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে, অতীতে যাঁর রাজনৈতিক জীবন খতম করে দেওয়া হয়েছিল তাঁকে আবার সাদরে ক্ষমতায় ফিরিয়ে আনা হয়েছে। আন্দোলন নোভোৎনিকে প্রথমে চেক কমিউনিস্ট পার্টির প্রধান সম্পাদকের পদ থেকে অপসারণ করা হয়েছিল, সর্বশেষে রাষ্ট্রপ্রধানের পদ থেকে তাঁকে সরিয়ে দিয়ে সে-পদে জেনারেল লুডভিচ স্ববোদাকে আনা হয়েছে। চেক কমিউনিস্ট পার্টির প্রেসিডিয়াম বা সর্বোচ্চ পরিষদ সাধারণ নির্বাচন না হওয়া পর্যন্ত দেশের প্রেসিডেন্ট পদে জেনারেল স্ববোদার নামই প্রস্তাব করেছে। প্রস্তাবক যেখানে পার্টির নতুন প্রধান সম্পাদক ডুবচেক তখন ধরে নেওয়া যেতে পারে যে সাত অক্ষরের স্ববোদার কপালেই রাষ্ট্রপ্রধানের গৌরবজনক পদটা নাচছে!

জেনারেল স্ববোদাকে দীর্ঘদিন থেকেই চেকরা বীরের আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছে। দুটো বিশ্বযুদ্ধেই সংগ্রামের অত্যুজ্জ্বল ঐতিহ্য রয়েছে স্ববোদার। কিন্তু সৈনিকের জীবন তাঁর আকস্মিক, ঐতিহাসিক প্রয়োজনে তাঁকে বার বার রাইফেল ঘাড়ে নিতে হয়েছে। নইলে স্ববোদাকে হয় তো সারা জীবন চাষ-বাস ক্ষেত-খামার নিয়েই পড়ে থাকতে হত।

মোরাভিয়ার একটা গ্রামে আজ থেকে ৭২ বছর আগে এক সম্ভ্রান্ত চাষী পরিবারে স্ববোদার জন্ম। বাবা ক্ষেত-খামার দেখাশুনো করতেন, বড় হলে ছেলেও তাই করবে আশা করে স্ববোদাকে কৃষি বিদ্যালয়ে পাঠানো হল। স্বাধীন চেকোশ্লোভাকিয়া বলে তখন মানচিত্রে কোন দেশের নাম ছিল না, ছিল অস্ট্রো-হাঙ্গেরী। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে তাঁকে বাধ্যতামূলকভাবে ইম্পিরিয়াল অস্ট্রো-হাঙ্গেরী সেনাবাহিনীতে নেওয়া হল। সুরু হল স্ববোদার সৈনিক জীবন। অস্ট্রো-হাঙ্গেরী থেকে তিনি পরে রুশদের পক্ষে চলে যান এবং চেকোশ্লোভাক লিজিয়নে যোগ দেন। ওপরওয়ালার হুকুম তামিল করা ছাড়া স্ববোদার ছিল জলন্ত দেশপ্রেম যার জন্যে তিনি ১৯৩১-৩৪ পর্যন্ত চার বছর হ্রানিসের মিলিটারী এ্যাকাডেমিতে অধ্যাপনা করার পর আবার সামরিক বাহিনীতে চলে এলেন। দেশের তখন চরম সংকট উপস্থিত। মিউনিক সংকট। বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী চেম্বারলেন মিউনিক চুক্তির মাধ্যমে চেকোশ্লোভাকিয়ার যে সর্বনাশ করেছেন তা রোধ করার দায়িত্ব আর যার থাকুক, সেনাবাহিনীর হাতে ছিল না। কিন্তু সুযোগ যেদিন স্ববোদা পেলেন সেদিনই তিনি তাঁর দেশপ্রেমের অতুলনীয় প্রমাণ দিলেন। দখলদারী নাৎসীদের বিরুদ্ধে দুর্ধর্ষ প্রতিরোধ বাহিনী গড়ে তুললেন স্ববোদা।

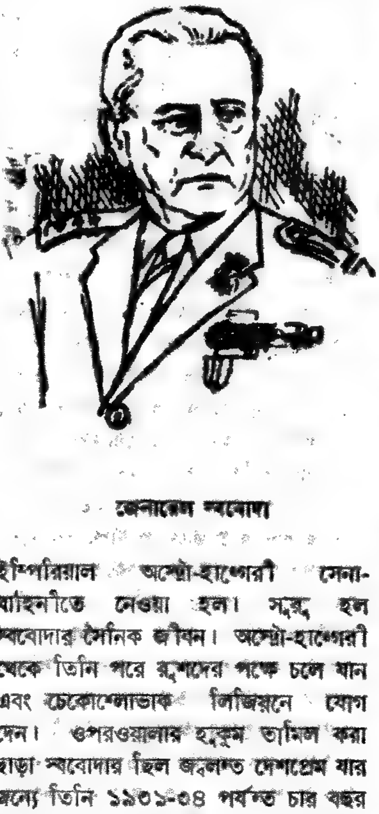

জেনারেল স্ববোদা

প্রেসিডেন্ট বেনেসের নেতা নির্বাচন নিখুঁত হয়েছিল। তিনিই জেনারেল স্ববোদাকে সোভিয়েট রাশিয়ায় চেকোশ্লোভাক সেনাবাহিনী গড়ে তোলার দায়িত্ব দিয়েছিলেন। জার্মান কবলমুক্ত হবার পর কিয়েভে প্রথম যে সেনাবাহিনী ঢুকেছিল তার পরিচালক-নেতা ছিলেন জেনারেল স্ববোদা। সেখানেই থামলেন না তিনি, শত্রুদের তাড়িয়ে নিয়ে চললেন ক্রমাগত। অতিক্রম করলেন কার্পেথিয়ান সীমান্ত, তারপর দীর্ঘদিনের ক্লান্তিহীন সংগ্রামের ফল লাভ করলেন, '৪৪ সনের ৬ই অক্টোবর জেনারেল স্ববোদার সেনাবাহিনী বিজয়-বৈজয়ন্তী উড়িয়ে চেকোশ্লোভাকিয়া প্রবেশ করল নাৎসী প্রতিরোধ চূর্ণ করে দিয়ে।

মুক্ত হবার পর চেকোশ্লোভাকিয়ায় প্রথম গণ সরকার গঠিত হলে জেনারেল স্ববোদা তার প্রতিরক্ষামন্ত্রী হয়েছিলেন কিন্তু স্ট্যালিনীয় গোঁড়ামি তখন দেশে পুরোমাত্রায় চলেছে, '৫১ সনে তাঁকে গদি হারাতে হল। পদচ্যুত, লাঞ্ছিত স্ববোদা ফিরে গেলেন জনতার মাঝে। নিজের ওপর কখনো বিশ্বাস হারান নি তিনি, বিশ্বাস ছিল দেশবাসীর ওপর। সে বিশ্বাসই তাঁকে আবার হৃত মর্যাদা ফিরিয়ে দিয়েছে, ফ্যাসী-বিরোধী লীগ গড়েছিলেন তিনি জার্মান ফ্যাসিস্টদের বিরুদ্ধে, সে লীগের ৩০ হাজার সংগ্রামী সুহৃদ একদিন স্ট্যালিন-নোভোৎনির হাতে নির্যাতিত হয়েছিলেন। আজ যখন চেকোশ্লোভাকিয়ায় পরিবর্তনের হাওয়া বইতে সুরু করেছে, তখন সেই ফ্যাসী-বিরোধী লীগই সাহস করে তাঁদের নেতা জেনারেল স্ববোদাকে মিছিলের পুরোভাগে আনতে উদ্যোগী হয়েছেন।

পার্টি-প্রধান ডুবচেক নিজে শ্লোভাক, তাই বোধ হয় তিনি চেক জাতীয় স্ববোদাকে মনোনীত করেছেন রাষ্ট্রপ্রধানের দায়িত্ব নেবার জন্যে যাতে চেক ও শ্লোভাক দুটো অঞ্চলের অধিবাসীদেরই সমান উন্নয়ন হয়। কিন্তু জেনারেল স্ববোদার অভিজ্ঞতা প্রধানত সৈন্য পরিচালনায়, রণকৌশলের। রাষ্ট্রশাসনের কাজে সামরিক পুরুষ স্ববোদা কতটা সফল হবেন সে বিষয়ে এখনি ভবিষ্যদ্বাণী করা চলে কি? অর্থাৎ চেকোশ্লোভাকিয়ার যে গণতন্ত্রীকরণের সংকল্প নেওয়া হচ্ছে তাতে ৭২ বছরের বৃদ্ধ জেনারেল স্ববোদার নেতৃত্ব কতটা কার্যকর এবং সার্থক হবে সে কথা আগে থেকে কে বলতে পারে?

বঙ্গদর্শন

পশ্চিমবঙ্গে রাষ্ট্রপতির শাসন প্রবর্তিত হবার পর বেশ কিছুকাল অতিবাহিত হয়েছে, কিন্তু এই শাসনের ফলে জনসাধারণের জীবনধারার সামান্যতম পরিবর্তন অনুভূত হয় নি, অথচ রাজ্যপালের কাছে জনসাধারণের কিছুটা প্রত্যাশা ছিল। সে প্রত্যাশা অবশ্য এমন কিছু ভয়ানক আকারের নয়, গত বিশ বছরে যা হয় নি তা কেন রাজ্যপালের হাতে হচ্ছে না এমন আহাম্মকের মত দাবি কেউই তুলছেন না, যেমন যুক্তফ্রন্টের কাজেও এমন দাবি কেউ তোলেন নি। তথাপি কয়েকটি অতি সাধারণ বিষয়ের সমাধান রাজ্যপালের কাছ থেকে অনেকেই সংগতভাবে আশা করেছিলেন এবং তাঁরা হতাশ হয়েছেন। রাজ্যপালের কয়েকটি বিশেষ সুবিধা আছে, যথা, তিনি এককভাবেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেন এবং তা কার্যকরী করার নির্দেশ দিতে পারেন; কোন আইনসভার কাছে তাঁকে কৈফিয়ৎ দিতে হয় না, এবং কোন মহলের চাপের নিকট তাঁর নতি স্বীকারের কোন প্রশ্নই ওঠে না। এই সব ভেবেই জনসাধারণ আশা করেছিলেন যে, অতঃপর প্রশাসনযন্ত্র বহুলাংশে নির্মল হবে, কাজকর্ম তাড়াতাড়ি হবে, লাল ফিতার বন্ধন শিথিল হবে এবং সরকারী অফিসার ও কর্মচারীদের বিরুদ্ধে অকর্মণ্যতা ও শৈথিল্যের যে অভিযোগ ন্যায়সঙ্গতভাবেই জনসাধারণের মধ্যে বর্তমান রয়েছে তার প্রতিবিধান হবে। কিন্তু কার্যত রাষ্ট্রপতির শাসনে অবস্থার কোন উন্নতি হয় নি, সরকারী অফিসগুলি পূর্ববৎ, সেই একইভাবে উৎকোচ ও দুর্নীতির রাজত্ব, গত বিশ বছরের চরিত্রের সঙ্গে সামান্যতম বৈসাদৃশ্যও পরিলক্ষিত হয় না। বরং অবস্থার আরও অবনতি ঘটেছে, আমলাতন্ত্রের দাপট শতগুণে বেড়েছে যদিও কর্মক্ষমতা বাড়ে নি। পুলিশবিভাগ যেন হাতে স্বর্গ পেয়েছে, একজন কনস্টেবল পর্যন্ত মনে করতে শুরু করেছে যে, সেই যেন ধরমবীর। পুলিশ বা সরকারী অফিসারদের আত্মবিশ্বাস বাড়ুক তাতে কোন আপত্তি নেই, যদিও কোন সি, ডি, ও, নিজেকে সিনিয়রো কর্মবীর মনে করে আত্মপ্রসাদ লাভ করে, তাতে আমাদের আপত্তির কিছু নেই। কিন্তু এর ফলে যদি তার কর্মক্ষমতা ধ্বংসাত্মক কার্যেই নিযুক্ত হয়, গঠনমূলক কার্যে নিযুক্ত হবার পরিবর্তে, তাহলে স্বাভাবিকভাবেই ভালোর বদলে মন্দটাই হবে, এবং শেষ পর্যন্ত এর কুফল জাতির জীবনে বড় মর্মান্তিক হয়ে দাঁড়াবে। বস্তুত রাজ্যপালের শাসন নতুন করে কয়েকটি সমস্যার সৃষ্টি ইতিমধ্যেই করেছে, পরবর্তী নিবন্ধগুলিতে সেগুলি নিয়ে আমরা কিছুটা আলোচনা করব।

সংগ্রহ নীতি

প্রথমেই সংগ্রহ নীতির কথায় আসা যাক। আমরা গোড়াতেই কাউকে দোষ না দিয়ে কয়েকটি স্থূল প্রসঙ্গ এখানে তুলে ধরব। কংগ্রেসী আমলেই পশ্চিমবঙ্গে রেশনিং প্রথা চালু করা হয়েছিল অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করে এবং রেশনে অসম বণ্টন, স্ট্যাটুটারী এলাকায় একরকম মডিফায়েড এলাকায় আর এক রকম মারফত জনসাধারণের মধ্যে অসন্তোষের বীজ স্বেচ্ছায় বপন করা হয়েছিল যার পরিণতি শেষ পর্যন্ত ১৯৬৬-র খাদ্য আন্দোলন, এবং যার পরিণামে শেষ পর্যন্ত কংগ্রেস গদিচ্যুত হল গত সাধারণ নির্বাচনে। এ ছাড়া মানুষের সাপ্তাহিক চাহিদার তুলনায় রেশনে যোগান কম দিয়ে স্বেচ্ছাকৃতভাবেই কালোবাজারের সৃষ্টি করা হয়েছিল, এবং এরই পরিণতিতে গড়ে উঠেছে নতুন একটি ব্যবসা, যা হচ্ছে চালের স্মাগলিং। কংগ্রেস সরকার তিন বছরেও রেশনিং প্রথাকে সুষ্ঠু করতে পারে নি, কৃষকদের উপরে লেভি জারী করে সংগ্রহ করার চেষ্টা করেছে, কিন্তু প্রত্যাশিত সংগ্রহকার্য কদাপি ফলপ্রসূ হয় নি। যুক্তফ্রন্টের খাদ্যনীতিও কংগ্রেসের অনুরূপ ছিল তবে এবার ভাল ফসল হওয়ায় যুক্তফ্রন্ট সরকার সংগ্রহের একটি ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিল যা ষোল আনা সাফল্যলাভ না করলেও বারো আনা করত, কেন না এবারের সংগ্রহ নীতির উপরই যুক্তফ্রন্ট সরকারের রাজনৈতিক অস্তিত্ব নির্ভরশীল ছিল। কিন্তু ঠিক সেই সময়ই যুক্তফ্রন্ট সরকারকে গদিচ্যুত করা হল যখন তাঁরা সংগ্রহকার্যে নামতে চলেছিলেন এবং যখন নতুন ফসল উঠেছে যে সময়টা সংগ্রহকার্যের পক্ষে রীতিমত অনুকূল ছিল। তার পরের পি, ডি, এফ সরকার তিন মাসের শাসনকালে গদি রক্ষার চেষ্টাতেই ব্যস্ত ছিল, তদুপরি ফসল সংগ্রহের কোন চেষ্টাও এই সরকার বিশেষ করে নি, কেন না আমরা বঙ্গদর্শনেই পূর্বে দেখিয়েছি যে পি, ডি, এফ, সরকারের অনেক মন্ত্রীই লেভি আদায়ের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে বিবৃতি দিয়েছেন, এবং রেশনিং প্রথার প্রতি ডঃ ঘোষের বিরাগ চিরকালই সুবিদিত। ফলে সেই অবসরে ধান-চালের যারা আসল কারবারী তারা নিজেদের ফসল গোপনস্থানে পাচার করেছে, মওকা বুঝে গলা কাটা দাম আদায় করার ফিকিরে এবং তা তারা করছেও। ফলে রাজ্যপালের স্কন্ধে যখন সংগ্রহের দায়িত্ব পড়ল তখন দেখা গেল যে আসল কারবারীরা বহু জলের তলায়। অথচ রাজ্যপালের নির্দেশের উপর ভিত্তি করে সরকারী কর্মচারীরা আদায়ের ভার নিয়েছেন, কিন্তু সে আদায়ের কোন নির্দিষ্ট পরিকল্পনা নেই। অথচ সংগ্রহের নাম করে গ্রামের দরিদ্র কৃষকদের উপর নিদারুণ অত্যাচার সরকারী অফিসার ও পুলিশ যুগপৎভাবে চালাচ্ছে, লোকের বাড়ি বাড়ি ঢুকে খোরাকীর ধান-চাল পর্যন্ত সীজ করছে, এবং বহু ক্ষেত্রে সংযম, শ্লীলতা, শালীনতা ও ভদ্রতার মাত্রা তারা ছাড়িয়ে গেছে। প্রতিটি গ্রামে যেন বর্গীর হাঙ্গামা শুরু হয়েছে। কিন্তু এত করেও সংগ্রহ যা হচ্ছে তা অবশ্য উল্লেখযোগ্য নয়,

সর্বাপেক্ষা শোচনীয় যা তা হচ্ছে সংগৃহীত ফসলের পরিমাণ টন বা মণের অংকে প্রকাশ না করে কিলোগ্রামে প্রকাশ করা হচ্ছে, বোধ হয় সরকারী কর্মচারীদের দক্ষতা প্রমাণের জন্য।

কিন্তু যাদের ধরা দরকার, যাদের কাছে হাজার হাজার মণ চাল আছে, সেই সব হাঙর-কুমীররা কিন্তু গভীর জলের তলাতেই ঘুরে বেড়াচ্ছে, তাদের কেশাগ্র পর্যন্ত স্পর্শ করা সম্ভবপর হয় নি। রাজ্যপালের প্রতি আমাদের জিজ্ঞাসা এদের খুঁজে বার করা কি একান্তই দুঃসাধ্য? পূর্ববর্তী আমলের দলীয় শাসনের সময় হয়ত তা সম্ভব ছিল না কেন না দলীয় রাজনীতিতে, নির্বাচনে এদের টাকা কাজে লাগত, কাজেই এদের দেখেও না দেখার ভান মন্ত্রীদের করতে হয়েছে। কিন্তু এখন তো এদের খুঁজে বার করা খুব দুঃসাধ্য নয়। প্রতিটি গ্রামেই এদের সংখ্যা একজন কি দুজন। এখানে আমরা একটি উদাহরণ দিচ্ছি। আমাদের জনৈক বন্ধুকে কোন প্রয়োজনে একবার এই রকম একজন ভদ্রলোকের দারস্থ হতে হয়েছিল। সেই ভদ্রলোকের চেহারার মধ্যে অবশ্য কোন জোতদারত্বের চিহ্ন নেই, অক্ষৌরিত গণ্ড, অর্ধ মলিন বেশভূষা। ইনি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান এবং সেই সঙ্গে স্থানীয় বিদ্যালয়ের সম্পাদক, এবং গ্রামের বিশেষ মান্যগণ্য ব্যক্তি। এ'র জমির পরিমাণ কম-সে-কম হাজার বিঘা যদিও কাগজে-কলমে নয়। এ ছাড়া তিনি একটি বড় দোকান ও একটি পেট্রোল পাম্পের মালিক। এগুলি বাদ দিলেও তাঁর নিজস্ব একটি ধান-কল আছে। তাঁর যে দোকানটির কথা উল্লেখ করলাম সেটি আবার মডিফায়েড রেশন দেবার দোকানও বটে, আবার সেই দোকানের মাথায় একটি কালো রং-এর সাইনবোর্ডও টাঙানো আছে 'ফুড কর্পোরেশন অফ ইণ্ডিয়া' এখানে সরকারী দামে ধান-চাল ক্রয় করা হয়। অর্থাৎ গ্রামটির সমুদয় অর্থনৈতিক শক্তি এই ভদ্রলোকের করায়ত্ত। গ্রামের সমস্ত ধানই তাঁর ধান-কলে আসতে বাধ্য, কংগ্রেসী আমলে এ'রই ধান-কলের উপর লেভি হয়েছে কখনো শতকরা একশো ভাগ কখনো বা পঞ্চাশ ভাগ, কিন্তু কাগজে-কলমে তাঁর উপর যতটাই ধার্য হোক না কেন সরকারকে নিশ্চয়ই তিনি তা দিয়ে বাধিত করেন নি, বরং সরকারী দামে কৃষকদের কাছ থেকে সরকারের হয়েই তিনি ধান কিনেছেন, এবং তার নামমাত্র সরকারকে সমর্পণ করে তিনি অবশিষ্ট ধান-চাল প্রচুর মুনাফায় বিক্রি করেছেন। তাঁর এই বিপুল লাভকে তিনি আবদ্ধ করে রাখেন নি, সেই টাকায় তিনি দুখানা বাস কিনেছেন। তা ছাড়া তিনি কয়েকটি লরীরও মালিক, এবং গত কয়েক বছরের সরকারী খাদ্যনীতির ফলে তিনি যে হারে সমৃদ্ধ হচ্ছেন তার ফলে দেখা যাবে যে আগামী দু-এক বছরের মধ্যে তিনি একটি কোল্ড স্টোরেজও খুলে ফেলেছেন। এই যে টিপিক্যাল উদাহরণটি দিলাম কম-বেশি এইরকম স্ট্যাটাসের মানুষ এক-আধজন করে সব গ্রামেই আছেন যাঁদের হাতে গ্রামের সমুদয় অর্থনৈতিক শক্তি কেন্দ্রীভূত, এবং সেই কারণেই গ্রামবাসীদের টিকিও তাঁদের হাতে বাঁধা, কিছু কিছু অনুগ্রহ বিতরণের দ্বারা গ্রামের এক শ্রেণীর মানুষকে তাঁরা নিজেদের করে রেখেছেন, সরকারী কর্মচারী, বি, ডি, ও সাহেব, পুলিশ-দারোগা নানাভাবে সকলের সঙ্গে তাঁরা দহরম-মহরম সম্পর্ক পাতিয়ে বসে আছেন। কাজেই তাঁদের কেশাগ্র স্পর্শ করে এমন সাধ্য কার? দলীয় শাসনের আমলে শাসক দলের সঙ্গে এ'দের রীতিমত ঘনিষ্ঠতা, পার্টি ফাণ্ডে টাকা দেন, নির্বাচন প্রার্থীকে অর্থ ও লোকের দ্বারা সাহায্য করেন, কখনো বা নিজেদের কোন কোন বিশেষ দলের মনোনয়ন নিয়ে নির্বাচনে অবতীর্ণ হন। মনোনয়ন পেতেও অসুবিধা নেই কেন না টাকা আছে,—নির্বাচনে জয়লাভের সেটা অন্যতম প্রধান উপকরণ। নির্বাচিত হলে এ'রাই সরকারের মধ্যে থেকে কলকাঠি নাড়েন, নিজেদের বা সমগোত্রীয় মানুষদের আঁতে যেন কোন ঘা না লাগে। রাজ্যপালের নিকট তাই আমাদের জিজ্ঞাস্য, এ'দের কি খুঁজে বার করা এতই কঠিন?

আইন ও শৃংখলা

পশ্চিমবঙ্গে রাষ্ট্রপতির শাসনের সঙ্গে সঙ্গে আইন ও শৃংখলা ফিরে আসবে বলে যাঁরা আশা করেছিলেন তাঁদেরও রাজ্যপাল হতাশ করেছেন, কেন না যে সর্ষে দিয়ে তিনি ভূত ছাড়ানোর ব্যবস্থা করতে গিয়ে ছিলেন সেটাই যে কতটা ভূতগ্রস্ত তা তিনি বোধ হয় খেয়াল করেন নি। এ-দেশের পুলিশ বিভাগের যোগ্যতার সুনাম কোনদিনই নেই, ভাবা গেছল যে রাষ্ট্রপতির শাসনে এরা কিছুটা সৎ ও যোগ্য হয়ে উঠবে। কিন্তু কার্যত ব্যাপারটা ঘটেছে ঠিক উল্টোটা। যে কথা আগেই বলেছি, একজন কনস্টেবলও নিজেকে ক্ষুদে বাদশাহ ভাবতে শুরু করেছে, এবং পুলিশ মহলে এই ধারণার সৃষ্টি হয়েছে যে এখন রাজ্যপতির শাসন মানে তাদেরই শাসন, অতএব যা খুশি তাই কর।

সমাজবিরোধী কাজের পরিমাণ দিনের পর দিন বেড়ে যাচ্ছে, বিশেষ করে পুলিশ তা বাড়তে দিয়ে সাহায্য করছে। আমরা পূর্বে বহুবার লিখেছি পুলিশ এবং সমাজবিরোধী ব্যক্তিরা আসলে একই মুদ্রার দুই পিঠ, একের স্বার্থের সঙ্গে অপরের স্বার্থ ওতপ্রোতভাবে জড়িত। গত সংখ্যায় আমরা দেখাবার চেষ্টা করেছিলাম কিভাবে মধ্যমগ্রামে আর একটি বেলঘরিয়ায় সৃষ্টি হতে চলেছে। আমাদের প্রকাশিত বক্তব্যের জন্য বিভিন্ন মহল থেকে আমরা যেমন একদিকে অভিনন্দনমূলক চিঠিপত্র ও টেলিফোন পেয়েছি, অপরদিকে তেমন কিছু লোক বে-নামী চিঠি লিখে ও টেলিফোন করে আমাদের শাসিয়েছে। টেলিফোনকারীদের মধ্যে একজন পুলিশের টাউট আছে। (শুনেছি মধ্যমগ্রামবাসী এই টাউটটি কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিরক্ষা হিসাব দপ্তরে কাজ করে।)

এ প্রসঙ্গে জনৈক অধ্যাপকের চিঠি নিম্নে উদ্ধৃত করছি :

"সমাজবিরোধী ও পুলিশ সম্পর্কে গত সপ্তাহের 'বঙ্গদর্শনে' আপনি যে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেছেন তার জন্য ধন্যবাদ জানাই।

স্বাধীনোত্তর ভারতবর্ষে পুলিশের চরিত্রের আমূলে পরিবর্তন না হলেও কিছুটা সংশোধন হবে বলে যাদের আশা ছিল, আমি তাদের একজন। বলতে দ্বিধা নেই, ভয় নেই, বহু বাস্তব অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের পর পুলিশ সম্পর্কে আমার চিন্তা-ভাবনার সম্পূর্ণ পরিবর্তন হয়েছে, পুলিশ দেখলে আমার ঘৃণা হয়, আতঙ্ক হয়। কিছুদিন আগে আমাদের পরিবারের কেউ পুলিশের চাকরির জন্য চেষ্টা করছে শুনে আমি এত উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলাম যে, তার (চাকরিপ্রার্থী) সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কথা ভুলে যেয়ে তাকে চরম অপমান করেছিলাম।

যা হোক, মধ্যমগ্রামবাসী হিসেবে আমি এটুকু বলতে পারি, সমাজবিরোধী ও পুলিশের প্রকৃত স্বরূপ উদ্ঘাটনে আপনি যে বলিষ্ঠতার পরিচয় দিয়েছেন, তার ফলে আমাদের সাময়িকভাবে হয় তো নানা লাঞ্ছনা ভোগ করতে হতে পারে, কিন্তু পরিণামে জনমতের চাপে সমাজবিরোধীদের ও পুলিশকে মাথা নোয়াতেই হবে—এ বিষয়ে আমি সুনিশ্চিত। বারাসতের পুলিশের এক কর্তাব্যক্তি অবশ্য ২৪শে মার্চ মধ্যমগ্রামে এসে প্রকাশ্যে শাসিয়ে গেলেন—এখন আমরাই সব, রাষ্ট্রপতি শাসন মানেই পুলিশের শাসন। কাগজে লিখেছেন, এর ফল ভোগ করতেই হবে। পি, ডি, এ্যাক্টে ধরব, শায়েস্তা করব।

পুলিশ কর্তা যতই লম্ফ-ঝম্ফই

করুন না কেন, সংঘবদ্ধভাবে সমাজ-বিরোধীদের প্রতিরোধের জন্য এগিয়ে এলে সব কিছুরই মোকাবিলা করা সম্ভব।

রাজ্যপাল শ্রীধরমবীর পুলিশ-প্যারেডে সমাজবিরোধীদের দমনে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য পুলিশের কর্তৃপক্ষের আহ্বান জানিয়েছেন। শুধু তাই, [illegible] জন্যে সীমাবদ্ধ না রেখে সমাজবিরোধীদের দমনের উদ্দেশ্যে রাজ্যপাল [illegible] করার জন্য পুলিশের প্রতি জরুরী [illegible] দাবী করেন—আমাদের এই অনুরোধ।"

আমরা রাজ্যপালকে অনুরোধ জানাই যেন তিনি এই [illegible] অনুসরণ করে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। তাঁর আমলের পুলিশ-[illegible] করার প্রয়োজন আছে, যেন না পুলিশ ও সমাজবিরোধী [illegible] শক্তির পার্থক্য [illegible]।

শিল্প ও শ্রমিক

পশ্চিমবঙ্গের অসংখ্য কলকারখানা বৎসরাধিক ধরে বন্ধ হয়ে আছে, যার ফলে শ্রমজীবী জনসাধারণের অবস্থা শোচনীয়তম পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। যুক্তফ্রন্টের আমলে মালিকপক্ষ জনসাধারণকে সহজেই একটি কথা বলে বিভ্রান্ত করেছিল যে শ্রম-বিরোধের ক্ষেত্রে যে বাড়াবাড়ি হয়েছে তারই কারণে কারখানা বন্ধ করা ভিন্ন কোন উপায় ছিল না। যুক্তফ্রন্ট সরকারের শ্রমিকপ্রীতি সর্বজনবিদিত ছিল এবং তাঁরা ঘোষণা করেছিলেন যে যেহেতু জীবিকার প্রয়োজনে শ্রমিকদের আন্দোলন করার মধ্যে কোন অন্যায় নেই, সেই হেতু সরকার এমন কোন আচরণ করবে না যা শ্রমিকদের স্বার্থ বিরোধী। শ্রমিকদরদী যুক্তফ্রন্ট সরকারকে অপসারণের পিছনে কোন কোন ইন্ডাস্ট্রিয়াল হাউসের যে হাত ছিল না তা নয়। কিন্তু বর্তমানে অবস্থা বদলে গেছে, পি-ডি-এফ'র আমলেও বন্ধ কারখানার দুয়ার খোলে নি, রাজ্যপালের আমলেও নয়, এ থেকেই বোঝা যায় কারখানা বন্ধের কারণ তথাকথিত "ঘেরাও" নয়, ওটা মালিকপক্ষের একটা নিকৃষ্ট ধরনের অছিলা। সুপরিকল্পিতভাবেই মালিক-শ্রেণী পশ্চিমবঙ্গের শিল্পক্ষেত্রে একটা অনিশ্চিত অবস্থার সৃষ্টি করেছে, তারা এখন কারখানা বন্ধের পক্ষে নানা রকম অজুহাত দেখাচ্ছে কোনগুলি যুক্তির ধোপে টেকে না। পদাধিকার বলে রাজ্যপাল আজ যে বিপুল ক্ষমতার অধিকারী সেই ক্ষমতা প্রয়োগ করে তিনি নিশ্চয়ই মালিক-পক্ষকে মোকাবেলা করতে পারতেন এবং তাদের কারখানা খুলতে বাধ্য করাতে পারতেন। তাঁর অনেকগুলি প্রাথমিক সুবিধা আছে যা কোন দলীয় নেতার নেই, পশ্চিমবঙ্গের শিল্পক্ষেত্রের অনিশ্চিত অবস্থা দূর করতে যদি রাজ্যপাল সমর্থ না হন তাহলে জনসাধারণের মনে একটা ধারণাই দৃঢ়তর হবে যে পুঁজিবাদী রাষ্ট্রব্যবস্থায় আসীন কোন ব্যক্তিকে [illegible] "নিরপেক্ষ" বলেই মনে হোক না কেন, সেই "শাসনযন্ত্রটি" [illegible] পুঁজিবাদীদের স্বার্থের বিরুদ্ধে যেতে পারেন না, এমন কি [illegible] দিতে।

ট্রাম কোম্পানী

যে কাজ করার প্রয়োজন আছে তা না করে যা প্রয়োজন অপেক্ষাকৃত নেই সেদিকে যদি রাজ্যপাল তাঁর কর্মক্ষমতাকে নিয়োগ করেন তাহলে তা মোটেই প্রশংসাযোগ্য হয় না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ ট্রাম কোম্পানী ক্রয় করে নেবার সিদ্ধান্তের কথাটা উল্লেখ করতে হয়। প্রথমত এই বিরাট ব্যাপারটা কোন প্রতিনিধিত্বমূলক সরকারের হাতে ছাড়াই উচিত, কেন না ব্যাপারটির সঙ্গে জনসাধারণের বহু স্বার্থ ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। দ্বিতীয়ত [illegible] মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন ট্রাম কোম্পানীর সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যে চুক্তি হয়েছিল তা অনুযায়ী ট্রাম কোম্পানীর বর্তমান পর্যায়ে ব্যবসার মেয়াদ আগামী ১৯৭১ সালে শেষ হবার কথা। তারপর যা হবার তা হবে, বিশেষ করে যখন কোম্পানীর পরিচালনাভার সরকারের হাতেই রয়েছে। তৃতীয়ত যে বিপুল পরিমাণ অর্থ দিয়ে ট্রাম কোম্পানী কিনে নেবার সিদ্ধান্ত হয়েছে সেই অর্থের যোগান কোথা থেকে আসবে, এটা একটা বড় প্রশ্ন। বলাই বাহুল্য সেই টাকাটা আসবে জনসাধারণের ঘাড় ভেঙে। ট্রাম কোম্পানীর যা অবস্থা তাতে বেচে দেওয়াই কোম্পানীর পক্ষে লাভজনক, এবং কোম্পানীর প্রস্তাবের টোপ গিলে রাজ্যপাল বিদেশী পুঁজিরই স্বার্থ রক্ষা করতে চলেছেন। আমাদের একশ্রেণীর অফিসারের মনে বিদেশী পুঁজির প্রতি বড় বেশি প্রেম আছে, এবং এদের পরামর্শে রাজ্যপাল যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন তা আত্মঘাতী, হঠকারী এবং দেশের স্বার্থ বিরোধী। আশা করি রাজ্যপাল বিষয়টি তলিয়ে বিবেচনা করবেন এবং এই দেশদ্রোহিতা-মূলক কাজ থেকে বিরত হবেন।

ছিটমহল হস্তান্তরের দাবি

পশ্চিমবঙ্গ ও পূর্ব পাকিস্তানের অন্তর্গত বিভিন্ন ছিটমহলগুলির সমস্যা মোকাবেলার জন্য [illegible] নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেছেন। পাকিস্তানী এলাকায় অবস্থিত ভারতীয় ছিটমহলগুলিতে ভারতীয় শাসনের কোন চিহ্নই নেই, ভারতীয় সরকারী কর্মচারী বা পুলিশ সেখানে যেতে পারে না, যদিও ভারতের অন্তর্গত পাকিস্তানী ছিটমহলগুলিতে পাকিস্তানীরা পূর্ণ অধিকার বজায় রেখেছে, এটা সত্যই লজ্জা ও দুঃখের বিষয়। এইরকম ছিটমহল [illegible] বেশি অবস্থিত। দেশ বিভাগের পর থেকেই ছিটমহলের ভারতীয় নাগরিকদের অত্যন্ত দুর্দশার মধ্যে দিন কাটাতে হচ্ছে। [illegible] পাকিস্তান [illegible] এই ছিটমহলগুলির অধিবাসীদের প্রতিনিয়ত পাকিস্তানী পীড়ন সহ্য করতে হচ্ছে, তারা [illegible] নাগরিক হওয়া সত্ত্বেও। [illegible] নিরাপত্তা নেই, অথচ পাকিস্তান ভারতীয় এলাকার মধ্যে অবস্থিত পাকিস্তানী ছিটমহল-গুলির উপর পূর্ণ কর্তৃত্ব বজায় রেখেছে। ভারত সরকার এ বিষয়ে একান্তই উদাসীন, এবং ভারতের নাগরিক হওয়ার অপরাধেই যেন ভারত সরকার এদের সম্পর্কে একেবারে নির্বিকার। ছিটমহল-গুলির অধিবাসীরা নিম্নলিখিত দাবিগুলি ভারত সরকারের নিকট পেশ করেছেন। (১) অবিলম্বে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে ছিটমহলসমূহ বিনিময় করতে হবে; (২) যতদিন না তা হচ্ছে ততদিন ভারতীয় ছিটমহলে যাবার জন্য পাকিস্তানী এলাকার ভিতর দিয়ে অবাধ যাতায়াতের পূর্ণ সুযোগ দিতে হবে; (৩) ভারতীয় ছিটমহলে শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার পূর্ণ ব্যবস্থা করতে হবে এবং পুলিশ ও সরকারী কর্মচারীদের সেখানে যাবার ব্যবস্থা করতে হবে; (৪) ছিটমহলের যে সব অধিবাসী নিজেদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে বাধ্য হয়ে নিজেদের ঘরবাড়ি ছেড়ে অন্যত্র থাকতে বাধ্য হচ্ছে তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে হবে। আমরা এই দাবি সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করছি, কেন না এটা একটা মানবিক সমস্যা। ছিটমহলের অধিবাসীরা নিজেরা কোন অপরাধ করে নি, অথচ ভারত সরকারের কৃপায় তারা নিজ বাসভূমে উদ্বাস্তুতে পরিণত হয়েছে। নিজ নাগরিকদের অধিকার রক্ষার প্রতি পাকিস্তান সরকার যতখানি সজাগ, ভারত সরকার তার শতাংশের একাংশও নয়, এর চেয়ে দুঃখ ও লজ্জার বিষয় আর কি থাকতে পারে?

(২৯।৩।৬৮)

গ্রাম-গ্রামান্তরে

'নয়া নীলকর সাহেবদের' কীর্তি

গ্রামে দেখছি বর্গীর হাঙ্গামা সুরু হয়ে গেল। মজুদ উদ্ধারের নামে ঘরে ঘরে গিয়ে সরকারী আমলারা যে সব কাণ্ড-কারখানা চালাচ্ছেন তাতে বলা যেতে পারে 'নীলকর সাহেব' আবার বেঁচে উঠেছেন।

নিজের সারা বছরের প্রয়োজন বা বীজ ধান ছাড়াও যারা অতিরিক্ত ধান-চাল জমিয়ে রেখেছেন বা লুকিয়ে রেখেছেন তা উদ্ধার করা হোক দেশের বৃহত্তর স্বার্থে তাতে কেউ আপত্তি করবে না; বরং দেশের মানুষ সহযোগিতা করছেন ও করবেনও যাতে সে ধান-চাল উদ্ধার করে বুভুক্ষু মানুষের হাতে দেওয়া হয়। কিন্তু আপত্তি এবং ঘোরতর আপত্তি হল সেখানে, যেখানে কিছু সংখ্যক সরকারী আমলা—নিজেদের কাজ দেখাবার জন্যেই হোক বা অন্য যে-কোন কারণেই হোক গরীব ও মধ্যবিত্ত চাষীদের ঘরে গিয়ে মরাই খুলে খোরাকীর ধান এমন কি বীজ ধান পর্যন্ত টেনে বার করে নিয়ে যাচ্ছে। ঐ চাষী পরিবারটি সারা বছর খাবে কি, আগামী বছর চাষই বা কি দিয়ে করবে, সে সব ভাববার বা শোনবার জন্যও তারা অপেক্ষা করে না। বর্ধমানে এমন অনেক গরীব চাষীর বাড়িও আছে যেখানে ১৪৪ ধারা জারি করে বর্গীরূপী আমলারা ঘরে ঢুকেছে, মরাই খুলেছে, সব ধান নিয়ে চলে গেছে। পাছে আশেপাশের লোকজন জড় হয়ে আপত্তি জানায় তাই ১৪৪ ধারা দিয়ে তাদের সরিয়ে রাখা হল। কারুর কোন ওজর আপত্তি চললো না ঃ অজস্র গ্রাম থেকে এই বর্গীর হাঙ্গামার অভিযোগ আসছে, শুধু বর্ধমানই নয়, মেখলীগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, মেদিনীপুর, হুগলী, ২৪ পরগনা, পুরুলিয়া সব জেলাতেই কৃষকরা সন্ত্রস্ত। প্রতিকারের জন্যে সকলেই ছোটেন দলে দলে বি-ডি-ও'র কাছে—কিন্তু প্রতিকার তো দূরের কথা সেখানে তাঁরা যে ব্যবহার পান, ভাবতে লজ্জা লাগে আমরা কোন্ দেশে আছি! উপায়ান্তর না দেখে টেলিগ্রামের পর টেলিগ্রাম পাঠানো হচ্ছে রাজ্যপালের কাছে—'মধ্যবিত্ত ও গরীব চাষীদের নির্যাতন ও জুলুমের হাত থেকে আপনি দয়া করে রক্ষা করুন'।

ধন্যবাদ রাজ্যপালকে, তিনি ঐ সব টেলিগ্রামের জবাবে জেলা কর্তৃপক্ষকে নাকি নির্দেশ দিয়েছেন—চাষীদের যেন কোন অসুবিধায় ফেলা না হয়। সবচেয়ে আশ্চর্য লাগে চাষীদের যখন ঘোরতর দুর্দিন, মুখের অন্ন কেড়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে সেই সময় দেশের রাজনৈতিক নেতাদের কোন পাত্তাই নেই। আজ তাঁরা কোথায়? মরাই শূন্য হয়ে যাওয়ার পর, দাওয়ায় বসে অনেক চাষীকে ঐ আক্ষেপ করতে শুনেছি, এমনও শুনেছি মনের দুঃখে কেউ কেউ বলেছেন, 'আবার তো ভোট আসছে, দেখে লিব ঐ সব বাবুদের'। কিন্তু সেসব আক্ষেপের কথা থাক। রাজ্যপালই যখন কিছু প্রতিকারের চেষ্টা করেছেন তখন রাজ্যপালকেই অনুরোধ করা হোক—(১) খোরাকীর ধান বা বিছনের ধান না রেখেই যে সব চাষীর গোলা থেকে ধান টেনে বার করে নিয়ে যাওয়া হয়েছে নিরপেক্ষ লোকদের দিয়ে সে সব ক্ষেত্রে তদন্ত করা হোক এবং চাষের ও খোরাকীর ধান তাদের যেন অবিলম্বে ফিরিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা হয়। (২) আমলাদের জুলুমের ফলে কৃষকদের মধ্যে যে ভয়ের সঞ্চার হয়েছে এবং যার ফলে চাষীরা ভয়ে ভয়ে তার খাওয়ার ধান বা ছাঁট ধানও দিয়ে না দেয় সে দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। বিভ্রান্তিকর প্রচারের ফলে বীরভূমের অনেক গ্রামে এই ধরণের ঘটনা ঘটে গেছে। (৩) মজুতদার ও বড় বড় জোতদারদের সঙ্গে এক শ্রেণীর সরকারী আমলাদের যোগসাজসের ফলে সত্যিকারের যেখানে বেশি ধান-চাল আদায় হতে পারতো তা ব্যাহত হচ্ছে, এসব ক্ষেত্রেও নিরপেক্ষ লোকদের দিয়ে তদন্ত করে ধান-চাল উদ্ধার করতে হবে ও দোষী আমলাদের শাস্তি দিতে হবে। ভরতপুর, দোমাহনী, মেমারী, বোলপুর, রায়গঞ্জ, সাঁইথিয়া, রামপুরহাট, কান্দি—এ সব জায়গা থেকেই বেশি অভিযোগ আসছে।

গ্রামান্তর থেকে আরও সব আতঙ্কজনক খবর আসছে; একদিকে যখন আমলারা মজুত উদ্ধারে বা ধান-চাল আদায়ে সর্ব শক্তি নিয়োগ করেছেন তখন আর একদিকে হাট-বাজার হয়ে যাচ্ছে চাল-শূন্য। গ্রামের সকলেই তো আর চাষবাস করেন না, বিশেষ করে যাঁরা মফস্বলের শহরে থাকেন তাঁদের কি অবস্থা হবে এখন? শান্তিপুর, রাণাঘাট, নবদ্বীপ, রায়গঞ্জ, তমলুক, নৈপুর—আরও বহু হাট-বাজার থেকে খবর এসেছে চাল আর একদানাও নেই। এখন উপায়? কি যে সরকারের নীতি বুঝি না! এদিকে যারা চাষবাস করে দেশকে খাওয়াবে আমলাদের উৎপীড়নে তারা আজ সর্বস্বান্ত হতে বসেছে, আর একদিকে যারা গাঁটের পয়সা খরচ করে চাল কেনেন তাঁদেরও ঘরে আজ চাল বাড়ন্ত। মানুষ করবে কি?

—সমর চট্টোপাধ্যায়

তিনি যে ব্যাঙ্কে এলেন সেখানে বছরে লক্ষ লক্ষ লোক আসেন

প্রতি বছর হাজার হাজার লোক তাঁদের সঞ্চয় ষ্টেট ব্যাঙ্কের ওপর বিশ্বাস করে রাখেন। বর্তমানে সেই সঞ্চয়ীকৃত টাকার পরিমাণ হ'ল ৯৫০ কোটি টাকার ওপর। এর ফলে ষ্টেট ব্যাঙ্ক শিল্পক্ষেত্রের ও কৃষিক্ষেত্রের উন্নয়নে আরো বেশী অর্থসাহায্য করতে সক্ষম হয়। ভারতের লক্ষ লক্ষ লোক যেখানে বাস করেন, সেখানেই ব্যাঙ্কের পৌঁছুনো সম্ভব হয়। সবচেয়ে বড় কথা হল, ষ্টেট ব্যাঙ্ক সততা ও বিশ্বাসেরই প্রতীক। প্রত্যেক লোকেরই তাদের এই নিজস্ব ব্যাঙ্কের প্রতি এই বিশ্বাস অটুট।

সকলের সেবায় ষ্টেট ব্যাঙ্ক

S. 371 BN

সপ্তাহের বোঝা

কৃত্তিবাস ওঝা

পশ্চিমবঙ্গের আগামী নির্বাচনী যুদ্ধের এক উল্লেখযোগ্য মহড়া হয়ে গেল কলকাতার বাইরে তরাই-এর তীরে শিলিগুড়ি শহরে। শিলিগুড়ি শহরের নির্বাচনী যুদ্ধের মহড়াটি যদি কলকাতা বা তার পাশের কোন শহরে অনুষ্ঠিত হত তবে তার দর্শকও যেমন অনেক বেশি জুটতো, তেমনি কলকাতায় অনুষ্ঠিত মহড়ার প্রতিক্রিয়ার ধাক্কা ভাঙতে হৈ চৈ পড়ে যেত। কিন্তু শিলিগুড়ি শহরের লোকসংখ্যাই বা কত আর প্রচারের মাধ্যমই বা আছে কতটা। শিলিগুড়ি শহরের মানুষ, যারা এই মহড়ার দৃশ্য দেখেছে, তারা যদি কলকাতায় সেই গল্প করে তবে কেউই বিশ্বাস করবে না। বরং উগ্র কোন মতবাদে অন্ধ দোষারোপে তাকে বসিয়ে দেবে। দৈনিক পত্রিকার কয়েকজন রিপোর্টারও এই দৃশ্য দেখেছে। কিন্তু তারা কেউই সব কথা লেখে নি—কারণ তাদেরও ভয় ছিল হয়ত তাদের সহযোগীরা বিশ্বাস করবে না।

আমি গত সপ্তাহে চার দিনের ব্যবধানে শ্রীঅতুল্য ঘোষ ও শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায়ের উত্তরবঙ্গের এক নম্বর সিটি শিলিগুড়ি শহরে অনুষ্ঠিত নির্বাচনী সভার কথা বলছি। যে সভায় বক্তৃতাকালে শ্রীঅতুল্য ঘোষকে পাল চাপা দেবার চেষ্টা দেখা গিয়েছিল—আর শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায়ের বক্তৃতাকালে সভার অদূরে ১৫টি বাড়িতে আগুন লেগে পুড়ে ছাই হতে দেখা গেছিল। কিন্তু এই সভার কথা বলার আগে শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায় আর শ্রীঅতুল্য ঘোষের উত্তরবঙ্গ ভ্রমণ আর উত্তরের নির্বাচনী অভিযানের পটভূমিকার কথা বলে নিই।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য রাজনীতির দুই প্রধান মল্লযোদ্ধা শ্রীঅতুল্য ঘোষ ও শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায় অতি সঙ্গত কারণেই রাজ্যের আগামী নির্বাচনের নির্বাচনী প্রচার অভিযানের উদ্বোধন ক্ষেত্র রূপে উত্তরবঙ্গকে গ্রহণ করেছেন। কারণ উত্তরবঙ্গের পাঁচটি জেলায় গত তিনটি নির্বাচনে দেখা গেছে, কুস্তির পালোয়ানের দ্বৈত লড়াইয়ে একবার একজন নিচুতে পড়েন আবার নিচু উপরে উঠে আসেন। হিসাবে তিন বারের পর তারা বারে বারে উপরে আসবেন তার জন্য সর্বাগ্রেই উত্তরবঙ্গে ছুটে এসেছেন—শ্রীঅতুল্য ঘোষ কংগ্রেসের সর্বোচ্চ নেতা, আর শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায় যুক্তফ্রন্টের সর্বোচ্চ নেতা। কংগ্রেস উত্তরবঙ্গের পাঁচটি জেলা যথা দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, দিনাজপুর, মালদহে ১৯৫৭ সালে ৩৩টি আসনের মধ্যে পেয়েছে ২১টি আসন, ১৯৬২ সালে পেয়েছে ২১টি আসন, আর ১৯৬৭ সালে মোট ৩৫টি আসনে পেয়েছে আবার ২১টি আসন। অর্থাৎ একবার কংগ্রেস এগিয়েছে আবার পিছিয়েছে—আবার এগিয়েছে। আবার এলোমেলো হিসেবের ধারায় এক-একটি জেলায় পিছিয়ে কংগ্রেস পালোয়ান নিচুতে পড়েছে আবার উপরে উঠে বিরোধী দলকে নিচুতে ফেলেছে। যেমন কোচবিহার জেলা। কোচবিহার জেলায় কংগ্রেস ১৯৫৭ সালে পেল ৭টি আসন আর ১৯৬২ সালে পেল মাত্র ১টি আসন, আবার ১৯৬৭ সালে পেল পাঁচটি আসন।

শুধু উপরে ওঠা নিচুতে নামার কারণে নয়, উত্তরবঙ্গে উক্ত দুই নেতার প্রায় একই সঙ্গে ভ্রমণের অন্য কারণ সম্ভবত এই যে, সর্বাপেক্ষা বেশি দলত্যাগ ঘটেছে এই উত্তরবঙ্গের এই জেলাগুলিতে। মোট ৩৫ জন বিধানসভা সদস্যের মধ্যে ৬ জন দলত্যাগ করেছেন এই কয় জেলায়। দলত্যাগীদের মধ্যে পি এস পি দলের তিনজন। অবশ্য ডাঃ সলিমুদ্দিন পরে দলে ফিরে আসেন। তবে যুক্তফ্রন্ট সরকারের পতনের কারণ ঘটিয়ে দলে ফিরে আসা আর না আসা অর্থহীন। কংগ্রেস একজন, বাংলা কংগ্রেস একজন, স্বতন্ত্র একজন। তাই শ্রীঅতুল্য ঘোষ আর শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায় দুইজনই উত্তরবঙ্গে এসে দলত্যাগ সম্পর্কে নিজ নিজ মতামত অতি স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করেছেন। দলত্যাগ সম্পর্কে শ্রীঅতুল্য ঘোষ ইসলামপুরে বলেছেন—"দলত্যাগীদের বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তুলতে হবে, দলত্যাগীদের বিরুদ্ধে লোকের ঘৃণা সৃষ্টি করতে হবে, কিন্তু গণতন্ত্রে দলত্যাগ বন্ধ সম্ভব নয়। দলত্যাগের নজির তুলে শ্রীঘোষ বলেন, ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রী মিঃ চার্চিল দুবার দলত্যাগ করেছিলেন। এই ক্ষেত্রে শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায়ের বক্তব্য অতি পরিষ্কার—কোন অবস্থায় বিধানসভায় বা লোকসভায় পদত্যাগ না করে দলত্যাগ করা চলবে না, এবং দলত্যাগীকে কোন দলে আশ্রয় দেওয়া চলবে না। দলত্যাগীদের স্বর্গরাজ্য উত্তরবঙ্গে দুই নেতার দলত্যাগীদের সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গী ভিন্নতর হলেও প্রকাশ পেয়েছে এই সর্বপ্রথম সামান্য দূরত্বের দুইটি সভায়।

কিন্তু আরো একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ কারণ এই দুই নেতাকে সর্বপ্রথম টেনে এনেছিল রাজ্যের সর্বাপেক্ষা দূরত্বের জেলাগুলিতে। সেই কারণ হল উত্তরবঙ্গেই শ্রীঅতুল্য ঘোষের শিলিগুড়ির সভার মত তার সংগঠনও পাল চাপা পড়ার দাখিল, ঠিক তেমনি শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায়ের শিলিগুড়ির সভায় দেখা আগুনের মত তাঁর সংগঠনেও আগুন লেগেছে। এক্ষেত্রে শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায় বলতে শুধু মাত্র বাংলা কংগ্রেস দলের নেতাকে বোঝায় না, শ্রীমুখোপাধ্যায় বলতে যুক্তফ্রন্টের দলগুলির নেতাকে বোঝায়। উত্তরবঙ্গে বাংলা কংগ্রেসে যেমন ভাঙন আছে, তেমনি নকশালবাড়ি গ্রুপের সৃষ্টিতে অন্য বড় দলের মধ্যেও ভাঙন আছে। উত্তরবঙ্গে কংগ্রেসের অবস্থা পাল চাপা পড়ার দাখিল হয়েছে প্রধানত দুটি কারণে এবং এই দুটি কারণই যে কোন দলের সর্বনাশ সৃষ্টির চরম অস্ত্র বলা যায়। প্রথম কারণ দলত্যাগ। সমতল বঙ্গের অনেকেই জানেন না, উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় অনেক কংগ্রেসসেবী রাতারাতি দলবদল আর প্রগতিশীল জনসেবীর জীবে নাম লেখাচ্ছেন। মালদহ, পশ্চিম দিনাজপুর জেলার প্রায় প্রতিটি আসনে আগামী নির্বাচনে যাদের কংগ্রেস ও যুক্তফ্রন্টের বিরোধী প্রার্থীরূপে দেখা যাবে, তার প্রায় সকলেই অতীতের কংগ্রেস কর্মী। অবশ্য যুক্তফ্রন্টের কর্মীরাও অনেকে এ দলে আছেন। সে কথা পরে বলা যাবে। এমন জায়গাও আছে, যেখানে প্রায় কংগ্রেসের পুরো আঞ্চলিক সংগঠন জনসঙ্ঘে চলে গেছে। কেন জনসঙ্ঘে গেছে তার অনেক কারণ আছে। তবে প্রধান কারণ হল বিত্তবান তথা জোতদার শ্রেণী কংগ্রেসের উপর বিরূপ হয়ে গত নির্বাচনে পালটে দেখার বাসনায় যুক্তফ্রন্টের সমর্থনে নেমেছিল, কিন্তু যুক্তফ্রন্ট শাসনের অভিজ্ঞতায় তারা বুঝেছে কংগ্রেস যদি হয় জল তবে যুক্তফ্রন্ট ফুটন্ত তেল। জল ও ফুটন্ত তেল উভয়ই হয়ত হ্যাভস্‌দের কাছে তরল পদার্থ, কিন্তু জল অপেক্ষা ফুটন্ত তেল মৃত্যুকে ত্বরান্বিত করে। যুক্তফ্রন্ট নীতি বা আদর্শের কারণে হ্যাভস্‌দের কাছে ফুটন্ত তেল, শুধু এই কথা কিন্তু সত্য নয়—

যুক্তফ্রন্ট শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষায় ব্যর্থতা সহ অন্যান্য কারণেও ফুটন্ত তেলে পরিণত হয়েছে। তাই উত্তরবঙ্গে হ্যাভস্‌রা কংগ্রেস ও যুক্তফ্রন্ট দুই-ই ত্যাগ করে এবং কারো কাছে তাদের স্বার্থের পরিপূর্ণ নিরাপত্তা না পেয়ে জনসঙ্ঘের দিকে ঝুঁকেছে। নজির খুঁজতে লাভ নেই, খড়িবাড়ি এলাকার কংগ্রেস নেতা শ্রীগিরিশ সিংহ প্রায় সমস্ত সংগঠন নিয়ে জনসঙ্ঘে যোগদান করেছেন বলে শোনা যায়।

দলত্যাগের আর এক নাম যদি হয় "আশুবাদ", তবে শ্রীআশুতোষ ঘোষের অনেকগুলি অন্তরাত্মা উত্তরবঙ্গের জেলায় জেলায় কংগ্রেসের মধ্যে কাজ করে দিয়েছে। কোচবিহারের শ্রীশঙ্কর সেন ইসোর, গত নির্বাচনে যিনি মার্কসবাদী কম্যুনিস্ট নেতা শ্রীদীনেশ কারজীকে প্রায় ১৭ হাজার ভোটে পরাজিত করেছিলেন, ও প্রাক্তন উপমন্ত্রী শ্রীমহেন্দ্র ডাকুয়া, এঁরা প্রকাশ্যভাবে আশুবাদের দীক্ষা নিয়েছেন। কিন্তু কোচবিহারের প্রবীণতম কংগ্রেস নেতা প্রাক্তন বিধানসভা সদস্য শ্রীউমেশচন্দ্র মণ্ডল কেন কংগ্রেসের প্রাথমিক সদস্য হন নি, সে কারণ কয়েকদিন পরেই জানা যাবে। নজির না বাড়িয়ে এই ক্ষেত্রেও শুধু কোচবিহার জেলার কথা বললাম। তবে অন্য জেলাতেও এই জাতীয় ছোটখাটো নজিরের অভাব নেই। কংগ্রেসের অন্তর্দ্বন্দ্বের কথা তো অমৃত সমান। কংগ্রেসের অন্তর্দ্বন্দ্বের কথা কে কবে সবটা বলতে পেরেছে বা লিখতে পেরেছে। কিন্তু সম্প্রতি ফালাকাটায় জলপাইগুড়ি কংগ্রেস কর্মী সম্মেলনে যে রূপ ধরা পড়েছে সেটা কিছুটা অভিনব। অভিনব এই কারণে যে, ওই অন্তর্দ্বন্দ্ব সৃষ্টি কোন আদর্শের ভিত্তিতে নয়—অন্তর্দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়েছে চা-বাগান মালিক আর অবাঙালী ব্যবসায়ীদের স্বার্থরক্ষার কারণে। জলপাইগুড়ি জেলা কংগ্রেসের দুই প্রধান—শ্রীখগেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত আর শ্রীরবি শিকদার—উভয়ের পিছনেই আছে চা-বাগান মালিক আর চা-ব্যবসায়ীরা। এরা দেখছে টাকা ঢালে এক পক্ষ কিন্তু মজা লোটে অন্য পক্ষ। এই দুই পক্ষের এক পক্ষ ফালাকাটায় শ্রীঅতুল্য ঘোষের সামনে বলে দিল—জেলার ১১ জন কংগ্রেস প্রার্থীর বিরুদ্ধেই তারা প্রার্থী দেবে। এত বড় কথা যারা বলেছে তারা একেবারে ভুয়ো একথা ভাববার কোন কারণ নেই, কারণ শ্রীরবি শিকদার, শ্রীখগেন দাশগুপ্ত, শ্রীবরেন ভৌমিক, শ্রীপীযূষ মুখার্জী সহ তাবড় তাবড় নেতাদের বলতে না পারা কথাগুলিই বিক্ষুব্ধরা সেই দিন বলেছে। তবে হ্যাঁ, বিক্ষুব্ধদের নেতারূপে শ্রীশ্যামশান্তি রায় সহ কয়েকজন সেদিন যে কথা বলেছেন; সেটাও কিন্তু কারো কারো মনের কথা। তারা কেউ কেউ বলেছিল, "যখন কাউকে জব্দ করার দরকার হয় তখন আমাদের উপর দায়িত্ব দেওয়া হয়। শ্রীজগদানন্দ রায়ের সভা সংগঠন করতে আমাদেরই নিয়োগ করা হয়েছিল—তখন তো অন্য কাউকে পাওয়া যায় না।"

এই অন্তর্দ্বন্দ্ব শুধু কি জলপাইগুড়ি জেলায়, খোঁজ নিলে জানা যাবে পশ্চিম দিনাজপুরে শ্রীমহারাজা বসু আর শ্রীশ্যামাপদ বর্মণের অনুগামীরা প্রায় একই সুরে কথা বলছেন। কংগ্রেসের এই কাহিনী সহজে শেষ হবে না। কিন্তু যুক্তফ্রন্টের অন্যতম শরিক বাংলা কংগ্রেস অধুনা ক্লান্ত দলের অবস্থা কি কংগ্রেসের চেয়ে ভাল? কংগ্রেস বড় সংগঠন—তার অন্তর্দ্বন্দ্ব, দল ভাঙাভাঙি প্রভৃতি রোগের একটা কৈফিয়ৎ আছে। আর কংগ্রেসের নিজস্ব একটা শক্তিও আছে, যে শক্তিতে সে তার শত ক্ষতিকে পূরণ করতে পারে, শত আঘাত সামলে উঠতে পারে। বাংলা কংগ্রেস যে, হাঁটি হাঁটি পা পা করে সবে হাঁটতে সুরু করেছে, তাকে যদি জরায় ধরে, তবে কোন রাজ-বৈদ্য আছে নীরোগ করতে পারে? দলত্যাগ কংগ্রেস অপেক্ষা বাংলা কংগ্রেসে বেশি হয়েছে, অন্তর্দ্বন্দ্বও কংগ্রেসের উত্তরাধিকারসূত্রে বাংলা কংগ্রেস পেয়েছে ষোল আনা। জলপাইগুড়ি জেলায় বিধানসভা সদস্য শ্রীযজ্ঞেশ্বর রায় আশুবাদে দীক্ষা নিয়ে দলত্যাগ করেছেন। কংগ্রেসের এক অঞ্চলের একজন নেতা সহ কিছু কর্মী দলত্যাগ করে জনসঙ্ঘে গেছে। পঃ দিনাজপুরে বাংলা কংগ্রেসের শ্রীরাধামোহন মোহান্ত সহ এক ডজন নেতা জনসঙ্ঘে নাম লিখিয়েছেন। বাংলা কংগ্রেস ও কংগ্রেস দলের এই অবস্থার মধ্যেই উত্তরবঙ্গে ছুটে এসেছিলেন শ্রীঅতুল্য ঘোষ ও শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায়। উভয়েই এলেন শিলিগুড়িতে। কিন্তু হায়! একজন সভা চলার কালে হলেন পাল চাপা পড়ার দাখিল, আর একজনের সভা চলাকালে চীৎকার উঠল আগুন-আগুন। আগুনের কাহিনী পরে বলছি।

অবক্তব্য

চন্দ্রগুপ্ত

প্রাইমারী—সেকেন্ডারী

অন্য কেউ নন, স্বয়ং ডক্টর ত্রিগুণা সেন সুস্পষ্ট মন্তব্য করেছেন, গত কুড়ি বছরে পশ্চিমবঙ্গে প্রাথমিক শিক্ষা শোচনীয় রকম অবহেলিত হয়েছে। একটি সাম্প্রতিক সংবাদে প্রকাশ, পশ্চিমবঙ্গে প্রায় বার লক্ষ শিশু প্রাথমিক শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। বিশদভাবে বলতে গেলে শিক্ষা গ্রহণের যোগ্য প্রায় ৫৩ লক্ষ শিশুর মধ্যে ৪২ লক্ষ শিশু শিক্ষার সুযোগ পাচ্ছে; পশ্চিমবঙ্গে মোট ৩৪ হাজার প্রাথমিক স্কুলের মধ্যে পাঁচ-ক্লাসের স্কুলের সংখ্যা মাত্র চার হাজার আর এই চার হাজারের অধিকাংশই গ্রামাঞ্চলে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের জনৈক মুখপাত্র স্বীকার করেন যে, রাজ্যের প্রাথমিক শিক্ষা যতটা উন্নত হওয়া উচিত ছিল ততটা হয় নি এবং এই শিক্ষার জন্য কার্যত কিছু করাও হয় নি।

শিক্ষায় সংস্কৃতিতে অন্য রাজ্যের বাসিন্দাদের তুলনায় উন্নত এহেন একটি উচ্চমন্য ভাবে বাঙালী দীর্ঘকাল আবিষ্ট। বঙ্গসংস্কৃতির ঐশ্বর্য স্বীকার করেও বলতে বাধ্য, বিংশ শতাব্দীর সপ্তম দশকে গর্ব করার মতো শক্ত সাংস্কৃতিক পাদপীঠ আজ অনেক দুর্বল হয়ে পড়েছে। শিক্ষায় সংস্কৃতিতে অন্যান্য কিছু রাজ্যের লক্ষণীয় অগ্রগতি দেখে মনে হচ্ছে, অদূর ভবিষ্যতে পশ্চিমবঙ্গ দ্বিতীয় সারির রাজ্য হয়ে পড়বে। শিক্ষা সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এই সম্ভাব্য পশ্চাদ্বর্তিতার জন্য সাধারণ মানুষ সেদিন দায়ী করবে রাজ্য শিক্ষা দপ্তরের কর্ণধার তথাকথিত শিক্ষাবিদ্ এবং রাজনীতি-নিয়ন্ত্রিত কিছু সংখ্যক ছাত্রকে। সেদিন এঁরা থাকবেন কি না জানি না, থাকলেও কিভাবে আত্মরক্ষা করবেন জানি না, কিন্তু চন্দ্রগুপ্তের মতো সাংস্কৃতিক নৈরাজ্যে বিপর্যস্ত হাজার হাজার শিক্ষাগ্রহী চরম ক্ষোভে-দুঃখে একটি স্মরণীয় রবীন্দ্র-পংক্তিকে বিকৃতার্থে হয়ত বলবেঃ 'সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে!'

*

স্বাধীনতা-উত্তর কালে শিক্ষা-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে উল্টোরথে চলার যে-দুর্মর অভ্যাস আমরা গড়ে তুলেছি তারই ফলে প্রাইমারী ও সেকেন্ডারী বা প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা অত্যন্ত অবহেলিত হয়েছে। আর এ ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গের কৃতিত্ব সর্বাধিক! আমাদের রাজ্য সরকার উচ্চ শিক্ষার উপর অযৌক্তিক গুরুত্ব আরোপ করে ইতিমধ্যে সামগ্রিক শিক্ষা-ব্যবস্থাকেই দুর্বল করে ফেলেছেন। অন্য পক্ষে কেরল প্রাথমিক শিক্ষার উপর পর্যাপ্ত গুরুত্ব আরোপ করে শিক্ষার বনিয়াদ দৃঢ় করে তুলছে। অথচ শিক্ষাবিদ মাত্রেই জানেন প্রাইমারী ও সেকেন্ডারী বা স্কুলপর্যায়ী শিক্ষাই মানুষের মনোজীবনের ভিত্তিভূমি। বাল্যে ও কৈশোরেই মানুষের মন সর্বাধিক গ্রহণক্ষম ও ধারণক্ষম হয়, এই বয়সে মানুষ যা শেখে তা তার জীবনে দীর্ঘ কিংবা চিরস্থায়ী হয়, এই বয়সের শিক্ষাই তার ভবিষ্যৎ জীবনকে বহুলাংশে নিয়ন্ত্রিত করে। অথচ এই সারাৎসারের প্রতি আমাদের শিক্ষা দপ্তরের শ্রদ্ধেয় রাজপুরুষ ও শিক্ষাবিদরা সম্পূর্ণ উদাসীন। ফলে প্রতি বছর কলেজে ও বিশ্ববিদ্যালয়ে যারা উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করতে আসছে তাদের একটি বড় অংশের উচ্চশিক্ষা গ্রহণের কোন যোগ্যতাই নেই। এর অর্থ এই নয় যে, তারা নির্বোধ বা বুদ্ধিহীন বা উচ্চশিক্ষায় মৌলত অনাগ্রহী বা অমনোযোগী। উচ্চশিক্ষা যে শেষ পর্যন্ত তাদের কাছে ভারস্বরূপ হয়ে দাঁড়ায়, তার জন্য দায়ী তাদের অভিভাবক-প্রতিম শিক্ষারথী ও রাষ্ট্রনেতৃবৃন্দ, চিন্তাহীন পরিকল্পনা ও কার্যক্রমের জন্য যাঁরা ইতিমধ্যে খ্যাতি অর্জন করেছেন। প্রাইমারী স্কুলের কথা ছেড়েই দিলাম, অধিকাংশ দশ-ক্লাস ও এগারো-ক্লাস স্কুলে যে-ভাবে পঠন-পাঠনকার্য সম্পন্ন হয় এবং যে-ভাবে আমাদের মহামান্য 'বোর্ড অফ সেকেন্ডারী এডুকেশন' স্কুল ফাইন্যাল ও হায়ার সেকেন্ডারী পরীক্ষা-গ্রহণের দায়িত্ব পালন করেন যে-কোন উন্নতিকামী দেশের পক্ষে তা লজ্জার কারণ। প্রতি বছর হাজার হাজার ছেলেমেয়ে কলেজে প্রবেশ করার পর অসহায় বোধ করতে করতে যখন এক সময় অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে, সদসৎ যে-কোন উপায়ে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার জন্য যখন মরীয়া হয়ে ওঠে, আসামীর কাঠগড়ায় তখন কাদের মুখ ভেসে ওঠে? রাষ্ট্রনেতা ও শিক্ষারথীদের এবং—।

এবং শিক্ষকদের, যে-শিক্ষকরা দিনের পর দিন ছেলেমেয়েদের প্রতারণা করে [illegible] দাঁড়িয়ে চলেছেন। পশ্চিমবঙ্গের প্রাইমারী এবং সেকেন্ডারী স্কুলের শিক্ষকদের মধ্যে আদর্শনিষ্ঠ ব্যক্তি নিশ্চয়ই আছেন, কিন্তু তাঁদের সংখ্যা কত? ক'জন শিক্ষক বুকে হাত দিয়ে বলতে পারেন, তিনি তাঁর পবিত্র দায়িত্ব যথাযথ পালন করছেন? ছাত্রবাৎসল্যের প্রমাণ দিতে পারেন ক'জন শিক্ষক? ছাত্র-অসন্তোষের তপ্ত মুহূর্তগুলিতে শিক্ষকসমাজ কি আত্মসমীক্ষার পরিবর্তে উটপাখির ধর্মেই আশ্রয় নেবেন?

গল্প নয়, একটি নিতান্ত সত্য ঘটনা বলি। কলকাতার একটি প্রখ্যাত সরকারী স্কুলে গণিতশিক্ষকের চাকরি নিয়েছেন জনৈক তরুণ। কর্মে যোগদানের পূর্বে তিনি তাঁর এক শ্রদ্ধেয় শিক্ষকের আশীর্বাদ প্রার্থনা করলে শিক্ষক মহাশয় আশীর্বাদান্তে বললেন, 'ভালো করে পড়িও, ছাত্রদের শ্রদ্ধা-ভালবাসা অর্জন করো, প্রার্থনা করি।' গুরুর উপদেশ মত তরুণ শিক্ষক যথাসাধ্য ভালোভাবে পড়াতে লাগলেন এবং বলা বাহুল্য অল্পদিনের মধ্যে ছাত্রদের অত্যন্ত প্রিয় হয়ে উঠলেন। তাঁর এই সাফল্য অন্যদিক থেকে বিপদ হয়ে দেখা দিল। শিক্ষকদের কমনরুমে তিনি হলেন সর্বাধিক অনাকাঙ্ক্ষিত ব্যক্তি, তাঁর সঙ্গে একে একে সকলেই বাক্যালাপ বন্ধ করে দিলেন, অস্ট্রাসাইজড্ হয়ে তিনি শুধু ভাবেন, বিনা দোষে তাঁর প্রতি এই গুরুদণ্ড কেন? স্কুল ছুটি হবার পর একদিন, দুয়ার হতে অদূরে, নিরুপায় হয়ে এক তরুণ সহকর্মীর হাত ধরে সকরুণভাবে জিজ্ঞাসা করলেন, আচ্ছা আমি কি অপরাধ করেছি, যার জন্য আপনারা কেউ আমার সঙ্গে কথা বলেন না। তারুণ্য কিংবা করুণা যে কারণেই হোক, সহকর্মীটি এদিক-ওদিক চেয়ে (পাছে কেউ দেখে ফেলে) আস্তে আস্তে বললেন, আপনি আমাদের ট্যুশনির বাজার খারাপ করে দিয়েছেন।

মানে? সমাজচ্যুত শিক্ষকের বিনীত প্রশ্ন।

এখনো মানে বোঝেন নি? মানে, আপনি ক্লাসে ভাল করে পড়াচ্ছেন বলে ছেলেরা ক্লাসেই সব বুঝে ফেলছে, ফলে তাদের বাড়িতে মাস্টার রেখে পড়ার আর দরকার হচ্ছে না, ফলে আমাদের ট্যুশনির রোজগার কমে এসেছে।

তাহলে আমি কি করব? তরুণ শিক্ষকের কণ্ঠে অসহায়তা।

মৃদু হেসে শুভার্থী জবাব দেন, ক্লাসে কিছু পড়াবেন না। আপনি অঙ্কের টীচার, আপনার তো খুব সুবিধা, এমনভাবে অঙ্ক কষাবেন, যাতে সহজতম অঙ্কও রিলেটিভিটির অঙ্কের মত শক্ত মনে হয়। আর তা হলে দেখবেন, আপনার প্রত্যেকটি ছাত্রই সুড়সুড় করে আমার আপনার কিংবা হেড টীচারের পায়ের উপর পড়ে বলবে, স্যার আপনার কাছে প্রাইভেটে

পড়ব, আমাকে অঙ্কে পাশ করিয়ে দিতেই হবে।

শুভার্থী বলে চলেন, শুধু অঙ্কে কেন, ফিজিক্স কেমিস্ট্রি ইংরেজী বাংলা প্রত্যেক বিষয়েই যে-শিক্ষক তাঁর বিষয়কে যত দুরূহ করে তুলতে পারেন, প্রাইভেট ট্যুশনির বাজারে ততই তাঁর নামডাক। এই দেখুন না, আমাদের হরিপদবাবু ফিজিক্সে নিচের দিক থেকে ফার্স্ট, মানে থার্ড ক্লাস লাস্ট, সেকালে মফস্বলের একটি সরকারী স্কুলে ঢুকে পড়েছিলেন, এখন এখানে প্রবীণ শিক্ষকদের একজন। তাঁর বাজার জানেন? সপ্তাহে তিনদিন বাড়িতে গিয়ে পড়ালে দেড়শো, বাড়িতে এসে পড়লে একশো পঁচিশ। ইউনিভার্সিটির অনেক বাঁড়ার প্রোফেসরের যা নেই, কলকাতায় তাঁর দুটি বাড়ি আছে, যেমন-তেমন বাড়ি নয়, যাকে বলে প্যালাসিয়াল বিল্ডিং অতএব যদি করেকম্মে খেতে চান, ক্লাসে পড়াবেন না; ক্লাসের বাইরে ছাত্রদের বাড়িতে, পড়াবার চেষ্টা করবেন।

এই বুদ্ধিমান পরামর্শ, যাকে বলে টীপস, দিয়ে শুভার্থী চলে গেলেন।

আর পরদিন থেকে সহকর্মীর পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করার ফলে আলোচ্য তরুণ গণিত-শিক্ষক আজ সাফল্যধন্য শিক্ষকদের অন্যতম। বছরখানেক আগে গুরুকে তিনি জানিয়ে গেছেন, তাঁর উপদেশের পরিবর্তে বন্ধুর পরামর্শ শুনে তিনি আজ জীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছেন, পাঁচ বছরের চাকরিজীবনে বেহালায় চার কাঠা জমি কিনেছেন এবং অনতিবিলম্বে বাড়ি তৈরির ব্যাপারটিও সেরে ফেলবেন।

*

সেকেণ্ডারী স্কুলের শিক্ষকসমাজের কোন প্রতিনিধি যদি প্রতিবাদের সুরে বলেন, এ ধরণের ঘটনা খুবই কম ঘটে আর শিক্ষকমাত্রই তাঁর পবিত্র আদর্শের জন্য জন্ম হইতেই বলিপ্রদত্ত, তাহলে আমি তা মেনে নিতে আমার বিনীত অক্ষমতা জ্ঞাপন করব। কলকাতার বিভিন্ন দশ-ক্লাস এগারো-ক্লাস স্কুলে পঠন-পাঠনের শুভকর্ম কিভাবে সম্পাদিত হয়, সে সম্পর্কে চন্দ্রগুপ্তের যথেষ্ট অভিজ্ঞতা আছে। এবং তাঁর সেই অভিজ্ঞতার প্রমাণ বিভিন্ন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী। হতভাগ্য সেই ছাত্র-ছাত্রীরাই বলবেন, স্কুলস্তরে তাঁরা কি শিখেছেন, কতখানি শিখেছেন, ক'জন শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রী ক্লাসের মধ্যে তাঁদের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করার চেষ্টা করেছেন। কলকাতার স্কুল-শিক্ষকদের তুলনায় মফস্বলের স্কুল-শিক্ষকদের আর্থিক ভাগ্য স্বাভাবিকভাবে মন্দ অর্থাৎ সেখানে প্রাইভেট ট্যুশনের বাজার সুবিধাজনক নয়। ফলে মফস্বলের স্কুলগুলিতে শিক্ষকদের মধ্যে আন্তরিকতার পরিমাণ (অগত্যা!) স্বাভাবিকভাবে কিছু বেশি। মফস্বলের স্কুলগুলির —শুধু স্কুল কেন কলেজগুলিরও—অসুবিধা অন্যত্র। উপযুক্ত শিক্ষকের ও প্রয়োজনীয় সাজসরঞ্জামের অভাব। একথা আজ আর কারও অবিদিত নেই, এই দুই অসুবিধার জন্য মফস্বলের শিক্ষার্থীরা সুযোগ পেলেই কলকাতায় চলে আসে।

প্রাইমারী ও সেকেণ্ডারী পর্যায়ে যে-সব ছাত্র-ছাত্রীর শিক্ষার ঘাটতি থাকে, উচ্চশিক্ষা গ্রহণের সময় তারা অসহায় বোধ করে, এই বোধ থেকেই আসে হতাশা নৈরাশ্য ও অন্যমনস্কতা। দৃষ্টান্তস্বরূপ বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকরা যেসব ছাত্র-ছাত্রী পান, সেই ছাত্র-ছাত্রীদের অনেকেই যে চাকুরি (ছেলেদের ক্ষেত্রে) ও বিবাহের (মেয়েদের ক্ষেত্রে) অভাবে পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট ক্লাসে ভর্তি হয়েছেন তা তাঁদের বুঝতে বিন্দুমাত্র অসুবিধা হয় না। তা ছাড়া যে-কথা আগেই বলেছি, স্কুলস্তরে পর্যাপ্ত শিক্ষার অভাবে উচ্চশিক্ষা গ্রহণের উপযোগী জ্ঞানবুদ্ধি অর্জন না করার ফলে পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট ক্লাসে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে শিক্ষকদেরও অনেক সময় বিরত বোধ করতে হয়।

অতএব রূঢ় শোনালেও চন্দ্রগুপ্ত বলতে বাধ্য, পশ্চিমবঙ্গের (অন্য রাজ্যেরও নিশ্চয়) শিক্ষার মান অবনতির জন্য দায়ীদের মধ্যে অন্যতম স্কুলের শিক্ষকসমাজ। পুনরুক্তির সুরে বলি, মানুষের শিক্ষা-জীবনের ভিত্তি রচিত হয় স্কুলে, সেই ভিত্তি দুর্বল হলে তার ভবিষ্যৎ জীবনও নানাভাবে দুর্বল হয়ে পড়ে। এই সার কথা মনে রেখে চন্দ্রগুপ্তকে ভুল না বুঝে তাঁরা যদি অবিলম্বে তাঁদের মহান দায়িত্ব পালনে মনঃসংযোগ করেন, তবে তাঁরা চন্দ্রগুপ্তের মত আরও অসংখ্য সাধারণ মানুষের কৃতজ্ঞতা অর্জন করবেন, শুধু বর্তমানে নয়, ভবিষ্যতেও। মনে রাখতে হবে শিক্ষকের জীবন দারিদ্র্যস্পর্শী আদর্শের, অর্থাশ্রিত অন্য ধর্ম তাঁর পক্ষে ভয়াবহ, স্বধর্মে তিনি যদি নিহত হন তবে দেশ ও কাল তাঁকে চিরদিনের শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করবে।

*

ভারতবর্ষের বিশেষত পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা জগতের দুরবস্থাকে আরও শোচনীয় করে তুলেছে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল। ছাত্রদের রাজনীতি করা উচিত কি অনুচিত সে প্রশ্নের উত্তর স্বতন্ত্র প্রবন্ধের উপজীব্য। কিন্তু সাধারণ বুদ্ধির মানুষ হিসাবে এটুকু বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, শিক্ষার্থীর প্রথম কর্তব্য সর্বতোভাবে শিক্ষাগ্রহণ। রাজনীতিজীবী অসাধারণ মানুষেরাও হয়তো এই সহজ সত্য উপলব্ধি করেন, কিন্তু আত্মস্বার্থ ও দলস্বার্থ তাঁদের কাছে একমাত্র বিবেচ্য হওয়ায় তারা ছাত্রদের নিষ্প্রাণ হাতিয়ার রূপে ব্যবহার করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করেন না। ভারতবর্ষে এমন অনেক রাজনীতিজীবী আছেন যিনি আমার আপনার ছেলেকে নিজের ও দলের স্বার্থে ব্যবহার করছেন, অথচ নিজের পুত্রেরতনকে রাজনীতির উত্তাপ থেকে শত হস্ত দূরে সরিয়ে রেখে এ দেশে সর্বোচ্চ শিক্ষা দানের শেষে অক্সফোর্ড-কেম্ব্রিজে পাঠান। নিজের ছেলের সবরকম ভালোর ব্যবস্থা হলে পরের ছেলের ভালোর জন্য উদ্‌গ্রীব হতে অসুবিধা নেই, আত্মস্বার্থে উদ্‌গ্রীব হওয়ার ভান করাই বরং স্বাভাবিক। গত দু-তিন বছর ধরে পশ্চিমবঙ্গে ছাত্র রাজনীতির নামে যে-উচ্ছৃংখলতা চলেছে, আজ পর্যন্ত কোন রাজনৈতিক নেতা তার নিন্দা তো করেনই নি, বরং ঐ নেতাদের অনেকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে উচ্ছৃংখলতাকে উৎসাহ দিয়ে এসেছেন।

*

একটি জাতিকে যা বড়ো করে তোলে তার নাম শিক্ষা। পরিবার থেকে স্কুল, স্কুল থেকে কলেজ, কলেজ থেকে বিশ্ববিদ্যালয় বিভিন্ন স্তরের মধ্য দিয়ে এই শিক্ষা নিকীর্ণ হয়। আমাদের পরিবারগুলি, বিশেষত মধ্যবিত্ত পরিবারগুলি, নানা কারণে নানাভাবে ভাঙনের মুখে। ফলে গোড়াতেই একটি শিশুর শিক্ষা ব্যাহত হচ্ছে। তারপরে স্কুলে প্রবেশ করে শিশু ও কিশোর-কিশোরীরা মানসিক স্বাস্থ্যের উপযোগী উপাদান ও আবহাওয়া থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। এ আঘাত স্বভাবতই প্রচণ্ড রকমের। পরের স্তরে, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়েও অবস্থা সুবিধা নয়, তা ছাড়া কলেজের বিশেষত বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসমাজ অপেক্ষাকৃত পরিণত বলে তাদের নতুন করে গড়ে তোলা সম্ভব নয়।

আসল কথা, শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে জাতীয়তার ক্ষেত্রে এক ভয়াবহ দুষ্টচক্র সৃষ্টি হয়েছে। এই চক্র না ভাঙতে পারলে আমাদের ভবিষ্যৎ অন্ধকারাবৃত।

শিক্ষার সূত্রে ফিরে এসে বলতে হয়, জাতি গঠনের ক্ষেত্রে যে-প্রয়োজন প্রাইমারী, সেই শিক্ষাকে আমাদের নেতারা সেকেণ্ডারী করে রেখেছেন। শিক্ষার নামে যে অর্থ ব্যয় হচ্ছে আপাতদৃষ্টিতে তা রমণীয় হলেও পরিণামে অর্থহীন। শিক্ষারথী নামধের মহাজনদের চিন্তার দৈন্য, সাধারণভাবে স্কুলের ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের দায়িত্বজ্ঞানের অভাব এবং রাজনৈতিক নেতাদের চক্রান্ত এই গ্রহস্পর্শে ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যের (বিশেষত পশ্চিমবঙ্গের) শিক্ষাজগৎ যে-সঙ্কটের মুখে এসে দাঁড়িয়েছে, আপাত সংখ্যাল্প শুভবুদ্ধিসম্পন্ন ছাত্র ও শিক্ষকরাই তা মোচন করতে পারেন।

(৩০।৩।৬৮)

ভারত দর্শন

দশ দফা কার্যসূচী রূপায়ণে গড়িমসি

বিরোধী পক্ষ নয়, কংগ্রেস সংসদীয় দলের সভায় গৃহীত দশ দফা কর্মসূচী রূপায়িত করার ব্যাপারে সরকারী গড়িমসির তীব্র সমালোচনা করেছেন কংগ্রেস দলেরই তরুণ সদস্যগণ। এই নিয়ে আসামের দেবব্রত বড়ুয়া বিহারের পি কে ঘোষ এবং উপ-প্রধান তথা অর্থমন্ত্রী মোরারজী দেশাইয়ের মধ্যে তীব্র বাদানুবাদও হয়ে গেছে।

পি কে ঘোষ বলেন, বছর চলে গেল কিন্তু গৃহীত প্রস্তাবের অন্যতম ধারা ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রায়ত্তের ব্যাপারে সরকার কোন ব্যবস্থাই গ্রহণ করলেন না।

বিহারের সীতারাম কোপরীও অনুরূপ অভিযোগ করে বলেছেন, দেশের অগ্রগতির পক্ষে অনিবার্য দশ দফা কর্মসূচী রূপায়িত হচ্ছে না, অথচ হওয়া আশু প্রয়োজন। প্রভুদয়াল হিম্মতসিংকা অভিযোগ করেছেন যে, ব্যাঙ্কগুলি শিল্প-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ঋণ দান করে, করে না কৃষিজীবীদের অভাব পূরণের জন্য।

বিগত জুন মাসে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনে যখন ফলাও করে দশ দফা কর্মসূচী গৃহীত হয় তখনই বিভিন্ন নেতা এবং সংবাদপত্র জগৎ প্রশ্ন তুলেছিলেন, কর্মসূচীর খসড়া তো হল কিন্তু বিড়ালের গলার সত্যিই কি ঘণ্টা বাঁধা হবে! এই আশঙ্কার কারণ একদিনে ঘটে নি। দল হিসেবে কংগ্রেস এবং ক্ষমতার অধীশ্বর হিসেবে কংগ্রেসী সরকার কখনই সমভাবে পা ফেলে ভারতবর্ষের সমস্যা সমাধানের পথে এগিয়ে যান নি। ফলত সমস্যার জটা দীর্ঘায়িতই হয়েছে। সুরাহা হয় নি কোনটারই।

আসলে প্রচলিত ব্যবস্থা দাঁড়িয়েছে এই যে, জনসমর্থন আকর্ষণ করার জন্য দল হিসেবে কংগ্রেস একতরফা প্রতিশ্রুতি আর প্রকল্পের ফাঁদ পেতে ভোট আদায় করবেন এবং ক্ষমতায় এসে ক্ষমতাসীন নেতৃবৃন্দ দলেরই ইস্তাহার এবং প্রতিশ্রুতিগুলিকে হিমঘরে পাঠিয়ে সমাজের মুষ্টিমেয় এক ধনবান শ্রেণীকে তোষণ করে যাবেন। এই দ্বৈধ নীতির লাগি ঠেলে কুড়ি বছর কংগ্রেস তিলে তিলে নিজেকে দলীয় প্রগতিশীল কর্মিবৃন্দ এবং জনসাধারণের দৃষ্টিতে খাটো করে আসছে। নীতিভ্রষ্টতা, প্রতিশ্রুতির খেলাপ এবং জনস্বার্থ-বিরোধী কার্য দলকে জনপ্রিয়তার শিখরচূড় হতে বহুদূরে নিক্ষেপ করেছে।

কংগ্রেস সদস্যের ক্ষোভ

শ্রীযুক্ত পি কে ঘোষ অত্যন্ত বেদনা এবং সাহসের সঙ্গে সেই খেদ প্রকাশ করেছেন এবং দুঃখের সঙ্গে জানিয়েছেন, আজকের কংগ্রেসী নেতারা দেশকে যেমন দলকেও তেমনি কয়েকজন নেতার 'জমিদারীতে' পরিণত করেছেন।

পি কে ঘোষ বলেন, "গৃহভৃত্য অপেক্ষা খারাপ ব্যবহার" সদস্যদের সঙ্গে নেতারা করে থাকেন। প্রসঙ্গত তিনি জানান, তাঁর সমালোচনার উত্তরে শক্ত মানুষ মোরারজী দেশাই তাঁকে নাকি বলেন সন্তুষ্ট না হলে শ্রীঘোষ দল থেকে বেরিয়ে যেতে পারেন।

সংবাদে আরও প্রকাশ, শ্রীঘোষ তীব্র ভাষায় ঐ ঘটনার প্রতিবাদ করে বলেছেন, "দল যদি মোরারজী ভাই-এর জমিদারী হোত, আমি পদত্যাগ করতাম। কিন্তু তা যখন নয় এবং আদর্শের জন্যই কংগ্রেসে আছি বলে পদত্যাগ আমি করি নি।"

শ্রীঘোষের দুঃখ কেবলমাত্র শ্রীঘোষের একক বেদনা ভাবলে ভুল হবে। তাঁর অভিযোগের মধ্যে নেতৃদাপট-দমিত কংগ্রেস কর্মীদের একাংশের বেদনাই মূর্ত হয়ে উঠেছে।

কংগ্রেসী নেতৃবর্গ দলকে আজ গঠন করছেন না বরং ভাঙতেই সাহায্য করে যাচ্ছেন। ক্ষমতাদম্ভ দলপ্রীতিকেও নস্যাৎ করে এমন নজির একাধিক কংগ্রেসী নেতার কার্যকলাপে প্রকট হয়ে উঠেছে কেন্দ্রে এবং বিভিন্ন রাজ্যে। কংগ্রেস ইতিমধ্যে ভেঙেছে উল্লেখযোগ্যভাবে। কিন্তু এই ভাঙন বর্তমান নেতৃত্বকে কিছুমাত্র সচেতন করছে বলে বিভিন্ন ঘটনাদৃষ্টে মনে হয় না। বর্তমান কংগ্রেসী নেতৃত্বই দলের ভবিষ্যৎকে স্বখাত সলিলে নিমজ্জিত করার জন্য যেন বদ্ধপরিকর। শ্রীঘোষ-শ্রীদেশাই-এর আলাপ সম্পূর্ণ ঘরোয়া এবং ব্যক্তিগতও হতে পারে। কিন্তু দিল্লীর কংগ্রেসী আলোচনা সভায় বাদানুবাদের মধ্যে শ্রীঘোষের অকপটে দুঃখ প্রকাশকে বিচ্ছিন্ন ঘটনারূপে গণ্য করলে পরিস্থিতির প্রতি সম্যক সুবিচার করা হয় না। শ্রীঘোষের বেদনা আজকের অধিকাংশ কংগ্রেসীরই মূক বেদনার সোচ্চার ঘোষণা। দল হিসেবে কংগ্রেস এই বেদনাকে সম্যক উপলব্ধি না করলে দলে আরও যে ভাঙন ধরবে, শেষে হয়ত তা রোধ করাই কঠিন হয়ে দাঁড়াতে পারে। কিন্তু সেজন্য বর্তমান নেতৃত্ব কি কিঞ্চিন্মাত্র চিন্তিত?

সরকারী দেনা শোধের মোক্ষম-ফরমুলা এবং কম্যুনিস্ট পার্টি

কংগ্রেস কর্মীরা আজ টন টন টাকার মালিক হয়েছেন। তাঁরা ও তাঁদের আত্মীয়-পরিজনেরা যদি সম্পত্তির হিসাব দাখিল করেন তা হলেই সরকারী দেনা পরিশোধ করা যেতে পারে (সেই অনুপার্জিত আয়ে?)। ঐ টাকায় তিন-তিনটে বোকারো কারখানাও গড়ে তোলা যায়।

উক্তিটি স্বতন্ত্র সদস্য শ্রীপিলু মোদীর। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রণালয়ের ব্যয়-বরাদ্দ প্রসঙ্গে বিতর্ককালে শ্রীমোদী আরও বলেছেন যে, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রণালয় আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষায় ব্যর্থ এবং দুর্নীতি ও অযোগ্যতা সম্প্রসারণেই কৃতী সেই মন্ত্রণালয়ের জন্য এক পয়সাও বরাদ্দ করা উচিত নয়।

ইতিপূর্বে সমালোচনা বহুভাবেই হয়েছে কিন্তু শ্রীমোদীর সমালোচনার মধ্যে যে তীব্র ব্যঙ্গোক্তি প্রকাশিত হয়েছে তা স্বতন্ত্রী সমাজের মনে দানা বেঁধে ওঠা অসন্তোষেরই সিধে প্রকাশ। স্বতন্ত্র দল আইন ও শৃঙ্খলার নামে বেশ কিছুকাল যাবৎ বিশেষ রাজনৈতিক দলের নিষিদ্ধকরণের পক্ষে ওকালতি করে আসছেন, যে বিষয় যে-কোন গূঢ় কারণেই হোক, স্বরাষ্ট্রদপ্তর এ পর্যন্ত গুছিয়ে কোনো এ্যাকসান বা কর্মপন্থাই গ্রহণ করে উঠতে পারেন নি। এজন্য স্বতন্ত্রী বিরাগ চরমে উঠেছে। শ্রীমোদীর বক্তব্যে সেই অসন্তুষ্টিরই প্রকাশ ঘটেছে।

অথচ শ্রীমোদী এবং তাঁর দলের অধৈর্য হওয়ার সত্যই কি সময় হয়েছে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তাঁর সাধ্যমতই চেষ্টা করে যাচ্ছেন কম্যুনিস্ট-বিরোধী মনোভাবের পক্ষে উপযুক্ত পরিস্থিতি সৃষ্টির জন্য। রাজ্যসভায় এজন্য শ্রীভূপেশ গুপ্তকে বলতে হয়েছে, কম্যুনিস্ট পার্টিকে নিষিদ্ধ করার জন্য কংগ্রেসী মহল সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করছেন।

বস্তুত স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আইন ও শৃঙ্খলা নিয়ে কী ভীষণ ভাবিত আছেন আসামের আত্মগোপনকারী নাগা উৎপাত ও গৌহাটি হাঙ্গামার সঙ্গে কম্যুনিস্ট হাতের যোগসাজস সম্পর্কে শ্রীচ্যবনের উদ্বেগেই কি তার যথেষ্ট প্রমাণ মেলে নি। সেই আলোচনাতেও স্বতন্ত্রী সদস্য লোকনাথ মিশ্র যখন কম্যুনিস্ট পার্টিকে নিষিদ্ধ করার দাবি করেন, তখনও তো শ্রীচ্যবন স্পষ্ট না হলেও একেবারে নৈরাশ্যজনক উত্তর দেন নি। অপরাধের মধ্যে তিনি শুধু বলে-

ছেন, কোনো রাজনৈতিক দলকে নিষিদ্ধ ঘোষণার আগে সতর্ক হিসাব-নিকাশের প্রয়োজন আছে।

কিন্তু স্বতন্ত্রীরা অধৈর্য হয়েছেন। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে তাঁর পদাধিকার অনুযায়ী একটি ধীর-স্থির উপসংহারে পৌঁছনোর সুযোগ দিতেও তাঁরা সম্ভবত নারাজ।

শ্রীমোদীর তীব্র কটাক্ষ এবং উষ্মার মধ্যে কি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর এই ধীর নীতির জন্য বিদ্বেষও সঞ্জাত নেই?

আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষায় স্বরাষ্ট্র দপ্তর যে ব্যর্থ হয়েছেন, ভারতবর্ষব্যাপী অরাজক অবস্থা অবশ্য স্বতই তার প্রমাণ হাজির করছে। কিন্তু শ্রীমোদীর চিন্তা সে কারণেই আলোড়িত হয়েছে বলে মনে করতে পারা যায় না, যখন দেখা যায় তিনি বিক্ষুব্ধ হয়ে বলছেন, কুড়িটি বিড়লা এবং দশটি টাটা যে ক্ষমতা ভোগ না করেন স্বরাষ্ট্র-মন্ত্রী সেই ক্ষমতা ভোগ করছেন। শ্রীমোদীর এজন্য ক্ষোভের অন্ত নেই। কিন্তু গণতান্ত্রিক সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সাধারণ ব্যবসায়ী সমাজের চেয়ে কম ক্ষমতাধারী হন, শ্রীমোদী এটা কোন দেশী আইন-শৃঙ্খলার জন্য ওকালতি করছেন! আসলে স্বতন্ত্রী ধারণায় আইন-শৃঙ্খলা অর্থে মালিকগোষ্ঠীর অঙ্গুলি চালিত আইন-শৃঙ্খলাকেই বোঝায়। মালিক-বিরোধী কম্যুনিস্টদের ওপর এই মুহূর্তে স্বরাষ্ট্র-মন্ত্রী কেন খড়্গহস্ত হচ্ছেন না এই যদি ক্ষোভের কারণ হয়ে থাকে, তবে শ্রীমোদীর রাজনৈতিক প্রশ্নে দু-চার কথা আর না বলাই ভাল। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী যথার্থই বলেছেন, কোন রাজনৈতিক দলকে নিষিদ্ধ করতে হলে বহু বিবেচনার প্রয়োজন।

স্বরাষ্ট্রদপ্তর স্বতন্ত্রী অভিপ্রায় অনুসারে শৃঙ্খলা রক্ষা করতে গেলে বরং হিতে বিপরীত হওয়ারই সম্ভাবনা। মনে রাখা দরকার রাজনীতি আর মালিক মেজাজ দুটো এক জিনিস নয়।

ভারতের বন্ধু এবং সি আই এ

গত পঁচিশে মার্চ রাজ্যসভার প্রশ্নোত্তর কালে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী চ্যবন ভারতে সি আই এ-র কার্যকলাপ সম্পর্কে তদন্তের দাবি উপেক্ষা করার কালে এমন দু-একটি মন্তব্য করেছেন যদ্দ্বারা মনে হতে পারে, ভারতের বন্ধুস্থানীয় রাষ্ট্রের সঙ্গে তিনি সি আই এ-কে অনবধানতাবশত একসঙ্গে মিশিয়ে ফেলেছেন।

সি আই এ'র কার্যকলাপের একটি বিশেষ তদন্তের দাবিকে নস্যাৎ করে চ্যবন বলেছেন, তদন্ত ঢের হয়েছে, আর দরকার নেই।

একদা সি আই এ-র জনৈক অফিসার মিঃ স্মিথের যে রিপোর্ট সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়েছে, এবং যে রিপোর্টে স্মিথ ভারতে সি আই এর কার্যকলাপের অনেক গুপ্ত তথ্য প্রমাণ্যভাবে উপস্থাপিত করেছেন, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর দৃষ্টি তৎপ্রতি আকর্ষণ করা হলে তিনি জবাবে বলেন, সরকারের করণীয় সরকার ইতিমধ্যেই করেছেন, তার বেশি কিছু করণীয় আছে বলে তিনি মনে করেন না।

সি আই এ সাহায্যপ্রাপ্ত এশিয়া ফাউণ্ডেশনের কাজ অবশ্য বন্ধ করা হয়েছে এবং বিগত নির্বাচনকালে রাজনৈতিক দল ও ব্যক্তিরা বিদেশী অর্থ পেয়েছেন বলে তর্ক উঠলে চ্যবন জানিয়ে দিয়েছেন যে, গোয়েন্দা রিপোর্ট সরকারের বিবেচনাধীন আছে। ঐ রিপোর্ট নিয়ে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সঙ্গে স্বয়ং চ্যবনই আলোচনা করবেন তবে রিপোর্টটি সংসদে পেশ করা হবে না।

সি আই এ আলোচনা প্রসঙ্গে স্বরাষ্ট্র-মন্ত্রী শ্রীচ্যবন জানান (যেন আর কেউ সে কথা জানেন না) যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং সোভিয়েট য়ুনিয়ন ভারতের বিশেষ মিত্র রাষ্ট্রদ্বয়, সুতরাং সদস্যগণের আচরণে বা

শ্রীচ্যবন

কথাবার্তায় যেন এমন কিছু প্রকাশ না পায় যা ঐ বন্ধুত্বে ফাটল সৃষ্টি করবে।

শ্রীচ্যবন কোন্ বিশেষ প্রসঙ্গের পরিপ্রেক্ষিতে উল্লিখিত উপদেশ বর্ষণ করেছেন তা জানা নেই, সংবাদে বিস্তারিত উল্লেখও নজরে আসে নি। কিন্তু সি আই এ-র কার্য আলোচনাকালে মিত্ররাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্কহানির দুর্ভাবনা কেন যে স্বরাষ্ট্র-মন্ত্রীর মনকে অধিকার করেছিল সে খবর জানার জন্য মন কৌতূহলী হয়ে আছে।

সি আই এ একটি মার্কিনী গোয়েন্দা সংস্থা, মূলত যারা গুপ্তচরবৃত্তির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। এরা বিভিন্ন রাষ্ট্রে ঘরশত্রু বিভীষণ তৈরি করছে; অর্থ ছড়িয়ে রাষ্ট্রীয় সামাজিক এমন কি শিল্প সাহিত্যের পবিত্র অঙ্গনকেও কলুষিত এবং দুর্দ্ধ নীতিহীন উচ্ছৃঙ্খলতার স্রোতে ভাসিয়ে দিতে চাইছে। মিঃ জন স্মিথের বিবরণে সি আই এ-র এদেশীয় কার্যকলাপের (ভারতের মাটিতে) কিছু নজির তুলে ধরার চেষ্টা হয়েছে। স্মিথ নিজে যেটুকু সংগ্রহ করতে পেরেছেন, তাকেই বিশ্বাসযোগ্য করার জন্য বিবরণীতে তিনি বহু জীবিত ভি আই পি-র নাম পর্যন্ত উল্লেখ রেখেছেন। স্বভাবতই স্মিথের বিবরণী উষ্মা ও অসন্তোষের জন্ম দিয়েছে। বিবরণীকে ঘিরে উঠেছে হাজারো প্রশ্ন।

শ্রীচ্যবন সে সমস্ত প্রশ্নের ওপর একটি জালাবরণ চাপান দিতে চেয়েছেন কিন্তু যে সি আই এ-র কার্যকলাপ বিভিন্ন রাষ্ট্রের রাজনৈতিক কাঠামো পরিবর্তনে এবং জাতির মেরুদণ্ড ভাঙার কাজে আত্মনিযুক্ত সেই প্রসঙ্গ আলোচনায় বন্ধু-রাষ্ট্রের সঙ্গে মনোমালিন্যের সম্ভাবনা কিভাবে দেখা দিতে পারে তা বোঝা গেল না। অথচ চ্যবনের সতর্ক-বাণী বলছে, পরম বন্ধু রাষ্ট্রদ্বয় চটে যান এমন কিছু যেন না করা হয়।

বলাই বাহুল্য, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বহুতরভাবে আমাদের সাহায্যে এগিয়ে এসেছেন। আবার অনেক রাষ্ট্র আছেন যাঁরা অঢেলভাবে না হলেও নিঃসর্ত সাহায্য দান করেছেন সাধ্য মত। সোভিয়েট দুনিয়া ভারতের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী, মিত্ররাষ্ট্র-গুলি, যাঁরাই উন্নয়নশীল ভারত গঠনে অকৃত্রিম বন্ধুত্ব এবং সাহায্যকারীর মনোভাব নিয়ে এগিয়ে এসেছেন ও আসছেন, সন্দেহ নেই তাঁদের প্রতি ভারতবাসীর কৃতজ্ঞতা কখনই অনুচ্চারিত নেই এবং থাকবেও না। কিন্তু যে অনিষ্টকারী সি আই এ চক্র শুধু ভারতবর্ষ বলে নয়, পৃথিবীব্যাপী দুষ্ক্রিয়ার ফাঁদ পেতেছে তার আলোচনা ঝাল এবং লবণাক্ত হওয়াই স্বাভাবিক। যেহেতু সি আই এ সংস্থাটি মার্কিনী, তাই প্রসঙ্গত মার্কিনী নীতির আলোচনাও স্বাভাবিকভাবেই এসে পড়তে পারে। কিন্তু সে আলোচনা বন্ধুত্বে ফাটল সৃষ্টির কারণ হবে বলে মনে করা অনুচিত। যদি সি আই এ কার্যকলাপের জন্য বন্ধুত্বে ফাটল না ধরে তবে অনিষ্টকারী সি আই এ চক্রের অপকীর্তি বিষয়ক আলোচনায় তা হবে কেন।

কার্যের দায়িত্ব ফলশ্রুতির সমালোচনা অপেক্ষা ঢের বেশি বলেই কি গণ্য হওয়া উচিত নয়?

বন্ধু-রাষ্ট্রের প্রতি সর্বদাই শ্রদ্ধার সঙ্গে কথা বলা উচিত। তবে বিশেষ রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিশেষ ক্যাম্পের উদ্দেশ্যে তীব্র আলোচনা বোধহয় সমগ্র জাতিকে দায়বদ্ধ করে না। তাই এ বিষয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করার সত্যিই কি কোন কারণ আছে!

(৩০।৩।৬৮)

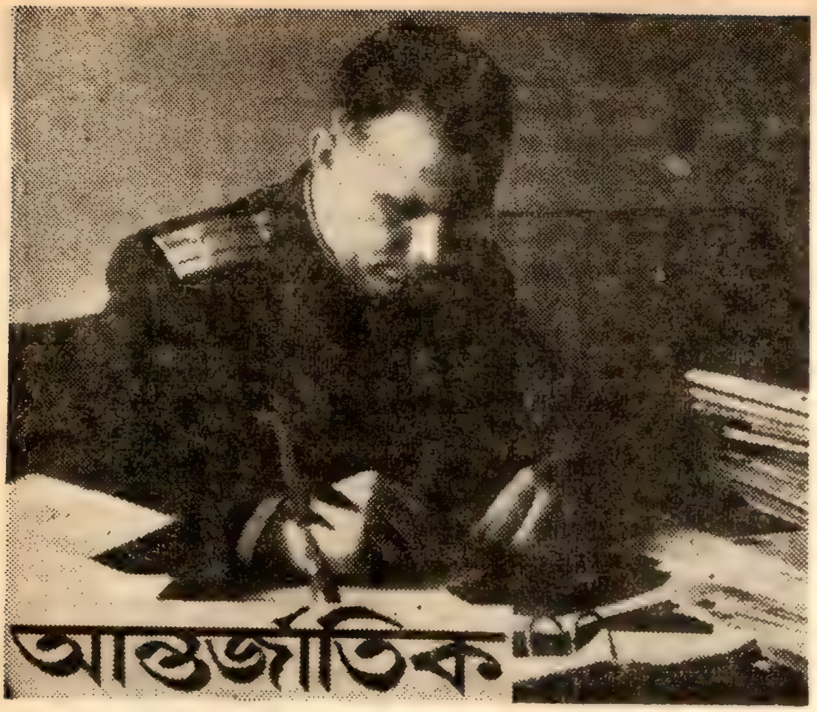

আন্তর্জাতিক

য়ুরি গ্যাগারিন

সোভিয়েট য়ুনিয়ন ঃ

ফুল আর ফুল। চারদিকে কেবল সাদা ফুলের মেলা। আর অগুন্তি লোক। শিশু, বৃদ্ধ, যুবা। নারী, পুরুষ। সকলেরই হাতে সাদা ফুল। কারও হাতে বিরাট বোকে, তোড়া মালা কারো হাতে। ছোটদের হাতে গোছা গোছা ফুল। মনে তাদের যেন দুঃসহ ব্যথা অন্তরে শোকের আগুন। আর তাদের চোখ? অশ্রুভরা নয়ন দিকে দিকে জাগে। সকলে নিথর, নিস্পন্দ সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে। কারো মুখে কোনো কথা নেই, যেন কেউ কাউকে চেনে না। কিন্তু ভেতরে প্রত্যেকের বুকেই ফেটে যাচ্ছে—একই আঘাত সকলকে সমানভাবে স্পর্শ করেছে। বিশ্বের প্রথম মহাকাশচারী য়ুরি গ্যাগারিনকে শেষ শ্রদ্ধা জানাবার জন্যে ব্যথিত হৃদয় নিয়ে সোভিয়েট নরনারী মধ্য মস্কোর সামরিক হেড কোয়ার্টার্সের সামনে জড়ো হয়েছে। এখানে সেই বীরের ভস্মরাশি রাখা হয়েছে যে-বীর মানুষের কল্পলোককে বাস্তবায়িত করেছেন, যিনি মানুষের মর্যাদা শতগুণ বাড়িয়ে দিয়েছেন প্রথম মহাকাশ জয় করে।

সেই য়ুরি গ্যাগারিনের শেষ স্মৃতি ঘিরে শত-সহস্র লোকের মেলা। বৃহস্পতি-বার একটা পরীক্ষামূলক জেট বিমান চালনা করতে গিয়ে বিমানটি হঠাৎ ভেঙে গিয়ে গ্যাগারিন এক গুরুতর দুর্ঘটনার কবলে পড়েন যার ফলে তাঁর মৃত্যু ঘটে। সঙ্গে ছিলেন আরো একজন বৈমানিক, কর্নেল ভ্লাডিমির সেরিওগিন। নিহত হন তিনিও।

মাত্র ৩৪ বছর বয়সে নিষ্ঠুর মৃত্যু য়ুরি গ্যাগারিনকে ছিনিয়ে নিয়েছে। অশ্রুসজল চোখে সোভিয়েট জনগণের সঙ্গে বিশ্ববাসী যখন গ্যাগারিনকে বিদায় দিচ্ছিল তখন সকলেরই সেই ৭ বছর আগেকার উজ্জ্বল স্মৃতিটাই মানসপটে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল। ১৯৬১ সালের ১২ই এপ্রিল ১০৮ মিনিটকাল মহাকাশে বিচরণ করে যেদিন সারা পৃথিবী প্রদক্ষিণ করলেন সেদিন তাঁর এই অনন্যসাধারণ কৃতিত্বে সমগ্র দুনিয়া বিস্ময়বিমুগ্ধ হয়ে পড়েছিল। সে-কৃতিত্বের স্বীকৃতি য়ুরি গ্যাগারিন সোভিয়েট য়ুনিয়ন ছাড়াও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন, ভারতবর্ষ সহ পৃথিবীর বহু দেশ থেকেই তিনি বীরের সম্মান লাভ করেছেন। '৬১ সালের ৪ঠা ডিসেম্বর গ্যাগারিন কল-কাতায় এলে লাখ লাখ লোক তাঁকে সম্বর্ধনার জন্যে ভেঙে পড়েছিল।

মানবসভ্যতাকে যিনি একসঙ্গে বহু ধাপ এগিয়ে দিয়েছেন, মহাকাশ বিজয়ের পথ প্রশস্ত করে দিয়েছেন, চন্দ্রলোকে মনুষ্য অবতরণের সম্ভাবনা সুনিশ্চিত করেছেন তাঁরই ভস্মাধারে শেষবারের মত নিবেদন করার জন্যে জনে জনে প্রত্যেকের হাতে ফুল। ওপরে প্রশান্ত নীল আকাশ, সূর্যের উজ্জ্বল আলো, নিচে সিক্ত নয়নে বিপুল জনতা। সোভিয়েট নেতা ব্রেজনেভও তাঁর অশ্রু সম্বরণ করতে পারেন নি, বীরের বিয়োগ ব্যথায় তিনিও মুষড়ে পড়েছেন। কান্নায় ভেঙে পড়েছে স্ত্রী ভ্যালেন্টিনা, ৯ ও ৭ বছরের দুই মেয়ে লেনা আর গালিয়া। বীরপ্রসবিনী আম্মা পুত্রশোকে বার বার মূর্ছা গিয়েছেন। এঁদের সান্ত্বনা দেবে কে, সান্ত্বনার ভাষাই বা কী আছে? য়ুরি গ্যাগারিন বিশ্বের তরুণসমাজের সামনে একটা নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছেন, নতুন করে বাঁচার সংকল্পে তাঁদের উদ্বুদ্ধ করেছেন—এ সান্ত্বনা ছাড়া? আম্মার সান্ত্বনা এখানে যে মহাকাশ জয়ের ইতি-হাসে তাঁর বীর পুত্রের নাম চিরদিন সোনার আখরে লেখা থাকবে, মানুষ কখনো য়ুরি গ্যাগারিনকে ভুলবে না।

পশ্চিম এশিয়া ঃ

পশ্চিম এশিয়ার আকাশে আবার কৃষ্ণ মেঘের সঞ্চার হয়েছে। গত ২১শে মার্চ জর্ডান নদীর পশ্চিম তীরে ইসরায়েলীরা নতুন করে যে-আক্রমণ সুরু করেছিল, নিরাপত্তা পরিষদে প্রস্তাব সত্ত্বেও তার অবসান হয় নি, বরং জর্ডান নদীর দু-পার থেকে ইসরায়েলী ও জর্ডানী সৈন্যরা গুলি বিনিময় করেছে এ-বৃহস্পতিবার এবং শুক্রবার ইসরায়েল বেশ বিরাটভাবে জর্ডানের ওপর হামলা চালিয়েছে। জর্ডান-ইসরায়েলের ৬০ মাইল দীর্ঘ সীমান্তে প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়েছে দু'পক্ষে, যেখানে শুধু গোলা-গুলীই নয়, মেসিনগান, কামান ইত্যাদিও ব্যবহৃত হয়েছে। ইসরায়েলের রকম-সকম দেখে মনে হয়েছে যে গত ৫ই জুন ঘটনার পুনরাবৃত্তি করতে চায়। কারণ মেসিনগান কামান ট্যাঙ্ক ছাড়াও সে শুক্রবার জর্ডানের বিরুদ্ধে বিমান ব্যবহার করেছে।

ইসরায়েলী আক্রমণের সময় নির্বা-চনের পেছনে একটা সুস্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে। গত ১৫ই ফেব্রুয়ারী যখন সে জর্ডানের উপর প্রথম হামলা চালায় তখন মার্কিন সরকার জর্ডানের সঙ্গে অস্ত্র ক্রয় সম্পর্কে একটা আলোচনায় রাজী হয়। আবার শুক্রবারের আক্রমণও ওই অস্ত্র ক্রয় চুক্তি স্বাক্ষরিত হবার ১৪ ঘণ্টার মধ্যেই সংঘটিত হয়েছে। স্পষ্টত ইসরায়েল তার ৫ই জুন যুদ্ধের ফলে যে আরবভূমি অধিকার করেছিল তা ছাড়তে চায় না। ইসরায়েল অবশ্য অভিযোগ করেছে যে ২১শে মার্চের আক্রমণটা জর্ডানই প্রথম সুরু করে, ইসরায়েলী সেনারা আত্ম-রক্ষার চেষ্টা করেছে মাত্র এবং আত্মরক্ষার খাতিরেই নাকি তাদের বিমান পর্যন্ত ব্যবহার করতে হয়েছে।

এ-যুদ্ধে জর্ডান দাবি করেছে যে তারই সুনিশ্চিত জয় হয়েছে, কারণ বেশ কিছু শতাধিক আক্রমণকারী ইসরায়েলী সৈন্য নিহত হয়েছে এবং অস্ত্রশস্ত্র ধ্বংস হয়েছে অথচ জর্ডানের ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ নাকি নগণ্য। কিন্তু আম্মানের কোন কোন শহরে নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা হিসাবে নিষ্প্রদীপ করা হয়েছে এবং কিছু

কিছু অসামরিক অধিবাসীর অপসারণও সুরু হয়েছে। ইসরায়েল আবার পুরোদস্তুর যুদ্ধে নামবে আশংকা করে আরব রাষ্ট্রনেতারা প্রতিরক্ষাবাহিনীকে প্রস্তুত থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। জর্ডান ছাড়াও ইরাক এবং সিরিয়া সরকার ইসরায়েলী পুনরাক্রমণের মোকাবিলা করার জন্য নিজেদের তৈরি করছেন।

এদিকে পশ্চিম এশিয়ায় উদ্ভূত নতুন পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে নিরাপত্তা পরিষদ আবার জরুরী আলোচনায় বসেছে। আলোচনায় অংশ গ্রহণ করে মার্কিন প্রতিনিধি গোল্ডবার্গ প্রস্তাব করেছেন ইসরায়েল-জর্ডান যুদ্ধবিরতি রেখা বরাবর যেন রাষ্ট্রসংঘের পর্যবেক্ষক পাঠানো হয়। কারামেহ শহর ছাড়াও জর্ডানের ইরা এবং ইয়ারক গ্রামটি ইসরায়েলী গোলাবর্ষণের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে নিরাপত্তা পরিষদে জর্ডানের প্রতিনিধি অভিযোগ করেছেন।

বিস্ময়ের বিষয় হচ্ছে, গত সপ্তাহে নিরাপত্তা পরিষদে এক সর্বসম্মত প্রস্তাবে ইসরায়েলী আক্রমণের নিন্দা করা হলেও ইসরায়েল সে-নিন্দা গ্রাহ্য না করেই নতুন করে আক্রমণ সুরু করেছে। ইসরায়েল অবশ্য স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছিল যে, সে-নিন্দা সে কানে তুলবে না, সে তার খুশিমত চলবে। তা যদি চলে তবে ওই প্রস্তাবে যে অমান্যকারীর বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা নেবার কথা বলা হয়েছে রাষ্ট্রসংঘ তা নিচ্ছে না কেন? এমনিতেই তো রাষ্ট্রসংঘের মর্যাদা ইসরায়েল ধুলোয় লুটিয়ে দিয়েছে। সেক্রেটারী জেনারেলের বিশেষ দূত গুন্নার জারিং-এর উপস্থিতি সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করেই তাঁর নাকের ওপর ইসরায়েল নতুন করে হাঙ্গামা সুরু করেছে। জারিং-এর কাজ কি তবে শুধু দুপক্ষে বন্দী-বিনিময় করা? প্রকৃতপক্ষে স্বীয় ভূমিকা পালনে জারিং-এর শোচনীয় ব্যর্থতাই পশ্চিম এশিয়া প্রসঙ্গটি আবার নিরাপত্তা পরিষদে স্থানান্তর করেছে।

জুন যুদ্ধের ফলে যে আরবভূমির উপর ইসরায়েল অন্যায় দখলদারী প্রতিষ্ঠা করে, সংযুক্ত আরব, জর্ডান বা সিরিয়াকে এক ইঞ্চি পরিমাণ জমিও সে ফেরত দিতে বিন্দুমাত্র ইচ্ছুক নয়। বৃটিশ প্রতিনিধির উদ্যোগে গত ২২শে নভেম্বর নিরাপত্তা পরিষদে উভয় পক্ষকে ৫ই জুনের পূর্ববর্তী অবস্থায় ফিরে যাবার যে-প্রস্তাব গৃহীত হয়, ইসরায়েল স্পষ্টত সে প্রস্তাব কার্যকর করতে মোটেই আগ্রহী নয়। সে এটা উপলব্ধি করে যে, আরব রাষ্ট্রগুলির দুর্বলতা সে ধরে ফেলেছে, এতদিন যখন তাদের রাজ্য জবরদখলে রাখতে পেরেছে এবং আরব নেতারা গরম গরম বক্তৃতা ও প্রস্তাব নেওয়া ছাড়া আর কিছুই করতে পারে নি এবং রাষ্ট্রসংঘের কিছু প্রভাবশালী সদস্য তার পেছনে রয়েছে তখন অধিকৃত অঞ্চলের ওপর পুরোপুরি কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতেও কোন বাধা নেই। আরব রাষ্ট্রনেতারা এখন সম্যক বুঝতে পারছেন যে, রাষ্ট্রসংঘের ওপর ভরসা করলে তাঁদের হৃত রাজ্য ফিরে পাবার কোন আশা নেই, তা যদি পেতে হয় তবে তাঁদের নিজেদের শক্তির ওপরেই নির্ভর করতে হবে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র :

প্রেসিডেন্ট জনসন জাতির উদ্দেশে এক টেলিভিশন ভাষণে ঘোষণা করেছেন যে, তিনি নির্বাচনে দাঁড়াবেন না। সারা আমেরিকা এবং সেই সঙ্গে বিশ্ববাসীকে বিস্মিত করে দিয়ে মিঃ জনসন বলেছেন যে, প্রেসিডেন্ট পদের জন্যে দলের (ডেমোক্রেটিক) মনোনয়ন চাইবেন না, আর দল মনোনয়ন দিলেও তা গ্রহণ করবেন না। সকলেই এ ঘোষণায় বিস্মিত এজন্য যে, প্রেসিডেন্ট জনসন তাঁর মনোভাবের কথা এক মিনিট আগেও কাউকে জানতে দেন নি, বা কথাবার্তায়ও কোন ইঙ্গিত দেন নি। নির্বাচন থেকে মিঃ জনসনের সরে দাঁড়ানোর ফলে ডেমোক্রেটিক দলের মনোনয়নপ্রার্থী রইলেন আর দুজন : সেনেটর রবার্ট কেনেডি এবং সেনেটর ম্যাকার্থি।

একই ভাষণে প্রেসিডেন্ট জনসন মার্কিন সেনাবাহিনীকে উত্তর ভিয়েতনামে বোমাবর্ষণ বন্ধ করার নির্দেশ দিয়েছেন। সে-নির্দেশ কার্যকরী হলে বাহিনীমুক্ত অঞ্চলের উত্তরাংশে এবং উত্তর ভিয়েতনামের শতকরা মাত্র ১০ ভাগ অঞ্চল ছাড়া আর কোথাও মার্কিনী বোমা পড়বে না। তিনি ভিয়েতনামে শান্তি ফিরিয়ে আনার উদ্দেশে একটা ফলপ্রসূ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যেও সংশ্লিষ্ট পক্ষকে আহ্বান জানিয়েছেন।

এদিকে সেনেটর ম্যাকার্থি এক ভাষণে বলেছেন যে, তিনি প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হলে ছ' মাসের মধ্যে ভিয়েতনামে শান্তি ফিরিয়ে আনবেন এক কোয়ালিশন সরকার গঠনের মাধ্যমে।

যাই হোক, নির্বাচন প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে মিঃ জনসনের সরে দাঁড়ানোর ঘটনা সারা বিশ্বে যে গভীর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করবে সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। ওয়েস্টমোরল্যান্ডকে ভিয়েতনাম থেকে সরিয়ে আনার পর নিজেরই সরে দাঁড়ানোর ফলে তাঁর ভিয়েতনাম নীতির ব্যর্থতার স্বীকৃতি জানানো হল না কি?

বের হ'ল

সাম্যবাদ

বিষয়বস্তু ও কার্যপদ্ধতি

"সরল তত্ত্বানুসন্ধান-ই হল স্বাধীনতার ভিত্তিস্বরূপ, এই বিশ্বাসের উপর ভরসা করেই আমরা এই বইখানি লিখেছি। যুক্তিহীন শত্রুতা কখনই পুরোপুরিভাবে যুক্তিযুক্ত বিশ্লেষণের স্থান গ্রহণ করতে পারে না। এ কারণেই, তত্ত্ব ও বাস্তবানুগ উপায়ে সাম্যবাদের একখানি চিত্র প্রণয়ন করাই হয়ে উঠেছে আমাদের লক্ষ্যবস্তু।"

হীনা শেলেসিঙ্গার

জোনা ব্লাস্টেইন

অনুবাদ

অধ্যাপক অমরনাথ দত্ত

॥ ৬·৫০ ॥

চীনের সামাজিক রূপান্তর

চু চাই ও উইনবার্গ

অনুবাদ : রবীন্দ্রনাথ সরকার ৬·০০

একত্রে দশ টাকার অর্ডার দিলে এবং টাকা অগ্রিম পাঠালে ডাকখরচা লাগবে না। পূর্ণাঙ্গ তালিকার জন্য লিখুন।

এশিয়া পাবলিশিং কোম্পানি
কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা-বারো
ফোন : ৩৪-২০৮৬

গ্রন্থমেলা

আশাপূর্ণা দেবীর গ্রন্থাবলী (২য় ভাগ)—শ্রীআশাপূর্ণা দেবী। বসুমতী সাহিত্য-মন্দির, ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য : ৫৲

আশাপূর্ণা দেবীর গ্রন্থাবলীর দ্বিতীয় ভাগে স্থান পেয়েছে উপন্যাস, বড় গল্প ও ছোট গল্প। অবশ্য একালে ইটের মত উপন্যাস দেখতে যারা অভ্যস্ত, তারা 'অনির্বাণ'-কে পূর্ণাঙ্গ উপন্যাসের মর্যাদা দেবে না। কিন্তু ঘটনার ব্যাপ্তি ও চরিত্রগুলির ক্রমদৃঢ়তা বা মাহাত্ম্যের মধ্যে উপন্যাসের বীজ অঙ্কুরিত আছে। নিখিলের বাবা বিভূতিবাবু গ্রামের মধ্যে গড়ে তুলেছেন 'সেবাশ্রম' প্রতিষ্ঠান। শহরবাসী নিখিলের কাছ থেকে প্রাপ্ত সংবাদের কোন এক আগ্রহে মিসেস চ্যাটার্জী বা বর্ণালী দেবী সশরীরে নিখিলসহ পল্লীগ্রামে উপস্থিত। কিন্তু ভীষণতম এক প্রশ্নের সম্মুখীন আজ নিখিল। "মানুষ কতো অসহায়, অর্থহীন আত্মসম্মানের কাছে? প্রাণ যাক তবু—নিখিলের উপায় নেই মণির অভিভাবকদের কাছে হীনতা স্বীকার করবার। বিভূতিবাবুর উপায় ছিল না—আপন সন্তানের কাছে মাথা হেঁট করে দাঁড়াবার। তাই তিনি হারিয়েছেন তাঁর মানসী প্রিয়াকে। হয়তো নিখিলকেও হারাতে হবে তার প্রথম প্রেমের আলোটুকু।" এই উপন্যাসটির মধ্যে যে মানব মনের বিশ্লেষণ তা আশাপূর্ণা দেবীর মত প্রখ্যাত লেখিকার দ্বারাই সম্ভব। অন্তর্দ্বন্দ্ব, পৌরুষকার, সামাজিক মর্যাদাবোধ—এসব থাকলেও ব্যক্তিগত সমস্যাই এ উপন্যাসের প্রধান বিষয় নয়। অনির্বাণে মানব-মানবীর যে চিরন্তন জিজ্ঞাসা প্রোজ্জ্বল হয়ে উঠেছে তার সমাপ্তি সমস্ত মানুষের মধ্যে আত্মত্যাগে। তাতেই যেন মহাজীবনের স্পর্শ লাগে। মানস আত্ম-বিড়ম্বনা বা আত্মশ্লাঘার পথ থেকে মুক্তি পায়, মোহমুক্তিও ঘটে। 'জহুরী' এবং 'সোনালী দিনের মন' দুটিই সুবৃহৎ গল্প। আকারে ছোটখাটো উপন্যাসের তুল্য হলেও 'জহুরী'-তে এবং 'সোনালী দিনের মনে' লেখিকা পাঠকচিত্তে অসাধারণ কৌতূহল সৃষ্টি করতে পেরেছেন। সবচেয়ে বড় কথা সেই কৌতূহল সৃষ্ঠু পরিণতির মধ্য দিয়ে, কখনো বা চাঞ্চল্যকর ঘটনার সাহায্যে পাঠকমনকে স্তম্ভিত করে। 'জহুরী'-র যে ছদ্মবেশী কাঙাল লোকটা নেমন্তন্নে এসে বসে সকলের মধ্যে কৌতুক ও কৌতূহল সৃষ্টি করেছিল—তাকে অচেনা মনে হয় না। কিন্তু তার জীবনের ইতিবৃত্ত ভীষণ চাঞ্চল্যকর। 'সোনালী দিনের মন' কিছুটা গার্হস্থ্য-ধর্মী ও পারিবারিক। স্বাভাবিকতা-অস্বাভাবিকতার মধ্যেও এটি চমৎকার হৃদয়ধর্মী। এ ছাড়া গ্রন্থাবলীতে স্থান পেয়েছে এগারোটি গল্প। আশাপূর্ণা দেবীর 'আদিম', 'কঙ্কাবতীর ইতিকথা' প্রভৃতি গল্পের সঙ্গে পাঠকদের নতুন করে পরিচয় করিয়ে দেওয়া নিষ্প্রয়োজন হলেও একথা বলা দরকার, গল্পগুলি নিটোল কবিতার মতোই বার বার পড়বার উপযুক্ত। আমাদের গৃহাঙ্গনের কস্তুরী, হৈমন্তী, কঙ্কা, পূরবী, নিরুপমা, সারদাময়ীকে হাহাকার, ভালবাসা, শত্রুতা, মিত্রতার পটভূমিতে যেভাবে পাশাপাশি পেলাম তার জন্যে আমরা কৃতজ্ঞ। গ্রন্থাবলীর মূল্যও বেশি নয়। এদিক দিয়ে বসুমতী সাহিত্য-মন্দির একালের চড়া বাজারে পূর্ব গৌরব অক্ষুন্ন রেখেছে।

সঙ্গীত চিন্তা—অরুণ ভট্টাচার্য। সঙ্গীত পরিষদ, ৯বি-৮, কালিচরণ ঘোষ রোড, কলিকাতা-৫০। মূল্য : ৫৲

সঙ্গীত সম্পর্কিত কোনো গ্রন্থ বের হলে, আমরা খুশি হই। বর্তমানকালে একদল লেখকের (এরা কবি নয়) হাতে পড়ে 'কবিতা' যে অবস্থায় পড়েছে, সত্যি কথা বলতে কি গানের জগতেও সেই এক দশা। বঙ্কিমচন্দ্রের সেই লাঠির গৌরব এখন নেই। তাই মসির বিরুদ্ধে মসির লড়াইটা দেখা দরকার।

সঙ্গীত চিন্তায় সে ধরনের লড়াই আছে একাংশে। যেমন, আকাশবাণীতে প্রচারিত আধুনিক গান কোন পর্যায়ভুক্ত তার আলোচনাটি মনোগ্রাহী হলেও তথাকথিত অধুনাবাদীরা অথবা আকাশবাণীর কর্তাব্যক্তিরা স্বীকার করে নেবে কিনা জানি না। তবে এ ব্যাপারে আমাদের মনে হয় শুধু লিখেই কাজ হয় না, সরব বিরোধিতা দরকার এবং সে বিরোধে সঙ্গীতজ্ঞরা এগিয়ে এলেই রসিক সাধারণেরও সমর্থন পাবেন।

আলোচ্য গ্রন্থটিতে কতকগুলি সঙ্গীত বিষয়ক প্রবন্ধ স্থান পেয়েছে। গ্রন্থান্তর্ভুক্ত প্রবন্ধগুলিকে ঐতিহাসিক, নান্দনিক এবং কবিতা, গান, লৌকিক ও রাগ সঙ্গীত আলোচনার মধ্যে পর্যায়ভুক্ত করা হয়েছে। অবশ্য আলোচনা বহুক্ষেত্রে টেকনিক্যাল হলেও গ্রন্থকার স্বয়ং কবি ও সঙ্গীতজ্ঞ হওয়ার জন্যে শিল্পের তীর্থে রসের পূজারী হয়েছেন।

সঙ্গীত চিন্তার 'ঐতিহাসিক' পর্যায়ে আছে 'বাঙালীর গান : রূপ ও প্রকৃতি অনুসন্ধানের কয়েকটি সূত্র', 'রবীন্দ্রনাথের গান : হৃদয় ও মননের আবেদন', 'ভারতীয় সঙ্গীতের আদিপর্ব', 'সঙ্গীতের তত্ত্ব ও ঐতিহাসিক অনুসন্ধিৎসা।' লেখকের মোটামুটি বক্তব্য : "রবীন্দ্রনাথ তাঁর নিজের গানে যে আদর্শে বেঁধেছেন, সম্ভবত বাঙালীর গানে সেইটেই চিরকালের আদর্শ।" 'ধ্রুপদ বা খেয়াল গানে বাঙালীর চরিত্রের বিকাশ বা শিল্পমানসের অভিব্যক্তি সমপরিমাণে হয় নি।" শচীন দেববর্মণই বাঙালীর গানের শেষ দিক্‌পাল, অজয় ভট্টাচার্যই শেষ গীতিকার এবং হিমাংশু দত্ত শেষ উল্লেখযোগ্য সুরকার। গ্রন্থকার রবীন্দ্রনাথের গানের সামগ্রিক বিচার এবং অদ্যাবধি রচিত সঙ্গীতের ইতিহাসের উপর প্রকাশিত গ্রন্থগুলির আলোচনা করেছেন। প্রসঙ্গত য়ুরোপীয় সঙ্গীতের ইতিহাসও এসেছে। গ্রন্থকার বর্তমানে প্রচলিত খেয়ালের পদ্ধতিতে রূপভেদ লক্ষ্য করে আশা করছেন যে আগামী দশকে নতুন কোনো গায়নপদ্ধতির বিকাশ লাভ ঘটবে। এই মন্তব্যের প্রতি বিশেষভাবে আমরা খেয়াল গায়কদের দৃষ্টি আকৃষ্ট করতে চাই। শ্রীভট্টাচার্যের একটি মন্তব্য অত্যন্ত খাঁটি। তিনি বলেছেন : "প্রকৃতপক্ষে, ধ্রুপদচর্চা বাংলাদেশে বিষ্ণুপুরের বন্দ্যোপাধ্যায় ও গোস্বামী পরিবার যেভাবে দীর্ঘদিন ধরে করে আসছেন, তেমনটি ভারতের আর কোথাও এখনও সক্রিয়ভাবে রয়েছে কিনা সন্দেহ।" তবুও বিষ্ণুপুরের সঙ্গীতের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস আজো রচিত হয়েছে বলে আমরা মনে করি না। এ ব্যাপারে সরকারের সাহিত্য ও সঙ্গীত একাদেমি অগ্রসর হতে পারেন। তারাপদ চক্রবর্তী ও ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গীতের তুলনামূলক বিচারে পৃঃ ৮৭ শ্রীভট্টাচার্য সঙ্গীতের সূক্ষ্ম বিচারশক্তির পরিচয় রেখেছেন। ১০৮ পৃষ্ঠায় রাগ-রাগিণীর আলোচনা মূল্যবান। আমাদের অনুরোধ, শ্রীভট্টাচার্য সাধারণের সুবোধ্য রাগ-রাগিণীর সম্পূর্ণ পরিচয়-সহ একটি পৃথক গ্রন্থ লিখুন। এখানে তিনি যা বলতে চেয়েছেন, তা অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত।

শ্রীভট্টাচার্যের মতামত সম্পর্কে সবাই একমত হবেন তা বলছি না। তবে তাঁর আলোচনায় গভীরতা আছে, তিনি তাঁর শৈল্পিক বিশ্বাসবোধের কাছে কোথাও প্রতারণা বা কপটতা করেন নি।

রবীন্দ্রনাথ ও সুভাষচন্দ্র

শঙ্করীপ্রসাদ বসু

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

অনেক দূরে শান্তিনিকেতন

১৯২১ সালের মাঝামাঝি ভারতে ফিরে অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান এবং ১৯২৪-এর অক্টোবর থেকে অন্তরীণ ও কয়েক মাস পর থেকে ব্রহ্মদেশে দীর্ঘদিনের জন্য নির্বাসনে গমন, এর মধ্যে সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বেশি সাক্ষাৎ হয় নি। হওয়া সম্ভবও ছিল না। স্বদেশী আন্দোলনের একটা পর্যায়ে রবীন্দ্রনাথ যেমন মেতে উঠেছিলেন, অসহযোগ আন্দোলনের ক্ষেত্রে তেমন হতে পারেন নি; তিনি প্রস্থান করেছিলেন কবির ধর্মে অর্থাৎ কাব্যসাধনায় এবং নিজ আদর্শানুগ কর্মে অর্থাৎ বিশ্বভারতীর সংগঠনে। আন্দোলন-তাড়িত ভারতবর্ষের মধ্যে একটি প্রশান্ত সাধনার আশ্রয়দ্বীপের নাম শান্তিনিকেতন—তা অনেক দূরে।

কেবল অসহযোগের কর্মনীতি ও আদর্শনীতির সঙ্গে মন মেলাতে পারেন নি বলে নয়, অসহযোগী নেতৃত্ব সম্বন্ধেও তিনি সম্পূর্ণ আস্থাশীল ছিলেন না। আমি এখানে গান্ধীজীর কথা বলছি না, সর্বাত্মকভাবে গান্ধীজীর নীতি মানলেও তাঁর ব্যক্তিরূপের প্রতি রবীন্দ্রনাথের বিশেষ শ্রদ্ধা ছিল; আমি বলছি বাংলার প্রধান নেতা চিত্তরঞ্জনের কথা। চিত্তরঞ্জনের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মতপার্থক্য সুগভীর হয়ে উঠেছিল, এবং সেটা মানুষ চিত্তরঞ্জন সম্বন্ধে অবিশ্বাসে পেঁৗছেছিল কিনা, তার পক্ষে বিপক্ষে কিছু বলা শক্ত, কারণ সে বিষয়ে কোন তথ্য পাই নি। কিন্তু পারিপার্শ্বিক থেকে বলা যায়, চিত্তরঞ্জনের প্রতি প্রীতি বজায় না থাকার যথেষ্ট কারণ উপস্থিত হয়েছিল।

চিত্তরঞ্জন রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কের বিষয়ে কিছু সংবাদ দেওয়া যায়।

রবীন্দ্রনাথ চিত্তরঞ্জনে সৌহার্দ্য থাকাই স্বাভাবিক কারণ উভয়ে ব্রাহ্ম-পরিবারের সন্তান। সে সৌহার্দ্য ছিলও*, পরে দূর হয়ে যায়। উভয়ের বিরোধের কারণ চিত্তরঞ্জনের পৃষ্ঠপোষকতায় নারায়ণ পত্রিকার আবির্ভাব (১৩২১, অগ্রহায়ণ)। নারায়ণ পত্রিকার লেখকগোষ্ঠীর মধ্যে বিপিনচন্দ্র পালও ছিলেন। এই পত্রিকায় হিন্দুসমাজের পক্ষ সমর্থন ও ব্রাহ্মসমাজের সমালোচনা করা হোত। প্রমথ চৌধুরী সম্পাদিত এবং রবীন্দ্রনাথ পৃষ্ঠপোষিত 'সবুজ পত্রের' কোন কোন মতাদর্শকে খণ্ডিত করার চেষ্টা সুরু করা হোল নারায়ণে। শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় অনুমান করতে চেয়েছেন চিত্তরঞ্জন-রচিত 'সাগর সঙ্গীত' কাব্যগ্রন্থের সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের নীরবতা উভয়ের মনোমালিন্যের অন্যতম কারণ। অন্য কারণ রবীন্দ্র-জীবনীকারের মতানুযায়ী এইরূপ—

"ধর্মবিশ্বাসে এই সময়ে চিত্তরঞ্জনের জীবনে যে প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়াছিল তাহা রবীন্দ্রনাথকে অত্যন্ত পীড়িত করিয়াছিল। চিত্তরঞ্জন ছিলেন সাধারণ ব্রাহ্মসমাজভুক্ত। তাঁহার পিতা দুর্গামোহন দাশ ছিলেন কলিকাতার বিখ্যাত ব্যবহারজীবী। যৌবনে হিন্দুসমাজ ও হিন্দুধর্মের সকল প্রকার বন্ধনকে রূঢ়ভাবে ছিন্ন করিয়া দুর্গামোহন ব্রাহ্মসমাজে আসিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার পুত্র চিত্তরঞ্জনের সহিত যে কারণেই হউক সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সম্বন্ধ ক্রমশই শিথিল হইয়া আসে এবং আলোচ্য পর্বে (১৩২১ সালে) তাহা প্রায় প্রকাশ্য বিরোধিতায় আসিয়া দাঁড়ায়। পিতা গোঁড়া ব্রাহ্ম, সমাজ-সংস্কারক ছিলেন বলিয়াই যেন প্রতিক্রিয়াপন্থী পুত্র ব্রাহ্মসমাজের সমস্ত কিছুকেই বাস্তবতাহীন প্রমাণে উৎসুক। হিন্দুত্ব ও জাতীয়ত্ববোধ মিশিয়া যে হিন্দু জাতীয়ত্ব বাংলা দেশে বঙ্কিমচন্দ্র পত্তন করিয়াছিলেন এবং বিংশ শতকের আরম্ভ হইতে ও বিশেষভাবে স্বদেশী আন্দোলনের সময় হইতে তাহা নানাভাবে পুষ্ট হইয়াছিল। বহু ব্রাহ্মযুবক নবীন হিন্দু জাতীয়তাবোধের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইয়াছিলেন। অরবিন্দ ঘোষ, বারীন্দ্র ঘোষ, দেবব্রত বসু, চিত্তরঞ্জন দাশ, প্রমুখ ব্রাহ্মসমাজভুক্তই ছিলেন। কিন্তু ব্রাহ্মসমাজের ধর্মসাধনা তাঁহাদের তৃপ্তিদান করে নাই।

" 'নারায়ণ' পত্রিকা এই নূতন মনোবিকারের প্রচারপত্র হইল। ব্রাহ্মধর্মের মতবাদ, ব্রাহ্মসমাজের প্রগতিবাদ সমালোচনাই হইল এই পত্রিকার প্রধান কার্য। চিত্তরঞ্জন নারায়ণ পত্রিকা বাহির করিলেন বটে; কিন্তু তাঁহার লিখিবার সময় কোথায়? তিনি তো তখন হাইকোর্টের প্রধান ভারতীয় ব্যারিস্টারদের অন্যতম। তাই তিনি অর্থ দিয়া কয়েকজন প্রভাবশালী লেখককে এই কার্যে নিযুক্ত করিলেন। ইঁহাদের মধ্যে বিপিনচন্দ্র পাল স্বনামধন্য। তরুণদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হইতেছেন গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী।"

দেখা যাচ্ছে রবীন্দ্রনাথ ও চিত্তরঞ্জনের বিরোধ কেবল কাব্যগত নয়, ধর্মগতও বটে। প্রভাতকুমারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী রবীন্দ্রনাথ, চিত্তরঞ্জনের নবহিন্দুত্ব অপছন্দ করেছিলেন। গোঁড়া ব্রাহ্ম দুর্গামোহনের 'প্রতিক্রিয়াপন্থী' পুত্র চিত্তরঞ্জন 'ব্রাহ্মসমাজের প্রগতিবাদ'কে বর্জন করে নারায়ণী 'মনোবিকার' দেখিয়েছিলেন, এটা রবীন্দ্রনাথ পছন্দ করেন নি বলে প্রভাতকুমার জানিয়েছেন। এখানে আমরা মৃদুভাবে জানাতে পারি, ধর্মগত বিরোধের বিশ্লেষণে প্রভাতকুমারের শব্দচয়নকে চিত্তরঞ্জনের অনুরাগী অথবা অননুরাগী হিন্দুরা মোটেই পছন্দ করবেন না। হিন্দুসমাজ ও ধর্মের দুর্বলতাকে যে-কেউ আক্রমণ করতে পারে, করলে দোষ হয় না, কারণ দুর্বলতামাত্রই আক্রমণযোগ্য, কিন্তু সেটা যদি বিশেষ ধর্মসম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে করা হয়, তাহলে উক্ত আক্রমণকারী ধর্মসমাজকে এতই 'অভ্রান্ত' হতে হয়, যে-অভ্রান্ততা পৃথিবীর কোন ধর্মসম্প্রদায়ের আছে কিনা সন্দেহ। এবং নিঃসন্দেহে তা ছিল না সমসাময়িক ব্রাহ্মধর্মে। ব্রাহ্মসমাজের সমালোচনা করলেই কেউ প্রতিক্রিয়াপন্থী হয় না, এবং তা করার নাম মনোবিকার নয়।

এর পরের ইতিহাস হোল রাজনৈতিক মতের দ্বন্দ্ব। রবীন্দ্রনাথ আমেরিকায় ন্যাশনালিজম্ সম্বন্ধে কয়েকটি বক্তৃতা দিয়েছিলেন ১৯১৬ খৃস্টাব্দে। চিত্তরঞ্জন তার সমালোচনা করেন। এ সম্বন্ধে রবীন্দ্রজীবনীতে আছে—

---

* অপর্ণা দেবী লিখিত 'মানুষ চিত্তরঞ্জন' দ্রষ্টব্য।

"দেশের কতকগুলি সাময়িকপত্র ও বিশেষ এক শ্রেণীর লেখক কবির আমেরিকায় প্রদত্ত বক্তৃতার সমালোচনায় অত্যন্ত মুখর। রবীন্দ্রনাথের সম্পূর্ণ ভাষণ 'ন্যাশনালিজম' গ্রন্থে প্রকাশিত হয় পর বৎসরে। মার্কিন সাংবাদিকদের টেলিগ্রাফী রিপোর্ট, যাহা সাময়িকপত্রে প্রকাশিত হয়, তাহারি উপর নির্ভর করিয়া সকলে সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। এই সমালোচনার পুরোভাগে ছিলেন চিত্তরঞ্জন দাশ। তখনো তিনি সর্বত্যাগী 'দেশবন্ধু' রূপে দেশপূজ্য হন নাই। বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনের বার্ষিক অধিবেশনের সভাপতিরূপে তিনি কবির জাতীয়তাবাদের সমালোচনাকে কেন্দ্র করিয়া যে তীব্র মন্তব্য করিলেন, তাহারই উত্তর প্রত্যুত্তরে সাময়িক পত্রিকাসমূহ অচিরকালের মধ্যে মুখরিত হইয়া উঠিল। চিত্তরঞ্জনের অভিভাষণে (বাঙ্গলার কথা) বলা বাহুল্য অনেক সুচিন্তিত মতামত ছিল। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ইতিপূর্বে বলেন নাই এমন কথা অল্পই ছিল। চিত্তরঞ্জন উহাতেই যদি নিবৃত্ত হইতেন তবে ক্ষতি ছিল না। কিন্তু তিনি কবির আমেরিকার বক্তৃতার অংশবিশেষ উদ্ধৃত করিয়া তাঁহার স্বদেশপ্রীতিকে বারে বারে ধিক্কৃত করিলেন। এই আক্রমণ অহেতুকী ও অপ্রাসঙ্গিক। রবীন্দ্রভক্তেরা চিত্তরঞ্জনের মন্তব্য ও সমালোচনার কঠোর প্রতিবাদ করিলেন। অজিতকুমার চক্রবর্তী এক দীর্ঘ প্রবন্ধে দেখাইলেন যে, চিত্তরঞ্জনের বক্তৃতার প্রায় সকল ভাবই রবীন্দ্রনাথের স্বদেশী যুগে রচিত প্রবন্ধাবলীর মধ্যে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত আছে। এমন কি কবির ভাষাও বক্তার অজ্ঞাতে রচনার মধ্যে বহুস্থানে যে আসিয়া গিয়াছে তাহাও প্রবন্ধকার সূক্ষ্মভাবে দেখাইলেন। প্রবাসী সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় কবির চিরসুহৃৎ, তিনি চিত্তরঞ্জনের বক্তৃতার তীব্র সমালোচনা করিলেন।" —[র. জী,—২—৪৫৬]

সংবাদপত্রের রিপোর্টের উপর নির্ভর করে চিত্তরঞ্জন যদি রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতার সমালোচনা করে থাকেন, ঠিক করেন নি, কিন্তু তবু ব্যাপারটা যখন রাজনীতি-ঘটিত, তখন গ্রন্থ প্রকাশের জন্য অপেক্ষা না করে রাজনীতিকদের যথাসম্ভব শীঘ্র মত প্রকাশ করতেই হবে, কারণ দেশের সবচেয়ে বড় কবির মতের প্রতিক্রিয়া জনসমাজে অতি দ্রুত ঘটে। বাংলাদেশ সম্বন্ধে চিত্তরঞ্জনের বক্তব্যে মৌলিকতা না থাকতে পারে, তিনি তদানীন্তন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কবির ভাষা অজ্ঞাতে আত্মসাৎ-ও করতে পারেন, তা সত্ত্বেও ন্যাশন্যালিজমের উদ্বোধন যদি দেশের আশু উদ্দেশ্য হয়, তাহলে তার বিরুদ্ধ-ভাষণকে আঘাত করা ন্যাশনালিস্টদের পক্ষে স্বাভাবিক। সর্বাবস্থায় উচিত, এমন বলছি না।

১৯২৫ সালের ১৬ই জুন চিত্তরঞ্জন হঠাৎ দেহত্যাগ করলেন। ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের অনুরোধে রবীন্দ্রনাথ দুই লাইন কবিতা লিখে দিলেন চিত্তরঞ্জনের ছবির উপর।

"এনেছিলে সাথে করে মৃত্যুহীন প্রাণ
মরণে তাহাই তুমি করে গেলে দান।"

অনবদ্য দুটি লাইন; মুষ্টিভিক্ষা হলেও প্রতিভার স্বর্ণমুষ্টি।

চিত্তরঞ্জনের স্মৃতিস্তম্ভের জন্য রবীন্দ্রনাথ ১৯২৫ খৃস্টাব্দে আরো চার লাইন কবিতা লিখে দিয়েছিলেন।

সুভাষচন্দ্র দেশে ফিরে এই চিত্তরঞ্জনের রাজনৈতিক শিষ্যত্ব গ্রহণ করলেন। মৃত্যু পর্যন্ত চিত্তরঞ্জন সুভাষচন্দ্রকে একান্ত অনুগত পেয়েছিলেন। সুভাষচন্দ্রের কাছে দেশের কাজ হয়ে উঠেছিল 'দেশবন্ধুর কাজ'। স্বভাবতই আশা করা যায় না রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ থাকবে এইকালে। তা ছাড়া রবীন্দ্রনাথ এই সময়ে রাজনীতি থেকে সরে গেছেন। অসহযোগ, চরকা, এইসব সম্বন্ধে কিছু মন্তব্য বা রচনা প্রকাশ করলেও বাস্তব রাজনীতির সঙ্গে আর সংশ্লিষ্ট নন। অপর দিকে সুভাষচন্দ্র বাস্তব রাজনীতির কর্মে ও মর্মে আচ্ছন্ন। সুতরাং কবিতে ও কর্মীতে দূর ব্যবধান।

রবীন্দ্রনাথকে সুভাষচন্দ্র অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন, এবং তিনি মানুষের স্বধর্মকে স্বীকারও করতেন। কবিকে পীড়ন করে রাজনীতিক করে তোলার বাসনা তাঁর কোনদিন ছিল না। তবু জীবনদর্শনের দিক থেকে তিনি রবীন্দ্রনাথের থেকে ভিন্ন জগতে বাস করছেন এই সময়। সুভাষচন্দ্রের যৌবনোদয় পর্যন্ত মনোবিকাশের রূপ আমরা বিশ্লেষণ করেছি ইতিপূর্বে। তাঁর ধর্মাগ্রহ, ত্যাগব্রত, সংগ্রামস্পৃহা—ইত্যাদির রূপ দেখেছি যথেষ্টভাবে। বিবেকানন্দ অরবিন্দের আদর্শের প্রতি তাঁর একান্ত আকর্ষণের পরিচয়ও নিয়েছি। কঠোর বাস্তববাদের সঙ্গে প্রচণ্ড ভাবাবেগের মিশ্রণচেষ্টা যে তাঁর চরিত্রধর্ম, তাও দেখানো হয়েছে। ত্যাগের কথা তাঁর কল্পনাকে উদ্দীপ্ত করে তুলত। বিলেতে থাকতে তিনি উদ্বুদ্ধ হয়েছেন চিত্তরঞ্জনের মহাত্যাগে। তখন থেকেই চিত্তরঞ্জন তাঁর কল্পনার গুরু হয়ে গিয়েছেন। চিত্তরঞ্জনের প্রতি তাঁর আরো আকর্ষণের সম্ভাব্য কারণ, চিত্তরঞ্জন অরবিন্দের 'মুক্তিদাতা'। অরবিন্দ স্বয়ং 'উত্তরপাড়া ভাষণে' চিত্তরঞ্জনকে ঈশ্বরপ্রেরিত বলে স্বীকার করেছেন, কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করেছেন কিভাবে চিত্তরঞ্জন পসারে জলাঞ্জলি দিয়ে রাতের পর রাত জেগে, নিজের স্বাস্থ্য বলি দিয়ে তাঁর মুক্তির জন্য লড়াই করেছেন। ধর্মীয়-রাজনীতিক অরবিন্দের প্রতি শ্রদ্ধাশীল সুভাষচন্দ্র ব্যারিস্টার চিত্তরঞ্জনের এই মহৎ সাধনার কথা নিশ্চয় মনে রেখেছিলেন। দেশে ফিরে গান্ধীজীর সঙ্গে সাক্ষাতে অখুশি হয়ে সুভাষচন্দ্র চিত্তরঞ্জনের সঙ্গে দেখা করেন এবং আলাপের শেষে বুঝতে পারেন—তিনি তাঁর নেতাকে পেয়ে গেছেন।

সুভাষচন্দ্র তাঁর 'ইণ্ডিয়ান স্ট্রাগল' গ্রন্থে দেশবন্ধুর ব্যক্তিত্ব, রাজনৈতিক বুদ্ধি, সংগ্রাম-ক্ষমতা এবং সংগঠন-সামর্থ্যের উজ্জ্বল বিবরণ উপস্থিত করেছেন। কিন্তু এই রাজনীতিক চিত্তরঞ্জন তাঁর যুক্তি ও বুদ্ধির দ্বারাই নিশ্চয় সুভাষচন্দ্রকে জয় করেন নি। গান্ধীজীর চেয়ে চিত্তরঞ্জনের রাজনীতিজ্ঞান উন্নততর হলেও তা কি সুভাষচন্দ্রের সর্ব প্রশ্নের মীমাংসা করবার মত যথেষ্ট ব্যাপক ছিল? ফরোয়ার্ড পত্রিকার সুবিখ্যাত সম্পাদক শ্রীযুক্ত সত্যরঞ্জন বক্সী এক সাক্ষাৎকারে চমৎকার বিশ্লেষণ করেছেন বিষয়টির। সাক্ষাৎকারের যে বিবরণ আমি লিপিবদ্ধ করেছি সেইটেই উদ্ধৃত করা যাক—

সত্যবাবু আলোচনার নানা সময়ে বহুবার বললেন, একটা মানুষকে বুঝতে হলে তার কিছু কাজ বা কতকগুলো কথাকেই বিচার করলে চলবে না; বিশেষ করে সেই মানুষটি যদি চিত্তরঞ্জন বা সুভাষচন্দ্রের মত man of soul—a man of enlarged soul হন। ভালমন্দ হিসেব করে এ'রা সব সময় চলেন নি। এ'দের পথ এ'রা ঝাঁপ দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। এই ধরুন আই-সি-এস ত্যাগ করে যখন সুভাষবাবু ফিরলেন; তখন তিনি গোড়ায় গেলেন গান্ধীজীর কাছে, সন্তুষ্ট না হয়ে এলেন চিত্তরঞ্জনের কাছে—এবং চিত্তরঞ্জন তাঁকে জয় করে নিলেন,—(সত্যবাবু আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন সোজা হয়ে বসে)—আপনি কি মনে করেন সি, আর, দাশ তাঁকে যুক্তি দিয়ে জয় করেছিলেন? সুভাষচন্দ্রের মত বুদ্ধিমান কোনো মানুষকে যুক্তি দিয়ে জয় করা যায় না;—দেশবন্ধুর মত-পথের মধ্যে সত্যই অত যুক্তিসিদ্ধি ছিল কি? না, তা নয়, সুভাষবাবুকে তিনি জয় করেছিলেন—তাঁর ব্যক্তিত্বের সমগ্রতা দিয়ে এবং সুভাষবাবু সেই পূর্ণ প্রাণময় জীবনকে প্রত্যাখান করতে পারেন নি।

একটু থেমে সত্যবাবু আবার বললেন, সি, আর, দাশকে ধরা যাবে না

তাঁর কতকগুলো 'কীর্তি'র মধ্যে। 'কীর্তি' হিসেব মত কিছুই নয়—স্বরাজ্য দল গঠন এবং বার কতক সেণ্ট্রাল অ্যাসেম্ব্লি বা প্রভিন্সিয়াল কাউন্সিলে সরকারকে হারানো, ডায়ার্কিকে অচল করে তোলা ইত্যাদি। এসবগুলো কিছু হলেও চিত্তরঞ্জনের প্রতিভার পক্ষে খুব কিছু কি? (আমাকে সম্বোধন করে সত্যবাবু বললেন) আপনি নিশ্চয় দেখেছেন, আত্মজীবনীতে জহরলাল সি, আর, দাশ সম্বন্ধে কি বলেছেন? সেখানে তিনি চিত্তরঞ্জনকে মতিলালের সঙ্গে এক পংক্তিতে ফেলেছেন—আইনজীবী রাজনীতিকদের দলে। জহরলালের পক্ষে সেটা স্বাভাবিক—সি, আর, দাশ ও মতিলাল—দুজনে বড় ব্যারিস্টার, দুজনেই ব্যারিস্টারি ছেড়ে রাজনীতি করেছেন, রাজনীতিতে বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন, আইনসভায় ঢুকে সরকারকে আইনের প্যাঁচে বিব্রত করতে চেয়েছেন—সুতরাং জহরলালের বিবেচনায় এঁরা দুজনে এক দলের। হায়, দেশবন্ধু মানুষটাকে যদি জানত! শুনুন একটা ঘটনা, অনেক ঘটনার একটি।

সত্যবাবু নড়েচড়ে বলতে লাগলেন—

ভোর থেকেই প্রায় সি, আর, দাশকে ঘিরে থাকত অজস্র লোক। অজস্র লোক, তাদের অজস্র স্বার্থ। দুপুর গড়িয়ে যেত তখনো লোক বসে আছে। বাসন্তী দেবী এসে তাড়ার পর তাড়ায় তাঁকে টেনে নিয়ে যেতেন। সেই রকম একদিন, বারটা সাড়ে-বারটা হয়ে গেছে—আমরা কয়েকজন ইনার সার্কেলের লোক আছি—সত্যেন মিত্তির প্রমুখ কয়েকজন। বাসন্তী দেবী হাতে তেলের বাটি নিয়ে ঢুকলেন; আমাদের ধমকে বললেন, তোমাদের কি বাছা নাওয়া-খাওয়া নেই, এখনো বসে আছ? বাড়ীর মায়েদের মত করেই তিনি আমাদের সঙ্গে কথা বলতেন। আমরা উঠব—এমন সময় হঠাৎ সম্পূর্ণ অপরিচিত একটা লোক সকলের মাঝখানে ঠেলে হাজির। লোকটা—কি বলব—একেবারে ছন্নছাড়া। যেমন চেহারা তেমনি পোষাক। মাথায় ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া রুক্ষ চুল—ছেঁড়া জামা গায়ে—সর্বাঙ্গে নোংরা—আর চোখ দুটো লাল, অস্বস্তিকর বিশ্রী চাউনি। এক কথায় বীভৎস যন্ত্রণা আর বুভুক্ষার মূর্তি। সকলে অস্বস্তিতে পড়ল। সত্যেন জিজ্ঞাসা করল—কি চাই? লোকটা প্রথমে উত্তর দিল না, পরে বলল—'অনেক চেষ্টায় আজ এসেছি। আমাকে আসতে দেয় নি, দু'দিন ফিরে গেছি, কেমন, আজ ফাঁকি দিয়ে উঠে এসেছি।' লোকটা কথা বলছিল থেমে থেমে, দম নিয়ে নিয়ে, ভাঙা গলায়। তাকে আবার জিজ্ঞাসা করা হোল দরকারটা কি? সে তখন বলল, 'সি, আর, দাশ এই বাড়ীতে থাকে? আমি সি, আর, দাশকে চাই।' দেশবন্ধু খুব শান্ত গলায় বললেন, বলো, আমি সি, আর, দাশ। লোকটি খেয়াল না করে একইভাবে দম টেনে টেনে বলতে লাগল—'সি, আর, দাশ কোথায়?' দেশবন্ধু আরো শান্তভাবে খুব মিষ্টি গলায় বললেন—তাঁর সেই 'সিলভারি টোন' গলায়—আমিই সি, আর, দাশ, আমাকে বলো, যা বলবার। লোকটি বিচিত্রভাবে তাকিয়ে বলল—'ও, সি, আর, দাশ?—আমি জীবনে একদিন আনন্দ করব।' অন্য সকলে ইতিমধ্যে ভীষণ বিরক্ত হয়েছে। সত্যেন ধমকে বলল, দুপুর বেলায় কি সব পাগলের কাণ্ড! যাও, এখন যাও। দেশবন্ধু বিব্রত হয়ে বললেন,—আঃ সত্যেন, একটু থামো না, লোকটি কি বলে শোনা যাক না! লোকটি একই কথা বলতে লাগল—'জীবনে আনন্দ পাই নি, একবার একটু আনন্দ করব।' দেশবন্ধু স্নিগ্ধ গলায় জিজ্ঞাসা করলেন, কিসে তোমার আনন্দ হবে? লোকটি বলল, 'পঞ্চাশ টাকা পেলে খরচ করে আনন্দ করব।' অন্য সকলে শুনেই চটে গেল—দেশবন্ধু হেসে ফেললেন। —পঞ্চাশ টাকা! তাতে আনন্দ হবে? আমি একদিনে পঞ্চাশ হাজার টাকা খরচ করেছি, পাঁচ হাজার করেছি, পাঁচশো করেছি—আনন্দ পাই নি। আনন্দ ওভাবে পাওয়া যায় না। লোকটি কিন্তু থামল না, একইভাবে বলে যেতে লাগল—'জীবনে একবার আনন্দ করব, আমার পঞ্চাশ টাকা চাই।' দেশবন্ধু তাঁর মুহুরীকে ডাকলেন, জিজ্ঞাসা করলেন তাঁকে—টাকা আছে কি-না। দুর্ভাগ্য, টাকা ছিল না, বাসন্তী দেবীকে বাজার খরচের জন্য দিয়ে দেওয়া হয়েছিল। দেশবন্ধু তখন মুহুরী মহেন্দ্রবাবুকে পাঠালেন উকিল নগেন্দ্র ব্যানার্জীর কাছে। পাঁচশো টাকা ধার চাই। অল্প পরেই টাকা নিয়ে মহেন্দ্রবাবু ফিরলেন। দেশবন্ধু লোকটাকে টাকা দিয়ে দিলেন।

কাহিনী শুনতে শুনতে আমার-ই ভয় হোল, বুঝি দেশবন্ধু সব টাকাটাই দিয়ে দেন। জিজ্ঞাসা করলুম—কত দিলেন? সত্যবাবু বললেন, কেন পাঁচশো টাকা।

সত্যবাবু বলতে লাগলেন,—পাগলটা চলে যাবার পরে সকলে পড়ল দেশবন্ধুকে নিয়ে। সে কি গালাগালি!—মাথা খারাপ, কাণ্ডজ্ঞান নেই, পাগলটা এখনি মদ-গাঁজা খেয়ে টাকা উড়িয়ে দেবে। পাগলকে পাঁচশো টাকা দেওয়া! গালাগালির ঝড়ের মধ্যে দেশবন্ধু শুধু ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলেন। (সত্যবাবু বললেন) সকলের মধ্যে আমি

'চীন যুদ্ধে পরাজয়ের দায়িত্ব' কার?

লেঃ জেনারেল কল-এর বহু বিতর্কিত

THE UNTOLD STORY-র

সম্পূর্ণ বঙ্গানুবাদ

অকথিত কাহিনী

—কুড়ি টাকা—

একটি ঘোষণা ঃ নয়াদিল্লী, ৪ঠা মার্চ, ১৯৬৮ ঃ

"অকথিত কাহিনী' গ্রন্থে গুপ্ত তথ্য ফাঁস করা সত্ত্বেও শ্রীনেহরু এবং শ্রীমেননের 'প্রিয়পাত্র' লেঃ জেনারেল কলের বিরুদ্ধে কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় নি,—সংসদে আজ অর্ধ ঘণ্টাব্যাপী বিতর্কে এই অভিযোগের উত্তরে প্রতিরক্ষামন্ত্রী শ্রীস্বরণ সিং বলেন, "জনস্বার্থের খাতিরে জেনারেল কলের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত হবে না, কারণ তাতে আরও গুপ্ত তথ্য প্রকাশিত হয়ে পড়বার সম্ভাবনা রয়েছে।"

—দি স্টেটস্‌ম্যান

সান্যাল এণ্ড কোম্পানী

১।১এ, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা—১২ [ফোনঃ ৩৪-৭৫২১]

তৃষ্ণা

সুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায়

তীক্ষ্ণ তৃষ্ণা সমস্ত দেহে-মনে ঃ
পায়ে পায়ে কাঁটা; চোখে মরু-বিভ্রম।
তবুও শীতল জলের অন্বেষণে
সুদীর্ঘ পথ করেছি অতিক্রম;
ক্লান্ত হৃদয়। কোথায় সে জলধারা!

পাশুটে আকাশে আগুন-বৃষ্টি ঝরে,
চেতনা আমার নিঃসাড় নিঝুম।
জমাট কান্না কঠিন মাটির স্তরে—
মেঘেরা আনে না ফসলের মরশুম;
বাজে না বাতাসে অতল জলের সাড়া!

সহজ সুখের স্বর্গের সিঁড়ি বেয়ে
চাই না মিথ্যা যশের মুকুট—মুক্তি।
এ রৌদ্রজ্বালা ঢের ভালো তার চেয়ে,
গভীর সাগরে খুঁজব আসল শুক্তি:
সইব না-হয় দারুণ দুঃখ-ঝড়।

চোখ-ঝলসানো হাজার মুখের ভিড়ে
তোমাকে দেখার আশায় প্রহর গণি।
খুঁজি আশ্রয় নরম বুকের নীড়ে,—
যেখানে জাগায় জলকল্লোল ধ্বনি
তোমার প্রাণের প্রশান্ত নির্ঝর।

কেবল চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছি। শেষে আমার হাত দুহাতে চেপে ধরে একটা গভীর বেদনার সঙ্গে দেশবন্ধু বললেন, —ওরা বুঝবে না, তুমি বল সত্য, আমি কি ভুল করেছি? তারপর নিঃশ্বাস ফেলে বললেন,—টাকা কিসে সদ্ব্যয় হোল, না হোল, এই ওদের ভাবনা। কিন্তু কে ঠিক করে বলতে পারে কোন্‌টা ঠিক ব্যয়? এই যে সেদিন পাঁচ হাজার টাকা কংগ্রেসের কাজে খরচ হোল, সত্যেনদের মতে ওটাই ঠিক ব্যয়। আর এটা নয়। দেখো, এই লোকটা জীবনে একদিনের জন্য আনন্দ করতে চেয়েছে। হয়ত সুখ কোনোদিন পায় নি। একদিনের সুখের পরে ওর গোটা জীবনটা হয়ত বদলে যেতে পারে। জীবনে 'ফুল-ফিলমেন্ট' কখন কিভাবে হয় কে জানে। ও লোকটা সুখ পাক। ভগবানের কত রূপ! কত বেশে তিনি আসেন! তোমরা মনে কর তিনি দাঁড়িপাল্লা হাতে দোকানদার—না না না—কখনো নয়—।

সত্যবাবু পরিপূর্ণ কণ্ঠে বললেন, এই হচ্ছে সি. আর. দাশ, ইনিই জয় করেছিলেন সুভাষচন্দ্রকে।

কঠোর নীতিবাদের পক্ষ থেকে এই জীবনবোধ কতখানি গ্রাহ্য হবে জানি না। বেশ কিছু অংশে যে নয়, তা বোঝা যায়। দেশবন্ধুর এই আধ্যাত্মিক মহাপ্রাণতার বিরুদ্ধে আপত্তি তোলা যায়—এই বিবেচনাহীন উদারতার দ্বারা পরোক্ষে অন্যায়ের সমর্থন করা হোল—আমার বিশ্বাস সে অভিযোগ করার মত সংকীর্ণ বুদ্ধিমান অল্পই আছেন। আসল কথা, মানুষের আত্মোপলব্ধি,—আর তা পূর্ণভাবে ঘটতে পারে অপরের সঙ্গে ভালবাসার একভূমিতে দাঁড়াতে পারলে। ঐ অপূর্ব কাহিনী, যেখানে বুভুক্ষার মূর্তিটির মধ্যে একটি চিরন্তন ক্রন্দন দেশবন্ধু শুনতে পেয়েছিলেন—'জীবনে একদিন আনন্দ করতে চাই'—সেই ক্রন্দন দেশবন্ধু নিজের জীবনেও শুনেছেন—পঞ্চাশ হাজার টাকা একদিনে উড়িয়েও সে কান্না থামে নি—লোকটিকে পাঁচশো টাকা দিয়ে দেশবন্ধু নিজের বুকের কান্না থামাতে চেয়েছিলেন।

দেশবন্ধুর চরিত্রটিকে নানাভাবে বিচার করার চেষ্টার পরে সুভাষচন্দ্র সার কথা বললেন অবশেষে, অতি পুরাতন একটি কথা—

"জনমণ্ডলীর উপর দেশবন্ধুর অতুলনীয় অলৌকিক প্রভাবের গূঢ় কারণ কি, অনেকে এ প্রশ্নের সমাধান করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। আমি সর্বপ্রথমে অনুচর হিসাবে তাঁহার প্রভাবের একটি কারণ নির্দেশ করিতে চাই। আমি দেখিয়াছি তিনি সর্বদা মানুষের দোষগুণ বিচার না করিয়া তাহাকে ভালবাসিতে পারিতেন। তাঁহার ভালবাসার উৎপত্তি হৃদয়ের সহজ প্রেরণা হইতে, তাঁহার ভালবাসা গুণীর গুণের উপর নির্ভর করিত না।" (তরুণের স্বপ্ন)

সুভাষচন্দ্র এই প্রসঙ্গে আরো বলেছেন—

"যাঁহারা তাঁহার পাণ্ডিত্যের নিকট মাথা নত করেন নাই, অসাধারণ বাগ্মিতায় বশীভূত হন নাই, বিক্রমের নিকট পরাজয় স্বীকার করেন নাই, অলৌকিক ত্যাগে মুগ্ধ হন নাই, তাঁহারা পর্যন্ত ঐ বিশাল হৃদয়ের দ্বারা আকৃষ্ট হইয়াছিলেন।......জীবন না দিলে জীবন পাওয়া যায় না......দেশবন্ধুর জীবন ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ।"

দেশবন্ধুর চরিত্র বিশ্লেষণ করতে গিয়ে সুভাষচন্দ্র এই বিশাল হৃদয়ের কথাই বলেছেন বারবার। সুভাষচন্দ্র স্বয়ং দেশবন্ধুর 'পাণ্ডিত্য', 'বাগ্মিতা', 'বিক্রম' বা 'অলৌকিক ত্যাগের' দ্বারাই আকৃষ্ট হন নি, হয়েছিলেন 'হৃদয়ের দ্বারা'। দেশবন্ধুর চরিতকথা বলতে গিয়ে তাই সুভাষচন্দ্রের মনে পড়ে 'উচ্ছ্বসিত ভাবরাশি' এবং 'পবিত্র অশ্রুবারির' কথা। তাঁর মনে পড়েছে কেমন করে 'তরুণের রাজা কাঁদিলেন, তরুণেরাও কাঁদিল।'

অথচ দেশবন্ধু নিরতিশয় বুদ্ধিমান এবং কঠোর বাস্তববাদী রাজনীতিক ছিলেন। বহু বিপরীত গুণের সমাবেশ ছিল তাঁর চরিত্রে। "মানুষ একাধারে কি করিয়া বড় ব্যারিস্টার, উদার প্রেমিক, পরম বৈষ্ণব, চতুর রাজনীতিজ্ঞ ও দিগ্বিজয়ী বীর হইতে পারে"—এ প্রশ্ন অন্য সকলের মত সুভাষচন্দ্রের মনেও স্বভাবতই উঠেছিল। প্রশ্নের সমাধান করতে চেয়েছেন নৃতত্ত্ববিদ্যার সাহায্যে। রক্তমিশ্রণের ফলেই বাঙালীর স্বভাবের এই বহুমুখিতা। বাঙালীর জ্ঞানসাধনার বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে সে যুগের অন্যান্য মনীষীদের সিদ্ধান্তের সাহায্যও তিনি নিয়েছেন—বাঙালীর শিক্ষার মধ্যে তন্ত্র, বৈষ্ণবতা, ন্যায় ও স্মৃতির বিভিন্ন ধারায় একত্র অবস্থান। চিত্তরঞ্জনের মধ্যে এই সকল বৈশিষ্ট্যগুলিই বর্তমান ছিল। ন্যায়শাস্ত্র চিত্তরঞ্জনকে দিয়েছিল ক্ষুরধার যুক্তি ও বুদ্ধি, বৈষ্ণবতা দিয়েছিল প্রেম, তন্ত্র দিয়েছিল শক্তি এবং মাতৃভাবের প্রতি আকর্ষণ। এর সঙ্গে যুক্ত ছিল বাঙালী-স্বভাবের আবেগধর্ম।—"তিনি দুর্বার বিক্রমে যখন যে পথে চলিতেন, কেহ তাঁহাকে রোধ করিতে পারিত না। সমুদ্রের তরঙ্গায়িত জলরাশির ন্যায় সকল বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া আপনার বেগে আপন আদর্শের পানে ছুটিতেন। প্রিয়জনদের আর্তনাদ অথবা অনুচরবর্গের সাবধানবাণীও তাঁহাকে ফিরাইতে পারিত না।"

দেশবন্ধুর চরিত্র সম্বন্ধে সুভাষচন্দ্রের শেষ সিদ্ধান্ত—

"বাংলার সভ্যতা ও শিক্ষার সার সংকলন করিয়া তাহাতে রূপ দিলে যে রূপ মানুষের উদ্ভব হয় দেশবন্ধু অনেকটা সেইরূপ ছিলেন।

"তাঁহার গুণ বাঙালীর গুণ, তাঁহার দোষ বাঙালীর দোষ। তাঁহার জীবনের সবচেয়ে বড় গৌরব ছিল যে তিনি বাঙালী।" (তরুণের স্বপ্ন) [ক্রমশঃ]

ছোট ভাইটার ক'দিন থেকেই অসুখ। জ্বর ছাড়ছে না—একজ্বরী। ডাক্তার বলছে টায়ফায়েডে দাঁড়াতে পারে।

মণিকুন্তলার মনটা ভাই ভালো নেই। বড় ন্যাওটা তার ভাইটা। মা'র শরীর ভাল নয়। সংসারের ধকল সামলে ছেলের ধকল সহ্য করার মত শারীরিক বা মানসিক শক্তি থাকে না তাঁর। শম্ভুর যত আব্দার, যত বায়না তাই দিদির কাছে।

পাঁচটা বাজার মিনিট পনেরো আগেই অফিস ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছে মণিকুন্তলা। একটু আগে না বেরোলে ট্রামে-বাসে ওঠাই যায় না। যা ভিড়, যেন চিঁড়েচ্যাপ্টা করে দেয়। আর মানুষগুলোও হয়েছে এক অদ্ভূত ধরণের হ্যাংলা। হুড়মুড় করে একেবারে গায়ের ওপরে এসে পড়বে। লেডিস সীটে বসেও সে এক অস্বস্তি। একেবারে গায়ের ওপর গা ঘেঁষে এসে দাঁড়াবে। থেকে থেকে ধাক্কা দেবে। না না, ওরাই বা কি করবে? ওদেরও যেতে হবে ট্রামে-বাসে। মাছিটি গলতে পারে না এমন ভিড়। ভদ্রতা রাখবে কি করে। তরুণী মহিলা বলে ওরা যা হোক উঠতে পায়, চাই কি বসতে পায় মাঝে মাঝে। পুরুষদের অবস্থা তো আরো সঙ্গীন। কোন রকমে উঠতে পারলেই ভাগ্য ভালো বলে মনে করে। বসার আশা বড় একটা কেউ করে না। বাসের পর বাস চলে যাচ্ছে রাস্তায় দাঁড়িয়ে জুলজুল করে দ্যাখে ওরা। পাঁচ-সাতটা বাস ছাড়ার পর হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে একটার হাতল ধরে কোন রকমে ঝাঁপিয়ে পড়ে। তারপর অদ্ভূত মাধ্যাকর্ষণে ঠেলতে ঠেলতে ঠ্যালা খেতে খেতে গিয়ে পৌঁছয় ভেতরে।

ডালহৌসী পাড়ার একটা ফুটপাথ ধরে ধর্মতলার দিকে পা বাড়ায় মণিকুন্তলা। অসুস্থ ভাইটার জন্যে ফল কিনতে হবে। না নিয়ে গেলে কেঁদে অস্থির হবে। ভ্যানিটি ব্যাগটা খুলে দেখলে মণিকুন্তলা। কত আছে। টাকা তিনেকের মত হবে। ম্যা আবার টুকিটাকি কিছু নিয়ে যাবার ফরমাস করেছেন বেরোবার সময়। ফলই বা কি কিনবে, আর মার চাহিদামত জিনিসই বা নিয়ে যাবে কি করে। তার ওপর এখনো দিন তিনেকের মত নিজের গাড়িভাড়ার খরচ আছে। টিফিন খাওয়া অবশ্য সে প্রায় ছেড়েই দিয়েছে ইদানীং।

চোখ ফেটে জল বেরিয়ে আসার উপক্রম হল মণিকুন্তলার। দূর ছাই, এ একটা ভূতের সংসার হয়েছে। মাস্টারী, কলেজ

আর ছেলে পড়িয়ে কত আর রোজগার করবেন বাবা, যে এই রাবণের গোষ্ঠীর ডানহাতের ব্যবস্থা রাজসূয় যজ্ঞের মত চলতে পারে। তা ছাড়া বাবার বয়েস হয়েছে, বেশি খাটতে পারেন না আজকাল। চোখেও কম দেখছেন বেশ কিছুদিন থেকে। চোখের ব্যবস্থা করতে না পারলে চিরদিনের মত নষ্ট হয়ে যাবে। আহা, সারা জীবনই কষ্ট করে গেলেন বাবা। ছেলেমেয়ে মানুষ করতে গিয়ে কোনদিন দেখেন নি নিজের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে। জুতো ছিঁড়ে গেলে সে এক দুর্ভাবনা বাবার। তালির পর তালি পড়বে। যখন কোন মুচিই সে জুতো সারাতে চাইবে না, তখন আসবে একটা রবারের সোল দেওয়া কাঁচা চামড়ার জুতো। চাদরটা শতচ্ছিন্ন, কোন রকমে ঢেকেঢুকে ফেলেন কাঁধের ওপর কোটটার অবস্থা আরো জীর্ণ। সেলাই আর তালিতে ভরে গেছে তার সর্বাঙ্গ। কোটটার যে কি রং ছিল আসলে, এখন দেখে বোঝার উপায় নেই।

যত রাগ গিয়ে পড়ে বড় ভায়ের ওপর। বিএ পাশ করে মানুষ যে এমন বদখত ধরণের হতে পারে এটা তার জানা ছিল না। সংসারের দুঃখ এতটুকু বোঝে না? খাবার সময় খাওয়া, তারপর সারাদিন কারখানার গেটের ধারে বসে থাকা! ইউনিয়নের লীডার হয়েছেন! কারখানার এখন স্ট্রাইক চলেছে, তাই সারাদিন গেটের ধারে বসে পাহারা দিতে হয়। মালিকের অত্যাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম! মালিক মাইনে বাড়াবে না, চাহিদা মত বোনাস দেবে না, তাই কাজ বন্ধ করে দিয়েছে শ্রমিকেরা।

যে যাই করুক, ওর কি এসব করা সাজে! বুড়ো বাপ খেটে খেটে শরীর পাত করছে, দৈন্য-রাক্ষসী হাঁ করে আছে সংসারে, সেসব দিকে নজর নেই। উনি যাচ্ছেন শ্রমিকসমাজের মঙ্গল করতে। তারপর যখন যাবে চাকরিটা তখন চোখের সামনে অন্ধকার হয়ে যাবে দুনিয়া! একবার ভেবে দেখে না কত কষ্টের চাকরি। বাবার ছাত্র রমেশ মল্লিক ওখানকার ম্যানেজার তাই চাকরিটা হয়েছিল। রমেশ মল্লিক হাসতে হাসতে বাবাকে বলেছিল—আপনি যখন এসেছেন মাস্টারমশাই, চাকরি হবে আপনার ছেলের। কিন্তু ইউনিয়ন-টিউনিয়ন করবে না তো শেষে? জবাবে বলেছিলেন বাবা—সে গ্যারান্টি তো দিতে পারবো না রমেশ। খুশি হয়েছিল রমেশ মল্লিক। বলেছিল—আচ্ছা আচ্ছা, আপনাকে কোন গ্যারান্টি দিতে হবে না। আপনার ছেলে, সেই তো সকলের চেয়ে বড় গ্যারান্টি মাস্টারমশাই। চাকরি হয়ে গিয়েছিল শিবনাথের।

একটা কিসের মিছিল আসছে রেড রোডের দিক থেকে। তাদের সমবেত কণ্ঠের চীৎকারের ক্ষীণ শব্দ কানে গেল মণিকুন্তলার। ওঃ, আজ শিক্ষকদের মিছিল বেরোবার কথা পড়েছিল সকালের কাগজে। শিক্ষকরা এবার বেরিয়ে পড়েছে রাস্তায়। না বেরিয়ে উপায় হল না তাদের। কিন্তু পথে বেরিয়েই কি কিছু সুরাহা হবে? কে তাদের টেনে বার করলে পথে?

সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়লো তার বড় ভাই শিবনাথের কথা—জানিস, ওরা এমনিই জাত যে প্যাঁচে না পড়লে একটা পয়সা ছাড়বে না। জোঁক দেখেছিস? জোঁক। রক্ত খেয়ে যখন ফুলে টইটম্বুর হবে তখনই শুধু ছেড়ে দেবে। এরা জোঁকেরও অধম। এদের রক্তের পিপাসার শেষ নেই। উদর এদের ইলাস্টিক, রবারের মত বাড়ে। এরা আমাদের হাড় খাবে, মাস খাবে, চামড়া নিয়ে ডুগডুগি বাজাবে, তাতেও এদের শান্তি নেই।

এতশত বোঝে না মণিকুন্তলা। তবে নিজের অপিসেও দেখেছে। কি দিনকাল পড়েছে, কিন্তু কর্তাদের বোঝানোই শক্ত। মাইনের কথা বলতে গেলেই যেন তেড়ে মারতে আসে। সাফ্ জবাব—পোষায় থাক, না পোষায় পথ দেখ। আরে, কোন উপায় নেই বলেই তো তোদের লাথি ঝ্যাঁটা খেয়েও পড়ে থাকা। সেদিন ডেসপ্যাচের অনিল একশোটা টাকা ধার চেয়েছিল বউয়ের অসুখের জন্যে। মেজকর্তা রসিকতা করে জবাব দিলেন—কেন, তোমাদের ইউনিয়ন দিতে পারলে না? কি কথার ছিরি! ও'দের জন্যে খেটে খেটে অস্থিচর্ম সার করবো আমরা, আর দরকারের সময় যেতে হবে অন্য জায়গায়! কেন? কিসের জন্যে যাব? দাদা হয়তো ঠিকই বলে—তুই চিনিস্ না ওদের মণি, তুই চিনিস্ না। ওরা হচ্ছে সমাজের মুখের ওপর দুষ্ট-ব্রণ।

কিন্তু আগে তো এমন ছিল না। অপিসের পুরনো কর্মচারীরা বলে, মেজকর্তার কি দয়ার শরীর ছিল। একবার গিয়ে কেঁদে পড়তে পারলেই হ'ত। ব্যস্, আর দেখতে হবে না। তোমার যা প্রয়োজন পেয়ে গেলে। কত কর্মচারীর মেয়ের বিয়েতে সাহায্য করেছে মেজকর্তা, চাকরী করে দিয়েছে কত কর্মচারীর ছেলের। তবে হঠাৎ এ পরিবর্তনের কারণ কি? বুঝতে পারে না মণিকুন্তলা। সব যেন গোলমাল হয়ে যায় তার।

হাঁটতে হাঁটতে হ্যামিলটনের বাড়ির কাছে এসে পড়েছে মণিকুন্তলা। দেখে রাজভবনের অমুখে বহু লোক বসে পড়েছে রাস্তায়। ট্রাম বন্ধ, বাস ঘুরে যাচ্ছে অন্য পথ দিয়ে। আরো খানিক এগিয়ে গেল সে। ফুটপাথে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল। জনতার সামনে পুলিশ বেষ্টনী। দাঁড়িয়ে আছে হাত ধরাধরি করে। আরে, বাবা না! হ্যাঁ, হ্যাঁ, বাবা-ই তো। রাস্তায় বসে পড়েছে। মুখটা শুকিয়ে আমসি হয়ে গেছে একেবারে। পা চালিয়ে এগিয়ে গেল মণিকুন্তলা। ভিড় ঠেলে গিয়ে হাজির হল ঠিক তার বাবার সামনে। বিস্মিতকণ্ঠে প্রশ্ন করলে—এ কি! বাবা, তুমি?

শ্যামসুন্দর হাই স্কুলের ইংরাজীর মাস্টার শরৎ মুখুজ্যে, যাকে সকলে শরৎ মাস্টার বলেই জানে, মণিকুন্তলার বাবা, ঘাড় তুলে একবার দেখলেন। তারপর বললেন—হ্যাঁ মা, আমি।

বাবার সামনে বসে পড়ে বলে উঠলো মণিকুন্তলা—শম্ভুর কি রকম বাড়াবাড়ি অসুখ তুমি তো জান বাবা।

—জানি বৈ কি মা। কিন্তু কি করবো, আজকে আমাদের পথে টেনে বার করে দিয়েছে। এদের সঙ্গে না এলে বুড়ো বলে তো এরা শুনবে না—, বলে শতচ্ছিন্ন চাদরটা দিয়ে কপালের ঘামটা মুছে নিলেন।

মণিকুন্তলা অসহায়দৃষ্টিতে একবার আশেপাশের শিক্ষকদের পানে চাইল। তারপর বললে শম্ভুর অসুখ, তা ছাড়া তুমি বুড়ো মানুষ। তোমার এসব করা কখনো পোষায়! তুমি ওঠ। আমার সঙ্গে বাড়ি চল।

শরৎবাবু এপাশ-ওপাশ চাইলেন অসহায় দৃষ্টিতে।

শরৎবাবুর অসহায় অবস্থা লক্ষ্য করে আধাবয়সী জনকয়েক মাস্টার বললেন—ঠিক আছে, ঠিক আছে। আপনি বাড়ি চলে যান।

লাইন থেকে উঠে যখন মণিকুন্তলার পেছন পেছন চলেছেন শরৎবাবু, শুনতে পেলেন পাশের একটি ছোকরা মাস্টার টিপ্পনি কাটলে—কি শরৎবাবু চললেন নাকি? যান্ মশাই, আপনাদেরই তো বাড়িঘর আছে। আমরা তো ভবঘুরে বাউন্ডুলে। আমাদের তো বাড়িঘর নেই। মাগ্‌গিভাতা বাড়লে কিন্তু আপনারাই প্রথমে নেবেন খাতায় সই করে।

জবাব দেবার কিছু নেই। দিলেও তার মানে হয়ে যাবে উল্টো। তা ছাড়া ঐ পরিস্থিতিতে সুস্থ মনে ভাবার মত মনের বা মাথার অবস্থা নেই কারো। তাই শরৎবাবু নিরুত্তরেই মণিকুন্তলাকে অনুসরণ করে বেরিয়ে গিয়ে ঢুকলেন কার্জন পার্কে।

বাবাকে সঙ্গে নিয়ে যখন ধর্মতলার মোড়ে পৌঁছলো মণিকুন্তলা সে এক অদ্ভুত অবস্থা। ট্রাম বন্ধ। বাসের সংখ্যাও কম। মাঝে-মধ্যে আসছে এক-আধখানা। বাস বলে চেনার উপায় নেই। বাদুড়ের মত লোক ঝুলছে চারদিকে। ভেতরের কিছু দেখা যাচ্ছে না। এমন কি গাড়ির বনেটের ওপরও লোক বসেছে।

মেয়েদের ছোটবেলা থেকেই
ত্বকের যত্ন নিতে শেখান।
তিনি সুন্দরী, তিনি রূপসী!
প্রতিদিনের ত্বক পরিচর্যায় তাঁর এই অপরূপ সৌন্দর্যের
উৎস-সাধনা বিউটি ক্রীম।
সাধনা বিউটি ক্রীম রূপসাধনায় অনন্য
সাধনা ঔষধালয়-ঢাকা
সাধনা ঔষধালয় রোড, সাধনানগর, কলিকাতা-৪৮
অধ্যক্ষ যোগেশ চন্দ্র ঘোষ, এম.এ.
আয়ুর্বেদশাস্ত্রী, এফ.সি.এস. (লণ্ডন)
এম.সি.এস. (আমেরিকা) ভাগলপুর
কলেজের রসায়ন-শাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক
কলিকাতা কেন্দ্র:
ডা: নরেশচন্দ্র ঘোষ,
এম.বি.বি.এস. (কলিঃ)
আয়ুর্বেদাচার্য
SADHANA
Beauty
CREAM
সাধনা
বিউটি
ক্রীম

ভয়ে মুখ শুকিয়ে গেল মণিকুন্তলার। বললে—এখন কি করে যাবে বাবা? আর, অপেক্ষা করলেও যে ওঠার মত বাস পাব বলে মনে হয় না। গড়পার পর্যন্ত হেঁটে কি তুমি যেতে পারবে!

—তুই যদি পারিস, আমি পারব না? নিশ্চয়ই পারব। —শরৎবাবু সান্ত্বনা দিলেন মেয়েকে।

—তুমি একটু দাঁড়াও। আমি চট করে শম্ভুর জন্যে কিছু ফল কিনে নিয়ে আসি—, বলে ফলের দোকানের দিকে রওনা হল মণিকুন্তলা। ফল কিনে ফিরে এসে দেখল বাবার সামনে একটা বিরাট গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে, আর বাবা একজন প্যান্টকোট পরা ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলছেন।

মণিকুন্তলাকে দেখেই শরৎবাবু বলে উঠলেন—না মণি, এ আমার ছাত্র রমেশ,—রমেশ মল্লিক। তোমার দাদার কারখানার ম্যানেজার। আমাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে থেমে পড়েছে।

মণিকুন্তলার বুকটা ধড়াস্ করে উঠলো। দাদার ব্যাপার নিয়ে নিশ্চয়ই রমেশবাবু দশ কথা শুনিয়ে দেবেন বাবাকে। ঘাড়টা হেঁট করে দাঁড়িয়ে রইল ও।

রমেশ মল্লিকই সেই পরিস্থিতিটাকে সহজ করে দিলে। বললে—মাস্টারমশাই, সারা রাত দাঁড়িয়ে থাকলেও আপনি বাসে উঠতে পারবেন না। আর যদি হেঁটে গড়পার যান তো কাল সকালে উঠে শুনবো আপনার গঙ্গাযাত্রা হয়েছে। তার চেয়ে চলুন, আমি আপনাকে পৌঁছে দিয়ে আসি।

শরৎবাবু নির্বাক। শুধু চেয়ে আছেন ফ্যালফ্যাল করে রমেশ মল্লিকের মুখের পানে।

—উঠুন মাস্টারমশাই। ওঠ ওঠ,—বলে রমেশ মল্লিক তাড়া দিলে মণিকুন্তলাকে।

—না না, আপনি আবার শুধু শুধু কষ্ট করতে যাবেন কেন?—মণিকুন্তলার কণ্ঠে দ্বিধা।

রমেশ মল্লিক হো হো করে হাসলো খানিক। তারপর বললে—তোমরা তো আজকালকার মেয়ে। অনেককিছু রাইটস্—রেসপন্সিবিলিটি সামাজিক ঋণের কথা বল। এটাও একটা সামাজিক ঋণ—গুরু-ঋণ। তাই আমাকে কষ্ট করতে হবে। আমাদের সময় শিক্ষক-ছাত্রে সম্বন্ধ ছিল পিতা-পুত্র। সেই সূত্রে তুমি আমার বোন। নাও নাও, উঠে পড়।

আর কথা বাড়ানো নিরর্থক। শরৎবাবুকে নিয়ে উঠে পড়লো মণিকুন্তলা। বিরাট গাড়িটা ঝড়ের গতিতে ছুটে চলল।

পথে যেতে যেতে রমেশ মল্লিককে উদ্দেশ করে বললে মণিকুন্তলা—দাদার ব্যাপারে আমরা সকলেই খুব মর্মাহত। খুবই লজ্জিত।

রমেশ মল্লিক সেই একভাবেই হেসে উঠলো হো হো করে। পরে বললে—কিছু না, কিছু না। লজ্জার কি আছে এতে। শিবনাথ যে মাস্টারমশায়ের ছেলে সেটা একটা এ্যাকসিডেন্ট। আর শিবনাথ না থাকলে ওর কাজটা অন্য কেউ করতো। এটা কালের গতি।

রমেশ মল্লিককে অজস্র আশীর্বাদ জানিয়ে বাড়ির ভেতরে ঢুকলেন শরৎবাবু। সামনেই দেখা হল শিবনাথের সঙ্গে। শিবনাথ ঝাঁঝিয়ে বলে উঠলো—ওই জানোয়ারটা বুঝি আমার ব্যাপার নিয়ে তোমাকে ফোসলাতে এসেছিল?

শরৎবাবু শিবনাথের কথাটা ঠিক বুঝতে না পেরে চাইলেন ওর মুখের পানে। জিজ্ঞেস করলেন—কে? কার কথা বলছিস তুই?

—এই, ওই মিস্টার মল্লিকের কথা,—বলে একটা মুখভঙ্গি করলে শিবনাথ।

—ও তোর সম্বন্ধে একটা কথাও বলে নি,—বলে ঘটনাটা সংক্ষেপে বললেন শরৎবাবু।

রুক্ষ চুলগুলো অকারণেই টানতে টানতে বলে উঠলো শিবনাথ—তুমি কি বাবা! ওর গাড়িতে আসতে তোমার এতটুকু লজ্জা বোধ হল না?

শরৎবাবু কোন উত্তর খুঁজে পেলেন না শিবনাথের কথার। বোকার মত চেয়ে রইলেন শিবনাথের মুখের পানে।

শিবনাথের রাগটা তখন গিয়ে পড়লো মণিকুন্তলার ওপর।—তুই বা কি মণি? স্বচ্ছন্দে চলে এলি ওর গাড়ি চেপে! গাড়ি চাপার লোভ বুঝি সামলাতে পারলি না?

জবাব না দিয়ে মণিকুন্তলা শুধু এক পলক চাইল শিবনাথের মুখের পানে।

শিবনাথের জ্বালা তখনো কমে নি। তুবড়ির মত মুখ দিয়ে বেরোতে লাগলো ভক্ ভক্ করে।—কি দরকার ছিল তোর বাবাকে লাইন থেকে তুলে আনবার? অতগুলো মানুষ বসে বসে যদি কষ্ট করতে পারে, বাবারও পারা উচিত। একেই বলে স্বার্থপরতা,—বিশ্বাসঘাতকতা।

মণিকুন্তলা এতক্ষণ চুপ করে ছিল। এবার জবাব দিলে—কেন তুলে এনেছি সে তুমি বুঝবে না, আমি তোমাকে বোঝাতেও পারবো না।

—তা' না হয় বুঝবো না। কিন্তু এটা তো বুঝি, মাগ্‌গিভাতা বাড়লে বাবাও তখন সুড়সুড় করে নিয়ে নেবে,—শিবনাথের কণ্ঠের শ্লেষ গিয়ে বিঁধলো মণিকুন্তলাকে। উচ্চকণ্ঠেই বলে উঠলো মণিকুন্তলা—তোমার লজ্জা করা উচিত দাদা। তোমার মত কুলাঙ্গার ছেলের উনি বাপ তাই হাত পেতে আজো ওঁকে স্কুলের মাইনে নিতে হয়। এই যে ছোট ভাইটা অসুখে ভুগছে, কদিন তুমি ওষুধ এনেছো? ক'টা টাকা দিয়েছো সংসারের?

—মুখ সামলে কথা কইবি মণি, নইলে চাঁড়িয়ে সিধে করে দোবো বোলছি,—ক্রোধে ফেটে পড়লো শিবনাথ।

চীৎকার শুনে ছুটে এলেন গৃহিণী। চেঁচিয়ে বলে উঠলেন—দ্যাখ শিবু, ষাঁড়ের মতন যদি চ্যাঁচাবি তো দূর হয়ে যা' বাড়ি থেকে। তোর ঐ নেতাগিরি ফলাবি বাইরে, এখানে নয়।

মায়ের সামনে এতটুকু হয়ে গেল শিবনাথ। আমতা আমতা করে বললে—দ্যাখ না মা, মণি কি সব যা' তা' বোলছে। দেখছে আজ দু' মাসের ওপর স্ট্রাইক চলেছে কারখানায়, পয়সা আমি এখন পাবো কোথা থেকে?

—ঠিকই বোলেছে মণি। ও তো আমার ছেলের কাজ করছে তবু।—মায়ের কথার ফাঁকে শিবনাথ সরে পড়ে বাড়ির ভেতরে।

মুখ হাত ধুয়ে আহ্নিক সেরে শরৎবাবু তক্তপোষটার ওপর বসে আছেন চুপচাপ। ছেলেটার অসুখ চোখে দেখছেন, করতে পারছেন না কিছুই। যেটুকু করছে মণিকুন্তলা। কিন্তু ওরই বা সামর্থ্য কতটুকু। একটা ভাল টিউশানি ছিল, সেটাও গ্যাছে। চোখে ভাল দেখতে পান না, যেতেও হত বেশ দূর, তাই মণিকুন্তলা জোর করে ছাড়িয়ে দিয়েছে টিউশানি। মাসের শেষ, হাতে নেই একটিও পয়সা। কার কাছেই বা হাত পাতবেন, কেই বা দেবে? ওষুধের দোকানে ধার হয়ে গ্যাছে অনেক, আর ধার দিতে চাইছে না। অথচ ডাক্তারবাবু বলে গেলেন কাল থেকে ইনজেকসন্ দেবার কথা। ডাক্তারের ফিও বাকি পড়ে গ্যাছে বেশ কিছু।

মাসকাবার হলেই দেনাগুলো শোধ করতে হবে সকলের আগে। গৃহিণীর দু'খানামাত্র কাপড়ে ঠেকেছে। মাসকাবারে একজোড়া কাপড় না কিনলেই নয়। মণি-মায়ের সাজপোষাকের বালাই নেই। তবুও ওকে বাইরে বেরোতে হয়, আপিস যেতে হয়, একটু ভদ্র পোষাক পরিচ্ছদ না হলে চলে না। ওরও একজোড়া শাড়ি দরকার। চটি জুতোটাও ছিঁড়ে এসেছে। না কিনলেই নয়। এই সব করে যা' উদ্বৃত্ত থাকবে তাতে তা দু'বেলা আঠারোটা পাতের খোরাক এক সপ্তার বেশি চলবে না।

ভাবনার সমুদ্রে যখন হাবুডুবু খাচ্ছেন শরৎবাবু, মণিকুন্তলা হাঁপাতে হাঁপাতে এসে খবর দিলে—বাবা, শম্ভুর জ্বর ছেড়ে গ্যাছে। যাই' আমি ডাক্তারবাবুকে খবরটা

দিয়ে আসি। শরৎবাবুকে খবরটা দিয়েই ঘর থেকে বেরিয়ে গেল মণিকুন্তলা।

শরৎবাবুও একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন।—বাকৃ, তাহলে ইনজেকসনটার আর দরকার নাও হতে পারে। একটু আরাম করে বসবার তোড়জোড় করছেন শরৎবাবু, দরজার বাইরে শিবনাথের কণ্ঠস্বর শুনতে পেলেন—এই মণি, শোন। দু'টো টাকা দিতে পারবি?

—কেন টাকা কি করবে?—মণিকুন্তলার প্রশ্ন।

—অত খোঁজে তোর কি দরকার। দিতে পারবি কি না তাই বল?

—তোমার কি লজ্জা সরমের বালাই বলে কিছু নেই দাদা। দেখছো শম্ভুটা আজ ক'দিন ধরে শুয়ে আছে। টাকার জন্যে হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন বাবা। মাসের আজ সাতাশ তারিখ। সংসার চলে কি করে সে খবর না রেখে আমার কাছ থেকে তুমি টাকা চাইছো কোন লজ্জায়!

প্রথমটা শিবনাথের কণ্ঠস্বর উত্তেজিত—মেলা লম্বা চওড়া কথা বলবি না বলছি মণি। তারপরেই সুরটা নরম হয়ে এল—আরে আমি কি নিজে ফুর্তি করার জন্যে টাকা চাইছি? দু মাসের ওপর হল স্ট্রাইক চলছে কারখানায়। অনেকের এমন অবস্থা দাঁড়িয়েছে যে এক বেলাও অন্ন জোটা ভার হয়েছে। তিন-চারটে ছেলে-মেয়ে নিয়ে মজিদটা দু'দিন উপোস করে আছে। ওকে আজ কিছু না দিলেই নয়।

—দাদা, একটা কথা বলবো রাগ করবে না বল?

—রাগ করবো কেন? কি বলবি বল না।

—মিস্টার মল্লিককে বলে কয়ে মিটিয়ে নাও স্ট্রাইক। তাতে সকলেরই ভাল হবে।

ক্ষণেক নীরবতা। তার পরেই শোনা গেল শিবনাথের গম্ভীরকণ্ঠ—পিছু হেঁটে আসার আর উপায় নেই রে মণি। এখন একটা প্রশ্নই শুধু রয়েছে আমাদের সামনে, হয় জিত না হয় মৃত্যু।—ফিরে চলে যাচ্ছিস যে? টাকা দিবি না?

—টাকা আমার নেই দাদা।

—ওঃ। একটা দীর্ঘশ্বাসের শব্দ [illegible]য়ে।

অল্প পরেই শিবনাথের কণ্ঠস্বর শোনা [illegible]য়ে, আবার—কি রে, আবার ফিরলি [illegible]?

—আনা আষ্টেক পয়সা দিতে পারি আমি।

—আ-ট আনা! আচ্ছা, তাই দে। [illegible] হয় মুড়ি-টুড়ি খেয়ে রাতটা তো কাটুক। তারপর দ্যাখা যাবে।

ঘরে বসে ভাই-বোনের প্রতিটি কথা শুনলেন শরৎবাবু। শিবনাথের সব কাজ তিনি সমর্থন করেন না। সংসারের প্রতি তার ঔদাসীন্য পীড়া দেয় তাঁকে। কিন্তু তাই বলে শিবনাথের প্রতি তাঁর কোন অবজ্ঞার ভাবও নেই। বরং মাঝে মাঝে মনে হয় ও-ই হয় তো ঠিক। শিবনাথের একটু আগের কথাগুলো তাঁর বেশ ভালই লাগলো। মনে মনে তৃপ্তিবোধ করলেন।

আজ পরিশ্রম হয়েছে বেশ। পা দু'টো ব্যথা করছে। পা দু'টো ছড়িয়ে একটু শুয়েছিলেন শরৎবাবু। একটু তন্দ্রার ভাব এসেছিল। গৃহিণীর উচ্চকণ্ঠ কানে যেতেই ছুটে গেল তন্দ্রা—সন্ধ্যে হতে না হতেই ভাতের জন্যে তাগাদা! ক'টা দাসী-বাঁদী রেখে দিয়েছিস সংসারে? আমার দ্বারা আর হবে না। যা যা, ভাতের এখন অনেক দেরি।

শিবনাথের মিনতিভরা কণ্ঠও শুনলেন —তুমি বুঝতে পারছো না মা, আমাকে এখুনি কারখানার গেটে যেতে হবে। আমি ডিউটিতে গেলে তবে সুরজিত ছাড়া পাবে। সে বেচারা সেই সকাল থেকে গেট আগলে বসে আছে।

গৃহিণীর জবাবের কণ্ঠটা বেশ কর্কশ—বন্ধ কারখানার গেটে বসে থাকলেই তো পারিস। বাড়ি আসার দরকারটা কি। ওঃ, ছেলে আমার নেতা হয়েছেন! সংসারটার হাড়ির হাল হয়েছে, বুড়ো বাপ খেটে খেটে অস্থি-চর্ম-সার, আর উনি বাইরে মাতব্বরি করে বেড়াচ্ছেন!

রাতের খাওয়া সেরে তক্তপোষে এসে বসেছেন শরৎবাবু। দেখলেন অত রাতে মণিকুন্তলা কোথায় বেরোচ্ছে। ডাকলেন মণিকুন্তলাকে। জিজ্ঞেস করলেন—এত রাত্তিরে আবার কোথায় যাচ্ছিস মা?

—দাদা না খেয়ে চলে গ্যাছে। খাবারটা দিয়ে আসতে যাচ্ছি বাবা,—জবাবে বললে মণিকুন্তলা।

—যা মা, যা। তাড়াতাড়ি দিয়ে আয়। নিশ্চয়ই খুব খিদে পেয়েছে।—বড় প্রফুল্ল দেখালো শরৎবাবুর মুখটা।

স্কুল থেকে হেঁটে লাইন দিয়ে যেতে হয়েছিল ধর্মতলা। ধকলটা হয়েছে খুবই। পরদিন তাই আর স্কুলে যেতে পারলেন না শরৎবাবু। তার পরদিন স্কুলে গিয়েই অবাক হয়ে গেলেন শরৎবাবু। মাথাটা যেন ঝিমঝিম করতে লাগলো। ছাত্ররা স্ট্রাইক করেছে। স্কুলের গেটের সামনে দাঁড়িয়ে জটলা করছে। সেক্রেটারীকে নিয়ে হেড মাস্টার মশাই এসেছিলেন মীমাংসা করতে। ছেলেরা দুজনকেই ধাক্কাধাক্কি করে সরিয়ে দিয়েছে। ছিঁড়ে দিয়েছে জামা। স্কুলের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ তাই স্কুলের লক আউট ঘোষণা করেছেন। যতদিন পর্যন্ত না ছাত্ররা ভদ্র ব্যবহার করবে ততদিন বন্ধ থাকবে স্কুল।

ছাত্রদের অভিযোগ, মাস্টাররা ছাত্রদের সঙ্গে ঠিকমত ব্যবহার করেন না। পড়া-লেখাও করান না ঠিকমত। অঙ্কের মাস্টারমশাই সুধাংশুবাবু কাল নাকি দশম শ্রেণীর ছাত্র প্রবীরকে বলেছিলেন—ক্লাশ

দেশ সেবায় নিয়োজিত,

এ্যালবার্ট ডেভিড লিমিটেড

কলিকাতা—৫০

নীতি ও বিজ্ঞানানুযায়ী ঔষধ প্রস্তুতকরণের অগ্রণী

—ব্রাঞ্চ সমূহ—

বোম্বে - মাদ্রাজ - দিল্লী - নাগপুর

বেজওয়াডা - শ্রীনগর - গৌহাটী

থেকে বেরিয়ে যাও। ক্লাশে গোলমাল করে আর পাঁচজনের পড়া নষ্ট করো না।

কী, এতবড় কথা! প্রবীর তখনই দাঁড়িয়ে উঠে বলে—বুঝতে পারছি না বলেই তো জিজ্ঞেস করছি বারবার। আর, দস্তুরমত মাইনে দিয়ে পড়ি। বেরিয়ে যেতে বলার কোন অধিকার নেই আপনার।

রাগী মানুষ সুধাংশুবাবু। চেঁচিয়ে বলে ওঠেন—যদি না যাস তো দরোয়ান ডেকে ঘাড় ধরে বার করে দোবো। বুঝতে গেলে শুধু ক্লাশেই হৈ-হট্টগোল করলে চলে না। আমার টিউটোরিয়াল ক্লাশে ভর্তি হতে হয়।

—আচ্ছাঃ,—বলে ক্লাশ থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল প্রবীর।

মিনিট পনেরোর মধ্যেই ডেপুটেশন আসে হেডমাস্টারের কাছে। সর্বসমক্ষে মাপ চাইতে হবে সুধাংশুবাবুকে।

অস্বীকার করেন হেডমাস্টার। সে কি করে হয়! তা' হয় না। তাহলে তো ডিসিপ্লিন বলে কিছু থাকে না স্কুলে।

তারই জের চলেছে আজ।

অগত্যা ফিরে যেতে হয় শরৎবাবুকে। পথ চলতে চলতে অনেক চিন্তাই এসে ভিড় করে তাঁর মাথায়। কেন এমন হল? কই, আগে তো ঠিক এমন ছিল না। মনে আছে তাঁর, অজিতকে তিনি বলেছিলেন—বাঁদর, থার্ড পারসেন সিঙ্গুলার নাম্বারে এস যোগ করতে হয় জানিস্ না? ঘাড় হেঁট করে চুপ করে দাঁড়িয়েছিল অজিত। মুখ তুলে চাইতে পারে নি, প্রতিবাদ করা তো দূরের কথা। সেই অজিত এখন নাকি খুব উন্নতি করেছে। একটা বড় কোম্পানীর সর্বময় কর্তা।

মনে পড়লো নরেনকে। একটু মেয়েলি মেয়েলি চেহারা ছিল। রাগের মাথায় নরেনকে কানটা ধরেছিলেন জোরে। কানে ঘা ছিল, রক্ত পড়তে লাগলো। কোঁচার খুটে কানটা চেপে ধরে বসে পড়েছিল নরেন। বড় কষ্ট পেয়েছিলেন মনে মনে। সন্ধ্যের সময় গিয়েছিলেন ওদের বাড়িতে নরেন কেমন আছে দেখতে। নরেনের মা শরৎবাবুকে প্রণাম করে বলেছিলেন—এর জন্যে আবার আপনি কষ্ট করে দেখতে এলেন! পড়া না করলেই তো মার খেতে হবে।

আহা, নরেনটা মরে গেল। টায়ফয়েড হয়েছিল নরেনের। ওর ভাইটাও পড়ছে তাঁর কাছে। এখন সে নাকি খুব বড় ডাক্তার হয়েছে। মনে মনে অযাচিত আশীর্বাদ জানালেন নরেনের ভাইকে।

সুদীর্ঘ শিক্ষকতার জীবনে কত ছাত্রই এসেছে তাঁর সান্নিধ্যে। এক একটা বছর পার হয়েছে, এসেছে নতুন নতুন মুখ। খুব অল্প ছাত্রের নাম মনে পড়ে আজ, কিন্তু মুখগুলো সব ভাসে চোখের সামনে। চোখ বুজলেই দেখতে পান ছাত্রের মেলা। সব চেনা মুখ। ঐ তো, গোপাল না? কপালে কাটা দাগ। হ্যাঁ হ্যাঁ, গোপালই তো। চাটুজ্জেদের গোপাল। ভারি জ্বালিয়েছে গ্রামার নিয়ে। টেন্‌স্ বোঝাতে গিয়ে হাড় হিম হয়ে গ্যাছে একেবারে। —ওটা কে? ও, সুবোধ—দত্তদের সুবোধ। আহা, হাতের লেখা ছিল যেন মুক্তোর মত। এই—এই তারক, টুকছিস কেন? যা পারবি নিজে লেখ না। বড় পাজী ছিল তারকটা। লেখাপড়া করবে না বলে যেন পণ করেছিল। এখন ট্যাক্সি চালায় তারক। সেদিন দেখা হয়েছিল পথে। গাড়ি থামিয়ে নেমে এসে প্রণাম করলে। হেসে জিজ্ঞেস করলে—ভাল আছেন মাস্টারমশাই?

মনে পড়লো রমেশকে। রমেশ মল্লিক। শিবনাথের কারখানার ম্যানেজার। দরিদ্র পিতার সন্তান রমেশ, তবে খুব মেধাবী ছিল। এখনো সম্মান দেয় শিক্ষক বলে। —ওর এ কাজটা কিন্তু ভাল হচ্ছে না। স্ট্রাইকটা মিটিয়ে ফেললেই পারে। আহা, কি দিনকাল পড়েছে। দুঃসহ কষ্ট হয়েছে মানুষের। তাই তো মানুষ দুটো পয়সার জন্যে হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়ায়। না হয় কিছু কম হবে মুনাফাটা, কিন্তু মানুষগুলো তো বাঁচবে। কিন্তু রমেশ তো অবিবেচক নয়। তবে কেন...?

রাস্তা পার হতে হবে। ছিঁড়ে গেল চিন্তার জাল। এপাশ-ওপাশ দেখে নিয়ে পার হলেন রাস্তা। আবার ডুবে গেলেন চিন্তার সমুদ্রে।—আজকাল মাস্টাররাও যেন একটু পেশাদার হয়ে পড়েছেন। নিজের চোখেই তো দেখতে পান হালচাল। পড়া বলে আজকাল আর কিছুই হয় না স্কুলে। শুধুই হৈ-হট্টগোল। স্কুলটা যেন অনেকের বিশ্রামের জায়গা। সব কিছু শক্তি তাঁরা সঞ্চয় করে রাখেন সকাল সন্ধ্যে দলে দলে ছেলে পড়ানোর জন্যে। এমন কি শুনতে পান, পাছে প্রাইভেট টুইশানি হাতছাড়া হয়ে যায়—তাই পরীক্ষার প্রশ্নপত্রের আভাসও নাকি ছাত্রদের আগে থাকতেই অনেকে দিয়ে থাকেন। ছিঃ ছিঃ, এ সব ভারী অন্যায়। এতে সমাজের একটা বিরাট ক্ষতি হবে। আবার তখুনি মনে হয়, এ সবই দারিদ্র্যের প্রতিক্রিয়া। ছেলে না পড়ালে সংসার চলবে না। অসুখ-বিসুখে ডাক্তার খরচ ওষুধ খরচ জুটবে না।

—কিন্তু তাই বলে অধর্ম করতে হবে? অসত্যের পথে চলতে হবে? সমস্ত সমাজটাতে ঘুণ ধরিয়ে দিতে হবে? শিক্ষকদের জীবনযাত্রার পথ যে ফুলে ফুলে বিছানো থাকে না, এতো জানা কথা। আদর্শ যদি কিছুটা না থাকে তাহলে এ পথে আসা কেন? অনেকে বোলবে পেট—পেটের জন্যে আসা। তা' বেশ তো, অফিস-আদালতে গিয়ে উদরপূর্তির মোকাবিলা কর। সরস্বতীর পীঠস্থানে এসে কেন এই ব্যাভিচার করা?

—কি গো, ফিরে এলে যে?—বাড়ি ঢুকতেই জিজ্ঞেস করলেন গৃহিণী।

—ছাত্রেরা করেছে স্ট্রাইক। স্কুল কর্তৃপক্ষ ঘোষণা করেছে লক আউট। ফিরে না এসে আর কি করি বল?—জবাব দিলেন শরৎবাবু।

দিন পাঁচেক কেটে গ্যাছে। বাড়িতে চুপচাপ বসে আছেন শরৎবাবু। শিবনাথের কারখানায় স্ট্রাইক, স্কুলে স্ট্রাইক। মণিকুন্তলার মাইনের সামান্য ক'টা টাকা—সে আর ক'দিন। উপবাস আরম্ভ হল বলে। তক্তপোষের ওপর বসে আকাশপাতাল চিন্তা করেন শরৎবাবু। যেদিকেই চোখ ফেরান—অন্ধকার। ঋণের বোঝা পর্বত-প্রমাণ। ধার আর কেউ দেবে না। সোনা বোলতে গৃহিণীর হাতের দুগাছা শাঁখা আর মণিকুন্তলার দুগাছা ব্রোঞ্জের চুড়ি। কিছুই হবে না ওতে। গুষ্টিবর্গ উপবাস করে মরা ছাড়া উপায় নেই।

কাজ কর্ম সেরে ঘরে ঢুকলেন গৃহিণী। তক্তপোষের ওপর বসে পড়ে বললেন—তিন হাঁটু এক করে বসে আকাশপাতাল ভাবলেই তো কিনারা হবে না।

নিঃশব্দে গৃহিণীর মুখের পানে চাইলেন শরৎবাবু।

—তোমার তো শুনতে পাই কত ছাত্র সব খুব বড় হয়েছে। যাও না তাদের কাছে। নিজের দুঃখ জানাও তাদের। অনেক তো করেছো তাদের জন্যে, তারাও না হয় তোমার দুঃসময়ে করুক কিছু।

সেই একভাবেই চেয়ে রইলেন শরৎবাবু গৃহিণীর মুখের পানে। মুখে কথা নেই তাঁর।

—তোমার ছাত্র, অজিত না কি যেন নাম। প্রায়ই বল তুমি। যাও না তার কাছে। অন্তত বলে কয়ে সুরেনকে একটা চাকরীতে ঢুকিয়ে দাও। সে তো ইচ্ছে করলেই পারে।

কিস্তিতে ট্রানজিস্টার

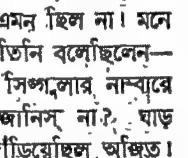

মাসিক ১০৲ টাকা কিস্তিতে অভঙ্গুর প্লাস্টিক ক্যাবিনেটে 'ন্যাশানাল' পোর্টেবল ৩ ব্যান্ড অল ওয়ার্ল্ড ট্রানজিস্টার।

Jagson Agencies (W.B.M.-88)
P.B. 1212, Delhi-6.

চিনলেন শরৎবাবুর মেজোছেলে?

শরৎবাবুর সেই একই বিমূঢ় ভাব। নির্বাক হয়ে শুনছেন গৃহিণীর কথা।

পরদিন গৃহিণীর পীড়াপীড়িতেই চাদরখানা কাঁধে ফেলে বেরিয়ে পড়লেন শরৎবাবু অজিতের অপিসের উদ্দেশ্যে।

বিরাট অপিস। আলোর মালার মত জ্বলছে নিওন লাইট। একধারে বসে মেমসাহেবেরা টাইপ করছে খট্‌খট্ করে। বাবুরা কাজে ব্যস্ত।

কাঁচের বড় ঘরটার পাশেই টুলে-বসা আরদালিকে জিজ্ঞেস করলেন শরৎবাবু—অজিত কোথায় বসে বলতে পার?

আরদালি টুল ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে একটু বিস্মিতকণ্ঠে পালটা প্রশ্ন করলে—বড়া সাব?

—না না, সাহেব-টায়েব নয়। অজিত, —অজিত বসু।

আরদালি ঘাড়টা দুলিয়ে বলে উঠলো—হাঁ হাঁ, অজিত বাসু। ওহি বড়া সাব হ্যায়।

—তাকে একটু বল তো, আমি দেখা করতে এসেছি।

আরদালির মুখে বিস্ময় ফুটে উঠলো। কোনরকমে জিজ্ঞেস করলে—আ—প?

—হ্যাঁ, বোলবে, মাস্টারমশাই। শরৎ মাস্টারমশাই।

একটা শিলিপের প্যাড আর পেনসিলটা এগিয়ে দিয়ে বলে উঠলো আরদালি—তব শিলিপ দিজিয়ে।

—আরে নারে বাবা, শিলিপ-টিলিপ দিতে হবে না।

সেই মুহূর্তেই কাঁচের ঘরের দরজা ঠেলে বেরিয়ে এল একজন খাঁটি সাহেবী-পোষাক-পরা মানুষ। শরৎবাবুকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেই বলে উঠলো—মাস্টারমশাই, আপনি! তারপরেই হেঁট হয়ে প্রণাম করলে।

—বেঁচে থাক বাবা, বেঁচে থাক।—বলে আশীর্বাদ জানালেন শরৎবাবু। পরে বললেন—দেখতে এলুম তুই কত উন্নতি করেছিস, কত বড় হয়েছিস।

বড়সাহেব অজিত বাসু হেসে জবাব দিলে—সবই আপনার আশীর্বাদ মাস্টার-মশাই। আসুন ভেতরে আসুন।

অজিত বাসুর সঙ্গে শরৎবাবু ঢুকে গেলেন ঘরের ভেতর।

আরদালি ঐ ময়লা জামা-কাপড়-পরা মানুষটার কথা ভেবে বিস্ময়ে কপালে তুললে চোখ দুটো। বড়সাহেব অজিত বাসুকে ঐ মানুষটাকে ঐভাবে প্রণাম করতে দেখে কর্মচারীরা পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগলো।

ঘরের ভেতর ঢুকে অবাক হয়ে গেলেন শরৎবাবু। এত বড় সাজানো গোছানো অপিস ঘর তাঁর জীবনে তিনি কখনো দ্যাখেন নি এর আগে।

—বসুন মাস্টারমশাই, বসুন।—অজিত বাসুর কণ্ঠস্বর শুনে তাঁর চমক ভাঙলো। চেয়ারে বসে বললেন—এ যে ঘরটাকে একেবারে হিমালয় বানিয়ে ছেড়েছিস রে!

অজিত জবাব না দিয়ে সামান্য হাসলো মাত্র।

—তা', হ্যাঁরে, তুই এখানকার সর্বে-সর্বা?

—সবই আপনার আশীর্বাদ মাস্টার-মশাই। অজিত বাসুর মুখে হাসিটি লেগে আছে।

আনন্দে আত্মহারা হয়ে বলে উঠলেন শরৎবাবু—বাঃ বাঃ। আমার যে কি আনন্দ হচ্ছে শুনে সে আর তোকে কি বোলবো। মনে হচ্ছে ছুটে গিয়ে বলে আসি সকলকে। তা', হ্যাঁরে মাইনেপত্তর কিরকম পাস?

হাসতে হাসতেই জবাব দিলে অজিত বাসু। বললে কত মাইনে পায়।

চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠে পড়ে বলে উঠলেন শরৎবাবু—বাহবা কি বাহবা। এই না হলে ছেলে। অজিত আমার মনে হচ্ছে তোকে বুকে জড়িয়ে ধরি। বুকটা আমার ঠাণ্ডা হোক্।

অজিত বাসুও একটু যেন উন্মনা হয়ে পড়লো। বললে—মাস্টারমশাই, আপনাদের কথা কি কখনো জীবনে ভুলতে পারি। আপনার মত মাস্টারমশাই পেয়েছিলুম বলেই তো জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পেরেছি।

—না, না, পড়িয়েছি তো অনেককেই। সকলেই কি আর অজিত হয়। বেঁচে থাক্, তোর আরো উন্নতি হোক্—শুধু এই কামনাই জানাই দেবীর চরণে।

বেশ খানিকক্ষণ কথার পর শরৎবাবু বললেন—আজ তাহলে উঠি অজিত। তুই কাজের মানুষ, বেশী সময় তোর নষ্ট করা আমার উচিত হবে না।

উঠতে যাচ্ছিলেন শরৎবাবু। বসে পড়লেন অজিতের কথা শুনে—দাঁড়ান, ড্রাইভারকে ডাকি। পৌঁছে দিয়ে আসবে আপনাকে।

কুণ্ঠিত বোধ করলেন শরৎবাবু—আরে, না না, গাড়ি আবার কি হবে! হেঁটেই চলে যাবো দিব্যি।

—তা' কি হয় মাস্টারমশাই—বলে ড্রাইভারকে ডাকতে পাঠালে অজিত।

বিরাট গাড়িটা থেকে যখন নামলেন শরৎবাবু, গৃহিণী দেখতে পেয়ে হাসতে হাসতে এসে দরজা খুলে দিলেন।

ড্রাইভার দীর্ঘ সেলাম জানিয়ে গাড়িতে উঠে স্টার্ট দিলে।

শরৎবাবু বোলতে বোলতে ঢুকলেন—জান গিন্নী, সে তোমাকে কি বোলবো! কি বিরাট অপিস! কত লোক, কত আলো। অজিতের ঘরটা যেন হিমালয়। কি খাতির যত্নই করলে আমাকে। আহা, কত বড় হয়েছে আজ ও।

গৃহিণী বলে উঠলেন—ভগবান ওর মঙ্গল করুন। আরো বড় হোক্ ও জীবনে।

—নিশ্চয়ই হবে। অজিতের মত ছেলে দেখা যায় না বড় একটা। অত টাকা মাইনে পায়, কিন্তু আমার সামনে কেঁচোটি। জানে তো, বাঁদরামি করলেই কান ছিঁড়ে দোবো। নিজের কথাতে নিজেই হেসে উঠলেন হা হা করে।

গৃহিণীও যোগ দিলেন সে হাসিতে। পরে জিজ্ঞেস করলেন—তা' হ্যাঁ গা, আসল ব্যাপারের কিছু হল?

শরৎবাবুর বিস্মিতকণ্ঠের জিজ্ঞাসা—কি বল তো?

—সুরেনের চাকরী বা তোমার দুঃসময়ে ছাত্রের কাজ করা, এই সবের আর কি।

গৃহিণীর মুখের পানে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থেকে বললেন শরৎবাবু—না তো। ওসব তো কিছু আমি বলি নি।

গৃহিণীর মুখেও কোন কথা যোগালো না। একদৃষ্টে শুধু চেয়ে রইলেন শরৎবাবুর মুখের পানে।

সেই সাহিত্যজগজ্জ্যোতি—প্রতিভা ও মনীষার অবতার—সাহিত্য-তপস্যানিষ্ঠ—মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর

হরপ্রসাদ গ্রন্থাবলী

কাঞ্চনমালা, বেণের মেয়ে, মেঘদূত, বাল্মীকির জয়, ভারত-মহিলা, বাংলা সাহিত্য সমালোচনা, ঐতিহাসিক নিবন্ধ-মালা, শিক্ষাসন্দর্ভ, সমাজসংস্কার নিবন্ধ-রাজি, মোহিনী।

এই জাতীয় সাহিত্য-জয়ন্তী দুই ভাগ একত্রে পাঁচ টাকা।

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড
১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট,
কলিকাতা-১২

যা দেখেছি, যা পেয়েছি

স্মৃতিচয়ন

শ্রীসুধীরঞ্জন দাস

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

॥ ত্রিংশ অধ্যায় ॥

ফেডারেল ও সুপ্রিম কোর্টের জজীয়তী
(১)

উনিশ শ' পঞ্চাশ সালের ২০শে জানুয়ারী প্রাতঃস্নান করে প্রাতরাশ সেরে গেলাম ফেডারেল কোর্টের দিকে। সে সময় ফেডারেল কোর্ট বসত গোলাকৃতি পার্লামেন্ট ভবনের ভিতরে, যেখানে আগে বসত দেশীয় রাজন্যবর্গের সম্মিলিত সভা। এর নাম ছিল "Princes' Chamber". যাঁরা দিল্লীর পার্লামেন্ট ভবন দেখেছেন তাঁরা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন যে, একটা বেশ চওড়া পথ বা corridor গোটা বাড়িটার চারিদিক ঘিরে গিয়েছে। ওই মস্ত বড় বাড়িটার দক্ষিণ দিকে এবং অধিকরণের North Block-এর উত্তরে যে একটি গাড়িবারান্দা আছে তাই দিয়ে এই Princes' Chamber-এ ঢোকবার পথ সাধারণের জন্যে। সেই গাড়িবারান্দা ছাড়িয়ে একটু গেলেই পড়ে একটা বড় আঙিনা সেখানে ছিল লর্ড রেডিংয়ের মস্ত বড় একটা ব্রোঞ্জ মূর্তি এই পার্লামেন্ট ভবনের দিক মুখ করে দাঁড়ান। সেখানে ছিল একটি ছোট দরজা যেখান দিয়ে খালি রাজন্যবর্গের Chancellor যেতে পারতেন। সেই দরজা দিয়ে ঢুকে গোল corridor-টা ডিঙিয়ে গেলেই ছিল Chancellor-এর প্রকাণ্ড Robing Room যেখানে Chancellor কাপড় বদলিয়ে রাজপোষাক পরে Princess Chamber-এ পৌরোহিত্য করতে যেতেন। এই ঘরের প্রবেশপথের ঠিক উল্টো দিকে ছিল একটি দরজা এবং সেই দরজার পরেই ছিল সামনের দিকে বের করা বৃত্তাকার একটি সাঙ্ঘারী ধরণের মঞ্চ। এখানে বড় জমকালো চেয়ারে বসতেন Chancellor. সে মঞ্চের নিচেই ছিল মেঝে থেকে ঈষৎ উঁচু জায়গা যেখানে টেবিল চেয়ার নিয়ে বসত Chancellor-এর সচিব, রেখাঙ্কর লেখক ও অন্যান্য কর্মচারিবৃন্দ। Chamber-এর আকৃতিটি ছিল অর্ধ গোলাকার। দেখতে যেন ছড়ান জাপানী হাতপাখা। মেঝেটা পুরু লাল বনাত দিয়ে মোড়া। হাজার হোক "Highness"-রা সেখান দিয়ে গিয়ে বসতেন তো নিজ নিজ আসনে। চারভাগে ভাগ করা গ্যালারী মেঝে থেকে উঠে গিয়েছে দেয়ালের প্রায় অর্ধেক পর্যন্ত। প্রত্যেক গ্যালারীর মধ্যে বেশ চওড়া পথ লাল বনাতে ঢাকা। প্রত্যেকটি আসন নরম লাল চামড়ায় মোড়া এবং সামনে ছোট একটু ডেস্ক। এই ঘরের উপরে এগিয়ে অলেস্ত বৃত্তাকার বারান্দা বা Balcony এবং তার উপরে ছিল সাধারণ দর্শকদের গ্যালারী। এই Balcony-র গায়ে অঙ্কিত ছিল রাজন্যবর্গের বিবিধ এবং বিচিত্র monogram বা Court of arms. Balcony-র উপরে বৃত্তাকারে ছিল নানা ধাঁচের জাফরী-কাটা জানালা এবং ঘরের উপরে ছিল মস্ত বড় একটা গম্বুজ। দেশ স্বাধীন হবার পর Princes' Chamber-এর কাজ বন্ধই হয়ে গিয়েছিল এবং সেইখানেই বসত ফেডারেল কোর্ট। Chancellor-এর Robing Room-টা হোলো ফেডারেল কোর্টের চীফ জাস্টিস অর্থাৎ ভারতের মুখ্য ন্যায়াধীশের খাসকামরা। বাইরের corridor-এ বেশ বড় বড় কামরায় ছিল অন্যান্য জজেদের খাসকামরা। ফেডারেল কোর্টের সেরেস্তা ছিল দোতলায় যেখানে বিরাজ করতেন রেজিস্ট্রার, ডেপুটি রেজিস্ট্রার ও অন্যান্য কর্মীরা।

লর্ড রেডিংয়ের ব্রোঞ্জ মূর্তিটির সামনে যে ছোট দরজা ছিল সেইখানে গাড়ি থেকে নামতেই ফেডারেল কোর্টের রেজিস্ট্রার পি এন মূর্তি আমাকে সমাদরে অভ্যর্থনা করে আমাকে একটা ঘরে নিয়ে গিয়ে বললেন যে, এইটে হবে আমার খাসকামরা। আমাকে কাপড় বদলিয়ে নিতে বলে তিনি বাইরে গেলেন। আমি জজের কোট, ব্যান্ড ও গাউন পরে নিলাম। মূর্তি এসে আমাকে চীফ জাস্টিসের ঘরে নিয়ে গেলেন। সেখানে গিয়ে দেখি অন্য চারজন জজও সেজেগুজে হাজির। চীফ জাস্টিস কানিয়া আমার সঙ্গে করমর্দন করে আমাকে এঁদের সকলের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন—ফজল আলি, পাতঞ্জলি শাস্ত্রী, মেহেরচন্দ মহাজন ও বিজন মুখার্জি। মহাজন ও বিজনবাবুর সঙ্গে আমার আগেই আলাপ ছিল। চীফ জাস্টিস কানিয়া সাহেব তাঁর লাল রঙের গুজরাটি পাগড়ি পরে আমাকে শপথ পাঠ করালেন। কি সব কাগজ সই করলাম। আবার চীফ জাস্টিস ও অন্যান্য জজেদের সঙ্গে করমর্দন করা গেল। হঠাৎ মেহেরচন্দ মহাজন বলে উঠলেন—

"I say Lord, one Bengali was bad enough but now we have two to reckon with."

কথাটা যে তিনি পাতঞ্জলি শাস্ত্রীকেই উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন সেটা পরে জেনেছি, কেন না তিনি তাঁকেই "Lord" বা "Lord Buddha" বলে সম্বোধন করতেন। কথাটা শুনে বিজনবাবু ঈষৎ হেসে বললেন—

"Well brother Mahajan, this Bengali is an innocent poor Brahmin but the new Bengali is coming via Punjab, i.e. half a Punjabi. So be careful."

খুব হাসাহাসি হোল। সেই যে মহাজন সাহেবের সঙ্গে ভাব হোল তা উত্তরোত্তর গভীর হয়ে উঠে আজ পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ রয়েছে। কোর্টের সময় হতে কানিয়া সাহেব ও আমরা পাঁচজন জজ একের পিছনে আরেকজন করে এক লাইনে কোর্টের মঞ্চে গিয়ে মাথা নিচু করে নিচে সমাগত আইনজীবীদের নমস্কার করে যার যার চেয়ারে বসে পড়লাম। সামনে চেয়ে দেখি উপরের Balcony-তে বড় ঘড়িটার পাশেই বুদ্ধ বসে আছেন। মনে হোল যেন মাথা নেড়ে আমাকে উৎসাহ ও শুভেচ্ছা তিনি জানালেন। কোর্টের কাজ

শুরু হোলো এবং সেই সঙ্গে আরম্ভ হোলো আমার কর্মজীবনের নতুন এক অধ্যায়।

(৫২)

ছয় দিন পরেই অর্থাৎ ২৬শে জানুয়ারীতে আমাদের নতুন সংবিধান কার্যকরী হলো এবং সেই সঙ্গে ফেডারেল কোর্টের নতুন নামকরণ হলো সুপ্রিম কোর্ট অফ ইণ্ডিয়া। আগে থেকেই বন্দোবস্ত করা হয়েছিল যে ভারতবর্ষের সব হাইকোর্টের চীফ জাস্টিসদের ও অন্যান্য সম্ভ্রান্ত লোকেদের নিমন্ত্রণ করে নতুন কোর্টের উদ্বোধন করা হবে। এক কলকাতার স্যার ট্রেভর হ্যারিস—যিনি তাঁর পায়ের অসুখের জন্য একেবারেই চলচ্ছক্তিরহিত হয়ে গিয়েছিলেন—তিনি ছাড়া বোধ হয় আর সব হাইকোর্টের সব চীফ জাস্টিসরাই সে অনুষ্ঠানে এসেছিলেন। আর উপস্থিত ছিলেন স্যার মরিস গয়ার, যিনি তখন ফেডারেল কোর্ট থেকে অবসর নিয়ে দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হয়ে সেই বিশ্ববিদ্যালয়টিতে নতুন প্রাণসঞ্চারের কাজে ব্রতী হয়েছিলেন। তাঁরও পায়ে কি অসুখ হওয়ায় তিনি crutch ছাড়া হাঁটতে পারতেন না। তিনি ছিলেন ফেডারেল কোর্টের প্রথম এবং বিশিষ্ট চীফ জাস্টিস। শুনেছি যে Government of India Act 1935-এর মুসাবিদাটা তিনিই করেছিলেন এবং সেই Act-এর মর্মার্থ নিয়ে কোন প্রশ্ন উঠলে তিনিই তার সদুত্তর দিতে পারবেন এই মনে করে তাঁকেই ফেডারেল কোর্টের প্রথম চীফ জাস্টিস করে পাঠান হয়েছিল। সুতরাং এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে স্যার মরিস গয়ারের উপস্থিতি অবশ্য প্রয়োজনীয় ছিল। তিনি এসেও ছিলেন। আমরা ছয়জন জজ সেজেগুজে চীফ জাস্টিস কানিয়ার ঘরে সমবেত হলাম। মহাজন সাহেব সাধারণত খালি মাথায় কোর্টে বসতেন। কিন্তু এই উদ্বোধনীর বিশেষ দিনে মাথায় প্রকাণ্ড পাগড়ি বেঁধে এসেছিলেন, বোধ হয় তাঁর পাঞ্জাবীত্বটা উগ্র রকমে জানিয়ে দিতে। কিন্তু বলতেই হবে যে বেশ মানানসই দেখাচ্ছিল তাঁকে। কানিয়া পরেছিলেন লাল রঙের বাঁধা গুজরাটি পাগড়ি, পাতঞ্জলি শাস্ত্রীর মাথায় ছিল ধবধবে সাদা পাগড়ি। আর ফজল আলি সাহেব, বিজনবাবু ও আমি খালি মাথায় কালো কোট, ব্যান্ড এবং গাউন চড়িয়ে হাজির হলাম। চীফ জাস্টিস কানিয়ার পেছু পেছু সিনিয়রিটি হিসেবে লাইন দিয়ে কোর্ট রুমে ঢুকলাম। আমরা কোর্ট ঘরে ঢুকে দেখি যে নিচে বাঁদিকের গ্যালারীর প্রথম সারে বসে আছেন স্যার মরিস গয়ার এবং মাটিতে পড়ে আছে তাঁর দুটি crutch. এঁর পাশেই বসে ছিলেন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু। তাঁর পেছনে আরো কজন মন্ত্রী। নিচের অন্যান্য গ্যালারীতে বসেছিলেন দিল্লীর ও অন্যান্য জায়গা থেকে সমাগত গণ্যমান্য নিমন্ত্রিত লোকেরা। উকিল, ব্যারিস্টার ও এজেন্টে ঘর একেবারে ভরে গিয়েছিল। মাথার উপরে Balcony-তে ছিলেন বিশিষ্ট মহিলাবৃন্দ। সামনের সারিতেই ছিলেন লেডী কানিয়া, বেগম ফজল আলি, তারপর মহাজন সাহেবের সহধর্মিণী ও আমার স্ত্রী। বিজনবাবুর স্ত্রী বহুকাল আগেই মারা গিয়েছিলেন। পাতঞ্জলি শাস্ত্রীর সহধর্মিণী দিল্লী পছন্দ করতেন না এবং মাদ্রাজেই বেশির ভাগ সময় থাকতেন। তিনি বোধ হয় সেদিন দিল্লী ছিলেন না—যতদূর মনে পড়ে। আমরা ছয়জন জজ এক লাইনে বসেছিলাম সামনে বের করা বেঞ্চাকার মঞ্চটার উপরে। আমাদের অব্যবহিত নিচেই জায়গা করা হয়েছিল ভারতের যাবতীয় হাইকোর্টের চীফ জাস্টিসদের যাঁরা সেদিন উপস্থিত হতে পেরেছিলেন। তাঁদের চেয়ার দেওয়া হয়েছিল ইংরেজী বর্ণানুক্রমে অর্থাৎ এলাহাবাদের চীফ জাস্টিসের চেয়ারখানা ছিল লাইনের গোড়ায়। সে সময় এলাহাবাদের চীফ জাস্টিস ছিলেন বিধুভূষণ মালিক। তাঁর পাশেই বসেছিলেন বম্বে হাইকোর্টের চীফ জাস্টিস চাগলা সাহেব। এই রকম করে অন্যান্য হাইকোর্টের চীফ জাস্টিসেরা যাঁরা এসেছিলেন তাঁরা তাঁদের হাইকোর্টের নামের বর্ণানুক্রমে চেয়ার পেয়েছিলেন। আমরা ঘরে ঢুকতেই সমাগত সকলেই উঠে দাঁড়িয়ে আমাদের স্বাগত জানালেন। আমরা যে যার আসনের সামনে দাঁড়িয়ে মাথা নুইয়ে সবাইকে প্রতি নমস্কার করে বসে পড়লাম। তারপর ভারতের প্রথম এটর্নী জেনারেল মতিলাল চিমনলাল শীতলবাদ প্রথমে উঠে একটি লিখিত ভাষণে নতুন কোর্টকে স্বাগত জানিয়ে দেশবাসীরা এই আদালতের কাছ থেকে কি প্রত্যাশা করেন তা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করলেন। তারপর চীফ জাস্টিস কানিয়া তাঁর প্রতিভাষণে নতুন সংবিধানের সর্তানুসারে এই নতুন আদালতের কি কর্তব্য তা বিশ্লেষণ করে দেশবাসীদের আশ্বাস দিলেন যে এই ধর্মাধিকরণ জনসাধারণের সকল অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখতে এবং নতুন সংবিধানকে সকল রকমে জয়যুক্ত করতে সর্বদা যত্নবান থাকবেন। তাঁর সেই ভাষণ থেকে অল্প একটু উধৃত করছি—

"The Supreme Court, an all-India Court, will stand firm and aloof from party politics and political theories. It is unconcerned with the changes in the Government. The Court stands to administer the law for the time being in force, has good will and sympathy for all but is allied to none ... We hope and trust the Court will maintain the high traditions of the judiciary and perform its duties without fear or favour."

এই দুইটি ভাষণ I.L.R. 1 Supreme Court Reports-এ ছাপা হয়ে আছে। এই প্রতিভাষণ পাঠের পরই অনুষ্ঠান শেষ হলো। আমার ছয় দিনের ফেডারেল কোর্টের জজীয়তী শেষ হয়ে সুপ্রিম কোর্টের জজীয়তী শুরু হলো।

(৫৩)

দেখতে দেখতে জানুয়ারী মাসটা কেটে গেল। ইতিমধ্যে পাঞ্জাব হাইকোর্ট থেকে "Last Pay Certificate" যা এসে গেল তার সঙ্গে আমার মাইনের বিল দাখিল করলাম। পয়লা ফেব্রুয়ারী আমার সতীর্থগণ সবাই মাইনে পেলেন। কিন্তু আমার মাইনের কোন টাকাই জমা হয় নি। আমাদের রেজিস্ট্রার পি, এন, মূর্তি জানালেন কি একটা গোল হয়েছে কোন জায়গায়। ভাবলাম যে আমার জানুয়ারীর মাইনের আগের দিকটা দেবে পাঞ্জাব সরকার এবং শেষের দিকেরটা দেবে ভারত সরকার এবং সেই সব ভাগাভাগি করতে গিয়ে হয়ত একটু দেরি হচ্ছে। কিন্তু বেশ কয়েকদিন কেটে যাবার পরও যখন কোন ব্যবস্থা হলো না তখন যে খানিকটা অস্বস্তি হয় নি তা বলতে পারব না। গল্প শুনেছিলাম এক ব্যক্তির কি একটা চাকরি হবার কথা শুনে তার নিন্দুক বন্ধু নাকি বলেছিল—"চাকরি পেয়েছে বটে, তবে মাইনে পায় না।" আমার অবস্থাও যে তা-ই হয়ে দাঁড়াল। খোঁজ করে যা জানলাম তাতে দুশ্চিন্তার সামান্য একটু কারণ ছিল বলেই মনে হলো। ব্যাপারটা তবে বুঝিয়েই বলি।

নতুন সংবিধানের ৩৭৪ আর্টিকেল-এ বলা ছিল :

"The Judges of the Federal Court holding office immediately before the commencement of this Constitution shall, unless they have elected otherwise, become, on such commencement, the Judges of the Supreme Court and shall thereupon be entitled to such salaries and allowances and to such rights in respect of leave of absence and pension as are provided for under article 125 in re-

pect of the Judges of the Supreme Court."

... আমি যে নতুন সংবিধান চালু হবার আগে ফেডারেল কোর্টের জজ ছিলাম তাতে সন্দেহ নেই। সুতরাং ৩৭৪ আর্টিকেল-এর বলে যে আমি রাতারাতি সুপ্রিম কোর্টের জজ হয়ে গেলাম তাতেও কোন ভুল নেই। তা যদি হয়—এবং এ সম্বন্ধে যখন কেউ প্রশ্ন তোলে নি—তখন দেখতে হবে যে আর্টিকেল ১২৫ অনুসারে আমি কি মাইনে ইত্যাদি পাব। সেই আর্টিকেল-এ লেখা আছে—

"There shall be paid to the Judges of the Supreme Court such salaries as are specified in the Second Schedule."

দ্বিতীয় তপশীলের Part ... দ্বারাতে যা বলা হয়েছে তা এই—

"9. (1) There shall be paid to the Judges of the Supreme Court, in respect of time spent on actual service, salary at the following rates per mensem, that is to say—

The Chief Justice Rs. 5,000/-
Any other Judge Rs. 4,000/-"

এর পরে একটা Proviso ছিল যা বিবেচনা করবার প্রয়োজন হবে না। তার পরের দুটি Sub-Paragraph খুবই জরুরী। তাদের বক্তব্য হলো এই ধরণের—

(2) Every judge of the Supreme Court shall be entitled, without payment of rent to the use of an official residence.

(3) Nothing in sub-paragraph (2) of this paragraph shall apply to a judge who, immediately before the commencement of this Constitution—

(a) was holding office as the Chief Justice of the Federal Court and has become the Chief Justice of the Supreme Court under Clause (1) of article 374, or

(b) was holding office as any other Judge of the Federal Court and has on such commencement, become a judge (other than Chief Justice) of the Supreme Court under the said Clause, during the period he holds office as such Chief Justice or other Judge, and every judge who so becomes the Chief Justice or other judge of the Supreme Court shall, in respect of time spent on actual service as such Chief Justice or other judge, as the case may be, be entitled to receive in addition to the salary specified in sub-paragraph (1) of this paragraph as special pay an amount equivalent to the difference between the salary so specified and the salary which he was drawing immediately before such commencement."

উপরোক্ত sub-paragraph-গুলির মর্ম অনুসারে চীফ জাস্টিস কানিয়া এবং আমরা পাঁচজন জজ যারা ফেডারেল কোর্ট থেকে সুপ্রিম কোর্টে এসেছি আমরা কেউই sub-paragraph (২)-এর সুযোগ পাব না অর্থাৎ বিনা ভাড়ায় বাড়ি পাব না। কিন্তু আমরা প্রত্যেকে sub-paragraph (৩)-এর শেষের দিকের বিধান অনুসারে আমরা নতুন সংবিধান চালু হবার আগে যে মাইনে draw করতাম তার আর সুপ্রিম কোর্টের জজেদের জন্যে sub-paragraph (১)-এ যে মাইনে ধরা ছিল তার মধ্যে যেটুকু পার্থক্য সেটুকু Special pay বলে পাব। অর্থাৎ সুপ্রিম কোর্টের জজেদের বরাদ্দ মাইনের চেয়ে বেশি পাব বলে Sub-paragraph (২)-এর সুযোগ-সুবিধে পাব না। এতে বলবার কিছু নেই এবং আমার সতীর্থেরা বেশ রাজী খুশিতেই তাঁদের মাইনে নিয়ে নিলেন। কিন্তু আমার গেরো হলো এই—এবং এই ফ্যাকড়া তুললেন তদানীন্তন অডিটার জেনারেল নরহরি রাও—যে ২৬শে জানুয়ারী যেদিন নতুন সংবিধান বলবৎ হলো সেদিন আমি যে ফেডারেল কোর্টের জজ ছিলাম তা ঠিক, যদিও আমার কার্যকাল ছিল কুল্যে ছয়দিন মাত্র। কিন্তু আমি ত' ফেডারেল কোর্টের জজের মাইনে বাস্তবিক পক্ষে draw করি নি। সুতরাং sub-paragraph (৩)-এর বিধান অনুসারে আমি Special pay বলে কিছুই পাব না এবং আমাকে মাইনে নিতে হবে সুপ্রিম কোর্টের নবনিযুক্ত ... জজেরা যা পাবেন সেই টাকাটা অর্থাৎ চার হাজার টাকা মাত্র। মোদ্দা কথা দাঁড়াল যে আমি ফেডারেল কোর্টের জজ ছিলাম বলে বিনা ভাড়ায় বাড়ি পাব না এবং ফেডারেল কোর্টের জজেদের মাইনে draw করি নি বলে Special pay-ও পাব না। পাঞ্জাবের চীফ জাস্টিস বলে মাইনে পেতাম পাঁচ হাজার টাকা। সুপ্রিম কোর্টের উচ্চ পদ লাভের খেসারত হিসেবে মাইনেটা হাজার টাকা কমে গেল। খ্যাতির বিড়ম্বনা একেই বলে। তার উপর যদি কলকাতাতেই থেকে যেতাম কিংবা এখন ফিরে যাই তবে মাইনে চার হাজার পেলেও সেখানে নিজেদের বাড়িতেই থাকতে পেতাম বলে এক পয়সা বাড়িভাড়া দিতে হোত না। কিন্তু এক্ষেত্রে মাইনেও পাব চার হাজার টাকা আবার বাড়িভাড়াও পাব না Sub-paragraph (২)-এর মোতাবেক, কেন না আমি ফেডারেল কোর্টের জজ ত' ছিলাম-ই। এ যেন হলো শাঁখের করাত—দু'দিকেই কাটে। সর্দার প্যাটেলের সঙ্গে আলোচনা হতে তিনি বললেন যে টাকা-পয়সার ব্যাপারে নতুন সংবিধানে ভারতের অডিটার জেনারেলের মত অগ্রাহ্য করা সম্ভব নয়। কিন্তু যা হোক একটা ব্যবস্থা করতেই হবে। সর্দার প্যাটেল ছিলেন হুঁসিয়ার লোক। তিনি নিলেন আর্টিকেল ৩৯২(১)-এর আশ্রয়। সে আর্টিকেল অনুসারে—

"The President may, for the purpose of removing any difficulties, particularly in relation to the transition from the provisions of the Government of India Act 1935 to the provisions of this Constitution, by order direct that this Constitution shall, during such period as may be specified in the order, have effect subject to such adaptation, whether by way of modification, addition or omission, as he may deem to be necessary or expedient. Provided that ..."

অডিটার জেনারেল তাঁর আপন মতে অটল রইলেন। সুতরাং নিরুপায় হয়ে রাষ্ট্রপতি ৩৯২(১)-এর দেওয়া ক্ষমতাবলে একটি অর্ডার দিলেন যে সংবিধান যাই বলুক না কেন জাস্টিস সুধীরঞ্জন দাস সাড়ে পাঁচ হাজার টাকা মাইনেই পাবেন অর্থাৎ সুপ্রিম কোর্টের জজের মাইনে চার হাজার টাকা এবং পনের শ' টাকা Special pay একুনে সাড়ে পাঁচ হাজার টাকা। কাল ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল।

[ক্রমশঃ]

সালতামামির পটে

কংগ্রেস ও যুক্তফ্রন্টের ইমেজ

মনোজ হালদার

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

॥ চার ॥

গতবারের আলোচনায় শেষের দিকে সংসদীয় গণতন্ত্রের ইতিহাসে যুক্তফ্রন্টের নতুন পরীক্ষা যে কংগ্রেস ধরতে পারে নি তা বলা হয়েছে। কিন্তু কেন ধরতে পারে নি সে কথাটা একটু তলিয়ে দেখা যাক। প্রথমত পার্টি গভর্নমেন্ট আর ফ্রন্ট গভর্নমেন্টের মধ্যে বিরাট পার্থক্য থাকে। পার্টির নীতি হয় এক এবং লক্ষ্যও হয় তদ্রূপ। সেজন্য যে সরকার তাঁরা গঠন করেন সে সরকার পার্টি দৃষ্টিকোণের বাইরে যেতে পারে না এবং সদস্যরাও তার পার্টি-ডিসিপ্লিনের মধ্যে থেকে কাজ চালিয়ে যেতে বাধ্য থাকেন। তাই পার্টি গভর্নমেন্টের সঙ্গে ফ্রন্ট গভর্নমেন্টের পার্থক্য খুঁজতে গেলে যেটা চোখে পড়ে সেটা হচ্ছে ফ্রন্টের মধ্যে থাকে একাধিক পার্টি। সে পার্টিগুলির নীতি ও লক্ষ্য বিভিন্ন রকমের হওয়াই স্বাভাবিক কিন্তু সরকার গঠন করতে গিয়ে তো আর বিভিন্ন নীতি অনুসরণ করা যায় না—তাই তাদের মিলতে হয় একটি সম্মত কর্মসূচীর ভিত্তিতে। এই কর্মসূচীকে মেনে নিয়ে পার্টিগুলি একই সঙ্গে তাদের স্বাধীন অস্তিত্বসহ ও যৌথভাবে কাজ করতে অঙ্গীকারবদ্ধ হয় এবং এইভাবেই কাজ করে যায়। এখানে উল্লেখযোগ্য এই যে পার্টি গভর্নমেন্টের সদস্যদের পক্ষে ডিসিপ্লিনের প্রশ্নটা যেখানে ব্যক্তিগত হয়ে দাঁড়ায় সেখানে ফ্রন্ট গভর্নমেন্টের সদস্যদের বেলায় তা ব্যক্তিগত হয় না—হয় পার্টিগত। পার্টিগত ডিসিপ্লিনের মধ্যে ফ্রন্ট গভর্নমেন্টের সদস্যরা অনেকখানি স্বাধীনতা ভোগ করেন। অবশ্য এ স্বাধীনতা নিয়ন্ত্রিত হয় নিজ নিজ পার্টির হুইপ দ্বারা। পার্টি গভর্নমেন্ট থেকে এ গভর্নমেন্টের কর্মপ্রচেষ্টা সেজন্য অনেক ব্যাপক ও সুষ্ঠু হবার সম্ভাবনা থাকে। কোন জনবিরোধী কাজে পার্টি গভর্নমেন্টের সদস্যদের যেখানে ডিসিপ্লিনের ভয়ে সায় দিতে বাধ্য হতে হয়—সেখানে ফ্রন্ট গভর্নমেন্টে তা হয় না। বরং যেটা ঘটে সেটাই বাঞ্ছনীয়। পার্টি গভর্নমেন্টের 'মেজরিটি' থাকে বাঁধা—আর ফ্রন্ট গভর্নমেন্টকে প্রতিটি 'ইসু'তে মেজরিটি অর্জন করতে হয়। কাজেই জনবিরোধী কোন 'ইসু' এলে পার্টিগুলির হুইপের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ কবতে হবে সরকারকে। এই দৃষ্টিভঙ্গী থেকেই প্রধানত ফ্রন্ট গভর্নমেন্টের মন্ত্রী ও সদস্যদের চলতে হয়। রাজনৈতিক বিজ্ঞানের নিয়মানুযায়ী যুক্তফ্রন্টের এই চেহারাটা কংগ্রেসের চোখে ফুটে উঠল না। অথচ একটু লক্ষ্য করলে দেখতে পাওয়া যেত: প্রচুর মুলতুবী প্রস্তাব, দৃষ্টি আকর্ষণসূচক প্রস্তাব, মৌখিক উল্লেখ (oral refference) প্রশ্নের পর প্রশ্ন, বেসরকারী প্রস্তাব—এমন কি প্রচণ্ড সমালোচনা কিছুই যুক্তফ্রন্টের শরিক পার্টিগুলির পক্ষ থেকে বাদ দেওয়া হয় নি। কংগ্রেস এসব লক্ষ্য না করে খুব নিচু স্তরের রাজনীতি যা ইতিপূর্বে তাঁদের কথায় প্রকাশ পেয়েছিল, সেই ছ' মাসের মধ্যে ক্ষমতায় ফিরে আসার কথা—তার মধ্যেই তাঁরা তাঁদের দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করে রাখলেন এবং তারই জের স্বরূপ মুনাফাশিকারীর মনোভাব নিয়েই যুক্তফ্রন্টের কার্যকলাপকে দেখতে লাগলেন। অর্থাৎ তাঁরা মনে করলেন যুক্তফ্রন্টের সদস্যরা যখন তাঁদেরই সরকারের তীব্র সমালোচনা করছেন তখন এটা তাঁদের আভ্যন্তরীণ খেয়োখেয়ি, তাঁদের নোংরা দলাদলি। কংগ্রেসের একটানা পার্টি গভর্নমেন্টের প্রভাবাধীন সংবাদপত্রগুলি অনভিজ্ঞতাবশত এদিকটাতেই কংগ্রেসকে উৎসাহিত করতে লাগলেন এবং তাঁরা বলে দিতে চাইলেন: ফ্রন্টসরকার নিশ্চয়ই আভ্যন্তরীণ কলহে ভেঙে পড়বে। তোমরা শুধু জমি তৈরি করো।

জমি অবিশ্যি আগে থেকেই তৈরির চেষ্টা হচ্ছিল। আগে সেকথা বলেও আসা হয়েছে এবং তা হল রাজনৈতিক তত্ত্বের সংজ্ঞাধীন নয় এমন ধরণের extra-Parliamentary activities অর্থাৎ যার সরল মানে দাঁড়ায়, ষড়যন্ত্রমূলক কার্যক্রম অনুসরণ করে যাওয়া।

শুধুমাত্র এই কারণেই যুক্তফ্রন্ট সরকারের দু-দুটি বিধানসভা অধিবেশনে কংগ্রেস আদৌ রেখাপাত করতে পারল না। ধরা যাক আইন ও শৃঙ্খলা সম্পর্কে। প্রথমত আইন ও শৃঙ্খলা ভেঙে পড়ার কথা কংগ্রেস বার বার উল্লেখ করতে চাইল কেন? কি ইতিহাস ছিল এর পিছনে? কেরালায় এই আইন ও শৃঙ্খলা ভেঙে পড়ার অভিযোগটা উঠেছিল প্রথমে ও তারপরে তোলা হয়েছিল গণ-অভ্যুত্থানের কথা এবং পরিশেষে হয়েছিল নাম্বুদ্রিপাদ মন্ত্রিসভা বাতিল। কাজেই আইন ও শৃঙ্খলা ভেঙে পড়ার অভিযোগটা কংগ্রেসের একটা অজুহাত সৃষ্টি করা, এ কথা বুঝতে কারো বাকি রইল না। দ্বিতীয়ত বিরোধী দলের ভূমিকায় দাঁড়িয়ে কবে, কোথায়, কোন দেশে, কোন সরকারের বিরুদ্ধে কোন বিরোধী দল এই দাবি করেছে: 'আরও পুলিশ দাও', 'জনসাধারণকে লাঠি ও গুলীতে শায়েস্তা করো', শ্রমিক ও মেহনতী মানুষের বিরুদ্ধে পুলিশ লেলিয়ে দাও?' কি মার্চ মাসের, কি জুন-জুলাইয়ের অধিবেশনে—দুই অধিবেশনেই কংগ্রেস এই সুরেই কথা বলল। এতে বিরোধী দলের কোন ইমেজই ফুটে উঠল না। বিরোধী দলেরা চিরকালই পুলিশের বাড়াবাড়ি, তার দমননীতি এবং তার মাথায় ওঠাকেই সমালোচনা করে এসেছে কিন্তু এ এক আশ্চর্য ব্যাপার দেখা গেল বিরোধী দল হিসাবে কংগ্রেসের কার্যাবলীতে। বৃটিশ পার্লামেন্টে সরকারী দলের পর্যন্ত যা করার ঐতিহ্য নেই অর্থাৎ বিরোধী দল যখন পুলিশ বাজেটে পুলিশের নানা ত্রুটি-বিচ্যুতি নিয়ে আলোচনা ও অভিযোগ করেন তখন সরকারী দল শুধু কিজন্য ব্যয়-বরাদ্দ করা হচ্ছে সেই কথা বলেই ক্ষান্ত থাকেন—পুলিশের পক্ষ সমর্থন করেন না বা তাকে defend করেন না। কেন না পুলিশ তাতে আস্কারা পেয়ে যাবে। আমাদের দেশে সরকারী দল হিসাবে কংগ্রেসের এই নীতি মানা দূরের কথা, বিরোধী দল হিসাবেও কংগ্রেস এটা দেখাতে পারলেন না। তাহলে আইন ও শৃঙ্খলা চাইছেন এঁরা কার স্বার্থে—এ কথাটা স্বতই উঠে পড়ে।

'৬৭ সালের মার্চ মাসের ভোট অন অ্যাকাউণ্ট বাজেটটি সংবিধানের প্যাঁচে পড়ে যুক্তফ্রণ্ট সরকারকে আনতে হয়েছিল। তখন সরকারের নিজস্ব বাজেট উপস্থাপিত করা যায় নি। তাই জুন মাসে যখন ফ্রণ্ট সরকার নিজস্ব বাজেট আনলেন তখন কংগ্রেস দলের যে প্রচণ্ড সুযোগ এল, সে সুযোগের তাঁরা সদ্ব্যবহার করতে পারলেন না।

বাজেটে প্রায় ২১ কোটি টাকা ঘাটতি দেখানো হয়। এর কারণস্বরূপ দেখানো হয় যে সরকারী কর্মচারী, বেসরকারী বিদ্যালয়সমূহের শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মচারীদের মহার্ঘভাতার জন্য ১১:১৫ কোটি এবং চলতি বছরের জন্য ৯:৬২ কোটি টাকা দায় ঘোষণা করা হয়। বাজেট বক্তৃতায় রাজ্যের প্রতি কেন্দ্রের দৃষ্টিভঙ্গীর আলোচনা করে অর্থমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসু বলেন—সংবিধান অনুযায়ী দেশের উৎসজাত সমস্ত অর্থ রাজ্যগুলিতে বিতরণ করবার একমাত্র প্রতিষ্ঠান হল ফিনান্স কমিশন এবং সংবিধানপ্রণেতাদের এটাই ছিল উদ্দেশ্য। তিনি চতুর্থ ফিনান্স কমিশনের চেয়ারম্যান ডঃ পি ভি রাজমন্নারের কথা উদ্ধৃত করে দেখান যে—প্ল্যানিং কমিশন একটা আধা রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান (যেহেতু প্রধানমন্ত্রী তার চেয়ারম্যান এবং সদস্যরা সবাই তাঁর মন্ত্রিসভার সদস্য) এবং অর্থসম্পদ বিতরণ করার ক্ষেত্রে তার চেয়ে যখন ফিনান্স কমিশনই হচ্ছে সংবিধানসম্মত মাধ্যম তখন প্ল্যানিং কমিশন তার রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়ে যদি রাজ্যগুলিকে তার প্রাপ্য অংশ হতে বঞ্চিত করে তাতে রীতিমত গোলমাল হবার সম্ভাবনা দেখা দেয়। এবং পশ্চিমবঙ্গ তার জন্য ৪৪ কোটি টাকার জায়গায় ৩৪ কোটি অর্থাৎ ১০ কোটি টাকা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। শ্রীবসু সেজন্য আরও বলেন যে, কেন্দ্রীয় সরকার আমাদের ঘাটতি পূরণ করুক—একথা বলার চাইতে আমরা বলতে চাই তাঁরা আমাদের ন্যায্য প্রাপ্য আমাদের দিক।

॥ পাঁচ ॥

কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় কংগ্রেস দল বাজেটের এই আন্তরিকতাকে ধরতে পারলেন না। তাঁরা বাজেট বিতর্ক উদ্বোধন করালেন শ্রীশৈল মুখার্জীকে দিয়ে। শৈলবাবু বিষয়টা বোঝেন ভাল। তাছাড়া তিনি ছিলেন বিদায়ী কংগ্রেস মন্ত্রিসভার অর্থমন্ত্রী। এর ওপর তিনি সুবক্তাও বটে। আশা করা গিয়েছিল তিনি একটা উচ্চদরের সমালোচনা করবেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় দেখা গেল প্রথমেই তিনি ডেফিসিট বাজেট প্রসঙ্গে বলে বসলেন, colossal deficit. কে জানে, শৈলবাবু যুক্তফ্রণ্ট সরকারের বাজেট বলে কি না কিম্বা জ্যোতি বসু এই বাজেট উপস্থাপিত করছেন বলে কি না তিনি ঘাটতি কথাটার ওপরই বেশি জোর দিয়ে বসলেন। অর্থাৎ এ বাজেটের কোন উজ্জ্বল দিক নেই যেন। শৈলবাবু বক্তৃতা করতে উঠে একবারও মনে করতে পারলেন না কিম্বা হয়ত চেপেই গেলেন—ঐ একই সময়ে দিল্লীতে শ্রীমোরারজী দেশাইয়ের বাজেটও ঘাটতি বাজেট ছিল। দিল্লীতে বাজেট ঘাটতি হলে সেটা 'কলোসাল ডেফিসিট' হয় না—কলকাতায় যুক্তফ্রণ্ট সরকারের বাজেটে ঘাটতি হলেই কলোসাল ডেফিসিট হয়—এ কোন ধরণের যুক্তি তা বুঝে ওঠা দুষ্কর। তাছাড়া যেখানে সরকারী কর্মচারী, শিক্ষক প্রভৃতিদের মহার্ঘভাতা ইত্যাদির জন্য, রিলিফ প্রভৃতির জন্য ব্যয় বরাদ্দের কথা উল্লিখিত হয়েছে সেখানে 'ডেফিসিট' যদি হয় সেটা কি খুব দোষের হয়? কেন্দ্রে যখন সাধারণ মানুষের ওপর করভার চাপিয়ে, একচেটিয়া ব্যবসায়ীগোষ্ঠীর করভার লাঘব করে এবং অনাদায়ী শত শত কোটি টাকা ট্যাক্স ধনিকশ্রেণীর কাছ থেকে আদায় না করে ডেফিসিট হয় তখন, যেহেতু সেখানে কংগ্রেস দল ক্ষমতায় আসীন সেইহেতু তা দোষের হয় না একথা বললে কি কেউ তারিফ করবে? তাছাড়া একথা কে-ই বা না জানে সমস্যা-জর্জরিত পশ্চিম বাংলা পাট-চা প্রভৃতি বিভিন্ন শিল্প বাবদ যা কেন্দ্রীয় সরকারকে রাজস্ব যোগায় তার যতটুকু ফেরৎ পাওয়ার কথা তা সে পায় না। দলীয় স্বার্থের খাতিরে দিল্লীকে পশ্চিমবঙ্গের ন্যায্য পাওনা দিতে ইতিপূর্বে কংগ্রেস কখনো জোর করে বলে নি। কেন্দ্রও ফিনান্স কমিশনকে এড়িয়ে প্ল্যানিং কমিশন মারফৎ সমস্তটা রাজনৈতিক কায়দায় চালাবার চেষ্টা করে-ছেন। ফ্রণ্ট সরকারের বাজেটে এই সমস্যা-সঙ্কুল প্রদেশের স্বার্থে সেই বিষয়টাকেই তো দেশবাসীর সামনে তুলে ধরা হয়েছিল। কংগ্রেস দলের চিন্তার গভীরতা এবং দৃষ্টির প্রসারতা থাকলে এইটেই যে সুষ্ঠু ও একমাত্র পথ তাকে তাঁরা অভিনন্দন জানাতেন এবং এই দুর্ভাগা রাজ্যের স্বার্থে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিতেন। কিন্তু তা তাঁরা পারলেন না, উল্টে বাজেটে সস্তা রাজনীতি করা হয়েছে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে, এই অভিযোগ আনলেন। এ অভিযোগে জ্যোতিবাবুর বাজেটই দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করল সবচেয়ে বেশি।

অথচ শৈলবাবুর মধ্যে এই প্রসারিত দৃষ্টিভঙ্গী ছিল। কারণ তিনিই প্রথম লোক কংগ্রেস দলের মধ্যে যিনি জ্যোতিবাবু গ্রাম দখলের কথা সহসা বিধানসভায় হাজির করলে, ঝটিতি অভিনন্দন জানান। বিদেশী কোম্পানীকে স্বাধীন দেশের বুকে বসে দিনের পর দিন শোষণ করবার যে চুক্তি কংগ্রেস দল ১৯৫১ সালে করেছিলেন সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে যুক্তফ্রণ্ট সরকারের সঙ্গে দ্বিধা না করে হাত মেলানোতে কংগ্রেসের এই কাজ খুব বুদ্ধিদীপ্ত অভিব্যক্তি বলেই মনে হয়েছে। সমস্ত সংবাদপত্রে রেডিওতে কংগ্রেসেরও এই গ্রাম দখলের ব্যাপারে যে অংশ গ্রহণ তাকে যথাযথ মর্যাদা দেওয়া হয়েছিল। ঠিক এই জিনিসই ঘটতে পারতো বাজেট সম্পর্কেও। কেন্দ্রীয় সরকারের বিমাতৃসুলভ মনোভাবের বিরুদ্ধে পশ্চিমবঙ্গের দলমত নির্বিশেষে সকল মানুষকে একসঙ্গে দাঁড়াবার যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা ছিল এবং ফ্রণ্ট সরকারের বাজেট সে সুযোগ এনে দিয়েছিল। অনায়াসে তাঁরা এই সুযোগে পশ্চিমবঙ্গের পর্বতপ্রমাণ দারিদ্র্য ও অর্থাভাবকে দূর করার উদ্দেশ্যে এবং এ বিষয়ে তাঁদের যে গৌরবময় ঐতিহ্য আছে সেটাকে রীতিমত ঊর্ধ্বে তুলে ধরতে পারতেন। তাতে তাঁদের আন্তরিকতায় দেশবাসী খুশি হত। তারা বুঝত যে কংগ্রেস এখনও পশ্চিমবঙ্গবাসীর জন্য কিছু করতে চায়—শুধু ক্ষমতা পাবার জন্য ব্যাকুল নয়। কিন্তু প্রসারিত দৃষ্টির অভাবের দরুণ সেদিক দিয়ে বিরোধিতার জন্য "বিরোধিতা" করা ছাড়া অন্য রাস্তা ধরতে পারল না।

সাপ্তাহিক বসুমতীর চাঁদার হার

সাপ্তাহিক বসুমতীর বাৎসরিক চাঁদা সডাক ১৮ টাকা, ষাণ্মাসিক ৯ টাকা ও ত্রৈমাসিক ৪.৫০ টাকা। প্রতি সংখ্যা ৩০ পঃ।

তিন মাসের কমে গ্রাহক করা হয় না। গ্রাহক হতে হলে অফিসে অগ্রিম টাকা জমা দিতে কিংবা মনি অর্ডারে টাকা পাঠাতে হবে।

—কর্মাধ্যক্ষ, বসুমতী

'মুক্তকেশের পুঞ্জ মেঘে
লুকায় অশনি'
সাধনার
মহাভৃঙ্গরাজ তৈল
মেঘের মত ঘন কুন্তল কেশদাম নারীদের আভিজাত্যের নিদর্শন। তাই কবি বলেছেন—
"চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা"
সেইজন্য সৌন্দর্য বিলাসিনী মাত্রেই ব্যবহার করেন সাধনার মহাভৃঙ্গরাজ তেল
বিশুদ্ধ আয়ুর্বেদ মতে প্রস্তুত স্নিগ্ধ ও শীতল। কেশ উৎপাদনে ও সংরক্ষণে এর জুড়ি নেই।
সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা
৩৬, সাধনা ঔষধালয় রোড, সাধনা নগর, কলিকাতা-৪৮
অধ্যক্ষ যোগেশচন্দ্র ঘোষ, এম, এ, আয়ুর্বেদশাস্ত্রী, এফ, সি, এস (লণ্ডন).
এম, সি, এস (আমেরিকা) ভাগলপুর কলেজের রসায়নশাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক।
কলিকাতাকেন্দ্র-ডাঃ নরেশচন্দ্র ঘোষ, এম, বি, বি, এস (কলিঃ) আয়ুর্বেদাচার্য্য

এতে কংগ্রেসের ইমেজ কোথায় নেমে যাচ্ছে তার হিসাব করার বোধহয় কংগ্রেসের তখন অবকাশও ছিল না।

বাজেটে আরও যে বিষয়টা নিয়ে তাঁরা চেঁচামেচি করার চেষ্টা করলেন সেটা হল ঘেরাও প্রসঙ্গ। প্রথমত ঘেরাওটাকে তাঁরা ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের একটা অঙ্গ হিসাবে দেখতে চেষ্টা করলেন না। পৃথিবীর সব দেশেই 'স্ট্রাইক', 'স্টে-ইন-স্ট্রাইক' এসব পদ্ধতি প্রচলিত আছে। এই দেশেও বহুবার এসব পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে। যুক্তফ্রন্ট সরকার হবার দরুণই যে ঘেরাও শুরু হল এমন কিছু নয়। ১৯৫৩ সালে পশ্চিমবাংলার সমস্ত শিল্পাঞ্চলে ব্যাপক ঘেরাও হয়েছিল। বিড়লার বিখ্যাত হিন্দুস্থান মোটর্সে ঐ সালের ১৪ই সেপ্টেম্বর পূজা-বোনাসের দাবিতে সকাল ৭টা থেকে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত ঘেরাও হয়েছিল। তাছাড়া প্রতি বছরই পূজার সময় অধিকাংশ কলকারখানা সওদাগরী অফিস প্রভৃতিতে কোন না কোন ধরণের ঘেরাও হয়েছে। কথা উঠতে পারে হিংসা-অহিংসার ব্যাপার নিয়ে, ল-অ্যান্ড-অর্ডারের প্রশ্ন নিয়ে। সেগুলি কোথায় কিভাবে লঙ্ঘিত হল তা নিয়ে হয়ত বিতর্ক হতে পারে। কিন্তু ঘেরাও একটা হঠাৎসৃষ্ট সমস্যা ছিল না।

তাছাড়া এত ঘেরাওই বা হল কেন? কংগ্রেস দল এর কারণ খোঁজবার আদৌ চেষ্টা করল না। বিদেশী পুঁজির চাপে এবং দেশের মানুষের ক্রয়ক্ষমতার অভাবে সঙ্কুচিত আভ্যন্তরীণ বাজারের দরুণ আমাদের সমস্ত শিল্পে নেমে এসেছে বিরাট মন্দা। তাই মন্দার জন্য শিল্পপতিরা তাদের সঙ্কটের সমস্ত বোঝাটা চাপিয়ে দিতে চাইছিল শ্রমিকদের ঘাড়ে। তাই একদিকে তারা 'ছাঁটাই' 'লে-অফ' যেমন করবার চেষ্টা করছিল তেমনি মজুরী হ্রাস, চাকুরীর নিরাপত্তা ও ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার প্রভৃতি কেড়ে নিতে চাইছিল। শ্রমিকশ্রেণী কখনো এসব নির্বিবাদে মেনে নেয় না। পৃথিবীর কোন দেশের শ্রমিক এসব মেনে নিয়েছে—এমন ইতিহাস নেই।

তাই এই আসল প্রশ্নের দিকে না গিয়ে তাঁরা যেকথা বলতে চাইলেন সেও এক অভিনব কথা এবং তা মালিকশ্রেণীর পক্ষে নির্লজ্জ ওকালতী ছাড়া আর কিছু নয়। তাঁরা বললেন, ঘেরাওকে দমন করতে হবে কারণ এর জন্য মূলধন স্থানান্তরিত হবে। অর্থাৎ প্রকারান্তরে মালিকশ্রেণীকে বলতে চাইলেন যুক্তফ্রন্ট সরকারকে জব্দ করার জন্য শিল্পে অচলাবস্থার সৃষ্টি করো। কেন না একথা সবাই জানে, মূলধন স্থানান্তরিত করা অতো সোজা ব্যাপার নয়। প্রথমত রেল ও বন্দর, নগর ও যোগাযোগ. সস্তায় শ্রম ও অবিচ্ছিন্নভাবে কাঁচা মালের যোগান পাওয়া যেখানে সম্ভব সেখানেই টাকা ঢেলে কলকারখানা হয়। তাছাড়া এ্যালায়েড এবং অক্সিলিয়ারী বা ফিডার ইন্ডাস্ট্রিজেরও সুযোগ থাকা চাই। এসব থেকে দূরে চলে যাওয়া কোন শিল্পপতির পক্ষেই সম্ভব নয়।

তাই ঘেরাও প্রসঙ্গে শ্রমিক ও মেহনতী জনসাধারণের কাছে কংগ্রেসের কথাগুলি তাদের স্বার্থবিরোধী কথা বলেই ফুটে উঠল। শ্রমিকশ্রেণীর ব্যাপক অংশের কাছে কংগ্রেসের আর কোন আসন রইল না। অথচ বাজেটে শ্রমিকদের দুরবস্থায় এই মুহূর্তে কি করা উচিত সরকারের, তার কর্মপদ্ধতি নিয়ে হাজির হলে যুক্তফ্রন্ট সরকার তা মানতে বাধ্য হত এবং তাতে উপকৃত শ্রমিকসাধারণ কংগ্রেসকে সম্মুখের সারিতে দেখতে পেত।

॥ ছয় ॥

দুটি অধিবেশনেই কংগ্রেসের ব্যর্থতা ফুটে উঠল শোচনীয়ভাবে। শুধু ট্রাম দখল ব্যাপারটুকু ছাড়া। কেন কংগ্রেসের এই দেউলিয়াপনা—সেকথা বলতে গিয়ে মুলতুবী রেখে এসেছি আগে। বিধানসভায় পরিষদীয় গণতন্ত্রের মাধ্যমে এগিয়ে যাওয়ার চেয়ে—যেহেতু ছ' মাসের মধ্যে ক্ষমতায় ফিরে আসতে হবে, যেহেতু ক্ষমতা না পেলে তাঁরা থাকতে পারেন না সেইহেতু তাঁদের কার্যধারা প্রধানত বিধানসভার বাইরে কেন্দ্রীভূত করাটাকেই তাঁরা বাঞ্ছনীয় বলে মনে করলেন। তার জন্য গোড়াতেই তাঁরা বেছে নিলেন তাঁদের সঙ্গে যে যে শক্তি যোগ দিতে পারে, তাঁদের। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য যারা তাদের কথা বলছি—

(১) সেই সব অফিসার যাদের সঙ্গে গত বিশ বছর ধরে মন্ত্রী থাকাকালীন কংগ্রেস নেতাদের ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল, (২) সেই সব ব্যবসায়ী মহল কংগ্রেস গদিচ্যুত হওয়ায় যাদের অসুবিধা হয়েছিল, (৩) সেই সব শিল্পপতি যারা মন্দার দরুণ কারখানায় শ্রমিক ছাঁটাই করতে চায় অথচ যুক্তফ্রন্ট সরকার তাদের পুলিশ দিচ্ছে না, (৪) সেই সব সাম্প্রদায়িকতাবাদী ও অসামাজিক ব্যক্তি কংগ্রেস সরকার থাকাকালীন যাদের স্বর্গরাজ্য ছিল এবং যুক্তফ্রন্ট সরকার হতে যাদের স্বর্গ হতে বিদায়লাভ ঘটেছিল এবং (৫) সেই সব উচ্চমহলের নেতা যাদের সঙ্গে বিদেশী গোয়েন্দা প্রতিষ্ঠানের রীতিমত যোগাযোগ ছিল।

প্রথমে সরকারী উচ্চপদস্থ অফিসার ও পুলিশ-প্রধানদের কথায় আসা যাক। দীর্ঘকাল ধরে চাকুরীর মাধ্যমে গোড়ায় ইংরাজদের এবং পরে কংগ্রেস মন্ত্রীদের সেবা করে এরা ঠিক যুক্তফ্রন্টের আন্দোলনকারী বা সংগ্রামী মন্ত্রীদের সহ্য করতে পারছিল না। সেজন্য এরা কিছু একটা করতে চাইছিল। তাই শেষ পর্যন্ত এদের কেউ কেউ কংগ্রেস নেতাদের সঙ্গে কংগ্রেস ভবনে, তাদের বাড়িতে এবং বিভিন্ন জায়গায় মিলিত হয়ে মতলব আঁটতে লাগল।

এর প্রথম প্রকাশ দেখা গেল বাগমারীর ঘটনায়। বাঙালী ও শিখদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধানোয়। যুক্তফ্রন্ট সরকার গদিতে বসতে না বসতেই এ দাঙ্গা শুরু হয়। এবং এটি যে ঘটবে রাজ্যের গোয়েন্দা বিভাগ স্বরাষ্ট্র দপ্তরে এর রিপোর্টও যথাসময়ে দিয়েছিল। কিন্তু স্বরাষ্ট্রদপ্তর নাকি এই রিপোর্ট গোপন রেখে দেন, ফ্রন্ট সরকারকে জানান না। কি সাংঘাতিক ব্যাপার—ভাবলেও শিউরে উঠতে হয়। অর্থাৎ যুক্তফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে—১৮ দফা কর্মসূচীর ভিত্তিতে সে সরকার কাজ করবে কিন্তু কর্মোদ্যমের প্রথম লগ্নেই তার সামনে এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি করো, যাতে সে না কিছু করতে পারে এবং দাঙ্গা বিস্তৃত হয়ে পড়লে চাই কি ফ্রন্ট সরকারের পতনও ঘটতে পারে। মুক্ত তরবারি আর অস্ত্র, বোমা ও গ্রেনেড নিয়ে ষড়যন্ত্রকারীরা নেমে পড়ল রাস্তায়। অসংখ্য ট্রাঙ্ককল বুক করা হল দিল্লীতে। দাঙ্গা বাধার আগেই প্রচারযন্ত্র প্রস্তুত। রাজধানীতে ছড়িয়ে দিতে হবে কলকাতায় শিখ-বাঙালী ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। পাঞ্জাবেও ছড়িয়ে পড়ুক দাঙ্গা। সেখানেও কংগ্রেসের অস্তিত্ব বিপন্ন। তাই উঠে দাঁড়াতে হবে এই সুযোগে।

কিন্তু দুর্ভাগ্য ষড়যন্ত্রকারীদের। যুক্তফ্রন্টের আঠারো দফার মধ্যে একটি দফা ছিল, 'সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা বিধান' করা। সেই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতেই হবে। যুক্তফ্রন্ট সরকারের মন্ত্রিসভা শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ঘরে বসে টেলিফোন তুলে কর্তব্য সমাধা করার মন্ত্রিসভা নয়—তাঁদের ছুটে যেতে হবে উন্মত্ত আত্মঘাতী, ভ্রাতৃঘাতী জনতার মাঝখানে। ছুটে গেলেন জ্যোতি বসু, বিশ্বনাথ মুখার্জী, ছুটে গেলেন অজয়বাবু, আর স্থানীয় বিধানসভা সদস্যা শ্রীমতী ইলা মিত্র। সঙ্গে সঙ্গে নামিয়ে দেওয়া হল মিলিটারী। চার ঘণ্টার মধ্যে দাঙ্গার পরিপূর্ণ অবসান। যারা ভেবেছিল বেশ দীর্ঘদিন ধরে রক্ত ঝরবে বাঙালীর, রক্ত ঝরবে কলকাতায় অবস্থানকারী সংখ্যালঘু শিখদের—

আর সেই রক্তের প্লাবনধারায় আরও রক্ত ঝরার পরিস্থিতি সৃষ্টি হলে সারা ভারত জুড়ে তাদের অর্থাৎ যুক্তফ্রণ্ট সরকারের বিরুদ্ধে চক্রান্তকারী রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ও তার দু-চারজন নেতা, রাইটার্স বিল্ডিংসের পদস্থ অফিসার, সাম্প্রদায়িকতাবাদী ব্যবসায়ী-গোষ্ঠী, সমাজ-বিরোধী শক্তি আর সি-আই-এ'র চরেদের আশা পূর্ণ হবে—তাদের সেই আশায় ছাই পড়ে গেল। সবচেয়ে ট্র্যাজেডি অভিনীত হল পরদিন বিধানসভায়। আবার কংগ্রেস-পরিষদ দলের নেতা শ্রীখগেন দাশগুপ্তের হাতে টেলিগ্রাম—যুক্তফ্রণ্ট সরকার মানুষের ধনপ্রাণ রক্ষা করতে অসমর্থ হয়েছে। টেলিগ্রাম পেয়েছেন তিনি দিল্লী থেকে। দিল্লী-ই যেন ও'দের সব কলকাঠি নাড়ছে। কিন্তু তাঁর অভিযোগের ফানুস মুহূর্তে ফেঁসে গেল যখন এম-এল-এ শ্রীকেষ্ট ঘোষ কলকাতা থেকে ট্রাঙ্ককল বুক করার একাধিক উদাহরণ দিলেন দাঙ্গার পূর্বাহ্ণেই। এর চেয়ে পূর্ব-পরিকল্পিত ব্যাপার আর কি থাকতে পারে ?

এরপর যুক্তফ্রণ্ট সরকার অফিসার মহলে কিছু অদল-বদল করলেও, পুলিশের কর্তামহলকে তেমনভাবে সামলাবার কোন কার্যকরী ব্যবস্থা করতে পারলেন না। ওখানে ষড়যন্ত্রের যে উৎস ছিল তা রয়েই গেল। এরপর একে একে রাণাঘাটের ঘটনা ঘটল, ঘটল হাওড়া হাটের ঘটনা। এণ্টালীর হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা।

রাণাঘাটে পুলিশ জনতার উপর গুলী চালালো। মারাও গেল কয়েকজন। মন্ত্রীরা ছুটে গেলেন ঘটনাস্থলে। দেখা গেল পিছনে উস্কানি ছিল। পুলিশ গুলী চালানোর জন্য জ্যোতিবাবু তাদের কয়েকজনকে সাসপেণ্ড করার নির্দেশ দিলেন। অজয়বাবু তখন কলকাতায় ছিলেন না। সহকারী মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু তখন মুখ্যমন্ত্রীরূপে কাজ করছেন। এতে পুলিশ মহল ভীষণভাবে ক্রুদ্ধ হল। এই সর্বপ্রথম পুলিশ সংবাদপত্রে খবর সরবরাহ করে প্রকাশ্যে মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে রাজনীতি করতে শুরু করে দিল। সংবাদপত্রে বেরুলঃ পুলিশকে কথায় কথায় মন্ত্রীরা যদি সাসপেণ্ড করতে থাকেন, তাহলে পুলিশ মন্ত্রীদের সেই কাজ মেনে নিতে পারে না। তা ছাড়া মন্ত্রীদের এ বিষয়ে এক্তিয়ারই বা কি আছে ? পুলিশের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ থাকলে তা তাদের ডিপার্টমেণ্টই যা কিছু করার করবে।

হাওড়ার ঘটনা আরও গুরুতর। হাওড়া হাটে মুসলিম সম্প্রদায়ের নমাজের স্থান নিয়ে কিছুদিন যাবৎ স্বার্থসংশ্লিষ্ট কোন ব্যক্তির সঙ্গে বিরোধ চলছিল। মুসলিম জনসাধারণ সেজন্য মুখ্যমন্ত্রী অজয়বাবুর কাছে প্রতিকার প্রার্থনা করেন। শোনা যায় মুখ্যমন্ত্রী নির্দেশও দিয়েছিলেন কর্তৃপক্ষকে। কিন্ত সে নির্দেশ পালিত হয় না। ঘটনার দিন এ বিষয়ে প্রাক্তন লোকসভা সদস্য মহম্মদ ইলিয়াস একথা কর্তৃপক্ষকে বলতে গেলে তিনি নৃশংসভাবে নির্যাতিত হন। এই ঘটনায় চারিদিকে যে বিক্ষোভ সৃষ্টি হয়—সেই বিক্ষোভকে কিভাবে পুলিশ নির্মমভাবে পিটিয়ে প্রতিশোধ নেবার চেষ্টা করে তা দেশবাসীর স্মৃতিপট থেকে আজো মুছে যায় নি। শুধু তাই নয় যুক্তফ্রণ্ট সরকারের ভূমিরাজস্বমন্ত্রী শ্রীহরেকৃষ্ণ কোঙারকেও পুলিশ তার উন্মত্ত আক্রমণ থেকে বাদ দিতে চায় নি। এই আক্রমণে হাওড়ার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, এম-এল-এ শ্রীঅপূর্ব মজুমদার কেউ-ই বাদ গেলেন না—সকলেই আহত হলেন। হাওড়ার ঘটনায় প্রথমত ছিল সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ধর্মীয় অনুষ্ঠানে হস্তক্ষেপ এবং সেই সঙ্গে তাদের ভিতরে সন্ত্রাস সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধিয়ে দেওয়া এবং এতেই আইন ও শৃঙ্খলা ভেঙে পড়েছে বলে কংগ্রেসের যে খেলা—সেই খেলাকে দেশের সামনে তুলে ধরা। তাই হাওড়ায় সেদিন পুলিশ শ্লোগান দিয়েছিল "যুক্তফ্রণ্ট সরকার ধ্বংস হোক।" এ থেকেই বোঝা যায় এরা কাদের নির্দেশে কাজ করে যাচ্ছিল।

এই সঙ্গে এণ্টালী অঞ্চলের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধানোর ঘটনাও উল্লেখযোগ্য। কলকাতা এবং পশ্চিমবাংলার কোন-না-কোন জায়গায় যদি একটা দাঙ্গা বা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা যায় এবং সেটাকে কোনরকমে দীর্ঘায়িত করা ও বিস্তৃত করা যায় তাহলেই বাজী মাৎ। প্রতিটি দাঙ্গা-হাঙ্গামার ব্যাপারে যুক্তফ্রণ্ট সরকারের মন্ত্রীরা যেমন ঝাঁপিয়ে পড়েন, এখানেও তাই পড়লেন। জ্যোতিবাবু, সোমনাথবাবু দাঙ্গা থামাতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে উপদ্রুত অঞ্চলে ঘুরতে লাগলেন। সেই সমাজবিরোধীদের অংশ, সেই সি-আই-এ'র লোকদের গোপন ষড়যন্ত্র যে এই দাঙ্গার পিছনে কাজ করেছে সেকথা বুঝতে দেশের কোন মানুষের বাকি রইল না।

এইসব একটার পর একটা ঘটনায় কংগ্রেসের কার্যকলাপ মানুষকে যত তিক্ত-বিরক্ত করে তুলতে লাগল, যুক্তফ্রণ্ট সরকারের প্রতি মানুষের মমতা ও শ্রদ্ধা ততই বাড়তে লাগল। তাই লোকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে চারিদিকে তার কঠিন-দৃষ্টিকে প্রসারিত করে দিল। এরই পটভূমিকায়

M&H M&H M&H M&H M&H M&H M&H

BI-COLATES
REGISTERED TRADE MARK
STEARNS

M&H

পিত্তরস প্রবাহ, পাকস্থলীর সুষ্ঠু ক্রিয়া ও কোষ্ঠকাঠিন্য নিয়ন্ত্রণে দীর্ঘদিনের প্রশংসাধন্য একটি অব্যর্থ ঔষধ।

MARTIN & HARRIS
PRIVATE LTD.
MERCANTILE BUILDING, LALLBAZAR,
CALCUTTA-1

M&H M&H M&H M&H M&H M&H M&H

কংগ্রেসের আর কোন রাজনৈতিক চরিত্র এখন নেই এবং জনগণের মাঝখানে তার কোন আসরও নেই।

॥ সাত ॥

তবু কংগ্রেসকে বাঁচিয়ে রাখার প্রয়াস দেখা গেল উচ্চপদস্থ অফিসার মহলে। কিভাবে এই আমলারা জঘন্য মিথ্যার আশ্রয় নিয়েও যুক্তফ্রন্টের কাজে বাধা সৃষ্টি করতে লাগল এখানে তার দুটি উদাহরণ না দিয়ে পারছি না।

১৯৬৬ সালের ১০ই মার্চ হরতালের দিনে পুলিশ হুগলী জেলার রিষড়ায় গুলী চালিয়ে তিনজনকে, কোন্নগরে গুলী চালিয়ে একজনকে হত্যা করে। কোন্নগরে গুলীতে আহত রঞ্জন দত্তকে রক্ত দিতে চাইলে শ্রীরামপুরের এস-ডি-ও তাঁর গাড়িতে করে ছ'টি ছেলেকে হাসপাতালে পাঠিয়ে দেন। তারা ঐ গাড়িতে ফিরে এলে এইবার সেই গাড়ি থেকে ছ'জনকে টেনে বের করে নিয়ে অমানুষিকভাবে জখম করে পুলিশ ও মিলিটারী। তারপর তাদের বিরুদ্ধে আবার মামলা দায়ের করা হয়। হিন্দ মোটরে গুলী করে একজনকে হত্যা করা হয় এবং একজন টাউট দ্বারা কয়েকজনের বিরুদ্ধে নরহত্যা প্রভৃতির অভিযোগ আনা হয়। এইসব মামলা যুক্তফ্রন্ট সরকার যাতে প্রত্যাহার করে নেন তার জন্য মুখ্যমন্ত্রী অজয় মুখার্জীর কাছে আবেদন জানানো হয়। এরপর মামলাগুলি সম্পর্কে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হল তা জানবার জন্য রিষড়া, কোন্নগর ও হিন্দ মোটর থেকে একদল প্রতিনিধি রাইটার্স বিল্ডিংসে ডেপুটেশনে যান।

মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমুখার্জী ডেপুটেশনকারীদের সংগে কথা বলার জন্য ফাইল চেয়ে পাঠালেন। ফাইল নিয়ে এলেন জনৈক দায়িত্বশীল কর্মচারী। তিনি ফাইলের প্রয়োজনীয় পৃষ্ঠাটি খুলে নিচের দিকে হাতটা চেপে রাখলেন। যেন ফাইলটা তিনি ধরেই রেখেছেন। অজয়বাবু নোটটা দেখে বললেন, বারো লাখ টাকার রেলও সম্পত্তি নষ্ট হয়েছে, এ কেস তোলা যাবে না। নোটটা কার?

কর্মচারী ভদ্রলোক বললেন, ডেপুটি সি-এমের।

অজয়বাবু তখন ডেপুটেশনকারীদের দিকে মুখ তুলে বললেন, "মামলার ব্যাপারে তো আমি জ্যোতিবাবুকে সব ভার দিয়ে দিয়েছিলাম। তিনি যদি এই নোট দেন তাহলে আমি কি করে মামলা প্রত্যাহারের কথা দেব?" একটু থেমে অজয়বাবু বললেন, "বারো লাখ টাকার রেলওয়ে সম্পত্তি নষ্ট হয়েছে, নরহত্যা হয়েছে, আগুন দেওয়া হয়েছে। এ কেস তো তোলা যাবে না।"

ডেপুটেশনকারীদের একজন বললেন, নরহত্যা তো পুলিশ করেছে। আর বারো লাখ টাকার রেলওয়ে সম্পত্তি নষ্ট করা হয়েছে—সে তো বারাউনি এক্সপ্রেস পুলিশ যেখানটা গার্ড করে রেখেছিল সেখানেই আগুনটা লেগেছিল। বরং জনতা সে আগুনকে প্রথম দিকে নেভাতে চেয়েছিল কিন্তু তাদের বলা হয় 'জ্বলুক না—তোমাদের কি।' বেসরকারী তদন্ত কমিশনের কাছে এসব কথা প্রকাশ পেয়েছে।

অজয়বাবু বললেন, তা সবই হতে পারে কিন্তু নোটটা দিয়েছেন জ্যোতিবাবু। আমি কি করে বলব। কর্মচারীটি তখন ফাইল নিয়ে অন্তর্ধান। তিনি যেন তৈরি হয়ে এসেছিলেন অজয়বাবু ফাইলের ঐ পৃষ্ঠাটাই দেখবেন এবং তাহলেই তাঁর কাজ হাসিল হয়ে যাবে। বেশ বোঝা গেল কর্মচারী ভদ্রলোককে তৈরি করেই কেউ পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।

ডেপুটেশনকারীদের সমস্ত রাগ জ্যোতিবাবুর ওপর গিয়ে পড়ল। কিন্তু কর্মচারীটির রকম-সকম দেখে তাদের কেমন সন্দেহও হল। জ্যোতিবাবুকে না জিজ্ঞাসা করে ব্যাপারটার হেস্তনেস্ত হবে না।

অতঃপর ডেপুটেশনকারীরা জ্যোতিবাবুর কাছে গেলেন। জ্যোতিবাবু তো অবাক। আবার সেই ফাইল এল। আবার সেই নোট খোলা হল—কিন্তু দেখা গেল তার নিচে যার সই তিনি জ্যোতিবাবু নন—উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী তিনি, যিনি যুক্তফ্রন্ট সরকারকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য একটি সুযোগও ছেড়ে দেন না।

আরেকটি ঘটনা। ৭ই আগস্ট তারিখে হাওড়া ডিভিশনের উত্তরপাড়া রেলওয়ে স্টেশনে খাদ্যের দাবিতে সকাল থেকে স্টেশনের সামনে মাইক ফিট করে ছাউনি সাজিয়ে কংগ্রেসীরা ট্রেন বন্ধ করলেন। পুলিশ অফিসার, মহকুমা শাসক প্রভৃতি সব জীপ গাড়িতে বসে। অত্যন্ত যাত্রীবহুল এই লাইনটি। সমস্ত জনতা অবাক বিস্ময়ে দেখছেন কংগ্রেসীদের কাণ্ড, পুলিশ ও জেলাকর্তৃপক্ষের কার্যকলাপ। তাঁরা তুলনা করছেন, কয়েকদিন আগে পাশেই চণ্ডীতলা বি-ডি-ও অফিসে যুক্তফ্রন্টের কর্মীরা খাদ্যের দাবিতে ডেপুটেশনে গেলে তাদের উপর লাঠি ও বুটের দাপট চালানো হয় এবং ১২ জনকে গ্রেপ্তার করে জেলে পোরা হয়। শুধু তাই নয় ওখানকার এম-এল-এ থানায় কিছু বলতে গেলে তাঁকে বলা হয়, "খাদ্যের দাবি করছে হয় তো—অজয় মুখার্জীকে ঘেরাও করুন গে।" তখন এম-এল-এ বলেন—"তাহলে অজয় মুখার্জীকে গিয়ে আপনার কথাই বলব।" তখন এস-ডি-ও উত্তেজিত হয়ে বলেন—'Who is Ajoy Mukherji ? Is he above the Governor ?' এসব কথা বসুমতী কাগজে বেরিয়েছিল এবং সেই এস-ডি-ও কংগ্রেসীদের দ্বারা অবরুদ্ধ ট্রেনগুলির সামনে তাদেরই সংগে সহাবস্থান করছেন দেখে লোকে ভাববার চেষ্টা করল, কি করে শাসনযন্ত্র এমন হয়! আরও মজার কথা এই—রেল আটকের ব্যাপারটার একটা সমাধানের উদ্দেশ্যে স্বরাষ্ট্রসচিব পুলিশকে এক মেসেজ পাঠিয়ে তাড়াতাড়ি স্থানীয় এম-এল-এ'র সংগে যোগাযোগ করতে বলেন এবং যাতে ট্রেন চলাচল করতে পারে তার জন্য তাঁর সাহায্য নিতে বলেন। পুলিশ-জীপ এম-এল-এ'কে খুঁজে বেড়াচ্ছে। অবশেষে পুলিশ যখন গিয়ে তাঁকে পেলেন এবং স্বরাষ্ট্রসচিবের মেসেজ জানালেন ঠিক তখনই রেডিওর মধ্যাহ্নকালীন সংবাদে ঘোষিত হচ্ছে—উত্তরপাড়া রেলওয়ে স্টেশনে মার্ক্সবাদী কমিউনিস্টরা কয়েকখানি যাত্রী-ট্রেন আটক করেছে এবং রেল চলাচল বন্ধ আছে।' এম-এল-এ ভদ্রলোক তো অবাক। তিনি পুলিশকে তখনই জানান—"একি মশায়!"

এর কোন উত্তর নেই। রেডিওর সংবাদের উৎস খুঁজতে গিয়ে জানা গিয়েছিল, সংবাদটি দিয়েছিলেন পি-টি-আই আর পি-টি-আই'কে দিয়েছিলেন জেলা কর্তৃপক্ষ। পরে ব্যাপারটি স্বরাষ্ট্রসচিব এবং বেতার দপ্তরের মন্ত্রী কে, কে, শাহকে জানানো হয়েছিল। কিন্তু কি করা যাবে এই প্রশাসনিক ষড়যন্ত্র তখন সারা বাংলা দেশ জুড়ে দেউলিয়া কংগ্রেসকে অবলম্বন করে জাল বুনে চলেছে।

একথা তো কারও অবিদিত নেই যে এই চক্রান্তকে 'ফাইনাল শেপ' দেওয়ার জন্যই এখানে এমন ব্যক্তিকে রাজ্যপাল করে পাঠানো হয়েছিল যাঁর দক্ষতা আসামাত্রই প্রমাণিত হয়ে গিয়েছিল। রাজ্যপাল আবার মন্ত্রিসভা থাকতে, জেলা ম্যাজিস্ট্রেট পুলিশ সুপারদের মিটিং ডেকে কবে বক্তব্য রেখেছেন তা তো আমাদের জানা নেই। অথচ তা-ই ঘটল। সংবাদপত্রের মন্তব্যে রাজ্যপাল একটু বে-সামাল হয়ে বললেন, তিনি সবাইকে চা খেতে ডেকেছিলেন। কিন্তু সেই চায়ের পেয়ালা-পিরীচের ঠোকাঠুকিতে চক্রান্তের যে জলতরঙ্গ বেজে উঠল তাতে শোনা গেল তিনি সবাইকে বলে দিয়েছিলেন—মন্ত্রীদের নির্দেশ মেনো না আইন মাফিক কাজ করে যেও। অর্থাৎ যে আইনের রাখা-লীরা রুদ্ধ তাঁর হাতে। পরবর্তী সংখ্যায় আরও কিছু বলার ইচ্ছা রইল।

অগ্নিযুগের একটি অধ্যায়

অনন্ত সিংহ

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

অত্যাচারের প্রতিবাদে আসানুল্লার প্রাণদণ্ড

যুব-বিদ্রোহের দ্বিতীয় পর্যায়ের প্ল্যান মাস্টারদার অনুমোদন সাপেক্ষ ছিল। নির্মলদা ও মাস্টারদা সাংগঠনিক শক্তির বর্তমান অবস্থা অনুধাবন ও বিবেচনা করেই জেলখানায় আমাদের নির্দেশ পাঠালেন এগিয়ে যেতে। এখন আমাদের কর্তব্য হচ্ছে যে প্ল্যান আমরা কাগজে-কলমে গ্রহণ করেছি তার বাস্তব রূপ দেওয়া। শত বাধাবিঘ্নের ভেতর দিয়ে শত্রুর সুদৃঢ় বেড়াজাল ভেদ করেই প্রস্তুত হতে হবে এবং সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করতে হবে। প্রতি মুহূর্তে শুনতে পাচ্ছিলাম সম্মুখে উন্মত্ত উত্তাল তরঙ্গ-গর্জন; দুরূহ গিরিশৃঙ্গের প্রতিচ্ছবি থেকে থেকে অন্তরে আতঙ্ক জাগাচ্ছিল; মরুপথের সুদীর্ঘ অভিযানের নিদারুণ কাঠিন্য ও অনিশ্চয়তার বিভীষিকা বারে বারে মনকে আচ্ছন্ন করেছে। তবু এই ভয়াল অন্ধকারের মধ্যেও পথ করে যেতে হবে। দৃঢ়চিত্তে অশান্ত উদ্বেলিত বিপদ-সমুদ্র মথিত করে শত সহস্র বাধা সত্ত্বেও শত্রুকে আমাদের স্বহস্ত নির্মিত ল্যাণ্ডমাইনের সাহায্যে বিধ্বস্ত করতেই হবে—শত্রুর সর্বপ্রকার নিরাপত্তা ব্যবস্থা অচল করে দিয়ে আমাদের প্ল্যান সফল করতেই হবে।

প্রস্তুতির কাজ সুরু করেছি। এইরূপ ব্যাপক প্ল্যান কার্যকরী করা সময় সাপেক্ষ; কাজেই প্রতিটি দিনের প্রতিটি মুহূর্ত আমাদের কাছে অতি মূল্যবান। আমাদের মামলা শেষ হবার আগে যদি প্ল্যান কার্যকরী করা না যায়, তবে আমাদের সব ভাবনা-চিন্তা আকাশকুসুমে পর্যবসিত হবে—মনের নিভৃত কোণে ঘটবে তার নীরব পরিসমাপ্তি। কিন্তু মাঝপথে যদি বাধা আসে, কোনো সমস্যা দেখা দেয় বা বৈপ্লবিক পরিস্থিতি অনুযায়ী মূল প্ল্যানকে সাময়িকভাবে স্থগিত রেখেও যদি শত্রুর বিরুদ্ধে অ্যাকশন অপরিহার্য মনে হয়, তবে অনিশ্চিত ভবিষ্যতের মিথ্যা দোহাই দিয়ে তা' ঠেকিয়ে রেখে নিজের দুর্বলতাকে প্রশ্রয় দেওয়ার কূটনীতি বিপ্লবী নেতা মাস্টারদার অভিধানে কখনই স্থান পায় নি।

অত্যাচার নিপীড়নে জর্জরিত চট্টগ্রাম-বাসীর তীব্র কণ্ঠের প্রতিবাদ ও প্রতি-শোধ গ্রহণের রুদ্ধ দাবি চট্টগ্রামের আকাশ-বাতাসে আলোড়িত করেছে—খাঁ বাহাদুর আসানুল্লার রক্ত চাই—তার প্রাণ চাই—তার শত সহস্র অত্যাচারের প্রায়শ্চিত্ত চাই। কুখ্যাত এই খাঁবাহাদুর ইংরেজ শাসক-বর্গের পৃষ্ঠপোষকতায় স্বার্থান্ধ হয়ে তার অধিকারের গণ্ডি ছাড়িয়ে সীমাহীন অত্যাচারে লিপ্ত হল। খাঁবাহাদুর স্ত্রী-পুরুষ নির্বিচারে চট্টগ্রামের বুকে তার অসীম প্রতাপের তাণ্ডব-লীলা অবাধে চালিয়ে যেতে লাগল। অম্বিকাদাকে গ্রেফ্‌তারে সমর্থ হওয়ায় আসানুল্লার অত্যাচারের মাত্রা আরো বেড়ে গেল এবং এতে ইংরেজ সরকারের কাছে খাঁবাহাদুরের প্রশংসা লাভের পথও প্রশস্ত হল।

চট্টগ্রামের বিপ্লবী যুবকেরা এদিকে ক্রমেই অধীর হয়ে উঠল। তাদের রাইফেল ও রিভলভার আর ধৈর্য রাখতে পারছে না। অধিনায়ক সূর্য সেনের কম্যাণ্ডে প্রতিটি রাইফেল ও রিভলভার বিপ্লবী যুবকদের হাতে আদেশের অপেক্ষায় একে-বারে attention-এ আছে। সকলেই আশা করে আছে মাস্টারদা আদেশ দেবেন —দৃপ্ত পদে এগিয়ে যাও। খাঁবাহাদুর আসানুল্লার বক্ষ লক্ষ্য করে গুলী ছোঁড়। কোনো দয়া-মায়ার প্রয়োজন নেই—তার বক্ষ বিদীর্ণ কর।" সংগঠনের প্রতিটি যুবক ভাবছে মাস্টারদা কার ওপর এই কর্তব্য-ভার ন্যস্ত করবেন।

নির্মলদা, মাস্টারদা ও তারকেশ্বর সিদ্ধান্ত নিল যে, চট্টগ্রামবাসীর এইরূপ সামগ্রিক দাবি আর উপেক্ষা করা যায় না। কাজেই স্থির হল দৃঢ়তার সঙ্গে সবল হস্তে খাঁবাহাদুরের বক্ষ অব্যর্থ লক্ষ্যে বিদীর্ণ করতে হবে।

খাঁবাহাদুর সব সময়েই বিশেষ দেহ-রক্ষী পরিবেষ্টিত হয়ে চলাফেরা করতেন। ইংরেজ সরকার বাহাদুর তাদের সৃষ্ট খাঁবাহাদুরের জীবনরক্ষার দায়িত্ব নিয়েছে। খাঁবাহাদুরকে সরকারের চাই-ই—কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলবে তারা—ভারতবাসীর সাহায্যে ভারতবর্ষকে শাসন করবে। কাজেই আসানুল্লার নিরাপত্তা ব্যবস্থা ছিল ব্যাপক ও প্রচুর। সরকারী কর্তব্যে বা সামাজিক ব্যাপারে আসানুল্লা যেখানেই যেতো, সেখানেই সশস্ত্র ও সাদা পোষাকে কড়া পুলিশ পাহারা মোতায়েন থাকতো। মাস্টারদা আসানুল্লার দেহরক্ষার এই ব্যাপক ব্যবস্থার সব সংবাদই রাখতেন পুরো-মাত্রায়। আসানুল্লাকে সুনিশ্চিতভাবে রিভলভারের পাল্লায় পাওয়া যে খুব সহজ-সাধ্য নয় তা তাঁর জানা ছিল। দূর থেকে হাতবোমা নিক্ষেপ করা হয়ত অপেক্ষাকৃত সহজ; কিন্তু দূর হতে নিক্ষিপ্ত হাত-বোমার প্রতিক্রিয়া কতখানি ফলপ্রসূ হবে তার উপর নির্ভর না করে খুব close range-এর ৪৫০ ব্যাসের রিভলভার দিয়ে যদি গুলী করা হয়, তবে অব্যর্থ-ভাবে লক্ষ্যভেদ হওয়া সম্ভব।

নির্মলদা ও মাস্টারদা স্থির করলেন এই প্ল্যানটিকে সফলতার সঙ্গে কার্যকরী করার জন্য একজন যুবক একটি রিভলভার হাতে আসানুল্লাকে close range-এ আক্রমণ করবে।

মাস্টারদা ভালভাবেই জানতেন যদি সেইরূপ একজন দুর্ধর্ষ মরণজয়ী যুবক পাওয়া যায়, তবে এই প্ল্যান কার্যকরী হওয়া খুবই সম্ভব। সেই যুবককে এগিয়ে যেতে হবে আসানুল্লার খুব কাছে।

আসানুল্লার সামকক্ষে একসঙ্গে দু'জন বা তার অধিক যুবকের আনাগোনা, পাছে দেহরক্ষীদের পূর্বাহ্নেই সজাগ করে দেয় সেই জন্য এক-একজনের উপরেই এই ভার ন্যস্ত করা সাব্যস্ত করলেন মাস্টারদারা।

কে সেইরূপ যুবক—এক হাতে প্রাণ ও অন্য হাতে রিভলভার নিয়ে মুখোমুখি আক্রমণ করতে যাবে ? এমন কোনো যুবক আছে কি; যে দেখতে অতি বিনীত শান্ত ও নিরীহ ? প্রাপ্তবয়স্ক "বীরদের" প্রতি আমাদের মনে সব সময়েই প্রশ্ন থেকে গেছে। তবু যারা যুবক,—সংসারের মায়া মোহে আচ্ছন্ন হবার তখনও সুযোগ পায় নি, তাদের বেছে নিয়েছি। এই বিশেষ ক্ষেত্রে মাস্টারদা সেই নিয়মের আরো ব্যতিক্রম করলেন।

পনেরো বছরের বালক—সুঠাম সুগঠিত দেহ, স্বর্ণাভ গাত্রবর্ণ, অপরূপ মুখাকৃতি, সরল সুন্দর দৃষ্টি, সদা হাস্য মুখ, শান্ত ধীর, একেবারে গোবেচারা—তার প্রতি কারোই (হোক না কেন, সে আসানুল্লার বিচক্ষণ দেহরক্ষী) কোনো সন্দেহের কারণ থাকতে পারে না। মাস্টারদা প্রকৃতই একটি বিপ্লবী চরিত্রের বালককে এই সাংঘাতিক "অশ্বমেধ যজ্ঞের" হোতা নির্বাচন করেছিলেন বলেই প্রথমেই সফলতার সঙ্গে নব্বইভাগ strategic gain-এ সমর্থ হন।

এই প্ল্যানের প্রতিটি দাবি উপযুক্তভাবে পূরণে সমর্থ হয়েছিল এই বালক—হরিপদ ভট্টাচার্য। দেখতে শুনতে একেবারেই নিরীহ বালক। কিন্তু তার অন্তরে বিপ্লবের আগুন প্রজ্বলিত—বহিঃপ্রকাশ নেই তার বিন্দুমাত্রও। বিপ্লবী morale—ভয়ে হাত কাঁপবে না কাজ অসমাপ্ত ফেলে আসবে না, অত্যাচারীর হৃদয়-শোণিতে তর্পণ করবে হরিপদ।

মাস্টারদা প্রেসিডেন্ট। বিপ্লবী পরিষদে আসানুল্লার প্রাণদণ্ডের আদেশ ঘোষিত হল। নির্মলদাকে ভার দেওয়া হল বিশদ প্ল্যানটিকে আনুষঙ্গিকভাবে বিচার করে তার বাস্তব রূপ দেবার জন্য। প্ল্যানের মূল ভিত্তি হল হরিপদর morale—একা যাবে, ফিরে আসবে না। নির্মলদা হরিপদর সঙ্গে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে প্রতিকূল অবস্থা সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন—তার মানসিক প্রস্তুতিতে যথেষ্ট সাহায্য করেছেন।

মহালগ্ন সমাসন্ন। হরিপদ মাস্টারদা, নির্মলদা ও তারকেশ্বরের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আসবে। দ্বিধাহীন ভয়-ভাবনা শূন্য দৃঢ়চিত্ত—রিভলবার কটিবদ্ধ। হরিপদর দুটি চোখ দৃপ্ত উদ্ভাসিত। হরিপদকে দেখে মাস্টারদা ও নির্মলদা বুঝেছিলেন এই বালকের হাতে আসানুল্লার আর নিস্তার নেই—প্রাণ তাকে দিতেই হবে, কিন্তু হরিপদকে তাঁরা হয়ত আর ফিরে পাবেন না। তবু বিপ্লবী কর্তব্য—হরিপদ মরণ তুচ্ছ করে বেরিয়ে যাবে—আজ—এক্ষুণি।

মাস্টারদা হরিপদকে বললেন—"তোকে হয়ত হারাবো আমরা। আর ফিরে পাবো না। তবু কঠোর হাতে তোর শত্রুদমন করতে হবে। প্রাণ যাক্‌ তবু ভাল—কিন্তু আসানুল্লা যেন রক্ষা না পায়। কোনো নিরাপত্তা ব্যবস্থা, দেহরক্ষীদের কোনো বাধাই যেন তোকে তোর কর্তব্য সাধনে বিরত না করে—তোর মরণ-পণ প্রতিজ্ঞা থেকে বিচ্যুত করতে না পারে।"

হরিপদ সহাস্য বদনে মাস্টারদা ও নির্মলদাকে অভয় দিয়ে বললো—"মাস্টারদা, আমি ভারতীয় গণতন্ত্রী-বাহিনীর একজন সৈনিক। আমার ওপর আপনি এই গুরুভার ন্যস্ত করেছেন। আমার কর্তব্য আমি পালন করবোই। আশীর্বাদ করুন।"

মাস্টারদা ও নির্মলদাকে প্রণাম করে হরিপদ বিদায় নিল। তাঁরা হরিপদকে শেষবারের মত বুকে নিয়ে সস্নেহে বললেন—"তুই যা, তোর সাধনা, তোর মৃত্যুপণ শত্রুনিধন অভিসার সফল হবে।"

হরিপদ শহরে এল। আসানুল্লা টাউন ক্লাবের সভাপতি। ফুটবল খেলায় আসানুল্লার উৎসাহ আছে। কিন্তু তার উৎসাহের চাইতে চারপাশের তাঁবেদারদের উৎসাহ অনেক বেশি। আজ চট্টগ্রামের সর্বোৎকৃষ্ট মাঠে চূড়ান্ত লীগ খেলা। আসানুল্লার ফুটবল টীম লীগ ফাইনালে আজ খেলবে—সকলেরই ধারণা জিতবেও। আসানুল্লা এবং চট্টগ্রামের সরকারী ও বেসরকারী প্রবীণ ব্যক্তিরাও সকলে খেলার মাঠে খেলা দেখতে সামিয়ানার নিচে বসেছেন। দ্রুত তালে খেলা চলেছে। তীব্র উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে। শেষ পর্যন্ত মহা সমারোহে খেলা সাঙ্গ হল। আসানুল্লার ফুটবল টীম বিজয় গৌরবে শীল্ড লাভ করেছে। হিপ্‌ হিপ্‌ হুররে! হিপ্‌ হিপ্‌ হুররে!—উল্লাসধ্বনিতে ফুটবল মাঠ মুখরিত। বিজয়ী দলের আনন্দ উল্লাস আর ধরে না!

আসানুল্লা কিন্তু তখন পর্যন্ত জানে না হরিপদর রিভলভার তার বুক লক্ষ্য করে সময় ও সুযোগের প্রতীক্ষায় আছে। বড় রাস্তার ওপর আসানুল্লার মোটর দাঁড়িয়ে আছে। খেলার মাঠ ছেড়ে স্তাবক-দল সমভিব্যাহারে আসানুল্লা নিজ মোটরে ওঠবার আগে বিজয়ী শীল্ডটি হাতে নিয়ে দেখছিলেন।

নয়ন ভরে শীল্ডটি দেখে তৃপ্তি-লাভের সুযোগ থেকে আসানুল্লাকে বঞ্চিত হতে হল। হরিপদর রিভলভার ঠিক সময় মত Point-blank range-এ গুড়ুম্‌ গুড়ুম্‌ শব্দে দুটি বার গর্জে উঠলো। ৪৫০ ব্যাসের রিভলভারের গুলির আঘাতে আসানুল্লা ধরাশায়ী হল। রুধিরাক্ত দেহে চট্টগ্রামের ভূমিতে মাথা নুইয়ে আসানুল্লা তার বর্বর অত্যাচার ও বহুবিধ পাপের প্রায়শ্চিত্ত করে ইংরেজ প্রভুদের কাছে চিরতরে বিদায় নিল।

গুলির শব্দে উপস্থিত সকলেই সচকিত হল। সাধারণ লোক প্রাণভয়ে ছুটে পালালো। পুলিশ প্রহরীরা হতভম্ব হল। এই অবস্থার ফাঁকে হরিপদ সেই স্থান পরিত্যাগের সুযোগ পেয়েছিল। কিন্তু দিনের আলোতে শত লোকের মাঝে হরিপদ পালাবার পথ করে নিলেও হত্যাকারীর ছায়াকায় তাকে দেখেছে এমন অনেক লোকের পক্ষে তার গতিপথ লক্ষ্য করা বিন্দুমাত্র অসুবিধের হয় নি। পুলিশবাহিনী তার পেছু নিল। এই বাহিনীর পুরোভাগে ছিল সিদ্দিক দেওয়ান ও হেম দারোগা। এরা দুজনেই ফুটবল খেলোয়াড় এবং আসানুল্লার প্রিয়পাত্র। উদ্যত রিভলভার হাতে হরিপদ মাঠ দিয়ে ছুটেছে। সে তাদের ভয় দেখিয়েছে—নিরস্ত হতে বলেছে এবং শেষ পর্যন্ত উপায়ান্তর না দেখে তাদের লক্ষ্য করে গুলিও ছুঁড়েছে। হেম দারোগা ও সিদ্দিক দেওয়ান রিভলভারের গুলি ভ্রূক্ষেপ না করে একেবারে উন্মত্ত বাঘের মত হরিপদর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে প্রাণপণে ছুটে চলেছে। মাঠ ক্রমে শেষ হয়ে এল। মাঠের পাশ দিয়ে গেছে রেললাইন। সিদ্দিক দেওয়ান একটা পাথর ছুঁড়ে মারলো হরিপদকে। এই আঘাতে হরিপদর একটি চোখ গুরুতর-রূপে আহত হল এবং হরিপদও জ্ঞান হারালো। আমরাও জেলে এই আঘাতের ভয়াবহ চিহ্ন দেখেছি। হরিপদ ধরা পড়লো।

এইবার সুরু হল হরিপদর ওপর অকথ্য অত্যাচার। সে জীবিত কি মৃত সেদিকে বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ না করেই নির্বিবাদে নিপীড়ন চলতে লাগলো। পুলিশের যে কেউ তার কাছে আসছে সেই তাকে লাথি চড় ও ঘুষি মারছে অথবা ব্যাটন দিয়ে আঘাত করছে। হরিপদর মুখেই শোনা যে, তার কখন জ্ঞান হয়েছে বা কখন জ্ঞান হারিয়েছে সে কিছুই বলতে পারে না।

হরিপদকে শৃঙ্খলিত অবস্থায় কোতোয়ালিতে বেঁধে রাখা হয়েছে। তখন প্রায় সন্ধ্যে। পুলিশ ও কর্তৃপক্ষ ক্রোধে একেবারে উন্মত্ত। চট্টগ্রামের বুকে তারা আজ দক্ষযজ্ঞ করবে স্থির করেছে। বৃটিশ অত্যাচারের কাহিনী বহু জানা আছে,

কিন্তু চট্টগ্রামে সেইদিন আসানুল্লা হত্যার পর তারা যে অভিনবভাবে অত্যাচার করেছে আর কোথাও তার নজীর আছে বলে আমার জানা নাই।

জেলা শাসক মিঃ ক্যাম্প, জেলা পুলিশ সুপারিনটেনডেন্ট মিঃ জনসন, অ্যাডিশন্যাল পুলিশ সাহেব মিঃ বি জে সুটার, মিঃ ডব্লু ভি হিকস্‌, মিঃ লুইস প্রভৃতি সাহেবগোষ্ঠী ও তাদের সঙ্গে রেলওয়ের কয়েকজন উচ্চপদস্থ সাহেব কর্মচারীও মিলিত হয়ে—দলবদ্ধভাবে পাঞ্চজন্য দৈনিক পত্রিকার অফিসে ও প্রেসে হানা দেন। সেখানে খানাতল্লাসী করার বা কাউকে গ্রেপ্তার করার কোন প্রয়োজন ছিল না। তাঁরা হানা দিয়েছেন প্রেসটিকে চুরমার করে দেওয়ার জন্য—প্রত্যেকের হাতেই বড় বড় হাতুড়ী—প্রেসে ঢুকেই তাঁরা প্রিনটিং মেশিনের উপর দমাদম হাতুড়ী চালাতে লাগলেন—তাঁদের যত আক্রোশ পত্রিকাটির উপর—কাজেই প্রিনটিং মেশিনটির আজ আর নিস্তার নাই! প্রেসের ম্যানেজার বা সহকারী সম্পাদক হীরেন চৌধুরী সাহেবদের এই দস্যুজনোচিত আক্রমণের প্রতিবাদে এগিয়ে আসেন—কিন্তু প্রতিবাদের ভাষা উচ্চারিত হবার সুযোগ ঘটল না—তার আগেই বেটনের আঘাতে অজ্ঞান হয়ে রক্তাপ্লুত দেহে তিনি মেঝেতে লুটিয়ে পড়লেন। জেলা কর্তৃপক্ষের দল ও আসাম বেঙ্গল রেলওয়ের উচ্চপদস্থ সাহেব কর্মচারিবৃন্দ—প্রেসটি ভেঙে, অফিসে আগুন দিয়ে হীরেন চৌধুরীকে মারাত্মক আহত করে উধাও হলেন। এই ধ্বংসলীলায় জেলা শাসক ও জেলা পুলিশ সাহেব স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন ও সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছিলেন। এই বাস্তব ঘটনা এতখানি অপ্রত্যাশিত ও অভাবনীয় যে আমার এই লেখা পড়ে মনে হবে যেন আমি একটা সস্তা প্রপাগান্ডা করছি। অবিশ্বাস্য মনে হলেও এই তথ্য সম্পূর্ণ সত্য। সেই সময়কার চট্টগ্রামের বহু লোক আজো বেঁচে আছেন। আসানুল্লা হত্যার সময়ে ও পরে সেখানে যাঁরা উপস্থিত ছিলেন আমার কথা তাঁরা সমর্থন করবেন। এই ব্যাপার কতখানি গড়িয়েছিল তার বিবরণ আরো খানিকটা দিচ্ছি। উচ্চপদস্থ ইংরেজ দল যখন পাঞ্চজন্য প্রেস ও অফিস ধ্বংস-কার্যে ব্যস্ত—তখন এ্যাংলো ও ইংরেজ সার্জেন্টদের—সারা শহরে অত্যাচার করবার জন্য লেলিয়ে দেওয়া হয়েছে। ভারতীয় গণতন্ত্রবাহিনীর প্রতি সহানুভূতিশীল বা যোগাযোগ আছে সন্দেহে তালিকাভুক্ত সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের প্রায় হাজারটি বাড়িতে—ইন্সপেক্টার ও সাব-ইন্সপেক্টারদের দলকে সশস্ত্র সান্ত্রীদের সঙ্গে সংগঠিত-ভাবে পাঠানো হয়েছে। কাকেও বন্দী করা বা কোন বাড়িতে খানাতল্লাসীর উদ্দেশ্য তাদের একটুও ছিল না। গৃহলী-বিধ্বংক্ষিপ্ত পশুর মত তারা প্রতি গৃহের আসবাবপত্র সব ভেঙেচুরে তছনছ করে—অধিবাসীদের নির্বিচারে মারধোর করেছে। বুটের লাথি, রাইফেলের গুঁতো, ব্যাটনের আঘাত আর ঘুষি চড়চাপড়ের হাত থেকে স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে কেউই রেহাই পায় নি। কেউ সামান্য বাধা দেবার চেষ্টা করলেই সঙ্গে সঙ্গে তাকে জ্ঞান হারাতে হয়েছে। আমি আগেই লিখেছি—কালার-পোল যুদ্ধের শহীদ মনোরঞ্জন সেনের

আজকের
সঞ্চয়
আগামীকালের
সংস্থান

মিতব্যয়ী
আজকে বাঁচায়
তার কালও বাঁচে।
অমিতব্যয়ী
খরচ করে ফেলে আজ
খুইয়ে ফেলে
কালও।

ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক
অব ইণ্ডিয়া লিঃ
রেজিষ্টার্ড অফিস :
৪, ক্লাইভ ঘাট ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-১।

UNITED BANK OF INDIA LTD

আমরা সেবার সাথে দিই আরও কিছু

পশ্চিমবঙ্গে ৯৫টিরও অধিক শাখা আছে

বৃদ্ধ পিতা তাঁর ছোট ছেলের উপর এই ক্ষিপ্ত জানোয়ারদের অমানুষিক অত্যাচারের বিরুদ্ধে মৌখিক প্রতিবাদ জানান—"কেন তোমরা স্কুলের একটি ছোট ছেলেকে এমনভাবে মারছ? এতো এখুনি মরে যাবে।" বৃদ্ধ পিতার চোখের সামনে পুলিশের নির্যাতনে নাবালক পুত্রের জীবনাশঙ্কা—তবু পিতার প্রতিবাদ করার এত স্পর্ধা! সার্জেন্ট কেলী মনোরঞ্জনের পিতার বুকে সজোরে তাঁর বুটের চিহ্ন এঁকে দিলো! মনোরঞ্জনের পিতার প্রতিবাদধ্বনি আর শোনা গেল না—সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ শাসনের চির অবসান কামনা করে তিনি শেষনিশ্বাস ত্যাগ করলেন।

সেই রাত্রে প্রতিটি বাড়িতেই এইরূপ পুলিশী তাণ্ডব চলেছে। বেপরোয়া আক্রমণের মুখে বুটের লাথি, বন্দুকের কুঁদোর বা ব্যাটনের আঘাতের মাত্রা ঠিক রাখা সম্ভব নয়—কে যে বাঁচবে বা আধমরা হবে থাকবে বা কে কিভাবে পরিত্রাণ পাবে তার হিসাব রাখা কঠিন। মনোরঞ্জনের পিতার মত সবাই বুটের লাথিতে প্রাণ হারান নি বটে তবে যে কিভাবে বেঁচে-ছিলেন তা কেবল তাঁরাই জানেন।

পুলিশী জুলুমের আর একটি অভিনব প্রয়োগকৌশল এই সময়েই প্রথম দেখা যায়। কর্তৃপক্ষের লিস্ট অনুযায়ী প্রায় সাত-আটশ' প্রৌঢ় ও যুবককে ঘর থেকে বার করে এনে প্রহার করতে করতে সারা পথ পায়ে হাঁটিয়ে কোতোয়ালীতে নিয়ে আসা হয়। দু'তিনটি বড় বড় ঘরে তাদের সবাইকে ঠাসাঠাসি অবস্থায় পুরে দরজা বন্ধ করে দেওয়া হয়। তারপর উচ্চপদস্থ পুলিশ সাহেবেরা, সার্জেন্টরা এবং বৃটিশের অনুরক্ত ভারতীয় ইন্সপেক্টার ও সাব-ইন্সপেক্টারের দল হঠাৎ দরজা খুলে সেই সব ঘরে ঢুকে কোনরকম বাছ-বিচার না করেই সবাইকে বেদম প্রহার করতে সুরু করে। জামীনমুক্ত আমাদের মামলার প্রত্যেকটি অভিযুক্তকেও সেই রাত্রে এই সব "যন্ত্রণা কক্ষে" নিক্ষেপ করা হয়েছিল। সতীদা ও তাঁর মত অনেককেই এই অভিনব নিদারুণ অভিজ্ঞতা অর্জন করতে হয়েছিল। সতীদার শিক্ষাদীক্ষা ও তাঁর সামাজিক উচ্চমানের কোন মূল্যই পুলিশ সেদিন দেয় নি। চট্টগ্রামবাসীর মনে বিভীষিকা সৃষ্টি করার অভিপ্রায়েই পূর্ব পরিকল্পিত প্ল্যান অনুযায়ী এইরূপ আইনবহির্ভূত অত্যাচারের পথ চট্টগ্রামের ইংরেজ শাসকগোষ্ঠী আবিষ্কার করেছিল। তারা ভেবেছিল এইরূপ বিভীষিকা সৃষ্টি করেই তারা বিপ্লবী যুবকদের মনোবল ভেঙে দেবে। সারারাত ধরে চট্টগ্রাম শহরের বুকে এই ভয়াবহ দৃশ্যের পুলিশী নাটক অভিনীত হলো। ভোর হওয়ার আগে দু'-একজন ছাড়া সবাইকে বাড়ি ফিরে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হলো।

রাত্রের এই গোপন নাটক সমাপ্ত করে পরের দিন সকাল থেকেই জেলা শাসকের সম্পূর্ণ সমর্থনে পুলিশ ও জেলা কর্তৃপক্ষ নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কের অভিনয়ে মনো-নিবেশ করলেন।

আসানুল্লার মৃতদেহের সৎকার তখনও বাকী। মহা সমারোহে মিছিল করে গোরস্থানে শবদেহ নিয়ে যাওয়া হবে। ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীরা আজো যদি সাম্প্রদায়িক দুর্বলতার সুযোগ না নেয়, তবে তা আর কখন নেবে? কর্তৃপক্ষ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও লুঠতরাজ করাবার ব্যাপক আয়োজন করলেন। প্রশ্ন হবে—কর্তৃপক্ষ কি কখনও দাঙ্গা করাবার ব্যবস্থা করতে পারেন? সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হতে পারে এবং তাতে হয়ত কর্তৃপক্ষের সমর্থন ছিল! সত্য ঘটনা তা নয়—সাধারণ চিন্তার বাইরেই ঘটনা ঘটেছিল। সুপরিচিত সমাজদ্রোহী, দাঙ্গাবাজ লোক-দের কোতোয়ালীতে অভ্যর্থনা করে আনা হয় ও আসানুল্লা হত্যার প্রতিশোধ নেবার জন্য তাদের পরিষ্কার নির্দেশ দেওয়া হয়—এবং তাদের জানিয়ে দেওয়া হয় যে, দু' ঘণ্টা তাদের রাজত্ব চলবে—এর মধ্যে কর্তৃপক্ষ কোন বাধা দেবেন না। এই দুটি ঘণ্টার মধ্যেই নাগরিকদের যতখানি ক্ষতিসাধন করা সম্ভব তারা যেন তাই করে। এও শুনে অবিশ্বাস্য মনে হবে। কিন্তু প্রত্যক্ষভাবে আমি যা জানি—যার সত্যতা সম্বন্ধে আমার কোন সন্দেহ নেই তাই আমি লিখছি।

লালদীঘির পাড়ে মাঠের উপর আসানুল্লার মৃতদেহ রক্ষিত। পুলিশ সাহেব মিঃ সুটার ছাড়া সমস্ত উচ্চপদস্থ সাহেব ও ভারতীয় ইংরেজ ভক্তের দল "কফিন" সামনে রেখে সাম্প্রদায়িকতার সুযোগ নিয়ে সমবেত সবাইকে উত্তেজিত করে বক্তৃতা দিলেন। ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট স্বয়ং বন্ধু আসানুল্লার অকাল তিরোধানের জন্য সজল চোখে বিগলিত কণ্ঠে "গডের" কাছে আসানুল্লার আত্মার চিরশান্তির জন্য প্রার্থনা জানালেন। হত্যার প্রতিশোধের জন্য উপস্থিত জনতা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল—সাম্প্রদায়িকতার চরম বীভৎস রূপ দেখা দিল। আন্দরকিল্লার প্রধান রাজপথের দুধারে যতগুলি বড় বড় দোকান ছিল—দেখতে দেখতে সব লুঠ হয়ে গেল। লালদীঘির বাজার পর্যন্ত দুধারের সমস্ত বড় বড় ধনীদের বাসগৃহ ও সাজানো দোকানপাট-গুলি কোনটাই গুণ্ডাদের হাত হতে রেহাই পেলো না—কর্তৃপক্ষের নির্দেশে লুঠ করেই সঙ্গে সঙ্গে সবগুলিতে আগুন লাগানো হলো। আগুনের লেলিহান জিহ্বায় দু-তিন মাইল এলাকা জুড়ে পুড়ে ছারখার হয়ে গেল।

চট্টগ্রামের জেলখানা আন্দরকিল্লার পোয়া মাইলের মধ্যে অবস্থিত। বাইরের তাণ্ডব চোখে দেখতে না পেলেও—লোক-জনের চিৎকার ছুটোছুটি আমরা শুনতে পাচ্ছিলাম। তারপর দেখতে দেখতে চট্টগ্রামের আকাশ আগুনের প্রচণ্ড ছটায় লালে লাল হয়ে গেল। এই ধ্বংসলীলার শেষ কোথায়। ক্ষয়ক্ষতির হিসাব করে আমরা মনে মনে প্রমাদ গুণলাম।

প্রায় দুটোর সময় বীরপুংগব W. B. Hicks—পুলিশের অতিরিক্ত সুপারিন-টেণ্ডেন্ট এবং জেল সুপারও বটে—মুখে ক্রুর হাসি নিয়ে আমাদের পরিদর্শন করতে এলেন। Hicks সাহেব দাম্ভিকভরে বললেন—

"Look here how much the people are enraged at the loss of their beloved Khan Bahadur! There is riot and arson. Just within 'Two Hours' the Hindus of Chittagong have lost more than fifty lakhs worth of property. Now it is quite."

(প্রিয় খাঁবাহাদুরের তিরোধানে জন-সাধারণ ক্রুদ্ধ ও উত্তেজিত। দুটি ঘণ্টার মধ্যে হিন্দুদের পঞ্চাশ লক্ষ টাকার উর্দ্ধে সম্পত্তি নষ্ট হয়েছে। এখন দাঙ্গা বন্ধ হয়েছে।)

পুলিশ সাহেবকে আমাদের পাল্টা মুখে জবাব শুনতে হলো—

"You British agents! you must know that your days are numberd and you will not get enough time to exploit our communal weakness!"

(সাহেব তোমাদের দিন ঘনিয়ে এসেছে। আমাদের সাম্প্রদায়িক দুর্বলতার সুযোগ গ্রহণের সময় তোমরা আর বেশি-দিন পাবে না।)

আমরা তখন ধারণাও করতে পারি নি যে তারা আমাদের সাম্প্রদায়িকতার সুযোগ পরিপূর্ণ মাত্রায় গ্রহণ করে ভারত-বাসীকে পাকিস্থান ও হিন্দুস্থান উপহার দিয়ে তবে বিদায় নেবে।

[ক্রমশঃ]

ভিয়েৎনামঃ ঝড়ের কেন্দ্রে

বরুণ রায়

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

আগুন আর আগুন।

পাহাড়ের গায়ে গায়ে কিংবা সমতলের বুকে কিংবা জঙ্গলের ধারে ধারে শুধু আগুন জ্বলছে। গ্রামের পর গ্রাম পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে।

যেন দিকে দিকে এক বিরাট শ্মশানে চিতার আগুন জ্বলছে সংখ্যাহীন।

জেনারেল দ্য তাসিনি, জাঁদরেল ফরাসী কম্যান্ডার, ভিন ইয়েনের যুদ্ধ জয় করে উৎসাহে দিগবিদিক্ জ্ঞান হারিয়ে ফেললেন। মাথার ঠিক থাকল না তাঁর অফিসারদেরও। মায় সাধারণ ফরাসী সৈন্যটি পর্যন্ত অতি আনন্দে বর্বর হয়ে উঠল।

ট্রাক চালাচ্ছে কোন ফরাসী ড্রাইভার, গাড়ি চালিয়ে দিল পথচারীদের তোয়াক্কা না করেই তাদের ওপর দিয়ে।

বাজারে ঢুকেছে কোন ফরাসী সৈন্য, দাম চাইবার সঙ্গে সঙ্গেই রাইফেলের কুঁদো দিয়ে দোকানীর মাথা ফাটিয়ে দিযে বীরপুঙ্গব ধীরে ধীরে হেঁটে এগিয়ে গেল আরেকটা দোকানে, যেন কিছুই হয় নি।

ভিয়েৎমিনদের খোঁজ করতে কোন গ্রামে ঢুকেছে একদল ফরাসী সৈন্য, সাধারণ মানুষের থেকে গেরিলাদের আলাদা করে খুঁজে বার করতে না পেরে লাথি, কুঁদো, গুলী, বেয়োনেট দিয়ে মেরে 'ঠাণ্ডা' করতে লাগল যাকে সামনে পেল তাকেই। তারপর গ্রামকে গ্রাম জ্বালিয়ে দিল আগুনে ধরিয়ে। দস্যুরা চলে যাবার পর দেখা গেল শত শত মৃতদেহ ছড়িয়ে আছে চারদিকে—ছেলে-বুড়ো, নারী-পুরুষ ও শিশুর মৃতদেহ।

আকাশ থেকে গেরিলাদের খুঁজে বেড়াচ্ছে কোন ফরাসী বিমান, খুঁজে না পেয়ে গ্রামাঞ্চল আর বনাঞ্চল ডিঙিয়ে বৃষ্টিধারার মত ছিটিয়ে দিল নেপাম। আগুনের ঝড় উঠল শান্ত, স্নিগ্ধ মাটির বুকে। মানুষ ঘর-ছাড়া হল, নিহত হল ঝাঁকে ঝাঁকে।

জেনারেল দ্য তাসিনি ভাবলেন তিনি দেশবাসীর আনুগত্য লাভ করছেন!

গোয়েন্দা রিপোর্ট এসেছিল দ্য তাসিনির কাছে। সেই রিপোর্ট তাঁকে জানিয়েছিল ভিন ইয়েনের যুদ্ধ জেতার কোন ক্ষমতাই ছিল না তাঁর যদি না আকাশ থেকে নেপামের তরল আগুন বর্ষিত হত। নেপামই ঐ যুদ্ধে তাঁকে বাঁচিয়ে দিয়েছিল।

সুতরাং ভবিষ্যতেও যদি বাঁচতে হয় তাহলে নেপামের আশ্রয়ই নিতে হবে।

বিমান বহরের কাছে নির্দেশ গেল তারা যেন এরপর থেকে যে কোন আক্রমণেই, কিংবা আক্রমণ না হলেও, অকুণ্ঠিত ভাবে নেপাম ব্যবহার করে।

কিন্তু দ্য তাসিনি জানতেন না ঐ নেপামের আগুনে তিনি ফরাসীদেরই চিতা জ্বালিয়ে যাচ্ছেন।

একদিকে নেপাম বর্ষণ করে গেরিলাদের ঠেকিয়ে রাখার চেষ্টা করে অন্যদিকে দ্য তাসিনি হ্যানয় ও হাইফংকে ঘিরে একটা বেড়াজাল তৈরির দিকে নজর দিলেন।

আলং উপসাগর থেকে পশ্চিমে ভিন ইয়েন পর্যন্ত, তারপর সেখান থেকে আবার দক্ষিণ-পূর্ব মুখে ফাট জিয়েমের কাছে সমুদ্রের উপকূল পর্যন্ত একটি রেখা টানলেন তিনি। তারপর ঐ রেখা বরাবর কাঁটা তার দিয়ে ঘিরে দুর্গের মত সুরক্ষিত করে অল্প দূরে দূরে বানালেন কতকগুলি ব্লকহাউস। কমসে কম বারো শ' ব্লকহাউস তিনি বানিযে ফেলেছিলেন ১৯৫১ সাল শেষ হবার আগেই।

ভেবেছিলেন এইভাবে হ্যানয়, হাইফং এবং ব-দ্বীপ এলাকাকে নিরাপদ করতে পারবেন গেরিলাদের হাত থেকে।

কিন্তু কি আগুনের বেড়াজাল কি কংক্রীটের 'দ্য তাসিনি লাইন' পারে নি ভিয়েৎমিন মুক্তি ফৌজের গতিরোধ করতে। পারা সম্ভবও ছিল না। আগুনে শুদ্ধ হয়ে আরো দুর্বার হয়ে উঠেছিল ওরা। আগুনকে জয় করতে শিখেছিল। তাছাড়া ওদের সহায় ছিল রাত। ফরাসীরা যদি ছিল দিনের অধিপতি, ওরা ছিল অন্ধকারের অধীশ্বর। দিনের আলো নিভে আসার সঙ্গে সঙ্গে ঘরে ফেরা পাখিদের মত ফরাসী সৈন্যরাও একে একে ফিরে আসত তাদের ব্লকহাউসে কিংবা শহরের শিবিরে। ওদের গুলী, ওদের

বোমা, ওদের নেপাম ঐ অন্ধকারের দেয়ালের নিচে মুখ থুবড়ে পড়ে থাকত। দিগন্ত অবারিত হত ভিয়েৎমিন মুক্তি বাহিনীর জন্যে।

অন্ধকারের রোমকূপ থেকে ওরা বেরিয়ে আসত দলে দলে। মাটির বুক থেকে জেগে উঠত ঘাসের মত। পাতার গা থেকে আলাদা হয়ে ওরা হেঁটে চলত। জঙ্গলের পর জঙ্গল পার হয়ে ওরা এগিয়ে যেত। পার হত খেতের পর খেত, নদীর পর নদী, খালের পর খাল। কখনো সোজা দাঁড়িয়ে, কখনো দৌড়ে, কখনো পিঁপড়ের মত বুকে হেঁটে। মাইলের পর মাইল, অনেক ঘুরপথে। এক বাঙ্কার থেকে অন্য বাঙ্কারে। এক সুড়ঙ্গ থেকে অন্য সুড়ঙ্গে।

যেত ফরাসীর চলার রাস্তা কাটতে কাটতে, যাতে ওদের গাড়ি গেরিলাদের ধাওয়া করে চলতে চলতে মুখ থুবড়ে দাঁড়িয়ে পড়তে বাধ্য হয়। উড়িয়ে দিত ব্রীজ। কিন্তু কখনও তারা এমন রাস্তা কাটত না কিংবা এমন ব্রীজ ওড়াতো না যাতে সাধারণ মানুষের অসুবিধা হতে পারে। আর কোন ব্রীজ বা রাস্তা কিংবা স্যাবোটাজের অন্য কোন লক্ষ্যবস্তু যদি থাকত কোন গ্রামের কাছাকাছি তাহলেও সেগুলি ছিল একেবারে নিষিদ্ধ। কারণ ওগুলি ভাঙলে বা কাটলে পরে ফরাসীর অত্যাচারের শক্ত হাত এসে পড়বে গ্রামবাসীদেরই ওপর। তা তাদের কখনই কাম্য ছিল না। তাই কোন কিছু স্যাবোটাজ করার আগে কিংবা কি কি লক্ষ্যবস্তু স্যাবোটাজ করা হবে সে সম্পর্কে ওরা গ্রামবাসীদেরই পরামর্শ নিত।

ধার্মিকেরা তাদের ধর্মকে যেভাবে আঁকড়ে ধরে রাখে, গেরিলারা সেইভাবেই রক্ষা করত গ্রামবাসীদের সম্পত্তি। ওদের ট্রেনিংয়ের প্রথম কথাই ছিল তাই। যখন কোন গ্রামে থাকতে হত ওদের, গ্রামবাসীদের সুখ-দুঃখের অংশীদার হয়েই থাকতে হত। মাঠে কিংবা ঘাটে দিনের বেলা ওদের কাজ ছিল মানুষের কাজে সাহায্য করা। তখন কারো সাধ্য ছিল না ওদের গ্রামবাসীদের থেকে আলাদা করে চিনতে পারে।

দ্য তাসিনি যখন ব্লকহাউসের বেড়াজাল দিয়ে নিজেকে সুরক্ষিত করে তুলছিলেন, তখন ভিয়েৎমিন গেরিলারা একাধিক ধারায় এগিয়ে আসছিল ব-দ্বীপ এলাকায়।

অনুপ্রবেশের প্রধান রাস্তা ছিল ব-দ্বীপের পশ্চিম প্রান্ত ধরে হোয়া বিন নামে একটা গ্রামের ভেতর দিয়ে। এই পথেই ১৯৫১ সালের মে মাসে গেরিলারা রেড রিভারের দক্ষিণ তীরে, রাজধানী হ্যানয় থেকে মাত্র পঞ্চাশ মাইল দূরে ক্যাথলিক শহর নিন বিনের ওপর চড়াও হয়েছিল। কিছুকালের জন্যে শহরটি দখলও করে নিয়েছিল তারা।

নিন বিনের যুদ্ধে ফরাসীদের অন্যতম কম্যাণ্ডার ছিলেন লেফটেন্যান্ট বার্নার দ্য লাত্র। জেনারেল দ্য তাসিনির ছেলে। ঐ যুদ্ধে সে নিহত হয়েছিল গেরিলাদের গোলায়।

দ্য তাসিনি মর্মাহত হয়েছিলেন। কিন্তু অবাক হয়েছিলেন তার চাইতেও বেশি। ভিন ইয়েনের পর তিনি ভেবেছিলেন ভিয়েৎমিনদের মেরুদণ্ড তিনি ভেঙে দিয়েছেন। ব্লকহাউসের বেড়াজাল তৈরি করার পর তিনি নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন যে, ঐ ব্যূহ ভেদ করে গেরিলাদের পক্ষে আসা অসম্ভব।

কিন্তু নিন বিন? নিন বিন তো তাঁর বেড়াজালের বাইরে নয়। দূরেও নয় খুব একটা হ্যানয় থেকে। গেরিলারা সেখান পর্যন্ত এলো কি করে? আর এসে এত বড় রকমের আক্রমণ চালাবার মতো ক্ষমতাই বা যোগাড় করল কোথেকে?

জেনারেল দ্য তাসিনি উদ্বিগ্ন হলেন। স্পষ্ট বুঝতে পারলেন যে, যত শক্ত ব্যূহই তিনি রচনা করে থাকুন ব-দ্বীপ এখনো কিরকম অসহায়। এই অসহায়তা দূর করা যাবে না যদি না গেরিলাদের সরবরাহের রাস্তা বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া যায়।

ম্যাপের ওপর চোখ বোলাতে বোলাতে তাঁর নজর পড়ল হোয়া বিনের ওপর।

দ্য তাসিনি জানতেন না, হোয়া বিন গেরিলাদের সরবরাহের প্রধান রাস্তা হতে পারে কিন্তু একমাত্র রাস্তা কখনই ছিল না।

তবু হোয়া বিন তাঁর চিন্তাকে আচ্ছন্ন করে রইল।

চারদিকে পাহাড়, মাঝখানে একটুখানি সমতলভূমি, আরই মধ্যে ছোট্ট একটুখানি শহর হোয়া বিন। হ্যানয়ের পশ্চিমে। দ্য তাসিনির বেড়াজাল থেকেও মাইল পঁচিশেক দূরে। ব-দ্বীপের উত্তরে ও দক্ষিণে এবং ব-দ্বীপের মধ্যে গেরিলাদের যে বাহিনী ছিল, তাদের সরবরাহ যেত এই হোয়া বিন হয়েই। গেরিলারা জড়ো হত এখানে এসেই, তারপর এখান থেকেই আবার ছড়িয়ে যেত নতুন নতুন দিকে। এবং এখান থেকেই দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব ব-দ্বীপের বিস্তীর্ণ এলাকার ওপর প্রভাব বিস্তার করা সম্ভব ছিল।

দ্য তাসিনি ভাবলেন, হোয়া বিন যদি দখল করে নেওয়া যায় তাহলে ব-দ্বীপ সত্যিই নিরাপদ হবে।

কিন্তু দ্য তাসিনি জানতেন না, ভিন ইয়েনের পর রেড রিভার দিয়ে বেশ কিছু জল গড়িয়ে গেছে।

ভিন ইয়েন বিপর্যয়ের রিপোর্ট পৌঁছেছিল জেনারেল গিয়াপের কাছেও। তিনি জেনেছিলেন পরাজয়ের আগে জয়ের কত কাছাকাছি তাঁরা পৌঁছেছিলেন। সুতরাং দ্য তাসিনির সৈন্যবলকে আর ভয় করবার কিছু ছিল না তাঁদের।

সেই সঙ্গে সামরিক দৃষ্টিভঙ্গীরও কিছু কিছু পরিবর্তন ঘটেছিল। সম্মুখ যুদ্ধে শত্রুকে সরাসরি পরাজিত করার চাইতে শত্রুসৈন্যকে কোন একটি জায়গায় যত বেশি সময় সম্ভব আটকে রেখে অন্যত্র ছড়িয়ে পড়ার দিকে গিয়াপ বেশি নজর দিলেন। নিছক সংখ্যাবলের চাইতে কৌশল এখন ভিয়েৎমিনদের বড় অস্ত্র হয়ে দাঁড়াল।

সুতরাং সামনা-সামনি মোকাবিলার উদ্দেশ্য নিয়ে জেনারেল দ্য তাসিনি যখন ১৯৫১ সালের ১৪ নভেম্বর একদল ছত্রী সৈন্যকে হোয়া বিনে নামিয়ে দিলেন, তখন তাঁকে নিরাশ হতে হয়েছিল।

কোন বাধাই আসে নি গেরিলাদের তরফ থেকে।

তার বদলে, গেরিলারা তাদের ভারী ভারী মেশিনগান টেনে তুলে এনেছিল চারদিকের পাহাড়ের ওপর। বসিয়েছিল নিচের দিকে তাক করে। বসিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল।

অপেক্ষা করতে কোন বাধা ছিল না। কারণ হোয়া বিন তখন তাদের হাতের মুঠোর মধ্যে রয়েছে। এই ভৌগোলিক সুবিধা আদায় করতে পারে নি ফরাসীরা। তাদের ছত্রীরা যখন এসে নামল তখন চারদিকের পাহাড়ে কঠিন ভিয়েৎমিন ব্যূহ রচিত হয়ে গেছে।

ফরাসীদের জমায়েৎ হবার প্রচুর সুযোগ দিল গেরিলারা। জেনারেল দ্য তাসিনি একে একে যতগুলি সম্ভব রিজার্ভ বাহিনীকে নিয়ে এলেন হোয়া বিনে। ব-দ্বীপ প্রায় অরক্ষিত পড়ে রইল। সেই সুযোগে ভিয়েৎমিনরা ছড়িয়ে পড়ল দক্ষিণ ব-দ্বীপ এলাকায়।

তারপর ওরা আক্রমণ আরম্ভ করল;

ফরাসীরা ছিল সম্পূর্ণ তাদের দয়ার ওপর। এইবার ওরা এক এক করে ভিন ইয়েনের প্রতিশোধ নিতে আরম্ভ করল।

মর্টারের প্রচণ্ড গোলায় প্রথমে বিধ্বস্ত হল হোয়া বিনের বিমানঘাঁটিতে দাঁড়িয়ে থাকা প্লেনগুলি।

সৈন্য ও রসদ নিয়ে প্লেনগুলি এলো পাহাড়ের খাঁজ দিয়ে নিচু হয়ে নামতে গিয়ে সেগুলি জখম হল অত্যন্ত সহজে গেরিলাদের অব্যর্থ গুলীতে।

পাশেই ছিল ব্ল্যাক রিভার। জেনারেল দ্য তাসিনি চেষ্টা করলেন ঐ নদীপথে সৈন্য পাঠিয়ে গেরিলাদের পেছন থেকে আক্রমণ করবার।

তাদের রক্তে ব্ল্যাক রিভারের কালো জল লাল হয়ে গিয়েছিল সেদিন।

ভিন ইয়েনের পুনরাবৃত্তি ঘটাতেও ...সর করেন নি দ্য তাসিনি। নেপাম বর্ষিত হয়েছিল হোয়া বিনের পাহাড়েও। কিন্তু আগুন স্পর্শ করতে পারে নি গেরিলাদের কারণ ওরা এবার সুরক্ষিত ছিল মাটির নিচে। ওদের তাগিদ ছিল না বেরিয়ে আসার। ওরা ছিল পাহাড়ের অনেক ওপরে। লক্ষ্যবস্তুকে ওরা খতম করতে পারত যখন খুশি এবং যেখানে খুশি।

তিন মাস এইভাবে লড়াই চলেছিল হোয়া বিনে। তিন মাস ওরা আটকে রেখেছিল দ্য তাসিনির বাহিনীকে। তিন মাস ধরে দ্য তাসিনি কেবলই অপেক্ষা করছিলেন সরাসরি বড় রকমের একটা আক্রমণের জন্যে। কিন্তু সে আক্রমণ আসে নি।

শেষে ফরাসী শিবিরে যখন ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে যাবার উপক্রম হল তখন বিস্ময়ে বিস্ফারিত দ্য তাসিনি দেখলেন পাঁচ হাজারেরও বেশি ফরাসী হোয়া বিনে নিহত হয়ে গেছে।

উদ্বিগ্ন হল ফরাসীরা। ফ্রান্সের সরকারী কর্তৃপক্ষ রীতিমত ঘাবড়ে ...লেন। ব্যস্ত হয়ে তাঁরা সরিয়ে নিলেন ...রেল দ্য তাসিনিকে। সে জায়গায় এলেন জেনারেল রাউল সালাঁ।

এসেই সঙ্গে সঙ্গে জেনারেল সালাঁ নির্দেশ দিলেন হোয়া বিন থেকে ফরাসী...দের সরে আসবার জন্যে। হোয়া বিনের যুদ্ধে সেটাই ছিল তাঁর একমাত্র অবদান।

সময় হয়ত লেগেছিল বেশি, কিন্তু প্রায় বিনা ক্ষতিতে হোয়া বিন গেরিলারা আবার দখল করে নিয়েছিল।

ভিন ইয়েনে গিয়াপ যে ভুল করেছিলেন, হোয়া বিনে এসে তিনি সে ভুল সম্পূর্ণ শুধরে নিলেন। একটি মূল্যবান শিক্ষাও তিনি পেয়েছিলেন এই যুদ্ধ থেকে। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন দীর্ঘায়িত গেরিলা যুদ্ধের মাধ্যমে কি চমৎকার ফল লাভ করা যায়।

হোয়া বিনের যুদ্ধ জয় করে গেরিলারা নতুন করে নিজেদের খুঁজে পেয়েছিল যেন। নতুন উদ্যমে ও টাটকা মনোবল নিয়ে ওরা জয়ের পর জয় অর্জন করে এগিয়ে চলল। আকাশের এ প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে মেঘের গর্জন যেমন গড়িয়ে গড়িয়ে চলে, ঠিক তেমনিভাবে। কিংবা বন্যার স্রোতের মত যেন। গ্রাম-গ্রামান্তর যেমনভাবে ভেসে যায়, শুধু মাঝে মাঝে কয়েকটি উঁচু গাছ কিংবা উঁচু বাড়ি কিংবা উঁচু টিলা জেগে থাকে, তেমনি হোয়া বিনের যুদ্ধের পর, ১৯৫১ সালের বাকী সময়ে ও ১৯৫২ সালে, ভিয়েৎমিন বাহিনী ছড়িয়ে গিয়েছিল ব-দ্বীপের সমগ্র সমতলভূমিতে। উত্তরে, দক্ষিণে, পশ্চিমে, পূর্বে। কেবল মাঝে মাঝে কয়েকটি শহর, কিংবা কয়েকটি সুদৃঢ় ফরাসী ঘাঁটি কোন মতে মাথা জাগিয়ে ভেসে ছিল। ভিয়েৎমিনের জলরাশি তাদের গায়ে গিয়ে যে ঢেউ তোলে নি তা নয়। ঢেউ উঠেছিল, ঢেউ প্রতিহতও হয়েছিল। কিন্তু তাদের ডুবিয়ে দেবার জন্যে জলরাশি অপেক্ষা করে নি। পাশ দিয়ে এগিয়ে গিয়েছিল আরো বিস্তীর্ণতায় ছড়িয়ে পড়বার জন্যে।

ঐ বিপুল, সর্বব্যাপী জলরাশির মাঝখানে ফরাসীদের গুটিকয় সুরক্ষিত ঘাঁটি ছিল নিতান্তই অসহায়। সেগুলি দখল করতে না পারলেও কোন ক্ষতি ছিল না ভিয়েৎমিনদের। গ্রামাঞ্চল ছিল সম্পূর্ণ তাদের দখলে।

নিজেদের ব্লকহাউসে বসে বন্যার এই অগ্রগতি লক্ষ্য করা ছাড়া ফরাসীদের আর কিছু করার ছিল না।

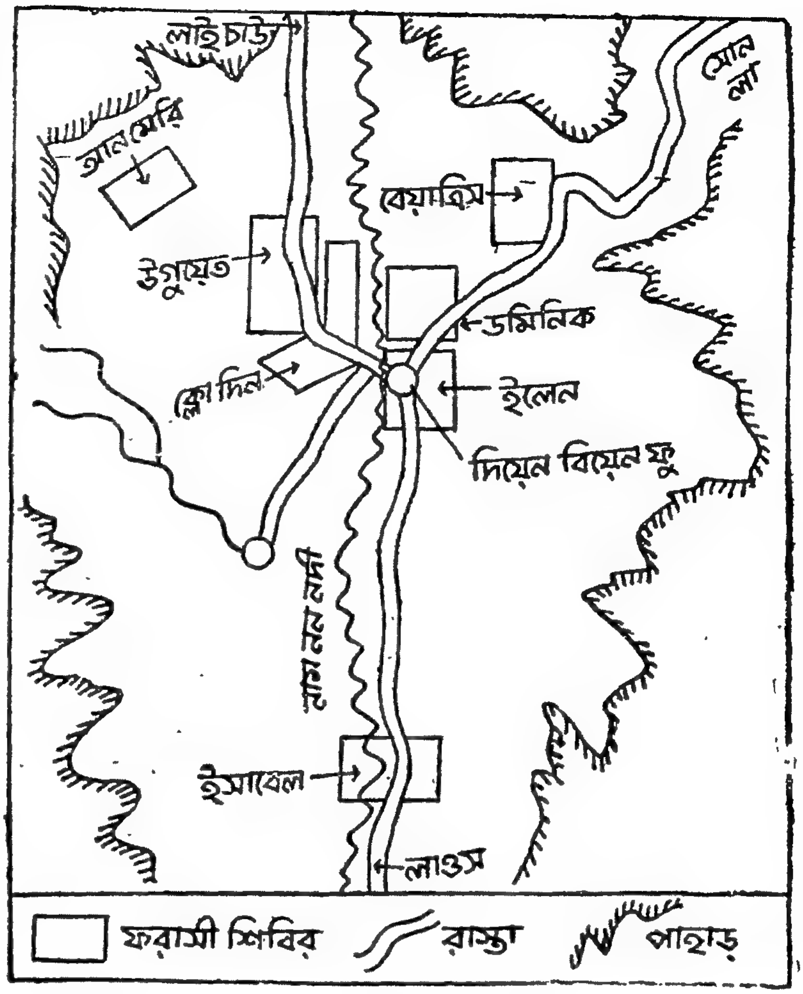

দিয়েন বিয়েন ফু'র রণক্ষেত্র : বিভিন্ন শিবিরের অবস্থা

এইভাবে ব-দ্বীপকে করায়ত্ত করার পর জেনারেল গিয়াপ দৃষ্টি দিলেন পশ্চিমে, লিয়া লো রিজের দিকে।

রিজ, অর্থাৎ পাহাড়ের পিঠ। চার নম্বর রুটের পাহাড়ের পিঠটি যেরকম ছিল, লিয়া লো'ও ছিল তেমনি। ব্ল্যাক আর রেড রিভারের মাঝখানে অনেকটা উত্তরে-দক্ষিণে বিছিয়ে ছিল লিয়া লো পাহাড়ের পিঠ। এই পাহাড়টা পেরিয়ে যেতে পারলেই সোজা লাওসের সীমান্তে পৌঁছে যাওয়া যায়। সেখানে পাহাড় এদিককার চাইতে আরো বেশি উঁচু, কাজেই ঐখানে পৌঁছতে পারলে ফরাসীদের ওপর প্রচণ্ড সামরিক সুবিধা আদায় করা যায়।

কিন্তু ঐখানে পৌঁছনোর পথে বাধা ছিল বিরাট। লিয়া লো পাহাড়ের ওপর ফরাসীদের কয়েকটি শক্ত ঘাঁটি ছিল। ঐ সব ঘাঁটির ফাঁক দিয়ে যে গেরিলারা গলে যেতে পারত না তা নয়। কিন্তু গিয়াপ চেয়েছিলেন লাওস সীমান্ত পর্যন্ত একটা অবাধ যাতায়াতের রাস্তা। সেটা

সম্ভব হবে না যদি না ঐ ঘাঁটিগুলি দখল করে নেওয়া যায়।

গিয়াপ তাই এবার লিয়া লো'র ঘাঁটিগুলি দখলের জন্যে তৎপর হলেন।

তিনটি পুরো ভিয়েৎমিন ডিভিশনকে (প্রায় ৩৩ হাজার সৈন্য) তিনি নিয়োগ করলেন এই কাজে। যদিও এত সৈন্যের কোন দরকার ছিল না, কিন্তু গিয়াপ কোন ঝুঁকি নিতে চান নি। আর কোন পরাজয়ের জন্যে তিনি প্রস্তুত ছিলেন না।

এর পরের ঘটনায় প্রমাণ হয় যে, গিয়াপ ভুল করেন নি।

ভিয়েৎমিনরা ব-দ্বীপ এলাকাতেই তৎপর এটাই জেনারেল সালাঁ জানতেন। তারা যে পশ্চিমের দিকে নজর দেবে এবং এত বিপুল সংখ্যক সৈন্য ব-দ্বীপ থেকে সরিয়ে নেবে সেটা তাঁর মাথায় আসে নি। কাজেই লিয়া লো'র ঘাঁটিগুলি রক্ষার জন্যে বিশেষভাবে কোন ব্যবস্থাই ছিল না। ঐ অঞ্চলে আক্রমণের জন্যে ফরাসীরা আদৌ প্রস্তুত ছিল না।

কাজেই ১৯৫২ সালের অক্টোবরে গেরিলারা যখন লিয়া লো'র পাহাড়ের পিঠে উদয় হল তখন একটা মস্ত বিষয় ছিল তাদের অনুকূলে। তারা ফরাসীদের অবাক করেছিল। বিস্ময়ের ঘোর কাটবার আগেই অর্ধেক যুদ্ধ জয় করেছিল তারা। বাকী অর্ধেক যুদ্ধ জয় করেছিল নিছক সংখ্যাবল দিয়ে।

ঐ বিপুল আক্রমণের সামনে ফরাসীরা ভেসে গিয়েছিল বন্যার মুখে কুটোর মতো। সাহায্য আসবার কোন সময়ই ছিল না।

চার নম্বর রুটের জয় যেমন একবার বাঁধ ভেঙে দিয়েছিল, তেমনি লিয়া লো'র বিজয় আরেকবার এবং আরো বিরাট ফাটল ধরালো ফরাসী প্রতিরক্ষার দেয়ালে। এই ফাটল দিয়ে গেরিলারা এখন আরো সহজে, আরো অবাধে ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে। গুরুত্বপূর্ণ লাওস সীমান্ত এখন তাদের জন্যে উন্মুক্ত। গোটা টংকিনেই এখন তাদের কার্যকর প্রভাব বিস্তীর্ণ।

জেনারেল সালাঁ দেখলেন গতিক সুবিধের নয়। এদিকে ফরাসীদের অবস্থা টলায়মান, ওদিকে ফরাসী জাতীয় পরিষদে যুদ্ধের বিরুদ্ধে সমালোচনা ক্রমশ মুখর হয়ে উঠছে। তাঁর নিজের অবস্থাও খুব নিরাপদ নয়।

তিনি ফিকির খুঁজতে লাগলেন কিভাবে ঢেউয়ের প্রতিকূলতা ফিরিয়ে দেওয়া যায়।

ভাবতে ভাবতে তাঁর মাথায় একটা কুবুদ্ধি ঘনালো। পিঁপড়ার যেমন মরবার জন্যে পাখা ওঠে।

তিনি দেখলেন, ভিয়েৎমিনদের তিনটি ডিভিশন এখন রেড রিভারের পশ্চিমে রয়েছে। নদীর পূর্বে উত্তর টংকিনে ভিয়েৎমিনদের মূল ঘাঁটির সঙ্গে তার যোগাযোগ এখন খুবই ক্ষীণ। তিনটি ডিভিশন দূরে থাকায় মূল ঘাঁটিও এখন অপেক্ষাকৃত অরক্ষিত। কাজেই এখন যদি নদীর পূর্ব তীর বরাবর এগিয়ে যাওয়া যায় তাহলে কেবল তিনটি পশ্চিমী ডিভিশনকে বিচ্ছিন্ন করে খতম করা যাবে তাই নয়, মূল ভিয়েৎমিন ঘাঁটির ওপরেও আঘাত হানা সম্ভব হবে।

এই অভিযানের নাম দেওয়া হল 'অপারেশন লোরেন'।

কিন্তু সালাঁ একটা কথা চিন্তা করেন নি। নিজেদের যোগাযোগের সূত্র রক্ষার প্রশ্ন। তিনি ভেবেছিলেন উত্তর টংকিনের দিকে এগোতে দেখলেই গেরিলারা বাধা দেবে এবং অপেক্ষাকৃত দুর্বল হওয়ার দরুণ তাদের পরাজিত করে তাঁর সৈন্যরা এগিয়ে যাবে।

গিয়াপের মাথা সালাঁর মত মামুলী ছিল না। ফরাসীদের তিনি বাধা দিলেন না মোটেই। তাদের এগিয়ে যেতে দিলেন যতটা ভেতরে তারা যেতে পারে, নিজেদের মূল ঘাঁটি থেকে যত দূরে।

ফরাসীরা ভাবল তারা জয়লাভ করছে। কিন্তু পেছনে পেছনে তাদের যোগাযোগ ও সরবরাহের সূত্র ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হচ্ছিল। এই সূত্র যখন ক্ষীণতম, তখন, কেবল জেনারেল সালাঁর মাথায় এলো কি ভয়ঙ্কর ফাঁদে তিনি নিজেই ধরা দিয়েছেন।

'অপারেশন লোরেন' কোনরকম অপারেশন আরম্ভ করবার আগেই বেসামাল জেনারেল সালাঁ তাঁর সৈন্যদের নির্দেশ দিলেন ফিরে আসবার জন্যে। প্লেন পাঠালেন মাথার ওপরে থেকে তাদের পাহারা দিয়ে নিয়ে আসবার জন্যে।

কিন্তু পাহারা আকাশেই রইল। নিচে, গেরিলাদের তাতে কিছুই এলো বা গেল না। অগ্রগমন বা পশ্চাদপসরণ, রাস্তা দুইয়েরই ছিল একটি। আর সেই রাস্তাও, ঘন গভীর জঙ্গলের বেড়া দিয়ে ঘেরা। সেই জঙ্গলে অপেক্ষা করছিল গেরিলারা, পাতার সঙ্গে পাতা হয়ে মিশে। ঐ উঁচু উঁচু জঙ্গলের সামিয়ানা ভেদ করে আকাশ থেকে দৃষ্টি চলে না একটুও। সেই নিরাপদ আশ্রয়ে বসে ওরা নিজেদের সময় ও সুযোগ মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে কচুকাটা করেছিল জেনারেল সালাঁর ঘরমুখী সৈন্যদের।

ভিয়েৎনামে ফরাসীদের বিপর্যয় আরও এক ধাপ এগিয়ে গেল।

বিভ্রান্ত সালাঁ দেখলেন, শ্যাওলা তাঁকে চারদিক থেকে ঘিরে ধরেছে। তিনি দু' হাতে শ্যাওলা সরিয়ে ইতস্তত এগিয়ে যেতে লাগলেন। কিন্তু এগিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই আবার পেছনে ফাঁকটুকু ভরে যেতে লাগল।

জেনারেল সালাঁর মামুলী মাথা ভেবে পাচ্ছিল না কি করে এটা সম্ভব।

১৯৫৩ সালের গোড়ায় এই যখন ছিল অবস্থা—টংকিনের অধিকাংশ গেরিলাদের দখলে, অধিকাংশ ফরাসী সৈন্য কতগুলি বিচ্ছিন্ন শহর আর ঘাঁটি রক্ষার কাজে আটকে আছে, আর যে অংশ গতিশীল আছে তারাও গেরিলাদের পেছন পেছন ধাওয়া করতে করতেই ক্লান্ত, জেনারেল সালাঁর অসহায়তা যখন ক্রমেই ফুটে উঠছে, ফ্রান্সের ভেতর যখন যুদ্ধের বিরুদ্ধে জনমত প্রবল হয়ে উঠছে,—তখন জেনারেল গিয়াপ চূড়ান্ত আক্রমণের জন্যে প্রস্তুত হলেন।

কিন্তু তিনি সামনা-সামনি কোন ফরাসী ঘাঁটিতে গিয়ে চড়াও হলেন না। তাতে লোকক্ষয়ের সম্ভাবনা খুব বেশি। গেরিলা যুদ্ধে এইভাবে লোকক্ষয় হতে দেবার কোন দরকার নেই।

তার বদলে তিনি লাওসে অনুপ্রবেশের সিদ্ধান্ত নিলেন।

লাওসে তখন ভিয়েৎনামের সীমান্তবর্তী এলাকায় পাথেট লাও বিদ্রোহীরা সক্রিয় ছিল। সেখান থেকে ওরা লড়াই চালাচ্ছিল রাজার বিরুদ্ধে। বিদ্রোহীদের নেতা প্রিন্স সুফানুভং সে সময় ছিলেন ভিয়েৎমিনদের হেড কোয়ার্টারে।

লাওস অভিযানের পেছনে হো চি মিন ও গিয়াপের একটা উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই ছিল পাথেট লাও বাহিনীর শক্তি বৃদ্ধি করা। কিন্তু আরেকটি উদ্দেশ্যও ছিল: জেনারেল সালাঁর বাহিনীকে টংকিন থেকে যতটা সম্ভব টেনে বার করে এনে লাওসের পাহাড়ে জঙ্গলে ছড়িয়ে দেওয়া। সেটাই ছিল প্রধান।

এই অভিযান ছিল একটা চমৎকার ওস্তাদের মার। ফাঁদে পা দিয়েছিলেন সালাঁ। না দিয়ে উপায় ছিল না। কারণ তাহলে লাওস অবাধ হয় গেরিলাদের জন্যে।

সুতরাং ৯ এপ্রিল যখন তিনটি ভিয়েৎমিন ডিভিশন মক চাউ নামক একটি জায়গা থেকে তিন দিক দিয়ে লাওসে প্রবেশ করল, তখন লাওসের নিরাপত্তার জন্যে উৎকণ্ঠিত জেনারেল সালাঁকেও বাধ্য হয়েই যেতে হয়েছিল তাদের পিছু পিছু।

গিয়াপ মনে মনে হাসছিলেন ফ্রান্সের এই কেতাবী জেনারেলের বুদ্ধি দেখে। তাঁর কৌশল এত ভালোভাবে খেটে যাবে তা তিনি নিজেও হয়ত ভাবতে পারেন নি। লাওসে যে ফরাসী সৈন্যরা ছিল, আগুয়ান ভিয়েৎমিনদের সামনে থেকে তারা

মরেন্স

আজকালকার স্থপতিরা গৃহনির্মাণে এইচ পি জি গ্লাস ব্যবহার করেন

হেক্স্যাগোনাল ওয়্যারড

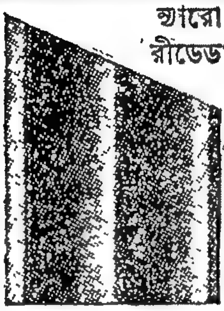

হ্যারো রীডেড

আজকের দিনের বাড়ীঘর ও অফিস-কাছারি, কলকারখানা, ইস্কুল ও হাসপাতালে সুদক্ষ ইঞ্জিনিয়াররা সর্ব্বত্রই এইচ পি জি গ্লাস লাগান, কেননা তাঁরা জানেন যে এইচ পি জি গ্লাস উৎকর্ষের নিখুঁত মান বজায় রেখে তৈরী হয়। বিলাতের শতাধিক বৎসরের কাঁচনির্মাণকারী প্রতিষ্ঠান পিলকিংটন ব্রাদার্স-এর কারিগরী কুশলতার সাহায্য নিয়ে হিন্দুস্থান পিলকিংটন গ্লাস ওয়ার্কস এই এইচ পি জি গ্লাস তৈরী করেন।

শীট গ্লাস

এইচ পি জি কেনা মানেই নির্ভরযোগ্য ভাল জিনিস কেনা।

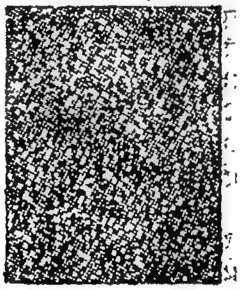

মরক্কো পিনহেড

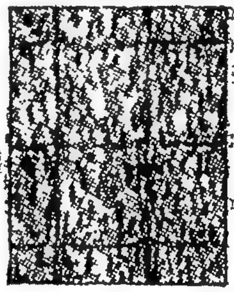

জর্জিয়ান ওয়্যারড

হিন্দুস্থান পিলকিংটন গ্লাস ওয়ার্কস লিমিটেড

রাফকাস্ট

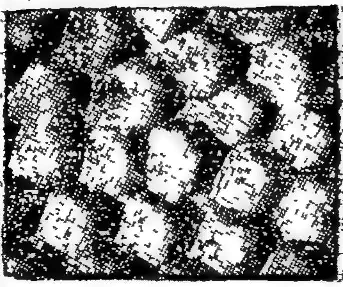

হ্যামার্ড

ম্যানেজিং এজেন্টস:
তালুকদার্স অ্যাণ্ড কোম্পানী প্রাইভেট লিমিটেড
হিন্দুস্থান বিল্ডিংস
৪, চিত্তরঞ্জন অ্যাভেনিউ,
কলিকাতা-১৩

IWTHP 1775A

ক্রমেও আরো ভেতরে সরে যেতে লাগল। আর যত তারা পেছনে সরতে লাগল জেনারেল সালাঁকে ততই বাধ্য হয়ে আরো, আরো সৈন্য পাঠাতে হল টংকিন থেকে। পাঠাতে হল বিমান। তাদের হাতে যত ছিল প্রায় সব।

কারণ ভিয়েৎমিনরা লুয়াং প্রাবাং ও ভিয়েন্তিয়েনের কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছিল। জেনারেল সালাঁ ভাবলেন গেরিলারা বুঝি লাওস দখল করে নিতে চায়।

কিন্তু লাওস দখল করার ইচ্ছা গিয়াপের ছিল না। এই উদ্দেশ্য তাঁর ওপর আরোপ করার অর্থ হল ইতিহাসের অপব্যাখ্যা করা। গিয়াপ যা চেয়েছিলেন তা হল ফরাসী বাহিনীকে নাকে দড়ি দিয়ে টেনে বার করে এনে তাদের মূল সরবরাহ ঘাঁটি হ্যানয় থেকে যত দূরে সম্ভব নিয়ে গিয়ে ছড়িয়ে দেওয়া।

এই উদ্দেশ্য যখন সিদ্ধ হল, সালাঁর বাহিনী যখন হ্যানয় থেকে শ' তিনেক মাইল দূরে গিয়ে পৌঁছেছে এবং যখন তার পরেও সালাঁ আরো সৈন্য পাঠিয়ে চলেছেন, তখন সালাঁকে তাঁর দুঃস্বপ্নে ভুলিয়ে রাখার জন্যে একটি ডিভিশন সেখানে রেখে গিয়াপ দুটি ডিভিশনকে ফিরিয়ে নিয়ে এলেন টংকিনে।

ফরাসীরা এই ছল মোটেই বুঝতে পারে নি। তারা ভেবেছিল তিনটি ডিভিশনই লাওসে রয়েছে এবং লাওস দখল করে নেওয়াই গেরিলাদের উদ্দেশ্য।

এই ভেবে তারা সেখানেই ঘুরে মরতে লাগল।

তখন মে মাস।

এই খবর যখন ফ্রান্সে পৌঁছল তখন রব উঠল সামাল সামাল।

ফরাসী সরকার দেখলেন টংকিন অরক্ষিত এবং হ্যানয়-হাইফং বেড়াজালের মধ্যেও অধিকাংশ স্থানই তাঁদের হাতছাড়া।

ওদিকে আন্নামে উয়ে, দানাং ও না ত্রাংয়ের আশেপাশে কিছু এলাকা ছাড়া আর সবই গেরিলাদের দখলে।

কোচিন চীনের অবস্থা যদিও একটু ভালো, তবু সেখানেও বিশেষ করে মেকং ব-দ্বীপ এলাকায় ভিয়েৎমিনরা দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে।

এই যেখানে অবস্থা সেখানে জেনারেল সালাঁ তাঁর অধিকাংশ বাহিনীকে লাওসে ঢুকিয়ে দিয়ে বসে আছেন।

জেনারেল সালাঁ যে ফরাসী সামরিক শক্তিকে কতখানি অসহায় ও বিপন্ন করে তুলেছেন সেটা এখন দিনের আলোর মত স্পষ্টভাবে ধরা পড়ল।

ফরাসী সরকার ভাবলেন, তবু একবার শেষ চেষ্টা করে দেখা যেতে পারে। কিন্তু সে চেষ্টা সালাঁকে দিয়ে হবে না। সালাঁর মস্তিষ্ক অনেক আগেই দেউলে হয়ে গিয়েছিল।

অতএব মার্কিনী বাঁধিবিধি অনুসারে জেনারেল সালাঁকে 'গুলী' করা হল। অর্থাৎ ছাঁটাই।

তাঁর জায়গায় নতুন নায়ক এলেন জেনারেল অঁরি নাভার। ১৯৫৩ সালের ৮ মে।

কিন্তু পরিবর্তন হল শুধু ব্যক্তির, দৃষ্টিভঙ্গির মোটেই নয়। দেখা গেল, সালাঁ যে ভুল করেছিলেন নাভারও ঠিক সেই ভুলই করতে যাচ্ছেন। ভিয়েৎমিনদের উদ্দেশ্য ও কৌশল দুজনের কেউই বুঝতে পারেন নি।

ফ্রান্স তখন যুদ্ধ করে করে এত ক্লান্ত, তার মনোবল তখন এত নিচু যে, এই ভুল দেখিয়ে দেবার মতো বুদ্ধি অবশিষ্ট ছিল না আর কারো মস্তিষ্কেও।

নাভার সঙ্গে করে এনেছিলেন একটি পরিকল্পনা। সামরিক বিপর্যয় রোধ করবার পরিকল্পনা যা শুধু ফরাসীদের চূড়ান্ত পরাজয় থেকে রক্ষা করবে না, বছর তিনেকের মধ্যে ভিয়েৎমিনদের সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন করবে!

দুটি ভাগ ছিল নাভারের পরিকল্পনার। প্রথমত, তিনি চেয়েছিলেন অন্তত বছর দেড়েক দুয়েক টংকিনে ভিয়েৎমিনদের সঙ্গে কোন বড়রকমের লড়াইয়ে নামবেন না। যতটা সম্ভব লড়াই এড়িয়ে এড়িয়েই চলবেন। দ্বিতীয়ত, এইভাবে হাঁফ ছাড়ার যে সুযোগটুকু পাওয়া যাবে সেই সুযোগে বাও দাইর সেনাবাহিনীকে শক্তিশালী ও সুশিক্ষিত করে তোলা হবে। এতে লাভ হবে এই: আন্নাম ও কোচিন চীনের দায়িত্ব বাও দাইর বাহিনীকে দিয়ে সেখান থেকে ফরাসীদের নিয়ে আসা হবে টংকিনে। তারপর বর্ধিত শক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়া হবে ভিয়েৎমিনদের ওপর।

কিন্তু আশা যেমন ছিল, তেমনি আশার ছলনাও ছিল। ভিয়েৎনামে পৌঁছেই জেনারেল নাভারেরও বুদ্ধি গেল বিগড়ে। সালাঁর মত তিনিও ধরে নিলেন —কি অদ্ভুত ধারণা!—টংকিন ছেড়ে দিয়ে ভিয়েৎমিনরা এখন লাওস দখল করতেই চায় এবং সেই দিকেই তারা গেরিলা বাহিনীকে পরিচালিত করছে।

নাভার ভাবলন, বাঃ। মেঘ না চাইতেই জল! ভিয়েৎমিনদের অধিকাংশ বাহিনী রয়েছে লাওসে। কাজেই যদি ঐ বাহিনী এবং ভিয়েৎমিন মূল ঘাঁটির মধ্যে যোগাযোগের রাস্তা সর্বশক্তি দিয়ে আটকে দেওয়া যায়, তাহলেই তো কেল্লা ফতে। গিয়াপের বাহিনী আর মূল ঘাঁটির সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে পারবে না, আর সেই সুযোগে তাদের ঝাড়ে-বংশে নির্মূল করা যাবে।

আনন্দের চোটে নাভার সেদিন লাফিয়ে উঠেছিলেন কিনা আমি জানি না, কিন্তু তাঁর পরিকল্পনার আমূল পরিবর্তন ঘটে গিয়েছিল।

খোঁজ নিয়ে জানলেন নাভার টুয়াম ইয়াও নামে একটা জায়গায় ভিয়েৎমিনদের একটি অগ্রবর্তী ঘাঁটি আছে। তিনি ভাবলেন, সেখান থেকেই হয়ত লাওসের অভিযান আরম্ভ করবে গেরিলারা।

এবং টুয়াম ইয়াও থেকে লাওসের রাস্তা কোথা দিয়ে গিয়েছে?

ম্যাপ দেখলেন নাভার। টুয়াম ইয়াও থেকে একটি রাস্তাই গিয়েছে লাওসের দিকে, আর সেই রাস্তা গিয়েছে দিয়েন বিয়েন ফুর ওপর দিয়ে।

সুতরাং রাস্তা যদি আটকাতে হয় তো দিয়েন বিয়েন ফুতে।

*

দিয়েন বিয়েন ফু! ভিয়েৎনামের ইতিহাসে যা একটা জল-বিভাজিকার মতো দাঁড়িয়ে রয়েছে।

দিয়েন বিয়েন ফু! যেখানে ইতিহাস মোড় নিয়েছে সম্পূর্ণ নতুন এক পথে।

কিন্তু জেনারেল নাভার অত্যন্ত সাধারণ একটা কথা ভুলে গিয়েছিলেন। দিয়েন বিয়েন ফু দিয়ে যে গেরিলাদের যেতেই হবে তেমন কোন কথা নেই। জঙ্গল যাদের আশ্রয়, পাহাড় ডিঙিয়ে যাদের নিত্য চলাফেরা, জল-কাদায় কিংবা ঘাসের বনের ভেতর দিয়ে যারা বুকে হেঁটে মাইলের পর মাইল অতিক্রম করে যায়, শহর-গঞ্জ কিংবা বাঁধানো সড়ক দিয়ে তাদের না গেলেও চলে।

এমন অনেকবার হয়েছে ফরাসীরা কোন গ্রামাঞ্চলে ঘাঁটির পত্তন করেছে খোঁজ পেয়ে গেরিলাদের পথরোধ করবার জন্যে। ওরা অনেকটা ঘুরে ঠিক তাদের লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে গেছে।

হোয়া বিনের যুদ্ধের সময় এইরকম হয়েছিল। গেরিলাদের দরকার ছিল লো নামে একটা নদী পার হবার। কিন্তু নদীর দক্ষিণ তীরে ফরাসীদের কড়া পাহারা। নদীতে ফরাসী নৌকা সব সময় টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে। এই অবস্থায় কি করে পার হওয়া যায়?

সমস্যা বটে। কিন্তু সমস্যার সমাধানও পাওয়া গেল সঙ্গে সঙ্গে। নদী থেকে মাইল দশেক দূরে একটা জায়গায় জড়ো হল গেরিলারা। ডাকল গ্রামবাসীদের। চটপট বানিয়ে ফেলল কয়েকটা নৌকা। তারপর গ্রামবাসীদের সহায়তায় সেগুলি কাঁধে করে বয়ে নিয়ে গেল বেশ কিছু দূরে নদীর তীরের একটা নিভৃত জায়গায়। হোয়া বিন থেকে অনেকখানি নিচে।

ফরাসী টহল ঐ পর্যন্ত পৌঁছয় নি। কারণ তারা ভাবতেই পারে নি যারা হোয়া বিনে আসতে চায় তারা এত দূরে গিয়ে নদী পার হবে।

হ্যাঁ, এত দূরে গিয়েই নদী পার হয়েছিল গেরিলারা। রাতের অন্ধকারে। তারপর গ্রামবাসীরা আবার সেই নৌকাগুলি কাঁধে করে ফিরিয়ে নিয়ে গিয়েছিল যেখান থেকে এসেছিল সেখানে, যাতে ফরাসীরা ঘুণাক্ষরেও কিছু বুঝতে না পাবে।

কাজেই দিয়েন বিয়েন ফু দিয়ে ওদের যেতেই হবে এমন কি কথা আছে?

কিন্তু বুদ্ধি যখন লোপ পায় তখন আর আগুপাছু বিবেচনা করার মত অবস্থা থাকে না। জেনারেল নাভারেরও ছিল না। অতএব তিনি দিয়েন বিয়েন ফু'তে সর্বশক্তি নিয়োগ করে গেরিলাদের পথরোধ করার পরিকল্পনা নিয়ে এগিয়ে গেলেন। এবং এই উদ্দেশ্যে সাহায্য চাইলেন আমেরিকার।

আমেরিকা, আমি আগেই বলেছি, ফ্রান্সকে সামরিক সাহায্য কয়েক বছর ধরেই দিয়ে আসছিল। ১৯৫০ থেকে কোন না কোনভাবে বছরে গড়পড়তা ৫০ কোটি ডলারের মতো। কিন্তু তাতে কুলোচ্ছিল না। নাভার দেখলেন, ফরাসীদের অস্ত্রশস্ত্র যা আছে সব পুরনো হয়ে গেছে, নতুন অস্ত্রশস্ত্র দরকার। দরকার বিমানেরও। সামরিক বাহিনীর সম্প্রসারণ করাও একান্ত আবশ্যক। কারণ ভিয়েৎমিনদের তখন ছিল সোয়া লক্ষেরও বেশি নিয়মিত সৈন্য, ৭৫ হাজার আঞ্চলিক সৈন্য, আর দুই থেকে সাড়ে তিন লাখ গ্রামরক্ষী বাহিনী। সে তুলনায় ফরাসীদের হাতে মাত্র ১ লক্ষ ৯০ হাজার সৈন্য যার মধ্যে লাখ খানেকেরও বেশি পাহারাদারীর কাজে আটকে ছিল। আর ছিল বাও দাই সরকারের লাখ খানেকের মতো সৈন্য। সুতরাং সৈন্যসংখ্যা না বাড়াতে পারলে গেরিলাদের সঙ্গে পেরে ওঠার আশা নেই।

জেনারেল নাভার তাঁর ফর্দ নিয়ে গেলেন প্যারিসে, প্যারিস থেকে দূত গেল ওয়াশিংটনে। ১৯৫৩ সালের সেপ্টেম্বরে মার্কিন সরকার ঘোষণা করলেন, ইন্দোচীনের যুদ্ধের জন্যে ফ্রান্সের যা খরচা হবে তার শতকরা ৭০ ভাগ পর্যন্ত তাঁরা বহন করবেন।

প্রকৃতপক্ষে দিয়েন বিয়েন ফু'তে ভিয়েৎমিনদের সঙ্গে শক্তি পরীক্ষার জন্যে নাভারের পরিকল্পনায় আমেরিকার উৎসাহই ছিল সবচেয়ে বেশি। ফরাসী সরকার বরং চটেই ছিলেন নাভারের ওপর তাঁর মূল পরিকল্পনা বাতিল করে দেওয়াতে। কিন্তু মার্কিন সরকার যখন যুদ্ধের অধিকাংশ ব্যয় বহন করতে রাজী হলেন এবং প্রেসিডেন্ট আইজেনহাওয়ার যখন ব্যক্তিগত আগ্রহ দেখালেন এই ব্যাপারে, তখন তাঁদের আপত্তি টিকল না।

অতএব নাভার পূর্ণ উদ্যমে দিয়েন বিয়েন ফু দখল করে নিয়ে একটি দুর্ভেদ্য ফরাসী শিবির পত্তনের জন্যে অগ্রসর হলেন। দখল করে, কারণ দিয়েন বিয়েন ফু সেই সময় ছিল ভিয়েৎমিনদের হাতে।

হ্যানয়ের ২০০ মাইল পশ্চিমে একটি বড় গ্রামের নাম দিয়েন বিয়েন ফু। মাইল বারো লম্বা আর মাইল আটেক চওড়া একখণ্ডে সমতলভূমি। সমতল বললে অবশ্য পুরো ঠিক বলা হয় না। কারণ ধানখেতের মাঝে মাঝে এধার-ওধার কয়েকটা টিলা। ন্যাড়া। বেশি উঁচুও নয়।

একটা ছোট নদী বয়ে গেছে সমতলের মাঝখান দিয়ে, উত্তর থেকে দক্ষিণে। নদীর নাম 'নাম ইয়ুম'। কয়েকটা উপনদী এসে মিশেছে তার সঙ্গে।

হৃৎপিণ্ডের আকারের এই সমতলভূমির চারদিকে রয়েছে পাহাড়। খুব একটা উঁচু পাহাড় নয়, কিন্তু খাড়া। সমতলের দিক থেকে সে পাহাড় বেয়ে ওঠা একরকম দুঃসাধ্য। আর নিবিড় জঙ্গলে ঢাকা। উঁচু উঁচু গাছের ঐ ভিড় ছিল দুর্ভেদ্য।

সব মিলিয়ে চেহারাটা একটা দেয়াল ঘেরা উঠোনের মত। কিংবা ঠিক যেন একটা অ্যামফিথিয়েটার, চারদিক ঘিরে দর্শকদের আসন, মাঝখানে নাটকের রঙ্গমঞ্চ।

তিন দিক থেকে তিনটি রাস্তা এসে মিলেছে দিয়েন বিয়েন ফু'তে। একটি রাস্তা গেছে উত্তরে, লাই চাউ হয়ে চীনের দিকে। আরেকটি তুয়াম ইয়াও হয়ে উত্তর-পশ্চিমে। তৃতীয়টি গেছে দক্ষিণে, লাওসে। লাওসের সীমান্ত এখান থেকে মাত্র দশ মাইল।

এছাড়া ছিল দুটি এয়ারস্ট্রিপ। ফরাসীরাই এক সময় বানিয়েছিল। একটি বড়, দিয়েন বিয়েন ফু গ্রামের কাছাকাছি। আরেকটি ছোট, মাইল তিনেক দক্ষিণে।

*

১৯৫৩ সালের ২০শে নভেম্বর জেনারেল নাভার তিন ব্যাটেলিয়ন ছত্রী সৈন্য নামিয়ে দিলেন দিয়েন বিয়েন ফু'র মাটিতে। এই পাহাড়-ঘেরা অ্যামফিথিয়েটারের রঙ্গমঞ্চে যে নাটকের দৃশ্য উন্মোচিত হতে চলেছিল আর কয়েক মাসের মধ্যে এরাই ছিল তার প্রথম অভিনেতা।

সঙ্গে সঙ্গে সুরু হয়ে গেল একটি সুরক্ষিত গ্যারিসন তৈরি করার কাজ। নাম ইয়ুম নদীর ধারে গ্রাম ও বড় এয়ারস্ট্রিপের মাঝামাঝি স্থাপিত হল কম্যান্ড হেডকোয়ার্টার। তাকে ঘিরে উত্তরে, দক্ষিণে, পূর্বে ও পশ্চিমে চারটি শক্তিশালী শিবির: ডমিনিক, ক্লোদিন, ইলেন ও উগুয়েত। এই মূল ঝাঁকের চারপাশেও একটু দূরে দূরে আবার চারটি সশস্ত্র শিবিরের পত্তন হল: তিনটি টিলার ওপর বেয়াত্রিস, গাব্রিয়েল ও ইসাবেল এবং ফাঁকা ধানখেতের ওপর আন মেরি। বেয়াত্রিস, গাব্রিয়েল ও ইসাবেল ছিল প্রায় পাহাড়ের দেয়ালের কাছাকাছি।

শিবিরগুলি এমনভাবে সাজিয়েছিলেন নাভার যাতে কোন একটি শিবির আক্রান্ত হলে অন্য শিবির থেকে গোলাবর্ষণ করে তাকে রক্ষা করা যায়। পরিকল্পনা ছিল এইরকম: দূরের শিবিরগুলি ভিয়েৎমিনদের প্রথম আক্রমণ ঠেকাবে এবং ইতিমধ্যে মূল ঝাঁকের শিবিরগুলি তৈরি হয়ে নিতে পারবে পাল্টা আক্রমণের জন্যে।

ফেব্রুয়ারীতে ফরাসী প্রতিরক্ষামন্ত্রী প্লেভাঁ দিয়েন বিয়েন ফু'তে এসে ব্যবস্থাপনা দেখে গিয়ে বললেন সব ঠিক আছে।

মার্চের গোড়ায় গ্যারিসনের শক্তি বাড়িয়ে ১২ ব্যাটেলিয়ন। এছাড়া এলো অজস্র বন্দুক, ভারী ভারী কামান, ট্যাঙ্ক। এলো অন্তত আধ ডজন জঙ্গী বিমান।

কিন্তু নাভারের পরিকল্পনা বিগড়ে গেল প্রথম থেকেই। দিয়েন বিয়েন ফু'তে তিনি এসেছিলেন এখানে থেকে গেরিলাদের চলার পথে বাধা দেবেন বলে। তার জন্যে দরকার ছিল টহলদারীর। কিন্তু নাভারের বাহিনী এসেই একেবারে আটকে গেল বারো মাইল লম্বা আট মাইল চওড়া ঐ সমতলভূমির মধ্যেই। সেখান থেকে কোন দিকেই তার বেরোবার উপায় ছিল না। বেরোলেই গেরিলাদের চোরাগোপ্তা আক্রমণ।

নাভার নিজের ফাঁদে নিজেই ধরা দিয়েছিলেন।

গিয়াপ এর চাইতে ভালো কিছু আশা করতে পারতেন না। নাভার তাঁর প্রধান শক্তিকে জড়ো করেছিলেন ফাঁকা মাঠে। চারদিকের পাহাড় ছিল গেরিলাদের জন্যে ফাঁকা। ঐ পাহাড় থেকে নিচের বাহিনীকে

কিস্তিবন্দীতে ট্রানজিস্টার

৩২০ টাকা মূল্যের টেলিকুইন, পোর্টেবল ৩ ব্যাণ্ড অল ওয়ার্ল্ড ৮ ট্রানজিস্টার মাসিক ১০ টাকার সহজ কিস্তিতে। আবেদন করুন:

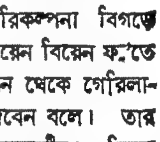

ATLAS CO. (S.B.—22)
Box No. 1329, Delhi—6.

শেষ করে দেওয়া শুধু সময়ের ব্যাপার।

ধীরে ধীরে, অলক্ষ্যে, কিন্তু সুপরিকল্পিতভাবে গিয়াপের বাহিনী পাহাড়ের গায়ে এসে জমতে লাগল।

ফরাসী বিমান অবশ্য টহল দিত আকাশে। কিন্তু নীরব বনাঞ্চল ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ত না তাদের।

পড়বার উপায় ছিল না। কেন না ঐ সব গাছ ছিল শ'খানেক ফুট কি তারও বেশি উঁচু। শ'খানেক ফুট নিচে দিয়ে পাতার আচ্ছাদনে নিজেদের সম্পূর্ণ আচ্ছাদিত করে বুকে হেঁটে পাহাড়ে উঠত গেরিলারা। তাও বেশির ভাগই রাতের অন্ধকারে।

ওদের অস্ত্রশস্ত্র, ওদের গোলাবারুদ, ওদের রসদ আসত অগণিত লোকের পিঠে পিঠে, কিংবা হাতে টেনে আনা সাইকেলের পেছনের ক্যারিয়ারে। হাজার হাজার সাইকেল ওরা লাগিয়ে দিয়েছিল এই কাজে। হঠাৎ দেখলে মনে হবে যেন গ্রামের হাটে কাঁচা তরি-তরকারী নিয়ে যাচ্ছে কোন কৃষক। কিন্তু তরি-তরকারীর ঐ ক্যামোফ্লেজের নিচে ছিল অস্ত্রশস্ত্র। পুরো অস্ত্র নয়, অস্ত্রের অংশ। এইভাবে নিতেও সুবিধা, চোখেও পড়ে না। সেই অংশ বেত পাহাড়ে, সেখানে জোড়া লাগানো হত সেগুলি। বসানো হত জায়গা বুঝে পাহাড়ের গায়ে, নিচের ফরাসী শিবিরের দিকে তাক করে। একটা অদৃশ্য কনভেয়ার বেল্টের মত সমস্ত ব্যাপারটা চলত, ধীরে ধীরে কিন্তু অব্যর্থ গতিতে।

ফরাসীরা আরো টের পেত না কারণ ভিয়েৎমিনরা বিমানগুলিকে টহল দিতে দিত বিনা বাধায়। কারণ ঐ টহলে তাদের কোন ক্ষতি নেই। অপরপক্ষে বাধা দিলে তাদের প্রস্তুতি সম্পর্কে ফরাসীদের কেবল সতর্কই করে দেওয়া হবে।

টের পেত না এই জন্যেও যে, নাভারের নজর বিক্ষিপ্ত করে দেবার জন্যে গিয়াপ টংকিনে ও আন্নামে কিছু কিছু জায়গায় অভিযান চালিয়ে যাচ্ছিলেন। নাভারা ভাবলেন ভিয়েৎমিনরা বুঝি অন্য মতলব করছে। তাই ঐ সব বিক্ষিপ্ত হামলার মোকাবিলা করার জন্যে তাঁকে কিছু কিছু সৈন্য সেখানে পাঠাতেই হল।

এইভাবে ফরাসী সামরিক শক্তিকে বিকেন্দ্রিত করে গিয়াপ দিয়েন বিয়েন ফুতে নিজের শক্তিকে কেন্দ্রায়িত করবার জন্যে তৎপর হলেন।

তিন মাস ধরে চলল তাঁর প্রস্তুতি। হাজার হাজার মানুষ, হাজার হাজার সাইকেল নদী পার হয়ে নালা ডিঙিয়ে শত শত জঙ্গলের পথ ধরে দিনরাত্রি চলতে লাগল শুধু একই লক্ষ্যের দিকে। দিয়েন বিয়েন ফু। চারটি পুরো ডিভিশন এবং একটি ডিভিশনের অংশ এই তিন মাস ধরে জমায়েত হয়েছিল এক এক করে। এসেছিল চীন থেকে মালোটভা ট্রাক গোলন্দাজদের বাক্স নিয়ে। অন্তত ২০০টি কামান ওরা জড়ো করেছিল, বেশ কিছু বিমানধ্বংসী কামান, এবং কিছু রুশীয় রকেট লঞ্চার।

দিয়েন বিয়েন ফুর ফরাসী কম্যান্ডার ছিলেন ব্রিগেডিয়ার-জেনারেল ক্রিশ্চিয়ান দ্য লা ক্রোয়া দ্য কাস্ত্রিস। বাইনোকুলার লাগিয়ে তিনি প্রত্যেকদিন ঘুরে ফিরে দেখতেন চারপাশের পাহাড়। বুঝতে চাইতেন গেরিলারা কোথায়, কত দূরে।

একটা অজানা আশঙ্কায় তাঁর মন চিন্তিত হয়ে উঠত। পুরোপুরি ভিয়েৎমিন-অধ্যুষিত একটি জায়গায় এই ঘাঁটি তিনি আগলে বসে আছেন, এবং দিনের পর দিন অপেক্ষা করছেন, কখন আক্রমণ আসবে।

আক্রমণ আসত না।

নিষ্ফল প্রতীক্ষায় দ্য কাস্ত্রিস শুধু মাঝে মাঝে খবর পেতেন কোন টহলদার দল গ্রামের পথে টহল দিতে গিয়ে আর ফেরে নি। কোথায় ভিয়েৎমিনদের একটা বড় দলকে চলাফেরা করতে দেখা গেছে।

এবং লক্ষ্য করতেন দ্য কাস্ত্রিস টহলদার বাহিনীর গতিবিধির সীমারেখা ক্রমশ সঙ্কুচিত হয়ে আসছে। যুদ্ধ তখনও আরম্ভ হয় নি অথচ এরই মধ্যে কমপক্ষে ১,০৩৭ জন ফরাসী সৈন্য হতাহত।

শেষে ফরাসী বাহিনী কেবল দিয়েন বিয়েন ফুর বারো মাইল লম্বা আট মাইল চওড়া সমতলের মধ্যেই পাহারা দিয়ে বেড়াতে লাগল।

দ্য কাস্ত্রিস দেখলেন তারপরেও গণ্ডী সঙ্কুচিত হচ্ছে। কারণ টহলদারদের আর পাহাড়ের কাছে পর্যন্তও যাবার উপায় ছিল না। গেলেই পাহাড় থেকে ছুটে আসত গুলী।

তখন ফেব্রুয়ারীর শেষ। দ্য কাস্ত্রিস বেশ বুঝতে পারলেন একটা শক্ত ফাঁস ক্রমেই ছোট হয়ে আসছে।

কিছুই করবার ছিল না তাঁর। মাঝে মাঝে কামান অবশ্য দাগতেন পাহাড়ের দিকে। কিন্তু ঐ জঙ্গলের মধ্যে গোলাগুলি হারিয়ে যেত খড়ের গাদায় ছুঁচের মত। মাত্র ক'টি প্লেন তাঁর হাতে। তখন পর্যন্ত গুটি ছয়েক বোমারু বিমান বড় জোর। তাতে ঐ বিরাট পাহাড়ী এলাকার কতটুকু ধ্বংস দূরের কথা স্পর্শ করা সম্ভব?

অথচ হ্যানয় বা সায়গনেরও তখন এমন অবস্থা নয় যে আরও বেশি প্লেন পাঠায়। গোটা ইন্দোচীনে তখন প্লেন ছিল মাত্র চারশ'র কিছু বেশি। গিয়াপের কৌশলে সেগুলি আটকে ছিল অন্যান্য অনেক দূর দূর অঞ্চলে। বেশ কিছু ছিল লাওসে।

১০ই মার্চ ভিয়েৎমিন গেরিলারা, অনেকটা নেট প্র্যাকটিস করার উদ্দেশ্য নিয়ে, বড় রানওয়ের ওপর এক ঝাঁক গোলা ছিটিয়ে দিল। পেট্রোলিয়ামের আগুনের চিতা জ্বলে উঠল একটি প্লেনের গায়ে।

আতঙ্কিত হলেন দ্য কাস্ত্রিস। রানওয়ের ক্ষতি হওয়ার অর্থ হল বাইরে থেকে সাহায্য আসা বন্ধ হওয়া। এবং এর ফলঃ পাহাড়ের দেওয়াল ঘেরা এই উঠোনে দাঁড়িয়ে নিশ্চিত মৃত্যুর জন্যে অপেক্ষা করা।

১১ই মার্চ তখনো সকাল হয় নি। খবরে ফাটিয়ে গাব্রিয়েলের কাঁটাতারের বেড়া ছিঁড়ে একটি ভিয়েৎমিন সুইসাইড স্কোয়াড ঢুকে পড়ল শিবির এলাকার মধ্যে। সকালে ফরাসী ট্যাঙ্ক যখন এসেছিল তাদের সরাবার জন্যে, তারা প্রাণ দিয়েছিল লড়াই করতে করতে।

পরের দিন একটা অস্বস্তিকর নীরবতা নেমে এসেছিল দিয়েন বিয়েন ফুর বুকে। গেরিলারা ঐ দুদিন আর কোন আক্রমণ করে নি। কেবল নাভারের বিমান বাইরে থেকে উড়ে এসে নেপাম আর বোমা ছিটিয়ে দিয়ে আবার ফিরে গিয়েছিল লাওসে ও মধ্য ভিয়েৎনামে যেখানে নাভার ভাবছিলেন তিনি আসল লড়াই করছেন।

১৩ই মার্চও সারাদিন বিশেষ কোন ঘটনা ঘটে নি। ক্রমে সন্ধ্যা হয়ে এলো। দ্য কাস্ত্রিস ভাবলেন বুঝি আরেকটা দিন নির্বিঘ্নে পার হবে।

হঠাৎ চারদিক থেকে সমস্ত কামান যেন গর্জে উঠল একসঙ্গে। ঐরকম গর্জন ইন্দোচীনে আগে আর কেউ কখনো শোনে নি। যেন কোন প্রচণ্ড বিস্ফোরণে ফেটে পড়ল পাহাড়গুলি। যেন নরক উন্মুক্ত হল তার সমস্ত ভয়াবহতা নিয়ে।

ঐ প্রচণ্ড গোলাবৃষ্টির আড়ালে ঢেউয়ের পর ঢেউয়ের মতো গেরিলারা নেমে এলো পাহাড় থেকে, স্রেফ সংখ্যার জোরে ভেঙে চুরমার করে দিল ফরাসীদের প্রতিরক্ষাব্যূহ। জাল যেমন ক্রমশ ছোট হতে থাকে তেমনি একইভাবে ওরা ঘিরে ধরল বেয়াত্রিস, গাব্রিয়েল ও আন মেরি শিবির তিনটিকে একসঙ্গে।

নাভারের পরিকল্পনা ছিল কোন একটি শিবির আক্রান্ত হলে অন্য শিবির থেকে সাহায্য আসবে। এর কোন উপায়ই রইল না। মাত্র রাত্রে বেয়াত্রিস গেরিলাদের দখলে চলে এলো, পরের রাত্রে গাব্রিয়েল, আর ১৭—১৮ তারিখের রাত্রে আন মেরি।

ভিয়েৎমিনদের প্রথম ধাক্কাতেই নাভারের যুদ্ধের সাধ সঙ্কুচিত হয়ে এলো মনে বাঁকের মধ্যে। গেরিলাদের পক্ষে হয়ত নিহত হয়েছিল কমসে কম আড়াই হাজার। কিন্তু ফরাসীদের পক্ষে ক্ষয়-

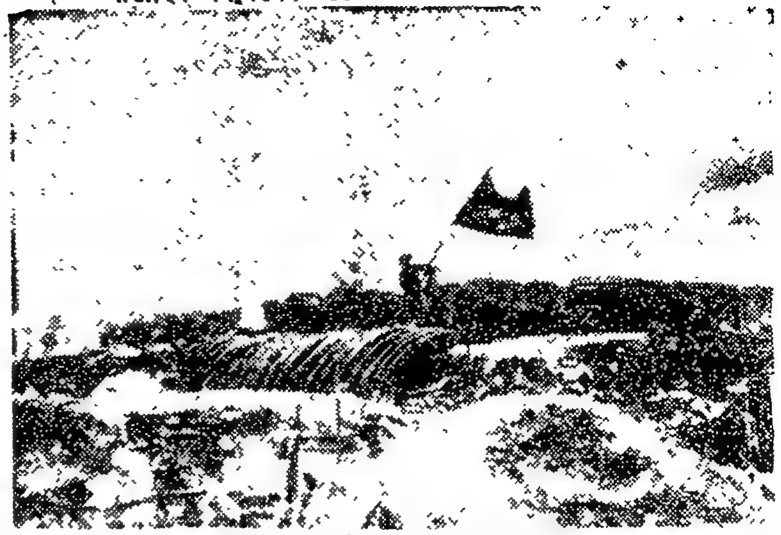

দিয়েন বিয়েন ফুর যুদ্ধের শেষে ভিয়েৎমিন সৈন্যরা ফরাসী দুর্গ শিবিরের ওপর ভিয়েৎমিন পতাকা উড়িয়ে দিচ্ছে।

ক্ষতির পরিমাণ ছিল এত বেশি যে প্যাবাসন্টের সাহায্যে নতুন সৈন্য পাঠানো হলেও (রানওয়ে অকেজো হয়ে যাবার পর) বেয়াত্রিস, গাব্রিয়েল ও আন মেরি পুনর্দখল করার মত শক্তি ওরা আর অর্জন করতে পারে নি।

প্লেন এসেছিল বটে ক্রমশ বেশি সংখ্যায়, কিন্তু নামবার উপায় ছিল না। ব্যর্থ আক্রোশে প্রত্যেকদিন প্রায় ৭৫ থেকে ৮০টি জঙ্গী ও বোমারু প্লেন এসে ছিটিয়ে দিয়ে যেতে লাগল নেপাম ও বোমা। কিন্তু দিয়েন বিয়েন ফু আর বিন ইয়েন এক ছিল না। বিন ইয়েনে ছিল না কিন্তু দিয়েন বিয়েন ফুতে গেরিলাদের হাতে ছিল বিমানধ্বংসী কামান। হাতের টিপ ওদের অব্যর্থ। একটু নিচে নেমে এলেই গুলী মেরে মাটিতে নামাবেই ওরা প্লেনকে। নামিয়েও ছিল। অন্তত ৬২টি প্লেন সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয়েছিল এইভাবে, এবং কমপক্ষে ১৭০টি প্লেন হয়েছিল দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত।

এর পর থেকে যুদ্ধ আর যুদ্ধ রইল না। চলল দু'পক্ষের ধৈর্যের পরীক্ষা। এই পরীক্ষার মীমাংসা সম্পর্কে সেদিন অন্তত গিয়াপের মনে কোন সংশয় ছিল না। প্রায় ১৬ হাজার ফরাসী সৈন্য আটকে আছে সমতলের মাঝখানে চারটি মূল শিবিরের মধ্যে। তাদের বেরোবার রাস্তা বন্ধ, বাইরে থেকে সাহায্যের প্রধান পথটিও অবরুদ্ধ। আর তাদের ঘিরে চারপাশের পাহাড়ে প্রস্তুত রয়েছে গিয়াপের দুর্ধর্ষ বাহিনী। এবং ওরা শুধু পাহাড়েই নেই। নেমে এসেছে মাটিতে। ট্রেঞ্চ কেটে কেটে বৃত্তের আকারে ওরা ক্রমেই এগিয়ে আসছে। প্রত্যেক দিন সকাল উঠে বিস্মিত দ্য কাস্ত্রিস দেখতে পান ওরা আরেকটু কাছে এসে গেছে। আরও, আরও কাছে।

শেষের দিকে সরবরাহ অক্ষুণ্ণ রাখাই প্রধান দুশ্চিন্তা হয়ে দাঁড়াল। সরবরাহ আসত আকাশ থেকে, প্যারাস্যুটের সাহায্যে। আগে যখন গেরিলারা পাহাড় ছেড়ে নেমে আসে নি, তখন কোন সমস্যাই ছিল না। কিন্তু এখন গেরিলারা মাটির বুক চিরে চিরে অনেকখানি এগিয়ে এসেছে। এখন আকাশ থেকে রসদ নিয়ে যে প্যারাস্যুটগুলি নামে তার অধিকাংশই পড়ে গেরিলাদের হাতে।

এমন কি হ্যানয় থেকে দ্য কাস্ত্রিসের জন্যে যে মদের বোতল আসত, সেগুলিও পড়তে লাগল গেরিলাদের হাতে।

ক্রমে দিয়েন বিয়েন ফুতে ফরাসীদের হাতে থাকল মাত্র একটা পার্কের মত জায়গা।

আতঙ্কে বিস্ফারিত জেনারেল নাভার প্রাণের দায়ে আমেরিকার মুখের দিকে তাকাল। তাঁর হাতে প্লেন নেই। মার্কিন বিমানবহর যদি ব্যাপক হস্তক্ষেপ করে তাহলেই কেবল দিয়েন বিয়েন ফু রক্ষা পেতে পারে, নইলে আর কোন উপায় নেই।

নাভারের এস-ও-এস নিয়ে মার্চের তৃতীয় সপ্তাহে ফরাসী সরকারের দূত গেলেন ওয়াশিংটনে। মার্কিন সাহায্যের পরিমাণ ইতিমধ্যেই ১৪০ কোটি ডলারে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল। সব শুনে প্রেসিডেন্ট আইজেনহাওয়ার তাঁর অফিসারদের নির্দেশ দিলেন, দিয়েন বিয়েন ফু রক্ষার জন্যে যা কিছু করা দরকার সবই যেন করা হয়।

৩রা এপ্রিল আইজেনহাওয়ারের পররাষ্ট্রসচিব জন ফস্টার ডালেস মার্কিন কংগ্রেসের আটজন প্রভাবশালী সদস্যকে নিয়ে এক গোপন বৈঠকে মিলিত হলেন। উদ্দেশ্য : দিয়েন বিয়েন ফুতে নৌ ও বিমানশক্তি ব্যবহার করার জন্যে তাঁদের সম্মতি আদায় করা। এছাড়া তিনিও বললেন, দিয়েন বিয়েন ফুকে রক্ষার আর কোন উপায় নেই।

মার্কিন কর্তৃপক্ষের পরিকল্পনা ছিল সপ্তম নৌবহরের বিমানবাহী জাহাজ 'এসেক্স' ও 'বাসার' থেকে ২০০ প্লেন এবং ফিলিপিনের ঘাঁটি থেকে আরো কিছু প্লেন একযোগে শুধু একবার গিয়ে দিয়েন বিয়েন ফু এলাকায় হানা দিয়ে আসবে। তাতেই কাজ হবে।

কিন্তু কংগ্রেস সদস্যরা ঐ পরিকল্পনায় যে কারণেই হোক সম্মতি দেন নি। যদি দিতেন তাহলে ভিয়েৎনামের ইতিহাস অন্যভাবে লিখিত হত কি না সে প্রশ্ন এখন অবান্তর।

সুতরাং নাভারকে তাঁর পরিকল্পনার এবং ফ্রান্সের মর্যাদাকে সঙ্গে নিয়ে চূড়ান্ত বিপর্যয়ের দিকে সংক্ষিপ্ত পথে একলাই আবার যাত্রা করতে হল।

সৈন্য তিনি পাঠিয়েছিলেন যতক্ষণ সৈন্য ছিল। রাতের পর রাত ডেকোটাগুলি আসত আর অতি সন্তর্পণে, ভিয়েৎমিন গোলার স্পর্শ বাঁচিয়ে কোনমতে নামিয়ে দিয়ে যেত তাদের। অনেকেই মারা পড়ত মাটির গুলীতে। যারা গুলী এড়িয়ে নেমে আসতে পারত বরাতের জোরে তারা আটকে যেত কাঁটাতারের গায়ে, কিংবা গেরিলাদের ট্রেঞ্চে, নয়ত মাইন-পাতা খানায় খেতে। সেখান থেকে মৃত্যু মাত্র কয়েক মিনিটের দূরত্ব।

৭ মে, ১৯৫৪ সাল। ভিয়েৎমিনদের প্রথম আক্রমণের পঞ্চান্ন দিন পর, দিয়েন বিয়েন ফুর রণক্ষেত্র তখন নিস্তব্ধ। মৃতদেহগুলি ছড়িয়ে রয়েছে চারদিকে, কাতারে কাতারে। বিকেলের পড়ন্ত আলোয় সেগুলি দেখাচ্ছিল বড় বীভৎস, বড় করুণ।

একটি ট্রেঞ্চ থেকে, দেখা গেল, একটি রাইফেলের ডগা প্রথমে একটু উঁকি দিয়ে তারপর ধীরে ধীরে জেগে উঠছে। তার মাথায় একটি ছোট সাদা রুমাল বাঁধা।

কিছুক্ষণ পরে একজন কর্নেল তাঁর স্পিট ট্রেঞ্চে উঠে দাঁড়ালেন।

ওদিক থেকে চ্যাপ্টা হেলমেট পরা একজন ভিয়েৎমিন সৈন্যও মাথা বার করে উঠে দাঁড়িয়েছে।

"আপনারা কি আর গুলী করবেন না?" ভিয়েৎমিন সৈন্যটি জিজ্ঞেস করল ফরাসীতে।

"না।" কর্নেলের উত্তর

"এই শেষ?"

"হ্যাঁ, এই শেষ।"

সেইদিনই শেষ হয়ে গিয়েছিল দিয়েন বিয়েন ফুর যুদ্ধ। দেখা গেল, ১৬,২০০ ফরাসী সৈন্য ভিয়েৎমিনদের হাতে হয় নিহত না হয় বন্দী।

[ক্রমশঃ]

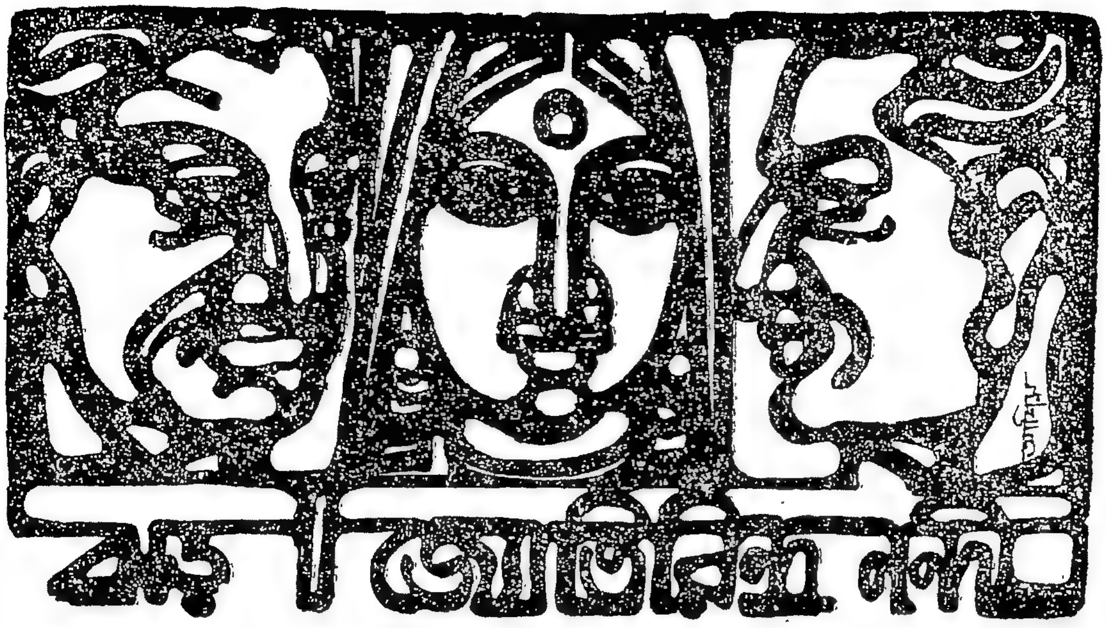

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

একদিন দুদিন করে অঘ্রাণ কাটল, পৌষ গেল, মাঘও যায় যায়। আর পাঁচটা দিন মোটে বাকি। তারপর ফাল্গুন। তার মানে চৈত্রের দোসর, মধু মাস। কাজেই এর মধ্যেই টিয়াটুলির জঙ্গলে একটা সোরগোল পড়ে গেছে। যেন কেউ আসছে, দু-একদিনের মধ্যেই এসে যাবে। পাখিদের কিচিরমিচির বেড়ে গেছে। পাখির সংখ্যাই তো কত বেড়ে গেল ক'দিনে দেখতে দেখতে। নিত্য-নতুন পাখি দেখা যাচ্ছে।

'কোথায় ছিল এরা এ্যাদ্দিন লুকিয়ে।' মাধব চুপ করে এক-একটা গাছের ডালের দিকে বেশ কিছুক্ষণ চেয়ে থাকে। কিন্তু সীতাংশুর যেন মনে হয়, ছোঁড়া কেবল পাখিই দেখছে না, আরও কিছু দেখছে। পাতাটাতা ঝরে গিয়ে মাদারগাছটা কেমন ন্যাড়া হয়েছিল, আর এই একটা-দুটো দিনের মধ্যে রাজ্যের কুঁড়ি এসে গেছে ডালে ডালে, কুঁড়ির সঙ্গে মেয়েলী নখের মতন সরু ছুঁচলো সব কলি। উঁহু, কেবল কলি আনবে কেন। গাছের আগায়, একেবারে মগডালে রক্তের ছিটার মতন টুকটুকে দুটো মাদারফুল ফুটে রয়েছে। পাতা বেরোবার আগেই ফুল। তেমনি ওদিকের শিমুলগাছ দুটো। পাতার দেখা নেই, তার আগেই ডবকা ডবকা কলি এসে গাছ ছেয়ে গেছে। ওদিকে অশোক শাল অর্জুন পলাশ, এদিকে আম আমড়া লিচু জাম নিম যেদিকে তাকাও, কচি পাতার সঙ্গে আড়াআড়ি করে ফুল কলি মঞ্জরীরা ছুটে এসেছে।

আর এসেছে ভোমরা মৌমাছিরা ঝাঁক, শালিক বুলবুলি চড়ুই ও নতুন পাখির দল : হুঁ, মধুর গন্ধ পেয়ে তারা কী ভীষণ চঞ্চল উৎসুক হয়ে উঠেছে তাকিয়ে দেখবার মতন। তাই সারাক্ষণ এত কূজন এত গুঞ্জন জঙ্গলে। কান পাতা যায় না এমন। একটা উৎসব সুরু হয়ে গেছে এই বাড়িতে বোঝা যায়।

'পাখিওলা কিন্তু আর এল না।'

'নাঃ।' একটা নতুন পাখি দেখতে সীতাংশু বকুলগাছটার দিকে চোখ ফিরিয়েছিল, মাধবের কথা শুনে চমকে উঠে ঘাড় নামিয়ে কিশোরের মুখটা দেখল। ঢোক গিলে আস্তে আস্তে বলল, 'আমার মনে হয় অন্য কোথাও চলে গেছে পাখিওলা, অন্য বনে।'

মাধব আর কিছু বলল না। যেন অনেক কিছু বলবার ছিল, কিন্তু তার প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে, তাই বেচারা হঠাৎ চুপ করে রইল। তার মুখটা দেখে সীতাংশুর কষ্ট হল।

'একটা কাজ করলে হত।' খানিকটা চিন্তা করার পর সীতাংশু বলল, 'কাঠ-বিড়ালের কিছু অভাব নেই এখানে। আমরা একটা কাঠবিড়ালের বাচ্চা পুষতে পারি।'

'নাঃ।' মাধব মাথা নাড়ল। এই জিনিসে তার যে কোনদিনই উৎসাহ নেই সীতাংশু জানত, তবু যেন পাখির প্রসঙ্গটা চাপা দিতে সে কথাটা তুলল। কিন্তু প্রস্তাব শোনামাত্র কিশোর যেভাবে মাথা নাড়ল, সীতাংশু এই নিয়ে আর কথা বলা সঙ্গত মনে করল না।

হাঁটতে হাঁটতে দুজন জঙ্গলের ভিতর সেই অন্ধকার মতন জায়গাটায় চলে এল। শীতকালে যেখানে কাঁটাঝোপ ছাড়া আর কিছু চোখে পড়ত না। আর কাঁটাগাছের সেই বিষে ভরা নীল নীল ফুল। আর প্রজাপতির মতন সাদা ডানার অফুরন্ত ছোট ছোট পতঙ্গ। এখন জায়গাটার চেহারা একেবারে বদলে গেছে। মোটেই অন্ধকার লাগছে না। অবশ্য বেলাও এখন বেশ বড়। সূর্য ওপরে উঠেছে। কারখানা ছুটি হয়ে যাবার পরও গাছের মাথায় সোনালী রোদ থিরথির করে কাঁপছিল। পাতার ফাঁক দিয়ে কিছু সোনা নিচেও ঝরে পড়ছিল। নিচের ঘাসগুল্ম সবুজ মখমলের মতন উজ্জ্বল দেখাচ্ছে। কিন্তু কাঁটাবন কোথায়। ভাঁটের জঙ্গলে জায়গাটা ভরে গেছে। এখনও কলির ভাগ বেশি। তা হলেও এর মধ্যেই কম ফুল ফুটেছে কি। সাদা ভাঁটফুলের মধু খেতে বোলতা মৌমাছি ও ভোমরার আনা-গোনা সুরু হয়েছে।

মাধব ও সীতাংশু চুপ করে দাঁড়িয়ে দৃশ্যটা দেখল। প্রায় দক্ষিণ-ঘেঁষা একটা হাওয়া থেকে থেকে বইছিল। ভাঁটবন কাঁপছিল, এখানে ওখানে থোকা থোকা ভাঁটফুল বাতাসে দুলছিল। ফুলের গন্ধে জায়গাটা ভরে গেছে।

ফুলের গন্ধ, পাখির কলরব, ভোমরা মৌমাছির গুঞ্জন, গাছে গাছে নতুন পাতা কুঁড়ি কলি মঞ্জরী বিকেলের সোনাঝরা রোদ—টিয়াটুলির জঙ্গলের এই উৎসবকে অস্বীকার করত কে ?

কিন্তু তবু মনে হচ্ছিল, কী যেন নেই, কিসের একটা অভাব। মাধবের চোখ দেখে সীতাংশু বুঝতে পারে মাধব ঠিক সুখী হতে পারছে না, জঙ্গলের এই উৎসবের দিনেও কেমন নিস্তেজ মনমরা হয়ে আছে সে। তেমনি সীতাংশুকে

দেখেও ছোট ছেলেটি বুঝতে পারছিল, টিয়াটুলির আকাশ মাটি গাছপালায় রং ধরছে, কিন্তু বয়স্ক মানুষটির মনে এক ফোঁটা রং লাগছে না। অথচ কেউ কারো মনের কথা প্রকাশ করছে না, যেন ভিতরের দুঃখটা, একটা কিছু না থাকার অভাব দুজনেই চেপে রাখতে চাইছে।

হয়তো এই জন্যই এমন চমৎকার ভাঁটের বনের সামনে দাঁড়িয়ে দুটি অসমান বয়সের মানুষ দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

আর এগোতে ইচ্ছা করছিল না তাদের।

'চল্, ফিরে যাই।' সীতাংশু আস্তে বলল।

মাধব ঘুরে দাঁড়াল। দুজন হাঁটতে আরম্ভ করল। কারো মুখে কথা ছিল না।

ডেরার কাছে পৌঁছে সীতাংশু থমকে দাঁড়ায়। দেখাদেখি মাধবও দাঁড়িয়ে পড়ে।

'লোকটাকে চেনাচেনা মনে হচ্ছে না!' সীতাংশু ফিসফিস করে উঠল।

'পাখিওলা।' ফিসফিস করে উত্তর দিল মাধব।

দুজনের গলার স্বরে চাপা উত্তেজনা। সীতাংশুর ডেরার দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে পাখিওলা কাকে যেন খুঁজছে; কাউকে খুঁজতে এসে দরজায় তালা দেখে অপ্রস্তুত হয়ে গেছে। মাধবকে নিয়ে বেড়াতে বেরোবার আগে সীতাংশু ঘরে তালা ঝুলিয়ে গিয়েছিল।

উত্তেজনা চাপতে না পেরে মাধব কেশে গলার শব্দ করল।

সীতাংশুও মনে মনে তাই চাইছিল। একটা শব্দ হলে লোকটা এদিকে ঘুরে দাঁড়াবে। দুজনকে দেখতে পাবে। এভাবে তালাবন্ধ ঘরের সামনে সে দাঁড়িয়ে আছে দেখে সীতাংশুর খুব খারাপ লাগছিল।

'হেই যে পাখিওলা!' কাশির শব্দ শুনতে পায় নি দেখে মাধব শেষটায় চেঁচিয়ে উঠল। এবার পাখিওলার কানে আওয়াজ ঢুকল, ঘুরে দাঁড়াল সে। এতক্ষণ আর মানুষ দেখছিল না। একলা চুপ করে দাঁড়িয়ে পাখির শব্দ শুনছিল গাছের, পাতার শব্দ শুনছিল, আর তার সঙ্গে একটানা ঝিঁঝির ডাক। এবার দুটি মানুষের মুখ একসঙ্গে দেখতে পেয়ে সে খুশি হল, তার লাল বিশাল চোখ দুটো দেখে সীতাংশু বুঝতে পারল। লাল চোখ, রাত্রির মতন মিশমিশে কালো গায়ের রং, সাদা দাঁত। মানুষটা অবিকল আগের মতন আছে। সাদা ধবধবে দাঁত ছড়িয়ে সে হাসল।

'কোথায় ছিলে এ্যাদ্দিন!' মাধব প্রশ্ন করল।

'উত্তরে চলে গেলাম হঠাৎ', পাখিওলা লম্বা করে নিশ্বাস ফেলল। 'তাই আসতে দেরি হয়ে গেল।'

'তুমি যাবার সময় বলে গেলে কিনা—সাতদিন পর আবার আসবে, এসে দিদির পাখিটা কেমন আছে, দেখবে।' মাধব অভিযোগের গলায় বলল, 'সারাটা শীত পার করে তবে এলে।'

পাখিওলা চুপ করে রইল। যেন লজ্জা পেল। কথা দিয়ে কথা রাখতে পারে নি।

'আজ কি আবার একটা পাখি ধরবে?' একটু পরে মাধব প্রশ্ন করল।

পাখিওলা চোখ তুলে সামনের আমলকীগাছটা দেখল, হরীতকীগাছটা দেখল।

'অনেক পাখি উড়ে এসেছে জঙ্গলে।' এবার সীতাংশু কথা বলল। 'নিত্য-নতুন পাখি দেখা যাচ্ছে।'

'হুঁ', পাখিওলা মাথা নাড়ল। 'বসন্ত-কাল এসে গেল কর্তা, এখন তো পাখির সময়।'

'কিন্তু আমাদের আর পাখির দরকার নেই পাখিওলা।' মাধব তাড়াতাড়ি বলে ফেলল; 'তোমাকে খামকা গাছে চড়ে কষ্ট করতে হবে না।'

লাল চোখ দুটো আরও বড় করে ছড়িয়ে দিল পাখিওলা। বাচ্চা ছেলেটির কথা শুনল। তারপর একটা প্রকাণ্ড ঢোক গিলল।

বেশ হেঁয়ালীর মধ্যে পড়ে গেছে মানুষটা; সীতাংশু তার চেহারা দেখে বুঝল। তাই একটু হাসল সে। 'মাধব পাখি পুষতে চাইছে না, বলে কি না মেয়েরা পাখি পোষে; বেটাছেলে জন্তু-জানোয়ার পুষবে।'

শুনে পাখিওলাও হাসল। যেন এবার সে একটু নিশ্চিন্ত হল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে চোখ ঘুরিয়ে আবার যেন কাকে খুঁজলে।

'দিদি এখানে নেই।' মাধব তৎক্ষণাৎ মাথা ঝাঁকাল। 'এখান থেকে চলে গেছে।'

'সুখী থাকলে আজ আর একটা পাখি চাইত ঠিক।' সীতাংশু মনে মনে বলল।

'কোথায় গেল দিদি?'

যেন একটু অবাক হয়ে প্রশ্ন করল পাখিওলা। মাধব চট করে উত্তর দিল না। সীতাংশুর মুখের দিকে তাকিয়ে চুপ করে রইল।

'আত্মীয়ের বাড়ি বেড়াতে গেছে ও দিদি।' পাখিওলার মেয়ের দিকে চোখ রেখে সীতাংশু বলল, 'কদিন ওখানে থাকবে।'

পাখিওলা আবার একটা লম্বা নিশ্বাস ফেলল। সঙ্গে সঙ্গে আর একটা প্রশ্ন, একটা কৌতূহল তার লাল চোখ দুটোর ভিতর উঁকি দিল।

'পাখিটা সঙ্গে নিয়ে গেছে?'

'না।' মাধব মাথা ঝাঁকাল। তারপর চুপ করে রইল।

পাখিওলা এবার সত্যি দমে গেল। যেন তারপর কী প্রশ্ন করবে বুঝতে পারছিল না।

'পাখিটা মরে গেছে, বাঁচল না।' সীতাংশু আঙুল দিয়ে ওপাশের কাঠ-মালতীগাছটা দেখাল। শূন্য খাঁচাটা গাছের ডালে ঝুলছিল। কবে জানি মাধব ওখানে ঝুলিয়ে রেখেছে ওটা।

পাখিওলা চুপ করে কতক্ষণ খাঁচাটা দেখল। তারপর মুখটা বিকৃত করে ফেলল। ঘাড় নামিয়ে একদলা থুথু ফেলল মাটিতে।

'ভালবাসা পায় নি, আদরযত্ন পায় নি।' নিজের মনে বকবক করে উঠল সে। 'আদরযত্ন পেলে ওই পাখি কখনো মরে?'

সীতাংশু শুনল, মাধব শুনল। চুপ করে রইল তারা। যেন এর পর আর কিছু বলার ছিল না।

বি. সি. মাইতি এণ্ড কোং
—ইলেকট্রো প্লেটিং সামগ্রী—
নিকেল ভ্যাট ও ব্যারেল, * ডাইনামো * পলিশিং মেসিন এবং প্লেটিং করিবার জন্য যাবতীয় সামগ্রীর আদি সরবরাহক।
শো রুম ঃ—৯৪, প্রেমচাঁদ বড়াল স্ট্রীট, কলি-১২। ফোন ঃ ৩৪-৩১৭৩
৩, রাধামোহন পাল লেন, কলি-১২। অফিস-ফোন—৩৪-৪৮৪৬

পাখিওলা আর দাঁড়াল না, পৈঠা থেকে লাফিয়ে নিচে নেমে কাঠমালতীগাছটার কাছে ছুটে গিয়ে দড়ির বাঁধন খুলে খাঁচাটা নামাল, চোখের সামনে শূন্য খাঁচাটা তুলে ধরে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে কী যেন দেখল। তারপর সেটা হাতে ঝুলিয়ে হনহন করে বনের দিকে চলে গেল। একবারও পিছন ফিরে তাকাল না। যেন এখানে আর তার কোনো কাজ নেই, সব শেষ হয়েছে।

'রাগ করেছে।' মাধব ফিসফিস করে বলল।

'হুঁ, তার মনে খুব দুঃখ হয়েছে।' সীতাংশু খাটো গলায় বলল।

একটু সময় বনের দিকে তাকিয়ে থেকে মাধব এদিকে চোখ ফেরাল।

'খাঁচাটা নাকের কাছে তুলে ধরে গন্ধ শুঁকতে শুঁকতে চলে গেল।'

'হুঁ', সীতাংশু ঘাড় কাত করল। 'পাখির গায়ের গন্ধ লেগে আছে খাঁচায়।'

তাই কি। কথাটা নিজের কানে খট করে লাগল। সুখী চলে যাওয়ার দুদিন পরে পাখিটা মরে যায়। তারপর তো ধরতে গেলে এই তিনমাস শূন্য খাঁচাটা কাঠমালতীর ডালে ঝুলছে। অনেক রোদ লেগেছে শিশির লেগেছে বাতাস লেগেছে। মাসের মাঝামাঝি চমৎকার এক পশলা বৃষ্টিও হয়ে গেল। বৃষ্টির জলে খাঁচা ধুয়ে গেছে। তবু কি পাখির গায়ের গন্ধ লেগে রইল ওতে? না কি গন্ধের স্মৃতি! নাকের কাছে ধরলে টের পাওয়া যায়?

তালা খুলে সীতাংশু ঘরে ঢুকল। বাইরে রোদ এতক্ষণে নিবে গেল। অন্ধকার লাগছিল ভিতরটা।

'আলো জ্বালব?' পিছন থেকে মাধব বলল।

'দরকার কি এখনই আলো জ্বালবার।' অন্ধকারটা ভাল লাগছিল সীতাংশুর। বলল, 'আজ পূর্ণিমা, এখনি চাঁদ উঠবে। জানালা খুলে দে। চাঁদের আলো ঘরে ঢুকুক।'

প্রস্তাবটা মন্দ লাগল না মাধবের। হ্যারিকেনে তেল ভরতে হবে, হাতে কালি-ঝুল লাগিয়ে চিমনি সাফ করতে হবে, সলতেটা কেটেছেঁটে সমান করা—তারপর তো আলো জ্বালা, অনেক হাঙ্গামা। তার চেয়ে জানালা খুলে দিয়ে ঘরে চাঁদের আলো ঢুকতে দেওয়া কত সহজ। মাধব তৎক্ষণাৎ দুটো জানালাই খুলে দিল। চাঁদ ওঠে নি, উঠতে আরম্ভ করেছে, পূর্বদিকে বনের পিছনে সবে আগুন লেগেছে। জ্যোৎস্নার পরিবর্তে বন্‌বন্‌ করে এক ঝাঁক মশা এসে ভিতরে ঢুকল, আর ঝিঁঝিঁর শব্দ।

'এখন কি উনুন ধরাব?' মাধব আবার প্রশ্ন করে।

'উঁহুঁ, দরকার কি', সীতাংশু মাথা নাড়ল। 'ওবেলার পান্তা ভাত আছে, একটু শুকনো মাছ পুড়িয়ে নিলেই চলবে। সে পরে দেখা যাবে।'

মাধব খুশি হল।

'তবে আমি একটু ঘুরে আসি।'

'তাই যাও।' সীতাংশু খুশি হয়ে অনুমতি দিল। হৃষ্টমনে কিশোর ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। সীতাংশু মনে মনে হাসল। দিদি চলে যাবার পর ভাইটি এখানে কাজ করছে। অবশ্য মুরারির কথা শুনেই সীতাংশু তার ঘরের কাজে মাধবকে লাগিয়ে দিয়েছে। 'বড় হয়েছে ছেলে, এখন আস্তে আস্তে দুটো পয়সা রোজগার করতে শিখুক, আর কতকাল জঙ্গলে ঘুরে খরগোসের বাচ্চা উদের বাচ্চা ধরবে।' মুরারির যুক্তি সীতাংশু অস্বীকার করতে পারে নি।

কিন্তু ওইটুকুন ছেলে। উনুন ধরান, বসে বসে রান্না করা, ধোয়ামোছা কি ঘর ঝাঁট দেওয়া, জল তোলা, বাটনা বাটা কতক্ষণ মন বসে তার। সীতাংশু তাই দেখছে, যত সংক্ষেপে মাধবের কাজ সারা হয়। তা না হলে তাকে সঙ্গে নিয়ে সে-ই বা বনে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াবে কেমন করে।

তাই আবার তার বাসনকোসনে দাগ ধরতে আরম্ভ করেছে, জামাকাপড়ের মতন বিছানাপাটি ময়লা হচ্ছে, ঘরে ধুলো জমছে, বেড়ার গায়ে কালিঝুল মাকড়সা, যেমন আগে ছিল। মাধব অবশ্য মাঝে মাঝে ঝাঁটা নিয়ে আসে ঘর পরিষ্কার করতে, সাবান সোডা নিয়ে তৈরি হয় এটা ওটা কেচে সাফ করবে বলে। সীতাংশু হাত তুলে তাকে নিবৃত্ত করে। 'আজ থাক, কাল দেখা যাবে।' পরদিন মাধব আবার হয়তো ঝাঁটা নিয়ে এল। সীতাংশু আলস্যের হাই তুলে কিশোরের মুখটা দেখল। 'এত তাড়া কি ওবেলা সব পরিষ্কার করলেই হবে।' এবং ওবেলা মাধবেরও আর কথাটা মনে রইল না। তা ছাড়া সীতাংশু হয়তো তাকে সঙ্গে নিয়ে তখন জঙ্গলে ঘুরতে বেরিয়েছে। মোটের ওপর এবেলার কাজ ওবেলা, ওবেলার কাজ পরদিনের জন্য জমিয়ে রাখছে বলে মাধবও কিছু অখুশি না। তার ফলে যা দাঁড়িয়েছে। দিনের পর দিন ঘরে ধুলো জমছে, ঘরের চারপাশে জঞ্জালের স্তূপ, ময়লা জামা-কাপড়, বিছানাপাটি মলিন থেকে মলিনতর হচ্ছে। এবং এখন আবার সীতাংশুর গালভরা দাড়ি, মাথায় বড় বড় চুল। চব্বিশঘণ্টা কানের কাছে কেউ 'পরিষ্কার' 'পরিষ্কার' করে চেঁচাচ্ছে না বলে সে খুবই নিশ্চিন্ত। তৃপ্ত বলা যায়।

তেমনি ঘর অন্ধকার করে চুপ করে বসে থাকার মধ্যে শান্তি পায় সে। পাখির খাঁচার মতন একটা ঘরের ভিতরও কোনো মানুষের গায়ের গন্ধ লেগে থাকে বৈকি, অথবা গন্ধের স্মৃতি। এই জন্যই আলো জ্বালতে ভয় করছিল তার। অন্ধকারের মজা এইখানে। স্মৃতিকেও চাপা দিয়ে রাখে, ঢেকেঢুকে রাখে। তা না হলে বেড়ার কালিঝুলি, ময়লা বিছানা, মেঝের ধুলো জঞ্জাল ময়লা জামাকাপড় আমাজা বাসনকোসন—এসব দেখে তিনমাস আগের কথা মনে পড়ত তার। হঠাৎ একটি পরিচ্ছন্ন মেয়ে এসে এই ঘর, ঘরের প্রত্যেকটা জিনিস কেমন ঝকঝকে করে তুলেছিল। কেবল তাই না, নিজের বেশ-ভূষা সম্পর্কেও কত সচেতন হয়ে উঠেছিল সীতাংশু, তা ছাড়া নিত্য সাবান মেখে স্নান করা, নিয়মিত দাড়ি কামান, মাথায় সুগন্ধ তেল মাখা। এখন মনে হলে তার হাসি পায়। মাধবের দিদির পাল্লায় পড়ে দুদিনের জন্য কত কী না তাকে করতে হয়েছিল।

তারপর একদিন একটা ঝড় উঠে সব ওলটপালট হয়ে গেল।

পীতাম্বরের গাছচাপা পড়াটা কিছু না। উঁহুঁ, একখণ্ড কালো মেঘও বলা যায় না ওটাকে। আবার আগের মতন কারখানায় কাজ করছে সে। পায়ে ব্যান্ডেজ নিয়ে দিন পনেরো বিছানায় শুয়ে ছিল। এখন পা সম্পূর্ণ সেরে গেছে।

[আগামীবারে সমাপ্য]

কিস্তিবন্দীতে ট্রানজিস্টার

৩২০, টাকা মূল্যের বিশ্ব-বিখ্যাত "এস-কর্ট" ৩ ব্যান্ড অল ওয়ার্ল্ড পোর্টেবল ট্রানজিস্টার মাসিক ১০, টাকার কিস্তিতে নিন।

আবেদন করুন:

Japan Agencies (B—10)
Post Box 1194, Delhi—6.

রঙ্গজগৎ

পশ্চিম জার্মানীর তরুণী প্রযোজিকা মে স্পিল

চলচ্চিত্রে সংকট

পশ্চিমবঙ্গের সিনেমা কর্মচারীদের ধর্মঘট এখনো চলছে। ক্রমে ক্রমে ধর্মঘটে আরো বেশি সংখ্যক কর্মচারী অংশ গ্রহণ করছে। মার্চ মাসের ১২ তারিখ থেকে এই ধর্মঘট শুরু হয়েছে। মালিকপক্ষের মতিগতি দেখে মনে হচ্ছে ধর্মঘট দীর্ঘস্থায়ী হবে। তাঁরা সহজে শ্রমিকদের সঙ্গে আপোষে আসছেন না। ইতিপূর্বে যে দু'বার সিনেমা কর্মচারীদের ধর্মঘট হয়েছিল সে সময়ও মালিকপক্ষ প্রথম পর্যায়ে মীমাংসায় আসতে রাজী ছিলেন না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মীমাংসা করেছেন শ্রমিকদের দাবি মেনে নিয়েছেন। মালিকপক্ষ তখনো জানতেন যে শ্রমিকদের দাবিতে যুক্তি আছে, তা সত্ত্বেও অনর্থক শ্রমিকদের ভোগানো। কারণ ধর্মঘট করা শ্রমিকদের কাছে একটা খেলার খেলা নয়। ধর্মঘট চলাকালীন কপর্দকশূন্য শ্রমিক পরিবারগুলির দুঃখের শেষ থাকে না। অনাহারে, অর্ধাহারে, বাড়ি ভাড়া বাকি রেখে তাদের দিন কাটাতে হয়। শ্রমিকরা নিতান্ত বাধ্য না হলে ধর্মঘটের পথে যায় না। প্রকারান্তরে মালিকরাই তাদের ধর্মঘটে ঠেলে দেন, যদি ধর্মঘট ব্যর্থ হয় তাহলে মালিকদের পোয়াবারো। এই লাভের আশায় টালবাহানা করে সময় নষ্ট করেন—সহজে মীমাংসা করেন না। বিশেষ করে সিনেমা-মালিকরা কল-কারখানার মালিকদের মত নন। এঁরা সমাজের পশ্চাদ্‌বর্তী এক দল মানুষ, যাঁরা কিছু টাকার মালিক হয়েছেন কিন্তু দেশ ও শিল্প-সচেতন নন। একারণে দেশের স্বার্থ, শ্রমিকদের স্বার্থ ইত্যাদি অপেক্ষা নিজেদের মুনাফাই এঁরা বেশি বোঝেন। মালিকদের এই পশ্চাদবর্তিতায় এবার কিছু ইন্ধন দিচ্ছে রাজ্যপাল-শাসিত সরকার। বর্তমান সরকার যতটা-না শ্রমিক-মালিক মীমাংসা এবং নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে সমস্যাকে দেখার ইচ্ছা প্রকাশ করছেন, তার চেয়ে বেশি মালিকপক্ষের প্রতি সহানুভূতি জানাচ্ছেন মনে হয়। এতে অবস্থা ক্রমে ক্রমে জটিল হয়ে উঠছে এবং ধর্মঘট দীর্ঘস্থায়ী হচ্ছে।

আমরা মনে করি রাজ্যপালের উচিত নিজে হস্তক্ষেপ করে ধর্মঘট মিটিয়ে দেওয়া। সিনেমা-মালিকরা যে সবদিক থেকে বর্তমানে সিনেমা শিল্পটিকেই নিয়ন্ত্রণ করছেন সে কথা কে না জানে। এঁদের লাভের অঙ্ক কেবল বড় নয়, কোনরূপ ঝুঁকিহীন এবং নিশ্চিত মুনাফার প্রতি ঝোঁকটা। এই অবস্থায় কর্মচারীদের সঙ্গে মীমাংসা না করে ধর্মঘট জীইয়ে রাখা মোটেই শুভবুদ্ধির লক্ষণ নয়। এই অশুভ বুদ্ধির জন্য সিনেমার সর্বনাশও মালিকপক্ষকেই দায়ী করবেন।

পশ্চিমবঙ্গে যখন কর্মচারী-মালিক বিরোধে এক অচল অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে, বোম্বাই এবং মাদ্রাজেও তখন অন্যভাবে অচল অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে। প্রথমে উভয় স্থানে জনসাধারণের একটা অংশ আপত্তি জানিয়েছিল দক্ষিণে হিন্দী ছবির বিষয়ে, উত্তরে দক্ষিণী ছবির বিষয়ে। মাদ্রাজে এবং বোম্বাইতে প্রস্তুত হিন্দী ছবি প্রদর্শন প্রায় বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গ, মাদ্রাজ এবং বোম্বাইতে যদি ছবি প্রদর্শন বন্ধ থাকে তবে ছবি দেখাবার আর জায়গা কোথায়? এই পরিস্থিতিতে প্রথমে বোম্বাইয়ের প্রযোজকরা, পরে মাদ্রাজের প্রযোজকরা ছবি নির্মাণ স্থগিত রেখেছে। এই সিদ্ধান্ত যে প্রতিশোধ-মূলক একটা ব্যবস্থা তাতে সন্দেহ নেই। এই ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে হাজার হাজার স্টুডিওকর্মী কর্মহীন হয়েছে। এই অচল অবস্থার জন্য মালিকরা বেতন দেবেন কি না কে জানে। এসব কর্মচারী তাদের পরিবার-পরিজনদের রক্ষা করবে কি প্রকারে?

সর্ব ভারতে এই চলচ্চিত্র-সংকট আসলে দেশের অর্থনৈতিক সংকট থেকে বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। একদিকে জিনিসপত্রের দাম বাড়ায় কর্মচারীদের যেমন জীবনধারণ কষ্টকর হয়ে উঠেছে, আর একদিকে মালিকপক্ষও লাভের অঙ্ক কমিয়ে শ্রমিকদের পাওনা চুক্তি অনুযায়ী মিটিয়ে দিতে রাজী নন। মালিকপক্ষ চান—হয় শ্রমিকরা মাথা নত করুক, না টিকেটের দাম বাড়াতে দেওয়া হোক। খরচের টাকাটা যেন জনসাধারণ অর্থাৎ দর্শকদের ঘাড় ভেঙে আদায় করা যায়। —সুজন।

পশ্চিম জার্মানীতে চলচ্চিত্রের নব পর্যায়

পশ্চিম জার্মানীর তরুণ চলচ্চিত্র নির্মাতারা ছবিকে গতানুগতিকতা থেকে সরিয়ে নিয়ে নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে ছবি তোলার জন্য এক উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। নিরীক্ষামূলক এই ছবির জন্য ওদের কেউ কেউ নিজেদের সঞ্চিত অর্থ এবং যথা-সর্বস্ব ব্যয় করতে কুণ্ঠিত হচ্ছে না। এই নিরীক্ষামূলক ছবির মধ্যে পাঁচটি ছবির কথা খুবই শোনা যাচ্ছে। এই পাঁচটি ছবি যথাক্রমে একটি প্রেমের কাহিনী; একটি ছবি জন্মনিয়ন্ত্রণ পিল ও তজ্জনিত সমস্যাকে নিয়ে, তৃতীয়টি এক হত্যাকাণ্ড অবলম্বনে, চতুর্থ ছবি বীরত্ব সম্পর্কে রসিকতা, পঞ্চমটি এক তরুণীর ট্রেন-ভ্রমণ পথে কুমারীত্ব নষ্ট হওয়া সম্পর্কে।

এই ছবিগুলি করার জন্য যাঁরা এগিয়ে এসেছেন তাঁদের একজন হলেন মে স্পিল। ছবি করার নেশায় তরুণী উত্তরাধিকার-সূত্রে পাওয়া তার সম্পত্তি বিক্রয় করে সেই অর্থ নিয়োগ করে 'জুর সাচে শ্বাৎসেন' নামে ছবিতে। মে স্পিল-এর মতে এখন যে সব ছবি হচ্ছে তা বড় সমস্যা ভারাক্রান্ত। আর একজন প্রযোজক হর্স্টম্যান-ফ্রেড তার 'একাপুলকো' ছবির জন্য নিজের প্লাস্টিক কারখানাটিই বিক্রয় করে দিয়েছে।

পশ্চিম জার্মানীর ছবির জগতে এই

কোয়াইট এন অর্ডিনারী স্টোরি' নাটকে ওলেগ তাবাকভ (দক্ষিণে) এবং মিখাইল ...য়াকভ।

নতুন উদ্যমের মূল কারণ তাঁদের চলচ্চিত্র সংকট। পশ্চিম জার্মানীর ছবির সংকটের কথা বোঝা যাচ্ছে ফিল্ম পরিবেশকদের সভার বিবরণীতে। ১১ই ডিসেম্বরের সভায় তাঁরা বলছেন, 'ছবিঘরগুলিতে দর্শক সংখ্যা ক্রমেই কমছে, ফলে টিকেট-ঘরের দিকটা ভয়ের কারণ হয়ে উঠেছে।'

১৯৬৬-৬৭ সালে টিকেট বিক্রয়ের অঙ্কটা ৬৪০ মিলিয়ন থেকে ৬০০ মিলিয়ন মার্কে নেমেছে। তাঁদের মতে টেলিভিশন এই সংকটের কারণ, টেলিভিশনে ছবি দেখান হলে স্বভাবতই মানুষ ছবিঘরে এসে ছবি দেখতে চাইবে না।

ইউরোপে যুদ্ধোত্তর কাল থেকেই এই সংকট চলছে। এরূপ সংকটের জন্য ফরাসী দেশে তরুণদের উদ্যোগে নিউ ওয়েভ ইংল্যাণ্ডে নিউ সিনেমা ইত্যাদি রীতির উদ্ভব হয়েছে। এই সব রীতিতে যেমন ছবি তোলার কাজকে সংক্ষেপিত করা, ফিল্মস্টারদের প্রাধান্য লোপ করা, নতুন ধরণের গল্প অবলম্বন করা ইত্যাদির চেষ্টা হয়েছে সঙ্গে সঙ্গে এসেছে ন্যুডিটি, বা নগ্ন নারী দৃশ্য। এমন কি ফরাসীরা নর-নারীর যৌন-সঙ্গম দৃশ্য দেখাতেও ইতস্তত করেন নি।

এদিক থেকে চিন্তা করলে পশ্চিম জার্মানীর তরুণ পরিচালক ও প্রযোজকরা আজ যা করতে যাচ্ছেন তাতে নতুনত্ব কিছু নেই। পুরনো কাপড়ে তালি দেওয়ার চেষ্টা মাত্র। একইভাবে তাঁরা ব্যক্তিগত মুডের উপর ছোট গল্পের মেজাজে চিত্র-নাট্য তৈরি করেছেন, ফিল্মস্টারের পরিবর্তে নতুন মুখ আনছেন। এবং তারই সঙ্গে যোগ করছেন ন্যুড বা নগ্ন নারীর দৃশ্য। 'জার্মান ট্রিবিউন' পত্রিকায় লিখেছে : নতুন দিনের তরুণী অভিনেত্রীরা সবার সামনে চোখের পলক না ফেলে উলঙ্গ হয়ে যেতে দ্বিধা করে না। পেট্রা পলি বহির্দৃশ্য তুলতে গিয়ে এত লোকের সামনে বিবস্ত্র হতে একটুও ইতস্তত করে নি—বরঞ্চ এমন ভাব দেখিয়েছে যেন গরমের থেকে সে রেহাই পেল।

এঁদের ছবিতে অভিনয় যাঁরা করেন তাঁরা পারিশ্রমিকের দিকটার উপর মোটেই জোর দেন না। সাধারণ নিয়ম থেকে অনেক কম টাকায় অভিনয় করেন।

এই জার্মান নব পর্যায় ছবির ব্যাপারে যাঁদের খুব নাম শোনা যায় তাঁদের মধ্যে আলেকজান্দার ক্লাগ, শচামনি ভ্রাতা, আলেকজান্দার শলয়েন ডর্ফ, হারো সেন-ফট্, হার্ট শচাফ, ক্লিশল্ স্টাউব, ফ্রিৎজ, লেমকে, গসনভ্।

এঁদের ছবিতে পেশাদার তারকা নেই সত্যি, তবে এঁরাই তারকা হয়ে পড়েছেন। অর্থাৎ কাহিনী, চিত্রনাট্য, পরিচালনা এই তিনটি কাজই একজনে করেন।

এই নব পর্যায়ের ছবিতে 'তারকা বর্জন এবং নগ্নতা সংযোজন ছাড়া এমন নতুন কিছু না থাকলেও লোকে উৎসাহ প্রকাশ করে নিরীক্ষার কথা শুনে; আর কিছুটা নগ্ন নারীদেহ দেখার আকর্ষণে। অবশ্য ইউরোপে নগ্ন নারীদেহ দেখার জন্য সিনেমায় যাওয়ার প্রয়োজন হয় না। তাহলেও অঙ্গ-ভঙ্গিগুলির আকর্ষণ থাকে।

পঃ জার্মানীর এই ফিল্ম সংকটের দরুণ ফিল্ম প্রমোশন বিধি প্রণয়ন করতে হয়েছে। এই বিধির সর্ত পূরণ করলে সহকারী ঋণ পাওয়া যাবে। নৈতিকতা সম্পর্কে যে বিধি এই আইনে রয়েছে নতুন প্রযোজকরা তার সীমাবদ্ধতার মধ্যে যেতে রাজী নন। সুতরাং তাঁরা তাঁদেরই মতে চলবেন।

অভিনেতা—ওলেগ তাবাকভ

ওলেগ তাবাকভ গত বছর রাষ্ট্রীয় পুরস্কার লাভ করেছেন। তিনি এই পুরস্কার লাভ করেছেন নাট্যমঞ্চে 'কোয়াইট এন অর্ডিনারী স্টোরি' নামক নাটকে অভিনয় করার জন্য। তাবাকভ একজন জনপ্রিয় অভিনেতা। বিশেষ করে সাংবাদিকরা তাঁর খুব ভক্ত। কারণ সাংবাদিকরা তাঁর সহযোগিতা সব সময় পেয়ে থাকেন।

সত্যিকার অভিনেতা বলতে যা বোঝায় তাবাকভ ঠিক তাই। একটা চরিত্রকে রূপ দেবার ব্যাপারে তিনি যা পরিশ্রম করেন তার তুলনা হয় না। চরিত্রটির ব্যাখ্যার জন্য সাহিত্য-সমালোচক থেকে মনস্তত্ত্ববিদ পর্যন্ত সকলের পরামর্শ গ্রহণ করে, নিজের মনের সঙ্গে মিলিয়ে নেন। তারপরে বসেন অনুশীলনে। তাঁর মত না কি এত নিখুঁত অনুকরণ করতে পারেন এমন লোক কম আছে' এরূপ কথা দর্শকরা বলে থাকেন।

দশ বছর আগে সোভ্রেমেনিক থিয়েটারে তিনি যোগ দেন। তখন থিয়েটারের প্রাথমিক অবস্থা। প্রবীণ অভিনেতারা

কুমারী মালঞ্চ সেন একডালিয়া সংগীত সম্মেলনে কথক নৃত্যে প্রশংসা লাভ করেছেন।

তাবাকভকে খুবই উৎসাহ দিতেন এবং তাঁর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আশা পোষণ করতেন। চলচ্চিত্রেও ওলেগ তাবাকভ অভিনয় করেছেন। ছবিতে তাঁর অভিনীত ছবিগুলির মধ্যে 'শাশা বিগিনস্ হিজ ইনডিপেন্ডেণ্ট লাইফ' 'পিপল অন দি ব্রীজ' 'অন দি ইভ' এ নইজ ডে' 'দি টেস্ট পিরিয়ড' 'দি ক্রুয়ার স্কাইজ' 'ইয়ং এন্ড গ্রীন' 'দি লিভিং এন্ড দি ডেড' 'দি ব্রীজ বিং বিল্ট' এবং 'ওয়ার এন্ড পীস' এ নিকোলাই রস্তভের ভূমিকায় অভিনয় করেছেন।

সোভ্রেমেনিক থিয়েটারে প্রথম নাটক 'আনন্দের সন্ধানে'-র জন্য পরিচালক এমন একজন অভিনেতা খুঁজছিলেন যে অভিনয়কেই জীবনের পেশা হিসাবে নেবে। তাবাকভ এই অভিনয়ে মনোনীত হয়ে প্রথম রজনীতেই দর্শকদের স্বীকৃতি লাভ করেন। তারপর বড় এবং ছোট সব রকমের ভূমিকায় অভিনয় করে দর্শকদের আকৃষ্ট করতে পেরেছেন। 'ন্যুড কিঙ' নাটকে বড় বড় অভিনেতার সঙ্গে ছোট পার্শ্ব-চরিত্রে প্রথমবার মাতাল অর্কেস্ট্রা পরিচালক এবং দ্বিতীয়বার পাচকের চরিত্রে অভিনয় করেন। এই অভিনয় দেখে আলেক্সি বাটালভ বলেছিলেন "এর চেয়ে ভাল অভিনয় আমি ভাবতেই পারি না।"

'কোয়াইট এন অর্ডিনারী স্টোরি' প্রায় একশত বছর আগে লেখা। ভিক্টর রজভ নাটকটি মঞ্চস্থ করেন কেবলমাত্র রাশিয়ান ক্লাসিক সাহিত্য বিবেচনায় অথবা অতীত দিনকে দেখাবার জন্য নয়, তিনি মনে করেন দিন বদলে গেলেও নাটকের প্রধান চরিত্র যে নিজের ক্যারিয়ারের জন্য নৈতিকতা, দয়া-মমতা বর্জন করতে পারে সেরকম লোক সমাজে এখনো আছে। এই নাটকে অভিনয় করবার জন্য চরিত্রের সঙ্গে নিজেকে মেলাবার জন্য ওলেগ তাবাকভ নিজের শরীরের ওজন কমালেন প্রায় দেড় কে-জি।

এই নিষ্ঠার জন্য ওলেগ তাবাকভ একজন সার্থক এবং জনপ্রিয় অভিনেতা।

নাটকের কথা

বেইমানের মা

ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘের কলাকার শাখা ম্যাক্সিম গর্কির গল্প 'মাদার অব এ ট্রেটর'-এর নাট্যরূপ 'বেইমানের মা' অভিনয়ের প্রস্তুতি চালাচ্ছে। নাট্যরূপ দিয়েছেন বাসুদেব বসু। দেশের স্বাধীনতা রক্ষার সংগ্রামের পটভূমিতে ন্যায়-অন্যায়ের প্রশ্নে এক মাতৃহৃদয়ের দ্বন্দ্ব ও জননীর ভূমিকাকে উজ্জ্বল করে তুলে ধরা হয়েছে এই নাটকে। নাটকটি ইতালীয়দের মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাস আশ্রিত হলেও সার্বজনীন আবেদনে দেশ কালের ঊর্ধ্বে, এবং এখানেও 'মা' চরিত্রটি একটি অনুপ্রেরণা ও বিশ্বাসের প্রতীক।

গর্কি জন্মশতবর্ষ উৎসব উপলক্ষে কলাকারগোষ্ঠী এই নাটকটি শীঘ্রই কলকাতায় এবং কয়েকটি জেলা শহরে অভিনয় করবেন।

রোভস রিক্রিয়েশন ক্লাবের প্রথম বার্ষিক মিলনোৎসব

সম্প্রতি রঙমহল রঙ্গমঞ্চে রোভ্‌স রিক্রিয়েশন ক্লাবের ১ম বার্ষিক মিলনোৎসব অনুষ্ঠিত হল। অনুষ্ঠানে সভাপতি ও প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন—এস, কে. লাহা এবং ডঃ সাধন ভট্টাচার্য।

সভান্তে দু'টি নাটক মঞ্চস্থ হয়, শচীন বসুর পরিচালনায় 'দৃষ্টি' নাটকে অভিনয় করেন শচীন বসু, প্রমোদ দাস, পরেশ গোস্বামী, জয়দেব রায়, গণেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রতিমা পাল, ভবেশ মিত্র, চণ্ডীদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, রমেন্দ্রনাথ সান্যাল, বিষ্টুপদ চক্রবর্তী, দেবপ্রদাস মুখোপাধ্যায়, প্রদীপকুমার সেন, সীমা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ।

পরেশ গোস্বামীর পরিচালনায় বনফুলের 'বন সংস্করণে' অভিনয় করেন—অজয় রায়, পরেশ গোস্বামী, দেবপ্রসাদ ঘোষ, নীরেন্দ্রকুমার দত্ত, কনককুমার দে, নিতাই ঘোষ, কৃষ্ণচন্দ্র সামন্ত, জহরলাল বসু, মীরা মুখোপাধ্যায়।

এ উপলক্ষে একটি সুন্দর স্মারকপত্র সম্পাদনা করেন শান্তনু দাস।

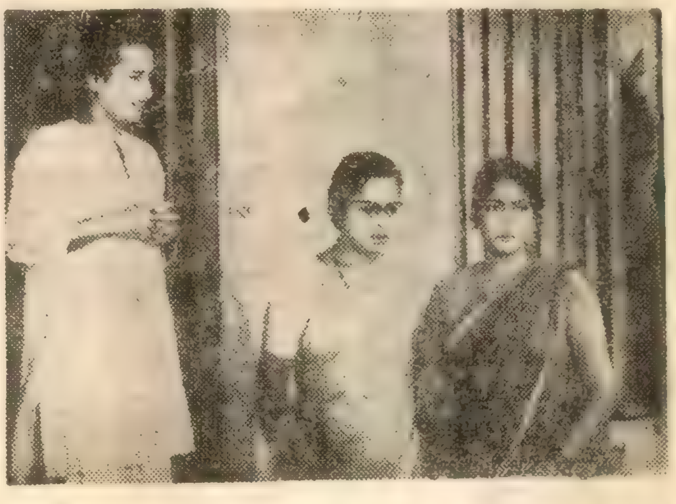

মুক্তিপ্রতীক্ষিত 'বালুচরী' ছবিতে নিমাই দত্ত, গীতা দে, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়।

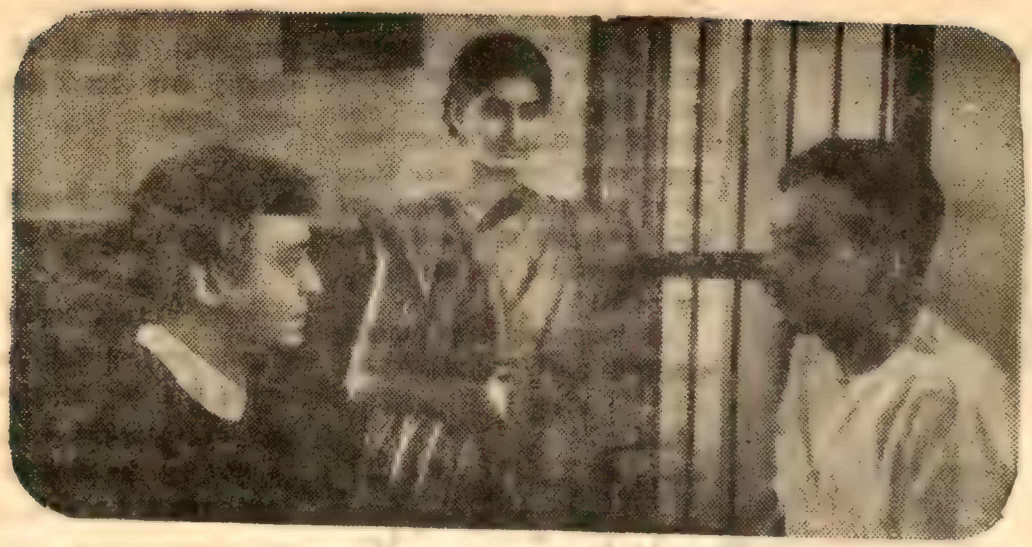

অজয় কর পরিচালিত 'পরিণীতা' ছবিতে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, মৌসুমী ও বিকাশ রায়।

জগদীশচন্দ্র পলিটেকনিকের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

জগদীশচন্দ্র পলিটেকনিকের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান শুক্রবার (২২শে মার্চ) সন্ধ্যায় পলিটেকনিকের ময়দানে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিরূপে উপস্থিত ছিলেন স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশ নেন নির্মলেন্দু চৌধুরী, হিমাংশু বিশ্বাস (যন্ত্রসংগীত) মৃণাল চক্রবর্তী, শৈলেন মুখার্জী ও আরও অনেকে।

ক্যালকাটা কালচারাল ইনস্টিটিউট

ক্যালকাটা কালচারাল ইনস্টিটিউটের উদ্যোগে আগামী ১৪ই এপ্রিল একডালিয়া রোডে এক সঙ্গীত নৃত্য ও গীতি অনুষ্ঠান হবে। অতুলপ্রসাদের গীতি আলেখ্য অনুষ্ঠানের অন্যতম আকর্ষণ।

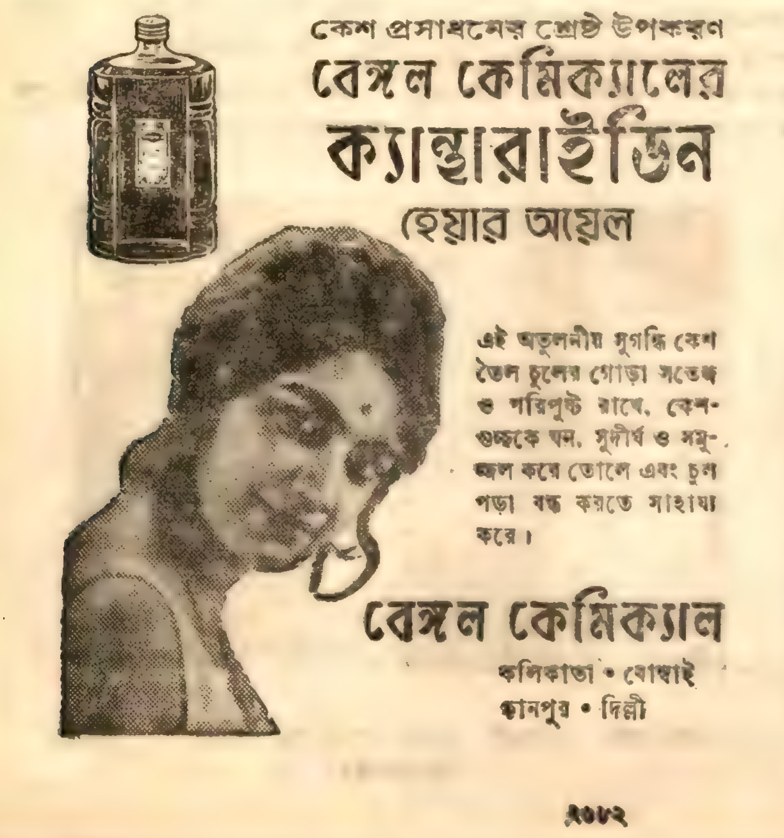

স্টুডিও খবর

ঋত্বিক ঘটকের নতুন ছবি

প্রবোধ সান্যালের 'রঙের গোলাম' অবলম্বনে ঋত্বিক ঘটক ছবি করতে উদ্যোগী হয়েছেন। প্রাথমিক কাজ শেষ হয়েছে। শান্তিনিকেতনের কাছে কিছু বহির্দৃশ্যও তোলা হয়েছে। এই ছবিতে প্রধান দুটি ভূমিকায় অংশ গ্রহণ করছেন: অনিল চ্যাটার্জী ও মাধবী মুখার্জী।

হিন্দী ছবিতে অপর্ণা সেন

অপর্ণা সেন (দাশগুপ্ত) এখন পেশাদার অভিনেত্রী হতে চলেছেন। সত্যজিৎ রায়ের ছবিতে হাতেখড়ি দিয়ে কয়েকটি বাংলা ছবিতে তিনি অভিনয় করেছিলেন। এখন তিনিও বোম্বাইয়ের পথে যাওয়া-আসা করছেন। কেওয়াল পি কাশ্যপের 'বিশ্বাস' নামক ছবিতে নায়িকা চরিত্রে তিনি অভিনয় করার জন্য চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন বলে প্রকাশ। তাঁর বিপরীতে থাকবেন জিতেন্দ্র। দেরাদুন এবং হৃষীকেশে ছবিটির বহির্দৃশ্য তোলা হচ্ছে। ছবিটি পরিচালনা করছেন কল্যাণজী আনন্দজী।

শেষ থেকে শুরু

গত ১৭ই মার্চ 'শেষ থেকে শুরু' ছবির জন্য মান্না দে-র গাওয়া একটি গান রেকর্ড করা হয়েছে। গানটি সুর দিয়েছেন নচিকেতা ঘোষ। শ্রীঘোষের দেওয়া সুরে আর একটি গান গেয়েছেন কিশোর-কুমার। অনিল বাগচীর দেওয়া সুরে দু'টি গান গেয়েছেন সবিতাব্রত দত্ত ও প্রতিমা ব্যানার্জী। ছবিটির প্রযোজক চিত্রপীঠ। পরিচালনা করছেন চিত্রসাথী নামে একদল কলাকুশলী।

তিন অধ্যায়

অপ্সরা ফিল্মসের 'তিন অধ্যায়' ছবির কাজ শেষ হয়েছে। ছবি মুক্তি-প্রতীক্ষায় রয়েছে। মঙ্গল চক্রবর্তী পরিচালিত ছবিটিতে প্রধান ভূমিকায় অভিনয় করেছেন : উত্তমকুমার ও সুপ্রিয়া দেবী।

নিকোলাস এণ্ড আলেকজান্দার

রাশিয়ার জারের পতন ঘটবার মুহূর্তের বর্ণনামূলক উপন্যাস 'নিকোলাস এণ্ড আলেকজান্দার' অবলম্বনে এক চিত্ররূপ নির্মাণ করছেন সাম স্পেইগেল। কলম্বিয়া পিকচার্সের পরিবেশনায় ছবিটি মুক্তি পাবে। স্পেইগেল বলেছেন এটা তাঁর জীবনের একটি উল্লেখযোগ্য ছবি হবে। তিনি রাশিয়ায় গিয়ে বহির্দৃশ্য তোলার জন্য সোভিয়েট সরকারের অনুমতি চাইবেন, বিশেষ করে লেনিনগ্রাড উইনটার প্যালেসের দৃশ্য গ্রহণের জন্য।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে পশ্চিমী দুনিয়ায় চলচ্চিত্র সংকটের তীব্রতায় প্রযোজকরা বিপ্লব ভিত্তিক ছবির উপর নজর দিচ্ছেন, এতে বিপ্লবের উত্তেজনায় যেমন দর্শক আকৃষ্ট করা চলে তেমন ঘটনা বিকৃত করে বিরুদ্ধ প্রচারও চলে। এক ঢিলে দুই পাখি।

সংবাদকেলী

চিত্রা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিদেশ যাত্রা

নৃত্যশিল্পী শ্রীমতী চিত্রা বন্দ্যোপাধ্যায় গত ৩০শে মার্চ বিমানযোগে ইংল্যান্ড যাত্রা করেছেন। তিনি সেখানে তাঁর স্বামী শ্রীবীরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে তিন মাস থাকবেন এবং লণ্ডনে ও বিভিন্ন স্থানে ভারতীয় নৃত্য প্রদর্শন করবেন। নৃত্যানুষ্ঠানের জন্য শ্রীমতী চিত্রা রবীন্দ্রসঙ্গীত এবং ভরতনাট্যম, কথাকলি, মণিপুরী ও কত্থক নাচের উপযোগী সঙ্গীত টেপ করে নিয়ে গেছেন। সম্প্রতি শ্রীমতী চিত্রা রাগিণী সংস্থার উদ্যোগে অনুষ্ঠিত 'আফ্রিকা' 'ক্ষুধিত পাষাণ' এবং 'শাপমোচন' নৃত্যনাট্যে প্রধান ভূমিকায় অংশ গ্রহণ করে প্রশংসা লাভ করেছেন।

রোভস রিক্রিয়েশন ক্লাবের বার্ষিক উৎসবের উদ্বোধন অনুষ্ঠান

'আপনজন' ছবির সেটে তপন সিংহ নির্দেশ দিচ্ছেন।

ব্রেসবেন উৎসব

অস্ট্রেলিয়ার ব্রেসবেন চলচ্চিত্র উৎসবে ভারত সরকারের ফিল্ম ডিভিশনের তোলা দুটি ছবি 'কোয়েস্ট ফর কোয়ালিটি' এবং 'দি রম ফ্রম দি রিভার ব্যাঙ্ক' প্রদর্শিত হবে। ৩রা মে থেকে ১২ই মে পর্যন্ত উৎসব চলবে।

মেলবোর্ন উৎসব

মেলবোর্ন চলচ্চিত্র উৎসবে ভারতীয় ছবি অরুন্ধতী মুখার্জী পরিচালিত 'ছুটি' প্রদর্শিত হবে। এই উৎসব চলবে ৩১শে মে থেকে ১৫ই জুন পর্যন্ত

শোক-সংবাদ

পরলোকে চিত্র-পরিচালক

বাঁকুড়া জেলা নিবাসী বিশিষ্ট চিত্র-পরিচালক শ্রীগুণময় বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার বেলুড়ের বাসভবনে গত ১১ই মার্চ, পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর ৬৬ বৎসর বয়স হয়েছিল।

শ্রীগুণময় বন্দ্যোপাধ্যায় প্রায় ২০ খানি বাংলা ছবি চলচ্চিত্রে রূপায়িত করেছেন। তাঁর প্রথম ছবি "শশীনাথ" (১৯৩৭) এবং উল্লেখযোগ্য ছবি "মাতৃ-হারা", "জীবনসঙ্গিনী", "নিরক্ষর", "বিশবছর আগে", "মা ও ছেলে", "নীলাঙ্গুরীয়", "রাজপথ", "গৃহলক্ষ্মী" ইত্যাদি। বাংলা চিত্রজগতে ইনিই প্রথম কার্টুন ছবি তৈরি করেছিলেন।

পাঠক মন

০৪, ৩, ৬৮ (৩৯শ সংখ্যা) তারিখের সাপ্তাহিক বসুমতীতে চন্দ্রগুপ্ত মহাশয়ের লিখিত "ভিজে মেঘের দুপুরে" প্রবন্ধ পড়ে, বাংলা দেশের পত্র-পত্রিকা এবং আধুনিক সভা-সমিতির সম্বন্ধে আর এক ধাপ নতুন অভিজ্ঞতা লাভয় পাঠক সমাজকে করালেন।

লেখকের বলিষ্ঠ লেখনীপ্রসূত লেখায় বাংলা ও বাঙালী সমাজ সচেতন হবে বলে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস।

চন্দ্রগুপ্ত মহাশয় জীবনানন্দের কবিতার মধ্য দিয়ে "দৈনন্দিনের গ্লানি, নির্জন, নিঃসঙ্গ, ক্লান্তি বিষাদ" ব্যাখ্যাতীত মানুষের দিকে দৃষ্টিপাত করে, পাঠক সমাজের পরম উপকার করেছেন।

লেখকের ভাষায় "বাংলা সাহিত্যের একটি শ্রেষ্ঠ নিটোল লিরিকে জীবনানন্দের 'হায় চিল' কবিতায়—অন্তহীন এই কান্না চিরদিনের মত বাণীবন্ধ হয়ে আছে।"

আপনার মন্তব্য পরিচ্ছন্ন এবং রুচিশীল মনোভাবের জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

সুশীল পাঁজা
বাসুদেবপুর, উলুবেড়িয়া

*

নাজমা চৌধুরী ও মোহম্মদ মনিরুজ্জমানের কবিতা দুটো সাপ্তাহিক বসুমতীতে প্রকাশের জন্য সম্পাদিকাকে অশেষ ধন্যবাদ জানাচ্ছি। রাষ্ট্রগত দিক থেকে দুই বাংলা পৃথক হলেও—দুই বাংলার মানুষ আমরা; এক জাতি, এক ভাষা, এক প্রাণ। আমরা বাঙালী। বাংলা ভাষা আমাদের গর্ব, আমাদের আশা। সাহিত্যের নীল আকাশের নিচে আমরা দুই বাংলার মানুষ এক। সাপ্তাহিক বসুমতী এই সত্যকে যথার্থ মূল্য দিয়েছে দেখে যথেষ্ট আনন্দ বোধ করছি।

আশা করি ভবিষ্যতে ঐ বাংলার আরও অনেক লেখা বসুমতীতে দেখতে পাব।

রমা চক্রবর্তী
থানা রোড
করিমগঞ্জ (কাছাড়)

*

১৪।৩।৬৮ তারিখের 'বঙ্গদর্শনে' পড়লাম 'কাশীপুর গান এণ্ড শেল ফ্যাক্টরী' এবং 'বার্ন কোম্পানী' লক্‌আউট ঘোষণা করে লক্ষ লক্ষ শ্রমিক কর্মচারীদের পথে বসিয়েছেন। অর্থাৎ এককথায় পশ্চিমবঙ্গে শিল্পসংকট দেখা দিয়েছে। আমার মতে 'বঙ্গদর্শন' তখনই সার্থক হবে যখন সংকট (যে-কোন রকমের সংকট)-এর খবর ছাপানোর সাথে সাথে কেমন করে তা দূর করা সম্ভব তাও লিপিবন্ধ করা হবে। 'বঙ্গদর্শন'-এর লেখকগণ বহুবিধ সমস্যার সুন্দর সমাধান দিয়েছেন—বহুবিধ সমস্যা তুলে ধরেছেন। সেজন্য তাঁদের উদ্দেশ্যে আমার আন্তরিক অভিনন্দন জানাই।

বহুবিধ সমস্যার মধ্যে শিল্পসংকট তো একটা। এখন এই সংকট কেমন করে এড়ান যায় সে সম্বন্ধে সূক্ষ্মভাবে বিচার করা উচিত। প্রথমেই জানিয়ে রাখি কোন এক পক্ষের (শ্রমিক বা মালিক) চেষ্টায় (তা যেমন ধরণের চেষ্টাই হোক না কেন) এই শিল্পসংকট এড়ান যাবে না। শ্রমিক-মালিক একে অপরের পরিপূরক হলেই শিল্পসংকট এড়ান যাবে। মালিকরা যদি শ্রমিকের স্বার্থ না দেখেন (এ-ক্ষেত্রে শ্রমিকদের বেতন বাড়ানোর দাবি উল্লেখ্য) এবং শ্রমিকরা যদি মালিকের স্বার্থ না দেখেন (এ-ক্ষেত্রে শ্রমিকদের অযথা ধর্মঘটের কথা উল্লেখ্য) এবং মালিক-শ্রমিক উভয়েই যদি সমাজের স্বার্থ না দেখেন তবে এতো যে 'সমাজতন্ত্র' 'সমাজতন্ত্র' বলে লাফালাফি করি তার কি সার্থকতা আছে শুনি? মালিকভাই ও শ্রমিকভাইদের অভিভাবকের সাথে এ-কথাটা ভেবে দেখবার জন্য অনুরোধ জানাই।

উগ্র সাম্যবাদী মনোভাবাপন্ন হলে বলতে পারতাম, "সর্বপ্রথম ঐ পেটমোটা মালিকদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাতে হবে—তাদের হাত থেকে সম্পদরাশি কেড়ে নিতে হবে—বিলিয়ে দিতে হবে তা শ্রমিকদের মধ্যে।" কিন্তু উগ্র সাম্যবাদীদের এ কথা জানিয়ে রাখি যে ঐ কথাগুলো শুনতে অতি মধুর কিন্তু পরিণাম শুভ নাও হতে পারে। আরও একটা কথা জানিয়ে রাখি—"There are institutions which, like plants, flourish only on their our hillside under their own sunshine."

এবার আসা যাক্ শিল্পসংকট প্রসঙ্গে। শিল্পসংকট দেখা দিয়েছে কেন? এ কথাটা অতি সূক্ষ্মদৃষ্টিতে ভেবে দেখবার সময় এসেছে। আমার মতে শিল্পসংকট এইজন্য দেখা দিয়েছে যেহেতু মালিকরা জানতে পেরেছেন যে শ্রমিকরা একমাত্র তার উপর অর্থাৎ তৎচালিত শিল্পে নির্ভরশীল। এ কথাটা তো সকলেই স্বীকার করবেন যে অন্য কেউ যদি আমার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে এবং ঐ ব্যক্তির যদি উপার্জনের অন্য কোন উপায় না থাকে তবে তাকে আমি যথেচ্ছভাবে পরিচালিত করবার সাহস পাব। আমার এই 'সাহস পাওয়া' দূষণীয় তো বটেই—কিন্তু ঐ ব্যক্তিটি, যে আমার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে আছে, তার কি কোন দোষ নেই? সে যদি সম্পূর্ণভাবে উদর-পূর্তির জন্য আমার উপর নির্ভর না করতো তবে যথেচ্ছভাবে পরিচালিত করবার সাহস আমার হোত না। মালিক-শ্রমিক সম্পর্কেও এ কথাটা খাটে বলে আমি বিশ্বাস করি। মালিক যে শ্রমিকদের শোষণ করছে এ তো দূষণীয় বটেই তবে শিল্পসংটের একমাত্র কারণ আমি মনে করি না। শ্রমিকেরা যারা মালিকদের উপর একেবারে সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল তাদেরও কিছুটা দোষ আছে বলে আমি মনে করি। শ্রমিকভাইদের উদ্দেশ্যে এ কথা বলছি। প্রসঙ্গত বলে রাখি কাউকে ভালবাসলেই তাকে সমালোচনা করা চলে। শ্রমিকভাইদের জানাই তারা যেন মালিকদের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর না করেন। মালিক যেন কখনও বুঝতে না পারে যে তারা মালিকদের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। মালিকরা যেন ভাবতে না পারেন যে লকআউট করলে শ্রমিকরা পথে বসবেন।

আসল কথা আমি বলতে চাই শিল্পের উপর থেকে শ্রমিক-চাপ কমাতে হবে। চাকুরে হিসাবে শ্রমিকদের চাহিদা যদি কমে যায় তবে শ্রমিকদের উপর অযথা অত্যাচার চালাতে সাহস পাবেন না। কেন না মালিক জানেন যে শ্রমিক নিয়েই তার যত কিছু—শ্রমিকদের অসুবিধায় ফেলতে চেয়ে নিজেরই ক্ষতির সম্ভাবনা বেশি। কিন্তু আসল কথা এই যে শিল্পের উপর অধিকাংশ জনতা যাতে নির্ভর না করেন তার ব্যবস্থা করতে হবে।

তবেই মালিক-শ্রমিক পরস্পর পরস্পরের স্বার্থ দেখবেন (অর্থাৎ দেখতে বাধ্য হবেন—তা কোন ধর্ম-নীতি নয়—পরিস্থিতিই ঐরূপে করতে বাধ্য করবে)। কিন্তু উভয়কেই সমাজের হিত দেখতে হবে।

এখন শিল্পে চাপ কেমন করে কমানো যেতে পারে এবং মালিক-শ্রমিক কেমন করে সমাজের স্বার্থ দেখবেন তা উল্লেখ করলে পত্র প্রবন্ধে পরিণত হবে। তাই এখানেই ইতি।

শ্যামাপদ দে
দেওঘর কলেজ
(বি-এ ফাইনাল ইয়ার)

খেলা ধুলো

আন্তঃ কলেজ টেনিস প্রতিযোগিতায় বিজয়ী সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজের খেলোয়াড়গণ।

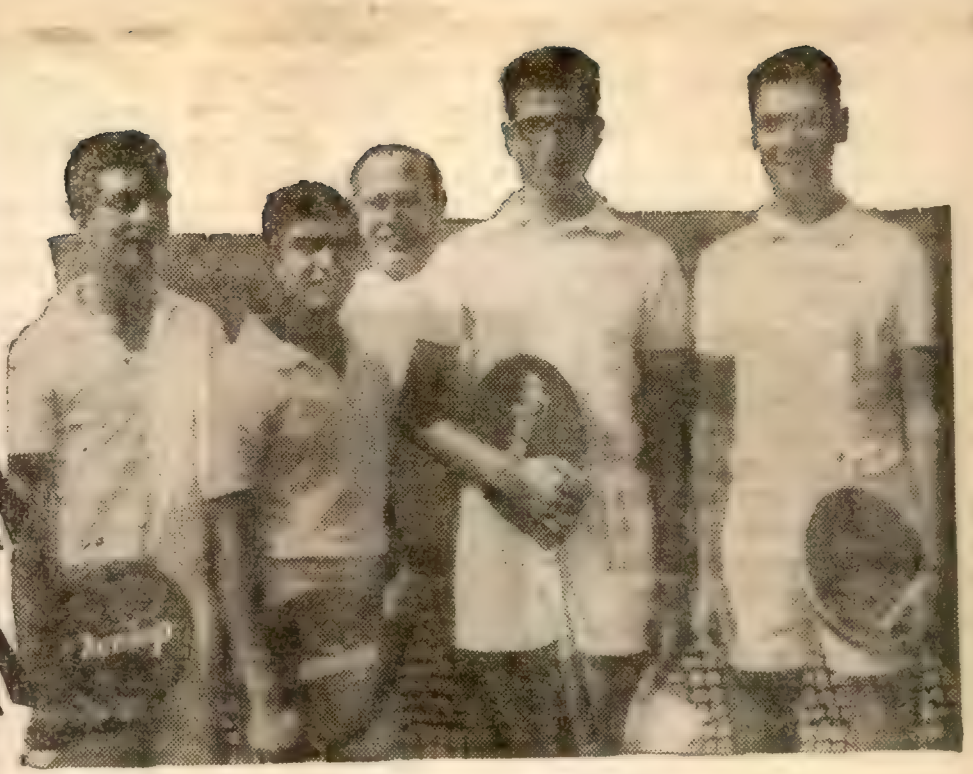

দক্ষিণ আফ্রিকা ও মেক্সিকো অলিম্পিক

মেক্সিকো অলিম্পিককে কেন্দ্র করে সমস্ত বিশ্ব জুড়ে প্রতিবাদের যে ঝড় উঠেছে—সে ঝড় আজ এসে উপস্থিত হয়েছে
ভারতেও। ভারতও আজ জোর গলায় জানিয়েছে প্রতিবাদ, জানিয়েছে আগামী অলিম্পিক প্রতিযোগিতায় তার
যোগদানে অনিচ্ছার কথা। কারণ প্রাঞ্জল। দক্ষিণ আফ্রিকাকে অলিম্পিক প্রতিযোগিতায় যোগদানের অনুমতি দেওয়া, ভারতের
মতে শুধু সম্পূর্ণ অসংগতই নয় অনুচিতও। দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণ-বৈষম্যনীতিই হলো বিশ্ব-জোড়া এই ঝড়ের মোল কারণ।
দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণ-বৈষম্যনীতি আমরা কোন মতেই সমর্থন করি না, কোন সুস্থ মস্তিষ্কের মানুষই তা করতে পারেন না।
সাদা চামড়ার সংগে কালো চামড়ার বিভেদ, সাদা-কালোর পার্থক্য বোধহয় আমাদের মতো বেশি করে জানেন না অনেক দেশের
লোকই। দুশ বছর ধরে বৃটিশ শাসনের লোহ-শৃংখল আমাদের শুধু মাত্র শৃংখলায়িতই করে রাখে নি—আমাদের ভালো করে
বুঝিয়ে দিয়েছে তাদের চোখে আমরা কতো ছোট, আমরা কতো নগণ্য।

তাই দক্ষিণ আফ্রিকার ঐ বর্ণ-বৈষম্যনীতির আমরা গোঁড়া বিদ্বেষী। আমরা মনেপ্রাণে ঐ নীতির শুধু বিরোধীই নই,
আমরা ঘৃণা করি সাদা-কালোর ঐ অন্ধ বিদ্বেষকে! দক্ষিণ আফ্রিকায় সাদাদের দলে কালোদের কোন স্থান নেই।
সাদারা কালোদের ঘৃণাভরে অবহেলা করে সরিয়ে রেখেছেন সব কিছু থেকে অনেক দূরে। কালোরা বুঝি অস্পৃশ্য ও-দেশে!
ভারত ঐ নীতির সম্পূর্ণ বিরোধী। তাই কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর ঘোষণাকে আমরা স্বাগত জানাই। তাঁর সংগে আমরাও
একমত—আমরাও বলি, দক্ষিণ আফ্রিকাকে মেক্সিকো অলিম্পিক প্রতিযোগিতায় যোগদান করতে দেওয়া হলে ভারত এবারের
অলিম্পিকে অংশ গ্রহণ করবে না। কেন্দ্রীয় সরকারের এই নীতি থেকে ধরে নেওয়া যেতে পারে যে মেক্সিকো অলিম্পিকে
ভারত এবার আর যোগদান করছে না। কারণ এবারের প্রতিযোগিতায় দক্ষিণ আফ্রিকার যোগদান মোটামুটিভাবে পাকা হয়ে গেছে।

দক্ষিণ আফ্রিকার এই বর্ণবৈষম্য নীতির জন্যে ভারতের সংগে আজ পর্যন্ত তাদের কোন ক্রিকেট খেলা হয় নি। ভারত
খেলতেও চায় না তাদের সংগে। কিন্তু এই প্রসংগে কয়েকটি কথা বলার প্রয়োজন আজ দেখা দিয়েছে। অবশ্য আগেই
বলেছি যে আমাদের এই মন্তব্য ভারতের নীতির প্রতিবাদ নয়। আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের এই নীতিকে সম্পূর্ণভাবে সমর্থন করি।
কিন্তু সেই সংগে দু'টি বিষয় উল্লেখ করে ঐ নীতির সমালোচনাও করতে চাই!
প্রথমেই আসে ডেভিস কাপ টেনিস প্রতিযোগিতার কথা। ডেভিস কাপ টেনিস প্রতিযোগিতায় ভারত দক্ষিণ আফ্রিকার
বিরুদ্ধে খেলেছে। ভাবতে অবাক লাগে যে দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণ-বৈষম্যনীতি সমর্থন না করা সত্ত্বেও কেন ভারত দক্ষিণ
আফ্রিকার বিরুদ্ধে ডেভিস কাপের খেলায় অংশ গ্রহণ করলো।

দ্বিতীয় বিষয়টি যদিও রাজনীতি ঘেঁষা তবুও বিষয়টি কেন্দ্রীয় সরকারের অলিম্পিক নীতির সম্পূর্ণ বিরোধী। নয়া
দিল্লীতে অনুষ্ঠিত "ইউনাইটেড নেশন কনফারেন্স অন ট্রেড এ্যান্ড ডেভেলপমেণ্টে" দক্ষিণ আফ্রিকাও যোগদান করেছে।
দক্ষিণ আফ্রিকার এই যোগদান নিয়ে গোলমালও হয়েছে যথেষ্ট। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে দক্ষিণ আফ্রিকার এই কনফারেন্সে যোগদানে
ভারতের ইচ্ছা-অনিচ্ছা স্পষ্টভাবে প্রকাশ পায় নি। তাহলে এ থেকেও কি ভারত সরকারের দু'মুখী মনোভাবের কথা প্রমাণিত
হয় না......? —শান্তিপ্রিয়

ঐতিহাসিক প্রত্যাখ্যান

যা কখনো হয় নি, যা কখনো কেউ শোনে নি, এইবার ঘটছে সেই সব অঘটন। কলকাতার হকি ইতিহাসে এই প্রথম আম্পায়াররা খেলা পরিচালনা করতে অসম্মতি জানালেন। ঘটনাটি তাই ঐতিহাসিকও বটে।

তবে অঘটনের পেছনের ঘটনাটিও কম নাটকীয় নয়। আমরা এতদিন জানতাম যে ফুটবল মাঠের রেফারী আর হকি মাঠের আম্পায়ারের রিপোর্টের ওপর বাদী এবং প্রতিবাদী দলগুলির বিচার-পর্ব নির্ভর করে। কিন্তু এবার ডালহৌসী আর অরোরার খেলার পর ব্যাপারটা একটু অন্যরকম হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ঐ খেলায় অরোরা দু' গোলে জিতেছিলো। কিন্তু খেলার পর ডালহৌসী প্রতিবাদ জানায়। তাদের প্রতিবাদের একটি কারণ ছিলো যে খেলা নাকি পুরো সময় ধরে হয় নি।

বি, এইচ, এ'র লীগ সাব-কমিটি তাই খেলাটি পুনরনুষ্ঠানের নির্দেশ দিয়েছেন। অথচ অরোরা-ডালহৌসীর খেলায় নিযুক্ত আম্পায়ারদের রিপোর্ট ছিলো অন্য রকম। তাঁদের মতে খেলা পুরো সময় ধরেই অনুষ্ঠিত হয়েছিলো। কিন্তু তাঁদের রিপোর্টের কোন মূল্যই থাকলো না। বি, এইচ, এ নির্দেশ দিলেন খেলাটি পুনরনুষ্ঠানের।

আর সেই জন্যেই আম্পায়াররা জানালেন প্রতিবাদ। নাটকীয়ভাবে তাঁরা অস্বীকার করলেন খেলা পরিচালনা করতে।

অভাবনীয় সাফল্য

ইন্দোনেশিয়ার আঠারো বছরের স্কুলের ছেলে রুডি হার্টোনোর সাফল্য সত্যিই অভাবনীয়। অল ইংলণ্ড ব্যাডমিন্টন চ্যাম্পিয়ানশীপের ফাইন্যালে হার্টোনো বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় মালয়েশিয়ার তান আইক হুয়াংকে ১৫-১২ ও ১৫-৯ খেলায় পরাজিত করেন মাত্র ৪৯ মিনিট খেলার পর।

তান আইক হাং ফাইন্যাল খেলার কোন সময়েই নিজের সুনাম অনুযায়ী খেলতে পারেন নি। তাঁকে বার বার ভুল করতে দেখা গিয়েছিলো। অবশ্য ভাগ্যও ছিলো হার্টোনোর সহায়।

পুরুষদের সিঙ্গলস ছাড়া অন্য প্রতিযোগিতাগুলোও অনুষ্ঠিত হয়ে গেছে। মহিলাদের সিঙ্গলস ফাইন্যালে সুইডেনের মিসেস ইভা তেওয়েডবার্গ ইন্দোনেশিয়ার মিস নিরারানিকে হারিয়ে দেন।

জাতীয় বক্সিং

জামসেদপুরে অনুষ্ঠিত ১৪তম জাতীয় বক্সিং চ্যাম্পিয়ানশীপ প্রতিযোগিতা এবারের মতো শেষ হয়ে গেলো। সার্ভিসেস দল এবারও শ্রেষ্ঠত্বের সম্মান লাভ করেছে, আর রানার্স আপ হয়েছে রেলওয়ে দল। পয়েন্টের হিসেবে প্রথম আর দ্বিতীয়র মধ্যে তাই তফাৎ অনেক। সার্ভিসেস পেয়েছে ৫০ পয়েন্ট। কিন্তু

ইঞ্জিনীয়ার

দ্বিতীয় স্থান লাভকারী রেলওয়ে দল পেয়েছে মাত্র ১৮ পয়েন্ট। ১৪ পয়েন্ট পেয়ে বিহার লাভ করেছে তৃতীয় স্থান। আর বাংলার ভাগ্যে জুটেছে মাত্র ৪ পয়েন্ট।

সার্ভিসেস দলের বক্সাররা বক্সিং-এর সব ক'টি বিভাগে সাফল্যলাভ করেছেন।

সমাচার দর্পণ

বিদেশে

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ক্রিকেট দল এই বছরের শেষের দিকে অস্ট্রেলিয়া সফরে যাবে। গারফিল্ড সোবার্সের ওপরই পড়েছে দল পরিচালনার ভার। এর আগে স্বর্গত স্যার ফ্রাঙ্ক ওরেলের নেতৃত্বে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দল অস্ট্রেলিয়া সফর করেছিলো। টাই-টেস্টের সেই আলোড়ন সৃষ্টিকারী সফরের পর ওয়েস্ট ইণ্ডিজ আবার চলেছে অস্ট্রেলিয়ায়। ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের ক্রীড়ানৈপুণ্য যদিও উল্লেখযোগ্য হয় নি, তবু অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ভালোই খেলবে বলে মনে হয়। কারণ ভারতের বিরুদ্ধে খেলার সময়েই প্রমাণিত হয়ে গেছে যে অস্ট্রেলিয়ার শক্তি এখন খুবই সীমিত।

* * *

জন্মের সময়ের ওপরই নাকি নির্ভর করে এ্যাথলেট আর খেলোয়াড়দের সাফল্য। লেনিনগ্রাড বিশ্ববিদ্যালয়ের লেকচারার ভ্যালেণ্টিনা সাপোসিনিকোভা সম্প্রতি তাঁর গবেষণার পর এই সিদ্ধান্তে এসেছেন। তাঁর মতে মানুষের জন্মের সময়টাই আসল। যদি কেউ গরমকালে জন্মগ্রহণ করে তাহলে তার পক্ষে ট্রাক ও ফিল্ড বিভাগে পারদর্শিতা লাভ করার সম্ভাবনাই বেশি, অর্থাৎ চেষ্টা করলে সে সহজেই কৃতী এ্যাথলেট হতে পারবে। আর শীতকালে ভূমিষ্ঠ শিশুদের ফুটবল, স্কীয়িং প্রভৃতি বিষয়ে সহজেই সাফল্যলাভ করার সম্ভাবনা। বৃটিশ এ্যামেচার বক্সিং এ্যাসোসিয়েশনের চিফ মেডিকেল অফিসার ডাঃ লারেন্স ব্রুনস্টিন ও ভ্যালেন্টিনার এই অভিমতকে সমর্থন জানিয়েছেন।

দেশে

ভারতের উইকেটরক্ষক ব্যাটসম্যান ফারুক ইঞ্জিনীয়ার সপরিবারে বিলেতের পথে পাড়ি দিয়েছেন। সংগে আছেন তাঁর স্ত্রী, পুত্র আর তাঁর বাবা। তিরিশ বছরের ইঞ্জিনীয়ার ল্যাঙ্কাশায়ার দলের পক্ষে খেলবেন। তিন বছরের এক কনট্রাক্টে সই করেছেন তিনি। অবশ্য এই সময়ের মধ্যে তিনি ভারতের পক্ষে টেস্ট খেলায় অংশ গ্রহণ করতে পারবেন।

* * *

পাতিয়ালার ন্যাশনাল ইনস্টিটিউটের টিউট অফ স্পোর্টসের স্থানান্তরিত হবার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। এই ইনসটিটিউটকে দু' ভাগে ভাগ করে এক ভাগ গোয়ালিয়রের লক্ষ্মীবাই কলেজ অফ ফিজিক্যাল এডুকেশনে আর এক ভাগ নিউ দিল্লীর ন্যাশানাল স্টেডিয়ামে আনা হবে।

পাতিয়ালার ন্যাশনাল ইনসটিটিউটের জন্যে এখনো পর্যন্ত ৫৭·৮৯ লক্ষ টাকা খরচ হয়েছে, এ ছাড়া আরো ১৭ লক্ষ টাকা খরচ হয়েছে বিভিন্ন খাতে। আর কোচিং-এর জন্যে খরচ হয়েছে ৩২ লক্ষ টাকা।

এখন প্রশ্ন জেগেছে যে খরচের সংগে ট্রেনিং-এর ফলাফল তাল দিতে পারে নি। শুধু খরচই হচ্ছে, সে অনুপাতে কাজ কিছুই হয় নি! তাই কেন্দ্রীয় সরকার বিষয়টি খুঁটিয়ে দেখার জন্যে একটি কমিটি গঠন করেছিলেন। সেই কমিটির মতে কোচিং বিভাগটি গোয়ালিয়রে আর ট্রেনিং বিভাগটি নিউ দিল্লীর ন্যাশনাল স্টেডিয়ামে স্থানান্তরিত করা দরকার।

অদ্ভুত যতো আউট

ক্রিকেট খেলার আইন-কানুনের আচার-বিচার অদ্ভুত। আইনের আঁশগলিতে সেখানে আউট আর নট-আউটের প্রশ্ন জড়িত। তাই মাঝে মাঝে হঠাৎ ঘটে যায় অদ্ভুত সব আউটের ঘটনা। খেলার সময় কারো হয়তো মাথার টুপি পড়ে গিয়ে উইকেট থেকে বেল ফেলে দিলো, কেউ হয়তো আউট হয়েছে ভেবে প্যাভেলিয়নে ফিরে যেতে গিয়ে দেখলো আম্পায়ার তাকে আউট দেন নি—কিন্তু ফিল্ডাররা ভেঙে দিয়েছে তার উইকেট—আরো কতোরকমের অদ্ভুত অদ্ভুত সব ঘটনাই না ঘটে ক্রিকেটাঙ্গনে।

অদ্ভুত সেইসব ঘটনা অবলম্বনেই এই লেখা 'অদ্ভুত যতো আউট'। অদ্ভুত-

ভাবে আউট হয়ে যাবার গাদাগাদা উদাহরণের আলোচ্য আলোচনায় নেওয়া হয়েছে মাত্র কয়েকটি। নিচে সেইরকম কতকগুলো আকর্ষণীয় আউটের কথা বলা হলো।

কয়েক বছর আগের ঘটনা। তখন ডেনিস কম্পটনের মতো ব্যাটসম্যান পৃথিবীতে খুবই কম ছিল। যেমন তাঁর মারের কায়দা, তেমনি হাতের জোর। তাই ডেনিস কম্পটনের খেলা দেখতে মাঠে হাজার হাজার দর্শক ছোটে।

কম্পটন সেদিন লর্ডস মাঠে ব্যাটিং করছিলেন সারে দলের বিরুদ্ধে। কম্পটন খেলছেন যা হবে। হাজার হাজার দর্শক হাততালি দিয়ে কম্পটনকে অভিনন্দন জানাচ্ছে। খুব সুন্দর ব্যাটিং করছিলেন কম্পটন।

সারের উইকেটরক্ষক আর্থার ম্যাকেন্টায়ার উইকেটের পেছনে দাঁড়িয়ে কম্পটনকে আউট করার সুযোগ খুঁজছেন। ব্যাকওয়ার্ড শর্ট লেগে ফিল্ডিং করছিলেন এরিক বেডসার। একটা লাফানো বল পেয়েই কম্পটন কসে হুক করলেন। চার রান অবধারিত। কিন্তু বলটা ব্যাকওয়ার্ড শর্ট লেগে এরিক বেডসারের পায়ের বুটে লেগে ছিটকে গিয়ে পড়লো উইকেটরক্ষক আর্থার ম্যাকেন্টায়ারের হাতে। প্রথমটায় থাবড়িয়ে গেলেও ব্যাপারটা বুঝে নিয়ে আর্থার 'হাউজ দ্যাট' বলে চীৎকার করে উঠলেন। আম্পায়ারের আঙুলও সঙ্গে সঙ্গে উঠলো মাথার ওপরে। আউট হয়ে গেলেন ডেনিস কম্পটন—কট আউট।

কম্পটন দুঃখজনকভাবে যেমন আউট হয়েছিলেন, তেমনি একবার তাঁর অদ্ভুত-ভাবে আউট করে দিয়েছিলেন একজন ভারতীয় ব্যাটসম্যান—বিজয় মার্চেন্টকে। এখন সেই ঘটনার কথাই বলি!

ইংলণ্ডের ওভাল মাঠে ভারতের সঙ্গে ইংলণ্ডের টেস্ট খেলা হচ্ছে। ভারত তখন ব্যাটিং করছে। সুন্দর ব্যাটিং করছেন ভারতীয় খেলোয়াড়রা। বিশেষ করে বিজয় মার্চেন্ট। অপূর্ব স্টোকসম্মত ব্যাটিং করে মার্চেন্ট পূর্ণ করলেন তাঁর নিজস্ব শতরান। সেঞ্চুরীর পরও সুন্দর-ভাবে খেলে রান সংগ্রহ করে চলেছেন মার্চেন্ট।

ইংলণ্ডের নামজাদা ডেনিস কম্পটন তখন ফিল্ডিং করছিলেন শর্ট লেগে। কম্পটনের খ্যাতি সর্বজনবিদিত। ফুটবল খেলোয়াড় হিসেবেও কম্পটন যথেষ্ট নাম করেছিলেন। বিলেতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ফুটবল দল আর্সেনেলের তিনি ছিলেন লেফট আউট। কলকাতার অনেকেই তাঁকে ফুটবল এবং ক্রিকেট খেলতে দেখেছেন। তাঁদের অনেকেই আজো ভাবেন—কম্পটন ফুটবল না ক্রিকেট, কোনটা ভালো খেলেন।

যাই হোক মার্চেন্ট তখন ১২৮ রান করেছেন। হঠাৎ একটা বল মেরে দু রান নেবার চেষ্টা করলেন তিনি। কম্পটন ফিল্ডিং করছিলেন শর্ট লেগে। তিনি ছুটে গেলেন বলটার পেছনে। মার্চেন্ট তখন একটা রান নেবার পর আর একটা রান নেবার জন্যে ছুটেছেন।

কম্পটন দেখলেন যে বলটা ধরে উইকেটে ছুঁড়ে মারতে গেলে আর আউট করা যাবে না। কম্পটন তখন করলেন কি, বলটা না থামিয়ে পায়ের বুট দিয়ে সজোরে কিক করলেন উইকেট লক্ষ্য করে।

মুহূর্তের মধ্যে বলটা গিয়ে ভেঙে দিলো উইকেট। হতভম্ব মার্চেন্ট বোকা বনে গিয়ে খানিকক্ষণ চেয়ে রইলেন উইকেটের দিকে। তারপর কম্পটনের দিকে তাকিয়ে বেরিয়ে গেলেন মাঠ ছেড়ে।

উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়লো সারা মাঠ। হাততালি আর থামে না। এমন অভিনব

পোর্ট অব স্পেনে অনুষ্ঠিত ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে চতুর্থ টেস্টে ইংলণ্ড জয়লাভ করায় ইংলণ্ডের প্রাক্তন টেস্ট খেলোয়াড় ডেনিস কম্পটন (বামে) ইংলণ্ড দলের অধিনায়ক কলিন কাউড্রেকে অভিনন্দন জানাচ্ছেন।

রান আউট আগে আর কেউ দেখে নি। নতুন জিনিস—একদম নতুন জিনিস। এর বুঝি তুলনা হয় না। ক্রিকেট ইতিহাসে এ এক অভিনব আউট......!

পৃথিবীতে সবচেয়ে দুঃখজনক স্টাম্পড আউট হয়েছেন সাসেক্স দলের পার্কস। ১৯৩৪ সালের কথা। সাসেক্স-এর সঙ্গে খেলা হচ্ছে ল্যাংকাশায়ার দলের। জর্জ ডাকওয়ার্থ ছিলেন ল্যাংকাশায়ার দলের উইকেটরক্ষক। উইকেটরক্ষক জর্জের হাতে কট আউট হয়েছেন ভেবে পার্কস, ফিল্ডাররা আবেদন জানাবার পরই ক্রীজ ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন। কিন্তু আম্পায়ার তাঁকে আউট দেন নি। কিন্তু তখন দেরি হয়ে গেছে, আর পার্কসও উইকেট ছেড়ে চলে এসেছেন অনেকখানি। আম্পায়ার কট আউট দিলেন না দেখে পার্কস উইকেটে ফিরতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু বড় দেরি হয়ে গেছে তখন। ইতিমধ্যে ডাকওয়ার্থ পার্কসকে স্টাম্পড করে দিয়েছেন, আর আম্পায়ারও সে ক্ষেত্রে আউট দিতে দ্বিধা করলেন না। স্টাম্পড আউটের ইতিহাসে এই আউটটাই সবচেয়ে করুণ।

খেলতে গিয়ে উইকেট ভেঙে ফেললেই ব্যাটসম্যান 'হিট উইকেট' হয়ে আউট হবে—তা সে উইকেট যেভাবেই ভাঙুক না কেন।

১৯৪৯ সালের কথা। খেলা হচ্ছিল নটিংহামশায়ারের সঙ্গে উরচেস্টার দলের। উরচেস্টার দলের ডন কেনিয়ন একটি বল পেয়ে কসে হুক করলেন। কিন্তু বল মারার সঙ্গে সঙ্গেই কেনিয়নের মাথা থেকে হঠাৎ টুপিটা খুলে গিয়ে পড়লো একেবারে উইকেটের ওপরে। উইকেট থেকে বেল গেলো পড়ে। ফলে হিট উইকট নিয়ম অনুসারে আউট হয়ে গেলেন উরচেস্টার দলের খেলোয়াড় ডন কেনিয়ন।

আউট অফ হিজ গ্রাউন্ড নিয়ম অনুসারে ব্যাটসম্যানের আউট হয়ে যাওয়া বড়ই দুঃখের বিষয়।

১৯৫৩ সালে ইংলণ্ডের লীডস মাঠে অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে ইংলণ্ডের টেস্ট খেলার সময় ইংলণ্ডের বেইলী ভারি অদ্ভুতভাবে আউট হয়ে গিয়েছিলেন। পপিং ক্রীজের প্রায় এক ফুটের মধ্যে বেইলীর ব্যাটটা থাকলেও, আসলে ব্যাটটা ছিলো মাটির ওপরে আর বেইলী দাঁড়িয়ে ছিলেন পপিং-ক্রীজের বাইরে। উইকেটরক্ষক তখন হঠাৎ ভেঙে দিলেন উইকেট আর 'আউট অফ হিজ গ্রাউন্ড' নিয়ম অনুসারে আউটের আবেদন জানালেন। ফলে আউট হয়ে গেলেন বেইলী।

আজকাল 'হান্ডেল দি বলের' মতো 'অবস্ট্রাকটিং দি ফিল্ড' অর্থাৎ অসুবিধা সৃষ্টির জন্যে আউট খুবই কম দেখা যায়। ধরতে গেলে হয়ই না। বর্তমানের স্পোর্টিং ক্রিকেট খেলার যুগে এই ধরণের আউট দেখতে পাওয়াই অস্বাভাবিক।

প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেট খেলায় অসুবিধা সৃষ্টির জন্যে আউটের একটি ঘটনার কথাই জানা যায়। ১৯৫১ সালে ওভাল মাঠে ইংলণ্ডের সঙ্গে সাউথ আফ্রিকার ৫ম টেস্ট খেলায় ঘটনাটি ঘটে। ইংলণ্ডের লেন হাটনের ব্যাটে লেগে বলটা উঁচুতে উঠে গেলো, ঠিক উইকেটের ওপরেই। পড়তে দিলে বলটা পড়বে উইকেটের ওপর। তাই হাটন গেলেন তাঁর উইকেট বাঁচাতে।

ওদিকে সাউথ আফ্রিকার উইকেট-কীপার এনডেন বলটা লুফতে চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু লেন হাটন তাঁর উইকেট বাঁচাতে গিয়ে এনডেনের ক্যাচ ধরায় অসুবিধে সৃষ্টি করলেন। এনডেন ক্যাচ লুফতে পারলেন না। ফলে সাউথ আফ্রিকার খেলোয়াড়রা অসুবিধে সৃষ্টির জন্যে আউটের আবেদন জানালেন। আম্পায়ারও ঐ নিয়ম অনুসারে আউট দিয়ে দিলেন লেন হাটনকে।

সম্পাদিকা—জয়ন্তী সেন

বসুমতী (প্রাঃ) লিঃ-এর পক্ষে ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীটস্থ কলিকাতা-১২
বসুমতী প্রেস হইতে শ্রীসুকুমার গুহমজুমদার কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বসুমতীতে পাওয়া যাচ্ছে! একরাশ শিশু-সাহিত্য!

কিন্তু সমগ্র পরিবার পড়তে পারেন

দামে যেমন সস্তা, তেমনি পাতায় পাতায় রঙীন ছবি।

মনোরম রঙীন প্রচ্ছদ। বোর্ডে বাধাই।

আজই অর্ডার পেশ করুন আপনার পরিবারের সকলের জন্য।

(পাঠাগার ও সংস্থাসমূহের জন্য শতকরা পনেরো টাকা কমিশন!)

১। রঘুবংশ	...	মহাকবি কালিদাস	...	প'চাত্তর পয়সা
২। শকুন্তলা	..	মহাকবি কালিদাস	...	প'চাত্তর পয়সা
৩। এ্যারেবিয়ান নাইটসের গল্প (দুই খণ্ডে সম্পূর্ণ)	..	অনুবাদ—অলকেন্দ্রনাথ ঠাকুর	...	প্রতি খণ্ড এক টাকা প'চিশ পয়সা
৪। জুলিয়াস সিজার	.	উইলিয়ম সেক্সপীয়র	...	এক টাকা পঞ্চাশ পয়সা
৫। ম্যাকবেথ	.	উইলিয়ম সেক্সপীয়র	...	এক টাকা পঞ্চাশ পয়সা
৬। রোমিও জুলিয়েট	...	উইলিয়ম সেক্সপীয়র	...	এক টাকা পঞ্চাশ পয়সা
৭। হারকিউলিস	...	হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ	...	এক টাকা বাষট্টি পয়সা
৮। আষাঢ়ে গল্প	...	হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ	...	এক টাকা প'চাত্তর পয়সা
৯। স্নো-হোয়াইট	...	হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ	...	এক টাকা বাষট্টি পয়সা
১০। কুমারের বাঘা গোয়েন্দা	...	হেমেন্দ্রকুমার রায়	...	এক টাকা প'চিশ পয়সা
১১। ছোট্ট পমির অভিযান	...	হেমেন্দ্রকুমার রায়	...	এক টাকা প'চিশ পয়সা
১২। রতনপুরের যাত্রী	...	হেমেন্দ্রকুমার রায়	...	এক টাকা প'চিশ পয়সা
১৩। ডন কুইকসোট	...	সারভেণ্টিস	...	এক টাকা পঞ্চাশ পয়সা
১৪। ওয়ার এ্যাণ্ড পিস	...	টলস্টয়	...	এক টাকা পঞ্চাশ পয়সা
১৫। বর্মায় যখন বোমা পড়ে	...	সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়	...	এক টাকা প'চিশ পয়সা
১৬। আমার দেশ	...	নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়	...	দুই টাকা পঞ্চাশ পয়সা
১৭। মোহন সিংয়ের ফাঁসি	...	সুমথনাথ ঘোষ	...	এক টাকা প'চিশ পয়সা
১৮। জন্মজন্মান্তরের কাহিনী	...	নরেন্দ্র দেব	...	এক টাকা পঞ্চাশ পয়সা
১৯। রকমারি গল্প	...	নরেন্দ্র দেব	...	দুই টাকা পঞ্চাশ পয়সা
২০। স্বার্থপর দৈত্য	...	বুদ্ধদেব বসু	...	এক টাকা প'চাত্তর পয়সা
২১। সুখী রাজপুত্র	...	বুদ্ধদেব বসু	...	এক টাকা পঞ্চাশ পয়সা
২২। লক্ষ্মণ সেনের রাজমুকুট	...	—	...	এক টাকা প'চিশ পয়সা
২৩। শান্তিপুরে অশান্তি	...	প্রভাবতী দেবী সরস্বতী	...	এক টাকা পঞ্চাশ পয়সা
২৪। বন্দী জেগে আছো?	...	প্রভাবতী দেবী সরস্বতী	...	এক টাকা প'চিশ পয়সা
২৫। প্রেতাত্মার প্রতিহিংসা	...	প্রভাবতী দেবী সরস্বতী	...	এক টাকা প'চিশ পয়সা
২৬। মনের মতো গল্প	...	প্রভাবতী দেবী সরস্বতী	...	এক টাকা প'চিশ পয়সা
২৭। টিয়ার গ্যাস	...	স্বপন বুড়ো	...	এক টাকা প'চিশ পয়সা
২৮। লাফিং গ্যাস	...	স্বপন বুড়ো	...	এক টাকা পঞ্চাশ পয়সা
২৯। অশরীরী আত্মা	...	স্বপন বুড়ো	...	এক টাকা পঞ্চাশ পয়সা
৩০। কেনিলওয়ার্থ	...	সুমথনাথ ঘোষ	...	এক টাকা প'চিশ পয়সা
৩১। টোয়েণ্টি ইয়ার্স আফটার	...	সুধীন্দ্রনাথ রাহা	...	এক টাকা প'চিশ পয়সা
৩২। টয়লার্স অব দি সী	...	সুধীন্দ্রনাথ রাহা	...	এক টাকা প'চিশ পয়সা
৩৩। ডেভিলস আইল্যাণ্ড	...	বিশু মুখোপাধ্যায়	...	প'চাত্তর পয়সা
৩৪। অচিন দেশের রাজকন্যা	...	দীনেশ মুখোপাধ্যায়	...	এক টাকা

শিশু-সাহিত্যের রত্নভাণ্ডার! স্বপ্নের ময়ূরপঙ্খী! বসুমতী (প্রাঃ) লিঃ। কলিকাতা-১২

5 APR 1968

রান্নার ইতিকথা
আদিম যুগ
তখন মানুষ
সব পুড়িয়ে খেতো।
কিন্তু স্বাদ গন্ধ জানতো না!
কুকমী নিজস্ব মিলে বৈজ্ঞানিক প্রথায় প্রস্তুত
দ্বিতীয় যুগ
তখন মানুষ
প্রথম স্বাদ
ও গন্ধের
খবর পেলো!
জানতে মশলা আছে! তাতে চমৎকার স্বাদ হয়!
কুকমী সর্ব্বাধিক বিক্রীত গুঁড়ো মশলা
তৃতীয় যুগ
তখন মানুষ পালতোলা
জাহাজে ভারতের দিকে
মশলা আনতে ছুটলো!
কুকমী মাসিক বিক্রয় — পনেরো লক্ষ প্যাকেট
বর্ত্তমান যুগ
এখন মানুষ
মশলা গুঁড়ানোর
ঝামেলা ছেড়ে
তৈরী গুঁড়ো মশলা
ব্যবহার করতে
শিখলো!
GOVT. REGD. No. 113611
Cookme
Fresh & Good Cooking Medium
SPICE POWDER
SPICE POWDER DIVISION
KRISHNA CHANDRA DUTTA (SPICE) PRIVATE LTD.
কুকমী বাজারের সেরা গুঁড়ো মশলা
© 2.67
১২৫ বৎসরের অধিক প্রাচীন ও বর্ত্তমানে মশলার বৃহত্তম প্রতিষ্ঠান
কৃষ্ণচন্দ্র দত্ত (স্পাইস) প্রাঃ লিঃ
২০১নং ও ২০৫নং মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড, পোস্তা, কলিকাতা-৭
ফোন : ৩৩-১২০২, ৩৩-২০৮১
গ্রাম : "স্পাইসমার্ট"

সাপ্তাহিক বসুমতী

ভিয়েতনাম যুদ্ধ সম্পর্কে জনসন-ঘোষণার আন্তরিকতায় হ্যানয়ের সন্দেহ, তবু আলোচনায় বসতে রাজী।

কূটনৈতিক মহলে জল্পনা-কল্পনা ও বিস্ময়

২ বর্ষ : ৪৩শ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ২৮শে চৈত্র, ১৩৭৪ বঙ্গাব্দ | OLDEST WEEKLY OF NORTH INDIA [72nd year, No. 43, 11th April, 1968

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয়		২৬৯১
আজকের মানুষ		২৬৯২
বঙ্গদর্শন		২৬৯৩
সপ্তাহের বোঝা	— কৃত্তিবাস ওঝা	২৬৯৭
অবক্তব্য	— চন্দ্রগুপ্ত	২৭০০
ভারতদর্শন		২৭০৩
আন্তর্জাতিক		২৭০৬
যা দেখেছি, যা পেয়েছি (স্মৃতিচয়ন)	— সুধীরঞ্জন দাস	২৭১০
ভারতীয় ছিটমহলের সমস্যা	— নির্মল বসু	২৭১৩
অগ্নিযুগের একটি অধ্যায়	— অনন্ত সিংহ	২৭১৭
রবীন্দ্রনাথ ও সুভাষচন্দ্র (ধারাবাহিক প্রবন্ধ)	— শঙ্করীপ্রসাদ বসু	২৭২১

"ভারতবর্ষের অধিকাংশ হিন্দু, বাংলা দেশের সকল হিন্দুর, বিশ্বাস যে, শ্রীকৃষ্ণ ঈশ্বরের অবতার। 'কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ম'—ইহা তাঁহাদের দৃঢ়বিশ্বাস। বাংলা প্রদেশে কৃষ্ণের উপাসনা প্রায় সর্বব্যাপক। গ্রামে গ্রামে কৃষ্ণের মন্দির, গৃহে গৃহে কৃষ্ণের পূজা, প্রায় মাসে মাসে কৃষ্ণোৎসব, উৎসবে কৃষ্ণযাত্রা, কণ্ঠে কণ্ঠে কৃষ্ণগীতি, সকল মুখে কৃষ্ণনাম। কাহারও গায়ে দিবার বস্ত্রে কৃষ্ণনামাবলি, কাহারও গায়ে কৃষ্ণনামের ছাপ।"—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

ভক্তির মন্দাকিনী! প্রেমের অলকানন্দা! জ্ঞানের আকাশগঙ্গা!

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার প্রবক্তা; কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে অর্জ্জুনের সারথি; পঞ্চপাণ্ডবের প্রধান-উপদেশক; শ্রীরাধিকার দিব্যপ্রেমের দোসর

শ্রীকৃষ্ণ

"হে কৃষ্ণ করুণাসিন্ধু বিতরিয়ে কৃপাবিন্দু
ফিরে চাও বারেক নয়নে।
ব্যাকুলা বিহ্বলা নারী মুছাও নয়নবারি
তাপহারী রাখ শ্রীচরণে॥"

পাঠাগার ও উপহারের জন্য সুশোভিত রাজ-সংস্করণ॥

বড় টাইপে, অ্যান্টিক কাগজে সুদৃশ্য কাগজে মুদ্রণ পৃষ্ঠাসংখ্যা ৫০৪

পরমভক্ত দেবেন্দ্রনাথ বসু বিরচিত

তৎসহ কুড়িখানি ত্রিবর্ণ চিত্রের আর্ট প্লেট : মূল্য মাত্র পনেরো টাকা

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড। ১৬৬, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলিকাতা—১২

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
স্বাধীন, প্রগতিশীল (কবিতা)	উলূখড়	২৭২৫
প্রতি-নায়ক (গল্প)	সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ	২৭২৬
রাজনীতি ও ছাত্রসমাজ	প্রদ্যোৎকুমার রায়	২৭২৯
[illegible] (ধারাবাহিক উপন্যাস)	জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী	২৭৩২
বিশ্বসাহিত্যের আদিপর্ব	ডঃ নরেন ভট্টাচার্য	২৭৩৫
বধ্যভূমি (কবিতা)	সাধনা মুখোপাধ্যায়	২৭৩৭
আকাশবাণী-পরিক্রমা	মেঘদূত	২৭৩৮
মঞ্চজগৎ		২৭৪০
পাঠকমন		২৭৪৫
খেলাধূলা	শান্তিপ্রিয়	২৭৪৯

—সদ্য প্রকাশিত হইয়াছে !!—

বহুকাল পরে পুনর্মুদ্রণ

"নবীনবাবু বর্ণনা এবং গীতিতে একপ্রকার মন্ত্রসিদ্ধ। · · এই সকল বিষয়ে তাঁহার লিপিপ্রণালীর সঙ্গে বাইরণের লিপিপ্রণালীর বিশেষ সাদৃশ্য দেখা যায়। ····বায়রণের ন্যায় নবীনবাবু বর্ণনায় অত্যন্ত ক্ষমতাশালী। ···· নবীনবাবুর যখন স্বদেশ বাৎসল্য স্রোতঃ উচ্ছলিত হয়, তখন তিনিও রাখিয়া ঢাকিয়া বলিতে জানেন না।"—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

মহাকবি

নবীনচন্দ্র সেনের গ্রন্থাবলী

রৈবতক কাব্য ॥ কুরুক্ষেত্র প্রভাস

গ্রন্থের পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩০৮। মূল্য মাত্র সাত টাকা।

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড: ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২

CALCUTTA UNIVE

৭২ বর্ষ : ৪৩শ সংখ্যা—মূল্য : ৩০ পয়সা বাংলা ভাষায় দ্বিতীয় সর্বাধিক প্রচারিত সাপ্তাহিক পত্রিকা PRICE : 30 Paise
বৃহস্পতিবার, ২৮শে চৈত্র, ১৩৭৪ বঙ্গাব্দ Thursday, 11th April, 1968

ডঃ লুথার কিং নিহত হলেন

মার্টিন লুথার কিং নিহত হলেন। একটি কালো মানুষ, যিনি কালো মানুষের হয়ে মৃত্যুর পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত অহিংস সংগ্রাম চালিয়েছেন, তিনি নিহত হলেন উগ্রপন্থী শ্বেতকায় আততায়ীর হিংস্র গোপন গুলীতে।

ডঃ মার্টিন লুথার কিং বয়সে চল্লিশ পার না হলেও, বিশ্ববন্দিত পুরুষ। কালো মানুষের হৃদয়ে কতো অমল ভাল-বাসা থাকে—তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ লুথার কিং। শুভবুদ্ধিসম্পন্ন শ্বেতকায় মানুষের বিরুদ্ধে তাঁর অশ্রদ্ধা ছিল না, তিনি সংগ্রাম করেছিলেন একজন মানুষ বর্ণের অসাম্যে আর একজন মানুষের বিরুদ্ধে যে ঘৃণা পোষণ করে—সেই ঘৃণার বিরুদ্ধে। তাই বর্ণবিদ্বেষী যারা নয় তাদের কাছে তিনি প্রভূত শ্রদ্ধা অর্জন করেছিলেন। আবার পৃথিবীর যেখানে যতো আছে নিগৃহীত, নির্যাতিত ও দরিদ্র মানুষ—তাদের পেয়েছিলেন তিনি তাঁর চলার পথে অকুণ্ঠ সমর্থন ও সহযোগিতা। তাদের ভালবাসার কেন্দ্রবিন্দু ছিলেন শান্তির সৈনিক, সহজ সরল অথচ সংগ্রামের পথে কঠোর অবিচল রেভারেন্ড ডঃ মার্টিন লুথার কিং। তিনি নামে নিগ্রো নায়ক হলেও বিশ্বের অসহায় মানুষের পথ-প্রদর্শক।

লুথার কিং-এর এ তো মৃত্যু নয়, এ হচ্ছে জীবনাদর্শে উজ্জীবিত চরম আত্মোৎসর্গ। মানুষের কল্যাণে যারা অবিরত রত—এভাবেই তাদের জীবন উৎসর্গীকৃত হয়।

আমেরিকার বুকেই এ নিয়ে তিনজন। কতো লাঞ্ছনা, রিক্ততা, অসাম্য ও মানব-বিদ্বেষ কোনো দেশের ভিতর পুঞ্জীভূত থাকলে পর পর তিনজনকে এভাবে প্রাণ দিতে হয়—তা নিয়ে আজ আত্মজিজ্ঞাসার প্রয়োজন আছে। আব্রাহাম লিঙ্কনের পর জন কেনেডির মৃত্যুতে মার্কিন জন-সাধারণের যে আত্মজিজ্ঞাসা দরকার ছিল—তার কিছুই হয় নি। বরং আত্মানু-সন্ধানের পরিবর্তে ধনগর্বী আমেরিকা নিজের মাটি ছেড়ে গেছে দেশান্তরে শান্তি স্থাপন করতে, গণতন্ত্র রক্ষা করতে। অথচ স্বদেশেই পুঞ্জীভূত হয়ে উঠেছে বর্ণ-বিদ্বেষ, মানবতার প্রতি ঘৃণা ও বঞ্চিত জনগণের অপরিসীম দারিদ্র্য।

তাই দরিদ্র ঝাড়ুদারদের অহিংস সংগ্রামকে রূপ দেবার জন্য লুথার কিং-কে হত্যা করার মধ্যে আমেরিকার যে স্বরূপ প্রকাশিত হোল, তা যেমন ঘৃণ্য তেমনি লজ্জার।

অবশ্য আমেরিকার সমগ্র পরিচয়ের শেষ এতেই নয়। একদিকে সেখানে যেমন কৃষ্ণাঙ্গের প্রতি অহেতুক ঘৃণা বিদ্যমান রয়েছে, অপরদিকে কৃষ্ণাঙ্গদের স্বার্থে আছে মার্কিন ফেডারেল সরকার, শুভবুদ্ধিসম্পন্ন শ্বেতাঙ্গ নাগরিক। এক শ্রেণীর মানুষ আর এক শ্রেণীর মানুষকে বর্ণবিদ্বেষের অজুহাতে চিরকাল নাগরিক অধিকার থেকে বঞ্চিত রাখতে পারে না। কোর্ট যেখানে সহানুভূতিশীল, রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ কর্ণধার যেখানে কৃষ্ণাঙ্গদের সঙ্গে শ্বেতাঙ্গদের সমস্বার্থে প্রতিশ্রুতিচিত্ত সেখানে কিছু রক্ষণশীল মানুষ অমানবিক স্বার্থে অত্যাচার চালিয়ে যাবে—এ এক বিস্ময়কর ব্যাপার। আরো বিস্ময়কর লাগে তখন—যখন চরম বৈজ্ঞানিক সাফল্যে কোটি কোটি ডলারের মূল্যে গ্রহান্তরে গমন সম্ভব হয়ে আসছে বিদেশে যুদ্ধ পরিচালনায় কোটি কোটি ডলার জলের মতো খরচ হচ্ছে। কিন্তু যে মাটিতে এতো ধনগর্ব সেই মাটিরই সন্তান কৃষ্ণকায় নিগ্রোরা চরমতম দারিদ্র্যে নিমজ্জমান।

তাই আজ মনে হয়, মার্টিন লুথার কিং-এর মৃত্যু আত্মানুসন্ধানের সূত্রপাত করবে। তাঁর আত্মাহুতি দেবে নবচেতনা, নতুন পথে চলার মন্ত্র। শুধু নিগ্রো সমাজের মুক্তিই নয়, বিদ্বেষ থেকে উদ্ধার করবে গোটা মার্কিন সমাজকে। তখনই আমেরিকা ঘোষণা করতে পারবে—বিশ্বশান্তির কথা, দেশে দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংকল্প।

প্রসঙ্গত বলা দরকার, আত্মানুসন্ধান করার নামে নিষ্ক্রিয় অথজিজ্ঞাসা ছদ্ম চাতুর্যেরই নামান্তর। সে পথে সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। এবং লুথার কিং-এর নিহত হওয়ার পর থেকে আমেরিকায় যে রকম বীভৎস দাঙ্গা-হাঙ্গামা শুরু হয়েছে, তা সভ্যতার নামাবলী পরা মার্কিন দেশেই হয়তো সম্ভব।

এমন দেশ মার্কিনেই কেনেডি-হত্যার চাপা-রহস্য আজো জনসাধারণের মনে বিরাজ করছে! একদল উগ্রপন্থী—কেনেডির মতো জনপ্রিয় নেতাকে খতম করার পরও মার্কিন মুল্লুকে বিচরণ করছে—তার প্রমাণ—প্রায় একই পন্থায় লুথার কিং-এর হত্যা। এখন প্রশ্নঃ এই ধরনের জঘন্য হত্যা চালিয়ে গিয়ে কি উগ্রপন্থীরা নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি করে মার্কিন যুক্ত-রাষ্ট্রের শুভ ইচ্ছাকে জলাঞ্জলি দেবে? যুক্তরাষ্ট্রের সরকার তার বিরুদ্ধেই বা কি করছেন?

এখন আততায়ীকে খুঁজে বের করে উগ্রবাদিতার মূলোৎপাটন করতে হবে। অবশ্য পুলিশ পক্ষ থেকে আততায়ীর বয়স, গায়ের রঙ, উচ্চতা, দেহের ওজন প্রভৃতি সবিস্তারে বর্ণনা করা হয়েছে। একমাত্র আততায়ীরই সন্ধান মেলে নি। আর কোনোদিন মিলবে কি না—সে দেশের পুলিশই বলতে পারেন। তবে এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে মার্কিন দেশের রাজনীতিও আগামী দিনগুলিতে নতুন আকার ধারণ করবে এ কথা বলা যেতে পারে।

সম্পাদকীয়

আজকের মানুষ

'—জনসন বাদে অন্য কেউ, অন্য কোন জন।' —'আমিই সেই অন্য কেউ, অন্য কোন জন।' উইনকনসিন এভিনিউর এক লম্বাটে প্রৌঢ় ভদ্রলোক খানিকটা বিরক্ত হয়ে নির্বাচনকর্মীদের বলছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে যিনি এগিয়ে এসে প্রৌঢ়ের করমর্দন করলেন এবং আত্মপরিচয় দিলেন—'অন্য কেউ' বলে, তিনি ইউজিন জে ম্যাকার্থি। মিনেসোটার ৫২ বছর বয়স্ক সেনেটর ম্যাকার্থি। এবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট পদে ডেমোক্রেটিক দলের মনোনয়ন প্রার্থী।

নিউ হ্যাম্পশায়ারের প্রাথমিক ভোট-গণনার ফলাফল জানার আগে ম্যাকার্থিকে সরকারী কর্তারা বিশেষ আমল দিতে চান নি। দলের অন্যতম প্রার্থী প্রেসিডেন্ট জনসনের গোঁড়া সমর্থক নিউ হ্যাম্পশায়ারেরই গভর্নর জন্ কিং তো বলেই ফেলেছিলেন যে, জনসন ম্যাকার্থিকে 'খতম' করে দেবেন। জনসনের প্রচার-ম্যানেজার বুটিন বলেছিলেন, হ্যাম্পশায়ারে শতকরা ৪০ ভাগের কম ভোট পেলে ম্যাকার্থিকে পরাজয় মেনে নিতে হবে। তাঁর ধারণা ছিল ম্যাকার্থি অনেক কম ভোটই পাবেন। কিন্তু ম্যাকার্থি এখানে শতকরা ৪২ ভোটের বেশি পেয়ে সবাইকে তাজ্জব করে দিয়েছেন।

মিনেসোটার ওয়াটকিন্স গ্রামের এক কৃষি পরিবারে ম্যাকার্থির জন্ম। বাবা আইরিশ, মা জার্মান। সেন্ট জন্স প্রিপারেটরী স্কুল থেকে কলেজভিল পর্যন্ত ৮ বছরের জায়গায় ৬ বছরে তাঁকে শিক্ষা শেষ করতে হয়েছে। সব বিষয়েই ভাল ছাত্র বলে স্বীকৃতি পেয়েছিলেন, কেবল ত্রিকোণমিতি ছাড়া। যথেষ্ট খ্যাতি ছিল বেস বল আর হকি খেলায়। ম্যাকার্থির অফিসে গিয়ে দর্শকদের চোখে আগে যে দুটো জিনিস চোখে পড়বে তা হল, একখানা হকি স্টিক আর একটা ফটো—টমাস মোর, তাঁর আদর্শ গুরুর।

টমাস মোরের উদার রাজনৈতিক মতবাদে ম্যাকার্থির আস্থা অগাধ। কিন্তু কলেজ থেকে বেরিয়েই তিনি রাজনৈতিক মঞ্চে আসেন নি, তিনি প্রথমে চার্চে ঢুকলেন। অবশ্য তারও আগে নর্থ ডাকোটার এক হাই স্কুলে শিক্ষকতা করেছেন। সেন্ট জন্স চার্চে বছরখানেক নিঃসঙ্গ জীবনযাপন করেছেন, শিক্ষানবিশ হয়ে চার্চ সংগঠনে থাকতে হয়েছে। ওই স্কুলেরই অন্যতম সেরা ছাত্রী আবিগেল কিনালেকে পরে বিয়ে করেছেন।

দেশে তখন গভীর রাজনৈতিক আলোড়ন চলছে। ডেমোক্রেটিক এবং ফার্মার লেবার পার্টি আতাতের চেষ্টা চলছে, চেষ্টা চলছে এই দুটো পার্টি থেকে কমিউনিস্টদের প্রভাব মুছে ফেলার। এই দুই পার্টির সংযুক্তিকরণের চেষ্টায় ছিলেন সেদিন হুবার্ট হামফ্রে, অর্ভিল ফ্রীম্যান ইত্যাদি যশস্বী উদারনৈতিক ডেমোক্রাটরা। ম্যাকার্থি আকর্ষণ অনুভব করলেন রোমাঞ্চকর রাজনীতির। সেন্ট পল-এর সেন্ট জন কলেজে সমাজবিজ্ঞান ও অর্থনীতি বিষয়ের অধ্যাপনা ছেড়ে ম্যাকার্থি যোগ দিলেন রাজনীতিতে।

ম্যাকার্থি

হামফ্রের পক্ষ নিয়ে তিনি প্রচারে নামলেন, সাহায্য করলেন হামফ্রেকে পার্টি নেতৃত্ব দখলে। সে বছরেই (১৯৪৮) তিনি প্রথম সেনেটর নির্বাচিত হলেন।

সেই থেকে পাঁচ দফায় তিনি সেনেটর নির্বাচিত হয়ে আসছেন। সেনেটে অবশ্য তাঁর বিরোধীর অভাব নেই এবং বিরোধী রিপাবলিকান দল ছাড়াও তাঁর ডেমোক্রেটিক দলেও রয়েছেন। ম্যাকার্থি উদার মতাবলম্বী তাই তিনি সেনেটের অনেক মাননীয় সদস্যের শত্রু হয়েছেন। সেনেটের নির্বাচনে তাঁকে বিরোধীপক্ষ কমিউনিস্ট আখ্যা দিতেও ছাড়ে নি। ম্যাকার্থির রাজনৈতিক বিচক্ষণতা প্রখর। তিনি বুঝেছেন প্রবল শত্রুর বিরুদ্ধে একক সংগ্রাম চালানো সম্ভব নয়, তাই তিনি সেনেটে একটা গ্রুপ সৃষ্টি করলেন গণতান্ত্রিক আলোচনা সংস্থা।

ম্যাকার্থি-বিরোধীদের আরো অভিযোগঃ ম্যাকার্থি কুড়ে, অলস। ম্যাকার্থি পারেন না। ম্যাকার্থি ভোটারদের সঙ্গে করমর্দন সফরে উৎসাহী নন, শ্রমিকদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করার জন্যে সকালে কারখানাগেটে বক্তৃতা দেন না ইত্যাদি। ম্যাকার্থি অবশ্য প্রত্যেকটি অভিযোগেরই জবাব দিয়েছেন এবং অভিযোগ যে প্রধানত ভিত্তিহীন তার বহু প্রমাণও রেখেছেন।

প্রেসিডেন্ট জনসনের ভিয়েতনাম নীতির তীব্র সমালোচনা করতে গিয়েই ইউজিন ম্যাকার্থি অনুভব করেছেন, অনুভব করেছেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভিয়েতনাম নীতি যদি পাল্টাতে হয়, তবে তার প্রেসিডেন্ট আগে 'পাল্টাতে' হবে।

কিন্তু ভিয়েতনামই একমাত্র কারণ নয় যা সেনেটর ম্যাকার্থিকে নির্বাচন যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে উদ্বুদ্ধ করেছে। আমেরিকানদের সামনে যে সমস্যাগুলো উদ্যত কাঁটার মত উপস্থিত হয়েছে, তার অর্থনীতি, শহরবাসীর হাজারো সমস্যা, বর্ণ-বিদ্বেষ ইত্যাদি। নির্বাচনে দাঁড়ানোর পেছনে এ সমস্ত কারণ অবশ্যই রয়েছে। আর রয়েছে অবশ্য সব প্রশ্নের সেরা প্রশ্নঃ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় নেতৃত্বে আজ চরম সঙ্কট দেখা দিয়েছে, তার নতুন নেতা চাই।

ম্যাকার্থি কি অহঙ্কারী, গর্বোদ্ধত? প্রেসিডেন্ট পদে তাঁর যোগ্যতা সম্পর্কে ম্যাকার্থি প্রায়ই বলেনঃ 'আমি হামফ্রের চেয়ে দ্বিগুণ উদার, কেনেডির চেয়ে দ্বিগুণ ক্যাথলিক এবং সেনেটর স্টুয়ার্ট সিমিংটনের চেয়েও দ্বিগুণ স্মার্ট বা সপ্রতিভ।' ভোটারদের মন জয় করার জন্যে অবশ্যি নিজেকে একটু জাহির করতে তো হয়ই।

লিন্ডন জনসন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে দাঁড়াবেন না শুনে ম্যাকার্থি বলেছেনঃ "এতে আমার দিক থেকে কোন মতের পরিবর্তন হবে না। আমি তো আপনাদের অন্তত ২০ বার বলেছি যে, প্রার্থীপদ আমি প্রত্যাহার করবো না।' রবার্ট কেনেডি নির্বাচনে দাঁড়াবার সিদ্ধান্ত নিয়ে যখন বললেন যে তিনি ম্যাকার্থিকে "সাহায্য" করার জন্যই ভোটযুদ্ধে নামছেন, তখন ম্যাকার্থি সাংবাদিকদের কাছে বলেছেন যে, "কেনেডির সাহায্যের জন্যে অশেষ ধন্যবাদ, তবে আমার কারো সাহায্যের দরকার হবে না।' শেষ পর্যন্ত জিতবেন কে? ডেমোক্রেটিক দলের মনোনয়ন কে পাবেন বলা শক্ত। তবে জনসন যদি সত্যিই না দাঁড়ান, তবে আজ পর্যন্ত রাজনৈতিক হাওয়া যা দাঁড়িয়েছে, তাতে ম্যাকার্থির আশাই বেশি।

বঙ্গদর্শন

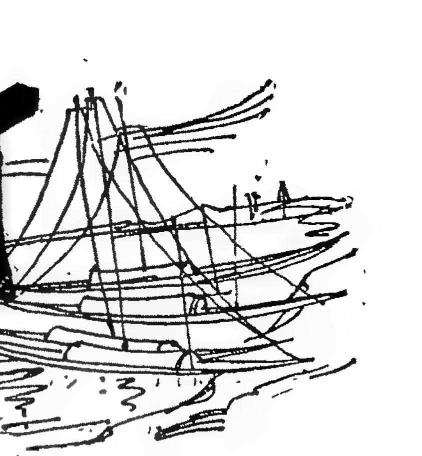

পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক দলগুলি এখন আগামী নির্বাচনের চিন্তাতেই ব্যস্ত এবং প্রতিটি দলের সামনেই এখন নানান ধরণের সমস্যার উদ্ভব হয়েছে। অবশ্য বামপন্থী দলগুলির নিকট এ সমস্যা খুব তীব্র হয় নি, কেন না গতবারের অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে তারা এটুকু বুঝেছে যে, এবারে ঐক্যবদ্ধভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা না করলে এককভাবে তাদের সর্বনাশ ঘটবে। এই কারণে এদের যা পারস্পরিক মতভেদ তা মোটামুটি আসন বণ্টন ও কর্মসূচীর মধ্যে সীমাবদ্ধ। মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টি, ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি ও অপরাপর মার্ক্সবাদী দলগুলির আভ্যন্তরীণ কোন সমস্যা নেই, ডিফেক্সান এই সব দল থেকে হয় নি, বা দল ভেঙে যাবার কোন সম্ভাবনাও নেই। নকশালপন্থী কমিউনিস্টরা অবশ্য মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টির কিছুটা মাথাব্যথার কারণ হয়েছিল, কিন্তু নকশালপন্থীদের রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টির কোন ক্ষতি করে নি। তারা এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে, তারা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবে না, এবং তাদের কর্মীদেরও পরোক্ষভাবে নির্বাচনে মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টির প্রার্থীদেরই পক্ষে কাজ করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আর তাছাড়া এককভাবে এই দলটি সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী হওয়ার জন্য অপরাপর দলগুলিকেও প্রধানত এদেরই নির্দেশে চলতে হবে, শেষ পর্যন্ত এদেরই সুরে সুর মেলাতে হবে, এবং তারাও একথা বোঝে। কাজেই অপরাপর মার্ক্সবাদী দলগুলির এখন একমাত্র লক্ষ্য কিভাবে আরও কয়েকটি বেশি আসন পাওয়া যায়, কাজেই এখানে সমস্যা খুব বেশি নেই। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি গত নির্বাচনে মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টির বিপক্ষে লড়েছিল, এবং এই দুই দলের রিফট এখন অনেকখানি জুড়ে গেছে। মনে রাখতে হবে গত নির্বাচনে বামপন্থী ঐক্যের সমস্যা মোটামুটি দুই কমিউনিস্ট পার্টির ঐক্যের সমস্যাই ছিল, কেন না সত্যকথা বলতে কি পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেসের বিপক্ষ হিসাবে কমিউনিস্ট পার্টিকেই (ডান ও বাম) লোকে বোঝে। অপরাপর মার্ক্সীয় পার্টিগুলির চরিত্র স্থানীয় ধরণের। অমার্ক্সবাদী অকংগ্রেসী দলগুলির প্রভাব পশ্চিমবঙ্গে বিশেষ নেই।

পি-এস-পির অবস্থা বর্তমানে মোটেই সুবিধার নয়। পশ্চিমবঙ্গে এই দলের প্রভাব নামমাত্র। এই দল থেকে অনেকগুলি ডিফেক্সান হয়ে যাওয়ায় পি-এস-পির রাজনৈতিক অবস্থাটা অত্যন্ত খারাপ হয়ে গেছে। অবশ্য পি-এস-পিকে নিজের স্বার্থেই যুক্তফ্রন্টে থাকতে হবে, তা না হলে এই দলটির যৎসামান্য অস্তিত্বটুকুও বিসর্জন দিতে হবে। সর্বভারতীয় স্তরে এই দলের উদগ্র কমিউনিস্ট বিদ্বেষ, এবং প্রাণের দায়ে তাদেরই সঙ্গে সহাবস্থান এই দলটিকে বরাবরই বেকায়দায় ফেলে রেখেছে। এই একই সঙ্গে ভাঙন দেখা গেছে পি-এস-পি'র সহোদর এস-এস-পি'র মধ্যেও। বাঁকুড়ায় সদ্য অনুষ্ঠিত এস-এস-পি দলের রাজ্য সম্মেলন চরম অশান্তি ও গোলযোগের মধ্যে শেষ হয়েছে। উভয় দলেরই সমস্যা অনুরূপ। ভারতীয় ক্রান্তি দলের সেই আগেকার জৌলুষ আর নেই। এই দল থেকেই দলত্যাগ হয়েছে সবচেয়ে বেশি, একমাত্র প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায়ের ইমেজটুকু এই দলের পুঁজি। কাজেই অবস্থাদৃষ্টে মনে হয় এই সকল দলকেই ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক যুক্তফ্রন্টে থাকতেই হবে মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্ব মেনে নিয়ে, নতুবা এই সব দলের রাজনৈতিক অস্তিত্বই হয়ত থাকবে না। গোর্খা লীগ, লোকসেবক সঙ্ঘ প্রভৃতি দলগুলিকে নিয়ে যুক্তফ্রন্টের কোন সমস্যা নেই, দলগুলিরও নেই, কেন না এগুলি একেবারেই আঞ্চলিক এবং এরা নির্দিষ্ট কয়েকটি আসনে বরাবর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে এসেছে, এবারেও করবে এবং সেক্ষেত্রে বাগড়া দেবার কেউ নেই।

এবার অন্য ক্যাম্পে আসা যাক। কংগ্রেস সম্পর্কে আমরা আগে যা বলেছিলাম তাই সত্য হয়েছে, কংগ্রেস আর কোন দলকে তার সহযোগী করবে না এই সিদ্ধান্ত ঘোষিত হবার পর ভারতীয় লোকদলের শিরে বজ্রাঘাত হয়েছে। কংগ্রেসের ভিতরকার অবস্থাও খুব ভাল নেই। কংগ্রেসের কর্মিবৃন্দের একটা বড় অংশ বর্তমান নেতৃত্বের উপর বিরূপ এবং মনোনয়নের ব্যাপার নিয়ে বহু কংগ্রেসী নেতার বর্তমান নেতৃত্বের প্রতি মোহভঙ্গ হয়েছে। তদুপরি দলত্যাগীদের নিয়ে কংগ্রেস যেভাবে নাচানাচি এক সময় করেছে তার পরিণামে কিছু আসন হয়ত ভারতীয় লোকদলকে ছেড়ে দিতে হতে পারে, যার ফলে কংগ্রেসকর্মীদের একাংশকে চটিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এদিকে আবার ভারতীয় লোকদলের মধ্যেও ভাঙন দেখা গেছে, এবং কৃষকসমাজ নামে আরও একটি নতুন দলের সৃষ্টি হয়েছে, যে দল লোকদলের প্রার্থী যেখানে যেখানে দাঁড়াবে সেখানে সেখানেই প্রার্থী দেবে। তদুপরি কৃষ্ণনগর উপনির্বাচন সম্পর্কে লোকদলের সিদ্ধান্তের পরিপন্থী কাজ করেছেন ডঃ ঘোষ, যিনি নিজ দলকে অগ্রাহ্য করে কংগ্রেসী নেতাদের কথায় চলছেন।

কৃষ্ণনগর কেন্দ্রের আসন্ন উপনির্বাচন থেকেই বিভিন্ন দলের ভিতরকার চেহারাটা ফুটে বেরুচ্ছে। এই কেন্দ্রের প্রার্থী দেওয়াতে যুক্তফ্রন্টের বিশেষ কোন অসুবিধা হয় নি কিন্তু ভারতীয় লোকদল তথা হুমায়ুন কবিরকে একেবারে অস্বীকার করে কংগ্রেসের তরফ থেকে প্রার্থী দেওয়ার ব্যাপারে কংগ্রেস-লোকদলের মধ্যে বন্ধু বিচ্ছেদ আসন্ন হয়ে উঠেছে। শেষোক্ত দলটি দল বদলাবদলি রাজনীতির শোচনীয় পরিণতির সাক্ষ্য হয়ে থাকবে বলে আশা করা যায়। যুক্তফ্রন্ট থেকে সমর্থন প্রত্যাহার করে নিয়ে যাঁরা প্রথমে পি-ডি-এফ এবং পরে ভারতীয় লোকদল গঠন করেছিলেন, বর্তমানে তাঁদের পায়ের তলা থেকে মাটি সরে যেতে শুরু করেছে, কংগ্রেসের স্নেহাঞ্চল তাঁদের মাথা থেকে খসে পড়েছে, এমন কি এই ছোট দল থেকে কবির-প্রফুল্ল ঘোষ বিরোধী আরও একটি

উপদল বেরিয়ে এসেছে যে দলের একমাত্র লক্ষ্যই হল লোকদলের প্রার্থীদের বিরুদ্ধে প্রার্থী দেওয়া। দলত্যাগী রাজনীতির ভক্ত যাঁরা সম্প্রতি হয়েছেন তাঁদের আর একটি নতুন শিক্ষা লাভের সুযোগ এসেছে। পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতির বিচিত্র গতির কথা কৃত্তিবাস ওঝার "সপ্তাহের বোঝা"তেই নিয়মিত পরিবেশিত হচ্ছে, কাজেই সেগুলির পুনরুক্তি বাহুল্যমাত্র।

হুগলী :

ব্যান্ডেল তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র

ব্যান্ডেলে থার্মাল প্লান্ট তৈরি হবার পর থেকে স্বাভাবিকভাবে আশা করা গিয়েছিল যে, অতঃপর এই প্রকল্পটি পশ্চিমবঙ্গের বিদ্যুতের প্রচুর চাহিদার কিছুটারও যোগান দেবে। সে সম্ভাবনা যে ছিল না তা নয়, অথচ সরকারী নীতি বা ব্যবস্থাপনার মহিমা এমনই যে, বিদ্যুতের ক্রেতা না জোটার অভাবে এই তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি প্রায় উঠে যেতে বসেছে। এই প্লান্টটি তৈরি করতে ব্যয় হয়েছিল বড় কম টাকা নয়, চল্লিশ কোটি টাকা, তাও আবার ধার করা টাকা। এই কেন্দ্রে চারটি উৎপাদনশীল ইউনিট আছে, কিন্তু এমনই ব্যবস্থাপনা যে ওই চারটি ইউনিটের মধ্যে দুটি নিয়তই বসে থাকে। এই চারটি ইউনিট চালু থাকলে প্রতিদিন তিনশো মেগাওয়াট বিদ্যুৎ তৈরি করা যেতে পারে, কিন্তু এমনই মজা যে আশী বা একশো মেগাওয়াটের বেশি বিদ্যুতের ক্রেতা নেই। এই চাহিদা না থাকার কারণ হচ্ছে তৃতীয় ও চতুর্থ পরিকল্পনায় গ্রামে গ্রামে বিদ্যুৎ সরবরাহের যে কথা ছিল তা কাজে পরিণত হয় নি। বিদ্যুতের চাহিদাকে বাড়িয়ে তোলার কোন চেষ্টা সরকারী তরফ থেকে হয় নি। আশেপাশের গ্রামগুলি আজও অন্ধকারে নিমজ্জিত। অধিবাসীরা আলোর জন্য আবেদন করে তিতিবিরক্ত হয়ে গেছেন, সে আবেদনে সাড়া দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা সরকার উপলব্ধি করতে পারেন নি। হুগলী জেলার বিভিন্ন গ্রামে সেচের জন্য গভীর নলকূপ বসানো হয়েছে। সেগুলিকে চালানোর জন্য যে বিদ্যুৎ শক্তির প্রয়োজন তা স্বচ্ছন্দে ব্যান্ডেল তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র যোগান দিতে পারে, কিন্তু কেবলের অভাবে তা সম্ভবপর হচ্ছে না। দূরবর্তী অঞ্চলসমূহে ইলেকট্রিকের তার বসানোর পয়সা নাকি সরকারের নেই। কাজেই নলকূপ বসেছে, তা চালানোর জন্য বিদ্যুতের যোগানও মজুত আছে, কিন্তু বিদ্যুৎ শক্তিকে নলকূপ পর্যন্ত নিয়ে যাবার মত উপায় এ পর্যন্ত করা গেল না। সেদিন নিত্যানন্দপুরে দেখলাম ক্ষীণধারা বেহুলা নদী থেকে ডিজেল পাম্পের দ্বারা জল তুলে সামান্য কয়েক একর জমিতে সেচ দিয়ে বোরো ধান চাষ করা হচ্ছে এবং তার আশেপাশের বিস্তীর্ণ ভূভাগ জলাভাবে ধূ ধূ করছে, অথচ বিদ্যুৎ শক্তি ব্যবহার করতে পারলে সমগ্র অঞ্চলটাই শস্যশ্যামল হয়ে উঠতে পারত। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য এই ডিজেল পাম্পের ব্যাপারেও ভেজাল আছে। আলোচ্য পাম্পটির দ্বারা পাঁচশো একর জমিতে সেচ দেওয়া যায়, কিন্তু কার্যত একশো একরের বেশি জমিতে তা দেওয়া সম্ভবপর হচ্ছে না কেন না পাইপ লাইন নেই। যেমন বিচিত্র আমাদের পরিকল্পনা, তেমনই বিচিত্র আমাদের পরিকল্পনাকারগণ। এ দেশের দুরবস্থা কি সহজে ঘুচবে?

জলপাইগুড়ি :

বিদ্যুৎ সমস্যা

পশ্চিমবঙ্গে বিদ্যুৎ সরবরাহের একদিকের চিত্র আমরা দেখলাম, এবার আর এক দিকের চিত্র দেখা যাক। জলপাইগুড়ির কথাই ধরা যাক। এখানকার ইলেকট্রিক কোম্পানীর দৌলতে জলপাইগুড়ির অধিবাসীরা দিনের পর দিন অন্ধকারের জীব হয়ে উঠছেন। কোম্পানী ২২০ ভোল্টে আলো সরবরাহ করবার জন্য প্রতিশ্রুত এবং সেই অনুযায়ী তাঁরা ইউনিট প্রতি যে মূল্য ধার্য করেছেন তা বোধ করি সারা ভারতে কোথাও নেই। এত উচ্চহারে মূল্য দিয়েও জনসাধারণ যে আলো পাচ্ছেন তা ১১০ ভোল্টের হবে কিনা সন্দেহ। পাওয়ার হাউসের কাছে যাঁদের বাড়ি তাঁরা হয়ত কিছুটা আলো পান, কিন্তু বেশির ভাগ মানুষই ৬০ পাওয়ারের বাল্ব জেলেও প্রায়ান্ধকার গৃহে বাস করেন। ২২০ ভোল্টের আলো না দিয়েই কোম্পানী মানুষের গলায় গামছা দিয়ে তার দাম আদায় করছে। শোনা যায় জনৈক প্রাক্তন কংগ্রেসী মন্ত্রী এই কোম্পানীর সঙ্গে সম্পর্কিত। জলঢাকা প্রকল্প থেকে বিদ্যুৎ আমদানী করে জলপাইগুড়ির আলোর সমস্যা মেটান যায়, কিন্তু এদিকে কারো কোন আগ্রহ আছে বলে মনে হয় না।

পশ্চিম দিনাজপুর :

বালুরঘাট-কলকাতা স্টেটবাস

বালুরঘাট-কলকাতা স্টেটবাস চালু হওয়াতে জনসাধারণের অনেক সুবিধা হয়েছে সন্দেহ নেই, কিন্তু রাষ্ট্রীয় পরিবহন কর্তৃপক্ষ এমন কয়েকটি অবস্থার সৃষ্টি করেছেন যা কোন যুক্তি দিয়েই সমর্থন করা যায় না। বালুরঘাট থেকে কলকাতার ভাড়া কুড়ি টাকা, কিন্তু অন্তত দুদিন আগে টিকিট না কাটলে টিকিট পাওয়া যায় না। এর জন্য টিকিট পিছু পঞ্চাশ পয়সা বেশি দিতে হয়। সমস্ত সীটের টিকিটই অগ্রিম অতিরিক্ত পয়সা দিয়ে পাওয়া যায়। গাড়ির সব সীটই যদি রিজার্ভ করার ব্যবস্থা থাকে তবে সাধারণ যাত্রীর সেই দিনই যাবার কোন সুযোগ নেই। আবার সীট পিছু অতিরিক্ত পঞ্চাশ পয়সাই বা কেন দিতে হবে, যাত্রীরা তাও বুঝতে পারছেন না। সুতরাং কর্তৃপক্ষ হয় ঘোষণা করুন, রিজার্ভ না করলে টিকিট পাওয়া যাবে না, নতুবা কয়েকটি আসন সাধারণ যাত্রীদের জন্য ছেড়ে রাখুন, যেমন ট্রেনে ব্যবস্থা থাকে। বর্তমানে যেভাবে টিকিট বিক্রী হয়, তাকে রিজার্ভেশন বলা যাবে না, আগাম টিকিট কাটা বলা চলবে। তাহলে তার জন্য পঞ্চাশ পয়সা অতিরিক্ত আদায় করার যৌক্তিকতা কোথায়?

বাঁকুড়া :

বাঁকুড়ায় মহিলা কলেজ

১৬ বছর আগে বাঁকুড়ায় একটি মহিলা কলেজ স্থাপনের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার তিন লক্ষ টাকা মঞ্জুর করেছিলেন। সে কলেজ আজও হয় নি। অভিভাবকগণের বিশেষ অনুরোধে বাঁকুড়া খৃস্টান কলেজ ১৯৬৪ থেকে দুই শতাধিক ছাত্রীর জন্য প্রাতঃকালে মহিলা বিভাগ খুলেছিলেন। কিন্তু বারবার খৃস্টান কলেজ কর্তৃপক্ষের অনুরোধ সত্ত্বেও শিক্ষাদপ্তর এই প্রাতঃকালীন মহিলা বিভাগটির পৃথক মঞ্জুরীর বা পরিচালনার জন্য উপযুক্ত পরিমাণ অর্থ মঞ্জুর না করায় ১৯৬৬ সালে কলেজের পরিচালকমণ্ডলী এই মহিলা বিভাগ বন্ধ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ফলে অভিভাবক সমিতির পক্ষে বাঁকুড়ার নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ ১৯৬৬ সালের ২৪শে জুন তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রীর নিকট এক ডেপুটেশনে গিয়ে বাঁকুড়ার জন্য একটি পৃথক মহিলা কলেজ স্থাপনের দাবি জানান। এই মহিলা কলেজ স্থাপন করতে যে সময় লাগবে ততদিন পর্যন্ত খৃস্টান কলেজের প্রাতঃকালীন মহিলা বিভাগটিকে পৃথক সংস্থা হিসাবে গণ্য করে তার পরিচালনার জন্য উপযুক্ত অর্থ সাহায্যের প্রতিশ্রুতিও একটা পাওয়া গিয়েছিল। কলেজ কর্তৃপক্ষ এই আশ্বাসে নির্ভর করে আজ পর্যন্ত উক্ত মহিলা বিভাগটি পরিচালনা করে আসছেন, কিন্তু সরকার থেকে এ পর্যন্ত এই উদ্দেশ্যে একটা পয়সাও পাওয়া যায় নি যার ফলে বাধ্য হয়ে খৃস্টান কলেজ কর্তৃপক্ষ এই বছর থেকে মহিলা বিভাগ তুলে দেবার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। স্বভাবতই এই ব্যাপারে অভিভাবক ও ছাত্রীরা অত্যন্ত চিন্তিত। একটা কিছু ব্যবস্থা এই মুহূর্তেই করা দরকার।

সংক্ষিপ্ত সমাচার

পশ্চিমবঙ্গের সিনেমা কর্মচারীরা বেশ কিছুকাল যাবৎ ধর্মঘট করে রয়েছেন যার ফলে সিনেমাগৃহসমূহে তালা ঝুলছে। জনসাধারণই শুধু সিনেমা

মন আজ
খুশীতে
ভরা
শরীর যদি ভাল থাকে তাহলে ভ্রমণের জন্য
মানুষ আনন্দে মেতে ওঠে প্রকৃতির সৌন্দর্য
উপভোগ করবার জন্য।
আপনিও স্বাস্থ্য ভাল রাখার জন্য সাধনার
অব্যর্থ মহৌষধ প্রতিদিন আহারের পর
দুইবার করে দু'চামচ মৃতসঞ্জীবনীর সঙ্গে
চার চামচ মহাদ্রাক্ষারিষ্ট (৬ বৎসরের
পুরাতন) খাবেন। এতে ক্লান্তি দূর করে,
খিদে ও হজমশক্তি বাড়ে, সর্দি কাশি
থেকে রেহাই পাবেন।
সাধনা ঔষধালয় ঢাকা
অধ্যক্ষ ডাঃ যোগেশ চন্দ্র ঘোষ, এম-এ,
আয়ুর্বেদশাস্ত্রী, এফ,সি,এস, (লণ্ডন),
এম,সি,এস, (আমেরিকা), ভাগলপুর
কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব
অধ্যাপক।
কলিকাতা কেন্দ্র ডাঃ নরেশ চন্দ্র ঘোষ,
এম-বি, বি-এস, আয়ুর্বেদাচার্য্য ঃ
৩৬, সাধনা ঔষধালয় রোড
সাধনা নগর, কলিকাতা ৪৮

কেন্দ্র থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন না, সেই দেশের সরকার-এ প্রতিদিনে প্রমোদ কর বাবদ যে লক্ষাধিক টাকা পেচ্ছেন তা থেকেও বঞ্চিত হচ্ছেন। সরকারী প্রচেষ্টায় সমগ্র বিষয়টির মীমাংসা করার প্রচেষ্টা হয়েছিল, কিন্তু তা ব্যর্থ হয়েছে। অথচ সিনেমা কর্মীদের দাবির মধ্যে কোনই অযৌক্তিকতা নেই। বছর দুয়েক আগে যে সিনেমা ধর্মঘট হয়েছিল তার মীমাংসার সর্ত হিসাবে মালিকপক্ষের যে আর্থিক দায় ছিল তা তাঁরা মেটান নি, যে কারণে দ্বিতীয়বার সিনেমা কর্মীদের আন্দোলনে নামতে হয়েছে। শ্রমিকদের ন্যূনতম দাবি-গুলিকে অস্বীকার করার বড় বেশি প্রবণতা ভারতীয় মালিকশ্রেণীর মধ্যে বর্তমান। এক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয় নি। অতিমুনাফা লোটার মনোবৃত্তি ত্যাগ করতে এরা অপারগ। সিনেমাগৃহগুলির জাতীয়করণ করা যায় কি না এ বিষয়টি এখন সরকারের ভাববার প্রয়োজন।

*

বন্দরকর্মীদের ধর্মঘট সম্প্রতি প্রত্যাহৃত হয়েছে। এবং এটা সম্ভবপর হয়েছে ত্রিপাক্ষিক আলোচনার দ্বারা। এই কাজটি আগে করলে অনেক ঝামেলার অবসান ঘটত কিন্তু কর্তৃপক্ষের অহেতুক জিদই এর প্রতিবন্ধক ছিল। মাঝখান থেকে কলকাতা বন্দরের কাজকর্ম কয়েকদিন বন্ধ থাকার জন্য জনসাধারণকেই ঝামেলা পোহাতে হয়েছে। অত্যাবশ্যক বহু পণ্য-সামগ্রী জাহাজ থেকে খালাস করা সম্ভবপর হয় নি। শ্রমবিরোধের কোন ঘটনা ঘটলে তা স্থির বুদ্ধিতে মিটিয়ে নেওয়াই ভাল। যে কোন উন্নত বা উন্নতিশীল বা উন্নতিকামী দেশে শ্রমবিরোধ থাকবেই কাজেই সেটিকে প্রেস্টিজ ইস্যুতে দাঁড় করানোর কোন সার্থকতা নেই।

*

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন ভাইস-চ্যান্সেলার হয়ে এলেন অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ সেন। এই নিয়োগে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত। দীর্ঘকাল পরে একজন শিক্ষক ভাইস-চ্যান্সেলারের গুরুত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত হলেন। এটাই হওয়া উচিত। বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ হিসাবে এমন ব্যক্তির থাকা উচিত যিনি শিক্ষা-দরদী এবং শিক্ষার সঙ্গে আজীবন সংশ্লিষ্ট। কোন বিচারপতি বা আমলা-তান্ত্রিক প্রধানকে ভাইস-চ্যান্সেলারের পদে বসানো দৃষ্টিকটু। তাঁরা যে কর্মদক্ষ নন তা নয়। তবে শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠানে শিক্ষাব্রতীকে বসানোই শোভন। কেন না তিনি শিক্ষার সমস্যা, শিক্ষকের সমস্যা এবং ছাত্রদের সমস্যা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার আলোকে অধিকতর ভাল বুঝবেন। দীর্ঘ-কাল পরে একজন শিক্ষাব্রতীর এই সম্মান প্রাপ্তি সেই কারণেই স্বাগত।

গত ৫ই এপ্রিল অটোমেশনের বিরুদ্ধে জীবনবীমা কর্মচারীরা ধর্মঘট করে-ছিলেন। জীবনবীমা কর্পোরেশনের ৪০ হাজার কর্মী ভারতব্যাপী এই ধর্মঘটে যোগ দিয়েছিলেন। ঐ দিনই বৈকালে কর্মীরা একটি সভা করেন। ময়দানে বহু মিছিল এসে জমায়েত হয়। ব্যাঙ্ক, রেল, সওদাগরি অফিসের কর্মী, রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারী এবং শিক্ষকেরা এই মিছিলসমূহের শরিক হন এবং অটো-মেশন বিরোধী ধ্বনি দিতে থাকেন। সভায় বিভিন্ন বক্তা ছাঁটাই, শ্রমিকবিরোধী নীতি ও অটোমেশনের নিন্দা করে বক্তৃতা করেন। গৃহীত এক প্রস্তাবে সরকার ও মালিকদের প্রতিহিংসাপরায়ণ মনোভাবের নিন্দা করা হয় এবং অন্যায় শাস্তিদানের নীতি অবিলম্বে প্রত্যাহারের দাবি জানানো হয়। ব্যাঙ্ক সম্বন্ধে সামাজিক নিয়ন্ত্রণ বিলের প্রত্যাহার এবং বরখাস্ত কর্মীদের কাজে পুনর্বহালের দাবি জানানো হয়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এবং ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিকাল ইনস্টিটিউটের কর্মচারীরা এল-আই-সি কর্মীদের সমর্থনে এক ঘণ্টা ধর্মঘট করেন।

*

ডক্টর রথীন্দ্রনাথ রায়ের আকস্মিক পরলোকগমনের সংবাদে আমরা আত্মীয়-বিয়োগ ব্যথা অনুভব করছি। সাপ্তাহিক বসুমতীতেও তাঁর সাহিত্যিক অবদানের অনেক নিদর্শন ধরা আছে। বঙ্গ সাহিত্যের একজন নিষ্ঠাবান সেবক এবং অক্লান্ত গবেষক হিসাবে তিনি বিশেষ সুপরিচিত ছিলেন এবং অধ্যাপক হিসাবেও তিনি সার্থক ছিলেন। তাঁর জ্ঞানের পরিধির এবং সেই সঙ্গে হৃদয়ের বিশালতা তাঁকে বিশেষ সম্মান ও শ্রদ্ধার আসনে অধিষ্ঠিত করে-ছিল। ধাপে ধাপে তিনি সাফল্য ও খ্যাতির শিখরে উঠছিলেন। আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে অতি অল্প বয়সেই তিনি চলে গেলেন যার ফলে বাংলা সাহিত্য তাঁর একজন একনিষ্ঠ সেবককে হারাল। তাঁর শোক-সন্তপ্ত পরিজনের উদ্দেশ্যে আমরা আমা-দের আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।

——(৪৪)——

গ্রাম-গ্রামান্তরে

ডি ভি সি ও ময়ূরাক্ষী সেচের জল বন্ধ

গ্রামের কৃষকদের সময়টা এ বছর দেখছি সত্যিই খারাপ যাচ্ছে। একে তো লেভী আদায় ও মজুত উদ্ধারের নামে সরকারী আমলারা গ্রামে গ্রামে অশান্তির আগুন জেলেছেন, তার ওপর ডি ভি সি ও ময়ূরাক্ষীর সেচের জল গত ৩১শে মার্চ থেকে বন্ধ করে দিয়ে হাজার হাজার চাষীদের ভাতে মারার আর একটি ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হ'ল। ডি ভি সির জল পাওয়া যাবে—এই আশ্বাস পাওয়ার পর হাওড়া ও হুগলীর প্রায় ৪৫ হাজার একর জমিতে রবিশস্যের চাষ করা হয়। ঐ সব জমিতে এখন রয়েছে আলু, গম, বোরো ও তাইচুং। আর ওদিকে ময়ূরাক্ষী থেকে জল পাওয়া যাবে এই আশায় বীরভূমের ৩০ হাজার একর জমিতে বোরো ও কলাই-এর চাষ করা হয়েছে। জল দেওয়া হচ্ছিল, চাষও হচ্ছিল। হঠাৎ সেচ দপ্তরের আমলাবাবুদের খেয়াল হ'ল—'জল বন্ধ করে দাও, বাঁধগুলো সব মেরামত হবে।' কৃষি দপ্তরের বাবুরা বললেন—'সে কি! ক্ষেতের দিকে একটু তাকিয়ে দেখুন, হাজার হাজার বিঘে জমিতে এই গরমেও কত ফসল ফলেছে; আর দু'মাস পরেই ফসল ঘরে উঠবে, খাদ্যাভাব অনেকটা তো কাটবে......।' 'ওসব কথা রাখুন'—বললেন, সেচবাবু—'শুধু আপনাদের কাজ দেখালেই' তো চলবে না, আমাদেরও দেখাতে হবে।' উন্নয়নের বাবুরা গেলেন, চাষীদের প্রতিনিধিরাও অনুনয় বিনয় করলেন—'অন্তত এ মাসটা জল দিন।' কিন্তু কা কস্য পরিবেদনা! সেচ বিভাগ তাদের সিদ্ধান্তে অনড়। শ্রমশক্তি দ্বিগুণ করে দু'মাসের মেরামতের কাজ এক মাসে করা যেতে পারে, কিন্তু জলাভাবে রাজ্যের যে লক্ষ লক্ষ মন ধান নষ্ট হয়ে যাবে তা আর ফিরবে না; কোন ফ্যাক্টরী বা ল্যাবরেটরীতে তা তৈরি হবে না—এই সহজ সত্যটুকু সেচ বিভাগের বাবুদের বোঝানো গেল না। বাবুরা বুঝলেন না এই সর্বপ্রথম ধনেখালি ব্লকের চাষীরা সরকারের কথার ওপর নির্ভর করেই বোরো ধানের চাষ করেছে প্রায় পাঁচ হাজার বিঘে জমিতে; যদি বিঘে প্রতি দু'শো টাকা খরচ ধরা যায় তাহলে খরচ পড়লো দশ লক্ষ টাকার মত। বিঘা প্রতি দশ মন ধান যদি হয়, মোটামুটি ফলন হবে পঞ্চাশ হাজার মন; চল্লিশ টাকা মন বিক্রি করলে আসবে ২০ লক্ষ টাকা। কিন্তু কে শুনেছে এসব কথা? লক্ষ লক্ষ টাকা সরকারের ঘরে আসুক, চাষীদের অবস্থার উন্নতি হোক, দেশের কল্যাণ হোক—খেয়ে পরে মানুষ আগে বাঁচুক—এ ইচ্ছাই যদি সরকারী আমলাদের থাকবে তাহলে দেশের এতো দুর্দশা হবে কেন? এইমাত্র কলকাতা থেকে খবর এলো রাজ্যপাল শ্রীধরমবীর সেচের জল এপ্রিলের তিন হপ্তা অন্তত যাতে দেওয়া হয় তার জন্যে নাকি নির্দেশ দিয়েছেন। যদি সত্যিই নির্দেশ দিয়ে থাকেন সে নির্দেশ ময়ূরাক্ষীতে হয়তো মানা হবে, কিন্তু ডি ভি সির কর্তৃপক্ষ তা মানতে কি বাধ্য হবেন? যদি হন ভালই তবু কিছুটা ফসল তো হবে। —সমর চট্টোপাধ্যায়

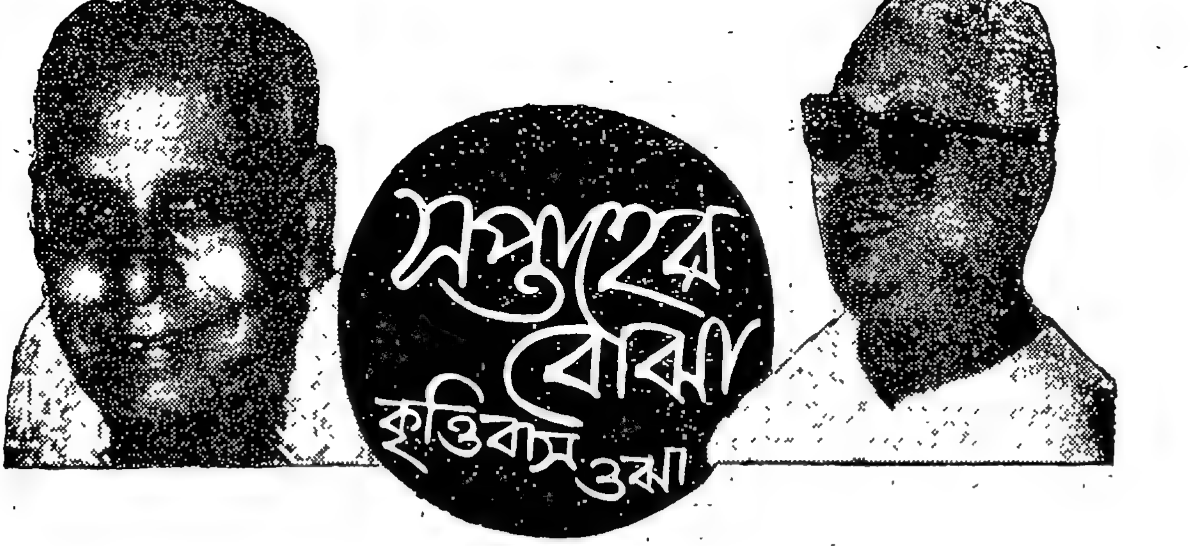

২৫শে মার্চ বাঘা যতীন পার্কে শ্রীঅতুল্য ঘোষের সভা আর ২৮শে মার্চ একই জায়গায় শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায়ের সভা শুধু দুটি জনসভার দৃষ্টিকোণে বিচার্য নয়। কারণ, শ্রীঅতুল্য ঘোষ আর শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায়ের এই যে একই সঙ্গে উত্তরবঙ্গের পাঁচটি জেলা সফর—তা রাজনৈতিক তাৎপর্যে ভরপুর। এই রাজনৈতিক তাৎপর্য কিন্তু শুধু উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে সীমাবন্ধ নয়। সেই তাৎপর্য ছড়িয়ে পড়েছে রাজ্য-রাজনীতির সর্বপ্রান্তে। তাই শিলিগুড়িতে অনুষ্ঠিত সভার কথা বলার আগে আরও কিছু কথা বলে নেওয়া দরকার। শ্রীঅতুল্য ঘোষ উত্তরবঙ্গ সফরে যাবেন এই সংবাদ প্রদেশ কংগ্রেস ভবনে ঘোষিত হবার কয়েকদিনের মধ্যেই দেখা গেল শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায়ের উত্তরবঙ্গ সফরের কর্মসূচী ঠিক হয়ে গেছে। শ্রীঅতুল্য ঘোষ সদলবলে রওনা হলেন শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায়ের উত্তরবঙ্গ যাত্রার দুদিন আগে—কিন্তু কলকাতায় ফিরলেন সফর শেষে উভয়েই একই দিনে। এমন কি—শ্রীঅতুল্য ঘোষ শিলিগুড়ি থেকে বিমানযোগে রওনা হয়ে ২৯ তারিখ বেলা চারটায় যখন দমদম বিমানবন্দরে পৌঁছলেন, শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায় তখন নিউ জলপাইগুড়ি থেকে ট্রেনে রওনা হয়ে ঠিক ঐ চারটার সময় দার্জিলিং মেলে শিয়ালদহ স্টেশনে নামলেন। অর্থাৎ শ্রীঅতুল্য ঘোষ অনেক আগে রওনা হয়ে যখন বিমানঘাঁটিতে প্রত্যাবর্তন করেন, শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায় তখন অনেক পিছনে রওনা হয়ে একই সময়ে সেই ঘাঁটিতে এসে শ্রীঅতুল্য ঘোষকে ধরে ফেলেন। রাজ্য-রাজনীতির দুটি ধারা এই দুই নেতার যাত্রাপথের মধ্যেই সূচিত হয় যে উভয়েই এখনও কেউ কাউকে খুব বেশি পিছনে ফেলতে পারেন নি।

২৩শে মার্চ শ্রীঅতুল্য ঘোষ কুচবিহারে, ২৪শে মার্চ জলপাইগুড়িতে, ২৫শে মার্চ শিলিগুড়িতে, ২৬শে মার্চ পশ্চিম দিনাজপুরে, ২৭শে মার্চ মালদহে, ২৮শে মার্চ আবার শিলিগুড়িতে এলেন। আর শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায় ২৬শে মার্চ মালদহ ও পশ্চিম দিনাজপুরে, ২৭শে মার্চ শিলিগুড়ি ও জলপাইগুড়িতে, ২৮শে মার্চ কুচবিহার ও শিলিগুড়িতে উপস্থিত হয়ে শ্রীঅতুল্য ঘোষকে ধরে ফেললেন। অর্থাৎ শ্রীঅতুল্য ঘোষ ২৩শে থেকে ২৮ তারিখ পর্যন্ত যে এলাকা ভ্রমণ করলেন শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায় অর্ধেক সময়ে সেই এলাকায় ভ্রমণ করে শ্রীঘোষকে ধরে ফেললেন। ২৮শে রাত আটটায় শ্রীঅতুল্য ঘোষ যখন তাঁর উত্তরবঙ্গ সফর শেষে শিলিগুড়ির অদূরে দাগাপুর এস্টেটের বাংলোয় বিশ্রাম করছিলেন, তখন ঐ একই সময়ে শ্রীঅতুল্য ঘোষের বাসস্থানের তিন মাইল দূরে শিলিগুড়ি শহরের হিলকার্ট রোডের ওপর শিউমঙ্গল সিংয়ের বাড়িতে শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায়ও উত্তরবঙ্গ সফর শেষে খাটিয়ায় বসে বিশ্রাম করছিলেন। পশ্চিমবাংলা রাজনীতির দুই সর্বোচ্চ নেতার শিলিগুড়ি শহরের বুকে একই সময়ে অবস্থান কোন গ্রহনক্ষত্রবৈগুণ্যে হয়েছিল সে বিচার করবার অধিকার আমার নেই। কিন্তু এই দুই নেতাকে কেন্দ্র করে সারা উত্তরবঙ্গ এবং ২৮শে মার্চ শিলিগুড়ি শহরে যে রাজনৈতিক পরিমণ্ডল সৃষ্টি হয়েছিল তার মধ্যেই নিহিত আছে রাজ্য-রাজনীতির প্রকৃত চেহারা। কথাটা একটু পরিষ্কার করে বলা দরকার। শিউমঙ্গল সিংয়ের বাড়িতে শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায় যখন বসে আছেন তখন তাঁর সবচেয়ে কাছে বসে আছেন পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার প্রাক্তন ডেপুটি স্পীকার শ্রীহরিদাস মিত্র। শ্রীমিত্র আজ ছায়ার মত শ্রীমুখোপাধ্যায়কে অনুসরণ করে চলেছেন—অথচ, যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভার পতনের কয়েকদিন আগে অথবা ২১শে নভেম্বর মন্ত্রিসভা পতনের পর বিধানসভা অনুষ্ঠানের দিন পর্যন্ত শ্রীমিত্র কত না দূরে সরে গিয়েছিলেন শ্রীমুখোপাধ্যায়ের কাছ থেকে। শেষ বিধানসভা অনুষ্ঠানের সময় শ্রীবিজয় সিং নাহারের মাধ্যমে শ্রীহরিদাস মিত্রকে ডেপুটী স্পীকাররূপে বহাল রেখে শ্রীবিজয় বন্দ্যোপাধ্যায়কে স্পীকারের আসন থেকে বিতাড়িত করে বিধানসভা চালু রাখবার একটা পরিকল্পনা কংগ্রেস করেছিল। শ্রীমিত্র কংগ্রেসের এই পরিকল্পনায় শরিকও হয়েছিলেন—একথা আজ শুনতে খারাপ লাগলেও বাস্তবে সত্য। শ্রীমিত্র প্রকাশ্য বিবৃতি দিয়ে বলেছিলেন, তিনি ডেপুটী স্পীকার হিসাবে কোন দলের প্রতি আনুগত্যশীল নন—তিনি নির্দল ও নিরপেক্ষ। নির্দল ও নিরপেক্ষ হওয়া কোন ব্যক্তির পক্ষে দোষের নয়, কিন্তু শ্রীমিত্র যেইদিন যে মুহূর্তে যুক্তফ্রন্ট থেকে নিজেকে নির্দলরূপে সরিয়ে নিয়েছিলেন সেই দিন যুক্তফ্রন্টের ক্ষণভঙ্গুর অবস্থায় বিরাট আঘাত লেগেছিল। আজ হাওয়ার পরিবর্তনে শ্রীমিত্র শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায়ের ছায়াসঙ্গী। কিন্তু ছায়া বহু সময়ে কুহক সৃষ্টি করে, যেমন সৃষ্টি করেছে শ্রীঈশ্বর তিরকী ও শ্রীভেনজিং ওয়াংদি। অথবা যজ্ঞেশ্বর রায় বা জগদানন্দ রায়। শ্রীঈশ্বর তিরকী নক্সালবাড়ি কৃষক আন্দোলনের সময় অথবা সাতষট্টি সালের নির্বাচনের সময় শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায়ের ছায়াসঙ্গী ছিলেন। কিন্তু আজ সেই ছায়া সরে গিয়ে সঙ্গী হয়েছে শ্রীঅতুল্য ঘোষের।

গত নির্বাচনে শ্রীঈশ্বর তিরকী ফাঁসিদেওয়া কেন্দ্রে বাংলা কংগ্রেসের প্রার্থীরূপে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন এবং ভোটও পেয়েছিলেন যথেষ্ট। ফাঁসিদেওয়া কেন্দ্রে কংগ্রেস প্রার্থী শ্রীতেনজিং ওয়াংদি পেয়েছিলেন ষোল হাজার দুই শত সাতাশ ভোট আর শ্রীঈশ্বর তিরকী পেয়েছিলেন ন' হাজার ছেষট্টি ভোট। এই কেন্দ্রে অপর একজন প্রার্থীও ছিলেন—তিনি হলেন শ্রীজঙ্গল সাঁওতাল। তিনি পেয়েছিলেন দশ হাজার চারশো আটচল্লিশ ভোট। শ্রীজঙ্গল সাঁওতাল বর্তমানে শিলিগুড়ি স্পেশ্যাল জেলে আটকবন্দী। নক্সালবাড়িপন্থীরূপে আগামী নির্বাচনে তাঁর প্রার্থী হবার কোন সম্ভাবনা নেই। তাই শ্রীঈশ্বর তিরকী ছিলেন আগামী নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের সম্ভাব্য যোগ্য প্রার্থী। কিন্তু ছায়ার গতি পরিবর্তনে আগামী নির্বাচনে শ্রীতিরকী হবেন কংগ্রেসের প্রার্থী। সেইদিন আটাশে মার্চ শ্রীতিরকী শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায়ের কাছে ছিলেন না—ছিলেন শ্রীঅতুল্য ঘোষের পাশে।

ছায়া শুধু শ্রীমুখোপাধ্যায়ের কাছ থেকে সরে গেছে একথা কিন্তু সত্য নয়—শ্রীঅতুল্য ঘোষের কাছ থেকেও ছায়া সরে গিয়েছে। গত ২৫শে ও ২৮শে মার্চ দুইদিন শ্রী টি ম্যানিরেন দার্জিলিং-কার্সিয়াং-কালিম্পঙ থেকে জীপে করে বেশ কয়েকজন কংগ্রেস কর্মীকে শ্রীঅতুল্য ঘোষের সম্মুখে হাজির করেছিলেন। শ্রীঘোষের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে রেখে দার্জিলিং জেলার ঠান্ডা পরিবেশের মানুষগুলোকে উত্তপ্ত করিয়েছিলেন। কিন্তু শ্রীম্যানিরেন একজনকে সঙ্গে আনতে পারেন নি—তিনি শ্রী টি ওয়াংদি। শ্রী টি ওয়াংদি রাজ্য বিধানসভার দীর্ঘদিনের সদস্য এবং রাজ্যের প্রাক্তন রাষ্ট্রমন্ত্রী। ফাঁসিদেওয়া কেন্দ্রের দুবারের বিজয়ী প্রার্থী—তিনি আজ সরে গেছেন শ্রীঅতুল্য ঘোষের কাছ থেকে। শ্রীওয়াংদিকে এখন আর হাওয়াই শার্ট পরে সকাল-সন্ধ্যা কংগ্রেস ভবনে দেখা যায় না—দেখা যায় আমীর আলি এভেনিউতে শ্রীশঙ্করদাস ব্যানার্জির সান্ধ্যবৈঠকে। শ্রীওয়াংদিকে কংগ্রেস মনোনয়ন দেবে না, কিন্তু তিনি নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন,—হয়তো যুক্তফ্রন্টের সমর্থনও পেয়ে যাবেন, যদি না শ্রীদেওপ্রকাশ রাই খুব বেশি বাধা সৃষ্টি করেন। যদি শিলিগুড়ি কেন্দ্র থেকে শ্রীদেওপ্রকাশ রাই শ্রীপ্রেম থাপাকে সরিয়ে নেন এবং বাংলা কংগ্রেসপ্রার্থী শ্রীবিধান মৌলিককে শ্রীঅরুণ মৈত্রের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতার সুযোগ দেন, তবে ফাঁসিদেওয়া কেন্দ্রের দাবি বাংলা কংগ্রেস ছেড়ে দিয়ে সেখানে গুর্খা লীগকে প্রতিদ্বন্দ্বিতার সুযোগ দিতে পারে। শিলিগুড়ি কেন্দ্রে গত নির্বাচনে কংগ্রেসপ্রার্থী শ্রীঅরুণ মৈত্র

পরিবার কল্যাণ পরিকল্পনার উদ্দেশ্য কি ?

এটা হল এমন একটা ব্যবস্থা যাতে ঃ

- কত বৎসর বাদে আপনার ক'জন ছেলেমেয়ে হলে ভাল হয় তা আপনি নিজেই স্থির করতে পারেন।
- আপনার পত্নীর স্বাস্থ্য ভাল রাখতে পারেন।
- আপনার সন্তানদের শিক্ষা ও স্বাস্থ্যরক্ষা ও তাদের ভালভাবে মানুষ করার দিকে বেশী দৃষ্টি দিতে পারেন।
- কোনরূপ দুশ্চিন্তা বা ভয় না করে আপনার বিবাহিত জীবন উপভোগ করতে পারেন।
- বন্ধ্যাত্ব নিবারণের চিকিৎসা গ্রহণ করতে পারেন।

সুখী ও স্বাস্থ্যোজ্জ্বল পরিবার গঠনের জন্য জন্মনিয়ন্ত্রণপদ্ধতি ব্যবহার করে আপনার পরিবারকে ছোট্ট ছিমছাম ও সুন্দর করে গড়ে তুলুন ঃ

পুরুষদের জন্য ঃ কনডোম।
স্ত্রীলোকদের জন্য ঃ ডায়াফ্রাম ও জেলী, ফোম টেবলেট, জেলী ও ক্রীম, লুপ।
উভয়ের জন্য ঃ অস্ত্রোপচার।

অনেক রকম পদ্ধতিতে 'জন্মনিয়ন্ত্রণ' করা যায়। আপনি ইচ্ছানুযায়ী সেগুলোর মধ্যে যে কোন একটি বেছে নিতে পারেন।

বিনামূল্যে পরামর্শ ও সেবার জন্য যে কোন হাসপাতাল বা স্বাস্থ্যকেন্দ্রের পরিবার পরিকল্পনা বিভাগে যান।

'পশ্চিমবঙ্গ স্টেট হেলথ এডুকেশন ব্যুরো কর্তৃক প্রচারিত'

পেয়েছিলেন চোদ্দ হাজার ছয় শত তেত্রিশ ভোট আর কংগ্রেস-বিরোধী ভোট পড়েছিল প্রায় আটাশ হাজার। শ্রীপ্রেম থাপা পেয়েছিলেন সাড়ে এগারো হাজার, শ্রীবিধান মৌলিক পেয়েছিলেন প্রায় সাড়ে আট হাজার, শ্রীসৌরেন বোস পেয়েছিলেন প্রায় সাত হাজার ভোট।

এই রাজনৈতিক পটভূমিকায় শ্রীঅতুল্য ঘোষ ও শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায় শিলিগুড়ি শহরে এলেন ও উভয়েই তিন দিনের ব্যবধানে একই ময়দানে জনসভায় ভাষণ দিলেন। শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায়ের উত্তর-খণ্ড ভ্রমণে কোন জনসভা করার কথা ছিল না, কারণ তিনি গিয়েছিলেন দলীয় কর্মসূচী রূপায়ণে। কিন্তু শ্রীঅতুল্য ঘোষের ভ্রমণসূচীতে প্রত্যহই একটি করে জনসভার ব্যবস্থা ছিল। তাই শ্রীঘোষের যে কোন শহরে আগমনের পূর্বে জনসভা সম্পর্কে প্রচার হয়েছিল, শত শত ছাপানো পোস্টার পড়েছিল, কিন্তু শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায়ের জন্য কোথাও একটি পোস্টার পড়ে নি, অবশ্য পড়বার কোন কারণও ছিল না; যেহেতু শ্রীমুখোপাধ্যায় কোথাও কোন জনসভা করবেন না, এটাই ঠিক ছিল। কিন্তু শ্রীমুখোপাধ্যায়কে শিলিগুড়ি শহরে সভা করতে হল, বিনা প্রচারে, বিনা পোস্টারে অনুষ্ঠিত সভায় ভাষণ দিতে হল আর বিস্ময়ের সংগে দেখা গেল শ্রীঅতুল্য ঘোষের বহু-প্রচারিত সভা অপেক্ষা শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায়ের সভা বহুগুণ সফল হয়েছে। শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায়ের সভা সফল হয় নি স্থানীয় যুক্তফ্রণ্ট বা স্থানীয় বি কে ডি দলের যোগ্যতায়, সভা সফল হয়েছিল শুধু একটি মাত্র কারণে—**সে কারণ হল, শিলিগুড়িতে শ্রীঅতুল্য ঘোষের সভা ব্যর্থ হয়েছে আর ব্যর্থ হবার পর কংগ্রেস নেতারা ঘোষণা করেছিলেন—কংগ্রেসের সভা ভাঙা হলে বাংলা দেশের কোথাও কোন দল আর সভা করতে পারবেন না। শিলিগুড়ির মানুষ সেই চ্যালেঞ্জের জবাব দিল শিলিগুড়ি শহরে তিন দিনের ব্যবধানে সেই একই ময়দানে সফল জনসভা করে।**

কংগ্রেসের সভায় আজকাল বড় একটা উদ্বোধন-সংগীত হয় না কিন্তু শিলিগুড়িতে ২৫শে মার্চ বাঘা যতীন পার্কে কংগ্রেসের সভায় দুখানি সংগীত পরিবেশন করা হল। রবীন্দ্রসংগীত—একলা চলরে, আর 'হে ভৈরব শক্তি দাও শক্তি দাও'। একলা চলরে গানের তাৎপর্য বোঝা গেল সাত দিন প্রচারের পরও সভায় জনসমাগমের অভাব দেখে, আর সভা চলাকালে যে তান্ডব শুরু হল তাতে ভৈরবের কাছে শক্তি প্রার্থনাও সময়োচিত হয়েছিল। বেলা সাড়ে চারটায় সভা শুরু হল, সভাপতিরূপে শ্রীচপলাকান্ত ভট্টাচার্য আসন গ্রহণ করলেন। প্রথম বক্তা শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মিশ্র। শ্রীমিশ্র বক্তৃতা করে কয়েক মিনিট এগুতেই দেখা গেল সভায় শ্রোতারূপে যারা উপস্থিত, তাদের বেশির ভাগেরই হাবভাব ভাল না। শ্রীমিশ্র সামান্য ধাক্কা খেয়ে বসে পড়লেন। শ্রীমিশ্রের পর উঠলেন শ্রীদয়ারাম বেরী। কিন্তু বেরীজী কিছু বলবার আগেই তার চেহারা আর বাচনভংগী সভার হল্লাকে দ্বিগুণ করে তুললো। এবার উঠলেন শ্রীঅমর ভট্টাচার্য। কিন্তু শ্রীভট্টাচার্য যত বেশি তীক্ষ্ণ বাক্যবাণে যুক্তফ্রন্টকে আক্রমণ শুরু করলেন তার তিনগুণ বেশি জোরে শ্রোতাদের দিক থেকে তাঁর দিকে আক্রমণ আসতে লাগল। আক্রমণ শুধু মুখের কথায় নয়। মাইকের তার কাটা গেল, অচল হল মাইক, পড়ল ঢিল, স্থানীয় এম এল এ শ্রীঅরুণ মৈত্র আঘাত পেলেন। সভা লণ্ডভণ্ড হবার প্রান্তসীমায় এল। এই ঘটনা যখন ঘটছে তখন শ্রীঅতুল্য ঘোষ কিন্তু অতি শান্ত ও নির্বিকারভাবেই বসেছিলেন। সামনের কিছু বাচ্চা ছেলের ছেলেমানুষী দেখে তিনি মৃদু হাসছিলেন, কিন্তু মাইকের তার কাটা যাবার পর দেখা গেল শ্রীঅতুল্য ঘোষের রূপ পরিবর্তন হয়েছে। নির্ভয় ও প্রবল ব্যক্তিত্বের প্রতিমূর্তিতে শ্রীঘোষ বিনা মাইকে চীৎকার করে ধিক্কার দিলেন তাদের, যারা মাইকের তার কেটেছে, ভীরু কাপুরুষ বলে তিরস্কার করলেন তাদের। তিনি বললেন—যদি সাহস থাকে, যারা এই সভা ভাঙছে তারা বলুক—তারা কোন দলের। কিন্তু ইতিমধ্যে মাইক নামিয়ে এনে মাইকের কাটা তার জোড়া দেওয়া হয়েছে। একজন কাঁধে ধরে আছেন মাইকটা। শ্রীঅতুল্য ঘোষ বললেন—সভা ভেঙে দলের অগ্রগতি রোধ করা যাবে না। তিনি শ্রীঅমর ভট্টাচার্যকে আবার বক্তৃতা দিতে বললেন। কিন্তু সভার গোলমাল যখন আরো বেড়ে গেল, এমন কি পতাকাদণ্ড থেকে কংগ্রেসের পতাকা নামিয়ে নেবার চেষ্টা হল, তখন শ্রীঅতুল্য ঘোষ আবার উঠলেন। তিনি অত্যন্ত ক্রোধের সংগে বিক্ষুব্ধ জনতার সামনে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করলেন—বাংলা দেশের জনতা এই নৈরাজ্য মেনে নেবে কি না? এই প্রশ্নের জবাব এল আরো বিয়োগান্তভাবে। একটি ঢিল পড়ে একটি ছেলের কপাল ভেঙে গেল, আর শুরু হল ঝাঁকানি দিয়ে দড়ি ছিঁড়ে দিয়ে মঞ্চের উপর টাঙানো পাল বা চাঁদোয়া নামিয়ে ফেলবার। এই অবস্থা আর সামান্য সময় চললে মঞ্চের উপর পাল ছিঁড়ে পড়তো আর পালের তলায় চাপা পড়তেন শ্রীঅতুল্য ঘোষ সহ কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ। কিন্তু ঘটনা সে পর্যন্ত যাবার আগেই আরো বেশি রক্তপাত এড়াবার জন্য সভা বন্ধ করে দেওয়া হল। কিন্তু সভা বন্ধের আগে শেষবার মাইকে চ্যালেঞ্জ দেওয়া হল—সাত দিনের মধ্যে এই ময়দানে আবার সভা হবে, সাধ্য থাকে যদি কেউ যেন সেই সভা ভাঙে।

কিন্তু সাত দিন পরে বা মধ্যে কংগ্রেসের আর সভা হয় নি। ২৫শে মার্চ সভা শেষ হবার পরই শ্রীঅরুণ মৈত্র শ্রীঅমর ভট্টাচার্যকে নিয়ে শিলিগুড়ি শহরের অনেক স্থানে ঘুরে নতুন করে সভা করার দিনস্থিরের চেষ্টা করেছিলেন—কিন্তু সে চেষ্টা সফল হয় নি। তার পরিবর্তে তিন দিন পরে ২৮শে সেই ময়দানে সফল সভা করলেন শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায়। ২৮শে সন্ধ্যার বাঘা যতীন পার্কে শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায় যখন মঞ্চে এলেন, তখন সমস্ত ময়দান টইটম্বুর, সারা শিলিগুড়ি শহর বোধ হয় ভেঙে পড়েছে বাঘা যতীন পার্কে। সভা চলছে, শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায় ভাষণ দিচ্ছেন, ঠিক এমন সময় সভার মাঝখান থেকে কিছু লোক উঠে দাঁড়িয়ে চীৎকার করে উঠল—আগুন, আগুন। আগেই সভায় উপস্থিত জনতা একটা মানসিক উত্তেজনায় ছিল, কারণ সকলেই জানত এই চ্যালেঞ্জের সভায় গোলমাল হতে পারে। সারা মাঠের মানুষ উঠে দাঁড়াল। শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায় বললেন—ও আগুন ঘরপোড়া আগুন নয়—রেল ইঞ্জিনের আগুন। সভার সকলে শান্ত হয়ে আবার বসল, কেউ কিন্তু পিছন ফিরে পরীক্ষা করল না কিসের আগুন—আর এত আগুন রেলের ইঞ্জিনে সম্ভব কি না। সভা শেষ হবার পর বোঝা গেল সত্যি ঐ আগুন রেলের ইঞ্জিনের আগুন নয়—সভা থেকে কিছুটা দূরে একটি বস্তিতে আগুন লেগেছিল। আগুনে ১৫টা বাড়ি পুড়ে গেছে। হয়ত শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায় সভা শেষ হবার আগে জানতে পারেন নি সেদিন তাঁর সভা চলাকালে সত্যি আগুন লেগেছিল, যার ফলে ১৫ জন গৃহস্থ সর্বহারা হয়েছিল। কি করে লেগেছিল সেই আগুন, সে সত্য আবিষ্কারের জন্য শিলিগুড়িতে কর্মরত যুগান্তরের প্রতিনিধি শ্রীনৃপেন বসু আর স্টেটসম্যানের প্রতিনিধি শ্রীঅশোক চট্টোপাধ্যায় তথ্য অনুসন্ধানের চেষ্টা করেছেন কিন্তু রহস্যের সন্ধান করতে পেরেছেন কি না জানি না। তবে একটি সত্য শিলিগুড়িতে প্রমাণিত হয়েছে যে, ঢিল পড়ে যেমন কোন কোন সভা ভেঙে যায় আবার ঘরে আগুন লাগবার পরও কোন কোন সভা শান্তভাবে চলে। চড়াই-উতরাই-এর দেশ তরাই উত্তরবঙ্গের এই বোধ হয় রাজনৈতিক চরিত্র।

অবক্তব্য

চন্দ্রগুপ্ত

একটি বিস্মৃত শতবার্ষিকী

আমিও ভুলে গিয়েছিলাম। না হলে গত বছর এরকম সময়েই সহমর্মী সহৃদয় পাঠককে শতবর্ষ পূর্বেকার একটি স্মরণীয় ঘটনার কথা মনে করিয়ে দিতাম। সারা দেশের তাতে কতখানি লাভ হতো জানি না, কিন্তু শতবার্ষিকী-উৎসাহী বাঙালীর অনুষ্ঠানের তালিকা কিঞ্চিৎ বাড়ত। আলোচ্য ঘটনার শতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে শহর কলকাতায় হয়তো দু-চারটি উৎসব-সভা হতো!

তেরো শ' চুয়াত্তরের আসন্ন চৈত্র-সংক্রান্তি আমাকে মনে করিয়ে দিচ্ছে বারো শ' তিয়াত্তরের চৈত্রসংক্রান্তিকে, যেদিন ছাতুবাবু অর্থাৎ আশুতোষ দেবের বেল-গাছিয়ার বাগানবাড়িতে কয়েকজন বাঙালী একটি মেলার আয়োজন করেছিলেন। সাধারণ মেলা থেকে এ মেলা উদ্দেশ্যে ও চরিত্রে ছিল স্বতন্ত্র। 'স্বজাতীয়দিগের মধ্যে সদ্ভাব সংস্থাপন করা ও স্বদেশীয় ব্যক্তিগণ দ্বারা স্বদেশের উন্নতিসাধন করা'ই ছিল এ মেলার উদ্দেশ্য। এ মেলার নাম 'হিন্দু মেলা' বা 'জাতীয় মেলা'। প্রথম তিন বছর চৈত্রসংক্রান্তির দিন অনুষ্ঠিত হয়েছিল বলে 'চৈত্রমেলা' নামেও এর পরিচিতি।

হিন্দু মেলার পরিকল্পনা রাজনারায়ণ বসুর। এ সম্পর্কে তাঁর নিজের উক্তি : 'আমি ইংরাজি ১৮৬৬ সালে Prospectus of a Society for the promotion of National Feeling among the Educated Natives of Bengal আখ্যা দিয়া ইংরাজিতে একটি ক্ষুদ্র পুস্তিকা প্রকাশ করি। তাহার অনুবাদ জাতীয় গৌরবেচ্ছাসঞ্চারিণী সভা সংস্থাপনের প্রস্তাব নামে এই গ্রন্থে (১২৮৯) সন্নিবিষ্ট হইল।...এই প্রস্তাব দ্বারা উদ্বুদ্ধ হইয়া বন্ধুবর শ্রীযুক্ত নবগোপাল মিত্র মহাশয় হিন্দু মেলা ও জাতীয় সভা সংস্থাপন করেন' (বিবিধ প্রবন্ধ, প্রথম খণ্ডের ভূমিকা)।

বাংলাদেশের অন্যান্য বহু সাংস্কৃতিক উদ্যোগের মতো হিন্দু মেলার ব্যাপারেও জোড়াসাঁকোর ঠাকুরপরিবার ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন। জীবনস্মৃতিতে রবীন্দ্র-নাথ বলেছেন, 'আমাদের বাড়ির সাহায্যে হিন্দুমেলা বলিয়া একটি মেলা সৃষ্ট হইয়াছিল'। জীবনস্মৃতির প্রথম পাণ্ডু-লিপিতে সন্নিবিষ্ট আরও বিশদ তথ্য এ রকম : 'দেশানুরাগ প্রচারের উদ্দেশে আমাদের বাড়ি হইতে হিন্দু মেলা নামে একটি মেলার সৃষ্টি হইয়াছিল।...বড়দাদা এবং আমার খুড়তত ভাই গণেন্দ্রদাদা ইহার প্রধান উদ্যোগী ছিলেন — তাঁহারা নবগোপাল মিত্রকে এই মেলার কর্মকর্তা-রূপে নিযুক্ত করিয়া ইহার ব্যয়ভার বহন করিতেন।' রবীন্দ্রনাথের অন্যতম অগ্রজ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বলেছেন : 'এই সময়েই [ইং ১৮৬৭] শ্রীযুক্ত নবগোপাল মিত্র মহাশয়ের উদ্‌যোগে ও শ্রীযুক্ত গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের আনুকূল্য ও উৎসাহে হিন্দুমেলা প্রতিষ্ঠিত হইল। শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও দেবেন্দ্রনাথ মল্লিক মহাশয়েরা হইলেন মেলার প্রধান পৃষ্ঠ-পোষক। শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ঘোষ এবং মনোমোহন বসুও এই মেলায় খুব উৎসাহী ছিলেন' (জ্যোতিস্মৃতি, পৃঃ ১২৭-২৮)। সংক্ষেপে, 'ন্যাশানাল পেপার' নামক পত্রিকার (প্রথম প্রকাশ ৭ অগস্ট ১৮৬৫) সম্পাদক নবগোপাল মিত্রের উদ্যোগ ও গণেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আনুকূল্যে ও উৎসাহে ১২৭৩ সালের চৈত্রসংক্রান্তির দিনে, ইংরেজী ১৮৬৭ খৃস্টাব্দের ১২ এপ্রিল, হিন্দু মেলা বা জাতীয় মেলা সংস্থাপিত হয়। প্রথম তিন বছর মেলার সম্পাদক ও সহকারী সম্পাদক ছিলেন যথাক্রমে গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং নবগোপাল মিত্র। ১৮৬৯ খৃস্টাব্দের ১৬ মে গণেন্দ্রনাথের মৃত্যু হ'লে রবীন্দ্রনাথের বড়দা দ্বিজেন্দ্র-নাথ মেলার সম্পাদক হন এবং মেলার চতুর্থ থেকে সপ্তম সাম্বৎসরিক অধিবেশন পর্যন্ত সম্পাদকের কাজ করেছিলেন। দ্বিজেন্দ্রনাথ দু'বার—১৮৭৪ (অষ্টম অধিবেশন) ও ১৮৭৬ (দশম অধিবেশন)—এই মেলার সভাপতিও হয়েছিলেন।

*

দীর্ঘস্থায়ী হয় নি হিন্দুমেলা, ১৮৮০-৮১ সাল পর্যন্ত চলেছিল। তবু বাংলাদেশের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসে হিন্দু মেলা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। হিন্দু মেলার সেই গুরুত্ব ব্যাখ্যানের পূর্বে মেলার উদ্দেশ্য ও উদ্দেশ্যসাধনের কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে কিছু বলা প্রয়োজন। মেলার দ্বিতীয় অধিবেশনের (ইং ১৮৬৮) গণেন্দ্রনাথ ও নবগোপাল রচিত। কার্যবিবরণী থেকে প্রাসঙ্গিক অংশ উদ্ধার করি। এ অংশে মেলার অনুষ্ঠাতা ও পৃষ্ঠপোষকদের পরিচয়ও বিধৃত।

'১৭৮৮ শকের চৈত্রসংক্রান্তিতে যে একটি জাতীয় মেলা হইয়াছিল, স্বজাতীয়-দিগের মধ্যে সদ্ভাব স্থাপন করা ও স্বদেশীয় ব্যক্তিগণ দ্বারা স্বদেশের উন্নতি-সাধন করাই তাহার উদ্দেশ্য।'

উদ্দেশ্যকথনের পর উদ্দেশ্যসাধনের উপায়গুলি সম্পর্কে কার্যবিবরণীর তথ্য :

'১। এই মেলাভুক্ত একটি সাধারণ মণ্ডলী সংস্থাপিত হইবে, তাঁহারা হিন্দু জাতিকে উপরোক্ত লক্ষ্য সকল সংসাধন জন্য একদলে অভিভুক্ত এবং স্বদেশীয় লোকগণ মধ্যে পরস্পরের বিদ্বেষভাব উন্মূলন করিয়া উপরোক্ত সাধারণ কার্যে নিযোগ করত এই জাতীয় মেলার গৌরব বৃদ্ধি করিবেন।

২। প্রত্যেক বৎসরে আমাদিগের হিন্দু সমাজের কতদূর উন্নতি হইল, এই বিষয়ের তত্ত্বাবধারণ জন্য চৈত্রসংক্রান্তিতে সাধারণের সমক্ষে একটি সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত পাঠ করা হইবে।

৩। অস্মদ্দেশীয় যে সকল ব্যক্তি স্বজাতীয় বিদ্যানুশীলনের উন্নতিসাধনে ব্রতী হইয়াছেন তাঁহাদিগের উৎসাহ বর্ধন করা হইবে।

৪। প্রতি মেলায় ভিন্ন ভিন্ন স্থানের ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর লোকের পরিশ্রম ও শিল্পজাত দ্রব্য সংগৃহীত হইয়া প্রদর্শিত হইবে।

৫। প্রতি মেলায় স্বদেশীয় সঙ্গীত-নিপুণ ব্যক্তিগণের উৎসাহ বর্ধন করা যাইবে।

৬। যাঁহারা মল্লবিদ্যায় সুশিক্ষিত হইয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছেন, প্রতি মেলায় তাঁহা-দিগকে একত্রিত করিয়া উপযুক্ত পারি-তোষিক বা সম্মান প্রদান করা যাইবে এবং স্বদেশীয় লোকমধ্যে ব্যায়ামশিক্ষা প্রচলিত করিতে হইবে।'

এই ছ'টি উদ্দেশ্য সাধনের জন্য দেশের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের নিয়ে ছ'টি মণ্ডলী বা কার্যনির্বাহক সমিতি গঠিত হয়েছিল। সমিতির সদস্যদের নাম যথাক্রমে দেওয়া হলো :

১। রাজা কমলকৃষ্ণ বাহাদুর, রমানাথ ঠাকুর, দিগম্বর মিত্র, তারিণীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, কাশীশ্বর মিত্র, দুর্গাচরণ লাহা, নীলকমল বন্দ্যোপাধ্যায়, ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষাল, মহেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, প্যারীচরণ সরকার, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, জয়গোপাল সেন, দেবেন্দ্রনাথ মল্লিক, কৃষ্ণদাস পাল এবং যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর।

২। নীলকমল বন্দ্যোপাধ্যায়, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, ভোলানাথ পাল, রাধিকাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এবং জগচ্চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

৩। মহেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, প্যারীচরণ-সরকার, রাজনারায়ণ বসু, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য, জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন, ভারতচন্দ্র শিরোমণি, ভবশঙ্কর বিদ্যারত্ন, তারানাথ তর্কবাচস্পতি এবং হরিচরণ তর্কসিদ্ধান্ত।

৪। কুমার সুরেন্দ্রকৃষ্ণ দেব, জয়গোপাল সেন, প্রসাদদাস মল্লিক, প্রিয়নাথ ঘোষ, ব্রজনাথ দেব, জয়গোপাল মিত্র, যাদবচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এবং সালিকরাম।

৫। সুরেন্দ্রকৃষ্ণ দেব, অক্ষয়কুমার মজুমদার এবং ব্রজনাথ দেব।

৬। ঈশানচন্দ্র ঘোষাল, দুর্গাদাস কর, গোপাল মিত্র, অম্বিকাচরণ গুহ। কালীপ্রসন্ন ঘোষ, ভবানীচরণ গুহ, নীলকমল মুখোপাধ্যায় এবং যজ্ঞেশপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায় আয়-ব্যয় পরীক্ষার ভার গ্রহণ করেছিলেন।

*

আপাতদৃষ্টিতে হিন্দুমেলা একটি সাধারণ মেলা মাত্র, কিন্তু ঐতিহাসিকের বিচারে এই মেলা দেশে জাতীয়তার অন্যতম উদ্বোধক। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, এই মেলাতেই প্রথম 'ভারতবর্ষকে স্বদেশ বলিয়া ভক্তির সহিত উপলব্ধির চেষ্টা' হয় (জীবনস্মৃতি, রবীন্দ্র রচনাবলী, শতবার্ষিক সংস্করণ, দশম খণ্ড, পৃঃ ৬৬)। রবীন্দ্রাগ্রজ সত্যেন্দ্রনাথ এই মেলাকে 'স্বদেশী মেলা'-রূপে বর্ণনা ক'রে বলেছেন, 'কলিকাতার প্রান্তবর্তী কোন একটি উদ্যানে বৎসরে বৎসরে তিন-চারিদিন ধ'রে এই মেলা চলতো। সেখানে দেশী জিনিসের প্রদর্শনী, জাতীয় সঙ্গীত, বক্তৃতাদি বিবিধ উপায়ে লোকের দেশানুরাগ উদ্দীপ্ত করবার চেষ্টা করা হতো।' অন্যতম রবীন্দ্রাগ্রজ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের মতে 'হিন্দুমেলাই বঙ্গদেশে, যদি সমগ্র ভারতবর্ষে না-ও হয়, সর্বপ্রথম জাতীয় শিল্প-প্রদর্শনীর (National Industrial Exhibition-এর) পত্তন' করে। সমসাময়িক সাক্ষ্য ও মন্তব্য এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক তথ্যের ভিত্তিতে নিঃসন্দেহেই বলা চলে, ১৮৬৭ খৃস্টাব্দের হিন্দু মেলাতে আমাদের স্বদেশবোধের উচ্চারণ প্রথম স্পষ্টভাবে শোনা যায়।

সাহিত্যের ইতিহাসকারের কাছেও হিন্দু মেলার বিশিষ্ট আকর্ষণ বিদ্যমান। এই মেলাতেই রবীন্দ্রনাথ সর্বপ্রথম প্রকাশ্যে স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন। ১৮৭৫ খৃস্টাব্দে ১১ ফেব্রুয়ারী আপার সার্কুলার রোডের (অধুনা আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোডের) বিখ্যাত পার্শীবাগানে রাজনারায়ণ বসুর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হিন্দু মেলার নবম অধিবেশনে রবীন্দ্রনাথ পঠিত সেই স্বরচিত কবিতার নাম 'হিন্দু মেলার উপহার'।১ (রবীন্দ্র রচনাবলী, চতুর্থ খণ্ড, শতবার্ষিক সংস্করণ; পৃঃ ৮২৪)। কবিতাটি ২৫ ফেব্রুয়ারীর 'অমৃতবাজার পত্রিকা'-য় রবীন্দ্রনাথের স্বাক্ষরযুক্ত হয়ে প্রকাশিত হয়েছিল। এইটিই রবীন্দ্রনাথের প্রথম স্বাক্ষরযুক্ত রচনা। ১৮৭৭ সালে হিন্দু মেলার একাদশ অধিবেশনে রবীন্দ্রনাথ আর একটি কবিতা পাঠ করেছিলেন, যার প্রসঙ্গ দিল্লী দরবার এবং যার উল্লেখ কবি স্বয়ং তাঁর জীবনস্মৃতিতে ক'রে গেছেন। এই কবিতাটির সন্ধান সমসাময়িক কোনো পত্রিকায় পাওয়া যায় নি, তবে গবেষকদের অনুমান জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাঁর 'স্বপ্নময়ী নাটক'-এর (ইং ১৮৮২) চতুর্থ অঙ্কের চতুর্থ গর্ভাঙ্কে শুভ সিংহের স্বগত কবিতারূপে আলোচ্য কবিতাকে ব্যবহার ব্যবহার করেছেন। রবীন্দ্রনাথের মেজদাদা সত্যেন্দ্রনাথও হিন্দু মেলা উপলক্ষে কতকগুলি দেশাত্মবোধক গান লেখেন। বিখ্যাত 'মিলে সবে ভারত সন্তান' জাতীয়-সঙ্গীতটি হিন্দু মেলার দ্বিতীয় অধিবেশনে (এপ্রিল ১৮৬৮) গাওয়া হয়। মেলার সম্পাদক গণেন্দ্রনাথ রচিত ও জীবনস্মৃতির 'বাড়ির আবহাওয়া' অধ্যায়ে উল্লিখিত 'লজ্জায় ভারত যশ গাইব কি ক'রে' গানটিও উক্ত দ্বিতীয় অধিবেশনে পরিবেশিত হয়েছিল।

*

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ বাংলার তথা ভারতের ইতিহাসে (মোটামুটিভাবে, উনিশ শতকের প্রথমার্ধের অবসানের পর থেকেই) নানাভাবেই গুরুত্বপূর্ণ। এই সময়েই সমাজ রাজনীতি অর্থনীতি সংস্কৃতি প্রভৃতি বিভিন্ন ক্ষেত্রে সার্থক আত্মপ্রকাশের প্রেরণায় ভারতবাসী ক্রমশ উদ্বেল হ'তে শুরু করে। জাতীয়তাবোধের সুস্পষ্ট সংহত রূপ বা তার বহুমুখী প্রকাশ একদিনেই সম্ভব নয়, ইংরেজশাসিত ভারতবর্ষেও এ ঘটনা সময়-সাপেক্ষ ছিল। বাংলাদেশে ১৮৬৭ খৃস্টাব্দে হিন্দু মেলার প্রথম অধিবেশনে বিক্ষিপ্ত স্বদেশচিন্তা ও জাতীয়তাবোধকে সংহত করার প্রথম প্রয়াস পরিলক্ষিত হয় বলেই এই মেলা সশ্রদ্ধ স্মরণের যোগ্য। নামত হিন্দু মেলা হলেও এটি সর্বজাতির মেলা, জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকলেই এতে অংশ গ্রহণ করত। কি সাহিত্যে কি শিল্পে কি ভাষণে কি সঙ্গীতে এ মেলার সকল প্রচেষ্টাতেই দেশাত্মবোধের উচ্চারণ শ্রবণযোগ্য এবং স্পষ্টভাবেই শ্রুতিগোচর। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে এবং পরোক্ষ-অপরোক্ষভাবে আমাদের জাতীয়চেতনার ক্রমবিকাশে যে-পরিবারের দান অদ্বিতীয়, সেই ঠাকুরপরিবার ছিল এই মেলার প্রধান উদ্যোক্তা ও প্রাণস্বরূপ। দ্বিজেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথ, গণেন্দ্রনাথ প্রমুখের সক্রিয় সাহায্য ও সমর্থনে এ মেলা সম্ভব হয়েছিল। তাঁদের সঙ্গে ছিলেন রাজনারায়ণ বসু, 'ইংরেজি বিদ্যাতে বাল্যকাল থেকে মানুষ' হয়েও 'বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের মধ্যে পূর্ণ উৎসাহ ও শ্রদ্ধার বেগে' যিনি প্রবেশ করেছিলেন। আর ছিলেন নবগোপাল মিত্র যাঁর উৎসাহ ও কর্মক্ষমতা ছিল সমসাময়িকদের বিস্ময়। পূর্বে পরিবেশিত তথ্যানুসারে সেকালের বহু গণ্যমান্য বাঙালী এই মেলার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। সন্দেহ নেই, হিন্দু মেলা সেকালের জনচিত্তকে বিপুলভাবে আলোড়িত করেছিল। হিন্দু মেলা দীর্ঘস্থায়ী হয় নি, কিন্তু পরবর্তীকালের উপর এর প্রভাব দুর্লক্ষ্য নয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ, ১৯০৪ সালের ২২ জুলাই মিনার্ভা থিয়েটারে অনুষ্ঠিত সভায় স্বপঠিত (ভাদ্র ১৩১১ 'বঙ্গদর্শন'-এ প্রকাশিত) 'স্বদেশী সমাজ' নামে বিখ্যাত প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ পল্লীসংগঠন ও পল্লীসেবার জন্য যে বাস্তবো-

---

১। ১৫ ফেব্রুয়ারী তারিখের 'ইণ্ডিয়ান ডেলি নিউজ'-এর প্রতিবেদকের ভাষায়, 'আনুমানিক পঞ্চদশবর্ষীয় সুদর্শন কিশোর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাংলা ভাষায় ভারতবর্ষ সংক্রান্ত যে কবিতা রচনা করেছিলেন সেটি তিনি স্মৃতির সাহায্যে পাঠ করেছিলেন; তাঁর কণ্ঠস্বরের মাধুর্য শ্রোতাদের বিশেষ আনন্দ দিয়েছিল" (Rabindranath Tagore ..., a handsome lad of some 15, had composed a Bengali poem on Bharut (India) which he delivered from memory ; the suavity of his tone much pleased his audience).

চিত্ত কার্যপদ্ধতি গ্রহণের কথা বলেন, তাঁর মূলে হিন্দুমেলার আদর্শ সক্রিয় ছিল মনে করতে অসুবিধা হয় না। অন্তত 'রবীন্দ্রজীবনী'-কার শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমারের বিশেষজ্ঞ অভিমতের আলোকে মনে হয়, রবীন্দ্রনাথের শৈশবে হিন্দু মেলার যে আদর্শ গণেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ প্রমুখ যুবকেরা ব্যক্ত করেছিলেন, সেই আদর্শই রবীন্দ্রনাথ প্রৌঢ়কালে দেশের সমক্ষে প্রকাশ করেন; এবং শুধু প্রকাশ করেই ক্ষান্ত হন নি, নিজের জমিদারিতে পর্যন্ত সে আদর্শ রূপায়িত করতে প্রয়াসী হয়েছিলেন ('রবীন্দ্রজীবনী', দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ১২৫)।

পরিবর্তমান এই ভারতবর্ষে আজ মেলাব সংখ্যা কমে এসেছে হিন্দু মেলার সংখ্যা কমে এসেছে, হিন্দু আর হয় না, হওয়া বোধ করি সম্ভবও নয়। তবু প্রশ্ন থেকে যায় ঃ স্মরণীয় এই হিন্দুমেলার জন্মশতবর্ষে শতবার্ষিকীপ্রিয় আজকের বাঙালী কি কিছু করতে পারত না? পারত না কি অন্তত একটিবার হিন্দু মেলার আদর্শে একটি মেলা সংস্থাপন ক'রে হিন্দু মেলা ও তার উদ্যোক্তাদের স্মরণ করতে? সংস্কৃতির প্রতি আমাদের আগ্রহ কম বা কমে আসছে এ অপবাদ বাঙালীরা মেনে নিতে চাইবেন না। প্রতি বছর রবীন্দ্র-কানন মার্কাস স্কোয়ার প্রভৃতি উদ্যানকল্প উদ্যানে সাড়ম্বর সাংস্কৃতিক মেলাব অনুষ্ঠান বাঙালীর সংস্কৃতি-নিরুৎসাহের সোচ্চার প্রতিবাদ। কিন্তু এ প্রতিবাদ কি আপাত নয়? এ প্রতিবাদ কি যথার্থ? আমাদের ক'টি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের পেছনে থাকে সুচিন্তিত পবিকল্পনা? ক'টি অনুষ্ঠানে মেলে জাতীয় ভাবাদর্শ?

হিন্দু মেলার শতবর্ষপূর্তিকে যদি বাঙালী স্মরণ না করে থাকেন, তবে তাতে বিস্মিত বা দুঃখিত হবার কিছু নেই। কারণ, হিন্দু মেলার মধ্যে ছিল 'ভারতবর্ষকে স্বদেশ বলিয়া ভক্তির সহিত উপলব্ধির চেষ্টা।'১ বলা বাহুল্য, আজকের বাঙালী আজকের ভারতীয়ের মধ্যে সেই চেষ্টা বিরল। ভারতবর্ষে আজ অন্য সব দেশ আছে, নেই শুধু ভারতবর্ষ। হিন্দু-মেলার বিস্মরণ তাই বিস্ময়কর তো নয়ই, তথা ভারতীয় চরিত্রের সঙ্গে চমৎকার সুসমঞ্জস।

(৫।৪।৬৮)

১। হিন্দু মেলার মাধ্যমে উদ্বোধিত দেশাত্মবোধ সম্পর্কে সত্যেন্দ্রনাথ বলেছিলেন ঃ "এই স্বদেশীভাবের যে পুনরুজ্জীবন হয়েছে এ-ভাব যদি দেশময় বিস্তার লাভ ক'রে শাশ্বতকাল স্থায়ী হয় তাহলেই দেশের মঙ্গল প্রত্যাশা করা যায়।" (বাল্যকথা ও বোম্বাই প্রবাস)

সত্যেন্দ্রনাথের এ আশা কবে পূর্ণ হবে?

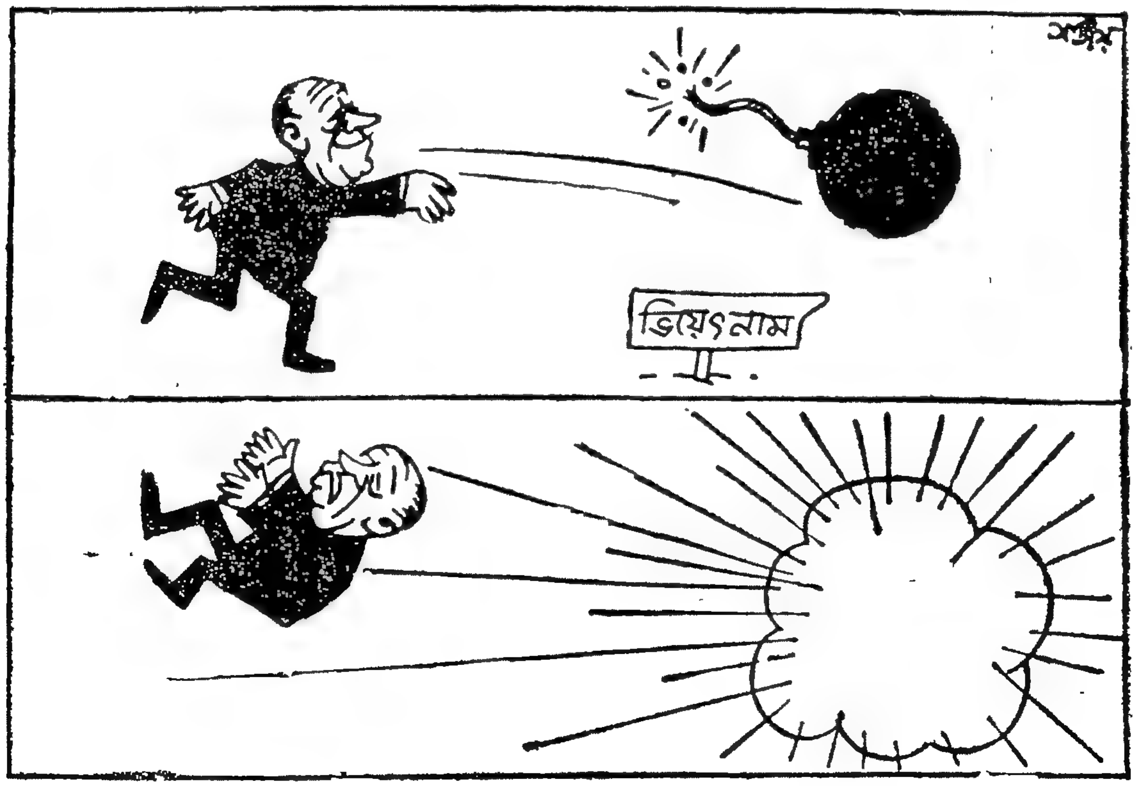

ভারত দর্শন

অট্টালিকায় ধ্বস

বিগত সাধারণ নির্বাচনে কংগ্রেসী রাজপ্রাসাদের ভিত টলেছে, এইবার অট্টালিকায় ধ্বস প্রত্যক্ষ হয়ে উঠল।

বিভিন্ন রাজ্য গত নির্বাচনে লোকসভায় অপেক্ষাকৃত কম হারে কংগ্রেসী প্রতিনিধি প্রেরণ করেছে। একাধিক রাজ্যে গঠিত, ভগ্ন এবং পুনর্গঠিত হয়েছিল অকংগ্রেসী মন্ত্রিসভা। এখনো কোনো কোনো রাজ্যে অকংগ্রেসী মন্ত্রিসভা পুনর্গঠনের আভাস পাওয়া যাচ্ছে। রাজ্যে রাজ্যে কংগ্রেসী 'কোটা'র এই সংখ্যা হ্রাস বিধানসভার কংগ্রেসী পক্ষকে দুর্বল করে দিয়েছে। এই বিধানসভাই রাজ্যসভার ভিত স্বরূপ। ভিত অশক্ত হওয়ার কাজে-কাজেই রাজ্যসভার কংগ্রেসী অট্টালিকাও পতনোম্মুখ হয়েছে। ১৯৬৮ সালে রাজ্যসভার দ্বি-বার্ষিক নির্বাচনে এই অনিবার্য পতন লক্ষণীয় হয়ে উঠল।

রাজ্যসভায় মোট আসনের সংখ্যা দুশ চল্লিশ যার বারটি মনোনীত সদস্যের জন্য সংরক্ষিত। ইতিপূর্বে রাজ্য বিধানসভায় কংগ্রেসী সদস্যের সংখ্যাগরিষ্ঠতা হেতু বিধানসভাগুলির দ্বারা নির্বাচিত রাজ্যসভার সদস্যবর্গের মধ্যে কংগ্রেসী প্রাধান্যই বর্তমান ছিল। কিন্তু গত নির্বাচনে বিধানসভার কংগ্রেসী ভিত নড়ে উঠল। সুতরাং সাম্প্রতিক রাজ্যসভার নির্বাচনে কংগ্রেসের শক্তি হ্রাস পেলো ১৪৪ সদস্যের সংখ্যাগরিষ্ঠতা থেকে ৬৪টি আসনের সংখ্যাধিক্যে। অর্থাৎ ১৯৬০ সালে মোট বিরোধী আসনের ওপর কংগ্রেসী গরিষ্ঠতা যেখানে ছিল ১৪৪ আসনে, ১৯৬৮-র দ্বি-বার্ষিক নির্বাচনে সেই ব্যবধান হ্রাস পেয়ে হল মাত্র ৬৪। এই মারাত্মক উত্তাপ পতন হঠাৎ হলে প্রায় নাড়ী ছাড়ার যোগাড় হত। গত সাধারণ নির্বাচনের পর অনেকটা সেইমত অবস্থা বিপাকেই কংগ্রেসকে পড়তে হয়েছে। কেন না গত নির্বাচনের পরেই কংগ্রেসে দলগত শৃঙ্খলা যেন চোখের পলকে শিথিল হয়ে পড়ল, যাকে সাংগঠনিক ধ্বস বলা যেতে পারে। দ্বিতীয় আঘাত এলো রাজ্যসভার গরিষ্ঠতা হ্রাসে। অবশ্য রাজ্য বিধানসভায় আসন হারাবার কালেই এ ধাক্কার জন্য প্রস্তুত হয়েই আছে কংগ্রেস। যা অনিবার্য তা যথার্থই ঘটেছে। বরং আরও যে দু-চারটি আসন হারানোর কথা, কোন রাজ্যে রাষ্ট্রপতির শাসন চালু থাকায় তা সাময়িকভাবে রহিত আছে। বিধানসভা চালু হলে সেই রাজ্যের প্রতিনিধি নির্বাচনের সময় কংগ্রেসী আসন সংখ্যা আরও হ্রাস পাবে। অপরাপর অবস্থা সমান থাকলে হিসাব মত ১৯৭০ সালের দ্বি-বার্ষিক নির্বাচনেই কংগ্রেসকে আরও কুড়িটি আসন (রাজ্যসভায়) হারাতে হবে। এখনই যে অবস্থা তাতে দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতাও রাজ্যসভায় কংগ্রেসীদের রইল না।

উল্লেখযোগ্য যে, কংগ্রেসের ওপর আজ ধাক্কাটা বেশ ভারী বোধ হলেও কংগ্রেসের শক্তি হ্রাসের শুরু ১৯৬০ সাল থেকেই। ১৯৬০ সালের পর রাজ্যসভায় কংগ্রেসী আসন সংখ্যা ক্রমহ্রাসমানতার দিকে ঝুঁকে নিয়েছিল। কর্তারা তখনই কাজে ও কথায় সমন্বয় সাধন করতে পারলে, নিজের থেকে দলের এবং দলের চেয়ে দেশের স্বার্থের দিকে যথাযথ নজর দিলে আজকের ধ্বস হয়ত এতোটা প্রচণ্ড আকার ধারণ করত না। কিন্তু কংগ্রেস তার পপুলারিটির ভরা কলস ক্রমাগত গড়িয়ে চলে আজকের বিপর্যয় স্বেচ্ছায় বরণ করে নিয়েছে। সুতরাং এখন হা-হুতাশেও আর ফল নেই। পড়তি জমিদারের মতো কংগ্রেসের ভাঙন আজ অপ্রতিরোধ্য। ওপর ওপর যতটুকু ঠাট বজায় রেখে চলা যায়। অবস্থা এতোদূর সঙ্গীণ যে কেন্দ্রে কংগ্রেসী কক্ষ থেকে দলত্যাগ ঘটলে সেখানেও কংগ্রেসী মন্ত্রিসভার পতন যে কোনো মুহূর্তে ঘটে যেতে পারে। তবে অকংগ্রেসী মহলে কম্যুনিস্ট, আধা-কম্যুনিস্ট, সমাজতান্ত্রিক, আধা সমাজতান্ত্রিক দক্ষিণী অতি-দক্ষিণী প্রমুখ পঞ্চভূতের বিভূতি যেখানে স্ব-স্ব উত্তাপে জ্বলছে তাতে সম্মিলিত শক্তি নিয়ে কংগ্রেসকে ক্ষমতাচ্যুত করার আশা অ-কংগ্রেসী মহলে সুদূর পরাহত ব্যাপার। তাই ইঁট বার করা অট্টালিকাও যেমনভাবে বছরের পর বছর যে কোনো মুহূর্তে পতনের ইঙ্গিত রেখেও বুড়ো হাড়ে টিকে থাকে, এ দেশে কংগ্রেসও তেমনিভাবেই টিকে থাকবে।

দলত্যাগ বন্ধের জন্য প্রথম যখন বিভিন্ন কোণ থেকে দাবি উঠেছিল, কংগ্রেস বিশেষ গা করে নি। দলত্যাগের মাধ্যমে মন্ত্রিসভাগুলি করায়ত্ত করা একটা সহজ পথ হবে এমন ধারণাও ঐ নিঃশব্দতার অন্যতম কারণ হতে পারে। কিন্তু ক্রমে হীনবল হয়ে পড়ায় এবং একাধিক রাজ্যে দলত্যাগ ঘটিয়ে আশানুরূপ ফললাভ না হওয়ায় এখন দলত্যাগ বন্ধের দিকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর নজর পড়েছে। শুভ লক্ষণ সন্দেহ নেই। তবে এখন দায়ে ঠেকে হচ্ছে তাও বুঝতে কারও বেগ পেতে হবে না। দলত্যাগের পরীক্ষা-নিরীক্ষায় বা এক্সপেরিমেন্টে একরকম কংগ্রেসের পরাজয়ই ঘটেছে। বর্তমানে তাই সাধু সংকল্প কংগ্রেসকে বেশ উত্তেজিত রেখেছে। রাখতেই হবে, ঐ দলত্যাগের ফ্রাঙ্কেনস্টাইন নচেৎ কোনও এক ক্ষণে কেন্দ্রীয় ক্ষমতায় কংগ্রেসী দাবার ছক উল্টে ধরতে পারে।

হরিয়ানায় দলত্যাগ নিবারণী প্রচেষ্টা

হরিয়ানায় দলত্যাগীদের প্রতি কংগ্রেসের অনমনীয় মনোভাব ঐ নবচেতনারই পরিচায়ক। কংগ্রেস সংসদীয় পর্ষৎ হরিয়ানার অন্তর্বর্তীকালীন নির্বাচনে একাশী আসনের মধ্যে চৌত্রিশটির ক্ষেত্রে চূড়ান্ত মনোনয়ন প্রদান করেছেন। মনোনয়ন দান কালে দলত্যাগীদের মনোনয়নপত্র না দেওয়া সম্পর্কে এবং বর্তমান সদস্যদের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দানের ব্যাপারে কংগ্রেস বস্তুত প্রশংসনীয় কঠোর মনোভাব অবলম্বন করেছেন। সর্বত্র এই মনোভাব রক্ষিত হলে কংগ্রেস তার হৃত মর্যাদা অনেকটা পূরণ করতে পারবে এবং গণ আস্থা পুনরধিকারে সক্ষম হবে বলে মনে হয়। দলত্যাগীদের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধতে গিয়ে কংগ্রেসের যে মর্যাদাহানি ঘটেছে, দলত্যাগীদের সঙ্গে নিঃসম্পর্ক হলে সেই মর্যাদা সুদে-আসলে ফিরে আসবে বলেই বিশ্বাস। দলত্যাগীদের যুক্তফ্রণ্টে স্থান দেওয়া হলে জনসমক্ষে যুক্তফ্রণ্ট হেয় হয়ে পড়বে। অথচ যুক্তফ্রণ্টে পাঁচ শরিকের পাঁচ মতামত মানতে গিয়ে অনেক বিশিষ্ট দলকেও হয়ত দলত্যাগীদের স্থান দেওয়ার প্রশ্নটা নিরুপায়ভাবে মেনে নিতে হবে। ফলত কংগ্রেস কঠোর মনোভাব অবলম্বন করলে কংগ্রেসের পক্ষে জনগণের দ্বারে উপস্থিত হওয়াও অনেক সহজ হয়ে পড়বে।

দলত্যাগ নিবারণে 'রিকলই' একমাত্র ওষুধ

মার্ক্সবাদী কম্যুনিস্ট দল ব্যতীত আর সমস্ত দল থেকেই ক্ষমতার লোভে, মন্ত্রিত্বের উচ্চাশায় এবং অন্যান্য উৎকোচের আকর্ষণে বিগত নির্বাচনের পরই যেভাবে দলত্যাগের হিড়িক শুরু হয়ে গেছে তাতে প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দলই আতঙ্কের ছবি দেখতে পাচ্ছেন। দলত্যাগের এবং দলত্যাগী সহযোগে মন্ত্রিসভা গঠন যত সহজ, ঠিক ততটা সহজভাবেই মন্ত্রিত্ব হারাতে বসে এখন সব দলেরই টনক নড়েছে যে কাজটা আদৌ ভালো নয়। যতকাল সুবিধার কাঁঠালটি নাগরিকদের মাথায় ভেঙে রাজনীতি করা যায় ততকালই ভালো; কিন্তু কাঁঠাল যখন নারকেলের আকারে রাজনৈতিক দলের নীরেট মাথাটি যখম করতে উদ্যত বলা বাহুল্য তখন দলত্যাগটা নিয়ে রাজনৈতিক মাথা ঘেমে উঠবেই। উঠেওছে।

সবচেয়ে বেশি ভাবিত আজ কংগ্রেস। যতই হটে গিয়ে থাক, আজও ভারতে কংগ্রেসই প্রথম দল, অন্যান্যরা কখনো দ্বিতীয় কখনো তৃতীয়। এই অবস্থায় দলত্যাগের মতো মানসিকতাকে প্রশ্রয় দিলে পরিণামে কংগ্রেস যে কী পরিমাণ ক্ষতিগ্রস্ত হবে তারই একটা আগ-জানান খুব অল্পকালের মধ্যেই পাওয়া গেছে এই একটি বছরে। আশা করি বহু আলোচিত সে প্রসঙ্গের পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন। সবাই জানেন দলত্যাগের মুগুরটি সব চেয়ে জোরদার আঘাত করেছে কংগ্রেসেরই ওপর। এখন ব্যাপারটা সামলাতে হবে।

কংগ্রেসী মহলে সে চিন্তাও শুরু হয়েছে। তবে যেহেতু দলত্যাগের নৈতিক দিকটার চেয়ে বিভিন্ন দলে এর রাজনৈতিক দিকটাই অপেক্ষাকৃত গুরুত্ব পাচ্ছে, তাই দলত্যাগ বন্ধের সহজতম কঠোর প্রক্রিয়াটি একবাক্যে গ্রহণে এখনো ইতস্তত চিত্ত-বিক্ষেপ লক্ষ্য করা যায়।

দলত্যাগ সুরু হওয়া মাত্র 'ভারত-দর্শনে'র পৃষ্ঠায় ক্রমাগত 'রিকল' প্রথা প্রবর্তনার জন্য আবেদন-নিবেদন এবং আলোচনা উপস্থাপিত হয়েছে। আজ সেই রিকলের প্রশ্নটিও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র-দপ্তরের অন্যতম বিবেচ্য বিষয়। অথচ আমাদের আপত্তি ঐ অন্যতমে। আমরা চেয়েছি 'রিকল' এবং একমাত্র 'রিকল'ই দলত্যাগীর সুবিধাবাদী মনোরোগের বিষ ঝেড়ে সাফ করে দিতে পারে। নান্যঃ পন্থা।

দলত্যাগ দেখা দিলে বিধানসভা ভেঙে দিয়ে পুনর্নির্বাচন একটি ব্যয়সাধ্য ব্যাপার, কয়েকজন কুমন্ত্রণাবীর দুষ্কার্যের জন্য যে শাস্তি রাজ্যবাসী কিম্বা জাতির স্কন্ধে চাপিয়ে দেওয়ার ন্যায্য অধিকার রাজনৈতিক দলগুলির নেই ও থাকা উচিত নয়। এছাড়া মুখ্যমন্ত্রীরা যদি বিধানসভা ভেঙে দেওয়ার অধিকারী হন যে অধিকার আজ রাজ্যপালের দ্বারা প্রযুক্ত হচ্ছে তবে ক্ষমতাসীন দলের হাতেই এতদ্বিষয়ে মাতব্বরি করার চূড়ান্ত অধিকারই তুলে দেওয়া হয়। পরন্তু এক্ষেত্রে মুখ্যমন্ত্রী ভার্সাস রাজ্যপালের দ্বন্দ্বেরও প্রকৃত অবসান ঘটছে না। রাজ্যপালের 'প্লেজার' যে কী ভয়ানক চীজ এবং তা নিয়ে কত কাণ্ডই ঘটতে পারে পশ্চিমবঙ্গ তার দীর্ঘ নজীর নথিবদ্ধ করেছে ইতিমধ্যেই। পশ্চিমবঙ্গে তুলকালাম কাণ্ড দেখেই বিহার সংযত ছিল, নচেৎ বিহারেও রাজ্যপালের 'প্লেজার' অনেক সংকটের জন্মদান করতে পারত। মুখ্যমন্ত্রী বিধানসভা ভাঙতে পারেন কিম্বা ভেঙে দেওয়ার জন্য রাজ্যপালকে পরামর্শ দান করতে পারেন; রাজ্যপাল সে পরামর্শ গ্রহণ করতে পারেন অথবা তাঁর 'প্লেজার' প্রয়োগ করতে পারেন দলত্যাগীদের শিক্ষাদানের জন্য। এ সব ফালতু প্রশ্নকে গণনার মধ্যে না রাখাই ভালো। রাখলে ব্যাপারটা দলত্যাগীর হুমকী বাড়াবে চাই কমাবে না। দলত্যাগও বন্ধ হবে না। যখনই দলত্যাগী জানবেন, তাঁর দলত্যাগের ফলে যে সংকট সৃষ্টি হবে তা প্রত্যেক রাজনৈতিক দল এমন কি যাঁদের ভোট কুড়িয়ে তিনি সদস্যপদের ক্যাপিটল অর্জন করেছেন, তাঁদেরই ওপর চাপ সৃষ্টি করবে; অন্তর্বর্তী নির্বাচন সকল নির্বাচিত সদস্যকেই পুনর্নির্বাচনের সম্মুখীন করাবে দু-একজন দলত্যাগীর মর্জিতে; তখন দলত্যাগীর পক্ষে সুবিধা লোটার সুযোগ বরং বেড়েই যাবে। গোপনে দলত্যাগের হুমকী দিয়েই তিনি অভীষ্ট লাভ করতে পারবেন। কেন না অন্তর্বর্তী নির্বাচনের ধকল স্বীকার করতে কোনো দলই সহজে সম্মত হবে না। বরং হুমকীদারকে কিছু দিয়ে-থুয়ে চালিয়ে যাবার চেষ্টাই হবে। এতে মন্ত্রিসভা তো বটেই, অন্যান্য রাজনৈতিক দলও সাংগঠনিক ক্ষেত্রে দুর্বল হয়ে পড়বে. যার বিষময় ফল ভোগ করতে হবে দেশবাসীকে। দেশবাসীই বা গণতন্ত্রের নামে এমন 'গণ-চিটিং' মেনে নেবেন কেন?

হয় সৎপথে দেশের ও দশের কাজ কর নয় ফিরে এসো। দু' পয়সা কামাতে অথবা রাজনীতি-ব্যবসা করতে দেশবাসী নিশ্চয় কতকগুলি লোককে প্রতিনিধি নির্বাচিত করে আইনসভায় প্রেরণ করেন না। তাঁরা কাজ চান এবং প্রতিনিধিরা দশের সেবাকার্য করবেন এই প্রতিশ্রুতি রেখেই আইনসভার প্রবেশপত্র লাভ করেন। কে কেমনভাবে সেবা করবেন তাই সেই প্রতিনিধির দলীয় ইস্তাহারে ছাপার হরফে লেখা থাকে। কোন প্রতিনিধি সেই প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করলে তিনি নিজে চুক্তিভঙ্গের অপরাধে দায়ী। এজন্য সমগ্র আইনসভা, গোটা মন্ত্রিমণ্ডলী এবং দেশবাসী শাস্তিভোগ করবেন নয়া নির্বাচনের ধকল পুইয়ে, এ কেমনধারা অত্যাচার। চুক্তি ভঙ্গকারীর প্রাপ্য শাস্তি তাঁকেই ভোগ করতে দেওয়া হোক অন্যে কেন তাঁর পাপের বোঝা বইবেন?

বেচারী রত্নাকর দস্যুবৃত্তি করে নিজের সংসারের ভরণ-পোষণ করতেন। তা সেই সংসারই তাঁর অর্জিত পাপের দায়-ভাগ বহনে অস্বীকার করে। অথচ একজন সামান্য ব্যক্তির পাপের বোঝা বইতে হবে সমগ্র জাতিকে? বস্তুত, রাজনীতি-ব্যবসায়ীরা দেশের কাছে খুব বেশি দাবি করছেন না কি? শোষণের চোটে দেশ তো আজ রসবিমুক্ত শুষ্ক ছিবড়েয় পরিণত হয়েছে। আর কতভাবে শোষণ-যন্ত্রের পেষণ চলবে!

নির্দলীয় সমস্যা

আর এক সমস্যা জট পাকিয়েছে নির্দলদের নিয়ে। আইনসভায় এঁরা প্রান্তিক সুবিধাভোগী একটি গোষ্ঠী। অবশ্য সকলেই সেই সুবিধা গ্রহণে উৎসাহী নন। অনেকেরই আদর্শ আছে। কিন্তু টিকে থাকতে হলে এঁদের কোন-না-কোন দলের সঙ্গে তাল দিয়েই চলতে হয়। স্বভাবতই ক্ষমতাসীন দলের তাঁবেই এঁদের অধিকাংশ সমর্পিত হয়ে থাকেন।

নির্দল বলতে আর এক শ্রেণীও আছেন। তাঁরা নামে নির্দল, কিন্তু কার্যত বিশেষ বিশেষ দলের দ্বারা সমর্থনপুষ্ট। অর্থাৎ ছাপ না-রেখে বিশেষ ক্ষেত্রে নির্বাচনী এলাকার বেকায়দা অবস্থায় এঁরা দুই শক্ত ঘাঁটির লড়ায়ের সুযোগে আইনসভায় ঢুকে পড়েন। সমর্থনপুষ্ট হওয়ার দরুণ কার্যত এঁরা সমর্থনকারী দলেরই ইস্তাহার গ্রহণ করে নির্বাচনে নেমেছিলেন বলে দাবি করা যেতে পারে। এই অর্থে এঁরা নির্দল হয়েও দলীয়। এবং সমর্থনকারী দল ত্যাগ করে প্রতিপক্ষে যোগ দিলে এঁদেরও দলত্যাগীই বলা যেতে পারে।

অথচ এঁদের নেপথ্য সঞ্চরণের দরুণ দলত্যাগের দোষে এঁদের প্রতি যথার্থভাবে 'রিকল' প্রয়োগে অসুবিধা। কারও সমর্থন পুষ্ট নন এমন নির্দলের ক্ষেত্রে তো দলত্যাগের প্রশ্নই ওঠে না। তাহলে এই প্রান্তিক সুবিধাভোগীদের বেলায় কী করা যেতে পারে। যদি আইনসভায় দুই প্রতিপক্ষ দলের সংখ্যার হেরফের খুব

সামান্য হয় তখন কতুতপক্ষে প্রান্তিক সুবিধাভোগী নির্দলরাই কি মন্ত্রিসভার ওপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করবেন না। যে দল নির্দলের সমর্থন আদায় করে নিতে পারবেন, বাজি তো তাঁরাই জিতবেন। কিন্তু আইনত এঁদের ধরবার উপায় কৈ।

সে উপায় নেই। কথা উঠেছে নির্দলদের নির্বাচনে দাঁড়ানই বন্ধ করতে হবে। এ যুক্তি নিরুপায়ের উপায় সন্ধান। কিন্তু এই নিরুপায়তাই বা কেন? যদি নির্বাচকমণ্ডলী প্রকৃত রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন হন, আপন স্বার্থে তখন তাঁরা নির্দলের পক্ষে ভোট দেওয়া আপসেই বন্ধ করবেন। কিন্তু মুস্কিল হল আমাদের দেশের গণতন্ত্র চলে নিরক্ষরের ভোটে। কেন না তাঁরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটদাতা। যাঁরা সাক্ষর, তাঁদেরও মধ্যে অনেকেরই রাজনৈতিক চেতনা অদ্যাবধি অপরিশুদ্ধ। এ হেন অবস্থায় নির্দল-বিপত্তি রোধ করার সহজ উপায় নেই। সহজ উপায় নির্বাচকমণ্ডলীকে শিক্ষিত করে তোলা।

নির্বাচকমণ্ডলীকে অন্ধকারে রেখে সুস্থ গণতন্ত্রের কল্পনা অবাস্তব। এ প্রসঙ্গের অবতারণাও 'ভারতদর্শনে' একাধিকবার হয়েছে। মূল সমস্যাকে এড়িয়ে অন্যতর বাঁধনীতে বাঁধতে গেলে সংবিধানের মূল নীতিকে অস্বীকার করা হয়। সুতরাং ওপথে বিশেষ সম্ভাবনা নেই। নির্বাচকমণ্ডলীকে শিক্ষিত করার প্রয়োজন 'রিকল' প্রথা চালু করতে হলেও দেখা দেবে। সুতরাং সমস্যাকে এই প্রসঙ্গে মূল থেকে গ্রহণ করাই উচিত। নাহলে সমস্যা নির্মূল করা অসম্ভব।

বর্ণ-বিদ্বেষ

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কৃষ্ণাঙ্গ নেতা ডঃ মার্টিন লুথার কিং (জুনিয়ার)-কে বর্বর পশুশক্তি হত্যা করল আর ভারতের একদল দাক্ষিণী বর্ণ-বিদ্বেষী গাছের সঙ্গে একটি হরিজন কিশোরকে বেঁধে পুড়িয়ে মারল। ভারতবর্ষের সাম্প্রতিক ইতিহাসে এমন পাশবিক হত্যাকাণ্ডের (যে হত্যাকাণ্ডের মূলে আছে বর্ণ-বিদ্বেষ) নজীর নেই। ভারতে জাতিভেদ প্রথা ছিল, আজও আছে। কিন্তু এমন নৃশংস হত্যা কেবলমাত্র বর্ণ-বিদ্বেষের জন্যই যে আজকের দিনে অনুষ্ঠিত হতে পারে তা কল্পনাও করা যায় না। অথচ অন্ধ্রপ্রদেশের কৃষ্ণা জেলার অন্তর্গত কাঞ্চিকাচেরিয়া গ্রামে এই অসম্ভব সম্ভব হয়েছে। একটি হরিজন কৃষক বালক চুরির অপরাধে ধরা পড়েছে। চৌর্যবৃত্তি স্বীকার করেছে, চুরির মালও উদ্ধার করা গেছে। তবু বালকের ওপর উৎপীড়নের মাত্রা কমে নি বরং প্রহারের চোটে তাকে আধমরা করে বর্ণাভিমানী কতিপয় পাশব মানুষ ছেলেটিকে জ্যান্ত পুড়িয়ে মেরেছে।

আমরা শুনে আসছি কৃষ্ণাঙ্গ-বিদ্বেষীরাই এমনভাবে কৃষ্ণাঙ্গ সমাজের ওপর অত্যাচার চালিয়ে আসছে, বিশ শতকেও যার কোন সুরাহা হয় নি। সেখানে নিরপরাধের ওপর 'লিঞ্চিং' নিয়ে কতই আন্দোলন আলোচনা হয়েছে ও হচ্ছে। ভারতবর্ষেও হরিজন সমাজের ওপর উৎপীড়ন চলে এসেছে মধ্যযুগীয় কুসংস্কারের আবহাওয়ায়। তবে যাকে বলে 'লিঞ্চিং' তা ছিল না। অন্ধ্রের ঘটনা প্রায় মার্কিনী লিঞ্চিং-এর অনুরূপ। এ রোগ নতুন। বিশেষ এ যুগে ভারতবর্ষে তা অকল্পনীয়। গান্ধী-ভারতে, বিবেক-রবি শ্রীচৈতন্যের ভারতবর্ষে হরিজন-নিগ্রহ অবাস্তব ঘটনা বলেই বোধ হয়।

সবিনয় নিবেদন

স্থানাভাববশত এ সপ্তাহে বরুণ রায়ের ধারাবাহিক প্রবন্ধ 'ভিয়েৎনাম : ঝড়ের কেন্দ্রে' প্রকাশ করা গেল না, এর জন্য আমরা দুঃখিত। আগামী সংখ্যা থেকে প্রবন্ধটি যথারীতি প্রকাশিত হবে। —সম্পাদিকা

কিন্তু তাই-ই সম্ভব হয়েছে অন্ধ্রের রাক্ষুসে জাত্যভিমানী কিছু গ্রামবাসীর দ্বারা। সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা, এই পাশবিক হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত অভিযুক্ত ব্যক্তিদের স্থানীয় পুলিশ মাসখানেকের মধ্যেও গ্রেপ্তার করে নি। ঘটনাটি কেন্দ্রীয় সরকারের নজরে না এলে অপরাধী-সন্ধানের অবশ্যকর্তব্যও হয়ত ধামাচাপা দেওয়া হত।

ভারতবর্ষ বর্ণভেদের দ্বারা হরিজন সমাজকে সামাজিক ও আর্থিক নিগ্রহের শিকারেই পরিণত করেছিল। এজন্য ভারত সরকার হরিজন সমাজের উন্নয়নের বিশেষ বিধি-বন্দোবস্ত রেখেছেন। নিগৃহীত সমাজের মুক্তি কামনায় ভারতেরই বিভিন্ন মনীষী আজীবন সংগ্রাম করে গেছেন। তাঁদের সেই স্বপ্ন আইনের সহায়তায় যখন সফল হতে চলেছে, তখন অন্ধ্রের এই দুঃসংবাদ আমাদের সামনে এক ভয়াবহ চিত্র তুলে ধরল। এখনও এমন স্থান আছে, যেখানে কেবলমাত্র বর্ণ-বিদ্বেষ একটি কিশোরকে পুড়িয়ে মারতে পারে! অথচ এই ভারতবাসীই যুগে যুগে হরিজন সমাজ থেকেই মহাপুরুষ সংগ্রহ করে তাঁর পাদমূলে সভক্তি প্রণামও জানিয়ে এসেছে।

বাস্তবিক বিচিত্র এই দেশ। এর কোথাও অশিক্ষা ও কুসংস্কার ঘোর অন্ধকার, কোথাও ঔদার্য ও জ্ঞানের অরুণচ্ছটা। যে মহাভারতে কর্ণ ও একলব্য কোণঠাসা সেই মহাভারতকারের সহানুভূতিই কর্ণ এবং একলব্যকে মহান করেছে।

অন্ধ্রের অন্ধকারটুকু অবশ্যই ভারতের কোনো প্রতিনিধিত্বমূলক চিত্র নয়। বিক্ষিপ্ত ঘটনা। এই বর্বরতার পুনরাবৃত্তি যাতে আর কোথাও না ঘটে তার জন্য বিশেষ সজাগ দৃষ্টির প্রয়োজন।

অনুরূপ ঘটনার পুনরাবৃত্তি নিবারণের জন্য কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী যথাশীঘ্র মুখ্যমন্ত্রীদের বৈঠক আহ্বান করবেন বলে জানিয়েছেন। সমাজকল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী শ্রীঅশোক মেহতা সংসদীয় অথবা উচ্চ পর্যায়ের কমিটি নিয়োগের কথাও ভাবছেন।

হরিজন পীড়নের ওপর বিতর্ককালে শ্রীকানওয়াড়লাল গুপ্ত অন্ধ্র এবং উত্তরপ্রদেশে হরিজন-পীড়নের কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করায় সমগ্র ভারতবাসী স্তম্ভিত ও লজ্জিত বোধ করবেন।

সবিশেষ লজ্জার কথা এই যে শ্রীকানওয়াড় কথিত ঘটনাগুলি সম্পর্কে এখনও তদন্ত আরম্ভ ও অপরাধী পাকড়াও অভিযান শুরু হচ্ছে না।

প্রশ্ন হল, এই সব বর্বরতা (মহিলাদের ওপর বলাৎকার, উত্তরপ্রদেশে দুইজন বালককে কূপে নিক্ষেপ ইত্যাদি) যেখানে অনুষ্ঠিত হয়েছে সেখানে পুলিশ কি সাক্ষীগোপালের ভূমিকা গ্রহণ করে আসছে। যদি তাই হয় তবে তাদের শাস্তিও সমান দরকার।

(৬।৪।৬৮)

মার্টিন লুথার কিং

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র:

মার্টিন লুথার কিং-এর নৃশংস হত্যার সংবাদে সমগ্র জগৎ স্তম্ভিত। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নিগ্রোদের নাগরিক অধিকার অর্জন আন্দোলনের অবিসংবাদী নেতা, শান্তির জন্য নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত, অহিংসায় বিশ্বাসী কিং মাত্র ৩৯ বৎসর বয়সে শহীদের মৃত্যু বরণ করলেন।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, টেনেসীর মেমফিস শহরে অবস্থানকালে ৫ই এপ্রিল রাত্রে নৈশভোজের পূর্বে যখন মার্টিন লুথার কিং তাঁর হোটেলের তিনতলার ঝুলবারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিলেন, তখন আততায়ীর গুলীতে তিনি নিহত হন। এখনও আততায়ী ধরা পড়ে নি, তবে সন্দেহবশে একজনকে আটক করা হয়েছে। মনে হচ্ছে, হোটেলের নিচের রাস্তায় চলন্ত গাড়ি থেকে অজ্ঞাত আততায়ী গুলী করে কিংকে হত্যা করেছে।

মার্টিন লুথার কিং মেমফিস এসেছিলেন নিগ্রোদের অধিকার রক্ষার আন্দোলন উপলক্ষে। এখানে জঞ্জাল সাফ করার কাজে নিযুক্ত নিগ্রো শ্রমিকদের ধর্মঘটকে কেন্দ্র করে ব্যাপক নাগরিক অধিকার রক্ষার আন্দোলন সুরু হয়েছে। কিং এই আন্দোলনে অংশ নেবার জন্যই এসেছিলেন। তিনি এখানে একটি বড় বিক্ষোভ-মিছিলের নেতৃত্ব করেন। সম্ভবত এইটিই তাঁর জীবনের শেষ মিছিল। নিগ্রোদের স্বাধিকার রক্ষার আন্দোলনকে উপলক্ষ করে মেমফিসে কিছুটা হাঙ্গামাও সুরু হয়েছে। এই হাঙ্গামার সুযোগ নিয়ে বর্ণান্ধ শ্বেতাঙ্গরা নতুন করে নিগ্রোদের ওপর হামলা সুরু করেছে। কিং এই সংকট মোচনের চেষ্টায় ছিলেন। এই অবস্থায় তাঁকে হত্যা করা হল।

কিং-এর হত্যার খবর ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সর্বত্র ব্যাপক দাঙ্গাহাঙ্গামা সুরু হয়েছে। নিগ্রোদের মধ্যে প্রচণ্ড বিক্ষোভ দেখা দিয়েছে। ওয়াশিংটন, নিউ ইয়র্ক, চিকাগো, বোস্টন, কনেকটিকাস, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রায় সব ক'টি বড় শহরে দাঙ্গা সুরু হয়েছে। লুঠতরাজ, অগ্নিসংযোগ, খুন—সব কিছুই চলছে। বহু শহরে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করা হয়েছে, কারফিউ জারি করা হয়েছে, সৈন্যদল তলব করা হয়েছে। মাত্র ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ১১ জন নিহত হয়েছে। অবস্থা এত গুরুতর হয়েছে যে, জনসন ভিয়েতনামের শান্তির ব্যাপারে আলোচনার জন্য প্রস্তাবিত হনোলুলু যাত্রা স্থগিত রাখতে বাধ্য হয়েছেন।

শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য জনসন কেন, নিগ্রো আন্দোলনে মার্টিন লুথার কিং-এর উত্তরাধিকারী র‍্যালফ্ আবেরনাথি এবং মেমফিসে কিং-এর শেষ সংগ্রামের ঘনিষ্ঠ সহকর্মী হোসিয়া উইলিয়ামস এবং অন্যান্য বিশিষ্ট নিগ্রো নেতাদের আবেদনেও কোন ফল হয় নি। নিগ্রোরা তাদের নেতার মৃত্যুতে ক্ষেপে গেছে।

মার্টিন লুথার কিং-এর স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য জনসন ও তাঁর সরকার সব রকম আয়োজন করেছেন। আমেরিকার সর্বত্র জাতীয় শোক দিবস (৭ই এপ্রিল) পালনের জন্য জনসন নির্দেশ দিয়েছেন। সর্বত্র জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত রাখা হবে, সকলে শোকের পোষাক পরবেন।

কিন্তু নিগ্রোরা এতে সন্তুষ্ট নয়। কিং-এর হত্যাকাণ্ডের দ্বারা এই সত্য আর একবার নগ্নভাবে প্রকাশিত হল যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সাদা-কালোর তফাৎ এখনও খুব প্রকটভাবে রয়েছে। শ্বেতাঙ্গ বর্ণ-বিদ্বেষীরা মার্টিন লুথার কিং-এর মত উদারনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীসম্পন্ন নেতাকে পর্যন্ত সহ্য করতে প্রস্তুত নয়।

এরপর আমেরিকার নিগ্রো আন্দোলন কোন্ পথে এগোবে? বেশ কিছুদিন যাবৎ নিগ্রোদের মধ্যে, বিশেষ করে নিগ্রো যুবকদের মধ্যে, এই মনোভাব দৃঢ় হচ্ছে যে, শান্তিপূর্ণ পথে নিগ্রোদের জন্য সমানাধিকার আদায় করা যাবে না। কিছু কিছু আইন পাশ হলেও শ্বেতাঙ্গরা নানাভাবে বাধা দেবে। আর, সমাজে নিগ্রোরা যে নিচে পড়ে রয়েছে তাই থাকবে। সুতরাং, হিংসাত্মক পথে নিগ্রো আন্দোলনকে পরিচালনা করতে হবে। স্টোক্লি কারমাইকেলের মত চরমপন্থী নেতার প্রভাব নিগ্রোদের মধ্যে কম নয়। কিন্তু এতদিন এই চরম পন্থার বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন মার্টিন লুথার কিং। তাঁর ব্যক্তিত্ব ও জনপ্রিয়তা নিগ্রো আন্দোলনকে কারমাইকেলের মত চরম নেতার হাত থেকে রক্ষা করেছে। তাঁর অনুসৃত অহিংসনীতিও নিগ্রো আন্দোলনে প্রভাব বিস্তার করেছে।

কিন্তু এখন মার্টিন লুথার কিং চলে গেলেন। তাঁর অনুপস্থিতিতে

কারমাইকেলদের সুবিধা হবে। কিং-এর মৃত্যুর প্রতিক্রিয়াও হবে।

প্রতিক্রিয়া ইতিমধ্যেই সুরু হয়েছে। দেশব্যাপী ব্যাপক দাংগাহাংগামা তারই নিদর্শন। স্টক্‌লি কারমাইকেল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দুই কোটি নিগ্রোকে গেরিলা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হতে আহ্বান জানিয়েছেন। বন্দুক ছাড়া কোন পথ নেই। প্রতিশোধ ছাড়া কোন কথা নেই।

* * *

রাষ্ট্রপতি লিন্ডন জনসনের ঐতিহাসিক ঘোষণার পর এক সপ্তাহ হয়ে গেছে। তিনি জানিয়েছেন, রাষ্ট্রপতি পদের জন্য তিনি দাঁড়াবেন না। আর, ভিয়েতনামে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য উত্তর ভিয়েতনামের সংগে তিনি শান্তি আলোচনা সুরু করতে চান, এবং তার প্রস্তুতিস্বরূপ উত্তর ভিয়েতনামে বোমাবর্ষণ শতকরা নব্বই ভাগ অঞ্চলে বন্ধ করার জন্য তিনি নির্দেশ দিয়েছেন।

জনসনের এই ঘোষণার পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আসন্ন রাষ্ট্রপতি নির্বাচন এবং ভিয়েতনাম যুদ্ধ, দুই ব্যাপারেই নতুন পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে।

জনসন যদিও বলেছেন, রাষ্ট্রপতি পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা না করার সিদ্ধান্ত তাঁর চূড়ান্ত, কিছুতেই তিনি এই সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করবেন না, তবু অনেকের ধারণা, শেষ পর্যন্ত তাঁকে পুনরায় নির্বাচনপ্রার্থী করা যাবে। ভিয়েতনামে শান্তি প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে তাঁর প্রচেষ্টা যদি অন্তত কিছুটাও সফল হয়, তাহলে তাঁকে নির্বাচনে নামতে রাজী করানো সম্ভব হবে। নিউ ইয়র্ক টাইমস পত্রিকার ধারণা অন্তত তাই। আর ফ্রান্সের কূটনীতিকদের মত অনেকের ধারণা, নির্বাচনে তাঁর দাঁড়ানো ও জয়ের সম্ভাবনা বাড়াবার জন্যই এটা একটা চমক বা 'স্টান্ট'।

তবে জনসন যদি শেষ পর্যন্ত না দাঁড়ান, তবে ইউজিন ম্যাকার্থি ও রবার্ট কেনেডীর মধ্যে কে ডেমোক্রাটিক পার্টির প্রার্থীরূপে মনোনীত হবেন এখনই সে-কথা জোর করে বলা মুশকিল। উইসকনসিন প্রাথমিক নির্বাচনে অবশ্য আবার ম্যাকার্থিই জয়লাভ করেছেন। তিনি শতকরা ৫৭টি ভোট পেয়েছেন, আর কেনেডী পেয়েছেন শতকরা ৩৫টি ভোট। তবে অনেকের ধারণা, জনসন নিজে না দাঁড়ালে উপ-রাষ্ট্রপতি হুবার্ট হামফ্রেকে তিনি রাষ্ট্রপতি পদের জন্য সমর্থন করবেন এবং জনসনের সমর্থন পেলে হামফ্রে একজন শক্তিশালী প্রার্থী হবেন।

রিপাবলিকান পার্টিতেও অনেকে মনে করছেন, জনসনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে সরে দাঁড়াবার সিদ্ধান্তের পর তাঁদেরও রিচার্ড নিকসনের পরিবর্তে অন্য কাউকে খুঁজে বের করা উচিত। ভিয়েতনাম যুদ্ধের বিরুদ্ধে মার্কিন জনসাধারণের মধ্যে যে তীব্র মনোভাবের সৃষ্টি হয়েছে তার জন্যই জনসন পিছিয়ে গেলেন। এই অবস্থায় নিকসন নয়, নির্বাচনে জিততে হলে যুদ্ধ-বিরোধী মনোভাবের কাউকে দাঁড় করাতে হবে। এই প্রসংগে নিউ ইয়র্কের গভর্নর নেলসন রকফেলারের কথা অনেকেই ভাবছেন।

তবে স্বদেশে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের ব্যাপারের চেয়েও ভিয়েতনামের যুদ্ধের

নিকসন

পটভূমিকায় জনসনের ঘোষণা অনেক বেশি গুরুত্ব লাভ করেছে।

জনসন সংগে সংগে উত্তর ভিয়েতনামের শতকরা নব্বই ভাগ অংশে বোমাবর্ষণ বন্ধের নির্দেশ দিয়েছেন। এই নির্দেশ কার্যকরীও হয়েছে। জনসন বলেছেন, ভিয়েতনামে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি অবিলম্বে উত্তর ভিয়েতনামের সংগে আলোচনা সুরু করতে চান। এই ব্যাপারে তিনি জেনেভা সম্মেলনের যুগ্ম-সভাপতি বৃটেন ও সোভিয়েট ইউনিয়নকে উদ্যোগী হবার জন্য অনুরোধ করেছেন। যদি উত্তর ভিয়েতনাম আলোচনায় রাজী হয় তবে তাঁর পক্ষ থেকে আলোচনা সুরু করার জন্য অ্যাভেরাল হ্যারিম্যানকে তিনি মনোনীত করার কথাও ঘোষণা করেছেন।

জনসনের এই সিদ্ধান্তের আন্তরিকতায় উত্তর ভিয়েতনাম ও সোভিয়েট ইউনিয়নের সন্দেহ আছে। বরাবর এই দাবি করা হয়েছে, শান্তি আলোচনায় বসতে হলে বোমাবর্ষণ পুরোপুরি বন্ধ করতে হবে। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বোমাবর্ষণ সম্পূর্ণ বন্ধ না করে আংশিকভাবে বন্ধ করেছে। দেশের কিছুটা অঞ্চলেও বোমা পড়বে, আর দুই পক্ষ শান্তির

জীবনী ও সাহিত্য আলোচনা

রবার্ট ফ্রস্ট
লরেন্স থম্পসন
অনুবাদ ॥ বাণী রায়

মার্ক টোয়েন
লুইস লেয়ারি
অনুবাদ ॥ মণীন্দ্র রায়

আর্নেস্ট হেমিংওয়ে
ফিলিপ ইয়ং
অনুবাদ ॥ রাখাল ভট্টাচার্য

উইলিয়াম ফকনার
উইলিয়াম ভ্যান ও'কনর
অনুবাদ ॥ কৃষ্ণগোপাল চট্টোপাধ্যায়

ক্যাথারিন অ্যান পোর্টার
রে বি ওয়েস্ট, জুনিয়র
অনুবাদ ॥ সুধীর চক্রবর্তী

ন্যাথানিয়েল হথর্ন
হায়াট এচ্ ওয়াগোনার
অনুবাদ ॥ নিখিল নন্দী

হেনরি জেমস
লিওন ইডেল
অনুবাদ ॥ অ. কৃ. ব.

টমাস উল্‌ফ
হিউ হলম্যান
অনুবাদ ॥ গৌরীশংকর ভট্টাচার্য

ওয়াশিংটন আর্ভিং

প্রতিখানি বই এক টাকা

বেঞ্জামিন ফ্র্যাঙ্কলিন
জয়ন্ত চৌধুরী
২·০০

জর্জ ওয়াশিংটন
জেনেভিভ ফস্টার
১·৫০

একত্রে দশ টাকার অর্ডার দিলে এবং টাকা অগ্রিম পাঠালে ডাকখরচা লাগবে না। পূর্ণাংগ তালিকার জন্য লিখুন।

এশিয়া পাবলিশিং কোম্পানি
এ : ১৩২, ১৩৩ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট
কলিকাতা-১২ ॥ ফোন : ৩৪-২৩৮৬

প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা করবে, এ কি করে হয়!

তাই অনেকেই ভেবেছিলেন, উত্তর ভিয়েতনাম জনসনের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করবে। কিন্তু সবাইকে বিস্মিত করে ৩রা এপ্রিল হ্যানয় রেডিও থেকে ঘোষণা করা হয়েছে, উত্তর ভিয়েতনাম আলোচনায় বসতে রাজী আছে। কূটনীতিক মহলের মতে, এই সিদ্ধান্তের দ্বারা উত্তর ভিয়েতনাম মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওপর দিয়ে টেক্কা মেরে গেল।

এখন আলোচনা কোথায় সুরু হবে? মস্কো, প্যারিস, দিল্লী প্রভৃতি স্থানের নাম এই প্রসঙ্গে শোনা যাচ্ছে। জনসনও নিজের সহকর্মীদের সঙ্গে আলোচনা করছেন। সপ্তাহ শেষে হনোলুলুতে গিয়ে দক্ষিণ ভিয়েতনামে উপস্থিত মার্কিন সামরিক কর্তাদের সঙ্গে তাঁর সলা-পরামর্শ করার কথা ছিল। কিন্তু মার্টিন লুথার কিং-এর হত্যা ও পরবর্তী দাঙ্গাহাঙ্গামার ঘটনার জন্য তাঁর হনোলুলু যাত্রা আপাতত বন্ধ রাখা হয়েছে।

দক্ষিণ ভিয়েতনাম, এবং 'সিয়েটো' ও লেজাসে'র মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যে সব মিত্ররাষ্ট্র রয়েছে, তারা স্বাভাবিকভাবেই উত্তর ভিয়েতনামের সঙ্গে একটা মীমাংসার এই প্রচেষ্টাকে ভাল চোখে দেখছে না। তারা সাধ্যমত শান্তি-প্রতিষ্ঠায় বাধাও দেবে। তবু দেশ ও বিদেশের জনমতের চাপে জনসনকে এ পথে যেতে হচ্ছে।

পানামা:

পানামায় এখন দু'জন রাষ্ট্রপতি। রাষ্ট্রপতি মার্কো রোব্লেসের বিরুদ্ধে পানামার ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলী মহাবিচারে প্রস্তাব পাশ করেছে: তাঁকে রাষ্ট্রপতি পদ থেকে অপসারণ করা হয়েছে। রোব্লেসের জায়গায় ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলী নতুন রাষ্ট্রপতি নির্বাচন করেছে উপ-রাষ্ট্রপতি ম্যাক্স ডেলভালেকে।

মে মাসে পানামায় যে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন হচ্ছে, তাতে অন্যতম প্রার্থী অর্থমন্ত্রী ডেভিড সামুদিও'র পক্ষে রাষ্ট্রপতি রোব্লেস পক্ষপাতমূলক আচরণ করেছেন, এই অভিযোগেই ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলী তাঁকে রাষ্ট্রপতি পদ থেকে সরিয়েছে। এ ব্যাপারে প্রধান উদ্যোগী রোব্লেসের প্রধান রাজনৈতিক শত্রু পানামার প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি এবং এবারেও রাষ্ট্রপতি পদের জন্য প্রার্থী আরনুলফো আরিয়াস।

কিন্তু রোব্লেস ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলীর এই সিদ্ধান্তকে বে-আইনী বলে ঘোষণা

রোব্লেস

করেছেন। বর্তমানে সুপ্রীম কোর্টে বিষয়টি বিবেচনাধীন। ইতিমধ্যে দু'জনই রাষ্ট্রপতি রূপে কাজ করছেন। রাষ্ট্রপতি প্রাসাদে বসে রোবলেস বলছেন, তিনিই রাষ্ট্রপতি। আর ডেলভালে তাঁর বাড়িতে বসে তাঁর নতুন মন্ত্রিসভার সদস্যদের নিয়ে দাবি করছেন, তিনিই রাষ্ট্রপতি। চার হাজার মানুষ নিয়ে গঠিত পানামার শক্তিশালী ন্যাশনাল গার্ড রোব্লেসকে সমর্থন করায় অবস্থা মোটামুটি এখনও রোব্লেসের পক্ষে। ন্যাশনাল গার্ডের প্রধান জেনারেল বোলিভার ভ্যালেরিনোর নির্দেশে গার্ডরা ডেলভালে ও তাঁর সহকর্মীদের কোন প্রকার সরকারী কাজে হাত দিতে দিচ্ছে না।

তবে এই ঘটনাকে উপলক্ষ করে পানামায় দুই দলের সমর্থকদের মধ্যে কিছু কিছু দাঙ্গাহাঙ্গামা হচ্ছে। ন্যাশনাল গার্ডকে পাল্টা ব্যবস্থারূপে কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপ এমন কি গুলীও ছুঁড়তে হয়েছে। কিছু লোক মারাও গেছে।

M&H M&H M&H M&H M&H M&H M&H

BI-COLATES
REGISTERED TRADE MARK
STEARNS

M&H

পিত্তরস প্রবাহ, পাকস্থলির সুষ্ঠু ক্রিয়া ও কোষ্ঠকাঠিন্য নিয়ন্ত্রণে দীর্ঘদিনের প্রশংসাধন্য একটি অব্যর্থ ঔষধ।

MARTIN & HARRIS
PRIVATE LTD.
MERCANTILE BUILDING, LALLBAZAR,
CALCUTTA-1

M&H M&H M&H M&H M&H M&H M&H

সেদিন থেকেই এমনি সুন্দর ছবি তুলবেন
...যেদিন আপনি কিনে নেবেন
Agfa
ক্লিক III
* শুধু ঠিকমত তাক ক'রে কলটি টিপে দিন।
কোনো হিসেবের ঝামেলা নেই—ভুল হবার ভয় নেই।
* প্রত্যেক ১২০'রোলে ১২টি বড় ছবি (৬ × ৬সেন্টিমিটার)
* এভার-রেডি কেস্, পোর্ট্রেট লেনস্ ও ফ্ল্যাশ গান
আলাদা দামে পাওয়া যায়।
দি নিউ ইণ্ডিয়া ইণ্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড, বরোদা।
একমাত্র পরিবেশক:
আগফা-গেভার্ট ইণ্ডিয়া লিমিটেড
বোম্বাই • নিউ দিল্লী • কলিকাতা • মাদ্রাজ
CMAG-103-203 BEN

যা দেখেছি, যা পেয়েছি

স্মৃতিচয়ন

শ্রীসুধীরঞ্জন দাস

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

আমি সুপ্রিম কোর্টের গোড়া থেকেই সেই কোর্টের জজ ছিলাম। বস্তুত সুপ্রিম কোর্ট যে ছয়জন জজ নিয়ে কাজ আরম্ভ করে আমি ছিলাম তার সর্বকনিষ্ঠ। সেই ২৬শে জানুয়ারী ১৯৫০ সাল থেকে শুরু করে ৩০শে সেপ্টেম্বর ১৯৫৯ সাল পর্যন্ত আমি সেই আদালতে জজীয়তী করেছি। ভাল-মন্দ অনেক রায় লিখেছি। কিছু যে প্রশংসা পাই নি তা-ও বলতে পারি নে। সে সব রায় সুপ্রিম কোর্ট রিপোর্টে ও অন্যান্য ল রিপোর্টে ছাপা আছে। আমার অনেক রায় পরে স্বীকৃতি পেয়ে অনুসৃতও হয়েছে। কোন কোনটা বা পাল্টেও গেছে। সে সব রায় নিয়ে গল্প বলবার মত কিছু নেই। আইনজ্ঞ ব্যক্তিরাই তার সমালোচনা করে ভাল-মন্দ বিচার করবেন। একটা কথা বলতে বাধা নেই। যখন সুপ্রিম কোর্ট প্রথম চালু হোলো তখন সংবিধানের নানা ধারার নিহিতার্থ নিয়ে নানা কূট প্রশ্ন উঠতে লেগেছিল। সর্বোচ্চ আদালতের আমরাই বিচারক—যা-ই বলি তা-ই হয় আইন। সুতরাং আমাদের জজেদের মধ্যে একটু যেন রেষারেষি ভাব ছিল আলাদা করে রায় লেখবার। অর্থাৎ আমরা প্রত্যেকে মনে করতাম যে এমন একটা রায় দিয়ে যাব যা চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। ফল হোতো প্রায় প্রত্যেক কেসেই মস্ত মস্ত আলাদা রায়—এবং প্রত্যেক রায়েতে যুক্তি-তর্কে কিছু কিছু বিভেদ। যেন আমরা প্রত্যেকেই একটা না একটা নতুন ভিত্তির উপরে নিজেদের রায় প্রতিষ্ঠিত করছি। সুপ্রিম কোর্ট সুরু হবার মাস চারেকের মধ্যে এলো এ, কে, গোপালনের Habeas Corpus-এর জন্যে Writ petition. Preventive Detention-এর বৈধতা সম্পর্কে সেইটেই সুপ্রিম কোর্টের প্রথম কেস। যেমন হোলো সওয়াল-জবাবের বহর তেমন হোলো আমাদের রায়ের বহর। (1950) S.C.R. 88 থেকে পাঁচ পাতা জুড়ে হোলো সেই কেসের head note. অল ইণ্ডিয়া রিপোর্টারে বোধ হয় হয়েছিল আরো বেশি। আমাদের রায়গুলিতে লেগে গেল ৯৫ পাতা থেকে ৩৩৪ পাতা পর্যন্ত। আমি ছিলাম শেষ জজ। অন্য জজেদের রায় পড়া শেষ করে কোন আইনজীবী আমার রায় পর্যন্ত পৌঁছতে পেরেছেন কি-না তা কে বলবে। আমরা প্রত্যেকে নতুন নতুন কারণে অথবা একই ধরণের কারণকে নতুন নতুন বেশ পরিয়ে সাব্যস্ত করলাম যে এ, কে, গোপালনের আরজি অগ্রাহ্য করা হোক। বেশ কিছুদিন পরে এম, পাতঞ্জলি শাস্ত্রী কি একটা কথা বলতে বলতে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলেন—"I say Das, in Gopalan's case did we agree on any point except that he should remain in jail ?"

কথাটা কিন্তু ঠিকই বলেছিলেন। এই রকম আরো অনেক কেসেরই নাম করা যায়।

আমার জজীয়তীর মধ্যে দুইটি Presidential Reference এসেছিল সংবিধানের ১৪৩ ধারা মতে। প্রথমটি এসেছিল ১৯৫১ সালে যখন চীফ জাস্টিস কানিয়া জীবিত ছিলেন। কেসটির নাম ছিল In re Delhi Laws Act, 1912. কেসটির রিপোর্ট পাওয়া যাবে (1951) S.C.R. 747. চীফ জাস্টিস কানিয়াকে নিয়ে আমরা সাতজন জজ বসেছিলাম কৌঁসুলীদের সওয়াল-জবাব শুনে রাষ্ট্রপতিকে সৎপরামর্শ দেবার জন্যে। Delhi Laws Act, 1912-এর সাত ধারায় বলা ছিল যে "The Provincial Government may by notification in the official gazette extend, with such restrictions and modifications as it thinks fit, to the Province of Delhi or any part thereof, any exactment which is in face in any part of British India at the rate of such notification". এই ধরণের কথা ছিল Ajmer-Merwara (Extension of Laws) Act, 1947 এবং The Part C States (Laws) Act, 1950 তে-ও। বেশ স্পষ্টই দেখা গেল যে এই আইনগুলি ভারতবর্ষের যে কোন প্রদেশের আইনকে অদলবদল করে আপন এলাকায় বলবৎ করবার ক্ষমতা দিয়েছিল executive Government-এর উপর। আইন অদলবদল করা মানেই হোলো আইন প্রণয়ন করা। সুতরাং এই সব এ্যাক্টের দ্বারা executive Government-কে যেমন খুশি আইন করার ক্ষমতাই দেওয়া হয়েছে। দ্বিধার সঞ্চার হোলো যে Executive Government-কে এই রকম ঢালা আইন প্রণয়ন ক্ষমতা দেওয়া বৈধ কি-না। সেই দ্বিধা দূরীকরণের জন্যে রাষ্ট্রপতি সংবিধানের ১৪৩ ধারা মতে সুপ্রিম কোর্টের পরামর্শ চাইলেন—"Was Section 7 of the Delhi Laws Act, 1912 or any of the provisions thereof and in what particular or particulars or to what extent ultra vires the Legislative which passed the said Act". অন্য দুটি Act সম্বন্ধেও সেই একই ধরণের প্রশ্ন তিনি করলেন।

সংবিধানের ১৪৩ ধারার এই প্রথম কেস। কৌঁসুলীরা এবং আমরা সবাই লেগে গেলাম কেসটাকে নিয়ে। রিপোর্টের Head note-ই হোলো ছয় পাতার উপরে। রায়গুলি সবসুদ্ধ হোলো ৭৫৫ পাতা থেকে আরম্ভ করে ১১২৫ পাতা পর্যন্ত অর্থাৎ ৩৭০ পাতা জুড়ে মোটামুটি বলতে গেলে ফজল আলি, পাতঞ্জলি শাস্ত্রী, মুখার্জি, আমি ও ভিভিয়েন বোস প্রায় একমতই হয়েছিলাম। কিন্তু চীফ জাস্টিস কানিয়া ও মহাজন সাহেব ভিন্ন মত দিয়েছিলেন। এই কেসটার delegated legislation সম্বন্ধে যে আলোচনা হয়েছিল সেটা সত্যই খুব সুন্দর

ও চিত্তাকর্ষক হয়েছিল। আরো দেখা যাবে যে আমরা যারা মোটামুটি একমত হয়েছিলাম আমাদের রায়ের মধ্যে নীতিগত একটু-আধটু পার্থক্য ছিল।

অন্য রেফারেন্সটা ছিল কেরালার প্রস্তাবিত শিক্ষা সংক্রান্ত বিলটি। এই সময়ে আমি ছিলাম চীফ জাস্টিস। কেসটা (1959) S.C.R. 995-এ In re Kerala Education Bill, 1947 বলে ছাপা আছে। আমি ও আর ছজন জজ বসলাম সে রেফারেন্স শুনতে। কেরালার আইনসভা এই বিলটি পাশ করায় সেখানকার রাজ্যপাল সেটিকে রাষ্ট্রপতির অনুমোদনের জন্য পাঠিয়ে দেন। যে বিলটি পাশ হয়েছিল তার উদ্দেশ্য ছিল কেরালার শিক্ষা পদ্ধতিকে ঢেলে সেজে সংবিধানের ৪৫ ধারাটির রূপায়ণ করা এবং সেইজন্যে প্রদেশ সরকারের উপর খুব বিস্তৃত ক্ষমতা দিয়েছিল সাহায্যপ্রাপ্ত এবং স্বীকৃত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে। প্রশ্ন উঠল যে ঐ বিলটির কয়েকটি বিশেষ বিশেষ ধারা সংবিধানের ১৪, ৩০ ও ২২৬ ধারার পরিপন্থী কি-না। বিলের বৈধতার বিরোধী দলের মধ্যে ছিলেন ভারত সরকারের সব কয়জন আইন কর্মচারী এম, সি, শিতলবাদ থেকে হেম সান্যাল পর্যন্ত। রাজস্থানের এ্যাডভোকেট জেনারেল শিতলবাদের সওয়াল জবাবের সমর্থন করলেন। এ ছাড়া গোপালস্বরূপ পাঠক, জে, বি, দাদাচাঁদজী. ডি, ও, এব্রাহাম, ফ্রাংক এ্যান্টনী, নূরুদ্দিন আহমেদ, জি, সি, মাথুর, বি, কে, বি, নারদ এবং অন্যান্য কৌঁসুলীরা বিভিন্ন কারণ দেখিয়ে বিলটির বিরোধিতা করলেন। কেরালা সরকার লাগিয়েছিলেন বিলেতের প্রিভি কাউন্সিলের বিখ্যাত কৌঁসুলী ডি, এন, প্রিট কে. সি, ও দুটি জুনিয়ার কৌঁসুলীদের। ঈশ্বরায়া ও তাঁর একটি জুনিয়ার হাজির হয়েছিলেন কেরালার Private Secondary School Office Staff-এর হয়ে। তিনি ডি, এন, প্রিটকে সমর্থন করলেন। খুব ঘটা করে সওয়াল জবাব হয়েছিল সে কেসটায়। শেষ পর্যন্ত আমি, ভগবতী, বি, পি, সিনহা, জাফর ইমাম, এস, কে, দাশ এবং জে, এল, কাপুর একমত হলাম এবং আমাদের সেই রায়টি আমিই লিখেছিলাম। প্রথম, তৃতীয় ও চতুর্থ প্রশ্নের আমরা যে উত্তর দিয়েছিলাম ভেংকটরামা আয়ার তার সঙ্গে একমত হয়েছিলেন কিন্তু দ্বিতীয় প্রশ্ন সম্বন্ধে তিনি একটু অন্য মত ব্যক্ত করেছিলেন। যাই হোক In re Delhi Laws Act, 1912-এর কেসে যেমন প্রত্যেক জজ আলাদা রায় লিখেছিলেন এই কেরালা কেসে তা হয় নি। এই কেরালা কেসটার রায় মনে থাকবার একটু কারণও আছে। এই রায়ে আমি গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের দুটি বিখ্যাত কবিতার ইংরেজী তর্জমা উদ্ধৃত করে দিয়েছিলাম।

রাষ্ট্রপতি নির্বাচন নিয়ে দুটি কেস আমাদের সামনে এসেছিল। প্রথম কেসটা Narayan Bhaskar Khare V. The Election Commission of India নামে (1957) S.C.R. 1081-এ ছাপা হয়ে আছে। ঘটনাবলী সম্বন্ধে বিশেষ তর্ক ছিল না। সংক্ষেপে ব্যাপারটা হোলো এই—সেবারের সাধারণ নির্বাচনে খালি হিমাচল প্রদেশ (যেখানে থেকে ৪ জন সদস্য লোকসভায় আসবেন) এবং পাঞ্জাবের দুইটি কেন্দ্র ছাড়া সমস্ত ভারতবর্ষের নির্বাচন ফলাফল ঘোষণা করা হয়ে যাওয়ায় পুরাতন লোকসভাকে বাতিল করে ১৯৫৭ সালের ৫ই এপ্রিল নতুন লোকসভা তৈয়ারী করা হয়েছিল। Presidential and Vice Presidential Election Act, 1952-এর ৪ ধারা অনুসারে Election Commission একটি notification বের করে দিলেন। এই notification-এ বলা হোলো যে নির্বাচনের প্রস্তাব পেশ করতে হবে ১৯৫৭ সালের ১৫ই এপ্রিলের মধ্যে। সেই সব প্রস্তাব পরীক্ষা করা হবে ১৭ই এপ্রিল, প্রস্তাব যদি প্রত্যাহার করতে হয় তা করতে হবে ২০শে এপ্রিলের মধ্যে, ভোট গ্রহণ করা হবে ৬ই মে এবং ভোট গণনা করা হবে ১০ই মে। এই কার্যক্রম এইরকমভাবে নির্ধারিত করা হয়েছিল কেন না রাষ্ট্রপতির তদানীন্তন কার্যকাল ১২ই মে তারিখে শেষ হবার কথা ছিল। যখন নতুন লোকসভা সংগঠনের কথা খবরের কাগজে ৭ই এপ্রিল তারিখে বের হল তখন দরখাস্তকারী Election Commission-এর কাছে nomination paper চেয়ে পাঠালেন। তিনি সে কাগজ পেলেন ১০ই এপ্রিল অর্থাৎ প্রস্তাব পেশ করবার শেষ দিনের পাঁচ দিন আগে। দরখাস্তকারীর বক্তব্য হোলো যে সময়টা খুবই সংকীর্ণ হওয়ায় তিনি তাঁর প্রস্তাবপত্র সময়মত দাখিল করতে পারেন নি। ২৬শে এপ্রিল তিনি সেই দরখাস্ত পেশ করে দাবি করলেন যে সংবিধানের ৭(১) ধারার মতে আদালত রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে যে "গভীর দ্বিধা"র সঞ্চার হয়েছে তা নিরসন করে দিন এবং সেইজন্যে Election Commission-এর উপর আদেশ জারি করা হোক যেন তিনি এই নির্বাচন মুলতুবী রাখেন যতদিন পর্যন্ত না সকল কেন্দ্রের নির্বাচনের ফলাফল ঘোষিত হয়। আর, এস, ডি, মনি ছিলেন খুব লড়িয়ে কৌঁসুলী। তিনি

'চীন যুদ্ধে পরাজয়ের দায়িত্ব' কার ?

লেঃ জেনারেল কল-এর বহু বিতর্কিত

THE UNTOLD STORY-র

সম্পূর্ণ বঙ্গানুবাদ

অকথিত কাহিনী

—কুড়ি টাকা—

একটি ঘোষণা :-নয়াদিল্লী, ৪ঠা মার্চ, ১৯৬৮ :

'অকথিত কাহিনী' গ্রন্থে গুপ্ত তথ্য ফাঁস করা সত্ত্বেও শ্রীনেহরু এবং শ্রীমেননের 'প্রিয়পাত্র' লেঃ জেনারেল কলের বিরুদ্ধে কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় নি,—সংসদে আজ অর্ধ ঘণ্টাব্যাপী বিতর্কে এই অভিযোগের উত্তরে প্রতিরক্ষামন্ত্রী শ্রীস্বরণ সিং বলেন, "জনস্বার্থের খাতিরে জেনারেল কলের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত হবে না কারণ তাতে আরও গুপ্ত তথ্য প্রকাশিত হয়ে পড়বার সম্ভাবনা রয়েছে।" —দি স্টেটসম্যান

সান্যাল এণ্ড কোম্পানী

১।১এ, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা—১২ [ফোন: ৩৪-৭৫২১]

খুব জোরের সঙ্গে বহাস করলেন। আমরা ৭ জন জজ একমত হলাম সংবিধানের ৭১(১) ধারায় সুপ্রিম কোর্টকে "রাষ্ট্রপতির" নির্বাচন ব্যাপারে "doubts and disputes" দূর করবার জন্যে যে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে সে ক্ষমতার ব্যবহার তখনই করা চলে যখন কোন এক ব্যক্তি রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হয়েছেন এবং তাঁর নির্বাচন নিয়ে "doubts and disputes" উঠেছে এবং সেই সব "doubts and disputes"-এর ফয়সালা করবার জন্যে একটি Election Petition ফাইল করা হয়েছে। এক্ষেত্রে নির্বাচন এখনো হয়ই নি এবং সেই কারণে বর্তমান দরখাস্ত নির্দিষ্ট সময়ের আগে করা হয়েছে বলে অচল। এই বলে আমার সতীর্থ জজেদের ও আমার নিজের রায় আমি লিখে দরখাস্তটি বাতিল করে দিলাম।

আর, এস, ভি, মানি কোন কেস ছেড়ে দেবার কৌসুলী ছিলেন না। যেই রাজেন্দ্রপ্রসাদের নির্বাচন ফলাফল ঘোষিত হোলো অমনি তাঁর মক্কেলের নাম দিয়ে কোর্টের দপ্তরে এক দরখাস্ত দাখিল করলেন। সেই দরখাস্তে দরখাস্তকারীকে বলা হয়েছিল "intending candidate" সেই দরখাস্তখানা দপ্তর থেকে ফেরত দেওয়া হয়েছিল কেন না রেজিস্ট্রারের মতে সে দরখাস্তখানা আইনসম্মত হয় নি, যেহেতু সেটি "Presidential and Vice Presidential Election Act, 1952 এবং সুপ্রিম কোর্টের রুল মোতাবেক লেখা হয় নি। আমাদের কাছে সেই প্রত্যাখ্যান হুকুমের বিরুদ্ধে আপীল এলো। আগের আমরা ৭ জন জজ বসলাম সে আপীল শুনতে। আমাদের রায় রিপোর্ট হয়েছে (1958) S.C.R. 648-এ। আপীলে দরখাস্তকারীর বক্তব্য হোলো যে দরখাস্তখানা ত' কেবলমাত্র "doubts and difficulties"-এর ভিত্তিতেই করা হয়েছে এবং সেইজন্যে সেই এ্যাক্ট কিংবা সুপ্রিম কোর্টের কোন রুলে পড়ছে না। আরও বলা হোলো যে ঐ Act এবং সুপ্রিম কোর্টের রুল সংবিধানের ৭১(১) ও (৩) ধারার পরিপন্থী: কোর্টের রায় বেশ ছোট্ট করে লিখলেন ভেংকটরামা আয়ার এবং তাতে বলা হোলো যে সংবিধানের ৭১(১) ধারা কেবলমাত্র ইঙ্গিত করে যে দরখাস্ত করতে হবে সুপ্রিম কোর্টে কিন্তু কি করে সুপ্রিম কোর্টের কাছে আসতে হবে তা নির্ভর করে ১৯৫২ সালের ঐ Act ও সুপ্রিম কোর্টের রুলের উপর। বর্তমান দরখাস্ত যখন ঐ Act এবং সুপ্রিম কোর্টের রুলের নিয়মমত করা হয় নি তখন সুপ্রিম কোর্টের দপ্তর যে দরখাস্ত গ্রহণ করে নি সেটা ঠিকই হয়েছে এবং বর্তমান আপীল বাতিল করতেই হবে। ব্যাপারটা এইখানেই শেষ হোলো আর, এস, ভি, মানির উৎসাহ ও আগ্রহাতিশয্য সত্ত্বেও।

চিরঞ্জিতলাল চৌধুরী বনাম ইউনিয়ন অফ ইণ্ডিয়া (1950 S.C.R. 869) থেকে সুরু করে বহু কেসে সুপ্রিম কোর্ট সংবিধানের ১৪ ধারার নিহিতার্থ নিয়ে আলোচনা করেছে। Equality before the law এবং Equal Protection of the law সম্বন্ধে নানা রায়ে নানাভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এ বিষয়ে আমারও কয়েকটি রায় আছে। পরে খুশন চৌধুরী বনাম স্টেট অফ বিহার (1955) S.C.R. 1045-এ প্রকাশিত কেসটি আসে সুপ্রিম কোর্টের সামনে। মহাজন সাহেব তখন ছিলেন চীফ জাস্টিস। তাঁর সঙ্গে মুখার্জী, আমি, ভিভিয়েন বোস, ভগবতী, জগন্নাথ দাস, ভেংকটরামা আয়ার আমরা সাতজন জজ সংবিধানের ১৪ ধারার নিহিতার্থ সম্বন্ধে একমত হয়ে চিরাঞ্জিতলাল চৌধুরীর কেস থেকে শুরু করে স্টেট অফ পাঞ্জাব বনাম আজৈব সিং (1953) S.C.R 661 পর্যন্ত সুপ্রিম কোর্টের যাবতীয় রায়গুলি পর্যালোচনা করে একটি রায় দিয়েছিলাম। সেই রায়টি আমারই লেখা। যা বলা হোলো তা খুব সংক্ষেপে এই—যদিচ কোন এক শ্রেণী লোকের জন্য বেহুদা ও অকারণে আইন প্রণয়ন করা সংবিধানের ১৪ ধারার পরিপন্থী, তথাচ আইন প্রণয়নে ন্যায্য কারণে শ্রেণী বিভাগে কোন বাধা নেই। যে শ্রেণী বিভাগ সংবিধানের সর্তানুসারে বৈধ হলে সে শ্রেণী বিভাগকে দুইটি সর্ত পরিপূরণ করতে হবে, যথা—(১) এই শ্রেণী বিভাগ এমন সহজ বোধগম্য গুণের ভিত্তিতে করতে হবে যে সেই গুণ খালি এই শ্রেণীভুক্ত লোকদের মধ্যেই দেখা যাবে কিন্ত অন্য কোন শ্রেণীর লোকের মধ্যে থাকবে না এবং (২) যে বিশিষ্ট গুণের ভিত্তিতে এই শ্রেণী বিভাগ করা হবে সেই গুণের সঙ্গে প্রস্তাবিত আইনের উদ্দেশ্যের খুবই ঘনিষ্ঠ পারস্পরিক যোগাযোগ এবং সঙ্গতি থাকবে। এই রায়টি শুনেছি এখনো বহালই আছে। আমাদের পার্লামেণ্টের বা অন্যান্য আইনসভার সদস্যদের "privilege", গো-বধ নিষিদ্ধকরণ ইত্যাদি সম্বন্ধেও কয়েকটা কেস আমাদের সামনে হয়েছিল। ভালমন্দ অনেক রায়ই লিখে গেছি। কোনটা টিকবে, কোনটা টিকবে না তা কে জানে।

"লেখা ত' লিখেছি ঢের
এখন পেয়েছি টের
সে কেবল কাগজের রঙিন ফানুষ।"
—রবীন্দ্রনাথ

[ক্রমশঃ]

দেশ সেবায় নিয়োজিত,
এ্যালবার্ট ডেভিড লিমিটেড
কলিকাতা—৫০
নীতি ও বিজ্ঞানানুযায়ী ঔষধ প্রস্তুতকরণের অগ্রণী
—ব্রাঞ্চ সমূহ—
বোম্বে - মাদ্রাজ - দিল্লী - নাগপুর
বেজওয়াডা - শ্রীনগর - গৌহাটী

ভারতীয় ছিটমহলের সমস্যা

নির্মল বসু

পাকিস্তানের ভৌগোলিক সীমার মধ্যে অবস্থিত ভারতীয় ছিটমহল বা এন্‌ক্লেভগুলি (বা আঁক্লাভ) এক অদ্ভুত সমস্যার সৃষ্টি করেছে।

ছিটমহলগুলি ভারতীয় এলাকা, কিন্তু ভারতের মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক নেই। এখানকার অধিবাসীরা ভারতের নাগরিক, কিন্তু ভারতের মূল ভূখণ্ডে তাদের আসার কোন ক্ষমতা নেই। যারা একবার ছিটমহল ছেড়ে চলে এসেছে, তারা আর ফিরে যেতে পারছে না। এই সব অঞ্চলে শাসনের কোন চিহ্ন নেই, কোন পুলিশ বা সরকারী কর্মচারী এখানে যেতে পারে না।

পূর্ব পাকিস্তানের রংপুর ও দিনাজপুর জেলার মধ্যে অবস্থিত প্রাক্তন কোচবিহার রাজ্যের ছিট এলাকাগুলি এই ভারতীয় ছিটমহল। আবার পশ্চিমবঙ্গের ভেতরে কোচবিহার ও জলপাইগুড়ি জেলায় পাকিস্তানেরও এইরূপ কিছু ছিটমহল আছে। ১৯৫১ সালের সেন্সাস রিপোর্টে দেখা যায়, পাকিস্তানে মোট ভারতীয় ছিটমহলের সংখ্যা ১৩১, আয়তন ২০,৪৬৩·০৫ বর্গমাইল এবং লোকসংখ্যা ১২,৬০১। বিপরীত দিকে ভারতে পাকিস্তানী ছিটমহলের সংখ্যা ৯৫, আয়তন ১২,১৫১·৯০ বর্গমাইল, এবং লোকসংখ্যা ১০,৯৫৪। কোটভাজানি, বাঁশকাটা, গাঁওচুলকা, দহলা খাগড়াবাড়ি, শালবাড়ি, নাটকটকা, পুঁটিমারি, কাজলদীঘি, বেউলাডাঙা, নাজিরগঞ্জ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য ভারতীয় ছিটমহল। এদের মধ্যে সবচেয়ে বড় হল দহলা খাগড়াবাড়ি (২,৬৫০·৩৫ একর), আর সবচেয়ে ছোট ছিটমহল হল পাণিশালা (০·২৭ একর)। ভারতের ভেতর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য পাকিস্তানী ছিটমহল হ'ল ডাহাগ্রাম।

১৯৪৭ সালে দেশবিভাগের পর থেকেই ছিটমহলের অধিবাসীদের নানারূপ অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। চারদিকে পাকিস্তান, মাঝখানে ক্ষুদ্র দ্বীপের মত এই ভারতীয় অঞ্চলগুলির অবস্থান—এই অবস্থায় ছিটমহলের পক্ষে ভারতের মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করা ক্রমেই কঠিন হয়ে পড়ে। অথচ, হাট-বাজার, চিকিৎসা, লেখা-পড়া সব কিছুর জন্যই তাদের মূল ভূখণ্ডে অবস্থিত শহর হলদিবাড়ি, জলপাইগুড়ি বা দিনহাটার ওপর নির্ভর করতে হত।

এই সব ছিটমহলের ওপর মাঝে মাঝেই পাকিস্তানীরা হানা দিয়ে ছিটমহল অধিবাসীদের গরু-বাছুর ও অন্যান্য মূল্যবান সম্পত্তি কেড়ে নিয়ে যেত। দাঙ্গা-হাঙ্গামা বাধাবার চেষ্টাও হয়েছে। কিন্তু ছিটমহলের বেশ কিছুসংখ্যক সৎ মুসলমান ও চারপাশের বন্ধুস্থানীয় পাকিস্তানী প্রতিবেশীর চেষ্টায় অবস্থা কখনও আয়ত্তের বাইরে যায় নি। কিন্তু ১৯৫০ সালের কুখ্যাত দাঙ্গার ঢেউ এই সব ছিটমহলেও এসে লাগে। ব্যাপক হারে খুন, রাহাজানি, অগ্নিসংযোগ, ধর্মান্তর প্রভৃতি হবার ফলে দলে দলে নর-নারী এই সব ছিটমহল ছেড়ে কোন-রকমে রাতের অন্ধকারে পাকিস্তানের ভেতর দিয়ে ভারতের মূল ভূখণ্ডে চলে আসতে বাধ্য হয়। তারপর তারা বিভিন্ন সময় ছিটমহলে ফিরে যাবার চেষ্টা করেছে, কিন্তু পাকিস্তান সরকার তাদের পাকিস্তানী এলাকা অতিক্রম করে ছিটমহলে যেতে দেন নি। ভারত সরকারও এ ব্যাপারে পাকিস্তানকে বাধ্য করতে পারেন নি। ১৯৫০-এর পর যখনই সুযোগ পেয়েছে তখনই ছিটমহল থেকে লোক এদিকে চলে এসেছে, কিন্তু ওদিকে আর কেউ যেতে পারে নি।

ভারতীয় ছিটমহলগুলি পশ্চিমবঙ্গের কোচবিহার জেলার অন্তর্ভুক্ত, এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রশাসনিক এক্তিয়ারের মধ্যে। কখনও এই সব ছিটমহলে পুরোপুরি সরকারী শাসন ছিল না। তবু মাঝে মাঝে পুলিশের লোক ছিটে যেতেন, কিছু কিছু সরকারী কর্মচারীও কার্যোপলক্ষে এখানে গিয়েছেন। কিন্তু পঞ্চাশের পর থেকে ধীরে ধীরে এই যাতায়াত বন্ধ হয়েছে। পাকিস্তান আমাদের পুলিশ ও কর্মচারীদের যেতে দেয় নি। ১৯৬৫ সালে মার্চ মাসে ডাহাগ্রামের গোলমালের পর শ্রীগোপাল পার্থসারথি করাচী দৌড়ে একটি চুক্তি করেন এবং তরপর ছিটমহলে কয়েকটি অস্থায়ী পুলিশ চৌকি বসাতে দেওয়া হয়। কিন্তু সেপ্টেম্বর ১৯৬৫-তে পাকিস্তানী আক্রমণের পর এই চৌকিগুলি ভেঙে ফেলা হয়, এবং তারপর থেকে কোন রকম সরকারী যোগাযোগ নেই এই ছিটমহলগুলির সঙ্গে। এই সব এলাকায় এখনও যে কয়েক হাজার ভারতীয় নাগরিক পড়ে রয়েছে, তাদের ভাগ্যে যে কি ঘটেছে তাও ঠিক জানা নেই।

অথচ ভারতের মধ্যে যে সব পাকিস্তানী ছিটমহল রয়েছে, সেখানে পাকিস্তানীদের পূর্ণ রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক কর্তৃত্ব রয়েছে। পাকিস্তানের সঙ্গে তাদের যোগাযোগও অক্ষুণ্ণ রয়েছে। পাকিস্তান থেকে এই ছিটমহলগুলিতে নিয়মিতভাবে পুলিশ, সরকারী কর্মচারী সবাই আসছেন, এখানকার পাকিস্তানী নাগরিকরা পাকিস্তানের মূল ভূখণ্ড থেকে তাদের রেশনও নিয়ে আসছে গাড়ি করে। সবই আসছে ভারতীয় এলাকার ভেতর দিয়ে। ভারত সরকার কখনও এ ব্যাপারে কোন আপত্তি করেন নি।

এই একতরফা ব্যাপার চলছে বহু বছর ধরে।

॥ দুই ॥

ছিটমহলের অধিবাসীদের অবস্থা খুবই শোচনীয়। যারা এখনও ছিটমহলে রয়ে গেছে, তাদের প্রায়-বন্দীজীবন যাপন করতে হচ্ছে। এলাকাগুলি কার্যত পাকিস্তানের অংশে পরিণত হয়েছে। এ ব্যাপারে আমাদের সরকার নীরব দর্শক মাত্র।

আর যে দশ-এগারো হাজার মানুষ এই সতেরো-আঠারো বছরে ছিটমহল ছেড়ে মূল ভূখণ্ডে চলে আসতে বাধ্য হয়েছে, তাদের অবস্থা? তারা এখন উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় অত্যন্ত দুর্দশার মধ্যে বাস করছে। ভারত সরকার তাদের উদ্বাস্তু বলে স্বীকার করেন না। ঠিকই তো। ভারতের এক অঞ্চল থেকে দেশের আর এক অঞ্চলে এলে কেউ কি উদ্বাস্তু হয়। কিন্তু অদৃষ্টের এমনই পরিহাস যে, আজ ছিটমহলের মানুষ নিজ দেশে উদ্বাস্তুতে পরিণত হয়েছে। তারা ছিটমহলে যেতে চায়, সেখানে তাদের ঘরবাড়ি, জমি-জমা রয়েছে, কিন্তু যাবার উপায় নেই।

রাজ্য বা কেন্দ্রীয় সরকার কেউ এ পর্যন্ত এক পয়সা সাহায্য দেন নি এই ছিটমহল উদ্বাস্তুদের। এদের ভেতর অধিকাংশই কৃষক, কিছু ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী আছে, অন্য জীবিকার লোকও আছে সামান্য। এদের মধ্যে একটা বড় অংশ তপশীলী জাতি ও উপজাতির লোক।

॥ তিন ॥

ছিটমহল সমস্যার স্থায়ী সমাধান একমাত্র ছিটমহল-বিনিময়ের দ্বারাই সম্ভব। ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে ছিটমহলগুলি বিনিময় করতে হবে। ভারত

সরকার এ ব্যাপারে মনস্থির করেছেন। ১৯৫৮ সালে এই সম্পর্কে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে একটি চুক্তিও হয়; অধুনা বিখ্যাত নেহরু-নুন চুক্তির মধ্যে এর স্থান হয়।

কিন্তু ভারত সরকার যেভাবে বিনিময়ের চুক্তি করেন, তাতে দেশে বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়। বিনিময়ের ফলে ভারতের ৮,৩১১·১৫ একর জমি ক্ষতি হবে। কারণ, প্রস্তাবিত বিনিময়ের দ্বারা পাকিস্তান পাবে পাকিস্তানে অবস্থিত সব ক'টি ভারতীয় ছিটমহল, যার মোট আয়তন ২০,৪৬৩·০৫ একর। আর, ভারতে অবস্থিত পাকিস্তানী ছিটমহলগুলি ভারতের ভাগে আসবে—যেগুলির মোট আয়তন ১২,১৫১·৯০ একর। চুক্তির দ্বারা দুই দেশের মধ্যে যখন বিনিময় হচ্ছে, তখন পাকিস্তান বেশি পাবে কেন? তাই দাবি উঠেছে, এই বাড়তি ৮,৩১১·১৫ একর জমির জন্য পাকিস্তানকে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। ভারতের সংলগ্ন কোন এলাকায় পাকিস্তানের জমি থেকে এই পরিমাণ জমি দিয়ে দিতে হবে।

ভারত সরকার আর একটি ভুল করেছেন। বেরুবাড়ি হস্তান্তরের বিষয়টিকেও এই এক নেহরু-নুন চুক্তির অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। কিন্তু বেরুবাড়ির ব্যাপার সম্পূর্ণ ভিন্ন। বেরুবাড়ি ছিটমহল নয়, কোনরূপ সীমানাবিরোধের ব্যাপারও এটা নয়, স্পষ্টত এর দ্বারা ভারতের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ পাকিস্তানের হাতে অর্পণের চেষ্টা চলছে। এর বিরুদ্ধে দেশব্যাপী আন্দোলন হয়, হাইকোর্ট ও সুপ্রীম কোর্টে মামলা হয়। এখনও এই প্রতিরোধ চলছে। পাকিস্তান আবদার করেছে, বেরুবাড়ি ফয়সালা না হলে ছিটমহলের ব্যাপারেও কিছু করা হবে না। আর আশ্চর্য, ভারত সরকারও একই কথা বলছেন, বেরুবাড়ির জন্যই সব আটকে আছে।

আসল কথা, বিনিময়ের জন্য পাকিস্তানের কোন আগ্রহ নেই। পাকিস্তানের তো এখন ডবল লাভ হচ্ছে। ভারতের ভেতর যে সব পাকিস্তানী ছিটমহল আছে, তার ওপর তাদের পূর্ণ কর্তৃত্ব রয়েছে। উপরন্তু পাকিস্তানে অবস্থিত ভারতীয় ছিটগুলিও তাদের দখলে। বিনিময় হলে ভারতের ভেতরকার ছিটমহলগুলি হাতছাড়া হবে।

কিন্তু যতদিন বিনিময় না হচ্ছে, ততদিন ভারতীয় ছিটমহলগুলিতে ভারতের কর্তৃত্ব থাকবে না কেন? এগুলি ভারতীয় অঞ্চল। ভারতের সরকারকে অবশ্যই এখানে শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা করতে হবে, এখানে যাতে পুলিশ, সৈন্য, সরকারী কর্মচারী, নাগরিক, সবাই যেতে পারেন তার ব্যবস্থা করতে হবে। যে সরকার নিজের এলাকায় নিজের দখল বজায় রাখতে পারে না, সে সরকার নামের অযোগ্য। আর পাকিস্তান আপত্তি করবে কেন? আর, করলে সে আপত্তি শোনাই বা হবে কেন? এখনও তো পাকিস্তানের সঙ্গে ভারতের কূটনৈতিক সম্পর্ক আছে। পাকিস্তানীরা তাদের ছিটে আসতে পারবে, আর আমরা আমাদের এলকায় যেতে পারব না?

যে সব ছিটমহল অধিবাসী মূল ভূখণ্ডে চলে আসতে বাধ্য হয়েছে, এবং নিজেদের ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও ছিটমহলে ফিরে যেতে পারছে না—সরকার তাদের যাবার ব্যবস্থা করতে পারছে না, তাদের এখানে পুনর্বাসনের পূর্ণ সুযোগ-সুবিধা দিতে হবে।

সুতরাং ছিটমহল সমস্যার সমাধানের জন্য এই তিনটি কাজ করা প্রয়োজন: (১) ছিটমহল বিনিময়; (২) যতক্ষণ বিনিময় না হচ্ছে, ততক্ষণ ছিটমহলে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা এবং ছিটমহল ও ভারতীয় ভূখণ্ডের মধ্যে যাতায়াতের ব্যবস্থা; এবং (৩) ছিটমহল থেকে চলে আসা ব্যক্তিদের পুনর্বাসনের জন্য সাহায্য।

॥ চার ॥

এই তিনটি দাবির ভিত্তিতে আজ ছিটমহল অধিবাসীরা সঙ্ঘবদ্ধ হয়েছেন। উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে যে সব ছিটমহল অধিবাসী বর্তমানে উদ্বাস্তুর মত বাস করছেন, তাঁরা 'ভারতীয় ছিটমহল উদ্বাস্তু সমিতি' গঠন করে এই দাবিগুলি নিয়ে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা সুরু করেছেন। আলাপ-আলোচনায় কোন ফল না হলে, তাঁরা প্রত্যক্ষ আন্দোলনের পথেও পা বাড়াবেন।

গত সেপ্টেম্বর মাসে ছিটমহল অধিবাসীদের পক্ষ থেকে একটি প্রতিনিধি দল এই প্রবন্ধলেখকের নেতৃত্বে পশ্চিমবঙ্গের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। শ্রীমুখোপাধ্যায় ছিটমহলবাসীদের দাবি সমর্থন করেন। তবে সব ব্যাপারই কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে। শ্রীমুখোপাধ্যায় অবশ্য কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে এই বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে পারেন নি। কিছুদিন পরেই অজয়-মন্ত্রিসভা বাতিল হয়ে যায়।

২৩শে মার্চ প্রবন্ধলেখক পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল শ্রীধর্মবীরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে ছিটমহলের সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেন। তিনিও এ বিষয়ে যথাসাধ্য করার প্রতিশ্রুতি দেন।

ছিটমহল অধিবাসীদের পক্ষ থেকে আটজন সদস্যের এক প্রতিনিধি দল ২৭শে মার্চ দিল্লী যান কেন্দ্রীয় সরকারের নেতৃবৃন্দ ও অন্যান্য সকলের সঙ্গে আলোচনার জন্য। প্রতিনিধি দল প্রায় এক সপ্তাহ দিল্লীতে ছিলেন। প্রবন্ধলেখক এই প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব করেন। শতকরা নব্বই ভাগ ছিটমহল যে বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্ভুক্ত সেই

নয়াদিল্লীতে ভারতীয় ছিটমহলের অধিবাসীদের প্রতিনিধিবৃন্দ

গ্রীষ্মের নকশা

পায়ে গলিয়েই বুঝবেন বাটার স্যান্ডাল গ্রীষ্মের পথচলায় এত উপভোগ্য কেন। তার আসল কারণ এদেয নকশা। এমন নকশা যাতে উপরে হাওয়া খেলবে আর নিচে তাপ আটকাবে। পথের যে পাথুরে বা পিচঢালা গরম, পায়ের তলা তাব খোঁজ পাবে না। পায়ের পাতায় শুধু হাওয়া খেলবে সারাক্ষণ—গ্রীষ্মে এর চেয়ে সুখকর অভিজ্ঞতা আর কি হতে পারে। বাছাই মসৃণ চামড়া, কোমল হলেও সুঠাম। তলি, গোড়ালি, সুখতলা—সবই বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফল। তার সঙ্গে আধুনিক নির্মাণ কৌশল। ফলে বাটার স্যান্ডাল এমন মজবুত যার কথা সকলের মুখে-মুখে। কারখানা থেকে মনোজ্ঞ সব নকশা এখন বাটার দোকানে এসেছে। আজই এসে দেখে যান।

Bata

মেখলীগঞ্জের নির্বাচিত সদস্য (বর্তমানে বাতিল) শ্রীঅমর রায়প্রধান ছিলেন প্রতিনিধিদলের সহকারী নেতা এবং ভারতীয় ছিটমহল উদ্বাস্তু সমিতির সম্পাদক শ্রীবিমলকুমার চক্রবর্তী প্রতিনিধি দলের সচিব। প্রতিনিধি দলের অন্যান্য সদস্য ছিলেনঃ শ্রীসত্যেন মজুমদার, শ্রীউপেন্দ্রনাথ রায়সরকার, শ্রীমণ্টুরাম রায়, শ্রীহিমাদ্রিবল্লভ রায়প্রামাণিক ও শ্রীদিগেন দেবসিংহ। ছিটমহল এলাকার নির্বাচিত লোকসভা সদস্য শ্রীবিনয়কৃষ্ণ দাসচৌধুরীও প্রতিনিধি দলের সঙ্গে ছিলেন।

২৭শে মার্চ পুনর্বাসনমন্ত্রী শ্রীজয়সুখলাল হাতির সঙ্গে ছিটমহল থেকে চলে আসা ব্যক্তিদের পুনর্বাসনের প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা হয়। শ্রীহাতি বিভিন্ন বিষয়ে দীর্ঘসময় ধরে খোঁজখবর নেন। পুনর্বাসনের ব্যাপারে সরকার শীঘ্রই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

২৮শে মার্চ প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে আলোচনা হয়। শ্রীমতী গান্ধী বিনিময়ের দাবির সঙ্গে একমত হন, তবে বেরুবাড়ির প্রশ্ন না মেটা পর্যন্ত এটা করা যাবে কি-না সে বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেন। প্রতিনিধি দল এ বিষয়ে তীব্র আপত্তি জানান। বেরুবাড়িকে এর সঙ্গে মেশালে চলবে না—দুটো সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যাপার। ছিটমহলে ভারতের কর্তৃত্ব বজায় রাখা, সেখানে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা এবং যাতায়াতের ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রী কোন প্রতিশ্রুতি দিতে পারেন নি। ছিটমহলের লোকেদের জন্য কিছু একটা করতেই হবে, কেবল এইটুকু তিনি বলেন। পুনর্বাসনের প্রশ্নে তিনি অবশ্য বিবেচনার আশ্বাস দেন।

২৯শে মার্চ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীচ্যবনের সঙ্গে আলোচনা হয়। ছিটমহলে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার দায়িত্বের কথা বিশেষভাবে তাঁকে বলা হয়। অবস্থার গুরুত্ব তিনি স্বীকার করেন এবং কিছু একটা করতে হবে, সে কথা বলেন।

এই তিনদিন মন্ত্রীদের সঙ্গে আলোচনার সময় বাংলাদেশের সব দলের সংসদ সদস্যরাই প্রায় উপস্থিত ছিলেন। শ্রীচিত্ত বসু ও শ্রীবিনয়কৃষ্ণ দাসচৌধুরী তিনদিনই ছিলেন, তাছাড়াও ছিলেন শ্রীসতীশ সামন্ত, অধ্যাপক হীরেন মুখোপাধ্যায়, শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল সেনগুপ্ত, অধ্যাপক সমর গুহ ও শ্রীজ্যোতির্ময় বসু।

ছিটমহল প্রতিনিধিদলের দিল্লী যাওয়ার ফলে সমস্যাটি একটি জাতীয় চরিত্র লাভ করেছে। এতদিন এই সমস্যা সম্পর্কে বিশেষ কেউ ওয়াকিবহাল ছিলেন না। কিন্তু সাতদিন ধরে দিল্লীতে প্রচার করার ফলে, সংসদ সদস্য, রাজনৈতিক নেতা ও সংবাদপত্র প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনা এবং পুস্তিকা প্রচার প্রভৃতির ফলে অনেকেই বিষয়টি জেনেছেন, বুঝেছেন। সংবাদপত্রেও বিষয়টি প্রাধান্য পেয়েছে।

প্রায় সব ক'টি অকংগ্রেসী সর্বভারতীয় রাজনৈতিক দলের নেতারা প্রকাশ্য বিবৃতি দিয়ে ছিটমহল অধিবাসীদের দাবির প্রতি তাঁদের সমর্থন জানিয়েছেন, এবং সরকারকে অবিলম্বে এই দাবিগুলি মেনে নেবার জন্য অনুরোধ করেছেন। কোন কংগ্রেসীর পক্ষে অবশ্য এই বিবৃতিতে স্বাক্ষর করা সম্ভব হয় নি, তবে সংসদের কেন্দ্রীয় হলে অনেক বিশিষ্ট কংগ্রেস সদস্যই দাবিগুলির প্রতি তাঁদের সহানুভূতি প্রকাশ করেছেন। বাংলাদেশের সব দলের সংসদ সদস্য ছাড়াও আর যাঁরা এই বিবৃতিতে স্বাক্ষর করেছেন, তাঁদের মধ্যে আছেন শ্রীমধু লিমায়ে, শ্রীআনন্দন নাম্বিয়ার, শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দ্বিবেদী, শ্রীঅটলবিহারী বাজপেয়ী, শ্রীকান্দাপ্পান প্রমুখ।

এতদিন কেন্দ্রীয় সরকার ছিটমহলের সমস্যাকে স্বীকারই করতে চান নি। চিঠি দিলে উত্তর দেন নি। ছিটমহল অধিবাসীদের উদ্বাস্তুর প্রাপ্য পুনর্বাসন-সুযোগ দিতে রাজী হন নি। কিন্তু এবার তাঁদের কানে জল ঢুকেছে। তাঁরা বুঝেছেন, কিছু করতে হবে।

॥ পাঁচ ॥

সরকার কি করবেন; আমরা জানি না। এখনও পরিষ্কার করে কিছুই তাঁরা ঘোষণা করেন নি। ছিটমহলের হতভাগ্য মানুষ অনেকদিন অবিচার সহ্য করেছে। এখনও তাঁরা কেন্দ্রীয় সরকারকে কিছুদিন সময় দিতে প্রস্তুত। কিন্তু বেশিদিন তাঁদের পক্ষে ধৈর্য ধরা সম্ভব হবে না। তাই তাঁরা ঘোষণা করেছেন, অল্পদিনের মধ্যে যদি ছিটমহল থেকে চলে আসা এগারো হাজার মানুষের পুনর্বাসনের সুযোগ না দেওয়া হয় এবং ছিটমহলে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা ও যাতায়াতের জন্য কার্যকরী ব্যবস্থা না করা হয়, তবে তাঁরা প্রত্যক্ষ আন্দোলন সুরু করবেন। ভারতীয় ছিটমহল উদ্বাস্তু সমিতির স্বেচ্ছাসেবকরা ভারতীয় এলাকা অতিক্রম করে পাকিস্তানীদের তাঁদের ছিটমহলে যেতে দেবে না। তাঁরা সীমান্তে প্রতিরোধ সৃষ্টি করবে। ভারতীয়রা তাঁদের ছিটমহলে যেতে পারবে না, পাকিস্তান সরকার তাঁদের এলাকা অতিক্রম করে যাবার অনুমতি দেবে না এবং ভারত সরকার সেই অনুমতি আদায় করতে পারবেন না, অথচ পাকিস্তানীরা ভারতের এলাকার ভেতর দিয়ে অবাধে যাতায়াত করতে পারবে, এই একতরফা ব্যবস্থা চিরকাল চলতে পারে না।

এই আন্দোলন পাকিস্তানের বিরুদ্ধে নয়, কোন সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে তো নয়ই। ভারত সরকারের নিষ্ক্রিয়তা ও অক্ষমতা এবং তাঁদের দুর্বল নীতির প্রতিবাদে এই আন্দোলন।

আশা করব, ছিটমহল বিতাড়িত এগারো হাজার মানুষকে শেষ পর্যন্ত এই চরম পথ গ্রহণ করতে হবে না। তার আগেই ভারত সরকার কিছু একটা করবেন। কিন্তু এখনও যদি তাঁরা ইতস্তত করেন, তবে প্রতিরোধ-সংগ্রাম সুরু হবে। কেবল ছিটমহলের মানুষই নয়, এই ন্যায়সঙ্গত আন্দোলনের পেছনে দেশবাসীর ব্যাপক সমর্থন পাওয়া যাবে, এই আশা আছে। কেবল কয়েক হাজার মানুষের জীবন-মরণের প্রশ্ন এটা নয়, এটা আজ জাতীয় সার্বভৌমত্বের প্রশ্ন, নাগরিকের মৌলিক অধিকার রক্ষার প্রশ্ন।

সেই সাহিত্যজগজ্জ্যোতি—প্রতিভা ও মনীষার অবতার—সাহিত্য-তপস্যানিষ্ঠ—
মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর

হরপ্রসাদ গ্রন্থাবলী

কাঞ্চনমালা, বেণের মেয়ে, মেঘদূত, বাল্মীকির জয়, ভারত-মহিলা, বাঙ্গালা সাহিত্য সমালোচনা, ঐতিহাসিক নিবন্ধমালা, শিক্ষাসন্দর্ভ, সমাজসংস্কার নিবন্ধমালা, মোহিনী।

এই জাতীয় সাহিত্য-জয়ন্তী দুই ভাগ একত্রে পাঁচ টাকা।

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড
১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট,
কলিকাতা-১২

অগ্নিযুগের একটি অধ্যায়

অনন্ত সিংহ

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

সমস্ত বৃটিশ শাসকদের অবর্ণনীয় অত্যাচার

চট্টগ্রাম জেলা কর্তৃপক্ষ পরাজয়ের গ্লানিতে অন্তরে অন্তরে দগ্ধ হয়েছে। জেলা পুলিশকে ঘুম পাড়িয়ে অতর্কিত আক্রমণে শহর দখল করেছে নির্ভীক যুবক দল। জালালাবাদ যুদ্ধে ইংরেজের শোচনীয় পরাজয় ঘটেছে—রণে ভঙ্গ দিয়ে তারা ঘরে ফিরে যেতে বাধ্য হয়েছে। অমরেন্দ্র নন্দীর রিভলভার সমবেত পুলিশ ও মিলিটারীর রাইফেলকে ব্যঙ্গ করে নিজ বক্ষ ভেদ করেছে—আত্মসমর্পণ করে নি। ফেণী স্টেশনে চারটি রিভলভারের গর্জন সুদৃঢ় পুলিশ বেষ্টনী নিশ্চল নিস্তব্ধ করে বিপ্লবীদের প্রস্থান-পথ সুগম করেছে। কালারপোল শহীদদের সেই গৌরবোজ্জ্বল মৃত্যুবরণ জেলা কর্তৃপক্ষকে প্রতিটি মুহূর্তে বিদ্রূপ করেছে—হেয় প্রতিপন্ন করেছে। তদানীন্তন বাংলা ও ভারত সরকারের দরবারে জেলা কর্তৃপক্ষের পদমর্যাদা রীতিমত ক্ষুন্ন! উপরতলার কাছ হতে হৃত পদমর্যাদা ও লুপ্ত কর্মদক্ষতা পুনরুদ্ধারে জেলা কর্তৃপক্ষের আহার-নিদ্রা ঘুচেছে। তাদের করুণ আর্তনাদে বিচলিত ভগবানই যেন ত্রাণকর্তা রূপে খাঁ বাহাদুর আসানুল্লাকে পাঠিয়ে দিলেন। আসানুল্লা এসেই যুব-বিদ্রোহের অন্যতম নেতা অম্বিকা চক্রবর্তীকে (অম্বিকাদা) গ্রেফতারে সমর্থ হলেন।

খাঁ বাহাদুরের দোর্দণ্ড প্রতাপ! জেলা কর্তৃপক্ষ যথেচ্ছ অত্যাচার ও নিপীড়ন চালাবার খোলা সনদ খাঁ বাহাদুরকে অর্পণ করেছেন। জেলা শাসক-গোষ্ঠীর বিশ্বাস ও আশা—খাঁ বাহাদুরই তাঁদের লুপ্ত মর্যাদা ফিরিয়ে আনবেন। কাজেই খাঁ বাহাদুরের নিরাপত্তা ব্যবস্থাও হয়েছে চূড়ান্ত। শাসকবর্গের এই ঘোরতর দুর্দিনে খাঁ বাহাদুরই তাঁদের ম্লান-মুখে হাসি ফুটিয়েছেন—বিষন্নবদনে প্রসন্নতা এনেছেন। কিন্তু শেষরক্ষা হোল কি? এ হেন খাঁ বাহাদুরকেও বিপ্লবীর অকস্মাৎ নিক্ষিপ্ত পিস্তলের গুলীতে প্রাণ দিতে হল—কোনো মিলিটারী বা পুলিশী ব্যবস্থাই তাঁকে রক্ষা করতে পারলো না। বৈপ্লবিক দৃঢ়তার কাছে জেলা কর্তৃপক্ষকে হার মানতেই হলো।

খাঁ বাহাদুরের হত্যা যেন শাসকবর্গের দক্ষতা, বুদ্ধিমত্তা ও পৌরুষের উপরেই কশাঘাত—এই পরাজয় মর্মান্তিক—দুঃসহ। তাই আসানুল্লার তিরোধানের অসহ্য যাতনায় অধীর শাসকগোষ্ঠী সেই বিষাদ রজনীতেই প্রতিশোধস্পৃহায় উন্মত্ত হয়ে ওঠেন এবং পরের দিনও তাঁদের নেশা কাটে নি। দুটি ঘণ্টার জন্য সাম্রাজ্যবাদী চক্রের সুপরিকল্পিত দাঙ্গা পরিচালিত হল—ব্যাপক লুঠতরাজ ও বিস্তৃত এলাকা জুড়ে অগ্নিসংযোগের মাধ্যমে নিরীহ দেশবাসীর উপর নিদারুণ উৎপীড়ন চললো। কিন্তু আশ্চর্য?—একজনও এই দাঙ্গায় হতাহত হয় নি। বাস্তব ঘটনা থেকে অভ্রান্ত প্রমাণ পাওয়া যায়—জেলা কর্তৃপক্ষের সুনির্দিষ্ট নির্দেশ অনুযায়ীই সেই "দাঙ্গা" অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

জেলা কর্তৃপক্ষের এই উন্মত্ততা শহরের ওপর অত্যাচারেই যদি সীমাবদ্ধ থাকতো তবে হয়তো কারও কারও মনে প্রশ্নের অবকাশ থাকতো যে—তদানীন্তন কর্তৃপক্ষ কি বৃটিশ জাস্টিসকে ধুলোয় মিশিয়ে রামের অপরাধে শ্যামের মাথা ভাঙতে পারে? ইংরেজ শাসকগোষ্ঠী কি বিনা পরোয়ানায় কাউকে গ্রেপ্তার করতে পারে? —শত শত অপরাধীকে সারা রাত্রিব্যাপী থানায় বেঁধে তাদের ওপর কি অমানুষিক শারীরিক উৎপীড়ন চালাতে পারে? উচ্চপদস্থ ইংরেজেরা জেলা শাসকের উপস্থিতিতে ও প্ররোচনায় পাঞ্চজন্য প্রেস হাতুড়ির ঘায়ে ভেঙে চুরমার করতে পারে? কিন্তু শুধুমাত্র শহরের বুকে তাণ্ডব চালিয়েই তাঁরা ক্ষান্ত হন নি। শহরের ওপর এই নিষ্ঠুর আক্রমণ পরিকল্পনা পরিচালনের সঙ্গে সঙ্গেই চট্টগ্রামবাসীকে স্তম্ভিত করে, তাদের চিন্তাধারারও বাইরে, জেলা কর্তৃপক্ষ গ্রামাঞ্চলেও আসানুল্লা-হত্যা-প্রতিশোধ অভিযানের আয়োজন করলো।

বাস্তব ঘটনাবলী এমনই অব্যর্থ প্রমাণ বহন করে যে, বৃটিশ জাস্টিসের প্রেমে বিগলিত ভক্তবৃন্দেরা যদি আমার বর্ণিত ঘটনা সম্বন্ধে সন্দেহ পোষণ করেন এবং বর্তমান "ঘেরাওকে" "বৃটিশ জাস্টিসের" নামে তুলনামূলক সমালোচনায় অবতীর্ণ হন, তবে তাঁদেরও লজ্জায় মুখ লুকোনো ছাড়া উপায় থাকবে না।

জেনারেল ওডায়ার এবং গভর্নর মাইকেল ওডায়ার জালিয়ানওয়ালাবাগে নৃশংস হত্যাকাণ্ড সংঘটিত করে বৃটিশ জাস্টিসের যে নমুনা রেখে গেছে তার তুলনা পাওয়া ভার। কিন্তু আসানুল্লা হত্যার পর কর্তৃপক্ষ যেরূপ অভিনব পদ্ধতিতে অবাধ অত্যাচার ও নিপীড়ন চালিয়ে গেছে তার দ্বিতীয় নজীর ভারতে আর নেই।

এডিশন্যাল পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্ট মিঃ সুটার Eastern Frontier Rifles Regiment-এর একশ জনের এক সুসজ্জিত বাহিনী নিয়ে গ্রামে গ্রামে অমানুষিক অত্যাচার চালাবার দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। এই সুসজ্জিত সৈন্যদলের মধ্যে সপ্তরথী পরিবেষ্টিত অভিমন্যুর মত দাঁড়িয়ে নির্ভীক বালক হরিপদ—হাতে হাতকড়া, কোমরে দড়ি, রুধিরাপ্লুত দেহ, শতচ্ছিন্ন রক্তরঞ্জিত বস্ত্র, সর্বাঙ্গে নিষ্ঠুর নির্যাতনের চিহ্ন এবং একটি চোখ বিশেষভাবে আঘাতপ্রাপ্ত। হরিপদর স্বদেশ প্রেমের এইসব উপহারপদক ইংরেজের

'ভিক্টোরিয়া ক্রস' বা 'কিংস মেডেলকে' ম্লান করে দিচ্ছিল। সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজের প্রচণ্ড শক্তির এই কি পরিণতি?

মিলিটারী বেষ্টিত শৃংখলিত হরিপদকে নিয়ে স্যুটার সাহেব তিনটি লঞ্চ যোগে কর্ণফুলী নদীপথে গ্রাম অভিমুখে চললেন। কোনো ম্যাজিস্ট্রেট কি হত্যাপরাধে ধৃত কোনো আসামীকে জেল হাজতে বন্ধ রাখার আদেশ না দিয়ে পারেন? স্বাভাবিক নিয়মের কি অভূতপূর্ব ব্যতিক্রম? ম্যাজিস্ট্রেটের ওইরূপ বিধিবহির্ভূত হুকুম ছাড়া কি স্যুটার সাহেব হরিপদকে নিয়ে গ্রামে গ্রামে বিভীষিকা সৃষ্টির মহান দায়িত্ব গ্রহণে সক্ষম হতেন? ম্যাজিস্ট্রেট ক্যাম্প সাহেব এইরূপ নির্দেশই দিয়েছিলেন এবং এই কুখ্যাত জেলাশাসকই ইংরেজ সঙ্গীদের নিয়ে আগের দিন রাত্রে 'পাঞ্চজন্যের' প্রিন্টিং প্রেসটি চূর্ণ করেছিলেন। There is a Method in Madness! There is a Method in British Justice?

স্যুটার সাহেব অত্যাচারীর মুষল হস্তে ভোর থেকে রাত সাতটা আটটা পর্যন্ত বড় বড় গ্রামগুলি পরিভ্রমণ করলেন। পাঁচ-ছ'টি হাটের জনতাকে আহবান করে তাদের সামনে স্যুটার সাহেব ও তাঁর সাব-ইন্সপেক্টরেরা বুটের লাথি, ব্যাটনের আঘাত ও অবিশ্রান্ত ঘুষিতে হরিপদকে নিষ্ঠুরভাবে পীড়ন করে চললেন এবং বক্তৃতা দিলেন—"হত্যাকারীর নিস্তার নেই। এ নিতান্ত বালক বলে নিজে বা তার নেতারা ভেবেছে আমরা তাকে রেহাই দেব—কেবল ফাঁসী দেব—ফাঁসী তো অনেক দিন পরের কথা। আমরা তাকে তিলে তিলে মারবো—জীবন্ত পুঁতে ফেলবো! সকলে মনে রেখো আবার যদি কোনো হত্যাকাণ্ড ঘটে তবে হত্যাকারীর চামড়া ছিঁড়ে ফেলবো—তার ছিন্নমুণ্ড নিয়ে জনসাধারণকে দেখাবো...।"

গ্রামে গ্রামে বেপরোয়াভাবে এই ধরণের ঔদ্ধত্যপূর্ণ বে-আইনী বক্তৃতা দিয়ে স্যুটার সাহেব জনসাধারণের মনে ভীতি সঞ্চারের আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। তাঁদের নির্দয় অত্যাচারে হরিপদ ছ'-সাতবার জ্ঞান হারায়। আমি হরিপদর মুখেই এই সমস্ত ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ শুনেছি। তাছাড়া আমাদের মামলা চলাকালে অনেক পুলিশ অফিসার, যাঁরা এই নৃশংসপর্বে প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন, তাঁদের কেউ কেউ আমাদের বলেছেন—"মশায়, ভাবতে পারি না ছেলেটি বেঁচে রইলো কি করে? এক-একটি লাথিতে দশ-বারো হাত দূরে ছিট্‌কে পড়েছে—মুখে কোঁক্‌ করে একটি শব্দ হয়েই একেবারে চুপ—প্রতিবারেই মনে হয়েছে—'এই বুঝি গেল'! আমরা তো মশাই পুলিশ আমাদের তো দয়ামায়া কিছুই নেই। আমরাও সেই দৃশ্য সহ্য করতে পারছিলাম না। কি নিদারুণ দৃশ্য—চোখে জল না এসে পারে না।"

স্যুটার সাহেবের তাণ্ডব কেবল হাটে-বাজারেই সীমাবদ্ধ ছিল না। এই প্রথম অধ্যায়টি নিষ্ঠার সঙ্গে সমাপ্ত করার পর তিনি গ্রামের বড় বড় উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়সমূহে আরও ভয়ঙ্কর মূর্তিতে সদলবলে হানা দেন। সঙ্গের রাইফেলধারী গুর্খা পল্টনের প্রত্যেক রাইফেলের মুখের সঙ্গীনের ফলা রৌদ্রকিরণে প্রতিবিম্বিত হয়ে হৃদয় বিদীর্ণ করার ইচ্ছে প্রকাশ করছে। শৃংখলিত অবস্থায় হরিপদকে নিয়ে এ'দের এই আকস্মিক আবির্ভাব স্কুল-কর্তৃপক্ষের মনে নিদারুণ ত্রাসের সঞ্চার করেছে। স্কুলে প্রবেশ করেই স্যুটার সাহেব প্রধান শিক্ষককে ডেকে বিশেষ সন্দেহভাজন ছাত্রদের নামের একটি তালিকা দিয়ে আদেশ করেন যে, ওই সব ছাত্রদের যেই মুহূর্তেই তাঁদের সামনে হাজির করা হোক। কি অনধিকার চর্চা? কিন্তু নিরুপায়—হিংস্র ক্রোধোন্মত্ত স্যুটার সাহেবের সামনে অসহায় অবস্থায় ছাত্রদের পেশ করা হল। প্রতিটি স্কুলে স্যুটার সাহেব প্রধান শিক্ষককে কঠিন নির্দেশ দেন অবিলম্বে সব ছাত্রকে স্কুলপ্রাঙ্গণে সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করাতে। ভীত-ত্রস্ত শান্তিপ্রিয় শিক্ষকবৃন্দ আদেশ অবজ্ঞা করতে সাহস করেন নি। ছাত্রেরা সকলে সমবেত হল, কিংকর্তব্যবিমূঢ় শিক্ষকেরাও ছাত্রদের পাশে এসে দাঁড়ালেন। এবারে শুরু হল স্যুটার সাহেবের প্রতিশোধ-পরায়ণ নীতির তীব্র প্রয়োগ। তিনি সমবেত ছাত্রদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন হরিপদর দিকে। নির্যাতনে ও নিপীড়নে জর্জরিত হরিপদকে দেখিয়ে স্যুটার সাহেব হিন্দীতে বললেন—"দেখ, অপরাধের ক্ষমা নেই। এই ছোকরা খাঁ বাহাদুরকে হত্যা করেছে। ইংরেজ সরকারের শক্তি প্রবল—ব্যক্তিগতভাবে অফিসারদের খুন করে তোমরা কিছু করতে পারবে না। তোমাদের সঙ্ঘবদ্ধ শক্তিও কিছু করতে পারবে না। সূর্য সেনকেও খুবই শীঘ্র ধরা হবে। তোমরা কে কে বিপ্লবী সংগঠনে যোগ দিয়েছ তা' আমাদের জানা আছে। তোমাদের এবার শেষবারের মত হুঁশিয়ার করে দিচ্ছি—বিপ্লবী দলে মিশবে না...।"

স্কুলে স্কুলে এইভাবে বক্তৃতা দিয়ে আদেশ ও নির্দেশ জারী করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, সন্দেহভাজন ছাত্রদের কিল, চড়, ঘুষি ও লাথি মেরেছে, ছাত্রদের চুল ছিঁড়েছে, কান টেনেছে, ওঠ-বোস করিয়েছে এবং প্রত্যেককে শপথ করিয়েছে বৈপ্লবিক সংগঠনে যেন তারা আর যোগ না দেয়। এত করেও কিন্তু স্যুটার সাহেব তৃপ্ত নয়। ছাত্রদের মনে বিভীষিকা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে প্রতিটি স্থানে প্রতি বারেই হরিপদর ওপর ক্ষিপ্ত জানোয়ারের মত আক্রমণ চালিয়েছে। এতে হরিপদ বহুবার জ্ঞান হারিয়েছে। কোনো কোনো পুলিশ অফিসারের থেকে জেনেছি অজ্ঞান অবস্থায়ও হরিপদকে রেহাই দেওয়া হয় নি—নিদারুণ নির্যাতন করা হয়েছে। এর একমাত্র ব্যতিক্রম ঘটে শারওয়াতলী হাই স্কুলে। এই স্কুলের প্রধান শিক্ষক স্যুটার সাহেবের এই অত্যাচারের প্রতিবাদ জানান। প্রতিফল স্বরূপ বড় টর্চের আঘাতে প্রধান শিক্ষক জ্ঞান হারিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। যে কোনো শিক্ষকই ছাত্রদের এই প্রচণ্ড মারের হাত থেকে বাঁচাতে চেয়েছেন—সামান্যতম বাধা দিতে চেষ্টা করেছেন, তাঁকেই তৎক্ষণাৎ তার মূল্য দিতে হয়েছে প্রচুর।

এইভাবে গ্রামে গ্রামে বিভীষিকা ও ত্রাস সঞ্চারের পর স্যুটার সাহেব অত্যাচার ও পাশবিক নির্যাতনের যে অভূতপূর্ব ভূমিকা গ্রহণ করলেন তার উপমা মেলা কঠিন।

পশুশক্তি যখন দুর্দমনীয় হয়ে ওঠে তখন তার কাছে করুণা ভিক্ষা করা পাপ। সাম্রাজ্যবাদী শক্তি তার সাম্রাজ্য রক্ষার্থে ও নিষ্পেষণ চালাতে স্যুটার সাহেবের মত আরও অনেক অত্যাচারীকে নিযুক্ত করবে। শত্রুর অত্যাচার ও নিপীড়ন সম্বন্ধে কোনো প্রকার ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হয়ে অভিমান ভরে প্রতিবাদ জানাবার ইচ্ছে আমার নেই। অবলার মত ক্রন্দন—"স্যুটার সাহেব বড় নির্দয়, বৃটিশ সরকারের আইনে সে মানে নি...", ইত্যাদি আমার বক্তব্যের মূল কথা নয়। ইংরেজ সরকার অত্যাচার করেছে—ধনিকতন্ত্র যতদিন বজায় থাকবে ততদিন ধনিকশ্রেণীও শোষিত জনগণের ওপর অত্যাচার করবে। সুতরাং শ্রেণী-সংগ্রাম লুপ্ত হবে—রামরাজ্য প্রতিষ্ঠা হবে—এটা যেমন মিথ্যে ও অবাস্তব, ঠিক তেমনি বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসন ও শোষণ ভারতের বুকে চলতে থাকবে আর স্যুটার সাহেবের দল তাদের প্রভুত্ব বজায় রাখতে ভারতীয়দের প্রতি নির্মম নিষ্ঠুর ও নির্দয় হবে না—মূর্খের মত এরকম বিলাপ আমি করবো না। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী সরকারের কাঠামোতে স্যুটার সাহেব যে অত্যাচার চালিয়েছিল তা সরকারী স্বার্থেরই পরিপন্থী। কাজেই অত্যাচার আরও চরমে উঠলেও অভিযোগ করবার কিছু নেই। আমাদের কেবল উপলব্ধি করবার হল—সাম্রাজ্যবাদী চক্রের ধনিকতন্ত্র ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনের পূর্বে অসংখ্য জনগণের ওপর মুষ্টিমেয় শোষক শ্রেণীর অত্যাচার ও নিপীড়নের অবসান ঘটতেই পারে না যতক্ষণ শ্রেণী-সংগ্রামের পরি-

শক্তি ও উৎসাহের জন্য-বোর্নভিটা !

বোর্নভিটার স্বাদ অতুলনীয়...
ওর রহস্য হচ্ছে-কোকো !

কোকো, দুধ, চিনি, ও মল্ট বিধিসম্মতভাবে মেশাবার ফলে—অতি শক্তিবর্দ্ধক পানীয় বোর্নভিটা। বোর্নভিটা গরম দুধে মিশিয়ে নেবেন—এই সুস্বাদু পানীয় থেকে শক্তি ও উৎসাহ পাবেন॥

শক্তি, উৎসাহ ও স্বাদের-জন্যে

ক্যাডবারিস্ বোর্নভিটা

2296 All-Ben

সমাপ্তি না ঘটছে—অর্থাৎ, যতক্ষণ মনুষ্য-সমাজ সমাজতন্ত্রবাদের একেবারে শেষধাপে উপনীত হতে না পারছে।

স্যাটার সাহেব লর্ড ক্লাইভ, ওয়ারেন হেস্টিংসের বংশধর—তাঁদেরই পদাঙ্ক অনুসরণের জন্য বিলেত থেকে বিশেষ শিক্ষা নিয়ে আসেন ভারতীয়দের ওপর প্রভুত্ব করতে। পশুশক্তির ভিত্তিতে বে-আইনীভাবে প্রতিষ্ঠিত বৃটিশ সাম্রাজ্যের আইন ও শৃঙ্খলা শাসকশ্রেণীর জন্য নয়—শাসিত ও নিষ্পেষিত ভারতবাসীর জন্য। বৃটিশ রাজশক্তির দোর্দন্ড প্রতাপের নমুনা দেখিয়ে এবং নানা প্রমাণ রেখে স্যাটার সাহেব বন্দী হরিপদকে নিয়ে গ্রামের পর গ্রাম পরিভ্রমণ করেছে।

স্কুলের ওপর স্যাটার সাহেবের "আক্রমণলীলা" শেষ হলেও তার কর্ম-সূচীর প্রধান অংশ তখনও বাকী ছিল। এবার সেই শেষ অঙ্ক শুরু হল। পুলিশের তালিকায় Indin Republican Army, Chittagong Branch-এর প্রথম শ্রেণীর সৈনিকদের নাম ছিল। স্যাটার সাহেব বেছে বেছে তাদের বাড়ি আক্রমণ করলো। তারকেশ্বর দস্তিদার, অর্ধেন্দু দস্ত, রামকৃষ্ণ বিশ্বাস, নির্মলদা, শচীন সেন, প্রমুখ আরও অন্যান্য বিপ্লবী-দের বাড়ি সৈন্য দিয়ে ঘেরাও করে বাড়ির লোকজনদের প্রচন্ড মারধোর ও আসবাব-পত্র সব ভেঙেচুরে তছনছ করা হল। সৈন্যদের ওপর ঢালাও হুকুম হল—ভাঙ, মার খেদাও, কেরোসিন ছড়াও, পেট্রোল ঢেলে আগুন লাগাও।

এইভাবে ঝড়ের মত হানা দিয়ে ভেঙে-চুরে তছনছ করে সকলকে প্রহার, অপমান ও ইংরেজী ভাষায় অকথ্য গালিগালাজ করে প্রতিটি বাড়িতেই আগুন ধরিয়ে দিয়েছে স্যাটার সাহেবের দল। হরিপদ বন্দী অবস্থায় তাদের সঙ্গে থেকে এইসব দৃশ্য দেখেছে আর তার অন্তরে বৈপ্লবিক আগুন আরো প্রজ্জ্বলিত হয়েছে। অসহায় গ্রামবাসী নির্বাক দর্শকের ভূমিকায় পাথরের মূর্তির মত নিশ্চল হয়ে তাদের এই সর্বনাশ দেখেছে। শক্তিমদমত্ত স্যাটার। সৈন্যবলে বলীয়ান স্যাটার, মনে মনে ভেবেছিল এইরকম বিভীষিকা সৃষ্টি করেই বিপ্লবী শক্তিকে খর্ব করবে—বিপ্লবীদের পরাভূত করবে। কিন্তু পৃথিবীর বিপ্লবী ইতিহাস সাম্রাজ্যবাদী শক্তির এই দুরাশার বিরুদ্ধে অভ্রান্ত সাক্ষ্য দেয়—বিপ্লবের পরাভব নেই, শেষ পর্যন্ত বিপ্লবী শক্তির জয়ই অবশ্যম্ভাবী।

অর্বাচীন স্যাটার সাহেবের তখন ভবিষ্যৎ নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় ছিল না এবং প্রয়োজনও মনে করেন নি। সেই সময় চট্টগ্রামের যুবশক্তিকে খর্ব করবার দায়িত্ব নিয়েছেন তিনি। এই কর্তব্যপালনে স্যাটার সাহেব যে কোনো প্রকারেই হোক যুবক মনে ত্রাস সঞ্চারের নীতি অবলম্বন করেছেন। তাঁর বাসনা—চূড়ান্ত নিপীড়ন, বিপ্লবীদের দরদী বন্ধু ও সমর্থকদের ভয় দেখিয়ে Indian Republican Army-কে কোনোরূপ সাহায্য দানে বা সহানুভূতি প্রদর্শনে বিরত করা। চরম অত্যাচারের বিভীষিকায় আদর্শ স্থাপনের জন্য সৈন্যদল নিয়ে স্যাটার সাহেব শৃঙ্খলিত হরিপদকে সঙ্গে করে প্রচন্ড বেগে তার গৃহে হানা দিলেন—হরিপদর মাকে চুলে ধরে টেনে হিঁচড়ে পুত্রের সামনে উপস্থিত করা হল। বৃটিশ সাম্রাজ্য রক্ষার দায়িত্ব গ্রহণকারী ইংরেজ শাসকের কাছে দেশ-প্রেমিক পুত্রের গর্ভধারিণীর অপরাধ তো সামান্য নয়—তাই আইন-আদালত ছাড়াই মাকেও নিশ্চয়ই স্যাটার সাহেবের দরবারে শাস্তি পেতে হবে। মায়ের চোখের সামনেই আঘাতের পর আঘাতে হরিপদ অজ্ঞান হয়ে পড়লো—মায়ের আকুল ক্রন্দন সাহেবকে এক তিল কর্তব্যচ্যুত করতে পারলো না। খানিক পরে জ্ঞান হলে হরিপদ দেখলো তার বাবাকে একটা খুঁটির সঙ্গে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা হয়েছে এবং সারা বাড়িতে কেরোসিন ঢেলে আগুন লাগাবার জন্য গুর্খা সৈন্যদের হুকুম দেওয়া হয়েছে।

দশ বারোজন সেপাই ছুটোছুটি করে বাড়ির চতুর্দিকে কেরোসিন ছিটিয়ে দিল। আগুন লাগাবার আগে স্যাটার হরিপদর বাবাকে কর্কশকণ্ঠে প্রশ্ন করে যাচ্ছিল—"কেন তোমার ছেলে হত্যা করেছে? কেন তুমি তাকে সামলাতে পার নি? —জবাব দাও...!" স্যাটার সাহেব ক্ষিপ্ত হয়ে প্রশ্ন করেছেন এবং কোনো উত্তরের অপেক্ষা না রেখেই হরিপদর বাবাকে নিষ্ঠুরভাবে ক্ষতবিক্ষত করেছেন। হরিপদর চোখের সামনেই এই নৃশংসতা ঘটেছে। কিন্তু শৃঙ্খলিত হরিপদ নিরুপায়—সব মুখ বুজে সহ্য করতে হয়েছে।

হরিপদর বাড়িতে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে উঠলো। মাটির ও বাঁশের ঘর আর টিনের ছাদ—চারিদিকেই ফুটফাট আওয়াজ হচ্ছে। স্যাটার সাহেব হরিপদকে নিয়ে আবার রওনা হল। যেতে যেতেও হরিপদ দেখতে পেল তার বাবা খুঁটির সঙ্গে বাঁধা আছেন। হরিপদ আমাকে নিজ মুখে বলেছে—"বাবার সেই করুণ অসহায় অবস্থা দেখে আমার মন অস্থির হয়ে উঠলো—কি করি? কি করা যায়? প্রতি মুহূর্তে মনে হয়েছে জ্বলন্ত টিন-গুলির একটাও যদি ছিটকে এসে বাবার গায়ে পড়ে তবে কি হবে? এই ভয়াবহ দৃশ্যই কেবল আমার চোখের সামনে ভাসছিল। যাবার পথে যতক্ষণ দৃষ্টি গেছে ফিরে ফিরে তাকিয়েছি। ক্রমেই আগুন ব্যাপকতর হল এবং সেই আগুনে আমাদের জ্বলন্ত বাড়ির শেষ পরিণতি দেখবার সুযোগ আমি পেলাম না। মাঝে মাঝে কেবল বাঁশ ফাটার শব্দ আমার কানে আসছিল। যা হবার তাই হবে—বিচলিত হই নি বটে, তবু মা বাবার কথা না ভেবে পারি নি। কেবলই মনে হয়েছে—'বাবার কি হল? মা কোথায়? বাবাকে কেউ কি মুক্ত করে নিয়ে গেছে?' মা-বাবার ওপর বৃটিশের এই আক্রোশের কারণ বুঝি এবং সেই জন্যে মানসিক প্রস্তুতিও ছিল। কিন্তু ভাবনা চিন্তা ও বাস্তব ক্ষেত্রে যে আকাশ-পাতাল প্রভেদ, আগে তা' বুঝি নি......।"

[ক্রমশঃ]

বিশেষ দ্রষ্টব্য

[আমার লেখা "অগ্নিযুগের একটি অধ্যায়ের" বহু পাঠক-পাঠিকা বাংলা ও বাংলার বাইরে থেকে অসংখ্য চিঠিপত্রের মাধ্যমে জানতে চেয়েছেন এই ধারাবাহিক লেখা পুস্তকাকারে কবে প্রকাশিত হবে। সকলকে ব্যক্তিগতভাবে জানানো সম্ভব নয় বলেই তাঁদের জ্ঞাতার্থে সাপ্তাহিক বসুমতী মারফৎ জানাচ্ছি, আমার লেখা বই "অগ্নিগর্ভ চট্টগ্রাম" গত সপ্তাহে প্রকাশিত হয়েছে। প্রকাশক—বিদ্যোদয় লাইব্রেরী প্রাইভেট লিমিটেড।]

—অনন্ত সিংহ

কিস্তিবন্দীতে ট্রানজিস্টার

৩২০, টাকা মূল্যের বিশ্ববিখ্যাত "উইন্ডসর হিতাচী" ৩ ব্যান্ড অলওয়ার্ল্ড পোর্টেবল ট্রানজিস্টার মাসিক ১০, টাকার কিস্তিতে নিন।

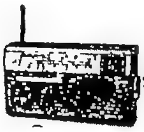

আবেদন করুনঃ—
SWISS TELEVISSION CO.
(B-10) Post Box 1320,
Delhi-6.

রবীন্দ্রনাথ ও সুভাষচন্দ্র

শঙ্করীপ্রসাদ বসু

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

রবীন্দ্রনাথের ধর্ম ও জীবনবোধের সঙ্গে পরিচিতরা জানেন, চিত্তরঞ্জনের মতাদর্শের সঙ্গে তাঁর পার্থক্য কতখানি। চিত্তরঞ্জনের মৃত্যু পর্যন্ত তাঁর অধীনে সুভাষচন্দ্র রাজনীতি করেছেন এবং চিত্তরঞ্জনের অন্যবিধ মত-ভাবনার সাহচর্যেও বঞ্চিত ছিলেন না। এইখানে একথা বলা উচিত, বাল্যকাল থেকে সুভাষচন্দ্র যে-চিন্তা ও আবেগ-জগতে বেড়ে উঠেছিলেন তা অনেকটা চিত্তরঞ্জনের অনুরূপ। পরবর্তীকালেও সুভাষচন্দ্র এই অনুভূতিজগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন হন নি, কিন্তু ব্যক্তিগত ভাবনাকে গোপন রেখে ব্যাপক দৃষ্টিতে সকলের গ্রহণযোগ্য উপায়ে সমস্যাগুলির সমাধান-চেষ্টা তাঁর মধ্যে দেখা যায়। রবীন্দ্রনাথ সেইকালে পুনরায় সুভাষচন্দ্রের নিকটবর্তী হয়েছিলেন, যে প্রসংগ আমরা পরে উপস্থিত করব।

চিত্তরঞ্জনের প্রভাবাধীন সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সম্পর্কের রূপ সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত সত্যরঞ্জন বক্সীর সঙ্গে আমার যে আলোচনা হয়েছিল, তার বিবরণ উপস্থিত করছি—

"সত্যবাবু রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে তৎকালীন বাংলার (দ্বিতীয় ও তৃতীয় দশকের গোড়ার দিক) মনোভাবের রূপ বিশ্লেষণের চেষ্টা করলেন। রবীন্দ্রনাথের প্রতিভাকে প্রায় সকলেই স্বীকার করে নিয়েছেন, কিন্তু তাঁর জীবনাদর্শকে মেনে নিতে কুণ্ঠা ছিল। অনেকের মনে হয়েছিল, রবীন্দ্রনাথ যে উচ্চ নৈতিকতা দাবী করেছেন জনসাধারণের কাছ থেকে, তা কার্যত পাওয়া অসম্ভব, এবং বুদ্ধিধর্মকে অতিরিক্ত প্রাধান্য দিয়ে আবেগধর্মকে অস্বীকার করলে জাতির স্বতঃস্ফূর্ত জাগরণ সম্ভব হবে না। রবীন্দ্রনাথ ঔপনিষদিক ভাবের ওপর দাঁড়িয়েছিলেন, অথচ বাংলাদেশ মূলত মাতৃতান্ত্রিক। শঙ্করাচার্য বাংলা দেশে পরাভূত। সুতরাং বাংলা দেশে যেমন গান্ধী-বিরোধিতা ছিল, তেমনি রবীন্দ্র-জীবনাদর্শের বিরুদ্ধে একটা প্রতিরোধ ছিল। রবীন্দ্রনাথ রাজনীতি থেকে সরে দাঁড়িয়েছিলেন—রাজনীতির সবটা সুন্দর ছিল না বলে। রাজনীতির সবটা, (সত্যবাবু বললেন) বিশেষত বিপ্লবাত্মক এবং প্রাত্যহিক রাজনীতির সবটা, সুন্দর হয় না কখনো, হয় নি কখনো। একটা সামান্য দৃষ্টান্ত ধরুন, একজন শিক্ষিত ভদ্রলোক দুপুরের রোদে মাঝ-রাস্তায় ঝাণ্ডা কাঁধে দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে গলা ফাটাচ্ছে—চেঁচাচ্ছে কতকগুলি বাঁধা বুলি—এর মধ্যে কি স্থূলতা নেই? রবীন্দ্রনাথ আশ্রমিক ভাবের মধ্যে প্রবেশ করে দেশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছেন, এমন একটা অভিযোগও তাঁর বিরুদ্ধে ছিল। রবীন্দ্রনাথ বিপ্লববাদের বিরোধিতা করেছেন, তাঁর রচনায় প্রায় একটিও মহৎ বিপ্লবী চরিত্র খুঁজে পাওয়া যায় নি, এটা বিপ্লববাদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল বাংলা দেশের পক্ষে সানন্দে পরিপাক করার বস্তু নয়। চিত্তরঞ্জন বা বিপিনচন্দ্র পাল রবীন্দ্রনাথের মধ্যে আরো একটি জিনিসের অভাব অনুভব করেছিলেন—রবীন্দ্রনাথ সুন্দরতম, কিন্তু গ্যেটে বা শেক্সপীয়ারের মত আত্মার বিক্ষুব্ধ বিস্তার কি তাঁর মধ্যে আছে? শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়েরও এই ধরনের মনোভাব কিছুটা ছিল। প্রথম দিকে সুভাষচন্দ্র এই ধরনের আইডিয়ার দ্বারা চারিপাশে বেষ্টিত ছিলেন।

সত্যবাবু যে বিশ্লেষণ করলেন তার সঙ্গে দু-একটি বিষয় ছাড়া (যেমন আত্মার বিক্ষুব্ধতাকে রবীন্দ্রনাথ যদি পরিস্ফুট না করেন তার কারণ ক্ষমতার অভাব নয়, ইচ্ছার অভাব। রবীন্দ্রনাথ ঝঞ্ঝা-উত্তর সাগরকে দেখেছেন, সাগরের পক্ষে, রবীন্দ্রনাথের মতে, ঝঞ্ঝার খণ্ডকালীন বিক্ষোভ অপেক্ষা চিরকালীন শান্তির বিস্তারই অধিকতর সত্য) আমার মতের ঐক্য আছে জানালুম। সত্যবাবু আরো বললেন, সুভাষবাবুর মত পূর্ণ বিপ্লবীরা কিছু পরিমাণে মতের ও বিশ্বাসের ক্ষেত্রে একরোখা হতে বাধ্য, যদিও সুভাষচন্দ্রের স্বাভাবিক সৌজন্যবোধ সেই গোঁড়ামি থেকে তাঁকে অনেকাংশে মুক্ত রেখেছিল। তবু তাঁর কাছে ভারতের স্বাধীনতা ছিল শ্বাসরোধী সমস্যা এবং সেজন্য আনুগত্যের বিভক্তি তিনি সহ্য করতে পারতেন না। রবীন্দ্রনাথ, জগদীশচন্দ্র বসু, প্রফুল্লচন্দ্র রায়, দেশের এই সব শ্রেষ্ঠ সন্তানেরা কি দেশের স্বাধীনতার কাজে আরো এগিয়ে আসতে পারেন না—এই ছিল তাঁর নিগূঢ় অভিমানের প্রশ্ন। এঁদের অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন বলেই তাঁর বেদনা এমন গভীর ছিল। অপরদিকে তাঁর ভয় ছিল, রাজনীতির আগুনে এঁদের সাধনার হয়ত ক্ষতি হবে।"

সুতরাং ১৯২১ সালের মাঝামাঝি সময় থেকে ১৯২৪ সালের মাঝামাঝি দেশবন্ধুর মৃত্যু পর্যন্ত সময়ে সুভাষচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের পৃথিবী থেকে অনেক দূরে বাস করেছিলেন। এই সময়ে রবীন্দ্রনাথ-সুভাষচন্দ্রের একটি মাত্র সাক্ষাৎকারের বিবরণ পেয়েছি। সেটি দিয়েছেন সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় (উদ্ধৃত করা যাক)—

"একদিন জোড়াসাঁকোর বাড়িতে আমি (সাবিত্রীপ্রসন্ন) ও সুভাষচন্দ্র উপস্থিত হলাম রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য। রবীন্দ্রনাথ সুভাষচন্দ্রকে বললেন, 'কি সুভাষ, তোমরা কলেজের নাম বিদ্যাপীঠ দিয়েছ কেন? বিদ্যা ওখান থেকে কি পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেছেন?' সুভাষচন্দ্র এই বিদ্রূপে লাল হয়ে উঠলেন। আমি বললাম, অনেকেরই সেই ধারণা, কিন্তু জাতীয় শিক্ষার গোড়াপত্তনের জন্যই এর প্রতিষ্ঠা, স্বেচ্ছাসেবকদের এক জায়গায় জমা করে রাখার জন্য নয়। রবীন্দ্রনাথ পরে কথা মোড় বদলালেন এবং তিনি সুভাষবাবুর সঙ্গে শিক্ষাবিষয়ক অনেক কথার আলোচনা করলেন। কংগ্রেসের চরখা কাটার বাধ্যতামূলক নিয়মের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করেই তিনি বললেন, গান্ধীজী কি মনে করেন সারা দেশটা তাঁতি বনে যাবে? এর উত্তর অবশ্য আমরা পেয়েছিলাম গান্ধীজীর

হরিজন পত্রিকার প্রবন্ধে। আমি 'কথা ও কাহিনী', 'নৈবেদ্য', 'বলাকা' পড়াই শুনে ঐ বইগুলি থেকে দুইতিনটি কবিতা আবৃত্তি করে শোনালেন। তাঁর মধুর কণ্ঠের আবৃত্তিতে ছবিগুলি, অন্তর্নিহিত ভাবগুলি যেন স্পষ্ট হয়ে চোখের সামনে, মনের সামনে ফুটে উঠতে লাগল। কথার উচ্চারণে ও বলার ভঙ্গিতে প্রত্যেক কাহিনীর অপূর্বতা ও সৌন্দর্য যেন প্রত্যক্ষ হয়ে উঠল। সেদিনকার রবীন্দ্র-সন্দর্শনের ঐ লাভটুকু একেবারে অপ্রত্যাশিত। শেষের দিকে সুভাষচন্দ্রের সম্বন্ধে আলাপে তাঁর প্রতি রবীন্দ্রনাথের গভীর স্নেহের ভাব ও তাঁর কাছ থেকে বৃহৎ কিছু প্রত্যাশার আভাস পাওয়া গেল।"

অসহযোগ আন্দোলনের গোড়ার দিকে রবীন্দ্রনাথ ও সুভাষচন্দ্রের সাক্ষাৎকারের এই বিবরণীটি সংক্ষিপ্ত হলেও এতে অনেক প্রয়োজনীয় কথা আছে। প্রথমত অসহযোগী জাতীয় শিক্ষার্থীদেরা রবীন্দ্রনাথের কোন অংশটিকে গ্রহণ করেছিলেন বোঝা যায়—নিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথের কথা ও কাহিনীকে, যা শৌর্যের অতি মহৎ কাব্য, নৈবেদ্যকে, যেখানে আছে ধর্মাশ্রিত আদর্শবাদের সংযত মন্ত্র, এবং 'বলাকা'—বিদ্রোহী গতির মুক্ত ছন্দ। সাবিত্রীপ্রসন্ন বইগুলি পড়ান জেনে রবীন্দ্রনাথ এদের থেকেই কয়েকটি কবিতা আবৃত্তি করে শুনিয়েছিলেন—কিন্তু কবির আবৃত্তির মূল লক্ষ্য কি সুভাষচন্দ্রই ছিলেন না? কবি, নিজ কাব্যকে কণ্ঠে তুলে প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তাতে,—করেন নি কি তাঁর জন্য যিনি বেঁচে আছেন কথা ও কাহিনী, নৈবেদ্য এবং বলাকার শক্তি নিয়ে, সত্য নিয়ে।

একটি কথা পাচ্ছি—রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত স্নেহের সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে কথা বলেছিলেন, তাঁর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে প্রত্যাশার সুর কবির কণ্ঠে বেজেছিল। রবীন্দ্রনাথ-সুভাষচন্দ্রে মত-গত অনেক পার্থক্যের কথা বলেছি। তা সত্ত্বেও এঁরা কত কাছে আসতে পারেন—যেহেতু এঁরা মহৎ ছিলেন। দুই মহৎ—বিকশিত ও বিকাশোন্মুখ—দুই মহত্ত্ব।

জাতীয় শিক্ষা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের সংশয়ও ঐ ক্ষুদ্র বিবরণী থেকে উদ্ঘাটিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ সারা জীবনে শিক্ষা নিয়ে অনেক সময় ব্যয় করেছেন, একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান তাঁর কর্ম ও অর্থকে অধিকাংশভাবে গ্রাস করে রেখেছিল,—স্বভাবতই শিক্ষা সম্বন্ধে তাঁর নিজস্ব বক্তব্য থাকবে। 'জাতীয়' শিক্ষা নিয়ে রবীন্দ্রনাথের অভিজ্ঞতা উপাদেয় নয়। "তিনি দেখেছিলেন জাতীয় আন্দোলনের উত্তেজনা এই 'জাতীয়' শিক্ষার জন্ম দেয়, উত্তেজনার অবসান হলে 'জাতীয়' শিক্ষারও অবসান ঘটে। রবীন্দ্রনাথের মত নীতি-বাদীর পক্ষে ব্যাপারটা নিতান্ত অরুচিকর। শিক্ষাকে তিনি আন্দোলনের বিষয় মনে করতে পারেন নি, সেটা তাঁর কাছে সাধনার বিষয়। আমি এখানে শিক্ষা সম্বন্ধে তাঁর ব্যক্তিগত চিন্তা এবং আদর্শ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপন ও রক্ষণের জন্য জীবনব্যাপী প্রয়াসের বিবরণ দেব না, কিন্তু 'জাতীয়' নামক শিক্ষার সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের ইতিহাস প্রয়োজনীয় মনে হবে।

১৯২০-২১ সালে অসহযোগ আন্দোলনের সময়কার 'জাতীয় শিক্ষা' ব্যাপারের পূর্বে দুটি 'জাতীয়' শিক্ষার অভিজ্ঞতা তাঁর হয়েছে—প্রথমটি বাংলার স্বদেশী আন্দোলনের সময়কার, দ্বিতীয়টি অ্যানী বেসান্তের হোমরুল লীগ আন্দোলন কালের। স্বদেশী আন্দোলন সময়ের জাতীয় শিক্ষার সঙ্গে তাঁর যোগ গভীরতর, কারণ প্রত্যক্ষ রাজনীতি এই সময়েই তিনি কিছু পরিমাণে করেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক জীবনের যে সূচীপত্র দিয়েছি, তার থেকে মনে থাকতে পারে, যখন ছাত্ররা স্বদেশী আন্দোলনে বিশেষভাবে যোগদান করল, তখন ছাত্রদের রাজনীতি নিষেধ করে 'সার্কুলার' জারী করা হয়েছিল, যা কার্লাইল সার্কুলার নামে খ্যাত। এই সার্কুলারের দেশব্যাপী প্রতিবাদ হয়। বিদেশী সরকারের অধীনস্থ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের বিকল্প জাতীয় শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলবার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। রাজনৈতিক আন্দোলনের জন্য এই পরিস্থিতির উদ্ভব বলে এই পর্যায়ের জাতীয় শিক্ষার প্রয়াসকে নিশ্চয়ই মূলে রাজনৈতিক প্রয়াস বলা চলবে।

রাজনৈতিক কারণ ছাড়াও জাতীয় শিক্ষা প্রবর্তনের আরো দুটি কারণ সুন্দর-ভাবে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় দেখিয়েছেন। দ্বিতীয় কারণ বলা চলে পুঁথিগত শিক্ষার বন্ধ্যাত্ব উপলব্ধি। শিল্পোন্নতি নইলে দেশের উন্নতি সম্ভব নয়, সেইজন্য কারুবিদ্যালয় স্থাপনের উদ্যোগ করলেন অনেকে, ব্যারিস্টার তারকনাথ পালিত স্থাপন করলেন কলকাতায় বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট। এ ছাড়া 'ধর্মহীন শিক্ষার উপর বীতশ্রদ্ধ' অনেকে ধর্মাত্মক জাতীয়তা শিক্ষার উদ্দেশ্যে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চালালেন। নৈতিক শুদ্ধি ও চরিত্রগঠনের উপর জোর দিয়ে স্থাপিত হোল সুবিখ্যাত ডন সোসাইটি—যা কলেজী ও পরবর্তী উন্নততর শিক্ষার চিন্তা করতে লাগল।

তাহলে জাতীয় শিক্ষার পিছনে আছে মূলত তিনটি কারণ রাজনৈতিক, অর্থ-নৈতিক ও ধর্মনৈতিক।

বিদেশী ভাষায় পুঁথিগত বিদেশী শিক্ষা যা বিজাতীয় করে তোলে জাতীয় মনকে, তার প্রতিবিধানের জন্য স্বদেশী যুগে রবীন্দ্রনাথ জাতীয় শিক্ষা প্রবর্তনের বাস্তব প্রয়োজনকে বিশেষভাবে অনুভব করেছিলেন, এবং কিছু পরিমাণে সক্রিয়ও হয়েছিলেন।

১৯০৫ সালের ১৬ অক্টোবর বঙ্গ-চ্ছেদ ঘোষিত হয়, কার্লাইল সার্কুলার জারী হয় ২২ অক্টোবর, এবং ২৪ অক্টোবর ফীলড এণ্ড একাডেমির ভবনে কলকাতার নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা সমবেত হয়ে স্থির করলেন সার্কুলারের "প্রতীকার জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করিয়া আমাদের শিক্ষাকে স্বাধীন করা।" অন্যত্র সেইদিনকার এক সভায় ঠিক হোল "গভর্নমেন্টের বিশ্ববিদ্যালয় এবং চাকরির দুই-ই ত্যাগ করিতে হইবে।"

রবীন্দ্রনাথ ঐ দুই সভায় উপস্থিত না থাকলেও ২৭ অক্টোবর পটলডাঙ্গা মল্লিকবাড়িতে বিরাট ছাত্রসভায় সভাপতিত্ব করেন। রবীন্দ্রনাথের অভিভাষণে জাতীয় শিক্ষালয়ে যোগদানের ঔচিত্য ঘোষিত হোল।—[র• জী• ২—১২৮]

পাঁচ দিন পরে ফীলড এণ্ড একাডেমিতে ডন সোসাইটির সভায় রবীন্দ্রনাথ বললেন—"আমাদের শিক্ষাকে স্বাধীন করিবার জন্য জাতীয় বিদ্যালয়ে প্রতিষ্ঠিত হইবার সময় এখন উপস্থিত হইয়াছে।" কয়েক দিন পরে ডন সোসাইটির আর এক সভায় একই কথা জানালেন।

অল্প পরে (১৩১২, কার্তিক ২৩) পান্তির মাঠে বিরাট জনসভায় জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাব গৃহীত হোল। সভাপতি সুবোধচন্দ্র বসু-মল্লিক এই উদ্দেশ্যে এক লক্ষ টাকা দিতে প্রতিশ্রুত হলেন। ৩০ কার্তিক জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় গঠনের জন্য যে মন্ত্রণাসভা হোল তাতে রবীন্দ্রনাথ উপস্থিত থাকলেন। জাতীয় শিক্ষা পরিষদের নাম দেওয়া হোল Bengal National Council of Education. পরদিন ফীলড এণ্ড একাডেমির মধ্যে সুরেন্দ্রনাথের সংবর্ধনা-সভায় রবীন্দ্রনাথের প্রস্তাবে 'জাতীয় শিক্ষা সমাজ' প্রতিষ্ঠা ঘোষিত হোল। অতঃপর ২৪ অগ্রহায়ণ জাতীয় শিক্ষা পরিষদের গঠন প্রণালীর খসড়া তৈরির সভায় উপস্থিত থাকলেন তিনি।

জাতীয় শিক্ষা পরিষদের স্কুল বিভাগের গঠন পত্রিকা রচনার ভার রবীন্দ্রনাথের উপর অর্পিত হয় ও তদনু-যায়ী রবীন্দ্রনাথ নিজের মত 'শিক্ষাসমস্যা' নামক প্রবন্ধ মারফৎ জ্ঞাপন করেন (২৩ জ্যৈষ্ঠ ১৩১৩); তিনি জাতীয় শিক্ষা পরিষদ প্রতিষ্ঠার উদ্বোধন সভায় (৩০ শ্রাবণ ১৩১৩) প্রতিষ্ঠানকে অভিনন্দিত

মেয়েদের ছোটবেলা থেকেই
ত্বকের যত্ন নিতে শেখান।
তিনি সুন্দরী, তিনি রূপসী!
প্রতিদিনের ত্বক পরিচর্যায় তাঁর এই অপরূপ সৌন্দর্যের
উৎস-সাধনা বিউটি ক্রীম।
সাধনা বিউটি ক্রীম রূপসাধনায় অনন্য
সাধনা ঔষধালয়-ঢাকা
সাধনা ঔষধালয় রোড, সাধনানগর, কলিকাতা-৪৮
অধ্যক্ষ যোগেশ চন্দ্র ঘোষ, এম.এ.
আয়ুর্বেদশাস্ত্রী, এফ.সি.এস. (লণ্ডন)
এম.সি.এস. (আমেরিকা) ভাগলপুর
কলেজের রসায়ন-শাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক
কলিকাতা কেন্দ্র:
ডাঃ নরেশচন্দ্র ঘোষ,
এম.বি.বি.এস. (কলিঃ)
আয়ুর্বেদাচার্য
SADHANA
Beauty
CREAM
সাধনা
বিউটি
ক্রীম

করেন।" এর পরে তিনি জাতীয় শিক্ষা পরিষদে সাহিত্য বিষয়ে চারটি বক্তৃতা দেন এবং তিন বৎসর (১৯০৬—৮) শিক্ষা পরিষদের বাংলা ভাষার পরিচালক ও পরীক্ষার প্রশ্নকর্তা ছিলেন। [র· জী· ২—১৪৭—৫২]

জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের এই যোগাযোগ সত্ত্বেও কিছুদিনের মধ্যে তিনি এ ব্যাপারে অসন্তুষ্ট হয়ে উঠলেন। সব কিছু তাঁর কল্পনার সঙ্গে সুসংগত হয়ে উঠছিল না। জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের অন্তর্নিহিত ত্রুটি তিনি দেখলেন, ও স্থানে স্থানে প্রকাশও করলেন। সেই সঙ্গে তুলে ধরলেন শিক্ষায় নিজ আদর্শ—ঘর ও বিদ্যালয়ের পার্থক্য দূর করতে তপোবনাশ্রম, প্রকৃতির কোলে শিক্ষা, আত্মনির্ভরতা ও ব্রহ্মচর্য পালন ইত্যাদি। রবীন্দ্রনাথের এই 'জাতীয়' শিক্ষা হিন্দু জাতীয়তা বলে সমালোচিত হয়েছিল। সে যাই হোক, জাতীয় শিক্ষা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের সমালোচনাই আমাদের মনোযোগের বিষয় এখানে।—

"রাজনৈতিক নেতাদের ও শিক্ষা পরিষদের সদস্যদের ভাবধারা ও কর্মপদ্ধতি যেভাবে চলিতে লাগিল, তাহা রবীন্দ্রনাথের মনঃপূত হইবার বিশেষ কারণ ছিল না। তিনি দেখিলেন যে, উদ্যোক্তাদের মধ্যে জাতীয় শিক্ষা সম্বন্ধে কোনো নূতন পরিকল্পনা দিবার মত লোক নাই।... তিনি দিব্য চক্ষে দেখিলেন যে নেতি নেতি দ্বারা সত্যে উপনীত হওয়া যাইবে না। বৃটিশ পণ্য বর্জনের জন্য দেশবাসীর মধ্যে যতটা উত্তেজনা দেখা দিল, দেশীয় শিল্প স্থাপনের জন্য সে প্রকার উৎসাহ প্রকাশ পাইল না।......তিনি বরাবর বলিতে লাগিলেন, দেশ সেবার দ্বারাই দেশ হিতৈষণা প্রকাশ পাইবে, আর কোন পথ বা পদ্ধতি নাই।......জাতীয় শিক্ষা পরিষদ প্রতিষ্ঠা ব্যাপারেও তিনি দেখিলেন যে, সদস্যদের মধ্যে কাহারও শিক্ষা সম্বন্ধে পরিপূর্ণ ধারণা নাই। কলিকাতা বা ঐ শ্রেণীর বিলাতী বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুকরণে আর একটি বিদ্যায়তন স্থাপন করিয়া তাহার গায়ে জাতীয় শব্দ লেপন করিয়া দিলেই যে তাহা জাতীয় শিক্ষা পরিষদ হইবে না একথা রবীন্দ্রনাথ ভালো করিয়া বুঝিতেন।"—[র· জী· ২—১৩১]

রবীন্দ্রনাথের এই মনোভাবের কিছু প্রকাশ ঘটল 'শিক্ষার আন্দোলন' নামক পুস্তিকায় তাঁর লিখিত ভূমিকায়। তিনি অন্যান্য কথার সঙ্গে বললেন—

"তাহার পর মফস্বলে বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষদের প্রতি কর্তৃপক্ষ এক ন্যায়বিগর্হিত সুবুদ্ধি বিবর্জিত সার্কুলার জারি করিলেন। তখন ছাত্রমণ্ডলী হঠাৎ উত্তেজিত হইয়া পণ করিয়া বসিলেন যে, আমরা বর্তমান য়ুনিভার্সিটিকে বয়কট করিব। আমরা এ বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা দিব না। আমাদের জন্য অন্য বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হউক।......

"আজ যাঁহারা অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া বলিতেছেন, আমাদের এখনি আর একটি বিশ্ববিদ্যালয় চাই, কালই সেখানে পরীক্ষা দিতে যাইব; তাঁহাদিগকে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার স্থায়ী সহায় বলিয়া মনে করিতে সাহস হয় না। এমন কি তাঁহারা ইহার বিঘ্নস্বরূপ হইতে পারেন।......প্রবল ক্ষমতাশালী পক্ষের প্রতি রাগ করিয়া যখন মনে জেদ জমে, তখন অতি সত্বর যে অসাধ্য সাধন করিবার ইচ্ছা হয়, তাহা ইন্দ্রজালের দ্বারাই সম্ভব।......

"কিন্তু মায়ার ভরসা ছাড়িয়া দিয়া যদি যথার্থ কাজের প্রত্যাশা করা যায়, তবে ধৈর্য ধরিতেই হইবে। ভিত্তি হইতে আরম্ভ করিতে, ছোট হইতে বড় হইতে হইবে।......ছোট আরম্ভের প্রতি ধৈর্য রক্ষা করা যথার্থ প্রীতির......লক্ষণ।...... কিন্তু বিপক্ষ পক্ষের প্রতি স্পর্ধা প্রকাশ করিয়া যখন আমরা কোন উদ্যোগে প্রবৃত্ত হই, তখন আমাদের বিলম্ব সয় না।...... দেশীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার উদ্যোগে প্রথম হইতেই আমাদের এই যে আঘাতকর অধৈর্যের লক্ষণ দেখা যাইতেছে, ইহাই আমাদের আশঙ্কার কারণ।" [র· জী· ২—১৩২]

জাতীয় শিক্ষা রবীন্দ্রনাথের অভিপ্রেত হোল না, হওয়া সম্ভব ছিল না। জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার দুটি দিক, একটি স্থায়ী অপরটি সাময়িক। সাময়িক দিকটিকে শিক্ষার বন্যাত্রাণ বলা চলে। দেশের সংকট পরিস্থিতিতে সেটি অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু স্থায়ী ও চিরন্তনের পূজারী কবি সাময়িকভাবে ঐ সময়ে প্রাধান্য পেতে দেখে সরে গেলেন, ফিরে গেলেন সেখানে যেখানে যথার্থ জাতীয় শিক্ষার ভিত্তিভূমি প্রতিষ্ঠিত আছে বলে মনে করেন—সেই নিজ রচনার শান্তিনিকেতনে। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীকে লিখলেন—"তাই আমি ঠিক করিয়াছি যে, অগ্নিকাণ্ডের আয়োজনে উন্মত্ত না হইয়া যতদিন আয়ু আছে আমার এই প্রদীপটিকে জ্বালিয়া পথের ধারে বসিয়া থাকিব।"

স্বদেশী যুগের জাতীয় শিক্ষার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সম্পর্ক এই পর্যন্ত। আরো একটি 'জাতীয়' শিক্ষার সঙ্গে তাঁকে জড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। হোমরুল লীগে আন্দোলনের অ্যানী বেশান্ত রাজনীতি থেকে অবসর নিয়ে শিক্ষাবিস্তারে মন দেন। মাদ্রাজে তাঁর প্রতিষ্ঠিত জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে চ্যান্সেলার করেছিলেন রবীন্দ্রনাথকে। সেটি ১৯১৮ সালের ব্যাপার। শ্রীমতী বেশান্তের এই শিক্ষা আন্দোলন অচিরকালে স্তিমিত হয়ে একটি কলেজে চরম পরিণতি লাভ করল।

সুতরাং 'জাতীয় শিক্ষা' সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের অভিজ্ঞতা খুব সুখকর নয়। শিক্ষাকে রাজনীতির উপজাত হতে দিতে তিনি প্রস্তুত ছিলেন না। ইতিমধ্যে জাতীয় শিক্ষা সম্বন্ধে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন হয়েছে। প্রথমে ছিল তাঁর কল্পনার তপোবন-শিক্ষা, যেটাকে বলা হয়েছে হিন্দু জাতীয় শিক্ষা। তা পরিবর্তিত হল কবিমনের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে—"শান্তিনিকেতনকে ভারতীয়দের শিক্ষাকেন্দ্র করিয়া তুলিতে হইবে; এখানে ভারতের নানা প্রদেশের ছাত্র আসিবে এবং যথার্থ ভারতীয় শিক্ষা তাহারা গ্রহণ করিবে;......বোলপুরের বিদ্যালয় প্রাদেশিক থাকিবে না, সাম্প্রদায়িক হইবে না॥ [র· জী· ২—৪৭৬] কী হবে তাহলে?—

"শান্তিনিকেতন বিশ্ববিদ্যালয়কে বিশ্বের সঙ্গে ভারতের যোগের সূত্র করে তুলতে হবে—এখানে সর্বজাতিক মনুষ্যত্বচর্চার কেন্দ্র স্থাপন করতে হবে—স্বাজাতিক সংকীর্ণতার যুগ শেষ হয়ে আসছে—ভবিষ্যতের জন্য যে বিশ্বজাতিক মহামিলন যজ্ঞের প্রতিষ্ঠা হচ্ছে তার প্রথম আয়োজন ঐ বোলপুরের প্রান্তরেই হবে। ঐ জায়গাটিকে সমস্ত জাতিগত ভূগোল বৃত্তান্তের অতীত করে তুলব এই আমার মনে আছে,—সর্বমানবের প্রথম জয়ধ্বজা ঐখানে রোপণ হবে। পৃথিবী থেকে স্বাদেশিক অভিমানের নাগপাশ বন্ধন ছিন্ন করাই আমার শেষ বয়সের কাজ। [চিঠিপত্র ২য় পত্র—৯, অক্টোবর, ১৯১৬। র· জী· ২—৪৭৬]

জাতীয় শিক্ষা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের ধারণা ও অভিজ্ঞতার ইতিহাস এই। প্রথমত, জাতীয় শিক্ষাকে যথার্থ জাতীয় এবং শিক্ষা তিনি করতে চেয়েছিলেন। কোনটিই সফল হয় নি, কারণ জাতীয় বিদ্যালয়গুলি অনেকাংশে বিলাতের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অনুকরণে সৃষ্ট হোল—যাকে রবীন্দ্রনাথের আদর্শে জাতীয় বলা চলে না; দ্বিতীয়ত, তার থেকে শিক্ষা এল না, কারণ প্রতিযোগিতা করে, স্পর্ধা করে, রাতারাতি শিক্ষা দেওয়া যায় না। তারপরে রবীন্দ্রনাথ বিদেশ ভ্রমণ করে, জাপান-আমেরিকায় ন্যাশনালিজম সংক্রান্ত বক্তৃতা করার পরে 'জাতীয়' শব্দটির উপর আস্থা হারিয়ে ফেললেন—তখন হোল আন্তর্জাতীয়।

এই পরিস্থিতিতে বিদেশে থাকতে রবীন্দ্রনাথ শুনলেন ভারতে আন্দোলন সুরু হয়ে গেছে, যেটার নাম অসহযোগ আন্দোলন। অবিলম্বে তাঁর মনে প্রতিক্রিয়া

স্বাধীন, প্রগতিশীল

টুলুখড়

এ পকেটে কিছু দে
ও পকেটে কিছু থো,
তবেই না বুড়ো শালিকের
ঘাড়ে রোঁ
ময়ূরপুচ্ছ হবে, সোনা!

হাট থেকে কিনে আন ইলিশ বা পোনা;
উনি কিছু ভাল খান্-দান্
দীনকে করেন দান
দুঃখীজনের শোকে সারা রাত উথালপাথাল
পরোয়া করেন নাকো কোথায় স্বর্গ আর কোথায় পাতাল!
যদিও নিন্দা রটে এ পাড়ায়, ও পাড়ায়...
কি বা আসে যায়!

কে না চায় নাচিয়ে বাঁদর?
চাকরি একটা কিছু হয়ে যাবে তোর!

তা ছাড়া এমন দিনে
কবি আর বেশ্যাতে
কোথায় তফাৎ?
বিনিদ্র রাত
ভক্তারের ঠুন্‌ঠুন্ শব্দেই কাৎ
বাংলার গোদা কবি, চুনো কবি দেখ্ সভা করে উজ্জ্বল!
যেভাবে ক'রলে 'তু', কুকুরের দল
মুনিবের চরণের শোভা করে বর্ধন
কবিরাও বাজারের বাড়িওলাদের মন, সেইভাবে,
'তু' ডাকলে করেন হরণ।

এর চেয়ে ভাল ছিল স্বয়ং মরণ...?
থাক্, থাক্! বাড়াসনে কথা!
ভুলে যাস, খবরের কাগজের আসল বারতা;
এই দেশ বুড়ো শালিকের কেনা, তোরা তার বেনামী গোলাম.

বাংলা দেশের কবি, স্বাধীন, প্রগতিশীল, তোদের সেলাম!

দেখা দিল—বিশ্বসহযোগের মন্ত্র তিনি প্রচার করছেন, সেখানে অসহযোগ ব্যাপারটি মূর্তিমান প্রতিবাদ। আবার তিনি দেখলেন—ছেলেদের স্কুল-কলেজ ছাড়ার ডাক দেওয়া হয়েছে। গান্ধীজী মেয়েদের ইংরেজি শিখতে বারণ করেছেন। কবি শিউরে উঠলেন—শিক্ষার সঙ্গে, জ্ঞানের সঙ্গে এই মারাত্মক অসহযোগ! তাঁর পূর্ব অভিজ্ঞতাগত তিনি দেখলেন—আন্দোলনের তরঙ্গে আবার কতকগুলি বিদ্যালয় ভেসে উঠেছে—যার নাম পুনরায় জাতীয়। সেখানে কি শিক্ষা দেওয়া হবে বুঝতেই পারলেন।

জাতীয় বিদ্যাপীঠের অধ্যক্ষ সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ হতে তাই ঠাট্টা করে বললেন—বিদ্যাপীঠ কি বিদ্যার দিকে পিঠ ফেরানো না কি?

এবং সুগৌর সুভাষচন্দ্র স্বতই লাল হয়ে উঠলেন। লাল হলেন এই কারণে যে, কবি তাঁদের উদ্দেশ্যের সততায় সন্দেহ করছেন; দ্বিতীয়ত সুভাষচন্দ্র ঠাট্টা বুঝতেন না, বা বুঝতে চাইতেন না।

এখানে একটি কথা বলে রাখা দরকার সুভাষচন্দ্র যতই লাল হন, কবির কথাই সত্য। এই সত্য বলতে কবিকে কোনো 'দিব্য প্রতিভা'র উপর নির্ভর করতে হয় নি, তাঁর পুরাতন অভিজ্ঞতার স্মরণই যথেষ্ট। সুভাষচন্দ্রের বিদ্যাপীঠ পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেছিল অচিরকালে; বিদ্যাপীঠে সুভাষচন্দ্র যতদিন ছিলেন অত্যন্ত নিষ্ঠাবান ছিলেন,—সে কথা ঠিক, কিন্তু যদি তিনি (বা তাঁরা) বিদ্যাপীঠকে বাঁচিয়ে রাখতে না পারেন, যদি অন্য 'গুরুতর' রাজনৈতিক প্রয়োজনে তাঁকে কার্যান্তরে চলে যেতে হয়, তাহলে জাতীয় বিদ্যালয় যে গৃহচ্যুত শিক্ষার্থীদের ক্যাম্পজীবন তা স্বীকার করতেই হবে।

কেবল সুভাষচন্দ্র বলতে পারেন, সারা দেশকে যেখানে স্বল্পাহারে জীবনধারণ করতে হচ্ছে—শিক্ষা তার বাইরে যেতে পারে না; আমরা যে সুরু করেছি, সেটাই প্রাণের লক্ষণ, নিখুঁত ও স্থায়ী করবার উপযুক্ত চরিত্র সংগ্রহ করবার পরে যদি সুরু করতে হয়, তাহলে হয়ত কোনোদিন সুরু করাই হবে না।

জাতীয় শিক্ষা ব্যাপারটি সুভাষচন্দ্র ব্যক্তিগতভাবে মন-প্রাণ দিয়ে গ্রহণ করেছিলেন। আদর্শবস্তুকে সর্বাত্মকভাবে গ্রহণ করবার মত ধ্যানশক্তি তাঁর ছিল। পূর্বেই দেখেছি, আই· সি· এস. ত্যাগ করবার সময়ে সুভাষচন্দ্র ভবিষ্যৎ জীবনের কার্যবিধি সম্বন্ধে বলেছেন, শিক্ষাপ্রচার এবং সাংবাদিকতা গ্রহণের ইচ্ছা আমার আছে। মনে হয় এ ব্যাপারেও অরবিন্দের দৃষ্টান্ত তাঁর সামনে ছিল। বরোদা থেকে অরবিন্দ ঘোষ জাতীয় পরিষদের ভার নিয়ে চলে আসেন এবং পরে 'বন্দেমাতরম্' পত্রিকার দায়িত্ব পড়ে তাঁর উপরে। সুভাষচন্দ্র হয়ত ভেবেছিলেন, অরবিন্দের মত শিক্ষকতা ও সাংবাদিকতার দ্বারা দেশচিত্তে আলোড়ন আনতে পারবেন। সুভাষচন্দ্র উৎকৃষ্ট শিক্ষক ছিলেন, এবং 'ফরোয়ার্ড' ইত্যাদি পত্রিকা পরিচালনায় তাঁর সাংবাদিক-প্রতিভার পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল। তা সত্ত্বেও বলা চলে, এই দুটির কোনোটিই তাঁর নিজের প্রতিভা-স্ফূর্তির যোগ্য ক্ষেত্র নয়। চিন্তাক্ষমতা থাকলেও তিনি চিন্তানায়ক নন, এবং নিভৃত নির্দেশের গুরুও তিনি ছিলেন না। তাঁর মহিমা অন্যত্র—তিনি প্রকাশ্য ও প্রচণ্ড, বিপুল জনমণ্ডলীর মধ্যে ঝাঁপ দিয়ে তাকে মথিত করাই তাঁর কাজ—জনসমুদ্রের কেন্দ্রে তাঁর স্থান—সেখানে তিনি নেতা ও নেতাজী। [ক্রমশঃ]

প্রতিনায়ক

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

সময়টা ছিল শীতকালীন। সবে সন্ধ্যা নেমেছিল রাজার ঘাটে। সেই সঙ্গে বৃষ্টিও এসেছিল ঝিরঝিরিয়ে। বাতাস বইছিল জোরে। সামনে গঙ্গার জলের ওপর বৃষ্টি বাতাস আর প্রচণ্ড ঠাণ্ডার মধ্যে নৌকোর টিমটিমে বাতিগুলোকে দেখাচ্ছিল সেই সব ভূতের মত—যারা নাকি নিজ নিজ অস্থিখণ্ড খুঁজে বেড়ায় নির্জনতা ও প্রাকৃতিক উপদ্রবের সুযোগে। নেপালবাবুর মড়াটা নিয়ে এরা চারজন বসেছিল ঘাটবাবুর আটচালায়। চারজনের তিনজনই যুবক, অন্যজন প্রৌঢ়। আটচালায় আরও জনাকয় লোক ছিল। তারা কেউ শহরফেরা ব্যাপারী, কেউ মামলাবাজ—আরও ক'জন। বৃষ্টির আকস্মিতা না থাকলেও ওরা সবাই তা আকস্মিক ভেবে বিরক্ত ও বিষণ্ণ হয়ে পড়েছিল। কেউ বিড়ি-সিগ্রেট টানছিল, কেউ বিড়বিড় করে গাল দিচ্ছিল। কথা বলার মেজাজ কারুর নিশ্চিত ছিল না।

সারাটি দিন আকাশ ছিল মেঘলা। উত্তরাগত বাতাসের দাপট ছিল অসাধারণ। তাই এতক্ষণে বৃষ্টি নামবার সম্ভাবনা তো ছিলই একরকম। ঘাটবাবুর ঘরে মাচার সামনে এতক্ষণ যে ডে-লাইটটা জ্বলছিল, বৃষ্টির ছাট বাঁচাতে সেটার সামনে ত্রিপল টাঙিয়ে দেওয়া হল। আশেপাশের চায়ের দোকানগুলোও ঝাঁপ নামাতে বাধ্য হল। হাইওয়ের দুপাশে গভীর নয়ানজুলিতে নির্বোধ ব্যাঙের ডাকও শোনা যাচ্ছিল। বড় বড় গাছগুলো দুলছিল। শোঁ শোঁ শব্দ হচ্ছিল চারপাশে। ঠাণ্ডা অন্ধকারে রাজার ঘাট এক সময় ডুবে গেলে আটচালায় নেপালবাবুর মড়া ছুঁয়ে যে চারজন বসেছিল, তাদের বুক টিপটিপ করছিল।

এ পাবেই কয়েক শো গজ দূরে আগাছার ঝোপ পেরিয়ে শ্মশান। শিয়রে তার বুড়ো বট—চারপাশে ছড়ানো তার শাখাপ্রশাখা ও ঝুরি। তার ওপাশে বাঁশের বন। ডোমের আটচালাটা এখন শূন্য হওয়াই স্বাভাবিক। সতু ডোম ঘাটের কাছে তার বাড়িতে ছেলেবৌ নিয়ে সম্ভবত নেশাভাঙ করছে। ওকে খবর দেওয়াও এক ঝক্কিকার। কাছাকাছি কাঠগোলা নেই। চুরিচামারির ভয়ে শ্মশানের আটচালায় সতু ডোম কাঠ রাখে না—আগের বহু অভিজ্ঞতায় এটা জানা আছে।

শববাহকদের মধ্যে যে প্রৌঢ়, তার নাম রাখাল। সে বলছিল—নেপালদার বরাত! সারাজীবন দুঃখকষ্টে কাটল—মরেও কি রেহাই আছে রে বাবা!

সন্তোষ সম্পর্কে নেপালবাবুর ভাইপো। সে বলল—বিষ্টি সহজে ছাড়বে বলে মনে হয় না। কতক্ষণ বসে থাকবে? বরং সতু-ফতু বাদ দাও রাখালকা, আমরা এগোই।

বিনোদ বলল—কিন্তু কাঠ?

রাখাল বলল—কাঠ সতুর বাড়ি থেকে নিয়ে আসা যাক্। সুনীল, আমার সঙ্গে চল্ দিকি বাবা।

সুনীল অন্ধকারে খিলখিল করে হাসছিল। বলল—বিষ্টিতে মড়া পুড়বে? চাঁদা করে খানিক ঘি আনলে হত।

—আর ঘি! রাখাল হাসল। নেপাল-

যার জন্যে চাঁদার নাম শুনলে রাণীচক তেড়ে মারতে আসত না ?

সে কথা ঠিকই। ছত্রিশ জাতের উচ্ছিষ্টখেকো, তায় গুণ্ডা ডাকু মানুষ এই নেপালদা। মদ মেয়েমানুষ তো সামান্য ব্যাপার, কোন্ দুষ্কর্ম বাকী ছিল জীবনে তার ? ওরা চারজনে নেপালবাবুর সম্পর্কে এই কথা ভাবছিল। ভাবতে ভাবতে তার মড়াটার ওপরেই বিরক্ত হচ্ছিল। পাঁচ মাইল পথ ওরা সেটা বহন করেছে। পুড়িয়ে ফিরে গেলে আবার কী অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ আছে, কেউ জানে না। যে মড়া কেউ ছুঁতে যায় নি, বরং অনেকে পরামর্শ দিয়েছিল, পঞ্চায়েতের খরচায় মুন্দোফরাস দিয়ে মাঠের ভাগাড়ে ফেলে আসতে, সেই মড়া ওরা চারজনে গঙ্গাতীরে নিয়ে এসেছে। কোন আকস্মিক উৎসাহ রাণীচকের অজস্র মানুষের মধ্যে মাত্র এই চারজন মানুষকে এমন কাজটা করাল, ওরা বলতে পারে না। শুধু মনে হয়, পৃথিবীতে নানারকম মানুষেরই তো থাকবার কথা। কতরকম মতামত, কত সব বৈচিত্র্য।

এদের পরস্পর কথা বলতে শুনে অন্যান্য লোকগুলো ক্রমে ক্রমে নীরবতা ভাঙল। এরা যেন জানত না, এতক্ষণ যাবৎ একটা মড়ার পাশে আশ্রয় নিয়েছে।

—কে গেলেন গো ? প্রথম প্রশ্ন উঠল কোণের দিকে।

জবাব রাখাল দিল—রাণীচকের।

—রাণীচকের তো অনেককেই চিনি। নাম ?

একটুখানি বিরক্তি চেপে রাখাল বলে —নেপাল বাঁড়ুয্যে।

প্রশ্নকর্তা অন্ধকারে খসখস করে নড়ে ওঠেন। বলে—নেপাল বাঁড়ুয্যে মারা গেলেন ? আশ্চর্য !......

অন্য একজন বলে—আশ্চর্যের কী আছে দাদা। মানুষ মরবে না ?

—না, তা বলছি নে। কিন্তু নেপালবাবু......

হেঁড়ে গলায় বলতে শোনা যায়—ও নেপালই বলুন আর ইয়েই বলুন, একই কথা। তা নেপালবাবুটি কে ?

রাখাল বলে—আপনার মুখেই তো জবাব রয়েছে। 'একই কথা' না কী বললেন না ?

হেঁড়ে গলা অপ্রস্তুত হাসবার চেষ্টা করে।—হ্যাঁ, মানে মৃত্যুর পর সবাই সমান। তবে জীবিতকালের একটা পরিচয় থাকে কি না ?

রাখাল শান্ত স্বরে বলে—থাকে। নেপালদার পূর্বপুরুষ ছিলেন জমিদার। অবিশ্যি নেপালদা হেঁড়া কাঁথায় মানুষ হয়েছিলেন। তবে ছেলেবেলায় অনাথ হলে যে দশা হয়......

কথা কেড়ে নেয় প্রথম প্রশ্নকর্তা।—লোকে ওঁর নাম দিয়েছিল নেপালগুণ্ডা। স্বদেশীও করেছিলেন কিছুকাল। কেন যে ছেড়ে দিলেন, তাও জানি নে। একবার এই ঘাটের ওপর একটা পুলিশ খুন করেছিলেন। সাত বছর জেল হয়েছিল। ফিরে এসে যেন আরও দুর্দান্ত হয়ে উঠেছিলেন। ফের খুনোখুনি গুণ্ডামী রাহাজানি।......

রাখাল বলে—অনেক কিছু জানেন দেখছি। মশায়ের নাম ? কোথায় থাকেন ?

—চিনবেন না। তবে নেপালবাবুকে আমি চিনতাম। শুধু দূরের চেনা নয়, প্রায় প্রতিদিনই আমাদের দেখাসাক্ষাৎ হত বলতে পারেন। তারপর এক বিশ্রী ঘটনায় ব্যাপারটার ছেদ পড়ে গেল।

—তাই নাকি ? বেশ আশ্চর্য লাগছে। রাখাল একটু অন্তরঙ্গভাবে বলে।

—আমারও। কারণ এতদিন পরে ফের নেপালবাবুর মুখোমুখি এসে যাব, ভাবতেই পারি নি। বলবেন, মড়ার মুখোমুখি হয়েছি—একথার কোন অর্থ হয় না। সত্যি হয় না। এমন কি নেপালবাবু এখন বেঁচে থাকলেও এ মুখোমুখি হওয়ার অর্থ থাকত না। কারণ এখন আমি পুরোপুরি অন্ধ।

অন্ধকার আটচালায় হঠাৎ সব স্পন্দন কিছুক্ষণের জন্যে থেমেছে। কেবল থামে নি বাইরের প্রাকৃতিক উপদ্রব। বৃষ্টি ক্রমশ জোর হয়েছে। বাতাস বেড়েছে। আটচালার তিনদিক বন্ধ এবং সেটা দক্ষিণের দিকে খোলা ; তাই আশ্রয় হিসেবে নিরাপদ কিছুটা।

দেশলাই জেলে সিগ্রেট ধরাচ্ছিল লোকটা। যেন তার উক্তির যথার্থতা প্রমাণের জন্যই সিগ্রেট জ্বালাছিল। সেই স্বল্প ক্ষণস্থায়ী আলোয় দেখা গেল, ওর নাকের দুপাশ থেকে কপালে ভুরু অব্দি একপোঁচড় পোড়া কালচে মাংস; দুটি চোখের কোন চিহ্ন খুঁজে পাওয়া কঠিন। সম্ভবত কোন ভীষণ দুর্ঘটনার ফলেই এমন অবস্থা। কিন্তু হঠাৎ আলোর ঝলকে দেখা ওই মুখ বড় বীভৎস দেখাল। শ্মশানের অলৌকিক পিশাচের চেহারা বুঝি এমনিই। এই পরিবেশের মধ্যে ওই মুখের উপস্থিতি—বিশেষত একটা মড়ার পাশে ; বিস্ময় তুচ্ছ, আতঙ্কে মিশে এদের সবার মনে একটা ঘোরতর অশুচিতা ছড়িয়ে দিয়েছে। সবচেয়ে কমবয়সী সুনীল বলে ওঠে—রাখালকা, চন্দন। সন্তুকে ডেকে আনি।

ব্যাপারীদের কেউ বলে—সন্তু এখন রাখগাছে সাঁতার দিচ্ছে বাবু। বেথা চেষ্টা। খানিক অপেক্ষা করুন বরং। অকালবাদলা ছেড়ে যাবে শীগ্‌গির।

রাখাল অন্য কথা ভাবছিল। অন্ধের মুখটা তার পরিচিত মনে হচ্ছিল। অন্ধ হবার আগেই কোথাও লোকটিকে সে দেখেছে। ওই কপাল, ঠোঁট, চিবুক—বেশ চেনা মনে হয়। সে একটু গলা ঝেড়ে বলে—মশায়ের পরিচয় পেলুম না কিন্তু। কোথাও দেখেছি মনে হচ্ছে।

অন্ধ হাসল। সাবধানে হাতের তালুতে সিগ্রেটের ছাই ফেলছিল সে। দেখা গেল জ্বলন্ত দেশলাই কাঠিটা এখনও ওর হাতের তালুতে রয়েছে। আশ্চর্য সহ্যশক্তি। কে বলে—কাঠিটা জ্বলে রয়েছে। ফেলে দিন।

আমল দিল না অন্ধ। হাসি থেমেছিল তার।—আমার পরিচয় কী দেবার মত আছে। সরকারী চাকরী করতাম। বুঝতেই পারছেন, চাকরী করা আর সম্ভব হয় নি। পেন্সন পাই মাসে মাসে। ওপারে শহরে এক আত্মীয় বাড়ি যাচ্ছিলাম। বাস থেকে নামতেই বৃষ্টি এল। কালই আবার পেন্সনের দিন। কেমন কাটবে কে জানে!

অন্ধ মানুষ এই দুর্যোগের রাতে কীভাবে কাদায় পিছল ঘাটে নৌকোয় চাপবে, সেই ভাবনা। ব্যাপারীদের একজন বলে ওঠে—ঘাটবাবুকে বলে কয়ে একটা নৌকো দিতে বলি, বাবু। কী বলেন ? মাঝিগুলো সব সুখের পায়রা। রাজার ঘাটও এক আজব জায়গা। এটুখানি বেগতিক দেখলেই লগি তুলে বসে থাকবে ওরা।

অন্ধ বলে—থাক্। অসময়ের বৃষ্টি, ছেড়ে যাবে এক সময়। তাছাড়া, আমাকে খুব অসহায় ভাববেন না কিন্তু। এ ঘাটের প্রতিটি ইঞ্চি আমার মুখস্থ। শরীরে জোর এখনও কমে নি। চোখই যা গেছে।

হঠাৎ রাখাল ঝুঁকে যায় অন্ধের দিকে।—মশাই কি মণিবাবু দারোগা ?

—ছিলাম।

—আপনার এ অবস্থা হল কিসে ?

কিস্তিবন্দীতে ট্রানজিস্টার

৩২০, টাকা মূল্যের
টেলিকুইন, পোর্টেবল
৩ ব্যাণ্ড অল ওয়ার্ল্ড
৮ ট্রানজিস্টার মাসিক
১০, টাকার সহজ
কিস্তিতে। আবেদন করুন :

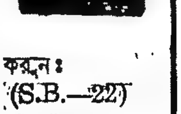

ATLAS CO. (S.B.—22)
Box No. 1329, Delhi—6.

অস্পষ্ট গুঞ্জন শুরু হয়েছিল চারপাশে তৎক্ষণাৎ। মণিবাবু দারোগা? সেই মণিদারোগা? কী সর্বনেশে কাণ্ড! জেলার যে-সব থানায় এই ভদ্রলোক গেছেন, বাঘা-বাঘা অপরাধী দেশ ছেড়ে পালিয়েছে। তার ওপর স্বয়ং বদনামও বড় কম অর্জন করেন নি। মদ মেয়েমানুষ জুয়া—সর্ব-বিষয়ে বিশারদ; রাখালের বিস্ময় আস্তে আস্তে বিষণ্ণতায় মিইয়ে পড়ছিল। নেপালদার ঘোর প্রতিদ্বন্দ্বী শত্রু মণিদারোগাও আজ অন্ধ!

ব্যাপারটায় কোন আইন-বে-আইনের প্রশ্ন থাকলে ভাববার মত কিছু খুঁজে পাওয়া যেত না। রাখালের মনে হচ্ছিল, সরমা যদি এখন ঠিক এমনি আকস্মিক-ভাবে এখানে উপস্থিত থাকত, তাহলেই সম্পূর্ণ হত নাটকটা। মণিবাবুকে জিগ্যেস করবে নাকি, সরমা কোথায়? উনি নিশ্চিত জানেন। রাণীচক থেকে যে রাতে নেপালদার আদেশে রাখাল গর্ভিণী সরমাকে শহরের হাসপাতালে নিয়ে আসছিল, সে-রাতেই পথে মুখোমুখি পড়ে যেত মণিদারোগার। বাঁকের মুখে আলো দেখে পাশের ঝোপে লুকিয়ে পড়ে দুজনে। হাসপাতালে সরমার একটি ছেলে হয়েছিল। সে ছেলের মুখে নাকি নেপালদার কোন চিহ্ন ছিল না। নেপালদা রাখালকে ইসারায় বলেছিলেন কথাটা। বলেছিলেন—জীবনে মানুষের ওপর ঘেন্না ধরে গেছে হে রাখাল। যে ক'টা দিন বাঁচবো, ঘেন্না করেই বাঁচবো। সরমাকে কেউ আর ফিরতে দেখে নি রাণীচক। ছোট তরফের বিধবা জমিদারগিন্নী সরমার নামে গাজনে ছড়া আর সঙ কম বাঁধে নি লোকে। সে আজ কতদিনের কথা।

রাখাল বলে—আচ্ছা মণিবাবু, আপনার চোখ অন্ধ হল কেমন করে?

—আগুনে পুড়ে।

রাখালের ইচ্ছে হল, শুধোয়—কিসের আগুন, পারল না। সুনীল উঠেছে ওদিকে। সে হাত বাড়িয়ে বাইরে বৃষ্টির আঁচ করছিল। বলল—এস, কে যাবে। ছ্যাটা না এলে কাঠই নিয়ে আসবো বরং।

খানিক পরেই কাঠ এসে যায়। সতু আসে না। কিন্তু কাঠের বোঝা এক সমস্যা হয়ে দাঁড়ায় শেষে। মাত্র চারজন মানুষ। চারজনই দৈহিক শক্তিতে খুব একটা পটু নয়। ক্লান্তিতে উদ্বেগে ওরা কাতর। অগত্যা মড়ার ওপর কাঠের বোঝাটা রাখবার মতলব করছিল ওরা। সেই সময় অন্ধ মণিবাবু বলে—কিছু যদি মনে না করেন, আমি কাঁধ লাগাতে পারি।

সকলেই হাঁ হাঁ করে ওঠে—সে কি! আপনি কেন যাবেন?

—তাহলে কে যাবে? মণিবাবু করুণ কণ্ঠে বলেন।

প্রকৃতপক্ষে যাবার লোক একজনও নেই। ব্যাপারীরা বলে—আমরা মুসলমান। নৈলে তো কোন ভাবনাই ছিল না। বাকি লোকগুলো নানা ওজর দেখাতে থাকে। কেউ বুড়োমানুষ, কেউ বাতের রোগে ভুগছে, কেউ নাকি সদ্য জ্বর ছেড়ে পথ্যি করেছে......ইত্যাদি। এ দুর্যোগের রাতে অপরিচিতের মড়ার কাঁধ লাগাতে কেই বা রাজী হতে পারে।

অগত্যা সুনীলের মাথায় প্রকাণ্ড কাঠের বোঝা। বাকি চারজনে টলতে টলতে যাচ্ছিল কাদার পথে। বৃষ্টিতে ভিজে যাচ্ছিল ওরা। মড়াটাও ভিজছিল। আগাছার জঙ্গল পেরিয়ে বুড়োবটের প্রান্তে ওরা পেঁছল। তারপর ডোমের আট-চালায় মড়াটা নামাল।

মণিবাবু বলে—বরং বটতলায় চিতা সাজিয়ে ফেলুন। বৃষ্টিতে জ্বলবে না অন্য কোথাও। কিন্তু কেরোসিন এনেছেন তো?

এরা মাথা নাড়ে। কেরোসিন তো দূরের কথা একটা হেরিকেন আনবার কথাও কারুর মাথায় ছিল না। একটা পাপের পিণ্ড যত দ্রুত পারে রাণীচকের সামাজিক মাটি থেকে তুলে সরিয়ে আনতে যেন ব্যস্ত হয়েছিল। এরা বুঝতে পারে, সমাজের প্রতি ভয় তাদের একটু অতিরিক্ত মাত্রায় যেন রয়ে গেছে। নাকি যে ব্যস্ততায় মানুষ ঘৃণার বস্তু দ্রুত ফেলে দেয় লাথি মেরে? নাকি যে দ্রুততায় মানুষ আতঙ্কের বস্তু ঝেড়ে ফেলে পা থেকে? রাখাল যেন পায়ে জড়িয়ে-যাওয়া একটা মরা গোখরো ঝেড়ে ফেলবার ব্যস্ততায় এই নেতৃত্ব নিয়েছিল। তার সব সাহস ও উদারতার মূলে কৃতজ্ঞতা ছিল না মোটে; ছিল যেন বা এক আতঙ্কের বিভ্রম। এখন তার ইচ্ছা করে, মড়াটা অগত্যা জলে ফেলেই দেবে। মরবার সময় নেপালদা বলেছিল তাকে যেন দয়া করে পোড়ানো হয়। গলায় ঘড় ঘড় শব্দ হচ্ছিল, তখনও সেই করুণার জন্যে তার কী ব্যাকুল আবেদন! সে বলতে চেষ্টা করছিল, নেপাল বাঁড়ুয্যেকে কেউ হারাতে পারে নি কোনদিন। তার দেহে কাঁটার আঁচড় দেবারও সাধ্য ছিল না কারুর। তার মৃতদেহে জন্তুরা আঘাত করবে, এটা উচিত নয়। উচিত যে নয়, রাখালেরও মনে হয়েছিল সে কথা। কিন্তু দৈব প্রতিকূল।

মণিদারোগা বলে—আমি অন্ধ। আপনারাও এখন তদ্রূপ। কেউ কিছু দেখতে পাচ্ছ না। এমন কি, নেপাল-বাবু, তিনিও কিছু দেখতে পাচ্ছেন না। কী বিচিত্র পরিস্থিতি!

হঠাৎ রাখাল বলে ওঠে—সরমার কোথায় মণিবাবু? শুনেছিলাম, হাস-পাতাল থেকেই সে উধাও হয়েছিল।

—হ্যাঁ।

—তারপর? তার সেই ছেলেটি কি বেঁচেছিল?

—না। সরমাও পুড়ে মারা যায়।

—সে কি!

—হয়ত ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করতে আগুন জেবলে দিয়েছিল নিজের দেহে। আমি তার জ্বলন্ত দেহ জড়িয়ে ধরে-ছিলাম। সেই বোকামিতে চোখ দুটো গেল। কিন্তু আমার জ্বালা রাবণের চিতার মত রয়ে গেল, বুঝলেন? ভাবতাম, যদি কোনদিন নেপাল বাঁড়ুয্যেকে সামনে পাই......

একটু চুপ করে থেকে রাখাল বলে—একটু আগে আপনি বলেছিলেন, আমরা কেউ কিছু দেখতে পাচ্ছিনে।

—হ্যাঁ। অন্ধকার বড় বেশি; তাই না?

—তা নয় মণিবাবু, আমি কিন্তু দেখতে পাচ্ছি। আপনি সরে আসুন।...

একটা নড়াচড়ার শব্দ ওঠে। মণিবাবু হাঁফাতে হাঁফাতে বলে—কী? কী দেখতে পাচ্ছেন আপনি?

রাখাল হিংস্রভাবে চিৎকার করে—সন্তোষ, সুনীল, বিনোদ! তোরা ওকে ঘিরে দাঁড়া। পালাতে দিসনে পিশাচ-টাকে। পরক্ষণেই সে দেশলাই জ্বালে। সেই আলোয় দেখা যায় দৃশ্যটা। এতক্ষণ ধরে মণিদারোগা মড়ার দুটো চোখ খুবলে তোলবার চেষ্টা করেছে। তার দুটো আঙুল, হাতের তালু এবং মড়ার মুখটা কালচে রক্তে বীভৎস হয়ে গেছে। খুবই ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছে নেপালবাবুর মুখটা। আলো নিভে আসার মুহূর্তে দেখা গেল, শবভোজী আক্রান্ত শেয়ালের মত ভীত অন্ধ লোকটি কোণের দিকে সরে যাচ্ছে।

অমানুষিক ক্রোধে গর্জন করে ওঠে চারজন মানুষ। চেলা কাঠ তুলে নেয় ক্ষিপ্রহাতে। কিন্তু প্রচণ্ড ধাক্কায় সরিয়ে মণিদারোগা বাইরে বৃষ্টির মধ্যে ছিটকে পড়ে। রাখালই আগে ছুটে যায়। চিৎকার করে—মার, মার! গঙ্গার কিনারায় পেঁছেই মণিদারোগা হঠাৎ ঝাঁপ দেয় জলে। এখানে গঙ্গার দহ। অতল ঠাণ্ডা জলে আলোড়ন ওঠে। তারপর যেন সেই আলোড়নময় অন্ধকার বৃষ্টিভরা তরল ও ঠাণ্ডা ব্যাপকতার ভাঁজে ভাঁজে একটা ভয়াবহ অট্টহাসির শব্দ ভাঙচুর হতে হতে মিলিয়ে যায় দূরের দিকে। সিক্তদেহ খরগোসের মত কান খাড়া করে ওরা চারজন নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থাকে শুধু।

রাজনীতি ও ছাত্রসমাজ

প্রদ্যোৎকুমার রায়॥

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

(৭)

১৯২০ সালের ৪ঠা থেকে ৯ই সেপ্টেম্বর পর্যন্ত কলকাতায় জাতীয় কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশন হয়। বিপিনচন্দ্র পাল অসহযোগ প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন। চিত্তরঞ্জন বিপিনচন্দ্রকে সমর্থন জানান। সর্বভারতীয় নেতাদের মধ্যেও অনেকেই গান্ধীজীর অসহযোগ নীতির সমর্থন করতে পারেন নি। যদিও এই অধিবেশনে গান্ধীজীর প্রস্তাব অধিকাংশ ভোটে গৃহীত হয়। এর ফলে বাংলাদেশের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত বর্জন করার কথাও ভেবেছিলেন। "কিন্তু বরিশালের নায়ক অশ্বিনীকুমার দত্তের পরামর্শে ন্যাশনাল কংগ্রেসের নির্দেশ পালনই যুক্তিযুক্ত বিবেচিত হয়।"১

১৯২১ সালের জানুয়ারী মাস থেকে বাংলাদেশের নেতৃবৃন্দ ছাত্রদের অসহযোগ আন্দোলনে-যোগ দিতে আহ্বান করেন। চিত্তরঞ্জন দাশ তখন বাংলাদেশের তরুণ হৃদয়ে সম্রাটের স্থান নিতে চলেছেন। বিপিনচন্দ্র বাংলাদেশের চরমপন্থী রাজনৈতিক চিন্তাধারার জনক। "Pal was a fire-eater and fire-spitter. His speeches were pervaded by fearlessness of consequences and indifference to responsibility. He knew how to electrify the audiences with his words. He was an ultra-idealist. This was Pal 1905-10."২

পৃথিবী পরিবর্তনশীল, অতএব মানুষও এই নিয়মের বাইরে নয়। ১৯২০-'২১ সালে বিপিনচন্দ্র আর সে আগুন ছড়াতে পারছেন না। কিন্তু তবুও তাঁকে চিত্তরঞ্জনের সঙ্গে এই সময়ে বিভিন্ন সভা-সমিতিতে দেখতে পাই। ১১ই জানুয়ারী মঙ্গলবার বিডন স্কোয়ারে যে সভা হয়েছিল এবং যে সভাতে কলকাতা শহরের স্কুল-কলেজের বহু ছাত্র জমায়েত হয়েছিল —তাতে সভাপতিত্ব করেন চিত্তরঞ্জন দাশ। বক্তা হিসাবে বিপিনচন্দ্র উপস্থিত ছিলেন। বিপিনচন্দ্র বলেন, "এক বছরের মধ্যেই আমরা অহিংসার পথে স্বরাজ পেতে পারি যদি ছাত্রসমাজ কালবিলম্ব না করে স্কুল-কলেজ পরিত্যাগ করে। ভারতবর্ষ স্বাধীন হবেই—সে দুর্দিন আগেই হোক কিংবা পরেই হোক। যদি দেশবাসী শান্তিপূর্ণ অহিংস সংগ্রামের মাধ্যমে স্বাধীনতা লাভ করতে চায় তবে বর্তমানই হল সেই শুভ সন্ধিক্ষণ। ইংরেজ রাজত্ব মায়ার উপর প্রতিষ্ঠিত। বর্তমানে যে দারুণ সঙ্কট দেখা দিয়েছে, আমলাতন্ত্রও তাতে যথেষ্ট ভীত। প্রতিটি ভারতীয়ের কর্তব্য হল স্বাধীনতার দুর্বার আকাঙ্ক্ষাকে হৃদয়ে সর্বদা জাগিয়ে রাখা। এই দুর্বার ইচ্ছাশক্তিই স্বরাজলাভের নিশ্চিত পথ।"৩ তিনি ছাত্রদের বলেন, তাঁরা যেন অন্তত তিন মাসের জন্য স্কুল-কলেজ থেকে দূরে থাকেন। এই সময়ের মধ্যে তিনি আশা করেন, ভারতবর্ষে নিশ্চয়ই কোনও যুগান্তকারী পরিবর্তন দেখা দেবে। প্রতিটি স্কুল-কলেজে ছাত্রদের নিয়ে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠিত হওয়া উচিত বলে তিনি মন্তব্য করেন। বক্তৃতার শেষে তিনি বলেন, "আত্মত্যাগের মধ্য দিয়েই স্বাধীনতার জয়যাত্রা ঘোষিত হয়। শান্তিপূর্ণ অহিংস সংগ্রামের সৈনিক যদি ছাত্ররা হতে রাজী না হয় বা সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করতে অহেতুক বিলম্ব করে তাহলে হয়ত এমন অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে যেখানে রক্তপাত অনিবার্য হয়ে উঠবে।"৪

১৩ই জানুয়ারী ছাত্ররা প্রথম কলেজ ছেড়ে বেরিয়ে আসে এবং ঐদিন বিকেলে মির্জাপুর স্কোয়ারে তাদের এক বিরাট সভা হয়। বিপিনচন্দ্র এই সভায় উপস্থিত হয়ে তাঁর বক্তব্য রাখেন। তিনি বলেন, "ভারতীয় যুবসমাজের কাছে নবজাগরণের যে বার্তা এসেছে, তাতে দেশের শত সহস্র যুবক এই নব আদর্শে উদ্বুদ্ধ হবে বলেই আমার বিশ্বাস। এ আহ্বান গান্ধীর কাছ থেকে আসে নি। আসে নি কংগ্রেসের কাছ থেকে। এ আহ্বান সেই পরম শক্তির আহ্বান। যে শক্তি মনুষ্য জাতির সমগ্র সত্তাকে নিয়ন্ত্রিত করে। স্বরাজকে লাভ করতে হবে যুবকদেরই। কথার মারপ্যাঁচে স্বরাজ লাভ সম্ভব নয়। স্বরাজ লাভের জন্য চাই সুতীব্র আকাঙ্ক্ষা। যে সংগ্রামে তোমরা আজ এগিয়ে এসেছ, এ সংগ্রাম সম্পূর্ণভাবে একটি নৈতিক সংগ্রাম। একদিকে আমাদের স্বাধীনতা লাভের তীব্র আকাঙ্ক্ষা, অন্য দিকে এই বিশাল উপমহাদেশের অগণিত মানুষকে পদদলিত করে রাখার ঘৃণ্য চক্রান্ত—এই দুই শিবিরে সংগ্রাম। স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা যে সত্যই তীব্র তা প্রমাণ হবে, যদি জীবনের সব কিছুকে পরিত্যাগ করতে আমরা স্বরাজ লাভের জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হই। কলকাতার ছাত্রসমাজ আজ যে ইতিহাস রচনা করল, এ সংবাদ দিল্লী-মাদ্রাজ প্রভৃতি ভারতের শহরে পৌঁছুতে খুব বেশী সময় লাগবে না। পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত এ খবর পৌঁছে যাবে। বিশ্ববাসী বুঝবে ভারতের নবজাগ্রত যৌবনশক্তি অহিংস পথে স্বাধীনতাকে ছিনিয়ে নিতে আজ বদ্ধপরিকর।"৫ সমবেত ছাত্রদের এই বর্ষীয়ান নেতা আশীর্বাদ করেন। আইন কলেজ ও স্নাতকোত্তর শ্রেণীর ছাত্রদের মধ্যে প্রায় ৪০০ (চার শত) ছাত্র ধর্মঘট করায় তিনি আনন্দ প্রকাশ করেন। ছাত্রদের এই ধর্মঘট ভারতীয়দের স্বাধীনতালাভের অদম্য ইচ্ছাশক্তির প্রতীক বলে তিনি মনে করেন। তিনি আরও বলেন, "গান্ধী নন, চিত্তরঞ্জন নন, শ্যামবাবুও (শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী) নন, শুধু ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস রেখে তোমরা এগোবে। দেশের অগণিত অসহায় মানুষের দিকে চোখ ফেরাও। কী দুর্বহ অবস্থার মধ্যেই না তারা কাল কাটাচ্ছে—তাদের কথা ভাব। ভবিষ্যৎকাল সেই মানুষকেই চাইবে—যে মানুষ সর্বসাধারণের স্বার্থের বিন্দুমাত্র ক্ষতি না করে গায়ে খেটে, মাথা ঘামিয়ে নিজের জীবিকা অর্জন করবে।"৬

এই সভাতে তিনি সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেন যে আগামী দিনের বিশ্বের ভাগ্যনিয়ন্তা হবে 'বলশেভিক'রা। তিনি

১ মুক্তির সন্ধানে ভারত—যোগেশচন্দ্র বাগল। পৃঃ ৩০৬।

২ Villages Towns as Social Patterns—B. K. Sarker. P 631.

৩ The Mussalman, Friday, January, 14th, 1921.

৪ The Mussalman, Friday, January, 14th, 1921.

৫। The Amrita Bazar Patrika, Jan. 14th., 1921.

৬। The Amrita Bazar Patrika, Jan. 14th., 1921.

'বলশেভিক' শব্দটিকে পছন্দ করতেন— কারণ তাঁর কাছে ঐ শব্দটি একটি অতীন্দ্রিয় আদর্শের প্রতীক। সর্বশেষে তিনি ছাত্রদের কাছে আবেদন করলেন তারা যেন আর ইস্কুল-কলেজে ফিরে না যায়—যতদিন পর্যন্ত ঐসব প্রতিষ্ঠান স্বদেশী প্রতিষ্ঠানে পরিণত না হচ্ছে।

এখানে একটি কথা বলতে চাই। বিপিনচন্দ্র দার্শনিক। কালের এক বিশেষ প্রান্তে বসে কালান্তরের ছবি তাঁর চিন্তায় স্পষ্ট হয়ে ওঠা স্বাভাবিক। আর সেই চিন্তাকে রূপ দিতে হলে প্রকৃত কর্মী চাই—যারা স্বপ্ন দেখবে; আদর্শের প্রেরণায় সর্বস্ব বিসর্জন দেবে। বলশেভিকদের জন্ম অনিবার্য। এ কথা বিপিনচন্দ্র বললেন ১৯২১ সালের জানুয়ারী মাসে। আর বললেন সেই তরুণসমাজেরই কাছে যারা সর্বযুগে সর্বকালে নতুনকে স্বাগত জানিয়েছে। নতুন আদর্শকে রূপ দিতে জীবন পণ করেছে। বিপিনচন্দ্রের এই মন্তব্যটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বলে বিবেচনা করি।

এরপর ১৫ই জানুয়ারী শনিবার কলেজ স্কোয়ারে প্রায় দু-হাজার ছাত্রের এক সমাবেশে মনীষী বিপিনচন্দ্রকে এক দীর্ঘ ভাষণ দিতে দেখি। তিনি প্রথমেই দুঃখ করে বলেন, "বর্তমানে কী তরুণ, কী প্রৌঢ়, কী বৃদ্ধ সকলেই যেন কল্পনা-শক্তিকে বিসর্জন দিয়ে বসে আছে। কোনও একজন ইংরেজ বলেছিলেন যে রাজনীতিতে কল্পনাশক্তির কোনও স্থান নেই। ভদ্রলোক আর যাই হোক, রাজনীতি বোঝেন না। এক ধরণের রাজনীতি আছে—যার উদ্দেশ্য হল সাময়িক কিছু লাভ করা। ভবিষ্যৎ রইল ঈশ্বরের হাতে। সে ক্ষেত্রে হয়তো কল্পনাশক্তির খুব বেশি প্রয়োজন না হলেও চলে। কিন্তু প্রকৃত রাষ্ট্রনায়ক কল্পনায় ভবিষ্যতের ছবি আঁকবেন—এবং সেই কল্পনাকে সার্থক করতে প্রথম থেকেই যথাযথ নীতি অনুসরণ করবেন—যাতে, কল্পনার ভবিষ্যৎ যখন বর্তমান হয়ে উঠবে—তখনকার সেই বিশেষ অবস্থায় যে বিশেষ ধরণের সমস্যা দেখা দেবে—তার সমাধান সম্ভব হয়। কল্পনা আর ইচ্ছা-খুশি এলোমেলো ভাবনা এক কথা নয়। সর্বশক্তিমান রাজ্যপালের আসনে নিজেকে বসিয়ে ভেবে দেখ—তুমি ঐ আসনে বসে নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমোতে পারবে কী? ভেবে দেখ—তোমরা আজ যারা স্কুল-কলেজ ছেড়ে বেরিয়ে এসেছ—তারা পৃথিবীর অন্য কারও কোনও ক্ষতি কর নি। যদি সত্যই কোনও ক্ষতি করে থাকো—তবে সে ক্ষতি করেছ নিজেদের। রাষ্ট্রপ্রধানের তাতে কী-ই বা আসে যায়? অনেকে ভাবছেন—কয়েকশত ছাত্র বই-পত্রের সঙ্গে সম্পর্ক ঘুচিয়েছে—তাতে রাষ্ট্রের কোনও ক্ষতি নেই। কিন্তু লর্ড রোনাল্ডসে বোবহয় এ ভাবের ভাবুক নন। আমার বিশ্বাস তাঁর চোখের ঘুম চলে গেছে। কনটের ডিউক এখন মাদ্রাজে আছেন। যখন তিনি কাগজে তোমাদের এই গৌরব-ময় ধর্মঘটের কথা পড়বেন—তখন তিনিও নিশ্চয়ই চিন্তাক্লিষ্ট না হয়ে পারবেন না। বাংলাদেশের তরুণসমাজ—ভারতবর্ষের অন্যান্য তরুণসমাজের অপেক্ষা অনেক বেশি প্রাণোচ্ছল, অনেক বেশি আদর্শ-বাদী। স্বদেশী আন্দোলনের যুগে তারা অগ্নিপরীক্ষা দিয়েছে। সেই দেশপ্রেমের আদর্শ আজও আমার বাংলার তরুণ হৃদয়ে জীবন্ত। সে যুগের শত শত তরুণের আত্মত্যাগ বৃথা হয় নি। তোমরা বর্তমানের ছাত্রসমাজ—সেই ঐতিহ্যের যোগ্য উত্তরাধিকারী। তাঁদের আত্মত্যাগ, দেশ-প্রেম, দুঃখকষ্ট সহ্য করার অপূর্ব ক্ষমতা সবই তোমাদের আছে। জাতীয় শিক্ষা-ব্যবস্থা হয়তো সাফল্যমণ্ডিত হয় নি। কিন্তু সে যুগে দেশপ্রেমের যে উজ্জ্বল বহ্নিশিখা জ্বলে উঠেছিল—তারই স্পর্শে শত শত দেশপ্রেমিক গড়ে উঠেছিল—আর সেইখানেই স্বদেশী আন্দোলনের সবচেয়ে বড় সার্থকতা। জাতীয় শিক্ষা-ব্যবস্থাকে কেন আমরা ঠিক পথে চালিত করতে পারি নি? জাতীয় শিক্ষা-ব্যবস্থা পরিচালনার ভার যাঁরা গ্রহণ করেছিলেন—তাঁরা সকলেই বিখ্যাত শিক্ষাবিদ এবং তাঁরা সকলেই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। আমি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে হেয় করতে চাই না। বাংলার নবজাগরণে কলকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের দান অসামান্য। কিন্তু প্রকৃতির নিয়মে সব কিছুই একদিন পুরাতন হয়ে যায়, প্রাণশক্তি হারিয়ে ফেলে। পচন যাতে ধরে—তার মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। এ বিশ্ব-বিদ্যালয় একদিন স্বাধীনতার বাণী শুনিয়েছে—তার ছাত্রদের। আমার ছাত্র-জীবনের কথা মনে পড়ে। আজ থেকে ৪০ বছর আগে অনেক কিছুই শিখেছি এখানে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সেই জীবন আজ আর নেই। কাজেই এর প্রয়োজন ফুরিয়েছে। হ্যাঁ, যে কথা বলছিলাম। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের হাতেই দেওয়া হয়েছিল জাতীয় শিক্ষা-ব্যবস্থা গড়ে তোলার ভার। দুঃখের বিষয় কলকাতা বিদ্যালয়ের প্রচলিত ধারার বাইরে গিয়ে নতুন কোনও সুষ্ঠু পরিকল্পনা তারা দিতে পারে নি। একটি কারিগরী বিদ্যা শিক্ষার বিভাগ ছাড়া গত ১৫ বছরে বঙ্গীয় জাতীয় বিদ্যালয় নতুন কোনও কাজ করেছে বলে জানা নেই। এই বিভাগের ছাত্ররা অবশ্য দেশের অনেক কাজে লেগেছে।

স্বদেশী আন্দোলন যারা করেছিল—তারা মোটেই জীবনে ব্যর্থতাকে বরণ করে নেয় নি। শিল্পে, ব্যবসা-বাণিজ্যে তারা প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে অনেকেই। সরকারী চাকুরী না করেও তারা বেঁচে আছে। স্বদেশী আন্দোলন ব্যর্থ হয় নি। তোমাদের মধ্যেই তার নবরূপায়ণ হয়েছে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

সরকারেরও মন বলে একটা কিছু আছে। ৫ হাজার ছাত্র স্কুল-কলেজ ছেড়ে চলে এল। যদি এই ছাত্রদল নিজেদের আদর্শে অটল থাকে—তবে স্বৈরাচারী সর-কারের নিকট তা মারাত্মক বলে বিবেচিত হবে। কারণ প্রতিটি ছাত্রই মানসিক দিক থেকে এক-একটি অগ্নিশিখা। পিক্‌রিক্‌ অ্যাসিডের বোমার শক্তি আর কতটুকু? এর শত সহস্র গুণ তেজী বোমার কাজ হবে—ঐক্যবদ্ধ আদর্শনিষ্ঠ এই সর্বত্যাগী ছাত্রদের দ্বারা। স্বাধীনতার জন্য প্রবল ইচ্ছাশক্তিই এই সাম্রাজ্যের উপর কঠিন আঘাত হানতে সক্ষম। এ কথা কি সরকার ভাবছে না মনে কর? এই ইচ্ছা-শক্তিকে মেরে ফেলা যায় না। এ মৃত্যুঞ্জয়ী। একে স্তব্ধ করে দিতে রাজ-রোষ নেমে আসবে সত্য। কিন্তু আমাদের সংগ্রাম সত্যের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত।

উপনিষদ গ্রন্থাবলী ঃ

১ম খণ্ড : ঐতরেয়, কৈবল্য, কাঠকো নৃসিংহতাপনী।

২য় খণ্ড : প্রুতাপ্যুত্তর, পরমহংস, সন্ন্যাস, নীলরুদ্রচুলিক, আরুণেয়, কণ্ঠশ্রুতি, জাবাল, পিণ্ড, আত্ম, ষটচক্র, ভৃগু, শিক্ষা, বৃহন্নারদ, নারদ, পরিব্রাজক, পৈঙ্গল, তুরীয়াতীত, বাসুদেব, শাণ্ডিল্য, নারায়ণ (ক), নারায়ণ (খ)।।

৩য় খণ্ড : ঈশ, কেন, প্রশ্ন, মুণ্ডক, মাণ্ডুক্য, তৈত্তিরীয়, প্রাণপ্রশ্ন-ব্রহ্ম, প্রাণাগ্নিহোত্র, তারক, গরুড়, শ্রীরামপূর্বতাপনীয়, শ্রীরামোত্তর-তাপনীয়, পঞ্চব্রহ্ম, কালাগ্নিরুদ্র, যাজ্ঞবল্ক্য, রামরহস্য, গোপাল-পূর্বতাপনীয়, গোপালোত্তরতাপনীয় কৌষীতক্য, অমৃতবিন্দু, কালিকা সর্বসার ও অমৃতনাদ। কাপড় ও বোর্ডে বাঁধা। মূল্য : প্রতি খণ্ড—৪.০০ টাকা।।

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড
১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট,
কলিকাতা—১২

অতএব জয় আমাদের হবেই। ইতিহাস যুগ যুগ ধরে সেই শিক্ষাই দিচ্ছে। স্বাধীনতার প্রবল আকাঙ্ক্ষাকে কোনও দিন কোনও শক্তিই নষ্ট করে দিতে পারে নি—পরাজিত করতে পারে নি। ইংলণ্ডের ইতিহাস আমেরিকার ইতিহাস, তরুণ ইতালীর ইতিবৃত্ত এই একই সত্য ঘোষণা করছে। স্বাধীনতা পেতে হলে সংগ্রাম চাই। আর সংগ্রামের শেষে জয় দেশ-প্রেমিকদের হবেই। সংগ্রামে যদি প্রথম প্রথম হারও হয়—ঘাবড়ে গেলে চলবে না। দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে আত্মবিশ্বাস নিয়ে লড়াই চালিয়ে যেতে হবে। আমি আমার পুত্রকে বলেছি এখন লেখা-পড়ার সময় নয়। জননী জন্মভূমিকে মুক্ত করাই এখন আমাদের একমাত্র কর্তব্য। শিক্ষা আজ না হোক কাল হবে। কিন্তু স্বরাজ লাভে বিলম্ব চলবে না। এই হল আমার দৃঢ় বিশ্বাস।"৭ এই বক্তৃতার শেষে তিনি বললেন,

'Now is your opportunity. Not five thousand, but tens of thousands of youngmen of India come out and stand for freedom—education or no education. Study may wait but Swaraj cannot. That is my opinion."

যুক্তি-যাদুর খেলা চলেছে রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে চিরন্তন কাল ধরে। এক কালের তারা দেখতে পায় নিজেদেরই আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিচ্ছবি। বিদায়ী দেশনেতার জীবনে এই ঘটনা অত্যন্ত করুণ। কিন্তু মানুষ তো এগিয়ে যাবেই। বিপিনচন্দ্রের জীবনেও এই একই রকম ঘটনা ঘটতে দেখি। "২৫শে মার্চ বরিশালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনের অধিবেশন হয়। সভাপতি শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল এতদিন অসহযোগের সমর্থন করিয়া সহসা বৃটিশ শাসনের উপকার স্মরণ করিয়া ইংলণ্ডের সহিত মিটমাট করা প্রয়োজন বলিয়া মত প্রকাশ করেন। এবং সম্মেলন তাঁহার নেতৃত্ব স্বীকার না করিয়া চিত্তরঞ্জনের নেতৃত্ব স্বীকার করেন।"৮

বরিশাল সম্মেলনে বিপিনচন্দ্র যে বক্তৃতা দেন—তা পরে "Swaraj : The Goal and the Way" নামক গ্রন্থে প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থের মুখবন্ধে বিপিনচন্দ্র বললেন—

"Lastly, it has been said that Swaraj may be attained first by non-violent means, and second within a year. The entire emphasis of the Present National Agitation has been laid upon these two things.* * * Having supported these two cries, I felt it morally binding upon me to fully make my meaning clear. This is why I have made it absolutely clear that Swaraj by non-violent non-co-operation can only mean a compromise with the present Govt. in the Country."

অধ্যাপক সরকার লিখছেন, "It was at this (Barisal) Conference (1921) that Pal, although the President, was howled into silence and forced to stop because the audience would have nothing of his message. Pal's message at that time was the message of opposition to the slogans raised by Gandhi, the New Star on the Indian Political firmament."৯

এক যুগের চরমপন্থী নেতা জনগণ কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হলেন। "..in 1921 at Barisal the same man asked the question, 'By what is the world Governed ?' and gave the most Prosaic reply, 'The world is governed by money.' Such realism was the least to be expected of this oratorical hypnotizer and fanatical idealist. This was too much for the audience. To the deafening protests from the thousands of the listeners he could give but one rejoinder, 'I do not know magic, I understand logic.' This finished him."১০

যাদু-যুক্তির খেলায় বিপিনচন্দ্র যুক্তিকে আশ্রয় করলেন। যে যুক্তি জনগণ গ্রহণ করতে সম্পূর্ণ নারাজ হল। অহিংস আন্দোলনে যখন সারা দেশ নতুন বিপ্লবের স্বপ্ন দেখছে—তখন এ ধরণের যুক্তিকে মেনে নেওয়া কেমন করেই বা সম্ভব ?

ভারতবর্ষের ইতিহাসে প্রাচীন ও নবীনের দ্বন্দ্ব, নরম ও চরমপন্থীদের দ্বন্দ্ব যেভাবে চলেছে—তা অনেকটা এই রকম :

বিপিনচন্দ্র পাল
——————(১৯০৫) =
সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী
——————(১৯২১) =
বিপিনচন্দ্র পাল

সুভাষচন্দ্র বসু
——————(১৯৪১)।১১
মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী

জননায়ক অন্যকালে পরিত্যক্ত হচ্ছেন। জননায়ক তাঁকেই বলে যাঁর চিন্তায় ভাবনায় জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষাই প্রতিফলিত হয়। যাঁর কর্মে মানুষ সহযোগিতা করে স্বতঃস্ফূর্তভাবে। মনে হয়, তিনি যেন এক অসাধারণ যাদুকর, যাঁর লেখনী বা বক্তৃতা জনমানসে ইন্দ্রজাল সৃষ্টি করে; তাদের মোহমুগ্ধ করে। কিন্তু এ ক্ষমতা যখন তিনি হারিয়ে ফেলেন—তখন আবার এই জনগণই তাঁকে ত্যাগ করতে দ্বিধাবোধ করে না। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই রাজনৈতিক নেতা দীর্ঘদিন রাজনীতির সঙ্গে জড়িত থাকার ফলে অতিরিক্ত যুক্তিবাদী হয়ে ওঠেন। সব কিছুই দেখতে থাকেন অভিজ্ঞতার চশমা এঁটে। নতুন যুগের নতুন বাণী তাঁর হৃদয়ে তেমনি করে সাড়া জাগায় না। ফলে তরুণেরা বেছে নেয় নতুন কোনও প্রিয় নেতাকে—যাঁর চিন্তায়

১৯০৫ সালে সুরেন্দ্রনাথকে রেখে বিপিনচন্দ্রকে নেতার আসনে বসানো হয়েছে। ১৯২১ সালে মহাত্মা গান্ধী বিপ্লবীসত্তার প্রতীক বলে বিবেচিত হলেন; বিপিনচন্দ্র প্রত্যাখ্যাত হলেন গণ-আদালতের বিচারে। ঠিক তেমনি ১৯৪১ সালে সুভাষচন্দ্রকেই বিপ্লবের প্রতীক বলে ধরা হল। রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে যাদু-যুক্তির খেলায় যাদুকর এমনি করেই চিরদিন জনমানসে আপনার স্থান করে নিয়েছে।

৭ The Amrita Bazar Patrika, January. 16th., 1921.

৮ কংগ্রেস — হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ—পৃঃ ৪০৫।

৯ Villages & Towns as Social Patterns—B. K. Sarker p. 630.

১০ Villages & Towns as Social Patterns—B. K. Sarker p. 631.

১১ Villages & Towns as Social Patterns—B. K. Sarker p. 636.

ঝড় । জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

আর, সেদিন কিনা খবরটা পেয়ে সীতাংশু প্রথমটায় ভেবেছিল টিয়াটুলিরা শান্ত আকাশে ওই বুঝি ঝড়। কোনোদিন যা এখানে ঘটে নি। এতবড় দুর্ঘটনা! কাজ করতে এসে তার এক কর্মচারী এভাবে আঘাত পেল।

কিন্তু ঝড়টা যে তার আগের রাত্রেই হয়ে গেছে, না কি তার আগের রাত্রে।

ঠিক টিয়াটুলির জঙ্গলে না, তবে কাছেই, সেই বাঁশের সাঁকোর ওপর। বারোটা বেজে গিয়েছিল তখন। নিশুতি রাত খাঁ-খাঁ করছিল। কুয়াশা ও জ্যোৎস্না নিয়ে সে এক অদ্ভুত রাত।

কিন্তু রাত্রের দিকে যে এমন একটা ঝড় উঠবে, এতবড় দুর্ঘটনা ঘটবে, সেদিন বিকেলেও সীতাংশু টের পায় নি। টের পাওয়া উচিত ছিল।

স্বামী-স্ত্রী বেড়াতে এসেছিল এই জঙ্গলে; তাবু ডেরা দেখতে এসেছিল। সেই সঙ্গে কান্নাকাটা।

সীতাংশুর বোঝা উচিত ছিল, তখন থেকে ঝড়ের সূত্রপাত। এই জঙ্গল থেকে মেঘের উৎপত্তি।

কিন্তু আগে থাকতে যদি পৃথিবীর সব জিনিস দেখা যেত, বোঝা যেত।

দেখা যায় না বোঝা যায় না। এই জন্যই আমরা পদে পদে ভুল করি। যেটা অভিনয় সেটাকে সত্য বলে ধরে নিই, সত্যটাকে মনে করি অভিনয়। সত্য-মিথ্যায় গুলিয়ে ফেলি।

হুঁ, রাত্রের ঝড়ের জের পরদিন ছিল, তার পরদিনও। থেকে থেকে ঝাপটা দিচ্ছিল, সোঁ সোঁ শব্দ হচ্ছিল হাওয়ার। সেই এলোমেলো মত্ত হাওয়ার বাড়ি খেয়ে টলতে টলতে রণধীর এসে দাঁড়াল এইখানে; সীতাংশুরা ঘরের দরজায়। বন্ধুর হাত ধরে সে তাকে ভিতরে নিয়ে এল। মাধবের দিদি ইজিচেয়ারটা বিছিয়ে দিল। শোকার্ত মানুষটির সেই মূর্তি ভুলবার নয়। তার কান্না উথলে উথলে উঠছিল। তাই তো, প্রিয়তমা পত্নীর অকালমৃত্যু এই জগতে কোন্ সৎ স্বামীকে না কাঁদিয়েছে। প্রেম যেখানে গভীর, সমুদ্রের মতন উত্তাল বিস্ফারিত।

বাংলা সাহিত্যে সম্পূর্ণ নতুন পটভূমিকায় ও জীবনালেখ্যে চাঞ্চল্যকর উপন্যাস

‘পথ কে রুখবে ?’

সাপ্তাহিক বসুমতীতে আগামী সংখ্যা থেকে (১৮ই এপ্রিল) ধারাবাহিকভাবে লিখছেন

শ্রীমনোজ বসু

রণধীর আরও বেশি কাঁদছিল তার ঘরের কথা ভেবে। যে-ঘর অষ্টপ্রহর উদ্যানের মতন সাজিয়ে রেখেছিল ব্রততী। যত্নের অভাবে দুদিনের মধ্যে তা কাঁটাবন হয়ে গেল।

আর তার পোষাক।

দুদিনেই কেমন জীর্ণ মলিন হয়ে গেছে।

ব্রততী নেই, তার বেশভূষার পরিচর্যা করে কে।

ঠিক এই জায়গায় মাধবের দিদি ডাক্তারকে সান্ত্বনা দিয়েছিল। ময়লা পোষাকের জন্য ভাবতে হবে না। সে ধুয়ে-কেচে সব ইস্ত্রী করে দেবে। আর, গিন্নী নেই বলে ডাক্তারবাবুর ঘরদুয়ার যদি এর মধ্যেই এলোমেলো বিশৃঙ্খল হয়ে গিয়ে থাকে, একদিন রাণীরবাগ গিয়ে সুশ্রী সব গোছগাছ করে দিয়ে আসবে, অসুবিধা কিছু হবে না, সুন্দর করে সাজিয়ে দিয়ে আসবে বাংলোর ভেতর বার।

প্রবোধ পেয়ে রণধীর কিছুটা সুস্থ হয়েছিল। সীতাংশুর কথা মতন আর কাঁদাকাটা না করে দাড়ি কামাল গায়ে সাবান মেখে ভাল করে স্নান করল। ময়লা পোষাক ছেড়ে ফেলে সীতাংশুর ধোয়া জামাকাপড় পরল। তারপর খেতে বসল। মাধবের দিদি একসঙ্গে দুজনকে পরিবেশন করল। দুই বন্ধু মাছের ঝাল ঝোল দিয়ে ভাত খেল।

তখন ডাক্তারের চেহারা দেখে বোঝা গেছে; সীতাংশুর উপদেশ ও সেই সঙ্গে মাধবের দিদির অনুরোধে কাজ হয়েছে। টিয়াটুলির জঙ্গলের ডেরায় দু-চারদিন থাকবে ডাক্তার, থেকে শরীর ও মন দুটোকে বিশ্রাম দেবে।

কিন্তু থাকল কি শেষ পর্যন্ত। বিকেল পড়তে আবার সে ব্যাকুল হয়ে উঠল। কাঁদতে আরম্ভ করল। এবার আর ফুঁপিয়ে কান্না না, যেন ঝড়ো হাওয়ার বাড়ি খেয়ে সমুদ্র উথলে উঠল, হাউ-হাউ করে কেঁদে উঠল রণধীর, বুক চাপড়াতে লাগল। যা বলা হচ্ছিল, ঝড়ের রেশ। দামাল বাতাস লেগে সমুদ্র নতুন করে উত্তাল হয়ে উঠতে সীতাংশু চিন্তা করল, তাই তো হবে। এতকাল প্রেমের সমুদ্রে সাঁতার কাটছিল

দুজন। সাঁতার কেটে কেটে খুব সম্প্রতি তারা একটা নিভৃত সুন্দর দ্বীপে পৌঁছে গিয়েছিল। কিন্তু বিধি বাম। দ্বীপে পৌঁছবার সঙ্গে সঙ্গে ব্রততী বিচ্ছিন্ন হল, ইহলোক থেকে সরে গেল। সঙ্গীহীন ডাক্তার ফিরে এল সমুদ্রে, এবার দুঃখের পাথার, যাকে বলে অন্তহীন শোকসমুদ্র। কতকাল কাঁদবে বুক চাপড়াবে কে জানে।

'আমার ঘর, আমার ঘর।'

'বলছি তো, তোর ঘর আবার সুন্দর হবে, কাঁটাবন থাকবে না', এবার একটু উত্তাক্ত হয়ে উঠেছিল সীতাংশু। চুপ থাকতে না পেরে শেষের গলায় বলেছিল, 'বাগানের মতন সাজিয়ে দেওয়া হবে তোর বাংলো, যেমন ছিল।'

'কবে! কখন?' বুক চাপড়ান শেষ করে রণধীর বুঝি মাথার চুল ছিঁড়তে আরম্ভ করেছিল। দুপুরের কাজ সেরে বাড়ি গিয়ে একটু বিশ্রাম নিয়ে সুখী আবার তখনি বিকেলের কাজে হাত লাগাতে ফিরে এসেছিল।

'না, এতটা অস্থির হলে তো চলবে না, ডাক্তারবাবু।' নতুন করে ডাক্তারের অস্থিরতা আরম্ভ হয়েছে দেখে সে-ও বিরক্ত হয়ে উঠেছিল। 'বলছি তো, আমি নিজে গিয়ে একদিন সব গোছগাছ করে দিয়ে আসব। একটুও এলোমেলো দেখাবে না আপনার ঘর, বৌদি যেমন করে সাজিয়ে রাখতেন—'

'কবে, কখন?' আর্ত অসহায় চোখ দুটো সুখীর মুখের দিকে মেলে ধরেছিল রণধীর।

'দুদিন এখানে থেকে বিশ্রাম করুন, চেহারা এত খারাপ হয়ে গেছে আপনার—' সুখী নতুন করে বোঝাতে আরম্ভ করেছিল। কিন্তু রণধীর তা শুনল না, অবোধ শিশুর মতন সুখীর দুটো হাত জড়িয়ে ধরে হাউ-হাউ করে উঠল।

'না, না, এক মুহূর্ত এখানে আমার থাকতে ইচ্ছে করছে না, আমার ঘর আমার স্বপ্ন—আমার সব সঙ্গতি যে ওখানে পড়ে আছে, মাধবের দিদি। আমি এখনি রাণীরবাগ চলে যাব।' বলতে বলতে সে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল।

'আশ্চর্য আপনি!' এবার সুখী ডাক্তারের একটা হাত চেপে ধরল। 'একটু পরেই অন্ধকার হয়ে যাবে, গাড়িটাও নিয়ে আসেন নি, এতটা রাস্তা হেঁটে যেতে আপনার কষ্ট হবে—'

এই সময়টা সীতাংশু চুপ থেকে তাকিয়ে সুখীকে দেখছিল। হলুদে-সবুজে ডোরা কাটা সুন্দর একখানা শাড়ি পরনে, টুকটুকে লাল রঙের একটা ব্লাউজ গায়ে, যেন বিকেলে এখানে আসবার আগে পরিপাটি করে চুল বেঁধেছিল তাই বড় বেশি উঁচু দেখাচ্ছিল খোঁপাটা, পান খাওয়া ঠোঁট দুটো কেমন টসটস করছিল।

অবশ্য মাধবের দিদির এমন সাজসজ্জা সীতাংশু রোজই দেখছিল। মানুষকে পরিপাটি পরিচ্ছন্ন থাকতে দেখতে যেমন ভালবাসে তেমনি নিজেও সর্বদা সেজেগুজে পরিচ্ছন্ন হয়ে থাকতে যুবতীর কত না আগ্রহ। তা হলেও সেদিন বিকেলে মাধবের দিদির সাজটা একটু বেশি সুন্দর লাগছিল। হয়তো এতটা তার ইচ্ছাকৃত ছিল না, বসন্তের বিকেল, তার ওপর গায়ের রংটাও এমন অনবদ্য উজ্জ্বল—হলুদে সবুজে ডোরাকাটা শাড়িতে রূপলাবণ্য যেন ফেটে পড়ছিল। আর ঐ পানের রসে ছোপানো ঠোঁট।

কিন্তু সীতাংশু তার চোখ দুটোই বেশি করে দেখছিল। মমতার বান ডেকেছিল সেখানে। অস্থির অপ্রকৃতিস্থ ডাক্তারকে সান্ত্বনা দিতে আর যেন ভাষা খুঁজে পাচ্ছিল না মাধবের দিদি। কালো গভীর ছলছল দৃষ্টি নিয়ে অসহায়ের মতন একবার সে সীতাংশুকে দেখল, যেন সীতাংশুর পরামর্শ খুঁজল। কেন না ঠিক সেই মুহূর্তে তার মুঠি থেকে হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে বেড়ার কাছে ছুটে গিয়ে ডাক্তার খুঁটির গায়ে মাথাটা ঠুকছিল।

'কী করা যায়!' অস্ফুট গলায় সুখী শুধোলো।

'আমিও বুঝতে পারছি না।' নিচু গলায় সীতাংশু উত্তর করল। তারপর এক সেকেণ্ড চুপ থেকে ভাবল। তারপর আবার সুখীর চোখ দুটো দেখল। 'আমার মনে হয় চলে যাওয়াই ভাল।'

'একলা যাবে এই রাত করে? এভাবে একা ছেড়ে দেওয়া ঠিক হবে কি।'

'না, তা হয় না।' সীতাংশু মাথা নাড়ল।

'আমার ঘর—আমার সাজান ঘর কী হয়ে গেল!' চিৎকার করে কেঁদে সমস্ত অরণ্যকে শোনাচ্ছিল ডাক্তার। আর মাথা ঠুকছিল।

'ঘরের অগোছাল চেহারাটাই ভুলতে পারছে না।' বিড়বিড় করে বলল সুখী।

'হুঁ, তুমিও আজই চলে যাও', মাটির দিকে চোখ রেখে সীতাংশু বলেছিল, 'দুদিন থেকে ঘরটর গুছিয়ে দেবে, আর ডাক্তারবাবুর খাওয়া-দাওয়াটাও যাতে সময়মত হয় দেখবে। দু-একটা দিন একজন সেখানে না থাকলে চলবে না।'

সুখী একটা ঢোক গিলেছিল।

'কিন্তু এখানে সব করবে কে, দেখবে কে?'

'আমার জন্যে ভাবতে হবে না।' একটু ম্রিয়মাণ হয়ে পড়েছিল মাধবের দিদি। সীতাংশু বুঝিয়েছিল, 'দুদিন আমি নিজেই চালিয়ে নিতে পারব। তা ছাড়া তুমি আসার আগে এতকাল তো একা একা আমাকে সব করতে হয়েছিল।' কথাটা শেষ করে সে একটু হেসেছিল যেন।

'আমি দুদিনের বেশি থাকব না।' সুখী তৎক্ষণাৎ বলে ফেলেছিল। সীতাংশু কিন্তু আর কিছু বলে নি। তৎক্ষণাৎ

॥ প্রকাশিত হল ॥

রবীন্দ্রনাথ ও বৌদ্ধসংস্কৃতি

শ্রীসুধাংশুবিমল বড়ুয়া এম. এ., ডি. ফিল.,
অধ্যাপক, সুরেন্দ্রনাথ কলেজ, কলকাতা প্রণীত।

ভূমিকা লিখিয়াছেন সুখ্যাত পণ্ডিতপ্রবর অধ্যাপক প্রবোধচন্দ্র সেন। বইটিতে আলোচিত হইয়াছে : বাংলায় বৌদ্ধধর্মের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, রবীন্দ্রচেতনায় বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতির কালানুক্রমিক সংক্ষিপ্ত বিবরণ, রবীন্দ্রদৃষ্টিতে বুদ্ধদেব ও অশোক, রবীন্দ্রদৃষ্টিতে বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতি, রবীন্দ্রনাথের ধর্মাদর্শ ও বৌদ্ধধর্ম এবং রবীন্দ্রসাহিত্যে বুদ্ধপ্রসঙ্গ।

রবীন্দ্র অনুরাগী পাঠকের পক্ষে একটি অনন্য গ্রন্থ। লাইনো টাইপে ঝরঝরে ছাপা, চারটি আর্টপ্লেট, মনোরম প্রচ্ছদ, শোভন সংস্করণ।

মূল্য : দশ টাকা মাত্র

সাহিত্য সংসদ

৩২এ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড :: কলকাতা ৯

ইয়াসীনকে ডাকিয়ে গ্যারেজ থেকে ট্রাকটা বার করতে বলল। ঘুর পথ হলেও রাত করে হেঁটে না গিয়ে গাড়ি করে যাওয়াই যে নিরাপদ এই বিষয়ে কারো সন্দেহ ছিল না। তা ছাড়া ডাক্তার একলা যাচ্ছে না, সুখীও যখন সঙ্গে যাচ্ছে। মাধবকে পাঠিয়ে সুখী বাড়ি থেকে অতিরিক্ত দুখানা শাড়ি ও ব্লাউজ আনিয়ে নিল। দুজনের রওনা হতে হতে সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছিল সীতাংশুর মনে আছে। তার একটা কারণও ছিল। স্টার্ট নেবার সময় গাড়ির এঞ্জিন একটু গোলমাল করেছিল। সেটা সারিয়ে নিতে ইয়াসীনের যেন বেশ খানিকটা সময় লেগেছিল। আর এই সময়টা রণধীর আগাগোড়া পাথরের মুর্তির মতন আমলকীতলায় স্থির স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কারো দিকে তাকায় নি কারো সঙ্গে কথা বলে নি। সুখী সঙ্গে যাচ্ছে শোনার পর থেকে কান্নাটা অবশ্য থেমে গিয়েছিল, কান্না অস্থিরতা। অতিরিক্ত শান্ত ও চুপ থেকে একদৃষ্টে ইয়াসীনের এঞ্জিন সারান দেখছিল।

হুঁ, তিন মাস আগের ঘটনা। সুখীর আর টিয়ার্টুলির জঙ্গলে ফিরে আসা হয় নি। দুদিন-চারদিন করে মাসের প্রায় আধাআধি যখন কেটে গেল, সীতাংশু বুঝতে পারল রাণীরবাগের বাংলো ছেড়ে মাধবের দিদি আসতে পারছে না। ঐ পর্যন্ত সীতাংশু মনে মনে মানুষটার জন্য অপেক্ষা করেছিল ঠিকই, তারপর আশা ছেড়ে দিয়েছে। তারপর বুঝতে পেরেছে কোনদিনই সুখী আর এখানে আসবে না।

ছোট্ট ছেলে মাধব তো নয়ই, মুরারিও এই নিয়ে সীতাংশুকে কোনো প্রশ্ন করে নি।

যেন তারা বুঝতে পেরেছিল সুখী না এলেও সীতাংশুর তেমন কোনো কষ্ট হবে না। তার এই জঙ্গলের ডেরায় ঝাঁটা পড়ুক বা না পড়ুক, জিনিসপত্র গুছিয়ে রাখা হোক কি না হোক, নিয়মিত উনুন ধরিয়ে কেউ তাকে রান্না করে দিক না দিক—এই নিয়ে সীতাংশু মোটেই মাথা ঘামাবে না। যেমন চলছিল চলে যাবে তার, চলে যাচ্ছে—যেমন সুখী আসার আগে চলে যাচ্ছিল। বরং সুখী না থাকলে ডাক্তারবাবুর অসুবিধা হবে, চরম কষ্টে পড়বে ভদ্রলোক। ঘর ঝাঁট দেওয়া, ঘর গোছান, ধোয়া-মোছা রান্না-বান্না, পোষাক-পরিচ্ছদ পরিষ্কার রাখা—পান থেকে চুন খসবার যার উপায় নেই,—তাই তো সেই মানুষকে একলা ফেলে রেখে মাধবের দিদিই বা কী করে চলে আসে। চাকর? পাঁচটা চাকর থাকলেও সংসারে এমন মানুষ আছে যাকে দেখেশুনে রাখতে আরো একজোড়া বিশেষ চোখের দরকার পড়ে। ব্রততীর আমলে চাকর ছিল না। তবে আর চব্বিশ ঘণ্টা তাকে এতসব দেখতে হত কেন। কাজেই সেই বিশেষ চোখের দেখা অন্য লোকে দিয়ে হবে না বলেই রাণীরবাগের ডাক্তারের দেখাশোনার ভার এখন মুরারির মেয়ে নিয়েছে।

না, সীতাংশুর অসুবিধা হচ্ছে না। তা ছাড়া, তার ঘরের কাজকর্ম করতে একেবারেই যে কেউ নেই এমন তো নয়, মাধব রয়েছে।

মাধব। সারামুখে একটা নিঃশব্দ হাসি ঝুলিয়ে সীতাংশু জানালায় উঁকি দিল। এটা তার ঘরের পিছন। হিজলগাছটা দেখা যাচ্ছে। দুধের সরের মতন পাতলা জ্যোৎস্নায় কাকেলার বেড়াটা তার চোখে পড়ল। হুঁ, যেখানে ধলাকে কবর দেওয়া হয়েছিল। বেড়ার প্রায় বারো আনাই ভেঙে পড়েছে, আগাছা গজিয়েছে খুব। ঝোপের কাছে মাধবকে দেখা গেল। সীতাংশু তাই আশা করছিল। মুঠো করে জোনাকী ধরছে ছেলে। ক'দিন ধরে এই নেশা হয়েছে। অন্য কোনো জীবজন্তু না, অন্ধকার হলেই ঝোপের মধ্যে ঢুকে জোনাকী পোকা ধরা।

তাই তো, একটা নেশা না থাকলে মানুষ বাঁচে কী করে।

সীতাংশু বাধা দিল না ডাকল না তাকে, একটু পরে নিজে থেকেই শ্রান্ত হয়ে ঘরে এসে ঢুকবে, এবং তখনি মাদুর বিছিয়ে মেঝের এক কোণায় শুয়ে পড়বে, তখন আর সীতাংশু ঐ ছোঁড়াকে কাজের কথা বলবে কী, ফুসফাস করে তার নাক ডাকতে আরম্ভ করবে। রাত্রে এখানেই শোয়। এখন আর দিদি নেই। তাই সীতাংশু ঝোপঝাড়ের ভেতর দিয়ে একলা তাকে বাড়ি যেতে দেয় না।

যত সকাল সকাল সে ঘুমিয়ে পড়ে ততই সীতাংশুর সুবিধা। মাধবের নাক ডাকতে আরম্ভ করলে সে আর একমিনিট ঘরে থাকে না, আস্তে আস্তে বেরিয়ে পড়ে। বাইরে থেকে দরজায় শিকল তুলে দিয়ে লম্বা পা ফেলে হাঁটতে আরম্ভ করে। তার এই নিঃসঙ্গ নৈশ-অভিযান তিন মাস একনাগাড়ে চলেছে। একদিন ব্যতিক্রম ঘটে নি। মাধবের যেমন জোনাকী পোকা ধরার নেশা, তেমনি রাত হলেই খাদের দিকে ছুটে যাওয়ার নেশায় পেয়েছে তাকে। কেমন যেন শ্বাস বন্ধ করে ছুটতে আরম্ভ করে সে। তারপর বাঁশের সাঁকোটার কাছে গিয়ে স্থির হয়ে দাঁড়ায়। তারপর একটু দম নিয়ে আস্তে আস্তে সাঁকোর ওপর ওঠে। না, অন্ধকার কি জ্যোৎস্না, আকাশের তারা কি মেঘ, দূরের ঝাপসা গাছপালা বা সাঁকোর নিচের অন্ধকার পাতালপুরী—কিছুই তার দেখার নেই। সন্ধানী চোখ নিয়ে সে সাঁকোর দুপাশের বাঁশ দুটো শুধু দেখে, কেউ বলে রেলিং, কেউ বলে বেড়া—খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সীতাংশু বেড়াটা পরীক্ষা করে, রোজই করছে, ভাঙা বাঁশ তার চোখে পড়ে না কেন। একদিকের বেড়া দেখা হয়ে যাবার পর আর একদিকের বেড়াটা খুঁটিয়ে দেখতে আরম্ভ করে সে। দেখা হয়ে যাবার পর চোয়াল দুটো শক্ত করে স্থির হয়ে দাঁড়ায়। তখন আকাশের দিকে চোখ রেখে নিজের মনে হাসে। না কি সেদিন বাঁশটা ভেঙে যাবার পর কেউ রাতারাতি আর একটা নতুন বাঁশ বেঁধে দিয়েছিল। এমন পরোপকারী মানুষ কেউ এই তল্লাটে আছে? তা ছাড়া সব ক'টা বাঁশই তো শ্যাওলা ধরে কালো হয়ে গেছে। নতুন বাঁশ খুঁজতে গিয়ে এত হয়রান হচ্ছে কেন সে। তার কপাল ঘামতে থাকে, অঘ্রাণের ঠাণ্ডা রাত্রে ঘেমেছিল, পোষে ঘেমেছে, এখন তো মাঘ শেষ হয়ে গেল, ফাল্গুনের মিষ্টি গরম এসে গেল। এখন না ঘামাটাই অস্বাভাবিক। 'বুঝতে পেরেছি, তুই আমায় অবিশ্বাস করছিস সীতাংশু, আমার কথা তোর বিশ্বাস হচ্ছে না।'

'কি করে বুঝলি?'

'তোর চোখ বলছে, তোর তাকানো দেখে বোঝা যাচ্ছে।'

সীতাংশু চট্ করে চোখটা আকাশ থেকে নামিয়ে আনে।

'না, না, দরকার কি আমার এভাবে তাকানো, আমি কেন চোখে অবিশ্বাস বয়ে বেড়াব। যেন লজ্জা পেয়ে নিজের মনে বিড়বিড় করে ওঠে সীতাংশু, মাথাটা দুবার ঝাঁকায়, তারপর আস্তে আস্তে সাঁকো থেকে নেমে আসে। যখন সে ডেরায় ফেরে তখন সপ্তর্ষি ঘুরে গেছে, চাঁদ থাকলে চাঁদ ডুবে যায়। শিকল নামিয়ে আস্তে আস্তে সে ভেতরে ঢোকে। হ্যারিকেনটা বাড়িয়ে দিয়ে মাধবের মুখটা দেখে। স্বপ্ন দেখে কিশোর হাসছে। হয়তো একটা উদের বাচ্চা দেখছে সে এখন, কি সাদা ধবধবে একটা খরগোসের ছানা। না কি নাম-না-জানা রঙিন ফুটফুটে কোনো পাখি। আর সীতাংশু তখন চিন্তা করে, ইতিমধ্যে রণধীর মাধবের দিদিকে একটা ভাল পাখি জোগাড় করে দিয়েছে কি। শোনে নি সে। তবে এটা শোনা গেছে, তার কাঠের বেপারীদের মধ্যে যেন কার মুখ থেকে শুনেছে সীতাংশু, রাণীরবাগের ডাক্তারবাবু একটা ছোট গাড়ি কিনেছে। মোটর সাইকেলটা বেচে দিয়েছে। মাধবের দিদিকে পাশে বসিয়ে প্রায়ই বিকেলের দিকে অনেকটা রাস্তা বেড়ায়, মাঝে মাঝে পিয়ালীছড়া ছাড়িয়ে চণ্ডীতলা পর্যন্ত গাড়ি চালিয়ে যায়। সুখী বেশ মোটা হয়েছে রংটা আরো বেশি ফরসা হয়েছে।

॥ সমাপ্ত ॥

বিশ্বসাহিত্যের আদিপর্ব

ডঃ নরেন ভট্টাচার্য

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

॥ ৪০ ॥

ইংরেজী সাহিত্যের কথা : চসার

প্রায় সকল লেখকের রচনাতেই তাঁর যুগের কিছু না কিছু বৈশিষ্ট্যের পরিচয় ফুটে ওঠে। পূর্ববর্তী কালের ধর্মীয় কবিতাগুলিতে খৃস্টীয় মরমী সাধকদের জীবনধারার পরিচয় পাওয়া যায়। ল্যাংল্যান্ডের রচনা সমকালীন সামাজিক দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। গাওয়ারের রচনায় কৃষক-বিদ্রোহের পরিপ্রেক্ষিতে বিত্তশালী সমাজের আতঙ্কের চিহ্ন সুস্পষ্ট। কিন্তু এঁরা কেউই সার্বিকভাবে সমগ্র যুগের প্রতিভূ নন। এঁদের প্রতিভার ক্ষেত্র ছিল একান্তই সীমাবদ্ধ।

জিওফ্রে চসারকেই (১৩৪০-১৪০০) একমাত্র তাঁর যুগের সার্থক ও সার্বিক প্রতিনিধি বলা হয়। লণ্ডন শহরে তাঁর জন্ম, তাঁর পিতা ছিলেন একজন মদ্য ব্যবসায়ী। সতের বছর বয়সে তিনি একটি বিচারালয়ে ভৃত্যের কাজে নিযুক্ত হন। তার দু'বছর পরে তিনি সৈন্যবাহিনীতে যোগ দেন; আর্টোইস ও পিকার্ডির রণক্ষেত্রে যুদ্ধও করেন; কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি বন্দী হন। মুক্তির পর তিনি রাজপ্রাসাদে একটি সামান্য কর্মে নিযুক্ত হন। সৌভাগ্যক্রমে এই সময় তিনি তৃতীয় এডওয়ার্ডের পুত্র ল্যাংকাস্টারের ডিউক জন অফ গন্টের সুনজরে পড়েন; যার ফলে তিরিশ বছর বয়সে কূটনৈতিক বিভাগে নিযুক্ত হন এবং ফ্রান্স, ফ্ল্যান্ডার্স ও ইটালীতে সেই সূত্রে তিনি দীর্ঘকাল বসবাস করেন। ১৩৭৪ খৃস্টাব্দে তিনি শুল্ক বিভাগের কর্মচারীর পদে নিযুক্ত হন এবং ১৩৮৫ খৃস্টাব্দে তিনি পার্লামেন্টের সদস্যপদে নির্বাচিত হন। কিন্তু তাঁর পৃষ্ঠপোষক ল্যাংকাস্টারের ডিউকের ভাগ্যবিপর্যয়ের ফলে তাঁরও ভাগ্যবিপর্যয় ঘটে। কিন্তু এ অবস্থা দীর্ঘকাল থাকে নি। ১৪০০ খৃস্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়।

বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত থাকার ফলে চসার বহুমুখী অভিজ্ঞতার অধিকারী হন। এছাড়া তিনি পড়াশোনার রীতিমত অনুরাগী ছিলেন। রাজসভাসদ, সৈন্য, সরকারী কর্মচারী, মদের কারবারী ও বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের সঙ্গে অবাধ মেলামেশা থাকার দরুণ চসারের দৃষ্টিভঙ্গিতে একটা সার্বজনীনতা এসেছিল। তা ছাড়া তাঁর পর্যবেক্ষণের শক্তিও ছিল অদ্ভুত। সমস্ত কিছু মিলে তাঁর যুগের প্রতিনিধিত্ব করার মত শক্তির তিনি অধিকারী হতে পেরেছিলেন। ল্যাটিন ভাষাতেও তাঁর দখল ছিল, এবং ল্যাটিন থেকে তিনি যে কিছু কিছু গদ্য অনুবাদ করেছিলেন সে কথা আমরা পূর্ববর্তী প্রবন্ধে বলেছি।

ইংরাজী সাহিত্যে চসারের অবদান সম্পর্কে পণ্ডিতেরা নিম্নলিখিত কথাগুলি বলেন : তাঁর সমকালীনদের মধ্যে চসারই একমাত্র ব্যক্তি যিনি কবিত্বের স্বার্থেই কবিতা লিখেছেন; সাহিত্যকে যিনি কোন নৈতিক আদর্শ বা দার্শনিক মতবাদ প্রচারের বাহনরূপে ধারণা করেন নি। তাঁর যুগের বহু সমস্যা তাঁর রচনাতে ফুটে উঠলেও সেগুলি একান্ত স্বাভাবিকভাবে প্রতিফলিত হয়েছে, যার ফলে তা সহজেই পাঠকের চিত্তকে আকর্ষণ করে। ছন্দের ক্ষেত্রে প্রাচীন প্রথাকে চসার বর্জন করেছেন এবং নিজেই বহুধরণের আবিষ্কার করেছেন। লেগুইব ভাষায়, তিনি নিজের অস্ত্রশস্ত্র নিজেই তৈরি করে নিয়েছিলেন। ভাব প্রকাশের মাধ্যম হিসাবে তিনি নিজের মাতৃভাষাকেই বেছে নিয়েছিলেন; গাওয়ারের মত তিনি ল্যাটিন বা ফরাসী ভাষার রচনার মোহে পড়েন নি, কৃত্রিম অ্যাংলো-নর্মান ভাষাকেও তিনি বর্জন করেছিলেন। তিনি ইউরোপের কয়েকটি অঞ্চলে পরিভ্রমণ করেছিলেন, এবং অপরাপর দেশের স্থানীয় সাহিত্যের বিকাশের ধারাটি লক্ষ্য করে অনুধাবন করার প্রয়াস পেয়েছেন। ফরাসী কবিতার যা কিছু সৌন্দর্য তাঁর ইংরাজী কবিতায় তিনি তা ফুটিয়ে তুলতে পেরেছিলেন। ব্যক্তিগতভাবে তিনি ফরাসী সাহিত্যের ব্যাপক অনুশীলন করেছিলেন এবং প্রথম যৌবনে তিনি ফরাসী কবিতার ইংরাজী অনুবাদ করেছিলেন। তাঁর এই অনুবাদকার্য তাঁর ভবিষ্যৎ সাহিত্যজীবন গড়ে তোলার পক্ষে অনুকূল প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হয়েছিল।

প্রেমের কবিতা রচনার মধ্য দিয়েই চসার তাঁর সাহিত্যজীবন শুরু করেন, যদিও সেই কবিতাগুলির কোন চিহ্ন বর্তমানে নেই। পরবর্তী জীবনে তিনি যে গীতি-কবিতাগুলি লিখেছিলেন সেগুলি অবশ্য টিকে আছে। এইগুলির মধ্যে কমপ্লেন্ট অফ অ্যানেলিডা এবং ব্যালাড অফ ত্রিসেলিডেস বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এগুলি হাল্কা মেজাজে লেখা। তাঁর যে সব রচনার সঠিক তারিখ পাওয়া যায় সেগুলির মধ্যে প্রথমেই উল্লেখযোগ্য বোক অফ দি ডাচেস। এটির রচনাকাল ১৩৬৯। তাঁর পৃষ্ঠপোষক জন অফ গন্টের পত্নী ব্লান্সের মৃত্যুর পর তার স্বামীর দুঃখকে অবলম্বন করে এই বৃহদায়তন কবিতাটি রচিত হয়েছে। কবিতাটির পটভূমিকাটি অপূর্ব। প্রেমিক কবি মেটামোরফোসিস গ্রন্থটি থেকে সিয়েক্স এবং আলসিয়োনের হৃদয়বিদারক কাহিনীটি পাঠ করতে করতে হঠাৎ ঘুমিয়ে পড়ে স্বপ্ন দেখছেন যে তিনি একটি নির্জন অরণ্যে উপস্থিত হয়েছেন যেখানে তাঁর সঙ্গে কৃষ্ণপরিচ্ছদভূষিত একজন নাইটের সাক্ষাৎ হয়েছে যার প্রিয়তমা পত্নী কিছুকাল আগে মারা গেছে এবং সেই শোকমগ্ন নাইট কবির কাছে নানাভাবে দুঃখ করছে : তাদের সুখভরা দাম্পত্য জীবনের দিনগুলির কথা স্মরণ

করে। সমালোচকদের মতে কবিতাটির মধ্যে কৃত্রিমতা আছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও মানবজীবনের গভীরতম ভাবগুলি বড় আশ্চর্যভাবে এই কবিতায় ফুটে উঠেছে। আমরা কয়েকটি লাইন এখানে উদ্ধৃত করছি যাতে চসারের রচনার সৌন্দর্য এবং সেইসঙ্গে সেই আমলের ইংরাজী ভাষার চেহারার সঙ্গেও পরিচিত হবার সুযোগ পাওয়া যাবে।

"And farewel, swete,
my worldes blisse!
I praye God your sorwe
lisse!
To litel whyl our
blisse lasteth."
With that hir eyen up
she casteth
And saw nought:
"Ah", quod she for sorwe
And deyd within the
thirdde morwe.

চসারের পরবর্তী উল্লেখযোগ্য কবিতা **পার্লেমেন্ট অফ ফাউলেস** যা ১৩৮২ খৃস্টাব্দে তৃতীয় রিচার্ডের বিবাহ উপলক্ষে রচিত। কবিতাটির পটভূমিকা নিম্নরূপ : কবি কিকেরোর **সোমনিয়াস সিপিওনিস** গ্রন্থটি পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে পড়েছেন। এমন সময় স্বপ্নে তিনি দেখলেন যে সিপিও তাঁর সামনে উপস্থিত হয়ে তাঁকে নিয়ে গেলেন একটি সুন্দর উদ্যানে যেখানে ভেনাসের মন্দির অবস্থিত এবং যেখানে ফেব্রুয়ারীর চোদ্দই তারিখে সেন্ট ভ্যালেন্টাইন দিবসে যুবক-যুবতীদের মদনোৎসব উদ্‌যাপিত হয়।

চসারের তৃতীয় উল্লেখযোগ্য কবিতা হচ্ছে **হাউস অফ ফেম**। এটি একটি রূপকধর্মী কবিতা যেখানে কবি দেখাতে চাইছেন কিভাবে গুজব ছড়ায়। এখানেও কবি ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছেন যে তিনি

ডাক্তার হউন

ডাকযোগে হোমিওপ্যাথী শিক্ষা করিয়া এম, ডি, এইচ, ডিপ্লোমা লাভ করুন। বিনামূল্যে প্রসপেক্টাস পাইবার জন্য লিখুন—

Hind Homeopathic College
(WBM) Sonepat (Haryana)

দেবী ভেনাসের মন্দিরে উপস্থিত হয়েছেন, এবং একটি সোনালী ঈগল তাঁকে 'যশের মন্দিরে' নিয়ে গেছে। সেখানে তিনি বিগত যুগের সব লেখকদের সঙ্গে পরিচিত হচ্ছেন, যাঁদের রচনা তিনি পড়েছেন ও প্রশংসা করেছেন। তিনি এও দেখলেন যশের দেবী কিভাবে তাঁর প্রিয়-পাত্রদের অনুগ্রহ বিতরণ করছেন (এই প্রসঙ্গে অক্ষয়কুমার দত্ত বিবাচিত "স্বপ্নদর্শন : কীর্তিবিষয়ক" প্রবন্ধটি স্মর্তব্য)। অতঃপর তাঁকে নিয়ে যাওয়া হল একটি গৃহে যেখানে গুজবের জন্ম হয়। সেখানে তিনি দেখলেন সংবাদ-সমূহকে কিভাবে বিকৃত করা হয়। চিৎকারে তাঁর কর্ণদ্বয় প্রায় বধির হতে চলল। এখানেই কবিতাটি অসমাপ্তভাবে শেষ হয়েছে। তাঁর চতুর্থ কবিতা **লিজেন্ড অফ গুড উইমেন**-ও অসম্পূর্ণ। এটির রচনাকাল ১৩৮৫ খৃস্টাব্দ। কবিতাটির একটি সুন্দর প্রস্তাবনা আছে। তাঁর রচনাসমূহে তিনি নাকি নারীদের সম্পর্কে অশ্রদ্ধেয় দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দিয়েছেন, তাই প্রেমের দেবতা তাঁর উপর কুপিত হয়েছেন। কিন্তু প্রেমের দেবতার স্ত্রী, যিনি প্রেমের দেবী, তাঁর বিষয়টি সহানুভূতির সঙ্গে বিচার করে ফতোয়া দিলেন যে অতঃপর যেন তাঁর রচনায় নারী চরিত্রের ভালো দিকগুলি ফুটিয়ে তোলা হয়।

কর্মসূত্রে চসার ইটালীতে পরিভ্রমণ করেছিলেন এবং সেই হিসাবে তিনি দান্তে, বোকাচিও এবং পেত্রার্কের রচনাবলীর সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন, তা ছাড়া পেত্রার্কের সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত পরিচয়ও হয়েছিল। পেত্রার্কের রচনা থেকে চসার নিয়েছিলেন গ্রিসেলডার কাহিনী, বোকা-চিওরও অনেক কাহিনী চসার গ্রহণ করেছিলেন। বোকাচিওর রচনার সঙ্গে সংযোগের প্রত্যক্ষ ফল হচ্ছে **ট্রয়লাস এণ্ড ক্রিসেইডি**, যার কতকাংশ **ইল ফিলো-স্ট্রাটো** থেকে অনুবাদ এবং কতকাংশ ওই গ্রন্থ অবলম্বনেই চসারের নিজস্ব রচনা। বোকাচিওর কাহিনীটি আবার বেনোয়া রচিত **রোমাঁ দেত্রোয়া** অবলম্বনে রচিত। বোকাচিওর কাহিনীর নায়কের নাম ট্রোলিও এবং নায়িকা **ক্রেসিডা**, এবং মূল কাহিনীটি হচ্ছে নায়িকা কর্তৃক নায়ককে প্রবঞ্চনার কাহিনী। চসার কাহিনীটির কাঠামো গ্রহণ করেছেন, কিন্তু চরিত্রগুলিকে তিনি নিজের মনোমত করে রচনা করেছেন যার ফলে দুটি রচনার মধ্যে পার্থক্য অনেক।

চসার এতাবৎকাল পরানুকরণের দ্বারা একদিকে যেমন নিজের জ্ঞানভাণ্ডারের প্রসার করছিলেন এবং দৃষ্টিভঙ্গিকে নিছক ইংলণ্ডীয় না করে ইউরোপীয় করে তুলছিলেন, অপর দিকে তেমনি তাঁর মৌলিকতাও বহুলাংশে ক্ষুণ্ণ করছিলেন এবং তাঁর প্রতিভার স্বাভাবিক বিকাশও এতে বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছিল। কিন্তু চসার ছিলেন আত্মসচেতন লেখক, নিজের অবস্থাটা উপলব্ধি করে নিতে তাঁর বিশেষ অসুবিধা হয় নি। তিনি স্থির করলেন তার সুবিপুল অধ্যয়ন ও ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে মৌলিক কিছুর সৃষ্টি করবেন। বিভিন্ন সূত্র থেকে অনেক কথা ও কাহিনীর ভাণ্ডার তিনি গড়ে তুলেছিলেন, ল্যাটিন, ফরাসী ও ইটালীয় সাহিত্যের গল্পভাণ্ডার তাঁর আয়ত্তে ছিল। এইগুলিকে তিনি কাজে লাগানোব চেষ্টা করলেন যার পরিণতি হচ্ছে তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা, ইংরাজী সাহিত্যের চিরস্থায়ী সম্পদ, **ক্যান্টারবেরী টেলস**।

সময়টা হচ্ছে ১৩৮৫ খৃস্টাব্দের বসন্তকাল। তখন চসার গ্রীনউইচে বাস করতেন। তাঁর বাড়ির সামনের পথ দিয়ে ইংলণ্ডের বিভিন্ন গ্রাম থেকে অজস্র তীর্থ-যাত্রী ক্যান্টারবেরীর সেন্ট টমাস বেকেটের দরগায় তীর্থ করতে যেতেন। তাঁদের এই যাওয়া চসার মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করতেন। একদিন কৌতূহলের বশবর্তী হয়ে তিনি এদেব দলে ভিড়ে গেলেন এবং সেই মুহূর্তেই তাঁর মাথায় একটি চিন্তা খেলে গেল, সেই চিন্তাটি হচ্ছে **ক্যান্টার-বেরী টেলস** রচনার পরিকল্পনা। তাঁর সংগৃহীত কাহিনীগুলি তিনি এদের মুখ দিয়ে বলাবেন।

তাঁর সমকালীন সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর এক-একজন প্রতিনিধি নিয়ে তাঁর কল্পিত তীর্থযাত্রীর গ্রুপটি তৈরি হল। মোট তিরিশজনেব দল। এতে আছে একজন নাইট, তার পুত্র ও ভৃত্য, একজন চিকিৎসক, একজন আইনবিদ, একজন অক্সফোর্ডের পণ্ডিত, একজন চাষী, একজন মিলওয়ালা, একজন বণিক, একজন নাবিক, একজন ছুতোর, একজন কামার, একজন ধোপা, কয়েকজন সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনী, তদুপরি বাথ অঞ্চলের একজন গৃহিণী যে কয়েকবার স্বামী বদল করেছে, সর্বোপরি কবি স্বয়ং—অর্থাৎ সমাজের সকল স্তরের লোক। এরা প্রত্যেকে নিজেদের গল্প বলবে। বাহ্যত পরি-কল্পনাটি খুবই সরল, কিন্তু দলের মধ্যে প্রতিটি ব্যক্তিকে নিজ বৈশিষ্ট্যে উপস্থাপিত

বধ্যভূমি

সাধনা মুখোপাধ্যায়

আমরা এ ওর বুকে মুখ ঢেকে,
এ ওর হাতে হাত রেখে,
আশংকার স্বেদে আর্দ্রিত সবাই ;
প্রাক্ চল্লিশের এই প্রতীক্ষাশালায়,
পুরনো সুহৃদ সখা,
অনুজ অগ্রজ বোন ভাই।

বক রাক্ষসের ভোজে
কখন যে আমাদের কার পালা আসে,
অদৃশ্য বঁড়শিওলা কখন যে ছিপে নেয় টেনে,
আমরা জানি না তাই সর্বদাই ত্রস্ত হয়ে থাকি,
কে কখন চলে যাব অবশিষ্ট ক্ষয়িষ্ণু পাহাড়ে,
শূন্যতার ধ্বস ডেকে এনে।

প্রহর ঘন্টা পল অনুপল নিমেষ নিমেষ,
চিন্তাকে পাড়াতে ঘুম প্রচণ্ড প্রয়াস চলে
ধর্মসভা, হালফিল তরুণেরা, রাজনীতি, মনুসংহিতা
গলার হাসিটা তবু যেন বেধে গিয়ে
বলে ওঠে, যে যজ্ঞের হবি হব মুহূর্তেও
আমি ভুলি নি তা।

ওরা যে থামে না কেউ
রাস্তার লাল নীল যুবক-যুবতী
আমাদের দেখে দেখে করুণার ঠোঁটে শুধু হাসে ;

তাই এই দীর্ঘশ্বাস আমাদেরই,
শুধু আমাদের,
চার দশকের চার চৌকাঠ পেরিয়ে
যারা আসে।

সব প্রতিযোগিতার শেষে
সব গৌরবের শেষে,
পণ্ডিত ধনী ও মূর্খ
অনুভবে এক হয়ে দাঁড়িয়েছি
আমরা সবাই ;
যতির উৎকণ্ঠা শুধু,
কোন গতিবেগ নেই,
পক্ষাঘাত কর্কট সন্ন্যাস,
অথবা কিছুতে,
কখন যে নিভে যায়
ধুকপুক এই রোশনাই।

করা যে কতটা প্রতিভার পরিচায়ক তা ক্যান্টারবেরী টেলস না পড়লে বোঝা যাবে না। প্রত্যেকের চেহারা, পোষাক-পরিচ্ছদ, কথাবার্তার ভঙ্গি, ব্যবহার সমস্ত কিছুকেই চসার পৃথক পৃথকভাবে চিত্রিত করেছেন।

লণ্ডন থেকে ক্যান্টারবেরী যাত্রার পথে এই তীর্থযাত্রীরা একে একে নিজেদের কাহিনী ও অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে যাচ্ছে, বাকি সকলে তা শুনছে। বলা বাহুল্য এই কাহিনীগুলির দ্বারা চসার কিছুই প্রতিপন্ন করতে চান নি, পাঠককে বিশুদ্ধ আনন্দ দেওয়াই তাঁর লক্ষ্য ছিল। তাঁর তীর্থযাত্রীরা প্রত্যেকেই রক্তমাংসের মানুষ, যে গ্রাম্য পাদরীটি অপরাধের স্বীকারোক্তি গ্রহণ করে, সাধারণ মানুষকে স্বর্গরাজ্যে পৌঁছনোর সোজা রাস্তাটি এককথায় বাতলে দেয়, ভিতরে ভিতরে সে আবার শহরের শুঁড়িখানারও খবর রাখে. অথবা সেই মিলওয়ালার পত্নী ধনগর্বে যার উন্নাসিকতার সীমা নেই—

She was as high as water in a ditch,
And full of scorn and full of back-biting.
She thought a lady should be quite willing
To greet her for her kin and culture.

এদের চরিত্র কি নিখুঁতভাবেই না চিত্রিত হয়েছে। বাথ অঞ্চলের সেই গৃহিণীটির কথাই ধরা যাক, চসারের ভাষায় Who, sad to say, was deaf in either ear. সেই গৃহিণী তার পঞ্চম স্বামী নিয়ে ঘর করছে। নিজের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করার সময় সে বলছে যে, তার বর্তমান স্বামীটি একজন অক্সফোর্ডের ছাত্র এবং সেই জন্য তাকে বশে রাখা বড় কঠিন, কেন না সে বই থেকে ভাল এবং মন্দ স্ত্রীদের লক্ষণগুলি তাকে সর্বদা পাঠ করে শোনায়। কিন্তু তা সত্ত্বেও সে বহু চেষ্টায় স্বামীকে বশে এনেছে বইটিকে ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে এবং বেচারীকে বেশ ঘা কতক দিয়ে। নিজের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করার পর সে প্রার্থনা জানাচ্ছে—

"..and Jesus to us send
Meek husbands, and young ones, and fresh in bed,
And good luck to outlive them that we wed,
And I pray Jesus to cut short the lives
Of those who'll not be
governed by their wives."

অপূর্ব প্রার্থনাই বটে। এই বাস্তবতাবোধই চসারের ক্যান্টারবেরী টেলসকে সাহিত্যের ইতিহাসে একটি শাশ্বত স্থান দিয়েছে। এখানে কোন রূপক নেই, নিছক আনন্দ দান ছাড়া আর কোন উদ্দেশ্যও খুঁজে পাওয়া যায় না। তথাপি দান্তের মত চসারও নিজ সমাজ-ব্যবস্থাব প্রতি প্রসন্ন ছিলেন না, বিশেষ করে গীর্জা ও ধর্মজগতের ভণ্ডদের ওপর তিনি রীতিমত ক্রুদ্ধ ছিলেন। কিন্তু তাই বলে তিনি দান্তের মত সব কিছুর ওপরে উঠে উচ্চ নৈতিকতার আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানেব নির্মম সমালোচনা করেন নি। তিনি শুধু ছবির পর ছবি এঁকে গেছেন. প্রকৃত অবস্থটা কি তা তুলে ধরেছেন, নিজেকে আড়ালে রেখে। চসারের সমকালীনদেব মধ্যেও প্রতিভাবান লেখকের অভাব ছিল না, কিন্তু চসার যেভাবে তাঁর সমসাময়িক জীবনের স্পন্দন নিজের মধ্যে অনুভব করতে সমর্থ হয়েছিলেন, তেমনটি আর কেউ পারেন নি। এই কারণেই চসারকে তাঁর যুগের শ্রেষ্ঠ ও একমাত্র প্রতিনিধি বলা হয়।

আকাশবাণী পরিক্রমা

মেঘদূত

ঘুম ভাঙানিয়া

ভোরবেলা বেড-টিতে চুমুক দিয়ে রেডিও শোনা অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে। কতো চেষ্টা করি স্বভাবটা পালটাতে। রেডিও শোনার জন্যে গিন্নির বকুনি তো মাসহারা বরাদ্দে দাঁড়িয়েছে, তবে ইদানিং মেঘদূতের ভূমিকায় নেমে পড়ায় তিনি একটু চুপচাপ থাকেন। বুঝেছেন যে, প্রোগ্রামগুলো ভালো না লাগলেও শুনতে হয়।

অনুষ্ঠান সুরু-শেষের বন্দেমাতরম্ এবং জয় হিন্দের ফাঁকটুকু ভরাট হয়ে আছে নানান অনুষ্ঠানে। সব অনুষ্ঠানই যে প্রকৃতিকটু এ কথা অতি বড়ো শত্রুও বলবে না। তবে ভোরের অনুষ্ঠান সম্পর্কে দু'-চার কথা বলার আছে। ভোরবেলা গালাগাল দেওয়া বা খাওয়া যেমন অন্যায়, তেমনি শ্রোতাদের মেজাজ বিগড়ে দেওয়াও কী শোভন? প্রথমত একঘেয়ে বৈচিত্র্যহীন পাঠ শুনিয়ে স্বজনটুকু বিতরণ করে কার যে কী লাভ হচ্ছে তা জানি না। আলোচনাংশগুলি গতানুগতিক এবং একঘেয়ে—কোন নোতুন চিন্তা নেই। পুরোনো কথাগুলি বেছে বেছে আমাদের শোনানো হচ্ছে। বিভিন্ন রচনা থেকে যুগোপযোগী অনেক মূল্যবান কথা শোনানো সম্ভব। সেদিকে কোন চেষ্টা দেখি না।

পাঠ সাঙ্গ হলে সংগীতাঞ্জলির রেকর্ড বেজে উঠলো। রেকর্ডগুলো শুনলে পাগল বা বেদের হাঁড়ির ছেঁড়া ময়লা ঝাঁপিটা চোখের সুমুখে জ্বলজ্বল করতে থাকে। ঝাঁপিতে যে দু'-একটা ভালো জিনিস থাকতে পারে না তা বলছি না। যেমন প্রথমের রবীন্দ্র-সংগীতখানি ভালো হোক মন্দ হোক আমি শুনে থাকি। কথা হচ্ছে, একই গান হয়তো পাঁচ বছর ধরে বাজানো হচ্ছে। নোতুন নোতুন গানের ব্যবস্থা না করলে সংগীতাঞ্জলি মাঠে মারা যেতে বসেছে।

রবীন্দ্রনাথ, অতুলপ্রসাদ, রজনীকান্ত, নজরুল ইত্যাদির সংগীত ছাড়াও বাছা বাছা দু'-একখানি আধুনিক কবিদের গানও বাজানো যেতে পারে। তবে আধুনিক গান সত্যিকার গীতধর্মী হওয়া চাই। দুর্বল কথা আর একঘেয়ে নকল সুরে আধুনিক গানের জাত মেরেছে। আধুনিক কবিদের লেখা ভক্তিমূলক গানের যে নমুনা আকাশবাণীতে পাই তাতে ভক্তি উবে যাবার জোগাড়। কেন এই দৈন্য—আধুনিক গানকে জাতে তুলতে আকাশবাণী কি চেষ্টা করছেন তা জানতে ইচ্ছে হয়। লিরিক লিখতে ভালো কম্‌পোজর খুঁজে বার করা চাই।

সংগীতাঞ্জলির একটু পর 'দেশবন্দনা'। জানি না পৃথিবীর কোন সুসভ্য দেশে দেশবন্দনার নামে এত বাজে গান বাজানোর রীতি আছে কি না। গান শুনলে মনে ধারণা জন্মাতে পারে, দেশবন্দনার মাধ্যমে কর্তৃপক্ষ কী সত্যই দেশাত্মবোধ জাগিয়ে তুলতে চান! গানগুলোর অধিকাংশ কমিক টাইপ। শ্রোতাদের শতকরা দশজনও দেশবন্দনার গান শোনেন কিনা সন্দেহ। দেশবন্দনার গান শুনে মনে জাতীয়তাবোধ জাগবে; দেশকে, দেশের মানুষকে ভালোবাসতে চাইবে মন। অথচ আকাশবাণী কলকাতা থেকে প্রচারিত দেশবন্দনার অধিকাংশ গান মনের ওপর বিরূপ ফল ফলায়। গানগুলো শুনে মনে হয়, এরই নাম কি দেশবন্দনা! নিষ্ঠা এবং সততার একান্ত অভাব না হলে দেশবন্দনার নামে ক্যারিকেচরের প্রশ্রয় দেওয়া হতো না। এ সম্পর্কে আমরা তথ্য ও বেতার সচীব শ্রীঅশোক মিত্রের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। তিনি বাঙালি এবং পণ্ডিত ব্যক্তি—দয়া করে দেশবন্দনার ভেজাল মিশ্রিত বাঙলা গানগুলি শুনুন এবং প্রতিকারের চেষ্টাও করুন।

সংগীত চিন্তা

গানে পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন রয়েছে। এবং কোন্ গানের কতটুকু অংশ গাওয়ার পর পুনরাবৃত্তি হবে সে সম্পর্কে জ্ঞান থাকা শিল্পীর একান্ত প্রয়োজন। 'আসা-যাওয়ার পথের ধারে' গানখানি কানাই মুখোপাধ্যায় গাইতে গাইতে 'মীড়গুলি'-র জায়গায় হঠাৎ ছেড়ে দিয়ে 'সুরগুলি তার নানা ভাগে' অংশটুকুর পুনরুল্লেখ করলেন। মাঝপথে এমন করে থামতে হয় বলে তো জানি না। এভাবে গাইলে গানের শুধু ছন্দপতনই হয় না, গায়কের ভাষা সাহিত্য এবং সংগীত সম্পর্কে জ্ঞান যে কত পরিমিত তা বোঝা যায়। অপর একটি গান 'রোদনভরা এ বসন্ত' যা হাটে মাঠে সকলে গেয়ে থাকে সে গানেও শ্রীমুখোপাধ্যায় বিরাম (Juncture) এবং মাত্রার তালগোল পাকালেন। মনে হয়, একজন বিশেষজ্ঞের কাছে এঁর শিক্ষা নেওয়া প্রয়োজন।

পাঠের এবং গানের কতকগুলি নিয়ম আছে যেমন,

'সারাদিন বনে বনে
ভ্রমিছি আপন মনে,
সন্ধ্যাকালে শ্রান্ত বড়—
বউ, কথা কও।' (ভগ্নহৃদয়)

এবং—

বউ কথা কও, বউ কথা কও
যতই গায় সে পাখি
নিজের কথাই কুঞ্জবনের
সব কথা দেয় ঢাকি। (ছন্দ)

দুটি কবিতাংশে 'বউ' একার্থক নয়। যিনি বাঙলা ভাষা জানেন না তাঁর কাছে দুটি উক্তিই referential অর্থবোধক। পাঠের সময়ে 'বউ' উক্তিকে একার্থক ভেবে পড়লে পঠন অশুদ্ধ হতে বাধ্য। গানেও তাই: ভাষা অর্থ সুর ছন্দ না জানা থাকলে দ্বন্দ্ব অনিবার্য। স্বর (pitch) সম্পর্কে সঠিক ধারণা না থাকলে কথা-প্রধান গানে বৈশিষ্ট্য ফুটিয়ে তোলা সম্ভব নয়। বাক্য-স্বর এবং সংগীত-স্বরের প্রকৃতিভেদ রয়েছে। কোন এক পণ্ডিতের মতে, Pitch in speech, unlike pitch in singing, is relative rather than absolute. A linguistically high pitch for a bass voice may differ considerably from the same pitch for a soprano, but as long as the levels are parallel in the two voices, the patterns which result are recognizable. রবীন্দ্রসংগীত সম্পর্কেও একথা সত্য। রবীন্দ্রসংগীতে অজস্র এবং বিচিত্র সুরের সমাবেশ ঘটেছে। এ সংগীত-শিল্পের বিরাট এবং বিশিষ্ট গবেষণা ভাণ্ডার। Speech intonation এবং Music intonation-এর পার্থক্য জানা না থাকলে সংগীতে কৃতিত্ব দর্শানো কঠিন। কবির সংগীতের প্রবন্ধগুলির গভীরে

যাঁরা যেতে পেরেছেন তাঁরা জানেন সংগীত এসেছিল কবির কাছে দুটি পথ ধরে—ইনট্যুশনের এবং ইনটেলেকচুয়েলের।

কথা?—সংগীতে কথার এধার-ওধার তো হচ্ছে। দেখা গেছে, উক্তির পরিবর্তনে সর্বত্র ছন্দপতন হয় না সত্য; তথাপি পরিবর্তন কেন হলো তা জানতে ইচ্ছে হয়। যেমন, 'বলো সখী, বলো তারি নাম' গানখানির একাংশে প্রতিমা মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠে 'সে নাম মদির হবে যে বকুল ঘ্রাণে' শোনা গেল, 'যে' স্থানে 'গো'। 'গো' কি কবি-কৃত পরিবর্তন?

'মম, যৌবন নিকুঞ্জে গাহে পাখি' গানে 'জাগ' ফাগুনগুণ গীতে'-র 'ফাগুন' পুরাতন সংস্করণে পাই 'ফাল্গুন' রূপে। 'চঞ্চল'-এর সঙ্গে 'ফাল্গুন' চলে। আবার 'মেলি রাগ-অলস আঁখি'র সঙ্গে 'জাগ' ফাগুনগুণ গীতে'-র মাত্রাগত মিল থেকেছে। এ ছাড়া গানে বিস্তারের সুবিধা থাকায় মাত্রা পরিবর্তনের সুযোগও থাকে। সে কারণে মনে হয়, এ গানে 'ফাগুন' এবং 'ফাল্গুন' দুই-ই চলতে পারে। তবে কবি নিজে যদি কোন পরিবর্তন করে না থাকেন অপরের হাতে হঠাৎ কবির রচনা পরিবর্তিত হওয়া নীতি-বহির্ভূত কাজ। এ সম্পর্কে বিশ্বভারতীর কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। এমনতরো ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত রয়েছে যা রবীন্দ্র গবেষকদের জানবার ভাববার দরকার।

আমার বিপক্ষে হয়তো আপনারা বলবেন যে, সংগীতজ্ঞের এত জ্ঞানের প্রয়োজন কিসের, শুধু গাইতে পারলেই তো যথেষ্ট। তা সত্য, তবে তাতে প্রতি পদে ভুল হবার সম্ভাবনা থেকে যাবে। তাছাড়া মানুষের শিক্ষা এবং অভিজ্ঞতা ক্রমশ বাড়ছে। এখন একটি শিশুও বিজ্ঞানের শক্ত শক্ত বিষয় বুঝতে পারে। সুতরাং গতকাল যদি বিনা বিদ্যায় সংগীতচর্চা হয়ে থাকে আজও তাই চলবে এ মতবাদ সমর্থন করা যায় না। বিশেষত রবীন্দ্র-সংগীত যা লৌকিক সংগীত নয় তাকে ঠিকমতো আয়ত্ত করতে শুধু কণ্ঠস্বরই একমাত্র পুঁজি হবে কেন। সর্ববিদ্যা যদি কঠোর সাধনলব্ধ হয় কেবল সংগীত ফাঁকতালে আয়ত্ত করা হবে এই বা কেমন কথা।

*

২৭-৩-৬৮-র 'সংবাদ পরিক্রমা' ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহর অসুস্থতার খবর আমাদের কাছে পৌঁছে দিল। ২৭শে ডিসেম্বর থেকে তিনি হাসপাতালে শয্যাশায়ী। ২১শে ফেব্রুয়ারির স্মরণীয় সভায় যাবার জন্য তাঁর আকুতি—খবরগুলি আন্তরিকতার সঙ্গে আকাশবাণী আমাদের জানালেন। ডক্টর শহীদুল্লাহ্ হলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষাতত্ত্ব বিভাগের প্রথম ছাত্র। বাঙলা ভাষা এবং বাঙালী সংস্কৃতির শ্রীবৃদ্ধি সাধন তাঁর অন্তরের কামনা। কলকাতায় বাঙলা ভাষার উন্নতিকল্পে মেঘদূতকে একদা যে কথাগুলি বলেছিলেন তা 'আকাশবাণী পরিক্রমা'র একটি সংখ্যায় উল্লেখ করেছি। সেদিন তাঁর কথায় ছিল শুধু দুই বাঙলার ভাষা ও সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখতে অনুরোধ। "পূর্ব পাকিস্তানী আঞ্চলিক ভাষার অভিধানে"র ভূমিকায় শহীদুল্লাহ্ সাহেব বলেছেন: 'আশা করি আমাদের এই পূর্ব পাকিস্তানী বাংলার আদর্শ অভিধানের প্রথম খন্ড "আঞ্চলিক ভাষার অভিধান" সমস্ত বাংলা ভাষা-মোদীর নিকট সমাদরে গৃহীত হইবে।' প্রবীণতম ভাষাতাত্ত্বিক শহীদুল্লাহ্ সাহেবের নেতৃত্বে পূর্ব পাকিস্তানে বাঙলা ভাষা নিয়ে নানা গবেষণা কার্য চলেছে।

পর পর ক'দিন 'সংবাদ পরিক্রমা' শুনলাম। আশা ছিল ভাষাতাত্ত্বিকের স্বাস্থ্যের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে আরও কিছু সংবাদ আমাদের দেওয়া হবে।

*

ওই দিনে জীবনানন্দ দাশের কয়েকটি কবিতা পড়ে শোনালেন কবি-পত্নী শ্রীলাবণ্য দাস। গভীর অনুভূতি কবি-জায়ার কণ্ঠে ধ্বনিত হলো। এমনি একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন প্রশংসনীয় বই কি।

*

১লা এপ্রিল সুচিত্রা মিত্রের কণ্ঠে 'অধরা মাধুরী ধরেছি ছন্দোবন্ধনে' গানখানি আশাতীত রকমের ভালো হয়েছিল। বেতারে এমন দরদভরা প্রাণ মাতানো রবীন্দ্রসংগীত কদাচিৎ শোনা যায়।

আকাশবাণী-পরিক্রমায় বারে বারে বলেছি, অপ্রচলিত বা কম প্রচলিত গানের দিকে একটু বেশি ঝোঁক দেওয়া প্রয়োজন। অন্যথায় রবীন্দ্রসংগীতে একঘেয়েমি এসে যাচ্ছে। এমনও ঘটছে যে, একই গান এক ঘন্টার মধ্যে দুবার গাওয়া হচ্ছে। তাতে শোনার মেজাজ যায় বিগড়ে।

ওই দিন রাতে শ্রীমিত্র গাইলেন, 'ধীরে বন্ধু ধীরে ধীরে'। গানখানি গলা কাঁপিয়ে কাঁপিয়ে গাইলেন। গানখানি ফাল্গুনী নাট্যকাব্যে অন্ধ বাউলের কণ্ঠে গীত হয়েছে। বাউল বলছে, 'আমি গান গাইতে গাইতে যাই, তোমরা আমার পিছনে পিছনে এস।' সেখানে ভাবের দিক থেকে কেঁপে কেঁপে গাওয়ার পরিবর্তে কি ধীরে ধীরে গাওয়ার ইঙ্গিত পাই না।

*

'খাদ্যদ্রব্যে ভেজালের সমস্যা' আলোচনা করলেন কলকাতার মেয়র শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দে গত ৩রা এপ্রিল। উদ্দেশ্য সাধু, তবে আলোচনাটি মামুলী এবং ভাসা ভাসা। বর্তমান আইনে এত ফাঁক থেকে গেছে যে, তারই সুযোগ নিয়ে মানুষের মুখোস-পরা হায়েনার দল নির্বিচারে জাতিকে পঙ্গু করে দিচ্ছে। মেয়র বলছেন, 'জাতির সর্বনাশ কিছুতেই হতে দেব না', 'ভেজাল বহুলাংশে কমাতে পারবো'। তা যদি তিনি পারেন তবে বহু দেশনেতার মাথার ওপর তাঁর আসন পাতা থাকবে। প্রয়োজন দুষ্কৃতকারীদের জন্য কঠোরতম শাস্তির ব্যবস্থা, ব্যবসার মূলধন এবং লাইসেন্স বাজেয়াপ্ত এবং সংবাদপত্রের পাতায় অসৎ ব্যবসায়ীদের নাম বড়ো বড়ো অক্ষরে প্রকাশ করা। শ্রীদের পক্ষে কী সম্ভব হবে এ ধরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করার? অন্যথায় ভেজাল বন্ধ হতে পারে না।

*

কলকাতা থেকে মীনাক্ষী মিত্র, শিবানী সেনগুপ্ত, প্রমিতা মুখোপাধ্যায়, তপতী বন্দ্যোপাধ্যায়, কৃষ্ণা চট্টোপাধ্যায়, নমিতা রায়চৌধুরী, সীমা সরকার লিখেছেন, আমরা আপনার আলোচনা নিয়মিত পাঠ করে থাকি। আমাদের আশ্চর্য লাগে আপনি রবীন্দ্রসংগীতের বিশুদ্ধতা নিয়ে এতো আলোচনা করেন অথচ পূরবী মুখোপাধ্যায়ের নাম উল্লেখ করেন না। আমাদের মনে হয় নিখুঁতভাবে উনি রবীন্দ্রসংগীত পরিবেশন করেন। যেমন সুমধুর উদাত্ত কণ্ঠ তেমন শুদ্ধ স্পষ্ট উচ্চারণ।

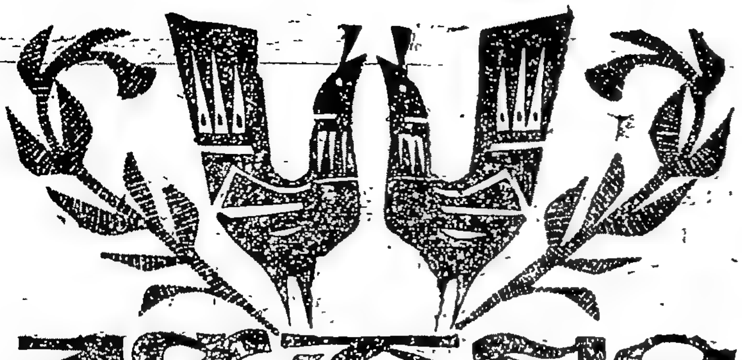

রঙ্গজগৎ

রবীন্দ্র সদন কি বিত্তবানদের জন্য ?

রবীন্দ্র সদন-এর পরিচালনা বিষয়ে ইতিপূর্বে অনেক মন্তব্য প্রকাশ করা হয়েছে। কিন্তু শহরের এমন সুন্দর ও আরামজনক প্রেক্ষাগৃহটি রবীন্দ্রনাথের নাম বুকে ধারণ করে কেবলমাত্র উচ্চবিত্তশ্রেণীর লোকের জন্য নির্দিষ্ট হয়ে আছে। এই হলে কোন অনুষ্ঠান করতে হলে নগদ এক হাজার টাকা দিতে হয়। তার এদিক-ওদিক হবার উপায় নেই। যদিও ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীর দু' শ' টাকা পর্যন্ত রেহাই দেবার ক্ষমতা আছে, কিন্তু রবীন্দ্র সদন পরিচালক কমিটির সেক্রেটারী যিনি আবার জনশিক্ষা দপ্তরেও আছেন তাঁর দাপটে যুক্তফ্রন্টের শিক্ষামন্ত্রী নজরুল একাডেমির মত প্রতিষ্ঠানকেও দু' শ' টাকা ছাড় দিতে পারেন নি। এখন তো আমলাদের রাজত্ব সুতরাং ছাড়ের প্রশ্ন তো ওঠেই না।

রবীন্দ্র-সদন প্রতিষ্ঠা হয়েছিল জাতীয় নাট্যশালা গঠনের কথা মনে রেখে। কিন্তু আজ পর্যন্ত সে কাজ ফাইল চাপা পড়ে আছে। জাতীয় নাট্যশালা যে কখনো হবে এমন ভরসা করা যায় না। কথা হয়েছিল কেবল রবীন্দ্রনাটক, ক্লাসিক্যাল নাটক, ক্লাসিক্যাল সংগীত ও নৃত্য এবং বিদেশী প্রতিনিধিমূলক সংস্কৃতি অনুষ্ঠানই এই হলে হবে। সেই প্রস্তাবেও আমলারা কর্ণপাত করে নি। যারা টাকা দিতে পারে তারাই অনুষ্ঠান করে যাচ্ছে। রক এন রোল থেকে টুইস্ট নাচতে বাধা নেই, প্রতিক্রিয়াশীল নাটক অভিনয়েও আপত্তি নেই। টাকা ফেল—যা খুশি কর। এই হচ্ছে আমলা-নীতি।

এই নীতির ফলে যে সব সংগঠনের পেছনে শহরের ক্যাপিটালিস্টরা নেই, চোরাকারবারী, দুর্নীতিপরায়ণ ব্যবসায়ী ও ঘুষখোর আমলাদের সমর্থন নেই তাদের পক্ষে রবীন্দ্র সদন ভাড়া নেওয়া সম্ভব হয় না। কারণ মোটা টাকার চাঁদা তো একমাত্র এরাই দিতে পারে! এ বিষয়ে রবীন্দ্র সদন কমিটির দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে কিন্তু ভাড়া কমানোর ব্যাপারে তাঁরা কিছু করেছেন বলে আমাদের জানা নেই। অথচ সকলেই স্বীকার করেন পশ্চিমবঙ্গের মত দেশে কোন হলের ভাড়া এক হাজার টাকা হওয়া কল্পনাতীত ব্যাপার। কংগ্রেস আমলে রবীন্দ্র সদন কমিটির সদস্যরা ভাড়ার ব্যাপারে কোন কথা বলারই প্রয়োজন বোধ করেন নি। আমলা-রাজত্ব প্রতিষ্ঠার পরে রবীন্দ্র সদন কমিটির কোন অস্তিত্ব আছে কি না জানি না। যদি থাকে তবে সদস্যরা এ ব্যাপারে নীরব থাকবেন না—আশা করি।

ভাড়ার সঙ্গে সম্প্রতি আর এক চাপ শুরু হয়েছে। রবীন্দ্র সদনে একটি ক্যান্টিন খোলা হয় অনুষ্ঠানের দিন। সদনের কর্মচারীরা নিজেরাই এই ক্যান্টিন পরিচালনা করেন। এখানে শুরুতে 'চা'-র দাম ছিল ভাঁড় প্রতি দশ পয়সা। এ সপ্তাহে দেখলাম এক কাপ পঁচিশ পয়সায় উঠেছে। চপ নামক নড়াকৃতি একটা পদার্থ বিক্রি করা হয় তার দাম পঁয়ত্রিশ পয়সা। যেমন বড়লোকের হল, তেমন বড়লোকের 'চা'-খানা। নিম্ন-মধ্যবিত্তদের সাধ্য কি যে অনুষ্ঠান দেখার পূর্বে এক কাপ চা খেয়ে তাজা হন, বা বিরতির সময় চা-পান করেন। অথচ কর্তাদের চোখের সামনেই এই কালোবাজারী চা-চপ-কোল্ড ড্রিংক বিক্রি হচ্ছে।

সমস্ত ব্যাপার দেখে মনে হচ্ছে রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে আর টানাটানি কেন! রবীন্দ্রনাথের নামটা তুলে দিয়ে শহরের অভিজাত ও আমলাদের জন্য প্রেক্ষাগৃহটি রিজার্ভ করে রাখলে মন্দ কি? —সুজন।

আনন্দশংকর

নাটকের কথা

শেষ কথা

রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থিয়েটারে 'শেষ কথা' নাটক ছাত্রছাত্রীদের দ্বারা মঞ্চস্থ হয়েছে। নাটকটি রবীন্দ্রনাথের 'শেষ কথা' গল্পের নাট্যরূপ। নাট্যরূপ দিয়েছেন শ্রীবিজয়কৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়। রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের নাটক বিভাগের প্রধান ডঃ সাধনকুমার ভট্টাচার্য নাটকটির প্রযোজক। পরিচালনা করেছেন গণেশ মুখোপাধ্যায়।

এই নাটকটির দ্বিতীয় অভিনয় দেখার সুযোগ আমার হয়েছে—থিয়েটার কর্তৃপক্ষের সৌজন্যে। ইতিপূর্বে প্রথম রজনী অভিনয়ের উচ্ছ্বাসপূর্ণ আলোচনা পড়েছিলাম বিভিন্ন সংবাদপত্রে। স্বাভাবিক ভাবেই একারণে কৌতূহল সৃষ্টি হয়েছিল। নাটক দেখার পরে মনে হয়েছে সংবাদপত্রের সমালোচকদের এত উচ্ছ্বাস ভাবপ্রবণতা ছাড়া আর কিছু নয়। রবীন্দ্রভারতীর ছাত্রছাত্রীরা এই নাটক অভিনয়ের জন্য নিঃসন্দেহে প্রশংসার পাত্র, নাটকের দৃশ্যসজ্জা, সঙ্গীত এবং আলোকের কাজে তাঁদের উল্লেখযোগ্য শিল্পরুচির পরিচয় রয়েছে। উপরোক্ত গুণগুলির জন্য নাটকটি প্রথমাংশের তুলনায় দ্বিতীয়াংশে উপভোগ্য হয়েছে। এবং দ্বিতীয়াংশে কিছুটা রবীন্দ্রদীপ্তি প্রকাশ পেয়েছে, তা হয়েছে প্রধানত সংলাপের কারণে। কিন্তু

নাট্যরূপ কিছুটা অসংযত, সংলাপ এবং চরিত্র সৃষ্টিতে। যে কারণে প্রথমাংশে রবীন্দ্রনাটকের মেজাজ ও রস অনুভব করা মোটেই যায় নি।

নাটকের দ্বন্দ্ব গড়ে উঠেছে অচিরাকে কেন্দ্র করে। অচিরা তার অধ্যক্ষ দাদুকে শিক্ষাজীবন থেকে বিচ্যুত করে বনে আশ্রয় নিয়েছে প্রথম প্রেমে প্রবঞ্চনার অপমান আড়াল করতে। ছোটনাগপুরের বনে এসে দেখলো আদর্শবাদী জিওলজিস্ট নবীনমাধব তার প্রতি মোহান্ধ হয়ে নিজের সাধনার জগৎ থেকে সরে আসছে। বুদ্ধিমতী অচিরার আশঙ্কা হলো অরণ্যের অন্ধ প্রাণের শক্তি তাকেও না টেনে নামায়। যে স্নেহ আচার্যকে শিক্ষাদান থেকে গ্রন্থকীটে পরিণত করেছে, যে প্রেম নবীনমাধবকে তার আদর্শ থেকে বিচ্যুত করেছে সে প্রেম মোহেরই নামান্তর। প্রেম মানুষকে পিছনে টানে না, এগিয়ে নিয়ে চলে জীবনের সাফল্যের পথে। এবং প্রেম কখনো আদর্শ বিচ্যুত নয়। মোহমুক্ত অচিরা দাদুকে ফিরিয়ে নিল লোকালয়ে শিক্ষাদানের যোগ্য কাজে; নবীনমাধবকে এগিয়ে দিল তার আদর্শকে সার্থক করতে। সাধনার পথে নারী প্রতিবন্ধক না হয়ে হলো সঞ্জীবনী শক্তি। সংলাপ, বক্তব্য ও আঙ্গিক সৌন্দর্যে 'শেষ কথা'য় নাটকীয় আকর্ষণ যথেষ্ট। কিন্তু নাট্যরূপদাতা এই সম্ভাবনাকে যথার্থভাবে কাজে লাগাতে পেরেছেন এমন কথা বলতে পারি না। প্রথমাংশের সংলাপে রবীন্দ্রনাথকে অনুভব করা যায় না, বরঞ্চ মনে প্রশ্ন জাগে। রবীন্দ্রনাথের 'শেষ কথা' গল্পের রচনাকাল ১৯৩৯ সাল। আর নাটকটি মঞ্চস্থ হচ্ছে ১৯৬৮ সালে। মাঝখানে বিরাট সময়ে জগতের অনেক পরিবর্তন হয়েছে। আমেরিকা সম্পর্কে ভারতীয়দের যে ধারণা ছিল—সেই ধারণাও আজ আর নেই। সুতরাং আমেরিকাকে কেউ যদি জাগ্রত-বুদ্ধির দেশ বলে ১৯৬৮ সালে সেটা কানে লাগে, বরঞ্চ দুর্বুদ্ধির দেশ বললেই উপযুক্ত শোনায়। রবীন্দ্রনাথ ত্রিশদশকে নবীনমাধবকে দিয়ে বলিয়েছেন—"জাগ্রত বুদ্ধির দেশে এসে বাস্তবকে বাস্তব বলে জেনেই শুকনো চোখে কোমর বেঁধে কাজ করতে শিখেছি।" আবার তিনি ফোর্ড উল্লেখে এও বলেছেন, "একটা কথা বুঝতে পারলুম টাকাওয়ালার দরদ টাকাওয়ালা-দেরই 'পরে। আর দেখলুম, এখানে চাকা তৈরির চক্রপথে শেখা বেশি দূর এগোবে না।" বৃটিশ-বিরোধিতা থেকে সেকালে আমেরিকা সম্পর্কে ভারতীয়দের বন্ধু-মনোভাব থাকলেও রবীন্দ্রনাথ যে বৃটিশ-আমেরিকাকে বেশি তফাৎ করে দেখতেন না ঐ উক্তিতে কি তা বোঝা যায় না? কিন্তু নাট্যরূপদাতা নবীনমাধবকে দিয়ে বলালেন 'আমেরিকা জাগ্রত বুদ্ধির দেশ'। অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ প্রো-আমেরিকান ছিলেন এ কথাটা বোঝাতে চাইলেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যে কত বড় সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ছিলেন সে কথা বোধ হয় নাট্যরূপদাতা মনে রাখেন নি।

ফরাসী ছবি 'অডিট ফিলপাইনস'-এর একটি দৃশ্য

ভারতের স্বাধীনতার প্রশ্নে সন্ত্রাস-বাদের পথকে রবীন্দ্রনাথ সমর্থন করেন নি, সে তো জানা কথা। সে কথা এখানেও তিনি নবীনমাধবকে দিয়ে বলিয়েছেন এবং তার কারণও বোঝা গেছে। 'শেষ কথা' গল্পে ভবতোষকে রবীন্দ্রনাথ প্রত্যক্ষ উপস্থিত করেন নি, ভবতোষ প্রসঙ্গ এসেছে চিঠিতে এবং আর একবার নবীন-মাধবের অনুমানে। কিন্তু নাট্যরূপদাতা তাকে মঞ্চে হাজির করে তার মুখ দিয়েই এমন যুক্তি হাজির করেছেন যাতে কিছুটা বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়, এবং নাটকীয় রহস্য বজায় থাকে না। ভবতোষ প্রসঙ্গ উল্লেখই যথেষ্ট ছিল। একইভাবে ম্যানেজারকে মঞ্চে উপস্থিত করে নাটকীয় দ্বন্দ্ব ও রস-সৃষ্টিতে বিশেষ যে সহায়তা হয়েছে এমন মনে হয় না। অথচ সাঁওতাল চরিত্র দুটি সংযোজন করে পরিবেশ রচনা ও রিলিফ সৃষ্টিতে চমৎকার কাজ হয়েছে। প্রযোজক ডঃ ভট্টাচার্য নাট্যরূপটি সম্পাদনা করে অভিনয় ব্যবস্থা করলেই বোধ হয় রবীন্দ্র-নাথের সংলাপবৈশিষ্ট্য ও যথার্থতা রক্ষিত হতে পারতো।

অভিনয়াংশে দাদু ডঃ সরকারের চরিত্রে বিমল চট্টোপাধ্যায়ের অভিনয় যথার্থই প্রশংসনীয়। অচিরা রূপে শর্মিষ্ঠা চট্টোপাধ্যায় প্রশংসনীয় অভিনয়ে নাটকে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করেছেন এবং নাটকীয় রসকে ঘনীভূত করে তুলেছেন। তবে সময় সময় তাঁকে (বিশেষ করে মুক্তাভিনয় ক্ষেত্রে) কিছুটা কৃত্রিম বা জোর করে অভিব্যক্তি করছেন মনে হয়েছে। নবীনমাধব রূপে দুর্লভ মুখোপাধ্যায় প্রশংসনীয়, তবে প্রথমাংশে তিনি তেমন ধারণা সৃষ্টি করতে পারেন নি নাট্যরূপের ত্রুটিতে। সাঁওতাল দম্পতি রূপে নিধি ভট্টাচার্য এবং শ্বেতা ভট্টাচার্য যথাযথভাবে চরিত্র রূপায়িত করেছেন। মায়ের ভূমিকায় যথাযথ অভিনয় করেছেন মনীষা চট্টোপাধ্যায়। অন্যান্য চরিত্রে অভিনয় করেছেন সুব্রত মুখার্জী, দেবেন গাঙ্গুলী, অনঙ্গ কুণ্ডু, মোহন মুখোপাধ্যায়, সুনীল দাশগুপ্ত, রণেশ বাগচি, ললিত কোনার, মণীন্দ্র দত্ত।

নাটকটির সার্থক আবহসঙ্গীত পরি-চালনা করেছেন তরুণ গঙ্গোপাধ্যায় এবং মঞ্চ দৃশ্য ও আলোক পরিচালনা কৃতিত্ব অমর ঘোষের।

'সংস্কৃতির' উদ্যোগে বিশ্ব রঙ্গমঞ্চ দিবস উদ্‌যাপন

চাকপোতার (হাওড়া) ঐতিহ্যশালী সংস্থা 'সংস্কৃতি' এক ভাবগম্ভীর পরিবেশে গত ২৭শে মার্চ বিশ্ব রঙ্গমঞ্চ দিবস উদ্‌যাপন করেন। উৎসবে সভাপতিত্ব করেন নাট্যপরিচালক নির্মল পাত্র।

শ্রীমহাদেব পাত্রের সংগীতের সাথে সভার কার্য সুরু হয়। ম্যাকসিম গোর্কী ও বের্টোল্ট ব্রেখট্-এর নাট্যকৃতির বিশ্লেষণ করেন কবি ও নাট্যসমালোচক নিমাই মান্না। এই প্রসঙ্গে তিনি বিশ্ব-নাট্য দিবসের তাৎপর্য ও উপযোগিতা সম্পর্কে আলোচনা করেন। 'নাটক ও সমাজচিন্তা', 'কিশোর নাট্য', 'নাট্যকারের দায়িত্ব' প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা করেন যথাক্রমে রণজিৎ পাত্র, তারাপদ দে

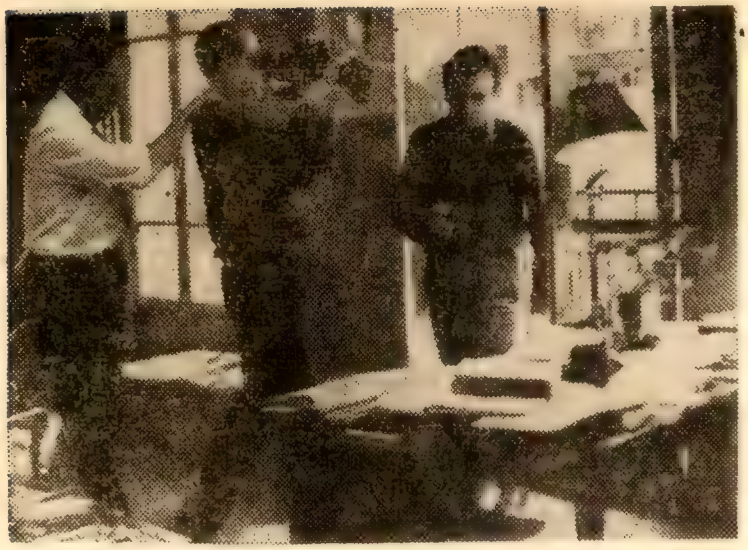

ফরাসী ছবি 'ক্লনিক দ্য উনেতে' ছবির একটি দৃশ্য

(মিঠুদা), দিলীপ মান্না। পরিশেষে নিমাই মান্নার নির্দেশনায় ও প্রয়োগে 'ভিয়েতনাম' নাটকটি সংস্থার সদস্যদের দ্বারা সাফল্যের সাথে মঞ্চস্থ হয়। 'নাটকে অংশ নেন সর্বশ্রী কালী দেয়াশী, ফেলু দোয়ারী, দিলীপ মান্না, অসিত পাত্র, সমীর পাখীরা, অরূপ মান্না, গোবিন্দ মাঝি, নরেন পাত্র ও অন্যান্যরা।

বসুমতী রিক্রিয়েশন ক্লাব-এর প্রথম বার্ষিক অনুষ্ঠান

গত ২৩শে মার্চ নেতাজী সুভাষ ইনস্টিটিউট-এ বসুমতী রিক্রিয়েশন ক্লাবের সভ্যেরা শচীন ভট্টাচার্যের "সম্রাটের মৃত্যু" মঞ্চস্থ করলেন। দলগত অভিনয়ে এই ক্লাবের সম্ভাবনা ভবিষ্যতের পথে সাফল্যপূর্ণ পদক্ষেপ রাখলেন। এই নাটকে যাঁরা অংশ গ্রহণ করলেন—তাঁরা হলেন যথাক্রমে : দেবব্রতর ভূমিকায় অমিতাভ অধিকারী, সত্যব্রত—নৃপেন্দ্রচন্দ্র রায়, হীরেন—শ্যামাপ্রসাদ চক্রবর্তী, ধীরেন—প্রবীর চট্টোপাধ্যায়, সৌমেন—নারায়ণ দে, দীনবন্ধু—সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরেশ—নয়ন চট্টোপাধ্যায়, তুষার—বিনয় চক্রবর্তী, শোভন—সুবোধ গঙ্গোপাধ্যায়, অনিল—শচীন মুখোপাধ্যায়, গোবিন্দ—অজিত ভট্টাচার্য, মিঃ দত্ত—চিত্ত মজুমদার, বিপ্লব—সুধীর চট্টোপাধ্যায়, সুধাংশু—সুধাংশু মুখোপাধ্যায় ও নারী চরিত্রে অংশ গ্রহণ করেন : বহ্নি—সবিতা মিত্র (দাস) ও স্বাতি—আলো মজুমদার। আলোকসম্পাত ত্রুটিপূর্ণ হলেও যন্ত্রসঙ্গীত চলনসই। নাটকটি পরিচালনা করেন অমিতাভ অধিকারী।

স্টুডিও খবর

দুরন্ত চড়াই

ক্যাপিটাল ফিল্মসের প্রথম ছবি 'দুরন্ত চড়াই'-এর চিত্রগ্রহণের কাজ শেষ হয়েছে। এখন সম্পাদনার কাজ চলছে। ছবিটি পরিচালনা করেছেন জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়। সমরেশ বসুর লেখা গল্প অবলম্বনে চিত্রনাট্য রচিত হয়েছে। অভিনয়ে আছেন মাধবী মুখার্জী, অনুপকুমার, বিকাশ রায়, জহর রায়, দিলীপ রায়, পদ্মা দেবী, অপর্ণা দেবী, সবিতা চ্যাটার্জী (বোম্বাই)।

মেঘনাদ বধ

লোকনাথ চিত্রমের পৌরাণিক কাহিনী ছবি 'মেঘনাদ বধ'-এর কাজ প্রায় শেষ হয়েছে। শক্তি চট্টোপাধ্যায় পরিচালিত এই ছবির সংলাপ রচনা করেছেন মন্মথ রায়।

রাত্রি শেষে

জাতিকা প্রোডাকসন্সের 'রাত্রি শেষে'র প্রাথমিক পর্যায়ের কাজ শেষ হয়েছে। বৈশাখ থেকে টেকনিশিয়ান স্টুডিওতে আবার স্যুটিং শুরু হবে।

ভানু গোয়েন্দা জহর এসিস্ট্যান্ট ছবিতে লিলি চক্রবর্তী

'দুরন্ত চড়াই' ছবিতে দিলীপ রায় ও মাধবী মুখার্জী

সংবাদিকী

ফরাসী চলচ্চিত্র উৎসব

গত ২রা এপ্রিল কলকাতাস্থ ফরাসী কালচারাল সেণ্টারের ডিরেক্টর এক সাংবাদিক সম্মেলনে জানান যে ফিল্ম সোসাইটি ও ক্লাবগুলির যুক্ত উদ্যোগে কলকাতায় ফরাসী চলচ্চিত্র উৎসবের আয়োজন করা হচ্ছে। এপ্রিল মাসেই এই উৎসব অনুষ্ঠিত হবে এবং চারটি ছবি দেখান হবে। এই চারটি ছবি যথাক্রমে আলা রেশনে পরিচালিত 'হিরোসিমা মন আমোর'; জ্যাকুই রোজিয়ে পরিচালিত 'অ্যাডিউ ফিলিপাইনস'; জাঁ রোচ পরিচালিত 'ক্রনিক দ্য উনেতে'; মাক্স ওফ্‌ফু পরিচালিত 'মাদাম দ্য'।

হিরোসিমা মন আমোর ইতিপূর্বে কয়েকবার দেখান হয়েছে। আণবিক বোমায় বিধ্বস্ত হিরোসিমার এক ফরাসী অভিনেত্রী ও এক জাপানী স্থপতিকে নিয়ে কাহিনী গড়ে উঠেছে। 'অ্যাডিউ ফিলিপাইনস'-এর কাহিনী এক তরুণকে কেন্দ্র করে দুই নারীর প্রতিদ্বন্দ্বিতা। 'ক্রনিক দ্য উনেতে' একটি নিরীক্ষামূলক ছবি। বিষয়সুখ সম্পর্কিত চিরন্তন সমস্যার কথা; ক্যামেরার কাজ ছবির বৈশিষ্ট্য বাড়িয়েছে।

এই ছবিগুলি দেখাবার আয়োজন করেছে সাউথ ক্যালকাটা ফিল্ম সোসাইটি ১১ই এপ্রিল থেকে সরলা রায় মেমোরিয়াল হলে। সিনেসেণ্ট্রাল ক্যালকাটা দেখাবে ২১শে এপ্রিল থেকে—একই স্থানে। নর্থ ক্যালকাটা ফিল্ম সোসাইটি এবং নবগঠিত ফিল্ম ক্লাব। ক্যালকাটা ছবি চারটির দেখাবার ব্যবস্থা করছে।

বার্লিন উৎসবে 'মাটির মণিষ'

মৃণাল সেন পরিচালিত ওড়িয়া ছবি 'মাটির মণিষ' বার্লিন চলচ্চিত্র উৎসবে প্রদর্শনের জন্য ভারত সরকারের অনুমোদন লাভ করেছে। জুন-জুলাই মাসে এই উৎসব হবে।

সিডনী উৎসবে

১৯৬৭ সালে রাষ্ট্রপতি স্বর্ণপদক-প্রাপ্ত ইংরেজী তথ্যচিত্র 'গ্লিম্পসেস অব ওয়েস্ট বেঙ্গল' সিডনী চলচ্চিত্র উৎসবে দেখানোর জন্য ভারত সরকারের অনুমোদন পেয়েছে। এই উৎসব হবে মে মাসে।

উদয়শংকর ইণ্ডিয়া কালচারাল সেণ্টার-এর ছাত্রীদের কথাকলি রীতির নাচের দৃশ্য

উদয়শংকর ইণ্ডিয়া কাল-চারাল সেণ্টারের অর্ঘ্য

উদয়শংকর ইণ্ডিয়া কালচারাল সেণ্টার (১৯৬৫) তিন বছর সময়ের মধ্যে দেশে-বিদেশে ভারতের এক প্রতিনিধিমূলক নৃত্য অনুশীলন কেন্দ্র হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। গত ৪ঠা এপ্রিল সন্ধ্যায় রবীন্দ্র সদনে এই অনুশীলন কেন্দ্রের অনুষ্ঠান দেখার সৌভাগ্য আমাদের হয়েছে। উদয়শংকর ইণ্ডিয়া কালচারাল সেণ্টারের এটি ছিল দ্বিতীয় বার্ষিক অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করেছিল এই তিন বছর সময়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত ছাত্রী এবং নতুন ছাত্রীরা। এদের বয়স পাঁচ থেকে কুড়ি অনূর্ধ্ব। রবীন্দ্র সদন মঞ্চে কখনো সাদা কখনো হালকা রঙের আলোর ঝরনায় শিশু ও কিশোরী ছাত্রীরা যখন রঙ-বেরঙের রূপসজ্জায় উপস্থিত হচ্ছিল, মনে হচ্ছিল যেন মঞ্চে খুশির মাতন লেগেছে, যেন ফুলের মত ফুটে উঠেছে, চারদিক তাদের শোভায় বিকশিত। পরম আনন্দময় সে দৃশ্য।

অনুষ্ঠান উদ্বোধন করলেন উদয়শংকর ইণ্ডিয়া কালচারাল সেণ্টারের অধ্যক্ষা শ্রীমতী অমলাশংকর। তাঁর বক্তব্য প্রসঙ্গে জানালেন—বর্তমানে এক শত ছাত্রী রবীন্দ্র সরোবর স্টেডিয়ামে এই সেণ্টারে শিক্ষা গ্রহণ করছে। শ্রীউদয়শংকর অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

শ্রী ও শ্রীমতী শংকর পুত্র শ্রীআনন্দশংকরের সেতার ছিল অনুষ্ঠানের প্রথম সূচী। তার পরে ভারতের বিশিষ্ট রীতির নৃত্য সমবেতভাবে পরিবেশিত হয়। প্রথম 'অর্ঘ্য' নৃত্যের নামানুসারে সমগ্র অনুষ্ঠানটিকে উদ্যোক্তারা 'অর্ঘ্য' নামকরণ করেছেন। ঐকান্তিক শিক্ষার পরে জন-সমক্ষে ছাত্রীদের 'অর্ঘ্য' এরই মধ্যে দিয়ে কেবল ছাত্রীদের নয় কেন্দ্রের শিক্ষক এবং পরিচালকদের গুণাগুণও প্রকাশ হয়েছে। বিশেষভাবে 'আনন্দ' নৃত্য দর্শকদের পরম আনন্দে মুগ্ধ করেছে। শিশুমনের সারল্য ও সহজ ছন্দ এতে প্রকাশিত। তার পরে একে একে উপস্থিত হয়েছে জাতিস্বরম, মণিপুরীরাস, সারি, পদ্মাদি, রূপ, ফসলকাটার নাচ। এই নাচগুলি আমাদের বহু বার দেখা, এবং অনেক সুদক্ষ শিল্পীর নাচ দেখেছি। কিন্তু পরিবেশন রীতিগুণে শিক্ষার্থীদের অনেক অক্ষমতা সত্ত্বেও আমাদের নাচগুলি খুবই ভাল লেগেছে। এই নাচগুলি পরি-বেশনায় উদয়শংকর ইণ্ডিয়া কালচারাল সেণ্টার নিজস্ব রীতি প্রবর্তন করেছেন। যেমন নাচে, তেমন পোষাকেও। কথাকলি, ভরতনাট্যম, মণিপুরী উ, ই, ক সেণ্টারের নিজস্ব রীতিগুণে যেন আরো সহজ ও রসময় হয়ে উঠেছে। সমবেত-ভাবে 'ভরতনাট্যম'-এর জাতিস্বরম এবং মণিপুরী ও কথাকলি অপূর্ব ছন্দবর্ণময় হয়ে উঠেছিল। আরো উল্লেখের দাবি রাখে সেণ্টারের নিজস্ব সৃষ্টি রবীন্দ্রনাথের কবিতা অবলম্বনে 'নমঃ যন্ত্র'। এটি ছিল অনুষ্ঠানের শেষ নৃত্য। যন্ত্র ও মানুষকে পাশাপাশি মঞ্চে ও ছায়ায় রেখে এই নৃত্যরূপ শংকর দম্পতির এক অভিনব সৃষ্টি। যে সৃষ্টির জন্য তাঁদের খ্যাতি আরো ব্যাপ্ত হবে। সেণ্টারের ছাত্রীরা যথেষ্ট দক্ষতার সঙ্গে এই নৃত্যটিকে সার্থক করেছে। এই অনুষ্ঠানের আর একটি আকর্ষণ ছিল উ, ই, ক সেণ্টারের আমেরিকান ছাত্রী মিস সালী ট্রামেলের একক নৃত্য 'প্রতীচী'। প্রাচ্য নৃত্য 'লা সিলফাইডস'-এর ভূমিকাংশটিকে তিনি নৃত্যরূপায়িত করেন। অতি সংক্ষিপ্ততার দরুণ রসোত্তীর্ণ না হলেও ভারতীয় নৃত্য-ছন্দ সমন্বয়ে এই পাশ্চাত্য নৃত্যটিকে বে-সুরো মনে হয় নি, বরং ভাল লেগেছে। মিস সালী ট্রামেল ভারতীয় নৃত্যেও সার্থকভাবে অংশ গ্রহণ করেছেন।

অনুষ্ঠানে আর একটি আকর্ষণ ছিল শ্রীকমলেশ মৈত্রের তবলাতরঙ্গ।

সমগ্র 'অর্ঘ্য' অনুষ্ঠানে জাতির প্রতি এবং আমাদের নৃত্য-ঐতিহ্যের প্রতি শংকর দম্পতির কর্তব্যবোধের পরিচয় পাওয়া গেল। আমরা উদয়শংকর ইণ্ডিয়া কালচারাল সেণ্টারের সর্বতোভাবে সাফল্য কামনা করি।

পাঠক মন

অগ্নিযুগের একটি অধ্যায় প্রসঙ্গে

সাপ্তাহিক বসুমতীতে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত "অগ্নিযুগের একটি অধ্যায়"-এর লেখক শ্রদ্ধেয় শ্রীঅনন্ত সিংহ মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য আমার এই চিঠিখানা প্রকাশিত হইলে বিশেষ বাধিত হইব।

৭২ বর্ষ ৩১শ সংখ্যা (১৮ই জানুয়ারী, ১৯৬৮ ইং) সাপ্তাহিক বসুমতীতে ১৯৪৫নং পৃষ্ঠার তৃতীয় কলামের প্রথম প্যারার শেষে শ্রীঅনন্ত সিংহ মহাশয় লিখিয়াছেন, "অনুশীলন পার্টি ও যুগান্তরের একটা অংশ যতীন্দ্রমোহনকে সমর্থন জানায় প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে সফল হতে।" শ্রীসিংহের এই উক্তি ভ্রমাত্মক এবং ইতিহাসে এমনতর ভ্রম উপেক্ষার বস্তু নয়। ১৯২৯ সালে বাংলা কংগ্রেসের নেতা নির্বাচনে যুগান্তর ও অনুশীলন দলের সক্রিয় কর্মধারা ইতিহাসের বিষয়বস্তু; এবং যুগান্তর দলের ঐ ঐতিহাসিক কর্মধারার অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবেই সেদিন সুভাষচন্দ্রকে চট্টগ্রাম হইতে মাস্টারদা সদলবলে সমর্থন করিয়াছিলেন। After thoughts বা লেখকের আত্ম-তুষ্টি ইতিহাস নয়; বিপ্লবী বাংলা শ্রীসিংহের কাছ হইতে ইতিহাসের বিষয়বস্তু জানিবার আকাঙ্ক্ষাও রাখে।

মাস্টারদাকে সম্মুখে রাখিয়া চট্টগ্রামের যুব-অভ্যুত্থানের গোষ্ঠীকে শ্রীসিংহ যুগান্তর দল হইতে বেমালুম স্বতন্ত্র দেখাইতে যথেষ্ট যত্নবান; তাঁহার প্রতি বিন্দুমাত্র কটাক্ষপাত না করিয়াও ইহা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে, শ্রীসিংহের এই স্বাতন্ত্র্য-প্রিয়তা ইতিহাসকে যথেচ্ছ ক্ষুণ্ণ করিতেছে। শ্রীসিংহ অনেকবারই শ্রদ্ধাস্পদ ভূপেনদা (শ্রীভূপেন্দ্রকুমার দত্ত), কালীদার (শ্রীকালীচরণ ঘোষ) নাম উল্লেখ করিয়াছেন; তাঁহাদের সঙ্গে অন্তত আলোচনা করিয়া এমনতর ঐতিহাসিক ইঙ্গিতগুলি সবিস্তারে লিখিলে বিপ্লবী বাংলার উপকার হইবে। এলার্জী না থাকিলে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীসুরেন্দ্রমোহন ঘোষের (মধু ঘোষ) সঙ্গেও আলোচনা করিয়া ঐতিহাসিক তথ্য পরিবেশন করিলে যথেষ্ট উপকার হইবে। ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দের ব্যাপার নয়। ইতিহাস বলে সেদিনকার বিপ্লবী বাংলায় শ্রীঘোষ উপেক্ষণীয় ছিলেন না—যুগান্তর দলের তো নয়ই। বাংলার বাইরে মাস্টারদা ও শ্রীঘোষের একই জেলে খুব সম্ভব যারবেদা জেলে একটা জেল-জীবন ছিল; ইতিহাস মহান্ বিপ্লবী মাস্টারদার সেই জেল-জীবনের ঘটনাপঞ্জীকেও জানিবার দাবী করে, কারণ জেল-জীবন বিপ্লবী চরিত্রের আগামী দিনের প্রস্তুতিকালও যে।

ইতিহাসের দৃষ্টিকোণ হইতেও শ্রীসিংহের প্রবন্ধটা পঠিত হইতেছে এই কথাটা স্মরণে রাখিয়া লেখার দায়িত্ব প্রতিপালিত হোক এই অনুরোধ তাঁহার কাছে করি। দীর্ঘ লেখার in between lines খুচ্‌খাচ্ অনুশীলন আর যুগান্তর দলকে টানাহ্যাঁচড়া না করিয়া স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গি লইয়া লিখিলেও আগামী দিনের ঐতিহাসিক একটা সন্ধান পাইবে; ভুল তথ্যে দিগ্‌ভ্রমের সুযোগ থাকিবে মাত্র।

এই সংখ্যাতেই ১৯৪৭নং পৃষ্ঠার প্রথম কলামে শ্রীসিংহ লিখিয়াছেন, "—হাতবোমা ফেটে যাওয়াতে বিপ্লবী যুবক তনুজা সেই স্থানেই মারা যায়।" এই শহীদের নাম অনুজা সেন—তনুজা নয়।

—শ্রীপ্রভাংশু ধরচৌধুরী

লেখকের বক্তব্য

সাপ্তাহিক বসুমতীর সম্পাদিকা মহাশয়ার কাছে লিখিত শ্রীপ্রভাংশু ধরচৌধুরী মহাশয়ের চিঠিখানা আমার জ্ঞাতার্থে পাঠিয়ে সাপ্তাহিক বসুমতীর কর্মসচিব তাঁর দায়িত্ব পালন করেছেন। সাপ্তাহিক বসুমতীতে আমার লেখা "অগ্নিযুগের একটি অধ্যায়" পড়ে শ্রীপ্রভাংশুবাবুর মনে যেসব প্রশ্ন দেখা দিয়েছে তা' তিনি খোলা চিঠির মারফৎ উপস্থিত করেছেন। তাঁর নিজস্ব অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে নিজ দৃষ্টিভঙ্গি ও সমালোচনার মন নিয়ে তিনি যা বুঝেছেন তার যৌক্তিকতা থাকলেও বাস্তব বিষয়বস্তু এত ধ্রুব সত্য যে, "যুক্তিতর্ক" দিয়ে তা' অস্বীকার করা যায় না।

আমার লেখা উদ্ধৃত করে প্রভাংশুবাবু বলতে চেয়েছেন—"অনুশীলন পার্টি ও যুগান্তরের একটা অংশ" দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহনকে সমর্থন জানিয়েছে তা' ঠিক নয়। তিনি বলছেন—"যুগান্তর দলের ঐ ঐতিহাসিক কর্মধারার অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবেই সেদিন সুভাষচন্দ্রকে চট্টগ্রাম হইতে মাস্টারদা সদলবলে সমর্থন করিয়াছিলেন।"

বাস্তব সত্যকে অস্বীকার করে প্রভাংশুবাবুর মত যদি আমিও বাংলাদেশে "যুগান্তর পার্টি" বলে কেবলমাত্র একটি পার্টির অস্তিত্বই জানতাম তবে তাঁরই মত ভাবা আমার পক্ষে সম্ভব ছিল। কিন্তু কার্যত বাংলাদেশে "যুগান্তর পার্টি" নামে একটা বড় বৈপ্লবিক প্ল্যাটফর্ম ছিল এবং সেই প্ল্যাটফর্মের ওপর "যুগান্তর পার্টি" নামে বিভিন্ন দল নিজের সীমিত গন্ডীতে নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী তাদের অস্তিত্ব বজায় রেখে চলেছিল।

বাস্তব অবস্থাটা এইরূপ—এটা কি সত্যি "যুগান্তর পার্টি" নামে বৈপ্লবিক পার্টি বাংলাদেশে সুপরিচিত?—হ্যাঁ সত্যি। এটাও কি সত্যি "যুগান্তর পার্টি" নামে কোনো একটি সুগঠিত ও সুনিয়ন্ত্রিত পার্টির অস্তিত্ব বাংলাদেশে কখনই ছিল না? —হ্যাঁ তা-ও সত্যি। কেউ কি অস্বীকার করতে পারেন যে বাংলাদেশে বিভিন্ন স্বয়ংসম্পূর্ণ দল নিজ নিজ স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে চলতেন? —সত্যি, কেউই তা অস্বীকার করতে পারবেন না।

এখন আমার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার কথা বলি। চারুদা ('চারুবিকাশ দত্ত মহাশয় নয়) ও ভূপেনদা (ভূপেন দত্ত—যাঁর কথা প্রভাংশুবাবু উল্লেখ করেছেন) চট্টগ্রামে প্রায় এক বছর মাস্টারদার সঙ্গে সাম্য আশ্রমে ছিলেন। তাঁরা নিশ্চয়ই যুগান্তর পার্টির নামে নিজেদের পরিচয় দিতেন এবং আমরাও তাঁদের তাই জানতাম। আবার বিপিনদা ('বিপিন গাঙ্গুলী), সন্তোষদা (সন্তোষকুমার মিত্র), জ্যোতিষদা প্রমুখ নেতারাও যুগান্তর পার্টির নামেই নিজেদের অভিহিত করতেন। মাস্টারদা ও চট্টগ্রাম বৈপ্লবিক শাখার সঙ্গে ভূপেনদাদের যখন অত ঘনিষ্ঠতা ছিল তখন কিন্তু আবার জ্যোতিষদা, সন্তোষদা, বিপিনদা ও অনুকূলদার সঙ্গেও বৈপ্লবিক ষড়যন্ত্রমূলক কার্যসূচীর ভিত্তিতে চট্টগ্রাম দলের যথেষ্ট ঘনিষ্ঠ সংযোগ ছিল। আমাদের এই বৈপ্লবিক ষড়যন্ত্রের গুপ্ত কথা যুগান্তরের অন্যান্য দল, এমন কি ভূপেনদারাও জানবার সুযোগ পান নি। ১৯২৩, ১৯২৪ ও ১৯২৫ সালের বৈপ্লবিক কার্যকলাপের মাধ্যমে যুগান্তরের এই অংশের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ ছিল।

১৯২৮ সালে জেল থেকে মুক্তি পেয়ে সকলে বাইরে আসার পর অনুশীলন ও যুগান্তর পার্টির নেতারা বৈপ্লবিক চেতনা-বোধে বাংলাদেশে ক্ষমতাশালী সুদৃঢ় একটিমাত্র বিপ্লবী পার্টি গড়ে তুলতে সচেষ্ট হলেন। কিন্তু ব্যক্তি-প্রাধান্য ও অহং ভাবের প্রভাবে তাঁদের এই পরিকল্পনা কার্যকরী হয় নি। যুগান্তর ও অনুশীলন পার্টি আবার নিজ নিজ গন্ডীতে নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে ফিরে গেল। যুগান্তর পার্টির "Democratic Platform even up to the right of cessasion" (এমন কি পার্টিগত সম্পর্কচ্ছেদের অধিকার লইয়া গণতন্ত্রী প্ল্যাটফর্ম) আগের মতই বৈশিষ্ট্য নিয়ে স্বস্থানে অধিষ্ঠিত রইল।

১৯২৪ সালে বেঙ্গল অর্ডিন্যান্সে জেলে যাবার আগে মাস্টারদা ও চট্টগ্রাম শাখার বিপ্লবী দলের সাধারণ রাজনৈতিক সম্পর্ক ছিল ভূপেনদাদের সঙ্গে এবং সেই একই সময় ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে গুপ্ত বৈপ্লবিক ষড়যন্ত্রমূলক কার্যের ব্যাপারে যোগাযোগ ছিল জ্যোতিষদা

বিপিনদা সন্তোষদা, অনুকূলদা প্রমুখ নেতাদের সঙ্গে। এই সময়ের বিপ্লবাত্মক সশস্ত্র অ্যাকশনের কর্মসূচী ছিল তাঁদেরই।

সেই একই কর্মসূচী নিয়ে কাজ করে যাদের সঙ্গে জেলে গেলাম, তাদের সঙ্গেই অর্থাৎ, জ্যোতিষদা-বিপিনদাদের গ্রুপের সঙ্গেই আমাদের প্রথম ও প্রধান বৈপ্লবিক সম্পর্ক ছিল—যুগান্তর প্ল্যাটফর্মের বিভিন্ন গ্রুপের সঙ্গে সাধারণ রাজনৈতিক সম্পর্ক থাকলেও সে যুগের সশস্ত্র কার্যকলাপের সঙ্গে সবার সংযোগ ছিল না এবং আমাদের সঙ্গে ছিল না।

এইরূপ বৈচিত্র্যপূর্ণ আন্তঃগ্রুপ সম্পর্ক নিয়ে জেল ভোগ করে মুক্তি পাবার পর বাস্তব ঘটনাবলীর মধ্যে সেই পুরাতন সম্পর্কের আমূল রূপ পরিবর্তন ঘটলো। বাংলাদেশে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের সভাপতি পদে প্রার্থী দাঁড় করানো হ'ল সুভাষচন্দ্র ও যতীন্দ্রমোহনকে। এই রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অংশ গ্রহণ করলো অনুশীলন ও যুগান্তর পার্টি এবং বাংলার বিভিন্ন স্বতন্ত্র বিপ্লবী গ্রুপ। প্রভাংশুবাবুর হয়ত বা এইটুকুই মাত্র জানা আছে যে, অনুশীলন পার্টি যতীন্দ্রমোহনকে এবং যুগান্তর পার্টি সুভাষচন্দ্রকে সমর্থন করেছে। কিন্তু Fact (বাস্তব ঘটনা) ঠিক তা' নয়।

জ্যোতিষদা, বিপিনদা, অনুকূলদা, সন্তোষদা প্রমুখ নেতাদের যুগান্তর পার্টির একটি অংশ বলে স্বীকার করতে প্রভাংশুবাবুর নিশ্চয়ই কোনো বাধা নেই। যুগান্তরের এই বিশেষ অংশের কথা স্মরণ করেই আমি লিখেছি—"অনুশীলন পার্টি ও যুগান্তরের একটা অংশ যতীন্দ্রমোহনকে সমর্থন জানায়।"

বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচন দ্বন্দ্ব তীব্র আকার ধারণ করলে জ্যোতিষদা ও বিপিনদা এক সন্ধ্যায় শ্রদ্ধানন্দ পার্কের কাছে মোটরে বসে আমার ও গণেশের সঙ্গে আলোচনা করে চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করতে চাইলেন—বাংলা কংগ্রেসের সভাপতিরূপে নির্বাচনে আমরা কা'কে সমর্থন করবো? জ্যোতিষদা সংক্ষেপে আমাদের বললেন— "......এতদিন এক সাথে একই বিপ্লবী সংগঠনে আমরা মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়েছিলাম। একসঙ্গে জেল ভোগ করে ফিরে এসেছি। আমাদের অতীত সম্পর্কের সঠিক মূল্যায়ন করা আজ একান্ত প্রয়োজন মনে করছি। আসন্ন বাংলা কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচনে তোমরা চট্টগ্রামে যতীন্দ্রমোহনকে সমর্থন করছ কিনা আমাদের জানা একান্ত প্রয়োজন। তোমরা জান আমরা যতীন্দ্রমোহনকে সমর্থন করছি এবং আমরা চাই তোমরাও যতীন্দ্রমোহনকেই সমর্থন করবে।"

আমি ও গণেশ জ্যোতিষদাকে চট্টগ্রামের রাজনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে অবহিত করি। অনুশীলন পার্টির সঙ্গে আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতার কথা সবিস্তারে তাঁকে জানাই এবং তাঁদের সঙ্গে যতীন্দ্রমোহনের সক্রিয় যোগাযোগ আমাদের অর্থাৎ মাস্টারদার নেতৃত্বে গঠিত চট্টগ্রামের বিপ্লবীদলের সশস্ত্র বৈপ্লবিক কর্মসূচীর পরিপন্থী তা-ও বলি। জ্যোতিষদাকে সব বিষয় জানিয়ে সুস্পষ্টভাবে তাঁর প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করতে আমরা বাধ্য হয়েছিলাম।

যদিও পরস্পর বিরোধী তবু বাস্তব সত্য—যাঁদের সশস্ত্র বিপ্লবাত্মক কার্যকলাপের সঙ্গে আমরা ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলাম তাঁদের সঙ্গেই কংগ্রেসের রাজনীতিক্ষেত্রে আমাদের বিরোধ হ'ল। তখন তাঁদের কোনো দলগত সঠিক বৈপ্লবিক কর্মসূচী ছিল কিনা সে সম্বন্ধে আমি অন্তত অজ্ঞ ছিলাম। তবু মজার কথা, যখন জ্যোতিষদাদের সঙ্গে আমাদের রাজনৈতিক মতের অমিল চলছে, ঠিক সেই সময়েই আমি তাঁদের গ্রুপেরই অন্যতম নেতা অনুকূলদার সাহায্যে স্মাগ্‌লারদের কাছ থেকে রিভলভার-পিস্তল কিনছি। আবার সেই একই সময় আমরা কংগ্রেস রাজনীতিক্ষেত্রে সুরেনদা, ভূপেনদা প্রমুখের সঙ্গে একাত্মভাবে মিলিত হয়ে বাংলা কংগ্রেসে "যুগান্তর পার্টি"-র অর্থাৎ "যুগান্তর প্ল্যাটফর্মের" সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভের জন্য মাস্টারদার নেতৃত্বে সুভাষচন্দ্রকে বিপ্লবী বাংলার পুরোভাগে রেখে যতীন্দ্রমোহনের বিরোধিতা করছি। কংগ্রেসের অহিংস রাজনীতিতে আমরা সুরেনদা-ভূপেনদাদের সঙ্গে যোগ দিলাম এবং জ্যোতিষদাদের সঙ্গে আমাদের বিচ্ছেদ ঘটলো। এই বিচ্ছেদের কথা জানা সত্ত্বেও অনুকূলদা আমাকে ব্যক্তিগত রিভলভার-পিস্তল যোগাড় করে দিয়েছেন। অনুকূলদা যেমন আমাদের সঙ্গে এইরূপ সম্পর্ক রাখতে কোন কুণ্ঠা বোধ করেন নি ঠিক তেমনি ভূপেনদাও যুব-বিদ্রোহের প্রায় ছ' মাস আগে একবার আমাকে ও গণেশকে ডেকে বলেন যে, বহু অস্ত্র গোপনে পাওয়া যাচ্ছে এবং তা' তাঁরা নেবার বন্দোবস্ত করেছেন। টাকার প্রশ্ন নেই, কেবল সমস্যা গোপন স্থানে সেগুলিকে সযত্নে রাখা। ভূপেনদা আমাদের ওইসব প্রত্যাশিত অস্ত্রের delivery নিতে প্রস্তুত থাকতে বলেছিলেন। তাঁর কথামত বড়শীর ছিপ হাতে টোপের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে বহুদিন বহু ঘণ্টা ধরে আমি ও গণেশ বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস অফিসে নিষ্ঠার সঙ্গে অপেক্ষা করেছি এবং প্রতিদিনই বিফল মনোরথ হয়ে ফিরে এসেছি। কিন্তু এতে ভূপেনদার প্রতি আমাদের কোনো বিরূপ ভাব হয় নি। কারণ, আমরা জানতাম তিনি যে Source-এর ওপর নির্ভর করছিলেন সেই Source-এর অক্ষমতা জন্যই তা' সম্ভব হয় নি।

প্রভাংশুবাবুর কাছে আমি এইসব Facts পরিবেশন করলাম—(১) "যুগান্তর পার্টি" বিভিন্ন স্বতন্ত্র বৈপ্লবিক দলের একটা প্ল্যাটফর্ম মাত্র। (২) মাস্টারদা ও আমরা ভূপেনদার সঙ্গে ১৯২১-১৯২৮ সাল পর্যন্ত কংগ্রেস রাজনীতিতে জড়িত ছিলাম। (৩) আবার সেই একই সময় জ্যোতিষদা-বিপিনদাদের সঙ্গে বৈপ্লবিক ষড়যন্ত্রমূলক কার্যকলাপে যুক্ত ছিলাম যার সন্ধান অন্যান্য গ্রুপ বা ভূপেনদাদের দল জানতেন না। (৪) বৈপ্লবিক কার্যকলাপের বিরুদ্ধে Bengal Ordinance জারী হয় এবং বিপ্লবীরা বিনা বিচারে আটক হন। (৫) ১৯২৮ সালে জেল থেকে মুক্তি পেয়ে অনুশীলন ও যুগান্তর—এই দুটি পার্টিকে মিলিত করে একটি পার্টি হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত করবার আশায় দু' পক্ষই সচেষ্ট হলেন কিন্তু সফল হলেন না। (৬) বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস সভাপতি নির্বাচন দ্বন্দ্বে সুভাষচন্দ্রের সমর্থনে মাস্টারদার নেতৃত্বে আমরা যুগান্তর পার্টির ভূপেনদা, সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ প্রমুখ নেতাদের পক্ষে যোগ দিই এবং এই কারণে যুগান্তরের জ্যোতিষদাদের অংশের সঙ্গে আমাদের বিচ্ছেদ ঘটে। তাঁরা সুভাষের বদলে যতীন্দ্রমোহনকে সমর্থন করেছেন বলেই আমি আমার লেখায় যুগান্তরের এই একটি অংশ সম্বন্ধেই উল্লেখ করেছি।

এখন আমার জিজ্ঞাসা—"After thoughts বা লেখকের আত্মতুষ্টি ইতিহাস নয়"—এই উক্তিটি মেনে নিয়ে প্রভাংশুবাবু আর কিভাবে এই অবিচলিত সত্যটি পরিবেশন করতে পারতেন?

প্রভাংশুবাবুর পত্রের মাধ্যমে তাঁর মানসিক চিন্তাধারা আমার চোখে যেটুকু প্রতিফলিত হয়েছে তা' থেকে আমার মনে হচ্ছে তিনি খুবই আনন্দিত হতেন যদি আমি তাঁর দৃষ্টিকোণ থেকে অগ্নিযুগের ইতিহাস বিকৃত করার চেষ্টা না করে লিখতে পারতাম—"মাস্টারদার নেতৃত্বে চট্টগ্রামে যে যুব-অভ্যুত্থান সংঘটিত হয়েছে তা' "যুগান্তর পার্টি"-রই ধারাবাহিক ও অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবেই বৈপ্লবিক অ্যাক্‌শনের আর একটি ঘটনা।" তাই তিনি তাঁর চিঠিতে লিখেছেন—"মাস্টারদাকে সম্মুখে রাখিয়া চট্টগ্রামের যুব-অভ্যুত্থানের গোষ্ঠীকে শ্রীসিংহ যুগান্তর দল হইতে বেমালুম স্বতন্ত্র দেখাইতে যথেষ্ট যত্নবান;"

শ্রীপ্রভাংশু ধরচৌধুরী মহাশয় বাস্তব ঐতিহাসিক সত্যকে "ক্ষুন্ন" না করে যদি নিম্নলিখিত Fact-এর পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করেন তবে হয়ত আমার লেখা

তে "স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়তা" আবিষ্কার না করে সত্যের কষ্ঠিপাথরে যাচাই করে আমার যে বিচ্যুতি ঘটে নি সে স্বীকৃতি দানে পরাঙ্মুখ হবেন না। অনস্বীকার্য ইতিহাস অকাট্য সাক্ষ্য বহন করে আসছে যে, বাংলাদেশে অনুশীলন পার্টির একটি সামিয়ানা ছিল; যুগান্তর পার্টির নামে তদনুরূপ আর একটি প্ল্যাটফর্ম ছিল যেখানে নিজ নিজ স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে বিভিন্ন গ্রুপ বাংলাদেশে তাঁদের অস্তিত্ব বজায়ে যত্নবান ছিলেন; আর মাস্টারদার নেতৃত্বে **Indian Republican Army—Chittagong Branch** চট্টগ্রাম শহরে শহর দখল করে স্বল্পকালের জন্য হলেও ভারতবাসীর কাছে অস্থায়ী বিপ্লবী সরকার ঘোষণা করেছে।

মাস্টারদার নেতৃত্বে চট্টগ্রামে যে যুব-অভ্যুত্থান ঘটেছিল এবং **Indian Republican Army—Chittagong Branch** সম্বন্ধে ইতিহাস যে সত্যকে অস্বীকার করতে পারে না, তা' কি আমার পক্ষে অস্বীকার করা সম্ভব? **Indian Republican Army—Chittagong Branch**-এর সংগঠন, নেতৃত্ব এবং জটিল আঁকা-বাঁকা পথের গতি ও পরিণতির কথা সরকারী নথিপত্রে ও বিভিন্ন বাস্তবতার ভিত্তিতে যা স্থাপিত হয়েছে তা' আমি কি করে উপেক্ষা করতে পারি? আর কি করেই বা আমি লিখতে পারি—মাস্টারদার নেতৃত্বে চট্টগ্রাম যুব-বিদ্রোহ "যুগান্তর পার্টি"-র দ্বারা সংঘটিত হয়েছে? তর্কের খাতিরেও যদি সেভাবে লিখতাম, তবুও কি প্রশ্ন আসতো না যে, "যুগান্তর পার্টি"-র কোন্ বিশেষ গ্রুপের দ্বারা যুব-বিদ্রোহ সংঘটিত হয়েছিল?—ভূপেনদা-সুরেনদার দলের প্রভাবে না কি জ্যোতিষদা-বিপিনদার দলের পরিচালনায়, না কি পূর্ণ দাস বা জীবনদার দলের সহযোগিতায়? তা' ছাড়া, বিপিনদা জ্যোতিষদাদের সংগে অনুকূলদার রাজনৈতিক পার্থক্য না থাকা সত্ত্বেও তাঁদের অগোচরেই অনুকূলদা আমাদের অস্ত্র সরবরাহ করেছেন, যদিও তিনি জানতেন কংগ্রেসের রাজনৈতিক প্ল্যাটফর্মে আমরা জোতিষদাদের বিপক্ষে সুভাষচন্দ্রকে সভাপতি নির্বাচনকল্পে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছি। ঘটনাপ্রবাহে চট্টগ্রাম যুব-বিদ্রোহের পর ফেণী সংঘর্ষে বিজয়ী হয়ে আবার যখন কলকাতায় এলাম তখন আমরা ভূপেনদার গ্রুপের আশ্রয়েই ছিলাম; যদিও সেই সময় অনুকূলদার সংগে গোপনে দেখা করে মাখন ও আনন্দকে তাঁর আশ্রয় থেকে ভূপেনদার গোপন আস্তানায় স্থানান্তরিত করেছি।

প্রভাংশুবাবুর কাছে এইসব তথ্য "খুচ্‌খাচ্" মনে হলেও ইতিহাস এইসব অকাট্য সত্যকে গুরুত্ব না দিয়ে পারে না। তিনি লিখেছেন—"দীর্ঘ লেখার **in between lines** অনুশীলন আর যুগান্তর দলকে খুচ্‌খাচ্ টানাহ্যাঁচড়া না করিয়া স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গি লইয়া লিখিলেও আগামী দিনের ঐতিহাসিক একটা সন্ধান পাইবে; ভুল তথ্যে দিগভ্রমের সুযোগ থাকিবে মাত্র।"

আমার লেখা "অগ্নিযুগের একটি অধ্যায়" অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। অগ্নিযুগের সুদীর্ঘ ও সম্পূর্ণ অধ্যায়টির একটি অংশের সঙ্গে আমি প্রত্যক্ষভাবে এবং আমাদের সংগঠনের মাধ্যমে পরোক্ষভাবে সুপরিচিত। আমি অবশ্য সুপরিকল্পিতভাবে সেই অংশের মধ্যেই আমাকে নিবদ্ধ রাখতে যত্নবান হয়েছি—বাংলার বিপ্লবী দলের ইতিহাস লেখার গুরুদায়িত্ব নেওয়ার সাহস আমার অন্তত নেই। যাঁরা সেই গুরুদায়িত্ব বহন করবেন তাঁরাই দলগত, মতগত ও দৃষ্টিভঙ্গির তারতম্যের মাধ্যমে কিভাবে সেই সর্বাত্মক ইতিহাস রচনা করা যায় তা' স্থির করবেন। যেখানে নানা মুনির নানা মত বিরাজমান সেখানে সর্বজন বা সর্বদল সমর্থিত যুগান্তর পার্টি বা অনুশীলন পার্টির ইতিহাস কেউ বা কোনো গোষ্ঠী সমালোচনার ঊর্ধ্বে থেকে লিখতে পারবেন বলে আমি বিশ্বাস করি না। সেই বিশ্বাস নেই বলেই অভ্রান্ত, অকাট্য, অবিচলিত "খুচ্‌খাচ্" সত্য ঘটনার সত্য বর্ণনা দিয়ে যদি সেই যুগের ইতিহাস বিভিন্ন প্রত্যক্ষ অংশ গ্রহণকারী বিপ্লবী নিজের সীমা অতিক্রম না করে তাঁর লেখা তাঁরই গণ্ডীতে নিবদ্ধ রেখে লেখেন তবে তাই বাস্তব ও নির্ভুল ইতিহাস হবে বলেই মনে করি। সেই জন্যে চট্টগ্রামের বিপ্লবী দলের উৎপত্তি ও বিভক্ত হওয়ার "খুচ্‌খাচ্" বাস্তব সত্য ঘটনা আমি লিখেছি, "যুগান্তর পার্টি"-র বিভিন্ন গ্রুপের সঙ্গে কোন্ স্তরে ও কোন্ সময়ে কিভাবে আমাদের যোগাযোগ ছিল সেই সব "খুচ্‌খাচ্" বিবরণও দিয়েছি। প্রভাংশুবাবু যদিও লিখেছেন—"মাস্টারদাকে সম্মুখে রাখিয়া চট্টগ্রামের যুব-অভ্যুত্থানের গোষ্ঠীকে শ্রীসিংহ যুগান্তর হইতে বেমালুম স্বতন্ত্র দেখাইতে যথেষ্ট যত্নবান;" তবু সেই পরিপ্রেক্ষিতে আমার বলার এইটুকু যে বিভিন্ন জনের বিভিন্ন পরস্পরবিরোধী তথ্যের ওপর নির্ভর না করে যে অভ্রান্ত "খুচ্‌খাচ্" তথ্য আমার একান্তভাবে জানা আছে তারই প্রাধান্য দেওয়া সমীচীন মনে করেছি। সেই কারণে যুগান্তরের বিভিন্ন দল থেকে যুব-অভ্যুত্থানের গোষ্ঠীকে স্বতন্ত্র দেখাতে চেষ্টা করি নি বলেই "খুচ্‌খাচ্" ঘটনাবলীর মাধ্যমে অকপটভাবে ভূপেনদা, কালীদার কথা উল্লেখ করেছি; অনুকূলদার অবদানের কথা স্মরণ করে আনন্দ পেয়েছি এবং যুগান্তর দলের অন্যান্য নেতাদের বিশেষ বিশেষ সম্পর্কের কথা উল্লেখে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হই নি। সেই একই কারণে অনুশীলন পার্টির সংগে আমাদের সম্পর্কের কথাও যথাস্থানে যথাযথভাবে পরিবেশন করেছি। আবার সরকার যখন লোকনাথকে ধরবার জন্য প্রচুর পুরস্কার ঘোষণা করেছিলেন, সেই সংকটকালেও কুমিল্লার অনুশীলন পার্টির শাখা যেভাবে দুর্জয় সাহস ও বৈপ্লবিক নিষ্ঠার সঙ্গে লোকনাথকে সাহায্য করেছিলেন তার অভ্রান্ত "খুচ্‌খাচ্" বর্ণনার মূল্য ইতিহাসের দিক থেকে অনেক প্রয়োজনীয় বলে আমার মনে হয়েছে। কারণ, প্রকৃত ঘটনাকে ব্যক্তিগত ভাল-লাগা বা না-লাগা দিয়ে উপেক্ষা করবার সুযোগ নেওয়া উচিত নয় বলেই মনে করি।

শ্রীপ্রভাংশু ধরচৌধুরী মহাশয় তাঁর চিঠিতে উল্লেখ করেছেন মাস্টারদা ও সুরেনদা বাংলার বাইরে কোনো এক জেলে একসঙ্গে আটক বন্দী ছিলেন। জেল-জীবনের চিন্তাধারা বা গবেষণা প্রভৃতি ভাবীকালের বৈপ্লবিক প্রস্তুতির পথ-নির্দেশে সাহায্য করে নিশ্চয়ই এবং সেই হেতু সুরেনদার সংগে মাস্টারদার সেই সময় কি আলোচনা বা ভবিষ্যৎ বিপ্লবী বাংলার কি কর্মসূচী স্থির হয়েছিল সেই সম্বন্ধে আমি যদি আলোকপাত করি তবে ইতিহাস সমৃদ্ধশালী হবে। ইতিহাসের দিক থেকে বিচার করলে এটা কাম্য বলেই মনে হবে হয়ত; কিন্তু তাহলে এই ভার সুরেনদাকেই নিতে হবে। মাস্টারদার সঙ্গে সেই সময় জেলে তাঁর প্রত্যক্ষ আলোচনা বা গবেষণা কি বিষয় নিয়ে হয়েছিল তা' সুরেনদার কাছ থেকে শুনে নিয়ে আমার লেখার চাইতে বাংলাদেশ তার প্রত্যক্ষ লেখকের থেকে সেই সব তথ্য জানতে পারলে অনেক বেশি উপকৃত হবে। মাস্টারদার **Indian Republican Army**-তে আমরা কয়েকজন প্রথম সারির সভ্য ছিলাম। একসঙ্গে যখন তাঁর নেতৃত্বে যুব-অভ্যুত্থানে অংশ গ্রহণ করেছি তখন এটা খুবই স্বাভাবিক ও অভ্রান্ত সত্য যে মাস্টারদা কংগ্রেস রাজনীতি থেকে যুব-বিদ্রোহের ভূমিকার প্রাধান্যই অনেক বেশি দিয়েছিলেন। সেই পরিপ্রেক্ষিতে যদিও তাঁর সুরেনদার সঙ্গে, প্রভাংশুবাবুর মতে, কংগ্রেস রাজনীতি ছাড়া যুব-অভ্যুত্থানের বিষয় আলোচনা হয়ে থাকে, তবু এটা ধ্রুব সত্য যে, মাস্টারদা তার বিন্দুমাত্র আভাসও আমাকে কখন দেন নি।

প্রভাংশুবাবু আমার কাছে অনুরোধ জানিয়েছেন যদি আমার এলার্জী না থাকে বা ইতিহাস লিখতে গিয়ে ব্যক্তিগত ভালমন্দের ঊর্ধ্বে নিজেকে রেখে সুরেনদা,

ভূপেনদা ও কালীদার সঙ্গে "আলোচনা করিয়া এমনতর ঐতিহাসিক ইঙ্গিতগুলি সবিস্তারে লিখিলে বিপ্লবী বাংলার উপকার হইবে।" জানি না প্রভাংশুবাবু নিজে কতখানি ব্যক্তিগত ভাল-মন্দ লাগার ঊর্ধ্বে থেকে আমাকে কেবলমাত্র সুরেনদা, ভূপেনদা ও কালীদার সঙ্গে পরামর্শ করে "ঐতিহাসিক ইঙ্গিতগুলি" সবিস্তারে দিতে লিখেছেন! আমি আমার লেখার গণ্ডী সম্বন্ধে আগেই জানিয়েছি। তা' ছাড়া আমি আমার সাধারণ বুদ্ধিতে ভাবতে পারি না যে তাঁরাই যুগান্তর দলের একমাত্র নেতা, যাঁদের কাছ থেকে পাওয়া "ঐতিহাসিক" তথ্য বা "তথ্যের ইঙ্গিত" অন্যান্য যুগান্তর গ্রুপের নেতারা নির্ভুল বলে স্বীকার করে নেবেন। এই বাস্তব কারণে, আমার বাস্তব বুদ্ধিতে "অগ্নিযুগের একটি অধ্যায়" লেখার সময় সযত্নে এই গুরুদায়িত্ব পরিহার করেছি এবং অভ্রান্ত "খুচ্‌খাচ্‌" সত্য ঘটনা লিপিবদ্ধ করে যুগান্তর দলের বা আমাদের Indian Republican Army-র কি ভূমিকা ছিল এবং যুগান্তর পার্টির মধ্যে বিভিন্ন গ্রুপের সঙ্গে কোন্ সময়ে কিভাবে আমরা সম্পর্ক বজায় রেখেছি তার অকপট বর্ণনা দিয়েছি। এই পরিপ্রেক্ষিতে আমি বলতে চাই, "বেমালুম" যুগান্তর পার্টিকে অস্বীকার করি নি—যুগান্তর পার্টির সঠিক মূল্যায়ন করার জন্য অভ্রান্ত "খুচ্‌খাচ্‌" তথ্য অকপটে পরিবেশন করেছি।

শহীদের নাম অনুজা সেনগুপ্ত তাতে কোনো সন্দেহ নেই। ছাপার ভুল—সংশোধনের প্রয়োজন ছিল—প্রভাংশুবাবু এই ভুল সংশোধন করে পাঠকবর্গের উপকার করেছেন বলে তাঁর কাছে আমার কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

—অনন্ত সিংহ

•

গত ২২শে ফেব্রুয়ারীর (৩৬শ সংখ্যা) সাপ্তাহিক বসুমতীতে প্রকাশিত আমার লেখা "পূর্ব পাকিস্তান : একটি দৃষ্টিকোণ থেকে" কিছুটা বিতর্কের সৃষ্টি করেছে। এ সম্পর্কে লেখকের কৈফিয়ৎ তার নিবন্ধের মধ্যেই থাকায় জবাবদিহির প্রশ্নটা অপ্রত্যাশিত ছিলো। কিন্তু ৩৮শ সংখ্যা (৭ই মার্চ) পত্রিকায় শ্রীবসুধা চক্রবর্তীর "পূর্ব পাকিস্তান ও আমরা" শীর্ষক প্রবন্ধটি পড়বার পর নীতিগত দিক থেকে লেখক হিসেবে কয়েকটি কথা বলবার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। বসুমতীর বহুমূল্য পৃষ্ঠার আংশিক মাহাত্ম্যে আমার এ বক্তব্য সহৃদয় পাঠক সমীপে উপস্থিত করতে সহায়তা করলে বাধিত হবো।

"পূর্ব পাকিস্তান ও আমরা" শীর্ষক প্রবন্ধটি পড়বার পর আমার মনে হয়েছে আমার প্রবন্ধের বিষয়বস্তুকে কিছুটা বাড়িয়ে দেখার চেষ্টা করে তার প্রতি অবিচার করা হয়েছে। শ্রীচক্রবর্তী আমার প্রবন্ধের প্রতিবাদ করে বলেছেন যে, 'পূর্ব পাকিস্তানের অনেক মহলে "সাম্প্রদায়িক মনোভাবেরও অনটন নেই।...কিন্তু তা আছে বলেই যেদিক দিয়ে যেটুকু ভাঙ্গার লক্ষণ, আশার লক্ষণ রয়েছে তাকে অভিনন্দিত করার প্রয়োজন কমে না।' শ্রীচক্রবর্তীর সংগে আমি একমত যে তা কমে না; কিন্তু সূক্ষ্মভাবে দেখলে কি আমার প্রবন্ধে এর Contradiction আছে? এবং সেজন্যই কি আমি বাংলা একাডেমি, ভাষা আন্দোলনের বীর শহীদগণ এবং তোফাজ্জেল হোসেনের কথা উল্লেখ করি নি? এঁদের কৃতিত্ব এবং প্রগতিশীল চিন্তাধারার কথা যেমন সত্য, তেমনি সত্য পূর্ব পাকিস্তানে প্রতিক্রিয়াশীল চক্রের হাতে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বিকৃতি সাধনের অপচেষ্টার কথা। এই ধরণের অপচেষ্টা কতদূর ঘৃণ্য হতে পারে সম্প্রতি সেখানকার ঐতিহ্যপূর্ণ অভিজাত গ্রন্থাগার থেকে মূল্যবান মূল্যবান পুস্তকের অন্তর্ধানের চাঞ্চল্যকর ঘটনাই তার সাক্ষ্য বহন করে। বাংলা ভাষার বিকৃতি সাধনের প্রসংগেই মোঃ মখদুম-ই-মুল্‌ক মাশরাফীর রচনা থেকে যে উদ্ধৃতিটা দিয়েছিলাম তা আমার বক্তব্যের পরিপন্থী বলে শ্রীচক্রবর্তী যে মন্তব্য করেছেন তার উত্তরে মোঃ মাশরাফীর গোটা রচনাটাই উদ্ধারের অপেক্ষা রাখে। কিন্তু তা সম্ভব নয় বলেই উক্ত অংশেরই মাত্র একটি লাইনের প্রতি শ্রীচক্রবর্তীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে ক্ষান্ত হলাম: "স্বেচ্ছাকৃত অপরিচিত শব্দ প্রয়োগ প্রচেষ্টায় এ উগ্রতা প্রকট হয়ে উঠছে।" এই অপরিচিত শব্দ কোন অবিকৃত বাংলা প্রতিশব্দ নয়।

১৯৬১ সালে রবীন্দ্র জন্ম-শতবার্ষিকী পালনের স্বপক্ষে 'কেবলমাত্র' তোফাজ্জেল হোসেন সক্রিয় হয়েছিলেন এমন কথা আমার প্রবন্ধে কোথাও নেই। এ ক্ষেত্রেও শ্রীচক্রবর্তী একটু বাড়িয়ে বলেছেন। আমি শুধু এ কথাই বলতে চেয়েছি "এই অদ্ভুত যুক্তির বিপক্ষে সেদিন প্রথম যিনি কলম চালিয়েছিলেন তিনি হলেন 'ইত্তেফাক' পত্রিকার সম্পাদক শ্রীতোফাজ্জেল হোসেন।"

শ্রীচক্রবর্তী আরো লিখেছেন "পশ্চিমবঙ্গের সাহিত্য সম্বন্ধে পূর্ব পাকিস্তানের আগ্রহ স্বাভাবিকভাবেই পরিতৃপ্ত হচ্ছে।" আন্তর্জাতিক কপিরাইট আইন পাকিস্তান গ্রহণ করে নি সত্য; কিন্তু শ্রীচক্রবর্তীকে প্রশ্ন করতে ইচ্ছে হয় পূর্ব পাকিস্তানের যে সকল ছাত্র বাংলা ভাষা ও সাহিত্য নিয়ে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা করেন তাঁদেরও কি সকল প্রয়োজনীয় বই-এর অভাব স্বাভাবিকভাবে পরিতৃপ্ত হয়?

বসুমতীর উক্ত সংখ্যাতেই শ্রীযুত প্রভাসচন্দ্র লাহিড়ীর পত্রটি পড়েছি। শ্রীলাহিড়ীর সংগে আমার পরিচয় "পাক-ভারতের রূপরেখা"র মাধ্যমেই। "পাক-ভারতের রূপরেখা"র লেখক খুবই সহজ, স্বাভাবিক ও সংগত কারণে আমার শ্রদ্ধাভাজন হয়েছিলেন। এই প্রবীণ লেখকের কাছ থেকে তাই এই মামুলী 'প্রতিবাদের জন্য প্রতিবাদ ধরণের' চিঠি প্রত্যাশা করি নি। শ্রীলাহিড়ীর সংগে আমি এই পর্যন্ত একমত যে, পূর্ব পাকিস্তানে ভারত থেকে আগত উদ্বাস্তুদের জন্য পাকিস্তান সরকার তেমন কিছু করেন নি; কিন্তু কিছুই করেন নি একথা বিশ্বাস করতে বোধ করি যাঁরা প্রত্যক্ষদর্শী নন তাঁদেরও কষ্ট হবে (যেখানে শ্রীলাহিড়ী নিজেই বলেছেন রিফিউজিদের জন্য পাকিস্তান সরকার বছরে কয়েক শ' কোটি টাকা রিফিউজি ট্যাক্স আদায় করেন) তাঁর খাগড়ায় আগত রিটায়ার্ড পুলিশ অফিসারের দেওয়া তথ্যের বিরোধিতা না করেও প্রশ্ন জাগে আমার 'চলার পথের' (শ্রীলাহিড়ীর ভাষায়) অভিজ্ঞতাকে অবিশ্বাস করবার যুক্তিসংগত কারণ কোথায়?

চিঠি দীর্ঘ হয়ে যাচ্ছে। পরিশেষে সহৃদয় পাঠক ও সমালোচক একটি কথা মনে রাখলে বোধহয় আমার প্রবন্ধের জটিলতা তাঁদের বিব্রত করবে না। পূর্ব বাংলা আমার জন্মভূমি—তার মাটির সংগে আমার প্রাণের টান কত গভীর তা যাঁরা পূর্ব বাংলা থেকে ভারতে এসে আশ্রয় গ্রহণ করেছেন তাঁরা অন্তত কিছুটা উপলব্ধি করতে পারবেন। সেখানকার প্রগতিশীল চিন্তা এবং আন্দোলনকে আমার প্রাণের আকাঙ্ক্ষারই মূর্ত রূপ বলে মনে হয়। কিন্তু তাকে যে নানাপ্রকার প্রতিক্রিয়ার মধ্য দিয়ে এগুতে হচ্ছে একথা বেদনাদায়ক হলেও অস্বীকার করবার নয়। আর এই প্রতিক্রিয়াশীল চক্র ত' সমাজ বহির্ভূত নয়! কিন্তু আমি আশাবাদী মানুষ। নিরাবরণ আত্মসমালোচনার মধ্যে যে লজিক আছে তাকে অস্বীকার করি না। কাজেই যে অভিমান থেকে প্রগতিশীল ভাইরা মনে রাখলে আমার উদ্দেশ্য সার্থক হবে। অন্যায়কে অন্যায় বলে মনে রাখবো যতক্ষণ—ততক্ষণই ত' তাকে প্রতিরোধ করবার চেতনা থাকবে। কাজেই আমার অগ্রগামী বন্ধুদের চলার পথে এ বাধা সৃষ্টি করে বলে শ্রীবসুধা চক্রবর্তীর অভিমতকে সমর্থন করতে পারলাম না বলে দুঃখিত।

—শ্রীসাগর বিশ্বাস

ইংলেণ্ড ও অস্ট্রেলিয়া দলের পঞ্চম ও শেষ টেস্ট খেলার আগে দু' দলের অধিনায়ক—কাউড্রে ও সোবার্স।

খেলা ও ধুলা

ক্রিকেট নয়

সমস্ত বাংলা দেশ জুড়ে এখন বয়ে চলেছে অদ্ভুত এক অশান্তির ঝড়। এই ঝড়ের দাপটে আজ বিপর্যস্ত মানুষের রোজকার দুঃখ আর সমস্যাগুলো। অশান্তির আগুনে আজ ঘুরির খাট খাট করে জ্বলছে। আর সমস্যা—সকালে ঘুম ভাঙার পর থেকে রাত্তিরে ঘুমিয়ে পড়ার আগে পর্যন্ত আমাদের দু' চোখের সামনে শুধু সমস্যা আর সমস্যা। তাই প্রতিক্ষণ আজ জীবনের সংকট।

খেলার মাঠেও! অসম্যানুকূল সমাজের এই পরিস্থিতির বাইরে খেলার মাঠেরও যাবার ক্ষমতা নেই। ক্রীড়াঙ্গনেও আজ তাই অশান্তির ঢেউ! হতাশায় মুহ্যমান দর্শকমনেও আজ এসেছে অশান্তির জোয়ার। কথায় কথায় তাই গোলমাল, কথায় কথায় তাই মারামারি, কথায় কথায় তাই উদ্ভব হয় অদ্ভুত এক অসহনীয় পরিস্থিতির।

ঠিক যেমনটি হয়েছিলো কয়েকদিন আগে ইডেন উদ্যানে মোহন বাগান বনাম স্পোর্টিং ইউনিয়ন দলের ক্রিকেট খেলার সময়। খেলাটি ছিলো সি, এ, বি ক্রিকেট লীগের কোয়ার্টার ফাইনালের। স্পোর্টিং ইউনিয়ন ৯ উইকেটে ৩১০ রান করার পর ইনিংস সমাপ্ত ঘোষণা করে। তারপর মোহনবাগান খেলতে নামে। কিন্তু সুব্রত গুহর চতুর্থ ওভারের তৃতীয় বলে আম্পায়ার এ গুপ্ত এল, বি ডাব্লিউ আউট দিলেন নিমাই ঘোষকে! সংগে সংগে শুরু হলো গোলমাল।

আম্পায়ার খেলা বন্ধ করে দিয়ে প্যাভেলিয়নের দিকে পা বাড়ালেন। কিন্তু দর্শকরা ততক্ষণে আক্রমণ চালিয়েছে আম্পায়ার এ গুপ্তর ওপর। কিল, চড় আর ঘুসির বৃষ্টিপাতে ছিঁড়ে গেলো আম্পায়ারের পোষাক, আহত হলেন তিনি। স্পোর্টিং ইউনিয়নের খেলোয়াড় নিমাই ঘোষের ওপরও হামলা চললো। শেষ পর্যন্ত দু' দলের খেলোয়াড়দের চেষ্টায় গোলমাল থামলো।

আর দর্শকদের এই অসমুখী আচরণের প্রতিবাদে মোহনবাগান আর খেললো না। ম্যাচ ছেড়ে দিলো স্পোর্টিং ইউনিয়নকে। জানি নে মোহনবাগানের এই সিদ্ধান্ত খেলোয়াড়ী মনোভাবের কতোটা পরিচায়ক। শুধু মাত্র এই সিদ্ধান্তের ফলেই কি এই ধরণের বিশৃঙ্খলার সমাধান সম্ভব? যদি তাই হতো— তাহলে বলার কিছু ছিলো না। কিন্তু মোহনবাগান ক্লাবকে এই ধরণের এই না খেলার সিদ্ধান্ত নিয়ে খেলা ছেড়ে দিতে এর আগেও আমরা অনেকবার দেখেছি! কিন্তু তাতে কি সত্যিই কোন লাভ হয়েছে? হয় নি যে তার সব থেকে বড় প্রমাণ হলো সাম্প্রতিক এই ঘটনাটি!

সুতরাং মোহনবাগান ক্লাব যদি ভেবে থাকেন যে শুধু আর খেলা ছেড়ে দিয়েই তাঁদের কর্তব্য শেষ করেছেন—তাহলে তার চেয়ে বড় ভুল আর কিছু নেই! আর সেইজন্যেই বাংলা দেশের ক্রীড়ারসিকরা বড় বেশি বিচলিত হয়ে পড়েছেন। ফুটবল, ক্রিকেট, হকি সর্বত্রই আজ অশান্তির আগুন ছড়িয়ে পড়েছে। অথচ সে আগুন নেভাবার উপায় যেন আর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

আর সেইজন্যেই বোধহয় সর্বভারতীয় খেলাধুলোর ক্ষেত্রে বাংলা দেশ দিনের পর দিন পিছিয়ে পড়ছে। অথচ সেদিকে নজর নেই কারো। খেলোয়াড়রা নিজেদের নিয়ে ব্যস্ত। ক্লাবগুলোর লক্ষ্য শুধু ট্রফির ওপর আর সি, এ, বি; আই, এফ, এ; বি, এইচ, এ প্রভৃতি ক্রীড়া সংগঠনগুলোর কাজ দলাদলি আর নিজেদের স্বার্থ রক্ষা করার মধ্যে।

ফলে অবহেলিত ক্রীড়াঙ্গনে আজ এসেছে অশান্তির ঝড়। আর সেই হাওয়ায় চারদিকে যে অসহনীয় পরিস্থিতির উদ্ভব হচ্ছে, আজ যদি এখনই তার প্রতিকারের দিকে নজর দেওয়া না হয় তাহলে হয়তো অল্প কিছুদিনের মধ্যে বাংলা দেশের ক্রীড়াঙ্গন কালো মেঘের আড়ালে মুখ লুকোবে হতাশার অন্ধকারে। কিন্তু আমরা আবার কামনা করি বাংলা দেশের ক্রীড়াঙ্গনের নির্মল আকাশে উজ্জ্বল সূর্যের উদয়......!! —শান্তিপ্রিয়

কালো মেঘের ছায়া

কলকাতার ফুটবল লীগের ওপর এবার নেমে এসেছে কালো মেঘের ছায়া। সংশয়ের দোলায় দুলছে বাংলা দেশের ফুটবল-রসিকদের মন। সকলেরই মনে 'কি হয় কি হয় ভাব। বিশেষ করে ইস্ট-বেঙ্গল ক্লাবের সাম্প্রতিক বিশেষ সাধারণ সভার পর এই সংকট আরো ঘনীভূত হয়েছে।

ঐ সভায় ঠিক হয়েছে যে, এবার প্রথম ডিভিসন ফুটবল লীগে যদি একটি করে খেলা হয় অর্থাৎ ফিরতি লীগের খেলাগুলো বন্ধ থাকে তাহলে ইস্টবেঙ্গল ক্লাব প্রতিযোগিতায় যোগদান করবে না কিম্বা একটিমাত্র খেলায় অংশ গ্রহণ করার পর প্রতিযোগিতা থেকে নাম প্রত্যাহার করে নেবে।

আজকের সংকটের পেছনে আছে আই, এফ, এ কর্তৃপক্ষের অদ্ভুত এক সিদ্ধান্ত। কলকাতার ফুটবল খেলার উন্নতি করার জন্যে হঠাৎ তাঁরা বড় বেশি চিন্তিত হয়ে পড়েছেন। তাই তাঁরা ঠিক করেছিলেন যে এর জন্যে তাঁদের কিছু একটা করা দরকার। এমন একটা কিছু করতে হবে যাতে ফুটবল খেলারও উন্নতি হবে, আবার সিদ্ধান্তটিও হবে ঐতিহাসিক।

আর তারই জের টেনে তাঁরা ঠিক করলেন যে এবার থেকে কলকাতার ফুট-বল লীগের ফিরতি খেলাগুলো হবে না। কলকাতার ফুটবল লীগে যা কখনো হয় নি, এবার হতে বসেছে তাই। আর সেই-জন্যে ইস্টবেঙ্গল প্রভৃতি ক্লাবগুলো তুলেছে প্রতিবাদের ঝড়।

ফিরতি লীগের খেলাগুলো যদি অনুষ্ঠিত না হয় তাহলে সব থেকে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে ক্লাব মেম্বাররা। একগাদা টাকা খরচ করে হতে হয় বড় বড় ক্লাব-গুলোর মেম্বার। বছরের চাঁদার অংকটাও খুব একটা কম নয়। এতো করার পরেও খেলা দেখার সুযোগ বারো-তেরোটির বেশি হবে না। কারণ বড় ক্লাবের মেম্বারদের কপালে তো আবার চ্যারিটি খেলার খাঁড়াও ঝুলবে।

তাই ক্লাব মেম্বাররা আই, এফ, এ'র এই সিদ্ধান্তে অসন্তুষ্ট হয়েছেন সব থেকে বেশি। আর তাঁদের অসন্তোষ সংক্রামিত হয়েছে ক্লাব কর্তৃপক্ষের মনে।

এ ছাড়া ক্লাবগুলোর আর্থিক ক্ষতির দিকটাও বড় কম নয়। অতো খরচ করে দল গড়ার পর অর্ধেক খেলার জন্যে অন্য বছরগুলোর তুলনায় যদি অর্ধেক টাকা আসে তাহলে চিন্তার কথাই বটে। আই, এফ, এ'র কথা ছেড়ে দিলাম, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ক্ষতির দিকটাও বড় কম নয়। আজকের এই আর্থিক অনটনের যুগে কয়েক লক্ষ টাকা লোকসান বড় ফেলনা নয়।

তাই আমরা আশা করবো যে সব দিকে তাকিয়ে আই, এফ, এ কর্তৃপক্ষ তাঁদের সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করবেন। ফুটবল খেলার উন্নতি যদি সত্যিই তাঁরা করতে চান তাহলে লীগের খেলায় ওঠা-নামা প্রথা চালু করে প্রত্যেক বিভাগ থেকে প্রতিযোগী দলের সংখ্যা কিছু কমানোই যথেষ্ট বলে আমাদের মনে হয়।

তহরূপ বরবাদ

এতো কাণ্ড, এতো হৈ-চৈ—শেষ পর্যন্ত সব কিছুই হলো বরবাদ। আই, এফ, এ'র কোষাগার তহরূপের ৭৩,৮৯৫ টাকা ৭৩ পয়সার হিসেব বরবাদ হয়ে গেলো। এ বছর থেকে হিসেবের খাতায় তহরূপের ঐ টাকাটাকে আর দেখানো হবে না। অর্থাৎ বহু আলোচিত পর্বটির ওপর এবার ইতির দাঁড়িই পড়লো।

সম্প্রতি আই, এফ, এ'র বার্ষিক সাধারণ সভায় প্রতিষ্ঠানের সভাপতি শ্রীস্নেহাংশু আচার্য আই, এফ, এ'র তহবিল তহরূপ বরবাদের সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে বলেন যে, প্রতিষ্ঠানের পরিচালক সমিতির সুপারিশও ছিলো এই সিদ্ধান্তের পেছনে।

আসল কথা হলো, এতোদিন যা আশা করা গিয়েছিলো—হলোও শেষ পর্যন্ত তাই, তবে কিনা নাক বেড় দিয়ে কান ধরার মতো করে......!

সমাচার দর্পণ

দেশে

সাময়িক সংকটের পর কলকাতার হকি লীগের আসর আবার জমে উঠেছে। মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গল প্রভৃতি বড় বড় দলগুলোর খেলা সত্ত্বেও মাঠে দর্শক সমা-গমের সংখ্যা নিতান্তই কম। তবু লীগ চ্যাম্পিয়ানশীপের দিকে লক্ষ্য রেখে নামী দলগুলো প্রতিদ্বন্দ্বিতা চালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু সাতটি খেলায় পর পর জেতার পর মোহনবাগান পোর্ট কমিশনা-রের কাছে একটা পয়েন্ট হারিয়ে লীগ চ্যাম্পিয়ানশীপের দৌড়ে একটু যেন পিছিয়ে পড়েছে।

* * *

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ল' কলেজ ক্রিকেট দল এবারও এস রায় শীল্ড লাভ করেছে। প্রতিযোগিতার ফাইন্যাল খেলায় ল' কলেজ দল ১৬ রানে বিদ্যাসাগর কলে-জকে হারিয়ে দেয়। ল' কলেজের প্রথম ইনিংস ১৩৩ রানে শেষ হয়ে যায়। প্রত্যুত্তরে বিদ্যাসাগর দল তাদের ইনিংস শেষ করে ১১৭ রানে। ল' কলেজের রমেশ-রতন শ্রেষ্ঠ ব্যাটসম্যান হিসেবে পুরস্কার লাভ করেন। তিনি করেছিলেন ৫৩ রান।

* * *

১৯৬৭ সালের আই, এফ, এ শীল্ডের খেলা নিয়ে একদিকে যেমন চলেছে ছেলে-খেলা অন্যদিকে তেমনি নাটকটিও বেশ জমে উঠেছে। আর তারই ফলশ্রুতি হিসেবে আই, এফ, এ কর্তৃপক্ষ সম্প্রতি নিয়েছেন এক দায়সারাগোছের সিদ্ধান্ত। শীল্ড ফাইন্যাল খেলাটি হয় ৩০শে এপ্রি-লের মধ্যে আর তা না হলে ১২ই মে'র মধ্যে ব্যবস্থা করতে হবে। আর এ ব্যবস্থা করার ভার তাঁরা দিয়েছেন নতুন প্রতি-যোগিতা কমিটির ওপর। কিন্তু এখন প্রশ্ন উঠেছে যে ১৯৬৭ সালের জের ১৯৬৮ সালেও টানা যাবে কি না...। অর্থাৎ ১৯৬৭ সালে যাঁরা মোহনবাগান বা ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের পক্ষে খেলেছিলেন তাঁরা ১৯৬৮ সালেও কি সেই দলের পক্ষেই খেলতে পারবেন...? সুতরাং খেলা যদি হবার সম্ভাবনা দেখা দেয়ও তাহলে মনে হয় এই বিষয়টির জন্যেই ১৯৬৭ সালের আই, এফ, এ শীল্ড ফাইন্যাল খেলাটি অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে।

বিদেশে

সম্প্রতি লণ্ডনে ইংলিশ কাপ খেলার সময় এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটেছে। ৪৩ হাজার দর্শক যখন পোর্টস মাউথ বনাম ওয়েস্ট ব্রোমউইচের খেলা দেখছিলেন তখন একজন পুলিশ মাঠে ঢুকে ব্রোমউইচের জন ট্যালবট নামে জনৈক খেলোয়াড়কে বকাবকি করতে আরম্ভ করেন। রেফারীর কথামতো পুলিশ মাঠের বাইরে গেলেও, পুলিশটি নিজের কর্তব্য করবে বলে জানায়। পুলিশের মতে মাঠ থেকে কোন খেলোয়াড় গালিগালাজ করলে তাকে ধরার অধিকার পুলিশের আছে। কারণ মাঠ জনসাধারণের স্থান, সেখানে গালা-গালি করা অপরাধ। কিন্তু এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে কোন খেলোয়াড়কে রেফারী ছাড়া আর কেউ মাঠ থেকে বার করে দিতে পারে কি...?

* * *

আগামী ২রা থেকে ১৬ই মে পর্যন্ত সিউল মিউনিসিপাল স্টেডিয়ামে দশম এশিয়ান যুব ফুটবল প্রতিযোগিতা অনু-ষ্ঠিত হবে। এই প্রতিযোগিতায় এবার ১৩টি দেশ যোগদান করছে। চারটি গ্রুপে ভাগ করে খেলাগুলো হবে। আর প্রত্যেক গ্রুপ থেকে ২টি করে দলকে পরবর্তী রাউণ্ডে নক আউট প্রথায় খেলার সুযোগ দেওয়া হবে। ভারত চতুর্থ অর্থাৎ ডি গ্রুপে থাইল্যাণ্ড, ফিলিপাইন আর হংকং-এর বিরুদ্ধে খেলবে।

আইন-কানুনের দুনিয়া

ক্রিকেট খেলার আইন-কানুনে বাই আর লেগ বাই নিয়মটি গোলমেলে না হলেও অনেক সময় এই নিয়মটি নিয়ে মতভেদ দেখা যায়। তাই এই সংখ্যার প্রথমেই বাই ও লেগ বাই সম্বন্ধে আলোচনা করা হলো—

ক্রিকেট খেলার আইন-কানুনের ৩৩ নম্বর নিয়মে বলা হয়েছে—

'ওয়াইড' এবং 'নো-বল' না হলে যদি কোন বল ব্যাটসম্যানের ব্যাট বা দেহ স্পর্শ না করে চলে গিয়ে বাউণ্ডারী লাইন অতিক্রম করে তাহলে বাউণ্ডারী এবং না করলে যে কটি রান ব্যাটসম্যানেরা নিতে পারেন, সেগুলিকে 'বাই' রান ধরা হবে। আম্পায়ার তখন 'বাই' বলবেন ও তার ইশারা দেখাবেন। কিন্তু যদি বলটি ব্যাটসম্যানের হাত বাদে (হাত তো কোন অঙ্গই নয়) অন্য কোথাও লেগে দূরে যায় তাহলে যে রানগুলি হবে বা বাউণ্ডারী হলে তাকে 'লেগ বাই' ধরা হবে, আম্পায়ার তখন লেগ বাই বলবেন ও তার ইশারা দেখাবেন।

বল ব্যাটে না লেগে লেগেছে প্যাডে। ব্যাটসম্যান ইচ্ছে করেও লাগান নি। এই বলে কোন রান হলে সেই রান লেগ বাই হিসেবে গণ্য করা হবে।

(ক) কোন ব্যাটসম্যান ব্যাট ধরা হাত ছাড়া যদি ইচ্ছে করে তাঁর দেহের কোন অংশ বলে স্পর্শ করান বা পা দিয়ে বলটি ঠেলে দেন তাহলে কোন রান হবে না। আম্পায়ার তখনই বলটাকে ডেড বল বলে ঘোষণা করবেন যখন তিনি বুঝবেন যে ফিল্ডিং পক্ষ আর কোনভাবেই উভয় ব্যাটসম্যানের কাউকেই আউট করতে সক্ষম হবে না।

(খ) আম্পায়ার তাঁর এক হাত মাথার পাশ দিয়ে সোজা উপরে তুলে 'বাই' রানের ইশারা দেবেন এবং এক পা তুলে হাত ছুঁয়ে 'লেগ বাইয়ের' ইশারা দেখাবেন।

বিশেষ মতামত—

যদি কোন ব্যাটসম্যান বাম্পার বল থেকে আত্মরক্ষা করতে গিয়ে ব্যাট-ধরা অংশ হাত বাদে হাতের অন্য কোন অংশে আঘাতপ্রাপ্ত হয় এবং সে বল দূরে গেলে রান কিম্বা বাউণ্ডারী লাইন অতিক্রম করলে বাউণ্ডারী হবে না এবং তাকে লেগ বাই রান হিসেবে ধরা চলবে না।

আবেদন ছাড়া কি কোন ব্যাটসম্যান আউট হয়? এ প্রশ্ন অনেকের মনেই উঁকিঝুঁকি দেয়। তবে ক্রিকেট মাঠে 'হাউজ দ্যাট' বলে আপীল অর্থাৎ আবেদন জানাবার ভঙ্গিমাটি বড়ই মনোরম এবং ক্রিকেট খেলার সংগে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত!

ক্রিকেট খেলার আইন-কানুনের ৪৭ নম্বর নিয়মে আপীল বা আবেদন সম্বন্ধে বলা হয়েছে—

প্রতিপক্ষ দলের আবেদন অর্থাৎ আপীল ব্যতিরেকে আম্পায়ার কোন আউটের নির্দেশ দেবেন না। আবেদন পরবর্তী বলের ডেলিভারি বা ১৮ নম্বর নিয়মানুযায়ী 'টাইম' ঘোষণার আগে জানাতে হবে। বোলারের দিক্‌কার আম্পায়ার ৩৮ বা ৪২ নং নিয়মের আউটের বা ৩১ নং নিয়মের স্ট্রাইকারের দিকেই রান আউটের আবেদন ব্যতীত সব নিয়ম বা ৪১ নং নিয়ম অনুসারে স্ট্রাইকারের দিকের রান আউটের বেলায় লেগ আম্পায়ার নির্দেশ দেবেন। কোন ক্ষেত্রে একজন আম্পায়ার যদি মতামতের জন্যে অপরজনের কাছে আবেদন জানান, তাহলে অপরজনের নির্দেশই কার্যকরী হবে।

দ্রষ্টব্য—

(ক) 'হাউজ দ্যাট' বলে আউটের জন্যে আবেদন জানানো হয়। আম্পায়ার মাথার ওপর তর্জনী (আঙুল) তুলে আউটের ইশারা দেবেন, এবং ব্যাটসম্যান আউট না হলে, 'নট আউট' বলবেন। এই 'হাউজ দ্যাট' আবেদনে সব রকম নিয়মের আউটের আবেদন আছে বলে ধরা হয়, যতক্ষণ না কোন বিশেষ আউটের আবেদন হচ্ছে। একজন আম্পায়ার আবেদন অগ্রাহ্য করলেও অপর আম্পায়ার তাঁর নিজের আওতার মধ্যে নিয়ম লঙ্ঘনের জন্য আউট দিতে পারেন, অবশ্য সেই সময়েই এটা চলতে পারে।

(খ) আম্পায়ার তাঁর নির্দেশ নাকচ করে দিতে পারেন, তবে খুব তাড়াতাড়ি করতে হবে।

(গ) প্রয়োজন মনে করলেই আম্পায়াররা কোন আবেদনের ব্যাপারে ঘটনা সম্পর্কে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করতে পারেন। কোন আম্পায়ারের যখন নির্দেশ দিতে সন্দেহ হচ্ছে না, তখন তিনি অপর আম্পায়ারের সংগে আলোচনা করবেন না। দুজন আম্পায়ারের মধ্যে আলোচনা হবার পরেও যদি সন্দেহ থাকে, তাহলে ব্যাটসম্যানের স্বপক্ষেই নির্দেশ যাবে, অর্থাৎ ব্যাটসম্যান আউট হবেন না।

(ঘ) যদি কোন ব্যাটসম্যান আউট না হয়েও ভুল বুঝে উইকেট ছেড়ে চলে আসেন, সেক্ষেত্রে আম্পায়ার ব্যাপারটিতে হস্তক্ষেপ করবেন।

(ঙ) ২৫ নং নিয়মানুযায়ী 'ওভার' ডাকা হলেই বলটি 'ডেড' হয়ে যায়; কিন্তু তা সত্ত্বেও পরবর্তী ওভারের প্রথম বলটি যতক্ষণ না দেওয়া হচ্ছে ততক্ষণ আবেদন চলতে পারে। কিন্তু টাইম ঘোষণার পর বেল তুলে নিলে আর আবেদন গ্রাহ্য হবে না।

পরিচীয়তে

অম্বর রায়

বাংলা দেশে কি এমন কোন খেলোয়াড় নেই, যিনি ভারতীয় দলের হয়ে খেলতে সমর্থ ?

ও প্রশ্নের উত্তরে কে যেন বলেছিলেন, "কেন সুব্রত গুহ তো রয়েছে!"

হ্যাঁ, সুব্রত গুহ আছেন ঠিকই, কিন্তু আমাদের মনে হয় সুব্রত গুহর অনেক আগেই আর একজন বাঙালী খেলোয়াড়ের ভারতীয় দলে স্থান লাভ করা উচিত ছিলো। আর ভারতীয় ক্রিকেট কর্তৃপক্ষের উচিত ছিলো বাংলার এই খেলোয়াড়টিকে ভারতীয় দলের পক্ষে প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ দেওয়া।

কিন্তু সে সুযোগ আজো পেলেন না অম্বর রায়। কেন যে পেলেন না, এ কথা আমরা কেউই জানি নে। আমরা শুধু জানি যে একজন যোগ্য খেলোয়াড়কে বছরের পর বছর শুধু অবহেলাভরে দূরে সরিয়ে রাখা হচ্ছে। ভাবতে অবাক লাগে যে রমেশ সাক্সেনার মতো খেলোয়াড়ও যখন ভারতীয় দলের প্রতিনিধি হিসেবে বারবার বিদেশ ভ্রমণে যেতে পারেন—তখন বাংলার অম্বর রায়ের কথা কেন একবারও মনে করা হয় না? কিন্তু আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, রমেশ সাক্সেনার থেকে অম্বর রায় কোন অংশেই কমতি নন!

তাই আমরা আশা করেছিলাম যে পঙ্কজ রায়ের পর তাঁরই ভাইপো অম্বর রায়, রায়বাড়ির ট্রাডিশন বজায় রেখে পূরণ করবেন তাঁর শূন্য স্থানটি। কিন্তু আমাদের সে আশা পূরলো না। অবশ্য তার জন্যে দায়ী অম্বর নন, দায়ী ভারতীয় ক্রিকেট কনট্রোল বোর্ডের চরম উদাসীনতা।

তবু খেলোয়াড় হিসেবে অম্বর রায় সাফল্য লাভ করেছেন যথেষ্ট। অবশ্য যাঁদের বিচার টেস্ট খেলার ওপর নির্ভর করে, তাঁরা হয়তো আমাদের সংগে একমত হবেন না। তবু আমরা বলতে বাধ্য যে অম্বরের খেলায় আছে সহজ সরল অথচ পরম নিপুণতার ছাপ। মনোরম ভঙ্গিমা আর আত্মবিশ্বাসে ভরপুর ক্রীড়া-ছন্দে-ছন্দায়িত মারের চমক! ব্যাটে-বলের মধুর কুলতানে অম্বর রমণীয় ক্রিকেটাঙ্গনকে রোমাঞ্চিত করে তুলতে পারেন। শুধু ব্যাটসম্যান হিসেবেই নন নিপুণ ফিল্ডার হিসেবেও অম্বর অতুলনীয়।

কি তাড়াতাড়িই না বছরগুলো গড়িয়ে গেল। কুমারটুলি পার্কের সেই ছোট্ট অম্বর হঠাৎ যেন বড় হয়ে গেছে! মনে হয় যেন এই তো সেদিন অম্বর তার ব্যাট নিয়ে ছোটাছুটি করতো পার্কের আনাচে-কানাচে!

তারপর একদিন নীহার মিত্তিরের চোখ পড়লো পঙ্কজ রায়ের ভাইপো

অম্বর রায়

অম্বর রায়ের ওপর। কুমারটুলি পার্ক থেকে অম্বর রায় সোজা এসে হাজির হলো স্পোর্টিং ইউনিয়ন মাঠে! আর তারপরই শুরু হলো ক্রিকেটার অম্বর রায়ের জয়যাত্রা।

১৯৫৭ সালে অম্বর স্পোর্টিং ইউনিয়নে আসেন। যতোদূর মনে পড়ছে তখন তাঁর বয়েস ছিলো সম্ভবত ১৪ বছর। পরের বছর থেকে ক্লাবের পক্ষে আর তার পরের বছর থেকে বাংলা দলের পক্ষে খেলতে আরম্ভ করেন অম্বর রায়। প্রথম শ্রেণীতে তাঁর প্রথম খেলাটি ছিলো রঞ্জি ট্রফিতে উড়িষ্যার বিরুদ্ধে। তারপর এলো ভারত সফরকারী পাকিস্তান ও এম, সি, সি (ডেক্সটারের অধিনায়কত্বে) দলের বিরুদ্ধে খেলার সুযোগ।

কিন্তু প্রথম শ্রেণীর খেলায় প্রথম শত রান করার জন্যে অনেকদিন অপেক্ষা করতে হয়েছিলো অম্বর রায়কে। ১৯৬৩-৬৪ সালে জামসেদপুরে অনুষ্ঠিত বিহারের বিরুদ্ধে রঞ্জি ট্রফির খেলায় ১০৩ রান করে প্রথম শত রান লাভের কৃতিত্ব অর্জন করেন অম্বর রায়।

এরপর অম্বর রায় সেঞ্চুরী করেছেন অনেক খেলায়, অনেক খেলায় দিয়েছেন অসামান্য কৃতিত্বের পরিচয়। কিন্তু আমার চোখে আজো ভাসছে আজ থেকে বছর আটেক আগের সেই উজ্জ্বল দিনগুলোর স্মৃতি।

সতেরো বছরের বাচ্চা ছেলে অম্বর রায়ের যে খেলা সেদিন দেখেছিলাম—তার তুলনা মেলা ভার। পঙ্কজ রায়ের কথা ছেড়ে দিলাম। হায়দ্রাবাদের বিরুদ্ধে তাঁর সেই দু' ইনিংসে সেঞ্চুরীর কথা আজ ইতিহাসের পাতায় স্থান নিয়েছে। কিন্তু সেই খেলার দ্বিতীয় ইনিংসে অম্বরের ৪৪ রানের কথাও তো ভোলার নয়। বাংলা সে খেলায় ১৮৪ রানে জিতেছিল। হয়তো সে জয়লাভের পেছনে পঙ্কজ রায়ের দু' ইনিংসে সেঞ্চুরী আর ডি, এস, মুখার্জীর অসামান্য বোলিংই ছিলো আসল। তবু অম্বর রায়ের সেই ৪৪ রানের ইনিংসটির কথা আজো আমরা ভুলতে পারি নি। এও ভুলতে পারি নি যে বাংলার জয়লাভের পেছনে অম্বর রায়ের অসামান্য অবদানের কথা।

তবু অম্বর রায় আজো টেস্ট খেলার সুযোগ পেলেন না। বেসরকারী টেস্ট ম্যাচে খেলেছেন বটে, কিন্তু আসল টেস্ট খেলার সুযোগ আজো অম্বর রায়কে দেওয়া হলো না। কিন্তু কেন এই অবহেলা? জানি এ প্রশ্নের উত্তর আমরা কোনদিনই পাবো না......!!

সম্পাদিকা—জয়ন্তী সেন

বসুমতী (প্রাঃ) লিঃ-এর পক্ষে ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীটস্থ কলিকাতা-১২
বসুমতী প্রেস হইতে শ্রীসুকুমার গুহমজুমদার কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বসুমতীর কালজয়ী গ্রন্থরাজি

॥ গ্রন্থনসৌষ্ঠবে নয়নাভিরাম ॥

ালিদাস গ্রন্থাবলী— ১ম ৬-০০
ালিদাস গ্রন্থাবলী— ২য় (যন্ত্রস্থ) ৬-০০
ালিদাস গ্রন্থাবলী— ৩য় ৮-০০
াইকেল গ্রন্থাবলী— ১ম ৪-৫০
াইকেল গ্রন্থাবলী— ২য় ৩-৫০
ঙ্কিম গ্রন্থাবলী (উপন্যাস)—১ম ৪-৫০
ঙ্কিম গ্রন্থাবলী (উপন্যাস)—২য় ৪-৫০
ঙ্কিম গ্রন্থাবলী (উপন্যাস)—৩য় ৪-৫০
ঙ্কিম গ্রন্থাবলী (সাহিত্য)—১ম ৩-০০
ঙ্কিম গ্রন্থাবলী (সাহিত্য)—২য় ৪-৫০
ঙ্কিম গ্রন্থাবলী (সাহিত্য)—৩য় ৪-৫০
দ্বিজেন্দ্রলাল গ্রন্থাবলী— ১ম ৬-০০
" " ২য় ৬-০০
" " ৩য় ৮-০০
সক্সপীয়র গ্রন্থাবলী—১ম খণ্ড ৪-৫০
সক্সপীয়র গ্রন্থাবলী—২য় খণ্ড ৪-৫০
ত্রৈলোক্য গ্রন্থাবলী— ১ম ৩-০০
ত্রৈলোক্য গ্রন্থাবলী— ২য় ৩-০০
দীনবন্ধু মিত্র গ্রন্থাবলী— ১ম ৩-০০
মানিক গ্রন্থাবলী— ১ম ৩-০০
মানিক গ্রন্থাবলী— ২য় ৩-০০
দামোদর গ্রন্থাবলী— ১ম ৩-৩০
দামোদর গ্রন্থাবলী— ৪র্থ ৪-০০
অমৃতলাল গ্রন্থাবলী— ১ম ৩-০০
অমৃতলাল গ্রন্থাবলী— ২য় ৪-০০
অমৃতলাল গ্রন্থাবলী— ৩য় ৪-০০
যোগেশ গ্রন্থাবলী— ২য় ৩-০০
বিহারীলাল গ্রন্থাবলী— ৩-০০
রঙ্গলাল গ্রন্থাবলী— ৩-০০
উপেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় গ্রন্থাবলী— ৩-০০
রামপ্রসাদ সেন গ্রন্থাবলী— ৩-০০
হরপ্রসাদ শাস্ত্রী গ্রন্থাবলী— ৫-০০
ঈশ্বরগুপ্তের গ্রন্থা:—১ম ও ২য় খণ্ড ৫-০০
ভারতচন্দ্র গ্রন্থাবলী— ৩-০০
স্কট গ্রন্থাবলী— ২য় ৩-০০
স্কট গ্রন্থাবলী— ৩য় ৩-৩০

দীনেন্দ্র রায় গ্রন্থাবলী— ১ম ৪-৫০
দীনেন্দ্র রায় গ্রন্থাবলী— ২য় ৪-৫০
নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ের গ্রন্থা:— ৪-০০
প্রভাবতী দেবী গ্রন্থাবলী— ৩-৫০
বিভূতিভূষণ মুখো: গ্রন্থাবলী— ৪-৫০
রামনাথ বিশ্বাস গ্রন্থাবলী— ৩-৫০
শৈলজা গ্রন্থাবলী— ১ম ৩-৫০
শৈলজা গ্রন্থাবলী— ২য় ৩-৫০
মণিলাল বন্দ্যো: গ্রন্থা:—১ম ৩-৫০
মণিলাল বন্দ্যো: গ্রন্থা:—২য় ৩-৫০
অসমঞ্জ গ্রন্থাবলী— ৪-০০
সংসাহিত্য গ্রন্থাবলী— ১ম ৪-০০
সংসাহিত্য গ্রন্থাবলী— ২য় ৪-০০
সংসাহিত্য গ্রন্থাবলী— ৩য় ৪-০০
সংসাহিত্য গ্রন্থাবলী— ৪র্থ ৩-০০
রামপদ মুখার্জী গ্রন্থাবলী— ৪-০০
হেমেন্দ্র রায় গ্রন্থাবলী— ৬-০০
মতিলাল দাসের গ্রন্থাবলী— ৩-০০
জগদীশ গুপ্তের গ্রন্থাবলী— ৩-৫০
বিভূতিভূষণ ভট্টের গ্রন্থাবলী— ৩-৫০
শচীশ চট্টো: গ্রন্থা:—২য় ভাগ ৩-০০
সৌরীন্দ্রমোহন মুখো: গ্রন্থা:—৩য় ৩-০০
সৌরীন্দ্রমোহন মুখো: গ্রন্থা:—৫ম ৩-০০
বিদ্যাসুন্দর গ্রন্থাবলী— ৫-০০
কথাসরিৎসাগর—১ম ভাগ ৪-০০
কথাসরিৎসাগর—২য় ভাগ ৪-০০
অরবিন্দ দত্তের গ্রন্থাবলী— ৩-০০
জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের গ্রন্থাবলী—
১ম, ২য়, ৩য়—প্রতি খণ্ড ৪-০০
ক্ষীরোদ গ্রন্থাবলী ২য় ও ৪র্থ হইতে
৮ম খণ্ড—প্রতি খণ্ড— ৩-৫০
ডিকেন্সের গ্রন্থাবলী—২য় ৪-০০
চারু বন্দ্যোপাধ্যায়ের গ্রন্থাবলী— ৪-০০
বিলাতী গুপ্তকথা—২য়ভাগ ৫-০০

নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের গ্রন্থাবলী—
১ম ও ২য় ভাগ—প্রতি ভাগ ৩-০০
নারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্যের গ্রন্থাবলী—
৩য় খণ্ড ও ৬ষ্ঠ খণ্ড—প্রতি খণ্ড ৩-০০
যোগেন্দ্র বিদ্যাভূষণের গ্রন্থাবলী—
২য় ভাগ ৩-০০
ভারতীয় সঙ্গীতের ইতিহাস—
গোপেশ্বর বন্দ্যো:—১ম ও ২য় ভাগ
প্রতি খণ্ড ৫-০০
কবিকঙ্কণ চণ্ডী— ৪-৫০
জ্যোতিষ রত্নাকর— ৩-৫০
পরলোক— ৪-৫০
পরলোক রহস্য— ২-০০
পরলোক ও প্রেততত্ত্ব— ৪-৫০
দৃশ্যকাব্য পরিচয়— ১০-০০
নাড়ীজ্ঞান প্রদীপিকা— ৩-০০
ভারত প্রতিভা— ৫-০০
সাধক কমলাকান্ত— ২-৫০
মহারাজ নন্দকুমার— ৩-০০
ছত্রপতি শিবাজী— ৩-০০
জালিয়াৎ ক্লাইভ— ৩-০০
বিক্রমাদিত্য— ৩-০০
বিসমার্ক— ২-০০
সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তীর আত্মজীবনী— ৩-০০

যৌন-মনোদর্শন
২য় ভাগ : স্বয়ং রতি ৪-০০
৩য় ভাগ : কামাবেগের বিশ্লেষণ ৪-০০
৪র্থ ভাগ : প্রেম ও পীড়া ৪-০০
৫ম ভাগ : কামাবেগের নিয়ন্ত্রণ-
কালিকত্বের ব্যাপার সমূহ ৪-৫০
৬ষ্ঠ ভাগ : রমণীর যৌন আবেগ ৪-০০
কুট্টনীমতম্ — ৪-০০
ANANDAMATH ৪-০০
(শ্রীঅরবিন্দ কর্তৃক ইংরেজী অনুবাদ)
DAVID HARE ৪-০০

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড ॥ ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলি-১২

Thursday, 11th April, 1968 SAPTAHIK BASUMATI Regd. No. C71
Price: 30 Paise Gram: "Basumati" Phone: 34-7771, 72, 73, 74

কি বলে,
'কুকমী' গুঁড়ো মশলা?

16 APR 1968

গ্রাম: "স্পাইসমার্ট" মিল-কাশীপুর ফোন: ৩৩-১২৩২, ৩৩-২০৮১

নিজস্ব মিলে বৈজ্ঞানিক প্রথায় প্রস্তুত

'কুকমী'—সর্বাধিক বিক্রীত গুঁড়ো মশলা।

পনের লক্ষ প্যাকেট মাসিক বিক্রয়

১২৫ বৎসরের অধিক প্রাচীন ও বর্তমানে মশলার বৃহত্তম প্রতিষ্ঠান

কৃষ্ণচন্দ্র দত্ত (স্পাইস) প্রাঃ লিঃ ২০১নং ও ২০৫নং মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড, পোস্তা, কলিকাতা-৭

সাপ্তাহিক বসুমতী

মার্টিন লুথার কিং-এর অন্তিমযাত্রা

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শহরে শহরে এখনও দাঙ্গাহাঙ্গামা

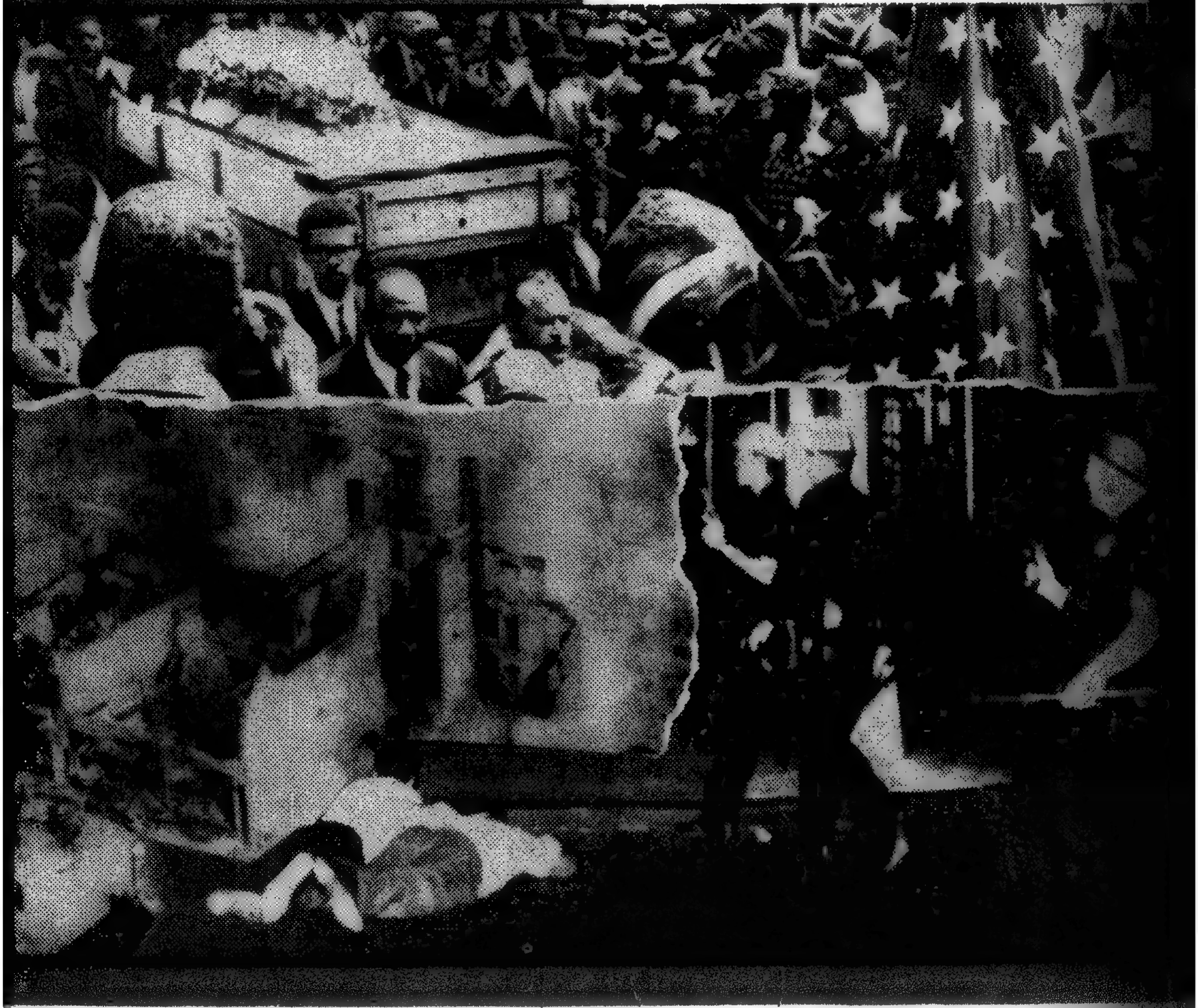

৭২ বর্ষ: ৪৪শ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ৫ই বৈশাখ, ১৩৭৫ বঙ্গাব্দ | OLDEST WEEKLY OF NORTH INDIA | 72nd year, No. 44, 18th April, 1968

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয়		২৭৫৫
আজকের মানুষ		২৭৫৬
রঙ্গদর্শন		২৭৫৭
অবক্তব্য	— চন্দ্রগুপ্ত	২৭৬২
ভারতদর্শন		২৭৬৫
আন্তর্জাতিক		২৭৬৮
রবীন্দ্রনাথ ও সুভাষচন্দ্র (ধারাবাহিক প্রবন্ধ)	— শঙ্করীপ্রসাদ বসু	২৭৭১
তিনটি সর্বভারতীয় কবিতা (কবিতা)	— বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	২৭৭৫
পোএট্রি ট্রান্সপোর্ট কোং-(কবিতা)	— সুরঞ্জনা রায়	২৭৭৫
লুথার কিং-কে নিবেদিত (কবিতা)		
(এক)	— কল্যাণকুমার দাশগুপ্ত	২৭৭৬
(দুই)	— দুর্গাদাস সরকার	২৭৭৬
(তিন)	— জয়ন্ত সাহা	২৭৭৬
(চার)	— জয়ন্তী সেন	২৭৭৬

॥ নাটক ॥ নাটক ॥ নাটক ॥ নাটক ॥ নাটক ॥

বহুকাল পরে আবার পাওয়া যাচ্ছে।

ম হা ক বি

গিরিশচন্দ্র ঘোষের রচনাবলী

প্রথম খণ্ড : প্রফুল্ল, ম্যাকবেথ, ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব ও স্বামী বিবেকানন্দ সম্পর্কে চারটি প্রবন্ধ, তিনখানি গীতিনাট্য ও গ্রন্থপরিচয়। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪১২। মূল্য দশ টাকা।

দ্বিতীয় খণ্ড : সিরাজউদ্দৌলা; য্যায়সা কা ত্যায়সা; জনা; দেললীলা ও গ্রন্থপরিচয়। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩৫৮। মূল্য দশ টাকা।

তৃতীয় খণ্ড : পাণ্ডবগৌরব, বলিদান, আবুহোসেন ও গ্রন্থপরিচয়। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩৫২। মূল্য দশ টাকা।

চতুর্থ খণ্ড : চৈতন্যলীলা, ভ্রান্তি, মলিনাবিকাশ, হীরার ফুল, বিবিধ রচনা ও গ্রন্থপরিচয়। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩০২। মূল্য দশ টাকা।

পরমহংসদেব শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর ভক্ত-শিরোমণি অতি প্রিয় নোটো গিরিশকে বলেছিলেন, —"অভিনয়ের প্রয়োজন আছে বৈ-কি—ওতে লোকশিক্ষা হবে। আর তোমার লেখা—ও যে ভারি ভাল হয়েছে।"

প্রতিটি খণ্ড বোর্ডে বাঁধাই। মূল্যবান কাগজে ছাপা।

রচনাবলী সম্পাদনা : শ্রীরমেন চৌধুরী

অবিলম্বে অর্ডার পেশ করুন।

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড : ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলি-১২

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
পথ কে রুখবে? (ধারাবাহিক উপন্যাস)	— মনোজ বসু	২৭৭৮
অগ্নিযুগের একটি অধ্যায়	— অনন্ত সিংহ	২৭৮১
ভিয়েৎনাম : ঝড়ের কেন্দ্রে (প্রবন্ধ)	— বরুণ রায়	২৭৮৫
যা দেখেছি, যা পেয়েছি (স্মৃতিচয়ন)	— সুধীরঞ্জন দাস	২৭৯২
কাঠের পা (গল্প)	— শক্তিপদ রাজগুরু	২৭৯৭
পূর্ব জার্মানী ও সোভিয়েট দেশ পরিক্রমা	— অশোক সেন	২৮০৪
রঙ্গজগৎ		২৮০৭
খেলাধুলো	— শান্তিপ্রিয়	২৮১২

আমাদের বই পাঠককে তৃপ্তি দেয় : পাঠাগারের গৌরব বৃদ্ধি করে

৭ই চৈত্রের বই
ফণিভূষণ দেব-এর
পরলোক সমীক্ষণ ১০·০০

সদ্য প্রকাশিত গ্রন্থসমূহ :
গজেন্দ্রকুমার মিত্রের উপন্যাস
শুভবিবাহ কথা ৩·০০
বনফুল-এর উপন্যাস
প্রচ্ছন্ন মহিমা ৪·০০
আশাপূর্ণা দেবীর
কাচ পুঁতি হীরে ৯·০০
স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস
অপরাহ্ণের আলো ৪·০০
বোধিসত্ত্ব মৈত্রেয়র উপন্যাস
সেই প্রেম আস্বাদন ৩·০০
বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের উপন্যাস
রিকশার গান ৫·০০
সঞ্জয় ভট্টাচার্যের উপন্যাস
সৃষ্টি ৫·৫০

সরোজকুমার রায়চৌধুরীর
অনুষ্টুপ ছন্দ ৫·০০
মহাশ্বেতা দেবীর
অমৃত সঞ্চয় ১০·০০
হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের
বাসরলগ্ন ৯·০০
শচীন্দ্র মজুমদারের
লীলা মৃগয়া ৩·০০
জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর
নীলরাত্রি ৩·৫০
বুদ্ধদেব বসুর
হে বিজয়ী বীর ৩·৫০
প্রেমেন্দ্র মিত্রের
মৌসুমী ৩·০০
কণাদ গুপ্তের
পূর্ব মীমাংসা ২·৫০

রামপদ মুখোপাধ্যায়ের
মেঘলা আকাশ ২·০০
দীপক চৌধুরীর
ললিতা প্রসঙ্গ ৮·০০
দেবেশ দাশের
রক্তরাগ ৪·৫০
প্রশান্ত চৌধুরীর
স্বগতোক্তি ৩·২৫
বিমল মিত্রের
সুয়োরাণী ৩·২৫
শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের
সসেমিরা ৩·০০

কবিতা : প্রবন্ধ : উপহারের অনবদ্য
প্রেমেন্দ্র মিত্রের
সম্রাট ২·০০ : কখনো মেঘ ৪·০০
দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের
কবিতা-চয়ন ৫·০০
ডঃ উমা দেবীর
অরণ্য-মন ৪·০০

ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোম্পানী প্রাইভেট লিঃ
গ্রাম : কালচার (বি) — ৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা—৭ — ফোন : ৩৪-২৬৪১

৭২ বর্ষ : ৪৪শ সংখ্যা—মূল্য : ৩০ পয়সা বাংলা ভাষায় দ্বিতীয় সর্বাধিক প্রচারিত সাপ্তাহিক পত্রিকা
বৃহস্পতিবার, ৫ই বৈশাখ, ১৩৭৫ বঙ্গাব্দ
PRICE : 30 Paise
Thursday, 18th April, 1968

শুচি হোক

"এসো, এসো, এসো হে বৈশাখ।
তাপসনিশ্বাসবায়ে মুমূর্ষুরে দাও উড়ায়ে,
বৎসরের আবর্জনা দূর হয়ে যাক ॥
যাক পুরাতন স্মৃতি, যাক ভুলে-যাওয়া গীতি,
অশ্রুবাষ্প সুদূরে মিলাক ॥
মুছে যাক গ্লানি, ঘুচে যাক জরা,
অগ্নিস্নানে শুচি হোক ধরা।
রসের আবেশরাশি শুষ্ক করি দাও আসি,
আনো আনো আনো তব প্রলয়ের শাঁখ
মায়ার কুজ্ঝটিজাল যাক দূরে যাক ॥"

পুরাতন বছরের বিদায়ের সঙ্গে সঙ্গে নতুন বছরের আবির্ভাবে রবীন্দ্রনাথের এই বাণী আমাদের জীবনে সত্য হোক। যে বৈশাখ এলো, তার কাছেও আমাদের জবাবদিহি আছে। বিশেষভাবে এই বাংলা দেশ কালবৈশাখীর নির্মম কঠিন রূপের সঙ্গে প্রত্যক্ষ ভাবে পরিচিত। তাই বৈশাখ এলেই, ভয়ে ভয়ে প্রথামতো, আমরা বড় বড় প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করি—কিন্তু তা যে এখন প্রথানুগতে মলিন আকার ধারণ করেছে—তাও অস্বীকার করা যায় না। আর প্রথাগত শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন শেষ হলেই পুনরায় একই ধরণের হিসাব, স্বার্থবুদ্ধির প্রসার—এমন কি তাৎক্ষণিক লাভালাভকে শ্রেয় বলে মনে করি। বিরাট সমাজদেহে এবং সুবিরাট রাষ্ট্রের অস্থি-পঞ্জরে যে পচনশীলতা কিংবা ঘুণ ধরার লক্ষণ নিয়ে চারদিকে এতো হৈ চৈ—তার বিরুদ্ধে প্রলয় শাঁখ বাজাবার কেউ নেই। স্বভাবতই মনে হয়, এখানে ভণ্ডামিরই প্রাধান্য, আন্তরিকতার সন্ধান পাওয়া সহজসাধ্য ব্যাপার নয়। যে যৌবশক্তির জয়গান করা হয়, তাও প্রলাপোক্তির মতো শোনায়। কারণ রাজনীতিতে, শিক্ষা ও সাহিত্য জগতে ধুকপুক করতে করতে মুমূর্ষুরাই আসন ত্যাগের অনিচ্ছায় ভাঙা হাল ধরে থেকে সাধারণকে মাঝদরিয়ায় নিয়ে গিয়ে তাদের ভরাডুবির ব্যবস্থা করতে চায়। হয়তো এ তাদের সম্পূর্ণ ইচ্ছাপ্রসূত নয়, কিন্তু দলীয় স্বার্থ ও ব্যক্তিগত সুবিধাবাদের নীতিতে এ অঘটন ঘটানো ছাড়া গত্যন্তর থাকে না।

গত বছরের স্মৃতিরোমন্থন করা নিষ্প্রয়োজন—একথা স্মরণীয় হলেও এটাও মনে রাখতে হবে—মুমূর্ষুর দল—যারা গত বছর ভোটদাতা জনসাধারণের বিরুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে—এ বছর অন্তর্বর্তী নির্বাচনকালে সেই জনসাধারণকেই বিশ্বাসঘাতক প্রতিক্রিয়াশীল চক্রের বিরুদ্ধে উপযুক্ত জবাব দিতে হবে। দুর্ভাগ্যের ব্যাপার, বছরের শুরু হবার আগে থেকেই মায়ার কুজ্ঝটিজাল সৃষ্টি করা হয়েছে। তাই জনসাধারণের সৃষ্টি যুক্তফ্রন্টকে বিপদগ্রস্ত করে তোলার জন্য বিভেদনীতি মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। তবে রাজনীতিসচেতন মানুষ এখন জানে, কোনটা মায়া, কোনটা আসল সত্য। একটা অপূর্ব তৃতীয় শক্তি খাড়া করে তোলার যারা আজ সহায়ক—জনগণ তাদের ক্ষমা করবে না। তবে যে বিভ্রান্তি সৃষ্টির চেষ্টা হচ্ছে—তার বিরুদ্ধে জনসাধারণকেই সদা সতর্ক থাকতে হবে।

দেশের রাজনৈতিক ভাবধারা যখন ঘূর্ণাবর্তে পতিত হয়, তখন সাহিত্য, সংস্কৃতি, শিক্ষা, অর্থনীতি—সর্বক্ষেত্রেই অস্থিরতা বিরাজ করে। দেশের মানুষ আশা করে—দেশের চিত্ত যখন শুষ্ক প্রায়—তখন সাহিত্যই তাকে রসপূর্ণ করে তুলবে, তাকে প্রেরণা দেবে। কিন্তু বলতে দ্বিধা নেই—পশ্চিমবাংলায় অতি অল্পসংখ্যক সাহিত্যিক মানুষের সুখ, দুঃখ ও মানবতার প্রকাশ সাহিত্যে রাখতে পারছেন—বাকি প্রায় সকলেই পুরস্কারলোভী, লুব্ধপ্রচারক এবং উদ্দেশ্যহীন। এ যুগে সংবাদপত্রসমূহের বিশেষ শক্তি অনস্বীকার্য। সেই সংবাদপত্রের পরিবেশিত সংবাদও প্রতিদিন বাদ-প্রতিবাদে ভরপুর। সুতরাং আসল সত্য আর ধরা পড়ে না।

শিক্ষা ক্ষেত্রেও নৈরাজ্য। তা থেকে উদ্ধার পাবার পথ যেন নেই। শিক্ষক ও ছাত্রের অসন্তোষ ভিন্নরূপ হলেও একই পথে পরিচালিত। সরকারও বহু প্রতিশ্রুতিসহ শিক্ষা ক্ষেত্রে গড়িমসি নীতিকেই আঁকড়ে ধরে আছে। তাছাড়া শিক্ষার মর্যাদাই বা কতটুকু রক্ষিত হচ্ছে। ঘরে ঘরে শিক্ষিত বেকারের জন্য যখন দুর্ভাবনার অন্ত নেই, তখন সরকার আধুনিকীকরণের নামে কম্পিউটারের জন্য লোভার্ত হয়ে উঠেছে। (অথচ সারা দেশটার দিকে তাকিয়ে দেখলেই বোঝা যায় আধুনিকতার প্রতি সরকারের কী ধরণের দরদ !) লক্ষ লক্ষ যুবককে বেকার রেখে প্রগতি সাধিত হয় না বরং বিপ্লবের পথ তৈরি করে দেওয়া হয়। পশ্চিমবাংলায় যুবমনে হতাশার মৌলিক কারণ অর্থনীতিগত—এ সত্য মেনে নিয়ে সমাধানের দিকে এগিয়ে যেতে হবে। কোটি কোটি লোককে অর্ধভুক্ত বা অভুক্ত রেখে কোটি কোটি টাকার মালিক যে সুখস্বপ্ন দেখছে—একদা তা দুঃস্বপ্নে পরিণত হবে—যদি সকলের কল্যাণের জন্য অবিলম্বে কিছু করা না হয়।

গত বছর—একদিকে যেমন বিশ্বাস, আর একদিকে তেমনি বিশ্বাসহননের বছর হয়ে আমাদের কাছে অবিস্মরণীয় মনে হলেও অবিশ্বাসকে দূর করে বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে। 'অগ্নিস্নানে শুচি হোক ধরা'—একমাত্র এই বোধেই নিহিত আছে জনমানসে নতুন ফসল ফলনের সুদৃঢ় সম্ভাবনা।

সম্পাদকীয়

আজকের মানুষ

পিয়ের ত্রুদো

পার্লামেন্টের মুখ দেখেছেন মাত্র তিন বছর আগে। মন্ত্রিত্বের অভিজ্ঞতা সবে বছরখানেকের। এরি মধ্যে...? তা হোক। নিয়োগকর্তা যখন বলেন নি যে 'প্রার্থীকে অবশ্যই একজন ঝানু পার্লামেন্টারীয়ান হতে হবে, কিম্বা মন্ত্রিগিরিতে অন্তত ১০ বছরের অভিজ্ঞতা থাকা চাই ইত্যাদি' তখন দেশের প্রধানমন্ত্রীর পদ পেতে তাঁর বাধা কোথায়। কানাডার শাসকদল লিবারেল পার্টির নেতা নির্বাচিত হয়েছেন পিয়ের এলিয়ট ত্রুদো। অর্থাৎ বিদায়ী প্রধানমন্ত্রী লিস্টার পিয়ারসনের সম্মানীয় পদটি তিনি কয়েকদিনের মধ্যেই পেতে চলেছেন।

পিয়ের ত্রুদো। হ্যাঁ নামটা ফরাসীই বটে। ত্রুদো কানাডার ফরাসী-অধ্যুষিত কুইবেকে এক ফরাসী পরিবারেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন আজ থেকে ৪৬ বছর আগে। জন্মসূত্রে ফরাসী হলেও ত্রুদোর কিন্তু কোন গোঁড়ামি নেই। অর্থাৎ কুইবেককে কানাডা থেকে আলাদা দেখার বাতিক তাঁর নেই। তবে আর পাঁচজন ফরাসী-কানাডিয়ানের মত ফরাসী ভাষাকে ইংরেজী ভাষার সমমর্যাদায় দেখতে অবশ্যই চান। ত্রুদোর কাছে দুই-ই সমান, ফরাসীভাষাভাষীও যা, ওঁর কাছে ইংরেজীভাষাভাষীও তাই। এই উদার মনোভাব ত্রুদোর একটা গুণ অবশ্যই, এবং আজ যে তিনি প্রধানমন্ত্রীর গদি পেয়েছেন তার অন্যতম কারণ বোধ হয় তাঁর ওই যোগ্যতা রয়েছে বলে।

কিম্বা হয়তো মসিয় ত্রুদো নিজে একজন সেরা স্পোর্টসম্যান বলে প্রধানমন্ত্রিত্বকেও একটা স্পোর্টস হিসেবে নিয়েছেন। খেলাধুলোর দিকে ত্রুদোর ঝোঁক ভয়ানক। গাড়ি চালানো তাঁর কাছে একটা বড় মজার খেলা। নিত্যনতুন গাড়ি চড়বেন, চালাবেন। স্টিয়ারিং ধরেই তিনি একসিলেটরে চাপ দেন এবং টপ গিয়ারে। গাড়ি চড়ে বেড়াবার সখ তাঁর নেই, সময়ও বোধ হয় কম, ত্রুদো স্পোর্টস কার নিয়ে ঝড়ের বেগে ছোটেন। স্কি যখন করেন তখনো তাঁর রক্তে ঝড়ের উন্দাম, মরিয়া হয়ে ঝাঁপ দেন এক তুষার-পাহাড় থেকে অন্য তুষার-পাহাড়ে। খেলেন স্কিন ডাইভ, খেলেন জুডো। বস্তুত চালে-চলনে, বেশ-বাসে পিয়ের ত্রুদো বললেই কানাডাবাসীদের চোখের সামনে একজন তুখোড় খেলোয়াড়ের ছবিটাই ভেসে ওঠে। পোষাক-আশাকের দিকে তাঁর নজর অত্যন্ত প্রখর। সব সময়েই ফিটফাট ধোপদুরস্ত হয়ে থাকেন তিনি। এবং পোষাক তাঁর কাছে এত প্রিয় যে, তিনি স্থান-কাল ভুলে গিয়ে স্রেফ জার্সি পরে একবার পার্লামেন্টে গিয়ে হাজির হয়েছিলেন। তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী জর্জ ডিফেনবেকার ওই পোষাকের জন্যে তাঁকে বার করে দিয়েছিলেন পার্লামেন্ট থেকে। ত্রুদো বলেছিলেন তাই সই, ভেতরে পারবো না, কিন্তু পার্লামেন্টের বাইরে আমি যেমন মন চায় তেমনি সেজে থাকবো।

এত সাজ-পোষাকের দিকে যাঁর ঝোঁক তাঁর কি আর কোন কাজ নেই? বিরাট বড়লোকের ছেলে। বাবা তাঁর জমি আর তেলের ব্যবসায়ে টাকা খাটিয়ে কোটি কোটি ডলার কামিয়েছেন, তা ছেলে তো একটু বিলাসী হবেই। কিন্তু কেবল বিলাসিতার স্রোতেই ত্রুদো গা ভাসিয়ে নিশ্চিন্ত থাকেন ন। ত্রুদো ভাল ছাত্র ছিলেন। মন্ট্রিল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি আইনে ডিগ্রি নিয়েছেন, হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়েছেন রাষ্ট্রবিজ্ঞান অর্থনীতি। তাতেও ত্রুদোর জ্ঞানপিপাসা মেটে নি, তিনি এর পরে গেলেন বিলেতের বিখ্যাত লণ্ডন স্কুল অফ ইকনমিকস্-এ। সবশেষে প্যারিসের একোল দ্য সায়েন্স পলিটিক্স-এ পাঠ শেষ করে তিনি কর্মজীবনে প্রবেশ করলেন।

তারপর সুরু হলো তাঁর চরৈবেতি। কাঁধে এক ঝোলা ঝুলিয়ে ত্রুদো বেরিয়ে পড়লেন দুনিয়া সফরে। এতগুলো সেরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপ তাঁর গায়ে কিন্তু ডানপিটে ভাব তাঁর বয়সের সঙ্গে বিদায় দেন নি। নিজেকে তিনি যেন মুক্ত বিহঙ্গ মনে করলেন, কোন বাধা কোন বন্ধনই যেন তিনি জানেন না। দেশ দেখার এক নেশায় তাঁকে পেয়ে বসেছিল, প্রচণ্ড ঝুঁকি নিতেও ইতস্তত করলেন না এতটুকু। কমিউনিস্ট দেশ যুগোশ্লাভিয়া, হাঙ্গেরী, পোল্যাণ্ডের লৌহ যবনিকা ভেদ করে দিব্যি তিনি গলে গেলেন 'নিষিদ্ধ দেশে'। পকেটে পাশপোর্ট ভিসা একটা অবশ্যই রয়েছে, তবে সেটি জাল। ধরা পড়লেন ত্রুদো। হাতে হাত-কড়া পড়লো তারপর বিতাড়িত হলেন। কিন্তু ওই সামান্য দাওয়াইয়ে কি নেশা কাটে। আবার গেলেন আরব অধিকৃত জেরুসালেমে। সেখানে সুরু হলো প্রশ্নবাণ। তাঁকে ইস্রায়েলের গুপ্তচর সন্দেহে আবার বন্দী করা হলো।

দেশে ফিরে কাজকর্ম করতে চাইলেন। সেখানে আরেক প্রস্থ অভিজ্ঞতা। আজ এটা তো কাল ওটা। প্রথমে একটা কাগজের সম্পাদনা করলেন, তারপর মন্ট্রিল বিশ্ববিদ্যালয়ে আইনের অধ্যাপনা। সবশেষে শ্রম সংক্রান্ত বিষয়ে ওকালতী। তারপর সেই বিখ্যাত উক্তি : গত ১৫ বছর সরকারের সমালোচনাই কেবল করলাম, এবার সরকার চালিয়ে দেখি! নির্বাচনে দাঁড়িয়ে পার্লামেন্টের সদস্য হলেন। বছরখানেক আগে বিচারবিভাগীয় মন্ত্রী। কিন্তু এক বছরের মধ্যে তিনি যে অসামান্য প্রশাসনিক ক্ষমতা দেখিয়েছেন তাতেই মনে হয় তাঁর নেতৃত্বে কানাডাবাসীর মঙ্গল হবে।

বঙ্গদর্শন

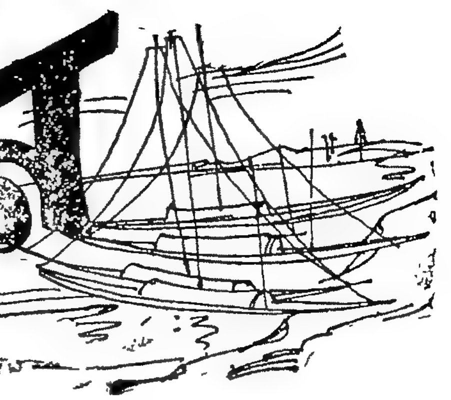

পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে আবার নতুন করে অস্থিরতা শুরু হয়েছে ভারতীয় ক্রান্তি দল যুক্তফ্রন্ট থেকে বেরিয়ে যাবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার পর। ক্রান্তি দলের এই আকস্মিক সিদ্ধান্তে রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরা তো বটেই, যুক্তফ্রন্টের বিভিন্ন শরিকেরা পর্যন্ত বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেছেন। যে শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায়কে বিগত এক বছরেরও অধিককাল ধরে যুক্তফ্রন্টের নেতা হিসাবে থাকতে দেখা গিয়েছিল, পি ডি এফ আমলে যাঁকে প্রত্যক্ষ আন্দোলনে নেতৃত্ব দিতে দেখা গেছে, অকস্মাৎ তাঁর এই ঘোষণায় কংগ্রেস-বিরোধী ক্যাম্পে রীতিমত ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে এবং সেই সঙ্গে জনসাধারণের মধ্যে যাঁরা কংগ্রেসবিরোধী তাঁরাও হতাশ হয়েছেন। অবশ্য এর দায়িত্ব একা অজয়-বাবুর নয়, ক্রান্তি দলের সর্বোচ্চ নেতৃবৃন্দই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। ক্রান্তি দলের মোদ্দা বক্তব্য হচ্ছে যে, তাঁরা মার্কসিস্ট কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখতে চান না। তাঁরা মনে করছেন এই দল দেশের পক্ষে বিপজ্জনক। যদি তাঁরা এই বিশ্বাসে আন্তরিক হন তাহলে আমাদের জিজ্ঞাস্য, সব জেনে-শুনেই বা ক্রান্তি দল কেন এতদিন মার্কসিস্ট কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে ঘর করেছিলেন? অজয়বাবু বা ডঃ ঘোষ বা অধ্যাপক কবির বা নিশীথবাবু এঁরা কেউই নাবালক নন, এঁদের দলের সদস্যরাও খোকা নন, কাজেই এতদিন পরে হঠাৎ তাঁরা সকলে মার্কসিস্ট কমিউনিস্ট পার্টিকে বলির পাঁঠা বানাতে এতটা আগ্রহী হয়ে উঠলেন কেন? মার্কসিস্ট কমিউনিস্ট পার্টির উদ্ভব হয়েছে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি ভেঙে, চীন আক্রমণের সময়। কোন্ পটভূমিকায় ও কোন্ বক্তব্যকে ভিত্তি করে এই পার্টি গড়ে উঠেছিল তা তো কারুরই অজানা থাকার কথা নয়। সব জেনেশুনেও কিসের লোভে এঁরা মার্কসিস্ট কমিউ-নিস্টদের সঙ্গে মন্ত্রিত্ব ভোগ করতে গেছলেন? এ জিজ্ঞাসা শুধু ক্রান্তি দলের প্রতি আমাদের নয়, পি এস পি, এস এস পি, ভারতীয় লোকদল—সকলের প্রতিই আমাদের এই জিজ্ঞাসা। এঁরা কি প্রত্যেকেই এই কাজ করে রাজনৈতিক সুবিধাবাদের পরিচয় দেন নি? যখন তাঁরা মার্কসিস্ট কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে গদীর বাঁটোয়ারায় ব্যস্ত ছিলেন, তখন কি তাঁদের কারুর মনে এতটুকু সন্দেহ জাগে নি যে, এদের দেশের প্রতি আনুগত্যে সন্দেহ আছে? আজ তাঁরা একথা বলছেন, এক বছর আগে এ কথা কোথায় ছিল?

ভারতীয় ক্রান্তি দল, এস এস পি, পি এস পি সকল তরফই তাঁদের দলীয় অধিবেশনগুলিতে তারস্বরে ঘোষণা করেছেন যে, মার্কসিস্ট কমিউনিস্ট দলের সঙ্গে একসঙ্গে কাজ করা যায় না, মন্ত্রিত্ব করার সময় তাঁরা এটা হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছেন।

ক্রান্তি দল তো স্পষ্টই বলে দিয়েছেন যে তাঁদের মনের টানটা কংগ্রেসের প্রতি কমিউনিস্টদের চেয়ে অনেক বেশি, আবার আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে এই যে, একই নিশ্বাসে তাঁরা একথা বলেছেন যে আগামী নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের সঙ্গে তাঁরা কিছুটা সমঝোতা করার চেষ্টা করবেন আসন বণ্টনের ক্ষেত্রে। রায়গঞ্জে অনুষ্ঠিত পি এস পি-এর বার্ষিক সম্মেলনে মার্ক্সিস্ট কমিউনিস্ট পার্টির তীব্র সমালোচনা হয়েছে এবং সেখানে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে, পি এস পি অবিলম্বে যুক্ত-ফ্রন্ট ত্যাগ করবে। এগুলি হচ্ছে, আমাদের মতে রাজনৈতিক অসাধুতার লক্ষণ। যাঁরা কথায় কথায় মহাত্মা গান্ধীর উল্লেখ করেন তাঁরা মহাত্মার আসল উপদেশটি স্মরণ করার প্রয়োজন উপলব্ধি করেন না। সেটি হচ্ছে উদ্দেশ্যটা ভাল হলেই হল না, সে উদ্দেশ্যে পৌঁছবার উপায়টাও ভাল হওয়া চাই।

এমতাবস্থায় বামপন্থী দলগুলির কর্তব্য আসন্ন নির্বাচনের পরিপ্রেক্ষিতে কি হবে সেটা ভেবে দেখার প্রয়োজন। প্রকৃতপক্ষে যুক্তফ্রন্ট এখন আর নেই। যাঁরা এখনো যুক্তফ্রন্টে থাকতে চাইছেন তাঁদের আনুগত্য দ্বিধাগ্রস্ত। শুধুমাত্র নির্বাচন বৈতরণী পার হতে যুক্তফ্রন্ট যেটুকু করতে পারে সেটুকুর সুযোগ নেওয়া ভিন্ন যুক্তফ্রন্টওয়ালাদের আর কোন উদ্দেশ্য নেই। এর চেয়ে বরং প্রতিটি দলের নিজের শক্তিতেই লড়ে যাওয়া ভাল। এর অর্থ অবশ্য এই নয় যে, কোনরকম সমঝোতাই হবে না।

সংবাদে প্রকাশ, যুক্তফ্রন্টের অন্যান্য দলগুলি পুরোনো পথেই যাচ্ছে এবং ক্রান্তি দলকে যুক্তফ্রন্টে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা চলছে। সংবাদে আরও প্রকাশ যে, ক্রান্তি দল ও অপরাপর সমধর্মী দল একটি জোটের কথা চিন্তা করছে। আরও একটি সংবাদে প্রকাশ, পি এস পি ক্রান্তি দলের যুক্তফ্রন্ট ত্যাগের সিদ্ধান্তে আনন্দিত হয়েছে। অর্থাৎ মৎস্য শিকারের পক্ষে রাজনৈতিক জলটাকে আরও ঘোলান হচ্ছে। কাজেই পরবর্তী হাওয়া কোন-দিকে বইবে সেটা বলা রীতিমত কঠিন। তবে কোন সুবিধাবাদী জোট হওয়ার চেয়ে তা না হওয়াই ভাল। বস্তুত রাজনৈতিক দলগুলির আচরণে জনসাধারণকে ক্রমশ ক্রমশ তিতিবিরক্ত করে তোলা হচ্ছে। আগামী নির্বাচনে ভোট দেবেন না এমন প্রচারও জোর গলায় করা হচ্ছে। কোন কোন সংবাদপত্রে এই মর্মে সুপরি-কল্পিত উপায়ে চিঠি ছেপে যাচ্ছে। অর্থাৎ যদি রাজনীতিবিদরা ক্রমান্বয়ে এমন আচরণ করে যান যাতে জনসাধারণ রাজ-নীতির প্রতি বিরক্ত ও উদাসীন হয়ে ওঠেন, এই ঔদাসীন্যের সুযোগেই একনায়কত্ব আসে এবং নানাভাবে তারই ব্যাকগ্রাউন্ড সৃষ্টি করা হচ্ছে। এই কারণেই কংগ্রেস-বিরোধী প্রতিটি রাজনৈতিক দলের নিকটেই আমাদের বক্তব্য, যা করার তা তাড়াতাড়ি করুন। হয় নিজ শক্তিতে নিজ আদর্শে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করুন, না হয় সম আদর্শের ভিত্তিতে

জোট বাঁধুন, তবে দোহাই আপনাদের কোন সুবিধাবাদী ফ্রন্ট তৈরি করবেন না।

রাজনৈতিক বৈঠক

বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সম্মেলনের এখন বোধ হয় মরশুম পড়েছে বাৎসরিক উৎসবেরই মত। বর্তমান সপ্তাহে পশ্চিমবঙ্গে দু' জায়গায় দুটি দলের সম্মেলন চলছে, একটি রায়গঞ্জে পি এস পি'র অপরটি বর্ধমানে মার্কসিস্ট কমিউনিস্ট পার্টির। কংগ্রেসের বাৎসরিক অধিবেশনটা অবশ্য প্রতি বছর দেশের এক এক জায়গায় হয়, মাস দুয়েক আগেই সে বৈঠক চুকেছে। সেখানকার কায়দাটা অন্যরকম, রাতারাতি নগর বানিয়ে ফেলা হয়, নেতারা তাকিয়ায় হেলান দিয়ে বসেন, সরকারী প্রস্তাবগুলি পড়া হয় এবং যথারীতি তা গ্রহণ করা হয়, কিছু বেসরকারী প্রস্তাবও ওঠে, সেগুলির প্রতি সুবিচার করা হয় না বলে অভিযোগ করা হয়, কয়েকজন সদস্য সমাজতন্ত্র হচ্ছে না বলে কিছুটা চীৎকার করেন। তারপর সবই ঠান্ডা হয়ে যায়, যথাপূর্বং তথাপরং। তবে এবারের একটি বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, কংগ্রেস সভাপতি ঘোষণা করেছেন যে, ছলে-বলে-কৌশলে যেমন করে হোক অকংগ্রেসী সরকারগুলিকে উৎখাত করতে হবে। কিছুদিন আগে লোহিয়ানগরে এস এস পি'রও অধিবেশন হয়ে গেল। কংগ্রেস কমিউনিস্ট দুদিক বাঁচিয়ে মিলিট্যান্ট গান্ধীবাদের মারফৎ বিপ্লব আনা হবে এই গোছের প্রস্তাব নেওয়া হল। তারপরেই ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির অধিবেশন। উদ্বোধন করানো হল মহামায়াপ্রসাদকে দিয়ে বেশ ঘটা করে। তখন কি জানা গেছল এই ভদ্রলোকই কিছুকালের মধ্যে বামপন্থী শক্তিসমূহের গন্ডে বৃহৎ চপেটাঘাত করবেন ? ক্রান্তি দলের শীর্ষস্থানীয় বৈঠক একটা হল বটে, যেখান থেকে ফিরে এসে অজয়বাবু আবার একটা বোমা ফাটালেন।

কিন্তু এই সব অধিবেশনগুলি ঘটে গেছে কিছুকাল আগে এবং বাংলার বাইরে অর্থাৎ বঙ্গদর্শনের এক্তিয়ারের বাইরে। কাজেই যা ঘটছে এবং বাংলার ভিতরেই ঘটছে সেখানে দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। পশ্চিমবঙ্গে নাকি পি এস পি'র সদস্য সংখ্যা বেশি হয়েছে এরকম কথা অধিবেশনে বলা হয়েছে। আরও ঘোষণা করা হয়েছে যে, পি এস পি যুক্তফ্রন্ট ত্যাগ করবে। সেই সঙ্গে মার্কসিস্ট কমিউনিস্ট পার্টির উপর প্রচন্ড একহাত আক্রমণ চালানো হয়েছে। বাস্তব রাজনীতির ক্ষেত্রে পি এস পি'র অবস্থাটা বরাবরই শোচনীয় কেন না একই সঙ্গে কংগ্রেস ও কমিউনিস্ট বিরোধিতা এ'দের করতে হয়। তদুপরি এই পার্টির বক্তব্যের সঙ্গে কংগ্রেসের বক্তব্যের খুব পার্থক্য নেই এবং দ্বিতীয় যেহেতু কংগ্রেসে কিছু সুবিধা করতে না পেরে থাকা লোকেরাই এই পার্টির পত্তন করেছেন সেই কারণে বৃহত্তর জনসমাজের কাছে এই পার্টি কংগ্রেসেরই বি-টিম বলে পরিচিত এবং সেই হিসাবে এই পার্টির জনসংযোগও সামান্য। এই কারণেই রাজনৈতিক অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য কমিউনিস্টদের উপর এ'দের নির্ভর করতেই হয়, অথচ এ'রা ভালই জানেন যে, যদি কোনদিন কমিউনিস্টরা এখানে সর্বময় কর্তৃত্ব স্থাপন করতে পারে তাহলে সর্বপ্রথম এ'রাই বলি হবেন। অবশ্য গত নির্বাচনে পি এস পি একাই লড়েছিল এবং বলাই বাহুল্য ফলাফল হতাশাজনক। যদি কমিউনিস্ট-বিরোধী কোন নির্বাচনী ফ্রন্ট তৈরি হয় তাহলে পি এস পি তাতে সাগ্রহে যোগদান করবে বলেই মনে হয়।

এর পরে আসছে বর্ধমানে মার্কসিস্ট কমিউনিস্ট পার্টির প্লেনামের কথা যা কয়েকটি কারণে বিশেষ উল্লেখযোগ্য এবং সেই হিসাবে প্রতিদিনের সংবাদপত্রেই বিশেষ গুরুত্ব অধিকার করেছে। আদর্শগত ক্ষেত্রে রুশ-চীন বিরোধের সূত্রপাত হবার পর অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টির একটি অংশ বেরিয়ে এসে মার্কসিস্ট কমিউনিস্ট পার্টির পত্তন করেন। এ'দের বিশ্বাস রাশিয়া বর্তমানে যে পথ অবলম্বন করেছে তা শোধনবাদী পথ, অর্থাৎ ধনতন্ত্রে পুনঃপ্রত্যাবর্তনের পথ; প্রকৃত মার্কসীয়-লেনিনীয় পথ একমাত্র চীনই অনুসরণ করছে, সেই হিসাবে চীনের পথই তাঁদের পথ। কালক্রমে অবশ্য চীনাপন্থীর প্রতি তাঁদের অসীম বিশ্বাসের ভিত্তি শিথিল হতে শুরু করে, বিশেষ করে বাইরের কমিউনিস্ট পার্টিগুলির আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে চীনের অত্যধিক মাথা গলানোর প্রবণতা মার্কসিস্ট কমিউনিস্টদের চীনের প্রতি বেশ কিছুটা বীতশ্রদ্ধ করে তোলে। তা ছাড়া যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভাগুলিতে মার্কসিস্ট কমিউনিস্টরা যোগদান করার পর পিকিং রেডিও থেকে পার্টিকে আক্রমণ করে বিবৃতি প্রকাশিত হতে থাকে, এবং মার্কসিস্ট কমিউনিস্ট পার্টির অনেক নেতার বিরুদ্ধেই পিকিং রেডিও থেকে কুৎসা প্রচার শুরু হয়। এই সকল ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে মার্কসিস্ট কমিউনিস্ট পার্টি কিছুকাল আগে এই সিদ্ধান্তে আসে যে, আন্তর্জাতিক ও জাতীয় ক্ষেত্রে তাঁরা নিজেদের লাইনই অনুসরণ করবেন, চীনের তাঁবেদারী করবেন না। তাঁদের এই ঘোষণার ফলে নকসালপন্থী হিসাবে পরিচিত উগ্রপন্থীরা প্রকাশ্যেই বিদ্রোহ করেন এবং সরকারী পার্টিকে অস্বীকার করেই প্রকাশ্যে নিজেদের প্রচারকার্য চালিয়ে যান এবং সরকারী পার্টির কুৎসা গাইতে শুরু করেন। বর্ধমানে অনুষ্ঠিত প্লেনামে এ'রা হাজির হয়েছিলেন এবং অন্ধ্র থেকে আগত বেশ কয়েকজন ডেলিগেট চীন ঘেঁসা পন্থা অনুসরণের জন্য মার্কসিস্ট কমিউনিস্ট পার্টির সরকারী নেতৃত্বের উপর রীতিমত চাপ দেন। ঘন্টার পর ঘন্টা বৈঠকের পর বৈঠক চলে এবং শেষ পর্যন্ত অন্ধ্র গ্রুপের প্রস্তাবটি ও সরকারী নেতৃত্বের প্রস্তাবটি ভোটে দেওয়া হয়। বিপুল ভোটাধিক্যে সরকারী প্রস্তাব গৃহীত হয়। অতঃপর স্থির হয় যে, মার্কসিস্ট কমিউনিস্ট পার্টি এবারে নিজেদেরই লাইনে চলবেন। নানা কারণে এ'দের সিদ্ধান্তটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

হাসপাতাল প্রসঙ্গ

কলকাতা ও মফস্বলের প্রতিটি হাসপাতালই নরককুন্ড হয়ে আছে এবং এই অবস্থা দীর্ঘকাল ধরেই চলে আসছে। সম্প্রতি এই সমস্যাটি সম্বন্ধে একটি বিশেষ কারণে সকলে সচেতন হয়েছেন। কারণটা হচ্ছে এই যে, কিছুদিন আগে নীলরতন সরকার হাসপাতালে কয়েকজন অস্ত্রোপচারের রোগী টিটেনাসে আক্রান্ত হয়ে মারা যান, যার কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে ডাক্তাররা এই সিদ্ধান্তে আসেন যে, সংক্রমণটা হচ্ছে হাসপাতালের ভিতর থেকেই এবং এর জন্য দায়ী ভিতরকার অপরিচ্ছন্ন পরিবেশ। অবস্থাটা এমনই হয়েছে যে, এরপরে হাসপাতাল থেকে অপারেশন বন্ধ হয়ে গেছে এবং যতদিন পর্যন্ত ভিতরকার পরিবেশ অনুকূল না হচ্ছে ততদিন কোন প্রকার অপারেশনই করা হবে না। ফলে রাজ্যপাল শ্রীধর্মবীর হস্তক্ষেপ করেছেন এবং তাঁর নির্দেশে নীলরতন ও আর জি কর হাসপাতালের ভিতরকার বহু শত চালাঘর ভেঙে দেওয়া হয়েছে। সেখানকার বাসিন্দারা অবশ্য এতে আপত্তি করেছেন কিন্তু তা সত্ত্বেও স্বীকার করতে হবে যে, এইগুলি ভেঙে দিয়ে যথার্থ কাজই করা হয়েছে। কেন না প্রথমত ঐগুলিতে হাসপাতালের চতুর্থ শ্রেণী কর্মচারীদের শতকরা মাত্র পাঁচ ভাগ বসবাস করতেন। বাকি সকলেই বাইরের লোক, সংখ্যায় যারা সহস্রাধিক হবে। এদের দ্বারা স্যানিটেসন ব্যবস্থা রীতিমতভাবে ক্ষুন্ন হয়েছে। হাসপাতালের কম্পাউন্ডের মধ্যেই যদি কাদা-পাঁক মলমূত্র কাঁচা ড্রেন ও আবর্জনার স্তূপ গড়ে ওঠে সেটা কোন ক্রমেই বরদাস্ত করা বাঞ্ছনীয় নয়। দ্বিতীয়ত ওই খুপরিগুলি নানা প্রকার অসামাজিক ক্রিয়াকলাপের কেন্দ্র ছিল, চোরাই মাল থেকে মাদক দ্রব্য এমন কি গণিকাবৃত্তির এগুলি ছিল গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র, তদুপরি ছিল খাটাল যা হাসপাতালের আবহাওয়াকে সম্পূর্ণই কলুষিত করেছিল। এই উচ্ছেদের বিরুদ্ধে চতুর্থ

"মুক্তকেশের পুঞ্জ মেঘে
লুকায় অশনি"
সাধনার
মহাভৃঙ্গরাজ তৈল
মেঘের মত ঘন কুন্তল কেশদাম নারীদের আভিজাত্যের নিদর্শন। তাই কবি বলেছেন—"চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা" সেইজন্য সৌন্দর্য বিলাসিনী মাত্রেই ব্যবহার করেন সাধনার মহাভৃঙ্গরাজ তেল বিশুদ্ধ আয়ুর্বেদ মতে প্রস্তুত স্নিগ্ধ ও শীতল। কেশ উৎপাদনে ও সংরক্ষণে এর জুড়ি নেই।
সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা
৩৬,সাধনা ঔষধালয় রোড,সাধনা নগর,কলিকাতা-৪৮
অধ্যক্ষ যোগেশচন্দ্র ঘোষ,এম,এ,আয়ুর্বেদশাস্ত্রী,এফ,সি,এস(লণ্ডন) এম,সি,এস(আমেরিকা)ভাগলপুর কলেজের রসায়নশাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক।
কলিকাতা কেন্দ্র-ডাঃ নরেশচন্দ্র ঘোষ,এম,বি,বি,এস(কলি) আয়ুর্বেদাচার্য

শ্রেণীর কর্মচারীরা ধর্মঘট শুরু করেছেন যেটা আমরা সমর্থন করতে পারলাম না। প্রথমত, হাসপাতালের সকল চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীই ওখানে বাস করেন না, শতকরা মাত্র পাঁচজন এবং হাসপাতালের মধ্যের এই ক্লাইম কলোনী ওই শতকরা পাঁচজনকেই মুনাফা দিচ্ছে। হাসপাতালের মত একটি অত্যাবশ্যকীয় সার্ভিসের ক্ষেত্রে এটা অনুচিত ও অবিবেচনাপ্রসূত। যদি সত্যই এতে কোন কর্মীর ক্ষতি হয়ে থাকে তাহলে তা অন্যভাবেও পূরণ করা যেত কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করে। আশা করি কর্মীরা এটা ভেবে দেখবেন। সরকার যে ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন সেটা বহু পূর্বেই করা উচিত ছিল।

ট্রপিক্যাল স্কুল অব মেডিসিনের কথা অমৃত সমান

কলকাতা ট্রপিক্যাল স্কুল অব মেডিসিনের কথা অমৃত সমান। দেখতে সুন্দর, নামে বড়, দেশে-বিদেশে প্রচুর নাম-ডাক। তাবং ডিগ্রীধারী ডাক্তারের সমারোহ। জ্বলজ্বলে, চকচকে, কিন্তু যা চকচকে, তাই কি সোনা? এর ভেতরের প্রকৃত অবস্থা কি?

এক এক করে বিবেচনা করা যাক। এটি যেন কয়েকজন ডাক্তারের মৌরসী-পাট্টা। এখানে যাঁরা নিযুক্ত, তাঁদের প্রায় সকলেই ওয়েস্ট বেঙ্গল হেলথ্ সার্ভিসেস-এর লোক। ওয়েস্ট বেঙ্গল হেলথ্ সার্ভিসেস-এ বদলীর একটা বিধান আছে। কিন্তু এখানকার কয়েকজন ডাক্তার কিছুতেই বদলী হন না। তাঁরা নাকি গবেষণার মহৎ কার্যে নিযুক্ত। ২/১ বার উপর মহল থেকে ২/১ জনকে বদলী করানোর চেষ্টা করা হয়েছে, কিন্তু তারও উপরের মহল থেকে চাপ দিয়ে ঐ বদলী রদ করেছেন রথী মহারথীরা।

শুধু তাই নয়, নতুন একটা বিভেদ-মূলক পদ্ধতি সরকার গ্রহণ করেছেন।

এখানে টিচিং পোস্ট-এ যে সমস্ত ডাক্তার নিযুক্ত আছেন তাঁদের কমপেনসটরী এলাওয়েন্স দেবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই এলাওয়েন্স এখানকার অন্য ডাক্তাররা পাবেন না। কিম্বা পাবেন না যাঁরা ডাক্তার নন, অথচ অধ্যাপনা করেন—এমন লোকেরা। টিচিং পোস্টে নিযুক্ত নন-মেডিকাল লোক এবং অন্যান্য কর্মে নিযুক্ত ডাক্তারদের মাঝে এই নিয়ে ইদানীং তীব্র অসন্তোষ দেখা দিয়েছে। অন্যান্য মেডিক্যাল কলেজেও তো গবেষণা চলছে। সেখানকার ডাক্তাররাও কেন এই কমপেনসটরী এলাওয়েন্স থেকে বঞ্চিত হবেন? গবেষণা কি শুধুমাত্র ট্রপিক্যাল স্কুলেই হয়—অন্যত্র নয়?

আর এই গবেষণার স্বরূপ কি? যাঁদের খুঁটির জোর আছে, তাঁদেরই এখানে সুবিধে হয়। কর্তাভজারাই শেষ পর্যন্ত গালভরা ডি ফিল ডিগ্রী লাভ করেন এখান থেকে, তাঁদের পশ্চাৎপট যেমনই থাক না কেন। যাঁরা একটু বেচালে চলেন বা মন ভেজাতে পারেন না, তাঁদের ডিগ্রী মেলা ৭ হাত জলের তলে তলিয়ে যায়। মাঝে মাঝে মাছি এসে পড়ে জালে। প্রতিভাধর কেউ কেউ আসেন গবেষণার আকাঙ্ক্ষা নিয়ে—কিন্তু এই হতভাগ্যগণ অচিরেই অবস্থা বুঝে নিজের খুঁটির জোর নেই জেনে, মন ভেজাতে পাববেন না বুঝতে পেরে বিদায় নেন। গত কয়েক বছরে কত রিসার্চ স্কলার এখান থেকে বিদেয় নিয়েছেন অকালে হতাশা এবং বিরক্তি নিয়ে এর পরিসংখ্যান নিলেই তা জানা যাবে।

বদলীর ব্যাপারে যেমন, অবসর নেবার ক্ষেত্রেও তাই। কর্তাভজারা এখান থেকে সহজে অবসর গ্রহণ করেন না—আবার অনেককেই বিদায় নিতে হয় অকালে। সুনির্দিষ্ট বাঁধা ধরা নিয়মের অস্তিত্ব এখানে থাকতেই পারে না। যে নিয়ম চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের বেলায়, সে নিয়ম প্রযোজ্য নয় না কি অফিসারদের উপর।

নিয়োগের ক্ষেত্রেও তাই। কর্তার ইচ্ছায় কর্ম। হোক না প্রার্থী অপদার্থ, হোক না সে নিম্নমানের, তাকে উচ্চতর বা উচ্চতম পদ দেবার কোন বাধাই নেই—স্বজন পোষণের এমন একটি আস্তা ভূ-ভারতে বিরল। এরকম একাধিক কাহিনী সাপ্তাহিক বসুমতী এবং অন্যান্য সংবাদপত্রের পাতায় আগে প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু কর্তাব্যক্তিদের টনক তাতে নড়েছে বলে এ পর্যন্ত কিছু জানা যায় নি। রাজ্য সরকারের স্বাস্থ্য দপ্তর এ বিষয়ে নীরবই রয়েছেন।

প্রমোশনের ক্ষেত্রেও একই অনিয়ম। এখানেও খেয়ালখুশির রাজত্ব। যাঁদের এঁরা চান না, প্রাণ থাকতেও তাঁদের উপরে উঠতে দেবেন না। যাঁদের চান, তাঁদের জন্যে স্বর্গের সিঁড়ি প্রস্তুত হতে ক্ষণবিলম্বও হয় না। স্থান-কাল-পাত্রের—সবরকম বাধা-বিপত্তিই সেখানে তুচ্ছ, অকিঞ্চিৎকর।

কত নামডাক, কত বিভাগ আউটডোরের, কত অসংখ্য রোগী আসে দেশ-বিদেশ থেকে—বহু দূর-দূরান্তরের। কিন্তু কি পায় তারা? এখানে ভর্তি হতে হলে চাই উপরওয়ালাদের বা আমলাদের দয়া-দাক্ষিণ্য। লেখা আছে, এ হাসপাতাল শুধু গরীব রোগীদের জন্যে। কিন্তু ভর্তি যাঁরা হন, তাঁদের মধ্যে গরীব ক'জন থাকেন? এক কালে সাদা-কালোর তফাৎ ধরা হোতো, এখনো সেই তফাৎ রয়েছে—ধনী-নির্ধনের। তবু যদি ভাল ক্লিনিসিয়ান থাকতেন! একেবারে যে কেউ নেই তা নয়, কিন্তু মনে হয় অনেকেই নমো নমো করে কাজ সারেন—ধার ধারেন না রোগীর উপর বিশেষ নজর দেবার, তাঁদের সহানুভূতি দেখাবার। নিয়ম এবং সমারোহের চোটে অস্থির। ধরা যাক, দূর দেশ থেকে এসেছে কোন দরিদ্র রোগী। এক আউটডোর থেকে অন্য আউটডোর-এ ঘুরতে হবে—রক্ত-কফ-পেচ্ছাব-পায়খানা পরীক্ষার একাধিক দিন পড়বে—এখানে ওখানে রেফার করা হবে, তারপর সর্বশেষে অশ্বডিম্ব প্রসব করবে—এতদিনে অনেকক্ষেত্রে একফোঁটা ওষুধও লিখে দেওয়া হয় না সে রোগীকে।

রোগীর সঙ্গে ব্যবহারের কথা ছেড়েই দেওয়া যেতে পারে—কারণ এ দেশের অধিকাংশ ডাক্তারই রোগীকে জন্তু ছাড়া মনে করে না। সেটাও সহ্য করা যেতো, যদি সুচিকিৎসা সম্ভব হত। কিন্তু কতকগুলি ফ্রাসট্রেটেড লোক, স্বার্থ যাঁদের কাছে বড়, তাঁদের কাছে তা আশা করাই বৃথা। এর ব্যতিক্রম আছে, কিন্তু তা' নগণ্য।

কাজেই, অতীতকে ভাঙিয়ে খাওয়াই আজ ট্রপিক্যাল স্কুলের কাজ।

আমাদের দাবি নিরপেক্ষ তদন্ত—যাতে করে এই গবেষণাগারটি আবার তার পূর্ব গৌরব ফিরে পেতে পারে। একজন খ্যাতনামা চিকিৎসক, একজন বিচারপতি এবং একজন সমাজসেবীকে দিয়ে একটি নিরপেক্ষ তদন্ত যদি করা হয়, তাহলে আমাদের বিশ্বাস ঐতিহ্যপূর্ণ এই হাসপাতালটির আরও বহু অনাবিষ্কৃত কাহিনী উদ্ঘাটিত হবে।

ডাঃ শৈলেন সেন লাঞ্ছিত

গত ১০ই এপ্রিল কলকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেটের সভার শেষে একদল উচ্ছৃঙ্খল মেডিক্যাল ছাত্র সিণ্ডিকেটের প্রবীণ সদস্য ও ডীন অব ফ্যাকাল্টি অব মেডিসিন ডাঃ শৈলেন সেনের

কিস্তিতে ট্রানজিস্টার

মাসিক ১০৲ টাকা কিস্তিতে অভঙ্গুর প্লাস্টিক ক্যাবিনেটে 'ন্যাশনাল' পোর্টেবল ৩ ব্যাণ্ড অল ওয়ার্ল্ড টানজিস্টার।

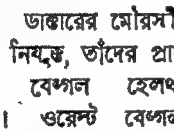

Jagson Agencies (W.B.M.-88)
P.B. 1212, Delhi-6.

প্রতি যে পশুসুলভ আচরণ করেছে তা সমগ্র ছাত্রসমাজের গায়ে কলঙ্ক লেপন করেছে। ছাত্র নামধারী এই গুন্ডারা তাদের তথাকথিত দাবি আদায়ের নামে ডাঃ সেনকে শুধু ঘেরাও করে ক্ষান্ত হয় নি, গালাগালি থেকে সুরু করে কিল-ঘুসি, চপেটাঘাত, পচা ডিম ১০ই এপ্রিল এই সব কুলাঙ্গারদের কৃপায় ডাঃ সেনের ভাগ্যে জুটেছে। ছাত্রদের মধ্যে, বিশেষ করে মেডিক্যাল ছাত্রদের মধ্যে উচ্ছৃঙ্খল ছাত্রের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম, তা সত্ত্বেও একদল বিপথগামী, অসুস্থ, বিবেক ও কাণ্ডজ্ঞানবর্জিত ছাত্রের হাতে ডাঃ সেনের মতন খ্যাতিমান সম্মানিত চিকিৎসক-অধ্যাপককে লাঞ্ছিত হতে হলো—এটাই সত্যিই দুর্ভাগ্যজনক।

ছাত্রদের দাবি এবং সিণ্ডিকেটের বক্তব্য সম্পর্কে আমরা নির্ভরযোগ্যসূত্র থেকে যে সব তথ্য জেনেছি, তাতে উল্লিখিত মেডিক্যাল ছাত্রদের আবদারের নিকট মাথা নত না করে ডাঃ সেন ঠিক কাজই করেছেন। বারান্তরে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করার ইচ্ছা রইল।

(১৩।৪।৬৮)

গ্রাম-গ্রামান্তরে

গাঁয়ের রাস্তায় আলো

এতদিনে দেখছি সরকারের ঘুম ভেঙেছে। স্বাধীনতা লাভের দীর্ঘ একুশ বছর পরে সরকার হঠাৎ বুঝতে পারলেন বাংলা দেশের পাড়াগাঁয়ে শুধু জন্তু-জানোয়ার থাকে না, মানুষও আছে; আর এই মানুষগুলোর রাত্রে নিরাপদে পথ চলার একটা ব্যবস্থা করাও দরকার। কি সে ব্যবস্থা? গাঁয়ের রাস্তাগুলোতে রাতে আলো জ্বালাতে হবে। আলো জ্বালাবেন পঞ্চায়েত; কেরোসিনের আলো, সন্ধ্যা থেকে সারা রাত্রি জ্বলবে কেবল সেই রাত্তিরগুলোতে যে রাত্রে চাঁদ ওঠে না। খরচ কে দেবে? সরকার? মোটেই না! সরকার শুধু হুকুম দেবার মালিক, হুকুম দিয়েই তাঁরা খালাস। পঞ্চায়েতের ওপর সব ভার, যা টাকা লাগবে হিসেব কষো. গাঁয়ের লোকেদের ওপর ট্যাক্সো বসাও। প্রয়োজন হলে সরকার আইন সংশোধন করে দেবেন। চমৎকার প্রস্তাব! এই না হলে আর জনগণের সরকার! কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে আলো তো জ্বলবে, কেরোসিনটা আসবে কোথা থেকে? সরকার কি খবর রাখেন ঠিক এই মুহূর্তে বাংলা দেশের হাজার হাজার গাঁয়ে এক ফোঁটাও কেরোসিন নেই? কেরোসিনের অভাবে রাতের কাজ দিনেই সারতে হয়, ঘরে ঘরে রাতে আলো জ্বালার পাঠও উঠে গেছে। এক ফোঁটা কেরোসিনের জন্য গাঁয়ের মানুষকে হয় কালোবাজারীদের শরণাপন্ন হতে হয়; না হয় দু' ক্রোশ, চার ক্রোশ পথ হেঁটে শহর থেকে সংগ্রহ করে আনতে হয়। কেরোসিনের অভাবে ঘরে আলো জ্বলে না. রাস্তায় সারা রাত আলো জ্বলবে—এ প্রস্তাব কোন মন্ত্রী বা নেতাদের কাছ থেকে এলে বুঝতাম—গাঁয়ের মানুষের কাছ থেকে ভোট আদায়ের এটা একটা ফিকির ছাড়া আব কিছু নয়।

আরও আশ্চর্য লাগে, যে সরকার দীর্ঘ একুশ বছরেও গাঁয়ের মানুষের নিরাপত্তার, ধন-প্রাণ রক্ষার এতটুকু ব্যবস্থা করতে পারেন নি, হঠাৎ তাঁদেব রাতারাতি কেরোসিনের আলো জ্বালাবার সখ হল কেন? প্রতিদিন কাগজ খুললেই চোখে পড়বে দিনে চলছে লেভি আর মজুত উদ্ধারের নামে গাঁয়ে গাঁয়ে সন্ত্রাসের রাজত্ব; আর রাতে চুরি, ডাকাতি, রাহাজানির হিড়িক। দিনে ও রাতের এই দুই মগের হাত থেকে গাঁয়ের নিরীহ মানুষগুলোর ধন-প্রাণ, ইজ্জৎ বাঁচাবার জন্যে আজ পর্যন্ত কেউ ছুটে আসেন নি, বিপদ-আপদে কারুর সাহায্য পাওয়া যায় নি, গ্রামবাসীদের আবেদন নিবেদনে কান দেওয়া কি সরকারী আমলাদের, কি নেতাদের কারুরই সময় হয় নি, এই প্রচণ্ড গরমে কুয়োগুলো ঝালিয়ে দেওয়া বা টিউব-ওয়েলগুলো জরুরী মেরামত করার প্রয়োজনও কেউ অনুভব করেন নি, এমন কি যে রাস্তায় আলো জ্বালার ব্যবস্থা হচ্ছে সেই রাস্তাগুলো যে মানুষের যাতায়াতের উপযোগী করা আগে দরকার সেটুকুও কেউ উপলব্ধি করেন নি, হঠাৎ কেরোসিনের আলো জ্বালাবার খেয়াল কেন হলো, রাতের অন্ধকারের মতো গাঁয়ের মানুষের কাছে এটাও একটা দুর্ভেদ্য রহস্য বলে মনে হচ্ছে। তবে এটুকু স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে রাস্তায় আলো জ্বালার নাম করে গ্রামবাসীদের উপর আর একটি নতুন কর বসবে, আর সে কর দিতেই হবে তার জন্যে আইনও হচ্ছে। ঘরে অন্ন থাক আর নাই থাক, ঘরে আলো জ্বলুক না জ্বলুক রাস্তায় আগে আলো জ্বালানো দরকার, তা না হলে ঠাটই বা বজায় থাকবে কি করে আর বাইরের পাঁচজনই বা জানবে কি করে গাঁয়ের কত ভালই না সরকাব করছেন!

পঞ্চায়েতের রাস্তার বেশির ভাগই ... বেদখল

রাইটার্স বিল্ডিংস থেকে যাঁরা হুকুম দেন তাঁরা বোধহয় গাঁয়ের খবর রাখেন না। তা না হলে আলো জ্বালার হুকুম দেওয়ার আগে খোঁজ নেওয়া উচিত ছিল পঞ্চায়েতের রাস্তার কতটুকু অংশ পঞ্চায়েতের হাতে আছে আর কতটুকুই বা বেদখল হয়েছে। যে কোন জেলায় বোধহয় যে কোন গাঁয়ে গেলেই এ দৃশ্য অনায়াসে চোখে পড়বে পঞ্চায়েতের রাস্তার আশে-পাশের বাসিন্দারা রাস্তার অংশ দখল করে নিজেদের সীমানা বাড়িয়ে নিয়েছেন। কেউ বা বাড়ির জল বা ময়লা ফেলার জন্য পঞ্চায়েতের রাস্তার ওপর গর্ত খুঁড়ে পাকাপাকি ব্যবস্থা কায়েম করে নিয়েছে। সরকারের হুকুমমত আজ যদি বাস্তায় আলো সত্যিই জ্বালা হয়, দু'দিন পরে হয় তো দেখা যাবে সেই আলো সমেত পোস্টটিও কেউ দখল করে নিয়ে বসে আছেন। প্রতিকার কি? পঞ্চায়েতেব হাতে এ সব প্রতিকারের কতটুকুই বা ক্ষমতা? বড় জোর পঞ্চায়েত সভা ডাকবেন, সভায় প্রস্তাবও পাস হবে, কিন্তু সে প্রস্তাব কার্যকরী করতে হলে পঞ্চায়েতকে আদালতের শরণাপন্ন হওয়া ছাড়া আর কোন পথ নেই। আদালত মানেই খরচ আর সময়ের ব্যাপার, কিন্তু সে খরচের টাকা যদি পঞ্চায়েতের তহবিলে থাকতো তাহলে গাঁয়ের রাস্তার কি ঐ হাল হতো?

মিউনিসিপ্যালিটি বা কর্পোরেশনে এমন কি জেলা পরিষদের হাতেও এমন আইন আছে যে বে-আইনীভাবে এই রকম জমি দখল হলে জেলা ইঞ্জিনীয়াররা সরাসরি ব্যবস্থা নেন, কিন্তু গ্রাম পঞ্চায়েতের সরাসরি কিছু করার ক্ষমতা নেই। শুধু রাস্তাই নয়, শ্মশান বা ভাগাড়ের কোন অংশ কেউ যাতে দখল করতে না পারে তার জন্যে আগে পঞ্চায়েতকে পুরাপুরি ক্ষমতা দিতে হবে। এই ক্ষমতা পেলে পঞ্চায়েত বে-আইনী দখলকারীদের হাত থেকে আগে রাস্তাগুলি উদ্ধার করুক, মেরামতের ব্যবস্থা হোক, নিজেদেব সীমানা ঠিক করে নিয়ে তারপর আলো জ্বালার ব্যবস্থা হলে সে আলোয় সত্যিই গ্রামবাসীরা নিজেদের পথ চিনে নিতে পারবেন, তা নাহলে গাঁয়ের মানুষ যে অন্ধকারে আছে সেই অন্ধকারেই থাকবে।

—সমর চট্টোপাধ্যায়

বিনামূল্যে লউন

আধুনিক প্রতিটি গৃহসজ্জায় আবশ্যকীয় নানাবিধ বিলাস সামগ্রী। বিশদ বিবরণের জন্য লিখুনঃ

PROFIT CIRCLE (WBC)
P. Box 1430, Delhi—6.

অবশ্য

চন্দ্রগুপ্ত

একটি সরস কাকতালীয় ঃ সর্বভারতীয় কবিসম্মেলন এবং রসগোল্লা-শতবার্ষিকী। তিনদিন-ব্যাপী প্রথম অনুষ্ঠানে ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সমবেত কবিরা স্বরচিত কবিতা পাঠ করেছেন, একদিন-ব্যাপী দ্বিতীয় অনুষ্ঠানে ১২৭২-বঙ্গাব্দে নবীনচন্দ্র দাস (নবীন ময়রা নামে যাঁর প্রসিদ্ধি) আবিষ্কৃত রসগোল্লার জন্ম-শতবার্ষিকী (সরকারী আদেশে যাকে দু বছর রসগোল্লা আত্মগোপন করেছিল) উৎসব পালিত হয়েছে। চন্দ্রগুপ্তের মতো সাধারণ বাঙালীর কাছে শীতাতপনিয়ন্ত্রিত সুরম্য রবীন্দ্রসদনে কয়েক কুড়ি কবির অবিচ্ছিন্ন ক্লান্তিকর কবিতা শোনার চাইতে নবীনচন্দ্রের স্মৃতি-উৎসবের আকর্ষণ বেশি। মহৎ রসের কারবারীরা যাই বলুন না কেন, চন্দ্রগুপ্ত এবং তাঁর মতো অন্যান্য বাঙালীরা 'আধুনিক' টিপছাপ-মারা পানসে কবিতার চাইতে রসগোল্লার মতো উপাদেয় মিষ্টান্নের প্রতি অনেক বেশি রসনালোলুপ। সন্দেহ নেই, আরও এক শ বছর পরে—১৪৭৪ বঙ্গাব্দে—রসগোল্লার আবিষ্কর্তা নবীনচন্দ্রকে বাঙালী যখন স্মরণ করবেন, তখন আজকের রবীন্দ্রসদনে আত্মনিনাদিত বাঙালী কবিদের অনেকেই সকরুণভাবে বিস্মৃতির অন্তরালবর্তী।

কবিতা এবং মিষ্টান্ন প্রসঙ্গেই মনে পড়লো যুগপৎ কাব্য এবং মিষ্টান্নের কারবারী ভোলা ময়রাকে। সাহিত্য-ইতিহাসকারদের ভাষায়, ভোলা ময়রা ও তাঁর সহধর্মীরা কবি নন, কবিয়াল; অন্যভাবে তাঁরা কবির চাইতে ন্যূন। ভোলা ময়রার মতো তথাকথিত কবিয়ালরা আর যাই হোন, কি পদ্যরচনায় কি মিষ্টান্ন তৈরিতে খাঁটি ছিলেন। কিন্তু একালের 'আধুনিক'-মার্কা পদ্যরচয়িতারা? কথার ভেজালে সিদ্ধহস্ত এই লেখকদের রচনায় 'অনুভব' নামক সেই জিনিসেরই অভাব যার উপস্থিতিতে পদ্য কবিতা হয়ে ওঠে; অর্থাৎ অধিকাংশ একালীন কবির রচনা বানিয়ে-তোলা জিনিস, হয়ে-ওঠা পদার্থ নয়। ফলে, শিক্ষার ব্যাপক প্রসার সত্ত্বেও একালের বাংলা কবিতার পাঠকসংখ্যা সীমাবদ্ধ।

*

জীবনানন্দ দাশ এক সময়ে বলেছিলেন, সকলেই কবি নয় কেউ কেউ কবি। একালের বাংলা কবিতার আলোচনা প্রসঙ্গে কোন সমালোচক সেই স্মরণীয় উক্তিকে উল্টে সবিদ্রূপে বলেছিলেন, সকলেই কবি, কেউ কেউ কবি নয়। তিনদিন-ব্যাপী সর্বভারতীয় কবিসম্মেলনে অ্যামিবাধর্মী বাঙালী পদ্যকারদের সমবেত হতে দেখেছি। এ'দের মধ্যে কে পাঠক কে শ্রোতা চিনতে পারি নি। প্রদীপ্ত রবীন্দ্রসদনের বাইরে জীর্ণবস্ত্র কালিঝুলি-মাখা একজনকে এক টুকরো কাগজ হাতে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম। ভাবলাম, ইনি বোধ হয় একালের শ্রেষ্ঠ কবিপ্রতিভাদের অন্যতম। আলাপ করতে যাচ্ছিলাম, এমন সময় উদ্যোক্তাদের দু'চারজন তাকে তাড়া করতে বুঝলাম; লোকটি পাগল। তাকে জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে হলো; মশায় আপনি কি কখনো পদ্য লিখতেন? তার হাতের চিরকুটখানা দেখতে ইচ্ছে হলো, কি জানি ঐ চিরকুটে যদি আধুনিক বাংলা কবিতার সর্বশ্রেষ্ঠ উদাহরণ থেকে থাকে!

আমার ইচ্ছের বাধা পড়ল; আকস্মিকভাবে কাঁধে চাপ দিয়ে জনৈক কবিবন্ধু বললেন; আরে এখানে কেন, ভেতরে চল, এক্ষুণি ত্রিগুণা সেন এসে পড়বেন।

ত্রিগুণা সেন মানে শিক্ষামন্ত্রী, কবিসম্মেলনে তিনি কেন?

আরে তিনিই তো কবিসম্মেলনের উদ্বোধন করবেন।

সাংসারিক বুদ্ধিতে কিঞ্চিৎ খাটো চন্দ্রগুপ্ত ত্রিগুণা সেনের কবিতা স্মরণ করার চেষ্টা করলেন। অনেক চেষ্টাতেও তিনি শ্রীসেনের কোন কবিতা পড়েছেন বলে মনে করতে পারলেন না। তবে নিশ্চয়ই ত্রিগুণাবাবু বাল্যবয়সে আর দশজন বাঙালীর মতো কাব্যচর্চা করেছেন, তা না-হলে কবিসম্মেলনের উদ্যোক্তারা প্রেমেন্দ্র মিত্র বা বিষ্ণু দের মতো কবিকে বাদ দিয়ে ত্রিগুণাবাবুকে দিয়ে সম্মেলনের উদ্বোধন করাতে যাবেন কেন।

চন্দ্রগুপ্তের গুড়ে বরাবরই বালি! ত্রিগুণাবাবু কবিসম্মেলনে স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন নি।

*

কে বলে ভারতবর্ষ দরিদ্র? কে বলে ভারতবর্ষের মানুষ অনশনে অর্ধাশনে দিন কাটায়, কে বলে ভারতবর্ষে দারিদ্র্যের তাড়নায় শিক্ষকদের পথের ধুলায় নেমে এসে সরকারী ঔদাসীন্যের প্রতিবাদ জানাতে হয়? সরকারী ভাষ্য বলে, অনশন অর্ধাশনের খবর সাংবাদিকদের সৃষ্টি, শিক্ষকদের ধর্মঘট রাজনৈতিক চক্রান্ত ছাড়া কিছু নয়। ভারতবর্ষ নামক তাসের দেশের লোক কৃষ্টি নিয়ে বড়ই ভাবিত, কৃষ্টির জন্য তারা সব করতে পারে। এই তাসের দেশের সরকার তাই হাজার হাজার টাকা খরচ করে কৃষ্টির জন্য, যে-খরচের নীট ফল শূন্য। সাম্প্রতিকতম প্রমাণ সুরম্য রবীন্দ্রসদনে অনুষ্ঠিত তিনদিন-ব্যাপী কবি সম্মেলন, যে-রবীন্দ্রসদনের ভাড়া দৈনিক হাজার টাকা; এবং যে কবিসম্মেলনে ব্যয়িত আনুমানিক চল্লিশ হাজার টাকার মধ্যে প্রায় সবটাই দিয়েছে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার। বিশ্বস্তসূত্রে প্রকাশ, রাজ্য সরকার ১০,০০০্ টাকা দিয়েছেন। আর তাঁরা রবীন্দ্রসদন বিনা মূল্যে ব্যবহার করতে দিয়েছেন কি না সে সংবাদ সংগ্রহ করে উঠতে পারি নি। কবিসম্মেলনের জন্য কলকাতা কর্পোরেশনও নাকি ১০,০০০্ দিয়েছেন। যদি এ খবর সত্য হয়—টাকার পরিমাণ যাই হোক না কেন—তাহলে মেয়রমশাইকে প্রশ্ন করব ঃ যেখানে টাকার অভাবে তিনি ময়লা-ফেলার গাড়ি কিনতে পারেন না, সেখানে তিনি কবিসম্মেলনের মতো সংদের মেলায় টাকা দেন কীভাবে কোথা থেকে?

*

কবিসম্মেলনের উদ্দেশ্য কি? উদ্যোক্তারা বলেছেন, জাতীয় সংহতির মহান উদ্দেশ্যেই এই কবিসম্মেলন। তিনদিন ধরে বিভিন্ন রাজ্যের কবিদের দিয়ে কবিতা পাঠ করিয়েই যদি জাতীয় সংহতি গড়ে তোলা যায়, তবে একটি বাঁদরকে টাইপরাইটারে বসিয়ে দিয়ে তিনঘণ্টার মধ্যে সেক্সপীয়ারের সনেটও লিখিয়ে নেওয়া যাবে। নানা ভাষা নানা রুচির দেশ ভারতবর্ষে স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়তা আজ বিপজ্জনকভাবে মাথা চাড়া দিচ্ছে; জাতীয় ঐক্যের ভিত্তিতে দুর্বলতা মাঝে মাঝে সকরুণভাবে প্রকট হচ্ছে। প্রত্যেক চিন্তাশীল দেশপ্রেমিককে এই ভয়াবহ জাতীয়

বিপদ সম্পর্কে সচেতন হতে হবে সন্দেহ নেই। এবং জাতীয় সংহতির জন্য তাঁকে সর্ববিধ প্রয়াস চালিয়ে যেতে হবে।

কিন্তু জাতীয় আয়ের অংশবিশেষ নির্বিচারে খরচ করে কি জাতীয় সংহতির মহান লক্ষ্যে পৌঁছানো যাবে? বিভিন্ন রাজ্যের কয়েকজন কবিকে দিয়ে (তাও সব কবি প্রতিনিধিস্থানীয় নন) কবিতা পাঠ করানোর জন্য যে বিপুল পরিমাণ অর্থব্যয় হচ্ছে জাতীয় সংহতির কাজে তা শেষ পর্যন্ত কতখানি ফলপ্রসূ হবে? অথচ এই বিপুল টাকা দিয়ে অন্তত তিন-চারটি কাজ করা যেত, জাতীয় সংহতির ভিত্তিকে যা দৃঢ়তর করতে পারত।

গুপ্তের মতে এই কাজগুলি হচ্ছে ঃ

এক ॥ পশ্চিমবঙ্গে ও অন্যান্য রাজ্যে অন্তত একটি করে পোয়েট্রি লাইব্রেরি বা কবিতা-গ্রন্থাগার সংস্থাপন। এই গ্রন্থাগারগুলিতে ভারতের প্রধান প্রধান ভাষায় রচিত (উপভাষার কথা পরে বিবেচ্য) কবিতাগ্রন্থ (এবং পরে সম্ভব হলে কবিতা-সংক্রান্ত আলোচনাগ্রন্থ) থাকবে।

দুই ॥ প্রত্যেক বৎসর প্রতিটি রাজ্যের কবিরা স্বভাষায় ও অন্য রাজ্যের ভাষাগুলিতে রচিত কবিতার (রোমান হরফে মূল ও ইংরেজীতে অনুবাদ সহ) সংকলন-গ্রন্থ প্রকাশ করবেন। এই সংকলন-কার্যে কাব্যগুণ ছাড়া অন্য কোন মানদণ্ড ব্যবহার করা হবে না। কবিতা-গ্রন্থাগারের পক্ষ থেকে এই সংকলনগ্রন্থের প্রকাশ বাঞ্ছনীয়।

তিন ॥ প্রত্যেক রাজ্যের কবিরা অন্য রাজ্যের একজন তরুণ ও একজন প্রবীণ কবিকে সম্মানিত করার ব্যবস্থা করবেন। এ কাজও কবিতা-গ্রন্থাগারের পক্ষ থেকে করা যেতে পারে।

চার ॥ সম্ভব হলে মাঝে-মাঝে ছোট আকারে (অনেকটা ঘরোয়াভাবে) কবি-সমাবেশ করা যেতে পারে। বিভিন্ন রাজ্যের কবিদের একসঙ্গে না ডেকে একটি রাজ্যের কবিদের এক-একবার আহ্বান করা বাঞ্ছনীয়। যেমন, পশ্চিমবঙ্গ এ বছর অন্ধ্র ও গুজরাটের কবিদের, সামনে বছর মাদ্রাজ ও পাঞ্জাবের কবিদের কবিতা-পাঠে ও আলোচনায় অংশ গ্রহণে আহ্বান জানাবেন। অনুরূপভাবে মহারাষ্ট্র এ বছর বিহার ও কেরলের কবিদের আমন্ত্রণ জানাবেন। বর্তমান সম্মেলনের মতো হটধর্মী সমাবেশে কবিদের পারস্পরিক পরিচয় ঘনিষ্ঠ হয় না আর এই ঘনিষ্ঠ পরিচিতির অভাবে কবিসম্মেলন লক্ষ্যভ্রষ্ট হতে বাধ্য।

ভাবলে আরও কিছু বাস্তবোচিত পন্থা আবিষ্কার করা যেতে পারে। কিন্তু কবিসম্মেলনের লক্ষ্য জাতীয় সংহতি-সাধনের উপায় ইত্যাদি নিয়ে ভাবছে কে, ভাববার মতো সংলোকই বা কোথায়? আর সংলোক যদি-বা দু'চারজন পাওয়া যায়, তাঁদের কথা শুনছে কে?

বন্ধু বলেন, ভারতবর্ষে এখন Age of Reason নয়, Age of Treason, Age of Man নয়, Age of Management. ভারতবর্ষে এখন বিদ্যাবত্তা যুক্তি মনুষ্যত্ব ধূল্যবলুণ্ঠিত। নিরাদর্শ ভারতবর্ষে এখন National Anthem-এর পরিবর্তে Personal Anthem—জয় হে আপনভাগ্য-বিধাতা!

*

অতএব সর্বভারতীয় কবিসম্মেলনে চন্দ্রগুপ্তের মতো অ-কবি সাধারণ ভারতীয় তাঁর প্রার্থিত ভারতবর্ষকে খুঁজে পান না। রবীন্দ্রসদনের রমণীয় অভ্যন্তরে তিনি যাঁদের প্রত্যক্ষ করেন, তাঁদের কারো কারো নাম তিনি পত্র-পত্রিকায় দেখেছেন, কারো কারো নাম অন্যসূত্রে শুনেছেন, আর কারো কারো নাম তিনি আদৌ শোনেন নি। ব্যবসায়ীদের বিজ্ঞাপন-সংবলিত ৩্ টাকা দামের সুভেনির তিনি দেখেছেন, অনুষ্ঠান-তালিকা দেখেছেন। বড়ো-মেজ-সেজ-ছোট সবরকম কবির স্বরচিত কবিতা-পাঠ শুনেছেন। কবিতা শুনে বিভ্রান্ত বোধ করেছেন, কারণ বড়ো ও মেজ দু-চারজনের কবিতা ছাড়া আর সকলের কবিতা প্রায় একইরকম ঃ কবিতে কবিতে নাহিক প্রভেদ নিখিল লেখক কাব্যময়। এক কবি যদি বলেন, আমার ঈশ্বরকে আমি স্বপ্নে খুঁজে পাই' আর-এক কবি বলবেন, গতকাল সন্ধ্যায় সিঁড়ির তলায় কেন তুমি এসেছিলে ঈশ্বরী? একজন যদি 'পিতামহ অন্ধকার' ব্যবহার করেন, অন্যজন 'পিতামহী বিষন্নতা'র হাত কিছুতেই এড়াতে পারেন না। অর্থাৎ একালের তরুণ কবি ও কবিযশঃপ্রার্থীরা কি চিন্তায় কি রূপকল্পে ক্লান্তিকর উৎপাদনে পাঠকসমাজের বিরক্তি ও বিরূপতার কারণ হয়েছেন। আত্মপ্রচারের মোহ ছেড়ে তাঁরা যদি সৎভাবে কাব্যচর্চায় আত্মনিয়োগ করেন, তাহলে তাঁদের ও বাংলা সাহিত্যের কল্যাণ অবশ্যম্ভাবী।

আমার এই সদিচ্ছা পূরণ আপাতত সম্ভব কি না ভাবছি। কারণ আমি কবি নই, আমি কবিতার উৎসাহী পাঠকমাত্র এবং বাঙালী হিসাবে বাংলা কবিতার উন্নতিকামী। পত্র-পত্রিকায় অনর্গল কবিতা প্রকাশ করে আত্মপ্রচারের বাসনা আজও আমাকে আক্রমণ করে নি। তাই যখন পত্র-পত্রিকা-সংশ্লিষ্ট (পত্রিকাওয়ালাদের ক্ষমতার তারতম্য অনুসারে) কবি বা কবিয়ালদের সম্মেলনের নায়ক পৃষ্ঠপোষক উদ্যোক্তারূপে রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হতে দেখি, তখন বুঝি 'জাতীয় সংহতি' উপলক্ষ্য মাত্র, লক্ষ্য আত্মস্বার্থসিদ্ধি, আর্থিক-পারমার্থিক লাভ। কবিতাই যদি কবিসম্মেলনের নীতি হতো, তাহলে অরুণ মিত্র, সঞ্জয় ভট্টাচার্য, বিমল-চন্দ্র ঘোষের মতো কবিকে নিশ্চয়ই কবিতাপাঠে আহ্বান করা হতো। আহূত কবিদের তালিকা দেখলে বোঝা যাবে, কবি ছাড়াও তাঁদের অনেকে অন্যতর ক্ষমতায় বিশিষ্ট, যার সঙ্গে কবিতার কোন সম্পর্ক নেই। নিমন্ত্রিতদের প্রতি উদ্যোক্তারা অভাবনীয়রকম অভদ্র ঃ বহু নিমন্ত্রণ-পত্রে নিমন্ত্রিতদের নাম সঠিকভাবে লেখা হয় নি, সুভেনিরে কবিতাপাঠে অংশ গ্রহণ-কারীদের অনেকেরই নাম তাঁদের বিনা অনুমতিতে ছাপা হয়েছে (ভাবখানা এই, কবিতাপাঠের সুযোগ দিয়ে তোমাকে ধন্য করছি), পরিচালকমণ্ডলীতেও অনেকে এমন আছেন যাঁদের অনুমতি নেবার প্রয়োজন উদ্যোক্তারা মনে করেন নি (এখানেও ঐ একই ধরণের মনোভাব,

সাপ্তাহিক বসুমতীর পক্ষ থেকে সম্বর্ধনা

'সাপ্তাহিক বসুমতী'র পক্ষ থেকে বাংলা ভাষায় সংবাদ-সাহিত্যে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ সৃষ্টির জন্য আগামী পঁচিশে বৈশাখ, ১৩৭৫, শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়কে সম্বর্ধনা জানানো হবে।

সাপ্তাহিক বসুমতীর পক্ষ থেকে প্রতি বছর এই ধরণের সম্বর্ধনা দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে।

কিস্তবন্দীতে ট্রানজিস্টার
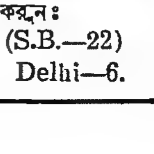
৩২০্ টাকা মূল্যের টেলিকুইন, পোর্টেবল ৩ ব্যান্ড অল ওয়ার্ল্ড ৮ ট্রানজিস্টার মাসিক ১০্ টাকার সহজ কিস্তিতে। আবেদন করুনঃ
ATLAS CO. (S.B.—22)
Box No. 1329, Delhi—6.

তোমার নাম ছেপে তোমাকে স্বর্গে তুলে দিয়েছি) মণ্ডগৃহে নিমন্ত্রিতদের প্রতি প্রয়োজনীয় সৌজন্য প্রকাশেও উদ্যোক্তাদের সমান ঔদ্ধত্য। সাহিত্যিকের প্রতি চন্দ্রগুপ্তের স্বাভাবিক শ্রদ্ধা, সাহিত্যের প্রতি ততোধিক। তাই সম্মেলনের পৃষ্ঠপোষক অন্নদাশঙ্কর রায়ের নাম যখন 'আনন্দশঙ্কর' রূপে ঘোষিত হয়, তখন বেদনা বোধ না করে পারি না। সামান্য ব্যাপার হলেও যুগপৎ করুণা ও কৌতুক-বোধ করি অনুষ্ঠান-তালিকায় non-political and non-profiteering organisation রূপে কবি-সম্মেলনের পরিচিতি দেখে। Non-political যদি বা বোধগম্য হয়, non-profiteering কেমন-কেমন ঠেকে। কবিসম্মেলন অলাভজনক ব্যাপার, এ আর নতুন কি, কিন্তু অজস্র অর্থব্যয়ে অনুষ্ঠিত এই কবিসম্মেলনকে যখন বিশেষভাবে non-profiteering বা অলাভজনক বলে বর্ণনা করতে হয়, তখন ঠাকুরঘর ও কলার অতিপরিচিত সম্পর্কের প্রসঙ্গ অনিবার্যভাবে মনে আসে।

*

সর্বভারতীয় কবিসম্মেলনে ভারতের বিভিন্ন রাজ্য থেকে কবিরা এসেছেন। অন্যান্য রাজ্যের প্রতিনিধিস্থানীয় অনেক কবিই আসেন নি। কারণ তাঁদের অসামর্থ্য না তাঁদের আদৌ আমন্ত্রণ জানানো হয় নি, সে কথা উদ্যোক্তারা বলতে পারবেন। কাব্য-রস পরিবেশনের ফাঁকে ফাঁকে নোনতারও ব্যবস্থা আছে : 'জাতীয় সংহতি ও কবিতা' 'কবিতার চিত্রকল্প' ইত্যাদি ভারি-ভারি বিষয় নিয়ে আলোচনা করবেন পণ্ডিতবর্গ। অনর্গল কবিতা পাঠ ও কবিতা-সংক্রান্ত পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা যাঁরা শুনেছেন ও শুনবেন তাঁরা চন্দ্রগুপ্তের সশ্রদ্ধ বিস্ময়! তবে কবিতাপাঠক ও আলোচকরা পালাক্রমে শ্রোতার ভূমিকা নিচ্ছেন বলে শ্রদ্ধার যোগ্য। বিশুদ্ধ শ্রোতার সংখ্যা সীমিত সংখ্যক।

জাতীয় সংহতির দোহাই দিয়ে সর্বভারতীয় কবিসম্মেলনের মতো আরও অনেক সর্বভারতীয় সম্মেলন হবে, ব্যয়িত হবে আরও হাজার হাজার অর্থ। আর কবিসম্মেলন হতে পারলে সর্বভারতীয় ক্ষৌরকার-সম্মেলন সর্বভারতীয় চর্মকার-সম্মেলনই বা হবে না কেন? জাতীয় সংহতিতে এই সমাজকর্মীদের ভূমিকা আরও প্রত্যক্ষ আরও গুরুত্বপূর্ণ বলে এ জাতীয় সর্বভারতীয় সম্মেলনের প্রয়োজনীয়তা বরং বেশি। অন্যপক্ষে অজস্র অর্থব্যয়ে অল্পসংখ্যকের আত্ম-স্বার্থে অনুষ্ঠিত আলোচ্য সর্বভারতীয় কবিসম্মেলন যে শেষ পর্যন্ত কোনরকম ফলপ্রসূ হবে না তাতে নিঃসন্দেহ। আর চিন্তাহীন পরিকল্পনায় ব্যক্তিগত দলাদলির মালিন্যে চিত্তের সংকীর্ণতায় সার্বিক সৌজন্যের ঘাটতিতে এবং বৃহত্তর জন-সমর্থনের অভাবে সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত এই সর্বভারতীয় কবিসম্মেলন চেহারায় চরিত্রে খর্বভারতীয় কবিসম্মেলন হয়ে দাঁড়াল, এই ভারতীয় কবি-সম্মেলন হয়ে দাঁড়াল, এ বেদনায় আপাতত চন্দ্রগুপ্ত আপ্লুত।

আমারি বঁধুয়া আন বাড়ি যায়,
আমারি আঙিনা দিয়া—

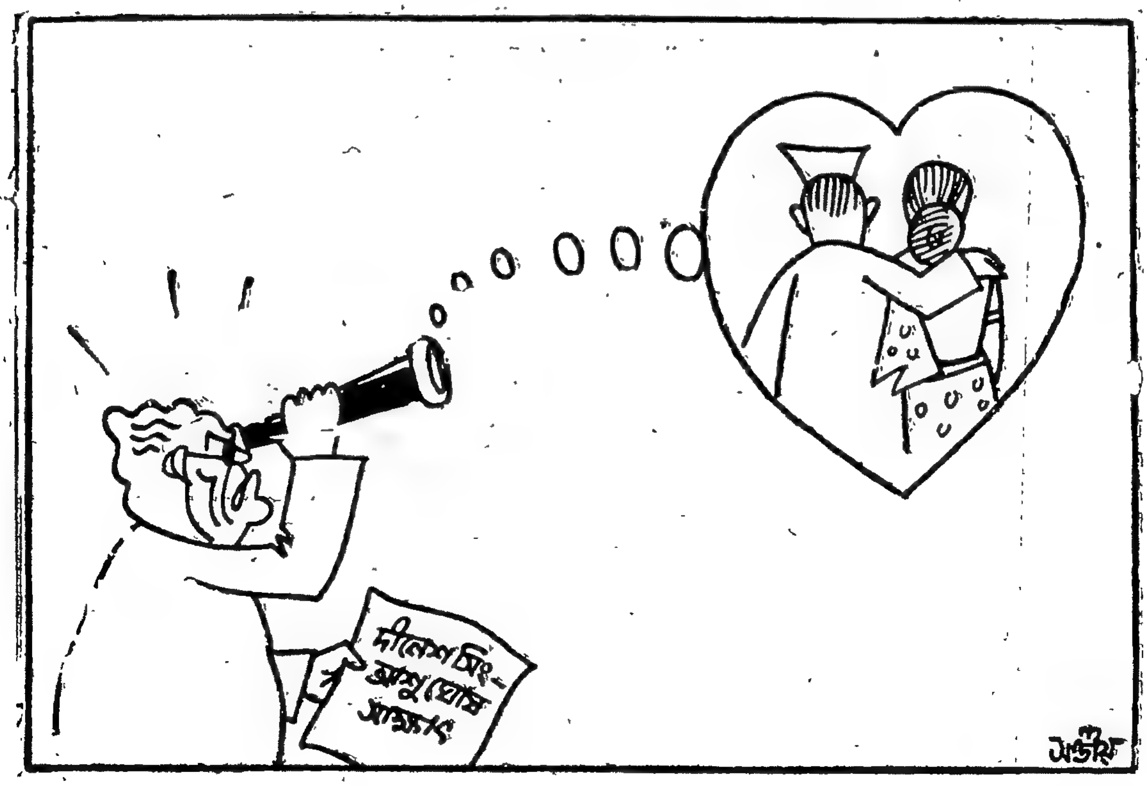

পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার অপসৃত অধ্যক্ষ শ্রীবিজয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের আলোড়ন সৃষ্টিকারী রুলিংকেই মুখ্যত মেনে নিয়ে দুইদিনব্যাপী অধ্যক্ষ ও সভাপতি সম্মেলনের সাফল্যপূর্ণ অধিবেশন সমাপিত হল নতুন দিল্লীতে। এই গুরুত্বপূর্ণ সম্মেলনটি আহ্বান করে এবং সম্মেলনে প্রকৃতপক্ষে নিরপেক্ষ এবং সময়োচিত কার্যকর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়ে লোকসভার অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত সঞ্জীব রেড্ডি বিজয়বাবুর পর গণতন্ত্রের স্বাধিকার রক্ষার ক্ষেত্রে দ্বিতীয় ইতিহাস সৃষ্টি করলেন।

রাজ্যপালের খেয়ালখুশির খেসারত দিতে হয়েছিল পশ্চিমবঙ্গ ও হরিয়ানাকে। রাজ্যপালের 'খুশি'কে একইভাবে ব্যবহৃত হতে দিলে গণতন্ত্রের গয়াপ্রাপ্তি ছিল সুনিশ্চিত। বিজয়বাবু সেই মৃগয়াকেই একক বীরের দুঃসাহস নিয়ে প্রথম ঠেকিয়েছিলেন, শ্রীযুত রেড্ডি প্রকারান্তরে বিজয়বাবুর অপরাজেয় রুলিংকেই স্বীকৃতি জানাবার ব্যবস্থা করলেন রাজ্য বিধানসভার প্রিসাইডিং অফিসারদের সম্মেলন আহ্বান করে, যে সম্মেলন দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করল, সভাই সবার উপরে। মন্ত্রিসভার গরিষ্ঠতা যাচাই-এর নিঃসংশয়িত স্থান হল আইনসভা, যার উপরে রাজ্যপালের কথা তো চলেই না (ইনি মনোনীত আমলা মাত্র), মুখ্যমন্ত্রীর খবরদারিও অচল (ইনি সভার কাছে সপারিষদ দায়াবদ্ধ), এমন কি স্বয়ং অধ্যক্ষ এবং সভাপতিও পারেন না নির্বাচিত প্রতিনিধিসভাকে, অনির্দিষ্টকাল অক্ষম করে রাখতে।

স্পীকার সম্মেলনের সিদ্ধান্ত স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীচ্যবনের ক্ষমতা কেন্দ্রীকরণের উদ্যোগপর্বেই বড় করে একটি 'না' উচ্চারণ করেছে। গণতন্ত্রের কণ্ঠরোধকারী শাসনযন্ত্রের আগ্রাসী নীতিকে এক কথায় অগণতান্ত্রিক বলে নির্দেশিত করেছে। বলা হয়েছে ; the executive authority had been exercised in a manner that was not always in keeping with the constitutional propriety so as to inspire confidence in the people. জনগণের মনে যাতে আস্থা উৎপাদন করে শাসনযন্ত্র সংবিধানের নির্দেশকে তেমনভাবে পালনে যে ব্যর্থ হয়েছে সভাধ্যক্ষ এবং সভাপতি সম্মেলনে তার স্বীকৃতি স্বরাষ্ট্র দপ্তরের প্রতি নিঃসন্দেহে গুরুতর তিরস্কার। এবং শ্রীচ্যবন যতই কেন মনে করুন না যে, সম্মেলনে পশ্চিমবঙ্গে উদ্ভূত সমস্যার আলোচনা হয় নি, বর্তমানে প্রশ্নটিকে

শ্রীবিজয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

ঐভাবে পাশ কাটানোর দায়িত্ব অস্বীকার করা অসম্ভব।

যেহেতু রাজ্যপালের 'খুশি' প্রয়োগে বিশেষত পশ্চিমবঙ্গের সভাধ্যক্ষ আজ অপসারিত, সে কারণ বিজয় বন্দ্যোপাধ্যায়কে সম্মেলনে আহ্বান জানানো যায় নি। তাঁর বদলে যাঁরা উপস্থিত ছিলেন, তাঁরা হলেন বিধানপরিষদের চেয়ারম্যান ও ডেপুটি চেয়ারম্যান যথাক্রমে ডঃ প্রতাপচন্দ্র গুহরায় এবং উপেন্দ্রনাথ বর্মণ। অথচ মজার ব্যাপার এই যে, বিজয়বাবুর জনাই সম্মেলন ডাকতে হয়েছিল, বিজয়বাবুর রুলিং-ই সম্মেলনকে মুখ্য সিদ্ধান্তরূপে গ্রহণ করতে হয়েছে। অমন যে প্রতাপবাবু, যিনি গত নভেম্বরে রাজ্যপালকে সংবিধানের ১৬৪ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী মন্ত্রিসভার দণ্ডমুণ্ডের কর্তারূপে প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন, তিনিও তাঁর গত বছরের রুলিং-এর বোঝা পুনরায় স্পীকার সম্মেলনে গিয়ে নামিয়ে আসতে পারেন নি। একদিন রাজ্যপালকে মন্ত্রিমণ্ডলী বরখাস্ত করার কর্তা বলে রুলিং দিলেও সঞ্জীব রেড্ডির নিরপেক্ষ ব্যক্তিত্বের সামনে রাজ্যপালের 'খুশি'কে পুনরায় উত্থাপনে শ্রীগুহরায়ের উদ্দীপনা একইভাবে জাগত হতে বাধা পেয়েছে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর স্বখাত সলিলে জল এখন বহুদূর ঘোলা হয়েছে, শ্রীযুত গুহরায় সেই ঘোলা জলে দ্বিতীয়বার অবগাহনে স্পষ্টতই ইতস্তত করেছেন।

স্পীকার সম্মেলনে পশ্চিমবঙ্গের ব্যাপারটাকে সাবধানে সরিয়ে রাখার একটা বাহ্য প্রচেষ্টা অবশ্যই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর অসুবিধা স্মরণ করেই করা হয়েছে। স্বরাষ্ট্র দপ্তর তাই সম্মেলনের ফলশ্রুতি দর্শন করে আটঘাট বাঁধতে শুরু করেছেন। তাঁদের ব্যাখ্যায়, সংবিধানের ১৬৪ অনুচ্ছেদের স্বরাষ্ট্র দপ্তরীয় ব্যাখ্যাকে

সম্মেলনে সমালোচ্য করা হয় নি। যখন স্পষ্ট ইঙ্গিত রাখা হয় নি, তখন সে কথা বলা যেতে পারে বটে, তবে চোখ বন্ধ করলেই কি সত্যের চেহারা দু'রকম হয়। স্পীকার সম্মেলন রাজ্যপালের অধিকার প্রয়োগ, মন্ত্রিসভা বরখাস্তকরণ প্রভৃতি যে প্রশ্নগুলিকে আলোচ্য করেছেন তা স্বরাষ্ট্র দপ্তরের কার্যেরই ফলস্বরূপ। রাজ্যপালের খুশি প্রয়োগ না ঘটলে বিজয়বাবুর রুলিং-এর প্রয়োজন দেখা দিত না। বিজয়বাবুর রুলিং রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে জটিল করে না তুললে কুড়ি বছর পরে এই স্পীকার সম্মেলনই বা ডাকা হত কেন। স্বরাষ্ট্র দপ্তর সুতরাং বেশ বেকায়দায় জড়িয়ে পড়েছেন।

ওদিকে প্রিসাইডিং অফিসার সম্মেলনে গৃহীত সিদ্ধান্ত কার্যকরী করার জন্য চাপ সৃষ্টি হচ্ছে কংগ্রেস সংসদীয় দলের মধ্যেই। অবশ্য সংগঠন হিসেবে কংগ্রেস ক্ষমতাসীন কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দের ওপর বিশেষ যে কোনও প্রভাব বিস্তার করতে পারে, পূর্বাপর বহু কংগ্রেসী অধিবেশনের সিদ্ধান্তগুলির অঙ্কুরে বিনাশ লক্ষ্য করে তেমন ভরসা রাখা যায় না। বিশেষ চাবন সাহেব নাকি ভয়ঙ্কর শক্ত মানুষ। রাজ্যপালের ক্ষমতা প্রয়োগের ব্যাপারে স্বয়ং প্রধানমন্ত্রীও নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছিলেন। শক্ত মানুষ চাবন কারও পরোয়া করেন নি। যাই হোক চাবন সাহেব ব্যাপারটা যে সামলাতে পারবেন তাতে সন্দেহ নেই, তবে ভবিষ্যতে রাজ্যপালের 'খুশি'কে একইভাবে ব্যবহার করা মুস্কিল হবে। মুস্কিল হবে কারণ, নির্বাচিত প্রতিনিধিসভাকে কেবলমাত্র ক্ষমতার চোখ রাঙিয়ে উড়িয়ে দেওয়া আগের মতো সহজ কর্ম বলে আর বিবেচিত হবে না।

স্পীকার সম্মেলনের সিদ্ধান্তগুলি প্রস্তাবাকারে লিখিত হয়েছে, যদিও শ্রীরেড্ডি নিজে ঐ সিদ্ধান্তগুলিকে কনভেনশন বা প্রচলিত বিধির আকারেই চালু রাখতে চান। সংবিধানে সিদ্ধান্তগুলির স্থায়ী স্থান করার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণের খুব একটা প্রয়োজন আছে বলে তিনি মনে করেন নি। কনভেনশনই হোক, আর লিখিত বিধানই হোক সব কিছুই ক্ষমতাসীন সরকারের মেনে চলার ওপরই নির্ভর করে। মেনে না চললে সংকট অনিবার্য হয়। ইংলণ্ড কনভেনশনকে লিখিত বিধির মতই মর্যাদা দান করেছে। গণতন্ত্রকে সজীব রাখার জন্য সেখানে সদিচ্ছার ত্রুটি নেই। সেই সদিচ্ছাটাই আসল কথা। নচেৎ লিখিত বিধানের অপব্যাখ্যার দ্বারা গণতন্ত্রের কণ্ঠরোধ এবং অবদমনও তো সম্ভব।

স্পীকার সম্মেলনের সুপারিশগুলি এখানে ধরে রাখা যাক ঃ

সম্মেলনের সুপারিশ

(ক) মন্ত্রিসভার সমর্থকগণ সংখ্যাগরিষ্ঠ কিনা এ বিচারের চূড়ান্ত অধিকারী বিধানসভা।

(খ) মুখ্যমন্ত্রীই প্রিসাইডিং অফিসারদের পরামর্শক্রমে আইনসভা আহ্বান ও বন্ধ করার তারিখ নির্দেশ করবেন। রাজ্যপালের ভিন্ন প্রস্তাব থাকতে পারে। তবে সিদ্ধান্ত গ্রহণের চূড়ান্ত ক্ষমতা মন্ত্রিসভার।

(গ) কিন্তু তাই বলেই মুখ্যমন্ত্রী অনির্দিষ্টকাল আইনসভার মুখ বন্ধ করে রাখতে পারেন না। যদি মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে উপযুক্ত সংখ্যক সদস্যের অনাস্থা

শ্রীসঞ্জীব রেড্ডি

প্রস্তাব থাকে তবে তদ্বিষয়ে লিখিত অনুরোধ প্রাপ্তির সপ্তাহকাল মধ্যেই আইনসভা আহ্বানের জন্য মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যপালকে পরামর্শ দিতে বাধ্য থাকবেন।

(ঘ) স্পীকারের ক্ষমতাকেও চূড়ান্ত রূপদানে স্পীকার সম্মেলন অনিচ্ছুক। সম্মেলনের মতে, অধ্যক্ষ বা প্রিসাইডিং অফিসার যদি বিধিবহির্ভূত ভাবে সভার অধিবেশন মুলতুবী রাখেন তা হলে যাতে তাঁকে অপসারিত করা যায় তার জন্য আইনসভার কার্যবিধি সংশোধন করার প্রয়োজন।

স্পীকার সম্মেলনের সিদ্ধান্তসমূহ স্পষ্টতই নির্বাচিত আইনসভাকে সবার উপরে স্থান দিতে চেয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী স্পীকার অথবা মনোনীত রাজ্যপাল যাতে অমিত শক্তি অধিকার করে গণতান্ত্রিক বিধানসভাকে অক্ষম করে দিতে না পারেন সেজন্য বস্তুত নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই সমগ্র সমস্যাটি আলোচিত হয়েছে। এখন এই সিদ্ধান্তগুলিকে রূপদানের জন্য সর্বতোভাবে প্রচেষ্টাই ক্ষমতাসীন সরকারের সদিচ্ছার প্রমাণ দেবে। অন্যথা বুঝতে হবে, গণতন্ত্রের জয়গানে দিগ্বিদিক মুখরিত করা হলেও আসলে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে আমরা ক্রমে বিশ্বাস হারাতে বসেছি।

এবং গণতন্ত্রে বিশ্বাসী কারুরই তো এ বিষয়ে কোনো সন্দেহই থাকতে পারে না যে, আইনসভার স্থানই সবার উপরে। স্বাধীন গণতান্ত্রিক ভারতের সংবিধান রচিত হওয়ার বিশ বছর পরেও যে আজ নির্বাচিত প্রতিনিধিদের ক্ষমতা রাজ্যপালের দ্বারা খর্বিত হওয়া সঙ্গত কি না এই বিষয়ে আলোচনা সভা বসাতে হচ্ছে এটাই আশ্চর্য এবং দুঃখের কথা। জনগণের দ্বারা সরকার বলতে নির্বাচিত সরকারকেই বুঝি। মনোনীত রাজ্যপালের খেয়ালে যদি সেই সরকারের কার্যকাল নির্ভর করে তাহলে আর গণতান্ত্রিক সংবিধানের বড়াই করার উপায় থাকে কোথায়। গণতান্ত্রিক অধিকার খর্ব করে একটি প্রাঞ্জল ব্যাপারকে ঘোলা করে তোলা হয়েছিল। স্পীকার সম্মেলন সেই সাংবিধানিক সংকট মোচনের পথে পশ্চিমবঙ্গের অপসারিত অধ্যক্ষ বিজয়বাবুর পর দ্বিতীয় ঐতিহাসিক অবদান রেখে গেলেন।

অল ড্যাডি'স সনস

'ভারত আবার জগৎ সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে' এ গান আজও শুনলে গায়ে কাঁটা দেয়। গভীর দেশপ্রেম, স্বাজাত্যাভিমান কবিকে দিয়ে সে যুগে সঙ্গীত রচনা করিয়েছিল; দেশপ্রেমিককে দিয়েছিল বৃটিশ বুটের অকথ্য নির্যাতন সহ্য করার শক্তি এবং দেশবাসীকে দিয়েছিল দেশের জন্য একটি স্বর্ণোজ্জ্বল ভবিষ্যতের আশা কল্পনা। কত রক্তক্ষয়ী আন্দোলনের পর, কত বীর শহীদের আত্মোদানের পর প্রার্থিত স্বাধীনতা খণ্ডিতভাবে ভারতবাসীর শৃংখলিত হাত মুক্ত করল। কিন্তু দিন যেতে না যেতেই বোঝা গেল আমরা যে গোলাম, মনে প্রাণে সেই গোলামই রয়ে গেছি। ইংরেজের বকলমে আমাদের গলায় বুড়ো আমলার মর্যাদার স্মারক নেকটাই রূপে ঝুলছে। আমরা ঢের বেশি সাহেব বনেছি এবং অনেক বেশি করে দেশের মান মর্যাদাকে অপদস্থ করতেই শিখেছি। তখনই বোঝা গেল, আমাদের প্রকৃত মুক্তি এখনও অপেক্ষায় আছে। সবাই মিলে দেশকে ভালোবাসতে পারি নি, কতিপয়ের ভালোবাসায় উৎসাহ দিয়েছিলাম মাত্র।

সেজনাই বিদেশে ভারতের মান মর্যাদা রক্ষিত হল কি না হল, আমাদের তাতে

বড় একটা আর আসে না; অথচ আমরা কতখানি বৈদেশিক বিলাসব্যসন ভোগ করলাম তাই নিয়ে বরং এক শ্রেণী ঢের বেশি মাথা ঘামাচ্ছি। হোটেল, বার, রেস্তোরাঁয় বিদেশীয়ানার বাহ্যাড়ম্বর থিকথিক করছে। গৃহকোণে 'মা' হয়েছেন 'ম্যমি', বাবা 'ড্যাড্ডি'। এ হেন যে দেশবাসী মানচিত্রে ভারতের অবয়ব দেখে থাকেন তাঁদের নাসিকাগ্রে ভারতভূমির মিঠে সুবাস মন নাড়া দেবে কেন। হ্যাম থেকে হমবুর্গের টান বরং অনেক বেশি।

ঠিক এই সব কথাই প্রমাণসহ জানা গেল রাষ্ট্রসঙ্ঘের সাধারণ পরিষদে অন্যতম ভারতীয় প্রতিনিধি শ্রী ডি এন তেওয়ারীর এক পত্রে। পত্রটি স্বয়ং প্রধানমন্ত্রীর কাছে লিখিত। তাঁর অভিযোগের সারমর্ম; ভারতীয় আমলাবর্গের মধ্যে দেশপ্রাণতার ভীষণ অভাব রাষ্ট্রসঙ্ঘে এবং বিদেশস্থ ভারতীয় কূটনৈতিক সংস্থাগুলিতে ভারতীয়ত্ব লোপ পাওয়াতে বসেছে, কাজের বদলে বিলাসের বেহেস্ত তৈরি করা হয়েছে সেখানে এবং দেশদরদী মানসিকতার অভাবেই ভারতীয় কূটনৈতিক প্রতিনিধিদের ভারত সম্বন্ধীয় ভাষণাদি বিদেশে প্রকৃত কোন ঔৎসুক্য সঞ্চার করতে পারছে না।

বোঝা যাচ্ছে, এ ভারত সে ভারত নেই। এমন কি সেই পরাধীন ভারতও বর্তমানের চেয়ে শতগুণে গরীয়সী ছিল। পরাধীন ভারতের নেতৃস্থানীয় প্রতিনিধিরা তাঁদের বক্তৃতামণ্ডপে স্বাধীন বিদেশী শ্রোতাকে বিমুগ্ধ করে ভারতের প্রতি শ্রদ্ধানত করতে পেরেছিলেন ভারতের বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বহু অপপ্রচারের অসুবিধা সত্ত্বেও। স্বাধীন ভারতের ঊষাকালে, বিশেষিত করলে, নেহরু-ভারতের প্রথম পাদে রাষ্ট্রসঙ্ঘে ভারতের প্রতিনিধিবর্গ ভারতের জন্য জগৎ সভায় প্রকৃতই অন্যতম শ্রেষ্ঠ আসন সংগ্রহে সক্ষম হয়েছিলেন। শেষবেশ ভি কে কৃষ্ণমেননের দীর্ঘ উন্নত শরীর যখন বক্তৃতা বিভঙ্গে আন্দোলিত হয়েছে তখনও রাষ্ট্রসঙ্ঘে ভারতীয় প্রতিনিধির বক্তব্য শ্রবণের জন্য শ্রোতৃবর্গ সভাস্থলে ভেঙে পড়েছেন। আর আজ, শ্রীতেওয়ারী লিখছেন, সাধারণ পরিষদে ভারতীয় প্রতিনিধির বক্তৃতা অল্পই কারও মনে প্রভাব বিস্তার করে।

কিন্তু তার কারণ কি? তেওয়ারী সে জবাব দেন নি, বলেছেন, আমাদের হৃত মর্যাদা পুনরুদ্ধারের জন্য পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধান প্রয়োজন।

সাংবাদিক সমালোচনায় এ ঘটনার নানান ব্যাখ্যা হয়েছে। অনেকে বলছেন, প্রতিনিধি বাছাই-এ গলদ আছে। কেউ বলছেন, গলদ আসলে পররাষ্ট্র দপ্তরেরই কেন না ভারতের বৈদেশিক নীতি এমনই তেলেজলে তোলা তোলা হয়ে আছে যে বিদেশস্থ প্রতিনিধিরা বিমূঢ় বোধ করছেন। কিন্তু এ সমস্ত আলোচনা তথ্যসন্ধানী। 'ভারতদর্শন' পূর্বাপর অন্তরে অবগাহনেরই চেষ্টা করে আসছে। বর্তমান আলোচনায়ও সেই অন্তর্নিহিত ত্রুটিরই সন্ধান করা যাক।

ভারতস্থ কূটনৈতিক সংস্থাগুলিতে কাজের চেয়ে ঠাট বেশি, কাইস অপেক্ষা আমলার সংখ্যাধিক্য। সেখানে স্যুট নেকটাই-এর যত সমারোহ, বৈদেশিক আচার অনুষ্ঠান রপ্ত করার যেরকম আগ্রহ এবং দরিদ্র দেশবাসীর পাঁজরা ধসানো অর্থ অপচয়ের যে ভয়ঙ্কর উৎসাহের কথা আমরা জানতে পারি সেগুলির সঙ্গে পররাষ্ট্রনীতির বড়রকম একটা সম্পর্ক আছে এমন পক্ষপাতদুষ্ট কথা কেমন করে বলা যায়। এগুলি সংশ্লিষ্ট আমলাবর্গের অন্তরে দেশপ্রাণতার অভাবকেই বরং বেশি করে প্রকট করে তোলে না কি! শ্রীতেওয়ারী জানিয়েছেন, নেদারল্যাণ্ড প্রভৃতি কয়েকটি বিদেশী দূতাবাসে স্বাধীনতা দিবস পালিত হয় নি। জানিয়েছেন, নিউ ইয়র্কে গান্ধীজয়ন্তী উদ্‌যাপনের প্রয়োজন অনুভব করেন নি মোটা মাইনের ভারতীয় কূটনৈতিক আমলারা। লণ্ডনে নমো নমো করে যদিবা একটা সভার আয়োজন করা হয়েছিল, ভারতীয় হাই কমিশন অথবা ক্রয় মিশন থেকে সেখানে কেউ উপস্থিত হওয়ার সময় পান নি। (সময় পান নি কারণ তাঁদের হাতে কাজ কম কর্মী বেশি!)

এখন বলুন, পররাষ্ট্র দপ্তর কি মোটা বেতনভোগীদের এই সব অপকর্ম করার জন্য পরামর্শ দিয়েছিলেন। অন্তত এ ক্ষেত্রে পররাষ্ট্র দপ্তরের তো কোনই হাত ছিল বলে মনে হয় না। তাহলে স্বাধীনতা দিবস বা গান্ধীজয়ন্তী পালন না করার দুঃসাহসটা তথাকার কর্তারা কোত্থেকে পেলেন!

পেলেন এজন্যই যে এসব অপরাধ সাঙ্ঘাতিক বলে বিবেচিত হয় না। কেন না দেশকে তো আমরা ভালোবাসি না। দেশের স্বাধীনতার নামে আমরা কেবল মাতব্বরী এবং আত্মসুখের ব্যবস্থা করে নিয়েছি। স্বাধীনতাটা সাধারণ মানুষের কাছে যতই মূল্যবান হোক অসাধারণ ব্যক্তির কাছে স্বাধীনতার অর্থ শাদা হাত থেকে শাসনদণ্ডের কালো হাতে হস্তান্তর মাত্র। তাই স্বাধীনতা দিবসকে পালন করার আবেগ বিদেশী (বিদেশস্থ বলার দরকার আছে কি?) ভারতীয় আমলাদের অনুপ্রেরিত করে না। বলতে পারেন, দেশেও ঐ দিনটি তো যথার্থ সাড়া জাগায় না। কিন্তু তার কারণ আলাদা, সে আমাদের সবের মান অভিমানের প্রশ্ন, আশা হতাশার কারণ। কিন্তু যাঁরা স্বাধীনতার কল্যাণে দরিদ্র দেশের ঘাড়ে চেপে দেশের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য বিদেশে গিয়ে নবাবী হালে ফুর্তির ফোয়ারা ছোটাচ্ছেন তাঁদের যে স্বাধীনতার প্রতি ব্যক্তিগত কৃতজ্ঞতাও স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু তা হয় নি। বোধ হয় দেশীর পোষাক ধারণ করে বিদেশে দেশী কালচার প্রদর্শনে তাঁদের যত লজ্জা, দেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম স্মরণ করে বিদেশে গর্ব ভরে সেই স্মৃতি রোমন্থনেও তেমনি অনীহা। দেশকে ভালো না বাসলে এমনিই হয়। গোলামী মনোভাব অন্তরে প্রোথিত থাকলে মাকে 'মা' বলে ডাকতে ভুল করা এমনিভাবেই সম্ভব। যাঁরা এই মাতৃহীনতার দুর্ভাগ্য সদর্পে আলিঙ্গন করে নিয়েছেন তাঁদের কাছে, গান্ধীজীর মতো কৌপীন-সর্বস্ব এক বৃদ্ধেরই বা দর কদর কী। গান্ধীজী সাহেব ছিলেন না, অথচ অনেক দেশী সাহেবের 'ম্যমি' 'ড্যাডি' ভাষাকে আমূল সংস্কৃত করে দিতে পারতেন। গান্ধীজী ইংলণ্ডে গোলটেবিল বৈঠকে ইংরেজের নকলেস গলায় এঁটে যাওয়ার প্রয়োজন বোধ করেন নি, আমাদের দেশী বিদেশী আমলারা নেকটাইয়ে গলাটিপে চলার কায়দাটাই শিখেছেন। দেশহিতৈষণার অভাবই এঁদের দেউলেপনার একমাত্র কারণ। অন্তরের গোলামী না তাড়ালে এঁদের কণ্ঠে মর্যাদাপূর্ণ বোলই বা ফুটবে কেন! তাই এঁরা যতটা সাজতে পারেন এবং টেবল ম্যানারস জানেন ততটা যদি দেশের কথা বিদেশীর মনোদ্বারে পৌঁছিয়ে দিতে সক্ষম না হন, তবে দোষ আর কাকে দেওয়া যাবে। বিদেশীরাই বা এঁদের গোলামী চেহারা দেখার পরেও এঁদের বক্তৃতায় আকর্ষণ বোধ করবেন কেন? ভারতের গরীবমারা অর্থে পুষ্ট এই সব বিদেশস্থ আমলারা যতকাল মনে প্রাণে ভারতবাসী না বনছেন ততকাল বিদেশে ভারতের মর্যাদা পুনরুদ্ধার অসম্ভব, তা যতই কেন পররাষ্ট্র দপ্তরের নির্দেশমালার সার্কুলার ছড়ানো হ'ক না।

সার্কুলার না-ছড়িয়ে আমলাদের দেহ থেকে স্যুট নেকটাই এবং কণ্ঠ থেকে 'ম্যমি' 'ড্যাডির' জঞ্জাল ছাড়ালে কাজ বরং অনেক বেশি হবে। কি দেশে, কি বা বিদেশে, বিলকুল স্বদেশী বানাবার ক্যাম্পেন শুরু হোক, ঢের সমস্যা মিটে যাবে।

(১৩-৪-৬৮)

বাঁদিকে : ওয়াশিংটনের দাঙ্গাবিধ্বস্ত এলাকায় ধ্বংসস্তূপ পাহারারত মার্কিন সৈন্য
ডানদিকে : অন্তিমশয়নে মার্টিন লুথার কিং।

ভিয়েতনাম :

উত্তর ভিয়েতনামের পক্ষ থেকে সরকারীভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আলোচনা-প্রস্তাবে সম্মতি জানানো সত্ত্বেও আজ পর্যন্ত আলোচনায় বসা সম্ভব হয় নি। কোথায় আলোচনা হবে, তাই নিয়ে উভয় পক্ষের মধ্যে কোন মতৈক্য হচ্ছে না। উভয় পক্ষই বলেছেন, উভয়ের কাছে গ্রহণযোগ্য যে-কোন স্থানে তাঁরা বসতে রাজী আছেন। কিন্তু উভয়ের কাছে সমানভাবে গ্রহণযোগ্য কোন জায়গা এখন পর্যন্ত খুঁজে পাওয়া যায় নি।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আলোচনার স্থান হিসাবে জেনেভার নাম প্রস্তাব করেছিল। কিন্তু উত্তর ভিয়তনাম জেনেভার প্রস্তাব অগ্রাহ্য করেছে। তারা চায়, কম্বোডিয়ার রাজধানী নমপেনে আলোচনা শুরু হোক। কম্বোডিয়ার রাষ্ট্রপ্রধান প্রিন্স নরোদম সিহানুক আলোচনায় যোগদানকারী প্রতিনিধিদের সর্বপ্রকার সুযোগ-সুবিধা দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নমপেনে বসতে আপত্তি আছে। নমপেনে যাতায়াতের অসুবিধাই নাকি তাদের আপত্তির প্রধান কারণ। অথচ জানুয়ারী মাসে চেস্টার বোলজ যখন নমপেনে এসেছিলেন, তখন কিন্তু এই যাতায়াতের অসুবিধার কথা ওঠে নি। পোল্যাণ্ডের রাজধানী ওয়ারশ'র প্রস্তাবও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অগ্রাহ্য করেছে—কোন কমিউনিস্ট রাষ্ট্রে তারা বসতে রাজী নয়। নিরপেক্ষ রাষ্ট্রের রাজধানীরূপে দিল্লী, রেঙ্গুন ও জাকার্তা, যে-কোন জায়গায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র রাজী। কিন্তু উত্তর ভিয়েতনামের পক্ষে এই শহরগুলির কোথাও বসা মুশকিল, কারণ চীনের তাতে চটে যাবার যথেষ্ট কারণ আছে। লাওসের রাজধানী ভিয়েনটিয়েনের নামও এসেছে মার্কিন পক্ষ থেকে।

আলোচনার স্থান নিয়ে এত মতভেদে অনেকেই হতাশ হয়েছেন। শুরুতেই এই, শেষ পর্যন্ত আলোচনায় কোন ফল হবে তো? উত্তর ভিয়েতনামের পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট অভিযোগ করা হয়েছে, ইচ্ছাকৃত ভাবে আলোচনায় বিলম্ব ঘটানোর জন্যই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র স্থান নিয়ে এত টালবাহানা করছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অবশ্য এই অভিযোগের কোন গুরুত্ব দেয় নি। তারা আলোচনার সুবিধার জন্য বোমাবর্ষণ আরও বন্ধ করেছে। ইতিমধ্যেই জনসন অ্যাভেরাল হ্যারিমানকে প্রস্তাবিত আলোচনায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান প্রতিনিধি রূপে মনোনীত করেছেন। ইদানীং প্রতি আন্তর্জাতিক গোলযোগে যিনি জনসনের প্রতিনিধিত্ব করেন, সেই সাইরাস ভ্যানসও প্রতিনিধিদলের অন্যতম সদস্যরূপে থাকবেন বলে ঘোষণা করা হয়েছে।

রাষ্ট্রসংঘের সেক্রেটারী-জেনারেল উ থাণ্ট জনসনের শান্তি প্রস্তাবকে বিশেষভাবে স্বাগত জানিয়েছেন। এতদিনে ভিয়েতনামে শান্তি প্রতিষ্ঠার একটা পথ পাওয়া গেল। তাই এই আলোচনা যাতে অবিলম্বে শুরু হয় এবং আলোচনার দ্বারা যাতে কার্যকরী কিছু করা সম্ভব হয়, তার জন্য তিনি বিশেষ আগ্রহী। গত সপ্তাহে উ থাণ্টের য়ুরোপ সফর ভিয়েতনাম শান্তি আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে গুরুত্বপূর্ণ। তিনি সংশ্লিষ্ট অনেকের সঙ্গে এই বিষয়ে কথাবার্তা বলেছেন। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য সাক্ষাৎকার ঘটেছে প্যারিসে, উ থাণ্টের সঙ্গে মাই ভান বো'র। মাই ভান বো উত্তর ভিয়েতনামের ডেলিগেট-জেনারেল এবং য়ুরোপে এই রাষ্ট্রের প্রধান কূটনীতিক প্রতিনিধি। প্রথম দিকে উ থাণ্ট আলোচনার স্থান হিসাবে জেনেভার নাম করেছিলেন, কিন্তু য়ুরোপ সফর শেষে তিনি বলেছেন, প্যারিসেই আলোচনা শুরু হতে

পারে। তাঁর ধারণা, আলোচনা একবার আরম্ভ হলে বোমাবর্ষণ পুরোপুরি বন্ধ করা সম্ভব হবে, এবং উভয়-পক্ষের কাছে গ্রহণযোগ্য একটা মীমাংসা খুঁজে পাওয়া যাবে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও উত্তর ভিয়েতনাম আলোচনার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করলেও, উভয়ের মিত্রগোষ্ঠী কিন্তু এ ব্যাপারে মোটেই খুশি নয়।

দক্ষিণ ভিয়েতনামের রাষ্ট্রপতি নুয়েন ভান থিউ বলেছেন, আলোচনা হোক, তাতে তাঁর আপত্তি নেই, কিন্তু তাঁদের আরও বেশি সতর্ক থাকতে হবে। অর্থাৎ, সৈন্যদলকে নতুন আক্রমণের জন্য তৈরি হতে হবে। ৭ই এপ্রিল দক্ষিণ ভিয়েতনামের ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলী প্রস্তাব গ্রহণ করে বলেছে, তাদের বাদ দিয়ে যদি কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়, তবে তা হবে দক্ষিণ ভিয়েতনামের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা, এবং সে সিদ্ধান্ত তারা মানবে না।

ওয়ারশর কূটনৈতিক মহলের খবরে প্রকাশ, ভিয়েতনামের জাতীয় মুক্তি ফ্রন্ট (এন-এল-এফ), অর্থাৎ ভিয়েত কং যোদ্ধারা নাকি এই শান্তি আলোচনার প্রচেষ্টায় ক্ষুব্ধ। যে আলোচনায় তারা অংশ গ্রহণ করতে পারবে না, তাতে তাদের সম্মতি নেই। চীন ও সোভিয়েট ইউনিয়নের সঙ্গে কোনরূপ পূর্ব-আলোচনা ছাড়াই উত্তর ভিয়েতনাম জনসনের প্রস্তাবে সাড়া দেওয়ার দুই রাষ্ট্রই নাকি অসন্তুষ্ট। তবে সোভিয়েট ইউনিয়ন শেষ পর্যন্ত উত্তর ভিয়েতনামকে এই প্রচেষ্টায় সমর্থন জানিয়েছে, তবে সরকারীভাবে এই সমর্থন ঘোষণা করতে পাঁচ দিন সময় লেগেছে। কিন্তু চীন তার সমর্থন জানায় নি। তারা এই প্রসঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে একচোট গাল দিয়েছে, এবং উত্তর ভিয়েতনামকে এই বলে সতর্ক করে দিয়েছে, কোনরূপ আপোষ করলে চীন তার সকল সমর্থন প্রত্যাহার করবে।

তবু, শান্তি-আলোচনা সম্ভব হবে, শান্তিকামী বিশ্ব একান্তভাবে এই আশা করে।

জর্ডান ঃ

ইসরায়েল আবার নতুন করে আক্রমণ সুরু করেছে।

আম্মান থেকে খবর এসেছে, ৮ই এপ্রিল ইসরায়েলী সৈন্যদের সাঁজোয়া বাহিনী যুদ্ধবিরতি সীমারেখা অতিক্রম করে জর্ডান অঞ্চলে প্রবেশ করেছে এবং প্রচণ্ড গুলীবর্ষণ করেছে। ডেড সী'র দক্ষিণে হেলিকপ্টারে করে ছত্রীবাহিনী নেমেছে, এবং জর্ডানের সৈন্যদের সঙ্গে এখানে তাদের প্রবল সংঘর্ষ হয়েছে। ডেড সী'র উত্তরেও জর্ডান নদী অতিক্রম করে ইসরায়েলী সৈন্য প্রবেশের চেষ্টা করেছে। জর্ডানের রাজধানী আম্মান থেকে যুদ্ধ-বিরতি সীমারেখা মাত্র পঁচিশ মাইল। আম্মানে বসে দুই পক্ষের গোলাবর্ষণের শব্দ শোনা গেছে।

ইসরায়েল কর্তৃপক্ষ অবশ্য এই আক্রমণের সত্যতা অস্বীকার করেছেন। তাঁদের পালটা অভিযোগ, ইসরায়েল সীমান্ত বরাবর সর্বত্র আরব গেরিলারা নাশকতা-মূলক কাজে লিপ্ত রয়েছে।

যাই হোক, ইসরায়েলের জর্ডান আক্রমণের সংবাদে অন্যান্য আরব রাষ্ট্রও সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। ইতিমধ্যেই দামাস্কাস ও কায়রোতে সোভিয়েট বোমারু বিমান এসে পৌঁছেছে।

গত বৎসর জুন মাসে ইসরায়েলী আক্রমণের পর থেকেই আরব জগৎ বেশি করে সোভিয়েট সামরিক সাহায্যের ওপর নির্ভর করছে। নাসের তো প্রকাশ্যেই বলেছেন, তাঁরা আরও বেশি সোভিয়েট সাহায্য চান।

এই পটভূমিকায় সোভিয়েট প্রতিরক্ষা মন্ত্রী আন্দ্রেই গ্রেচ্‌কো'র পশ্চিম এশিয়া সফর বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। গত সপ্তাহে তিনি ইরাক ও সিরিয়ায় গিয়েছিলেন। সোভিয়েট সামরিক সাহায্যের ব্যাপারে তিনি দুই দেশের নেতাদের সঙ্গে কথা বলেছেন।

এর মধ্যেই রাষ্ট্রসঙ্ঘ নিযুক্ত শান্তি-দূত গানার জারিং বিবদমান দুই পক্ষের মধ্যে শান্তি আলোচনা সুরু করার জন্য কথাবার্তা চালিয়ে যাচ্ছেন। জারিং কায়রোতে আলোচনা সুরু করেছেন। এদিকে ১২ই এপ্রিল জেরুজালেম থেকে সংবাদ প্রচার করা হয়েছে, জারিং-এর প্রস্তাবমত ইসরায়েল আরব রাষ্ট্রের প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনায় বসতে রাজী আছে।

ক্যানাডা ঃ

সপ্তাহে অটোয়ায় ক্ষমতাসীন লিবারেল পার্টির জাতীয় সম্মেলনে দলের নতুন নেতারূপে নির্বাচিত হয়েছেন পিয়ের ইলিয়ট ত্রুদো। এ মাসের শেষে ত্রুদো ক্যানাডার নতুন প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্বভার গ্রহণ করবেন।

বর্তমান প্রধানমন্ত্রী লিস্টার পিয়ারসনের অবসর গ্রহণের সিদ্ধান্তের জন্যই নতুন নেতা নির্বাচনের প্রয়োজন হল। গত ফেব্রুয়ারী মাসে পিয়ারসন ঘোষণা করেন, তিনি এপ্রিলে অবসর গ্রহণ করবেন। বর্তমানে তাঁর বয়স ৭১ বৎসর। ক্যানাডার জনপ্রিয় নেতা পিয়ারসনের অকস্মাৎ

নিত্য
নতুন
বই পড়ুন

সাম্যবাদ
বিষয়বস্তু ও কার্যপদ্ধতি
ইনা স্লোসিঙ্গার ও জোনা ম্যাস্টেইন
অনুবাদ ॥ অমরনাথ দত্ত
৬·৫০

বিশ্ববিধানের সন্ধানে
রিচার্ড এল গার্ডনার
অনুবাদ ॥ অনিলরঞ্জন গুহ
৩·০০

মানব ইতিহাসের সন্ধানে
কার্লটন এস কুন
অনুবাদ ॥ রবীন্দ্রনাথ সরকার
প্রথম পর্ব ৬·০০ ॥ দ্বিতীয় পর্ব ৬·০০

ভারত ও পাশ্চাত্ত্য
বারবারা ওয়ার্ড
অনুবাদ
নিরঞ্জন হালদার ও অমলিন গুহ
৫·০০

চীনের সামাজিক রূপান্তর
চু চাই ও উইনবার্গ চাই
অনুবাদ ॥ রবীন্দ্রনাথ সরকার
৫·০০

পরিপ্রেক্ষিতের
বিচারে
কম্যুনিস্ট চীন
এ ডোক বারনেট
অনুবাদ ॥ অমিতাভ চৌধুরী
১·০০

ভিয়েৎনামের যুদ্ধ ঃ কেন ?
এম শিবরাম
অনুবাদ ॥ শিব গঙ্গোপাধ্যায়
২·০০

আত্মকাহিনী
ইলিনর রুজভেল্ট
অনুবাদ ॥ পশুপতি চট্টোপাধ্যায়
২·৫০

একত্রে দশ টাকার অর্ডার দিলে এবং টাকা অগ্রিম পাঠালে ডাকখরচা লাগবে না। পূর্ণাঙ্গ তালিকার জন্য লিখুন।

এশিয়া পাবলিশিং কোম্পানি
এ ঃ ১৩২, ১৩৩ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট
কলিকাতা-১২ ॥ ফোন ঃ ৩৪-২৩৮৬

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শহরে শহরে দাঙ্গা দমনে সৈন্যদল পথে নেমে পড়েছে

অবসর গ্রহণের সিদ্ধান্ত ঘোষণায় লিবারেল পার্টির সদস্য তথা দেশবাসী খুবই দুঃখিত। কিন্তু উপায় নেই। পিয়ারসন তাঁর অবসর নেবার সিদ্ধান্তে অটল।

নতুন নেতার পদের জন্য প্রায় উনিশ-কুড়ি জন প্রার্থী ছিলেন। তাঁদের মধ্যে আবার আট জনই পিয়ারসন মন্ত্রিসভার সদস্য। ৬৪ বৎসর বয়স্ক পররাষ্ট্রমন্ত্রী পল মার্টিনও অন্যতম প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। তবে শেষ পর্যন্ত বিচার মন্ত্রী পিয়ের ইলিয়ট ত্রুদোই নেতা নির্বাচিত হয়েছেন। চতুর্থ ব্যালটে নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বীকে ১২০৩-৯৫৪ ভোটে পরাজিত করে ত্রুদো জয়লাভ করেছেন। অর্থমন্ত্রী ও লিবারেল পার্টির অন্যতম প্রভাবশালী নেতা মিচেল শার্প প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে সরে গিয়ে শেষ পর্যন্ত ত্রুদোর পক্ষ সমর্থন করাতেই তাঁর পক্ষে জয়লাভ করা সম্ভব হয়েছে।

৪৬ বৎসর বয়স্ক ত্রুদো রাজনীতি-ক্ষেত্রে বলতে গেলে নবাগত। মাত্র তিন বৎসর পূর্বে তিনি প্রথম পার্লামেণ্টে আসেন। তবে লেখক, সাংবাদিক, আইন-বিদ ও অধ্যাপকরূপে ত্রুদোর খ্যাতি আছে। তিনি রাষ্ট্রবিজ্ঞান সংক্রান্ত একটি পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন।

ত্রুদো নিজে ফরাসীভাষী ও কুইবেকের অধিবাসী, কিন্তু ইংরেজদের মধ্যেই তাঁর জনপ্রিয়তা বেশি। মণ্ট্রীলের একটি ইংরেজপ্রধান কেন্দ্র থেকে তিনি কমন্স-সভায় নির্বাচিত হয়েছেন। তিনি কুই-বেকের বিচ্ছিন্নতার ঘোর বিরোধী। তাঁর মতে, সংখ্যালঘু কিন্তু শক্তিশালী একদল ফরাসী পাতি-বুর্জোয়া এই বিচ্ছিন্নতার আন্দোলনের পেছনে আছে— বিংশ শতাব্দীর প্রগতিশীল রাজনীতির বিরোধী এরা। তবে ফরাসীভাষী ক্যানাডীয়দের আশা-আকাঙ্ক্ষার দাবি পূরণে তাঁর বিশেষ আগ্রহ আছে। গত ফেব্রুয়ারী মাসে পিয়ারসন ফরাসীভাষীদের সমস্যা আলোচনার জন্য যে সম্মেলন ডেকেছিলেন, ত্রুদো সেই সম্মেলনে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। তাই বর্তমান ক্যানাডার ফরাসী-ইংরেজ সম্পর্কের পরি-প্রেক্ষিতে জাতে ফরাসী, কিন্তু দ্বিভাষী, ও ইংরেজদের আস্থাভাজন ত্রুদোর নির্বাচনে সুবিবেচনার পরিচয় পাওয়া যায়।

শোনা যাচ্ছে, ত্রুদো সেপ্টেম্বরে কমন্সসভা ভেঙে দিয়ে নতুন নির্বাচনের জন্য গভর্নর-জেনারেলের কাছে সুপারিশ করবেন। বিরোধী রক্ষণশীল দলেও ডিফেনবেকারের জায়গায় নতুন নেতা নির্বাচিত হয়েছেন নোভাস্কোশিয়ার রবার্ট স্ট্যানফিল্ড। দুই নতুন নেতার নেতৃত্বে দুই প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী দল নির্বাচনে অবতীর্ণ হবার জন্য এখন থেকেই তৈরি হচ্ছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ঃ

মার্টিন লুথার কিং-এর মৃত্যুসংবাদ ছড়িয়ে পড়ার সংগে সংগে সমস্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জুড়ে যে দাঙ্গা-হাঙ্গামা শুরু হয়েছিল, তা কিছুটা প্রশমিত হলেও ৭ই এপ্রিল জাতীয় শোক দিবস পালনের পর আবার তা নতুন করে শুরু হয়। বালটি-মোর ও পিটসবার্গে পরিস্থিতি গুরুতর আকার ধারণ করে। বালটিমোরে দুই হাজার সৈন্য পাঠাতে হয় দাঙ্গা থামানোর জন্য।

বাষট্টিটি শহরে ব্যাপক দাঙ্গা-হাঙ্গামা হয়। তার মধ্যে চিকাগো ও ওয়াশিংটনের অবস্থা সবচেয়ে খারাপ। বিভিন্ন শহরে দাঙ্গা থামানোর জন্য বিশ হাজারের ওপর যুক্তরাষ্ট্রীয় সৈন্য নিয়োগ করতে হয়। তাছাড়া ছিল একচল্লিশ হাজার ন্যাশনাল গার্ড। তিন দিনের দাঙ্গায় ২৭ জন নিহত হয়েছে, আহতের সংখ্যা ১৫০০, আর গ্রেপ্তার হয়েছে ৬০০০-এর মতো।

এর মধ্যেই ৯ই এপ্রিল আটলাণ্টায় কিং-এর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে। মেমফিস থেকে মৃতদেহ কিং-এর নিজের শহর আটলাণ্টায় আনা হয়। এবেনজার ব্যাপটিস্ট চার্চে অন্ত্যেষ্টি-উপাসনা হয়। এই গির্জাতেই কিং-এর পিতা যাজক ছিলেন, কিং-ও কিছুদিন এখানেই যাজকতা করেছেন। পঞ্চাশ হাজারের ওপর নর-নারী অন্ত্যেষ্টি-অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে ছিলেন। এঁদের অধিকাংশই নিগ্রো, তবে বহু শ্বেতাঙ্গও ছিলেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উপরাষ্ট্রপতি হুবার্ট হামফ্রে, নিউ ইয়র্কের গভর্নর নেলসন রকফেলার, মিসেস কেনেডী প্রমুখ বিশিষ্টদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন।

সরকারী কর্তৃপক্ষের একাংশ বলছেন, কিং-এর হত্যা এবং হত্যাপরবর্তী দাঙ্গা-হাঙ্গামার মধ্য দিয়ে মার্কিন সমাজজীবনের যে গুরুতর সমস্যা আর একবার উৎকট ভাবে প্রকাশ পেল, অবিলম্বে তার সমা-ধানের জন্য উদ্যোগী হতে হবে, এবং দলিত নিগ্রোদের জন্য এখনই উল্লেখযোগ্য কিছু করতে হবে। কিন্তু প্রশাসন কিংবা আইনবিভাগ সামগ্রিকভাবে এই ব্যাপারে তৎপর হয়েছেন, এমন নিদর্শন এখনও পাওয়া যায় নি।

রবীন্দ্রনাথ ও সুভাষচন্দ্র

◎ শঙ্করীপ্রসাদ বসু ◎

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

কিন্তু সুভাষচন্দ্র নিষ্ঠায় ছিলেন অদ্বিতীয়। জাতীয় বিদ্যাপীঠের ভার যখন নিলেন, চরমভাবে নিলেন। ছেলে কমে যাচ্ছে—যাক্‌—সুভাষচন্দ্র বেঞ্চিকে পড়াতে লাগলেন,—আসলে সত্য হয়ে উঠতে লাগলেন নিজের কাছে। এই তাঁর সাধনা, সুতরাং এর কাছে বিসর্জন দিলেন জীবনের লঘু চপল দিককে। এই কারণেই অনেকের ধারণা ছিল—সুভাষচন্দ্র রসিকতার ধার ধারেন না। বাস্তবিক সচরাচর সুরসিক বলতে যাঁদের বোঝায়, সুভাষচন্দ্র তাঁদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না। কিন্তু তাঁর রসবোধ ছিল না, একথার প্রতিবাদ করেছেন দিলীপকুমার। একান্ত আলাপে সুভাষচন্দ্র প্রচুর হাসতেন—এবং সেই অতি নির্মল পরিপূর্ণ হাসির মধ্যে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠত সুভাষচন্দ্রের সমগ্র সত্তা। বাইরের জীবনে সুভাষচন্দ্র প্রতিক্ষণে তাঁর 'একমাত্র আরাধ্য দেবীর' ধ্যানে এতই ব্যাপৃত থাকতেন যে, রসিকতা উপভোগ করার মত মানসিক অবস্থা থাকত না তাঁর। রসিকতা বুঝতেন না,—এই কথার চেয়ে রসিকতা বোঝার সময় নিতে চাইতেন না—এই কথাটাই অধিকতর ঠিক।

প্রসঙ্গটি উত্থাপন করেছিলুম শ্রীযুক্ত সত্যরঞ্জন বক্সীর কাছে। সুভাষচন্দ্রের আলোচ্য রবীন্দ্র-সন্দর্শন সবন্ধে সাবিত্রীপ্রসন্নের লিখিত বিবরণের কথা জানিয়েছিলুম। সত্যবাবু তার উত্তরে বললেন—

তা হতে পারে। সুভাষবাবু তখন রসিকতার ধার ধারতেন না। সব সময় গভীর গম্ভীর আর চিন্তাকুল। দৃষ্টান্ত দিই। সুভাষবাবু তখন গৌড়ীয় বিদ্যায়তনের অধ্যক্ষ, প্রধান অধ্যাপক, অ্যাকাউণ্ট্যাণ্ট ও প্রয়োজনে ঝাড়ুদার। দিনের কাজকর্ম সেরে সুভাষবাবু সন্ধ্যায় এলেন ফরোয়ার্ড অফিসে। ফরোয়ার্ড অফিস সন্ধ্যের সময় রাজনীতিকদের আড্ডার জায়গা। রাত্তির আটটা নাগাদ সেখান থেকে কিরণশঙ্কর, সুভাষচন্দ্র ও আমি বেরুলাম। সুভাষবাবু বললেন, চলুন বিদ্যাপীঠ ঘুরে যাই, কয়েক মিনিটের একটা হিসাব বাকি আছে। আমরা বিদ্যাপীঠে হাজির হলুম—সুভাষবাবু হিসেবের খাতা খুলে বললেন, মাত্র কয়েক মিনিটের কাজ। সেই সামান্য কয়েক মিনিট দেখতে দেখতে আধ ঘণ্টা এবং তারো বেশী হয়ে পড়ল। এধারে কিরণবাবু অস্থির। সন্ধ্যে পর্যন্ত কিরণবাবু কাজে-কর্মে, আড্ডায় বাইরে থাকতে পারেন, কিন্তু ন'টার মধ্যে বাড়ি ফেরা চাই। এধারে সুভাষচন্দ্রকে তখন কিছু বলাও কঠিন—কাজ নিয়েই তিনি যথারীতি ধ্যানস্থ, সুগম্ভীর। কিরণবাবু আমাকে ফিসফিস করে বললেন, "ওকে বলুন না মশাই, আর কত দেরী করা যায়?" আমি সন্তর্পণে সুভাষকে জিজ্ঞাসা করলাম, "কত দেরী?" সুভাষবাবু বললেন—এই যে হয়ে গেল। আরো কিছু সময় কাটল। পুনরায় জিজ্ঞাসা করলাম, —হোল কি?" সুভাষবাবু গম্ভীরভাবে বললেন,—"হিসেব মিলছে না।"—"কত?" জানা গেল গরমিলের পরিমাণ দু' পয়সা। কিরণবাবু আর থাকতে পারলেন না, পকেট থেকে দুটো পয়সা বার করে বললেন, "তাই যদি হয়, পয়সা দুটো আমি দিয়ে দিচ্ছি, আমাদের রেহাই দিন।" আর দেখে কে, শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র মুহূর্তে অগ্নিবৎ—"খুব বাহাদুরি! উঃ, দু' পয়সা আমি দিয়ে দিচ্ছি! দেবেন না কেন—দি গ্রেট জমিদার অব তেওতা। দু' পয়সার বেলায় দিয়ে দিচ্ছি—যদি বেশী টাকার হোত? এই থেকেই গরমিলের সুরু হয়—হুঁ! ইত্যাদি।*

১৯২৪ সালের ২৫ অক্টোবর সহসা সুভাষচন্দ্র গ্রেপ্তার হলেন ১৮১৮ সালের

---

* কৌতুকপ্রবণ বিধাতা বাস করেন সাহিত্য-বিধাতাদের মধ্যে। ব্যক্তিগত আলাপের প্রতিটি কথায় যিনি রসসাহিত্য সৃষ্টি করতেন, সেই রবীন্দ্রনাথের কথা না হয় বাদই দিলাম, বাংলার আর এক উচ্চাঙ্গের কথাসাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ও কৌতুক-রসিকতার বর্ষণে অক্লান্ত ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র উভয়েই সুভাষচন্দ্র সম্বন্ধে অত্যন্ত আশা ও আস্থাশীল ছিলেন। সুভাষচন্দ্রের কর্মনিবিষ্ট গাম্ভীর্য উভয়ের মনেই যুগপৎ শ্রদ্ধা ও কৌতুকের সৃষ্টি করত। চিত্তরঞ্জনও সুভাষচন্দ্রকে ঠাট্টা করে 'My crying Captain' বা 'খুবকবুন্ধ' বলতেন। এখানে সুভাষচন্দ্রকে নিয়ে শরৎচন্দ্রের তামাসার একটি মজার দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। ঘটনাটি শ্রীযুক্ত বক্সী আমাকে বলেছেন। —ফরোয়ার্ড অফিসে সন্ধ্যায় সবাই হাজির নিয়মমত, সুভাষবাবুও আছেন। শরৎচন্দ্র ঢুকছেন। ঢুকতে ঢুকতে সুভাষচন্দ্রকে দেখেই যেন দেখেন নি এই ভঙ্গিতে বেশ গলা উঁচিয়ে উদারভাবে বলতে লাগলেন—"আচ্ছা সুভাষ হাসে না কেন?" বলেই কপট-গম্ভীর গলায় নিজের মনে বলতে লাগলেন—"আহা, হাসবে কি করে? অভাগিনী ভারতমাতা যে বড় কষ্টে আছেন!" সুভাষবাবু অপ্রস্তুত হয়ে, মুখ লাল করে প্রতিবাদ করলেন—"কে বললে আমি হাসি না?" শরৎচন্দ্র কথা কানেই নিলেন না। "না না, সুভাষ হাসতে পারে কি করে—দেশে যখন ঘরে ঘরে কান্না—হাহাকার—।" সুভাষচন্দ্র বেজায় ব্যস্ত হয়ে পুনশ্চ প্রতিবাদ করেন—"কি সব বাজে কথা, আমি হাসি না কে বললে, না-হাসবার কারণ কি" কে সে কথা শোনে? শরৎবাবু সেই একই সুরে টেনে টেনে বলতে থাকেন—"না সুভাষ, তুমি হেসো না। হাসি কি তোমাকে মানায়? তুমি দেশের একনিষ্ঠ কর্মী, ভারতমাতার কোলজোড়া সোনার চাঁদ ছেলে, মায়ের দুঃখের সময়ে তোমার মত সুসন্তান কি হাসতে পারে? হেসো না সুভাষ, কদাপি হেসো না।" ইত্যাদি। শরৎবাবুর কথা ও অভিনয় শুনে সবাই প্রচুর হাসতে লাগল, আর সুভাষবাবু নাজেহাল হয়ে, রেগেমেগে মুখ-চোখ লাল করে বারবার বোঝাতে লাগলেন—না, তিনি সত্যই হাসেন।

এই সমস্ত কথা উত্থাপন করছি এই জন্য যে, এর দ্বারা সুভাষচন্দ্রের চরিত্রের একটি বিশেষ দিক উদ্ঘাটিত হচ্ছে। সুভাষচন্দ্র হাসতে ভালবাসতেন, সে হাসি

তিন আইনে। ভোরবেলায় তাঁর ঘুম ভাঙানোয় পরম দুঃখিত পুলিশের অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার বললেন, আপনাকে এখনি যেতে হচ্ছে লালবাজারে। যথারীতি গ্রেপ্তারী পরোয়ানা পুলিশ সাহেব দেখিয়েছিলেন। সুভাষচন্দ্র তখন কর্পোরেশনের চীফ এক্সিকিউটিভ অফিসার।

এটি সুভাষচন্দ্রের দ্বিতীয় কারাবাস।

এর আগে তিনি অসহযোগ আন্দোলনে গ্রেপ্তার হয়ে আট মাস জেল খেটেছিলেন। সেই আট মাস তাঁর জীবনের সুখের সময় ছিল। জেলে তিনি দেশবন্ধুর সাহচর্য পেয়েছিলেন, মানুষটিকে তিনি চিনতে পেরেছিলেন, কাছ থেকে দেখেও তাঁকে মহৎ বলে জেনেছিলেন—নৈকট্য শ্রদ্ধা দূর না করে বাড়িয়ে দিয়েছিল। জেলে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব অধ্যাপক হেমন্তকুমার সরকার ছিলেন দেশবন্ধুর ভৃত্য এবং কর্পোরেশনের চীফ এক্সিকিউটিভ অফিসার সুভাষচন্দ্র বসু ছিলেন পাচক। বাংলা সরকারের জেল বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী স্যার আবদুর রহিম তা দেখে রসিকতা না করে পারেন নি—

"C. R., you are a very expensive prisnor. An I. C. S. is serving you as cook and a University lecturer as your servant."

জেল থেকেই দেশবন্ধু স্বরাজ্য দলের পরিকল্পনা করেন, মুক্ত হয়ে গান্ধীজীর কাছে প্রথমে পরাভূত, পরে বিজয়ী হয়ে কংগ্রেসকে স্বরাজ্য দলের কাউন্সিল-প্রবেশ নীতি গ্রহণে প্রণোদিত করেন। অসহযোগ আন্দোলন যা সম্ভব করতে পারে নি, কাউন্সিলের ভিতরে গিয়ে তিনি তাই সম্ভবপর করলেন—অচল করে দিলেন ডায়ার্কিকে,*১ তাঁর সংগঠন-ক্ষমতা ও রাজনৈতিক প্রজ্ঞায় বিচলিত সরকার যখন আপোষের প্রস্তাব করছেন, যে-প্রস্তাবকে গান্ধীজীর রাজনৈতিক অদূরদর্শিতা নষ্ট করে দিল, (যেমন কিছু পূর্বে অসহযোগ আন্দোলনকে নষ্ট করেছিল চৌরিচৌরা-ঘটনার পরে গান্ধীজীর হঠকারিতা)—যখন তিনি তা সত্ত্বেও তাঁর সৈনিকগুলিকে নিয়ে সংগঠন চালিয়ে যাচ্ছেন—তখন জীবনের সবচেয়ে বড় আঘাত পেলেন—অত্যন্ত বেআইনী এক আইনে তাঁর প্রধান কয়েকটি কর্মীকে নির্বাসনে পাঠিয়ে দিলেন সরকার। তার মধ্যে ছিলেন সুভাষচন্দ্র বসু—দেশবন্ধুর ভাষায়—'দেশের জন্য আমার শ্রেষ্ঠ দান।'*২

রবীন্দ্রনাথ এই সময়ে দক্ষিণ আমেরিকায়। সেখান থেকে 'কবি ২০ ডিসেম্বর দিনেন্দ্রনাথকে ভারত-রাষ্ট্রশাসকদের এই ধর্ষণনীতি সম্বন্ধে এক পত্র-কবিতা' লিখে পাঠান।

"ঘরের খবর পাইনে কিছুই,
গুজব শুনি নাকি
কুলিশপাণি পুলিশ সেথায়
লাগায় হাঁকাহাঁকি।
শুনেছি নাকি বাংলাদেশে
গান হাসি সব ঠেলে,
কুলুপ দিয়ে করছে আটক
আলিপুরের জেলে।...
প্রতাপ যখন চেঁচিয়ে করে
দুঃখ দেবার বড়াই,
জেনো মনে, তখন তাহার
বিধির সঙ্গে লড়াই।
দুঃখ সহার তপস্যাতেই
হক বাঙালির জয়,
ভয়কে যারা মানে তারাই
জাগিয়ে রাখে ভয়।
মৃত্যুকে যে এড়িয়ে চলে
মৃত্যু তারেই টানে,
মৃত্যু যারা বুক পেতে লয়
বাঁচতে তারাই জানে।

এই গ্রেপ্তার দেশবন্ধুকে সবচেয়ে বেশি বেজেছিল। তিনি অসহায় বোধ করেছিলেন, নিজেকে অপরাধী মনে হয়েছিল, ইংরেজ শাসকদের অন্যায়ে একেবারে ক্ষিপ্ত হয়ে গিয়েছিলেন। আপাতত এমন অহেতুক গ্রেপ্তার হয় না। সরকার সন্ত্রাসবাদের সঙ্গে সংযোগের জন্য সুভাষচন্দ্রাদিকে গ্রেপ্তার করেছিলেন, কিন্তু তা প্রমাণ করার সামর্থ্য নেই সরকারের। অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান পত্রিকা স্টেটসম্যান ও ইংলিশম্যান লিখল, সুভাষচন্দ্র বৈপ্লবিক চক্রান্তের মস্তিষ্কস্বরূপ। সে কথা লেখামাত্র সুভাষচন্দ্রের পক্ষ থেকে মানহানির মামলা করা

বুদ্ধির চতুর সুড়সুড়ি থেকে আসত না, সেটা ছিল আনন্দানুভব—সত্তামূল থেকে উচ্ছ্বসিত প্রাণপ্রবাহ, কিন্তু কাজের সময় তিনি কাজের গভীরতা অনুভব করতে ও করাতে চাইতেন। বাঙালী চরিত্রের একটি সাধারণ দুর্বলতা—সব জিনিস ফষ্টিনষ্টি করে হেসে উড়িয়ে দেওয়া—একথা বলেছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। সুভাষচন্দ্র সে দুর্বলতায় ধরা দিতে চান নি, কারণ তিনি কাজ করতে চেয়েছিলেন—যার থেকে বড় কাজ সম্ভব নয়—চাল্লিশ কোটি মানুষের মুক্তি। অবিরত হাসির চালাকিতে সে মহৎ কাজ নিষ্পন্ন হবে না। একথা বুঝেছিলেন ঐ দুই মহৎ প্রতিভা—যে দুজন তাঁকে নিয়ে হেসেছেন। সাবিত্রীপ্রসন্ন জানিয়েছেন, কৌতুকের পরেই পরম স্নেহের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে কথা বলতে লাগলেন, এবং তাঁর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে গভীর প্রত্যাশার ভাব ফুটে উঠল কবিগুরুর কথায়। আর শরৎচন্দ্র? "সুভাষবাবুর সঙ্গে কথা কইতে কইতে তাঁর চোখের দৃষ্টি যেন কোন্ গভীরে কিসের অন্বেষণে তন্ময় হয়ে যেত।......যে-গভীর স্নেহ ও প্রীতি ও আস্থার সঙ্গে তিনি সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে কথা কইতেন তার মাধুর্যে মন অভিভূত হোত।" (সাবিত্রীপ্রসন্নের বর্ণনা)

এখনো প্রসঙ্গ শেষ করতে পারছি না—সুভাষচন্দ্রের সুস্মিত প্রসন্নতার ছবি অনেকেই দেখেছেন—মেয়র সুভাষচন্দ্রের শাল গায়ে সুপরিচিত ছবিটি—শারদ প্রভাতের আলোকের মত সেই নির্মল-উজ্জ্বল আনন। তাঁর হাসির অন্য ছবিও আছে—দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় তোলা দুটি ছবির কথা মনে পড়ছে—একটি নিচু মুখের মনোহর হাসি, অন্যটিতে অভিনয় দেখার কালে পাগলা হাসির অস্থিরতা।

*১ "It is not possible to describe the enthusiasm of the public when diarchy was over thrown....It was regarded as a great triumph for the Swarajists and this victory brought a sense of elation all over the country. In 1920, the Congress had tried to paralyse the new constitution, by boycotting the polls, but this attempt had failed, because not a single seat had remained vacant and undesirable men had flooded the legislatures. In 1924, on the other hand, the Swarajists, by carrying the fight inside the legislatures, were able to wreck the Constitution, in at least some of the provinces." (Indian Struggle)

*২ "সুভাষকে করপোরেশনে কাজ দিবার পরে একদিন আমাকে বলিয়াছিলেন, I have sacrified my best man for this corporation এবং সেই সুভাষকেই যখন পুলিশ ধরিয়া লইয়া গেল, তখন তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছিল, তাঁহাকে সর্বদিক দিয়া অক্ষম ও অকর্মণ্য করিয়া দিবার জন্য গভর্ণমেন্ট তাঁহার হাত-পা কাটিয়া তাঁহাকে পঙ্গু করিয়া আনিতেছে"—[শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় —[illegible]—স্বদেশ ও সাহিত্য]

হোন, এবং আপ্রাণ চেষ্টা করেও পত্রিকা দুটি বা সরকার সুভাষচন্দ্রের বিরুদ্ধে বৈপ্লবিক চক্রান্তের প্রমাণ সংগ্রহ করতে পারলেন না।* দেশবন্ধুর বুকফাটা প্রতিবাদ বেরিয়ে এল—মেয়রের আসন থেকে তিনি বেদনাভগ্ন কণ্ঠে বললেন—

"If love of country is a crime, I am a criminal. If the Chief Executive officer is criminal then I declare, that the Mayor is also a criminal."

এখানে তবু তো কিছু বললেন, আর এক জায়গায় প্রায় কিছুই বলতে পারলেন না। স্বরাজ্য-কর্মীদের গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে দেশবন্ধু সভা ডাকালেন। সারা ভারতের নেতারা সমবেত হলেন। টাউন হলে মিটিং। হাজার হাজার লোক জমেছে। তখন মাইক ছিল না, সুতরাং টাউন হলের ছ' জায়গায় ছটি সভা। দেশবন্ধু প্রতি সভাতে সামান্য কিছু বললেন। কি বললেন? সেই ক্ষুরধার-বুদ্ধি, প্রতিভাবান ব্যারিস্টার—তিনি কি যুক্তি দিয়ে ছিন্ন ভিন্ন করে দিলেন সরকারের অন্যায়ের? না। তিনি বললেন—দরদর করে কাঁদতে কাঁদতে,—"মা, মা গো, বাংলার ঘরে ঘরে আগুন জেলে দে, আগুন জেলে দে—সব ছারখার হয়ে যাক।"

একটি বাক্যে দেশবন্ধুর যাতনাকে প্রকাশ করলেন সত্যরঞ্জন বক্সী—

"It was the total reaction of a total man."

বিক্ষুব্ধ ১৯২৮

হিমালয়ের শান্তির বদলে সমুদ্রের আহ্বান যখন থেকে সুভাষচন্দ্র গ্রহণ করেছিলেন, তখন থেকে অশান্তির ঝড়ো হাওয়ায় গড়ে উঠেছিল তাঁর জীবন। ঝড়ের রাতের কাণ্ডারীরূপে তাঁকে দেখা গিয়েছে অতঃপর। তাঁর জীবনের গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়গুলিকে বলা চলে সংকটের সৃষ্টি। বিপদের সিংহাসনে আসীন তাঁর নায়কত্ব।

কথাগুলি কাব্যিক নয়, মিথ্যাও নয়। সুভাষচন্দ্রের জীবনের ঘটনাগুলি তার সাক্ষী। ইতিমধ্যেই আমরা দেখেছি—তাঁর প্রথম নেতৃত্বের সূচনা ওটেন শাসনের মধ্য দিয়ে। তারপরে আই সি এস ত্যাগ। তৃতীয় ঘটনার মুখে আমরা দাঁড়িয়ে আছি : ১৯২৮ সালে তাঁর কার্যাবলী।

আরো পরবর্তীকালে দুটি ঘটনা ঘটবে—১৯৩৯ সালে দ্বিতীয়বার কংগ্রেস-নির্বাচনে জয় ও পদত্যাগ, এবং ১৯৪১ সালে নূতন পথের সন্ধানে গৃহত্যাগ। এই পঞ্চকলঙ্কের তিলক সুভাষচন্দ্রের উদার ললাটে পঞ্চনয়নের অগ্নিতে দীপ্ত হয়ে রয়েছে।

১৯২৮ সালে রবীন্দ্র-সুভাষ সম্পর্ক সুমনোহর হয় নি। একবার প্রায় প্রকাশ্য সংঘর্ষে উপনীত হয়েছিল। অপর ক্ষেত্রটিতে সুভাষচন্দ্রের আচরণ রবীন্দ্রনাথ পছন্দ করেন নি বলেই শুনেছি।

সুভাষচন্দ্র ১৯২৪ সালের ২৫

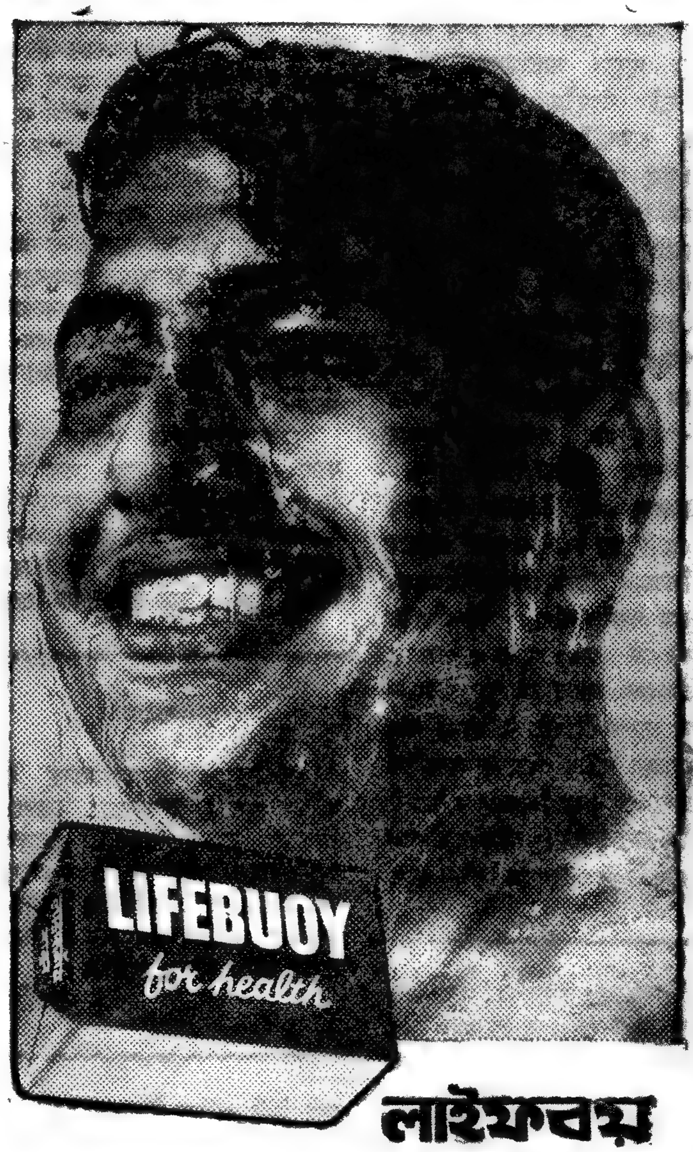

লাইফবয়

যেখানে স্বাস্থ্যও সেখানে

লাইফবয় মেখে স্নান করলেই তাজা ঝরঝরে হবেন।
এই চমৎকার সুস্থ পরিচ্ছন্ন ভাব থেকেই বুঝবেন ভাল
সাবানের সবকিছু গুণ তো আছেই লাইফবয়ে,
তারচেয়ে বেশীও কী যেন আছে।

লাইফবয় ধুলোময়লার রোগবীজাণু ধুয়ে দেয়

হিন্দুস্থান লিভারের তৈরী.

---

* সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে বিপ্লবীদের সম্পর্কের বিষয়ে তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধ শ্রীযুক্ত অনন্ত সিংহ সাপ্তাহিক বসুমতীতেই লিখেছেন।

অক্টোবর অন্তরীণ হয়েছিলেন, একথা আমাদের স্মরণ আছে। তিনি মুক্তি পান ১৯২৭ সালের ১৬ মে। এই বন্দী-কালের অধিকাংশ সময় কাটে ব্রহ্মদেশের কারাগারে। বন্দিত্বের সময় সুভাষচন্দ্রের স্বাস্থ্য ভেঙে যায় এবং তাঁর ক্ষয়রোগের আশঙ্কা করা হয়। এই তিন বৎসরে সুভাষচন্দ্র তাঁর জীবনের একটি প্রধান শোক পেয়েছেন (প্রধানতম?) তাঁর [illegible] দেশবন্ধুর মৃত্যু। সুভাষচন্দ্রের কাছে শোকটি দুই জাতীয়, রাজনৈতিক ও ব্যক্তিগত। রাজনীতির দিক দিয়ে সুভাষ-চন্দ্রের ধারণা—দেশবন্ধুর মৃত্যু ভারতের পক্ষে একটি প্রধান 'ক্যালামিটি', তিনি আরো কয়েক বৎসর বাঁচলে ভারতের ইতি-হাস অন্যরকম হোত। ব্যক্তিগতভাবেও সুভাষচন্দ্রের আঘাত কোনো অংশে কম নয়—দেশবন্ধুকে পিতার মত তিনি শ্রদ্ধা করেছিলেন ও ভালবেসেছিলেন তাঁর মৃত্যুতে—"হায় রাগ করিবার, অভিমান করিবার জায়গাও ঘুচিয়া গিয়াছে।" *১

অপরপক্ষে এই নির্জন কারাবাস নিজের মনের সঙ্গে বোঝাপড়ার সুযোগ করেও দিয়েছে। তিনি প্রস্তুত হয়েছেন ঝাঁপ দিয়ে পড়বার জন্য, 'বিশ্ববিহীন বিজন সাধনার' অন্তে। বাংলা ও ভারতের প্রতি ভালবাসা আরো বেড়েছে, তিনি অধিকতর চরমপন্থী হয়ে উঠেছেন। তাঁর সেই মনোভাব মুক্তির পরে কার্যাবলীতে প্রকাশিত হবে। এবার নিজের পথ নিজেই কেটে তাঁকে চলতে হবে। যাঁকে গুরু বলে মেনেছিলেন, তিনি নেই, গান্ধীজীকে গুরু বলে কোনোদিন স্বীকার করেন নি। গান্ধীজী যতক্ষণ জাতীয় সংগ্রামে বেগ সঞ্চার করবেন, ততক্ষণ গান্ধী-নেতৃত্ব মানবেন, অন্যথায় গান্ধীজীর বিরুদ্ধেও সংগ্রাম সুরু করবেন।

জেলে নানা বিষয়ে পড়াশোনা করে-ছেন; প্রেমতত্ত্ব শিখেছেন তন্ত্র ও বৈষ্ণব কবিতা পড়ে। সে নিয়ে রীতিমত পাণ্ডিত্যের অভিমান। বন্ধু দিলীপকুমার তার জন্য ন্যায়সঙ্গত কৌতুকবোধ না করে পারেন নি। প্রেমবিজ্ঞান বলে যদি কিছু থাকে সে বিজ্ঞানটা প্রধান অংশে ফলিত, তাত্ত্বিক নয়। সুভাষচন্দ্র একদিন কলেজে পড়বার সময়ে নাস্তিক্যবাদের পক্ষে প্রবন্ধ লিখতে সুরু করেছিলেন,—সেটা যেমন তাঁর স্বভাবসঙ্গত নয়,—তেমনি প্রেম সম্বন্ধে তাঁর এই আস্তিক্যবোধও ঐকালে অকাল-আগত। আসলে প্রেম-ব্যাপারটা সুভাষচন্দ্রের পক্ষে তখন একটা সাবজেক্ট, আমাদের মনে রাখতে হবে তিনি এম-এ'তে পরীক্ষামূলক মনস্তত্ত্ব পড়বার ইচ্ছা করে-ছিলেন!

সাহিত্য সম্বন্ধেও সুভাষচন্দ্র চিন্তা করেছেন। দিলীপকুমারকে লেখা চিঠিতে (৯।১০।১৯২৫) সাহিত্য সম্বন্ধে তাঁর ধারণার উদারতা প্রকাশ পেয়েছে। জনগণের কাছে সাহিত্য পৌঁছবে কি করে, সে বিষয়ে চিন্তা করেছেন। দিলীপকুমার সেই চিঠি পাঠিয়ে দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথের কাছে. রবীন্দ্রনাথ বিশেষ প্রশংসা করেছেন 'সুভাষের বুদ্ধি ও হৃদয়র পরিচয়' পেয়ে।

১৯২৫ সালের অক্টোবর মাসে তাঁর সাহিত্য-বিষয়ক পত্রের প্রশংসা করেছেন রবীন্দ্রনাথ। শোনা যায় ঐ মাসেই সুভাষ-চন্দ্রের অন্য একটা কাজ আবার তিনি মনের সঙ্গে সমর্থন করতে পারেন নি। ব্রহ্ম-জেলে বন্দীরা দুর্গাপূজা করতে চান, কর্তৃপক্ষ অসম্মত হলে সুভাষচন্দ্র প্রমুখ বন্দীরা অনশন করেন। পনের দিন অনশনের পরে বন্দীরা দাবি আদায়ে সমর্থন হন। ধর্মীয় ব্যাপারে এই ধরনের অনশন রবীন্দ্রনাথের নাকি পছন্দ ছিল না। এটা আমার শোনা কথা, তাই এ-বিষয়ে বেশি কিছু বলা নিরাপদ নয়।

১৯২৭ সালের ১৬ মে মুক্তির পরে ও ১৯২৮ সালের আগে রবীন্দ্র-সুভাষ-চন্দ্র সাক্ষাৎকারের একটি তথ্য পাচ্ছি। দেশবন্ধুর মৃত্যুর পরে তাঁর ত্যক্ত স্থান পূরণ করলেন যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত—সুভাষচন্দ্রাদি তরুণ স্বরাজীরা তখন জেলে। যতীন্দ্রমোহন সুপরিচিত ত্রিমুকুটের অধিকারী হয়েছিলেন—কর্পো-রেশনের মেয়রত্ব, কাউন্সিলে স্বরাজ্য দলের নেতৃত্ব এবং বঙ্গীয় কংগ্রেসের সভাপতিত্ব। বিবাদ সুরু হয়ে গেল অচিরে। যতীন্দ্র-মোহন কিছুদিন পরে কাজের চাপে বঙ্গীয় কংগ্রেসের সভাপতিত্ব ত্যাগ করলেন। উপযুক্ত সভাপতি সত্বর মিলল না, কারণ কংগ্রেস-সভাপতিত্বে রয়েছে বিশুদ্ধ ত্যাগের মর্যাদা, আন্দোলনের কাল ভিন্ন সে দায়িত্ব পালনের জন্য নেতারা উৎসাহী নন!! 'সংকীর্ণ দলীয় স্বার্থ, ব্যক্তি-স্বার্থ এবং গোঁড়ামীতে'*২ অসহিষ্ণু যুবক কর্মিগণ তখন বিদ্রোহ করল এবং সভাপতি পদের জন্য (ইতিমধ্যে কয়েকজন সভাপতি হয়েছেন, তাঁদের ইচ্ছা ও চেষ্টা সত্ত্বেও সুষ্ঠু কার্যসম্পাদন সম্ভব হয় নি) তরুণ-দের নেতাকে মনোনীত করল। ৩০ বৎসর বয়স্ক সুভাষচন্দ্র বসু ১৯২৭ সালের নভেম্বর মাসে বঙ্গীয় কংগ্রেসের সভাপতি হলেন, প্রায় একই বয়সের কিরণশংকর রায় হলেন সম্পাদক।*৩

সভাপতি হবার পরে সুভাষচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যান। সঙ্গে ছিলেন সত্যরঞ্জন বক্সী। সুভাষ-চন্দ্র রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাদ ভিক্ষা করতে গিয়েছিলেন। সত্যরঞ্জন আমাকে জানিয়ে-ছেন, রবীন্দ্রনাথ সুভাষচন্দ্রের এই নির্বাচনকে 'তরুণের জয়' বলে দেখে-ছিলেন এবং তরুণ নেতাকে আশীর্বাদ করেছিলেন।

[ক্রমশঃ]

---

*১ শরৎচন্দ্রের রচনাংশ। সুভাষচন্দ্র নিজের অনুভূতি প্রকাশের জন্য লাইনটির ব্যবহার করেছেন। (তরুণের স্বপ্ন—পত্র)

*২ Indian Struggle—200.

*৩ সুভাষচন্দ্রের সমর্থক বলে পরিচিত 'বিগ ফাইভ' পর্যন্ত এত অল্প বয়স্ক একজনের সভাপতি হওয়া মনেপ্রাণে গ্রহণ করতে পারেন নি। বিগ ফাইভ সুভাষচন্দ্রকে সামনে খাড়া রেখে অনেক সময় কাজ করে গেছেন, কিন্তু সুভাষ-চন্দ্রের প্রতি তাঁদের অনেক সময়ই 'অসম্পূর্ণ সহানুভূতি'। সত্যরঞ্জন বক্সীর মতে সুভাষচন্দ্রের পনের আনা শক্তি ক্ষয় হোত ভিতরের লোকদের সঙ্গে লড়াইয়ে। **'He was a man alone in all his walks of life.'**

ভ্রম সংশোধন

'রবীন্দ্রনাথ ও সুভাষচন্দ্র' ধারা-বাহিক প্রবন্ধে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের পিতার নাম মুদ্রণ প্রমাদবশত দুর্গামোহন দাশ প্রকাশিত হয়েছে। বলা বাহুল্য, তাঁর খ্যাতিমান পিতার নাম ভুবনমোহন দাশ। এ ধরণের দৈবানুষ্ঠিত ত্রুটির জন্যে আমরা দুঃখিত।

—সম্পাদিকা।

আপনি পাইতে পারেন

সামবায়িক ভিত্তিতে মাত্র ২০, টাকায় ৩৩০, টাকা মূল্যের ৩ ব্যাণ্ড অল ওয়ার্ল্ড পোর্টেবল ট্রান-জিস্টার পাইবেন।

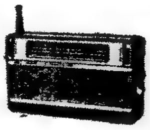

আবেদন করুন :
Ceylon Traders (WBC—22)
P. Box 1257, Delhi—6.

কবিতা

তিনটি সর্বভারতীয় কবিতা

[যেখানে শকুনেরা মৃত কবিদের নিয়ে উজ্জ্বল হয়।]

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

সভা

ভাগাড়ে অনেক মজা;
যদি রে মড়ক লাগে
আমরা তখন রাজা।

কিনবো পয়সা দিয়ে
বাংলা দেশের কবি—
অথবা চোখ রাঙিয়ে।

উজ্জ্বল হবে সভা!...
যদি কেউ ফিনিক কাটে
ঠেঙিয়ে করবো বোবা।

হনুমান

লেজের আগুনে মুখ পুড়বে, পুড়ুক
স্বর্ণলঙ্কা হবে ছাই;
ভাই রে, এর বেশি সুখ
ত্রিভুবনে নাই।

মুখ পুড়বে পুড়ুক; সে-তো লেজেরই
বড়াই।

ভাষণ

কবির সভায় ভাষণ দেয় ভাঁড়
মুনিব আর গোলাম মাস্টার!
কিনতে কবি মন্ত্রী, রাজ্যপাল
টাকা ছড়ায়: দয়ার অবতার॥

পোএট্রি ট্রান্সপোর্ট কোং

সুরঞ্জনা রায়

ওহো কি করছো বুবা? পাশ করে' কবিতার চাষ? বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ। মিললো না বসতি কোথাও তোমারি। পোএট্রি ট্রান্সপোর্ট কোং খুলেছ? সাবাস! যতোদিন কম্পটোমিটার কাব্য না লিখছে—দাঁও মারো। এ তো সুখের খবর। পুরস্কার পরিণামে পাবে। আছে সুপারিশ। সরকারী তহবিল থেকে টাকা (দরিদ্র-ভাণ্ডার) লুটে নিচ্ছো কবিতার নামে! জড়বাদী-জোড়বাদী বাবা অর্ডার পেলেই কাব্য লেখে এবং কর্কশ কণ্ঠে সভা ডেকে উচ্ছিষ্ট বাজারে বলে ঃ শোনো হে কবিতা, তুমি মান বাঁচালে তখন পোএট্রির ট্রান্সপোর্ট কোং খুলে। বলি, প্রাইভেট লিমিটেড—মনোপলি রোজগার্ড কি বটে? আহা রে লাভের ব্যবসা দেখে আরেকটা কোম্পানি কখন গজিয়ে উঠতে পারে। কর্ডনিং-এ দিলে কী কী ভেট? ?

লুথার কিং-কে নিবেদিত

(এক)

তুমি ছিলে সহজ প্রার্থনা :
পৃথিবী সবার হোক, রাজার রাজত্বে
রাজা হোক সকলেই, মৃত্যুর দাসত্বে
জীবন বিদ্রোহী হোক, প্রত্যেক আকাশে
দেখা দিক অসংখ্য সূর্যের সম্ভাবনা।

ইতিহাসে এ প্রার্থনা কাঁদে অহর্নিশ :
আমরা রয়েছি নাকি আধুনিক যুগে।
প্রভেদ বিদ্বেষ শাঠ্যে সহস্র হুজুগে
মধ্যযুগেও মাঝে মাঝে ম্লান হয়ে আসে।
সাম্প্রত প্রমাণ মেমফিস।

মানুষ তবুও চিরদিন :
মিসিসিপি আমাজনে নীলের নীলিমা
দেখে যাবে পেরিয়ে সে সময়ের সীমা,
মানুষ স্বাধীন এই দুর্মর বিশ্বাসে
যদিও লুথার তুমি হবে ফের মৃত্যুর অধীন॥

কল্যাণকুমার দাশগুপ্ত

(দুই)

মার্টিন লুথার কিং আমাদের মধ্যেই আছেন।
মৃত্যুতে কি জীবনের শেষ? তার মৃত্যুহীন প্রাণ
প্রাণ থেকে প্রাণে প্রাণে মানবতা-বোধে অনির্বাণ।
তবে কেন রক্তপাত? কার জন্য সৈন্য মোতায়েন।

কে তুমি ওল্টাও চোখ? দেবে না কি সমানাধিকার
ভাগাড়েও? গির্জায় ঘন্টার শব্দ।—তা শাদা না কালো,
বর্ণভেদে আছে না কি শ্বেতাঙ্গ ঈশ্বর? কে হাসলো
পৃথিবীর লোক। দ্যাখো পোড়া মুখ নিজের এবার।

শাদা চামড়ার তলে খাঁটি যে হৃদয় সুপ্ত আছে
সেখানে লুথার কিং রয়েছেন। কৃষ্ণাঙ্গ মানুষ
ফিরে পাবে মানবিক অধিকার। কেবল ফানুস
হয়ে উড়ে যাবে বর্ণদ্বেষী—কালো মানুষের আঁচে।

সেদিনেও চোখের মণির মতো লুথার নিজেই
পথ দেখাবেন। তিনি আছেন চোখের মণিতেও॥

দুর্গাদাস

(তিন)

নিহত নিকট সহোদর
তুমি শান্তি চেয়েছিলে চেয়েছিলে মুক্তি মানুষের।
দুর্গম পথের মাঝে মৃত্যু নেমে এলো
জীবনের মহানন্দ নির্মোহ সত্তায়।
শূন্য হাতে মৃত্যু ফিরে গেছে অস্থাবর আয়ু নিয়ে
তার জিহ্বা নখ দাঁত আরক্ত লজ্জায়।

অস্থাবর আয়ু নিয়ে তুমি
অলাত বলয়ে দগ্ধ অস্তিত্বের পোড়া মাটি
খয়ে যাওয়া খরা-ক্লান্ত পৃথিবীতে
প্রজ্ঞাপদক্ষেপে কিছুক্ষণ.........

তারপর অতিকায় প্রতিকূল তমসা মারুতে
প্রমেয়-বিলয়-উর্ধ্বে অস্তিত্ব স্থাবর।

[illegible] সাহা

(চার)

এক বিন্দু অশ্রু আজ এক বিন্দু রক্ত হয়ে ঝরে—
জীবন রক্তিম হোল আরও একবার ;
আদিঅন্তহীন ধ্রুব সনাতন এক অঙ্গীকার
ক্ষীণ প্রতিধ্বনিময় হৃদয়ের আন্দোলিত ঘরে—।
আকাশে বিশ্বস্ত তারা বুকে নিয়ে অনন্য ব্যথার
স্পন্দিত উজ্জ্বল প্রেম নিরুদ্বেগে জ্বলে—
নিরন্তর অন্ধকারে সেই মুখ আগামী বিভাস।
এক বিন্দু অশ্রু যেন মৌন রক্ত আমর্ত্য আত্মার,
ক্ষমার দ্রবন্তী ধারা পাথরেও পথ কেটে চলে ;
বেদনার্ত পৃথিবীর সান্ত্বনাই সত্য ইতিহাস।

জয়ন্তী সেন

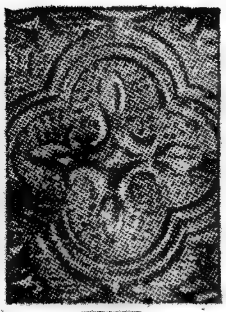
মরেস্ক

হ্যারো রীডেড

মরক্কো পিন্‌হেড
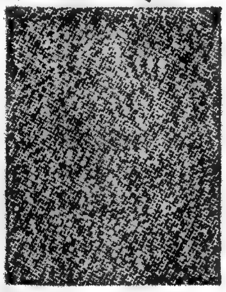

রাফকাস্ট
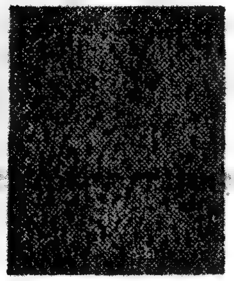

আজকালকার
স্থপতিরা
গৃহনির্মাণে
এইচ পি জি
গ্লাস
ব্যবহার করেন

আজকের দিনের বাড়ীঘর ও অফিস-কাছারি, কলকারখানা, ইস্কুল ও হাসপাতালে সুদক্ষ ইঞ্জিনিয়াররা সর্বত্রই এইচ পি জি গ্লাস লাগান, কেননা তাঁরা জানেন যে এইচ পি জি গ্লাস উৎকর্ষের নিখুঁত মান বজায় রেখে তৈরী হয়। বিলাতের শতাধিক বৎসরের কাঁচনির্মাণকারী প্রতিষ্ঠান পিলকিংটন ব্রাদার্স-এর কারিগরী কুশলতার সাহায্য নিয়ে হিন্দুস্থান পিলকিংটন গ্লাস ওয়ার্কস এই এইচ পি জি গ্লাস তৈরী করেন।

এইচ পি জি কেনা মানেই নির্ভরযোগ্য ভাল জিনিস কেনা।

হিন্দুস্থান
পিলকিংটন
গ্লাস ওয়ার্কস
লিমিটেড

হ্যামার্ড
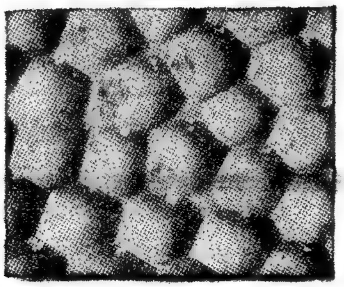

হেক্স্যাগোনাল ওয়্যারড
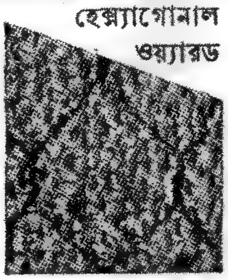

শীট গ্লাস

জর্জিয়ান ওয়্যারড
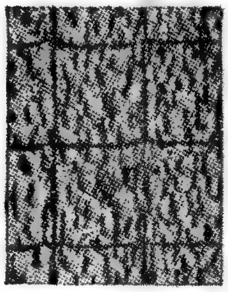

ম্যানেজিং এজেন্টস
তালুকদার ল'
অ্যাণ্ড কোম্পানী
প্রাইভেট লিমিটেড
হিন্দুস্থান বিল্ডিংস
৪, চিত্তরঞ্জন অ্যাভেনিউ,
কলিকাতা-১৩

IWTHP 1775A

(ধারাবাহিক উপন্যাস)

পথ কে রুখবে?

মনোজ বসু

॥ এক ॥

ভারতে আর পাকিস্তানে সেই যে লড়াই হয়ে গেল—পূর্বাঞ্চল আমাদের এই বঙ্গদেশে একেবারে নিরামিষ লড়াই, একটা গুলিও ছোটে নি উদ্যত বন্দুকের ছিদ্র দিয়ে। মুখের তড়পানিটা কিন্তু দস্তুর-মতো খর, লড়াই যত-কিছু সেইখানে। তা সে যাই হোক, বাইশ দিনে লড়াই চুকল কিন্তু বাইশটা মাসেও তার জের মেটে না। বর্ডার সিল করে দিয়েছে, পাশপোর্ট-ভিসা বিলকুল বন্ধ। মানুষ তো মানুষ, একটা মাছি গলবে না এপার থেকে ওপারে, একটা মশা উড়বে না ওপার থেকে এপারে। সীমানায় পা বাড়িয়েছে কি গুলি। চালাও হুকুম, বিচার-বিবেচনা নেই—স্রেফ গুলি চালিয়ে যাবে। এমন আহা-মরি সব বন্দুক লড়াইয়ের সময় লাগে নি তো এইবারে কাজে লাগুক। লাগছেও তাই—তামাম বর্ডার জুড়ে রাত্রিবেলা দুড়ুম-দড়াম দেওড় শুনতে পাবেন।

মল্লিকরা এককালের দুর্ধর্ষ জমিদার, মল্লিকবাড়ি লোকে একডাকে চিনত। জমিদারি গেছে, শরিকেরা এদিক-সেদিক ছিটকে পড়েছে। একটা তরফ মাত্র টিকে আছে। তাও শুকোলেও খাল একটু থেকে যায়—স্বনামে-বেনামে কিছু ধানজমি কয়েকঘর প্রজাপাটক এবং পুকুর ও বাগ-বাগিচা কয়েকটা, তাতেই সামান্যভাবে তাদের দিন চলে যায়। হেনকালে দেশ ভাগাভাগি হল, মানুষের মাথায় বজ্রাঘাত। র‍্যাডক্লিফের লাইন চলে গেল মল্লিকবাড়ির গা ঘেঁষে—জমাজমি আওলাতপশার সমস্ত পাকিস্তানের ভাগে পড়েছে, ভদ্রাসন প্রাচীন অট্টালিকা শুধু হিন্দুস্থানে। শেষমেষ শ্রীধর মল্লিক একলা কেবল ভদ্রাসনে পড়ে আছেন।

কাজিরাও পুরনো গৃহস্থ। মল্লিকদের সঙ্গে চিরকালের মাখামাখি—জমিদারি যখন ছিল, এস্টেটের আদায়-তহশিল পুরুষানুক্রমে কাজিরাই করে এসেছে। দেশ ভাগ হয়ে তাদের অসুবিধা নেই—পাকিস্তান এলাকার ভিতরে সমস্ত। কাজিবাড়ির আনোয়ারকে শ্রীধর বললেন, তোমার জমিজিরেতের সঙ্গে আমার এটুকুও বেড় দিয়ে নাও। বামুন গেল ঘর তো লাঙল তুলে ধর। ভিনদেশের মানুষ হয়ে গেছি—প্রজাদের কেউ একটা ছেঁদা পয়সা ঠেকাবে না, বর্গাদারে ধানের ছিটেটাও দেবে না। বারোভূতে লুঠেপুটে খাবে, তার চেয়ে নিজের মতন আদায়পত্তর করে তোমরাই খেও সব। তাতে আমার অনেক শান্তি। আর পার তো দু-দশ টাকা ছুঁড়ে দিও এদিক পানে। না পারলেও আমি কিছু মনে করব না।

নিশ্বাস ফেলে আবার বললেন, তাই বা কটা দিন? বর্ডার-পুলিশের যা হিড়িক, আমিই কি থাকতে পারব এখানে? টাকা ছুঁড়বে কার কাছে? দালানকোঠা গাছ-গাছালি বিক্রি করে দিয়ে চলে যাব কাঁহা-কাঁহা মুলুক।

আনোয়ার বলেছিল, তারপর?

ভিক্ষের ঝুলি—সে কি আর মুখে বলতে হবে? সেই জন্যেই আরও দূরের জায়গায় যাওয়া। এখানে মল্লিকবাবু, অজানা জায়গায় কে কাকে চেনে?

বাড়ি বিক্রির সত্যিই চেষ্টা করেছিলেন তখন। খদ্দের কোথা? বর্ডার বলে নিজে পালাচ্ছেন, নতুন করে কে ঘরবসত করতে আসবে?

যাওয়া হয় নি। যাই-যাই রব শেষ পর্যন্ত মুখেও আর ছিল না। সতেরটা বছর দেখতে দেখতে গেল। আনোয়ারই তার মূলে। এ রকম সৎ ছেলে হয় না। এবং তুখোড়ও বটে। পাকিস্তানের পারে মল্লিকদের বাগিচার মধ্যে প্রকাণ্ড এক আটচালা তুলে নিয়েছে। শ্রীধরের জমিজমা ও নিজের জমিজমা একত্র মিশিয়ে পাইক-দরোয়ান নিয়ে দাবরাবে ঐ আটচালায় কাছারি বসে। আদায়পত্র করে মালিকের মালখাজনা মিটিয়ে হিসাব-মাফিক শ্রীধরের প্রাপ্য দিয়ে দেয় এবং তহশিলদার হিসাবে নিজের পাওনাগণ্ডা বুঝে নেয়। স্বামী আর স্ত্রী দুজন নিয়ে শ্রীধরের সংসার—ছেলেটা একটু বড় হলেই লেখাপড়ার নাম করে বসিরহাটে মামার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন। বিশাল অট্টালিকার খানতিনেক ঘর নিয়ে আছেন তাঁরা—বাকি ঘরগুলোর কড়িতে চামচিকে ঝোলে, মেজেয় জঙ্গল, দেয়াল খসে খসে পড়ছে। ছোট্ট সংসার বলে যা হোক করে চলে যায়, এর অধিক আর পাচ্ছেনই বা কোথা? বসিরহাটে শ্যালক কতদূর কি সুখে রয়েছেন তা-ও দেখা আছে নিজ চোখে।

বছর সতের এমনি কাটল। লাগ্ লাগ্—কিন্তু লেগেও লাগে না, টাল সামলে গেছে বরাবর। পঁয়ষট্টিসালে এসে সত্যি সত্যি লাগল। সামান্য লড়াই, বাইশ দিন মাত্র পরমায়ু। মিলিটারি গোড়াতেই শ্রীধরের বাড়ি দখল করে নিয়েছিল। স্ত্রী রেণুকা অগত্যা ভাইয়ের বাড়ি চললেন, পিছন পিছন শ্রীধরও। শ্যালকের বাড়ি পুরোপুরি তিনি ওঠেন নি—হোটেলে খেয়ে কাজকর্মের চেষ্টায় ঘোরাঘুরি করেন, রাত্রে এসে শুয়ে পড়েন।

লড়াই কবে থেমে গেছে, শ্রীধরের ঘর-বাড়িও ছাড় পেয়েছে। কিন্তু লঙ্কার আগুন নিভলেও হনুমানের লেজের আগুন নেভে না। বর্ডার সিল করা আছে, এপারে-ওপারে চলাচল নিষিদ্ধ। রাত্রি হলেই কারফিউ—বর্ডার-লাইনের এপারে পাঁচ মাইল, ওপারে পাঁচ মাইল। চলাচলে

কিস্তবন্দীতে ট্রানজিস্টার

৩২০, টাকা মূল্যের বিশ্ব-বিখ্যাত "এসকর্ট" ৩ ব্যান্ড অল ওয়ার্ল্ড পোর্টেবল ট্রানজিস্টার মাসিক ১০, টাকার কিস্তিতে নিন।

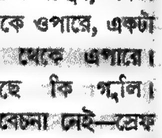

আবেদন করুন:

Japan Agencies (B—10)

Post Box 1194, Delhi—6.

পা বাড়ালেই গুলিতে এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় করে দেবে।

হেন অবস্থায়, ঐ যা চলে এসেছেন—আর ও-মুখো হবেন না শ্রীধর। পুরো বাড়ির খদ্দের না হোক, বাড়ি ভেঙে ফেলে দরজা-জানলা কড়ি-বরগা বিক্রি করবেন। উৎকৃষ্ট সেগুনকাঠ, সে জিনিসে সকলের আগ্রহ, দেখেও এসেছে কেউ কেউ বর্ডার অবধি গিয়ে। দরদাম করছে।

আনোয়ার খোঁজে খোঁজে এসে ধরল। মল্লিক-দা, খবরদার, খবরদার—বাড়ি বিক্রির নামও কোরো না। বাপ-দাদার বানানো জিনিস সাজিয়ে-গুজিয়ে তকতকে ঝকঝকে করে রাখবে—তা নয়, ভেঙেচুরে এখন বিক্রির ফিকিরে আছেন।

শ্রীধর বললেন, বাপ-দাদারাই বা অমন জায়গায় কেন বানাতে গেলেন? অবিশ্যি জানবেন কেমন করে, দেশের মাঝখান দিয়ে একদিন বেমক্কা এমনি লাইন টেনে দেবে।

রহস্যভরা চোখে আনোয়ার মিটমিট করে তাকায়ঃ সেকেলে সাচ্চা মানুষ তাঁরা—কেমন করে যেন বুঝতে পেরেছিলেন, বেছে বেছে তাই ঐ জায়গাতেই অতবড় বাড়ি বানালেন।

ধরেই নিয়ে চলল শ্রীধরকে তাঁর পরিত্যক্ত বাড়িতে। পারঘাটা দু-চারটে আগে থেকেই ছিল, ইতিমধ্যে এদিক-সেদিকে আরও বিস্তর গজিয়েছে। কয়েকটা ঘাট আনোয়ার ঘুরিয়ে দেখিয়ে আনল। তারপরে প্রশ্ন করে, বাড়ি বেচবে নাকি মল্লিক-দা?

ক্ষেপেছ? কাছারির আটচালায় তুমি ওপারের ওয়েটিংরুম বানাও। ঘরগুলোর চামচিকে তাড়িয়ে চুন টেনে আমি ঝকঝকে তকতকে করে ফেলি। সত্যিই তো, পিতৃপুরুষের ভিটের এমন হাল হয়ে থাকবে কেন।

ছিল মল্লিকবাড়ি—লোকে একডাকে চিনত। এখন মল্লিকঘাট—ঘাটেরও রীতিমত নামডাক পড়ে যাচ্ছে।

জয় হোক যাঁরা লড়াই বাধালেন। বর্ডার পাকাপাকি সিল হয়ে গেল। রাজ্য-পুলিশ, বর্ডার পুলিশ তদুপরি মিলিটারি সিপাহি—

শ্রীধর বলেন, জয় হোক যাঁরা দেশ ভাগ করেছেন। চিরজীবী হোক জিন্নাহ্-জওহরলালদের নাম।

আনোয়ার গবেষণা করে বলে, লাখ লাখ লোক বেকার—দেশ ভাগ সেই সব বিবেচনা করেই বোধহয়। উঃ, কত লোকে করে খাচ্ছে!

মুখ বাঁকিয়ে ঘৃণাভরে শ্রীধর বলেন, দুই বাংলা আবার এক হওয়ার কথা বলে না কি কেউ কেউ। গাড়োল আর কাকে বলে! চাইনে, চাইনে—গাদা গাদা আবার নতন করে বেকার হবে।

ঘাট তো কতই—দুই বাংলার তেরোশ' মাইল বর্ডারে পাঁচ-সাতশ' তো বটেই। কিন্তু মল্লিকঘাটের জুড়ি নেই। কাজকর্মের ধরনই আলাদা। পারাপার কতই তো হয়ে থাকেন, মল্লিকঘাট একবার পরখ করে দেখুন। পার না হয় না-ই হলেন, গিয়ে দেখতে দোষটা কি? তারপরে, বলে দিচ্ছি, ঘরের দুয়োরের ঘাট বাতিল করে দশ-বিশ কিলো পায়ে হেঁটে মল্লিকঘাটে যেতেই মন চাইবে।

॥ দুই ॥

থালায় ভাত দিয়েছে, ছেলেপুলে খেতে বসবে কি—স্ফূর্তিতে আগে একপাক নেচে নেয়। ভাত নয়, অমৃত—সাগর-মন্থনের অমৃতের মতোই দুর্লভ বস্তু।

খাঁয়েরা ধানীমানী গৃহস্থ, ধান বেচে বড়লোক। মায়ে ছেলেয় শলাপরামর্শে বসে খাঁয়েদের কথাই সর্বাগ্রে মনে পড়ে। ধান ওদের নিশ্চয় আছে।

মা কল্যাণী বললেন, ঐখানে চলে যাও বাবা, গিয়ে আমড়াগাছি করোগে। পেটের ক্ষিধের চেয়ে বড় কী আছে? দরদাম নিয়ে কষামাজা করতে যেও না। দেখ, যদি কিছু বের হয়ে আসে।

দিলেও দিতে পারে, একেবারে অসম্ভব মনে হয় না। সময়টা শুভ। জনশ্রুতি, হরিহর খাঁ ইলেকসনে দাঁড়ানোর তোড়জোড়ে আছেন। অদ্ভুত তম্বিরবাজ—এতদিন দাঁড়ান নি কেন, সেই আশ্চর্য। জিততে পারলে পুরো না হোক একটা আধা-মন্ত্রিত্ব ঠেকায় কে? আর টাকা ছড়ালে জেতাও কিছু কঠিন কাজ নয়। হেন অবস্থায় প্রণব গিয়ে ঠিক মতো কথা পাড়তে পারলে ফল হবার সম্ভাবনা।

যাবার মুখে মা কথা পাড়বার কায়দা তালিম দিয়ে দেনঃ গুণপনা ফলাও করে বলবে। যুবসংঘের সেক্রেটারি তুমি, ছোঁড়ারা তোমার কথায় ওঠে বসে, দুর্গা, কালী, সরস্বতী—পাড়ার কোন পুজো তোমায় বাদ দিয়ে হয় না—ভাল করে বুঝিয়ে দিও। যে বিয়ের যে মন্তর। লজ্জা করতে গেলে হবে না।

অতদূর না হোক, কিছু অন্তত বলতই সে মরিয়া হয়ে। কিন্তু হরিহর ভাল করে পাড়তেই দিলেন না। আকাশ থেকে পড়েনঃ কোথায় পাব ধান? লেভিতে সবই তো টেনে নিল। সংসার-খোরাকিতেই টান পড়ে যাবে।

লেভিতে দেবার বান্দাই বটে! কে না জানে, ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে তোমার বন্দোবস্ত। বিশ-তিরিশ মন ধান লোক-দেখানো লেভি জমা দিতে পার—সে তো সাগরের গণ্ডূষমাত্র জল।

খাতির করে বসিয়ে হরিহর ঠাণ্ডা ডাবের সরবৎ খাওয়ালেন, সঙ্গে সঙ্গে আবার গরম চা আনতে পাঠালেন। বলেন, থাকলে ধান কেন দেব না। সোনাদানা নয় যে সিন্দুক ভরে রাখলাম, মরার পরে ছেলে-নাতিরা ভাঙিয়ে ভাঙিয়ে খাবে। এদেশ-সেদেশ বদনাম রটেছে ধান আছে নাকি আমার। দেশসুদ্ধ না খেয়ে মরছে, আমি ধান মজুত করে বসে আছি।

খপ করে প্রণবের হাত দুটো জড়িয়ে ধরলেনঃ এসেছ যখন একটা কাজ করো ভাই, কত ধান আছে নিজ-চোখে দেখে যাও। তন্নতন্ন করে খুঁজে দেখ, কোন জায়গা বাদ দিও না। কিছু আমার গোপন নেই, পাপ নেই তো গোপন কিসের? সব জায়গায় মেলামেশা তোমার, সকলের সঙ্গে দহরম-মহরম। কী দেখে যাচ্ছ বলবে সকলকে। সত্যি কথা বলবে। বাপদাদারা এককালে গোলাবাড়ি বানিয়েছিলো, তাই আমার কাল হয়েছে। গোলার ভিটেয় হেড়াঞ্চির জঙ্গল, ধানের বদনাম তবু চিরকালের তরে রয়ে গেল।

পরম আপ্যায়িত হয়ে প্রণব ফিরল। প্রাণভরে গালিগালাজ করছে। মেঘ করেছিল আকাশে, চড়বড় করে বড় বড় ফোঁটায় বৃষ্টি নামল। আর বাতাস।

বি, সি, মাইতি এণ্ড কোং

—ইলেকট্রো প্লেটিং সামগ্রী—

নিকেল ভ্যাট ও ব্যারেল * ডাইনামো * পলিশিং মেসিন এবং প্লেটিং করিবার জন্য যাবতীয় সামগ্রীর আদি সরবরাহক।

শো রুম ঃ—৯৪, প্রেমচাঁদ বড়াল স্ট্রীট, ক-লি/১২। ফোন ঃ ৩৪-৩১৭৩

৩, [illegible] পাল লেন, কলি-১২ ঃ অফিস-ফোন—৩৪-৪৮৪৬

ছেলে রওনা হয়ে গেলে গিন্নি বাইরের ঘরে উঁকি দিয়ে দেখলেন। কর্তার ঘুম ভেঙেছে ইতিমধ্যে। বললেন, প্রণবকে খাঁয়েদের বাড়ি পাঠালাম। টাকা চিবিয়ে পেট ভরবে না, চেষ্টা তো করতেই হবে।

কর্তা বলেন, টাকা কোথায় পেলে তুমি? নোট, নোটের ছাপা কাগজ—

কলকে ধরিয়ে গিন্নি হুঁকোর মাথায় বসিয়ে দিলেন। এই বস্তুটা চাই, অভাব পক্ষে কাছে কাছে-বসা কোন একটা মানুষ। এত কাজের মানুষ ছিলেন, আজকে কোন কাজই আর নেই। শক্তিই বা কোথা? অঙ্গের মধ্যে মুখটাই নড়ে-চড়ে ভাল। তামাক টানা উপলক্ষে নড়ে। আর তামাক না দিয়ে তো সামনে লোক বসিয়ে দাও কথাবার্তার ব্যাপারে মুখ নড়বে।

তামাক টানছিলেন মজুমদার-কর্তা অর্ধ-মুদিত নেত্রে, কে তখন বাইরে ডাকাডাকি করে ঃ দুয়োর খুলুন। বাদলায় নেয়ে যাচ্ছি একেবারে।

হুঁকো নামিয়ে কর্তা ডাকেন ঃ খোলাই আছে, ধাক্কা দিয়ে দেখুন না। আচ্ছা গোঁফখেজুরে মানুষ তো মশাই! আসুন—

[ক্রমশঃ]

অগ্নিযুগের একটি অধ্যায়

অনন্ত সিংহ

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

বাংলার বিপ্লবী আন্দোলন ও দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন

নিরস্ত্র গ্রামবাসীর ঘরে ঘরে আগুন জ্বালিয়ে, নির্বিচারে অসহায় স্ত্রীলোক ও শিশুদের উপর অকথ্য অত্যাচার চালিয়ে মদমত্ত হস্তীর মত স্যুটার সাহেব বৃটিশ সরকারের প্রচণ্ড পশুশক্তির পরিচয়ে সারা দেশে আতঙ্কের সঞ্চার করলেও বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের সেদিনকার অন্তর্নিহিত দুর্বলতার চিহ্ন তাতে ঢাকা পড়ে নি বরং তা' আরও সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। বীরত্বের মিথ্যা দম্ভে ও অহঙ্কারে আচ্ছন্ন স্যুটার তুমি সেদিন জানতেও পার নি, তোমার পৌরুষে তোমার বীরত্বের দীনতাকে সেদিন শত ধিক্কারে জর্জরিত করেছে! তোমার আর মাতৃভূমিতে ফিরে যাওয়া সম্ভব হয় নি—কলকাতায় University Service Club-এ আত্মহত্যা করে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়েছে!

গ্রামবাসীর মনে বিভীষিকা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে নির্মম অত্যাচারে নিপীড়িত শৃঙ্খলাবদ্ধ হরিপদকে গ্রামের হাটে-বাজারে ঘোরানো হ'ল—স্কুলের শিক্ষক ও ছাত্রবৃন্দকেও অসহ্য অপমান ও দৈহিক অত্যাচারের হাত থেকে রেহাই দেওয়া হলো না। গ্রামের বিশেষ বিশেষ বাড়ি-গুলি আগুনে ভস্মীভূত করা হ'ল। এই তাণ্ডব ও বহ্ন্যুৎসব সমাপ্ত করে সন্ধ্যে সাতটা-আটটায় স্যুটার সাহেব সদলবলে শহরে ফিরে এলেন।

সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ সরকার আশা করেছিল—অত্যাচার ও নিপীড়নের এই বিভীষিকা চট্টগ্রামবাসীর মানসিক শক্তির অবসান ঘটাবে। সরকারের সে আশা অপূর্ণ থেকে গেল—বিক্ষুব্ধ চট্টগ্রামবাসী অত্যাচারের ভয়ে মাথা নত করলো না—তাদের রোষবহ্নিতে দিঙ্‌মণ্ডল আচ্ছন্ন হয়ে গেল! বাংলার যুবকদল ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলো। ধলঘাটে ক্যাপ্টেন কেমারনকে প্রাণ দিতে হ'ল, কুমিল্লার পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট এলিসন্ সাহেবও বিপ্লবীদের গুলীতে প্রাণ দিয়ে প্রায়শ্চিত্ত করলেন—ঢাকার ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ ডুর্নকে তাঁর অপকীর্তির উপহারস্বরূপ শরীরে গুলীর চিহ্ন ধারণ করতে হ'ল—বোমা ও রিভলভারের মুখে চট্টগ্রামের পাহাড়তলীর সাহেব ক্লাবকে এই অত্যাচারের ঋণ পরিশোধ করতে হ'ল।

সাম্রাজ্যবাদীরা পশুশক্তির বলে নির্মম অত্যাচার চালিয়ে মানুষের মনোবল ভেঙে দেওয়ার মিথ্যা স্বপ্নই কেবল দেখেছে। এঙ্গেলসের কথায়—

"Well contested battle even if defeated it will have the same morale effect as is the easily won victory."—(সহজসাধ্য জয়ের তুলনায় সুপ্রতিযোগিতামূলক যুদ্ধে যদি শেষ পর্যন্ত পরাভবও সূচিত হয়, তবু সেই পরাজয়ও জয়ের সমতুল্য।

বিপ্লবী যুবসমাজ যখন অত্যাচারের বদলে অত্যাচার হিংসার বদলে প্রতিহিংসা, রক্তের বদলে রক্ত, প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ নেওয়ার জন্য বদ্ধপরিকর, তখন সাধারণ চট্টগ্রামবাসীরাও এই অমানুষিক অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালো। সারা বাংলায় এই সমস্ত খবর ছড়িয়ে পড়লো। দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন তখন কলকাতায়। তাঁর কাছে বিভিন্ন সূত্রে খবর গিয়ে পৌঁছলো। কলকাতা ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলে সভা আহূত হ'ল। সভাগৃহে জন-সমাগমে তিল-ধারণেরও স্থান নেই। তাঁর প্রতিবাদ জানিয়ে প্রস্তাব পাশ হ'ল। দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহনের সভাপতিত্বে বেসরকারী তদন্ত কমিটি গঠিত হ'ল। কমিশনের অন্যতম দুইজন সদস্য—দেশপ্রাণ শাসমল ও বাংলার অন্যতম কংগ্রেস নেতা অধ্যাপক নৃপেন বন্দ্যোপাধ্যায়কে সঙ্গে নিয়ে দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন তদন্তের জন্য চট্টগ্রামে এলেন।

ইংরেজ শাসকগোষ্ঠী আসানুল্লা হত্যার প্রতিশোধ নিয়েছেন। যতীন্দ্রমোহনের আগমনে তাঁরা শঙ্কিত হয়ে পড়লেন—আহত অভিমানে ভাবতে লাগলেন—এ কি! যতীন্দ্রমোহন কংগ্রেসের একজন খ্যাতনামা কর্মী, অহিংসাবাদের একনিষ্ঠ পূজারী, গান্ধীজীর একান্ত অনুগত ভক্ত—তিনি কেন বিপ্লবীদের সমর্থনে প্রত্যক্ষ অংশ গ্রহণ করবেন—তিনি কেন হিংসাত্মক কাজ দমনে ইংরেজ শাসকের অপরিহার্য দমননীতির অবশ্যম্ভাবী ফলাফলের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবেন?

প্রথম রাউণ্ড টেবিল কনফারেন্সের শোচনীয় পরিণতির পর ১৯৩১ সালের ২৬শে জানুয়ারী গান্ধীজীকে বিনাসর্তে মুক্তি দেওয়া হ'ল। ১৯৩১ সালের ৫ই মার্চ গান্ধী-আরউইন্ প্যাক্ট বা সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হ'ল। গান্ধীজীর সর্ত অনুযায়ী আইন অমান্য আন্দোলনে ধৃত সমস্ত কংগ্রেসকর্মী মুক্তি পেল। হিংসাত্মক কার্যে দণ্ডিত বন্দীদের মুক্তির দাবিতে গান্ধীজী বড়লাট আরউইন্‌কে কোনো অনুরোধ জানান নি। এমন কি, দেশবাসীর একান্ত আগ্রহ সত্ত্বেও ভগৎ সিং, রাজগুরু ও সুখদেও-এর প্রাণদণ্ড রোধের জন্য কোনো দাবিও বড়লাটের কাছে পেশ করা প্রয়োজন মনে করেন নি। ১৯৩১ সালের ২৩শে মার্চ তাঁদের ফাঁসি হয়ে গেল। বৃটিশের Divide and Rule (বিভেদ সৃষ্টি করে শাসন করা) নীতির জয় হ'ল—কংগ্রেসের সঙ্গে সমঝোতা কর আর কঠোর হস্তে বিপ্লবীদের দমন কর। তাইতো শাসকগোষ্ঠী পুলিশের এক অত্যাচারী খাঁবাহাদুরের হত্যাকে উপলক্ষ করে বিপ্লবী চট্টগ্রামকে সায়েস্তা করবার জন্য এইরূপ নৃশংস দমননীতি চালিয়েছে।"

ভগৎ সিং প্রমুখ বিপ্লবীদের প্রাণদণ্ড রহিত করবার ব্যাপারেই স্বয়ং গান্ধীজী যখন সম্পূর্ণ উদাসীন তখন যতীন্দ্রমোহন কেন চট্টগ্রাম শাসকগোষ্ঠীর এই-রূপ হিংসাত্মক কার্যকলাপ ও নৃশংস দমননীতির বিরুদ্ধে তদন্ত করতে এলেন?? জেলা শাসকগোষ্ঠীর তাই দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহনের প্রতি অভিমান।

যতীন্দ্রমোহনের নেতৃত্বে এই বেসরকারী তদন্ত কমিশন শহরের বিভিন্ন স্থানে ও বাড়িতে অনুসন্ধান চালালেন। প্রতিটি বাড়িতে নির্মম নির্যাতনের চিহ্ন দেখে গৃহবাসী ও পাড়াপড়শীর কাছ থেকে অত্যাচার ও জুলুমের কাহিনী শুনে তাঁরা স্তম্ভিত হয়েছেন। শহরের প্রধান বাণিজ্য অঞ্চল আন্দরকিল্লা ও লামার বাজারের শোচনীয় দৃশ্য দেখে যতীন্দ্রমোহন তাঁর ভাবাবেগ সংবরণ করতে পারলেন না। কী ভীষণ ভয়াবহ মর্মান্তিক দৃশ্য! সব দোকানপাট পুড়ে ছাই হয়েছে—আশেপাশের সব বাড়িঘর ধ্বংসস্তূপে পরিণত। কত স্ত্রী-পুরুষ শিশু সন্তানদের হাত ধরে পথে এসে দাঁড়িয়েছে। চট্টগ্রামের ঘরে ঘরে মা-বোনেরা লাঞ্ছিতা, অপমানিতা; প্রৌঢ় ও যুবকেরা চরম অত্যাচারে নিপীড়িত বিধ্বস্ত! তবু সকলে পুলিশী জুলুমকে ভ্রুক্ষেপ না করেই তদন্ত কমিশনের কাছে নিদারুণ ঘটনাবলীর বিবরণদানে এগিয়ে এসেছে। ঘটনাস্থলের বাহ্যিক আগুন নিভে গেলেও তাদের বুকের আগুন তখনও নেভে নি—অন্তরের ক্ষতস্থান হতে তখন রক্ত ঝরছে!

ইংরেজ বণিকেরা সেইদিন চট্টগ্রামের বুকে আগুন জ্বালিয়ে সারা বাংলার জনসাধারণকে ক্ষিপ্ত ও বিক্ষুব্ধ করে তুলেছিল। তদন্ত কমিশন বুঝতে পেরেছিল, বাংলার জনসাধারণ বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী সরকারের এই জুলুম নীরবে সহ্য করবে না।

দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহনের সভাপতিত্বে বেসরকারী তদন্ত কমিশন সমস্ত সাক্ষীসাবুদ গ্রহণ করে এবং বিভিন্ন ক্ষয়-ক্ষতি ও ধ্বংসের নানারূপ তথ্যপূর্ণ ফটোগ্রাফ সংগ্রহ করে, এই নির্মম নিদারুণ অত্যাচারের করুণ কাহিনী দেশবাসীকে জানানো একান্ত প্রয়োজন মনে করে। তদানীন্তন বাংলা সরকার এতে প্রমাদ গুণলেন! অবস্থা বেগতিক দেখে এই বেসরকারী তদন্ত কমিশনের রিপোর্টটিকে অসত্য প্রমাণ করবার জন্য বাংলার লাট ডিভিশনাল কমিশনার মিঃ বেলকে সরকারীভাবে নিযুক্ত করলেন। পুলিশ ইন্সপেক্টর জেনারেল মিঃ ক্রেগকে বিভাগীয় (Departmental) তদন্ত করার জন্য নিযুক্ত করা হ'ল। বেল-কমিশনের তদন্ত ও পুলিশের বিভাগীয় তদন্ত শেষ হলে বটে, কিন্তু বাংলার লেজিস্লেটিভ্ কাউন্সিলে সরকারী তদন্ত কমিশনের রিপোর্টটিকে উপস্থিত করার জন্য "উদারপন্থী" কাউন্সিলারেরা পীড়াপীড়ি করা সত্ত্বেও এই সরকারী রিপোর্টটি উপস্থিত করতে তাঁরা সাহসী হলেন না।

আমার সুস্পষ্ট মনে আছে—আমাদের মামলা চলাকালে আমি কয়েকজন উচ্চপদস্থ বাঙালী পুলিশ অফিসারকে জিজ্ঞেস করি "মামলায় সরকারী রিপোর্টটি অন্তত জনসাধারণের সামনে রাখা হচ্ছে না কেন?" উত্তরে তাঁরা বলেছিলেন—"কি করে এই রিপোর্ট প্রকাশ করবে? বিশেষ করে দুটি ঘটনার কোনো সমর্থনই তাঁদের পক্ষে নেই—পৃথিবীতেও বোধহয় সেইরূপ নজীর আর নেই। রাত্রিবেলা কেবল সাহেবেরা গিয়ে ছাপাখানার মেসিন ভেঙেছে এবং পরের দিন গ্রামে গ্রামে অতগুলি ঘর-বাড়ি পুড়িয়ে দিয়েছে। যদি বিক্ষুব্ধ জনসাধারণ বিক্ষোভের মুখে প্রেস ভেঙেছে ও গ্রামে গ্রামে আগুন জ্বালিয়েছে বলে কোনো নজীর সরকার দেখাতে পারতো, তবে হয়ত বা জেলা-শাসকদের কীর্তি সমর্থন করে সরকারী রিপোর্টটি রচনা করা সম্ভব হোত। যে সরকার জনসাধারণের রক্ষক, ন্যায়দণ্ডের প্রতীক—তার হাতেই যদি জনসাধারণের প্রেস, সম্পত্তি, ধন, প্রাণ—কোনো কিছুরই নিরাপত্তার নিশ্চয়তা না থাকে তবে স্বভাবতই জনসাধারণ সেই সরকারের ওপর আস্থা হারাবে। ন্যায় ও ধর্মের ওপর প্রতিষ্ঠিত বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বুনিয়াদ মুহূর্তেই যে পৃথিবীর কাছে ধূলিসাৎ হয়ে যাবে, যদি সরকারী রিপোর্টটি প্রকাশিত হয়। কাজেই সরকার কি কখনও রিপোর্টটি প্রকাশ করতে পারে?"

দ্বিতীয় রাউণ্ড টেবিল কনফারেন্সে বিফলমনোরথ হয়ে গান্ধীজী লণ্ডন থেকে ভারতে ফিরলেন। বড়লাট আরউইন ভারতের কার্যভার লর্ড উইলিংডনকে অর্পণ করে ইংলণ্ডে ফিরে গেলেন। নতুন পলিসি নিয়ে নতুন বড়লাট লর্ড উইলিংডন কঠোরহস্তে ভারত শাসনে অধিষ্ঠিত হলেন। দ্বিতীয় গোল টেবিল বৈঠক বিফল হওয়ার পর গান্ধীজী আবার আইন অমান্য আন্দোলনের জন্য দেশবাসীকে প্রস্তুত হতে বললেন। কিন্তু ভারতব্যাপী এই আইন অমান্য আন্দোলনের ব্যাপকতা ও তীব্রতা ভারত সরকারকে যে কতখানি বিপর্যস্ত করে তুলতে পারে এবং এই গণ-আন্দোলন যে কতখানি হিংসার আগুন ছড়িয়ে দিতে পারে তা সম্যক উপলব্ধি করাবার উদ্দেশ্যেই বোধহয় আইন অমান্য আন্দোলনের ডাক দেবার আগে গান্ধীজী আর একবার শেষবারের মত লর্ড উইলিংডনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চাইলেন। বড়লাট বাহাদুর গান্ধীজীর এই সাক্ষাৎ প্রার্থনা সরাসরি প্রত্যাখ্যান করলেন।

ভগৎ সিংহের ফাঁসি, চট্টগ্রামের ওপর এইরূপ চরম নিপীড়ন, গোল টেবিলের মরীচিকা, গান্ধীজীর বড়লাট সাক্ষাৎ প্রার্থনা নামঞ্জুর জনসাধারণকে বিক্ষুব্ধ করে তুললো। আবার সাজ-সাজ রব উঠলো। ভারতের আকাশ আবার ঘন, গাঢ় কালো মেঘে আচ্ছন্ন হয়ে এলো। বিক্ষুব্ধ ভারত ব্যাপক আইন অমান্য আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়তে প্রস্তুত।

ভগৎ সিংহের ফাঁসির পর প্রতিহিংসার আগুন জ্বলে উঠলো। ১৯৩১ সালের ৭ই এপ্রিল মেদিনীপুরের জেলা-শাসক মিঃ পেডি প্রাণ হারালেন। ১৯৩১ সালের ২৭শে এপ্রিল—তখনও দীনেশ মজুমদারের প্রাণদণ্ডের জাজমেণ্টের কালি শুকিয়ে ওঠে নি—আলিপুরের সেসন্ জজ মিঃ গার্লিকের বুক লক্ষ্য করে বিপ্লবীর বন্দুক অব্যর্থ লক্ষ্যে গর্জে উঠল। হরিপদর গুলীতে অত্যাচারী খাঁবাহাদুর আসানুল্লাকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হল। একের পর এক এইরূপ বৈপ্লবিক ঘটনা সংঘটিত হতে লাগল।

আইন অমান্য আন্দোলন আবার শুরু হলে আন্দোলন অপ্রতিহত গতিতে চলার পথে বিক্ষুব্ধ জনগণ যে হিংসাত্মক বৈপ্লবিক পথ নিতে বাধ্য—এই বাস্তবতার উপলব্ধি আর কারও না থাকলেও গান্ধীজীর যে ছিল সেই সম্বন্ধে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।

বাংলার কংগ্রেস নেতারা বাংলার বিপ্লবী যুবসমাজকে কখনই উপেক্ষা করতে পারেন নি। ক্ষুদিরাম, কানাইলাল, প্রফুল্ল চাকী, বাঘা যতীন প্রমুখ শহীদদের আত্মদানের প্রভাব ও বাংলার বৈপ্লবিক বৈশিষ্ট্য বাংলার মাটিতে যে আবহাওয়ার সৃষ্টি করেছিল তার গভীর প্রেরণা থেকে গান্ধীজীর অনুগত কংগ্রেস নেতারাও নিষ্কৃতি পান নি।

দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহনও বাংলার বৈপ্লবিক বানের স্রোত থেকে নিজেকে সম্পূর্ণ বাঁচিয়ে রাখতে পারেন নি।

সবিনয় নিবেদন

কৃত্তিবাস ওঝা কার্যব্যপদেশে কলকাতার বাইরে থাকায় তাঁর রচনা "সপ্তাহের বোঝা" এবারে প্রকাশ করা গেল না বলে আমরা দুঃখিত। আগামী সপ্তাহে রচনাটি যথারীতি প্রকাশিত হবে। . ...

—সম্পাদিকা

আসানুল্লা হত্যার পর যে অত্যাচার সারা বাংলাকে বিক্ষুব্ধ করে তোলে তার রিপোর্টটি বৃটিশ পার্লামেন্টের হাউস অফ কমন্সে উপস্থিত করবার জন্য যতীন্দ্রমোহন সস্ত্রীক ইংলণ্ডে যান। সেখানে বহু স্থানে তিনি ম্যাজিক লাণ্টার্নের সাহায্যে বর্বরোচিত ঘটনাবলীর বিবরণের মাধ্যমে অবৈধ ইংরেজ শাসনের জঘন্যরূপ উদ্ঘাটিত করেন।

পৈশাচিক ঘটনার খুব সামান্য বিবরণ শ্রীপূর্ণেন্দু দস্তিদারের "স্বাধীনতা সংগ্রামে চট্টগ্রাম" গ্রন্থে পাই। পূর্ণেন্দু দস্তিদার জালালাবাদ যুদ্ধের শহীদ অর্ধেন্দু দস্তিদারের বড় ভাই। অর্ধেন্দুর পরের ভাই সুখেন্দু দস্তিদার যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়ে আমাদের সঙ্গে আন্দামানে বন্দী ছিল এবং এক সঙ্গে মুক্তি পাওয়ার পর থেকেই পূর্ব-পাকিস্তানে সক্রিয়ভাবে কম্যুনিস্ট পার্টির সদস্য হিসেবে আত্মগোপন করে আছে। তার অন্যান্য ভাইয়েরাও কম্যুনিস্ট। পূর্ণেন্দু দস্তিদার কৃতী ছাত্র ও একজন এম এল এ। প্রাক্ আয়ুবশাহী নির্বাচনে অসংখ্য ভোটের অধিক্যে তিনি আইন সভায় নির্বাচিত হন। পূর্ণেন্দু দস্তিদারের এই পুস্তকখানির প্রথম প্রকাশ —শ্রাবণ, ১৩৭৪ সাল। মনে হয় আসানুল্লার এই ঘটনার কিছুটা বিবরণ পূর্ণেন্দুর এই পুস্তক থেকে উদ্ধৃত করলে পাঠকবর্গের কাছে তা' বিশেষ সমাদৃত হবে। এই পুস্তক পূর্ব-পাকিস্তানে প্রকাশিত হয়েছে।

পূর্ণেন্দু দস্তিদার লিখেছেন—"এই অত্যাচারের সংবাদ চট্টগ্রাম থেকে কলকাতায় দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহনের কাছে পাঠানো হয়। সেখানে ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটে চট্টগ্রামের জনসাধারণের উপর এই নির্মম অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিরাট জনসভায় অনলবর্ষী ভাষায় সুবক্তা দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন প্রতিবাদ জানান। এই সভায় তৎকালীন কংগ্রেস নেতা নৃপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বীরেন শাসমল ও দেশপ্রিয়কে নিয়ে এক তদন্ত কমিশন গঠিত হয়। ঐ বেসরকারী তদন্ত কমিশন চট্টগ্রামে এসে গ্রামে গ্রামে গিয়ে পুলিশ বর্বরতার ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন ও লাঞ্ছিতা মা-বোন ও নির্যাতিত সকলের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে আলাপ করেন। শহরেও যে সকল লুঠতরাজ ও অত্যাচার ইংরেজ পুলিশ কর্মচারীর ব্যক্তিগত উদ্যোগ ও পরিচালনায় চলে, এই কর্মীদল তার বিশদ বিবরণ সংগ্রহ করেন।

বিশেষ করে দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের চেষ্টায় সারা বাংলার জনমত ইংরেজ সরকারের এই সুপরিকল্পিত অত্যাচারের ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে নিদারুণ বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। তার ফলে সরকার বিভাগীয় কমিশনার মিঃ বেলকে সভাপতি করে একটি সরকারী বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিটি গঠন করে। ঐ তদন্ত কমিটির বিভিন্ন সাক্ষ্য গ্রহণের পরে, যে ইংরেজ পুলিশ কর্মচারী ঐ সব লুঠতরাজ, নির্যাতন, বলাৎকার ও অন্যান্য অত্যাচার চালানোর জন্য কোতোয়ালী থানায় আহূত এক বৈঠকে উপস্থিত থেকে পরিকল্পনা দিয়েছিল, সে কলকাতার এক হোটেলে নিজের রিভলবার দিয়ে আত্মহত্যা করে। আর "বেল তদন্ত কমিটির" রিপোর্টে দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহনের ঘোষিত প্রায় সকল অভিযোগই প্রমাণিত হওয়ায় সে রিপোর্ট আর জনসাধারণের কাছে প্রকাশ করা হয় নি।

"ঐ সময় দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সস্ত্রীক ইংলণ্ডে গিয়েছিলেন। সেখানে তৎকালীন র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ডের শ্রমিক মন্ত্রিসভা "হাউস অফ কমনস"-এ তাঁকে বক্তৃতা দিতে অনুমতি দেয়। ঐ সভায় যতীন্দ্রমোহন চট্টগ্রামের বুকের উপর পুলিশের প্রত্যক্ষ উদ্যোগে যে বর্বরতা সংঘটিত হয়েছিল, তার বিবরণ জ্বালাময়ী ভাষায় ইংরেজ পার্লামেন্টে জনসাধারণের সামনে উপস্থিত করেন। ঔপনিবেশিক ইংরেজ সরকারের পক্ষে তা সহ্য করা সম্ভব হয় নি। তাই কিছুদিন পর দেশপ্রিয় যখন দেশে ফিরে এলেন তখন বোম্বাই বন্দরে জাহাজ ভিড়লেই ১৮১৮ ইং ৩ নং বেঙ্গল রেগুলেশন আইনে তাঁকে গ্রেপ্তার করে বিনা বিচারে আটক করা হয়।"

বাংলা সরকার বিপ্লবীদের সঙ্গে দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহনের মানসিক সংযোগ ও সক্রিয় যোগাযোগ সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন। আগেই বলেছি বাংলার রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে বিপ্লবীদের সংযোগ কোন স্তরেই উপেক্ষণীয় ছিল না। কিন্তু দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ও দেশগৌরব সুভাষচন্দ্রের বৈপ্লবিক চিন্তাধারা ও বিপ্লবীদের সঙ্গে সাংগঠনিক যোগাযোগ যতখানি প্রকট ছিল—দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহনের সঙ্গে ততখানি ছিল বলে প্রকাশ পায় নি। তবু সরকারী সূত্রে জানতে পারি যতীন্দ্রমোহনকে পুলিশ বিপ্লবীদের সমর্থক বলে জানতো এবং সেই কারণে শেষ পর্যন্ত ভারতরক্ষা আইন Regulation III-র সাহায্যে বিনা বিচারে দেশপ্রিয়কে আটক করল। ইংরেজীতে মুদ্রিত গোপন পুলিশ রিপোর্ট, কলকাতা, ২৫শে জানুয়ারী ১৯৩২, পৃষ্ঠা ৫—৬ থেকে উদ্ধৃত করছি—

"Mr. J. M. Sen Gupta's views on connection of Congress with terrorists—the following extracts from a speech made by Mr. J. M. Sen Gupta a member of the All India Congress Committee, show in what light the Congress viewed the detenus, persons who were interned by Government because they were engaged in terrorists conspiracies and who style themselves "the front rank fighters in the cause of freedom." On the 8th March 1931 at the All Bengal Students' Conference Mr. J. M. Sen Gupta said :

My friends, it seems to me that it was all ordained by Providence, otherwise how is it that when I entered this hall a resolution should actually be under discussion on a question which has been agitating the whole of India and particularly the young minds of Bengal for the past few days ?

My friends, I am not here to speak on behalf of the Indian National Congress or the Working Committee of the Congress or Mahatma Gandhi, the leader of the Indian Nation. I am here as one of you. Mahatma Gandhi represents you me, all men and women of the whole of India. And because both you and I know that you will not, in the interest of your country, in your own interest, in the interest of all that you hold dear to yourselves, pass a resolution which will make you later hang down your heads in shame. (Applause)

You have not heard Mahatmaji, you do not know the implications of the document issued to the press by the Government of India. Do not be superficial readers. Read that Document through and through. Get to the bottom through. Get to the bottom of the words. Read it carefully and find out what the significance of that document is,

My friends, you and I know and so also knows Mahatma Gandhi that there can be no peace in India unless every young man is released from prison. (Applause) There is no doubt about that. There is no man who could have fought with greater ability, with greater strength for the release of these young men than Mahatma Gandhi himself. Remember my friends that there has been a war and after the war a truce has been declared I ask you to realise and understand the distinction between truce and peace. But even in this circumstances we did a lot which in ordinary case we could not claim. We got back actually those who were taken as prisoners in the non-violent war.

With regard to the violent prisoners I pressed for their release all through and asked Mahatmaji to press for their release before the Viceroy when he met him. But it was found impossible to make the release of those convicted of violent crime a condition precedent of truce. My friends, I do not blame you because I know that you are all filled with the loftiest of sentiments because all of you feel for those detained without trial. But you do not know that most of the 500 young men who have been interened without trial and without charge are my intimate friends and co-worker in the Congress. (Hear hear) I told this to Mahatma Gandhi and others. I further told Mhatmaji that every one of them is a staunch Congress men—many of them are office-bearers of the different Congress Committee. I have represented their case to Mahatmaji and I have pressed their case before the Working Committee. My friends, you can create such a situation by so strengthening the hands of the Congress and of Mahatma Gandhi that in the course of a few days, in the course of a few weeks, they will be with us. If you can create such a situation by strengthening your national organisation it would be possible to have even the 'violence' prisoners released just as the 'non-violence' ones."

দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন আইন বাঁচিয়েই এই বক্তৃতা দিয়েছেন—তবু পুলিশ এই বক্তৃতাটি সম্বন্ধে তাদের গোপন নথিতে লিপিবদ্ধ করে রেখেছে। তাদের বিভিন্ন গুপ্ত তথ্যের সমর্থনে বিপ্লবী বাংলার সঙ্গে যতীন্দ্রমোহনের সম্পর্ক প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছে। এই কারণেই ইংলণ্ড থেকে প্রত্যাবর্তনের সময় বোম্বাই বন্দরেই Regulation III-তে যতীন্দ্রমোহনকে বন্দী করা হয়। [ক্রমশঃ]

বর্তমান বঙ্গসাহিত্যে সর্বাধিক জনপ্রিয় লেখিকা

আশাপূর্ণা দেবীর
গ্রন্থাবলী
আবার একখণ্ড
প্রকাশিত হয়েছে !

তিনখানি সম্পূর্ণ উপন্যাস। সাতটি বড় গল্প
১। বলয়গ্রাস ২। প্রেম ও প্রয়োজন
৩। দুর্নিবার ৪। এক গুচ্ছ গল্প
মূল্য মাত্র সাড়ে ছয় টাকা

আগেই বেরিয়েছে আর এক খণ্ড
গ্রন্থাবলী
১। জহুরী ২। অনির্বাণ
৩। সোনালী দিনের মন
৪। এক গুচ্ছ গল্প
মূল্য মাত্র পাঁচ টাকা

বসুমতী (প্রাঃ) লিঃ
কলিকাতা-১২

ভিয়েৎনাম: ঝড়ের কেন্দ্রে

বরুণ রায়

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

একদিকে যখন ভিয়েৎমিন দেশপ্রেমিক বীরেরা দিয়েন বিয়েন ফু-র পর্বতে প্রান্তরে মুক্তি ও স্বাধীনতার জন্যে লড়াই করে মরছিল, অন্যদিকে তখন সায়গনে ফরাসীর হাতের পুতুল বাও দাই তাঁর সাকরেদ বে ভিয়েনকে প্রশ্রয় দিচ্ছিলেন বারো শ' মেয়ে নিয়ে এশিয়ার বৃহত্তম বেশ্যালয় স্থাপন করবার জন্যে।

ইতিহাস বিচার করুক ভিয়েৎনামের সত্যিকার প্রতিনিধি কারা।

যখন ওরা রাতের পর রাত না ঘুমিয়ে, দিনের পর দিন না খেয়ে, পায়ে হেঁটে বুকে হেঁটে পাহাড়, জঙ্গল, নদী পেরিয়ে, প্রতি পদক্ষেপে মৃত্যুকে সঙ্গে নিয়ে এগিয়ে চলছিল—ঘর-ছাড়া, বাড়ি-ছাড়া, সুখ, আরাম, নিরাপত্তা সব ছাড়া, সঙ্কল্পে দুর্বার, লক্ষ্যে অটুট মুক্তিপাগল একদল মানুষ—তখন বাও দাই ঐ বে ভিয়েনের সঙ্গে মিলেই 'গ্রাঁদ ম'দ' নামে একটি জুয়ার আড্ডা চালাচ্ছেন।

সত্য, ন্যায়, বিচার ইত্যাদি বলে যদি কিছু থেকে থাকে তাহলে তারাই বিচার করুক ভিয়েৎনামের স্বাধীনতা কাদের হাতে আসা উচিত।

যারা স্বাধীনতার জন্যে লড়াই করেছিল, কষ্ট স্বীকার করেছিল, প্রাণ দিয়েছিল তাদের হাতে? না তাদের হাতে যারা শোষক সম্প্রদায়ের তল্পিবাহক হয়ে বারে, রেখেলে রিভিয়েরায় দিন এবং রাত্রি দুই-ই কাটানো ছাড়া আর কিছু করত না?

সততা বলে কোন বৃত্তি যদি আজো অবশিষ্ট থাকে তাহলে সেই বলে দেবে এই প্রশ্নের জবাব কি হওয়া উচিত।

অথচ দিয়েন বিয়েন ফু-র বিস্ময়কর জয়লাভের পর হো চি মিনের নেতৃত্বে ভিয়েৎমিনরা যখন স্বাধীন, ঐক্যবদ্ধ ভিয়েৎনামের দায়িত্ব নেবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছিল, তখন সাম্রাজ্যবাদী রাজনীতি তাদের সেই দীর্ঘ রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের ফসল থেকে বঞ্চিত করার ষড়যন্ত্র আঁটছিল।

ঠিক যেমনভাবে ১৯৪৫ সালে মিত্রশক্তির বিশ্বাসঘাতকতা আরেকবার স্বাধীনতার জন্মলগ্নে স্বাধীনতা কেড়ে নিয়েছিল ভিয়েৎনামের মানুষের হাত থেকে।

দেখা গেল ন' বছর পরেও সাম্রাজ্যবাদ তার চরিত্র পাল্টায় নি।

এই ষড়যন্ত্র ও বঞ্চনার কথা সকলের জানা দরকার। তা না হলে আজ ভিয়েৎনামে যে অবিচার, যে অন্যায়, মানবতার বিরুদ্ধে যে অপরাধ সংগঠিত হচ্ছে তার প্রকৃত স্বরূপ এবং এই অবিচার, অন্যায় ও অপরাধের বিরুদ্ধে যারা প্রতিরোধ চালিয়ে যাচ্ছে তাদের আসল উদ্দেশ্য ভালোভাবে বোঝা যাবে না।

ভিয়েৎনামের সমস্যার ওপর আজ অত্যন্ত কৌশলে ও সুপরিকল্পিতভাবে একটা ধূম্রজাল বিস্তার করা হয়েছে মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্যে। এই সমস্যার যাঁরা সমাধান চান, এই জাল ভেদ করে তাঁদের তাকাতেই হবে আসল সত্যের দিকে। আর সেইজন্যে এই ষড়যন্ত্র ও বঞ্চনার কথা আরো বেশি জানা দরকার।

দিয়েন বিয়েন ফু-র যুদ্ধে ফ্রান্স ছিল পরাজিত পক্ষ, এবং নিশ্চয়ই সে শুধুমাত্র উত্তর ভিয়েৎনামের শাসক হিসেবে ভিয়েৎমিনদের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হয় নি।

ঐ যুদ্ধে ভিয়েৎমিনরা ছিল বিজয়ী পক্ষ, এবং নিশ্চয়ই তারা শুধুমাত্র উত্তর ভিয়েৎনামের শাসক হিসেবে ফরাসীদের পরাজিত করে নি।

সুতরাং বিজয়ী ও পরাজিতের মধ্যে বোঝাপড়া যা হবার তা ভিয়েৎমিন ও ফ্রান্সের মধ্যেই হবার কথা। দায় ও দায়িত্বের হস্তান্তরও যা কিছু তা এই দুজনের মধ্যেই হবে এটাই স্বাভাবিক;

দিয়েন বিয়েন ফু-র চূড়ান্ত ফয়সালার পরের দিন, অর্থাৎ ১৯৫৪ সালের ৮ মে, এই বোঝাপড়ার জন্যে ভিয়েৎনাম তথা গোটা ইন্দোচীন সম্পর্কে জেনিভায় এক আন্তর্জাতিক বৈঠকের অধিবেশন আরম্ভ হয়। ফ্রান্স ও হো চি মিনের গণতান্ত্রিক রিপাবলিক ছাড়া ঐ সম্মেলনে উপস্থিত ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন, রাশিয়া, চীন এবং লাওস, কম্বোডিয়া ও বাও দাই-র পুতুল সরকার।

কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, এ-কথা আজ

আর বলতে বাধা নেই, সম্মেলন আরম্ভ হবার আগে থেকেই এ সম্পর্কে শুধু উদাসীন ছিল না, সম্মেলন চলাকালে এর কাজকর্মে নানাভাবে বাধা দেবার চেষ্টা করেছিল। এক সময় পররাষ্ট্রসচিব মিঃ ডালেস এবং সহকারী পররাষ্ট্রসচিব মিঃ বেডেল স্মিথ দুজনেই সম্মেলন ত্যাগ করে চলে গিয়েছিলেন।

একটি জাতি দীর্ঘকাল সংগ্রাম করার পর স্বাধীনতার দ্বারপ্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছে এবং সেই স্বাধীনতার জন্যে আলোচনা চালাতে এসেছে, এই কথাটা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সেদিন কিছুতেই স্বীকার করে নিতে চায় নি। তার একমাত্র বক্তব্য, ভিয়েৎমিন একটি কম্যুনিস্ট আন্দোলন, সুতরাং মীমাংসা আলোচনায় সমর্থন জানাবার অর্থ হল কম্যুনিস্টদের সঙ্গে আপোস করা। কোনরকম আপোস করার বিরুদ্ধে আমেরিকার মনোভাব এতই কঠিন ছিল যে, আমেরিকা জেনিভা সম্মেলনের সিদ্ধান্তে স্বাক্ষর পর্যন্ত করে নি। ওয়াশিংটনের এই সময়কার ভূমিকাকে যে কোনমতেই বিশ্বশান্তির সহায়ক বলা যায় না একথা নিরপেক্ষ পশ্চিমী পর্যবেক্ষকরাই স্বীকার করে থাকেন।

মার্কিন সরকারের মুখপাত্ররা আজ যখন আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে বিরোধ মীমাংসার কথা বলেন, তখন আমরা জেনিভা সম্মেলনে তাঁদের ভূমিকার কথা মনে না করে পারি না।

অথচ মার্কিন কর্তৃপক্ষ কম্যুনিস্ট আখ্যা দিয়ে সেদিন যাদের সঙ্গে আপোস করতে অস্বীকার করেছিলেন, সেই ভিয়েৎনাম গণতান্ত্রিক রিপাবলিকের সরকারের ভূমিকার কথা মনে করুন। লড়াই তারাই করেছিল, ফরাসীদের তারাই পরাজিত করেছিল, গোটা ভিয়েৎনামের শাসনভার গ্রহণের অধিকার তারাই অর্জন করেছিল, অথচ মীমাংসার খাতিরে—জেনিভা বৈঠকে যখন দেশটাকে সপ্তদশ সমান্তরাল বরাবর সাময়িকভাবে দু' ভাগে ভাগ করার প্রস্তাব করা হয়েছিল, তখন সেই প্রস্তাবে তারা আপত্তি জানায় নি।

দুনিয়ার শান্তিকামী মানুষই বিচার করবে কে বেশি গণতান্ত্রিক : 'কম্যুনিস্ট' উত্তর ভিয়েৎনাম না 'গণতান্ত্রিক' আমেরিকা।

*

প্রায় আড়াই মাস আলোচনার পর ২০ জুলাই জেনিভায় একটি যুদ্ধ-বিরতি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় এবং পরের দিন ২১ জুলাই একটি চূড়ান্ত ঘোষণা-পত্র প্রচারিত হয়।

এই চুক্তি ও ঘোষণার মর্মার্থ ছিল

এক, সপ্তদশ সমান্তরাল বরাবর ভিয়েৎনামকে সাময়িকভাবে—লক্ষ্য করবেন, সাময়িকভাবে—দু' ভাগ করা হবে। উত্তরাংশ থাকবে ভিয়েৎমিনদের হাতে, দক্ষিণাংশ থাকবে ফ্রান্সের তত্ত্বাবধানে। দু' পক্ষের সেন্যরা চুক্তি বলবৎ হবার ৩০০ দিনের মধ্যে যে যার অংশে চলে যাবে।

দুই, দেশকে আবার ঐক্যবদ্ধ করার জন্যে দু' বছর পর, ১৯৫৬ সালের জুলাই মাসে, একটি সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। এর ক্ষেত্র প্রস্তুত করবার জন্যে ১৯৫৫ সালে উভয়পক্ষ মিলিত হয়ে আলাপ-আলোচনা করবে।

তিন, যুদ্ধবিরতির সর্তাবলী ঠিক ঠিক পালিত হচ্ছে কি না তা দেখার জন্যে কানাডা, পোল্যাণ্ড ও ভারতকে নিয়ে একটি আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণ কমিশন গঠন করা হবে।

চার, চুক্তি বলবৎ হবার দিন থেকে কোন পক্ষই সৈন্য বা সামরিক কর্মীর সংখ্যা বৃদ্ধি করতে পারবে না, কিংবা বাইরে থেকে সৈন্য, সামরিক কর্মী, অস্ত্র-শস্ত্র, গোলা-বারুদ, জঙ্গী বিমান, জাহাজ, জেট ইঞ্জিন, সাঁজোয়া গাড়ি ইত্যাদি আমদানী করতে পারবে না। ভিয়েৎনামের কোথাও কোন নতুন সামরিক ঘাঁটি নির্মাণ করাও নিষিদ্ধ। কোন পক্ষই কোন সামরিক জোটের সঙ্গেও সামিল হতে পারবে না।

হো চি মিনের সরকার এই চুক্তি মেনে নিয়েছিলেন পুরোপুরি, ফ্রান্সকে পাহ-দুয়ার দিয়ে অন্তত দু' বছর ভিয়েৎনামে বজায় রাখার চেষ্টা সত্ত্বেও। এবং ফ্রান্সও যখন চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছিল তখন এই চুক্তির মর্যাদা সে রক্ষা করে চলবে এটাই ছিল প্রত্যাশিত।

হো চি মিন আরেকবার বিশ্বাস করেছিলেন পশ্চিমী সদিচ্ছা ও সততার ওপর। ইতিহাস পাঠ করলে দেখা যাবে এইভাবে বিশ্বাস করে প্রতি পদে পদে হো চি মিনকে ঠকতে হয়েছিল। তবু শান্তির স্বার্থে তিনি আরেকবার হাত মেলাতে কুণ্ঠিত হন নি।

কিন্তু সাম্রাজ্যবাদ ঐ মুহূর্তেই চক্রান্ত করেছিল চুক্তি বানচাল করার জন্যে। নির্বাচনের জন্যে ১৯৫৫ সালে যে আলোচনার কথা ছিল তা অনুষ্ঠিত হয় নি, এবং সাধারণ নির্বাচনের তারিখের ঠিক প্রাক্কালে ফ্রান্স তল্পিতল্পা গুটিয়ে দক্ষিণ ভিয়েৎনাম থেকে চলে গিয়েছিল।

এরকম যে ঘটতে পারে জেনিভার সম্মেলনকারীরা তা আগেই অনুমান করতে পেরেছিলেন। তাই চুক্তিতে এই কথা বলা ছিল যে, যদি মূল স্বাক্ষরকারী ফ্রান্স ও উত্তর ভিয়েৎনামের কেউ চুক্তির খেলাপ করে তাহলে তাদের উত্তরাধিকারীর ওপর চুক্তি রূপায়ণের দায়িত্ব বর্তাবে। ফ্রান্স চুক্তি নির্লজ্জভাবে লঙ্ঘন করেছিল, এবং ফ্রান্সের উত্তরাধিকারী হিসেবে দক্ষিণ ভিয়েৎনামের দায়িত্ব গ্রহণ করে বাও দাই-নো দিন জিয়েম সরকার।

কিন্তু বাও দাই-জিয়েম চক্রকে জেনিভা চুক্তি অগ্রাহ্য করার জন্যে প্রকাশ্যে উস্কানি দিচ্ছিল আমেরিকা।

আমেরিকারই প্ররোচনায় বাও দাই-জিয়েমের প্রতিনিধি জেনিভা চুক্তিতে স্বাক্ষর দেন নি, এবং এই সিদ্ধান্তকে মার্কিন সরকার প্রকাশ্যে পূর্ণ সমর্থন জানালেন। অবশ্য রিপাবলিক অব ভিয়েৎনামের আলাদা স্বাক্ষরের কোন দরকার ছিল না, কারণ ফ্রান্সের উত্তরাধিকারী হিসেবে চুক্তি পালন করতে সে এমনিতেই দায়বদ্ধ ছিল। এই দায় অগ্রাহ্য করা তার পক্ষে সম্ভব হত না যদি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হাত না থাকত।

প্রেসিডেন্ট আইজেনহাওয়ার মন্তব্য করেছিলেন, সপ্তদশ সমান্তরাল বরাবর ভিয়েৎনামের বিভাগকে তিনি কৃত্রিম বলে মনে করেন। জিয়েম বলেছিলেন, জেনিভা চুক্তি জনগণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে হয়েছে। অথচ ঐ বিভাগ দূর করবার জন্যে এবং জনগণের ইচ্ছা যাচাই করার জন্যে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠান করতে বলা হল, তখন তাঁরা নির্বাচন হতে দিতে সরাসরি অগ্রাহ্য করলেন।

একে আমরা কি বলব : সদিচ্ছা?

অথচ যে বিভাগকে কৃত্রিম ও জনগণের ইচ্ছা-বিরুদ্ধ বলা হল সেই সাময়িক ভাগের ফসলকে এখন আমেরিকা ও জিয়েম চক্র লুঠের মাল হিসেবে ব্যবহার করতে অগ্রসর হলেন।

একে আমরা কি বলতে পারি : সততা?

এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জেনিভা সম্মেলনকে যে পদে পদে বাধা দিয়েছিল ও জেনিভা চুক্তিতে যে স্বাক্ষর করতে রাজী হয় নি, একজন পরম নীতিবাদীর মতো ঘোষণা করেছিল জেনিভার সভা-কক্ষে : মার্কিন সরকার যদিও জেনিভার ঘোষণায় সামিল হতে রাজী নয় তবু যেহেতু তাঁরা রাষ্ট্রসংঘের আদর্শ ও উদ্দেশ্য অনুযায়ী শান্তির জন্যে কাজ করতে প্রতিশ্রুত, তাই তাঁরা একতরফা এই ঘোষণা করছেন যে, তাঁরা এই চুক্তির কথা নজর করছেন, চুক্তি বিঘ্নিত করার জন্যে তাঁরা শক্তির প্রয়োগ করবেন না, এবং এই চুক্তি লঙ্ঘন করে আক্রমণ পুনরায় আরম্ভ হলে তাঁরা তা আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা গুরুতরভাবে বিপন্ন বলে মনে করবেন।

অথচ তাঁরাই এখন প্রথম প্রথম গোপনে তারপর প্রকাশ্যেই চুক্তি লঙ্ঘন করে

মেয়েদের ছোটবেলা থেকেই
ত্বকের যত্ন নিতে শেখান।
তিনি সুন্দরী, তিনি রূপসী!
প্রতিদিনের ত্বক পরিচর্যায় তাঁর এই অপরূপ সৌন্দর্যের
উৎস-সাধনা বিউটি ক্রীম।
সাধনা বিউটি ক্রীম রূপসাধনায় অনন্য
সাধনা ঔষধালয়-ঢাকা
সাধনা ঔষধালয় রোড, সাধনানগর, কলিকাতা-৪৮
অধ্যক্ষ যোগেশ চন্দ্র ঘোষ, এম.এ.
আয়ুর্বেদশাস্ত্রী, এফ.সি.এস. (লণ্ডন)
এম.সি.এস. (আমেরিকা) ভাগলপুর
কলেজের রসায়ণ-শাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক
কলিকাতা কেন্দ্র :
ডাঃ নরেশচন্দ্র ঘোষ,
এম.বি.বি.এস. (কলিঃ)
আয়ুর্বেদাচার্য
SADHANA
Beauty
CREAM
সাধনা
বিউটি
ক্রীম

প্রচুর পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র, সামরিক কর্মী ও যুদ্ধসামগ্রী দক্ষিণ ভিয়েৎনামে পাঠাতে লাগলেন।

একেই বা আমরা কি বলব : নীতি, ধর্ম, শান্তির আকুলতা?

জেনিভা চুক্তির পরবর্তী বছরগুলিতে আমেরিকা ও জিয়েম চক্র কত নির্লজ্জভাবে চুক্তি লঙ্ঘন করেছে, তার প্রমাণ রয়েছে আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণ কমিশনের রিপোর্টের পাতায় পাতায়। ১৯৫৭ সালের রিপোর্টে কমিশন পরিষ্কার ভাষায় জানিয়েছেন যে, উত্তর ভিয়েৎনাম চুক্তি লঙ্ঘন করেছে বলে কোন রিপোর্ট তাঁরা পান নি। অপরপক্ষে দক্ষিণ ভিয়েৎনাম জেনিভার নির্দেশ উপেক্ষা করে পাঁচটি মার্কিন সামরিক বিমানে আমেরিকা থেকে সামরিক কর্মী, বিমানের চাকার জন্যে টায়ার, এক হাজার রিভলভার ও রিভলভারের গুলীভর্তি ৬১০টি বাক্স আনিয়েছে।

এই বিষয়ে কমিশন যখন সায়গন সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন, তার কোন জবাবই এলো না।

মিথ্যা প্রচারের দ্বারা এই ঘটনাগুলি এখন আচ্ছন্ন করে দেবার চেষ্টা হচ্ছে। বলা হচ্ছে হো চি মিন উত্তর ভিয়েৎনামে একটি কম্যুনিস্ট রাষ্ট্রের পত্তন করেছেন এবং জোর করে দক্ষিণ ভিয়েৎনাম দখল করার মতলব কষছেন।

কিন্তু পৃথিবীর বিবেক বলে যদি কিছু থাকে তবে সে-ই রায় দিক : নির্বাচনে রাজী হওয়া আর জোর করে ক্ষমতা দখল কি সমার্থক?

ওয়াশিংটন-সায়গন চক্র বলবে, ঐ নির্বাচন অবাধ ও ন্যায়সংগত হ'ত না।

এই যুক্তির একটিই উত্তর আছে : নির্বাচনের প্রস্তুতির জন্যে উভয়পক্ষের মধ্যে আলোচনার ব্যবস্থা তো চুক্তিতে ছিল। আলোচনা তাহলে করা হয় নি কেন?

ওয়াশিংটন-সায়গন চক্র আবার বলবে, নির্বাচন হলে হো চি মিনের পক্ষই জয়লাভ করত অর্থাৎ দক্ষিণ ভিয়েৎনামও কম্যুনিস্ট হয়ে যেত।

নিজেদের শক্তি ও প্রভাব সম্পর্কে তাদের যদি এতই উচ্চ ধারণা, তাহলে আমরা কি বলতে পারি না দক্ষিণ ভিয়েৎনামে তারাই জনগণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে ক্ষমতা দখল করেছে? নির্বাচন হলে যদি হো চি মিন জয়যুক্ত হয় তাহলে ভিয়েৎনামে শাসন করবার প্রকৃত অধিকারী কে : হো চি মিন, না আমেরিকার হাতের পুতুল নো দিন জিয়েম? ভিয়েৎনামের মানুষ তাহলে কাকে চায় : হো চি মিনকে, না জিয়েমকে? এবং জনসাধারণ যদি স্বাধীন ইচ্ছায় হো চি মিনের নেতৃত্বই কামনা করে, তাহলে ঐ ইচ্ছার বিরুদ্ধে ঐ দেশ শাসন করবার কোন নৈতিক যুক্তি ও অধিকার তাদের আছে?

*

ভিয়েৎনামের মানুষ হো চি মিনকে চায় না এটা প্রমাণ করবার জন্যে একটা তথ্য খুব ফলাও করে প্রচার করা হয়ে থাকে : দেশ দুভাগ হবার পর উত্তর থেকে প্রায় ৮ লক্ষ উদ্বাস্তু দক্ষিণে চলে এসেছে। আর দক্ষিণ থেকে গেছে মাত্র দেড় লক্ষ। কিন্তু একথা কখনই প্রচার করা হয় না যে, ঐ ৮ লক্ষের মধ্যে ৬ লক্ষ ৭৭ হাজারই ছিল ক্যাথলিক যারা ফরাসীদের দ্বারা সৃষ্ট এবং তাদের দ্বারাই পুষ্ট, আর বাকি সকলে ছিল দক্ষিণ ভিয়েৎনামী সৈন্যদের পরিবারের লোক।

সায়গনে তখন জিয়েম একটি ক্যাথলিক সাম্রাজ্যের পত্তন করেছেন। দক্ষিণ ভিয়েৎনামে তখন ক্যাথলিকরাই কুলীন এবং সুবিধাভোগী শ্রেণী। সুতরাং ক্যাথলিকরা যে উত্তর ভিয়েৎনামে থাকতে চাইবে না তো জানা কথা। অথচ ঐ উদ্বাস্তু স্রোত নিয়ে তখন কত প্রচার হয়েছে, কত উদ্ভট ও বিকৃত চিত্র আঁকা হয়েছে হো চি মিন ও তাঁর সরকার সম্পর্কে, অত্যাচার ও নিপীড়নের কত কাল্পনিক কাহিনী সৃষ্টি করা হয়েছে।

কি রকম বিকৃত, উদ্ভট ও কাল্পনিক তার প্রমাণ পাওয়া যায় টম ডুলি নামে এক ভদ্রলোকের লেখা 'ডেলিভার আস ফ্রম ইভিল' বইয়ে। বইটি ঐ সময় ব্যাপকভাবে প্রচার করা হয়েছিল এবং এ নিয়ে একটা ফিল্মও তৈরি করে সর্বত্র দেখানো হয়েছিল। তাতে এক জায়গায় বলা হয়েছে, ১৯৪৬ সালের ডিসেম্বরে ফরাসীদের বিরুদ্ধে লড়াই আরম্ভ করবার আগে ভিয়েৎমিনরা হ্যানয়ে ফরাসী-সমর্থক প্রায় এক হাজার মহিলাকে কতল করে পেট চিরে তাদের নাড়ীভুঁড়ি বার করেছিল।

এই এবং এই ধরণের অন্যান্য গাল-গল্প সম্পর্কে পল মুস (১৯৪৭ সালে ফরাসী সরকার যাঁকে হ্যানয়ে পাঠিয়েছিলেন হো চি মিনের সংগে একটা আপোষ রফা করবার জন্যে) পরে বলেছিলেন : "আজ একথা বলবার ও প্রমাণ করবার মতো অবস্থায় আমি আছি যে, ভিয়েৎমিনদের অত্যাচার ও নৃশংসতার যে-সব কাহিনী প্রচার করা হয়ে থাকে তার চার পঞ্চমাংশই হয় মনগড়া না হয় বিকৃত।"

অথচ এই সব বিকৃত ও মনগড়া তথ্য প্রচার করে প্রমাণ করার চেষ্টা হল যে, ভিয়েৎমিনরা অত্যন্ত জঘন্য ধরণের ব্যক্তি, তাদের প্রতি জনসাধারণের কোন সমর্থন নেই, কারণ তারা বুঝতে পেরেছে ভিয়েৎমিনদের অধীনে গেলে তাদের কি হাল হবে।

এবং এই সব বিকৃত ও মনগড়া তথ্যের আড়ালে দক্ষিণ ভিয়েৎনামকে জোর করে দখলে রাখবার ষড়যন্ত্র চলতে লাগল।

চলতে লাগল কাকে নিয়ে? প্রথমে একজন ভ্রষ্টচরিত্র প্রাক্তন সম্রাট এবং পরে একজন স্বেচ্ছাচারী, অত্যাচারী, স্বজনপোষক ব্যক্তি। বাও দাইকে ক্ষমতাচ্যুত করে ১৯৫৫ সালের অক্টোবরে নো দিন জিয়েম যখন দক্ষিণ ভিয়েৎনামের প্রেসিডেন্ট হলেন, তখন আমেরিকার সমস্ত সমর্থন এসে জড়ো হল জিয়েমের পেছনে।

জিয়েমকে মার্কিনীরা গড়ে তুলতে চাইল হো চি মিনের বদলা হিসেবে।

অথচ ১৯৫৫ সালে জিয়েম যখন সায়গনের গাই লং প্রাসাদে অধিষ্ঠিত হন, তখন পশ্চিমী পর্যবেক্ষকরাই স্বীকার করেন তাঁর প্রভাব প্রাসাদ-প্রাঙ্গণের দেয়ালের বাইরে বিস্তৃত ছিল না।

তাঁর জনপ্রিয়তা এতই বেশি এবং তাঁর নেতৃত্ব এতই সুপরিচিত ছিল যে, ওয়েসলি ফিশেল নামে এক তরুণ মার্কিন অধ্যাপক পরিচয় করিয়ে দেবার আগে ওয়াশিংটনের সরকারী মহল তাঁর সম্পর্কে অবহিতই ছিলেন না। আর মার্কিন সরকারের কৃপা লাভ করবার জন্যে তাঁকে পিঠ চাপড়ানি নিতে হয়েছিল ক্যাথলিক পাদ্রী কার্ডিন্যাল স্পেলম্যান ও মার্কিন সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি উইলিয়াম ও, ডগলাসের কাছ থেকে। মিঃ ডগলাসই একদিন প্রাতরাশের টেবিলে জিয়েমকে সেনেটার মাইক ম্যান্সফিল্ড ও জন এফ, কেনেডির সংগে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। সেই সংগে যুক্ত হয়েছিল সি-আই-এ অর্থাৎ কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার তদ্বির। ব্যস, জিয়েম আমেরিকার নেকনজরে পড়ে গিয়ে দক্ষিণ ভিয়েৎনামের একমাত্র আশা ও ভরসা বনে গেলেন।

সি-আই-এ'র এজেন্টরা তৎপর হলেন। তৎপর হলেন অধ্যাপক ফিশেলের নেতৃত্বে মিশিগান স্টেট ইউনিভার্সিটির একটি দল, সি-আই-এ'র টাকায় যে দল জিয়েমকে অর্থনৈতিক ও অন্যান্য ব্যাপারে সাহায্য করবার জন্যে গিয়েছিলেন। লেখা হল বই, পত্র-পত্রিকায় বেরোতে লাগল অজস্র প্রবন্ধ, সায়গন থেকে আসতে লাগল গোপন রিপোর্ট। সকলেরই একই বক্তব্য : জিয়েমের নেতৃত্বে দক্ষিণ ভিয়েৎনামে অসাধ্য সাধিত হচ্ছে, লোকেরা জিয়েমের ভক্ত হয়ে পড়ছে, হো চি মিনের প্রভাব প্রায় নেই বললেই চলে।

মেজর-জেনারেল স্যামুয়েল মায়ার্স, যিনি মার্কিন সামরিক সাহায্য উপদেষ্টা গ্রুপের সহকারী প্রধান ছিলেন, ১৯৫৯ সালে বললেন, ভিয়েৎমিনরা আর সরকারের প্রধান বিপদ নয়; দুটি টেরিটোরিয়াল রেজিমেন্টই ওদের ঠেকাবার জন্যে যথেষ্ট।

সেই সময়ের একজন মার্কিন রাষ্ট্রদূতে

মিঃ এলব্রিজ ডুব্রো মার্কিন সেনেটের একটি সাব-কমিটির কাছে বললেন, জিয়েমের আমলে দক্ষিণ ভিয়েৎনামের আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা এত উন্নত হয়েছে যে, মার্কিন সামরিক সাহায্যের পরিমাণ কমিয়ে আনা যেতে পারে।

১৯৫৪ থেকে ১৯৬০ সালের মধ্যে আমেরিকা জিয়েম সরকারকে ১৩০ কোটি ২০ লক্ষ ডলার সামরিক সাহায্য দিয়েছিল।

১৯৬১ সালের ১৩ মে মিঃ লিন্ডন জনসন (তখন ভাইস-প্রেসিডেন্ট ছিলেন) জিয়েমের সংগে এক যুক্ত বিবৃতি প্রচার করে বললেন: "এশিয়ায় কম্যুনিস্ট সাম্রাজ্যের প্রান্তদেশে যে ক'জন নেতা স্বাধীনতা রক্ষার জন্যে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, আমেরিকা মনে করে প্রেসিডেন্ট জিয়েম তাঁদের মধ্যে অগ্রগণ্য।"

কিন্তু কি ছিল ঐ স্বাধীনতার স্বরূপ?

পুলিশ যাকে খুশি যখন তখন গ্রেপ্তার করতে ও জেলে পুরতে পারত। ন্যায়বিচার বলে কিছু ছিল না। ছিল না সংবাদপত্রের স্বাধীনতা। ভ্রমণের ও সভা-শোভাযাত্রা করার অধিকারও কেড়ে নেওয়া হয়েছিল। এমন কি বিবাহ ও শেষকৃত্য করতে গেলেও সরকারের অনুমতি দরকার হত।

১৯৫৯ সালে জাতীয় পরিষদের জন্যে যে 'নির্বাচন' অনুষ্ঠিত হয়েছিল তা এমনই ন্যায়সঙ্গত ছিল যে, মাত্র একজন ছাড়া কোন বিরোধী প্রার্থী জিততে পারেন নি। অনেক প্রার্থীকেই নানা উপায়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতার আগেই সরিয়ে দেওয়া হয়। কাউকে ভয় দেখিয়ে, কারো বিরুদ্ধে নানা রকম মিথ্যা অভিযোগ তুলে, কারো বেলায় পোস্টার বেশি বড় হয়ে গেছে এই ধরণের অর্থহীন অজুহাত তুলে। একজন যিনি নির্বাচিত হয়েছিলেন, ডাঃ ফান কোয়াং ডান, তাঁকে পরাজিত করার জন্যে আট হাজার সৈন্যকে পাঠানো হয়েছিল তাঁর নির্বাচনী কেন্দ্রে।

কিন্তু জয়ী হয়েও কি নিস্তার পেয়েছিলেন ডাঃ ডান? জাতীয় পরিষদের অধিবেশন যেদিন বসবে সেদিন তিনি তাঁর বাড়ি থেকে রওনা হচ্ছেন, পুলিশ এসে তাঁকে বলা নেই কওয়া নেই ধরে নিয়ে গেল, তারপর পাঠিয়ে দিল পুলো ক'দোর দ্বীপে। নির্জন নির্বাসনে।

তবুও জিয়েম বলতেন তিনি দাসত্ব চান না, তিনি মুক্ত ও স্বাধীন সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে চান। দোহারের মতো সি-আই-এ এজেন্টরা আর কিছু সংখ্যক অন্ধ সমর-নায়ক মার্কিন সরকারকে তাই বুঝিয়ে এসেছেন আর মার্কিন সরকারও তাই বুঝেছেন।

কাদের জন্যে ছিল ঐ স্বাধীনতা?

'যিনি সার্বভৌম শাসক তিনি জনসাধারণ আর ঈশ্বরের মধ্যে যোগসূত্র হিসেবে কাজ করে থাকেন, সুতরাং জনসাধারণের পবিত্র সম্মান লাভের যোগ্য," তিনি একবার লিখেছিলেন।

কাজেই স্বাধীনতা তো তাঁর জন্যে বটেই।

এবং যেহেতু ঐ সার্বভৌম শাসক নিজের ভায়েদের প্রতি অনুরক্ত, সুতরাং স্বাধীনতা ঐ ভায়েদের জন্যেও।

এক ভাই নো দিন থুক উয়েতে রোমান ক্যাথলিক বিশপ; একটি জাহাজ কোম্পানীর ও অসংখ্য বাগিচার মালিক।

আরেক ভাই নো দিন ক্যান মধ্য ভিয়েৎনামের লাট-বেলাট। তাঁর সৈন্যবাহিনী আলাদা, তাঁর 'রাজস্ব' আলাদা। সেখানে কারো নাক গলাবার উপায় নেই।

আর সবচেয়ে খলিফা যে ভাই নো দিন নু, তিনি জিয়েমের সঙ্গে গাই লং প্রাসাদেই ছিলেন এবং সেখান থেকে একটি অদৃশ্য সরকার পরিচালনা করতেন। তাঁর হাতিয়ার 'কান লাও' নামে ৭০ হাজার লোকের একটি গুপ্ত সংস্থা। ঐ সংস্থার মারফৎ একজন গুন্ডার সর্দারের মতো তিনি দক্ষিণ ভিয়েৎনামে খবরদারী করে বেড়াতেন: লটারী চালাতেন, আফিমের কারবার করতেন, ব্যবসায়ীদের ভয় দেখিয়ে টাকা আদায় করতেন, বৈদেশিক মুদ্রার অবৈধ লেন-দেন করতেন।

জিয়েম কিছুই দেখতেন না। দেখতে চাইতেন না। কারণ নু একে তাঁর ভাই, তার ওপর একটি সুন্দরী স্ত্রীর অধিকারী। কিছু বলতে এলেই ধমক খেতেন মাদাম নুর কাছে। সুন্দরীর মুখের ধমক, হজম করেও আনন্দ।

নিজের ঘরে ফিরে গিয়ে জিয়েম সিগারেটের পর সিগারেট খেয়ে নিজেকে ধোঁয়ার আবরণে ঢেকে ফেলতেন।

এই ভ্রাতৃ চক্রের বাইরে আর যারা স্বাধীনতা ভোগ করত তারা, এক, ক্যাথলিক সম্প্রদায় চাকরি-বাকরির ক্ষেত্রে যাদের জন্যে দরজা ছিল অবারিত, দুই, তাঁবেদার সমর-নায়ক যারা বন্দুকের গুলীতে নিজেদের পথ পরিস্কার করতে করতে এগিয়ে চলতেন; তিন, অনুগত অফিসার গোষ্ঠী যাঁরা ঘুষের টাকা কুড়িয়ে নিজেদের দক্ষতা প্রমাণ করতেন; চার, মার্কিন মহল; আর পাঁচ, গুন্ডা-ডাকাত।

তার বাইরে আর যারা তারা ইচ্ছা করলে জাহান্নামেও যেতে পারত।

উয়ের বৌদ্ধরা ক্যাথলিকদের কোন পাকা ধানে মই দিতে যায় নি। ১৯৬৩ সালের মে মাসে ভগবান বুদ্ধের ২,৫০৭ তম জন্মদিনে তাঁরা একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন তু দাম প্যাগোডায়। সেই অনুষ্ঠানে তাঁদের ধর্ম পতাকা ওড়াতে চেয়েছিল ভিক্ষুরা।

আর্চবিশপ থুক বললেন, কি এতবড় কথা! ক্যাথলিক ধর্ম হচ্ছে নো দিন পরিবারের ধর্ম, সুতরাং দক্ষিণ ভিয়েৎনামেরও জাতীয় ধর্ম। সেখানে কি না বৌদ্ধধর্মের পতাকা উড়বে?

অসম্ভব!

ক্রুদ্ধ থুক ঠিক করলেন, পতাকা তো তিনি তুলতে দেবেনই না, সভাও ভণ্ডুল করবেন।

থুকের একটি নিজস্ব সৈন্যদল ছিল। তাদের বলা হত 'বিশপ্‌স্‌ বয়েজ'। ঐ 'বিশপ্‌স্‌ বয়েজ'দের তিনি পাঠিয়ে দিলেন তু দামে। বলে পাঠালেন, পতাকা তারা তুলতে পারবে না।

প্রতিবাদ জানিয়েছিল ভিক্ষুরা। বৌদ্ধদের দেশ ভিয়েৎনাম। সেখানে তারা এই ঔদ্ধত্য সহ্য করবে কেন। কিন্তু থুকের হাতে ছিল ক্ষমতা, তাঁর পেছনে ছিল জিয়েমের প্রশ্রয়। তাই বৌদ্ধ প্রতিবাদের জবাব এসেছিল বুলেটের আকারে। উয়ের বেতার কেন্দ্রের সামনের মাঠ ন'জন বৌদ্ধের রক্তে লাল হয়ে গিয়েছিল।

নির্বিচার এই হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে তু দাম প্যাগোডার ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীরা অনশন করেছিল। ওরা অহিংস, ওরা আর কিভাবে প্রতিবাদ জানাতে পারে? প্রতিহিংসাপরায়ণ সরকার নির্দেশ দিল, কাঁটাতার দিয়ে ঘিরে ফেল প্যাগোডা, বন্ধ করে দাও বিদ্যুৎ ও জল।

১১ জুন প্রেসিডেন্ট জিয়েম যখন সায়গনের একটি গীর্জায় পরলোকগত পোপের আত্মার শান্তি কামনা করছিলেন, তখন কম্বোডিয়ার দূতাবাসের সামনে রাস্তার মোড়ে একটি মোটর গাড়ি চলতে চলতে হঠাৎ থেমে গেল। গাড়ির পেছনে পেছনে আসছিল বৌদ্ধ ভিক্ষুদের একটি গেরুয়া শোভাযাত্রা।

গাড়িটি থামতেই কয়েকজন লোক নেমে পড়ল চটপট, তুলে ফেলল গাড়ির হুড। গোল হয়ে ঘিরে দাঁড়াল ভিক্ষুরা। মুখে মন্ত্র, হাতে রুদ্রাক্ষ, ধীরে ধীরে ঐ ভিড় থেকে এগিয়ে এলেন ৭৩ বছরের বৃদ্ধ ভিক্ষু থিচ কোয়াং ডুক। বসে পড়লেন রাস্তার যে গোল জায়গাটা খালি ছিল তার মাঝখানে। একজন গাড়ির হুডের নিচ থেকে বার করে আনল একটি পেট্রোলের টিন, ঢেলে দিল ডুকের গায়ে।

কোন দিকে না তাকিয়ে, কোন চাঞ্চল্য প্রকাশ না করে ডুক একটি দেশলাই জ্বেলে ছুঁইয়ে দিলেন নিজের গায়ে। আগুন জ্বলে উঠল। সায়গনের রাস্তায় একজন জীবন্ত মানুষের চিতা। অত্যাচারের বিরুদ্ধে জ্বলন্ত প্রতিবাদ। কিন্তু সেই

প্রতিবাদের ভাষা কি পেঁৗছোচ্ছিল জিয়মের প্রাসাদে?

কোয়াং ডুক ঠায় বসেছিলেন তাঁর দেহ যতক্ষণ নিষ্প্রাণ হয় নি ততক্ষণ। একটি মাংসপেশীও তাঁর কাঁপে নি। তারপর প্রাণহীন দেহখানি লুটিয়ে পড়েছিল রাস্তার বুকে।

মন্তব্য করলেন জিয়েম ঃ "ড্যাম্‌ড্‌ ফুল! ওদের পাগলামীর জন্যে তো আমি দায়ী হতে পারি না।"

বললেন মাদাম নু ঃ "বাঃ, কি চমৎকার বারবিকিউ করা ভিক্ষু! ওরা যদি এইভাবে নিজেদের পোড়াতে থাকে তো আমি আনন্দে হাততালি দেব!"

হঠাৎ একদিন দেখা গেল, বিন দিন প্রদেশের নুয়ে থিউ মঠের কাঁচের জানলাগুলো ভাঙা আর ঘর থেকে শহীদ কোয়াং ডুকের ছবিটি অদৃশ্য। তারপর ঝাঁকে ঝাঁকে বুলেট এসে মঠের দেয়ালগুলি ক্ষত-বিক্ষত করে দিল।

আন জিয়েন প্রদেশের একটা নিভৃত মঠ ছিল কোয়ান আম। হঠাৎ একদিন কয়েকটা বোমা এসে পড়ল সেখানে। পরদিন আবার। তার পরদিনও। সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনীরা প্রাণভয়ে পালিয়ে গেল অন্যত্র।

ট্রান কোয়াং বা তাঁর গাড়িটি মাঝে মাঝে ব্যবহার করতে দিতেন একটি বৌদ্ধ সমিতিকে। একদিন রাত্রে দেখা গেল সেটি পুড়ে ছাই হয়ে গেছে।

ভিক্ষুণী ত্রাং থি তামকে একদিন খুঁজে পাওয়া গেল না। কয়েকদিন পর তাঁকে একটি রাস্তার ধারে পড়ে থাকতে দেখা গেল ঃ অচেতন, হাত-পা বাঁধা।

সায়গনের রাস্তায় পুলিশ মহিলা বিক্ষোভকারীদের রাস্তায় ফেলে বর্বরভাবে তাদের ওপর দিয়ে মাড়িয়ে চলে গেল।

অত্যাচার যখন চরমে, তখন সেই নিরুপায় যন্ত্রণাকে রূপ দেবার জন্যে ৪ আগস্ট দ্বিতীয় এক ভিক্ষু আগুনে আত্মাহুতি দিলেন। আরো চল্লিশজন ঘোষণা করলেন জিয়েম বৌদ্ধদের অভিযোগের প্রতিকার না করলে তাঁরাও আত্মাহুতি দেবেন।

জিয়েম বললেন ঃ ব্যাটারা সব কম্যুনিস্ট, ওদের মেরে খতম কর।

বললেন মাদাম নু ঃ ওদের আরো দশগুণ বেশি পেটানো উচিত।

কিন্তু মায় তুয়েট তান কি কম্যুনিস্ট ছিল? আঠারো বছরের তরুণী মায় তুয়েট তান?

"আমার সধর্মীদের সংগ্রামে আমার এই ছোট্ট সাহায্যটুকু রেখে গেলাম।"

ধীরে ধীরে তিনটি আলাদা কাগজে এই কথাগুলি লিখল মায় তুয়েট তান। তারপর একে একে ভাঁজ করে ঠিকানা লিখল ঃ "আমার মা ও বাবা," "দক্ষিণ ভিয়েৎনামের বৌদ্ধ সম্প্রদায়," এবং সর্বশেষে "নো দিন জিয়েম, প্রেসিডেন্ট, ফ্রীডম প্যালেস, সায়গন।"

তারপর। আগে থেকেই একটা ভারী হাতুড়ি জোগাড় করে এনেছিল সকলকে লুকিয়ে। এবার সে নিজের বাঁ হাতখানি শুইয়ে দিল জা লোই প্যাগোডার পবিত্র চাতালে। আর ডান হাত দিয়ে তাতে মারল প্রচণ্ড হাতুড়ির ঘা।

আঠারো বছরের তরুণী দেহখানি অচেতন হয়ে লুটিয়ে পড়ল তথাগতের মন্দিরে। রক্তে ভেসে গেল জায়গাটা, ভরে গেল মায় তুয়েটের সারা শরীর।

জা লুইয়ের ভিক্ষু ও কর্মীরা আত্মনিবেদনের এই মর্মস্পর্শী দৃশ্যে অভিভূত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।

পরের দিন, ১৩ আগস্ট, সায়গন থেকে ৪০০ মাইল উত্তরে উয়ের তু দাম প্যাগোডায় তখনো কেউ জাগে নি। ভোরের হাল্কা বাতাস চীন সমুদ্র থেকে বইছিল মৃদু-মধুর। চুপি চুপি, কাউকে কিছু না বলে ঘর থেকে বেরিয়ে আসেন এক ভিক্ষু।

একবার নীরবে দাঁড়িয়ে বুঝি মনে করার চেষ্টা করেন তথাগতের সৌম্য মুখখানি। তারপর ধীরে ধীরে সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসেন প্যাগোডার প্রশস্ত উঠোনে।

ভোরের হাওয়ায় কাঁপছিল তাঁর উত্তরীয়। একটি কেরোসিনের টিন নিয়ে উজাড় করে ঢেলে দেন নিজের গায়ে। দেশলাই জেলে তাতে ধরিয়ে দিলেন আগুন। দেখতে দেখতে সে আগুন ছড়িয়ে পড়ল। আগুনের জীবন্ত মশাল হয়ে তিনি বসে রইলেন অচঞ্চল। তারপর একসময় গড়িয়ে পড়ল তাঁর দেহ। পুড়ে ছাই হয়ে গেল।

কম্যুনিস্ট কি ছিলেন তিনিও?

নিজের বিশ্বাসের জন্যে, আদর্শের জন্যে, অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্যে যাঁরাই আন্দোলন করবেন তাঁরাই কম্যুনিস্ট? অত্যাচারের বিরুদ্ধে, পীড়নের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানালেই যে কেউ কম্যুনিস্ট হয়ে যাবে?

হ্যাঁ, কম্যুনিস্ট, জিয়েম বললেন। তাতে সায় দিলেন মার্কিনী দোহারেরা।

জা লোই প্যাগোডায় বৌদ্ধ আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ এক জরুরী বৈঠকে মিলিত হয়ে তৈরি করলেন একটি টেলিগ্রামের খসড়া। পাঠিয়ে দিলেন সে টেলিগ্রাম ওয়াশিংটনে প্রেসিডেন্ট কেনেডির কাছে, নিউইয়র্কে রাষ্ট্রসঙ্ঘের সেক্রেটারী-জেনারেলের কাছে, দুনিয়ার যত বৌদ্ধ সংস্থা আছে তাদের কাছে।

২১ আগস্ট নো দিন নু'র নেতৃত্বে সি-আই-এ'র ট্রেনিং পাওয়া দক্ষিণ ভিয়েৎনামী বিশেষ বাহিনী জা লোই প্যাগোডার ওপর চালালো গুলী, গ্রেপ্তার করল বৌদ্ধ নেতাদের।

জিয়েম ভাবলেন, তিনি কম্যুনিস্টদের সায়েস্তা করছেন।

প্রদেশে প্রদেশে নো দিন নু'র নিজে হাতে বাছাই করা তাঁবেদারদের প্রদেশ-প্রধান করে পাঠানো হল। প্রতিবাদের বিন্দুমাত্র ইঙ্গিত পাওয়া মাত্র তারা লোকেদের ধরে জেলে পুরতে লাগল, গ্রামকে গ্রাম জ্বালিয়ে দিতে লাগল।

জিয়েম বললেন, তিনি কম্যুনিস্টদের হাত থেকে তৎপরতা কেড়ে নিচ্ছেন।

সরকারী সৈন্যসংখ্যা সাড়ে তিন লাখে গিয়ে দাঁড়ালো। জিয়েম বললেন, কম্যুনিস্টদের বিরুদ্ধে তাঁরা শক্তি বৃদ্ধি করছেন।

কিন্তু এই সাড়ে তিন লাখ সৈন্য কিভাবে অর্জন করা হয়েছিল? কোন রিক্রুটিং সেন্টারে নয়। নো দিন নু'র লোকেরা হঠাৎ এক এক সময় এক একটি শহরে কিংবা গ্রামে গিয়ে উদয় হত, তারপর একটা রাস্তা বা একটা এলাকা ঘিরে ফেলত। ব্যস, আর কথা নেই। ঐ ঘেরা এলাকার মধ্যে যত সক্ষম যুবক থাকত তাদের যেতেই হত জিয়েমের ব্যারাকে।

জিয়েমের খাতায় সংখ্যা বৃদ্ধি হত। কিন্তু মানুষগুলি কি তাতেই ভালোমানুষ সৈন্য বনে যেত? এ হিসাব পশ্চিমী পর্যবেক্ষকদেরই দেওয়া যে, দিনে অন্তত গড়ে ৬০০ করে সৈন্য পালিয়ে যেত সুযোগ পেলেই।

ওরা ফিরে যেতে পারত না নিজেদের গ্রামে। যাবার উপায় ছিল না। ওরা চলে যেত জঙ্গলে, যেখানে ওরা প্রস্তুত হচ্ছিল প্রত্যাঘাতের জন্যে।

আমেরিকা ভাবল 'কম্যুনিস্টদের দেশ-ছাড়া করবার একটা মোক্ষম অস্ত্র পাওয়া গেছে। তার নাম জিয়েম। স্রোতের মতো ডলার আসতে লাগল ভিয়েৎনামে। সেগুলি যে আবার ফেরত ডাকে চলে যেতে লাগল দেশের বাইরে, জমতে লাগল মার্কিন; ফরাসী, সুইস ব্যাঙ্কে, সে হুঁস তার ছিল না।

তার ধারণা, দেশ স্থিতিশীল হচ্ছে। এত স্থিতিশীল যে, তিন তিনবার জিয়েমের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থানের চেষ্টা হয়েছিল। এবং ভাগ্যের এমনই পরিহাস, শেষের বার ঐ চেষ্টা শুধু সফলই হয় নি, যে সি-আই-এ জিয়েমকে একদিন ফ্রীডম প্যালেসে অধিষ্ঠিত করেছিল, সেই সি-আই-এ'কেই ঐ চেষ্টার পেছনে মদত যোগাতে হয়েছিল।

সেদিন তারিখ ছিল ২ নভেম্বর, ১৯৬৩ সাল।

ইতিহাস সেদিন চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছিল যে, আমেরিকার সমস্ত ধারণা মিথ্যা, সমগ্র চিন্তা ভ্রান্ত, সকল প্রচেষ্টাই বিপথচালিত। ভিয়েৎনামে আমেরিকা যার পেছনে ছুটে চলেছিল তা এক বিরাট মরীচিকা।

আমেরিকা তবুও থামে নি। কারণ ইতিহাস থেকে শিক্ষা পাবার জন্যে সে ভিয়েৎনামে আসে নি। তার উদ্দেশ্য ছিল অন্য। তার সংকল্প ছিল সে গায়ের জোরে দক্ষিণ ভিয়েৎনামকে কব্জায় রাখবে। কতগুলি অপদার্থ সি-আই-এ এজেন্টের রিপোর্টের ওপর ভিত্তি করে সে সিদ্ধান্ত করে ফেলেছিল ভিয়েৎনামীদের সে কিছুতেই নিজেদের ভাগ্য নিজেদের নির্ধারণ করতে দেবে না।

এলো আরো ডলার, আরো সৈন্য, আরো উপদেষ্টা, আরো অস্ত্র। এলো একের পর এক নতুন নতুন পুতুল : নুয়েন ক্যান, কাও কি, নুয়েন ভান থিউ। জিয়েমের আমলের পরেও বৌদ্ধরা সংস্কারের জন্যে আন্দোলন করেছে। প্রত্যেকবারই, এটাই বড় বিচিত্র, মার্কিনী আর তাদের তাঁবেদারেরা ঐ আন্দোলনকে কম্যুনিস্ট বিদ্রোহ আখ্যা দিয়ে নিষ্ঠুরভাবে দমন করেছে। মাঝে মাঝে নির্বাচনের ভড়ং করা হয়েছে বটে, কিন্তু সেগুলিতে সরকারী হস্তক্ষেপ এত স্থূলভাবে প্রকট ছিল যে, তা চোখে পড়তে দেরি হয় নি।

একদল লোক যাকে আমেরিকা নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্যে 'জনপ্রিয়' নেতা বানিয়ে ক্ষমতায় বসিয়েছে তাদের 'অনুরোধে' দক্ষিণ ভিয়েৎনামে উপস্থিত হয়ে ভিয়েৎনামীদের স্বাধিকারের দাবির কণ্ঠরোধ করবার কি অধিকার আছে আমেরিকার? ইতিহাস প্রমাণ করেছে ঐ সব পুতুল নেতার জনপ্রিয়তার সীমা কতখানি। তবু তাদেরই মুখের কথায় একটা গোটা জাতিকে আমেরিকা আজ নিশ্চিহ্ন করতে উদ্যত। এই যখন অবস্থা তখন হো চি মিন কি করতে পারেন? কি করা তাঁর উচিত?

তিনি লড়াই করেছিলেন দেশের স্বাধীনতার জন্যে। স্বাধীনতার দ্বারপ্রান্তে এসে সেই স্বাধীনতা তাঁর হাত থেকে কেড়ে নেওয়া হল। শুধু তাই নয় দেশটাও দু'ভাগ হয়ে গেল। তবু তিনি অপেক্ষা করেছিলেন নির্বাচনের মাধ্যমে দেশ আবার ঐক্যবদ্ধ হবে এই আশায়।

সেই নির্বাচন হয় নি। কথা রাখে নি যারা তাঁকে সেদিন আশ্বাস দিয়েছিল। একটি আন্তর্জাতিক চুক্তিকে পায়ে দলে লুঠেরার মনোভাব নিয়ে তাঁর দেশের একটা অংশ দখল করেছিল চক্রান্তকারীর দল। মানুষ তাদের চায় কিনা তা যাচাই করতেও সাহস হয় নি তাদের। অথচ তারাই এখন হো চি মিনকে তাঁর চুক্তির কথা মনে করিয়ে দিতে চাইছে। কপটতার এর চাইতে কপট দৃষ্টান্ত আর দুটি নেই। আমেরিকা তার কাজের দ্বারাই প্রমাণ করেছে ভিয়েৎনামে সে ফরাসীদের মতোই সাম্রাজ্যবাদী। একটি সাম্রাজ্যবাদের বদলে আরেকটি সাম্রাজ্যবাদ কায়েম হতে দেবার জন্যেই কি হো চি মিন লড়াই করেছিলেন? দেশকে ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে দ্বি-খণ্ডিত হতে দেবার জন্যেই কি তিনি পাহাড়ে-জঙ্গলে অনাহারে, অর্ধাহারে ঘুরে বেড়িয়েছেন, দুঃখ, কষ্ট ও যন্ত্রণা সহ্য করেছেন?

এবং যদি ঐ নয়া সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে তিনি পুনরায় লড়াই আরম্ভ করে থাকেন, যদি সাহায্য পাঠিয়ে থাকেন দক্ষিণে তাহলে কি তিনি অন্যায় করেছেন?

কখনোই নয়। কারণ হো চি মিনের পক্ষে তাঁর দেশের স্বাধীনতা এখনো সম্পূর্ণ হয় নি। সাম্রাজ্যবাদীরা এখনো ভিয়েৎনাম ছেড়ে যায় নি। ১৯৫৬ সালে জেনিভা চুক্তির সমাধিই সে কথা প্রমাণ করছে।

তা-ও, হো চি মিন জোর করে দক্ষিণ ভিয়েৎনাম দখল করতে চাইছেন এ-কথা যাঁরা বলেন তাঁদের জানা উচিত, তিনি ১৯৬০ সাল পর্যন্ত অপেক্ষা করেছিলেন। তখনও যখন চক্রান্তের শেষ হল না, কেবল তখনই তিনি লড়াই আরম্ভের নির্দেশ দিয়েছিলেন।

শুরু হয়েছিল দক্ষিণ ভিয়েৎনামে গেরিলাদের তৎপরতা, জিয়েম যাঁদের আখ্যা দিয়েছিলেন ভিয়েৎ কং—ভিয়েৎনামী কম্যুনিস্ট।

জিয়েম কিংবা আমেরিকা যে আখ্যাই দিক, এই লড়াই ভিয়েৎনামের অপূর্ণ স্বাধীনতার লড়াই। একথা আজ সকলের মনে রাখা দরকার। কারণ স্বার্থসংশ্লিষ্ট মহলের প্রচার এই লড়াইকে অন্যভাবে চিত্রিত করে একটি দেশের জবরদখলে, একটি জাতির ক্রমাবলুপ্তিতে আমাদের সায় দিতে বলা হচ্ছে।

[ক্রমশঃ]

মুক্তার মত ঝকঝকে উজ্জ্বল...

আপনার দাঁত হবে সাদা ধবধবে, দাঁতের মাড়ী নীরোগ থাকবে আর মুখের দুর্গন্ধ দূর হবে, আপনি শুধু ডেন্টনিক দিয়ে দাঁত মাজা অভ্যাস করুন।

ক্লোরোফিল মিশ্রিত ডেন্টনিক পাইওরিয়া সারাতে সাহায্য করে।

যাঁরা টুথ পাউডারের জায়গায় পেষ্ট ব্যবহার পছন্দ করেন তাঁদের জন্য জনপ্রিয় ডেন্টনিকের সমস্ত গুণসম্পন্ন টুথ পেষ্ট বাজারে প্রচলন করা হইয়াছে। ধবধবে দাঁত আর মনভোলান হাসি যাঁরা পছন্দ করেন তাঁরাই চান ডেন্টনিক টুথ পেষ্ট।

বেঙ্গল কেমিক্যাল
কলিকাতা • বোম্বাই • কানপুর • দিল্লী

যা দেখেছি, যা পেয়েছি

স্মৃতিচয়ন

শ্রীসুধীরঞ্জন দাস

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

একাদশ অধ্যায়

সুপ্রিম কোর্টের সতীর্থদের কথা

এইখানে সে সময়কার সুপ্রিম কোর্টের যে সব জজেদের দেখেছি এবং যাঁদের সঙ্গে কাজ করেছি তাঁদের সম্বন্ধে দু'য়েক কথা বলা যেতে পারে। চীফ জাস্টিস কানিয়া ফেডারেল কোর্টে এসেছিলেন বম্বে থেকে। তিনি বম্বের চীফ জাস্টিস হয়ে ফেডারেল কোর্টে আসেন। ফেডারেল কোর্টের দ্বিতীয় চীফ জাস্টিস স্যার প্যাট্রিক স্পেন্স অবসর নিতে কানিয়া সাহেব ফেডারেল কোর্টের চীফ জাস্টিস হন। কানিয়া সাহেবের ছেলে ছিল না। ছিল একটি-মাত্র কন্যা। লেডী কানিয়া ছিলেন বম্বের এক ধনী মহাজনের মেয়ে। তিনি ছিলেন বেশ ফিট্‌ফাট্‌ কায়দাদুরস্ত মহিলা। গল্‌ফ্‌ খেলতে উৎসাহী ছিলেন খুবই। কানিয়া সাহেবের বম্বে ওরিজিন্যাল সাইডে commercial ও ইনকাম ট্যাক্স প্র্যাকটিস ভালই ছিল। বেশ চোখা ছিল তাঁর সাধারণ বুদ্ধি এবং প্রগাঢ় ছিল তাঁর আইনজ্ঞান। কথাবার্তা একটু কমই কইতেন। কোর্টে কৌঁসুলীদের বিশেষ ঘাঁটাতেন না। তবে কৌঁসুলীরা যদি আইন সম্বন্ধে বা মামলার ঘটনা নিয়ে খুব জোর করে কিছু বলতেন তখন বেশ ধীরভাবে চীফ জাস্টিস কানিয়া বলতেন, "So what ?" কিংবা "What is the sequitor ?" সওয়াল জবাব যা হচ্ছিল তার মাথামুণ্ড ছিল না এবং তার আবার sequitor কি থাকতে পারে। সুতরাং অবিলম্বেই থেমে যেত কৌঁসুলীর বহ্বাস্ফোটের আস্ফালন। আমাকে যখন ফেডারেল কোর্টে নিয়োগ করা হয় তারপরই কানিয়া সাহেব তাঁর বাড়িতে অন্যান্য জজেদের নিমন্ত্রণ করে আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন এক মধ্যাহ্নভোজে। কানিয়া সাহেবের বাড়ি প্রতি বছর ঘটা করে দীপান্বিতা উৎসব হোত—অনেক লোকজন নিমন্ত্রণ করে। সরবৎ ও ভাজাভুজি দেওয়া হোত অভ্যাগতদের এবং উৎসব শেষে পান-সুপারি বিতরণ করতেন লেডী কানিয়া সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে। ১৯৫১ সালের নভেম্বর মাসে হরিলাল কানিয়া সাহেবের শরীরটা কেমন খারাপ হয়ে পড়ল। কারো কথা না শুনে তিনি সেবারও দীপান্বিতা উৎসবে সবাইকে ডেকেছিলেন অন্যান্য বছরের মতই। সেই রাত্রিতেই তাঁর মুখে ক্লান্তির কালিমা দেখে আমরা সবাই ভয়ই পেয়েছিলাম। সেই ভয়ই সত্যি হোল। হঠাৎ হৃদরোগ হয়ে দু'দিনের মধ্যেই তিনি শেষনিশ্বাস ফেললেন ওই ১০নং এ্যালবুকার্ক রোডের বাড়িতে। সেই সংকট মুহূর্তে অসাধারণ ধৈর্য ও স্থৈর্য দেখেছি লেডী কানিয়ার মধ্যে।

ফজল্‌ আলি সাহেব ছিলেন বিহারের লোক। তিনি প্র্যাকটিস করতেন পাটনা হাইকোর্টে। কালক্রমে তিনি পাটনা হাইকোর্টে জজ হন এবং স্যার ট্রেভর হ্যারিস সাহেব পাটনার চীফ জাস্টিসের পদ থেকে পাঞ্জাব হাইকোর্টের চীফ জাস্টিস হয়ে লাহোরে বদলী হতে ফজল আলি সাহেব পাটনার চীফ জাস্টিস হন এবং বেশ সুনামের সঙ্গে কয়েক বছর কাজ করবার পর দিল্লীর ফেডারেল কোর্টে জজ হয়ে আসেন। বেগম ফজল আলি ছিলেন বেশ হাসিখুশি ভাল মানুষ। এঁদের বড় কন্যাটির সঙ্গে বিয়ে হয়েছে বিখ্যাত ব্যারিস্টার ও দেশনেতা হাসান ইমামের ছেলে মেহ্‌দী ইমামের। এঁদের ছেলে মুরতাজা পাটনাতেই প্র্যাকটিস করতেন এবং আস্তে আস্তে আপন অধ্যবসায় ও নিষ্ঠার গুণে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে তুলছিলেন। আমি যখন সুপ্রিম কোর্টের চীফ জাস্টিস তখন আমি চেষ্টা করতাম এক প্রদেশের লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যবহারজীবীকে অন্য প্রদেশের হাইকোর্টে জজ করে পাঠাতে। সেই নীতি অবলম্বন করে মুরতাজাকে জম্মু ও কাশ্মীর হাইকোর্টের জজ করে পাঠান হয়েছিল। আমার পক্ষে এটা খুবই আনন্দের বিষয় যে মুরতাজা সেই হাইকোর্টে সকলের সুখ্যাতি ও শ্রদ্ধা অর্জন করতে সমর্থ হয়েছেন।

ফজল আলি সাহেব ছিলেন অতি অমায়িক ও নিরহংকার মানুষ। ধর্মভীরু ও ভক্ত মুসলমান হলেও তিনি একেবারেই সাম্প্রদায়িক ছিলেন না এবং সকলের সঙ্গে সৌহার্দ্য বজায় রেখে চলতেন। ফৌজদারী আইনে তিনি বিশেষভাবে অভিজ্ঞ ছিলেন। মেজাজ ছিল খুবই ঠাণ্ডা। কোর্টে কৌঁসুলীদের সঙ্গে রাগারাগি করতে দেখেছি বলে মনে হয় না। যে বেঞ্চে ফজল আলি সাহেব থাকতেন সিনিয়র জজ সে কোর্টে কৌঁসুলী যদি এক কথা শতবার বলেই চলেছেন ফজল আলি সাহেব মৃদু হেসে বলতেন—"আপনার সওয়াল জবাবটি বাস্তবিকই খুব চিন্তা-কর্ষক হয়েছে এবং আমি খুব ভাল করে পুরো নোট লিখে নিয়েছি।" বলেই ডান হাতের পেন্সিলটা নিজের সামনের নোট-বইটাকে বার দুয়েক টোকা মেরে তলার দিকটা একটু উঁচু করে ধরতেন। মুহূর্তে বন্ধ হয়ে যেতো বাগ্মিতার দুর্বার স্রোত। ফজল আলি সাহেব ১৯৫১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে অবসর নেবার পর আসামের রাজ্যপাল হয়ে শিলং-এ গিয়েছিলেন। সেখানেও নিজের চরিত্রগুণে তিনি জনসাধারণের হৃদয় জয় করেছিলেন। আমি যখন চীফ জাস্টিস হয়ে গৌহাটিতে গিয়েছিলাম আসাম হাইকোর্ট পরিদর্শন করতে তখন ফজল আলি সাহেব শিলং থেকে গাড়ি পাঠিয়েছিলেন আমাকে রাজভবনে যাবার অনুরোধ জানিয়ে। সেবার সস্ত্রীক আমরা শিলংয়ে এই আলি দম্পতির আতিথ্যে ও সৌজন্যে বিমুগ্ধ হয়েছিলাম। এর অল্প পরেই স্বামীস্ত্রী উভয়েই মারা যান।

এম পাতঞ্জলি শাস্ত্রী ছিলেন ছিপছিপে বেঁটে মানুষ। মুখে ছিল তাঁর বুদ্ধির উজ্জ্বল দীপ্তি। নিত্য প্রাতে স্নানাদির পর কপালে একটি শ্বেত-চন্দনের তিলক কেটে তিনি আহ্নিক করতেন। কোর্টে আসতেন অনেক সময় ধুতি পরে ও মাথায় মায়লাপুর ব্রাহ্মণের প্রথায় পাগড়ী বেঁধে। তাঁর পাগড়ী বাঁধার ধরণ ছিল বেশ সুন্দর। শাস্ত্রীজীর

পাগড়ীটি দেখতে হোত ডাক্তার সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণের পাগড়ীর মত। আগে মাদ্রাজে তিনি আয়কর মামলায় সরকারের বাঁধা উকিল ছিলেন এবং ঐ আইনটায় তিনি বিশেষ রকমে অভিজ্ঞ হয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু আইনের নানা শাখায় তিনি বেশ ব্যুৎপত্তি লাভ করেছিলেন। Commercial আইনে যে তিনি খুব বেশি সড়গড় ছিলেন তা বলতে পারি না। তবে সেটা অভিজ্ঞতার অভাবেই বোধ হয়, কেন না মাদ্রাজের ওরিজিন্যাল বিভাগে তাঁর খুব বেশি যাতায়াত ছিল না। পাতঞ্জলি শাস্ত্রীর ইংরেজী ভাষার উপর বেশ ভালরকম দখল ছিল এবং খুব ছোট্ট ও প্রাঞ্জলভাবে তিনি রায় লিখতে পারতেন। তাঁর চরিত্রের উৎকর্ষের জন্যে আমাদের সতীর্থ মেহেরচাঁদ মহাজন সাহেব তাঁকে বলতেন Lord Buddha বা আরো সংক্ষেপে শুধু Lord. পাতঞ্জলি শাস্ত্রীর সঙ্গে আমার বহু ক্ষেত্রে মতের মিল হোত বলে মহাজন সাহেব আমাকে বলতেন ভক্ত চেলা বা devoted disciple.

চীফ জাস্টিস স্যার হরিলাল কানিয়া যখন হৃদরোগে আচমকা মারা যান তখন ফজল আলি সাহেব সবে অবসর নিয়েছেন। তখন আমাদের মধ্যে সিনিয়র জজ ছিলেন পাতঞ্জলি শাস্ত্রী। তিনিই যথারীতি সুপ্রিম কোর্টের চীফ জাস্টিস হলেন। রাষ্ট্রপতি ভবনে বেশ ঘটা করে তাঁর শপথ গ্রহণ সমাধা হোল। সন্তুষ্টচিত্তে তিনি নতুন পদমর্যাদায় চীফ জাস্টিসের খাস কামরায় চলে গেলেন। অল্প ক'দিন পরে আমরা আমাদের প্রথা অনুসারে যখন তাঁর খাস কামরায় সমবেত হলাম কোর্টে যাবার আগে তখন আমাদের নতুন চীফকে কি রকম উত্তেজিত বলে মনে হোল। তিনি একখানা চিঠি মহাজনের হাতে দিলেন। মহাজন সেটি পড়লেন জোর গলায়। মোট কথা হচ্ছে যে, আমার পুরাতন বন্ধু অডিটার জেনারেল নরহরি রাও এবার পাতঞ্জলি শাস্ত্রীকে নিয়ে পড়েছেন। তিনি ফ্যাকড়া তুলেছেন যে, সংবিধানের ধারা অনুসারে ফেডারেল কোর্টের চীফ জাস্টিস যখন সুপ্রিম কোর্টের চীফ জাস্টিস হবেন, তখন তিনি ফেডারেল কোর্টে যে মাইনে পেতেন সেটা এবং সুপ্রিম কোর্টের চীফ জাস্টিসের মাইনের পার্থক্যটুকু Special pay বলে পাবেন—অর্থাৎ আগে যা পেতেন তা-ই পাবেন। সংবিধানে আরো বলেছে যে ফেডারেল কোর্টের জজ যখন সুপ্রিম কোর্টের জজ হবেন, তখন তিনিও Special pay নিয়ে আগে যা পেতেন তা-ই পাবেন। কিন্তু নরসিংহ রাও ধরেছেন এই কথা যে ফেডারেল কোর্টের জজ যখন সুপ্রিম কোর্টের জজ হয়ে যাবার পর সুপ্রিম কোর্টের চীফ জাস্টিস হবেন, তখন তার জন্যে কোন Special pay বরাদ্দ নেই। সুতরাং এই রকমের চীফ জাস্টিস সংবিধানে চীফ জাস্টিসের যে মাইনে বরাদ্দ আছে সেইটুকুই পাবেন, তার বেশি কিছু পাবেন না। পাতঞ্জলি শাস্ত্রী ফেডারেল কোর্টের জজ বলে পাচ্ছিলেন সাড়ে পাঁচ হাজার টাকা এবং নতুন সংবিধান বলবৎ হলে তিনি সুপ্রিম কোর্টের জজ হয়ে পেতেন সুপ্রিম কোর্টের জজের মাইনে চার হাজার এবং Special pay পনের শ' টাকা—একুনে সাড়ে পাঁচ হাজার টাকা। কিন্তু তারপর তিনি সুপ্রিম কোর্টের জজ হওয়ায় নরসিংহ রাওয়ের ফতোয়া মতে পাতঞ্জলি শাস্ত্রী পাবেন কুল্লে পাঁচ হাজার টাকা। মহাজন সাহেব তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ঝোঁকের মাথায় বললেন—"Absurd".

আমি হেসে বললাম—

"Well, Chief, you have to sacrifice 500 rupees as the price for the dignity of the high office."

পাতঞ্জলি শাস্ত্রী বললেন—

"I don't want the dignity. I would rather continue as a puisne judge and have my 500 rupees."

কিন্তু কি করা যাবে। টাকাপয়সার ব্যাপারে অডিটার জেনারেলের কথা উপেক্ষা করা চলে না। অগত্যা সেই ছাই ফেলতে ভাঙা কুলো সংবিধানের ৩৯২(১) আর্টিকেলের শরণাপন্ন হতে হোলো ভারত সরকারকে। রাষ্ট্রপতি সেই আর্টিকেলের ক্ষমতার সদ্ব্যবহার করে হুকুমনামা জারি করলেন যে ফেডারেল কোর্টের জজ যখন সুপ্রিম কোর্টের জজ হবার পর আবার সুপ্রিম কোর্টের চীফ জাস্টিস হবেন তখন তিনি সুপ্রিম কোর্টের জজের চীফ জাস্টিসের নির্ধারিত বেতন পাঁচ হাজার টাকা এবং Special pay পাঁচ শ' টাকা—একুনে সাড়ে পাঁচ হাজার টাকাই পাবেন। এবং বলা হোলো যে ঐ অর্ডারটি বলবৎ থাকবে ১৯৫৯ সালের ১লা অক্টোবর পর্যন্ত অর্থাৎ আমার জন্মদিন যেদিন আমি অবসর নেব সেই দিন পর্যন্ত। বেঁচে গেলেন পাতঞ্জলি শাস্ত্রী, কেন না তিনি dignity-ও পেলেন এবং পাঁচ শ' টাকাও পেলেন। আর সেই হিড়িকে বেঁচে গেলাম মহাজন, বিজনবাবু ও আমি। সব ভাল যার শেষ ভাল।

মেহেরচাঁদ মহাজন সাহেব অবিভক্ত পাঞ্জাবের হাইকোর্টে একজন নামকরা এ্যাডভোকেট ছিলেন। তিনি টক্কর দিতেন

যুগজয়ী বই

রবীন্দ্রনাথ ও বৌদ্ধসংস্কৃতি—ডঃ সুধাংশুবিমল বড়ুয়া রচিত ও অধ্যাপক শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেনের ভূমিকা সম্বলিত। [১০·০০]

ঠাকুরবাড়ীর কথা—শ্রীহিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত। দ্বারকানাথের পূর্বপুরুষ হইতে রবীন্দ্রনাথের উত্তরপুরুষ পর্যন্ত তথ্যবহুল ইতিহাস। [১২·০০]

বাঁকুড়ার মন্দির—শ্রীঅমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত। বাঁকুড়ার তথা বাঙলার মন্দিরগুলির সচিত্র পরিচয়। ৬৭টি আর্টপ্লেট। [১৫·০০]

উপনিষদের দর্শন—শ্রীহিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত উক্ত বিষয়ের প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা। [৭·০০]

ভারতের শক্তি-সাধনা ও শাক্ত সাহিত্য—ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্তের এই বইটি সাহিত্য আকাদমী পুরস্কারে ভূষিত। [১৫·০০]

বৈষ্ণব পদাবলী—সাহিত্যরত্ন শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সঙ্কলিত ও সম্পাদিত প্রায় চার হাজার পদের আকরগ্রন্থ। [২৫·০০]

দীনবন্ধু রচনাবলী—ডঃ ক্ষেত্র গুপ্ত সম্পাদিত। একটি খণ্ডে সম্পূর্ণ। [১৩·০০]

মধুসূদন রচনাবলী—ডঃ ক্ষেত্র গুপ্ত সম্পাদিত। ইংরেজিসহ একটি খণ্ডে সম্পূর্ণ। [১৫·০০]

বঙ্কিম রচনাবলী—শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল সম্পাদিত। ১ম খণ্ড সমগ্র উপন্যাস টা ১২·৫০। ২য় খণ্ড সমগ্র সাহিত্য অংশ টা ১৫·০০।

দ্বিজেন্দ্র রচনাবলী—ডঃ রথীন্দ্রনাথ রায় সম্পাদিত। দুই খণ্ডে সম্পূর্ণ। ১ম খণ্ড ১২·৫০। ২য় খণ্ড ১৫·০০।

রমেশ রচনাবলী—শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল সম্পাদিত। একখণ্ডে সমগ্র উপন্যাস। [৯·০০]

ডেটিনিউ—অমলেন্দু দাশগুপ্ত রচিত স্মরণীয় ডেটিনিউ জীবন-কথা। শ্রীভূপেন দত্তের ভূমিকা। [৩·০০]

প্রতি রচনাবলীতে
জীবন-কথা ও সাহিত্য-কীর্তি আলোচিত।

সাহিত্য সংসদ

৩২এ, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড : কলি-৯

বিখ্যাত আইনজীবী জগন্নাথ আগরওয়ালার সঙ্গে। মহাজন সাহেব যখন প্র্যাকটিসের উচ্চশিখরে উঠে বার এ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট হন ঠিক সেই সময়ে লাহোরে গিয়ে পৌঁছলেন স্যার ট্রেভর হ্যারিস পাঞ্জাবের চীফ জাস্টিস হয়ে। স্যার ডাগলাস ইয়াং-এর অসৌজন্যপূর্ণ ব্যবহারের পর স্যার ট্রেভর হ্যারিস অতি অল্পদিনের মধ্যেই সকলের শ্রদ্ধা অর্জন করতে সমর্থ হন। স্যার ট্রেভর হ্যারিসের লোকচরিত্রের অসাধারণ জ্ঞান ছিল। তিনি ঠিক করলেন যে মেহেরচাঁদ মহাজনের ন্যায় জনপ্রিয় ও অভিজ্ঞ ব্যবহারজীবীকে হাইকোর্টের জজয়তীপদে নিলে হাইকোর্ট বেশ জোরদার হবে। কিন্তু মেহেরচাঁদ মহাজনের তখন বয়েস বেশ হয়েছিল এবং দেখা গেল যে জজীয়তী নিলে তাঁর পুরো পেনসন হবে না। অতএব জজীয়তীর দিকে মহাজন সাহেবের তেমন আকর্ষণ ছিল না। তবু হ্যারিস সাহেব যখন তাঁকে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করলেন তখন কর্তব্যের খাতিরে মহাজন সাহেব জজীয়তী নিতে রাজি হলেন আর্থিক লোকসান সত্ত্বেও। অল্পদিনের মধ্যেই মহাজন সাহেব সুদক্ষ জজ বলে পরিচিত হয়ে গেলেন। যখন দেশভাগ হোলো তখন দেশী রাজন্যবর্গ ভারতের সঙ্গে যোগ দেবেন, না, পাকিস্তানে যাবেন, না সাধীন রাজা হয়ে থাকবেন—সেই নিয়ে খুব গুলতানি চলছিল। জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্য কোন্ দিকে যায় ঠিক নেই। তখন সে দেশে শেখ আবদুল্লা প্রবল প্রতাপশালী হয়ে উঠেছিলেন। জিন্না সাহেব শেখ সাহেবকে ভজাচ্ছিলেন পাকিস্তানে যোগ দিতে। শেখের মনোগত ইচ্ছে ছিল জম্মু ও কাশ্মীর স্বাধীন রাজ্য হয়ে থাকুক এবং হিন্দু রাজাটিকে হয় একেবারে ছেঁটে ফেলে, নয়তো ঠুঁটো জগন্নাথের মত বসিয়ে রেখে তিনি অর্থাৎ শেখ সাহেব সর্বেসর্বা হয়ে থাকবেন। হিন্দু রাজার উভয় সংকট—শ্যাম রাখি কি কুল রাখি। পরিস্থিতি যখন এইরূপ তখন ভারত সরকার ঠিক করলেন যে একজন বিচক্ষণ ও জবরদস্ত লোক কাশ্মীরে দেওয়ান করে পাঠাবেন। সর্দার প্যাটেলের চোখ পড়ল মহাজন সাহেবের উপর। একজন হাইকোর্টের জজকে এই ধরণের কাজে নিয়োগ সম্পর্কে অনেক বাকবিতণ্ডা হয়েছিল। কিন্তু সর্দার যে বিষয় মনস্থির করতেন তার থেকে তাঁকে টলান সহজসাধ্য ছিল না। সুতরাং মহাজন সাহেবকে জজীয়তী ছেড়ে জম্মু ও কাশ্মীরের দেওয়ান হয়ে শ্রীনগরে যেতে হোল। সেখানে কি সব ঘটনা ঘটলো তা জানা যাবে মহাজন সাহেবের লেখা আত্মজীবনীতে। সে একটা নাটকীয় ব্যাপার। নিত্য পরিবর্তনশীল পরিস্থিতি। মহাজন সাহেব খুব অধ্যবসায়ের ও দৃঢ়তার সঙ্গে ক'মাস সেখানে কাজ করে মহারাজ স্যার হরি সিংকে ভারতে যোগ দিতে রাজি করিয়ে Instrument of Accession-এ তাঁকে দিয়ে সই করিয়ে রাতারাতি বিমানযোগে দিল্লীতে এসে সর্দার প্যাটেলকে সেই দলিলটি দিলেন। সর্দার প্যাটেল যে মহাজন সাহেবকে এই ব্যাপারে নিয়োগ করেছিলেন সেটা সার্থক হোল। একেই বলে "ফলেন পরিচীয়তে" মহাজন সাহেব যখন শ্রীনগর ছেড়ে চলে আসেন Instrument of Accession-টি পকেটে করে তখন প্রান্তবাসী মুসলমান আক্রমণকারীর ছদ্মবেশে পাকিস্তানী সৈন্যদল এগিয়ে চলেছে শ্রীনগর অভিমুখে এবং ভারত সরকার বিমানযোগে ভারতীয় সৈন্য ও যুদ্ধের সাজসরঞ্জাম জম্মু ও কাশ্মীরে নামাতে সুরু করেছেন।

মেহেরচাঁদ মহাজন সাহেব কাশ্মীর থেকে ফিরে এসে আবার হাইকোর্টে যোগ দিলেন এবং তার অল্প পরেই ফেডারেল কোর্টে জজ হয়ে আসেন। দিল্লীতে অল্পদিনেই তিনি সুপরিচিত হয়ে উঠলেন। মহাজন সাহেবের আইনজ্ঞান ছিল সুগভীর কিন্তু তার চেয়েও বেশি ছিল তাঁর সহজ সাধারণ বুদ্ধি। লোকচরিত্র বুঝতে তাঁর সময় লাগত না এতটুকুও। এসব ছাড়া মহাজন সাহেবের ছিল অসাধারণ সামাজিকতা। বন্ধুবান্ধবদের সুখে দুঃখে তিনি ছিলেন সমব্যথী। তিনি খেতে ও খাওয়াতে খুব ভালবাসতেন এবং এখনো ভালবাসেন। মহাজন সাহেবের বাড়ি থেকে নিমন্ত্রণ এলেই বিজনবাবু টেলিফোনে জিজ্ঞাসা করতেন, "What is the provocation" অর্থাৎ খাওয়ানটা কি অজুহাতে?" আমার সঙ্গে মহাজন সাহেবের প্রথম পরিচয় হয় সিমলা পাহাড়ে। তাঁর বড় ছেলে দয়াকিষণ তখন ইস্ট পাঞ্জাব হাইকোর্টে প্র্যাকটিস করতেন। আমি সেখানে যাবার পর মহাজন সাহেব যখন সিমলা আসেন তখন তাঁর সঙ্গে সেখানে আলাপ হয়েছিল এবং তারপর আমার সম্মানার্থে তিনি যে মধ্যাহ্নভোজের আয়োজন করেছিলেন তার কথা আগেই বলেছি। বছরখানেক পর যখন দিল্লীতে আমি ফেডারেল কোর্টের জজ হয়ে আসি সেই থেকে শেষ পর্যন্ত যতদিন আমি দিল্লীতে ছিলাম মহাজন সাহেবের আতিথ্য আমি সম্ভোগ করেছি বরাবর। তাঁর ছেলেমেয়েদের বিয়ে-চুড়োতে আমার ও আমার স্ত্রীর ঢালা নিমন্ত্রণ থাকত তাঁদের পরিবারের নিকট আত্মীয়দের মতই। এখনো যখন ন'মাসে ছ'মাসে দিল্লী যাই মহাজন সাহেবের বাড়ি পাত পাততেই হয় অন্তত একবার। এরকম সুহৃদ সহজে মেলে না। মহাজন সাহেবের বড় ছেলেটি এখন পাঞ্জাব হাইকোর্টের জজ হয়েছেন। তিনি বেশ নাম করেছেন তাঁর সততা, আইনজ্ঞান ও ক্ষিপ্র কর্মকুশলতার জন্যে। এতে করে আমার যে কী আনন্দ হয় তা বলা যায় না, কেন না তাঁকে হাইকোর্টে নিয়োগ করায় আমার অল্প কিছু হাত ছিল। এই প্রসঙ্গ শেষ করবার আগে মহাজন গৃহিণীর কথা বলতেই হবে। মহাজন সাহেবের প্রথমা পত্নী খুবই অল্প বয়সে দুটি পুত্র ও একটি কন্যা রেখে মারা যান। বেশ কিছুদিন পরে মহাজন সাহেব দ্বিতীয় দার পরিগ্রহ করেন। এই মহিলাও বহু সন্তানের জননী হয়েছেন। কিন্তু ইনি সপত্নী-পুত্রকন্যাদের ও নিজের পেটের সন্তানের মধ্যে যে এতটুকুও পার্থক্য করেন নি এবং এখনো করেন না সে কথা শুনেছি মহাজন সাহেবের প্রথমা পত্নীর গর্ভজাত প্রথমা কন্যা কল্যাণীয়া শ্রীমতী রাজের মুখে। রাজ তাঁর এই বিমাতার প্রশংসায় পঞ্চমুখ। মহাজন সাহেবের বিশাল পরিবারের সবাইকে একত্রে নিজ স্নেহচ্ছায়ায় বড় করে তুলেছেন এই মহীয়সী রমণী। এঁর গায়ের রঙ খুবই ফর্সা, এবং এঁকে দৈর্ঘ্যে সামান্য বেঁটেও বলা চলে। অত্যন্ত মিতভাষিণী, স্নেহশীলা ও সদাহাস্যময়ী এই মহিলাটির সৌজন্য ও আতিথেয়তা সত্যই হৃদ্যতাপূর্ণ। আমার সহধর্মিণীর সঙ্গে এঁর খুবই ঘনিষ্ঠতা হয়ে গিয়েছিল।

কোর্টের কাজ মহাজন সাহেব খুব দক্ষতার সঙ্গে পরিচালিত করতেন। বাজে সময় নষ্ট করতে দিতেন না কৌঁসুলীদের। হায়দ্রাবাদ যখন শেষ পর্যন্ত ভারতের সঙ্গে যোগ দিল তখন নিজাম সরকারের কাছে অনেকগুলি আপীল ঝুলছিল। এগুলিকে সবাই নিজাম বাহাদুরের প্রিভি কাউন্সিল আপীল বলত। এসব আপীলের বিষয়বস্তুর মূল্য অনেক ক্ষেত্রে অত্যন্ত কমই ছিল। সেই সব প্রিভি কাউন্সিল আপীলগুলি দিল্লীতে টেনে এনে শুনানী করলে আপীলের উভয়পক্ষেরই অনেক টাকা ব্যয় হয়ে যাবার কথা। সে ত যেন ঢাকের দায়ে মনসা বেচে যাওয়ার সামিল হবে। ঠিক হোল যে সুপ্রিম কোর্টের একজন জজ হায়দ্রাবাদে গিয়ে সেখানে স্থানীয় হাইকোর্টের দুজন জজের সঙ্গে একত্রে ডিভিসন বেঞ্চ হয়ে বসে ঐ সব আপীল নিষ্পত্তি করে দেবেন। সে কাজের ভার পড়ল মহাজন সাহেবের উপর। মহাজন উর্দু ভাষায় অভিজ্ঞ হওয়ায় খুব সুবিধেই হয়েছিল। মহাজন সাহেব সেখানে গিয়ে দুজন স্থানীয় হাইকোর্টের দুজন জজ যাদের adhoc সুপ্রিম কোর্টের

জজ করা হয়েছিল মাস তিনেকের জন্যে তাঁদের সঙ্গে বসে অনতিবিলম্বে তিন শ'র বেশি আপীল ফয়সালা করে দিয়ে ফিরে এলেন। অন্য দুজন জজ এবং স্থানীয় এ্যাডভোকেটরা মহাজন সাহেবের দ্রুত কর্মপরিচালনা দেখে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গিয়েছিলেন।

এইখানে মনে পড়ছে মহাজন সাহেবের কোর্টের একটা আপীল মামলার কথা। মহাজন সাহেব তখন চীফ জাস্টিস। একটা আপীল এসেছিল দক্ষিণ দেশ থেকে। বাদীকে অন্যায় করে বরখাস্ত করা হয়েছে বলে বাদী খেসারত চেয়ে মামলাটা রুজু করেছিল। প্রথমে সাব-জজের কোর্টে এবং আপীলে হাইকোর্টে হেরে গিয়ে বাদী আপীল দায়ের করেছিল সুপ্রিম কোর্টে। মামলার ঘটনাগুলি খুবই পরিষ্কার। মস্ত বড় মূলধনওয়ালা একটা কোম্পানীর কারখানার ম্যানেজার ছিল বাদী। যেমন হয়ে থাকে, ঐ কোম্পানীর ডিরেক্টারদের মধ্যে বিরোধ লেগে গেল। দুই দল ডিরেক্টারই চায় কোম্পানীটার কর্তৃত্বটাকে নিজ দলের আয়ত্তাধীনে আনতে ও রাখতে। দুই দলের এই আভ্যন্তরীণ বিবাদে বাদী কি রকম করে একটি দলের খপ্পরে পড়ে গেল। বেচারী করেই বা কি? যে দল তার মনে হোল বেশি জোরাল সেই দলেই ভিড়ে গেল। হাজার হোক তার চাকরী বজায় রাখতে হবে ত'। এখন হয়েছে কি, অন্যদলটা ইতিমধ্যে অনেকগুলি শেয়ার কিনে ফেলে ভোটের জোরে বার্ষিক সভায় নিজেদের ডিরেক্টার বানিয়ে ফেলল। তারা ক্ষমতাসীন হয়ে লাগল বাদীর পেছনে। তাদের রাগ যে বাদী অন্যদলের ডিরেক্টারদের সঙ্গে মিশে এ দলের সঙ্গে শত্রুতা করেছে। কি একটা অছিলা করে বিনা নোটিশে তারা বাদীকে কাজ থেকে বরখাস্ত করে দিল। বাদী তখন এই wrongful dismissal-এর জন্যে খেসারতের দাবি করে মামলা রুজু করেছিল। দু' কোর্টে হেরে বাদী এলো সুপ্রিম কোর্টে। মহাজন সাহেব তখন চীফ জাস্টিস হিসেবে যে বেঞ্চে বসতেন সে বেঞ্চে মামলাটা উঠল শুনানীর জন্যে। আমরা আপীলের কাগজপত্র তন্ন তন্ন করে পড়ে দেখলাম যে আপীলটাতে কোন দম ছিল না। দুই কোর্টের concurrent finding of fact-এর ত' নড়চড় করা যাবে না। আইনের প্রশ্ন কিছুই ছিল না। বাদীর কৌঁসুলী কেবলই ঘটনাগুলি নিয়ে সওয়াল জবাব করতে লাগলেন। তাঁকে বলা হোল দুই কোর্ট যে finding of fact দিয়েছে তার বিরুদ্ধে বহাস করে কোন লাভই হবে না। তবু তিনি শোনেন না। আমরা তখন নিরুপায় বুঝে যে যার চেয়ারে ঠেস দিয়ে চোখ বুজে বসলাম। মহাজন সাহেব তখন সামনের দিকে ঝুঁকে বাদীর কৌঁসুলীর দিকে চেয়ে প্রশ্ন করলেন—"In an internecine quarrel amongst the Directors why did your client take sides?" কৌঁসুলী বললেন—"My client was a mere manager, and those directors were men in power. What could the poor fellow do, my lord?" মহাজন সাহেব আবার বললেন—"Assuming they were men in power, why did your client take sides with them?" কৌঁসুলী তখনো বললেন—"My client had no other alternative, for those Directors were then men in power." মহাজন সাহেব বললেন—"I see, your client believes in propitiating the men in power! Now, look here, I am the man in power here and I tell you to sit down now."

আশ্চর্যের কথা এই যে কৌঁসুলীটিও সত্যি সত্যি বসে পড়ল। বহাসের স্রোত যেন মরুপথে হারিয়ে গেল। ছোট কয়েক ছত্র রায় দিয়ে মহাজন সাহেব তক্ষুণি তক্ষুণি আপীলটা ডিসমিস করে দিলেন, কিন্তু বিবাদীদেরও খরচা থেকে বঞ্চিত করলেন। বিবাদীর কৌঁসুলী অবস্থা বুঝে খরচার জন্যে আর ওজর-আপত্তি তুললেন না।

মহাজন সাহেব অবসর নেবার পর

দিল্লীতেই নিজের বাড়ি করে বসতি করেছেন। তিনি আর্য সমাজের একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি। সকলেই তাঁকে শ্রদ্ধা করে। আমি ব্রাহ্ম সমাজের লোক বলে তিনি আমাকে বেশ পছন্দই করতেন। অবসর নেবার পর মহাজন সাহেব দেশের ছেলে-মেয়েদের শিক্ষা নিয়ে খুবই চিন্তা করেন এবং D.A.V. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির তিনি বোধ হয় প্রেসিডেন্ট। সম্প্রতি মহীশূর ও কেরালার মধ্যে প্রদেশের সীমা নিয়ে যে তুমুল ঝগড়া উঠেছে সে সম্বন্ধে তদন্তের ভার ভারত সরকার মহাজন সাহেবের উপরেই ন্যস্ত করেছেন।

ডক্টর বিজনকুমার মুখার্জীর কথা বলতে গেলেই মনে পড়ে যায় কলকাতা হাইকোর্টে তাঁর সঙ্গে আমার সাত বছরের এবং তারপর সুপ্রিম কোর্টে তাঁর জীবনের শেষ ছয় বছরের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ও সহ-যোগিতা এবং মনটা ভাবাবেগে উদ্বেলিত হয়ে ওঠে, কেন না কর্মসূত্রে তাঁর বন্ধুত্ব ও প্রীতি পাবার সৌভাগ্য আমার ঘটে-ছিল। ১৮৯১ সালের ১৫ই আগস্ট তারিখে বিজনকুমার জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর প্রাথমিক শিক্ষা হয়েছিল হুগলী শহরে যেখানে তাঁর পিতা ওকালতী করতেন। পরে তিনি কলকাতায় আসেন এবং ইতিহাসে এম-এ ডিগ্রী লাভ করেন। বি-এল এবং এম-এল পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের সুবর্ণ পদক প্রাপ্ত হন। তিনি অনাথ দেব গবেষণা পুরস্কারও পেয়েছিলেন। ১৯১৪ সালের ৯ই জানুয়ারীতে তিনি কলকাতা হাইকোর্টের এ্যাপেলেট সাইডে প্র্যাকটিস শুরু করেন। এই সময় স্যার আশুতোষ তাঁকে কলকাতা ল' কলেজে অধ্যাপকের একটি চাকরি দেন। মাইনে যদিও কমই ছিল তথাপি এই চাকরিটি তাঁকে কলকাতা হাইকোর্টে পশার জমিয়ে তুলবার কঠিন যুদ্ধে বিস্তর সাহায্য করেছিল। জুনিয়ার এ্যাডভোকেটদের যে দারুণ খাটুনী খাটতে হয় তা তিনি মুখ বুজে খেটে গিয়েছেন এবং সাময়িক দুর্বিপাকে তিনি বিমূঢ় বা বিহ্বল হন নি। প্র্যাকটিস করতে করতেই তিনি ডি-এল উপাধি পেয়েছিলেন। তাঁর পড়াশুনায় একনিষ্ঠ অভিনিবেশ ও আইনের নীতি সম্পর্কে তাঁর গভীর জ্ঞানের জন্যে তিনি ক্রমে ক্রমে ব্যবহার-জীবীদের মধ্যে অগ্রণী হয়ে উঠেছিলেন। তাঁর অসাধারণ আইনজ্ঞান ও কর্মকুশলতার সঙ্গে সংমিশ্রিত হয়েছিল একটি মধুর বাগ্মিতা যা জজেদের মনের উপর রেখা-পাত করত। তাঁর গুণাবলী স্বীকৃতি পেয়েছিল যখন ১৯৩৪ সালে তিনি জুনিয়ার সরকারী উকিল ও তার দুই বছরের মধ্যেই সিনিয়ার সরকারী উকিল পদলাভ করেন। ১৯৩৪ সালে তিনি কলকাতা হাইকোর্টের জজ হন। ১৯৪৭ সালে তিনি দেশভাগ করবার জন্যে যে Boundary Commission গঠন করা হয়েছিল তার অন্যতম সভ্য হন। পর বৎসরেই তিনি ফেডারেল কোর্টের জজ হয়ে দিল্লী চলে যান এবং ১৯৫০ সালে সুপ্রিম কোর্ট প্রতিষ্ঠিত হলে ইনি সেই কোর্টের জজ হন। ১৯৫৪ সালের ২৩শে ডিসেম্বর তারিখে তিনি ভারতের সর্বোচ্চ ন্যায়ালয় সুপ্রিম কোর্টের চতুর্থ মুখ্য ন্যায়াধীশ পদে বহাল হয়েছিলেন। বিজন-বাবু ফেডারেল ও সুপ্রিম কোর্টে গিয়ে-ছিলেন কলকাতা হাইকোর্টের অত্যুচ্চ আদর্শের ধারক ও বাহকরূপে।

বিজনবাবু এ্যাডভোকেট হিসেবে যে বড় ছিলেন তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু জজ হিসেবে তিনি আরো বড় হয়ে উঠে-ছিলেন। তাঁর মিষ্ট মেজাজ ও উদ্দীপনায় কত যে জুনিয়ার এ্যাডভোকেট উপকৃত হয়েছেন তার সংখ্যার অবধি নেই। তাঁর সতীর্থেরা তাঁর কাছ থেকে যে অমায়িকতা, সৌজন্য ও সমাদর পেতেন তার সাক্ষ্য আমি নিজেই দিতে পারি। জজ হিসেবে তিনি যে উচ্চ প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন তা সর্বজনবিদিত। তাঁর রায়গুলি পড়লেই বোঝা যায় কি সুন্দর, সরল ভাষায় তিনি আইনের বিবিধ প্রশ্নগুলি সম্বন্ধে তাঁর সুচিন্তিত মত ব্যক্ত করতে পারতেন। Hindu Law কি Law of Land Tenures কি Constitutional Law —এসব বিষয়েই তাঁর সুগভীর জ্ঞান ছিল। তাঁর রায়ের মধ্যে তিনি শুধু নজিরের মালাই গাঁথতেন না। প্রতিটি আইনের নীতিগত মর্মার্থ বিশ্লেষণ করে তিনি যে আইনের জগতে অসাধারণ অবদান রেখে গেছেন তা Law Report-এর পাতা উল্টালেই দেখা যাবে। জজীয়তীর কর্ম-ভার সত্ত্বেও তিনি Hindu Law of Endowment সম্বন্ধে যে Tagore Law Lectures দিয়ে গেছেন তা তাঁর পাণ্ডিত্যের ও অধ্যবসায়ের সম্যক পরি-চায়ক।

বিজনবাবু যে কেবল আইনচর্চাই করে গেছেন তা মোটেই নয়। সংস্কৃত সাহিত্যে-ও তিনি বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করে "সর-স্বতী" উপাধি পেয়েছিলেন এবং এক সময়ে Bengal Sanskrit Associa-tion-এর সর্বাধ্যক্ষ হয়েছিলেন। তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের Fellow ছিলেন। দর্শনেও তাঁর বেশ দখল ছিল। সাহিত্যরুচি ছিল তাঁর খুবই সমার্জিত এবং রবীন্দ্রনাথ ও সংস্কৃত ও ইংরেজী কবিদের রচনা তিনি যে অনর্গল আবৃত্তি করে যেতে পারতেন তা শুনেছি নিজ কানে। বিজনবাবু আসলে উচ্চস্তরের ধার্মিক ও চরিত্রবান ব্যক্তি ছিলেন। চিন্তায়, কথায় ও কাজে তাঁর অন্তরের পবিত্রতা ফুটে বের হোত খুবই স্পষ্টভাবে। অতি অল্প বয়সে তাঁর পত্নীবিয়োগ হয় কিন্তু তিনি আর দার পরিগ্রহ করেন নি। এক-মাত্র ছেলে অমিয়কুমারকে তিনি একলাই লালনপালন করে বড় করে তুলেছিলেন এবং সেই ছেলেকে ওকালতী পেশায় সুপ্রতিষ্ঠিত দেখে যেতে তিনি পেরে-ছিলেন। যে-কেউ তাঁর সংস্পর্শে আসতেন তিনিই তাঁর চরিত্রগুণে বিমুগ্ধ হতেন। পাঞ্জাবের একজন উচ্চশিক্ষিত এ্যাড-ভোকেটকে বলতে শুনেছি যে বিজন মুখার্জীর সঙ্গে আধ ঘণ্টা কথাবার্তা বলে চলে আসবার সময় তাঁর মনে হোত যে তিনি যেন আর একটু ভাল মানুষ হয়ে ফিরছেন। এর চেয়ে বড় সম্মান মানুষ মানুষকে আর কি দিতে পারে? জীবনের শেষদিকে তিনি রোগযন্ত্রণায় খুবই কষ্ট পেয়ে ১৯৫৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের শেষদিকে কলকাতায় আপন বাস-গৃহে শেষনিশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর মৃত্যুতে দেশ হারাল একটি জ্ঞানী ও গুণীজনকে।

[ক্রমশঃ]

ফোল্ডিং ৫০ গুলির পিস্তল

লাইসেন্সের প্রয়োজন নেই। আমেরিকান মডেল। চোর এবং বন্য জন্তুর হাত থেকে নিজেকে বাঁচান। পিকনিক, ভ্রমণ এবং নাটকের পক্ষে উপযোগী। ৫০ গুলীর ব্যবস্থা-সহ অটোমেটিক। হাল্কা ওজন এবং চোখ ধাঁধান আগুন আপনাকে বিপদ থেকে রক্ষা করবে।

মূল্য ৫০ গুলীসহ নং ৩৩ টাঃ ১৩·৫০ জার্মান মডেল নং ৯৯ টাঃ ১৫·৫০। ভি, পি, পি, চার্জ টাঃ ২·৫০। চামড়ার কেস ৭্ টাকা। অতিরিক্ত প্রতি একশত গুলী ৫্ টাকা।

GEM ARTS (WBM—15)
P.B. 1325, Delhi—6.

সবুজ শালগাছের মত বাড়ন্ত গড়ন, গানের গলাও ছিল তেমনি মিষ্টি। গদাধর ছেলের দিকে চেয়ে থাকে, সে এতকাল কীর্তন গাইছে তবু তার গলায় এমন মিষ্টি সুর বের হয় না। গদাধর মনে মনে ভাবে তার ছেলে শ্রীনিবাস তাদের বংশের মুখ রাখবে, বড় মূল গায়েন হবে।

শ্রীনিবাস এরই মধ্যে বাবার দলে বের হয়েছে। বীরভূম-বর্ধমানের পল্লী অঞ্চলে আর নবদ্বীপ কৃষ্ণনগরেও গদাধরের বাঁধা আসর আছে। শ্রীনিবাস বাবার সঙ্গে সেসব জায়গায় কত শস্যসিক্ত মাঠ পার হয়ে কোন্ দূরে গ্রাম-গ্রামান্তবে কীর্তন গেয়ে এসেছে। গদাধর উৎসাহ দেয়।

এ সাধনার পথ, নিত্যানন্দ মিলবে এরই মধ্যে।

শ্রীনিবাসের অবশ্য নিত্যানন্দ পাবার বাসনা তখনও হয় নি। বলিষ্ঠ সুন্দর একটি তরুণ, ডাগর দুটো চোখ—টিকলো নাকে রসকলি পরে গলায় মালা দুলিয়ে আসরে নামে।

এই মনের অতলে তার অন্য মন আছে, হঠাৎ সেটাকে আবিষ্কার করেছে শ্রীনিবাস। তার যৌবনমদির মনের অতলে নতুন একটা সত্তা ধীরে ধীরে মাথা তুলেছে—সঙ্গোপনে। সেই সদাজাগর মন আরও কি পেতে চায়। ললিতা যে তার মনের গোপনে সেই সুর তুলেছে সেটা আবিষ্কার করে চমকে উঠেছে শ্রীনিবাস। তার সব চিন্তাকে ওই-ই ভরিয়ে রেখেছে কি ম্লান সুরভির মত।

ললিতার বাবা মনোহরের বৃত্তি বলতে ছোট্ট দোকানদারি। বড় রাস্তার ধারে গ্রামের বাইরে একটা খড়ো চালায় টুকি-টাকি জিনিসপত্র থাকে—বটতলার বাঁশ-বাখারির মাচা মত করা। দু-চার জন খদ্দের চা-ও খায়। কোন রকমে চলে মনোহরের। ললিতার বিয়ের ব্যবস্থাও করতে পারে নি, এদিক-ওদিক খোঁজ-খবর করে মাত্র।

ললিতা অবশ্য ওসব খবর রাখে না। তার দেহে এসেছে যৌবনের প্রথম সাড়া। এতদিন সে ও সম্বন্ধে ছিল সম্পূর্ণ উদাসীন। শালবনে, আমবাগানে না হয় ছায়ানামা যোড়ের ধারে বৈঁচি—টোপা-কুলগুলো পেকে উঠেছে, কোথায় রঙীন প্রজাপতির দল পাখা মেলে উড়ে বেড়ায় সেই সন্ধানেই সে ঘুরতো।

শ্রীনিবাস তখন তার সঙ্গী। দুজনে ওই বনে বনে ঘুরতো। শ্রীনিবাসের মাথার চুলগুলো কদমছাট করা। গলায় কণ্ঠিও পরেছে। ওটা অবশ্য তার বাবার নির্দেশেই পরতে হয়েছে, ওতে নাকি মনের ভাব বদলে যায়। এ নিয়ে ললিতাই বলে—ঢং। এইবার শাড়ি পর চিনিবাস মানাবে ভালো।

সেদিন ওদের খামারের পেয়ারাগাছে কাকে উঠে ডাঁসা পেয়ারাগুলো পাড়তে দেখে এগিয়ে আসে শ্রীনিবাস। ললিতাও হাতে-নাতে ধরা পড়ে যাবে ভাবে নি। কাঠবেড়ালীর মত ডাল বেয়ে পাঁচিলের দিকে চলেছে, শ্রীনিবাসও এগিয়ে যায়—হঠাৎ ওর কপালে সজোরে এসে লাগে পেয়ারাটা। ললিতা শেষ অস্ত্র হিসাবেই ওটাকে ব্যবহার করেছে—অস্ফুট আর্তনাদ করে ওঠে শ্রীনিবাস, চোরও সেই সুযোগে ডাল থেকে লাফ দিয়ে নেমে একেবারে হাওয়া।

তার জের অবশ্য বেশ কয়েকদিনই ছিল। কপালটা ফুলে আগড়া আঁটির মত হয়ে গেছে। সেদিন ওপাড়ায় দত্তবাড়ির নাটমন্দিরে রাস উপলক্ষে কীর্তন হবে। গদাধর আসরে নামবার সময় ছেলের কপালে ওই ফুলোটা দেখে অবাক হয়। যেন আব গজিয়েছে। শ্রীনিবাসকে সেদিন মিথ্যা কথাই বলতে হয়।

—এমনি ঠোক্কর খেয়েছিলাম কপাটে।

গদাধর সেদিন ওকে আসরেই নামতে দেয় না—ওই বেশ নিয়ে আর কেত্তন গাইতে হবে না, বাঁদর কোথাকার।

চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে শ্রীনিবাস। আজ ভেবেছিল গ্রামের সকলে দেখবে তার কীর্তনের এলেম। তার মিষ্টি সুরেলা গলাও শুনবে গ্রামের লোকে, কিন্তু তা হয় না। রাগে অভিমানে চোখ ফেটে জল বের হয়—চিনি। এ্যাই চিনিবাস।

অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আছে শ্রীনিবাস। ওকে দেখে রাগে যেন ফেটে পড়বে। আবছা তাবা-জ্বলা অন্ধকার। বাতাসে ভেসে আসে কীর্তনের সুর, শ্রীনিবাস ওই জগৎ থেকে আজ নির্বাসিত হয়েছে ওরই জন্য।

—খুব লেগেছে না রে?

কথা বলে না শ্রীনিবাস। চুপ করে থাকে। ললিতা এগিয়ে উঠে ওর হাতখানা তুলে নেয়। তারপর আলো পড়েছে ওর চোখে। ওই রহস্যময় অন্ধকারে ললিতার

ওই ছোঁয়াটুকু তার মনে সাড়া তোলে। ললিতা বলে চলেছে।

—সত্যি এত লাগবে তা জানতাম না। এ্যাই চিনি—কথা বলবি না?

ললিতা আরও কাছে এগিয়ে এসেছে, ওর দু'হাত দিয়ে কাছে টেনে নেয় শ্রীনিবাসকে। শ্রীনিবাসের সারা দেহ-মনে নীরব একটা সুর ওঠে। সারা শরীর কাঁপছে সেই অনুভূতির তীব্রতায়। উষ্ণ নরম পেলব স্পর্শ। ললিতার দেহটা যে কবে তার অগোচরে এমনি একটা পরি-ণতিতে এসেছে তা জানতো না। ললিতার দিকে চেয়ে থাকে সে—অস্ফুট কণ্ঠে ওকে ডাকছে শ্রীনিবাস—ললিতা!

এ সেই দুরন্ত চঞ্চল মেয়ে নয়—কোন অধরা রহস্যময়ী নারীতে পরিণত হয়েছে সে। কাছে টেনে নেয় ওকে শ্রীনিবাস। ওরা যেন কোন অন্ধকার অতলে হারিয়ে যাচ্ছে, তাদের চেনা জগৎ থেকে কি বিচিত্র স্বপ্নলোকের দরজায় এসে পৌঁচেছে তারা—দুটি কিশোর-কিশোরী।

ফিস্‌ফিসিয়ে ওঠে ললিতা—চিনি, ছাড়। কেউ এসে পড়বে।

সেই সন্ধ্যার একটুকু স্মৃতি শ্রীনিবাসের সারা মনকে আচ্ছন্ন করেছে। তাই এবার দোলের মরশুমে গ্রাম থেকে যেতে ইচ্ছে করে না। গদাধরের এই মরশুমে নবদ্বীপ, কাটোয়া, কৃষ্ণনগর, শান্তিপুরে কয়েকটা বাঁধা আসর আছে, এবার গদাধর আশা করে শ্রীনিবাস গাইছে ভালো, বয়সও একেবারে কাঁচা—তার সুন্দর চেহারা আর তেমনি সুরেলা গলার জন্য সে ওখানে নাম প্রতিষ্ঠা পাবে, তারও মবলক কিছু রোজগার হবে।

কিন্ত ছেলের মনের খবর সে রাখে নি। শ্রীনিবাসের কাছে আজ ওই শালবন মহুয়াফুলের গন্ধভরা সন্ধ্যা ওই লাল ডাঙা—ছায়ানামা ঘোড়ধার আজ ললিতার সঙ্গে মিশিসে তার মনকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে কি বিচিত্র সুরে। ললিতা এ জগতের সঙ্গী। শ্রীনিবাস সেদিন বলে ললিতাকে।

—তোকে ছেড়ে যাবো না ললিতা।

ললিতাও যেন বেপরোয়া হয়ে উঠেছে। দু-চার জনে নানাকথা বলে, এ নিয়ে বাবা-ও তাকে কি সব বলেছে—বাড়ি থেকে বের হওয়া বন্ধ করে দেবে। শ্রীনিবাসও শুনেছে সেসব কথা। নরু চাটুজ্যে তো সেদিন দুজনকে আমবাগানে দেখে কি বলেছিল।

কিন্তু ওদের সবাইকে মনে হয় তাদের শত্রু, এই কঠিন শত্রুপুরীতে ললিতা তাই শ্রীনিবাসকে কাছে পেতে চায়, শ্রীনিবাসও সারা মন দিয়ে সেই কামনা করে। তাই জানায় সে।

—তোকে ছেড়ে যাবো না ললিতা।

ললিতা চেয়ে থাকে শ্রীনিবাসের দিকে। ছায়া ছায়া রোদ নেমেছে আমবাগানে। বোলের মিষ্টি গন্ধ ওঠে, মৌমাছিগুলো গুন্‌গুন্ করে সেই ক্লান্ত দুপুরকে উদাস করে তোলে, ললিতা আর শ্রীনিবাস যেন অন্য জগতে হারিয়ে গেছে।

ললিতা বলে—ওসব কেত্তন-ফেত্তন গাইবে না আর। পাশ করে বাবুদের মত চাকরি করবে।

—তারপর। শ্রীনিবাস ওর কালো চোখের তারায় আরও কি ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখে।

ললিতা ওর নিবিড় বাঁধন থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করে জবাব দেয়।

—জানি না।

ছেলেবেলার পুতুল খেলার স্মৃতি আজ ললিতার সদ্যযুবতী মনে কি বিচিত্র রূপে ফুটে ওঠে ওই শ্রীনিবাসকে কেন্দ্র করে। কালো দুটো টলটলে চোখে কি গভীর স্নিগ্ধতা—শ্রীনিবাস ওরই অতলে হারিয়ে যেতে চায়।

তাই বোধ হয় সাহসী হয়ে উঠেছিল সে। বাবাকে বলেছিল কথাটা, ওসব মেয়ে-ছেলের মত সেজেগুজে রসকলি কেটে মালা দুলিয়ে আসরে কেত্তন করবে না সে, সামনের বছরই পরীক্ষা। ভালভাবে পড়া-শোনা করে পাশ করবে সে। চাকরি-বাকরি করবে, কেত্তন তার ভালো লাগে না।

গদাধর কথাটা শুনে ফোঁস করে ওঠে। ছেলের সম্বন্ধে দু-চারটে কথা তার কানে এসেছিল, সেদিন নরু চাটুজ্যেই বলেছিল—ছেলেকে সামলা গদাধর। উড়ছে। গদাধর কান দেয় নি ওই হেপো ঠাকুরের কথায়। আজ মনে হয় কথাটা নিছক রটনা নয়। গদাধরের সামনে মরশুমের রোজগার। তিনপুরুষের কীর্তনিয়া তারা—ছেলেকেও লেখাপড়া শিখিয়ে এই পথেই আনবে। তাই গদাধর গর্জে ওঠে—ওসব বাঁদরামি ছাড়। কালই বেরুতে হবে। পরীক্ষার এখন অনেক দেরি।

শ্রীনিবাসের মনে হয়েছিল বাবার কথার জবাব দেবে, কিন্তু পারে নি। যেতে তাকে হবেই। ললিতার দু' চোখে জল নামে। আজ সেই ছাবাকালো আমবাগানে বোলের মিষ্টি গন্ধটাকে মনে হয় তাদের কান্নার মতন করুণ রেশে ভরা। ললিতার দু' চোখে জল। সেই দুরন্ত দামাল মেয়েটা কান্নায় ভেঙে পড়ে, সে যেন কোথায় অত্যন্ত অসহায়। শ্রীনিবাস তাকে সান্ত্বনা দেয়।

—চুপ কর ললিতা, ক'টা মাস তো—তারপরই ফিরে আসবো। আর যাবো না তোকে ছেড়ে।

ললিতা শ্রীনিবাসের কথাগুলো যেন শুনতে পায় নি, তার মনের অতল বেদনায় সে গুমরে গুমরে কাঁদছে।

শ্রীনিবাস হারিয়ে গিয়েছিল। অনেক পথ। তাদের ছায়াচ্ছন্ন গ্রাম লালডাঙা—দামোদরের বালিয়াড়ি পার হয়ে শালবনের ধারে নির্জন দুর্গাপুর স্টেশনে তারা গাড়িতে উঠেছিল। সেই গাড়িখানা যেন কোন অনির্দিষ্টের যাত্রী—শ্রীনিবাসের সামনে সকালের আলোটুকু মুছে সন্ধ্যা নেমেছিল—নেমেছিল অতল বেদনার অন্ধকার। ললিতা তখন তার কাছ থেকে অনেক দূরে।

নতুন জগৎ। এখানের মাটি আরো নরম—আরো সবুজ। চারিদিকে গম যব কলাই-এর ক্ষেত, সবুজ হলুদে ভরে গেছে মাটির বুক। কালো জলভরা গঙ্গার ওপরে নবদ্বীপে এসে পৌঁচেছে তারা। শ্রীনিবাস অবাক হয়ে দেখছে চারিদিক। তবু এক-জনকে সে ভোলে নি—তার সেই কান্নাভরা নীরব চাহনি এখনও তাকে ব্যাকুল করে তোলে। সেই ভাব আর অন্তরের সুপ্ত বেদনাই যেন রাধিকার বিরহ বর্ণনার সুরকে বেদনাময় করে তোলে।

—আজু রজনী হাম ক্যায়াসে
গোঙায়বো
সে যদি গো নাহি হয় সাথী।

বেলা বাড়ছে। চড়চড়ে হয়ে ওঠে রোদ। দূরে শালবনের মাথায় নীল আকাশে একটা চিল পাক দিচ্ছে, মাথা তুলে উঠেছে সাহারজোড়ার গ্রাম সীমায় উঁচু একটা তালগাছ। ওটা কত কালের জানে না শ্রীনিবাস। সেদিনও অমনি দেখেছে ওটাকে তাদের ছেলেবেলায়। সেই বসন্তের দিনে। বাদল বেলায় মেঘ নামতো, কালো মেঘ—ওই তালগাছ ছুঁয়ে বৃষ্টি নামতো। তবু চারিদিক আজ বদলে গেছে। বদলে গেছে এই ডাঙার পরিবেশ, সেই দিনের মানুষগুলোও। খোয়াঢাকা রাস্তায় আজ পড়েছে পিচের কালো প্রলেপ, ভারী চাকার মসৃণ শব্দ তুলে, হর্নের শব্দে চারিদিক কাঁপিয়ে তুলে ছুটে যায় ট্রাক-গুলো—দূর-দূরান্তরের পানে।

—কই রে চিনিবাস—নে। চা নে। কালকের দু আনা বাকী আছে কিন্তু।

গুপী আজও বদলায় নি, ওর কথায় শ্রীনিবাস হাসে। সব দিয়ে দেবে সে। গুপীর চায়ের দোকানে এখন চেয়ার-টেবিল এসেছে—ওপাশে একটা চালায় তালাবন্ধ একরাশ সাইকেল রয়েছে, দুর্গাপুরের কারখানার সিফটের বাবুদের গাড়ি ওসব। ওপাশে মনোহরের ধানকলে পুরোদমে কাজ চলেছে। সেই ছোট্ট মুদিখানার দোকান আজ বিরাট হয়ে উঠেছে, ডাঙায় গড়ে তুলেছে ধানকল।

শক্তি ও উৎসাহের জন্য—বোর্নভিটা !
বোর্নভিটার স্বাদ অতুলনীয়...
ওর রহস্য হচ্ছে—কোকো !
Bournvita
কোকো, দুধ, চিনি, ও মল্ট বিধিসম্মতভাবে মেশাবার ফলে—অতি শক্তিবৰ্দ্ধক পানীয় বোর্নভিটা ! বোর্নভিটা গরম দুধে মিশিয়ে নেবেন—এই সুস্বাদু পানীয় থেকে শক্তি ও উৎসাহ পাবেন।
শক্তি, উৎসাহ ও স্বাদের জন্যে
ক্যাডবেরিস্ বোর্নভিটা

সবাই বদলে গেছে। বদলে গেছে শ্রীনিবাসও। আমূল বদলেছে। আজকের শ্রীনিবাসের জীবনের উপর দিয়ে আজ সেই সুন্দর যুবকটির কোনকিছু অবশেষ নেই। আগুনের তাপে পুড়ে যাওয়া সবুজ গাছের মতই সে আজ প্রাণহীন বিবর্ণ।

এই অবক্ষয় শুরু হয়েছিল অনেকদিন আগেই। চায়ে চুমুক দিতে দিতে আজও সে অতীতের সেই কথাগুলো ভাবে। আজকের পলাতক বঞ্চিত মন অতীতের শ্যাম-সবুজ চিন্তার জগতে কি শান্তির সন্ধান করে।

ক' মাসেই সেই তরুণ শ্রীনিবাস নবদ্বীপ, কাটোয়া, কৃষ্ণনগর অঞ্চলে নাম কুড়িয়েছে। যুদ্ধের সময় বাজারে তখন টাকার ছড়াছড়ি। নানা উপায়ে টাকা আসছে লোকের হাতে। অঢেল টাকা—তারই কিছু ব্যয় করে তারা হরিনাম শুনে পুণ্য অর্জন করতে যায়। গদাধর কুড়িয়েছে সেই পয়সার বেশ কিছু। শ্রীনিবাসের এসব ভালো লাগে না। তার মন পড়ে আছে ছায়াচ্ছন্ন কোন আমবাগানের ধারে গ্রামের দিকে—মনে পড়ে ললিতার কথা—তার ডাগর কালো দুটো চোখ যেন অন্ধকারে আজও তাকে খোঁজে—ডাক দেয় পাখীর সুরে। বাড়ির জন্য মন কেমন করে। গদাধর ছেলের কথায় জবাব দেয়।

—যাবো রে। দু'-একটা মাস যাক। শান্তিপুরের আসর সেরে যাবো। তাকে তখন পয়সার নেশায় পেয়েছে।

শ্রীনিবাস মনে মনে রেগে ওঠে। তবু শেষে একদিন বাড়ির দিকে পা বাড়ায় তারা। দলের সকলেই এবার বেশ খুশি, এবারের বাণিজ্য তাদের বেশ ভালোই হয়েছে। গদাধরের মনে অনেক কল্পনা। ছেলের গলাও মিষ্টি, ভাবও আছে। আছে আসর মানানসই রূপ। শুধু কিছু পড়তে হবে আর সেই সঙ্গে তালিমের ব্যবস্থা থাকলে সামনের মরশুমেই শ্রীনিবাস আরও নামকরা গাইয়ে হবে, তখন টাকা আরও আসবে।

শ্রীনিবাস দূর-দিগন্তে তাদের গ্রামখানাকে খুঁজছে, তিরোলগাছটা দেখা যায়, গ্রামের মধ্যে ওইটাই সবথেকে উঁচু। একজন তার পথ চেয়ে আছে। ললিতাও ছুটে আসবে। এতদিনে বোধ হয় আরও সুন্দর হয়েছে। ডাগর বাড়ন্ত গড়ন—চোখ দুটোয় কি যেন নেশা মাখানো। ললিতা তাকে দেখে মুখ ভার করে থাকবে। ওকে কাছে টেনে নেবে শ্রীনিবাস, আজ সে একজন বড় গাইয়ে—রোজগারও করেছে বেশকিছু। নিজের দাম এইবার বুঝেছে সে, তাই দাবি নিয়েই এগিয়ে যাবে। ওকে কাছে টেনে নিয়ে বলবে শ্রীনিবাস।

—সত্যি দেরি হলে গেল ললিতা।

যোড়ের তিরতিরে জলধারার দু'পাশে জাম-অর্জুন গাছের ছায়া নামবে। ওই জলের রেখার সঙ্গে তাদের জীবনের যেন কোথায় মিল আছে। সে যেন তীরভূমি ছায়ার স্বপ্ন বুকে নিয়ে অধরা ওই চঞ্চল স্রোতের দিকে চেয়ে থাকে—ললিতা ওই জলরেখা। আপন ছন্দে সে বিভোর—মুক্ত। শুধু সুর আর ছন্দে ওই তীরভূমিকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে যায় কোন কল্পলোকের দিকে।

কিন্তু সব আলো এক ফুৎকারে কে নিভিয়ে দিল শ্রীনিবাসের জীবনে। ললিতা আর গ্রামে নেই। মনোহর মেয়ের বিয়ে দিয়েছে। জামাই নাকি বেশ পয়সাওয়ালা, অবশ্য দোজপক্ষের জামাই। কি যেন রোগে ভুগছে। জেনেশুনেই মনোহর পয়সার লোভে ললিতার মত মেয়ের বিয়ে দিয়েছে ওর সঙ্গে। সদরে জামাই-এর বেশ চালু কারবার। লোকে বলে মনোহর জেনেশুনেই মেয়েকে পয়সার সঙ্গে বিয়ে দিয়েছে।

শ্রীনিবাস চুপ করে বসে কথাগুলো শোনে গুপীর চায়ের দোকানে। তার মনে হয় এসব যেন মিথ্যা, আবার ললিতাকে দেখবে ওই বনকাটির আমবাগানে। কার ডাকে মুখ তুলল শ্রীনিবাস। নরু চাটুজ্যে ওকে দেখে হাসছে। লোকটার জিবে যেন হুল আছে। শীর্ণ পাকানো চেহারা। হেঁপো রুগী নরু চাটুজ্যে বলে—

—কবে এলি রে চিনিবাস? শুনলাম জব্বর গেয়েছিস এবার মাথুর পালা, তা এবার রাধিকাই যে ভেগে গেল র‍্যা? ললিতা সখী যে কাট্। অ্যাঁ।

নিজের রসিকতায় নিজেই খ্যাঁক খ্যাঁক করে হাসছে নরু। গলা নামিয়ে শোনায় নরু চাটুজ্যে।

—ছুঁড়িটাও মহা ত্যাঁদড়, না হলে এই ঘাটের মড়ার সঙ্গে ড্যাং ডেঙিয়ে ঘর করতে যায়? বুঝলি বাবা—দুনিয়া এই এরই বশ। প্রেম—ধ্যাৎ।

দুটো আঙুলে টাকা বাজানোর ভঙ্গি করে সে। শ্রীনিবাস চটে ওঠে, মনে মনে গজরায়। নরু উপদেশ দিতে ছাড়ে না—ওসব মাদীগিরি ছাড় চিনিবাস। কেত্তন-ফেত্তন ছেড়ে কাজটাজ কর—দ্যাখ কতো ছুঁড়ি জুটবে।

সরে এল শ্রীনিবাস। তবু কথাটা তার মনে একটা সাড়া তুলেছে।

সেই চাপাপড়া রাগটা প্রকাশ করে শ্রীনিবাস বাবার উপরেই। গদাধরও ক'দিন ধরে দেখছে শ্রীনিবাসকে। কেমন চুপ করে থাকে, কথাবার্তা বিশেষ বলে না। গদাধর ইতিমধ্যে ছেলেকে কীর্তনীয়া তৈরি করার জন্য উঠেপড়ে লেগেছে। চৈতন্যচরিতামৃত-চৈতন্যভাগবত-দাসলীলা—আরও সব বই-পত্র সে এনেছিল, সেইগুলো পড়তে দিয়েছে, সকাল-সন্ধ্যা রেওয়াজ করতে বলে, তবু শ্রীনিবাসের কোনদিকে খেয়াল নেই। গদাধর ছেলেকে তাই বলেছে কথাটা।

—এ সাধনার পথ, ভক্তিমার্গের পথ শ্রীনিবাস।

শ্রীনিবাসের মনে তখন নরুর কথাগুলো জ্বালা ধরিয়েছে। বাবার কথায় জবাব দেয়—ওসব আমার হবে না।

তার কাছে মনে হয় ওই কেত্তন গাওয়া নাকি সুরে কেঁদে বিরহ বর্ণনা করা মেয়েছেলের কাজ, চপওয়ালীদের মত ইনিয়েবিনিয়ে সে কীর্তন গাইবে না।

গদাধর চটে ওঠে—গাইতেই হবে তোকে। বাঁদরামি ছাড় চিনিবাস, ঢের হয়েছে ওসব নষ্টামি। কাল থেকে রেওয়াজ কর—করতে হবে। তিনপুরুষের বিদ্যে—উনি বলেন কি না চপওয়ালীগিরি।

গদাধর শেষ কথা শুনিয়ে যায় তাকে। শ্রীনিবাস বুনো মোষের মত গোঁ ধরে দাঁড়িয়ে থাকে, এ পথে সে যাবে না কীর্তন গাইতে গিয়েই তার সব গেছে, ললিতাও হারিয়ে গেছে। চুপ করে বের হয়ে এল বাড়ি থেকে। বাড়িতে যেন মন টেঁকে না।

সন্ধ্যা নেমেছে। শালবনে হাওয়ার সুর বদলে যায়। ঘুমের আবেশ নামে, বাতাসে ভেসে আসে কুর্চিফুলের মিষ্টি গন্ধ, একপশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে তাই আকাশটা তখনও থমথমে রয়েছে, কোথায় মেঘের আড়ালে দু-একটা তারা জ্বলছে, তারাও যেন ভয়ে ভয়ে চেয়ে আছে ঘুমনামা পৃথিবীর দিকে। ফিরছে শ্রীনিবাস। বাঁশগাছে বাতাস তখন লুকোচুরি খেলছে।

ফিকে ফিকে অন্ধকারে কাকে দেখে দাঁড়াল শ্রীনিবাস।

প্রথমে চিনতে পারে নি। পরনে তার লালপাড় হলুদ জমির শাড়ি—সিঁথিতে সিঁদুর, হাতের সোনার চুড়িগুলো মিষ্টি সুর তোলে।

—ললিতা!

ললিতাও ওকে দেখে দাঁড়িয়েছে, তার সারা দেহে এসেছে নিটোল পূর্ণতা, যৌবনের ঢল নেমেছে সারা দেহে। চোখদুটো আরও উছল লাস্যময়। ললিতা শোনায়। যাক ফিরেছ তাহলে? শুনলাম ছিরাধিকে সেজে ইনিয়ে-বিনিয়ে কেত্তন গেয়ে খুব নাম-যশ করেছো?

শ্রীনিবাস চমকে ওঠে, ললিতার মুখে এমনি তীব্র ঠাট্টার সুরে ওই কথাগুলো শুনবে ভাবে নি সে। ক' মাসের মধ্যেই ললিতাও একেবারে বদলে গেছে। শ্রীনিবাস বেদনাহত কণ্ঠে আর্তনাদ করে ওঠে—ললিতা!

ললিতা কৃত্রিম ভয়ে যেন শিউরে ওঠে—ও মা! গায়ে-হাত দেবে নাকি?

শ্রীনিবাস হয়তো চুল ধরেই টেনে

বসতো আগেকার মত, কিন্তু ওর কথায় ওই শাণিত হাসিতে আজ কঠিন আঘাত দিয়েছে শ্রীনিবাসকে, সে জেনেছে ললিতাও আজ তাকে ঠাট্টা করে, শ্রীনিবাস জবাব দেয় না।

ললিতার জিবে কিছুই আজ আটকায় না। সেও যেন জ্বলছে, তবে কি সে বেদনা তার খবর রাখে না শ্রীনিবাস। তাই ললিতার কথাগুলো তার মনেও জ্বালা ধরায়। তীব্র জ্বালা।

—মুরোদ বোঝা গেছে তোমার। পথ ছাড়ো—আর কোনদিন পথে হ্যাংলার মত চেয়ে থেকো না। তোমার মান-সম্মান না থাকতে পারে—আমার আছে। মাদী কোথাকার!

ললিতা ওর মুখের উপর সজোরে যেন কয়েকটা চড় কসে দিয়ে গেল। শ্রীনিবাস বিবর্ণ মুখে দাঁড়িয়ে আছে, তার শেষ আশ্রয়টুকুও হারিয়ে গেছে।

গ্রামে থাকারও ইচ্ছে নেই তার। কি রইল তার জানে না? এখানে থাকলে ওই অপমানটাকেই সইতে হবে—আর বাবার চাপে পড়ে কেত্তন গাইতে হবে। সবটাই তার কাছে অসহ্য ঠেকে। এখানে আর কোন সান্ত্বনা নেই।

সব হারিয়ে গেছে তার।

তাই সেই রাতের অন্ধকারেই শ্রীনিবাস হারিয়ে গিয়েছিল। কি যেন খেয়ালের বশেই চলে এসেছিল শালবন—অনেক পথ পার হয়ে সদর শহরে।

গদাধর যখন জানতে পেরেছিল তখন বেশ কয়েকদিন পার হয়েছে, সেদিনই শ্রীনিবাস করাচী বন্দর থেকে জাহাজে উঠে চলেছে হাজারো মানুষের সংগে অজানা সমুদ্রে অনির্দিষ্ট লক্ষ্যে। আজ বেশ-বাস তার বদলে গেছে। পরনে ধুতি-চাদর নেই—সেই বাবরি চুল কেটে ফেলেছে মুছে গেছে নাকের রসকলি, গলার কণ্ঠিও ছিঁড়ে ফেলেছে। পরনে আজ খাকি প্যান্ট-সার্ট পায়ে পাঁচসেরী বুট, মাথায় লোহার হেলমেট। জাহাজের ওয়াচ ডেকে দাঁড়িয়ে আছে শ্রীনিবাস দিগন্তের দিকে সন্ধানী দৃষ্টি মেলে—কোথায় শত্রুপক্ষের কোন সাবমেরিন বা এরোপ্লেন দেখা যায় কি না তারই সন্ধানে। সবকিছু বদলে গেছে শ্রীনিবাসের—অতীতের সব পরিচয় সে মুছে ফেলতে চায়।

—এই চিনিবাস! হল চায়ের গেলাসটা?

শূন্য গেলাসটা তুলে নিয়ে গেল চায়ের দোকানের ছেলেটা। খদ্দের লেগেছে। একটা বাস এখুনি দুর্গাপুর থেকে বাঁকুড়ার দিকে চলে গেল তাদের স্টপেজ-টাকে ছুঁয়ে। শ্রীনিবাস একটু নড়ে বসল—উঠে যাবে কোথায় জানে না। কাজ তার নেই। এখন শুধু মাসে মাসে সরকার থেকে বরাদ্দ হয়েছে তার মত পংগু একটা মানুষের জন্য মাসিক তিরিশ টাকা মাত্র। একটা পা নেই কাঠের পা'টা খুলে রেখেছে পাশে। দুপুরের রোদে শালবনটা ঝিম হয়ে আছে যেন নেশার ঘোরে, কেঁদগাছে এসেছে হলুদ গোল গোল ফলের রাশি। মনোহরের ধানকলের বয়লার থেকে একটানা গর্জন ওঠে হিস্-স্-হিস্-স্। একটা ট্রাক বেগে ছুটে চলেছে, ওর ডিস্ট্রিবিউশন প্লাগ থেকে পর পর কয়েকটা বিস্ফোরণের শব্দ ওঠে। নীরব ছায়াঘেরা ঠাঁইটা সেই প্রচন্ড শব্দে ভরে ওঠে। ফট্-ফট্...ফটাস...!

চমকে ওঠে শ্রীনিবাস। ওই শব্দগুলো তার খুব চেনা। তার জীবনের এই চরম সর্বনাশের সংগে ওরাও জড়িয়ে আছে।

ধু-ধু মরুভূমি বালি আর বালির পাহাড়। সমুদ্রের ঢেউগুলো যেন হঠাৎ বালিতে পরিণত হয়েছে। তারই বুক চিরে চলেছে ওরা, কীর্তনীয়া শ্রীনিবাস আজ থার্ড ইন্ফেণ্ট্রি রেজিমেন্টের একজন নায়ক মাত্র, তার নাম নেই। গলার চাকতিতে একটা নাম্বার ঝুলছে। দূর-দিগন্তে ওঠে বিস্ফোরণের শব্দ। কালো ধোঁয়া আর বালিতে বাতাস ভারী হয়ে উঠেছে। ট্রাক ট্যাংকগুলো এগিয়ে চলেছে। ধোঁয়া ধুলোয় দৃষ্টি আচ্ছন্ন হয়ে যায়। হঠাৎ আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে এগিয়ে আসে কারা। বালির স্তূপে উঠেছে প্রচন্ড বিস্ফোরণের শব্দ। চারিদিকে যেন ওরা উন্মাদ আক্রোশে বালিগুলোকেই আকাশে তুলে ফেলবে। ওঠে মেসিনগানের শব্দ। কে চিৎকার করে।

—লে ডাউন! ইউ ওডাস্ সন্ অব্ এ্যা বিচ!

চমকে ওঠে শ্রীনিবাস। সামনে দাঁড়িয়ে আছে ললিতা—পরনে সেই লাল ডুরে শাড়ি, সিঁথিতে সিঁদুর মুখে তার ব্যংগের হাসি মাদী কোথাকার! কালো ছায়াটা নেমে আসছে। শ্রীনিবাস তার সব শক্তি একত্রিত করে ওই নিচে আসা প্লেনটাকে তার অটোমেটিক দিয়ে ফায়ার করছে, প্রচন্ড বিস্ফোরণে কেঁপে ওঠে চারিদিক। কে যেন তাকে শূন্যে তুলে ছিটকে ফেলে দিল—ওপাশে আগুন জ্বলছে, কালো ধোঁয়ায় আর অসহ্য যন্ত্রণায় তার জ্ঞান হারিয়ে যায়। বাবা ললিতা ওরা সব কোন দূর-দিগন্তে হারিয়ে গেছে।

জ্ঞান ফেরে শ্রীনিবাসের বেস হাস্পাতালে। সারা শরীরে অসহ্য যন্ত্রণা। বাতাসে ওঠে ওষুধের তীব্র গন্ধ। জুতোর শব্দ তুলে নার্সরা ঘোরাফেরা করছে। হঠাৎ অস্ফুট আর্তনাদ করে ওঠে শ্রীনিবাস! তার পা!...ডান পা'টা নেই!... কেটে বাদ দিতে হয়েছে। কঠিন একটা আঘাতে স্তব্ধ হয়ে গেছে। দু' চোখ ফেটে জল নামে। এর চেয়ে মরাই ছিল ভালো। অক্ষম পংগু একটা মানুষ—তবু

তাকে বেঁচে থাকতে হবে এই নিদারুণ অভিশাপ সহ্য করে।

বেস হাসপাতালে দীর্ঘ কয়েক মাস কাটিয়ে ওরা তাকে জাহাজে তুলে পাঠিয়ে দিল ভারতবর্ষে—বোম্বাই হয়ে এসে ভর্তি হল পুনায়। হাসপাতালের জানলা দিয়ে দেখা যায় দূর-দিগন্তে কালো ধোঁয়াটে পাহাড়গুলো; ইতিহাসে পড়েছিল শিবাজীর কথা। পাহাড়ের ওদিকে রায়গড়-সিংহগড়—আরও ওপাশে খাণ্ডা-দ্বার গিরিদুর্গ। জানলা দিয়ে দূরে পাহাড়ের মাথায় সাদা বিন্দুর মত তরানী মন্দিরটা দেখা যায়—ওখানে যাবার সাধ্য আর তার নেই।

খট্ খট্ খট্। তবু হাঁটবার চেষ্টা করে শ্রীনিবাস। দীর্ঘদিন পর সে আবার হাঁটার চেষ্টা করছে সরীসৃপের মত। ক্লান্তি আসে—হাঁপাচ্ছে সে।

সেই অক্ষম পঙ্গু মানুষটাকে আজ ওরা বাতিলের দলে ফেলেছে—তার জন্য মাসিক বরাদ্দ হয় মাত্র তিরিশ টাকা। আব ওই কাঠের পা'টা তারা ভেঙে গেলে বদলে দেবে এখানে এনে, তার জন্য শ্রীনিবাসের কোন খরচ লাগবে না।

বহুদিন পর বাড়ি ফিরছে শ্রীনিবাস। ফেরার আর কোন ঠাঁই তার নেই।

একদিন সে খোলকত্তাল ফেলে কীর্তন বন্ধ করে যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়েছিল; হিটলারের জার্মানবাহিনীর সঙ্গে মুখোমুখি যুদ্ধ করে তাদের হারিয়েছিল এই বলে সে-কথাটা ফলাও করে বের হয়েছিল কাগজে, আজকের মানুষ সে সব ভুলে গেছে। শ্রীনিবাস নিজেও। তাই অতীতের সেই ফেলে-আসা ছায়াচ্ছন্ন গ্রাম—সেই চেনা মানুষগুলোর কথা মনে পড়ে; মনে পড়ে ললিতার কথা, সে-ও আজ বোধহয় তাকে ভুলে গেছে, অনেক পয়সার মালিক তার স্বামী। আজ সে-ও বদলে গেছে।

বদলে গেছে এখানকার পরিবেশও। দুর্গাপুর স্টেশনে নামল কয়েক বছর পর অন্য একটি মানুষ। যেদিন প্রথম তারা যুদ্ধে যায় এখান থেকে সেদিন স্টেশনে এসেছিল ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব জেলার চোমরা-চোমরা অনেকেই। বাদ্য-বাজনা বেজেছিল—কে মালা পরিয়ে দিয়েছিল তাদের গলায়, আজ! তাকে কেউ চেনে না। মনে হয় নিরানন্দভাবে ঠকে গেছে শ্রীনিবাস। আজ সে একটা পঙ্গু মানুষ—কাঠের পা'খানা ঠুকে ভিখারীর মত হেঁটে হেঁটে স্টেশনের বাইরে এসে দাঁড়াল। আজ সেই শালবনঘেরা ছোট্ট স্টেশনটাও বদলে গেছে। আশে-পাশে ঝকঝকে গাড়ি, বাস দাঁড়িয়ে আছে, বড় বড় চিমনীগুলো দিয়ে ধোঁয়া বের হচ্ছে। মানুষ একে কেন্দ্র করে গড়ে তুলেছে নতুন জগৎ। হাজার হাজার মানুষ আজ এখানে এসে বাসা বেঁধেছে। দুর্দান্ত দামোদর নদীকেও বেঁধে ফেলেছে ওরা—তার ওপর দিয়ে ছুটে চলেছে বাসগুলো।

এই পরিবর্তনের ঢেউ এসে লেগেছে তাদের সুপ্তিমগ্ন ছায়াঢাকা গ্রামসবুজেও। গ্রামের মানুষ আজ অনেকেই চাষ-বাস ছেড়ে দুর্গাপুরে কাজকম্মো করছে, প্যান্ট সার্ট পরে যাতায়াত করে, রাস্তার ধারে মাথা তুলেছে কতকগুলো নতুন পাকাবাড়ি—ওপাশে বিরাট ধানকল, গড়েছে মনোহর। যুদ্ধের বাজারে জামাই-এর পয়সায় সে-ও লাল হয়ে গেছে।

বাসটা তাকে এই নতুন গড়ে-ওঠা উপনিবেশের ধারে নামিয়ে দিয়ে চলে গেছল সদরের দিকে। একা আজ শ্রীনিবাস দীর্ঘদিন পর এই জগতে ফিরে এসেছে।

—ছিরিনিবাস না?

এগিয়ে আসে নরু চাটুজ্যে, চেহারা আরও টিকটিকির মত হয়ে উঠেছে। সাঁই সাঁই করছে হাপরের মত। তবু ওর মুখখানা বদলায় নি, সে অবাক হয়ে দেখছে আজকের শ্রীনিবাসের ধ্বংসস্তূপের মত দেহটাকে। দু-এক কলি ইংরাজীও আওড়ায় সে।

—ফিরে এলি তাহলে। হোম কাম্‌স দি ওরিয়র। অ্যাঁ।

ওরও বন্ধু দু-চারজন ওকে ঘিরে ধরে, পটলা দত্তদের গগন, নেউল মায় গুপীও। কতকগুলো ছোট ছেলেও ভিড় করেছে। ওরা তাকে চেনে না—কৌতূহলী দৃষ্টি মেলে চেয়ে দেখে মাত্র ওর কাঠের সেই পায়ের দিকে। কান পেতে শোনে তার চলার বিচিত্র শব্দটা।

কোথায় ধ্বংসপুরীতে ফিরে এসেছে এই শ্রীনিবাস। তার জীবনের সঙ্গে এই বাড়িটারও নিবিড় মিল রয়েছে। একদিন সুর উঠেছিল জীবনে—সব সবুজ সেদিন ধরা দিয়েছিল, তারপর কি নিষ্ঠুর আঘাতে তার সবকিছু বিবর্ণ হয়ে গেছে—ঝরে গেছে। এই বাড়িটাতেও একদিন ছিল সুখ-শান্তি আর পূর্ণতা। বাবা মা ছিল, সেই পূর্ণতার দিনগুলো আজও এখানের বাতাসে মিলিয়ে আছে এই ধ্বংসপুরীর মধ্যে। বড়ঘরখানা ছাউনি অভাবে পড়ে গেছে, টিকে আছে ছোট্ট রান্নাঘরটুকু—প্রাচীল-পাঁচিলও নেই; উঠোনে গজিয়েছে কালকাসিন্দের জঙ্গল—তুলসী-মঞ্চের গাছটাও মরে গেছে কবে। বাবা মারা যাবার কয়েক মাস পরই মা-ও চলে যায়। শ্রীনিবাস দাঁড়িয়ে আছে এই শূন্য, ধ্বংসপুরীতে। নিজের দেহ আর মনের সেই বেদনা-নিঃস্ব ধ্বসে-পড়া শ্রীহীন বাড়ির সঙ্গে তাই একাত্ম হয়ে গেছে। মনে হয় মিশরের মরুভূমির বুকে সেদিন যদি শেষ হয়ে যেত, হয়তো ভালোই হতো, জীবনের এই কঠিন পরিহাসটুকুকে দেখতে হতো না। মনে হয় এর চেয়ে এখানে না ফেরাই ছিল ভালো, পুনায় থাকলে কোনখানে কাজকম্মো ওরা জুটিয়ে দিতে পারতো—পঙ্গু মানুষটা তবু সে-সব ছেড়ে তার গ্রামে ছুটে এসে-ছিল—থাকতে পারে নি সে। এই মাটি-শালবন-গ্রামসবুজ এই চেনামুখগুলো তার মনে কি ব্যাকুলতা এনেছিল। আজ এখানে এসে দেখে নিষ্ঠুর বাস্তব আর কল্পনা এই দুয়ের মধ্যে মিল কোনখানেই নেই।

ক'দিন এসেছে শ্রীনিবাস। দিন কাটে কোনরকমে, মাসিক তিরিশ টাকা বরাদ্দে আজ বেঁচে থাকা যায় না। গুপীর চায়ের দোকানে এসে বসে থাকে তবু লোকজন কিছু দেখতে পায়। ওরা সুস্থ সবলদেহে বেঁচে আছে, বাসে ঝুলে হৈ হৈ করে দুর্গা-পুর কারখানায় কাজ করতে যায়। রাস্তা কাঁপিয়ে দানবের মত ঝড় তুলে ছুটে যায় ট্রাকগুলো। ডাঙার ওদিকে মনোহরের ধানকলের বয়লারটা হিসহিস গর্জনে বাতাস ভরিয়ে রাখে। লোকজন কাজ করে সেখানে। মনোহরও যুদ্ধের বাজারে গুছিয়ে নিয়েছে। আর গদাধর—তার নামও মুছে গেছে এখান থেকে, শ্রীনিবাসকে আজ অনেকেই চেনে না।

সন্ধ্যা নামছে। দু-একটা বিজলী বাতি জ্বলে ওঠে ধানকলে, দত্তদের দোকানে ও গুপীর চায়ের দোকানেও বিজলী এসে গেছে। কে খবরের কাগজ পড়ছে—এর বাইরেও বিস্তৃত বিশাল জগৎ একটা আছে। মিশর আর ইসরায়েলে যুদ্ধ বেধেছে। মিশর!...বালির দেশ আর খেজুরগাছ!...নিজের আধখানা পায়ে হাত বুলোয় শ্রীনিবাস—সে দেশের সঙ্গে তার অনেক বেদনাময় স্মৃতি জড়িয়ে আছে।

উঠে পড়ল সে। কাঠের পায়ে ঠক্ ঠক্ শব্দ তুলে চলেছে একটা জানোয়ারের মত। অন্ধকার নেমেছে গ্রামে। বাঁশবনে উথালপাথাল বাতাস সাড়া তোলে—কোথায় ফুটেছে বকুল গন্ধ বাতাসে তারই খবর ভেসে আসে। দু-একটি তারা উঠেছে ভীরু চাহনিতে তারা চেয়ে আছে!...হঠাৎ কাকে দেখে থমকে দাঁড়াল শ্রীনিবাস।

—ললিতা!...তুই!

মাসে ৬০০৲ টাকা উপার্জন করুন

অবসর সময়ে বিখ্যাত রোমার ঘড়িগুলির জন্য অর্ডার বুক করিয়া। বিনামূল্যে সর্তাবলী এবং স্যাম্পেল ঘড়ির জন্য পত্র লিখুন।
TAJ CO. (WBC—88)
P. Box 1383, Delhi—6.

চমকে ওঠে শ্রীনিবাস। মনে হয় চারিদিকে শুধু হারাবারই পালা। তার জীবনে সেই নিষ্ঠুর অভিশাপের বেদনা সে বুঝেছে, কিন্তু ললিতাকে এমনি অবস্থায় দেখবে ভাবে নি। আজ তার টাকার অভাব নেই সব এসেছে তার, ধূর্ত বাবা ওই মনোহর দাসের হাতে। ললিতাকে সে টাকার জন্যই বুড়োর সংগে বিয়ে দিয়েছিল, কয়েক বছরের মধ্যেই সে মারা যায়—মনোহর তখন সবই গ্রাস করেছে। ললিতার পরনে আজ সাদা থান—সুন্দর নিটোল হাতদুটো শূন্য। সিঁথির সিঁদুরও মুছে গেছে। রিক্ত ব্যর্থ নিরাভরণ একটি নারী, শুধু ব্যর্থ জীবন-যৌবনের বোঝা বয়ে চলেছে। দু'চোখে তার জল।

ললিতাও তাকে দেখছে। শুনেছিল সে শ্রীনিবাসের কথা। তাকে একদিন অকারণ অপমান আর নিষ্ঠুর অবজ্ঞাই করেছিল বোধহয় তার জন্যই সে নিজেকে মৃত্যুর মুখে তুলে দিতেও দ্বিধা করে নি। কিন্তু মরে নি। ফিরে এসেছে ওই শবলপুরীতে সব হারিয়ে। অতীতের সেই সুন্দর শ্রীনিবাসের কঙ্কালটা যেন তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে—দুজনেই একই বাজের কঠিন আঘাতে শিউরে উঠেছে।

—এ কি হল চিনি?

শ্রীনিবাসের মনে হয় এ যেন তেমন ক্ষতি তার নয়, তার চেয়ে বেশি হারিয়েছে ললিতাই। শ্রীনিবাস জবাব দেয়—কি আর হবে?...কিন্তু তোর? তোর যে সব গেল?

ললিতার ডাগর কালো চোখে জল নামে। কাঁদছে সে। এতদিনের ব্যবধান দূর হয়ে গেছে তাদের মধ্যে, আবার বহু পিছনে-ফেলে-আসা অতীতের বুকেই ফিরে গেছে তারা। আজও শোনে সেই ছায়া-সবুজে হারানো পাখীর ডাক, ফুলের মদির সৌরভ ভেসে আসে বহুদিনের ওপার থেকে।

—সেই দিনগুলোই ভালো ছিল ললিতা। সব কোনদিকে হারিয়ে গেল।

—চিনি!

ললিতার কণ্ঠে সেই আগেকার মিষ্টি সাড়া, চিরন্তন নারী আজ আবার এতকাল পরে এই অন্ধকারে নিজেকে আবিষ্কার করেছে। ললিতা আজ ওকে এখানে একটা চাকরি-বাকরি দিতে পারে, তবু বসে বসে কিছু পাবে শ্রীনিবাস। আর দেখতে পাবে ললিতাকে। ললিতা বলে—কাল দেখা করবো, আজ চলি!

ললিতা চলে গেল। এ যেন অন্য কোন নারী। ওর শূন্য ব্যর্থ জীবনে আবার যেন আশ্বাস জাগে। একেবারে ব্যর্থ বঞ্চিত সে হয় নি জীবনে। একজন এখনও আছে যে তাকে ভালবাসে। এত দুঃখের মধ্যে একটা সান্ত্বনার ঠাঁই তার হারায় নি।

হঠাৎ খ্যাকখ্যাক হাসির শব্দে চমকে ওঠে শ্রীনিবাস। এগিয়ে আসে নরু চাটুয্যে। গ্রামের সবকিছুতেই সে আজও আছে। নরু চাটুয্যের চোখ এড়ায় না কোন কিছু। বলে চলেছে নরু।

—তালে পুরনো রং এখনও বজায় আছে চিনিবাস : এ্যাঁ—মাগীর এখন অঢেল পয়সা বুঝলি, বয়সও তেমন কিছু নয়। রং-ঢংও আছে! আর তোদের পুরনো ভাব—ফুলে পড়। মিলিটারী মানুষ তোরা—সাহস আছে, হিম্মৎ আছে। দে না ব্যাটা মনোহর ওর বাপটাকে আউট করে। ব্যাটার বড় ভাট বুঝলি!... ধরাকে সরা দেখছে মেয়ের টাকায়! তা কি বলে গেল র‍্যা। সি লাভ্‌স ইউ—এ্যাঁ ছাড়িস না মৌকা—

শ্রীনিবাস ওই হেঁপো রুগীটার দিকে চেয়ে থাকে। ওর চোখ দুটো জ্বলছে, পা-ই নেই তবু এখনও ওর শরীরে প্রচণ্ড শক্তি আছে। এসব কুশ্রী ইঙ্গিত শোনে নি সে।

এক লাফে খোঁড়া পা নিয়েই ওর টুঁটি টিপে ধরেছে শ্রীনিবাস—কি বললে?

হাঁপানির রুগী এমনিতেই দম পায় না, ওই টিপুনীর চোটে ছটফট করতে থাকে, চোখমুখ কপালে উঠে গেছে। শ্রীনিবাস কি ভেবে ওকে ছেড়ে দিয়ে বলে, —ফের যদি কোনদিন কোন কথা শুনি জিব টেনে ছিঁড়ে দেব!

কাঠের পায়ের শব্দ তুলে চলে গেল শ্রীনিবাস তার বাড়ির দিকে। নবু চাটুয্যে সামলে নিচ্ছে—মনে মনেও তার জ্বালা অন্তরের ভিতর কুণ্ডলী পাকানো সাপটা জেগে উঠেছে ধীরে ধীরে। নরু চাটুয্যেকে ও চেনে নি—সাপের চেয়েও সে হিংস্র আর নিষ্ঠুর—ওর যত বিষ জমছে শুধু মুখেই। নরু গজরাতে থাকে—আচ্ছা!

অবশ্য নরু চাটুয্যেও বসে নেই। ইতিমধ্যে গুপীর চায়ের দোকানেই কথাটা তুলেছে, মনোহর দাসেরও কানে উঠেছে কথাটা। মেয়ের সম্বন্ধে ও ভাবনা তার ছিলই। তবু ধূর্ত কৌশলী লোক—মেয়েকে চটাতে চায় না। তাই বোধহয় মত দিয়েছে শ্রীনিবাসের কাজের ব্যাপারে। পরে পশ্চাতে যা হয় কল-কাঠি নাড়বে সে।

শ্রীনিবাসও ক'দিনেই চমকে উঠেছে। গুপীর দোকানে পাঁচ গ্রামের লোক যাতা-য়াত করে, ললিতা শ্রীনিবাসকে জড়িয়ে দু-চারটে রসাল কথা তার কানেও এসেছে। ক'দিন গুপীর ওখানেও যায় নি। ললিতাকে এড়াতে চায় সে, বার বার কথাটা ভেবেছে। মনে হয় এ সবের আর কোন দাম নেই। ললিতারই অপমান বাড়বে এতে। তাই ইচ্ছে করেই ক'দিন এড়িয়ে গেছে তাকে।

সন্ধ্যার অন্ধকারে বাড়িতে বসে আছে, চারদিকে ভাঙা প্রাচীর আর নুয়ে পড়া মাটির স্তূপ—কালকাসিন্দের জঙ্গল ঠেলে কাকে আসতে দেখে মুখ তুলে চাইল শ্রীনিবাস। ললিতা এসেছে। আজ সে আরও অনেক সাহসী আরও যেন পূর্ণ রহস্যময়ী হয়ে উঠেছে। ললিতা বলে—মিলেই কাম করবে তুমি। বসে বসে কাম। তবু পঞ্চাশ টাকা মাইনে পাবে। চিনি—

ললিতার দু' চোখে কি এক আলো-ভরা জগতের আমন্ত্রণ, শূন্য ব্যর্থ পঙ্গু একটি মানুষকে আজ সে অন্তর দিয়ে ভালবাসে, ভালবাসে তার সেই হারিয়ে যাওয়া ব্যর্থ যৌবনকে। ওর হাতখানা ললিতার হাতে। বাতাসে কোথায় বাতাবি ফুলের উদগ্র নেশালাগানো সৌরভ। ললিতা বলে—

—তবু তুমি কাছে কাছে থাকবে এই আমার বড় সান্ত্বনা চিনি।

ললিতা সত্যিই অনেক সুন্দর। নরু চাটুয্যের দেওয়া কলঙ্ক ওকে স্পর্শ করবে না। ব্যর্থ জীবনের সব সৌন্দর্য নিয়ে সে বেঁচে থাকবে শ্রীনিবাসের স্বপ্নমনে—তাকে প্রত্যহের কালিমায় কি কালো করতে পারে শ্রীনিবাস।

রাত কত জানে না। ফিরে গেছে ললিতা। শ্রীনিবাস তখনও কথাটা ভাবছে। এই গ্রাম—তার সেই দিনগুলো—ভালবাসার স্বাদ সব ফুরিয়ে গেছে। আর তা শুধু অতীতেই —ব্যর্থ অতীত। তার মতো আজকের পঙ্গু শ্রীনিবাসের কোন ঠাঁই নেই। সে হারিয়েই যাবে। তাই বোধ-হয় কাঠের পা'খানাকে ঠুকে ঠুকে ভিজে ফেলে শ্রীনিবাস এইবার পানাগড় বেস-এ গিয়ে রিপোর্ট করলেই ওরা তাকে সেই দূর পুনায় পাঠিয়ে দেবে—হয়তো সেখানে একটা কাজকম্মো কিছু জুটবে, আবার নতুন কাঠের পা'ও বানিয়ে দেবে তারা।

চলে যাবার আগে ভোরের প্রথম আলোয় শুকতারা জাগা আকাশের দিকে চেয়ে শ্রীনিবাসের বোধহয় ললিতার মুখ-খানা মনে পড়েছিল—অমনি ডাগর দুটো চোখের চাহনিও। তবু স্মৃতি সে স্মৃতিই থাক। শ্রীনিবাস তার জের টানতে চায় নি। তাই বিস্মৃতির অতলে হারিয়ে গেছে সে। আজকের পাঁচ গাঁয়ের কর্মব্যস্ত মানুষ সেই শ্রীনিবাসের কথা বোধহয় ভুলে গেছে। ললিতা হয়তো তার কথা ভাবে।

কে জানে সেও হয়তো ভুলে গেছে তাকে।

পূর্ব জার্মানী ও সোভিয়েট

অশোক সেন / দেশ পরিক্রমা

১৯৬৮ সালের ব্রেশ্‌ট ডায়ালগে অংশ গ্রহণ করবার জন্য বার্লিনার আসেম্বল থেকে আমন্ত্রণ এল—৯ই ফেব্রুয়ারী থেকে ১৬ই ফেব্রুয়ারী অবধি এই ডায়ালগের কার্যকাল—সুতরাং দু-এক দিন আগেই রওনা হওয়া দরকার।

কিছুকাল আগেই এখানকার জার্মান ডেমোক্রেটিক রিপাব্লিকের প্রধান কর্মকর্তা মিস্টার রেডার আমাকে ইঙ্গিত দিয়েছিলেন যে আমাকে হয়তো এ বছরে একবার পূর্ব জার্মানী সফরে যেতে হতে পারে—তাঁদের ব্যবস্থায়। তাই আগে থেকেই পাসপোর্ট করিয়ে রেখেছিলাম। কিন্তু এত তাড়াতাড়ি আমন্ত্রণ আসবে ভাবতে পারি নি—বিশেষত ব্রেশট ডায়লগের তরফ থেকে। যাই হোক 'পি' ফর্ম পাবার জন্য প্রচুর আয়াস করতে হল—যাবার আগের দিন 'পি' ফর্ম পেয়েও গেলাম। আগেই বার্লিনার আসেম্বল এয়ার টিকেট পাঠিয়ে দিয়েছিলেন—মিস্টার রেডার চিঠি দিলেন যে বার্লিন পৌঁছিয়েই রিটার্ন টিকেট পেয়ে যাব। আমার এই পূর্ব জার্মানীতে গিয়ে ব্রেশট ডায়ালগে অংশ গ্রহণ করার ব্যাপারে সমস্ত ব্যবস্থাই সম্ভব হয়েছে এই মিস্টার রেডারের সাহায্য এবং প্রচেষ্টায়। পূর্ব জার্মানীর থিয়েটারকে এখন দুনিয়ার সবসেরা রংগমঞ্চ বলা চলে—বিশেষত ব্রেশ্ট পার্টির স্থায়ী রংগমঞ্চ হচ্ছে পূর্ব বার্লিনে। আমার সংগে বার্লিনার আসেম্বলের তরফ থেকে চিঠিপত্র দিচ্ছিলেন ভারনার হেস্‌ট—ওখানকার লিটারারি ডিরেক্টর। ৬ই ফেব্রুয়ারী দমদম থেকে এয়ার ইণ্ডিয়ার প্লেনে রওনা হলাম। সকালে কায়রোতে নামিয়ে দিল এবং ওঠালো নিয়ে হোটেল ক্লিওপাট্রাতে—পরের দিন সন্ধ্যায় পূর্ব জার্মানীর প্লেন ইণ্টারফ্লুগে বার্লিন যাব। দেড় দিনে আর কায়রোর কতোটা দেখা যায়—তবু নীল নদ, মিউজিয়াম এবং পায়ে হেঁটে যতোটা পারা যায় দেখে নিলাম। আমার সম্বল মাত্র সাড়ে তিন পাউণ্ড—তার থেকে এক পাউণ্ড যাবে কায়রোর পোর্ট ডিউটিতে। পিরামিড দেখতে যাবার সুযোগ হোল না পয়সার অভাবে।

ইজিপ্টের লোকেরা ভারতীয়দের অন্তর থেকে ভালবাসে—তারা জানে ভারতীয়রা তাদের বন্ধু—আলাপ করতে এগিয়ে আসে—কফি খেতে আমন্ত্রণ জানায়—অনেকের সংগেই রাস্তায়-ঘাটে আলাপ হোল—বেশ ভালই কাটল দেড় দিন।

পরের দিন দুপুরে হোটেল থেকে বেরিয়ে আশ্রয় নিলাম ইউ-এ-আর অফিসে—উল্টো দিকে ইণ্টারফ্লুগের অফিস তখনও বন্ধ। এখানে একজন ওয়েস্ট জার্মান যুবকের সংগে আলাপ হোল—ছেলেটি ইংরাজী জানাতে দু'জনে আড্ডা দিয়ে কাটালাম ঘণ্টা দুয়েক—তারপর গেলাম এয়ারপোর্টে। ওখানে আর একটি জার্মান যুবক এসে আমাদের সংগে যোগ দিলেন—ইনি পূর্ব জার্মানীর অধিবাসী—প্লেনে এ'দের সংগে গল্প-গুজবে বেশ সময় কেটে যেতে লাগল।

পূর্ব বার্লিনের এয়ারপোর্টের কাছাকাছি এসে জানতে পারলাম ফগের জন্য নিচে নামা যাবে না—আমাদের নিয়ে যাওয়া হবে প্রাহাতে। সে রাত্রিটা এবং পরদিন দুপুর অবধি প্রাহাতে কাটাতে হোল বাধ্য হয়ে—আমাদের হোটেলটি ওখানকার একটি পস্‌ হোটেল—নাম ইণ্টারন্যাশনাল হোটেল। সকালে ভাল ব্রেকফাস্ট দিল—পোচ্‌ড এগ্‌স, বেকন, ব্রেড এবং বাটার ইত্যাদি।

দুপুরের প্লেনে ঘণ্টাখানেকের ভেতরই এসে বার্লিনে নামলাম—সেখানে মিনিস্ট্রি অব্‌ কালচারের তরফ থেকে মিনিস্টার জাইডেলমান উপস্থিত ছিলেন। তিনিই ছাড়পত্রের ব্যবস্থা করলেন এবং গাড়িতে করে এনে ওঠালেন বার্লিনের সব থেকে ভাল হোটেল উন্‌টার ডেনলিন্ডনে। গাড়িতে আসবার সময় চমৎকার লাগছিল বাইরের দৃশ্যাবলী—চারদিক বরফে ঢাকা। বাইরে খুব ঠাণ্ডা থাকলেও হোটেলের ভেতর সেণ্ট্রাল হিটিং-এর কৃপায় মনে হচ্ছিল যেন নিজেদের দেশের ক্লাইমেট উপভোগ করছি।

হোটেলের একটি বিরাট হলঘরে বার্লিনার আসেম্বলের অফিস করা হয়েছে—আমরা আসতেই সেখানে রিপোর্ট করতে হোল এবং সংগে সংগে আমাদের প্রত্যেককে আট দিনের টাকা তিরিশ মার্ক দিন হিসাবে ২৪০ মার্ক দিয়ে দিলেন

একজন কর্মচারী—সঙ্গে প্রতিদিনের জন্য থিয়েটার, ব্যালে, ওপেরা প্রভৃতির টিকেট। প্রতিদিনের কার্যসূচীও পেয়ে গেলাম—সকাল—দুপুরে ব্রেশটের নাটক, প্রডাকসন, এ্যাকটিং, সেট্-ডিজাইন ইত্যাদি ব্যাপারে নানা বিশেষজ্ঞদের আলোচনা হবে—তাছাড়া অনুবাদকদেরও স্ব স্ব অভিজ্ঞতা বিষয়ে কথাবার্তা বলবার সুযোগ দেওয়া হয়েছে দেখলাম। আমি ট্রান্স্লেটর কমিটিতে থাকাতে হেলেনা ভাইগেলের সঙ্গে প্রত্যক্ষ আলাপ করবার একটা সুযোগ পেয়ে গেলাম—এই কমিটিতে ছিলাম আমি, একজন মেক্সিকেন, একজন ফরাসী এবং একজন আমেরিকান। আর থাকতেন হেলেনা ভাইগেল, ভারনার হেসট এবং ব্রেশটের ওয়েস্ট জার্মান পাবলিশার। দিন চারেক আমাদের আলোচনা সভা বসেছিল—সঙ্গে সব সময়েই আমাদের দোভাষী—মিস কারিন ফিক্লারও থাকতেন। হেলেনা ভাইগেল এবং ভারনার হেসট্ অবশ্য ইংরাজী জানতেন। আমাকে জিজ্ঞেস করা হোল ভারতবর্ষে মাতৃভাষায় ব্রেশটের নাটক অনুবাদ করতে গিয়ে আমার কি কি অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয় এবং আমাদের দেশে ব্রেশটের প্রভাব কি রকমের। আমি এ'দের জানালাম যে আমাদের দেশে ব্রেশটের সেট্জুয়ান, চক্ সারকল্, গ্যালিলিও, দি এক্সেপশন্ এণ্ড দি রুল, দি ডিসিপ্লিনারি মেজার প্রভৃতি নাটক অনুবাদে যথেষ্ট মঞ্চসাফল্য পেতে পারে—এবং এক চক্ সারকল্ বাদে বাকী ক'টিই অনূদিত হয়ে মঞ্চসাফল্য লাভ করেছে—আমি নিজেই সেট্জুয়ান অনুবাদ করে যথেষ্ট সাফল্যের সঙ্গে মঞ্চস্থ করেছি। মাদার কারেজ জাতীয় নাটক আমাদের দেশে মঞ্চসাফল্য পাবে না—কারণ সাধারণ দর্শকেরা ইওরোপীয়ান ইতিহাস এবং রাজনীতি সম্বন্ধে তেমন কোনো খোঁজখবর রাখেন না। তবে বিদগ্ধ ব্যক্তিরা এই জাতীয় নাটক পড়ে আনন্দ পান।

একথাও বললাম জার্মান ভাষা না জানা থাকাতে আমাদের বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই ব্রেশটের নাটকের অনুবাদ করতে হয় ইংরাজী অনুবাদ থেকে। এবং এই সব ইংরাজী অনুবাদে ব্রেশটের রচনার স্বাভাবিক সৌন্দর্য আমরা খুঁজে পাই না—উপস্থিত সবাই এবং অন্যান্য অনুবাদকেরা এ বিষয়ে তাঁদের সমর্থন জানালেন।

হেলেনা ভাইগেলের ব্যক্তিত্ব এবং চমৎকার ব্যবহার আমাকে মুগ্ধ করেছিল। বলা বাহুল্য যে আজ তিনি পৃথিবীর সবসেরা অভিনেত্রী। ১৯৫৬ সালে তাঁকে দেখেছিলাম ব্রেশটের দুটি বিখ্যাত নাটক—মাদার কারেজ এবং ককেশিয়ান চক্ সারকল নাটকে অভিনয় করতে। তিনি যে কতবড় শিল্পী সে কথা তখনই অন্তর থেকে উপলব্ধি করতে পেরেছিলাম—এবার গকীর মাদার, কোরিয়োলান প্রভৃতি নাটকে তাঁকে দেখলাম—তাঁর বয়স এখন সত্তরের কোঠায়, তবে অভিনয়-প্রতিভা এতটুক ম্লান হয় নি। কিন্তু বিশদভাবে জার্মান থিয়েটার বা রাশিয়ান থিয়েটারের আলোচনা—এ লেখায় করবো না। যখন 'রঙ্গমঞ্চ—এদেশে ও ওদেশে' লিখতে শুরু করবো তখনই ও সব দেশের যে সব প্লে দেখলাম তার আলোচনা করবো।

গর্কীর 'মাদার' নাটকের নাম ভূমিকায় হেলেনা ভাইগেল

এর মধ্যে মিনিস্ট্রি ফর্ কালচারের মিসেস ব্যামবোয়ার এবং মিস্টার গ্রাইজার আমাকে তাঁদের অফিসে গিয়ে আলোচনা করবার জন্য আমন্ত্রণ জানালেন। একদিন সকালে টেলিভিসনে বার্লিনার আন্সেম্বলের The Visions of Simone Marchard দেখে ফেরবার পথে Ministry for Culture-এ মিস্টার গ্রাইজারের সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। প্রথমেই দেখি আমার লাঞ্চের জন্য বিরাট আয়োজন করে রেখেছেন মিস্টার গ্রাইজার—এই প্রসঙ্গে একটি কথা বলি—পূর্ব জার্মানীর লোকেদের মত অতিথিপরায়ণ জাতি আমি খুব কম দেখেছি—ভারতীয়দের এ'রা অন্তর থেকে ভালবাসেন এবং সব সময় নানাভাবে সাহায্য করবার জন্য উন্মুখ হয়ে থাকেন। পথে, ঘাটে, সভা-সমিতিতে জার্মান জাতির আতিথেয়তার পরিচয় আমি বারবার পেয়েছি।

যে দু-একজন লোকের সঙ্গে আলাপ করে যথেষ্ট আনন্দ পেয়েছি এবার তাঁদের কথা বলব।

১৪ই ফেব্রুয়ারী আমার সঙ্গে হোটেলে দেখা করতে এলেন অধ্যাপক রুডল্ফ পেঙ্কা। ইনি বার্লিন ড্রামা স্কুলের অধ্যক্ষ। এ'র কাছে শুনলাম জার্মান ডেমোক্রেটিক রিপাবলিকে আরও দুটি নাট্য বিদ্যালয় আছে একটি লাইপ-

জিকে অপরটি ব্যাবেলস্‌বার্গে। অধ্যাপক পেস্কার কাছ থেকে শুনলাম যে পূর্ব জার্মানীতে কোন বেকার অভিনেতা নেই। স্কুল থেকে পাশ করবার পর সংগে সংগে পূর্ব জার্মানীর নানা রঙ্গমঞ্চে এই সব পাশকরা ছাত্র-ছাত্রীদের চাকরি হয়ে যায়। নাট্য বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের কোন মাহিনা দিতে হয় না এবং পরীক্ষার জন্যও কোন ফিজ চার্জ করা হয় না। প্রয়োজনীয় অর্থ সরকারের তরফ থেকে আসে। বার্লিনের বিদ্যালয়টিতে ৩০ জন ছাত্র-ছাত্রীকে শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা আছে—কিন্তু এখন পর্যন্ত এঁরা ২৫ জনের বেশি ছাত্র-ছাত্রী নেন না—কারণ তার বেশি প্রতিভাসম্পন্ন অভিনয়-শিক্ষার্থী পাওয়া যায় না।

সমগ্র ছাত্র-ছাত্রীর দুই-তৃতীয়াংশ ছেলে এবং এক-তৃতীয়াংশ মেয়ে।

অভিনয়ের ভিত্তিকে দৃঢ় করবার জন্য প্রথমে স্তানিস্‌লাভস্কীর পদ্ধতি অনুসারে শিক্ষা দেওয়া হয় এবং তার পরে ব্রেশটের বিচ্ছিন্নবাদী পদ্ধতিতে অভিনয়ের অনুশীলন করান হয়ে থাকে। বার্লিনের স্কুলটির প্রতিষ্ঠাতা হচ্ছেন বিখ্যাত প্রডিউসার ম্যাক্স রাইনহার্ট। প্রফেসর পেস্কার সংগে আলোচনার আগের দিন সকালে ব্রেকফাস্ট টেবিলে আলাপ হোল বিখ্যাত ইংরাজ নাট্যসমালোচক, প্রডিউসার এবং অনুবাদক মিঃ জন উইলেটের সংগে। মিঃ উইলেটকে বললাম যে ব্রেশটের—'দি গুড পারসন অফ সেটজুয়ান'-এর যে ইংরাজী অনুবাদ তিনি করেছেন তারই থেকে বাংলায় অনুবাদ করে আমি নাটকটি কলকাতায় মঞ্চস্থ করেছিলাম ১৯৬৭ সালে। উইলেট বিনয়বশত বললেন যে, তাঁর অনুবাদটি আরও মাজা-ঘষা করা দরকার। আমি জানালাম এরিক বেনট্‌লের ইংরাজী ভারসনটি নিয়ে অনুবাদ করতে গিয়ে আমি বেশ অসুবিধায় পড়েছিলাম এবং পরে তাঁর অনুবাদটি পাওয়াতে আমার কাজের যথেষ্ট সুবিধা হয়। এর পর নিম্নোক্তভাবে আমাদের ভিতর কথাবার্তা চলে—

প্রঃ—মিঃ উইলেট, কতদিন থেকে ব্রেশটের নাটক সম্বন্ধে আপনি আগ্রহান্বিত?

উঃ—১৯৩৭, ৩৮ সাল থেকে।

প্রঃ—ব্রেশটের ক'টি নাটক আপনি অনুবাদ করেছেন?

উঃ—দু'টি—দি গুড পারসন অব সেট-জুয়ান এবং ড্রামস্ ইন দি নাইট।

প্রঃ—ব্রেশটের নাটকের অনুবাদ করতে গিয়ে কি অসুবিধা অনুভব করেছেন?

উঃ—বিশেষভাবে ব্রেশটের অনুবাদের জন্য কোন বিশেষ অসুবিধা আমার হয় নি।

প্রঃ—মূল জার্মান নাটকের কাব্যিক সৌন্দর্য কি ইংরাজী অনুবাদে প্রকাশ করা যায় না?

উঃ—আমি মনে করি যায়—অনুবাদকের পক্ষে এটা একটা সমস্যাই নয়।

প্রঃ—নন্ কমিউনিস্ট এবং নন্ মার্কসিস্ট কোন লোকের পক্ষে ব্রেশটের নাটকের বক্তব্য এবং সৌন্দর্য অনুধাবন করা কি সম্ভব নয়?

উঃ—নিশ্চয় সম্ভব।

মিঃ উইলেট এখন এক্সপ্রেশনিসম-এর উপর একটি বই লিখছেন এবং একটি ওপেরার প্রোডাকসন নিয়ে ব্যস্ত আছেন।

এর পর আলাপ হল এক বৃদ্ধা অবসরপ্রাপ্ত জার্মান অভিনেত্রীর সংগে নাম—সাল্‌কা ভিয়ারটেল।

ইনি বার্লিনে ম্যাক্স রাইনহার্টের থিয়েটারে ১৯১২-১৩ সালে অভিনয় সুরু করেন প্রথমে এক্সট্রা হিসাবে এবং পরে প্রধান ভূমিকায়। হেবেলের ক্ল্যাসিক নাটক 'জুডিথে' এবং ম্যাগড়ার ভূমিকায় মঞ্চাভিনয় করে এক সময় যথেষ্ট যশ অর্জন করেন। বার্লিন, লাইপজিক এবং ভিয়েনার বিভিন্ন মঞ্চে ইনি অভিনয় করতেন—১৯২৮ সালে মঞ্চ থেকে অবসর গ্রহণ করেন।

এঁর স্বামী ছিলেন বিখ্যাত মঞ্চ পরিচালক 'বেটলট্‌ভিয়ারটেল' তিনি ১৯২৮ সালে স্ত্রী সহ ছবি তোলবার জন্য আমেরিকা চলে যান।—মিসেস ভিয়ারটেল, বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই গ্রেটা গার্বোর ছবির সিনারিয়ো লিখতেন তিনি ১২ বছর মেট্রোগোল্ডউইন মায়ারের সংগে যুক্ত ছিলেন। স্যাম বারমেনের সহযোগিতায়, তিনি কুইন ক্রিশ্চিয়ানার চিত্রনাট্য রচনা করেন। তা ছাড়া ম্যারিওয়ালেসকা, আনা-ক্যারেনিনা প্রভৃতি ছবির সিনারিয়ো লেখেন। তাঁর মতে জন ব্যারিমোর ছিলেন এক অদ্ভুত ক্যারেকটার-এ্যাক্টর।

মিসেস ভিয়ারটেল এখন আত্মজীবনী রচনায় ব্যস্ত—থাকেন সুইজারল্যাণ্ডে।

এর পর আলাপ হল মার্জারী নেল্‌সন স্টাইন ব্রুয়েক-এর সংগে, সিট্‌ল রিপার-টরি থিয়েটারে (ওয়াশিংটন) ইনি অভিনয় করেন—এই অভিনেত্রীটি জাতে মার্কিন।

১৯৪৭ সালে হলিউডে গ্যালিলিও প্রোডাকসনে ইনি ব্রেশটের সংগে কাজ করেন—হেলেনা ভাইগাল এবং মার্জারী নেলসন নাটকটির পোষাকপত্র তৈরি করেন—কানাডার ভ্যান্‌কুভারে ইনি ১৯৪৬ সালে মাদার কারেজের ভূমিকায় অভিনয় করেন—ইচ্ছা আছে যে আগামী বছরে সিট্‌ল রিপারটরী থিয়েটারে আবার ঐ ভূমিকায় নামবেন।

নিউ ইয়র্কে ইনি স্টুয়ার্ট ভনের সংগে একটি থিয়েটার ওয়ার্কসপে কাজ করেছেন। এখানে ব্রেশটের বিশেষ অভিনয়-পদ্ধতি সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়া হত।

বিগত কুড়ি বছর ধরে ইনি পেশাদারী অভিনেত্রী হিসাবে কাজ করেছেন।

[ক্রমশঃ]

দেশ সেবায় নিয়োজিত,

এ্যালবার্ট ডেভিড লিমিটেড

কলিকাতা—৫০

নীতি ও বিজ্ঞানানুযায়ী ঔষধ প্রস্তুতকরণের অগ্রণী

—ব্রাঞ্চ সমূহ—

বোম্বে - মাদ্রাজ - দিল্লী - নাগপুর

বেজওয়াডা - শ্রীনগর - গৌহাটী

রঙ্গজগৎ

নববর্ষে সিনেমা বন্ধ

বাংলা নববর্ষের দিনে প্রতি বছর সকাল-বিকাল সিনেমা হাউসের সামনে ভিড় জমে উঠত। সারা বছরের কর্ম-ক্লান্তির পরে এই দিনটিতে সবান্ধবে সিনেমা দেখে অনেকে আনন্দলাভ করতেন বছরের শুভারম্ভ হিসাবে। এবছর সিনেমাগুলির সামনে অন্ধকার দরজায় তালা বন্ধ। কোন কোন সিনেমার সামনে ধর্মঘটী কর্মচারীরা তেলেভাজা বিক্রি করে সংসার চালাবার চেষ্টা করছে। ও'দের মনোবল দৃঢ়।

সিনেমা ধর্মঘটের এক মাস অতিক্রম করে গেল। মালিকপক্ষ এখনো অনমনীয় মনোভাব দেখাচ্ছে। যদিও সরকার ধর্মঘটকে বেআইনী ঘোষণা করেছিল, কিন্তু আজ সরকারের কাছেও মালিকদের মনোভাব স্পষ্ট—একথা বোঝা যাচ্ছে সরকারী বিবৃতিতে। তবু সরকার কর্মচারীদের দাবি মেনে নিতে মালিকদের বাধ্য করছে না কেন? যত তৎপরতার সঙ্গে ধর্মঘটকে বেআইনী বলা হল, মালিকদের মীমাংসায় আনতে যেন তেমন তৎপরতা নেই।

আর একদিকে চৌরঙ্গী পাড়ার বিদেশী ছবির সিনেমাগুলি গোড়া থেকেই কর্মচারীদের দাবি মেনে নিয়ে নিয়মিত ছবি দেখাচ্ছে। ওয়াকিবহাল মহলের মতে সিনেমা মালিকদের উদ্দেশ্য দীর্ঘসূত্রতা অবলম্বন করে কর্মচারীদের ঐক্যে ফাটল ধরানো এবং আর একদিকে চাপ সৃষ্টি করে টিকেটের দাম বাড়িয়ে ও দিনে তিনটির পরিবর্তে চারটি শো করে একই সঙ্গে পাবলিকের পকেটে হাত দিয়ে এবং শ্রমিকদের বেশি খাটিয়ে মুনাফার অঙ্কটা স্ফীত রাখা। শেষ পর্যন্ত মালিকরা মীমাংসা করবেই—তবে কর্মচারী এবং দর্শকদের ঘাড় ভেঙে টাকাটা আদায় করা উদ্দেশ্য। অথচ চারটি শো এবং টিকেটের দাম না বাড়ালেও কর্মচারীদের চুক্তি অনুযায়ী বেতন বাড়াতে সিনেমা মালিকদের কিছু আসে যায় না। কারণ ছবি দেখাবার জন্য যেমন তাঁরা পার্সেন্টেজ বাড়িয়েছেন তেমনি হাউস গ্যারান্টি নামক এক অবৈধ ব্যবস্থা চালু করেছেন, তার ওপর রয়েছে গোপন ব্যবস্থা। এতে ওদের লোকসান দূরের কথা লাভটা অতি নিশ্চিত হয়ে থাকে। দশ বছর আগে নির্মিত একটা সিনেমাতে কত পুঁজি খেটেছে এবং দশ বছরে কত মুনাফা করেছে হিসাব করলে দেখা যাবে —মুনাফা বহু পূর্বে পুঁজিকে ছাড়িয়ে গেছে। এ থেকেই বোঝা যাবে সিনেমাগুলিতে লাভ না লোকসান হচ্ছে।

এই ধর্মঘটের ফলে অনেক প্রযোজক মারা যাচ্ছে সুদ গুণে গুণে, যারা ঋণ করে ছবি করেছে অথচ ছবি দেখাতে পারছে না। সবদিক মিলিয়ে সিনেমা ধর্মঘটের সত্বর অবসান হওয়া উচিত। জনমতের অভিব্যক্তি হওয়া প্রয়োজন।

—সুজন

লোরা পিকচার্সের 'নতুন পাতা' ছবিতে সাবিত্রীর ভূমিকায় শিখা রায়চৌধুরী

'গ্রানাডা, গ্রানাডা, গ্রানাডা মাইন' ছবি গ্রহণকালে বাম থেকে দক্ষিণে 'কমসোমল' জাহাজের ক্যাপ্টেন জর্জ মেজেনেৎসব, যে জাহাজ ১৯৩৬ সালে ফ্যাসিস্টরা ডুবিয়ে দিয়েছিল, লেখক সিমোনভ এবং পরিচালক রোমান কারম্যান।

'গ্রানাডা, গ্রানাডা, গ্রানাডা মাইন'

স্পেনের গৃহযুদ্ধের এক প্রামাণিক চিত্রের এই নাম রাখা হয়েছে একটি জনপ্রিয় সোভিয়েত গানের প্রথম কলি নিয়ে। ছবিটি মস্কোর প্রামাণিক চিত্রের কেন্দ্রীয় স্টুডিওতে গ্রহণ করা হয়েছে। পরিচালনা করেছেন বিখ্যাত রোমান কারম্যান; বিখ্যাত সাহিত্যিক কনসটানটিন সিমোনভের লেখা চিত্রনাট্য অবলম্বনে। এই ছবি সম্পর্কে রোমান কারম্যান সংবাদ এজেন্সীর প্রতিনিধিকে বলেছেন ঃ

ত্রিশ বছর আগে নিউজ রীল ক্যামেরাম্যান রূপে কাঁধে একটি ক্যামেরা ঝুলিয়ে আমি সীমান্ত অতিক্রম করে স্পেনে প্রবেশ করেছিলাম। আমার সঙ্গে ছিলেন সহকর্মী বরিস মাকানায়েভ। সেদিনের কথা আজো আমার স্পষ্ট মনে আছে। জিরান উচ্চভূমিতে এবং সানসেবাস্তিয়ানের রাস্তায় যুদ্ধের ছবি আমি তুলেছিলাম। বিদ্রোহী জাহাজ 'কানারিজ' থেকে রাস্তায় গোলা পড়ছিল। এই ঘটনার ছবি তুলেছিলাম হিটলার-মুসোলিনির প্ররোচনায় ফ্যাসিস্ট জেনারেলের বিদ্রোহের এক মাস পরে।

এক বছর সময় আমি স্পেনে থেকে এক ফ্রন্ট থেকে আর এক ফ্রন্টে গেছি এবং যুদ্ধের ছবি তুলেছি। আমার তোলা এই ছবিগুলি সযত্নে সোভিয়েত রাষ্ট্রের সংরক্ষণাগারে রক্ষিত হয়েছে। বহু দেশ ছবি তৈরির কাজে এখান থেকে ছবি ধার করে নিয়েছে। আমিও আমার কোন কোন ছবিতে কিছু কিছু শট ব্যবহার করেছি। ১৯৬৬ সালে আমি স্থির করলাম এই প্রামাণিক ছবিগুলিকে ব্যবহার করে একটা ছবি করবার। সাহিত্যিক কনসটানটিন সিমোনভ আমার সঙ্গে সহযোগিতা করলেন। দুজনে মিলে আমরা স্পেনের গৃহযুদ্ধ সম্পর্কে ছবিটি করতে অগ্রসর হলাম। সারা জগৎকে ফ্যাসিস্ট দানবদের গণতন্ত্রবিরোধী কাজগুলিকে আবার জানাবার জন্য। কিভাবে তারা গণতান্ত্রিক স্পেনের বুকে অরাজকতা সৃষ্টি করেছিল, নিজেদের পছন্দ মত সরকার জোর করে বসাবার জন্য। দুই বছর কাল আমরা গভীর নিষ্ঠার সঙ্গে তথ্য অনুসন্ধান করলাম। যদিও আমাদের প্রধান অবলম্বন ছিল স্পেনে যুদ্ধক্ষেত্রে তোলা ছবিগুলি। ছবিগুলি দেখতে দেখতে আমার অনেক কথা মনে হতে লাগলো। যেমন হেমিংওয়ের ছয়টি ছবি, যা আমি তুলেছিলাম ১৯৩৭ সালের বসন্তকালে—গণতন্ত্রীশক্তির ট্রেঞ্চের মধ্যে। আন্দ্রে মার্তির পাশে যে অফিসার দাঁড়িয়ে আছেন তাঁকে আমি চিনতে পারলাম—তিনি ইতালীর লুইগি লঙ্গো, তখন আন্তর্জাতিক বাহিনীর অধিনায়ক ছিলেন। জার্মান গণতান্ত্রিক রিপাবলিকের সংরক্ষণাগারে আমরা কয়েকটি ছবি পেলাম যাতে হিটলারের 'কনডর' বাহিনীর কার্যকলাপ প্রকাশ হয়ে পড়ে। নন-ইনটারভেনশনের কথা বলেও হিটলারের বাহিনী স্পেনীস ফ্যাসিস্টদের পাশে থেকে গণতন্ত্রী বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়েছে।

আমাদের ছবির প্রধান ধ্বনি হবে—বিজয়, পরাজয় নয়। ১৯৬৭ সালে স্পেনের জনসাধারণ বলেছিল 'নো' ফ্যাসিস্টদের জিততে দেব না। এই কথাটিকে কেন্দ্র করেই ছবি অগ্রসর হবে। ছবিতে আমরা এমন কিছু কবিতার ভাব-বক্তব্য গ্রহণ করলাম যা তখনকার দিনে দেশে দেশে কবিরা রচনা করেছিলেন গণতান্ত্রিক শক্তির সমর্থনে।

আমি এবং সিমোনভ একটা ১৬ মি মি ক্যামেরা নিয়ে স্পেনে গেলাম, আবার

স্পেনকে দেখতে। তখন আমাদের স্ক্রিপ্ট তৈরি হয়ে গেছে। রাস্তায় চলতে চলতে আমার মনে পড়ছিল কোথায় লেখক হেমিংওয়ে দাঁড়িয়েছিলেন, কোথায় কোন চেনা মুখ গুলী লেগে শেষবারের মত গণতন্ত্রের প্রতি আস্থা জানিয়ে লুটিয়ে পড়ে গেছিল। এ সময় ছবি তোলা খুবই কঠিন কাজ। কারণ ফ্যাসিস্ট সরকারের পুলিশের সতর্ক দৃষ্টি রয়েছে যাতে ছবি তোলা না যায়। তা সত্ত্বেও আমরা কিছু কিছু ছবি তুললাম।

একদিন আমি ও সিমোনভ 'ক্যাপিটল' সিনেমার পাশ দিয়ে চলতে চলতে মনে পড়ে গেল সেদিনের কথা যেদিন রণক্লান্ত ফ্যাসিস্ট-বিরোধী যোদ্ধারা ফ্রন্ট থেকে এসেছিল সোভিয়েত ছবি 'উই ফ্রম ক্রনসটাড' দেখতে।

ছবি করবার জন্য আমরা এমন লোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছি যাঁরা আন্তর্জাতিক বাহিনীতে যোগ দিয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে পাভেল বাটভ দ্বাদশ আন্তর্জাতিক বাহিনীর অধিনায়কের পরামর্শ-দাতা, বিমানচালক স্বাকারভ, ইয়াকুশিন, স্মিরনভ, ট্যাঙ্কচালক ভেট্রভ এবং স্যাপুটিন, এডমিরাল কুজনেৎসব, মার্শাল ভরোনভ, একাডেমিশিয়ান মেইশকি, লেখক পাবলো নেরুদা, লেখক লুডউইগ রেন প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।

এ'দের মুখে সেকালের ঘটনাগুলি শুনতে শুনতে আমাদের মনে হচ্ছিল আন্তর্জাতিক ফ্যাসিস্টবিরোধী ভ্রাতৃত্বের এক মহান রূপ। কিভাবে গণতন্ত্ররক্ষার জন্য দেশবিদেশের মানুষ, সৈনিক থেকে লেখক-শিল্পী পর্যন্ত কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করেছে।

এতকাল পরে আজ আমরা এই ছবিতে একালের যুবকদের বলতে চাই : বল, ১৯৩৬ সালে তোমাদের বয়স যদি কুড়ি বছর থাকত তোমরা কি স্পেনে গণতন্ত্রের পক্ষে যুদ্ধ করতে যেতে? আজকের মত তোমরা যদি মস্কো, নিউ-ইয়র্ক, মেক্সিকো, ইংল্যান্ড প্রভৃতি দেশে বাস করতে তবে তোমাদের কুড়ি বছর বয়সে তোমরা কোন্ পক্ষ গ্রহণ করতে গণতান্ত্রিক স্পেন অথবা ফ্যাসিস্ট ফ্রাঙ্কো? এই দুটোর একটা তোমাদের বেছে নিতে হত, কারণ জীবনে তৃতীয় পথ নেই। এই দুয়ের একটাকে গ্রহণ করতে হয়। জীবনে তৃতীয় পথের স্থান নেই।

এই ছবিটি পৃথিবীর সব দেশের মানুষের মত আমরাও দেখতে আগ্রহী।

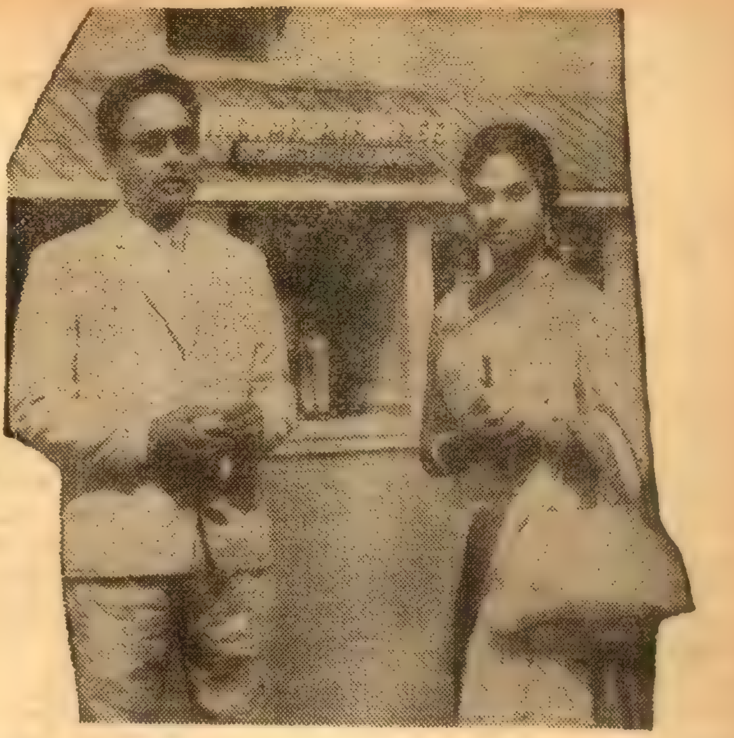

'দিবারাত্রির কাব্য' ছবির আউটডোর স্যুটিং-এর পথে দমদম বিমান বন্দরে মাধবী মুখার্জী ও নবাগত স্বপন রায়।

নাটকের কথা

ফাইটন ক্লাবের বার্ষিক অনুষ্ঠান

গত ১৯শে মার্চ ফাইটন ক্লাবের বাৎসরিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপলক্ষে শ্রীমতী আলো দাশগুপ্তের 'সুখের পায়রা' নাটকটি কাশী বিশ্বনাথ মঞ্চে অভিনীত হয়েছে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন ডাঃ এস এম সরকার। নাটকে অভিনয় করেন অজয় মুখার্জী, স্বপ্না মিত্র, প্রিয়ব্রত চ্যাটার্জী, মাখন মুখার্জী, মণীন্দ্র সোম, সাধন ভট্টাচার্য ও নৃপেন সাহা, রণজিৎ ঘোষ, ইলোরা দে, চিত্তরঞ্জন দেবনাথ, নিত্যানন্দ দত্ত, বিশ্বনাথ শেঠ, রাইমোহন রায়, দেবিকা দাস। নাটকটি পরিচালনা করেন অরুণ সেনগুপ্ত।

যক্ষ্মাহাসপাতালের সাহায্যার্থে নাট্যানুষ্ঠান

দরিদ্র বান্ধব ভান্ডার পরিচালিত যক্ষ্মা হাসপাতালগুলির সাহায্যার্থে ১৬ই, ১৭ই ও ১৯শে এপ্রিল, ১৯৬৮ রবীন্দ্র সদনে নিম্নলিখিত নাটকগুলি মঞ্চস্থ হবে :—ইংগিত গোষ্ঠীর 'শেষ থেকে সুরু', রূপকারের 'চলচিত্ত চঞ্চরী' ও 'ব্যাপিকা বিদায়' এবং কলকাতা মঞ্চ ও চিত্রজগতের বিশিষ্ট শিল্পী সমন্বয়ে রবীন্দ্রনাথের 'চিরকুমারসভা'। অংশ গ্রহণ করছেন। সবিতাব্রত দত্ত, অনুপকুমার, হারাধন ব্যানার্জী, জহর রায়, ভানু বন্দ্যোঃ, অজিত চ্যাটার্জী, সরযূবালা, তপতী ঘোষ, বাসবী নন্দী প্রভৃতি। বিস্তারিত সংবাদের জন্যে দরিদ্র বান্ধব ভান্ডার, ৬৫।২বি, বিডন স্ট্রীট, কলিকাতা-৬ (টেলিফোন : ৫৫-৪৪৬৩) ঠিকানায় যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা যাচ্ছে।

রবীন্দ্র জন্মোৎসব

নাট্যসম্মেলন ও মহাজাতি সদন ট্রাস্টি বোর্ডের উদ্যোগে এ বছরও ২৪ ঘণ্টাব্যাপী বিরতিহীন রবীন্দ্র জন্মোৎসব পালিত হবে ২৫শে বৈশাখ (৮ই মে)। সাধারণের প্রবেশাধিকার থাকবে।

গগনচটি

পাঁশকুড়া ছাত্র ফেডারেশন ও গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশনের যুক্ত উদ্যোগে গত ৮ই এপ্রিল এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে পরশুরামের গল্প অবলম্বনে 'গগনচটি' নাটকাভিনয় হয়।

তরুণ শিল্পী সম্মেলন

দিশারী সংস্থা আগামী জুন মাসে

তরুণ শিল্পী সম্মেলন' নামে এক সঙ্গীত সম্মেলনের আয়োজন করছে। এই সম্মেলনে নবাগত ও তরুণ শিল্পীদের অগ্রাধিকার থাকবে।

স্টুডিও খবর

প্রথম কদম ফুল

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের উপন্যাস 'প্রথম কদম ফুল'-এর চিত্ররূপ দিতে অগ্রসর হয়েছে ইকন্স ফিল্মস। চিত্রনাট্য রচনা ও পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেছে ইন্দর সেন। শ্রীসেন মৃণাল সেনের সহকারিরূপে এযাবৎ কাজ করেছেন। সঙ্গীত পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন সুধীন দাশগুপ্ত। চিত্রগ্রহণ করবেন শৈলজা চট্টোপাধ্যায়। সম্পাদনা করবেন অরবিন্দ ভট্টাচার্য এবং শিল্প নির্দেশনার দায়িত্ব নিয়েছেন রবি রায়চৌধুরী। ছবির প্রধান দুটি ভূমিকায় অভিনয় করবেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ও বোম্বাইয়ের তনুজা।

পরিণীতা

চিত্রলিপি ফিল্মসের 'পরিণীতা' ছবির ছয়টি সঙ্গীত গ্রহণের কাজ হেমন্ত মুখার্জীর পরিচালনায় শেষ হয়েছে। শরৎচন্দ্রের 'পরিণীতা' উপন্যাসের চিত্ররূপ দিচ্ছেন পরিচালক অজয় কর। ছবির জন্য গানগুলি গেয়েছেন হেমন্ত মুখার্জী, প্রতিমা ব্যানার্জী, অরতি মুখার্জী। ছয়টি গানের মধ্যে একটি অতুলপ্রসাদের, একটি রবীন্দ্রনাথের আর চারটি প্রণব রায়ের লেখা। প্রথম পর্যায়ের চিত্রগ্রহণের কাজ শেষ হয়েছে ৩০শে মার্চ; পরবর্তী কাজ শুরু হবে ১১শে এপ্রিল থেকে। দশদিন চিত্রগ্রহণের পর ছবির কাজ প্রায় শেষ হয়ে আসবে।

দিবারাত্রির কাব্য

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'দিবারাত্রির কাব্য' ছবির বহির্দৃশ্যের কাজ সম্প্রতি উড়িষ্যায় করা হয়েছে। কোনারকের বিখ্যাত সূর্যমন্দির, পুরীর মহাবীরের মন্দির, ঝাউবন ও সমুদ্রসৈকতে ছবির বহির্দৃশ্য গ্রহণ করা হয়েছে। পরিচালক বিমল ভৌমিক ও নারায়ণ চক্রবর্তী সদলে এই উদ্দেশ্যে উড়িষ্যায় গিয়েছিলেন। ছবিটির চিত্রগ্রহণ করছেন কৃষ্ণ চক্রবর্তী এবং সঙ্গীত পরিচালনা করছেন তিমিরবরণ। স্পান ফিল্মস ছবিটির পরিবেশক।

সংবাদকণী

ভ্যালাডোলিড উৎসবে 'চারুলতা'

সত্যজিৎ রায়ের 'চারুলতা' ছবিটি স্পেনের ধর্মীয় ও মানবিক গুণাবলী সম্পন্ন ছবির ত্রয়োদশ আন্তর্জাতিক উৎসবে প্রদর্শনের জন্য ভারত সরকার মনোনীত করেছে। এই উৎসব স্পেনের 'ভ্যালাডোলিড'-এ ২১শে এপ্রিল থেকে ২৪শে এপ্রিল অনুষ্ঠিত হবে। ছবির প্রযোজক আর ডি বনশাল ছবিটির স্পেনীস সাব-টাইটেল এবং প্রয়োজনীয় প্রচার পুস্তিকাদির ব্যবস্থা করছেন। শ্রীবনশাল এই উৎসবে উপস্থিত থাকবেন এবং আন্তর্জাতিক সেমিনারে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করবেন।

পুতুল প্রদর্শনীতে ভারত-ইতিহাস

মস্কোর মিউজিয়ম অব আর্টের প্রাচ্য জাতিসমূহের কলাকেন্দ্রে "ভারত-ইতিহাস" বিষয়ক পুতুল প্রদর্শনীটি খুবই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে, মস্কো থেকে এ-পি-এন'এর সংবাদে প্রকাশ।

এই প্রদর্শনীতে ১২০০ পুতুলের মাধ্যমে প্রাচীন থেকে আধুনিককাল পর্যন্ত ভারতের ইতিহাসের নানা পর্ব দেখান হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে রামায়ণ, মহাভারতের বিভিন্ন বীর চরিত্র এবং ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের নায়কদের প্রতিমূর্তি।

ওই কলাকেন্দ্রেই আর এক কক্ষে, সম্প্রতি জাপানী শিল্পেরও এক প্রদর্শনী চলেছে। এতে জাপানের চিরাচরিত ও আধুনিক শৈলীর বিভিন্ন ধরণের চিত্রাবলী রয়েছে।

ভারতীয় ও জাপানী উভয় প্রদর্শন কক্ষেই মন্তব্যের খাতায় মস্কোর অগণিত দর্শক তাঁদের সানন্দ মন্তব্য লিখে রেখে গেছেন।

সঙ্গীতকথা

গীতবিতানের সমাবর্তন উৎসব

গীতবিতানের ঊনবিংশ বার্ষিক সমাবর্তন উৎসব ৩১শে মার্চ রবীন্দ্র সদনে অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন ডঃ রমা চৌধুরী। তাঁর ভাষণটি সমবেত শ্রোতৃমণ্ডলীর কাছে আকর্ষণীয় হয়েছিল। তিনি বলেন: সংগীতের সাধনাও ওতপ্রোতভাবে আনন্দের সাধনা, অমৃতের সাধনা, সৌন্দর্যের সাধনা।

সংস্থার সভাপতি শ্রীঅশোককুমার সরকার বলেন: রবীন্দ্রসঙ্গীতের কথা উচ্চারণ সুর ভাষা নাকি ঠিকমত হচ্ছে না—এই নিয়ে হৈ-চৈ হচ্ছে। রবীন্দ্রসঙ্গীত নাকি বিশেষভাবে হওয়া চাই—এসব হচ্ছে বর্তমানের কথা। [illegible] আন্দোলন হলে

[illegible] ছবির আদাম [illegible] একটি দৃশ্য

রবীন্দ্রসংগীতের অবস্থা হবে ধ্রুপদের মত। ......প্রয়োজন সঙ্গীতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করা।

স্নাতকদের উপস্থাপন করেন শ্রীনীহারবিন্দু সেন ও শ্রীসুখেন্দু গোস্বামী। আচার্যের আশীর্বাচন ও শান্তিবাচনে অংশ নেন শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র রায়। প্রতিটি শিক্ষার্থীকে একটি করে শ্বেতপদ্ম উপহার দেওয়া হয়।

রাজ্যপাল শ্রীধর্মবীর নিষ্ঠার সঙ্গে রবীন্দ্রসংগীত প্রচারের ইচ্ছা প্রকাশ করেন।

সঙ্গীতানুষ্ঠানটি মনোজ্ঞ হয়েছিল। নৃত্য সহযোগে 'এস এস বসন্ত ধরাতলে' গানখানি সুপরিবেশিত হয়েছিল। সম্মিলিত নাচ এবং গান বসন্তের আমেজ এনে দেয়। 'আমি আশার আশায় থাকি' গাইলেন শ্রীগীতশ্রী রায়। দরদী কণ্ঠস্বর প্রশংসনীয়। শ্রীমতী রায় গীতবিতানের এ বৎসরের শ্রেষ্ঠ কৃতী ছাত্রী। তা ছাড়া রয়েছেন শ্রীসুরজিৎ চক্রবর্তী, শ্রীমতী রূপা চক্রবর্তী প্রমুখ।

ওস্তাদ আলি আকবর খান বিদেশের অভিজ্ঞতা বর্ণনা

গত নয়মাসকাল ইউরোপ ও আমেরিকা সফরের পরে সম্প্রতি ওস্তাদ আলি আকবর খান দেশে ফিরেছেন। গত সোমবার এক সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি তাঁর অভিজ্ঞতা বিবৃত করেন। এই সঙ্গে বিদেশে ছাত্রদের চাহিদা এবং জনসাধারণের আগ্রহ অনুসারে তিনি যে নতুন সৃষ্টি করেছেন তা রেকর্ডার সাহায্যে শোনালেন। প্রসঙ্গত তিনি বলেন, ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের এক বিশ্বজনীন আবেদন আছে যা সকল দেশের মানুষের মনের গভীরে পৌঁছয়। ভারতীয় সঙ্গীত সম্পর্কে বিদেশে আগ্রহ ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। ভারতীয় কণ্ঠ ও যন্ত্রসংগীতের কদর পাশ্চাত্য দেশে বাড়ছে। এই আগ্রহের জন্যই তিনি ক্যালিফোর্নিয়ায় 'আলি আকবর কলেজ অব মিউজিক' প্রতিষ্ঠা করেছেন। ১লা বৈশাখ কেন্দ্রটির শুভ-উদ্বোধন হবে। শেখাবার কাজ শুরু হবে ১৭ই জুন থেকে। প্রাচ্যের উচ্চাঙ্গ সংগীতকে পাশ্চাত্য সমাজে পরিচিত করে তোলা এই কেন্দ্রের উদ্দেশ্য। প্রায় চারশত ছাত্র-ছাত্রী ইতিমধ্যে নাম তালিকাভুক্ত করেছে।

নতুন সৃষ্টির প্রশ্নে তিনি বলেন, বিভিন্ন কবিতার ভাবধারাকে স্বরোদে প্রকাশ করবার জন্য তিনি পরীক্ষা চালাচ্ছেন। এই ব্যাপারে তিনি কতদূর অগ্রসর হয়েছেন তা বোঝাবার জন্য একটি কবিতার ভাবধারাকে কিভাবে স্বরোদে প্রকাশ করেছেন তা রেকর্ডার সাহায্যে শোনান।

পূর্ণিমা হালদার

বজবজ উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণীর ছাত্রী কুমারী পূর্ণিমা হালদার বিশ্বনাথ সঙ্গীতসমাজের (কলকাতা) সঙ্গীত প্রতিযোগিতায় আধুনিক সঙ্গীতে প্রথম, ভজন ও গীতে ২য় স্থান অধিকার করেছে। কুমারী পূর্ণিমা বিভিন্ন সঙ্গীত প্রতিযোগিতায় ও সঙ্গীত অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করে প্রশংসা অর্জন করেছে। পূর্ণিমা শ্রীপ্রতাপকুমার মণ্ডলের ছাত্রী। কুমারী পূর্ণিমা ভারতীয় নৃত্যকলা মন্দিরের অধ্যক্ষ নৃত্যবিদ নীরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের কাছে ভারতীয় উচ্চাঙ্গ নৃত্য শিক্ষা করে।

দিলীপকুমারের সংবর্ধনা

অসামান্য সুরকার এবং খ্যাতনামা সাহিত্যিক শ্রীদিলীপকুমার রায়ের এক সংবর্ধনার আয়োজন করা হয় গত ৯ই এপ্রিল। রবীন্দ্র সদনে অনুষ্ঠিত এই সংবর্ধনার উদ্যোক্তা ছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য শ্রীবিধুভূষণ মালিক, ডাঃ নীহাররঞ্জন মুন্সী, শ্রীমিলন সেন প্রমুখ গুণমুগ্ধ ব্যক্তিরা। রাজ্যপাল শ্রীধর্মবীর অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন। কলকাতার শেরিফ শ্রীকেদারনাথ মুখোপাধ্যায় সুরের যাদুকর দিলীপকুমারের সংগীত প্রচারের সার্থকতার বিষয়ে ভাষণ দিয়ে প্রতি বছর এমন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বিনামূল্যে সর্বসাধারণের মধ্যে তাঁর সংগীত প্রচারের উদ্যোগকে অভিনন্দন জানান। ডাঃ গোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায় মঙ্গলাচরণের অনুষ্ঠান করবার পর শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র কবি নরেন্দ্রনাথ দেবের একটি কবিতা আবৃত্তি করেন। পরিশেষে দিলীপকুমার তাঁর অতুলনীয় সংগীত পরিবেশন করেন। বাহাত্তর বছর অতিক্রম করার পর একমাত্র তাঁর মত গুণী-শিল্পীর পক্ষেই এমন অপূর্ব সংগীত পরিবেশন করা সম্ভব। প্রায় দেড় ঘণ্টা গানের পর এই অনুষ্ঠানের পরিসমাপ্তি ঘোষিত হয়। মঞ্চসজ্জায় শ্রীঅমলেন্দু সেন সুরুচির পরিচয় দিয়েছেন।

নববর্ষের প্রীতি ও শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন
সুসংবাদ! সুসংবাদ!! সুসংবাদ!!!
জিনিষ ভাল হয়েছে—দামও অনেক কমেছে।
এইচ, এম, ভি
"কেলিপ্সো"
রেকর্ড প্লেয়ার, রেডিওর সাথে বাজাতে পারবেন।
"ফিয়েস্টা"
রেকর্ড রিপ্রডিসর—রেডিও ছাড়াই বাজান চলবে।

নগদ ও কিস্তিতে বিশদ বিবরণের জন্য নিম্ন ঠিকানায় আজই অনুসন্ধান করুন।
রেডিও এণ্ড ফটো ষ্টোরস্
৭৫নং গণেশচন্দ্র এভিনিউ। কলিকাতা-১৩।
ফোন :—২৪-৪৭৯৩।

খেলাধুলা

খেলা ও খেলোয়াড়

ওয়েস্ট ইন্ডিজের অধিনায়ক সোবার্স বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নির্ভীক অধিনায়ক! আর এ মরশুমের খেলাগুলো হয়েছে, যদি বলা হয় ইংলণ্ড বনাম ওয়েস্ট ইন্ডিজের মধ্যে, তাহলে ভুল করা হবে; বরং বলতে হবে এবার সোবার্স একা খেলেছেন ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে! এ কথা বলতে এতোটুকুও দ্বিধা করেন নি দীর্ঘ আট বছর পরে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে রাবার বিজয়ী ইংলণ্ডের অধিনায়ক কলিন কাউড্রে। শুধু এ কথা বলেই কাউড্রে ক্ষান্ত হন নি, তিনি আরো বলেছেন যে এ পর্যন্ত তিনি যতো অধিনায়কের সম্মুখীন হয়েছেন, তাঁদের মধ্যে সোবার্স ন্যায়, নীতি আর সততার দিক দিয়ে শ্রেষ্ঠ।

কাউড্রের মন্তব্য নিঃসন্দেহে প্রশংসার যোগ্য। কাউড্রে আজ আমাদের আরো ভালোভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, সোবার্স শুধু বর্তমান বিশ্বের শ্রেষ্ঠ অলরাউন্ডারই নন, তিনি কতো উঁচুদরের খেলোয়াড়। ব্যাটিং, বোলিং আর ফিল্ডিং তিনটি বিষয়ে একজন খেলোয়াড়ের এমন অবিশ্বাস্য নিপুণতা নিঃসন্দেহে বিস্ময়কর। সম্প্রতি অনুষ্ঠিত ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে প্রতিটি টেস্ট ম্যাচে সোবার্সের অবিস্মরণীয় ব্যাটিং, চাতুর্যে ভরা বোলিং আর নিপুণ ফিল্ডিং হয়তো বা বিস্ময়ে হতবাক করে দিয়েছিলো ইংলণ্ডের অধিনায়ক কাউড্রেকে।

সোবার্সের আগে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেট দলের অধিনায়ক ছিলেন ক্রিকেটের রাজপুত্র পরলোকগত স্যার ফ্রাঙ্ক ওরেল। ওরেলের সংগে সোবার্সের তুলনা করতে যাওয়া বাতুলতা। ওরেল ছিলেন ক্রিকেট জগতের ভিন্ন এক পুরুষ, কালো পাথর কুঁদে কুঁদে বিধাতা যেন সৃষ্টি করেছিলেন অপূর্ব এক পুরুষ মূর্তি। ওরেলের সব কিছুই ছিলো সাধারণ মানুষের চিন্তাধারার অনেক ওপরে। সে দিক দিয়ে সোবার্স কিন্তু কাছের মানুষ। কিন্তু ওরেলের যোগ্য উত্তরাধিকারী। ওরেলের ভাবধারায় পরিচালিত ওয়েস্ট ইন্ডিজের স্পোর্টিং অধিনায়ক গারফিল্ড সোবার্স।

তবু চতুর্থ টেস্টে ওয়েস্ট ইন্ডিজের পরাজয়ের পর সোবার্সকে নিয়ে সমালোচনাও কম হয় নি। শুধু দেশ-বিদেশের ক্রিকেটরসিকরাই নন, আমাদের মধ্যে অনেকেই চতুর্থ টেস্টে সোবার্সের ইনিংস সমাপ্তি ঘোষণার বিরুদ্ধে। তাঁদের মতে সোবার্সের ভুলেই ওয়েস্ট ইন্ডিজ হেরেছে। তাঁরা ওয়েস্ট ইন্ডিজের ঐ পরাজয়ের সমস্ত দোষটাই চাপাতে চাইছেন সোবার্সের ওপর। অথচ তাঁরা একবারও দেখছেন না সোবার্সের স্পোর্টিং অর্থাৎ খেলোয়াড়ী মনোভাবের দিকটা, সোবার্সের অতুলনীয় সাহস আর ক্রিকেট খেলাকে আকর্ষণীয় করে তোলার প্রশংসনীয় প্রয়াসের দিকে তাঁরা একবার ফিরেও চাইছেন না। ফিরে তাকালে আর যাই হোক, সব দোষ নন্দ ঘোষ, বলে সব দোষ সোবার্সের ঘাড়ে চাপাতে পারতেন না।

হয়তো সোবার্সকে নিয়ে আবার তাঁরাই নাচানাচি করতেন যদি পঞ্চম টেস্টে ওয়েস্ট ইন্ডিজ জিততে পারতো। যদিও এ জয়লাভ সম্ভব হয় নি শুধু মাত্র সময়ের অভাবের জন্যেই। অবশ্য ইংলণ্ডের কৃতিত্ব তাতে এতোটুকুও কমে নি। কারণ খেলাটি ছিল ছ' দিনের। শুধু তাই নয়, এবারের মরশুমে ১—০ টেস্টে জিতে ইংলণ্ড লাভ করেছে 'রাবার'। শুধু 'রাবার'ই নয়, এই জয়লাভ ইংলণ্ডকে আবার ফিরিয়ে দিয়েছে ক্রিকেট বিশ্বের এক অমূল্য সম্মান। ক্রিকেট জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ দল হিসেবে সম্মানের যে আসন থেকে ইংলণ্ড ধীরে ধীরে সরে যাচ্ছিলো, অধিনায়ক কাউড্রে তাকে আবার ফিরিয়ে এনেছেন বিশ্ব চ্যাম্পিয়ান ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে দীর্ঘ আট বছর বাদে রাবার লাভ করে। এই মরশুমে অস্ট্রেলিয়া আসছে ইংলণ্ড সফরে। ভারতের বিরুদ্ধে খেলায় অস্ট্রেলিয়া দলের যে দলগত শক্তির পরিচয় আমরা পেয়েছি, তাতে মনে হয় ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে অস্ট্রেলিয়া এবার খুব একটা সুবিধে করতে পারবে না। হয়তো এবার 'রাবার' লাভ করবে ইংলণ্ডই......!!

—শান্তিপ্রিয়

দীপুর দ্বি-মুকুট

পূর্ব-ভারত ব্যাডমিন্টন চ্যাম্পিয়ানশীপে দীপু ঘোষ এবার দ্বি-মুকুট লাভ করেছেন। সিংগলস ফাইন্যালে তিনি হারিয়েছেন দীনেশ খান্নাকে আর ডাবলস ফাইন্যালে নিজের ভাই রমেন ঘোষকে
ফাইন্যালে নিজের ভাই রমেন ঘোষকে

= দীপু ঘোষ =
এবার লাভ করেছেন দ্বি-মুকুট

সংগে নিয়ে পরাজিত করলেন দি ডি দেওরাস ও সুরেশ গোয়েলকে।

এবারের সিংগলস ফাইন্যাল খেলা কিন্তু খুব একটা জমে নি। মাত্র ২৫ মিনিটের মধ্যে দীপু ঘোষ স্ট্রেট সেটে হারিয়ে দিলেন দীনেশ খান্নাকে। দীপু ঘোষ এর আগে তিনবার ফাইনালে উঠলেও এই প্রথম পূর্ব-ভারত চ্যাম্পিয়ানশীপ লাভ করলেন। আর উল্লেখ করার মতো আর একটি বিষয় হলো ১৯৬৬-৬৭ সালে দীপু ঘোষ পরাজিত হয়েছিলেন দীনেশ খান্নার কাছেই।

মিক্সড ডাবলস-এর খেলায় সতীশ ভাটিয়া আর দীপা চ্যাটার্জী হারিয়ে দিয়েছেন অনিল সোন্ধী ও তুলসী ব্যানার্জীকে।

অমীমাংসা

ইংলণ্ড বনাম ওয়েস্ট ইণ্ডিজের পঞ্চম ও শেষ টেস্ট ম্যাচ অমীমাংসিত-ভাবে শেষ হলো। অবশ্য সময়ের সীমা অতিক্রম করতে পারে নি বলেই খেলাটি রয়ে গেলো অমীমাংসিত। খেলার সময় যখন শেষ হয়ে গেলো, তখন ইংলণ্ডের হাতে ছিলো মাত্র দু'টি উইকেট। আর ওয়েস্ট ইণ্ডিজ সে সময় এগিয়ে ছিলো অনেক রানে।

অবশ্য ওয়েস্ট ইণ্ডিজের অধিনায়ক সোবার্স যদি দ্বিতীয় ইনিংসে তাঁর সেই অবিস্মরণীয় খেলা (৯৫ রানের) না খেলতে পারতেন, তাহলে পরাজয় এড়াতে ওয়েস্ট ইণ্ডিজকে যথেষ্ট বেগ পেতে হতো। তাই পঞ্চম টেস্ট ম্যাচের আগা-গোড়াই ছিলো আকর্ষণে ভরা। আবার খেলার শেষ অর্থাৎ ষষ্ঠ দিনের শেষ মুহূর্তে প্রচণ্ড উত্তেজনার মধ্যে যখন খেলা শেষ হয়ে গেলো অমীমাংসিতভাবে, তখন দর্শকদের মধ্যে দেখা গেলো আর এক ধরণের উত্তেজনা।

সে উত্তেজনা ছিলো 'রাবার' হারাবার দুঃখে। কিন্তু সে দুঃখ বিসদৃশভাবে পর্যবসিত হলো অদ্ভূত এক পরি-স্থিতিতে। মাঠে নেমে পড়লেন দর্শকরা, আক্রান্ত হলেন খেলোয়াড়রা, সারা মাঠ জুড়ে ফোয়ারা ছুটলো ঢিল আর বোতলের। আহত হলেন ইংলণ্ডের টনি লক।

তবে শেষ টেস্টে ইংলণ্ডের পক্ষে টনি লকের অবদান বড় কম নয়। ন' নম্বর ব্যাটসম্যান হিসেবে খেলতে নেমে লক যদি ৮৯ রান করতে না পারতেন, তাহলে ইংলণ্ডকে পড়তে হতো অসহনীয় অবস্থার মধ্যে। নবম উইকেটে লক-পোকক জুটি ১০৯ রান যোগ করে ইংলণ্ডের পক্ষে এক নতুন রেকর্ড প্রতিষ্ঠা করেন। অবশ্য এর আগেও এই উইকেটে রেকর্ডের অংশীদার ছিলেন লক। ১৯৬৩ সালে বার্মিংহাম টেস্টে ফ্রিজ শার্প আর লক নবম উইকেটে ৮৯ রান যোগ করে নতুন রেকর্ড করেছিলেন।

প্রথমে ব্যাটিং করার সুযোগ পেয়ে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ করেছিলো ৪১৪ রান। উত্তরে ইংলণ্ডের ইনিংস শেষ হলো ৩৭১ রানে। এর মধ্যে বয়কটের ১১৬ রান আর কাউড্রের ৫৯ রান ছাড়া একমাত্র লকই যা খেলেছিলেন। মাত্র ১১ রানের জন্যে লক পারেন নি শতরান পূর্ণ করতে।

স্নোর মারাত্মক বোলিং-এর জন্যে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের দ্বিতীয় ইনিংসে দেখা দিলো বিপর্যয়। সোবার্স একা ৯৫ রান করে কিছুটা সামলালেন বলে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের দ্বিতীয় ইনিংস শেষ হলো ২৬৪ রানে। স্নো ৬০ রানের বিনিময়ে পেয়েছিলেন ৬টি উইকেট।

জয়লাভ করতে হলে ইংলণ্ডকে তখন ৩৩০ মিনিটে করতে হবে ৩০৮ রান। কিন্তু শেষ পর্যন্ত জয়লাভের আশা ছেড়ে দিয়ে ইংলণ্ডের খেলোয়াড়রা ব্যস্ত হয়ে পড়লেন পরাজয়ের হাত থেকে রেহাই পেতে। শেষ পর্যন্ত সময়ই বাঁচিয়ে দিলো ইংলণ্ডকে! খেলা যখন শেষ হয়ে গেলো, তখন ইংলণ্ড ৯টি উইকেট হারিয়ে করেছিলো ২০৬ রান। একমাত্র কাউড্রে (৮২) আর নট (৭৩) একটু যা খেলে-ছিলেন। গিবস পেলেন ৬টি আর সোবার্স লাভ করলেন ৩টি উইকেট। যার ফলে দীর্ঘ আট বছর বাদে ইংলণ্ড ফিরে পেলো 'রাবার'!

= বয়কট =
শেষ টেস্টেও শতরান করেছেন

ন'বছর পরে

ন'বছর পরে স্পোর্টিং ইউনিয়ন, সি এ বি পরিচালিত লীগ ক্রিকেট প্রতিযোগি-তায় চ্যাম্পিয়ানশীপ লাভ করলো। এর

আগে ১৯৫৭-৫৮ সালে স্পোর্টিং ইউনিয়ন প্রথম বিভাগীয় ক্রিকেট লীগের খেলায় শ্রেষ্ঠত্বের সম্মান লাভ করেছিলো।

স্পোর্টিং ইউনিয়ন দল এবার ৭ উইকেটে পরাজিত করেছে ইস্টার্ন রেল ক্রিকেট দলকে। স্পোর্টিং ইউনিয়ন দলের এই জয়লাভের পেছনে আছে পংকজ রায়ের অপরাজিত ১২৫ আর অম্বর রায়ের ৯১ রান।

ইস্টার্ন রেল দল প্রথমে ব্যাটিং করে করেছিলো ২৯৯ রান। এর মধ্যে ছিলো এল এডমন্ডস-এর ৮৫ আর এ ভট্টাচার্যের ৫৪ রান। উত্তরে স্পোর্টিং ইউনিয়ন মাত্র ৩টি উইকেট হারিয়ে ৩০০ রান করায় তারা ৭ উইকেটে জয়লাভ করে।

সমাচার দর্পণ

দেশে

কলকাতার মাঠে বাইরের অর্থাৎ ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে সেরা খেলোয়াড়দের খেলার জন্যে আনাবার প্রথা অনেক দিনের। এবারও এর কোন ব্যতিক্রম হয় নি। এখনো পর্যন্ত এ আই এফ এ মোট ৪১ জন খেলোয়াড়কে আন্তঃ রাজ্য ছাড়পত্র দিয়েছেন। এর মধ্যে ১৫ জন আসছেন বাংলা দেশে। আর একমাত্র মহামেডান স্পোর্টিং-এর পক্ষে আসছেন এদের মধ্যে থেকে আটজন। উড়িষ্যার বিজয় দাশ আর দিল্লীর বিনয় ঘোষ খেলবেন বি এন আর দলের পক্ষে। আর উত্তর প্রদেশের বীর বাহাদুর গুরুং, আর সার্ভিসেসের টিকেন রাম ও বেণীকুমার লিম্বু খেলবেন ইস্টবেঙ্গলের পক্ষে।

কয়লা সাহায্য ভাণ্ডারের জন্যে অনুষ্ঠিত ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় প্রধানমন্ত্রী একাদশ ৯ রানে রাষ্ট্রপতি একাদশকে পরাজিত করেছে। এই প্রতিযোগিতায় দেশ-বিদেশের নাম করা খেলোয়াড়রা যোগদান করেছিলেন। এই খেলায় প্রধানমন্ত্রী দলের পক্ষে জয়সীমা (১০২), হার্ডিকার (১০৫) আর বার্জেস (১০২)

এমারসন

শতরান করার কৃতিত্ব অর্জন করেন। এই প্রতিযোগিতায় দেশ-বিদেশ থেকে খেলতে এসেছিলেন রমন সুব্বারাও, ফ্রেড্রী ট্রুম্যান, স্টাথাম, ওয়ার্ডলে, বার্জেস, নর্মান ও'নীল ছাড়াও ভারতের নাম করা খেলোয়াড়রা।

* * *

কলকাতার হকি লীগের খেলা বেশ জমে উঠেছে। অধিকাংশ দলই এগারো-বারোটা করে ম্যাচ খেলেছে। এর মধ্যে ইস্টবেঙ্গল ক্লাবই এখন সবার ওপরে। তারা এখনো কোন পয়েন্ট নষ্ট করে নি। ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের ঠিক পেছনেই আছে মোহনবাগান আর বি, এন, আর। লীগ চ্যাম্পিয়ানশীপের দিকে লক্ষ্য রেখে এই তিনটি দলই এখন এগিয়ে চলেছে। চ্যাম্পিয়ানশীপের শিকে শেষ পর্যন্ত যে কার ভাগ্যে ছিঁড়বে কে জানে ...!!

* * *

সিংহলের বিরুদ্ধে ডেভিস কাপ টেনিস প্রতিযোগিতায় জয়দীপ মুখার্জী খেলছেন না। জয়দীপের অনুরোধ অনুসারেই কর্তৃপক্ষ তাঁকে দলে নেন নি। ভারতীয় দলের পক্ষে মনোনীত খেলোয়াড়রা হলেন কলকাতার প্রেমজিৎ লাল, শ্যাম মিনোত্রা ও গৌরব মিশ্র আর মাদ্রাজের আনন্দ অমৃতরাজ। সিংহল বনাম ভারতের ডেভিস কাপের খেলা হবে গৌহাটিতে আগামী ২৬, ২৭ ও ২৮শে এপ্রিলে।

বিদেশে

অস্ট্রেলিয়ার রয় এমারসন, আমেরিকার বিলি জেন কিং ছাড়াও আরও তিনজন নাম করা টেনিস খেলোয়াড় পেশাদার হয়ে গেলেন। জানা গেছে যে ৩৬ সপ্তার আন্তর্জাতিক সফরের জন্যে রয় এমারসন ৭৫,০০০ হাজার ডলার পাবেন।

* * *

এবারও ইংলন্ডের টেস্ট ক্রিকেট সিলেকশন কমিটিতে কোন পরিবর্তন করা হলো না। ডি, জে, ইনসোলই থাকলেন সিলেকশন কমিটির চেয়ারম্যান। তাঁর সংগে আরো আছেন এলেক বেডসার, ডন কেনিয়ন আর পিটার।

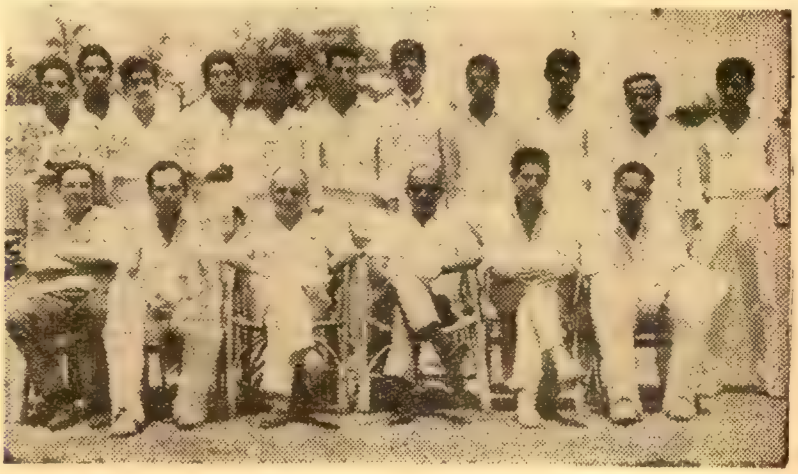

= স্পোর্টিং ইউনিয়ন দল =

ন' বছর পরে এ'রা আবার ফিরিয়ে আনলেন সি· এ· বি· লীগ বিজয়ের সম্মান।

আইন-কানুনের দুনিয়া

অজয় ও তাপস সিনহা (রেড়কী, ইউ, পি)

প্রশ্ন : খেলা যখন চলছে তখন বলটা যদি হঠাৎ হারিয়ে যায় তাহলে কি হবে?

উত্তর : খেলা চলার সময় বল যদি হারিয়ে যায় তাহলে ফিল্ডিং পক্ষের যে কেউ অর্থাৎ কোন ফিল্ডসম্যানকে বলতে হবে 'লস্ট বল' তখন ব্যাটিং পক্ষের রানের সংগে ৬ রান যোগ করা হবে। অবশ্য লস্ট বল ঘোষণা করার আগে ব্যাটসম্যানরা যে কটি রান নিয়েছিলেন সেগুলোও বজায় থাকবে। তারপর হারিয়ে যাওয়া বলের বদলে আর একটা বল আম্পায়ার খেলার জন্যে দেবেন।

সুজিতকুমার বসু, (নীলমণি মিত্র রো, কলকাতা—২)

প্রশ্ন : বোলার কি ইচ্ছেমত বোলিং কিম্বা ব্যাটিং করতে পারে?

উত্তর : না, পারে না। বোলারকে বোলিং-এর ধরণ বদলাতে হলে আম্পায়ারকে জানাতে হবে। আর আম্পায়ারও সেই পরিবর্তনের কথা ব্যাটসম্যানকে জানিয়ে দেবেন।

সিদ্ধার্থ মুখোপাধ্যায় ও মধুশ্রী মুখার্জী (কৃষ্ণনগর, নদীয়া)

প্রশ্ন : ব্যাটসম্যানের ব্যাটে লেগে একটা বল উঁচুতে উঠে গেলো, একজন ফিল্ডার ক্যাচটা লুফতে ছুটে এলেন, ব্যাটসম্যানও সেই সময় ছুটে যাচ্ছিলেন রান নিতে। দু'জনে সংঘর্ষ হওয়ায় ফিল্ডার বলটা লুফতে পারলেন না। তখন যদি তিনি 'অসুবিধে সৃষ্টির জন্যে আউট' নিয়ম অনুসারে আবেদন জানান, তাহলে কি ব্যাটসম্যান আউট হবেন?

উত্তর : এ প্রশ্নের সব উত্তরই নির্ভর করে আম্পায়ারের ওপর। আম্পায়ার যদি মনে করেন যে ব্যাটসম্যান রান নেবার অছিলায় ইচ্ছে করে ফিল্ডসম্যানকে ধাক্কা দিয়েছেন ক্যাচটা না লুফতে দেবার জন্যে, তাহলে তিনি ব্যাটসম্যানকে আউট বলে ঘোষণা করতে পারেন। আর আম্পায়ার যদি বোঝেন যে ওটা নেহাতই একটা দুর্ঘটনা তাহলে তিনি ব্যাটসম্যানকে আউট দেবেন না।

স্বর্ণজিৎ ভট্টাচার্য (গৌহাটি, আসাম)

প্রশ্ন : পিচ থেকে মাঠের চারদিকের বাউণ্ডারী লাইন কতো দূরে হয়?

উত্তর : সব থেকে বড় মাঠে বাউণ্ডারী লাইন ৭৫ গজ দূরে হয়। তবে এর থেকে অনেক ছোট মাঠেও খেলা হয়। টেস্ট খেলাও।

হৃষীকেশ মুখোপাধ্যায় (গোবরডাঙ্গা, ২৪ পরগনা)

প্রশ্ন : ক্যাচ তোলবার সময় দেখা গেলো যে ফিল্ডসম্যানের হাত মাটি ছুঁয়ে আছে বা মাটির ওপরে আছে। এভাবে ক্যাচ লুফলে ব্যাটসম্যান কি আউট হবে?

উত্তর : হ্যাঁ, হবে। তবে লক্ষ্য রাখতে হবে যে বলটা মাটি ছুঁয়ে আছে কি না। বল মাটি ছুঁলে ব্যাটসম্যান আর আউট হবে না।

খোকন, বাপ্পা ও বাপী (টাকী, ২৪ পরগনা)

প্রশ্ন : ব্যাটসম্যানের ব্যাটে লেগে বলটা মাটিতে পড়ার আগেই উইকেটরক্ষকের পায়ের প্যাডের মধ্যে ঢুকে গেলো, একজন ফিল্ডার তখন ছুটে গিয়ে বলটা বের করে নিয়ে 'হাউজ দ্যাট' বলে আবেদন জানালো। এ ক্ষেত্রে ব্যাটসম্যান কি আউট হবে?

উত্তর : হ্যাঁ, ব্যাটসম্যান এ ক্ষেত্রে আউট হবে। নিয়ম অনুযায়ী বল যদি কারো পোষাকের মধ্যে ঢুকে যায় তাহলে বলটি 'ডেড' হয়ে যাবে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে তা হয় না বলেই ব্যাটসম্যান আউট হয়ে যায়।

অনুপকুমার দেব (শরৎ ঘোষ লেন, কলকাতা)

প্রশ্ন : কোন ফিল্ডসম্যান ন্যায়সংগতভাবে বল না থামায়, তাহলে কি হবে? এ বিষয়ে ক্রিকেট খেলার আইন কানুনে কোন নিয়ম আছে নাকি?

উত্তর : ক্রিকেট খেলার আইন কানুনের 'দি ফিল্ডস ম্যান' অর্থাৎ ৪৪ নম্বর নিয়মে বলা হয়েছে যে—

"ফিল্ডস ম্যান তার শরীরের যে কোন অংশ দিয়ে বল থামাতে পারে, কিন্তু সে যদি ইচ্ছে করে অন্যভাবে বল থামায় তাহলে রান সংখ্যার সংগে আরো ৫ রান যোগ হবে। আর ব্যাটসম্যানরা কোন রান না নিয়ে থাকলে শুধু ৫ রান যোগ হবে। স্ট্রাইকার যদি বলটি মেরে থাকে তাহলে তার রানের সংগে এই রান যুক্ত হবে। তা নাহলে বাই, লেগ বাই, নো-বল কিম্বা ওয়াইড বল যা হবে তার সংগে যুক্ত হবে।

বাবুলাল পোদ্দার (বড়বাজার, কলকাতা)

প্রশ্ন : শুনেছি লেগের দিকে এখন নাকি দু'জনের বেশি ফিল্ডার রাখা যায় না। এ কথা কি সত্যি?

উত্তর : পুরোপুরি সত্যি নয়। তবে পরীক্ষামূলকভাবে যে নিয়ম চালু আছে তাতে বলা হয়েছে,

"পপিং ক্রীজের পেছনে 'অন সাইডে' বোলারের বোলিং করার সময় ফিল্ডারের সংখ্যা দুয়ের বেশি হবে না। তবে পপিং ক্রীজের পেছনে ছাড়া অন সাইডে ফিল্ডারের সংখ্যার ধরা-বাঁধা কোন নিয়ম নেই। অর্থাৎ পপিং ক্রীজের পেছনের দু'জন সহ 'অন সাইডে' ফিল্ডিং পক্ষ যতোজন খুশি ফিল্ডার রাখতে পারে।

অজিতকুমার হালদার (কাশীনগর, ২৪ পরগনা)

প্রশ্ন : বোলার বল করার পর বলটি ব্যাটসম্যানের পায়ে লাগলো। তারপর বলটি গড়িয়ে গিয়ে উইকেটে লাগলো, কিন্তু বেল পড়লো না। এ ক্ষেত্রে ব্যাটসম্যান কোন আউট হবে?

উত্তর : এ ক্ষেত্রে একমাত্র এল, বি, ডব্লিউ-এর প্রশ্ন উঠতে পারে। বেল না পড়লে কোন সময়ই উইকেটের পতন ঘটে না।

শুভ্র ভট্টাচার্য (পূর্বস্থলী, বর্ধমান)

প্রশ্ন : বোলার বল করার পর বল উইকেট থেকে বেরিয়ে গিয়ে আম্পায়ারের গায়ে লেগে এসে উইকেটে লাগলো। বেলও পড়ে গেলো। এ ক্ষেত্রে ব্যাটসম্যান কি আউট হবে?

উত্তর : না। আপনার অপর প্রশ্নের উত্তর হলো, ব্যাটসম্যান প্লে ডাউন হয়ে আউট হবে।

পরিচীয়তে

পরাজিত নায়ক

দ্বীপগুলোর নাম ওয়েস্ট ইণ্ডিজ। আবার ওর মধ্যের ছোট্ট ঐ দ্বীপটার নাম বার্বাডোজ। সমুদ্রের ঢেউগুলো এসে আছড়িয়ে পড়ে সাগরবেলায়। জীবনের উচ্ছল আনন্দে উদ্ভাসিত কালো কালো ছেলে-মেয়েরা সাগরজলে সিনান করে সজল চোখে মাতামাতির আনন্দে উদ্বেল হয়ে ওঠে। ওরা নাচানাচি করে, খায় আর হাসে গলা ছেড়ে।

আর তারপর বয়েস বাড়ার সংগে সংগে ছোট ছোট ব্যাট নিয়ে আরম্ভ করে ক্রিকেট খেলতে। আজ থেকে বছর তিরিশেক আগে ছোটদের এই দলে এসে যোগ দিয়েছিলো আর একটি ছেলে। বন্ধুরা তাকে ডাকতো গ্যারি বলে। পুরো নাম গারফিল্ড সোবার্স!

দেখতে দেখতে গ্যারি বড় হয়ে উঠলো। বেণ্টিক স্কুলে ভর্তি হয়েছে গ্যারি। ছোট্ট ছেলে গ্যারি ক্রিকেট খেলাতেও বেশ নাম করে ফেলেছে তখন। স্কুল দলের নিয়মিত খেলোয়াড় সে। দেখতে দেখতে তার খেলার গণ্ডী স্কুলকেও ছাড়িয়ে গেলো।

কিন্তু তারপর...। তারপর আজকের সোবার্সকে পার হয়ে আসতে হয়েছে অনেক পথ, অনেক বিপর্যয়। তবে ক্রিকেটই বাঁচিয়েছে সোবার্সকে সব বিপদ থেকে। চোদ্দ বছর বয়সে গ্যারিকে খুঁজতে হয়েছে উপার্জনের পথ। পুলিশ ব্যাণ্ড বিভাগে কাজ পেয়েছিলো সে। কিন্তু এ কাজও তার ঐ ক্রিকেট খেলার দৌলতে।

আর দু'টো বছর যেতে না যেতেই সোবার্স ভবিষ্যতের উজ্জ্বল সম্ভাবনা নিয়ে শ্রেণীবদ্ধ হলেন ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের খেলোয়াড় তালিকায়। মাত্র ষোল বছর বয়সে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ সফরকারী ভারতীয় দলের বিরুদ্ধে খেলার জন্যে সোবার্স নির্বাচিত হলেন। আর তার পরের বছর ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে সোবার্সকে টেস্ট খেলতে দেখা গেলো।

তারপর এলো ১৯৫৮ সাল! পাকিস্তান ক্রিকেট দল গেলো ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ভ্রমণে। সোবার্স তখন ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের নিয়মিত খেলোয়াড়।

তখন অবধি ব্যক্তিগতভাবে সর্বোচ্চ রান করার রেকর্ড ছিলো ইংলণ্ডের লেন হাটনের। হাটন মোট ১৩ ঘণ্টা ২০ মিনিট ব্যাটিং করে করেছিলেন ৩৬৪ রান।

সেই রানের রেকর্ড ভাঙলেন সোবার্স। হাটনের চেয়ে অনেক কম সময়ে সোবার্স তুলে ফেললেন নতুন বিশ্বরেকর্ড স্থাপনের জন্যে প্রয়োজনীয় ৩৬৫ রান। ঐ রান করতে সোবার্সের সময় লেগেছিলো ১০ ঘণ্টা ১০ মিনিট, অর্থাৎ হাটনের চেয়ে ৩

গারফিল্ড সোবার্স

ঘণ্টা ১০ মিনিট কম। শুধু তাই নয়—সেই মরশুমে সোবার্স পাকিস্তানের বিরুদ্ধে করেছিলেন মোট ১,০০৭ রান।

আজকের সোবার্সের কাছে এ কিছু আর উল্লেখ করার মতো ঘটনা নয়। কারণ সোবার্সের খেলা দেখলে স্পষ্টই বোঝা যায় যে তিনি ইচ্ছে করলেই রান করতে পারেন, ইচ্ছে করলেই করতে পারেন শত-রান, আর পারেন না কি—বোলিং বা ফিল্ডিং? ও দুটি বিভাগেও তাঁর জুড়ি মেলা ভার।

যে হাতে সোবার্স পেস বল করেন, ধনুকের মতো বল ঘুরিয়ে সুইং করান আবার সেই হাতেই দেন স্পিন বল। প্রতিপক্ষ দলের নামী ব্যাটসম্যানদের হতবাক করে মাঝে মাঝে দিয়ে বসেন গুগলি বল। ক্রিকেট খেলার সব ক'টি বিভাগে একজন খেলোয়াড়ের এমন পারদর্শিতা এর আগে আর দেখা যায় নি। তাই আজ বলতে বাধা নেই যে সর্বকালের শ্রেষ্ঠ চৌকস ক্রিকেটার।

সম্প্রতি ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিরুদ্ধে রাবার বিজয়ী ইংলণ্ড দলের অধিনায়ক কলিন কাউড্রে বলেছেন যে খেলোয়াড় মনোবৃত্তিসম্পন্ন যতো খেলোয়াড়ের সম্মুখীন তিনি হয়েছেন, তাঁদের মধ্যে সোবার্স সর্বশ্রেষ্ঠ। কাউড্রে আরো বলেন, "একা সোবার্স যদি বাধা হয়ে না দাঁড়াতেন তাহলে আমরা আরো সহজে 'রাবার' জয় করতে পারতাম। অনেক সময় আমার মনে হয়েছে, ইংলণ্ড বনাম সোবার্স টেস্ট খেলা হচ্ছে...!"

সোবার্সের খেলা সম্বন্ধে জ্যাক ফ্রিঙ্গলটন লিখেছেন, সোবার্সের প্রতিটি মার নিজের বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল। ব্যাটে পাওয়া যাবে না এমন বলও তিনি ওভার বাউণ্ডারী মারতে পারেন। যেমন মেরেছিলেন অস্ট্রেলিয়ার মেকিফের একটি বল। ফরওয়ার্ড খেলার জন্যে পা বাড়িয়ে সোবার্স দেখলেন বল ব্যাটে পাওয়া যাবে না। পিছিয়ে এসে তখন সেই বলটাকে মিড অনের ওপর দিয়ে পাঠিয়ে দিলেন স্টেণ্ডারীতে। ওভার বাউণ্ডারীতে!

এই হলো সোবার্সের পরিচয়। সুতরাং সোবার্স সম্বন্ধে বেশি কিছু লিখতে যাওয়া বাতুলতা। কারণ সোবার্স একাই একশ'! সোবার্স একাই বোধহয় পৃথিবীর যে কোন শ্রেষ্ঠ ক্রিকেট দলের বিরুদ্ধে লড়াই করতে পারেন। জিততেও পারেন।

কিন্তু অস্ট্রেলিয়ার প্রাক্তন অধিনায়ক ববি সিম্পসন তাঁর ক্যাপ্টেনস স্টোরিতে যে কথা লিখেছেন—জানি নে সে ধারণা তাঁর কি করে হলো। সিম্পসন লিখেছেন, "ক্রিকেট জগতে সোবার্স অপাংক্তেয়, কারণ তিনি আম্পায়ারকে মানেন না......!"

সম্পাদিকা—জয়ন্তী সেন

বসুমতী (প্রাঃ) লিঃ-এর পক্ষে ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীটস্থ কলিকাতা-১২ বসুমতী প্রেস হইতে শ্রীসুকুমার গুহমজুমদার কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বসুমতীর শাস্ত্র-প্রচার গ্রন্থরাজি

ধনুর্বেদ :

কাশীরাজ পণ্ডিত শ্যামাকান্ত তর্কপঞ্চানন সম্পাদিত। বহু আয়াসে তাঞ্জোরের প্রাচীন দুষ্প্রাপ্য পুথির সংগ্রহশালা, কাশীর কুইন্স কলেজ লাইব্রেরী, কাশী মহারাজার বিশাল গ্রন্থাগার হতে সংগৃহীত। মূল্য—২-০০ টাকা।

বেদান্তসার :

শ্রীমদ্ পরমহংস সদানন্দ যোগীন্দ্র বিরচিত : ধর্মশাস্ত্র প্রচার-ব্রতী উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় অনূদিত (সুবোধিনী-টীকা সংযুক্ত)। বেদের এই অংশেই জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান ব্রহ্মবিদ্যার দিব্যজ্যোতিঃ বিবম্বিত। মূল্য—২-০০ টাকা।

মানসোল্লাস :

বশিষ্ঠানন্দ পুরী (অনুবাদ)।

মূল্য—২-০০ টাকা।

বিবরণ-প্রমেয়-সংগ্রহ :

ভারতীতীর্থ বিরচিত। সুপণ্ডিত শ্রীপ্রমথনাথ তর্কভূষণ অনূদিত। (১ম নাই) চারি খণ্ডে সম্পূর্ণ। মূল্য—প্রতি খণ্ড—৩-০০ টাকা।

শঙ্করাচার্যের গ্রন্থমালা :

পণ্ডিতপ্রবর পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত। সুবিস্তারিত ব্যাখ্যা ও বিবৃতি সন্নিবেশিত। মূল্য—১ম খণ্ড—৫-৫০ টাকা। ৩য় খণ্ড ৪-০০ টাকা।

যোগশাস্ত্র :

শিবসংহিতা, ঘেরণ্ডসংহিতা, বুদ্ধসংহিতা, অষ্টাবক্র-সংহিতা, ষটচক্রনিরূপণম্, দত্তাত্রেয়প্রোক্ত যোগরহস্যম, পরাশরপ্রোক্ত যোগোপদেশ। দুষ্প্রাপ্য সাতখানি যোগ গ্রন্থের সমাবেশ। কাপড় ও বোর্ডে বাঁধা। মূল্য—৫-০০ টাকা।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণায়ণ :

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের শ্রীমুখনিঃসৃত অমিয় নিস্যন্দিনী বাণী ভক্তপ্রবর উমাপদ মুখোপাধ্যায় সঙ্কলিত। মহামূল্য রত্নের সন্নিবেশ। বোর্ড বাঁধাই মূল্য—২-৫০ পয়সা।

শাণ্ডিল্যসূত্রম্ :

উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় অনূদিত—২-০০ টাকা।

ক্রিয়াকাণ্ড-বারিধি :

(ত্রিবেদ, উপনিষদ, স্মৃতি ও সর্বতন্ত্র হইতে সঙ্কলিত। সংবর্ধিত সংশোধিত ও সুসংস্কৃত সংস্করণ)।

বহু আয়াস ও অধ্যবসায় আহৃত এবং প্রচুর অর্থব্যয়ে মুদ্রিত আর্য সৎকর্মানুষ্ঠান সম্বন্ধীয় যাবতীয় তথ্যপূর্ণ এই বিরাট গ্রন্থশাস্ত্র প্রচারোদ্দেশ্যে এখনও স্বল্পমূল্যে বিক্রয় হইতেছে। দীক্ষা প্রকরণ, নিত্যকৃত্য প্রকরণ, পূজা প্রকরণ, ধ্যানাদি প্রকরণ, ন্যাস প্রকরণ, ব্রত প্রকরণ, যাত্রা প্রকরণ, আসন ও মুদ্রা প্রকরণ-সমন্বিত মূল বিষয়-সমূহে ৮৬৩ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ প্রথম খণ্ড। মূল্য—১০-০০ টাকা।

দ্বিতীয় খণ্ড। মূল্য—৮-০০ টাকা (যন্ত্রস্থ)।

তৃতীয় খণ্ড। মূল্য—৮-০০ টাকা (যন্ত্রস্থ)।

পবন-বিজয়-স্বরোদয় :

বায়ু জয়ই যোগের শ্রেষ্ঠ সাধনা। অলৌকিক সত্য নির্দেশক যোগাক্রিয়ার গ্রন্থ। মূল্য—৩-০০ টাকা।

হিন্দুধর্ম পরিচয় :

ধর্মশাস্ত্রবিশারদ শ্রীসনৎকুমার রায়চৌধুরী প্রণীত। দ্বিতীয় সংস্করণ। মূল্য—৩-০০ টাকা।

আত্মানুসন্ধান :

শ্রীসুশীলকুমার ঘোষাল প্রণীত। প্রতিটি ধর্মপ্রাণ নর-নারীর অবশ্যপাঠ্য গ্রন্থ। মূল্য—২-৫০ পয়সা।

পুরশ্চরণ রসোল্লাস :

(দুর্লভ তান্ত্রিক গ্রন্থ। মূল সংস্কৃত ও বঙ্গানুবাদ)। মূল্য—৩-০০ টাকা।

যোগী যাজ্ঞবল্ক্যম্ :

যোগীপ্রবর মহর্ষি শ্রীযাজ্ঞবল্ক্য বিরচিতম্। মূল সংস্কৃত, বঙ্গানুবাদ ও ব্যাখ্যাসমন্বিত। মূল্য—২-০০ টাকা।

পঞ্চতীর্থ মাহাত্ম্য :

শ্রীকাশীমাহাত্ম্যম, শ্রীগয়ামাহাত্ম্যম, শ্রীবৈদ্যনাথ মাহাত্ম্যম শ্রীপ্রয়াগ মাহাত্ম্যম, শ্রীবৃন্দাবন মাহাত্ম্যম। মূল সংস্কৃত ও পণ্ডিতপ্রবর শ্রীকালীপ্রসন্নকৃত বঙ্গানুবাদ। মূল্য—৩-০০ টাকা।

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড ॥ ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলিকাতা - ১২

19 APR 1968

চিনতে পেরেছেন নিশ্চয়ই

হাঁ, আমি (কুকমী) গুঁড়ো মশলা !

কেন আমাকে দিয়ে
রান্না করবেন,
জানেন তো ?

① আমি প্রথম শ্রেণীর
ঝাড়াই ও বাছাই
মশলায় প্রস্তুত

② আমি সময়, পরিশ্রম
ও অপচয় বাঁচাই

③ আমি বৈজ্ঞানিক প্রথায়
সর্ব্বাধুনিক মেশিনে
প্রস্তুত এবং নির্ভেজাল

④ আমাকে শিশু ও রুগীর
পথ্যে নির্ভয়ে ব্যবহার
করতে পারবেন

⑤ আমি রান্নার
স্বাদ বৃদ্ধি করি

২৩১ } মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড, কলিকাতা ৭, ফোন { ৩৩-১২৩২, ৩৩-২৩৮১
২৩৫ } "গ্রাম-স্পাইস মার্ট" মিল-কাশীপুরে

নিজস্ব মিলে প্রস্তুত

'কুকমী'—সর্বাধিক বিক্রীত গুঁড়ো মশলা

পনের লক্ষ প্যাকেট মাসিক বিক্রয়

১২৫ বৎসরের অধিক প্রাচীন ও বর্ত্তমানে মশলার বৃহত্তম প্রতিষ্ঠান

কৃষ্ণচন্দ্র দত্ত (স্পাইস) প্রাঃ লিঃ

সাপ্তাহিক বসুমতী

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

বিগত সপ্তাহের কলকাতার একটি চিত্ররূপ

বর্ষ ঃ ৪৫শ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ১২ই বৈশাখ, ১৩৭৫ বঙ্গাব্দ] OLDEST WEEKLY OF NORTH INDIA [72nd year, No. 45, 25th April, 1968

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয়	...	২৮১৯
আজকের মানুষ	...	২৮২০
রঙ্গদর্শন	...	২৮২১
অবক্তব্য	— চন্দ্রগুপ্ত	২৮২৩
ভারতদর্শন	...	২৮২৫
আন্তর্জাতিক	...	২৮২৮
সপ্তাহের বোঝা	—কৃত্তিবাস ওঝা	২৮৩০
ধূর্ত কবিমশাই (কবিতা)	— হরপ্রসাদ মিত্র	২৮৩৩
সাংকেতিক তারবার্তা (কবিতা)	— নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী	২৮৩৩
পথ কে রুখবে? (ধারাবাহিক উপন্যাস)	— মনোজ বসু	২৮৩৪
আকাশবাণী-পরিক্রমা	— মেঘদূত	২৮৩৮
ভিয়েৎনাম : ঝড়ের কেন্দ্রে (প্রবন্ধ)	— বরুণ রায়	২৮৩৯

—সদ্য প্রকাশিত হইয়াছে ।।—

বহুকাল পরে পুনর্মুদ্রণ

"নবীনবাবু বর্ণনা এবং গীতিতে একপ্রকার মন্ত্রসিদ্ধ ।..... এই সকল বিষয়ে তাঁহার লিপিপ্রণালীর সঙ্গে বাইরণের লিপি প্রণালীর বিশেষ সাদৃশ্য দেখা যায় । .... বায়রণের ন্যায় নবীনবাবু বর্ণনায় অত্যন্ত ক্ষমতাশালী ।..... নবীনবাবুর যখন স্বদেশ বাৎসল্য স্রোতঃ উচ্ছলিত হয়, তখন তিনিও রাখিয়া ঢাকিয়া বলিতে জানেন না ।"—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ।

মহাকবি

নবীনচন্দ্র সেনের গ্রন্থাবলী

রৈবতক কাব্য ।। কুরুক্ষেত্র প্রভাস

গ্রন্থের পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩০৮ ।

মূল্য মাত্র সাত টাকা ।

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড : ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
গ্রন্থমেলা		২৮৪৭
পাঠকমন		২৮৪৮
রবীন্দ্রনাথ ও সুভাষচন্দ্র (ধারাবাহিক প্রবন্ধ)	শঙ্করীপ্রসাদ বসু	২৮৪৯
যা দেখেছি, যা পেয়েছি (স্মৃতিচয়ন)	সুধীরঞ্জন দাস	২৮৫৪
বিজ্ঞান-বিচিত্রা	ডঃ বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য	২৮৬০
ইলেকট্রনিক কম্পিউটার	মনোরঞ্জন হাজরা	২৮৬৬
পূর্ব জার্মানী ও সোভিয়েটদেশ পরিক্রমা	অশোক সেন	২৮৬৯
প্রশ্নজগৎ		২৮৭২
খেলাধূলা	শান্তিপ্রিয়	২৮৭৭

রহস্য গল্প। খুনের গল্প। ডাকাতির গল্প। এ্যাডভেঞ্চারের গল্প।

সদ্য প্রকাশিত হইল।

শিশু-সাহিত্যের সম্রাট

হেমেন্দ্রকুমার রায়ের

গ্রন্থাবলী

শিশু ও কিশোর-কিশোরীদের জন্য লেখা—কিন্তু হেমেন্দ্রকুমারের রচনা আবালবৃদ্ধবনিতা পড়ে থাকেন। হেমেন্দ্রকুমারের ছখানি সাড়াজাগানো উপন্যাস এই সুবৃহৎ গ্রন্থাবলীতে স্থান পেয়েছে।

১। যকের ধন ২। প্রদীপ ও অন্ধকার ৩। রহস্যের আলোছায়া।
৪। ক্ষুদিরামের কীর্তি ৫। চাবি ও খিল
৬। একরত্তি মাটি ৭। এক গুচ্ছ রহস্য ও গোয়েন্দা গল্প।

পৃষ্ঠা সংখ্যা ২১৬
মূল্য মাত্র ছয় টাকা

বসুমতী প্রাঃ লিঃ
কলিকাতা-১২

অবিলম্বে অর্ডার পেশ করুন !!

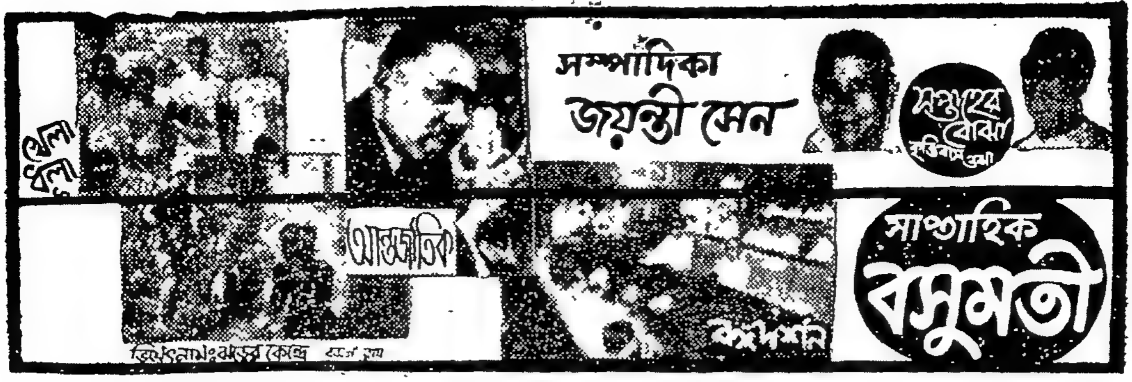

CALCUT
CENTRA
LIBRA
UNIVE

৭২ বর্ষ : ৪৫শ সংখ্যা—মূল্য : ৩০ পয়সা
বৃহস্পতিবার, ১২ই বৈশাখ, ১৩৭৫ বঙ্গাব্দ

বাংলা ভাষায় দ্বিতীয় সর্বাধিক প্রচারিত
সাপ্তাহিক পত্রিকা

PRICE : 30 Paise
Thursday, 25th April, 1968

জাতীয় অপরাধ নিরোধ সপ্তাহ

জাতীয় অপরাধ নিরোধ সপ্তাহ হয়তো বেশ সাড়ম্বরে পালিত হয়েছে। সংবাদ-পত্রে অপরাধের বিবরণী, রাজ্যপালের বক্তৃতা এবং অপরাধীদের ব্যবহৃত অস্ত্র-শস্ত্রের প্রদর্শনী থেকে সুরু করে যা করা হয়েছে তাতে অপরাধ নিবারণের জয়ঢাক পেটানো হয়েছে। কার্যত অপরাধ নিরোধ-এর জন্যে কী কাজ করা হয়েছে তা প্রায় উহ্য বললেই চলে।

অপরাধ নিরোধ প্রয়োজন—একথা অপরাধীরাও মুখ ফুটে বলবে। কিন্তু অগোচরে ও গোপনে সমাজের অভ্যন্তরে থেকে সভ্যতার মুখোশ পরে যে একদল তথাকথিত মানুষ অপরাধ করে চলেছে—তারাও অপরাধ নিবারণের কথা বলছে। অনেকেই জানে যে, সমাজের গা ঘেঁষে রয়েছে ছদ্মবেশী অপরাধীর দল। কিন্তু তার বিরুদ্ধে কিছু বলার শক্তি সাধারণ গোবেচারা লোকেদের যেমন নেই, তেমনি অপরাধীদের বিরুদ্ধে আইনত হাতিয়ার নিয়ে যারা দাঁড়িয়ে তারাও তাদের বেলায় চুপচাপ। এবং তখনই ওঠে প্রয়োগ করার মতো আইনের অভাবের কথা। এই কারণে আমাদের গণতান্ত্রিক দেশে কালোবাজারী মজুতদারী প্রভৃতির এমন বাড়-বাড়ন্ত।

জাতীয় অপরাধ নিরোধ সপ্তাহে জন-সাধারণের একজনও যদি বলতে পারে যে, শাসকগোষ্ঠীর কর্মদক্ষতা ও সতর্কতার গুণে কেউ ভেজাল খায় নি, কালোবাজারে কিছু কেনে নি তাহলে আমরা মনে করতে পারি জাতীয় অপরাধ নিরোধ সপ্তাহ পালন করে আমরা শুভ ফল লাভ করেছি। জাতীয় মন ও জাতীয় স্বাস্থ্য এখন পুনরুদ্ধারের পথে।

অবশ্য অপরাধ বলতে সাধারণত ধারণা হয়—খুন, জখম, রাহাজানি, ডাকাতি, প্রতারণা, কেপমারি, চোলাই মদ তৈরি, জুয়াখেলা প্রভৃতি ঘটনা। ঐ সব ঘটনার মুখোমুখি হতে জনসাধারণ এখন অভ্যস্ত মনে হয়। গ্রামে বাস করলে রাত্রে চুরির ভয়, শহরে রাস্তায় বের হলে পকেটমার হবার চিন্তা,—এ তো নিত্য দিনের ব্যাপার। উপরন্তু মাসাধিককাল সংবাদপত্রের প্রায় প্রাত্যহিক খবর হচ্ছে—খুন-জখম। অর্থাৎ বাড়ি থেকে বের হয়ে গুন্ডার আক্রমণে প্রাণ নিয়ে বাড়ি ফেরা যাবে কি না বলা বড়ই কঠিন। এসব ঘটনা থেকে রক্ষার দায়িত্ব মূলত পুলিশ বিভাগের। দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে, পুলিশের বর্তমানকালে মুখ্য ভূমিকা হচ্ছে যেন বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলিকে শায়েস্তা করা. জনসেবা তারা কতটুকু করবে—তা আজো জনগণের জ্ঞাতব্য নয়। কারণ, সংবুদ্ধিসম্পন্ন নাগরিকেরা পুলিশের দ্বারস্থ হলেও তাঁদের হয়রানির শেষ হয় না। কথায় বলে, 'পুলিশে ছুঁলে আঠারো ঘা'। স্বাধীন ভারতে শিক্ষিত নিরপরাধ ব্যক্তিদের মনে যদি এই রকম ধারণা বদ্ধমূল থাকে, তাহলে আমরা বুঝতে পারি না কিভাবে স্বল্প শিক্ষিত বা নিরক্ষর জনসাধারণের কাছ থেকে পুলিশ বিভাগ সহযোগিতা কামনা করত পারে। ভারত স্বাধীন হওয়ার পর থেকে অদ্যাবধি পুলিশ বিভাগ কাদের সঙ্গে কি রকম সহযোগিতা রক্ষা করেছে, কিংবা কোন অপরাধের কি রকম ফয়সালা করেছে তার একটা সমীক্ষা গ্রহণ করলে বোঝা যাবে এতদিন পুলিশের ভূমিকা কী ছিল। তবু আশা করতেই হবে যে, পুলিশ বিভাগ সম্পর্কে বীতস্পৃহ জনসাধারণ তাদের ধারণা বদলাবেন। এবং বর্তমানকালেব আধুনিক চিন্তাধারার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট পুলিশ অফিসারগণই পুলিশ বিভাগকে দুর্নামের হাত থেকে রক্ষা করবেন।

সত্যি কথা বলতে কি—অপরাধীদের ধরা তেমন কিছু কঠিন ব্যাপার নয়। এক-জন পকেটমার যদি ধরা পড়ে তাহলে একটা গোটা দলই বা কেন ধরা পড়বে না ? প্রসঙ্গত এটাও অপরাধ কার্যের সঙ্গে বিচার-বিশ্লেষণ করে দেখতে হবে যে, কারা কী ধরণের অপরাধ করছে, কেনই বা করছে। সমাজ এবং রাষ্ট্র অপরাধীদের সাময়িকভাবে শায়েস্তা করেই দায়িত্ব সম্পন্ন করতে চায়, না, অপবাধের মূল কারণ অন্বেষণ করে তা থেকে অপরাধীকে রক্ষা করে সৎ নাগরিক হিসেবে পরিণত করতে ইচ্ছুক ? তেমন ইচ্ছুক যদি না হয়, তাহলে যে কেউ হলপ করে বলবে যে, অপরাধীকে সমাজে জিইয়ে রেখে জাতীয় অপরাধ নিরোধ সপ্তাহ পালন করাই হবে বছরের অন্যান্য প্রথাগত উৎসবের মতো একটি জাতীয় উৎসব।

তাই হয়তো এবার এই উৎসবের বৈশিষ্ট্যে অপবাধীর সামিল হয়েছেন অগ্নিযুগের বিপ্লবীরা। তাই তাঁদের ব্যবহৃত অস্ত্রশস্ত্র চোর গুন্ডা প্রভৃতি অপরাধীদের পাশে সাজিয়ে রেখে জাতীয় অপরাধ নিরোধ সপ্তাহ পালন করা হযেছে। সাবাস, পুলিশের মনোভাব। ভাবতের স্বাধীনতা অর্জনে যাঁদের গৌরবে সাবা ভারতের গৌরব—আজ তাঁরাই পুলিশের চোখে অপরাধীর তালিকায়। হয়তো অগ্নিযুগেব আজো যাঁরা জীবিত রয়েছেন তাঁদের নাম পুলিশের ডায়েরিতে 'অপরাধীদের তালিকায় জাজ্বল্যমান। এই না হলে জাতীয় অপরাধ নিরোধ সপ্তাহ পালন। আর একমাত্র সৎ নিরপবাধ তাঁরাই —যাঁরা প্রদর্শনীর আয়োজন করে জাতীয় অপরাধ নিরোধ সপ্তাহের জয়ঢাক পিটিয়ে-ছেন। জাতীয় নিরপরাধ সপ্তাহ কোনো-দিন পালিত হলে—হয়তো তাঁদের কীর্তি কোনো প্রদর্শনীর শোভা বৃদ্ধি করবে। এবারের জাতীয় অপরাধ নিরোধ সপ্তাহ পালনের এটাই বোধ হয় নীট ফল।

সম্পাদকীয়

আজকের মানুষ

সাইকেলটা ধীরে, স্বচ্ছন্দ-গতিতে আসছিল। কখনো বা সবেগে, সাঁই সাঁই করে। ঘরে স্ত্রী একা। নতুন মা হয়েছে। আর আছে, ছোট্ট ফুটফুটে এইটুকু হোসিয়া চে। কয়েক মিনিটের মধ্যেই ছেলের তুলতুলে মুখখানা দেখতে পাবে ভেবে আনন্দে রুডি হয়তো শিস দিচ্ছিল। এমন সময় হঠাৎ অতর্কিতে আড়াল থেকে কে একজন তার সাইকেলের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। রুডিকে সাইকেল থেকে হেঁচকা টান মেরে নামালো, চোরা-পকেট থেকে রিভলবার বার করলো। তারপর উন্মাদের মত গুলী ছোটালো রুডির ওপর। মাথায়, বুকে, গালে—পর পর তিনটি গুলী। রক্তের বন্যায় ভাসলো রুডি ডুটশকের নিঃসাড় দেহ। তারপর পাঁচ ঘন্টা ধরে যমে-মানুষে লড়াই। মাথার খুলি থেকে সার্জনরা গুলী বার করলেন। দিন-রাতের সেবা-শুশ্রূষা ও চিকিৎসার গুণে রুডি চোখ মেলে চেয়েছে। তার জ্ঞান ফিরেছে।

কে এই রুডি ডুট্‌শকে? কেন তাকে লুথার কিং-এর মত গুলী করে হত্যা করার অপচেষ্টা? হ্যাঁ। কিং-এর মতই। মিউনিকের বাড়ি-রঙের মিস্ত্রি জোসেফ বাখমান পুলিশের কাছে স্বীকারোক্তিতে বলেছে যে, মার্টিনের হত্যাকাণ্ডের সংবাদ পড়ে তারও নাকি মনে হয়েছে 'আমারও এমনি একটা কিছু করা উচিত।' রুডি আমেরিকার নাগরিক অধিকার আন্দোলনের নেতা নন, লুথারের মতো অহিংস আন্দোলন পরিচালনার জন্যে তাঁর কপালে কোনদিন যে নোবেল পুরস্কার জুটবে না, এটাও সত্যি, অহিংস আন্দোলনে ডুট্‌শকের আস্থা আছে কিনা তাতেও যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে। কিন্তু তবুও তাঁকে বধ করা দরকার মনে করেছে বাখমান। ডুট্‌শকে আজ যেন সারা ইয়োরোপের শাসকমণ্ডলীর কাছে আতঙ্ক বিশেষ। আটাশ বছরের ছোকরা লাল ডুট্‌শকে ইয়োরোপীয় নায়কদের চোখের ঘুম কেড়ে নিয়েছেন। পশ্চিম জার্মানীর ডুট্‌শকের প্রাণে যে-আগুন ইয়োরোপের সমাজ-ব্যবস্থা জ্বালিয়ে দিয়েছে, সে-আগুন এখন তিনি রোম, প্যারিস, আমস্টারডাম—সবখানে ছড়িয়ে দিয়েছেন।

মাত্র ২৮ বছর বয়স হলে কী হবে, হের ডুট্‌শকের সাংগঠনিক ক্ষমতার যেন তুলনা নেই। রুডি ডুট্‌শকে পশ্চিম জার্মানীর বামপন্থী ছাত্র সংগঠন সোস্যালিস্ট স্টুডেন্টস্ ফেডারেশনের নেতা। দেশে মাত্র দেড় হাজার বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র নিয়ে এর কেন্দ্রবিন্দু গঠিত হলেও মনে হয়, গোটা পশ্চিম জার্মানীর তিন লাখ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ডুট্‌শকের এক ডাকে

রুডি ডুট্‌শকে

বার্লিনের রাস্তায় নেমে পড়বে। একাধিকবার একাধিক রাজধানীতে পড়েছেও। হো হো—হো চি মিন ছিল তাদের শ্লোগান। বন-বার্লিন থেকে রোম প্যারিস আমস্টারডাম—একই শ্লোগান ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়েছে। হো চি মিন—জিন্দাবাদ শ্লোগানের মানে বুঝি; কিন্তু 'হো হো' করার অর্থ কী? অর্থ এই পশ্চিমী রাষ্ট্রব্যবস্থা বা সরকারী নীতি যারা ভিয়েৎনাম যুদ্ধ চালাচ্ছে বা সমর্থন করছে তাদের প্রতি 'হো হো'—মানে 'ছোঃ ছোঃ'।

শুধু ভিয়েৎনামের যুদ্ধই নয়, ছাত্র রুডি ডুট্‌শকের আপত্তি পশ্চিম জার্মানীর বর্তমান কোয়ালিশন ব্যবস্থারও। তিনি মনে করেন গোঁড়া দক্ষিণপন্থী ক্রিশ্চান ডেমোক্রাটদের সঙ্গে মধ্য-বামপন্থী সোস্যাল ডেমোক্রাটরা গাঁটছড়া বেঁধে দেশ-পথ রুদ্ধ করছে, দেশটাকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তাঁবেদার রাষ্ট্রে পরিণত করা হচ্ছে। ডুট্‌শকের নেতৃত্বে পশ্চিম জার্মানীর ছাত্রদের আক্রমণের অন্যতম প্রধান স্থল আক্সেল স্প্রিংগারের সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠানও।

বিক্ষোভ মিছিল পরিচালনা করতে গিয়ে ছাত্ররা প্রায়ই পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছে, পুলিশের মোটা ব্যাটনের বিরুদ্ধে ছাত্ররা অবাধে ইঁট পাটকেল ছুঁড়েছে, পুলিশের গাড়ি পুড়িয়েছে। স্প্রিংগারের দুটো প্রভাবশালী সংবাদপত্র 'বিল্ড জিটুং', 'ডাই ওয়েল্ট' ইত্যাদি ছাত্রদের এ-আন্দোলনের তীব্র নিন্দা করেছেন। কখনো তাঁরা ছাত্রদের 'ছাত্রগুণ্ডা' কখনো 'পোড়ো বিট্‌নিক', 'বুদ্ধিজীবী বেকুব' বলেছেন, আবার কখনো বা আন্দোলনের প্রভাব খাটো করার জন্যে বলেছেন 'অশিক্ষিত জনতা' 'উচ্ছৃঙ্খল বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদী' ইত্যাদি বিশেষণে ভূষিত করেছেন। ফলে ছাত্ররা গিয়েছে আরো ক্ষেপে। তারা 'স্প্রিংগার সাম্রাজ্যের' সুউচ্চ সুরম্য অফিসভবনের নীচতলার কোন কাঁচের জানলার কাঁচ অক্ষত রাখে নি, কাগজের ডেলিভারী ভ্যান এ পর্যন্ত অন্ততঃ ২০খানা পুড়িয়েছে।

পশ্চিম জার্মানীকে জ্বালিয়ে মারলেও রুডি ডুট্‌শকে কিন্তু আসলে পূর্ব জার্মানীর ছেলে। বাবা পোস্টম্যান। পূর্ব জার্মানী থেকে তিনি পালিয়ে এসেছিলেন সেনাবাহিনীতে যাবার ভয়ে। রুডি ডুট্‌শকের আদর্শ নায়ক মার্ক্স, মাও, কাস্ত্রো। সেজন্যে রক্ত যেন সব সময় টগবগ করে ফুটছে। রুডিকে সকলেই 'রেড' বা লাল ডুট্‌শকে বলে ডাকে। বিয়ে করেছেন এক মার্কিন তরুণীকে। তবে তিন মাসের শিশুপুত্রের নাম গুয়েভারার অনুকরণে—হোসিয়া চে।

রুডি সারা পশ্চিম জার্মানীকে কাঁপিয়ে তুলেছে, ১৯৩০ সনের পর এ-ধরণের ব্যাপক ছাত্র আন্দোলন এখানে আর দেখা যায় নি। তাঁর হত্যা প্রচেষ্টা তাঁকে সারা ইয়োরোপে আরো জনপ্রিয় করে তুলেছে।

বঙ্গদর্শন

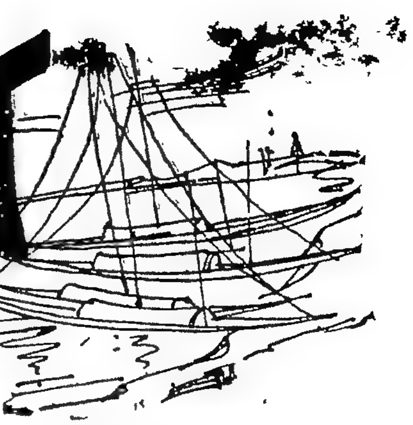

পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেস বিরোধী কয়েকটি রাজনৈতিক দলের সাম্প্রতিক কার্যকলাপ ও সিদ্ধান্ত সমূহ দেখে মনে হচ্ছে যে আমাদের দেশের রাজনৈতিক সমস্যাটা রীতিমত জটিল পথ পরিগ্রহ করেছে। নিজের নাক কেটে পরের যাত্রাভঙ্গ করার নীতি সর্বদা সফল হয় না, অনেক সময় নিজের নাকটুকুকেও খোয়াতে হয়।

কথাগুলি আমরা ভারতীয় ক্রান্তিদল, পি এস পি এবং এস এস পি'কেই উদ্দেশ্য করে বলছি। কয়েক বছর আগে হলে কংগ্রেসকেও এই প্রসঙ্গে টানা যেত, কিন্তু নেহরুর মৃত্যুর পর থেকে যেভাবে কংগ্রেস দ্রুত দক্ষিণ পন্থার দিকে সরে আসছে তাতে অদূর ভবিষ্যতে স্বতন্ত্র দলের সঙ্গে তার পার্থক্য থাকবে কিনা সন্দেহ। গণতান্ত্রিক সমাজবাদ কথাটা এখন কংগ্রেস প্রায় পরিত্যাগ করেছে, তবে কংগ্রেসের বি টিম এই দলগুলির মুখে এই কথাটি প্রায়ই শোনা যায়। পি এস পি, এস এস পি প্রমুখ দলগুলি ইউরোপীয় সোস্যাল ডেমোক্রাটদের মতই গণতন্ত্রের পথে সমাজতন্ত্রে উত্তরণে বিশ্বাসী। পক্ষান্তরে কমিউনিস্টরা পার্লামেন্টীয় গণতন্ত্রের কার্যকারিতায় বিশ্বাস করে না। তারা বিপ্লবের মাধ্যমেই শ্রমিকশ্রেণীর ক্ষমতা দখলের স্বপ্ন দেখে, তবে বুর্জোয়া গণতন্ত্র যতটুকু সুযোগ দেয় ততটুকুর সদ্ব্যবহার করতে তারা দ্বিধা বোধ করে না, কেন না তাদের মতে সেটাও সংগ্রামের একটা কৌশল।

মোটামুটি এই জাতীয় ধারণার উপরই ভিত্তি করে পশ্চিমবঙ্গে জনসঙ্ঘ ছাড়া সকল কংগ্রেস বিরোধী দলই দাঁড়িয়ে আছে। কমিউনিস্ট বা কমিউনিস্ট ভাবাপন্ন দলগুলির বক্তব্যে কোন ধোঁয়াটে ভাব নেই, তাদের বক্তব্য ঠিক হোক বা না হোক। পক্ষান্তরে পি এস পি প্রভৃতির মত সোস্যাল ডেমোক্রাটিক দলগুলি সর্বদাই একটা সংশয়ে ভুগছে সেটি হচ্ছে তাদের নিজেদেরই বক্তব্যের সমস্যা। গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র দুটি পরস্পর বিরোধী ধারণা, একটির ভিত্তি ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য অপরটির সমষ্টিবাদ। এই দুটি পরস্পর বিরোধী ধারণার লাগাম এক হাতে রাখতে গিয়ে কখনো তাদের কমিউনিস্টদের কাছাকাছি আসতে হয়, কখনো বা বিপরীত মেরুতে চলে যেতে হয়। কখনো প্রো-কংগ্রেস কখনো প্রো-কমিউনিস্ট এই দোদুল্যমান নীতির ধাক্কায় জনসাধারণের কাছেও তাঁরা বিশেষ ছাপ ফেলতে পারেন না। একমাত্র কংগ্রেস বিরোধিতা ছাড়া জনসাধারণের কাছে পেঁছবার কোন মন্ত্রই এঁদের জানা নেই, কিন্তু সেখানেও কমিউনিস্টরা থাবা গেড়ে বসে আছে, এবং জনসাধারণের একটা অংশকে তারা নিজেদের মতবাদের অনুগামী করতে পেরেছে।

সেই কারণে কমিউনিস্ট প্রভাবিত যুক্তফ্রন্টে যোগদানের প্রশ্ন নিয়েও এই দলগুলি নিদারুণ সমস্যার এবং সংশয়ে ভুগছে, এবং এই কারণেই একটা তৃতীয় ফ্রন্ট গড়ে তোলার কথা এই সকল দলের নেতাদের মুখ থেকে সর্বদাই শুনতে পাওয়া যায়, অতীতেও যেত। কিন্তু জনসাধারণ ঠিক তিনটি শ্রেণীতেই বিভক্ত নয়, তারা হয় জোড়া বলদ বোঝে না হয় লাল ঝাণ্ডা। কাজেই নির্বাচন-বৈতরণী পার হবার জন্য কমিউনিস্ট ও কমিউনিস্ট ভাবাপন্ন দলগুলির সঙ্গে গাঁটছড়া না বাঁধলে চলে না, এবং একলা চলতে গেলে অবলুপ্তির আশঙ্কাই সমধিক। এই কারণেই আমরা দেখি যে ক্রান্তিদলের বা পি এস পি'র র‍্যাঙ্ক এণ্ড ফাইলে চরম বিক্ষোভ দেখা গেছে, এমন কি প্রাদেশিক নেতাদের মধ্যে কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সুর ধ্বনিত হচ্ছে।

আমরা আগেই বলেছি যদি এঁরা যুক্তফ্রন্টে না থাকেন তাতে যে উদ্দেশ্যে এঁরা যুক্তফ্রন্ট ত্যাগ করছেন সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে না, মাঝখান থেকে কংগ্রেস কমিউনিস্ট দুই শক্তি পোলারাইজড হয়ে যাবে যাতে কমিউনিস্টদের কোনই ক্ষতি নেই। তারা সার্বিক ক্ষমতালাভের জন্য সুযোগের অপেক্ষায় থাকবে, এবং যদি কোনদিন সে সুযোগ আসে তাহলে সেখানে ক্ষমতার ভাগীদার হবার জন্য কোন পি এস পি বা এস এস পি থাকবে না। ইউরোপে যদি দুই যুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়ে কমিউনিস্ট সোস্যালিস্টরা একত্র থাকত, তাহলে হয়ত ফ্যাসীবাদের শ্রীবৃদ্ধি ঘটত না এবং তাতে সোস্যালিস্টরা অবলুপ্ত হবার বদলে প্রগতিশীল কোন মোর্চার মাধ্যমে ক্ষমতার অধিকারী হতে পারত।

আমাদের, পশ্চিমবঙ্গে আসন্ন নির্বাচনের পরিপ্রেক্ষিতে ক্রান্তিদল ও পি এস পি যে পথে অগ্রসর হচ্ছেন তাতে পশ্চিমবঙ্গে যুক্তফ্রন্টের আমল ও পি ডি এফ আমলে গড়ে ওঠা অকংগ্রেসী শিবিরের ঐক্য ভেঙে যে গেছে বা ভেঙে যে যেতে বসেছে তাতে সর্বাপেক্ষা ক্ষতি কংগ্রেস বা কমিউনিস্ট ভাবাপন্ন গোষ্ঠীর কোন তরফেরই হবে না। চরম মূল্য তাঁদেরই দিতে হবে যাঁরা একই সঙ্গে কংগ্রেস-কমিউনিস্ট এই দুই মহাদৈত্যকে বধ করার দায়িত্ব নিয়েছেন।

অপরাদ পতিরোধ সপ্তাহ

পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ বিভাগ খুবই ঘটা করে অপরাধ প্রতিরোধ সপ্তাহ পালন করছে এবং সেই উপলক্ষে একটি প্রদর্শনীরও আয়োজন করেছে। প্রদর্শনীতে প্রাচীন বিপ্লবীদেরও অপরাধীদের তালিকায় ফেলে তাঁদের ব্যবহৃত অস্ত্রশস্ত্রাদিও দেখানো হচ্ছিল তবে এই নিয়ে প্রবল প্রতিবাদ ওঠায় তা দেখানো বন্ধ হয়েছে। দুঃখের বিষয় এই যে, পুলিশ এত চেষ্টা করেও জনসাধারণের মন পাচ্ছে না, এবং তাদের মন ভেজানোর জন্য পুলিশের কতই না আগ্রহ! বস্তুত নানা কারণেই, এবং সেই কারণগুলির কোনটিই অসঙ্গত নয়। জনসাধারণ পুলিশকে বিশ্বাস করেন না, পক্ষান্তরে পুলিশ এমন একটি ধারণা জনসাধারণের মনের মধ্যে গেঁথে দিয়েছে যে পুলিশের কাছে সুবিচার পাওয়া যায় না, এবং সত্যই তা যায় না। আমরা পূর্বে নানা ঘটনার উল্লেখ করে দেখিয়েছি যে অপরাধীদের শায়েস্তা করার কোন মতলব বা প্রচেষ্টা পুলিশের নেই। পক্ষান্তরে যত সব সমাজবিরোধী লোকেরাই পুলিশের সস্নেহ পক্ষপুটে লালিত হয়। দুর্নীতি এবং পুলিশ বিভাগ আজ সমার্থক হয়ে গেছে। ছেলেবেলায় গল্প শুনেছিলাম জনৈকা বৃদ্ধা কোন জজসাহেবকে "পেঁড়োর দারোগা" হও বলে আশীর্বাদ করেছিল। পুলিশের এ চরিত্রের পরিবর্তন আজও হয় নি। তাছাড়া ভারতের শাসকশ্রেণী চিরকাল পুলিশ নির্ভর হওয়ার দরুণ পুলিশের কর্মের পরিসর অনেক বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে। চাল ধরা থেকে শুরু করে রাজনৈতিক প্রয়োজন পর্যন্ত পুলিশকে দিয়ে মেটানো হচ্ছে। ফলে

পুলিশের বাড়তি প্রয়োজনীয়তা বাড়ছে। কিন্তু যা কমছে তা হচ্ছে পুলিশের আসল কাজের ক্ষেত্র, অর্থাৎ অপরাধী ধরা। এই কাজটি বাদ দিয়ে পুলিশ সব কাজই ভালভাবে চালাচ্ছে। আজ যখন এই বিভাগ অপরাধ-নিরোধ সপ্তাহ পালন করছে তখন স্বভাবতই এই প্রশ্ন জাগে যে আজকের দিনের রেকর্ড পরিমাণ অপরাধ অনাচার ও সমাজবিরোধী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে পুলিশ এ পর্যন্ত কি করেছে?

তথাপি আমরা পুলিশের এই প্রচেষ্টার নেতিবাচক দিকটি তুলে ধরার মধ্যেই বর্তমান নিবন্ধ রচনার সার্থকতা প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করছি না। পুলিশের সঙ্গে জনসাধারণের যে অহিনকুল সম্পর্ক গড়ে উঠেছে তা অবসানের প্রয়োজনীয়তা আছে এবং সেই হিসাবে বর্তমান ধরণের প্রচেষ্টারও প্রয়োজনীয়তা আছে। রাজ্যপাল সমাজবিরোধীদের দমন করার কথা বলেছেন, ইন্সপেক্টার জেনারেল মহাশয়ও অনুরূপ ঘোষণা করেছেন, এবং সত্যই যদি তা সম্ভব হয় তবে তার চেয়ে আনন্দের বিষয় আর কিছুই নেই। কিন্তু গত কয়েক বছরের ঘটনাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে এই ঘোষণার উপরে নির্ভর করতে ভয় হয়। বেলঘরিয়ার নরকের সঙ্গে আমরা পরিচিত আছি। সংবাদপত্রে এত লেখালেখি, এত চিঠিপত্র, আলোচনা, এত পুলিশী হুংকার সব সত্ত্বেও কাদের অদৃশ্য স্বার্থের জন্য বেলঘরিয়ার সমাজবিরোধী কার্য এখনো চলতে দেওয়া হচ্ছে সেটাই বিস্ময়। মধ্যমগ্রাম অঞ্চলটিতে সমাজবিরোধীদের দৌরাত্ম্য বেড়েই যাচ্ছে এবং পুলিশের নাকের উপর তা সম্ভব হচ্ছে, ফলে শান্তিপ্রিয় মানুষের অবস্থা শোচনীয় হয়েছে।

অথচ পুলিশ বিভাগে যোগ্য ব্যক্তির অভাব নেই। আই পি এস হয়ে যাঁরা এই বিভাগে যোগদান করছেন তাঁরা সকলেই উচ্চ-শিক্ষিত, সমাজসচেতন। অথচ এমনই মজা তা সত্ত্বেও এই বিভাগটির কোন প্রকৃত কর্মকুশলতার নিদর্শন দেখা যায় না। আমাদের মনে হয় এর কারণ বহুবিধ। প্রথমত ভারতের স্বাধীনতালাভের পর উচ্চ-পদস্থ কর্মচারীদের ব্যুরোক্রাটিক মেজাজটি এত বেশি উঁচুতে উঠে গেছে যে, তাঁরা নিজেদের রুলিং ক্লাস হিসাবে মনে করেন, দেশের বৃহত্তম জনসমাজকে তাঁরা স্বজন বলে মনে করতে পারেন না। দ্বিতীয়ত পুলিশের কাজের পরিসর দিনের পর দিন বেড়ে যাওয়াতে তার আসল কাজটির প্রতি, অর্থাৎ আক্ষরিক অর্থে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার প্রতি মনোযোগ দেওয়া সম্ভবপর হয় না। তৃতীয়ত কংগ্রেস আমলে রাজনৈতিক নেতাদের পুলিশের কাজের উপর যখন তখন হস্তক্ষেপ তাকে নিরপেক্ষভাবে কাজ করতে দেয় নি।

এছাড়া আমাদের বিচার ব্যবস্থাও ত্রুটি-বহুল যার ফলে অপরাধীদের সাজা পাবার সম্ভাবনা খুব কমই থাকে। বিচার পর্ব এখানে অত্যন্ত বিলম্বিত হবার দরুণ ন্যায় বিচার সবসময় হয় না, জাস্টিস ডিলেড ইজ জাস্টিস ডিনায়েড।

হাসপাতালে লেভি

কয়েক বছর আগে একবার মেডিকেল কলেজের চক্ষু বিভাগে গিয়েছিলাম। দোতলার বারান্দায় দেখি বড় বড় হরফে লেখা আছে "এই হাসপাতাল গরীব লোকেদের জন্য। কেহ যদি কোনরূপ অর্থ দাবি করে তাহা হইলে তাহা কর্তৃপক্ষকে জানাইবেন, কেন না যে-কোন প্রকার অর্থ গ্রহণই এখানে বে-আইনী।" সম্প্রতি এই বে-আইনী ব্যাপারটিকেই আইন সম্মত করে নেওয়া হচ্ছে, অতঃপর রোগীদের মাথাপিছু লেভি দিতে হবে। এর একটিমাত্রই অর্থ দাঁড়ায় এই যে "এই হাসপাতাল কেবল গরীব লোকেদের জন্য" এই লেখাটিকে মুছে দেওয়া, অর্থাৎ বিনামূল্যে চিকিৎসিত হবার যে সুযোগ পশ্চিমবঙ্গের দরিদ্র মানুষ পরাধীন বৃটিশ আমলেও ভোগ করে এসেছে, স্বাধীন ভারত তাকে সেটুকু থেকেও বঞ্চিত করল।

একান্তই দুর্ভাগ্য না হলে পশ্চিমবঙ্গে কেউ বড় সহজে হাসপাতালমুখো হতে চায় না, কেন না এখানে হাসপাতাল মানেই এক-একটি নরককুণ্ড, চিকিৎসার নামে অবহেলা এবং ক্ষেত্র বিশেষে জন্তুরও অধম ব্যবহার রোগীদের ভোগ করতে হয়। যাদের কিছুটা সামর্থ্য আছে তারা হাসপাতালের বাইরেই চিকিৎসার চেষ্টা করে, তা ছাড়া হাসপাতালেও একটু ভালভাবে থাকার আশায় পেয়িং বেড বা কেবিনের আশ্রয় নেয় রীতিমত খরচ করে। যাদের সে সামর্থ্য নেই এবং সত্য বলতে দেশের পঁচানব্বই ভাগ লোকই সামর্থ্য-হীন, ফ্রী-বেড ছাড়া গতি নেই। কিন্তু সেখানে লেভি ধার্য করার অর্থই হল ফ্রী-বেডকে পেয়িং বেড করে তোলা, অর্থাৎ শতকরা পঁচানব্বই জন লোককে হাসপাতালে প্রবেশাধিকার থেকে বঞ্চিত করা।

বলা হয়েছে রোগী পিছু লেভি ধার্য করে যে টাকাটা পাওয়া যাবে সেটা সেই হাসপাতালের শ্রীবৃদ্ধিকল্পে ব্যয়িত হবে। এতে হয়ত হাসপাতালের বাহ্যিক সৌন্দর্য বাড়বে, হয়ত ভেতরটাও অপেক্ষাকৃত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হবে, কেন না সেখানে রোগীরা পয়সা দিয়ে থাকবে। শুধুমাত্র যাদের সামর্থ্য আছে তারাই থাকবে এবং যাদের তা নেই তারা মৃত্যুপথযাত্রী হয়ে এলেও হাসপাতালের দরজা তাদের জন্য উন্মুক্ত হবে না। ঔষধ বলে প্রচলিত বড় বড় বোতল ভর্তি লাল-নীল জলেরও যে কতটা মূল্য এই দরিদ্র দেশবাসীর কাছে সেটা আমাদের কর্তারা বোঝেন না, বা বুঝতেও চান না। অর্থাৎ অন্যান্য সকল ক্ষেত্রে ... দরিদ্রশ্রেণী সাধারণতম সুযোগ-সুবিধা যে ক... খণ্ডিত হচ্ছে, চিকিৎসার ক্ষেত্রে তাই। কত ... দিন পরে হয়ত এমন আর একটি সরকারি নির্দেশনামা প্রচারিত হবে যে অতঃপর আউটডোরে দেখাতে হলেও পয়সা লাগবে ইতিমধ্যেই এই উদ্দেশ্যে সান্ধ্য আউটডোর খোলা হয়েছে, প্রাতঃকালীন আউটডোরেও লেভি চার্জ করতে বোধ হয় কোন অসুবিধা হবে না, শুধুমাত্র কোন আমলার মাথায় বুদ্ধিটা গজালেই হল।

কলকাতা কর্পোরেশন সমাচার

প্রতি এপ্রিলেই নিয়মমাফিক কলকাতা কর্পোরেশনের মেয়র ও ডেপুটি মেয়র নির্বাচন করা হয় এবং ব্যাপারটা কদাপি সুশৃংখলে ঘটে না, সেটা আমরা বছরের পর বছর দেখে আসছি। বলা বাহুল্য এবারেও সে রীতির ব্যতিক্রম হয় নি। গত শুক্রবার ১৯ তারিখে মেয়র নির্বাচন অনুষ্ঠানে প্রিসাইডিং অফিসারের একটি মন্তব্যের জন্য বিরোধীপক্ষের সক্রিয় বিক্ষোভে এক ঘণ্টা কাল অধিবেশনকক্ষে যেন কালবৈশাখীর তাণ্ডব চলে। শেষে প্রিসাইডিং অফিসারের ক্ষমা প্রার্থনার পর নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এবং মেয়র ও ডেপুটি মেয়র পদে যথাক্রমে শ্রীগোবিন্দ দে এবং শ্রীশিবকুমার খান্না পুনর্নির্বাচিত হন।

মেয়র নির্বাচন ছাড়া এবং সেই উপলক্ষে হট্টগোল হওয়া ছাড়া, কলকাতা পৌরসভার আরও একটি কাজ চোখে পড়ে। সেটি হচ্ছে মাঝে মাঝে বিখ্যাত মৃত ব্যক্তিদের জন্য শোক প্রকাশ এবং এই উপলক্ষে পৌরসভার ছুটি প্রদান। সত্যই তো বরেণ্য ব্যক্তিদের মৃত্যুর জন্য এক পৌরসভা ছাড়া আর কে শোক করবে। এ ছাড়া আছে পৌরসভার অধিবেশনে মাঝে মাঝে হাতাহাতি হবার সংবাদ এবং সর্বোপরি ধর্মঘটের সংবাদ; প্রায়ই সেখানে একটা-না-একটা ব্যাপার উপলক্ষ করে ধর্মঘট লেগেই আছে।

কিন্তু আসল যে কাজের জন্য পৌরসভার সৃষ্টি সেটা বোধ হয়—না করলেও চলে। এক করভার বৃদ্ধি করা ছাড়া কলকাতা পৌরসভা নাগরিকদের আর কোন উপকারে আসতে পারে নি। রাস্তাঘাটের আবর্জনা কস্মিনকালেও সাফ হয় না, মহানগরীর পয়ঃপ্রণালী ব্যবস্থা বিপর্যস্ত, পৌরসভার স্বাস্থ্যদপ্তরও নির্বিকার, মহামারী হচ্ছে তো হোক, এবং পৌরসভা পরিচালিত প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির কথা বোধ হয় না বলাই ভাল। নাগরিকদের বিন্দুমাত্র কল্যাণে কলকাতা পৌরসভা লাগতে পারে নি। আজ যে বিদেশীদের চোখে কলকাতা একটি নরককুণ্ড সেই ধারণা সৃষ্টির মূলে পৌরসভার অবদান অনেকখানি।

(২০।৪।৬৮)

অবক্তব্য

চন্দ্রগুপ্ত

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ঃ
উপাচার্য সমীপেষ্

এশ্জন বিখ্যাত বাঙালী আই-সি-এস অফিসারকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিবন্ত করার ইচ্ছা প্রকাশ ক'রে পশ্চিমবঙ্গের ভূতপূর্ব রাজ্যপাল বলেছিলেন ঃ আপনার মতো বিচক্ষণ অফিসার এক হাতে লাঠি এবং আর এক হাতে ঝাঁটা নিয়ে যদি এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ভার গ্রহণ করেন তাহলে এর উন্নতি সম্ভব ব'লে মনে হচ্ছে। সেই অফিসার দীর্ঘজীবী হন নি, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ শিক্ষক ও কর্মচারী উপাচার্যরূপে তাঁকে পান নি, কিন্তু এই বিশ্ববিদ্যালয়ের গত কয়েক বছরের ইতিহাস ভূতপূর্ব রাজ্যপালের উক্তির সারবত্তা প্রমাণ করেছেঃ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যকে বিচক্ষণ দৃঢ়ব্রত ও কঠোরহস্ত হতে হবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সম্পর্কশূন্য ব্যক্তিকে উপাচার্য নিয়োগ করার দীর্ঘস্থায়ী কুপ্রথার অবসান ঘটিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য শ্রীধরমবীর আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। শ্রীধরমবীর এমন একজনকে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পদে অভিষিক্ত করেছেন যিনি এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে দীর্ঘদিন যুক্ত, আদ্যন্ত বিদ্যাব্রতী শিক্ষক ও মানুষ হিসাবে যিনি ছাত্রদের ও সর্বসাধারণের শ্রদ্ধাভাজন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাবী উপাচার্য অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ সেনের কাছে শিক্ষক ও শিক্ষানুরাগী বাঙালীর আশা অনেক। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বাঙ্গীণ উন্নতিতে উপাচার্য শ্রীসেনের পাশে তাবৎ শিক্ষানুরাগী বাঙালী সব সময়েই থাকবেন, এ সম্পর্কে চন্দ্রগুপ্ত নিঃসন্দেহ।

*

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক গলদের মধ্যে বিভাগীয় দলাদলি অন্যতম। এই গলদ দূর করতে হ'লে যে-বিচক্ষণতা ও মনোবলের প্রয়োজন শ্রীসেনের তা আছে বলে আমাদের বিশ্বাস। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক ইতিমধ্যে শিক্ষাগত রাজনীতি ও প্রতিহিংসাপরায়ণতাতে সুনাম অর্জন করেছেন। এই আপনাতে-আপনি-বিকশিত ক্ষুদে মহারাজাদের দুষ্টচক্র কিভাবে ভাঙবেন তা শ্রীসেনের চিন্তার বিষয়, শিক্ষানুরাগীরা আমরা শুধু এটুকু অনুরোধ উপাচার্য মহাশয়ের কাছে রাখছি, তিনি যেন অনতিবিলম্বে এই দুর্দান্ত অধ্যাপক-মহারাজাদের দমনে তৎপর হন। আলোচ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন কোন বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপকের (ভাষান্তরে অধ্যক্ষ) কীর্তিকলাপের রম্য কাহিনী ১৯৬৭ সালের ৮ জুন তারিখের 'সাপ্তাহিক বসুমতী'তে প্রকাশ করেছিলাম। মৌচাকে ঢিলের মতো সেই কাহিনীতে ক্ষিপ্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের মৌমাছিরা সেদিন চন্দ্রগুপ্তকে আক্রমণ করতে এসেছিলেন, যদিচ তাঁরা শেষ পর্যন্ত চন্দ্রগুপ্তের বিশেষ ক্ষতি করতে পারেন নি। সেদিনের সেই নিবন্ধে উল্লিখিত বিভাগীয় অধ্যক্ষদের প্রতিহিংসাপরায়ণতার কিছু কিছু দৃষ্টান্ত সম্প্রতি আমাদের দপ্তরে এসেছে। এই দৃষ্টান্তগুলির অন্যতম ভূগোল বিভাগের প্রধান অধ্যাপক তথা অধ্যক্ষ নির্বাচন। ভূগোল বিভাগের প্রবীণ রীডার 'প্রোফেসর' পদের অন্যতম প্রার্থী ছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে ২১ বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতাসম্পন্ন কৃতবিদ্য এই শিক্ষককে বাদ দিয়ে নির্বাচন-কমিটি এমন একজনকে বাছাই করলেন পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক গ্রন্থাদি তো দূরের কথা পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট স্তরে পাঁচ বছরেরও শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা যাঁর নেই (জনান্তিকে বলে রাখি, অত্যন্ত অসাধারণ ক্ষেত্র ছাড়া, পাঁচ এবং দশ বছরের কম শিক্ষকতার অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তিকে যথাক্রমে বিশ্ববিদ্যালয়ের রীডার ও প্রোফেসর পদে মনোনীত করা হয় না)। ভূগোল বিভাগের এই প্রোফেসর-নির্বাচনের নেপথ্য কাহিনী অনুসারে ঐ বিভাগের খ্যাতিমান প্রাক্তন অধ্যক্ষ নির্বাচন-কমিটির সদস্যদের বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিলেন। কমিটি মনোনীত প্রার্থী অধ্যক্ষ মহাশয়ের স্নেহভাজন এবং স্নেহভাজনের জন্য তিনি তাঁর যথাসাধ্য করেছিলেন। এই নেপথ্য কাহিনী সত্য হলে প্রশ্ন থাকে, স্নেহভাজনকে বড় করতে গিয়ে যোগ্যজনকে ছোট করা কি চরিত্রগত ত্রুটির পরিচায়ক নয়? নির্বাচকমণ্ডলীর বহিরাগত 'বিশেষজ্ঞ' সদস্যদের উপর প্রভাব বিস্তার করে প্রাক্তন অধ্যক্ষ যদি এ কাজ করে থাকেন, তবে সাধারণ মানুষ তাঁর মতো অসাধারণ মানুষের উপর আস্থা রাখবেন কিভাবে? গত একুশ বছর যাবৎ যিনি একনিষ্ঠভাবে বিদ্যাব্রত উদ্‌যাপন করে এসেছেন, তাঁর প্রতি এই ব্যবহারকে নির্মম ছাড়া আর কিছু বলা যায় না। নতুন উপাচার্য এবং সিণ্ডিকেট সদস্যদের আমরা এ বিষয়ে অনুসন্ধান করতে অনুরোধ জানাই।

*

অনেক অন্যায় অবিচারের কাহিনীতে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস গড়ে উঠেছে। বহু হতভাগ্যের দীর্ঘশ্বাসে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের বাতাস উষ্ণ ও গুরুভার। তুচ্ছাতিতুচ্ছ কারণে কিংবা পারিষদবর্গের মন্ত্রণায় এই বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন সময়ের মহারাজারা কতজনকে যে প্রাণদণ্ডতুল্য শাস্তি দিয়েছেন তার ইয়ত্তা নেই। সেই সব হতভাগ্যদের কেউ কেউ আমাদের পরিচিত, অন্যরা অপরিচয়ের অন্তরালে বিষাদমগ্ন। পঠন-পাঠনের ক্ষেত্রে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সুনাম ও ঐতিহ্য সুপ্রাচীন, সুতরাং এখানে অধ্যাপক নির্বাচনে যথাসম্ভব মনোযোগ ও সতর্কতা অবলম্বন অবশ্যকরণীয়। কয়েকটি নির্দিষ্ট নিয়ম ও নীতির ভিত্তিতে যে এই

শতকরা ২০, টাকা কমিশন
উপার্জন করুন

সুইস প্রস্তুত ১৭ জুয়েল রোমার ঘড়ির বিক্রয় বৃদ্ধি করিয়া। সর্তাবলী এবং স্যাম্পেল ঘড়ির জন্য আবেদন করুন।

JAPEX INDIA (Watch)
P. B. 1405 (WBM—15),
Delhi—6.

আপনি পাইতে পারেন

সামবায়িক ভিত্তিতে মাত্র ২০, টাকায় ৩৩০, টাকা মূল্যের ৩ ব্যাণ্ড অল ওয়ার্ল্ড পোর্টেবল ট্রানজিস্টার পাইবেন।

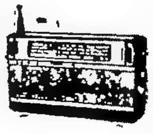

আবেদন করুন ঃ
Ceylon Traders (WBC—22)
P. Box 1257, Delhi—6.

নির্বাচন হওয়া উচিত সামান্য জ্ঞানবুদ্ধি-সম্পন্ন যে-কোন ব্যক্তিই তা স্বীকার করবেন। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ে সম্প্রতি এমন কয়েকটি অধ্যাপক মনোনয়ন ঘটেছে যেখানে শিক্ষাগত কোন নির্দিষ্ট নীতি অনুসৃত হয় নি। অধ্যাপক (রীডার এবং প্রোফেসর) নির্বাচনের ক্ষেত্রে তিনটি গুণের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়ঃ এক, ছাত্রজীবনের আপেক্ষিক সাফল্য-অসাফল্য; দুই, উচ্চতর গবেষণায় কৃতকার্যতা; এবং তিন, শিক্ষকতায় অভিজ্ঞতা। এ ছাড়া ছাত্রছাত্রীদের গবেষণাকার্য পরিচালনাক্ষমতাও রীডার ও প্রোফেসর-পদপ্রার্থীর অন্যতম সম্পদ ব'লে বিবেচিত হয়। সম্প্রতি বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি বিভাগে এমন একজনকে রীডার পদে মনোনীত করা হয়েছে যিনি সারাজীবন রেশনিং ইন্‌স্‌পেক্টরের কাজ করতে করতে আকস্মিকভাবে একদিন—মাত্র তিন বছর আগে—লেকচারারের পদ লাভ করেছেন। দ্বিতীয় বিভাগের আই. এ., পাশ কোর্সের বি. এ., এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর এম-এ (ন'জন দ্বিতীয় শ্রেণীতে উত্তীর্ণদের মধ্যে পঞ্চম স্থানাধিকারী) এই ব্যক্তি কিভাবে লেকচারার নির্বাচিত হয়েছিলেন, সে ইতিহাসের অভ্যন্তরে প্রবেশ না ক'রে আপাতত এ প্রশ্ন রাখিঃ তিনি কিসের জোরে আজ রীডারপদে মনোনয়ন পেলেন? অত্যন্ত সহজ উত্তরঃ খুঁটির জোরে, বিভাগীয় প্রধানের (নির্বাচক মণ্ডলীর সক্রিয়তম সদস্য) প্রবলতম সমর্থনে। বিভাগীয় প্রধানের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক কাজকর্ম ক'রে দেওয়ার ক্ষমতা রীডার নির্বাচনে প্রধানতম মানদণ্ড হ'লে নীরবতাই আমাদের আশ্রয় হবে। কিন্তু আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, উপাচার্য ও সিণ্ডিকেট সদস্যরা এ বিষয়ে ভিন্ন মত পোষণ করেন। রীডার ও অধ্যাপক নির্বাচনে উপরি-উল্লিখিত গুণাবলী-ধৃত (উজ্জ্বল ছাত্রজীবন, শিক্ষকতায় অভিজ্ঞতা ইত্যাদি) মানদণ্ডের প্রয়োগকে তাঁরা আবশ্যিক ব'লে মনে করেন। এবং সঙ্গতভাবে তা মনে করেন বলেই চন্দ্রগুপ্তের মতো শিক্ষানুরাগী জনসাধারণ উপাচার্য ও সিণ্ডিকেট সদস্যদের এ অন্যায়কে প্রতিরোধ করতে কাতর অনুরোধ জানাচ্ছেন। সংশ্লিষ্ট পদের দরখাস্তকারীদের মধ্যে এমন একজন ছিলেন যিনি ঐ বিভাগের অধ্যাপকরূপে অধিকতর অভিজ্ঞতাসম্পন্ন যাঁর শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা দীর্ঘদিনের, যাঁর ছাত্রজীবন কৃতিত্বে উজ্জ্বল, যিনি প্রথম শ্রেণীর এম-এ, ডক্টরেট এবং একাধিক ছাত্রছাত্রী যাঁর অধীনে ডক্টরেট ডিগ্রীর জন্য গবেষণারত। শিক্ষিত বাঙালীর সুপরিচিত এমন একজন নীরব শিক্ষাব্রতীর সাংসারিক পদোন্নতিকে প্রতিহত ক'রে বিভাগীয় প্রধানমহাশয় কতখানি মানবধর্মসঙ্গত কাজ করেছেন, শিক্ষানুরাগী সমাজের পক্ষ থেকে চন্দ্রগুপ্ত এ বিনীত প্রশ্ন তুলছেন। মাননীয় উপাচার্য এবং সিণ্ডিকেট সদস্যদের প্রতি আমাদের বিনীত অনুরোধ, তাঁরা অবিলম্বে এই গর্হিত মনোনয়নের তদন্ত ক'রে অন্যায়কে প্রতিহত করুন।

নতুন উপাচার্য ডক্টর সত্যেন্দ্রনাথ সেনকে আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়ে আপাতত এখানেই ছেদ টানছি।

★ ★ সদ্য প্রকাশিত হইয়াছে !

স্বনামধন্য সাহিত্যিক
ও লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যারিস্টার

নীরদরঞ্জন দাশগুপ্তের
গ্রন্থাবলী

গ্রন্থাবলীতে
আছে দুইখানি
সুবৃহৎ ও
ধ্রুপদী
উপন্যাস

সুশান্ত-সা
ও
লাল শাড়ী

পৃষ্ঠা সংখ্যা
সর্বসমেত
৩০৪

বাঙলা সাহিত্যে
অভিনব সংযোজন

মূল্য মাত্র দশ টাকা

বসুমতী (প্রাঃ) লিঃ
কলিকাতা—১২

ভারতদর্শন

দলত্যাগী-হটাও
(সর্বদলীয় কমিটি কতদূর)

সর্বনাশা দলত্যাগ বন্ধের জন্য স্বরাষ্ট্র-মন্ত্রকের উদ্যোগে যে সর্বদলীয় কমিটির আলোচনা বৈঠক বসেছিল দিল্লীতে, তা এ পর্যন্ত কোনো পাকা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে না পারলেও একটি প্রায় সর্ববাদী-সম্মত সুপারিশ গৃহীত হওয়ার অপেক্ষায় আছে। আগামী মে মাসের বৈঠকে পুনরালোচনার পর হয়ত তা গ্রহণ করাও হবে। সাজেশনটি হল, পরাজয়ের সম্ভাবনা দেখা দিলে কিম্বা পরাজিত হলে মুখ্যমন্ত্রী বিধানসভা ভেঙে দিয়ে মধ্যবর্তীকালীন নির্বাচনের প্রস্তাব করতে পারবেন। দলত্যাগ নিবারণের জন্য সুস্থ রীতি গড়ে তোলার প্রয়োজন একবাক্যে সকলেই স্বীকার করেন। দলত্যাগীকে নির্দিষ্টকাল পর্যবেক্ষণে না রেখে সরাসরি তাঁকে মন্ত্রিত্বদানেও আপত্তি ওঠে। দলত্যাগ করার পর পুনরায় নির্বাচনের সম্মুখীন হওয়া—এই নীতি দলত্যাগীর পক্ষে প্রযোজ্য করার পক্ষেও আলোচনা হয়।

কিন্তু দলত্যাগ নিবারণের জন্য সবাই মিলে উপযুক্ত পরিবেশ রচনার উদ্দেশ্যে সংবিধানে ব্যবস্থা প্রবর্তনের কথা চিন্তা করেছেন কিনা সংবাদে তার উল্লেখ চোখে পড়ল না। যদি তাই না হয় তবে সর্বদলীয় কমিটি কতদূর এ বিষয়ে অগ্রসর হতে পারবেন তাতে সন্দেহের অবকাশ থেকে যাচ্ছে, কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রণালয়ের মন্তব্য জানার পর। আইনমন্ত্রক সর্বদলীয় কমিটির চিন্তাধারার সামনে আইনের প্রাচীর গেঁথে দিয়েছেন। আইনমন্ত্রকের মূল বক্তব্য, দলত্যাগ বন্ধের জন্য এ পর্যন্ত আলোচিত পন্থাগুলি সংবিধানে প্রদত্ত ব্যক্তি-স্বাধীনতার বিরোধী হয়ে দাঁড়াবে। ব্যক্তি-স্বাধীনতা যদিও সমাজ-স্বাধীনতার জন্যই প্রযোজন। সার্বিক মঙ্গল যেখানে ব্যাহত হয় ব্যক্তি-স্বাধীনতা সেখানে আপন স্বাধীনতার দ্বারা আপনাকেই হনন করে। তবু ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য-বাদী সমাজে আইনের প্যাঁচে ব্যক্তির মূল্যই সর্বাধিক। এক্ষেত্রেও যদি কোনো ব্যক্তি স্বার্থসিদ্ধির জন্য সমাজবিরোধী কার্যকলাপে উদ্যোগী হ'ন, তবু আইনের চক্ষে তাঁর সেই অপকর্মও অপ্রতিরোধ্য। সর্বজনীন স্বার্থে এই ব্যক্তিপ্রাধান্য অবশ্যই খর্বিত হওয়া প্রয়োজন। সংবিধানের কোনো ধারা যদি ব্যক্তিকে এমন প্রাধান্য দিয়ে থাকেন যদ্দ্বারা সমাজ ও জাতি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে, তবে সেই ধারার সংশোধন সর্ব-দলের সমর্থনে অনায়াসেই আজ হতে পারে। সর্বদলীয় বৈঠক এদিক দিয়েও চিন্তা করতে পারেন। কেন না দলত্যাগ কেবলমাত্র বিশেষ রাজনৈতিক দলকেই বেকায়দায় ফেলছে না, প্রত্যেক দলই আগে হোক পরে হোক এই স্বার্থপ্রবাহের দ্বারা ভাঙনের সম্মুখীন হচ্ছেন। সর্বোপরি দলত্যাগ জনসাধারণের বিশ্বাস এবং স্বার্থ নিয়ে যথাখুশি হাত-বল খেলা খেলে যাচ্ছে। এহেন অবস্থায় দলত্যাগ নিবারণে কার্যকরী উপায় গ্রহণ করতে সংবিধান যদি বাধ সাধেই তবে তার সংশোধনেই বা ইতস্তত কিসের। সমাজে যেমন ব্যক্তির মূল্য, জাতির সুস্থ প্রগতিতে সাহায্যের জন্য তেমনি সংবিধানের অস্তিত্ব। সর্বদলীয় কমিটি সর্ব মত সমন্বয়ের পর (মতামতই পথের কাঁটা) সুতরাং যে কোনো বাধাই অপসারিত করতে পারেন। কিন্তু প্রশ্ন হল সর্বদলীয় কমিটি কতদূর এগোবেন। এরই মধ্যে দেখা গেছে সর্বদলীয় কমিটিতেও দলত্যাগ বন্ধের প্রশ্নে খোল টানাটানির লক্ষণ। যদি সেটাই শেষ পর্যন্ত মুখ্য হয়ে ওঠে তবে সোজা আঙুলে ঘি উঠবেই না। না উঠলে আখেরে অবশ্য কারই লাভ নেই, লাভ একমাত্র প্রান্তিক ভোট নিয়ে যাঁরা ব্যবসা করবেন তাঁদের। কিন্তু মনোপলির চান্স ভোট মার্কেটে কম। এই সব কথা মনে রেখে সর্বদলীয় কমিটি একটি সুস্থ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার চেষ্টা করুন। কেন না কোনো গুরুতর বিষয় স্থির করার জন্য বিভিন্ন দল একত্রে বসার সুযোগ তো সচরাচর ঘটে ওঠে না। ভাগ্যের ফেরে যদি তাই ঘটল তবে আর দ্বিধা কেন।

আইনমন্ত্রকের মন্তব্য

আইনমন্ত্রক দলত্যাগ সম্বন্ধে যে মন্তব্যাদি করেছেন তাতে ব্যক্তি-স্বাধীনতার নামে কতকগুলি মারাত্মক সাংবিধানিক ত্রুটিই ধরা পড়েছে।

যেমন ধরুণ, যেহেতু ব্যক্তির স্বাধীনতা স্বীকৃত সুতরাং কোনো ব্যক্তি যদি স্বার্থ সন্ধানে জাতীয় ক্ষতিসাধন করেও দলত্যাগ

স্বল্প সঞ্চয়ের

মতুন বছরের অভিনন্দন ও উপহার

পোস্ট অফিসে পাঁচ বছরের স্থায়ী

আমানত (ফিক্সড ডিপোজিট) পরিকল্প

এইটি সম্পূর্ণ নতুন পরিকল্প

প্রতি ১০০ টাকা পাঁচ বছর পরে বেড়ে হবে ১২৫ টাকা।
আয়করমুক্ত শতকরা বার্ষিক ৫ টাকা সুদ।

অন্তত পঞ্চাশ টাকা হলেই পাশবই খোলা যায় এবং একই পাশ বইতে যতবার খুশি ৫০ টাকা করে জমা করে যেতে পাবেন।

ন্যাশনাল ডিফেন্স সার্টিফিকেট

এর সুদের হার বাড়ানো হল।

এখন প্রতি ১০০ টাকার সার্টিফিকেটে ১২ বছর পরে ১৮০ টাকা পাওয়া যাবে (আগে পাওয়া যেত ১৭৫ টাকা মাত্র)

১০ টাকা ও ১০০০ টাকার সার্টিফিকেটও

পোস্ট অফিসে কিনতে পাওয়া যায়।

——ডব্লিউ, বি, (আই অ্যান্ড পি, আর) এডি ৯৩৭৯/৬৮——

করেন, তবু তিনি ব্যক্তি-স্বাধীনতার নামে এই অনাচার অবাধেই করে যেতে পারবেন। বাধার উপায় নেই।

সাধ থাকলে অসাধ্য কি

কিন্তু সাধ থাকলে দুনিয়ায় অসাধ্য কিছুই নেই। যদি আইনমন্ত্রক পবিত্র সংবিধানের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করেন এবং বিভিন্ন দল অন্য দলের প্রস্তাব নাকচে অধিকতর উত্তেজনা বোধ করেন, তথাপি তবুও উপায় আছে। খুব সহজ উপায়। যদি অতি লোভে তাঁত-ই নষ্টের অভিপ্রায় ত্যাগ করা সম্ভব হয় তবে কোনো কিছুর পরোয়া নেই। বিভিন্ন দলই দলত্যাগ বন্ধ করতে পারেন। কি করে ? দলত্যাগীকে কোন দলে জায়গা না দিলেই হল। প্রশ্ন উঠবে, কিন্তু তাও কি সম্ভব ? দলত্যাগের তখন নানান ব্যাখ্যা শুরু হয়ে যাবে। তাছাড়াও বড় প্রশ্ন, সদুদ্দেশে কেউ দলত্যাগ করলে, বস্তুত নীতির প্রশ্নে কেউ স্বদলে নিজেকে ধরে রাখতে অক্ষম হলে তাঁর কি কোথাও স্থান হবে না। যদি না হয় তাহলে তো সে আর এক বিড়ম্বনা। তখন দল সদস্যদের মাথায় লাঠি ভাঙবে। দলের ক্ষমতাসীনচক্রের গোলামী ভিন্ন উপায় থাকবে না স্বাধীনচেতা কোন প্রকৃত সজ্জন ব্যক্তিরও। এ সমস্যার সমাধান কি করে সম্ভব।

একটিই মাত্র উপায়, জনগণের কাছে বিচারপ্রার্থী হওয়া।

কোন নির্বাচিত সদস্য দলত্যাগ করলেই তো সমস্যা। কেন না তাঁরাই মাথা গণনায় মন্ত্রিসভা ভাঙা-গড়ার মালিক। সাধারণ সদস্যের ক্ষেত্রে সে সমস্যা নেই। সুতরাং নির্বাচিত সদস্যের ক্ষেত্রে প্রত্যেক দলই যদি একটি নীতিতে স্বীকৃতি জানান যে, যে ব্যক্তি দলত্যাগী হয়েছেন তাঁর সততার বিচার সরাসরি কোন দলই করবেন না। নির্বাচিত সদস্য জনপ্রতিনিধি। সে হিসেবে তিনি জনগণের কাছে দায়বদ্ধ। তিনি নিজে নন, দলের কর্মসূচী হাতে করেই জনগণের সমর্থন কুড়িয়ে এম এল এ, এম পি হচ্ছেন তাই তাঁর আচরণের বিচার প্রথমে জনগণই করবেন। এই নীতি যদি সব দলে স্বীকৃতি লাভ করে, তাহলে ঐ ব্যক্তিকে কোন দলে গ্রহণ করায় আর অসুবিধা থাকে না।

যেমন ধরুন, ক-বাবু, কংগ্রেসী টিকিটে বিধানসভায় এসেই যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভায় ভিড়ে গেলেন। অথচ তাঁর নির্বাচনী এলাকা তাঁকে কংগ্রেসসেবী হিসেবেই পাঠিয়েছেন। প্রশ্ন উঠল, যুক্তফ্রন্টে নির্বাচনের সময় যে যে দলের ভিন্ন কর্মসূচী জনগণের সামনে রাখা হয়েছিল তিনি সেই সেই দলের মধ্যে কাকে পছন্দ করছেন। বাম কম্যুনিস্ট, ডান কম্যুনিস্ট, স্বতন্ত্র, জনসঙ্ঘ নাকি পি এস পি, এস এস পি ? যদি তিনি দলে ঢুকতে চান তবে সেই কর্মসূচী নিয়ে জনগণের কাছে গিয়ে নির্বাচন প্রার্থী হ'ন, পাশ করে এলে কেউ আর কোন কথা বলতে পারবেন না, দলে প্রবেশের দরকার হলেও বিধানসভায় ভোটাভুটির ক্ষেত্রে নবনির্বাচিত পার্টির তরফে হাত তোলায় তাঁর ন্যায্যত কোনো বাধা থাকবে না। কিন্তু তিনি যদি বলেন, ঠিক দলে নয়, আমি যুক্তফ্রন্টের দশ পনের বিশ দফার সমর্থক হতে চাই। বেশ তো, ভালো কথা। সেই বিশ দফা কর্মসূচী নিয়েই নির্দল যুক্তফ্রন্ট সমর্থক হিসেবেই তিনি পাশ করে আসুন, বিধানসভায় তাঁকে নিয়ে আলোচনার ঝড় তোলার অধিকার কোনো পার্টির থাকবে না। তিনিও মাথা-উঁচু করেই চলাফেরা করবেন, কেন না তিনি তখন গণ-আদালতের বিচারে সসম্মানে উত্তীর্ণ। পরীক্ষাটা এখানেই হওয়া উচিত। দলের পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে পাশ ফেলের মজা থাকলে দলীয় ঘোঁটের অবসান হবে না। সে-ও ম্যানেজ করেই তরে যাওয়া যাবে। মোটকথা যদি কেউ দলত্যাগও করতে চান আবার এম এল এ এম পি-ও থাকতে চান তবে তাঁকে গণ-আদালতে ঠেলে দেওয়ার দায়িত্ব সর্বদলকে নিষ্ঠুরভাবেই গ্রহণ করতে হবে। সেক্ষেত্রে 'রিকল'-এর ঝঞ্ঝাটও থাকবে না। নিজেই গিয়ে আদালতে বিচার প্রার্থী হতে পারেন তিনি। লোক ঠকানোর উপায়, পার্টিকে পথে বসানোর অপকৌশল একমাত্র এইভাবেই সহজভাবে হতে পারে। সদস্য সৎ-ই হোন, চাই অসৎ-ই হোন, যে জনগণ তাঁকে পাঠিয়েছেন বিচার তাঁরাই করে দিন, ল্যাঠা মিটে গেল। এই বিচারে উত্তীর্ণ হতে না পারলে তিনি সাধারণ সদস্য হিসেবেই নতুন দলে যোগ দিয়ে নিজের আদর্শের সততা প্রমাণ করুন না। নির্বাচন তো আর ব্যক্তির জীবনে কেবলমাত্র একবার আসবে না। এ সুযোগ আবারও মিলবে, সততার জয় সর্বদাই হবে। কিন্তু আইনসভার সদস্যও থাকব অথচ নির্বাচকমণ্ডলীকে ফাঁকি দিয়ে দলবদল করব আপন স্বার্থসিদ্ধির ঘৃণ্য লোভে, এই অবাধ ব্যক্তি-স্বাধীনতার ফাটকাবাজার বন্ধ করতেই হবে। সে সুযোগ সর্বদলীয় কমিটির হাতেই আছে। আইন-মন্ত্রক, আদালত বা সংবিধানের তোয়াক্কা না করেই যা তাঁরা করতে পারেন।

আর যে কোনো সদস্যই দলত্যাগ করতে পারেন। সত্যিই তো তাঁর ব্যক্তি-স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ কারো গণতন্ত্রের কণ্ঠরোধ করার ব্যবস্থাই বা অনুমোদন করা হবে কেন। তিনি স্বদলে আপন আদর্শ নিপীড়িত হচ্ছে মনে করলে একশবার পদত্যাগ করতে পারেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আইনসভার পদটিও ছাড়তে হবে, কেন না ওটা যে দলের দৌলতেই প্রাপ্ত। তারপর ইচ্ছে হয় পুনরায় তিনি নির্বাচকমণ্ডলীর সম্মুখীন হয়ে সত্যের জয় ঘোষণা করবেন, না হয় দুঃখ কি, আদর্শের জন্যই না হয় আইনসভার সদস্যপদও ত্যাগ করবেন। কী এমন কঠিন ব্যাপার। চাগলা তো এককথায় মন্ত্রিত্বই ছেড়ে দিলেন। ইতিপূর্বে আদর্শনিষ্ঠা আরও অনেকে অনেকভাবেই দেখিয়েছেন, তাঁর আদর্শপ্রাণতায় কেউ হস্তক্ষেপ করবে না সেক্ষেত্রে। কিন্তু নির্বাচকমণ্ডলীর অনুমোদন না পেলে কোন দলই কোনো আইনসভা সদস্যকে স্থান দেবেন না, সর্বদলীয় কমিটি এই সিদ্ধান্তে, সদিচ্ছা থাকলে, অনায়াসেই আসতে পারেন।

ইচ্ছে থাকলে উপায়ের অভাব ? কেবল বৈঠকে ঘোঁট করার রাজনীতি আর টেবিল থাবড়ে লাভ কি।

এস এম যোশীর বিড়ম্বনা

এস এম যোশী হচ্ছেন এস এস পি দলের সভাপতি। বর্তমানে তিনি নিদারুণ বিড়ম্বনায় পতিত হয়েছেন। তাঁর দলের (বিশেষজ্ঞরা যে দলকে কম্যুনিস্ট-ঘেঁষা মনে করেন) এক সর্ব ভারতীয় প্রস্তাব কার্যকরী করার পথে প্রথম কিস্তিতেই দলের কেরালা রাজ্য কমিটি মূল দল থেকেই বিচ্ছিন্ন হতে চলেছে। শ্রীযোশী সুতরাং সেই বিপর্যয় ঠেকাবার জন্য ত্যাগী-হটাও মন্ত্রবাণ প্রয়োগের এক অদ্ভুত কৌশল অবলম্বনে উদ্যোগী হয়েছেন।

ব্যাপারটা গোড়া থেকে ভেঙে বলা

এখন নিন পরে টাকা দেবেন

মাসিক ১০ টাকা কিস্তিতে মিনি জাপান মডেল ৩ ব্যান্ড অল ওয়ার্ল্ড ট্রানজিস্টার।

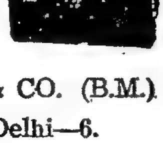

J. L. SANSON & CO. (B.M.)
P.B. 1288, Delhi—6.

বিনামূল্যে লউন

আধুনিক প্রতিটি গৃহসজ্জায় আবশ্যকীয় নানাবিধ বিলাস সামগ্রী। বিশদ বিবরণের জন্য লিখুন:

PROFIT CIRCLE (WBC)
P. Box 1430, Delhi—6.

দরকার। নিখিল ভারত এস এস পি সম্প্রতি একটি সাধু প্রস্তাব গ্রহণ করেছিলেন। তা হ'ল কচ্ছ সম্পর্কে আন্তর্জাতিক আদালতের রায়ের প্রতিবাদে রাজ্যে রাজ্যে সত্যাগ্রহ আন্দোলন গড়ে তোলার প্রস্তাব।

কিন্তু এস এস পি'র কেরালা রাজ্য কমিটি কি জানতেন, দলের ঐ প্রস্তাবের আড়ালে আর কোনো চতুর রাজনীতি খেলা করছে। বস্তুত প্রস্তাবটি পবিত্র গংগার জলে ধোওয়া। কী জাতীয়তাবোধ, কী দেশপ্রাণতায়—এস এস পি প্রস্তাব চমক-চকচকে! তারও মধ্যে কুটিল অন্যতর উদ্দেশ্য পিঠ ফিরিয়ে আছে, অতশত কেই বা বোঝে। কিন্তু আকাঙ্ক্ষা তীব্র হ'লে, উদ্দেশ্যের মধ্যে কুটিলতা বেশি পরিমাণে কিলবিল করলে আগুপিছু জ্ঞান লোপ পায়। এস এস পি-রও তাই-ই হ'ল। তাঁদের সাধু আন্দোলনের মধ্যকার প্রচ্ছন্ন উদ্দেশ্যের স্যাম্পলটি প্রস্তাবমাত্রেই প্রকাশ হয়ে পড়ল। কেরালা রাজ্য কমিটি অবাক, তবে কি এই ছিল মনে। পার্টির নির্দেশ হ'ল, এস এস পি রাজ্য কমিটিকে কেরালার যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভার সংগে সম্পর্ক ছিন্ন করতে হবে। অর্থাৎ এস এস পি সদস্য যাঁদের দুজন কেরালায় মন্ত্রী এবং একজন বিধানসভার স্পীকার পদ আলো করে আছেন, মন্ত্রিসভা ছেড়ে বেরিয়ে আসতে হবে তাঁদের।

কিন্তু কেন রে বাপু! কচ্ছ-রায় বিরোধী আন্দোলন মানে কি ভারতবর্ষে যে দু-একটা অকংগ্রেসী মন্ত্রিসভা আছে সেগুলিকে ভেঙে দিবে যে কংগ্রেস কচ্ছ-রায় নির্বিবাদে মেনে নিলেন (কংগ্রেস একটি জাতীয়তাবাদী দল), তাঁদেরই হাত শক্ত করা! এই অন্যায় নির্দেশ কেরালা রাজ্য কমিটি মানবেন কেন? তাঁরা সমস্বরে বললেন, মন্ত্রিসভা ভেঙে দেওয়ার এই চতুরালি চলবে না। জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের নামে প্রগতিশীল মন্ত্রিসভা ভাঙার এই আন্দোলনে তাঁরা নিজেদের সরিক করতে গররাজী। বরং যে পার্টি এমন নির্দেশ দিতে পারে, তাঁরা মনে করলেন দরকার নেই সেই পার্টির সংগেই কোনো সংস্রব রেখে। পার্টির সমাজতান্ত্রিক বামপন্থী আদর্শেই তো তাঁরা উদ্বুদ্ধ। পার্টি যদি আজ সেই বামপন্থী ঘাঁটির ওপরই আঘাত হানতে উদ্যত হয় তবে আপন চরিত্র বজায় রাখার জন্য তাঁদেরই বরং পার্টি থেকে সরে দাঁড়ানো সমুচিত কার্য হবে। তাঁরা সরে দাঁড়ালেন। আন্দোলনের প্রথম পদক্ষেপেই যোশীদল ভয়ানক টাল খেলেন।

যোশী অর্থাৎ সমাজতান্ত্রিক এস এস পি'র অন্তর্যাতনা সুতরাং শুরু হয়ে গেল। এস এস পি এখন যাহা কেরালায় ফাঁস হইয়া গেল তাহাকেই পশ্চিমবংগে ঠাসবুননে বাঁধতে চান।

সম্প্রতি সভাপতি এস এম যোশী কেরালার মুখ্যমন্ত্রী শ্রীযুত নাম্বুদ্রিপাদকে এই বলে সতর্ক করেছেন যে, যদি নাম্বুদ্রিপাদ এস এস পি-ত্যাগীদের অবিলম্বে তাঁর মন্ত্রিসভা থেকে না হটান, তবে যোশীদল এরই বদলা নেবেন পশ্চিমবংগে। অর্থাৎ কেরালায় যুক্তফ্রন্ট ভাঙা যখন হ'লই না তখন ত্যাগী-হটাও মন্ত্র মুখে নিয়ে তাঁরা পশ্চিমবংগে বাম স্বার্থে ভাঙার কাজ সুসম্পন্ন করবেন। এস এস পি'র জাতীয়তাবাদ মানে যখন নিতান্তই কম্যুনিস্ট-বিরোধিতা তখন পশ্চিমবংগে সোৎসাহী সাড়া মিলবে পার্টির বেশ গরিষ্ঠ সংখ্যক সদস্যের কাছ থেকেই। সম্ভবত এই ধারণাই শ্রীযুক্ত যোশীকে দ্বিতীয় এক্সপেরিমেন্টে উদ্বুদ্ধ করেছে। কিন্তু এস এস পি সভাপতির যাতনা যে কত তীব্র তা তাঁর দ্বিতীয় সিদ্ধান্তে আরও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। মার্ক্সবাদী শুনলে এস এস পি'র কি দোষ, আমাদের অনেকেরই মাথা গরম হয়ে যায়। কেরালায় সেই মার্ক্সবাদী-প্রধান সরকারকে কাৎ করা গেল না সে বড় দুঃখ সন্দেহ নেই। কিন্তু যোশী ঐটুকু এগোলেই পারতেন। তা না তিনি এখন বিলকুল ত্যাগব্রত ধারণ করেছেন। ঘোষণা জারি করেছেন, খবরদার, এস এস পি'র কেরল শাখার সংগে যে কেউ সম্পর্ক রাখবে সর্বভারতীয় এস এস পি তারই সংগে 'আড়ি' (সম্পর্কচ্ছেদ) করবেন।

বস্তুত, পাকে প্রকারে এস এস পির ব্যাপারটা ত্যাগী-হঠাও ধারায় পড়ে গেল বটে, কিন্তু এই ঘটনার সংগে দলত্যাগের চরিত্র বিজড়িত নেই। কেন না কেরালার এস এস পি গোষ্ঠী আজ যদি উল্টে বলেন, সর্বভারতীয় এস এস পি-ই আদর্শচ্যুত তাহলে তাঁদের দলত্যাগী তো বলা যায় না। বামপন্থী মুখেই, বামপন্থী শক্তিজোট ভাঙার প্রচেষ্টা অন্তরে, এমন স্ববিরোধ যদি পার্টির একদল সদস্য বরদাস্ত না করেন, তবে দলত্যাগী-হটাও ফরমুলায় ফেলে বর্তমান হাওয়ার সুযোগ নেওয়া কি সংগত! দলত্যাগের বিরুদ্ধে যে আওয়াজ উঠেছে সুস্থ পরিমণ্ডল গঠনের জন্য, সর্বভারতীয় এস এস পি দলের ত্যাগী-হটাও-এর প্রথম নমুনা দেখে মনে হয়, রাজনীতির কুটিল উদ্ভাবনীশক্তি সেই সুস্থ পরিস্থিতিকেও যত্র তত্র অসুস্থ করার অবাধ সুযোগ অচিরেই গ্রহণ করতে পিছপাও হবে না।

উত্তর প্রদেশ ঃ

শাসকের শাসানি

উত্তর প্রদেশের ওপর রাষ্ট্রপতির শাসনের থাবা খামচে ধরেছে। কিন্তু জ্বালাটা শুধু উত্তর প্রদেশেই নয়, প্রদেশে প্রদেশে প্রদাহের সৃষ্টি করল। আর কোনো উপায় নেই, শাসকের শাসানি দুই চক্ষু উন্মত্তের মতো রাঙা করে তুলেছে। সুতরাং এদেশে লোক-দেখানি ভদ্রজনের বৈঠক সম্মেলনে আর কাজ নেই। সব বরবাদ হয়ে যাচ্ছে, বরবাদ হয়ে যাবে, হয়ে গেছে।

মাত্র গত সংখ্যায় দিল্লীতে অনুষ্ঠিত স্পীকার সম্মেলনের আলোচনার শিরোনাম 'ভারতদর্শনে' রাখা হয়েছিল, 'সবার উপরে সভা'। স্পীকার সম্মেলনে কতদূর আশা-আকাঙ্ক্ষার সৃষ্টি করেছিল, উৎসাহব্যঞ্জক শিরোনামে সোৎসাহে তারই পরিচয় রাখবার সময় অবশ্য হাত আমার কেঁপেছিল, জানতাম, শাসকের রাজদণ্ডই একমাত্র ন্যায়দণ্ড তদুপরি আর কিছু নেই। অন্যান্য সব-কিছুর মতই স্পীকার সম্মেলনের নীট ফলও হবে বিরাট রসগোল্লা। হয়েওছে তাই। স্পীকার সম্মেলনের পরেও আইনসভা পাত্তা পায় নি। টাটকা টাটকা উত্তর প্রদেশের রাজ্যপাল আবার গণতন্ত্রের গর্দানে একটি অর্ধচন্দ্র দান করে শাসকের শাসানি এবং যথেচ্ছ খুশি প্রয়োগ করে বসেছেন। মনে পড়ছে, 'সবার উপরে সভা, নিবন্ধের উপ-সংহারে একটি ইংগিত এইভাবে রাখা হয়েছিল ঃ "কনভেনশনই হোক, আর লিখিত বিধানই হোক সবকিছুই ক্ষমতাসীন সরকারের মেনে চলার ওপরে নির্ভর করে। মেনে না চললে সংকট হয় অনিবার্য।... সদিচ্ছাটাই আসল কথা।"

উত্তর প্রদেশে এই সদিচ্ছার অভাব অত্যন্ত প্রকটভাবেই ধরা পড়েছে। ঠিক স্পীকার সম্মেলনের পরেই কেন্দ্রীয় শাসকবর্গ সম্মেলনে গৃহীত সুপারিশ ('সব ক্ষমতার উপরে ক্ষমতাশালী হলেন বিধানসভা', 'গরিষ্ঠতা যাচাইয়ের স্থান বিধানসভা') সমূহকে তাৎক্ষণিক জবাব দান করেছেন উত্তর প্রদেশে ন্যায় নীতি বর্জিত উপায়ে বিধানসভা বাতিল করে, রাজ্যপালের 'খুশি' প্রয়োগ করে রাষ্ট্রপতির শাসন জবরদস্তি রাজ্যের ওপর চাপিয়ে দিয়ে।

এই নিয়ে অসন্তোষ দানা বেঁধে উঠেছে। লোকসভায় স্বতন্ত্র এবং ডি এম কে ছাড়া প্রত্যেক দলই উত্তর প্রদেশে গণতন্ত্র হত্যাকারী ক্ষমতার অপ-প্রয়োগকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করেছেন। (২০।৪।৬৮)

মাসিক ৬০০৲ টাকা উপার্জন করুন

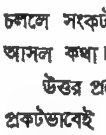

অবসর সময়ে বিখ্যাত রোমার ঘড়িগুলির জন্য অর্ডার বুক করিয়া বিনামূল্যে সর্তাবলী এবং স্যাম্পেল ঘড়ির জন্য পত্র লিখুন।

TAJ CO. (WBC—88)
P. Box 1383, Delhi—6.

উ থান্ট

ভিয়েৎনাম ঃ

এখনও শান্তি আলোচনার স্থান নির্বাচন সম্ভব হয় নি। স্থান নির্বাচন নিয়ে দুই পক্ষের মধ্যে প্রায় লুকোচুরি খেলা সুরু হয়েছে। আর এক পক্ষ অপর পক্ষের বিরুদ্ধে আলোচনা পণ্ড করার অভিসন্ধির অভিযোগ করছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আলোচনার স্থান হিসাবে ভিয়েনটিয়েন, রেঙ্গুন, জাকার্তা ও নয়াদিল্লীর নাম প্রস্তাব করেছিল। কিন্তু উত্তর ভিয়েৎনাম এর কোনটিই গ্রহণ করে নি। অপর পক্ষে উত্তর ভিয়েৎনামের প্রস্তাব ওয়ারশ ও নমপেনও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অগ্রাহ্য করেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দ্বিতীয় দফায় আরও যে দশটি জায়গার নাম করেছে, উত্তর ভিয়েৎনাম তাও অগ্রাহ্য করেছে।

ডাক্তার হউন

ডাকযোগে হোমিওপ্যাথী শিক্ষা করিয়া এম, ডি, এইচ, ডিপ্লোমা লাভ করুন। বিনামূল্যে প্রসপেক্টাস পাইবার জন্য লিখুন—

Hind Homeopathic College
(WBM) Sonepat (Haryana)

স্থান নিয়ে উভয় পক্ষের মধ্যে এই মতানৈক্য শান্তিকামীদের কাছে অসহ্য বলে মনে হচ্ছে। তবে এ ব্যাপারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রই বেশি বেকায়দায় পড়েছে। কারণ রাষ্ট্রপতি লিণ্ডন জনসন যখন শান্তি আলোচনার প্রস্তাব করেন, তখন তিনি বলেছিলেন, বিশ্বের যে কোন জায়গায় যে কোন সময় তিনি আলোচনা সুরু করতে প্রস্তুত আছেন। তাই, এখন ওয়ারশ বা নমপেনের বিরুদ্ধে তাঁর আপত্তির পেছনে বিশেষ যুক্তি দেখানো যাচ্ছে না।

উত্তর ভিয়েৎনাম কমিউনিস্ট দলের মুখপত্র 'নান দানে' অভিযোগ করা হয়েছে, স্থান নির্বাচনে এভাবে আপত্তি জানানোর কারণ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কালহরণ করে আলোচনা বানচাল করতে চায়। আসলে কোন আলোচনা করার ইচ্ছা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেই. এ নেহাৎই একটা প্রচার মাত্র। সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির মুখপত্র 'প্রাভদা'তেও একই কথা বলা হয়েছে। চীনা কমিউনিস্ট পার্টির মুখপত্র 'পিপলস ডেইলি' সমগ্র ব্যাপারটিকেই একটা ধাপ্পা বলে বর্ণনা করেছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও বসে নেই। ক্যাম্প ডেভিডে তাঁর ঘনিষ্ঠ সহকর্মীদের নিয়ে জনসন আলোচনায় বসেছিলেন। হনোলুলুতে গিয়ে জনসন প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের মার্কিন সামরিক কর্তাদের সঙ্গে কথা বলেছেন। দক্ষিণ কোরিয়ার রাষ্ট্রপতি চুং হি পার্কও এখানে জনসনের সঙ্গে এসে কথা বলেছেন।

এখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আলোচনার জন্য নতুন শর্তের কথা বলছে। ওয়াশিংটনে পররাষ্ট্রদপ্তরের মুখপাত্ররা এই কথা বলেছেন, হনোলুলুতে জনসন-পার্ক ইস্তাহারে এই একই কথা বলা হয়েছে—উত্তর ভিয়েৎনামের সঙ্গে আলোচনার সময় মিত্রপক্ষের বিশেষ করে দক্ষিণ ভিয়েৎনামের প্রতিনিধিদের উপস্থিত থাকতে দিতে হবে।

স্বাভাবিকভাবেই উত্তর ভিয়েৎনাম এই নতুন শর্তের ব্যাপারে তীব্র আপত্তি জানিয়েছে।

বৃটেনের প্রধানমন্ত্রী হ্যারল্ড উইলসন প্রস্তাব করেছেন, যে কোন স্থানে (অর্থাৎ, উত্তর ভিয়েৎনামের প্রস্তাবিত কোন জায়গায়) উভয় পক্ষের মধ্যে প্রাথমিক আলোচনা সুরু হোক। তারপর দু' পক্ষ বসে স্থির করুন, মূল আলোচনা কোথায় হবে।

রাষ্ট্রসঙ্ঘের সেক্রেটারী-জেনারেল উ থান্টও চেষ্টা করছেন, উভয় পক্ষের মধ্যে স্থান নির্বাচনের ব্যাপারে একটা আপোষের জন্য। রাষ্ট্রসঙ্ঘে মার্কিন রাষ্ট্রদূত আর্থার গোল্ডবার্গের সঙ্গে তিনি এই ব্যাপারে কথাবার্তা বলেছেন।

পাকিস্তান ঃ

সোভিয়েট ইউনিয়নের প্রধানমন্ত্রী আলেক্সি কোসিগিন চার দিন ধরে পাকিস্তানে রাষ্ট্রীয় সফর শেষ করে দিল্লীর পথে রওনা হয়ে গিয়েছেন।

এই প্রথম পাকিস্তানে সোভিয়েট ইউনিয়ন থেকে কোন প্রধানমন্ত্রী এলেন। এদিক থেকে কোসিগিনের সফরের ব্যাপারে সর্বত্র বিশেষ কৌতূহলের সৃষ্টি হয়েছে। ইসরায়েলী আক্রমণের পর থেকে পশ্চিম এশিয়ায় সোভিয়েট প্রভাব বিশেষভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। সোভিয়েট ইউনিয়ন এখন তার প্রভাবের এলাকা পাকিস্তান পর্যন্ত প্রসারিত করতে চায়। কিন্তু পাকিস্তানের সঙ্গে সোভিয়েটের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তোলার ক্ষেত্রে কয়েকটি বড় বাধা আছে। বিস্ময়কর মনে হলেও এটাই সত্যি যে, পাকিস্তান একই সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের সঙ্গে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আবদ্ধ। এই দু' দিক থেকেই পাকিস্তানের পক্ষে সোভিয়েট ইউনিয়নের নিকটবর্তী হওয়া শক্ত। আবার ভারতের

সত্ত্বেও সোভিয়েট ইউনিয়নের যে নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে, তাতে ঘনিষ্ঠ পাক-সোভিয়েট সম্পর্ক গড়ে ওঠার পথে বাধার সৃষ্টি হয়েছে।

তবু গত কিছুদিন ধরে পাকিস্তানের সঙ্গে সোভিয়েট ইউনিয়নের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হয়েছে, বিভিন্ন ক্ষেত্রে উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে সহযোগিতার ক্ষেত্র প্রসারিত হয়েছে। তাসখন্দ বৈঠকের পর থেকে পাকিস্তানের ব্যাপারে সোভিয়েট কূটনৈতিক তৎপরতা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

কোসিগিনের পাকিস্তান সফরের প্রধান উদ্দেশ্য অর্থনৈতিক ও অন্যান্য ক্ষেত্রে পাকিস্তানের জন্য সম্ভাব্য সোভিয়েট সাহায্যের ব্যবস্থা করা। শোনা যাচ্ছে, কালাবাগে যে ইস্পাত কারখানা স্থাপন করা হবে, তার জন্য সোভিয়েট সাহায্য পাওয়া যাবে। তা ছাড়া দুই দেশের পারস্পরিক স্বার্থসংক্রান্ত অন্যান্য বিষয়ে উভয় রাষ্ট্রের নেতাদের মধ্যে আলোচনা হয়েছে। আন্তর্জাতিক সমস্যা, বিশেষ করে ভিয়েৎনামে শান্তি প্রতিষ্ঠা এবং আরব-ইসরায়েল সম্পর্ক নিয়েও আলোচনা হয়েছে।

ঢাকায় বিমান বন্দরে কোসিগিনকে সম্বর্ধনা জানাবার জন্য স্বয়ং আয়ুব খাঁ উপস্থিত ছিলেন। আয়ুব খাঁর সাম্প্রতিক অসুস্থতার পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর এই উপস্থিতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ঢাকা থেকে রাওয়ালপিণ্ডি পর্যন্ত আয়ুব খাঁ কোসিগিনের সঙ্গে ছিলেন। কোসিগিনের সঙ্গে আয়ুব খাঁ বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনাও করেছেন। তবে তাঁর স্বাস্থ্যের ওপর যাতে চাপ না পড়ে তার জন্য একসঙ্গে দীর্ঘ আলোচনার ব্যবস্থা কখনও করা হয় নি। কোসিগিনের সম্মানার্থে আয়ুব খাঁ রাষ্ট্রীয় ভোজের আয়োজন করেছিলেন।

রাওয়ালপিণ্ডি, করাচী, লাহোর, যেখানেই কোসিগিন গিয়েছেন, সেখানেই তিনি ভাল সম্বর্ধনা পেয়েছেন। তবে পর্যবেক্ষকদের ধারণা, দু' বছর আগে যখন লিউ শাও চি এসেছিলেন, তখন তাঁর সম্বর্ধনা আরও ব্যাপক হয়েছিল। কোসিগিনের সঙ্গে যাঁরা এসেছেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন বাইলো-রাশিয়া ও লিথুয়ানিয়ায় প্রধানমন্ত্রী।

পাকিস্তানের বিভিন্ন অর্থনৈতিক প্রকল্পের জন্য সোভিয়েট সাহায্যদানের বিষয়ে কোসিগিন পাকিস্তানের নেতাদের সঙ্গে যে আলোচনা করেছেন, তাতে পাকিস্তানের কর্তারা মোটামুটি খুশি। কিন্তু আন্তর্জাতিক প্রশ্নে উভয় পক্ষের মধ্যে খুব একটা মতৈক্য হয়েছে বলে মনে হয় না। কোসিগিন ভিয়েৎনামের ব্যাপারে যে কথা বলেছেন, পাকিস্তান তার সঙ্গে একমত নয়। পেশোয়ারের মার্কিন সামরিক বিমান ঘাঁটির প্রশ্নেও আয়ুব খাঁর সঙ্গে কোসিগিনের মতানৈক্য হয়েছে। সোভিয়েট সীমান্তের কাছাকাছি মার্কিন সামরিক ঘাঁটি অবশ্যই সোভিয়েট ইউনিয়নের পছন্দ নয়। কিন্তু 'সেন্টো' জোটভুক্ত পাকিস্তান এই মার্কিন ঘাঁটি তুলে দেবে কি করে? বিপরীত দিকে ভারতের জন্য সোভিয়েট ইউনিয়ন যে সামরিক সাহায্য দিয়েছে, তার বিরুদ্ধে পাকিস্তান কথা তুলেছে। পাকিস্তানও সোভিয়েট সামরিক সাহায্য চায়।

কোসিগিনের পাকিস্তান সফরের সময় ভারতের জন্য সোভিয়েট সামরিক সাহায্য এবং ভারত-পাকিস্তান সম্পর্ক বিশেষ করে কাশ্মীরের প্রশ্ন উঠবে, এ কথা জানাই ছিল। তাই কোসিগিনের মস্কো ত্যাগের পূর্বে সোভিয়েট ইউনিয়নে ভারতের রাষ্ট্রদূত শ্রীকেবল সিং কোসিগিনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে এই সব বিষয়ে আলোচনা করেছেন। ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীও কোসিগিনকে এ ব্যাপারে চিঠি দিয়েছেন।

রাওয়ালপিণ্ডির আলোচনা থেকে মনে হয়, ভারত-পাকিস্তান সম্পর্কের উন্নতির জন্য কোসিগিন আয়ুব খাঁর সঙ্গে কথা বলেছেন। পাকিস্তান সফর শেষে হঠাৎ কোসিগিনের দিল্লী আসা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। কোসিগিন কি মধ্যস্থের ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন? তাসখন্দ বৈঠকের সময় থেকেই সোভিয়েট ইউনিয়ন দুই দেশের মধ্যে সম্পর্কের উন্নতির ব্যাপারে আগ্রহী। এবার পাকিস্তানে গিয়ে কাশ্মীর ও অন্যান্য ব্যাপারে আয়ুব খাঁর সঙ্গে কোসিগিন যে কথা বলেছেন, তার থেকে নতুন কোন মীমাংসার সূত্র বেরিয়েছে কি না, তা অবশ্য এখনও জানা যায় নি।

সবিনয় নিবেদন

অনিবার্য কারণ বশত এ সপ্তাহে অনন্ত সিংহের রচনা 'অগ্নিযুগের একটি অধ্যায়' ও সমীর মুখোপাধ্যায়ের গল্প 'উট পাখি' প্রকাশ করা গেল না।

—সম্পাদিকা

জীবনী ও সাহিত্য আলোচনা

রবার্ট ফ্রস্ট
লরেন্স থম্পসন
অনুবাদ ॥ রাখী রায়

মার্ক টোয়েন
লুইস লেয়ারি
অনুবাদ ॥ মন্দ্রা রায়

আর্নেস্ট হেমিংওয়ে
ফিলিপ ইয়ং
অনুবাদ ॥ রাখাল ভট্টাচার্য

উইলিয়াম ফকনার
উইলিয়াম ভ্যান ও'কনর
অনুবাদ ॥ কৃষ্ণগোপাল চট্টোপাধ্যায়

ক্যাথারিন অ্যান পোর্টার
রে বি ওয়েস্ট, জুনিয়র
অনুবাদ ॥ সুধীর চক্রবর্তী

ন্যাথানিয়েল হথর্ন
হায়াট এচ্ ওয়াগোনার
অনুবাদ ॥ নিখিল নন্দী

হেনরি জেমস
লিওন ইডেল
অনুবাদ ॥ অ. কৃ. ব.

টমাস উল্ফ
হিউ হলম্যান
অনুবাদ ॥ গৌরীশংকর ভট্টাচার্য

ওয়াশিংটন আর্ভিং
প্রতিখানি বই এক টাকা

বেঞ্জামিন ফ্র্যাঙ্কলিন
জয়ন্ত চৌধুরী
২·০০

জর্জ ওয়াশিংটন
জেনেভিভ ফস্টার
১·৫০

একত্রে দশ টাকার অর্ডার দিলে এবং টাকা /অগ্রিম পাঠালে ডাকখরচা লাগবে না। পূর্ণাঙ্গ তালিকার জন্য লিখুন।

এশিয়া পাবলিশিং কোম্পানি
এ ঃ ১৩২, ১৩৩ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট
কলিকাতা-১২ ॥ ফোন ঃ ৩৪-২৩৮৬

সপ্তাহের বোঝা

কৃত্তিবাস ওঝা

রাজ্য রাজনীতির দুই যমজভাই এস এস পি ও পি এস পি দলের রাজ্য সম্মেলন দশ দিনের ব্যবধানে রাজ্যের দুই প্রান্তের দুই জেলা যথাক্রমে বাঁকুড়া ও পশ্চিম দিনাজপুর জেলায় অনুষ্ঠিত হল। এস এস পি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল বাঁকুড়া জেলার ঝাটিপাহাড়ী গ্রামে, আর পি এস পি সম্মেলন যখন রায়গঞ্জে চলছিল তখন সেখানে ক্রমাগত উৎপাত করেছিল ঝাটি ঝড়। ঝাটি শব্দের অর্থ যদি হয় ঝাঁটা—তবে বলতে হয় উভয় দলের সম্মেলনে ঝাঁটার কাজটি সর্বাপেক্ষা গুরুত্বলাভ করেছে। কারণ দুই দলের সম্মেলনেই অনেক কিছুকে যেমন ঝেঁটিয়ে বিদায় দেওয়া হয়েছে, তেমনি ঝাঁটা পেটা করে বিদায় করেছেন এক পক্ষ অপর পক্ষকে। এই ঝাঁটা পেটা করা হয়েছে যেমন দলের নেতৃত্ব গ্রহণের প্রশ্নে, সেরূপ রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রশ্নে। ঝাঁটার মুখে কোন পক্ষই কোন পক্ষের সঙ্গে আপোষ করেন নি, ফলে সম্মেলন শেষে দু দলের বহু নেতা এখনও পরস্পরের বিরুদ্ধে মারমুখিভাবে ঝাঁটা উঁচিয়ে আছেন। এই দুই দলের শীর্ষে আছেন দুইজন—উপাধিতে দাস, তাঁরা হলেন শ্রীনরেন দাস ও শ্রীসুনীল দাস। দুই দলের সভাপতি পদে আছেন দুই অতিপ্রবীণ নেতা ডাঃ ভূপাল বসু ও শ্রীনিশীথনাথ কুণ্ডু। এই দুইজনই কিন্তু নেতাজীর ভাবশিষ্য এবং উভয়েই একদা ফরোয়ার্ড ব্লকের নেতা ছিলেন। সর্বশেষে এই দুই দলের নতুন ভূমিকা গ্রহণে যাঁরা সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ অংশ নিয়েছেন, তাঁরা হলেন দুই দলের দুইজন লোকসভা সদস্য শ্রীদেবেন সেন ও শ্রীসমর গুহ। এস এস পি দল শুধু নীতিগত বিচারেই এক পথের পথিক নয়, যত কিছু সদ্‌গুণ অথবা বদগুণ সবই নিয়েছেন ভাগ করে।

এস এস পি দলের কথাই আগে ধরা যাক। ছোট দল এস এস পি কিন্তু উপদল বিদ্বেষে ভরপুর। পশ্চিমবঙ্গে যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠিত হবার পর সেই সরকার সর্বপ্রথম বিড়ম্বিত হয়েছিল যে কারণে, সেই কারণ হল শ্রীনরেন দাস ও শ্রীকাশীকান্ত মৈত্রকে কেন্দ্র করে দলের মধ্যে বিরোধ। শ্রীনরেন দাস মন্ত্রিসভায় তফসিলী মন্ত্রী নিতে হবে এই দাবি তুলে যুক্তফ্রন্টের এস এস পি দলের মন্ত্রী শ্রীকাশীকান্ত মৈত্রকে প্রায় মন্ত্রিত্ব থেকে নামিয়ে এনেছিলেন। নানা চাপে পড়ে যুক্তফ্রণ্টে একজন তফসিল মন্ত্রী নেবার প্রশ্ন স্বীকৃত হলেও সেই মন্ত্রী গ্রহণে নানা কারণে দেরি হতে লাগল। কিন্তু এই সময় দেখা গেল যুক্তফ্রণ্টে তফসিল মন্ত্রী গ্রহণের প্রশ্নে বহু দলই শুধু ভিন্নমত নয়, অনেকে বিরূপ মনোভাব পর্যন্ত গ্রহণ করলো। অবশেষে শ্রীচারুমিহির সরকারকে মন্ত্রী হিসাবে নিয়োগ করা হল কিন্তু দপ্তর বণ্টনে দেখা দিল প্রচণ্ড বিরোধ, তাই বহুদিন শ্রীসরকার দপ্তরবিহীন মন্ত্রী রয়ে গেলেন। এই শ্রীচারুমিহির সরকারকে দপ্তর দেওয়া, তফসিল মন্ত্রী নিয়োগ করা প্রভৃতি প্রশ্ন নিয়েই সর্বপ্রথম বাংলা কংগ্রেসের একদল সদস্য প্রকাশ্য বিবৃতি দিতে সুরু করেন। তফসিল মন্ত্রী নিয়োগ নিয়ে যে বিবৃতি দেওয়া শুরু করেন শ্রীনলিনাক্ষ সান্যাল, শ্রীহরেন মজুমদার, শ্রীগঙ্গাধর প্রামাণিক, শ্রীচণ্ডীপদ মিত্র—তাঁরাই ভাবীকালে বিবৃতি দিয়ে যুক্তফ্রন্ট ত্যাগ করেন ও যুক্তফ্রন্ট সরকারের পতন ঘটান। অর্থাৎ তফসিল মন্ত্রী চাই এই ধুয়া তুলেই যে দল সর্বপ্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকারের সংকটের বউনি করেছিল, সেই সংকটই ভাবীকালে শশীকলায় বৃদ্ধি পেয়ে সরকারের পতন ঘটিয়েছিল আর সংকট সৃষ্টির জন্য সেদিন এস এস পি দলের নেতৃত্ব করেছিলেন শ্রীনরেন দাস। শ্রীদাসের সম্পর্কে কিন্তু এমন অভিযোগ আনা কোনক্রমে সংগত নয় যে, তিনি যুক্তফ্রণ্টকে সংকটে ফেলতে চেয়েছিলেন। শ্রীদাস শুধু চেয়েছিলেন শ্রীকাশীকান্ত মৈত্রকে মন্ত্রিত্ব থেকে সরিয়ে আনতে। ব্যক্তি বিরোধিতায় যে অশুভ শক্তির আবির্ভাব, সেই শক্তিই ভাবীকালে দানবের শক্তিতে আক্রমণ করেছিল যুক্তফ্রণ্টকে।

যুক্তফ্রণ্টের কাল শেষ হল, কিন্তু শেষ হল না এস এস পি দলের অন্তর্বিরোধ। বাঁকুড়া জেলায় রাজ্য সম্মেলন। ২৯শে মার্চ সম্মেলন সুরু হল আর এই সুরু থেকে ৩১শে মার্চ শেষ পর্যন্ত চললো ঝড়। প্রতি পদে ও প্রতি ক্ষেত্রে অভিযোগ। অভিযোগ প্রতিনিধি নিয়ে। অভিযোগ আসানসোল থেকে এন, ভি, এফ-এর একদল লোককে প্রতিনিধি করে আনা হয়েছে, আবার শতাধিক প্রতিনিধির নাম বাতিল হল সভাপতির রুলিংয়ের ফলে। শ্রীদীনেশ দাশগুপ্ত প্রতিনিধিদের স্বীকৃতি তালিকা দেখাতে না পারায় বাতিল হয়ে গেল অনেক প্রতিনিধির প্রতিনিধিত্ব। কার্যকরী সমিতিতে সম্পাদকের বিবরণী পাশ হল না, আয়-ব্যয়ের হিসাব পাশ হল না। শ্রীনরেন দাস হিসাব পেশ করলে শ্রীবিমান মিত্র ও অধ্যাপক শ্রীদিলীপ চক্রবর্তী জানালেন হিসাব ঠিক নয়। অর্থাৎ একটি রাজনৈতিক দলের তিন দিনের সম্মেলনে দেখা গেল—সম্মেলনের প্রতিনিধি নির্বাচন থেকে সুরু করে দলের টাকা-পয়সার হিসাব পর্যন্ত সব কিছুতে গোলমাল। কিন্তু দল থাকলে গোলমাল থাকা কিছু অন্যায় বা অস্বাস্থ্যকর বা অঘটন কিছু নয়, কিন্তু এখানে গোলমালটার রহস্য অন্য কারণে।

কিস্তিবন্দীতে ট্রানজিস্টার

৩২০, টাকা মূল্যের টেলিকুইন, পোর্টেবল ৩ ব্যান্ড অল ওয়ার্ল্ড ৮ ট্রানজিস্টার মাসিক ১০, টাকার সহজ কিস্তিতে। আবেদন করুন:

ATLAS CO. (S.B.—22)
Box No. 1329, Delhi—6.

পশ্চিমবঙ্গে এস এস পি দল আছে অথচ সেই দলের পরিচালনায় রাজ্যের প্রকৃত এস এস পি নেতৃবৃন্দ নেই—সেই ব্যাপারটার মধ্যেই প্রকৃত রহস্য বর্তমান। রাজ্য এস এস পি বলতে যাঁদের বোঝায়, সে-ই শ্রীকাশীকান্ত মৈত্র, শ্রীবিমান মিত্র, শ্রীসতীন রায়চৌধুরী, অধ্যাপক দিলীপ চক্রবর্তী, শ্রীসৈফুদ্দিন কাশ্মিরী, অধ্যাপক দ্বিজেন বসু প্রমুখের নাম বাদ দিলে এস এস পি-তে কারা আছেন তাঁদের খুঁজে বের করা শক্ত। উপরের নামগুলি শুধু কলকাতার প্রসঙ্গে বলা হল, তেমনি, জয় অধিকারী অর্থাৎ শৈলেন অধিকারী, দেবেন সরকার প্রমুখকে বাদ দিলে মফস্বলেও বা এস এস পি'র কে থাকেন? এস এস পি দলের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন তারকেশ্বরের শ্রীঅজিত বসু শ্রীবিমান মিত্রকে পরাজিত করে। কোন নামের কারণে নয়—কিন্তু এস এস পি নেতা ও কর্মী বলতে রাজ্যে যাঁদের বোঝা যায় ও যাঁদের পরিচিতি আছে, তাঁদের যখন বাদ দেওয়া হয় তখন স্বভাবতই ঠিকে গলদ ধরা পড়ে। একটা প্রশ্ন এই প্রসঙ্গে মনে পড়তে পারে—এস এস পি দলের বিরোধটা কি এবং কোথায়? নীতির প্রশ্নে শ্রীনরেন দাস আর শ্রীকাশীকান্ত মৈত্রের মধ্যে কোন আসমান-জমিন তফাৎ নেই, কিন্তু তফাৎটা সম্ভবত সেই জায়গায়, যেখানে এস এস পি রাজ্য সম্মেলনে শ্রীনরেন দাস তিন দিনই বিরতিহীন কথা বলেছেন আর শ্রীকাশীকান্ত মৈত্র তিন দিনে একবারও মুখ খোলেন নি। তা ছাড়া শ্রীনরেন দাস বা ডাঃ ভূপাল বসুর বিরুদ্ধে সাংগঠনিক দিক থেকে যে অভিযোগ আনা হোক না কেন সেটা এমন কিছু বড় কথা নয়—সব দলেই এক দলের বিরুদ্ধে আর এক দলের বিক্ষোভ থাকতে পারে, মত-বিরোধ থাকতে পারে। রাজ্য এস এস পি দলের বিরোধের চরিত্রটা একটু অন্যরকম। শ্রীকাশীকান্ত মৈত্রের অনুগামীদের শ্রীনরেন দাস পন্থীদের বিরুদ্ধে যেটা প্রধান অভিযোগ সেটা হল দলের নেতৃত্ব এমনভাবে চলতে চান যার অর্থ রাজ্যের বামপন্থী ঐক্যে বিঘ্ন ঘটানো এবং কংগ্রেসকে সহায়তা করা। ঠিক এই অভিযোগ করেই কেরলের এস এস পি দল রাজ্যে নিজেদের আলাদা করে নিচ্ছে এবং কেরল এস এস পি নেতা শ্রী পি আর কুরুপ প্রকাশ্যে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছেন। বাঁকুড়ায় এস এস পি দলের সম্মেলনে অতি তরুণ একজন প্রতিনিধির বক্তৃতা আমি মনে রেখেছি একটি কারণে—কারণ, এই তরুণ কর্মী তার আগোছালো বক্তৃতায় এবং কোন বড় কথা না বলে যে কথাটি বলেছিল সেই কথাটা মনে ধরেছিল অনেকেরই। উক্ত তরুণ কর্মী শ্রীদ্বিজদাস চট্টোপাধ্যায় বলেছিল—'জনতার কাছে আছে হিসাবের ডায়েরী। যদি পার্টির নীতি ও কার্যক্রমকে অস্বীকার করে প্রাদেশিক নেতৃত্ব কোন হঠকারিতা করেন, তাহলে সমাজবাদী পশ্চিম বাংলার তরুণ কর্মীরা তাদের ক্ষমা করবে না। সমাজবাদের রূপকার স্বর্গত ডঃ লোহিয়ার আরব্ধ কাজ তরুণ কর্মীরা সমাপন করবেই। সে কাজের বাধা হিসাবে যাঁরা দেখা দেবেন তাঁদের মুখোস খোলা হবে।' এই কথাগুলো বলে উক্ত তরুণ কর্মী তার স্বর্গত পিতার একটি কবিতা পাঠ করেছিল। সে কবিতার প্রথম ছত্র হল—

ভ্রষ্ট বুদ্ধি ব্যর্থ নীতি বংশপরম্পরা
শ্রেণীহীন সমাজের ফ্যাসানী আওয়াজ
নিরন্ন জনতার দ্রুত অবক্ষয়
ঋণ ভারাক্রান্ত জাতি বিলাসী সমাজ।

এই হল পশ্চিমবঙ্গ এস এস পি'র বর্তমান চেহারা, এই চেহারা পালটাতে গেলে সমাজবাদী মুখোসধারী নেতাদের আবরণ খুলে দিতে হবে। তরুণ কর্মীর এই বক্তৃতায় সকলেই হাততালি দিয়েছিলেন; শুধু গোমড়ামুখে বসেছিলেন মঞ্চে বসা কয়েকজন নেতা।

রায়গঞ্জে পি এস পি দলের সম্মেলনে ঘটল আরও নাটকীয় ঘটনা। পি এস পি নাটকে বহু চরিত্রের মধ্যে দুইটি চরিত্র অতি আকর্ষণীয়। একজন শ্রীসমর গুহ, অপরজন শ্রীঅশোক দাশগুপ্ত। আবও দুইজন আছেন। তাঁরা হলেন—রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী শ্রীনিশীথনাথ কুণ্ডু ও শ্রীসুনীন্দ্র দাস। পি এস পি'র রায়গঞ্জ সম্মেলনের একমাত্র উল্লেখ্য ঘটনা হল পি এস পি দলের যুক্তফ্রন্ট ত্যাগের সিদ্ধান্ত।

কত মজাদার ঘটনাই না দেখা গেছে রায়গঞ্জ সম্মেলনে। একটি দলের সরকারী প্রস্তাব ভোটে বাতিল হওয়ার ঘটনা সম্প্রতি কোন রাজনৈতিক দলে ঘটেছে কি-না জানা নেই, তেমনি জানা নেই দলের সাধারণ সম্পাদক সরকারী প্রস্তাবকে পরাজিত করতে জীবনপণ করেছেন ও নিজে সরকারী প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছেন। পি এস পি দলের রাজ্য কমিটিতে প্রায় আটটা বৈঠকে উক্ত সরকারী প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল এবং এই প্রস্তাবের মূল কথা ছিল পি এস পি যুক্তফ্রন্টে যুক্ত থাকবে। পি এস পি'র সরকারী রাজনৈতিক প্রস্তাব পেশ করেন শ্রীঅশোক দাশগুপ্ত। এই প্রস্তাবের সার কথা হল, "পার্টির বর্তমান সাংগঠনিক শক্তির পরিপ্রেক্ষিতে পার্টি এককভাবে কংগ্রেসকে ক্ষমতা থেকে হটিয়ে রাখতে সক্ষম নয়, এই বাস্তব সত্যকে মেনে নিয়ে পার্টিকে অন্তর্বর্তী নির্বাচনের কৌশল নির্ণয় করতে হবে। সংসদীয় গণতন্ত্রকে সজীব ও সতেজ রাখার প্রশ্নে বিধান-সভায় যথেষ্ট আসন লাভ করার গুরুত্ব রয়েছে। অবাস্তব আদর্শবিলাস, এক-দিকে যেমন পার্টির অস্তিত্বকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারে, অন্যদিকে তেমনি গণ-তন্ত্র ও জাতীয়তাবাদের শত্রুদের হাতকে শক্তিশালী করে পরোক্ষভাবে কংগ্রেসকেই

ISM-MH-403A BN

ক্ষমতায় ফিরে আসার সহায়ক হিসাবে কাজ করতে পারে। সেইজন্য পার্টিকে গণতান্ত্রিক ও জাতীয়তাবাদী দলসমূহের সঙ্গের সম্পর্ককে আরও ঘনিষ্ঠ করার অবিরাম প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। এই প্রচেষ্টার সার্থক রূপদানের জন্য এই সম্মেলন গণতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী সকল দলসমূহের কাছে আবেদন জানাচ্ছে। .....পশ্চিমবঙ্গের বিশেষ রাজনৈতিক পরিস্থিতির পটভূমিকায় কংগ্রেসের পরাজয় সুনিশ্চিত করবার জন্য কংগ্রেস-বিরোধী দলগুলির নির্বাচনী বোঝাপড়ার প্রয়োজনীয়তা যেমন অস্বীকার করা যায় না, তেমনি সম্পূর্ণ ভিন্ন মতাদর্শী দলগুলোর সমন্বয়ে গঠিত যুক্তফ্রন্ট সরকারগুলির ব্যর্থতার অভিজ্ঞতাকেও যথেষ্ট গুরুত্বের সঙ্গে বিচার করে ভবিষ্যতের কর্মসূচী স্থির করতে হবে। দেশের সংহতি, স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্বকে সুরক্ষিত রাখা, বিধানসভার মর্যাদা রক্ষা, বৈদেশিক আনুগত্যের প্রবণতাকে রোধ করা, বিভিন্ন দলগুলির নিজ নিজ আদর্শ প্রচার এবং শক্তিবৃদ্ধির সমান ও ন্যায়সঙ্গত অধিকারের স্বীকৃতি প্রদান এবং আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার স্পষ্ট প্রতিশ্রুতি প্রভৃতি নির্দিষ্ট নীতি ও কার্যক্রমের ভিত্তিতে এই বোঝাপড়া ও সমঝোতা কার্যকরী হতে পারে। কংগ্রেস-বিরোধী অন্যান্য দলগুলো কর্তৃক উপরোক্ত নীতি ও কার্যক্রম গ্রহণ বা বর্জনের উপর উক্ত দলসমূহের সঙ্গে পি এস পি'র নির্বাচনী বোঝাপড়া বা মোর্চা গঠনের ভিত্তি স্থিরীকৃত হবে।"

শ্রীঅশোক দাশগুপ্ত এই রাজনৈতিক প্রস্তাব পেশ করলেন ১১ই এপ্রিল রাত প্রায় বারটায় আর পরদিন রাত বারটায় এই প্রস্তাব শ্রীসুনীল দাসের এক সংশোধনী প্রস্তাবে পরাজিত হল। শ্রীসুনীল দাস শ্রীঅশোক দাশগুপ্তের প্রস্তাবের বিরোধিতা করে বললেন—শ্রীদাশগুপ্ত "যুক্তফ্রন্টের মানসিক বন্দী" আর শ্রীঅশোক দাশগুপ্ত শ্রীসুনীল দাসকে বললেন—অবাস্তব আদর্শবিলাস আমদানী করে শ্রীদাস পার্টির তথা পশ্চিম বাংলায় কংগ্রেসকে ক্ষমতায় ফিরে আসতে সহায়তা করছেন। সেইদিন মধ্যরাত্রে পি এস পি দলের দুই চিন্তাধারায় যে শক্তিপরীক্ষা হল সেটা পরম আকর্ষণীয়। শ্রীঅশোক দাশগুপ্তের প্রস্তাব মাত্র ১৫ ভোটে হেরে গেল। কিন্তু কেন? শ্রীদাশগুপ্ত তাঁর প্রস্তাবে কোথাও বলেন নি,'আমরা যুক্তফ্রন্টে থাকছি, আবার একথাও বলেন নি আমরা যুক্তফ্রন্ট ত্যাগ করছি।' তবু শ্রীসুনীল দাস প্রস্তাব আনলেন অবিলম্বে যুক্তফ্রন্ট ছাড়তে হবে। ভোটের পর শ্রীঅশোক দাশগুপ্ত বলেছিলেন, সন্ধ্যার মধ্যেও যদি কলকাতার টেলিফোন লাইনটা পেতাম, তাহলেও আমার প্রস্তাব জয়ী হত। কিন্তু রায়গঞ্জ থেকে কোনক্রমেই কলকাতার লাইন পেলাম না। কেন সেইদিন শ্রীঅশোক দাশগুপ্ত কলকাতায় টেলিফোন করে লাইন পান নি তার কারণটা আমরা বুঝেছিলাম একটু পরে। রায়গঞ্জ পোস্ট অফিস থেকে টেলিফোন তুলছি কিন্তু টেলিফোন এক্সচেঞ্জ কোন সাড়া দিচ্ছে না। স্থানীয় একজন আইনজীবী শ্রী কে সি মিত্রকে সঙ্গে নিয়ে রওনা হলাম টেলিফোন এক্সচেঞ্জের দিকে। টেলিফোন এক্সেচেঞ্জে গিয়ে দেখি—দরজা-জানলা বন্ধ, ঘরে আলো জ্বলছে। বহু চীৎকার ও দরজা ধাক্কায় দরজার পাশে এসে একজন দাঁড়ালেন—কি ব্যাপার, কি চাই? বললাম, আপনি এক্সচেঞ্জ বন্ধ করে ঘুমুচ্ছেন, আমরা কলকাতার লাইন চাই। অপারেটর পরম নির্বিকারে বললেন—কলকাতার লাইন পাওয়া যাচ্ছে না। বললাম—দরজাটা একটু খুলুন। রাগতভাবে অপারেটর বললেন, না দরজা খোলা হবে না। বুঝলাম অশোক দাশগুপ্ত কেন কলকাতার লাইন পান নি। তাই সেদিন ১২ই এপ্রিল রাত্রে শ্রীঅশোক দাশগুপ্ত যদি টেলিফোনে একবার শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায় বা শ্রীঅশোক ঘোষের সঙ্গে কথা বলতে পারতেন তবে সেইদিন মধ্যরাত্রে রায়গঞ্জে অন্য নাটক হতো। কিন্তু শ্রীদাশগুপ্ত রায়গঞ্জ টেলিফোন এক্সচেঞ্জের কারণে কলকাতার কোনক্রমে যোগাযোগ করতে পারলেন না, তাই মধ্যরাত্রে শ্রীদাশগুপ্তের পরাজয় হ'ল। —সেই পরাজয়ের কাহিনী পরে বলছি।

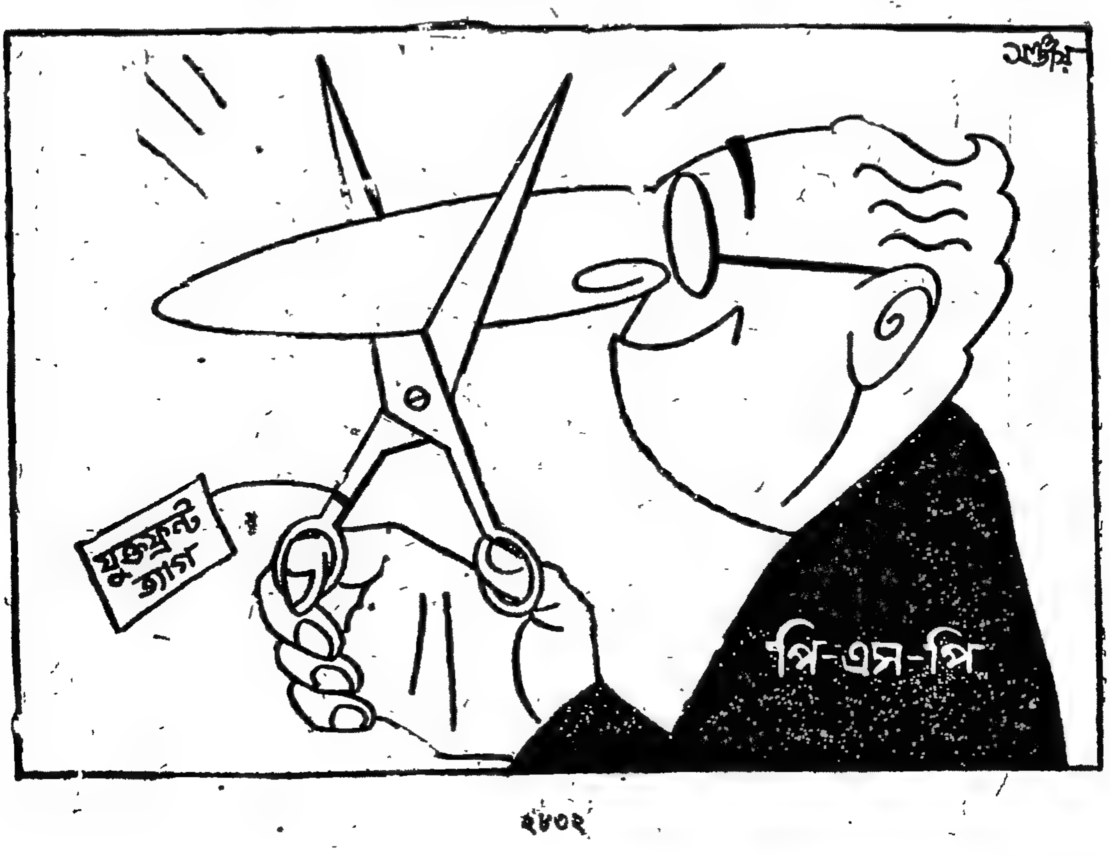

কবিতা

ধূর্ত কবিমশাই

হরপ্রসাদ মিত্র

চালাক-চতুর, দলের মানুষ—
ইচ্ছে-মতন কবিতা
লিখতে পারেন যখন-তখন,
পুরুষ এবং বনিতা—
এমন কবি অনেক আছেন,
প্রেম অথবা দেশপ্রেম
সব ব্যাপারেই সমান সিদ্ধ,
তাঁদের তাবৎ যোগক্ষেম
বহে বেড়ান যে বৎসল,
তাঁকেই বলে নিয়তি।
তল্পীটি তাঁর বহন করার
সমর্থতাই প্রগতি।

খ্যাতি বড়োই ঈর্ষাময়ী,
কীর্তি বড়োই সাপেক্ষা।
তিনিই অধিক উচ্চ যিনি
ধূর্ত সবার অপেক্ষা।

সাংকেতিক তারবার্তা

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

সারাদিন আলোর তরঙ্গ থেকে ধ্বনি জাগে
দূরে যাও।
সারারাত্রি অন্ধকার কানে-কানে মন্ত্র দেয় ঃ
দূরে যাও।
বাল্যবয়সের বন্ধু, পরবর্তী জীবনে তোমরা
কে কোথায়
কর্মসূত্রে জড়িয়ে রয়েছে, আমি খবর রাখি না।
কেউ কি অনেক দূরে রয়ে গেলে?
কৈশোর-দিনের সঙ্গী. তোমরা কেউ কি
দূর ভুবনের মৃত্তিকায়
সংসার পেতেছ, তবু
কৈশোর-দিনের কথা ভুলতে পার নি?
কিংবা যারা প্রথম-যৌবনে কাছে এসেছিলে
তারাই কেউ কি
অজ্ঞাত বিদেশে আজ অবেলায়
পর্বতচূড়ায় উঠে অকস্মাৎ পূর্বাস্য হয়েছ?
তোমরা কেউ কি
উন্মাদের মত ঢিল ছুঁড়ে যাচ্ছ স্মৃতির অতলে?

আলোর অক্লান্ত ধ্বনি প্রাণে বাজে ঃ দূরে যাও!
কেন বাজে?
অন্ধকার কানে-কানে মন্ত্র দেয় ঃ দূরে যাও।
কেন দেয়?
অন্য জীবনের মধ্যে ডুব দিয়ে তবুও কেউ কি
পরিপূর্ণ ডুবতে পার নি?
কেউ কি নিঃসঙ্গ দূর দ্বীপ থেকে খবর চাইছে?
বুঝতে পারি, স্মরণ করছ কেউ রাত্রিদিন।
বুঝতে পারি, নিরুপায় সংকেত পাঠাচ্ছ কেউ
আলোর তরঙ্গে, অন্ধকারে।

পথ কে রুখবে?

মনোজ বসু

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

অপরিচিত মানুষ ঘরে ঢুকল।

মজুমদার-কর্তা বলেন, গোঁফখেজুরে বোঝেন তো? খেজুরতলায় শুয়েছিল, পাকা খেজুর টুপ করে গোঁফের উপর পড়েছে। পথ-চলতি মানুষকে তখন খোসামোদ করছে: পা দিয়ে খেজুরটা মুখে ঠেলে দিয়ে যাও। নিজ হাতে সরিয়ে নেবে না, পরকে বলবে। আপনার হল তাই, দরজা খুলে দিতে বলছেন। কী মশায়, নজর যে ফিরছে না মোটে।

আগন্তুক স্তম্ভিত। বীভৎস বিকৃত-মুখ বৃদ্ধ খাটের উপর আড় হয়ে আছেন। এক চোখ কোটর থেকে ঠেলে বেরুচ্ছে, আর একটা চোখ নেই। বাঁ-হাত নুলো।

বৃদ্ধ হা-হা করে হেসে উঠলেন। চোখে যে পলক পড়ে না মশায়। আগেও ঠিক এই ছিল—রূপ দেখে নজর ফিরত না। আমার যে স্ত্রী, পরে শুনলাম, বোনের কাছে বলেছিল, দেবে তো এই পাত্রের সঙ্গে বিয়ে দাও। নয় তো জলে ঝাঁপ দেবো নয়তো ছাদ থেকে লাফিয়ে পড়ব—

উৎকট হাসি হাসছেন বৃদ্ধ, গা কাঁপে সে হাসিতে। আগন্তুক ভাবছে, পাগলের পাল্লায় এসে পড়ল নাকি? তা অবশ্য নয়, ভাল করেই খবরবাদ নিয়ে এসেছে। মাথায় ছিট থাকতে পারে, অনেকেরই এমন থাকে। সর্বস্ব ফেলে দেশত্যাগ করে আসার পরেও মাথা ষোলআনা ঠিক থাকবে, এমন শক্ত মাথা কটা মানুষের আছে? পাগল নয়, অভিজ্ঞাত মানুষ—খবরাখবর নিয়েই রঞ্জন দত্ত এসেছে।

প্রসঙ্গ ভোলানোর জন্য বাইরে একবার মুখ বাড়িয়ে রুমালে মাথা মুছতে মুছতে রঞ্জন বলল, বৃষ্টি চলবে এখন। 'ধন্য রাজা পুণ্য দেশ, যদি বর্ষে মাঘের শেষ'—

বৃদ্ধ খিঁচিয়ে উঠলেন: কচু। রাজা ঠগজোচ্চোর, দেশ মহাপাতকী—

ঘাড় নুইয়ে রঞ্জন তৎক্ষণাৎ সায় দিয়ে উঠল: যে আজ্ঞে। বর্ষণে বন্যা বয়ে গেলেও পোড়া দেশের ভাল হবে না। তা ছাড়া মাঘমাসও শেষ, ফাল্গুন পড়ে গেল।

এবারে তোয়াজের অন্য পথ ধরেছে। চতুর্দিকে চোখ ঘুরিয়ে দেখে রঞ্জন বলে, উঃ, বাড়ি বটে একখানা। ঘর তো নয়, যেন মাঠ।

বৃদ্ধ বেজার মুখে বললেন, এ বাড়ি আমাদের বানানো নয়।

ওই হল। সেকেলে মশায়দের কীর্তি—সেকেলে বলেই তো এমন। একালের সব বাড়ি হচ্ছে দেখুনগে। তাসের ঘর—বাতাসের ঘায়ে ভেঙে পড়ে।

বৃদ্ধ বললেন, যারা বানিয়েছিল আমি তাদের কেউ নই। পাকিস্তানে গিয়ে আমাদের টিনের ঘরে আস্তানা নিয়ে তারা আমার নম্বুই বিঘে চকের জমির ধান খায়। আর আমি এখানে পাকা-দালানে শুয়ে শুয়ে হরিমটর চিবোই।

আগন্তুক দমে না: তা খান না খান, শোন কর্তামশাই দস্তুরমত ভাল। সেটা মানতে হবে।

তাকের দিকে আঙুল তুলে বৃদ্ধ বললেন, কালো খাতাটা পেড়ে আনুন—

রঞ্জনের কথা শেষ হয় নি, আরও বক্তব্য আছে। বলে, হুকুম হয়ে যাক কর্তামশাই, আমিও এই রাত্তিরটা আপনার এখানে শুয়ে যাই।

কর্তামশাই তাঁর একটা চোখে যেন বল্লমের খোঁচা দিয়ে প্রশ্ন করলেন—আপনি থেকে একেবারে তুমিতে নেমেছেন: তুমি কে?

অধীনের নাম রঞ্জনকুমার দত্ত। মেয়ের বিয়ের পাত্র দেখতে বেরিয়েছিলাম। অন্ধকার মধ্যে যাই কোথা এখন? একটা মাদুর ছুঁড়ে দেবেন—এতবড় বাড়ির যেখানে হোক গড়িয়ে পড়ব।

বৃদ্ধ বললেন: বালিশ দেবো না?

রঞ্জন নিস্পৃহকণ্ঠে বলে, দিলেও হয় না-দিলেও হয়।

উপোসি পড়ে থাকবে বুঝি? মুখে কিছু দিতে হবে না?

দিলেও হয় না-দিলেও হয়।

এক পশলা জোর বৃষ্টি হয়ে এখন ফোঁটা ফোঁটা পড়ছে। প্রণব এক বাড়ির ছাঁচতলায় আশ্রয় নিয়েছিল। ছুটতে ছুটতে ঘরে এসে উঠল।

কর্তামশাই ছেলেকে শুধান: কি বলল হরিহর খাঁ? দেবে?

প্রণব তিক্তকণ্ঠে বলে, নেই তো দেবে কোত্থেকে? হরেক কাঁদুনি গাইতে লাগল—

কালো খাতা এনে দিয়েছে রঞ্জন। একখানা হাতে পাতা উলটাতে উলটাতে বৃদ্ধ অন্যমনস্কভাবে বললেন, তারপর?

বলে এলাম, চাইনে ধান। এক কিলো দু-কিলো চাল আমিই বরং যোগাড় করে পাঠাব।

বৃদ্ধ খিঁচিয়ে উঠলেন: কথাগুলোর বাজে খরচা। কথার চাবুক ওদের গায়ে লাগে না, কাঁটিওয়ালা শঙ্করমাছের চাবুক চাই। আগা-পাস্তালা আচ্ছা করে চাবকে ঠ্যাঙে দড়ি বেঁধে কড়িকাঠের সঙ্গে উল্টো করে ঝুলিয়ে দিতে হয়। ওটাকে, আর কুবুদ্ধিদাতা মোসাহেবগুলোকে। জিভ বেয়ে লালা গড়াবে, সেই সঙ্গে ধানের খবরও বেরিয়ে আসবে।

কথা বলতে বলতে হঠাৎ চুপ।

যা খুঁজছিলেন, পেয়ে গেছেন এতক্ষণে। খাতার সেই পাতাটার উপর নিবিষ্ট দৃষ্টি।

কলকে নিভে গেছে, প্রণব লক্ষ্য করল। নতুন করে সেজে রান্নাঘরে আগুন নিতে যাচ্ছে, কর্তামশায় বললেন, তোর মাকে বলবি খানতিনেক রুটি বেশি করে যেন বানায়। বাড়িতে অতিথ।

ভ্রূকুটি করলেন রঞ্জনের দিকে; সেই যে বলে 'পেটে নেই দানাপানি, জ্ঞাত-কুটুম্বকে ডেকে আনি।' তা কোন কুটুম্ব ডাকতে যাই নি আমি। আয়ে হেঁটে হাজির হল। টং করে শুধু একটা মাদুর চাওয়া হচ্ছে, মাদুর পেতে শুয়ে পড়বে। মানে, গৃহস্থের বাড়ি মাদুরের বেশি কি চাইতে হবে?—মাদুরের পিছন পিছন সমস্ত কিছু এসে পড়বে। তা বলে ভাতের পিত্যেশ কোরো না বাছাধন। রুটি—ভরপেট নয়, গোণাগুণতি তিনখানা। সাত সমুদ্দুর

পায়ের ভিক্ষে-করা গম। খান দুই-তিন রুটি চিবিয়ে ঠেসে জল খেয়ে নেবে। ঐ জিনিসটার অভাব নেই, দেদার খেও।

শুনতে শুনতে প্রণব বেরিয়ে গেল। হুঁকোর মাথায় কল্কে নেই, এবং সামনের উপর দুই কান-সমন্বিত লোক বসে আছে। কর্তামশায়কে পায় কে! বলছেন, লেখার ব্যাতিক ছিল, এক বয়সে বড্ড লিখতাম। ছাপতে পাঠাতাম, ফেরত আসত। তাকে ঐ যত খাতা দেখছ, লেখায় লেখায় ঠাসা। আমার শেষ রচনা এই কালো খাতায়। এই একটাই কেবল ছাপা হয়েছে, পয়সা খরচ করে ছেপেছি।

খোলা খাতা এগিয়ে দিলেন রঞ্জনের দিকে। ছাপা-বিজ্ঞাপন পাতার উপর সাঁটা রয়েছেঃ

সম্পত্তি বিনিময়

যশোর জেলার বাঁশতলি-গ্রামে নব্বই বিঘারও ঊর্ধ্বে তে-ফসলা জমি, ফলের বাগ, তিনটি পুষ্করিণী এবং সাত বিঘা ভদ্রাসন ও বসতবাড়ি পশ্চিমবঙ্গের যে-কোন স্থানের সহিত বিনিময়ের জন্য লিখুন। বক্স নং এইচ, ই, ২৭৮৯।

বলছেন, আমার শেষ লেখা—আর লিখব না এ জীবনে। লেখার পর কলম ভেঙে ফেলছিলাম—মনে হল, আরও একটা কাজ আছে তো কলমের। খদ্দের যদি আসে, দলিলে সই করার সময় তখন আবার কলম কোথায় খুঁজে বেড়াব?

চোখ বুজে হঠাৎ গলা অতিশয় নিচু করে কেবল নিজেকেই যেন শোনাচ্ছেনঃ গাঁয়ের ছেলে গাঁয়েই ছিলাম। লেখাপড়া করতে কলকাতায় এলাম তারপর, সেই তো মরণ হল, রাক্ষুসে কলকাতা আঁকড়ে ধরল। পুজোর সময় গাঁয়ে আর জষ্ঠিমাসে আম-কাঁঠালের সময় যেতাম কেবল। তখন কি জানি, ধোঁয়া হয়ে সব মিলিয়ে যাবে, একটা দিনও তা হলে গ্রাম-ছাড়া হতাম না। ছিলাম না, বাড়ি তবু জমজমাট। জ্ঞাতগুষ্ঠি, আত্মীয়-কুটুম্ব, এসো-জন বসো-জন—নাও খাও থাকো—

কল্কেয় ফুঁ দিতে দিতে প্রণব ঘরে ঢুকল।

কর্তামশায়ের হুঁস নেই, বিড়বিড় করে যেন মন্ত্র পড়ে যাচ্ছেন। হুঁকোর মাথায় কল্কে বসিয়ে প্রণব এগিয়ে ধরেঃ তামাক খাও বাবা—

চোখ মেলে বৃদ্ধ ফড়ফড় করে হুঁকো টানতে লাগলেন। ছেলেকে মধ্যস্থ মেনে হঠাৎ একবার গর্জন করে ওঠেনঃ অতিথ হয়ে এসে বলে কিনা, মাদুর দিন—শুয়ে পড়ে থাকব। আমার বাঁশতলি গিয়ে বলুক দিকি কেমন। তিন-চার মরদ খেপলাজাল নিয়ে পুকুরে পড়েছে, পেল্লায়

সমালোচনা-সাহিত্য পাঠে গবেষক ও ছাত্রদের অপরিহার্য

আমাদের প্রকাশিত কয়েকখানি বই

ডক্টর অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের

দীর্ঘকাল গবেষণাপ্রসূত পুস্তক

বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত

১ম খণ্ড ১৫·০০, ২য় খণ্ড ১৫·০০, ৩য় খণ্ড ২৫·০০

বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত ১৩·০০

ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা ২৫·০০

সাহিত্য ও সংস্কৃতির তীর্থসঙ্গমে ১২·৫০

ডঃ অজিতকুমার ঘোষ

বঙ্গসাহিত্যে হাস্যরসের ধারা (২য় সং) ১৫·০০

শ্রীভূদেব চৌধুরী

বাংলা সাহিত্যের ছোট গল্প ও গল্পকার ১৬·০০

ডঃ শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য

ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদ (২য় সং) ১০·০০

ভারতীয় সাহিত্যে বারমাস্যা ৬·৫০

মধুসূদনের কাব্যালংকার ও কবিমানস ৬·০০

মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড

॥ সম্পূর্ণ পুস্তক তালিকার জন্য লিখুন ॥

১০ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা—১২

ফোন : ৩৪-৩১০৫, ৩৪-৮৪৫১ গ্রাম : BIBLIOPHIL

এক কাতলা ধরে দড়াম করে উঠোনের উপর ফেলল। সকালবেলাই কি ছাড় পাচ্ছ? হুঁ-হুঁ, রাত্তিরে পাঁঠা হয় নি তো—ঐ দেখ, জিওলগাছে পাঁঠা এনে বেঁধেছে, ভ্যাঁ-ভ্যাঁ করছে। গোণাগণতি ক'খানা এমনি পাকা কুঠরি নয়—ঘরের গোলকধাঁধা—টিনের-ঘর খোড়ো-ঘর—ঢুকে পড়তে পারো, বেরিয়ে আসা চাট্টিখানি কথা নয়। পথ হারিয়ে ধাঁধার মধ্যে ঘুরপাক খাবে। খুঁজে-পেতে পথ যদিই বা পেয়ে গেলে, তখন আবার গায়ের জামা পায়ের জুতো খুঁজে পাচ্ছ না। রাত্রে কাল খুলে ঘুমুচ্ছিলে, তারপরে গায়েব। আচ্ছা, দুপুরের খাওয়া-দাওয়া তো হোক, তখন খুঁজে দেখা যাবে—

তামাকে রুচি নেই, হুঁকো রেখে কর্তা-মশায় শয্যা নিলেন। উঠে পড়বার জন্য রঞ্জনকে প্রণব ইসারা করছে: চলে আসুন। ক্লান্ত আছেন, যা-হোক কিছু মুখে দিয়ে শুয়ে পড়বেন।

বৃদ্ধ বললেন, হেরিকেন নিভিয়ে দিয়ে যা। কেরোসিন পুড়িয়ে রোশনাই করবি, এমন লাটসাহেব কবে থেকে হলি? কি মাস এটা—ফাল্গুন পড়ে গেছে, না রে?

আলো নিভিয়ে দরজা ভেজিয়ে দিয়ে দুজনে বেরুল। অন্ধকারে বৃদ্ধের মন্ত্র পড়া আবার আরম্ভ হয়ে গেছে: ফাল্গুন মাস। ধানের পালায় উঠোনে আর পা ফেলবার জায়গা নেই। মলা-ডলা অর্ধেকও সারা হল না। ধান খেয়ে খেয়ে মুটিয়ে গিয়ে ইঁদুরগুলো হাতী হয়ে উঠল রে—

মানুষ পটাতে এই রঞ্জন লোকটার জুড়ি নেই, ইতিমধ্যে ঘোরতর জমিয়ে নিয়েছে প্রণবের সঙ্গে। খাওয়া-দাওয়া অন্তে প্রণবই বিছানা করে দিচ্ছে, তাই নিয়ে দুজনে কাড়াকাড়ি।

প্রণব বলে, চুপচাপ বসে থাকুন বলছি। অতিথি না?

রঞ্জন হেসে বলে, অতিথি বলেই বুঝি হাত ঠুঁটো হয়ে যাবে—চাদরের কোণটাও ধরে দিতে পারব না?

কোন-একখানে মাদুর পেতে পড়ে থাকতে চেয়েছিল—তা মাদুরই নেই সে বিছানায়। আলাদা এক ঘরে তক্তাপোষের উপর সতরঞ্চি-তোষক চাদর-বালিশ। বাড়িতে জামাই এলেই বা এর চেয়ে কী আর বেশি হত?

কর্তামশায়ের কথাগুলো রঞ্জনই এবার বলছে, আলো কি জন্যে? আলো নিভিয়ে দিন। খেতে বসলে তখন লাগতে পারে, দেখেশুনে গালে তুলতে হয়। তা-ই বা কেন—মাছের কাঁটা বাছবার সময় একটু-খানি, চিংড়ি-টিংড়ি হলে তাও লাগে না। ধান-চাল শুধু নয়, কেরোসিনেরও তো বিষম আকাল। উঃ, কী রাজত্বই করছে কুঁড়ি-কুড়িটা বছর ধরে। সভা করে সোনার মেডেল দিতে হয়।

রঞ্জন সংশোধন করে দিল: ক্যারেট সোনা বলুন। তাতেও ভেজাল, দু বছরে দেখবেন সোনা লোহা হয়ে গেছে।

প্রণব বলে, কাগজে দেখতে পাই আমাদের এক ম্যাজিসিয়ান বিদেশে গিয়ে তারিফ আর টাকা কুড়োচ্ছেন। সেই বিদেশীরা এ দেশে এলে দেখতে পারে ঘরে ঘরে আমাদের ম্যাজিসিয়ান। পুরুষ-মেয়ে, বাচ্চা-বুড়ো সবাই।

আলো নিভিয়ে দিয়ে তক্তপোষের একদিকে পা ঝুলিয়ে প্রণব ঘনিষ্ঠ হয়ে বসেছে। বলে, ধানের চেষ্টায় আজ খাঁয়েদের বাড়ি গেলাম। যে দাম চায় তাতেই রাজী। বেকবুল গেল, ধান নেই। তার মানে যে দামটা পেতে চায়, মুখে বলতে লজ্জা লাগছে। লজ্জা আজ বটে—কিন্তু বহুদর্শী মানুষ জেনেবুঝে আছে, বর্ষা পড়লে ঐটেই বাজারদর হয়ে যাবে। হাতে ধরে বলল, তন্নতন্ন করে খুঁজে দেখুন—ধান-চাল সুচ-আলপিন নয় যে, এক কোণে গুঁজে রেখে দিয়েছি। খুঁজলে পেতাম না. নয় তো অত জোর দিয়ে বলবে কেন? তবে দেখুন, হাজার হাজার মন ধান অদৃশ্য করে রেখেছে—ম্যাজিক বই আর কি! বিশ বছরের রাজ্যশাসনে ম্যাজিকবিদ্যাটা ঘরে ঘরে সবাই রপ্ত করে নিয়েছে।

কায়দা পেয়ে রঞ্জন বলে উঠল, ব্ল্যাকের দরেও একচিটে ধান জোটানো যায় না, কেন আছেন পড়ে এমন জায়গায়?

প্রণব বলে, এক-রাত্রির পথ পুরী—পুরী থেকে ফিরে লোকে সেখানকার ফুরফুরে ভাতের গল্প করে। যতবার চাইবেন, ততবারই নাকি ভাত দেয়। অথচ সারা ভারত নাকি একই দেশ, ভারতীয়েরা একজাতি একপ্রাণ—কাগজে পড়ে দেখুন গে।

অন্দুর কেন, রাত্রের ভোগান্তি কেন নিতে যাবেন। ঘরের কাছে একদৌড়ের পথ। যথার্থ বলছি, পাঁচ ক্রোশ পথও বোধ-হয় হবে না।

একেবারে হেঁয়ালির মতো ঠেকছিল—তার পর বুকে নিয়ে প্রণব বলল, পাকি-স্তানের কথা বলছেন?

ঘাড় কাত করে সায় দিয়ে রঞ্জন বলে, বাংলাদেশের পূর্ব-অঞ্চলের কথা। অঢেল ধান-চাল। নতুন ধান উঠেছে, পুরনো ধান কত আর ধরে রাখবে। পোকায় খেয়ে তুঁষ করে দেবে, গুমে গিয়ে অখাদ্য হয়ে যাবে। যে দাম পায়, চাষী তাতেই ছেড়ে দিচ্ছে। সেই দামও আপাতত বাকি—পয়সা-কড়ি সচ্ছল হলে তখন দিয়ে দেবে। তার মানে দেবেই না অর্ধেক লোকে।

অন্ধকারে মুখ দেখা যাচ্ছে না। হঠাৎ রঞ্জন প্রশ্ন করল: বিশ্বাস হয় না বুঝি?

হলেই বা কি। সে তো পাকিস্তান।

পাকিস্তানের চালে বুঝি ভাত হয় না?

হি-হি করে রঞ্জন হেসে উঠল। বলে, একরকম নির্ভেজাল কলকাত্তাই মানুষ দেখেছি, তাদের কাছে শিয়ালদহ পার হলেই বাঙাল-দেশ পদ্মা-মেঘনা সুন্দরবন রয়াল-বেঙ্গল টাইগার। আর হাওড়া স্টেশন ছাড়লেই খোট্টা মুলুক। আপনারও কি তাই? বর্ডার পেরিয়ে পাকিস্তানে পা ঠেকলেই অমনি বুঝি মার-মার কাট-কাট ধুন্দুমার লেগে গেল! কিন্তু কত মুসলমান প্রাণ দিয়েছেন হিন্দু বাঁচানোর জন্যে তার হিসাবটা জানেন?

প্রণব নিরুত্তর। আবছা রকম দেখা যায়, উবু হয়ে বসে হাঁটুতে মাথা রেখেছে।

নাছোড়বান্দা রঞ্জন বলে যাচ্ছে, পাকা-পাকি থাকবেন কেন? দেশ ছাড়তে কে বলছে? আমার কথা সত্যি না মিথ্যে, দুটো চারটে দিন ঢুঁ মেরে পরখ করে আসুন। আপন কেউ না কেউ আছে। চিরকালের সম্পর্ক মানুষ একেবারে ধুয়ে মুছে ফেলতে পারে না—

প্রণব ভিজে গলায় বলে উঠল, আমরা পেরেছি। কেউ নেই আমাদের সে-দেশে, কিছুই নেই। ছিল সেদিন অবধি, মানুষ অবিশ্যি—ভদ্রাসন আর কিছু জমিজিরেত। ঘুচিয়ে দিয়ে এই বাড়ি পেলাম। বাবা বলেন. মরাটা এখন নিজের জায়গায় উপর হতে পারবে।

একটুখানি স্তব্ধ থেকে আবার বলে, অত বড় আগুনে পুড়েও বাবা দমেন নি। কিন্তু বিনিময়ের দলিলে সইয়ের পর থেকে শয্যাশায়ী। মাথারও কিছু গোলমাল—কথাবার্তায় বুঝতে পারা যায়। আপনিই কি আর বোঝেন নি? আম-জাম ডাব-কাঁঠাল সামনে দেখলে হাউ হাউ করে কেঁদে ওঠেন—নাকি সে-বাড়ির গাছ-পালার কথা মনে পড়ে যায়।

সকালবেলা রঞ্জন বেরিয়ে পড়েছে। হাতছানি দিয়ে প্রণবকে কাছে ডাকল: কাল কিছু মিথ্যে বলেছিলাম—প্রণব সহজ ভাবে বলে, জানি। বর খোঁজা মিছে কথা, আপনি ঘাটের দালাল।

জানলেন কি করে বলুন তো?

কথাবার্তা শুনে। ওপারে 'ধান-চালের হিমালয় পর্বত, ওপারের মানুষজন দেবতা-গোঁসাই। হিন্দুস্থানে যে যে জিনিসের অভাব-অনটন, ঘাট পার হয়েই দেখা যাবে সেই সমস্ত জিনিষ গাদা দেওয়া রয়েছে।

রঞ্জন হাসল: বুঝেছি। ডোজটা বেআন্দাজি বাড়ানো হয়ে গেছে। খবর তা বলে বিলকুল মিছে নয়। না গেলে কি

কবে বুঝবেন? ঘুরআঁত্র পেলাম, ধানের একটা হদিস দিয়ে যাচ্ছি। পার না হতে পান, ঘাটে চলে যান একটি বার, ঘাটে চেষ্টা করে দেখুন।

প্রণব অবিশ্বাসের সুরে বলে, ঘাটে বুঝি ধানের গুদাম?

গুদাম কি বলেন, একটা মুড়ি-মুড়কির দোকান অবধি থাকতে দেয় নি। এপারে-ওপারে পাঁচ মাইল জুড়ে কারফিউ। লড়াই-এর সময় থেকে এই সব উপসর্গ—থানা-পুলিশ বর্ডার-পুলিশ তো আছেই, তার উপরে আবার পেল্লায় পেল্লায় ফৌজ বন্দুক ঘাড়ে চক্কোর মেরে বেড়াচ্ছে। তবু যেতে বলছি। মল্লিকঘাটে গিয়ে মালিক শ্রীধর মল্লিককে ধরুন। অগতির গতি—তিনি ইচ্ছে করলে সমস্ত হতে পারবে। নির্ঝঞ্ঝাটে ঘাটে পৌঁছে দেবার মানুষও পেয়ে যাবেন—টৌর্নি-দালাল তারা। দিনমানে ফৌজে বন্দুক মারে না—

একগাল হেসে বলল, আমাদের মল্লিক-ঘাটে রাত্রেও মারবে না।

[ক্রমশঃ]

আয়কর বিভাগ

ইনকামট্যাক্সের ইনস্পেক্টর নিয়োগ

নোটিশ

২১০—১০—২৯০—১৫—৩২০—বোঃ বাঃ—১৫—৪২৫—বোঃ বাঃ—১৫—৪৮৫৲ টাকা বেতন ও প্রদেয় ভাতায় আয়কর বিভাগে বিভিন্ন চার্জে ইনস্পেক্টররূপে নিয়োগের জন্য নামের প্যানেল প্রস্তুতের জন্য প্রার্থী মনোনয়নের জন্য ১৯৬৮ সালের ৪ঠা ও ৫ই জুলাই আমেদাবাদ, এলাহাবাদ, বাঙ্গালোর, ভূপাল, বোম্বে, কলিকাতা, কটক, নিউ দিল্লী, এর্নাকুলম, গৌহাটী, হায়দ্রাবাদ, জয়পুর, লক্ষ্ণৌ, মাদ্রাজ, নাগপুর, পাতিয়ালা, পুণা ও জম্মুতে ইনস্পেকশন অধিকার (আয়কর) একটি প্রতিযোগিতা-মূলক পরীক্ষা গ্রহণ করিবেন। চলতি নিয়মানুযায়ী তপশীলী জাতি ও তপশীলী উপজাতীয় প্রার্থীর জন্য আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা আছে। ইনস্পেকশন অধিকার (আয়কর)-এর ইচ্ছায় পরীক্ষাকেন্দ্র পরিবর্তিত হইতে পারে।

প্রার্থী যে ইনকামট্যাক্সের কমিশনারের চার্জে মনোনীত হইতে ইচ্ছুক তাঁহার নিকট অবশ্য নির্ধারিত আবেদনের ফর্মে দরখাস্ত করিবেন। ১৯৬৮ সালের ১৫ই মে বা পূর্বে ইনকাম ট্যাক্স কমিশনারের নিকট দরখাস্ত পৌঁছিবে।

ভারতীয় নাগরিক বা আইনানুযায়ী যাঁহারা যোগ্য ও যাঁহারা অনুমোদিত বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীধারী ও ১৯৬৮ সালের ১লা এপ্রিল যাঁহাদের বয়স ১৯ বৎসর হইয়াছে ও ২৩ বৎসর হয় নাই, তাঁহারা পরীক্ষা দিতে পারিবেন। ১৯৬৮ সালের এপ্রিল/মে মাসে যাঁহারা ডিগ্রী পরীক্ষা দিবেন তাঁহারা কলেজের অধ্যক্ষ/বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রারের সার্টিফিকেট বলে পরীক্ষা দিতে পারিবেন। অবশ্য তাঁহারা ডিগ্রী পরীক্ষা পাশ করিলেই নিয়োগের যোগ্য বিবেচিত হইবেন। ঊর্ধ্ব বয়ঃসীমা শিথিলকরণ ও অন্যান্য বিশদ বিবরণের জন্য নিয়মাবলী দেখুন।

দরখাস্তের ফর্ম ও পরীক্ষা সংক্রান্ত নিয়মাবলী যাহা ১৩-৪-৬৮ তারিখের গেজেট অফ ইণ্ডিয়ার ৩য় পার্টের ১ম সেকশনে প্রকাশিত হইয়াছে তাহা কমিশনারের অনুকূলে তাঁহার হেড কোয়ার্টার্সে অবস্থিত কোন পোস্ট অফিসে তাঁহার অনুকূলে দেয় ক্রশযুক্ত ইণ্ডিয়ান পোস্টাল অর্ডারে ১৲ টাকা দিয়া ইনকামট্যাক্স কমিশনারের নিকট হইতে প্রাপ্তব্য। ইস্যুয়িং পোস্ট মাস্টারের স্বাক্ষর ও ইস্যুয়িং পোস্ট অফিসের পরিষ্কার স্ট্যাম্প -পোস্টাল অর্ডারে থাকিবে। প্রার্থীকে দরখাস্তের ফর্মের জন্য আবেদনের সময় নিজ ঠিকানা লিখিত (২৩×১০ সি-এম) স্ট্যাম্পযুক্ত খাম পাঠাইতে নির্দেশ দেওয়া যাইতেছে।

৩টি বিষয়ে যথা, সাধারণ ইংরাজী, সাধারণ জ্ঞান ও পাটিগণিতে লিখিত পরীক্ষা ঐ পরীক্ষার অন্তর্ভুক্ত এবং পরে ইনস্পেকশন অধিকার (আয়কর) কর্তৃক নির্ধারিত ন্যূনতম মার্কের পার্সেন্টেজ প্রাপ্ত প্রার্থীর সাক্ষাৎকার হইবে। ভারপ্রাপ্ত ভারত সরকারের প্রকাশিত পুস্তক বিক্রেতার নিকট পূর্বের ৩টি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র প্রাপ্তব্য।

দরখাস্তের ফর্মের জন্য দেয় ১৲ টাকা ব্যতীত যে প্রার্থী প্রকৃতপক্ষে পরীক্ষার জন্য আবেদন করিবেন তাঁহাদের ৬·৫০ টাকায় পরীক্ষা ফী (তপশীলী জাতি ও উপজাতীয় প্রার্থীর ক্ষেত্রে ৮৭ পয়সা) দিতে হইবে। উপরোক্ত ৪ স্তবকে লিখিত পন্থায় পোস্টাল অর্ডারে এই ফী দিতে হইবে।

পরীক্ষা বা সাক্ষাৎকারে যোগদানের জন্য রাহাখরচা দেওয়া হইবে না।

সংশ্লিষ্ট ইনকামট্যাক্স কমিশনারের নিকট পরীক্ষা সংক্রান্ত বিষয় যোগাযোগ করিতে হইবে। কোন ক্ষেত্রেই ইনস্পেকশন অধিকার (আয়কর) নিউ দিল্লী কর্তৃক যোগাযোগ গৃহীত হইবে না।

Davp 533 (1) /68.

আকাশবাণী পরিক্রমা

মেঘদূত

বেতারের বাঙলা খবর একটি বিশিষ্ট অনুষ্ঠান। বহু লোক খবর শোনার জন্য সাগ্রহে কান পেতে থাকেন। বিশেষ করে যাঁরা সংবাদপত্র কিনতে বা পড়তে পারেন না। তাছাড়া টাটকা খবরের জন্য লোকে রেডিও শুনে থাকেন। বেতার কর্তৃপক্ষ সংবাদ পরিবেশনের একটি মূল্যবান ভূমিকা নিয়েছে।

অথচ বেতার কর্তৃপক্ষ কী আলোচ্য কর্তব্য যথাযথ সম্পাদন করছেন? বেতারে যাঁরা খবর পড়েন—কী সকাল, কী সন্ধ্যা তাঁদের উচ্চারণ এবং ভাষা অসংস্কৃত।

ভাষা শুনলে বিস্ময় বোধ হয় এবং মনে প্রশ্ন জাগে, যাঁরা বাঙলা খবরগুলি তৈরি করে দেন তাঁরা কী বাঙলা ভাষার গঠন প্রকৃতি কিছুই জানেন না? এবং জানবার ইচ্ছে আছে বলেও মনে হয় না। প্রায়ই এমন সব বাক্য কানে আসে যার কোন অর্থ খুঁজে পাওয়া যায় না এবং ব্যাকরণগত ত্রুটি গাদা গাদা কানে আসে। বেতারের বাঙলা খবরের অংশ বিশেষ মধ্যে মধ্যে স্কুলের পরীক্ষার প্রশ্নপত্রে ভ্রম সংশোধনের জন্য তুলে দেওয়া যেতে পারে। এবং কৃতজ্ঞতা স্বীকার স্বরূপ 'আকাশবাণী' নামটি উল্লেখও করা যেতে পারে। শিক্ষিত বঙ্গসন্তান এমন ভাষা সৃষ্টি করতে পারেন বলে আমাদের জানা ছিল না। বেতারের বাঙলা খবর বাঙলা ভাষার মান নামিয়ে আনছে।

তাছাড়া, পূর্বেও বলেছি, আবার বলছি, বেতারের বাঙলা খবরের ভাষা প্রাচীনধর্মী। খবর প্রচারিত হয় জনসাধারণের জন্য। আমাদের দেশে নিরক্ষর জনসাধারণের সংখ্যাই তো বেশি। তাদের জন্য প্রচারিত ভাষা হবে চলিতধর্মী সহজবোধ্য। বাঙলা খবরে অবথা বড়ো বড়ো তৎসম শব্দ ব্যবহার করে ওজনে ভারী করার দিকে লক্ষ্য দেখি। আর কঠিন শব্দগুলো উচ্চারণ করতে ঘোষক বারে বারে হোঁচট খান। ভুলভাল যা খুশি পড়ে যান। দুঃখ প্রকাশ করারও ধার ধারেন না।

আর উচ্চারণ? সে কথা না বলাই ভালো। সর্বসম্মত আধুনিক চলিত ভাষার উচ্চারণ বেশির ভাগ ঘোষকের জানা নেই এবং জানবার কোন আগ্রহও নেই। যত্রতত্র থেমে যান। থামার নিয়ম জানেন না। দিনের পর দিন খবর শুনে মনে হয়, ঘোষক মশায়রা কী বেতারের খিড়কীর পথে ঢুকে পড়েছেন! তাঁদের হাত ধরে ভেতরে প্রবেশ করালো কে?

গত ১৩ই এপ্রিল মহিলামহলে 'বর্ষ-বিদায়' অনুষ্ঠিত হলো। ক'টি নোতুন কণ্ঠস্বর শোনা গেল। বেতারের বিচিত্রানুষ্ঠানগুলিতে অধিকাংশ সময়ে দু'-তিনটি গলা ছাড়া নোতুন কণ্ঠস্বর একেবারে শোনা যায় না। একঘেয়েমির পরিবর্তন ঘটলে বাধিত হবো।

*

গত ১৪ই এপ্রিল সকাল ৮টার ও রাত ১০-১৫মিঃ (শর্টওয়েভ) শ্রীবুদ্ধদেব রায় ও সহশিল্পিবৃন্দের কণ্ঠে পরিবেশিত 'ভুই-দেবতারা' ও 'মন-যমুনা' এই দুটি লোকসংগীতানুষ্ঠান খুবই হৃদয়গ্রাহী হয়েছিল। এই দুটি অনুষ্ঠানের সব ক'খানি লোকগীতিই আপন বৈশিষ্ট্যে সুপরিবেশিত। এই ধরণের অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করার জন্য আকাশবাণী কর্তৃপক্ষ ধন্যবাদার্হ।

*

শান্তিনিকেতন থেকে কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায় লিখছেন,......'আকাশবাণী-পরিক্রমা' আমি পড়ে থাকি। গানের সমালোচনার সঙ্গে সঙ্গে আরো অনেককিছু এতে থাকে বলে আমার ভালো লাগে। আমার গাওয়া **'তুমি কিছু দিয়ে যাও'** গানটি আপনার ভালো লেগেছে জেনে আমি খুবই খুশি হয়েছি। এতদিন ধরে গান করছি, কিন্তু তবুও এখন যদি আমার গান কাউকে আনন্দ দিতে পেরেছে জানতে পারি, মনে হয় গান গাওয়া সার্থক হোলো। এবং এতেই প্রেরণা পাই।

*

কলকাতা-৪৭ থেকে **শ্রীমৃগেন্দ্রনাথ দাশ** লিখছেন, ২৮শে মার্চ তারিখের 'আকাশবাণী-পরিক্রমা'য় বেতার অভিনীত 'পদ্মানদীর মাঝি' সম্পর্কে আপনার স্বল্প অথচ যুক্তিপূর্ণ সমালোচনার পাশাপাশি আপনার মতবিরুদ্ধ এক পত্রলেখকের সমালোচনাও ওই একই সংখ্যায় পড়লুম। আপনি বলেছেন,......"সময়ে সময়ে মনে হচ্ছিল, শুধু শুনছি না, দু'চোখ ভরে দেখছিও। বেতার নাটকের সার্থকতা তো এখানেই।" আর পত্রলেখক লিখছেন, "অনেক আশা নিয়ে শুনতে বসেছিলুম, কিন্তু সমস্ত আশার মূলে ছাই দিয়েছেন রেডিও কর্তৃপক্ষ।......'পদ্মানদীর মাঝি'র মতো জীবনধর্মী নাটক করা এদের দ্বারা পোষায় না।"

আপনার মতের সঙ্গে এই বিরূপ মতটি প্রকাশ না করলেও পারতেন; কিন্তু প্রকাশ করার মধ্যে যে সৎ এবং নির্ভীক সাংবাদিকতার পরিচয় দিয়েছেন তা আমাদের বিস্মিত করেছে। আমাদের দেশে অন্তত বর্তমানকালে সাংবাদিকতার ইতিহাসে এ দৃষ্টান্ত বিরল। বিদেশে বিশেষ করে ইউরোপে এ ধরণের সাংবাদিকতা লক্ষ্য করেছি। আমাদের দেশের সাংবাদিকদের অনুরোধ করি তাঁরা এই ধরণের বলিষ্ঠ সাংবাদিকতার আদর্শ গ্রহণ করুন। তবেই 'yellow journalism'-এর হাত থেকে আসবে মুক্তি।

পরিশেষে সাপ্তাহিক বসুমতীর পরিচালকমণ্ডলীকে ধন্যবাদ জানাই।

*

নৈহাটী থেকে শ্রীঅরতি ভট্টাচার্য লিখছেন, 'আপনার নাম জানি না, ছদ্ম নামটির সঙ্গেই আমার পরিচয় আছে 'সাপ্তাহিক বসুমতী'র মাধ্যমে। গত ১৫ই ফেব্রুয়ারীর 'সাপ্তাহিক বসুমতী'তে আমার একটি আকাশবাণীর অনুষ্ঠানের কথা আপনি উল্লেখ করেছিলেন। আমি গত বারো-তেরো বছর ধরে আকাশবাণী কলকাতায় রবীন্দ্রসংগীত ও অতুলপ্রসাদের গান গাইছি—এবং এই একই অবস্থায় আছি। আর হয়ত ৪।৫ বছর বড় জোর ভাল করে (আমার পক্ষে যতটা সম্ভব) গাইতে পারবো। আর আমি জানি, ওই যে অবস্থায় আছি—এই বাকি ক'টা দিনও হয়ত ওই একই সময়ে (প্রায় দুপুর ও পুরো দুপুরে) আমাকে গাইতে দেওয়া হবে। কিন্তু সেজন্যে না, আমি আপনাকে এই চিঠি বিশেষভাবে লিখছি এই জন্য যে, "আকাশবাণী-পরিক্রমা'য় আপনি আমার গান সম্বন্ধে যে নিরপেক্ষ সমালোচনা করেছেন—তা এখনকার দিনে সত্যিই খুব অভাবনীয় বলে মনে হয়েছে আমার। আপনি আমাকে চেনেন না—জানেন না—অথচ আমার অনুষ্ঠান মনোযোগ দিয়ে শুনেছেন এবং যথাযথ আলোচনা করেছেন—আমরা এই দীর্ঘদিনের সংগীতজীবনে এমনটা প্রথম। আমি খুব অভিভূত হয়েছি। চোখে প্রায় জল এসে যায়। এজন্য আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা গ্রহণ করবেন। আর অন্য কোন উদ্দেশ্য নিয়ে নয়, শুধুমাত্র আপনার যে ভালো লেগেছে আমার সেদিনের গান সেই ভরসাতেই শুধু জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা।

ভিয়েৎনামঃ ঝড়ের কেন্দ্রে

বরুণ রায়

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

"আমাদের জাত এক, আমাদের দেশ অখণ্ড। সমস্ত বাধা, সমস্ত বিপত্তি অতিক্রম করে আমাদের জনগণ জাতীয় ঐক্য সাধন করবেই। উত্তর ও দক্ষিণকে আবার একসঙ্গে আনতে তারা দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ।"

এ-কথা ঘোষণা করেছিলেন হো চি মিন, ১৯৬০ সালের ৫ সেপ্টেম্বর, উত্তর ভিয়েৎনামের লাও ডং (শ্রমিক) পার্টির তৃতীয় জাতীয় সম্মেলনে। ভিয়েৎমিন দল ভেঙে দিয়ে হো ১৯৫১ সালে পত্তন করেছিলেন লাও ডংয়ের।

ঐ সম্মেলনের মঞ্চ থেকেই ঘোষণা করেছিলেন লাও ডংয়ের প্রথম সেক্রেটারী লে দুয়ান: "জাতীয় ঐক্য অর্জনের জন্যে মার্কিন জিয়েমচক্রকে উৎখাত করা ছাড়া আর কোন রাস্তা নেই।"

ডিসেম্বরে গঠিত হল ফ্রন্ট ফর ন্যাশ-নাল লিবারেশন, জাতীয় মুক্তি ফ্রন্ট। আজকে যারা লড়াই করছে দক্ষিণ ভিয়েৎ-নামে তাদের রাজনৈতিক সংগঠন।

কারা ছিলেন এই ফ্রন্টের নেতা? লাও ডং পার্টির খবরদারী ছিল এর ওপর সন্দেহ নেই, কিন্তু হাতে-কলমে কারা চালাতেন এর কাজ?

নুয়েন হু তো, ফ্রন্টের প্রেসিডেন্ট, যিনি ছিলেন সায়গনের একজন সর্বজন-শ্রদ্ধেয় আইনজীবী। ভাইস-প্রেসিডেন্ট তিনজন: দুজন জনপ্রিয় ডাক্তার ফুং ভান কুং ও ভো চিং কং এবং একজন স্থপতি হুইন তান ফাট। সেক্রেটারী জেনারেল হলেন নুয়েন ভান হিউ, যিনি সায়গনের একজন বিশিষ্ট সাংবাদিক এবং ইতিহাসের প্রাক্তন অধ্যাপক ছিলেন।

আমরা কি করে বলতে পারি এ'দের প্রতিবাদ ছিল কোন বিজাতীয় উদ্দেশ্যের দ্বারা পরিচালিত? সায়গনের সমাজের এ'রা সকলেই ছিলেন এক-একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি। এ'দের জনপ্রিয়তার মাত্রা ছিল অপরিসীম। অত্যাচারের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে সাহসী হয়েছিলেন তাঁরা, কারণ তাঁরা ছিলেন মানুষের অনেক কাছাকাছি। জিয়েমের মত গাই লং প্রাসাদের নিভৃততম প্রকোষ্ঠে বসে সিগারেটের ধোঁয়ার আবরণে নিজেকে ঢেকে রাখতেন না। অথচ যুক্তির কণ্ঠ, ন্যায়ের কণ্ঠ, নীতির কণ্ঠ, সুবিচারের কণ্ঠ যখন তাঁদের ভেতর দিয়ে উচ্চারিত হল, তখন জিয়েম তাঁর ধূম্রকুণ্ডলীর ভেতর থেকে ফতোয়া দিলেন, ওরা কম্যুনিস্ট।

এরপর নো দিন নু'র গুপ্ত পুলিশের হাত এড়াবার জন্যে ওঁরা যদি পালিয়ে গিয়ে থাকেন জঙ্গলে, তাহলে কে তাঁদের ঘর-ছাড়া করেছিল?

তাঁদের 'ভিয়েৎকং'ই যা করেছিল কে?

এই ইতিহাস ছিল সর্বত্র। এমন অনেক গ্রাম ছিল যেখানে অধিকাংশ লোককেই পাঠানো হয়েছিল জেলে। ছাড়া পাবার পর তারা কি জিয়েমের জন্যে প্রেমে গদগদ হবে?

গ্রামকে গ্রাম জ্বালিয়ে দিয়েছে গুপ্ত পুলিশ। মানুষগুলি কোথায় যাবে

নিরাপত্তার জন্যে? জিয়েমের শহরে, না ভিয়েৎকং'দের জঙ্গলে?

যে সব বুদ্ধিজীবী প্রতিবাদে রুখে দাঁড়াতে চেয়েছিলেন, তাঁদের অনেককে স্থান দেওয়া হয়েছিল সায়গনের বোটানিকাল গার্ডেনের খাঁচায়। মুক্তি পেয়ে তাঁরা কি করতে পারতেন? লড়াই, না জিয়েমের মোসাহেবী?

দেশের চারদিকে অত্যাচারিত, উৎপীড়িত মানুষেরা ভিড় করতে লাগল ফ্রন্টের পতাকার পেছনে। ওরা চায় নিরাপত্তা, চায় শোষণহীন জীবন। জাতীয় মুক্তি ফ্রন্ট ওদের সেই নিরাপত্তা ও শোষণমুক্ত জীবনের প্রতিশ্রুতি নিয়ে এল। শুধু প্রতিশ্রুতি নয়, হাতে-কলমে কাজও।

যে গ্রাম আগে জিয়েমের সৈন্য আর নো দিন নু'র গুপ্ত পুলিশের দয়ার ওপর নির্ভর করত, মুক্তিযোদ্ধারা এখন সেই গ্রাম রক্ষা করবার জন্যে এগিয়ে এলো।

যেখানে করের বোঝা ছিল দুর্বহ, সেখানে কর ওরা মকুব করে দিল।

যেখানে অনুপস্থিত, অত্যাচারী জমিদারের জমি চাষ করে ওদের ভাতের যোগাড় হত না, সেখানে জমিদারের জমি কেড়ে নিয়ে ওরা বিলিয়ে দিল ভূমিহীন মানুষের মধ্যে।

যেখানে উৎপীড়ক মোড়ল কিম্বা প্রদেশ প্রধানের হাতে ওদের মান, মর্যাদা, ধন-সম্পত্তি, মায় প্রাণ পর্যন্ত লুণ্ঠিত হত, সেখানে মুক্তিযোদ্ধারা শুধু ওদের উৎখাতই করল না, প্রাণেও খতম করতে লাগল।

যেখানে স্কুল ছিল না সেখানে স্থাপিত হল স্কুল। যেখানে স্কুল ছিল সেখানে আরো স্কুল স্থাপিত হল। যেখানে ক্লাস ছিল শুধু দিনে সেখানে রাত্রেও ক্লাস চলতে লাগল। যেখানে জিয়েমচক্র স্কুল বন্ধ করে দিয়েছিল সেখানে নতুন শিক্ষক এসে সেগুলি আবার চালু করল।

যেখানে ম্যালেরিয়া, কলেরা, নিউমোনিয়ার মানুষগুলি অসহায়ের মত মারা যেত, চিকিৎসার কোন বন্দোবস্ত ছিল না, সেখানে ওরা খুলল ডিসপেন্সারী, হাসপাতাল। ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে ওরা প্রাথমিক চিকিৎসা নিয়ে যেতে লাগল গ্রাম থেকে গ্রামে।

ওরা চাষীর হয়ে লাঙল ঠেলল মাঠে। চাষীর সওদা ওরাই নিয়ে গেল বাজারে। চাষীর কাঠ ওরাই নিয়ে এলো কেটে, জল ওরাই এনে দিল তুলে।

যদি আর কোন কাজ না থাকত তাহলে ওরা বাসন পর্যন্ত মেজে ধুয়ে দিত গ্রামবাসীদের হয়ে।

ধীরে ধীর, ঠিক যেমনটি হয়েছিল ভিয়েৎমিনদের আমলে, মুক্তিযোদ্ধারা একটা প্রতীকে পরিণত হল। শান্তির প্রতীক, চাষীর হাতে জমির প্রতীক, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, নিরাপত্তার প্রতীক।

সেই প্রতীককে বিশ্বাস করল মানুষ, কারণ সেই প্রতীক ছিল কথা দিয়ে কথা রাখারও।

অপর পক্ষে কিসের প্রতীক ছিল জিয়েমের শাসন? ভস্মীভূত গ্রামের, কারারুদ্ধ মানুষের, ক্ষুধার্ত শিশুর, অবহেলিত রোগীর। ছিল অত্যাচারের, শোষণের, দুর্নীতির। ছিল গুলীর, বেয়নেটের, বোমার। ছিল গুপ্তহত্যার, বিশ্বাসঘাতকতার ষড়যন্ত্রের।

মানুষ তাহলে কোনদিকে যাবে?

কোন অপরিচিতের দাবি নিয়ে মুক্তিযোদ্ধারা গ্রামের মানুষের কাছে হাজির হয় নি। ওরা ছিল গ্রামের মানুষেরই একজন। থাকত ওদের সঙ্গেই, খেতও ওদের সঙ্গে, পড়তও ওদের মতোই। ওরা ছিল খুবই সাধারণ।

অথচ ওরা ছিল খুবই অসাধারণ। গ্রামের মানুষে ওদের চিনত অনেকদিন থেকেই। সেই ভিয়েৎমিন আমল থেকে। মানুষ জানতো ওরা দেশের মুক্তির জন্যে লড়াই করছে। মানুষ জেনেছিল ওরা ফরাসীদের হাত থেকে দেশকে উদ্ধার করেছিল।

তাই যখন ওরা আবার বলতে এলো সাম্রাজ্যবাদীরা এখনো দেশ ছেড়ে যায় নি, যখন ডাক দিয়েছিল এই বলে যে আরো সংগ্রাম, আরো রক্তপাত, আরো স্বার্থত্যাগ দরকার দেশকে পুরোপুরি স্বাধীন করবার জন্যে, তখন ওরা বিশ্বাস করেছিল সে-কথা, এগিয়ে এসেছিল বিনা প্রশ্নে নিজেদের সাহায্য নিয়ে।

যারা ওদের সুখ-দুঃখের অংশীদার, যারা ওদের সঙ্গে সবসময় উঠছে, বসছে, কাজ করছে, ওরা তাদের জন্যে লড়াই করবে না তো কি করবে দুঃশাসন জিয়েমের জন্যে ক্রীডম প্যালেসের জানালার ফোকর দিয়ে যে ভিয়েৎনামকে দেখে? কিংবা ঐ দুঃশাসনের দোসর আমেরিকানদের জন্যে যারা বোমা আর বেয়নেটের বিনিময়ে আনুগত্য আদায় করতে চায়?

সুতরাং সময় এবং আহবান যখন এলো, সেই আহবানে সাড়াও এসেছিল সঙ্গে সঙ্গে।

জেনিভা চুক্তি কার্যকর হবার পর নির্দিষ্ট ৩০০ দিন থেকে তিন দিন আগে হো চি মিন তাঁর সৈন্যদের সরিয়ে নিয়েছিলেন দক্ষিণ থেকে। কিন্তু কিছু কিছু সক্রিয় সমর্থক রয়ে গিয়েছিল আসন্ন নির্বাচনের প্রস্তুতির জন্যে। এরা প্রধানত ছড়িয়ে ছিল ফু ইয়েন, বিন দিন, কোয়াং নাম, কোয়াং নাই, ভিন লং, ভিন বিন, কা মাউ, কোন্টুম, প্লাইকু ও দারলাক প্রদেশে এবং সায়গনের উত্তরাঞ্চলে। এদের ভিত্তি এইভাবে আগেই তৈরি ছিল, এখন ঐ ভিত্তির ওপর নির্ভর করে ফ্রন্টের কর্মক্ষেত্র প্রসারিত হল সারা দক্ষিণ ভিয়েৎনামে।

১৯৬৫ সালের এপ্রিলে আমি যখন দক্ষিণ ভিয়েৎনামে যাই তখন সরকারী হিসাব অনুযায়ী মূল 'ভিয়েৎকং' সৈন্যসংখ্যা ৩৫ হাজার, আর স্থানীয় বাহিনী আরো ৮০ হাজারের মতো।

কিন্তু নিছক এই সৈন্যসংখ্যা দিয়ে কিছুই বোঝাবে না, কারণ 'ভিয়েৎকং'রা শুধু সৈন্য দিয়ে যুদ্ধ করে না। তারা যুদ্ধ করে দেশের মানুষকে সঙ্গে নিয়েও। বলা যায় জনশক্তিই ছিল তাদের আসল শক্তি। আমি শুনেছিলাম, অন্তত ৪০ থেকে ৫০ লাখ লোক তখনই সক্রিয়ভাবে তাদের সঙ্গে আছে।

অথচ সায়গনের সরকারী মুখপাত্ররা বারবার উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করে চলেছিল যে, গ্রামাঞ্চলে 'ভিয়েৎকং'রা একটা সন্ত্রাসের রাজত্ব শুরু করেছে, আর তার ফলে দলে দলে লোক পালিয়ে আসছে সরকারী এলাকায়।

ভিয়েৎনামে এই একটা কথা আমি প্রায়ই শুনতে পেতাম: সরকারী এলাকা আর 'ভিয়েৎকং' এলাকা। কিন্তু যদি এ নিয়ে প্রশ্ন করতাম তাহলেই আর সন্তোষজনক জবাব পাওয়া যেত না। যদি জিজ্ঞেস করতাম সরকারী এলাকা বলে যাকে বলা হচ্ছে সেখানে একজনও গেরিলা নেই এই গ্যারাণ্টি কি তাঁরা দিতে পারেন, জবাব পেতাম, 'না'।

ওরা বলত, দিনের বেলা সরকারী বাহিনী যে এলাকায় বিনা বাধায় টহল দিতে পারে সেই 'এলাকাই সরকারী এলাকা। কিন্তু ওরা ভুলে গিয়েছিল গেরিলারা কোন নিয়মিত সৈন্যবাহিনী নয়, কোন কেতাবী যুদ্ধও তারা লড়ছে না। শত্রু দেখলেই যে তাকে খতম করতেই হবে গেরিলা যুদ্ধে এমন কোন কথা নেই। দ্বিতীয়ত, যুদ্ধ যে কেবল গেরিলারাই চালায় তা নয়, চালায় সাধারণ মানুষও। নানাভাবে। কাজেই কোন এলাকায় 'ভিয়েৎকং' নেই বলেই যে ঐ এলাকা গেরিলাদের প্রভাবমুক্ত এমন মনে করার কোন কারণ নেই। তৃতীয়ত, গতিবিধির স্বাচ্ছন্দ্য গেরিলা যুদ্ধের একেবারে গোড়ার কথা। সুতরাং কোন বিশেষ এলাকাকে দখল করে সেখানে কায়েম হবার মতো বোকামী তারা করবে কেন? আর 'ভিয়েৎকং' এলাকা বলে যখন কোন নির্দিষ্ট এলাকা নেই তখন সরকারী এলাকারই বা কি তাৎপর্য থাকে? চতুর্থত. সরকারী বাহিনী টহল দেয় দিনের বেলায়। কিন্তু রাতের বেলায়? রাত্রে গেরিলাদের অবাধে [illegible] বেড়াতে কে বাধা দিচ্ছে?

এ-ক্ষেত্রে এক দল লোক যদি এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যায়, তাহলে কি করে বলা যায় যে, তারা 'ভিয়েৎকং' এলাকা ছেড়ে সরকারী এলাকায় যাচ্ছে?

সে যাই হোক, আসলে কি লোকেরা ভিয়েৎকং'দের 'সন্ত্রাসের' হাত থেকে বাঁচবার জন্যে দলে দলে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় পালিয়ে যাচ্ছিল?

"অসম্ভব।"

সায়গনের ক্যারাভেল হোটেলে বসে কয়েকজন জাপানী সাংবাদিকের সঙ্গে কথা হচ্ছিল। দক্ষিণ ভিয়েৎনামে মার্কিনীদের পরেই সে সময় জাপানী সাংবাদিকের সংখ্যা ছিল সবচেয়ে বেশি। যুদ্ধকে তারা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে অনুসরণ করেছে, গেরিলাদের কর্মপদ্ধতি ওরা খুব কাছে থেকে লক্ষ্য করেছে। তাছাড়া সংবাদ সংগ্রহের ওদের নিজস্ব সূত্র ছিল। তাদেরই একজন ঐ একটি কথায় সায়গনের প্রচারের জবাব দিয়েছিল

এবং সঙ্গে সঙ্গে বলেছিল, কেন।

অপদার্থ, অত্যাচারী, দুর্নীতিপরায়ণ গ্রাম মোড়ল আর প্রদেশপ্রধানদের মৌরসীপাট্টা গায়ের জোরে খতম করে দেবার নাম যদি সন্ত্রাসবাদ হয় তাহলে 'ভিয়েৎকং'রা নিঃসন্দেহে ছিল সন্ত্রাসবাদী। কিন্তু তার বাইরে?

কর ওরা জোর করে আদায় কেন করবে যখন ওরা জমি বিলিয়ে দিয়েছিল গ্রামের মানুষের মধ্যে?

যে চাষীর ক্ষেতে ওরা লাঙল দেয়, যে চাষী ওদের হয়ে বন্দুক ধরে রাত্রে, সে চাষীর ফসল ওরা লুঠ করবে কেন? বিশেষ করে যখন ওদের এক দিনের খাবার একটা ভাতের গোল্লা এবং যখন অধিকাংশ 'ভিয়েৎকং' গুপ্তঘাঁটির সঙ্গেই নিজস্ব ধানের ক্ষেত রয়েছে?

রাত্রে তো বটেই, দিনেরও কিছুটা সময় যে গ্রাম ওরা পাহারা দেয়, সেই গ্রাম ওরা কেন জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে ছারখার করবে?

যে স্কুলে তাদেরই সমর্থকেরা শিক্ষকতায় নিযুক্ত, সেই স্কুল কেন ভাঙতে যাবে ওরা?

যে হাসপাতালবাড়ি একদিন তাদেরই সম্পত্তি হবে তা ওরা ভেঙে নিজেদের কাজ বাড়াতে যাবে কেন?

যে সেতু ও রাস্তা ওদেরও পারাপারে সাহায্য করে সেই সেতু ও রাস্তা ওরা সাধারণত নষ্টই বা করবে কোন্ যুক্তিতে?

যে মানুষগুলির সাহায্য না পেলে তাদের নিরাপত্তা নিরাপদ নয়, সেই মানুষগুলিকেই বা তারা কেন ভয়ে ভীত এবং আতঙ্কে সন্ত্রস্ত করতে চাইবে?

কাজ উদ্ধার করার জন্যে? যদি সন্ত্রাসই ওদের একমাত্র অস্ত্র হয়ে থাকে, যদি অধিকাংশ লোকই নিজেদের ইচ্ছায় বিরুদ্ধে গেরিলাদের সাহায্য করতে বাধ্য হয়ে থাকে, তাহলে এতদিন ধরে এত ব্যাপক ভিত্তিতে এবং এত নিখুঁতভাবে একটা গেরিলা আন্দোলন চলতে পারে?

"যারা সন্ত্রাসের থিসিস প্রচার করছে", ঐ জাপানী সাংবাদিক আরও বলেছিলেন, "তারা হয় ইচ্ছে করে কোন উদ্দেশ্য নিয়ে তথ্যকে বিকৃত করছে, না হয় মূর্খের স্বর্গে বাস করছে।"

বরং জন-সমর্থন প্রচন্ডভাবে ছিল বলেই গেরিলারা দ্রুত একটা ব্যাপক, সংগঠন গড়ে তুলতে পেরেছিল। এমন কোন গ্রাম ছিল না যেখানে কোন গেরিলা কম্যান্ড ছিল না। ওরা যাতায়াত করত বিনা বাধায়। ওরা সভা করত অনেক সময় লাউডস্পীকার লাগিয়ে।

প্রায় প্রত্যেক সপ্তাহে হত এই সব সভা। সারা গ্রামের লোক জড়ো হত সেখানে। গ্রামের দায়িত্বে ছিল যে গ্রাম কমিটি কিংবা বিশেষভাবে শিক্ষিত যে ক্যাডাররা ছিল সামরিক প্রস্তুতির জন্যে, তাদের সঙ্গে আলোচনা করত লোকেরা। তর্ক করত, কোন যুক্তি পছন্দ না হলে পাল্টা যুক্তি দেখাতো, অভাব-অভিযোগ থাকলে তাও পেশ করত। প্রতিকার হয়ে যেত সঙ্গে সঙ্গেই।

গ্রাম কমিটি নির্বাচন করত গ্রামের লোকেরাই। নিজেদের মধ্যে থেকে। কাজেই কমিটির কাজকর্মে অবিশ্বাস বা বিরোধিতা করার প্রশ্নই উঠত না কোন। নিজেদের লোকের কাছেই ওরা নিয়ে যেত তাদের সমস্যা, নিজেদের লোকের স্বার্থে সেগুলি সমাধান করত কমিটি। এর মধ্যে সন্ত্রাসের কোন সুযোগই ছিল না।

গ্রাম কমিটির ওপরে জেলা কমিটি। বিশেষ কোন কাজের জন্যে অর্থ, লোক ও রসদের সংস্থান করার দায়িত্ব এই কমিটির ওপর। তার ওপর রয়েছে প্রদেশ কমিটি যার কাজ হল স্থানীয় গেরিলাদের মধ্যে সামরিক কর্তব্য বণ্টন করে দেওয়া। তারও ওপর সাতটি আঞ্চলিক কমিটি যার কাজ সাধারণভাবে হল বিভিন্ন পর্যায়ের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা। এগুলি আবার তিনটি আন্তঃঅঞ্চল কমিটির আওতায়, গেরিলাদের ট্রেনিং এবং জনসাধারণের মধ্যে প্রচার যার প্রধান দায়িত্ব। একেবারে জাতীয় মুক্তি ফ্রন্টের কেন্দ্রীয় কমিটি।

এই যে বিশদ, অন্তর্খন্ডিত কাঠামো তা একেবারে নিচের স্তরে যার ওপর একান্তভাবে নির্ভরশীল ছিল গেরিলাদের ভাষায় তার নাম ক্যাডার। সংগ্রামের বোঝা প্রধানত বইতে হত, এখনও হয়, এই ক্যাডারদেরই। শত্রুপক্ষের গতিবিধির ওপর নজর রাখার দায়িত্ব ছিল এদেরই। নিজেদের যোগাযোগের ব্যবস্থায় যাতে কোন ত্রুটি না থাকে সেদিকেও লক্ষ্য রাখত এরাই। রসদের সরবরাহ ঠিক ঠিক আছে কিনা তার খবরদারীর ভারও ছিল এদের।

এমন কোন সরকারী অফিস ছিল না যেখানে এই ক্যাডাররা অনুপ্রবেশ করে নি। এমন কি সরকারী গ্যারিসনের মধ্যেও এরা ছড়িয়ে পড়েছিল। টাইপিস্ট হয়ে কিংবা কেরানী সেজে মার্কিন সামরিক বা আধা-সামরিক দপ্তরে ঢুকে পড়তেও কোন বাধা ছিল না। সরকারী ট্রাকে ড্রাইভার হত ওরা, কিংবা বাসে। সরকারী অফিসার সেজে ওরা আদায় করত সরঞ্জাম, যোগাড় করত গোপন তথ্য। মশা-মারা কর্মচারী সেজে সরকারী সৈন্যদের নাকের ডগা দিয়েই নিজেদের কাজ করে যেত ওরা।

এইভাবে দেশ-জোড়া ক্ষেত্র প্রস্তুত করার পর মুক্তি ফ্রন্ট আরও একবার ভিয়েৎনামের অপহৃত স্বাধীনতাকে উদ্ধার করবার জন্যে সংগ্রামে অবতীর্ণ হল।

প্রথম প্রথম আক্রমণ ছিল বিক্ষিপ্ত, ছাড়া ছাড়া। ছোট ছোট দু-পাঁচজনের দলে বিভক্ত হয়ে হঠাৎ এক-একটি বিচ্ছিন্ন সরকারী ঘাঁটিতে চড়াও হয়েই আবার দ্রুত সরে পড়ত গেরিলারা। বলা যায়, 'ভিয়েৎকং' লড়াইয়ে ওটা ছিল নেট প্র্যাকটিসের যুগ। ওরা পরীক্ষা করত নিজেদের দক্ষতা, গতিবিধির ক্ষিপ্রতা, অপরপক্ষের প্রতিক্রিয়া। ব্যবস্থা নিখুঁত হত ক্রমে।

এবং, যেটা তখন গেরিলাদের পক্ষে আরো গুরুত্বপূর্ণ ছিল, সংগ্রহ হত অস্ত্র-শস্ত্র। ১৯৫৯, ১৯৬০ ও ১৯৬১ এই তিন বছরে অন্তত ১৪ হাজার হাল্কা ও ভারী অস্ত্র ওরা যোগাড় করেছিল এই-ভাবে।

১৯৬১ সালের শেষার্ধ থেকে লড়াইয়ের প্যাটার্ন গেল পাল্টে। গেরিলারা আরো বড় বড় দলে আক্রমণ চালাতে লাগল এবং তাদের অভিযানও ক্রমশ একটা সংঘবদ্ধ রূপ নিল।

ওদিকে প্রথমে শত শত, তারপর হাজার হাজার মার্কিন অফিসার ও নন-কমিশন্ড অফিসার এসে পৌঁছতে লাগল ভিয়েৎনামে। জিয়েমের বাহিনীকে গড়ে-পিটে 'মানুষ' করবার জন্যে। যাতে ওরা গেরিলাদের আরো ভালোভাবে প্রতিহত করতে পারে।

ঐ সব মার্কিন অফিসাররা ছড়িয়ে পড়ল গ্রামে গ্রামে, জিয়েমের বাহিনীর উপদেষ্টা হয়ে। কিভাবে লড়াই করতে হবে, কিভাবে গেরিলাদের জনসাধারণ থেকে বিচ্ছিন্ন করতে হবে, উপদেশ সেই বিষয়ে। যুদ্ধে যেত জিয়েমের সৈন্যরা, ওরাও সঙ্গে সঙ্গে যেত। দেখিয়ে দিত কোন্ পথে আক্রমণ আরম্ভ করতে হবে।

এমনি একজন উপদেষ্টা ছিলেন ক্যাপ্টেন এডোয়ার্ড নিডেভার।

১৯৬১ সালের সেপ্টেম্বর মাসের একদিন। সন্ধ্যে তখন হয় হয়, কি সবেমাত্র সন্ধ্যের কাল উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। ক্যাপ্টেন নিডেভার ট্রুং লাপে তাঁর আস্তানায় বসে দাবার ঘুঁটি সাজিয়ে বসেছিলেন।

একলাই খেলছিলেন। এমনি তাঁকে প্রায়ই খেলতে হয়। নির্বান্ধব প্রহরগুলি যখন আর কাটতে চায় না তখন তিনি এইভাবে সময় কাটাবার জন্যে বসতেন। সময় কেটে যেত।

ট্রুং লাপ জায়গাটা বেশি দূরে নয় সায়গন থেকে। উত্তর-পশ্চিমে মাত্র কুড়ি মাইল। তাহলেও যেন মনে হচ্ছে অনেক দূর। বাইরে অন্ধকারে ভালোভাবে ঠাহর হয় না কিছু। লোকজনের চলাফেরা বন্ধ হয়ে গেছে অনেক আগেই। প্রায় ছাদ সমান উঁচু কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে ঘেরা ছোট্ট দুখানা পাকা ঘরের আস্তানার মধ্যে নিডেভার একা। দরজায় অবশ্য একজন ভিয়েৎনামী পাহারাদার আছে, কিন্তু তার সঙ্গে সন্ধ্যার আলাপ জমে না। একটু যে বাইরে বেড়িয়ে আসবেন তারও উপায় নেই। জায়গাটা একদম নিরাপদ নয়।

পাশেই ভিয়েৎনামী সৈন্যদের ব্যারাক। সারাদিন ক্যাপ্টেন নিডেভারের সঙ্গে ঘুরে বেড়িয়েছে ওরা। যেতে কি চায়। একটু চলে তো বিশ্রাম করে তার বেশি। নিডেভার যদি বলেন একদিকে যেতে তো ওরা যাবে তার সম্পূর্ণ উল্টো দিকে।

এইভাবে কোন যুদ্ধ চালানো যায়? কিন্তু চালাতেই হবে, নিডেভার ভাবেন, কারণ তা না হলে কম্যুনিস্টরা নিয়ে নেবে দেশ।

সারাদিনের পর সৈন্যরা ক্লান্ত হয়ে বিশ্রাম করছে নিজেদের ব্যারাকে।

পরনে হাফ প্যান্ট গায়ে গেঞ্জী, ক্যাপ্টেন নিডেভার বাঁ হাতে সিগারেট ধরে একমুখ ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে চালবার জন্যে সবে একটা বোড়ে তুলেছেন।

হঠাৎ......

রাত্রির অন্ধকার খান খান হয়ে গেল গুলীর শব্দে। পর পর বেশ কয়েকটা।

বোড়ে হাত থেকে পড়ে গেল নিডেভারের। কান পেতে তিনি কিছুক্ষণ শোনার চেষ্টা করলেন। রাইফেলের গুলী বলেই মনে হচ্ছে। বেশি দূরেও তো মনে হল না।

নিডেভার বোঝবার চেষ্টা করলেন। একটা চাপা দৌড়োদৌড়ির আওয়াজ কানে এল। এ নিশ্চয়ই অ্যামবুশ, ভিয়েৎকং-দের চোরাগোপ্তা আক্রমণ। এবং তাঁর শিবির থেকে বেশি দূরেও নয়।

একলাফে উঠে দাঁড়ালেন ক্যাপ্টেন নিডেভার। ভাববার মতো কোন অবকাশ ছিল না তাঁর। দেয়াল থেকে টেনে নিলেন একটা কারবাইন। টোটা লাগানো একটা বেল্ট তুলে নিয়ে মালার মতো খালি কাঁধের ওপর দিয়ে ঝুলিয়ে দিলেন। তারপর হাফ প্যান্ট আর হাত-কাটা গেঞ্জী পরেই ছুটে বেরিয়ে গেলেন দরজা দিয়ে।

নিডেভার দেখলেন অন্ধকার ঈষৎ রাঙা হয়ে উঠেছে।

পাশের ব্যারাক থেকে ভিয়েৎনামী সৈন্যরা অটোমেটিক রাইফেলে 'ট্রেসার' ছুড়ছিল। আলোকরশ্মি হয়ে সেগুলি ছড়িয়ে পড়ছিল আকাশে। প্রায় শ'খানেক গজ দূরে একটা জায়গা তাইতে বেশ আলোকিত হয়ে উঠেছে।

ঐ আলোর দিকে লক্ষ্য করে প্রথমেই কয়েকটা গুলী ছুড়ে নিলেন নিডেভার।

কিন্তু এত আলো সত্ত্বেও এ যেন অন্ধকারে ঢিল ছোড়া। কে শত্রু কে মিত্র কিছুই বোঝার উপায় নেই। নিডেভার শুধু দেখলেন ঐ আলোকে পেছনে রেখে কেবল কয়েকটা শিলুয়েট এধার-ওধার দৌড়োদৌড়ি করছে।

"কে, কে ওখানে?" চেঁচিয়ে উঠলেন নিডেভার। "ব্যাপার কি?"

কেউ কোন উত্তর দিল না। শুধু শুনতে পেলেন গুলী চলছে ঘনঘন।

তিনি আবার কারবাইন তুলে নিলেন। কিন্তু আবার নামিয়ে নিলেন সঙ্গে সঙ্গে। কাকে গুলী করবেন? কে 'ভিয়েৎকং' আর কে তাঁদের সৈন্য? আন্দাজে গুলী করলে নিজের দলের লোকরাই যে মারা পড়বে না তা কে বলতে পারে?

পোষাক দেখেও চেনার উপায় নেই। একে শিলুয়েট, ভালো করে বোঝাই যাচ্ছে না কিছু। তা-ও যতটুকু দেখা যাচ্ছে তাতে নিডেভারের মনে হল সকলেই একই রকম পোষাক পরেছে।

কে যেন এদিকেই দৌড়ে আসছে না? কারবাইন তৈরি রেখে অপেক্ষা করতে লাগলেন নিডেভার। কিন্তু কে হতে পারে লোকটা? তিনি যে গুলী করবেন সে কাকে?

লোকটি যখন তাঁর সামনে দিয়ে চলে গেল নিডেভার তখনো বুঝতে পারেন নি সে কে হতে পারে, ভিয়েৎকং না ভিয়েৎনামী রেঞ্জার।

ঘণ্টাখানেক পর। গুলীর আওয়াজ থেমে গেছে। আকাশে আলোর রশ্মি-গুলিও আর নেই। অন্ধকার আবার আগের মতোই নিরন্ধ্র। কেবল তাঁর শিবিরে এবং পাশের ব্যারাকে আলো জ্বলছে।

ক্যাপ্টেন নিডেভার গম্ভীর মুখে ব্যারাকের উঠোনে দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর সামনে তাঁর ইউনিটের লোকেরা মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছে। ইউনিট কম্যান্ডার হতাশভাবে মাথা নেড়ে জানাচ্ছিলেন, না, একজন ভিয়েৎকংকেও ধরা যায় নি। অন্ধকারের সঙ্গে মিশে সরে পড়েছে ওরা, যাবার সময় ব্যারাকে যত অস্ত্র ছিল সব নিয়ে গেছে ঝেড়ে মুছে। মাঝখান থেকে নিজদের গুলীতে মারা পড়েছে বেশ কিছু ভিয়েৎনামী সৈন্য।

ধীরে ধীরে ফিরে এলেন নিডেভার। তাঁর লোকেরা মাথা নিচু করে দাঁড়িয়েই রইল। একজন কাঁদতে আরম্ভ করল।

নিডেভার তখন দাঁতে দাঁত চেপে ভাবছিলেন, এই অপদার্থদের নিয়ে তাঁরা গেরিলাদের ঠেকাবেন! তার পরেই তাঁর মনে হল এদেরই বা দোষ কি। রাত্রে হয়েই তো যত মুস্কিল। হত যদি দিনের বেলা...।

নিজের চারদিকে একবার তাকিয়ে দেখলেন নিডেভার। এত জঘন্য ধরণের কালো রাত্রি তিনি আগে আর কোথাও দেখেন নি।

ঠিক এই কথাই মনে হয়েছিল স্টাফ সার্জেন্ট ওয়েন মার্চ্যান্ড-এর।

"ট্রেসার ছোড়ো", তিনি চেঁচিয়ে উঠেছিলেন পাগলের মতো। "কোথায় গেল সব ট্রেসারগুলি!"

একবার যেন মনে হল সামনে থেকে গুলী আসছে। অন্ধকারে কিছুই ঠাহর হচ্ছে না, তবু যেন নাকের সোজাই কতক-গুলি আগুনের হল্কা দেখা গেল।

ভিয়েৎনামী সৈন্যরা ভয় পেয়ে সেই আগুনের ফুলকিগুলির দিকে ঝাঁকে ঝাঁকে গুলী উজাড় করে দিল।

যেন প্রতিধ্বনি ফিরে এলো তেমনি-ভাবেই অন্ধকারের ওপার থেকে আবার শোনা গেল গুলীর আওয়াজ। কিন্তু সামনে থেকে তো নয়! এ আওয়াজ যে আসছে ডান দিক থেকে।

আর তাতেই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিলেন মার্চ্যান্ড। একে কালি-গোলা অন্ধকার, কোন দিকেই দৃষ্টি চলে না। তার ওপর গেরিলারা যদি একাধিক দিক থেকে আক্রমণ করে তাহলে কোন্‌দিক সামলানো যায়। এবং এইভাবে চারদিকে সৈন্যদের ব্যস্ত রেখে যদি উঁচু উঁচু ঘাসের ভেতর দিয়ে সাপের মতো বুকে হেঁটে গেরিলারা এগিয়ে আসে, তাহলে এই ঘাঁটি দখল করে নিতে তাদের কতক্ষণ লাগবে?

কোয়াং নাম প্রদেশের এক দূর গ্রামে এটা ঘাঁটিও বটে আবার শিক্ষণ শিবিরও বটে। মার্কিন স্পেশাল ফোর্সেস-এর শিবির। মার্চ্যান্ড এবং তাঁর সঙ্গী জেমস গ্যাব্রিয়েল ঐ বিশেষ বাহিনীর লোক। তাঁদের মাথায় সবুজ 'বেরে' টুপি। এই টুপি দুর্ধর্ষতার প্রতীক। এই টুপি

যাঁরা পরেন, ধরে নেওয়া হয় তারা একাধারে ঝানু পদাতিক ছত্রী, সাবোটাজ-পারদর্শী, গেরিলা, ভাষাবিদ ও যোগাযোগ বিশেষজ্ঞ।

মার্চ্যাণ্ড ও গ্যারিয়েল এই শিবিরে ভিয়েৎনামী সৈন্যদের গড়ে-পিটে 'মানুষ' করার কাজে নিযুক্ত আছেন। অর্থাৎ ভিয়েৎনামীদের তাঁরা শেখান কি করে গেরিলা যুদ্ধের মোকাবিলা করতে হয়।

গ্রামের নাম আন চাউ। ঠিক গ্রাম নয়। একটা ছোট্ট কাদা-জল নদীর ধারে কতকগুলি খড়ের ছাউনি দেওয়া ঘরের মাইলখানেক লম্বা লাইন। জায়গাটা পাহাড়ী হলেও খুব একটা ঘন জঙ্গল নয় চারদিকে। মোটামুটি সমতলই বলা যায়। অথচ এই সমতলেই একদল গেরিলার আক্রমণে তাঁরা বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছেন।

অবশেষে, অনেক চেষ্টার পর, একটি ট্রেসার শেল খুঁজে এনে ছোঁড়া হল। কয়েক সেকেণ্ডের জন্যে একটা চোখ-ধাঁধানো নীলচে-সাদা আলোয় অন্ধকার উজ্জ্বল হয়ে উঠল। কয়েক সেকেণ্ডের জন্যে ঘাসের জঙ্গল পরিস্কার দেখা গেল নিস্তব্ধ বিছিয়ে রয়েছে পশ্চিমে পাহাড়ের পাদদেশ পর্যন্ত।

কিন্তু কয়েক্ সেকেণ্ডের জন্যেই। তার পর ধীরে ধীরে আলো ম্লান হয়ে এলো, এবং যখন একেবারে নিভে গেল তখন অন্ধকার দ্বিগুণ কালো হয়ে ওদের সামনে থেকে মুছে দিল সবকিছু।

ঐ জঙ্গলে ওরা কিছুই দেখতে পায় নি।

তবে কি গেরিলারা ইতিমধ্যে সরে পড়েছে?

একজন একটা হাতবোমা ছুঁড়ে দিল সামনের দিকে। দ্রুত বিস্ফোরণে টুকরোগুলি ছড়িয়ে পড়ল এদিকে-ওদিকে। সঙ্গে সঙ্গে একঝাঁক বুলেট অন্ধকার ভেদ করে ছুটে এসে কয়েকটা ঠন্ ঠন্ আওয়াজ তুলে এদিকে ঠিকরে পড়ল আর কয়েকটা আশেপাশের গাছের গুঁড়িতে বিঁধে গেল।

সে রাত্রে মার্চ্যাণ্ড বা গ্যারিয়েল কিংবা তাঁদের ভিয়েৎনামী সৈন্যরা কেউই ঘুমোতে যান নি। তবে ঐ রাত্রে আর গুলী আসে নি ঘাসের জঙ্গল থেকে।

ভোর বেলা অন্ধকার যখন ফিকে হয়ে এলো, মার্চ্যাণ্ড তখন অনেকটা নিশ্চিন্ত হলেন। তারপর যখন দেখলেন রাস্তায় লোকজন চলাফেরা করছে, পসরা নিয়ে বাজারে চলেছে মেয়েরা, পাহাড়ের ঢালে গরু চরাচ্ছে রাখাল, তখন তাঁর মনে হল সবই স্বাভাবিক আছে, রাতে যা ঘটেছিল সেটা একটা দুঃস্বপ্ন ছাড়া আর কিছু নয়।

একটা গাছের নিচে দুটো ক্যাম্প চেয়ার টেনে এনে ব্রেকফাস্ট নিয়ে বসেছিলেন মার্চ্যাণ্ড ও গ্যারিয়েল। কাল রাতে খাবার সময়টুকু পর্যন্ত পান নি তাঁরা। একটু দূরে ভিয়েৎনামী সৈন্যরা চায়ের কাপ নিয়ে চুপ-চাপ খেয়ে যাচ্ছিল। কাল রাতের অভিজ্ঞতা দারুণভাবে নাড়া দিয়েছিল ওদের। ওরা জানতো সামনে পেছনে যে পাহাড়গুলি রয়েছে সেগুলিতে গেরিলারা গিজ গিজ করছে। যদি তারা একসঙ্গে কখনও আক্রমণ চালায় তাহলে আর রক্ষা নেই।

মুখ থেকে সিগারেটটা নামিয়ে রেখে পা দুটো সামনে ছড়িয়ে দিয়ে চেয়ারে আধশোয়া অবস্থায় আকাশের দিকে তাকালেন মার্চ্যাণ্ড। তারপর কাঁটাতারের বেড়ার ওদিকে ঘাসের জঙ্গল পার হয়ে ধানের ক্ষেতের দিকে চোখ ফিরিয়ে গ্যারিয়েলকে বললেন: "হোয়া কামে (স্পেশাল ফোর্সেস-এর ট্রেনিং ক্যাম্প) খবর দিতে হবে আমাদের আরো গোলা-বারুদ, ট্রেসার শেল দরকার। কখন কি হয় তা বলা যায় না।"

পাকা ধানের ক্ষেত একটা সোনার কার্পেটের মতো বিছিয়ে রয়েছে।

হঠাৎ যেন মনে হল মার্চ্যাণ্ডের ধানের গাছগুলি একটু নড়ে উঠল।

চকিতে সোজা হয়ে বসলেন তিনি।

"কি ব্যাপার?" জিজ্ঞেস করলেন গ্যারিয়েল। পাহাড়ী এলাকায় মেঘমুক্ত দিনে ভোরের একটা আমেজ আছে। সেই আমেজে একটু কিমুনি ধরেছিল তাঁর। হঠাৎ মার্চ্যাণ্ডকে সোজা হয়ে বসতে দেখে তিনিও ধড়ফড়িয়ে উঠলেন।

"দেখ তো জিম, ধানের ক্ষেতে কিছু দেখতে পাও কি না।"

খুব শক্ত করে তাকাবার চেষ্টা করল গ্যারিয়েল। তারপর হঠাৎ এক লাফ দিয়ে কারবাইনটা টেনে আনতে আনতে বলল: "হ্যাঁ, ধান ক্ষেত নড়ছে, 'কং'রা নিশ্চয়ই ওখানে লুকিয়ে আছে।"

গ্যারিয়েল ততক্ষণে কারবাইনটা তুলে নিয়ে তাক করেছে ক্ষেতের দিকে।

"সাবধান জিম!" মার্চ্যাণ্ড চেঁচিয়ে বলে উঠল। "এটা রাত নয়, দিন। আমরা জানি না ওদের সংখ্যা কত, ওরা জানে আমাদের শক্তি কি। আমরা দেখতে পাচ্ছি না ওদের কিন্তু ওরা আমাদের পুরোপুরি দেখতে পাচ্ছে। এই অবস্থায় গুলী চালানো ঠিক হবে কি?"

"না করে উপায় কি?" গ্যারিয়েলের উত্তর। "আমি জানি ওরা গুটি গুটি এগিয়ে আসছে। এবং এসে পড়বেও একেবারে আমাদের বেড়ার ধার পর্যন্ত। তখন আর আত্মরক্ষার সুযোগ পাবো না।"

এই দল খুব সন্তর্পণে অনেকক্ষণ ধরে তাক করে গুলী করলেন ধান ক্ষেতের একটা জায়গা লক্ষ্য করে। গেরিলারা যদি সংখ্যায় অল্প হয় তাহলে তারা এর পর আর এগোতে সাহস পাবে না।

কিন্তু যদি সংখ্যায় বেশি হয়?

সে-কথা আর ভাববার সময় পেলেন না মার্চ্যাণ্ড কিংবা গ্যারিয়েল। চারদিক থেকে ধানগাছগুলি যেন এক সঙ্গে বিস্ফোরণে ফেটে পড়ল। যেন ধানের গাছগুলিই রাইফেল হয়ে গুলী ছুঁড়তে লাগল বৃষ্টিধারার মতো।

এই ভয়ঙ্কর অবস্থার জন্যে প্রস্তুত ছিলেন না মার্চ্যাণ্ড কিংবা গ্যারিয়েল। ওঁরা ভাবতেও পারেন নি সারা রাত ধরে গেরিলারা পাহাড় ছেড়ে ধান ক্ষেতে এসে জড়ো হয়েছে।

"আক্রমণ! এ রীতিমতো একটা আক্রমণ!" স্লিট ট্রেঞ্চে ঝাঁপিয়ে পড়তে পড়তে চীৎকার করে উঠলেন মার্চ্যাণ্ড।

ওদিকে ভিয়েৎনামী সৈন্যরা ভয়ে ছুটোছুটি শুরু করে দিয়েছে। একজন শুয়ে বিশ্রাম করছিল, সে আর উঠল না। চায়ের কাপ মুখে তুলেছিল আরেকজন, হাত থেকে পড়ে গেল কাপ, যন্ত্রণায় হাত দুটো একবার ওপরের দিকে তুলে ঝুলে পড়ল মাটির বুকে। কেউ দৌড়ে নামতে যাচ্ছিল ট্রেঞ্চে, পায়ে গুলী লেগে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল।

এদিকে এরা মাত্র জনা চল্লিশেক। ওদিকে ওরা কত?

"গুলী চালাও! শীগ্গির গুলী চালাও। নইলে আমরা শেষ হয়ে যাবো!" মার্চ্যাণ্ডের নির্দেশ একটা প্রচণ্ড আর্তনাদের মতো শোনালো।

এদিক থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে বুলেট গিয়ে ধানের গাছগুলিকে দুলিয়ে দিল ভীষণভাবে।

কিন্তু এ কি! ঘাসের জঙ্গল নড়ছে কেন?

"শুধু নড়ছে কই, এগিয়েও আসছে যে!" রেডিও ট্রান্সমিটারে হোয়া কামকে ধরবার চেষ্টা করতে করতে বলে উঠলেন গ্যারিয়েল।

বিস্মিত মার্চ্যাণ্ড দেখলেন, ঘাসের জঙ্গল এক এক লাফে একটু একটু করে এগিয়ে আসছে। তিনি বুঝলেন এটা ক্যামোফ্লেজ। ঐ এক-একটা ঝাড়ের নিচে একজন করে 'কং' লুকিয়ে আছে।

এবার গুলী আসতে লাগল ঘাসের জঙ্গল থেকে।

মার্চ্যাণ্ড এখন কোন্ দিক সামলাবেন? ধানের ক্ষেত লক্ষ্য করে গুলী চালালে জঙ্গল এগিয়ে আসে, আর জঙ্গল নিয়ে পড়লে ধান ক্ষেত নিরাপদ।

"হোয়া কাম! হোয়া কাম! গেরিলারা ঘাঁটি দখলের জন্যে আক্রমণ শুরু

করেছে। শীগগির প্লেন পাঠান। শীগগির। আমরা শেষ হয়ে যাচ্ছি।" দ্রুত, উত্তেজিত, চাপা গলায় গ্যাব্রিয়েল কথা বললেন ট্র্যান্সমিটারে।

তারপর মুখ তুলে আকাশের দিকে তাকিয়ে বলে উঠলেন: "আসছে! প্লেন আসছে। যে-কোন মুহূর্তেই এসে পড়বে।"

আর সঙ্গে সঙ্গে, বোধ হয় তাঁর এই কথার জবাবে, প্রচণ্ড এক বিস্ফোরণের শব্দ এল একেবারে কাঁটাতারের বেড়ার কাছ থেকে।

মার্চ্যাণ্ড উদ্‌ভ্রান্ত। গ্যাব্রিয়েল অবাক। ভিয়েৎনামী সৈন্যরা এলোপাথাড়ি গুলী করেই চলেছে।

"ওরা যে একেবারে ঘাঁটির গায়ে এসে পড়েছে!"

"বেড়া! কাঁটাতারের বেড়া ছিঁড়ে ফেলেছে ওরা!"

মার্চ্যাণ্ড দেখলেন চার-পাঁচজন গেরিলা ছেঁড়া কাঁটাতারের ফাঁক দিয়ে হাতবোমা নিয়ে ছুটে আসছে তাঁদের ট্রেঞ্চের দিকে।

সঙ্গে সঙ্গে গুলী করলেন তিনি। জনা দুয়েক গেরিলা সেইখানেই পড়ে গেল। কিন্তু ঐ ফাঁকে, মার্চ্যাণ্ড দেখলেন, বাকী গেরিলারা এগিয়ে এসেছে অনেকখানি। তাদের পেছনে আরো কয়েকজন আসছে। তাদেরও পেছনে আরো।

ওদিকে জঙ্গল আর ক্ষেত থেকেও গুলী চলছে সমানে।

কত লোককে খতম করবেন তিনি? এখন যেন মনে হল মার্চ্যাণ্ডের জঙ্গলের ঘাসগুলিই মানুষ হয়ে এইদিকে এগিয়ে আসছে।

পাগলের মতো চেঁচিয়ে উঠলেন তিনি: "গুলী থেমে যাচ্ছে কেন? আমাদের লোকগুলি করছে কি? সব কি মরে গেছে নাকি?"

গ্যাব্রিয়েল কেটে যাওয়া রেকর্ডের মতো বলে যেতে লাগলেন ট্রান্সমিটারে: "আমরা শেষ হয়ে যাচ্ছি...রিপিট...আমরা শেষ হয়ে যাচ্ছি...রিপিট...আমরা শেষ হয়ে যাচ্ছি!"

ভুলে গিয়েছিলেন মার্চ্যাণ্ড তাঁরা সংখ্যায় মাত্র ৪০ জন। আর এ খেয়ালও তাঁর হয় নি উত্তেজনার মুহূর্তে কখন তিনি ট্রেঞ্চে উঠে দাঁড়িয়েছেন।

যখন খেয়াল হল, তখন তাঁর সারা শরীর কুঁকড়ে কুঁকড়ে উঠছে। তাঁর মুখ সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ল, হাত দুটি শিথিলভাবে দুলতে লাগল দুপাশে, মুখ ছাই হয়ে গেল নিদারুণ যন্ত্রণায়।

"হায় যীশু!" বলে তিনি লুটিয়ে পড়লেন ট্রেঞ্চের মেঝেতে। তাঁর সবুজ টুপি ছিটকে পড়ল দূরে।

একটা গুলী তাঁর বুক ভেদ করে চলে গিয়েছিল।

গ্যাব্রিয়েল তাড়াতাড়ি আবার ট্রান্সমিটার চালু করবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু এবার আর কিছুতেই যোগাযোগ করা গেল না হোয়া কামের সঙ্গে। ওদিকে গুলীর আওয়াজ ক্রমেই এগিয়ে আসছে। এখন কত দূরে হবে? এক শ' গজ? পঞ্চাশ গজ! নাঃ, আরও যেন কাছে মনে হচ্ছে।

গ্যাব্রিয়েল একটা গ্রেনেড নিয়ে ট্রেঞ্চের মুখ দিয়ে গড়িয়ে দিলেন নিচে। একটা বিস্ফোরণের আওয়াজ শোনা গেল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আরও একশ' গুণ বেশি বিস্ফোরণ যেন ফেটে পড়ল ট্রেঞ্চে মাথার ওপর।

"ওরা একেবারে কাছে এসে পড়েছে, আর রক্ষা নেই।" গ্যাব্রিয়েল আর্তনাদ করে উঠলেন।

আর কিছু বলতে পারেন নি গ্যাব্রিয়েল। তার আগেই একটা গুলীর আঘাতে তিনি ছিটকে পড়েছিলেন ট্রেঞ্চের দেয়ালে।

তারপর হঠাৎ গুলী থেমে গিয়েছিল আন চাউ শিবিরে। প্রচণ্ড গোলা-গুলীর পর ঐ স্তব্ধতা ছিল অতল, অপরিমেয়।

প্রায় এক ঘণ্টা যুদ্ধের পর আন চাউ শিবির নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছিল গেরিলারা।

পরে, অনেক পরে, যখন প্লেন এসেছিল আন চাউয়ে তখন সেখানে ইতস্তত ছড়ানো কয়েকটি মৃতদেহ আর নিস্তব্ধ ঘাসের জঙ্গল ছাড়া আর কিছুই ছিল না।

হ্যাঁ, রাত সহায় ছিল গেরিলাদের। নিরক্ষীয় এলাকার নিকষ কালো রাত। ঝিরঝিরে বৃষ্টি। হওয়া রাত। লতায়-পাতায়, জলায়-জঙ্গলে আটকে থাকা গাঢ় অন্ধকার।

কিন্তু আন চাউ তো শুধু রাতের ঘটনা ছিল না। সেখানে বরং প্রধান আক্রমণটাই হয়েছিল দিনে। এবং যে জাপানী সাংবাদিকের কাছে আমি আন চাউয়ের ঘটনা শুনেছিলাম, তিনিই বলেছিলেন যে, ১৯৬২ সাল থেকে আন চাউয়ের মতো আক্রমণ শত শত হয়ে এসেছে এবং সবগুলিই রাত্রের অভিযান নয়।

ভিয়েৎনামী কর্তারা আর তাঁদের মার্কিন উপদেষ্টারা ভেবেছিলেন সারা দক্ষিণ ভিয়েৎনাম জুড়ে যদি তাঁরা সশস্ত্র ঘাঁটির একটা জাল বিছিয়ে দিতে পারেন তাহলে ঐ সব ঘাঁটি থেকে আশেপাশের এলাকায় নিয়মিত টহল দিয়ে গেরিলাদের ছেঁকে তোলা সম্ভব।

কিন্তু এখন তাঁরা দেখলেন, ঘাঁটিগুলি গেরিলাদেরই টারগেট প্র্যাকটিসের বস্তু হয়ে দাঁড়াল। একের পর এক ঘাঁটিগুলি আক্রান্ত ও বিধ্বস্ত হতে লাগল। সরকারের হাতে ছিল প্লেন। প্লেন থেকে বোমা ফেলে তারা কোথাও কোথাও গেরিলাদের হটিয়ে দিত বটে, কিন্তু সেটা কোন কথাই নয়। কারণ এই রকম ঘটনার সংখ্যা ছিল খুবই অল্প, আর ঘাঁটিগুলি অকেজো হয়ে যেত ঠিকই।

আর টহল? মধ্য ভিয়েৎনামের পাহাড়ী এলাকার এক জঙ্গলে টহল দিতে গিয়ে একদিন মার্কিন স্পেশাল ফোর্সেস-এর দুজন উপদেষ্টা ও তাঁদের উপজাতীয় অনুচরেরা একটা গাছের ফাঁপা গুঁড়ির মধ্যে কতকগুলি প্লাস্টিকের বাসনের ঢাকনা খুঁজে পেল। তারপর এধার-ওধার তাকিয়ে দেখল কতকগুলি অ্যালুমিনিয়ামের বাসন মাটিতে ছড়ানো রয়েছে। ছড়ানো ঠিক নয়, এক-একটা গর্তের মুখে বসানো রয়েছে। চাল আর জল রয়েছে তার মধ্যে। বাইরে থেক বোঝার উপায় নেই কিন্তু ঐ এক-একটা গর্ত এক-একটা উনুন। আগুন জ্বলছে। কিন্তু ধোঁয়া বেরোচ্ছে না, কারণ, পরে দেখা গেল, চার পাশে লম্বা লম্বা সুড়ঙ্গ কেটে মাটির তলা দিয়েই ধোঁয়া নিয়ে যাওয়া হচ্ছে কিছুটা দূরে যাতে ধোঁয়া মাটির সঙ্গেই মিশে যেতে পারে, আর যেটুকু বেরোবে জঙ্গলের মধ্যে তা ততটা নজরে পড়বে না।

"এটা ভিয়েৎকংদের একটা আস্তানা," একজন মার্কিন উপদেষ্টা আনন্দে লাফিয়ে উঠলেন। "নিশ্চয়ই আমাদের আসার খবর পেয়ে তাড়াতাড়ি পালিয়েছে।"

জিনিসগুলি যেমন ছিল তাঁরা তেমনই রেখে দিলেন। তারপর আশেপাশে অনেক দূর পর্যন্ত সন্তর্পণে খুঁজে বেড়ালেন। কিন্তু কোথাও গেরিলাদের দেখা পেলেন না। আরও কয়েকদিন পর পর এলেন, তবু গেরিলাদের টিকিটিও দেখা গেল না।

তখন হঠাৎ তাঁদের মধ্যে একজনের মনে হল, তাঁরা যখন টহল দেন তখন কারা যেন তাঁদের পেছন পেছন ছায়ার মতো অনুসরণ করে। এবং সঙ্গে সঙ্গেই মনে পড়ে গেল যেখানটায় তাঁরা গেরিলাদের আস্তানা আবিষ্কার করেছিলেন সেখান থেকে কিছুটা দূরে কাসাভা গাছের একটা ঝাড় আছে। তার গোড়ায় তিনি যেন প্রায়ই নতুন নতুন জায়গায় মাটি খোঁড়া দেখতে পেয়েছেন।

নিশ্চয়ই আমরা চলে গেলে তারা গাছের মূল (খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত) তুলতে আসে, তিনি ভাবলেন।

ব্যস, অমনি একটা প্ল্যান এঁটে ফেললেন তাঁরা। ঠিক হল পরের দিন যথারীতি টহল বেরোবে এবং যেন তারা গেরিলাদের খুঁজে না পেয়ে হতাশ হয়েছে

এমনিভাবে কাসাভার ঝাড় ছাড়িয়ে কিছু দূর গিয়ে ফিরে আসবে। তার আধ ঘণ্টা পর শিবির থেকে ঐ ঝাড়ের দিকে লক্ষ্য করে গোলাবর্ষণ করা হবে। ততক্ষণে গেবিলারা নিশ্চয়ই মুল খোঁড়বার জন্যে সেখানে ফিরে আসবে।

পরের দিন। টহল যথারীতি বেরোল এবং কাসাভার ঝাড় ছাড়িয়ে কিছু দূরে এগিয়েও গেল। তারপর ফিরতি পথে তারা আবার ঝাড়ের কাছাকাছি এসে পড়েছে, হঠাৎ প্রচন্ড চীৎকার করে একজন স্পেশাল ফোর্স উপদেষ্টা বসে পড়লেন। তাঁর হাত থেকে এ-আর ১৫ অটোমেটিক রাইফেলটি পড়ে গেল। একটা লতায় তাঁর পা লেগেছিল, অমনি একটা বাঁশের বর্শা ছিটকে এসে বিঁধে গেল তাঁর বাঁ হাতে।

ধনুকের মত বাঁকিয়ে লতার সঙ্গে এমনভাবে আটকানো ছিল বর্শা যে লতায় একটু টান লাগার সঙ্গে সেটা ছিটকে বেরিয়ে আসে। একটা ভৌতিক কান্ড যেন।

তবু ভালো এটা বর্শা। এমনি কায়দায় মাইনও পেতে রাখে গেরিলাবা। তাহলে আর দেখতে হত না।

বর্শাটা টেনে বার করতে কোন অসুবিধা হল না। কিন্তু সোজা পথে আর যেতে ভরসা হল না। কে জানে আরো কত আপাত-নির্দোষ লতার পেছনে মারাত্মক বর্শা লুকিয়ে আছে।

কাজেই ঘুর পথে ফিরে যাওয়াই ঠিক করলেন স্পেশাল ফোর্স উপদেষ্টারা। তাড়াতাড়ি ফিরতে হবে কারণ একটু পরেই গোলাবর্ষণ শুরু হয়ে যাবে। সেজন্যে তাড়াতাড়ি হাঁটছিলেনও তাঁরা।

হঠাৎ থমকে দাঁড়ালো দলটি। উপদেষ্টারা দেখলেন, সঙ্গের পাহাড়ীরা দেখালো, সামনে মাটিতে অনেকখানি জায়গা জুড়ে ছুঁচলো-মুখ বাঁশের ফলা পোঁতা। একবার যদি সেখানে পা পড়ে তো সোজা গেঁথে যাবে।

একটা একটা করে ফলাগুলি তুলে ইঞ্চি ইঞ্চি করে দলটা যখন এগোতে লাগলো, তখন গোলাবর্ষণ আরম্ভ হয়ে গেছে।

ভিয়েৎকংদেব জন্যে পাতা ফাঁদে নিজেরাই পা দিয়ে ঈশ্বরের নাম করে অপেক্ষা করা ছাড়া ঐ টহলদার দলের আর কিছু করার ছিল না।

সুতবাং সায়গনের কর্তারা যখন দেখলেন গেবিলাদের ছেঁকে তোলাব বদলে তাঁদের পাতা জাল যখন নিজেদেরই হতাহতদের টেনে তুলতে লাগল, তখন তাঁরা একটি নতুন বুদ্ধি বাৎলালেন। ঠিক হল মাটিতে টহল দিয়ে গেরিলাদের খুঁজে বার করায় চাইতে টহলের জন্যে ক্রমশ বেশিমাত্রায় হেলিকপ্টার ব্যবহার করা হবে।

এলো এইচ-২১ 'উড়ন্ত কদলী', ইউ-এইচ ১-বি 'হুই'। ব্যাঙের মতো লাফিয়ে চলতে লাগলো এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায়।

কিন্তু তাতে লাভ হলো কি? সৈন্যদের গতিবিধির তৎপরতা বেড়ে গেল বটে, কিন্তু গেরিলাদের কি খুঁজে পাওয়া গেল?

রাত্রিবেলা ঐ জঙ্গল ভেদ করে গেরিলাদের তল্লাসী করার কথা চিন্তা করাই অবাস্তব। আর দিনের বেলা? আকাশে উড়ে সায়গনের হেলিকপ্টার শুধু গেরিলাদের চোখের সামনেই নিজেকে মেলে ধরেছিল। ঘন জঙ্গলের আড়াল থেকে গুলী করে তা নামিয়ে দেওয়া কিছুই কঠিন ছিল না। প্রায়ই দেখা যেতো হেলিকপ্টারগুলি কিছুক্ষণ বৃথা ঘুরে বেড়িয়ে আন্দাজে কিছু গুলী এলোপাতাড়ি ছিটিয়ে দিয়ে ঘাঁটিতে ফিরে আসত। গেরিলারা বাধা দিয়ে নিজেদের অস্তিত্ব জানাবার কোন চেষ্টাই করত না।

কখনো কখনো মার্কিনীরা একটু চালাকি করবার চেষ্টা করতেন। একটা হেলিকপ্টারকে আগে 'টোপ' হিসেবে পাঠানো হতো। খানিকক্ষণ আকাশে উড়ে ঐ 'টোপ' ক্রমে ক্রমে নিচুতে নামতো। যখন 'টোপ' অনেকখানি নেমে এসেছে, গাছের মাথা প্রায় ছোঁয় ছোঁয়, তখন গুলী আসত নিচে থেকে। সঙ্গে সঙ্গে হেলিকপ্টার থেকে খবর যেত বেতারেঃ গেরিলারা টোপ গিলেছে। ছুটে আসত অন্যান্য হেলিকপ্টার যারা এতক্ষণ দূরে দূরে ছিল। মাটির যে জায়গা থেকে গুলী এসেছিল সেই জায়গা লক্ষ্য করে চালাতো গোলা, ফেলত বোমা।

প্রথম প্রথম এতে যে কাজ হয় নি তা নয়। কিন্তু গেরিলারা শীগগিরই ধরে ফেলেছিল চালাকি। তার পর থেকে ওরা টোপ যদি গিলত তো গিলত ইচ্ছে করেই, এবং যখন বোমা নিয়ে বাকী হেলিকপ্টারগুলি আসত তখন চারদিক থেকে গুলী এসে পড়ত তাদের ওপর। গেরিলাদের ঘায়েল করার বদলে তারাই ফিরে যেত ঘায়েল হয়ে।

শেষের দিকে কোন বিশেষ অভিযানের জন্যে সৈন্য নিয়ে যেসব হেলিকপ্টার যেত সেগুলিও গেরিলাদের আক্রমণে কিমা-কাটা হতে লাগল।

এই হচ্ছে যুদ্ধ আমেরিকানরা যা জয় করতে চাইছে।

এবং কিভাবে? টহলে ওরা বেরোয় ঠিকই, কারণ ওটা তাদের নৈমিত্তিক কর্তব্যের মধ্যে পড়ে। ওরা বলে 'ওয়াকস ইন দি সান', রৌদ্রে ভ্রমণ।

কখনো কখনো মাসের পর মাস কেটে যায় ওরা শুধু ঘুরেই বেড়ায়। লক্ষ্যহীন। 'ভিয়েৎকং'দের ডাকনাম ওরা দিয়েছে চার্লি। চার্লির টিকিটিও দেখা যায় না কোথাও।

চার্লি বোধ হয় ভয় পেয়েছে, ওরা ভাবে। মাঝে মাঝে হঠাৎ কোন ছেঁড়াখোঁড়া লতায় পা আটকে যায়, আর সঙ্গে সঙ্গে মাইন ফাটে কিংবা বর্শা ছিটকে এসে বিঁধে যায় শরীরে। কখনো পা গেঁথে যায় 'পাঞ্জি'তে, ছুঁচলো বাঁশের ফলায়। প্রায়ই ফাঁদ পাতা থাকে রাস্তায়। গভীর গর্ত। তার তলায় আটকানো থাকে পাঞ্জি। ওপরে ঘাস মাটি দিয়ে ক্যামোফ্লেজ করা। একবার পা পড়লে আর রক্ষা নেই।

চার্লি না থেকেও আছে, হাড়ে হাড়ে টের পায় ওরা। কিন্তু কিছু করার উপায় নেই। কারণ চার্লিকে পাওয়া যাবে না হাতের কাছে। ওরা শুধু গালাগাল দেয়, চার অক্ষরের অশ্রাব্য গালাগাল।

কেউ কেউ নিজেদের আস্তানার দেয়ালে লিখে রাখে ঐ গালাগাল। বড় বড় অক্ষরে। যাতে ঘুম থেকে উঠে আর ঘুমোতে যাবার সময় চোখে পড়ে।

কেউ কেউ হাতে উল্কি আঁকিয়ে লিখে রাখেঃ 'সাত কং!' 'কং'দের হত্যা কর!

ওরা উত্তেজিত হয়। ভাবে, ওরা জয়লাভ করছে।

একের পর এক জেনারেলরা এসেছে আর গেছে। ১৯৫৪ সালে জেনারেল জন ও'ডানিয়েল। তারপর জেনারেল স্যামুয়েল উইলিয়ামস। তারপর জেনারেল লায়নেল ম্যাকগার। তারপর জেনারেল পল হারকিনস। এবং তারপর জেনারেল উইলিয়াম ওয়েস্টমোরল্যান্ড। সায়গনের অদূরে ওরা একটি দ্বিতীয় পেন্টাগন বানিয়েছে। সেইখানে বসে ওরা খবর পাঠায় ওয়াশিংটনেঃ আমরা যুদ্ধ জয় করছি, আরো সৈন্য পাঠাও।

এই দুটো কথার মধ্যে যে কোন সঙ্গতি নেই সে খেয়াল তাঁদের হয় না।

সঙ্গে দোহার আছে সি আই এ। রিপোর্ট দেয়, 'কং'দের প্রায় মেরে এনেছি। এখন যত পারো সৈন্য পাঠাও। ভিয়েৎনামীরা কি ভাববে না ভাববে তা দেখার কোন দরকার নেই।

"রাস্তার মোড় ঘুরে আমরা নিশ্চিতভাবে জয়ের দিকে চলেছি।" এ-কথা প্রাক্তন মার্কিন প্রতিরক্ষাসচিব রবার্ট ম্যাকনামারার। সেটা ১৯৬৩ সাল, মে মাস।

কিন্তু জয়যাত্রা এমনই ছিল যে তার পরেও সৈন্য পাঠাতে হয়েছে জলের মতো। ১৯৬৫ সালের শেষাশেষি ছ' ডিভিসন মার্কিন সৈন্য ছিল ভিয়েৎনামে। এখন সেখানে সোয়া পাঁচ লাখ সৈন্য গিজগিজ করছে।

ম্যাকনামারা যখন ঐ কথা বলেছিলেন তখন ভিয়েৎনামে মার্কিনীদের ভূমিকা ছিল উপদেষ্টার। ভিয়েৎনামীরাই যুদ্ধ করত, মার্কিনীরা শুধু যুদ্ধ বিষয়ে পরামর্শ দিত তাদের। ১৯৬৫ সাল থেকে এই যুদ্ধ আমেরিকার নিজের যুদ্ধ হয়ে দাঁড়ায় এবং এখন একমাত্র ব-দ্বীপ এলাকার কিছুটা ছাড়া দক্ষিণ ভিয়েৎনামের আর সর্বত্র যুদ্ধ পুরোপুরি আমেরিকান সৈন্যরাই লড়ছে।

ওয়াশিংটন তার পরেও বলছে এই যুদ্ধ তারা জয় করছে।

১৯৬৫ সালেও যেখানে মার্কিন সৈন্যদের হতাহতের সংখ্যা ছিল নগণ্য, এখন সেখানে প্রতি সপ্তাহে ১,২০০ হতাহত হচ্ছে তবু ওরা বলবে যুদ্ধের গতি তাদের অনুকূলে।

১৯৬৫ সালে যেখানে যুদ্ধের খরচ ছিল ১০ কোটি ৩০ লক্ষ ডলার, ১৯৬৭ সালে তা দাঁড়ায় ২ হাজার ২০০ কোটি ডলারে। তবু আমাদের বিশ্বাস করতে হবে যুদ্ধ ওরা জয় করতে সক্ষম।

তান সন্ নুট বিমানঘাঁটির এক কোণায় বিরাট এক ফটো-স্টুডিও আছে। ওরা বলে ল্যাবরেটরী। ওখানে যারা কাজ করে হঠাৎ দেখলে মনে হবে ওরা কোন মহাকাশ গবেষণাগারের টেকনিসিয়ান। মাথায় সাদা টুপি, মুখে ফেটি বাঁধা। ঐ ফটো ল্যাবে প্রতি মাসে অন্তত ৩০ লক্ষ ফুট ফিল্ম ডেভেলাপ ও প্রিণ্ট করা হয়। রেডারে, ইনফ্রা-রেড ক্যামেরায় তোলা এই সব ছবি, অন্ধকারেও যার চোখ চলে। ছবি তোলা হয় প্রত্যেক দিন। বিশেষ করে যেসব জায়গায় বোমা ফেলা হয় সেই সব জায়গার ছবি। মিলিয়ে দেখা হয়। যদি দেখা যায় যেখানে জঙ্গল থাকার কথা নয় সেখানে জঙ্গল গজিয়ে উঠেছে, তাহলে ওরা ধরে নেয় ওখানে গেরিলারা আস্তানা করেছে। সঙ্গে সঙ্গে চলে আক্রমণ।

প্রত্যেকদিন শত শত প্লেন আকাশে ওড়ে বিভিন্ন ঘাঁটি থেকে। হাজার হাজার টন বোমা নিক্ষিপ্ত হয় বর্ষার ধারার মতো। সেই সঙ্গে চলে গোলন্দাজ আক্রমণ। বোমার কার্পেট বিছিয়ে দেয় ওরা। তবু গেরিলারা যেখানে খুশি এবং যখন খুশি আক্রমণ করতে সক্ষম। তবু বিয়েন হোয়া, দানাং, তান সন নুট-কোন ঘাঁটিই নিরাপদ নয়। এবং ১৯৬৮ সালের ভিয়েৎনামী নববর্ষের দিনে সারা দক্ষিণ ভিয়েৎনামে অন্তত গোটা চল্লিশেক শহরে একযোগে আক্রমণ চালিয়ে গেরিলারা প্রমাণ করে দিয়েছে দক্ষিণ ভিয়েৎনামে তাদের শক্তিই প্রধান।

যুদ্ধ তাহলে জয় করছে কে?

একটা হিসাব দেওয়া হয়েছিল ১৯৬৭ সালে। মার্কিন কম্যাণ্ডেরই তৈরি করা হিসাব। ঐ বছর প্রথম ন' মাসে মার্কিন সৈন্যরা ছোট ছোট ইউনিটে ১৫ লক্ষ বার টহল দিয়েছিল। মাত্র ১২ হাজারটি ক্ষেত্রে গুলী করেছিল টহলদার দল। তা-ও ভিয়েৎকংদের খোঁজ পেয়ে নয়, না দেখতে পেয়ে। রাগের চোটে।

এমন খুব কমই হয় যখন আমেরিকানরা নিজেরা গেরিলাদের সন্ধান পেয়ে গুলী ছোঁড়ে। একশ'র মধ্যে ৯০টি ক্ষেত্রেই গুলী প্রথমে করে গেরিলারাই। আমেরিকানরা শুধু পাল্টা গুলী চালায়। তাও মাত্র কয়েকবার। তারপরেই ওরা নিরাপদ জায়গায় পিছু হটে যায় এবং বেতারে সাহায্য চায় বিমানের।

কম্বোডিয়ার সীমান্তের কাছাকাছি পার্বত্য অঞ্চলের প্লাই মে শিবিরের ১২ জন মার্কিন সবুজ টুপি অফিসার এবং ৪০০ ভিয়েৎনামী সৈন্য, আমি শুনেছিলাম, দু' মাসে মাত্র একজন 'ভিয়েৎকং'-কে নিহত করেছিল।

কমসে কম আঠারো-কুড়িটি মার্কিন যুদ্ধজাহাজ ও গোটা পনেরো সী-প্লেন দক্ষিণ ভিয়েৎনামের উপকূলে চব্বিশ ঘণ্টা পাহারা দিয়ে বেড়াচ্ছে, যাতে 'ভিয়েৎকং'-রা সাম্পানে করে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় সৈন্য ও রসদ পাঠাতে না পারে।

"কিন্তু আমরা খুব বেশি কিছু খুঁজে পাচ্ছি না", টহলদারীর ভারপ্রাপ্ত অফিসারেরা নিজেরাই স্বীকার করেন। "হয় ভিয়েৎকং'রা আমাদের এড়িয়ে যাচ্ছে আর না হয় ওরা সেখানে নেই।"

অথচ মার্কিনী প্রচার বোঝাতে চায় গেরিলারা ক্রমেই কোণঠাসা হয়ে আসছে।

সায়গন ইউ-এস-আই-এস-এর 'দোতলার একটি ঘরে ম্যাপ আর চার্ট দেখিয়ে মার্কিন মুখপাত্ররা প্রত্যেকদিন সন্ধ্যায় পৃথিবীর কাছে তাদের সাফল্যের কাহিনী প্রচার করেন। কঠোর সরকারী নিয়মে তাঁদের বিজ্ঞপ্তির বাইরে কোন সাংবাদিক কিছু পাঠাতে পারবেন না। পাঠাতে গেলেই তাঁকে ভিয়েৎনাম থেকে বহিষ্কৃত হবার জন্যে প্রস্তুত থাকতে হবে। এবং তাঁদের বিজ্ঞপ্তির ভাষা প্রতিটি ক্ষেত্রেই প্রায় একই রকম। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাঁরা 'ভিয়েৎকং'-দের হটিয়ে দেন, প্রায় সকল ক্ষেত্রেই তাঁদের পক্ষে হতাহতের সংখ্যা 'হাল্কা' আর 'ভিয়েৎকং'-দের বেলায় 'ভারী'।

কিন্তু ঐ হিসাব কিভাবে তৈরি হয়?

সাংবাদিকদের মনে সংশয় অনেকদিন ধরেই ছিল। খবর পাঠাতে না পারলেও ইউ-এস-আই-এস-এর প্রেস ব্রিফিং ছাড়া অন্য নানা সূত্রে খবর এসে পৌঁছত তাদের কাছে। ঐ খবরের সঙ্গে মার্কিনী বিজ্ঞপ্তির কোন মিল ছিল না।

আমি যখন সায়গনে ছিলাম, তখন এই অমিল রীতিমত একটা আলোচনার বিষয় ছিল। তার কয়েক মাস আগেই এই নিয়ে একটা তুমুল হৈ-চৈ হয়ে গিয়েছিল। ব্যাপারটা এত গুরুতর হয়ে উঠেছিল যে, সাংবাদিকরা পর্যন্ত প্রতিবাদ জানাতে বাধ্য হয়েছিল। তাদের স্পষ্ট অভিযোগ ছিল যে, ভিয়েৎনামী সামরিক কর্তারা নিজেদের দক্ষতা প্রমাণ করবার জন্যে গেরিলাদের হতাহতের সংখ্যা অন্তত চার-পাঁচ গুণ বাড়িয়ে এবং নিজেদের হতাহতের সংখ্যা চার-পাঁচ ভাগ কমিয়ে বলছে।

এই অভিযোগ অস্বীকার করা সম্ভব হয় নি আমেরিকানদের পক্ষে। কারণ তার পরেই ঢালাও নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল যে, কেবল যে হত বা আহত চোখে দেখা ও হাতে গোণা যাবে কেবল তার ভিত্তিতেই হতাহতের সংখ্যা রচনা করা হবে।

কিন্তু যখন ১৯৬৫ সালের শেষের দিকে আমেরিকানরা নিজেরা যুদ্ধে অবতীর্ণ হল তখন তাদের বিরুদ্ধেও প্রকাশ্যেই এই অভিযোগ করা হল যে, তারাও হিসাব অন্তত তিন-চার গুণ বাড়িয়ে দেখাচ্ছে।

তবু যদি আমরা ধরে নিই যে, আমেরিকানরা সত্যি কথাই বলছে, হিসেব ভাঁড়াচ্ছে না, তাহলে আজকে 'ভিয়েৎকং' বলে কিছু থাকার কথা নয়। কারণ আমেরিকানদের নিজেদের হিসেবেই ১৯৬৭ সাল পর্যন্ত (১৯৬০ থেকে) দু' লক্ষ ভিয়েৎকং নিহত হয়েছে এবং আমেরিকানরা প্রচার করছে যে, যুদ্ধের ঢেউ এখন তাদের অনুকূলে, ভিয়েৎনামের মানুষ এখন আর আশ্রয় দিতে রাজী নয়, দলে দলে তারা চলে আসছে 'সরকারী এলাকায়'। অথচ ১৯৬৭ সালের জুলাই মাসে ঐ আমেরিকানদেরই হিসাবে বলা হয়েছে যে, দক্ষিণ ভিয়েৎনামে ২ লক্ষ ১৫ হাজার গেরিলা রয়েছে।

এর কোন ব্যাখ্যা মার্কিন মুখপাত্ররা দেন নি। অথচ যেখানে ১৯৬৭ সাল পর্যন্ত কোন বছরেই মার্কিন হিসেবে গেরিলাদের সংখ্যা দু' লক্ষের বেশি ছিল না, সেখানে এই নিয়ে যে-কোন সৎ মানুষের মনেই প্রশ্ন দেখা দিতে বাধ্য।

হয় আমেরিকানদের দু' লক্ষ গেরিলা নিহত করার দাবি মিথ্যা ও অতিরঞ্জিত, আর না হয় সাধারণ মানুষের থেকে গেরিলাদের বিচ্ছিন্ন হবার কথা একেবারেই ভিত্তিহীন। দুটির যেটাই সত্যি হোক তা থেকে এই কথা নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হবে যে, মার্কিন সামরিক তৎপরতা যুদ্ধের গতি বিন্দুমাত্র ফেরাতে পারে নি।

যেমন পারে নি গেরিলাদের বিরুদ্ধে তাদের অন্য আরেক লড়াই: ভিয়েৎনামীদের 'শান্ত' করার, তাদের মন জয় করে নেবার প্রোগ্রাম।

॥ সমাপ্ত ॥

গ্রন্থমেলা

'ইতিহাস' একটি প্রাচীন ভারতীয় চেতনা—শ্রীব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। পিলগ্রিম পাব্লিশার্স, ১৮বি।১বি ট্যামার লেন, কলিকাতা ৯। মূল্য— দুই টাকা।

ইতিহাস চিন্তার মধ্য দিয়েই মানুষের এক নতুন চেতনার উন্মেষ সূচিত হয়েছে এবং ইতিহাসবোধ প্রধানত স্থান-কালের বিস্তৃত পবিপ্রেক্ষিতে মানুষের পরিবেশকে বুঝবার প্রয়াসের ফল। মানুষ এবং তার পরিবেশ পরিবর্তনের ঘটনাকেই আমরা ইতিহাস বলে থাকি। প্রতিকূল পবিবেশের বিরুদ্ধে মানুষের সংগ্রাম, তার সর্বপ্রকার মর্মপ্রয়াস এবং মননের সাধনা এই সবগুলিই তাব ইতিহাসের উপাদান। যুগে যুগে নানা দেশের মনীষীরা ইতিহাসকে নানাভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। বর্তমান গ্রন্থে প্রাচীন ভারতীয়দের ধারণায় ইতিহাসের স্বরূপ কি ছিল সে বিষয়ে বিদগ্ধ আলোচনা করা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে আলোচিত হয়েছে যে সেই ধাবণার বিবর্তন কিভাবে হয়েছিল। প্রকৃত ইতিহাস রচনায় ভারতীয়রা কতটা সফল হয়েছিলেন এবং ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে তাঁদের সাফল্য বা ব্যর্থতার কারণগুলি কি। এরই সাথে সাথে পৃথিবীর অপর কয়েকটি প্রাচীন দেশে ইতিহাস চর্চার কথাও বর্ণনা করা হয়েছে।

লেখক অকারণে গ্রন্থটির কলেবর বৃদ্ধি করেন নি। অত্যন্ত স্বল্প পরিসরের মধ্যে তিনি বলেছেন যে 'অতীত-কথন শাস্ত্রের সর্বাপেক্ষা প্রাচীন ভারতীয় নাম হচ্ছে "ইতিহাস"। ইতি-হ-আস, "এইরূপই ছিল (ঘটেছিল) এই নিরুক্তি-গত অর্থে অতীতের সকল কিছুই "ইতিহাসের" পর্যায়ভুক্ত'। প্রাচীন ভারতে 'ইতিহাস'-সাহিত্যের মাহাত্ম্য ও পাঠের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করে তিনি বলেছেন যে শতপথ ব্রাহ্মণে কথিত আছে যে প্রাত্যহিক 'ইতিহাস' পাঠ দেবকুলের সন্তোষ সাধন করে। অশ্বমেধ যজ্ঞানুষ্ঠানে 'ইতিহাস বেদের' আবৃত্তির প্রয়োজনীয়তার প্রসঙ্গ উত্থাপন করে তিনি প্রমাণ করেছেন যে 'ইতিহাসকে' বেদের সমমর্যাদা দান তার মাহাত্ম্য সম্পর্কে প্রাচীন ভারতীয়দের সশ্রদ্ধ ধারণারই ইঙ্গিত করে।

ইতিহাসের সংজ্ঞা সম্পর্কে বিবর্তনের পরবর্তী স্তরের প্রকাশ হয়েছে কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে। কৌটিল্য 'ইতিহাস' শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন ছিলেন এবং তিনি 'ইতিহাসকে' পুরাণ, ইতিবৃত্ত, উদাহরণ, আখ্যায়িকা, ধর্মশাস্ত্র এবং অর্থশাস্ত্র রূপে ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর মতে দিনের শেষভাগে রাজার 'ইতিহাস' পাঠ করা উচিত। মহাভারতের 'ইতিহাসের' উপদেশাত্মক বৈশিষ্ট্যের দিকটি বিশেষভাবে তুলে ধরা হয়েছে।

ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহ এবং রচনার ব্যাপারে কহ্লনের বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়ে লেখক মন্তব্য করেছেন যে তার মধ্যে একটি প্রায়াধুনিক ছাপ লক্ষ্য না করে উপায় নেই। অবশ্য কহ্লনের যুগবাদ, অদৃষ্টবাদ, কর্মফল ইত্যাদিতে বিশ্বাসের সমালোচনা করে তিনি বলেছেন যে, এইগুলিই তাঁর সৃষ্টির মূল্য ব্যাহত করেছে। ইতিহাস সম্পর্কে প্রাচীনতার ধাবণা উন্নত মতবাদের কাছে কেমন করে পরাভব স্বীকার করে সে তথ্য উদ্ঘাটন করে তিনি বলেছেন যে—'কতগুলি গ্রন্থে "ইতিহাসের" যে সংজ্ঞা পাওয়া যায়, তা ইতিহাস রচনারীতি সংক্রান্ত আধুনিক মতবাদের সঙ্গে তুলনীয়। কোনও কিছু ঘটনার কাল সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান, যা যে কোনও ঐতিহাসিকের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয়, সে বিষয়ে ভারতীয় ইতিহাসকারদের সচেতনতা, 'ইতিহাস' কথাটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থেই পরিস্ফুট।'

পরিশেষে এই সচেতনতা থাকা সত্ত্বেও ভারতে প্রকৃত ইতিহাস সাহিত্য প্রসার না হওয়ার কারণ বিশ্লেষণ করে তিনি বলেছেন যে, অতীত বিবরণী লিপিবদ্ধ করার প্রথা অন্যান্য দেশের তুলনায় ভারতে অপেক্ষাকৃত পরে সুরু হয়েছিল বলেই এমন একটি ব্যাপার সম্ভব হয়েছিল। লেখক বলেছেন যে 'ইতিহাস' শব্দটিই সম্ভবত সর্বযুগের ইতিহাস সাধনার ক্ষেত্রে প্রাচীন ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ দান। আমরা আশা করি এই গ্রন্থটি ছাত্র এবং গবেষক মহলে যোগ্য সমাদর লাভ করবে।

উত্তরসূরী—সম্পাদক অরুণ ভট্টাচার্য। ৯বি-৮, কালিচরণ ঘোষ রোড, কলিকাতা—৫০।

শ্রাবণ-আশ্বিন ও কার্তিক-পৌষ ১৩৭৪। উত্তরসূরীর এই সংখ্যায় শরৎচন্দ্র সম্পর্কিত কয়েকটি প্রবন্ধের সংকলন। এর একটি প্রবন্ধে লেখক শ্রীঅরবিন্দ পোদ্দার শিল্পী শরৎচন্দ্রকে 'মৃত' বলে ঘোষণা করেছেন। এরূপ উক্তির আমরা তীব্র প্রতিবাদ জানাই। আমরা মনে করি, শরৎচন্দ্র শিল্পীরূপে এখনও আমাদের মধ্যে জীবিত আছেন এবং থাকবেন। যা হোক লেখক শ্রীনন্দগোপাল সেনগুপ্ত, শ্রীসুধীন দাশগুপ্ত ও শ্রীঅরুণ ভট্টাচার্য শরৎচন্দ্রের শিল্পিসত্তাকে সঠিকভাবে তুলে ধরেছেন।

উত্তরসূরীর এই সংখ্যাটিতে সম্পাদন-পারিপাট্যের পরিচয় মেলে। এতে শরৎচন্দ্র সম্পর্কিত কয়েকটি প্রবন্ধ ছাড়া আরও কয়েকটি মূল্যবান প্রবন্ধ ও কবিতা স্থান পেয়েছে।

গ্রন্থপরিক্রমা—সম্পাদক অপর্ণাপ্রসাদ সেনগুপ্ত। ৬, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা—১২। দাম—পঁচিশ পয়সা

পঞ্চম বর্ষ, ষোড়শ সংখ্যা। গ্রন্থ ও পত্র-পত্রিকা ইত্যাদি আলোচনার এই পাক্ষিক পত্রিকাটি এরই মধ্যে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। আলোচ্য সংখ্যাটিতে সুলিখিত কয়েকটি গ্রন্থ সমালোচনা চোখে পড়ল। যেমন শ্রীপ্রশান্তবিহারী মুখোপাধ্যায় লিখিত 'বঙ্কিম সাহিত্য ও সাধনা', সুকুমার বসু প্রণীত 'হিমালয়', অনিল বিশ্বাসের 'আশুতোষের শিক্ষা-চিন্তা', সুবোধ চক্রবর্তীর 'রম্যাণি বীক্ষ্য মগধপর্ব' প্রভৃতি গ্রন্থের আলোচনা ও সমালোচনা। সরল ও সহজবোধ্য ভাষায় আলোচনা ও সমালোচনা পাঠকদের গ্রন্থ পাঠে আকৃষ্ট করতে সক্ষম হবে।

বাংলা গল্প—সম্পাদনা : রজত চৌধুরী। ৯এ, সর্দার শঙ্কর রোড; কলকাতা—২৬। দাম : ৭৫ পয়সা।

এই দ্বিতীয় সংকলনটি ২১শে ফেব্রুয়ারী স্মরণে প্রকাশিত। এই পত্রিকার প্রথম সংকলনটি, কিছু লেখকেব বিকৃত-রুচির বিরুদ্ধে যখন প্রকাশিত হয়, তখন বাংলা সাহিত্য জগতে রীতিমতো আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। দ্বিতীয়

কিস্তিবন্দীতে ট্রানজিস্টার

৩২০ টাকা মূল্যের বিশ্ববিখ্যাত "উইন্ডসর হিতাচী" ৩ ব্যান্ড অলওয়ার্ল্ড পোর্টেবল ট্রানজিস্টার মাসিক ১০ টাকার কিস্তিতে নিন।

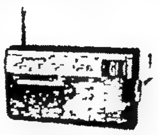

আবেদন করুন:—

SWISS TELEVISSION CO.
(B-10) Post Box 1320,
Delhi-6.

পাঠক মন

একটি প্রতিবাদ

১১ই এপ্রিল, ১৯৬৮ তারিখের সাপ্তাহিক বসুমতীর ২৬৯৭ পৃষ্ঠায় 'সপ্তাহের বোঝা' শিরোনামায় যথাযথ প্রয়াস ও অনুসন্ধান ব্যতিরেকেই আমার সম্পর্কে একটি সম্পূর্ণ অসত্য মন্তব্য আরোপণের প্রতি আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। সংশ্লিষ্ট অংশটি নিম্নরূপঃ—

"শেষ বিধানসভা অনুষ্ঠানের সময় শ্রীবিজয়সিং নাহারের মাধ্যমে শ্রীহরিদাস মিত্রকে ডেপুটি স্পীকাররূপে বহাল রেখে শ্রীবিজয় বন্দ্যোপাধ্যায়কে স্পীকারের আসন থেকে বিতাড়িত করে বিধানসভা চালু রাখবার একটা পরিকল্পনা কংগ্রেস করেছিল। শ্রীমিত্র কংগ্রেসের এই পরিকল্পনার শরিকও হয়েছিলেন—একথা আজ শুনতে খারাপ লাগলেও বাস্তবে সত্য।"

অনুগ্রহপূর্বক জেনে রাখুন যে, মৎ-সংক্রান্ত এই নিন্দাবাদ একান্তই অসত্য ও ভিত্তিহীন। অমূলকভাবে উপস্থাপিত এইরকম কোন ব্যবস্থা সম্বন্ধে শ্রীবিজয়সিং নাহারের সঙ্গে আমার কোন যোগাযোগ বা কথাবার্তা হয় নি, এমন কি এইরকম কোন পরিকল্পনার শরিক আমি কোন-ভাবেই ছিলাম না।

পক্ষান্তরে উপরি-উক্ত আপত্তিজনক নিন্দাবাদগুলিকে সরাসরি মিথ্যা প্রতিপন্ন করার জন্য একথা স্মর্তব্য যে, আমি নিজেই বিভিন্ন সময়ে কংগ্রেসী অনাস্থা-সূচক প্রস্তাবের অন্যতম লক্ষ্য হয়েছিলাম।

আমি এই আশা ও বিশ্বাস করতে পারি কি যে, সত্য এবং সৎ সাংবাদিকতার খাতিরে যাতে এটি সংশোধিত হয় এবং অনতিবিলম্বে আপনার পত্রিকায় উপরি-উক্ত উদ্ধৃতির জন্য দুঃখ প্রকাশ করা হয় আপনি সেদিকে অনুগ্রহপূর্বক লক্ষ্য রাখবেন।

অন্তত যা আপনি অনুগ্রহপূর্বক করতে পারেন, তা হলো আমার বিরুদ্ধে আনীত অসত্য এবং ক্ষতিকর অভিযোগের জন্য সংশোধন হিসেবে এই পত্রটি প্রকাশ করা।

ধন্যবাদান্তে—
শ্রীহরিদাস মিত্র

সাংবাদিক শ্রীবরুণ রায় লিখিত "ভিয়েৎনাম ঃ ঝড়ের কেন্দ্রে" পড়ার সুযোগ হচ্ছে একমাত্র ২৯-২-৬৮ তারিখ ভিন্ন। রচনাটি অত্যন্ত সহজ ও তথ্যসমৃদ্ধ। ভারতবর্ষের চেয়ে ঐ দেশটি অনেক ছোট ও জনসংখ্যায়ও কম। ফরাসী সাম্রাজ্যবাদী-দের হটিয়ে হো চি মিন ও তাঁর সুযোগ্য শিষ্যেরা সুচিন্তিত পরিকল্পনা গ্রহণ করে অক্লান্তভাবে কাজ করে যাচ্ছেন। সাংবাদিকের রচনা থেকেই আমরা জানতে পারি ঃ 'চি' ও 'মিন' শব্দের অর্থ যথাক্রমে আকাঙ্ক্ষা ও প্রজ্ঞা। এই দুই মহাশক্তির অধিকারী যোগ্য দেশনায়ক মুখে শুধু গণতন্ত্রের বুলি আওড়াচ্ছেন না—বহু দেশের সৌখীন রাজনীতিকদের মতো। জেনে আরো আনন্দ হলো কর্মী হো চি মিন অতি সাধারণ ঘরের মানুষ। ইতিহাসের বহু নজীরে আমরা জানি জাতিগঠকেরা প্রত্যেকেই সাধারণ পরিবারের মানুষ অর্থাৎ প্রকৃত বাস্তবের মাধ্যমে দেশের কাজে এগিয়েছেন। কিন্তু আধুনিক জগতের অনেক দেশের নায়কদের ক্ষেত্রে ব্যত্যয় ঘটছে। সাধারণ পাঠক হিসেবে—মনে হচ্ছে আমাদের দেশের বর্তমান চরম অবস্থায় এই রচনা অবশ্য পঠনীয়। অতি অল্প সময়ে সমস্ত দেশবাসীকে সজাগ করে তুলেছেন—এ এক প্রোজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ও অপার বিস্ময়। আশা করি ভবিষ্যতে সাংবাদিক শ্রীরায় আরো অনেক শিক্ষণীয় তথ্য সরবরাহ করে পাঠকের মনের ক্ষুধা মেটাবেন।

শ্রীশীতলদাস জোয়ারদার
১।৩৯।১ বিজয়গড়, কলিকাতা—৩২

আপনার সুপরিচালনায় "সাপ্তাহিক বসুমতী"-র অগণিত পাঠক ও পাঠিকাকে সন্তুষ্ট করেছে; বিশেষভাবে যে সকল ব্যক্তিরা সুরুচিসম্পন্ন, ন্যায় ও সত্যের গোঁড়া সমর্থক, আমার দৃঢ় বিশ্বাস তাঁরা সাপ্তাহিকটি দ্বারা খুবই উপকৃত হবেন। ক্ষমতাসীন কংগ্রেসের এবং ক্ষমতাচ্যুত যুক্তফ্রন্টের কার্যাবলীর বিরূপ সমালোচনা ও প্রশংসা পত্রিকাটির নিরপেক্ষতা সম্বন্ধে সমস্ত ব্যক্তির সন্দেহ সম্পূর্ণরূপে দূর করেছে বলে মনে হয়।

পত্রিকাটি প্রথম শ্রেণীর মর্যাদা দাবি করতে পারে। যদি বিখ্যাত পার্লামেন্টা-রিয়ান শশাঙ্ক সান্যাল, খ্যাতিমান ব্যবহার-জীবী অজিত দত্ত এবং এন, সি, চ্যাটার্জী প্রমুখ ব্যক্তির রচিত শাসনতন্ত্রের ও ভারতীয় গণতন্ত্রের উপর গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধের ব্যবস্থা করেন; যদি সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ের উপর প্রবন্ধ প্রকাশের ব্যবস্থা করেন; যদি "রঙ্গজগৎ" বিভাগে "সুজন" যৌন ব্যাধিতে ভয়াবহরূপে আক্রান্ত চলচ্চিত্রগুলিকে আরও কড়া করে সার্জারি করেন, তবে পত্রিকাটি চিন্তাশীল ব্যক্তিদের নিকট একটি শ্রেষ্ঠ চিন্তার খোরাকে পরিণত হবে।

শ্রীরবীন্দ্রকুমার বেরা
পাঁশকুড়া, (মেদিনীপুর)

সংকলনটিও বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন। 'আবেদন'-এ সোচ্চার সম্পাদকীয় ঃ 'সাহিত্য ক্রীতদাস হলে তাকে বন্ধন থেকে মুক্ত করাই একমাত্র উপায়। অর্থগৃধ্নু দুশ্চরিত্র সেবাদাস-দের হাতে শৃঙ্খলিত বর্তমান বাংলা সাহিত্যকে, সাহিত্যে গণমুক্তির আন্দোলন দ্বারাই মুক্ত করা সম্ভব।' বাংলা ভাষাকে বাদ দিয়ে বাংলা সাহিত্য অকল্পনীয়। তাই দুই বাংলার সাহিত্যিকগণ সেই ভাষা ও সাহিত্যের অগ্রগতির পরিচয় দিয়েছেন গল্পে, প্রবন্ধে, চিঠিপত্রে। লিখেছেন—আহমদ ছফা, আবদুল মান্নান সৈয়দ, রজত রায়চৌধুরী, অনিমেষ চট্টোপাধ্যায়, সুরঞ্জন চক্রবর্তী প্রমুখ।

আধি ব্যাধি — সম্পাদকমণ্ডলী ঃ নীহারকুমার মুন্সী, জ্যোতির্ময় মজুমদার, সমর রায়চৌধুরী। পি-৫, সি, আই, টি, রোড, কলিকাতা—১৪। দাম ঃ প্রতি সংখ্যা ৫০ পঃ। বার্ষিক—ছয় টাকা।

বাংলা দেশে বস্তাপচা লেখারও দাম আছে, কিন্তু এমন দুর্ভাগ্যের ব্যাপার যে, শরীরটা ব্যাধিতে পচে গেলেও তা থেকে মুক্তির ভাবনা খুব কম লোকই ভাবে। এজন্যে যে সব পত্রিকায় শারীরিক অসুস্থতা ও তা থেকে মুক্তির পথ সতর্কতার সঙ্গে আলোচিত হয়, সেদিকে দৃষ্টি খুব কম লোকই দেয়। আমাদের ধারণা ঃ এ ব্যাপারে বাংলা দেশের প্রতিটি মানুষের সচেতন হতে হবে। এবং বাংলা ভাষার মাধ্যমে প্রকাশিত চিকিৎসা সংক্রান্ত 'আধি ব্যাধি'র মতো পত্রিকাটিও সেদিক দিয়ে যথেষ্ট সাহায্য করবে। পত্রিকার সম্পাদকগণ কৃতবিদ্য চিকিৎসক। তাঁরা যে কাজে হাত দিয়েছেন, তাতে আর্থিক ক্ষতির সম্ভাবনা, কিন্তু বাংলা ভাষা-ভাষীরা যথেষ্ট লাভবান হবেন। বিশেষত অতি সাধারণ রোগের বিবরণ ও তা থেকে নিরাময়লাভের জন্য সহজ বিধিব্যবস্থা-গুলি প্রত্যেকের জানা উচিত—এই আশা নিয়ে আমরা বাংলা দেশের পাঠকদের এই মাসিক পত্রিকাটির সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে অনুরোধ জানাচ্ছি।

রবীন্দ্রনাথ ও সুভাষচন্দ্র

শঙ্করীপ্রসাদ বসু

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

১৯২৮ সালের একটি ঘটনায় কিন্তু রবীন্দ্রনাথ সুভাষচন্দ্রের উপর বিশেষভাবে বিরক্ত হয়েছিলেন। বিরক্ত হবার ন্যায়-সঙ্গত কারণ ছিল। ঘটনাটি সিটি কলেজে সরস্বতী পূজা নিয়ে। ঘটনার বিবরণ আমি প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের রচনা থেকে উদ্ধৃত করছি। প্রভাতকুমার যে ব্রাহ্মধর্মের পক্ষপাতী, তা তিনি কখনো গোপন করেন নি। আবার তিনি যথা-সম্ভব নিরপেক্ষ।—

"এই সময়ে কলিকাতার সামান্য একটি ঘটনা এমন বিসদৃশ সাম্প্রদায়িকতার রূপ গ্রহণ করে যে, কবিকে বাধ্য হইয়া লেখনী ধারণ করিতে হইল। কলিকাতার সিটি কলেজ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের দ্বারা স্থাপিত ও পরিচালিত প্রধান প্রতিষ্ঠান। কলেজের সংলগ্ন ছাত্রাবাসের নাম রামমোহন হস্টেল। এখানকার ছাত্ররা ভাল করিয়া জানিত যে, প্রতিষ্ঠানটি ব্রাহ্মসমাজের। এ বৎসর জেদ করিয়া ছাত্ররা হস্টেলের মধ্যে সরস্বতী পূজার আয়োজন করে, কর্তৃপক্ষও জোর করিয়া তাহা বন্ধ করিয়া দেন। এই ব্যাপারটিকে কেন্দ্র করিয়া হিন্দুসমাজ ও ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে বিরোধ দেখা দিল। সত্যাগ্রহ অনাহার প্রভৃতি রাজনৈতিক অস্ত্র প্রয়োগ করিয়া ছাত্ররা শহরে তুমুল আন্দোলন সৃষ্টি করিল। ব্রাহ্মবিদ্বেষী লোকের অভাব নাই; অনেক সম্ভ্রান্ত লোক ছাত্রদের পক্ষ লইয়া বিষয়টাকে কদাকার ও জটিল করিয়া তুলিলেন। কোনো কোনো রাজনৈতিক নেতাও এই আন্দোলনের পৃষ্ঠপোষকতা করেন 'মাইনরিটির' ধর্মাধিকারের বুলি তুলিয়া। ব্রাহ্মসমাজের কর্তৃপক্ষও সর্বদা যে সুবিবেচনার পথ গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা নহে। হিন্দু-সমাজের লোকেরা ব্রাহ্মসমাজের 'উদারতার' অভাবকে নিন্দা করিতে লাগিলেন। এই বিসদৃশ ব্যাপার প্রশমিত করিবার জন্য রবীন্দ্রনাথ ও এনড্রুস সাহেব দুইটি প্রবন্ধ লেখেন।*

"রবীন্দ্রনাথ এই দীর্ঘ প্রবন্ধের এক-স্থানে পরিষ্কার করিয়া লিখিলেন যে, ধর্মের স্বাধীনতাই যদি কাম্য হয় তবে সে স্বাধীনতা শুধু রামমোহন হস্টেলের হিন্দু ছাত্ররা পাইবে এমন তো নহে, মুসলমান ছাত্রেরাও পাইবে। মুসলমান-দের পক্ষে গো-কোরবানি ধর্মের অঙ্গ; সুতরাং কর্তৃপক্ষ হস্টেলে তাহাদের তাহাও করিতে দিতে বাধ্য। সুতরাং এভাবে যুক্তি চলে না; একটি প্রতিষ্ঠিত সমাজের বিধিবন্ধ কতকগুলি নিয়ম আছে, সেগুলি ভাঙিতে চেষ্টা করায় সৌজন্যের অভাব প্রকাশ পায়। সিটি কলেজ ব্রাহ্মদের, এবং ব্রাহ্মরা প্রতিমাপূজক নহেন, একথা সকল ছাত্রই জানেন। কলেজ প্রতিষ্ঠার পঞ্চাশ বৎসর পরে হঠাৎ সেখানে প্রতিমা পূজা করিবার জন্য জিদ অশোভন।"

—[র· জী· ৩—২৩১]

রবীন্দ্রনাথ এই সময়কার একটি পত্রে লেখেন—

"যাঁরা ভারতে রাষ্ট্রিক ঐক্য ও মুক্তি-সাধনাকে তাঁদের সমস্ত চেষ্টার একমাত্র লক্ষ্যরূপে গ্রহণ করেছেন, তাঁরাও যখন প্রকাশ্যে এই ধর্মবিরোধকে পক্ষপাত দ্বারা উৎসাহই দিচ্ছেন, তাঁরাও যখন ছাত্রদের এই স্ববাজনীতিগর্হিত আচরণে লেশমাত্র আপত্তি করতে কুণ্ঠিত, তখন স্পষ্টই দেখছি, আমাদের দেশের পলি-টিক্স-সাধনার পদ্ধতি নিজের ভীরুতায় দুর্বলতায় নিজেকে ব্যর্থ করবার পথেই দাঁড়িয়েছে।"

[২৩ বৈশাখ, ১৩৩৫, র· জী· ৪—৩১২]

রামমোহন হোস্টেলে ছাত্রদের সরস্বতী পূজা করার দাবি সম্বন্ধে 'ব্রাহ্মসমাজের কর্তৃপক্ষ সর্বদা সুবিবেচনার পরিচয়' দেন নি বলে প্রভাতকুমার মনে করেন। তাঁদের সুবিবেচনার অভাবের দৃষ্টান্ত সংকলন করে লাভ নেই। তা সত্ত্বেও, অধিকতর অবিবেচনার পরিচয় দিয়েছিলেন এ-ব্যাপারে বিরোধী পক্ষ—হিন্দুসমাজের সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ। অন্যায় যদি ব্রাহ্মপক্ষে থাকেও, তা বহিরঙ্গ অর্থাৎ ব্যবহারগত, কিন্তু ছাত্রপক্ষের (এবং তাদের সমর্থকদের) অন্যায় মূলগত, তাঁরা অনধিকার দাবি করেছিলেন। প্রতীক উপাসনায় বিশ্বাস করে না, এমন এক সম্প্রদায় পরিচালিত কলেজ হোস্টেলে প্রতিমা পূজার দাবি উপস্থিত করা যায় না।

এ জাতীয় সম্প্রদায়গত বিরোধে সুভাষচন্দ্র নিজেকে জড়িত করলেন কেন? তিনি আহত হিন্দুয়ানীর পক্ষে আন্দোলন সুরু করেছিলেন, এমন বিশ্বাস হয় না।

আমার ধারণা, এইক্ষেত্রে সুভাষচন্দ্র আবেগচালিত হয়েছিলেন। সুভাষচন্দ্র সব সময় ছাত্র ও তরুণ আন্দোলনে জড়িত। ১৯২৭-২৮ সালে ছাত্র আন্দোলনের প্রথম জোয়ার। সুভাষচন্দ্র এই জোয়ারের পূর্ণিমাচন্দ্র। আন্দোলন সুরু করেছে ছাত্ররা, তাদের সেন্টিমেন্টে ঘা লেগেছে, সরস্বতী পূজা বিশেষভাবে ছাত্রদের পূজা, বিদ্যাকেই সেখানে দেবী করা হয়েছে, সেই দেবীর উপর আঘাত ছাত্রদের ক্ষিপ্ত করে তুলল—তরুণরা ডাক দিল তরুণের নেতাকে—এবং তিনি স্থির থাকতে পারলেন না—ব্যাপারটা এই ধরনের হয়েছিল বলে আমার বিশ্বাস। সুভাষচন্দ্র এখানে 'তরুণের ভুল করবার স্বাধীনতা যুদ্ধে' নেতৃত্ব করেছিলেন।

সুভাষচন্দ্রের আচরণের এই সমালোচনার সময়ে পরিবেশ-বিচার বিশেষ প্রয়োজন। ইতিপূর্বে সুভাষচন্দ্র দু'টি ধর্মীয় আন্দোলনে যোগ দিয়েছেন। প্রথমটি দেশবন্ধুর নেতৃত্বে পরিচালিত তারকেশ্বর সত্যাগ্রহ, দ্বিতীয়টি জেলে দুর্গা পূজার দাবি আন্দোলন। তারকেশ্বরের মহান্তদের অনাচারের বিরুদ্ধে পরিচালিত আন্দোলনটি দেশবন্ধুর প্রভাবে বিশেষ শক্তিলাভ করে। হিন্দুসমাজের ভিতরকার স্বাস্থ্যরক্ষার আন্দোলনের বিরুদ্ধে বলবার কিছু নেই, এবং সরকার কায়েমী স্বার্থের পক্ষ সমর্থন করায় স্বভাবতই এটা একাংশে সরকার-বিরোধী আন্দোলনের রূপ নেয়। ব্রহ্ম-জেলে দুর্গাপূজার আন্দোলনের মধ্যেও ছিল সরকারের বিরুদ্ধে আঘাতের চেষ্টা, যেটা সুভাষচন্দ্রের সর্বাবস্থায় সংগ্রাম-নীতির অন্তর্ভুক্ত। হয়ত সুভাষচন্দ্র একই আবেগে সরস্বতী পূজা—আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েন।

---

* ১৯২৮ মডার্ন রিভিউ দ্রঃ, প্রবাসীও।

বলা বাহুল্য। যদি তাই হয়, বলতে হবে বিচার-বিভ্রাট ঘটেছিল। তারকেশ্বর সত্যাগ্রহ হিন্দুর সংস্কার-আন্দোলন। তার বিরুদ্ধে কারো কিছু বলবার থাকতে পারে না। জেলে দুর্গাপুজোর জন্য অনশনও ন্যায়সঙ্গত (রবীন্দ্রনাথ যদি তাকে সমর্থন নাও করেন), কারণ জেল পরিচালনা করেন সরকার যে-সরকার কোনো ধর্মাবলম্বী নন, সর্বধর্মের করদাতার পয়সায় সরকার চলে, সেই সরকারী জেলে খৃস্টানেরা বা মুসলমানেরা ধর্মীয় আচরণের অধিকার পাবে অথচ হিন্দুরা পাবে না, এটা হতে পারে না। বিনা বিচারে সমাজ থেকে রাজনৈতিক বন্দীদের বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে, তার অন্যায়ের সীমা নেই, তদুপরি সেই বন্দীজীবনের মধ্যেও সামান্য ধর্মীয় অধিকার থেকে মানুষকে বঞ্চিত করা হয়েছে—এর চেয়ে নিষ্ঠুরতা আর কি হতে পারে?

সিটি কলেজের ব্যাপারটা তা ছিল না। এটা একটা ধর্মপ্রতিষ্ঠানের কর্মক্ষেত্র। সেই প্রতিষ্ঠানে, তার মূলনীতির বিরোধী কিছু তাঁরা স্বীকার করবেন কেন? এই আন্দোলনের দ্বারা হিন্দুসমাজের বল বৃদ্ধি হয় নি, সরকার-বিরোধী মনোভাব জাগানো যায় নি, অথচ ক্ষতি হয়েছে যথেষ্ট,—সুভাষচন্দ্রের রাজনৈতিক নেতৃত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ এসেছে ব্রাহ্মসমাজের মনে, দেশের শিক্ষিত মহলের উপর যে-ব্রাহ্ম-সমাজের বিশেষ আধিপত্য।

এই সব থেকে মনে হয়, বহুধর্মের দেশে রাজনৈতিক নেতাদের কোনো ধর্মীয় আন্দোলনে প্রত্যক্ষ অংশ নেওয়া উচিত নয়। রাজনৈতিক নেতার বিশেষ ধর্ম-বিশ্বাস থাকতে পারে, থাকা অন্যায় নয়, কিন্তু তিনি নিজের ধর্ম-নামটি যদি নিজের গায়ে বড়ো করে লিখে রেখে দেন, তাহলে অপর ধর্ম-সম্প্রদায়ের পক্ষে তাঁকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করা কঠিন হয়ে পড়বার সম্ভাবনা থাকে, বিশেষত ধর্মীয় সংঘাত যে দেশের নিত্য ঘটনা।* দেশের বৃহত্তর ধর্ম-সম্প্রদায়ের ধর্মীয় ভাবাবেগের সুযোগ নিয়ে প্রভাব বিস্তার করা সহজ, কিন্তু সেই সহজ পথটি ভবিষ্যতে চলবার পক্ষে অতিশয় মারাত্মক। গান্ধীজীর সমালোচনা করতে গিয়ে সুভাষচন্দ্র বলেছেন, গান্ধীজী দেশের দুর্বল ধর্মীয় ও অন্যান্য ভাবাবেগের সাহায্য গ্রহণ করেছেন, করে অন্যায় করেছেন, সুভাষচন্দ্রের সেই সমালোচনা স্বীকার করেই বলব, তাহলে এক্ষেত্রে নিজের আক্রমণের লক্ষ্যস্থল নিজেই হয়েছেন।

সুভাষচন্দ্রের 'অন্যায়' কিন্তু ঐ একবারের জন্যই। এইখানেই তাঁর মহত্ত্ব। নিশ্চয় তিনি নিজের ভুল বুঝতে পেরেছিলেন। তাঁর লেখায় এই আন্দোলনের কোনো উল্লেখ পাওয়া যায় না। পরবর্তী চিন্তায় তিনি নিশ্চয় রবীন্দ্রনাথের (এবং সেই মতাবলম্বী অন্যান্যদের সমালোচনার যৌক্তিকতাকে স্বীকার করেছিলেন। জন-সাধারণের দুর্বলতায় প্রেরণা সঞ্চার করা তাঁর আদর্শ ছিল না। ধর্মসংঘাতের মধ্যে অংশ গ্রহণের বিপজ্জনকতা তিনি এমন-ভাবে স্বীকার করেছিলেন যে, তাঁর স্বাধীনভারত সত্যই ধর্মনিরপেক্ষ ছিল। রাশিয়ার ইতিহাস থেকে তিনি শিক্ষা নিয়েছিলেন। বহু ধর্ম ও বহু ভাষার দেশ সোভিয়েট রাশিয়া কিভাবে রাষ্ট্রীয় অখণ্ডত্ব লাভ করল, সেই সমাধান সুভাষচন্দ্রের কাছে অনুসরণীয় আদর্শ বলে মনে হয়েছিল। সুভাষচন্দ্রের ধর্ম-নিরপেক্ষতা নিশ্চয় রুশীয় ধর্মবিরোধিতা নয়;* তিনি ব্যক্তিজীবনে ধর্মসাধনা করতেন, কিন্তু রাষ্ট্রের ব্যাপারে কঠোর নিরপেক্ষতাই (ধর্মের বিরোধিতা নয়) তাঁর লক্ষ্য ছিল।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় আজাদ হিন্দ সরকার গঠন করার পরে বিভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায়ের মধ্যে অভূতপূর্ব ঐক্যস্থাপনে সুভাষচন্দ্রের সাফল্য 'অতি প্রাকৃত' বলে স্বীকৃত হয়েছে। ব্যাপারটা নিশ্চয় অতি প্রাকৃত ছিল না (সুভাষচন্দ্রের ব্যক্তিত্ব ছাড়া, ওটা সত্যই অতি প্রাকৃতের পর্যায়ে উঠেছিল),—সুভাষচন্দ্র কতকগুলি মুখের কথাকে সত্যই বাস্তবায়িত করতে সমর্থ হয়েছিলেন। জাতীয় শিক্ষায় ধর্মশিক্ষার স্থান সম্বন্ধে সুভাষচন্দ্রের নীতির কথা ধরা যাক। ১৯৪৪ সালের নভেম্বর মাসে আজাদ হিন্দ সরকারের শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিভাগ থেকে 'ধর্মশিক্ষা' বলে একটি পুস্তিকা বেরিয়েছিল। পুস্তিকাটিতে ধর্মশিক্ষা জাতীয় শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত কি না সে বিষয়ে আলোচনা ছিল। নেতাজী সুভাষচন্দ্র ভূমিকায় বলেছেন, ভারতের দুর্গতির মূল আশঙ্কা, একমাত্র প্রতিকার শিক্ষায়। যদি মহান জাতি হতে হয় তাহলে ভারতকে অনেক কিছু ভাঙতে হবে এবং অনেক কিছু নতুন করে গড়তে হবে। এই গড়ার কাজ করতে হবে সক্রিয় সুনির্দিষ্ট ও সুপরিকল্পিত উপায়ে। সে কাজ করতে হলে জানা প্রয়োজন—কোথায় জাতির দুর্বলতা। দুর্বলতা রয়েছে ভারতের অনৈক্যের মধ্যে। অনৈক্য দূর করতে হলে একদিকে প্রত্যক্ষ-ভাবে প্রত্যেক ভারতীয় ছাত্রকে শেখাতে হবে সে সর্বাবস্থায় ভারতীয়, অন্যদিকে দূর করতে হবে ঐক্যনাশক শক্তির শিকড়-গুলি। বিদ্যালয়ে ধর্মশিক্ষা সম্বন্ধে সুভাষচন্দ্র বলেছেন—

"আমাদের মনে করতে হবে যে বিভিন্ন ধর্মের পথ বহু ঊর্ধ্বে একই মহান লক্ষ্যের দিকে চলেছে এবং সেই উচ্চ লক্ষ্যে উপ-স্থিত হলে দেখা যাবে যে, সেখানে আর কোন পথের পার্থক্য নেই, সেখানে এক বিরাট অবিভক্ত সত্তা বিরাজ করছে। ভারতমাতা জাতি, ধর্ম ও সম্প্রদায়ের পার্থক্য মানেন না।

"অতএব সর্বপ্রকার সামাজিক বৈষম্য ও বাধা সরিয়ে দিয়ে স্কুল, কলেজ, আদালত ও আইনসভাতে সকলেরই প্রবেশাধিকার থাকবে এমন ব্যবস্থা করতে হবে। বিশেষত এ ব্যবস্থা সর্বপ্রথম করতে হবে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে, যেখানে শিশু সর্বপ্রথম বিবিধ বিষয়ে শিক্ষালাভ করবে। অতএব জাতীয় বিদ্যামন্দিরে কোনো বিশেষ প্রকার ধর্ম-শিক্ষার ব্যবস্থা করলে সেটা জাতীয় শিক্ষার মূল উদ্দেশ্যের পরিপন্থী হবে।

"......আজাদ হিন্দ সরকারের অধীনে মুসলিম বিদ্যালয়, হিন্দু বিদ্যালয় খৃস্টান বিদ্যালয়গুলি কেন জাতীয় বিদ্যালয়ে (অন্তত এই পূর্ব এশিয়ায়) পরিণত হবে না—একথা আমি বুঝতে অক্ষম। এই বিদ্যালয়গুলিকে বর্তমান অবস্থায় পরি-চালিত হতে দিলে চিরন্তন বৈষম্য ও বিরোধই জাগিয়ে রাখা হবে। কারণ দেখা গিয়েছে যে, ধর্ম অনুসারে পৃথক বিদ্যা-লয়ের সার্থকতা স্বীকার করে নিলে তার সঙ্গত পরিণতি হবে পৃথক মুসলিম ভারত, হিন্দু ভারত, খৃস্টান ভারত ইত্যাদি। আমরা যদি প্রত্যাশা করি, এই প্রকার পৃথক পৃথক বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করে আমাদের ছাত্রেরা দেশপ্রেমিক হয়ে বেরিয়ে আসবে—তাহলে তাতে নির্বুদ্ধি-তারই পরিচয় দেওয়া হবে। কারণ যে-স্বার্থে সেখানে শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা আছে,

---

* মনে হয়, জেলে দুর্গা পুজোর ব্যাপারে সুভাষচন্দ্রাদির অনশনের প্রতি রবীন্দ্রনাথের বিরূপতার মূল কারণ এখানে আছে।

* জানি, রাশিয়ায় ধর্মাচরণের স্বাধীনতা আছে বলে দাবি করা হয়। কিন্তু তা 'মিথ্যা ধর্ম' আচরণের স্বাধীনতা! যে-শাসকদলের দৃষ্টিতে ধর্ম ঘুমপাড়ানোর আফিম, সেখানে শিক্ষিত ব্যক্তি 'আফিম-খোর' এই অপবাদকে মহাসম্মানের বিষয় মনে না করলে কি করে ধর্মাচরণ করবেন!!

* দ্রঃ সুভাষচন্দ্র ও নেতাজী সুভাষ-চন্দ্র—সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়। এই পুস্তিকাটির বিবরণী আমি এই বই থেকে সংগ্রহ করেছি।

তার মধ্যে জাতীয়তাবোধের দৃষ্টিভঙ্গি নেই। অন্য বিষয় অপেক্ষা বিদ্যালয়ে বিশেষ কোনো সম্প্রদায়ের ইতিহাস এবং ধর্ম-বিষয়ের শিক্ষা দেশাত্মবোধ ও জাতীয়তার পক্ষে হানিকর হতে পারে। কারণ এই প্রকার শিক্ষার সংগে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পৃষ্ঠপোষকদের স্বার্থ জড়িত থাকে।...... একথা স্বীকার করতেই হবে যে, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের যদি বিশেষ কোনো ধর্ম সম্বন্ধে (অথবা সকলের প্রতি প্রযোজ্য নয় এমন কোনো বিষয়) শিক্ষা দেওয়া হয়,—সৎ উদ্দেশ্য নিয়ে সে শিক্ষার ব্যবস্থা করলেও তাতে কতকগুলি মিথ্যা ধারণা, ধর্মভাবাপন্ন জাতীয়তা, এবং সাম্প্রদায়িক জাতীয়তাবোধের সৃষ্টি হয়ে থাকে।" (অনুবাদ সাবিত্রীপ্রসন্ন)

এ প্রসঙ্গ দীর্ঘ করা উচিত নয়। আমার বক্তব্য সুভাষচন্দ্র কোনো ধর্মসম্প্রদায়ের স্বার্থকে বড়ো করে দেখার কুফল বুঝতেন, এবং তা দূর করবার জন্য কার্যকরী পথও নিয়েছিলেন। তবে এখানে বলা উচিত, সুভাষচন্দ্রের এই আদর্শ অখণ্ড ভারতকে সামনে রেখে গড়ে উঠেছিল। ধর্মের ভিত্তিতে দেশবিভাগকে যাঁরা মেনে নিয়েছেন, তাঁরা ঐ আদর্শের জন্য আড়ম্বরের নৈতিক অধিকার হারিয়ে ফেলেছেন।

সিটি কলেজ আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার ফলভোগ সুভাষচন্দ্রকে করতে হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ ও ব্রাহ্মসমাজের বিরক্তি ছাড়াও হিন্দুসমাজের কোনো কোনো দল সুভাষচন্দ্রকে আক্রমণ করতে সুরু

ষষ্ঠ সারা ভারত বুনিয়াদী সাহিত্য প্রতিযোগিতা

ভারত সরকারের ষষ্ঠ সারা ভারত বুনিয়াদী সাহিত্য প্রতিযোগিতার জন্য ভারতীয় গ্রন্থকারদের নিকট হইতে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহে পাণ্ডুলিপি/পুস্তক (নাটক সহ)-এর আকারে এণ্ট্রি আহ্বান করা হইতেছেঃ

১। সমষ্টি উন্নয়ন ও সামাজিক-আর্থনীতিক পরিবর্তন, (২) সমষ্টি উন্নয়নে স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানসমূহের ভূমিকা, (৩) সমষ্টি পরিসম্পৎ গঠনে পঞ্চায়তের ভূমিকা, (৪) পঞ্চায়তী রাজ এগিয়ে চলছে—পঞ্চায়তের সাফল্য কাহিনী, (৫) গ্রামোন্নয়ন ও ক্রমবর্ধিত কর্মসংস্থানের জন্য গ্রামীণ লোকবলের সদ্ব্যবহার, (৬) গ্রাম পুনর্গঠনে যুবশক্তির ভূমিকা, (৭) সামাজিক কল্যাণে নারীর ভূমিকা, (৮) ফলিত পুষ্টি কর্মসূচীর মাধ্যমে পল্লীগ্রামের অধিকতর স্বাস্থ্য ও অধিকতর সম্পদ, (৯) সমষ্টি উন্নয়নের মারফত জনসমষ্টির দুর্বলতর অংশের কল্যাণ, (১০) পরিবার পরিকল্পনায় সমষ্টি উন্নয়নের ভূমিকা, (১১) ক্রমবর্ধমান কৃষি উৎপাদনে পঞ্চায়তরাজের ভূমিকা, (১২) সমবায়ের ক্ষেত্রে কায়েমী স্বার্থের বিলোপ, (১৩) অধিকতর উৎপাদন ও কৃষকের অধিকতর উপকারের জন্য কো-অপারেটিভ ফার্মিং, (১৪) কো-অপারেটিভ ক্রেডিটের ফলপ্রসূ সদ্ব্যবহার, (১৫) কো-অপারেটিভ মার্কেটিং ও প্রসেসিং, (১৬) মূল্যমান নিম্নে রাখার জন্য কনজ্যুমার্স কো-অপারেটিভ, (১৭) কো-অপারেটিভ সুগার ফ্যাক্টরী—কো-অপারেটিভ প্রসেসিং-এ অগ্রগতির নিরিখ।

প্রতিটি ১,০০০, টাকা মূল্যের সতেরটি পুরস্কার দেওয়া হইবে। একটি বিষয়ে একটির বেশী পুরস্কার দেওয়া হইবে না।

ভাষা ও রচনাশৈলী—নিম্নলিখিত যে কোন ভাষায় এণ্ট্রি হইতে পারিবে ঃ

অসমিয়া, বাংলা, গুজরাটি, হিন্দী, কানাড়া, কাশ্মীরী, মালায়ালম, মারাঠী, ওড়িয়া, গুরুমুখী, সিন্ধী, তামিল, তেলেগু ও উর্দু।

এণ্ট্রিগুলি এমন সহজ ও সাবলীল হইতে হইবে, যাহাতে সেগুলি সমষ্টি উন্নয়ন, পঞ্চায়তরাজ ও সমবায় কর্মসূচীর সহিত সম্পর্কিত কর্মীদের পক্ষে সহজবোধ্য ও আবেদনশীল হয়; এগুলি তাঁহাদের জন্যই।

আকার—পাণ্ডুলিপির আয়তন হইবে প্রায় ১০,০০০টি শব্দ লইয়া অথবা মুদ্রিত হইলে অন্তত ১৬ পয়েন্ট টাইপে ডিমাই ৮-পেজী সাইজের প্রায় ৪০ পৃষ্ঠা। বই হইলে সেগুলি যথাযথ চিত্র সম্বলিত হইতে হইবে।

কপিরাইট—পুরস্কারবিজয়ী এণ্ট্রির কপিরাইট সমস্ত দায়মুক্ত অবস্থায় ভারত সরকারে বর্তাইবে। কপিরাইটের জন্য উভয় পক্ষের ঐক্যমত অনুসারে যথোপযুক্ত অর্থ দেওয়া হইবে।

এণ্ট্রি ফি—রচয়িতা কর্তৃক দাখিল করা প্রতি এণ্ট্রির জন্য ৩, টাকা

এণ্ট্রি গ্রহণের শেষ তারিখ—৩০শে সেপ্টেম্বর, ১৯৬৮

প্রতিযোগিতার নিয়মাবলী ও নির্দেশাবলী সম্পর্কিত বিস্তারিত বিবরণ দরখাস্তক্রমে নিম্নঠিকানায় পাওয়া যাইবেঃ

দি ডিরেক্টর (বেসিক লিটারেচার)

মিনিস্ট্রী অব্ ফুড, এগ্রিকালচার,

কমিউনিটি ডেভেলপমেণ্ট অ্যাণ্ড কো-অপারেশন

(ডিপার্টমেণ্ট অব্ কমিউ, ডেভে, অ্যাণ্ড কো-অপারেশন)

কৃষি ভবন, নয়াদিল্লী

ডিএ ভি পি ৬৮/৫

করেন। শনিবারের চিঠিতে ব্যঙ্গ সাহিত্যের উৎস খুলে যায়।

সিটি কলেজ আন্দোলন সুভাষচন্দ্রের জীবনের সামান্য কথা, ১৯২৮ সালের সম্মুখ-প্লাবনে তা পশ্চাতের আকর্ষণ। জয় কিন্তু শেষ পর্যন্ত তরঙ্গের এবং বন্যার। সুভাষচন্দ্রের প্রাণপ্রবাহ প্লাবনের আকারে আঘাত করল দেশকে। বন্দনায় এবং বিরোধিতায় মুখর হয়ে উঠল নর-নারী। ভারতবর্ষের নতুন নায়কের চেহারায় দেখা দিলেন তিনি।

বামপন্থী আন্দোলনের দিক দিয়ে এই সালটি স্মরণীয়। ১৯২৭-২৮ সালের রাজনৈতিক ঘটনার সূত্র নির্দেশ করে সুভাষচন্দ্র বলেছেন—"তাপমাত্রা বাড়ছে।—The barometer rises."

তাপবৃদ্ধির একটা কারণ সাইমন কমিশন। ভারতীয় শাসন ও শিক্ষাব্যবস্থা সম্বন্ধে তদন্ত করবার জন্য এই স্ট্যাটুটারি কমিশনের নিয়োগ—উদ্দেশ্য, তদন্ত-অন্তে আরো কিছু শাসনক্ষমতা ভারতীয়দের হাতে অর্পণ করা যায় কি না নির্ধারণ। ইতিপূর্বে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োজনমতে হরণের পক্ষে সুপারিশ করবার অধিকারও কমিশনকে দেওয়া হোল। স্যর জন সাইমনের নেতৃত্বে গঠিত এই কমিশনে একজনও ভারতীয় ছিল না। ফলে দেশের সংগ্রামী দলগুলি তো নিশ্চয়, উদারনৈতিকেরা পর্যন্ত এই সর্বশ্বেত দলটিকে বর্জন করল। কৃষ্ণকায়দের ভাগ্যনির্ধারণ করবে শুধুই শ্বেতকায়রা, শ্বেত মনুষ্যের এই গুরুভার মহানুভবতাকে কৃষ্ণকায় উদারনৈতিকতাও (শত উদারতা সত্ত্বেও) বরদাস্ত করতে পারল না। সারা ভারতবর্ষ জুড়ে চীৎকার উঠল—'সাইমন ফিরে যাও।' শুধু মুখের চীৎকার নয়, প্রাণ ও পেশীর প্রতিজ্ঞাও তার সঙ্গে যুক্ত হল।

এমন হবার কারণ, দেশ ইতিমধ্যেই সংগ্রামাত্মক আন্দোলনের জন্য প্রস্তুত হয়ে উঠেছিল। ১৯২৭-২৮ সালকে বামপন্থার শক্তিবৃদ্ধির কাল বলা চলে। গান্ধীজী তখনো তাঁর স্বেচ্ছাবসর থেকে সম্পূর্ণ প্রত্যাবর্তন করেন নি। মাদ্রাজের প্রবীণ বামপন্থী নেতা শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার এগিয়ে এসে কিছুটা নেতৃত্ব গ্রহণ করলেন। ভারতসচিব লর্ড বার্কেনহেড, ভারতের জন্য সর্বস্বীকৃত শাসনতন্ত্র প্রণয়নের জন্য ভারতীয় নেতাদের চ্যালেঞ্জ করেছিলেন। উত্তরে ১৯২৭ সালের নভেম্বর মাসে কলকাতায় ঐক্য সম্মেলন, মোসলেম লীগের অধিবেশনে মিঃ জিন্না ও আলী ভ্রাতৃদ্বয়ের প্রভাবে সাইমন কমিশন বর্জনের প্রস্তাব গ্রহণ, এবং ১৯২৭, ডিসেম্বরে মাদ্রাজ কংগ্রেসের অধিবেশনে কমিশন বর্জন ও ভারতের জন্য সর্বদলের গ্রহণযোগ্য শাসনতন্ত্র রচনার প্রস্তাব অনুমোদন।

ফেব্রুয়ারী মাসে সাইমন কমিশন উপস্থিত হোল ভারতে। সারা ভারত হরতাল করে কমিশনের সংবর্ধনা করল। কমিশন যেখানে যায়, সেখানে আন্দোলন, প্রতিবাদ, কৃষ্ণপতাকা ও 'ফিরে যাও' ধ্বনি। আন্দোলনের ফল মারাত্মক হোল লাহোরে। শোভাযাত্রার নেতৃত্ব করছিলেন লালা লাজপত রায়। পুলিশের লাঠি পড়ল তাঁর মাথায়। সেই আঘাতেই মৃত্যুর কারণ হোল তাঁর। সারা ভারতবর্ষ ঘৃণায় ও প্রতিজ্ঞায় থরথর করতে লাগল।

বার্কেনহেডের চ্যালেঞ্জের উত্তরে নেহরু কমিটি শাসনতন্ত্র উপস্থাপিত করল। সুভাষচন্দ্র কমিটির সদস্য ছিলেন। ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস বা পূর্ণ স্বাধীনতা, উভয়ের সঙ্গেই খাপ খেতে পারে, এমন করে রচিত হয়েছিল শাসনতন্ত্রটি। পূর্ণ স্বাধীনতার পূর্ণ সমর্থক সুভাষচন্দ্র আপত্তি সত্ত্বেও রিপোর্টে স্বাক্ষর দিলেন, কারণ নেহরু কমিটি 'পূর্ণ স্বাধীনতায় বিশ্বাস করে এমন রাজনৈতিক দলসমূহকে' নিজের পথে কাজ করবার স্বাধীনতা দিয়েছিল।

১৯২৭ সালের মাদ্রাজ কংগ্রেস সম্বন্ধে সুভাষচন্দ্র বলেছেন—"মাদ্রাজ কংগ্রেসকে বামপন্থার দিকে সুস্পষ্টভাবে ঝুঁকে পড়বার দিক-নির্দেশক বলা চলে।" পূর্ব কথিত কমিশন-সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত ছাড়াও এই কংগ্রেসে পূর্ণ স্বাধীনতা দাবি করে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং বামপন্থীদের কংগ্রেস পরিচালনাযন্ত্রে গ্রহণ করা হয়। জহরলাল এবং সুভাষচন্দ্র কংগ্রেসের জেনারেল সেক্রেটারী হন।

১৯২৮-এর কাছাকাছি সময় থেকে বহু 'জাগরণে' ও আন্দোলনে দেশ স্পন্দিত হতে থাকে। তার মধ্যে পড়ে যুবক, শ্রমিক ও নারী আন্দোলন। দেশে চতুর্দিকে যুব সভার গঠন হতে থাকে এবং শ্রমিক অসন্তোষ ও তার ফলস্বরূপ ধর্মঘট ছড়িয়ে পড়তে থাকে। এই সময়েই কম্যুনিস্ট পার্টি স্পষ্ট মূর্তি ধারণ করে। পূর্ণ স্বাধীনতার দাবিকে জোরদার করবার জন্য সুভাষচন্দ্র ও জহরলালের নেতৃত্বে 'ইনডিপেনডেন্স লীগ' গঠিত হয়। ১৯২৮ সালেই বারদোলী সত্যাগ্রহ (গান্ধীজী যে সত্যাগ্রহ চৌরীচৌরার পরে স্থগিত রেখেছিলেন) বল্লভভাই প্যাটেলের পরিচালনায় সাফল্যলাভ করে এবং সেই সাফল্য দেশে উৎসাহের সৃষ্টি করে।

এই ধরনের ব্যাপক উন্মাদনার মধ্যে কলকাতায় ডিসেম্বর-মাসে কংগ্রেসের অধিবেশন বসল। সেই অধিবেশনে বিশিষ্ট ও প্রচণ্ড বিদ্রোহী ব্যক্তিত্ব রূপে দেখা দিলেন সুভাষচন্দ্র।

কলকাতায় ডিসেম্বর মাসে কংগ্রেসের বলেছেন—কংগ্রেসের সুরু থেকে যত অধিবেশন হয়েছে, এই কলকাতা কংগ্রেস তার মধ্যে বৃহত্তম। সকল ব্যবস্থা করা হয়েছিল অতি বিপুল আকারে।

এই কলকাতা কংগ্রেসেই গান্ধীজীর সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের প্রকাশ্য সংঘর্ষ, এবং সামরিক সংগ্রামী সুভাষচন্দ্রের প্রথম প্রকাশ।

কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবকবাহিনীর অধিনায়করূপে সুভাষচন্দ্রের ভূমিকা প্রশংসা ও নিন্দা অর্জন করে—প্রবীণমহলে নিন্দাই বেশি। কিন্তু প্রশংসা বা নিন্দা, যা-হোক একটা কিছু করতে হয়েছিল সকলকে—উদাসীন থাকতে পারে নি কেউ।

শোনা যায় রবীন্দ্রনাথ সুভাষচন্দ্রের সামরিক চেহারাকে পছন্দ করেন নি। করলেই আশ্চর্যের ব্যাপার হোত। রবীন্দ্রনাথের মনোগঠনে সামরিকতার সমর্থন ছিল না কোনোদিন। তদুপরি তিনি য়ুরোপের সমরতন্ত্রের উপর আস্থা হারিয়ে দেশে ফিরেছেন। শুধু তাই নয়, শান্তি ও অহিংসবাদী গান্ধীজী রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংযোগ রাখছেন। এবং রবীন্দ্রনাথ সিটি কলেজের ব্যাপারের পরে সেই সময়ে অন্তত সুভাষচন্দ্রকে পছন্দ করছেন না।

কংগ্রেসে তরুণ দলের অন্যতম মুখপাত্র, ফরোয়ার্ড সম্পাদক সত্যরঞ্জন বক্সী আমাকে বলেছেন, "কলকাতা কংগ্রেস যে গুরুত্বপূর্ণ হবে সে বিষয়ে সকলেই সচেতন ছিলেন। এই সময়ে দেশের চিন্তা-মহলকে নিজের দিকে আকর্ষণ করতে সকলেই উৎসুক। এ ব্যাপারে গান্ধীজীর বিশেষ দূরদর্শিতা ছিল। তিনি দেশের চিন্তা-মহলকে তুষ্ট রাখতে চেয়েছেন সর্বসময়। সেটা তিনি করতেন চিন্তানায়কদের সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্ক স্থাপন করে—যেটা সুভাষচন্দ্র পারতেন না। সুভাষচন্দ্র নিজের আবেগ ও ধারণাকে অবলম্বন করে এগিয়ে যেতেন, এবং সেই পথে অন্যে না এলে অভিমান বা ক্ষোভ করতেন। ১৯২৮ সালে সুভাষচন্দ্র ও তাঁর কর্মনীতির বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথের মনকে বিরূপ করার আয়োজন প্রচুরভাবে করা হয়। ১৯২৮ সালের কংগ্রেসের আগে গান্ধীজী শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করলেন, তারপর রবীন্দ্রনাথ চলে এলেন কলকাতায়—সেখানে গান্ধীজী তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগ রাখলেন।"

সত্যবাবু বললেন, "কলকাতায়, গুরুত্বপূর্ণ কংগ্রেস অধিবেশনের কালে গান্ধীজী ও রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠতা আমরা ভাল চোখে দেখি নি। সুতরাং সুভাষচন্দ্রকে পাঠানো হোল রবীন্দ্রনাথের কাছে। সুভাষচন্দ্র সাক্ষাৎ করে কার্যত ব্যর্থ হয়ে ফিরে এলেন।"

১৯২৮ সালের কংগ্রেসের পটভূমিকা এই পর্যন্ত। প্রত্যক্ষ ঘটনার মধ্যে প্রবেশ করা যাক। [ক্রমশঃ]

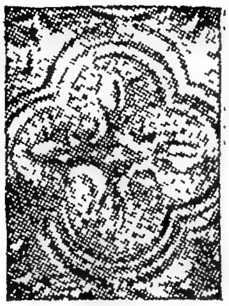

মরেস্ক

আজকালকার স্থপতিরা গৃহনির্মাণে

এইচ পি জি গ্লাস ব্যবহার করেন

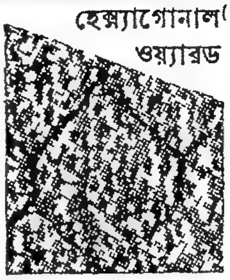

হেক্স্যাগোনাল ওয়্যারড

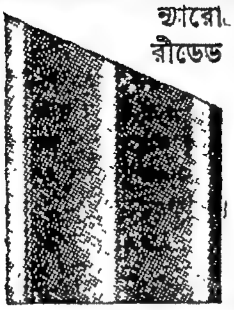

ন্যারো রীডেড

আজকের দিনের বাড়ীঘর ও অফিস-কাছারি, কলকারখানা, ইস্কুল ও হাসপাতালে সুদক্ষ ইঞ্জিনিয়ারেরা সর্বত্রই এইচ পি জি গ্লাস লাগান, কেননা তাঁরা জানেন যে এইচ পি জি গ্লাস উৎকর্ষের নিখুঁত মান বজায় রেখে তৈরী হয়। বিলাতের শতাধিক বৎসরের কাঁচনির্মাণকারী প্রতিষ্ঠান পিলকিংটন ব্রাদার্স-এর কারিগরী কুশলতার সাহায্য নিয়ে হিন্দুস্থান পিলকিংটন গ্লাস ওয়ার্কস এই এইচ পি জি গ্লাস তৈরী করেন।

এইচ পি জি কেনা মানেই নির্ভরযোগ্য ভাল জিনিস কেনা।

শীট গ্লাস

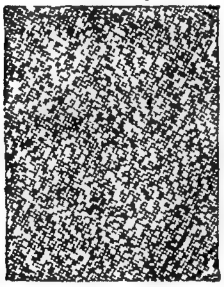

মরক্কো পিনহেড

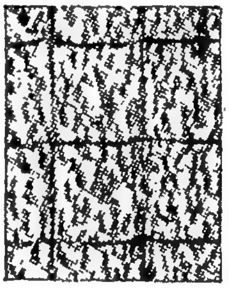

জর্জিয়ান ওয়্যারড

হিন্দুস্থান পিলকিংটন গ্লাস ওয়ার্কস লিমিটেড

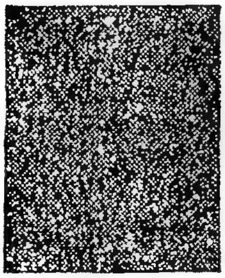

রাফকাস্ট

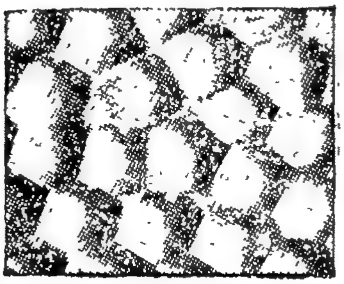

হ্যামার্ড

ম্যানেজিং এজেন্টস
তালুকদার ল' অ্যাণ্ড কোম্পানী প্রাইভেট লিমিটেড
হিন্দুস্থান বিল্ডিংস
৪, চিত্তরঞ্জন অ্যাভেনিউ,
কলিকাতা-১৩

যা দেখেছি, যা পেয়েছি

স্মৃতিচয়ন

শ্রীসুধীরঞ্জন দাস

[পূর্ব-প্রকাশিতের

আমি পাঞ্জাব থেকে সুপ্রিম কোর্টে আসবার কিছুদিন পরেই নূতন জজ এলেন নাগাপুদী চন্দ্রশেখর আয়ার। ইনি প্র্যাকটিস করতেন মাদ্রাজে এবং সি পি রামস্বামী আয়ার, যিনি মাদ্রাজের এ্যাডভোকেট জেনারেল ও পরে বড়লাটের কাউন্সিলের ল মেম্বার হয়েছিলেন তাঁর চেম্বারে কাজ করতেন। পরে তিনি মাদ্রাজ প্রদেশের ডিস্ট্রিক্ট জজ হয়েছিলেন। তারপর তিনি কিছুদিন মাদ্রাজ হাইকোর্টে জজীয়তী করেছিলেন এবং অবশেষে সুপ্রিম কোর্টে জজ হয়ে এলেন। রঙ ময়লাই বলতে হয়। দক্ষিণের লোকেরা খুবই নিষ্ঠাবান এবং তাঁরা প্রাতঃস্নান সেরে চন্দনপঙ্কে আপন ললাট বিভূষিত করে জপ আহ্নিক করে থাকেন নিয়মিতভাবে। আর এই চন্দন লাগাবার কায়দা ছিল নানা রকমের। কেউ কপালে খালি একটি টিপ লাগান, যেমন লাগাতেন এম পাতঞ্জলি শাস্ত্রী। কেউ কপালের মাঝখানে দিয়ে উপর থেকে দুই ভুরুর মাঝখান পর্যন্ত একটি সরু লাইন টানেন। আবার কাউকে দেখেছি কপালের একপাশ থেকে অপর পাশ পর্যন্ত তিনটি সরু সমান্তরাল রেখা টানতেন। আবার কেউ বা আঁকতেন U অক্ষরটি। কেউ বা সেই U অক্ষরটির তলায় একটি ছোট ল্যাজ দিয়ে তাকে ইংরেজী Y অক্ষর বানিয়ে নিতেন। শুনেছি এই সব তিলক দেখে নাকি বোঝা যায় নাকি লোকটি কোন্ সম্প্রদায়ের মানুষ—বৈষ্ণব কি শাক্ত। আমাদের চন্দ্রশেখর আয়ার নিত্য কপালে শ্বেতচন্দন লেপন করে দিতেন। লাইন টাইন নয়; সমস্ত কপালটাকে লেপে দিতেন ঢেকে। সেই শ্বেতচন্দন শুকিয়ে গেলে মনে হোতো যেন সন্ন্যাসীদের কপালের ভস্ম। মহাজন সাহেব সেইজন্যে চন্দ্রশেখর আয়ারকে ডাকতেন "Bhasma" বলে।

চন্দ্রশেখর আয়ার মানুষটি ছিলেন স্ফূর্তিতে ভরা। সকলের সঙ্গে হাস্য পরিহাসে তিনি ছিলেন বিশারদ। খুব যে বেশি আইনগত পান্ডিত্য ছিল তা বলতে পারি না। তবে মোটামুটি সহজ সাধারণ বুদ্ধির জোরে কোর্টের কাজ বেশ চালিয়ে যেতে পারতেন। এ্যাডভোকেট মহলে তিনি বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিলেন। গোল হোতো খালি যখন মাদ্রাজের প্রাক্তন বিচারপতি কৃষ্ণস্বামী আয়েঙ্গার কোন কেসে এ্যাডভোকেট হয়ে হাজির হতেন। তাঁর সঙ্গে চন্দ্রশেখর আয়ারের সংঘর্ষ অবশ্যম্ভাবী ছিল। কৃষ্ণস্বামী আয়েঙ্গার তাঁর কপালের রক্তচন্দনে আঁকা ইংরেজী Y অক্ষরটিকে যখন ভ্রূকুটি করে টেনে উপরে তুলতেন তখনই বোঝা যেত ঘূর্ণিবাত্যা আসন্ন প্রায়। এই সব ঝড়ের আদি কেন্দ্র বোধ হয় ছিল প্রাচীন কালের মাদ্রাজ হাইকোর্টের মধ্যে দুজনের রেষারেষি। এই সব সংঘর্ষে বেশির ভাগ সময়েই কৃষ্ণস্বামী আয়েঙ্গারই বেশি নম্বর পেতেন।

চন্দ্রশেখর আয়ার ছিলেন ইংরেজীতে যাকে বলে "my dear fellow" সতীর্থদের সঙ্গে তাঁর ব্যবহার অমায়িক এবং হৃদ্যতাপূর্ণ। তাঁর সহধর্মিণী সীতা দেবীও ছিলেন ধীর শান্ত স্বভাবের। চন্দ্রশেখরের দুই কানে ছিল দুটি মস্ত বড় হীরার "drop"। সেটার ওজনের জন্যে বোধ হয় তাঁর কানের ফুটোটা বেশ লম্বা হয়ে বেড়ে চলেছিল। অনেক সময়ে আপন স্ত্রীকে টালাবার জন্যে চন্দ্রশেখর আয়ার নিজের কানে হাত দিয়ে বলতেন—"All that my father-in-law gave me are these two diamond drops and my well beloved Sita Devi" বলেই সীতা দেবীর দিকে হাত বাড়িয়ে ধরতেন। সীতা দেবীর ওজর আপত্তি ডুবে যেতো হাসির রোলে। সীতা দেবী অল্প অল্প হিন্দি বলতে শিখে নিয়েছিলেন। সুতরাং বড় বড় পার্টিতে ইংরেজী না জানলেও তাঁর কোন অসুবিধেই হোতো না। চন্দ্রশেখর আয়ার ইংরেজীতে "Anjaneya" বলে একখানা চটি বইতে হনুমানের বহুমুখী প্রতিভার উল্লেখ করেছিলেন, যেমন Anjaneya as Ambassador, Anjaneya the politicion ইত্যাদি। অবসর নেবার পরও চন্দ্রশেখর আয়ার অনেকবার ad-hoc জজ হয়ে সুপ্রিম কোর্টের কাজ করেছেন। যখনই কোন জজ ছুটি নিয়েছেন কিংবা কাজের চাপ বেড়েছে তখনই ডাক পড়ত চন্দ্রশেখর আয়ারের এবং তিনি হৃষ্টচিত্তে ad-hoc জজ হয়ে বসতেন। আমরা তাঁকে ঠাট্টা করে Stepney বলে ডাকতাম।

চন্দ্রশেখরের পরে সুপ্রিম কোর্টে জজ হয়ে এসেছিলেন নাগপুর হাইকোর্টের চীফ জাস্টিস ভিভিয়ান বোস। ফুটফুটে ফরসা ছিল এঁর গায়ের রঙ—একেবারে ইংরেজদেরই মত। শুনেছি এঁর মা ছিলেন ইংরেজ না ফরাসী মহিলা। ভিভিয়ান বোস ছিলেন নাগপুরের স্বনামখ্যাত ব্যবহারজীবী ও নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম দিশী উপাচার্য শ্রী বি কে বোসের নাতি। এঁর বাবা নাকি ছিলেন ইঞ্জিনীয়ার। তিনি অল্প বয়সেই মারা যান বলে ভিভিয়ান তাঁর ঠাকুর্দার কাছেই মানুষ হয়েছিলেন এবং কথায়বার্তায় বেশ বুঝেছি যে ইনি তাঁর ঠাকুর্দাকে খুবই শ্রদ্ধা করতেন। ভিভিয়ান বোস বিবাহ করেছেন আইরিনী বলে একটি মার্কিন রমণীকে। এই বোস দম্পতির সঙ্গে আমাদের বেশ সৌহার্দ্য হয়েছিল। আমাদের দুই পরিবারের মধ্যে যাতায়াত ছিল। আইরিনী বোস একবার তাঁর বাড়িতে একটা fete বা মেলার আয়োজন করেছিলেন। কি চমৎকারই না হয়েছিল সব ব্যবস্থা। দিশী মেলায় যেমন খাবারের দোকানের প্রাচুর্য দেখা যায় এই মেলাতেও তাই ছিল। সম্ভ্রান্ত পরিবারের মেয়েরা বসে গেছেন পুরী তরকারী ভাজতে ও বিক্রি করতে। সাপুড়ের কাপড় পরে বাঁশী বাজালেন একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী। সবসুদ্ধ মেলাটি হয়েছিল চমৎকার সুন্দর।

ভিভিয়ান বোসের রায়গুলির ইংরেজী ভাষা ছিল মার্জিত ও উঁচুদরের। যেখানে জনসাধারণের মৌলিক অধিকারে হস্তক্ষেপ

হোতো ভিভিয়ান বোস সে সব কেসে ঠেসে চাস্ত ইংরেজীতে রায় লিখতেন। আমাদের নতুন সংবিধানের fundamental rights-গুলি সম্বন্ধে তিনি খুবই সজাগ ছিলেন। এ সব সম্বন্ধে তাঁর রায়গুলির খুবই খ্যাতি হয়েছিল। বোধ হয় এই কারণেই তিনি কোর্ট থেকে অবসর নিয়ে International Jurist Association-এর President পদে বৃত হয়েছিলেন। এ ছাড়া রামকিষণ ডালমিয়ার কোম্পানীর উপরে যে সকল অভিযোগ এসে পড়েছিল-তার তদন্তের ভার পড়েছিল ভিভিয়ান বোসের উপর। তিনি বহুকাল ধরে অধ্যবসায়ের সংগে ওই তদন্তের কাজ সেরে যে রিপোর্ট দেন তার কথা সবাই জানে। এই বোস দম্পতি খুব বেড়াতে ভালবাসতেন। এঁরা একটি বিশেষ ধরণের গাড়ি তৈরি করিয়েছিলেন—যাতে একজন রাত্রে শুতে পারেন এবং অন্যজন সারা রাত গাড়ি চালাতে পারেন। স্বামী-স্ত্রী উভয়েই গাড়ি চালাতে জানেন বেশ ভাল রকমে। এঁদের একটি মাত্র ছেলে আমেরিকায় রয়ে গেছেন। মেয়েটির বিয়ে হয়ে গেছে আমাদের বায়ুসেনার একজন পদস্থ কর্মচারীর সঙ্গে।

ভিভিয়ান বোসের পরে আসেন এলাহাবাদ হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত জজ গোলাম হাসান সাহেব। লক্ষ্ণৌয়ের সম্ভ্রান্ত মুসলমান পরিবারের সন্তানের সকল সদ্‌গুণই তাঁর ছিল পোষাকে আষাকে ও ব্যবহারে। অমায়িক ছিল তাঁর কথাবার্তা ও ব্যবহার। তেমনি আভিজাত্য ছিল তাঁর গৃহিণীর। তাঁর মুখে একটি সুন্দর লাবণ্য ও বুদ্ধির দীপ্তি ছিল। মহাজন সাহেবের চীফ জাস্টিসসীপের সময় তিনি আমি এবং গোলাম হাসান শ্রীনগরে Circuit Bench হয়ে বসে সেখানকার ছোট বড় Privy Council আপীলগুলির নিষ্পত্তি করে এসেছিলাম। সেই সময় একই বাড়িতে আমরা দুই পরিবার একেবারে পাশাপাশি বাস করেছিলাম এবং আমাদের মধ্যে কিছু ঘনিষ্ঠতাও হয়েছিল। জজ হিসেবে গোলাম হাসান যে খুব উচ্চ পর্যায়ের ছিলেন তা বলা যায় না। তবে আচারে ব্যবহারে তিনি ছিলেন খুবই ভদ্র ও অমায়িক। ১৯৫৪ সালের অক্টোবর মাসে অর্থাৎ তাঁর জীবনের শেষের দিকে তাঁর এক কন্যার কি একটা অস্ত্রোপচার প্রয়োজন হওয়ায় বেগম গোলাম হাসানকে ইয়োরোপ যেতে হয়েছিল। দিল্লীর বাড়িতে তখন গোলাম হাসান একাই ছিলেন। হঠাৎ নভেম্বর মাসের গোড়ায় তিনি হৃদরোগে আক্রান্ত হন। সেই দুর্বল শরীরে তাঁকে Willingdon Nursing Home-এ নিয়ে যাওয়া হয় কিন্তু সেখানে পৌঁছতে না পৌঁছতেই তিনি শেষনিশ্বাস ফেলে ইহধাম থেকে চলে গেলেন। আমরা সব জজেরা পরদিন সকালে তাঁর মরদেহের সঙ্গ New Delhi Railway Station ছাড়িয়ে একটি গোরস্থানে তাঁর মরদেহকে কবরস্থ করতে দেখে এলাম।

গোলাম হাসানের পর এলেন বম্বে হাইকোর্টের জজ নটবর হরিলাল ভগবতী। বম্বেতে জজ হবার আগে এঁর সেখানকার ওরিজিন্যাল সাইডে বেশ ভাল প্র্যাকটিস ছিল। Commercial Law-তে বেশ ব্যুৎপত্তি এঁর ছিল। একটু উচ্চৈঃস্বরে কথা বলতেন এবং যখন যা বলতেন বেশ জোরের সঙ্গেই বলতেন। এঁর স্ত্রী বেশ সুগৃহিণী ছিলেন এবং এঁদের সব কটি ছেলেই নিজ নিজ লাইনে খুবই প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন। বড় ছেলেটি এখন গুজরাট হাইকোর্টে জজীয়তী করছেন বেশ সুখ্যাতির সঙ্গে। সুপ্রিম কোর্টের জজেদের কি ধরণের বাড়ি হওয়া চাই, তাদের T. A. কি রকম হারে হবে, ইত্যাদি ছোটখাট ব্যাপারে ভগবতী সাহেব সর্বদাই সজাগ ছিলেন। এজন্যে মহাজন সাহেব তাঁকে বলতেন আমেদাবাদী বেনিয়া। ভগবতী জবাব দিতেন—“But Bania is writ large in your very name”! ইনি বেশ কিছুদিন সুপ্রিম কোর্টে আমাদের সঙ্গে কাজ করে আমি অবসর নেবার মাসখানেক আগে অবসর গ্রহণ করেন।

ভগবতী সাহেব সুপ্রিম কোর্টে আসার মাস ছয়েক পরে এলেন বাচ্চু জগন্নাথ দাস। ইনি ছিলেন তখন উড়িষ্যা হাইকোর্টের চীফ জাস্টিস। যখন মাদ্রাজে প্র্যাকটিস করতেন তখন কংগ্রেস দলেও ভিড়েছিলেন। একবার বোধ হয় দিন কতকের জন্যে জেলেও গিয়েছিলেন। গঞ্জাম মদ্রপ্রধান হলেও সে জেলাটি ছিল উড়িষ্যা প্রদেশে। সেই সুবাদেই বোধ হয় জগন্নাথ দাস উড়িষ্যা হাইকোর্টের জজ হয়ে যান। কিন্তু তিনি যখন সুপ্রিম কোর্টে এলেন তখন বলা হোলো যে তাঁকে আনা হোলো মাদ্রাজী বলে নয়, ওড়িয়া বলে। যখন কোর্টে সওয়াল জবাব চলেছে এবং আমরা জজেরা কৌঁসুলীকে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে ব্যতিব্যস্ত করে দিয়েছি তখন জগন্নাথ দাস প্রশ্ন করতেন “tentatively speaking” বলে। এইজন্যে তিনি তাঁর “tentative opinion”-এর জন্যে সুপরিচিত হয়ে উঠেছেন। এই না ছুঁই পানি মনোভাব তাঁর রায়ের মধ্যেও এসে যেতো। অনেক সময় তিনি রায়ের মধ্যেও বলতেন “as at present advised”। এতে সুবিধে এইটুকু ছিল যে ভবিষ্যতে বেগতিক দেখলে ঠিক উল্টো কথাটাও বলা যেতে পারবে। জজের রায় নিঃসংশয়ভাবেই দেওয়া উচিত নইলে সে রায়ের মান খুবই নিচু হয়ে যায়। সুপ্রিম কোর্টে যখন তাঁর কার্যকাল প্রায় শেষ হয়ে আসে তখন বাচ্চু জগন্নাথ দাস Pay Commission-এর চেয়ারম্যান হয়ে চলে যান। সে কাজটা হয়ে গেলে তিনি কিছুদিন ইণ্ডিয়ান ল ইনস্টিটিউটের Executive Chairman হয়েও কাজ করেছিলেন।

টি এল ভেঙ্কটরামা আয়ার ছিলেন মাদ্রাজের একজন অবসরপ্রাপ্ত জজ। যেদিন এম পাতঞ্জলি শাস্ত্রী সুপ্রিম কোর্টের চীফ জাস্টিস পদ থেকে অবসর নিলেন তার পরদিনই মেহেরচাঁদ মহাজন হলেন চীফ জাস্টিস এবং ভেঙ্কটরামা আয়ার এসে বসলেন সুপ্রিম কোর্টের জজ হয়ে। বেশ লম্বা চওড়া মানুষ তিনি ছিলেন। রঙ ছিল তাঁর বেজায় কালো এবং দেখতে বেশ রুক্ষই ছিলেন। কিন্তু অত্যন্ত নরম ছিল তাঁর ব্যবহার। কথাবার্তা বলতেন তাড়াতাড়ি ও জড়ানভাবে এবং গলাটা কিছু ভাঙা ছিল বলে সব সময়ে তাঁর কথা বোঝা শক্ত হোতো। দূর থেকে কৌঁসুলীদের অনেক সময় শুনতে এবং বুঝতে কষ্টই হোতো। তাঁর আইনজ্ঞান ছিল গভীর এবং বিশ্লেষণশক্তি ছিল বিস্তর। তাঁর লিখিত রায়গুলি হোতো সুচিন্তিত ও সুখপাঠ্য। কিন্তু তাঁর বাক্যে বা ব্যবহারে কোনো গরিমা ছিল না। খুবই নিরীহ ভাল মানুষ তিনি ছিলেন। আইন ছাড়া আরো একটি বিষয়ে তিনি সুপণ্ডিত ছিলেন। সেটা হোলো সংগীত শাস্ত্র। শুনেছি সেটা তিনি পেয়েছিলেন তাঁর পিতার কাছ থেকে। নিজেও গাইতে পারতেন। একদিন পাতঞ্জলি শাস্ত্রীর বাড়িতে আমাদের সকলকে নিমন্ত্রণ করে খাইয়ে তাঁর গান শোনানো হয়েছিল। বেশ মনে আছে শকুন্তলার পতিগৃহে যাত্রার সময়কার একটি গান। বয়স হয়েছিল বলে গলাটা হয়ে গিয়েছিল একটু ফ্যাসফেসে কিন্তু সমঝদারেরা বলেছিল যে কর্ণাটক সঙ্গীতের বৈশিষ্ট্যগুলি নাকি নিখুঁতভাবে ফুটে উঠেছিল। আপন স্বভাব ও কৃতিত্বের জন্যে তিনি আইনজ্ঞ মহলে খুবই জনপ্রিয় হয়েছিলেন। তিনি বেঁচে থাকতেই এ্যাডভোকেটেরা চাঁদা তুলে তাঁর প্রমাণ সাইজ তৈলচিত্র তিনি যে ঘরে বসতেন সেখানে টাঙাবার জন্য দান করেছিলেন। এরকম স্বীকৃতি সচরাচর হয় না। কিন্তু ভেঙ্কটরামা আয়ারের এটা প্রাপ্যই ছিল। এই ঘটনা ঘটেছিল আমি যখন চীফ জাস্টিস। কেউ কেউ বলেছেন যে জীবিত ব্যক্তির তৈলচিত্র টাঙাতে অনুমতি দেওয়া আমার উচিত হবে না। কিন্তু আমার মনে হয়েছিল যে এ্যাডভোকেটদের এই অনুরোধ উপেক্ষা করাটা নীচতার পরিচায়কই হবে, কেন না

প্রস্তাবেও সম্মানটা যোগ্য পাত্রেই পড়েছিল।

উনিশ শ চুয়ান্ন সালের গোড়ায় এম পাতঞ্জল শাস্ত্রী অবসর নিলে মেহেরচাঁদ মহাজন সাহেব তাঁর জায়গায় চীফ জাস্টিস হলেন। এই মহাজন সাহেব সেই বছরের শেষেই অবসর গ্রহণ করেন। যাবার আগে তিনি ভুবনেশ্বরপ্রসাদ সিংহকে সুপ্রিম কোর্টের জজ করে আনেন। এই ভুবনেশ্বর-প্রসাদ সিংহ আগে পাটনা হাইকোর্টে প্র্যাকটিস করতেন। পরে তিনি সেই হাইকোর্টের জজ হন। তারপর যখন ভিভিয়ান বোস নাগপুরের চীফ জাস্টিস পদ ছেড়ে সুপ্রিম কোর্টের জজ হয়ে আসেন তখন ভুবনেশ্বরপ্রসাদ সিংহকে নাগপুরে হাইকোর্টে চীফ জাস্টিস করে পাঠান হয়। পরে সুপ্রিম কোর্টে একটি জায়গা খালি হলে তিনি দিল্লীতে চলে আসেন। তিনি বেশ হাসিখুশি গল্পী লোক ছিলেন। বেশ সময়োপযোগী উর্দু ও ফারসী কবিতা উদ্ধৃত করতে পারতেন এবং অনেক সময় সভা-সমিতিতে বক্তৃতা দেবার সময় ঐ রকম উর্দু কি ফারসী কবিতা দিয়ে ভাষণ আরম্ভ কিংবা শেষ করতেন। আমার পরে যখন তিনি প্রধান বিচারপতি হন তখন তাঁর নতুন খেয়াল হোলো "Rule of Law"। যে কোন জায়গায় এবং যে কোন উপলক্ষে বক্তৃতা প্রসঙ্গে তিনি ঐ Rule of Law-র কথার অবতারণা না করে ছাড়তেন না। কানিয়া সাহেব অস্ট্রেলিয়ার কোর্টের শতবার্ষিকীতে আহূত হয়ে সেখানে গিয়েছিলেন। এ ছাড়া ভারতের চীফ—জাস্টিসদের বাইরে সফর করার রেওয়াজ ছিল না। ভুবনেশ্বর-প্রসাদ সিংহ কিন্তু কোর্টে যতটা কাজ করেছেন তার অন্তত অর্ধেক সময় বোধ হয় সফরেই কাটিয়েছেন। জাপান, আমেরিকা, ইংল্যাণ্ড এবং এমন কি গ্রীসেও তিনি ঘুরে এসেছেন ভারতীয় সরকারের খরচায় এবং বিদেশী সরকারের অতিথি হয়ে। শুনেছি খুবই সম্মান পেয়েছেন সে সব দেশে। সব জায়গাতেই তাঁর বক্তৃতার বিষয়বস্তু হোতো ঐ Rule of Law। এমন কি ইংল্যাণ্ড, যেখানে Rule of Law-র জন্ম হয়েছিল, সেখানেও তিনি Rule of Law শুনিয়ে এসেছেন। কোন কোন দুষ্টবুদ্ধি লোককে বলতে শুনেছি যে প্রফেসার ডাইসীকে নাকি কবরের মধ্যে পাশ ফিরে শুতে হয়েছিল তাঁর Rule of Law ব্যাখ্যান শুনে। ভুবনেশ্বর সিংহ অবসর নিয়ে Language না কি একটা কমিশনের চেয়ারম্যান হয়ে দিল্লীতেই বসবাস করছেন।

বোধ হয় মহাজন সাহেবের পরামর্শ অনুসারেই সৈয়দ জাফর ইমামকে সুপ্রিম কোর্টে জজ করে আনা হয়েছিল, যদিও তিনি কাজে যোগ দিয়েছিলেন মহাজন সাহেব অবসর নেবার অব্যবহিত পরেই। সৈয়দ জাফর ইমাম ছিলেন পাটনার বিখ্যাত আলী ইমাম সাহেব যিনি এক সময়ে বড়লাট সাহেবের কাউন্সিলের ল মেম্বার হয়েছিলেন তাঁরই জ্যেষ্ঠপুত্র। উচ্চতায় খুব বেশি না হলেও একেবারে বেঁটেও নয়। গায়ের রঙ পরিষ্কার। পোষাক-পরিচ্ছদ বেশ পরিচ্ছন্ন। বিলেতে লেখা-পড়া শিখেছিলেন। পাটনায় ব্যারিস্টারী করে সেখানে এ্যাডভোকেট জেনারেল হন। পরে সেই কোর্টের জজীয়তী পদ প্রাপ্ত হন এবং কালক্রমে চীফ জাস্টিস পদে উন্নীত হয়েছিলেন। তিনি সুপ্রিম কোর্টে আসেন উনিশ শ পঞ্চান্ন সালের জানুয়ারী মাসের প্রথমার্ধে। ফৌজদারী আইনে তাঁর জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা ছিল বিস্তর। সব চেয়ে বড় গুণ তাঁর ছিল মধুর ও অমায়িক ব্যবহার। চেহারা দেখলে, কথা শুনলেই টের পাওয়া যেত যে তিনি ছিলেন একটি বিশিষ্ট অভিজাত বংশের সন্তান। এতটুকু ক্ষুদ্রতা তাঁর মধ্যে দেখি নি। সকলের সঙ্গে মিলে মিশে গল্প করতে পারতেন। রহস্যালাপে কম ছিলেন না। তিনি বিবাহ করেছিলেন তাঁরই খুল্লতাত সুবিখ্যাত কৌসুলী ও দেশ নেতা সৈয়দ হাসান ইমামের এক দুহিতা বেগম আসমাকে। খুবই করিৎকর্মা চৌখস মহিলা। এই ইমাম পরিবারের সঙ্গে আমাদের পরিবারের বেশ হৃদ্যতা ছিল আগে থেকেই। দিল্লীতে সেই সম্পর্কটা ঝালিয়ে নেওয়া গিয়েছিল। এঁদের ছিল বোধ হয় দুটি কন্যা ও একটি পুত্রসন্তান। পুত্রটি সৈয়দ আকবর ইমাম পাটনায় ব্যারিস্টারীতে বেশ প্রতিষ্ঠালাভ করেছেন।

মহাজন সাহেব অবসর নিলে তাঁর জায়গায় চীফ জাস্টিস হলেন বিজনকুমার মুখার্জি। কিন্তু বছর না ঘুরতেই বিজনবাবুর শরীর অসুস্থ হয়ে পড়ায় তাঁর হয়ে কোর্টের যাবতীয় administrative কাজ আমাকেই বেসরকারীভাবে করতে হোতো। শেষে তাঁকে ছুটি নিয়ে যেতে হোলো কলকাতায় চিকিৎসার জন্যে। সেই সময় আমাকে দুইবার অস্থায়ী চীফ জাস্টিস হয়েও কাজ করতে হয়েছে। বিজনবাবুর মত প্রতিভাশালী জজ যে সব উচ্চাঙ্গের রায় লিখে গেছেন পিউনী জজীয়তীকালে সে রকম উচ্চ পর্যায়ের কোন রায় তিনি চীফ জাস্টিস পদে উন্নীত হবার পর লিখে যেতে পারেন নি নেহাৎ শারীরিক অসুস্থতার কারণে। অবশেষে উনিশ শ ছাপ্পান্ন সালের ফেব্রুয়ারী মাসের শেষ দিকে বিজনবাবু কলকাতায় নিজ গৃহে শেষনিশ্বাস ফেলে মহাপ্রয়াণ করলেন। তাঁর জায়গায় আমি ভারতের প্রধান বিচারপতির পদে আসীন হলাম।

আমার চীফ জাস্টিসগিরির গোড়াতেই পাটনা হাইকোর্ট থেকে সুধাংশুকুমার দাস এলেন সুপ্রিম কোর্টের জজ হয়ে। এই সুধাংশুকুমার দাস অল্পবয়স থেকেই পড়াশুনায় ভাল ছিলেন। তিনি বিলেতে গিয়ে আই-সি-এস পরীক্ষায় কৃতিত্বের সঙ্গে পাশ করে দেশে ফিরে আসেন এবং বিচার বিভাগেই কাজ করতে লাগলেন। তিনি পাটনা হাইকোর্টের রেজিস্ট্রার হয়ে বেশ ক' বছর কাজ করে সেই হাইকোর্টের জজ হন। পরে সৈয়দ জাফর ইমাম সুপ্রিম কোর্টে চলে আসবার পর সুধাংশুকুমার দাস পাটনা হাইকোর্টের চীফ জাস্টিস হয়েছিলেন। আমি যখন তাঁকে সুপ্রিম কোর্টে নিয়ে আসব বলে মনে ঠিক করেছিলাম তখন প্রথম আপত্তি উঠেছিল যে, আই-সি-এস জজকে সুপ্রিম কোর্টে আন ঠিক হবে না। জবাবে বলেছিলাম যে আই-সি-এস লোক যদি হাইকোর্টের জজ এবং চাই কি চীফ জাস্টিস হতে পারেন যেমন হয়েছিলেন পাঞ্জাবের ওয়েস্টন সাহেব এবং তিনি যদি হেগের আন্তর্জাতিক আদালতের জজ হতে পারেন যেমন হয়েছিলেন বি, এন, রাও সাহেব তবে তিনি সুপ্রিম কোর্টে আসবেন না কেন? দ্বিতীয় আপত্তি উঠেছিল যে পাটনা হাইকোর্ট থেকে সুপ্রিম কোর্টে ইত্যবসরে দুইজন জজ এসেছেন—যথা ভুবনেশ্বরপ্রসাদ ও জাফর ইমাম এবং সেই জন্যে সেই হাইকোর্ট থেকে তৃতীয় আর একজন জজ আনা বিধেয় হবে না। এর জবাব দিলাম যে সুপ্রিম কোর্টে জজ করে আনতে হবে এমন লোককে যার যোগ্যতা সম্বন্ধে কোন সন্দেহই নেই। যদি একই কোর্টে একাধিক যোগ্য ব্যক্তি থাকেন তবে তাঁদের আনতে বাধা নেই। যোগ্য ব্যক্তিকে বাদ দিয়ে কেবলমাত্র regional representation-এর নীতি অনুসরণ করে অযোগ্য ব্যক্তিকে সর্বোচ্চ আদালতে আনা খুবই অনুচিত। সুধাংশু দাসের যোগ্যতা সম্বন্ধে আমার খুবই আস্থা হয়েছিল তাঁর প্রকাশিত রায় পড়ে। সুতরাং তাঁর নামই প্রস্তাব করে পাঠালাম। সুখের বিষয় আমার প্রস্তাবে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কি প্রধানমন্ত্রীর কোন আপত্তি না থাকায় রাষ্ট্রপতি সুধাংশু দাসকেই নিয়োগ করলেন। সুধাংশু দাস তাঁর সুপ্রিম কোর্টের কাজে আপন প্রতিভার পরিচয় দিয়ে আমার মুখ রক্ষা করেছেন। সুধাংশু দাসের আইনজ্ঞান ও বিশ্লেষণশক্তির মান যে যথেষ্ট উচ্চ পর্যায়ের তা ল' রিপোর্টে প্রকাশিত তাঁর রায়গুলি পড়লেই জানা যাবে। সুধাংশু দাস বেশ হাসিখুশি মানুষ। তিনি ও তাঁর কল্যাণময়ী সহ-

শক্তি ও উৎসাহের জন্য–বোর্নভিটা !

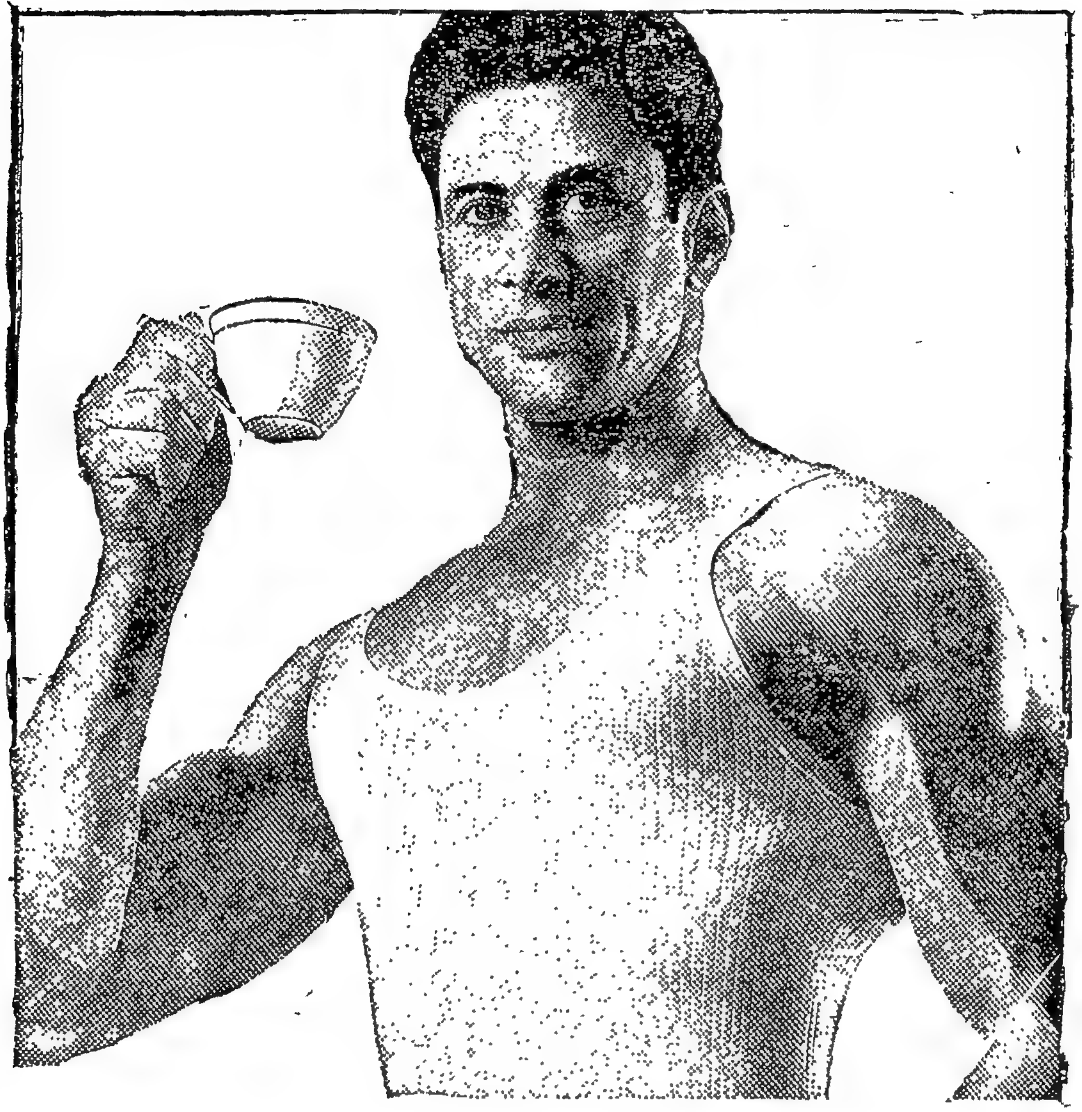

বোর্নভিটার স্বাদ অতুলনীয়......
ওর রহস্য হচ্ছে–কোকো !

কোকো, দুধ, চিনি, ও মল্ট বিধিসম্মতভাবে মেশাবার ফলে—অতি শক্তিবর্দ্ধক পানীয় বোর্নভিটা। বোর্নভিটা গরম দুধে মিশিয়ে নেবেন—এই সুস্বাদু পানীয় থেকে শক্তি ও উৎসাহ পাবেন।

শক্তি, উৎসাহ ও স্বাদের-জন্যে
ক্যাডবেরিস্ বোর্নভিটা

2296 All-Ben)

ধর্মিণী রাবেয়া দেবী সামাজিকতায় খুবেই পারদর্শী। কোর্ট থেকে অবসর নেবার পর সুধাংশু দাস অনেকগুলি কমিশনের চেয়ারম্যান হয়ে সুচিন্তিত রিপোর্ট দাখিল করে সুখ্যাতি ও অর্থ অর্জন করেছেন।

সুধাংশু দাসের সুপ্রিম কোর্টে আসার মাস পাঁচেক পরে এসেছিলেন পি, গোবিন্দ মেনন। দীর্ঘাকৃতি মানুষ তিনি ছিলেন এবং বাইরে থেকে বেশ বলিষ্ঠই মনে হোতো। তিনি মাদ্রাজে প্র্যাকটিস করে সেখানকার ফৌজদারী উকিল হয়েছিলেন। উনিশ শ ছেচল্লিশ সালে তিনি জাপানে গিয়েছিলেন International Military Tribunal for the Far East ভারতের তরফে। উনিশ শ সাতচল্লিশ সালে তিনি মাদ্রাজ হাইকোর্টের জজ হন এবং বছরখানেক সেখানে কাজ করবার পর উনিশ শ ছাপান্ন সালে আমার সুপারিশে সুপ্রিম কোর্টে আসেন। কিন্তু একটি বছর পরেই তিনি অকস্মাৎ হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে দিল্লীতেই দেহরক্ষা করেন।

পাঞ্জাব হাইকোর্টে আমার সময়ে এবং আমার সুপারিশে জজ হয়েছিলেন মালিক জীবনলাল কাপুর। আমারই সময়ে এবং আমারই সুপারিশে উনিশ শ সাতান্ন সালের জানুয়ারী মাসে তিনি এলেন সুপ্রিম কোর্টে। কাপুর সাহেব ছিলেন ব্যারিস্টারে এবং তিনি বরাবরই ব্যারিস্টার বলে গৌরব করতেন। তাঁর মতে ব্যারিস্টারদের মধ্যে এমন কিছু সদ্‌গুণ ঢুকে যায় গোড়া থেকে যা বিলেতে শিক্ষা না হলে নাকি হয় না। খুব খাটতে পারতেন এবং আইনের কূট তর্ক পেলে পরমানন্দে তাঁর মতের স্বপক্ষে নজির খুঁজে খুঁজে বের করবার চেষ্টা করতেন। বিলেতের প্রিভি কাউন্সিল বা হাউস অব লর্ডসের নজির ছাড়া অন্য কোন নজিরকে তিনি আমল-ই দিতেন না। বেশ লম্বা লম্বা রায় লিখতেন। নিজের মনে একটা ধারণা গড়ে উঠলে এবং অন্যদের সঙ্গে মতানৈক্য ঘটলে তিনি আলাদা রায় দিতে দ্বিধাই করতেন না। সামাজিকতায় কাপুর সাহেব ও তাঁর সহধর্মিণী জ্ঞানবন্তী দেবীর দোসর মেলা ভার। দুজনেই খুব দরদী মানুষ এবং বন্ধুবাৎসল্যে ভরা। তাঁদের মায়া মমতার পরিচয় অনেক পেয়েছি যখন দিল্লীতে ছিলাম। এ'দের জ্যেষ্ঠপুত্রটিও ব্যারিস্টারী করেন পাঞ্জাব হাইকোর্টে ও সুপ্রিম কোর্টে। সুপ্রিম কোর্ট থেকে অবসর নেবার প্রাক্কালেই কাপুর সাহেব Law Commission-এর চেয়ারম্যান হয়েছিলেন এবং এখনো বোধ হয় সে কাজ করছেন। এ ছাড়া Delimitation Commission-এরও চেয়ারম্যান তিনি হয়েছিলেন। এক্ষণে মহাত্মা গান্ধীর হত্যা সম্বন্ধে যে কমিশন হয়েছে তিনি সেই কমিশনের একমাত্র সভ্য।

বম্বেতে এম, সি, চাগলা যখন ছিলেন চীফ জাস্টিস তখন সেই হাইকোর্ট পরিদর্শন করতে গিয়েছিলাম। কয়েকজন জজের কোর্টে খানিকক্ষণ করে বসেও ছিলাম। প্রহ্লাদ বি, গজেন্দ্রগাদকার ছিলেন প্রধানত বম্বে হাইকোর্টের এ্যাপেলেট সাইডের জজ। তাঁর কোর্টে বসেছিলাম কিছুক্ষণ এবং তাঁর কাজের ঢং আমার বেশ পছন্দসই মনে হয়েছিল। তিনি তার কিছু আগে কর্মীদের দাবি নিয়ে কি একটা ট্রাইব্যুনাল হয়েছিল তাতে ছিলেন চেয়ারম্যান। সেই কাজ শেষ হবার কিছু পরে তিনি এলেন সুপ্রিম কোর্টের জজ হয়ে। বেশির ভাগ সময়েই তাঁকে আমার বেঞ্চে নিয়েই বসতাম। হিন্দু আইন, জমিজমা সংক্রান্ত বিধি বিধান এবং এ্যাপেলেট বিভাগে যে ধরণের মামলা হয় সে সম্বন্ধে তিনি বিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন। পরিষ্কার নীতিগত বুদ্ধি দিয়ে কোর্টের কাজ খুব তৎপরতার সঙ্গেই সমাধা করতেন। শুনেছি যখন তিনি সিনিয়ার জজ হয়ে বেঞ্চে বসতেন তখন এক এক সময়ে একটু নাকি অধৈর্য হয়ে উঠতেন। তবে কৌসুলীরা যখন অন্তঃসারশূন্য সওয়াল জবাব করেই চলেন তখন জজেদের ধৈর্য রাখা সহজ নয়। যখন ভুবনেশ্বর সিংহের পর তিনি ভারতের প্রধান ন্যায়াধীশ হলেন তখন তিনিও খুব সভাসমিতিতে বক্তৃতা দিয়ে বেড়াতে লাগলেন। ভারতের বাইরেও বোধ হয় বেড়িয়ে এসেছেন সরকারী খরচায় এবং বক্তৃতা দিয়ে। ভুবনেশ্বর সিংহের বক্তৃতার বিষয়-বস্তু হোতো Rule of Law, গজেন্দ্রগাদকার সাহেবের বক্তৃতার ধুয়া ছিল Socio Economic Justice. এক্ষণে তিনি অবসর নিয়ে বম্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হয়েছেন। যে-কোন সভার তিনি প্রধান অতিথি বা পুরোহিত হন—তা সেটা কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবই হোক, কিংবা কোন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানই হোক—বক্তৃতা দিতে দিতে ঐ Socio Economic Justice-এর অবতারণা হবেই হবে। Labour ট্রাইব্যুনালে বসেই বোধ হয় নিম্নশ্রেণীর কর্মীদের উপর তাঁর মমতার উদ্রেক হয়েছিল। কিন্তু যাঁদের তিনি underdogs বলতেন তাঁদের দুঃখে তাঁর মনের কাতরতাটা একটু উগ্রভাবেই ব্যক্ত করতেন। নিন্দুকেদের বলতে শুনেছি—"বলবেন না, স্যার, গরীবদের প্রতি মায়ার কথা। পরের পয়সায় দাক্ষিণ্য রাজনৈতিক উচ্চাশার পরিচায়কমাত্র।" আমার সময়ে জজেদের রীতি ছিল রাজনৈতিক বিষয়ে কোন মতামত না দেওয়া। সেই উচ্চ রীতিনীতি লঙ্ঘন করলে এই রকম সমালোচনা যে হবে তাতে আশ্চর্য হবার কিছুই নেই।

গজেন্দ্রগাদকার সাহেবের সুপ্রিম কোর্টে আসবার পর সেই কোর্টে যখন আর একটি জজের দরকার হোলো তখন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি অমলকুমার সরকারকে সেই পদে নিয়োগ করা হয়। অমল সরকার প্রথমে কলকাতা হাইকোর্টে ব্যারিস্টারী করতেন। রোগা, বেঁটে বাঁটকুল চেহারা। তিনি আমারই চেম্বারে কাজ করতে আসতেন বহু বছর। সেই সময়ে তাঁকে খুবই কাছাকাছি দেখেছিলাম। তাঁর আইনে অসাধারণ পাণ্ডিত্য ছিল বলতে পারি না। তবে তাঁর মনটা নীতি বিশ্লেষণে বিশেষ পটু ছিল বলে লক্ষ্য করেছি। যে পর্যন্ত না তিনি কোনো কূট প্রশ্নের মীমাংসা নিজ সহজ বুদ্ধি দিয়ে বুঝতেন ততক্ষণ তিনি তা স্বীকার করতেন না। ব্যবহারজীবীর কর্মজীবনে এই মানসিক ভাবটা খুবই প্রয়োজনীয়। শরীরটা কিছু কমজোর হলেও বেশ নিয়মিত খাটতে পারতেন। আমার নানা কেসে তাঁর কাছে সৎপরামর্শ পেতাম। আমি কলকাতায় জজ হয়ে যাবার পর তিনি নিজের কাজ নিয়েই ব্যাপৃত থাকতেন এবং একনিষ্ঠভাবে ব্যবসায়ে মনোনিবেশ করেছিলেন। প্র্যাকটিসে যে একটা উল্কার মত উন্নতি তাঁর হয়েছিল কিংবা খুব বেশি রোজগার যে তিনি করেছিলেন তা বলা যায় না। তবে তিনি যে হাইকোর্টের ওরিজিন্যাল বিভাগে নিজেকে অল্পবিস্তর সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিলেন সে কথা নিরপেক্ষ আইনজীবীমাত্রই স্বীকার করতেন। কলকাতা হাইকোর্টের চীফ জাস্টিস স্যার ট্রেভর হ্যারিসের আমার মতামতের উপর খানিকটা আস্থা ছিল। তিনি আমাকে একদিন বললেন—"Das, I have reached the bottom of the barrel. Can you suggest the name of a barrister advocate whom I may consider for the next barrister vacancy.?" আমি বিনা দ্বিধায় অমল সরকারের নাম বলেছিলাম। অমল সরকার কলকাতা হাইকোর্টে জজ হলেন। হ্যারিস সাহেবের কাছে শুনেছি যে অমল সরকার জজ হিসেবে বেশ যোগ্যতার সঙ্গে কাজ করে যাচ্ছিলেন। শুনে যে খুশি হয়েছিলাম তা বলাই নিষ্প্রয়োজন। তারপর যখন আমার আমলে সুপ্রিম কোর্টে একটি জজের আসন খালি হোলো তখন আমি অমল সরকারকেই সেই আসনে বসাতে মনস্থ করলাম। এক্ষেত্রেও দুটি প্রশ্ন কেউ কেউ তুলেছিলেন। প্রথমত সুপ্রিম কোর্টে তখনই সুধাংশু দাস এবং আমি দুজন বাঙালী জজ ছিলাম। অমল

সরকারকে আনলে সেটা কারো কারো কাছে দৃষ্টিকটু হতে পারে। জবাব দিলাম যে সুপ্রিম কোর্টে শুধুমাত্র যোগ্যতা দেখেই জজ নিয়োগ করতে হবে। এক প্রদেশ থেকে বা এক জাতের একাধিক লোক আছেন বলে যোগ্য ব্যক্তিকে বাদ দেওয়া চলে না। দ্বিতীয় ওজর হোলো যে অমল সরকার আমারই চেম্বারে ডেভিল ছিলেন বলে তাঁকে সুপ্রিম কোর্টে আনলে লোকে পক্ষপাতিত্বের দোষারোপ করবে। এর প্রত্যুত্তর দিলাম যে অমল সরকার আমার চেম্বারে কাজ করতেন বলেই তাঁকে কাছাকাছি দেখেছি এবং তাঁর গুণাবলীর সম্যক পরিচয় পেয়েছি। সেই পরিচয়ের ভিত্তিতেই অমল সরকারের জন্যে হ্যারিস সাহেবকে সুপারিশ করেছিলাম এবং হাতে-কলমে দেখা গেছে যে অমল সরকার তাঁর নিজস্ব যোগ্যতার পরিচয়ই দিয়েছেন। আমার চেম্বারে ডেভিলিংটা সুযশপূর্ণ যদি না-ও হয়, তবু সেটা নিশ্চয়ই অপযশের সামিল নয়। সুতরাং সেই অজুহাতে অমল সরকারকে বাদ দেওয়া অযৌক্তিক হবে। খুবই সন্তোষের কথা এই যে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও প্রধানমন্ত্রী আমার প্রস্তাব সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ করে রাষ্ট্রপতির কাছে অমল সরকারের নামই পেশ করেন এবং রাষ্ট্রপতিও তা মঞ্জুর করেন। আরো আনন্দের কথা এই যে আমার এই ডেভিলটা সুপ্রিম কোর্টের বিচারের উচ্চমান সম্পূর্ণ রক্ষা করে নিজের প্রতিভাগুণে ঐ উচ্চ আদালতের একজন বিশিষ্ট বিচারক এবং গজেন্দ্রগাদকার অবসর নেবার পর ভারতের মুখ্য ন্যায়াধীশ বলে প্রতিষ্ঠা লাভ করে গিয়েছেন। অমল সরকার দার পরিগ্রহ করেন নি। অবসর নিয়ে তিনিও কি যেন একটা কমিশনের চেয়ারম্যান হয়ে বিনা দক্ষিণায় কাজ করছেন। জজেরা অবসর নিয়ে বেশ মোটা পেন্সন পান। যদি দেশ এই সব অবসরপ্রাপ্ত জজেদের কাছে কোন সেবা চান তবে সে সব জজেদের কাজের জন্যে কোন আলাদা পারিতোষিক চাওয়া অনুচিত বলে মনে করি। আমি নিজেও এই নীতি অবলম্বন করেছি এবং আমার বিশেষ আনন্দ এই যে, আমার ডেভিলও এই নীতি অনুসরণ করে চলেছেন।

অমল সরকারের পর সুপ্রিম কোর্টে এলেন কোকা সুব্বারাও। ইনি মাদ্রাজ হাইকোর্টের জজ ছিলেন। মাদ্রাজের চীফ জাস্টিস রাজা মান্নার হলেন এঁর সম্বন্ধী। এম. পাতঞ্জলি শাস্ত্রী সুব্বারাওয়ের খুব প্রশংসাবাদ আমাকে জানিয়েছিলেন। ইনি সুপ্রিম কোর্টে আসবার পর এঁর সঙ্গে একত্রে বেঞ্চে বসে এঁর মেধা ও ধীশক্তির পরিচয় পেয়েছি। কোর্টের কাজে ইনি সুপটুই ছিলেন। দুটো জিনিস লক্ষ্য করেছি। একবার একটা কোন ধারণা মাথায় ঢুকলে সেটার অপসারণ খুবই শক্ত হোতো। তা ছাড়া মাদ্রাজে তিনি যেসব রায় দিয়ে এসেছেন সেগুলিকে অভ্রান্ত বলে ধরে নিতে সর্বদাই প্রয়াসী হতেন। আমাদের সংবিধানে নাগরিকদের যে মৌলিক অধিকার দেওয়া হয়েছে সে বিষয়ে তিনি খুবই সজাগ ছিলেন। তাঁর আক্ষেপ ছিল যে সেসব অধিকার গভর্নমেণ্টের হাতে পড়ে গোল্লায় যেতে বসেছে। অমল সরকার অবসর নেবার পর ইনি অল্পকাল চীফ জাস্টিস পদে বহাল হয়েছিলেন। রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে বিরোধী দলগুলির মনোনীত প্রার্থী হয়ে ইনি তিন মাস আগেই কাজে ইস্তফা দিয়ে রাজনৈতিক লড়াইয়ে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। তাঁর এই কার্যকলাপ আইনসঙ্গত কিংবা শোভন হয়েছে কি-না এই নিয়ে তর্ক ওঠে। কিন্তু সে সম্বন্ধে আমি কোন মতামত দিতে প্রস্তুত নই। সুব্বা রাও ও তাঁর সহধর্মিণী দুজনেই বেশ অমায়িক এবং তাঁদের ব্যবহার বেশ সৌহার্দ্যপূর্ণ।

কৈলাসনাথ ওয়াঞ্চু হলেন কাশ্মীরি ব্রাহ্মণ। খুব ফরসা গায়ের রঙ। ছিপছিপে লম্বা। সিগার বা বর্মা চুরুট দিয়ে ধূমপানবিলাসী। আই-সি-এস পরীক্ষায় কৃতিত্বের সঙ্গে পাশ করে ইনি উত্তর প্রদেশে নানা স্থানে ডিস্ট্রিক্ট জজ পদে কাজ করেছেন। পরে ইনি এলাহাবাদ হাইকোর্টের জজ পদে বৃত হন। আমার আমলে এঁকে রাজস্থান হাইকোর্টের চীফ জাস্টিস করে পাঠান হয়। এঁর সুযোগ্য পরিচালনায় রাজস্থান হাইকোর্টের অনেক উন্নতি হয়। ইনি সে সময়ে কিংবা তার অল্প আগে দু'-একটি জরুরী কমিশনের চেয়ারম্যান হয়ে সুচিন্তিত রিপোর্ট দাখিল করে সুখ্যাতি অর্জন করেছিলেন। আমি যখন রাজস্থান হাইকোর্ট পরিদর্শনে যাই তখন এই ওয়াঞ্চু সাহেব ও তদীয় সহধর্মিণীর সঙ্গে আমার সহধর্মিণী ও আমার বেশ ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল। এই ওয়াঞ্চু দম্পতির সামাজিকতা ও সৌজন্য সত্যই অনুকরণীয়। কোর্টের কাজেও ওয়াঞ্চু সাহেবকে বেশ তৎপর বলেই মনে হয়েছে। আমরা যখন লেবার অ্যাপীল শুনতে বসতাম তখন আমি সুধাংশু দাস, গজেন্দ্রগাদকার, ওয়াঞ্চু এবং হিদায়তুল্লা সাহেবকে নিয়ে বেঞ্চ গঠিত করতাম। কোম্পানীর আয়-ব্যয়ের মোটা মোটা অঙ্কগুলি ওয়াঞ্চু সাহেব কোর্টে বসেই অবলীলাক্রমে কষে "available surplus" বের করে দিয়ে আমাদের কাজ খুবই লাঘব করে দিতেন। আমরা তখন সর্বসম্মতিক্রমে বোনাসের একটা formula ঠিক করে দিয়েছিলাম এবং কোম্পানী ও মজদুরমণ্ডলীর কৌঁসুলীরা তা রাজী-খুশিতেই গ্রহণ করে নিতেন। সে ফরমুলাটা এখনো আছে কি-না তা জানি নে। ওয়াঞ্চু সাহেবের সঙ্গে কাজ করে দেখেছি যে তাঁর যে একটা সহজ সাধারণ বুদ্ধি আছে তা-ই তিনি সর্বদা কাজে লাগাতেন। এতে করে তাঁর রায়গুলি সহজবোধ্য বলে মনে হোতো। এক্ষণে সুব্বারাও চাকরিতে ইস্তাফা দেওয়ায় ওয়াঞ্চু সাহেব ভারতের প্রধান বিচারপতি হয়েছেন। [ক্রমশঃ]

দেশ সেবায় নিয়োজিত,

এ্যালবার্ট ডেভিড লিমিটেড

কলিকাতা—৫০

নীতি ও বিজ্ঞানানুযায়ী ঔষধ প্রস্তুতকরণের অগ্রণী

—ব্রাঞ্চ সমূহ—

বোম্বে - মাদ্রাজ - দিল্লী - নাগপুর

বেজওয়াড়া - শ্রীনগর - গৌহাটী

বিজ্ঞান-বিচিত্রা

ডঃ বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য

পরমাণু বোমা এবং তারপর

সেদিন এক হিসেব পাওয়া গেল। পারমাণবিক অস্ত্রের সর্বশেষ অবস্থাটা জানা গেল এই সেদিন। জানালেন রাষ্ট্রসঙ্ঘ। জানাবার উদ্যোগ-আয়োজন কিছুকাল আগে থাকতেই চলছিল। ১৯৬৬ খৃস্টাব্দের ৫ই ডিসেম্বর রাষ্ট্র-সঙ্ঘের সাধারণ পরিষদে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল যে সেক্রেটারী জেনারেলকে বিশেষজ্ঞদের সাহায্য নিয়ে পারমাণবিক অস্ত্রের সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়া ও পরিণতি সম্বন্ধে একটি রিপোর্ট দাখিল করতে বলা হোক। এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী দেশ-বিদেশের সুধীদের নিয়ে অচিরেই এক বিশেষজ্ঞ-কমিটি গড়ে উঠল এবং কমিটির সভ্যরা যথাসময়ে তাঁদের রিপোর্ট দাখিল করলেন।

রিপোর্টটি বিশেষ মূল্যবান। কারণ, মনোযোগ-সহকারে তা' পাঠ করলে পারমাণবিক অস্ত্রের সর্বশেষ অবস্থাটা বেশ বোঝা যায়। স্পষ্টই ধারণা হয় তখন যে, পৃথিবী-জোড়া সর্বনাশের জাল খুব কায়দামাফিকই পাতা হচ্ছে। অর্থাৎ, উদ্যোগ-আয়োজনের ত্রুটি ঘটছে না কোথাও। যে যার সামর্থ্য অনুযায়ী পারমাণবিক অস্ত্রসম্ভার মজুত করছে।

এদিকে পৃথিবী দেউলিয়া হতে চলল। কারণ, এক-একটি পরমাণু বোমার মধ্যে ধ্বংসের যে বিপুল ক্ষমতা লুকিয়ে আছে, বারুদ আবিষ্কৃত হবার পর থেকে সবগুলো ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ একত্র জুড়লেও তার সমান হবে না। অর্থাৎ, যুদ্ধক্ষেত্রে আজ অবধি সংঘটিত সব প্রকম বিস্ফোরণের যোগফল একটিমাত্র পরমাণুবোমার বিস্ফোরণ-শক্তির তুলনায় নগণ্য। আবার পরমাণুবোমাও একটি নেই, আছে কয়েক হাজার। অতএব অনুমান করা যেতে পারে যে, ওদের মধ্যে গোটা পৃথিবীর কবর আগে থাকতেই খোঁড়া আছে। ওদের কয়েকটিকে কাজে লাগালেও কয়েক কোটি মানুষকে ধ্বংস করা যাবে। আর কাজে লাগাবার ব্যবস্থাটা যদি ঘটা করে হয় তো পৃথিবীজোড়া বিরাট সভ্যতা মুছে যেতে সময় লাগবে না মোটেই। কেন না যুদ্ধ-ক্ষেত্র থেকে যাঁরা দূরে থাকবেন পরমাণু বোমার দহন তাঁদের স্পর্শ করবে। তাঁরা মরবেন তিলে তিলে। অথবা মরবেন না ঠিক, এমন একটা দুঃসহ অবস্থার সৃষ্টি করবেন যা' মানবজীবনের ধারাকে আর অব্যাহত রাখতে পারবে না। তাঁদের সন্তান-সন্ততিরা পঙ্গু হয়ে জন্মাবে এবং অচিরেই সেই পঙ্গু মানুষের দল নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে পৃথিবী থেকে।

পৃথিবীর সর্বনাশ সম্বন্ধে ওপরে যে ক'টি কথা বলা হল, তাদের কোনটিই নতুন নয়। বরং অনেকবারই এগুলো বলে সাবধান করা হয়েছে আত্মঘাতীদের। অথচ ঘাতকদের কেউই কিন্তু এসব কথায় খুব একটা কান দেন নি। ওঁরা ধরেই নিয়েছেন, এসব এক শ্রেণীর নির্বোধ দুর্বলের 'প্রপ্যাগান্ডা' মাত্র।

এমন কি সাধারণ মানুষদেরও অনেকেই এ সম্বন্ধে নির্বিকার। ওঁদের ধারণা, আগুন নিয়ে রাষ্ট্রনায়কদের খেলায় সাধারণ নীরব দর্শকমাত্র; ইচ্ছে থাকলেও কিছুই করবার নেই ওঁদের। অনেকে আবার আগুনের আঁচ সম্বন্ধে উদাসীন। পরমাণুবোমার বিধ্বংসী ক্ষমতাকে ওঁরা যেন মৃত্যুর মতই একটি অবধারিত সত্য বলে মেনে নিয়েছেন। ভেবে রেখেছেন যে, যা হবার তা তো হবেই। অতএব নীতি-কথার অযথা পুনরুক্তি কেন।

এদিকে রাষ্ট্রসঙ্ঘের বিশেষজ্ঞরা বলছেন, পুনরুক্তির প্রয়োজন অবশ্যই আছে: এবং এই প্রয়োজনীয়তার গুরুত্ব উপলব্ধি করতে হলে পরমাণুবোমার বিধ্বংসী ক্ষমতা সম্বন্ধে মোটামুটি একটা ধারণা থাকা চাই এবং ধারণাটা গড়ে ওঠা চাই এমন কিছু তথ্য-প্রমাণের ওপর ভিত্তি করে যা' মর্মান্তিক হলেও ধ্রুব সত্য।

তথ্য-প্রমাণ হিরোসিমা এবং নাগাশাকির কাছ থেকে মিলতে পারে। কারণ, পারমাণবিক মারণ-যজ্ঞের প্রথম শহীদ এই দু'টি শহরের অধিবাসীরা। যুদ্ধে ব্যবহৃত প্রথম পরমাণু বোমা ১৯৪৫ খৃস্টাব্দের ৬ই আগস্ট হিরোসিমার ওপর ফেলা হয়। এই বোমাটির বিধ্বংসী ক্ষমতা ছিল ২০,০০০ টন টি এন, টি-র সমান। টি, এন, টি, বা ট্রাইনাইট্রোটলুইন নামক পদার্থটি তার মারাত্মক বিস্ফোরক-ক্ষমতার জন্যে বিজ্ঞানীমহলে সুবিদিত। এ হেন পদার্থের ২০,০০০ টন যদি একসঙ্গে কোথাও বিদীর্ণ হয় তো অবস্থাটা কতখানি সাংঘাতিক হতে পারে তা' সহজেই অনুমেয়। হিরোসিমার হতভাগ্যরা প্রত্যক্ষ করেছে এই অবস্থা এবং ১৯৪৫ খৃস্টাব্দের ৯ই আগস্ট ঠিক এই একই অবস্থার সাক্ষী হয়েছে নাগাশাকি।

উভয় শহরেই পরমাণু বোমার বিস্ফোরণ ঘটে ভূপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ৫৫০ মিটার ওপরে। তবে বিস্ফোরণের প্রতিক্রিয়া নাগাশাকির তুলনায় হিরোসিমাতে কিছুটা বেশি হয়। তিন লক্ষ লোক অধ্যুষিত হিরোসিমার মর্মান্তিক দুর্ভাগ্যের কাহিনী সভ্যতার ইতিহাসে যে গভীর ক্ষতের সৃষ্টি করেছে, তা' আর কোনো কালে শুকোবে বলে মনে হয় না। প্রত্যক্ষ-দর্শীরা বলেন, পরমাণুবোমা বিস্ফোরণের কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই ওখানকার আকাশে আগুনের একটি গোলক ধীরে ধীরে স্ফীতকায় হ'তে থাকে এবং ধীরে ধীরে তা' মেঘের মত কুণ্ডলী পাকিয়ে ছত্রাকের রূপ ধবে। ছত্রাকটি কালো ধোঁয়ার স্তম্ভকে আশ্রয় করে দাঁড়িয়ে থাকে যেন এবং যেন প্রতি মুহূর্তে মৃত্যুর আহ্বান জানাতে থাকে। মুহূর্তের মধ্যে আগুন লাগে হিরোসিমার হাজার হাজার জায়গায় আর মানুষ জ্বলে-পুড়ে মরে।

হিরোসিমার তুলনায় নাগাশাকি শহরটি ছিল সংকীর্ণ। তিন দিকে পাহাড়-ঘেরা ছিল সেটি এবং তার একদিকে ছিল সমুদ্র। নাগাশাকির কেন্দ্রীয় অঞ্চলের লোকসংখ্যা ছিল ৭৮,০০০ এবং সেই লোকগুলো মোটামুটি সুখে-স্বচ্ছন্দেই থাকত। কিন্তু হঠাৎ একদিন শুধুমাত্র একটি পরমাণুবোমার আঘাতে সব সুখ কর্পূরের মত উবে গেল। শহরবাসীবা দেখল, তাদের চোখের সামনেই অগ্নিযজ্ঞ সুরু হলো এবং তারপর এত সুন্দর এই পৃথিবী অন্ধকার হয়ে উঠছে দেখতে দেখতে। দেখল, মরণ-রশ্মির বিকিরণ সুরু হয়েছে এবং মানুষ হয়ে উঠেছে পতঙ্গ।

বিস্ফোরণের তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া হিরোসিমা এবং নাগাশাকি উভয় শহরে প্রায় একই রকমের হয়েছিল। তবে শহর দু'টোর অবস্থান ও আয়তনে পার্থক্য-হেতু অগ্নিযজ্ঞের চেহারা ছিল আলাদা রকম। হিরোসিমার যজ্ঞে পূর্ণাহুতির ব্যবস্থা ছিল যেন। আর নাগাশাকিতে যেন ছিল আহুতির প্রায়-পূর্ণ ব্যবস্থা।

উভয় শহরেই ধ্বংসলীলার সময় এত প্রচণ্ড তাপ সৃষ্টি হয়েছিল যে বিস্ফোরণ-কেন্দ্র থেকে আধ কিলোমিটার দূরে অবধি সমস্ত বাড়ির মৃন্ময় ছাদগুলো গলে যায় আর দেড় কিলোমিটার দূরে অবধি কাঠের বাড়িগুলো দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকে। হাজার হাজার মানুষ কয়েক মিনিটের মধ্যে জ্বলে-পুড়ে মরে; আর বাকী হাজার হাজার অর্ধদগ্ধ প্রাণভয়ে ছুটে পালায়।

বিশেষজ্ঞদের ধারণা, ছুটে পালিয়েছিল যারা, তাদের মধ্যে ঠিক যে কতজনের মৃত্যু হয়েছে তা' বলবার উপায় নেই। তবে রাজসূয় আহুতিব মোটামুটি একটা হিসেবে দাঁড় করানো যেতে পারে। মরণ-যজ্ঞের পুরোহিতদের প্রতি কোনরকম কটাক্ষ না করেও বলা যেতে পারে; একমাত্র হিরোসিমাতেই ৭৮,০০০ হতভাগ্যের মৃত্যু হয়; আর ওখানে আহত হয় ৮৪,০০০ জন। নাগাশাকিতে হত ও আহতের সংখ্যা হল যথাক্রমে ২৭,০০০ ও ৪১,০০০। এ ছাড়া উভয় শহরেই কয়েক হাজাব করে নব-নারী নিখোঁজ হয়েছিল।

প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে, হিরোসিমা ও নাগাশাকির প্রাথমিক ক্ষয়-ক্ষতির অধিকাংশই সংঘটিত হয় অফিস ও আবাসগৃহসমূহ চূর্ণ-বিচূর্ণ হওয়ার ফলে। হিরোসিমাতে ৬০,০০০ বাড়ির প্রত্যেকটিই সম্পূর্ণ অথবা আংশিকভাবে ধ্বংস হয়েছিল। এমন কি শহরের কেন্দ্র থেকে ৮ কিলোমিটার দূরবর্তী বাড়িগুলোও রেহাই পায় নি। তবে ধ্বংসলীলা সবচেয়ে বেশি হয়েছিল 'গ্রাউন্ড্-জিরো' বা বিস্ফোরণ-স্থলের ঠিক তলাকার অঞ্চলটিতে। ঐ অঞ্চলের ঘর-বাড়িগুলো চলচ্ছক্তি লাভ করেছিল যেন। যেন একটি ছুটে গিয়ে আর একটির ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়েছিল। আর তাণ্ডব যা' হয়েছিল ওখানে,—ভূমিকম্প, অগ্ন্যুৎপাত ও ঝড়-ঝঞ্ঝাব ত্রিবেণীসংগম না ঘটলে বিশ্বজগতে তা' বুঝি কোনদিনই হতে পারত না।

হিরোসিমায় আগুনে-পোড়া হতভাগ্যদের সারিয়ে তোলা দারুণ এক সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কেন না, বিস্ফোরণের সময় যারাই বাইরে ছিল, তারাই বিকিরণের প্রত্যক্ষ-স্পর্শ এড়াতে পারে নি; তারাই কোন না কোনরকমে মারাত্মকভাবে দগ্ধ হয়েছে। 'গ্রাউন্ড্-জিরো' এলাকা থেকে ২ কিলোমিটার দূরে অবধি সরাসরি দহনের শিকার হয়েছে ওখানকার অধিবাসীরা এবং মোট মৃত্যুর অর্ধেকেরই মূলে আছে অগ্নিদাহ। হিরোসিমার ক্যামেইযামা হাসপাতাল থেকে এ সম্পর্কে চাঞ্চল্যকর কিছু তথ্য পাওয়া গেছে। জানা গেছে, মূল বিস্ফোরণ-কেন্দ্র থেকে ১ কিলোমিটার অবধি দূরে যারা থাকত এবং যারা অগ্নিদগ্ধ হয়েছিল তাদের মধ্যে, শতকরা ৫৩ জন এক সপ্তাহের মধ্যে প্রাণ হারায় এবং শতকরা ৭৫ জন প্রাণ হারায় এক পক্ষকালের মধ্যে। আহত হবার পর থেকে চতুর্থ দিনেই সবচেয়ে বেশি লোকের মৃত্যু হয়। তৃতীয় এবং চতুর্থ সপ্তাহে মৃত্যুর জোয়ার আসে আবার। ঐ সময়ে লক্ষ্য করা হয়, বিষাক্ত রশ্মির বিকিরণের ফলে আহত হতভাগ্যদের দেহে যে সব ক্ষতের সৃষ্টি হয়েছিল, তাদের কেন্দ্র করে বিচিত্র সব উপসর্গ দেখা দিচ্ছে। মরণ-যন্ত্রণা দেখতে দেখতে উন্মাদ করে তুলছে আহতদের। কিন্তু তবু বলবো, এই সব কিছুই হল পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরণের পরোক্ষ প্রতিক্রিয়া, আগুন নিয়ে খেলার অনিবার্য পরিণাম। আসল খেলা জমে উঠেছিল বোমা-বিস্ফোরণের পর-মুহূর্তে। প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে, সর্বগ্রাসী এক আগুনের ঝড় হিরোসিমার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হয় তখন এবং দীর্ঘ ৬ ঘণ্টা ধরে শহরটির ওপর তার তাণ্ডব চলে। এই তাণ্ডব শেষ হলে দেখা যায়, হিরোসিমার ১২ বর্গ কিলোমিটার অংশ জ্বলে-পুড়ে ছাই হয়ে গেছে এবং কর্মব্যস্ত অতি সুন্দর একটা মহানগরী মহা-শ্মশানের বিভীষিকা নিয়ে হাহাকার করছে। অতি সাংঘাতিক সেই হাহাকার। বাতাস চারিদিক থেকে ঘণ্টায় ৫০-৬০ কিলোমিটার বেগে ছুটে এসে ইন্ধন যোগায় ওতে। শহরের শতকরা ৭০টি দমকল অকেজো হয়ে পড়ে, জলের পাইপগুলো ফেটে যায় এবং আহত ও মুমূর্ষুদেব চিৎকারে সমগ্র অঞ্চলটি হয়ে ওঠে বিরাট একটা বধ্যভূমি। কিন্তু তবু হয়েছিল চেষ্টা। মৃত্যুপথযাত্রীদের বাঁচাবার জন্যে অকেজো দমকল ও ভাঙা পাইপ দিয়েই মানুষ চেয়েছিল আগুন নেভাতে। চেয়েছিল, কিন্তু পারে নি; 'গ্রাউন্ড্-জিরো'র ১ই কিলোমিটার এলাকার মধ্যে এগোতে পারে নি কেউ। কে এগোবে? হাজার রাবণের চিতা কোটি রাক্ষসের ভীষণতা নিয়ে ওখানে অগ্নি-উদ্গিরণ করছে তখন। আর ওখানে তখন ৪৫,০০০ মৃতদেহ অগ্নিশয্যায় শায়িত।

হ্যাঁ, বিস্ফোরণের দিনে মোট ৪৫,০০০ হতভাগ্য প্রাণ দিয়েছিল হিরোসিমায় এবং আরও ২০,০০০ প্রাণ দিয়েছিল বিস্ফোরণের পর থেকে ৪ মাসের মধ্যে। তবে উদ্ধারকারীদের মধ্যে ঠিক যে কতজন মরণরশ্মির বিকিরণের শিকার হয়েছিল, তার সঠিক হিসেব আজও অবধি পাওয়া যায় নি। হিসেব দেবে কে? হিরোসিমার প্রেতপুরীতে যারা বেঁচেছিল, কোনরকম হিসেব নেবার মত মানসিক অবস্থা তাদের তো থাকবার কথা নয়। তারা জাগ্রত অবস্থাতেই দুঃস্বপ্ন দেখছিল অনুক্ষণ। আর দেখছিল,—জল নেই, খাদ্য-সরবরাহ বন্ধ এবং বিদ্যুৎ-ব্যবস্থা অচল। অর্থাৎ চারদিক থেকে অভূতপূর্ব একটা দুর্বিপাক গ্রাস করতে চাইছে ওদের। সাহায্য আসছে না কোনখান থেকে, অথচ সবখান থেকেই সাহায্যপ্রার্থী আর্ত মুমূর্ষুদের চিৎকার ভেসে আসছে।

শোনা যায়, ধ্বংসলীলার এই স্মৃতি হিরোসিমার মরণযজ্ঞের প্রত্যক্ষদর্শীদের মনে দারুণ এক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল। সেই প্রতিক্রিয়া এমন কি আজও অনেককে স্বাভাবিক জীবনযাত্রাপথে বিভ্রান্ত করে তোলে। আর স্বাভাবিক জীবনযাত্রার সুযোগই বা হিরোসিমা ও নাগাশাকির হতভাগ্যদের মধ্যে ক'জন পেয়েছে। ক'জনই বা সর্বনেশে রশ্মির বিকিরণ-প্রভাব থেকে শেষ পর্যন্ত অব্যাহতি পেয়েছে!

নির্ভরযোগ্যসূত্রে জানা যায়, অব্যাহতি-পাওয়া মানুষের সংখ্যা ছিল মুষ্টিমেয়। সেই মুষ্টিমেয়দেরও অনেকেই আবার বিকিরণের পরোক্ষ-শিকার হয়েছিল। হয় বংশগত কোন বিকৃতি দেখা দিয়েছিল ওদের, আর না হয় দেখা দিয়েছিল এমন কোন রোগ যা'তে আক্রান্ত হলে জীবন-প্রদীপটি নিভু নিভু হয়ে জ্বলতে থাকে এবং তারপর অনিবার্যভাবেই একদিন নিভে যায়। এই শ্রেণীর রোগের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হল লিউকোমিয়া ও ক্যান্সার। লিউকোমিয়া বলতে বুঝি এক ধরণের মারাত্মক রোগ। রক্তমধ্যস্থ শ্বেতকণিকার অস্বাভাবিক রকম বৃদ্ধির ফলে এর উদ্ভব হয়। বিশেষজ্ঞরা কিছুদিন থেকেই সন্দেহ করছিলেন, বার বার নিয়ন্ত্রিত হারে পারমাণবিক বিকিরণের সংস্পর্শে এলে এই রোগটি দেখা দিলেও দিতে পারে। কিন্তু হিরোসিমা ও নাগাশাকিব নাগরিকদের বেলায় দেখা গেল; বিকিরণেব মাত্রা একবারে যদি বেশি পরিমাণে হয় তবে লিউকোমিয়ার প্রাদুর্ভাব অবশ্যম্ভাবী। ১৯৪৮ খৃস্টাব্দে এই দু'টি শহরের অধিবাসীদের মধ্যে লিউকোমিয়া বেড়ে চলল এবং বাড়তে বাড়তে গিয়ে চরমে পৌঁছুল ১৯৫০-৫২ খৃস্টাব্দের মধ্যে। ১৯৫২ খৃস্টাব্দের পর থেকে হিরোসিমা ও নাগাশাকিব অধিবাসীদের মধ্যে লিউকোমিয়ার প্রসার হ্রাস পেল বটে, কিন্তু ঠিক দেখা গেল, জাপানের অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় এ দু'টি অঞ্চলে রোগটির অত্যাচাব অপেক্ষাকৃত বেশি। এ ছাড়া সব রকম বয়সীরাই লিউকোমিয়ায় আক্রান্ত হল; তবে কম বয়সীদের মধ্যে এর প্রভাব অনেক বেশি চোখে পড়ল যেন। চিকিৎসকরা বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করলেন, হিরোসিমা ও নাগাশাকির 'গ্রাউন্ড্-জিরো' এলাকার ১ কিলোমিটারের মধ্যে যাঁরা

ছিলেন তাঁদের মধ্যে লিউকোমিয়ার প্রকোপ দূরবর্তী এলাকার অধিবাসীদের তুলনায় ৫০ গুণ বেশি। এ ছাড়া মারাত্মক সব ক্যান্সার রোগেও এই দু'টি শহরের অধিবাসীদের অনেককেই ভুগতে দেখা গেল; আর বিশেষ করে দেখা গেল 'থাইরয়েড্'-গ্রন্থির ক্যান্সার। কিন্তু ক্যান্সার বা লিউকোমিয়া নয়, হিরোসিমা ও নাগাশাকির অবশিষ্ট অধিবাসীদের মধ্যে সবচেয়ে মর্মস্পর্শী যে জিনিসটি দেখা গেল, তা হল ওদের গড় আয়ুর স্বল্পতা। ক্ষতিকর রশ্মির বিকিরণের ফলেই যে এরূপ ঘটছে, সে বিষয়ে সন্দেহ থাকল না কারও। আর সন্দেহ থাকল না, নবজাতকদের দুর্ভাগ্য সম্পর্কে। সভয়ে লক্ষ্য করলেন সবাই, পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরণের সময় যে সব নারী সন্তান-সম্ভবা ছিলেন তাঁদের সন্তানদের অধিকাংশই বিকৃত হয়ে ভূমিষ্ঠ হচ্ছে। অধিকাংশেরই মাথা স্বাভাবিক-শিশুদের তুলনায় অনেক ছোট হচ্ছে। আর শুধু তাই নয়, অনেকেরই বয়স বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে মানসিক বিকৃতির লক্ষণ প্রকট হয়ে উঠছে।

ওপরের এই বর্ণনা থেকে পরমাণু বোমার ভয়াবহ ক্ষমতা সম্বন্ধে মোটামুটি একটা ধারণা করা চলে। কিন্তু মনে রাখা দরকার যে, হিরোসিমা ও নাগাশাকির ওপর যে দু'টি বোমা বিদীর্ণ হয়েছিল তাদের শক্তির পরিমাপক ছিল কিলোটন। এখন ওদের চেয়ে আরও অনেক বেশি শক্তিশালী অস্ত্র তৈরি হয়েছে। রাক্ষুসে ঐ সব পারমাণবিক অস্ত্রের শক্তিকে এখন 'মেগাটন'-এর মাধ্যমে প্রকাশ করা হচ্ছে। ১ মেগাটন হল ১০ লক্ষ টন বিস্ফোরক 'টি এন্ টি'র সমান। এদিকে আগেই বলেছি, হিরোসিমার ওপর যে পরমাণু বোমাটি বিদীর্ণ হয় তার ধ্বংসাত্মক ক্ষমতা ছিল ২০ হাজার টন 'টি এন্ টি'র সমতুল্য। অর্থাৎ এখনকার ১ মেগাটন শক্তিবিশিষ্ট একটি পরমাণুবোমার শক্তি হিরোসিমার মৃত্যুদূতটির চেয়ে ৫০ গুণ বেশি। এদিকে ১ মেগাটন তো অতি তুচ্ছ, ৫০ এবং এমন কি ১০০ মেগাটন অবধি শক্তিবিশিষ্ট পারমাণবিক অস্ত্র এরই মধ্যে তৈরি হয়েছে। অর্থাৎ, হিরোসিমার বোমাটির চেয়ে কয়েক হাজার গুণ শক্তিশালী মারণাস্ত্র এরই মধ্যে গড়ে ফেলেছে উৎসাহীরা। এই সব মারণাস্ত্র জনবহুল অঞ্চলের ওপর ফাটালে কী ধরণের প্রতিক্রিয়া হতে পারে তা' নিয়ে চিন্তা করেছেন রাষ্ট্রসংঘের নিযুক্ত বিশেষজ্ঞ-কমিটি। প্রতিক্রিয়ার পরিমাপ করতে গিয়ে ১ মেগাটন শক্তিবিশিষ্ট একটিমাত্র হাইড্রোজেন বোমাকে প্রতীক হিসেবে নিয়েছেন ওঁরা, বলেছেন, এই বোমাটিকে যদি ১০ লক্ষ লোক-অধ্যুষিত এবং ২৫০ বর্গ কিলোমিটার আয়তন-বিশিষ্ট কোন শহরের ওপর ফাটানো হয় তবে হতাহতের সংখ্যা দাঁড়াবে এইরকম ঃ—

ঝঞ্ঝা এবং আগুনে নিহত—২ লক্ষ ৭০ হাজার

তেজস্ক্রিয়তার ফলে নিহত—৯০ হাজার

আহত—৯০ হাজার

অর্থাৎ, একটিমাত্র বোমার আঘাতে শহরটির এক-তৃতীয়াংশেরও বেশি লোকের মৃত্যু হবে। মোট মৃতের সংখ্যা দাঁড়াবে ৩ লক্ষ ৬০ হাজার। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে বিমান-আক্রমণের ফলে সমগ্র জার্মানী এবং জাপান মিলিয়ে ঠিক এই পরিমাণ লোকের মৃত্যু হয়েছিল।

বিশেষজ্ঞদের ধারণা, ১ মেগাটন শক্তি-সম্পন্ন কোন পরমাণুবোমা নিক্ষিপ্ত হলে ঐ বিশেষ শহরটির কেন্দ্রীয় অঞ্চলের প্রায় সমস্ত লোকই মরবে। দেখতে দেখতে অগ্নি-ঝঞ্ঝা দেখা দেবে সেখানে এবং সেখানকার ৬ কিলোমিটার দীর্ঘ ও ৫ কিলোমিটার চওড়া এলাকা জুড়ে ধ্বংস ও মৃত্যু ছাড়া অন্য কিছু অবশিষ্ট থাকবে না। ভাগ্যক্রমে এখানকার কেউ যদি সাময়িকভাবে বাঁচেও তো কয়েক দিনের মধ্যেই তার মৃত্যু হবে পারমাণবিক তেজস্ক্রিয়তার ফলে। এ ছাড়া এই কেন্দ্রীয় অঞ্চলটির সীমানা থেকে ২½ কিলোমিটার অবধি দূরে যাঁরা থাকবেন তাঁদের মধ্যে শতকরা ৭৫ জন হবেন হতাহত। এইভাবে 'গ্রাউন্ড্ জিরো' এলাকা থেকে যত দূরে যাওয়া যাবে, হতাহতের সংখ্যা ততই কমে আসবে বটে; কিন্তু তা' সত্ত্বেও শহরবাসীদের মধ্যে এমন কি নিরাপদ দূরত্বে যাঁরা আছেন তাঁদের মধ্যে শতকরা ২০ জন পারমাণবিক তেজস্ক্রিয়তার কবল থেকে রেহাই পাবেন না। শেষ পর্যন্ত ঐ শহরটির অর্ধেক সংখ্যক লোক হয়তো অক্ষত থাকবেন; কিন্তু তার মানে এই নয় যে, ওঁরা ওঁদের স্বাভাবিক জীবনকে ফিরে পাবেন আবার। স্বাভাবিক বলে কোন কিছুই সে শহরে আর অবশিষ্ট থাকবে না। সেখানকার প্রতিটি বাড়ি

পরমাণুবোমা বিস্ফোরণের ঠিক পরমুহূর্তে

"মুক্তকেশের পুঞ্জ মেঘে
লুকায় অশনি"
সাধনার
মহাভৃঙ্গরাজ তৈল
মেঘের মত ঘন কুন্তল কেশদাম নারীদের আভিজাত্যের নিদর্শন। তাই কবি বলেছেন— "চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা" সেইজন্য সৌন্দর্য বিলাসিনী মাত্রেই ব্যবহার করেন সাধনার মহাভৃঙ্গরাজ তেল বিশুদ্ধ আয়ুর্বেদ মতে প্রস্তুত স্নিগ্ধ ও শীতল। কেশ উৎপাদনে ও সংরক্ষণে এর জুড়ি নেই।
সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা
৩৬,সাধনা ঔষধালয় রোড;সাধনা নগর,কলিকাতা-৪৮
অধ্যক্ষ যোগেশচন্দ্র ঘোষ,এম,এ,আয়ুর্বেদশাস্ত্রী,এফ,সি,এস(লণ্ডন) এম,সি,এস(আমেরিকা)ভাগলপুর কলেজের রসায়নশাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক।
কলিকাতাকেন্দ্র:ডাঃ নরেশচন্দ্র ঘোষ,এম,বি,বি,এস(কলি)আয়ুর্বেদাচার্য্য

কমবেশি পরিমাণে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। ঘর-বাড়ির এক-তৃতীয়াংশ ভেঙে-চুরে, জ্বলে-পুড়ে ধ্বংস হয়ে যাবে একেবারে। অপর এক-তৃতীয়াংশেরও ক্ষতি হবে মারাত্মক রকম। বাকী এক-তৃতীয়াংশের অবস্থা জোড়াতালি দিয়ে কাজ চালাবার মত থাকবে-বটে, কিন্তু ওখানে থেকে কোন কাজ করতে নিশ্চয় রাজী হবেন না কেউ। কেন না, ঘর-বাড়িগুলোকে যুদ্ধক্ষেত্রে আহত সৈনিকের মত দেখাবে তখন। দেখাবে, বাড়িগুলের কোনটার ছাদ ভাঙা, কোনটাব দরজা-জানালা উড়ে গেছে, কোনটা আবার পোড়া রুটির মত কালো, বিকৃত ও দুমড়ান। এ ছাড়া জল ও খাদ্য-সরবরাহ এবং বিদ্যুৎ-ব্যবস্থা বানচাল হয়ে যাবে তখন; সমগ্র শহরে এমন একটি বাড়িও থাকবে না যেখানে শহুরে জীবনের স্বাভাবিক সুযোগ-সুবিধেগুলো মিলছে। এইখানে প্রশ্ন করতে পারেন অনেকেই, শহরের পথঘাটগুলো থাকবে কি? উত্তর হল,—না, থাকবে না। ওদের অধিকাংশেরই হাল দাঁড়াবে রাবার দিযে মুছে ফেলা সরলবেখার মত।

তাহলে দেখছি, শুধু একটিমাত্র ১ মেগাটন পরমাণুবোমার মধ্যে ধ্বংস ও মৃত্যুর যে বীজ নিহিত আছে তা' একটি বিরাট শহরকে পংগু ও অকেজো করে দেবার পক্ষে যথেষ্ট। তবে এমন কথা মনে করার কোন কারণ নেই যে, শহবটির উপর শুধু একটিই পরমাণু বোমা নিক্ষিপ্ত হবে অথবা ১ মেগাটনেব একটি মৃত্যুদূতকে বিদীর্ণ করেই সন্তুষ্ট থাকবেন সমর-নায়করা। যুদ্ধ যদি বাধে তো একাধিক এবং ১ মেগাটনের চেয়ে অনেক বেশি শক্তিসম্পন্ন পবমাণুবোমা ব্যবহারের সম্ভাবনা দেখা দেবে। এই সম্ভাবনার কথা ভেবে উৎসাহীরা এরই মধ্যে তৎপর হয়েছেন। মারাত্মক সব পারমাণবিক অস্ত্র এরই মধ্যে সযত্নে মজুত করে রাখছেন ওঁরা। ওঁদের ঐ সব মজুত অস্ত্রসম্ভারের কার্যকরী ক্ষমতা নিয়ে আলোচনার আগে ১ মেগাটন পরমাণু বোমাটির প্রতিক্রিয়া কতদূর অবধি গড়াতে পারে, তা নিয়ে আলোচনা কবা যাক। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, প্রতিক্রিয়া গড়াতে পারে অনেকদূর অবধি। বোমাটি যদি মাটিতে ফাটে তো তেজস্ক্রিয়তা এমন কি কযেক শো বর্গ কিলোমিটার অবধি ব্যাপ্ত হতে পারে। ঐ বিরাট এলাকা জুড়ে উপযুক্ত আশ্রয়ে থাকবেন না যাঁরা অথবা যাঁরা তেজস্ক্রিয়তা কমে আসা অবধি উপযুক্ত আচ্ছাদন ব্যবহার করবেন না তাঁদের অনেকেই ক্ষতিকর বিকিরণের শিকার হতে পারেন। মারাত্মক সব প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে তাঁদের দেহে। অথবা এমনও হতে পারে যে, প্রতিক্রিয়া বাইরে থেকে কিছুই দেখা যাবে না; ভিতর থেকে ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়বেন তাঁরা। আর বোমাটি যদি হয় ১০ মেগাটন শক্তিসম্পন্ন; ভিতর-বাহির তখন একাকার হয়ে যাবে। তখন ধ্বংস-লীলা চলবে ৩০০ এবং এমন কি ৫০০ বর্গ কিলোমিটার এলাকা জুড়ে। অর্থাৎ, ১০ লক্ষ লোক অধ্যুষিত ঐ গোটা শহরটাই ধ্বংস হয়ে যাবে তখন; অগ্নিঝঞ্ঝা ও বিকিরণের পরিমাণ এত প্রচণ্ড হবে যে শহরটির সীমানার বাইরেও তাণ্ডব চলবে অনিবার্যভাবেই। এমন কি 'গ্রাউন্ড্-জিরো' এলাকা থেকে ২০ কিলোমিটার দূরে আছে যে সব গাছপালা, সেগুলোও জ্বলে উঠবে দাউ দাউ করে। আর বোমা-বিস্ফোরণেব কেন্দ্রটি থেকে ২৫ কিলোমিটার অবধি দূরবর্তী জনপ্রাণীদের অর্ধেকেরও বেশি মৃত্যুবরণ করবে।

এই অবধি গেল ১ ও ১০ মেগাটন পরমাণুবোমার প্রসঙ্গ। এ ছাড়া ২০ মেগাটনের ধ্বংসাত্মক ক্ষমতা নিয়েও রাষ্ট্র-সঙ্ঘের বিশেষজ্ঞ-কমিটি পর্যালোচনা করেছেন। সময় থাকতেই সাবধান কবে দিয়ে বলেছেন ওঁরা যে এই ধরণের বোমা বিস্ফোরণ-কেন্দ্র থেকে এমন কি ৩০ কিলোমিটার দূরেও আগুন জ্বালাতে সমর্থ। আর আকাশ যদি পরিষ্কার থাকে তো এ থেকে ৬০ কিলোমিটাব অবধি দূরবর্তী মানুষদেরও জীবন বিপন্ন হতে পারে। হিসেব করে দেখা গেছে, ২০ মেগাটন একটি বোমা যদি নিউ ইয়র্কের ম্যানহাটান অঞ্চলে বিদীর্ণ হয় তবে এই শহরটির ৮০ লক্ষ লোকের মধ্যে ৬০ লক্ষেরই মৃত্যু হবে; এবং এ ছাড়া মৃত্যু হবে আরও ১০ লক্ষের। এই শেষের হতভাগ্যরা নিউ ইয়র্কের শহরতলী বা কাছাকাছি কোন অঞ্চলের অধিবাসী। ২০ মেগাটনের এই মৃত্যুদূতটি আকাশে না ফেটে মাটিতে ফাটে যদি তো রাক্ষুসে এক জ্বালামুখ বা গর্ত তৈরি হবে এবং সে গর্তের ব্যাস ও গভীরতা হবে যথাক্রমে ৪০০ ও ৯০ মিটার। অতএব দেখছি, কোন মহানগবীতে একটিমাত্র পবমাণুবোমা বিদীর্ণ হলেই ক্ষতির বহর কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধকে ছাড়িয়ে যাবে। কিন্তু আক্রমণের উপকরণ যদি হয একাধিক অস্ত্র? যদি একাধিক পারমাণবিক বোমা কোন একটি দেশের বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে ফাটানো হয়, ক্ষতির পরিমাণটা কি হবে তবে? বিশেষজ্ঞদের ধাবণা, এক্ষেত্রে 'ক্ষতির পবিমাণ নির্ভর করবে অঞ্চলটির অবস্থান ও প্রকৃতির উপব। পারমাণবিক বোমার লক্ষ্য যদি হয় কোন শিল্পাঞ্চল তবে অবস্থাটা কী দাঁড়াতে পারে, তা' নিয়ে গবেষণা হয়েছে প্রথমে। বলা হয়েছে, কল্পনা করা যাক এমন একটি বিরাট শিল্পাঞ্চলের কথা- যেখানে আছে ৯টি শহর এবং সে শহরগুলির প্রত্যেকটিতেই ৫০ হাজারেরও বেশি লোক বাস করে। এই সংগে কল্পনা করা যাক আরও যে ঐ শিল্পাঞ্চলে ৫০ হাজারের চেয়ে কম লোক-অধ্যুষিত আরও ১৪০টি শহর আছে এবং ঐ শহরগুলোর মধ্যে ৬০টিতে আছে গুরুত্বপূর্ণ সব শিল্প। এখন এই শিল্পাঞ্চলের ৯টি শহরের প্রত্যেকটিতে যদি একটি করে ১ মেগাটন বোমা নিক্ষিপ্ত হয় তবে সমগ্র অঞ্চলটির মোট জনসংখ্যার শতকরা ২০ জনের মৃত্যু হবে বলে বিশেষজ্ঞদের ধারণা। অবশ্য খোদ শহরগুলোতে এবং মূল শিল্পকেন্দ্রগুলোতে মৃত্যুর সংখ্যা এর চেয়ে অনেক বেশি দাঁড়াবে। পারমাণবিক অস্ত্র-গুলো ঠিক ওদের দিকে তাক করে যদি নিক্ষিপ্ত হয় তো শহরে ও শিল্পকেন্দ্রে মৃত্যুর সংখ্যা দাঁড়াবে যথাক্রমে শতকরা ৩০ ও ৩৫। এছাড়া ঐ সব অঞ্চলের ঘর-বাড়িগুলোর প্রায় অর্ধেকই ধ্বংসস্তূপে পরিণত হবে; আব শিল্প-প্রতিষ্ঠান-গুলোর মধ্যে সরাসরি ধ্বংস হবে শতকরা ৭০টি। পরোক্ষভাবে শতকরা ৯০টি শিল্প ক্ষতিগ্রস্ত হবে। কেন না, বিভিন্ন শহবের আশেপাশে থাকবে যে সব কল-কারখানা, যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন হবার ফলে এবং খাদ্য ও বিদ্যুৎ-সরবরাহ বানচাল হবার ফলে সেগুলোর অধিকাংশই অকেজো হয়ে পড়বার সম্ভাবনা। এছাড়া কোন একটি ছোটখাটো দেশের ওপর পারমাণবিক বোমা নিক্ষিপ্ত হলে ক্ষতিটা কী ধরণের হবে, তারও একটি চিত্র রাষ্ট্র-সঙ্ঘের বিশেষজ্ঞ-কমিটি উপস্থাপিত কবেছেন। বিশেষজ্ঞদের ধারণা, দেশটি যদি হয় দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে যথাক্রমে ১০০০ ও ৫০০ কিলোমিটার এবং তার জনবসতি যদি হয় প্রতি বর্গ কিলোমিটারে ১০০, তবে ৪টি মাত্র ২০-মেগাটন পবমাণুবোমার সাহায্যেই সে দেশের এক-পঞ্চমাংশ সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস হবে এবং তেজস্ক্রিয়তার কমবেশি প্রভাব ছড়িযে পড়বে গোটা দেশ জুড়ে। তবে দেশটি অপেক্ষাকৃত বড় হলে এবং পারমাণবিকবোমা ফেলা হলে পাইকারীভাবে, বিপর্যয় আরও বড় আকারের হতে পারে। হিসেব করে দেখা গেছে, ১০ মেগাটন শক্তিবিশিষ্ট ৪০০ পরমাণুবোমা যদি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শহরগুলোকে তাক করে ফেলা হয় তবে সে দেশের অর্ধেকেরও বেশি লোকেব মৃত্যু হবে এবং সমগ্র দেশটি পরিণত হবে শ্মশানপুরীতে। কেন না, ১০ কোটিরও বেশি হতভাগ্যের মৃতদেহ সভ্যতাব এক বিরাট সমাধি রচনা কববে সেখানে এবং শেষ পর্যন্ত যারা সেখানে বাঁচবে তাদেরও গতিটা হবে ঐ সমাধিরই দিকে। দেখতে দেখতে খাদ্যদ্রব্য বিষাক্ত হয়ে উঠবে সে দেশের। সেখানকার শাক-সব্জী, ফলমূল

ও পানীয় জলের মধ্যে তেজস্ক্রিয়তার প্রভাব ছড়িয়ে পড়বে।

এইখানে প্রশ্ন করেন অনেকেই, যুদ্ধ-ক্ষেত্রের ওপর পরমাণুবোমার প্রতিক্রিয়া কতদূর অবধি গড়াতে পারে? এ-প্রশ্নেরও জবাব দিয়েছেন রাষ্ট্রসঙ্ঘের বিশেষজ্ঞ-কমিটি। বলেছেন, যুদ্ধে লিপ্ত উভয় পক্ষই যদি পরমাণুবোমা ব্যবহার করে তো প্রতিক্রিয়াটা মারাত্মক রকমের হওয়া মোটেই বিচিত্র নয়। মোটেই অস্বাভাবিক নয় কয়েক মিনিটের মধ্যে কয়েক লক্ষকে বলি দেওয়া। এছাড়া এই সঙ্গে সমগ্র যুদ্ধ-ক্ষেত্রটির ধ্বংসস্তূপে পরিণত হবার আশঙ্কা তো আছেই।

যুদ্ধক্ষেত্রের ওপর পরমাণুবোমার ধ্বংসলীলা নিয়ে সাম্প্রতিককালে বিস্তর গবেষণা হয়েছে। গবেষকদের কেউ কেউ কল্পিত একটি যুদ্ধক্ষেত্র বেছে নিয়ে ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাপ করেছেন। বলেছেন, ধরে নেওয়া যাক এমন একটি অঞ্চল যার সামনের দিকটা ২৫০ কিলোমিটার চওড়া এবং যার মধ্যে ৫০ কিলোমিটার অবধি জায়গা জুড়ে সৈন্য ও সমরোপকরণ ছড়িয়ে আছে। এই অঞ্চলটিতে ১০০টি ছোট-খাটো পারমাণবিক অস্ত্র নিক্ষিপ্ত হলেই যুদ্ধ করবার মত আর একজনও অবশিষ্ট থাকবে না। আর যুদ্ধটা যদি আরও একটু বড় অঞ্চল জুড়ে অপেক্ষাকৃত বড় আকারের হয় এবং সে যুদ্ধে ব্যবহৃত হয় ৪০০টি ছোটবড় পারমাণবিক অস্ত্র তবে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ দাঁড়াবে দ্বিতীয় মহা-যুদ্ধে বোমাবর্ষণের ফলে সংঘটিত মোট সর্বনাশের ৬ গুণ।

এদিকে অনেকেই আশঙ্কা প্রকাশ করছেন এই বলে যে, তৃতীয় আর একটি মহাযুদ্ধ বিভিন্ন দেশে পুঞ্জীভূত কয়েক হাজার পরমাণুবোমার মধ্যে স্তব্ধ হয়ে আছে। এই সব বোমার শক্তি কিলোটন থেকে সুরু করে মেগাটন অবধি। ৫০-৬০ মেগাটন পরমাণুবোমার পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ এরই মধ্যে প্রত্যক্ষ করেছি আমরা এবং আমরা ধরেই রেখেছি, ১০০ মেগাটন নিয়ে পরীক্ষার খবরও যে কোন মুহূর্তে পেতে পারি।

এইখানে বলে রাখা ভাল যে, ১০০ মেগাটন পরমাণুবোমাটির শক্তি দাঁড়াবে হিরোসিমাতে বিদীর্ণ মৃত্যুদূতটির ৫,০০০ গুণ। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, অবস্থা যা দাঁড়িয়েছে, তা দেখে মনে হয়, এ-হেন বিধ্বংসী অস্ত্র আজ পৃথিবীর যে কোন দেশের বায়ুমণ্ডলে ফাটানো হতে পারে। অর্থাৎ, যে কোন দেশকে এবং এমন কি মহাদেশকে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে মহাশ্মশানে পরিণত করা আজ কঠিন নয় মোটেই।

শ্মশান-শ্মশান খেলাটা অবিশ্যি অন্যভাবেও জমে উঠতে পারে। এমনও হতে পারে যে, শ্মশানে আগুন জ্বলবে না এককণা; অথচ আস্ত এক-একটা দেশ ছারখার হয়ে যাবে। অনুকূল আবহাওয়ার দিকে লক্ষ্য রেখে সমুদ্রের তীর ঘেঁষে জাহাজের ওপর ফাটানো হবে পরমাণুবোমা এবং তারপর সমুদ্রের রাক্ষুসে ঢেউ বা 'টাইড্যাল ওএইভ' এসে গোটা দেশটিকে গ্রাস করবে। অর্থাৎ, এক্ষেত্রে পাইকারী হারে সলিল-সমাধি লাভ করবে হতভাগ্যের দল; ওরা জ্বলেপুড়ে না মরে জলের তলায় দম বন্ধ হয়ে মরবে।

বিশেষজ্ঞদের ধারণা, পারমাণবিক যুদ্ধটা পুরোপুরি জমে উঠলে জল-স্থল, আকাশ-বাতাস কিছুই রেহাই পাবে না। এমন কি যে দেশগুলো যুদ্ধে লিপ্ত নয়, রেহাই পাবে না তারাও। কারণ, তেজ-স্ক্রিয় পদার্থ অতিকায় মেঘের আকারে দূর-দূরান্তরে ভেসে বেড়াবে এবং তারপর ধীরে ধীরে সেই মেঘ থেকে থিতিয়ে পড়বে সর্বনাশা মৃত্যুকণিকাগুলো। অর্থাৎ এককথায়, মেগাটন-মার্কা পারমাণবিক অস্ত্রের প্রয়োগ ঘটা করে যদি হয় তো পৃথিবীর কোন অংশই তার কবল থেকে পরিত্রাণ পাবে না।

এমন প্রশ্ন, এ ধরণের বিশ্বব্যাপী যুদ্ধ আদৌ হতে পারে কি? প্রাজ্ঞদের অনেকেই বলছেন,—না, পারে না হতে। কারণ, পারমাণবিক অস্ত্রধারী কোন শক্তি ঠিক সেই ধরণের কোন শক্তিকে আঘাত করতে সাহস পাবে না। আঘাত করলেই প্রত্যাঘাতের ভয় থাকবে এবং বিরুদ্ধশক্তির প্রতিশোধ-স্পৃহাটা মারাত্মক হয়ে উঠতে কতক্ষণ! এই প্রতিশোধের কথা পর্যা-লোচনা করতে গিয়ে অনেকেই মন্তব্য করেছেন, পারমাণবিক যুদ্ধ যদি বাধে তো প্রথম আক্রমণকারীরই ক্ষতিটা হবে বেশি; কারণ আক্রমণ সুরু হবার সঙ্গে সঙ্গেই আহত দেশ মরিয়া হয়ে উঠবে, শত্রুপক্ষকে সে জব্দ করতে চাইবে সর্বশক্তি প্রয়োগ করে। অতএব, কোন দেশই প্রথম-আক্রমণ-কারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে চাইবে না; সে চাইবে না যে তার ইমারতশোভিত শহরগুলো ধ্বংসস্তূপে পরিণত হোক।

এইখানে সাধারণ মানুষের মনে সংশয় দেখা দেয়। তাঁরা প্রশ্ন করেন, দেশ চাইবে না ঠিক কথা, কিন্তু দেশের নায়করা যদি চান? যদি মুষ্টিমেয় একটি-দু'টি মানুষ এক মুহূর্তের জন্যে ভুল করে বসেন? বিজ্ঞানের ক্ষমতা আজ যে রাষ্ট্র-নায়কদের হাতে পুঞ্জীভূত, তাঁদের এক-জনও এক মুহূর্তের জন্যে উন্মাদ হয়ে ওঠেন যদি?

বলা বাহুল্য, সাধারণের এই সব প্রশ্ন পৃথিবীর কোটি কোটি শান্তিকামী মানুষকে আজ উদ্বেজিত করেছে এবং শান্তিকামীরা আজ সঙ্গত কারণেই বলছেন, পারমাণবিক অস্ত্রসম্ভার যতদিন থাকবে, পারমাণবিক যুদ্ধের সম্ভাবনাও ততদিন বিলুপ্ত হবে না।

এদিকে মুখে শান্তির কথা বলছেন সবাই; কিন্তু কার্যত অস্ত্র-গড়ার কাজে কোটি কোটি টাকা জলের মত খরচ হচ্ছে; এবং এরই মধ্যে শুধুমাত্র মার্কিন যুক্ত-রাষ্ট্র ও রাশিয়া যে পরিমাণ পারমাণবিক অস্ত্র মজুত করেছে, তা দিয়ে পৃথিবীকে কয়েক ডজন বার ধ্বংস করা যায়।

রবীন্দ্রভারতী প্রকাশনা

INDIAN CLASSICAL DANCES
শ্রীবালকৃষ্ণ মেনন
নৃত্যকলার শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যা ও প্রয়োগকলা নির্দেশিত। চিত্রভূষিত। ২৫·০০

The House of the Tagores
শ্রীহিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়
জোড়াসাঁকো ঠাকুর পরিবার ও পরিজনের পরিচয়বাহী গ্রন্থ। ২·০০

Tagore on Literature and Aesthetics
ডক্টর প্রবাসজীবন চৌধুরী ৮·৫০

Studies In Aesthetics
ডক্টর প্রবাসজীবন চৌধুরী ১০·০০

A Critique of the Theories of Viparyaya
ডক্টর ননীলাল সেন

Studies in Artistic Creativity
ডক্টর মানস রায়চৌধুরী ১৫·০০

রবীন্দ্র-সুভাষিত
রবীন্দ্ররচনার উদ্ধৃতিসম্ভার ১২·০০

রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে মৃত্যু
ডক্টর ধীরেন্দ্র দেবনাথ ৬·০০

পদাবলীর তত্ত্বসৌন্দর্য ও কবি রবীন্দ্রনাথ
ডক্টর শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য ৫·০০

গান্ধীমানস
রতনমণি চট্টোপাধ্যায়, প্রিয়রঞ্জন সেন, নির্মলকুমার বসু লিখিত। ৩·০০

রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়
৬।৪ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা-৭
পরিবেশক। 'জিজ্ঞাসা'
৩৩ কলেজ রো, ১৩৩এ রাসবিহারী এভিনিউ

ইলেকট্রনিক কম্পিউটার

মনোরঞ্জন হাজরা

অটোমেশন যাকে কেন্দ্র করে, সেই ইলেকট্রনিক কম্পিউটার সম্পর্কে বলছি। সাধারণভাবে মানুষ কাজ করে অফিসে আর কল-কারখানায়। এর সব কাজই ইলেকট্রনিক কম্পিউটার করতে পারে। শুধু পারেই না—মানুষ যে কাজ করতে অক্ষম বা যা মানুষের কল্পনাতীত, সে কাজও এই ইলেকট্রনিক কম্পিউটার করে দিতে পারে। সবচেয়ে বড় কথা এর অবিশ্বাস্য রকমের গতি। ইলেকট্রনিক কম্পিউটারের কাজকে আমরা যদি দু'ভাগে ভাগ করি, তাহলে বুঝতে সহজ হবে। প্রথমটি হচ্ছে অফিসের কাজ, দ্বিতীয়টি হচ্ছে, কারখানা বা কায়িক পরিশ্রমে যে কাজ হয় সেই কাজ।

এসব আলোচনার আগে মোটামুটি এই ইলেকট্রনিক কম্পিউটারের ইতিহাসটুকু একবার জেনে নিই। মার্কিন দেশেই এর সবচেয়ে বড় ঘাঁটি। 'ইন্টারন্যাশনাল বিসনেস মেসিন' (আই-বি-এম), 'রেমিংটন', 'ইউনিভ্যাক,' 'কন্ট্রোল ডাটা কর্পোরেশন' প্রভৃতির নাম এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়া হ্যানিওয়েলের নাম তো আছেই। ইংলণ্ডের সবচেয়ে বড় কোম্পানীর নাম হল "ইন্টারন্যাশনাল কম্পিউটার্স এ্যান্ড ট্যাবুলেটার্স" (আই-সি-টি) ফ্রান্স, পশ্চিম জার্মানী, জাপান প্রভৃতি ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতেও এই ইলেকট্রনিক কম্পিউটার তৈরি হয়। তবে ওসব দেশের কোম্পানীগুলি এখনও ভারতের বাজারে তেমন আধিপত্য বিস্তার করতে পারে নি—যতখানি করেছে মার্কিন কোম্পানীগুলি এবং মার্কিন কোম্পানী বলতে বিশেষ করে আবার আই-বি-এম কোম্পানী। এই আই-বি-এম কোম্পানী ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে ইলেকট্রনিক কম্পিউটারের প্রায় শতকরা ৬০ ভাগ বাজার দখল করে রেখেছে।

এই সব কোম্পানীগুলির তৈরি এই ইলেকট্রনিক কম্পিউটার যন্ত্র কি করতে পারে আর কি পারে না প্রথমে অফিসের কাজগুলি সম্পর্কে একটুখানি দেখে নেওয়া যাক। ১৯৬৪ সালের ১৩ই মে তারিখে মাদ্রাজের 'হিন্দু' পত্রিকা থেকে জানা যায় "টাটা ইন্সটিটিউট অব ফান্ডামেন্টাল রিসার্চ" কর্তৃক কন্ট্রোল ডাটা কর্পোরেশনের একটি ৩৬০০ মডেলের ইলেকট্রনিক কম্পিউটার আনা হয়। তাতে দেখা যায় পনেরোটি সংখ্যার ছ' লক্ষ যোগ ও বিয়োগ এবং দু' লক্ষ গুণ অথবা ভাগ এক সেকেণ্ডের মধ্যে এই যন্ত্রটি করে দিতে পারে। এই কোম্পানীরই আরেকটি মডেলের নম্বর হচ্ছে ৬৬০০। এটি প্রতি সেকেণ্ডে ৩০ লক্ষ অংক করে দেবে। আই-বি-এম-এর ৭০৯৩ মডেলে দেড় লক্ষ কেরানীর একত্র গোটা দিনের সম্পূর্ণ কাজকে এক ঘণ্টার কম সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করে দেবে। কাজেই অবস্থাটা কি সাংঘাতিক তা উপলব্ধি করে সব ব্যাপারটা আমাদের আলোচনা করতে হবে।

কতকগুলি প্রসেস

অফিসের ব্যাপারে অটোমেশনের কাজ সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলে সাধারণত পাঞ্চার, ইউনিট রেকর্ডার ও ইলেকট্রনিক কম্পিউটারের প্রয়োজনীয়তাই দেখা যায় বেশি। কর্মচারীরা অফিসে যে সব কাজ করেন, সে সব কাজ কম্পিউটারকে করতে হলে প্রথমে সবগুলিকে সাজিয়ে নেবার পর দেখা যাবে প্রতি কাজের থেকে কিছু সময় সঞ্চয় করা যায়। এইভাবে প্রতিটি অফিসের কাজ সরল পথে সাজিয়ে দেবার যে পদ্ধতি তাকে বলা হয় 'সিম্প্লিফিকেশন।' এই 'সিম্প্লিফিকেশনের' একটা উদাহরণ দেওয়া যাক : যেমন প্রতিটি কর্মচারীর মাসিক বেতনের একটা অংশ প্রভিডেন্ড ফান্ড বাবদ কেটে নিয়ে সেটা জমা করা হয়। তারপর ঐ জমার হিসাব রাখার জন্য একটি খাতায় ঐ কর্মচারীর নাম একটি পাতায় লিখে রাখা হয়। এই কাজটি প্রতি মাসেই একবার করে লিখতে হয় এবং প্রতি মাসে একই টাকার অংক লেখা হয়। এই অংকটি বছরে সাধারণত একবার মাত্র বদলায়, যখন নাকি বছরের শেষে উক্ত কর্মচারীর বেতন বৃদ্ধি হয়।

এখন কর্মচারীটির টাকার অংকটিকে যদি বছরের প্রথম মাসে লেখা হয় এবং কেবলমাত্র যে মাসে ঐ অংক বদলালো শুধু সেই মাসে আবার লেখা হয় তাহলে বাকি দশ মাস ধরে ঐ টাকার অংকটি লেখার পরিশ্রমকে বাঁচানো যায়। এর পর সহজেই বুঝতে পারা যায় যে ঐ প্রথম লেখার অংকটিকে যে ক'মাস টাকার অংক লেখা হয় নি, সে ক'মাসের সংখ্যা দিয়ে গুণ করলেই ফল বেরিয়ে যাবে। তারপর যে মাসে বেতন বৃদ্ধির দরুণ টাকার অংকের পরিবর্তন হল—সেই অংকটিকে পরের বছর অবশিষ্ট মাসের সংখ্যা দিয়ে গুণ করে এবং প্রথম ও দ্বিতীয় গুণফল দুটিকে যোগ করলেই উক্ত কর্মচারীটির প্রভিডেন্ড ফাণ্ডের সঠিক হিসাব বেরিয়ে আসবে। এইভাবে কাজ করানোর ফলে অটোমেশনের পূর্বে কেবলমাত্র 'সিম্প্লিফিকেশনের' নামেই কিছু সংখ্যক কর্মচারী বেকার হয়ে যাবেন। অবশ্য, যার গুণ ও যোগের কাজ নিখুঁত হয়। তবে, যেহেতু কম্পিউটার নিখুঁত হিসাব দিতে পারে, সেহেতু এই 'সিম্প্লিফিকেশন' পর্বটি এইভাবে সাজিয়ে নেওয়া হয়।

পরে যান্ত্রীকিকরণ অর্থাৎ উপরোক্ত যে কাজটি কর্মচারীদের দ্বারা হাতে করানো হয় সেই কাজটি যন্ত্রের সাহায্যে করানোকে যান্ত্রীকিকরণ বলে। ফলে এই কাজটি আরও কিছুটা দ্রুত এবং যন্ত্রের সাহায্যে সংগে সংগে গুণ বা যোগ করানোর ফলে আরও কিছুটা নিখুঁত হয়। এই দ্বিতীয় ধাপে আরও কিছু সংখ্যক কর্মচারী বেকার হতে বাধ্য।

প্রথম ও দ্বিতীয় পর্বের হিসাব করলে দেখা যাবে যে প্রতি ১০ জন লোকের কাজ ১ জন কর্মচারীকে দিয়ে করানো সম্ভব। ফলে শতকরা ১০ ভাগ কর্মচারীর জন্য যে ব্যয়ভার বহন করা হত তা বন্ধ করা গেল। এর জন্য কিন্তু উৎপাদিত দ্রব্যের মূল্য কমানো হয় না। কারণ তখন বলা হয় উৎপাদনের মূল্য (Cost of production) কমল তা কি হল—নতুন যন্ত্র কিনতে হয়েছে এবং তার ফলে যে ব্যয় হয়েছে তা যতদিন না উঠে আসছে ততদিন উৎপাদিত দ্রব্যের মূল্য হ্রাস সম্ভব নয়।

তৃতীয় পর্বে অটোমেশন

তারপর তৃতীয় পর্বে অটোমেশনের প্রথম ভাগ আরম্ভ হয়। ইউনিট রেকর্ডার মেসিনের দ্বারা কাজ করাতে হলে প্রথম কাজটিকে কার্ডে পাঞ্চ করে নেওয়া হয়। কার্ড অর্থাৎ পোস্টকার্ডের অনুরূপ একরকমের কার্ড। এই কার্ডের চওড়ার দিকে উপর হতে নিচে প্রথমে 'x', 'y' ও পরে 0, 1, 2 এইভাবে অংকের অক্ষর ছাপানো থাকে। একটি পাঞ্চ মেসিনের সাহায্যে কোন কাজের সকল বিষয় পাঞ্চ করে ঐ কার্ডের উপর লিখে রাখা হয়। তারপর ঐ কার্ড থেকে ইউনিট রেকর্ডারের সাহায্যে কাগজে ছাপানো হয়। এই কাজটি করার ফলে ইলেকট্রনিক কম্পিউটার আনার কাজ প্রায় সম্পূর্ণ হল বলা চলে। কেন না যেরকমভাবে কার্ড থেকে ইউনিট রেকর্ডার কাজ করে, ঠিক

সেইরকমভাবে ঐ কার্ড থেকেই ইলেকট্রনিক কম্পিউটার কাজ করে। এইভাবে সাধারণ কাজকে কার্ডের মধ্যে পাঞ্চ করে রূপান্তর করাটাকে ডাটা প্রসেসিং (Data processing) বলা হয়। অর্থাৎ সাধারণ কাজের সকল ডাটাই কার্ডে পাঞ্চ করে দেওয়ার পর ঐ কার্ড থেকে কাজকে যন্ত্রের সাহায্যে সম্পূর্ণ করা হয়।

কার্ডগুলি মূলে ভাউচার থেকে পাঞ্চাররা (From original vouchers) পাঞ্চ করে নেন। তারপর ঐ কার্ডকে, তার সংখ্যা দু শো, পাঁচ শো, হাজার দু হাজার যতই হোক—একসংগে ইলেকট্রনিক কম্পিউটারকে দেওয়া হয় এবং এর পর ঐ কম্পিউটারকে নির্দেশ দিলে তখনই সে কাজ করে দেয়। যদি ঐ কার্ডের মধ্যে কি লেখা আছে কেবলমাত্র সেইটুকু ছাপার অক্ষরে দিতে বলা হয় তো সে সেইটুকুই ছাপার অক্ষরে দেবে। যদি সব হিসাব চাওয়া হয় তবে সে তাই দেবে। এই কার্ডের লেখা পড়তে যদি সাধারণ মানুষের সময় লাগে ১০ সেকেণ্ড তো ইলেকট্রনিক কম্পিউটারের পড়তে লাগবে মাত্র ১/১১ মাইক্রো সেকেণ্ড (১ সেঃ= ১,০০,০০০ মাইক্রো সেঃ) অর্থাৎ এইটুকু সময়ের মধ্যে ঐ লেখা পড়ার পর কার্ডে উল্লিখিত কাজের হিসাবের প্রশ্ন বা অন্য কোন প্রশ্নের উত্তরের জন্য দ্রুতগতিতে চলে যাবে ইলেকট্রনিক কম্পিউটারের ব্রেনের কাছে।

এখানে ইলেকট্রনিক কম্পিউটারের এই ব্রেন সম্বন্ধে কয়েকটা কথা বলে নিই। আমরা মানুষেরা যা কিছু বলি বা করি সে সর্বকিছুর উৎস হল মস্তিষ্ক। আমাদের মস্তিষ্কে হাজার হাজার নার্ভ সেল আছে। সেই নার্ভ সেলই মানুষের সকল বুদ্ধি ও বিবেচনার উৎপত্তিস্থল। ইলেকট্রনিক কম্পিউটারের মধ্যেও মানুষ সৃষ্টি করেছে কয়েক হাজার নার্ভ সেল। এই নার্ভ সেলগুলি তৈরি করা হয়েছে অতি সূক্ষ্ম বৈদ্যুতিক তার, কয়েল আর কিছু কিছু যন্ত্রপাতির সাহায্যে—যার ফলে এই ইলেকট্রনিক ব্রেনে সকল রকম কাজ করানো সম্ভব হচ্ছে। এবং যতই দিন যাচ্ছে মানুষ তত পরিমাণ নার্ভ সেল সৃষ্টি করছে ঐ ব্রেনের মধ্যে, আর তার ফলে কাজও করানো যাচ্ছে বেশি বেশি করে একে দিয়ে।

এখন কার্ড থেকে কাজের কথা পড়ে নিয়ে ব্রেনের কাছে গেলে, ব্রেন তার উত্তর নিয়ে ফিরে আসে। ব্রেনে যাওয়া আর সেখান থেকে ফিরে আসার গতি প্রতি ঘণ্টায় ১,৮৬,০০০ হাজার মাইলের চেয়েও অনেক বেশি। অনেক বেশি কেন না—অতি আধুনিক ইলেকট্রনিক কম্পিউটারের গতি কল্পনাতীত।

আগে ইলেকট্রনিক কম্পিউটারের কথা বলা হয়েছে। এবারে এর গুদামঘরটির কথা উল্লেখ করছি। এখানে কাজের হিসাব ও উত্তর জমা হয়ে থাকে। সেজন্য একে বলা হয় 'কোর স্টোরেজ' (core storage). আমাদের এখানে যে কম্পিউটার আনা হচ্ছে তার নম্বর হচ্ছে ১৪০১। এই যন্ত্রটির মোটামুটি তিনটি ভাগ অর্থাৎ ১৪০১, ১৪০২, ১৪০৩—এই তিনটি অংশ বৈদ্যুতিক তার দিয়ে সংযুক্ত। এর একটার মধ্যে দিয়ে নির্দেশ দেওয়া হয় কি ধরণের কাজ তাকে করতে হবে, একটির দ্বারা পূর্ববর্ণিত পাঞ্চ করা কার্ড প্রবিষ্ট করে দিয়ে কার্ডের নির্দেশিত কাজের প্রশ্ন ও উত্তর তৈরি করা এবং স্টোরেজ করা অর্থাৎ গুদামজাত করা—অপরটির দ্বারা ছাপা এবং অন্যান্য কাজ করা। এ ছাড়া আরও একটি বাড়তি যন্ত্র এর সংগে যুক্ত করা হয়, যার দ্বারা ম্যাগনেটিক্ টেপ (Magnetic tape) থেকে কাজ বার করা হয়ে থাকে।

ম্যাগনেটিক টেপ

এখন ম্যাগনেটিক টেপ কি ও তার কাজ কি সে সম্বন্ধে কিছু বলা যাক্। জমি মাপার ফিতে আমরা সকলেই দেখেছি। এই টেপ অনেকটা সেইরকম। এর আকার আর আয়তন হচ্ছে লম্বায় ২৪০০ ফুট, চওড়ায় ½" আধ ইঞ্চির মত এবং স্থূলতায় একটি চুলের মত পাতলা। এর প্রতি ইঞ্চিতে ৩৬৫টি 'ক্যারেকটার' বা 'ডাটা' লেখা থাকে। প্রতি ইঞ্চি লেখার পর আধ ইঞ্চি করে ফাঁক রাখা হয়। তারপর আবার লেখা আবার অনুরূপ ফাঁক। এমনি করে ২৪০০ ফুট একটি ইস্পাতের ফিতেয় হাজার হাজার ডাটা লেখা থাকে। এই লেখা কোন সময়েই নষ্ট হয়ে যাবার ভয় থাকে না বরং বলা যায় বছরের পর বছর তা অক্ষয় হয়েই থাকে।

এই ইস্পাতের ফিতে আসার ফলে ব্যাপারটা কি দাঁড়ালো তা একটু অনুধাবন করে দেখা যাক্। হাজার হাজার খাতা-পত্র-বই, হাজার হাজার ফাইল আর নথি কিম্বা দলিল দস্তাবেজ আর কি মানুষের কাছে কোন দরকারী জিনিস বলে মনে হবে? তাছাড়া কত অল্প জায়গার মধ্যে সব কিছু সংরক্ষিত থাকবে সেটাও এই প্রসংগে অনুমেয়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে একটি ১০×১০×১০ ফুট মাপের ঘরের মধ্যে এই টেপ-এর সাহায্যে যত রেকর্ড রাখা যাবে, কাগজের সাহায্যে তা রাখতে গেলে যা জায়গা লাগবে, তত বড় বাড়ি বোধ করি কলকাতায় আজও তৈরি হয় নি। এজন্য খুব স্পষ্ট করেই একথা বলা যেতে পারে, আগামীদিন

কাগজ শিল্পে চরমতম দুর্দিনের বাস্তব উদাহরণ হয়ে দাঁড়াবে—যে দুর্দিন নাগাসাকি ও হিরোশিমায় পাশব উল্লাসের দিনেও পৃথিবী দ্যাখে নি।

ম্যাগনেটিক টেপ-এর ম্যাজিক

এই ম্যাগনেটিক টেপ-এর আরও অনেক গুণ আছে। কোন লেখা যদি অপ্রয়োজনীয় বলে মনে হয় তাহলে সেই লেখাকে মুছে ফেলে নতুন করে 'ডাটা' বা তথ্য লেখা যায়। এমন কি কোথাও কোন তথ্যের আংশিক পরিবর্তন করতে হবে, তাও করার সুবিধা আছে। পরিবর্তনযোগ্য অংশ কার্ডে পাঞ্চ করে ইলেকট্রনিক কম্পিউটারকে দিলে ঐ টেপের লিখিত অংশ এবং কার্ডের লিখিত অংশ একত্রে মূল লেখার সঙ্গে একীভূত হয়ে যায়।

একটা উদাহরণের সাহায্য নেওয়া যাক্। একটি টেপ-এ ৫০০ লোকের বেতনের মাসিক হিসাব অথবা ৫০০ লোকের ইন্সিওরেন্সের পলিসির সব কিছু অংশ লেখা আছে। পরে এক মাসে হয়ত ৫০ জন লোকের বেতন বৃদ্ধি হল কিম্বা ৫০টি লোক তাদের 'নমিনির' নাম পরিবর্তন করল—এক্ষেত্রে ঐ পরিবর্তিত লোকের সকল বিষয় কার্ডে পাঞ্চ করে ঐ যন্ত্রকে সংশোধন করার নির্দেশ দিলে এই টেপ আলোর গতিতে ঘুরতে আরম্ভ করবে ও যন্ত্রের অপর অংশে ঐ কার্ডগুলি পড়ে নিয়ে তার হিসাব করে ফেলবে টেপ-এর যে যে অংশে ঐ লোকগুলির সকল বিষয় লেখা আছে, ঠিক সেই জায়গাগুলিতে ঠিক পরিবর্তনটি করে সঠিক 'ডাটা' টেপ-এ রেকর্ড করে দেবে। প্রয়োজন বোধে যে কেউ ছেপে নিয়ে ব্যাপারটা মিলিয়ে নিতে পারবেন।

আরও একটা উদাহরণ এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। ধরা যাক্ কোন একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে ৫ লক্ষ পরীক্ষার্থী পরীক্ষা দিল। তারপর দেখা গেল, প্রায় শতকরা ৭০ জন ফেল করেছে। তখন কর্তৃপক্ষ স্থির করলেন ২৭ পর্যন্ত যারা নম্বর পেয়েছে তাদেরই শুধু 'গ্রেস' দিয়ে পাশ করানো হবে। পাশ মার্ক হচ্ছে ৩০। কম্পিউটারকে নির্দেশ দেওয়া হল—মাত্র কয়েক মিনিটের মধ্যে দেখা গেল যারা ২৯ পেয়েছে যারা ২৮ পেয়েছে, যারা পেয়েছে ২৭ তারা সবাই যথাক্রমে পেল ২৯+১=৩০, ২৮+২=৩০, এবং ২৭+৩=৩০ এবং তা এইভাবে ছেপে বের করে দেয়া হল।

ছাপাখানার কাজে

অনেকবার ছাপার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এবারে ছাপাখানার কাজে এই ইলেকট্রনিক কম্পিউটারের মাধ্যমে কি হতে পারে সে বিষয়ে একটু আলোচনা করা যাক্। কম্পিউটারের (১৪০১ নং) ছাপার গতি প্রতি মিনিটে ৬০০ লাইন এবং প্রতি লাইনে প্রায় দেড়শোর মত অক্ষর থাকে। আমরা ছাপার কথা বলতে সাধারণত প্রেসে ছাপার কথা মনে করি। কিন্তু প্রতি সেকেন্ডে ২০/২৫টা অক্ষর ছাপার কথা ভাবা খুবই শক্ত। কম্পিউটার কি করে এত দ্রুত ছাপার কাজ করতে পারে তা ভাবতেও বিস্ময় লাগে।

পুঁতির মালা যেমন ঠিক তেমনিভাবে এর অক্ষরগুলি পর পর সাজানো থাকে এবং এরকম মালাও প্রায় দেড়শোর মত পাশাপাশি রাখা হয়। তারপর নির্দেশ পাওয়া মাত্র সমস্ত মালগুলি একসংগে ঘুরতে আরম্ভ করে—ঠিক সাইকেলের চেনের মত এবং অসম্ভব রকমের দ্রুতগতিতে। ঘোরার সময় একটি নির্দিষ্ট জায়গায় শুধু কাগজের উপরটুকু ছুঁয়ে দিয়ে যায়।

ঐ অক্ষর যেখানে এসে কাগজের উপর ছাপ দিয়ে যায়, ঠিক সেইখানে আসে কোন অক্ষরটার ছাপ পড়বে তার নির্দেশ এবং এই নির্দেশ অনুযায়ী ঐ মালার আকারে সাজানো অক্ষরগুলির নির্দিষ্ট অক্ষরটি কাগজের উপর ছাপ দেয়। প্রতিটা মালার মধ্যে 0, 1, 2, 3, 4, 5 ও A, B, C, D, E প্রভৃতি পর পর সাজানো থাকে। কাগজ আর লেখার অক্ষর পরস্পরের বিপরীত দিক থেকে এসে একটা নির্দিষ্ট লাইনের সংযোগক্ষেত্রের ভিতর দিয়ে পুনরায় বিপরীত দিকে চলে যায়। তাই এত দ্রুত ছাপার কাজ করা এতে সম্ভব হয়।

ইলেকট্রনিক কম্পিউটারের মধ্যে এই ছাপার কান্ড দেখলে মনেই হয় না যে, এটি একটি ছাপাখানা সংক্রান্ত ব্যাপার—বরং মনে হয় যেন অনেকগুলি সাইকেলের চেন বৃত্তাকারে কোন দোকানের শো-কেসে সাজানো। তবে লেখার অক্ষরগুলির আকার খুব ছোট এবং গায়ে গায়ে লাগানো। একই 'ম্যাটার' যদি দুবার ছাপতে হয় তো দেখা যাবে প্রথমবারের চেয়ে দ্বিতীয়বার ছাপার সময় লাগছে অনেক কম।

লেখার পর কাগজ যেমন ছাপার আগে থাকে ঠিক সেইরকমভাবে আবার আপনা হতে ভাঁজ হয়ে যায়। এক্ষেত্রে কাগজ প্রথমে কাটা থাকে না। পরে প্রয়োজনমত আলাদা করে নেওয়া হয়। ছাপার পর কাগজগুলি যখন নিচে পড়তে থাকে তখন অনেকটা দক্ষিণ ভারতের কাপড়ের ভাঁজের মত আপনা হতে ভাঁজ হয়ে যায়। এক্ষেত্রেও কাগজ প্রথমে কাটা হয় না। পরবর্তী অধ্যায়ে তা করা হয়।

সংস্কৃতির উপর আঘাত

[redacted]ভাবে ইলেকট্রনিক কম্পিউটারের সাহায্যে ছাপার কাজ সুরু হলে সংস্কৃতি জগতে যে এক বিরাট সংকট সৃষ্টি হবে সে কথা না বললেও চলবে। সাম্রাজ্যবাদী আর ধনতান্ত্রিক দেশগুলি এই মুদ্রণ বিপ্লবকে সংস্কৃতি জগতে বিষাক্ত গ্যাস ও আণবিক বোমারূপে ব্যবহার করবে। লক্ষ লক্ষ বই যার ছত্রে ছত্রে ভরা থাকবে বিকৃত রুচি আর নর্দমার পূতিগন্ধময় যৌন ও অপরাধ সাহিত্যের বীভৎস বর্ণনা—সেই সব বই তারা বাজারে ছেড়ে দেবে। ভুলে যাব আমরা 'না বলিয়া অপরের দ্রব্য লইলে চুরি করা হয়', ভুলে যাব ভুবনের উক্তি 'মাসি তুমিই আমার ফাঁসীর কারণ হইলে।' 'মাতৃবৎ পরদারেষু' বলে কোন কথা যে এদেশে কোনদিন ছিল—সে কথা হয়ত কারও স্মরণেই আসবে না। তখন ওয়াগন ব্রেকার, ব্যাঙ্ক লুঠ আর গ্যাংস্টারিজমের সঙ্গে নিষিদ্ধপল্লীর ভাষায় গড়ে ওঠা সংস্কৃতির ধারক ও বাহক হয়ে উঠব আমরা।

ধনতন্ত্রের পৃষ্ঠপোষক ইনটেলেকচুয়ালের দল হয়ত বলবে, 'এ তো মানব সভ্যতার অগ্রগতি। এর খারাপ করবারও যেমন ক্ষমতা আছে, তেমনি ভাল করার ক্ষমতাও আছে। কে নিষেধ করেছে এর খারাপের বিরুদ্ধে অভিযান করতে?'

কথাটা আপাতদৃষ্টিতে ঠিকই বলে মনে হবে। কিন্তু এই ইলেকট্রনিক কম্পিউটার হস্তগত করবার মত উপায় সাধারণ মানুষের হাতে কোথায়? আমরা কি জানি না, আমাদের গরীব প্রকাশকেরা ততোধিক গরীব লেখকদের বই কি করে ছাপেন? একটি একটি করে টাইপ সাজিয়ে, তিনটে প্রুফ দেখে, বাকির পর বাড়িতে যায়—তারপর কতদিন পরে সে বই বাজারের মুখ দেখে, সে অভিজ্ঞতা আমাদের দেশে অনেকেরই আছে। এখানে যখন ঐ ধারায় আমাদের সংস্কৃতি রক্ষা করার কাজ চলবে, তখন অন্যদিকে দেখব বন্যার মত দুর্বার বেগে বাজারে হাজার হাজার বাকি ফেলে যদিও বা ফর্মাগুলি দফতরীর হাজার বইয়ের স্রোতধারা।

কি দিয়ে আমরা এর বিরুদ্ধে অভিযান করব? ভোরের বেলায় ঘরের দরজায় একজোড়া শঙ্খনী অথবা অল ইন্ডিয়া রেডিওর দুখানা রবীন্দ্র কি নজরুল অথবা অতুলপ্রসাদের সঙ্গীত কিম্বা আমাদের দেশের সীমাবদ্ধ ক্ষমতায় সৃষ্ট কয়েকখানি দৈনিক পত্রিকা ছাড়া আমাদের আর কি আছে? তাছাড়া ব্যাপক রুচি-বিকারের মত্ততায় এসবও তো আক্রান্ত হয়ে পড়বে।

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

পূর্ব জার্মানী ও সোভিয়েট দেশ পরিক্রমা

অশোক সেন

পূর্ব বার্লিনের থিয়েটার, ব্যালে এবং ওপেরার কথা আমি পরে 'রঙ্গমঞ্চ—ওদেশে এবং এদেশে' শীর্ষকে আলোচনা করবো। ১৬ই ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত আমি ছিলাম বার্লিনার এ্যাসেম্বলের অতিথি। তার পরদিন থেকে জার্মান ডেমোক্রেটিক রিপাবলিকের গেস্ট। ১৭ই ফেব্রুয়ারী সরকারের তরফ থেকে নতুন দোভাষী এলেন—মিসেস মায়াবোম। ২০শে ফেব্রুয়ারী তাঁর সঙ্গে গেলাম বার্লিনার এ্যাসেম্বলের অফিসে—সেখানে হেলেনা ভাইগেলের অটোগ্রাফ করা একটি ফটোগ্রাফ ছিল আমার জন্য—গোর্কির মাদার এবং সেট্‌জুয়ান নাটকেরও কিছু ফটোগ্রাফ কিনলাম—মিসেস মায়াবোম এসব ছবির দাম দিয়ে দিলেন মিনিস্ট্রি ফর কালচারের তরফ থেকে। তা ছাড়া আগেই মিনিস্ট্রির মিসেস ব্যামবোয়ার আমাকে বার্লিনার এ্যাসেম্বলের অনেক নাটকের ছবি উপহার দিয়েছিলেন।

বার্লিনার এ্যাসেম্বলের ড্রামাটর্জ ভার্নার হেশট

২১শে ফেব্রুয়ারী এ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিল জার্মান সাউথ-ইস্ট এশিয়া সোসাইটির সঙ্গে। এঁদের তরফ থেকে উপস্থিত ছিলেন মিস উলরিশ। আর তাঁর সঙ্গে ছিলেন ইনস্টিটিউট ফর ওরিয়েন্টাল স্টাডিজের ডক্টর জে হাইডরিশ—ডক্টর হাইডরিশ বছরতিনেক দক্ষিণ ভারতে কাটিয়ে গেছেন। মিস উলরিশ বললেন কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় কয়েকদিন বাদেই বার্লিনে আসছেন—ইণ্ডো-জার্মান ফ্রেণ্ডশিপ সোসাইটির সভ্য হিসাবে এঁরা তাঁকে আমন্ত্রণ করেছেন। আমাকে জিজ্ঞেস করা হল আমি ঐ সোসাইটির সভ্য কি-না এবং ওদের কাগজে লিখি কি-না। বললাম এই সোসাইটির শুভ উদ্বোধনের দিন আমি উপস্থিত ছিলাম। এবং তখনও যুক্তফ্রণ্ট সরকার চলছে। এই উদ্বোধন সভায় হাজির ছিলেন বিশ্ববিখ্যাত জাতীয় অধ্যাপক সত্যেন বোস, যুক্তফ্রণ্টের মন্ত্রী অজয় মুখোপাধ্যায়, জ্যোতি বোস, সোমনাথ লাহিড়ী, স্পীকার বিজয় ব্যানার্জী প্রমুখ। আমি নিজে এখানকার সভ্য নই এবং এঁদের কাগজে লিখি না। কেন লিখি না এই প্রশ্নের উত্তরে বললাম যে এই ধরণের কাগজের সার্কুলেশন অত্যন্ত কম—আর আমি নিয়মিতভাবে সাপ্তাহিক বসুমতী এবং রবিবারের বসুমতীতে লিখি—যে দুটি কাগজ নাম ডাক এবং সার্কুলেশনের দিক দিয়ে সারা বাংলা দেশে বিখ্যাত।

জার্মান এবং রাশিয়ানরা আতিথেয়তার জন্য প্রখ্যাত। মিস উলরিশদের সঙ্গে মধ্যাহ্নভোজন সমাধা করতে হল—প্রচুর পানীয় এবং সুখাদ্যের বন্দোবস্ত ছিল।

এখান থেকে উণ্টার ডেন লিণ্ডনের রাস্তায় এসে হাজির হলাম—বার্লিন

ওয়ালের কাছাকাছি এলাম। বাঁ দিকে একটি টিলার মত দেখলাম—এরই ভেতর ছিল হিটলারের শেষ আশ্রয়স্থল। ডান দিকে রাইসটাগ। এর কিছুটা দূরেই পূর্ব বার্লিনের সীমান্তের দেওয়াল

এর পরই প্রশ্ন উঠতে পারে বার্লিনকে এভাবে দুই ভাগে ভাগ করাটা সম্ভব হল কি করে? এর জন্য একটু পূর্ব ইতিহাস জানা দরকার।

১৯৪৫ সালে সমগ্র বার্লিনকে ফ্যাসিবাদের কবলমুক্ত করলো সোভিয়েট আর্মির সৈনিক দল। মিত্রশক্তির বিজয় লাভের পর ভবিষ্যতে জার্মানীর রূপায়ণ কিভাবে হবে এ নিয়ে তেহেরান ও ইয়ালটাতে আলোচনা করা হল—ঠিক হোল যে জার্মানীকে একটি অর্থনীতিক ইউনিট হিসাবেই রাখা হবে। কিন্তু এই সঙ্গে দেখা দরকার যে জার্মানরা যেন ভবিষ্যতে কোন কারণেই আর যুদ্ধ শুরু করতে না পারে। পটস্‌ড্যাম চুক্তিতে পরে এসব কথা লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল। এই সব ইচ্ছাকে কার্যকরী করবার জন্য আগেকার রাইন ক্যাপিটাল বার্লিনে মিত্রশক্তির একটি কণ্ট্রোল কাউন্সিল স্থাপিত হওয়া দরকার। ১৯৪৪ এবং ১৯৪৫ সালের লণ্ডন চুক্তিতে জার্মানীর অকুপেশন জোন্স এবং বার্লিনের সেক্টরস সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বর্ণিত হল। ক্রমে বার্লিনকে দুই ভাগে ভাগ করা হল—পূর্ব বার্লিন রইল সোভিয়েট রাশিয়ার আয়ত্তে. আর পশ্চিম বার্লিন থাকল পশ্চিমী শক্তিদের অধীনে। তারপর সময়মত সোভিয়েট রাশিয়া পূর্ব জার্মানী থেকে সরে গেল—কিন্তু আজও পর্যন্ত পশ্চিম বার্লিন পশ্চিমী শক্তিদের কবলমুক্ত হতে পারে নি।, একথা আজ আর কারও অবিদিত নেই যে পশ্চিম জার্মানীতে আবার নাৎসীদের আধিপত্য দেখা দিতে শুরু হয়েছে।

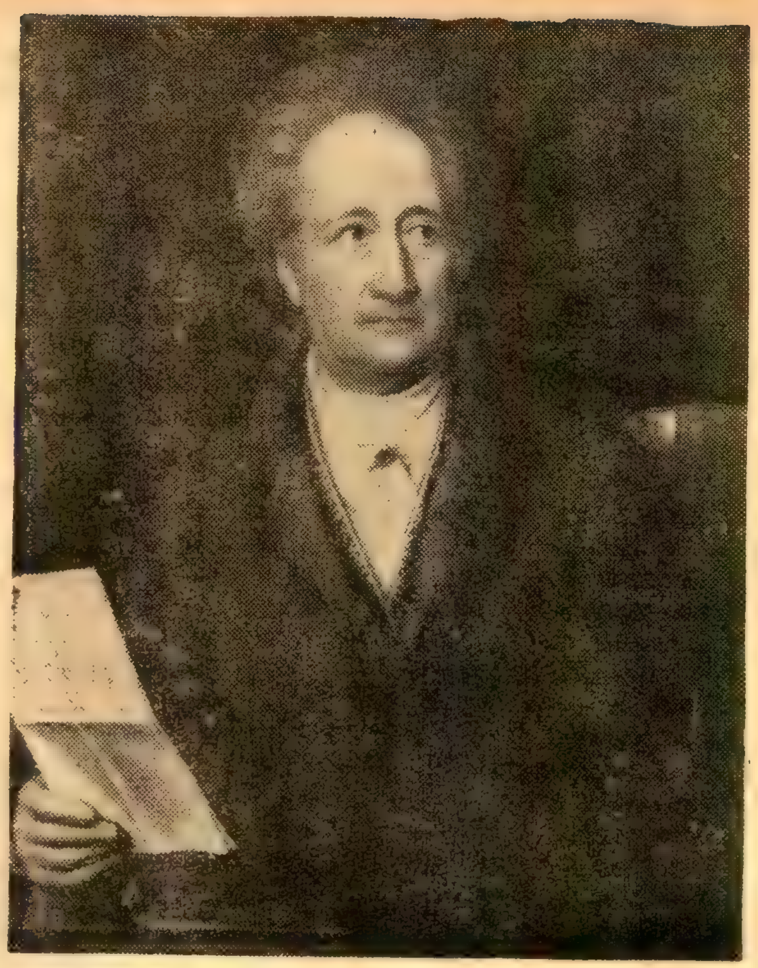

গ্যয়টে

পটস্‌ডাম চুক্তির সম্পূর্ণ বিরোধিতা করে পশ্চিমী শক্তিবর্গ প্রথম থেকেই শুরু করলেন পশ্চিম জার্মানীকে ইম্পিরিয়ালিস্ট এবং অ-গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসাবে গড়ে তুলতে—এর একটি মাত্র উদ্দেশ্যই আমরা দেখতে পাই। সেটি হচ্ছে জার্মানীতে এমন একটি রাষ্ট্র গড়ে তুলতে হবে ভবিষ্যতে যাকে কাজে লাগানো যাবে সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েট রাশিয়াকে দাবিয়ে রাখবার জন্য। কিন্তু সে চেষ্টা সফল হবে বলে আমার তো মনে হয় না। পূর্ব এবং পশ্চিম উভয় বার্লিনেই আমি গেছি—দু' জায়গাতেই দেখেছি তারা সবাই কায়মনোবাক্যে চায় সমগ্র জার্মান জাতি আবার আগের মত এক হয়ে যাক। আর আজকের দিনে জনসাধারণের ইচ্ছাটাই হচ্ছে সব থেকে বড় কথা। পশ্চিম জার্মানীতে বর্তমানে ভূতপূর্ব নাৎসী দলের অনেক লোককে রাষ্ট্রশাসনের ক্ষেত্রে অনেক দায়িত্বপূর্ণ পদে প্রতিষ্ঠিত করা হচ্ছে—এমন কি হিটলারের আমলের একজন লোক যিনি সে সময় কনসেনট্রেশন ক্যাম্প তৈরি করবার কাজে নিযুক্ত

ব্রাণ্ডেনবার্গার গেট—এর পরেই পূর্ব-পশ্চিম বার্লিনের বিভেদকারী দেওয়াল......

শিলার

ছিলেন। এখন পশ্চিম জার্মান সরকারের একটি বড় পোস্টে আছেন। কিন্তু এ সব ধূর্ত নীতির পরিপোষকতা করেও পশ্চিমী শক্তিরা আবার নতুন করে জার্মানীতে নাৎসী শক্তির পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে পারবেন বলে আমার মনে হয় না। দুটি বিশ্ব-মহাযুদ্ধের পর জার্মান জাতি আজ হাড়ে হাড়ে বুঝতে শিখছে যে মিলিটারিজমই তাদের সর্বনাশের মূল। আবার তাদের ক্ষেপিয়ে তুলে রাশিয়াকে অগ্রগতির পথ থেকে ঠেকিয়ে রাখা আর কখনও সম্ভব হবে বলে আমার তো মনে হয় না। তাছাড়া বিভক্ত জার্মানীর লোকেদের আবার যে সংযুক্ত হবার তীব্র আকাঙ্ক্ষা আমি দেখলাম, শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানের নীতির প্রতি সাধারণ জার্মান নাগরিকদের যে গভীর আন্তরিক বিশ্বাসের কথা শুনলাম, তাতে মনে হোল অদূর ভবিষ্যতে আবার তারা এক হবেই।

জার্মান জাতি আজ অতীত অভিজ্ঞতা থেকেই বুঝতে শিখেছে হিংসার পথ, মিলিটারিজমের পথ, একটা জাতিকে এগিয়ে নিয়ে যায় না—অনেকটাই পেছিয়ে এনে ফেলে। এই জন্যই জার্মানরা ভারত-বর্ষের অহিংস নীতি এবং নিউট্র্যালিটিকে শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখে এবং মহামানব মহাত্মাকে এ যুগের একজন শ্রেষ্ঠ অধি-নায়ক হিসাবে শ্রদ্ধা করে।

জার্মানীতে আমার টুর প্রোগ্রাম হল এইভাবে:

২৫শে ফেব্রুয়ারী থেকে ২৯শে ফেব্রুয়ারী ভাইমার ২৯ থেকে ৪ঠা মার্চ ড্রেসডেন, ৪ঠা মার্চ থেকে ৮ই মার্চ লাইপজিগ, ৮ই মার্চ থেকে ১২ই মার্চ রস্টক এবং আবার বার্লিনে ফেরা।

উপরোক্ত সফরসূচী অনুসারে ২৫শে ফেব্রুয়ারী সন্ধ্যায় ভাইমারে এসে পৌঁছলাম। Weimer-কে বলা হয় The Town of Goethe and Schiller—কারণ এ শহরের সর্বত্র ছড়িয়ে আছে গ্যয়টে, শিলারের স্মৃতি। এখানে আমরা এসে উঠলাম ইতিহাসপ্রসিদ্ধ হোটেল এলিফাণ্টাতে।

বিখ্যাত জার্মান ঔপন্যাসিক টমাস মান তাঁর 'Lotte in Weimer' নভেলে এই হোটেলটি সম্বন্ধে অতি সুন্দর এবং বিশদভাবে আলোচনা করেছেন। The first letter of concession signed personally on February 17th 1696 by Wilhelm Ernst, by the grace of God Duke of Saxony, Lilich, Cleves and Bergk—permission dictated to Christion Andreas Brittig and to his heirs and successors. Brittig was the tenant of the Black Beer, the oldest inn in Weimer—ব্ল্যাক বিয়ার পান্থশালাটি ছিল আমাদের হোটেলের পরেই—এখানে আমি প্রত্যহ সকাল, দুপুর এবং সন্ধ্যার আহারপর্ব সমাধা করতাম। গ্যয়টে ভাইমার আসবার পর থেকেই এলিফাণ্টাতে মাডিরা পান করতে আসতেন। সে সময়-কার নামজাদা অস্ট্রিয়ান কবি ফ্রাঞ্জ গ্রিল-পার্জার ১৮২৬ সালে গ্যয়টের সংগে দেখা করতে আসেন ভাইমারে—এই এলিফাণ্টা হোটেল সম্বন্ধে তিনি লিখেছেন: "The Elephant inn, famous throughout Germany, at the same time the anti-chamber to Weimers living Valhalla . . ."

বার্লিন সিঙ্গিং আকাডেমীর কম্পো-জার এবং কণ্ডাক্টর কার্ল ফ্রিডরিশ জেলটার ছিলেন গ্যয়টের ঘনিষ্ঠ বন্ধু—তিনি তাঁর বার বছর বয়সের শিষ্য ফেলিক্স মেণ্ডেলশন বারথল্ডিকে নিয়ে ভাইমারে এসে উঠে-ছিলেন এই হোটেলে—এখানে আসবার উদ্দেশ্য ছিল গ্যয়টের সঙ্গে দেখা করা। জুলাই মাসের তিন তারিখ, ১৯২৬ সালে এবং ঐ বছরই ২০শে অক্টোবর হিটলার এসে উঠেছিলেন এই হোটেলে—পেশা লিখেছিলেন লেখক এবং জার্নালিস্ট।

২৬শে সকালে ভাইমারের থেকে কিছু দূরে হিটলারের আমলের বিখ্যাত বুকেন-ওয়াল্ড কনসেনট্রেশন ক্যাম্প দেখতে গেলাম—রাস্তার বহু বীচ বৃক্ষ দেখা যায় —তাই থেকেই বুকেনওয়াল্ড নামটি হয়েছে।

সারা পথ বরফে ঢাকা—রাস্তার দু পাশে বীচ গাছের সারি—আমরা বাসে চড়ে এগিয়ে চলেছি—ভারি সুন্দর লাগছিল দেখতে। এই কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে ইউ-রোপের ১৮টি নেশনের ৫৬০০০ ফ্যাসী-বিরোধী যোদ্ধাকে নাৎসী বর্বরেরা অমানুষিক অত্যাচার করে হত্যা করে—এই জায়গাটি এখন ওই সব বীর শহীদদের স্মৃতির বাহক হিসাবে একটি তীর্থস্থলে পরিণত হয়েছে। এখান থেকে বরফাবৃত রাস্তায় ৭। ৮ মিনিট হেঁটে ঐ সব বীর শহীদদের মেমোরিয়াল টাওয়ার-এর কাছে গেলাম—মহাকবির জীবনের স্মৃতিবাহক হোটেলে ফিরলাম।

বিকেলবেলা গ্যয়টে মিউজিয়ামে গেলাম মহাকবির জীবনের স্মৃতিবাহক অনেক জিনিসপত্র এখানে আছে।

[ক্রমশঃ]

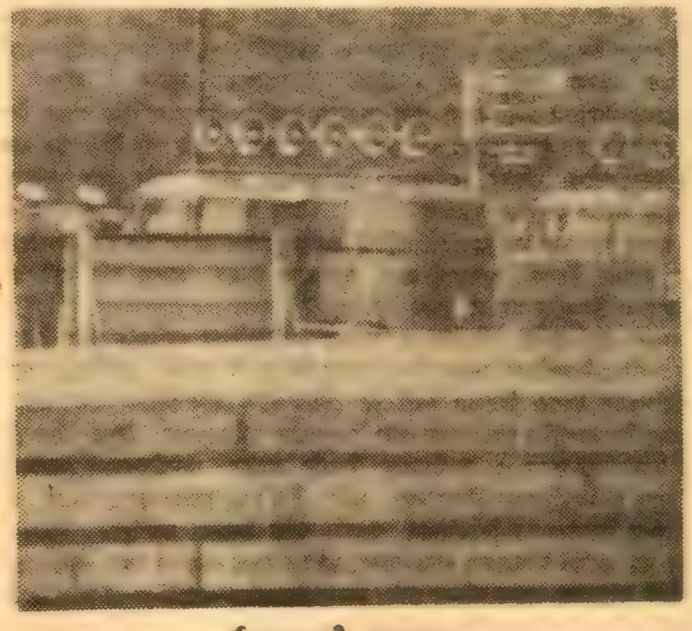

বিভেদকারী দেওয়াল

রঙ্গজগৎ

সংগ্রামের পথে অভিনেতা

সংবাদে প্রকাশ বিখ্যাত অভিনেতা মারলন ব্রাণ্ডো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নাগরিক অধিকার অর্জনের সংগ্রামে আত্মনিয়োগ করবেন। তিনি সাংবাদিকদের কাছে নিজে একথা ঘোষণা করেছেন; এবং আরো বলেছেন এই সংগ্রামের জন্য আপাতত তিনি চলচ্চিত্রে অভিনয় করা বন্ধ রাখছেন। 'দি এরেঞ্জমেণ্ট' নামক যে ছবিতে তিনি অভিনয় করছিলেন তাও তিনি বন্ধ করেছেন। মারলন ব্রাণ্ডো হলিউডের একজন প্রথম শ্রেণীর অভিনেতা। আমেরিকার বাইরেও তাঁর ব্যাপক জনপ্রিয়তা রয়েছে। তিনি আজ অভিনয় জীবন অপেক্ষা নাগরিক অধিকার রক্ষার সংগ্রামকে অগ্রাধিকার দিচ্ছেন। এই ঘোষণায় বিশ্বের চলচ্চিত্র-দর্শকরা বিস্মিত এবং চলচ্চিত্র প্রযোজকরা দুঃখিত হলেও সভ্যতা ও মানবতার বিচারে ব্রাণ্ডোর অভিপ্রায় অভিনন্দনযোগ্য।

শিল্প আগে না দেশ আগে একথা নতুন নয়। প্রতি দেশে এক এক বিশেষ মুহূর্তে শিল্পী সাহিত্যিকদের সামনে এই প্রশ্ন উঠেছে। জাতীয় বিপর্যয়ের সময় অথবা জাতির সংকটকালে সমাজসচেতন শিল্পী-সাহিত্যিকরা যথাযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। কেবলমাত্র যাঁরা দেশ ও মানবজাতির ভবিষ্যৎ সম্পর্কে উদাসীন, আত্মসর্বস্ব, তাঁরাই নিরপেক্ষতার ভান করেন, অথবা শিল্পীদের স্থান কেবল মঞ্চে একথা বলে উট পাখীর মত আত্মরক্ষার উপায় খোঁজেন।

মার্কিন রাষ্ট্রে বর্ণবিদ্বেষের ভয়াবহ পরিস্থিতির কথা কে না জানে। মার্কিন রাষ্ট্র বিশ্বের গণতন্ত্র রক্ষার পবিত্র দায়িত্ব পালনের দোহাই দিয়ে ভিয়েতনামে ঠেঙাড়ে বাহিনীর ঘৃণ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছে; অথচ তার নিজের দেশে গণতন্ত্রের মর্যাদা এমনভাবে লাঞ্ছিত যে মারলন ব্রাণ্ডোর মত অভিনেতাকে অভিনয় ছেড়ে নাগরিক অধিকার রক্ষার সংগ্রামে নামতে হয়। ইতিপূর্বে বিখ্যাত গায়ক অভিনেতা পলরবসন থেকে বিখ্যাত বহু শিল্পী নাগরিক অধিকার রক্ষার জন্য 'গণতন্ত্রী নির্যাতন'-এর সম্মুখীন হয়েছেন। একই চেতনা ও দায়িত্ববোধে আজ ব্রাণ্ডো সংগ্রামী হলেন। একই দেশের নাগরিক হয়েও যেখানে সাদা-কালোয় তফাৎ। কালোরা সাদাদের সঙ্গে পড়তে পায় না, রেস্টুরেণ্টে খেতে পায় না, একই মানুষের মর্যাদা পায় না। এই বৈষম্যের বিরুদ্ধে কথা বলার জন্য যেদেশে কেনেডি থেকে মার্টিন লুথার কিংকে প্রাণ হারাতে হয়, সে দেশ আবার গণতন্ত্রের বড়াই করে! এই পরিস্থিতিতে মারলন ব্রাণ্ডোর সিদ্ধান্তকে সকলে অভিনন্দন জানাবেন। যদিও তাঁর মত শক্তিশালী অভিনেতার অভাব দর্শকরা অনুভব করবেন, কিন্তু শিল্পীর সামাজিক ও মানবিক কর্তব্য পালন সবচেয়ে বড় কথা। এদিক থেকে মারলন ব্রাণ্ডো যথার্থ শিল্পীর কাজ করেছেন, কারণ শিল্প মানুষের জন্য, মানবতার জন্য। মানুষ যদি লাঞ্ছিত হয় তবে শিল্প ও শিল্পীর মর্যাদা থাকে কি করে?

প্রসঙ্গত মনে পড়ছে পশ্চিমবঙ্গে সিনেমা কর্মচারীদের ধর্মঘটের কথা, এবং এই ব্যাপারে চলচ্চিত্র-শিল্পীদের কোন ভূমিকা আছে কি না সে প্রশ্ন। চলচ্চিত্র-শিল্পীদের কাজ স্টুডিওতে হলেও সিনেমা কর্মীদের থেকে তাঁরা বেশি বিচ্ছিন্ন এমন মনে করা ভুল। কারণ সিনেমাগুলি চালু থাকা এবং ভালভাবে পরিচালনার উপর শিল্পী বা চলচ্চিত্র তারকাদের কাজ ও জনপ্রিয়তা নির্ভর করে। মাসাধিককাল সিনেমা বন্ধ থাকায় নতুন ছবি মুক্তিলাভ করছে না; ছবি নির্মাণের হারও কমার কথা। অথচ পশ্চিমবঙ্গের চিত্রতারকারা নির্বিকার! আজো তাঁরা সিনেমা কর্মীদের পাশে এসে দাঁড়ালেন না, ধর্মঘট মীমাংসার জন্য কোন ভূমিকা গ্রহণ করলেন না। ব্রাণ্ডোর মত রাজনৈতিক সংগ্রামের সাহস তাঁদের নেই; কিন্তু নিজেদের এবং শিল্পের ভবিষ্যৎ চিন্তা করে সিনেমা কর্মীদের পাশে দাঁড়াবার সাহসও কি আমাদের দেশের 'তারকা'দের নেই?

—সজন

'প্রথম বসন্ত'-এর নায়িকা মাধবী মুখোপাধ্যায়।

চিত্র আলোচনা

হিরোসিমা মন আমোর

ফিল্ম ফেডারেশন অব ইণ্ডিয়া ও ভারতে ফরাসী দূতাবাসের যুক্ত উদ্যোগে ফরাসী ছবির এক সেসন শুরু হয়েছে। এই সেসনে যে চারটি ছবি দেখান হচ্ছে তার মধ্যে অন্যতম আলা রেঁনে পরিচালিত 'হিরোসিমা মন আমোর' বা হিরোসিমা প্রিয় আমার। এই ছবিটি নির্মাণ করে আলা রেঁনে বিখ্যাত হয়েছেন। যদিও ধনতান্ত্রিক জগতে তিনি বিশেষ খ্যাতি লাভ করেছেন কিন্তু সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার নীরবতা সকলে লক্ষ্য করেছে; একমাত্র পোল্যাণ্ডের তরুণরা ছবিটির প্রশংসা করেছে। ছবিটি ইতিপূর্বে কলকাতায় দেখান হয়েছিল এবং যথেষ্ট বিতর্ক সৃষ্টি করেছিল।

এই ছবিতে নায়িকা এক ফরাসী চলচ্চিত্র অভিনেত্রী। বিশ্বশান্তির বক্তব্যের উপর একটি ছবিতে অভিনয় করতে সে জাপানে এসেছে। এক জাপানী স্থপতির সঙ্গে তার আকস্মিক পরিচয়। দুজনের পরিচয় মুহূর্তের মধ্যে এমন অন্তরঙ্গতায় পরিণত হল যে স্থপতির গৃহে তারা যৌনসঙ্গমে লিপ্ত হল। স্থপতি বিবাহিত, স্ত্রী বায়ু পরিবর্তনে গেছে; অভিনেত্রীও বিবাহিতা এবং সন্তানের জননী। এই যৌনসঙ্গম মুহূর্তে তার মনে পড়ে গেল অতীতকে। অভিনেত্রীর প্রথম প্রেম হয়েছিল অবরুদ্ধ ফরাসী দেশে এক নাৎসী সৈনিকের সঙ্গে। শত্রুর সঙ্গে প্রেম সমাজের মানুষ ভাল চোখে দেখে

'হিরোসিমা মন আমোর'-এ ফরাসী অভিনেত্রী ইমানুয়েল রিভা ও জাপানী অভিনেতা এইজি ওকেদা।

নি। দেশপ্রেমিকদের গুলীতে সে নাৎসী নিহত হয়। তাকেও নির্যাতন সহ্য করতে হয় এবং শেষ পর্যন্ত গোপনে প্যারীতে এসে অভিনেত্রী হয়।

হিরোসিমায় এসে জাপানী স্থপতির যৌনসংসর্গে তার মনে কিভাবে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয় পরিচালক তা ছবিতে দেখিয়েছেন। অভিনেত্রীর প্রথম প্রেম যেমন নিষ্ঠুরভাবে গুলীবিদ্ধ ও ধিকৃত হয়েছিল, জাপানী স্থপতির জন্মভূমি হিরোসিমা তেমনি নিষ্ঠুরভাবে বিধ্বস্ত হয়েছে। দুটিকেই একই মানসিকতার অভিশাপরূপে পরিচালক দেখাতে চেয়েছেন। হিরোসিমা পুনর্গঠিত হচ্ছে, ধ্বংসই একমাত্র কথা নয়, তেমনি প্রেমকেও হত্যা করা যায় না। স্থপতির সঙ্গে যৌনসঙ্গমে সে তার প্রথম প্রেমের আস্বাদন লাভ করেছে।

পরিচালক রেঁনের ছবি মূলত যুদ্ধ-বিরোধী হলেও এই যুদ্ধবিরোধীকে প্রগতিশীল চিন্তা বলা যায় না। কারণ তিনি জাতীয় মুক্তিকামী ফরাসী দেশপ্রেমিকদের সংগ্রাম বা নাৎসী সৈন্যদের হত্যা করা আর হিরোসিমার ধ্বংস একাকার করে ফেলেছেন। যে নাৎসীরা মানবতা ও সভ্যতার শত্রু, সেই নাৎসী সৈনিকের সঙ্গে নায়িকার প্রেম এবং যৌনসঙ্গম ঘটালেন রেঁনে। রেঁনের চোখে প্রেমের ক্ষেত্রে নাৎসী, অনাৎসী, জার্মান-আমেরিকান সবই একাকার হয়ে গেছে। যে নাৎসীদের অবরোধ মুক্ত হবার জন্য সারা ফরাসী জাতি সংগ্রাম করছিল—রেঁনের নায়িকা তখন সেই ঘৃণিত নাৎসীর সঙ্গে সমুদ্রতীরে যৌনসঙ্গম করছে। দর্শক আকর্ষণের জন্য (?) এতসব যৌন আকর্ষণমূলক ঘটনা দেখিয়ে তার পরে রেঁনে মহাজনবাণী ব্যক্ত করেছেন তাঁর ছবিতে; পৃথিবী চঞ্চল। প্রেম, জয়-পরাজয় বা ধ্বংস যাই বল না কেন কিছুই স্থায়ী নয়। কাল যাকে ঘৃণা করেছ আজ তাকে ঘৃণা নাও করতে পার; কাল যাকে ধ্বংস করেছ আজ সে মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছে। খুব গম্ভীর চালে কথা বললেও আসলে রেঁনে এমন লোক—যাঁর চোখে স্বাধীনতার যুদ্ধ আর সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ একইভাবে নিন্দিত।

এই ছবিটি দেখে প্যারীর একদল মহিলা খুবই ক্ষেপে গিয়েছিলেন। এই ছবিটিকে তাঁরা জাতীয় অপমান মনে করেছিলেন। প্রতিরোধ সংগ্রামে যোগ দিয়েছিলেন এমন একশতজন মহিলা 'লু্যৎমানিতে' পত্রিকায় একটা চিঠি প্রকাশ করেছিলেন। সেই চিঠিতে তাঁরা লিখেছিলেন, ফ্যাসিস্টদের কবল থেকে ফ্রান্সের মুক্তির জন্য আমাদের যুবকরা যে প্রাণ দিয়েছে, স্বামী-পুত্ররা যে বুকের রক্ত ঢেলেছে, সে রক্ত কি এই গণিকার পা ধোয়ার জন্য?

যে কারণে এই মহিলারা উত্তেজিতভাবে প্রতিবাদ জানিয়েছেন—সে কারণেই জগতের ধনিক শ্রেণী এবং তাদের তোষামোদকারীরা এই ছবিটির প্রশস্তি লিখে রেঁনেকে একজন 'হিরো' বানিয়েছে!

হিরোসিমা মন আমোর-এর প্রধান দুজন অভিনেতা ইমানুয়েল রিভা ও এইজি ওকেদা।

নাটকের কথা

পঞ্চক-এর বর্ষবরণ অনুষ্ঠান

গত ১৩ই এপ্রিল হাওড়া জেলার মুগকল্যাণ গ্রামে পঞ্চক সাংস্কৃতিক সংস্থার উদ্যোগে বর্ষবরণ অনুষ্ঠান হয়েছে। এই অনুষ্ঠানে উদ্বোধন সঙ্গীতে অংশ গ্রহণ করেন : শ্রীমতী বাসন্তী ঘোষ, মৃণাল ঘোষ ও চিত্রা ঘোষ।

উদ্বোধন সঙ্গীতের পর প্রধান অতিথি সাংবাদিক শ্রীকল্পতরু সেনগুপ্ত 'বর্তমান পরিস্থিতিতে সংস্কৃতি কর্মীদের কর্তব্য' বিষয়ে বক্তৃতা করেন। তার পরে পঞ্চক কর্তৃক 'ঝিঁঝিঁপোকার কান্না' নাটক অভিনীত হয়। এক মানসিক রোগের হাসপাতালকে কেন্দ্র করে সমাজের দুর্নীতি ও আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে এই নাটকে নিন্দা করে শোষণহীন সমাজকে মানবমুক্তির উপায় বলা হয়েছে। নাটকের শেষাংশ অবশ্য পরিচালক সম্পাদনা করেছেন এবং ফলে মূল নাটক অপেক্ষা বক্তব্য স্পষ্ট হয়েছে। অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করেছেন, শচীন ঘোষ, স্নেহময় পাল, প্রবীর চট্টোপাধ্যায়, তুষার ঘোষ, তুষার ঘোষাল, গোপাল সরকার, লক্ষণ মল্লিক, প্রীতিময় পাল ও রমেন দত্ত।

মঞ্চ থেকে বলছি

শ্রীমনোরঞ্জন কর্মকার রচিত নাটক "মঞ্চ থেকে বলছি" ৭ই এপ্রিল সি টি আই স্টাফ ক্লাবের ব্যবস্থাপনায় সি টি আই মঞ্চে অভিনীত হয়। অভিনয়ের শেষে প্রায় দর্শকমণ্ডলী শ্রীকর্মকারকে অভিনন্দন জানান। অভিনয়ে প্রশংসার দাবি রাখেন : সর্বশ্রী দেবব্রত ভট্টাচার্য, চিত্ত বোস, পরিতোষ চক্রবর্তী, অনিরুদ্ধ বোস, দুলাল সরকার, প্রভাত পাত্র, বিভাস চৌধুরী ও সুনীল মিত্র। সংগীত পরিচালক শ্রীদিলীপ রায়চৌধুরী তাঁর মৌলিক চিন্তার পরিচয় দেন। বর্তমান সামাজিক কাঠামোর আঙ্গিকে এই নাটক রূপায়িত হয়েছে। অধ্যক্ষ শ্রী বি এম বোস ও প্রধান অতিথি শ্রীসুধী প্রধান নাটকের বিষয়বস্তু ও দলগত অভিনয়ের ভূয়সী প্রশংসা করেন। ১০ই এপ্রিল শ্রীকর্মকারকে সি টি আই স্টাফ ক্লাবের তরফ থেকে পুরস্কৃত করা হয়। নাট্য-নির্দেশনায় ছিলেন শ্রীদেবব্রত ভট্টাচার্য।

'চৌরঙ্গী' ছবিতে উত্তমকুমার ও জয়শ্রী সেন

পাবলভ ডে উপলক্ষে একটি স্ত্রীচরিত্র

পাবলভ ইনস্টিটিউটের সদস্যগণ আগামী ৫ই মে রবিবার একাডেমি অব ফাইন আর্টস হলে 'পাবলভ ডে' উদ্‌যাপনের আয়োজন করেছেন। এই উপলক্ষে পাবলভ ইনস্টিটিউট নাট্য সংস্থার সদস্যগণ ডাঃ ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় রচিত 'একটি স্ত্রীচরিত্র' নাটক অভিনয় করবেন।

স্টুডিও খবর

স্বর্ণশিখর প্রাঙ্গণে

পরিচালক পীযূষ বসু 'স্বর্ণশিখর প্রাঙ্গণে' ছবির বহির্দৃশ্য গ্রহণের জন্য সদলে দার্জিলিং যাত্রা করেছেন। সারদা চিত্রমন্দিরের এই ছবির প্রযোজক কালিপদ দত্তগুপ্ত। সমরেশ বসুর লেখা উপন্যাস অবলম্বনে ছবিটি নির্মিত হচ্ছে। সিঞ্চল হ্রদ, মল, টাইগার হিল, জিমখানা ক্লাব এবং আরো কয়েকটি স্থানে চিত্রগ্রহণ করা হবে। এই বহির্দৃশ্য গ্রহণে যে শিল্পীরা গিয়েছেন তাঁদের মধ্যে আছেন : মাধবী মুখার্জী, সুব্রতা চ্যাটার্জী, নবাগত স্বরূপ দত্ত, দিলীপ রায়, রবি ঘোষ, অরুণ মুখার্জী, প্রশান্ত চ্যাটার্জী, প্রসাদ মুখার্জী, বেবি মিতু, কৃষ্ণা প্রধান। এ মাসের শেষ সময় পর্যন্ত দার্জিলিং-এ স্যুটিং চলবে, এবং তাতে ছবির প্রায় অধিকাংশ কাজ শেষ হবে।

'স্বর্ণশিখর প্রাঙ্গণে' ছবিতে নাকি সঙ্গীতের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। গান গেয়েছেন : হেমন্ত মুখার্জী, মান্না দে, লতা মঙ্গেশকর, আশা ভোঁসলে।

গুপী গায়েন বাঘা বায়েন

সত্যজিৎ রায় 'গুপী গায়েন বাঘা বায়েন' ছবির বহির্দৃশ্য গ্রহণের জন্য রাজস্থান গিয়েছিলেন। রাজস্থানে চিত্রগ্রহণ করে সম্প্রতি তিনি ফিরে এসেছেন। জয়শলমীর, যোধপুর, বুন্দি ও অন্যান্য ঐতিহাসিক স্থানের পটভূমিতে গুপী ও বাঘার অভিযান কাহিনী এবং এ সঙ্গে একটি গান এখানে গ্রহণ করা হয়েছে। এসব দৃশ্য গ্রহণে নির্বাচিত শিল্পীরা ছাড়া হাজার হাজার একস্ট্রা ও কয়েক শ' উট স্যুটিং-এ ব্যবহার করা হয়েছে। গভীর তুষারাচ্ছন্ন কুফরি অঞ্চলেও ছবির কিছু দৃশ্য তোলা হয়েছে। এবার নিউ থিয়েটার্সের এক নম্বর স্টুডিওতে একটানা স্যুটিং হবে। এবার ব্যয়বহুল দৃশ্য নির্মাণ করার দায়িত্ব পড়েছে বংশীচন্দ্রগুপ্তের ওপর। স্টুডিওর মধ্যে রাজপ্রাসাদ ইত্যাদি নির্মাণ করা হচ্ছে। এই ছবিতে অভিনয় করছেন তপেন চট্টোপাধ্যায়, রবি ঘোষ, জহর রায়, হরিধন মুখোপাধ্যায়, প্রসাদ মুখোপাধ্যায়, খগেন পাঠক, বিনয় দত্ত, অবনী মুখোপাধ্যায়, চিন্ময় রায়, সন্তোষ দত্ত, শান্তি চট্টোপাধ্যায়, অশোক মিত্র, কানু মুখার্জী, কবি হারীন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ।

চৌধুরী প্রোডাকসন্সের 'আর একটু কাছে' ছবির বহির্দৃশ্য গ্রহণকালে পরিচালক সমর চৌধুরী মধু শ্রীমানী ও গীতা দেকে সংলাপ শোনাচ্ছেন।

মেট্রো সিনেমায় 'মোর দ্যান এ মিরাকল' ছবিতে ওমর শরিফ ও সোফিয়া লোরেন,

জনাব আয়েগী

চিলড্রেন্স ফিল্ম সোসাইটির প্রযোজনায় 'জনাব আয়েগী' ছবিটি তুলছিলেন শহীদ লতিফ। আকস্মিকভাবে তাঁর মৃত্যু হওয়ায় তাঁর স্ত্রী ইসমত চুগতাই বাকি অংশ পরিচালনা করেছেন। শ্রীমতী চুগতাই একজন চিত্রশিল্পী।

অধ্যাপক শ্যামমোহন লিখিত ছবির কাহিনীর নায়ক এক বাগানের মালির ছেলে। পরবর্তী জীবনে কিভাবে সে এক বিখ্যাত শিল্পীরূপে স্বীকৃতি পেয়েছিল তারই কথা বলা হয়েছে ছবিতে। চিত্রনাট্য ও সংলাপ রচনা করেছেন শ্রীমতী ইসমত চুগতাই। ছবির সঙ্গীত পরিচালনা করেছেন সলিল চৌধুরী। অভিনয়ে আছেন : বেবি পিঙ্কি, মাস্টার যোগেশ, চাঁদ উসমানি, জি এম দুরানী, রবিকান্ত।

সংবাদকণী

চলচ্চিত্র উৎসবে 'নায়ক'

সত্যজিৎ রায় পরিচালিত 'নায়ক' তৃতীয় ব্রিসবেন (অস্ট্রেলিয়া) চলচ্চিত্র উৎসবে প্রদর্শনের জন্য ভারত সরকার কর্তৃক মনোনীত হয়েছে। ব্রিসবেন উৎসব অনুষ্ঠিত হবে ৩রা থেকে ১২ই মে।

আর ডি বনশাল প্রযোজিত 'নায়ক'-এর প্রধান ভূমিকায় অভিনয় করেছেন উত্তম কুমার ও শর্মিলা ঠাকুর।

'নায়ক' অস্ট্রেলিয়ার দশম এডেলেইড আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব এবং প্রথম অস্ট্রেলিয়ান বিশ্ব টেলিভিশন উৎসবে প্রদর্শনের জন্য ভারত সরকার কর্তৃক মনোনীত হয়েছে।

ছবিটি উৎসবে প্রদর্শনের জন্য প্রয়োজনীয় সাবটাইটেল ইত্যাদি করা হচ্ছে এবং শ্রীবনশাল এসব উৎসবে উপস্থিত থাকবেন।

পর্যটনে হামবুর্গ স্টেট অপেরা

কয়েক বছর ধরেই হামবুর্গ স্টেট অপেরা বিদেশে অভিনয় করে আসছে। এবছরও তারা যাবে রোম ও ইংল্যাণ্ড সফরে। রোমে তারা মঞ্চস্থ করবে স্ট্রাভিনস্কির "দি রেক্স প্রোগ্রেস" ও রিচার্ড স্ট্রাউসের "উওম্যান উইদাউট এ শ্যাডো"। ইংল্যাণ্ডের এডিনবরা উৎসবে তারা উপস্থিত করবে হবাগনারের "ফ্লাইং ডাচম্যান", স্ট্রাউসের "আরিয়াডনে অন নাক্সোস" এবং অ্যালেক্সাণ্ডার গোরের "আরডেন মাস্ট ডাই"।

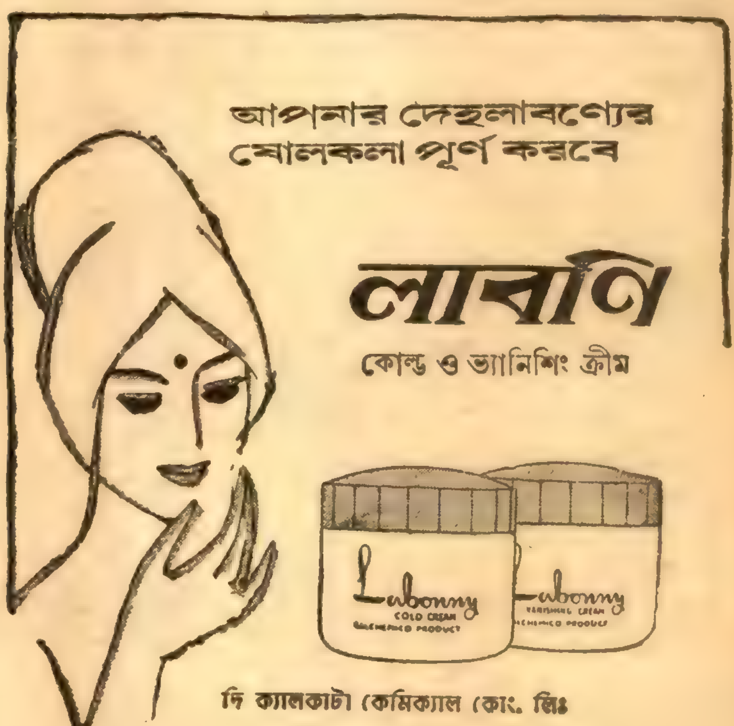

দি ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোং. লিঃ

বিটোফেনের 'ফিডেলিও' গীতিনাট্যে লিও নোরের ভূমিকাভিনেত্রী নর্তকী আনিয়া সিলিয়া।

কুইজমাস্টার "কুলি"

ফ্রাঙ্কফুর্ট (ভি এ ডি) ঃ—টেলিভিশনে আজকাল বুদ্ধির প্রশ্নোত্তর প্রতিযোগিতার খুব রেওয়াজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই বুদ্ধির প্রশ্নকে ইংরেজীতে বলে কুইজ। পশ্চিম জার্মানীর সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় কুইজ ওস্তাদ হলেন হ্যান্সজোয়াকিম কুলেন-কাম্ফ। লোকে তাকে আদর করে "কুলি" বলে ডাকে। প্রত্যেক কুইজ প্রতিযোগিতায় যে জয়ী হয়, তাকে জার্মান টেলিভিশনের তরফ থেকে চার হাজার মার্ক পুরস্কার দেওয়া হয়। একাধিক ব্যক্তি জয়ী হলে লটারী করা হয়।

পৃথিবীর কনিষ্ঠতম প্রিমাডোনা

এক সংবাদে প্রকাশ যে পশ্চিম জার্মানীতে সম্প্রতি স্টেট অপেরার প্রযোজনায় বিটোফেনের "ফিডেলিও" গীতিনাট্যটি রঙীন টেলিভিশনে তোলা হচ্ছে। এতে লিও নোরের ভূমিকায় অভিনয় করছেন সাতাশ বৎসর বয়স্কা নর্তকী আনিয়া সিলিয়া। কি কণ্ঠস্বরে, কি অভিনয় দক্ষতায় তিনি এই চরিত্রটিকে নিপুণভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন।

আনিয়ার অভিনয়-জীবন শুরু হয় মাত্র দশ বছর বয়সে এবং তদবধি আজ পর্যন্ত তিনি খ্যাতির শিখর থেকে শিখরে উঠে চলেছেন। জানা গেছে যে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয়ের জন্য তিনি চুক্তিবদ্ধ।

হলিউডের অভিনেত্রী এলকে সোমার এক চিত্রশিল্পী। সম্প্রতি জার্মানীর মিউনিকে শুন্নাচের আর্ট গ্যালারীতে তাঁর ছবির প্রদর্শনী হয়েছে। এই প্রদর্শনীর নাম ছিল—'সখের চিত্রাংকনে বিখ্যাতরা'। ছবিতে এলকে সোমারকে ছবি সহ দেখা যাচ্ছে।

মোহনবাগান-ইস্টবেংগল দলের খেলার আগে হাসিমুখে দু' দলের অধিনায়ক করমর্দন করছেন। লীগ চ্যাম্পিয়ান-শীপের দৌড়ে দু' দলকেই ঐ খেলায় হারাতে হয়েছিল একটি করে পয়েণ্ট।

খেলা ধুলা

কি বিচিত্র এই দেশ

কলকাতার হকি লীগের খেলা এখন শেষ পথে। বেটন কাপের খেলাগুলো শুরু হবে হবে করছে। বেটন কাপের খেলা শেষের সংগে সংগেই শেষ হয়ে যাবে কলকাতা ময়দানের সব থেকে সংক্ষিপ্ত হকি মরশুম। এই মরশুমটা এতোই সংক্ষিপ্ত যে শুরু হতে না হতে শেষ হয়ে যায়। ধরা-ছোঁয়ার একেবারেই বাইরে। কখন আসে আর কখন যে টুপ করে এক ফাঁকে চলে যায়—তা বোঝাও যায় না, টের পাওয়াই দূরের কথা আর নাচা-নাচি করা তো আরো দূরের কথা!

হকি নামে যে একটি খেলা আছে, আর সে খেলার রেওয়াজ যে কলকাতাতেও আছে, সে কথা বোঝা যায় মাস তিনেকের এই ছোট্ট মরশুমটিতে। অথচ একমাত্র এই হকি খেলাই বিশ্ব ক্রীড়াঙ্গনের অলিম্পিক অনুষ্ঠানে আজো ভারতের একমাত্র সম্বল, একমাত্র আশা আর ভরসা। অলিম্পিক প্রতিযোগিতার এই একটি মাত্রই স্বর্ণপদক ভারত পেতে অভ্যস্ত। তবু হকি খেলার দিকে নজর নেই আমাদের। শুধু আমাদেরই বা বলি কেন? হকি কর্তৃপক্ষেরই এ বিষয়ে কতোটুকু নজর আছে?

অবাক হবার বিষয়ই বটে। যে বিষয়ে ভারতের আরো বেশি তৎপর হওয়া উচিত, হওয়া উচিত আরো বেশি যত্নবান—সেদিকে এতোটুকু নজর নেই কারো, তা সে খেলোয়াড় বলুন, কর্তৃপক্ষ কিম্বা ক্রীড়ারসিকই বলুন! প্রমাণ চাই? বেশি দূরে যেতে হবে না—একবার কলকাতার ময়দানের দিকে তাকান! সেখানে মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গলও খেলছে। খেলছে সীমিত দর্শকের উপস্থিতিতে। তাও যাঁরা মাঠে আসেন, তাঁরা খেলার টানে আসেন না, আসেন মোহনবাগান কিংবা ইস্টবেংগলের নামের অন্ধ মোহে।

কিন্তু মোহভঙ্গের প্রয়োজন আজ যে বড় বেশি। আর আজ সব থেকে বেশি দরকার খেলার উন্নতি করার, খেলার উন্নতির দিকে নজর দেবার। ভারত জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ আসন পেয়েছে খেলার মাঠে একমাত্র তার স্টিক ওয়ার্কের জোরে। বিদেশী খেলোয়াড়রা ভাবতো যে ভারতীয় খেলোয়াড়দের স্টিকে যাদু আছে। কারণ স্টিক ওয়ার্কের দিকে তারা কোনদিনই নজর দেয় নি। দিয়েছে দৈহিক শক্তির দিকে! ফলে ভারতীয় খেলোয়াড়দের কাছে কোন দিক দিয়েই তারা সমকক্ষ হতে পারে নি। তাই তারা আন্তরিকভাবে চেষ্টা করে চলেছে সেই খুঁত শুধরে নিতে। আর আমরা, ভারতীয় খেলোয়াড়রা ভুলে যেতে বসেছি যাদুকরী সেই স্টিক ওয়ার্ক। আমাদের নজর এখন দৈহিক শক্তির দিকে!

সেই সংগে আবার তাল দিয়েছে অবহেলা সম্বলিত স্টেজে মেরে দেবার মনোভাব। ফলে দিনকে দিন ভারতীয় হকি এগিয়ে চলেছে অন্তিম পথের সন্ধানে। ভারতের প্রাক্তন খেলোয়াড়দের কোচ হিসেবে নিয়ে গিয়ে পৃথিবীর অন্যান্য দেশগুলো যখন উন্নতির জন্যে তাদের খেলার ধারা পাল্টে ফেলছে, আমরা তখন হাঁ করে বসে আছি স্টেজে মেরে দেবো বলে। ফলে যে ভারত এতোদিন ছিল অতুলনীয়, যে ভারত এতোকাল ছিল অপ্রতিদ্বন্দ্বী, সেই ভারতকে আজ মুখোমুখি হতে হচ্ছে শোচনীয় ফলাফলের।

কিন্তু তার চেয়েও ঢের বেশি শোচনীয় হাল হয়েছে বাংলা দেশের হকি খেলার। বাংলা দেশের দলগুলোতে বাঙালী খেলোয়াড়ের সংখ্যা নামমাত্র। আর জাতীয় হকি প্রতিযোগিতায় বাংলা দলের খেলোয়াড় তালিকায় বাঙালী ছেলের নাম খুঁজে পাওয়াই মুশকিল। অর্থাৎ বাংলা দলের একজন-দু'জনের বেশি বাঙালী খেলোয়াড় চান্স পান না! অবাক কাণ্ডই বটে! আর শুধু অবাক কাণ্ড বললেই চলবে না, বলতে হবে সেই পুরনো কথা—সত্য সেলুকাস কি বিচিত্র এই দেশ! —শান্তিপ্রিয়

চ্যাম্পিয়ানশীপের শিকে

শেষ পর্যন্ত চ্যাম্পিয়ানশীপের শিকে যে কার ভাগ্যে ছিঁড়বে কে জানে! তবে চেষ্টায় কসুর নেই কারো। কলকাতা ময়দানের প্রধান দলগুলো পয়েন্ট সংগ্রহের দিকে নজর দিয়ে একটার পর একটা খেলায় চলেছে অংশ গ্রহণ করে। জয়, পরাজয় আর অমীমাংসার প্রশ্নে লীগ তালিকার ওপরতলার দলগুলো এখন সমান উদ্বিগ্ন। কোনভাবেই আর একটিও পয়েন্ট নষ্ট করতে চাইছেন না কেউ। কারণ লীগ খেলার শেষ পর্বে আজ এই মুহূর্তে একটি পয়েন্টের মূল্য অনেকখানি।

তবু কলকাতার হকি লীগের খেলা জমেও যেন জমছে না। খেলাগুলি গতানুগতিকভাবে অনেকটা যেন দায়সারা গোছের—না আছে আকর্ষণ, না আছে উন্মাদনা। আর তারই মধ্যে মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল, বি, এন, আর ও মহামেডান স্পোর্টিং-এর মতো নামকরা দলগুলোর খেলা অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

এর মধ্যে আবার উদ্ভব হচ্ছে অস্বাভাবিক পরিস্থিতির। সেদিনের ইস্টবেঙ্গল বনাম খালসা ব্লুজের খেলার কথাই ধরা যাক। বিরতির এক মিনিট আগে আম্পায়ারের পেনাল্টিপুশের নির্দেশের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ঝড় ওঠে মাঠে। খালসা দল আর খেলতে রাজী হলো না।

তখন পর্যন্ত কোন দলই গোল করতে পারে নি। খেলায় ২৯ মিনিটের সময় পেনাল্টি কর্নারের সুযোগ থেকে দাবিন্দর ডানাত স্কুপ করলে খালসা ব্লুজের গোলরক্ষক এস ধর ঝুকে পড়ে বাঁ হাত দিয়ে বলটা গোলের বাইরে ঠেলে দেন। কাছেই ছিলেন আম্পায়ার তারক সেন। তিনি সংগে সংগে দিলেন পেনাল্টিপুশের নির্দেশ। আর তারই প্রতিবাদে খালসা ব্লুজ দল বাকী সময় খেলায় যোগদান করলো না।

সেদিনই ঘটলো আরো এক কাণ্ড। এবারের খেলাটি ছিলো ইস্টার্ন রেল দলের সংগে মেসারার্সের কতো সামান্য কারণে যে আজকাল অসন্তোষ দানা বেঁধে ওঠে তারই জ্বলজ্যান্ত প্রমাণ হলো এই ঘটনাটি! এই খেলাটি শেষ হতে তখন বাকী আছে মাত্র আট মিনিট। বেশ জোরেই বৃষ্টি পড়ছিলো তখন। আর ইস্টার্ন রেল দল জিতছিলো দু' গোলে। তখন মেসারার্স দল আবেদন জানালো খেলা বন্ধ করে দেবার জন্যে! কিন্তু আম্পায়ারদ্বয় তাঁদের সে আবেদনে সাড়া দিলেন না! তাই মেসারার্স দল আর খেলবে না বলে মাঠ ছেড়ে গেলো!

এই যদি খেলোয়াড়দের খেলার নমুনা হয়—তাহলে কলকাতা ময়দানের খেলাধূলোর ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করলে ভয় পাওয়াই স্বাভাবিক। আর এর জন্যে দায়ী হলো কলকাতা ময়দানের ক্রীড়া কর্তৃপক্ষের দুর্বল পরিচালনা। তাঁরা যদি কঠোর হাতে অরাজকতা দূর করতে পারতেন, তাহলে আর যাই হোক অন্তত আম্পায়ারদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে কোন দলই এই ধরণের সিদ্ধান্ত নিয়ে আর নিয়ম-শৃংখলা না মেনে খেলার অগ্রগতি ব্যাহত করতে পারতো না।

ইষ্টবেঙ্গলের নাগজী ট্রফি

কালিকটে অনুষ্ঠিত নাগজী মেমোরিয়াল ফুটবল ট্রফির ফাইন্যাল খেলায় কলকাতার ইস্টবেঙ্গল দল বিজয়ীর সম্মান অর্জন করেছে। ফাইন্যালে তারা বাঙ্গালোরের এম, ই, জি, দলকে দু' গোলে হারিয়ে দেয়।

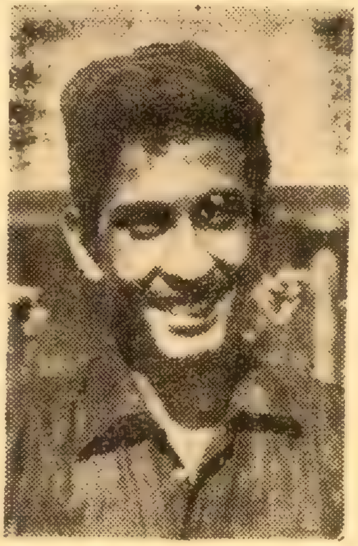

= পরিমল দে =

পরিমল দে'র দু'টি গোল ইস্টবেঙ্গলকে এনে দিয়েছে নাগজী ট্রফি।

খেলাটা মোটামুটিভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক হলেও ইস্টবেঙ্গলের জয়লাভ সহজ হয়ে যায় পরিমল দের দু'টি গোলের জন্যে। ইস্টবেঙ্গল দলের সমস্ত খেলোয়াড়রাই এই জয়লাভের জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করতে থাকেন। তবু খেলায় যথেষ্ট উত্তেজনা দেখা গিয়েছিল। ফলে রেফারীকে বাধ্য হয়ে কয়েকজন খেলোয়াড়কে মাঠ থেকে বের করে দিতে হয়।

অলিম্পিক সমাচার

মেক্সিকো অলিম্পিকে দক্ষিণ আফ্রিকার যোগদানের প্রশ্ন নিয়ে এবারের অলিম্পিক প্রতিযোগিতা দিনে দিনে অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে চলেছে। শেষ পর্যন্ত যে মেক্সিকো অলিম্পিকের বরাতে কি আছে কে জানে! একদিকে রাশিয়ার হুঁশিয়ার, অন্যদিকে আফ্রিকার দেশগুলোর পাল্টা অলিম্পিক অনুষ্ঠানের কথা আবার আর একদিকে দক্ষিণ আফ্রিকার নাম প্রত্যাহার না করার গোঁ।

সম্প্রতি সোভিয়েট অলিম্পিক কমিটির সভাপতি মিঃ কে, এ, আঁদ্রিয়েনভ বলেছেন যে, মেক্সিকো অলিম্পিকে দক্ষিণ আফ্রিকার যোগদান যদি বন্ধ করা না হয় তাহলে অলিম্পিক প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণকারী দেশগুলির অর্ধেকেরও বেশি তাদের নাম প্রত্যাহার করে নেবে।

ওদিকে দক্ষিণ আফ্রিকাও তার গোঁ ছাড়তে নারাজ। তারা স্পষ্টই বলে দিয়েছে যে তারা কিছুতেই অলিম্পিক প্রতিযোগিতা থেকে নাম প্রত্যাহার করবে না। অর্থাৎ মেক্সিকো অলিম্পিকে তারা যোগদান করবেই।

ওদিকে বলা নেই কওয়া নেই আভেরী বনডেজ গিয়ে হাজির হয়েছেন দক্ষিণ আফ্রিকায়। বনডেজের দক্ষিণ আফ্রিকা গমন একেবারেই অপ্রত্যাশিত ব্যাপার। কি মনে করে বনডেজ যে আফ্রিকা গেছেন তা জানা না গেলেও, এটুকু বোঝা যাচ্ছে যে তিনি হয়তো দক্ষিণ আফ্রিকাকে অলিম্পিক প্রতিযোগিতা থেকে নাম প্রত্যাহার করার জন্যে অনুরোধ জানাবেন।

অবশ্য তাতে খুব একটা সুবিধে হবে বলে মনে হয় না। কারণ দক্ষিণ আফ্রিকার অলিম্পিক কমিটির চেয়ারম্যান বলেছেন যে আভেরী বনডেজ যতোই অনুরোধ করুন না কেন দক্ষিণ আফ্রিকা মেক্সিকো অলিম্পিক প্রতিযোগিতা থেকে কোন মতেই নাম প্রত্যাহার করবে না!

নাটক তাই জমে উঠেছে খুব। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কি যে হবে কে জানে...!

জমাটি নাটকের অপর দিকে চলেছে এখন পাল্টা অলিম্পিক অনুষ্ঠানের চিন্তা। আফ্রিকার সুপ্রীম স্পোর্টস কাউন্সিলের সভাপতি মিঃ জিম কুড গাংগা জানিয়েছেন যে মেক্সিকো অলিম্পিকের পাল্টা একটি অলিম্পিকের আয়োজন করা সম্ভব কি না, সে বিষয়ে তাঁরা চিন্তা করে দেখছেন। এই পাল্টা অলিম্পিক প্রস্তাবের পেছনে আছে আফ্রিকার ৩৩ দেশের সমর্থন। এ ছাড়া নাকি এই ব্যাপারে বাইরের অনেক দেশেরও সমর্থন আছে।

আইন-কানুনের দুনিয়া

আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় হলো বাউণ্ডারী। অত্যন্ত সহজ ও সরল হলেও বিষয়টি ক্রিকেট খেলার সংগে অংগাংগিভাবে জড়িত। খেলার সময় ব্যাটসম্যানরা বাউণ্ডারীতে বল পাঠাবার জন্যে যেমন সব সময় সুযোগ খোঁজেন, তেমনি ফিল্ডাররা বল বাউণ্ডারী সীমা যাতে পার না হয়, তার জন্যে সচেষ্ট থাকেন।

তবু এই বাউণ্ডারী নিয়েও অনেক সময় গোলমাল বাধে, খেলার মাঠে অসন্তোষ দানা বেঁধে ওঠে। বিশেষ করে গোলমাল বাধে যখন কোন ফিল্ডার মাঠের মধ্যে দাঁড়িয়ে লাইন পার হওয়া বল ধরেন কিম্বা বাউণ্ডারী লাইনের বাইরে দাঁড়িয়ে মধ্যের বল থামান।

তাই বাউণ্ডারী সম্বন্ধে আমাদের ধারণা স্পষ্ট হওয়া দরকার। বিশেষ করে ক্রিকেট খেলার আইন-কানুনের বাউণ্ডারী নিয়মটির খুঁটিনাটি দিকগুলো সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হবার প্রয়োজন বড় বেশি।

এখন যদি বলি, বাউণ্ডারী দু' রকমের। চার রানের বাউণ্ডারী আর ছয় রানের ওভার বাউণ্ডারী। তাহলে হয়তো সকলেই হাসবেন। বলবেন, এ কি একটা লেখার মতো বিষয় হলো।

ধরে নিলাম তাই। তাহলে বলুন দেখি, মাঠের মধ্যে সাইড স্ক্রীন রয়েছে। ব্যাটসম্যান সজোরে বলটা সোজাসুজি উঁচু করে মারলেন। নির্ঘাৎ ওভার বাউণ্ডারী। কিন্তু বলটা গিয়ে সাইড স্ক্রীনে লেগে মাটিতে পড়ে গেলো! এখন ব্যাটসম্যানকে বাউণ্ডারী দেওয়া হবে, না ওভার বাউণ্ডারী

যাই হোক বাউণ্ডারী সম্বন্ধে ক্রিকেট খেলার আইন-কানুনের ২০ নম্বর নিয়ম বলে,

"খেলার আগেই আম্পায়াররা বাউণ্ডারী লাইন দেখে নেবেন। ব্যাটসম্যান হিট করার পর যদি কোন বল বাউণ্ডারী লাইন অতিক্রম বা স্পর্শ কিম্বা বলসুদ্ধ কোন ফিল্ডার লাইন অতিক্রম করে, তাহলে আম্পায়ার বাউণ্ডারী বলবেন এবং তার ইশারা দেখাবেন। বলটি বাউণ্ডারী লাইন অতিক্রম করার আগে ব্যাটসম্যানরা যদি বাউণ্ডারীর নির্ধারিত রানের বেশি করতে পারেন, তবে সেই বেশি রানই গোনা হবে। যদি ব্যাটসম্যান রান করার পর ফিল্ডারের বল ছোঁড়ার দোষে বা ইচ্ছাকৃত অপপ্রচেষ্টায় বল বাউণ্ডারী লাইন অতিক্রম করে তাহলে যে কয় রান হয়েছে আর তার সংগে বাউণ্ডারীর চার রান ব্যাটসম্যানের নামে লেখা হবে। বাউণ্ডারী না হলে ব্যাটসম্যান ছুটে যে ক' রান নিতে পারবেন সেগুলিই শুধু গোনা হবে।

......পিচের মধ্যখান থেকে বাউণ্ডারী লাইনের সীমানা কোন সময়েই ৭৫ গজের বেশি হতে পারবে না।"

দ্রষ্টব্য—

বাউণ্ডারী

(ক) বাউণ্ডারী লাইন কোথায় হবে তা আম্পায়াররা মাঠ দেখে স্থির করবেন।

(খ) বল যদি বাউণ্ডারী লাইন স্পর্শ করে, বা ফিল্ডসম্যান যদি বল হাতে লাইন অতিক্রম করেন বা তাঁর শরীরের কোন অংশ লাইনের ওপর স্থাপন করেন তাহলে আম্পায়ার বাউণ্ডারীর ইশারা দেবেন। কিন্তু ফিল্ডসম্যান যদি লাইনের ভিতরে দাঁড়িয়ে লাইনের বাইরের বল থামাতে পারেন তাহলে বাউণ্ডারী হবে না।

(গ) মাঠের মধ্যে যদি কোন কারণে বল কোন কিছুর গায়ে লেগে থেমে যায় বা আম্পায়ারের গায়ে লাগে তাহলে বাউণ্ডারী দেওয়া হবে না।

(ঘ) সাধারণত বাউণ্ডারীতে চার রান দেওয়া হয়, তবে বল যদি উঁচু হয়ে বাউণ্ডারী লাইনের (কোন ফিল্ডসম্যানের গায়ে লেগে গেলেও ক্ষতি নেই) বাইরে যায় তাহলে ৬ রান দেওয়া হয়। কিন্তু সাইড স্ক্রীন মাঠের মধ্যে থাকলে বল যদি উঁচু হয়ে অর্থাৎ মাটি স্পর্শ করে তার (সাইড স্ক্রীনের) গায়ে লাগে তাহলে ওভার বাউণ্ডারীর ৬ রান দেওয়া হবে না। সেখানে ৪ রানই দিতে হবে।

ওভার বাউণ্ডারী

(ঙ) আম্পায়ার তাঁর হাত বুক বরাবর এক দিক দিয়ে অপর দিকে বার বার নিয়ে গিয়ে বাউণ্ডারীর ইশারা দেন আর ওভার বাউণ্ডারীর বেলায় দু' হাত মাথার ওপরে তুলে নাড়ান।

বিশেষ মতামত—

মারার পর যদি কোন কারণে বলটি থেমে যায় বা কোন অবাঞ্ছিত ব্যক্তির গায়ে লেগে মাঠের মধ্যে থাকে তাহলেও বল 'ডেড' হয় না। তখনও ব্যাটসম্যান রান নেবার সময় রান আউট হতে পারেন।

সব সময় বাউণ্ডারীতে একটা লাইন দিয়ে রাখা দরকার। লাইন ছাড়াও ফ্ল্যাগ বা পোস্ট দিয়ে বাউণ্ডারীর সীমানা সাধারণত নির্ধারিত করা হয়।

ফোল্ডিং ৫০ গুলির পিস্তল

লাইসেন্সের প্রয়োজন নেই। আমেরিকান মডেল। চোর এবং বন্য জন্তুর হাত থেকে নিজেকে বাঁচান। পিকনিক, ভ্রমণ এবং নাটকের পক্ষে উপযোগী। ৫০ গুলীর ব্যবস্থাসহ অটোমেটিক। হাল্কা ওজন এবং চোখ ধাঁধান আগুন আপনাকে বিপদ থেকে রক্ষা করবে।

মূল্য ৫০ গুলীসহ নং ৩৩ টাঃ ১৩·৫০। জার্মান মডেল নং ৯৯ টাঃ ১৫·৫০। ভি, পি, পি, চার্জ টাঃ ২·৫০। চামড়ার কেস ৭, টাকা। অতিরিক্ত প্রতি একশত গুলী ৫, টাকা।

GEM ARTS (WBM—15)
P.B. 1325, Delhi—6.

সীমার মাঝে অসীম

পরিচীয়তে

ইডেনে সেদিন তুলকালাম কাণ্ড! পুলিশের লাঠি আর কাঁদানে গ্যাসের সেল-ফাটার দুমাদুম শব্দ। ঘেরা মাঠের মধ্যে আবদ্ধ আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার অসহনীয় অবস্থা। মাঠ ছেড়ে আসার জন্যে সমস্ত মাঠে তখন প্রচণ্ড হুড়োহুড়ি!

কিন্তু দেখতে দেখতে অবস্থা গেলো পাল্টে। যারা খাচ্ছিলো মার, তারাই এবার এগিয়ে এলো মারতে। উপায় না দেখে পুলিশ পালালো মাঠ ছেড়ে।

লাগাম ছেঁড়া ঘোড়ার মতো উন্মত্ত জনতা উত্তেজনায় অধীর হয়ে মাঠে লাগালেন আগুন। গ্যালারীর ছাউনীগুলো আগুনে আগুনে ছেয়ে গেলো।

ভারতের খেলোয়াড়রা সময় বুঝে চলে গেছেন হোটেলে। পথ-ঘাট চেনেন না ওয়েস্ট ইণ্ডিজের খেলোয়াড়রা, অসহায়ের মতো তাঁরা মাঠের আশেপাশে ছুটে বেড়াচ্ছেন। আর ঠিক সেই মুহূর্তে মাঠের মধ্যে দেখা গেলো আর এক দৃশ্য।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজের পতাকা তখনো পত্ পত্ করে উড়ছে! আর হয়তো পারবে না। আগুনের হল্কায় এখনই বুঝি পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। ঠিক তখনই দেখা গেলো ফ্লানেলের প্যাণ্ট-সার্ট আর সোয়েটার পরা কালোমতন কে যেন একজন বাঁশ বেয়ে ওপরে উঠছেন। তিনি ওপরে উঠলেন, সযত্নে ফ্লাগটাকে খুলে নিয়ে আবার নেমে এলেন নিচে। নিচে নেমে এলেন ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের সহ-অধিনায়ক কনরাড হাণ্ট!

খেলোয়াড় হিসেবে হাণ্ট যতো বড়, তার চেয়ে অনেক বেশি বড়-মানুষ হাণ্ট। দলের গোড়া পত্তনে খেলোয়াড় হাণ্ট সহজ-সরল ভঙ্গিমাতে যেভাবে এগিয়ে চলেন, তার চেয়ে বোধহয় অনেক বেশি সহজ আর সরল কনরাড হাণ্টের সাধারণ জীবন। আর তারই প্রতিফলন তাঁর খেলোয়াড় জীবনের প্রতি মুহূর্তে প্রতিভাত হয়।

তবে দেখতে দেখতে হাণ্টের বয়েসও যৌবনের শেষ প্রান্তে গড়িয়ে গেলো। সামনের মে মাসে ছত্রিশ বছরে পা দেবেন হাণ্ট। জন্ম ১৯৩২ সালের ৯ই মে। তাই মনে হয় আর ক'দিনই বা হাণ্ট খেলবেন। হয়তো হঠাৎই এসে যাবে বিদায়ের বেলা। ক্রিকেট খেলা থেকে অবসর নেবেন জেন্টলম্যান ক্রিকেটার কনরাড হাণ্ট!

তবে আমাদের সৌভাগ্য আমরা হাণ্টকে বিভিন্ন দিক দিয়ে নানাভাবে দেখেছি। দেখেছি তাঁর প্রতিভাদীপ্ত খেলোয়াড় রূপ আবার দেখেছি মানুষ হিসেবে হাণ্টের মহান রূপ। সে রূপের তুলনা করতে গেলে মনে আসে শুধু একটিই নাম—সে নাম স্যার জ্যাক হবসের......!

হাণ্টও বার্বাডোজের ছেলে। মাত্র আঠারো বছর বয়সে প্রথম শ্রেণীর খেলায়

কনরাড হাণ্ট

যোগদান করতে আরম্ভ করলেও টেস্ট জগতে প্রবেশ করতে তাঁকে অপেক্ষা করতে হয়েছিল আরও ছ' বছর।

১৯৫৮ সালে প্রথম বিদেশ ভ্রমণের সুযোগ পেয়ে হাণ্ট এসেছিলেন ভারতে। কিন্তু সে মরশুমে তিনি সাফল্যলাভ করতে পারেন নি এতোটুকুও। সব মিলে করেছিলেন মাত্র ২১৬ রান। কিন্তু সে বছরই দেশের মাটিতে হাণ্টের ব্যাটিং প্রতিভার পরিচয় পাওয়া গেলো। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে প্রথম টেস্টে করেছিলেন ১৪২ রান। আর তৃতীয় টেস্টে করলেন ২৬০ রান। সোবার্সের সংগে দ্বিতীয় উইকেটে সে টেস্টে যোগ হয়েছিলো ৪৪৬ রান। এ ছাড়া জর্জটাউনের ১১৪ আর ব্রিজটাউনের ১৪২ রানের কথাও মনে রাখার মতো।

১৯৬০-৬১ সালে অস্ট্রেলিয়া সফরে মেলবোর্নে ১১০ রান করলেও ব্রিসবেনের টাই টেস্টে হাণ্টের সেই অবিস্মরণীয় ফিল্ডিং আর টাই টেস্টের শেষ মুহূর্তে গ্রাউটকে রান আউট করার জন্যে অতুলনীয় থ্রোয়িং-এর কথা ক্রিকেট উৎসাহীদের মনের মণিকোঠায় জ্বলজ্বল করবে চিরকাল। এর পর ১৯৬৩ সালে ইংলণ্ড সফরের প্রথম টেস্টে হাণ্টের ১৮২ রানই ওয়েস্ট ইণ্ডিজকে এগিয়ে দিয়েছিলো জয়লাভের পথে। আর শেষ টেস্টের প্রথম ইনিংসে ৮০ আর দ্বিতীয় ইনিংসে ১০৮ রানের কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তারপর ১৯৬৫ সালে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ৫টি টেস্টে হাণ্টের ৫৫০ রানের কথা কি ভোলা যায়......!

মনে হয় খেলোয়াড় হিসেবে হাণ্টের পরিচয় আর বোধহয় না দিলেও চলবে! কারণ হাণ্টকে আমরা দেখেছি একাধিকবার! দেখেছি খেলোয়াড় হাণ্টের অতুলনীয় রূপ। কতো সহজ আর সরল ভঙ্গিমাই না হাণ্টের খেলার। দলের ইনিংস সূচনা করতে এসে ব্যাট নিয়ে উইকেটের সামনে দাঁড়ালে মনে হয় যেন বিশাল পাহাড় উইকেট আড়াল করে দাঁড়িয়েছে। অথচ হাণ্ট মোটেই স্ফীতকায় নন। কিন্তু আত্মবিশ্বাসে ভরপুর, নিপুণ যোদ্ধাকে চোখের সামনে দেখলে বোধহয় ঐ একটা উপমার কথাই মনে আসবে।

নিপুণ শিল্পী হাণ্ট, অদ্ভুত ভদ্র আর বিনয়ী স্বভাব তাঁর। হাণ্টকে শুধুমাত্র একটি কথা দিয়েই বুঝিয়ে দেওয়া যায়—সীমার মাঝে অসীম তিনি।

সম্পাদিকা—জয়ন্তী সেন

বসুমতী (প্রাঃ) লিঃ-এর পক্ষে ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীটস্থ কলিকাতা-১২

বসুমতী প্রেস হইতে শ্রীসুকুমার গুহমজুমদার কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বসুমতীতে পাওয়া যাচ্ছে! একরাশ শিশু-সাহিত্য!

কিন্তু সমগ্র পরিবার পড়তে পারেন

দামে যেমন সস্তা, তেমনি পাতায় পাতায় রঙীন ছবি।

মনোরম রঙীন প্রচ্ছদ। বোর্ডে বাধাই।

আজই অর্ডার পেশ করুন আপনার পরিবারের সকলের জন্য।

(পাঠাগার ও সংস্থাসমূহের জন্য শতকরা পনেরো টাকা কমিশন!)

১।	রঘুবংশ	মহাকবি কালিদাস	পঁচাত্তর পয়সা
২।	শকুন্তলা	মহাকবি কালিদাস	পঁচাত্তর পয়সা
৩।	এ্যারেবিয়ান নাইটসের গল্প (দুই খণ্ডে সম্পূর্ণ)	অনুবাদ—অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর	প্রতি খণ্ড এক টাকা পঁচিশ পয়সা
৪।	জুলিয়াস সিজার	উইলিয়ম সেক্সপীয়র	এক টাকা পঞ্চাশ পয়সা
৫।	ম্যাকবেথ	উইলিয়ম সেক্সপীয়র	এক টাকা পঞ্চাশ পয়সা
৬।	রোমিও জুলিয়েট	উইলিয়ম সেক্সপীয়র	এক টাকা পঞ্চাশ পয়সা
৭।	হারকিউলিস	হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ	এক টাকা বাষট্টি পয়সা
৮।	আষাঢ়ে গল্প	হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ	এক টাকা পঁচাত্তর পয়সা
৯।	স্নো-হোয়াইট	হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ	এক টাকা বাষট্টি পয়সা
১০।	কুমারের বাবা গোয়েন্দা	হেমেন্দ্রকুমার রায়	এক টাকা পঁচিশ পয়সা
১১।	ছোট্ট পাখির অভিমান	হেমেন্দ্রকুমার রায়	এক টাকা পঁচিশ পয়সা
১২।	রতনপুরের যাত্রী	হেমেন্দ্রকুমার রায়	এক টাকা পঁচিশ পয়সা
১৩।	ডন কুইকসোট	সারভেণ্টিস	এক টাকা পঞ্চাশ পয়সা
১৪।	ওয়ার এ্যাণ্ড পিস	টলস্টয়	এক টাকা পঞ্চাশ পয়সা
১৫।	বর্মায় যখন বোমা পড়ে	সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়	এক টাকা পঁচিশ পয়সা
১৬।	আমার দেশ	নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়	দুই টাকা পঞ্চাশ পয়সা
১৭।	মোহন সিংয়ের ফাঁদি	মন্মথনাথ ঘোষ	এক টাকা পঁচিশ পয়সা
১৮।	জন্মজন্মান্তরের কাহিনী	নরেন্দ্র দেব	দুই টাকা পঞ্চাশ পয়সা
১৯।	রকমারি গল্প	নরেন্দ্র দেব	দুই টাকা পঞ্চাশ পয়সা
২০।	স্বার্থপর দৈত্য	বুদ্ধদেব বসু	এক টাকা পঁচাত্তর পয়সা
২১।	সুখী রাজপুত্র	বুদ্ধদেব বসু	এক টাকা পঞ্চাশ পয়সা
২২।	লক্ষ্মণ সেনের রাজমুকুট	—	এক টাকা পঁচিশ পয়সা
২৩।	শান্তিপুরে অশান্তি	প্রভাবতী দেবী সরস্বতী	এক টাকা পঞ্চাশ পয়সা
২৪।	বন্দী জেগে আছো?	প্রভাবতী দেবী সরস্বতী	এক টাকা পঁচিশ পয়সা
২৫।	প্রেতাত্মার প্রতিহিংসা	প্রভাবতী দেবী সরস্বতী	এক টাকা পঁচিশ পয়সা
২৬।	মনের মতো গল্প	প্রভাবতী দেবী সরস্বতী	এক টাকা পঁচিশ পয়সা
২৭।	টিয়ার গ্যাস	স্বপন বুড়ো	এক টাকা পঁচিশ পয়সা
২৮।	লাফিং গ্যাস	স্বপন বুড়ো	এক টাকা পঞ্চাশ পয়সা
২৯।	অশরীরী আত্মা	স্বপন বুড়ো	এক টাকা পঞ্চাশ পয়সা
৩০।	কেনিলওয়ার্থ	মন্মথনাথ ঘোষ	এক টাকা পঁচিশ পয়সা
৩১।	টোয়েন্টি ইয়ার্স আফটার	সুধীন্দ্রনাথ রাহা	এক টাকা পঁচিশ পয়সা
৩২।	টয়লার্স অব দি সী	সুধীন্দ্রনাথ রাহা	এক টাকা পঁচিশ পয়সা
৩৩।	ডেভিলস আইল্যাণ্ড	বিশু মুখোপাধ্যায়	পঁচাত্তর পয়সা
৩৪।	অচিন দেশের রাজকন্যা	দীনেশ মুখোপাধ্যায়	এক টাকা

শিশু-সাহিত্যের রত্নভাণ্ডার! স্বপ্নের ময়ূরপঙ্খী! বসুমতী (প্রাঃ) লিঃ॥ কলিকাতা-১২

মহাকাশে যান ছুটছে

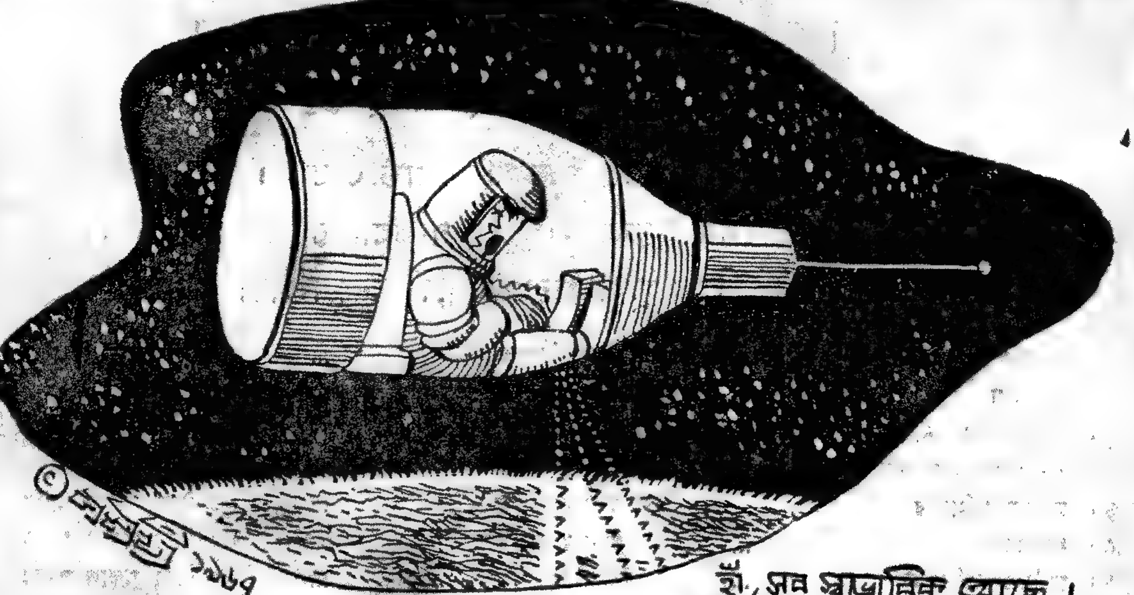

হাঁ, সব স্বাভাবিক আছে।
যন্ত্রগুলো চমৎকার কাজ করছে।
আকাশ গাঢ় কালো নীল। অত চোখধাঁধা সূর্য্যের আলোতেও তারাগুলো আগুনের মত জ্বলছে।

এখন ভারতের ঠিক উপর দিয়ে যাচ্ছি —
ঐ মশলার দেশটা নিচে দেখা যাচ্ছে — ঐ দূরে মশলার দ্বীপপুঞ্জ SPICE ISLANDS চোখে পড়ছে। এ সব স্থান হতেই হাজার বছর ধরে পৃথিবীর সবজাতি মশলা নিয়ে যাচ্ছে। আর,--- হাঁ, হঠাৎ মনে পড়ে গেল----

এখান থেকেই সব চাইতে সেরা ভারতের গুঁড়ো মশলা কুকমী কলকাতা হতে তৈরী হয়ে ভারতের সর্ব্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে!

26 APR 1968

বাজারের সেরা
গুঁড়ো মশলা

গ্রাম : "স্পাইসমার্ট" মিল-কাশীপুর ফোন : ৩৩-১২০২, ৩৩-২০৮১

নিজস্ব মিলে বৈজ্ঞানিক প্রথায় প্রস্তুত

'কুকমী'—সর্বাধিক বিক্রীত গুঁড়ো মশলা

পনের লক্ষ প্যাকেট মাসিক বিক্রয়

১২৫ বৎসরের অধিক প্রাচীন ও বর্তমানে মশলার বৃহত্তম প্রতিষ্ঠান

কৃষ্ণচন্দ্র দত্ত (স্পাইস) প্রাঃ লিঃ ২৩১নং ও ২৩৫নং মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড, পোস্তা, কলিকাতা-৭

সাপ্তাহিক বসুমতী

কলকাতায়

বিক্ষুব্ধ রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের সমাবেশ

পরীক্ষা সমস্যা সম্পর্কে বিশেষ ছাত্র সম্মেলন

শ্রীঅতুল্য ঘোষের বিরুদ্ধে শ্রীআশুতোষ ঘোষের অভিযোগ

নাটকর প্রত্যাহারের দাবিতে নাট্যকার-শিল্পীদের বিক্ষোভ

বর্ষ: ৪৬শ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ১৯শে বৈশাখ, ১৩৭৫ বঙ্গাব্দ] OLDEST WEEKLY OF NORTH INDIA [72nd year, No. 46, 2nd May, 1968

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয়		২৮৮৩
আজকের মানুষ		২৮৮৪
রঙ্গদর্শন		২৮৮৫
সপ্তাহের বোঝা	—কৃত্তিবাস ওঝা	২৮৯০
ভারতদর্শন		২৮৯৩
আন্তর্জাতিক		২৮৯৬
অবক্তব্য	— চন্দ্রগুপ্ত	২৮৯৮
বিশ্বসাহিত্যের আদিপর্ব	— ডঃ নরেন ভট্টাচার্য	২৯০০
অগ্নিযুগের একটি অধ্যায়	— অনন্ত সিংহ	২৯০৩
পথ কে রুখবে? (ধারাবাহিক উপন্যাস)	— মনোজ বসু	২৯০৭

"ভারতবর্ষের অধিকাংশ হিন্দু, বাংলা দেশের সকল হিন্দুর, বিশ্বাস যে, শ্রীকৃষ্ণ ঈশ্বরের অবতার। 'কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ম্'—ইহা তাঁহাদের দৃঢ়বিশ্বাস। বাংলা প্রদেশে কৃষ্ণের উপাসনা প্রায় সর্বব্যাপক। গ্রামে গ্রামে কৃষ্ণের মন্দির, গৃহে গৃহে কৃষ্ণের পূজা, প্রায় মাসে মাসে কৃষ্ণোৎসব, উৎসবে কৃষ্ণযাত্রা, কণ্ঠে কণ্ঠে কৃষ্ণগীতি, সকল মুখে কৃষ্ণনাম। কাহারও গায়ে দিবার বস্ত্রে কৃষ্ণনামাবলি, কাহারও গায়ে কৃষ্ণনামের ছাপ।"—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

ভক্তির মন্দাকিনী! প্রেমের অলকানন্দা! জ্ঞানের আকাশগঙ্গা!

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার প্রবক্তা; কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে অর্জ্জুনের সারথি; পঞ্চপাণ্ডবের প্রধান-উপদেশক;
শ্রীরাধিকার দিব্যপ্রেমের দোসর

শ্রীকৃষ্ণ

"হে কৃষ্ণ করুণাসিন্ধু বিতরিয়ে কৃপাবিন্দু
ফিরে চাও বারেক নয়নে।
ব্যাকুলা বিহ্বলা নারী মুছাও নয়নবারি
তাপহারী রাখ শ্রীচরণে॥"

পাঠাগার ও উপহারের জন্য সুশোভিত রাজ-সংস্করণ॥

বড় টাইপে, অ্যান্টিক কাগজে সুদৃশ্য বর্ণাঢ্য মুদ্রণ পৃষ্ঠাসংখ্যা ৫০০

পরমভক্ত দেবেন্দ্রনাথ বসু বিরচিত

তৎসহ কুড়িখানি ত্রিবর্ণ চিত্রের আর্ট প্লেট : মূল্য মাত্র পনেরো টাকা

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড। ১৬৬, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলিকাতা—১২

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
গ্রামবাংলার কথা	— অসীম মুখোপাধ্যায়	২৯০৯
মানবতা সম্পর্কে (কবিতা)	— শম্ভুনাথ চট্টোপাধ্যায়	২৯১২
উট পাখি (গল্প)	— সমীর মুখোপাধ্যায়	২৯১৩
যা দেখেছি, যা পেয়েছি (স্মৃতিচয়ন)	— সুধীরঞ্জন দাস	২৯২২
রাজনীতি ও ছাত্রসমাজ	— প্রদ্যোৎকুমার রায়	২৯২৮
পূর্ব জার্মানী ও সোভিয়েটদেশ পরিক্রমা	— অশোক সেন	২৯৩১
রঙ্গজগৎ		২৯৩৪
স্তব্ধ বিহঙ্গ	— কাজল মিত্র	২৯৩৮
খেলাধুলা	— শান্তিপ্রিয়	২৯৪০

॥ নাটক ॥ নাটক ॥ নাটক ॥ নাটক ॥ নাটক ॥

বহুকাল পরে আবার পাওয়া যাচ্ছে।

ম হা ক বি

গিরিশচন্দ্র ঘোষের রচনাবলী

প্রথম খণ্ড : প্রফুল্ল, ম্যাকবেথ, ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব ও স্বামী বিবেকানন্দ সম্পর্কে চারটি প্রবন্ধ, তিনখানি গীতিনাট্য ও গ্রন্থপরিচয়। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪১২। মূল্য দশ টাকা।

দ্বিতীয় খণ্ড : সিরাজউদ্দৌলা ; যায়সা কা ত্যায়সা ; জনা ; দোললীলা ও গ্রন্থপরিচয়। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩৫৮। মূল্য দশ টাকা।

তৃতীয় খণ্ড : পাণ্ডবগৌরব, বলিদান, আবুহোসেন ও গ্রন্থপরিচয়। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩৫২। মূল্য দশ টাকা।

চতুর্থ খণ্ড : চৈতন্যলীলা, ভ্রান্তি, মলিনাবিকাশ, হীরার ফুল, বিবিধ রচনা ও গ্রন্থপরিচয়। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩০২। মূল্য দশ টাকা।

পরমহংসদেব শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর ভক্ত-শিরোমণি অতি প্রিয় নোটো গিরিশকে বলেছিলেন, —"অভিনয়ের প্রয়োজন আছে বৈ-কি—ওতে লোকশিক্ষা হবে। আর তোমার লেখা—ও যে ভারি ভাল হয়েছে।"

প্রতিটি খণ্ড বোর্ডে বাঁধাই। মূল্যবান কাগজে ছাপা।

রচনাবলী সম্পাদনা : শ্রীরমেন চৌধুরী

অবিলম্বে অর্ডার পেশ করুন।

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড : ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলি-১২

CALCUT… CENTRAL LIBRARY. …UNIVERSITY

৭২ বর্ষ : ৪৬শ সংখ্যা—মূল্য : ৩০ পয়সা বাংলা ভাষায় দ্বিতীয় সর্বাধিক প্রচারিত সাপ্তাহিক পত্রিকা PRICE : 30 Paise
বৃহস্পতিবার, ১৯শে বৈশাখ, ১৩৭৫ বঙ্গাব্দ Thursday, 2nd May, 1968

পরীক্ষা-পদ্ধতি প্রসঙ্গে

বস্তুত বিশ্ববিদ্যালয় এবং মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ পরিচালিত পরীক্ষায় পাশ করার জন্যে জ্ঞান নয়, কান্ডজ্ঞানের দরকার—এরকম কথা হাসির উদ্রেক করলেও—ঘটনা হিসেবে তা নির্মম সত্য। কান্ডজ্ঞান আবার তেমন কিছু মহৌষধি নয়; মুখস্থ-বিদ্যা যার আছে, সেই প্রাথমিক শিক্ষা থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম শিক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারে। পড়াশুনায় কিছুটা ভালো বলে যাদের পরিচয়, তারাও মুখস্থ করে ভালো ফল করে। তাদের কাছে বেশি কিছু প্রত্যাশা করা দুরাশা মাত্র। আমাদের দেশে এখন অনেক বিশ্ববিদ্যালয়, অনেক ছাত্র প্রথম থেকে দশম স্থানাধিকার করছে। কিন্তু তারা দেশের কাজে কতটুকু লাগে? নিজেদের অর্জিত বিদ্যার সাহায্যে প্রতি-যোগিতামূলক চাকরির ক্ষেত্রে তারা বড় চাকরি পায়। তাদের বিদ্যাও অর্থকরী। মৌলিক সৃষ্টির ক্ষেত্রে তাদের কোনো অবদান নেই। এমন কি দশে মিলে যে কাজ হচ্ছে, সেখানেও তারা আভিজাত্য-বোধে প্রায় অনুপস্থিত!

একালের পরীক্ষার অন্যতম অভিশাপ—সাধারণ পাশ করা ছেলেদের কোনো সুবিধাই এ পরীক্ষা প্রায়ই সাধন করতে পারছে না। হাল আমলে চাকরির দরজা সর্বত্রই বন্ধ। যে সব ছাত্র গলদঘর্ম হয়ে পাশ করছে—তাদের ভবিষ্যৎই বা কি? এ কথা নিষ্ঠুর হলেও সত্য, এখন যে রকম আর্থিক দুরবস্থা, তাতে পড়াশুনোটাই মূলত অর্থকরী হয়ে দাঁড়িয়েছে। সুতরাং যে পরীক্ষা চাকরি পাওয়ার চৌকাঠ মাত্র—যা পার হলেই চাকরি পাওয়ার আশা—, পাশ করা বেকার যুবকের কাছে তার মূল্য কি? বর্তমানে যে রকম পরীক্ষা চালু রয়েছে—প্রায় সেরকম পদ্ধতি পঞ্চাশ বছর আগেও ছিল। তখন মৌলিক প্রতিভা-সম্পন্ন ছাত্রের অভাব হয় নি। এখনো তারাই কী বিজ্ঞান, কী সাহিত্য, কী অর্থ-নীতি—প্রায় সব ক্ষেত্রেই বাংলা দেশের মুখ রক্ষা করছে। আবার, তখন সামান্য বিদ্যায় চাকরিও দুর্লভ ছিল না।

আমরা স্বীকার করি, পরীক্ষা পদ্ধতিতে গলদ আছে ঠিকই। সেই সঙ্গে আনুষঙ্গিক বিষয়গুলির কথা না ভাবলে মৌলিক পরিবর্তনের দ্বারা তেমন কিই বা লাভ হবে?

এখন বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা বেড়েছে ততোধিক বেড়েছে ছাত্র সংখ্যা। ছাত্র সংখ্যার অনুপাতে বাড়ে নি অধ্যাপকের সংখ্যা। নতুন তত্ত্ব ও নতুন তথ্য প্রায়শই পাঠ্যতালিকার অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে। ল্যাবরে-টরিতে ছাত্রদের প্রাকটিক্যাল ক্লাস আরো বেশি হওয়া প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ছে, তবু তা সম্ভব হয় না। অধ্যাপনা ও অধ্যয়নের জন্যে আজো সেই গতানুগতিক ধারাই অনুসৃত হচ্ছে। গোনাগুণতি দিনে অগুণতি পাঠ্য বিষয় সমাপ্তির জন্যে বাঁধা সময়-সূচী—উপরন্তু নানা রকম বাধা-বিঘ্ন। শিক্ষকদের মধ্যে অসন্তুষ্টি বর্তমান, ছাত্ররাও কখনো-সখনো মারমুখী। ছাত্রদের দিকটাও বিবেচনার যোগ্য। কারণ অত্যধিক দামের জন্য চড়া দামে বিদেশাগত গ্রন্থগুলি কেনা তাদের পক্ষে সহজসাধ্য নয়। বিদেশী ভাষার বৈতরণী পার হতে গিয়ে অনেকের দফা-রফা শেষ হয়। মৌলিক চিন্তাশক্তি নষ্ট হয়। তাদের জন্য না আছে তেমন পাঠাগার। পাঠাগার থাকলেও কয়েকশত ছাত্রের জন্য বোধ হয় একটি গ্রন্থ। কলেজেও সব বিষয় সম্পূর্ণ পড়ানো সম্ভব হয় না। তাছাড়া তাদের আছে পড়ার মতো যথোপযুক্ত স্থানাভাব, এবং ভবিষ্যৎ-এর দুশ্চিন্তায় নৈরাশ্য। সুতরাং পরীক্ষা পিছিয়ে দেবার দাবি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় থেকে সেই যে শুরু হয়েছে—তার আর যেন শেষ নেই। যে পরীক্ষা হবার কথা ছিল ১৯৬৭-র নভেম্বরে তা হয়তো হবে ১৯৬৮-র নভেম্বরে। অর্থাৎ এক বছর বিলম্বিত হলেও তারিখ এবং সময়টা যেন ঠিক থাকে। ফলে, বহু ছাত্রেরই একটা বছর জলে পড়ে। এভাবে পরীক্ষা পিছিয়ে দেওয়া ঘোরতর অন্যায় হলেও নানাবিধ কার্যকারণে কর্তৃপক্ষও তা মেনে নেন। এবং ছাত্রদের একটা দাবি মিটে গেলে আসে আর একটা দাবি। ইচ্ছেমতো পরীক্ষায় বসার দাবি, গ্রেস মার্কের দাবি। প্রসঙ্গত বলা দরকার, ঐ সব দাবির মূলে থাকে প্রশ্নপত্র রচয়িতাদের কিছুটা ত্রুটি। যেমন পাঠ্যতালিকা বহির্ভূত প্রশ্নপত্র তৈরি কিংবা নিজ বিদ্যা প্রদর্শনের ইচ্ছায় বিদেশী ভাষার মারপ্যাঁচ।

আনন্দের ব্যাপার, কলকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের নতুন উপাচার্য ডক্টর সত্যেন্দ্র-নাথ সেন পরীক্ষাপদ্ধতি, পাঠ্যতালিকা এবং শিক্ষার মাধ্যম নিয়ে প্রথমেই অগ্রসর হতে চেয়েছেন। তিনি স্বয়ং একজন খ্যাতিমান অর্থনীতিবিদ, প্রবীণ শিক্ষাচার্য এবং ছাত্র-দরদী। যেভাবে তিনি কাজে হাত দিতে চেয়েছেন—তা সাধুবাদের যোগ্য। কিন্তু একথাও ঠিক, পশ্চিমবঙ্গে আরো যে ছ'টি বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে তাদের উপাচার্যদেরও এ বিষয়ে মনোযোগী হতে হবে। নচেৎ, এক জায়গায় আমূল পরিবর্তন সাধিত হওয়ার আশা থাকলেও অন্যত্র গলদগুলি বিদ্যমান থাকলে বর্তমান অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতিতে সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের উন্নতি হওয়ার সম্ভাবনা নেই।

সম্পাদকীয়

আজকের মানুষ

টিপটপ। সব সময় ফিটফাট খোপদুরস্ত পোষাকে দেখতে পাবেন তাঁকে। সে-পোষাক রাজকীয় কিছু নয়, কিন্তু দামী, মার্জিত রুচিসম্পন্ন। পোষাক দেখেই পোষাকধারীর চরিত্র বোঝা যাবে। না, কেবল মেয়েদের মন ভোলাবার জন্যে নয়, মেয়ে-পুরুষ, শিশু-বৃদ্ধ সকলের মন পাবার কৌশল তাঁকে রপ্ত করতে হয়েছে পেশার খাতিরে। বিলাসিতার জন্য পোষাক-আশাকের দিকে তাঁর এ-তীক্ষ্ন নজর নয়, পেশাগত কারণেই তাঁকে আস্তে আস্তে এ-অভ্যাস গড়ে তুলতে হয়েছে। আর হয়েছে তাঁর পরিবেশের কারণে। কবি-দার্শনিক তো তিনি নন যে, যা-হোক-একটা দিয়ে গা ঢাকলেই তাঁর হল, তিনি কূটনীতিক; তাঁকে দেশ-বিদেশের বড় বড় লোকেদের সঙ্গে নিত্য সহবং করতে হয়। ময়লা, নোঙরা জামা-কাপড়-পরা সেলসম্যানের কাছে খদ্দেররা যাবে কেন? আরশাদ হোসেন তো এক হিসেবে সেলসম্যানই—বিদেশের রাজধানীতে স্বদেশের (পাকিস্তান) তথ্য, আদর্শ ইত্যাদির পসরা নিয়ে বসেছেন। আজ আরশাদ হোসেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী হয়েছেন বলে কি তিনি তাঁর সে সৌখীন বেশ বদল করবেন? এতদিন খুচরো মাল বেচেছেন, আজ তিনিই পাইকার, তিনিই পণ্য উৎপাদক। পাকিস্তানের বৈদেশিক নীতি এখন থেকে তিনিই পয়দা করবেন। কিন্তু তাই বলে ফর্সা জামা ছেড়ে ময়লা জামা পরে ভোল পাল্টাবার কোনো কারণ ঘটেছে কি?

আজ পাকিস্তানের পররাষ্ট্রনীতির মূল প্রবক্তার ভূমিকা নিলেও আরশাদ হোসেন পাকিস্তানে একজন উদ্বাস্তুমাত্র। তিনি ভারতের পাঞ্জাবের লোক। পাকিস্তান সৃষ্টি হবার পরেও তিনি নয়াদিল্লীতে উঁচু পদে কাজ করছিলেন—ভারত সরকারের বিজ্ঞাপন বিষয়ক উপদেষ্টা। দেশ-বিভাগের সঙ্গে সঙ্গে তিনি পাকিস্তানে যাবার ইচ্ছে প্রকাশ করে (option) কোন ঝুঁকি নিতে চান নি, ঝুঁকি নিয়েছেন ১৯৫০ সনে। পাকিস্তান সরকার তাঁকে বৈদেশিক দপ্তরে উঁচু পদের লোভ দেখালেন আরশাদ কেরিয়ারিস্ট। আরসাদ সিভিল সার্ভিসের লোক নন, স্বাভাবিক নিয়মে বৈদেশিক দপ্তরে কোন গুরুত্বপূর্ণ পদ তাঁর পাবার কথা নয়। কিন্তু কেরিয়ারিস্ট আরশাদ এ-সুযোগ ছাড়লেন না। ঝুঁকি নিলেন তিনি। ভারত সরকারের অধীনে ফিল্ম ও প্রকাশনা দপ্তরের ডাইরেক্টরের পদ ছেড়ে তিনি পাক পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে ডেপুটি সেক্রেটারীর পদ নিয়ে করাচী গেলেন।

আণ্ডার সেক্রেটারী থেকে দপ্তরের সর্বময় কর্তা হবার ভাগ্য খুব কম সিভিলিয়ানেরই হয়েছে। কিন্তু এই ভাগ্যান্বেষী যুবকটির প্রতি পাকিস্তান সরকার যেন বরাবরই একটু প্রসন্ন। ডেপুটি সেক্রেটারীর কাজের পর আরশাদকে পাঠানো হল বিলেতের ইম্পিরিয়াল কলেজে। সেখানে দু' বছর ট্রেনিং নিয়ে বৈদেশিক সম্পর্ক বিষয়ে তিনি দিব্যি

আরশাদ হোসেন

কেতাদুরস্ত হয়ে উঠলেন। তারপর আরশাদ ঘুরলেন দেশে দেশে, এ-রাজধানী থেকে সে-রাজধানীতে, ধাপে ধাপে উন্নতির পথে পা ফেলে চলতে লাগলেন। ইয়োরোপের কয়েকটি পাক দূতাবাসে কয়েক-বছর কাটল তাঁর বিভিন্ন দায়িত্বভার নিয়ে। দেশে ফিরলেন আর একটি প্রমোশন নিয়ে—ভারতে ডেপুটি হাই কমিশনার। আরশাদ ছ' বছর পরে মাতৃভূমির মাটি স্পর্শ করতে পেরে খুশিই হয়েছিলেন, ১৯৫৬ সাল থেকে তিনি কলকাতার ডেপুটি হাই কমিশনার। কিন্তু এটাও ছিল তাঁর উচ্চতর পদপ্রাপ্তির পথে একটা প্রয়োজনীয় ধাপমাত্র।

পরের ধাপে পুরোদস্তুর রাষ্ট্রদূত। ছোট দেশ সুইডেনে। তা হোক। সুইডেন ছাড়াও ডেনমার্ক এবং ফিনল্যাণ্ডে পাকিস্থানকে প্রতিনিধিত্ব করার বাড়তি দায়িত্ব গৌরবও পেলেন তিনি। সুইডেন থেকে সোভিয়েট য়ুনিয়ন। আরশাদ মস্কোতে রাষ্ট্রদূত হলেন, সঙ্গে উলাম বাতোর, প্রাগ এবং ওয়ারশ'তেও পাক স্বার্থ দেখাশুনো করার ভার পড়ল। সেখান থেকে ফিরলেন দিল্লী, হাই কমিশনার। গত '৬৩ সালে হাই কমিশনারের কার্যভার গ্রহণ করে আরশাদ হোসেনের মেয়াদ প্রায় ফুরিয়ে এসেছিল, এমন সময় ডাক এল যে-মন্ত্রণালয়ে ১৮ বছর ধরে কাজ করছিলেন তার পূর্ণ কর্তৃত্বভার নেবার জন্যে।

আরশাদকে গুরুত্বপূর্ণ পররাষ্ট্র দপ্তর দেবার পেছনে আয়ুবের অবশ্যই কোন গোপন অভিলাষ রয়েছে। স্পষ্টত তিনি আরশাদের পূর্ব অভিজ্ঞতাকে নিজের বা দেশের কাজে লাগাতে চান। পররাষ্ট্রমন্ত্রী থাকাকালীন ভুট্টো তাঁকে যথেষ্ট নাকাল করেছেন। তাই বোধ হয় আয়ুব তাঁকে অপসারণের সিদ্ধান্ত নিলেন। মস্কোতে রাষ্ট্রদূতের পদে কাজ করে আরশাদ সোভিয়েট য়ুনিয়নের সঙ্গে ব্যক্তিগত প্রীতির সম্পর্ক গড়ে তুলেছিলেন। তাঁকে পররাষ্ট্রমন্ত্রীর পদে আনলে সোভিয়েট রাশিয়ার মনও তিনি পেতে পারবেন মনে করেই হয়তো আয়ুব মন্ত্রিসভায় এ পরিবর্তন সাধন করলেন।

এবং আয়ুব খাঁ হয়তো এটাও বুঝেছেন যে, প্রতিবেশী ভারতের সঙ্গে মৈত্রীর সম্পর্ক গড়ে না তুললে সোভিয়েট বন্ধুত্ব পেতে তাঁর পক্ষে কষ্টসাধ্য হবে। আর ভারত-পাক মিতালি স্থাপনের ব্যাপারে আরশাদ হোসেন যেমন শক্তিশালী সেতুর কাজ করতে পারবেন তেমন আর পারে কজন?

আরশাদ আন্তরিকভাবেই ভারতের বন্ধুত্ব কামনা করেন। লাঞ্চে-ডিনারে খানাপিনার পার্টিতে আরশাদ আর সকলের কাছ থেকে যেন একটা হিসেব করা দূরত্ব বজায় রেখে চলেছেন, কিন্তু ভারতীয় পেলেই তার গলা জড়িয়ে ধরেছেন। বড় ঘরের ছেলে আরশাদ, মনও তাঁর বড়। পাঞ্জাবের এক জমিদার পরিবারে তাঁর জন্ম। বাবা আফজল হোসেন এককালে পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর ছিলেন। তাঁর এক ভাই আজিজ হোসেন বর্তমানে জেনেভায় ভারতের রাষ্ট্রদূত। ভারত-পাক কচ্ছ চুক্তিপত্রে দুদেশ থেকে এই দু'ভাই স্বাক্ষর দিয়েছিলেন। একে বড় লোক, তার ওপর জীবনের বেশির ভাগ সময় কেটেছে ইয়োরোপে। বিলেতেই তিনি উচ্চশিক্ষা নিয়েছিলেন। সর্বোপরি কাজ করেছেন প্রচার ও বিজ্ঞাপন দপ্তরে। সৌখীন পোষাক-বিলাসী তো আরশাদ হবেনই। কিন্তু এ-বিলাসিতা দোষ তাঁর বিবিধ গুণের নিচে কি চাপা পড়ে নি?

বঙ্গদর্শন

গত সপ্তাহের আগের সপ্তাহে পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক ক্রীড়াঙ্গনে যে আকস্মিক চাঞ্চল্য এসেছিল, ক্রান্তি দল ও প্রজা-সমাজতন্ত্রী দলের যুক্তফ্রন্ট পরিত্যাগ করার সংবাদ ঘোষণার পর এ সপ্তাহে তার বেগ অনেকটা মন্দীভূত হয়েছে। ক্রান্তি দলের পশ্চিমবঙ্গ শাখা তো প্রকাশ্যেই বিদ্রোহ করেছে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে, পি, এস, পি-র কর্মীদের মধ্যেও এই নিয়ে দারুণ অসন্তোষ ও ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। ক্রান্তি দলের রাজ্য শাখার সম্মেলনে দলের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের তীব্র সমালোচনা করা হয়েছে। পি, এস, পি-র একটা বড় অংশ যুক্তফ্রন্টে থাকার জন্য প্রাণপণ লড়াই করেছে রায়গঞ্জ সম্মেলনে। মাত্র ১৫টি ভোটের ব্যবধানে ঐক্যকামী শক্তি পরাজিত হয়েছে। যুক্তফ্রন্ট ত্যাগের এই যে হিড়িক পড়েছে তার কারণটা যে কি সেটা ঠিক স্পষ্ট করে উপলব্ধি করতে পারা যাচ্ছে না। কেউ কেউ বলছেন এর পিছনে কোন কোন মহলের টাকার খেলা আছে। এই ধরণের ধারণার ইঙ্গিত গত ১৫ই এপ্রিলের ক্রান্তি দলের রাজ্য শাখার সম্মেলনে সম্পাদক শ্রীসুশীল ধাড়া দিয়েছেন। তিনি প্রশ্ন করেছেন যে, পনের-কুড়ি দিনের মধ্যে এমন কি ঘটল যে দলের কেন্দ্রীয় নেতারা সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করলেন? অথচ শ্রীমহামায়াপ্রসাদ সিংহ ঘোষণা করেছিলেন যে তাঁরা কমিউনিস্টদের সঙ্গে ফ্রন্টেই থাকছেন! কোন কোন পি-এস-পি কর্মীর সন্দেহ, রায়গঞ্জে পি-এস-পি'র সম্মেলনে যুক্তফ্রন্ট ছাড়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যাপারে উপরোক্ত মহল হয়ত কাজ করেছে। আবার কেউ কেউ বলছেন যে এগুলি আসলে বেশি আসন পাবার জন্য কমিউনিস্ট দুটির পার্টিগুলির ওপর চাপ দেবার প্রচেষ্টা। কমিউনিস্ট পার্টিরা জানে যুক্তফ্রন্ট ছাড়লে ক্রান্তি দল বা পি, এস, পি-র রাজনৈতিক অস্তিত্ব বিপন্ন হবে। ওরা কিছুতেই ফ্রন্ট ছাড়তে পারবে না। তাই তারা বেশি আসন লাভের জন্য ব্ল্যাকমেলিং করবে এবং তারপর নির্বাচনের পর একটা অজুহাত তুলে ফ্রন্টকে পথে বসাবে। এই মোটিভগুলির মধ্যে কোন্‌টি সত্য তা বলা শক্ত, হয়ত কোনটিই না হতে পারে, আবার সবগুলিও হতে পারে। রাজনীতি কোন ম্যাজিক নয়, এখানে প্রতিটি ক্রিয়ারই প্রতিক্রিয়া আছে। আমরা গত সংখ্যায় পি, এস, পি ও ক্রান্তি দলের নীতিকে আত্মঘাতী বলেছিলাম, কেন না যুক্তফ্রন্ট ত্যাগের অর্থই হল এই দলগুলির রাজনৈতিক অবলুপ্তি এবং এটা বোঝার জন্য খালি চোখই যথেষ্ট, রঙীন চোখ লাগে না, অথচ কোন মোটিভ না থাকলে এই পথ গ্রহণ করার সার্থকতা বুঝে উঠতে পারা যায় না। তাই যতদূর মনে হয়, এই সিদ্ধান্তগুলি কোন রাজনৈতিক নীতিবোধ দ্বারা উদ্দীপ্ত নয়, হয়ত অন্য কোন স্বার্থ আছে।

আসন ভাগাভাগি

বস্তুত যুক্তফ্রন্টের শরিক কয়েকটি রাজনৈতিক দলের সাম্প্রতিক আচরণসমূহ যুক্তফ্রন্টের তরফে আসন ভাগাভাগির ব্যাপারটিকেও একটি দ্বিধাগ্রস্ত স্থানে এনে ফেলেছে। কংগ্রেস-বিরোধী জনসাধারণ যুক্তফ্রন্টের প্রতিটি শরিকের কাছ থেকেই এই বিষয়ে চটপট কিছু একটা করার আশা করছেন এবং তা যতই বিলম্বিত হচ্ছে ততই এ'দের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দিচ্ছে। জনসাধারণের বক্তব্য, যা করার তা তাড়াতাড়ি করুন, যদি সত্যই কংগ্রেস-বিরোধী দলগুলির কোন সমঝোতা না হয় তাহলে যাঁদের মধ্যে সমঝোতা হয়েছে তাঁদের প্রার্থীদের তালিকা প্রকাশ করুন। শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত এ'রা দলাদলি করবেন, অনুরাগ-বিরাগ-প্রেম-ডাইভোর্সের খেউড় চলবে, তারপর ইলেকসনের অব্যবহিত পূর্বে মশারী-রাজনীতি নামক একটা কৃত্রিম সমঝোতা হবে এবং নির্বাচনের পরে তা ভেঙে যাবে, জনসাধারণের কংগ্রেস-বিরোধী অংশ এই দৃশ্যের অবতারণা সহ্য করতে নারাজ। সুবিধাবাদী রাজনীতির পালা চলতে দিতে জনসাধারণ নারাজ। কংগ্রেস-বিরোধী দলগুলি আসলে একটা মানসিক ব্যাধিতে ভুগছেন, যার প্রকাশ ঘটছে এই আসন বণ্টনের ক্ষেত্র নিয়ে। সেটি হচ্ছে মার্ক্সিস্ট কমিউনিস্ট পার্টি ফোবিয়া। ওই পার্টি আসন বণ্টনের যে ফর্মুলা দিয়েছে সেটি হজম করতে অনেকেই পারছেন না, অথচ অপেক্ষাকৃত শক্তিমান এই পার্টিটির বিপক্ষে যেতেও ভরসা হয় না যদি তাতে দুকূলই হারাতে হয়।

যাই হোক আসন বণ্টনের ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেস-বিরোধী দলগুলির একটা কিছু করা উচিত এবং সেটা যাতে বিশুদ্ধ সুবিধাবাদ না হয়, কংগ্রেস-বিরোধী জনসাধারণ এটুকু আশা করেন। শুধু মুখে বড় বড় কথা বললেই অথবা অপরের প্রতি দোষারোপ করলেই রাজনীতি করা হয় না। পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে বামপন্থীপ্রবণতা রীতিমত বৃদ্ধি পেয়েছে এবং আগামী দিনের বামপন্থী আন্দোলনের সাফল্য বর্তমান বামপন্থী দলগুলির ও কংগ্রেস-বিরোধী দলগুলির

ওপর বহুলাংশে নির্ভর করে। এই কারণেই জনসাধারণের বামপন্থী অংশ চাইছেন যে এইসব দলগুলি নিছক পার্টি স্বার্থের মুখ চেয়ে যেন এমন কিছু না করেন যাতে ভবিষ্যৎ বামপন্থী আন্দোলন দুর্বল হয়ে পড়ে বা প্রতিক্রিয়াশীল রাজনীতির পুনরুত্থান ঘটে।

কংগ্রেসী শিবির

আগামী নির্বাচনের পরিপ্রেক্ষিতে কংগ্রেস শিবিরেও কর্মচাঞ্চল্য দেখা গেছে এবং ইতিমধ্যেই বিভিন্ন নির্বাচন কেন্দ্রের প্রার্থীপদের দাবিদারদের তালিকা অফিসে জমা পড়ছে। যতদূর মনে হচ্ছে কংগ্রেস এবারে একলা চলার নীতিই অবলম্বন করেছে। সর্বশেষ সংবাদে প্রকাশ যে লোকদলের সঙ্গে কংগ্রেসের নির্বাচনের ক্ষেত্রে কোন সম্পর্ক থাকবে না। তবে কংগ্রেসের অবস্থাটা মোটেও সুখকর নয়। কংগ্রেস নামে একটা দল হলেও আসলে বহু দল, বিভিন্ন গোষ্ঠীর কলহে তার ভেতরটা ফাঁপা হয়ে গেছে। অন্তর্বিরোধ আজ অবশ্য সকল দলেই দেখা গেছে, কয়েকটি ছোট দল ছাড়া। এস, ইউ, সি, আর, এস, পি ইত্যাদি দলগুলি অন্তর্বিরোধ থেকে মুক্ত, ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির ক্ষেত্রেও এই কথা খাটে। মার্কসিস্ট কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে অন্তর্বিরোধ আছে, কিন্তু তা মূলত তাত্ত্বিক ও নীতিগত। পক্ষান্তরে এস, এস, পি, পি, এস, পি, ক্রান্তিদল ও কংগ্রেসের অন্তর্বিরোধ মূলত গোষ্ঠীকেন্দ্রিক। সম্প্রতি কলকাতা কর্পোরেশনের মেয়র নির্বাচন উপলক্ষে একটা নতুন জিনিস দেখা গেল, সেটা হচ্ছে কংগ্রেসে অতুল্যবাবুদের শক্তিহ্রাস। প্রতিবারেই কংগ্রেস মিউনিসিপ্যাল এ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি অতুল্য ঘোষকে মেয়র, ডেপুটি মেয়র স্থির করার চূড়ান্ত ক্ষমতা দেওয়া হয়। এবারে তা হয় নি। ব্যালটে ভোট দিয়ে প্রার্থী ঠিক করতে হয়েছে। সব মিলিয়ে কংগ্রেসের ঘরের অবস্থা এখন বিশেষ সুবিধার নয়, যদিও এর সুযোগ যুক্তফ্রন্ট নিতে পারছে না, ঠিক যেমন যুক্তফ্রন্টের আভ্যন্তরীণ দলাদলির সুযোগ নিতে কংগ্রেস অপারগ।

খাদ্য প্রসঙ্গ

কলকাতা শহর মোটামুটি চুপচাপ, কেন না পরিমাণে পর্যাপ্ত না হলেও সাপ্তাহিক রেশনটা এখানে পাওয়া যায় এবং তা ছাড়া শক্ত কর্ডন থাকা সত্ত্বেও, বাইরের চালও মোটামুটি এখানে আসে। কাজেই যারা ক্রয়ক্ষমতার অধিকারী অর্থাৎ মোটামুটি বিত্তবান তাদের কোন অসুবিধা নেই। অল্পবিত্তকেও বাধ্য হয়ে চালিয়ে নিতে হচ্ছে অন্য জিনিস কেনা থেকে নিজেদের বঞ্চিত করে, অর্থাৎ উপার্জনের অধিকাংশ অর্থই কালোবাজার থেকে চাল কিনতে ব্যয়িত হচ্ছে। তা হলেও কলকাতা শান্ত, অন্যান্য শহরগুলিও অনুরূপ। কিন্তু শহর অঞ্চলে রেশনের চাল যে কিভাবে যোগান হচ্ছে সে কাহিনী যদি কেউ শোনেন, তাহলে তিনি অনিবার্যভাবেই একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হবেন যে অতি শীঘ্রই আবার ১৯৬৬ সাল ফিরে আসছে। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে আগামী কয়েক মাসের মধ্যেই পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন গ্রামে আগুন জ্বলবে এবং এর জন্য একমাত্র দায়ী হবে সরকারী সংগ্রহনীতি। রাষ্ট্রপতির শাসন যে কত জবরদস্ত আর তার গুঁতোয় কিভাবে গ্রামাঞ্চলের দরিদ্র মানুষেরা নিয়ত পিষ্ট হচ্ছে বাইরে থেকে তা ধারণা করা যাবে না। রাষ্ট্রপতির শাসনে খাদ্য-সংগ্রহের দায়িত্ব ন্যস্ত হয়েছে যে সব সরকারী কর্মচারীদের ওপর তাঁরা বোধ হয় নিজেদের কর্মদক্ষতা প্রতিপাদনের উপযুক্ত সময় পেয়েছেন। এবং তার পরিণাম হচ্ছে বড় মারাত্মক। কেন না চালের যারা আসল মহাজন তারা বি, ডি, ও সাহেবের চেয়ে অনেক বেশি চালাক, পি, ডি, এফ আমলেই তারা তাদের আরব্ধ কর্ম সমাপন করার সুযোগ পেয়ে গেছে। সেই চাল যেখানে আছে তা খুঁজে বার করার সামর্থ্য এঁদের নেই। কাজেই এঁদের কোপটা গিয়ে পড়েছে দরিদ্র চাষীদের ওপরেই, যাদের ঘরে হয়ত এক বছর বা ছ' মাসের খোরাকী ধান রাখা আছে। বীরবিক্রমে পুলিশবাহিনী নিয়ে গিয়ে এদের ওপর হামলা করা হচ্ছে, কারো অনুমতি না নিয়েই বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করা হচ্ছে, স্ত্রীলোকদের প্রতিও অকথ্য ভাষা প্রয়োগ করা হচ্ছে, তা ছাড়া গ্রেপ্তারী ও ডাণ্ডাবাজি তো আছেই। এই বর্গীর হাঙ্গামা সমর্থন করার কোন যুক্তিই আমরা খুঁজে পাচ্ছি না। খাদ্য-সংগ্রহের নামে এই ব্যাপক জুলুমবাজির অবসান-ঘটারও কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। সংগ্রহের ক্ষেত্রে পুলিশ ও সরকারী কর্মচারীরা স্পষ্টতই সেই আইন লঙ্ঘন করছে যা সংবিধানে মৌলিক অধিকার বলে স্বীকৃত। এই সংঘবদ্ধ গুণ্ডাবাজির বিরুদ্ধে আজ হয়ত গ্রামবাসী প্রাথমিকভাবে কিছুটা অসহায় বোধ করছে কিন্তু স্বাভাবিক নিয়মেই আশা করা যায় যে এ চাকা ঘুরতে বেশি দেরি নেই, ক্রিয়ামাত্রেরই প্রতিক্রিয়া আছে। অথচ শোনা যায় যে গত বছর নাকি রেকর্ড পরিমাণ ফসল ফলেছিল। একটি ইংরেজি দৈনিকে (২৬।৪।৬৮) পশ্চিমবঙ্গের খাদ্য পরিস্থিতিকে বেশ ভাল বলা হয়েছে। কিন্তু তার বাস্তব নিদর্শন সাদা চোখে যা দেখতে পাচ্ছি তাতে ভরসার কোন কারণই দেখা যাচ্ছে না। দেশের খাদ্যের অবস্থা যদি ভালই হবে তাহলে খাদ্য-সংগ্রহের নামে গ্রামের ঘরে ঘরে বর্গীর হাঙ্গামা চালানো হচ্ছে কেন? খাদ্য পরিস্থিতি যদি ভালই হবে তাহলে মডিফায়েড রেশনিং এলাকাতে শুধু ভুট্টা আর মাইলোর যোগান দেওয়া হচ্ছে কেন? এ সবের কোন সদুত্তর পশ্চিমবঙ্গ সরকার দিতে পারবেন না। খাদ্য নিয়ে ঝড় উঠল বলে, আমরা শুধু সময়োচিত সাবধানবাণী প্রয়োগ করছি মাত্র।

আগামী সংখ্যায়

গ্রাম-গ্রামান্তরে

সিনেমা ধর্মঘট

দেড় মাসেরও অধিককাল হল পশ্চিমবঙ্গের সিনেমাহলগুলি বন্ধ হয়ে রয়েছে যার ফলে সরকারের প্রতিদিন এক লক্ষ টাকা পরিমাণ রাজস্ব আদায় হচ্ছে না এবং কয়েক সহস্র সিনেমা কর্মীর পরিবার অনশনে দিন কাটাতে বাধ্য হচ্ছে। আমরা আগে বলেছি যে সিনেমা কর্মচারীরা সঙ্গত কারণেই ধর্মঘট করেছেন, কেন না গতবারের ধর্মঘটের পর মালিক ও কর্মীদের মধ্যে যে চুক্তি হয়েছিল মালিক পক্ষ তা স্পষ্টতই ভঙ্গ করেছেন। বিগত চুক্তি অনুযায়ী কর্মীদের প্রদেয় আর্থিক দায় মালিক পক্ষ এড়িয়ে গেছে। কাজেই সিনেমা কর্মীদের দোষ দেবার কোন কারণ আমরা দেখতে পাচ্ছি না। রাজ্যপালও সমস্ত ঘটনা অনুসন্ধান করে সিনেমা কর্মীদের ওপর দোষারোপ করতে পারেন নি, যে কারণে সরকারের তরফ থেকে মালিক পক্ষকেই দায়ী করা হয়েছে এবং কর্মীদের দাবিদাওয়া মেনে নিয়ে প্রেক্ষাগৃহ পুনরায় চালু করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু সিনেমাহলের মালিকরা সরকারকে থোড়াই কেয়ার করেছে এবং তারা কর্মীদের সঙ্গে কোনপ্রকার আপোষে আসতে রাজী নয়। শেষ পর্যন্ত রাজ্যপাল সিনেমাহলগুলির লাইসেন্স রিনিউ না করার আদেশ দিয়েছেন। এর ফল কি হবে তা অবশ্য এখন থেকে বলা সম্ভবপর নয়। তবে মালিক পক্ষ শাসিয়েছে

মন আজ
খুশীতে
ভরা
শরীর যদি ভাল থাকে তাহলে
মানুষ আনন্দে মেতে ওঠে প্রকৃতির সৌন্দর্য
উপভোগ করবার জন্য।
আপনিও স্বাস্থ্য ভাল রাখবার জন্য সাধনার
অব্যর্থ মহৌষধ প্রতিদিন আহারের পর
দুইবার করে দু'চামচ মৃতসঞ্জীবনীর সঙ্গে
চার চামচ মহাদ্রাক্ষারিষ্ট (৬ বৎসরের
পুরাতন) খাবেন। এতে ক্লান্তি দূর করে,
খিদে ও হজমশক্তি বাড়ে, সর্দি কাশি
থেকে রেহাই পাবেন।
সাধনা ঔষধালয় ঢাকা
ডাঃ যোগেশ চন্দ্র ঘোষ,
আয়ুর্বেদশাস্ত্রী, এফ,সি,এস, (লণ্ডন),
এম,সি,এস, (আমেরিকা), ভাগলপুর
কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব
অধ্যাপক।
কলিকাতা কেন্দ্র ডাঃ নরেশ চন্দ্র ঘোষ,
এম-বি, বি-এস, আয়ুর্বেদাচার্য্য।
৩৬, সাধনা ঔষধালয় রোড
সাধনা নগর, কলিকাতা ৪৮

যে তারা সরকারের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করবে। আমরা আগেও বলেছি, এবারও বলছি, সিনেমাহলগুলির জাতীয়করণ করাই এই অবস্থায় একমাত্র পথ, অথবা বিকল্প হিসাবে সমবায়মূলক প্রচেষ্টায় কর্মীদেরই প্রেক্ষাগৃহসমূহের মালিকানা দেওয়া উচিত। তবে রাজ্যপাল কি ততদূর যেতে রাজী হবেন?

চিকিৎসা জগতে দুর্নীতি

চিকিৎসাজগতে দুর্নীতি পাকাপাকিভাবেই আসন গেড়ে বসেছে, তাকে আর কিছুতেই নিজের স্থান থেকে নড়ানো যাচ্ছে না। কলকাতার হাসপাতালগুলির প্রায় প্রতিটিই এক-একটি দুর্নীতির পীঠস্থান। উঁচুতলা থেকে নিচুতলা পর্যন্ত বিভিন্ন ধরণের দুর্নীতির প্লাবন বইছে। রোগী ভর্তির ব্যাপারে ডাক্তারদের দুর্নীতির কাহিনী তো সর্বজনবিদিত। সেকথা আর নতুন করে বলার প্রয়োজন নেই। মূল্যবান ঔষধপত্রসমূহ বাইরে বিক্রি করে দেওয়া হয়, এক্ষেত্রেও ডাক্তারদের এবং স্টোরের কর্মীদের প্রত্যক্ষ হাত থাকে। এ কাহিনীও সর্বজনবিদিত। রোগীদের পথ্যের ব্যাপারেও বিভিন্ন হাসপাতালে অজস্র দুর্নীতির অভিযোগ নিয়ে পত্রপত্রিকায় নানা তথ্য নিয়ত প্রকাশিত হচ্ছে, যে খাদ্য রোগীদের দেওয়া হয় তা সুস্থ মানুষকেই রোগী করে দেবার পক্ষে পর্যাপ্ত। সম্প্রতি আর, জি, কর ও নীলরতন সরকার হাসপাতালের ভিতরকার অস্বাস্থ্যকর কুঠুরিগুলিকে ভেঙে দেওয়ার প্রসঙ্গে আরও এক ধরণের দুর্নীতির সংবাদ প্রকাশিত হল, জানা গেল যে ওই খুপরিগুলিতে অর্থের বিনিময়ে সংঘটিত হত না এমন কোন পাপকাজই নেই। মাত্র কয়েকদিন আগে কলকাতার একটি হাসপাতালে বাইরের একটি হাসপাতালের একদল কর্মী এসে জনৈকের বিরুদ্ধে নতুন ধরণের একটি দুর্নীতির অভিযোগ করলেন। যার ফলে মারামারি রক্তপাত পর্যন্ত হয়ে গেল। স্বাস্থ্যদপ্তর তো জেগেই ঘুমোন।

এত দুর্নীতির মাঝখানে আরও একটি নতুন ধরণের দুর্নীতির উপাখ্যানের অবতারণা এখানে করছি। বক্তব্যটি ছোট, কিন্তু বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। এই দুর্নীতির পীঠস্থান কলকাতার একটি মেডিক্যাল কলেজ, নায়ক কতিপয় চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী। এরা রাত্রে ক্লাসঘরগুলি ভাড়া দেয়, সারা রাত্রির জন্য, অথবা ঘণ্টা হিসাবে। এবং কি উদ্দেশ্যে যে এই ঘরগুলি ব্যবহৃত হয় সে কথাটা আশা করি বুদ্ধিমান পাঠকদের বুঝিয়ে বলতে হবে না। পবিত্র শিক্ষায়তনের মধ্যে যারা এভাবে পাপের অনুপ্রবেশ ঘটাচ্ছে তাদের শায়েস্তা করা এই মুহূর্তে প্রয়োজন। আশা করি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এ-বিষয়ে দৃষ্টি দেবেন।

কল্যাণী হাসপাতাল প্রসঙ্গে

কল্যাণী জওহরলাল নেহরু মেমোরিয়াল হাসপাতালের অব্যবস্থা ও দুর্নীতি সম্পর্কে আমরা ইতোপূর্বে বঙ্গদর্শনে আলোচনা করেছি। যুক্তফ্রন্ট সরকারের স্বাস্থ্যমন্ত্রী এ বিষয়ে তদন্তের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। বিলম্ব হলেও তদন্তকার্য সুরু হয়েছিল, কিন্তু পি ডি এফ মন্ত্রিসভার আমলে সমস্ত ব্যাপারটা ধামাচাপা দেওয়া হয়। এমন কি স্বাস্থ্য দপ্তরের ঊর্ধ্বতন একজন আমলার তৎপরতায় দুর্নীতি ও অব্যবস্থা সংক্রান্ত বহু কাগজপত্র নষ্ট করে দেওয়া হয়।

রাষ্ট্রপতির শাসন চালু হবার পর অবস্থা চরমে পৌঁছেছে, স্বাস্থ্য দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত সচিবের দৃষ্টি এদিকে আকর্ষণ করে কোন ফল হয় নি। কল্যাণী হাসপাতালের কর্তাব্যক্তিদের আরো পোয়াবারো হয়েছে। তাঁরা দিনকে রাত, রাতকে দিন করতে একটুকুও ভয় বা সঙ্কোচবোধ করছেন না। কল্যাণীর কয়েকজন বিশিষ্ট নাগরিক হাসপাতালের অনাচার সম্পর্কে আমাদের নিকট এক পত্র দিয়েছেন। যথাযথ কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকৃষ্ট হবে এ ভরসায় পত্রটির কিছু অংশ নিম্নে উদ্ধৃত করা হলো :

"বর্তমানে কল্যাণী হাসপাতালের বিভিন্ন বিভাগে শয্যাসংখ্যা ১৭৫, যার মধ্যে ১২৫ শয্যা বিশেষ বিভাগগুলিতে এবং ৫০টি সাধারণভাবে রক্ষিত আছে। কিন্তু ঐ ১৭৫টি শয্যার হাসপাতালে বর্তমানে জি-ডি-এ-এর সংখ্যা প্রায় ১৪০ জন। উক্ত সংখ্যা থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় যে, প্রয়োজনীয় সংখ্যক জি-ডি-এ এখানে নিযুক্ত আছেন। কিন্তু হাসপাতালের যে কোন রোগীকে জিজ্ঞেস করলে উত্তর পাবেন—রোগীরা সময় মত তাঁদের সাহায্য থেকে বঞ্চিত। আরও ভিতরে অনুসন্ধান করলে বুঝতে পারবেন কেবলমাত্র নামেই খাতাপত্রে ঐ সব কর্মী হাসপাতালে আছেন। এবং মাসের প্রথমে বেতন নেওয়ার সময় উপস্থিত থাকছেন। সারা মাসে এদের কোন খোঁজ কেউ পাবেন না। এদের সম্বন্ধে বিশেষভাবে খোঁজ নিয়ে অবাক হয়ে যাবেন যখন জানবেন এরা কেউ কেউ অন্য কোন স্থানে চাকুরী করেন বা কোন বিশিষ্ট ব্যক্তির বা দলের কাজে সর্বক্ষণ নিয়োজিত আছেন। ঐ সব চাকুরীপ্রার্থীদের মধ্য থেকে কেবলমাত্র তাঁদেরই নিয়োগ করা হয়, যাঁরা নিয়োগকর্তাকে বিশেষভাবে পারিতোষিকের মাধ্যমে সন্তুষ্ট করতে পারেন। কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রাবাসে চাকুরীরত একজনকে একই কারণে ঠকতে হয়েছে। হাসপাতালের সেবিকাদের ভীতি প্রদর্শন করে তাঁদের মুখ বন্ধ করে রাখা হয়েছে। ফলে রোগীদের প্রয়োজনে সেবিকারা নিজেরাই সমস্ত কাজ চালিয়ে যেতে বাধ্য হন—তাঁরা ঐ সব খাতা-কলমের তথাকথিত জি-ডি-এ'দের মুখদর্শন করতে পান না। সিনিয়র একজন ওয়ার্ড মাস্টার থাকতে কোন অদৃশ্য কারণে ঐ সব জি-ডি-এ'দের খাতাপত্র ও কাজের হিসাব কেবলমাত্র একজন বিশিষ্ট ওয়ার্ড মাস্টারকে দিয়ে নাকি করান হচ্ছে। আর সিনিয়র ওয়ার্ডমাস্টারকে দিয়ে নাকি তত্ত্বাবধান করান হচ্ছে মাত্র ৯।১০ জন ঝাড়ুদারদের। এর পরও কি বুঝতে বাকি থাকবে দুর্নীতির উৎস কোথায়?

রোগীদের ভর্তির ব্যাপারে অনুসন্ধান করলে বা নিজে যদি কোন রোগীকে ভর্তির জন্য নিয়ে যান, বুঝতে পারবেন কোথায় গলদ। কোন বিশেষ একজন প্রিয়জনকে বহিরাগত রোগীদের ভর্তির সর্বময় কর্তৃত্ব দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু পত্র-পত্রিকায় বিভিন্ন সময়ে খবর প্রকাশিত হতে থাকায় বর্তমানে কিছুটা শুধরে চলার চেষ্টা হচ্ছে। তবুও অন্যায় হস্তক্ষেপ এবং অপ্রয়োজনীয় ক্ষেত্রেও ভর্তি করা হচ্ছে। ফলে খুব প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে নানা কারণে ব্যক্তিবিশেষকে সন্তুষ্ট করতে অক্ষম কোন রোগী মৃত্যুশয্যায় শায়িত থাকলেও ভর্তি হতে পারছেন না এবং বিনা ঔষধে বা চিকিৎসায় তাঁকে মৃত্যুর কোলে আশ্রয় নিতে হচ্ছে।

বহু ভাগ্যের ফলে জেনারেল ডিপার্টমেণ্টে রোগীকে ভর্তি করাতে সক্ষম হলেও আপনার দৃষ্টিতে যা ধরা পড়বে তা' হল রোগীর সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য চার্ট। কোন চার্টের ব্যবস্থা এখানে নেই। এমন কি রোগী বাড়ি ফিরে যাওয়া পর্যন্ত জানতেই পারবেন না প্রকৃতপক্ষে রোগীর রোগটা কি। এ বক্তব্যের অবতারণা করার উদ্দেশ্য আপনার দৃষ্টি ঔষধের ব্যবস্থা ও অন্যান্য আনুষঙ্গিকের দিকে আকৃষ্ট করা। এটা সহজেই বুঝতে পারবেন যে, রোগের চিকিৎসার বিশদ বিবরণ লিখিত থাকলে যে কোন সময় ঔষধের হিসাবকে পরীক্ষা করা সম্ভব। কাজেই অদৃশ্য হাতের পরশ লাগাতে ঐ পন্থাতেই দরকার। পথ্যের ব্যাপারে বহুদিন কোন খাদ্য কমিটি ছিল না। ফলে রোগীদের নানা প্রকার কষ্টের সম্মুখীন হতে হয় এবং রোগীরা এর প্রতিকারের দাবিতে সোচ্চার হয়ে ওঠেন। বর্তমানে নামেমাত্র একটি কমিটি তৈরি হয়েছে বটে, কিন্তু এর কার্যক্রম বিশ্লেষণ করলে অথবা

রোগীদের সঙ্গে যোগাযোগ করলে জানতে পারবেন গলদ কোথায় এবং কেন রোগীদের পথ্যের ব্যাপারে শৈথিল্য। হাসপাতালের কোন একজন কর্মী এ ব্যাপারের তীব্র প্রতিবাদ করায় তাকে রান্নার তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব থেকে একেবারে সরাসরি গেটে দারোয়ানের কাজে স্থানান্তরিত করা হয়েছিল। কয়েকদিন হল একজন জি-ডি এ বান্নার ব্যাপারে নিযুক্ত থাকা অবস্থায় মাছের ওজন কম সম্পর্কে প্রতিবাদ করায় তাকে নাকি অন্যত্র বদলি করে দেওয়া হয়। গত ২রা এপ্রিল হাসপাতালের প্ল্যাস্টিক অর্থপেডিক বেডের রোগিণীগণ পথ্যের নিম্নমানের প্রতিবাদে কেউই আহার্য গ্রহণ করেন নি। আশা করি হাসপাতালের কর্তাব্যক্তিরা একথা অস্বীকার করতে পারবেন না। খাওয়া-দাওয়ার পর রোগীদের বাসনপত্র ধোয়া-মোছা করার নির্দিষ্ট জায়গার পরিবর্তে শৌচাগারে বা প্রস্রাবাগারে কাজ সারা হয় এবং এক্ষেত্রে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার কোন বালাই নেই। বাইরের বৃহৎ অট্টালিকা দেখে মন আকৃষ্ট হবে সত্য, কিন্তু ভিতরের নোংরা পরিবেশ এবং অপরিচ্ছন্ন, দুর্গন্ধযুক্ত পরিবেশে ঢুকে ঘৃণায় ও তিক্ততায় মনে করবেন মাকাল ফলের সৌন্দর্যের কথা। এর জন্য কি আভ্যন্তরীণ প্রশাসন ব্যবস্থা দায়ী নয়? ব্যতিক্রম কিছু যে নেই তা নয়। বাইরে থেকে কোন পরিদর্শক অথবা ঊর্ধ্বতন কোন বিভাগীয় কর্মচারী যদি কোনদিন হাসপাতাল পরিদর্শনে আসেন, তবে কেবলমাত্র তারই পূর্বাহ্নে সমস্ত কিছুই সজ্জিত করে প্রাসাদকে সত্যিকারের প্রাসাদোপম সৌন্দর্যে ভূষিত করা হয়। কারণ একদিনের প্রয়োগ কৌশল ভবিষ্যতের পাথেয় হবে এবং কিছুদিনের স্বার্থসিদ্ধির সহায়ক হবে। চিকিৎসকদের ব্যাপারে আপনার ঔৎসুক্য নিশ্চয়ই আছে। অধিকাংশ চিকিৎসক সম্পর্কে খোঁজ নিলে জানতে পারবেন যে, তাঁরা রোগীদের কাজে যতক্ষণ নিয়োজিত করেন, তার চেয়ে অনেক বেশি সময় কাটান কলকাতায় নিজেদের ব্যক্তিগত কাজে। এবং ঐ সুযোগে ঐ গোষ্ঠীভুক্ত আর কতিপয় কর্মচারী তাদের হাসপাতালের কাজে প্রায়ই অনুপস্থিত থাকেন অথবা হাজিরা দিয়েই চলে যান নিজেদের ব্যক্তিগত স্বার্থে অথবা হাসপাতালের কর্তাব্যক্তির কাজে। অথচ ঐসব অনুপস্থিতির জন্য কোন ছুটির দরখাস্ত করতে হয় না। সাধারণ কর্মীদের ঐসব প্রলোভনে প্রলুব্ধ করে তাদের হাতে রেখে স্বার্থান্বেষীচক্র সুখে দিন যাপন করছেন এবং নানা প্রতিরোধ থেকে রেহাই পাওয়ার অবকাশ পাচ্ছেন। ঐসব চিকিৎসক নিজেদের স্বার্থে যা কিছুই করুন না কেন হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ তাঁদের কাজের তারিফ করেন শুধুমাত্র নিজের কাজ হাসিল করার প্রয়াসে গোষ্ঠী তৈরির সংকল্পে। হাসপাতালের অপারেশনের ব্যাপারে যে সব প্রয়োজনীয় অস্ত্র বা আনুষঙ্গিক সরঞ্জাম উক্ত হাসপাতালে আনা হয়েছে, তার জন্য সাধুবাদ জানাতে হয় বহিরাগত বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকবৃন্দকে। তাঁদের অক্লান্ত পরিশ্রম এবং কর্মস্পৃহা অপারেশনের কাজকে বহুলাংশে সার্থক রূপায়ণে সাহায্য করেছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় ঐসব গুণী চিকিৎসকবৃন্দের কাউকেও স্থানীয় কর্তৃপক্ষ সাহায্য তো করছেনই না বরং নানাভাবে তাঁদের বিব্রত করার চেষ্টা হচ্ছে। এরই প্রমাণ পাওয়া গেছে কিছুদিন পূর্বে প্রখ্যাত প্ল্যাস্টিক সার্জন ডাঃ মুরারি মুখার্জীকে একদল জি· ডি· এ'কে দিয়ে হাসপাতালে ঘেরাও করার মাধ্যমে।

হাসপাতালের নিজস্ব কোন এ্যাম্বুলেন্সের ব্যবস্থা নেই। তবে হাসপাতালের জন্য বহিরাগত বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকবৃন্দের স্টেশন ও হাসপাতালের মধ্যে যাতায়াতের জন্য নির্দিষ্ট একটি গাড়ি আছে। উক্ত গাড়িটিকে নাকি প্রায় সর্বক্ষণই ব্যবহার করা হয় কলকাতায় যাতায়াত করা, ব্যক্তিগত পরিচর্যা ও প্রমোদ-ভ্রমণের জন্য। সবকিছু বাদ দিলেও যিনি ওই গাড়ি নিজের কলকাতা যাতায়াতের জন্য সপ্তাহে গড়ে প্রায় দুদিন ব্যবহার করেন তিনি কি জবাব দিতে পারবেন কেন এই যাতায়াত? শুধুমাত্র দোষ স্খালনের জন্য ২।১টি চিঠি দেওয়া ছাড়া এ্যাম্বুলেন্সের কি ব্যবস্থা করা হয়েছে?

এ ছাড়া ঔষধপত্র, আসবাবপত্র, নিত্য-প্রয়োজনীয় কিছু কিছু জিনিসপত্রের ক্রয় ও এর ব্যবহারিক প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বিভিন্ন সময়ে খবরের কাগজে যথেষ্ট লক্ষণীয় বিষয়ে দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। যেমন রোগীদের জন্য সময়মত খাট, বিছানা ইত্যাদি পাওয়া যায় না অথচ বিশিষ্ট কারো কারো বাড়িতে ঐসব আসবাবপত্র ও শয্যার প্রাচুর্য বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। গেস্ট-হাউসের নামে "নাইট ক্লাব" পরিচালনার ক্ষেত্রেও বিশিষ্ট আত্মীয় এবং ইয়ার-বন্ধুদের মিলনকেন্দ্রে অবৈধ ও অপ্রয়োজনীয় সত্ত্বেও আসবাবপত্রের নাকি ত্রুটি হয় না। নিয়মিতভাবে ঐ গেস্ট-হাউসের জন্য একজন জি, ডি, এ নিযুক্ত আছে—অথচ কোন অতিথির জন্য আজ পর্যন্ত ওখানে জি. ডি, এ, দরকার হয় নি এবং ঐ জি. ডি, এ-কে নাকি পারিবারিক স্বার্থে ব্যবহার করা হচ্ছে। জি. ডি. এ-পোস্টে চাকুরি করে দেওয়ার সর্তে স্থানীয় রিক্সাওয়ালাকে বিনা ভাড়ায় খাটান হয়, মালীর নিকট থেকে ফুলের তোড়া নিয়ে গৃহের শোভা বর্ধন করা হয় এবং এমন কি নগদ টাকায় ঘুষের কারবার চালাতেও কোন দ্বিধা বা সংকোচ নেই। প্রায় ছ' মাস পূর্বে দমদমের কোন একজনকে চাকুরি দেওয়ার লোভ দেখিয়ে চারশত টাকা ঘুষ নেওয়া হয়। এ, জি, বেঙ্গল থেকে বর্তমানে কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের অডিটকার্যে রত কর্মীদের নিকট উক্ত ঘুষের বিস্তারিত বিবরণ জানা যেতে পারে। এ ছাড়া হাসপাতালের জনৈক কর্তাব্যক্তির বাড়িতে কার্যরত ঝিকে বিনা পারিশ্রমিকে খাটানোর পরিবর্তে তার ছেলেকে হাসপাতালে চাকুরি দেওয়া হয়েছে এমন এক সময়, যখন তুলনামূলক বিচারে দক্ষ ও যোগ্য শতাধিক চাকুরিপ্রার্থীর দরখাস্ত পদ খালি নেই এই অজুহাতে বিবেচিত হয় নি এবং আজও ফাইলবন্দী অবস্থায় পড়ে আছে।

হাসপাতালের স্টোরের ব্যাপারে গুরুতর গলদ সংক্রান্ত সংবাদ ফটোস্ট্যাট কপিসহ সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছিল। ঐ ব্যাপারে তদন্তের কাজ শুরু হওয়া সত্ত্বেও আকস্মিকভাবে ঐ তদন্ত স্থগিত রাখা হয়েছিল কেন? পরবর্তীকালে সংবাদপত্রে ফাঁস হওয়ার পর কেনই বা সমস্ত ব্যাপার ধামাচাপা দেওয়ার জন্য মনগড়াভাবে রিপোর্ট তৈরি করা হয়েছিল? ৪৫ মিটার লম্বা, ১ ইঞ্চি চওড়া কাপড়ের সরু ফিতে ১০১ টাকা মূল্যে ক্রয় করার দায়িত্ব কার? অন্যান্য জিনিসের মধ্যে ৭০০ টাকার মোমবাতি, ৩০০ কে, জি, ঝাড়ুর কাঠি, ৫।৭ মণ লোহার পেরেক ও রিং, প্রতিটি প্রায় দুইশত টাকা মূল্যে লোহার কড়া সত্যি কি কেনা হয়েছিল? ডেটলের টিন, জানালার পর্দার কাপড়, সাবান ইত্যাদি কোথায় যায়? এর কি কোন জবাব আছে? যেখানে টাকা খরচের ব্যাপারে কোন নীতির বালাই নেই, সেই হাসপাতালের কর্তাব্যক্তিদের কাছ থেকে এমার্জেন্সী রুমের বন্দোবস্ত কোনমতেই আশা করা যায় না। ফলে এমার্জেন্সী রুমের অবর্তমানে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে চিকিৎসকদের বাসা থেকে ডাকিয়ে নিতে ন্যূনপক্ষে আধঘণ্টা সময় লাগে। আর জি, ডি, এ, না থাকলে উক্ত সময়ের ব্যবধান বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পায় এবং সেক্ষেত্রে এমার্জেন্সী কলের কোন তাৎপর্যই রোগীর কাছে থাকে না।"

[২৬।৪।৬৮]

সপ্তাহের বোঝা

কৃত্তিবাস ওঝা

রায়গঞ্জে পি এস পি সম্মেলন সুরুর মুখেই দিল্লী থেকে ঘোষণা হল বি কে ডি যুক্তফ্রন্ট ত্যাগ করবে। এই সংবাদ একদিকে যেমন শ্রীসুনীল দাস, অধ্যাপক সমর গুহ প্রমুখের মনে উৎসাহের সঞ্চার করলো, তেমনি শ্রীবিদ্যুৎ বসু, শ্রীঅশোক দাশগুপ্তের মনে চরম উৎকণ্ঠা সৃষ্টি করলো। কলকাতায় পি এস পি রাজ্য কমিটির বৈঠকে দলের রাজনৈতিক প্রস্তাব আলোচনার জন্য সভা আহ্বান করা হল। এই সভায় যোগদানের জন্য শ্রীসুনীল দাস, শ্রীমতী সাগরিকা ঘোষকে আমন্ত্রণ করা হল। শ্রীদাস ও শ্রীমতী ঘোষ গত ১৪ই ফেব্রুয়ারী রাজ্য কমিটি থেকে পদত্যাগ করেন এক দীর্ঘ পত্র লিখে, তারপর রাজ্য কমিটির সভায় যোগদান করেন নি। কলকাতায় রাজ্য কমিটির বৈঠকে পরপর তিন দিন রাজনৈতিক প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা হল, কিন্তু কোন ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত হল না। তাই এই অবস্থায় শ্রীঅশোক দাশগুপ্ত দেখলেন তাঁর যুক্তফ্রন্টে থাকার রাজনৈতিক প্রস্তাব তীব্র বিরোধিতার সম্মুখীন হবে এবং এর মধ্যে যদি আবার বি কে ডির যুক্তফ্রন্ট ত্যাগের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় তবে পি এস পি প্রতিনিধিদের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করবে। তাই শ্রীঅশোক দাশগুপ্ত রায়গঞ্জ যাবার সময় ফরোয়ার্ড ব্লকের শ্রীঅশোক ঘোষকে বললেন, তিনি যেন ১২ই এপ্রিল রাত্রে বি কে ডি প্রকৃতপক্ষে কি করবে সেটা জানিয়ে দেন। অবশ্য তিনি স্বয়ং রায়গঞ্জ থেকে ১২ই এপ্রিল শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন। গত ৮ই এপ্রিল ভারতীয় ক্রান্তি দলের (বি কে ডি) জাতীয় কর্ম-পরিষদ যে প্রস্তাব গ্রহণ করে, সেই প্রস্তাব তখনও কেউই দেখে নি—সবই কাগজের সংবাদ। কিন্তু পি এস পি দলের সরকারী প্রস্তাব রচনার পর বেশ কিছু সংশোধন করা হল। পরে দেখা গেল বি কে ডি দলের প্রস্তাব আর পি এস পি দলের সরকারী প্রস্তাবে অনেক মিল আছে। বি কে ডি প্রস্তাবের শেষ অংশে বলা হয় যে, "ক্রান্তি দল (বি কে ডি) সমস্ত রাজ্য শাখাগুলিকে নির্দেশ দিচ্ছে যে, অগণতান্ত্রিক ও জাতীয়তা বিরোধী শক্তিগুলির বিরুদ্ধে সমস্ত শক্তি সংহত করে সংগ্রাম করতে হবে। এই উদ্দেশ্যে যেখানে সম্ভব অপর গণতান্ত্রিক শক্তিগুলির সহায়তা ও শুভেচ্ছা লাভ করতে হবে। ভারতবর্ষের প্রতি যাদের চূড়ান্ত আনুগত্য নেই, এমন সমস্ত দল বা গোষ্ঠীসমূহের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করতে হবে।"

বি কে ডি-র এই প্রস্তাব রায়গঞ্জ সম্মেলনে পি এস পি-প্রতিনিধিদের যাঁরা দোদুল্যমান ছিলেন, তাঁদের পুরোপুরি যুক্তফ্রন্ট ত্যাগের পক্ষে নিয়ে গেল। যুক্তফ্রন্ট ত্যাগের পক্ষে সদস্যরা নিজেদের প্রস্তাব অপেক্ষা আরো বেশি করে বলতে লাগলেন—এই ত' বি কে ডি যুক্তফ্রন্ট ত্যাগ করেছে, অজয় মুখোপাধ্যায় আর যুক্তফ্রন্টের নেতা থাকবেন না, কাজেই পি এস পি-র যুক্তফ্রন্টে থাকার কোন যুক্তিই থাকতে পারে না। ইতিমধ্যে শ্রীহরিবিষ্ণু কামাথ রায়গঞ্জ পৌঁছলেন এবং তিনি সকলকে জানালেন বি কে ডি নেতাদের সঙ্গে তাঁর কি কথা হয়েছে। শ্রীমহামায়া প্রসাদ সিংহ, শ্রীচরণ সিং, শ্রীউদিত্‌নারায়ণ শর্মা কি চান এবং শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায় কিভাবে যুক্তফ্রন্ট ত্যাগের প্রস্তাব গলাধঃকরণ করেছেন ভাল ছেলের মত—সব কথাই বললেন। অর্থাৎ ১২ই এপ্রিল সকাল থেকে হাওয়া উঠল পশ্চিমবঙ্গের যুক্তফ্রন্ট ভাঙছে আর জাতীয়তাবাদীরা নিশ্চিতভাবে নতুন ফ্রন্ট করছে। অতএব রাজ্যে যদি পি এস পি যুক্তফ্রন্ট ত্যাগ করে, তবে তার সিদ্ধান্ত হবে এক কদম এগিয়ে থাকা। কিন্তু এই আলাপ-আলোচনার মধ্যে শ্রীবিদ্যুৎ বসু, শ্রীস্বরাজবন্ধু ভট্টাচার্য, শ্রীঅশোক দাশগুপ্ত নিজেদের মত আঁকড়ে ছিলেন এবং তাঁদের মনে দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, দিল্লীতে যা-ই ঘটুক না কেন, পশ্চিমবঙ্গে শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায় যুক্তফ্রন্ট ত্যাগ করবেন না। শুধু তাই নয়—কলকাতা থেকে রায়গঞ্জ আসবার পূর্ব মুহূর্তে শ্রীঅশোক দাশগুপ্ত শ্রীঅশোক ঘোষের সঙ্গে কথা বলে এসেছেন এবং শ্রীঅশোক ঘোষ স্পষ্ট বলে দিয়েছেন—তাঁরা যুক্তফ্রন্ট ত্যাগও করবেন না বা ঐ তৃতীয় শক্তি সৃষ্টির কোন গোলকধাঁধায় প্রবেশ করবেন না। শ্রীঘোষ আরো বলেছিলেন ক্রান্তি দলের শ্রীসুকুমার রায়, শ্রীসুশীল ধাড়া তাঁকে স্পষ্ট করে জানিয়েছেন, ক্রান্তি দল কোন অবস্থায় যুক্তফ্রন্ট ত্যাগ করছে না। কিন্তু এই সব কথা জেনে যাবার পর কাগজের সম্পূর্ণ বিপরীত ধরণের খবর শ্রীঅশোক দাশগুপ্তকে বিপাকে ফেললো। তাই তিনি শেষ চেষ্টা করলেন কলকাতার সঙ্গে যোগাযোগ করবার। শেষ সময়েও যদি জানা যায় যে, ক্রান্তি দল যুক্তফ্রন্ট ত্যাগ করছে না বা ফরোয়ার্ড ব্লক কোন ক্রমেই তৃতীয় শিবির সৃষ্টির শরিক হবে না, তবে হয়ত হাওয়া ঘুরিয়ে দেওয়া যাবে। যুক্তফ্রন্টত্যাগীরা যখন খবরের কাগজে ক্রান্তি দলের যুক্তফ্রন্ট ত্যাগের সিদ্ধান্ত ডেকে ডেকে প্রতিনিধিদের পড়াচ্ছে আর বোঝাচ্ছে পি এস পি'র যুক্তফ্রন্ট ত্যাগ কত সময়োচিত, তখন যদি বলা যেত যে, দিল্লীতে যা-ই ঘটুক না কেন, রাজ্য রাজনীতিতে ঐ সিদ্ধান্ত কার্যকরী হবে না—তাহলে হয়ত হাওয়া ঘোরানো যেত। কিন্তু বিধি বাম, ১২ই এপ্রিল সন্ধ্যার পর শ্রীঅশোক দাশগুপ্ত শত চেষ্টা করেও টেলিফোনে কলকাতার লাইন পেলেন না আর জানতে পারলেন না—প্রকৃতই অজয় মুখোপাধ্যায় যুক্তফ্রন্ট ত্যাগ করছেন কি না? রায়গঞ্জে খবরের কাগজ এক দিন পরে পৌঁছয়, ১২ই এপ্রিলের কাগজ যখন ১৩ই সকালে রায়গঞ্জ পৌঁছল, তখন দেখা গেল শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায় কলকাতা এসে যুক্তফ্রন্ট ত্যাগ সম্পর্কে কোন কথা বলেন নি। সোজা কৃষ্ণনগরে নির্বাচনী অভিযানে চলে গেছেন। শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায় যদি যুক্তফ্রন্ট ত্যাগ করবেন তবে দিল্লী থেকে ফিরে সোজা কৃষ্ণনগর যাবেন কেন? এই কাগজটি যদি ১২ই সকালেও রায়গঞ্জে পাওয়া যেত তবুও কিছুটা কাজ হত। কিন্তু এই কাগজ যখন পৌঁছল, তখন কাজ শেষ—মধ্যরাত্রে ভোটে শ্রীঅশোক দাশগুপ্তের সরকারী প্রস্তাব ১৫ ভোটে পরাজিত হয়েছে।

রায়গঞ্জ রাজ্য কমিটির সভায় মূল প্রস্তাবকে অনেক বার নতুন করে লিখেও সমঝোতার চেষ্টা হয়েছিল। ১১ই এপ্রিল সকালে শ্রীসমর গুহের অনুরোধে শ্রীঅশোক দাশগুপ্ত তাঁর প্রস্তাব নতুন করে লেখেন ও পেশ করেন। এইবার শ্রীগুহ শ্রীদাশগুপ্তের প্রস্তাবের সুর সমর্থন করেন কিন্তু বলেন সুর বজায় রেখে আবার নতুন করে লেখা হোক। পরের বৈঠকে শ্রীসমর গুহ একটি প্রস্তাবের খসড়া পেশ করেন। দুটি প্রস্তাব পাশাপাশি রেখে দেখা যায় শ্রীঅশোক দাশগুপ্তের প্রস্তাব হল কংগ্রেস

বিরোধী পটভূমিকায় তৈরী আর সমরবাবুর প্রস্তাব মূলত কম্যুনিস্ট-বিরোধী। অবশেষে প্রস্তাব ভোটে দেওয়া হল। ভোটে শ্রীসমর গুহের পক্ষে মাত্র পাঁচজন—সর্বশ্রী সমর গুহ, দ্বিজেশ দত্তমজুমদার, প্রদীপ বসু, উমা দেবী, দেবু বসু ভোট দেন। ১১ই এপ্রিল রাত ১১টায় শ্রীঅশোক দাশগুপ্ত সরকারী রাজনৈতিক প্রস্তাব প্রতিনিধি সম্মেলনে পেশ করলেন—পরদিন সকালে শ্রীসুনীল দাস আনলেন তাঁর সংশোধনী প্রস্তাব। পি এস পি সম্মেলনে শ্রীসুনীল দাসের সংশোধনী প্রস্তাবের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল, রাজ্যের যুক্তফ্রন্টের শরিক একটি দলের রাজ্য সম্মেলনে প্রথম রাজ্যের বিধানসভার প্রাক্তন স্পীকারের বিরুদ্ধে বিরূপ কটাক্ষ। সম্ভবত ইতিপূর্বে অন্য কোন দলের সভায় স্পীকারের কাজের প্রতি এমন কটাক্ষ শোনা যায় নি। এমন কি কংগ্রেস দলের কোন প্রস্তাবেও ঠিক এই সুরে স্পীকারের প্রতি কটাক্ষ নেই। কংগ্রেস তার যে কোন প্রস্তাবে স্পীকারের আচরণকে দুঃখজনক বলেছে, তার বেশি কিছু বলে নি। কিন্তু শ্রীসুনীল দাসের প্রস্তাবে বলা হল :

"দুঃখের বিষয় পশ্চিমবঙ্গের সার্বভৌমত্বকে অস্বীকার করে কংগ্রেস পি ডি এফ সংখ্যালঘিষ্ঠ কোয়ালিশন সরকারকে বিধানসভায় পরাজিত করার সুযোগ গ্রহণ না করে যুক্তফ্রন্ট সকরুণভাবে রাজ্যপালের মন্ত্রিসভা বাতিলের ক্ষমতার উপর নির্ভর করল এবং রাষ্ট্রপতির শাসন ডেকে এনে পরিষদের সার্বভৌমত্বকে শাসন বিভাগের পায়ের তলায় লুটিয়ে দিল স্পীকার বিধানসভার রক্ষক হয়েও সভার কণ্ঠরোধের সহায়ক হয়ে পরিষদীয় গণতন্ত্র উপড়িয়ে ফেলতে অগ্রসর হন।"

দলের রাজনৈতিক কর্মসূচী সম্পর্কে দীর্ঘ সংশোধনী প্রস্তাবের শেষ দিকে বলা হয় : "কংগ্রেসী শাসনের অপসারণ ভারতীয় জনসাধারণের অনিবার্য কর্তব্য, কিন্তু কংগ্রেসের বিকল্প বিপরীত আদর্শসম্পন্ন রাজনৈতিক পার্টিগুলির কোয়ালিশন নয়। পশ্চিমবঙ্গের যুক্তফ্রন্ট সরকার কিম্বা, উত্তরপ্রদেশের সংযুক্ত বিধায়ক সরকার তা প্রমাণ করেছে।.... এই পরিপ্রেক্ষিতে আগামী মধ্যবর্তীকালীন নির্বাচনে বৈদেশিক আনুগত্যসম্পন্ন জাতীয়তাবাদে প্রত্যয়হীন রাজনৈতিক শক্তিসমূহের সঙ্গে যুক্তফ্রন্টের শরিক হয়ে পরিষদীয় রাজনীতির পাশাখেলায় দিকভ্রান্ত হলে গণতন্ত্রেরও যেমন অনতিবিলম্বে অন্তিম শয্যা রচিত হবে, জাতীয় জীবনেও তেমনি চীন, রুশ, মার্কিন চক্রের টানা-পোড়েনে পশ্চিম বাংলায় ও পূর্ব ভারতে বৈদেশিক শক্তিবর্গের সংগ্রামভূমির প্রস্তুতিপর্বের প্রবল সহায়তা করা হবে।

এই সম্মেলন দৃঢ়ভাবে এই মত প্রকাশ করছে যে, জাতীয় জীবনে জাতীয়তাবাদ গণতন্ত্র ও সমাজবাদের ভিত্তিভূমি রচনায় দায়িত্বে বৈদেশিক আনুগত্যসম্পন্ন গণতন্ত্র ও জাতীয়তা-বিরোধী শক্তিদ্বারা উপরোক্ত পরিণতির সঙ্গে প্রবল বৈপরীত্য রয়েছে এবং এই যুক্তফ্রন্টের শরিকানার দিনগুলি যত দীর্ঘায়ত হবে, পি এস পি'র স্বকীয়তা ও তার নিজস্ব ভূমিকা ততই দ্রুত অবলুপ্ত হয়ে ভারতীয় সার্বভৌমত্বের যে শিবিরে পি এস পি'র স্থান চিহ্নিত হয়ে আছে, সেই শিবিরকে দুর্বল ও পঙ্গু করে তুলতে সহায়তা করবে। সুতরাং এই সম্মেলন বৈদেশিক আনুগত্যসম্পন্নদের অধ্যুষিত যুক্তফ্রন্ট অবিলম্বে ত্যাগ করে কংগ্রেসকে পরাজিত করিবার জন্য অকংগ্রেসী, জাতীয়তার আদর্শে যারা একমাত্র আস্থাশীল, অসাম্প্রদায়িক এবং পুঁজিবাদ বিরোধী তাদের সংহতি গঠনে এবং এই ভিত্তিতেই আগামী মধ্যবর্তী নির্বাচনের প্রস্তুতির জন্য উদ্যোগী হতে নির্দেশ দিয়েছে এবং তা বাস্তবে রূপদান অসম্ভব হলে একক শক্তিতেই নির্বাচনে অগ্রসর হয়ে ভারতীয় সার্বভৌমত্বের শিবিরে প্রাণ সঞ্চারের দায়িত্ব গ্রহণের জন্য নির্দেশ দিচ্ছে।"

শ্রীসুনীল দাসের প্রস্তাব ও শ্রীঅশোক দাশগুপ্তের প্রস্তাবের মৌল পার্থক্য কিন্তু প্রকৃতপক্ষে যুক্তফ্রন্টে থাকা না থাকার প্রশ্নে নয়। যুক্তফ্রন্টে থাকা বা না থাকার মধ্য দিয়ে একটি দলের ভবিষ্যৎ কখনও নির্ভর করে না, আর পি, এস, পি কোনদিনই পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন সময়ের যুক্তফ্রন্টের একজন অপরিহার্য শরিক নয়। ১৯৫২ সাল—যখন আজকের পি, এস, পি কে, এম, পি, পি ছিল, তখন থেকে সুরু করে ১৯৬৭ সালের নির্বাচনকাল পর্যন্ত পি, এস, পি শক্তি যে নামেই হোক যত যুক্ত মোর্চায় শরিক থেকেছে, তার চেয়ে বেশি মোর্চার বাইরে থেকেছে। কাজেই পি, এস, পি যুক্তফ্রন্টে থাকলো বা না থাকলো সেটা বড় কথা নয়। প্রকৃত রহস্য সম্পূর্ণ অন্যস্থানে অতি গোপনে নিহিত রয়েছে বলা যায়। তাই শ্রীসুনীল দাস তাঁর প্রস্তাবকে 'ক্যারি' করতে চাইলেন যুক্তফ্রন্টে থাকা বা না থাকার প্রশ্নে—আর শ্রীঅশোক দাশগুপ্ত বলতে লাগলেন—আমরা কার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করবো ? আমাদের প্রকৃত শত্রু কে? সেই শত্রুকে আগে নির্দিষ্ট করা হোক। শত্রু যদি হয় প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি, শত্রু যদি হয় শোষকশ্রেণী, তবে তার বিরুদ্ধে সংগ্রামের নিরিখ নির্ধারিত হবে দলের রাজনৈতিক প্রস্তাবে। কিন্তু এই মৌল পার্থক্য তলিয়ে গেল যুক্তফ্রন্টের পক্ষে আর বিপক্ষের তর্কবিতর্কে। ১২ তারিখ বেলা ১২টায় বক্তৃতাকালে শ্রীসুনীল দাস শ্রীদ্বিজেশ দত্তমজুমদারের হাত থেকে এক গেলাস জল খেয়ে গলা ভিজিয়ে তাঁর দীর্ঘ বক্তৃতা শেষ করলেন এই বলে যে, যুক্তফ্রন্টের মানসিক বন্দী হয়ে থাকলে দলের অস্তিত্ব বিপন্ন হবে। এর জবাব দিলেন শ্রীবিদ্যুৎ বসু। শ্রীবসু বললেন, বি, কে, ডি ও ফরোয়ার্ড ব্লক কোনক্রমেই যুক্তফ্রন্ট ত্যাগ করবে না আর শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায় আজও বাংলার জাতীয় নেতা, এবং কম্যুনিস্টদের সঙ্গে সংগ্রাম যদি লক্ষ্য হয়, তবে সে লক্ষ্য পূরণ যুক্তফ্রন্টে থেকেই সম্ভব—এককভাবে সম্ভব নয়। শ্রীসমর বসু বললেন, চীন, পাকিস্তান আর পশ্চিম বাংলার ভৌগোলিক অবস্থানের কথা চিন্তা করে কম্যুনিস্টদের সঙ্গে যুক্তফ্রন্টে থাকা সম্ভব নয়, উচিতও নয়। শ্রীসমর গুহের কথার জবাব দিলেন শ্রীস্বরাজবন্ধু ভট্টাচার্য। শ্রীভট্টাচার্য বললেন, যুক্তফ্রন্টের সমর্থন না থাকলে শ্রীসমর গুহ দিল্লীর লোকসভার মুখ দেখতে পেতেন না। শ্রীসুধীর দাস, শ্রীবিভূতি পাহাড়ী, শ্রীসুজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীমাণিক মুখোপাধ্যায় ও শ্রীভজন দাশগুপ্ত বললেন—যুক্তফ্রন্ট ভাঙলে কংগ্রেসেরই লাভ হবে, কংগ্রেসের মুখেই হাসি ফুটবে।

সত্যি হলোও তাই, রায়গঞ্জে পি, এস, পি'র যুক্তফ্রন্ট ত্যাগের সিদ্ধান্তে সর্বাপেক্ষা খুশি হলেন শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন এবং সন্তোষ প্রকাশ করলেন সংবাদপত্রে বিবৃতি দিয়ে। রায়গঞ্জ সম্মেলনের পর শ্রীসুনীল দাস সাংবাদিক সম্মেলনে রায়গঞ্জ প্রস্তাব ব্যাখ্যা করার দিন জনৈক পি, এস, পি নেতা বললেন,—একটা রহস্যের সমাধান করে দিতে পারেন। পি, এস, পি'র রাজনৈতিক প্রস্তাবে, কংগ্রেস যদি খুশি হয়, তাহলে তো বোঝা উচিত—আমরা আবার সেই কংগ্রেসের 'বি-টিম' অপবাদের যুগে ফিরে যাচ্ছি। যুক্তফ্রন্টে থাকা খুবই খারাপ অনেকে বলেন, কিন্তু পি, এস, পি'র ইতিহাসে সম্ভবত এই যুক্তফ্রন্টের রাজত্বকালেই 'পি, এস, পি কংগ্রেসের 'বি-টিম' অপবাদ' লোকে ভুলে গেছিল—অথচ ওই সময় পি, এস, পি কিছু কম কম্যুনিস্ট-বিরোধিতা করে নি। উক্ত নেতা আর একটা কথা বলেছিলেন—"আচ্ছা, বলতে পারেন, পি, এস, পি নেতা শ্রীপ্রদীপ বসু দু'খানি বই লিখেছেন—"যুক্তফ্রন্ট ও কম্যুনিস্ট কৌশল" আর "গণতান্ত্রিক সমাজবাদ ও মাওবাদ"। সেই বই দু'খানি স্বয়ং প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি এত সযত্নে কিনে নিয়ে বিলি করছেন কেন ? বই

লেখেন পি, এস, পি নেতা আর সেই বই কিনে লোককে পড়ান ডঃ প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র।" তিনি আরো দুঃখ করে বলেছিলেন—জানেন, ১৯৫৫ সালে পি, এস, পির নীতি সম্পর্কে থিসিস রচনা হয়েছে, আর আজ পর্যন্ত সেই থিসিস পশ্চিমবঙ্গের কর্মীরা ছাপার অভাবে দেখতে পায় নি। সম্প্রতি চাঁদা তুলে শ্রীসন্দীপ দাস বইটি জাতীয় প্রকাশনী থেকে প্রকাশ করেছেন।

যা হোক রায়গঞ্জের মধ্যরাত্রের নাটক শেষে পি, এস, পি নেতারা কলকাতা পৌঁছলেন আর রায়গঞ্জের সিদ্ধান্ত কার্যকর করা আর বাতিল করা নিয়ে দু' পক্ষে লড়াই সুরু হল। এবং এই লড়াই চলছে ও চলবে। শ্রীসুনীল দাস বলছেন—যুক্তফ্রন্টে ফিরে যাবার প্রশ্নই ওঠে না; রায়গঞ্জের রায় অপরিবর্তিত থাকবে। শ্রীঅশোক দাশগুপ্ত বলছেন—রাজনীতিতে পরিবর্তন হবে না এমন নীতি নেই, আর যে নীতি মাত্র ১৫ ভোটের ব্যবধানে গৃহীত হয়েছে। শ্রীদাশগুপ্ত সদ্য অনুষ্ঠিত বিহার পার্টির সিদ্ধান্ত প্রকাশ করে বলেছেন—গত মার্চ মাসে বিহারে পি, এস, পি ৫০০—৩০০ ভোটে যুক্তফ্রন্ট ত্যাগ সম্পর্কে একটা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, কিন্তু যেহেতু ৩০০ সদস্য এইরূপ গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে, তাই তিন সপ্তাহ পরে আবার সম্মেলন ডাকা হয়। পরবর্তী সম্মেলনে ৫৫০—২০০ ভোটে যুক্তফ্রন্টে থাকার সপক্ষে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। কাজেই বিহারে যদি ৩০০ সদস্যের মত পার্থক্যের প্রশ্নকে মূল্য দেওয়া হয়, তবে পশ্চিমবঙ্গে ১৫ জন সদস্যের মতপার্থক্যকে মূল্য দেওয়া হবে না কেন? শ্রীদাশগুপ্ত আরো প্রশ্ন তুলেছেন—যুক্তফ্রন্ট খারাপ; কম্যুনিস্টরা আরো খারাপ, তবে হরিয়ানায় কম্যুনিস্ট পার্টির সঙ্গে ঐক্য করে পি, এস, পি নির্বাচন করছে কিভাবে?

প্রকৃতপক্ষে পি, এস, পি দলের মধ্যে যে সংঘাত দেখা দিয়েছে, সে সংঘাত কোনক্রমেই মিটবে না—আজ মিটলে কাল নতুনভাবে দেখা দেবে বলে অনুমানের যথেষ্ট কারণ আছে। রায়গঞ্জে একটি প্রস্তাব যেটি ছাপানো হয়েছিল কিন্তু পরে পেশ করা হয় নি, আলোচনাও হয় নি, সেই প্রস্তাবটির মধ্যেই রয়েছে পি, এস, পির নতুন সুর। "অর্থনৈতিক প্রস্তাবের খসড়া"—যেটা প্রচার করা হয়েছিল, সেই প্রস্তাবের বয়ানকে যদি আজ পি, এস, পি কার্যকরী করে, তবে পি, এস, পি-কে সম্পূর্ণভাবে তার গতিপথ পরিবর্তন করতে হবে। সেই প্রস্তাবে আছে "অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতার সঙ্গে শ্রেণী সংঘাত অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। স্বার্থের সংঘাত এই জন্যই শ্রেণী সংঘাতে রূপান্তরিত হয়। সমাজের বর্তমান ব্যবস্থার মধ্যেই স্বার্থ ও সংঘাত নিহিত রয়েছে। এই কারণে পি, এস, পি সকল শ্রেণীর অবসান ঘটিয়ে শ্রেণীহীন সমাজ কায়েম করার কথা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করছে। বিদেশী শাসনের অবসানের জন্য যেমন প্রয়োজন জাতীয় সংগ্রামের—অত্যাচারিত শ্রেণীর মুক্তির জন্য তেমনি প্রয়োজন শ্রেণী সংগ্রামের। অর্থনৈতিক আমূল পরিবর্তন কখনও আপনা থেকে আসে না। অর্থনৈতিক পরিবেশ সামাজিক পরিবর্তনের অনুকূল হলেও ক্ষমতায় আসীন পুঁজিবাদী শ্রেণী সেই পরিবর্তনের ঘোর বিরোধী। সমগ্র জনসাধারণের নৈতিক আবেদন-নিবেদনে ক্ষমতাসীন শ্রেণী তাদের শ্রেণীগত বিশেষ সুবিধা কখনও সংঘাত ও সংঘর্ষ ব্যতিরেকে স্বেচ্ছায় ত্যাগ করেছে বলে ইতিহাস বলে না।"

উপরের এই কথাগুলির মধ্যেই রয়েছে রাজ্য পি, এস, পি দলের নতুন বিরোধের বীজ। একদল মনে-প্রাণে বিশ্বাস করে শ্রেণী সংগ্রাম, যে সংগ্রাম আবেদন-নিবেদনের পথে নয় এবং সেই দল এগিয়ে যেতে চায়। যুক্তফ্রন্ট ত্যাগের প্রস্তাব হয়ত এই নতুন চিন্তার একটি বাধা হতে পারে, কিন্তু সেই বাধা চিরকাল অলঙ্ঘ্যনীয় থাকবে এ কথা মনে করার কোন কারণ নেই। রায়গঞ্জ পি, এস, পির সম্মেলনে এই সংঘাতের চিহ্নই ধরা পড়েছে।

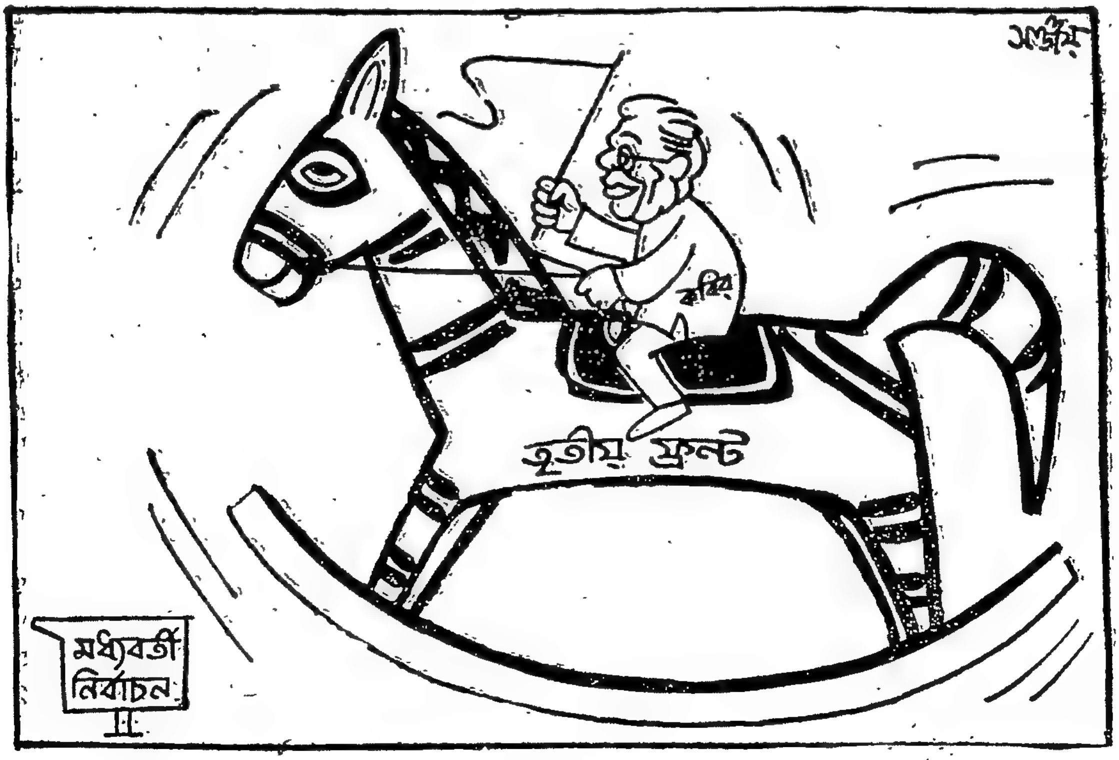

পালাম বিমান বন্দরে কোসিগিনের সম্বর্ধনা

ক্ষণিকের অতিথি

যত ক্ষণকালের জন্যই হোক, পাকিস্তান সফরান্তে সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রী শ্রীযুক্ত কোসিগিন-এর ভারতে অবতরণ ভারতভূমির প্রতি সোভিয়েট দেশের সৌহার্দ্যপূর্ণ আকর্ষণকেই প্রমাণিত করে। পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদের মিতা, আশ্চর্য কারণে চীনা প্রশ্রয়প্রাপ্ত, গোঁড়ামিপূর্ণ ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র পাকিস্তানের সঙ্গে সোভিয়েটের প্রীতি লেনদেনের ঘটনাটি এবং পাকিস্তানের উন্নতিতে সোভিয়েটের সাহায্যের বাহু প্রদান একটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা হলেও, একই সময় সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রীর ভারত সফর ও তাসখন্দ ঘোষণার ওপর জোরদানও কম তাৎপর্যপূর্ণ নয়। বিশেষ ভারতকে অস্ত্র সাহায্যদান বন্ধ করানোর জন্য পাক প্রচেষ্টা শ্রীযুক্ত কোসিগিনের উপস্থিতিকালেই স্পষ্টত বানচাল হয়ে যাওয়ায় ভারতের পক্ষে সোভিয়েট প্রধানের পাক-সফর অন্যতর তাৎপর্যেও ভারতে একটি সন্তোষের পরিমণ্ডল রচনায় সাহায্য করেছে। ভারত যা এতাবৎকাল চিন্তা করে আসছে এবং প্রকাশ্যে প্রচারও করে থাকে। সোভিয়েট প্রধানের পাকিস্তানে প্রদত্ত উপদেশে সেই সুরই ধ্বনিত হয়েছে। পাক-ভারত সম্পর্কের ক্ষেত্রে তিনি শান্তি স্থাপনার ওপরই জোর দিয়েছেন। দুটি উন্নয়নশীল দেশ যে বিরোধের মাধ্যমে কেবলই পিছিয়ে পড়বে শ্রীযুক্ত কোসিগিন পাক নেতৃবৃন্দকে সে কথাও বোঝাবার প্রয়াস পেয়েছেন।

শ্রীমতী গান্ধীর সঙ্গে শ্রীকোসিগিনের আলাপ হয়েছে প্রধানত মধ্যপ্রাচ্য এবং ভিয়েৎনাম পরিস্থিতিকে কেন্দ্র করে। ওরই মধ্যে ভারত-সোভিয়েট মৈত্রীবন্ধন দৃঢ়তর করার অনুকূলে দুই নেতার হৃদ্যতাপূর্ণ আলোচনাও যে হয়েছে এ বিষয়ে আর সন্দেহ কি। সোভিয়েট প্রধান অবশ্য বলেছেন, পাক-ভারত সম্পর্ক স্বাভাবিকীকরণের জন্য তিনি নতুন কোনো পরিকল্পনা গ্রহণ করেন নি। কিন্তু তার মানেই এই যে, সোভিয়েট দুনিয়া আজও মনে করেন, এই দুই রাষ্ট্রের সম্পর্ক উন্নততর হতে পারে একমাত্র তাসখন্দ চুক্তির ভিত্তিতেই। বলা বাহুল্য, ভারতও একই কথা ভাবে।

সোভিয়েট প্রধান শ্রীকোসিগিনের ক্ষণকালের আতিথ্য গ্রহণ দিল্লীর রাজনৈতিক মহলে তাই এক চিন্তার আবর্ত সৃষ্টি করে গেছে। সুখের বিষয় শ্রীকোসিগিন তাঁর পাকিস্তান ও ভারত আগমনের পেছনে এমন কিছু সূত্র রেখে যান নি, যার ফলে পর্যবেক্ষক মহলে হতাশার সঞ্চার হতে পারে। বরং একটি সুস্থ চিন্তার আবহাওয়াই বিরচিত হয়েছে এবং অনেকে মনে করছেন, শ্রীকোসিগিনের আগমনে হয়ত পাকিস্তান পাক-ভারত সম্পর্ক কিছুটা স্বাভাবিক করার বিষয়ে নতুন প্রেরণা লাভ করবে।

কচ্ছ সমর্পণ বিরোধী সংগ্রাম

কচ্ছ সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক ট্রাইবুনালের রোয়েদাদ অনুযায়ী ভারত সরকার কচ্ছের রান অঞ্চল পাকিস্তানকে প্রদানের সিদ্ধান্ত করায় কচ্ছ সমর্পণ বিরোধী সংগ্রাম শুরু হয়েছে গত একুশে এপ্রিল। আন্দোলনে যোগদানকারী তিন প্রধান হলেন এস-এস-পি, জনসঙ্ঘ এবং পি-এস-পি। প্রথম দিনেই পাঁচজন সংসদ সদস্যের নেতৃত্বে একশ একাশিজন স্বেচ্ছাসেবক গ্রেপ্তার বরণ করেছেন। সত্যাগ্রহী পঞ্চনেতাদের সকলেই স্ব স্ব দলের মুকুটমণি। মধু লিমায়ে, নাথ পাই, হেম বড়ুয়া, রাজনারায়ণ, জে আর যোশী ছিলেন সেই প্রথম পাঁচ নেতা। বিশিষ্ট যাঁরা গ্রেপ্তার হয়েছেন তাঁদের মধ্যে মধ্যপ্রদেশের পদত্যাগ পেশকারী মন্ত্রী আরিফ বেগ। গুজরাট থেকে পি-এস-পির চেয়ারম্যান নটবর লাল শা এবং জনসঙ্ঘের সভাপতির (গুজরাট) হরি সিং গোহেল।

একুশের গ্রেপ্তার লোকসভায় উত্তপ্ত আলোচনার সূত্রপাত করেছিল কিন্তু অধ্যক্ষ কোনো আলোচনার প্রস্তাব তো মঞ্জুর করেনই নি, ঐ দিনের বিবরণও যাতে সাংবাদিকগণ নোট না করেন তার নির্দেশ দেন। প্রকাশ, পি-এস-পির সমর গুহ এবং এস-এস-পির রবি রায় কংগ্রেসকে দেশের প্রতি বিশ্বাসভঙ্গের অভিযোগে অভিযুক্ত করেছেন। দেশের জমি বিদেশীর হাতে এইভাবে অক্লেশে তুলে দেওয়ার ফলে বাস্তবিকই দেশবাসীর মন হতাশার আক্রোশে উত্তপ্ত হওয়া স্বাভাবিক।

আন্দোলনের দ্বিতীয় দিনে মধ্যপ্রদেশের জনৈক উপমন্ত্রী, দুজন এম-এল-সি এবং একজন এম-এল-এ-সহ একানব্বই জনকে গ্রেপ্তার করা হল।

তৃতীয় দিনের ১২৬ জনসহ মোট গ্রেপ্তার দু'শ এগারোয় দাঁড়ায়। সত্যাগ্রহীদের ওপর গুজরাট সরকারের নির্মম ব্যবহারের প্রতিবাদ জানিয়েছেন জনসঙ্ঘ সভাপতি শ্রী এ বি বাজপেয়ী। তাঁর বিবরণে জানা গেল, দেশের একাংশ বিদেশী আদালতের রোয়েদাদ অনুযায়ী পাকিস্তানের হাতে তুলে দেওয়ার প্রতিবাদ করছেন যে দেশপ্রেমিক সত্যাগ্রহীগণ, গুজরাট সরকার তাঁদের প্রতি ইংরেজ বাহাদুরের মতো বন্দীনিগ্রহ আরম্ভ করেছেন। প্রখর রৌদ্রতাপে বাসের ছাদে বসিয়ে সত্যাগ্রহীদের নিয়ে যাওয়া, শিশুসহ নারীদের বহু দূরে নিয়ে গিয়ে নির্জন স্থানে ছেড়ে দেওয়া এবং কোন কোন সত্যাগ্রহী দলকে গভীর রাত্রে জনমানবশূন্য স্থানে গিয়ে নামিয়ে দিয়ে আসা প্রভৃতি জাতীয় সরকার সুলভ ব্যবহার নয়। কিন্ত গুজরাট সরকার তাই করছেন। শ্রীবাজপেয়ী এ জাতীয় ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটলে আন্দোলনের স্থান সম্প্রসারিত করা হবে বলে জানিয়েও দিয়েছেন।

সত্যাগ্রহের পরিধি দ্রুত সম্প্রসারিত হচ্ছে এবং স্বেচ্ছা সত্যাগ্রহীর সংখ্যাও বৃদ্ধি পাচ্ছে. চব্বিশে এপ্রিল ভুজের ছাত্রগণ এবং খাবদার অধিবাসীরা সত্যাগ্রহে যোগদান করে তার প্রথম কিস্তী প্রমাণ রাখলেন। কচ্ছের মহারাজকুমার হিম্মৎ সিংজী নিজে সত্যাগ্রহীদের মধ্যে এগিয়ে গেলেন আর পাঁচ হাজার সত্যাগ্রহী যদি কচ্ছ থেকে সত্যাগ্রহ আন্দোলনে যোগদান করেন, তবে রাজকুমার স্বয়ং একটি দলের নেতৃত্ব করতে ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। পুরীর জগদ্গুরু শঙ্করাচার্যও প্রস্তুত, কেবলমাত্র আহ্বানের অপেক্ষা। জনসঙ্ঘের মন্ত্রীরা দলে দলে মধ্যপ্রদেশ মন্ত্রিসভা ছেড়ে সত্যাগ্রহে নামছেন। সাতজন মন্ত্রী ইতিমধ্যেই পদত্যাগের অনুমতিও পেয়ে গেছেন। মহারাজকুমার বলেছেন, ভারতের জমি সরকার পাকিস্তানকে বিলিয়ে দিচ্ছেন। যে কোনো প্রকারেই হোক, এই হস্তান্তর রুখতে হবে।

কিন্তু ভারত সরকার আন্তর্জাতিক ট্রাইবুনালে বিষয়টি প্রেরণ করার কালেই সে পথ মেরে রেখেছেন। কচ্ছের চিহ্নিত অঞ্চল প্রদান করা বর্তমানে অনিবার্য। পরন্তু দেশের জমি বিলি বন্দোবস্তের ক্ষেত্রে আমরা উদারনৈতিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ। তাই কচ্ছ সমর্পণ আন্দোলনটিকে ঘিরে দেশের সর্বত্র খুব একটা অসন্তোষের ঝড় এ পর্যন্ত কুজ্ঝটিকার সৃষ্টি করে নি। বিশেষ আন্দোলনে যাঁরা না নামলে আন্দোলন দানা বাঁধে না, সেই কম্যুনিস্টরা চুপ। তবে উত্তর উত্তর-পশ্চিম ভারতে জনসঙ্ঘ এস-এস-পি'র প্রভাব-প্রতিপত্তি ক্রমবর্ধমান। সুতরাং উদার হস্তে দেশের জমিবিলির এ হেন ঘটনা দু-একদিনের কাগজী শিরোনাম লাভ করেই ঝিমিয়ে পড়বে বলে মনে হয় না। কে আর দীর্ঘকাল নিজেকে দান করেই খুশি। পাকিস্তানকে দানের ব্যাপারে আমরা দাতাকর্ণ। সম্ভবত এই দরাজ দানের কালও সীমিত হয়ে আসছে। পাকিস্তানকে দিয়ে দিয়ে আমরা বস্তুত আর কত নিঃস্ব হতে পারি।

সংখ্যাগুরুর ফ্যাসাদ

রাজনীতির সাধ মেটাতে রাজনীতিকদের বহুতর ফ্যাসাদ স্বেচ্ছায় আহ্বান করে আনতে হয় প্রতিপক্ষকে কাহিল করার জন্য। ভারতের দুর্ভাগ্য, এখানে রাজনীতি করার জন্য জাতির মনে বিভেদ সৃষ্টির ফ্যাসাদ দেশের নেতৃবর্গই সযত্নে আবাহন করে আনেন। বিশেষ নির্বাচন টির্বাচন কাছিয়ে এলে এই সব 'ফ্যাসাদ'-কেই দল উপদল ক্যাপিটল করে লড়াই-এ নামেন। তাতে অবস্থার ঊনিশ বিশ হোক চাই না হোক, উলুখাগড়ার প্রাণ যায়।

রাজনীতি করতে গিয়েই ভারতে হিন্দু এবং মুসলমান এই দুই সম্প্রদায়ের মনে কুটিল ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতার বিষ অনুপ্রবিষ্ট করানো হয়েছিল। ফলে উলুখাগড়াকুল কচুকাটা হলে কি হয়। ভারতবর্ষকে ভাগ বাটোয়ারা করে নিয়ে রাজনীতিওয়ালারা বিশেষ বিশেষ ভূখণ্ডে রাজত্ব পাকা করে নিতে পেরেছিলেন। বর্তমানের ভাঙা ভারতেও সেই খেলা আজও বন্ধ হয় নি। অথচ এই খেলা চলতে থাকলে ভবিষ্যৎ ভারত যে রসাতলে ডুববে স্বখাত সলিল খননকারী রাজনীতি সে কথা ভুলেও ভাবে না।

ইতিপূর্বে 'ভারতদর্শনে'র পাতায় লিখেছিলাম, রাজনীতিওয়ালারাই সাম্প্রদায়িকতার ডিমে তা' দিয়ে সাম্প্রদায়িক হঠকারী কুবুদ্ধির বংশবৃদ্ধি করে যাচ্ছেন। যে দেশের সংবিধান সাম্প্রদায়িক ভেদাভেদকে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করেছে, সেই দেশের ক্ষমতাসীন দলই সাম্প্রদায়িক স্বার্থকে বারম্বার চোখের ওপর তুলে ধরে ভেদবুদ্ধি উত্তেজিত করছেন অকারণ প্রচারকার্য চালিয়ে। অন্যপক্ষে দু'একটি রাজনৈতিক দল এই দুর্বলতার পিঠ থাবড়ে রাজনীতি ব্যবসায় ফাঁপিয়ে তুলছেন। কিন্তু দেশের সাধারণ মানুষ এই ভেদাভেদতত্ত্বের সংরক্ষণে আদৌ আগ্রহী বলে তো মনে হয় না। ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের বড়াই করব অথচ ধর্মভেদে বিশেষ স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখব এই স্ববিরোধী কার্যই সাম্প্রদায়িক অজ্ঞান ভেদবুদ্ধিতে ইন্ধন যুগিয়ে আসছে।

কংগ্রেস-ওয়ার্কিং কমিটি বিষয়টি নিয়ে নতুন করে নাড়াচাড়া শুরু করেছেন এবং এমন সমস্ত বক্তব্য হাজির করছেন যা দেখে মনে হয়, কংগ্রেস এদেশে সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়েরই প্রতিষ্ঠান, তবে সৌভাগ্যক্রমে ভয়ানক উদারচেতা বলেই তাঁরা দিবারাত্র সংখ্যালঘু নিয়ে মস্তক ঘর্মাক্ত করছেন। বস্তুত এটা সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়েরই মানসিক দুর্বলতার পরিচায়ক, দুর্ভাগ্যক্রমে সেই পরিচয় প্রকাশ করে কংগ্রেস নিজেকে সংখ্যাগুরুর প্রতিষ্ঠান এবং সংখ্যালঘুর রক্ষাকর্তারূপে জাহির করতে উদ্যত। এতদ্দ্বারা সংখ্যালঘুর প্রেম-প্রীতি কংগ্রেস কত দূর আকর্ষণে সমর্থ হবে তা ইতিহাসে চোখ দিলে আপনি বোঝা যায়। যাই হোক কংগ্রেস হয়ত মনে করেন, এইভাবে সংখ্যালঘুর সমর্থন কংগ্রেসী ক্যাম্পে অজস্র ধারায় বর্ষিত হতে থাকবে। হোক, না হোক, এই কাজের কিন্তু অবশ্যম্ভাবী বিষময় ফল দাঁড়াবে এবং দাঁড়াচ্ছে এই যে, সুস্থ ভারতীয় নাগরিক মনে সম্প্রদায়গত ভেদবুদ্ধিকে অযথা উত্তপ্ত করে তোলা হচ্ছে যা জাতীয় সংহতি বিনাশের অন্যতম কারণরূপে অবশ্যই দেখা দেবে। কেবলমাত্র রাজনৈতিক পরিস্থিতি যদি কোনও দলকে এইভাবে ভারতের বুকে সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি জিইয়ে রাখার প্রেরণা যোগান দিয়ে যায়, তবে সংখ্যালঘুর তো বটেই, সংখ্যাগুরুর জীবনেও নিত্য নতুন ফ্যাসাদ দেখা দিতে

কিস্তিবন্দীতে ট্রানজিস্টার

৩২০, টাকা মূল্যের টেলিকুইন, পোর্টেবল ৩ ব্যান্ড অল ওয়ার্ল্ড ৮ ট্রানজিস্টার মাসিক ১০, টাকার সহজ কিস্তিতে। আবেদন করুন:

ATLAS CO. (S.B.—22)
Box No. 1329, Delhi—6.

থাকবে। এটা সম্পূর্ণ দুর্বোধ্য, কেন যে-কোনো সম্প্রদায়কেই সমদৃষ্টিকোণ থেকে কেবলমাত্র ভারতের নাগরিক বলে গ্রহণ করা অসম্ভব! কিসের জন্য সংখ্যালঘু বলে একদল নাগরিককে চিহ্নিত করে রেখে সংখ্যাগুরুর বদান্যতা দেখিয়ে তাঁদের চিরকাল রাজনীতির ঘুঁটি হিসেবে ব্যবহার করা হবে। লোভ দেখিয়ে আকাঙ্ক্ষা বাড়ানো হবে কেন কোনো বিশেষ সম্প্রদায়ের। কে এ হেন অধিকার তো ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের নেই। তার দৃষ্টিতে ধর্ম নির্বিশেষে সকলেই সমান সুযোগ-সুবিধার অধিকারী। কেউ বিশেষ সুবিধাভোগের কল্পনা করবেন এবং সেই কল্পনায় উস্কানি দিয়ে কেউ রাজনীতি করে যাবেন, ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে তা বরদাস্ত করা যায় না।

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে উপরোক্তভাবে বিশেষ সম্প্রদায়ের আশু তোষ করার জন্য সক্রিয় প্রয়াস লক্ষ্য করে উক্ত মন্তব্যের প্রয়োজন অস্বীকার করতে পারছি না।

সেই পর্যন্ত অবশ্যই ভালো, যেখানে ওয়ার্কিং কমিটি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি-ভঙ্গকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বনের চিন্তা করছেন। কিন্তু যখনই বিশেষ সুযোগ-সুবিধার নেওয়া নিয়ে বিশেষ সম্প্রদায়কে ভেদবুদ্ধিতে উত্তেজিত করা হচ্ছে, তখনই নতুন ফ্যাসাদ যেচে আহ্বান করছেন কংগ্রেস নিজে। চাকুরী ও অন্যান্য সুযোগ দানের জন্য ওয়ার্কিং কমিটি একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কমিটি গঠনের পরিকল্পনা করছে। বলা বাহুল্য মানুষের মন থেকে সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি বিতাড়নের এটা পথ নয়, বরং এই পথই ভেদবুদ্ধি সৃষ্টির সহায়ক। অধিক মহত্ত্বের আড়ালে সব সময় যে শুভবুদ্ধি কাজ করে এমন নয়। বহু ক্ষেত্রে মহত্ত্বই অভিশাপরূপে দেখা দেয়। কংগ্রেসের সংখ্যাগুরু মেরে সংখ্যালঘু সংরক্ষণের পরিকল্পনাগুলি সেই জাতের পঙ্গু মহত্ত্বের পরিচায়ক। মনে করা যাক, কংগ্রেসী নেতারা যদি অধিকাংশ সংখ্যালঘু সম্প্রদায় থেকেই আসতেন, সে ক্ষেত্রে সংখ্যালঘুর বিশেষ ব্যবস্থা কি সাম্প্রদায়িকতা বলেই গণ্য হত না? যেহেতু তাঁদের বৃহদংশই সংখ্যাগুরুর প্রতিনিধি সে কারণ পক্ষপাত প্রদর্শনের নির্ভীক সুযোগ তাঁরা লাভ করেছেন। কিন্তু আসল ফ্যাসাদ ঐখানেই। অধিক ঔদার্য প্রদর্শনের ফলে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় চিরটাকালই সংখ্যাগুরুর কাঁধে চেপে চলবারই চেষ্টা করবেন। ফলে তাঁদের মধ্যে জাগ্রত জাতীয়তাবোধ এবং ভারতীয় নাগরিকত্বের মনোভাব গড়ে-ওঠা সংখ্যাগুরু প্রদত্ত প্রতিকূলতাই বাধা হয়ে দাঁড়াবে। ভয়ানক ভালো মানুষের মতো সংখ্যালঘু প্রীতি প্রদর্শন করতে গিয়ে কংগ্রেস কিন্তু হিতে বিপরীতই করবেন। কেন না ভারতীয় নাগরিকতাবোধ থেকে সংখ্যালঘুরা যেমন বঞ্চিত হবেন, সুবিধা-সুযোগের ঢালাও ব্যবস্থা তেমনি অন্যতর সম্প্রদায়ের মনে ঈর্ষা এবং ক্ষোভেরই সঞ্চার করবে।

১০৭৫এর রবীন্দ্র-জন্মদিবস উপলক্ষে প্রকাশিতব্য

সাপ্তাহিক বসুমতীর বিশেষ সংখ্যা

সমালোচকের সমালোচনা বিতর্কবহুল ব্যাপার। একজন সমালোচকের অভিমত আর একজন সমালোচকের কাছে অনেক সময় অনভিপ্রেত। এ কালের সাহিত্য-সংগীত-শিল্প-সিনেমা-সংবাদ, এমন কি, সামাজিক উন্মার্গ-গামিতা নিয়ে সমালোচকদের মধ্যে একদিকে যেমন সোচ্চার জেহাদ আর একদিকে তেমনি অকুণ্ঠ সমর্থন। এই দুয়ের বিচার-বিশ্লেষণ পঁচিশে বৈশাখ, ১৩৭৫, রবীন্দ্র-জন্মদিবস উপলক্ষে প্রকাশিতব্য সাপ্তাহিক বসুমতীর বিশেষ সংখ্যায় বিশেষ আকর্ষণ। লিখেছেন: অন্নদাশঙ্কর রায়, আদিত্য ওহদেদার, অচিন্ত্য সেনগুপ্ত, কালীকুমার দত্ত, চন্দ্রগুপ্ত, নন্দগোপাল সেনগুপ্ত, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, নারায়ণ চৌধুরী, নীরদচন্দ্র চৌধুরী, পরিমল গোস্বামী, প্রেমাংকুর, মৈত্রেয়ী দেবী, লীলা মজুমদার, সুকুমার রায়, সুশীল রায়, হরপ্রসাদ মিত্র প্রমুখ।

এই বিশেষ সংখ্যার জন্য মূল্য বৃদ্ধি করা হয় নি।

ভারতে হিন্দু এবং মুসলমান ছাড়াও অনেকানেক ধর্ম সম্প্রদায় বর্তমান। প্রতিটি সম্প্রদায়কে পৃথক সুযোগ দান করতে গিয়ে কর্তারা কি নাগরিক মনে সম্প্রদায়গত চেতনার স্বাতন্ত্র্যই সৃষ্টি করবেন না। এই রাজনৈতিক কদভ্যাসটির পরিবর্তন যতদিন না সম্ভব হচ্ছে, দেশে সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধিও ততদিন অপসারিত হবে না।

সংখ্যাগুরুর গর্ব নিয়ে এ জাতীয় বদান্যতার মনোভাব অবিলম্বে বন্ধ হওয়া উচিত, অন্যথা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের চোখে আঙুল দিয়ে কেবলই তাঁদের মনে সম্প্রদায় চেতনাকে উস্কানি দান করা হবে। ফলত তাঁদের মনে নিরাপত্তাবোধ সৃষ্টির মহৎ প্রয়াস মাঠেই মারা যাবে।

ডঃ চেন্না রেড্ডির নির্বাচন বাতিল

কেন্দ্রীয় ইস্পাতমন্ত্রী ডঃ চেন্না রেড্ডির নির্বাচন অবৈধ ঘোষণা করে অন্ধ্র হাইকোর্ট যে রায় দিয়েছেন তদনুযায়ী ডঃ রেড্ডির রাজ্যসভার সদস্যপদ খারিজ হয়ে যায়। শোনা যাচ্ছে, ডঃ রেড্ডি কেসটা সুপ্রীম কোর্টে নিয়ে যাবেন।

অন্ধ্র হাইকোর্ট চেন্না রেড্ডির নির্বাচন দুর্নীতিগ্রস্ত এবং ডঃ রেড্ডি নিজে এবং তাঁর সমর্থকদের দ্বারা ভোটারদের ঘুষ দিয়ে নির্বাচন জিতেছেন বলে যে চাঞ্চল্যকর মন্তব্য করেছেন তার প্রভাব সুদূরপ্রসারী হবে। এই একটি রায় দানের মাধ্যমে বিচারপতি কুপা রাও বিখ্যাত হয়ে গেলেন।

বিচারপতি আরও বলেছেন, ডঃ রেড্ডি সাধারণের স্বাধীন ভোটাধিকারে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে হস্তক্ষেপ করেছেন। তিনি ধর্ম এবং সম্প্রদায়ের নামেও ভোট ভিক্ষা করেছিলেন।

ডঃ রেড্ডির বিরুদ্ধে ভোটারদের ওপর জুলুম এবং বলপ্রয়োগের অভিযোগও প্রমাণিত হয়েছে বলে রায় দান করা হয়। ভোটার লাইনে রেড্ডি সমর্থকদের ছুরিকা-প্রদর্শনে ভোটার-মনে আতঙ্ক সৃষ্টি এবং রেড্ডি স্বয়ং ঘুষি বাগিয়ে ভোটারদের ভীতি প্রদর্শন করেন বলে যে অভিযোগ, তাও প্রমাণিত হয়েছে আদালতে।

এই চাঞ্চল্যকর রায়টি ভারতীয় গণতন্ত্রের অক্ষতাকটির ছিদ্র সম্প্রসারিত করল সন্দেহ নেই।

উল্লেখযোগ্য, বিচারপতি কুপা রাও প্রসঙ্গত মন্তব্য করেছেন যে, মন্ত্রীরা পুনরায় নির্বাচনপ্রার্থী হলে তাঁদের মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করেই প্রার্থী হওয়া উচিত।

বিনামূল্যে লউন

আধুনিক প্রতিটি গৃহসজ্জায় আবশ্যকীয় নানাবিধ বিলাস সামগ্রী। বিশদ বিবরণের জন্য লিখুন:

PROFIT CIRCLE (WBC)
P. Box 1430, Delhi—6.

আভেরী ব্রাণ্ডেজ সাংবাদিকদের কাছে আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটির সিদ্ধান্ত ঘোষণা করছেন

রাষ্ট্রসংঘ :

চার মাস বন্ধ থাকার পর আবার রাষ্ট্রসংঘ সাধারণ পরিষদের অধিবেশন সুরু হয়েছে গত ২৪শে এপ্রিল থেকে।

আফ্রো-এশীয় সদস্যদের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে, প্রথমেই দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকার বিষয়ে আলোচনা করতে হবে। এই প্রাক্তন জার্মান উপনিবেশটি প্রাক্তন জাতিসংঘের (লীগ অব নেশনস) ম্যাণ্ডেট-শাসিত অঞ্চলরূপে দক্ষিণ আফ্রিকার নিয়ন্ত্রণাধীনে ছিল। পরে যখন জাতিসংঘের উত্তরাধিকারী রূপে রাষ্ট্রসংঘ সিদ্ধান্ত করে যে, এই অঞ্চলটি রাষ্ট্রসংঘের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণে আসবে, তখন দক্ষিণ আফ্রিকা দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকার ওপর রাষ্ট্রসংঘের কর্তৃত্বের দাবি অস্বীকার করে, এবং এলাকাটিকে পুরোপুরি নিজে গ্রাস করার চেষ্টা করে। বলা বাহুল্য, দীর্ঘকাল ধরেই এই অঞ্চলে দক্ষিণ আফ্রিকা তার বর্ণবৈষম্য নীতি অনুসরণ করে আসছে। শেষ পর্যন্ত রাষ্ট্রসংঘ সিদ্ধান্ত করে, তারা দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকার কর্তৃত্ব নিজেরা গ্রহণ করবে। সেই মত এই মাসের গোড়ার দিকে রাষ্ট্রসংঘের কর্মচারীরা দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকায় যাবার চেষ্টা করে। কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকা তাদের এই এলাকার মধ্যে প্রবেশ করতে দেয় নি।

এর পর কি হবে? উত্তেজিত আফ্রো-এশীয় রাষ্ট্রসমূহ এ ব্যাপারে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছে। প্রয়োজন হলে, সামরিক শক্তির সাহায্যে দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকাকে দক্ষিণ আফ্রিকার বে-আইনী দখলের হাত থেকে উদ্ধার করতে হবে।

শেষ পর্যন্ত ঠিক হয়েছে, এবার রাষ্ট্রসংঘ সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে প্রথমে দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকার বিষয়ে আলোচনা হবে। তারপর অন্য সব কথা।

রাষ্ট্রসংঘ সাধারণ পরিষদের প্রধান রাজনৈতিক কমিটিতে অন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা সুরু হয়েছে। পরমাণু অস্ত্রের প্রসার বন্ধ করার জন্য প্রস্তাবিত খসড়া চুক্তির ওপর এই আলোচনা চলছে। গত মাসে জেনেভায় নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনে এই প্রস্তাবের খসড়া রচনা করা হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েট ইউনিয়ন, ব্রিটেন প্রভৃতি এই প্রস্তাবের সমর্থক। কিন্তু জেনেভা সম্মেলনে উপস্থিত ভারত, জাপান, ইতালী, পশ্চিম জার্মানী, ব্রেজিল প্রভৃতি এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করেছে। বিশ্বের অন্যতম পরমাণুশক্তিধর রাষ্ট্র ফ্রান্স ও চীন পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছে, এইরূপ কোন চুক্তিতে তারা স্বাক্ষর করবে না।

পরমাণু অস্ত্রের প্রসার যাতে আর না হয়, তার জন্যই এই চুক্তির প্রস্তাব এসেছে। কিন্তু মজা হল, যাদের হাতে বর্তমানে পরমাণু অস্ত্র রয়েছে তারা নিজেদের দখলে এই সব অস্ত্র রাখতে পারবে, কেবল নতুন কোন রাষ্ট্র এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করার পর নতুন করে আর পরমাণু অস্ত্র প্রস্তুত করতে পারবে না।

ভারত এই চুক্তিকে বৈষম্যমূলক বলে ঘোষণা করেছে। ভারত শান্তির নীতিতে বিশ্বাসী। এখন পর্যন্ত সে পরমাণু অস্ত্র তৈরি করে নি। কিন্তু ভবিষ্যতে প্রয়োজন হলে নিশ্চয়ই করবে। হয় সকলে তাদের পরমাণু অস্ত্র নষ্ট করে ফেলুক ও ভবিষ্যতে আর কোন অস্ত্র তৈরি করবে না বলে সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করুক, আর না হয় সকলেরই অধিকার থাকবে এই অস্ত্র তৈরি করার।

আরও উল্লেখযোগ্য, এই ব্যাপারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েট ইউনিয়ন, উভয়ের মধ্যে সম্পূর্ণ মতৈক্য রয়েছে। রাজনৈতিক কমিটিতে মার্কিন প্রতিনিধি গোল্ডবার্গ ও সোভিয়েট প্রতিনিধি

কুজনেৎসভের বক্তব্যের মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য নেই। সোভিয়েট ইউনিয়ন চেষ্টা করেছে যাতে ভারত এই চুক্তির প্রস্তাবকে সমর্থন করে। কিন্তু ভারত সরকার তাতে রাজী হয় নি।

সুইজারল্যান্ড ঃ

সংবাদটি খেলাধুলার জগতের হলেও আন্তর্জাতিক রাজনীতির সঙ্গে বিষয়টি ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন, আগামী মেক্সিকো অলিম্পিকে দক্ষিণ আফ্রিকাকে যোগ দিতে দেওয়া হবে না।

লসেনে অনুষ্ঠিত অলিম্পিক কমিটির নয় সদস্য বিশিষ্ট কার্যনির্বাহক পরিষদের সভায় দক্ষিণ আফ্রিকাকে বাদ দেবার সুপারিশ-প্রস্তাব গৃহীত হয়, এবং আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটির ৬১ জন সদস্যের মধ্যে ৩৬ জন এই প্রস্তাব সমর্থন করেন। এর আগে গ্রেনোবলে তিন ভোটের ব্যবধানে দক্ষিণ আফ্রিকাকে গ্রহণ করার পক্ষে যে প্রস্তাব নেয়া হয়েছিল, লসেন সিদ্ধান্তের ফলে তা বাতিল হল।

দক্ষিণ আফ্রিকার অনুসৃত বর্ণ-বৈষম্য নীতির প্রতিবাদস্বরূপ এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। তবে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছে। শ্বেতাঙ্গ রাষ্ট্রগুলির প্রাধান্য-মণ্ডিত অলিম্পিক কমিটি সহজে এই প্রস্তাব গ্রহণ করতে চান নি। কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকা থাকলে এবারের অলিম্পিক একেবারে বানচাল হবে, এমন আশঙ্কা দেখা দেয়। দক্ষিণ আফ্রিকা অলিম্পিকে যোগ দিলে নাইজেরিয়া, কেনিয়া প্রভৃতি বহু আফ্রিকীয় রাষ্ট্র অলিম্পিক বয়কট করবে বলে ঘোষণা করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিশিষ্ট নিগ্রো অ্যাথলিটরা যাঁরা অনেকগুলি স্বর্ণপদক লাভ করেছেন, তাঁরাও অলিম্পিকে যোগ দেবেন না বলে জানান। সোভিয়েট ইউনিয়ন, ভারত প্রভৃতি রাষ্ট্রও মেক্সিকোতে যাবে না, এমন কথা শোনা যায়। তা ছাড়া, দক্ষিণ আফ্রিকার ক্রীড়াবিদদের বিরুদ্ধে মেক্সিকোয় বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হবে। গুরুতর দাঙ্গাহাঙ্গামাও সুরু হয়ে যেতে পারে। এই সব দেখে শুনেই শেষ পর্যন্ত অলিম্পিক কমিটি বর্তমান সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটির সভাপতি আশী বৎসর বয়স্ক আভেরী ব্রান্ডেজ কিন্তু এই সিদ্ধান্তে খুশি হতে পারেন নি। তাঁর মতে এর দ্বারা খেলাধুলার ক্ষেত্রে রাজনীতি আমদানী করা হচ্ছে। কিন্তু ব্যাপারটি রাজনীতির নয়, এটি মানবিক অধিকারের বিষয়। বর্ণ-বৈষম্য আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত মানবিক অধিকারের বিরোধী। আর আন্তর্জাতিক ক্রীড়ানুষ্ঠানের ভিত্তিই হল মানবিক অধিকার। আন্তর্জাতিক মৈত্রী ও বন্ধুত্ব খেলাধুলার মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠে। দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবৈষম্য এই মৈত্রীর পথে এক মস্ত বাধা। তাই অলিম্পিক অনুষ্ঠান থেকে দক্ষিণ আফ্রিকার বহিষ্কারের দ্বারা আন্তর্জাতিক ক্রীড়ানুষ্ঠান, মানবিক অধিকার ও মৈত্রীর আদর্শেরই জয় সূচিত হয়েছে।

পশ্চিম জার্মানী ঃ

জনপ্রিয় বামপন্থী ছাত্র নেতা রুডি ডুটশকেকে হত্যার চেষ্টার প্রতিবাদে ছাত্ররা সারা পশ্চিম জার্মানী জুড়ে যে দক্ষযজ্ঞ সুরু করে, এখন তা থামলেও কিসিঙ্গার সরকার বামপন্থী ছাত্রদের আন্দোলন সম্পর্কে রীতিমত চিন্তিত হয়ে পড়েছেন।

রুডি ডুটশকের 'সোস্যালিস্ট স্টুডেন্টস লীগ' বা সংক্ষেপে এস-ডি-এস পশ্চিম জার্মানীর শক্তিশালী ছাত্র সংগঠন। মাত্র আড়াই হাজার ছাত্র এদের সক্রিয় সদস্য হলেও, এবার বন, পশ্চিম বার্লিন, ফ্র্যাঙ্কফুর্ট প্রভৃতি শহরের বিক্ষোভে এগারো হাজারের বেশি ছাত্র অংশ গ্রহণ করেছে। দেশের মোট তিন লক্ষ ছাত্রের মধ্যে অর্ধেকের বেশিই এদের সমর্থক।

রুডিকে অনেকে কমিউনিস্ট বলে মনে করে। কিন্তু রুডি বা তাঁর সংগঠনকে কোন মতেই কমিউনিস্ট বলা যায় না। এরা পশ্চিম জার্মানীর কমিউনিস্ট পার্টির বিরোধী। এদের চিন্তাধারার মধ্যে যুগোস্লাভিয়া ও চীনের অনুসৃত নীতির এক অদ্ভুত সংমিশ্রণ দেখা যায়। তবে এরা প্রগতিশীল। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও দেশীয় পুঁজিপতি গোষ্ঠীর এরা বিরোধী। এক-চেটিয়া সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠান 'স্প্রিংগার'-এর বিরুদ্ধে এস-ডি-এস বর্তমানে আন্দোলন চালাচ্ছে।

ডিয়েট্রিচ উলফ এস-ডি-এসের সভাপতি এবং পশ্চিম জার্মানীর সহকারী প্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী উইলী ব্র্যান্ডের পুত্র পিটার ব্র্যান্ড এই সংগঠনের অন্যতম নেতা।

রুডি ডুটশকের নেতৃত্বে ছাত্ররা প্রগতিশীল সংগ্রামী আন্দোলনে অংশ নেবার ফলে জার্মানীর প্রাক্তন নাৎসী ও চরম দক্ষিণপন্থীরা বেশ সতর্ক হয়ে উঠেছে। ডুটশকের আততায়ী জোশেফ বাচম্যান প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছে, সে কমিউনিস্টদের সহ্য করতে পারে না, তাই ডুটশকেকে হত্যার চেষ্টা করেছে।

অ্যাডলফ ভন থ্যাডেনের নেতৃত্বে 'ন্যাশনাল ডেমোক্রাটিক পার্টি'র মধ্যে প্রাক্তন নাৎসীরা সঙ্ঘবদ্ধ হচ্ছে। শেষ পর্যন্ত পশ্চিম জার্মানীতে রুডিপন্থী ছাত্রদের সঙ্গে এই নাৎসীদের বড় রকমের কোন সংঘর্ষ সুরু হবে কি না, সে কথাই অনেকে ভেবে চিন্তিত বোধ করছেন।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ঃ

অবশেষে উপ-রাষ্ট্রপতি হুবার্ট হোরেসিয়ো হামফ্রে আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করেছেন, তিনি আগামী নির্বাচনে রাষ্ট্রপতি পদের জন্য ডেমোক্রাটিক পার্টির মনোনয়ন প্রার্থী হবেন।

লিন্ডন বি জনসন যেদিন জানিয়েছিলেন যে, তিনি পুনরায় রাষ্ট্রপতি পদের জন্য দাঁড়াবেন না, সেদিন থেকেই মোটামুটি জানা ছিল যে, জনসন না দাঁড়ালে হামফ্রে দাঁড়াবেন, এবং তিনি জনসনের সমর্থন পাবেন।

ইতিমধ্যেই হামফ্রে ডেমোক্রাটিক পার্টির বিশিষ্ট নেতাদের সমর্থন লাভ করেছেন, তাঁদের মধ্যে বিভিন্ন রাজ্যের গভর্নর, সেনেটার ও মেয়ররা আছেন। সম্ভবত লুসিয়ানার গভর্নর জন ম্যাককিথেন উপ-রাষ্ট্রপতি পদের জন্য হামফ্রের জুটী হবেন। প্রভাবশালী ব্যবসায়ী গোষ্ঠী ও শ্রমিক সঙ্ঘের সমর্থনও হামফ্রের দিকে। হামফ্রের প্রার্থীপদের জন্য কাজ করার উদ্দেশ্যে সেনেট-সদস্য ফ্রেড হ্যারিসের নেতৃত্বে 'ইউনাইটেড ডেমোক্রাটস ফর হামফ্রে' নামে কমিটি গঠিত হয়েছে, প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি হ্যারি ট্রুম্যান এই কমিটির অবৈতনিক সভাপতি।

এখন ডেমোক্রাটিক পার্টির মনোনয়নের জন্য তিন জন প্রধান প্রার্থী হলেন। এঁরা হচ্ছেন ঃ হুবার্ট হামফ্রে, রবার্ট কেনেডী ও ইউজিন ম্যাকার্থি। হামফ্রের পক্ষে কেনেডী ও ম্যাকার্থিকে হারিয়ে মনোনয়ন লাভ করা সম্ভব হবে কি না, এখনই সে কথা জোর করে বলা শক্ত। তবে এক দল পর্যবেক্ষক বলছেন, শেষ পর্যন্ত হামফ্রেই জয়ী হবেন।

অবক্তব্য

চন্দ্রগুপ্ত

রাজনীতি ও ছাত্রসমাজ

সেদিন কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের মুখপত্র 'ভারসিটি'-র একটি সংখ্যা পড়ছিলাম। পত্রিকাটির এক জায়গায় দেখলাম; নবনির্বাচিত সম্পাদক পোর্ল গেলিং তাঁর লক্ষ্য সম্পর্কে বলেছেন, 'ভারসিটি'কে তিনি সম্পূর্ণ রাজনীতি মুক্ত বা রাজনীতি-বিমুখ ('অ্যাপোলিটিক্যাল') রাখবেন।' পোর্ল আরও বলেছেন, তাঁর সম্পাদিত পত্রিকাতে যেমন বামপন্থী মতবাদ প্রকাশিত হবে না, তেমনই তাঁর নিজস্ব দক্ষিণপন্থী চিন্তাধারা তাঁর বন্ধুদের স্বাধীন মতামত প্রকাশে বিন্দুমাত্র অন্তরায় হবে না। মুখে শিশুসুলভ স্নিগ্ধতা, মেজাজে-চরিত্রে গম্ভীর পোর্ল বলেছেন, 'ভারসিটি'কে তিনি উপভোগ্য পত্রিকারূপে প্রকাশ করবার চেষ্টা করবেন; কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের লঘুগুরু নানা জাতীয় খবর পরিবেশনই হবে তাঁর সম্পাদিত পত্রিকার আদর্শ।

পত্রিকাটির অন্যত্র একটি খবরে দেখলাম, সাধারণভাবে ব্রিটিশ ছাত্ররা এখন তাঁদের বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্যা নিয়ে ভাবতে শুরু করেছেন এবং বিভিন্ন ছাত্র-প্রতিনিধিদের সুচিন্তিত মতামতে ওখানকার 'ইউনিভার্সিটি গ্রান্টস কমিটি' এবং সরকার বিশেষ লাভবান হয়েছেন। যুক্তরাজ্যের শিক্ষানীতি রচনাতে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রপ্রতিনিধিরা তাই এখন গুরুত্বপূর্ণ অংশ নিচ্ছেন। আর এই ভাবেই ব্রিটিশ ছাত্রসমাজ জাতীয় শিক্ষা তথা জাতীয় জীবনের মানোন্নয়নে যে-শ্রম ও চিন্তা নিয়োগ করছেন নিঃসন্দেহেই তা আমাদের ছাত্রদের প্রেরণা ও আদর্শ হতে পারে।

*

ছাত্রদের রাজনীতি করা উচিত কি উচিত নয় এই বিতর্কমূলক প্রশ্নের চুলচেরা বিশ্লেষণের চেষ্টা না ক'রে একটি সহজবুদ্ধি কথা বলি : ছাত্রদের প্রাথমিক লক্ষ্য ও কর্তব্য অধ্যয়ন এবং কর্মময় ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য আত্মপ্রস্তুতি। আরও সহজভাবে, বিনা কারণে নিজের আখের নষ্ট করা নিবুদ্ধিতারই নামান্তর। ছাত্রজীবনে রাজনৈতিক নেতাদের দ্বারা উত্তেজিত উদ্বেলিত ছাত্ররা শিক্ষাজীবন সমাপ্তির পর যে-বাস্তবের মুখোমুখী হন, তা বড় রুক্ষ বড়ই কর্কশ। আর সেই বাস্তব জগতে এককালের প্রিয় রাজনৈতিক দাদারা বড়, নির্মমভাবে অনুপস্থিত। ছাত্রশক্তি রাজনীতিজীবীর মূলধন। ছাত্রশক্তির ব্যবহারে কোন বিশেষ রাজনৈতিক মতাদর্শ যদি সার্থক প্রচারে-প্রসারে লাভবান হতো, তাহলেও সান্ত্বনা পাওয়া যেত, কিন্তু গুটিকয় সুবিধাবাদী রাজনৈতিক নেতা বা অভিনেতার ব্যক্তিগত সমৃদ্ধিতে ছাত্রশক্তির অপচয় অত্যন্ত দুঃসহ। অন্তত সাম্প্রতিক ভারতবর্ষে ছাত্রশক্তির অপচয় যে-কোন সৎ ও শুভবুদ্ধিসম্পন্ন ভারতীয়ের দুশ্চিন্তা ও উদ্বেগের কারণ।

আমাদের ছাত্রদের সরাসরি প্রশ্ন করি : রাজনীতিতে মগ্ন হবার আগে তাঁরা সাম্প্রতিক রাজনৈতিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে দেখেছেন কি? তাঁদের চাইতে বয়সে ও জ্ঞান-বুদ্ধিতে (?) বড় নেতারা তাঁদের সামনে এমন কি ধ্রুব আদর্শ এমন কি উজ্জ্বল ভবিষ্যতের চিত্র মেলে ধরছেন যার জন্য তাঁরা তাঁদের আখের খুইয়ে স্বচ্ছসুখী দিনগুলিকে নষ্ট করতে যাচ্ছেন?" সাধারণভাবে বলতে গেলে, আমাদের রাজনৈতিক মতাদর্শ কথার ফানুস, আমাদের রাজনৈতিক নেতারা জলের 'আলপনা'। সকাল-বিকাল দল পালটানো পারস্পরিক কুৎসাপ্রচার দুর্নীতিকে জীবনের নীতিরূপে গ্রহণ ইত্যাদি ভারতীয় রাজনৈতিক জীবনকে এমনই পঙ্গু করে ফেলেছে যে, রাজনৈতিক নেতাদের কথায় ছাত্রদের বিন্দুমাত্র কর্ণপাত আজ সম্পূর্ণ অর্থহীন। এমন দু-চারজন নেতা আছেন, যাঁরা আমার আপনার ছেলেকে রাজনীতিতে নিযুক্ত করে নিজের কাজ হাসিল করছেন, অথচ নিজের ছেলেকে রাজনীতির উত্তাপ থেকে শত হস্ত দূরে রেখে উচ্চতর শিক্ষার জন্য অক্সফোর্ড কেম্ব্রিজে পাঠাচ্ছেন। আবার এমন আদর্শনিষ্ঠ শ্রদ্ধেয় নেতাও আছেন যাঁরা একক অথবা দলগতভাবে তাঁদের রাজনৈতিক মতবাদের প্রতিষ্ঠার জন্য নিত্য সংগ্রামে নিরত। এবং এমনই আশ্চর্য, তাঁরা কখনও নিজেদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য

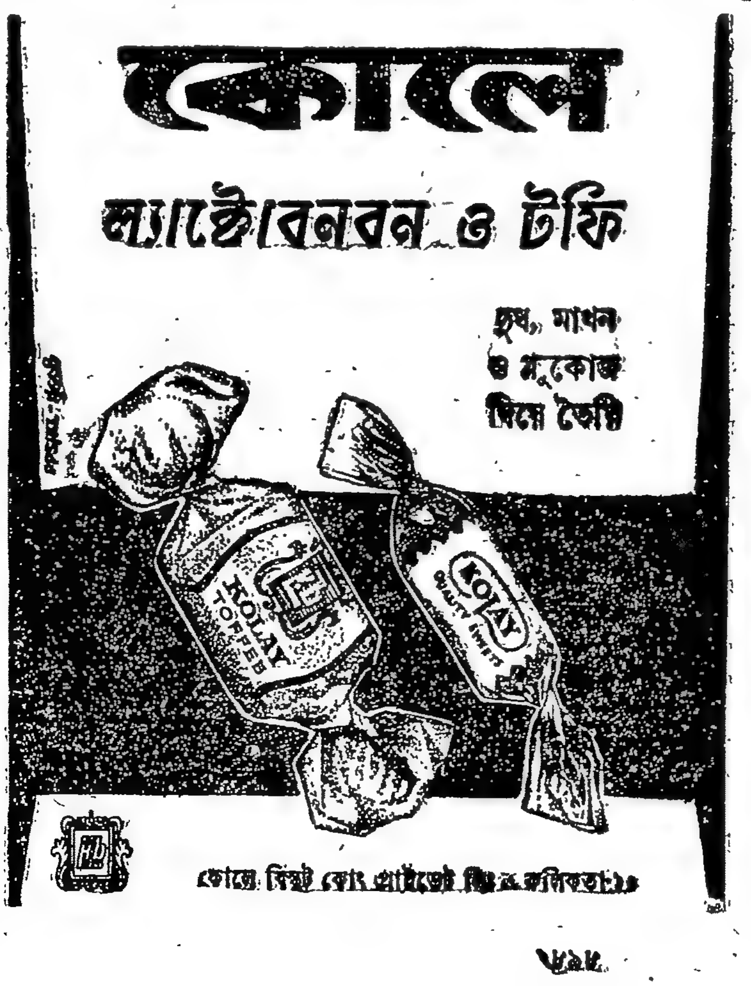

ছাত্রদের শরণাপন্ন হন না, বরং তাঁরা স্বীয় ব্রত অর্থাৎ লেখাপড়া করার জন্য ছাত্রদের অনুরোধ করে থাকেন।

*

পেটে খেলে পিঠে সয়। রাজনীতি করে নিজেদের কোন লাভ কিংবা সামগ্রিকভাবে দেশের মঙ্গল হলে ছাত্রদের রাজনীতি-চর্চা সার্থক হতো। ভারতবর্ষের বর্তমান অস্থির আদর্শহীন রাজনীতি থেকে ছাত্রদের দূরে থাকাই বাঞ্ছনীয়। ছাত্রজীবনে যথার্থ শিক্ষা গ্রহণ করে স্বীয় ব্যক্তিত্বকে গড়ে তোলার পর তাঁরা যদি রাজনীতিতে অবতীর্ণ হন তবে দেশের রাজনৈতিক স্বাস্থ্য ফিরে আসবে এবং সামগ্রিকভাবে দেশের মঙ্গল সম্ভব হবে।

ছাত্রজীবনে পড়াশোনা ছাড়া আর কি করা সম্ভব? সোভিয়েট দেশে ছাত্ররা অবসর সময়ে দলবদ্ধভাবে বিবিধ কল্যাণমূলক কাজ করে থাকে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, সোভিয়েট ছাত্ররা অবসর সময়ে Komsomol-এর নেতৃত্বে মধ্য এশিয়ার পতিত জমিতে আবাদ বা অনুর্বর জমিকে উর্বর করার মতো কাজে আত্মনিয়োগ করে। শিল্প সাহিত্যের চর্চাও ছাত্রদের পক্ষে অবসর যাপনের অন্যতম সুস্থ উপায়। কেম্ব্রিজের 'ভার্সিটি' পত্রিকার আলোচ্য সংখ্যাতে দেখলাম, (মার্চ ৯, ১৯৬৮) সেখানে বর্তমানে ছাত্ররা একটি 'বিশ্ববিদ্যালয় স্টুডিও' স্থাপনে আগ্রহী। পত্রিকাটির সম্পাদকীয়তে স্টুডিও স্থাপনের উপর গুরুত্ব আরোপ করে বলা হয়েছে, চিত্র ভাস্কর্য ইত্যাদি শিল্পকলায় আগ্রহী ছাত্রছাত্রীরা এই ধরণের স্টুডিওতে শিল্পচর্চার মাধ্যমে আত্মপ্রকাশের পথ খুঁজে পাবেন। অন্যান্য প্রাগ্রসর দেশে খেলাধুলা ব্যায়াম ও অন্যান্য আরও নানাবিধ উপায়ে ছাত্রছাত্রীরা নিজেদের ব্যক্তিত্ব গড়ে তোলার জন্য যে আগ্রহ দেখান, আমাদের ছাত্রছাত্রীদের সেদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করি।

জানি, ভারতবর্ষ অনুন্নত দেশ, ভারতবর্ষের হাজার সমস্যা। সাধারণ শিক্ষা, উচ্চতর শিক্ষা তো বটেই, এ দেশে ব্যয়সাধ্য বা বিলাসবহুল ব্যাপার। ভারতবর্ষের মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত ছাত্রছাত্রীরা যেভাবে পড়াশোনা করে নিজেদের গড়ে তোলার চেষ্টা করেন, অন্যান্য দেশের ছাত্রছাত্রীদের তা সশ্রদ্ধ বিস্ময়। শ্রদ্ধাযোগ্য সাধারণ ভারতীয় ছাত্রছাত্রীদের কাছে এইজন্যই চন্দ্রগুপ্তের অনুরোধ, অকারণ রাজনীতি চর্চায় কালক্ষেপ ও শক্তিক্ষয় না করে তাঁরা নিজেদের গড়ে তুলুন, ভবিষ্যতে দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে অংশ নেবার মতো সামর্থ্য সঞ্চয় করুন। ভারতীয় ইতিহাসের যে পর্বে ছাত্ররা রাজনীতিতে অংশ নিয়েছিল, সেদিন ভারতবর্ষ ছিল পরপদানত, সেদিনের রাজনীতিতে ছাত্রদের অংশগ্রহণ ছিল অনেকটা অনিবার্য। আজ স্বাধীন ভারতবর্ষে রাজনীতিতে অংশগ্রহণ অনিবার্য নয়, ইচ্ছামূলক। ছাত্ররা রাজনীতিতে অংশ নিয়ে যদি রাজনৈতিক আবহাওয়ার পরিবর্তন ঘটাতে পারতেন, তাহলে বলার কিছু ছিল না। কিন্তু সাংসারিক বুদ্ধিতে অপরিণত আবেগপ্রবণ ছাত্রছাত্রীদের পক্ষে স্বার্থসন্ধী ধূর্ত রাজনীতিজীবীদের মোকাবিলা করা সম্ভব নয়, অন্যপক্ষে তাঁরা আকস্মিকভাবে এক সময় আবিষ্কার করেন, তাঁরা এতদিন ধূর্ত পরার্থে নিজেদের শক্তিক্ষয় করে এসেছেন।

ছাত্রজীবন জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ সময়। এই সময়ের উপভোগ ও সদ্ব্যবহারই যদি ছাত্রছাত্রীদের লক্ষ্য হয়—লক্ষ্য নিশ্চয়ই—তবে ছাত্রছাত্রীদের রাজনীতি চর্চার চাইতে আত্মচর্চাই বাঞ্ছনীয়। রাজনীতি কোনো ছাত্রের প্রিয় হলে তাঁর উচিত, প্রত্যক্ষ রাজনীতি না করে রাজনীতি-শাস্ত্র গভীরভাবে অধ্যয়ন। মার্ক্সবাদ কি সেটা ভালো করে না জেনে প্রত্যক্ষ মার্ক্সবাদী রাজনীতি কি করে সম্ভব তা কিছুতেই বুঝে উঠতে পারি না। আমাদের বহু মার্ক্সবাদী ছাত্রছাত্রী যে মার্ক্সবাদের অ-আ-ক-খও জানেন না, এ কথা শিক্ষকবন্ধুদের কাছে শুনেছি। অতএব ছাত্রজীবন যতদূর সম্ভব অধ্যয়নেই সংলগ্ন হওয়া উচিত। অন্যভাবে ভবিষ্যৎ জীবনের পাথেয় সঞ্চয়েই ছাত্রজীবন ব্যয়িত হওয়া উচিত বলে চন্দ্রগুপ্তের বিনীত ধারণা।

*

এক-এক সময় ভাবি: আমাদের ছাত্রছাত্রীরা এত বিষয়ে মাথা ঘামান, অথচ নিজেদের সম্পর্কে এতটুকু চিন্তিত নন কেন? আত্মবিস্মৃতভাবে বিশ্বচিন্তা—এও কি ভারতীয় সভ্যতার বৈশিষ্ট্য? খুব কম ছাত্রসংঘকেই নিজেদের সমস্যা সমাধানে তৎপর হতে দেখেছি। কটি ছাত্রসংঘ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনার আবহাওয়াকে ভালো করে তোলার জন্য প্রয়াসী? ক'জন ছাত্র সমবেতভাবে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে তাঁদের অধ্যয়ন অধ্যাপনা সংক্রান্ত দাবি-দাওয়া জানান? গ্রন্থাগার থেকে বই চুরি যাওয়া বা বইর পাতা কাটার মতো দুর্ঘটনা রোধ করতে ক'জন ছাত্র এগিয়ে এসেছেন? সোভিয়েট রাশিয়ার শাসনব্যবস্থায় মুগ্ধ ভারতীয় ছাত্রছাত্রীদের ক'জন দলবদ্ধভাবে অবসর সময়ে পতিত জমি উদ্ধারে আত্মনিয়োগ করেন বা করেছেন? কারণ যাই হোক, এক ধরনের লক্ষ্যহীনতা ও বিশৃঙ্খলতা আমাদের ছাত্রজগৎকেও সংক্রমিত করেছে। ছাত্রজগৎকে এই দুরবস্থা থেকে উদ্ধার করার জন্য অ্যাপোলিটিক্যাল বড়দের এগিয়ে আসতে হবে, এবং সেই সঙ্গে ছাত্রছাত্রীদেরও আত্মসচেতন হতে হবে।

'ভার্সিটি'র সামান্য দৃষ্টান্ত দিয়েই বলি: কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা তাঁদের সমস্যা অভাব অভিযোগ যেভাবে 'ভার্সিটি'র মাধ্যমে কর্তৃপক্ষের কাছে পৌঁছে দেন, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা কি অনুরূপ কোন মুখপত্রের মাধ্যমে কর্তৃপক্ষকে সচেতন ও সহযোগী করে তুলতে পারেন না? কেম্ব্রিজের ও অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা ছাত্রজীবনের আনন্দ-উত্তেজনাকে বরবাদ করে প্রত্যক্ষ রাজনীতির মরীচিকার পেছনে ধাবিত হন না, ধাবিত হতে রাজী নন, 'ভার্সিটি' ও অন্যান্য ছাত্রসংঘের মুখপত্র পাঠ করলেই তা বোঝা যাবে। যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র সোভিয়েট প্রভৃতি প্রাগ্রসর দেশের ছাত্রছাত্রীরা রাজনীতিতে সম্পূর্ণ নিস্পৃহ এ কথা সত্য নয়, অ্যাকাডেমিক ও প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক কারণে তাঁরা রাজনীতি-সচেতনতার প্রমাণও দেন, কিন্তু লক্ষ্যহীন নিরাদর্শ রাজনীতি ও রাজনীতিজীবীর স্বার্থে যে তাঁরা আত্মবিসর্জন দেন না, তার অসংখ্য প্রমাণ বারংবার পাওয়া গেছে! বিদেশী ছাত্রবন্ধুদের কাছ থেকে আমাদের ছাত্রছাত্রীরা কি কিছু শিখতে পারেন না? নিদেনপক্ষে আপাতত তারা 'ভার্সিটি'র মতো আদ্যন্ত ছাত্রসংঘের মুখপত্র প্রকাশ করে ছাত্রস্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখতে প্রয়াসী হতে পারেন না কি? নানা ব্যাপারে অগ্রণী কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ঐ ধরনের একটি আদ্যন্ত মাসিক বা দ্বিমাসিক ছাত্র-মুখপত্র প্রকাশ সম্ভব কি?

বি. সি. মাইতি এণ্ড কোং

—ইলেকট্রো প্লেটিং সামগ্রী—

নিকেল ভ্যাট ও ব্যারেল * ডাইনামো * পলিশিং মেসিন এবং প্লেটিং করিবার জন্য যাবতীয় সামগ্রীর আদি সরবরাহক।

শো রুম ঃ—৯৪, প্রেমচাঁদ বড়াল স্ট্রীট, কলি-১২। ফোন ঃ ৩৪-৩১৭৩

৩, রাধামোহন পাল লেন, কলি-১২ ঃ অফিস-ফোন—৩৪-৪৮৪৬

বিশ্বসাহিত্যের আদিপর্ব

ডঃ নরেন ভট্টাচার্য

॥ ৪২ ॥

ইটালীয় সাহিত্যের কথা

দান্তে পর্যন্ত ইটালীয় সাহিত্যের ইতিবৃত্ত আমরা পূর্ববর্তী প্রবন্ধে আলোচনা করেছি। সর্বদেশের সর্বকালের সাহিত্যের ইতিহাসে দান্তে একজন শ্রেষ্ঠ পুরুষ, যাঁকে এক হিসাবে ইটালীয় ভাষা ও সাহিত্যের জনক বলা যায়। আমরা পূর্ববর্তী প্রবন্ধে দেখেছি যে দান্তের পূর্বকালের ইটালীয় সাহিত্য বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষায় রচিত হয়েছে, এবং দান্তের যেটা সর্বাধিক কৃতিত্ব সেটা হচ্ছে সেই বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষাসমূহের মধ্যে একটিকে ইটালীর সকল অঞ্চলের মানুষের পক্ষে গ্রহণযোগ্য করে তোলা, বিশেষ করে এমন একটা সময়ে যখন ইটালীর রাষ্ট্রীয় ঐক্য বলতে কিছু নেই। সৌভাগ্যক্রমে দান্তের মৃত্যুর পর ইটালীর সাহিত্যের অগ্রগতি রুদ্ধ হয়ে যায় নি, বরং তার উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি ঘটেছে। পঞ্চদশ শতকে ইউরোপ মহাদেশে যে রেনেসাঁস যা চিন্তাবিপ্লবের সূচনা হয় ইটালী তার পুরোধা ছিল। সেই ভাব-আন্দোলনের ভিত্তিভূমি ইটালীতে গঠিত হয়েছিল সমগ্র চতুর্দশ শতক জুড়ে। শুধু সাহিত্যেই নয়, সাংস্কৃতিক জীবনের বহুক্ষেত্রেই ইটালীতে এমন কয়েকজন প্রতিভাবান মানুষের জন্ম হয়েছিল যাঁরা পুরাতন আমলের সমগ্র ভাবধারারই পরিবর্তন আনতে সমর্থ হয়েছিলেন। সাহিত্যক্ষেত্রে এরকম দুজন দিকপাল হচ্ছেন পেত্রার্ক ও বোকাচিও।

বোকাচিও

পুরো নাম গিওভান্নি বোকাচিও; জন্ম প্যারিসে ১৩১৩ খৃস্টাব্দে। পূর্বপুরুষের দেশ ছিল টাস্কানি। তাঁর বাল্যকাল কেটেছিল ফ্লোরেন্সে, যৌবনে নেপলসে কিছুদিন ব্যবসাবাণিজ্য শিখেছিলেন। তাঁর ব্যবসায়ী পিতার আশা ছিল যে, তিনি পিতার পেশাই অবলম্বন করবেন। কিন্তু বোকাচিও সাহিত্যকেই জীবিকা হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। দান্তের বিয়াত্রিচের মত বোকাচিওরও একজন মানসী ছিলেন, নাম ফিয়ামেত্তা। সাহিত্যিকের অনিশ্চিত জীবনে তাঁকে নানাবিধ দুঃখকষ্টের সম্মুখীন হতে হয়েছিল, বিশেষ করে অর্থকষ্ট তাঁর নিয়ত সঙ্গী ছিল।

বোকাচিওর রচনার সংখ্যা বহু গদ্য ও কবিতা উভয়বিধ রচনাতেই তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তাঁর প্রথম রচনা হচ্ছে একটি কাব্যগ্রন্থ **চাচ্চিয়া দি দিয়ানা** (Caccia di Diana)। কয়েকটি সুন্দরী রমণীর বর্ণনাই হচ্ছে এই কাব্য-গ্রন্থের বিষয়বস্তু। বোকাচিও এখানে যে ছন্দ ব্যবহার করেছেন তা Terza Rima নামে পরিচিত। তাঁর দ্বিতীয় গ্রন্থের নাম হচ্ছে **ফিলোকোলো** (Filocolo), রচনাকাল ১৩৩৬ খৃস্টাব্দ। গদ্যে লিখিত এই গ্রন্থটি পাঁচটি অধ্যায়ে বিভক্ত, বিষয়-বস্তু হচ্ছে ফ্লোরিও ও বিয়ানোফিওরের প্রেমকাহিনী। পশ্চিম ইউরোপে এই কাহিনীটি বিশেষ জনপ্রিয় ছিল, অপরাপর ভাষাতেও বিভিন্ন লেখকেরা নিজেদের মত করে এই কাহিনীটিকে লিখেছিলেন। পাঠক হয়ত ফ্লোরেন্স ও ব্লান্সেফ্লোরের কাহিনী স্মরণ করতে পারছেন, যা আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি ডাচ ও জার্মান সাহিত্য প্রসঙ্গে।

বোকাচিওর তৃতীয় রচনা হচ্ছে **ফিলোস্ট্রাটো** (Filostrato), রচনাকাল ১৩৩৮। Ottava Rima ছন্দে রচিত এই কবিতাটিতে ট্রোইলাস ও বিশ্বাস-ঘাতিনী ক্রেসিডার কথা বলা হয়েছে। ইংলন্ডের বিখ্যাত কবি চসার তাঁর ট্রোইলাস ও ক্রিসেইডি কাব্যের উপাদান এখান থেকেই সংগ্রহ করেছিলেন এবং পরবর্তীকালে শেক্সপীয়ারও এই কাহিনীটি ব্যবহার করেছিলেন। বোকাচিওর পরবর্তী কাব্যগ্রন্থ **তেসেইদা** (Teseida) এমিলিয়া নামক একটি নারীর জন্য দুই বন্ধু আর্টিকা ও পালমোনের দ্বন্দ্বের কাহিনী। এটি দ্বাদশটি সর্গে বিভক্ত একটি মহাকাব্য, রচনাকাল ১৩৪০-৪১। নেপলসে রচনার শুরু এবং ফ্লোরেন্সে শেষ। এটিও Ottava Rima ছন্দে রচিত। ১৩৪১ থেকে ১৩৪৫-এর মধ্যে তিনি আরও চারটি গ্রন্থ রচনা করেন, দুটি গদ্যগ্রন্থ এবং দুটি কাব্যগ্রন্থ, যেগুলির নাম **নিনফালে দামেতো** (Ninfale d'Ameto), **লামোরোসা ভিসিওনে** (L'Amorose Visione), **এলেজিয়া দিমাদোন্নে ফিয়ামেত্তা** (Elegia di Medonne Fiemmetta) এবং **নিনফালে ফিয়েসোলানো** (Ninfale Fiesolano).

১৩৫০ খৃস্টাব্দে তাঁর সঙ্গে বিখ্যাত ইটালীর লেখক পেত্রার্কের সাক্ষাৎকার হয়, যা তাঁর জীবনের একটি স্মরণীয় ঘটনা। এই সময় তিনি ল্যাটিন ভাষায় অনুরাগী হয়ে ওঠেন এবং ওই ভাষায় মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেন যেগুলির মধ্যে উল্লেখ-যোগ্য হচ্ছে দান্তের জীবনী, পেত্রার্কের জীবনী, বিখ্যাত মহিলাদের জীবনী-সংগ্রহ, সমকালীন ঘটনাপঞ্জী, প্রাচীন বিখ্যাত স্থানসমূহ ও একটি কোষগ্রন্থ। কিন্তু যে গ্রন্থটি বোকাচিওকে অমর করেছে তা হচ্ছে তাঁর বিখ্যাত **ডেকামেরন** বা দশদিনের কথা। গ্রন্থটির রচনাকাল ১৩৪৯-৫১। এতে আছে মোট একশোটি গল্প। প্রতিটি গল্পের শেষেই একটি করে গান আছে। **ডেকামেরনের** ভূমিকাটি নিম্নরূপঃ ফ্লোরেন্স শহরে প্লেগের প্রাদুর্ভাব হয়েছে। দলে দলে লোক এখানে ওখানে পালিয়ে যাচ্ছে। এই-রকম প্রাণভয়ে ভীত দশজন নরনারী, তিন-জন পুরুষ ও সাতজন স্ত্রীলোক, একটি গ্রামে এসে আশ্রয় নিয়েছে। অবসর বিনোদনের জন্য এরা প্রত্যেকে নিজেদের গল্প বলছে। এইভাবে এরা দশদিন ধরে

একশোটি গল্প বলবে। এক একদিন এক এক ধরণের গল্প, কোনদিন হাসির গল্প, কোনদিন এডভেঞ্চারের গল্প, কোনদিন প্রেমের গল্প, কোনদিন চালবাজির গল্প, এইরকম। বইটি দিন হিসাবে অধ্যায়ে বিন্যস্ত হয়েছে। ডেকামেরন বিশ্ব-সাহিত্যের একটি আশ্চর্য সৃষ্টি।

বোকাচিও মারা যান ১৩৭৫ খৃস্টাব্দের ২১শে ডিসেম্বর তারিখে।

পেত্রার্ক

পেত্রার্ক বোকাচিওর চেয়ে বয়সে বড় ছিলেন, তিনি জন্মেছিলেন আরেৎজো নামক স্থানে ১৩০৪ খৃস্টাব্দের ২০শে জুলাই তারিখে। তাঁর পুরো নাম ফ্রান্সিস্কো পেত্রার্ক। তাঁর পিতা রাজনৈতিক কারণে ফ্লোরেন্স থেকে নির্বাসিত হন এবং পরিবারটি ভাগ্যহত অবস্থায় প্রথমে পিসায়, পরে আভিগনন্যে এবং সর্বশেষে কার্পেন্দ্রায় বসতি স্থাপন করে। অল্প বয়সেই তিনি মাকে হারান। এই ঘটনা তাঁকে দারুণ ব্যথিত করেছিল এবং তাঁর সেই সময়কার মানসিক বেদনার কথা তাঁর সর্বপ্রথম রচনা ল্যাটিন ভাষায় এপিস্টোলে ম্যাট্রিকে কাব্যগ্রন্থে প্রকাশ পেয়েছে।

পিতার বিশেষ নির্দেশে পেত্রার্ক আইনশাস্ত্র অধ্যয়ন করতে শুরু করেন এবং কালক্রমে বিভিন্ন কূটনৈতিক পেশায় নিযুক্ত হন। ইটালীর বিভিন্ন রাজ্যে তিনি বারবার পরিভ্রমণ করেন। প্রথম জীবনে তিনি দারুণ নীতিবাদী ও ধর্মনিষ্ঠ ছিলেন, কিন্তু কালক্রমে তিনি জীবন সম্বন্ধে ধারণার পরিবর্তন সাধন করেন। এটি সম্ভবপর হয় একটি নারীর জন্য [illegible] একবার দেখেছিলেন। দান্তের বিয়াত্রিচে, বা বোকাচিওর ফিয়ামেত্তার মত লরাও পেত্রার্কের মানসী ছিলেন, যার অস্তিত্ব কেবল পেত্রার্কের রচনাতেই আছে।

পেত্রার্ক ছিলেন একাধারে কবি, মানবতন্ত্রী, ঐতিহাসিক, প্রত্নতত্ত্ববিদ এবং রাজনীতিক। এতগুলি ভিন্নধর্মী বিষয়ের আকর্ষণে তিনি কোনদিন স্থির হয়ে থাকতে পারেন নি, ছুটে বেড়িয়েছেন দেশ থেকে দেশান্তরে। রাজনীতিবিদ হিসাবে তিনি রোমে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য অনেক সংগ্রাম করেছিলেন, কিন্তু দান্তের মতই এক্ষেত্রে তাঁর স্বপ্ন আংশিকভাবে সফল হয়েছিল। তাঁর জীবনের একটি বড় কীর্তি হচ্ছে প্রাচীন রোমক লেখক কুইন্টালিয়নের রচনাবলী আবিষ্কার এবং বিখ্যাত রোমক মনীষী কিকেরোর অজস্র পত্রাবলী উদ্ধার। ১৩৫০ খৃস্টাব্দে বোকাচিওর সঙ্গে সাক্ষাতের পর উভয়ে উভয়কে গভীরভাবে আকর্ষণ করেছিলেন এবং পেত্রার্ক উপলব্ধি করেছিলেন যে, দেশকে সত্যই তাঁর কিছু দেবার আছে।

দুর্ভাগ্যক্রমে পেত্রার্কের অধিকাংশ রচনাই ল্যাটিনে রচিত। আমরা সেগুলির নাম ও যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় এখানে দিচ্ছি। এপিস্টোলে ম্যাট্রিকে (তাঁর মাতার মৃত্যুর পর রচিত কবিতাবলী; সপ্তমাত্রিক ছন্দে লিখিত তিনখণ্ডে বিভক্ত মোট ৬৬টি কবিতার সংকলন), আফ্রিকা (রচনাকাল ১৩৩৮-৪১; দ্বিতীয় পিউনিক যুদ্ধের কাহিনী অবলম্বনে রচিত মহাকাব্য), ডে ভিরিস ইলাসট্রিবাস (রচনাকাল ১৩৩৮-'৫৩; বিষয়বস্তু বিখ্যাত রোমকদের জীবনকথা), সেক্রেটাম মেনাম (রচনাকাল ১৩৪১-'৫৮; আত্মজীবনীমূলক রচনা), ডে ভিটা সোলিটারিয়া (রচনাকাল, ১৩৪৬; দার্শনিক রচনা; বিষয়বস্তু জীবনে নির্জনতা), ডে ওটিও রেলিজিওসো (রচনাকাল ১৩৪৭, সংশোধিত প্রকাশন ১৩৫৭, বিষয়বস্তু মঠজীবন), ফ্যামিলিয়ারিয়াম রেরাম লিব্রি (১৩৪৫-৬১; পত্রাবলী সংকলন), ডে রেমিডিস ইউট্রিয়াস্ক ফরচুনে (রচনাকাল ১৩৫৪-৬৬; দার্শনিক রচনা, যুক্তি, আনন্দ, বেদনা, আশা ইত্যাদির উপর আলোচনা), সেনিলাম রেরাম লিব্রি (পত্রাবলী), পস্টেরিটাটি (পত্রাবলী), ডে সুই ইপসিয়াস এট মাল্টোরাম ইগনোরেন্সিয়া (সাহিত্য সমালোচনা), ইত্যাদি।

মাতৃভাষায় পেত্রার্কের রচনার সংখ্যা কম, কিন্তু এখানেই তাঁর প্রতিভার চরম বিকাশ ঘটেছে এবং সেই প্রতিভা হচ্ছে কবিপ্রতিভা। ইটালীর ভাষায় তাঁর কবিতা সংকলনের নাম রেরাম ভালগারিয়াম ফ্রাগমেন্টা, নামটি অবশ্য ল্যাটিন। এতে আছে মোট ৩৬৬টি রচনা (৩১৭টি সনেট, ২৯টি সঙ্গীত, ৯টি ষষ্ঠপদী, ৭টি ব্যালাড এবং ৪টি মাদ্রিগাল)। তাঁর দ্বিতীয় গ্রন্থ হচ্ছে একস্ত্রাভাগান্তি, অর্থাৎ অবশিষ্ট কবিতাসমূহের সংকলন। তাঁর তৃতীয় গ্রন্থ হচ্ছে একটি দীর্ঘ কাব্য, নাম ত্রিয়োনফি, দান্তের ডিভিনা কমেডিয়া অনুসরণে তেরৎসা রিমা ছন্দে রচিত অসম্পূর্ণ রচনা। এই কাব্যের নায়িকা তাঁর মানসী লরা। পণ্ডিতদের মতে তাঁর মত প্রতিভাবানের দ্বারা রচিত হলেও কাব্যটি রসোত্তীর্ণ হতে পারে নি।

পেত্রার্ক মারা যান ১৩৭৪ খৃস্টাব্দের ১৮ই অথবা ১৯শে জুলাই তারিখে। শেষের প্রভাতে তাঁকে নিজ পাঠকক্ষে মৃত অবস্থায় দেখা যায়। তাঁর প্রিয় কবি ভার্জিলের রচনা তখন তাঁর হাতে ধরা ছিল।

চতুর্দশ শতকের অপরাপর রচনা

ইটালীয় সাহিত্যের আকাশ পেত্রার্ক ও বোকাচিও আচ্ছন্ন করে রাখলেও অপরাপর তারকার অভাব ছিল না। কিন্তু বৃহৎ জ্যোতিষ্কের প্রভায় তাঁদের আলো ঢাকা পড়ে গিয়েছিল। চতুর্দশ শতকের এইরকম দুজন প্রতিভাবান গীতিকবি ছিলেন। একজনের নাম সিয়েনিজ বিন্দো যিনি লিখেছিলেন চানৎসোন দিরোম (Canzone di Rome), অপরজন ছিলেন ফাৎসিও যাঁর রচিত গীতিকাব্যের নাম দিত্তামোন্দো। ফ্লোরেন্সের আন্তোনিও পুচ্চি (মৃত্যু ১৩৮৮) অপর একজন বিখ্যাত কবি ছিলেন, যিনি আত্মজীবনী অবলম্বনে অনেক সনেট এবং সিরভেন-তেসি ও সেন্তিলোকিও নামক দুটি কাব্য রচনা করেছিলেন। শেষোক্ত গ্রন্থটি গিওভানি ভিল্লানির ক্রণিকা গ্রন্থের কাব্যরূপ।

গল্প ও উপন্যাসের ক্ষেত্রেও ইটালীয় সাহিত্যে চতুর্দশ শতকে বিশেষ উন্নতির লক্ষণ দেখা যায়। সের গিওভান্নি ফিওরেন্তিও রচিত পেকোরোনে (Pecorone) এবং সাক্কেৎতি রচিত ত্রেসেন্তোনোভেলি (Trecentonovelle) দুটি উল্লেখযোগ্য গল্প সংকলন। উপন্যাসের ক্ষেত্রে সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য আন্দ্রেয়া দ্য বার্বারিনো (১৩৭০-১৪১১)। এঁর বিখ্যাত রচনা হচ্ছে গুয়েরে মেশিনো (Guérrin Meshino), স্তোরি নেরবোনেসি (Stori Nerbonesi) এবং রেয়ালি দি ফ্রান্সিয়া (Reali di Frencia)। এ ছাড়া অজ্ঞাতনামা লেখকদের রচিত নিম্নলিখিত উপন্যাসগুলিও উল্লেখযোগ্য—পুৎসেল্লা গাইয়া (Pulzella Gaie), বেল গেরার্দিনো (Bel Gherandino) দোন্না দেল ভিরগিউ (Donna del Virgiu) এবং লিয়োমব্রুনো (Liombruno)। এছাড়া পশ্চিম ইউরোপের জনপ্রিয় কাহিনীসমূহ, যেমন ফাত্তি দি সিজার, রোমা দেল্লোয়া ইত্যাদির ইটালীয় সংস্করণও চতুর্দশ শতকে প্রস্তুত হয়েছিল। ইটালীর স্থানীয় কথা ও কাহিনীসমূহের সংকলন করেছিলেন গুইদো দাপিসা ফিওর দিতালিয়া (Fiore d' Italia) নামক গ্রন্থে।

ইটালীয় ভাষায় চতুর্দশ শতকে ধর্মীয় সাহিত্যও বড় কম রচিত হয় নি। এগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ফান্সিউল্লেৎসা দি জেসু ক্রস্তো (Fanciullezze di Gesu Cristo), পাসিওন (Passione) ও জাকোবো পাসাভান্তির বক্তৃতাসমূহ। চতুর্দশ শতকে ইটালীতে কতিপয় ঐতিহাসিকেরও আবির্ভাব হয়েছিল যাঁদের

মধ্যে কোমপাজ্ঞনি, ভিল্লানি, আম্মিরাইওলি প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। এ'রা দু'-একটি জমিদার বা সামন্তবংশের ইতিহাস লিখেছিলেন।

পঞ্চদশ শতকের ইটালীয় সাহিত্য

১৪৫৩ সালকেই মোটামুটি রেনেসাঁসের সূচনা বলে ধরা হয় এবং ইতিহাসের ছাত্রমাত্রেই জানেন যে, রেনেসাঁস আন্দোলনের প্রথম জোয়ার ইটালীতেই ঘটেছিল। রেনেসাঁস কথাটির অর্থ পুনর্জাগরণ, ইউরোপের ক্ষেত্রে ক্লাসিকাল সংস্কৃতি, অর্থাৎ গ্রীক ও রোমক সংস্কৃতির পুনর্জাগরণ। সংস্কৃতি না বলে জীবনধারা বলাই ভাল। গ্রীস ও রোমের জীবনধারার মূল কথাটি ছিল ইহজীবনের প্রতি অনুরাগ এবং তাকেই সার্থক করার মধ্যে জীবনের সার্থকতা। পক্ষান্তরে পরবর্তী যুগের খৃস্টীয় জীবনধারার আদর্শ ছিল ভিন্ন, এখানে জীবনের সার্থকতা ইহকালে নয় পরকালে এবং তা একমাত্র সম্ভব ঈশ্বরের করুণার দ্বারা। অর্থাৎ এক কথায় খৃস্টীয় আদর্শ মোটামুটি জীবনবিমুখ, পরলোককেন্দ্রিক, হিন্দুদের মতই।

অবশ্য রেনেসাঁস আন্দোলন শুধুমাত্র হারিয়ে যাওয়া গ্রীক-রোমক ঐতিহ্যকে পুনঃপ্রতিষ্ঠ করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, আধুনিক যুগের সূত্রপাতও এরই ফলে হয়েছে। এরই ফলে পরবর্তীকালে ধর্মসংস্কার আন্দোলন, আঞ্চলিক ভাষা ও সাহিত্যের বিকাশ, নতুন দর্শন ও বিজ্ঞানের সৃষ্টি সম্ভবপর হয়েছিল। মূলত উদীয়মান বৈশ্যশক্তি এই আন্দোলনের পৃষ্ঠপোষক ছিল, যারা একান্তই জাগতিক বিষয়ের কারবারী এবং সেই হিসাবে জগৎ সম্পর্কে আরও প্রত্যক্ষ জ্ঞানের প্রয়োজন হয়েছিল।

এবারে আমাদের নিজেদের ব্যাপারে ফিরে আসা যাক। ইটালীতে পোগেও ব্রাচ্চিওলিনি এবং গিওভানি ওরিস্পা প্লেটো ও আরিস্টোটলের রচনাবলীর হারিয়ে-যাওয়া পাণ্ডুলিপিসমূহ আবিষ্কার করার পরেই, অপরাপর গ্রীক ও রোমক লেখকদের রচনাবলী আবিষ্কারের হিড়িক লেগে যায়। ইটালীতে ল্যাটিন ভাষার চর্চা একেই বেশি ছিল, দান্তে, বোকাচিও, পেত্রার্ক সকলেই ল্যাটিনে অল্পবিস্তর লিখেছিলেন। একে মা মনসা তায় ধুনোর গন্ধ, অতঃপর গ্রীক-রোমক ঐতিহ্যের পুনর্জাগরণ ঘটায় পণ্ডিত-অপণ্ডিত সকলেই মুক্তকচ্ছ হয়ে ল্যাটিন চর্চা শুরু করেন। তাই দেখি পঞ্চদশ শতকের ইটালীয় সাহিত্য মূলত ল্যাটিন সাহিত্যই।

কিন্তু ক্রিয়ার যেমন প্রতিক্রিয়া আছে, সেইরকম মাতৃভাষাকে রক্ষার জন্যও পাশাপাশি রীতিমত প্রচেষ্টা দেখা যায়। মাতৃভাষাকেই সকল ভাবধারা প্রচারের বাহন করতে হবে এই মর্মে একটা আন্দোলনও গড়ে ওঠে (এটা পঞ্চদশ শতকের ইটালীর কথা, বিশ শতকেও বাংলাদেশে এরকম কোন আন্দোলন হয় নি, পণ্ডিতেরা তাঁদের গবেষণার ফল এখনো ইংরাজীতেই প্রকাশ করেন)। ১৪৪১ খৃস্টাব্দে ফ্লোরেন্সে ইটালীয় ভাষার শ্রীবৃদ্ধিকল্পে একটি প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি হয় এবং সারতামে করোনারিও নামক প্রতিযোগিতারও ব্যবস্থা করা হয়, এবং ইটালীয় ভাষায় যে কোন ভাল রচনার জন্য পুরস্কার দেওয়ার রীতি প্রচলিত হয়।

পঞ্চদশ শতকের ইটালীয় সাহিত্যে দুজন কবি বিশেষ প্রতিষ্ঠা অর্জন করতে পেরেছিলেন। এ'দের মধ্যে একজন হলেন মাত্তেও মারিয়া বোবার্দো, যাঁর রচনার নাম অর্লান্দো ইন্নামোরাতো, রচনাকাল ১৪৭৬, প্রকাশকাল ১৪৮৩। অপরজন ছিলেন লুইগি পুলচি যাঁর গ্রন্থের নাম মোরগান্তে রচনাকাল ১৪৬০, প্রকাশকাল ১৪৮৬। দুই কাব্যই মহাকাব্যের ধরণে লেখা, বিষয়বস্তু হচ্ছে ক্যারোলিঙ্গীয় অর্থাৎ শার্লামানের যুগের কাহিনী। অথচ রচনা দুটির মধ্যে পার্থক্য মৌলিক। প্রথমটি ঘটনানির্ভর, বর্ণনাবহুল সাবেকী চালের; দ্বিতীয়টি ব্যাখ্যামূলক তুলনামূলকভাবে যা অনেকাংশে আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রতীক।

পঞ্চদশ শতকের অপরাপর রচনাবলীর মধ্যে এরপর উল্লেখযোগ্য পোলিৎসিয়ানোর স্তান্জে পের লা গিয়োস্ত্রা দী গিউলিয়ানো দে মেদিচির সম্মানে রচিত। এই রচনাটির বিষয়বস্তু পৌরাণিক কাহিনী, কিন্তু লেখক তাঁর পৃষ্ঠপোষকের জীবনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই এই গ্রন্থটি কিছুটা পদ্যে কিছুটা গদ্যে লিখেছিলেন। পরবর্তী উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হচ্ছে সান্নাৎসারোর আর্কাডিয়া; আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ যা অষ্টাদশ শতকেও জনপ্রিয় ছিল। পঞ্চদশ শতকের ইটালীয় গদ্যসাহিত্যের সর্বাপেক্ষা শক্তিমান লেখক ছিলেন আলবের্তি। এ'র রচিত চারটি গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া গেছে যেগুলির নাম যথাক্রমে : তেওগিনিও, দেল্লা ফামিগলিয়া, দেল্লা ত্রাংকুইলিতা দেল্লামিনো এবং দে ইকিয়ার্চিয়া। আলবের্তিই প্রথম ইটালীয় লেখক যাঁর রচনায় বাস্তবতা ও সমাজসচেতনতার পরিপূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায়। উপরিউক্ত চারটি গ্রন্থেরই বিষয়বস্তু প্রাচীন সাহিত্য থেকে গৃহীত এবং লেখকের সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব এই যে, বিভিন্ন পৌরাণিক চরিত্রের মাধ্যমেই তিনি তাঁর সমসাময়িক যুগের সমস্যাগুলিকে সুন্দরভাবে তুলে ধরতে সমর্থ হয়েছেন।

ষোড়শ শতক থেকেই আধুনিক ইটালীয় সাহিত্যের সূত্রপাত হয়।

অগ্নিযুগের একটি অধ্যায়

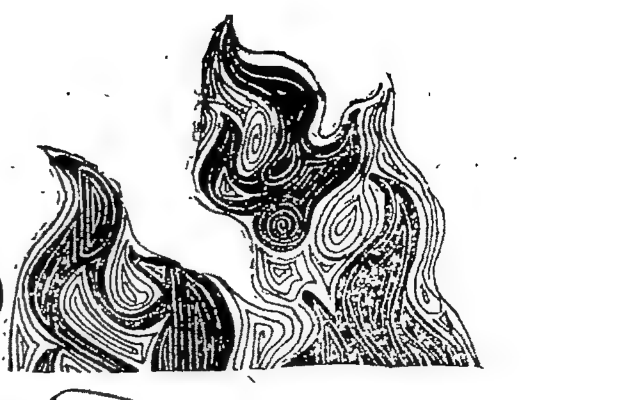

অনন্ত সিংহ

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

বিফল পরিকল্পনা

খাধাহাদুর আসানুল্লা হত্যার যথেচ্ছ প্রতিশোধ সরকার নিয়েছে। চট্টগ্রামের অবস্থা ভয়াবহ—চারিদিকেই থমথমে ভাব। সরকারের এই অমানুষিক অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য বিক্ষোভ অপেক্ষা এর প্রতিশোধস্পৃহা জনসাধারণের মনে তুষের আগুনের মতই নিরন্তর জ্বলছিল। জেলা-শাসকগোষ্ঠী, সাময়িক উত্তেজনা ও উন্মত্ততার ঝোঁকে নিজ ক্ষমতা লঙ্ঘন করে রাজ্য পালনের পরিবর্তে যে অরাজকতার সৃষ্টি করেছেন প্রতি মুহূর্তে তার অশুভ পরিণতির আশঙ্কাও যে তাঁদের মনে স্থান পেয়েছিল তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

চট্টগ্রাম শহরে কার্যত মিলিটারী শাসন চলছিল। সর্বত্রই অস্বাভাবিক অবস্থা। আমাদের মামলাও সাত দিনের জন্য মুলতুবি রাখা হয়েছে।

তিন মাসের তিক্ত অভিজ্ঞতার পর জেলা জজ জে, ইউনী (ট্রাইব্যুনালের সভাপতি) আমাদের বিচার জেল থেকে আবার চট্টগ্রাম আদালত ভবনে স্থানান্তরিত করেছিলেন। জজ সাহেবের সুবিধার্থেই এই ব্যবস্থা হয়েছিল। অনির্দিষ্টকাল মামলা চলার আশঙ্কায় জজ সাহেব জেলের সাময়িক আদালত ব্যবহারে নারাজ ছিলেন। আদালত ভবনের নিজ অফিসের সুবিধে ও আরাম জেলের এই অস্থায়ী বিচার কক্ষে পাওয়া সম্ভব ছিল না। অগত্যা আমাদের বিচার আদালত ভবনে হওয়াই সাব্যস্ত হল এবং এই ব্যবস্থায় পুলিশ ও মিলিটারীর দায়িত্ব বেড়ে গেল। প্রতিদিন আমাদের জেল থেকে আদালতে আনা এবং আবার জেলে ফিরিয়ে নেওয়া—এই কঠিন কাজের গুরু-দায়িত্ব বইতে হল পুলিশ কর্তৃপক্ষকে।

সাতদিন পর আবার বিচার শুরু হল আদালত ভবনে। আদালত ভবনে প্রবেশ করে মনে হল পুলিশ ও মিলিটারী সংখ্যায় দ্বিগুণ বাড়ানো হয়েছে এবং তারা অত্যন্ত সজাগ হয়ে পাহারা দিচ্ছে। আদালত কক্ষেও ব্যবস্থার নতুনত্ব দেখা গেল। মামলা চলাকালে এতদিন পর্যন্ত আমরা যে কাঠগড়ায় আবদ্ধ থাকতাম তার রেলিং-এর উচ্চতা ছিল প্রায় আমাদের গলার সমান। ইচ্ছে করলেই যে-কোন সময়ে যে-কোন কেউ রেলিং টপকে শত্রু-পক্ষের কাউকে অনায়াসে আক্রমণ করতে পারতো—কর্তৃপক্ষের নিরাপত্তা বজায়ে এই ব্যবস্থা যথেষ্ট ছিল না। সাতদিন পরে আদালত কক্ষে প্রবেশ করে এই পুরনো কাঠগড়ার অস্তিত্ব দেখা গেল না। তার পরিবর্তে Cage-Dock—অর্থাৎ লোহার ডবল জাল দিয়ে ঢাকা একটি পিঁজরা প্রস্তুত করা হয়েছে—ঢোকবার এবং বেরোবার মাত্র একটিই দরজা। এই খাঁচায় একবার পুরে দিয়ে দরজাটি বন্ধ করলে বেরোনো একেবারে অসম্ভব। ভাগ্যের এমনই বিড়ম্বনা, আমাদের অভ্যর্থনা করতে এই Cage-Dock আজ দু হাত বাড়িয়ে আছে!

জেল থেকে আনবার পর আমাদের সকলকে বিচার কক্ষ সংলগ্ন অন্য একটি কামরায় নেওয়া হোত এবং প্রত্যেকের শরীর তল্লাসী করে তবেই বিচার কক্ষের সামনে কাঠগড়ায় আবদ্ধ করত।

জেল-বিধি অনুসারে জেল ওয়ার্ডার আসতে-যেতে জেল-গেটে প্রত্যেকের শরীর তল্লাসী করবে—জেলের এই কড়া নিয়মের কোন ব্যতিক্রম নেই। আমাদের ক্ষেত্রে এর ওপরেও আরো কঠিন নিয়ম প্রয়োগ করা হল। প্রথমে জেলকর্তৃপক্ষ ও পরে গোয়েন্দা সাব-ইন্সপেক্টারের অনুমতি ছাড়া কোনও সাধারণ ব্যবহার্য জিনিসপত্রও আমাদের কাছে পৌঁছতো না। তাঁরা ঐসব জিনিসপত্র পরীক্ষা করে নিঃসন্দেহ হলে তবেই অনুমতি দিতেন। জেল-গেটের তল্লাসী ছাড়াও বিচার কক্ষের নিরাপত্তার জন্য ভারপ্রাপ্ত পুলিশ অফিসারের মনোরঞ্জনার্থেও আমাদের শরীর তল্লাসী করা হোত।

দিনের পর দিন এই নিয়মই চলছিল—এর কোন ব্যতিক্রম ছিল না। কিন্তু এই রুটিন কাজে সেপাই ও হাবিলদারদের শিথিলতা আসা খুবই স্বাভাবিক এবং বাস্তবেও তাদের সেই শৈথিল্য এসেছিল, আর আমরাও তার নানা সুযোগ নিয়েছি। পুলিশের ওপরওয়ালারাও নিজেদের ভেতরকার এই দুর্বলতা সম্বন্ধে অত্যন্ত সচেতন ছিল। খাকী পোষাক পরিহিত পুলিশ রক্ষীরা পরস্পর পরস্পরকে বিশ্বাস করতে পারত না—কি জানি যদি তাদের মধ্যে কেউ কেউ আমাদের প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং আমরা তাদের সাহায্যে তাদেরই বিরুদ্ধে ব্যবহারের জন্য অস্ত্রশস্ত্র যোগাড় করি। আক্রমণাত্মক দুরভিসন্ধি বা ষড়যন্ত্রের কথা ভেবেই কর্তৃপক্ষ আমাদের বার বার তল্লাসী করা এবং পুলিশের ওপরেও পুলিশ নিয়ে Check করার পদ্ধতি বা System চালু রেখেছে।

সাতদিন পর আবার বিচার আরম্ভে আদালতের নিরাপত্তার জন্য পুলিশ কর্তৃপক্ষ কঠোর সাবধানতার চরম পদ্ধতি গ্রহণ করলো। সুটার সাহেব স্বয়ং আমাদের প্রত্যেকের শরীর সার্চ করবেন। প্রত্যেককে আলাদা করে একটা সংরক্ষিত ঘরে নিয়ে গেল। সেই ঘরের ভেতরে সাত-আটজন সশস্ত্র সেপাই উদ্যত রাইফেল হাতে যেন কেবল আদেশের অপেক্ষায় আছে। আমাদের এক-একজনকে নিয়ে সুটার সাহেব স্বয়ং ঘরে প্রবেশ করছেন—তাঁর ঠোঁটে বাঁকা হাসি। সকলকেই সম্পূর্ণ উলঙ্গ করে তল্লাসী করা হল। মূর্খ স্যুটার। মূর্খ পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ! কোন প্রকার নিরাপত্তা ব্যবস্থাই বিপ্লবী দৃঢ়তার কাছে যথেষ্ট নয়। বিপক্ষ দলের শত ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও তাকে বিপর্যস্ত বা বিধ্বস্ত করার উপায় থাকবেই—নতুন নতুন আক্রমণ পদ্ধতির কখনও

শেষ নেই। বিপ্লবী সংগ্রামের অসংখ্য ইতিহাস পড়ে এবং আমার নিজ অভিজ্ঞতা থেকে অব্যর্থ সত্য হিসেবে বুঝেছি, বিপ্লবীরা যদি অন্তরে পরাজয় মেনে না নেয় তবে প্রবল শত্রুর প্রচণ্ড শক্তির বিরুদ্ধেও আক্রমণের নতুন নতুন কার্যকরী উপায় আবিষ্কার করা কখনই অসম্ভব হয় না। তাই সুটার সাহেবের বাঁকা হাসি আমাদের মনে বৈপ্লবিক দৃঢ়তা দৃঢ়তর করতেই সাহায্য করেছিল। এর প্রমাণ কিছুকাল পরেই কর্তৃপক্ষ পেয়েছিল এবং বুঝেছিল ফাঁসি না হওয়া পর্যন্ত আমাদের আক্রমণ প্রস্তুতি অব্যাহত থাকবে।

সাতদিন পর কোর্টে আমাদের পক্ষের উকিল-ব্যারিস্টারদের দেখেও মনে হল তাঁরা নিরীহ জনসাধারণের ওপর সরকারের এই বর্বরোচিত অত্যাচারে যথেষ্ট ক্ষুব্ধ। প্রেস রিপোর্টারদের মধ্যেও সেই একই বিক্ষুব্ধ ভাব—এই অত্যাচারের কি প্রতিবাদ নেই—প্রতিকার নেই—প্রতিশোধ নেই! গ্যালারীতে উপবিষ্ট আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধব সকলেই একেবারে চুপ-চাপ স্থির গম্ভীর। এ'দের কারও মুখে কথা নেই—প্রত্যেকেই অপমানিত, লাঞ্ছিত ও চরম নির্যাতিত হয়েছেন। তাঁরা কালারপোলের শহীদ মনোরঞ্জনের পিতাকে (এই কোর্টেরই উকিল) পুলিশের উন্মত্ত তাণ্ডবে চিরকালের মত হারিয়েছেন—সার্জেন্ট কেলীর বুটের লাথিতে অকালে তাঁর প্রাণ বিয়োগ হয়। এই সব নির্মম অত্যাচারের ঘটনায় সকলেরই মন ভারাক্রান্ত—ভবিষ্যতের চিন্তায় অধীর। তাঁদের ধারণা হয়েছিল আমরা এই অত্যাচার মুখ বুজে কোনমতেই সহ্য করবো না। কাজেই আরো বিপদ, আরো অত্যাচার ঘনিয়ে আসবে ও আমাদের মামলা চালানো সুকঠিন হয়ে পড়বে। এই সব চিন্তা করে শেষ পরিণতির কথা ভেবে তাঁরা কোনই কূল-কিনারা পাচ্ছিলেন না।

সাতদিন পরে কাঠগড়ায় দেখা হল জামিনে মুক্ত আমাদের অন্যান্য সাথীদের সঙ্গে। প্রত্যেকের শরীরেই আঘাতের চিহ্ন। তাদের মধ্যেই একজন সাথী তার অজস্র ক্ষতস্থানের প্রতি আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট করে অভিযোগ ও অভিমানের সুরে বলল—

"দেখুন এইসব ক্ষতচিহ্ন। আমার বাড়ির মা-বাপ, ভাই-বোন—কাউকেই পুলিশ রেহাই দেয় নি। প্রত্যেকেই অকথ্য অপমান ও নিষ্ঠুর নির্যাতনে জর্জরিত......। আপনারা তো আমাকে বিশ্বাস করতেন না—সব সময় সন্দেহের চোখে দেখতেন?"

সত্যিই আজ এই সাথীর যেন মুখ রাখার জায়গা নেই—এত বড় আকাশের নিচে দাঁড়াবার সামান্য স্থানও যেন আর নেই। সে সাথীদের সন্দেহভাজন—এ তথ্য পুলিশের জানা থাকা সত্ত্বেও তাদের কাছেও সমাদৃত নয়। এই অবস্থার মানসিক প্রতিক্রিয়া তাকে একান্ত বিষণ্ণ ও ব্যথিত করে তুলেছে তাতে সন্দেহ নেই। তবু, এই সাথীর প্রতি সমবেদনা থাকলেও তার কথার জবাবে অপ্রিয় সত্য বলতে আমি দ্বিধা করি নি। আমি তাকে স্পষ্টই বললাম—

আমি—"সত্যিই আমরা তোমাকে আগে বিশ্বাস করি নি।"

প্রশ্ন—"আমার দেহের এইসব ক্ষতচিহ্ন দেখে এখন কি বিশ্বাস করতে পারেন?"

আমি—"হ্যাঁ, এখন বোধ হয় বিশ্বাস করতে পারি।"

প্রশ্ন—"আমাকে বিশ্বাস করবার পর যদি আমি পুলিশের চর হই?"

আমি—"তখন আমি তা ঠিক বুঝতে পারব না।"

সাথীটি আমার মুখের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল।

আমি কখনই কাউকে সুদীর্ঘদিন জেলখাটার মাপকাঠিতে বা কে পুলিশের কাছে কতখানি লাঞ্ছিত, অপমানিত ও নির্যাতিত হয়েছে সেই পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করে বৈপ্লবিক ষড়যন্ত্রমূলক সঙ্ঘে গ্রহণ করার যোগ্য বলে মনে করি নি—এটাই আমার জীবনের শিক্ষা। কাউকে পুলিশ আহত করেছে বলেই তার রক্তাক্ত দেহ দেখে ভাবপ্রবণ মন নিয়ে তাকে বিশ্বাস করা বিপ্লবী সঙ্ঘের মূল নীতি বহির্ভূত—এই বাস্তব উপলব্ধিই রূঢ় সত্য বলতে আমাকে বিন্দুমাত্র বিচলিত করে নি।

এই সাথীটিকে বিভ্রান্ত করে যুব-বিদ্রোহের কিছুকাল আগে থেকেই পুলিশের ডি, এস, পি,-কে মিথ্যা সংবাদ সরবরাহ করার পূর্ণ সুযোগ আমরা নিই—পুলিশ জেনেছিল আমরা লবণ-আইন ভঙ্গ না করে Sedition Law উপেক্ষা করবো।

আমরা পুলিশকে বিভ্রান্ত করে সশস্ত্র বিদ্রোহের পথ সুগম করেছিলাম। পুলিশ সেই কারণে এই "সাথী"-কেও সন্দেহ করল—ভাবলো সেও বোধ হয় সুপরিকল্পিতভাবে মিথ্যা তথ্য সরবরাহ করে তাদের বিভ্রান্ত করছে। কাজেই তাকেও পুলিশী জুলুমের শিকার হতে হয়েছে। পুলিশী জুলুমের শিকার হয়ে সাময়িকভাবে তার যে বৈপ্লবিক প্রতিক্রিয়া হয়েছে, তার মূল্য নিয়েই আমি তাকে তখনকার মত বিশ্বাস করতে পারি এই কথাই আমি বলেছিলাম।

বহু বছর পর যখন চীন-ভারত পঞ্চশীলের যুক্ত দায়িত্ব বহন করছিল, তখন চীন দেশের একটি ছায়াচিত্র—TRAP ছবিটি কলকাতার কোনো চিত্রগৃহে দেখবার সুযোগ হয় আমার। তাৎপর্যপূর্ণ ছবিটি দেখে আমার এই সাথীটির ঘটনা মনে পড়ে গেল। ছবিটির মূল বিষয়বস্তু এইরূপ—জেলের নির্জন কক্ষে এক প্রৌঢ়া বিপ্লবী রমণী কালাতিপাত করছে। হঠাৎ বাইরে শোনা গেল রমণীকণ্ঠের চিৎকার। পরক্ষণেই দেখা গেল অল্পবয়স্কা একটি মেয়েকে ক্ষত-বিক্ষত শরীরে সেই একই কক্ষে ছুড়ে ফেলা হল। মেয়েটির মাথা থেকে অঝোরে রক্ত ঝরে পড়ছে। প্রৌঢ়া রমণী ছুটে গিয়ে সযত্নে তার মাথা কোলে নিয়ে সেবা-শুশ্রূষা করলেন। তারপর উভয়ের বৈপ্লবিক পরিচয় বিনিময় হল। প্রৌঢ়া সেই মেয়েটিকে গুপ্ত দলের কর্মকেন্দ্রের কথা বলে ফেললেন। ঠিক সময় মেয়েটির ডাক এল—সে মুক্তি পাবে।...... এই মেয়েটি—পুলিশ স্পাই—পুলিশের গুপ্তচর।

ছবিটি দেখে সেদিন আমার কিছু শেখার ছিল না। আমার ভাল লেগেছিল—আমি কখনও নির্যাতনের ডিগ্রী হিসেব করে কাউকে বিশ্বাস করি নি এবং কারও গোপন ষড়যন্ত্রমূলক কার্যে যোগদানের যোগ্যতা আছে কি-না বিচার করি নি। যে অধিকারে আমি সবাইকে সন্দেহ করেছি, সেই অধিকারেই আমি সকলকে অবাধ স্বাধীনতা দিয়েছি সর্বস্তরে আমাকে পরীক্ষা করে দেখতে কেউ যেন কসুর না করে।

আমাদের মামলা দু' বছর ধরে চলেছে। এই দুটি বছর জেলে ও আদালতে নানা বৈচিত্র্যের মধ্যে আমাদের দিন কেটেছে। আদালত কক্ষে ছোটখাটো ঝগড়াঝাঁটি প্রায় লেগেই থাকতো, আবার জেলেও কিছু-না-কিছু গণ্ডগোল হামেশাই চলতো। বহু দিনের ঘটনা—কাজেই, আজ লিখতে গিয়ে হয়ত কিছুটা আগে-পিছে হয়ে যাচ্ছে। মোট কথা এই দু' বছরের মধ্যে যেসব ঘটনা ঘটেছে তার উল্লেখ আমি এখানে করছি। প্রতিদিনের নানা খুঁটিনাটি ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে আবার আমাদের জেল ভাঙা ও বিস্ফোরণের সাহায্যে শহর আক্রমণের পরিকল্পনাও সমান তালে চলেছিল। আগে বিচ্ছিন্ন ঘটনাগুলির উল্লেখ করে তারপর যুব-বিদ্রোহের দ্বিতীয় পর্বের সার্বিক প্ল্যান ও ঘটনার বিবরণ দেবো।

আসানুল্লা হত্যার ঠিক এক বছর আগে, ১৯৩০ সালের ২৯শে আগস্ট, ঢাকায় পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেন্ট মিঃ হাডসন ও মিঃ লোম্যানকে (আই, জি, পি,) গুলী করা হয়। ঘটনাস্থলে কেউ ধরা

পড়ে নি। এই সংবাদ সেই সময় আমাদের খুব উৎসাহিত করেছিল। আমরা অকূল আগ্রহে বাংলায় বিপ্লবীদের কর্মসূচীর বাস্তব প্রয়োগের অপেক্ষায় ছিলাম। আমরা যতই উৎসাহী হয়েছি কর্তৃপক্ষ ততোধিক বিব্রত বোধ করেছে।

আই, জি, মিঃ লোম্যানের স্থলে মিঃ ক্রেগ্ ইন্সপেক্টার জেনারেলের পদে বহাল হলেন।

মিঃ ক্রেগ্ চট্টগ্রামে এলেন পুলিশের কাজকর্ম পরিদর্শনে। আমরা জেলে ও আদালতে বিভিন্ন পুলিশ সার্জেণ্ট, সাব-ইন্সপেক্টার, ইন্সপেক্টার প্রমুখের সঙ্গে কথা বলার প্রচুর সুযোগ পেতাম। সেই সুযোগে আমরা জানতে পারলাম মিঃ ক্রেগ্ জেলা-পুলিশ অফিস পরিদর্শনে তিন দিনের জন্য চট্টগ্রামে আসছেন। জেলে বসে সচরাচর এইরূপ সংবাদ পাওয়া কঠিন। অনুসন্ধান করে আরও জানতে পারলাম তিনি আবার কোন্ ট্রেনে এবং কবে ফিরে যাচ্ছেন। এইরূপ সঠিক তথ্যের ওপর প্ল্যান করা যত সহজ অন্যথায় তা' সম্ভব হয় না এবং বিপদের আশঙ্কাও অনেক বেশি থাকে। সেই যুগে যখন ইংরেজ রাজপুরুষদের হত্যা করা আমাদের প্রোগ্রাম ছিল, তখন এই সংবাদ পেয়ে গণেশ ও আমি স্থির করি, যত শীঘ্র সম্ভব মাস্টারদাকে খবর পাঠানো এবং যতদূর সম্ভব একটি প্ল্যানও এঁকে দেবো মিঃ ক্রেগ্‌কে সশরীরে যেন আর ফিরে যেতে না হয়—বিপ্লবীরা যেন বাংলার ইন্স-পেক্টার জেনারেলের পদ চিরকাল শূন্য রাখার ব্যবস্থা করে।

হাতে সময় মাত্র তিন দিন। এই সংক্ষিপ্ত সময়ে মাস্টারদার কাছে খবর পাঠানো, তারপর একজন বা দু'জন যুবককে এই কাজে নিযুক্ত করা যে খুব সহজ নয় তা' বুঝেছিলাম। তবু এই সুযোগ গ্রহণের সব রকম চেষ্টা করবো বলে স্থির করলাম।

আমাদের সংবাদবাহক "শিশু" একেবারেই নিরীহ শিশু। পুলিশ তাকে নিরীহ জেনেও ছয়জন গোয়েন্দা পুলিশকে সর্বক্ষণ তাকে অনুসরণ করতে বহাল করেছিল। কর্তৃপক্ষ সোজাসুজি অর্ধেন্দুর (শিশু) সঙ্গে তাদের পরিচয় করিয়ে দেয় এবং তারা যে অর্ধেন্দুর গতিবিধি সব সময় লক্ষ্য করবে তা অর্ধেন্দুকে জানিয়ে সাবধান করে দেয়। এইরূপ পুলিশ-বেষ্টনীতে অর্ধেন্দু নিজ বাড়িতে থাকতো এবং সে যেখানেই যেত, তার পেছনে এরা ছুটত। কিন্তু মানসিক দৃঢ়তার কাছে যে-কোন পাহারার ব্যবস্থাই যথেষ্ট বাধা নয়। আমরা স্থির জানতাম অর্ধেন্দু পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে মাস্টারদার সঙ্গে দেখা করবেই। মাস্টারদার সঙ্গে এইরূপ যোগাযোগের ব্যবস্থা আমরা আগে থেকেই করে রেখেছিলাম। সুতরাং আমাদের মনে কেবল একটাই চিন্তা ছিল—এত অল্প সময়ের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন সম্ভব হবে কি?

সময়ের গুরুত্ব এবং প্ল্যান সফল করতে হলে সেইদিন রাত্রেই মাস্টারদার সঙ্গে সাক্ষাতের একান্ত প্রয়োজন—এই সম্বন্ধে অর্ধেন্দুকে ভালভাবেই বোঝানো হল। মাস্টারদার কাছে প্ল্যানটির নিখুঁত ব্যাখ্যার প্রয়োজনে অর্ধেন্দুর সঙ্গে প্ল্যানটি সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করলাম আমরা। পুলিশবেষ্টিত কাঠগড়ার অন্তরালে ট্রাই-ব্যুনালের নাকের ডগায় বসে এই প্ল্যানটি রচিত হয়। প্ল্যানটির সারমর্ম এইরূপ—

১। একটু ভিন্ন ধরণের পোষাকে দু'জন লোক নিযুক্ত করা হোক।

২। এদের সঙ্গে রিভলভার থাকবেই উপরন্তু সম্ভব হলে হাতবোমাও রাখতে হবে।

৩। সন্ধ্যের সময় চট্টগ্রাম-মেইলে মিঃ ক্রেগ্ রওনা হবেন। আমাদের অপর কোন বন্ধু সেই ট্রেনে মিঃ ক্রেগের কামরার পাশের কামরায় উঠবে। এর সঙ্গে কোন অস্ত্রাদি থাকবে না।

৪। যে দু'জন সশস্ত্র হয়ে যাবে, তারা কুমীরা স্টেশন থেকে এই ট্রেনে চাপবে।

৫। যে বন্ধুটি চট্টগ্রাম স্টেশন থেকেই মিঃ ক্রেগ্‌কে অনুসরণ করে যাবে সে এই দু'জনকে কুমীরা স্টেশন থেকে ট্রেনে ওঠবার সময় সে ট্রেনেই যে আই, জি, যাচ্ছেন তা' সুনিশ্চিতভাবে জানাবে এবং মিঃ ক্রেগের কামরাটি দেখিয়ে দেবে।

৬। লাকসাম জংশনে তারা মিঃ ক্রেগ্‌কে আক্রমণের চেষ্টা করবে। যদি সেখানে সম্ভব না হয় তবে আবার চাঁদপুরে সুযোগ নেবে। এই দু'টি জংশনের কোনটাতেই যদি সুযোগ পাওয়া না যায়, তবে আই, জি,-কে অনুসরণ করে আরো এগোবে এবং গোয়ালন্দ স্টীমার-ঘাটে আক্রমণে করবে।

৭। দৃঢ়তা চাই। দৃঢ়প্রতিজ্ঞ দু'জন যুবক চাই—মিঃ ক্রেগ্ অক্ষত দেহে প্রাণ নিয়ে কোনমতেই যেন ফিরে যেতে না পারে।

১৯৩০ সাল—১লা ডিসেম্বর মিঃ ক্রেগ চট্টগ্রাম পরিত্যাগ করবেন। মিঃ ক্রেগের প্রত্যাবর্তনের দিনটিও আমরা মাস্টারদাকে জানালাম। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই প্ল্যান ও এই সংক্রান্ত সমস্ত খুঁটিনাটি খবর মাস্টারদার কাছে পৌঁছলো। তিনি নির্মলদার সঙ্গে পরামর্শ করে রামকৃষ্ণ বিশ্বাস ও কালী চক্রবর্তীকে এই কাজের জন্য মনোনীত করলেন।

কালী চক্রবর্তী ১৮ই এপ্রিল যুব-বিদ্রোহের প্রথম সারিতে অংশ গ্রহণ করেছে, ২২শে এপ্রিল জালালাবাদ যুদ্ধে

অমর শহীদদের পাশে দাঁড়িয়ে বীরত্বের সঙ্গে রাইফেল চালিয়েছে। কালীর ওপর এই দায়িত্ব দিয়ে মাস্টারদা খুব নিশ্চিন্ত ছিলেন। তা ছাড়া দৃঢ়চিত্ত রামকৃষ্ণের সহযোগিতায় তাদের মিলিত শক্তি হবে দুর্বার ও অপ্রতিহত।

রামকৃষ্ণ ও কালী চক্রবর্তী গ্রাম থেকে শহরে এল। পল্টনের কাছে রামকৃষ্ণ ও শহীদ দেবব্রত গুপ্তের সহপাঠী রমেশের বাড়ি। রমেশ রামকৃষ্ণ ও দেবু এই তিনজন বিশেষ বন্ধু। রমেশ ও রামকৃষ্ণ উভয়েই বৃত্তিপ্রাপ্ত কৃতী ছাত্র। রামকৃষ্ণ ও কালী শহরে এসে দুপুরের দিকে রমেশের বাড়ি গেলে রমেশ তার বাড়িতে তাদের সন্ধ্যে পর্যন্ত থাকবার সবরকম ব্যবস্থা করলো।

সূর্যাস্তের সাথে সাথেই রামকৃষ্ণ ও কালী মোটরযোগে কুমীরা স্টেশনের উদ্দেশ্যে রওনা হল। মোটরে প্রায় বারো মাইল পথ তাদের যেতে হবে। তাই তারা একটু সময় হাতে নিয়ে বেরোনো সমীচীন মনে করে। মিঃ ক্রেগ চট্টগ্রাম স্টেশনে ট্রেনে চাপলেন। আমাদের একজন সাথীও পূর্ব-পরিকল্পনা অনুযায়ী তাঁর দৃষ্টির অগোচরে সেই ট্রেনে উঠে পড়লো। ব্যবস্থা মতই কুমীরা স্টেশনে এই সাথীটি রামকৃষ্ণ ও কালীকে মিঃ ক্রেগের কামরাটি দেখিয়ে দিয়ে টুক্ করে নেমে গেল।

কুমীরা স্টেশন থেকে লাকসাম জংশন প্রায় সত্তর মাইল। এর মধ্যে ছোটখাটো আরো অনেক স্টেশন আছে এবং কয়েক মিনিট করে প্রতিটি স্টেশনেই ট্রেনটি থামছে। রামকৃষ্ণ ও কালী দু'-তিনবার ট্রেন থেকে নেমে মিঃ ক্রেগের কামরার পাশ দিয়ে হেঁটে গেছে। প্রতিবারই দেখেছে তাঁর কামরাটি ভেতর থেকে বন্ধ। মিঃ ক্রেগের দেহরক্ষীরা তাঁর প্রথম শ্রেণীর কামরা সংলগ্ন অন্য একটি পৃথক কামরায় তাঁদের কর্তব্য পালনে সদা জাগ্রত ও সচেতন। রাত প্রায় দুটোর সময় গাড়ি লাকসাম জংশনে পৌঁছলো। রাত্রে প্রায় সব যাত্রীরাই ঘুমিয়ে আছে। কেবল যারা গন্তব্যস্থলে এসে গেছে তারাই গাড়ি থেকে নামছে। লাকসাম জংশনে ঘণ্টাখানেকেরও বেশি ট্রেনটি থেমে থাকলেও মিঃ ক্রেগ ঘুম থেকে ওঠেন নি বা তাঁর কামরার দরজা খোলেন নি। শীতের রাত না হলে অন্তত জানালাগুলিও খোলা পাওয়া যেত। কিন্তু শীতের রাতের দরুণ তা-ও বন্ধ।

রামকৃষ্ণ ও কালীর ওপর নির্দেশ ছিল ট্রেনের কামরার বাইরে থেকে জানালার ফাঁক দিয়ে গুলী ছুঁড়তে কোনো বাধা নেই: কিন্তু যদি লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়ার বিন্দুমাত্র আশঙ্কা থাকে তবে সেইরূপ অনিশ্চয়তার সম্ভাবনাকে উপেক্ষা করবে না—বরং চাঁদপুর জংশনে সুনিশ্চিতভাবে মিঃ ক্রেগকে বাইরে পাবেই।

ভোররাত প্রায় চারটার সময় ট্রেনটি চাঁদপুর পৌঁছয়। ট্রেন থেকে নেমে বেশ কিছুটা পথ পায়ে হেঁটে তবেই যাত্রীদের স্টীমারে উঠতে হয়। প্রথম শ্রেণীর যাত্রীদেরও এই পথটুকু পায়ে হেঁটেই যেতে হয়; কিন্তু তাদের হাঁটা পথটি ভিন্ন—সকলের সঙ্গে ভিড় ঠেলে যাবার তেমন প্রয়োজন হয় না।

চট্টগ্রাম থেকে কলকাতার পথে আক্রমণের এইরূপ সুযোগ অন্যত্র আর কোথাও ছিল না। চাঁদপুর থেকে স্টীমারে গোয়ালন্দ পৌঁছনোর পর যাত্রীরা স্টীমার ছেড়ে আবার পায়ে হেঁটে ট্রেনে ওঠে। তাই গোয়ালন্দেও মিঃ ক্রেগকে একেবারে পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জে পাওয়ার সম্ভাবনা যথেষ্টই ছিল। কিন্তু দুপুরবেলা গোয়ালন্দে পৌঁছে দিনের আলোতে ক্রেগের পথ অনুসরণ করে আকস্মিক আক্রমণের সুযোগ পাওয়া অপেক্ষাকৃত কঠিন ছিল। তাই ভোররাতের অন্ধকারে চাঁদপুর জংশনে আক্রমণের পূর্ণ সুযোগ নিতে রামকৃষ্ণ ও কালী সর্বতোভাবে প্রস্তুত ছিল।

ট্রেনটি যথাসময়ে লাকসাম থেকে ছাড়লো। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই চাঁদপুর পৌঁছবে। কালী ও রামকৃষ্ণের চোখে ঘুম নেই। বাংলার ইন্সপেক্টার জেনারেল অফ পুলিশ সুখ-নিদ্রায় বিভোর।

যে ঘটনার বিবরণ দিচ্ছি তা কালী চক্রবর্তীর মুখ থেকেই আমার শোনা এবং আগের বৃত্তান্তটি আমার প্রত্যক্ষ জানা ও বাকিটুকু অর্ধেন্দুর কাছ থেকে জেনেছি।

চাঁদপুরে ট্রেন থামার সঙ্গে সঙ্গে কালী ও রামকৃষ্ণ তড়াক্ করে নেমে পড়লো—সঙ্গে মালপত্তরের কোনো বালাই ছিল না। তাদের মহামূল্য "লাগেজ"—রিভলভার ও হাতবোমা কোমরে বাঁধা এবং গায়ের সার্ট দিয়ে সযত্নে ঢাকা আছে। শীতের ভোররাত—ইলেকট্রিক লাইটে চাঁদপুর জংশন আলোকিত হলেও মাঝে মাঝে রাতের অন্ধকারের কালোছায়া। ভোর চারটায় শীতে ঠক্ ঠক্ করে শরীর কাঁপছে। অনিশ্চয়তা, উৎকণ্ঠা ও উত্তেজনার মানসিক প্রতিক্রিয়ায় শীতের কাঁপুনি তারা আরও তীব্রভাবে অনুভব করছে।

মিঃ ক্রেগের কামরার দিকে প্রখর দৃষ্টি রেখে খুব সন্তর্পণে হাঁটছে কালী ও রামকৃষ্ণ। একটু পরেই তারা দেখতে পেল মিঃ ক্রেগ কামরা খুলে একা নেমে এলেন। মিঃ ক্রেগ উচ্চতায় সাত ফুটেরও অধিক—কোনো ইংরেজকেও সচরাচর এত লম্বা দেখা যায় না। শীতের দরুণ সাহেবের গায়ে একটি ওভারকোট চাপানো এবং মাথায় নাইট-ক্যাপের মত এক ধরণের টুপি। মিঃ ক্রেগকে নামতে দেখেই তারা রিভলভার নিল হাতে—একেবারে ট্রিগারে আঙুল স্পর্শ করে আছে। মিঃ ক্রেগ যেন সন্দেহ করতে না পারেন সেভাবে একটু পেছনে থেকে অনুসরণ করছিল তারা। মিঃ ক্রেগ দশ-বারো কদম এগিয়ে গেলে রামকৃষ্ণ ও কালী দ্রুত এসে ঠিক তাঁর পেছনে পয়েন্টব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জে ফায়ার করে। গুলীবিদ্ধ হয়ে তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন। ধরাশায়ী মুমূর্ষু ব্যক্তির কাতরকণ্ঠ নিঃসৃত বাণী শোনা গেল—"উঃ—বাবা, গেলুম......।"

আশ্চর্য! কে নিহত হল? এ তো ক্রেগ নয়? মিঃ ক্রেগ তবে গেলেন কোথায়?

পুলিশ ইন্সপেক্টার তারিণী মুখার্জী দেখতে প্রায় মিঃ ক্রেগের মতই ছিলেন। আই, জি,-র কম্পার্টমেণ্ট থেকে তিনিই আগে অবতরণ করেন। আবছা অন্ধকারে, গায়ে ওভারকোট ও মাথায় টুপি—ইনি বাঙালী কি ইংরেজ তা ঠিক বুঝে উঠতে পারে নি রামকৃষ্ণ ও কালী। তা ছাড়া বাঙালী অথবা ইংরেজ—এটা পরীক্ষা করে নেবার কথাও তাদের মনে জাগে নি।

কি হতে কি হয়ে গেল! মারতে গেল কাকে, মরলো কে? মনে হবে—রাখে হরি মারে কে? হরিনামের দোহাই দিয়ে বিপ্লবীদের নিজ অক্ষমতা ঢাকতে চেষ্টা করার অর্থ বিপ্লবী অভিধান কলঙ্কিত করা।

"If we abstractly theorise, we will find, that in each battle, there are elements of defeat. But the danger of such defeat can be reduced to the minimum if we are organised more and more thoroughly."

—Lenin.

—যদি কেবল অবাস্তর কল্পনা করে যাই তবে দেখতে পাবো, প্রত্যেকটি যুদ্ধে পরাজয়ের বীজ নিহিত আছে। কিন্তু পরাজয়ের বিপদকে ন্যূনতম স্তরেও নির্মূল করা যায়, যদি আমরা ক্রমেই সম্যকরূপে সংগঠিত হই।

[ক্রমশঃ]

পথ কে রুখবে?

মনোজ বসু

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

॥ তিন ॥

মানুষ সেই এক জনই—কিন্তু রঞ্জন দত্ত নয় এখন, রমজান গাজি। পরনে রাত্রিবেলার সেই ধুতি—কাছা খুলে ফেরতা দিয়ে লুঙির মতন করে পরা। মাথায় বাড়তি এক কিস্তিটুপি চড়েছে, এইমাত্র। দাড়ি রাখার রেওয়াজ উঠে গিয়ে হাল আমলে ভারি সুবিধা—চট করে ভোল পালটে হিন্দু থেকে মুসলমান হওয়া যায়।

সামসুল হকের দলিচঘরে রমজান নাস্তায় বসে গেছে। ফিসফিসিয়ে ভয়ের কথা বলে সামসুলের কানে: দিনকাল সুবিধের নয় মিঞাভাই।

সচকিত হয়ে সামসুল বলে, কেন; কি হল আবার?

ভাতভিত্তি সব এই মাটিতে তখন জবানে কসুর করবেন কেন? ডাইনে বাঁয়ে বড় গলা করে শোনাবেন: হিন্দুস্থান বই কোন ঠাঁই আর জানা নেই। মুখে হরবখত বলে যাচ্ছেন, নজরটা ওপারপানে খোলা রয়েছে—গোলমাল বুঝলেই টুক করে অমনি পার হয়ে যাবেন।

সভয়ে সামসুল বলে, গোলমাল লাগছে না কি?

এই এখুনি না হল, মানুষ ক্ষিধের অন্ন পাচ্ছে না—লাগতে আর কতক্ষণ। তখন তো এক লহমার সবুর সইবে না।

সামসুল বলে, পেটের ক্ষিধে মোসলমান হিন্দু সবারই। আলাদা করে আমাদের ভয় তবে কিসের?

গোলমালের মুখ ঘুরিয়ে দিলেই হল—একগাল হেসে আমাদের রমজান গাজি বলে, মজাই তো ওখানে। এতাবৎ তাই হয়ে এসেছে, ভবিষ্যতেও হবে। না হলেই ভাল। ভাই-বন্ধু বিস্তর যখন ওপারে, ধুকপুকির মধ্যে কেন থাকেন—মেয়েছেলে-গুলো চালান করে দিয়ে হাত-পা ঝাড়া হয়ে বসে থাকুন। লেগে গেল তো সঙ্গে সঙ্গে পগার-পার—ওপারে গিয়ে বুড়ো-আঙুল নেড়ে কলা দেখাবেন। আর না লাগে তো বুঝে-সমঝে ঘরের মানুষ আবার ঘরে এনে তুলবেন।

সামসুল হক ভাবছে—ভাবছে। সাহস দিয়ে রমজান বলে, অত ভাবনার কী? আখচারই তো করছে সবাই। আপনার নিজের কিছু করতে হবে না, শ্রীধর মল্লিককে মুখের কথা বলে দিন—তিনিই সব করে দেবেন।

সামসুল বলে, বলেন কি ভাইসাহেব? লড়াই হয়ে গেল—দু-পা অন্তর ঘাঁটি খাঁটিয়ে ফৌজ বসিয়েছে। এই ডামা-ডোলের মধ্যেও মানুষ পারাপার হচ্ছে?

নিত্যিদিন, হরবখত—

তা-ও তো বেটাছেলে নয়, মেয়েলোক—

রমজান জোর দিয়ে বলল, মেয়েমানুষ হলেও পায়ে হেঁটে চলতে পারে। মল্লিক-মশায়ের ক্ষমতা জানেন না—পাহাড়-পর্বত হলেও তিনি পার করে দিতে পারেন। নেই এ তল্লাটে, কী হবে?

হেসে বলে, গুটিগুটি যান না চলে একদিন। মল্লিকঘাট ন-মাস ছ-মাসের পথ নয়। সরে-জমিনে গিয়ে বন্দোবস্তটা দেখে আসুন।

সামসুলের চাচাতো ভাই নুরুদ্দিন, শহরে মাছ চালান দেয়। কাজকর্ম চুকিয়ে হিসাবপত্র সেরে ঘরে ফিরছে। দলিচঘরে রমজানের দিকে ঘন ঘন তাকায়। ঘুরে এলো হঠাৎ। ভ্রূকুঞ্চিত করে বলে, দেখেছি যেন মিঞাসাহেবকে?

রমজান বলে, হতে পারে। বসে-থাকা মানুষ তো নই, সদাসর্বদা ঘুরতে হয়।

কাল বিকেলবেলা দেখলাম—

হতে পারে—

তখন আপনি ঠিক এ-মানুষ নন। চেহারায় আলাদা, সাজ-পোষাকে আলাদা।

রমজানের নির্বিকার জবাব: হবে তাই। ওপাড়ার ঐরকম সাজ।

নুরুদ্দিন সন্দিগ্ধকণ্ঠে বলে, মাথায় টুপি চড়ালেই ধোঁকা দেওয়া যায় না। কোন জাত আপনি?

কোন জাত আমি বেন? সব সময় আমার মনে থাকে না—

যেন ভারি একটা রসিকতার কথা—রমজান হাসছে। হাসতে হাসতে সামসুলের গায়ে খোঁচা দিয়ে বলে, বলে দিন না বড়-মিঞা, কোন জাত?

সামসুলের সঙ্গেও জমে গেছে, ভাব জমাতে মানুষটার জুড়ি নেই। ভাইয়ের উপর সামসুল ধমক দিয়ে ওঠে: বিয়ে-সাদি হচ্ছে না, জাত খোঁজাখুঁজির কি হল? ধোঁকাবাজি নয়, ভাল কথাই বলছেন ইনি।

রমজান বলল, ঘাটের দালাল আমি। পারে যাবার মানুষ পটিয়ে বেড়াচ্ছি।

সামসুল হেসে টিপ্পনী কাটে: এক এক মরশুমে হজ্জের লোক কুড়োতেও আসে এমনি।

রমজান বলে, হিন্দুদেরও আছে। পান্ডারা যাত্রী জুটিয়ে গয়া-কাশী প্রয়াগ-পুরী নিয়ে বের করে। ঘাটে গ্যাঁট হয়ে রইলাম, মানুষ আপনা-আপনি গিয়ে পড়বে—তাতে আর পোষাচ্ছে না এখন। সরকার কড়াকড়ি বাড়াচ্ছে, ঘাটোয়ালের খরচা ততই বেড়ে যাচ্ছে, মানুষ বেশি করে না জোটালে পাত্তাড়ি গোটাতে হবে। রাজা-বাবুর দুধে পানা—জানেন তো গল্পটা? ঠিক সেই জিনিস।

নুরুদ্দিনকে আহ্বান করে পাশের জায়গা দেখিয়ে দেয়: বসুন ছোটমিঞা, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হয় নাকি? ঠক-জোচ্চোর নই, পরিচয় তো খুলেই বললাম। গাঁয়ে গাঁয়ে টহল মেরে বেড়াচ্ছি কেন, সেইটে বলি। রাজাবাবুর দুধে এককুচি পানা পাওয়া গেল—

নড়েচড়ে ভাল হয়ে বসে রমজান বলছে:

গাইয়ের খাঁটি দুধ রাজাবাবুর জন্যে। চুমুক দিতে গিয়ে তার মধ্যে এককুচি পানা। রাজাবাবু আগুন, বাবুর্চির চাকরি ধরে টান: গোয়ালায় পানি মেশায়, তুমি আছ তবে কি জন্যে? বিস্তর কান্নাকাটি করে চাকরি রক্ষে হল। তখন সরকারের উপর হুকুম: বাবুর্চি তো আছেই, তুমিও ঐসময় নজর রাখবে। গোয়ালা দুধ দুতেই হোক দু'জনের চার-চারটে চোখ

ফাঁকি দিতে পারবে না। কিন্তু রাজাবাবুর মনে সন্দেহ ঢুকে গেছে, দুধ যেন আরও পাতলা ঠেকে। এবারে খোদ দেওয়ানকে তলব ঃ ওদের ঠকাচ্ছে, যত কাজই থাকুক গাই দোওয়ার সময় আপনি নিজে গিয়ে দাঁড়াবেন। গোয়ালা এর পর মরিয়া হয়ে রাজাবাবুর পা জড়িয়ে কে'দে পড়ল ঃ তদারক ঠেকান হুজুর, নয় তো দুধের সাদা রং আর বজায় রাখতে পারি নে। কি বৃত্তান্ত? না, বাবুর্চি সামান্য মানুষ, পেটের বহর ছোট, একটু-আধটু পানি মিশিয়েই পুষিয়ে যেতো। বাবুর্চির উপর সরকার বহাল হলো, তাঁর জন্যে আবার নতুন একদফা বন্দোবস্ত। দেওয়ানজি নিজে এবার—এতবড় ওজনদার মানুষের অল্পে-সল্পে পেট ভরে না, আস্ত একখানা পুকুর না ঢাললে এখন আর পোষানো যাবে না—

নুরুদ্দিনের আগের মেজাজ আর নেই, হাসির তোড়ে চৌদিক ফাটিয়ে দিচ্ছে, বয়সটা কম বলেই এমনধারা হাসি হাসে। পুরনো পিরীত-প্রণয়ের সম্পর্ক যেন মানুষটার সঙ্গে—সুখ-দুঃখের খবরাখবর নিয়ে ঘুরছে, সংবুদ্ধি বাতলাতে বসে গেছে। হিন্দু আর মুসলমান, থুড়ি, জাত আলাদা করে বলতে গিয়ে সংবিধানের ফ্যাশাদে না পড়ে যাই!—সংখ্যাগুরু ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়। কাগজেপত্রে ফারাক না-ই মানি, দুই তরফের মন দুটোর মাঝখানে কিন্তু পর্দা ঝুলছে। অবাধে সেই পর্দার এপার-ওপার করে বেড়াচ্ছে, রঞ্জন বা রমজান যে-নামেরই হোক, এই মানুষটা।

রমজান বলে, ওপারে নাম উল্টেছে—ওরা সংখ্যালঘু, তোমরাই সংখ্যাগুরু। পাকিস্তানেও সমান চলাচল আমার—কেগন ববে ঠেকাবে! লড়াইয়ের মুখে শুনতাম, ওপারের স্পাই সব এসে মিলেমিশে একাকার হয়ে আছে, গোয়েন্দার বাপের সাধ্য নেই আলাদা বাছাই করে তুলবে। এপার থেকেও তেমনি না কি ওপারে গিয়ে ঢুকেছিল। তা অকাজ-কুকাজ নিয়ে তারা যদি পেরে থাকে, আমার তো গলদ নেই, ভাল ছাড়া মন্দ বুদ্ধি দিতে যাইনে—আমার ভয়টা কিসের তরে? গাঁ-গ্রামের মানুষ বুঝিয়ে-সুজিয়ে ঘাটে হাজির করা কাজ আমার ঃ যাও, পার হয়ে গিয়ে দেখগে। চিরদিন যেমন যেতে আসতে। দেখে এসো, সবই ঠিক আছে আগের মতন। তা-ও-নয়, আরও ভাল হয়েছে। দুটো মেটেহাঁড়িও একসঙ্গে থাকলে ঠোক্কর লাগে, হাঙ্গামা-হুজ্জত তেমনি তোমাদের মধ্যেও যা ছিল—এবারে দেখ গিয়ে সব পরিষ্কার। অনেকদিন পরে পেয়ে সাতরাজার ধন মাণিকের মতন মাথায় তুলে নেবে দেখো।

ঘাটোয়ালি কাজ-কারবার দিনকে-দিন কঠিন হয়ে উঠছে. মোকামে চুপচাপ বসে থাকবার উপায় নেই। গাঁয়ে গাঁয়ে লোক বেরুচ্ছে। গোড়ায় খাসা ছিল—চলতি যে থানা-পুলিশ, বর্ডারও তারা দেখত। একলা তারাই। তাদের সঙ্গে চিরকেলে দহরম-মহরম, দাদা-বাবা ডাকাডাকি আছে, বিয়ে-থাওয়া পালা-পার্বণে দাওয়াত পড়ে, বন্দোবস্ত এককথায় হয়ে যেত। দিন যায়, কর্তারা কষে ইস্ক্রুপ আঁটছে—থানার পুলিশে ঠেকাতে পারছে না, বর্ডার-পুলিশ জুড়ে দেয়। রাজাবাবুর সেই বাবুর্চির উপর সরকার চাপিয়ে দেওয়া আর কি! লাইন ধরে বরাবর বর্ডার-পুলিশ—কোথাও তাঁবু খাটিয়েছে, কোথাও বা টিনের চালা তুলেছে। ফলে, অন্য কিছু নয়, ঘাটোয়ালের খরচাই বেড়েছে কেবল—জায়গা বিশেষে দুনো তেদুনো হয়েছে। আমাদের নিজেদের দিয়েই বুঝি—

এমন যে ডাকসাইটে মল্লিকঘাট, তারই অবস্থা তুলে ধরে রমজান বোঝাচ্ছে।

খেয়াঘাটে যেমন ডাক ওঠে এসব ঘাটেও ঠিক তাই। পাশের কেউ ধরো বেশি ডেকে জিতে গেল, সেখানেই ঘাট চালু তখন, এ ঘাট বাতিল হয়ে পড়বে। অবশ্য মল্লিক-ঘাটের হপ্তা যে উঁচুতে উঠে আছে, তারও উপরে উঠে কারো আর কারবার করে খেতে হবে না। থানায় দু-শ, ক্যাম্পে তিন-শ—হপ্তায় হপ্তায় এই টাকা শ্রীধর মল্লিক নিজে পৌঁছে দিয়ে আসেন, তারা ঘাটে আসতে যাবে না। ওপারেও ঠিক তাই—সেখানে আনোয়ার মিঞা দিয়ে আসে। তারিখের পরে আধলা দিনও মার্জনা নেই—ঘাটের উপর সঙ্গে সঙ্গে অমনি বুটজুতোর খটমটি, দুড়ুম-দাড়াম বন্দুকের দেওড়। কোন্ মক্কেল তারপরে আর ঐ ঘাটে আসতে যাবে। আর একবার বানচাল হলে সেই ঘাট আবার জমিয়ে তোলা চাট্টিখানি কথা নয়। আরও আছে। পাবলিক সেয়ানা হয়েছে—ইস্কুল লাইব্রেরী বারোয়ারির চাঁদা ছাড়ো, টিউবওয়েল বসাব এখানে ঈদগাহ্ বসাব সেখানে—দাও তাব টাকা। না দিলে হল্লা হবে, চুপিসাড়ে কাজ হতে পারবে না

তা বলে মল্লিকঘাট নিয়ে এসব কিছু নয়। খরচপত্রে মল্লিকের কঞ্জুষপনা নেই, চতুর্দিকে আটঘাট-বাঁধা। কিন্তু সেই মোটা খরচা পারঘাটার মানুষই তো জোগাচ্ছে—গাঁট থেকে গচ্চা দিয়ে কেন ঘাট চালাবে? মানুষ যাতে গাদায় গাদায় পারাপার হয়, তাই দেখ। মানুষ বাড়লে তবেই পড়তায় পোষাবে।

অতএব গাঁয়ে গাঁয়ে দালাল ঘুরছে—একজন এই রঞ্জন অথবা রমজান—ঘরের মানুষ জপিয়ে-জাপিয়ে যারা ঘাটে পাঠাবে। বেরিয়ে পড়ো, ভয় কিসের? এপারে যেমন মানুষ, ওপারেও ঠিক তেমনি মানুষ। এককালে তাদের বস্তু চিনতে, বিশ বছরে কতটুকুই বা ভুলেছ? তোমার আপন মানুষ, তোমারই মতন বাংলায় কথা বলে, মাথায় এক থাবড়া তেল দিয়ে ঝুপঝাপ করে খালের জলে কয়েকটা ডুব দিয়ে ভাতের কাঁসর নিয়ে বসে যায়। মাঝবয়সি ছিল, বিশ বছরে চুল পেকে সাদা হয়েছে এইমাত্র তফাত। দাওয়ায় বসে দিনান্তে তামাক টানতে টানতে মন তার উদাস হয়ে গেছে ঃ কোথায় মিলিয়ে গেল আনন্দের হাট! পাঠশালার এক পড়ুয়া বিশ বছর পরে নিশ্বাস ফেলে তার সহপাঠী অতীনের নামে, কবিতা লিখেছে, দেখ—

"অতীন তোমাকে
প্রবাসী আপন জন ডাকে ঃ
'আমার হৃদয়ে এসো, শান্তি দাও,
জুড়াও আমাকে।'

....

স্মৃতি ঘূর্ণপাক খায়, দুলে উঠে
রক্ত ধমনীতে,
ফুঁসে উঠে রুদ্ধ ক্রোধ বাঁধ ভাঙ্গা
দুর্জয় সংগীতে।
বেজে উঠে চরণ শৃঙ্খল ঃ
আমি সব্যসাচী হবো
বৃহন্নলা যাক্ রসাতল।
আমি পুত্র বিনতার ঃ
কুটিলা কদ্রুর সর্বনাশ
আমি দৃপ্ত নচিকেতা ঃ
নতুন আলোয় ইতিহাস,
প্রিয়জন, প্রস্তুতি নাও
'কংসবধ' পালা এলো,—মারণাস্ত্র
শানাও শানাও!

সূর্যের ঔরসে হবে আততায়ী
রজনী গর্ভিণী
বৃত্রাসুর হত্যা করে
করবো দেবতাবৃন্দে ঋণী!
প্রিয়জন, বজ্রহাতে, করুণা কান্নার
টিপো গলা।
এখনো জাগ্রত সূর্য ঃ এখনো বিপ্লবী
রশ্মিফলা।

সবিতার হাত ধরে সম্মিলিত
মৈত্রী আসে ফিরে।
আপন জনের ডাক ক্রমে ব্যাপ্ত
সৌরলোক ঘিরে।"

আনন্দের হাট আবার জমাও না কেন, ভাইসব? সব ঠিক আছে। ঘরবাড়ি ভুঁই-ক্ষেত আছে, মানুষেরা আছে, মানুষদের বুকের মধ্যে এক-পাহাড় করে কথা জমে আছে। এসো, বেরিয়ে পড়—.

[ক্রমশঃ]

"শহর থেকে দূরে"—জাতীয় সড়কের একটি দৃশ্য

(হাওড়া জেলা)

বাগনান স্টেশনে যখন নামলুম, তখন রাত মোটামুটি ঘনিয়ে এসেছে, তবে চারপাশ তখনও বেশ জমজমাট। শনিবারের রাত, তাই বেশ কিছু "আপিসবাবু" গাড়ি থেকে নামলেন হাতে এটা-সেটা নিয়ে, গিন্নীর আদেশ আর ছেলেমেয়েদের অনুরোধ-উপরোধে ঢেঁকী গিলেছেন বোঝা যাচ্ছে। তা যাক শনিবারের রাতটায় কেমন ছুটির গন্ধ মাখানো আর গোটা রবিবারটা তো পড়েই রয়েছে বিশ্রাম আর ফুর্তির অফুরন্ত ভান্ডার নিয়ে। তাই ঘামে চুপসে যাওয়া মুখগুলোতে বেশ একটা স্বস্তির চিহ্ন, গর্তে ঢুকে যাওয়া চোখগুলোতে তাই একটা খুশির আলো।

তাড়াহুড়ো করে উঠে পড়লুম একটি খুব ছোট্ট চেহারার বাসে, নামটিও বেশ চমৎকার—"খোকাবাবু"। কনডাকটর তারস্বরে চেঁচাচ্ছে "মহিষরেখা", "দেউলটি", "নবাসন" আর ড্রাইভার থেকে থেকে "খোকাবাবুর 'পেট টিপে দিচ্ছে", "পক", "পক", "পক"। তারপরে যখন মোটা আর রোগা, বেঁটে আর লম্বা, ফর্সা আর কালো পাশাপাশি, ঠাসাঠাসি হয়ে দাঁড়িয়ে গেল, ঘামের গন্ধ, পাকাকলার গন্ধ আর শুঁটকী, চিংড়ির গন্ধ মিলেমিশে একাকার হয়ে আমাকে ওপর দিকে ঠেলে তুলে দিতে চাইল, ঠিক সেই সময় "খোকাবাবু" গর্জে উঠলেন, আমরা সবাই সমস্বরে বললুম—আঃ, বাঁচা গেল।

জাতীয় সড়কের দু' পাশে, গাঢ় কালো অন্ধকারে, টিমটিম করে দু'টি-একটি ক্ষীণ আলো জ্বলছিল, যেন মহাসমুদ্রের বুকে বাতিঘর। আমার কিন্তু মনে হচ্ছিল ঐ আলো একটা বিশেষ অর্থ বহন করছে। অবহেলিত, অনাদৃত, শ্রীহীন গ্রামবাংলার প্রাণপ্রদীপটি জ্বলছে নৈরাশ্যের অন্ধকারে, "খোকাবাবু" ছুটছিল, ছুটছিল আর সবাই, কিন্তু আমি যেন বাইরের অন্ধকারে নিজেকে হারিয়ে ফেলেছিলুম। বাগনান থানার গ্রামগুলি আজ এক অবশ্যম্ভাবী অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। যে ক'দিন ছিলুম কাউকে দেখি নি এই এলাকার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আশা-ভরসার কথা বলতে। গন্ডগ্রামের চাষীদের সংগে কথা বলেছি। তারা আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন রোদে ফাটা, রুক্ষ জমি। জল নেই, যে জলের আর এক নাম জীবন। সুজলা, সুফলা গ্রামবাংলার সেই সুপরিচিত, চির আকাঙ্ক্ষিত ছবিটি ফুটে ওঠে নি বাগনান থানার কোথাও।

প্রকৃতপক্ষে সেচের কোনও সুবন্দোবস্ত নেই এই অঞ্চলে। ডি-ভি-সি হবার পর থেকে ধীরে ধীরে শুকিয়ে গেছে দামোদরের নিম্নাংশ, ফলে চাষীর কপাল ফেটেছে। গরমের দিনে জলের অভাব খুব বেশি। "কাঁরিয়া-বিরামপুর", "মেস্রক", "কন্মারোয়া", "কাশীপাড়া", "পিপুল্যান" প্রভৃতি খাল অকেজো হয়ে পড়ছে ধীরে ধীরে। বিখ্যাত "মেদিনীপুর ক্যানাল", যা চওড়ায় একটি ছোটখাটো নদীর মতনই ছিল একদিন, আজ তা একেবারে শুকিয়ে গেছে। খালগুলোর অবস্থা দেখে ছোটবেলায় বইতে পড়া "দোয়াত আছে কালি নেই" কথাটা বার বার মনে পড়ছিল। "কাঁরিয়া-বিরামপুর" এবং "মেস্রক" এই দু'টি খালের স্লুইস গেটগুলির সংস্কার আশু প্রয়োজন। প্রথম খালটির স্লুইস গেটের একটি পাল্লা পালটে ফেলা বিশেষ দরকার আর দ্বিতীয় খালটির স্লুইস গেটটি আরও একটু বড় করা উচিত। বাগনানের এক নম্বর ব্লক আপিসের পেছনের খালটি সংস্কারের অভাবে আজ একেবারেই নষ্ট হয়ে গেছে। উচিত ছিল এই খালটিকে একদিকে "কাশীপাড়া" এবং অপরদিকে "পিপুল্যান" খালের সংগে যুক্ত করে দেওয়া। অনতিদূরেই, জাতীয় সড়কের উত্তরে রয়েছে "মেস্রক" খাল, যার সংগে উল্লিখিত খালটিকে মিলিয়ে দেওয়া মোটেই কষ্টকর হোত না। উভয় খালের সংযোগস্থলে টেঁপুরগ্রামের পূর্বদিকে একটি কালভার্ট বানালেই হোত। জাতীয় সড়কের কোনও ক্ষতিই হোত না, বরং বাগনান থানার কয়েকটি ইউনিয়নের চাষীরা সেচের যথেষ্ট সুবিধা পেতেন। কিন্তু কাজ হয়েছে অন্যরকম এবং চাষীদের তাতে বিশেষ কোনও সুবিধা হয় নি। ব্লক "এ"-র অধীন এলাকায়,— গোপালপুর মৌজায় একটি গভীর নলকূপ বসানো হচ্ছে। কাজ প্রায় সম্পূর্ণ হয়ে এসেছে এবং আশা করা যাচ্ছে যে, প্রায় ২৫০ একর জমির তৃষ্ণা মিটবে। কিন্তু বাকী জমির কি হবে? বর্ষা নামার পরে জলের সমস্যা যদিও বা মেটে কিন্তু দেখা দেয় নতুন এক দুর্যোগ। ডি-ভি-সি যে অতিরিক্ত জল বার করে দেয়, তা কাজে লাগান যায়

"কারিয়া-বিরালপুর খালের জীর্ণ স্লাইস গেট"

উল্লেখযোগ্য এবং এই মন্তব্য তিনি করেন ১৩৬৬ বঙ্গাব্দের ২১শে কার্তিকের "স্বাধীনতা" কাগজে প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে। তিনি বলেন যে, "দামোদর পরিকল্পনার আওতায় নিম্নাঞ্চলের জল-নিকাশের ব্যবস্থা করা হয় নি। শুধু তাই নয় এই দামোদর পরিকল্পনার উপত্যকার বন্যা-নিরোধী বাঁধ নির্মাণের ফলে যে হুগলী নদীর মোহনাই মজে যাবে, কলিকাতা বন্দর ধ্বংস হবে, সারা পশ্চিমবঙ্গে প্লাবনের করাল লীলা প্রবর্তিত হবে, একথা পরিকল্পকগণ আদৌ উপলব্ধি করতে পারেন নি"। বর্ষার সময় দামোদর শুধু যে চাষের জমির ক্ষতি করে তা নয়। বন্যার জল বার করে দেওয়া নিয়ে নদীর দু' পারের গ্রামবাসীদের মধ্যে ছোটখাটো দাঙ্গাও বাধে হামেশা। ওপারের চাষীরা চান জল বার করে দিতে, তাদের জমি, বসত-ভিটে, সব কিছুই নইলে ডুবে যাবে, কিন্তু জল যাবে কোথায়? দক্ষিণদিকে? নদীর খাত বেয়ে মোহনার কাছে? তা সম্ভব নয়! কেন না নদীগর্ভ পলি পড়ে এত উঁচু হয়ে উঠেছে যে জল সহজ গতিতে নামতে পারবে না, কাজেই জল বার করে দেওয়ার চেষ্টা করা মানেই এপারের চাষের জমিতে জল ঢুকিয়ে দেওয়া। এইভাবে বছরের পর বছর নদীর দু' পারের চাষীরা জলাতঙ্কে ভুগছেন। সরকারী কাগজ পত্তরেও বন্যার জলের অপসারণ নিয়ে দু' দল গ্রামবাসীর মধ্যে বিবাদের ইঙ্গিত পেয়েছি। ডি-ভি-সি হবার ফলে আরও না, উপরন্তু চাষের ভীষণ ক্ষতি করে। আগেই বলেছি যে ডি-ভি-সি হবার পর থেকে দামোদরের নিম্নাংশ একেবারেই শুকিয়ে গেছে। কেবল তাই নয়, শুকনো নদীখাতের অনেক জায়গা উঁচু হয়ে উঠেছে ওপর থেকে আসা জলের পলি পড়ে। ফলে বর্ষার সময় যখন ডি-ভি-সি জল ছাড়ে তখন অগভীর নদীখাত উপছে সেই জল দু' পাশের চাষের জমি ডুবিয়ে দেয়। বাগনান থানার দক্ষিণাংশে, প্রায় ২৫ হাজার বিঘে জমি জলে ডুবে যায়। "রবিভাগ", "কুলতেপাড়া", "কানাইপুর", "বাঁটুল", "মৃগকল্যাণ", "রূপাসগোড়ি", "পাঁচআনি", "ছআনি", "হাল্যান", "খাজুরনান" প্রভৃতি অঞ্চলে চাষীদের নাকের জলে চোখের জলে এক হতে হয়। এমনটি যে হবে তা নদীবিজ্ঞানী কপিল ভট্টাচার্য বুঝতে পেরেছিলেন। ডি-ভি-সি পরিকল্পনার এক সুন্দর ও সুযুক্তিপূর্ণ সমালোচনা তিনি করেছেন তাঁর "বাংলা-দেশের নদনদী ও পরিকল্পনা" বইটিতে। কপিল ভট্টাচার্যের একটি মন্তব্য বিশেষ

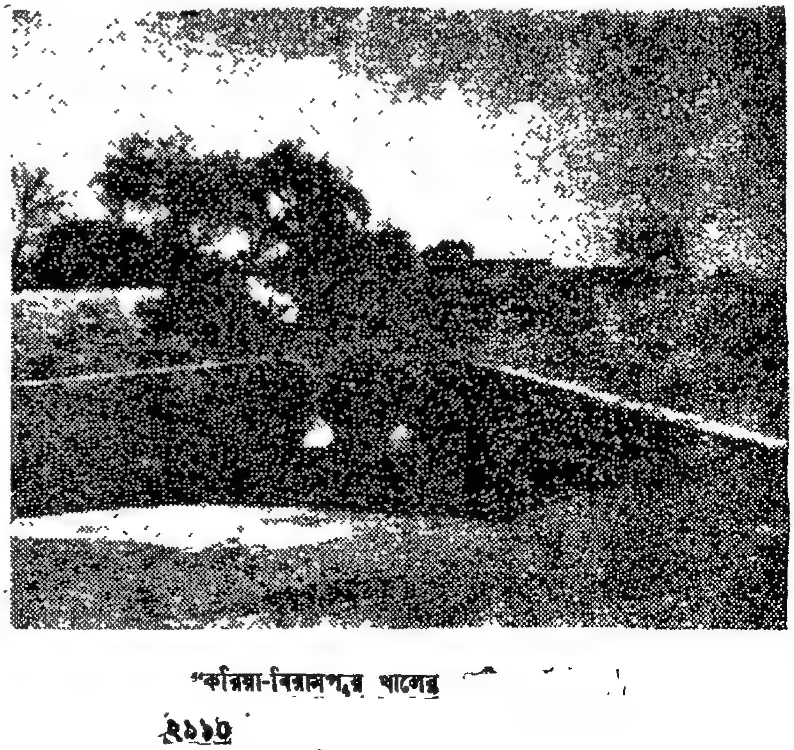

"কারিয়া-বিরালপুর খালের

একটা অসুবিধা দেখা দিয়েছে। বছরের অধিকাংশ সময়ে দামোদরের শুকনো খাতে জল না থাকায় জোয়ারের সময় সমুদ্র থেকে যে লোনা জল ভেতরে ঢোকে তা বাধাপ্রাপ্ত হয় না। ওপর থেকে জল এসে যদি এই সমুদ্রের লোনা জল আটকাতো তা হলে নুন জমে চাষের জমির ক্ষতি হোত না। একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, ডি-ভি-সি হবার ফলে বর্ধমান জেলার সুবিধে হয়েছে বটে, কিন্তু অসুবিধা হয়েছে অনেক বেশি। "বাঁটুলে"র এক বৃদ্ধ চাষী ভারী সুন্দর মন্তব্য করেছিলেন, ডি-ভি-সি সম্পর্কে। তিনি বলেছিলেন,—"ব্যাপারটা যেন খাজনার চেয়ে বাজনা বেশির মত"।

অতিরিক্ত জল বার করে দেওয়ার কয়েকটি উপায়ের উল্লেখ করেছেন স্থানীয় লোকেরা। দামোদরের মজাখাতের যেখানে যেখানে বর্ষার জল বাধা পায় সেই সব জায়গা গভীর করে কাটিয়ে দিতে হবে। "মেল্লক" আর "করিয়া-বিরামপুর" খাল দুটি আরও গভীর করে কাটাতে হবে এবং তাদের স্লুইস গেটের সামনের পলি কাটাতে হবে। তা না হলে বর্ষার জল স্লুইস গেটের সামনে গিয়ে বেরোবার আর পথ না পেয়ে দু' পাশের জমিতে ঢুকে পড়বে। মেদিনীপুরের ক্যানালটিকে কাজে লাগাবার একটি চমৎকার পরিকল্পনার কথা বলেছেন এই অঞ্চলের এক বিশিষ্ট সমাজসেবী। এই খালটি, রূপনারায়ণ ও দামোদর, উভয় নদকে সংযুক্ত করেছে। আজ তার বুকে জল নেই। কিন্তু খালটিকে যদি আবার সংস্কার করা যায় তাহলে এটি একটি অতি প্রয়োজনীয় নৌপথ হবে এবং স্থানীয় ব্যবসা-বাণিজ্যের সহায়ক হবে। কেবল তাই নয়, খালটিতে মাছ ছেড়ে একটি বড় ভেড়ীও করা যেতে পারে একই সঙ্গে। আবার খালের দু' পারে যদি সারিবদ্ধভাবে নারকেল গাছ বসানো হয় তবে যে পরিমাণ নারকেলের ছোবড়া পাওয়া যাবে তাতে একটা ছোট কুটীরশিল্প গড়ে তোলাও কঠিন হবে না। বেশ কিছু ধীবর, খালবিলের জল শুকিয়ে যাওয়ায় এবং অন্য কোন কাজ না পাওয়ায় স্রেফ উঞ্ছবৃত্তি করে দিন কাটাচ্ছে। মেদিনীপুর ক্যানালটিকে কাজে লাগালে তাদের কিছু অংশ একটু আশার আলো দেখতে পাবে।

সেচের সমস্যা যেমন আছে, তেমন আছে সার আর বীজের সমস্যা। বাগনান থানার বিভিন্ন অঞ্চলে যখন ঘুরেছিলুম তখন বহু চাষীই জানিয়েছেন যে, তারা সার সময় মত পান না আর যদিও বা পান তা বিশেষ সুবিধের হয় না। তা ছাড়া তাঁরা এমন কথাও বলেছেন যে সার পায় তারাই যারা সরকারী বিভাগে হরদম যাতায়াত করে এবং যখন সার পায় তখন গোপনে কালোবাজারে বিক্রি করে দেয়। আর একথাটাও ঠিক যে যথেষ্ট জলের অভাব থাকলে কেবল রাসায়নিক সার প্রয়োগ করেই ভাল ফসল পাওয়া যায় না, চাষীরা রাসায়নিক সারের প্রয়োগ সম্বন্ধে এখনও অনেক অজ্ঞ। কিন্তু তাদের খুঁটিনাটি শেখাবার দায়িত্ব নেবে কে? "সিডফার্ম"গুলোর উপযোগিতা সম্পর্কেও চাষীরা যথেষ্ট সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। তাঁদের মতে এগুলো অনেকটা পরগাছার মত। কাজে লাগে কম কিন্তু গালভরা নাম।

ধান, পান আর পাট বাগনান অঞ্চলের প্রধান কৃষিজাত পণ্য। কিন্তু এই তিনের অবস্থাই আজ অতি শোচনীয়। এখন মাঠে জল নেই, "তাইচুঙ" ধানের গাছ আর বাড়ছে না। আবার যখন গোটা আকাশটা গলে গলে পড়তে থাকবে আষাঢ়ের পর থেকে, ডি-ভি-সি'র জল দামোদরের মজা খাত ছাপিয়ে উঠে আসবে চাষীর ক্ষেতে, তখন হবে আবার "আমনের আকাল। বিঘের পর বিঘে ধানি জমি ডুবে থাকবে বন্যার জলে। বাংলাদেশের চাষীর কপালে যে সুখ নেই তা বেশ টের পাওয়া যাবে বাগনানে এলে।

রবীন্দ্র-জন্মোৎসব

অন্যান্য বৎসরের ন্যায়

এই উৎসবের মধ্যে এক পক্ষকাল

৬ মে থেকে ২০ মে

সুলভ মূল্যে—শতকরা ১২½ টাকা বাদ দিয়ে—রবীন্দ্রনাথের সমুদয় গ্রন্থ ও রবীন্দ্রসাহিত্য সম্বন্ধে বিশ্বভারতী প্রকাশিত ও প্রচারিত অন্যান্য গ্রন্থ বিক্রয়ের ব্যবস্থা হয়েছে। যে-কোনো পুস্তকালয়ে সর্বসাধারণ এই সুবিধা পাবেন।

॥ পুস্তকবিক্রেতাদের প্রতি নিবেদন ॥

নির্দিষ্ট সময়ে পুস্তকবিক্রেতাগণ যাতে ক্রেতাসাধারণকে পুস্তক সরবরাহ করতে পারেন সেজন্য নির্ধারিত অতিরিক্ত কমিশন ৩ মে থেকে এই কয়টি কেন্দ্রে তাঁরা পুস্তক সংগ্রহ করতে পারবেন—

বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়
২১০ বিধান সরণী
কলিকাতা ৬

বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ
৬।৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন
কলিকাতা ৭

জিজ্ঞাসা
১৩৩এ রাসবিহারী অ্যাভিনিউ
কলিকাতা ২৯

জিজ্ঞাসা
৩৩ কলেজ রো
কলিকাতা ৯

বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়
২ কলেজ স্কোয়ার। কলিকাতা ১২

বিশ্বভারতী শিল্পসদন
শান্তিনিকেতন। বীরভূম

দামোদর পুস্তকালয়
২৪ বিজয়চাঁদ রোড। বর্ধমান

পত্রিকা সিন্ডিকেট
গোল মার্কেট। নিউ দিল্লী

হুইলার ডিস্ট্রিবিউটার্স
১৫ এলগিন রোড। এলাহাবাদ

ভারতী ভবন
গোবিন্দ মিত্র রোড। পাটনা ৪

বিশ্বভারতী

মানবতা সম্পর্কে

শম্ভুনাথ চট্টোপাধ্যায়

অবশেষে মনে হয় মানুষের সম্পর্কে যা-কিছু
গভীর আশ্চর্য কথা
ডারউইন সত্য বলেছেন ঃ
সৃষ্টির প্রথম যুগে আমাদের পূর্ব-পুরুষেরা
অবশ্যই ছিলেন বানর।
স্বভাবে এখনো সেই পরিচয়, সেই বংশধারা
সর্বত্র উজ্জ্বল দেখি।

অন্ধকার গুহা থেকে আলোকিত চাঁদের আকাশে
অবিরাম সঙ্গে চলে আদিম অরণ্যচারী পরিচিত
চরিত্রের ছায়া।

আমাদের লীলাভূমি শুধু দুই ভিয়েতনাম নয়,
শুধু রোডেশিয়া নয়—
সমস্ত পৃথিবী জুড়ে এক
দুঃখোৎসব-নৃত্যের পাশে প্রসারিত আছে চিরদিন
বিশাল পুরনো দৃশ্যপট।

মানবতা—আজও তুমি উচ্চারিত হও বড় হাস্যকর
খুনীর সংলাপে।

"পান যদি ফলে,
লক্ষ্মী এলে ঘরে"।

তখন সন্ধ্যার অন্ধকার ধূসরে বুড়ীর মত একটু একটু করে এগিয়ে আসছে। বাটুল গ্রামে, এক চাষীর ঘরের দাওয়ায় বসে গল্প শুনছিলুম এই অঞ্চলের পান চাষের। বৃদ্ধ চাষী বললেন,—"তা দেখ বাছা, লক্ষ্মী এসেছেন, তবে আমাদের ঘরে নয়, শেঠজীদের ঘরে"। কথাটা খুবই সত্য এবং মর্মান্তিক রকমের সত্য। পানের ব্যবসাটা আজ পুরোপুরি অবাঙালীদের হাতে এসে গেছে। এরা বাঙলার বাইরে বিভিন্ন প্রদেশে পান চালান দিচ্ছে। যখন যেমন দাম বেঁধে দিচ্ছে, চাষীদের তাই মেনে নিতে হচ্ছে, কেন না পান এমনই জিনিস, যে ঘরে ফেলে রেখে দিলে একেবারে নষ্ট হয়ে যাবে। হতভাগ্য এই পানচাষীদের কথা ভাবলে খুবই কষ্ট হয়। এদের কল্যাণেই বাগনানের দোকান-পাট চলছে, যেদিন এদের বেচাকেনা ভাল হয় না সেদিন অন্যান্য ব্যবসায়ীদের মুখ-গুলোও থম্‌থম্‌ করে। আমাদের দুর্গতির এখানেই শেষ হয় নি, আরও কিছু বাকী আছে। একদিন যে বাঙালী ব্যবসাদাররা পানের চালানদার ছিলেন, আজ তাঁরা গুজরাটী, মাড়ওয়ারীদের সাথে পাল্লা দিতে না পেরে দালালের কাজ নিয়েছেন। তাদের অনুগ্রহে গরীব পানচাষীরা মরছে, আর অবাঙালী শেঠদের হচ্ছে পোয়াবারো!

বাঙলার চাষী আজ মরছে, দেহে মরছে, মনে মরছে। ভূমিহীন চাষীরা, কেউ কেউ আজ চাল পাচারের কাজে নেমেছে। চুরির হিড়িক পড়ে গেছে চারদিকে। আমার আশ্রয়দাতার বাড়িতে এরই মধ্যে পর পর দুবার চুরি হয়ে গেল। মনুষ্যত্বের এই অবমাননার জন্যে আমরা সবাই দায়ী। শহরে যে "বাবু-ভেয়ে"রা কলম পেশেন, তাঁদের কাছ থেকে চাষীরা কোনও ব্যাপারেই বিশেষ কিছু আশা করেন না। ও'রা ও'দের "জমি, জরু আর জিরাৎ" নিয়েই আছেন। গ্রামের প্রতি দরদ বলতে নিজের জমির প্রতি দরদ। সার্বজনীন কল্যাণের কথা কেউ বড় একটা ভাবেন না। এ অভিযোগ মনগড়া নয়, গ্রামে গ্রামে চাষীর ঘরে জোয়ান, বুড়ো সবাই এক কথা বলছে। নুনটে গ্রামের এক পানচাষী নালিশ করছিলেন আমার কাছে,—"বাবুদের বলে-ছিলাম, সরকারকে বল ব্যবসাটা শেঠদের হাত থেকে নিয়ে নিতে। আমাদের একটা কো-অপারেটিভ করে দেয় যেন। তা, কে কার কথা শোনে, তারা শনিবারে বাড়ি এসে সোমবার চম্পট দেয়, আমাদের তাই চিনির বলদ হয়েই থাকতে হবে।" তা "বাবুভেয়ে"রা যদি এখানেই থামতেন, তা হলেও একটা কথা ছিল। গরীব চাষী-দের সঙ্গে একটা আর্থিক বৈষম্যের সৃষ্টি করে তাঁরা থামেন নি, জাতিভেদ প্রথার বিষও ঢালছেন গ্রামসমাজের কাঠামোতে। নবাসনের এক ব্যক্তি আমাকে জানালেন যে, তিনি যখন একবার এক উচ্চবর্ণের বাড়ি আহারের নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে যান, তখন "তফসিলী" হওয়ায় তাঁর সাথে কেউ এক পঙ্‌ক্তিতে আহার করেন নি।

ভাবছি, আমাদের, অর্থাৎ শিক্ষিত মধ্যবিত্তদের উপায় কি হবে। উচ্চবিত্ত, উন্নাসিকদের সারিতে আমাদের ঠাঁই হবে না, আমাদের চলতে হবে এই ক্ষেত-খামারের হতভাগ্যদের সাথে হাত মিলিয়ে, কিন্তু তা কি আর আমরা পারব? *

(* আলোকচিত্র লেখক কর্তৃক গৃহীত)

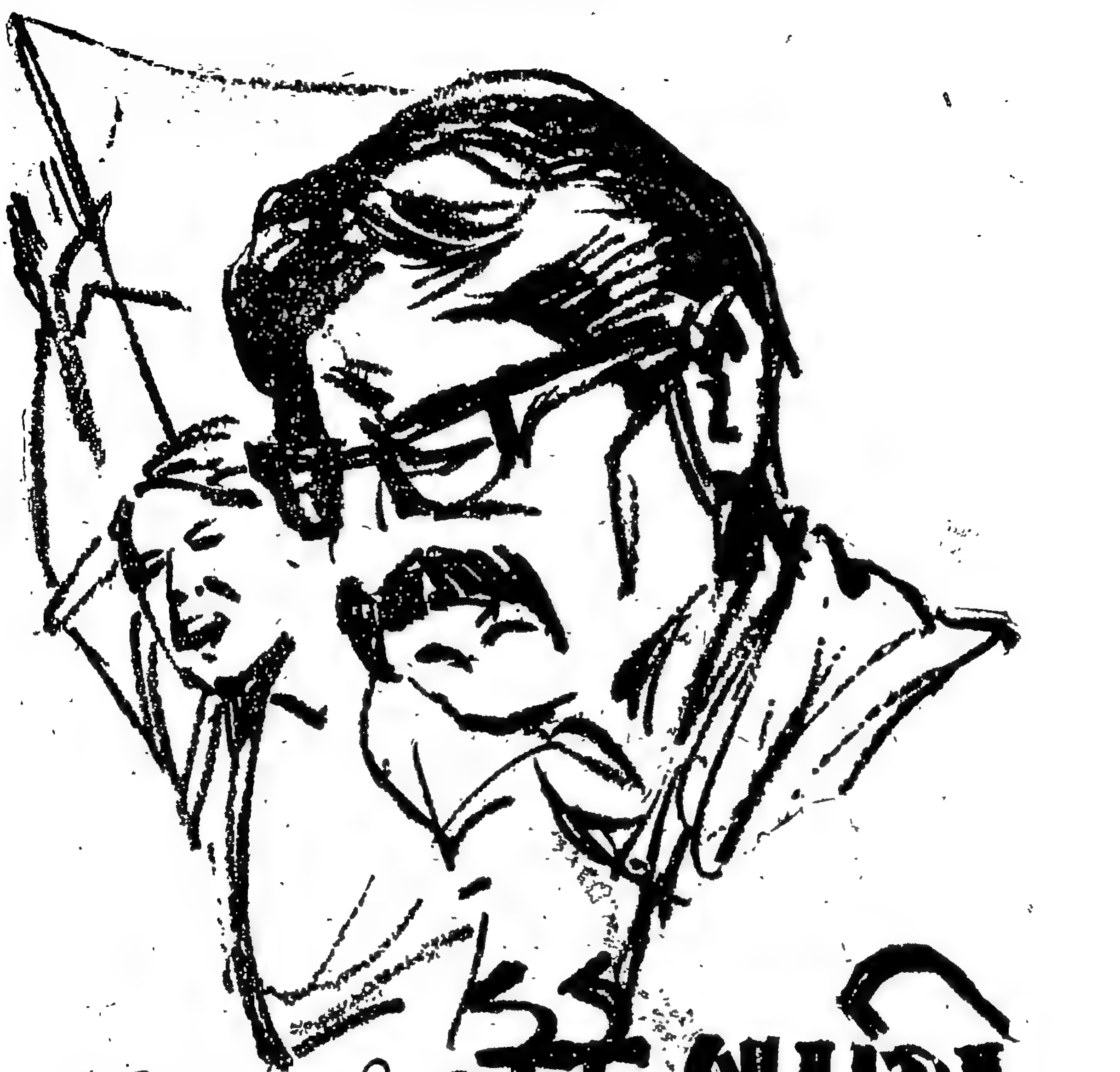

উটপাখি

সমীর মুখোপাধ্যায়

রাস্তার দুপাশে, আলিন্দে, পাঁচিলে, জানলায়, দোকানের সিঁড়িতে, বাড়ির ছাদে শুধু মানুষ আব মানুষ। এ এক অদ্ভুত উৎসব-মুখারিত সন্ধ্যা। এমন আর কখনো দেখা যায় নি। কাদা, ধুলো আর ধোঁয়ার বিষন্ন এ শহর হঠাৎ এক চমৎকার খুশিতে পাগল হয়ে উঠেছে। দুরন্ত হাউই ছুটছে আকাশে। বোমা ফাটছে মুহুর্মুহু। মেয়েরা আজ আগুন-রঙা শাড়ি পরে শাঁখ বাজাচ্ছে। লাল, নীল ডুম দিয়ে সাজানো দেবদারু পাতার তোরণের নিচে দিয়ে, মোটা আর ভারি গাঁদাফুলের মালা নিয়ে, বিরোধীপক্ষের বিজয়ী এম এল এ-রা চলন্ত লরিতে যুক্তকরে চলেছেন। কখনো ফুল ছুঁড়ে দিচ্ছেন রাস্তার লোকেদের গায়ে। কখনো লরি থেকে সকলের সঙ্গে হাতে হাত মিলোচ্ছেন। মাঝে মাঝে লরি দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে মাল্যদান যেন আর ফুরোয় না। ক্যামেরার ফ্লাশ বালব্ মাঝে মাঝে জ্বলে উঠছে। দোতলা-তেতলার বারান্দা থেকে অকস্মাৎ ঝরে পড়ছে ফুল। এই মুহূর্তে এ শহরের সমস্ত মানুষ যেন অকস্মাৎ পরস্পরের কাছে প্রিয় ও মহৎ হয়ে উঠেছে। মিছিল চলেছে। বিজয় মিছিল। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সুরেশ মাস্টার এ দৃশ্য খানিকটা দেখলো। কিন্তু কতোক্ষণ দাঁড়াতে পারে আর। একটা টিউশ্যনী সেরে এসেছে। আরেকটায় জয়েন দিতে হবে। ভিড়ের মধ্যে পথে আট্‌কে গেছে। গচ্চা যাওয়ার জন্যে পনেরোটা পয়সা পকেটে তখন থেকে উসখুশ উসখুশ করছে। যাই একটু ব্যানার্জি কেবিনের 'পাঁচন' গলায় ঢেলে আসি। ট্রানজিস্টার-ঝোলানো ব্যানার্জি কেবিনে সুরেশ ঢুকে পড়লো। স্যাকারিন মেশানো এই অখাদ্যও যে একটু ধীরে সুস্থে খাবে তারও উপায় আছে না কি? মগজের মধ্যে কোর ম্যাথামেটিক্সের পোকা কিলবিল করছে। কাল একটা অংক পারে নি। আজ ক'রে দিতেই হবে। অংক-গুলো মাধব রায় এ্যাতো শক্ত দিয়েছে। নিজে ত' শুনি বই বেচে লাল হয়েছে, বাড়ি, গাড়ি করেছে, আর আমি শালা এক চোতা স্কুলের পচা মাস্টার, পনেরো বছর একই ঘানিতে ঘুরপাক খাচ্ছি, কারা যেন আবার নাম দিয়েছে 'নেশন'স বিল্ডার', মনে হয়, যে হারামজাদা এরকম নাম দিয়েছে তাকে যদি হাতের কাছে পেতাম তবে তার 'নেশন'স বিল্ডার' ঘুচিয়ে দিতাম। এর চেয়ে যদি এদের মত 'জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ' বলে দু'হাত তুলে গৌরাঙ্গ হয়ে যেই যেই

নাচতে পারতাম, না হয় দু-চারবার জেলেই যেতাম, সুতাং, ধন্য এদের জীবন, ইট ওয়াজ বোজেজ রোজেজ অল দি ওয়ে... স্কুলে পড়া পেট্রিয়ট' কবিতাটি মনে পড়ে যাচ্ছে...কিন্তু কোন ম্যাথামেটিক্সের পোকাটা ...বিয়ে বাড়ির বরের মত এম এল এ-দের লাজুক লাজুক মুখ, মুখে গাদা গাদা হাসি.., না প্রশেসনের আদিখ্যেতা দেখে আর বাঁচি না, এ শহরের লোকদের সুরেশ মাস্টার বিলক্ষণ চেনে, যখন যে মাচায় ওঠে এরা তার দিকে তখন ঢুলে পড়ে, সেবার চীন...চীন নিয়ে কী কান্ড, চল শালা কম্যুনিস্ট পার্টির অফিস পোড়াবি চল, জ্যোতিবাবুর কুশপুত্তলিকা না কি বলে তাই পোড়াবি চল, সে খেলা বেশ হল, সেটা জুড়োতে না জুড়োতে খাদ্য আন্দোলন নিয়ে আরেক র‍্যালা, রেলের লাইন ওপড়াবি চল, বাসে আগুন দে, ট্রাম জ্বালা, সেটা মিটতে না মিটতে নির্বাচনে আরেক মজা, কংগ্রেসকে মুখ থুবড়ে ফেল কার্নিশে, খালি আওয়াজ...আওয়াজ, সুরেশ মাস্টার এ সবে নেই, আমি এক পচা স্কুলের চোতা মাস্টার, আওয়াজে আমি ভুলছি না, আমি ফরোয়ার্ড ব্লকের কাছে ফরোয়ার্ড ব্লক, কম্যুনিস্টের কাছে কম্যুনিস্ট, কংগ্রেসের কাছে কংগ্রেস, কোনো একটা পার্টির পতাকার নিচে দাঁড়াতে আছে?

কংগ্রেসকে সাপোর্ট করলে ছাত্র-পরিষদের ছেলেরা তোমার 'গোয়ালে' আসবে, কিন্তু এস, এফ, এ'র ছেলেরা আসবে না। কম্যুনিস্ট পার্টিকে সাপোর্ট করলে এস, এফ, এ'র ছেলেরা তোমার 'গোয়ালে' আসবে কিন্তু ছাত্রপরিষদ আসবে না। তাহলে তোমার চলেটা কিসে এই মাগ্গিগন্ডার বাজারে......মাইনে যখন যেমন তেমন ...তাই পাবার ঠিক নেই। দু-তিন মাস ত' প্রায়ই আন্ডার-কন্ট্রাক্টে হয়, তখন যার 'গোয়াল'টি বড়ো সেই টেকে আর তা না হলে...

'স্যার, চার বছর আগে একদিন আপনি খাওয়াবেন বলেছিলেন।' সুরেশ মাস্টার ঘাড় ফিরিয়ে সুনন্দকে দেখলো, তারই অনেকদিনের পুরনো ছাত্র, সাত-আট বছর আগেকার, পরনে ময়লা গেরুয়া, কাঁধে মার্কামারা সুতির ব্যাগ, মুখে দাড়ি, হাতে এক বান্ডিল ইস্তাহার, খুবই ব্যস্তসমস্ত ভাব, ঝুপ করে পাশের চেয়ারে বসে পড়লো।

'খাওয়াবো বড় একটা কাউকে বলি না। কিন্তু মনে হচ্ছে তোমাকে বলেছিলাম। তুমি কিন্তু তুমিই আছো সুনন্দ। এতোদিনে তোমার 'চার বছর' হল? কিন্তু খাওয়াবে ত' তুমি আজ। 'বিজয় মিছিল' বার করেছো। তোমাদেরই ত' দিন।'

'হ্যাঁ, বিজয় মিছিল।' সুনন্দের চোখের তারায় বিদ্যুতের ঝিলিক খেলে গেল, 'কিন্ত এই কি সব?'

সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়লো। ইলেকশনের কিছু আগেই হবে। একদিন গোয়াবাগানের পাশ দিয়ে কোথায় যেন যাচ্ছে সুরেশ মাস্টার। তখন সন্ধ্যের দিকে বিকেলে বেশ অনেকটা এগিয়েছে। কর্পোরেশনের আলো জ্বলে নি। কালচে রঙটা আকাশে একটু একটু করে ছড়িয়ে পড়ছে। সেদিন পেছন থেকে 'স্যর' শুনে দাঁড়াতে হল। পেছন দিক থেকে সুনন্দ আসছে। সঙ্গে একটি রোগা, রঙ ময়লা, ঢ্যাঙা মেয়ে। হাতে বই। ছাত্রী। সুনন্দ খুবই রোগা তবু গায়ের টি-সার্টটি খুলে ফেলেছে। কাঁধের ওপর ওটা ফেলে বেশ বীরত্বব্যঞ্জক ভংগিতে সুরেশ মাস্টারের দিকে তাকিয়ে বলল, 'পরিচয় করিয়ে দি। ইনি আমার মাস্টার মশাই। সাত-আট বছর আগে শেষ পড়া এনার কাছে পড়ি। আর ইনি মানে রেবা সেন, বেথুনের ছাত্রী, বি-এ পার্ট ওয়ান পরীক্ষা দেবার জন্যে নাছোড়বন্দা।'

'ও, আচ্ছা।' সৌজন্য সহকারে বেথুনের ছাত্রীটির দিকে একনজর তাকিয়ে একটু হেসে সুরেশ মাস্টার সুনন্দকে বলল, 'তারপর, চলেছো কোথায়?'

'এ্যাঁ!' বলে মুখটা উঁচু দিকে তুলে তারপর নাবিয়ে একটা অদ্ভুত ভংগি করে সুনন্দ বলল, 'আপনি হয়তো জানেন না আমি ভালো বোমা বাঁধতে পারি। আমার পকেটে এখন বোমা আছে।'

'বোমা আছে?' বলে কি ছোকরা? সুরেশ মাস্টার সত্যিই চমকে উঠেছিলো, কী সর্বনাশ। বোমার স্বভাবই হচ্ছে এই যার কাছেই থাকুক না কেন এটা কোন না সময়ে ফাটেই।'

'ফাটুক না।' বেথুনের ছাত্রীটির দিকে একটু তাকিয়ে সুনন্দ বেপরোয়া হবার চেষ্টা করলে। তারপর ভ্রূ দুটো কুঁচকে বলল, 'আপনি আথের স্বাদ নোনতা' পড়েছেন? কম্যুনিস্ট তরুণদের হাতে হাতে ওটা ঘোরে।'

'পড়ি নি।' সুরেশ মাস্টার বলল, 'আমি কম্যুনিস্ট নই। তরুণও নই।'

'এ্যাঁ'—আবার সেই মুখটা উঁচু দিকে তুলে আবার নাবিয়ে অদ্ভুত সেই উচ্চারণ। দ্বিতীয়বার এরকম করাতে সুরেশ মাস্টার বুঝলো এটা ওর নিজের দিকে অপরের মনোযোগ আকর্ষণের বিশেষ একটি আর্ট। আর্ট দেখানো হবে গেলে সুনন্দ বলল, 'কাল প্রেসিডেন্সী কলেজের একটা জায়গায় আমরা লুকিয়েছিলাম। আরেকটু হলে মারা যেতাম। গুন্ডারা দেখতে পায় নি। একজন ইসারা করলো। সঙ্গে সঙ্গে পিল পিল করে'......

'বেথুনের অসুবিধে হচ্ছে', সুরেশ মাস্টার মেয়েটির অসুবিধের কথা চিন্তা করছিলো। মেয়েটা মাঝে মাঝে রঞ্জিত ঠোঁট কামড়ে, পা ঠুকে, তারের শালিখের দিকে একদৃষ্টে অর্থহীন তাকিয়ে বুঝিয়ে দিচ্ছিলো ব্যাপারটা।

'অসুবিধে হচ্ছে?' সুনন্দ মেয়েটার দিকে এমনভাবে তাকালো যে ও সংকুচিত হয়ে গেল। অমন যে সুনন্দ, 'বিপ্লবের কারুশিল্পী, পকেটে বোমা নিয়ে ঘোরে তার সংগিনী হবার সুখ আবার যে আলোচনায় সে নিজে অংশগ্রহণ করতে পারছে না, শুধু শুনেই যাচ্ছে তার অর্থহীনতা মেয়েটাকে ক্রমে ক্রমে গ্রাস করছিলো। সুনন্দ কিন্তু কোনকিছু গ্রাহ্য না করে বলে চলল 'যে কথা বলছিলাম। সঙ্গে সঙ্গে পিল পিল করে ডজনখানেক গুন্ডা বোমা নিয়ে আমাদের আক্রমণ করলো। তখন আমি সেই অন্ধকারে'......

'দাড়িটা কার সুনন্দ?' সুরেশ মাস্টার হঠাৎ প্রশ্ন করলো।

'কার মানে?' চমকে উঠলো সুনন্দ।

'এতোদিন ত' এ দাড়ি এখানকার যুবকদের চিবুকে দেখি নি।'

'হ্যাঁ। যে গুয়েভারার চিবুকে এ দাড়ি প্রথম গজায়।'

'সঙ্গে সঙ্গে তোমরা রপ্তানী করে নিলে? ঐ জন্যেই কিছু হচ্ছে না। নিজের দাড়ি লাগাও।' সুরেশ মাস্টারের খোঁচাটা সুনন্দকে একটু জখম করলো। কিন্তু দমাতে পারলো না।

'আপনাদের ঐসব জাতীয়তাবাদী ধারণাগুলো লেনিন অনেক আগেই পচিয়ে দিয়েছেন।'

'তা সত্ত্বেও, ইট ইজ স্টীল ওয়াম, সুনন্দ।' আর সুরেশ মাস্টার কথা বাড়ালো না। বেশি রাজনীতি হয়ে যাচ্ছে। তার স্ত্রী তাকে বারণ করেছে। মনে মনে তুমি......

'আচ্ছা চলি।' সুরেশ মাস্টার চলে গেল চটি বাজিয়ে। নিয়ন জ্বলে উঠেছে কলকাতার রাস্তায়। ওরা যাচ্ছে। পেছন ফিরে দেখলেন কোথায় যাচ্ছে ওরা? মরুগ্যে। দেখি জগুবাবুর বাজারে। শুনেছি ওখানে কপি সস্তা। সুরেশ মাস্টার সস্তার কপি ছাড়া এ মুহূর্তে আর বেশি কিছু ভাবতে পারলো না।

'তুমি এখন কোথায় চাকরি করছো সুনন্দ?'

'চাকরি?' ব্যানার্জি কেবিনের মধ্যে দৃষ্টিটাকে অনেকখানি প্রসারিত করে তারপর সুরেশ মাস্টারের দিকে গুটিয়ে এনে, বড়ো কৃপা করে যেন সুনন্দ হাসলো, 'চাকরি করি না। বি-কম পড়ছি।'

'বছর চার আগেও এ ঐ একই পড়া পড়ছিলে না?' তীক্ষ্ন চোখে সুরেশ মাস্টার তাকালো সুনন্দের দিকে।

'হ্যাঁ। পাশ ত' যখন তখন করতে পারি। আমি ইচ্ছে করে ড্রপ করছি। পাশ করে গেলে ত' কলেজে থাকতে দেবে না।'

'কলেজে থাকতেই বুদ্ধি চাও সারা জীবন? স্কুলে কিন্তু একই ক্লাসে বছর বছর থেকে যাবার গোঁ ত' তোমার দেখি নি সুনন্দ কোনদিন?'

সুনন্দ উত্তেজিত হয়ে উঠলো, 'জিনিসটাকে আপনি হাল্কা করে দিচ্ছেন। আমি কেন কলেজে আছি এখনো, সেটা আমার পার্টি জানে।'

'কিন্তু তোমার বাড়ির অবস্থা ত' তেমন...তাছাড়া এসব কাজ করবার জন্যে বড়লোকের ছেলের ত' অভাব নেই... তোমাকে ত' আফটার অল করে যেতে হবে, তোমার এই একই ক্লাসে বছর বছর থেকে যাওয়া. অন্যদিকে তোমার বাড়িব যা অবস্থা, তাতে'......

হঠাৎ সুনন্দ খুব গম্ভীর হয়ে গেল। তাল আঁটির মত শক্ত মুখটা আরো শক্ত হয়ে উঠলো। অস্থির হয়ে উঠলো টেবিলে রাখা সুনন্দের মুষ্টিবদ্ধ হাত দুটি।

'সামনে বিপুল তরঙ্গ। লড়াই-এর ছকও দ্রুত পাল্টে যাচ্ছে। এই তরঙ্গে যদি ঝাঁপ না দিতে পারলাম তবে বৃথাই জন্মগ্রহণ করা। এখন কে আমার জন্যে কি আশা করে, বাড়ির অবস্থা কেমন ইত্যাদি. ....এসব'......

সুনন্দ অনুচ্চ, মৃদুকণ্ঠে হেসে উঠলো।

তারপর একটু থেমে, দাঁতে দাঁত ঘষে সুনন্দ দাঁড়িয়ে উঠে হঠাৎ চীৎকার করে উঠলো, 'যতোদিন বুর্জোয়া, জমিদার, আমলাতন্ত্র থাকবে......শ্রেণীসংগ্রাম...এখন স্পষ্ট হয়ে যাওয়া ভালো, কোন রাজনৈতিক দল জোতদাব, জমিদারকে সমর্থন করে, কারা'...

এ কি, সুনন্দ হঠাৎ মৃগী রোগীর মত কি সব হিং টিং ছট বলছে? নড়ে-চড়ে বসলো সুরেশ মাস্টার। আর খবরের কাগজে দেখা সোয়াকর্নের সেই বিখ্যাত ছবি, মাইকের সামনে দু'খানা হাতের সব ক'টি আঙুল কাঁকড়াবিছের মত পাকিয়ে, দাঁত কড়মড় করে বক্তৃতা দেওয়ার সেই বিখ্যাত মুদ্রা টেলিভিশনে দেখতে পেল।

'আপনি অদ্ভুত! কোথায় আমার স্পিরিট তুলবেন, তা নয়, বাবা, মা, অবস্থা আর কেরিয়ারেব কথা তুলে আমাকে ড্যাম্প কবে দিচ্ছেন! যাই।'

মনে মনে অপমানিত বোধ করলো সুরেশ মাস্টার।

'হ্যাঁ, বিপ্লবের দেরি হয়ে যাচ্ছে।' একটা স্থূল রসিকতা করলো। সুনন্দ সুন্দর হাসলো।

'ব্রাঞ্চ কমিটির মিটিং। আর দেরি করা যায় না।'

অথচ এই সুনন্দ, সুরেশ মাস্টার দশ বছর আগেকার সুনন্দকে মনে করবার চেষ্টা করলো, তখন ও ক্লাস এইটে পড়ে, বেশ বড়ো, একদিন কাছে এসে কাগজ-পাকানো কি একটা হাতে গুঁজে দিয়ে দে ছুট, সুরেশ মাস্টার একটু অবাক হয়ে কাগজ পাকানোটা খুলে দেখে, সেখানে দু'টি লাল মাছ লজেন্স, কি ছেলেমানুষই না ছিলো সুনন্দ, কি মিষ্টি বে ছিলো।

হুঁ, বিপ্লব! যতোসব ট্রাম পোড়ানো, বাস-জ্বালানোর দল! যেন ট্রাম পোড়ালে চাল পাওয়া যায়, বাস জ্বালালে কেরোসিন পাওযা যায়!

চালের বদলে পোড়া ট্রাম টাক ডুমা ডুম ডুম। কেরোসিনের বদলে পোড়া বাস টাক ডুমা ডুম ডুম। কেরিয়াবের বদলে ছাত্র নেতা টাক ডুমা ডুম ডুম!

সুরেশ মাস্টার, সুনন্দ চলে গেলেও, কিন্তু সহজে উঠতে পারলো না ব্যানার্জী কেবিন থেকে। স্কুলে পড়ানো সুরেশ মাস্টারের আলো, তার বাতাস। সে ও খাদ্য। কিন্তু আসল খাদ্য মাটির নিচে। রস। টিউশ্যনীর শেকড় চালিয়ে তবে তাকে পেতে হয়। শুধু সেইজন্যই নয়। ওটার জন্যে এতো মাথাব্যথা সেটা শুধু টাকার জন্যেই নয়।

এ এক অদ্ভুত ধরণের বাধ্যবাধকতা। দুদিন ক্যাজুয়েল লিভ নিয়ে স্কুল কামাই করা চলে। সেটা চাকরি। কিন্তু টিউ-শ্যনী কামাই করা চলে না। কেন না সেটা চাকরির বাড়া। কে যেন আলস্যের ঘাড় ধরে খাড়া দু' পায়ে দাঁড় করিয়ে দেবে যথাসময়ে। না গেলে চৌয়াঢেকুর উঠবে। বাড়ি বাড়ি পুরুতগিরির মতই এই বাড়ি বাড়ি ঘোরা। মাস গেলে ঐ ছাত্রের হাত দিয়েই ময়লা নোট গুণে নেওয়া। লজ্জা নেই, ঘেন্না নেই, অমনি জীবন। সেই টিউশ্যনী টান থাকলেও উঠতে পারলো না বেঞ্চিতে পেবেক-আঁটা সুরেশ মাস্টার কেন, কে জানে আরেক সুনন্দকে তার মনে পড়ে গেল ঠিক দু' বছর আগের।

হাওড়া স্টেশনের বাইরে বুকস্টল-গুলির আশেপাশে ঘোরাঘুরি করছে মাস্টাব মানুষ। কিনতে ত' পারবে না। এই একটু ম্যাগাজিনগুলি শুঁকে শুঁকে দেখা। আগে কতো অভ্যেস ছিলো বই কেনাব। কলকাতা এলেই কিছু একটা বই কিনতেই হবে।

সেদিন কি আব আছে? সংসারে ঢুকে গেছে সুরেশ মাস্টার অনেকদিন। কাচ্চা-বাচ্চা ফ্যামেলি কণ্ট্রোলেব নিয়মও অতিক্রম করেছে। চোর হযে আছে সুবেশ মাস্টার আর কাব যেন চাবুক খাচ্ছে পড়ে পড়ে, সর্বাংগে এখন কালসিটে দাগ।

'স্যর'—এরা ঠিক আছে। হয়তো লুকিয়ে চুরিয়ে নাইট শো'য়ে একটা হিন্দী ছবি দেখতে গেছে সেখানেও মাটি ফুঁড়ে একজন ছায়ামূর্তি বেরুবেই. তার-পর বিস্মিত প্রশ্ন, 'স্যর আপনি!' এমন কি সুরেশ মাস্টার তার বিয়ের সময়েও একই ব্যাপার লক্ষ্য করেছে। যেখানে তার বিয়ে হয়েছিলো সেখানে তার ছাত্র থাকার কথা নয়, সেখানেও ছাদনাতলার ঘেরা-টোপের মধ্যেও, টেলিস্কোপের মত অনুসন্ধিৎসু চোখ আর সেই চোখে বিশ্বের বিস্ময়, 'স্যর আপনি!' 'স্যর'।

'কি ব্যাপার সুনন্দ?'

'আপনি ত' কাগজটাগজ মানে ম্যাগাজিন খুবই পড়েন।'

'না। এখন আর পড়ি না। সময় পাই না।'

'আমার স্যর এবার দশ জায়গায় কবিতা বেরিয়েছে।'

'ভালো। খুবই ভালো। তুমি কবিতা লেখ নাকি তা' জানতাম না। ঐ সব বড় বড় কাগজে ত' তোমার কবিতা'......

'না।' একটু অপ্রস্তুত হল সুনন্দ। তারপর বেপরোয়া ভঙ্গিতে বলল, 'এসব ম্যাগাজিনে লিখে কি হবে? ওরা ব্যবসা বোঝে। কবিতার কি বোঝে? আমি লিটল ম্যাগাজিনের কবি। ওখানে কতো সুবিধে। নানারকম পরীক্ষার সুযোগ পাই।'

'কিসের পরীক্ষা?' স্কুল-কলেজের মত কবিতার পরীক্ষা আছে নাকি?'

সুনন্দ সুরেশ মাস্টারের অজ্ঞতায় বেশ একটু অবজ্ঞার হাসি হাসলো।

'হ্যাঁ।' কবিতার চেহারা আর চরিত্র নিয়ে পরীক্ষা। আমরা এখন কবিতার গা থেকে প্রতীক, উপমা, মিষ্টি লিরিক ঝরিয়ে দিয়ে রয়েলটি ভেতরে যে দ্বিতীয় রিয়েলিটি আছে তার'......

ক্রমশই সুরেশ মাস্টারের পক্ষে ব্যাপারটা জটিল হয়ে উঠেছিলো। আমি ওসব কি বুঝি। আমি বুঝি কুমুদরঞ্জন, রবীন্দ্রনাথ, কালিদাস রায়। পাঠ সংকলনে যা পড়াচ্ছি। এসো, কাকে যৌগিক ক্রিয়া বলে, বা চলে এসো, যত্ব-ণত্বের বিধানের ব্যাপারে, তা' নয়...

'তুমি এখানে কোথায় এসেছিলে?'

'কফি হাউসে।'

'কফি হাউসে কখনো যাই নি।'

'কফি হাউসে কখনো যান নি? কফি হাউসই ত' সব। গোটা বাংলাদেশ বলতে পারেন। আমার কফি হাউসের ওপর একটা কবিতা আছে। কেটলিতে জল ফোটার কবিতা। সমস্ত কলকাতা ফুটছে।'

'এসব করে কোন লাভ নেই। বরং বড়ো বড়ো পত্রিকা ধরো, তাতে'......

'মরে যাবো স্যর। তবু ওদের দরজায় ধাক্কা দোবো না।'

একটা যেন অভিমান, একটা আক্রোশ ফুটে উঠলো সুনন্দের কণ্ঠস্বরে 'আমকে আদর্শ নিয়ে বেঁচে থাকতে দিন স্যর।'

'এ কিসের আদর্শ? কবিতার আবার

আদর্শ কি? ক্রমেই জটিল করে তুলছো ব্যাপারটা।'

'আপনাকে বোঝানো অসম্ভব।'

'কেন, অসম্ভব কেন?'

'মদ, ভাঙ যে না খায়, স্ত্রীলোক সংসর্গ যে না ক'রে'...

'বলা উচিত নয়। তবু বলছি ওসব হবেও একজন কবি আদর্শবান থাকতে পারেন।'

'এ্যাঁ' বলে কি সুনন্দ! 'ঠিক আছে। একদিন ভালো করে এ ব্যাপারে আলোচনা... আজ তাহলে'... কথা সেদিন এইখানেই শেষ। তারপর একদিন সূর্যাস্তের রঙে এ শহর অলৌকিক হয়ে উঠলো। আর রিয়েল সিটি। মেঘের ফাটল চুইয়ে রঙের একটা আমেজ ভাঙাচোরা লোকগুলোর মুখে লেগে গেল। বাজারের বাঁধাকপিগুলো পর্যন্ত বাহারে হয়ে উঠলো। সুরেশ মাস্টারের মত বাসি, মরা লোকও সেদিন মনস্থ করে ফেলেছে, আজ একছড়া রজনীগন্ধার মালা কিনবেই। ইচ্ছেটা, এখনকার স্ত্রীর ভেতর থেকে দশ বছর আগেকার স্ত্রীকে, একটুখানির জন্যে......

হঠাৎ সুনন্দকে দেখলো সুরেশ মাস্টার। বাজারের সামনে এক বাণ্ডিল পত্রিকা হাতে দাঁড়িয়ে থাকতে। সুনন্দ একটা করে পত্রিকা ভিড়ের ভেতর থেকে ওপর তুলে ধরছে আর খুবই বিনীতভাবে বলছে, 'কবিতার জন্যে মাত্র চার আনা, কেউ হেসে চলে যেতে চাইলে সুনন্দ বলছে, 'কপির জন্যে চার আনা রেখে কবিতার জন্যে চার আনা', তাতেও কাজ হচ্ছে না দেখে রেগে গিয়ে ধৈর্য হারিয়ে বলছে, 'অতো বড়ো একটা কুমড়ো কিনলেন মশাই, আর একটা কবিতার বই কিনতে পারলেন না?'

সুরেশ কাছে যেতেই যা হবার তাই হল। সুনন্দ একটি গছিয়ে দিলো। সুরেশ মাস্টার বলল, 'এসব কি?'

দারুণ উৎসাহ নিয়ে সুনন্দ বলল, 'কবিতা দৈনিক।'

'সে আবার কি?'

'অবাক হয়ে গেছেন ত'! এরকমই অবাক হয়ে গেছেন বাংলা দেশের বড় বড় কবিরা। জ্বলজ্বলে চোখে সুনন্দ সুরেশ মাস্টারের দিকে তাকালো।

'তুমি সবাইকে অবাক করে দেবার জন্যেই এসব বার করছো? তা' অবাক করে দেবার জন্যে হলে আরো অনেক জিনিস নিয়েই ত' অবাক করে দেওয়া যায়, বরং আরো ভালোভাবে অবাক করা যায়।'

'অবাক? হ্যাঁ। অবাক করে দেবার জন্যেই প্রধানত। কেন, অবাক হওয়া কি ভালো নয়?' ফ্যালফ্যাল করে তাকালো সুনন্দ। সুরেশ মাস্টার জবাব দিলো না। অতি মৃদু একটু হাসলো।

ঐ হাসিটা এমনি যে অমন যে নিরেট আদর্শবাদ সুনন্দের, তাও চিড় খেল। সুনন্দ হঠাৎ এ পকেট ও-পকেট হাতড়ে কি একটা চৌকোমত বার করে দিলো সুরেশ মাস্টারকে।

'দেখুন।'

'কি দেখবো? এটা ত' মান্থলী।'

'তবু দেখুন।' ম্লান হাসলো সুনন্দ। নামের জায়গায় দেখলো সুরেশ মাস্টার লেখা 'নোস্বোয়াদ' কথাটি ইংরেজীতে লেখা। ওটা কি? এরকম অদ্ভুত ইংরেজী ওর গোটা মাস্টারী জীবনেও শোনে নি। খুবই উৎসুক হয়ে উঠলো জানবার জন্যে। নোস্বোয়াদ না নৌসাদ?

'নৌসাদ? সে আবার কে?'

অত্যে দুঃখেও সুনন্দ সুরেশ মাস্টারের ভারত-প্রমাণ অজ্ঞতা দেখে হাসলো।

'নৌসাদ জানেন না? নৌসাদ হচ্ছে ভারতবিখ্যাত মিউজিক উইজার্ড। কিন্তু আমি তা লিখি নি। আমি 'নো স্বোয়াদ' লিখেছি। জীবনে স্বাদ নেই। নো স্বোয়াদ। 'গোর্কী' যেমন ছদ্মনাম। এটাও তেমনি।'

'এইটুকু তোমার জীবন। এর মধ্যে জীবনের স্বাদ বিস্বাদ বুঝে ফেললে?'

'এইটুকু আর কোথায় হল?' হাহাকার করে উঠলো সুনন্দ, 'এর ঢের আগে কিশোর কবি র‍্যাবো অমর কবিতা লিখেছেন তাছাড়া আমাদের সুকান্ত......আর আমি পাঁচ বছর কলকাতার মাটি কামড়ে আছি, ওরা আমাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিলে, ঐ বড় বড় ম্যাগাজিনের দল, বছরে একটা ছাপায়, এইভাবে দশটা বছর গেলে দশটা, আরো দশটা বছর গেলে বিশটা অতোদিনে আমি বৃদ্ধ, বৃদ্ধ, বৃদ্ধ হয়ে যাবো, এনুয়ি, অবসাদ, এমনি করে ওরা আমার বুকে এনুয়ির বীজ বুনে গেছে, এইভাবে ওরা' .. শেষের দিকে দারুণ হতাশায় চোখ ফেটে জল ঝরে পড়লো

বেশি বেশি কবিতা লিখতে পারে নি বলে কাঁদছে সুনন্দ? অবাক হয়ে সুরেশ মাস্টার সেদিন তাকিয়েছিলো সুনন্দের দিকে। তার সমস্ত মাস্টারী জীবনে কবিতার জন্যে সে কাউকে কখনো কাঁদতে দেখে নি।

বিজয় মিছিল চলে গেছে। রাস্তায় তবু অগুনতি মানুষের ভিড়। আনন্দ আর খুব আনন্দ হলে বুকে যে বেদনা জমে তার জন্যে মানুষ মানুষকে পাগলের মত বুকে বেঁধে ফেলছে। কে যেন রাস্তার মোড়ে হাত দুটোকে চোঙার মত করে বক্তৃতা দিচ্ছে, ইনকিলাবী ঝাণ্ডা তুলে ধরুন। কাজ অনেক বন্ধুগণ। নজরুলের কবিতা স্মরণ করুন, যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দন রোল আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না, অত্যাচারীর খড়্গ কৃপাণ ভীম রণভূমি রণিবে না, বিদ্রোহী রণক্লান্ত আমি সেই দিন'......

পাগল। সুরেশ মাস্টার নিজের মনে-মনেই কথাটা উচ্চারণ করে ব্যানার্জি কেবিন থেকে উঠে পড়লো। 'বিপ্লবের লাল ঘোড়া ঐ ডাকে ঐ।' কে যেন বলতে বলতে উত্তেজিত হয়ে উঠলো। পাগল, পাগল সব।

ব্যানার্জি কেবিন থেকে উঠে, ছাত্রের বাড়িতে, টিউশ্যনীর কড়া নাড়তে নাড়তে সুরেশ মাস্টার ভেবেই পেলো না আজকের বিক্ষুব্ধ, ভয়ংকর, বিপজ্জনক সুনন্দের কথা ভাবতে ভাবতে দু' বছর আগের সেই ক্লান্ত, বিষণ্ণ, ব্যর্থ কবি সুনন্দকে তার কেন মনে পড়লো।

কে যেন পাক দিয়ে একটা ঘূর্ণিঝড়কে জাগিয়ে দিয়েছে হঠাৎ। মানুষ ক্ষেপে গেছে বুড়ো মহিষের মত। ঢেউ তুলে আসছে ঘটনার পর ঘটনা। বছরের পর বছর তেলচিটে খাটিয়ায় বসে, তুলো-ওঠা বালিসে ঠেস দিয়ে খৈনি ডলতে ডলতে যা শুধু ভাবনার চৌকাঠেকুর, আজ চোখের নিমেষে তাই ঘটে যাচ্ছে। কোন কিছুই আর নতুন থাকছে না। অতি দ্রুত পুরনো হয়ে যাচ্ছে। কেন না আরো, আরো নতুন আসছে গাঁদি দিয়ে, ডংকা বাজিয়ে, রৈ রৈ করতে করতে। কোনো কেন্দ্র নেই এখন। ঝোড়ো বাতাসে ডিগবাজি খাচ্ছে এতোদিনের সাজান ছক। যেন মস্তিষ্কের লড়াই সুরু হয়েছে ইতিহাসের মোড়ে মোড়ে। ছেঁড়া পাতার মত উড়ছে বুলেট-বিদ্ধ ভুখা, আধা-নাংগা ভাঙা বাংলার স্মৃতি। খোল নলচে বদলে এসে গেছে নতুন দিন, নয়া জমানা। এই বৈপ্লবিক শহরও তাই উথাল-পাথাল। উল্টো সিধে ঝড়ে টালমাটাল। আগে মিলগেটের বাইরে সভা বসতো। এখন আসছে ভেতরে। ম্যানেজারের ঘরের ওপর লাল ঝাণ্ডা পুঁতে দিয়ে আসছে। এই সেদিন কুলি লাইনের সামনে দিনে-দুপুরে কোম্পানী পুলিশ আনিয়ে বেছে বেছে জংগী জোয়ানদের বর্বরের মত গুলী করেছিলো ধর্মঘটের সময় গুণ্ডা লেলিয়ে মেয়েদের ইজ্জত কেড়ে নিয়েছিলো-কতো কারদার ঘুস। কতো রকমের ফাঁকি। পাটের ফেঁসোর সংগে চিরদিনের মত জড়ানো। মনে করলেই দগদগে ঘায়ের মত ভয়ংকর। রাস্তায় রাস্তায় বস্তি। ঘরে ঘরে টি বি। হঠাৎ চাকাটা ঘুরে গেছে। হুংকার উঠেছে তাই কারখানায় কারখানায়, ঘেরাও, ঘেরাও......

লেবর অফিসার, ম্যানেজার সবাইকে

আজকালকার স্থপতিরা গৃহনির্মাণে এইচ পি জি গ্লাস ব্যবহার করেন

মরেস্ক

হ্যারো রীডেড

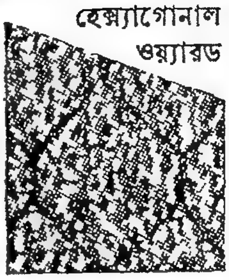
হেক্স্যাগোনাল ওয়্যারড

শীট গ্লাস

আজকের দিনের বাড়ীঘর ও অফিস-কাছারি, কলকারখানা, ইস্কুল ও হাসপাতালে সুদক্ষ ইঞ্জিনিয়াররা সর্বত্রই এইচ পি জি গ্লাস লাগান, কেননা তাঁরা জানেন যে এইচ পি জি গ্লাস উৎকর্ষের নিখুঁত মান বজায় রেখে তৈরী হয়। বিলাতের শতাধিক বৎসরের কাঁচনির্মাণকারী প্রতিষ্ঠান পিলকিংটন ব্রাদার্স-এর কারিগরী কুশলতার সাহায্য নিয়ে হিন্দুস্থান পিলকিংটন গ্লাস ওয়ার্কস এই এইচ পি জি গ্লাস তৈরী করেন।

এইচ পি জি কেনা মানেই নির্ভরযোগ্য ভাল জিনিস কেনা।

হিন্দুস্থান পিলকিংটন গ্লাস ওয়ার্কস লিমিটেড

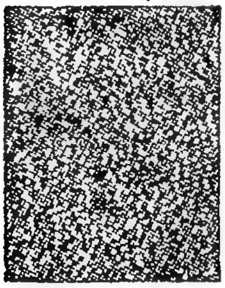
মরক্কো পিন্‌হেড

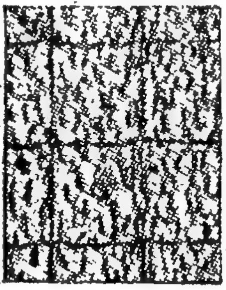
জর্জিয়ান ওয়্যারড

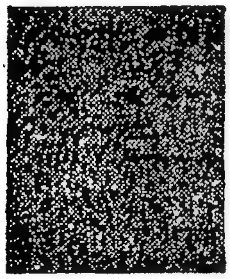
রাফকাস্ট

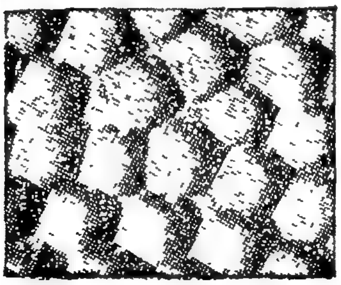
হ্যামার্ড

ম্যানেজিং এজেন্টস
তালুকদার ল' অ্যাণ্ড কোম্পানী প্রাইভেট লিমিটেড
হিন্দুস্থান বিল্ডিংস
৪, চিত্তরঞ্জন অ্যাভেনিউ,
কলিকাতা-১৩

WTHP 1775A

ঘেরাও করো, 'হমরা খাও দো, নেহি তো কোম্পানীকা জিভ ছিন্ লেগা', আওয়াজ তোলো, ধুতু ছেটাও, বাপ-মা তুলে শুয়োরের বাচ্চাদের যাচ্ছেতাই গাল-মন্দ লাগাও, শালাদের টেরেলিন টেনে ছিঁড়ে ফেলো, খুনির মত প্রতিশোধের চোখগুলি জ্বলছে ক্ষুধিত নেকড়ের মত।

আর মানুষ অবাক বিস্ময়ে লক্ষ্য করছে বট-পাকুড়ের তলায় সেই যে পুলিশ ভ্যান সকাল থেকে দাঁড়িয়ে ছিলো, এখন দুপুর গড়িয়ে বিকেল, ওটা তেমনি দাঁড়িয়ে আছে, এত যে কারখানায় গোলমাল, কই, হিংস্র নরখাদকের দল ত' নামলো না ভ্যান থেকে!

রিলিফের টাকা বহুদিন ঠিকমতো বিলি হচ্ছে না সন্দেহে লোকেরা গ্রামসভার অধ্যক্ষের কাছে খোঁজ নিচ্ছিল ক'দিন। অধ্যক্ষ মশাই লোকেদের হাতে রিলিফের (জি, আর) মাস্টার রোলটি দেখতে দিয়ে বাড়ির পেছনের দরজা দিয়ে পালাচ্ছেন—এ-দৃশ্যটি অন্য সময় হলে দেখা যেত না। শহরের মানুষ তার বদলে দেখত পি, ডি, অ্যাক্টে ইতিমধ্যেই পুলিশভ্যানটি ভরে গেছে।

কাড়ানাকাড়া বেজে উঠেছে এখানকার কলেজেও। ষোল বছরের ডেভেলপমেন্ট ফী বাবদ এক লক্ষ টাকা আর ইউনিয়ন ফী বাবদ আরো এক লক্ষ টাকা-সম্পাদকের পেটে চলে গেছে। অথচ ছাত্ররা দীর্ঘদিন চীফ ক্যান্টিন, জিমন্যাসিয়াম, ইত্যাদি তৈরির কথা সম্পাদককে বারেবারে জানিয়ে এসেছে। একটা কমনরুম পর্যন্ত নেই। ছাত্র-ছাত্রীরা রিসেসের সময় রোদে-জলে পথে পথে ঘোরে। এর একটা বিহিত করবার জন্যে ওরা যখন সম্পাদককে নিয়ে আসছিলেন কলেজে আলোচনা করবার জন্যে এমন সময় অতর্কিতে, পেছন দিক দিয়ে, জমিদারের পোষা গুন্ডারা ঝাঁপিয়ে পড়লো ওদের ওপর। গুরুতর আহত হল ডজনখানেক ছাত্র। এক অদৃশ্য টেলি-প্রিন্টারে সে খবর চলে গেল আশেপাশের কলেজে। মুহূর্তে সে এক অদ্ভুত দৃশ্য। বালির লরির ছাদে ডজন ডজন ছাত্র আসছে বিভিন্ন কলেজ থেকে। এক লহমায় সমস্ত অঞ্চল ভাবী যুদ্ধের ভীষণ সম্ভাবনায় থরথর করে কাঁপতে লাগলো। হয়ে যাক শালা হেস্তনেস্ত। মাঠের ধারে কারা বাড়ি করছিলো। তাদের স্তূপাকার ইঁট ছাত্রদের হাতে উঠে এলো। রাস্তা মেরামতের জন্যে পড়েছিলো খোয়া। ওরা তৈরি হয়ে মারমুখী ভঙ্গীতে এমন-ভাবে ঘুরে দাঁড়ালো যেন এই মুহূর্তেই এই মাটিতে, আসন্ন ভিয়েতনাম যুদ্ধের পটভূমিকা রচিত হয়ে যাচ্ছে।

ব্যালট বাক্সের মধ্যে নীরবে বিপ্লব ঘটে যাবার পর প্রথম প্রথম কংগ্রেসের বিশ বছরের বন্দুক নিস্তব্ধ ছিলো হঠাৎ চালের দর লাফিয়ে চার টাকা কে-জি-তে চলে যাবার পর, পাঁচজন এম এল এ দল ভাঙার পর আবার গর্জন করে উঠলো ভীষণ, ভয়ঙ্কর হিংস্র এক যুদ্ধের কিনারায় দাঁড়িয়ে।

কংগ্রেসীরা নতুন টেকনিক নিলো। কোন একটা জায়গায় গোল হয়ে বসে মাঝে মাঝে কথা ছুঁড়ে দিয়ে জনমত নিজে-দের পক্ষে আনা। ওরা বলতো, 'ওরাই সাচ্চা, কমিউনিস্টরা বাচ্চা', 'বলেছিলো না তিন কে-জি চাল ভাওয়াবে মাথাপিছু? কি হল? এখন শালারা বলছে, প্রফুল্ল ঘোষের দোষ। দোষ শালা জ্যোতি বসুর'। 'জ্যোতি বোস মুর্দাবাদ, ভুলো মাৎ, ভুলো মাৎ।' 'প্রফুল্ল ঘোষ জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ।' 'শালা, কবে যে দেশটা ইন্দোনেশিয়া হবে! হাতটা মাইরী নিশ-পিশ নিশপিশ করছে।'

তারপর মিছিল চলেছে মিছিল। জবাব চাই, জবাব চাই আর নিপাত যাক, নিপাত যাক। সেই অতি পরিচিত রণ-হুংকার। বিষয়বস্তু সেই একই, খাদ্য। বিশ বছর ধরে যা চাওয়া হচ্ছে অথচ পাওয়া যাচ্ছে না। সুরেশ মাস্টার মোড়ের এই চায়ের দোকানে বসে বিশ বছর ধরে সেই একই সুর শুনে আসছে। দুপুরে মোড়ের এই ট্রানজিস্টার-ঝোলানো ব্যানার্জি কেবিনে বসে চা খেতে খেতে সেদিনও চোখ দুটি খোলা রেখে রঙ্গ-তামাসা দেখে যাচ্ছিলো। বিশ বছর পর এরা আবার পথে নেমেছে। ঘামে ভিজে জবজবে হয়ে গেছে দুপুর। চুলের ডগা বেয়ে টপ টপ করে করে পড়ছে ঘাম। পিচ গলে কাপড়ে উঠে আসছে থোকা থোকা। আর এর মধ্যেই মিছিল চলেছে, মিছিল।

কে একজন, এখানকার নয়, ছাপ্‌কা ছাপ্‌কা জামা গায়ে, জিপ থেকে ধাঁ করে নেমে, একটা সিগারেট দাঁতে চেপে, চোখ সরু করে তাকিয়ে হঠাৎ কম্যান্ড দিলো, 'প্রসিড। ডবল লাইন।' অমনি মিছিল দু'ভাগে সরে এলো। সামনে সাত-আটটা লরি। পিছনে তিন-চারটে জিপ। তারপর দশটি মোটর সাইকেল। আর তারপর ডিস্ট্রিক্টের অগুনতি মানুষ। পতাকা আর ফেস্টুন। শ্লোগান আর মুষ্টিবদ্ধ হাত। ছিঁড়ে ফেলা আর পুড়িয়ে ফেলার ডাক।

মিছিলে ধ্বনি উঠছে, 'মার্ক্সবাদ, মাও-বাদ, নিপাত যাক, নিপাত যাক।' 'অজয়-জ্যোতি-সুশীল ধাড়া, ছাড়ো এদের বাংলা ছাড়া।' 'জ্যোতি বসু জবাব দাও, চার কে-জি চালের হাওয়া খাও'। কংগ্রেস আভিতক্ জিন্দা হ্যায়, ভুলো মাৎ ভুলো মাৎ।'

সুরেশ মাস্টার অবাক বিস্ময়ে দেখলো চা খেতে খেতে; প্রথম সারিতে তেরঙা ঝান্ডার নিচে সেই ইঁটগোলার মালিক ভূতনাথ রায়, নাগরমল জুটমিলের সিটে গুন্ডা, তালডাঙার বিখ্যাত জমিদার যদু-পতি বসু, পান্ডুয়ার সাতশো বিঘে জমির মালিক হাতেমতাই মন্ডল......কংগ্রেসের দেয়াল, এ'রাও খাদ্য আন্দোলনে নেমেছেন, আশ্চর্য!

এদেরও তাহলে খাদ্যের দরকার! একটু হাসি খেলে গেল সুরেশ মাস্টারের মুখে। কিন্তু বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে। সুরেশ মাস্টার সাবধান হয়ে গেল। কেউ দেখে ফেলল না কি তার হাসি? বলা যায় না। দেয়ালের যদি কান থাকে, তাহলে দেয়ালেরও চোখ থাকতে পারে। সুতরাং হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে হাসিটা ও মুছে ফেলল। আমি পৃথিবীতে ছাত্র পড়াতে এসেছি ছাত্র পড়িয়ে যাবো। আমার এসবে দরকার কি। আমি ফরোয়ার্ড ব্লকের কাছে ফরোয়ার্ড ব্লক, কমিউনিস্ট-এর কাছে কমিউনিস্ট, কংগ্রেসের কাছে কংগ্রেস। যখন যে দেশের রাজা, যার খাচ্ছি, পরছি তারই আমি কেনা দাস। সুরেশ মাস্টার এরকম চিন্তা করে খানিকটা সান্ত্বনা পেল। কিন্তু এতেও কি স্বস্তি আছে? কোনো মানে হয় না, তাদের স্কুলের মলয় মাস্টার অংকের কোশ্চেন আউট করে দিয়ে তার কোচিনে অনেক ছেলে টেনে নিয়েছে। মাত্র একটা শিফটে সে ছাত্র পড়াতো। এবার তাও যাবার দাখিল। ওঃ, যদি মলয় মাস্টারটাকে পি ডি এ্যাক্টে কেউ গ্রেপ্তার করতো কিন্তু তাও শালা আবার যুক্তফ্রন্ট ঐ অ্যাক্ট তুলে দিয়েছে। পাবলি-সিটি, স্রেফ পাবলিসিটি। গণতন্ত্রী সাজার ইচ্ছে। দ্যাখো, আমরা কাউকে বিনা বিচারে গ্রেপ্তার করি না। খুব বাহা-দুর নেংটি ইঁদুর। পি ডি এ্যাক্টটা থাকলেই কি মলয় মাস্টারকে গ্রেপ্তার করা সম্ভব হত? নিস্ফল আক্রোশে ব্যানার্জি কেবিনে বসে স্যাকারিনের বিস্বাদ চা খেতে খেতে সুরেশ মাস্টার মুখখানাকে কুৎসিত করে তুলল।

স্কুলে যাবার টাইম হয়ে গেল। মোটে আধঘন্টা টিফিন। সুতরাং সাইকেলের প্যাডেলে পা দিয়ে দ্রুত চলল। সামনে দত্ত গলি। হঠাৎ থমকে সাইকেল থেকে নামলো সুনন্দকে দেখে। সুনন্দ আর কয়েকটা ছেলে, হাতে মই, গঁদের শিশি, বালি-খসা, ঘুণধরা দেয়ালে বোধ হয় পোস্টার সাঁটছে।

সুনন্দকে দেখেই খুশি হয়ে উঠলো সুরেশ মাস্টার।

'সুনন্দ, শোনো শোনো!'

'কি স্যার?'

'এখন কোথায় থাকবে?'

'পোস্টার মারা হয়ে গেলে বলাইদার চায়ের দোকানে।'

'তারপর?'

'বলাইদার চায়ের দোকানে।'

'তারপর?'

'তারপরও বলাইদার চায়ের দোকানে।'

'খুব ভালো। এরকম পোস্টার কখনো দেখি নি। এই প্রথম দেখলাম। এসবের খুব দরকার আছে। যতো ওরকম পোস্টার মারা যায় ততোই ভালো সুনন্দ।'

'আপনার ভালো লেগেছে স্যার? খুশিতে সুনন্দের মুখ জ্বলজ্বল করে উঠলো।'

'খুব ভালো লেগেছে। সত্যিই তোমরা একটা কাজের কাজ...যাক, একটা কথা, আচ্ছা থাক, পরেই না হয়'......

'বলুন না স্যার? অতো কিন্তু কিন্তু করছেন কেন?'

'না না। কিন্তু কিন্তু করবো কেন? তাছাড়া তোমাদের কাছে আবার লজ্জা কি। হ্যাঁ, হ্যাঁ, যা বলছিলাম, তোমার হাতে ত' অনেক ছাত্র, না?'

'অনেক ছাত্র মানে? গোটা বাংলা দেশের সমস্ত ছাত্র বলুন। সব আমাদের দিকে। বলুন কে আপনার পেছনে লেগেছে? কাকে ওড়াতে হবে?' আস্তিন গুটিয়ে তুলে নিলো সুনন্দ হাতের শার্টকে গুলির ওপর।

'না, না।' খুবই বিব্রত দেখালো সুরেশ মাস্টারকে, ওসব ওড়ানো-ফোড়ানো নয়। আমি মাস্টার মানুষ। ওসব আমার ঠিক.....। বুঝতেই ত' পারছো, যখন অনেক ছাত্র তোমার হাতে, তখন দু-একটা যদি দিতে, আমার কাছে পড়তে পাঠাতে, আমার কোচিনে তাহলে..., তোমাদের পোস্টারগুলো কিন্তু......, তোমরা একটু নতুন কিছু, এই মানে মারাত্মক কিছু...... ঐ মলয় মাস্টারটা কোশ্চেন আউট করেই ত'......

'টিউশ্যানী? মুহূর্তে সুনন্দের গোটানো আস্তিন শার্টকে গুলির নিচে ঝুলে পড়লো। ম্লান একটা ছায়ার মুখখানা তার থমথম করে উঠলো। 'আমিই ত' কোনরকম টিউশ্যানী করে ......, একটু আগে যদি বলতেন .....'

ঐ এক ব্যাপার লক্ষ্য করেছে সুরেশ মাস্টার। একটু আগে বললে সকলেই যেন হাতে চাঁদ ধরিয়ে দিতে পারে। কিন্তু সুরেশ মাস্টারদের পক্ষে অসুবিধা এই, সেই একটু আগে কার যে কখন হয় সেটাই বোঝা যায় না।

'দেখ চেষ্টা করে' বলে ক্ষুণ্ণমনে সুরেশ মাস্টার প্যাডেলে পা রাখলো। দত্ত গলি ছাড়িয়ে দে গলি, দে গলি ছাড়িয়ে বামুন-পাড়া, বামুনপাড়া ছাড়িয়ে বেলতলা, একি পোস্টারগুলো সঙ্গে সঙ্গে চলবে না কি, সামান্য কাগজে এবড়ো-খেবড়ো করে লেখা রক্তবর্ণ সব অক্ষর, তখন দেখে নি, এখন দেখে সুরেশ মাস্টারের কেমন যেন লাগলো।

এমন ভালোবাসা আর পাঁকে মাখা-মাখি একগলা জল নিয়ে টলটলে আহ্লাদের মত এক-একটি পুকুর। এখন স্যাঁৎস্যাঁতে, ভিজে, মাঝে মাঝে ধুলো-ওড়ান বালি-খসা এক-একটি প্রাগান্ধকার গলি, এখানে এসব কেন, এই বিপ্লব আর ভিয়েতনাম এই লালসেলাম, এসব কি, সাইকেল চালাতে চালাতে আতঙ্কিত চোখে হঠাৎ সুরেশ মাস্টার আবিষ্কার করলো স্কুলের দেয়ালেও কখন বিপ্লব এসে গেছে!

দোসরা অক্টোবর যুক্তফ্রন্টের কষের দাঁতটা বেশ জোরে একটু নড়ে উঠলো। সঙ্গে সঙ্গে এ শহরে একটা অদ্ভুত থম-থমে ভাব নেমে এলো। দোকানের বাইরে ঝোলানো ট্রানজিস্টারের সামনে মানুষের মাথা অ-গুনতিতে ক্রমশ বেড়ে যেতে লাগলো। এ এক বিচিত্র মানুষ। কেউ কোন কথা বলছে না। সবাই ভীষণ চুপচাপ। সারা মুখে দুশ্চিন্তার ছাপ। যেন কান আছে মাথার দুপাশে তাই শুনে যাচ্ছে। কিন্তু নাকের নিচে মুখ থাকলেও 'রা' কাড়ছে না। কথা বলার ওপর যেন ১৪৪ ধারা জারি হয়ে গেছে। চায়ের দোকানগুলিতে খবরের কাগজের ওপর হুমড়ি-খাওয়া মানুষের ভিড় ক্রমশই বেড়ে যেতে লাগলো। চা খেতে খেতে নিস্পৃহ ভঙ্গিতে যেন শুধু অক্ষর দেখে যাচ্ছে। যেন হঠাৎ খুব শান্ত, বড় বেশি ভদ্র, ভীষণ সবাই সংযত হয়ে পড়েছে।

পি ডবলু ডি অফিসের কেরানিরা, কোর্ট-কাছারীর পেশকার, মোক্তার আর এ্যাডভোকেট, স্কুল-কলেজের শিক্ষক অধ্যাপকেরা এই সেদিনও চেঁচিয়ে যারা টেবিল ফাটাতো তারা আজ ফেঁসে যাওয়া টায়ারের মত গলা বসিয়ে ফেলেছে। আফিসপাড়ার পায়রার খোপের মধ্যে একটা আশঙ্কা, ভয়, কখন কার নামে বিনা নোটিশে সাসপেনশনের অর্ডার আসে, চার্জসীট আসে, কার ওভারটাইম মারা যায়......।

রাত আটটায় কোনদিনই দোকান বন্ধ হয় না। একটা পাল্লা ভেজিয়ে দিয়ে ভেতরে ঠিকই কাজ চলে। হঠাৎ দেখা গেল, আটটার পর আইন-মাফিক দোকান-গুলো ঠাস ঠাস করে বন্ধ হয়ে যেতে লাগলো।

বিভিন্ন পার্টির রাজনৈতিক কর্মীরা নিজের নিজের বাড়ি ছেড়ে দিয়ে এর তার বাড়িতে রাত কাটাতে লাগলো। সর্বত্র একটা অস্থিরতা, একটা সন্ত্রাসের ভাব, চাপা অসন্তোষ এ শহরের পথে-ঘাটে, অলিতে-গলিতে চিতাবাঘের মত ঘুরে বেড়াতে লাগলো।

কংগ্রেসের পক্ষ থেকে আবার মিছিল বের হল। আবার আওয়াজ উঠলো আকাশে, 'ইনক্লাব জিন্দাবাদ নয়, বন্দেমাতরম', 'ভিয়েতনাম নয় ইন্দোনেশিয়া, কায়েম করো কায়েম করো', 'নকশালবাড়ি খাড়বাড়ি এবার যাও যমের বাড়ি', 'যুক্তফ্রন্ট নিপাত যাক, নিপাত যাক'। আর অন্যান্য রাজ-নৈতিক দলের পরিচিত দৃশ্যপটের সঙ্গে এ শহরের মানুষ আর একটি দল, নতুন আর একটি গ্রুপকে এই প্রথম লক্ষ্য করলো।

'নয়া শোধনবাদীর হাত থেকে ঐ লাল পতাকা ছিনিয়ে নাও', 'কানু সান্যাল জংগল সাঁওতাল, জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ', 'ছাত্রফৌজ তৈরি হও, যুক্তফ্রন্টের পতন চাও', ইত্যাদি ধ্বনি দিতে দিতে কিছু ছাত্র ভয়ংকর মূর্তিতে রাত্রির শহর মশালের আলোয় সচকিত করে শহর প্রদক্ষিণ করতে লাগলো।

আর পাঁচজন শান্তশিষ্ট, তেলচিটে, শ্রান্ত, ক্লান্ত, জীবনযুদ্ধে পরাজিত ও বিপর্যস্ত লোকের মত সুরেশ মাস্টারেরও জীবনের চাকা ইস্কুল, ইস্কুল থেকে বাড়ি, বাড়ি থেকে বাজার, বাজার থেকে আবার বাড়ি, স্ত্রীর আকস্মিক অশ্রুনৎপাতকে আপাতত ঠেকনা দেবার জন্যে মাসান্তিক একবার তৃতীয় শ্রেণীর টিকিটে সিনেমা-অভিযান, এই মসৃণ রাস্তার ঢ্যাব ঢ্যাব করে গড়াতে লাগলো।

দূরে বিরাট কলধ্বনি হচ্ছে, বিপুল জীবন বিরাট হাতছানি দিয়ে ডাকছে, ঢেউ উঠছে, পড়ছে, নাটকের মত চমকপ্রদ ঘটনা, একটার পর একটা, আর এরই মধ্যে ভীত, সন্ত্রস্ত সুরেশ মাস্টার শুধু ছাত্র পড়িয়ে যাচ্ছে। 'কি হবে এসবে?' সুরেশ মাস্টার ছাত্রদের বলে, 'ইনক্লাব জিন্দাবাদ দল কি আমাদের চাকরি দেবে? ওরা কি তোমাদের ডাক্তার করবে? তোমাদের ইঞ্জিনীয়ার করবে? কতকগুলো রাজ-নৈতিক জুয়াড়ী মিলে দেশটাকে জাহান্নামের দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। নেতাদের গায়ে গুলী লাগে না। নেতারা খালি শহীদবেদীতে মালা দেয়।'

আর স্ত্রীর ঘ্যানঘ্যানানিতে নিতান্ত যখন অধৈর্য হয়ে ওঠে, 'ঘরে একটা আলমারী পর্যন্ত নেই, আমার অনেকদিনের শখ একটা ড্রেসিং টেবিলের, এমন ভাগ্য আমার, সকলের জোটে আমার জোটে না, বাটিকের কাজ করা একটা শাড়ি কতদিন আসতে যেতে শো-কেসে ঝোলানো দেখেছি...ঐ দেখাই সার, আমি কি আর..., আমার অনেক ভালো জায়গায় বিয়ে হতে পারতো, বলতে বলতে তার চোখ দিয়ে যখন আক্ষেপ আর অনুশোচনার জল টস-

টস করে গড়িয়ে পড়ে রাত্রি ভিজিয়ে তোলে তখন অক্ষম, ব্যথা, পঙ্গু সুরেশ মাস্টার মাথার চুল ছিঁড়তে ছিঁড়তে দারুণ আক্রোশে তারই মত রোগা, জীর্ণশীর্ণ, তারই মত অসহায় স্ত্রীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, নখ দিয়ে ফালাফালা করে চিরে ফেললেও যেন রাগ মেটে না, দেয়ালে মাথাটা ধরে ঠুকে ঠুকে, 'চুপ করবি হারামজাদী, চুপ করবি ছোটলোকের বাড়ির মেয়ে, চুপ কর, নইলে'...কুৎসিত গালাগাল দিয়ে পাগলের মত ঊর্ধশ্বাসে ছুটে মাঠে চলে আসে, রহস্যময় আকাশের নিচে মাঠ-ভরা অন্ধকারে কেঁদে কেঁদে দুই চোখ অন্ধ করে ফেলে, তারপর ঘরে ফিরে ক্লান্ত, শ্রান্ত শরীর নিয়ে বিছানায় এসে আবার স্ত্রীর সঙ্গে আগামী স্নায়ুযুদ্ধের জন্যে মনে মনে অর্থহীন অস্ত্র সাজায়।

ক' দিন পর, এক নভেম্বরে ইংরাজীর টিচার উমাপতিবাবু বললেন, 'শুনেছেন, সুনন্দ একটা মেয়েকে নিয়ে এ-বাড়ি ও-বাড়ি রাত কাটাচ্ছে?'

সুরেশ মাস্টার বলল, 'কোন সুনন্দ?'

'আমাদের প্রাক্তন ছাত্র।'

'সেই দাড়ি?'

'হ্যাঁ। মহেশ যোগীর ট্রানসেন্ডেন্টাল দাড়ি নয়। চে গুয়েভারার রেভুলিউশ্যনারি দাড়ি। নিজের বাড়িতে আর এ অবস্থায় কে জায়গা দেবে?'

মনে পড়ে গেল সুরেশ মাস্টারের। গোয়াবাগানে দেখা সেই মেয়েটিকে। সেই রোগা, লম্বা, ময়লা, বুকের কাছে একরাশ বই চেপেধরা বেথুনের ছাত্রীটিকে। কিন্তু তাকে নিয়ে এ-বাড়ি ও-বাড়ি করছে কেন? কি যেন হয়েছে এখনকার ছেলেদের। কি যেন রোগ ঢুকেছে। আমিও তো একজনকে কোন একসময় ভালোবেসেছিলাম। কিন্তু তাকে নিয়ে ত' এমন করে ঘুরি নি এ-বাড়ি ও-বাড়ি। কি যেন হয়েছে সুনন্দের। কিছু যেন খুঁজছে। অথচ পাচ্ছে না। অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে বেড়াচ্ছে। কি যেন হয় আজকালকার ছেলেদের। কি যেন খোঁজে।

ফোল্ডিং ৫০ গুলির পিস্তল

লাইসেন্সের প্রয়োজন নেই। আমেরিকান মডেল। চোর এবং বন্য জন্তুর হাত থেকে নিজেকে বাঁচান। পিকনিক, ভ্রমণ এবং নাটকের পক্ষে উপযোগী। ৫০ গুলীর ব্যবস্থা-সহ অটোমেটিক। হাল্কা ওজন এবং চোখ ধাঁধান আগুন আপনাকে বিপদ থেকে রক্ষা করবে।

মূল্য ৫০ গুলীসহ নং ৩৩ টাঃ ১৩·৫০। জার্মান মডেল নং ৯৯ টাঃ ১৫·৫০। ভি, পি, পি, চার্জ টাঃ ২·৫০। চামড়ার কেস ৭, টাকা। অতিরিক্ত প্রতি একশত গুলী ৫, টাকা।

GEM ARTS (WBM—15)
P.B. 1325, Delhi—6.

'আপনি কি করে জানলেন?'

'সোনাটুলীর আমার এক ছাত্রী আমাকে বলেছে। সে চেনে ওদের।'

'বিয়ে করে না কেন?'

'টিউশ্যনীর ওপর ভরসা ক'রে বিয়ে? আপনি কোন জগতে আছেন মশাই সুরেশবাবু?'

সুরেশ মাস্টার যে জগতে ছিলো সেখান থেকেই ভাবতে লাগলো, তাহলে সুনন্দ মেয়েটাকে নিয়ে কি করতে চায়? অদ্ভুত ত'। বিয়েই যদি করবে না তবে, সকলের চোখের সামনে, এইভাবে একসঙ্গে রাত কাটানো, এ সব কি? হয়তো আমরা সুনন্দের ব্যাপারটা ঠিক জানি না।'

'ও আর জানাজানি কি মশাই? একটা ছেলে একটা মেয়ে এ-বাড়ি ও-বাড়ি রাত কাটাচ্ছে। এর পরও জানতে হবে? আমি এই সব বাড়ির লোকদেরও বুঝি না। এরাই বা কি করে জায়গা দেয়? যতো সব দায়িত্বজ্ঞানহীন'......

ঠিক। দায়িত্বজ্ঞানহীন। ঠিক বলেছেন উমাপতিবাবু। এতক্ষণে উনি একটা কথার মত কথা বলেছেন। অনেকদিন আগে সুরেশ মাস্টার যেন চোখের সামনে পরিষ্কার সুনন্দের পরিণতি আগেভাগে দেখতে পেয়ে বলেছিলো, 'গরুর গাড়ি মন্থর গতিতে চলে সুনন্দ তাই তার ব্রেক লাগে না। সাইকেল গরুর গাড়ির থেকে জোরে চলে তাই তাতে ব্রেক লাগে। মোটর আরো জোরে চলে তাই তাতে আরো জোর ব্রেক লাগে।'

সুনন্দ চাপা বিদ্রূপের সুরে বলেছিলো, 'তাহলে গরুর গাড়ি হয়ে যাই কি বলেন? গরু হয়ে বসে থাকি।'

এই সব ছেলেরা, এই সুনন্দেরা, খালি উল্কার মত ছুটছে, মাঝে মাঝে যে ব্রেক করা দরকার, এ যুক্তি কিছুতেই মানছে না, তীব্র গতিতে ছুটতে ছুটতে এ্যাকসিডেন্টের সংখ্যা বাড়িয়ে ফেলছে, এক উন্মাদ, অস্থির আবেগে স্টার্ট নেওয়া মোটর সাইকেলের মতন থরথর করে কাঁপছে সব সময়। গরুর গাড়ি না হয়েও, গরু হয়ে না বসেও যে ছোটা যায় এরা তা' বোঝে না, বুঝবে না। যতসব দায়িত্বজ্ঞানহীন..., ..., সুনন্দের যে এই পরিণতিই হবে এ যেন ছক-মাপা। অতোটুকু তুবড়ির খোলে অতোখানি মশলা ঢোকাবার যে ফল তাই হয়েছে। এখন তুবড়ির খোল চৌচির। যতোসব চায়ের দোকানের বিপ্লবী।

হুঁ। কিন্তু এরকম কেন দেখাচ্ছে রাস্তাটা? ছুটির পর রাস্তায় নেমে দারুণ একটা অস্বস্তিতে জড়িয়ে পড়লো সুরেশ মাস্টার। ঝাঁকি মাঝি গলির টিউশ্যনীটা সেরে নিলে। ঘন আহ্লাদে চটচটে মেয়ে। পড়াশুনো করবে না। বই হাত থেকে কেড়ে নেবে। ওর ক'জন লাভার সে গল্প শুনতে হবে। এসব কারই বা ভালো লাগে। মোটা টাকা দেয়। হাতছাড়া করা যায় না। এদিকে আবার কামাই হলে কৈফিয়ৎ চায়। 'কেন, কামাই করলেন?' অথচ কামাই না করলে শুনতে হবে ওই সব, ওর লাভারদের গল্প...কোনো মানে হয়, যতোসব ইরেসপনসিবল......

শেষ বিকেলে রাস্তায় নেমে আবার অস্বস্তিটা বেড়ে গেল। ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। কিছু যেন এখানে, আশেপাশে হতে যাচ্ছে। কি হতে পারে? ভালো করে তাকালো সুরেশ মাস্টার। অন্ধকারে একটু একটু করে ছড়িয়ে পড়ছে। একটু একটু শীত করছে। হাওয়া উঠছে ঘুরতে ঘুরতে। কিছু যেন হতে যাচ্ছে এখানে, আশেপাশে। কি হতে পারে?

'আপনি কি করে জানলেন?'

রেডিওয়ে কোনকিছুর কি অদ্ভুত ঘোষণা? অতো ভিড় কেন ওখানে? মৌচাকের সামনে চাকবাঁধা মৌমাছির মতন দোকানের ঝোলানো ট্রানজিস্টারের সামনে একদল লোক নিবিষ্টভাবে দাঁড়িয়ে। সুরেশ মাস্টার আর একটু কাছে ঘেঁসে এলো। বাতাসে ভেসে এলো ঘোষকের গম্ভীর কণ্ঠস্বর, 'যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভার পতন অনিবার্য হয়ে উঠেছে। ডঃ প্রফুল্ল ঘোষের নেতৃত্বে পি, ডি, এফ, মন্ত্রিসভা গঠনের কাজ প্রায় সমাপ্তির দিকে। আজ কিংবা কাল'......

অন্ধকার আর একটু ঘন হয়েছে। একটা কালচে রঙ পাতলা চাদরের মত ঝুলে পড়েছে আকাশ থেকে। পথে মানুষজন একটু দ্রুত হাঁটছে। একটা চাপা, গুমোট ভাব। কিছু যেন হবে আজ। কিছু যেন হতে পারে।

হঠাৎ ঘাড় তুলতেই সুরেশ মাস্টার দেখতে পেল, মাথায় হেলমেট চাপানো মুখ-মোটর সাইকেল নিয়ে বিদ্যুৎ গতিতে চলে গেল। গা সুরেশ মাস্টারের অজানা আশঙ্কায় ছম ছম করে উঠলো।

পাশ দিয়ে 'করুণাময়ী স্টোর্স'-এর কর্মচারীটি সাইকেল করে জোরে যেতে যেতে কাকে যেন বলল, পুলিশ ব্যারাকের পেছনে আজ মিলিটারীর দারুণ জমায়েত। কি হবে তা' বলা যায় না। দোকানে দোকানে আলোচনা হচ্ছে। কানে আসছে সুরেশ মাস্টারের। সহসা বঙ্কিমচন্দ্রের

'মৃণালিনী' উপন্যাসের একটা অধ্যায় মনে পড়ে গেল। 'অকস্মাৎ বাতায়ন পথ অন্ধকার হইল—চন্দ্রালোকের গতিরোধ হইল। হেমচন্দ্র বাতায়ন সন্নিধি একটি মনুষ্যমুণ্ড দেখিতে পাইলেন। বাতায়ন ভূমি হইতে কিছু উচ্চ—এজন্য কাহারও হস্তপদাদি কিছু দেখিতে পাইলেন না—কেবল একখানি মুখ দেখিলেন। তিনি একাকী সেই গভীর নিশাতে শস্ত্রময় হইয়া যাত্রা করিলেন। বাতায়নপথে মনুষ্যমুণ্ড দেখিয়া, তিনি জানিতে পারিয়াছিলেন যে, যবন তুরক আসিয়াছে।'

তারপর চতুর্থ পরিচ্ছেদে, 'ষোড়শ সহচর লইয়া মর্কটাকার বখতিয়ার খিলিজি গৌড়েশ্বরের রাজপুরী অধিকার করিল।'

সাইকেলটা একটু ডানপাশে সরিয়ে নিলো সুরেশ মাস্টার। মাথায় জাল দেওয়া ধূসর বর্ণের হেলমেট, পাঁচ-ছটা বন্দুক উঁচিয়ে একদল মিলিটারী ত্রিপল ফেলা চলন্ত ট্রাকের ভেতর দিয়ে সন্দিগ্ধদৃষ্টিতে তাকাতে তাকাতে চলে গেল।

আবার গা'টা ছম ছম করে উঠলো। ডঃ ঘোষের বঙ্গবিজয় কি আসন্ন!

তারপর বাড়ি এসেছে দ্রুত সুরেশ মাস্টার। ঘরে ঢুকেই সদর দরজায় খিল তুলে দিয়েছে। সবাইকে নিষেধ করে দিয়েছে তাড়াতাড়ি। আজ কেউ যেন বাইরে না বার হয়। পথে মিলিটারী ঘোরাঘুরি করছে। কি জানি কি হবে আজ। ঘণ্টাখানেক পর দরজার কড়া নড়ে উঠলো। সুরেশ মাস্টার তাড়াতাড়ি দরজায় খিল খুলে দিয়ে সন্ত্রস্ত হয়ে বাইরের অন্ধকারে তাকালো।

'কে?'

'আজ্ঞে আমি। সুনন্দ।'

'কি ব্যাপার!' যেন ব্যাপারটা খুব তাড়াতাড়ি মিটে গেলেই ভালো।

'আমি স্যর দু'দিন খাই নি। পুলিশের ওয়াচের তাড়ায় এ-পাড়া ও-পাড়া করছি তিনদিন ধরে। আপনি না একদিন আমাকে খাওয়াবেন বলেছিলেন?' সুনন্দ এ অবস্থাতেও হাসতে লাগলো। বলেছিলো বটে সুরেশ মাস্টার একদিন ওকে খাওয়াবে! কিন্তু সে কি বেছে বেছে আজকেই হতে হবে? এমন দিনে?

'না না।' সুরেশ মাস্টার যেন সামনে ভূত দেখলো। 'তুমি চলে যাও সুনন্দ। আমি ছেলে-মেয়ে নিয়ে ঘর করি। এ সময় আর উপদ্রব বাড়িও না। আর একদিন, বুঝলে আর একদিন'......

সুনন্দ মুখ নিচু করলো। লাইট পোস্টের আলোয় সুরেশ মাস্টার স্পষ্ট দেখলো ওর মুখের রঙ বদলে গেছে। কিন্তু সে শুধু মুহূর্তের খেলা। হঠাৎ সুনন্দ মুখটা তুলে তীব্র একটু হাসলো।

এ বিশ্রী হাসিতে সুরেশ মাস্টারের সব মনে পড়ে গেল।

মুহূর্তে ওর সম্বন্ধে অনেকদিনের জমা করে রাখা অভিযোগের ফর্দটি সুরেশ মাস্টার মাস্টারী ভঙ্গিতে তুলে ধরলো, এ সবের কি মানে হয় এ্যাঁ, খালি পোস্টার মারো দেয়ালে, এমন কি ইস্কুলের দেয়ালে পর্যন্ত পোস্টার সেঁটে দিচ্ছো, এদিকে বলছো ছেলেদের তোমরা ভালো করতে চাও। তোমার রক্তে নাকি বিপ্লবের ঝোড়ো হাওয়া। এদিকে দেখি দিনরাত চায়ের দোকানে গজালি করা। একটা মেয়ে, বলতে আমার লজ্জা হয়, তার দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে তাকে নিয়ে এ-বাড়ি ও-বাড়ি, ছিঃ ছিঃ, ভাবতেই পারি না, তোমরাই আবার আদর্শবাদের বড়াই করো, না না, হাসলে চলবে না সুনন্দ, এর একটা জবাব—

কোনো জবাবই দিলো না সুনন্দ। জবাব দেবার প্রয়োজনই বোধ করলো না। মুখটা তুলে আবার তেমনি একটু তীব্র হেসে দ্রুত নেমে গেল অন্ধকারে।

স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো সুরেশ মাস্টার বন্ধ দরজার সামনে। দূরে একটা বোমা ফাটার শব্দ হল। হঠাৎ একটা তীব্র হুইসেল ধারে-কাছেই। তারপর একটা ভারী গাড়ি ঢোকার শব্দ গলিতে। ঘ্যাঁচ করে ব্রেক করে কারা যেন এগিয়ে আসছে...কারা যেন... এগিয়ে আসছে......

'সুরেশবাবু আছেন, সুরেশবাবু?' সম্মিলিত পায়ের বুট জোড়ার শব্দ থমকে দাঁড়ালো দরজার সামনে।

'কে, কাকে চাই?' হুড়মুড় করে সুরেশ মাস্টার দরজা খুলে দিলো।

'দয়া করে একটু আসুন।' বিনীতভাবে বলল একজন পুলিশ অফিসার।

সুরেশ মাস্টার অপ্রস্তুত কোঁচাটি পাঞ্জাবীর পকেটে ঢোকাতে ঢোকাতে নিচে নেমে এলো।

'গাড়িতে উঠুন।' আরোও বিনীত কণ্ঠস্বর।

'কেন?' বিস্মিত, দিশেহারা ভঙ্গিতে সুরেশ মাস্টার তাকালো এদের দিকে।

'কেন, জানেন না?' খুবই ভদ্র, বিনীতভাবে হেসে উঠলো পুলিশ অফিসারটি।

'না।' ভীষণ ভয় পেয়ে গেল সুরেশ মাস্টার। 'সত্যি বলছি'......

'থামুন। যাকে আমরা দু'দিন হন্যে হয়ে খুঁজছি তাকে এইমাত্র আপনার ঘর থেকে বার হতে দেখলাম।'

'কিন্তু আমি ত'...বিপন্নভাবে কি যেন বলতে গেল সুরেশ মাস্টার।

'ব্যাটা বুড়ো ভাম।' ধাক্কা খেল পেছন থেকে সুরেশ মাস্টার।

'শালা মাস্টারগুলো আজকাল এ্যাতো মিছে কথা বলে'......

দেশ সেবায় নিয়োজিত,

এ্যালবার্ট ডেভিড লিমিটেড

কলিকাতা—৫০

নীতি ও বিজ্ঞানানুযায়ী ঔষধ
প্রস্তুতকরণের অগ্রণী

—ব্রাঞ্চ সমূহ—

বোম্বে - মাদ্রাজ - দিল্লী - নাগপুর
বেজওয়াডা - শ্রীনগর - গোহাটী

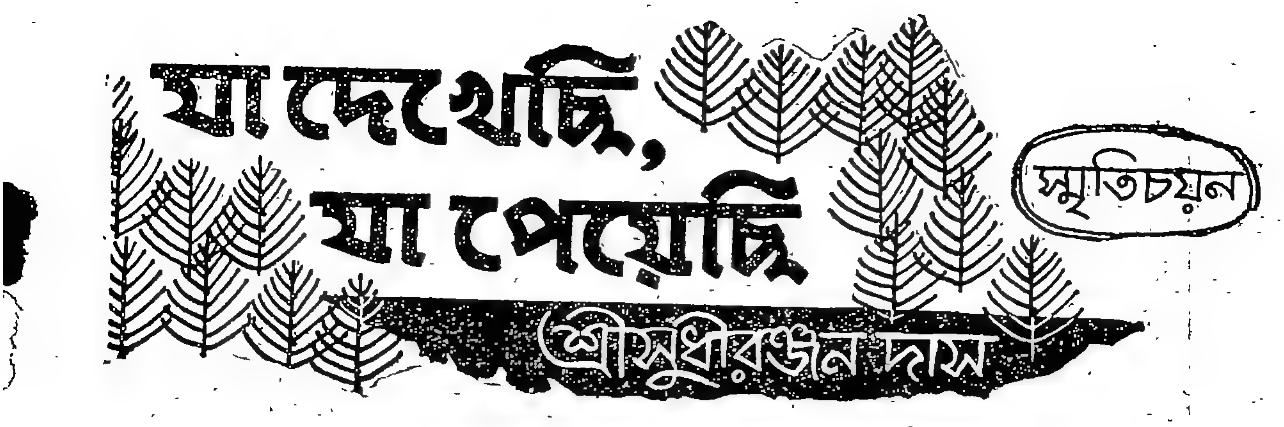

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

(৫)

ওয়াঞ্চু সাহেব সুপ্রিম কোর্টে আসার পর একটি ঘটনা ঘটেছিল তা এইখানে বলে রাখি। আগেই বলেছি যে, নতুন সংবিধানের বলে ২৬শে জানুয়ারী ১৯৫০ সালে সুপ্রিম কোর্ট প্রতিষ্ঠিত হোল। কিন্তু সুপ্রিম কোর্টের নিজস্ব কোন ঘরবাড়ি ছিল না। দিল্লীর বিখ্যাত ও সুপরিচিত থাম দিয়ে ঘেরা পার্লামেন্ট ভবনে Princes' Chamber-এ সুপ্রিম কোর্টের অধিবেশন হোত। শুনেছিলাম যে, দিল্লীর অধিকরণের সাউথ ব্লকের দক্ষিণে ঠিক পার্লামেন্ট ভবনের মতই থাম দেওয়া গোলাকৃতি আর একটি বাড়ি হবে সুপ্রিম কোর্টের জন্যে। সেরকম বাড়ি করতে অসম্ভব বেশি খরচা পড়বে বলে সে সংকল্প নাকি ছেড়ে দেওয়া হয় এবং তার পরিবর্তে হার্ডিঞ্জ এ্যাভেনিউ যার নাম এখন হয়েছে তিলক মার্গ সেখানে প্রশস্ত জমির উপর গম্বুজ ও থামওয়ালা বিশাল ও কমনীয় একটি হর্ম্য নির্মিত হয়েছে সুপ্রিম কোর্টের জন্যে। সেই নতুন ধর্মাধিকরণের উদ্বোধন হয় উনিশ শ' আটান্ন সালের ৪ঠা আগস্ট তারিখে। সেই বিশাল প্রাসাদের দুই বাহুর মধ্যে যে প্রকাণ্ড আঙিনা আছে তাতে মস্ত বড় সামিয়ানা খাটান হয়েছিল অভ্যাগত ও আগন্তুকদের বসবার জন্যে। বন্দোবস্ত হয়েছিল সেই অনুষ্ঠানের যোগ্য রকমেই। কিন্তু আগের রাত্রি থেকে দারুণ ঝড় ও বৃষ্টি হওয়ায় বাইরে সে অনুষ্ঠান করা সম্ভব হয় নি। আমাদের সকলেরই মন হয়ে গেল খুবই খারাপ। নিমন্ত্রণপত্রগুলি ইতিপূর্বেই বের হয়ে গেছে। আমাদের উচ্চপদস্থ লোক ছাড়াও বিদেশী রাষ্ট্রদূত, ভারতবর্ষের নানাস্থানের বিশিষ্ট ব্যক্তিদেরও নিমন্ত্রণ করা হয়েছিল। এত লোকের জায়গা কোথায় হবে? শেষ পর্যন্ত ঠিক হোল যে চীফ জাস্টিসের ঘরেই গাদাগাদি করে ছোট ছোট চেয়ার দিয়ে, বাড়ির চারিদিকের বারান্দায় চেয়ার পেতে ও লাউড স্পীকারের বন্দোবস্ত করা হবে। সেই মতই বন্দোবস্ত করা হোল। কিন্তু তাতে ঘরে ও বারান্দায় ন স্থানম্ তিলধারণম্—হলেও বহু লোক জায়গা না পেয়ে বাইরে দাঁড়িয়ে বৃষ্টিতে ভিজলেন বা গালাগালি দিতে দিতে ফিরে গেলেন। কিন্তু কোন উপায় ছিল না। আমি ও আমার সতীর্থ জজেরা একে একে V. I. P.-দের সাদর অভ্যর্থনা করে চীফ জাস্টিসের খাস কামরায় নিয়ে গেলাম। সেখানে সকলে সমবেত হবার পর আমি রাষ্ট্রপতি, উপরাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী ও অন্যান্য মন্ত্রীদের নিয়ে লাইন করে চীফ জাস্টিসের প্রশস্ত আদালত ঘরে গিয়ে উপস্থিত হলাম। সমবেত জনগণ সবাই উঠে দাঁড়ালেন। ঘরে এতটুকু জায়গা ছিল না। তখনো গায়ের জোরে গুণ্ডামী করে সভা ভেঙে দেবার রেওয়াজটা হয় নি এই যা ছিল রক্ষে। সবাই উপবেশন করলে আমি উঠে রাষ্ট্রপতি ও অন্যান্য সকলকে স্বাগত জানিয়ে রাষ্ট্রপতিকে অনুরোধ জানালাম আনুষ্ঠানিকভাবে সুপ্রিম কোর্টের নতুন গৃহের শুভ উদ্বোধন করতে। সেই ভাষণে আমি নানা কথার মধ্যে বলেছিলাম—

"The stately edifice that we see before us to-day stands firmly on the solid foundation that you, Mr. President, had well and truly laid on that memorable day. To us it is more than a mere magnificent mansion ; to us it stands forth as a solemn and sublime symbol of the majesty of law. The portals of this palace of Justice shall be open to every person who may seek redress for wrong, if any, done to him by his fellow men or by the State and Justice shall be denied to none. The lowliest of the low, be he a citizen or a non-citizen, may as of right claim here equality before the law and shall receive from this temple of justice equal protection of the laws. The writs of this Court will issue from this citadel of law and Justice and run to the furthest corner of this vast country bringing adequatic relief to the oppressed and just retribution to the wrong doer whoever he may be. It shall be the constant endeavour of all of us, charged with the solemn and sacred duty of administering justice, to do right to all manner of people after the laws and usages of our country and to discharge our functions without fear or favour, without affection or ill will and to hold the scale of justice even as between man and man, State and State and as between the States and the Union and above all as between the Union or the State and the man."

আমার ভাষণটি আমি শেষ করেছিলাম আমাদের প্রাচীন গৃহ প্রবেশের সংস্কৃত মন্ত্র উচ্চারণ করে এবং ভগবানের আশীর্বাদ ভিক্ষা করে। রাষ্ট্রপতি ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ তাঁর উদ্বোধনী ভাষণ শেষ করলেন এই বলে—

"In the welter of politics and political parties and ideologies the courts of justice

furnish the one stable element and if they with the Supreme Court at the apex from which they should draw inspiration and sustenance continue to hold their own by air and just decisions and no less by their quick disposal of disputes, we can look forward with confidence to the future for steady growth and progress.

Humbly do I declare the portals of this Temple of Justice open and join the Chief Justice in his salutations and prayers for Devine Benidiction.

অনুষ্ঠানের শেষে বিশিষ্ট অতিথিদের নিয়ে আমি ও অন্যান্য জজেরা আমাদের সেই নতুন প্রাসাদেব আগাগোড়া ঘুরিয়ে আনলাম।

সুপ্রিম কোর্টের নতুন গৃহে অধিবেশন শুরু হবার পর নাগপুর হাইকোর্টের তদানীন্তন চীফ জাস্টিস এম, হিদায়েতুল্লা এলেন সুপ্রিম কোর্টের জজ হয়ে। ইনি নাগপুরে ব্যারিস্টারি কবতেন এবং ভিভিয়ান বোস জজ হবার পর সেখানকাব এ্যাডভোকেট জেনারেল হন। তারপর তিনি নাগপুর হাইকোর্টেব জজ হয়ে ভুবনেশ্বরপ্রসাদ সিংহ যখন সেখানকার চীফ জাস্টিস পদ ছেড়ে দিল্লীতে আসেন তখন তাঁর জায়গায় ইনিই চীফ জাস্টিস হন। ইনি বেশ বিজ্ঞ ও আইনজ্ঞ ব্যক্তি এবং বিলাতি নজির ভাল জানেন। কথায় কথায় হোয়ার্টনস্ ল লেক্সিকন, উইলসন্স প্সসারী অব ওয়ার্ডস্ এ্যান্ড ফ্রেসেস, স্মিথস্ লীডিং কেস ইত্যাদিব উল্লেখ কবে কৌসুলীদের এবং আমাদেরও তাক লাগিয়ে দিতেন। কে জানত ঐ সব বইতেই সকল প্রশ্নের সমাধানের মালমসলা খুঁজে পাওয়া যায়। ইনি বিবাহ কবেছেন একটি হিন্দু মহিলাকে এবং এই দম্পতি বেশ জনপ্রিয় তাঁদের সামাজিকতা ও সৌজন্যের জন্যে। ভিভিযান বোস পরিবারের সঙ্গে এ'দের খুবই ঘনিষ্ঠতা ছিল।

হিদায়েতুল্লার পরে এসেছিলেন কুলদাচরণ দাশগুপ্ত। তিনি পড়াশুনায় খুবই ভাল ছাত্র ছিলেন। তিনি কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন কৃতী ছাত্র। আই-সি-এস পবীক্ষা পাশ কবে তিনি বাংলা দেশেব নানা জেলায ডিস্ট্রিক্ট জজ হযে কাজ কবেছেন বিশেষ সুখ্যাতির সঙ্গে। তারপর ইনি কলকাতা হাইকোর্টে জজ হয়ে ফণিভূষণ চক্রবর্তী অবসর নিলে জজ জায়গায় চীফ জাস্টিস হন। ইনি সুপ্রিম কোর্টে আসেন আমি অবসর নেবার মাস খানেক আগে। একসঙ্গে চারজন বাঙালী সুপ্রিম কোর্টে বসেছেন বলে কটাক্ষ করবার আগেই আমি অবসর নিয়েছিলাম। এঁ'র সঙ্গে আমি সুপ্রিম কোর্টে মাত্র মাস খানেক কাজ করেছিলাম। ইনি আকারে বে'টেই ছিলেন এবং এঁ'র গায়ের রঙ ছিল আমার চেয়েও এক পোঁচ গাঢ়। কুলদা দাশগুপ্ত ফৌজদারী আইনে খুবই অভিজ্ঞ ছিলেন। তা ছাড়া অতি চরিত্রবান, সৎ ও সদাচারী মানুষ বলে তাঁর খ্যাতি ছিল। সুপ্রিম কোর্ট থেকে অবসর নেবাব অল্প আগে কুলদা দাশগুপ্তকে Monopoly Commission-এর চেয়ারম্যান করা হয়। সেই Commission যখন চলছিল তখন তাঁর স্ত্রী-বিয়োগ হয়। তিনি তাঁর কমিশনের যে রিপোর্ট পেশ করেছেন ওয়াকিবহাল মহলে তার ভূয়সী প্রশংসা শুনেছি।

আমাব আমলেই বম্বে হাইকোর্টের জে, সি, সাহের নিয়োগ সাব্যস্ত হয় কিন্তু তিনি সুপ্রিম কোর্টে আসন পরিগ্রহ করেন আমি অবসর নেবার দিন দশ-বার পরে। সুতরাং এঁ'র সঙ্গে কাজ করবার সুযোগ আমার হয় নি।

দ্বাত্রিংশ অধ্যায়

সুপ্রিম কোর্টে যেসব ব্যবহারজীবী দেখেছি

সুপ্রিম কোর্টে আমাদের সামনে যেসব কৌসুলীরা সওয়াল জবাব করতে আসতেন তাঁদের কথা কিছু বলা আবশ্যক। প্রথমে বলি যাঁবা বাইরে থেকে মাঝে মাঝে আসতেন আমাদের কোর্টে। সর্বাগ্রে মনে পড়ে স্যার আহ্লাদী কৃষ্ণস্বামী আয়ারকে। তিনি শুনেছি খুবই গরীবের ঘরের সন্তান ছিলেন। আপন অধ্যবসায় ও প্রতিভাগুণে তিনি পড়াশুনায় বিশেষ উৎকর্ষ এবং সাংসারিক জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন। ছোট-খাট মানুষ, দেখতে শুনতে সুপুরুষ বলা চলেই না। কিন্তু এই সব প্রতিবন্ধক সত্ত্বেও তাঁর প্র্যাকটিস দেখতে দেখতে বেড়ে গিয়েছিল এবং অচিরে তিনি মাদ্রাজের এ্যাডভোকেট জেনাবেল হয়ে বিশেষ খ্যাতি ও প্রভূত অর্থ অর্জন কবেছিলেন। কিন্তু তিনি দুঃস্থদেব ভোলেন নি। বহু গরীব ছেলেদের তিনি অর্থসাহায্য করে গেছেন বলে শুনেছি। Indian Constituent Assembly-র তিনি একজন উদ্যোগী সভ্য ছিলেন এবং আমাদের জাতীয় সংবিধান প্রণয়নে স্যার আহ্লাদীর অবদান ছিল বিস্তর। তিনি বরাবরই খুব পড়ুয়া লোক ছিলেন—বিশেষ করে আন্তর্জাতিক আইন সংক্রান্ত নতুন বইগুলি। আমার সঙ্গে তাঁর বেশ আলাপ হয়ে গিয়েছিল এবং পরস্পরের মধ্যে যাতায়াতও হোত। তিনি আমাকে অনেক সময় ঐসব বই পড়তে দিতেন। বইগুলি যে তিনি তন্ন-তন্ন করে পড়েছেন তার পরিচয় পেতাম তাঁর পেন্সিলের লম্বা লম্বা দাগে। স্যার আহ্লাদী আমাদের কোর্টে একাধিকবার হাজির হয়েছেন। ঐটুকু শরীর থেকে এত জোর আওয়াজ কি করে বের হয় তা ভেবে আশ্চর্য লাগত। একটা জিনিস লক্ষ্য করেছি যে তাঁর মননক্রিয়া তাঁর মুখের কথা থেকে অনেক দ্রুত চলত। সেই জন্যে অনেক সময় তিনি মুখের কথাটা শেষ না করেই তারপরের কথাটা শুরু করতেন। অসাধারণ ছিল তাঁর আইনজ্ঞানের গভীরতা।

স্যার জামসেটজী কাংগা বোম্বাই হাইকোর্টের নামকরা কৌসুলী ছিলেন। এক সময়ে কিছুকাল তিনি বম্বে হাইকোর্টে জজীয়তীও বোধ হয় করেছিলেন। কিন্তু জজীয়তীর চেয়ে ব্যবহারজীবী বলেই তাঁর বেশি খ্যাতি ছিল। তিনি বহুকাল বোম্বাইয়ের এ্যাডভোকেট জেনারেল ছিলেন। শেষের দিকে আয়কর প্র্যাকটিসই বেশি করতেন। সুপ্রিম কোর্টে তিনি কয়েকবারই এসেছিলেন। কিন্তু তাঁর বহাস শোনার সুযোগ আমার হয় নি। সুপ্রিম কোর্ট যখন শুরু হয় তখনই স্যার জামসেটজীর চোখটা খারাপ হতে শুরু করেছিল। তিনি কোর্টে এসে বসে থাকতেন এবং তাঁর জুনিয়ার—বেশি সময়ে জুনিয়ার হতেন পালকীওয়ালা বলে একটি পার্শি মাঝবয়সী এ্যাডভোকেট—কেসটার সওয়াল জবাব করতেন। তিনি মাঝে মাঝে নির্দেশ দিতেন জুনিয়ারকে। কোর্টে তিনি সাদা পাগড়ি পরে আসতেন। শুনেছি পার্শি পুরোহিত সম্প্রদায়ের লোকেরা ঐ রকম সাদা পাগড়িই পরেন। স্যার জামসেটজী সেই সম্প্রদায়ের মানুষ ছিলেন।

বোম্বাই থেকে আসতেন স্যাব এন, পি, এঞ্জিনীয়ার। লম্বা ছিপছিপে মানুষ। তিনিও এককালে বোম্বাইয়ের এ্যাডভোকেট জেনারেল ছিলেন। পরে তিনি স্যার বি, এন, মিত্রের পর ফেডারেল কোর্টেরও এ্যাডভোকেট জেনারেল হয়েছিলেন। ইনি কোর্টের কাজ খুব মন দিয়ে করতেন এবং পুঙ্খানুপুঙ্খ নোট করে আনতেন। যখন তিনি আমাদের কোর্টে আসতেন তখন তাঁর বয়েস হয়েছিল বেশ এবং চুল ও ভুরু সাদা হয়ে গিয়েছিল। খুব আস্তে আস্তে সওয়াল জবাব করতেন। একটু হয়ত দীর্ঘ হোত তাঁর বক্তৃতা; কিন্তু তা সারগর্ভই হোত। একটা জিনিস লক্ষ্য কবেছি যখনই এঞ্জিনীয়ার সাহেব দিল্লীতে আমাদের কোর্টে আসতেন তাঁর সহধর্মিণী লেডী এঞ্জিনীয়ার অন্তত প্রথম দিন কোর্টে বেশ কিছুক্ষণ বসে থাকতেন।

কানহাইয়ালাল মুন্সী নামকরা লোক আইনজগতে এবং রাজনীতিক্ষেত্রে। বম্বে হাইকোর্টে এঁর বেশ ভাল প্র্যাকটিস ছিল এবং ব্যবহারজীবীদের প্র্যাকটিস ভাল হলে সচরাচর যা হয় এঁরও তাই হয়েছিল—অর্থাৎ ইনি রাজনীতিক্ষেত্রে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। বম্বে মন্ত্রিসভায় তিনি বোধ হয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পদে কিছুকাল অধিষ্ঠিত ছিলেন। তারপর তিনি দিল্লীর বৃহত্তর ক্ষেত্রে এসে পড়েন। ভারত সরকারের মন্ত্রিসভায় তিনি এককালে খাদ্য ও কৃষিমন্ত্রী হন এবং সেই সময়ে রবীন্দ্রনাথ প্রবর্তিত বৃক্ষরোপণ অনুষ্ঠানটিকে সারা ভারতবর্ষে বনমহোৎসব বলে চালু করেছিলেন। কিছু পরে তিনি হায়দ্রাবাদের নিজাম সরকারের দরবারে ভারতের Political Officer হয়ে যখন রাজাকর আন্দোলন খুবই জোর চলেছিল সেই সঙ্কটময় সময়ে কাজ করেছিলেন। মাঝখানে বোধ হয় তিনি তাঁর সেখানকার বাসভবনেই আবদ্ধ ছিলেন—আজকালকার "ঘেরাও"-এরই প্রথম সূচনা বোধ হয়। আইন ও রাজনীতি ছাড়া কানহাইয়ালাল মুন্সীর সুসাহিত্যিক বলেও খ্যাতি ছিল। তিনি গুজরাটিতে অনেক নাটক রচনা করেছেন। বর্তমানে "ভারতীয় বিদ্যাভবন"-এর প্রতিষ্ঠা ও তার কুলপতিরূপে সে প্রতিষ্ঠানের দেখাশুনা করা মুন্সী সাহেবের বিশেষ কৃতিত্বের পরিচায়ক। সুপ্রিম কোর্টে তিনি যে কয়বার এসেছেন প্রত্যেকবারই আয়কর সংক্রান্ত আপীলেই হাজির হতেন। বেশ সংক্ষেপেই বহাস করতেন—কোর্টের সময় নষ্ট হোত না। তিনি ফিন্‌ফিনে ধুতির উপর কালো কোট, ব্যাণ্ড ও গাউন চড়িয়ে এবং সৌখিন চপ্পল পায়ে দিয়ে কোর্টে আসতেন।

বম্বে থেকে আরো দুজন এ্যাডভোকেট প্রায়ই সুপ্রিম কোর্টে আসতেন। তাঁরা দুজনেই সুখ্যাত ছিলেন আয়কর বিশেষজ্ঞ। দুজনেই ছিলেন পার্শি সম্প্রদায়ভুক্ত। প্রথমটির নাম আর, জে, কোলা। লম্বা ও রোগা ভদ্রলোক। আয়করের ধারাগুলি এবং সেসব ধারার উপর যাবতীয় রায়সমূহ এঁর নখদর্পণে ছিল। তিনি নিজে আয়কর ভাল জানতেন বলে ধরেই নিতেন যে সব জজেরা-ও সে বিষয়ে ওয়াকিবহাল। এই ধারণার বশবর্তী হয়ে তিনি খুব দ্রুত বহাস করতেন। মনে হোত যেন বড্ড বেশি হুড়বড় করে চলেছেন। অনেক সময় সে বহাসের সঙ্গে পাল্লা দেওয়া অন্তত আমার পক্ষে শক্ত হয়ে উঠত এবং একটু রাশ টেনে ধরতে হোত এই বলে—"Mr. Kolah, you are going too fast for me." হাসি মুখে তিনি আবার ফিরে আরম্ভ করতেন। পালকীওয়ালা কোলার চেয়ে বয়সে কম ছিলেন কিন্তু তাঁর বহাসের কায়দাটি ছিল উচ্চাঙ্গের। তাঁর আইনের জ্ঞান ছিল পাকা—বিশেষ করে আয়কর আইন সম্বন্ধে। এঁর সওয়াল জবাবের মধ্যে বেশ একটি ধারা ছিল। ধাপে ধাপে তিনি চলতেন। অনেক সময় গোড়ার দিকে তিনি তাঁর বক্তব্যটা চুম্বক করে কয়েকটি প্রস্তাব আমাদের লিখিয়ে দিতেন এবং তারপর প্রত্যেকটি প্রস্তাবের ব্যাখ্যা ও তার সমর্থনে আইনের ধারা ও নজির পেশ করতেন। শুধু আয়কর নয়—অন্য ধরণের মামলাও তিনি করেছেন আমাদের সামনে এবং তাতেও তিনি একই নীতি অনুসরণ করে সওয়াল জবাব করতেন। আমি এই যুবক এ্যাডভোকেটের কার্যক্রম দেখে সত্যই মুগ্ধ হয়েছিলাম এবং এক সময় তাঁর সুপ্রিম কোর্টের বেঞ্চে আসা নিয়ে তাঁর সঙ্গে আলাপও করেছিলাম। কিন্তু সেটা তখন তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় নি। তিনি আয়কর সম্বন্ধে যে একখানি বই লিখেছেন সেটা সর্বজন অনুমোদিত গ্রন্থ বলে খ্যাতি লাভ করেছে।

বোম্বাই হাইকোর্টের আরো কয়েকজন এ্যাডভোকেট আসতেন শিল্পমজুরদের কেস নিয়ে। একজনের নাম বেশ মনে আছে—এ, এস, আর, চারি। খুব ফিট্‌-ফাট্‌ সাজগোজ পরা বামপন্থী এ্যাডভোকেট। ইনি যখন বেশ জোর বহাস করতেন তখন তাঁর বাম হাত বাড়িয়ে হাওয়ায় থাবা মারতেন যেন মনে হোত যে তিনি তাঁর বক্তব্যটা আমাদের মাথায় বেশ ভাল করে ঢুকিয়ে দেবার প্রয়াস করছেন। আর একজন এসেছিলেন কি যেন দেশাই। গৌরবর্ণ, বেঁটে মানুষ, চোখে চশমা।

মাদ্রাজের অবসরপ্রাপ্ত জজেদের মধ্যে গোড়ার দিকে আসতেন আমাদের কোর্টে কৃষ্ণস্বামী আয়েঙ্গার। পায়ে চপ্পল, পরনে ধুতি এবং তার উপরে কাল কোট, ব্যাণ্ড ও গাউন মাথায় সাদা পাগড়ি এবং কপালে চন্দনতিলকের বড় বড় লাইন। গায়ের রঙ ছিল খুবই ময়লা এবং সেই জন্যে কপালের চন্দন বেশ চক্‌চক্‌-ই করত। মাদ্রাজের জমিজমা সংক্রান্ত পুরনো আইন সংক্রান্ত কেসেই তিনি বেশি আসতেন। খুব ধারালো ছিল তাঁর রসনা এবং বেঞ্চে চন্দ্রশেখর আয়ার থাকলেই বজ্রবিদ্যুতের গর্জন বেজে উঠতই। অনেকদিন জজীয়তী করে তাঁর মন ও মেজাজে বোধ হয় একটু অর্ধ্বে এসে গিয়েছিল। আমরা তাঁর কোন আইনগত প্রস্তাবে একমত না হলে যেন একটু বিরক্ত হতেন।

শেষের দিকে আসতেন মাদ্রাজের অবসরপ্রাপ্ত জজ বিশ্বনাথ শাস্ত্রী। ছিপ্‌-ছিপে রোগা মানুষ। কাপড়-চোপড়ে কোন দৃক্‌পাতই ছিল না—কেমন যেন অমনোযোগী এসব বিষয়ে। কোর্ট থেকে বাড়ি ফেরার সময় দেখেছি যে এক নং গেটের বাইরে হার্ডিঞ্জ এ্যাভেন্যুতে একগাদা ব্রীফ হাতে করে দাঁড়িয়ে আছেন বিশ্বনাথ শাস্ত্রী টাঙ্গা কি ফট্‌-ফটিয়ার অপেক্ষায়। যাকে বলে plain living and high thinking. কোর্টের কাজ করতেন খুব যোগ্যতার সঙ্গেই। খুব সংক্ষেপে বিনা আড়ম্বরে মামলার মোক্ষম প্রশ্নগুলি নিয়ে আলোচনা করতেন। কোর্টের সময় একেবারেই নষ্ট করতেন না। আমার অবসর নেবার পর শুনেছি বিশ্বনাথ শাস্ত্রীর সুপ্রিম কোর্টে একচেটিয়া প্র্যাকটিস জমে ছিল।

সুপ্রিম কোর্টের গোড়ার দিকে এক কেসে এসেছিলেন এম, কে, নাম্বিয়ার। সে কেসটা ছিল Preventive Detention Act-এর বৈধতা সম্বন্ধে। এখন সে কেসটা এ, কে, গোপালন বনাম স্টেট অফ মাদ্রাজ বলে বিখ্যাত হয়ে গেছে। এই কেসে নানা রকমের সাংবিধানিক প্রশ্নের আলোচনা হয়েছিল নাম্বিয়ার মাদ্রাজে, না, কেরালায় প্র্যাকটিস করতেন ঠিক মনে নেই। তিনি খুব তৈরি হয়ে এসেছিলেন এবং ইংরেজী ও মার্কিন অনেক নজির আমাদের সামনে পেশ করেছিলেন। কেসটা খুবই যোগ্যতার সঙ্গে পরিচালিত করেছিলেন। শুনেছি এই কেসের পরই নাম্বিয়ারের খুব খ্যাতি রটে গিয়েছিল এবং তাঁর প্র্যাকটিসও হু-হু করে বেড়ে গিয়েছিল। বয়সটা তাঁর বেশ গড়িয়ে গিয়েছিল বলে জজীয়তী নেওয়া তাঁর পক্ষে লোকসানের বাণিজ্য হবে বলে সেটা তিনি নিতে পারেন নি।

এলাহাবাদ হাইকোর্টের বিচারপতি এস, পি, সিনহার দুর্ভাগ্যক্রমে কি একটা কারণে ফেডারেল কোর্টের অভিমত অনুসারে তাঁকে কাজ থেকে অবসর নিতে হয়েছিল। অনেকের কাছে শুনেছি যে ভদ্রলোকটির ত্রুটি-বিচ্যুতি যদি বা কিছু হয়ে থাকে তার চেয়ে শতগুণে বেশি শাস্তি দেওয়া হয়েছিল। তাঁর চেয়ে ঢের বেশি অপরাধীও নাকি বিনা ওজরে পার পেয়ে গেছে। তাঁর এই দুর্ভাগ্যের ভালমন্দ বিচারের ভার আমার উপরে ভগবান দেন নি। তিনি এই ঘটনার পর দিল্লীতেই বসে গেলেন প্র্যাকটিস করতে। খুব হামেশাই তিনি সুপ্রিম কোর্টে হাজির হতেন। অনেক কেসই বলবার কিছু না থাকলেও মক্কেলের নির্বন্ধাতিশয্যে তাঁকে একটু বেঁযে-চেয়ে দেখতে হোত। আইনজ্ঞান, বিশেষ করে ফৌজদারী আইনে—তাঁর বেশ ভালই ছিল। দিল্লীতে থাকতে তাঁর সঙ্গে নানা পার্টিতে দেখাশুনা হোত। মাঝে মাঝে আমার বাড়িতেও আসতেন। আমিও তাঁর বাড়ি গেছি যখন তিনি অসুস্থ হয়ে শয্যাগত হয়ে পড়েছিলেন। তিনি আমাকে খুবই প্রীতির

চক্ষে দেখতেন এবং কেন জানি না তাঁর মুখের দিকে চাইলেই আমার মনে একটা বিষাদভরা করুণার উদ্রেক হোত—কেবলই মনে হোত যে হয়ত তিনি একটা মস্ত বড় ভুলের ক্রীড়াপুত্তলি হয়েছিলেন।

প্রায়ই সুপ্রিম কোর্টে হাজির হতেন গোপালস্বরূপ পাঠক। এলাহাবাদের নামকরা এ্যাডভোকেট তিনি ছিলেন। কিছুকাল সেখানে হাইকোর্টের অতিরিক্ত জজ-ও ছিলেন। জজীয়তীর চেয়ে প্র্যাকটিসের টাকার মোহটাই ছিল বেশি। সুতরাং জজীয়তী ছেড়ে প্র্যাকটিসেই নেমে এলেন। অর্থ উপার্জন করেছেন বিস্তর। পরে দিল্লীতেই প্রায় বসে গেলেন এবং সুপ্রিম কোর্টে বেশ বড় বড় কেসে আসতেন। জুনিয়ারবা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে যেসব তথ্য উদ্ধার করতেন তিনি তার থেকে বিস্তৃত নোট করে কোর্টে আসতেন। এবং কোন পয়েন্টই ছাড়তেন না। নাছোড়বন্দা কৌসুলী যাকে বলে। জজেরা কিছু গোলযোগ বা অপ্রিয় কথা তুললে সহাস্য মুখে জবাব দিতেন যেন কিছুই হয় নি। কিছুদিন আগে তিনি ভারত সরকারের আইনমন্ত্রী হয়ে কাজ করেছিলেন। এক্ষণে তিনি বোধ হয় মহীশূরের রাজ্যপাল হয়েছেন।

উত্তর প্রদেশের প্রাক্তন বিচারপতি চন্দ্রভান আগরওয়ালাও বসেছেন দিল্লীতে। তাঁরও বেশ কাজকর্ম ছিল দেখেছি। হাসিখুশি মানুষ। প্র্যাকটিস ছাড়াও তাঁর অন্যান্য বিষয়ে উৎসাহ ছিল। তিনি ইণ্ডিয়ান ল ইনস্টিটিউটের একজন উদ্যোগী কর্মকর্তা ছিলেন—এখনও বোধ হয় আছেন।

বিহার থেকে আসতেন পি, আর দাশ—আমাদের মেজদাদা প্রফুল্লরঞ্জন। আইনজ্ঞান ছিল তাঁর অসামান্য—দক্ষিণাও নিতেন খুব ভাল রকম। বহু কেসে তিনি সুপ্রিম কোর্টে কৃতিত্বের সঙ্গে কাজ করেছেন। বিহার ল্যাণ্ড রিফর্মস্ এ্যাক্টকে নাকচ করে দেবার জন্যে তিনি যে চিত্তাকর্ষক সওয়াল জবাব করেছিলেন তা অন্য কোন কৌসুলী পারতেন কিনা সন্দেহ।

পাটনার সরকারী উকিল—লালনারায়ণ সিংহ—এসেছেন আমাদের কোর্টে কয়েকবার। চমৎকার ছিল তাঁর সওয়াল জবাবের রীতি। ঝোপেঝাড়ে না ঘুরে বেড়িয়ে তিনি সোজা মামলার মোক্ষম প্রশ্নটি নিয়ে যা বলবার বলে বসে পড়তেন। একেবারে বাজে আলোচনায় জজেদের বিভ্রান্ত করবার চেষ্টা করতেন না এবং কোর্টের সময় বৃথা নষ্ট করতেন না। এর জন্যে তাঁর সওয়াল জবাব খুবই মনোজ্ঞ হোত।

একটি জুনিয়ার এ্যাডভোকেট বাসদেও প্রসাদ—দু'-একবার সুপ্রিম কোর্টে এসেছেন। এঁর খুব প্রশংসা করতেন আমাদের মেজদাদা প্রফুল্লরঞ্জন। ইনিই পার্লামেন্ট ও অন্যান্য আইনসভার privilege সম্বন্ধে Search Light Case-এ খুব সুচিন্তিত বহাস করেছিলেন। এঁর যুক্তি আমরা গ্রাহ্য করতে পারি নি কিন্তু তার জন্যে এঁর সওয়াল জবাবের ন্যায্য প্রশংসা করতে বাধা নেই। অন্তত একজন জজ সুব্বা রাও এঁর স্বপক্ষে রায় দিয়েছিলেন। সম্প্রতি আমাদের সংখ্যাগরিষ্ঠ বায়টি নিয়ে উত্তর প্রদেশের একটি কেসে খুবই আলোচনা হয়ে গেছে। অমলকুমার সরকার আমাদের সেই পুরনো রায়টির পূর্ণ সমর্থন করেছেন। চীফ জাস্টিস গজেন্দ্র গাদকার ও অন্যান্য জজেরা আমাদের পুরনো রায়টিকে অশুদ্ধ বলেন নি কিন্তু কেমন করে যেন এড়িয়ে গেছেন।

কলকাতা থেকে যাঁরা আসতেন তাঁদের মধ্যে অগ্রণী ছিলেন অতুল গুপ্ত মশায়। খুব ধীরে ধীরে ইনি কথা বলতেন। শেষ দিকে এঁর কণ্ঠস্বর এমন ক্ষীণ হয়ে গিয়েছিল যে এজলাস থেকে শোনা কঠিন হয়ে উঠত। ইনি ছিলেন অতি বিচক্ষণ আইনজীবী। এঁর বহাসে উত্তেজনা কিংবা ভাবাবেগ ছিল না। কিন্তু তাঁর বক্তব্যের ভিত্তি হোত আইনের নীতিগত মর্মার্থ ও প্রাচীন নজির। সেই জন্যে এঁর কাজের মান বেশ উঁচু ছিল। আইন ছাড়া সাহিত্যে এঁর খ্যাতি ছিল। ছাত্রাবস্থায় বরিশালের কনফারেন্সের মিছিলে যোগদান করায় এঁকে যে মুচলিকা দিতে হয়েছিল তার জন্যে এঁর হাইকোর্টের জজীয়তীটা যে পণ্ড হয়ে গেল সে কথা আগেই বলেছি।

হীরালালবাবু দু'-একটা হিন্দু আইন সংক্রান্ত ব্যাপারে সুপ্রিম কোর্টে এসেছেন বলে মনে পড়ে। হিন্দু আইনটা সত্যি সত্যি জানতেন। তবে জজেরা প্রশ্ন করে করে তাঁর বহাসের স্রোতে বাধা দিলে একটু বেজার হয়ে যেতেন। পঞ্চানন ঘোষ অনেক কেসে আমাদের সামনে হাজির হয়েছেন। তাঁর ছেলে সুকুমার ঘোষ সুপ্রিম কোর্টের এজেন্ট ছিলেন। সেই জন্যে পঞ্চাননবাবু একেবারে দিল্লীতেই বসে যাবার ইচ্ছে করেছিলেন। হাতে এক টিপ নস্যি নিয়ে পঞ্চাননবাবু বহাস করতেন এবং মাঝে মাঝে নাকে গুঁজতেন। এঁর নামটাকে সংক্ষেপ করে কোর্টের বাইরে মহাজন সাহেব বলতেন "হ্যালো পঞ্চম"। মাঝে মাঝে আয়করের আপীল নিয়ে এসেছেন সুকুমার মিত্র। ঐ বিষয়টাতে এঁর সত্যি সত্যি খুবই অভিজ্ঞতা ছিল। আগেই এর বিস্তারিত পরিচয় দিয়েছি।

বাইরে থেকে একবার এসেছিলেন ডি, এন, প্রিট, কে, সি। ইনি বিলেতের প্রিভি কাউন্সিলে প্র্যাকটিস করতেন। বেশির ভাগই ছিল এঁর ইণ্ডিয়ান আপীল। যখন প্রিভি কাউন্সিলের বদলে সুপ্রিম কোর্ট হয়ে গেল তখন এঁর প্র্যাকটিসেও কিছুটা মন্দা পড়েছিল। এঁকে কেরালার কম্যুনিস্ট সরকার নিয়ে এসেছিল কেরালা শিক্ষা বিলের সম্বন্ধে রাষ্ট্রপতি সুপ্রিম কোর্টের কাছে যখন পরামর্শ চেয়ে পাঠান সেই রেফারেন্সে হাজির হবার জন্যে। বেশ আস্তে কথা বলতেন—গলার আওয়াজটা তেমন ভাল ছিল না—কেমন যেন ফ্যাঁসফেঁসে। মেজাজটা তাঁর যেন একটু রুক্ষই মনে হয়েছিল। তাঁর মতের সঙ্গে মত না মিললেই কেমন যেন রেগে উঠতেন। এই রকম মেজাজ নিয়ে প্রিভি কাউন্সিলে কাজ করতেন কি করে জানি না। যাই হোক আমাদের কোর্টে দু'-একবার একটু অপ্রীতিকর আবহাওয়ার সৃষ্টি হলেও অঘটন কিছু হয় নি।

সুপ্রিম কোর্টে অনেক সময় এক দেশের মামলা এলে অন্য দেশের এ্যাডভোকেট জেনারেলদের নোটিশ দেওয়ার রেওয়াজ আছে, কেন না এ ধরণের প্রশ্নে অন্যান্য দেশেরও বক্তব্য থাকতে পারে। অনেক সময় সেই সব এ্যাডভোকেট জেনারেলরা হাজির হতেন। এঁদের বলা হোত intervener. এই রকম intervener হয়ে অথবা নিজের স্টেটের মামলা নিয়ে অনেক এ্যাডভোকেট জেনারেল আমাদের সামনে হাজির হতেন। এঁদের মধ্যে মনে আছে উত্তর প্রদেশের প্যারীলাল ব্যানার্জীকে। সুপ্রিম কোর্টে যখন তিনি আসতেন মধ্যে মধ্যে তখনই তাঁর শরীর ভেঙে পড়েছিল এবং সেই জন্যে তাঁর অতিবিশ্রুত বাগ্মিতার পরিচয় আমি পাই নি। এর পর আসতেন কানহাইয়ালাল মিশ্র। ইনি উত্তর প্রদেশের এ্যাডভোকেট জেনারেল ছিলেন বহুকাল। সম্প্রতি কংগ্রেস সাধারণ নির্বাচনে হেরে যাওয়ায় ইনি এ্যাডভোকেট জেনারেলের পদে ইস্তফা দিয়ে সুরুচির পরিচয় দিয়েছেন। বেশ সংক্ষেপে সত্যিকারের প্রয়োজনীয় কথাই বলতেন। আমি যখন এলাহাবাদে যাই তখন এঁর কাছে আতিথ্য ও সৌজন্য লাভ করেছিলাম। বোম্বাইয়ের দুইটি এ্যাডভোকেট জেনারেলকে দেখেছি—আমিন ও শীরভাই। দুজনেই বেশ ভাল এ্যাডভোকেট। শীরভাইয়ের একটু হাত নাচাবার মুদ্রাদোষ আছে। বিহারের মহাবীরপ্রসাদ প্রায়ই সুপ্রিম কোর্টে আসতেন। এ্যাডভোকেট জেনারেল হবার আগে ইনি কিছুদিন অস্থায়ী জজও ছিলেন বোধ হয় পাটনায়। অত্যন্ত ভদ্র ছিল এঁর ব্যবহার এবং কোর্টের কাজ করতেন বেশ ভালই। মহীশূরের এ্যাডভোকেট জেনারেল সোমনাথ আয়ারের সওয়াল জবাবে আমি বেশ আকৃষ্ট হয়েছিলাম। বোধ হয় রাজনৈতিক কারণে তাঁর এ্যাডভোকেট জেনারেলের কাজটা বেশি-

দিন চলে নি। এ'র উপরে সেজন্য আমার একটু মমতা ছিল। পরে এ'কে মহীশূর হাইকোর্টের জজীয়তী পদে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছিল। মাদ্রাজের তদানীন্তন এ্যাডভোকেট জেনারেল ছিলেন ভি, কে, টি, চারী। ইনি ছিলেন নামকরা কৃষ্ণমাচারীর পুত্র এবং গোপালস্বামী আয়েঙ্গারের জামাতা। সেই জন্যে অনেকে এ'কে ঠাট্টা করে বলত "double barrel gun." ইনি খুব পড়াশুনা করতেন—বিশেষ করে সাংবিধানিক আইনের নতুন বইগুলি। আইনের জ্ঞান ভাল ছিল। শুনেছি যে তিনি মাদ্রাজ গভর্নমেণ্টের ফাইলে যেসব মতামত ও পরামর্শ দিতেন তা খুবই উঁচুদরের হোত। কোর্টের বহাস অতটা বোধ হয় মনমজান হোত না। সওয়াল জবাব করতে করতে মাথা নাড়তেন এবং হাতের আঙুলগুলি নানা রকমে নাড়তেন—যেমন হয় নাচের মুদ্রায়। মাদ্রাজের অনেক এ্যাডভোকেটের দেখি মাথা নাড়ানর অভ্যাস। এক-এক সময়ে হাসি পায় এবং মাঝে মাঝে কেমন যেন বিরক্তিকরও ঠেকে। চারী সাহেবের আগে মাদ্রাজের এ্যাডভোকেট জেনারেল ছিলেন রাজা আয়ার। বেঁটে-খাট মানুষটি গোড়ার দিকে সুপ্রিম কোর্টে আসতেন। কিন্তু মাদ্রাজে তাঁর এত বেশি কাজ ছিল যে তা ফেলে অনেক সময় দিল্লী আসা তাঁর পক্ষে সম্ভব হোত না। কলকাতার এ্যাডভোকেট জেনারেল স্যার এস, এম, বোসেরও ডাক পড়ত দিল্লীতে। কিন্তু তিনি পারতপক্ষে আসতে চাইতেন না। এস, এম বোস সাহেব ছিলেন কলকাতার বিগ ফাইভের একজন। তাঁর গুণাবলীর কথা আগেই বলেছি। পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন।

দিল্লীতে সুপ্রিম কোর্টে যাঁরা নিয়মিত কাজ করতেন তাঁদের অগ্রণী ছিলেন মতিলাল চমনলাল শীতলবাদ। ইনি সুপ্রিম কোর্টের প্রথম এটর্নী জেনারেল এবং ঐ পদে বহাল ছিলেন কিছুদিন আগে পর্যন্ত। ইনি বম্বের স্বনামধন্য স্যার চমনলাল শীতলবাদের জ্যেষ্ঠ পুত্র। বম্বের ওরিজিন্যাল সাইডে এ'র খুবই পশার জমেছিল এবং কালক্রমে তিনি সেখানকার এ্যাডভোকেট জেনারেলও হন। সেখান থেকে তিনি সুপ্রিম কোর্টে আসেন। এ'র একমাত্র ছেলে অতুল মতিলাল শীতলবাদ বম্বেতে প্র্যাকটিস করছেন। এ'রা তিন পুরুষ আইনজীবী। মতিলাল শীতলবাদের কোর্টের কাজ আমার খুবই পছন্দ হোত। এ'র বহাস এলোধাবাড়ি ছিল না। ইনি সওয়াল জবাব করতেন ধাপে ধাপে—যাকে বলে logically, step by step. ইনি কেসে থাকলে এ'র সঙ্গে মতের ঐক্য হোক আর নাই হোক রায় লিখবার খুব সুবিধে হোত। মামলাটায় যা যা সত্যিকারের প্রশ্ন উঠতে পারে সব ক'টারই আলোচনা হয়ে যেত বিশদভাবে। শীতলবাদের সওয়াল জবাবে সচরাচর উষ্মা দেখা যেত না। তবে অন্যায় কোন ইঙ্গিত করলে তাঁর আপত্তি ও অসন্তোষ বেশ স্পষ্টই বুঝেই দিতেন।

সুপ্রিম কোর্টের কাজ বেড়ে যাওয়ায় সলিসিটার জেনারেলের পদ সৃষ্টি হোল এবং সেখানে এলেন চন্দ্রকুমার দপ্তরী। ইনি ব্যারিস্টার হয়ে বম্বেতেই প্র্যাকটিস করতেন। পরে বম্বের এ্যাডভোকেট জেনারেল হন। ইনি বিবাহ করেছেন একটি বাঙালী মহিলাকে—স্যার অতুল চ্যাটার্জীর ভ্রাতুষ্পুত্রীকে। দপ্তরী ইংরেজীতে যাকে বলে my dear fellow. মুখে সদানন্দ হাসিটুকু লেগেই আছে। হাসিঠাট্টা বোঝেন এবং করেনও। সাতেও নেই পাঁচেও নেই। অতি নির্বিবাদী মানুষ বলেই জানি। এ'র একটি সহজ সাধারণ বুদ্ধি আছে। তার উপর আইনের জ্ঞানও প্রখরই বলা যায়। ইনি খুব সরল ও সহজভাবে কেসটার ঘটনা ও আইন বিশ্লেষণ করতে পারেন। কথায় কথায় আইনের নজির পেশ করে জজেদের বিভ্রান্ত করেন না। এ'র বহাস শুনলে কলকাতা হাইকোর্টের বিগ ফাইভের অন্যতম বি, সি, ঘোষ সাহেবের কথা আমার মনে হয়। ইনি মহাত্মা গান্ধী হত্যার মামলা করেছিলেন এবং সেই সূত্রে পাঞ্জাব হাইকোর্টে যে আপীল হয়েছিল অতেও তিনি সিমলায় এসেছিলেন।

গভর্নমেণ্টের কোর্টের এবং আইনগত বিষয়ে কাজ আরো বেড়ে গেলে অতিরিক্ত সলিসিটার হয়ে এলেন কলকাতা হাইকোর্টের ব্যারিস্টার হেমনাথ সান্যাল। হেমনাথ আমার সঙ্গে কলকাতা হাইকোর্টে অনেক কেসে জুনিয়ার হয়ে কাজ করেছেন। তিনি আইনটা বেশ ভালই জানতেন। অনেক কূটকচালে প্রশ্ন তুলতে পারতেন। তাঁর যে বাগ্মিতা খুব উঁচুদরের ছিল তা বলতে পারা যায় না। কিন্তু সলাপরামর্শ সরকারকে ভালই দিতেন বলে শুনেছি। কোর্টে যে সওয়াল জবাব করতেন তা সারগর্ভই হোত। দপ্তরী সাহেব এটর্নী জেনারেল হলে সান্যাল সাহেবও সলিসিটার জেনারেল হয়েছিলেন। আমার অবসর নেবার বহুদিন পরে হেমনাথ সান্যাল রাত্রে নিদ্রিতাবস্থায় আততায়ীর হাতে মারা যান। কি কারণে তারা তাঁকে হত্যা করল তা জানি না।

অন্যান্য যাঁরা নিয়মিত সুপ্রিম কোর্টে প্র্যাকটিস করতেন তার মধ্যে ছিলেন নির্মলচন্দ্র চ্যাটার্জী। এ'র কথা আগেই বলেছি। যেমন কলকাতায় তেমনি দিল্লীতে নির্মল চ্যাটার্জীর খুব ভাল প্র্যাকটিস জমেছে। আগে তিনি লোকসভার সভ্য ছিলেন। মাঝে নির্বাচনে হেরে গিয়ে ক' বছর লোকসভায় ছিলেন না। ইদানীং এবং এখনো তিনি এম-পি হয়ে দেশের কাজ করছেন। ইনি দিল্লীর সুপ্রিম কোর্ট বার এ্যাসোসিয়েশনের ভাইস-প্রেসিডেণ্ট বহুকাল ধরেই রয়েছেন। আইনজ্ঞান এ'র বেশ প্রখর, বাগ্মিতাও ভাল। এক-এক সময়ে একটু নাটকীয় হযে যায়। সেটা বোধ হয় রাজনৈতিক আবহাওয়ার গুণে। এ'র ছোট ছেলে সোমনাথ খুব ভাল প্র্যাকটিস করছেন কলকাতায়।

আরো অনেক এ্যাডভোকেটদের দেখেছি সুপ্রিম কোর্টে প্র্যাকটিস করতে। কার নাম বাদ দিয়ে কার নাম করব। এ'দের মধ্যে অনেকে এখন বিভিন্ন হাইকোর্টের জজ হয়ে গেছেন, যেমন সঞ্জীব নায়ডু, জি, সি, মাথুর, কে, বি, আস্থানা, এস, কে, কাপুর, রণজিৎ সিং নারুল্লা, জিন্দ্রালাল ইত্যাদি। তারাচাঁদ মাথুর বোধ হয় মারা গেছেন। বেদব্যাস, বিন্দ্রা ও বি, সেন এখনো প্র্যাকটিস করছেন। গুরুবচন সিং হৃদরোগে মারা গেছেন। উম্রিগর, দাদাচাঁদজী, দ্বিজেন মুখার্জী, সুকুমার ঘোষ, সমর মুখার্জী, দলীপ কাপুর ও আরো কত ভাল ভাল এ্যাডভোকেট। ফ্র্যাঙ্ক এ্যান্টনি প্র্যাকটিসও করছেন, রাজনীতিও চালিয়েছেন সেই সঙ্গে। তিনি এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান সম্প্রদায়ের উন্নতিকল্পে অনেক কাজ করেছেন এবং করছেন এখনো। যাঁদের নাম এখনো করতে পারলাম না তাঁরা যে স্মরণীয় নন তা মোটেই নয়। আমার স্মরণশক্তির ক্ষয়ই এর একমাত্র কারণ। আমার কর্তব্য পালনে এ'রা সর্বদাই আমাকে সাহায্য করেছেন। সুপ্রিম কোর্টের গোড়ার দিকে একজন এজেন্ট ছিলেন রাজেন্দ্রনারায়ণ বলে। দিল্লীর লোকেরা অপভ্রংশ করে বলত রাজিনদর নারায়ণ। চমৎকার কাজের লোক ছিলেন তিনি। একটি ভাল আফিসও করেছিলেন আর কয়েকজন এজেন্টদের নিয়ে। অতি অকালে কামলা রোগে তিনি মারা যান।

আর মনে পড়ে সুপ্রিম কোর্টের যত কর্মচারী—উচ্চ ও নিচ—যাঁরা আমাকে দীর্ঘ দশ বছর সর্বরকমে সাহায্য করেছেন। রেজিস্ট্রার পি, এন, মূর্তি যিনি অকালে মারা গেলেন। তারপর এলেন অরিন্দম দত্ত যিনিও এখন ইহজগতে নেই। এস, এন, শর্মা, গুরু দত্ত—দুই ডেপুটি রেজিস্ট্রার। আমার ব্যক্তিগত সচিব সুধাংশু গুপ্ত, রামকিষণ কৌল, পীতাম্বর শর্মা ও রাঘবাচারী। সি এম.

মাও, কৃষ্ণাণ, লাইব্রেরীর অমারিক সিং, এস, দত্ত, হীরেন সান্যাল, এন, সেনগুপ্ত এবং আমার হেড চাপরাশি অনন্তরাম।

আমি বাংলা দেশের এক অকিঞ্চন সন্তান। আমি এসে পড়েছিলাম প্রথমে ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত দেশ পাঞ্জাবে এবং পরে দিল্লীতে। নতুন দেশে কত নতুন লোকেদের সঙ্গে আলাপ হোল এবং তাঁদের সুখ-দুঃখের অংশীদার হয়ে গেলাম। অবাক হয়ে যাই ভেবে যে কে আমাকে তাঁদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিল, কে এই সব অচেনাদের চিনিয়ে দিল।

"জীবনে মরণে নিখিল ভুবনে
যখন যেখানে লবে
চির জনমের পরিচিত ওহে
তুমিই চেনাবে সবে।"
—রবীন্দ্রনাথ

[ক্রমশঃ]

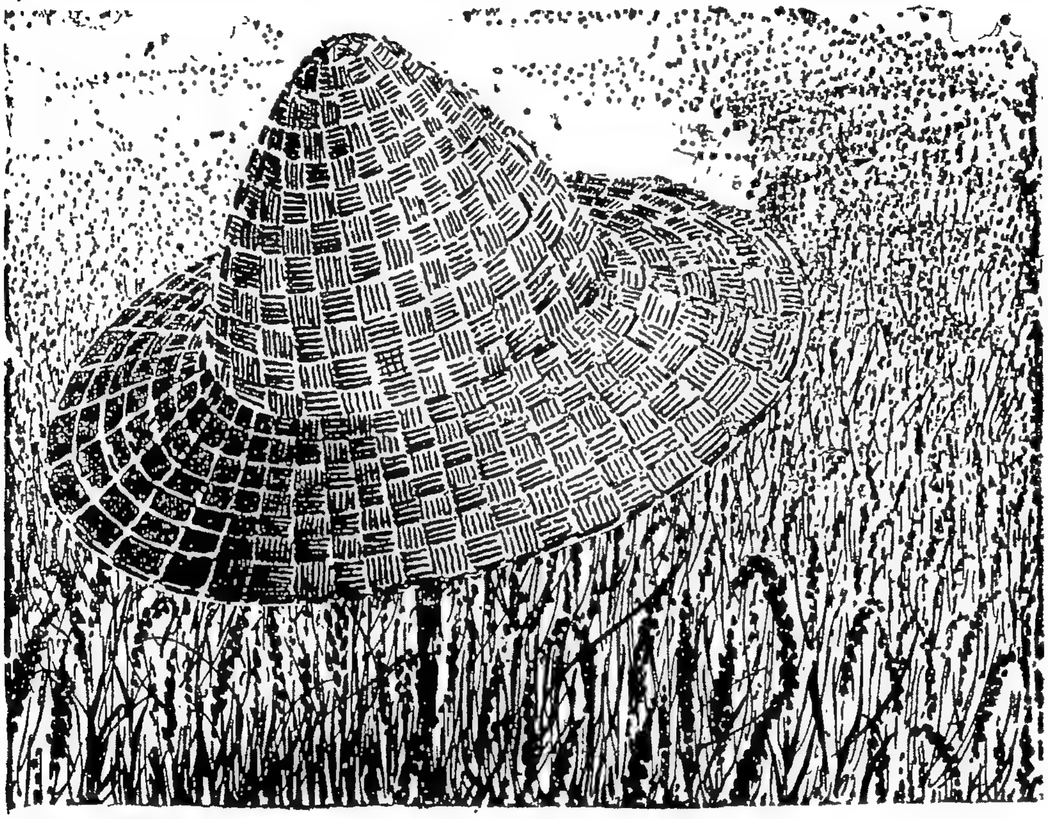

ইউবিআই ও কৃষক

কৃষি উন্নয়নে অর্থলগ্নির ব্যাপারে দরকার সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গির। সে দৃষ্টিভঙ্গি ইউবিআই-র আছে।

• আর দরকার সমগ্র প্রয়োজন মেটানোর ব্যবস্থার (পাম্প, ট্রাক্টর, বীজ, সার, চাই কি পোকামাকড় মারার ওষুধ কেনা, ফসল তুলে গুদামজাত করা, বেচাতে বাজারে পাঠানো— কতদিকে কত খরচ)। সে ব্যবস্থা ইউবিআই-র আছে।

• রাজ্য সরকারের সহযোগিতায় কোন পরিকল্পনাতে ঋণদানের প্রস্তাবও বিবেচনা করা হয়।

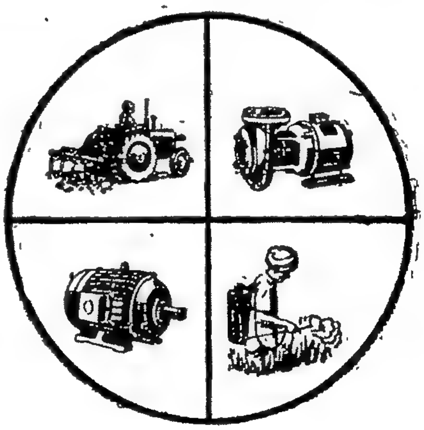

যোগাযোগ করুন :

ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া লিঃ

কৃষিঋণ বিভাগ

২৫-২৭, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা-১

পশ্চিমবঙ্গে ৯৫টিরও অধিক শাখা আছে

রাজনীতি ও ছাত্রসমাজ

প্রদ্যোৎকুমার রায় ॥

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

(৮)

১৯২০-'২১-এর আন্দোলনে মহাত্মা গান্ধী ভারতবর্ষের জাতীয় কংগ্রেসের ধারক হলেন। "স্কুল-কলেজ বর্জন নিয়ে প্রথমে অসহযোগ আন্দোলন সুরু হয়। প্রত্যেক প্রগতিমূলক আন্দোলনে তরুণ-মন আগে সাড়া দেয়। সুতরাং বিভিন্ন শিক্ষাকেন্দ্রে ছাত্রগণ বিদ্যালয় ত্যাগ করে দেশ-সেবায় আত্মনিয়োগ করতে চাইলে *** মহাত্মা গান্ধী ভারতবর্ষের সর্বত্র পরিভ্রমণ করে স্বরাজের বার্তা প্রচার করলেন ***"।১

কলকাতার ছাত্রধর্মঘটের খবর পেয়ে মহাত্মা গান্ধী ১৯শে জানুয়ারী তারিখে তরুণ বাংলার উদ্দেশ্যে 'ইয়ং ইণ্ডিয়া'তে তাঁর বক্তব্য রাখেন। গান্ধীজী লিখলেনঃ "জাতির আহবানে তোমরা যে সাড়া দিয়েছ, সে সংবাদ আমি পেয়েছি। এতে তোমরা যেমন নিজেদের গৌরবান্বিত করেছ—তেমনি গৌরবান্বিত করেছ—তোমাদের সোনার বাংলাকে। বাংলা দেশ তার মেধা-বুদ্ধির জন্য খ্যাত। হৃদয়ের দিক থেকে বাংলা দেশের অসাধারণত্বের খ্যাতি আছে সর্বত্র। আত্মিক দিক থেকে ভারতবর্ষ বিশ্বসভায় বিশেষ আসনে প্রতিষ্ঠিত। আমাদের আত্মিক উত্তরাধিকারে বাংলা দেশের দান সমধিক। তোমাদের আত্ম-বিশ্বাস, ভাবপ্রবণতা, কল্পনাশক্তি সব মিলিয়ে ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রান্তরে যে কোনও সমাজ অপেক্ষা তোমরা শ্রেষ্ঠ। ভীরুতা তোমাদের স্পর্শ করে না—এ সত্য তোমরা প্রমাণ করেছ একাধিকবার। অতীতে বাংলা দেশ যেমন করে নেতৃত্ব দিয়েছে—এখনও তা সম্ভব না হবার কোনও কারণ আছে বলে আমি মনে করি না।

"তোমরা যে-কাজ করেছ—তার থেকে পশ্চাৎপদ হবে না। তোমরা সমস্ত বিষয়টি ভেবে দেখেছ এবং সুচিন্তিত পথেই অগ্রসর হয়েছ—এই বাংলা দেশই জাতিকে অসহযোগের নীতি দিয়েছে। অসহযোগের অর্থ হল আত্মশুদ্ধি, আত্মত্যাগ, সাহস ও দেশহিতে আত্মসমর্পণ। নাগপুর কংগ্রেসে এই নীতি দ্বিতীয়বার সমর্থিত হয়েছে। প্রথম যখন এই নীতি ঘোষিত হয়—তখন সংশয় ছিল, ছিল অনৈক্য। কিন্তু নাগপুরে এই নীতি গৃহীত হল পূর্ণ আশা ও ঐক্যমতের মধ্য দিয়ে। তোমরা ইচ্ছা করলে এই নীতিকে প্রত্যাখ্যান করতে পারতে—কংগ্রেসের আহবানে সাড়া দিতে দ্বিধা করতে পারতে। তোমরা মঙ্গলের পথ বেছে নিয়েছ, তোমরা পথ ধরেছ সত্যের। ইহবাদীর দৃষ্টিতে তোমাদের কাজ বেপরোয়া গোছের বলে মনে হচ্ছে। *** এই বিরাট ভূখণ্ডের জনসমাজের অন্তত একটি সম্প্রদায়ও যদি উৎসর্গীকৃত না হয়—তবে স্বরাজ প্রাপ্তির আশা দুঃস্বপ্ন মাত্র। বর্তমান সরকার শক্তির কাছে কিছুতেই মাথা নত করতে রাজী নয়। সরকার যুক্তি বোঝে না। প্রকৃত সাহসের সঙ্গে আমরা যদি কোনও মহৎ কাজ করে তুলতে পারি—তাহলেই তারা আমাদের ক্ষমতা বুঝবে। তরবারির শৌর্য এরা বোঝে। শক্ত বর্ম এঁটে বসে আছি—যাতে তাদের বিরুদ্ধে এর ব্যবহার করা আমাদের পক্ষে দুঃসাধ্য হয়। আমরা কিছু হিংসাত্মক ঘটনা ঘটাই—এটা এদের অনেকেরই কাম্য। হিংসাত্মক কার্যাবলী দমনে এরা ওস্তাদ। কাজেই আমার বক্তব্য—ওদের হিংসাত্মক কাজকে আমরা অহিংসার দ্বারা সম্পূর্ণ অর্থহীন করে তুলব। একপক্ষের হিংসা যদি অপরপক্ষের হিংসা সৃষ্টি করতে না পারে—তাহলে তা আপনিই নষ্ট হয়ে যায়। অহিংসাই হল অসহযোগ আন্দোলনের বীজমন্ত্র। যথেষ্ট প্ররোচনা সত্ত্বেও যখন আমরা অহিংসা নীতিতে স্থির বিশ্বাস রাখতে সক্ষম হব—সেই মুহূর্তেই আমরা আমাদের কাম্যকে লাভ করব। *** আমাদের জাতীয় চেতনাকে এতদিন ফিরে পাই নি। কাজেই শাসক-গোষ্ঠী আমাদের পরস্পরের মধ্যে বিরোধ জিইয়ে রাখতে পেরেছে। আমাদের কর্তব্য হবে শাসকদের হাতের পুতুল না সাজা। মনে রাখতে হবে—আমাদের প্রভু আমরাই—তারা নয়।"

তিনি ভারতবর্ষের ছাত্রসমাজকে অসহযোগের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হতে বলেন। এদেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতি চরকার উপর নির্ভরশীল বলে তিনি মত প্রকাশ করেন। গুজরাটের জাতীয় মহাবিদ্যালয়ের ছাত্ররা প্রতিদিন চার ঘণ্টা *** সুতো কাটছে। তিনি মনে করেন যে, এমন একটি চমৎকার শিল্পে দক্ষ হওয়া কিছু অন্যায় নয়। চরকার সাহায্যে অর্ধ-নগ্ন দেশবাসীর বস্ত্রের সংস্থান করা সম্ভব হবে। সর্বশেষে তিনি লিখলেন, "সরকারী স্কুল-কলেজ ত্যাগ করে তোমরা তোমাদের কর্তব্য সম্পাদন করেছ। আমি শুধুমাত্র তোমাদের খুব সহজভাবে ও লাভজনকভাবে সময়ের সদ্ব্যবহার করার কথাই বললাম। ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করি তিনি তোমাদের শক্তি দিন, সাহস দিন—যাতে তোমরা তোমাদের বিশ্বাসে অটল থাকতে পার।"

এরপর মহাত্মাজী কলকাতায় আসেন। মির্জাপুর স্কোয়ারের সভায় গান্ধীজী বলেন, "যেভাবে দেশের আহবানে বাংলার তরুণদল সাড়া দিয়েছে, সেজন্য বাংলা-দেশের ছাত্রসমাজকে আমি অভিনন্দন জানাই। আমি জানতাম কলকাতার ছাত্র-সমাজ আমার বন্ধু চিত্তরঞ্জনের অপেক্ষায় ছিল। বন্ধুবর চিত্তরঞ্জন দাশকে অভি-নন্দন জানাই—কারণ তিনি তোমাদের পরিচালনার গুরুদায়িত্ব নিয়েছেন। আর তোমাদের অর্থাৎ বাংলা দেশের ছাত্রদের অভিনন্দন জানাই কারণ তোমরা তাঁর নেতৃত্বে পরিচালিত হচ্ছ। কলেজ ছেড়ে বেরিয়ে আসাই যথেষ্ট নয়। যে স্কুল ও কলেজ তোমরা ছেড়ে এসেছ—সেখানে আর ফিরে যাবে না—এইটাই এখন একান্ত প্রয়োজন। তোমাদের যথাযথ কাজ যোগানও আমাদের দায়িত্ব। সেই কাজ করতে করতেই তোমরা দেশকর্মী হয়ে উঠবে। মনে রাখবে—এই সময়টা হল আত্মশুদ্ধির সময়। *** সরকারী ও সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত ইস্কুল-কলেজ ছেড়ে এসে তোমরা তোমাদের কর্তব্যপালন করেছ। জাতির স্বরাজলাভের কাজে যাতে তোমাদের শক্তির সুষ্ঠু ব্যবহার করা যায়—সেজন্য ব্যবস্থাদি করা প্রয়োজন। আমি দুঃখ পাই যখন দেখি ছাত্রসমাজ প্রচণ্ড উদ্যম নিয়ে কাজে এগিয়ে এলেও এই বাংলা দেশের শিক্ষককুল এবং বড় বড় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিচালকবর্গ ঠিক সেই উদ্যম নিয়েই এগিয়ে আসছেন না। তাঁদের মধ্যে অনেকেই ভাবছেন, অসহযোগ আন্দোলন প্রবর্তন করে আমি বিষম ভুল করেছি। তাঁরা ভাবছেন, ছাত্রদের সরকারী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ত্যাগ করতে বলা আমার পক্ষে আরও জঘন্যতম ভুল হয়েছে। ***

১ মুক্তির সন্ধানে ভারত—যোগেশ-চন্দ্র বাগল। পৃঃ ৩১০।

আমি তোমাদের সম্মুখে আজ স্বীকার করছি যে, দেশের নিকট আমি যে কর্ম-পদ্ধতি রেখেছি—তাতে আমার পূর্ণ বিশ্বাস আছে।

*** এক বৎসর সময়ের চার মাস কেটে গেছে। বাংলার তরুণদের সঙ্গে কথা বলতে বলতে অদ্যকার সন্ধ্যায় আমার আশা যে পরিমাণ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে—এমন কিন্তু এতদিন হয় নি। তোমরা আমাকে আশান্বিত করেছ, তোমরা আমাকে সাহস যুগিয়েছ। তোমরা আমাকে শক্তি যুগিয়েছ।

"*** মুষ্টিমেয় শিক্ষিত জনসাধারণই ভারতবর্ষের প্রতীক নন। যদি শিক্ষিত ভারতবর্ষ আশাহীন, সাহসহীন, শক্তিহীন হয়েও থাকতে চায়—তবু ভারতবর্ষ তার আশা-আকাঙ্ক্ষাকে বাঁচিয়ে রাখবেই। সেই ভারতের আশাই আমার স্বপ্ন। আমি আশা করি, ছাত্রসমাজ, বিশেষত বাংলা দেশের ছাত্রসমাজ যদি তাদের আদর্শে ও কর্তব্যে স্থির থাকে, তাহলে বাংলা দেশ ও অন্যান্য প্রান্তের শিক্ষককুল ও শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের পরিচালকবর্গ আমাদের আহ্বানে সাড়া না দিয়ে পারবেন না। হতাশার মেঘ কেটে গিয়ে তাঁদের মনেও আশার আলো জ্বলবে। আমি বাংলা দেশের ছাত্রদের বলি—তোমরা যে সিদ্ধান্ত নিয়েছ—তাতে অবিচলিত থেক। বিপদ যতই আসুক—আদর্শে স্থির থেক।"

ছাত্রদের চরকা-কাটা শিখতে মহাত্মাজী উপদেশ দেন। "সাধারণ শিক্ষা না হয় স্বরাজলাভের পরই হবে। বর্তমান বাংলা দেশের প্রতিটি তরুণ-তরুণীর কর্তব্য হবে সুতো কাটার কাজে সমস্ত সময় অতিবাহিত করা। *** ভারতবর্ষের সাড়ে সাত লক্ষ গ্রামে কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা করতে হলে তরুণদের সাহায্য ছাড়া তা সম্ভব নয়। বাংলা দেশের ও ভারতের অন্যান্য প্রান্তের যুবকদের কাছে আজ দেশমাতৃকার আহ্বান এসেছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ভারতের তরুণ-তরুণীরা এ আহ্বানে সাড়া না দিয়ে পারবে না। *** ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি, তিনি বাংলার তরুণ-তরুণীর হৃদয়ে সাহস দিন, শক্তি দিন।"

মেডিকেল ছাত্রদেরও তিনি কলেজ ত্যাগ করতে উপদেশ দেন। এই বক্তৃতার শেষে গান্ধীজী বলেন, "And so I ask all the medical students and all the boys of the colleges and all the boys over sixteen years of the schools without a moment's hesitation first of all to leave their schools and colleges to finish that one peremptory duty that devolves upon them. *** And so, my young friends I would ask you to cast all your doubts, all your fear all your scepticism into the Bay of Bengal and rise with a new hope that will not be denied."

এরপর শহর ও গ্রামে কংগ্রেসের প্রচার চলল পুরোদমে। চরকা চালাতে শিখল অনেকে। পল্লী অঞ্চলে প্রাণের সাড়া জাগল। "হৃত সন্তান ফিরে পেলে মায়ের প্রাণে যে অনাবিল আনন্দ জন্মে, শত-বর্ষ পরে হৃত সম্পদ চরকা পেয়ে পল্লী-বাসীর মনে আজ সেই আনন্দ। তারা আবার গান ধরলে,

চরকা আমার সোয়ামি-পুত,
চরকা আমার নাতি
চরকার দৌলতে মোর দুয়ারে বাঁধা
হাতী।

* * *

কবিবর সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত এ সময় চরকার গুঞ্জন ছন্দোবদ্ধ করে দেশবাসীকে শোনালেন,

ভোমরায় গান গায় চরকায়,
শোন ভাই!
খেই নাও পাঁজ দাও, আমরাও
গান গাই!
ঘর বার করবার দরকার নেই আর,
মন দাও চরকায় আপনার আপনার!
চরকার ঘর্ঘর পড়শীর ঘর ঘর!
ঘর ঘর ক্ষীর-সর,—আপনায়
নির্ভর!
পড়শীর কণ্ঠে জাগল সাড়া—
দাঁড়া আপনার পায়ে দাঁড়া।

* * *

চন্দ্রের চরকায় জ্যোৎস্নার সৃষ্টি
সূর্যের কাটনায় কাঞ্চন বৃষ্টি।
ইন্দ্রের চরকায় মেঘ-জল থান থান!
হিন্দের চরকায় ইজ্জৎ সম্মান!
ঘর-ঘর দৌলত! ইজ্জত ঘর-ঘর।
ঘর ঘর হিম্মৎ—আপনায় নির্ভর।
গুজরাট—পাঞ্জাব—বাংলায় সাড়া
দাঁড়া আপনার পায়ে দাঁড়া।"২

৪ঠা ফেব্রুয়ারী (১৯২১) জাতীয় মহাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দিনে মহাত্মাজী ছাত্রদের উদ্দেশ্যে বলেন, "ভারতের কোনও বিদ্যায়তন উদ্বোধন করতে গিয়ে আমি এত বেশী চিন্তিত হই নি—যত বেশী চিন্তিত হচ্ছি আজ এখানে। আমি অন্যত্র বলেছি যে ভারতবর্ষের ছাত্রসমাজের দৃষ্টি কলকাতার ছাত্রসমাজের প্রতি। * * * তোমরা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছ যে তোমাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে এই উপমহাদেশের ছাত্রসমাজ সরকারী শিক্ষায়তন ত্যাগ করছে। কাজেই তোমাদের, এখানকার অধ্যাপকবৃন্দের, আমার বন্ধু শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয়ের ও আমার দায়িত্ব অপরিসীম।"

তিনি এই বিদ্যায়তনের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি কামনা করেন। বাংলা দেশ পূর্বেও যেমন, এখনও তেমনি তার ঐতিহ্য বজায় রাখতে পারবে—একথা তিনি বিশ্বাস করেন বলে ঘোষণা করেন।

এই তিনটি বক্তৃতা সংক্ষিপ্ত আকারে উপস্থিত করলাম কারণ এতে মহাত্মাজীর এই সময়কার বক্তব্য বোঝা সহজ হবে।

বর্তমান বাংলা দেশে গান্ধীজীকে ভাঙিয়ে দিন কাটাচ্ছেন অনেক রাজনৈতিক নেতা। দেশের সাধারণ মানুষ খানিকটা হকচকিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু এর মধ্য থেকে একটি সত্য স্পষ্ট হয়ে উঠেছে—তা হল এই যে, যাঁরা গান্ধীজীর দোহাই দিয়ে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে চাইছেন—তাঁরা কিন্তু সকলেই গান্ধীবাদী নন। বেশির ভাগই হলেন 'গান্ধীজীবী' অর্থাৎ গান্ধীজীকে তাঁরা জীবিকার সহায়ক বলে মনে করে থাকেন এবং সময় ও সুযোগে ব্যবহারও করেন। 'গান্ধীজীবী'-দের সংখ্যার প্রাবল্যে এমন একটা অবস্থার সৃষ্টি হতে চলেছে যেখানে মহাত্মাজীর বক্তব্যকে সাধারণ মানুষ নেতাদের বক্তৃতার বিষয়বস্তু বলেই মনে করে থাকেন। গান্ধীজী যে এক যুগের ভারতবর্ষের বিপ্লবী সত্তার প্রতীক ছিলেন, কিংবা তাঁর বক্তব্য যে বাস্তবে রূপ ধরতে পারে—এ বিশ্বাসের অস্তিত্ব প্রায় নিঃশেষ হয়ে যেতে বসেছে।

তবুও বাংলা দেশে যে কয়জন গান্ধীবাদী মানুষ আছেন—শ্রদ্ধেয় নির্মলকুমার বসু তাঁদের অন্যতম। ছাত্রদের প্রতি বিভিন্ন সময়ে মহাত্মাজী যেসব মন্তব্য

কিস্তিতে ট্রানজিস্টার
মাসিক ১০, টাকা কিস্তিতে অভঙ্গুর প্লাস্টিক ক্যাবিনেটে 'ন্যাশানাল' পোর্টেবল ৩ ব্যান্ড অল ওয়ার্ল্ড ট্রানজিস্টার।

Jagson Agencies (W.B.M.-88)
P.B. 1212, Delhi-6.

২ মুক্তির সন্ধানে ভারত—যোগেশচন্দ্র বাগল। পৃঃ ৩১১—৩১২।

রেখেছিলেন—সেগুলি একত্রিত করে 'To the Students' নামে একটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। এই গ্রন্থের ভূমিকায় শ্রদ্ধেয় বসু লিখছেন, "* * * students in a subjugated country like ours had a more urgent responsibility in connection with the political liberation of the land. Many students sought Gandhiji's advice in this respect. He wished all of them to develop a national attitude, listen to every one, learn to discriminate the Chaff from the grain, and, on the whole, to steer clear from what is known as 'Party' or 'Power' politics. They were to remain true to their calling, obeying the discipline of the institution, except where it came in conflict with their fundamental moral ideals. In times of general national upheaval they were to lay down their books and serve as soldiers in the campaign. At moments when the whole house was on fire, everybody was expected to take up a bucket of water and lend his helping hand to the immediate task ahead. Gandhiji expected, at times, that the student community should play the part of pioneers, just as they had done in a country like China. During the national struggle, the battlefield itself was to serve as the richest school of experience.

In short, Gandhiji thus uniformly tried to lead the student world along the path of dedicated service and progressive identification with the exploited for the purpose of serving and lifting them up from the mire. This was the highest aim of life, and the highest purpose of education was also to prepare the student for fulfilling this heavy responsibility when he grew up to manhood."

আমাদের প্রকাশিত কয়েকখানি প্রাইজ ও লাইব্রেরী পুস্তক

ডক্টর গুণময় মান্না
রবীন্দ্র কাব্যরূপের বিবর্তন-রেখা ১২·০০

ডক্টর বহ্নিকুমারী ভট্টাচার্য
বাংলা গাথাকাব্য ৮·০০

ডক্টর সুবোধরঞ্জন রায়
নবীনচন্দ্রের কবি-কৃতি ৬·৫০

ডক্টর জীবেন্দ্র সিংহ রায়
প্রমথ চৌধুরী ৫·০০

ডক্টর সীতাংশু মৈত্র
যুগন্ধর মধুসূদন ৬·০০

শ্রীদিলীপকুমার মিত্র
ইংরাজী সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত ৮·০০

শ্রীদেবেন্দ্রকুমার ঘোষ
প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রাঞ্জল ইতিহাস ৭·৫০

শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল নাথ
মোহিতলালের কাব্য-পরিক্রমা ৪·০০

ডক্টর তমোনাশচন্দ্র দাশগুপ্ত
রবীন্দ্র সাহিত্য-পরিচয় ১·৫০

শ্রীনেপাল মজুমদার
ভারতের জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা এবং রবীন্দ্রনাথ (দ্বিতীয় খণ্ড) ১০·০০

শ্রীকমলাকান্ত পাঠক
বীরভূমের হারানো মাণিক (সতীশচন্দ্রের পদ-সংগ্রহ) ৫·০০

ডাঃ পশুপতি ভট্টাচার্য
বাংলার মহাপুরুষ—শ্রীঅরবিন্দের জীবনী ২·০০
সুস্থজীবন প্রসঙ্গ ৩·০০

মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড
১০ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা—১২ ফোন : ৩৪-৩১০৬ ; ৩৪-৮৪৫১ : গ্রাম : BIBLIOPHIL

পূর্ব জার্মানী ও সোভিয়েট দেশ পরিক্রমা

অশোক সেন

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

আগেই বলেছি ভাইমার হচ্ছে গ্যয়টে এবং শিলারের জীবনের সঙ্গে দৃঢ়ভাবে সংযুক্ত। গ্যয়টে জার্মান জাতির সব থেকে বড় কবি, নাট্যকার, সমালোচক এবং ঔপন্যাসিক। বৈজ্ঞানিক হিসাবেও সে সময় তাঁর পরিচিতি ছিল। এক কথায় ইউনিভার্সাল জিনিয়াস বলতে যা বোঝায় গ্যয়টে ছিলেন তাই। প্রথমত সাহিত্যিক হিসাবে বিশ্বব্যাপী খ্যাতি থাকলেও একথা ভুলে গেলে চলবে না যে প্রায় সমস্ত শিল্পকলা সম্বন্ধেই তাঁর বিরাট জ্ঞান এবং পারদর্শিতা ছিল। তাঁর আঁকা ছবিগুলো দেখলাম—তিনি যে কত উঁচুদরের চিত্রশিল্পী ছিলেন তা এসব ছবি দেখেই বোঝা যায়। তাছাড়া মিনারেলজি, অপটিক্স, কম্প্যারেটিভ এ্যানাটোমী এবং প্লান্ট মরফোলজী সম্বন্ধেও তাঁর যথেষ্ট কাজ আছে। ১৭৪৯ সালে ফ্র্যাঙ্কফার্ট-এ্যাম-মেইনে গ্যয়টে মধ্যবিত্ত ধনী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর মা-বাবার শিল্প এবং বুদ্ধিবাদের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা থাকায় গ্যয়টে অল্প বয়স থেকেই সুশিক্ষা পাবার সুযোগ পান। এই সময় ফরাসীরা ফ্র্যাঙ্কফার্ট অধিকার করে বসল এবং একটি ফ্রেঞ্চ থিয়েটারও সেই সঙ্গে এল। এই থিয়েটারের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হলেন গ্যয়টে এবং কয়েকটি নাটক রচনা করলেন ফ্রেঞ্চ নিওক্ল্যাসিসিজমের দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে। ১৬ বছর বয়সে লাইপজিগ বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি তিন বছরের জন্য আইন অধ্যয়ন করতে গেলেন। গুরুতরভাবে অসুস্থ হয়ে দেড় বছরের জন্য তিনি দেশে ফিরে এলেন এবং প্রায় অকর্মণ্য হয়ে থাকলেন।

এই সময় বেশ নিবিষ্টভাবে এ্যালকেমী এবং কেমিস্ট্রি অধ্যয়ন করলেন। তারপর স্ট্র্যাসবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে আইন পড়া শেষ করলেন (১৭৭০-৭১)। কিন্তু এখানে তাঁর আসল শিক্ষা শুরু হল হার্ডারের কাছে। হার্ডার তখন নিওক্ল্যাসিসিজমের বিরুদ্ধে এক বিরাট আন্দোলন শুরু করেছেন—ঐ জাতীয় সাহিত্যকে তাঁরা কৃত্রিম সাহিত্য বলে অভিহিত করে, হোমার, সেক্সপীয়ার, ওসিয়ানিক কাব্য এবং লোকসঙ্গীতের স্বাভাবিক সৌন্দর্যের প্রতি জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করবার চেষ্টায় উঠে পড়ে লেগেছেন।

এরপর গ্যয়টে ফ্র্যাঙ্কফার্টে পাঁচ বছর ধরে অসংলগ্নভাবে আইন ব্যবসা শুরু করেন। তবে সাহিত্যিক হিসাবে প্রতিষ্ঠালাভের জন্যই এই সময় তিনি বিশেষভাবে উদ্যমী হয়ে উঠেছিলেন। তাঁর কিছু কিছু সাধারণ স্তরের লেখা প্রকাশিত হয়েছিল এবং কিছু ভাল প্রেমকাব্যও তিনি লিখেছিলেন। এইবার গ্যয়টে ফাউস্ট রচনার কাজেও হাত দিয়েছিলেন—কিন্তু এই মহাকাব্য প্রকাশিত হয় অনেক বছর বাদে। ১৭৭৩ সালে তিনি তাঁর বিখ্যাত নাটক GOTZ VON BERLICHINGEN প্রকাশ করেন—সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যজগতে তাঁর নাম এবং খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। এ নাটকের নায়ক হচ্ছেন একজন মধ্যযুগীয় সম্ভ্রান্ত পরিবারের লোক—যিনি কৃষক-বিদ্রোহে কৃষকদের দলে যোগ দিয়েছিলেন—এ বিদ্রোহ অবশ্য সাফল্যলাভ করে নি। নাটকটির বলিষ্ঠতা, প্রচলিত একঘেয়ে গাঠনিক আকৃতির পরিবর্জন, স্বাধীনতার আদর্শের প্রতি বিরাট শ্রদ্ধা এবং আস্থা এই সব দিক থেকে বিচার করে Sturm und Drang পিরিয়ডের একটি সেরা নাটক হিসাবে এর পরিচিতি আছে। এর পরেই সম্পূর্ণ ভিন্ন জাতের আর একটি অত্যন্ত জনপ্রিয় উপন্যাস লিখলেন গ্যয়টে ১৭৭৪ সালে— The Sorrows of Young Werther. This epistolary novelette about a young man who brooded over a hopeless love until he finally blew his brains out plunged all Europe into tears. এ জাতীয় ভাবাবেগ অবশ্য আজকের দিনের পাঠকের কাছে আতিশয্য বলে মনে হতে পারে। কিন্তু মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ এবং যেভাবে কাহিনী পাঠকদের কাছে তুলে ধরা হয়েছে, সেদিক দিয়ে বিচার করলে ভার্দার আজও এক বিরাট শিল্পকীর্তি বলেই বিবেচিত হয়। গ্যয়টের জীবনের এই সময়কার কিছু ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ওপর ভিত্তি করেই ভার্দার রচিত হয়। এক সময় গ্যয়টে মন্তব্য করেছিলেন যে তাঁর সমস্ত রচনার ভেতরই টুকরো টুকরোভাবে

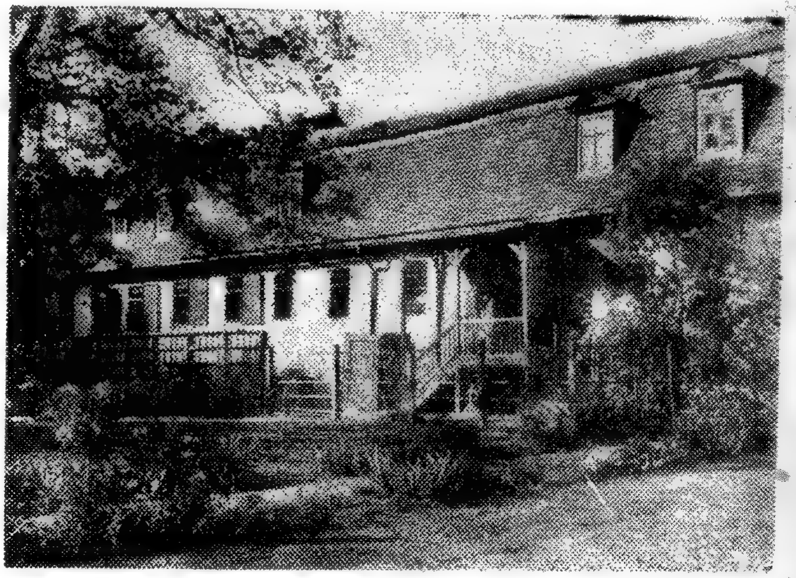

গ্যয়টের বাগানবাড়ি

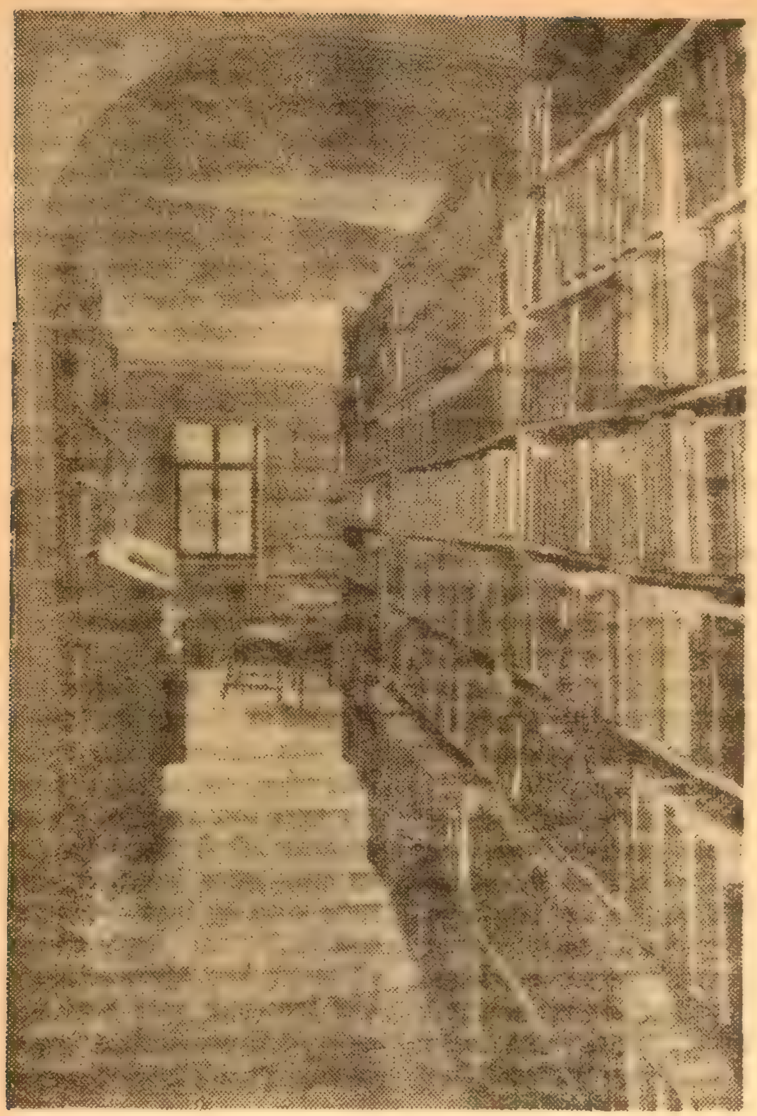

গ্যয়টে হাউসে মহাকবির গ্রন্থাগার

তাঁর আত্মস্বীকৃতি পাওয়া যায়। একথা সবাই জানেন যে এই জার্মান মহাকবি সারা জীবন ধরেই কোন না কোন নারীর সংগে প্রেমে পড়েছেন এবং সেই প্রেমই তাঁকে মহৎ রচনায় অনুপ্রাণিত করেছে।

ভার্দারে ভাবাতিশয্য থাকতে পারে, কিন্তু তার জন্য বইটি মোটেই অস্বাভাবিক মনে হয় না। পড়তে শুরু করে শেষ না করে ছাড়া যায় না। পড়তে পড়তে পাঠক নিজের অজ্ঞাতেই ভার্দারের সংগে কখন একাত্ম হয়ে পড়েন।

গায়টের সাহিত্য সম্বন্ধীয় রচনাগুলো ভাইমারের যুবক ডিউককে মুগ্ধ করে এবং তিনি ১৭৭৫ সালে কবিকে তাঁর রাজসভায় আসবার জন্য আমন্ত্রণ জানান। ভাইমার ছিল একটি ছোটখাট জমিদারী—এর সমস্ত জনসংখ্যা ১০০,০০০-এর বেশি ছিল না—আর শহরে লোক ছিল মাত্র ৯০০০। কিন্তু তা সত্ত্বেও ডিউক কার্ল অগাস্ট ভাইমারকে জার্মানীর ইন্টালেকচুয়াল ক্যাপিটাল হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিলেন—কারণ জার্মানীর সেরা প্রতিভাবান ব্যক্তিরা তখন ডিউকের সাদর অভ্যর্থনায় ভাইমারে এসে বসবাস শুরু করেন। এঁরা ছিলেন ভাইলাণ্ড, গায়টে, হার্ডার এবং শিলার। হার্ডার এবং শিলার পরে আসেন। শাসনসংক্রান্ত অনেক গুরুদায়িত্ব গায়টের কাঁধে চাপানো হয়—তাতে নানা বিষয়ে তাঁর মনের প্রসার এবং বাস্তবজ্ঞান বেড়ে যায় বটে, কিন্তু সংগে সংগে রচনার লেখাটা ব্যাহত হতে থাকে। এর বছর দশেক বাদে গায়টে ইটালী বেড়াতে যান (১৭৮৬-৮৮)। দি ইটালীয়ান জার্নি বইতে কবি তাঁর এই সফরের কাহিনী লিপিবন্ধ করেন (১৮১৬-১৭)। এই সফরের পর তাঁর রচনায় একটা বিরাট পারিবর্তন আসে—হার্ডারের প্রভাবমুক্ত হয়ে তিনি রচনাধারায় ক্ল্যাসিকাল গঠনের দিকে ঝুঁকে পড়েন। তাঁর মনের এই পরিবর্তন তখনকার রচিত অনেকগুলি নাটকে প্রতিফলিত হয়।

১৭৮৮ সালে রচিত গদ্যনাটক এগমণ্টে দেখা যায় হার্ডারের প্রভাব অপসারিত হচ্ছে এবং ক্ল্যাসিসিজম মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে কবির রচনায়। স্পেনের বিরুদ্ধে নেদারল্যাণ্ডের বিদ্রোহ এবং নেদারল্যাণ্ডের এক বীর সন্তানের চরিত্র নিয়েই নাটকটি লিখেছিলেন গায়টে। লেখার স্টাইল Transitional.

ইফিজেনিয়া ইন টাউরিস নাটকটি আগেকার গদ্য রচনা—১৭৮৭ সালে এটির সংস্কার করে নাটকটিকে গ্যয়টে একটি ক্ল্যাসিকাল কাব্য-নাটকে পরিণত করেন। ইটালীয়ান কবি টাসোর জীবনী নিয়ে আর একটি ক্ল্যাসিকাল কাব্যনাট্য লেখেন গ্যয়টে ১৭৯০ সালে। এটি একটি অসাধারণ নাটক। ১৭৯০ সালে গায়টে তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ কীর্তি ফাউস্টের অংশবিশেষ প্রকাশ করেন—কিন্তু সম্পূর্ণ ফাউস্ট প্রকাশিত হয় কয়েক বছর বাদে—প্রথম ভাগ ১৪০৮ সালে এবং দ্বিতীয় ভাগ ১৮৩২-এ। ইটালী থেকে ফিরে আসবার পর ভাইমারে গায়টের জীবন খুব ঘটনাবহুল নয়। সরকারী কাজকর্ম থেকে তাঁকে প্রায় অব্যাহতি দেওয়া হয়—অবশ্য আরও পঁচিশ বছর ধরে তিনি কোর্ট-থিয়েটার পরিচালনা করেন। শিলারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বের সূত্রপাত হয় ১৭৯৪ সালে এবং এর সমাপ্তি ঘটে ১৮০৫ সালে শিলারের মৃত্যুতে। এ বন্ধুত্বে দুজনেরই নানাদিক থেকে উপকার হয়।

ক্রিস্টিয়ান ভালপিয়াসের সঙ্গে সতেরো বছর ঘনিষ্ঠভাবে জীবন কাটানোর পর এ সম্পর্ককে আইনানুমোদিত করেন ১৮১৬ সালে মহিলাকে বিয়ে করে।

গায়টের জীবনের শেষ কয়েক বছর তাঁকে বেশ নিঃসঙ্গভাবে এবং নির্জন জীবনযাপন করতে হয়। তাঁর যশ এবং খ্যাতি ও সুনাম সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে—সবাই তাঁর প্রতিভায় মুগ্ধ, সবাই তাঁকে অন্তর থেকে শ্রদ্ধা করে। কিন্তু সত্যিকার বন্ধু এসময় তাঁর কেউ ছিল না। থাকবেই বা কোথা থেকে—সমতুল্য প্রতিভাবান লোক না পেলে তো আর সত্যিকার বন্ধুত্ব হতে পারে না। সমসাময়িক লোকেরা এই সময় গায়টেকে অলিম্পিয়ান হাইটে তুলে দিয়েছেন—সেই উচ্চ শিখরে উঠে গায়টে

তো আর নিচে নেমে এসে সাধারণ লোকের সঙ্গে মিশতে পারেন না। জীবনের শেষ চল্লিশ বছর তাঁর পক্ষে খুব সৃজনশীল এবং ফলপ্রসূ হয়েছিল। থিয়েটার শিক্ষা প্রসারের ওপর কি প্রভাব বিস্তার করতে পারে—তার ওপর উপন্যাস লিখলেন ১৭৯৫-৯৬ সালে 'উইলহেল্‌ম মাইস-টারস এ্যাপ্রেনটিসিপ'—এবং একই আদর্শে ১৮২১-২৯ সালে রচিত হল 'উইলহেল্‌ম মাইসটার্‌স জার্নিম্যান ইয়ার্স।' এর পরেও তাঁর বহু প্রেমকাব্য, জীবনী ইত্যাদি ক্রমাগত প্রকাশিত হতে থাকে। মৃত্যুর কয়েক মাস আগে পর্যন্ত ফাউস্টের দ্বিতীয় ভাগের কিছু অংশ কাব্যরসে ভরপুর হয়ে রচিত হয় এবং তাঁর মাস্টারপিসকে সর্বাঙ্গসুন্দর করে সৃষ্টি করেন গ্যয়টে।

মৃত্যুর অনেক আগে থেকেই বিশ্ব-সাহিত্যে গ্যয়টের একটা বিশেষ স্থান নির্ধারিত হয়ে যায়। একথা বোধ হয় অনেকেই জানেন যে এই 'বিশ্বসাহিত্য' কথাটিও গ্যয়টেরই আবিষ্কার। তাঁর রচনার অনুবাদ শুরু করেন বিশ্ববিখ্যাত সাহিত্যিকরা—যথা কার্লাইল, স্কট, জেরার্ড দ নার্ভেল প্রমুখ।

He is now generally admitted to be the most recent writer who can confidently be placed in the class of the supremely great—the class of Homer, Dante, and Shakespeare.

২৭শে ফেব্রুয়ারী বিকেলে গ্যয়টের গার্ডেন হাউস দেখতে গেলাম—তারপর গেলাম গ্যয়টে এবং শিলারের burial place দেখতে—কফিন দুটি একটি ঘরে পাশাপাশি রাখা রয়েছে—জার্মানীতে দেখলাম ঘরের ওপরেই বিখ্যাত ব্যক্তিদের কফিন সাজানো থাকে—অবশ্য সাধারণ লোকেদের কফিন মাটির তলাতেই রাখা হয়। ২৮শে ফেব্রুয়ারী গ্যয়টে হাউসে গেলাম—কার্লাইলের, স্যার ওয়াল্টার স্কট এবং লর্ড বায়রনের স্বহস্তে লেখা চিঠি দেখলাম। তাছাড়া গ্যয়টের বহু কাব্য-নাটকের পাণ্ডুলিপির অংশও এখানে সযত্নে রক্ষিত হয়েছে।

গ্যয়টের বেডরুমে তাঁর শেষ শয্যা এখনও অতি সুন্দরভাবে সাজিয়ে রাখা হয়েছে। লর্ড বায়রন এবং নেপোলিয়নের দুটি অতি সুন্দর ছবি ঘরের দেয়ালে টাঙানো আছে। তা ছাড়া গয়টের নিজের আঁকা বহু ছবিও এই বাড়িতে দেখলাম।

রবীন্দ্রনাথের 'শকুন্তলা' প্রবন্ধের কথা বারবার মনে আসছিল—কবি বলেছেন যে বিখ্যাত জার্মান কবি কালিদাসের শকুন্তলা পড়ে মন্তব্য করেছিলেন যে যদি একসঙ্গে স্বর্গ ও মর্ত্ত দেখতে চাও, তবে 'শকুন্তলায়' তা পাওয়া যাবে। শকুন্তলা পড়ে গ্যয়টে যে প্রশস্তিটি লিখেছিলেন তা এখানে তুলে দিচ্ছি:

Willst du die Blute des
Fruhen, die
Fruchte des spateren Jahres,
Willst du, was re zt
und entzuckt,
Willst du, was sattigt
und nahrt,
Willst du den Himmel,
die Erde mit
Einem Namen begreifen,
Nenn' ich, Sakuntala,
dich, und
Dann ist alles gesagt.

অর্থাৎ, বসন্তের ফুল এবং ফল, স্বর্গ এবং মর্ত্ত একসঙ্গে শকুন্তলা নাটকের ভেতর খুঁজে পেয়েছিলেন মহাকবি গ্যয়টে [ক্রমশঃ]

গ্যয়টের সহধর্মিণী ক্রিস্টিয়ান ভালপিয়াস

কিস্তিবন্দীতে ট্রানজিস্টার

৩২০৲ টাকা মূল্যের বিশ্ব-বিখ্যাত "এস-কর্ট" ৩ ব্যাণ্ড অল ওয়ার্ল্ড পোর্টেবল ট্রানজিস্টার মাসিক ১০৲ টাকার কিস্তিতে নিন।

আবেদন করুন:
Japan Agencies (B—10)
Post Box 1194, Delhi—6.

রঙ্গজগৎ

সিনেমা ধর্মঘটে নতুন পরিস্থিতি

পশ্চিমবঙ্গে সিনেমা ধর্মঘটে এক নতুন পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে। যদিও ধর্মঘটের শুরুতে সরকারী মনোভাব বিরূপ ছিল, কিন্তু প্রায় দেড় মাসের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে সরকার বুঝতে পেরেছেন যে, ধর্মঘটের এবং ধর্মঘটকে দীর্ঘ করার জন্য দায়ী মালিকপক্ষ। এই কথা সরকারী মনোভাবে কিছুদিন থেকে প্রকাশ হচ্ছিল। সম্প্রতি রাজ্য সরকার সরাসরি ঘোষণা করেছেন ধর্মঘট আপোষ নিষ্পত্তি না হলে সিনেমাগুলির লাইসেন্স রিনিউ করতে দেওয়া হবে না। সরকারের কাছে মালিকপক্ষ এত বড় ধমক খাবে আশা করে নি। তাদের আশা ছিল চিরাচরিত নিয়মে সরকার নিরপেক্ষতার ভান করে মালিকদের সাহায্য করবে। কিন্তু মালিকদের পাপের ভার এত বেশি যে আজ গভর্নর শাসিত সরকারও মালিকদের সমর্থন করার যুক্তি পাচ্ছে না। এই ধমক দেবার সঙ্গে সঙ্গে সরকার শ্রমিকদের ইউনিয়ন ভিত্তিতে ছবি দেখাবার অনুমতি দিয়েছেন—সাময়িক রিলিফ হিসাবে। যাতে সিনেমাকর্মচারীদের পরিবারগুলি বাঁচতে পারে। রাজ্য সরকারের এই ঘোষণা প্রশংসনীয়।

মালিক বা ইস্ট ইণ্ডিয়া মোশান পিকচার্স এ্যাসোসিয়েশনের উচিত ছিল এই ঘোষণার পরে এক মুহূর্ত দেরি না করে ইউনিয়নের সঙ্গে আপোষ করা। কিন্তু মালিকরা সিনেমা বন্ধ রেখে একদিকে সরকারকে প্রমোদকর বঞ্চিত করে চাপ দিচ্ছে 'শো ট্যাক্স' প্রত্যাহার এবং টিকিটের দাম বাড়াতে দেবার জন্য ; অপর দিকে কর্মচারীদের ভাতে মেরে মালিকদের ঐ দুটি দাবির প্রতি সমর্থন আদায়ের চেষ্টা করছে।

এই প্রসঙ্গে ইস্ট ইণ্ডিয়া মোশান পিকচার্স এ্যাসোসিয়েশন (এক্জিবিউটার্স সেকশন) কাদের স্বার্থে পরিচালিত হয় এবং এই আপোষ-বিরোধী মনোভাব নিয়েছে তা লক্ষ্য করা দরকার। সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ চলচ্চিত্র শিল্প সংরক্ষণ সমিতি নামে একটি সংস্থা গঠিত হয়েছে। এই সংস্থার সভাপতি নিউ থিয়েটার্সের সুপরিচিত শ্রী বি এন সরকার এক সাংবাদিক সম্মেলনে যে বক্তব্য রেখেছেন তা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বাংলা ফিল্ম স্টুডিওগুলির শোচনীয় অবস্থার কথা উপস্থিত করে তাঁরা বলেছেন, বাংলা ছবি দেখাবার ক্ষেত্র ক্রমেই সংকুচিত হয়ে আসছে। পশ্চিমবঙ্গের বাইরে বাংলা ছবি দেখাবার স্থান নেই, পশ্চিমবঙ্গে শতকরা দশভাগের বেশি সিনেমা বাংলা ছবি দেখায় না। দৃষ্টান্তস্বরূপ তাঁরা দেখিয়েছেন : উত্তর কলকাতার ১৩টি সিনেমার মধ্যে মাত্র পাঁচটিতে বাংলা ছবি দেখায় ; বড়বাজারসহ পশ্চিম কলকাতার কোন সিনেমায় বাংলা ছবি দেখান হয় না ; উত্তর-মধ্য-পূর্ব কলকাতার ১৭টি সিনেমার মধ্যে ৪টিতে বাংলা ছবি দেখান হয় ; বাঙালী অধ্যুষিত দক্ষিণ কলকাতার ১৭টি সিনেমার মধ্যে ৪টিতে বাংলা ছবি দেখান হয় ; বেহালার ৪টির মধ্যে ১টিতে বাংলা ছবি দেখান হয় ; গার্ডেন-রীচে ৫টির কোনটিতেই বাংলা ছবি দেখান হয় না ; কাশীপুর-দমদমে ৪টির মধ্যে মাত্র ১টিতে বাংলা ছবি দেখান হয়। এসব অঞ্চলে কোন কোন সিনেমায় বাংলা ও হিন্দী ছবি মিশ্রভাবে দেখান হয়। কিন্তু কেবলমাত্র বাংলা ছবি দেখান হয় এমন সিনেমার সংখ্যা কলকাতা, হাওড়া-হুগলী মিলিয়ে মাত্র ১৬টি। এই পরিসংখ্যান চিত্র থেকে অনুমান করা যায় বাংলা দেশে আসল সিনেমা মালিক কারা এবং কাদের স্বার্থে তারা সিনেমা চালাচ্ছে। বাংলার চলচ্চিত্র শিল্পের শোচনীয় অবস্থার জন্য সিনেমা মালিকরা কম দায়ী নয়।

এই পরিস্থিতিতে সিনেমা মালিকদের উচিত পশ্চিমবঙ্গের আরো সর্বনাশ না করে শীঘ্র ধর্মঘট মিটিয়ে ফেলা। যদি বিশেষ কোন চক্রের স্বার্থের বাধা থাকে, তবে ছোট ছোট সিনেমাগুলির নিজেদের উদ্যোগেই আপোষের পথে আসা এবং আপোষের জন্য চাপ সৃষ্টি করা দরকার।

—অজেন

মূকাভিনেতা যোগেশ দত্ত

চিত্র আলোচনা

দুটি ফরাসী ছবি

ফেডারেশন অব ফিল্ম সোসাইটিজ এবং ভারতস্থ ফরাসী দূতাবাসের যুক্ত উদ্যোগে যে চারটি ফরাসী ছবি প্রদর্শিত হচ্ছে তার অন্যতম 'হিরোসিমা মন আমোর' সম্পর্কে গত সপ্তাহে আলোচনা করেছি। এ সপ্তাহে 'মাদাম ডি' এবং 'এডিউ ফিলিপাইন' সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করছি। ছবি দুটির মানের দিক থেকে সংক্ষিপ্ত আলোচনার অধিক কিছু নয়।

মাক্স ওফুলস-এর 'মাদাম ডি' ১৯৫৩ সালে নির্মিত। ছোট গল্পের মেজাজে এই ছবির কাহিনী ত্রিকোণ দ্বন্দ্বে পরিণতির পথে অগ্রসর হয়েছে। এই দ্বন্দ্ব স্বামী-স্ত্রী-স্ত্রীর প্রেমিককে নিয়ে। কাহিনীর রসোত্তীর্ণতার পথে অবলম্বন হয়েছে একজোড়া কানের দুল। দুল-জোড়া স্বামী, স্ত্রী, দোকানী; আবার স্বামী — তার বান্ধবী-দোকানী-স্ত্রীর প্রেমিক এবং স্ত্রীর কাছে এসেছে। কাহিনীকে কৌতুকের ভঙ্গীতে মৃদু শ্লেষে এগিয়ে নিয়েছে মোঁপাশার গল্পের মেজাজে ও গতিতে। শেষ পর্যন্ত পুরনো ফরাসী গল্পের রীতিতে দেখা গেল ডুয়েল। প্রচ্ছন্ন শ্লেষ এবং কৌতুকে —বিশেষ একটা কাল ও পরিবেশের পট-ভূমিকায় অভিজাতশ্রেণীর চরিত্র উদ্ঘাটনের সঙ্গে একটি প্রেমের ক্রমলগ্ন ও সেই প্রেমানুভূতির রূপ দেখান হয়েছে। এই অনুভূতি ছবিটিকে উপভোগ্য

রয়েছে। প্রধান এই তিনটি চরিত্রে অভিনয় করেছেন : জাক্লিয়েন দারিয়েক্স, চার্লস বয়ার, ভিত্তোরিও ডি-সিকা।

জাকু রোজির 'এডিউ ফিলিপাইন' একটি যুবচিত্র এবং অত্যন্ত হালকা মেজাজের। এক টেলিভিশন ক্যামেরাম্যান ও দুজন তরুণীকে নিয়ে প্রাকৃতিক দৃশ্য-সৌন্দর্য, যুব শিবির এবং টেলিভিশন গ্রহণ কেন্দ্রের পটভূমিতে কাহিনী বিস্তার লাভ করেছে। আধুনিক ফরাসী সিনেমা ভ্যারাইটি রীতি ভুক্ত করা চলে এই ছবিকে। আধুনিক যুব মানসিকতা, অস্থিরতা, চাঞ্চল্য ও উদ্দেশ্যহীনতা এই ছবিতে প্রতিফলিত। উদ্দেশ্যহীনভাবে নায়ককে কেন্দ্র করে চলেছে দুটি তরুণী। নায়ক তাদের দুজনার সঙ্গে দৈহিক মিলনসুখ ভোগ করে ফিরে এসে সৈন্য-বাহিনীতে যাবার তলবপত্র পায়। প্রচ্ছন্ন-ভাবে যুদ্ধবিরোধী বা যুদ্ধোত্তর জীবনের অস্থিরতার বক্তব্য থাকলেও প্রকৃতিবাদী রীতিতে চিত্র গ্রহণ ও পরিচালনার জন্য সে বক্তব্য স্পষ্ট হয়ে উঠতে পারে নি। সরস সংলাপে ও ট্রিটমেন্টে চটুল মানসিকতা পরিস্ফুট হয়েছে। অভিনয় করেছেন: জাঁ ক'দে আইমিনি, ইয়েলিন সেরী, স্টেফানিয়া সাবাটিনি।

মঞ্চের কথা

যোগেশ দত্তের মূকাভিনয়

গত ১লা বৈশাখ মহাজাতি সদনে নাতুন পৃথিবীর পঞ্চবার্ষিক ও নববর্ষ উৎসব উদ্যাপিত হয়। মঞ্চে পাঁচটি প্রদীপ জ্বালিয়ে উৎসব উদ্বোধনের পর প্রভাতীগোষ্ঠী নৃত্যের মাধ্যমে অভ্যাগত-দের সাদর অভিনন্দন জানায়। তারপর শুরু হয় মূকাভিনয়ে অগ্রণী যোগেশ দত্তের মূকাভিনয়। তিনি প্রায় দুইঘণ্টা-কাল একক মূকাভিনয় প্রদর্শন করেন। তাঁর অভিনয়ের মধ্যে ছিল চলা, কলকাতার বাস, প্যাসেঞ্জার, চোর, ফটোগ্রাফার, সীতা-হরণ, প্রসাধনরতা আধুনিক মহিলা, বেকার যুবক, দুষ্টু ছেলে, জন্ম থেকে মৃত্যু। প্রত্যেকটি অনুষ্ঠান পরম উপভোগ্য হয়ে ওঠে। শ্রীদত্তর সার্থক অভিনয়ে। সুরশিল্পী হিমাংশু বিশ্বাস মূকাভি-নয়ের সঙ্গে ঐকতান সুর সৃষ্টি করে রসোপলব্ধিতে সাহায্য করেন। খালেদ চৌধুরীর সাজসজ্জা পরিকল্পনা এবং তাপস সেনের আলোকসম্পাত এবং সুরেশ দত্তের মঞ্চসজ্জা অনুষ্ঠানকে সার্থক করতে সাহায্য করেছে। রূপ-সজ্জার কাজ করেছেন অরূপ দাস।

এই অনুষ্ঠানে সংগৃহীত অর্থ জন-কল্যাণকর কাজে ব্যয়িত হবে উদ্যোক্তারা এরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন।

শ্লেবে 'দি বাইবেল' ছবিতে সারার ভূমিকায় আভা গার্ডনার

'কমললতা' ছবিতে সুচিত্রা সেন

ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে

সম্প্রতি বহুরূপী সাংস্কৃতিক সংস্থা প্রতাপ মেমোরিয়াল হলে শ্রীসুধীর সরকার রচিত 'ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে' হাসির নাটকটি মঞ্চস্থ করলেন। নাটক নির্বাচনে ও প্রযোজনায় বহুরূপী সম্প্রদায় কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। নিছক ভাঁড়ামোর সাহায্যে দর্শকদের জোর করে হাসিয়ে সহজে বাজীমাৎ করবার চেষ্টার পরিবর্তে নির্মল হাসির ছটা নাটকের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বিদ্যমান ছিল।

নাটকটির নির্দেশনায় ও সঙ্গীত পরিচালনায় ছিলেন তরুণ নাট্য-পরিচালক সুবীরকুমার সরকার। তাঁরই দেওয়া সুরের একটি গান মনোগ্রাহী হয়েছিল। 'এফেক্ট মিউজিক' রচনাতেও শ্রীসরকার যথেষ্ট পারদর্শিতার পরিচয় দেন।

অভিনয়ে অংশগ্রহণকারী প্রতিটি শিল্পীর অভিনয়ই সুন্দর হয়েছিল। তবে তাঁদের মধ্যে সুধা বন্দ্যোপাধ্যায়, জ্যোতিষ ঘোষ ও হরিপ্রসাদ দাসের অভিনয় বিশেষ করে উল্লেখযোগ্য।

মাসিক ৬০০৲ টাকা উপার্জন করুন

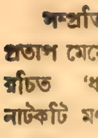

অবসর সময়ে বিখ্যাত রোমার ঘড়িগুলির জন্য অর্ডার বুক করিয়া বিনামূল্যে সর্তাবলী এবং স্যাম্পেল ঘড়ির জন্য পত্র লিখুন।

TAJ CO. (WBC—88)
P. Box 1383, Delhi—6.

স্টুডিও খবর

মহরৎ—দৃষ্টি দর্পণ

এস জি পিকচার্সের প্রথম নিবেদন ছাইয়া ঘোষ প্রযোজিত 'দৃষ্টি দর্পণ' ছবির মহরৎ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়েছে গত ২৮শে এপ্রিল ইণ্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবরেটরীতে। শ্যামল মিত্রের পরিচালনায় সঙ্গীত গ্রহণের মাধ্যমে এই অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়েছে। এক অসহায় অন্ধ মেয়ের মর্মস্পর্শী জীবনকাহিনী অবলম্বনে ছবির চিত্রনাট্য রচিত হয়েছে। কাহিনী ও চিত্রনাট্য রচনা করেছেন দিলীপ দেচৌধুরী। ছবিটি পরিচালনা করবেন রঞ্জন মজুমদার। সম্পাদনা করবেন অরবিন্দ ভট্টাচার্য। বিভিন্ন চরিত্রে রূপদান করবেন মাধবী মুখার্জী, অনিল চট্টোপাধ্যায়, বিকাশ রায়, দিলীপ রায়, রবি ঘোষ, জহর রায়, অনুভা ঘোষ, ছায়াদেবী প্রমুখ।

মহানগর বাদশানগর

'কেদার রাজা' ছবির প্রযোজক সুনীল জিন্দল শুরু শীঘ্রই তাঁর নতুন ছবির কাজ আরম্ভ করবেন বলে জানা গেছে। ছবির চিত্রনাট্য রচিত হয়েছে সম্রাট সেনের মহানগর-বাদশানগর অবলম্বনে।

নিশিপদ্ম

পরিচালক অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়ের 'নিশিপদ্ম' ছবির প্রস্তুতিপর্ব প্রায় শেষ হয়েছে। শীঘ্রই তিনি স্টুডিওর কাজে অগ্রসর হবেন। তাঁর এই ছবিতে নায়ক উত্তমকুমার, নায়িকা সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়।

পিতাপুত্র

চিত্রযুগের পরবর্তী ছবি 'পিতা-পুত্র'র কাজ শুরু হয়েছে সন্ধ্যা মুখার্জীর কণ্ঠে গাওয়া দুটি গান রেকর্ড করে। এবার ছবির কাজ চলবে টেকনিসিয়ান্স স্টুডিওতে। রাজকুমার মৈত্র রচিত কাহিনী অবলম্বনে ছবির জন্য চিত্রনাট্য রচনা করেছেন প্রণব রায়। ছবিটি পরিচালনা করবেন অরবিন্দ মুখার্জী। নায়িকা চরিত্রে অভিনয় করবেন তনুজা।

আনোখী রাত

পরলোকগত রোশনের সুরসমৃদ্ধ 'আনোখী রাত'-এর কাজ শুরু করেছেন পরিচালক অসিত সেন। এই ছবির প্রধান ভূমিকায় অভিনয় করবেন নবাগতা জাহিদা ও সঞ্জীবকুমার। সহভূমিকায়

…কবেন পরীক্ষিৎ সাহানী, অরুণা ইরানী, …নোয়ার, মুখরী, তরুণ বোস, বিজয় …খাটে।

হামেসা

জয় মুখার্জীর রঙিন ছবি 'হামেসা'র চিত্রগ্রহণ শেষ হয়েছে। এই ছবিতে দুটি চরিত্রে রয়েছেন শর্মিলা ঠাকুর ও মালা সিন্‌হা। নায়ক স্বয়ং জয় মুখার্জী।

সংবাদকণা

কার্ল ড্রেয়ারের জীবনাবসান

'প্যাসন অব জোয়ান অব আর্ক' বিশ্বের অন্যতম বিখ্যাত ছবির স্রষ্টা কার্ল ড্রেয়ার উনআশি বছর বয়সে কোপেন-হেগেনে পরলোকগমন করেছেন। তিনি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ পরিচালকদের অন্যতম—এই স্বীকৃতিতে সম্মানিত ছিলেন। 'প্যাসন অব জোয়ান অব আর্ক' ১৯২৭-২৮ সালে নির্মিত। ছবিটি ফেডারেশন অব ফিল্ম সোসাইটিজের উদ্যোগে কলকাতায় প্রদর্শিত হয়েছিল।

চেকোশ্লোভাক ছবি

সিনে সেন্ট্রাল ক্যালকাটা চেক্ কন্সলেটের সহযোগিতায় আগামী ১২ই মে থেকে অ্যাকাডেমী অব ফাইন আর্টস হলে একটি চেকোশ্লোভাক চলচ্চিত্র উৎসব অনুষ্ঠিত হবে। এই উপলক্ষ্যে ৭টি ৩৫ মিঃ মিঃ ছবি—'ক্যারেজ টু ভিয়েনা' 'স্ট্রিকট্‌লি গার্ডেড ট্রেন', 'দি সান্‌ ইন দা নেট', 'দি এন্ড অফ এজেন্ট ডব্লু সি-৪', 'রোমান ফর এ বিউগল', 'রিটার্ন অফ দি প্রডিগ্যাল সান্‌', 'সেভেন ডেজ এ উইক' প্রদর্শিত হবে।

সঙ্গীতকথা

অনিতা বসু

কুমারী অনিতা বসু (সঙ্গীত-প্রভাকর)' এ বছর উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে সর্বোচ্চ নম্বর পেয়ে ভারত সরকারের মাসিক ২৫০ টাকার বৃত্তি লাভ করেছেন। কুমারী বসু ১৯৬৬-৬৭ সালে আন্তঃ কলেজ সঙ্গীত প্রতিযোগিতায় পর পর দু' বছর চ্যাম্পিয়নশিপ লাভ করে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। কুমারী বসু শ্রীবিনোদলাল বসুর কনিষ্ঠা কন্যা। সঙ্গীত শিক্ষা গ্রহণ করছেন শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট।

অনিতা বসু (সঙ্গীতপ্রভাকর)

তাপসী মীরা

শিশু কেন্দ্রের বসন্ত উৎসব ও পাঠাগারের দ্বারোদ্‌ঘাটন অনুষ্ঠান গত ২৪শে মার্চ ও ২১শে এপ্রিল অনুষ্ঠিত হয়েছে শ্রীঅরবিন্দ সরণীতে। এই অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় দিনে 'তাপসী মীরা' গীতিনাট্য অভিনীত হয়। এই অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করে পূরবী ভট্টাচার্য, নিবেদিতা ভট্টাচার্য, জয়ন্তী পাল, কাবেরী পালিত, কাবেরী রায়চৌধুরী, সুদেষ্ণ মুখার্জী, প্রশান্ত ভট্টাচার্য, মহেন্দ্র মুখার্জী, গণেশ হালদার, উর্মিতা হালদার, ইভা ভট্টাচার্য, লিলি শেঠ। এই গীতিনাট্য পরিচালনা করেন কালীপদ ঘোষ এবং সঙ্গীত পরিচালনা করেন রামকুমার চট্টোপাধ্যায়।

সম্বলপুরে বিচিত্রানুষ্ঠান

গত শুভ ১লা বৈশাখে উড়িষ্যার সম্বলপুরে স্থানীয় কালীবাড়িতে মিলনী সঙ্ঘের সভ্যবৃন্দেরা একটি বিচিত্রা-নুষ্ঠানের আয়োজন করেন। অনুষ্ঠানে স্থানীয় এবং কলকাতার শিল্পিবৃন্দ অংশ গ্রহণ করেন। কলকাতার শিল্পী-দের মধ্যে ছিলেন—নৃপতি চট্টোপাধ্যায়, ভুলু চৌধুরী, রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়, রবীন সিন্‌হা (যন্ত্রসঙ্গীত) এবং শ্রীঅমল বসুর ব্যঙ্গগীতি শ্রোতাদের প্রভূত আনন্দদান করে। পরবর্তী দিবসে নাটক অভিনয়ের পর অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়।

'সেভেন ডেজ এ উইক'-এর একটি দৃশ্য

ঊর্ধ্বলোকে

কাজল মিত্র

"গান না গেয়ে বেঁচে থাকতে পারব না। গান গাইতে গাইতে মরবো তবুও গান ছেড়ে বাঁচা সম্ভব নয়।" কথাগুলি বলেছিলেন এযুগের বিস্ময়কর প্রতিভা স্বর্ণকণ্ঠশিল্পী ওস্তাদ বড়ে গোলাম আলি খাঁ। পক্ষাঘাতে শরীর পঙ্গু, তবুও গান, তবুও সুর! নিদারুণ ব্যাধির ভয়াল আক্রমণে অবশ তাঁর হাত, কিন্তু সেই কেঁপে ওঠা হাতেও তিনি জড়িয়ে ধরেছেন তাঁর প্রিয় সুরমণ্ডলটিকে। গুনগুন করে উঠেছে কালেংড়া অথবা মোহিনীর সুরে। কিন্তু তবু আমরা তাঁকে হারালাম। গত ২৪শে এপ্রিল পৃথিবীর বন্ধন ছিন্ন করে তিনি যাত্রা করলেন জ্যোতির্লোকের পথে। পেছনে পড়ে রইল সুরের অতলান্ত সমুদ্রে অগণ্য ঢেউ।

পূর্ব পরিচয়ের সন্ধানে আমাদের যেতে হবে সুদূর আরব দেশে। বিশাল মরুভূমি, রুক্ষ কাঁটাগুল্ম আর তৃষ্ণার্ত মানুষের দীর্ঘশ্বাসে ভরা আরব দেশ। তবু সে দেশ সুরের রাজ্য। রুক্ষ মরুর বুকে অসংখ্য সুরের কুসুম নিত্য বিকশিত। এ এক বিস্ময়।

এই আরব দেশের সঙ্গীত সাধক ছিলেন গোলাম আলির পূর্বপুরুষেরা। সেখান থেকে তাঁরা আসেন গজনীতে। তারপর ভারতবর্ষে এসে তাঁরা লাহোরের কসুর অঞ্চলে বসবাস শুরু করেন। গোলাম আলির পিতামহ ইদি খাঁ ছিলেন সেকালের খেপদাশিল্পী। ইদি খাঁ সাহেবের দুই পুত্র ওস্তাদ আলি বক্স আর প্রথিতযশা সঙ্গীত শিল্পী ওস্তাদ কালে খাঁ। আলি বকস্-এর পুত্র গোলাম আলি। জন্ম ১৯০২ সালের ৪ঠা এপ্রিল।

বোম্বাই-এ বিদ্যাভ্যাসের সামান্যতম চেষ্টা করে বিফল হয়েছিলেন গোলাম আলি। সুরের কুহেলি তখন হাতছানি দিয়ে ডাকছে তাঁকে। সহজাত শিল্পিমন তখন থেকে পিতা-পিতৃব্যের রেওয়াজ শুনে মাতোয়ারা!

চার বছর বয়স থেকেই কালে খাঁর কাছে তাঁর গান শোনা আর তন্ময় হয়ে যাওয়া। সাত বছরে আনুষ্ঠানিকভাবে শিষ্যত্ব গ্রহণ করে গোলাম আলি প্রবেশ করলেন সুরের মায়াময় রাজ্যে। পাতিয়ালা ঘরানা শিল্পী হিসাবে ওস্তাদ কালে খাঁ তখন অবিভক্ত ভারতে সর্বজনস্বীকৃত প্রতিভা। তাঁর স্বরে বজ্রনির্ঘোষ আর সুরের মায়াজালে মোহাবিষ্ট অগণ্য সঙ্গীতপিপাসু।

গোলাম আলির শিক্ষাগুরু হিসাবে পাতিয়ালার অপর এক শিল্পী ওস্তাদ ফতে আলি খাঁর নামও উল্লেখ্য।

১৯১৯ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তির পর মিত্রপক্ষের বিজয়োৎসব উপলক্ষে লাহোরে যে সংগীতানুষ্ঠান হয় তাতে গোলাম আলি ছিলেন অন্যতম শিল্পী। সতেরো বছরের তরুণের সঙ্গীত

বড়ে গোলাম আলি খাঁ

পরিবেশনায় সেদিন মুগ্ধ হয়েছিলেন উপস্থিত শ্রোতৃবৃন্দ।

এরপর ১৯২৪ সাল। খাঁ সাহেবের জীবনে এক স্মরণীয় ঘটনা। লখনৌ মিউজিক কনফারেন্স জমজমাট হয়ে উঠেছে খ্যাতিমান শিল্পীদের উপস্থিতিতে। এখানে এসেছেন বিখ্যাত শিল্পী আল্লা বন্দে খাঁ, তাঁর সঙ্গে 'বাপকা বেটা' ওস্তাদ নাসিরুদ্দীন, সঙ্গীত জগতের অপার বিস্ময় ওস্তাদ ফৈয়াজ খাঁ আর ভারত-বিখ্যাত তবলিয়া ওস্তাদ মাসিদ খাঁ। আরও একজন এসেছেন। তিনি ওস্তাদ গোলাম আলি খাঁ। তিনি এসেছেন পিতা আলি বকস্-এর সঙ্গে। প্রথমে কেমন যেন একটা সঙ্কোচ, একটু ভয় হচ্ছিল। কিন্তু মঞ্চে উঠে সুর বেঁধে আলাপ ধরতেই সব কিছু ভুলে গিয়েছিলেন তিনি। কলাদেবীর হাত ধরে আলাপ থেকে শেষ পর্যন্ত বিচরণ করলেন সুরের স্বর্গে। গানের শেষে বিদগ্ধজনের উদার কণ্ঠের প্রশংসায় গর্ব অনুভব করেছিলেন পিতা আলি বক্স।

কিছুদিনের মধ্যেই ছড়িয়ে পড়ল শিল্পীর কণ্ঠের খ্যাতি। কলকাতায় এলেন গোলাম আলি। মেগাফোন কোম্পানিতে শিল্পীর রেকর্ড হলো। মুলতানে খেয়াল আর পিলুতে ঠুমরী। এ হলো ১৯৩৫ সালের কথা।

১৯৩৯ সাল। অল বেঙ্গল মিউজিক কনফারেন্স। স্থান কলকাতার রক্সি সিনেমা হল। মধ্যরাতের শিল্পী ওস্তাদ বড়ে গোলাম আলি খাঁ। শ্রোতাদের সামনে বজ্রকণ্ঠে পরিবেশিত হলো কেদারার সুর। খাঁ সাহেব তখন তিনসপ্তকে অনায়াস আনাগোনার কঠিনতম বিদ্যাটি অর্জন করেছেন। সুপরিমিত দোয়ারীর কাজও অনবদ্য, অসাধারণ। সঙ্গীত শেষে শ্রোতারা নির্বাক, সমাহিত, মন্ত্রমুগ্ধ। তাঁদের রক্তের স্রোতে সুরের লহর ছুটে চলেছে। এমনই গান চেয়েছিল কলকাতার রসিকসমাজ। তাই কলকাতার সঙ্গে শিল্পীর সম্পর্ক হলো অবিচ্ছেদ্য। এরপর বহু জায়গায় অসংখ্য আসরে গেয়েছেন তিনি। সিংহের মত বলিষ্ঠ পদক্ষেপে উঠে এসেছেন মঞ্চে। আবার পঙ্গু দেহে অপরের সাহায্যে কোনক্রমে বসে গান গেয়েছেন ব্যথিতকণ্ঠে। কিন্তু কলকাতার শ্রোতাদের সম্বন্ধে প্রশ্ন করতে একই উচ্ছ্বসিত জবাব শুনেছেন সকলে: 'উন্‌লোগ বহুৎ সমঝদার হ্যায়'। একথা যেমন সত্য তেমনই অনস্বীকার্য তাঁর প্রতিভা। শাস্ত্রীয় সংগীতের বাঁধাধরা রাস্তার বাইরে দাঁড়িয়ে 'কনভেনশন' ভেঙে অথচ মূল বিষয়টি ঠিক রেখে শ্রোতাকে বিমোহিত করেছেন গোলাম আলি। ঠুম্‌রীর লঘু চালে সর্বশ্রেণীর শ্রোতাকে আনন্দে মাতিয়ে রাখতেন তিনি। আবার মালকোষের মত গম্ভীর রাগে পঞ্চমকে একটু ছুঁয়ে নিয়ে এক অনন্য সুর শুনিয়েছেন শ্রোতাদের। তাঁকে ভুলে যাওয়া অসম্ভব!

সঙ্গীত পরিবেশন করতে গোলাম আলি বহুবার আফগানিস্তানে গেছেন। কাবুলের রাজদরবারের সংগীত শিল্পী ছিলেন ওস্তাদ আলি বকস-এর মামা ওস্তাদ পীর বকস। তিনি গোলাম আলিকে কাবুলের রাজদরবারে সঙ্গীত পরিবেশনের জন্য নিয়ে যান।

শুধুমাত্র গায়ক হিসাবেই নয়, সঙ্গীত রচয়িতা আর সুরস্রষ্টা হিসাবেও গোলাম আলির কৃতিত্ব যথেষ্ট। নতুন রাগ হিসাবে তিনি সৃষ্টি করেছেন 'হরিকোষ' আর 'কোহেলি কল্যাণ'। 'সবরং' ছদ্মনামের আড়ালে তাঁর রচিত আর সুরারোপিত গানের সংখ্যা ৫০০টিরও বেশি।

কলাবিদ্যার মধ্যে সঙ্গীত শ্রেষ্ঠ। সঙ্গীতের মাধ্যমে লাভ করা যায় প্রকৃত আনন্দ। সাধারণ সুখ আর অনুভবের আনন্দে আসমান জমিন তফাৎ। কিন্তু গোলাম আলি একটি অদ্ভুত জিনিস আবিষ্কার করেন—তা হচ্ছে সঙ্গীতের মাধ্যমে রোগ নিরাময়। এই প্রসঙ্গে তাঁর কাছে শোনা একটি ঘটনার উল্লেখ না করলে বিষয়টি অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। বহু বছর আগে লাহোরে এক জায়গায় খাঁ সাহেব গান গাইছেন। এই সময় একজন এসে সংবাদ দিল পাশের বাড়ির এক রোগী খাঁ সাহেবের গান শুনতে অত্যন্ত ইচ্ছুক। কিন্তু রোগীর শরীর অথর্ব হওয়ার দরুণ তিনি আসতে পারছেন না। গোলাম আলি গেলেন সেই রোগীর কাছে। বাতজ্বরে পঙ্গু লোকটি সংগীতরসিক। তিনি সনির্বন্ধ অনুরোধ জানালেন খাঁ সাহেবকে। রোগশয্যার পাশে বসে পর পর তিন দিন গান শোনালেন গোলাম আলি। রোগী ক্রমশ সুস্থ হলেন। উঠে বসলেন বিছানায়। পঙ্গু হাত-পা একটু একটু করে সহজ হলো। এ এক বিস্ময়!

সেই বিস্ময় গোলাম আলি নিজের জীবনেও ঘটিয়েছেন। প্রথম রোগাক্রমণের পর তাঁর চিকিৎসক নিষেধ করেছিলেন গান গাইতে। কিন্তু শিল্পী নিজের রোগের ব্যবস্থাপত্র নিজেই রচনা করে নিয়েছিলেন। তার মধ্যে ছিল শুধু সুর আর গান। পঙ্গু অবস্থায় শয্যাশায়ী থেকেও তিনি জড়িয়ে ধরেছেন তাঁর প্রিয় সুরমণ্ডলটিকে। গুন্‌গুন্‌ করে গেয়েছেন 'প্রেম কী মার কঠোর' অথবা 'আয়েনা বালাম'। গলা ছাড়তে পারেন নি, তাই দু'চোখ বেয়ে গড়িয়ে পড়েছে অশ্রুধারা। ইসারায় পুত্র মুনাব্বরকে বলেছেন গান শোনাতে। নিজেও তার সঙ্গে সঙ্গে গেয়েছেন, তারিফ করেছেন। ধীরে ধীরে সুস্থতা লাভ করেছেন। চিকিৎসকেরা অপার বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেছেন!

সামান্য কিছুদিন আগের কথা। হায়দ্রাবাদ যাবার ঠিক আগেই দক্ষিণ কলকাতার একটি বাড়িতে ঘরোয়া আসরে গেয়েছিলেন খাঁ সাহেব। ভাবতেও অবাক লাগে! প্রায় তিন ঘণ্টা ধরে খেয়াল আর ঠুমরী শুনেছি আমরা। তখন মনে হয়েছে সিংহ পিঞ্জরাবদ্ধ! বার বার কণ্ঠ দিয়ে সহায়তা করেছেন মুনাব্বর। বেদনাহত কণ্ঠে রোগযন্ত্রণার মধ্যেও অপূর্ব সুরের সন্ধান পেয়ে সেদিন স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলাম। আমরা এযুগে জন্মগ্রহণ করেও ভাগ্যবান। আমরা স্বর্ণকণ্ঠের মহিমা শ্রবণে পরিতৃপ্ত।

শেষের দিনগুলি অতি নিদারুণ! শিল্পী সজ্ঞান অথচ বাক্‌শক্তি রহিত! দর্শক আর শুভার্থীদের দেখে শুধু একটু কণ্ঠের হাসি ফুটে উঠেছে, দৃপ্ত চোখ দু'টি ভাষাময় হয়ে প্রত্যভিবাদন জানিয়েছে। মাঝে মাঝে মুনাব্বরকে চোখ দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছেন সুরমণ্ডল বাজাবার কথা, গান গাইবার কথা। সুরমণ্ডল বেজেছে, গান হয়েছে। উৎকণ্ঠিত ভক্ত আর গুণীজন বসে রয়েছেন টেপ রেকর্ডার নিয়ে শিল্পীর 'শেষ গানের রেশ' ধরে রাখার জন্য।

কিন্তু তা আর হলো না। ২৩শে এপ্রিল সূর্য ডুবে গেল। তিনি যাত্রা করলেন সেই জ্যোতিতীর্থের পথে, যেখানে সব বেদনার অবসান, সব যন্ত্রণার সমাপ্তি। শুধু পেছনে পড়ে রইল অর্ধ শতাব্দীর সুরের ইতিহাস, গানের ইতিহাস, যার মধ্যে তিনি অমর হয়ে থাকবেন।

বর্তমান বঙ্গসাহিত্যে সর্বাধিক জনপ্রিয় লেখিকা

আশাপূর্ণা দেবীর
গ্রন্থাবলী
আবার একখণ্ড
প্রকাশিত হয়েছে।

তিনখানি সম্পূর্ণ উপন্যাস। সাতটি বড় গল্প

১। বলয়গ্রাস ২। প্রেম ও প্রয়োজন
৩। দুর্নিবার ৪। এক গুচ্ছ গল্প

মূল্য মাত্র সাড়ে ছয় টাকা

আগেই বেরিয়েছে আর এক খণ্ড
গ্রন্থাবলী

১। জহুরী ২। অনির্বাণ
৩। সোনালী দিনের মন
৪। এক গুচ্ছ গল্প

মূল্য মাত্র পাঁচ টাকা

বসুমতী (প্রাঃ) লিঃ
কলিকাতা-১২

পরপর চারবার বিশ্ববিজয়ীর সম্মান অর্জন করলেন কার্টিস কোকস দক্ষিণ আফ্রিকার উইলি লুডিককে হারিয়ে দিয়ে। ডালাসে অনুষ্ঠিত ওয়েল্টার ওয়েট চ্যাম্পিয়নশীপ প্রতিযোগিতার পঞ্চম রাউণ্ডেই টেকনিকাল নক আউট করে বিজয়ী হন কোকস। ছবিতে কোকসের ঘুষিতে লুডিককে পড়ে যেতে দেখা যাচ্ছে।

ফাস্ট বোলার চাই, ফাস্ট বোলার নাই

ফাস্ট বোলার নিয়ে আবার গালভরা কথা বলার ধুম পড়ে গেছে। ভারতীয় ক্রিকেট জগতের চিরন্তন একটি সমস্যাকে নিয়ে বাজার আবার সরগরম। ভারতের প্রাক্তন ক্রিকেটার পলি উমরিগড়ের একটি রিপোর্টকে কেন্দ্র করে আমাদের দেশের ক্রিকেট বিশেষজ্ঞরা নিজেদের অভিমত প্রকাশ করে ক্রিকেট খেলার ওপর তাঁদের আন্তরিক টানের কথাই বোধহয় বিশেষ করে প্রমাণ করতে চাইছেন। অবশ্য তাঁদের সেই সারগর্ভ মতামত কতোটা কাজে লাগবে জানি নে। আদৌ লাগবে কি না সে বিষয়ও যথেষ্ট সন্দেহ আছে। সন্দেহ থাকবে নাই বা কেন—আমাদের ভারতীয় ক্রিকেট কণ্ট্রোল বোর্ডের মাননীয় সদস্যরা যে পিঠে বেঁধেছেন কুলো আর কানে দিয়েছেন তুলো। তাঁদের কাছে ভালো কিছু বলতে যাওয়া, কিম্বা করণীয় কোন বিষয়ের প্রস্তাব করতে যাওয়া জেনে-শুনে অরণ্যে রোদন ছাড়া আর কিছু নয়। কারণ ফাস্ট বোলার সমস্যা আমাদের দেশে কিছু আর নতুন নয়। অনেক কালের অনেক দিনের এক বিরাট চাহিদার মুখে ছাই দিয়ে তাঁরা পরম অবহেলাভরে বিষয়টি দূরে সরিয়ে রেখেছেন বছরের পর বছর। মাঝে মাঝে বিদেশ থেকে ফাস্ট বোলার এনে বিরাট একটা কিছু করছেন এমন ভাব দেখিয়ে তাঁরা নষ্ট করেছেন শুধু হাজার হাজার টাকা। কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয় নি। বেশি দূরে যাবার দরকার নেই। মাত্র কয়েক বছর আগে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ থেকে গিলক্রীস্ট, কিং প্রমুখ ফাস্ট বোলারদের আমাদের দেশের হবু ফাস্ট বোলারদের তালিম দেবার জন্যে আনা হয়েছিল। কিন্তু আখেরে দেখা গেলো যে কাজ কিছুই হয় নি। আমাদের দেশের হবু ফাস্ট বোলাররা সেদিন যেখানে ছিলেন, আজো রয়ে গেছেন ঠিক সেইখানেই। মধ্যে পড়ে নষ্ট হলো বেশ কিছু টাকা। কিন্তু আসল কাজটি আজও কেউ করলেন না—এমন কি সেদিকে এতোটুকুও নজর দিলেন না কেউ। সবার আগে খুঁজে বার করতে হবে তাদের, যারা ভবিষ্যতে সত্যিকারের ফাস্ট বোলার হতে পারবে। স্যার ফ্রাঙ্ক ওরেলও ঠিক একই কথা বলে গিয়েছিলেন আজ থেকে বেশ কয়েকবছর আগে কিন্তু ওরেলের মন্তব্যও সেদিন পায় নি হালে পানি। আর আজ তারই খেসারত দিতে হচ্ছে আমাদের পর পর পরাজয়ের লজ্জা সয়ে।

—শান্তিপ্রিয়

ক্রিকেট খেলার উন্নতির প্রসঙ্গে

সম্প্রতি ভারতের প্রাক্তন টেস্ট ক্রিকেটার ও অধিনায়ক পলি উমরিগড় ভারতে ক্রিকেট খেলার উন্নতির জন্যে কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষামন্ত্রকের কাছে একটি রিপোর্ট পাঠিয়েছেন। বিভিন্ন বিষয়ের পর তিনি এসেছেন ভারতের ফাস্ট বোলার প্রসঙ্গে।

ফ্রাঙ্ক ওরেল

ক্রিকেট খেলায় ভারতের উন্নতির পথ-নির্দেশ বহুকাল আগেই দিয়ে গিয়েছিলেন স্যার ফ্রাঙ্ক।

উমরিগড় বলেছেন যে বিদেশ থেকে নাম করা ফাস্ট বোলারদের আনিয়ে কোচিং-এর মাধ্যমে ফাস্ট বোলিং-এ ভারতের চিরাচরিত দুর্বলতা দূর করা সম্ভব।

কিন্তু আগেই বলেছি যে শুধু মাত্র বিদেশ থেকে ফাস্ট বোলার আনিয়ে সব সমস্যার সমাধান করতে যাওয়া বাতুলতা ছাড়া আর কিছু নয়। ভারতে সত্যিকারের ফাস্ট বোলার তৈরি করতে হলে গ্রামে গ্রামে গিয়ে শক্তিশালী তরুণদের খুঁজে বের করতে হবে। তারপর ক্রিকেট শিক্ষায় তাদের প্রথমে শিক্ষিত করে তুলতে হবে।

কিন্তু প্রাথমিক শিক্ষার আগেই যদি বিদেশী কোচদের দিয়ে প্রশিক্ষণ শুরু করা হয় তাহলে উঠতি খেলোয়াড়রা শুধুমাত্র অসুবিধারই সম্মুখীন হবেন। কারণ বিদেশী কোচদের কথাবার্তা, প্রশিক্ষণ-পদ্ধতি কিছুই তারা বুঝতে পারবে না।

আমাদের ক্রিকেট কর্তাদের নজর শুধু-মাত্র শহরের ছেলেদের দিকে! ফলে গ্রামের খেলোয়াড়রা চিরকালই রয়ে গেছে অবহেলিত। অথচ গ্রামের তরুণদের মধ্যেই হয়তো লুকিয়ে আছে সত্যিকারের ফাস্ট বোলার, সত্যিকারের ভালো ক্রিকেট খেলোয়াড়।

আজ থেকে বেশ কয়েক বছর আগে ভারতের ফাস্ট বোলার প্রসংগে পরলোকগত স্যার ফ্রাঙ্ক ওরেল বলেছিলেন,

"The fast bowling department is still poorly manned and probably will be for a long time unless the Indian Board looks towards the hale and hearty Sikhs for recruitment. I would venture to state that with (i) planning at this stage ; (ii) the discovery of two good pace-bowlers, the Indian team by 1967 could be rated in the first three in International Cricket."

কিন্তু ওরেলের এই অভিমতকে যে এতটুকুও কাজে লাগানো হয় নি—সে কথা বোধহয় না বললেও চলে। ভারতীয় ক্রিকেট কনট্রোল বোর্ড যদি ওরেলের মতের ওপর নির্ভর করে এই বিষয়ে একটু সচেষ্ট হতেন, তাহলে, আর যাই হোক ভারতীয় ক্রিকেটকে আজকের মতো এমন অসহনীয় অবস্থার মুখোমুখি হতে হতো না।

তাই উমরিগড়ের ঐ সুচিন্তিত রিপোর্টের ভাগ্যেও যে কি আছে—একটু ভেবে দেখলে তা জলের মতো পরিষ্কার হয়ে যাবে। কারণ সত্যিকারের কাজের মতো কাজ করতে আমাদের দেশের ক্রীড়া-কর্তৃপক্ষরা কোনদিনই চান না......!

জনমতের স্বীকৃতি

শেষ পর্যন্ত মেক্সিকো অলিম্পিক থেকে দক্ষিণ আফ্রিকা বাদ গেলো। বাদ গেলো দক্ষিণ আফ্রিকার তীব্র বর্ণবৈষম্য-নীতির জন্যেই। আজো সেখানে সাদা-কালোয় চরম ভেদাভেদ। এই ভেদাভেদ পৃথিবীর প্রায় সব কটি দেশের নীতির বিরুদ্ধে। পৃথিবীর প্রায় অধিকাংশ দেশই দক্ষিণ আফ্রিকার এই বর্ণবৈষম্যনীতি সমর্থন করে না! আর তাই প্রতিবাদে তারা রাখতে চায় না দক্ষিণ আফ্রিকার সংগে বিশেষ কোন সম্পর্ক!

তাই মেক্সিকো অলিম্পিক প্রতি-যোগিতায় দক্ষিণ আফ্রিকার যোগদান নিয়ে দিকে দিকে উঠেছিলো প্রতিবাদের ঝড়। ভারত ও সোভিয়েট রাশিয়া সহ পৃথিবীর প্রায় চল্লিশটি দেশ দক্ষিণ আফ্রিকার অলিম্পিকে যোগদানের প্রতিবাদে নিজেরা অলিম্পিক প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ না করার কথা জানিয়ে দিয়েছিলো।

এঁদের দাবি ছিলো দক্ষিণ আফ্রিকাকে মেক্সিকো অলিম্পিকে যোগদান করতে দেওয়া চলবে না আর দক্ষিণ আফ্রিকাকে অলিম্পিকে যোগদান করুক। তার জন্যে যে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিলো তা প্রত্যাহার করে নিতে হবে।

কিন্তু আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটির সভাপতি আরভি বনডেজ চেয়ে-ছিলেন যে দক্ষিণ আফ্রিকা মেক্সিকো অলিম্পিকে যোগদান করুক। তার জন্যে যদি অনেক দেশ প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ না করে তাহলেও কিছু যায় আসে না। তাই তিনি স্পষ্টই বলেছিলেন যে রাশিয়া প্রভৃতির মতো দেশগুলির হুমকিতে তাঁরা টলবেন না। মেক্সিকো অলিম্পিক অনুষ্ঠিত হবেই, আর দক্ষিণ আফ্রিকাও যোগদান করবে।

কিন্তু তারপর যখন দক্ষিণ আফ্রিকার অলিম্পিকে যোগদানের বিরুদ্ধে দিকে দিকে প্রতিবাদের ঝড় সোচ্চারিত হতে থাকে, তখনই ভোটাভুটির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হলো। আর পোস্টাল ভোটের খতিয়ানে যখন দেখা গেলো যে প্রয়োজনীয় ৩৮টির অনেক বেশি ভোট দক্ষিণ আফ্রিকার অলিম্পিকে যোগদানের বিরুদ্ধে পড়েছে, তখনই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হলো যে, দক্ষিণ আফ্রিকাকে মেক্সিকো অলিম্পিকে যোগদানের জন্যে যে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল, তা প্রত্যাহার করে নেওয়া হবে।

পলি উমরিগড়

ক্রিকেট খেলার উন্নতির জন্যে উমরিগড়ের রিপোর্ট আবার বাজার গরম করেছে।

এ সিদ্ধান্ত হয়তো বা আরভি বন-ডেজের ব্যক্তিগত পরাজয় আর প্রতিবাদী দেশগুলির নৈতিক জয়। তবু আমরা আশা করবো যে এবার অন্তত দক্ষিণ আফ্রিকা তাদের বর্ণবৈষম্যনীতি পরি-বর্তনের কথা চিন্তা করবে! কারণ একঘরে হয়ে থাকার জ্বালা যে কতো, এবার মনে হয় দক্ষিণ আফ্রিকা তা বুঝতে পেরেছে......!

কলকাতার হকি

কলকাতার হকি লীগের খেলা এবারের মতো শেষ হয়ে এলো। অধিকাংশ দলেরই খেলার পালা সাঙ্গ হচ্ছে একে একে। বাকী যেটুকু ছিলো তা ঐ লীগ চ্যাম্পিয়ানশীপের প্রশ্ন। কিন্তু তাও গেলো মিটে।

এবারের লীগ চ্যাম্পিয়ানশীপের দৌড়ে ছিলো প্রতিদ্বন্দ্বী তিনটি দল—ইস্টবেঙ্গল, মোহনবাগান আর বি এন আর। এর মধ্যে আবার ইস্টবেঙ্গলের চান্সই ছিল বেশি। ইস্টবেঙ্গল মাত্র একটি পয়েন্ট হারিয়ে হয়েছে এবারের লীগ চ্যাম্পিয়ান। পক্ষান্তরে রানার্স আপ মোহনবাগান আর লীগ তালিকায় তৃতীয় স্থান লাভকারী বি এন আর দল হারিয়েছে যথাক্রমে ৩টি ও ৫টি করে পয়েন্ট।

লীগ তালিকার প্রথম তিনটি দল

	খেলা	জয়	ড্র	পরাজিত	স্ব	বিঃ	পয়েণ্ট
ইষ্টবেঙ্গল	১৯	১৮	১	০	৩২	২	৩৭
মোহনবাগান	১৯	১৬	৩	০	৪২	১	৩৫
বি এন আর	১৯	১৫	৩	১	৪৫	৭	৩৩

ওদিকে কলকাতার হকি মরশুমের শেষ পর্বে চিরাচরিত প্রথা অনুযায়ী শুরু হয়ে গেছে বেটন কাপের খেলা। সর্ব-ভারতীয় এই প্রতিযোগিতায় এবার যোগদান করেছে ঘরে-বাইরে মিলে ৩০টি দল। এর মধ্যে বহিরাগত দলের সংখ্যা হলো ৯।

কিন্তু খেলাগুলো ঠিক যেন জমতে চাইছে না। কলকাতায় অনুষ্ঠিত সর্ব-ভারতীয় প্রতিযোগিতার আজকাল এই একই হাল। বাইরের দলগুলো, কেন জানি নে, কলকাতায় খেলতে ঠিক যেন উৎসাহ পায় না। এর পেছনে তবে কি আছে কর্তৃপক্ষের উদাসীনতা, না কি বাইরের দলগুলির প্রতি চরম অবহেলা?

সমাচার দর্পণ

দেশে

কিছুদিন আগে শোনা গিয়েছিলো যে পাতিয়ালার ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ স্পোর্টসকে স্থানান্তরিত করা হবে। নতুন স্থানগুলোর মধ্যে নয়াদিল্লীর ন্যাশনাল স্টেডিয়ামও ছিলো। কিন্তু এখন শোনা যাচ্ছে যে ইনস্টিটিউটটি পাতিয়ালাতেই থাকবে। সম্প্রতি ইনস্টিটিউটের কার্য-নির্বাহক কমিটির সভায় উপরোক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে।

* * *

মেক্সিকো অলিম্পিক কমিটি থেকে আমন্ত্রণ এসেছে কালী গাঙ্গুলী আর ডেভিড আব্রাহামের কাছে। এঁরা দু'জন মেক্সিকো অলিম্পিক প্রতিযোগিতায় ভারোত্তোলন বিভাগে রেফারী হিসেবে আমন্ত্রিত হয়েছেন। ভারতীয় ভারোত্তোলন ফেডারেশনের সহ-সভাপতি হলেন ডেভিড আব্রাহাম, আর কালী গাঙ্গুলী ফেডারেশনের সম্পাদক।

* * *

সম্প্রতি উড়িষ্যা অলিম্পিক এ্যাসোসিয়েশন এক অভাবনীয় নজীর সৃষ্টি করেছে। এ্যাসোসিয়েশন উড়িষ্যার পরলোকগত ফুটবল খেলোয়াড় বচনের পরিবারকে সাহায্য হিসেবে দশ হাজার টাকা (১০,০০০) দান করেছেন। উড়িষ্যার অলিম্পিক এ্যাসোসিয়েশনের এই স্মরণীয় কীর্তিটি আমাদের বেঙ্গল অলিম্পিক এ্যাসোসিয়েশন কিম্বা আই এফ এ'র মনে ধরলে মন্দ হয় না......।

বিদেশে

স্যার লিয়ারি কনস্টানস্টাইন নেলসন ও কলোনের উপনির্বাচনে লিবারেল পার্টির প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেছেন। স্যার লিয়ারি সম্প্রতি সেণ্ট এনড্রুজ বিশ্ববিদ্যালয়ের রেক্টর পদ গ্রহণ করেছেন। নির্বাচন প্রসংগে তিনি বলেন যে, তিনি চিরকাল নেলসনের পক্ষে ক্রিকেট খেলেছেন আর সিলভারম্যান ও লেবার পার্টিকে সমর্থন করেছেন। দলের প্রতি আনুগত্যের কোন অভাব তাঁর ঘটে নি। সম্প্রতি মিঃ সিলভারম্যানের মৃত্যুতে এই উপনির্বাচনের প্রসংগ এসে পড়েছে।

* * *

গারফিল্ড সোবার্স নাটিংহাম দলের অধিনায়ক নির্বাচিত হয়েছেন। গত বছর নাটিংহাম দল একটা খেলাতেও সাফল্য লাভ করতে পারে নি। তবুও সোবার্স আশা করেন যে, তাঁর দল কাউণ্টি চ্যাম্পিয়নশীপের পুরস্কার গিলেট কাপ লাভ করবে। সোবার্স আরো বলেছেন যে তাঁর দল তাঁর কাছে যা আশা করে তা তিনি তাঁর সর্বশক্তি প্রয়োগ করে পূর্ণ করবেন।

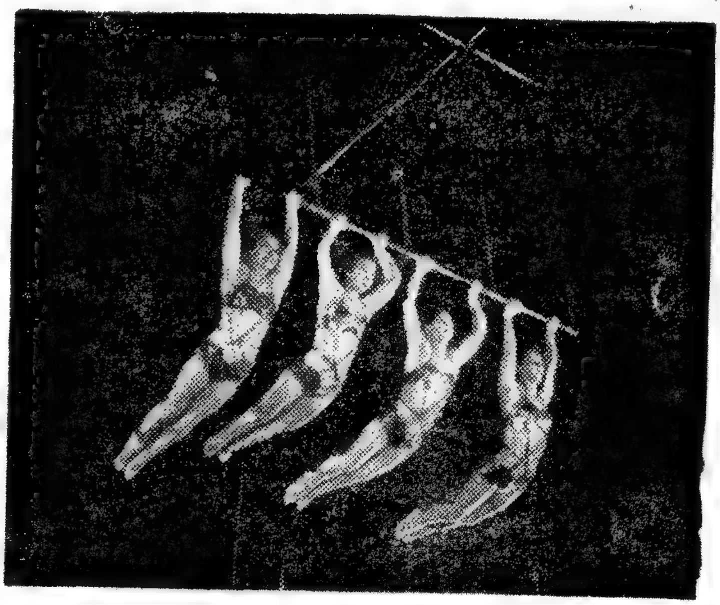

॥ অলিম্পিক আসছে ॥

মেক্সিকো অলিম্পিক প্রতিযোগিতার দিন ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে! তার প্রস্তুতিপর্ব আজ বিশ্বের প্রতিটি দেশে পুরোদমে চলছে। কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকাকে কেন্দ্র করে যে ঝড় আজ বিশ্ব ক্রীড়াঙ্গনে উঠেছে, তার শেষ কোথায় কে জানে! শেষ পর্যন্ত মেক্সিকো অলিম্পিকের ভাগ্যে যে কি আছে তাও আজ অজানা।

আইন-কানুনের দুনিয়া

শংকরকুমার দে (আন্দুল রোড, হাওড়া—৩)

প্রশ্ন : অতিরিক্ত রান কোন কোন বলে হয়? আম্পায়ারদের যদি কোন বিষয়ে মতভেদ ঘটে তাহলে সমস্যার সমাধান হবে কি করে? উইসডেন কি?

উত্তর : অতিরিক্ত রান নো বল ওয়াইড বল প্রভৃতিতে হয়, এ ছাড়া বাই, লেগ বাইয়ের প্রশ্ন তো আছেই। যদি কোন আউটের সিদ্ধান্তের বিষয়ে আম্পায়ারদের মধ্যে মতভেদ ঘটে তাহলে সিদ্ধান্ত সাধারণত ব্যাটসম্যানের অনুকূলে যায়। উইসডেন হচ্ছে, ক্রিকেট সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য সমস্ত বিষয় নিয়ে প্রকাশিত একটি বার্ষিক সংকলন। ইংলন্ড থেকে গত ১০৪ বছর ধরে এটি প্রকাশিত হচ্ছে।

শ্যামলী দে (খালনা মাকুরা, হাওড়া)

প্রশ্ন : ব্যাটসম্যানকে কতরকমভাবে আউট করা যেতে পারে?

উত্তর : বোল্ড, কট, এল বি ডব্লিউ, হিট উইকেট, স্ট্রে ডাউন (সাধারণত বোল্ড বলে ধরা হয়), হিট দি বল টোয়াইজ, স্টাম্পড, হ্যান্ডল দি বল, অসুবিধে সৃষ্টির জন্যে আউট, রান আউট প্রভৃতি।

মন্টু রায় (নারায়ণগড়, মেদিনীপুর)

প্রশ্ন : রান নিতে গিয়ে স্ট্রাইকার বা নন-স্ট্রাইকার উইকেট ছুঁয়ে ফেললো। কিন্তু ইতিপূর্বে বলটি বাউন্ডারী সীমা অতিক্রম করেছিলো। এ ক্ষেত্রে কি কেউ আউট হবে?

উত্তর : না, হবে না। আপনার অপর প্রশ্নের উত্তরগুলো আশা করি সাপ্তাহিক বসুমতীর সচিত্র আলোচনায় দেখেছেন।

অচিন্ত্য ও অপূর্বকুমার মল্লিক (আরা-বাগ, বর্ধমান)

প্রশ্ন : ব্যাটসম্যান বলটা হিট করার পর সেটা নন-স্ট্রাইকার ব্যাটসম্যানের প্যাডে লেগে বাউন্ডারী হলো। এ ক্ষেত্রে রান হবে কি? হলে ৪ রান কার হবে?

উত্তর : বাউন্ডারীর ৪ রান যোগ হবে স্ট্রাইকার ব্যাটসম্যানের রানের সংগেই।

অনিলচন্দ্র দাস (হালিসহর, মান্নাপাড়া, ২৪ পরগনা)

প্রশ্ন : ব্যাটসম্যান একটা বল হিট করার পর বলটা উইকেটের দিকে ফিরে আসছিলো। ব্যাটসম্যান তখন পা দিয়ে বলটা কিক করে বাউন্ডারীতে পাঠালেন। ব্যাটসম্যান পা দিয়ে আস্তে করে বলটা চাপে নি বা হাত দিয়েও ধরে নি। সে সজোরে পা দিয়ে কিক করেছে। এ ক্ষেত্রে ব্যাটসম্যান কি আউট?

উত্তর : না, আউট নয়।

অজিত, তারক, রথীন (হিংগলগঞ্জ, ২৪ পরগনা)

উত্তর : আপনাদের প্রশ্নটা ঠিক বুঝতে পারলাম না। তবে যেটুকু মনে হয় তাতে আম্পায়ারকে দেখতে হবে যে ঠিক মত বলটা করা হয়েছে কি না অর্থাৎ ডেলিভারী ফেয়ার কি না। আর ব্যাটসম্যান যদি খেলার জন্যে প্রস্তুত অর্থাৎ রেডি না থাকেন, তাহলে তিনি কোন সময়েই আউট হবেন না—বোল্ড আউট হলেও না।

সৈয়দ মহিউদ্দিন (বোলপুর স্টেশন রোড, বোলপুর, বীরভূম)

প্রশ্ন : বোলার বল করলেন। কিন্তু বলটি নো বল। আম্পায়ার সংগে সংগে নো বল বললেন। কিন্তু ব্যাটসম্যান আম্পায়ারের কথা শোনার আগেই বল এসে গেলো উইকেটের সামনে এবং তিনি মারতে গিয়ে ক্যাচ তুললেন। একজন ফিল্ডার আইনসংগতভাবে ক্যাচটা লুফলেন। তাহলে ব্যাটসম্যান কি আউট হবে?

উত্তর : নো বলে একমাত্র রান আউট ছাড়া অন্য কোনভাবে আউটের প্রশ্নই ওঠে না

স্বপন, চঞ্চল ও হিমাচল মণ্ডল (গুসকরা, বর্ধমান)

উত্তর : আপনাদের অনুরোধ রাখার চেষ্টা করবো।

মোহনলাল চৌধুরী (ভদ্রেশ্বর হুগলী)

উত্তর : আপনার আঁকা সুন্দর ছবির জন্যে ধন্যবাদ। না, ওভাবে বল করলে নো বল হবে না। কয়েকটি সংখ্যা আগে নো বলের আর কি ঠিক বলের সময় পায়ের কি অবস্থা থাকে—সে বিষয়ে ছবি দিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। আশা করি আপনি তা দেখে থাকবেন।

অসীমকুমার চট্টোপাধ্যায় (চন্দননগর বয়েজ স্পোর্টিং ক্লাব, চন্দননগর, হুগলী)

উত্তর : আপনার সমালোচনামূলক চিঠির জন্যে প্রথমেই আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। কিন্তু মুস্কিল হয়েছে সীমিত পরিসর নিয়ে। জায়গা অল্প থাকার জন্যে সব সময় সব প্রশ্নগুলোর সবটাই ছাপা যায় না—মোটামুটিভাবে সংক্ষেপে ছাপা হয়—তাই অনেক সময় একটু-আধটু অসুবিধে হয় বৈকি। প্রশ্নটা ছিলো ফিরতি বলটা হাত দিয়ে থামলে ব্যাটসম্যান 'হ্যান্ডেল দি বল' নিয়ম অনুসারে আউট হবে। আবার ব্যাট দিয়ে জোরে হিট করলে 'হিট দি বল টোয়াইজ' নিয়মের কবলে পড়ে ব্যাটসম্যান আউট হয়ে যাবে। তাহলে তার কি করা উচিত। এ ক্ষেত্রে সহজভাবে উইকেট বাঁচাতে হলে পা দিয়েই বলটা আটকানো বা কিক করা যেতে পারে। অবশ্য ব্যাট দিয়েও বলটা শুধু থামানো চলতে পারে। নিয়ম মতো হাত বাদ দিয়ে দেহের যে কোন অংশ দিয়েই বল থামানো চলতে পারে। কিন্তু তাই বলে কি তাড়াতাড়ির সময় শুয়ে পড়ে কিম্বা হাটু দিয়ে বা অন্য কোনভাবে বল থামানো সম্ভব?

পরিশেষে এই বিভাগটির ওপর আপনার আগ্রহের জন্যে আপনাকে আবার ধন্যবাদ জানাই।

আপনি পাইতে পারেন

সামবায়িক ভিত্তিতে মাত্র ২০৲ টাকায় ৩৩০৲ টাকা মূল্যের ৩ ব্যান্ড অল ওয়ার্ল্ড পোর্টেবল ট্রানজিস্টার পাইবেন।

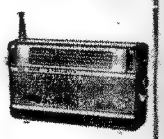

আবেদন করুন :
Ceylon Traders (WBC—22)
P. Box 1257, Delhi—6.

স্মরণীয় স্মৃতি

পরিচীয়তে

আজ থেকে কয়েক বছর আগের কথা। স্কুলের গণ্ডী পেরিয়ে সবে তখন ঢুকেছি কলেজে ঢুকেছি আমরা। স্কুলের ধরা-বাঁধা নিয়মের পর কলেজের খোলামেলা ভাব বেশ ভালোই লাগে। কিন্তু আমাদের কলেজ ছিলো স্কুলের চেয়ে এক কাঠি ওপরে। তবু কলেজ কলেজই। আর যাই হোক ক্লাসে যাওয়া না যাওয়ার স্বাধীনতা তো আমাদের হাতেই ছিলো।

সেবার আমাদের এন সি সি ক্যাম্প পড়েছিলো হাবড়ার বাণীপুরে। স্যোসাল সার্ভিস ক্যাম্প। কিন্তু ঐ ক্যাম্পের শেষ ভাগেই শুরু হচ্ছিলো কলকাতার ভারত বনাম ওয়েস্ট ইন্ডিজের টেস্ট ম্যাচ। তাই আমি ঠিক করেছিলাম যে সেবার আর ক্যাম্পে যাবো না!

কিন্তু ছাড়লেন না আমাদের বাংলার অধ্যাপক আর এন সি সি অফিসার শ্রীবাবুরাম বন্দ্যোপাধ্যায়। আমাকে ক্যাম্পে যেতে হলো। যাবার আগে স্যারকে বলে রাখলাম যে কলকাতায় খেলার আগের দিন আমি ক্যাম্প থেকে চলে যাবো। ফিরে আসবো পরদিন রাত্তিরে। প্রথম দিনের খেলা দেখতেই হবে।

তারপর যথারীতি খেলার আগের দিন 'টেলিগ্রাম' এলো—কাম শার্প। টেলিগ্রাম দেখে স্যার হাসলেন। আমাদের প্লাটুনের সবাই ব্যাপারটা জানতো। তাই সবাইকে জানিয়ে-টানিয়ে দুপুর গড়িয়ে বিকেল হতে না হতেই আমি বেরিয়ে পড়লাম।

ভাগ্যিস গিয়েছিলাম!

না গেলে যে সেদিন কি হারাতাম তা শুধু আমিই জানি। আজো সেদিনের সেই স্মৃতি মনের মণিকোঠায় উজ্জ্বল। আহা, কি খেলাই না দেখেছিলাম সেদিন। বোধহয় জন্ম-জন্মান্তরেও ভুলবো না।

সেদিন দেখেছিলাম ওয়েস্ট ইন্ডিজের এক তরুণ ব্যাটসম্যানের নয়নাভিরাম রূপ। দেখেছিলাম আত্মবিশ্বাসে ভরপুর এক নিপুণ শিল্পীর অতুলনীয় উদ্যম। কি সে খেলা! ভারতের বোলার আর ফিল্ডার-দের অসহায় করে তুলে উচ্ছ্বসিত উচ্ছ্বাসে শুধু রানের পর রান সংগ্রহ করে চলেছেন তিনি।

তাঁর প্রতিটি মারে অভিজ্ঞতার ছাপ! দীপ্ত ভঙ্গিমায় এক অসাধারণ যোদ্ধার মতো প্রতিটি মুহূর্তকে যেন সুদে আসলে আদায় করে নিচ্ছেন।

সেদিন কানহাইকে আমার তুলনা করতে ইচ্ছে করেছিলো রণাঙ্গনের বীর

রোহন কানহাই

সেনাপতি রোমেলের সংগে। রোমেল পরাজয় জানতেন না, পরাজয় মানতেন না। কানহাই-ও যেন ঠিক তাই। অপ্রতি-দ্বন্দ্বী অদ্ভুত এক পুরুষসিংহ। তাই বোধহয় সেদিন কানহাই-এর নৃত্যছন্দে ইডেন উদ্যান ছন্দায়িত হয়ে উঠেছিলো।

আমি যে এতোটুকুও বাড়িয়ে লিখছি না তার প্রমাণ দিতে পারেন শুধু তাঁরাই, যাঁরা সেদিন উপস্থিত ছিলেন ইডেন উদ্যানে। তাঁরা কেউ কোন দিনই ভুলতে পারবেন না কানহাই-এর সেই ২৫৬ রানের কথা। ওয়েস্ট ইন্ডিজ সেই ইনিংসে ৫টি উইকেট হারিয়ে করেছিলো ৬১৪ রান।

সেদিনের সেই তরুণ কানহাই-এর বয়েস তো আজ আর কম হলো না। দেখতে দেখতে কেটে গেলো অনেক বছর। তেত্রিশ বছর চলছে এখন কানহাই-এর। জন্ম ১৯৩৫ সালের ২৬শে ডিসেম্বর।

কানহাই ওয়েস্ট ইন্ডিজের খেলোয়াড় হলে কি হবে—তিনি ভারতীয়ই। যতদূর মনে পড়ছে কানহাই-এর ঠাকুরদাই ভারত ছেড়ে ওয়েস্ট ইন্ডিজে গিয়ে সেখানেই বসবাস করতে আরম্ভ করেছিলেন। ওয়েস্ট ইন্ডিজের আর এক কৃতী খেলোয়াড় রামাধীনের মতো কানহাইও তাই ভারতীয়।

ওয়েস্ট ইন্ডিজের ছোট ছেলেদের সংগে ক্রিকেট খেলা শুরু করে কানহাই দেখতে দেখতে এসে গেলেন বড়দের আসরে। আন্তঃদ্বীপ প্রতিযোগিতায় সাফল্য লাভ করার পর কানহাই মনোনীত হলেন ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের পক্ষে খেলার জন্যে! তারপর দেখতে দেখতে ওয়েস্ট ইন্ডিজের পরম নির্ভরযোগ্য খেলোয়াড় হিসেবে ছড়িয়ে পড়লো কানহাই-এর নাম!

ক্রিকেট বিশ্বে ওয়েস্ট ইন্ডিজের নাম বিশেষভাবে ছড়িয়ে পড়েছিলো আজ থেকে বছর এগারো আগে ১৯৫৭ সালে। আর তারপর থেকে আজ পর্যন্ত কানহাই-এর নাম ভুলে থাকার এতোটুকুও উপায় নেই!

বেশি দূরে যেতে হবে না! এ বছরের ইংলণ্ড-ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের খেলার কথাই ধরা যাক। ইংলণ্ড এবার 'রাবার' লাভ করেছে ঠিকই। কিন্তু তারা হাড়ে হাড়ে চিনে গেছে ওয়েস্ট ইন্ডিজের দুজন খেলোয়াড়কে। একজন দলনায়ক সোবার্স আর একজন হলেন শান্তশিষ্ট নিরীহ গোছের চেহারার রোহন কানহাই।

কানহাই-এর পরিচয় আর নতুন করে দেবার কোন প্রয়োজন নেই! মনে আছে শুধু একটি আশা—আবার আমরা কবে কানহাই-এর খেলা দেখতে পাবো......?

সম্পাদিকা—জয়ন্তী সেন

বসুমতী (প্রাঃ) লিঃ-এর পক্ষে ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীটস্থ কলিকাতা-১২

বসুমতী প্রেস হইতে শ্রীসুকুমার গুহমজুমদার কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বসুমতীর কালজয়ী গ্রন্থরাজি

॥ গ্রন্থনসৌষ্ঠবে নয়নাভিরাম ॥

কালিদাস গ্রন্থাবলী— ১ম ৬-০০
কালিদাস গ্রন্থাবলী— ২য় (যন্ত্রস্থ) ৬-০০
কালিদাস গ্রন্থাবলী— ৩য় ৮-০০
মাইকেল গ্রন্থাবলী— ১ম ৪-৫০
মাইকেল গ্রন্থাবলী— ২য় ৩-৫০
বঙ্কিম গ্রন্থাবলী (উপন্যাস)—১ম ৪-৫০
বঙ্কিম গ্রন্থাবলী (উপন্যাস)—২য় ৪-৫০
বঙ্কিম গ্রন্থাবলী (উপন্যাস)—৩য় ৪-৫০
বঙ্কিম গ্রন্থাবলী (সাহিত্য)—১ম ৩-০০
বঙ্কিম গ্রন্থাবলী (সাহিত্য)—২য় ৪-৫০
বঙ্কিম গ্রন্থাবলী (সাহিত্য)—৩য় ৪-৫০
দ্বিজেন্দ্রলাল গ্রন্থাবলী— ১ম ৬-০০
" " ২য় ৬-০০
" " ৩য় ৮-০০
সেক্সপীয়র গ্রন্থাবলী—১ম খণ্ড ৪-৫০
সেক্সপীয়র গ্রন্থাবলী—২য় খণ্ড ৪-৫০
ত্রৈলোক্য গ্রন্থাবলী— ১ম ৩-০০
ত্রৈলোক্য গ্রন্থাবলী— ২য় ৩-০০
দীনবন্ধু মিত্র গ্রন্থাবলী— ১ম ৩-০০
মানিক গ্রন্থাবলী— ১ম ৩-০০
মানিক গ্রন্থাবলী— ২য় ৩-০০
দামোদর গ্রন্থাবলী— ১ম ৩-৩০
দামোদর গ্রন্থাবলী— ৪র্থ ৪-০০
অমৃতলাল গ্রন্থাবলী— ১ম ৩-০০
অমৃতলাল গ্রন্থাবলী— ২য় ৪-০০
অমৃতলাল গ্রন্থাবলী— ৩য় ৪-০০
যোগেশ গ্রন্থাবলী— ২য় ৩-০০
বিহারীলাল গ্রন্থাবলী— ৩-০০
রঙ্গলাল গ্রন্থাবলী— ৩-০০
উপেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় গ্রন্থাবলী— ৩-০০
রামপ্রসাদ সেন গ্রন্থাবলী— ৩-০০
হরপ্রসাদ শাস্ত্রী গ্রন্থাবলী— ৫-০০
ঈশ্বরগুপ্তের গ্রন্থা:—১ম ও ২য় খণ্ড ৫-০০
ভারতচন্দ্র গ্রন্থাবলী— ৩-০০
স্কট গ্রন্থাবলী— ২য় ৩-০০
স্কট গ্রন্থাবলী— ৩য় ৩-০০

দীনেন্দ্র রায় গ্রন্থাবলী— ১ম ৪-৫০
দীনেন্দ্র রায় গ্রন্থাবলী— ২য় ৪-৫০
নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ের গ্রন্থা:— ৪-০০
প্রভাবতী দেবী গ্রন্থাবলী— ৩-৫০
বিভূতিভূষণ মুখো: গ্রন্থাবলী— ৪-৫০
রামনাথ বিশ্বাস গ্রন্থাবলী— ৩-৫০
শৈলজা গ্রন্থাবলী— ১ম ৩-৫০
শৈলজা গ্রন্থাবলী— ২য় ৩-৫০
মণিলাল বন্দ্যো: গ্রন্থা:—১ম ৩-৫০
মণিলাল বন্দ্যো: গ্রন্থা:—২য় ৩-৫০
অসমঞ্জ গ্রন্থাবলী— ৪-০০
সৎসাহিত্য গ্রন্থাবলী— ১ম ৪-০০
সৎসাহিত্য গ্রন্থাবলী— ২য় ৪-০০
সৎসাহিত্য গ্রন্থাবলী— ৩য় ৪-০০
সৎসাহিত্য গ্রন্থাবলী— ৪র্থ ৩-০০
রামপদ মুখার্জী গ্রন্থাবলী— ৪-০০
হেমেন্দ্র রায় গ্রন্থাবলী— ৬-০০
মতিলাল দাসের গ্রন্থাবলী— ৩-০০
জগদীশ গুপ্তের গ্রন্থাবলী— ৩-৫০
বিভূতিভূষণ ভট্টের গ্রন্থাবলী— ৩-৫০
শচীশ চট্টো: গ্রন্থা:—২য় ভাগ ৩-০০
সৌরীন্দ্রমোহন মুখো: গ্রন্থা:—৩য় ৩-০০
সৌরীন্দ্রমোহন মুখো: গ্রন্থা:—৫ম ৩-০০
বিদ্যাসুন্দর গ্রন্থাবলী— ৫-০০
কথাসরিৎসাগর—১ম ভাগ ৪-০০
কথাসরিৎসাগর—২য় ভাগ ৪-০০
অরবিন্দ দত্তের গ্রন্থাবলী— ৩-০০
জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের গ্রন্থাবলী—
১ম, ২য়, ৩য়—প্রতি খণ্ড ৪-০০
ক্ষীরোদ গ্রন্থাবলী ২য় ও ৪র্থ হইতে
৮ম খণ্ড—প্রতি খণ্ড— ৩-৫০
ডিকেন্সের গ্রন্থাবলী—২য় ৪-০০
চারু বন্দ্যোপাধ্যায়ের গ্রন্থাবলী— ৪-০০
বিলাতী গুপ্তকথা—২য়ভাগ ৫-০০

নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের গ্রন্থাবলী—
১ম ও ২য় ভাগ—প্রতি ভাগ ৩-০০
নারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্যের গ্রন্থাবলী—
৩য় খণ্ড ও ৬ষ্ঠ খণ্ড—প্রতি খণ্ড ৩-০০
যোগেন্দ্র বিদ্যাভূষণের গ্রন্থাবলী—
২য় ভাগ ৩-০০
ভারতীয় সঙ্গীতের ইতিহাস—
গোপেশ্বর বন্দ্যো:—১ম ও ২য় ভাগ
প্রতি খণ্ড ৩-০০
কবিকঙ্কণ চণ্ডী— ৪-০০
জ্যোতিষ রত্নাকর— ৩-০০
পরলোক— ৪-০০
পরলোক রহস্য— ২-০০
পরলোক ও প্রেততত্ত্ব— ৪-০০
দৃশ্যকাব্য পরিচয়— ১০-০০
নাড়ীজ্ঞান প্রদীপিকা— ৩-০০
ভারত প্রতিভা— ৩-০০
সাধক কমলাকান্ত— ২-০০
মহারাজ নন্দকুমার— ৩-০০
ছত্রপতি শিবাজী— ৩-০০
জালিয়াৎ ক্লাইভ— ৩-০০
বিক্রমাদিত্য— ৩-০০
বিসমার্ক— ২-০০
সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তীর আত্মজীবনী— ৩-০০

যৌন-মনোদর্শন

২য় ভাগ : স্বয়ং রতি ৪-০০
৩য় ভাগ : কামাবেগের বিশ্লেষণ ৪-০০
৪র্থ ভাগ : প্রেম ও পীড়া ৪-০০
৫ম ভাগ : কামাবেগের নিয়ন্ত্র-
কালিকত্বের ব্যাপার সমূহ ৪-০০
৬ষ্ঠ ভাগ : রমণীর যৌন আবেগ ৪-০০
কুট্টনীমতম্ — ৪-০০
ANANDAMATH ৪-০০
(শ্রীঅরবিন্দ কর্তৃক ইংরেজী অনুবাদ)
DAVID HARE ৪-০০

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড ॥ ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলি-১২

Thursday, 2nd May, 1968 | SAPTAHIK BASUMATI | Regd. No. C71
Price : 30 Paise | Gram : "Basumati" | Phone : 34-7771, 72, 73, 74

'কুকমী' গুঁড়ো মশলা বাজারের সেরা !

কৃষ্ণ চন্দ্র দত্ত (স্পাইস) প্রাইভেট লি:

১২৫ বছরের ও অধিক প্রাচীন ও বর্তমানে মশলার বৃহত্তম প্রতিষ্ঠান

আড়তদারি আমদানি রপ্তানি পাইকারি খুচরা

সর্বাধিক বিক্রীত গুঁড়ো মশলা • নিজস্ব মিলে প্রস্তুত
পনের লক্ষ প্যাকেট মাসিক বিক্রয়

গ্রাম ঃ "স্পাইসমার্ট" মিল-কাশীপুর ফোন ঃ ৩৩-১২৩২, ৩৩-২৩৮১

২৩১নং ও ২৩৫নং মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড, পোস্তা, কলিকাতা-৭

সাপ্তাহিক বসুমতী

সমালোচনা-বোধ, সমালোচকের বোধি।

বর্ষঃ ৪৭শ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ২৬শে বৈশাখ, ১৩৭৫ বঙ্গাব্দ] OLDEST WEEKLY OF NORTH INDIA [72nd year, No. 47, 9th May, 1968

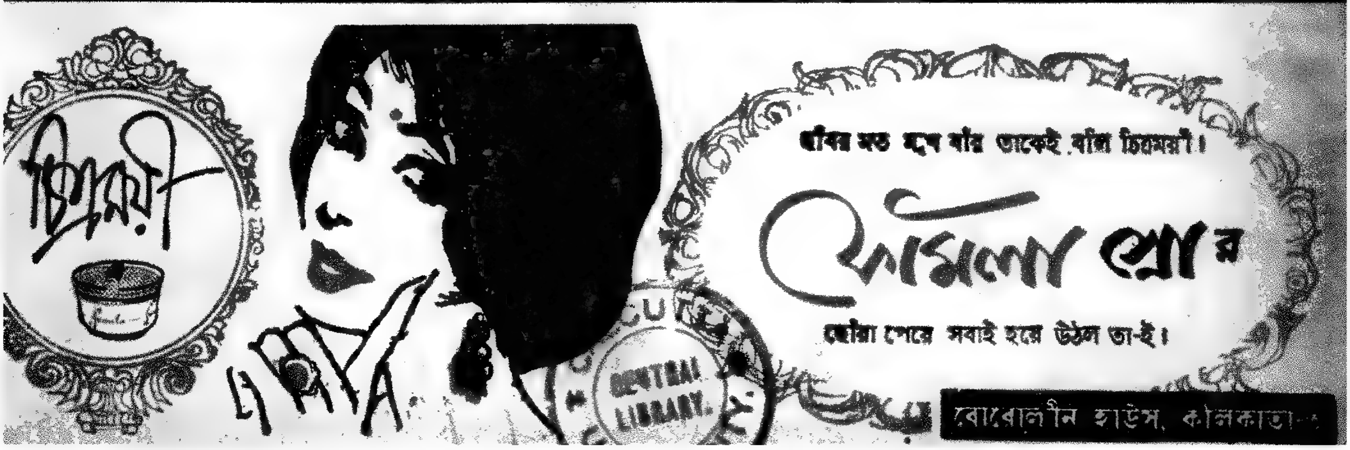

CENTRAL LIBRARY

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয়		২৯৪৭
সমালোচনার সমালোচনা (প্রবন্ধ)	চন্দ্রগুপ্ত	২৯৪৮
বাঙালী লেখক, সমালোচক ও পাঠক (প্রবন্ধ)	নীরদচন্দ্র চৌধুরী	২৯৫১
ইন্দ্রনাথের একটি চিন্তা (প্রবন্ধ)	নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়	২৯৫৭
জন্মোৎসবের ফলাফল (গল্প)	পরিমল গোস্বামী	২৯৬০
সোনার জহুরী (প্রবন্ধ)	অন্নদাশঙ্কর রায়	২৯৬৪
আজকালকার ছেলেমেয়ে (প্রবন্ধ)	লীলা মজুমদার	২৯৬৬
ইতিহাস রচনার উপাদান ও পদ্ধতি (প্রবন্ধ)	নরেন্দ্র ভট্টাচার্য	২৯৬৮
ইংরেজি সাহিত্যে সমালোচনা (প্রবন্ধ)	জগন্নাথ চক্রবর্তী	২৯৭১
আধুনিক বাংলা সাহিত্য ও ঐতিহ্যবোধ (প্রবন্ধ)	নারায়ণ চৌধুরী	২৯৭৭
এই অন্ধকারে (প্রবন্ধ)	হরপ্রসাদ মিত্র	২৯৮০

এ. সরকার অ্যাণ্ড সন্স

সন অ্যাণ্ড গ্র্যাণ্ড সন্স অবলেট

এম. বি. সরকার

ট্র্যাডিশ্যনাল জুয়েলার্স

১৭১।১ এ, রাসবিহারী এভিন্যু

বালিগঞ্জ কলিকাতা-১৯

ফোন : ৪৬-৬২৫৮

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
সমালোচক রবীন্দ্রনাথ (প্রবন্ধ)	সুশীল রায়	২৯৮৩
স্বদেশ ও অস্বদেশ (প্রবন্ধ)	মৈত্রেয়ী দেবী	২৯৮৮
সংস্কৃত সাহিত্যে সমালোচনা (প্রবন্ধ)	কালীকুমার দত্ত	২৯৯১
সমালোচিত রবীন্দ্রনাথ (প্রবন্ধ)	আদিত্য ওহদেদার	২৯৯৭
সংবাদপত্র, স্বাধীনতা ও আমরা (প্রবন্ধ)	নন্দগোপাল সেনগুপ্ত	৩০০১
শিল্প ও শিল্প সমালোচনা (প্রবন্ধ)	চিন্তামণি কর	৩০০৩
আকাশবাণী-পরিক্রমা (প্রবন্ধ)	মেঘদূত	৩০০৪
সঙ্গীত সমালোচনার সমালোচনা (প্রবন্ধ)	সুকুমার রায়	৩০০৫
সমালোচক ও সমালোচনার মান (প্রবন্ধ)	শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়	৩০০৭

আমাদের বই পাঠকের তৃপ্তি দেয় ঃ পাঠাগারের গৌরব বৃদ্ধি করে

৭ই চৈত্রের বই

ফণিভূষণ দেব-এর

পরলোক সমীক্ষণ ১০·০০

সদ্য প্রকাশিত গ্রন্থসমূহ ঃ

গজেন্দ্রকুমার মিত্রের উপন্যাস

শুভবিবাহ কথা ৩·০০

স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস

যখন তরঙ্গ ৭·০০

অপরাহ্নের আলো ৪·৫০

বনফুল-এর উপন্যাস

পক্ষীমিথুন ৪·০০

স্থাবর ৮·০০

আশাপূর্ণা দেবীর মহোত্তম সৃষ্টি

কাঁচ পুঁতি হীরে ৯·০০

সুনীলকুমার নাগ-এর

মনের আলোয় দেখা ৫·০০

কয়েকখানি উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ গ্রন্থ ঃ

নটসূর্য অহীন্দ্র চৌধুরীর

নিজেরে হারায়ে খুঁজি ২০·০০

[স্মরণীয় বিরাট আত্মজীবনী। বহু চিত্রশোভিত গ্রন্থ।]

ডঃ যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়ের

বিপ্লবী জীবনের স্মৃতি ১৫·০০

[বৃটিশ রাজত্বের অবসানকল্পে এদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের কঠোর সংগ্রামপূর্ণ দিনগুলির জ্বলন্ত ইতিহাস]

মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের

দক্ষিণের বারান্দা (২য় সং) **৪·৭৫**

[ঠাকুরবাড়ীর ইতিকাহিনী। শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথের দৌহিত্র এ গ্রন্থের রচয়িতা]

রাহুল সাংকৃত্যায়নের

নিষিদ্ধ দেশে সওয়া বৎসর ৫·০০

[তিব্বতের সামাজিক জীবনের পুঙ্খানুপুঙ্খ ইতিবৃত্ত। উপন্যাসের চেয়েও মনোরম]

হেমেন্দ্রকুমার রায়ের

সৌখিন নাট্যকলায় রবীন্দ্রনাথ ৩·৫০

বাছাইকরা ছোটদের জন্য কয়েকখানি বই ঃ

পদ্মশ্রী প্রেমেন্দ্র মিত্রের

চাঁদ তারা জোনাকারা ৩·৫০

[ছোটদের ছড়ার বই]

ঘনাদাকে ভোট দিন ৩·০০

সরোজকুমার রায়চৌধুরীর

রাজার কুমার ৩·০০

অরূপ-এর

জ্যান্ত ভূতের দল ২·৭৫

বনফুল-এর

রঙ্গনা ২·৫০

স্বপনবুড়োর

মজার গল্প ২·০০

হেমেন্দ্রকুমার রায়ের

হে ইতিহাস গল্প বলো ২·৫০

ইংরেজদের যেমন শেক্সপীয়র, আমাদের তেমনি কালিদাস। কালিদাসের ৩খানি নাটক ও ৩খানি কাব্যকাহিনীর রসের ধারা বজায় ও উপমা অবিকৃত রেখে কিশোরের কালিদাস রচিত। স্বাভাবিকভাবেই অই-চার্লস্ ল্যাম্বের টেলস্ ফ্রম শেক্সপীয়র-কে মনে পড়িয়ে দেয়— কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের

কিশোরের কালিদাস ৪·০০

ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোম্পানী প্রাইভেট লিঃ

গ্রাম ঃ কালচার (বি) — ৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা—৭ — ফোন ঃ ৩৪-২৬৪১

রবীন্দ্র-জন্মদিবসে

দিন আসে, দিন যায়। এরই মধ্যে একটি দিন পঁচিশে বৈশাখ। এ দিনটি আসে, আবার যায়। তবু এ দিনের ভাষা আলাদা, ব্যঞ্জনা ভিন্নতর। জীবনকে আনন্দিত করার বাণী ছড়িয়ে দেয় নীল আকাশের তলে। সেই বাণী অনন্তের, শাশ্বত কালের।

বর্তমান কাল যেমন কঠোর, তেমনি কর্মময়। মানুষ আত্মমগ্ন কিন্তু স্বার্থ-শূন্য নয়! সেজন্যে মনুষ্যত্বের বিকাশ যে পূর্ণতায়, তার সাধনা অসম্পূর্ণ।

রবীন্দ্রনাথের সাধনা সম্পূর্ণতার সাধনা। 'আমার জীবনে লভিয়া জীবন জাগো রে সকল দেশ'—তার প্রতি আমাদের অনুরাগহীন উচ্ছ্বাস। রবীন্দ্র-জন্মদিবস সাড়ম্বরে পালন করা হয়, বাহ্যিক ত্রুটি-বিচ্যুতির লেশমাত্র থাকে না, মনের ভ্রান্তিও মনে হয় প্রকট। শুধু কবির জিজ্ঞাসার উত্তর দেবার থাকে না একটুও চেষ্টা। তাঁর সঙ্গীতের সুরেই ক্ষণমুগ্ধ, বাণীর মধ্যে প্রবেশ করার নেই সামর্থ্য। বাইরে ভক্তিগদগদ হলেই জীবন-সত্যকে উপলব্ধি করা যায়-না। তাই রবীন্দ্র-জন্মদিবসকে কেন্দ্র করে অনুষ্ঠিত অধিকাংশ সভামঞ্চ এক মুহূর্তমাত্র ধূপ-গন্ধে সুরভিত হলেও পর মুহূর্তেই সংসারের চক্রাবর্তে রসাস্বাদহীন জীবনের ছদ্ম অভিনয় প্রকাশ করে তোলে। অথচ এক পঁচিশে বৈশাখে রবীন্দ্রনাথের নির্দেশিত পথে এগিয়ে যাবার যে প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করা হয়—আর এক পঁচিশে বৈশাখে সে প্রতিশ্রুতি কতটা পালন করা হল—তা যাচাই করার কথাই প্রায় সকলে বিস্মৃত হয়।

না হয় স্বীকার করা গেল, সাধারণ মানুষ দিনযাপনের গ্লানিতেই ব্যস্ত। সুতরাং সাহিত্যের সত্যকে গ্রহণ করার মত সময় বা শক্তি তাদের অত্যন্ত স্বল্প। কিন্তু রবীন্দ্র-চিন্তাকে তাদের মধ্যে সঞ্চারিত করে তোলার জন্য কতটুকুই বা চেষ্টা হয়েছে? আলো ঝলসিত শহরে কিছু তথাকথিত ভদ্রব্যক্তির জন্যেই কি রবীন্দ্রনাথের সমগ্র সৃষ্টি? রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন গ্রামের মানুষের কথা, পল্লী-বাংলার উন্নতিকল্পে বাস্তবধর্মী সংবিধান; দুর্ভাগ্যের হলেও একথা সত্য যে, গ্রামের নিরক্ষর অশিক্ষিত মানুষের কাছে রবীন্দ্রনাথের নামও আজও পৌঁছায় নি। বিশ্ব-সভায় রবীন্দ্রনাথ সুপ্রতিষ্ঠিত, শহর কিংবা গ্রামের কিছু শিক্ষিত লোক সেই ধারণার বশবর্তী থেকে কিছু সঙ্গীতের রেওয়াজ করলেই—'মোর নাম এই বলে খ্যাত হোক, আমি তোমাদেরই লোক' রবীন্দ্রনাথের প্রতি সম্মান জানানো হয় না। তাই মনে হয়, রবীন্দ্রনাথকে যারা সত্যিকারের শ্রদ্ধা করে ও ভালবাসে—তারা অযত্নের বাধা সরিয়ে তাঁকে সর্বত্র প্রকাশমান করবে। রবীন্দ্রনাথ পূর্ণতা লাভের যে পথ নির্দেশ করে গেছেন, সমস্ত মানুষের চিত্তে সেই বোধের উদ্বোধন ঘটানো হবে অবশ্য-করণীয় কাজ।

কিন্তু আমরা কি করছি, কোন্ পথেই বা যাচ্ছি? রবীন্দ্রনাথের পর একেবারে হালের সাহিত্য, শিল্প, সংস্কৃতি থেকে সাধারণ মানুষ কি পাচ্ছে?

যখন মানুষ যুগ-জটিলতার আবর্তে অন্ধকারে হাতড়িয়ে বেড়াচ্ছে, সেই অন্ধকার থেকে তাকে কে নিয়ে যাবে আলোর তীর্থে? স্বভাবত মানুষ স্বার্থপর ও কূপমণ্ডুক—একথা ভাবার কারণ নেই। যুগ-চক্রে খণ্ড-বিখণ্ড মানুষের আশা-আহ্লাদ-আনন্দ। নৈরাশ্য, তাই, দিগন্ত-ব্যাপী বিস্তৃত। সাধারণ অশিক্ষিত মনুষ্যের পক্ষে সম্ভব নয়—এ অবস্থায় চৈতন্যের বিস্তৃতি। অবশ্য এমন কোনো যুগ নেই, যে যুগে স্বার্থপরতার কুটিল ভেদাভেদ ছিল না। তবু তখন ছিল শিল্পী-সাহিত্যিকের উন্মুক্ত চিন্তার উদার বিস্তার। তারই ফলে এসেছে সমাজে সংযম, মনুষ্যত্বের স্বীকৃতি, সুড়ঙ্গপথ অতিক্রম করে বিশাল ভালবাসার সবজনীনতা হয়েছে 'স্বার্থের সমাপ্তি অপনাতে'। একদিকে সৃষ্টি—আর একদিকে মানুষ। সে মানুষ অমানুষ নয়—দৃষ্টিরই দর্পণে সে দেখতে পায় আপনার কল্যাণময় মুখ।

একালের শিল্প ও সাহিত্য জগৎ ও জীবন এবং মনোজিজ্ঞাসা কিভাবে রূপায়িত হচ্ছে, তার বিশ্লেষণ প্রয়োজন। সাধারণ পাঠককে তা কিছুটা সাহায্য করতে পারে। কিন্তু সমালোচকের সব বিশ্লেষণই কি নিরপেক্ষ? নিরাসক্ত দৃষ্টির দ্বারা তিনি কি চালিত হতে পারেন? অথচ বাংলা সাহিত্যের সমালোচনা একদা সাহিত্য সৃষ্টির যেমন সহায়ক হয়েছে, তেমনি সাধারণ পাঠকদেরও প্রভূত সাহায্য করেছে। বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, মোহিতলাল সেক্ষেত্রে আমাদের পথপ্রদর্শক।

বস্তুত সমালোচনা যে কম মূল্যবান নয়, সে কথা স্মরণে রেখেই বর্তমান সংখ্যাটির অধিকাংশ লেখাই হল সমালোচনার সমালোচনা। পরস্পর আক্রমণ নয়, রবীন্দ্র-জন্মদিবস উপলক্ষে নিজেদের এবং নিজেদের সৃষ্ট সম্পদকে যথার্থভাবে জানার জন্যে এ ধরণের আলোচনার বিশেষ প্রয়োজন আছে, আশা করি, এ বিষয়ে সকলেই একমত হবেন।

সমালোচনার সমালোচনা

চন্দ্রগুপ্ত

জীবনানন্দ বলেছিলেন, সবাই কবি নয় কেউ কেউ কবি। আমি বলি, সবাই সমালোচক নয় কেউ কেউ সমালোচক। সঙ্গীতজ্ঞ কবি চিত্রী প্রভৃতি মহৎ শিল্পের স্রষ্টারা সমালোচককে যতই তির্যক চোখে দেখুন না কেন, সার্থক সমালোচক স্রষ্টা-শিল্পীর সমান পংক্তিতে বসার যোগ্য বলে আমার বিনীত ধারণা। অন্তত এ মুহূর্তে চন্দ্রগুপ্ত অধ্যাপক ম্যাকেইলকে সাক্ষী মানতে পারেন, যাঁর মতে সমালোচনার ক্ষমতা ও সৃষ্টিশক্তি সমগোত্রীয়—The critical faculty is akin to the creative faculty of the artist. আর আর্নল্ড এলিয়ট বঙ্কিম রবীন্দ্রনাথের মতো একাধারে মহৎ স্রষ্টা ও সার্থক সমালোচকের সাক্ষাৎ পাওয়াতে এ সিদ্ধান্ত প্রায় অনিবার্য, সমালোচনা সৃষ্টিশীল শিল্পকর্মের অন্যতম এবং কাব্যরচনা বা চিত্রাঙ্কন জাতীয় সুকুমারশিল্পের মতোই দুরূহ ও দুশ্চর সাধনাসাপেক্ষ।

কিন্তু এই সাধনার ধারপাশ দিয়ে যান খুব কম সমালোচক। অধিকাংশ সমালোচকের মূলধন পল্লবগ্রাহিতা। তাৎপর্যহীন কয়েকটি শব্দ বা Jargon-এর সাহায্যে চমকপ্রদ হওয়ার ও পাণ্ডিত্য প্রমাণের চেষ্টাতে যাঁদের উদ্যম নিঃশেষিত তাঁরা আর যাই হোন সমালোচক নন। বন্ধুত্ব বা শত্রুতা, দলীয়তা, চলতি হাওয়ার অনুসরণ, আত্মস্বার্থচিন্তা প্রভৃতি শিল্পবহির্ভূত বিষয়গুলি যখন সৃষ্টিশীল শিল্পের সমালোচনায় প্রেরণারূপে কাজ করে, তখনই সমালোচনার অপমৃত্যু ঘটে। কিংবা অন্যভাবে বলা যায়, সমালোচনার জন্মই অসম্ভব হয়ে ওঠে। বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সময়ে অগণ্য ছদ্মসমালোচকরা সৃষ্টিশীল শিল্পীদের মনোবেদনার ও ক্ষোভের কারণ হয়েছেন। এই সমালোচকদের অনেকে স্ব স্ব যুগে প্রতিপত্তি বিস্তার করলেও শেষ পর্যন্ত অখণ্ড কালের হাতে তাঁদের অপমৃত্যু ঘটেছে, অন্যপক্ষে তাঁদের অবহেলিত অনাদৃত সৃষ্টিশীল শিল্পীরা মৃত্যুঞ্জয়রূপে দেখা দিয়েছেন। কীটসের বিরূপ সমালোচকদের নাম আজ গবেষণার বিষয়, কীটস আজও অসংখ্য মানুষের হৃদয় অধিকার করে আছেন।

*

সমালোচকের প্রাথমিক ও আবশ্যিক গুণ সহৃদয়-হৃদয়-সংবেদনা, সমালোচ্য শিল্পীর সৃষ্টিশীল চিত্তের সঙ্গে একাত্ম হওয়ার ক্ষমতা। এই হিসাবে সমালোচকও সৃষ্টিশীল শিল্পী। অর্থাৎ যিনি কাব্য-সমালোচক তিনি ইচ্ছা করলে কবিতা লিখতে পারেন বা পারতেন, যিনি সঙ্গীত-সমালোচক সঙ্গীতশিল্পীর ক্ষমতা তাঁর আয়ত্তাধীন (একটি চীনে প্রবাদ মনে পড়ছে : সে-ই যথাযথ বাঘের ছবি আঁকতে পারে, যার মধ্যে বাঘ হবার শক্তি বিদ্যমান)। সমালোচকের দ্বিতীয় গুণ তথ্যনিষ্ঠা, যে তথ্যনিষ্ঠাকে টি এস এলিয়ট বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ মনে করেন।[১] অর্থাৎ সমালোচককে পরিশ্রমী ও অধ্যবসায়ী হতে হবে। তৃতীয় এবং সর্বশেষ, যেহেতু সমালোচনা শেষ পর্যন্ত মূল্যায়নবিশেষ, অন্তত একালের সমালোচনা, চিন্তাশীলতা ও বিদ্যাবত্তা সমালোচকের প্রধান সম্পদ বলে পরিগণ্য। কোনো শিল্প সৃষ্টি সম্পর্কে ভালো-মন্দ উচ্চারণ করার আগে সৎ সমালোচককে রীতিমতো ভাবতে হয়, অনুরূপ আর-দশটা শিল্পকর্মের সঙ্গে তুলনামূলক বিচার করতে হয়। এই তুলনামূলক বিচারের সময় আবার যুগ সমাজ ব্যক্তিমানস রুচি ইত্যাদির প্রশ্ন এসে পড়ে। স্থিতধী সমালোচক মনে মনে এই সমস্ত প্রশ্নের সমাধান করে তাঁর অধীত শিল্পকৃতি সম্পর্কে আন্তরিক রায় দেন।

অতএব দেখা যাচ্ছে, সমালোচনা-কর্ম আপাতদৃষ্টিতে যত সহজ, প্রকৃতপক্ষে তত দুরূহ। বিভিন্ন উপাদানকে সংশ্লেষণ করে শিল্পী তাঁর চিন্তা-কল্পনাকে মূর্তিত করেন, সমালোচক সেই রূপ-প্রমূর্তির উপাদানগুলিকে বিশ্লিষ্ট করে প্রত্যেকটি অংশের স্বতন্ত্র বিচার করেন এবং পুনর্বার অংশগুলিকে শিল্পীসুলভ পদ্ধতিতে সংশ্লিষ্ট করে অধীত সৃষ্টির বিচারে প্রবৃত্ত হন। এইজন্যই বলেছি, সার্থক সমালোচকের স্থান সৃষ্টিশীল শিল্পীর আসনের সন্নিকট। শিল্পস্রষ্টা ও সৎ সমালোচক লক্ষ্যে-কর্মে-আদর্শে সমগোত্রীয় এবং এইজন্যই ম্যাথু আর্নল্ড, টি এস এলিয়ট, এজরা পাউন্ড, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, প্রমথ চৌধুরী প্রমুখ দেশী-বিদেশী লেখকদের অনেকে একাধারে সাহিত্যিক ও সাহিত্যসমালোচক।

*

সমালোচনা কি? সাহিত্য চিত্র সঙ্গীত ইত্যাদি শিল্পকর্মের সম্যক আলোচনা, অর্থাৎ শিল্পকর্মবিশেষের গুণ-দোষ বিচারের সরস ও বিস্তৃত আলোচনাই সমালোচনা। সমালোচনা কেন? কোনটি সুরচনা কোনটি কুরচনা তা বুঝিয়ে দেবার জন্য সমালোচকের প্রয়োজন অবশ্যস্বীকার্য। এজরা পাউন্ডও একই সুরে সমালোচনাকে 'ঝাড়াই-বাছাই'র কাজ হিসাবে বর্ণনা করে বলেছেন : Excernment. The general ordering and weeding out of what has actually been performed.....the ordering of knowledge so that the next man (or generation) can most readily find the live part of it, and waste the least possible time among obsolete issues. এই ঝাড়াই-বাছাই করতে গিয়ে সমালোচক অনেক অনাদৃত লেখক চিত্রশিল্পী ভাস্কর সঙ্গীতজ্ঞকে আবিষ্কার করেন, রসজ্ঞ সমাজকে তাঁদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। আবার প্রচার মাহাত্ম্যে অহেতুক বিখ্যাত জনকেও তিনি বিচার ক'রে দেখান, ভদ্রলোক প্রাপ্যের অতিরিক্ত পেয়েছেন।

*

সমালোচনা যদি হয় শিল্পসৃষ্টির মূল্যায়ন, সমালোচক যদি হন প্রতিভার আবিষ্কারক, তবে বাংলা দেশের হয়তো বা ভারতবর্ষের, সমালোচনা-সাহিত্য এখনও দুর্বল। বাংলা দেশে যথার্থ সাহিত্য-সমালোচনার সূত্রপাত বঙ্কিমচন্দ্র থেকে, তাঁর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত বা দীনবন্ধু মিত্র সংক্রান্ত আলোচনা সাহিত্য-সমালোচনার

---

১ খবরের কাগজে সাধারণত যে-ধরনের তথ্যবিশ্লিষ্ট স্বমতসর্বস্ব হামবড়া ভাসা ভাসা সমালোচনা প্রকাশিত হয় এলিয়ট তার তীব্র সমালোচনা করে বলেছেন : Any book any essay, any note in Notes and Queries which produces a fact even of the lowest order about a work of art is a better piece of work than nine-tenths of the most pretentions critical journalism in journals or in books.

ইতিহাস যেমন দেশ বা কালের সংকীর্ণ পরিধিতে আবদ্ধ থাকে না, তেমনি ইতিহাসের যাঁরা চিহ্নিত পুরুষ তাঁদেরও জীবন বা জীবনাদর্শ দেশ বা কালের সংকীর্ণ পরিধিতে আবদ্ধ থাকে না। পক্ষান্তরে, ইতিহাস-চিহ্নিত মহাপুরুষদের জীবনী যেমন রোমাঞ্চকর তেমনি কৌতূহলোদ্দীপক, অনেক ক্ষেত্রে তা প্রথম শ্রেণীর উপন্যাসের সমগোত্রীয়।

একটি মহৎমানুষের জীবন, জীবনদৃষ্টি—সবই তাঁর অনুভূতির সমষ্টিগত ফল, আর জীবনীকারের নিপুণ উপলব্ধির ভিতর দিয়ে ব্যাখ্যাত হয়ে, পরিশোধিত হয়ে সেই অনুভূতি যখন পাঠকচিত্তে সঞ্চারিত করে দেওয়া হয় তখনই তার প্রকৃত সার্থকতা।

রবীন্দ্রজন্মবার্ষিকী বাঙালির জীবনে নিয়ে আসে প্রাণোৎসবের প্রবাহ। এই প্রবাহের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে স্মরণ করা প্রয়োজন সার্থক বাঙালি মনীষীদের॥

আমাদের প্রকাশিত জীবনীগ্রন্থমালায় আমরা রবীন্দ্রজন্মবার্ষিকীর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করিঃ

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ॥ সুশীল রায়

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের লেখা কোনো বই বা আঁকা কোনো ছবি বর্তমানে অধিকাংশ বাঙালির দৃষ্টিগোচর নয়। অথচ আমরা বাঙালিরা শিল্প-সাহিত্যপ্রিয়তার জাঁক করি। লেখক হিসাবে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের প্রথম পরিচয় নাট্যকাররূপে, দ্বিতীয় পরিচয় অনুবাদকরূপে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের মৌলিক নাটক একদা অভিনয়ে খুব জমেছিল, বিশেষ করে 'সরোজিনী'। 'সরোজিনী' নাটক যাত্রাপালা হয়ে দেশে পল্লীঅঞ্চলে সমাদৃত হয়েছিল। এভাবে এতটা সমাদর আর কোনো বাঙালি নাট্যকারের রচনা—ক্ষীরোদপ্রসাদের 'আলিবাবা' ছাড়া—পায় নি।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের বিবিধ কর্মের এবং তাঁর উদ্যমের উদ্যোগের ও উৎসাহের কথা যাঁরা সামান্যমাত্রও জানেন তাঁদের কাছে তিনি একটি আশ্চর্য চরিত্র। যে চরিত্র এমন বিস্ময় সৃষ্টি করতে পারে তার পরিণাম যে এমন বিস্মৃতিতে সম্ভব—এও এক বিস্ময়।

সুশীল রায় তাঁর ঐকান্তিক নিষ্ঠার সাহায্যে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনচরিত রচনা করে বাঙালির ঋণ পরিশোধের পথ উন্মুক্ত করেছেন।

মূল্য : দশ টাকা

দুই মনীষী ॥ হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়

বিশিষ্ট বাঙালিদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দ উভয়েরই স্থান শীর্ষদেশে। বাঙালি তথা ভারতবাসী তাঁদের একান্ত আপনজন বলে দাবি করতে পেরে গৌরবান্বিত। উভয়েরই জন্মস্থান কলকাতার উত্তর অংশে। সুতরাং উভয়েই ছিলেন প্রতিবেশী। আরও একটা বড় যোগসূত্র হল, তাঁরা ছিলেন পরস্পরের সমকালীন। তাঁদের মধ্যে বয়সের ব্যবধান মাত্র দুই বৎসরের। এই দুই মনীষী প্রথম জীবনে বিভিন্ন পথে সম্পূর্ণ বিপরীত দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে সাধনা শুরু করলেও পরিণতিতে তাঁরা একই উপলব্ধিতে উপনীত হয়েছিলেন। মানবিকতার জয় ঘোষণায় উভয়ের কণ্ঠ সম্মিলিত হয়ে গিয়েছিল। লেখক তাঁর সুগভীর পাণ্ডিত্যের সাহায্যে এই দুই মনীষীর জীবনভাষ্য রচনা করেছেন গ্রন্থখানিতে।

মূল্য : ছয় টাকা

অন্যান্য জীবনীগ্রন্থ

পিতৃস্মৃতি ॥ রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৬·০০

পুণ্যস্মৃতি ॥ সীতাদেবী ১০·০০

রবীন্দ্র-বর্ষপঞ্জী ॥ প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ৪·০০

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ॥ মণি বাগচি ৪·৫০

রামমোহন ॥ মণি বাগচি ৫·০০

রমেশচন্দ্র ॥ মণি বাগচি ৫·০০

বিদ্যাসাগর ॥ নমিতা চক্রবর্তী ৬·০০

বঙ্কিমচন্দ্র ॥ মণি বাগচি ৬·০০

জিজ্ঞাসা ১৩৩এ, রাসবিহারী অ্যাভিনিউ, কলিকাতা ২৯
৩৩, কলেজ রো, কলিকাতা-৯

CALC… CENT… LIBR… UNIVE…

উৎকৃষ্ট উদাহরণ। বঙ্কিমচন্দ্রের পরেই উল্লেখযোগ্য রবীন্দ্রনাথ, সাহিত্য-সমালোচনাকে যিনি মহৎ শিল্পকর্মে রূপান্তরিত করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের সমালোচনা অনেকাংশে মন্ময়, কবির সংবেদন ও ভাবাবেগে অনুরঞ্জিত। রবীন্দ্রনাথের পর যে-দু-চারজন সাহিত্য-সমালোচক চন্দ্রগুপ্তের মতে উল্লেখের দাবি রাখেন তাঁরা—প্রমথ চৌধুরী, অতুলচন্দ্র গুপ্ত, সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, সুশীলচন্দ্র দে ও ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। ইদানীংকালে সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, অমিয় চক্রবর্তী, বিষ্ণু দে, বুদ্ধদেব বসু প্রমুখ সাহিত্যস্রষ্টাকে যখন মাঝে-মধ্যে সমালোচকরূপে আত্মপ্রকাশ করতে দেখি, তখন আশ্বস্ত বোধ করি এই ভেবে, এ দেশেও এলিয়ট-পাউন্ডের আদর্শ বাস্তবে অসম্ভব নয়। এবং সাম্প্রতিক সাহিত্য-সমালোচনা যদি কখনও কখনও পাঠযোগ্য হয়ে থাকে তা এঁদের ও এঁদের মতো সাহিত্য-স্রষ্টার লেখনীর দাক্ষিণ্যেই। সামগ্রিকভাবে বলতে গেলে বাংলা সাহিত্য-সমালোচনাকে যাঁরা সমৃদ্ধ করেছেন, তাঁরা মূলত কিংবা প্রধানত সাহিত্যশিল্পী। অ-সাহিত্যিক সমালোচকের সংখ্যা নগণ্য নয়, অন্তত একালে, কিন্তু শশিভূষণ দাশগুপ্ত (স্বর্গত দাশগুপ্ত অবশ্য কিছু কিছু সাহিত্যকর্মেরও নিদর্শন রেখে গেছেন) শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বা অমলেন্দু বসুর মতো দু-চারজনকে বাদ দিলে অধিকাংশ সমালোচক পাঠযোগ্য বিশেষ কিছু লেখেন নি। এর কারণ বোধ করি সমালোচক নামধেয় লেখকদের সহৃদয়-হৃদয়-সংবেদ্যতার অভাব, চিন্তার অপরিচ্ছন্নতা, পাণ্ডিত্যমন্যতা, চর্বিতচর্বণের অভ্যাস, রচনায় প্রসাদগুণের অনুপস্থিতি। পেশাবিশেষের প্রতি কটাক্ষ করছি না, অধ্যাপক হেতু সমালোচকদের মধ্যে এমন খুব কমই আছেন, যাঁরা ইচ্ছা করলে সৃষ্টিশীল লেখক হতে পারেন বা পারতেন। এবং যেহেতু সার্থক সমালোচনা শেষ পর্যন্ত সৃষ্টিশীল শিল্পকর্ম, সে কারণে আগে-অধ্যাপক-পরে-সমালোচক আর যাই হোক চিন্তাস্পর্শী সরস সমালোচনা সৃষ্টিতে অক্ষম। এই ধরণের সমালোচককেই জীবনানন্দ দাশ (যিনি স্বয়ং অধ্যাপক ছিলেন) সব্যঙ্গে 'ছায়াপিণ্ড' আখ্যা দিয়েছিলেন। আর টেনিসনের ক্রিস্টোফারও এই শ্রেণীর সমালোচকদের আদর্শ প্রতিনিধি।

সাপ্তাহিক বসুমতীর চাঁদার হার

সাপ্তাহিক বসুমতীর বাৎসরিক চাঁদা সডাক ১৮ টাকা, ষাণ্মাসিক ৯ টাকা ও ত্রৈমাসিক ৪·৫০ টাকা। প্রতি সংখ্যা ৩০ পঃ।

তিন মাসের কমে গ্রাহক করা হয় না। গ্রাহক হতে হলে আপিসে অগ্রিম টাকা জমা দিতে কিংবা মানি অর্ডারে টাকা পাঠাতে হবে।

—কর্মাধ্যক্ষ, বসুমতী

বাংলা দেশে সমালোচনার ক্ষেত্রে সাহিত্য বড় অংশ দখল ক'রে আছে আর সাহিত্য-আলোচনার মানই যখন এ দেশে পর্যাপ্ত উন্নত নয়, তখন চিত্র ভাস্কর্য ইত্যাদি অন্যান্য শিল্পের এবং ইতিহাস, অর্থনীতি, বিজ্ঞান, প্রভৃতি বিষয়ের আলোচনার প্রসঙ্গ না তোলাই ভালো। সাহিত্য-সমালোচনার ক্ষেত্রে কোন ব্র্যাডলী, রিচার্ডস, লীভিসকে আজও আমরা পাই নি, চিত্র ভাস্কর্য ইত্যাদি আলোচনার ক্ষেত্রে আপলনিয়ের, রাস্কিন, রীড এখনও অনুপস্থিত। বদলেয়ার স্টাইন কক্তোর মতো একাধারে সাহিত্যিক ও শিল্প-আলোচক এ দেশে কোটিকে গোটিক। রবীন্দ্রনাথ বা অবনীন্দ্রনাথ বা এ-কালে বিষ্ণু দের মতো দু-চারজনকে বাদ দিলে সকলেই স্ব স্ব ক্ষেত্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ, সীমার বাইরে পদার্পণ করার মতো সাহস ও বিচার-বুদ্ধি নেই। শিল্প-সমালোচনার ক্ষেত্রে শাহেদ সুরাবর্দী, অর্ধেন্দুকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, নন্দলাল বসু, বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় প্রমুখ দু-চারজনের নাম এ প্রসঙ্গে মনে পড়ে। শাহেদ সুরাবর্দীর রচনা মিতপরিমাণ, কিন্তু চন্দ্রগুপ্তের চোখে তিনি প্রথম সারির শিল্প-সমালোচক। এ তথ্য আজ অনেকে বিস্মৃত হয়েছেন, যামিনী রায় সম্পর্কে তিনিই প্রথম উল্লেখযোগ্য রসজ্ঞ আলোচনা করেন; এবং এক হিসাবে যামিনী রায়কে শ্রীসুরাবর্দীর আবিষ্কার বলা চলে।[১] সঙ্গীত নাটক চলচ্চিত্র প্রভৃতি অন্যান্য শিল্পবিষয়ক আলোচনার পরিমাণ স্বাভাবিক কারণে কিছু বেশি, কিন্তু এই সব আলোচনা পর্যাপ্ত তথ্যনিষ্ঠ নয়, চিন্তায় অগভীর ও অস্বচ্ছ এবং রচনারীতিতে কষ্টপাঠ্য। সংবাদপত্রে ও অন্যান্য বহুলপ্রচারিত পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত চলচ্চিত্র নাটক ইত্যাদির আলোচনা ইত্যাদিতে উপর্যুক্ত মন্তব্যের প্রমাণ মিলবে।

বাংলা দেশে সমালোচনার কেন এই দুরবস্থা? চন্দ্রগুপ্তের মতে অন্তত চারটি কারণ এই দুরবস্থার জন্য দায়ী। প্রথম, সমালোচকের সহৃদয়-হৃদয়-সংবেদ্যতা এবং মননশীলতার অভাব; দুই, প্রয়োজনীয় তথ্যনিষ্ঠার প্রতি সমালোচকের অনাগ্রহ, অন্যভাবে পরিশ্রম-বিমুখতা; তিন, বাঙালী সমালোচকের দলিতপন্থায় নিশ্চিন্ত ভ্রমণের অভ্যাস, অন্যভাবে সাহসের অভাব; এবং চতুর্থ, সমালোচ্য শিল্পসৃষ্টির আলোচনায় সৃষ্টিবহির্ভূত বিবিধ কারণের (যেমন সাহিত্যিক দলাদলি, রাজনীতি, আত্মস্বার্থসিদ্ধির বিভিন্ন উপায় চিন্তন ইত্যাদি) ভয়াবহ উপস্থিতি। এই সমস্ত কারণের সোনায় সোহাগার কাজ করছে সংবাদপত্র, বহুলপ্রচারিত সাহিত্যপত্র নামধেয় পত্র-পত্রিকা, বিভিন্ন সাহিত্যিকগোষ্ঠী, ধনপতিসমাজ (পারিক থিয়েটার ও সিনেমার ক্ষেত্রে এদের দুর্নীতিগর্ভ প্রভাব দুঃসহ) এবং অর্থগৃধ্নু অশিক্ষিত প্রকাশক (তথাকথিত অনেক সাহিত্যকার বিখ্যাত প্রকাশকও বটেন!)। আপাতত এমন প্রকাশক অঙ্গুলিগণ্য যিনি সুগ্রন্থ প্রকাশে আদৌ আগ্রহী। ফলত বাংলা ভাষায় সার্থক সমালোচনা বিরলদর্শন, সুখপাঠ্য বুদ্ধিগ্রাহ্য সমালোচনা স্বল্পপ্রচারিত সাহিত্য পত্রিকার (যাদের 'লিটল ম্যাগাজিন' বলা যায়) মধ্যেই সীমাবদ্ধ। সাম্প্রতিক বাংলা সমালোচনা হয় নির্জলা প্রশংসার উম্বারী উচ্ছ্বাস নতুবা অকারণ নিন্দার পঙ্কিল বিলাস। এ দুই ধরণের সমালোচনার মধ্যবর্তী এক জাতের সমালোচনা মাঝে-মধ্যে চোখে পড়ে, যাদের বক্তব্য চন্দ্রগুপ্তের মতো সাধারণ ব্যক্তির বুদ্ধির বহিঃপাতী। বাংলা সমালোচনা-সাহিত্যের সেকাল আর একালের তুলনামূলক আলোচনায় এক একসময় মনে হয়, সেকালের সমালোচনায় আর যারই অভাব থাকুক আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার ঘাটতি ছিল না। সমালোচক হয়তো অনেকক্ষেত্রে সমালোচ্য স্রষ্টাকে ভুল বুঝতেন কিন্তু স্বীয় বিচারবোধকে সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করার সাহস তাঁর ছিল। একালের সমালোচক স্বরব্রত উদ্‌যাপনের পূর্বে ব্যক্তিগত লাভ-ক্ষতির কথা বিশেষভাবে চিন্তা করেন। ফলত একালে যোগ্য সমালোচক অনেক সময়েই আত্মপ্রকাশে দ্বিধাগ্রস্ত, ব্যক্তিগত কারণে যথার্থ সমালোচনায় নিরস্ত হন, সাংসারিক বুদ্ধিতে পাকা হলে দলবিশেষের ক্যানেস্তারা হিসাবে আত্মনিয়োগ করেন। তবু অন্ধকার সমুদ্রে নিঃসঙ্গ লাইটহাউসের মতো দু-চারজন সৎ ও নির্ভীক সমালোচক অন্যান্য দেশের মতো বাংলা দেশেও ছিলেন, আছেন ও ভবিষ্যতেও থাকবেন। নির্বোধ বর্তমানের সাধারণ বাঙালীর পক্ষে এই আশাই একমাত্র অবলম্বন।

১ পরবর্তীকালে যামিনী রায় সম্পর্কে আরউইন ও বিষ্ণু দে সার্থক আলোচনা করেছেন।

বাঙালী লেখক, সমালোচক ও পাঠক

শ্রীনীরদচন্দ্র চৌধুরী

(১)

এই প্রবন্ধে যে-প্রশ্নটার আলোচনা করিতে যাইতেছি, রবীন্দ্রনাথের জন্মদিনে উহা উত্থাপন করিবার সার্থকতা আছে। প্রশ্নটা এই—বাংলাদেশে ও বাংলাভাষায় লিখিবার সার্থকতা আছে কি? অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ কবি না হইয়া জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবংশীয় জমিদার হইয়া থাকিলেই ভাল করিতেন কিনা? আমার বাল্যকালে তাঁহার জমিদারত্ব বড়, কি লেখকত্ব বড়, এ-বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ ছিল। একটি কেশতৈলের বিজ্ঞাপনে তখন পড়িয়াছিলাম, "জোড়াসাঁকোর বিখ্যাত জমিদার এবং কবি শ্রীযুক্ত বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেন", ইত্যাদি। সুতরাং মনে হয়, বেশীর ভাগ বাঙালীর যেন ধারণা ছিল, রবীন্দ্রনাথের জমিদারত্বই তাঁহার লেখকবৃত্তিকে আভিজাত্য দিয়াছে। সাংসারিক প্রতিষ্ঠা যে লেখাকে মর্য্যাদা দিতে পারে এই বিশ্বাস পরযুগেও বাংলাদেশে লোপ পায় নাই। তখন অবশ্য জমিদারির আর তেমন মান ছিল না, কিন্তু বাংলা সাহিত্যকে জাতে তুলিবার আর এক কষ্টি-পাথর বাহির হইয়াছিল, সেটা ইংরেজ সরকারের চাকুরী। একজন যুবক বাঙালী লেখকের নামের পিছনে 'আই-সি-এস্' বসাইয়া তাঁহার লেখার উপর কি শ্রদ্ধা কয়েকজন সম্পাদক জন্মাইয়াছিলেন, তাহার কথা আমার এখনও মনে আছে। এই জন্য আমার মাঝে মাঝে মনে হয়, 'সাপ্তাহিক বসুমতী'-সম্পাদিকা কি ভুল করিতেছেন। তিনি কেন নামের পিছনে 'আই-সি-এস'-কন্যা ও 'ব্যারিস্টার-পত্নী' বসান না? যে দেশে সাংসারিক প্রতিষ্ঠার সহিত সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠার এই সম্পর্ক, সেখানে লেখক হইবার কোনও সার্থকতা আছে কি?

এই প্রশ্ন তুলিলে বা পূর্ব্বপক্ষ করিলে, তখনই উত্তরপক্ষ হইবে—প্রশ্নটা অর্থহীন, সার্থকতা সব সময়েই আছে—লিখিয়া ও লেখা প্রকাশ করিয়া লোকে বাংলাদেশে অল্পবিস্তর পয়সা উপার্জন করিয়া থাকে; সুতসই (ইহার অর্থ বলিয়া দিব না, সকলেই অনুমান করিতে পারিবেন) লেখা লিখিতে পারিলে বাড়ী তুলিবার মত পয়সাও হয়; এক ধরণের নাম এবং প্রতিষ্ঠাও হয়; ইহার অতিরিক্ত, রাজনীতি ও ব্যবসায়ে যতটা আছে, একেবারে ততটা না থাকিলেও লেখকের বৃত্তিতেও লেখকের মাপে চুরি-চামারি, ধাপ্পাবাজী ও মানসিক বেশ্যাবৃত্তি করিবার অবকাশও আছে। সুতরাং লেখক হওয়া নিষ্ফল এ-কথা বলিব কেন?

এই সব কথা আমি বিনা আপত্তিতে মানিয়া লইতেছি। লেখক হইবার সার্থকতা যদি শুধু লেখকসমাজে ও তাহার বাহিরে অর্ব্বাচীন সমাজে হোমরা-চোমরা বলিয়া স্বীকৃত হওয়ার মধ্যে হয়; যাহারা কখনও কিছু পড়ে না অথচ অমুক দারুণ 'ইন্টেলেকচুয়াল' বলিয়া ঘোষণা করে তাহাদের মধ্যে এরণ্ড হওয়াতে হয়; অল্প পয়সার গরমে দেহের মধ্যদেশে স্ফীত ও অল্প-প্রতিষ্ঠার জন্য অহমিকায় মুখে স্ফীত হইবার মধ্যে হয়, তবে বাংলাদেশে লেখকবৃত্তিতে সার্থকতা নাই এ-কথা কখনই বলিব না।

কিন্তু আমার কাছে এ-সব লেখকবৃত্তির সার্থকতার কোনও প্রমাণই নয়। আমার নূতন বাংলা বই-এ লিখিয়াছি, যাহারা শুদ্ধ নাম বা প্রতিষ্ঠার জন্য লেখে তাহাদের অপেক্ষা নিম্নস্তরের লেখক হইতে পারে না। আর, শুদ্ধ জীবিকা বা পয়সার জন্য লেখাও সত্যকার লেখা নয়। বহুকাল পূর্ব্বে জন ষ্টুয়ার্ট মিল লিখিয়াছিলেন, "যে লেখার দ্বারা লোকে প্রাণে বাঁচিতে পারে সেই সব লেখা নিজেরা বাঁচে না।" ইহা মূলত সত্য। লেখা হইতে লেখক জীবিকার প্রত্যাশা করিবে না, এ-কথা আমি কখনই বলিব না, বলিতে পারি না—কারণ আমারও একমাত্র জীবিকা লেখা। কিন্তু উহা সত্যকার লেখকবৃত্তির আনুষঙ্গিক।

লেখকবৃত্তির আসল সার্থকতা অন্য-রকমের। লেখক নিজেকে সত্যকার লেখক বলিয়া তখনই মনে করিতে পারেন যখন তিনি জীবন সম্বন্ধে নূতন জ্ঞান ও অনুভূতি আনিয়া সাধারণের মনকে প্রভাবান্বিত করিতে পারেন। সোজা কথায়, মানুষকে সভ্য করা, সভ্য থাকিলে সভ্যতর করা, এবং সভ্যতার চরম আদর্শ প্রচার করাই সত্যকার লেখকবৃত্তি। লেখা পড়িবার আনন্দ বা সুখ সর্ব্বদাই ইহারই সাথী। এই সব হওয়া সম্ভব একমাত্র লেখক ও পাঠকের মনের সবল ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া হইতে। এই ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াই লেখক-বৃত্তির মূল কথা। প্রেমে প্রণয়ী বা প্রণয়িনীকে পাওয়ার মত, লেখক হইয়া সমানধর্ম্মীকে পাওয়াই লেখক হইবার চরম তৃপ্তি ও সুখ।

এই দিক হইতে দেখিলে, লেখকবৃত্তি বাঙালীসমাজে আপাতদৃষ্টিতে খুবই নিরুৎসাহজনক। সাড়া প্রায় নাই-ই বলা চলে, এবং সাড়া জাগিলেও, উহা লেখকের কাছে পৌঁছিয়া তাহাকে উৎসাহ দিতে পারে না। বঙ্কিমচন্দ্র এবং রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত এই নিরুৎসাহ অনুভব করিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে বিশেষ করিয়া ইহা বলা চলে। তিনি মানসিক প্রেরণার বশে লিখিলেও লেখক-পাঠকের সম্পর্ক হইতে কোনও উৎসাহ বা আনন্দ পান নাই। সুতরাং তাঁহার জীবনে দেশের লোকের প্রতিক্রিয়া হইতে লেখকবৃত্তির সার্থকতারও কোনও অনুভূতি আসে নাই। আমিও সামান্যভাবে যতটুকু লেখক, তাহাতে বাংলাদেশে লেখক হওয়ার নিরুৎসাহ বোধ করিয়াছি। এই

নিরুৎসাহ আমি ১৯২৭ সনে বাংলা লেখা আরম্ভ করিবার কয়েক মাসের মধ্যেই অনুভব করিতে আরম্ভ করি। আজ যে আবার আমি বাংলা লিখিতেছি তাহা নিরুৎসাহ থাকা সত্ত্বেও, কর্ত্তব্যবোধে এই নিরুৎসাহকে অতিক্রম করিয়া।

(২)

এই নিরুৎসাহের হেতু বিচার করাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। কিন্তু তাহার আগে নিরুৎসাহের অন্য দুই-চারিটি কারণ সম্বন্ধে কিছু বলিতে হয়, কারণ সাধারণ, এমন কি অসাধারণ লেখকও অনেক সময়ে এ-গুলিকে নিরুৎসাহের হেতু করিয়া তোলেন। ইহাদের প্রথমটি নিন্দা।

নিন্দাতে বিচলিত হইবার মত দুর্ব্বলতা আর কিছু হইতে পারে না। আমি বলিব, নিন্দা যে শুধু অগ্রাহ্যই করিতে হইবে, তাহাই নয়, উহাতে উৎসাহিতও হইতে হইবে। কোনও নবীনের লেখকের বিরুদ্ধে যদি প্রবল নিন্দা আরম্ভ হয়, তাহা হইলে তিনি ধরিয়া লইতে পারেন, তাঁহার লেখার মধ্যে কিছু আছে। নিন্দা অংশত হয়, প্রচলিত কুসংস্কারে আঘাত দিলে, কিন্তু মুখ্যত ঈর্ষ্যা হইতে। ইহা লেখকের শক্তির পরীক্ষা মাত্র।

আজ যাঁহারা আমার বিরুদ্ধে অভদ্রোচিত উক্তি করিয়া আমাকে 'দেশদ্রোহী' বা 'ধর্ম্মদ্রোহী' প্রমাণ করিতে চান, তাঁহারা ভুলিয়া যান যে, 'দেশদ্রোহী' হইবার কুখ্যাতি অর্জ্জন করিবার বহু আগে হইতেই আমাকে গালি দেওয়া আরম্ভ হয়। আমি তখন মাত্র মাস ছয়েক ধরিয়া লিখিতেছি, কিন্তু আমাকে নিজের সম্বন্ধে নিম্নোদ্ধৃত উক্তির মত উক্তি শুনিতে হইয়াছিল।

"শনিবারের চিঠির সম্পাদক মহাশয়ের যখন 'বিব্লিওগ্রাফি' মুখস্থ করিতে করিতে মস্তিষ্কের বিকৃতি ঘটিয়াছিল আমরা তাঁহার জন্য দুঃখিত হইয়াছিলাম, কিন্তু তাঁহার অবস্থা যে এতটা বাড়িয়া যাইবে...তাহা আমরা সত্যই ভাবি নাই। সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, উত্তেজনা শুধু লেখার ভিতরেই প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা না হইলে তাঁহার বন্ধুবান্ধবদেরও সাবধান করিয়া দিতে হইত।"

আর একটি সমালোচনা নিম্নলিখিত রূপ।—

"শনিবারের চিঠির সম্পাদক মহাশয় তাঁর কৃশ শরীরকে কৃশতর করিয়া থ্যাকার স্পিঙ্ক হইতে ক্যাটালগ আনিয়া মুখস্থ করিতে বসিয়াছেন। চিন্তার সম্পদ তাঁহার না থাকিতে পারে, কিন্তু তাঁহার 'ক্র্যাম' করিবার শক্তি নাই, এই দুর্নাম তাঁহাকে কেউ দিতে পারিবেন না। অতএব সবাই সাবধান।"

'সাবধান!'-ই বটে, তখনও সাবধান, এখনও সাবধান। যদি আমি সেই অপরিণত বয়সেই ভয় না পাইয়া থাকি, তাহা হইলে আমাকে এখন নিন্দা করিয়া লেখা হইতে নিবৃত্ত করিবার চেষ্টা যে কতটা হাস্যকর তাহা বলাই বাহুল্য। সুতরাং আমি নূতন লেখকদের এই অনুরোধ করিব যে, তাঁহারা যদি নিজের মনে অনুভব করেন তাঁহাদের কোনও বক্তব্য আছে, তাঁহারা যেন নিন্দায় ভীত না হ'ন। লেখায় পদার্থ থাকিলে, নূতনত্ব থাকিলে নিন্দা অনিবার্য্য। শুধু ক্লীবের কোথাও নিন্দা হয় না, কিংবা জড়ভরতেরও নয়।

এই জন্যই আমার মনে হয়, নিন্দায় অতিরিক্ত বিচলিত হইয়া, মনে কষ্ট পাইয়া রবীন্দ্রনাথ তাঁহার চরিত্রের সবল দিক দেখান নাই। পক্ষান্তরে বঙ্কিমচন্দ্র নিন্দা সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহা যেমন সত্য তেমনই পুরুষোচিত। তাঁহার বন্ধু দীনবন্ধু মিত্রের যেমন প্রশংসা ছিল, তেমনই নিন্দাও ছিল। ইহাতে সহৃদয় ও উদারপ্রকৃতি দীনবন্ধু সাধারণত বিচলিত হইতেন না, একবার মাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া 'জামাই-বারিকে'র ভোঁতারাম ভাটের চরিত্রে শোধ লইতে চাহিয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র তাহা অনুমোদন করিতে পারেন নাই। এই প্রসঙ্গেই তিনি লোকনিন্দা সম্পর্কিত উক্তি করিয়াছিলেন। আমি উহার সবটুকু উদ্ধৃত করিব।

বঙ্কিমচন্দ্র প্রথমে বলিলেন,—

"যেখানে যশ, সেইখানেই নিন্দা, সংসারের ইহা নিয়ম। পৃথিবীতে যিনিই যশস্বী হইয়াছেন, তিনিই সম্প্রদায়বিশেষ কর্তৃক নিন্দিত হইয়াছেন। ইহার অনেক কারণ।"

কারণগুলি বঙ্কিম একে একে লিপিবদ্ধ করিতেছেন,—

"প্রথম, দোষশূন্য মনুষ্য জন্মে না; যিনি বহুগুণ বিশিষ্ট, তাঁহার দোষগুলি, গুণসান্নিধ্য হেতু কিছু অধিকতর স্পষ্ট হয়, সুতরাং লোকে তৎকীর্তনে প্রবৃত্ত হয়।"

সুতরাং দেখা যাইতেছে বঙ্কিমচন্দ্র নিন্দা একেবারে অকারণ এ-কথা বলেন নাই। ইহার পর অন্য কারণ দেখাইতেছেন,—

"দ্বিতীয়, গুণের সঙ্গে দোষের চিরবিরোধ, দোষযুক্ত ব্যক্তিগণ গুণশালী ব্যক্তির সুতরাং শত্রু হইয়া পড়ে।

"তৃতীয়, কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবৃত্ত হইলে কার্য্যের গতিকে অনেক শত্রু হয়; শত্রুগণ অন্য প্রকারে শত্রুতা সাধনে অসমর্থ হইলে নিন্দার দ্বারা শত্রুতা সাধে।

"চতুর্থ, অনেক মনুষ্যের স্বভাবই এই, প্রশংসা অপেক্ষা নিন্দা করিতে ও শুনিতে ভালবাসে; সামান্য ব্যক্তির নিন্দা অপেক্ষা যশস্বী ব্যক্তির নিন্দা বক্তা ও শ্রোতার সুখদায়ক।

"পঞ্চম, ঈর্ষ্যা মনুষ্যের স্বাভাবিক ধর্ম্ম; অনেকে পরের যশে অত্যন্ত কাতর হইয়া যশস্বীর নিন্দা করিতে প্রবৃত্ত হয়েন। এই শ্রেণীর নিন্দকই অনেক, বিশেষ বঙ্গদেশে।"

ইহার অপেক্ষা স্পষ্ট এবং উদার উক্তি আর কিছু হইতে পারে না। আমরা বঙ্কিমচন্দ্রকে 'ঋষি' 'ঋষি' বলিয়া পূজা করিতে আরম্ভ করিয়াছি, অথচ তাঁহার উক্তির প্রতি যথেষ্ট মনোযোগ করি না। আমি তাঁহার উপদেশ অনুসরণ করিতে চেষ্টা করি, এবং করি বলিয়া আমার সামান্য সাফল্যেও কাহারও কাহারও মনে জ্বালা ধরিয়াছে দেখিয়া কষ্ট পাই, কিন্তু স্বভাবের তাড়নায় লেখা ছাড়িতে পারি না। আশা করি যাঁহারা নিন্দায় বিচলিত হ'ন তাঁহারাও বঙ্কিমের সবলতা অনুকরণ করিতে চেষ্টা করিবেন।

(৩)

এর পর সমালোচকদের কথা বলিতে হয়। এখানে সমালোচক অর্থে ইংরেজী ভাষার 'ক্রিটিকে'র কথা বলিব না, 'রিভিউ'-কারের কথা বলিব। লেখক ও 'রিভিউ'-লেখকের মধ্যে অহি-নকুল সম্বন্ধ, এবং এই ঝগড়া পুরাতন। এ-বিষয়ে প্রথমে ডাঃ জনসনের একটি উক্তি প্রথমে উদ্ধৃত করিব, তিনি বলিয়াছিলেন,—

"There is a certain race of men that either imagine it their duty, or make it their amusement, to hinder the reception of every work of learning or genius, who stand as sentinels in the avenue of fame, and value them-

selves upon giving Ignorance and Envy the first notice of a prey."

কিন্তু জনসনই বলিয়াছেন,

"It is rarely that an author is hurt by his critics."

সমালোচক সম্বন্ধে কোলরিজের উক্তি আরও কঠিন। তিনি লিখিয়াছিলেন,

"Reviewers are usually people who would have been poets, historians, biographers, etc., if they could; they have tried their talents at one or at the other, and have failed; therefore they turn critics."

সুতরাং যাঁহারা নিজেদের পুস্তক সমালোচনা দেখিয়া হতাশ হইয়া পড়েন, তাঁহাদের হ্যাজলিটের একটি উক্তি মনে রাখিতে বলিব—

"It is the business of reviewers to watch poets, not of poets to watch reviewers."

বাংলাদেশের পুস্তক সমালোচকদের সম্বন্ধেও এই সব কথা সাধারণভাবে প্রযোজ্য, বরঞ্চ একটু বেশীই প্রযোজ্য। বঙ্কিমচন্দ্রের এই ধরণের সমালোচকদের উপর শ্রদ্ধা একেবারেই ছিল না। তখনকার দিনের বাঙালী সমালোচকের রূপ তিনি 'লোকরহস্য' 'ব্যাঘ্রাচার্য্য বৃহল্লাঙ্গুল' প্রবন্ধে প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহাদিগকে বানর জাতির অন্তর্ভুক্ত করিয়া। বানরদের চক্ষে ব্যাঘ্রদের রচনা ও আলোচনার দোষ নিম্নলিখিত রূপ।

প্রথম দফা। ব্যাঘ্রদের "ব্যাকরণ অশুদ্ধ। আমরা বানরজাতি ব্যাকরণে বড় পণ্ডিত। ইহাদের ব্যাকরণ বাঁদুরে ব্যাকরণের মতে নহে।"

দ্বিতীয় দফা। "ইহাদের ভাষা বড় মন্দ। ইহারা বাঁদুরে কথা কয় না।"

আপনারা যদি ইংরেজী বা বাংলায় লেখেন, তাহা হইলে দুইভাষা প্রয়োগ সম্বন্ধে নিশ্চয়ই অনেক উপদেশ শুনিয়াছেন এবং ইহাও শুনিয়াছেন, আপনার রচনা লণ্ডনের প্রকাশকই গ্রহণ করুক বা কলিকাতার প্রকাশকই গ্রহণ করুক, আপনার, না ইংরেজী না বাংলা, কোনও ভাষাতেই দখল নাই।

বঙ্কিমচন্দ্রের মতে বানরদের তৃতীয় সমালোচনা এইরূপ,—

"কি প্রকারে বক্তৃতা হয়, তাহা উহারা জানে না। বক্তৃতায় কিছু কিচ্‌কিচ্ করিতে হয়, কিছু লম্ফঝম্ফ করিতে হয়, দুই একবার মুখ ভেঙ্গাইতে হয়, দুই একবার কদলী ভোজন করিতে হয়, উহাদের কর্ত্তব্য আমাদের কাছে কিছু শিক্ষা লয়।

বর্ত্তমানে বাংলাদেশে যাহাকে 'রম্য রচনা' বলা হয়, তাহা অংশত এই প্রকার, 'চিন্তামণি'র নাচের মত।

রবীন্দ্র-রচনাবলীর পর এই শতাব্দীর দু'টি মহোত্তম ঐতিহাসিক গ্রন্থ। এ ধরণের গ্রন্থ এক শতাব্দীতে স্বল্প-সংখ্যকই প্রকাশিত হয়। কাজী নজরুল ইসলামের

নজরুল রচনা-সম্ভার

১ম খণ্ড ১২ ॥ ২য় খণ্ড ১২

বহুপ্রতীক্ষিত দ্বিতীয় খণ্ড আজ বেরুল। এই খণ্ডে কবির ৬টি বিখ্যাত গ্রন্থের (যাদের মূল্য ১৮) মুদ্রণ ছাড়াও বহু অপ্রকাশিত প্রবন্ধ-চিঠিপত্র-কবিতা-গান ইত্যাদি সংকলিত হয়েছে। আজই সংগ্রহ করুন।

আগামী সপ্তায় প্রকাশিত হচ্ছে শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের

আমার বন্ধু নজরুল ৮

কবি নজরুলের ঘনিষ্ঠতম বন্ধুদের অন্যতম হলেন শৈলজানন্দ। এই গ্রন্থে তিনি এমন সব ব্যক্তিগত সুমধুর তথ্য পরিবেশন করেছেন যা অন্য কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। গ্রন্থটি পূর্ণাঙ্গ নজরুল-জীবনী হ'য়ে রইলো।

আরো বই ঃ নজরুল ইস্‌লামের নজরুল রচনা-সম্ভার (১ম খণ্ড—১২ ॥ রাঙাজবা (শ্যামা-সংগীতের প্রথম সংকলন) ৩ ॥ সুরবাহার (নজরুল সংগীতের স্বরলিপি)—৭ ॥ আবদুল আজীজ আল-আমানের শাহানী একটি মেয়ের নাম —২·৫০ ॥ সোলেমানপুরের আয়েশা খাতুন—৩ ॥ লবণ পারাবারের তীরে—২·৫০ ॥ ইবনে ইমামের সরাইখানার যাত্রী —১০ ॥ অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সদ্য প্রকাশিত উপন্যাস পুতুল—৪ ॥ সৈয়দ আবদুল বারির প্যালেস্টাইন থেকে আরব—৭ ॥ রিয়াজউদ্দীন আহমদের প্রাক-যৌবন—২·৫০ ॥ মোজাম্মেল হকের ফেরদৌসী চরিত—২ ॥ সৈয়দ মুস্তফা সিরাজের উপন্যাস হিজলকন্যা—৩·৫০ ॥ পিঞ্জর সোহাগিনী—২·৫০ ॥ প্রেমের প্রথম পাঠ—৩ ॥

● পরিবেশক ঃ হরফ প্রকাশনী ॥ এ-১২৬ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট ॥ কলকাতা—১২ ●

এরপর বঙ্কিমচন্দ্র বানর সমালোচকদের মূলগত সমালোচনার কথা বলিতেছেন। সেগুলি দফা দফা এইরূপ,—

(১) "আমার বিবেচনায় বক্তৃতার মহদ্দোষ এই যে, বৃহল্লাঙ্গুলে আপনার জ্ঞান ও বুদ্ধির দ্বারা আবিষ্কৃত অনেকগুলি নূতন কথা বলিয়াছেন। সে সকল কথা কোন গ্রন্থেই পাওয়া যায় না। যাহা পূর্ব্বলেখকদিগের চর্ব্বিতচর্ব্বণ নহে, তাহা নিতান্ত দূষ্য। আমরা বানরজাতি চিরকাল চর্ব্বিতচর্ব্বণ করিয়া বানরলোকের শ্রীবৃদ্ধি করিয়া আসিতেছি—ব্যাঘ্রাচার্য্য যে তাহা করেন নাই ইহা মহাপাপ।

তখন আর একটি রাগী বানর বলিয়া উঠিল,

(২) "আমি এই সকল বক্তৃতার মধ্যে হাজার এক দোষ তালিকা করিয়া বাহির করিতে পারি। আমি হাজার এক স্থানে বুঝিতে পারি নাই। যাহা আমার বিদ্যাবুদ্ধির অতীত, তাহা মহাদোষ বই আর কি?"

অন্য বানর বলিল,—

"আমি বিশেষ কোন দোষ দেখাইতে পারি না। কিন্তু আমি নানাপ্রকার মুখভঙ্গী করিতে পারি; এবং অশ্লীল গালিগালাজ দিয়া আপন সভ্যতা এবং রসিকতা প্রচার করিতে পারি।"

বাংলাদেশে এখনও যে সমালোচনার এই ধারাগুলি অন্য ধারা হওয়া সত্ত্বেও বর্ত্তমান আছে তাহা অস্বীকার করা চলে না। বিশেষত বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের মুখ হইতে প্রথম ধরণের সমালোচনা খুব বেশী শোনা যায়।

—প্রকাশিত হইল—
শ্রীমণীন্দ্র চক্রবর্ত্তী প্রণীত
ছোটদের সঙ্গীতের আর একটি
অসাধারণ গ্রন্থ
গানের সহজ পাঠ
২য় ভাগ—মূল্য ৩·৫০, ঐ ১ম ভাগ—২৲
শ্রীসত্য প্রকাশন
২৫৪, প্রিন্স আনোয়ার শা রোড,
কলিকাতা-৪৫

(৪)

যাঁহাদের লেখক হিসাবে সত্যকার প্রেরণা ও শক্তি আছে তাঁহাদের কেহই এই ধরণের প্রতিক্রিয়াকে লেখার পথে বাধা বলিয়া মনে করিবেন না। আসল নিরুৎসাহকর ব্যাপার অন্য—পাঠকের অসাড়তা। ইহার কথা রবীন্দ্রনাথ অতি অল্প বয়সেই বলিয়াছিলেন। আমি উহা আমার বাংলা বই-এর মুখবন্ধে উদ্ধৃত করিয়াছি, আবার উদ্ধৃত করিব। কথাগুলি এইরূপ—

"আমরা হতভাগ্য বাঙালী লেখকেরা মানুষের ভিতরকার সেই প্রাণের অভাব একান্তমনে অনুভব করি—আমরা আমাদের কল্পনাকে সর্ব্বদাই সত্যের খোরাক দিয়ে বাঁচিয়ে রাখতে পারি নে, নিজের মনের সঙ্গে বাইরের মনের একটা সংঘাত হয় না বলে আমাদের রচনাকার্য্য অনেকটা পরিমাণে আনন্দবিহীন হয়। আমাদের দেশের লোক এত যে ইংরাজি সাহিত্য পড়েছে, কিন্তু তাদের অস্থিমজ্জার মধ্যে ভাবের প্রভাব প্রবেশ করতে পারে নি—তাদের ভাবের ক্ষুধাই জন্মায় নি, তাদের জড় শরীরের মধ্যে একটা মানস শরীর এখনো গঠিত হয়ে ওঠে নি, সেইজন্যে তাদের মানসিক আবশ্যক বলে একটা আবশ্যক বোধ নিতান্তই কম—অথচ মুখের কথায় সেটা বোঝবার জো নেই, কেন না বোলচাল সমস্তই ইংরাজি থেকে শিখে নিয়েছে। এরা খুব অল্প অনুভব করে, অল্প চিন্তা করে এবং অল্পই কাজ করে—সেইজন্যে এদের সংসর্গে মনের কোনো সুখ নেই। গেটের পক্ষেও শিলারের বন্ধুত্ব আবশ্যক ছিল, তাইলে আমাদের মত লোকের পক্ষে একজন যথার্থ খাঁটি ভাবুকের প্রাণসঞ্চারক সঙ্গ যে কত অত্যাবশ্যক তা আর কি করে বোঝাব। আমাদের সমস্ত জীবনের সফলতাটা যে জায়গায় সেইখানে একটা প্রেমের স্পর্শ, একটা মনুষ্যসঙ্গের উত্তাপ সর্ব্বদা পাওয়া আবশ্যক—নইলে তার ফুলফলে যথেষ্ট বর্ণ গন্ধ এবং রস সঞ্চারিত হয় না।"

এই কথাগুলি ১৮৯৪ সনে লেখা। কিন্তু লেখক ও পাঠকের মধ্যে মানসিক যোগাযোগের অভাবের এই যে কথা রবীন্দ্রনাথ তখন বলিয়াছিলেন, তাহার ব্যতিক্রম এখনও হয় নাই।

ইহার কারণ আলোচনা করিবার আগে লেখকবৃত্তির সার্থকতা কি ধরণের পাঠকসমাজ থাকলে হয় সাধারণভাবে উহার খোঁজ লওয়া আবশ্যক। সহৃদয়, সহানুভূতি-সম্পন্ন ও উৎসাহী পাঠক সম্প্রদায় না থাকিলে যে সাহিত্য সৃষ্ট হয় না তাহা সকল যুগের সকল বড় লেখকই অনুভব করিয়াছেন। ভবভূতি বলিয়াছিলেন, "যাহারা নাকি এখানে আমার প্রতি অবজ্ঞা দেখায়, তাহারা কি জানে? তাহাদের উদ্দেশে আমার এই প্রযত্ন নয়। আমার সমানধর্ম্মা কেউ না কেউ জন্মিবেই এবং আছেই, কারণ কাল নিরবধি ও পৃথিবী বিপুল।" এই উক্তির প্রধান কথা এ নয় যে, ভবভূতির মতে তাঁহাকে বুঝিবার বা আদর করিবার মত ব্যক্তি নাই; আসল কথা, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান পাঠক সম্বন্ধে তাঁহার অবিচল বিশ্বাস। তিনি জানিতেন, তাঁহার সমানধর্ম্মা আছেই।

তেমনই মনে রাখিতে হইবে, অ্যাটিক নাটকের মূল্য বিচার একজন বা দশজন পণ্ডিত করিত না, করিত এথেন্সের সমস্ত জনসাধারণ। অ্যাক্রপলিসের ধারে উন্মুক্ত আকাশের নীচে বিশাল থিয়েটারের পাথরের আসনে বসিয়া হাজার কুড়ি এথেন্সবাসী তিন নাটককারের প্রতিযোগিতা দেখিত, পরে কে পুরস্কারের যোগ্য তাহা বলিত। ঐস্কুলস্, ও সোফোক্লেস বহু পুরস্কার পাইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাদিগকে কোনও অসাহিত্যিক রাজনৈতিক মুরুব্বি ধরিতে হয় নাই। তবে এ-কথাও সত্য, আজকাল কুড়ি হাজার নগরবাসীর হাতে সাহিত্যের মূল্য বিচার ছাড়িয়া দিলে 'পোর্নোগ্রাফি'র বই ভিন্ন আর কিছুই পুরস্কার পাইবে না। একটা সমাজে সাধারণভাবে সাহিত্যবোধ না থাকিলে লেখকের ইহা চাটুকার নয় বেশ্যা না হইয়া উপায় নাই।

যে-সব লেখক জীবন্ত পাঠকসমাজে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের পৃষ্ঠপোষকতা বা পুরস্কার ভাঙাইয়া সমাদর লাভ করিবার কোনও ঈপ্সা হয় না, বরঞ্চ এইভাবে পণ্ডিতের চোটে বাবা বলানো সম্বন্ধে অর্পাস্তি থাকে। বর্ত্তমান যুগে সারত্র্ (সাত্র্) ইহার পরিচয় দিয়াছেন। তিনি নোবেল পুরস্কার প্রত্যাখ্যান করেন। ইহার কারণ এই দেশে বিস্তারিতভাবে প্রকাশিত হয় নাই। আমার কাছে ফরাসীতে এই প্রত্যাখ্যান সম্বন্ধীয় উক্তিটি আছে। তাহা পড়িয়া সারত্র্-এর উদ্দেশ্যে আমি শ্রদ্ধাপূর্ণ প্রণাম করিয়াছিলাম। তিনি প্রথম কারণ এই দেখান যে, নোবেল পুরস্কারের একটা রাজনৈতিক আশ্লেষ আছে, তিনি নিজের লেখার সহিত এই আশ্লেষ জড়িত করিতে চান না। এটাও কত উল্লেখযোগ্য তাহা একটি বাঙালী লেখক সম্বন্ধে একটি বিজ্ঞপ্তি দেখিয়া

বিশেষ অনুভব করিয়াছিলাম। তাঁহার প্রতিষ্ঠার এই বিজ্ঞাপন দেওয়া হইয়াছিল,—

> "Leading Marxist Poet of Bengal and recipient of the Sahitya Akadami Prize."

যিনি মার্কস্ ও ভারত গভর্ণমেণ্টের সাহিত্য আকাদেমী সম্বন্ধে সমজ্ঞান পোষণ করিতে পারেন, তিনি সারস্বত নন ইহা তো সুস্পষ্ট।

কিন্তু ইহার চেয়েও বড় কথা তাঁহার দ্বিতীয় কারণ। সারস্বত বলেন যে, শুদ্ধ সারস্বত এবং নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত সারস্বত, কিছুতেই এক হইতে পারে না, দ্বিতীয় সারস্বত-এর পিছনে একটা অসাহিত্যিক চাপ থাকিবেই, সুতরাং তিনি পুরস্কার গ্রহণ করিবেন না—পাঠক কোনও বাহ্যিক চাপের ফলে তাঁহাকে পড়ে এটা তিনি চান না। কিন্তু পাঠকসমাজ সম্বন্ধে কতটুকু আস্থা ও শ্রদ্ধা থাকিলে লেখক এই কথা বলিতে পারে? তবে এই আস্থা ভিত্তিহীন নয়, প্রকৃত সাহিত্য-রসিক সমাজ সর্ব্বদাই লেখককে এইভাবে সহায়তা করিয়া থাকে।

এইরূপ পাঠকসমাজের মধ্যে চারিটি জিনিস সব সময়েই দেখা যায়। এর প্রথমটি নূতন ধ্যান-ধারণা বা 'আইডিয়া' সম্বন্ধে আগ্রহ। এই আগ্রহ আবার ধ্যান-ধারণা সম্বন্ধে তীক্ষ্ণ বোধ না থাকিলে জন্মে না। কেউ যদি একটি ধারণা হইতে আর একটি ধারণার পার্থক্যই না অনুভব করিতে পারে, তাহা হইলে নূতন ধারণা সম্বন্ধে তাহার আগ্রহ জন্মিবে কেন? শালগ্রামের তো ওঠা-বসা সমান।

দ্বিতীয় জিনিস, আবেগের ক্ষমতা। যে-সমাজে স্ত্রী-পুরুষ প্রবলভাবে অনুরাগ-বিরাগ, করুণা-ক্রোধ, কৌতুক-বিষাদ অনুভব করিতে পারে না, সে-সমাজে সাহিত্যের আদর হইতে পারে না।

তৃতীয় জিনিস, লোকোত্তর অনুভূতি, অর্থাৎ আটপৌরে অনুভূতি ছাড়াইয়া অনুভূতির গভীরতম ও উচ্চতম স্তরে যাইবার ক্ষমতা। সাহিত্যের, বিশেষত কাব্যের, বারো আনাই যুক্তির অতীত—শুধু বুদ্ধির সাহায্যে উহাকে গ্রহণ করা যায় না। উহার জন্য ইংরেজীতে যাহাকে 'ইনটুইশ্যন' বলা হয়, তাহার প্রয়োজন হয়।

চতুর্থ জিনিস, প্রখর ইন্দ্রিয়ানুভূতি, অর্থাৎ পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের, বিশেষ করিয়া দৃষ্টি ও শ্রবণের, তীক্ষ্ণতা। এই তীক্ষ্ণতা না থাকিলে লেখক প্রাণ স্পর্শ করিবার মত কিছু লিখিতে পারে না, আবার পাঠকের মধ্যে এই তীক্ষ্ণতা না থাকিলে ভাল লেখাও নিষ্ফল হয়।

কিন্তু এই চারিটি জিনিসের অস্তিত্ব ও শক্তি পঞ্চম আর একটি জিনিসের উপর নির্ভর করে। উহা না থাকিলে, এই চারিটি আসিতে পারে না। এই মূলগত জিনিসটা আর কিছু নয়—প্রাণশক্তি, জাতীয় প্রাণশক্তি। ইহার প্রাচুর্য্য না থাকিলে কোনও বড় সাহিত্য সৃষ্ট হয় না। সেজন্য যুগে যুগে প্রতিটি দেশে যখনই জনসাধারণের প্রাণশক্তি ক্ষীণ হইয়াছে, তখনই সাহিত্যেরও অবনতি হইয়াছে।

(৪)

এখন এই সব বিবেচনা করিলে বাঙালী পাঠকসমাজের কি লক্ষণ দেখা যাক। বাঙালী সমাজে সুরসিক সহৃদয় সাহিত্য সম্বন্ধে উৎসাহী পাঠক একেবারেই নাই, একথা কেহ বলিবে না, বলা সম্ভবও নয়। ছাপার অক্ষরে আমি কি গালি খাই তাহা সকলেরই জানা আছে। তবু নানা অপরিচিত পাঠক-পাঠিকার কাছ হইতে আমি কত আন্তরিক অনুভূতিপূর্ণ চিঠি পাই তাহা পড়িয়া আমি নিজেই বিস্মিত হই। এই ধরণের চিঠি সকল লেখককেই উৎসাহ দেয়।

কিন্তু প্রশ্ন এটা নয়। প্রশ্নটা এইরূপ—সমগ্র বাঙালী সমাজে সাহিত্য সম্বন্ধে আগ্রহ এরূপ কি না যাহাতে লেখক ক্রমাগত নিজেকে প্রবোধ ও সান্ত্বনা না দিয়া, কর্ত্তব্যের খাতিরে লিখিতেছি এই কথা মনে না করিয়া, নিজের বৃত্তি চালাইতে পারে কি না; তাহা ছাড়া অপ্রিয় সত্য, নূতন কথা, নূতন ধারণা প্রচার করিয়া যাহাদের কাছ হইতে গালি খাইবারই তাহাদের কথা বাদ দিয়া, অন্যদের কাছ হইতে উৎসাহ ও সহায়তা প্রত্যাশা করিতে পারে কি না; যেমন লোক বিপক্ষে আছে, সে-রকম পক্ষেও আছে তাহা মনে করিতে পারে কি না। রবীন্দ্রনাথ এই ভরসা জীবনে পান নাই তাহা সর্ব্বজনস্বীকৃত। অন্যের কথা তাহা হইলে বাদ দিতে হয়।

মোটামুটি এটা সত্য যে, ব্যবসা হিসাবে লেখা চালাইয়া না গেলে, শেষ গতি হিসাবে জীবিকার জন্য লেখা না চালাইলে, এক কর্ত্তব্যবোধ ছাড়া অন্য কোনও মানসিক উৎসাহ লইয়া বাঙালী সমাজের জন্য লেখা আজকাল কঠিন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বেশীর ভাগ বাঙালী পাঠকই গুঁতোর চোটে, কিম্বা কুপ্রবৃত্তির বশে, কিম্বা সুপারিশের জোরে, কিম্বা অন্য কোনও কাজ না থাকায় সময় কাটাইবার জন্য, অথবা ঘুম সহজে আসে না বলিয়া ঘুম আনিবার জন্য পড়ে।

ইহার পর যে চারিটি জিনিসের কথা সাধারণভাবে বলিয়াছি, উহার হিসাব লইব। প্রথম, নূতন ধারণা সম্বন্ধে আগ্রহ ও অনুভূতি। এটা পাঠক-সাধারণের মধ্যে নাই বলিলেই চলে।

এর চেয়েও আশ্চর্য্যের কথা বর্ত্তমান যুগের বাঙালীর মধ্যে আবেগের দুর্ব্বলতা। যখন বাঙালী আবেগ অনুভব করে তাহা সাধারণত দুর্ব্বলতা হইতে অনুভব করে, চরিত্রের শক্তি হইতে করে না। তাহার মনে যদি করুণা আসে তাহা হইলে সেটা আসে নিজের দুঃখ হইতে, অপরের দুঃখ হইতে নয়। দুঃখবিলাস বাঙালীর একটা নিদারুণ দুর্ব্বলতা হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

আমার অবস্থা যতই ভাল হউক না কেন, পৃথিবীর সাধারণ লোকের 'অবস্থা এরূপ যে, সমগ্র মনুষ্য জীবনের কথা ভাবিলে স্বতঃই অশ্রু পড়ে এরূপ করুণা অনুভব করিবার ক্ষমতা কয়জনের আছে? ভালবাসারও সেই অবস্থা। ইহাও আত্ম-প্রীতি, স্বার্থপরতারই এক মূর্ত্তি, অপরের জন্য আত্মবিসর্জ্জন নয়। আরও যদি হিসাব নেওয়া যায়, কয়জন আজ দেশ বা নিজের সভ্যতাকে ভালবাসে? একটা অন্ধ ও মূঢ় জাতীয়তা আছে বটে, কিন্তু সত্যকার দেশপ্রেম কোথায়? এই সব লক্ষ্য করিয়া বাঙালী হৃদয়ের যে ঊষরতা আমি দেখি তাহাতে ভয় হয়।

সাধারণ আবেগের অনুভূতিই যদি আমাদের মধ্যে ক্ষীণ হয়, তাহা হইলে লোকোত্তর অনুভূতির কথা তোলাই

রাণীধূপ
প্রস্তুত কারক:-কাককার প্রডাক্টস্

অন্যায়। এই অনুভূতি সাধারণত অল্প বয়সে আসে না, বেশী বয়সে হয়, কারণ ইহার জন্য সুখদুঃখের ব্যাপক অভিজ্ঞতার প্রয়োজন হয়, জ্ঞানের প্রয়োজন হয়, ভূয়োদর্শনের প্রয়োজন হয়। কিন্তু চল্লিশ বা পঞ্চাশ বৎসর বয়সে, যখন শুধু শারীরিক শক্তি কমিয়া আসে, তখন যদি কাহারও মনে এই সব না জাগে যে, আমি একটা বিশ্বব্যাপী স্রোতের উপর ছোট নৌকার মত ভাসিয়া যাইতেছি, তাহা হইলে কাহারও সত্যকার জীবনের অনুভূতি হইয়াছে বলিতে পারি না। যদি এইরূপ অনুভূতি আসে তাহা হইলে জীবনের দৈনন্দিন ক্ষুদ্র ঘটনাও অর্থপূর্ণ হয়, সমস্ত জীবনে লুকানো ঐশ্বর্য্যের সন্ধান পাওয়া যায়, এবং সব জিনিসই সীমাহীন আনন্দ বা করুণায় আপ্লুত হইয়া যায়। কিন্তু আমাদের প্রৌঢ় বা বৃদ্ধ ব্যক্তিদের এইরূপ কোনও অনুভূতি আসা দূরে থাকুক, তাহারা অতি সঙ্কীর্ণভাবে বৈষয়িক হইয়া যায়। অল্পবয়স্ক যুবক-যুবতীর মধ্যে হয়ত বিচ্ছিন্নভাবে অজ্ঞাতসারে লোকোত্তর অনুভূতি আসে, তবু প্রৌঢ় ও বৃদ্ধের মধ্যে আসে না। মনে হয়, যেন তাহারা চিতাতে উঠিয়া পুড়িবার জন্য মৃত্যুর আগেই কাঠ হইয়া গিয়াছে।

সর্ব্বশেষে ইন্দ্রিয়ানুভূতির দুর্ব্বলতার কথা বলিতে হয়। সাধারণত আমাদের দেশে লোকে কোনও জিনিস পরিষ্কার করিয়া রূপ ও রং নির্ভুলভাবে দেখিতে পারে না, ধ্বনির বৈচিত্র্যও কাণে যায় না। মানুষের জীবনের উচ্চতম অনুভূতি যাহা তাহা জ্ঞানেন্দ্রিয়ের প্রখরতা ভিন্ন আসে না। এই প্রখরতা থাকিলে মানসিক জীবন কোথায় পৌঁছিতে পারে তাহা বুঝাইবার জন্য ওয়াল্টার পেটার হইতে কয়েকটা কথা উদ্ধৃত করিব। সত্যকার সফল জীবন যে কি তাহার পরিচয় দিতে গিয়া পেটার বলিয়াছেন,—

"To burn always with this hard, gemlike flame, to maintain this ecstasy, is success in life. In a sense it might be said that our failure is to form habits: for, after all, habit is relative to a stereotyped world, and meantime it is only the roughness of the eye that makes any two persons, things, situations, seem alike. While all melts under our feet, we may as well grasp at any exquisite passion, or any contribution to knowledge that seems by a lifted horizon to set the spirit force for a moment, or any stirring of the senses, strange dyes, strange colours, and curious odours, or work of the artist's hands, or the face of one's friend. Not to discriminate every moment same passionate attitude in those about us, and in the very brilliancy of their gifts same tragic dividing forces on their ways, is, on this short day of frost and sun, to sleep before evening."

হায়! বেশীর ভাগ বাঙালীকে দেখিলেই আমার মনে হয়, তাহারা যে শুধু সূর্য্যাস্তের আগেই শ্রান্ত হইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে তাহাই নয়, ঊষার আলো বা পাখীর কাকলীতেও জাগে নাই।

অবশ্য ইহা সত্য যে, পেটার বর্ণিত অনুভূতি সর্ব্বোচ্চ অনুভূতি, ইহা কোনও সমাজেই সহজে আসে না। কিন্তু আসেও যে, তাহারও বহু প্রমাণ ইতিহাসে আছে। গ্রীকদের মধ্যে আসিয়াছিল, রোমানদের মধ্যে আসিয়াছিল, প্রাচীন হিন্দুদের মধ্যে আসিয়াছিল। পরবর্ত্তীকালেও আসিয়াছিল। কিন্তু পুরাপুরি আসুক আর নাই আসুক, একটা সূচনা সর্ব্বত্রই জীবন্ত সমাজে থাকে। যে ইন্দ্রিয়গত অনুভূতি উচ্চতম অনুভূতির ভিত্তি তাহাই যে আমাদের মধ্যে দুর্ব্বল।

এই সকল কথাগুলি অনেকের কাছেই দর্শনের তত্ত্ব প্রচারের মত মনে হইবে। কিন্তু এগুলি অত্যন্ত সত্য অনুভূতিরই অক্ষম ভাষাগত প্রকাশ মাত্র। জীবনীশক্তি থাকিলে এগুলির আভাস সব সময়েই মনে আসে। আসল কথা যেটা তাহা এই—জাতি হিসাবে বাঙালীর জীবনীশক্তি অতি ক্ষীণ হইয়া আসিয়াছে। সুতরাং উহার প্রকাশ, কি লেখক, কি পাঠক, দুই-এর মধ্যেই ক্ষীণ।

এই সমাজে লেখকের ক্ষুদ্র আবেগ ও ক্ষুদ্র কর্ম্ম লইয়া লিখিতে হয়, অথবা তুচ্ছ তামাসা দেখাইতে হয়—অনেক সময়েই একেবারে ভাঁড় বনিয়া। পাঠকও ইহার বেশী কিছু চায় না। কতজন পাঠক মন দিয়া একটা বই আগাগোড়া পড়িতে পারে বা উহার বিষয় মনে রাখিতে পারে? সাধারণত বাঙালী পাঠকের পড়া পল্লবগ্রাহিতা মাত্র; মানসিক চাট খাওয়ার মত।

ইহার অপেক্ষাও গুরুতর কথা এই যে, জীবনীশক্তি যখন কমিয়া আসে, অনুভূতির গাঢ়তা ও গভীরতা যখন লোপ পাইতে থাকে, তখনই একটা জাতির মধ্যে দুর্ব্বল কামুকতা ও কলহপরায়ণতাও বাড়িতে থাকে। আজকাল বাংলা লেখার মধ্যে এই দুইটা জিনিস বেশ দেখা দিয়াছে, মনে হয় যেন অনুভূতি এত দুর্ব্বল যে লঙ্কা ও টক ভিন্ন আর কিছু রসনায় লাগে না।

সংক্ষেপে বলিব, আজ বাঙালী লেখক, সমালোচক ও পাঠকের মধ্যে যাহা সর্ব্বোপরি প্রকাশ পাইতেছে তাহা ক্ষীণপ্রাণতা, ও ক্ষীণপ্রাণের ইন্দ্রিয়পরতন্ত্রতা ও দ্বেষ—তাহার উপর যেটুকু আছে উহা ক্ষীণপ্রাণের ভাঁড়ামি। একমাত্র পাঠকেরও দোষ নয়, একমাত্র সমালোচকেরও দোষ নয়, একমাত্র লেখকেরও দোষ নয়—সকলের দোষ জড়াইয়া একটা জাতির দোষ। লেখক, সমালোচক ও পাঠক একই জিনিসের ত্রিমূর্ত্তি মাত্র।

শ্রাবণী পূর্ণিমায়

অমরনাথ

২৭শে জুলাই টুরিস্ট কোচে যাত্রা
প্রত্যাবর্তন ১৯শে আগস্ট

কাশী, হরিদ্বার, অমৃতসর, ভূস্বর্গ কাশ্মীর, অমরনাথ, জ্বালামুখী, কাংড়া, ছিনমুট কুরুক্ষেত্র, মথুরা, বৃন্দাবন (জন্মাষ্টমীতে) এলাহাবাদ, গয়া।

থাকা খাওয়া, চা-জলখাবার, যানবাহনাদির খরচ সহ ৪৯৫৲ টাকা, অমরনাথ ব্যতীত ৪৬৫৲ টাকা।

TRAVELESCO
54|D, Nimtala Ghat Street,
Calcutta-6.
Phone : 55-0712

ইন্দ্রনাথের একটি চিন্তা

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

বাংলা দেশে ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় একটি পরিচয়েই ঐতিহাসিক হয়ে আছেন —তিনি 'পঞ্চানন্দ।' আর তাঁকে অমরত্ব দিয়েছে সেই দুর্ধর্ষ 'ভারত-উদ্ধার' কাব্য—যা একমেবাদ্বিতীয়ম্—যার তুল্য ব্যঙ্গ কাব্য আমাদের সাহিত্যে আর প্রকাশিত হয় নি। "ভারত-উদ্ধার কথা অমৃত সমান, দ্বিজ রামদাস ভণে শুনে পুণ্যবান'— আমরা সেই পুণ্যবানের দল—দ্বিজ রামদাস অর্থাৎ ইন্দ্রনাথের কাছে চির-ঋণী থাকব।

প্রখর বাস্তব-জ্ঞান এবং সেই সঙ্গে যুক্তিসিদ্ধ মনের সহযোগেই উঁচুদরের ব্যঙ্গ রচনা জন্ম নেয়। কুয়াশাচ্ছন্ন এবং নিরবয়ব আদর্শবাদ, আবেগের আতিশয্য, তত্ত্ব এবং তার প্রয়োগের অসঙ্গতি, দায়িত্ব-হীন সুভাষণ—এগুলো সবই ব্যঙ্গ-রসিকের টার্গেট। মুক্তবুদ্ধি বাস্তববাদী হওয়ার ফলে ব্যঙ্গরসিকের জীবন-জগৎ-সমাজ-পরিবেশ—সব কিছু সম্পর্কে কতগুলো স্পষ্ট আর পরিচ্ছন্ন বক্তব্য থাকে—যেমন করে ভল্‌ট্যার তাঁর নিজের কথা বলতে পেরেছিলেন। অতএব ইন্দ্রনাথও যখন কোনো গম্ভীর বক্তব্য গভীরভাবে বলতে চেয়েছেন, তখন তা মোহহীন, পরিচ্ছন্ন, যুক্তি আর বুদ্ধিতে বিভাসিত। এই প্রসঙ্গেই তাঁর 'বাঙ্গালা ভাষা' এবং 'বাঙ্গালা ভাষার সংস্কার' শীর্ষক দুটি দীর্ঘ আলোচনার কথা মনে পড়ে গেল।

বাংলা ভাষার প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়েছে, এ নিয়ে সেকালে যাঁরা আত্মতৃপ্ত, তাঁদের উদ্দেশে ইন্দ্রনাথের বক্তব্য এই ঃ

"আমি বলি যে যখন অদ্যাপি বাঙ্গালা ভাষার ব্যাকরণ হয় নাই, অভিধান হয় নাই, বানানের বিধি-ব্যবস্থা পর্যন্ত হয় নাই, তখন বাঙ্গালা ভাষার উন্নতির কথা উপহাসের বিষয় হয় না কি? শিশুর আধো আধো ভাবে ভাষার উন্নতি হওয়া কেহ বলে না; বাঙ্গালা ভাষাও এখন আধো আধো ভাবমাত্র।" (বাঙ্গালা ভাষা, প্রথম পত্র)

আজ থেকে তিয়াত্তর বছর আগে এই আলোচনা লিখিত হয়েছে। এর মধ্যে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য অনেক দীপ্তিলাভ করেছে, রবীন্দ্রনাথ বাঙালীর একটি প্রান্তীয় ভাষাকে আন্তর্জাতিক মহিমায় উত্তীর্ণ করে দিয়েছেন, কিন্তু ইন্দ্রনাথের অনুযোগ এখনো সম্পূর্ণ খণ্ডিত হয়েছে কি না সন্দেহ।

'বাঙ্গালা ভাষা' প্রবন্ধের পঞ্চম পত্রে ইন্দ্রনাথ বলেছেন ঃ "যাঁহারা বাঙ্গালা লিখেন, তাঁহারাও বাঙ্গালা শিখেন না। কেহ, ইংরেজী শিখিয়া বাঙ্গালা লেখেন; কেহ বা সংস্কৃত শিখিয়া বাঙ্গালা লিখেন, কেহ বা উভয় ভাষা শিখিয়া বাঙ্গালা লেখেন; কিন্তু বাঙ্গালা লিখিবার নিমিত্ত কিম্বা বাঙ্গালা বলিবার নিমিত্ত কেহ বাঙ্গালা শিখেন না।"

মারাত্মক অভিযোগ। ইন্দ্রনাথ বলতে চান—সংস্কৃতপন্থী অথবা ইংরেজীনবীশ কোনো পক্ষই বাঙালীর মাতৃভাষার সাধনা করেন না। আলোচনা করে তিনি দেখিয়েছেন, একদল শিক্ষিত ব্যক্তি বাংলা লেখেন যেন ইংরেজির অনুবাদ করে—যেমন রাজনারায়ণ বসু এক জায়গায় কোনো বাংলা বইয়ের সমালোচনা-প্রসঙ্গে মন্তব্য করছেন ঃ "ইহাতে উভয় পাণ্ডিত্য এবং হৃদয় সম্মিলিত আছে।" ইন্দ্রনাথ বলেছেন, "ইংরাজেরা আর ইংরেজীতে শিক্ষিতেরা ইংরেজিতে Heart বলিলে যাহা বুঝি, ইংরেজী না-জানা বাঙ্গালী 'হৃদয়' বলিলে তাহা বুঝিবে কেন? এরূপ শব্দ প্রয়োগ বাঙ্গালার পণ্ডিতের অবোধ্য, মূর্খেরও অবোধ্য।" (বাঙ্গালা ভাষা, দ্বিতীয় পত্র)

আবার যাঁরা অতিমাত্রায় সংস্কৃত-বিশারদ—তাঁরা যে নির্বিচারে তৎসম শব্দ ব্যবহার করেন তাতেও ঠিক এই রকম সমস্যার সৃষ্টি হয়। এই সব শব্দের প্রয়োগ প্রায় ক্ষেত্রেই বিভ্রান্তি বহন করে আনে। কারণ, "মূলে সংস্কৃতে সেই শব্দগুলির যাহা অর্থ, বাঙ্গালা ভাষায় তাহা নাই।" একটি দৃষ্টান্তে ইন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন—"সংস্কৃতে 'সচরাচর' হইতেছে—চরাচরের সহিত বর্তমান অর্থাৎ স্থাবর জঙ্গম সকলই, অর্থাৎ কিনা নিঃশেষরূপে সমস্তই: কিন্তু সেই 'সচরাচর' বলিলে বাঙ্গালায় বুঝিতে হইবে—সর্বদা বা যেখানে সেখানে —সর্বত্র তা সাধারণতঃ।" (দ্বিতীয় পত্র)

তা হলে বাংলা ভাষা ইংরেজীর অনুগামী হতে বাধ্য নয়, সংস্কৃতেরও না। তার একটা নিজস্ব রূপ, নিজস্ব চরিত্র থাকা চাই। সেই চরিত্রের পরিচয় লাভ সহজ নয়, কারণঃ "বাঙ্গালা মিশ্র ভাষা। এইজন্যই বাংলা ভাষাকে শাসন করা শক্ত।" কিন্তু সেই শাসন আসবে কোন্ উপায়ে? একদল শিক্ষিত দাবী করছেন—ইংরেজী ব্যাকরণ অনুসারে বাংলা ভাষার চলা উচিত—সেই-ই তার শক্তিলাভের পথ। আর একদল—যেমন "শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয়" ইত্যাদি—এঁরা বাংলাকে সংস্কৃতের জোয়ালেই বেঁধে দিতে চান। কিন্তু বাঙালী ইন্দ্রনাথ এর একটি প্রস্তাবেও রাজী নন—তিনি খাঁটি বাংলা ভাষার নিজস্ব ব্যাকরণের ওপরেই জোর দিয়েছেন।

বাংলা ভাষার ওপর সংস্কৃত, ইংরেজী, আরবী, ফারসী—সকলেরই প্রভাব আছে। কিন্তু প্রভাব থাকলেই তার নিজত্ব বিসর্জন দিতে হবে—একথা ইন্দ্রনাথ স্বীকার করেন না। বাংলারও একটা স্বরূপ আছে ঃ "কতকগুলা মোটামুটি কায়দা বাংলা ভাষারও আছে, তাহা না থাকিলে তো বাঙ্গালা ভাষাকে ভাষাই বলিতাম না"। (তৃতীয় পত্র)

অতএব "বাঙ্গালা ভাষার সংস্কার" প্রবন্ধে, আরো বারো বৎসর পরে, ইন্দ্রনাথ নিজের বক্তব্যকে কাশীমবাজার "বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনী"র অধিবেশনে আরো

এখন নিন পরে টাকা দেবেন

মাসিক ১০৲ টাকা কিস্তিতে মিনি জাপান মডেল ৩ ব্যাণ্ড অল ওয়ার্ল্ড ট্রানজিস্টার।

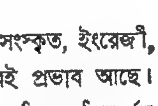

J. L. SANSON & CO. (B.M.)
P.B. 1288, Delhi—6.

বিস্তৃত ও পরিচ্ছন্ন আকারে উপস্থিত করেছেন। বাংলা ভাষা সম্পর্কে যাঁরা চিন্তা করে থাকেন, তাঁদের কাছে আজও এই প্রবন্ধটির সবিশেষ মূল্য আছে।

মূল্য আছে এই জন্যই যে ইন্দ্রনাথের পূর্বে এমন বলিষ্ঠভাবে কেউ ঘোষণা করেন নি—সাহিত্যের ভাষা এবং কথ্য ভাষার নৈকট্য না ঘটলে ভাষা অথবা সাহিত্য—কোনোটিরই উপযুক্ত শ্রীবৃদ্ধি ঘটতে পারে না। স্মরণ রাখতে হবে, প্রমথ চৌধুরীর 'সবুজপত্র' আত্মপ্রকাশ করেছে আরো সাত বৎসর পরে। তীক্ষ্ণধী ইন্দ্রনাথ অনুভব করেছিলেন—ইংরেজির বঙ্গানুবাদে অথবা সংস্কৃত শব্দের ভাবমন্থরতায় বাংলা ভাষা এবং সাহিত্য—দুইয়েরই অপঘাত অনিবার্য। সর্বজনের মানস-সংযোগের মাধ্যমই হচ্ছে সত্যিকারের ভাষা।

"সাহিত্যের ভাষা যেন কথোপকথনের ভাষা হইতে এমন দূরে সরিয়া না পড়ে যে, সাহিত্যের সঙ্গে কথোপকথনের সম্পর্ক লোপ পায়। সাহিত্যের ভাষার সঙ্গে কথোপকথনের ভাষার যত নৈকট্য থাকে, যত ঘনিষ্ঠতা থাকে ততই ভাল; দুইয়ের অন্তর যত অধিক হয় ততই মন্দ। বিচ্ছেদ হইলে কেহ কাহারও উপকার করিতে পারে না; একই ভাষা ক্রমে দুইটি পৃথক ভাষা হইয়া দাঁড়াইতে পারে। তাহাতে কেবল যে ভাষার অনিষ্ট তাহা নহে, সমাজেরও বিশেষ অমঙ্গল ঘটিবার আশঙ্কা হয়।"

এই স্পষ্টোক্তি থেকে বোঝা যায়, ইন্দ্রনাথ কোন্ বাংলা ভাষাকে চান, এবং কোন্ বাংলা ভাষার ব্যাকরণ রচনায় তিনি উৎসাহী। "প্রতি পাদক্ষেপেই বাংলা ভাষাকে পরের মুখপানে তাকাইয়া থাকিতে হয়"—এই অগৌরব দূর করে—সর্বসাধারণের বোধ্য এবং ব্যবহারযোগ্য ভাষাকেই তিনি স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন।

স্বাধীন স্বয়ম্ভর বাংলা ভাষার কথা বলতে গিয়ে ইন্দ্রনাথ প্রথমেই আমাদের বর্ণমালার প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ করেছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি যে বাস্তব দৃষ্টি ও সৎসাহসের পরিচয় দিয়েছেন তা অভিনন্দনযোগ্য। এই প্রবন্ধ রচনার একষট্টি বৎসর পরেও বাংলা বর্ণমালার কোনো উল্লেখযোগ্য সংশোধন সাধিত হয় নি, অথচ বহু পূর্বেই তাঁর সংকেত আমাদের গ্রহণ করা উচিত ছিল।

ইন্দ্রনাথের সুদীর্ঘ আলোচনা থেকে পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা উদ্ধার করলে তাঁর যুক্তিধারা সম্পূর্ণ অনুসরণ করা যেতে পারে। কিন্তু উৎসাহীরা সমগ্র প্রবন্ধটিই পড়ে নেবেন—এই আশা করে তাঁর বক্তব্যের কিছু অংশ উদ্ধৃত করি:

"আমাদের 'ঐ'কার বস্তুতঃ ওই, আমাদের 'ঔ'কার বস্তুতঃ ওউ। এই কারণে 'কৈ' লিখিতে কেহ 'ক'তে ঐকার লাগাইয়া দেন, কেহ বা ক'র পরে একটি ই বসাইয়া দেন। ব'য়ে ঔকার বৌ, কি ব উ বউ, এ প্রশ্ন তুলিলে দাঙ্গা হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা। তাহার পর হ্রস্বই কি আর দীর্ঘই কি, মূর্ধণ্য স্ববর্ণ এবং দন্ত্য স্বরবর্ণ বাঙ্গালাতে মোটেই নাই। সংস্কৃত ঋ বাঙ্গালায় 'র'তে ইকার, সংস্কৃত '৯' বাঙ্গালার ল'তে ইকার। তবেই বুঝা গেল যে, স্বরমালার সঙ্কেতগুলি এবং তাহাদের ক্রমবিন্যাস আমরা দৃষ্টতঃ লইলেও কাজে লই না। অবেই সংস্কৃত স্বরমালা কোনও মতেই বাঙ্গালার স্বরমালা হইল না।"

সমস্যা ব্যঞ্জন বর্ণেও। ঞ এবং দন্ত্য ন উচ্চারণের ক্ষেত্রে তালগোল পাকিয়ে আছে—'ঞ' কখনো দন্ত্য ন-এর মতো উচ্চারিত—যেমন যাচ্ঞা—'যাচ্না', আবার প্রাচীন 'গোসাঞি' শব্দ আনুনাসিক হয়ে গোসাঁই-এ পরিণত। মূর্ধণ্য ণ 'ষ' যোগে 'ট'-এর দিকে প্রসারিত—যেমন কিশ্ট, বিষ্টু। তিনটি উষ্ম বর্ণের এক 'ষ'-ই বাংলায় উচ্চারিত—"দন্ত্য 'স'কারের কদাচিৎ। তালব্য 'শ'কারের ব্যবহার আমি জানি না।" এ ছাড়া অন্তঃস্থ 'য' এবং 'ব' তো আধুনিক বাংলায় নেই-ই—তারা 'প' বর্গের সঙ্গে একাকার।

উদাহরণ ইন্দ্রনাথ অনেকভাবে দিয়েছেন। তাঁর মূল বক্তব্যের নিষ্কর্ষ এই যে বাংলা বর্ণমালাকে উপযুক্তভাবে পরিবর্তিত এবং সংস্কৃত না করলে বাংলা ভাষায় স্বাচ্ছন্দ্য আসবে না, প্রাণশক্তিও সঞ্চারিত হবে না।

"ফল কথা বাঙ্গালা ভাষার উপযুক্ত বর্ণসঙ্কেত অবধারিত না হইলে, বানানের গোলযোগ এবং বানান ভুলের বিভ্রাট অনিবার্য। মানুষ স্বভাবতঃ প্রচলিতের পক্ষপাতী, অল্পে প্রচলিতের আংশিক বিপর্যয় করিতেও কুণ্ঠিত, ইহা আমি জানি। কিন্তু আমি নিতান্ত উদ্ভট বা অতি নূতন প্রস্তাব যে উপস্থিত করি নাই, ইহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কতকটা পথ দেখাইয়া গিয়াছেন; তাঁহার বর্ণমালায় য়, ড়, ঢ়, ৎ, ঃ, ং যোগ করিয়া এবং তখনকার প্রচলিত ক্ষ আর সংস্কৃতের দীর্ঘ ৠ এবং দীর্ঘ ৡ-কার বাদ দিয়া তিনি ইঙ্গিত করিয়া গিয়াছেন যে, বাঙ্গালা ভাষার বর্ণমালা শোধনের বা সংস্কারের প্রয়োজন আছে।" এবং, নিঃসন্দেহে এই শোধন বা সংস্কার বাঙালীর উচ্চারণ অনুযায়ী অপ্রয়োজনীয় রক্ষণশীল বর্ণমালাকে সংস্কৃতের অনুরোধেই রক্ষা করতে হবে—ইন্দ্রনাথ এ চিন্তা কখনোই সমর্থন করেন না। দৃষ্টান্ত দিয়ে তিনি বলেছেন, তামিল বর্ণমালায় সংস্কৃতের অনেক বর্ণই অনুপস্থিত, কিন্তু তাতে তো তামিল ভাষিদের কোনো অসুবিধের সৃষ্টি হয় না।

একষট্টি বৎসর আগেকার এই প্রস্তাব নিঃসন্দেহে আজো প্রগতিশীল। বিদ্যাসাগর দীর্ঘ ৠ এবং ৯-এর হাত থেকে আমাদের মুক্তি দিয়েছিলেন, কিন্তু তার পরে কি বাংলা বর্ণমালায় একবিন্দু সংস্কার সাধিত হয়েছে? খুব সম্ভব—সঠিক বলতে পারি না—বর্ণমালার দিক থেকে চীনা এবং রুষ ভাষা বোধ হয় এখনো সব চাইতে বেশি রক্ষণশীল, কিন্তু চীনারা তাঁদের কয়েক হাজার চিত্রলিপিকে এখন কয়েক শো-র মধ্যে নিয়ে আসতে চাইছেন বলে শুনেছি—রুষীয় ভাষাতেও সংস্কার সাধনের চেষ্টা চলছে। কিন্তু বিদ্যাসাগরের পরে কিছু কিছু বিচ্ছিন্ন আলোচনার পরে, ইন্দ্রনাথের প্রবন্ধ রচনার একষট্টি বৎসর পরেও—বাংলা দেশে এ নিয়ে উল্লেখযোগ্য কোনো কাজই করা হয় নি। ফলে উচ্চারণের বিভ্রান্তি এবং বানানের বিশৃঙ্খলা একই ভাবে চলে আসছে। ফরাসী বর্ণমালায় বিদেশী শব্দ ছাড়া 'স'-র কোনো ব্যবহার নেই, ইতালীয় লিপিতে 'K'-র অভাব 'ch' দিয়েই মেটানো হয়; অনুরূপভাবে বাংলার বর্ণমালা কেন পরিমার্জিত এবং প্রয়োজনক্ষেত্রে বর্ধিত ও বর্জিত হবে না?

ইন্দ্রনাথ পর পর দেখিয়েছেন, সংস্কৃতের সন্ধি, লিঙ্গ, বিভক্তি, কারক, প্রত্যয়, সমাস—প্রতিটিই প্রায় ক্ষেত্রে বাংলার নিজস্ব ভাষারীতির উপরে অযথা হস্তক্ষেপ করে চলেছে। এগুলো কেবল শিক্ষার্থিদের বিপন্ন করে, পরশাসনের পীড়নের মতো বাংলা ভাষার স্বাধীনতাকে পদে পদে ব্যাহত করে, রাশি রাশি অসঙ্গতির সৃষ্টি করে। যেমন 'স্ত্রী-প্রত্যয়' সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে তিনি বলছেন:

"পাঁঠি বলিলেও চলে, মেদি ছাগল বলিলেও চলে, গয়লানি বলিলেও চলে বা গোয়ালাঝি, গোয়ালাবৌ, বা গোয়ালার মেয়ে বলিলেও চলে। পুরুষ মানুষও মানুষ, স্ত্রীও মানুষ। আবার বিশেষণেও স্ত্রীত্বের খাতিরে বহু বিচার করা না করা, বক্তার বা লেখকের সম্পূর্ণ ইচ্ছায়ত্ত। সুন্দর মেয়েটি, এ মেয়েটি কেমন সুন্দর, এ পুরুষটা খোঁড়া, ও মেয়েটি খোঁড়া ইত্যাদি প্রয়োগ ত নির্দোষ বটেই, সাদা, কালো, ময়লা, ফরসা, ভাল, মন্দ, ইত্যাদি শব্দের স্ত্রীত্ব সাধন মোটেই করিবার জো নাই। সংস্কৃত, হিন্দি, উর্দু, ফারসি—এত ঘনিষ্ঠ সংসর্গ করিয়াও বাঙ্গালাকে স্ত্রীত্ব প্রকরণে কোট ছাড়াইতে পারে নাই।"

অতএব, এই সব কারণেই বাংলা ভাষা

আজও তার কোনো নিজস্ব চরিত্র নিয়ে দাঁড়াতে পারল না। তার স্বরূপ নির্ধারণ করতে আমাদেরই হিমসিম খেয়ে যেতে হয়—আমাদের এক অবাঙালী লেখকবন্ধু সখেদে বলেছিলেন: "বাংলা? উ তো ভগোয়ানকি ভি নেহি আতা—" তাঁর এই মর্মপীড়ার জন্য বাংলার অন্তর্নিহিত অনিয়মগুলোই দায়ী। ইন্দ্রনাথ লক্ষ্য করেছিলেন, এক শ্রেণীর বুদ্ধিজীবী এ ক্ষেত্রে ইংরেজীর বাংলা তর্জমাই সব চেয়ে নিরাপদ বলে মনে করেন:

"আজিকালি আমরা গড়গড়ার মাথায় কলিকা বসাইয়া দিলে চাকরকে 'ধন্যবাদ' না দেওয়া অশিষ্টাচার মনে করি। আত্মীয়-স্বজনের বা বন্ধু-বান্ধবের সম্পদে বিপদে এখন আমরা 'সহানুভূতি' ঠেলিয়া দিই। সহানুভূতি ঠেলিয়া দিয়া 'যোগদান' করিতে পারি ত যোগদান করি, আর যোগদানে অসুবিধা বুঝিলে চা-চক্রে 'মনোযোগ প্রদান' করি।"

এ যেমন বাংলা নয়, তেমনি সংস্কৃত শব্দের এবং রীতির অপরিমিত ও অনিয়ন্ত্রিত প্রয়োগও বাংলা ভাষার যাত্রাপথ সুগম করে না। ইন্দ্রনাথের এই সব অভিযোগের আজও নিরসন ঘটেছে—এ কথা কি আমরা জোর দিয়ে বলতে পারি? এখন কি আরো বেশি করে আমরা ইংরেজিতেই চিন্তা করি না এবং সাংপ্রতিক সংস্কৃত-পন্থী পরিভাষার সঙ্গে এক বিচিত্র তির্যক পদ্ধতি মিশিয়ে বাংলা গদ্যরীতির যে নবায়ন ঘটছে, তা কি বাঙালীর ভাষা?

ইন্দ্রনাথ আশা করেছিলেন, "এখন হইতে একটুকু ভালো করিয়া লাগিলে অনতিদীর্ঘকাল মধ্যে বাঙ্গালী বাঙ্গালা ভাষার গৌরবে বাঙ্গালী বলিয়া পরিচয় দিতে আর কুণ্ঠিত হইবে না। অসাধারণ অধিকারীরা তখন অলঙ্কারস্বরূপে অন্য ভাষার সেবা করিবেন। কিন্তু তোমার আমার মতো লোককে, দেশের রাম, শ্যাম, যদু, মধুকে তখন আর ইংরেজির মুখাপেক্ষা করিতে হইবে না।"

সেই শুভদিন বাংলা ভাষায় যে আসে নি, সে-কথা বলব না। বিদ্যাসাগর-বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথ-প্রমথ চৌধুরী-রাজশেখর বসুর সাধনায় বাংলা ভাষা এবং সাহিত্যে "স্বর্ণযুগ" (ইন্দ্রনাথ হয়তো ইংরেজির অনুবাদ বলে 'স্বর্ণযুগে' আপত্তি করতেন) আমরা দেখেছি। কিন্তু তাঁর প্রধান প্রস্তাব—বাংলা বর্ণমালার সংস্কারে আমরা কতখানি অগ্রসর হয়েছি? এবং আচার্য সুনীতিকুমারের প্রয়াসের কথা সশ্রদ্ধভাবে স্মরণে রেখেও এ-কথাও কি জিজ্ঞাসা করা যায় না যে খাঁটি বাংলা ভাষার যথার্থ নির্দেশিকা বিজ্ঞান-সম্মত পূর্ণাঙ্গ ব্যাকরণ কি বাংলায় এখনো লেখা হয়েছে?

প্রকাশিত হইল ! প্রকাশিত হইল !

একটি ভিন্ন স্বাদের বই

মহৎ অনুপ্রেরণায় দিব্য অনুভূতিতে লেখা

পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব সম্পর্কে বহু

অনুদ্‌ঘাটিত তথ্যে সমৃদ্ধ

"Out of a handful of dust lacs of Vivekananda can be made by him—This Ramkrishna."

—Swami Vivekananda

ঠাকুর পরমহংসদেবের

আবির্ভাবের পূর্বাভাষ

ঘরে ঘরে রাখবার, প্রত্যেকের পড়বার মত বই

শ্রীজীবনকৃষ্ণ মাইতি রচিত

মূল্য মাত্র দুই টাকা

বসুমতী (প্রাঃ) লিঃ
কলিকাতা-১২

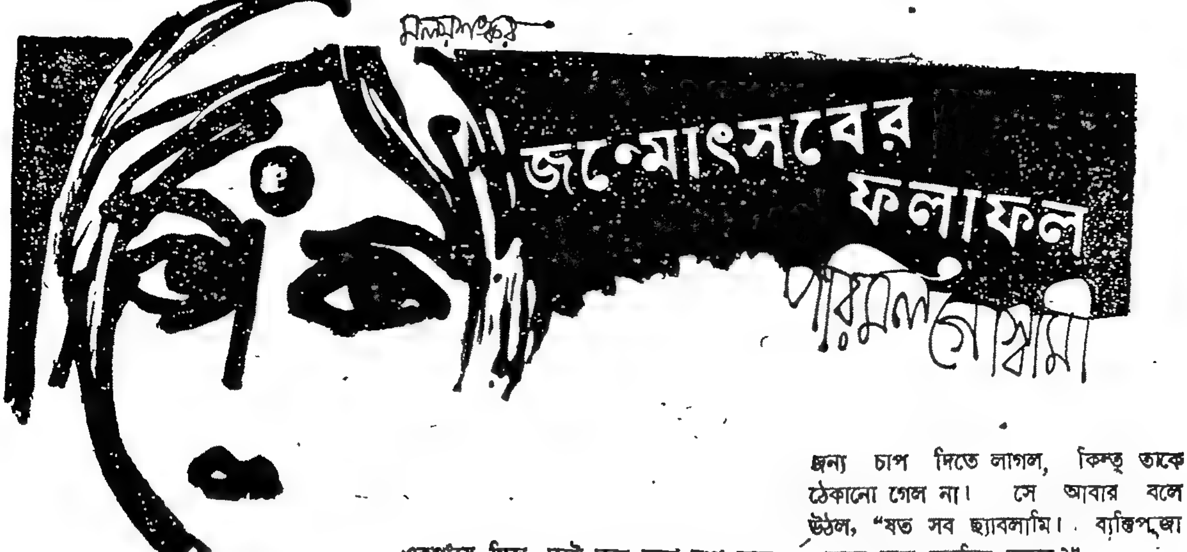

জন্মোৎসবের ফলাফল

পরিমল গোস্বামী

শ্রীমতী জয়ার চোখ দুটি স্বাভাবিক অপেক্ষা একটু বেশি বড়। কেউ বলে অত বড় চোখ ভাল না, কেউ বলে অমন চোখ না হলে ওকে মানাতই না।

সংসারে মতভেদ আছে। কিন্তু এই চোখের জন্য একজনকে হাত ভেঙে হাসপাতালে যেতে হবে তা কেউ ভাবতে পারে নি।

ব্যাপারটা রবীন্দ্র জন্মোৎসব নিয়ে। কলেজের একটি আয়োজন। কিন্তু সে আয়োজন সম্পূর্ণ হতে পারে নি, এবং শেষে যারা এসেছিল তারা শূন্য হল-ঘরে ভাঙা আসবাবপত্র দেখে ভেবেছিল ওখানে কোনো একটি ফাইনাল পরীক্ষা হয়ে গেছে।

সেদিন উগ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের সেখানে উপস্থিতিটা অনেকের ভাল লাগে নি, অথচ তাকে নিয়েই এই দুর্ঘটনা, এবং মার খেয়েছে ঐ উগ্রনাথই। তার আসবারই বা কি দরকার হয়েছিল? সে এ কলেজের ছাত্র নয়, দ্বিতীয়ত অভদ্র মন্তব্যের জন্য সে কুখ্যাত। কোনো বিষয়ে অন্যের সঙ্গে সে কখনো মত মেলাত না। মিল হবার সম্ভাবনা দেখলেই মত বদলে ফেলত। কিন্তু কি করে যে এই উৎসবে তার আবির্ভাব ঘটল সেও এক রহস্য। তার কোনো ভক্ত (তারও ভক্ত আছে সংসারে!) তাকে এনে থাকবে এখানে। তাকে বলা হয়েছিল একটি নতুন মেয়ে অদ্ভুত গান গায়, সে এই সভায় গান গাইবে। উগ্রনাথের লোভটা হয় তো এই কারণেই জেগে থাকবে। মেয়েটির অহঙ্কার চূর্ণ করা যাবে এই উপলক্ষে, কল্পনা করে উগ্রনাথ মনে মনে পুলকিত হয়েছিল।

ছেলেবেলা থেকেই সে সব বিষয়ে একগুঁয়ে ছিল, তাই তার বাবা রাগ করে তার ঐ নাম রেখেছিলেন। অবশ্য তিনিও কিছু অন্য রকম ছিলেন না। বংশগতি একটুখানি অ্যাসিড-আশ্রিত বীজমন্ত্রের ব্যাপার মাত্র, মানুষের হাত নেই ওতে। অতএব এ গল্পে আর অকারণ তার পিতাকে টানব না।

উগ্রনাথ নিজে যে জাতীয় মতবাদ প্রচার করত, তার মূল্যবান নমুনা কয়েকটি এই—রবি ঠাকুর নিষ্কর্মা, আরামে বসে বসে কবিতা লিখেছেন, সুভাষ বসু ছুটন্ত উল্কা, পরিণাম ভস্ম। গান্ধী সমস্ত জীবন সাধনা করে এক রামধুন ছাড়া দেশকে আর কিছুই দেন নি।—এই জাতীয় সব কথা। সে জন্য তাকে কেউ বিশেষ আমল দিত না, সে যা কিছু বলত গায়ে পড়ে।

তাকে দেখে, সেজন্য, তাকে যারা জানত তারা অস্বস্তি বোধ করেছিল। অথচ এসে পড়েছে যখন, উপায় তো নেই।

উদ্বোধনী সঙ্গীতটি মিলিতকণ্ঠে—"হে নূতন, দেখা দিক আর বার জনমের প্রথম শুভক্ষণ"—গাওয়া হল। সবাই এ গানে মুগ্ধ বিগলিত। গান মিলিত-কণ্ঠে হলেও একটি মধুর, এবং সতেজ কণ্ঠ অন্য সবার উপরে ভেসে উঠেছিল, তাকে পৃথকভাবে না চিনে উপায় ছিল না। মেয়েটি কে, উদ্যোক্তাদের কাছে কেউ কেউ চাপা গলায় জিজ্ঞাসা করেছিল।

উগ্রনাথের দুজন ভক্ত তাকে আগলে রেখেছিল, বলেছিল দোহাই তোমার চুপ করে থাক। কিন্তু গান শেষে স্তুতি আরম্ভ হলে তাকে আর ঠেকানো গেল না। সে হঠাৎ বলে উঠল জন্মদিন না শ্রাদ্ধদিন!

শ্রোতাদের মধ্যে সবাই টিটকারি দিতে আরম্ভ করল, একটা উত্তেজনার গুঞ্জন উঠল, উৎসবের সুর কেটে গেল। সবাই স্তম্ভিত, বিমূঢ়। উগ্রনাথের ভক্তরা তাকে আর একটি কথা যাতে সে না বলে তার জন্য চাপ দিতে লাগল, কিন্তু তাকে ঠেকানো গেল না। সে আবার বলে উঠল, "যত সব ছ্যাবলামি। ব্যক্তিপূজা এভাবে আর কতদিন চলবে?"

শ্রোতারা ভীষণ উত্তেজিত হয়ে উঠল। কিন্তু সভাপতি একটি কৌশল প্রয়োগ করলেন। তিনি বললেন, "আমি এবারে অনুরোধ করি শ্রীমতী জয়া মজুমদার একটি গান করুন।"—ভেবেছিলেন উত্তেজনা শান্ত হবে এতে। তাঁর অনুমান ভুল হয় নি। ঐ নামে সবাই চমকিত হল, যেন কত বড় একটা আরাম নেমে আসবে এই অভিশপ্ত পরিবেশে।

জয়া খুবই অল্পদিনের আবিষ্কার। তার সেদিন সেই উদ্বোধনী সঙ্গীতের মিলিত কণ্ঠ ছাপিয়ে-পড়া সুরে মুগ্ধ হয় নি এমন পাষণ্ড (উগ্রনাথ ছাড়া) সেখানে আর কেউ ছিল না। তার শুধু কণ্ঠ মাধুর্য নয়, রবীন্দ্রসঙ্গীত বিষয়ে যে চেতনা থাকলে, কণ্ঠে যে আত্মবিশ্বাসপূর্ণ তেজ থাকলে, সুরের যে পরিপূর্ণতা থাকলে এবং সুরের শেষ সীমা পর্যন্ত কণ্ঠের যে অনায়াস গতি থাকলে রবীন্দ্র-সঙ্গীত গাইবার অধিকার জন্মে তা তার আছে। তাই সে যখন সভাপতির নির্দেশে প্রোগ্রাম বহির্ভূত গান গাইবার জন্য যন্ত্রের দিকে একবার ফিরে তাকিয়ে গুন গুন করে সুরটা ধরিয়ে দিতে উদ্যত হল তখন সবার দৃষ্টি যেন পুনরায় অভিসৃত হল একটি নাভিতে। সে নাভি তার চোখের তারায় না নাকের ডগায় বলা কঠিন। কারণ ইতিমধ্যেই শ্রোতাদের মধ্যে কিছু মতভেদ ঘটেছে। অধিকাংশের মতে জয়ার শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ তার চোখ, বাকি অল্প কয়েক-জনের মতে, তার নাক। ইংরেজীতে যাকে স্নাব নোজ বলে, তার অনেকটা তাই। দুই ভ্রূর মাঝখান থেকে সোজা নেমে এসেই উঁচু হয়ে উঠেছে। আর্টিস্টের চোখে সুন্দর।

গান আরম্ভ হল—"পাখী বলে চাঁপা আমারে কও, কেন তুমি হেন নীরবে রও।"—গান যেন মূর্তি ধরে সবার চোখের সম্মুখে ভাসতে লাগল। একটা আনন্দের

আবেশে সবাই অভিভূত—"চাঁপা শুনে বলে হায় গো হায়, যে আমারি গাওয়া শুনিতে পায়, নহ নহ পাখি, সে তুমি নও।"—শুনে সবাই বিগলিত।

উগ্রনাথ মনে করল এ তাকেই ঠাট্টা করে বলা হচ্ছে। তাকে চ্যালেঞ্জ করা হচ্ছে। সে মনে মনে চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে সুযোগের অপেক্ষা করতে লাগল। আক্রমণটা কিভাবে চালাবে মনে মনে তার পরিকল্পনা করতে লাগল। গান চলছে। শ্রোতারা আবিষ্ট। উগ্রনাথেরও প্ল্যান পাকা। সে দুটি দিক থেকে আক্রমণ করবে ঠিক করল। যুদ্ধের ভাষায় যাকে পিন্‌সার বলে। প্রথম আক্রমণ—সে চেঁচিয়ে বলে উঠল, "একেও গান বলতে হবে? এ তো ডায়ালগ। নির্বোধ পাখী ধূর্ত চাঁপার পাল্লায় পড়ে হিমসিম খাচ্ছে।"

এমন মন্তব্যে আবার হট্টগোল আরম্ভ হল। জয়া তো কেঁদেই ফেলল। কিন্তু যারা উগ্রনাথকে আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল তাদের জোর করে থামিয়ে রাখা হল। ওদিকেও মডারেটর ছিল, তারা সহজে উৎসবটাকে পণ্ড হতে দিতে নারাজ।

কিন্তু এতে উগ্রনাথের সাহস আরও বেড়ে গেল। সে হট্টগোলের মধ্যে তার দ্বিতীয় অস্ত্রটি ছাড়ল। বলে উঠল, "গায়িকা শুধু তার চোখ দেখিয়ে সভায় বাহবা নিতে এসেছেন। কিন্তু ঐ চোখ স্বাভাবিক চোখ নয়, অতিবাস চোখ, নির্বোধেরা তা দেখে মনে করেছে কি না কি। আর অমন বল-পয়েন্ট নাকও অনেক শিশুরই আছে।"

উগ্রনাথ ঐ গানের কল্পিত চ্যালেঞ্জের জবাব এইভাবে দিল। তার মুখে তখন এক পৈশাচিক আনন্দ, সে তখন ক্ষিপ্ত, উত্তেজনার আবেগে কম্পমান।

এই অনাহূত ইতর এবং অশোভন মন্তব্যের পর মারমুখীদের আর ঠেকানো গেল না, তারা তড়িৎগতিতে উগ্রনাথের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। সভা ভেঙে গেল তুমুল হট্টগোলের মধ্যে। পরে দেখা গেল উগ্রনাথের একখানা হাতও ভেঙে গেছে, তার নাক দিয়ে রক্ত ঝরছে। নাকের নিন্দায় নাকের উপর জবাব নাকভক্তদের পাল্টা আক্রমণ। এরপর অ্যাম্বুলেন্স ইত্যাদির পর্ব। এবং এই ঘটনা নিয়ে একটা দলের মধ্যে প্রাণের সাড়া জেগে উঠল। এমন মুখরোচক আলোচনার অনেকদিন সুযোগ পাওয়া যায় নি—এমন দন্তের দমনও চোখের সামনে ইতিপূর্বে দেখা যায় নি।

॥ দুই ॥

এরপর প্রায় পনেরো দিন কেটে গেছে। উগ্রনাথ একটি বড় নার্সিং হোমে আরোগ্য লাভ করছে। ভাঙা হাতে প্ল্যাস্টার ব্যাণ্ডেজ।

তবে একটা উপকার তার হয়েছে। সে এ ক'দিন শুয়ে শুয়ে কিছু আত্ম-চিন্তার অবকাশ পেয়েছে। এই কাজটির পক্ষে নার্সিং হোম শ্রেষ্ঠ স্থান। তাঁর মতেরও বদল ঘটতে আরম্ভ করেছে, তার মনে প্রশ্ন জেগেছে, "যা করেছি তা কি ঠিক?" এ রকম একটি প্রশ্ন যে নিজেকেই করা যায়, এ ধারণা তার কখনো ছিল না। নিশ্চয় হাত ভাঙার ফল। যাঁদের মত অনড় বলে ধারণা, তাঁরা নিজ নিজ হাত ভেঙে পরীক্ষা করে দেখতে পারেন। অবশ্য অনেকের বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে জীবনের বহু ঘা খাওয়ার অভিজ্ঞতা থেকে উচ্ছলতা দমিত হয়। এক কবি এইভাবে "joy of elevated thoughts" উপভোগ করেছিলেন, আর এক কবি বললেন "চিনিলাম আপনারে আঘাতে আঘাতে।"—তবে উগ্রনাথ কবি নয়, তাই তার পরিবর্তন বিবর্তনের পথে নয়, বিপ্লবের পথে ঘটল। এতে সময় কম লাগে।

নার্সিং হোমে এসে প্রথম কয়েকদিন উগ্রনাথের মন আরও উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল, মনে হয়েছিল একবার বেরোতে পারলে হয়। কিন্তু যত দিন যেতে থাকে, তত তার মনের উত্তেজনা ক্লান্ত হয়ে ওঠে। শেষ পর্যন্ত মনে হল সুস্থ হয়ে উঠলে কিছুই করা হবে না। কিন্তু তার ক্রমে ধারণা হতে লাগল, জয়ার চোখ সত্যই সুন্দর। সম্ভব হলে তার কাছে গিয়ে ক্ষমা চেয়ে নেবে। বলবে—সে তার অহঙ্কার দাম্ভিকতা এবং উদ্ধত স্বভাবকে গঙ্গায় বিসর্জন দিয়ে এসেছে।

এ সব কল্পনা করে নিজেই খানিকটা হাসল। তার কি এমনই অধঃপতন ঘটল, মার খেয়ে? অদ্ভুত লাগছিল এমন কথা ভাবতে।

॥ তিন ॥

নার্সিং হোম থেকে প্রায় পাঁচ মাইল দূরে আর এক বাড়িতে আর এক ঘটনা ঘটল উগ্রনাথের অলক্ষ্যে। সেদিনের সব কথা এতদিনে গিয়ে পৌঁছল সদাশিব-বাবুর কানে। তিনি পশ্চিমদেশের কোনো এক কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন, বর্তমানে অবসর গ্রহণ করে কয়েক মাস হল কলকাতা এসেছেন। সম্প্রতি তিনি রবীন্দ্রনাথের দুটি গান—"নদী আপন বেগে পাগল পারা" ও "পাখি বলে চাঁপা আমারে কও"-কে মুখবন্ধরূপে ব্যবহার করে রবীন্দ্রনাথের সত্যদৃষ্টি নিয়ে একখানা গ্রন্থ রচনায় নিযুক্ত। ভাগ্যের পরিহাস—এই গান নিয়েই একটি সভায় এমন প্রলয়-কাণ্ড! এ তো অতি বিপজ্জনক কথা।

আত্মভোলা এই ব্যক্তিটি একটু বেশি রকম বিচলিত হয়ে পড়লেন। নিরপরাধ মেয়েকে অপমান করার জন্য ততটা নয়, যতটা রবীন্দ্রনাথের ঐ বিশেষ গানটি সম্পর্কে মন্তব্যের জন্য। তাঁর মন অস্থির হয়ে উঠল। "পাখী বলে চাঁপা আমারে কও"—এই গান ঐ যুবক বুঝতে পারে নি? কিন্তু আরও অন্যায় সেই যুবকের হাত ভেঙে দিয়েছে সবাই মিলে—এ তো আরও খারাপ। একজন সব ভুল বোঝে বলে তাকে মারতে হবে, এ বড়ই অন্যায়, বড়ই অন্যায়।

সদাশিববাবু অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়লেন। যে গানকে আশ্রয় করে তাঁর গ্রন্থ রচনা চলছে, সে গানের মর্মকথা তাকে বুঝিয়ে দেবার কি কেউ ছিল না? কোনো কবিকে স্থবির বলা একটা প্রচণ্ড ভ্রান্তি, একথাও কি কেউ তাকে শেখায় নি?

সদাশিববাবু অস্থিরভাবে পায়চারি করতে লাগলেন ঘরের মধ্যে। তাঁর যেন আর ধৈর্য থাকছে না। এখুনি ছুটে গিয়ে উগ্রনাথের কাছে বসে তাঁকে সব বুঝিয়ে বলবেন এমন চঞ্চলতা জাগল তাঁর মনে। অপরিচিত ভ্রান্ত যুবককে সত্যে দীক্ষা দিতে হবে।

পরদিন ঠিকানা সংগ্রহ করে, কাউকে না জানিয়ে তিনি দুপুরবেলা গিয়ে হাজির হলেন নার্সিং হোমে। তাকে যেমন করে হোক বোঝাতেই হবে যে সে ভুল করেছে। অহঙ্কারের স্ফীতি তার শুভবুদ্ধিকে চেপে নষ্ট করে দিয়েছে, তা দূর করতে হবে। কবির প্রতি তার অভিগম উল্টো দিক থেকে, এ জিনিস আর চলতে দেওয়া উচিত নয়। সে কি কিছুই চিন্তা করতে জানে না? দেখতে হবে আলাপ করে।

তিনি ক্যাবিনের নম্বর দেখে ভিতরে প্রবেশ করে বিনা ভূমিকায় তাঁর গম্ভীর, সম্ভ্রম জাগানো কাঁচাপাকা দাড়ি সম্বলিত চেহারা নিয়ে রোগীর পাশে গিয়ে বসেই রোগীকে কোনো কথা বলার অবসর না দিয়ে আবেগভরে বলতে আরম্ভ করলেন তাঁর নিজের কথা। মনে কথার ঝড় বয়ে যাচ্ছিল, ভূমিকা ইত্যাদি অনাবশ্যক বিষয়ে সময় নষ্ট করার মতো ধৈর্য তাঁর ছিল না। রোগী তো এই অপরিচিত ব্যক্তির চেহারা দেখেই মুগ্ধ হয়ে পড়েছিল, তার বল-বারও কিছু ছিল না।

সদাশিববাবু বলতে লাগলেন, মানুষ জীবনে নানা ভুল করে, কিন্তু সে ভুল বৃথা যায় না, ভুলের ভিতর দিয়েই আমাদের শিক্ষা সমস্ত জীবন ধরে চলে। রবীন্দ্রনাথ অথবা যে-কোনো যথার্থ কবি দার্শনিক বা চিন্তাশীল মানুষ কখনো স্থবির নন। কবি চলেন তাঁর কাব্যের ভিতর দিয়ে। দার্শনিক চলেন তাঁর

লিখিত চিন্তার ভিতর দিয়ে। সে চলা দেখা যায় না।

সদাশিববাবু এইভাবে সেই গানের তাৎপর্য বোঝাবার জন্য ভূমিকা করে নিলেন। তারপর বলতে লাগলেন, রবীন্দ্রনাথ এই কথাই তো বলতে চেয়েছেন তাঁর দুটি গানের ভিতর দিয়ে। এ কথা তিনি চাঁপা গাছ ও চাঁপা ফুলের মুখ দিয়ে বলিয়েছেন। একটি গানে বলা হয়েছে "নদী আপন বেগে পাগল পারা।" —এখানে চাঁপা গাছ এ কথা বলছে। বলছে, নদী নিজের বেগেই পাগলের মতো ছুটে চলে, কিন্তু আমার বাইরে কোনো গতি নেই, আমি তোমাদের চোখে অচল থাকি। কিন্তু আমিও চলি। আমার চলা গভীর পথে, অদৃশ্য পথে, সে চলা আমি গোপন রাখি। আমার সে চলা নব নব পত্রোদ্গমের পথে, ফুলের ধারা পথে। আমি চলি, কিন্তু সে চলা প্রকাশ করা যায় না, সে চলা আলোর পানে প্রাণের চলা, সে চলার আনন্দ আকাশের বুকে স্পন্দন জাগায়, নীরব তারা তা বুঝতে পারে।

সদাশিববাবু বিভ্রান্ত রোগীর দিকে চেয়ে একটুখানি থেমে বলতে লাগলেন, তুমি বুঝে দেখ, নদী আর চাঁপা গাছ—দুইই সচল। একটির চলা দেখা যায়, অন্যটি অনুভব করতে হয়। তুমি এই চাঁপা গাছের চলার সঙ্গে কবির চলা মিলিয়ে নিতে পার। কবি চলেন তাঁর কাব্যের পথে। শুধু তো একটি কবি নন, সকল কবি, দার্শনিক, চিন্তাবীর, যাঁরা আজ জীবিত, যাঁরা আজ বেঁচে নেই, তাঁরা সবাই চলেছেন, ছুটে চলেছেন যুগ থেকে যুগান্তরে। রবীন্দ্রনাথ সবার হয়েই ঐ দুটি গান গেয়ে গেছেন। দুটি গানের মর্মার্থ প্রায় এক।

বলতে বলতে সদাশিববাবুর চোখদুটি বুজে এলো, তিনি আরও গভীরে ডুবে গিয়ে একটা অদ্ভুত উত্তেজনার সঙ্গে বলে উঠলেন, ঐ যে, ঐ যে, আমি শুনতে পাচ্ছি তাঁদের চলার শব্দ, দেখতে পাচ্ছি তাঁদের চলার গতি, চলেছেন তাঁরা তাঁদের বাণীর পথে—বর্তমানের অতীতের, সকল কবি, সকল দার্শনিক। আমি দেখতে পাচ্ছি—

"কত বাণী দলে দলে
অলক্ষিত পথে উড়ে চলে
অস্পষ্ট অতীত হতে অস্ফুট
সুদূর যুগান্তরে।"

বলতে বলতে সদাশিববাবু কথা হারিয়ে ফেললেন, তারপর নীরব। যেন কথা বলে এই অন্তর্দৃষ্টিকে ভাঙতে চান না। ঘন ঘন নিশ্বাস পড়ছে তাঁর। যেন তিনি নিজেও ছুটছেন তাঁদের সঙ্গে।

মিনিট তিনেক এই সমাহিত অবস্থায় কাটার পর তিনি ধীরে ধীরে চোখ খুললেন। মুখে একটা গভীর তৃপ্তির ছাপ।

রোগী বিচলিত। তবু, আগন্তুক ব্যথা পাবেন জেনেও সত্য কথাটা তার বলা উচিত মনে হল। সে একটু ইতস্ততঃ করে বলল, আপনি বোধ হয় ভুল করে আমার ক্যাবিনে ঢুকেছেন।

সদাশিববাবু চমকে উঠে বললেন, ও! তিনি মূঢ় বিভ্রান্ত দৃষ্টিতে রোগীর দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন তোমার নাম উগ্রনাথ নয়?

আজ্ঞে না, আমার নাম চন্দ্রকান্ত সরকার, খেলতে গিয়ে হাত ভেঙেছি।

সদাশিববাবু কোনো কথা না বলে সোজা বেরিয়ে বাইরে এসে দাঁড়ালেন। সবটাই যেন কেমন অবাস্তব মনে হচ্ছিল তাঁর। বাইরের দিকে কিছুক্ষণ শূন্য দৃষ্টিতে চেয়ে থেকে পিছন ফিরে ক্যাবিনের নম্বর ভাল করে দেখলেন। ১৩! এই ১৩কে তিনি ২৩ দেখেছেন এর আগে।

॥ চার ॥

উগ্রনাথ তার প্ল্যাস্টার করা হাত নিয়ে ২৩ নম্বর ক্যাবিনে আপন চরিত্র বিশ্লেষণ করছিল এবং তাতে বেশ কৌতুক অনুভব করছিল। মাত্র পনেরো দিনের মধ্যে তার এমন রূপান্তর ঘটবে সে কথা তার স্বপ্নেরও অগোচর ছিল। তার এখন দৃঢ় প্রত্যয় জন্মেছে যে, জয়ার চোখ দুটি অস্বাভাবিকও নয়, অতিকায়ও নয়। তার নিজের অহঙ্কারই ভালকে বিকৃত করে দেখেছে। যে জিনিস যেমন তা তার পছন্দ ছিল না। এই অভ্যাসকে প্রশ্রয় দিয়েই তার এই দুর্দশা।

কিন্তু জয়ার দুটি চোখ! কেন বার বার মনে পড়ে? এই চোখ নিয়ে সে কি অসভ্য বিদ্রূপই না করেছেন! এখন মনে হচ্ছে সে চোখের তুলনা নেই। এ কথা এখন কি করে সে কাউকে বলে? কে বিশ্বাস করবে তার কথা? বন্ধুরা দু-একজন সন্ধ্যায় দেখা করতে আসে, কিন্তু এ বিষয়ে একটি কথাও বলা হয় নি তাদের। বিপক্ষকে পাল্টা আক্রমণের পরিকল্পনা নিয়েই তারা আলোচনা করে।

এইভাবে শুয়ে শুয়ে উগ্রনাথ নিজের চরিত্রের কথা ভাবছিল একাগ্র মনে। এমন সময় সদাশিববাবুর প্রবেশ ঘটল তার ক্যাবিনে। তাঁকে দেখে উগ্রনাথ সর্বাঙ্গে চমকে উঠল। গায়ে গলাবন্ধ কোট, হাতে ছাতা, মুখে শাদাকালো চাপ দাড়ি—এ কার আবির্ভাব ঘটল হঠাৎ? কি প্রকাণ্ড দুটি চোখ! সেই চোখ দুটির উপর মোটা মোটা দুটি ভ্রূ, সেও শাদায় কালোয় মেশানো। উদার করুণ দৃষ্টি। সে দৃষ্টিতে সম্মোহন শক্তি আছে, সেদিকে চেয়ে সে আর চোখ ফেরাতে পারল না। কে এই ব্যক্তি? এবং এখানে কেন? এমন একটি প্রবল এবং ঋজু মানুষটির উদ্দেশ্য কি।

সদাশিববাবু প্রশ্ন করলেন, তোমার নাম উগ্রনাথ?

আজ্ঞে হাঁ।

আমার নাম সদাশিব মজুমদার, আমাকে চিনবে না, কলকাতায় নবাগত। আমি তোমাকে দেখতে এসেছি, কিছু কথা আছে।

মোহগ্রস্তের কণ্ঠে যান্ত্রিক উচ্চারণে উগ্রনাথ বলল বসুন।

তার এ এক অভিনব অভিজ্ঞতা। বহু রকম মানুষ দেখলেও এমন প্রবল ইচ্ছাপূর্ণ মানুষ সে আর দেখে নি। চোখের কথাও মনে এলো। বড় চোখের কথা ভাবছিল এতদিন, আবার বড় চোখ? এটাই কি এখনকার ফ্যাশন?

সদাশিববাবু ধীর কণ্ঠে বলতে লাগলেন, মাত্র আজই তোমাদের সেই জন্মোৎসব সভার কথা কানে এলো।

উগ্রনাথ ভয়ে চমকে উঠল এ কথায়। দু-এক ঘা মারতে এসেছেন কি এই ভদ্রলোক? কিন্তু চেহারা দেখে সে কথা বিশ্বাস করা শক্ত।

সদাশিববাবু বলতে লাগলেন, খুব বেদনা পেয়েছি শুনে। তুমি সেখানে যে মতই প্রকাশ করে থাক, তোমার উপর আক্রমণটা আমি পছন্দ করি না। আমি বাইরের মানুষ, তোমাদের শহরে অল্পদিন এসেছি। কিন্তু এমন ঘটনা এখানে ঘটে শুনে আমি অত্যন্ত বিচলিত হয়েছি।

উগ্রনাথ নিশ্চিন্ত হল এ কথায়। বলল, আমারই দোষ। উপযুক্ত শাস্তিই পেয়েছি। আমি একটি গান সম্বন্ধে যা-তা বলেছিলাম। গায়িকাকে অপমান করেছিলাম।

মত প্রকাশের অধিকার সবারই আছে, তবে অকারণ গায়ে পড়ে কাউকে আঘাত করতে নেই।

কিন্তু আমি গায়ে পড়েই আঘাত দিয়েছিলাম গায়িকাকে আর যা বলেছিলাম, তা আমার মত নয়, অভদ্র ভাষায় ঠাট্টা।

আমি শুনেছি তুমি পাখী ও চাঁপার গান সম্বন্ধে বলেছ ওটা গান নয়, ডায়ালগ।

এখন আমার মত বদল করেছি, ভুল বুঝতে পেরেছি।

সদাশিববাবু একটু নড়েচড়ে বসে স্থির দৃষ্টিতে উগ্রনাথের দিকে চেয়ে বলতে লাগলেন, এ তো শুধু মত বদলের কথা নয়। বদলের ইচ্ছা হলে তোমার দৃষ্টিভঙ্গীটাই বদলাতে হবে। মূলে যদি ভ্রান্তি থাকে তবে শাখা-প্রশাখা বদলে কিছু লাভ হয় না।

কিছুক্ষণ দুজনেই নীরব। তারপর সদাশিববাবু বলতে লাগলেন, যে গান তুমি পছন্দ কর নি, সেই গানকে উপলক্ষ করেই আমি একখানা বই লিখতে আরম্ভ করেছি। ঐ গানে একটা সত্যের প্রকাশ আছে। পাখী চাঁপা ফুলের নীরব অচল রহস্য বুঝতে পারে নি তাই সে তাকে প্রশ্ন করে তার রহস্যটা বুঝতে চেষ্টা করেছে, তাই না? চাঁপা বলেছে, "আমিও গান গাই, তা তুমি শুনতে পাও না। আমিও পাখা মেলি, কিন্তু তুমি তা দেখতে পাও না।" আবার এই গানেরও ভূমিকা আছে/আর একটি গানে। সে গানটি চাঁপা গাছের গান। তার প্রথম লাইন "নদী আপন বেগে পাগল পারা।" এই দুটি গানই আমার নতন রচনার মুখবন্ধ।

সদাশিববাবু কিছু আগেই অনেক কথা তিনি অন্য ক্যাবিনের রোগীর কাছে বলে এসেছেন, তাই তাঁর মন কিছু ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। তিনি যেন আপন মনেই বলতে লাগলেন, উগ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ কত-ভাবে তাঁর উপলব্ধ সত্য তাঁর নানা রচনায় প্রকাশ করে গেছেন, তুমি একটু চিন্তা করলেই ক্রমে বুঝতে পারবে। চিন্তা করবে এ বিষয়ে। কিন্তু চিন্তার মতো মনের ভাব পেয়েছ কি?

উগ্রনাথের কানে এ সব কথা অস্পষ্ট প্রবেশ করছিল। একই সঙ্গে বহু পরস্পরবিরোধী চিন্তা তার মনে তখন ঝড় তুলেছে। তার মন তখন ছুটে গেছে সেই অপমানিত বেদনাহত মেয়েটির কাছে। সদাশিববাবু দৃষ্টি আরও একটু গভীরে চালনা করলে দেখতে পেতেন উগ্রনাথের জীবনটাই একেবারে বদলে গেছে। যে হাতে এতদিন দুনিয়ার বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাবে ভেবেছিল, সেই হাত কোন্ এক অদৃশ্য শক্তি ভেঙে দিয়ে তার মনটাকে অন্তর্মুখী করে দিয়ে গেছে। তাই সে এখন আর উগ্রনাথ নয়, এখন সে নিজেরই কাছে পরাভূত এক অসহায় যুবক।

ক্লান্ত সদাশিববাবু ওকে অন্যমনস্ক দেখে আস্তে আস্তে উঠে চলে যাচ্ছিলেন। বহু কথা বলবার ছিল, কিন্তু এখন আর ইচ্ছা হচ্ছে না। তাঁর প্রথম উৎসাহটা নষ্ট হয়ে গেছে অন্য ক্যাবিনে।

উগ্রনাথ তাঁকে উঠতে দেখে বলল, সদাশিববাবু, আমারও কথা আছে। আমি শুধু টাকার জোরে সবাইকে ছোট করে দেখেছি এতদিন। আমার প্রকৃত বন্ধু কেউ নেই সংসারে। আমাকে কেউ ভালবাসে না। ভেবেছিলাম টাকা থাকলে সবাইকে অগ্রাহ্য করে চলা যায়, অভদ্র হওয়া যায়, ইতর হওয়া যায়। সে ভুল আমার একেবারে ভেঙে গেছে। আমি আজ আপনার কাছে কৃতজ্ঞ।

সদাশিববাবু এ কথায় কিছু উৎসাহিত বোধ করে পুনরায় আসন গ্রহণ করলেন।

উগ্রনাথ বলতে লাগল আমার হাত সক্ষম থাকলে উঠে আপনাকে প্রণাম করতাম। আপনি অপরিচিত হয়েও আমার কাছে ছুটে এসেছেন আমাকে ক্ষমা করতে, আমাকে বোঝাতে যে আমি অন্যায় করেছি, এ এক আশ্চর্য ব্যাপার। অন্যায়ের বোধ আমার নিজের মনেও জেগেছে, কিন্তু আপনি এসে আমাকে সমর্থন জানালেন, এ আমি চিরদিন মনে রাখব। এখন আপনার কাছে একটি পরামর্শ চাই।

কি, বল।—সদাশিববাবু আরও উৎসাহিত হয়ে উঠলেন।

উগ্রনাথ গভীর আন্তরিকতার সঙ্গে বলতে লাগল, যে গায়িকা মেয়েটিকে আমি অভদ্রভাবে অপমান করেছি, তার কাছে আমি ক্ষমাভিক্ষা করতে চাই, আপনি কি দয়া করে আমার পক্ষ থেকে বুঝিয়ে দিতে পারবেন যে আমি সত্যই অনুতপ্ত? সেরে উঠলে তার কাছে আমি নিজে গিয়ে ক্ষমা চেয়ে নেব। আপনি যদি এ বিষয়ে আমাকে সাহায্য করেন। আমি অযাচিত-ভাবে আপনার অনুগ্রহ লাভ করেছি, আশা করি এইটুকু থেকে আমাকে বঞ্চিত করবেন না। আপনি বললে সে নিশ্চয় বিশ্বাস করবে। আমি আপনাকে বন্ধুর মতো অনুরোধ জানাচ্ছি, ত্রুটি যদি কিছু হয়, আপনি নিশ্চয় আমাকে ক্ষমা করবেন।

সদাশিববাবু কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইলেন। তারপর উঠে দাঁড়ালেন। তখনও নীরব। প্রায় তিন মিনিট কেটে গেল। দৃষ্টি উগ্রনাথের দৃষ্টিতে নিবদ্ধ। তার অন্তরটা বুঝতে চেষ্টা করলেন। তারপর বললেন, তোমার উপর নির্ভর করতে পারি?

সম্পূর্ণ।

তোমার অনুতাপ সত্য?

সত্য।

তাহলে তোমাকে সাহায্য করব।

কি বলে কৃতজ্ঞতা জানাব জানি না। তার ঠিকানা আমি কয়েকদিনের মধ্যেই আপনাকে জানিয়ে দেব। আপনার ঠিকানা-টাও আমার জানা দরকার।

সদাশিববাবু মৃদু হেসে বললেন, সে আমারই কন্যা।

বৈষ্ণব-সাহিত্যের অমূল্য অবদান

ভক্তিজগতের কৌস্তুভরত্ন, ভগবদ্ভক্তগণের সাধনার ধন, ভক্তের তুলসী-মাল্য সদৃশ মহাপবিত্র ভক্তিশাস্ত্র সমন্বয়।

বৈষ্ণব গ্রন্থাবলী

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রলাপ ও শিক্ষাষ্টক

শ্রীচৈতন্যদেবের শ্রীকৃষ্ণলাভের জন্য যে উৎকণ্ঠা, এই 'প্রলাপে' তাহা অভিব্যক্ত। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখনিঃসৃত 'শিক্ষাষ্টক শ্লোকই' তাঁহার একমাত্র রচনা। শ্রীল কৃষ্ণদাস গোস্বামীর সুললিত পদ্যানুবাদে এই অমিয় মাধুরী লীলায়িত।

নরোত্তম বিলাস

বৈষ্ণবগণের পরম উপভোগ্য উপজীব্য ভক্তিচরিতামৃত।

দুর্লভসার

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল-রচয়িতা শ্রীল লোচনদাস বিরচিত, বৈষ্ণবগণের সংপূজিত।

আত্মতত্ত্ব

বৈষ্ণব দর্শনের সূক্ষ্মতম অনুসরণ।

মনঃশিক্ষা

শ্রীপ্রেমানন্দ দাস ঠাকুর বিরচিত। বৈষ্ণব-সিদ্ধান্ত সাধন-ভজনের নিগূঢ় মর্মসমাহিত।

শ্রীচমৎকার চন্দ্রিকা

পরম পণ্ডিত শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী প্রণীত সংস্কৃত গ্রন্থ হইতে তাঁহার সুযোগ্য শিষ্য পরম বৈষ্ণব শ্রীল কৃষ্ণদাসের সুললিত পদ্যানুবাদ।

পাষণ্ড-দলন

মূর্তিমান বৈরাগ্য শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর বিরচিত প্রেমভক্তির লহর-লীলা।

ভক্তিতত্ত্বসার

হাটপত্তন, শ্রীশ্রীগুরুবন্দনা, নাম-সংকীর্তন, চৌত্রিশ পদাবলী, শ্রীকৃষ্ণের অষ্টোত্তর শতনাম, নরোত্তম দাসের প্রার্থনা, প্রেমভক্তি চন্দ্রিকা। সুলভে নামমাত্র মূল্যে বিতরিত।

মূল্য : ৫·০০

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড : ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলি-১২

সোনার জহুরী

শ্রী অন্নদাশঙ্কর রায়

বাউলদের মুখে শোনা যায়—

"কমলবনে কে আসিল সোনার জহুরী
নিকষে কষয়ে কমল আ মরি আ মরি!"

জহুরীও ভালো, নিকষও ভালো, কিন্তু কমলের পক্ষে নয়, সোনার পক্ষে। এই সামান্য কথাটা মনে থাকলে সোনার সমঝদার যিনি তিনি কমলের সমঝদার হতে রাজী হতেন না। কিন্তু কথাটা তাঁরও মনে থাকে না, যাঁদের চোখে সোনার দামই বেশী তাঁরাও মনে করিয়ে দেন না। তাই অনেক সময় সোনার জহুরী এসে কমল পরীক্ষা করেন।

নীতির বেলা বা আইনের বেলা বা সাংসারিক লাভলোকসানের বেলা যাঁর বিচার শিরোধার্য রুচির বেলা তাঁর রায় হয়তো নির্ভরযোগ্য নয়। আবার রুচির বেলা যাঁর অভিমত নির্ভরযোগ্য তিনিও হয়তো শিল্পকর্মের প্রকৃতি ও উদ্দেশ্য সম্যক অবগত নন।

বিধাতা আমাকে যেমনটি গড়েছেন, আমি তেমনিটি। তার চেয়ে ভালোও নই, তার চেয়ে খারাপও নই। আমি যদি আমার প্রকৃতির প্রতি সত্য হয়ে থাকি তবে আমি যা হবার তাই হয়েছি। আমাকে আরো ভালো করতে গিয়ে অসত্য করে তোলা বিধাতার অভিপ্রায় নয়। তা যদি হতো তবে তিনি আমাকে না গড়ে আরেকজনকে গড়লেই পারতেন। আমাকে যারা চায় তারা আমার স্বকীয়কেই চায়, আমার উত্তমকে নয়।

উপরে যা বলা হলো তা যেমন প্রত্যেকটি মানুষের ক্ষেত্রে খাটে তেমনি প্রত্যেকটি শিল্পসৃষ্টির ক্ষেত্রে। কাব্য যদি তার প্রকৃতির প্রতি সত্য হয়ে থাকে তবে যা হবার তাই হয়েছে। তার অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য যদি সিদ্ধ হয়ে থাকে তবে সে যেমনটি হয়েছে তেমনিটিই ভালো। চিত্র বা নৃত্য সম্বন্ধেও সেই কথা।

এক একটি সৃষ্টি এক একটি বিশেষ রূপ ধারণ করে আসে। সঞ্চার করতে আসে এক একটি বিশেষ রস। বিশেষের একটা মূল্য আছে। সেইজন্যেই তার আদর। আর সব গুণ বাড়তি গুণ। নীতির দিক থেকে, রুচির দিক থেকে অনবদ্য হলে সেটা হবে বাড়তি গুণ। আইনের দিক থেকে, বাজারের দিক থেকে মার না খেলে সেটাও হবে তেমনি বাড়তি গুণ।

কিন্তু যেখানে বিশেষ বলে কোনো রস বা রূপ নেই সেখানে ভালো বলে একটি গুণ তার জায়গা নিতে পারে না। নীতিবোধ যাকে ভালো বলে রসবোধ বা রূপবোধ হয়তো তাকে নিয়ে কিছু একটা সৃষ্টি করতে অক্ষম হয়।

সাহিত্যে ইতিপূর্বে এত বেশী নীতিমূলক কাহিনী বা কাব্য লেখা হয়ে গেছে যে নীতির গন্ধ পেলেই একালের পাঠকরা দৌড় দেন। তেমনি রুচিতেও অরুচি ধরে গেছে অনেকের। গুছিয়ে লেখা দেখলেই সন্দেহ হয় যে বানিয়ে লেখা। বানিয়ে লেখার উপরেও অনেকে ক্ষিপ্ত। জীবন যদি মসৃণ না হয় তো সাহিত্য মসৃণ হবে কী করে! এলোমেলো এবড়োখেবড়ো রচনাই তাঁদের পছন্দ। চেতনার স্রোত বলা হয় যাকে তার গতি আঁকাবাঁকা উল্টোপাল্টা মাথামুণ্ডুহীন।

এমনি করে এসেছে অ্যাবসার্ড নাটক। সোনার জহুরীদের সম্পূর্ণ দুর্বোধ্য। হাজার চেষ্টা করেও সে নাটকের সংস্কার ঘটানো যাব না। তাকে আরো ভালো বা কম মন্দ করা অসম্ভব। নাটকের সঙ্গে ঝগড়া করে কী হবে। জীবনটাই অ্যাবসার্ড। তার সঙ্গে ঝগড়া করতে চাও তো করো গে।

— অ্যাবসার্ড নাটকেরও একটা বিশেষ রূপ ও বিশেষ রস আছে। সেই জন্যে তা সাহিত্যের ঘরের জিনিস। তার বিচার হবে সাহিত্যের নিজস্ব নিকষে। সেটা দিয়ে শুধু সাহিত্যেরই পরীক্ষা হয়, সোনার পরীক্ষা হয় না। জীবনের এক এক বিভাগের জন্যে এক এক নিকষ আছে। নীতির নিকষ বিজ্ঞানে অচল। বিজ্ঞানের নিকষ সাহিত্যে অচল।

কোথাও হয়তো একটা সবতাল চাবী আছে, যা দিয়ে সব কটা তালা খোলা যায়। জীবন যদিও বহুধা বিভক্ত তবু মূলে তো এক। নিকষও তা হলে একটাই হবে না কেন? কিন্তু এখন পর্যন্ত আমরা সেই সবতাল চাবীর সন্ধান পাইনি। ধর্মকেই এককালে সর্বক্ষেত্রের উপযোগী নিকষ মনে করা হতো। ধর্মের জহুরীদের বিচারই ছিল শেষ বিচার। কিন্তু মানব ইতিহাসের সেই স্বর্ণযুগ এখন বহু পশ্চাতে পড়ে আছে।

ধর্মের স্থান নিতে চেষ্টা করেছিল নীতি। কিন্তু নীতির জহুরীরাও বিকল্প কিছু সৃষ্টি করতে বা করাতে পারেননি। নেতি নেতি বলে তৈরি জিনিসকে বাতিল করা এক, ইতি ইতি বলে নতুন জিনিস তৈরি করে তোলা আরেক। নীতির বিচারে যেটা নিখুঁত বলে গণ্য হলো লোকে তার দিকে ফিরেও তাকায় না। দেখা গেল পাপের উপরেই তাদের পক্ষপাত। অবশ্য পাপের জন্যে অনুতাপ বা শাস্তিবিধান থাকারও তারা পক্ষপাতী। পাপ জিতে যাবে এটা তো তারা চায় না। পাপও থাকবে, পাপের পরাজয়ও থাকবে। আর নয়তো পাপের থেকে পাপীর পরিত্রাণ।

টলস্টয়, ডস্টয়েভস্কির মতো ছাড়িয়ে

রিস্ট ওয়াচ
মাত্র ৬, টাকায়
আমাদের চেন পদ্ধতি স্কীমের মাধ্যমে মাত্র ৬, টাকায় ৫ বৎসরের গ্যারান্টী সমেত ৫ জুয়েল রিস্ট-ওয়াচ লাভ করুন। ডাকমাশুল ১/১৫ টাকা অতিরিক্ত।

দ্রষ্টব্য : আমাদের মধ্য-চন্দ্রিমা সেন্টের বিক্রয় বৃদ্ধির জন্যই এই স্কীম চালু করা হইল। পছন্দ না হইলে মূল্য ফেরৎ।

SWISS WATCH
TRADING CO.
P. B. 87, (WBC) Jullundur City.

আমরা অনেক দূরে চলে এসেছি। পাপ দেখতে চাইলে যত খুশি দেখাতে পারি, কিন্তু পাপের জন্যে অনুতাপ বা শাস্তি-বিধান বা তার থেকে পরিত্রাণ কি জীবনে দেখতে পাই যে সাহিত্যে দেখাব? সে ভার জীবনবিধাতার উপর ছেড়ে দেওয়াই ভালো। তিনি হয়তো একভাবে না একভাবে শাস্তি দেন, আমরা খোঁজ রাখিনে। পরিত্রাণও ঘটে হয়তো। আমরা খবর পাইনে। বাধ্য হয়ে মানতে হয় সেই দর্শন যে বলে পাপই পাপের পরিণাম, পুণ্যই পুণ্যের পুরস্কার।

পাপ পুণ্যের মাঝখানে অনেকগুলি স্তর। যেমন শাদা কালোর মাঝখানে অনেকগুলি রং। আধুনিক শিল্পী চরম-পন্থী নন। তিনি মধ্যপন্থী। তিনি সহসা কোনো সিদ্ধান্তে উপনীত হন না। শেষটা অনির্দিষ্ট রেখে দেন। 'মরাল' ও 'ইম্‌মরাল' ছাড়া আরো একটা কথা আছে। তাকে বলে 'আমবাল'। আজকালকার আর্টে 'আমরাল' চারদিকে ছড়ানো। কিন্তু তাকেই লোকে ভুল করে ঠাওরায় 'ইম্‌মরাল'। কারণ বহু-দিন থেকে লোকের সংস্কার যা ভালো নয় তা মন্দ। ও ছাড়া যে আরো একটা কথা আছে এটা তাদের সংস্কারবিরুদ্ধ।

সমাজে যেমন কতকগুলি জাতকে যুগ যুগ ধরে অস্পৃশ্য ও অশুচি বলে বর্জন করা হয়ে এসেছে সাহিত্যেও তেমনি কতক-গুলি বিষয়কে ও শব্দকে। এসব বিষয়ে লেখা যায় না, এসব কথা লেখনীর মুখে আনা যায় না। এরা অবদ্য, এরা অনুচ্চারণীয়।

বিংশ শতাব্দীর সমাজভাবনা স্বীকার করে না যে হরিজনরা মন্দিরে প্রবেশ করলে মন্দির অপবিত্র হবে বা বিগ্রহকে স্পর্শ করলে বিগ্রহ অপবিত্র হবেন। ওরাও মানুষ। এ কেমন মন্দির যে মানুষের দ্বারা অপবিত্র হয়! এ কেমন দেবতা যে মানুষ এঁকে অপবিত্র করতে পারে! উল্টে পবিত্র করার সাধ্য কি মন্দিরেরও নেই, দেবতারও নেই!

সাহিত্যেরও সেই একই জিজ্ঞাসা। বিংশ শতাব্দীর সাহিত্যের সদর দরজা দিয়ে এমন সব বিষয় আর শব্দ নিত্য প্রবেশ করছে যারা খিড়কি দিয়ে অনুপ্রবেশ করতেও সাহস পেতো না। এখন কেউ অপাঙ্‌ক্তেয় বলে সরাসরি বহিষ্কারযোগ্য নয়। সমাজভাবনার মতো সাহিত্যভাবনাও আজকের দিনে আর আচারসর্বস্ব নয়. সেও বিচারসম্পন্ন। বিচারও আর কাজীর বিচার নয়, ইতিমধ্যে অনেকরকম সূক্ষ্ম প্রশ্ন উঠেছে। কাজীরাও ততটা নিশ্চিত নন, যতটা আগে ছিলেন। এক দেশের কাজীর রায় আরেক দেশের কাজী মানতে চান না। এক যুগের কাজীর রায় আরেক যুগের কাজী রদবদল করেন। ভগবান কারো মুখ চেয়ে সৃষ্টি করেন নি। ধ্বংসও যখন করেন তখন কারো মুখ চেয়ে নয়। যে যার আপন সীমানার মধ্যে শিল্পীরাও সৃষ্টি করে থাকেন। বিশ্বের এক একটি প্রকোষ্ঠে শিল্পীরাও স্রষ্টা। তাঁরাও কারো মুখ চেয়ে সৃষ্টি করার পাত্র নন। যাঁর পছন্দ হবে না তিনি পড়বেন না বা দেখবেন না। কিন্তু সাধা-রণত পাঠকের বা দর্শকের অভাব হয় না। বরঞ্চ তাঁদের ঠেকিয়ে রাখবার জন্যেই বই বাজেয়াপ্ত বা ছবি নিষিদ্ধ হয়। কিন্তু আখেরে ঠেকিয়ে রাখা যায় কি? পড়বার মতো হলে লোকে পড়বেই, দেখবার মতো হলে দেখবেই। হয়তো তারপরে ফেলে দেবে। কিন্তু পরের কথায় ফেলে দেবে না।

মুসলমানদের মধ্যে একটা কথা আছে—

'মিঞা বিবি রাজী
কী করিবে কাজী।"

লেখক ও পাঠক যদি একমত হন তা হলে সমালোচক বা বিচারক বা সরকার কীই বা করতে পাবেন! মিঞা আর বিবি যেমন বিয়ে করতে চাইলে বিয়ে করেন, লেখকও তেমনি লেখেন, পাঠকও তেমনি পড়েন, কারো জন্যে কিছু আটকায় না।

"লেডী চ্যাটার্লিজ লাভার" এখন ইংরেজরা লাখে লাখে পড়ছে। বকে যাবার ভয় ভেঙে গেছে। ভয়টা যে অমূলক ছিল তা আমি বলব না। কমবয়সীরা সত্যি বকে যেতে পারত। এখনো পারে। ভবিষ্যতেও পারবে। কিন্তু তা বলে প্রাচীন কীর্তির গায়ে তো কেউ ঘেরাটোপ জড়িয়ে রাখে না। সমাজকে ভয় অতিক্রমণের শক্তি অর্জন করতে হয়। এটা রসের খাতিরে, রূপের খাতিরে। নয়তো কোণার্ক বা খাজুরাহো আর কখনো গড়া হবে না।

"লেডী চ্যাটার্লি"র কথাই ধরা যাক। তার সম্বন্ধে প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে, ও বই লেখার সত্যি কি কোনো দরকার ছিল? দরকার ছিল মেনে নিলে দ্বিতীয় প্রশ্ন ওঠে, ও ভাবে না লিখে কি অন্যভাবে লেখা যেত না? ও ভাষায় না লিখে অন্য ভাষায়? এই যে প্রশ্ন দুটি এদের উত্তর দিতে পারতেন একমাত্র লরেন্স। তাঁর অবর্তমানে দিতে পারেন লরেন্সের পক্ষপাতী পাঠক, যদি পাঠককে পাঠ করার সুযোগ দেওয়া যায়। সুযোগ পাবার পর ইংলন্ডের পাঠক-দের ব্যবহার দেখে মনে হয় তাঁরা প্রথম প্রশ্নের উত্তরে বলেছেন, "হাঁ" আর দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে "না"।

যে কোনো সাহিত্যসৃষ্টি সম্বন্ধে ওই দুটি প্রশ্নই সত্যিকার প্রশ্ন। বিচারকরা যদি বিচারকের আসনে না বসে পাঠকের স্থানে বসেন তা হলে তাঁদের সেই পাঠকসত্তাই সত্যিকার উত্তর দেবে। কিন্তু সাধারণত দেখা যায় তাঁরা সমাজের মুখ চেয়ে নীতি-বোধের নিকষ হাতে নিয়ে রুচিবোধের দ্বারা চালিত হয়ে বিচার করেন। চূড়ান্ত মীমাংসার ভার কিন্তু কাজীর উপর নয়, বিবির উপর। পাঠকের উপর। রসিকের উপর।

অমরেন্দ্র দাশের আধুনিকতম উপন্যাস

নীলপদ্মের আলপনা ৪'৫০

জীবনদর্শী কৃষ্ণগোপাল বসাকের অপূর্ব মর্মস্পর্শী উপন্যাস

রিক্তের বেদন ৭'০০

বিমল মিত্রের

জীবন সাথী ৩'০০

প্রভাবতী দেবীর

বধূবরণ ২'৫০

দরদী লেখকের সুনিপুণ হাতে অঙ্কিত সমাজচিত্রের মর্মস্পর্শী আলেখ্য

শেষ বিচার (যন্ত্রস্থ) ১০'০০

দ পালী বুক হাউস

১২।১ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

আজকালকার ছেলেমেয়ে

লীলা মজুমদার

আজকালকার ছেলে-মেয়েদের বিষয়ে আবার কি এমন সমালোচনার কথা উঠতে পারে তা ভেবে পেলাম না। সমালোচনা মানে কোনো জিনিসের ভালমন্দ বিচার। শুনেছি হিন্দীতে নাকি আলোচনা বলতে লোকে নিন্দেই বোঝে; তার আবার সমালোচনা! কিন্তু আমি নিজে বিশুদ্ধ বাংলা-পন্থী হওয়াতে, যুগপৎ যেমনি অশুদ্ধ হিন্দী বলি, ঠিক তেমনি আজকালকার ছেলেমেয়েদের সমালোচনা করতে বসে অ-গুণ খুঁজতে গিয়ে শুধু গুণ-ই দেখতে পাই।

মেনে নিলাম আমাদের শ্রদ্ধেয় দাদা যে-কথা বলেছিলেন সেটা সত্যি। অর্থাৎ খুব ভালো করে দেখলেও ফ্যাশন-নবিশদের মধ্যে কে ছেলে আর কে মেয়ে তা বোঝা যায় না। সেই এক চকড়া-বকড়া হাফ হাতা ঝুলো কামিজ, সেই এক আঁটো পেন্টেলুন, সেই দেড় হাত লম্বা ছুঁচলো চপ্পল। ভালো করে খুঁটিয়ে দেখতে গেলে নাকি দলে দলে রেগে ওঠে। সব মানলাম। তার চেয়েও বেশি-ই মানলাম। হাবভাব দেখে বা কথাবার্তা শুনেও কে যে কি তা বোঝার জো নেই। বড় বেশি স্বাধীনতা পাচ্ছে ওরা। বড় বেশি বাড়াবাড়ি করছে। কিন্তু সেই স্বাধীনতাটি দিচ্ছেন কারা? ওদের বাবা-মা'রা না? তবে কি স্নেহের সম্পাদিকা মহাশয়া বাবা-মা'দেরও সমালোচনা লিখতে বলছেন না কি?

সত্যিই, দারুণ আড্ডা দেয় এরা। অদ্ভুত সব অজ্ঞাতকুলশীল বিদেশী লেখকদের আর শিল্পীদের—যাদের মূল রচনা পড়বার মতো ভাষাজ্ঞান ওদের ছিটে-ফোঁটা থাকলেও, আমাদের আদৌ নেই এবং যাদের আঁকা ছবির মাথামুণ্ডু ওরা কিছু বুঝলেও, আমরা বুঝি না—এ হেন লোকদের নিয়ে যেন বড় বেশি উত্তেজনা। অবিশ্যি সান্ত্বনার কথা এই যে, আজ থেকে বছর ষাটেক আগে সুকুমার রায়, কালিদাস নাগ, শ্রদ্ধেয় প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ, শ্রদ্ধেয় জীবনময় রায়, শ্রদ্ধেয় প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ কর্নওয়ালিশ স্ট্রীটের সমাজপাড়ার গলিতে দুর্বোধ্য সব বিষয় নিয়ে এমনি গলাবাজি করতেন যে শেষ পর্যন্ত প্রশান্তচন্দ্রের পিতাঠাকুর উৎক্ষিপ্ত হয়ে উঠে, তাঁদের অমন খাসা রোয়াকটিকে আমূলে উৎখাত করে ফেলেছিলেন।

আর সাজ-পোষাকের কথাই যদি উঠল, তাতেও তো বিস্ময়ের খুব কারণ দেখছি না। উনবিংশ শতাব্দীর প্রগতিশীল ইংল্যাণ্ডের অভিজাত পরিবারের মহিলাদের সান্ধ্য পরিচ্ছদের অনেক ছবি দেখেছি। এখনকার ইউরোপের কথা তো ছেড়েই দিলাম। অবিশ্যি তাই বলে এখনকার মেয়েদের সব ফ্যাশান আমি মোটেই সমর্থন করছি না। যা দেখতে বিশ্রী তা কি করে ভালো বলি, এই হল মুস্কিল। দেখতে সুন্দর হওয়া আর ফ্যাশানেবল্ হওয়ার মধ্যে যে আকাশ-পাতাল তফাৎ তাও আমি জানি, কিন্তু মিসেলিন স্টারের বিজ্ঞাপনের মতো ভাঁজ-ভাঁজ পেট কি সত্যি প্রকট হবার যোগ্য?

ওদিকে সরু ঠ্যাং পেন্টেলুন কি করে লোকে চট করে খুলবে বা পরবে বলুন তো? ধরুন হঠাৎ যদি কিছুতে কামড়াবার জন্যে তেড়ে আসে? ভেবে আকুল হয়ে যাই। তার উপর ঐ পেন্টেলুনগুলো উপরদিক থেকে এতটা নেমে আসে যে তার স্থিতি-স্থাপকতা সম্পর্কে নিদারুণ উৎকণ্ঠা বোধ করি।

এগুলো সুন্দর কি অ-সুন্দর বিচার করার মতো মনের অবস্থা থাকে না আমার। যে কোনো ন্যায়পরায়ণ বিচারকের চিত্ত হওয়া উচিত আবেগশূন্য ও পক্ষপাতমুক্ত। আমার পক্ষে তার কোনোটাই সম্ভব নয়। একদিকে এদের পোষাক-পরিচ্ছদের নিরাপত্তা সম্পর্কে দুশ্চিন্তায় সদাই আকুল হয়ে থাকি। অন্য দিকে ওরা সবাই আমার নাতি-নাতনি সম্পর্কীয় হওয়াতে পার্সেলিটি না করেও পারি না। দুনিয়ায় নাতি-নাতনিদের মতো আছে কি!

তাছাড়া দাদা যে বলেন প্যান্টপরারা ছেলে না মেয়ে বোঝা যায় না, তাঁকে এইটুকু বলে দিলে দোষ হবে না যে সর্বদা দাড়ির দিকে তাকাবেন। নিজের দাড়ির দিকে নয়, দ্রষ্টব্যদের দাড়ির দিকে। যদি থুতনিতে অল্প-বিস্তর কিছু গজিয়েছে বলে মনে হয়, তাহলে তারা নির্ঘাৎ ছেলে। এ আর এমন শক্ত কি। কিন্তু মেয়ে চেনা অনেক কঠিন। ঢোলা কামিজে সর্বাঙ্গ-ঢাকা। তবে প্রায়ই ঠোঁটে অদ্ভুত একটা চকচকে সাদাটে রং দেখবেন, তাই দিয়ে চিনবেন।

কিন্তু এত বাছ-বিচারের কি কোনো দরকার আছে? পুত্রই বলুন আর কন্যাই বলুন, কি এমন তফাৎ? এখন আর কিছু মেয়েদের বিয়ের ভাবনা ভাববার কারণ নেই। বরং যদ্দুর মনে হয় অতিরিক্ত প্রার্থী ভাগানোই আসল সমস্যা। আর তাই যদি না-ও হয়, তবু যতদিন না মেয়ের বিয়ে হচ্ছে ততদিন তো গৃহস্থেরই মঙ্গল। এরা কেউ রুবে-বিয়ে-হবে বলে নাটক-নভেল পড়ে এবং কবির 'শেষ-রক্ষার' যেমন কথিত আছে, নিজেদের হৃদয় বিশ্লেষণ করে কিছু সময় কাটায় না। এমন কাজের মেয়ে কোনো জন্মে কেউ দেখেছে? পৃথিবীর যে-কোনো দেশের মেয়েদের সঙ্গে এদের তুলনা করে দেখুন। টপাটপ পরীক্ষা পাশ করছে; এটা শিখছে ওটা শিখছে; এখানে কাজ করছে ওখানে কাজ করছে; মাসকাবারে হাত পাতা দূরে থাকুক, এই এতগুলো করে টাকা ঘরে আনছে। নিজেদের খরচ নিজেরা চালাচ্ছে, সংসারেও দিচ্ছে। এ সব আমার নিজের চোখে দেখা। সমালোচনা আবার কি?

হয়তো বড্ড বেশি বন্ধুবান্ধব ওদের এবং তারা যখন-তখন বাড়িতে এসে উৎপাত করে। কিন্তু তাই বলে বাড়িশুদ্ধ লোককে ওরা খাটিয়ে মারে না। বাইরে থেকে এটা-ওটা কিনে আনে আর নিজেরা রান্নাঘরে গিয়ে চিজ্ দিয়ে টোমাটো দিয়ে সরু সরু সিমাই দিয়ে কি সব উপাদেয় দ্রব্যাদি বানায়, সে যদি আপনারা না খেয়ে থাকেন, তা হলে আপনাদের সত্যিই দুর্ভাগ্য।

বাস্তবিকই আজকালকার ছেলেমেয়েরা দাসদাসীর ধার ধারে না। আর ধারবেই বা কি করে? ক'জন-ই বা ও সব বিলাস চোখে দেখেছে? যে-সব ক্ষণিকের মূরতি আজ আছে কাল নেই, তাদের সঙ্গে ওদের কতটুকু পরিচয়? ওরা কিসের আশায় প্রসন্নমুখে কাজকর্ম করে যাচ্ছে তা জানেন? বর্তমান ছাত্র আন্দোলনের কথা শুনেও কেন আমি অবিচলিত থাকি

জানেন? এক-ই কারণে। আসলে ওরা অপেক্ষা করে আছে কবে বাজারে রোবো কিনতে পাওয়া যাবে। আমিও তাই। তখন আর কোনো ভাবনা থাকবে না। নিজেরা চাকরি করে কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা আনবে। তাই দিয়ে রোবো কিনবে। মাঝে মাঝে রোবোর যন্ত্রপাতিতে একটু তেল দিতে হবে, তারটারগুলো খারাপ হলে হয়তো বদলাতে হবে। সে আর এমন কি। ব্যামোব্যাধি ভাইপোর বিয়ে দেশ থেকে ঠাকুমার গত হওয়ার টেলিগ্রাপেব কাছে ওসব কিছুই নয়।

ওদিকে কত সুবিধা একবার ভেবে দেখুন। কিছু কাঁচা রসদ মজুত থাকলেই হল। তা-ও রোবোই হয় তো কিনে আনতে পারবে। তারপর ফরমায়েসগুলো রোবোর কানের ছ্যাঁদায় একবার মাত্র চেঁচিয়ে বলে দিতে হবে। ব্যস্, নিঃশব্দে রোবো রাঁধা-বাড়া, কাপড় কাচা, ঘর মোছা, বাসন মাজা, সব করবে। ওদিকে সে খাবেও না, পরবেও না, ছুটিও চাইবে না, আগাম-ও চাইবে না; আগাম আবার কি, মাইনেটি পর্যন্ত নেবে না। এবং তখনকার পরি-কল্পকদের ঘটে যদি এতটুকুও বুদ্ধি থাকে, তা হলে তাঁরা অন্তত গৃহকর্মী রোবোদের বোবা করে বানাবেন। কি সুখ কি শান্তি একবাব ভাবুন।

আমার বিশ্বাস আজকালকার ছেলেমেয়েরা ঐ রকম সুখ-শান্তির স্বপ্ন দেখে বলেই কিছুতেই তারা সন্তুষ্ট হতে পারে না। পরি-বেশ যখনি মনের মতো হয় না, তখনি তাই চেয়াব উল্টে টেবিল ভেঙে, গুরুজনদের চাবিবন্ধ কবে, ঢিল ছুঁড়ে, চেঁচিয়ে-মেচিয়ে একাকার করে। তবে ভয়ের কোনো কারণ নেই। ভবিষ্যতের আদর্শ শিক্ষকরা এবং উপাচার্যরা ধরা-ছোঁয়ার বাইরে থাকবেন। তাঁরা অশরীরী হবেন; শুধু বেতারে তাঁদের স্বর শোনা যাবে, অন্তরীক্ষে ঝুলোয়মান আণবিক কেন্দ্র থেকে। মস্তিষ্ক যন্ত্র-রে কবে পাশ-ফেল ঠিক করা হবে; পরীক্ষা-টরীক্ষা দিতে হবে না। বিজ্ঞান কি না করতে পারে।

আপনাদর খুব বেশি উদ্বিগ্ন হবার সত্যি কারণ নেই। যে-হেতু অন্তত আরো কিছুদিন বাবা-মা শ্রেণীর বুড়োদের বহাল রাখতেই হবে। নইলে রোবো উদ্ভাবন করবে কে? তাছাড়া ছেলেমেয়েরা যতক্ষণ রোবো তৈরিব কাজে সাহায্য করছে, ওদের খাওয়াবে কে? কে সরু-ঠ্যাং পেন্টেলুন কিনে দেবে? এর উত্তরটা খুবই সহজ। এখন যারা দিচ্ছে, নিশ্চয় তারাই দেবে।

এতে কারো আপত্তি করার কিছু নেই। এখন যাঁরা দিচ্ছেন তাঁরা নিশ্চয় পবোক্ষভাবে ও-সব সমর্থন করেন। নইলে দিচ্ছেন কেন?

নিশ্চিন্ত হোন। ভবিষ্যতের জন্যে বাস্তবিক ভাবনা করার কিছু নেই। এরা সত্যি ভারি তৎপর, এদের কর্মক্ষমতার অবধি নেই। দেখবেন দেখতে দেখতে কেমন ভালো ভালো রোবো তৈরি হয়ে যাবে। জানেন তো প্রয়োজনই হল উদ্ভাবনের জনক। সাধারণ মানুষের কর্ম নয় নব্যদের চাহিদা মেটায়, তাই মেসিনের যুগ এই এল বলে।

বাবা-মা'দের সুখের দিন-ও আসন্ন। তাঁদের আর কোনো দায়িত্বই নিতে হবে না। একটিও না। এমন কি বাবা-মা হবার দায়িত্বও না। ভবিষ্যতের ছেলে-মেয়েরা প্ল্যাস্টিকের বোতলের মধ্যে তৈরি হবে, নানারকম উৎকৃষ্ট রাসায়নিক উপকরণ দিয়ে। ওদের রোবোরাই ওদের বানাতে পারবে। বাবা-মা লাগবে না কারো। কি সুখ বলুন তো। সম্পাদিকা মহাশয়াকে শুধু এই কথাই বলার জন্য এত অবান্তর প্রসঙ্গ উত্থাপন করতে হল যে এদের সমালোচনা করার কোনো দরকার-ই নেই। বরং আসুন, আসন্ন সুদিনের কথা ভেবে নৃত্য করি।

★ ★ সদ্য প্রকাশিত হইয়াছে।

স্বনামধন্য সাহিত্যিক
ও লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যারিস্টার

নারদরঞ্জন দাশগুপ্তের
গ্রন্থাবলী

গ্রন্থাবলীতে
আছে দুইখানি
সুবৃহৎ ও
রূপসী
উপন্যাস

সুশান্ত-সা
ও
নীল শাড়ী

পৃষ্ঠা সংখ্যা
সর্বসমেত
৩৩৪

বাঙলা সাহিত্যে
অভিনব সংযোজন

মূল্য মাত্র দশ টাকা

বসুমতী (প্রাঃ) লিঃ
কলিকাতা—১২

ইতিহাস রচনার উপাদান ও পদ্ধতি

নরেন্দ্র ভট্টাচার্য

ভারতের ইতিহাস, বিশেষ করে প্রাচীন ভারতের ইতিহাস নিয়ে রচিত গ্রন্থের অভাব নেই। গবেষকেরা প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতির বিভিন্ন দিক নিয়ে গবেষণা করছেন, তাঁদের গবেষণার ফলাফলও পুস্তকাকারে প্রকাশিত হচ্ছে, তাঁদের পাণ্ডিত্য, যোগ্যতা ও শ্রমনিষ্ঠা সম্বন্ধেও কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। কিন্তু একটা প্রশ্ন যা স্বভাবতই মনে জাগে, এই গবেষণাসমূহ সত্যই প্রাচীন ভারতকে প্রতিফলিত করে কি-না, অর্থাৎ গবেষণার দ্বারা উদ্ঘাটিত যা হয়েছে তা অতীতে বাস্তবে আদৌ বর্তমান ছিল কি-না, অর্থাৎ এক কথায়, ইতিহাসের প্রতি সুবিচার করা হয়েছে কি না। আমার ধারণা তা হয় নি, এবং তা হওয়া সম্ভব নয়, যদি না ঐতিহাসিকেরা তাঁদের কার্য-পদ্ধতি সম্বন্ধে এবং যে উপাদানসমূহ নিয়ে তাঁরা কাজ করছেন সেগুলির কার্যকারিতা সম্পর্কে সচেতন না হন। দুঃখের বিষয়, সেরকম সচেতনতার কোন লক্ষণ এখনো পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে না।

মূলত সাহিত্যগত উপাদানের উপরেই আমাদের ইতিহাস রচনা আজও নির্ভরশীল। বৈদিক সাহিত্য, মহাকাব্য-পুরাণ-স্মৃতিশাস্ত্র, বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মগ্রন্থ ইত্যাদির উপরই গবেষকগণ প্রধানত নির্ভর করে আসছেন শতাব্দীরও অধিককাল ধরে। কিন্তু ইতিহাসের উপাদান হিসাবে এগুলির আদৌ কোন মূল্য আছে কি-না, সেটা কোনদিনই খুব তলিয়ে দেখা হয় নি। এই গ্রন্থগুলির প্রতিটিই এত বেশি অসঙ্গতিতে পূর্ণ যার উপর কোন দায়িত্বশীল ঐতিহাসিকের নির্ভর করা চলে না। অসঙ্গতিহীন পরস্পরবিরোধিতামুক্ত পর পর দশটি শ্লোকও বোধ হয় প্রাচীন শাস্ত্রকার ও পুরাণকারগণ লিখতে পারেন নি। ইতিহাসচেতনা তো দূরের কথা নিজেদের দেশটাকেও তাঁরা চিনতেন না। পুরাণসমূহে বর্ণিত জনপদ তালিকাগুলির দিকে তাকালেই সেটা বোঝা যাবে। এমন কি সবেধন নীলমণি আমাদের একমাত্র প্রাচীন ঐতিহাসিক যে মহামতি কহ্লন, তাঁর উপরেই কি পুরোপুরি নির্ভর করা যায়? কহ্লন যেখানে তাঁর সমকালীন ঘটনাসমূহের বর্ণনা দিচ্ছেন সেখানেও তাঁর বর্ণনাভঙ্গি অস্পষ্ট, অসঙ্গতিপূর্ণ, পুরাণধর্মী, প্রাচীন গ্রীক ও রোমক বিখ্যাত ইতিহাসকারকদের কথা বাদ দিলাম, ইউরোপের ক্রনিকলধর্মী যে সাহিত্য যেমন স্যাক্সোর গেস্টা ডানোরাম, বা মনমাউথের জিওফ্রের হিস্টোরিয়া রেগাম বৃটানিয়েন্সের মত রচনাগুলির যে ধারাবাহিকতা এবং পাঠযোগ্যতা আছে তা আমাদের প্রাচীন সাহিত্যে একান্তই অনুপস্থিত।

কাজেই, সাহিত্যগত উপাদানের এই রকম যখন অবস্থা, তখন ঐতিহাসিক বা গবেষকের সামনে দুটি পথ খোলা থাকে। যে ব্যক্তি বা বিষয় নিয়ে তিনি গবেষণা করছেন তা কোন্ কোন্ প্রাচীন গ্রন্থের কোন্ কোন্ শ্লোকে আছে তা খুঁজে বার করা। অর্থাৎ যদি তাঁকে প্রশ্ন করা হয়, অমুক রাজা সম্বন্ধে আপনি কিছু আলোকপাত করুন, তাহলে তিনি সেই রাজা সম্পর্কে কোন তথ্য দিতে পারবেন না, তিনি শুধু বলবেন যে অমুক রাজার উল্লেখ অমুক অমুক গ্রন্থের অমুক অমুক শ্লোকে আছে এবং যিনি যত বেশি রেফারেন্স দিতে পারবেন তিনি তত বড় পণ্ডিত বলে স্বীকৃত হবেন। অবশ্য রাজনৈতিক ইতিহাসের জন্য শুধুমাত্র সাহিত্যগত উপাদানের উপর নির্ভর করা হয় না, এ বিষয়ে প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান, বিশেষ করে লেখমালার সাহায্য নেওয়া হয়। কিন্তু ভালভাবে ব্যবহার করা যায় এমন লেখমালার সংখ্যা খুব বেশি নয়। গত দেড়শো বছরে যত লেখমালা আবিষ্কৃত হয়েছে তার উপরে আর বেশি আবিষ্কৃত হবার সম্ভাবনা নেই এবং ঠিক এই কারণেই প্রাচীন ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসের বিভিন্ন দিক নিয়ে গবেষণা প্রায় হয় না বললেই চলে। আরও যে দু-চারটি নতুন লেখমালা আবিষ্কৃত হবে সেগুলিও ইতিপূর্বে আবিষ্কৃত লেখমালার ভিত্তিতে রচিত ইতিহাসের কোন মৌলিক পরিবর্তন সাধন করতে পারবে না। আর তা ছাড়া সাহিত্যগত উপাদানের মত লেখমালাগুলিও ত্রুটিপূর্ণ। বহু ক্ষেত্রেই দেখা যায় রাজার নাম বা তারিখ স্পষ্ট করে উল্লিখিত নেই, যাঁর নাম চন্দ্র তিনি লেখমালায় হয়েছেন সুধাকর, এমন কি যে শত্রুর বিরুদ্ধে তিনি জয়লাভ করে প্রশস্তি লিখিয়েছেন তার নামও ঠারেঠুরে দেওয়া হয়েছে, যে স্থান তিনি দখল করেছেন তারও কোন স্পষ্ট পরিচয় নেই, যিনি একটি পার্শ্ববর্তী গ্রাম দখল করেছেন তিনি আসমুদ্রহিমাচল বিজয়ী বলে প্রশস্তি লিখিয়েছেন, যদিও দুটোর কোনটাই তিনি দেখেন নি। সুদূর দক্ষিণের রাজা অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গ-কামরূপ-গান্ধার-সিন্ধু-সৌবীর একসঙ্গে দখল করে বসে আছেন, যে দেশগুলি কোথায় তাও তিনি জানেন না। আমার দীর্ঘজীবী প্রপিতামহের মুখে ছেলেবেলায় গল্প শুনেছিলাম খিলাফত আন্দোলনের সময় হুগলী জেলার সম্প্রদায়বিশেষের চাষীরা বলতেন 'আরামবাগ পেরিয়েই তুরুস্কু দেশ।' উপমাটি বোধ হয় এখানে খাটে।

বিভিন্ন প্রাচীন গ্রন্থ থেকে কোন বিষয় সম্বন্ধে রেফারেন্স সংগ্রহ করে এবং সেগুলিকে একটি পরিকল্পনা অনুযায়ী সাজিয়ে গবেষক একটি বই লিখতে পারেন এবং তাই তিনি লেখেন। এ ছাড়া আরও একটি রাস্তা তাঁর সামনে খোলা আছে। সেটি হচ্ছে সাহিত্যগ্রন্থসমূহে উল্লিখিত কোন বিষয়ের অসঙ্গতিসমূহকে নিজ মস্তিষ্কচালনার দ্বারা সঙ্গতিপূর্ণ করে নেওয়া। উপরি-উক্ত দুটি পথই বিপজ্জনক ও অবৈজ্ঞানিক, কেন না এর ফলে সমগ্র বিষয়টাই মানসকেন্দ্রিক বা সাবজেক্টিভ হয়ে পড়ে। আমার মাথায় ধারণা গজাল যে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ আজ থেকে দশ হাজার বছর আগে হয়েছিল। আমি তখন এই ধারণার সমর্থনে প্রাচীন শাস্ত্রসমূহ থেকে শ্লোক খুঁজতে আরম্ভ করলাম। এবং বলাই বাহুল্য আমি অবশ্যই এই রকম কিছু শ্লোক খুঁজে পাব। অনুরূপভাবে আপনারও মাথায় ধারণা চাপল যে ওই যুদ্ধ আজ থেকে দশ শো বছর আগে হয়েছিল। আপনি চেষ্টা করলে তাও প্রমাণ করতে পারবেন। কারণ প্রাচীন

কিস্তিবন্দীতে ট্রানজিস্টার

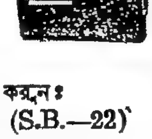

৩২০, টাকা মূল্যের টেলিকুইন, পোর্টেবল ৩ ব্যান্ড অল ওয়ার্ল্ড ৮ ট্রানজিস্টার মাসিক ১০, টাকার সহজ কিস্তিতে। আবেদন করুনঃ

ATLAS CO. (S.B.—22)
Box No. 1329, Delhi—6.

গ্রন্থগুলি, আগেই বলেছি, পরস্পর-বিরোধিতা ও অসঙ্গতিতে পরিপূর্ণ। মেয়েদের বিবাহের বয়স সম্বন্ধে একটু অনুসন্ধানের জন্য আমাকে একবার মনুস্মৃতির পাতা ওল্টাতে হচ্ছিল। কী আশ্চর্য, ওইটুকু একটি পুস্তিকায়, যা লিখতে লেখকের কয়েক ঘন্টার বেশি সময় লাগা উচিত নয়, তিন জায়গায় তিন রকম কথা লেখা আছে। এই অসঙ্গতিই ভারতীয় ঐতিহাসিকদের পক্ষে অবজেক্টিভ দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণের পক্ষে বাধা হয়ে আছে এবং চূড়ান্ত বিশ্লেষণে জানা যায় প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসের বিভিন্ন দিকগুলি সম্বন্ধে এ পর্যন্ত যা কিছু জ্ঞান আমাদের ভান্ডারে জমা হয়েছে তা আসলে কয়েকজন ঐতিহাসিকের "ধারণা" ছাড়া আর কিছুই নয়।

আমি একথা বলছি না যে পুরাণাদি শাস্ত্রসমূহের কোন মূল্য নেই, অন্য ক্ষেত্রে এগুলির যথেষ্ট মূল্য আছে, এবং সেই সকল ক্ষেত্রে এগুলির সাহায্যে অসাধ্য-সাধনও করা যায়। কিন্তু বিশুদ্ধ ইতিহাসের প্রয়োজনে, অতীত যুগের সঠিক অবস্থা জানার প্রয়োজনে এগুলির ব্যবহার না করাই সঙ্গত। সামাজিক ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে পুরাণ-স্মৃতিশাস্ত্রাদি গ্রন্থ ঐতিহাসিককে যে কতদূর বিপথচালিত করতে পারে তার দু-একটি নিদর্শন এখানে দেওয়া ভাল। প্রাচীন ভারতে নারীজাতির অবস্থা কিরূপ ছিল তা নিয়ে অনেক গ্রন্থ রচিত হয়েছে এবং সেগুলিতে ঋগ্বেদ থেকে শুরু করে স্মৃতিশাস্ত্র পর্যন্ত সকল গ্রন্থ থেকেই নারীজাতি সংক্রান্ত অংশগুলি সংকলিত করে সেগুলির ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত টানা হয়েছে। কিন্তু আমার জিজ্ঞাস্য, পুরাণে বা স্মৃতিগ্রন্থে বর্ণিত মেয়েদের অবস্থার যে চিত্র আমাদের সামনে উপস্থাপিত করা হয়েছে, বাস্তবে সেই চিত্র আদৌ ছিল কি না? স্মৃতিশাস্ত্রের অনুশাসন সমাজের কোন্ শ্রেণী মেনে চলত? তাঁদের সংখ্যা কত? বৃহত্তর জনসমাজের তুলনায় সেটা কি একান্তই নগণ্য নয়? পাঁচশোরও বেশি ট্রাইবাল সমাজ যা ভারতের বুকে এখানে ওখানে অসংখ্য দ্বীপপুঞ্জের মত ছড়িয়ে আছে, তারা কোনদিন স্মৃতিশাস্ত্রের ধার ধারে নি। প্রাচীনকালে এই ট্রাইবাল সমাজের সংখ্যা নিশ্চয়ই এরও বহুগুণে বেশি ছিল তারাই জনসাধারণের বৃহত্তর অংশ ছিল। কালক্রমে এই সব ট্রাইবাল সমাজের মানুষেরাই, অন্তত তাদের একটা মোটা অংশ হিন্দু-ধর্মের আওতায় এসে হিন্দুসমাজে বিভিন্ন নিম্নবর্গে স্থান পেয়েছে। এরা আজও নিজেদের প্রাচীন ট্রাইবাল রীতিনীতিই মেনে চলে। ধর্মের ক্ষেত্রে যদিও এরা হিন্দু দেবদেবীর উপাসনা করে তা সত্ত্বেও এদের নিজস্ব আচার অনুষ্ঠান আছে। আমারই পাড়ার আশেপাশে বিভিন্ন নিম্ন-বর্ণের মানুষের জীবনযাত্রা পর্যবেক্ষণ করার সুযোগ আমার হয়েছে। আমি নিজে বাল্যকালে এদের মেয়েদের বিধবা বিবাহ, ডাইভোর্স ও পুনর্বিবাহ ঘটতে দেখেছি, পরিণত বয়সে আরও অনুসন্ধান করেছি এবং যেটা সর্বাগ্রে আমার চোখে পড়েছে সেটা হচ্ছে এই যে এই সব সমাজে আজও নারীপ্রাধান্য বজায় আছে, যা দেখে আমি "ভারতে মাতৃতান্ত্রিক সমাজের অবশেষ" নিয়ে গবেষণা করতে উদ্বুদ্ধ হয়েছি। এরা এবং এদের পূর্বপুরুষেরা আর যাই করুক স্মৃতিশাস্ত্র মেনে চলে নি, অর্থাৎ ভারতের জনসমাজের বৃহত্তর অংশের জীবনধারার সঙ্গে পুরাণ বা স্মৃতিশাস্ত্র বর্ণিত জীবনধারার কোন মিলই নেই। কাজেই ওই সব গ্রন্থ অবলম্বনে যে সামাজিক ইতিহাস রচিত হচ্ছে এবং হবে সেগুলিতে সঙ্গতভাবেই বাস্তব জীবনের প্রতিফলন থাকতে পারে না। উৎপাদন ব্যবস্থার সঙ্গে চিরকালই ভারতবর্ষের নারীজাতির ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ থাকার ফলে বৃহত্তর জনজীবনে নারীজাতি চিরকালই ঘরের বাইরে পুরুষের সঙ্গে একত্রে কাজ করেছে। সর্বত্রই দেখা যায় স্ত্রী-পুরুষ একত্রেই ক্ষেতের কাজ করছে, শুধু কৃষিকর্ম কেন প্রতিটি পেশাতেই দেখা যায় নারী-পুরুষ প্রকাশ্যে আরও পাঁচজনের সঙ্গে সকলের দৃষ্টির সামনে চিরকালই একসঙ্গে কাজ করে এসেছে। এ দৃশ্য যেমন আমি দেখেছি, আমার পিতা-পিতামহ-প্রপিতামহ এবং তাঁদের পূর্বপুরুষেরা একইভাবে দেখেছেন। নারীজাতির এই চিত্র কি পুরাণে বা স্মৃতিতে বা অন্য কোন ধর্মগ্রন্থে পাওয়া যায়? হয়ত দু-একটা স্ট্রে রেফারেন্স কোথাও থেকে যেতে পারে, কিন্তু তা দিয়ে আর কতটুকু কাজ হবে? কাজেই সামাজিক ইতিহাস রচনায় আমাদের প্রচলিত সাহিত্যগত উপাদানের কোন মূল্য আছে বলে মনে হয় না, অবশ্য লোকসাহিত্যের কথা আলাদা, কিন্তু বেদ-পুরাণ ও অপরাপর প্রাচীন গ্রন্থ মূলত ক্লেরিকাল লিটারেচার, সেগুলিকে অবলম্বন করে হয়ত হাজার হাজার বই লেখা যায় কিন্তু ইতিহাসের প্রতি সুবিচার করা যায় না।

আমাদের সামাজিক ইতিহাসে চতুর্বর্ণ প্রথার গুরুত্ব অত্যন্ত বেশি বলে পন্ডিতেরা মনে করেন। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র —এই চতুর্বর্ণে বিভক্ত সমাজব্যবস্থার উদ্ভব ও বিকাশ নিয়ে যে কোন সামাজিক ইতিহাস গ্রন্থেই দীর্ঘ পরিচ্ছেদ রচনা করা হয় এবং এই বিষয় নিয়ে যে কোন গ্রন্থেই শ' দেড়েক পাতা আলোচনা করার মত সাহিত্যগত উপাদানের অভাব নেই। বেদ থেকে শুরু করে হাল আমলের স্মৃতিগ্রন্থ পর্যন্ত এই প্রথার গুণগানে পরিপূর্ণ, এবং কোন্ কোন্ বর্ণের কি কি কর্তব্য আছে সে সম্পর্কেও বিস্তৃত বর্ণনা প্রতিটি প্রাচীন গ্রন্থে আছে। কিন্তু এই প্রথা কি সত্যই বাস্তবে ছিল? চারটি শ্রেণীতে বিভক্ত একটি সমাজব্যবস্থা আসলে একটি ধারণা, বলা বাহুল্য, মিথ্যা ধারণা ছাড়া আর কিছুই নয় এবং প্রতিটি প্রাচীন গ্রন্থেই এই মিথ্যা ধারণার উপরেই শত শত শ্লোক লেখা হয়েছে। আমার বাংলাদেশের অভিজ্ঞতায় আমি জানি, এখানকার সমাজ কোনদিন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—এই চারটি শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল না। বাংলাদেশে আছে অকুপেশনাল গ্রুপ, পেশাগত গোষ্ঠী, যেমন বামুন, কায়েত, ধোপা, নাপিত, তাঁতী, কুমোর, বারুই, তেলী ইত্যাদি। এরা কোনদিনই চারটি বর্ণে বিভক্ত নয়। এখানে এমন কোন জাত নেই, যার কোন জাতব্যবসা নেই। সারা ভারতের চেহারাটা বোধহয় এই রকমই এবং আবহমান কাল ধরেই এই পেশাগত গোষ্ঠীগুলি বজায় থেকে এসেছে, সেই বেদের যুগ থেকেই। অথচ প্রাচীন গ্রন্থগুলিতে এই পেশাগত গোষ্ঠীতে বিভক্ত মানবজাতির পরিচয় নেই, তার বদলে যা আছে তা একটা কৃত্রিম সামাজিক বিভাগের পরিচয় যে বিভাগ বাস্তবে বর্তমান ছিল না, অন্তত বাংলাদেশে তো ছিলই না। অথচ ঐতিহাসিক ও গবেষকেরা অন্য কোন পদ্ধতির অভাবে যে উপাদানের উপর নির্ভর করে সামাজিক ইতিহাস রচনা করছেন, সেখানে শ্রমনিষ্ঠা ও আন্তরিকতা যতই থাক, অতীত সম্বন্ধে কোন সঠিক তথ্য পাওয়া যাচ্ছে না। আপনি বলতে পারেন যে, অমুক পুরাণে বর্ণিত সমাজব্যবস্থা এইরকম, কিন্তু একথা বলতে পারেন না ওইরকম সমাজ-ব্যবস্থা ঐ পুরাণ রচনার কালে বাস্তবে বর্তমান ছিল এবং এইটেই হচ্ছে ঐতিহাসিকদের ট্র্যাজেডি।

অম্বলের ঔষধ

সেবনে অম্ল, অজীর্ণ, বুকজ্বালা, গ্যাসট্রিক আলসার, উচ্চ রক্তচাপ নিম্ন রক্তচাপ, কোষ্ঠবদ্ধতা প্রভৃতি আরোগ্য হয়। মূল্য ২·৭৫ প্রতি রবিবার পাওয়া যায়। ভি, পি, করা হয়।

পি, ব্যানার্জী, ১০১ জি, টি, রোড।
হাওড়া ময়দান। হাওড়া—১
ফোন : ৬৭-৩৪২৮

যাঁদ আভ্যন্তরীণ উপাদানসমূহের অবস্থা এইরকম হয়, তাহলে বাইরে থেকে যাঁরা ভারত সম্পর্কে লিখেছেন অতঃপর তাঁদের দিকেও নজর দিতে হয়। কিন্তু সেখানেও ভেজাল। সাহেব ঐতিহাসিকদের মধ্যে অনেকেরই বাতিক ছিল যা গ্রীক তাই গংগাজল, অতএব বিশুদ্ধ। আলেকজান্ডারের ভারত অভিযান নিয়ে অনেক গ্রন্থ রচিত হয়েছে, কিন্তু ভারত সম্পর্কে বর্ণনায় গ্রীক ঐতিহাসিকরা অনেক সময় এমন সব কথা লিখেছেন যেগুলির সংগে সত্যের কোন সম্পর্ক নেই। মেগাস্থিনিস এদেশে থেকে এমন সব মানুষকে দেখেছিলেন যাদের নাকি একটা করে চোখ। গ্রীক ঐতিহাসিকেরা এদেশের সংগে তাঁদের দেশের কোন পার্থক্যই দেখেন নি, এখানে ডাওনিসাসের পূজো হচ্ছে, হারকুলেসের পূজো হচ্ছে, গ্রীক ধর্মীয় উৎসবসমূহ অবলীলাক্রমে অনুষ্ঠিত হচ্ছে! তবে গ্রীকেরা ভারতীয়দের চেয়ে অধিকতর ইতিহাস-সচেতন জাতি, এই কারণেই বোধহয় গ্রীক ঐতিহাসিকেরা আজগুবি সব ঘটনার বর্ণনা দিতে গিয়ে গোড়াতেই বলে নিয়েছেন, "বাপু হে, যা শুনেছি তাই লিখছি, সত্য-মিথ্যা ভগবান জানেন।" তাঁদের এই স্পিরিট অবশ্যই প্রশংসার যোগ্য, কিন্তু তাঁদের রচিত গ্রন্থগুলিকে অবলম্বন করে আমাদের কাজ কতটুকু এগোবে তাতে সন্দেহ আছে। তবে গ্রীক ঐতিহাসিকদের সম্পর্কে একটি কথা বলা যায় যে, আলেকজান্ডারের ভারত অভিযানের বিবরণটি তাঁরা নিখুঁতভাবে চিত্রিত করার চেষ্টা করেছেন এবং এই একটি বিষয়ে প্রত্যেকেরই বর্ণনা মোটামুটি বিরোধমুক্ত, যদিও ভারত সংক্রান্ত অপরাপর বিষয়ের বর্ণনায় তাঁরা নির্ভরযোগ্য নন।

এ পর্যন্ত যা বলা হল তা থেকে এটাই প্রমাণিত হচ্ছে যে, আমাদের ঐতিহাসিকদের সামনে যে কয়েকটি মৌলিক সমস্যা রয়ে গেছে তার মধ্যে প্রধানতম হচ্ছে উপাদানের সমস্যা। বিগত যুগের ঐতিহাসিকেরা যাঁরা পুরোনো লেখমালা ইত্যাদি নিয়ে প্রত্যক্ষভাবে কাজ করেছেন, উপাদানের চারিত্রিক ত্রুটির জন্যই তাঁদের সাবজেক্টিভ হতে হয়েছে এবং তাঁরা বিশুদ্ধ অনুমাননির্ভর কিছু কথা লিপিবদ্ধ করতে বাধ্য হয়েছেন। এই সাবজেক্টিভ ট্র্যাডিশন আমাদের মত একালে ঐতিহাসিকদের ঘাড়েও ভর করেছে, যার ফলে আমাদের কোন অনুমানকে বেদ-পুরাণাদিব শ্লোকের দ্বারা সমর্থন করাতে না পারলে আমরা তৎক্ষণাৎ খোঁজ করি বিগত যুগের ঐতিহাসিকদের, যাঁদের আমরা এ যুগে অথরিটি বলে মানি এবং তাঁরা এ বিষয়ে কি লিখেছেন, অর্থাৎ আমার অনুমানের সমর্থনে তাঁকে "কোট" করা যায় কি-না, সেই চেষ্টা করি। যদি কোন গবেষক এ কথা অস্বীকার করেন তাহলে তিনি সত্যের অপলাপ করবেন। কিন্তু এই যে পদ্ধতি বর্তমানে অনুসৃত হচ্ছে এটা নিশ্চয়ই কোন বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি নয়। বরং সবচেয়ে অবৈজ্ঞানিক ও বিপজ্জনক পদ্ধতি। এবং এই পদ্ধতিকে ভিত্তি করে গাদা গাদা পুস্তক রচিত হলেও, সেগুলিতে লেখকদের শ্রমনিষ্ঠা ও অধ্যবসায়ের পরিচয় থাকলেও, বস্তুত তা ইতিহাসের স্বার্থ সিদ্ধ করতে পারছে না।

এ ছাড়া আরও একটি বিষয় আছে যা প্রাচীন ভারতের সঠিক চিত্রটি বোঝার পক্ষে বাধাস্বরূপ। খুব অল্প ঐতিহাসিকই আছেন যাঁরা সংস্কারমুক্ত ও নিরপেক্ষ, অনেকেই রঙীন চশমা এঁটে অতীতকে দেখতে চান এবং সেটাই কার্যত ইতিহাসের অমর্যাদা ঘটায়। উদাহরণস্বরূপ আর্য-অনার্য প্রসঙ্গটির কথা এখানে তোলা যেতে পারে। অনেক বড় বড় পণ্ডিতেরও আর্যবাতিক কিভাবে সত্যানুসন্ধানের পক্ষে অন্তরায় হয়েছে সেটা দেখার জন্য বেশিদূর যেতে হবে না। অথচ আর্য সংস্কৃতি বলে কিছুই নেই। সমগ্র বৈদিক সাহিত্য দূরের কথা, ঋগ্বেদের মত একটি গ্রন্থও কোন একটি বিশেষ সংস্কৃতির নির্দেশক নয়; সেখানেও বিভিন্ন স্তরের অনেকগুলি সংস্কৃতির পরিচয় বিদ্যমান। অতীত সম্পর্কে অতিরঞ্জিত কল্পনা এমন কয়েকটি ধারণার জন্ম দিয়েছে যেগুলি মূলতই অনৈতিহাসিক। এমন একটি ধারণার পরিচয় বিভিন্ন গ্রন্থে পাওয়া যায় যে, ঋগ্বেদের যুগে নারীজাতির সমাজে বিশেষ মর্যাদা ছিল, কিন্তু পরবর্তীকালে সে মর্যাদা লুপ্ত হয়েছে। ঋগ্বেদ সম্বন্ধে অতিরিক্ত গৌরববোধই এই জাতীয় ধারণার হেতু এবং বড় বড় ঐতিহাসিকেরাও অনেকে এই ধারণা থেকে মুক্ত হতে পারেন নি। আসলে পিতৃতান্ত্রিক পশুপালক সমাজে নারীর স্থান উঁচুতে হওয়া ইতিহাসের সাধারণ নিয়মেই সম্ভবপর নয়।

আজকের দিনে বিভিন্ন বিষয় একে অপরের নিকটবর্তী হচ্ছে, অথচ এই নৈকট্যের সুযোগ প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস সংক্রান্ত গবেষণা যথোপযুক্ত নিতে পারছে না। ফলে অবস্থাটা এমন হয়েছে যে, সংস্কৃত সাহিত্যে যে গবেষণা প্রামাণ্য বলে খ্যাতিলাভ করল, ইতিহাসের দৃষ্টিকোণে সেই একই রচনা নিরর্থক বলে বিবেচিত হল। আবার ইতিহাসের নামে যে গবেষণাগ্রন্থ প্রসূত হল প্রত্নতত্ত্ব ও নৃতত্ত্ব তাকে নাকচ করে দিল। ঐতিহাসিক মহাশয় আবার নাক কুঁচকে বললেন, এসব কি আর মাটি খুঁড়ে পাওয়া যায়? একথা বললে ভুল হবে যে, একটি বিষয় অপর একটি বিষয়ের কাছে আসে নি, বা প্রাচীন ইতিহাসের গবেষকেরা নৃতত্ত্ব বা আধুনিক প্রত্নতত্ত্বের সাহায্য নিচ্ছেন না, কিন্তু তা নিতে গেলে ঐ সকল শাস্ত্রে যতটা দখল থাকার প্রয়োজন হয়, গবেষকেরা নিজ এলাকা ছেড়ে ততদূর যেতে সচরাচর রাজী হন না। একটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি আরও স্পষ্ট করে বোঝানো যাবে। প্রাচীন ভারত সংক্রান্ত বহু গ্রন্থেই টোটেমিজম নামক একটি নৃতাত্ত্বিক টার্মের উল্লেখ পাওয়া যায়, বিশেষ করে ধর্মীয় ইতিহাসের ক্ষেত্রে। কিন্তু এমন একটা বইও আমার চোখে পড়ে নি, যেখানে বোঝা যায় লেখক ঐ টোটেমিজম বস্তুটিকে নিজেই ভাল করে বুঝতে পেরেছেন। তাঁর বুঝতে পারার যোগ্যতা নেই একথা বলছি না, তিনি বুঝতে চান না এটাই সত্য।

এখন কিভাবে এই সমস্যাগুলিকে অতিক্রম করে প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে একটি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রতিষ্ঠা করা যায়, তা নিয়ে চিন্তা করার সময় এসেছে। ইতিহাসের একনিষ্ঠ ছাত্র হিসাবে আমি নিজে যে সমস্যাগুলি উপলব্ধি করেছি, তা এখানে প্রকাশ করলাম। এটি পাঠ করে যদি কেউ বলেন যে, এসব কিছু না, আমরা ভালই আছি, দিব্যি তো মোটা মোটা বই বেদ-পুরাণ ঘেঁটে লিখছি, তাহলে আমার আর কি বলার থাকতে পারে?

শতকরা ২০৲ টাকা কমিশন উপার্জন করুন

সুইস প্রস্তুত ১৭ জুয়েল রোমার ঘড়ির বিক্রয় বৃদ্ধি করিয়া। সর্তাবলী এবং স্যাম্পেল ঘড়ির জন্য আবেদন করুন।

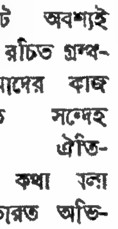

JAPEX INDIA (Watch)
P. B. 1405 (WBM—15),
Delhi—6.

ইংরেজি সাহিত্যে সমালোচনা

জগন্নাথ চক্রবর্তী

অ্যারিস্টটল নিজে কখনো নাটক বা কবিতা লেখেন নি, কিন্তু তাঁর 'কাব্যতত্ত্বে' নির্দেশ রেখেছেন 'এই হচ্ছে নাটক, এই হচ্ছে ট্রাজেডি' ইত্যাদি। ইংরেজি সমালোচনায় কিন্তু এরকম ফরমান জারি খুব বেশি দেখা যায় না। ফিলিপ সিডনি, বেন জনসন, ড্রাইডেন, কোলরিজ, এলিয়ট প্রত্যেকেই কবি বা নাট্যকার। কবি বা নাট্যকারদের লক্ষ্য করে উপদেশচ্ছলে এঁরা কিছু বলেন নি, কিছুটা স্বগতভাষণের মতো নিজেদের রচনার জবাবদিহি করেছেন মাত্র। আত্মবিশ্লেষণ ও আত্মসমালোচনাই এঁদের সমালোচনার মূল কথা। সাহিত্যের চিরকালীন ধারণা বা সংজ্ঞা নিয়ে তাঁরা মানদণ্ড হাতে বিচারকের আসনে বসেন নি, নিজেদের সৃষ্টি যাতে সুবিচার পায় তারি জন্য নিজেরাই দরদী পক্ষসমর্থকের ভূমিকা নিয়েছেন।

ইংরেজি সমালোচনা সম্বন্ধে অভিযোগ করা হয় যে, এতে নূতনত্ব বা অরিজিন্যালিটি নেই, এর সব কিছু য়ুরোপ থেকে ধার করা। বলা হয়, ড্রাইডেন হবস ও কর্নেই থেকে, কোলরিজ জার্মান সমালোচকদের থেকে, ম্যাথু আর্নল্ড স্যাঁত বোভ-এর কাছ থেকে এবং এলিয়ট রেমি দ্য গুর্‌মঁর কাছ থেকে ধার বা চুরি করেছেন। কিন্তু একথা মানতেই হবে, ইংরেজি সাহিত্যে শ্রেষ্ঠ লেখকরাই শ্রেষ্ঠ সমালোচক এবং এঁরা কেউই সমালোচনাকে অ-সাহিত্যিক বা নিচু সাহিত্যিক কর্ম বলে জ্ঞান করেন নি। 'প্রেমের জন্য সর্বস্ব' (অল ফর লভ) নাটকের ভূমিকায় ড্রাইডেন খুব স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন, 'একমাত্র না হলেও, কবিরাই সবচেয়ে যোগ্য সমালোচক'।

বিগত তিনশো বছরে ইংরেজি সমালোচনায় কী ধরণের প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে? এর সদুত্তর খুঁজতে হলে আমাদের যাঁদের কথা প্রথমেই মনে পড়বে তাঁরা হচ্ছেন ড্রাইডেন, কোলরিজ, আর্নল্ড। ড্রাইডেনের 'নাট্যকাব্য প্রসঙ্গে' (অব ড্রাম্যাটিক পয়েজি) (১৬৬৮) প্রবন্ধে নাটকের উৎকর্ষ অনুকর্ষের স্বরূপ নিয়ে কোনো অ্যাবসট্রাক্ট আলোচনা আমরা পাই না। রেস্টোরেশন ইংলণ্ডে ফরাসী আদর্শে রচিত সমিল কাব্যনাটকের সম্ভাব্যতা নিয়েই ড্রাইডেন আলোচনা করেছেন।

যখন ইংরেজি সমালোচনার প্রকৃত সূচনা ঘটে নি তখন, অর্থাৎ ষোড়শ শতকে এলিজাবিথিয় যুগে, সমালোচনা ছিল ফরমান-সূচক; তার লক্ষ্য ছিল কবি বা লেখক, পাঠক নয়। কবির প্রতি আইন বা ফরমান জারি করেই সমালোচক ক্ষান্ত হতেন। যে-আইন জারি করা হত তাও সবি ক্লাসিক কানুনের পুনরাবৃত্তি। এই ফরমানি সমালোচনা ইংরেজ মেজাজের সঙ্গে কখনোই খাপ খায় নি। ফলে এ ধরণের সমালোচনা পরবর্তীকালে আমরা পুরোপুরি আর কখনই দেখি না।

ইংরেজিতে স্রষ্টারাই সমালোচক হওয়ায়, তাদের আগ্রহের পরিধি নিজের সৃষ্টিধারার বাইরে খুব বেশি বিস্তৃত হয় নি। ১৭শ শতকে ড্রাইডেনের এবং ২০শ শতকে এলিয়টের সমালোচনার আংশিকতা অনেকের কাছে পীড়াদায়ক। ড্রাইডেনের সমালোচনা পড়লে মনে হবে, রেস্টোরেশন সাহিত্য বলতে বুঝি নাটক ছাড়া আর কিছুই বুঝায় না। তেমনি এলিয়টের প্রবন্ধ পড়তে পড়তে ভুলেই যেতে হয় যে, এলিয়টের সমকালেই জয়েস, লরেন্স বা অডেন নামক লেখকেরাও বর্তমান। অবশ্য সমকালীন লেখকদের নিয়েই যে সমালোচনা করতে হবে এমন কোনো নিয়ম নেই এবং সমালোচনার বিষয়বস্তু ও পরিধি স্থির করবেন সমালোচক স্বয়ং। ড্রাইডেন ও এলিয়টের সমালোচনার পরিধি সীমিত। তার কারণ, এঁরা সমালোচনায় হাত দিয়েছেন এই জন্য যাতে পাঠকের মানসিক প্রস্তুতি করানো যায়; সমালোচনা যেন এঁদের মুখ্য রচনারই মুখবন্ধ। কোলরিজ তাঁর দার্শনিকতত্ত্বের ভিত্তির উপর সাহিত্য সমালোচনা দাঁড় করাতে ব্যস্ত; আর্নল্ড তাঁর সমালোচনায় নীতিবাগিশতা কিছুতেই ত্যাগ করতে পারেন না; এলিয়ট যখন কাব্য সমালোচনা করেন, মনে হয় তা যেন অন্য কোনো কবির নয়, তাঁর নিজেরি ভাবী সৃষ্টির উপক্রমণিকা। ড্রাইডেনের 'হিরোয়িক ট্রাজেডি' বিষয়ে অত্যুৎসাহ, আর্নল্ডের এপিক সম্বন্ধে মাথা ঘামানো, এবং এলিয়টের 'কাব্যনাটক' সম্বন্ধে অতিরিক্ত মাথাব্যথার কারণ একই। সমালোচনার নামে তাঁরা নিজের নিজের প্রিয় ভাবী বিষয়েই মনোনিবেশ করতে গিয়েছিলেন; বা বলা যায়, তাঁরা যে-যে বিষয়ে চেষ্টা করেও ব্যর্থ সেই সেই বিষয়েই মনোনিবেশ করে সমালোচক হয়ে উঠেছেন। ব্যর্থ বিষয়েব পরিবর্তে, সার্থক বিষয়ে সার্থক সমালোচনার উদাহরণ খুব বেশি নেই। ব্যতিক্রম, বোধ হয়, হেনরি জেমস। হেনরি জেমস নিজে ঔপন্যাসিক এবং বলতে গেলে তিনি যা কিছু সমালোচনা লিখেছেন তাও সবি উপন্যাস সম্পর্কেই। ইংরেজি সমালোচকদের মধ্যে অবশ্য হেনরি জেমসের মতো এরকম একনিবিষ্টের সংখ্যা খুবই কম।

ড্রাইডেনের পূর্বে ইংরেজি সমালোচনার ক্ষেত্রটি ছিল খুবই স্বল্পপরিসর। কিছু ফরমানি সমালোচনা এবং তাও প্রায়শই লাতিন গ্রন্থাদির চর্বিতচর্বণ। ষোড়শ শতকের ইংরেজ সমালোচকরা য়ুরোপীয় পাণ্ডিত্যচর্চার উত্তরাধিকার হিসাবে ঝুড়ি ঝুড়ি সংজ্ঞা, পরিভাষা—যথা ট্রাজেডি, প্যাস্টর‍্যাল, এলেজি ইত্যাদি—এবং ছন্দ ও অলঙ্কারশাস্ত্রের বিভিন্ন সূত্র লাভ করেছিলেন। কিন্তু এই সব পরিভাষা ও সূত্র প্রয়োগের উপযুক্ত ক্ষেত্র তখনো ইংরেজি সাহিত্যে সৃষ্টি না হওয়ায় এগুলির চর্চা প্রধানত ব্যাকরণপাঠের অঙ্গ হিসাবেই সীমাবদ্ধ থাকতো। ষোড়শ শতকে বর্ণনাধর্মী সমালোচনা বলতে আমরা কিছুই পাই না। এলিজাবিথিয় নাটকের কোনো সমসাময়িক সমালোচনা নেই। এমন কি ১৭শ শতকের প্রথমে মেটাফিজিক্যাল কাব্যের মতো কালাপাহাড়ি কাব্যের উপরও কোনো সমসাময়িক মন্তব্য বা আলোচনা আমরা পাই না। ইংরেজি সমালোচনার আরম্ভ বলতে গেলে ড্রাইডেন দিয়ে এবং ডক্টর জনসন ড্রাইডেনকেই "ইংরেজি সমালোচনার জনক" বলে অভিহিত করেছেন। কিন্তু ড্রাইডেনের দীর্ঘ চল্লিশ বৎসরের সাহিত্যকৃতির মধ্যে 'নাট্যকাব্য প্রসঙ্গে' বাদ দিলে আর সব সমালোচনাই তাঁর কোন না কোন গ্রন্থের মুখবন্ধ মাত্র; খানিকটা যেন ধান ভানতে শিবের গীত। তবু বর্ণনাধর্মী সমালোচনার তিনিই প্রবর্তক। তাঁর প্রথম প্রকাশিত নাটক 'প্রতিদ্বন্দ্বী নারী' (রাইভ্যাল লেডিজ) (১৬৬৪)-র উৎসর্গপত্রে তিনি ছন্দপ্রয়োগের সপক্ষে ওকালতি করেন এবং এখানেই প্রথম আমরা ইংরেজি সমালোচনার মোড় পরিবর্তনের সুস্পষ্ট আভাস পাই। এখানে ড্রাইডেন নিজের অজ্ঞাতেই নূতন সমালোচনারীতির প্রবর্তক হয়ে উঠেছেন। আমরা দেখি, একজন তরুণ কবি নিজের কাব্যচর্চার সমস্যা নিয়ে বিশ্লেষণ ও বর্ণনাধর্মী আলোচনায় প্রবৃত্ত। এর আগে

জন্য কোনো ইংরেজ লেখককে এইভাবে আলোচনা করতে দেখা যায় নি। 'নাট্যকাব্য প্রসঙ্গে' গ্রন্থে ড্রাইডেন পূর্ববর্তী যুগের জের হিসাবে কিছু কিছু ফরমানি উক্তি অবশ্য করেছেন, কিন্তু এই গ্রন্থেই প্রথম একটি ইংরেজি দেশি গ্রন্থের—বেন জনসনের 'নির্বাক নারী' (সাইলেণ্ট ওম্যান)—বিশ্লেষণ ও বর্ণনাধর্মী আলোচনা পাই। তাঁর স্বরচিত নাটকের মুখবন্ধে সাম্যাবস্থ প্রবন্ধগুলির সঙ্গে এর চরিত্রগত প্রভেদ খুব একটা নেই, কারণ এখানেও ড্রাইডেনের আসল উদ্দেশ্য আত্মপক্ষ সমর্থন। 'প্রতিদ্বন্দ্বী নারী', 'গ্রানাডা বিজয়' (কঙ্কোয়েস্ট অব গ্রানাডা) 'প্রেমের জন্য সর্বস্ব' প্রভৃতি নাটকের মুখবন্ধেরও লক্ষ্য একই। ড্রাইডেনের সমালোচনার বেশির ভাগই নাটক সম্পর্কিত। 'নাট্যকাব্য প্রসঙ্গে' সংলাপের আকারে রচিত হলেও—এবং এলিয়ট একে প্লেটোর ডায়ালগ-এর সঙ্গে তুলনা করলেও —এর মধ্যে সংলাপের স্বাদ একেবারেই অনুপস্থিত। ড্রাইডেন তিনজনের মুখে তিনজোড়া বিবৃতি বসিয়ে দিয়েছেন, এর মধ্যে 'নিয়্যানডার' নামধারী ব্যক্তি হচ্ছেন ড্রাইডেন স্বয়ং। ফরাসী আকাদেমির আক্রমণের জবাবে নাট্যকার কর্নেই ১৬৬০ খৃঃ তাঁর তিনখণ্ডে প্রকাশিত নাটকের সঙ্গে তিনটি প্রবন্ধ লেখেন এবং প্রত্যেক খণ্ডের সঙ্গে একটি করে নাটকের বিশদ আলোচনা জুড়ে দেন। এর আগে অবশ্য বেন জনসনও তাঁর নাটকের সঙ্গে আলোচনামূলক মুখবন্ধ জুড়েছেন, কিন্তু সে-আলোচনা নিতান্তই সাধারণ ধরণের। ড্রাইডেন, যতদূর মনে হয়, ফরাসী নাট্যকার কর্নেই-এর দৃষ্টান্তেই উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। এছাড়া, বলা যায়, ড্রাইডেন ইংরেজিতে তুলনামূলক সাহিত্য-সমালোচনারও প্রবর্তক। কারণ, ফরাসী ও ইংরেজ নাট্যরীতির তুলনামূলক আলোচনাই তার প্রবন্ধের মূল বিষয়। তবু ইংরেজিতে কেন, অন্যান্য আধুনিক য়ুরোপীয় ভাষায়ও তুলনামূলক সমালোচনা ড্রাইডেনের আগে খুব একটা চোখে পড়বে না। অন্ধ দেশপ্রেমিকতার জন্য ড্রাইডেনের যুক্তিগুলি অবশ্যই একপেশে ও পক্ষপাতদোষে দুষ্ট। কিন্তু নূতন রীতির তিনিই যে প্রবর্তক তাতে সন্দেহ নেই।

অগস্টান যুগের সমালোচনা এক হিসাবে ড্রাইডেন-প্রবর্তিত রীতিকেই আরো এক ধাপ এগিযে নিয়ে গেছে। যুবক পোপ-এর 'সমালোচনা নিবন্ধ'—(এসে অন ক্রিটিসিজম) (১৭১১) ফরাসী রীতির বিরুদ্ধতায় ড্রাইডেনের রচনাকেই মনে পড়ায়। পোপ ঐতিহাসিকতা মানেন, তাঁর মতে এক এক যুগের এক-একটি বিশেষ রীতি থাকে। অগস্টান যুগ যে এলিজাবিথিয় ফরমানি সমালোচনার যুগ থেকে বহু দূরে এগিয়ে এসেছে তা এই যুগের অন্যান্য সমালোচকদের রচনাতেও স্পষ্ট। অ্যাডিসন মিল্টনের ওপর লেখা তাঁর প্রথম প্রবন্ধে ঘোষণা করেন যে, কতকগুলি সাধারণ সংজ্ঞা নিয়ে অসার আলোচনা না করে তিনি মিল্টনের 'হৃতস্বর্গ' (প্যারাডাইস লস্ট)-কে বীর-কাব্য বলা যায় কি না সে সম্বন্ধেই বিচার করবেন। অ্যাডিসনে এসে আমরা স্পষ্ট বুঝতে পারি যে, শুধু এলিজাবিথিয় যুগ থেকেই নয়, ড্রাইডেন ও পোপ থেকেও ইংরেজি সমালোচনা অনেক দূরে এগিয়ে এসেছে। ফরমানের পরিবর্তে প্রকৃত উদাহরণ, লেখককে উপদেশ বা অনুশাসনে ভারাক্রান্ত না করে পাঠককে সাহিত্য বোঝাতে সাহায্য করাই এই সমালোচনার নূতন দৃষ্টিভঙ্গি। ওয়র্ডসওয়র্থের 'গীতিমূলক কাহিনীকাব্য' (লিরিক্যাল ব্যালাডস) এবং তার মুখবন্ধ প্রকাশিত না হওয়া পর্যন্ত এই পাঠকমুখী সমালোচনাই ইংরেজি সাহিত্যে প্রবল থাকে। একটি দৃষ্টান্ত দিলেই এযুগের বৈশিষ্ট্য সহজে বোঝা যাবে। পোপ 'মেটাফিজিক্যাল' কবিদের উদ্ভট ভঙ্গির নিন্দা করেই ক্ষান্ত থাকেন, আর অ্যাডিসন 'মেটাফিজিক্যাল' কাব্যের মনোহারিত্ব কী তাই ব্যাখ্যা করেন।

ইংরেজি সমালোচনার ইতিহাসে ডক্টর জনসন এক স্বয়ংপ্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠান। অষ্টাদশ শতকের ইংরেজ সমালোচকদের মধ্যে ইতিহাসধর্মী সমালোচক হিসাবে তিনিই শ্রেষ্ঠ। তাঁর কথোপকথনপটুত্বের কথা এখন ইংলণ্ডের এক অতুলন কিংবদন্তী, কিন্তু বিদগ্ধ সাহিত্যসমালোচক হিসাবেও ডক্টর জনসনের স্থান খুবই উঁচুতে। 'ভ্রামণিক' (র‍্যামব্লার) নামক পত্রিকায় প্রকাশিত কয়েকটি সমালোচনা প্রবন্ধের পর ১৭৫৫ খৃঃ তাঁর 'অভিধান' (ডিকশনারি), দশ বৎসর পর ১৭৬৫ খৃঃ তাঁর সম্পাদিত শেক্সপীয়র গ্রন্থাবলী এবং পরিশেষে ১৭৮১ খৃঃ তাঁর 'চরিতমালা' (লাইভস) সমালোচক জনসনের শ্রেষ্ঠ কীর্তি। চল্লিশ বছর বয়সের আগে তিনি একটি প্রবন্ধও লেখেন নি এবং তাঁর শ্রেষ্ঠ সমালোচনাগ্রন্থ 'চরিত্রমালা' যখন প্রকাশিত হয় তখন তাঁর বয়স বাহাত্তর। জনসনের রচনা অনুধাবন করলে দেখা যায়, তিনি অগস্টান যুগের পরিবর্তিত দৃষ্টিভঙ্গি স্বীকার করে আরো পরিবর্তনের দিকে প্রাগ্রসর। পাঠক-পাঠিকার রুচিগঠনকে তিনি অগ্রাধিকার দিতে চান। প্রচলিত নব্য-ক্লাসিক সাহিত্যরীতি তিনি আক্ষরিকভাবে কখনই গ্রহণ করেন নি। তাঁর চিন্তাধারা বাস্তবমুখী, কোন একটি বিশেষ সাহিত্যিক মতবাদ বা থিয়োরি আঁকড়ে থাকা তাঁর মনঃপূত নয়। থিয়োরি সম্বন্ধে তিনি মোটেই অজ্ঞ নন, কিন্তু থিয়োরি দ্বারা তাঁর আলোচনা শাসিত নয়। তাঁর আলোচনায় অ্যারিস্টটল-পূজো একেবারেই নেই। গ্রীক ও রোমান ধ্রুপদী সাহিত্য যে প্রাচীন সাহিত্যসমালোচনার অনুশাসন মেনে চলেছে বলেই সার্থক তা তিনি মনে করেন না। সার্থকতার স্বরূপ রচনাগুলির মধ্যেই নিহিত এবং তা উদ্ঘাটন করাই সমালোচকের কাজ। জনসনের 'অভিধান' ইংরেজি ভাষায় রচিত প্রথম সম্পূর্ণ অভিধানই শুধু নয়, প্রথম ইতিহাস-সম্মত প্রণালীতে লিখিত অভিধানও। 'অভিধান' সমাপ্ত হবার পরই তিনি শেক্সপীয়র সম্পাদনায় হাত দেন। প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ ফোলিয়োর পর শেক্সপীয়র গ্রন্থাবলীর সম্পাদনা করেন রো, পোপ, থিয়োবাল্ড, হ্যানমার, একজন অনামী সম্পাদক ও ওয়ারবারটন এবং তারপর সপ্তম সম্পাদক হলেন ডক্টর জনসন। বর্ণনাধর্মী সমালোচনার নিদর্শন হিসাবে জনসনের মুখবন্ধটি খুবই মূল্যবান। শেক্সপীয়রকে স্বভাবকবি বলে অভিহিত ও অভিনন্দিত করে তাঁর মিশ্র-রীতির নাটক ট্র্যাজি-কমেডির প্রতি জনসন সমর্থন জানিয়েছেন। স্থানকালের ঐক্যের বস্তাপচা ধারণাকে তিনি আক্রমণ করেছেন। জনসনের সবচেয়ে পরিণত সমালোচনাগ্রন্থ তাঁর 'চরিতমালা' বা 'ইংরেজ কবিজীবনী'। এতে আছে বাহান্নটি জীবনী। এই চরিতমালার মডেল সম্ভবত তিনি ফঁতেনেল-এর 'সংগ্রহ' (রেকুই) থেকে পেয়েছিলেন। কবিজীবনী, কবিচরিত্র ও কাব্যালোচনা এই তিন ভাগে প্রত্যেকটি প্রবন্ধ রচিত। বলা যায়, ঊনবিংশ শতকের ইতিহাসধর্মী সমালোচনাধারার তিনিই গোড়াপত্তন করেন। মিল্টনরচিত প্রবন্ধে 'হৃতস্বর্গ' কাব্যের আলোচনা এবং কুলি-চরিত প্রবন্ধে মেটাফিজিক্যাল কাব্যরীতির উপর তাঁর মন্তব্য খুবই অন্তর্দৃষ্টির পরিচায়ক।

১৭৭৭ খৃঃ শেক্সপীয়রের ফলস্টাফ চরিত্রের উপর মরিস মরগানের বিখ্যাত সমালোচনা প্রকাশিত হয়। এই ধারারই বিবর্তনে রোমান্টিক সমালোচনা এবং সর্বশেষে ব্রাডলির 'শেক্সপীয়রীয় ট্র্যাজেডি'র উদ্ভব হয়। ইংরেজ সমালোচকদের মধ্যে এখন পর্যন্ত রোমান্টিক কবি-সমালোচক কোলরিজের স্থানই সর্বোচ্চ। কিন্তু কেন, তা নিয়ে সমালোচকদের মধ্যে মতৈক্য দেখা যায় না। কোলরিজের মৌলিকতা সম্পর্কে সন্দেহের অবশ্য যথেষ্ট অবকাশ আছে, যেহেতু তাঁর অধিকাংশ বক্তব্যই জার্মান দার্শনিক-সমালোচকদের প্রতিধ্বনি বলে মনে হয়। মার্কিন সমালোচক রেনে ওয়েলেক-এর মতে, কোলরিজের গুরুত্ব হচ্ছে এই যে

গরমিকালের
আরামজুতো
প্রচণ্ড গরম। এই গরমে বাটার স্যাণ্ডাল পায়ে দিন
যা আরাম তা খালি-পায়ের সুখেরই সামিল।
এমন হাওয়া-খেলানো এদের নকশা!
হাজার গরমেও বাটার স্যাণ্ডাল ছিমছাম,
ফিটফাট—তার কারণ এদের দীর্ঘস্থায়ী মসৃণ চামড়া
উপরন্তু আধুনিক যন্ত্রপ্রয়োগে দক্ষ কারিগরের
নির্মাণ কৌশল তো আছেই। সুঠাম তলি,
গোড়ালি আর সুখতলা—বহু
ব্যবহারেও অটুট থাকে। বেশ কিছু
সুদৃশ্য স্যাণ্ডাল বাটার দোকানে এসেছে
আজই এসে দেখে যান।
Bata
আলিবাবা

তিনি ছিলেন জার্মানী ও ইংলণ্ডের মধ্যে সাহিত্যিক মধ্যস্থ। তাঁর দেওয়া সাতটি বক্তৃতামালার মধ্যে মাত্র তিন-চারটির কোন না কোন অনুলিপি বর্তমান, বাকি সবি লুপ্ত। বর্তমান অনুলিপিগুলির যে মুদ্রিত রূপ আমরা পাই তাও কোলরিজের নিজের তৈরি বা সংশোধিত নয়। তাঁর জীবদ্দশায় প্রকাশিত একমাত্র সমালোচনা-গ্রন্থ 'বাইয়োগ্রাফিয়া লিটারেরিয়া' (১৮১৭) এমন এলোমেলো ও অগোছালো যে একে স্কেচ বলাই যুক্তিসঙ্গত। কোলরিজের সমালোচনার মূল লক্ষ্য বিশ্লেষণ নয়, সমালোচনাকে একটি সম্পূর্ণ দার্শনিক রূপ দেওয়া। কাব্যরচনার মূল সূত্র আবিষ্কারই তাঁর অন্বিষ্ট, শুধুমাত্র রায় দেওয়া নয়। যে সৃষ্টিপ্রক্রিয়ার ফলশ্রুতি কবিতা সেই প্রক্রিয়ার পর্যালোচনাতেই কোলরিজের চরম উৎসাহ। সব পাঠকের জন্য ঢালাও একটিমাত্র আস্বাদনের মান তিনি খোঁজেননি। শেক্সপীয়র বা অন্য লেখকের রচনা তিনি কী চোখে দেখেছেন সেটাই বারবার করে বলেছেন; কোলরিজের দৃষ্টি দিয়ে তিনি পাঠককে শেক্সপীয়র পড়াতে চেয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে কবিতার মূল্যায়ন কোলরিজে নেই বললেই হয়; কোনো কবিতাকে ভাল বা মন্দ কবিতা বা মহৎ কবিতা বলার জন্য তিনি একটুও ব্যস্ত নন; ছন্দ থাকলেই কবিতা হবে কি না বড়জোর এই বিষয়ে সাধারণ দার্শনিক আলোচনা করেছেন। ডক্টর জনসনের সঙ্গে কোলরিজের তফাৎ এই যে কোলরিজ বর্ণনাধর্মী সমালোচনা শুধু দৃষ্টান্ত দিতে গিয়েই ব্যবহার করেছেন; বর্ণনাধর্মী সমালোচনার জন্যই সমালোচনা তিনি করেন নি। এমন কি শেক্সপীয়রের ওপর তাঁর লেকচারগুলিও অনেকটা বর্ণনাধর্মী হওয়া সত্ত্বেও তাঁর লক্ষ্য থিওরি সন্ধান। ভিক্টোরিয়া যুগের সমালোচকদের পক্ষে কোলরিজমানস অনুধাবন করা ছিল অসম্ভব। ভিক্টোরিয় যুগে কোলরিজ অবহেলিত, তাঁর রচনাবলী গ্রন্থন বা সম্পাদনার কথা তখন কেউ ভাবেন নি। কোলরিজ সম্বন্ধে যা কিছু উৎসাহ উদ্দীপনা মূল্যায়ন সবই বিংশ শতকে এসে। কাণ্টের সাহিত্য ও সৌন্দর্যতত্ত্ব যে-একজনমাত্র ইংরেজ সমালোচক ইংরেজি সাহিত্য সমালোচনায় প্রয়োগ করতে প্রয়াসী হয়েছিলেন তিনি হচ্ছেন আদি ও অদ্বিতীয় কোলরিজ। 'বাইয়োগ্রাফিয়া লিটেরারিয়া'-তে কোলরিজ ওয়র্ডসওয়র্থের 'লিরিক্যাল ব্যালাডস'-এর মুখবন্ধের বক্তব্যের সোচ্চার প্রতিবাদ করেছেন। 'বাইয়োগ্রাফিয়া' দ্রুত নিষ্পন্ন হওয়ায় এবং সুসম্পাদিত নয় বলে এর দ্বাদশ অধ্যায়ে বর্ণিত কাণ্টীয় ধারণার সঙ্গে ত্রয়োদশ অধ্যায়ে বর্ণিত 'ফ্যান্সি' ও 'ইম্যাজিনেশন'-এর ধারণার মিল খুঁজে পাওয়া কঠিন। কোলরিজের শেক্সপীয়র-লেকচারগুলির গভীরতা বিস্ময়কর। শেক্সপীয়র সমালোচনার ক্ষেত্রে তাঁর রোমাণ্টিকতার চূড়ান্ত উদাহরণ হ্যামলেট প্রসঙ্গে তাঁর বিখ্যাত উক্তি—"বলতে গেলে আমার নিজের মধ্যেই একটা হ্যামলেট-হ্যামলেট ভাব রয়েছে (আই হ্যাভ এ স্ম্যাক অফ হ্যামলেট মাইসেলফ)।" আধুনিককালে, উইলসন নাইট ও চিত্রকল্প-সমালোচক স্পার্জন, ক্লেমেন প্রভৃতির পূর্বসূরী হিসাবে কোলরিজকে চিহ্নিত করা হচ্ছে। কোলরিজের সমসাময়িক সমালোচকদের মধ্যে ল্যাম, হ্যাজলিট ও ডি-কুইনসির নাম উল্লেখযোগ্য। ওয়েবস্টারের নাটকের ওপর ল্যামের আলোচনা, শেক্সপীয়র নাটকের চরিত্রের ওপর হ্যাজলিটের সমালোচনা, এবং 'ম্যাকবেথ' নাটকে করাঘাত দৃশ্যের উপর ডি-কুইনসির বিশ্রুত প্রবন্ধ রোমাণ্টিক যুগের শ্রেষ্ঠ কীর্তি।

ভিক্টোরিয় যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্য সমালোচক ম্যাথু আর্নল্ড। যে-যুগে ধর্মবিশ্বাস খুবই শিথিল এবং মানুষের মন সংশয়ে জর্জরিত সে-যুগে কবিতাই পারে ধর্মের শূন্যস্থান পূরণ করতে—এই কথাই ব্যক্ত করেছেন আর্নল্ড তাঁর 'কৃষ্টি ও অরাজকতা' (কালচার অ্যান্ড অ্যানার্কি) গ্রন্থে। 'সমালোচনা প্রবন্ধাবলী' (এসেস ইন ক্রিটিসিজম)-তেও তাঁর কালচার পুনরুদ্ধারের আবেগ স্পষ্ট। সংকীর্ণ, স্থৈপায়ন, 'ফিলিস্টাইন' দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ইংরেজ জাতিকে কী করে পরিমার্জিত, উদার, শীলিত আদর্শের দিকে নিয়ে যাওয়া যায় তাই ছিল আর্নল্ডের ধ্যানজ্ঞান। তাঁর রচনায় একই ধারণার পুনরুক্তি অনেক সময় পীড়াদায়ক, কিন্তু সংস্কৃতির সপক্ষে প্রচারকের ভূমিকা গ্রহণ করায় ফরাসী সমালোচক স্যাঁত বোভ-এর মতো আর্নল্ড আবেগময় পুনরুচ্চারণের রীতি গ্রহণ করেন।

আর্নল্ড ও এলিয়টের মধ্যবর্তী তিন দশকের মধ্যে ইংরেজি সাহিত্যে একদল কলাকৈবল্যবাদী, সৌন্দর্যসুখী, রুচিবাগীশ, বাকপটু, সমালোচকের আবির্ভাব ঘটে। প্রি-র‍্যাফেলাইট-ধারা অনুসরণ করে এরা সৌন্দর্যতন্ময়তার পূজারী হন। এঁদের মধ্যে আছেন পেটার ও অস্কার ওয়াইল্ড। বিপরীত দিকে উপন্যাস সমালোচনার ক্ষেত্রে নীতিমূলক দৃষ্টির সূত্রপাত দেখি হেনরি জেমসের নোটবুক, মুখবন্ধ ও অন্যান্য প্রবন্ধে। কিন্তু এলিয়টের আবির্ভাবের পর সমালোচনার মানচিত্র সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হয়ে যায়। এলিয়ট কবি হিসাবে প্রসিদ্ধ হলেও সমালোচক হিসাবেও তিনি বহুখ্যাত। ইংরেজি সমালোচনার ধারা যে এলিয়টের প্রভাবে সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হয়ে গেছে তা প্রায় সকলেই স্বীকার করে, কিন্তু খুবই আশ্চর্যের বিষয়, এলিয়ট বলতে গেলে একখানিও গোটা প্রবন্ধের বই লেখেন নি। তাঁর বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বিষয়ে রচিত প্রবন্ধ ও ভাষণের যোগফলই সমালোচনা ক্ষেত্রে বলতে গেলে এক নিঃশব্দ বিপ্লব ঘটিয়েছে। বিদগ্ধ সমালোচক টিলিয়ার্ড লিখেছেন, "'সেক্রেড উড' গ্রন্থের প্রবন্ধগুলি পড়বার পর আমার কেমন যেন অস্বস্তি বোধ হতে লাগলো এবং আমি বেশ বুঝতে পারলাম যে এগুলিকে কিছুতেই অগ্রাহ্য করা সম্ভব হবে না।"

এলিয়টের অনুবর্তী ও বিরোধী কোনো গোষ্ঠীই এলিয়টের নতুনত্ব ও বৈশিষ্ট্য যে ঠিক কী তা স্পষ্ট করে ব্যাখ্যা করতে পারেন নি। তাঁর কবি-সত্তা কখনো সমালোচনার ধূম্রজাল রচনা করে নিজেকে প্রকাশ, কখনো বা আড়াল করেছে। এলিয়ট কখনো বিশদ বিশ্লেষণ বা বিস্তারিত ব্যাখ্যা বা ঐতিহাসিক বা বর্ণনামূলক ব্যাখ্যানে নিজেকে নিয়োজিত করেন নি। তাঁর ধরণ হচ্ছে কতকগুলি সাধারণ সিদ্ধান্ত যুক্তিসিদ্ধ আকারে পরিবেশন করা। তাঁর সমালোচনার আকস্মিক প্যারাডক্স ও দুর্বোধ্য পাঠকের অভ্যস্ত রুচিকে আঘাত করে এবং জড়তা ভেঙে দেয়। এই আঘাত দেওয়াই এলিয়টের মূল উদ্দেশ্য। কারণ তাঁর অন্বিষ্ট ভাবী কবিতা বা সৃষ্টির পাঠকরুচি প্রস্তুত করা। এ হিসাবে তাঁর কাজ অনেকটা ড্রাইডেনের মতো, যদিও ড্রাইডেনের মতো তিনি নিজের কোনো বিশেষ রচনার ভূমিকা বা অনুবন্ধ হিসাবে কোনো প্রবন্ধ রচনা করেন নি। ১৯১৯ খৃঃ প্রকাশিত 'ট্রাডিশন অ্যান্ড দ্য ইণ্ডিভিডুয়্যাল ট্যালেণ্ট' প্রবন্ধটি সমালোচক এলিয়টের ম্যানিফেস্টো বলা যায়। এলিয়ট 'ঐতিহাসিক' সমালোচনারীতির বিরোধী। কবি তাঁর নিজস্ব ব্যক্তিত্ব ও সামাজিক পারিপার্শ্বিকতা কবিতায় প্রকাশ করেন না, কবিতার মধ্যে বরং এগুলি থেকে মুক্ত হন, এই হচ্ছে এলিয়টের মত। 'সেক্রেড উড' ও 'দ্য ইউস অব পোয়েট্রি অ্যান্ড দ্য ইউস অব ক্রিটিসিজম' গ্রন্থে সংকলিত প্রবন্ধাবলীতে দেখা যায় অনুচ্চ শ্লেষোক্তি —তাঁর কবিতার মতোই—তাঁর সমালোচনারও একটি বিশিষ্ট রীতি। সমালোচনাগুলি যে নিছক সমালোচনার জন্যই নয় তা 'মেটাফিজিক্যাল' কবি ও কাব্য সম্বন্ধীয় প্রবন্ধগুলি পড়লে খুব সহজেই বোঝা যায়। এই প্রবন্ধগুলি যেন 'ওয়েস্টল্যান্ড' কাব্যেরই অনুক্ত ভূমিকা। কবি ডান ও মেটাফিজিক্যাল কবিতা সম্বন্ধে তাঁর বিখ্যাত থিওরি 'অনুভূতির বিযুক্তি' (ডিসোসিয়েশন অব সেনসিবিলিটি) তাঁর নিজের কবিতার জগতেও সমভাবে প্রযোজ্য। 'হ্যামলেট' সম্পর্কিত প্রবন্ধে তিনি 'বাস্তবানুষঙ্গ' (অবজেক্টিভ কো-

রিলেটিভ) তত্ত্বের অবতারণা করেন। কাব্য বা শিল্প নৈর্ব্যক্তিক এইটিই এই তত্ত্বের মূল কথা। কোনো ব্যক্তিগত আবেগ নয়, পাঠকের মনে আবেগ-আভাষ ফুটিয়ে তোলাই বড় কথা; এর জন্য যা কিছু আয়োজন তাই হচ্ছে 'অবজেক্টিভ কো-রিলেটিভ।'

এলিয়টের অন্যান্য প্রবন্ধের মধ্যে 'দান্তে', 'থর্টস আফটার ল্যামবেথ', 'আফটার স্ট্রেঞ্জ গডস' প্রভৃতিতে সনাতনপন্থী এলিয়টকে সহজেই চেনা যায়। ১৯২৮ খৃঃ এলিয়টের বিখ্যাত ঘোষণা "আমি সাহিত্যে ধ্রুপদী, ধর্মে ইংগ-ক্যাথলিক এবং রাজনীতিতে রাজতন্ত্রী" এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। এজরা পাউন্ড বলেছিলেন, "কবিতা এক ধরণের অনুপ্রাণিত গণিত।" কাব্যের এই নৈর্ব্যক্তিকতার ওপর আরো জোর দিয়ে এলিয়ট বলেন, "কবির কোনো ব্যক্তিত্ব নেই, তিনি কবিতায় কোনো ব্যক্তিত্ব প্রকাশও করেন না। ব্যক্তিত্ব নয়, কবির যা আছে তা হচ্ছে কাব্য-প্রকাশের একটি মাধ্যম। এই মাধ্যম বা মিডিয়ামের মধ্যে নানা ধরণের ধারণা ও অভিজ্ঞতা অদ্ভুতভাবে এসে মিলিত হয়।" এ যেন রোমান্টিক সমালোচনার বিপরীত মেরুর কথা। কবি নয়, কবিতার ওপরই সবটুকু জোর এসে পড়ছে এবং এখানেই এলিয়ট ও আই-এ-রিচার্ডস সগোত্রে পরিণত। বিচিত্র ও বিপরীত অভিজ্ঞতার সমন্বয় সাধনেই কবির কৃতিত্ব। শুধু সপ্তদশ- শতকের মেটাফিজিক্যাল কবিতায় নয়; সব কবিতাতেই এই বৈপরীত্যের, এমন কি বিরোধিতার, ব্যাপার রয়েছে। কোলরিজের বিখ্যাত কথা 'বিপরীতের সমন্বয়' (রেকনসাইলমেন্ট অব অপোজিটস)-ও এই তাৎপর্য বহন করে।

আধুনিক যুগে যাকে 'নব্য সমালোচনা' (নিউ ক্রিটিসিজম) বলা হয় তার প্রবর্তক হচ্ছেন আই-এ-রিচার্ডস। 'নন্দনতত্ত্বের মূলভিত্তি' (দ্য ফাউন্ডেশনস অব এসথেটিকস) (১৯২২), 'অর্থের অর্থ' (দ্য মিনিং অব মিনিং) (১৯২৩), 'সাহিত্য সমালোচনার নীতি' (দ্য প্রিন্সিপল অব লিটারারি ক্রিটিসিজম) (১৯২৪), তিন বৎসরে পরপর তিনখানি গ্রন্থের পর ১৯২৯ খৃঃ প্রকাশিত হয় তাঁর 'প্র্যাকটিক্যাল সমালোচনা' (প্র্যাকটিক্যাল ক্রিটিসিজম)। শেষোক্ত বইটির নামকরণ লক্ষণীয়। এ যেন সমালোচনার নৈর্ব্যক্তিক ল্যাবরেটরি পদ্ধতির পক্ষে ওকালতি। অতি-আধুনিক কম্পিউটার যুগের পদধ্বনি বুঝি রিচার্ডসের রচনায় আভাসিত। 'নব্য সমালোচক' গোষ্ঠীর মধ্যে আছেন উইলিয়ম এম্পসন ও মার্কিন সমালোচক কবি জন ক্রো র‍্যানসম। বাক্যাংশ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বিচার করা ও একাধিক তাৎপর্য আবিষ্কার করা এই সমালোচনা রীতির বৈশিষ্ট্য।

নব্য সমালোচকদের পদ্ধতি কিন্তু আই-এ-রিচার্ডস থেকে খানিকটা পৃথক। কারণ রিচার্ডস কিছুটা সান্তায়ানার (The Sense of Beauty) ধরণে বলতে চেষ্টা করেছেন যে, সুসমতা বা সমন্বয় থেকে সৌন্দর্যের উদ্ভব, এই

পরিবার পরিকল্পনার উদ্দেশ্য কি ?

এটা হ'ল এমন একটা ব্যবস্থা যাতে ঃ

- কত বৎসর বাদে আপনার ক'জন ছেলেমেয়ে হলে ভাল হয় তা আপনি নিজেই স্থির করতে পারেন।
- আপনার পত্নীর স্বাস্থ্য ভাল রাখতে পারেন।
- আপনার সন্তানদের শিক্ষা ও স্বাস্থ্যরক্ষা ও তাদের ভালভাবে মানুষ করার দিকে বেশী দৃষ্টি দিতে পারেন।
- কোনরূপ দুশ্চিন্তা বা ভয় না করে আপনার বিবাহিত জীবন উপভোগ করতে পারেন।
- বন্ধ্যাত্ব নিবারণের চিকিৎসা গ্রহণ করতে পারেন।

জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ব্যবহার করে আপনার পরিবারকে ছোট্ট ছিমছাম ও সুন্দর করে গড়ে তুলুন ঃ

বিনামূল্যে পরামর্শ ও সেবার জন্য যে কোন পরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্রে যান।

'পশ্চিমবঙ্গ স্টেট হেলথ এডুকেশন ব্যুরো কর্তৃক প্রচারিত'

সুসমতার নাম দিয়েছেন রিচার্ডস Synthesis বা Synaesthesis; এ হচ্ছে কাব্যাস্বাদের অতএব কাব্যসৌন্দর্যের মূল কথা। সান্তায়ানার মতানুযায়ী যা আনন্দ দেয় হ্ল্যাদিনী তাই সুন্দর; Clive Bell এবং Roger Fry বলেন, যা এক বিশেষ aesthetic সৌন্দর্যানুভূতির আনন্দ দেয় তাই সুন্দর। Lipps ও Vernon Lee-র মতে যা empathy বা সমানুভূতির উদ্রেক করে তাই সুন্দর। John Crowe Ransom ও অন্যান্য কাব্য সমালোচকরা রিচার্ডস ও সমগোত্রীয় নন্দনতাত্ত্বিকদের বিরুদ্ধে এই বলে অভিযোগ তোলেন যে, বিশেষ আনন্দ, রস বা সৌন্দর্যানুভূতি যদি বিচারের একমাত্র মাপকাঠি হয়, তাহলে কবিতার বিচার অপ্রয়োজনীয় এমন কি অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু নব্য সমালোচকরা কবিতাকেই পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিশ্লেষণ করার পক্ষপাতী। তাঁরা বলেন, সুসমতা শুধু সৃষ্ট আবেগেই নয়, রচিত কাব্যের গঠনে ও শব্দার্থের মধ্যেও থাকবে এবং সমালোচকের কাজ তা বিশ্লেষণ করে দেখানো। Ransom-এর মতে কবিতায় দুটি জিনিস থাকে structure এবং texture, কাঠামো ও বুনুনি; কাঠামোতে কবিতার বক্তব্য পাই, আর বুনুনিতে পাই সেই আদ্যতা যার জন্য কবিতা কবিতা হয়; বৈজ্ঞানিক সত্যে শুধু কাঠামোই থাকে কোনো বুনুনি থাকে না। কবিতার বুনুনি যদিও কাঠামো বা যুক্তি থেকে পৃথক তবু তা কাঠামোকেও প্রভাবিত করে। বুনুনি বক্তব্যের পক্ষে অপ্রাসঙ্গিক বলেই তার অবতারণা যুক্তিকে বাধা দেয়, বিলম্বিত করে, ঘুরপাক খাওয়ায় এবং শেষ পর্যন্ত যখন যুক্তির সৃষ্টি ঘটে তখন সরলীকৃত যুক্তির পরিবর্তে বাস্তবের জটিলতা—যা যুক্তি কিছুতেই সম্পূর্ণ পরিমাপ করতে পারে না—এ সম্পর্কে আমাদের চেতনা তীব্র হয়, আমরা আনন্দ পাই। কবিতার কাঠামো থেকে আমরা পাই অবিশেষের ধারণা এবং বুনুনি থেকে পাই সবিশেষের ধারণা বিজ্ঞান শুধু সবিশেষের (universal) জগতে ঘোরাফেরা করে, কবিতা সবিশেষের (particular) জগতে আমাদের প্রবেশাধিকার দেয়। অবিশেষ ও সবিশেষ কি একত্রে মিলে একাকার হয়ে যায়, একটা সাম্যে উপনীত হয়? র‍্যানসম বলেন, না, তেলে-জলে যেমন মিশ খায় না, তেমনি, সবিশেষ ও অবিশেষ কখনোই একে অপরের মধ্যে দ্রবীভূত হয়ে একাকার হয় না, বড়জোর একটা মণ্ডে পরিণত হতে পারে। ইভর উইন্টার্স (Ivor Winters) এতে আপত্তি তুলে বলেছেন, বুনুনি যদি কবিতার কাঠামোর পক্ষে অপ্রাসঙ্গিকই হয় তবে, এক এক কবিতায় এক এক ধরণের বুনুনির প্রয়োজন হয় কেন? যা অপ্রাসঙ্গিক তা পুরোপুরিই অপ্রাসঙ্গিক।

কাব্যে যুক্তি বা কাঠামোর মূল্য যে নগণ্য তার সপক্ষে দেখানো যায় যে একটি কবিতার গদ্যানুবৃত্তি বা সারাংশে। যুক্তি অপরিবর্তিতই থাকে কিন্তু তার স্বাদ কবিতা থেকে অনেক আলাদা ও নিকৃষ্ট হয়ে থাকে। সোজা পথ বিজ্ঞানের পথ, কিন্তু পথ দিয়ে যেতে যেতে দুধারে নেমে ঘুরে ফুল তুলতে তুলতে এবং গাছপালা মাঠ দেখতে দেখতে আবার পথে ফিরে এলে আমাদের শুধু পথ হাঁটাই নয়, অঞ্চল দেখা হয় এবং অভিজ্ঞতাও সমৃদ্ধ হয়। কাব্যের অভিজ্ঞতা ঐ সমৃদ্ধ, বাঁকা পথ। এম্পসন যখন Seven Types of Ambiguity বলেন তখন ambiguity বা দ্ব্যর্থ কথাটির ওপর নজর না পড়েই যায় না। বিজ্ঞানের ব্যবহারে শব্দ বা পদের একটা অর্থ থাকে, কিন্তু কাব্যে তা নয়। তিনিও বলেন, দ্ব্যর্থ কাব্যে খুবই মূল্যবান, এতে কবিতার জটিলতা, সূক্ষ্মতা ও ঘনত্ব বাড়ে।

সিম্বলিজম বা প্রতীকবাদের প্রভাব শুধু শিল্পীদের নয়, সমালোচকদের ওপরও পড়েছে শ্রীমতী সুসান কে ল্যাংগার (Mrs. Susanne K. Langer) Philosophy in a New Key গ্রন্থে বলতে চেয়েছেন যে, কাব্য বা শিল্প হচ্ছে এক "নূতন প্রতীকী ফর্ম" যা বিজ্ঞান ও দর্শনের পাশাপাশি থাকতে পারে। Feeling and Form গ্রন্থে শ্রীমতী ল্যাংগার বিভিন্ন শিল্পে প্রতীকী রূপায়ণের মতবাদটির প্রয়োগ দেখিয়েছেন। ইয়ুং-এর 'archetype' বা আদি রূপকল্প মতবাদ অনুসরণ করে নরথ্রপ ফ্রাই (Northrop Frye) কবিতার উৎসে অর্থাৎ archetypes-এ পৌঁছাতে সচেষ্ট। শ্রীমতী ল্যাংগার দেখিয়েছেন যে, ফ্রয়েডের তত্ত্ব কাব্যের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করবার বড় অসুবিধা এই যে, উৎকৃষ্ট অপকৃষ্ট কাব্যের কোনো প্রভেদ ফ্রয়েডীয় তত্ত্বে করা সম্ভব নয়; কারণ সব শিল্পকর্মই স্বপ্ন ও দিবাস্বপ্নের মতো স্বাভাবিক ও স্বপ্রকাশক। মিস বডকিন (Maude Bodkin) Archetypal Patterns of Poetry-তে কাব্যের কাঠামোর সঙ্গে আদি রূপকল্পের সম্পর্ক নির্ণয় করে দেখিয়েছেন কতকগুলি আর্কেটাইপের প্যাটার্ন প্রাচীন ও নবীন কাব্যে সমভাবেই বর্তমান। কুমারী বডকিন বলেন, কাব্যের মর্মগ্রহণ করবার সময় আমাদের মানসিক সম্বলের সবটুকুই আমরা ব্যবহার করবো। ফ্রয়েড পড়ে যদি অভিজ্ঞতার কোন কোন অংশ স্পষ্টতর হয়ে থাকে, তবে সেই নব উপলব্ধি আমরা নিশ্চয়ই ওথেলো বা হ্যামলেট নাটকের মর্ম গ্রহণে প্রয়োগ করবো, যদিও এই উপলব্ধি শেক্সপীয়রের নিজের চিন্তাধারার মধ্যে বা তার দর্শকদের মধ্যে তখন ছিল না। কারণ, লেখকের উদ্দিষ্ট মর্মার্থে পাঠক বাঁধা থাকতে পারেন না, বিশেষ করে যখন কোন নাটক বা কাব্য লেখকের মৃত্যুর পরও শত শত বৎসর বেঁচে থাকে। অর্থাৎ লেখক নিরপেক্ষভাবেই রচনার মর্মার্থের বৃদ্ধি ঘটা সম্ভব। আদিম রূপকল্পের জ্ঞান প্রাচীন শিল্প সৃষ্টিগুলিকে আরো সমৃদ্ধ করতে পারে, কবির ও কবিতার সম্ভাব্য শক্তির বিকাশ ঘটাতে পারে। ফ্রয়েড থেকে স্বতন্ত্রভাবে ইয়ুং আদিম রূপকল্প ও প্রাচীন পুরাণকে অবদমিত অভীপ্সার পূরণ হিসাবে না দেখে, আমাদের সামাজিক সত্তা সম্পর্কে আত্মজ্ঞান লাভের উপকরণ হিসাবে ব্যাখ্যা করেন। স্বপ্নের ভিতর দিয়ে যেমন কখনো কখনো আমরা নির্জ্ঞান মনের সহায়তায় গভীরতর আত্মজ্ঞান লাভ করি তেমনি করি সাহিত্য ও শিল্পের মধ্য দিয়ে। কারণ মহৎ শিল্প স্বপ্নের মতই; স্বপ্ন যেমন বলে না, 'এটা করো সেটা কোরো না' বা 'এটা ভালো এটা মন্দ, এটা উচিত এটা অনুচিত', সাহিত্যও তেমনি। প্রভেদ এই যে, স্বপ্ন নির্জ্ঞান মনের সৃষ্টি; কবিতা নির্জ্ঞান মনের গভীরতা স্পর্শ করলেও সজ্ঞান মনেরই সৃষ্টি।

বিংশ শতকের সাহিত্য সমালোচনায় যেটি সবচেয়ে বড় হয়ে দেখা দিয়েছে তা হচ্ছে মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি। ফ্রয়েডীয় গবেষণা অনুসরণ করে কাব্যে, উপন্যাসে ও নাটকে গূঢ়ার্থ ব্যাখ্যা করা হচ্ছে। কাব্যে পুরাণ ও প্রতীকের ব্যবহারকে নূতন চোখে দেখা হচ্ছে। আবার, আবেগের ভারসাম্য খুঁজতে গিয়ে শব্দের মধ্যে বাচ্য ও ব্যঙ্গের আপেক্ষিক টানাপোড়েন বিশ্লেষণ করা হচ্ছে। শ্লেষ, বক্রোক্তি, দ্ব্যর্থ, প্যারাডক্স প্রভৃতিও সমালোচনায় গুরুত্বলাভ করছে। রোমান্টিক যুগে কবিতার বিচার হত কবিকে দিয়ে, কবির মানসিকতা বিশ্লেষণ করে। কাব্য বিচারে যে আরেকটি নূতন ধারা দেখা যাচ্ছে তাতে কবিতার জায়গায় কবিকে না বসিয়ে পাঠককে বসানো হচ্ছে, যে পাঠকের জন্য কবিতা তার মানসিকতা গ্রহণ-ক্ষমতা প্রভৃতির বিশ্লেষণ মুখ্য হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

মধ্য বিংশ শতকের ইংরেজি সাহিত্য-সমালোচনা কবিতার মধ্যে আরেক কবিতা, কবির মধ্যে আরেক কবি, মনের মধ্যে আরেক মন এবং অর্থের মধ্যে আরেক অর্থ, এমন কি, নিরর্থের মধ্যে অন্য এক নিরর্থের সন্ধানে ব্রতী।

আধুনিক বাংলা সাহিত্য ও ঐতিহ্যবোধ

নারায়ণ চৌধুরী

১

সেদিন সমকালীন বাংলা সাহিত্যের একজন অগ্রগণ্য বর্ষীয়ান সমালোচক এক সভায় আক্ষেপ করে বলছিলেন যে, আমাদের সাম্প্রতিক বাংলা সাহিত্যের কালচেতনা বড়ো দুর্বলঃ বাংলা সাহিত্যের ঐতিহ্য ক্রমাগত শ্রেষ্ঠ সম্পদগুলিকে লালন ও পোষণ করবার মনোভাব আজকের লেখকদের মধ্যে তেমন দেখা যায় না। বিলাপের সুরে তিনি প্রশ্ন করেছিলেনঃ তবে কি বৈষ্ণব তথা শাক্ত সাহিত্যের অমূল্য সঞ্চয়, যা আমরা উত্তরাধিকারস্বরূপ পেয়েছি, বৃথা যাবে? কিংবা সামগ্রিকভাবে প্রাচীন বাংলা সাহিত্য নামক যে ঐশ্বর্যময় রিক্থ আমাদের পূর্বাচার্যগণ আমাদের হাতে গচ্ছিত রেখে গেছেন তা হেলায় হারিয়ে যাবে? লেখকদের সাহিত্যগত কালচেতনার শুরু যদি হয় মাত্র এক প্রজন্ম বা বড়ো জোর দুই প্রজন্ম আগে থেকে, তবে তো বড়োই মুশকিলের কথা!

প্রবীণ সমালোচকপ্রবরের এই খেদোক্তির মধ্যে প্রভূত সত্য বিদ্যমান। সমকালীন লেখকদের লেখা পড়ে এবং তাঁদের সকলের সঙ্গে না হলেও একটা উল্লেখযোগ্য অংশের সঙ্গে মিশে আমার নিজেরও অনেক সময় এমনতরো কথা মনে হয়েছে। কিন্তু এতদিন আমি আমার সে চিন্তাকে ভাষা দেবার চেষ্টা করি নি। চেষ্টা করি নি তার কারণ একেই আমার অপ্রিয়ভাষী বলে সাহিত্যমহলে কিছুটা বদনাম আছে তার উপর কথায় কথায় যদি সমালোচনাচ্ছলে যা মনের ভিতর উঁকিঝুঁকি দেয় তাকেই কলমের মুখে রূপ দিতে যাই তা হলে তো আর সমাজে টেকা যায় না। স্বভাবতঃ অপরের মিত্রতাকামী ও অপরকে মিত্রতাদানে ইচ্ছুক হয়েও শুধুমাত্র অপ্রিয় সত্যের ব্যায়ামের জন্য বিশ্বসুদ্ধ মানুষকে শত্রু বানিয়ে ফেলায় না আছে কারও প্রকৃতির সত্যকার পরিচয় না বা বুদ্ধির পরিচয়। অতীতে এ-জাতীয় বুদ্ধিহীনতার পরিচয় বারেবারেই দিয়েছি, তাইতে ঠেকে-শিখেছি বিস্তর। ফলে ইদানীং অনেকটা সাবধান হয়ে গেছি, নিতান্ত আবশ্যক না হলে কারও বা কিছুর বিরুদ্ধে সহজে মুখ খুলতে চাইনে। আর সকলে চুটিয়ে সাহিত্যসংসারে পরস্পরের সঙ্গে প্রীতির চর্চা করবেন আর কিছু অপ্রিয় কথা বলবার দায় থাকলেই এই অভাজন লেখকটির দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করে অন্যেরা সরে পড়বেন আর নিজ নিজ বিবেকের কাছে পরিচ্ছন্ন থাকবার চেষ্টা করবেন এই অবস্থা আমি আর মেনে নিতে রাজী নই। প্রতিবাদ বা প্রতিকূল সমালোচনা করবার যত দায় কেবল এই হতভাগা সংসারজ্ঞানহীন লেখকটির! মজা মন্দ নয়।

ভাববেন না উষ্মার বশে এ কথা লিখছি, লিখছি বহু বেদনায়।

একটা দৃষ্টান্ত দিলেই কী বলতে চাইছি বুঝতে পারা যাবে। সম্প্রতি শ্লীলতা-অশ্লীলতার প্রসঙ্গ নিয়ে বাংলা সাহিত্যে নতুন করে আলোড়ন উপস্থিত হয়েছে, এটা অনেকেই লক্ষ্য করে থাকবেন। এই নিয়ে সভা-সমিতিতে বাদ-প্রতিবাদ চলছে, কাগজেও লেখালেখি কম হচ্ছে না। একাধিক সমব্যবসায়ী সতীর্থ বন্ধুকে জানি, যাঁরা অশ্লীলতার বিরুদ্ধে অতিশয় তীব্র মত পোষণ করেন কিন্তু প্রকাশ্যে এ ব্যাপারে কোনো কথা বলতে নারাজ। হেতু? না, তাতে তাঁদের জনপ্রিয়তা বিপন্ন হবে, অশ্লীলতার সমর্থন করে যাঁরা লিখেছেন সেই সব বন্ধুদের সঙ্গে সম্পর্ক তিক্ত হবে। তাছাড়া মালিক-সম্পাদকদের চটাবার ভয়ও আছে। তখন অবধারিতভাবে ছাই ফেলতে ভাঙা কুলোর মতো এই অধম লেখকটির আসরে ডাক পড়ে। এই আহ্বানের পিছনে পরিকল্পনা নেই তা নয়। কারণ আহ্বানের যাঁরা উদ্যোক্তা তাঁরা জানেন, হারাবার মতো জনপ্রিয়তা এই লেখকটির নেই, এবং অতিবড়ো ঘনিষ্ঠ বন্ধুর সঙ্গেও আদর্শগত কারণে সম্পর্ক তিক্ত করবার প্রয়োজন দেখা দিলে এই লেখক তাতে পেছপা হওয়ার মতো মানুষ নয়। সুতরাং অশ্লীলতার বিরুদ্ধে কিছু লিখতে হলে ডাকো ওই বিষয়বুদ্ধিহীন লেখককে, কিছু বলতে হলে ডাকো ওই বেপরোয়া লেখককে।

কিন্তু, সবিনয়ে বলছি, এইভাবে চিহ্নিত হতে আমি আর রাজী নই। অন্য সকলে শিকারসুখ অনুভব করতে চাইবে' কিন্তু বন্দুক রাখবার বেলায় কেবলমাত্র একটি ঘাড়ের দিকেই তাঁদের নজর পড়বে—তাঁদের অহংবোধের সুড়সুড়ি সত্ত্বেও আজ আর এবংবিধ পছন্দকে বিশেষ তারিফ করতে পারি না। নিজে ঝক্কি পোয়াব না কিন্তু অপরকে দিয়ে ঝক্কি পুইয়ে তার মজাটুকু লুটব এই মনোভাবকে বাধিত করতে আমার সবিশেষ আপত্তি।

কাজেই যতো ন্যায্য কারণেই হোক অপ্রিয় সমালোচনা আর করব না বলে মনস্থির করেছিলুম। কিন্তু পূর্বোক্ত মনীষী-সমালোচকের ওইদিনকার কথা আমার চিন্তাকে এমনভাবেই নাড়া দিয়েছে যে অন্ততঃ এই বিষয়টির আলোচনার জন্য আমি আমার সংকল্পকে সাময়িকভাবে স্থগিত রাখতে প্রলুব্ধ বোধ না করে পারছি না। এতকাল এই প্রসঙ্গটির বিষয়ে আমি মনে মনে যা ভেবেছি সুধী সমালোচকের খেদোক্তির মধ্যে তার জোরালো সমর্থন পেয়ে উল্লসিত বোধ করেছি। আমার উল্লাস আরও এ কারণে যে, যে প্রবীণ সমালোচকের কথা বলেছি তিনি সর্বাংশে 'গুণবিচারী' সমালোচক, পারতপক্ষে কারও দোষ-দর্শন করেন না। এমন যে সাতিশয় গুণগ্রাহী আর প্রিয়ংবদ মানুষ তাঁরই চোখে যখন সমকালীন বাংলা সাহিত্যের এই ত্রুটী ধরা পড়েছে তখন সেটি যে একটি মূলগত ত্রুটী তাতে সন্দেহ নেই। অতএব আমার পূর্বতন প্রতিজ্ঞাকে শিথিল করে কেনই না এই উপলক্ষ্যে কিছু আলোচনা-সমালোচনা করবার চেষ্টা করি? হয়তো এই আলোচনার মধ্যে, বিষয়বৈশিষ্ট্যের জন্য কতকটা এবং আমার স্বভাববৈশিষ্ট্যের জন্যও

অতকটা, অপ্রিয়ভাষণের ঝাঁজ প্রকাশ পাবে, কিন্তু আমি নিরুপায়। ভরসা করি পাঠক আমার এই ভঙ্গীটিকে কিছুটা সস্নেহ প্রশ্রয়ের দৃষ্টিতে দেখবেন ও সহ্য করবেন। তাঁদের অনুমোদন পেলে তবেই শুধু আমি মন খুলে কথা কইতে পারি।

২

আজ থেকে প্রায় তিরিশ বছর আগে আমরা যখন প্রথম সাহিত্যক্ষেত্রে প্রবেশ করি তখন রবীন্দ্রনাথ আমাদের মধ্যে জীবিত ছিলেন। শরৎচন্দ্র তার কিছুকাল আগে বিগত হয়েছেন। কবিগুরুর সর্বাতিশায়ী সৃষ্টিশীল অমর প্রতিভা তদানীন্তনকালের বাঙালী সাহিত্যিকদের মানসিকতাকে এমনভাবে প্রভাবিত করেছিল যে রবীন্দ্রনাথের আগেও যে বাংলা সাহিত্য বলে একটা বস্তু ছিল তা প্রায় তাঁদের মনোযোগ এড়িয়ে গিয়েছিল। মুষ্টিমের ব্যতিক্রম-দৃষ্টান্তের কথা অবশ্য আলাদা, তাঁদের বাদ দিয়ে আর যাঁরা ছিলেন তাঁদের প্রায় সকলেরই প্রেরণার একমাত্র উৎসস্থল ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথের পূর্ববর্তী যে বাংলা সাহিত্য, যার ভিতর মাইকেল ছিলেন, বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন, ছিলেন ঈশ্বর গুপ্ত-রঙ্গলাল-হেম-নবীন-বিহারীলাল, তার সম্বন্ধে বিশেষ কোনো চেতনা, উৎসাহ, অবহিতির প্রমাণ পাওয়া যেত না। রবীন্দ্রনাথ এমনভাবেই তিরিশের লেখককুলের দৃষ্টি আচ্ছন্ন ক'রে ছিলেন যে ওই আবেশের ফাঁক বেয়ে লেখকদের মনোযোগ দূরে বিস্তৃত হবার অবকাশ পেত না। মধুসূদন-বঙ্কিম-হেম-নবীন প্রমুখ সম্বন্ধেই যখন এই উৎসাহ-হীনতা, তখন ইংরেজ-অভ্যুদয়ের পূর্ববর্তী বাংলা সাহিত্যের রথী-মহারথীদের সম্বন্ধে উৎসাহ কতদূর গড়াতে পারে তা সহজেই অনুমান করা চলে।

লেখকদের মধ্যে যাঁরা কথাসাহিত্যের চর্চা করতেন তাঁদের উপর রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের প্রভাব সবিশেষ বিদ্যমান ছিল, খতিয়ে দেখলে, শরৎচন্দ্রের প্রভাবই বেশি ছিল; কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র তেমনভাবে তাঁদের মনোহরণ করতে পেরেছিলেন কিনা সন্দেহ। কবিদের অনুরাগ ভক্তি ও পূজো-ব্যাকুলতার জীবন্ত বিগ্রহ ছিলেন রবীন্দ্রনাথ, এই ক্ষেত্রে অন্য কোনো কবির প্রবেশাধিকারের প্রশ্নই ছিল না। বিগত পঞ্চাশ বছরের বাংলা সাহিত্যের যাঁরা খবরাখবর রাখেন তাঁরা জানেন নবপর্যায় 'ভারতী' পত্রিকাকে কেন্দ্র করে কিভাবে মণিলাল-চারুচন্দ্র-সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত-হেমেন্দ্র কুমার-সৌরীন্দ্রমোহনের দল ঐকান্তিক রবীন্দ্র-উপাসনার একটি চক্র রচনা করেছিলেন। অন্য দিকে, কালিদাস রায়-কুমুদরঞ্জন -করুণানিধান-কিরণধন-যতীন্দ্রমোহন বাগচী-সাবিত্রীপ্রসন্ন প্রমুখ কবিরা —যাঁরা পরবর্তীকালে সকলেই প্রসিদ্ধি অর্জন করেছেন—তাঁরাও একান্তরূপেই রবীন্দ্রভাবের ভাবুক ছিলেন। এ'দের বেলায় রবীন্দ্রচেতনা এমন একটা সর্বগ্রাসী প্রভাবের কেন্দ্রবিন্দু ছিল যে তাঁদের মনোযোগ সব সময় ওই কেন্দ্রকে ঘিরেই আবর্তিত হয়েছে, সামগ্রিক বাংলা সাহিত্য রূপ যে বৃত্তের কেন্দ্রে রবীন্দ্রনাথের অধিষ্ঠান, সেই বৃত্তের পরিধিতে তা কখনও সম্প্রসারিত হয় নি। অবশ্য তিনজন কবির মধ্যে এই আবিষ্ট রবীন্দ্র-মনস্কতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ লক্ষ্য করা যায়—তাঁরা হলেন—মোহিতলাল, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ও কাজী নজরুল। কিন্তু তাঁরা ব্যতিক্রমরূপেই গণনীয় এবং শেষ অবধি তাঁদেরও রবীন্দ্র-বিরোধিতা অনেকটা ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে এসেছিল। এর পরে কল্লোলের লেখকেরা আর একবার রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলেন কিন্তু সে বিদ্রোহের মধ্যে প্রত্যয়ের কোন জোর ছিল না। তা নিতান্তই ভঙ্গিসর্বস্ব বিদ্রোহ ছিল।

মোদ্দা কথাটা তা হলে দাঁড়াচ্ছে এই যে, বিশ শতকের বিশ ও তিরিশের দশকে রবীন্দ্রচেতনা বাংলা সাহিত্যের আকাশে-বাতাসে একটা সর্বব্যাপক ভাবপরিমণ্ডলের মতো বিরাজমান ছিল। ক্ষুদ্র-বৃহৎ-মাঝারি কোনো লেখকই ওই আবহের প্রভাব অতিক্রম করতে পারেন নি। এর ফল সবটাই যে ভালো হয়েছে তা বলা যায় না, কিছু পরিমাণে এই অতিরিক্ত রবীন্দ্র-মনস্কতার ফলে বাংলা সাহিত্যের পূর্বতন ঐতিহ্য সম্বন্ধে আমাদের ধারণা কথঞ্চিৎ পরিমাণে দুর্বল থেকে গেছে। উনিশ শতকের শেষ তিন দশক আর বিশ শতকের প্রথম দুই দশকের লেখকেরা যে রকম সোৎসাহ অভিনিবেশের সঙ্গে মাইকেল আর হেম-নবীন প্রমুখের কাব্য আর বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস ও প্রবন্ধ-রাজির আলোচনা করেছেন, উত্তরকালের লেখকদের ভিতর তার সিকির সিকি উৎসাহও লক্ষ্য করা যায় না। সংস্কৃত কাব্য, প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা কাব্য এ-সবের বিষয়ে আগ্রহ আর অভিনিবেশ তো প্রায় শূন্যের কোঠায় এসে ঠেকেছে। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যের খাতিরে চর্যাপদ, বৈষ্ণবকাব্য আর মংগলকাব্যের পঠনপাঠন আজও কিছু পরিমাণে অব্যাহত আছে সন্দেহ নেই, কিন্তু তার প্রভাব ছাত্র-ছাত্রীদের জগতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ, সাহিত্যের বৃহত্তর জগতে তার ছাপ পড়ে নি। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, সংস্কৃত সাহিত্য নিয়ে আলোচনা-সমালোচনার রেওয়াজ আজকাল একপ্রকার উঠেই গেছে। সংস্কৃত সাহিত্যের অধ্যাপকীয় পরিমণ্ডলের বাইরে একমাত্র ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় আর ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্তের লেখায় ছাড়া এ-বিষয়ক চেতনার বড়ো একটা প্রমাণ পাওয়া যায় না। বাংলা ভাষার আদিমাতা সংস্কৃত সম্বন্ধে অনৌৎসুক্যের পরিচয় দিয়ে আমরা খুবই সাহিত্যপ্রীতি দেখাচ্ছি যা-হোক!

সংস্কৃত-কাব্যসাহিত্য সম্বন্ধে উৎসাহের অভাব আমাদের কালেই দেখা দিয়েছিল, এখন তো তার ভরা পূর্ণ হয়েছে। অথচ এক সময়ে বাংলা ভাষায় সংস্কৃত কাব্যের উপর কত যে আলোচনা-সমালোচনা হয়েছে তার লেখাজোখা নেই। বঙ্কিমচন্দ্র, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, অক্ষয়চন্দ্র সরকার, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, দ্বিজেন্দ্রলাল এ'দের সংস্কৃত সাহিত্যবিষয়ক আলোচনা আজও রসবাদী সমালোচনা আর ঐতিহ্যপ্রীতির পরাকাষ্ঠারূপে স্মরণীয় হয়ে আছে। এখন বাংলা ভাষায় এ-জাতীয় আলোচনা হওয়া তো দূরের কথা, পুরাতন যেসব আলোচনা হয়ে গেছে সে সম্বন্ধেও ঔৎসুক্যের কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। আমরা আমাদের অতীত সাহিত্যকে বিস্মৃতির অতলে নিমজ্জিত করে চমৎকার এক পশ্চাৎটানশূন্য নিরালম্ব আধুনিকতার ভেলায় ভেসে চলেছি! হাল্কা হাওয়ার টানে এ ভেলা তরতর গতিতে বয়ে চলেছে, তাতে মনে হওয়া স্বাভাবিক এ ভেলার বেগ খুব স্বচ্ছন্দ, কিন্তু পিছনে কোনো ভার না থাকাতেই যে গতির এই আপাত-স্বচ্ছন্দ প্রবহমাণতা সেটা কারও চোখে পড়ছে না। যে নৌকোর ওজন নেই, বোঝা নেই, তা তো ক্ষিপ্রতার সঙ্গে জল কেটে চলবেই। কিন্তু এই ক্ষিপ্রতা যে অন্তঃসারশূন্যতার কারণেও হতে পারে সে খেয়াল কেউ করছেন না। মানি কালের অগ্রগতির সঙ্গে পুরাতনের চেতনা ক্রমশঃ ক্ষীণ হয়ে আসে। যুগ থেকে যুগান্তরের পথে যত আমরা এগোতে থাকি তত পুরাতন যুগের আকর্ষণ মন্দীভূত হয়ে আসতে থাকে এবং সেই পরিমাণেই নতুন কাল আমাদের

আপনি পাইতে পারেন

সামবায়িক ভিত্তিতে মাত্র ২০, টাকায় ৩৩০, টাকা মূল্যের ৩ ব্যান্ড অল ওয়ার্ল্ড পোর্টেবল ট্রানজিস্টার পাইবেন।

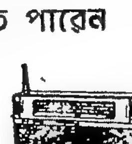

আবেদন করুন :

Ceylon Traders (WBC—22)
P. Box 1257, Delhi—6.

মরেস্ক

আজকালকার
স্থপতিরা
গৃহনির্মাণে
এইচ পি জি
গ্লাস
ব্যবহার করেন

হেক্স্যাগোনাল ওয়্যারড

স্যারো রীডেড

শীট গ্লাস

আজকের দিনের বাড়ীঘর ও অফিস-কাছারি, কলকারখানা, ইস্কুল ও হাসপাতালে সুদক্ষ ইঞ্জিনিয়াররা সর্বত্রই এইচ পি জি গ্লাস লাগান, কেননা তাঁরা জানেন যে এইচ পি জি গ্লাস উৎকর্ষের নিখুঁত মান বজায় রেখে তৈরী হয়। বিলাতের শতাধিক বৎসরের কাঁচনির্মাণকারী প্রতিষ্ঠান পিলকিংটন ব্রাদার্স-এর কারিগরী কুশলতার সাহায্য নিয়ে হিন্দুস্থান পিলকিংটন গ্লাস ওয়ার্কস এই এইচ পি জি গ্লাস তৈরী করেন।

এইচ পি জি কেনা মানেই নির্ভর-যোগ্য ভাল জিনিস কেনা।

হিন্দুস্থান
পিলকিংটন
গ্লাস ওয়ার্ক্স
লিমিটেড

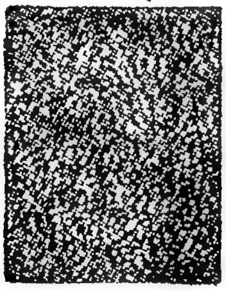
মরক্কো পিন্হেড

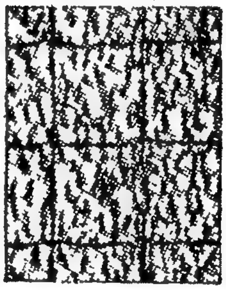
জর্জিয়ান ওয়্যারড

রাফকাস্ট
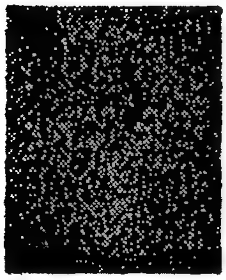

হ্যামার্ড
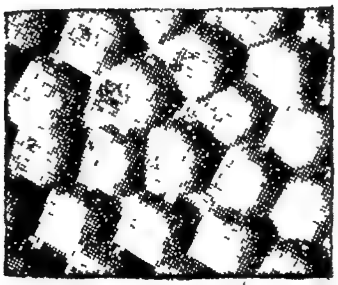

ম্যানেজিং এজেন্টস
তালুকদার ল'
অ্যাণ্ড কোম্পানী
প্রাইভেট লিমিটেড
হিন্দুস্থান বিল্ডিংস
৪, চিত্তরঞ্জন অ্যাভেনিউ,
কলিকাতা-১৩

JWTHP 1775A

মনোযোগের উপর তার দাবি পেশ করে। এককালে মধুসূদন-হেম-নবীন-বঙ্কিম বাংলা সাহিত্যের চর্চাকারীদের মনোযোগের একেবারে কেন্দ্র মধ্যে অধিষ্ঠিত ছিলেন, পরবর্তী সময়ে নিতান্ত বোধগম্য কারণেই তাঁরা নবাগত শক্তিমান কবি ও ঔপন্যাসিকদের পথ করে দিয়ে চিরায়ত লেখকদের সুসজ্জিত পার্শ্ব-কুঠরিতে স্থান করে নিতে বাধ্য হন। এখানে কে বড়ো কে ছোট কে বেশি শক্তিমান কে কম শক্তিমান এই তারতম্য বিচারের প্রশ্ন ওঠে না; কারণ সাহিত্যের অভিজ্ঞতা এই যে, যে সাহিত্য চলমান এবং জীবন্ত, সে সাহিত্য শাশ্বত মূল্যবিচারে যথেষ্ট সারবান হোক আর না-ই হোক, তার আকর্ষণ সব সময়ই চলতি কালের পাঠকদের কাছে সবিশেষ। একদা ঈশ্বর গুপ্ত-রঙ্গলাল পাঠকের মনোযোগ দখল করে ছিলেন, তার পর এলেন মধুসূদন-হেম-নবীন, তার পর বিহারীলাল-অক্ষয় বড়াল-দেবেন্দ্রনাথ সেনদের যুগ, তার পর প্রদীপ্ত আলোকশিখার মত অত্যুজ্জ্বল বিভায় দশ দিক আলো করে দেখা দিলেন রবীন্দ্রনাথ, তার পর মোহিতলাল-যতীন্দ্রনাথ-নজরুল-সত্যেন-কালিদাস-কুমুদ-করুণানিধান-যতীন বাগচীরা কিছুদিন কাব্যামোদী পাঠকদের আনন্দ দিলেন, এর পরে এল প্রেমেন্দ্র মিত্র-বুদ্ধদেব-জীবনানন্দ-সুধীন্দ্রনাথ-বিষ্ণু দে-অমিয় চক্রবর্তীদের যুগ; এখন তাঁরাও মনোযোগের আড়ালে পড়ে যেতে শুরু করেছেন এবং তাঁদের জায়গায় স্বভাবের নিয়মেই আত্মপ্রকাশ করেছেন আঙ্গিকে ও ভাববস্তুতে আরও বেশি অভিনবত্বপ্রয়াসী কবির দল। শুধু তাই নয়, এঁদের পাশাপাশি 'হাংরি' আর 'অ্যাংরি'-দের দাপাদাপিও শুরু হয়েছে। তাঁদের কবিতা সম্বন্ধে এক শ্রেণীর পাঠকের মাতামাতিও লক্ষ্য করা যাচ্ছে। কালের নিয়মেই এই সব ঘটছে।

এই পর্যন্ত যুক্তিক্রমটি বোঝা যায়, কিন্তু অভিনবত্বের চর্চার নামে, আধুনিকতার অভিমানবশতঃ, কেবলমাত্র চলতি কালেই যদি মনোযোগ সংলগ্ন থাকতে দেখা যায়, লেখকের মনোভঙ্গিতে ঐতিহ্যচেতনার বাষ্পও যদি খুঁজে না পাওয়া যায়, তবে সাবধানবাণী উচ্চারণ করতেই হয়। চলতি কালের লেখকদের সম্পর্কে উৎসাহের 'সজাগতা থাকা ভাল কিন্তু ঐতিহ্যচেতনাকে বাদ দিয়ে কোনমতেই ওই সজাগতার অনুশীলন হওয়া উচিত নয়। ঐতিহ্যজ্ঞানের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত আর ঐতিহ্যের দ্বারা অনুপ্রাণিত হলে তবেই শুদ্ধ আধুনিকতা সত্যিকার জোরালো হতে পারে। এমন বলব না যে অদ্যকার প্রগতিশীল মনোভঙ্গিকে বর্জন করে আমাদের পুরাতনের সুরে সুর মেলাতে হবে, যে মানসিকতায় একদা বাংলা সাহিত্য সংলগ্ন ছিল সেই উৎসে ফিরে যেতে হবে; তা কখনও কাম্য হতে পারে না। কিন্তু ঐতিহ্য সম্বন্ধে কোনো চেতনাই নেই, শ্রদ্ধাবোধ নেই, অথচ মাতৃভাষার চর্চা করছি বলে অভিমান আছে ষোল আনা, তার উপর অধিকন্তু হিসাবে আছে প্রগতির অহঙ্কার—এ-জাতীয় অভিমান আর অহঙ্কারের কোনো মানেই হতে পারে না। এ আত্মাভিমান অসার, পলকা, ভিত্তিবিবর্জিত। এই আত্মক্ষয়কর মোহের যত শীঘ্র অবসান হয় ততই মঙ্গল।

৩

আত্যন্তিক রবীন্দ্র-মনস্কতার কিছু অপূর্ণতা থাকলেও যাঁরা এ-জাতীয় মানসিকতার অধীন ছিলেন তাঁদের সপক্ষে এই একটা মস্ত বলবার কথা যে, তাঁরা যাঁকে আশ্রয় করেছিলেন, তিনি এক পরম আশ্রয়; যুগ যুগ ধরে সে আশ্রয়ের তলায় মাথা গুঁজে থাকলেও নিরাপত্তাবোধে ফাটল ধরবার কথা নয়। রবীন্দ্রনাথ থেকে এবং তাঁকে দিয়েই যাঁদের ঐতিহ্যচেতনার শুরু তাঁদের অতীত দৃষ্টি কিছু অস্বচ্ছ হলেও আর যাই হোক তাঁরা যে এক বৃহৎ বনস্পতির ছায়ায় আশ্রিত এবং সেই হিসাবে ভাগ্যবান সে কথা তো অস্বীকার করা যায় না। না-ই বা রইল মধুসূদন বা বঙ্কিম সম্বন্ধে সুতীব্র মনোযোগ, বৈষ্ণব আর মঙ্গলকাব্যের যুগ সম্পর্কে না-ই বা থাকল সাভিনিবেশ উৎসাহ; একা রবীন্দ্রনাথেই যে অনেক অপূর্ণতার পূরণ হয়ে যায়। আর তা ছাড়া, রবীন্দ্রনাথ তো একটা বিচ্ছিন্ন আবির্ভাব নয়, তাঁর সাহিত্যে প্রত্যক্ষে অথবা পরোক্ষে, অস্ফুটে অথবা স্ফুটতরভাবে, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বিগতকালীন সকল যুগের ছায়াই প্রলম্বিত আছে। পুরাতন সব প্রভাবই রবীন্দ্রকাব্যে সমাহৃত ও জীর্ণ। গোটা বাংলা ভাষার ঐতিহ্য রবীন্দ্রভাষায় একাঙ্গীভূত হয়ে গেছে এবং তাকেও ছাড়িয়ে রবীন্দ্রনাথ নিজের ভাষা তৈরি করে নিয়েছেন। ভাষা বলতে এখানে ভাষা, ভাব, দৃষ্টিভঙ্গি সবকিছুর সমাহার বোঝাচ্ছে। তা যদি হয় তো রবীন্দ্রনাথকে যাঁরা পরমাশ্রয়রূপে স্বীকার করে নিয়েছেন তাঁরা প্রকারান্তরে গোটা বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ঐতিহ্যকেই স্বীকার করে নিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথকে ঐতিহ্যের কেন্দ্রবিন্দুরূপে গ্রহণ করা মানে পরোক্ষভাবে এবং পরিস্রুত আকারে, বাংলা সাহিত্যের ঐতিহ্যের নির্যাসকেই আপনার করে নেওয়া।

কিন্তু যাঁদের ঐতিহ্যচেতনার শুরু, ধরা যাক, জীবনানন্দ বা সুধীন্দ্রনাথ দত্তকে দিয়ে, তাঁদের সম্বন্ধে কী বলা যায়? এঁরা আধুনিকতার অভিমানে এবং কাব্যক্ষেত্রে নতুন কিছু একটা করার নেশায় এমনই ডগমগ যে, বাংলা সাহিত্যের উনিশ-শতকীয় অথবা তার চেয়েও দূরবর্তী, প্রাচীনতর ঐতিহ্য সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল থাকার প্রয়োজন বোধ করা তো দূরস্থান, খোদ রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কেও শ্রদ্ধান্বিত হওয়ার আবশ্যকতা এঁরা অনুভব করেন না। সত্যি কথা বলতে কি, এঁদের বেলায় বাংলা সাহিত্যের মাইলচিহ্নের শুরুই হয় রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী কাল থেকে। মাত্র কিছুকাল আগে রবীন্দ্রনাথ নামক এক পরম বিস্ময় যে বাংলা সাহিত্যের দশদিক আচ্ছাদিত করে ছিল সেই আনন্দিত ও শ্রদ্ধিত চেতনার ক্ষীণতম প্রমাণ পর্যন্ত পাওয়া যায় না এঁদের হাবেভাবে, লেখায় ও আলোচনায়। এঁদের বেলায় কালচেতনার আদিবিন্দু জীবনানন্দ অথবা সুধীন্দ্রনাথ দত্ত অথবা অমিয় চক্রবর্তী, এর ওপারে ও আগে আর যা কিছু আছে সব এঁদের চোখে ঝাপসা। এরকম ক্ষীণ ঐতিহ্যচেতনা নিয়ে আর যা-ই করা যাক সাহিত্যানুশীলন করা চলে না।

এমন কথা বলব না জীবনানন্দ বা সুধীন্দ্রনাথ অশ্রদ্ধেয় কবি। তাঁরা নিশ্চয়ই শ্রদ্ধেয় কবি এবং সেই হিসাবে কাব্যামোদী পাঠকমাত্রেরই মনোযোগের পাত্র। কিন্তু সেই সঙ্গে এ কথাও বলা দরকার যে, তাঁরা অসম্পূর্ণ কবি, খণ্ডিত কবি—বাংলা কবিতার চিরাচরিত ভাষা তাঁদের কাব্যের ভাষায় প্রতিফলিত হয় নি, তাঁরা কম-বেশী বিদেশী diction-এ বাংলা কাব্য রচনা করেছেন। জীবনানন্দ রূপসী বাংলার সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়েছেন সন্দেহ নেই কিন্তু সেই সৌন্দর্যবিহ্বলতা আর মুগ্ধতাকে যে ভাষায় প্রকাশ করেছেন সে ভাষার সঙ্গে বাংলা কাব্যের পরম্পরাগত ভাবাভঙ্গির প্রাণের যোগ নেই। তাঁর রূপকল্প, উপমান শব্দ ব্যবহারের রীতি সবই আধুনিক বিদেশী কাব্যাদর্শে গঠিত। এ কাব্যের ধাঁচধরণ অনুধাবন করলে মনে হয় না এ কাব্যের রচয়িতা আমাদের প্রাচীন কাব্যঐতিহ্যের সম্যক অনুশীলন কখনও করেছেন। অনেকে সুধীন্দ্রনাথকে মাইকেলের স্বগোত্র কবি বলে মনে করেন। কিন্তু এ প্রতিতুলনা বহিরঙ্গ সাদৃশ্যের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত সুতরাং অমান্য। মাইকেলসুলভ সংস্কৃত শব্দের সমাবেশ সুধীন্দ্রনাথে আছে ঠিকই কিন্তু যে মন ও মেজাজ নিয়ে সুধীন্দ্রনাথ সংস্কৃত শব্দসম্ভারের দ্বারস্থ হয়েছেন তার সঙ্গে এ দেশের জল-হাওয়ার কোনো যোগ নেই। সে মনা ইউরোপিয়ানার দ্বারা চোদ্দ আনা চর্চিত। মাইকেল খৃষ্টধর্ম অবলম্বন করেছিলেন

এবং হারেভাবের সাহেব ছিলেন ঠিক কথা; কিন্তু তা বলে তিনি এ-দেশের মাটি ও মানুষের সঙ্গে অন্তরের যোগ হারান নি। তিনি যে এ-দেশের মহাকাব্য আর পুরাণ আর বৈষ্ণবকাব্যের ভাবরসে কতখানি নিমগ্ন ছিলেন তার প্রমাণ তো তাঁর কাব্যের মধ্যেই রয়েছে, তার জন্য তাঁর জীবনচরিত সন্ধান করবার প্রয়োজন নেই। কিন্তু তেমন কথা কি সুধীন্দ্রনাথ সম্পর্কে বলা যায়। তিনি তো মানসিকতায় আধা-সাহেব আধা-ভারতীয়; শুধু অনুগ্রহ করে বাংলা কাব্যচর্চার দিকে নজর দিয়েছিলেন এই মাত্র।

আমার এক-এক সময় আরও ভয়ঙ্কর কথা মনে হয়। সেটা ভয়ে বলব কি নির্ভয়ে বলব বুঝতে পারছিনে। জীবনানন্দ-সুধীন্দ্রনাথ গোত্রের বিদেশী ভাবাপন্ন কবিরা শুধু যে বাংলা কাব্যের পরম্পরাগত ঐতিহ্য-সংস্কার সম্বন্ধেই চেতনাক্ষীণতার পরিচয় রেখেছেন তা-ই নয়, রবীন্দ্রকাব্যও তাঁরা ভালো করে অনুশীলন করেছেন কিনা তাতে আমার সন্দেহ আছে। তা যদি করতেন, তা হলে তাঁদের কাব্যভাষায় ছন্দোভঙ্গীতে ও ইমেজ বা রূপকল্পের প্রয়োগে নিশ্চয়ই কিছু-না-কিছু পরিমাণে রবীন্দ্র-কাব্যের আদল দেখা দিত, কিন্তু একান্তই এই ক্ষেত্রে প্রমাণাভাব। এঁদের ভাষার খোলসটাই শুধু বাংলার, ভিতরকার উপাদান সর্বাংশে না হলেও অনেকাংশে বিজাতীয় কাব্যের সূত্রে আহৃত।

এখন, জীবনানন্দ বা সুধীন্দ্রনাথ বা ওই গোত্রের অন্য কোনো কবি যেখানে সাহিত্যিক কালচেতনার আদিতম বিন্দুতে সংস্থাপিত, সেখানে কাব্যচর্চার ফসল কতটা সমৃদ্ধ হতে পারে, তা সুধীজনকেই বিবেচনা করে দেখতে অনুরোধ করি। আমার বিনীত নিবেদন এই যে, নতুন কালের কবিরা জীবনানন্দ বা সুধীন্দ্রনাথ বা অমিয় চক্রবর্তী বা বিষ্ণু দে-কে মাথায় করে রাখুন, তাতে দোষ দেখিনে—অন্যান্য ক্ষেত্রে যেমন তেমনি সাহিত্যের ক্ষেত্রেও সাময়িক রুচির চাহিদাকে মান্য না করে উপায় নেই, সমসাময়িকের প্রতি অনুপাত-অতিরিক্ত আকর্ষণ মানবস্বভাবের এক অচ্ছেদ্য দুর্বলতা—কিন্তু দোহাই, তাঁদের উৎসাহ আর অভিনিবেশ যেন কেবলমাত্র ওই ক'টি কবিতেই নিঃশেষিত হয়ে না যায়; এঁদের অগ্রবর্তী হিসাবে পূর্ব-পূর্ব যুগে যে সকল কবি জন্মগ্রহণ করেছেন তাঁদের সম্পর্কেও যেন উৎসাহের কিছু ছিটেফোঁটা অবশিষ্ট থাকে। একালের কাব্যচেতনার শুরুই যদি হয় রবীন্দ্র-পরবর্তী কাল থেকে তবে তো বড়ো সাংঘাতিক কথা! ভাব সর্বদাই নূতনত্বের অপেক্ষা রাখে সাহিত্যে। নূতন নূতন চিন্তার ও কল্পনার দিগন্ত উন্মোচিত হবে এইতেই প্রত্যাশিত। এই ক্ষেত্রে ঐতিহ্যের ভূমিকা তেমন গুরুতর নয় বলেই আমার ধারণা—কিন্তু যে ভাষারীতি যে প্রকাশ-শৈলীর সহায়ে সেই নূতন ভাববস্তুকে রূপ দেবার কথা, সেখানে ঐতিহ্যকে লঙ্ঘন করবার কোনো উপায়ই নেই। প্রত্যেক সাহিত্যেরই ভাষার একটা চিরাগত স্বীকৃত রূপ আছে, তাকে এই ভাষার স্ট্যান্ডার্ড বলা হয়। ওই স্ট্যান্ডার্ড ভাষার পদ্ধতি প্রকরণ, রীতি ও রূপ বিশদভাবে আয়ত্ত করবার জন্যই ঐতিহ্যচর্চার একান্ত প্রয়োজন। ঐতিহ্যের সঙ্গে সম্পর্ক-রহিত উৎকেন্দ্রিক ভাষা দিয়ে কখনও পাঠকের চিত্ত জয় করা যায় না। ভাব যতই মৌলিক আর নূতন হোক, কল্পনা যতই অভিনবত্বপ্রয়াসী আর সৃষ্টিলক্ষণাক্রান্ত হোক, তা যদি উৎকেন্দ্রিক আর বিজাতীয় ভাষাভঙ্গীতে পরিবেশিত হয় পাঠক-মনের উপর তার প্রভাব কখনও গভীর রেখায় মুদ্রিত হতে পারবে না।

৪

এখনকার পত্র-পত্রিকায় 'সাহিত্য-সংবাদ' শীর্ষক আলোচনাগুলিতে একেবারে হালের বিদেশী কবি আর হালের বিদেশী ঔপন্যাসিকদের এমন সোৎসাহ আর ঘন ঘন উল্লেখ থাকে যে তাতে দিশেহারা হয়ে পড়তে হয়। তাঁদের মধ্যে একাধিক জন আছেন যাঁদের নাম এই প্রথম শোনা গেল। এ-জাতীয় পাঠের প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া হয় খুবই আত্মবিধ্বংসী। এঁরা এতো জানেন আর আমরা এত কম জানি! নিজের জ্ঞানদৈন্যের ভারে এক-এক সময় নুয়ে পড়বার উপক্রম হয়, অজ্ঞানতার লজ্জা ঢাকবার পথ খুঁজে পাইনে। কিন্তু পরক্ষণেই চিন্তার মোড় ঘুরে যেতে আশার আলো দেখতে পাই। যাঁরা এইসব সাহিত্য-সংবাদ রচনা করেন তাঁদের অনেকেরই বয়স আমাদের চেয়ে অনেক কম, কারও কারও প্রায় অর্ধেকের কোঠায়। অথচ হালফিল সাহিত্য সম্পর্কে এঁদের আপাত-অধিকারের বহর আমাদের চেয়ে দৃশ্যতঃ অনেক বেশী। এ কেমন করে সম্ভব হয়? এই রহস্যের হেতু কি? এর দুটি কারণ থাকতে পারে। প্রথম কারণ, আমরা বুড়িয়ে গেছি; সুতরাং বয়োধর্ম অনুযায়ীই হালফিল সাহিত্য সম্পর্কে আমাদের আর আগের মতো মনোযোগ সজাগ নেই, তাইতে তরুণ লেখকের দল—যাঁরা এই জাতীয় সাহিত্য-সংবাদ পরিবেশন করেন—তাঁদের সঙ্গে এই ক্ষেত্রে আমাদের পাল্লা দেওয়া অসম্ভব। কিন্তু দ্বিতীয় যে কারণটি আমার মনে হয় তার তাৎপর্য একটু গভীর। এইটি তলিয়ে বিচার করলে আর আত্মকরুণার অবকাশ থাকে না, বরং এঁদেরই করুণা করতে ইচ্ছা হয়। যাঁদের কথা বলছি তাঁরা

যুগজয়ী বই

রবীন্দ্রনাথ ও বৌদ্ধসংস্কৃতি—ডঃ সুধাংশুবিমল বড়ুয়া রচিত ও অধ্যাপক শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেনের ভূমিকা সম্বলিত। [১০·০০]

ঠাকুরবাড়ীর কথা—শ্রীহিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত। দ্বারকানাথের পূর্বপুরুষ হইতে রবীন্দ্রনাথের উত্তরপুরুষ পর্যন্ত তথ্যবহুল ইতিহাস। [১২·০০]

বাঁকুড়ার মন্দির—শ্রীঅমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত। বাঁকুড়ার তথা বাঙলার মন্দিরগুলির সচিত্র পরিচয়। ৬৭টি আর্টপ্লেট। [১৫·০০]

উপনিষদের দর্শন—শ্রীহিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত উক্ত বিষয়ের প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা। [৭·০০]

ভারতের শক্তি-সাধনা ও শাক্ত সাহিত্য—ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্তের এই বইটি সাহিত্য আকাদমী পুরস্কারে ভূষিত। [১৫·০০]

বৈষ্ণব পদাবলী—সাহিত্যরত্ন শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সঙ্কলিত ও সম্পাদিত প্রায় চার হাজার পদের আকরগ্রন্থ। [২৫·০০]

দীনবন্ধু রচনাবলী—ডঃ ক্ষেত্র গুপ্ত সম্পাদিত। একটি খণ্ডে সম্পূর্ণ। [১৩·০০]

মধুসূদন রচনাবলী—ডঃ ক্ষেত্র গুপ্ত সম্পাদিত। ইংরেজিসহ একটি খণ্ডে সম্পূর্ণ। [১৫·০০]

বঙ্কিম রচনাবলী—শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল সম্পাদিত। ১ম খণ্ড সমগ্র উপন্যাস টা ১২·৫০। ২য় খণ্ড সমগ্র সাহিত্য অংশ টা ১৫·০০।

দ্বিজেন্দ্র রচনাবলী—ডঃ রথীন্দ্রনাথ রায় সম্পাদিত। দুই খণ্ডে সম্পূর্ণ। ১ম খণ্ড ১২·৫০। ২য় খণ্ড ১৫·০০।

রমেশ রচনাবলী—শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল সম্পাদিত। একখণ্ডে সমগ্র উপন্যাস। [৯·০০]

ডেটিনিউ—অমলেন্দু দাশগুপ্ত রচিত স্মরণীয় ডেটিনিউ জীবন-কথা। শ্রীভূপেন দত্তের ভূমিকা। [৩·০০]

প্রতি রচনাবলীতে
জীবন-কথা ও সাহিত্য-কীর্তি আলোচিত।

সাহিত্য সংসদ
৩২এ, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড : কলি-৯

হালফিল সাহিত্য সম্পর্কে এত যে খবর রাখেন আর এত যে প্রত্যয়সিদ্ধভাবে কথা বলেন তার ভিতরকার কথাটা খুব সম্ভব এই যে, এঁদের বাংলা সাহিত্যের ঐতিহ্য-চেতনা অতিশয় দুর্বল অথবা একেবারেই অনুপস্থিত। এঁদের যা বয়স তাতে এঁরা বাংলা সাহিত্যের ঐতিহ্যকে আত্মস্থ করে তারপর হালফিল বিদেশী সাহিত্যের অভি-মুখে মনোযোগক্ষেপ করেছেন এমন হওয়া সম্ভব নয়। এঁদের উৎসাহের শুরুই একেবারে হালফিল সাহিত্যের কাল থেকে। এ কথার আভ্যন্তর প্রমাণ আছে। এঁদের ভাষাভঙ্গী সেই আভ্যন্তর প্রমাণ। ঐতিহ্য-চেতনার বাষ্পও খুঁজে পাওয়া যায় না এঁদের রচনারীতির মধ্যে—যা কি না হাল্কা-চটুল, তরল, চিন্তাবর্জিত। ভাষায় এক ধরণের স্বচ্ছন্দতা আছে, কিন্তু এ স্রোতোপ্রবাহের উপরকার গতিস্বাচ্ছন্দ্য, স্রোতের তলায় কোনো গভীরতা নেই। বাংলা ভাষার উনিশ শতকের সমৃদ্ধ ঐতিহ্য অথবা বিশ শতকের প্রথম চার দশকের ঐতিহ্য সম্পর্কে যে এঁদের বিশেষ জ্ঞান-গম্যি আছে তা এঁদের লেখা পড়ে মনে হয় না। অথচ সাম্প্রতিক বিদেশী কবিদের কাব্যকৃতির ব্যাখ্যানে এঁরা পঞ্চমুখ। বাংলা সাহিত্যের জ্ঞান এঁদের কতটা আছে জানি না কিন্তু সাম্প্রতিক বিদেশী লেখক-দের সম্বন্ধে এমনভাবে কথা বলেন যেন বিদেশী সাহিত্য গুলে খেয়েছেন। বাংলা ভাষার ঐতিহ্যবোধ থাকুক আর না-ই থাকুক, বিদেশী সাহিত্য যেন এঁদের নখাগ্রে এমনি এঁদের রচনার ভাবভঙ্গী।

এ-জাতীয় মনোভঙ্গীটাই মূলতঃ সন্দেহস্থল। আগে দেশকে জানতে হবে তারপর বিদেশকে; আগে জাতীয় সাহিত্যের ধারার সঙ্গে পরিচিত হতে হবে, তারপর সময় থাকে তো বিদেশী সাহিত্যের ধারাধরণের সঙ্গে পরিচিত হও, না হলেও ক্ষতি নেই। কিন্তু এঁদের বেলায় প্রক্রিয়াটা উল্টো আকারে দেখা দেয়। এঁরা আগে বিদেশী সাহিত্যের ভক্ত, তারপর দেশীয় সাহিত্যের, তা-ও শেষোক্ত ক্ষেত্রে কতটা ভক্ত স্থিরনিশ্চয় করে বলবার যো নেই।

এই-জাতীয় লেখকদের ঐতিহ্যচেতনা যে দুর্বল তার স্বপক্ষে আর একটি অনুমান উপস্থিত করছি। অনুমানটিকে নানা লক্ষপদে বোধ হয় প্রামাণ্য মনে করা যায়।

দেখা যায় এই শ্রেণীর লেখকই শ্লীল-অশ্লীল বিতর্কের ক্ষেত্রে প্রায়শঃ অশ্লীল-তার সপক্ষে কথা বলেন এবং বিদেশী সাহিত্য থেকে নজীর উপস্থিত করেন। বাংলা সাহিত্য থেকেও কখনও কখনও, বোধ হয় শোনা কথার উপর নির্ভর করে, 'কৃষ্ণকীর্তন' আর 'বিদ্যাসুন্দরের' নাম করেন। কিন্তু এঁদের খেয়াল নেই যে, পুরাতন যুগ আর সমকালীন যুগের মধ্যে বাংলা সাহিত্যে মধুসূদন বঙ্কিমচন্দ্র আর রবীন্দ্রনাথ নামক তিন বিরাট বনস্পতির আবির্ভাব ঘটেছিল এবং তাঁদের অভ্যুদয়ে বাংলা সাহিত্যের আবহাওয়া যথেষ্ট পরিমাণে নির্মল আর শোধিত হয়ে গেছে। উপন্যাস সাহিত্যে বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথ আর শরৎচন্দ্র তাঁদের নিজ নিজ কালের বাস্তব জীবনের ছবিই উপস্থিত করেছেন, তা বলে বাস্তবচর্চার নামে তাঁদের নোংরা ঘাঁটবার কখনও প্রয়ো-জন হয় নি, যে কাজ হালের কয়েকজন অন্যথা-শক্তিমান বিভ্রান্ত লেখক হামেশাই করছেন। মানুষের সুপ্ত জৈব প্রবৃত্তিতে সুড়সুড়ি দিয়ে পয়সা পেটবার মতলব ছাড়া ভিন্নতরো বা উচ্চতরো কোনো মতলব এঁদের রচনার পিছনে আছে বলে তো মনে হয় না। এই বৈশ্যাচার বেশ্যা-চারেরই নামান্তর।

দুরাত্মার ছলের অভাব হয় না। এঁদেরও বেলায়ও তা-ই। অপকর্মের পেছনে যুক্তি যোগাতে চতুর লোকের ঘটে বুদ্ধির অভাব হয়েছে এমন কখনও দেখা যায়নি। অশ্লীলতার সমর্থনে এঁরা প্রায়ই এই ধরতাই বুলি ঝাড়েন যে, সাহিত্যে শ্লীল-অশ্লীল বড়ো কথা নয়, রচনাটি সাহিত্য কি অসাহিত্য হয়েছে সেইটেই ধর্তব্য বিষয়। অহো, কি বিচক্ষণ সাহিত্যজ্ঞান! কি গভীর রসানুভূতি! কি তীক্ষ্ণ সৌন্দর্যবোধ! অভিজ্ঞতার কথা না-ই ধরলুম, যাঁদের বয়সেরও এখন পরিপক্কতা সাধিত হয় নি, তাঁরা রচনাবিশেষ সাহিত্য হয়েছে কি হয় নি, রসের মানোত্তীর্ণ হয়েছে কি হয় নি, সে বিষয়ে ফতোয়া দিচ্ছেন। আমরা তো জানি সাহিত্যের ভালোমন্দ সম্বন্ধে সুনিশ্চিত রায় দেবার ক্ষমতা অর্জন করতে হলে একটা গোটা জীবনের সাধনা প্রয়োজন—একনিষ্ঠ সারস্বতব্রতধারী ছাড়া এ ব্যাপারে আর কারও অভিমত প্রকাশের এক্তিয়ার থাকতে পারে না। কিন্তু এ সব কথা কাকে বলব! আজকাল বালখিল্য-দেরই যুগ—বালখিল্য ধ্যানধারণার মান-দণ্ডেই সাহিত্যের পরিমাপ হচ্ছে। এ ধারণায় ঐতিহ্য অনুপস্থিত, পূর্বাচার্যরা অস্বীকৃত, জাতীয়তা ভূলুণ্ঠিত। সুতরাং ফল যা হবার তা-ই হচ্ছে। সুস্থ ঐতিহ্যচেতনার প্রতিষেধক ছাড়া সাম্প্রতিক বাংলা সাহিত্যের উন্মার্গগামিতা রোধ করা শিবেরও অসাধ্য।

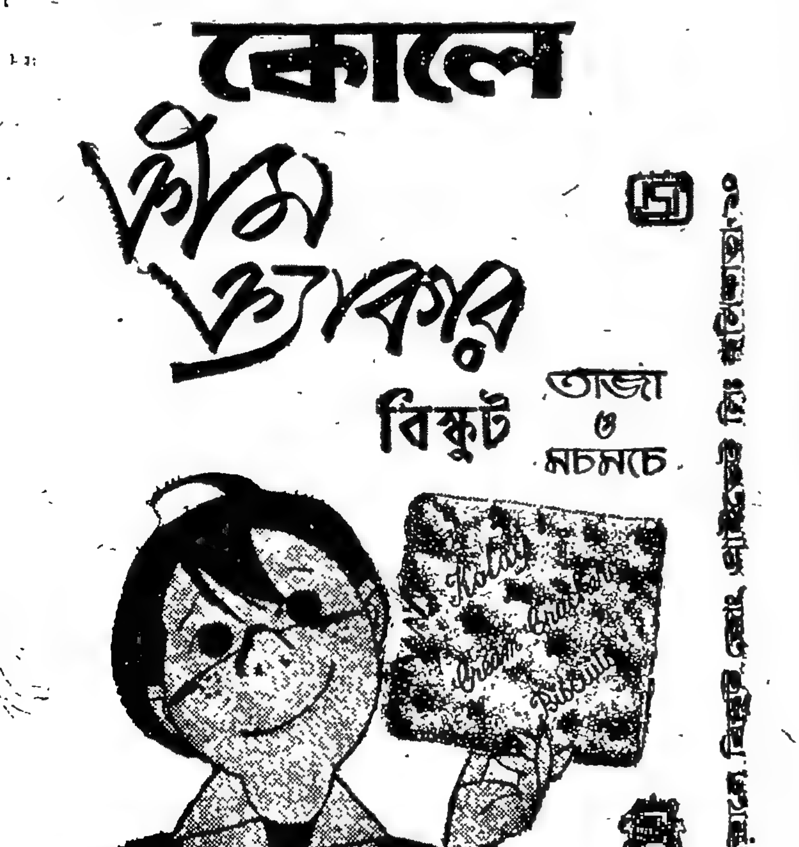

হরপ্রসাদ মিত্র

এই অন্ধকারে

নিস্তরঙ্গ গংগা দেখলুম ফুলিয়ায় গিয়ে। মাঘের শেষ দিনগুলিতেও সজনে ফুটে আছে ইতস্তত। শিমুল গাছ লাল হয়ে আছে ফুলে ফুলে। নদীর চেহারা আপাতদৃষ্টিতে শান্ত বটে, কিন্তু তার ভেতরের মেজাজ মোটেই ভাল নয়। কিনারা ধসিয়ে দিয়ে ঢুকে এসেছে পাল-চৌধুরীদের প্রকাণ্ড বাড়ি-বাগান-ভূসম্পত্তিতে দাঁত বসিয়ে।

পাশেই শান্তিপুর। কাছেই রাণাঘাট। গংগার এপারে শান্তিপুর, ওপারে গুপ্তিপাড়া, বোধ হয়। রেলের পুল দিয়ে চূর্ণীর সরু ফিতে পেরিয়ে যেতে-যেতে অনেকদিন আগের কথা মনে পড়েছিল।

বৈষ্ণব ভক্ত-সাধক-মহাজনরা এসব অঞ্চলে বাস করেছেন। গঙ্গার দুই কিনারা ধরে জীবনের কলরবমুখরিত স্রোত বয়ে চলেছে। বৈষ্ণব গোস্বামীরা ছিলেন। শাক্ত ভক্তের সংখ্যাও কম ছিল না। শ-দেড়েক বছর আগে গুপ্তিপাড়ার ব্রাহ্মণ-বৈদ্য সমাজই জগদ্ধাত্রীপুজো আরম্ভ করেন বারোয়ারি রীতিতে। বিনয় ঘোষ মশাই তাঁর পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতিতে ১৮২০ খৃস্টাব্দের মে মাসের 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া' পত্রিকার এক উদ্ধৃতি তুলে দেখিয়েছেন যে, শ্রীরামপুরের ঐ মাসিক পত্রিকাটির অনুমান অনুসারে এই বারোয়ারি পুজোর সূচনা হয় ১৭৯০ খৃস্টাব্দে, কিন্তু গুপ্তিপাড়ার মুখোপাধ্যায় পরিবারে রক্ষিত দ্বিতীয় বছরের পুজোর যে ফর্দ তিনি দেখিয়েছেন, সেটি আরো আগেকার,—এবং সে-হিসেবে দেখা গেছে যে প্রথম পুজো হয়েছিল ১৭৫৯-৬০ খৃস্টাব্দে। ইতিমধ্যে দুশো বছর পেরিয়ে এলুম আমরা।

ইলেকট্রিক ট্রেন চলেছে দুশো বছরের উধাও কল্পরেখার এ-প্রান্তে। মানুষের ভিড়ে দুঃসহ একালের এই ধরনের যাত্রা। মেয়েরা বসবার জায়গা পান নি অনেকেই। অনেক যুবক বসে আছেন তবু। একটি বৃদ্ধা তাঁর ছোটো নাতিটিকে একটু জায়গা দেবার অনুরোধ করছেন শুনছি। কিন্তু কে কাকে জায়গা দেবে? ফেরিওয়ালা পসরা নিয়ে উঁচু পর্দায় গলা চড়িয়ে নিজেদের পণ্যদ্রব্যের গুণব্যাখ্যানে ব্যস্ত।

এরকম ভিড়, ফেরিওয়ালা,—এরকম হাঁপ-ধরানো রেলভ্রমণ কি একেবারেই সাম্প্রতিক ব্যাপার? শান্তিপুরের বারোয়ারি পুজোর মহিমা যেকালের, কালীপ্রসন্ন সিংহ সেইকালের কথাই লিখে গেছেন তাঁর 'হুতোম প্যাঁচার নক্সায়'—

> 'একবার শান্তিপুরওয়ালারা পাঁচ লক্ষ টাকা খরচ করে এক বারোইয়ারি পুজো করেন; সাত বৎসর ধরে তার উয্যুগ হয়, প্রতিমেখানি ষাট হাত উঁচু হয়েছিল, শেষে বিসর্জনের দিনে প্রত্যেক পুতুল কেটে কেটে বিসর্জন কর্ত্তে হয়। তাতেই গুপ্তিপাড়াওয়ালারা 'মার' অপঘাত মৃত্যু উপলক্ষে গণেশের গলায় কাচা বেঁধে এক বারোইয়ারি পুজো করেন, তাতেও বিস্তর টাকা ব্যয় হয়।'

আবার কালীপ্রসন্নের নিজের কালেরই হাওড়া-বালি-উত্তরপাড়ার রেলপথের যাত্রার বিবরণ আছে হুতোমের নক্সায়। সেই প্রেমানন্দ-জ্ঞানানন্দ তাঁদের দলবল নিয়ে যখন ট্রেনে উঠেছেন, তখনো বোধ হয় অনেকটা এইরকমই ছিল। এইরকম ভিড়,—বসবার জায়গা নিয়ে এইরকম অসংকোচ স্বার্থপরতা। তখনকার যাত্রীরা 'হরকরা' পড়তেন—একালের মতন 'আনন্দবাজার', 'যুগান্তর', 'বসুমতী' ছিল না। কিন্তু চলন্ত ট্রেনের তৃতীয় শ্রেণীর কামরার মানুষরা অনেকটা বোধ হয় এইরকমই ছিলেন—

> 'বালির যাত্রীরা বালিতে নাবলেন। ধোপা ও গঙ্গাভক্তির দলটি বালিতে নাবায় প্রেমানন্দ হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন —দলের ছোঁড়াগুলো নাববার সময় প্রেমানন্দের ভুঁড়িতে একটা চিমটি কেটে গেল।'

না, এখনকার যাত্রীরা নিশ্চয় এরকম নন। এখন কেউ কোনো অচেনা মানুষকে চিমটি কাটতে ভরসা পান কি? শুনেছি, কেউ কেউ বলেন ওসব এখন বিধানসভার ব্যাপার। বড়োদের দেখে ছোটোরা শিখেছেন বটে, কিন্তু সাম্প্রতিক কোনো উগ্র আধুনিক যুবকও সহযাত্রীকে চিমটি কেটেছেন বলে শুনি নি। তাঁরা বড়ো জোর ইস্কুল-কলেজে মাস্টারমশাইদের এবং সহপাঠীদের ওপর সদলবলে চড়াও হচ্ছেন।

মাঘের শেষদিনগুলির রিক্ত ধানক্ষেত দেখতে দেখতে আমার এই একালের সহযাত্রীদের আলাপ-আলোচনা শুনছিলুম। 'সব অন্ধকার হয়ে এলো, মশাই'—একজন বলছেন আর একজনকে।

অন্ধকারের রূপকটি যথাসাধ্য বিস্তৃতভাবে অনুভব করবার চেষ্টা করলুম। শুধু চোখের নয়, চেতনার ব্যাপক অন্ধকারই বুঝি। ভেতরে অন্য কণ্ঠস্বর শোনা গেল—

> প্রাতিদিন পরামাশ্চর্য প্রিয় ঘটনায় মন যে সুখী হবার সুযোগ পায় না, সেকথা মানি। কিন্তু তাতে কি এসে যায়? জীবনে অভাব-অভিযোগ ছিল, আছে এবং তা সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হবে বলেও তো মনে হয় না। অসুবিধা দূর করবার নিয়োগই কাজের মানুষের কাজ।

এই ভাবনা থেকেই মনে এলো সাহিত্যে সৃষ্টির পথে যেসব অসুবিধা আছে, সে-সব সত্যিই হঠাৎ দূর করা যায় না। কোনো লেখকের হয়তো টেবিল নেই অথবা কারও চেয়ার নেই,—কিংবা একজনের একটা নতুন কলম চাই অথবা ভাল কাগজ চাই—এসবও অসুবিধা বটে,—কিন্তু আমার মন সেদিন এসব অসুবিধার কথা ভাবে নি। কারণ, কলম না থাকলে লেখা যায় না বটে, তবে কলমের চেয়ে মনের এবং পারিপার্শ্বিক অনুকূল আবহাওয়ার অভাবই বড়ো অভাব। কাগজ, কলম, টেবিল চেয়ারের অভাব এই বৃহৎ অভাবেরই অন্তর্ভুক্ত। তবে, সোনার দোয়াত-কলম ব্যতিরেকেই জগতের মানব-রচিত শ্রেষ্ঠ রচনা সম্ভব হয়েছে বলে আমার বিশ্বাস। কিন্তু অসন্তুষ্ট মন যথার্থ বড়ো কোনো রচনায় সমর্থ হয়েছে বলে শুনি নি। 'অসন্তুষ্ট' কথাটা নিয়ে অযথা তর্ক বাড়াবার দরকার নেই। ইলেকট্রিক ট্রেনের প্রচণ্ড ভিড়ে কোণঠেসা হয়ে সেদিন এই তাপ্তব আধ্যাত্মিক আবহাওয়ার কথাই মনে এসেছিল। দেশব্যাপী অতৃপ্তির আবহাওয়াতেই দেবেন্দ্রনাথ সেনের দু' ছত্র কবিতা দেখা দিয়েছিল মনে—

> বিনোদিনি, চাবি তব গিয়েছে হারায়ে?
> এই দেখ, আমি তাহা পেয়েছি
> কুড়ায়ে।

সৃষ্টির চাবি যখন হারিয়ে যায়, আর সেই দুর্দশার সাক্ষী রসিক অদৃষ্ট যখন

বলেন—'দিব না, দিব না চাবি, দিব না ফিরায়ে', তখন বিনোদিনী অন্ধকারে নিজের কপাল চাপড়াতে পারেন বটে, কিন্তু তাতে তার গৃহস্থালী গুছিয়ে নেবার কাজ এগোয় না।

সাহিত্যের সমালোচনা এই কারণেই সম্পূর্ণ ব্যক্তিসত্যসাপেক্ষ এবং সমাজকল্যাণ-নিরপেক্ষ ব্যাপার ব'লে মনে করতে আমার দ্বিধা হয়। অর্থাৎ সাহিত্যকে যাঁরা পুরোপুরি ব্যক্তিলীলা ব'লে দেখেন আমি তাঁদের কথাতেও ভরসা পাই না, যাঁরা পুরোপুরি সংঘভঙ্গি বা জনসমষ্টির স্বাক্ষর বলে প্রচার করেন, তাঁদের সঙ্গেও একমত হতে পারি না।

একথা গুছিয়ে বলতে পারা শক্ত কাজ। শিল্পীমাত্রেই এ সত্য অনুভব করেছেন; তবে সমালোচকরা কেউ মানেন, কেউ মানেন না। সেদিন চূর্ণীর ঈষৎ সবুজ ফিতে পেরিয়ে যাবার সময়ে আমার মনে যে রচনা দেখা দিয়েছিল সেটি এই সূত্রেই নিবেদনযোগ্য। ১৩১২ সালে,—অর্থাৎ আজ থেকে প্রায় ষাট বছর আগে—যখন 'সাহিত্য', 'ভারতী' ইত্যাদি পত্রিকার আসর জমজমাট ছিল, এ সেই সময়ের কথা। ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 'ভারতী'তে লিখেছিলেন—

'আমাদের কেমন প্রকৃতি, আমরা লিখিতে গেলেই লম্বা-চওড়া গুরু-গম্ভীর প্রবন্ধ, রাজনীতিক, ঐতিহাসিক, বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, সামাজিক, সাহিত্যিক গবেষণা আসিয়া পড়ে, অথবা কবিতার আগ্নেয় উচ্ছ্বাস দশ যোজন ধরিয়া উদ্গীর্ণ হইয়া পড়ে। চুট্‌কী লেখাটা আমাদের মাথায় আসে না; আমরা skull-cap-এর আদর বুঝি না, মস্তকের শোভাসমৃদ্ধি দেখাইতে বিশ গজ থান দিয়া পাগড়ী বানাই, সমস্ত ইন্দ্রিয়দ্বার বন্ধ করিয়া বিরাট বুদ্ধিমান হবচন্দ্র রাজার গবচন্দ্র মন্ত্রী সাজিয়া বসি। চুট্‌কী লিখিতে কেমন মায়া করে, এত বড় প্রতিভাটা দু'ছত্রে মাটি করিব?'

বোধ হয়, সেদিন যদি রূপনারায়ণ বা মহানদী পেরিয়ে আসতুম, তাহলে আমার মনে এই চুট্‌কির চিন্তা দেখা দিত না। কিন্তু সেদিন ট্রেনের কামরায় সেই ভিড়ে আবদ্ধ-দৃষ্টি আমার এই মন আড়চোখে যে নদীটিকে ক্ষণকালের জন্যে দেখতে পেয়েছিল, আমি আগেই বলেছি—সে নদী বিশালও নয়, তরঙ্গনিকরধ্বনিময়ও নয়,—সে আমাদের শান্ত, শীর্ণ, নিত্যসেবিকা চূর্ণী।

উনিশ শতকের নবযৌবনোচ্ছ্বাসটুকু বাদ দিলে, গত দু'-পাঁচশো বছরের মধ্যে আমরা যে জাতি হিসেবে কোনো বিশাল মানব-পৃথিবীর অন্তর্ভুক্ত বলে নিজেদের আচরণ নিয়ন্ত্রিত করি নি, সে তো তর্কাতীত সত্য। বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ ইত্যাদি ক্ষণজন্মা ব্যক্তিরা বাংলাদেশে জন্মেছিলেন বলেই আমাদের মতো চুট্‌কি-রসিক জাতির তাঁরা আত্মীয় ছিলেন বলে মনে করা কি ঠিক হবে? এইসব মনীষীদের লোকোত্তর পুরুষ-রূপেই আমি অনুভব করি—এবং চুট্‌কি-জীবী নিজেদেরও নিন্দা করতে চাই না। কারণ, তাঁরা যে রূপনারায়ণ-গঙ্গা-পদ্মা-মহানদী-ব্রহ্মপুত্রের বিস্তারে মুগ্ধ ছিলেন এবং আমরা যে বালিখাল, মাণিকতলার খাল,—কালীঘাটের আদিগঙ্গা অথবা মফস্বলের চূর্ণী পারাপার করছি অক্লেশে, আশা করি এ-বিষয়ে কোনো দ্বিমত হবে না। সাহিত্যে শ্লীলতা-অশ্লীলতা,—বাংলায় সর্বভারতীয় কবিসম্মেলন ইত্যাদি সাম্প্রতিক সাহিত্য-বিসংবাদও আমাদের চুট্‌কি-স্বভাবেরই অভিব্যক্তি বলে আমার মনে হয়। তবে, কোন্‌টি সার্থক চুটকি-কৃতিত্ব আর কোন্‌টি যে তার বিকার, তা যাঁরা সমঝদার তাঁদের কাছে ব্যাখ্যা করবার দরকার নেই।

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী যখন চুট্‌কির বিরুদ্ধে বক্তৃতা দিয়েছিলেন আর প্রমথ চৌধুরী তার জবাবে কলম ধরেছিলেন, তখন চুট্‌কির মর্মার্থ ও মর্ম-লক্ষণ সম্বন্ধে অনেক কথা হয়ে গেছে। ললিতকুমারের যে-রচনার কথা সেদিন আমার মনে এসেছিল, সেটি সে-সব ঘটনার বছর দশেক আগের চিন্তা। ওঁদের তর্ক-বিতর্কের আগে ললিতকুমারই তাঁর দেশবাসীকে জানিয়ে গেছেন—

'আমরা ভুলিয়া যাই যে, মাধ্যাকর্ষণ-শক্তির বলে শূন্যে ভ্রাম্যমাণ সৌর-জগৎ সৃষ্টি করিতে বিধাতা যে কৌশলের পরিচয় দিয়াছেন, সুন্দরীর নাসিকায় দোদুল্যমান ক্ষুদ্র মুক্তাটির নির্মাণে তাহা অপেক্ষা কম কৌশলের পরিচয় দেন নাই।'

দেশব্যাপী অস্থিরতায় এবং উত্তর-পুরুষের ক্রোধে, নৈরাশ্যে সাহিত্যের আসর যখন কোলাহলে, অবিশ্বাসে ভেঙে পড়ছে, সেই সময়ে ব্যক্তি এবং সমাজ,— সাহিত্য সৃষ্টির এই দুই আবশ্যিক উপাদানের সারবত্তা সম্বন্ধে শ্রদ্ধা নিয়েই সেদিন আমার মন বলেছিল যে বাংলাদেশে,—এই খণ্ডিত একালের বাংলাদেশেই কোথাও নিশ্চয় একটি নদী আছে—যার চেহারা পদ্মা বা গঙ্গা বা রূপনারায়ণের মতো নয়,—যে নদী ক্ষিপ্র,—হোক্ না ক্ষীণ,—যে বিশাল নয়,—গভীর না হলেও ক্ষতি নেই,—যে চূর্ণির মতো ম্লান্ নয়,—যার জলে সূর্যের আলো খেলে যায়—যার পাশেই উধাও প্রান্তর,—যে-প্রান্তরে অনেকে একসঙ্গে কোনো আনন্দের জমায়েতে যোগ দিতে পারি,—এবং যেখানকার আকাশ আজও 'নিতল নীল নীরব'। সেইখানে অদৃষ্ট আমাদের একবার বলতে দিন—'নিকষেতে উঠলো ফুটে সোনার রেখাখানি'। সর্বভারতীয় কোনো বৃহৎ বা উচ্চ রাজনীতি, সমাজতত্ত্ব বা দর্শন জিজ্ঞাসার মহাসভার জন্যে নয়,—'নিখিল বঙ্গীয় চুট্‌কি বিলাস সম্মেলন' ডাক যেতে পারে সেই নদীর কিনারায়।

১৯৬৮ খৃস্টাব্দে পৌঁছে গেছি আমরা। প্রমথ চৌধুরীর জন্মশতবার্ষিকীর বছর এটি। এই সময়ে, সেই ক্ষিপ্র-ধারা নদীর কিনারায়, খোলা মাঠের মুক্ত অঙ্গনে আমরা কি মিলতে পারি না? কোনো মণ্ডপের দরকার নেই। কোনো শিক্ষামন্ত্রীকে সভাপতি হতে হবে না। শুধু তিনটি গাছ থাকলেই যথেষ্ট—বিশাল বনস্পতি নয়, শুনেছি 'তরল গাছের সরল রেখা',—সে গাছ দেখি নি যদিও তবু আমার মন সেই গাছের প্রেমেই বিভোর হয়ে আছে। সেই জাতের তিনটি গাছে পর পর তিনটি ছবি টাঙিয়ে দিতে অসুবিধা হবে না—মাঝের গাছটিতে প্রমথ চৌধুরীর ছবি,—দু'পাশের দু'টিতে ললিতকুমারের আর কবি সত্যেন্দ্রনাথের। এ'রা তিনজনেই চুট্‌কি-রসিক,—খাঁটি, অথচ উচ্চশিক্ষিত বাঙালী। সেই সভায় প্রাণখোলা হাসির নিয়ন্ত্রণ থাকবে না,—প্রাচ্য বা পাশ্চাত্ত্য বা তুলনামূলক সাহিত্য সম্বন্ধে পৃথক কোনো শাখার আয়োজন থাকবে না,—তবে, প্রথম অধিবেশনের মুখবন্ধেই ললিতকুমারের একটি গদ্য-চুট্‌কি থেকে এই ছত্রগুলি পড়ে শোনানো হবে—

'আমার বিশ্বাস, বাঙ্গালা ভাষার সংস্কৃত ভাষার সঙ্গে নিকট সম্বন্ধ থাকার দরুণই হউক, অথবা অন্য কোনও অনির্দেশ্য কারণবশতঃই হউক, বাঙ্গালা ভাষার ও ফরাসী ভাষার ন্যায় কোমলতা, সরলতা ও ভাষালীলার বিচিত্র ভঙ্গি যথেষ্ট পরিমাণে আছে। আশা হয়, প্রতিভাশালী লেখকের হাতে পড়িলে এ ধরনের সাহিত্য খুলিবে ভাল। অতি অল্প কথায় নরচরিত্রের বা মনুষ্যজীবনের কোন একটা জটিল তত্ত্ব সরল অথচ সরস ভাষায় প্রকাশ করাই এই প্রকারের সাহিত্যের বিশিষ্টতা; একটু রসিকতা থাকিবে, কিন্তু তাহা হাল্‌কা হইবে না, ভাবটি গভীর হইবে অথচ তাহাতে বিকট গাম্ভীর্য থাকিবে না, চাই কি একটু বিদ্রূপের কটাক্ষ থাকিবে অথবা করুণার অন্তঃসলিল প্রবাহ ধীরে বহিয়া যাইবে। এইরূপে

উজ্জ্বলে মধুরে মিশিলেই এই প্রকারের সাহিত্য সার্থক হয়।'

এই পাঠের পরে, প্রমথ চৌধুরীর সেই ১৩২২ সালের জ্যৈষ্ঠের 'চুটকি' প্রবন্ধটি পড়বার দরকার নেই,—কারণ, তাতে চৌধুরী মশাই ছেলেবেলার রাগ ভুলতে না পেরে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর বিরুদ্ধে ব্যাপকভাবে যেসব নিন্দার কথা লেখেন, সে-প্রসঙ্গ সেই আশ্চর্য নদী আর মাঠ আর আকাশের নৈসর্গিকতাকে বড়োই পীড়িত করবে। বরং তাঁর এই লাইনগুলি সত্যি-কার কোনো নবীন কবির কণ্ঠে উচ্চারিত হলে ভাল হয়—

তোমাদের চড়া কথা শুনে
যদি হয় কাটিতে কলম,
লেখা হবে যথা লেখে ঘুণে,
তোমাদের পড়া কথা শুনে
তার চেয়ে ভাল শতগুণে
দেয়া চির লেখায় অলম্,
তোমাদের পড়া কথা শুনে
যদি হয় কাটিতে কলম।

এ তাঁর 'সবুজপত্র'-আমলের রচনা—১৯১৪ খৃস্টাব্দের পয়লা নভেম্বরের সৃষ্টি,—এ-কবিতার নাম দিয়েছিলেন 'সমালোচকের প্রতি'।

এই দ্বিতীয় রচনা-পাঠের পরে তৃতীয় পাঠের বিষয় হবে সত্যেন্দ্রনাথের এই কয়েক ছত্র—যা তিনি বেরসিক চুটকি-অবিশ্বাসী-দের ব্যঙ্গ করে লিখেছিলেন—

এই চট্ করে যাহা বলে ফেলা যায়
  চুট্‌কি তাহারে কয়,
ওগো ছোট লেখা যত লেখে ছোটলোকে
  জানিবে সুনিশ্চয়।
ওই চুট্‌কি রচনা কেট্ কেট্ গ্র্যাম
  বিকিকিনি চলে চোটে
ও যে ফুট্-কড়াযের ছুট্‌কো বেসাতি
  হুন্ডি চলে না মোটে।
ভুয়ো সজ্জনের খুঁটি চুটকি রচনা
  দেখিতে নিবেট বটে,
ছদ্মা, ভর দিলে ভারে ভেঙে পড়ে চাল
  আয়ু-সংশয় ঘটে।

এই কটি ছত্র পড়া শেষ হলেই সভায় উপস্থিত যুবতীরা স্মিতহাস্য-সহযোগে ঐ স্তবকের পরবর্তী অংশটুকু পড়বেন এবং তারপর সমস্বরে সকলে 'কোরাসে'র একাক্ষরটুকু ধ্বনিত করবেন—

ওগো লিখো না চুট্‌কি, লিখিলে
    পড়িবে
  যশোভাগ্যেতে দ',
আর পণ্ডিত-সভা পুঁছিবে না তোরে
  দুখ না ঘুচিবে।—
  (কোরাস)...অ!

আমি জানি, অতঃপর সে-সভা থেকে—সবাহুত যদি কোনো মন্ত্রী বা শিল্প-পতি থাকেন, তাহলে তাঁরা তো বটেই,—এমন কি উচ্চগম্ভীর পণ্ডিতরাও 'তোবা' 'তোবা' রবে বিদায় নেবেন—শুধু যশো-লিপ্সু দু'দশজন ইতর ব্যক্তি তখনো সংবাদপত্রের রিপোর্টারদের ঘনিষ্ঠ হবার চেষ্টা করবেন—যাতে পরের দিনের কাগজে উপস্থিতদের তালিকা থেকে তাঁদের নাম-গুলি বাদ না যায়। রাজনৈতিক সুযোগ-সন্ধানীরাও চেষ্টা করবেন অতঃপর বীরবলের 'রায়তের কথা' তুলতে। সত্যেন্দ্রনাথের 'আখেরী' আবৃত্তি করবার জন্যেও কেউ কেউ উশখুশ করবেন। কিন্তু সেসব রাজনৈতিক ইচ্ছে চরিতার্থ হবার আগেই বীরেন ভদ্র মশাই যদি অনুগ্রহ করে 'নীললোহিতে'র কোনো একটি গল্পপাঠ শুরু ক'রে দেন, তাহলে অবান্তর আলোচনার কবল থেকে এই সভা রক্ষা করা সম্ভব হবে এবং সভার পরে,—আশা করা যায়,—একালের এই অন্ধকারেও আমাদের লেখকদের মনের বিনোদিনীরা নিজেদের গৃহস্থালীর চাবি খুঁজে পাবেন। অর্থাৎ সমালোচনা মিলবে সৃষ্টিতে, সৃষ্টি মিলবে সমালোচনায়!

সে যাই হোক্, শান্তিপুর-লোকালে সেদিন খুবই ভিড় ছিল, যেমন প্রতিদিনই থাকে। ফেরবার পথেও ঠিক তেমনি ভিড়। আমি আবার আর এক কামরার আর এক কোণে বসে সেই ললিতকুমার, প্রমথ চৌধুরী, সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কথা ভাবছিলুম। বোধ হয়, একটু বেশিই ভাবছিলুম। সহযাত্রী বৃদ্ধটি জিগেস করলেন,—'মশাই আপনি কি ভাবছেন?'

আমি বললুম—আমি একটি নদী খুঁজছি,—যার স্রোত ক্ষিপ্র এবং উজ্জ্বল,—যার কিনারায় খোলা মাঠ,—মাঠের একান্তে তিনটি গাছ—তিনটি সরল গাছ, মশাই।

ভদ্রলোক আমাকে অপ্রকৃতিস্থ মনে করেছিলেন নিশ্চয়। একটু সরে ব'সে নিরাপদ দূরত্ব রক্ষা করবার চেষ্টা করে-ছিলেন। কিন্তু কোথায় সরবেন তিনি? জায়গা কোথায়? আমাদের পরস্পরের হাঁটুতে হাঁটুতে ঠোকাঠুকি হচ্ছিলই, ইতিমধ্যে উল্টোডাঙা পেরিয়ে যাবার আগেই হ্যাঁচ্‌কা টান লাগলো গাড়ির গতিতে,—আমার ডান রগের সঙ্গে তাঁর বাঁ-রগের ধাক্কা লাগলো। আমরা উভয়েই কোরাসে একাক্ষর একটি অব্যয় উচ্চারণ করলুম—এবার আর 'অ' নয়,—'আঃ'!

ভারতের কৃষি ব্যবস্থার পরিচয়

১ম ও ২য় খণ্ড

লেখক : শ্রীবনবিহারী চক্রবর্তী ও অন্যান্য

আমাদের কৃষি ব্যবস্থার উন্নতি সাধন করিতে হইলে এই দুইখানি বই অপরিহার্য। অসংখ্য ছবি ও ফটো দ্বারা বিষয়বস্তু বুঝান হইয়াছে।

মূল্য : প্রতি খণ্ড ৩ টাকা মাত্র

বিজ্ঞানের ছাত্রদের জন্য নতুন প্রকাশিত বই

রশ্মি দৃশ্য ও অদৃশ্য	:	রমেন মজুমদার	৫·০০
বিদ্যুৎশক্তির কথা	:	সমরজিৎ কর	৩·০০
জীবের স্বভাব ধর্ম	:	শৈলেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	৪·০০
সাগর পেরিয়ে বার্তা	:	চিত্তরঞ্জন দাশগুপ্ত	৪·০০
যন্ত্রের মানুষ	:	তুষার দে	৩·৫০
মহাবিশ্বের সন্ধানে	:	রাখাল ভট্টাচার্য	৩·৫০

॥ অসমীয়া মাসিক পত্রিকা : ৮ম বৎসর চলিতেছে ॥

আমার প্রতিনিধি

সর্বাধিক প্রচারিত ও সর্বশ্রেষ্ঠ : বিজ্ঞাপনের শ্রেষ্ঠ মাধ্যম

সম্পাদক : ডঃ ভুপেন হাজারিকা

শ্রীভূমি পাব্লিশিং কোম্পানী

৭৯ মহাত্মা গান্ধী রোড : কলিকাতা-৯

সমালোচক রবীন্দ্রনাথ

সুশীল রায়

"হে বিধাতা, জগতে কাক সৃষ্টি করিয়াছ বলিয়া তোমার দোষ দিই না। কাকের অনেক কাজ আছে। কিন্তু তাহাকে যে কাজ দিয়াছ সেই কাজেই সে লিপ্ত থাকে না কেন। সৌন্দর্যপূর্ণ বসন্তের প্রাণের মধ্যে সে কেন তাহার কঠোর কণ্ঠের চঞ্চু বিঁধিতে থাকে?"

রবীন্দ্রনাথের এই উক্তিটি আমাদের অনেক সময় মনে পড়ে। যাকে অনধিকার-চর্চা বলা হয়ে থাকে, ঐ উক্তিটি তার প্রতি তাঁর প্রতিবাদরূপেই গণ্য করা যায়।

কিন্তু আমাদের সমাজ ও সংসার হচ্ছে আসলে অনধিকারচর্চার বৃহৎ একটি ক্ষেত্র। যার যে কাজ করায় কোনো অধিকাব নেই, সে সেই কাজেই বিশেষ-ভাবে লিপ্ত আছে, এবং বেশ বহাল তবিয়তেই আছে। উপন্যাস লেখার যার কথা নয়, সে উপন্যাস লেখে; কবিতা লেখার পক্ষে যার কোনোরকম যুক্তি নেই, সে কবিতা লেখে। এবং মজার কথা এই —এইসব বচনার জন্যে বেশ তারিফও পায়। সমালোচনা করার যোগ্যতা যার নেই, সেই হচ্ছে একালের একজন সমা-লোচক। এর পরিণাম যা হবার তাই হয়, বা হয়েছে।

"সৌন্দর্যপূর্ণ" বসন্তের প্রাণের মধ্যে অনেক অবান্তর কণ্ঠের হাহাকার উঠে কোকিলের কণ্ঠ চাপা পড়ে গিয়েছে।

বাংলাদেশের কথা এখন থাক। সমগ্র-ভাবে দেশের কথা তুলে এখন দরকার নেই। এখন আমরা কেবল তার একটি অংশের কথা বলছি। আমরা বাংলা সাহিত্যের কথা বলছি।

সাহিত্য জিনিসটা ঠিক যে কি বস্তু, তার কোনো নির্দিষ্ট সংজ্ঞা নেই। এই সংজ্ঞাটি না থাকায় অনেকের বেশ সুবিধে হয়েছে। সমাজে যাঁরা ছলে-বলে বা কৌশলে একটু প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছেন, তিনিই সাহিত্য সম্বন্ধে কথা বলার অধিকার পেয়ে গিয়েছেন। এবং তাঁর কথাই অনেকের কাছে গ্রাহ্য হয়ে গিয়েছে। কেন না সমাজে তিনি প্রতিষ্ঠাবান্।

সাহিত্য জিনিসটা কি, সাহিত্য কাকে বলে—এর কোনো নির্দিষ্ট সংজ্ঞা যখন নেই, এ জিনিসটা কথা দিয়ে বোঝানো যখন যায় না; এ জিনিসটা বুঝতে হয় অনুভূতি দিয়ে উপলব্ধি দিয়ে। ভাষা দিয়ে যা কিছু রচনা করা যায় তাই সাহিত্য কি না—এটা ভাববার কথা। কিন্তু সকলেই এ কথা ভেবে এবং বিবেচনা করে একটা সিদ্ধান্তে আসতে পারবেন, এতটা আশা সকলের কাছে করা যায় না। এই জন্যেই এমন একজন মানুষের দরকার হয়, যিনি সকলের হয়ে ভেবে তাঁর অভিমত জানা-বেন, এবং তাঁর অভিমতটাই গ্রাহ্য হবে।

বাংলাদেশ এই রকম একজন পুরুষকে একবার পেয়েছিল, তিনি বঙ্কিমচন্দ্র। সেই বাংলাদেশ পুনরায় ঐ রকম আর একজনকে পায়—তিনি রবীন্দ্রনাথ।

সাহিত্য নিজের ইচ্ছামত বহতা নদীর মত অবশ্যই চলবে। পদে পদে তাকে নিয়ন্ত্রণ করতে যাওয়া ঠিক না, তাহলে স্বাভাবিক ধারাটা বিঘ্নিত হতে পারে। কিন্তু এ কথাও মনে রাখতে হবে যে, সেই নদী উগ্র বা রুদ্রমূর্তি ধারণ করে যখন দুকূলে সর্বনাশ সৃষ্টি করার জন্য উদ্যত হয়, তখন তার শাসন প্রয়োজন, তখন তার নিয়ন্ত্রণ দরকার।

এ কাজ সকলে পারে না, যে পারে সে আপনি পারে। এ কাজ পারতেন রবীন্দ্রনাথ। নিজের জনপ্রিয়তা ক্ষুণ্ণ হবে কি হবে না, সেদিকে লক্ষ্য না রেখে তিনি যা উপলব্ধি করেছেন, তা বলতে দ্বিধা করেন নি। বাংলা সাহিত্যে তাই সৌন্দর্য ছিল। বাগানের মালী গাছের খুব অনুরক্ত; তবু সেই মালীকেও অনেক সময় নির্মম হতে হয়। অনেক আগাছা ও পরগাছা তাকে উপড়ে ফেলতে হয়। কেন না, তার লক্ষ্য উদ্যানের সৌন্দর্যের প্রতি।

সাহিত্যেরও অন্যতম কাজ সৌন্দর্য রচনা করা। সুতরাং সেই সৌন্দর্যপূর্ণ জগতে কোনো অসুন্দরের আবির্ভাব ঘটলে তা নির্মমভাবে বিদূরিত করতে হবে। সে সময়ে নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থের দিকে দৃষ্টি দেওয়া যাবে না।

সাহিত্যই যখন একটি জাতির ও জাতীয়-জীবনের অভিব্যক্তি, তখন সাহিত্য সম্বন্ধে বোধ এবং চেতনাই হচ্ছে জাতির জীবনের অন্যতম সম্পদ। এ বোধ যখন থাকে না তখন সঙ্কট দেখা দেয়। বর্তমানে আমাদের দেশের সাহিত্যে ও দেশের জাতীয়-জীবনে তেমন কোনো সঙ্কট দেখা দিয়েছে কি না—সে বিষয়ে কোনো তর্কের অবতারণা করে লাভ নেই। কিন্তু আমাদের এক-এক সময় মনে হয় যে, একটা সঙ্কট যেন দেখা দিয়েছে। এখন যা-কিছু লেখা হচ্ছে তার প্রায় সমস্তই সাহিত্য নামে চলে যাচ্ছে। এই জন্যেই, এ সবের মধ্যে যেটা সত্যিকারের সাহিত্য তার উপর কারো দৃষ্টি তেমনভাবে পড়ছে না। এবং এর প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করবেন এমন যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিও এখন তেমন নেই। অন্য কোনো কারণে না হোক, অন্তত এই একটিমাত্র কারণে রবীন্দ্রনাথের অভাব খুব বেশি করে বোধ করা যাচ্ছে।

বিশেষ করে এই সময়ে তাঁর উপস্থিতিটি আমাদের কাছে বিশেষভাবে কাম্য হয়ে উঠেছে এই জন্যে যে, তার শত বিপর্যয় সত্ত্বেও এখন বাঙালি জাতি বাড়তির পথে। তার ধনসম্পদ বেড়ে চলেছে, তার জনসম্পদ বেড়ে চলেছে, শিক্ষার প্রসার হয়ে চলেছে, শিক্ষিতের সংখ্যা বেড়ে চলেছে, পাঠক বাড়ছে, বই বাড়ছে, লেখক বাড়ছে। সব বিষয়ই বাড়তির পথে। কিন্তু এই বাড়তি জিনিসটা বাড়াবাড়ি হয়ে না যায়, সে

ফোল্ডিং ৫০ গুলির পিস্তল

লাইসেন্সের প্রয়োজন নেই। আমেরিকান মডেল। চোর এবং বন্য জন্তুর হাত থেকে নিজেকে বাঁচান। পিকনিক, ভ্রমণ এবং নাটকের পক্ষে উপযোগী। ৫০ গুলীর ব্যবস্থাসহ অটোমেটিক। হাল্কা ওজন এবং চোখ ধাঁধান আগুন আপনাকে বিপদ থেকে রক্ষা করবে।

মূল্য ৫০ গুলীসহ নং ৩৩ টাঃ ১৩·৫০। জার্মান মডেল নং ৯৯ টাঃ ১৫·৫০। ভি, পি, পি, চার্জ টাঃ ২·৫০। চামড়ার কেস ৭ টাকা। অতিরিক্ত প্রতি একশত গুলী ৫ টাকা।

GEM ARTS (WBM—15)
P.B. 1325, Delhi—6.

জন্যে সব বিষয়টির পরিচালনা করার জন্যে দরকার একজন দক্ষ ব্যক্তির।

সেই ব্যক্তিটিকে কেবল একজন ব্যক্তি হলেই হবে না, তাঁকে হতে হবে একটি ব্যক্তিত্ব। শাসন না করে যিনি শোধন করতে পারবেন, রূঢ় না হয়ে যিনি স্পষ্টভাবে সত্য কথা বলতে পারবেন, উষ্মা প্রকাশ না করে উচ্ছৃংখলতা প্রতিরোধ করার জন্যে যিনি নির্দেশ দিতে পারবেন। যিনি সকলের দ্বারা স্বীকৃত অভিভাবক হতে পারবেন।

এই রকম একটি ব্যক্তিত্বও যদি বর্তমানে বাঙলাদেশে থাকতেন তাহলে সেটা আমরা বাংলাদেশের সৌভাগ্য বলে মনে করতাম।

রবীন্দ্রনাথ যখন জীবিত ছিলেন, তখন তিনি কেবল সাহিত্যসৃজনের কাজেই নিযুক্ত ছিলেন না; সাহিত্যের মূল্যায়ন করার দায়িত্বও পড়েছিল তাঁর উপর। যা ভালো তাকে ভালো বলা, যা মন্দ তা অকপটে মন্দ বলা নির্ভর করে কিছুটা আত্মপ্রত্যয়ের উপর। তা না হলে কেবল মনরক্ষা ও মানরক্ষা করে চলতে হলে নিজেকে অপমান করাও হয়, অপরের শ্রদ্ধাও বিশেষ পাওয়া যায় না।

প্রাচীন সাহিত্য, লোকসাহিত্য, আধুনিক সাহিত্য—সব সাহিত্য সম্বন্ধেই তিনি বিচার-বিশ্লেষণ করেছেন। প্রাচীন সাহিত্যের ও লোকসাহিত্যের সঙ্গে পাঠক সাধারণকে পরিচয় করে দেওয়া যেমন একটা কাজ, তার মূল্য নির্ধারণ করাও একটা কাজ। আবার আধুনিক সাহিত্য ও সাহিত্যিকের প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করাও একটি কাজ। এ সব কাজই রবীন্দ্রনাথ যেমন অকৃপণভাবে করেছেন, সে রকমভাবে করার আর লোক কই? এমন কেউ নেই—এটা আমাদের কম আক্ষেপ নয়।

একালের অনেকেই কিন্তু প্রাণ খুলে কথা বলেন না। মানুষের মনরক্ষা ও মানরক্ষা করে কথা বলেন নিজের স্বার্থ-সিদ্ধির জন্যে। এর দ্বারা আত্মরক্ষার কাজটা ভালোভাবেই হয় বটে, কিন্তু সাহিত্যের সম্ভ্রম রক্ষার কাজটা তেমন হয় না।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর সমকালের সাহিত্যিকদের সম্বন্ধেও কিন্তু অকপট কথা বলতে দ্বিধা করেন নি। 'কল্লোল' ও 'কালি-কলমে' যেসব তৎকালীন তরুণ সাহিত্যিকরা সাহিত্যে নূতন মেজাজ আনার জন্য কলম ধরেছিলেন, তাঁদের সব সাহিত্যকর্মের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ একমত ছিলেন না। কিন্তু সে কথা তিনি গোপন না করে অকপটে তা প্রকাশ করেছেন। তখন সম্ভবত রবীন্দ্রনাথের উক্তির সঙ্গে সকলে একমত হন নি; কিন্তু এখন প্রমাণ হয়ে গিয়েছে কোন্ কথাটা ঠিক ছিল এবং কোন্টা ঠিক ছিল না।

কিন্তু যিনি সাময়িক বাহাদুরি চান না, যিনি এ সবের অনেক তফাতে, জনতার অভিরুচি অনুযায়ী নিজেকে চালিত না করে যিনি জনতার রুচি নির্মাণে আত্মনিয়োগ করতে পারবেন, এমন মানুষই আমাদের আদর্শ। আমাদের সমস্ত বোধের ও বুদ্ধির অভিভাবকরূপে তাই আমাদের প্রয়োজন রবীন্দ্রনাথের মত ব্যক্তিত্ব।

জনতার কাছে আত্মসমর্পণ করলে জনতা হয়তো খুশি হয়, কিন্তু জনতা তখন শ্রদ্ধা করতে ভুলে যায়। অখ্যাতি বা দুর্নাম যাই বলা যাক না একে, রবীন্দ্রনাথ তার জন্যে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে প্রকৃত সত্যটি প্রকাশ করতে কখনো যে কুণ্ঠিত বা দ্বিধাগ্রস্ত হন নি, তার কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেব। তিনি যা উপলব্ধি করেছেন সে কথা প্রকাশ করলে লোকে পাছে মন্দ বলে, এ ভয় তাঁর ছিল না। আত্মপ্রত্যয় তাঁর ছিল বলেই তিনি ঝুঁকি নিতে পেরেছিলেন, এবং একদা তাঁর যে উক্তির জন্যে দেশের লোক তাঁর প্রতি হয়তো অপ্রসন্ন হয়েছিলেন, আজ সেই দেশের লোকই বুঝতে পেরেছেন যে, তাঁদের অপ্রসন্ন হওয়াটাই ভুল হয়েছিল সে সময়ে। সাময়িকভাবে রবীন্দ্রনাথ দেশের লোকের অসন্তুষ্টির কারণ হয়েছিলেন বটে, কিন্তু এখন সকলের ভুল ভাঙার পর তাঁরা সকলেই তাঁর প্রতি যে পরিতুষ্ট, এতে বুঝি কোনো ভুল নেই।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও রবীন্দ্রনাথ সমসাময়িক লেখক। শরৎচন্দ্রের বইয়ের কাটতি তখন অনেক। তিনি খুবই জন-প্রিয়। সে সময়ে শরৎচন্দ্রের কোনো লেখা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের পক্ষে কোনো অকপট মন্তব্য করা খুবই কঠিন কাজ ছিল। এতে ভুল বোঝাবুঝির সম্ভাবনা ছিল খুব বেশি।

অথচ, রবীন্দ্রনাথ সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে তাঁর অভিমত জানিয়ে দিয়েছেন। মনরক্ষা বা মানরক্ষার রাস্তায় চলার মত পথিক তিনি ছিলেন না। তার প্রমাণ এই।

১৯২৭ সালে শরৎচন্দ্রের ষোড়শী নাটক প্রকাশিত হয়। ঐ নাটক একখণ্ড শরৎচন্দ্র রবীন্দ্রনাথকে পাঠান।

রবীন্দ্রনাথ ঐ নাটক পড়ে যা লেখেন তার কিছুটা এখানে উদ্ধৃত করি—

> বাংলা সাহিত্যে নাটকের মত নাটক নেই। আমার যদি নাটক লেখবার শক্তি থাকত তাহলে চেষ্টা করতুম; কেন না, নাটক সাহিত্যের একটা শ্রেষ্ঠ অঙ্গ। আমার বিশ্বাস তোমার নাটক লেখবার শক্তি আছে। ভিতরের প্রকৃতি আর বাইরের আকৃতি এই দুইটেই যখন সত্যভাবে মেলে, তখন চরিত্র-চিত্র খাঁটি হয়—আমার বিশ্বাস তোমার কলম ঠিকভাবে চললে এই রূপের সঙ্গে ভাব মিলিয়ে তুলতে পারে। তুমি যদি উপস্থিত কালের দাবি ও ভিড়ের লোকের অভিরুচিকে না ভুলতে পার তাহলে তোমার সেই শক্তি বাধা পাবে।......

ষোড়শীতে তুমি উপস্থিত কালকে খুশি করতে চেয়েছ এবং তার দামও পেয়েছ। কিন্তু নিজের শক্তির গৌরবকে ক্ষুণ্ণ করেছ।

নিজের কালকে খুশি তো একালের অনেক লেখকই করছেন, কিন্তু এ কালের অন্য কোনো লেখক কি এভাবে তাঁর নিজের মত জানাতে ভরসা করবেন? এ কথা অনেক সময় আমাদের মনে হয়।

শরৎচন্দ্রের পথের দাবী বইটি কি রকম জনপ্রিয় হয়েছিল, তা অনেকের মনে থাকার কথা। সে বই সম্বন্ধে বিরূপ মন্তব্য করা ছিল কঠিন কাজ। অথচ রবীন্দ্রনাথ ঐ বই সম্বন্ধে বলেন—

> তোমার পথের দাবী পড়া শেষ করেছি। বইখানি উত্তেজক অর্থাৎ ইংরেজের শাসনের বিরুদ্ধে পাঠকের মনকে অপ্রসন্ন করে তোলে। লেখকের কর্তব্য হিসাবে সেটা দোষের না হতে পারে, কেন না লেখক যদি ইংরেজ-রাজকে গর্হণীয় মনে করেন তাহলে চুপ করে থাকতে পারেন না।

বইটিতে ইংরেজ-রাজের বিরুদ্ধে অনেক কথা ছিল বলে, সে সময়ে ইংরেজ-রাজ বইটির প্রচার বন্ধ করে দেন। এতে চার-দিকে প্রবল প্রতিবাদ ওঠে। ২৭ মাঘ ১৩৩৩ (১৯২৭) তারিখে লেখা ঐ পত্রে এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ মন্তব্য করেন—

> ইংরেজ-রাজ ক্ষমা করবেন এই জোরের উপরেই ইংরেজ-রাজকে আমরা নিন্দা করব, সেটাতে পৌরুষ নেই।

এ উক্তি অনেকের কাছেই তখন ভালো লাগে নি বটে, কিন্তু স্থির মস্তিষ্কে ভেবে এ বিষয়ে আমাদের এখন কি মনে হচ্ছে—সে কথা চিন্তা করে দেখা যাক। এবং শরৎচন্দ্রের পথের দাবী বইটির প্রকৃত মূল্য কি, তাও কি আমরা এর মধ্যে বুঝতে পারি নি?

বিনামূল্যে লউন

আধুনিক প্রতিটি গৃহসজ্জায় আবশ্যকীয় নানাবিধ বিলাস সামগ্রী। বিশদ বিবরণের জন্য লিখুনঃ

PROFIT CIRCLE (WBC)
P. Box 1430, Delhi—6.

বুদ্ধি ও অবুদ্ধি

মৈত্রেয়ী দেবী

এই বিচিত্র দেশের সমাজের যে কোনো দৃশ্য চোখে পড়ে দেখি এক অবিশ্বাস্য অদ্ভুতের সমাবেশ। সবচেয়ে বিস্ময়কর বোধহয় চিন্তার ও কর্মের গরমিল। শুনে থাকি ভারতীয়েরা আধ্যাত্মিক ও ধর্মবিশ্বাসী। এই ধর্মবিশ্বাস অবশ্য বিচিত্র, বহুবিধ, কখনো পরস্পর বিরোধী। কিন্তু যেখানেই কোনো দৃঢ়মূল বিশ্বাস সেখানেই আছে আনুষঙ্গিক আচার, অনুষ্ঠান। মানুষের দৈনন্দিন জীবনের অনেকখানিই বাঁধা পড়ে আছে সেই সব প্রথা সংস্কারের বন্ধনে। কিন্তু যেখানে বিশ্বাসের মূল একেবারেই শিথিল বরং বিশ্বাস অনুপস্থিত সেখানেও কেন হাজার হাজার বছরের পুরানো রীতি আঁকড়ে ধরে আমরা সমাজজীবন জঞ্জালে আকীর্ণ করে রেখেছি একথা বহুদিন ধরেই অনেকে ভাবছেন কিন্তু এই অনড় চিত্তবৃত্তিসম্পন্ন দেশে সে ভাবনা কোনো প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি। যদিও ভারতের প্রায় সব ধর্মসম্প্রদায়ই বুদ্ধির সতর্ক সচলতা হারিয়ে বুদ্ধি ও কর্মের সঙ্গে একটা বিরোধ ঘটিয়ে রেখেছে তবু যেহেতু হিন্দুসমাজের সঙ্গেই আমার সংযোগ বেশি সেজন্য হিন্দুসমাজ সম্বন্ধেই আলোচনা করব।

প্রথম ধরা যাক সামাজিক উৎসবগুলির কথা—বেশির ভাগ উৎসব অনুষ্ঠানেরই মূল রয়েছে অতীতের কোনো ধর্মবিশ্বাসের সঙ্গে জড়িত হয়ে। ঈশ্বর, পরলোক, আত্মা, পাপ, পুণ্য এই সমস্ত অজ্ঞেয় ভাবনাই আমাদের আচার অনুষ্ঠানগুলিকে নিয়ন্ত্রিত করেছে। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত আমাদের যে দশকর্ম বিধান সেগুলি পরীক্ষা করলে আমরা দেখি যে সব বিশ্বাস বহু পূর্বে শিক্ষিত মানুষের মন থেকে ক্ষয় হয়ে গেছে বা যাওয়া উচিত ছিল, মানসিক জড়ত্ব হেতু তাদেরও স্থানচ্যুত করবার চেষ্টা হয় নি। ভূত, প্রেত ও বহু আজগুবি কল্পনা, জাগতিক ব্যাপারের অতিপ্রাকৃত কারণ অনুসন্ধান, প্রাকৃতিক নিয়মের অমোঘতা সম্বন্ধে অজ্ঞতা থেকেই আচার অনুষ্ঠানের মধ্যে যে সব ক্রিয়াকর্ম সৃষ্টি হয়েছিল তার অনেক কিছুই আজও বহাল রয়েছে।

একটি সদ্যোজাত মানবশিশুর মত দুর্বল জীব আর নেই—চারিদিকে রোগ-ব্যাধির জীবাণু ছড়ানো, বিপদসঙ্কুল এই পৃথিবীতে তাকে বাঁচিয়ে রাখা কম কঠিন কাজ নয়। এক সময় যখন রোগ-ব্যাধিগুলোর কারণ ও তাদের সঙ্গে লড়াই করবার উপায়গুলো জানা ছিল না তখন অনেক আজগুবি উপায় চিন্তা করা স্বাভাবিক ছিল। টিটেনাসকে পেঁচোয় পাওয়া ভাবা, ষষ্ঠীঠাকরুণকে সন্তুষ্ট রাখার চেষ্টা, মা শীতলাকে পেট ভরে খাওয়ান, তখন হয়ত স্বাভাবিক ছিল, কিন্তু আজ যখন দেশের একটি বৃহৎ অংশ রোগবীজাণু, জাগতিক নিয়মের অমোঘতা প্রভৃতি সম্বন্ধে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল। অন্তত বিজ্ঞান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ, তখনও কেন তারা জাগতিক ব্যাপারের আধিভৌতিক ব্যাখ্যা করতে কিছুমাত্র লজ্জিত নয়। কেনই বা ষষ্ঠী, শীতলা, তন্ত্র-মন্ত্র, তাগা-তাবিজ, স্বস্ত্যয়নের কিছুমাত্র ঘাটতি হচ্ছে না। এমনকি ডাক্তারের বাড়িতে বা বিজ্ঞানের বড় বড় ডিগ্রীধারীর বাড়িতেও এর ব্যতিক্রম দেখা যায় না। নিজের জ্ঞান-বুদ্ধি যা বলে তা এড়িয়ে যে সব অন্ধবিশ্বাস শিক্ষিত লোকের মনের উপরও জগদ্দল পাথর চাপিয়ে রেখেছে তার ফলে তার শিক্ষা ও বিশ্বাসের মধ্যে সামঞ্জস্য থাকছে না। চিন্তার মধ্যে বহু আবর্জনা সঞ্চিত হয়ে উঠছে—ফলে তার ব্যবহার হচ্ছে অসংলগ্ন। সমস্ত সমাজের মধ্যেই বিচারবুদ্ধিকে অস্বীকার করায় এক রকম চিন্তার উচ্ছৃঙ্খলতা বেড়ে উঠছে।

আজকের দিনেও ব্রাহ্মণদের মধ্যে উপবীত গ্রহণের অনুষ্ঠানটি একটি বৃহৎ অনুষ্ঠান—হয়ত ৯৯টি ব্রাহ্মণ পরিবারে অনুষ্ঠান আজও সাড়ম্বরে পালিত হয়ে থাকে—অর্থ ব্যয় হয় প্রচুর। কিন্তু আজকে জীবনের সঙ্গে এর সংযোগ কোথায়? কোন ব্রাহ্মণ-তনয় আজ প্রত্যুষে উঠে গায়ত্রী মন্ত্র জপ করবে? কেই বা ব্রহ্মচর্য পালনের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। আজকের ব্রাহ্মণ বালকের সঙ্গে তার অন্য বর্ণের সহপাঠীর জীবনযাত্রার পার্থক্য কোথায়? তাদের স্কুল-কলেজ খেলাধুলো, চিন্তাভাবনা, আমোদ-প্রমোদ কোনো কিছুর সঙ্গেই আজ যজ্ঞোপবীতধারী গুরুগৃহবাসী ব্রাহ্মণ-তনয়ের কোনো সাদৃশ্য নেই, থাকতে পারে না। যদি কোনো আধ্যাত্মিক চিন্তা বা ধর্মভাবনার প্রয়োজন আজ থাকে তবে তাকে বর্তমানের চিন্তাধারার সঙ্গে মিলিয়ে নিতে পারলে তবেই তা অর্থবহ হয়। 'ভবতি ভিক্ষাং দেহি' বলে আজকের সদ্য দ্বিজত্বে উপনীত বালক কোন আদর্শের প্রেরণা লাভ করছে? সে কি মাধুকরী বৃত্তিকে করণীয় মনে করবে? সে কি যজ্ঞোপবীত পরিধান করে যজ্ঞ করবে কখনো? আজকের মানুষের কাছে যাগ-যজ্ঞর কি কোনো অর্থ আছে? তবু যে কতগুলি রীতি পালন গতানুগতিক পথে চলেছে এর দ্বারা এদেশের মানুষের কল্পনাশক্তির অভাব ও বিচারবুদ্ধির দৈন্যই প্রকাশ পাচ্ছে।

কেউ হয়ত তর্ক তুলবেন যে এগুলি সামাজিক উৎসব মাত্র। এবং মানুষের জীবনে উৎসবের প্রয়োজনীয়তা আছে। উৎসব হচ্ছে মানুষে মানুষে মিলবার একটা উপলক্ষ্য সেই জন্যই উপলক্ষ্যগুলির যদি তাৎপর্য থাকে তবেই তা উন্নততর মহত্তর আনন্দে জীবনকে পূর্ণ করতে পাবে। যে আনন্দ সকল মানুষের উপভোগ্য আজকের উৎসবে তাকেই খুঁজে পেতে হবে। বিগত দিনের পুরানো রংচটা আসবাবে ঘর সাজালে যেমন তার শোভা হয় না তেমনি এককালে যা তাৎপর্যপূর্ণ ছিল আজ সম্পূর্ণ অর্থহীন তেমনি কতগুলি অভ্যস্ত কর্ম দিয়ে আজকের উৎসব সার্থক হয় না। বিবাহ ব্যাপারটাই ধরা যাক না—সাধারণত বাঙালি হিন্দুর বিবাহ উৎসব তো কখনো কখনো কষ্টকর আতিশয্যের পর্যায়ে পৌঁছায়। সাধ্যের অতিরিক্ত জনসমাগম ব্যবস্থা কখনো কখনো সমগ্র আবহাওয়া ক্লেদাক্ত করে তোলে। এ ছাড়া বিবাহ পদ্ধতিটাও হয়ে দাঁড়িয়েছে কতগুলি অর্থহীন অসংলগ্ন ঘটনা সমষ্টি। এত সুন্দর যে বরবধূবরণ তার সৌন্দর্যটা ফুটিয়ে তোলার কোনো সুব্যবস্থাই হয় না। ভিড়ের চাপে কতগুলি অপ্রাসঙ্গিক বস্তুর স্তূপে বরণডালার সৌন্দর্য ঢাকা পড়ে যায়। সাজান সুন্দর বিবাহমণ্ডপে পাট-কাঠির ধোঁয়ায় চোখের জল ফেলে বরবধূ যে মন্ত্রোচ্চারণ করেন তার অল্পই তাঁদের হৃদয়ঙ্গম হয়। আজকের শিক্ষিত ছেলেমেয়েরা ক'জন চিন্তা করেন মন্ত্রগুলি কি বলছে—বা এই ঘৃতে আহুতির অর্থ ও তাৎপর্য কি? একটি দক্ষিণালোভী পুরুতের ভুল উচ্চারণে উচ্চারিত দুর্বোধ্য কতগুলি শব্দই আজকের অধিকাংশ নর-নারী জীবনের একটি শ্রেষ্ঠ মুহূর্তে

নির্বোধভাবে গ্রহণ করে। যজ্ঞকর্মের তাৎপর্যই বা কি? ধর্মপত্নীর সঙ্গে পতি একত্রে ধর্মকর্ম করছে—আজকের মানুষের কাছে ধর্মকর্ম কি আগুনে ঘি ও খৈ ঢালা? আজকের মানুষ এ সব ক্রিয়াকাণ্ডে বিশ্বাসী নয়—জীবনের কোনো সময়ই যজ্ঞ করা তার কাছে ধর্মচর্চা নয়। আজকের মানুষ ন্যায় নীতির অনুশীলন ও পরহিতকর কর্মের মধ্যে মানবধর্মের সার্থকতা খোঁজে। কোনো পদার্থবিজ্ঞান বা রসায়নের ছাত্র কি আজ বিশ্বাস করতে পারে যে যজ্ঞ করে কোনো পুণ্য লাভ বা কোনো অঘটন ঘটান যায়? বৃষ্টি, ফসল, সন্তান বা অন্য কোনো বস্তু ঘৃতে আহুতি দিয়ে যজ্ঞফলরূপে লভ্য হবে এ কি আজকের সামান্য শিক্ষিত ব্যক্তিও বিশ্বাস করতে পারে? অথচ তারা নির্বিচারে বিবাহের মত জীবনের একটি গভীর অভিজ্ঞতায় প্রবেশের মুখে ছেলেখেলার মত কতগুলি কাজ করে যায়—যা তাদের যুগ্ম জীবনের আবেগ অনুভূতি ও আনন্দের সঙ্গে সম্পূর্ণ সংযোগহীন কখনো বা বিরক্তিকর ও ক্লান্তিকর ঘটনা।

শুভদৃষ্টির মত একটি সুন্দর সরস অনুষ্ঠানের কবিত্ব কেনই বা পিঁড়ির উপর দোদুল্যমান অবস্থায় সার্কাসের আঙ্গিকে ঘটান হয়? কেনই বা কনকাঞ্জলির মত লজ্জাকর একটি প্রথা আজও অসঙ্কোচে চলে আসছে—এক থালা চাল মায়ের আঁচলে ঢেলে দিয়ে মাতৃঋণ শোধ করার মত কুৎসিত প্রথা আসন্ন বিচ্ছেদবেদনার মধ্যের মাধুর্যটুকু নিঃশেষ করে নিষ্ঠুরতায় পরিণত করে মাত্র।

সত্য বলতে কি আমাদের অধিকাংশ উৎসব প্রভৃতির মধ্যে রমণীয় সৌন্দর্যবোধ ও সৌকুমার্য নেই—যদিও এমন চিহ্ন আছে যাতে মনে হয় একদিন হয়ত তার কোনো কোনো আঙ্গিকে রসের মধুরের ছোঁয়া ছিল। বিবাহের এমনি একটি সুন্দর অঙ্গ অরুন্ধতী দর্শন। জীবনের এক পরম লগ্নে দুজন মানুষ একত্র জীবনযাত্রা শুরু করবার মুহূর্তে উন্মুক্ত মহাকাশের নিচে দাঁড়িয়ে ঊর্ধ্বমুখী হওয়াই একটি সুন্দর ঘটনা। বিশেষত যখন কয়েকদিন ধরে অজস্র বিবিধ খুঁটিনাটিতে আচার-ভীরু মনে কোনো বিরাট অনুভূতির পথ কণ্টকাকীর্ণ।

এমনি আর একটি সুন্দর প্রথা ছিল মুমূর্ষুকে মৃত্যুর পূর্বে খোলা আকাশের নিচে নিয়ে আসা। জীবনের একটি পরমক্ষণ মৃত্যু—অনন্তের সঙ্গীত শোনবার মুহূর্তে বন্ধ ঘরের কপাট খুলে তাকে আকাশের মহিমার মধ্যে নিয়ে আসা—এমন সুন্দর ও সঙ্গত ভাব আমাদের প্রথাগুলির মধ্যে কমই আছে।

এর কার্যকরী দিক অক্সিজেনের অভাব পূরণ। নানা কারণে এ প্রথা এখন অচল হয়েছে। তাতে ক্ষতিও নেই। কিন্তু দাহকর্ম? একদা নদীর তীরে আগুনের শিখায় প্রিয়জনের শেষ চিহ্নটুকু মিলিয়ে দিয়ে শোকার্ত আত্মীয়কুলের যে শ্মশান-বৈরাগ্যভাব তার মধ্যে বেদনামথিত আধ্যাত্মিক অনুভূতি জাগিয়ে তোলার একটি আশ্চর্য প্রথা ছিল এই দেশে। কিন্তু শ্মশান আজ পাগল কুকুরের বিচরণ ক্ষেত্র হয়ে যখন সব গাম্ভীর্য ও মহিমা-ভ্রষ্ট হয় তখন আমাদের সমাজের কোথাও আঘাত লাগে না। মানুষের চির শান্তির ক্ষেত্র আর্ত আত্মীয়স্বজনের গভীরতম উপলব্ধির স্থানটি পূজার মন্দিরের মত পবিত্র, সেখানে আমরা অনায়াসে কুৎসিতকে জায়গা ছেড়ে দিই আমাদের তাতে কোনো বেদনা বাজে না।

আর পূজার স্থানই বা কি? হিন্দুর পরম তীর্থ কালীঘাটের মন্দির কি জলকাদা রক্তে এক নারকীয় বীভৎসতা সৃষ্টি করে আমাদের লজ্জার কারণ হয়ে নেই? ইংরেজিতে একটা কথা আছে cleanliness is next to Godliness—সে প্রবচনের অবশ্য বাংলা হয় না—আমরা চিন্তাও করি না যে অপরিচ্ছন্ন ক্লিন্ন আবহাওয়ায় কোনো উচ্চ মহৎ সুকুমার উপলব্ধি ঘটতে পারে না। পূজার আয়োজনে আছে ধূপ ধুনা পুষ্প চন্দন—কিন্তু আজ এ উপাচারগুলি তাৎপর্যভ্রষ্ট—বিচ্ছিন্ন কতগুলি বস্তু মাত্র। তা দিয়ে কোনো স্তবগান বেজে উঠছে না। বিচ্ছিন্ন শব্দে যেমন গান নেই—তেমনি বিচ্ছিন্ন কতগুলি সুন্দর বস্তুর অসমঞ্জস সমাবেশে তেমনি সৌন্দর্য নেই—জল কাদা ও মনুষ্য ক্লেদে পূর্ণ আবহাওয়ায় তা বিকারগ্রস্তের হাসির মত তাম্রপটের উপর পড়ে থাকে।

সব চেয়ে দুর্বোধ্য লাগে আমাদের শ্রাদ্ধ প্রক্রিয়া। পরমপ্রিয় যে মানুষটিকে শ্রদ্ধা জানাতে চাই যার দেহহীন অস্তিত্বের চিন্তা আমাদের বিরহকাতর মনে নানা গভীর প্রশ্ন ঘনিয়ে আনে। জন্মমৃত্যুর অপার রহস্যর সামনে দাঁড়িয়ে যখন আমরা এক নিগূঢ় অপ্রকাশ্য অনুভূতিতে মৃত্যুর মহিমা উপলব্ধি করি সেই সময়ে আমাদের শ্রাদ্ধ বাড়িটি কল্পনা করুন। খুঁটিনাটি তুচ্ছ দ্রব্যের আয়োজনে সাজানো উপাচার—বস্তুহীন উদার অনুভূতির প্রতিবন্ধক মাত্র। শ্রাদ্ধের মন্ত্রপাঠে সব শব্দ ছাপিয়ে যা বার বার কানে আসে তা হচ্ছে অমুক প্রেতের শুভ কামনায় বা স্বর্গ কামনায় ব্রাহ্মণায় দদামি। কেন ব্রাহ্মণকে দিলে অমুক প্রেতের শুভ হবে কেউ বা তা ভাবছে? কেউ বা না জানে চতুর ব্রাহ্মণের রোজগারের এটি কায়েমি ব্যবস্থা। ব্রাহ্মণশ্রেণীর পৈতৃক পেশাটি রক্ষার জন্যই যে অধিকাংশ আচার অনুষ্ঠান ক্রিয়াকর্ম তা 'ব্রাহ্মণায় দদামি' থেকেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। লোকান্তরিত পরমপ্রিয় ব্যক্তির কোনো সত্তার অস্তিত্ব কল্পনা করতে আমাদের নিঃসন্দেহে ভাল লাগে তার কোনো বিজ্ঞানসম্মত প্রমাণ থাকুক বা না থাকুক—যারা বর্তমান আছে তাদের কাছে সেই ভাল লাগাটুকুই অসীম মূল্যবান—সেজন্য এই কল্পনার মধ্যে একটি সত্য আছে—সে সত্তার কোনো বাস্তবতা সম্ভবত নেই তবু তা জীবনের বেদনার পাত্রে অনুভূতির গভীরতায় এক বিশেষরূপে সত্য কিন্তু সেই সত্তাকে প্রেতরূপে কল্পনা করে তার উদ্দেশে আলোচাল ও কাঁচকলা সিদ্ধ চটকে পিণ্ডদান করার মধ্যে যে বীভৎসতা আছে তা আমাদের সমস্ত সুকুমার ভাবনার উপর একটি স্থূলে হস্ত বুলিয়ে দেয়। এই যে প্রেতরূপে কল্পনা করে আত্মার স্বর্গ কামনায়

রবীন্দ্রভারতী প্রকাশনা

INDIAN CLASSICAL DANCES
শ্রীবালকৃষ্ণ মেনন
নৃত্যকলার শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যা ও প্রয়োগকলা নির্দেশিত। চিত্রভূষিত। ২৫·০০

The House of the Tagores
শ্রীহিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়
জোড়াসাঁকো ঠাকুর পরিবার ও পরিজনের পরিচয়বাহী গ্রন্থ। ২·০০

Tagore on Literature and Aesthetics
ডক্টর প্রবাসজীবন চৌধুরী ৮·৫০

Studies In Aesthetics
ডক্টর প্রবাসজীবন চৌধুরী ১০·০০

A Critique of the Theories of Viparyaya
ডক্টর ননীলাল সেন

Studies in Artistic Creativity
ডক্টর মানস রায়চৌধুরী ১৫·০০

রবীন্দ্র-সুভাষিত
রবীন্দ্ররচনার উদ্ধৃতিসম্ভার ১২·০০

রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে মৃত্যু
ডক্টর ধীরেন্দ্র দেবনাথ ৬·০০

পদাবলীর তত্ত্বসৌন্দর্য ও কবি রবীন্দ্রনাথ
ডক্টর শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য ৫·০০

গান্ধীমানস
রতনমণি চট্টোপাধ্যায়, প্রিয়রঞ্জন সেন, নির্মলকুমার বসু লিখিত। ৩·০০

রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়
৬।৪ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা-৭
পরিবেশক । 'জিজ্ঞাসা'
৩৩ কলেজ রো, ১৩৩এ রাসবিহারী এভিনু্য

পুরুৎকে দান এ-কাজ তো বড় বড় বিশ্ব-বিদ্যালয় থেকে পাশ করা বৈজ্ঞানিকরাও করে থাকেন—তাঁরা কি বিশ্বাস করেন যে ঐ পুরুৎকে ঘটি বাটি খাট পালং দিলে তবেই তাঁদের পিতার মাতার অক্ষয় স্বর্গ-বাস হবে? স্বর্গ কোথায় এবং সেখানকার পথঘাট ঐ ব্রাহ্মণের সন্ধানে আছে একথা আজকের দিনে কোনো বয়স্ক ব্যক্তি মনে করে না অথচ যে সামাজিক কর্মগুলি পাঁচজনের সঙ্গে একত্র উদ্‌যাপন করা হয় সেখানে অনায়াসে এমন সব আজগুবি কল্পনার স্থান থাকে যাকে ছেলেমি বললে অত্যুক্তি হয় না। দুঃখের বিষয় এই যে জীবনের গভীরতম অভিজ্ঞতার ক্ষণগুলি আমরা এইভাবে অবাস্তব ভূতুড়ে কল্পনার খোঁয়াড় বানিয়ে রেখেছি যেখানে জঞ্জালের স্তূপের মধ্যে বুদ্ধি বিচার সৌন্দর্যবোধ কল্পনাশক্তি সব কিছু জলাঞ্জলি দিয়ে আমরা নিশ্চিন্তে বসে অতীত গৌরবের স্বপ্ন দেখছি।

আমাদের সমাজজীবনে, প্রতিদিনের জীবনে, গুরু-পুরুতের হাতে পোঁতা এই সব বহু বিচিত্র অনড় খুঁটি গাঁথা আছে—যেগুলিকে নির্বিচারে মেনে নিতে, যার কাছে নিজের বিচার বুদ্ধিকে খণ্ডিত করতে, আমাদের এতটুকু লজ্জা বোধ হয় না। শুধুই যে মনের অনড়ত্ব এর কারণ তা নয়, নিজের বুদ্ধিবৃত্তির চেয়ে শাস্ত্র-বাক্যের উপর বিশ্বাসপ্রবণতাই এর মূল তা সে শাস্ত্র মনু-পরাশরের তৈরিই হোক বা ঠাকুমা দিদিমা-র তৈরিই হোক! অথচ আজ থেকে একশ' বছর আগেই এদেশের মানুষ বুদ্ধির চর্চা করতে শুরু করেছিল। জীবনের সকল ক্ষেত্র থেকেই খুঁটিগুলিকে নড়িয়ে দেওয়ার কাজে তাঁরা কিছুটা সফলও হয়েছিলেন। সমস্ত সামাজিক ক্রিয়াকর্মগুলিকে ব্রাহ্মসমাজ আধুনিক মনের গ্রহণযোগ্যভাবে, বুদ্ধিগম্যভাবে রূপ দেবার চেষ্টা করেছিল—দুঃখের বিষয় সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতা সেখানেও দেখা দেবার ফলে তা সমগ্র হিন্দুসমাজের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে তাকে নতুন রূপ দিতে পারে নি। তার প্রভাব খুব একটি সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে সীমিত থেকে অনেক সম্ভাবনা বিফল হয়েছে তা না হলে হিন্দুসমাজের মধ্যে আজকের প্রচলিত পূজারীতি এমন উচ্ছৃঙ্খল ছেলে-খেলা হয়ে উঠতে পারত না। দেবতার নামে এমন পুতুল খেলা পুণ্য ভারতের আধ্যাত্মিক জাতির মধ্যেই উত্তরোত্তর বেড়ে উঠেছে। এই পূজা পদ্ধতি আজকের মানুষের মনের কোন ভাবনা স্পর্শ করতে পারে না যতই না কেন প্রতিমার প্রতীকত্ব নিয়ে তত্ত্বকথা বলা হোক। সে তত্ত্ব আজকের চোঙা প্যান্ট পরা টুইস্ট নাচিয়ে নবযৌবনের মর্মে প্রবেশ করতে পারে না। পরিবেশভ্রষ্ট এক প্রাগৈতিহাসিক পূজা আয়োজন আজ কেবলমাত্র প্রমোদোৎসব ছাড়া কিছু নয়। তর্কের খাতিরে একথা বলা চলে যে এতে ক্ষতিই বা কি আজকের নিরানন্দ জীবনে যেটুকু উৎসবের গান বাজে তাই লাভ। কিন্তু পূজার প্রয়ো-জনীয়তা যাঁরা মানেন তাঁরা নিশ্চয় স্বীকার করবেন যে পূজাকে খেলা করে ফেলা একটি মানবিক শূন্যতা—জীবনের যে দিকটি গভীরের প্রতি, অনন্তের প্রতি অমর্ত্যের প্রতি উন্মুখ সেই দিকটিকে প্রতিদিন সত্য করে তোলার সাধনা মনুষ্যত্ব লাভের একটি প্রধান উপায় সেই দিকটিই তাই এমন পঙ্গু বঞ্চিত ও খেলো করে রাখায় ক্ষতি বৈ লাভ নেই। সারা জীবনের ক্রিয়াকাণ্ডের মধ্যে এমন ব্যাপক অবুদ্ধির চাষ মনুষ্য সমাজের পক্ষে মঙ্গলজনক হতে পারে না। প্রতিদিনের জীবন ব্যাপারে যদি মান্ধাতার আমল চলতে থাকে তাহলে রাষ্ট্র ব্যাপারে যে সে আধুনিক ও যুক্তি-বাদী হয়ে উঠবে এটা আশা করা যায় না। সমাজ বিজ্ঞান অর্থনীতি ও সব রকম জ্ঞানের চর্চার ক্ষেত্রই তাই যুক্তিতর্ক বিচারের মুক্ত ক্ষেত্র না হয়ে আধিভৌতিক আধিদৈবিকের অঙ্গরাজ্য হয়ে থাকে। ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজের ছাত্ররা বিশ্বকর্মা পূজা করে, ইঞ্জিনে সিঁদুরের ফোঁটা দেয়, ল্যাবরেটরির ভিত্তি স্থাপনে দিনক্ষণ শুভ লগ্নের অপেক্ষা থাকে, পূজাপাঠ হয়।

বলা যেতে পারে বৈজ্ঞানিক যদি বিজ্ঞানের বিদ্যাটা জানে অথচ দেশের আচারগুলিও মানে তাতে ক্ষতি কি। ক্ষতি এই যে একই সময়ে বুদ্ধির ও অবুদ্ধির চর্চা চলতে পারে না। অতএব যত ডিগ্রী-ধারী হয় তত বৈজ্ঞানিক হয় না। আর সমাজের সর্বক্ষেত্রেই শাস্ত্র শাসন দৈব গুরু ও অতি-প্রাকৃতের উপর নির্ভর হলে জাতি আত্মনির্ভর হতে পারে না। তারা তাই রাজ্য শাসনের উচ্চ কর্তৃত্বে থাকলেও অন্তরে স্বাধীন হতে পারে না। রাষ্ট্র ব্যবস্থায় পরাধীনতার চেয়েও বুদ্ধির এই দাসত্ব মানব মুক্তির অন্তরায়। আমাদের সমাজ আজও নানাবিধ প্রথা সংস্কারের ছোট ছোট বেড়ায় বাঁধা এক-একটি কারাগারে মানুষকে বন্দী করে রেখেছে। মহামানবের সাগরতীরে মানুষের মিলন সঙ্গীত ধ্বনিত করবার পক্ষে তা অন্তরায়। আমাদের দেশের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে শাস্ত্র ও আচারের এই খুঁটিগুলি পরস্পরের মেলবার পথে কণ্টক—কারণ যে যার নিজের খুঁটি ও শৃঙ্খল-গুলিকেই মুক্তির সোপান, শাশ্বত এবং অভ্রান্ত ধরে নিয়ে নিশ্চিন্তে আছি। যেসব সামাজিক আচার ব্যবহারের ধর্মের সঙ্গে যোগ—সেগুলো তাই আরো বিশেষভাবে সতর্ক বুদ্ধি বিচারের অপেক্ষা রাখে। বহু ধর্মমতে বিভক্ত এই দেশে মানুষের মিলবার পথে কাঁটার চাষ চলেছে দীর্ঘদিন ধরে—এখন এ সম্বন্ধে কিছু কর্তব্য আছে শিক্ষিত মানুষদের।

এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বহু প্রবন্ধ রয়েছে কিন্তু রবীন্দ্র পূজায় আমাদের যত আগ্রহ তাঁর বাণীতে কর্ণপাত করায় তত নয়।

......"তারাও (ডিগ্রীধারী শিক্ষিত ব্যক্তিরাও) উচ্ছৃঙ্খলভাবে যা-তা মেনে নিতে প্রস্তুত, অন্ধ ভক্তিতে অদ্ভুত পথে অকস্মাৎ চালিত হতে তারা উন্মুখ হয়ে আছে: আধিভৌতিক ব্যাপারের আধি-দৈবিক ব্যাখ্যা করতে তাদের লজ্জা নেই। তারাও নিজের বুদ্ধি বিচারের দায়িত্ব পরের হাতে সমর্পণ করতে লজ্জা বোধ করে না। আরাম বোধ করে। তার একটা প্রধান কারণ এই যে মূঢ়তার বিপুল ভারাকর্ষণ জিনিসটা ভয়ঙ্কর প্রবল। নিজের সতর্ক বুদ্ধিকে সর্বদা জাগ্রত রাখতে সচেষ্ট শক্তির প্রয়োজন হয়। যে সমাজ দৈব গুরু ও অপ্রাকৃত ভাবের উপর আস্থাবান নয়, যে সমাজ বুদ্ধিকে বিশ্বাস করতে শিখেছে সে সমাজে পরস্পরের উৎসাহে ও সহায়তায় মানুষের মনের শক্তি সহজেই নিরলস থাকে। আমাদের দেশে শিক্ষাপ্রণালীর দোষে একে তো শিক্ষা অগভীর হয়, তার উপরে সেই শিক্ষার ব্যাপ্তি নিরতিশয় সঙ্কীর্ণ এইজন্যে সর্বজনের সম্মিলিত মনের শক্তি আমাদের মনকে অগ্রসরতার দিকে আত্মশক্তির দিকে উন্মুখ করে রাখতে পারে না। সে সহজেই অলস হয়ে পড়ে এবং প্রচলিত বিশ্বাস ও চিরাগত প্রথার হাতে গা ঢেলে দিয়ে ছুটি পায়। তারপরে অশিক্ষিতের সঙ্গে আমাদের প্রভেদ ঘটে এই যে তাঁরা আপন অন্ধ বিশ্বাসে বিনা দ্বিধায় সহজ ঘুম ঘুমোয়, আমরা নিজেকে ভুলিয়ে আফিঙের ঘুম ঘুমোই। আমরা কুতর্ক করে লজ্জা নিবারণ করতে চেষ্টা করি, জড়তা বা ভীরুত্ববশত যে কাজ করি তার একটা সুনিপুণ বা অনিপুণ ব্যাখ্যা বানিয়ে দিয়ে সেটাকে গর্বের বিষয় করে দাঁড় করাতে চাই। কিন্তু ওকালতির জোরে দুর্গতিকে চাপা দেওয়া যায় না।

দেশকে মুক্তি দিতে গেলে দেশকে শিক্ষা দিতে হবে, একথাটা হঠাৎ এত অতি-বিস্তৃত মস্ত বলে ঠেকে যে, একে আমাদের সমস্যার সমাধান বলে মেনে নিতে মন রাজী হয় না।

দেশের মুক্তির কাজটা খুব বড়ো অথচ তার উপায়টা খুব ছোট হবে একথা প্রত্যাশা করার ভিতরেই একটা গলদ আছে। এই প্রত্যাশার মধ্যেই রয়ে গেছে ফাঁকির 'পরে বিশ্বাস। বাস্তবের 'পরে নয়, নিজের শক্তির 'পরে নয়।"

(কালান্তর রবীন্দ্রনাথ)

সংস্কৃত সাহিত্যে সমালোচনা

কালীকুমার দত্ত

সে অনেকদিন আগেকার কথা। তখন আমি অধুনা স্বর্গত ডক্টর সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের তত্ত্বাবধানে "সংস্কৃত সাহিত্যে শব্দসৌন্দর্যের তত্ত্ব ও তথ্য" সম্বন্ধে গবেষণার 'বুনো রাজহাঁস তাড়ানো'র চেষ্টায় নিরত। এদেশের একজন প্রখ্যাত সংস্কৃত অলংকারবিদ্‌কে প্রসঙ্গক্রমে আমার গবেষণার বিষয়বস্তুটির কথা বলেছিলাম। তাতে তিনি মন্তব্য করলেন—"এ করে কি হবে? কোন শ্লোকে উপমা আছে কি রূপক আছে বা কোথায় বস্তুধ্বনি আছে কি অলংকারধ্বনি আছে, তার ফিরিস্তি নিয়ে সাহিত্যিক মূল্যের কি যাচাইটা হবে?" বলা বাহুল্য, এ মন্তব্য শুনে মনে মনে খুবই অস্বস্তি অনুভব করেছিলাম সেদিন। তার কারণ এই নয় যে, আমার গবেষণার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমার কোন দুশ্চিন্তা জেগেছিল। অস্বস্তিটা হয়েছিল এই কারণে যে, এত বড়ো সংস্কৃত অলংকারবিদ্ তিনি, কিন্তু সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্র সম্বন্ধে তাঁর এ কি বিচিত্র ধারণা!

আর একটি ঘটনার কথা বলি। আমার এক ইংরেজি সমালোচনাতত্ত্ববিদ্ বন্ধু সংস্কৃত সমালোচনাসাহিত্য নিয়ে চর্চা শুরু করেছিলেন। আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি মন্তব্য করলেন—"সংস্কৃতে সমালোচনা বলে কিছু নেই আর ও সাহিত্যে সমালোচনার খোরাক হবার মতো বস্তুও তেমন কিছু নেই। সবই গতানুগতিক আর অগভীর (hackneyed and shallow) আর একই কথার চর্বিত-চর্বণ নিয়ে তত্ত্বের কচকচি।" সেদিন তাঁর এ মন্তব্য শুনে ক্ষুব্ধ হই নি। কারণ, স্পষ্টই তো বুঝলাম যে, বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর কমলাকান্তের দপ্তরে যে এসিয়াটিক রিসার্চের কথা বলেছেন, বন্ধুটি সেই ছোবড়া-চিবানোর রসেই মশগুল হয়ে আছেন।

সত্য সত্যই বিস্মিত হলাম সেদিন, যেদিন এক প্রতিভাবান সাহিত্যব্রতীর সংস্কৃত সাহিত্যের কোন একখানি বইয়ের সমালোচনাগ্রন্থ হাতে এসে পড়লো। সেই বইখানি পড়ে সেদিন জানতে পারলাম যে, সংস্কৃত সাহিত্য সমালোচনার ব্যাপারে সংস্কৃতভাষা এমন কি তার কোন শব্দার্থ পর্যন্ত জানবার কোন প্রয়োজন হয় না, সমালোচনা রথ ঘর্ঘর নিনাদে এগিয়ে চলে যায়।

এই কটি ঘটনার কথা যে তুললাম, এটা কারুর প্রতি কটাক্ষ করা বা বিরূপ মন্তব্য করা কিংবা কাউকে হেয় প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যে নয়। সংস্কৃত সমালোচনা সাহিত্য সম্বন্ধে আমাদের দেশে শিক্ষিত-সমাজের মধ্যে কি ধরণের একটা অভিনব দৃষ্টিভঙ্গী যে গড়ে উঠেছে, তার বাস্তব দৃষ্টান্ত দেবার জন্যেই এগুলির উল্লেখ করলাম।

সংস্কৃত সাহিত্য খুবই প্রাচীন। তার ইতিহাস যে কবে শুরু হয়েছিল, তা ঠিক জানা যায় না। তবে সেটা যে দু হাজার বছরেরও আগে, তা নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে এখন আর কোনো মতভেদ নেই। বলা বাহুল্য, এই সুদীর্ঘ কালের ইতিহাস শুধু একটানা অগ্রগতির অবিচ্ছিন্ন ধারায় গড়ে উঠতে পারে না। জাতীয় জীবনের নানা উত্থান-পতনের সঙ্গে এ সাহিত্যের জীবনেও যে জোয়ার-ভাটা দেখা দেবে সেটা খুবই স্বাভাবিক। এই ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতেই এর বিচার করতে হবে।

যে কোন প্রাণবন্ত সাহিত্যের ইতিহাস লক্ষ্য করলেই দেখা যায় যে, সাহিত্যের সৃষ্টি সমালোচনাকে বাদ দিয়ে কোথাও সার্থক হয়ে উঠতে পারে নি। সংস্কৃত সাহিত্যের ক্ষেত্রেও এর কোনো ব্যতিক্রম হয় নি। বর্তমান প্রবন্ধে সেই সম্বন্ধেই দু-চারটি কথা বলতে চাই।

সংস্কৃত সাহিত্যের সমালোচনার ধারা সম্বন্ধে কোন কিছু বলতে গেলেই, তার কুলজী পাঁটা অপরিহার্য হয়ে ওঠে। কারণ ইতিহাসের বিভিন্ন ধাপে এ নিয়ে যে সব পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলেছিল, তার ধারাবাহিক ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে মোটামুটি একটা ধারণা না থাকলে এর প্রকৃত পরিচয় পাওয়া সম্ভব নয়। এ প্রসঙ্গে আর একটা কথাও মনে রাখতে হবে যে, ঐতিহাসিকেরা এর বিবর্তনের যে একটা কালিক (chronological) ধারাবিবরণী সংগ্রহ করেছেন, তাতে এর খানিকটা পরিচয় পাওয়া গেলেও সেটাই তার সম্পূর্ণ পরিচয় নয়। এ সম্বন্ধে যে সকল বিচিত্র চিন্তাধারাকে অবলম্বন করে বিভিন্ন তত্ত্বের উদ্ভব হয়েছিল, সেগুলি ঠিক কালিক ধারার সুনির্দিষ্ট পথে চলে নি। কোন দেশেই তা চলে না। তাই শুধু যে সব বই পাওয়া গেছে নাগালের মধ্যে তাদের কালিক ক্রমের তালিকা-গুলিকেই একমাত্র সম্বল করে এ বিষয়ে কোন আলোচনা করতে গেলে বিভ্রান্তি ঘটবার সম্ভাবনাই বেশি। সাহিত্যিক বিবর্তনের বিভিন্ন ধাপে সমালোচকেরা তাঁদের নাগালের মধ্যে পাওয়া স্রষ্টাদের সৃষ্টিকে কিভাবে যে বিচার-বিশ্লেষণ করেছিলেন, তার পরিচয় নিহিত আছে বিভিন্ন সমালোচকের সমালোচনাতত্ত্বের মধ্যে। এ সম্বন্ধে যে সব গ্রন্থ রচিত হয়েছিল তাদের সবগুলি কালের সংহার-হস্ত এড়িয়ে আমাদের কাছে পৌঁছায় নি। যেগুলিও বা এসে পৌঁছেছে তারাও ঠিক যথাযথভাবে এই সব তত্ত্বের কালিক বিবর্তনের ধারাবাহিক সাক্ষ্য বহন করে না। সোজা কথায়, আমরা যে সব বই পেয়েছি সেগুলিতে নানা তত্ত্ব সম্বন্ধে যে সব বিবৃতি পাওয়া যায়, সেগুলি হলো উত্তরকালের রচনা। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই সমসাময়িক যুগের রচনায় বিধৃত অবস্থায় তাদের পাওয়া যায় নি।

আর একটা কথাও এই প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার যে, সমালোচনা বলতে যা বোঝায়, তা ঠিক দর্শক বা পাঠকের ব্যক্তিগত মানসিক প্রতিক্রিয়া বা ভালো-মন্দ-লাগার অভিব্যক্তি নয়। এমন কি, নন্দনতত্ত্বের (Aesthetic) দৃষ্টিতে শিল্প বা সাহিত্যের পর্যবেক্ষণও ঠিক সমালোচনার পর্যায়ে পড়ে না, যদিও অনেকক্ষেত্রে এ জাতীয় বস্তুই সমালোচনা বলে গণ্য হয়। আসল সমালোচনা বস্তুটি হলো—শাস্ত্র বা বিদ্বজ্জনসম্মত আদর্শের আলোকে বিচারশক্তির যথাযথ প্রয়োগ করে সাহিত্য বা শিল্পসৃষ্টির কলাকৌশলের নিরপেক্ষ বিশ্লেষণ ও সৃষ্টি হিসাবে মূল্য নির্ধারণ।

সোজা কথায়, শিল্প বা সাহিত্য সম্বন্ধে কোন ব্যক্তিগত মন্তব্য জাহির করা বা কোন তত্ত্ব তার ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়ার নাম সমালোচনা নয়। সমালোচনা হলো শিল্প বা সাহিত্যের নিগূঢ় মর্মকথাটিকে সমস্ত রসিকজনের কাছে সহজবোধ্যরূপে উপস্থাপিত করা।

সংস্কৃতে যে সমালোচনা সাহিত্য আমরা পাই, তাতে কিন্তু 'সমালোচনা'—এই কথাটি নেই। সাহিত্যশাস্ত্র বা অলংকারশাস্ত্র নামেই এই সাহিত্য আমাদের কাছে পরিচিত। এ শাস্ত্রে আছে সাহিত্যের স্বরূপ ও তাৎপর্যের বিশ্লেষণ আর সেই সঙ্গে সাহিত্যের বিভিন্ন অঙ্গের বিশ্লেষণ ও স্বরূপ নির্ণয়ের চেষ্টা।

সংস্কৃতে এই শাস্ত্র যে কবে গড়ে উঠেছিল তা বলা শক্ত। পণ্ডিতেরা মনে করেন সম্ভবত খৃস্টপূর্ব অষ্টম শতকে বা তারও পূর্বেকার কোন যুগে গার্গ্য প্রভৃতি বৈয়াকরণদের আলোচনার মধ্য দিয়ে এ শাস্ত্রের প্রথম প্রতিষ্ঠা হয। তখন কিন্তু সেটা সাহিত্যশাস্ত্র ছিল না, ছিল সংকীর্ণ অর্থে অলংকারশাস্ত্র অর্থাৎ উপমা, রূপক প্রভৃতি বাক্‌সৌন্দর্যের উপাদান সম্বন্ধে আলোচনা। এর পরে বহুদিনের ইতিহাস হারিয়ে গেছে।

নাটক সম্বন্ধে যে প্রাচীনতম বইখানি পাওয়া যায় তা হলো ভরতের নাট্যশাস্ত্র। এর মূল বইখানি হয়তো খৃস্টপূর্ব কোন এক শতকে রচিত হয়েছিল। নাটক প্রসঙ্গে এতে আছে রস সম্বন্ধে আলোচনা যেটা পরবর্তীকালে কাব্য সমালোচকের প্রধান উপজীব্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই রস যে কেমন করে কাব্যের সঙ্গে এসে জড়িত হলো তা বলা শক্ত। তবে ভামহ, দণ্ডী প্রভৃতি প্রাচীন আচার্যেরাও যে রস সম্বন্ধে ওয়াকেফহাল ছিলেন আর কাব্যের সঙ্গে রসের একটা সম্পর্ক যে আছে সেটাও তাঁরা মানতেন, তার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। এই প্রসঙ্গে এটাও লক্ষ্য করা ভাল যে, ভরত বোধ হয় নাট্য আর কাব্যের মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য রাখতে চান নি। কারণ, নাট্যও তাঁর মতে 'কাব্যবন্ধ'। খুব সম্ভব কাব্য ও নাট্য দুয়েরই মূল যে প্রেরণা তা এক ও অভিন্ন এই রকমের একটা অভিমত ছিল ভরতের।

ভরত ছত্রিশটি 'লক্ষণে'র কথা বলেছেন তাঁর নাট্যশাস্ত্রে। পরবর্তীকালেও কয়েকজন আলংকারিক 'লক্ষণে'র কথা বলেছেন। এ নিয়ে যে এক সময়ে তীব্র বাদানুবাদ চলেছিল, তার প্রমাণ পাওয়া যায় অভিনবগুপ্ত যে দশটি বিভিন্ন মতবাদের উল্লেখ করেছেন এ প্রসঙ্গে তার মধ্যে। এই লক্ষণ সম্বন্ধীয় আলোচনার মধ্যেই দেখা যায় যে, কাব্যের যে দুটো দিক আছে, তার একটা হলো অন্তরঙ্গ ও অপরটা হলো বহিরঙ্গ, সে সম্বন্ধে আলংকারিকদের ধারণাও বেশ দানা বেঁধে উঠেছে। এ নিয়ে যে সব সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম আলোচনা আছে তার মধ্যে রস, গুণ, রীতি, অলংকার, বক্রোক্তি, ঔচিত্য প্রভৃতি নানা বিষয়ের অবতারণা করা হয়েছে। অনেকে মনে করেন—সংস্কৃত আলংকারিকেরা পরবর্তীকালে যে সব বিভিন্ন প্রস্থানের কথা বলেছেন, এক ধ্বনি প্রস্থানের কথা বাদ দিলে বাকী আর সব কয়টি প্রস্থানেরই মূল উৎস হলো এই 'লক্ষণ'-বাদ। এই লক্ষণবাদ কিন্তু বহুদিন পূর্বেই লুপ্ত হয়ে গেছে, আছে শুধু তার একটা ক্ষীণ স্মৃতি।

এরই সমসাময়িক যুগে বোধ হয় কাব্যের বহিরঙ্গকে শরীররূপে কল্পনা করে তার স্বরূপ নির্ণয় প্রসঙ্গে পাক বা পরিণাম বা সৌশব্দ্য, শব্যা বা মুদ্রা, গুম্ফ, ভণিতি, উক্তি, চমৎকার প্রভৃতি নানা মতবাদের উৎপত্তি হয়েছিল। এদের মূল কথা ছিল—শব্দ প্রয়োগের বৈশিষ্ট্যের মধ্যেই কাব্যের বৈশিষ্ট্য নিহিত আছে—এই কথাটিকে প্রমাণ করা। এইগুলির বিবর্তনের ফলেই বোধ হয় রীতি ও অলংকারবাদের সৃষ্টি। তবে চমৎকারবাদের সঙ্গে রসবাদের যোগটা বোধ হয় একটু ঘনিষ্ঠ। এর পরেই বোধ হয় আসে অলংকার প্রস্থান। এই প্রস্থানের মতে কাব্যের যে কাব্যত্ব তার উৎস হলো অলংকার আর এই অলংকারের মূলে আছে বক্রোক্তি বা উক্তিবৈচিত্র্য। অনেকে আবার এর সঙ্গে অতিশয়োক্তিকেও জুড়ে দিতে চেয়েছেন। চারুত্ব বা সৌন্দর্যই হলো কাব্যের অলংকার একথাও অনেকে বলেছেন। কিন্তু প্রশ্ন হলো—নিরলংকার হলে কি কাব্য সৌন্দর্যহীন হয়? অলংকারহীন কাব্য কি হয় না? অলংকৃত নয় অথচ কাব্যের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এমন রচনাও তো অনেক আছে! তবে? এহ বাহ্য, আগে কহ আর।

আর একটা কথা এখানে মনে রাখতে হবে যে, সংস্কৃত সমালোচনার ইতিহাসে দেখা যায় যে, খুব প্রাচীন যুগেই কাব্য সম্বন্ধে বেশ সুপ্রতিষ্ঠিত একটা ধারণা গড়ে উঠেছিল। তাই সমালোচকদের প্রশ্ন ছিল—কাব্য জিনিষটা আসলে কি, তার স্বরূপ কি, তার সঙ্গে অন্যান্য সাহিত্যকৃতির পার্থক্য কোথায়? লক্ষণ-বাদে দেখা যায় যে, কি কি লক্ষণ (characteristics) দেখে কাব্যকে চেনা যাবে, তার একটা মোটামুটি হিসাব ধরা হয়েছে। অলংকারবাদের মধ্যে দেখি লক্ষণ নিরূপণ চেষ্টা আরও গভীরে প্রবেশ করেছে, স্বরূপ নির্ণয়ের চেষ্টা আরম্ভ হয়েছে।

এর পরে এগিয়ে এসেছে রীতি-প্রস্থান। এবারে শরীর ছেড়ে প্রাণের কথা শোনা গেল, একজন আবার আত্মার কথাও তুললেন। রীতিবাদীদের মত হলো এই—রীতির মধ্যেই কাব্যের কাব্যত্ব নিহিত আছে, আর সেই রীতির প্রাণস্বরূপ হলো মাধুর্য, প্রসাদ প্রভৃতি গুণ। এই রীতি বস্তুটা ঠিক কি, diction না style, তা নিয়ে গণ্ডগোল আছে। কিন্তু প্রশ্নটা হলো এই যে রীতি style বা diction যাই হোক না কেন, সেটা তো বহিরঙ্গ বস্তু অর্থাৎ তার কাজ তো form নিয়ে আর গুণগুলিও তো ঠিক অন্তরঙ্গ বস্তু নয়। অতএব এহ বাহ্য।

এর পরে এসেছে বক্রোক্তিবাদ, ঔচিত্যবাদ আর অনুনয় বা অনুমানবাদ। বলা বাহুল্য, এদের কোনটাই গ্রাহ্য হয় নি।

এ প্রসঙ্গে আবার আর একটা প্রশ্ন উঠেছিল। প্রশ্নটা অনেকটা semantics নিয়ে। প্রশ্নটা হলো এই যে, কাব্যের যে বৈশিষ্ট্য সেটা তো তার শব্দ ও অর্থকে কেন্দ্র করে। কিন্তু শব্দ ও অর্থের মধ্যে যে সম্পর্ক, তার সীমারেখা টানা যাবে কোথায়? সরল কথায়—কাব্যের কাব্যত্ব খুঁজতে হবে কোথায়? কাব্যত্ব কি প্রযুক্ত শব্দগুলির অভিধানগম্য সাধারণ অর্থের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়ে থাকে? শব্দবিদেরা শব্দের কতকগুলি বৃত্তি স্বীকার করেন। অভিধা, লক্ষণা আর (কোন কোন মতে) তাৎপর্য। অনেকে আবার এক অভিধাবৃত্তিরই প্রসারণে অন্য বৃত্তিগুলির কাজ সেরে নিতে চান। এ নিয়ে বহু বিতণ্ডা আছে। যাই হোক আলংকারিকেরা কিন্তু অভিধা আর লক্ষণাকে মেনে নিলেন আর বক্তা, বোদ্ধব্য, দেশ, কাল, প্রসঙ্গ প্রভৃতির উপর নির্ভরশীল 'ব্যঞ্জনা' নামে একটা নতুন বৃত্তি স্বীকার করে নিলেন। এই ব্যঞ্জনা বা ধ্বনিকে অবলম্বন করে উৎপত্তি হলো ধ্বনিবাদের। এঁদের মতে ধ্বনিই হলো কাব্যের আত্মা। ধ্বনিপ্রধান কাব্যই হলো শ্রেষ্ঠ কাব্য। এঁরা কিন্তু মোটামুটিভাবে রসবাদের সঙ্গে একটা রফা করে নিলেন। বস্তুত, অলংকার ও রসধ্বনির মধ্যে রসধ্বনিই শ্রেষ্ঠ এটা মানতেও এঁদের কোন আপত্তি নেই।

রসবাদীরাও কিন্তু ধ্বনিকে অস্বীকার করলেন না, কিন্তু তাঁরা জোর দিলেন 'রসে'র উপর। এছাড়া রমণীয়ার্থবাদীও একদল ছিলেন, আবার সহজ পন্থায় "কবিকৃতিই কাব্য" এ রকমের একটা মতও ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ধ্বনি ও রস-বাদই প্রায় সর্ববাদিসম্মত হয়ে উঠেছে আলংকারিকদের মধ্যে।

এই তো হলো মোটামুটি অলংকার-

আপনার স্নায়ু !

স্নায়ু-ই মানুষের শক্তি। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে জীবন-সংগ্রামের ঘাতপ্রতিঘাতে স্নায়ু দুর্বল হয়ে পড়ে। ঠিক এই অবস্থায় সাধনার শুক্রসঞ্জীবন আপনার একান্ত প্রয়োজন। ইহা শুধু একটি শক্তিশালী রসায়ন নয়, একটি পুষ্টিকর খাদ্যও। স্নায়ুতন্ত্রীর ক্ষয়পূরণে ও দেহ পুনর্গঠনে আশ্চর্য্যরূপে সাহায্য করে।

সাধনা শুক্রসঞ্জীবন

সাধনা ঔষধালয়-ঢাকা

সাধনা ঔষধালয় রোড, সাধনা নগর কলিকাতা-৪৮

অধ্যক্ষ—শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ, এম. এ. আয়ুর্বেদ-শাস্ত্রী, এফ. সি. এস. (লণ্ডন) এম. সি. এস. (আমেরিকা) ভাগলপুর কলেজের রসায়নশাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক।

কলিকাতা কেন্দ্র—ডাঃ নরেশচন্দ্র ঘোষ, এম. বি. বি. এস. (কলিঃ) আয়ুর্বেদাচার্য্য।

শাস্ত্রের তাত্ত্বিক বিবর্তনের ইতিহাস। এই ইতিহাসের ধারার মধ্য দিয়ে আমরা সংস্কৃত সাহিত্যে সমালোচনার একটি বিশিষ্ট রূপের পরিচয় পাই। সংস্কৃত সাহিত্যে সমালোচনাব সব চাইতে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো এই যে, সৌন্দর্যবোধ ও আনন্দ—মানব-মনের এই দুটো দিক থেকে সাহিত্য ও শিল্পসৃষ্টির মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে একটা বিশ্বজনীন আদর্শের পরিপ্রেক্ষিতে। এ প্রসঙ্গে সত্য, শিব ও সুন্দরের কথা অনেকে বলেছেন বটে, হয় তো সেইটাই সংস্কৃত সাহিত্য সমালোচকরা যা বলতে চেয়েছেন তার ফলিতার্থ, কিন্তু সংস্কৃত সমালোচনা-সাহিত্যে এই ধরণের অস্পষ্টার্থক শব্দ দিয়ে সমালোচকের বক্তব্যকে ধোঁয়াটে করে তোলা হয় নি। আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে যে সংস্কৃত সাহিত্যে সমালোচনার ব্যাপাবে তত্ত্বের দিকটাকেই বড়ো করে তুলে ধবা হয়েছে, সব কিছুরই ব্যাখ্যা করা হয়েছে সেই মনগড়া তত্ত্বের আলোকে, ফলে সাহিত্যসমালোচনা শেষ পর্যন্ত দার্শনিকতায পর্যবসিত হয়েছে। এ রকম একটা ধারণা যে সত্য নয় তার প্রমাণ হলো এই যে সংস্কৃতে এক দিকে যেমন সাহিত্য ও শিল্পসৃষ্টির মূল প্রেরণা হিসাবে সৌন্দর্যবোধ ও আনন্দকে পূর্ণ স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে, অপর দিকে আবার তেমনি একথাও বলা হয়েছে যে, সাহিত্য সৃষ্টির যে প্রতিভা তার দুটো দিক আছে। একটা হলো ‘কারয়িত্রী’ আর অপরটা হলো ‘ভাবয়িত্রী’। কারকও কবি, ভাবকও কবি। এরা দু’জনে পরস্পর পবিপূরক। সাহিত্য স্রষ্টা কবি আর সেই সৃষ্ট সাহিত্যের রসবেত্তা সমালোচক-এই দুয়ের মিলনে হয় সাহিত্যের সার্থকতা, নইলে সাহিত্য অসম্পূর্ণ থেকে যায়। একটা শ্লোকে কথাটা খুব সুন্দরভাবে বলা হয়েছে। শ্লোকটি এই—

> “কবিতা রসমাধুর্যং কবির্বেত্তি,
> ন তৎকবিঃ।
> গিরিজা ভ্রূকুটিভঙ্গী ভবো বেত্তি
> ন ভূধরঃ॥

অর্থাৎ কবিতার স্রষ্টা কবির পক্ষে নিজ সৃষ্টির মাধুর্য পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধি করা সম্ভব নয়, যেমন সেটা সম্ভব সহৃদয় সমালোচকের পক্ষে। দেখ গিরিতনয়া পার্বতীর মুখে ভ্রূকুটির বেসব বিচিত্র ভঙ্গি ফুটে ওঠে তার যে কি তাৎপর্য, সেটা তাঁর জনক গিরিরাজের পক্ষে তেমনি করে জানা সম্ভব নয় যেমনটা সম্ভব পার্বতীপতি শিবের পক্ষে।

এ থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় যে, সমালোচকও যখন কবি বলে গণ্য এবং স্রষ্টা কবির সৃষ্টি কার্যের পরিপূরকের মর্যাদায় সুপ্রতিষ্ঠিত, তখন স্পষ্ট বোঝা যায়, সমালোচনাটা এ’দের মতে শুষ্ক তত্ত্ব নয়, খাঁটি অনুভববেদ্য পদার্থ।

সমালোচনা প্রসঙ্গে Carlyle এক জায়গায় বলেছেন—The question was not only who was the poet and how did he compose, but what and how was the poem and why was it a poem and not rhymed eloquence, creation and not figured passion. সংস্কৃত সমালোচনার ধারাও ঠিক এই একই খাতে প্রবাহিত। বলা বাহুল্য যাকে Historical Criticism বলে, তা সংস্কৃতে নেই। Biographical Criticism-ও সংস্কৃতে নেই। সাহিত্য ও শিল্পসৃষ্টিকে সংস্কৃতে যে দৃষ্টিতে দেখা হয়েছে, তাতে তাকে দেশ-কাল-পাত্রের অতীত প্রাত্যহিকতার ঊর্ধ্বে অবস্থিত অলৌকিক আত্মভোলা এক আনন্দের উৎসরূপে কল্পনা করা হয়েছে। কবি আর তার ইতিহাস সেখানে নিতান্তই গৌণ। এতে লাভ-ক্ষতি যে কি হয়েছে, সে হিসাব করা বড় কঠিন। অবশ্য একথাও মনে রাখা দবকার যে, সংস্কৃতে সমালোচনার ক্ষেত্রে কোথাও যে কবিজীবন বা ইতিহাসের কথা একেবারেই নেই, তা নয়। কয়েকটি সূক্তের মধ্যে এবং দক্ষিণাবর্তনাথ ও মল্লিনাথের লেখায় এ জাতীয় আলোচনা কিছু আছে, কিন্তু সেগুলিকে কোথাও সমালোচনার একটা গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হিসাবে গণ্য করা হয় নি। সংস্কৃতে যে জাতীয় সমালোচনা দেখতে পাওয়া যায়, সেটা অনেকটা ‘রোম্যান্টিক’ সমালোচনা। এ সমালোচনার সঙ্গে ‘ইম্প্রেসনিস্ট’ মতবাদপুষ্ট Neo-critic-দের সমালোচনা ধারার বহু মিল আছে।

ব্যঞ্জনা বা ধ্বনির যে রূপটি সংস্কৃত সমালোচনাসাহিত্যে পরিকল্পিত হয়েছে, সাহিত্য ও শিল্প সমালোচনার ক্ষেত্রে আজ সেই ‘না-বলা-কথার বাণী’-র মাধুর্য প্রায় সর্বজনস্বীকৃত। কাব্যিকদের “গূঢ়ং সৎ চমৎকরোতি”-র প্রতিধ্বনি শোনা যায় Jesperson-এর “suggestion is impression through suppression এই বিশ্লেষণের মধ্যে। George Rowley তাঁর শিল্পসমালোচনা-গ্রন্থে এক বিখ্যাত চৈনিক শিল্পীর উক্তি উদ্ধৃত করেছেন। শিল্পী বলেন—The brush comes to a stop, but the idea is without limit। এ তো একেবারে আনন্দবর্ধনের কথাকেই একটুখানি ঘুরিয়ে বলা হয়েছে।

Abercrombie তাঁর Theory of Poetry গ্রন্থে কবিকৃতির তাৎপর্য সম্বন্ধে বলেছেন—The whole purpose of poet’s technique is to make a moment of his experience come to life in other minds than his. রবীন্দ্রনাথও বলেছেন—“অন্তরের জিনিসকে বাহিরের, ভাবের জিনিসকে ভাষার, নিজের জিনিসকে বিশ্বমানবের এবং ক্ষণকালের জিনিসকে চিবকালের করিযা তোলা সাহিত্যের কাজ।” আর্ট জিনিসটা যে কি তার বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে টলস্টয় বলেছেন—A real work of art destroys, in the consciousness of the receiver, the separation between himself and all whose minds receive the work of art. সংস্কৃত সমালোচকেরাও তো রসচর্বণা ব্যাপারে ঠিক এই কথাগুলিই বলেছেন। সকল হৃদয়সংবেদনসাক্ষিক ইত্যাদি যে সব কথা রসের মূলতত্ত্ব, বিশেষ করে সাধারণীকরণের বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, সেগুলির তাৎপর্য অনুধাবন করলে আর সন্দেহ থাকে না যে, উপরের উদ্ধৃতিগুলির মধ্যে সংস্কৃত সমালোচকদের রসতত্ত্বের কথাই বলা হয়েছে।

Ducasse তাঁর গ্রন্থে মানবের মানস প্রেরণাগুলিকে ectotelic, autotelic ও endotelic এই তিনটি ধারায় বিভক্ত করেছেন। মানুষের সৌন্দর্যপ্রেবণাকে তিনি endotelic activity বলে গণ্য করেছেন। ভট্টনাযক রসচর্বণা ব্যাপারে যে ভোজকত্বের কল্পনা করেছেন, এ যেন তারই প্রতিধ্বনি।

কবি ও সহৃদয়ের পরস্পর হৃদয়-সংবেদনের মধ্যে পরিপূর্ণতা লাভ করেন কাব্যসরস্বতী—এই হলো ভট্ট অভিনবগুপ্তের সুচিন্তিত অভিমত। তাঁর গুরু ভট্ট তৌত বলেছেন—কবির সাক্ষাৎকৃতিব ফলে গড়ে ওঠে বর্ণনা আর সেই বর্ণনার মাধ্যমে পাঠকের মনের মধ্যে খুলে যায় অন্তর্দৃষ্টি, ফলে সে লাভ করে কবির সেই সাক্ষাৎকৃতিকে। সহজ করে বললে কথাটা দাঁড়ায় এই—কবির যে অনুভূতি তার একান্ত নিজস্ব পাঠকের কাছে তা হলো পবোক্ষ। কিন্তু কবির বর্ণনাগুণে সেই পবোক্ষ বস্তুও পাঠকের মানসলোকে একান্ত প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে। এর প্রতিধ্বনি শুনতে পাই Nahm-এর কথায়, যখন তিনি বলেন—The glory of art is that it creates the creator, that is, the percipient is enabled to share the thoughts and feelings of the artist to share, in other words, the mysterious but exhilaratory experience of

the creation. Dewey যখন বলেন যে the sensitive readers is of like heart with the poet. তখন ঠিক এই এক কথাই শোনা যায়। Spingarn-ও ঠিক এর অনুরূপ কথা বলেছেন—Art can find its alter-ego (other self) only in art. সংস্কৃত সমালোচকদের যে সিদ্ধান্ত—সাহিত্যসৃষ্টি আর তার সমালোচনা দুটো স্বতন্ত্র পদার্থ নয়, একই বস্তুর দুটো দিক—পাশ্চাত্ত্য সমালোচকেরাও তার প্রতিধ্বনি করছেন, দেখা যাচ্ছে।

তালিকা আর বাড়িয়ে লাভ নেই। এ পর্যন্ত যা দেখা গেল তাতে এটা বেশ বোঝা যায় যে, সংস্কৃত সমালোচকেরা সমালোচনা বিজ্ঞানের দিক থেকে বেশ অনেকখানি প্রগতিশীল। তাঁদের দূর-প্রসারী অন্তর্দৃষ্টিতে আমাদের যুগেরও অনেকখানি ধরা পড়ে গেছে, দেখা যাচ্ছে।

এ তো গেল সাহিত্যের স্বরূপ নির্ণয় প্রসঙ্গে। সাহিত্যের উৎস ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে চর্চার কথাও সমালোচনা প্রসঙ্গে এসে পড়ে। উৎস সম্বন্ধে আলোচনায় যা পাওয়া যায়, তাতে এটা খুব স্পষ্ট বোঝা যায় যে, প্রতিভা অর্থাৎ প্রকৃতির দানকেই সংস্কৃত সাহিত্যে কবিত্বশক্তির একমাত্র উৎস বলে ধরা হয়েছে। বলা বাহুল্য যে এই প্রতিভা পূর্বজন্মকৃত সুকৃতের ফলে লাভ করা যায়, এটা চেষ্টা-সাধ্য নয়। তবে কেউ কেউ এটুকু আশ্বাসও দিয়েছেন যে, শ্রুত অর্থাৎ শাস্ত্রজ্ঞান, চেষ্টা আর নিষ্ঠা নিয়ে সেবা করলে সরস্বতী কিছু না কিছু অনুগ্রহ করবেনই; সন্দেহ নেই। এর ফলিতার্থ হলো এই যে, চেষ্টার ফলে উত্তম কাব্য না হোক, অধম বা মধ্যম কাব্যের সৃষ্টি হতে পারে। বলা বাহুল্য, দ্রুতিকাব্য উপাদেয় বটে, কিন্তু দীপ্তিকাব্যকেও অবহেলা করা হয় নি।

সাহিত্যের উদ্দেশ্যের ব্যাপারে কিন্তু বেশ একটু গণ্ডগোল দেখা যায়। ধর্ম, অর্থ, কাম আর মোক্ষ—এই হলো চতুর্বর্গ। কাব্যকে বলা হয়েছে 'চতুর্বর্গ প্রাপ্তির সুখকর উপায়'। এটা অর্থবাদ বা propaganda কি না বলা কঠিন। তবে এও সত্য যে ভারতীয় দর্শনগুলিতে কোন-খানেই সাহিত্যজ্ঞানকে মোক্ষলাভের উপায় বলে ধরা হয় নি। অপর পক্ষে বলা হয়েছে—কাব্যালাপাংশ্চ বর্জয়েৎ—অর্থাৎ মোক্ষের পথে কাব্য পরিহার্য। তবে একথাও ঠিক যে, রসোপলব্ধি যদি 'ব্রহ্মাস্বাদ সহোদর' হয় এবং তার জন্যে যদি মন 'রজস্তমোমলমুক্ত' হয়ে 'সত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত' হয়, তাহলে সেটা সাক্ষাৎভাবে না হোক পরম্পরা ক্রমে হয় তো শেষ পর্যন্ত পরমপুরুষার্থপ্রাপ্তির সহায়ক হতে পারে। এ নিয়ে অবশ্য বিতণ্ডা আছে।

এ পর্যন্ত যে আলোচনা করা হলো, তাতে এ রকম একটা ধারণা হতে পারে যে, সংস্কৃত সাহিত্য যাই হোক না কেন, তার সমালোচনাটা কিন্তু সাহিত্যের জগৎ ছেড়ে দার্শনিকতার মধ্যে অনধিকার প্রবেশ করেছে অর্থাৎ সমালোচনাটা কার্যক্ষেত্রে সাহিত্য হয় নি, হয়েছে দর্শনের কচকচি। কথাটা হয়তো খানিকটা সত্য। কারণ, জীবনকে বাদ দিয়ে সাহিত্য হয় না আর জীবনের ব্যাখ্যানের চেষ্টা করতে গেলেই দার্শনিকতা এসে পড়বেই। আনন্দের অনুভূতি জীবনের একটা বাস্তব সত্য, কিন্তু তাকে বুঝতে গেলে যে নন্দনতত্ত্বের মধ্যে প্রবেশ করতে হবে, সেটা হলো দর্শন। ঠিক কথা। তবু এ কথাটাকেও অস্বীকার করা যাবে না যে, সংস্কৃত সমালোচনার তত্ত্বে যতই দার্শনিকতা থাকুক না কেন, সমালোচকের কাজটাকে কিন্তু সাহিত্য সৃষ্টির সমপর্যায়ভুক্ত আনন্দানুভূতির অভিব্যক্তি বলে গণ্য করা হয়েছে।

সংস্কৃত সমালোচকদের মধ্যে উৎকট নীতিবাগিশতা যাকে বলা হয়, ঠিক সে জিনিষটা দেখা যায় না। আবার উদ্দাম Art for art's sake জাতীয় ধারণাও সংস্কৃতে দেখা যায় না। এ বিষয়ে দেখা যায়, একটা সুসংযত সামাজিক আচরণেরই (decorum) তাঁরা পক্ষপাতী ছিলেন। তবে সর্বত্র যে সুরুচির মর্যাদা রক্ষিত হয়েছে, একথা বলা যায় না। তার কারণ বোধ হয় এই যে, যে কালের বা যে সমাজের কথা এতে বিধৃত হয়েছে, সে কালে. সে সমাজের যা রুচি ছিল, সেইটাই হয়তো এতে প্রতিবিম্বিত হয়েছে। এ কালের ও আধুনিক সমাজের আদর্শে তাকে বিচার করলে অবিচারের সম্ভাবনাই বেশি।

পরিশেষে আর একটি কথাও এখানে বলা দরকার। এ প্রবন্ধ পড়ে বুদ্ধিমান পাঠক হয়তো বলবেন—এ যা বলা হয়েছে এ তো Keith যাকে বলেন reading new things in the old texts. এর প্রত্যক্ষ পরিচয় কোথায়? তত্ত্বে যাই থাকুক না কেন, তথ্যে তার সমর্থন কোথায়? কোন টীকাকার তো এ ধরণের কোন সমালোচনা করেন নি। অতএব এ হলো অবাস্তব ভাববিলাসমাত্র।

এ সন্দেহ অস্বাভাবিক নয়। এর উত্তর পেতে হলে কতকগুলি গোড়ার কথা জানা দরকার। আমাদের দেশে অতি প্রাচীনকাল থেকেই বিদ্যার আদান-প্রদান হয়ে আসছে গুরুমুখে আর এই গুরু-মুখলব্ধ বিদ্যাকে বলা হয়েছে "সম্প্রদায়-শুদ্ধ" বিদ্যা। এর তাৎপর্য এই যে, বহু শাস্ত্রেরই মর্মকথা নিগূঢ়। অনেক ক্ষেত্রে তা সাংকেতিক, অনেকক্ষেত্রে সূত্রাকারে নিবদ্ধ, অনেকক্ষেত্রে আবার প্রয়োজনানুরোধে অতি সংক্ষিপ্ত অর্থাৎ cryptic। তাই সম্প্রদায়শুদ্ধ না হলে এর প্রকৃত মর্ম বোধগম্য হয় না। এখন মুস্কিল হলো এই যে, অবনতির যুগ (decadence) থেকে শুরু করে ক্রমশই শাস্ত্রাদি লোপ পেতে বসেছে, সম্প্রদায় তো অনেক দিন থেকেই বিলুপ্তির পথে। তার উপরে আবার এক নতুন উৎপাত জুটেছে মধ্যযুগ থেকে। সেটা হলো অশিক্ষিত বা অর্ধশিক্ষিতের প্রচণ্ড পাণ্ডিত্যের আস্ফালন। ফলে বহু শাস্ত্রের বহু তথ্য লুপ্ত হয়েছে, যাও বা রয়েছে তার বেশির ভাগই হয়েছে বিকৃত। সংস্কৃত সাহিত্যে কুন্তক, আনন্দবর্ধন, জগন্নাথ প্রভৃতি প্রতিভাধর সমালোচকদের লেখার মধ্যে যে সুস্থ, সবল ও অন্ত-র্দৃষ্টিময় সাহিত্য বিশ্লেষণের নমুনা মেলে, কোন টীকাকারকেই সে জাতীয় বিশ্লেষণের মধ্যে প্রবেশ করতে দেখা যায় না। কেন যে তাঁরা করেন নি, তার কারণ বোধ হয় এই যে, বিভিন্ন বিবদমান মত-বাদের বেড়াজালের মধ্যে তাঁরা সোজাসুজি ধরা দিতে চান নি। শুধুমাত্র দিগ্-দর্শন করাবার জন্যে অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত আকারে উপাদেয়তার বীজটুকুর নির্দেশ দিয়েই তাঁরা তাঁদের কর্তব্য সমাপন করেছেন। একটা উদাহরণ দিলে বক্তব্যটা স্পষ্ট হবে। কালিদাসের কুমার-সম্ভবের একটি শ্লোকঃ—

"এবং বাদিনি দেবর্ষৌ পার্শ্বে
পিতুরধোমুখী।
লীলাকমলপত্রাণি গণয়ামাস
পার্বতী॥" (৬।৮৪)

এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে মল্লিনাথ মন্তব্য করলেন—"লজ্জাবশাৎ কমল-দল-গণনা-ব্যাজেন হর্ষং জুগোপ ইত্যর্থঃ। অনেন 'অবহিত্থা'খ্যঃ সঞ্চারী ভাব উক্তঃ।" শুধু এইটুকু-মাত্র সংকেত। ভবতমল্লিক অবশ্য আর একটু এগিয়েছেন। তিনি দেখিয়েছেন কমলদলগণনাচ্ছলে পার্বতী

শুকৃতি রায়চৌধুরীর
তপোময় তুষারতীর্থ
সচিত্র কেদারবদরী কাহিনী ॥ ৪·৫০
দেশ : 'একটা শ্লিষ্ট দর্শন ও গতি আছে'
যুগান্তর : 'ভাষা ও বর্ণনাভঙ্গী সুন্দর'
অমৃত : 'দৃষ্টিভঙ্গীর বৈচিত্র্য আছে'
অনুক্ত : একাঙ্ক নাটক সংকলন ॥ ১·৫০
দি বুক হাউস
১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা-১২

কেমন করে অতীতের হতাশাময় বিষাদ-ক্লিষ্টদিনগুলির সঙ্গে বিবাহ সম্ভাবনায় আনন্দময় ভাবী দিনগুলির ব্যবধানের দূরত্ব গণনা করতে শুরু করলেন। বিবাহের নিশ্চিত সম্ভাবনায় বাঞ্ছিত প্রাপ্তির আনন্দে মন তাঁর উৎফুল্ল কিন্তু গুরুজনসান্নিধ্যে শালীনতার আবরণে সে আনন্দ সংযত। আনন্দবর্ধন নিরলংকার এই শ্লোকটির মধ্যে উৎকৃষ্ট ধ্বনির উদাহরণ খুঁজে পেয়েছেন, বিশ্লেষণ করেছেন এর নিগূঢ় মর্মকথা। মল্লিনাথ কিন্তু একটি মাত্র ক্ষুদ্র ইঙ্গিতেই সব কথা সেরেছেন, বলেছেন—এখানে আছে যে সঞ্চারী ভাব, তার নাম হলো অবহিত্থা। টীকাকারদের এ একটা নিজস্ব শৈলী। এর মর্ম বুঝতে পারলে সব ব্যাপারটা স্পষ্ট হয়ে উঠবে, সন্দেহ নিরস্ত হবে।

আসল কথাটা হলো এই যে, শ্রদ্ধা নিয়ে, নিষ্ঠা সহকারে জিজ্ঞাসু ছাত্রের দৃষ্টিতে চর্চা করলে হবেই এ শাস্ত্রের মর্ম বোঝা যাবে, উন্নাসিক অবজ্ঞার দৃষ্টিতে নস্যাৎ করে দিলে এর মর্ম দূরেই রয়ে যাবে। মনে রাখতে হবে—

"শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানম্।"

দুটি বা তিনটি সন্তানই যথেষ্ট

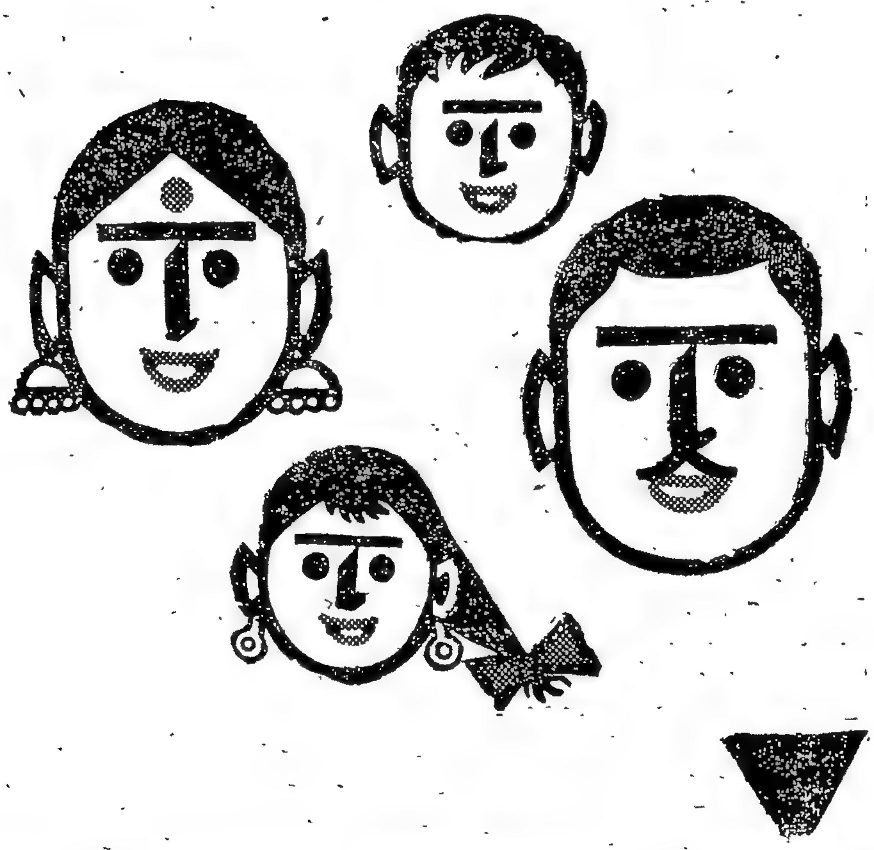

পরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্রগুলির পরিচায়ক লাল ত্রিকোণ

67/458

সমালোচিত রবীন্দ্রনাথ

আদিত্য ওহদেদার

প্রশংসিত, সংবর্ধিত রবীন্দ্রনাথের অপর পিঠ : সমালোচিত রবীন্দ্রনাথ, যা বিদ্বেষ-ধূমাঙ্কিত। কবি নিজে বলে গেছেন, "এমন অনবরত, এমন অকুণ্ঠিত, এমন অকরুণ, এমন অপ্রতিহত অসম্মাননা আমার মতো আর কোনো সাহিত্যিককেই সইতে হয় নি।"

আপাত মনে হতে পারে, এ হল কবির স্পর্শকাতর মনের অতিরঞ্জিত ক্ষোভ। কিন্তু সমকালীন ঘটনাবলীর কিঞ্চিৎ হদিশ নিলেই কবির কথার যাথার্থ্য ধরা পড়বে।

'কড়ি ও কোমল' কবির প্রথম জীবনের কাব্যগ্রন্থ। তখন থেকেই শুরু হয় রবীন্দ্র-বিরোধিতা। 'সাধারণী' ও 'নবজীবন' সম্পাদক অক্ষয়চন্দ্র সরকার রবীন্দ্রনাথের কবিতার প্রতি ইঙ্গিত করে ব্যঙ্গ করলেন যে তা "ন কাব্য, ন কবিতা। কেবল কাব্যি। না মরদ, না মহিলা। কেবল কাব্যি।" আর কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ মশাই 'মাহ' ছদ্মনামে 'কড়ি ও কোমলে'র প্যারডি ছাপালেন—'মিঠেকড়া'। কবিকে বিদ্রূপ করে লেখা হল—

উড়িস নে রে পায়রা কবি
খোপের ভিতর থাক ঢাকা।
তোর বকবকম্ আর ফোঁস ফোঁসানি
তাও কবিত্বের ভাব মাখা।
তাও ছাপালি, গ্রন্থ হলো
নগদ মূল্য এক টাকা !!

'মিঠেকড়া'র পর বেশ কিছুদিন রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে সমালোচনা তেমন তীব্র হয়ে দেখা দেয় নি। মাঝে মাঝে এই ধরনের উক্তি অবশ্য করা হয়েছে—"রবীন্দ্রবাবুর কবিতাসিন্ধু মন্থন করিলে অতি অল্প স্থানেই বিষাদভরা করুণ স্বর ব্যতীত আর কিছু প্রাপ্ত হওয়া যায় না।"

কিন্তু বিস্ময়ের কথা রবীন্দ্র-প্রতিভা যখন মধ্যগগনে, কবির সাহিত্যকর্মের ধার ও ভার উভয়কেই যখন শ্রদ্ধার সংগে স্বীকার না করে উপায় নেই, তখনই তার বিরুদ্ধে সমালোচনা অত্যন্ত তীব্র ও অকরুণ হয়ে উঠল।

এই রবীন্দ্র-বিরোধিতা যজ্ঞের প্রধান হোতা ছিলেন দ্বিজেন্দ্রলাল। তিনি তখন 'দ্বিজু রায়' হয়ে বঙ্গসাহিত্যের আসর অলংকৃত করছেন। রবীন্দ্র-কাব্য সম্পর্কে অস্পষ্টতার যে অভিযোগ একদল সেকালপন্থী পাঠকের মনে ধূমায়িত ছিল, দ্বিজেন্দ্রলাল তাদের প্রতিভূ হয়ে রবীন্দ্র-সমালোচনায় প্রবৃত্ত হলেন। এক যুগ আগে প্রকাশিত 'সোনার তরী' কবিতার দৃষ্টান্ত ধরে তিনি বজ্রনির্ঘোষ রায় দিলেন, বাংলাদেশের অস্পষ্ট কবিদের অগ্রণী হলেন রবীন্দ্রনাথ। তিনি লিখলেন, "রবিবাবুর ভক্তগণ রবিবাবুর 'সোনার তরী'কে তাঁহার সকল কবিতার প্রায় শীর্ষে স্থান দেন। সভায় সভায় ইহার আবৃত্তি হইয়াছে। একজন সমালোচক এইটি পড়িয়া লিখিয়াছিলেন যে, 'তাঁহার সোনার লেখনী অক্ষয় হউক।' দেখা যাক ইহার সৌন্দর্য কোথায় ও এ কাব্য হইতে কিভাবে সংগ্রহ করিতে পারি। বলা বাহুল্য কবিতাটি যার-পর-নাই অস্পষ্ট। তারপর তিনি বিশ্লেষণ করে দেখাতে প্রয়াস পেলেন যে এই কবিতার গদ্যার্থ অত্যন্ত অস্বাভাবিক এবং এর থেকে আধ্যাত্মিক অর্থ বার করতে যাওয়া পণ্ডশ্রম মাত্র। পরিশেষে মন্তব্য করলেন, "আমি এ কবিতাটির একটু দীর্ঘ ও তীব্র সমালোচনা করিলাম। কারণ রবীন্দ্রবাবুর অনেক ভক্তদের মুখে এ অর্থহীন কবিতাটির বড়ই বেশি প্রশংসা শুনিতে পাই। আমার বলা উদ্দেশ্য যে, হেঁয়ালিতে কবিতা লিখিলেই কবিতা উত্তম হয় না।...যদি স্পষ্ট করিয়া লিখিতে না পারেন, সে আপনার অক্ষমতা। তাহাতে গর্ব করিবার কিছুই নাই। অস্পষ্ট হইলেই গভীর হয় না; কারণ, সমুদ্রের জলও স্বচ্ছ; অস্পষ্টতা লইয়া বাহাদুরী করিয়া, 'miraculons' দাবী করিয়া, স্পষ্ট কবিদের ব্যঙ্গ করিবার কারণ নাই। অস্পষ্টতা একটা দোষ : গুণ নহে।"

দ্বিজেন্দ্রলালের এই সানাই-বাদ্যে পোঁ ধরলেন 'সাহিত্য' পত্রিকার জাঁদরেল সম্পাদক সুরেশ সমাজপতি। তাঁর কাগজের সংখ্যায় সংখ্যায় রবীন্দ্রকাব্যে অস্পষ্টতার বিরুদ্ধে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ শাণিত হয়ে উঠল। যেমন 'আজি যত তারা তব আকাশে, সবে মোর প্রাণ ভরি প্রকাশে' গানটির সম্পর্কে বলা হল, এটি "বাঙ্গালায় লিখিত, কিন্তু বাঙ্গালী পাঠকের পক্ষে গ্রীক। বোধ করি, রচয়িতা ভিন্ন আর কেহ এই গোলকধাঁধার ব্যূহভেদ করিতে পারিবেন না।" আর এক স্থানে লেখা হল, "শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ক্রমে আমাদের 'অবোধ্য' হইয়া উঠিলেন। তাঁহার একটি গানের প্রথম কলি এই—

আজি শ্রাবণ ঘন-গহন মোহে,
গোপন তব চরণ ফেলে
নিশার মত নীরব ওহে
সবার দিঠি এড়ায়ে এলে।

শ্রাবণের ঘন গহনে পরিণত হইল, তাহাও বুঝিলাম। কিন্তু চরণ কেমন করিয়া 'গোপন' হইল, তাহা বুঝিতে পারিলাম না। সাপের পা 'গোপন' বটে। কিন্তু এ 'গোপন' চরণ কাহার? পরে আছে—'নীলাঞ্জনীল আকাশ।' 'নীলাঞ্জনীল' কে, বুঝিতে পারিলাম না।"

অস্পষ্টতার অভিযোগের পর এল রবীন্দ্রসাহিত্যে দুর্নীতি তথা অশ্লীলতার অভিযোগ। আবার সেই দ্বিজেন্দ্রলাল। তিনি উচ্চরোল তুললেন, রবীন্দ্রনাথের প্রেমের গান দুর্নীতিমূলক। তাঁর অভিমতে 'সে আসে ধীরে', 'সে কেন চুরি করে চায়, 'দুজনে দেখা হ'লে পথের মাঝে' ইত্যাদি বহুতর গান সবই—ইংরেজী কোর্টসিপের গান। এবং 'তুমি যেও না এখনই,' 'কেন যামিনী না যেতে জাগালে না' ইত্যাদি গান "লম্পট বা অভিসারিকার গান।" তারপর চিত্রাঙ্গদা সম্পর্কে দ্বিজেন্দ্রলাল লিখলেন, "ঘরে ঘরে চিত্রাঙ্গদা হইলে সংসার একেবারে উচ্ছন্ন যায়।...রবীন্দ্রবাবু এই পাপকে যেমন উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত করিয়াছেন তেমন বঙ্গদেশে কোনও কবি অদ্যাবধি পারেন নাই।...এ পুস্তকখানি দগ্ধ করা উচিত।"

এই প্রসঙ্গে আর একজন লেখেন, "অপরিণত বয়স্ক যুবক-যুবতীর জীবন 'ঘরে বাহিরে' 'চোখের বালি'র ন্যায় জঘন্য রুচির উৎকট উপন্যাসগুলি একেবারে বিগড়াইয়া দিতে কম সহায়তা করিতেছে না।" (নব্যভারত) 'ঘরে বাইরে' সম্পর্কে বলা হল যে এতে কোনো নিত্যবস্তুর সন্ধান পাওয়া যায় নি পাওয়া গেছে শুধু উদ্দাম কামপ্রবৃত্তির পোষাকী রূপ। সাহিত্যের স্বাস্থ্যরক্ষা-প্রয়াসী এক প্রবীণ ব্যক্তি লেখেন যে সন্দীপ, নিখিলেশ ও বিমলা, "এই তিন ব্যক্তি যেন তাহাদের পেটের নাড়ীভুঁড়ি বাহির করিয়া ক্রমাগত চটকাইতেছে, এবং তাহার দুর্গন্ধে চতুর্দিকের আবহাওয়া ভারাক্রান্ত হইয়া

উঠিয়াছে।...এই পূতিগন্ধময় কাব্য রচনা করিয়া সমাজের নৈতিক বায়ু কলুষিত করিবার কোন অধিকার আছে কি না ইহাই সুধীগণের বিবেচ্য।"

এই অভিযোগের সঙ্গে মিশল আর এক অভিযোগ—রবীন্দ্রনাথ হিন্দুধর্মকে আক্রমণ করেছেন। বলা হল, "রবীন্দ্রনাথ 'অচলায়তনে' প্রত্যক্ষে ও পরোক্ষে হিন্দুধর্মকে আক্রমণ করিয়াছেন।...রবীন্দ্রনাথ 'মেটারলিঙ্ক হউন আমরা আনন্দিত লাভ করিব। কিন্তু না বুঝিয়া হিন্দুধর্মকে আক্রমণ করিবেন না।" ঘরে-বাইরে-তে সন্দীপের মুখে সীতা সম্পর্কে যে উক্তি আছে তা পড়ে একজন লেখেন—

হে মহাপাতক হিন্দু! তব পুণ্য গেহ
করিও না কলঙ্কিত...
হায় বঙ্গ! যে কবির বীণায় আপনি
সুমন্দ মলয় এসে করে প্রতিধ্বনি
তার কব প্রণালীর পূতিগন্ধময়
পঙ্কে কলঙ্কিছে যত দিব্য কুবলয়।

১৩১৮ সালে কবির পঞ্চাশ বছর বয়স পূর্ণ হওয়ার উপলক্ষ্যে কলিকাতা টাউন হলে সংবর্ধনাসভা হল। সভা অনুষ্ঠিত হয় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের উদ্যোগে, কিন্তু কবিকে এ নিয়ে কটুকথা শুনতে হল। রবীন্দ্র-বিরোধিগণ রটিয়ে দিলেন কবির স্তাবকবৃন্দ কবিকে নিয়ে এই প্রচারকার্য চালিয়েছে। যাই হোক, এই সংবর্ধনার অব্যবহিত পরেই বিপিন পাল একটি প্রবন্ধ লিখলেন যার শিরোনাম 'চরিত-চিত্র-রবীন্দ্রনাথ'। এ রচনার মূলে বক্তব্য হল রবীন্দ্র-সাহিত্যে বস্তুতন্ত্রের অভাব। কথাটা খুবই জোর দিয়ে বলা হল, এবং জানানো হল যে রবীন্দ্র-সাহিত্য বস্তুতন্ত্রী হতে পাবে নি তাব কারণ রবীন্দ্রনাথের অভিজাত কুলশীল ও পারিবারিক পরিবেশ। ব্যাজস্তুতি ক'রে বলা হল, "রবীন্দ্রনাথ শতরঞ্জগালিচামণ্ডিত ত্রিতল প্রাসাদকক্ষে বসিযা মানসচক্ষে কর্দমমণ্ডিত পিচ্ছিল পল্লীপথ প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। সুচিক্কণবপু সুমার্জিতরুচি, স্বজনবর্গে পরিবৃত থাকিয়া, সুদূরে দরিদ্রপল্লীর শুষ্কদেহ, রুক্ষকেশ নরনারী সকলের অপূর্ব তৈলচিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন।" বলা হল রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-সৃষ্টি মায়িক। ঊর্ণনাভ যেমন আপনার ভেতর থেকে তন্তু বার ক'রে অদ্ভুত জাল বিস্তার করে, রবীন্দ্রনাথও সেইরকম আপনার অন্তর থেকেই অনেক সময় ভাবের ও রসের তন্তু বার করে আপনার 'অদ্ভুত কাব্য সকল' রচনা ক'রেছেন। এই কারণে নাকি রবীন্দ্রকাব্য অনেক সময়ে চিত্তকে মুগ্ধ করে কিন্তু স্নিগ্ধ করতে পারে না। জ্ঞানের, ভাবের, কর্মের পিপাসা বাড়িয়ে দেয়, কিন্তু সে পিপাসার নিবৃত্তি করতে পারে না। "রবীন্দ্রনাথ একবার 'তত্তকিম্'? নামে একটি উপাদেয় প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন। তাঁহার নিজের লেখাতেও প্রায় সর্বদাই ঐ দুর্দমনীয় প্রশ্নটি জাগিয়া রহে।"

উপরোক্ত সব অভিযোগ ছাপিয়ে উঠল কবির প্রতি দ্বিজেন্দ্রলালের ব্যক্তিগত আক্রমণ, যার সাক্ষ্য 'আনন্দ-বিদায়' নামক প্যারডি নাট্য। স্টার থিয়েটারে অভিনীত এই নাটকে রবীন্দ্রনাথকে কী পরিমাণ বিদ্রূপ করা হয়েছিল তা বোঝা যাবে নিচের উদ্ধৃতি থেকে—

"একাধারে কবি, অধিকারী, ঋষি
কিবা ত্যাগ কিবা দান,
'পরিষৎ' জল ছিটায়ে দিলেই (কবিবর)
স্বর্গে উঠিয়া যান।"

* * *

"আমি লিখছি যেসব কাব্য
মানব জাতির জন্যে
নিজেই বুঝি না তার অর্থ
বুঝবে কি আর অন্যে!
আমি যা লিখেছি এবং আজ কাল
যা সব লিখছি,
সে সব থেকে মাঝে মাঝে আমিই
অনেক শিখছি।
এখন কর গৃহে গমন—নিয়ে আমার
কাব্য
আমি আমার তপোবনে এখন একটু
ভাবব।"

"২য় ভক্ত—এই একবার বিলেত ঘুরে এলেই
ইনি P. D. হয়ে আসবেন।
৩য় ভক্ত—P. D. কি?
২য় ভক্ত—Doctor of Poetry.
৩য় ভক্ত—ইংরেজরা কি বাঙ্গালা বোঝে যে
এঁর কবিতা বুঝবে?
৪র্থ ভক্ত—এ কবিতা বোঝাব ত দরকার
নেই। এ শুধু গন্ধ। গন্ধটা
ইংরেজীতে অনুবাদ করে' নিলেই
হোল।
২য় ভক্ত—তারপর রয়টার দিয়ে সেই খবরটা
এখানে পাঠালেই আর Andrew-
এর একটা Certificate যোগাড়
করলেই P. L.
৩য় ভক্ত—P. L. কি?
২য় ভক্ত—Poet Laureate.
১ম ভক্ত—ইত্যবসরে একখানা মাসিক বের
কর, মাসিক বের কর। আমরা
ইত্যবসরে এঁকে একদম ঋষি
বানিয়ে দেই—"

১৩১৯ সালে রবীন্দ্রনাথের বিলেত যাবার পরেই নাটকের অভিনয় হয়। তার পরের বছর কবি নোবেল পুরস্কার পান। এতে একদল লোকের আরো উষ্মা বাড়ল। 'রবিয়ানা' নামক পুস্তিকার লেখক লিখলেন, "নোবেল প্রাইজ পাইবার পূর্বে রবীন্দ্রবাবু অবশ্য কবিগুরু বাল্মীকিকে খোঁচা মারিবার সাহস করিতেন না।... কিন্তু দেশশুদ্ধ লোকের বাহবা পাইয়া, সৌভাগ্যের গাদায় বসিয়া রবীন্দ্রনাথ...আজ ব্যাস-বাল্মীকিকে তিনি তুড়ি দিয়া উড়াইবার চেষ্টা করিতেছেন!—ভাবিতেছেন, তাঁহার কলমের খোঁচার উপরেই তাঁহাদের জীবন-মরণ নির্ভর করিতেছে।" এবং তিনি জানালেন যে রবীন্দ্রনাথের চিন্তা-ভাবনা প্রচণ্ড অসঙ্গতিতে ভরা। শেকস্পীয়রকে অনুকরণ করে একটি অলংকার-খন্ধ ইংরেজি বাক্যই ছাড়লেন—Oh Inconsistency! They name is Rabindranath! কারণ, "কবিবর রবীন্দ্রনাথের মত নিতুই নব। তাঁহার নিকট আজ যাহা 'হাঁ' কাল তাহা 'না'। রাজনীতি, সমাজনীতি ও সাহিত্যনীতি প্রভৃতি সকল রকম নীতিতেই কবিবরের মত নিত্য পরিবর্তিত হইতেছে।...সুবিধাবাদী যেমন মিনিটে মিনিটে মতান্তরে গড়াইয়া চলে, রবীন্দ্রনাথও তেমনই গড়াইতেছেন।"

১৩৩০ সালের দিকে এবং তারপর রবীন্দ্র-সমালোচনায় অস্পষ্টতা ও দুর্নীতিপরায়ণতার অভিযোগ বড় একটা দেখা যায় না। বরং তথাকথিত 'কল্লোল' যুগের তরুণ সাহিত্যিকদের বক্তব্য দাঁড়াল, "রবীন্দ্রনাথ জীবনের একটা দিক বাদ দিয়া গিয়াছেন (তাঁহার সুচিত্রিত চরিত্রগুলির সকলেই যেন শুচিতায ভরা; এমনকি বিনোদিনীর মধ্যেও পঙ্কিলতা নাই। মানুষ যেখানে সর্বাঙ্গে কাদা মাখিয়া বসিয়া আছে—হয় তো তাহার অন্তরের গূঢ়তম প্রদেশে সত্যের স্ফুলিঙ্গটুকু বাঁচিয়া আছে মাত্র—সেখানে আমরা রবীন্দ্রনাথকে পাই না।...তাঁহার চিত্ত হোমানলের মত উপর দিকে উঠিয়া

কিস্তিবন্দীতে ট্রানজিস্টার

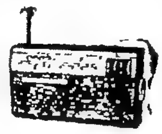

৩২০. টাকা মূল্যের বিশ্ববিখ্যাত "উইন্ডসর হিতাচী" ৩ ব্যান্ড অলওয়ার্ল্ড পোর্টেবল ট্রানজিস্টার মাসিক ১০. টাকার কিস্তিতে নিন।

আবেদন করুন:—
SWISS TELEVISSION CO.
(B-10) Post Box 1320,
Delhi-6.

সুন্দরের মাঝে সত্যকে খুঁজিয়াছে; মলিনতার ভিতর নামিয়া তাহারও ভিতর যে পরম সত্য লুকাইয়া আছে তাহার সন্ধানলব্ধ হয় না।" আরও বলা হল যে রবীন্দ্রসাহিত্য আভিজাত্য-আশ্রিত —তাতে দরিদ্রের কথা নেই। 'এবার ফিরাও মোরে' বলে একদা কবি যে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন সে প্রতিশ্রুতি তিনি রক্ষা করতে পারেন নি। অগ্নিময় সুধাময় উদ্দীপনা তাঁর বাণী—তিনি দরিদ্রের জীবনের ছবি বাংগালীর চক্ষে তুলে ধরলে ঘরে ঘরে নিদারুণ আত্ম-তিরস্কার হাহাকার করে উঠত, সেবার উৎসাহে বাংগালী আকুল হযে অগ্রসর হত। দরিদ্রের দুর্ভাগ্য, সে রবীন্দ্রসাহিত্য দ্বারা উপকৃত হতে পারে নি।

রবীন্দ্রসাহিত্যে বস্তুতন্ত্রের অভাব, তাতে দরিদ্রের কথা নেই—এই অভিযোগ কিছুদিন পরে কবির শেষ জীবনে নূতন ভাষায় রূপ পেল—রবীন্দ্রনাথ বুর্জোয়া কবি। কবির সম্পর্কে কতকগুলি সংশয়-প্রশ্ন করা হল। "মন তাঁর গতিধর্মী; কিন্তু সে কি বুর্জোয়া গণতন্ত্রের সীমানায় এসে ঠেকল? তার ভেতরকার দ্বন্দ্ব যার দ্বারা মানুষ অশান্তি জর্জরিত হলো—তাকে কি তিনি কেবল ধর্মের প্রলেপ দিয়ে মুছে ফেলতে চান?... দেখলুম না তো তাঁর রচনায় সে মানুষের স্বীকৃতি মাথার ঘাম পায়ে ফেলে যে এ জগৎ সৃষ্টি করে। দেখলুম শুধু অনুকম্পা। যে মানুষ আজ বুঝেছে যে এ জগৎ তারই আপন হাতের সৃষ্টি, সে নেবে অধিকার—অনুকম্পাকে সে অপমান জ্ঞান করে। রবীন্দ্রনাথ গতিধর্মী; কিন্তু সামন্তপ্রথা থেকে বুর্জোয়াতন্ত্রের গতিমুখে ধনশক্তি প্রতিভূদের নায়কতায় রাষ্ট্র ও সমাজবিধানেই কি ইতিহাসের পথে তাঁর দৃষ্টি থেমে গেলো?"

একদা 'সাহিত্য' পত্রিকাতে যে-ধরণের রবীন্দ্র-বিরোধিতা দেখা যেত, ১৩৩৮ সালের দিকে 'শনিবারের চিঠি'তে তাই দেখা গেল। 'শেষের কবিতা' এই পত্রিকার মতে ভাষা ও ভাবের বিজাতীয়তাপূর্ণ। মন্তব্য করা হল, "শক্তির prostitution-এর কথা আমরা শুনিয়া থাকি, কিন্তু এত বড় শক্তির এতখানি আত্ম-বিস্মৃতি আমরা স্বপ্নেও ভাবিতে পারি নাই। 'শেষের কবিতা' সর্বপ্রকারেই অতি-আধুনিকতার জয়ধ্বনি; এই একখানি পুস্তকের প্রভাব রসাতলযাত্রীদের পক্ষে যথেষ্ট হইযা দাঁড়াইয়াছে। কারণ, ভাবের মদোন্মত্ত হাওয়ায় ভাষার তক্‌মা-তাবিজ ছেড়ার এমন ভরসা ও আশ্বাস তাহারা আর কোথাও পায় নাই।" কবির চিত্রকলাকে ব্যঙ্গ করে বলা হল, "রবীন্দ্রপ্রতিভার ইহা বিকাশ না বিবর্তন?—বিস্ময়ের যে আর সীমা রহিল না। যতগুলি কলা ছিল; ক্রমে ক্রমে প্রায় সবগুলি রবীন্দ্র প্রতিভাশশীর তিথিতে তিথিতে পূরিয়া উঠিয়া এতদিনে কি ষোলকলা সম্পূর্ণ হইয়া পৌর্ণমাসী দেখা দিল।? না কৃষ্ণপক্ষের রবীন্দ্রশশী একে একে সকল কলাগুলি ত্যাগ করিয়া শেষ কলায় আসিয়া ঠেকিয়াছে? আমরা প্রার্থনা করি, ইহাই যেন শেষ কলা না হয়; মূর্তি ও বাস্তব এই দুইটি কলা এখনও বাকি, আশা হয় এ দুটিও বাদ যাইবে না, অন্ততঃ বাস্তব-কলাটি।" কবির বয়স তখন সত্তর পার হয়ে গেছে। সমালোচনার নামে তখনও তাঁকে ব্যক্তিগত বিদ্রূপ করে আত্মপ্রসাদ লাভের প্রয়াস চলছে।—"রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে একটা জিনিস আমরা বরাবরই লক্ষ্য করিয়া আসিতেছি, হিন্দুধর্ম, সমাজ ও আচার সম্পর্কে তিনি বরাবরই অত্যন্ত অসহিষ্ণু।...নিজে অপরিমিত বিলাসের মধ্যে বাস করিয়া, মাংসাহারকালে এখনও 'পরাণকে অরুণ-বরুণী' কবিবার প্রবৃত্তি লইযা রহিয়া রহিয়া উপনিষদের বুকনি আওড়াইলে যদি ঋষি হওয়া যাইত তাহা হইলে ভাবনা ছিল না। ত্যাগ ও সাধনা ব্যতীত কোনও দেশে মানুষে কখনও ধর্ম সম্বন্ধে কথা বলিবার অধিকারী হয় নাই—রবীন্দ্রনাথ জীবনে এমন কি ত্যাগ করিয়াছেন যাহার জন্য ধর্ম সম্বন্ধে কথা বলিবার দাবী করিতে পারেন? কাব্য-মার্গে চীনাংশুক আলখাল্লা পরিয়া বিচরণ করিলেই গুরু হওয়া যায না, গুরু হইতে হইলে তপস্যা প্রয়োজন।"

ওপরে রবীন্দ্র-সমালোচনার যে সামান্য চুম্বক দেওয়া গেল তা থেকে স্পষ্টই দেখছি যে কবির শেষ জীবন পর্যন্ত কবিকে বিদ্রূপ-কটূক্তি করার লোকের অভাব হয় নি। এবং এই বিদ্রূপ-কটূক্তি বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই অত্যন্ত অশোভনভাবে ব্যক্তিগত দ্বেষ-হিংসার প্রকাশ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এতে একদিকে যেমন আমাদের চরিত্রের কালিমা ফুটে বেরিয়েছে, অন্যদিকে তেমনি প্রকটিত হয়েছে আমাদের চিন্তা-শক্তি ও রসজ্ঞানের অসারতা। যাঁরা নিজেদের অসংস্কৃত রুচি ব্যক্তি তথা সমাজগত দাবির ভিত্তিতে রবীন্দ্রসাহিত্য পাঠ করেছেন, তাঁরা তাঁদের ইচ্ছাপূর্তি না ঘটাতে রবীন্দ্রসাহিত্যের প্রতি বিরূপতা প্রকাশ করেছেন। যাঁরা অস্পষ্টতার অভিযোগ এনে রবীন্দ্র-সমালোচনার ঝড় তুলেছেন, তাঁদের জ্ঞান ছিল না যে কবিতায় সূক্ষ্ম

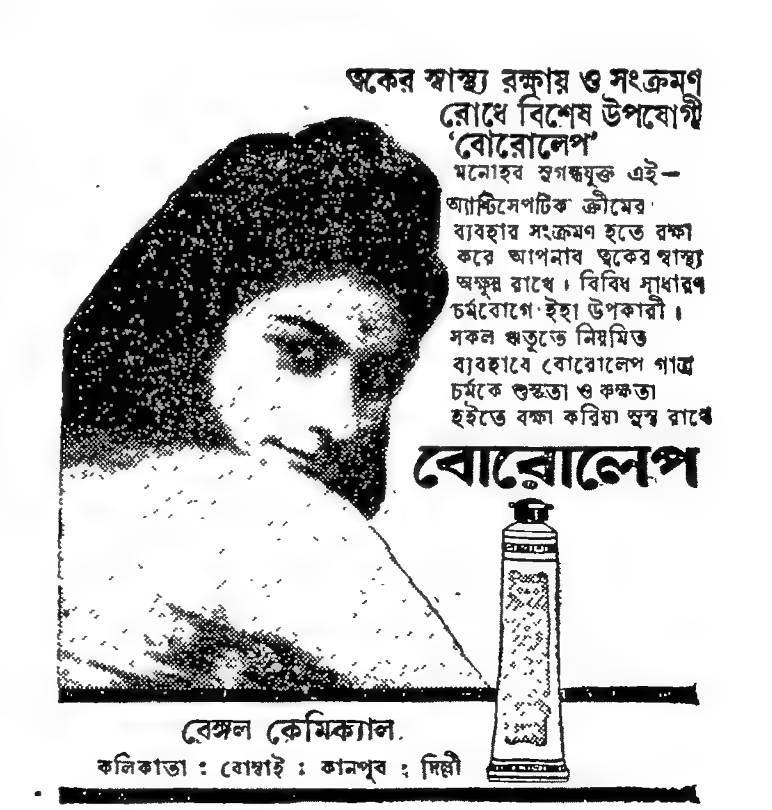

ভাবের প্রকাশ কোনো স্পষ্ট অর্থের মাধ্যমে সম্ভব নয়। যাঁরা দুর্নীতি নিয়ে হৈ-চৈ করেছেন তাঁরা সাহিত্য-নীতির খোঁজ রাখেন নি—তাঁরা প্রাচীনপন্থী হয়েও আমাদের অলঙ্কারশাস্ত্রের কথা ভুলে ছিলেন, যে-শাস্ত্রে সাহিত্যবিচার কখনো সামাজিক সুনীতি-কুনীতির দোহাই পাড়ে নি। যাঁরা বস্তুতন্ত্রহীনতার অভিযোগ এনেছিলেন তাঁরা দেখেন নি তাঁদের নিজেদের সমালোচনাই কতখানি বস্তুতন্ত্রহীন ছিল—সাহিত্যবিচার করতে গিয়ে সাহিত্যের বিষয়বস্তু ও উপাদানের বিচারকেই মুখ্য করে ধরেছিলেন। এই-ভাবে আমাদের সাহিত্য-সমালোচনা একটা দিগ্বিদিকজ্ঞানহীনতা ও মতিচ্ছন্নতার ঘূর্ণিপাকে হাবুডুবু খেয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর স্বাভাবিক কারণেই ব্যক্তিগত ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের পালার অবসান ঘটল বটে, কিন্তু কবিকৃতির প্রকৃত মূল্যায়ন তবু তেমন জোরালো হল না। কবি যখন মারা গেলেন তখন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ বেশ তীব্র হয়ে উঠেছে। এই সময় চারিদিকে রাষ্ট্রগত আদর্শের যে দ্বন্দ্ব দেখা গেল, সেই পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের দেশে অনায়াসে সম্ভব হল রবীন্দ্রনাথকে বুর্জোয়া কবি বলে চিহ্নিত করা। ঢাক পেটানো হল, রবীন্দ্রসাহিত্যে শ্রেণী-দ্বন্দ্বের কোনো চেতনা বা পরিচয় নেই।—নেই সর্বহারাদের জন্য কোনো বাণী।

ক্রমে রবীন্দ্রপ্রতিভার মহত্ত্ব সম্পর্কেই সংশয় পুঞ্জিত হয়েছে এবং এখন তো এই সংশয় প্রায় উচ্চভাষিত। বলা হয়েছে ও হচ্ছে যে ইংরেজি নব্য-রোমান্টিক কাব্যের প্রভাব এবং কিয়ৎ পরিমাণে অধ্যাত্ম-চেতনার মিশেল ছাড়া রবীন্দ্রকাব্যের অন্যতর কোনো মহিমা নেই। শেকস্পীয়র কিংবা গ্যয়েটের সমতুল্য হওয়া তো দূরের কথা, এমন কি রিল্‌কে, র‍্যাঁবো প্রমুখ কবিদের অনুভব-প্রাখর্য ও তীব্রতা রবীন্দ্রনাথ তাঁর কাব্যে ফুটিয়ে তুলতে পারেন নি।

কবির জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন-কালে বেশ স্পষ্ট করেই দুজন চিন্তাশীল ব্যক্তি রায় দেন যে, গোটা রবীন্দ্রকাব্য ইংরেজি তথা পশ্চিমী কাব্যের অনুবাদ বললে অত্যুক্তি হয় না। অথচ এঁরা উভয়েই রবীন্দ্র-গুণগ্রাহী বলে পরিচিত।

আর একজন সেদিন ঘোষণা করেছেন যে, নোবেল প্রাইজ পাবার আগে পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ ছিলেন পুরোপুরি দেশী ও বাঙালী—তিনি বিদেশ, বিশেষ করে বিলেতকে সহ্য করতে পারতেন না। কিন্তু নোবেল প্রাইজ পাবার পর রবীন্দ্রনাথ দেশবাসীর প্রতি উদাসীন হলেন এবং বিদেশকে তাঁর প্রকৃত কর্মক্ষেত্র ও বিদেশীকে তাঁর প্রকৃত সমাজধর্মী বলে মনে করতে লাগলেন। অথচ বাঙালী ছাড়া আর কিছু হবার ক্ষমতা তাঁর ছিল না। সুতরাং রবীন্দ্রনাথের মধ্যে এক কৃত্রিম ব্যক্তিত্ব দেখা দিল,—আমরা পেলাম এক অভিনেতা রবীন্দ্রনাথ। লেখকের ভাষায়, "ইহার ফলে বাঙালী রবীন্দ্রনাথ যে তিরোহিত হইলেন তাহা নয়, কিন্তু দেশ ও বিদেশের উজ্জ্বলিত নাট্যমঞ্চে যে অভিনেতা দেখা দিলেন তাঁহার কাছে সত্যকার রবীন্দ্রনাথ ম্লান হইয়া গেলেন। বিশ্বমানবতা প্রচার, সুপরিসর আলখাল্লা পরিয়া বিদেশে ভ্রমণ, বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠা, শ্রীনিকেতন প্রতিষ্ঠা, বিদেশ হইতে ভারতীয় কালচারের বিদেশী ফিরিওয়ালা আনিয়া শান্তিনিকেতনে ইউরোপীয় চিড়িয়াখানা স্থাপন, উডকাট-বাটিক প্রভৃতির বাতিক, চিত্রাঙ্কন ইত্যাদি সবই অভিনেতা রবীন্দ্রনাথের কাজ, সত্যকার রবীন্দ্রনাথের নয়।"

একালে রবীন্দ্রপ্রতিভার এবম্বিধ অবমূল্যায়নের পেছনে ইয়েট্‌স ও এজরা পাউণ্ডের প্রভাবও যথেষ্ট। তাঁদের প্রকাশিত পত্রাবলীতে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে অত্যন্ত বিরূপ মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে। তাঁরা একদা কবির প্রতিভাকে যে মহত্ত্বের চূড়ায় স্থাপিত করেছিলেন সেই শীর্ষদেশ থেকে তাঁকে তাঁরা নিজের হাতেই ধাক্কা দিয়েছেন। এই কাজটারই অনুকরণ আমরা করছি। পুনর্বিচারের নামে রবীন্দ্রনাথের 'ইমেজ'-কে মলিন করছি। বর্তমানে যা অবস্থা দাঁড়িয়েছে তাতে দেখা যাচ্ছে, কি প্রাচীন, কি নবীন কোনো দলের মধ্যেই রবীন্দ্রচর্চা কোনো সাক্ষাৎ অনুপ্রেরণার বস্তু নয়। সেদিনের রবীন্দ্র-বিরোধিতা ছিল একটা প্রচণ্ড সঙ্ঘর্ষ-সঙ্ঘাতের ফল। তাতে রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত ক্ষোভের কারণ ঘটলেও, তাঁর প্রভাবের প্রাবল্যই সূচিত হয়েছে। এখন স্পষ্ট রবীন্দ্র-বিরোধিতা নেই. যা আছে তাকে বলা হচ্ছে রবীন্দ্র-পুনর্বিচার। কিন্তু এই রবীন্দ্র-পুনর্বিচার রবীন্দ্রসাহিত্যের প্রতি একটা অনীহা তথা রবীন্দ্রসাহিত্যের অযত্ন পাঠের ওপর প্রতিষ্ঠিত। কতকগুলি আপ্তবাক্যে রবীন্দ্র-প্রতিভার মহত্ত্ব খর্বায়িত করার একটা প্রবর্তনা দেখা দিয়েছে। যাঁরা এ কাজ করছেন তাঁদের কাউকেই তো দেখলুম না বিস্তৃত বিশ্লেষণ দ্বারা বুঝিয়ে দিতে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য মহত্ত্বের শীর্ষদেশে কেন স্থান পাবে না, অথবা কেন আমাদের পক্ষে রবীন্দ্রনাথকে তেমন গুরুত্ব না দিলেও চলে। অথচ এঁদের এই মনোভাব ও রবীন্দ্রসাহিত্যের প্রতি অনীহা খুবই দ্রুত তরুণমনে সংক্রামিত হচ্ছে। সাধারণ স্কুলের ছাত্রকে পর্যন্ত বলতে শোনা যাচ্ছে—রবি ঠাকুরের কবিতায় পড়বার আর কী আছে।

অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ এখন প্রায় অপঠিত হয়েই সমালোচিত।

দেশ সেবায় নিয়োজিত,
এ্যালবার্ট ডেভিড লিমিটেড
কলিকাতা—৫০
নীতি ও বিজ্ঞানানুযায়ী ঔষধ
প্রস্তুতকরণের অগ্রণী
—ব্রাঞ্চ সমূহ—
বোম্বে - মাদ্রাজ - দিল্লী - নাগপুর
বেজওয়াডা - শ্রীনগর - গৌহাটী

সংবাদপত্র, স্বাধীনতা ও আমরা

নন্দগোপাল সেনগুপ্ত

একাদিক্রমে ত্রিশ বছর একটি দৈনিক পত্রের সম্পাদকীয় দপ্তরের সঙ্গে যুক্ত রয়েছি। এই ত্রিশ বছরে দেশ পরাধীনতা থেকে স্বাধীনতায় উন্নীত হয়েছে, তার রাজনীতিক ও অর্থনীতিক ছক বদলেছে, অনিবার্যভাবেই সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশও বদলেছে। এক অবস্থা থেকে আর এক অবস্থায় এসেছি এবং দুই অধ্যায়েই সাংবাদিকতা করছি বলে দুইয়ের মধ্যে যোগসূত্রটা কোথায়, কোথায় বা পরিবর্তন হয়েছে তা আমার যাচিয়ে দেখার সুযোগ হয়েছে ভাল করে। এই পরিবর্তনের প্রসঙ্গটাই আমার আলোচ্য। কিন্তু বলে রাখি যে বক্তব্য একান্তই আমার।

পরাধীন ভারতবর্ষে সংবাদপত্র ছিল প্রধানত ও প্রথমত স্বাধীনতা সংগ্রামের হাতিয়ার। তাই তা একদিকে যেমন বিদেশী শাসকগোষ্ঠীর ত্রুটি-বিচ্যুতি ও অন্যায় অনাচরণের সমালোচনায় মুখর হয়ে উঠত, অন্যদিকে তেমনি দেশের মানুষকে চাইত জ্ঞানে কর্মে আচারে সংস্কারে পৃথিবীর উন্নত দেশের মানুষদের সঙ্গে এক স্তরে এনে দাঁড় করাতে। চিন্তার ক্ষেত্রে তারা কেউ হয়ত ছিল চরমপন্থী, কারো সুর হয়ত ছিল একটু নরম, কিন্তু সমান স্বার্থ ও স্বাধীনতার প্রশ্ন ছিল সবারই দৃষ্টির পুরোভাগে। আপন মতামত নির্ভয়ে ব্যক্ত করার জন্যে তাই সংবাদপত্রকে সেদিন নানা বিপদের ঝুঁকি নিতে হয়েছে।

ব্যবসা হিসাবে সংবাদপত্র সেদিন একেবারেই লাভজনক ছিল না। সাবেকী পয়সার দু' পয়সা ছিল তার দাম। বিজ্ঞাপনের রেটও ছিল নগণ্য, দেড় টাকা দু'টাকা ইঞ্চি। তাই খরচপত্র মিটিয়ে অস্তিত্ব রক্ষা করতেই হিমসিম খেয়ে যেতেন অধিকাংশ কাগজের স্বত্বাধিকারীরা। সাংবাদিকরা বেতন পেতেন পঁচিশ-ত্রিশ টাকা, তাও নিতে হত দু'-তিন বারে। তাই সাংবাদিকতার সঙ্গেই তাঁদের করতে হত আরো এটা-সেটা। তা সত্ত্বেও সাংবাদিকরা সেদিন ছিলেন আদর্শনিষ্ঠ, কেন না সাংবাদিকতা বৃত্তি ছিল না, ছিল ব্রত। অনেক সাংবাদিক এই ব্রতে জীবনই দিয়ে গেছেন এ আমি সগৌরবে লক্ষ্য করেছি।

স্বাধীন ভারতে আজ সংবাদপত্রের সেই পুরান ভূমিকা পালটেছে। আজ আর তা স্বাধীনতা অর্জনের হাতিয়ার নয়, লব্ধ স্বাধীনতা রক্ষার হাতিয়ার। জাতির নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে যেখানে শাসন ক্ষমতা এসেছে, সেখানে সংগ্রামের স্থান কোথায়? অনিবার্যভাবেই প্রধান সংবাদপত্রগুলি আজ হয়ে পড়েছে সরকারী স্বার্থের প্রতিভূ, যদিও জনস্বার্থের খাতিরে মৃদু বা ঈষদুষ্ণ সমালোচনার হাতও বজায় রেখেছে তারা। অবশ্য তীব্র সমালোচনাকারী সংবাদপত্রও আছে দু'-চারখানি, কিন্তু তাদের প্রচার কম, কেন না উপযুক্ত পুঁজির অভাবে কোনটাই শক্তিশালী হয় নি।

জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রের এই ভূমিকা বদলের ফলে অবশ্য সংবাদপত্রের ব্যবসায়িক শ্রীবৃদ্ধি হয়েছে যথেষ্টই। সংবাদপত্র চালান আজ হতে পেরেছে বৃহৎ ব্যবসায়ের শ্রেণীভুক্ত। এখন পেশাদার সাংবাদিকরা বেতন, ভাতা ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা যা পান তা যে কোন উঁচু চাকরির সমান। তাঁরা বাড়ি গাড়ি করেন, অনেকে বিদেশ ঘুরে আসেন দু'বার তিনবার করে। সমাজেও তাঁদের প্রসার-প্রতিপত্তি বেড়েছে। সরকারী-বেসরকারী সব মহলে তাঁদের ডাক পড়ে। বিদেশী দূতাবাসে ও প্রচার দপ্তরে মান্য অতিথি-রূপে গৃহীত হন তাঁরা। শুনেছি কেউ কেউ অন্য কিছুও পান।

সংবাদপত্র মালিকরা ত আজ হয়েছেন প্রকৃত অর্থেই ভারতীয় প্রেস লর্ড। যে কোন মাঝারি বা বড় শিল্পপতির মত ধনাধিকারী হতে পেরেছেন আজ তাঁরা এবং তার ফলে রাষ্ট্রে ও সমাজে হয়েছে তাঁদের অসীম প্রভাব বৃদ্ধি। বিদেশেও তাঁদের সম্ভ্রম আজ কম নয়। এক কথায় স্বাধীনতার বিশ বছরে দেশের সংবাদপত্র রাজ্যে এসেছে একটা প্রাচুর্য ও সমৃদ্ধির সমারোহ ও ব্যাপ্তির জোয়ার। পরাধীন ভারতে অধ্যাপকতা ছেড়ে যখন সাংবাদিকতা নিয়েছিলাম, তখন এই শিল্পের এতখানি বাড়-বাড়ন্ত ছিল স্বপ্নেরও অগোচর। পরিবর্তন অবশ্যই হয়েছে অন্যান্য ক্ষেত্রেও, কিন্তু এত অভাবনীয় নয় তা আর কোথাও, যেমন আধুনিক সংবাদপত্রে।

পেশাদার সাংবাদিক ও সংবাদপত্র মালিকদের সমুন্নতির কথাটাই শুধু উল্লেখনীয় নয়। পণ্য হিসাবে সংবাদপত্রের নিজস্ব উন্নতিও কম হয় নি। প্রথমত তার অনেকগুলিরই প্রচার সংখ্যা লক্ষের উপর উঠে গেছে, দ্বিতীয়ত ছাপায় ছবিতে বৈদেশিক সংবাদের সম্পদে তা আজ যে-কোন দেশের প্রধান সংবাদপত্রগুলির যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে ওঠার সামর্থ্যলাভ করেছে। শুধু তাই নয়, সংবাদকে ভিত্তি করে দেশের এবং সারা দুনিয়ার সাহিত্য সংস্কৃতি বিজ্ঞান অর্থনীতি সমাজ ধর্ম কলা কৃষ্টি সকল দিকের প্রতিনিধিত্বই আজ এসেছে সংবাদপত্রের এক্তিয়ারে। শতমুখে ছড়িয়েছে তার কর্মকাণ্ড।

গতি ও উৎপাদনের ক্ষেত্রে একালীন

বি, সি, মাইতি এণ্ড কোং
—ইলেকট্রো প্লেটিং সামগ্রী—
নিকেল ভ্যাট ও ব্যারেল * ডাইনামো * পলিশিং মেসিন এবং প্লেটিং করিবার জন্য যাবতীয় সামগ্রীর আদি সরবরাহক।
শো রুম ঃ—৯৪, প্রেমচাঁদ বড়াল স্ট্রীট, কাল-১২ । ফোন ঃ ৩৪-৩১৭৩
৩, রামমোহন পাল লেন, কলি-১২ ঃ অফিস-ফোন—৩৪-৪৮৪৬

বিজ্ঞানের দানগুলিই অবশ্য সংবাদপত্রের মান ও মূল্যবৃদ্ধিতে এতটা সহায়তা করেছে। ১৮১৮ সালে বাংলা দেশে প্রথম সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়, দেড়শ' বছরে তার এই বিস্তৃতি নিঃসন্দেহে ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু এর পরই উঠছে আসল প্রশ্ন, নৈতিক বা মানবিক মাপকাঠিতে বিচার করেও কি সংবাদপত্রের এই উন্নতিকে প্রশংসার জয়পত্র দেওয়া যায়? এখানে আমার উত্তর নেতিবাচক। আমার ধারণা সংবাদপত্র এত বড় হয়েছে বলেই তা আজ অন্যায় ও অনাচারের মোকাবিলা করার শক্তি হারিয়েছে। আজ তা স্থিতাবস্থায় ঘা দিতে ভরসা পায় না।

যে-কোন অভিজ্ঞ লোকই জানেন, বর্তমান সমাজ কাঠামো এমনই পারস্পরিক স্বার্থের বাঁধনে বাঁধা যে এর একটা জায়গায় হাত দেওয়া মাত্র অন্যান্য জায়গায় হয় তার নিদারুণ প্রতিক্রিয়া। সেই প্রতিক্রিয়ার ভয়েই কেউ কোন পাপের বাসায় খোঁচা দিতে সাহস পায় না। দিলে পাপ উন্মূলিত হয় না, তার অনুষ্ঠাতার পক্ষ হয়ে মাথা তুলে দাঁড়ায় সমাজের সেই অংশ, যাদের দাক্ষিণ্যের মুখাপেক্ষী না হয়ে উপায় নেই সংবাদপত্রের। এই জন্যেই জাল ভেজাল ঘুষ দুর্নীতি দুর্বৃত্ততা কিছুরই প্রতিকার হয় না। সংবাদপত্র জেনেও কিছুই না জানার ভান করে, কিংবা ল্যাজা মুড়ো ছেঁটে খবরটা ছাড়ে।

এ না করে উপায় কি? কোনটাতে সরকার বিরূপ হবে, কোনটাতে ক্ষুণ্ণ করা হবে বণিকসমাজকে, কোনটায় বা প্রভাবসম্পন্ন রাজনীতিক দলের রোষ ও অসন্তোষ স্বাগত করা হবে। অতএব এই তিন পক্ষকে না ঘাঁটিয়েই সাংবাদিকতা করতে হবে, কেন না এই তিনের যে কেউ কুপিত হলেই কাগজ অচল। ইদানীং এই সঙ্গে আর একটি পক্ষও যুক্ত হয়েছে। আমি বলছি জনতা মহারাজের কথা, যিনি রুষ্ট হলে সক্রিয় হামলা পর্যন্ত দেখা দিতে পারে যে-কোন সময় এবং তাতে সাংবাদিকের প্রাণ নিয়েও টানাটানি পড়ে যেতে পারে। এ অবস্থায় নির্ভীক ন্যায়নিষ্ঠ ও সত্য সাংবাদিকতার রাস্তা কোথায়?

সংবাদপত্রের মালিকরা যাঁরা মোটা মোটা বেতন দিয়ে সাংবাদিক কর্মীদের বহাল করেছেন, তাঁরা তাই এই চতুর্বর্গ প্রভুর কারো গায়ে আঁচড়টি দেওয়া অনুমোদন করবেন না এবং সংবাদপত্রের নীতি নির্ধারণের চরম কর্তৃত্ব যে আইন তাঁদেরই হাতে তুলে দিয়েছে, বেতনভুক কর্মীদের দেয় নি, এ কে না জানেন? অনিবার্যভাবেই আজকের সংবাদপত্র শুধু সাংগ্রামিক ভূমিকা হারায় নি, জনকল্যাণের আদর্শভ্রষ্টও হয়েছে অনেকখানি। আমাদের অতীত ঐতিহ্য নিঃসন্দেহে দৈন্য ও কৃচ্ছ্রতার মধ্যেও এর তুলনায় ঢের বেশি উজ্জ্বল ছিল। আর তা ছিল বলেই সেদিনের প্রতিভাবান সাংবাদিকরা ব্যক্তিক স্বাধিকারে চিহ্নিত হতেন লেখক বক্তা ও মনস্বীরূপে, যা হন না আজ আর কেউ।

অবশ্য আমরা যারা পুরনো দিনের আদর্শবাদী সাংবাদিকতাকে আজো মনে মনে বড় বলে মানি, তারা এই রকম সিদ্ধান্ত করলেও, বর্তমান প্রজন্মের সাংবাদিকরা ভিন্নতর চোখে দেখেন জিনিসটাকে। স্বাধীনতা সংগ্রামের উত্তাপময় দিনগুলির মধ্যে তাঁদের চিত্ত লালিত হয় নি বলেই হোক বা অন্য যে জন্যেই হোক, তাঁরা মনে করেন সংবাদপত্রে সংবাদ প্রচারের তৎপরতা, তা উপস্থাপনের চাতুর্য, সর্বোপরি তার প্রসাধনের পারিপাট্য, যত বড় জিনিস, তার অন্তর্নিহিত আদর্শবাদ বা জীবনদর্শন তা নয়। এই শেষোক্ত জিনিসটাকে তাঁরা স্থিতি-স্থাপক বলেই গণ্য করেন, অর্থাৎ সাংবাদিক হিসাবে তাঁরা মূলত ক্ষণবাদী।

এই মানসিকতা তাঁদের তৈরি হয়েছে বিদেশী সংবাদপত্রের ছাঁচ অনুসরণের ফলে। ইউরোপ আমেরিকার অধিকাংশ সংবাদপত্রে মন্তব্যহীন সংবাদই সব এবং সে সংবাদও আপন আপন ভৌমিক এলাকার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। তাই দেখি বিদেশে যুগান্তকারী ঘটনা—ঘটলেও তাকে তারা বড় একটা পাত্তা দেয় না, তার স্থানে আপন দেশের একটা ঘোড়দৌড় বা অপেরা বা চমকপ্রদ বিবাহ বিচ্ছেদকেও দেখে অনেক বড় করে। বিশেষ আগ্রহ ফুটে উঠতে দেখি তাদের উঁচু মহলে কোন কেলেঙ্কারীসূচক ঘটনা ঘটলে। ব্যাঙ্ক লুঠ, নারী হরণ বা খুন-খারাপি তাদের কাছে যত প্রিয় সমাচার, বিজ্ঞান বা সাহিত্য বিষয়ক কোন ব্যাপার তা নয়। সম্পাদকীয় অনেকে লেখেই না, লিখলেও তা এমন কিছু নয়।

ইউরোপ আমেরিকার সাপ্তাহিকগুলিই হল সত্যকার নির্ভরযোগ্য পত্রিকা। রাজনীতি অর্থনীতি বিজ্ঞান ইতিহাস ও কলাকৃষ্টি সম্পর্কীয় যাবতীয় ঘটনার তাৎপর্য এবং মর্মকথা বিশ্লেষণ করে দেখায় তারাই। তারাই করে প্রামাণ্য পুস্তক সমালোচনা চিত্রকলা নাটক ও সঙ্গীত সমালোচনা, সমাজ ও আইন আদালত বা আন্তর্জাতিক ঘটনাবলী সংক্রান্ত প্রসঙ্গের বিশ্লেষণ এবং ব্যাখ্যাও পাওয়া যায় এই সব পত্রিকাতেই। বেশির ভাগই এর লেখান হয় কৃতী বিশেষজ্ঞদের দিয়ে। আমরা এই মডেল নিই নি, এই ধারার একটা সাপ্তাহিকও তৈরি হয় নি তাই এ দেশে। আমরা নিয়েছি দৈনিকের ধরণটা। পুরনো দিনের দৈনিকে কিন্তু আমাদের ছিল সংবাদ পরিবেষণের সঙ্গেই পাশ্চমী সাপ্তাহিকের এই প্রাণধর্মটুকুও।

সংক্ষেপে বললে এই বলতে হয় যে আজকের ভারতবর্ষীয় সংবাদপত্র বিবরের সর্বগ্রাসিতায়, প্রসাধনের চমৎকারিতায় এবং প্রচারের সংখ্যাধিক্যে যেমন, প্রতিপত্তি ও বিত্তের প্রাচুর্যে তেমনি সাবেকী দিনকে বহু পিছনে ফেলে এলেও সেদিনের আত্মিক গভীরতাভ্রষ্ট হয়েছে। আর একটা জিনিস হয়েছে, জনকল্যাণের ক্ষেত্রেও তার পূর্বতন ঐতিহ্য বিলয় পেয়েছে। আসলে স্বাধীনতা লাভের পর থেকে একটানা বিশ বছর একটি বিশেষ দলের হাতে শাসনতন্ত্র থাকায় বিপাকেই প্রধান প্রধান সংবাদপত্র সরকার সমর্থক অর্থাৎ কায়েমী স্বার্থ সমর্থক হয়ে পড়ে জনমঙ্গলের প্রতি অনিচ্ছা সত্ত্বেও কতকটা উদাসীন হয়েছে, কারণ এদেশে জনগণ এবং সরকার ও সরকার সমর্থকদের স্বার্থ তো অভিন্ন নয়।

অথচ দেশজোড়া অশিক্ষা, বেকারী, মূল্যস্ফীতি, সামাজিক অশান্তি ও রাজনীতির অনিশ্চয়তা বিড়ম্বিত এই মুল্লুকে সংবাদপত্রই পারত সার্থক পরিবর্তনের হাওয়া আনতে। পারত নতুন দৃষ্টিভঙ্গির আলোয় নবতন মূল্যমান প্রতিষ্ঠা করতে, নতুন যুগচেতনার বুনিয়াদ গড়ে তুলতে। কিন্তু পারল না। আমরা তাই রামমোহন রায়, ঈশ্বর গুপ্ত, হরিশ মুখুজ্যে, কেশব সেন, বঙ্কিম চাটুজ্যে, সুরেন বাঁড়ুজ্যে, যোগেন বিদ্যাভূষণ, যোগেন বসু কাব্য বিশারদ কৃষ্ণকুমার মিত্র থেকে ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, বিপিন পাল, পাঁচকড়ি বাঁড়ুজ্যে, অরবিন্দ ঘোষ ও ভূপেন দত্ত, বারীন ঘোষ, উপেন বাঁড়ুজ্যে, হেমেন্দ্র ঘোষ, মৃণাল বসু, প্রফুল্ল সরকার, ধীরেন সেন ও সত্যেন মজুমদার পর্যন্ত স্মরণীয় সাংবাদিক পূর্বসূরীরা যে ঐতিহ্য রেখে গেছেন, তার যোগ্য উত্তরাধিকারী হতে পেরেছি কি-না সেই আত্মজিজ্ঞাসা মুখে নিয়েই শেষ করছি আমার কথা।

কবিপক্ষে প্রকাশিত হোল
জীবনের রসমধুর আলেখ্য
তৃপ্তি বসুর
বেগম বৌ
প্রাপ্তিস্থান :—
ডি. এম. লাইব্রেরী
দাশগুপ্ত এণ্ড কোং
দাম—তিন টাকা

চিন্তামণি কর

শিল্প ও শিল্পসমালোচনা

যবে থেকে চিত্রণ ও ভাস্কর্যের জন্ম হয়েছে অনুমান করা যায়—তার গুণাগুণ সম্পর্কে সমালোচনাও সেই সঙ্গে আরম্ভ হয়েছে দর্শক মহলে। সময়ের তারতম্যে শিল্পক্ষেত্রের পরিসর অনুযায়ী এবং স্রষ্টার সঙ্গে শিল্পের গ্রাহক ও দর্শকের লেনদেন-এর গুরুত্বের পরিমাপে সমালোচনার গুরুত্ব, উদ্দেশ্য, প্রকৃতি ও তার প্রতিক্রিয়ার রূপান্তর ঘটে থাকে। দীর্ঘকাল পর্যন্ত শিল্পস্রষ্টার সমাদরের ক্ষেত্র, শিল্পপৃষ্ঠপোষক শাসক, ধনী, ধর্মসম্প্রদায় এবং বণিকগোষ্ঠীর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ছিল এবং সেই কারণে সমালোচনার প্রয়োজন ও সম্ভাবনা ছিল অতিশয় গৌণ। কিছুসংখ্যক যে সমালোচকের এই পরিবেষ্টিতে অভ্যুদয় ঘটেছিল তাঁদের সমালোচকের চেয়ে ঐতিহাসিকের আখ্যায় অভিহিত করাই ঠিক। অতি সাধারণভাবে বলা যেতে পারে যে শিল্পীদের সমসাময়িক যাঁরা শিল্পবচনার সমীক্ষাদি করে থাকেন তাঁদের অনেকেই হয়ে পড়েন সমালোচক। সেই একই শিল্প যদি অতীতের পটভূমিতে পড়ে বিলীন না হয়ে যায় এবং যে বিশেষজ্ঞরা তাকে গুরুত্ব দিয়ে আলোচনার অব্তারণা করেন তাঁরাই বহুক্ষেত্রে স্বীকৃত হন ঐতিহাসিক হিসাবে। সমালোচকদের সমসাময়িক শিল্পের বিচারকে শিল্পঐতিহাসিকরা অনেকক্ষেত্রে অনুমোদন করেন নি এবং দেখা যায় যে বিচক্ষণতার প্রতিষ্ঠা থাকা সত্ত্বেও সমালোচকদের সমসাময়িক শিল্পের ব্যাখ্যা ও বিচার পরে বেশ ভ্রান্তিময় প্রমাণিত হয়েছে।

অবশ্য সমালোচনা যে কেবলমাত্র সমসাময়িক শিল্পের পরিধির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে এমন কোন নির্দিষ্ট ধারণা করা বা ধারণা দেওয়া ঠিক নয়। অতি দুর্লভ হলেও কখন কখন এমন বোদ্ধা ও বিচক্ষণ শিল্পসমালোচকের আবির্ভাব ঘটে যিনি বর্তমানকে ব্যাখ্যা করতে প্রাচীন ও অতীতের নজীরকে সহজে ও স্বচ্ছন্দে উল্লেখ করতে দ্বিধা বোধ করেন না।

প্রাচীনকালের শিল্পী কদাচিৎ পৃষ্ঠপোষকের অনুজ্ঞা ব্যতিরেকে রচনা সৃষ্টি করেছিলেন এবং সেই পৃষ্ঠপোষকের ব্যক্তিগত অভিরুচি ও খেয়াল শিল্পীর রচনার অভিব্যক্তিকে অন্তত পরোক্ষভাবে বেশ কিছুটা নিয়ন্ত্রিত করতো। পৃষ্ঠপোষকের শিল্পরুচি, তিনি যে সমাজের মধ্যে বর্ধিত, সেই সমাজ অন্তর্ভূক্ত সর্বজনের শিল্পধাবণার অনেকখানি প্রতিবিম্বিত করতো।

সে যুগে শিল্পীর রচনা বিশেষ সৌভাগ্যবান বিত্তশালী ব্যক্তিবিশেষের জন্য তৈরি হলেও এবং সর্বসাধারণ সে শিল্পকে উপভোগ করার সুযোগ বঞ্চিত হলেও সে রচনা সর্বজনগ্রাহ্য শিল্পরসের সত্তাকে বহন করতো। যান্ত্রিক সভ্যতার বিস্তার পুরাতন কাঠামোকে বদলে আধুনিক সমাজকে যে প্রতিষ্ঠা দিয়েছে তাতে কলাশিল্পের রচনা ও তার সংগ্রহ কেবলমাত্র সম্পদশালীদের মনোরঞ্জনের উপাদান হিসাবে স্বতন্ত্র না থেকে আপামর সর্বজনের উপভোগের ক্ষেত্রে উপনীত হযেছে। শিল্প বর্তমানে পৃষ্ঠপোষক বা শিল্পনিয়ামক ধনীর খেয়ালের বন্ধনমুক্ত হওয়ায় শিল্পী তাঁর স্বকীয় শিল্পস্বপ্ন ও কল্পনাকে পরিপূর্ণভাবে ব্যক্ত করতে সমর্থ হয়েছেন। কিন্তু একদিকে যেমন শিল্পী তাঁর রচনার স্ফুরণে অবাধ স্বাধীনতালাভ করেছেন সেই সঙ্গে পূর্বেকার তাঁর সমঝদারী ছোট গোষ্ঠীকে হাবিয়ে রুচিনিবপেক্ষ এক বিরাট জনতার অগণিত দ্রষ্টাব মধ্যে পড়ে যাওয়ায় তাঁর শিল্প, দ্রষ্টাব সঙ্গে কল্পনা বিনিময়ের সুযোগ যেন আব ফিরে পাচ্ছে না। বর্তমান পরিস্থিতিতে স্বাধীন শিল্পীর সৃজন প্রতিভাব সঙ্গে অদীক্ষিত জনতার যোগসূত্র স্থাপন করতে আজ প্রয়োজন হয়েছে শিল্পসমালোচকের। কিন্তু এই প্রয়োজনকে মিটাবার উপযুক্ত প্রকৃত শিল্পসংবেদনমনা সমালোচক আজ কোথায়! আমাদের দেশে আজকের তথাকথিত শিল্পসমালোচকদের উদ্ভব হচ্ছে দুটি শ্রেণী থেকে—একটি হচ্ছে শিল্পোৎসুক লেখক ও অন্যটি সাহিত্যোৎসুক শিল্পী। বিশ্ববিখ্যাত শিল্পী ও ভাস্কর এপসটাইন সাধারণ শিল্পসমালোচকের প্রকৃত পরিচয সম্বন্ধে মন্তব্য কবেছিলেন যে, "এঁরা হচ্ছেন হয় ক্ষুব্ধ সাংবাদিক অথবা ব্যর্থ শিল্পী।" এঁদের মধ্যে অনেকে শিল্প ও শিল্পীকে দর্শকের কাছে পরিচিত করার চেয়ে নিজেদের বিচারকের আসনে উন্নীত করে আপাত গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু বাস্তবে অন্তঃসারশূন্য বাক্যবিন্যাসে সকলকে বিভ্রান্ত করে থাকেন। এঁদের আদেশাত্মক ও আজ্ঞাব্যঞ্জক শিল্পশব্দ বিস্ফোরণে প্রকৃত শিল্পজ্ঞানের আওয়াজ শোনা যায় না। পূর্ব-চিন্তা বিনা অনেকক্ষেত্রে শিল্পী রচনা সৃষ্টি করেন শুধু এক অব্যক্ত অনুভূতির আবেগে এবং দেখা যায় যে সেই রচনার অনুভূতি অপটু সমালোচকের সম্পূর্ণ অনুপলব্ধ থেকে গেলেও তার সত্বর বিচার ও সিদ্ধান্তে তাঁদের তৎপরতা কিছুমাত্র ব্যাহত হয় না। বর্তমান যুগে সমাজে দেশে ও বিদেশে যে কোন বিষয়কে জানাতে ও বোঝাতে সংবাদপত্রের অসামান্য শক্তি ও প্রভাব সর্বজনজ্ঞাত। লেখনী ও মসী ব্যবহারে কিছুটা কৃতি এমন কেউ শিল্পসমালোচক হতে চাইলেই আমাদের দেশের সংবাদপত্রগুলির দরাজ আনুকূল্যে তাঁরা শিল্প বিচারকের আসনে অনায়াসে অধিষ্ঠিত হয়ে যাচ্ছেন। ফলে এইসব শিল্পসমালোচকদের উচ্চারিত ভ্রান্ত অভিমত ও নিবন্ধ সাধারণের কাছে শিল্পকে পরিচিত ও বোধগম্য করার চেয়ে আবো দুর্বোধ্য করে তুলছে। ব্যর্থ শিল্পী সমালোচক হযে আপন ব্যর্থতাকে পরিতৃপ্ত করছেন সম্ভাব্য শিল্প ও শিল্পীকে নির্মম আঘাত করে। প্রকৃত সমালোচকের অভাব থাকলে সংবাদপত্রগুলির উচিত ব্যর্থ শিল্পসমালোচনা না ছাপিয়ে শিল্প, শিল্পী ও প্রদর্শনীর কেবল ঘোষণাটুকুকে জ্ঞাপন করা। অন্যান্য দেশে বহু শিল্প সংগ্রহশালার ও শিল্প প্রদর্শনীর ব্যবস্থা থাকায় দর্শকেরা অতীত ও বর্তমান শিল্পকে দেখবার ও জানবাব অবাধ সুযোগ পেয়ে থাকেন। সেখানকার সংবাদপত্রে অভিজ্ঞ শিল্পবেত্তাদের তথ্যপূর্ণ নিবন্ধের প্রচারে সর্বসাধারণের শিল্পধারণা একটা উচ্চমানে উন্নীত হয়ে থাকে এবং তাঁরা স্বীয় শিল্পধারণা ও শিল্পমতে আস্থাবান হওয়ায় যে কোন শিল্পসমালোচকের মন্তব্যকে বিনা বিচারে গ্রহণ করেন না। আমাদের দেশে যতদিন পর্যন্ত সাধারণে শিল্পরুচি ও জ্ঞানের উপযুক্ত বিস্তার না ঘটছে ততদিন সার্থক শিল্প উদ্ভবের ও পরিচিতির ক্ষেত্র সংকীর্ণ থেকে যাবে।

আকাশবাণী ও পরিক্রমা

'মেঘদূত'

'সমালোচনা' সংখ্যায় মেঘদূতকে-ও সমালোচনাধর্মী লেখা লিখতে হবে। মেঘদূতের কাজই তো আকাশবাণীর অনুষ্ঠান-সূচীর সমালোচনা। তবে এবারের লেখার বিষয় হচ্ছে সমালোচনার সমালোচনা। সমালোচনার সমালোচনাও মেঘদূতের বেলায় একেবারে নতুন নয়; 'আকাশবাণী পরিক্রমা'-র পাতায় তা-ও এক-আধবার করতে হয়েছে। সমালোচনা বা সমালোচনার সমালোচনা যাই করুন না কেন, নেট ফল দাঁড়ায় বহুর কাছে অপ্রিয় হওয়া। সমালোচনার বিপদ অনেক। অন্তত বেশ কিছু বন্ধু হারাতে হয়। আমরা যে বড়ো স্পর্শকাতর। সমালোচনা সহ্য করতে পারি কই।

আকাশবাণীর প্রোগ্রামের সমালোচনা দুভাবে হতে পারে: স্বয়ং আকাশবাণী কর্তৃক এবং সংবাদপত্র মারফৎ।

আকাশবাণী একটি সরকারী প্রতিষ্ঠান। অথচ প্রতিষ্ঠানটি তার আয়োজিত এবং পরিবেশিত প্রোগ্রামের সমালোচনা করেন না। এবং তার কোন প্রকার সুযোগও নেই। সংবাদপত্রে যেমন পাঠকের কলম আছে কিম্বা পরিবেশিত সংবাদ আছে, যেখানে মালিকানাভুক্ত কাগজের বিরুদ্ধেও সম্প্রদক পাঠক বা ভিন্নধর্মীদের মতামত প্রকাশ করে থাকেন।

আকাশবাণীতে কিছু চিঠিপত্র পড়ার ব্যবস্থা আছে। যেসব চিঠিতে থাকে শুধুমাত্র শ্রোতাদের নিবেদন,—এটা করুন, ওটা করুন। মাত্র ঐ পর্যন্ত। মনে করুন, যদি কোন শ্রোতা কোন ফিচর (talk) সম্পর্কে বিরুদ্ধ মত প্রকাশ করে লেখেন আকাশবাণী মারফৎ নিশ্চয়ই তা জানানো হয় না। সম্ভবত আড়ালে নিজেদের কেউ সংশোধনও করেন না। তবে দায়ে পড়ে যেসব টকার ডাকা হয় তাঁদের বিরুদ্ধে কোন চিঠি গেলে সে চিঠি হয়তো বাণ হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

চন্দ কমিশন আকাশবাণীকে একটি স্বয়ং শাসিত প্রতিষ্ঠানরূপে দেখতে চান এবং সেই মতো মতও দেন। স্বয়ং শাসিত-প্রতিষ্ঠানের আত্মসমালোচনার সুযোগ থাকবে যথেষ্ট। সত্যিকার সমালোচনা না হলে কোন প্রতিষ্ঠান জনপ্রিয় হতে পারে না। বিশেষ করে যে প্রতিষ্ঠানের কাজ দেশের সংস্কৃতিকে দেশে-বিদেশে সকলের কাছে পৌঁছে দেওয়া।

আকাশবাণী কেমন করে আত্মসমালোচনা করতে পারে? আত্মসমালোচনার সহজ উপায় হলো বেতারজগৎকে একাজে ব্যবহার করা। বেতারজগৎ পত্রিকার কিছু অংশ আকাশবাণীর অনুষ্ঠানসূচীর সমালোচনার জন্য উৎসর্গ করলে অনুষ্ঠানের মান উন্নয়নের সম্ভাবনা থাকতো। দেশের অভিজ্ঞ লোকেদের চিঠিপত্র আলোচনা বেতারজগতে ছাপা যেতে পারে। বেতারে অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানের সমালোচনা এবং অনুষ্ঠানের উন্নতিকল্পে দেশের বিশেষজ্ঞদের মতামত আহবান করা এবং তা প্রকাশ করার সুযোগ থাকা উচিত ছিল।

বেতারে অনুষ্ঠিত বহু আলোচনা, নাটক ইত্যাদি কঠোর সমালোচনা প্রত্যাশা করে। অথচ আকাশবাণীর কর্তৃপক্ষ নিজেদের অনুষ্ঠানের সমালোচনার কোন ব্যবস্থা নিজেরা করেন নি। আকাশবাণীর মতো সরকারী প্রতিষ্ঠানের হাতে সমালোচনার কোন হাতিয়ার থাকা উচিত নয় কি?

আকাশবাণীর ভুল-ত্রুটির এবং আকাশবাণীর কি করা উচিত বা অনুচিত সে সম্পর্কে পাক্ষিক বা মাসিক আলোচনার ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

কিন্তু আকাশবাণী কি অতটা সাহসী হবেন?

পরিস্থিতি যেখানে এমনতরো তখন শ্রোতাদের সমালোচনার জন্য সংবাদপত্রের মুখ চেয়ে থাকতে হয়।

এক বছরের সমালোচনার মোটামুটি ধারা কি? এবং আকাশবাণীতেই বা তার প্রতিক্রিয়া কেমনতরো? তবে প্রতিক্রিয়ার এটুকু নমুনা বেশ স্পষ্ট যে, যাঁদের সমালোচনা আকাশবাণীর মনঃপূত হয় না তাঁদের বেতারে আর ডাকা হয় না। তাতে কখনো কখনো সুফলও ফলেছে। সমালোচক বেতারের দিকে লক্ষ্য রেখে সমালোচনার কঠোরতা কমিয়ে এনেছেন, অযথা স্তুতিবাদ করেছেন এবং দেখা গেছে আকাশবাণীর দরজা সমালোচকের জন্য আবার খুলে দেওয়াও হয়েছে। একবার টোপ গিললে কৃতজ্ঞতার দোহাই দিয়ে সমালোচনার তাপ উবে যেতে কতক্ষণ। প্রলোভনকে কাটাতে পারলে তবেই নির্ভীক সমালোচনা সম্ভব। সমালোচকরা অনুভব করেন প্রলোভনের নাগপাশ কতো মনোমোহিনী। বলুন তো, আমরা কে না চাই আত্মপ্রচার? জ্ঞানী-গুণীরা চাইবেন তাঁদের মুখনিঃসৃত বাণী সকলে শুনে ধন্য হোন, গায়ক-গায়িকা চাইবেন তাঁদের মধুক্ষরা কণ্ঠস্বর দিকে দিকে মন্দ্রিত হোক। আর এসব প্রচারের শ্রেষ্ঠ কেন্দ্র আকাশবাণী।

গুণী লোকের প্রতি আকাশবাণী মুখ ফেরালেও তাঁদের হাতে অন্য হাতিয়ারও আছে: তাঁরা পত্রপত্রিকায় লিখতে পারেন, বই রচনা করতে পারেন। যার খ্যাতি ও মর্যাদা আকাশবাণী প্রচারিত দশ বা পনেরো মিনিটের আলোচনার থেকে লক্ষগুণ ওজনে ভারী। তাই স্বাধীনচেতা পণ্ডিতদের অনেকে আকাশবাণীকে গ্রাহ্যের মধ্যে আনেন না। অন্তত এমন একজন মহাপণ্ডিতকে জানি যাঁকে বোধহয় গত পনেরো বছরের মধ্যে সাধ্য-সাধনা করেও আকাশবাণীর কর্তৃপক্ষ বেতারের কোন অনুষ্ঠানে উপস্থিত করতে পারেন নি।

তবে শিল্পীদের (গায়ক ইত্যাদি) আত্মপ্রচারের সুযোগ অতিশয় সীমিত। আকাশবাণীই তাঁদের আত্মপ্রচারের শ্রেষ্ঠ চাবিকাঠি। আকাশবাণীর অনুষ্ঠানে কলকে পেলে পর গ্রামোফোন কোম্পানী হয়ত একদিন ডাক দেবে। তাই যে-নবীন শিল্পী আকাশবাণীকে চটাবে তার শিল্প-জীবন ব্যাহত হতে বাধ্য। শিল্পী অত্যন্ত উচু দরের হলেও আকাশবাণীকে থোড়াই কেয়ার করার স্পর্ধা বড় একটা থাকে না।

সঙ্গীতকে যাঁরা কেরিয়র করতে চান বা যাঁরা প্রচারের পক্ষপাতী তাঁদের আকাশবাণীর দরগায় শিরনি দিয়ে 'যো হুজুর' করে থাকতে হবে বৈ কি! আকাশবাণীর প্রকাশ্য সমালোচনার গন্ধে তাঁদের এ্যালার্জি দেখা দিতে পারে। অবশ্য কেরিয়রিস্টদের মধ্যেও কিছু কিছু স্বাধীনচেতা যে নেই একেবারে তা বলি না। দুঃখের বিষয় স্বাধীনতা বজায় রেখে সসম্মানে তাঁরা বেশিদিন চলতে পারেন না। প্রসংগত বলি, এমন কজন স্বাধীনসত্তাসম্পন্ন শিল্পীকে জানি যাঁরা বেতারে অডিশন পর্যন্ত দিতে চান না। অথচ এঁদের গান আকাশবাণী প্রচারিত বহু শিল্পীর পরিবেশিত সঙ্গীতের ঊর্ধ্বে স্থান পেতে পারে।

সর্বশেষে আকাশবাণীর সমালোচকদের কাছে আমার নিবেদন, সমালোচনা চালিয়ে যান, অবশ্য সুস্থ সমালোচনা চাই এবং সুফল একদিন ফলবেই। নিজের এবং অন্য সমালোচক বন্ধুদের সম্পর্কে বলি,—মা ফলেষু কদাচন। গীতার মহাবচন শুধু নিজেদের সম্পর্কে বলা আকাশবাণীর জন্য নয়।

সঙ্গীত সমালোচনার সমালোচনা

সুকুমার রায়

সম্পাদকের অনুরোধ সংগীত সমালোচনার সমালোচনা লিখে দিতে হবে। কঠিন। সত্যিকারের সমালোচনা বিশেষ বিষয় সম্বন্ধে যুক্তিসম্বলিত ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গির ফলশ্রুতি। যুক্তির ওপর যুক্তি চড়াও হওয়া সংগত নয়। তবে দৃষ্টিভঙ্গির তারতম্য সম্বন্ধে কথা হতে পারে। একেবারে নৈর্ব্যক্তিক (যাকে বলে objective বা তদ্‌গত) লক্ষ্য নিয়ে সমালোচনার জগতে প্রবেশ—এমনটা বড় দেখা যায় না। তা ছাড়া শিল্পের ক্ষেত্রে আরো অসুবিধা। ব্যক্তিগত ভাল লাগা না লাগার একটা সমস্যাতো আছে। কিছুদিন পূর্বে আমার এক সাহিত্যিক সংগীত-রসিক বন্ধু বলেছিলেন "আজকের গান আমার ভাল লাগে না।" অথচ 'অমুক' শিল্পী জনসাধারণের অত্যন্ত প্রিয়-রাগ-সংগীত গায়ক এই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে সংগীত-রসিক ভদ্রলোক যদি সংগীত সমালোচনা করেন তাহলে "অমুকের" গানের মূল্যায়ন কোথায় দাঁড়াবে ভাবা যায় না। অনেক সমালোচনা এই শ্রেণীর হয়ে পড়ে। যে কোন শিল্পের রসাস্বাদনের স্তরটি এর কতকটা ওপরে। অর্থাৎ রস-তত্ত্বেও কতকগুলো সূত্র ফেলে মাপজোক করেও শিল্পের এক ধরণের মূল্যায়ন করা যায়। সংগীত-আলোচনায় সৌন্দর্যতত্ত্বের প্রয়োগও যথেষ্ট দেখা যায়। এ সব ব্যাখ্যা আমাদের মতো সাধারণ পাঠকের কোন বিশেষ কাজে আসে না। কারণ সমালোচনা মানে শুধু উৎকর্ষ বিবেচনা নয়, উপাদানগুলোকে জট ছাড়িয়ে বুঝিয়ে দেওয়াও প্রয়োজন। এক ধরণের আলোচনা একেবারে আকাশগামী। এইরূপ আলোচনার লক্ষ্য 'গানাৎ পরতরং নহি' তত্ত্বে পৌঁছাবার চেষ্টা। আজকাল গান ধর্মবোধ চরিতার্থতার জন্যে শোনা যায় কদাচিৎ। গান জীবনের কথা বলে, না বললে সে গ্রাহ্য নয়, সে রাগসংগীতই হোক আর আধুনিকই হোক। আজকাল ধর্মীয় গানের মধ্যেও প্রচুর মানবিক ভাবের উপাদান থাকে, অনেক ভজন শুনতে শুনতে মনে হয় আধুনিক গান শুনছি, আর কিছু ভজন শুনে ভক্তিভাবের উদয় হয় না, হয় কারুকলা সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা। মিষ্টি কীর্তন শুনতে শুনতে আমরা কৃষ্ণলীলার কথা ভাবি না। রবীন্দ্রনাথের অনুসরণ করে বলি, আমরা সত্যি গান-গাওয়াটাকেই শুনি। অর্থাৎ শ্রোতা একস্তরে এগিয়ে এসেছে—সমালোচনাও এগিয়ে যাওয়া দরকার। একটি জলসায় জনৈক শ্রোতা বলেছিলেন "আহা কি চমৎকার খেয়াল না গাইলেন, যেন সাক্ষাৎ মহাদেব এসে উপস্থিত। জয় শিব শঙ্কর!" আমি বলেছিলাম, "আমি তো মহাদেবের ভূত-টাকেও কল্পনা করতে পারছি না মশায়, কিন্তু ওস্তাদ 'নিখাদের বক্রতাকে' চমৎকার দেখিয়েছেন।" গানটি ছিল—'আদ মহাদেব বীণ বজাই'—রাগ, শঙ্করা। আমরা দুজনা যদি সমালোচক হয়ে দাঁড়াই তাহলে আমাদের দুটো দৃষ্টিকোণ কোন কোন দিকে যাবে ধারণা করার কোন অসুবিধা নেই।

সংগীত সম্বন্ধে ঐতিহাসিক ও ভাষাবিদদের আলোচনায় কিছু কিছু বিভ্রমের সৃষ্টি হয়। সকলেই জানেন পল্লীসুরের উৎপত্তি স্বতঃস্ফূর্ত। গোড়ায় স-র-গ-ম-প-ধ-ন এই সাতটি স্বর পল্লীর গানে একসংগে ব্যবহৃত হত না। বড়জোর তিন-চারটি ব্যবহৃত হতে পারত। কোথাও হয়ত চলিত ছিল এক ধরণের একটা টানা সুর—নিতান্ত একঘেয়ে। কিন্তু পল্লী-সুরের পেছনে কোন রাগ-রাগিণীর প্ল্যান থাকাও সম্ভব নয়। দেখা যাচ্ছে গবেষণার জন্য কেউ কেউ পল্লীসুরের সংগে রাগ-রাগিণীর সম্পর্ক চিন্তা করতে করতে প্রাচীন গ্রন্থের ভেতরে প্রবেশ করেন। তারপর কেউ হয়ত বললেন, দেখুন এই যে ভাটিয়ারী বলে একটা রাগের নাম শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে দেখা যাচ্ছে—এটার সঙ্গে ভাটিয়ালী সুরের সম্পর্ক থাকতে পারে। অথবা 'বঙ্গালী' রাগটা যেহেতু বুদ্ধগান ও দোহাতে ব্যবহৃত হয়েছে—ওটা বাংলার পল্লীগীতিতে ব্যবহৃত সুরও হতে পারে।" এই ধরণের ধারণা নিয়ে আলোচনা ইতি-হাসে আর ভাষাতত্ত্বে ভালই চলতে পারে, কিন্তু সংগীতজ্ঞের কাছে রাগের আর ওসব তথ্যের দূরত্ব অনেক—আশমান-জমিন ফারাক্। ভাটিয়ারী বা ভাটিয়ার বলে যে রাগ রূপ জানা যায় তার সংগে কোন সম্পর্ক থাকাও সম্ভব নয়। তা ছাড়া, রাগ শুধু একটা 'নাম' নয়—ওর পেছনে একটা প্ল্যান বা গঠন প্রকৃতি আছে, আছে নিয়ম। নিয়ম বহু পুরোনো কাল থেকেই চালু। হয়ত পরিবর্তনও হয়েছে, কিন্তু নিয়মের মধ্য দিয়ে। রাগের নাম উল্লেখ থেকে বোঝা যায় রাগটি সে নিয়মের মধ্যে রূপ লাভ করেছে। যথার্থ সংগীতজ্ঞের কাছে এ ধরণের আলোচনা গরুকে ঘোড়ায় পরিণত করার মত মনে হবে। ঐতিহাসিক ও ভাষাতাত্ত্বিকদের এলাকা শুধু কথাটি নিয়ে কিন্তু সংগীত-ঐতিহাসিকের রাজ্যটা সম্পূর্ণ আলাদা রকমের।

রাগসংগীত সমালোচনার জন্যেই এদেশে নানান শাস্ত্রীয় বিচার পদ্ধতি বিভিন্ন শাস্ত্রকার ও সমালোচকের সৃষ্টি হয়েছে। সে সবও এ যুগে সুশৃঙ্খলভাবে নানাভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে বা হচ্ছে. স্তরে স্তরে নানা বিচারসূত্রের উদ্ভবও

সুশীতল আরামদায়ক হাওয়া পরিবেশনে সুপার ডিল্যাক্স

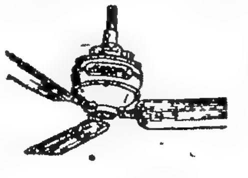

মার্কনী ফ্যান

সহজ কিস্তিতে

কিনুন

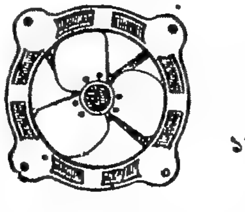

মার্কনী ইলেকট্রিক করপো

(প্রাঃ) লিঃ

১১৭, কেশব সেন স্ট্রীট, কলিকাতা-৯

ফোন ঃ ৩৫-৩০৪৮

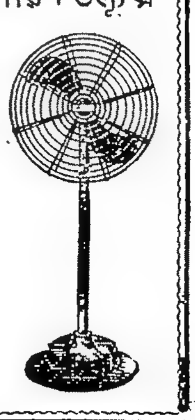

দেখা যায়। শাস্ত্রীয় সংগীতের আধুনিক সমালোচনা পদ্ধতিও ধীরে ধীরে স্পষ্ট হয়ে দাঁড়াচ্ছে। কিন্তু দেশী বা লোক-প্রচলিত লঘুসংগীতের ব্যাখ্যা করবার মত বাঁধা নিয়মপদ্ধতি নেই। এ জন্যে মূল্যায়নের নানান তারতম্যও দেখা যায়। বাংলা দেশে শাস্ত্রীয় সংগীতের নানা সংস্কারের বিরুদ্ধে বহু প্রতিবাদও নতুন দৃষ্টিভঙ্গির সৃষ্টি করেন উনবিংশ শতাব্দীতে কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর গীতসূত্রসার গ্রন্থে। এরপর রবীন্দ্রনাথের জীবনে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের প্রভাব এবং ঠাকুর পরিবারের পরিবেশ সংগীত সম্বন্ধে নতুন ধারণার পথে রবীন্দ্রনাথকে এগিয়ে দেয়। রবীন্দ্রনাথই নিজ সংগীত-প্রকৃতি বিশ্লেষণের জন্যে যুগান্তকারী সংগীত-চিন্তার সৃষ্টি করেন। তিনি সকল বিশ্লেষণের মধ্যে লক্ষ্য স্থির রেখে আগাগোড়া যে বিশিষ্ট ভাবনা-স্রোত প্রসারিত করে দিয়ে গেছেন তাতে বাংলা গান সমালোচনার নতুন পন্থা আবিষ্কৃত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ ব্যাখ্যার জন্যে কখনো পেছন ফিরে শাস্ত্রের দিকে তাকান নি, তেমনি আবার নিছক পাণ্ডিত্যও মানে কোনো সুবিধে পায় নি। Observation বা নিরীক্ষা এবং যুক্তি হচ্ছে পদ্ধতির মূলে। রবীন্দ্রসংগীত আলোচনায় সেজন্যে যেমন তাঁর ব্যক্তিগত রচনা পথপ্রদর্শক তেমনি সমসাময়িক কবি-সুরকারদের সম্বন্ধেও তাঁর মতামত খাটে।

সংগীত আলোচনায় শ্রীদিলীপকুমার রায় নতুন গানের মৌলিকতা লক্ষ্য করে নতুন সমালোচনার ধারা রচনার ইঙ্গিত দিয়েছেন ১৯৩৮ সনে "সাঙ্গীতিকী"তে। আধুনিক গান সম্বন্ধে একটি প্রসঙ্গ উত্থাপন করে বলেছেন "একটা আভাষ... পেয়েছি, বুকে নবীন এক স্বপ্ন যে উষার আকাশে সোনার বিন্দুর মতন ফুটে উঠেছে ও সে আলো দিকে দিকে ব্যাপ্ত হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে—এ বিষয়ে সংশয় নেই। এই স্বপ্ন কি? না, গানের স্বপ্ন, আলাপের স্বপ্ন নয়, রাগের স্বপ্ন নয়, কীর্তনের স্বপ্ন নয়। এক কথায় গানের কোন জাতীয়তার স্বপ্নই নয়—যেহেতু এ হল এ "গান"-এর ব্যক্তি-স্বরূপের স্বপ্ন—নিজের স্বভাবে স্বভাবস্থ হতে চাওয়ার স্বপ্ন। এখনকার গানকে বিচার করা হবে না তার বংশগৌরব দিয়ে, তার শ্রেণী কৌলীন্য দিয়ে, তার গোত্র, গোষ্ঠী, বন্ধু-বান্ধব, পৃষ্ঠ-পোষকের আভিজাত্য দিয়ে। তাকে বিচার করা হবে তার স্বকীয় পরিচয় দিয়ে।"

যাঁরা এই পরিচয়ের প্রকৃত ব্যাখ্যা করতে পারবেন সংগীত সমালোচনার দায়িত্ব তাঁদেরই। এজন্যে প্রত্যক্ষ সংগীত সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল না থাকলে সমালোচনা পাঠককে ভ্রান্ত করে দিতে পারে। সুখের বিষয় আজকের রাগসংগীত সমালোচকেরা যেমন শাস্ত্রজ্ঞান ও সংগীত-অভিজ্ঞতা দুটোকে সমানভাবে ওজন করে এগিয়ে যেতে পারছেন, লোকপ্রচলিত নানান সংগীতের আলোচনায়ও নতুন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে অনেক সুর-অনুসন্ধানী মন কাজ করে যাচ্ছে। নতুন সংগীতের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম প্রয়োগরীতির কথা আজ উঠেছে। গানের ধারা নানা শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। আজকের সমালোচকের তাই বিরাট সংগীতদেহের ছোট ছোট শিরা-উপশিরার অনুসন্ধান ও ব্যাখ্যা দরকার হয়ে পড়েছে। সংগীতে প্রত্যক্ষ ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা এখানে একান্ত আবশ্যক—শুধু থিওরি ও ইতিহাস নয়। এর পর হয়ত একটি যুগ এমন আসবে যে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন ধরনের সংগীত বিভিন্ন বিষয় অনুসারে সমালোচকের সৃষ্টি করবে।

*** সদ্য প্রকাশিত হইল ***

খ্যাতিমান মনীষীদের সঙ্গে
ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার

≡ যাঁদের সংস্পর্শে এসেছি ≡

স্বামী বিবেকানন্দ ॥ অশ্বিনীকুমার দত্ত ॥ এ্যানি বেসান্ত ॥ ভগিনী নিবেদিতা ॥ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ॥ স্বর্ণকুমারী দেবী ॥ গোপালকৃষ্ণ গোখেল ॥ কামিনী রায়

≡ যাঁদের সংস্পর্শে এসেছি ≡

প্রফুল্লচন্দ্র রায় ॥ সরোজিনী নাইডু ॥ মদনমোহন মালব্য ॥ সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ সুভাষচন্দ্র বসু ॥ নরেন্দ্রলাল খাঁ ॥ রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ॥ অনাগারিক ধর্মপাল

≡ যাঁদের সংস্পর্শে এসেছি ≡

দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী ॥ যাদুর রাজা গণপতি ॥ হৃষীকেশ লাহা ॥ লর্ড কিচনার ॥ সরলা দেবী ॥ অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় ॥ রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ॥

লেখকের ব্যক্তিগত সাক্ষাতে
২৬ জন মনীষীর ব্যক্তিগত পরিচয়।
এই ধরণের সচিত্র সঙ্কলন বাঙলায় এই
প্রথম প্রকাশিত হইল।

শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ রচিত

ভূমিকা

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

মূল্য মাত্র দুই টাকা

দি বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড
১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট,
কলিকাতা-১২

সমালোচক ও সমালোচনার মান

শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়

অঘোরে ঘুমোচ্ছিলাম।

হঠাৎ ঘুমটা ভেঙে গেলো। ভেঙে গেলো বিশ্রী একটা স্বপ্ন দেখতে দেখতে। মনে হলো, কে যেন বার বার আমার নাম ধরে ডাকছে। যেন বলছে, কি হতে চেয়েছিলে তুমি আর হতে চলেছো কি। সাবধান, সাবধান—এখনো সময় আছে, সাবধান।

ভয় পেয়ে আঁৎকে উঠে না বসলেও বেশ বুঝতে পারছিলাম যে স্বপ্নের ঘোরটা কাটবে-কাটবে করেও তখনো কাটে নি। নিজেকে কেমন যেন ভীষণ খালি খালি মনে হচ্ছিলো।

হাত দিয়ে চোখ দুটো রগড়িয়ে নিয়ে পাশের টেবিল থেকে জলের গ্লাসটা তুলে নিয়ে ঢক ঢক করে খানিকটা জল খেয়ে ভাবতে বসলাম, কি হতে চেয়েছিলাম আমি।

রাত তখন শেষ হয় হয়। ঝিরঝিরে হাওয়ায় বোশেখ মাসে ক্লান্তি কেটে যায়!

আমার আমি তখন হাজার প্রশ্নের এত ভিড়ে ছটফট করছে! কি হতে চেয়েছিলাম আমি? সাহিত্যিক, কবি, বড় অফিসার, বিজনেসম্যান? শেষে শুধু এইটুকুই বুঝলাম যে কি হতে চেয়েছিলাম আসলে আমি তা নিজেই জানি নে!

সেই মুহূর্তে আমার খুব হাসতে ইচ্ছে করছিলো। কারণ তখনই আমার মনে পড়লো রুড়কীর প্রফেসার সিনহার সেই গল্পটা!

দু'জনে গিয়েছিলাম এক ভদ্রলোকের বাড়িতে। মস্ত বড় একটা কুকুর ওঁদের দেখেই চিৎকার করতে করতে তেড়ে এলো! দু'জনের একজনকে কুকুরটা চিনতো। তাই তাঁকে দেখে সে লেজ নাড়তে লাগলো, আর যাঁকে চেনে না তাঁর দিকে হিংস্র চোখে তাকিয়ে ডাকতে লাগলো।

অচেনা ভদ্রলোক তো কুকুরের ভয়ে থ। শুনেছিলেন, দাঁড়িয়ে থাকলে কুকুর কিছু বলে না। তাই তিনিও থাকলেন স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে।

অপর ভদ্রলোক তখন বললেন, "আরে চলো চলো—ওকে ভয় পাবার কিছু নেই। জানো না বুঝি, বার্কিং ডগ নেভার বাইটস...!"

ওঁর কথা শেষ হলে কুকুরের ভয়ে ভীত ভদ্রলোক হাসলেন। তারপর হাসি মুখে বললেন, "সে তো আমিও জানি, তুমিও জানো। কিন্তু ঐ কুকুরটা জানে তো?"

"কি?"

"ঐ যে বার্কিং ডগ নেভার বাইটস......!"

আজ সমস্ত দেশ জুড়ে ঐ ডগের সমস্যা অর্থাৎ যাঁদের নিয়ে এতো হৈ-চৈ, যাঁদের নিয়ে এতো চেঁচামেচি তাঁদের বিষয় আমরাও জানি, জানেন আপনারাও,

বার্কিং ডগ নেভার বাইটস

হয়তো বা রাম, শ্যাম, যদু, মধু সকলেই জানে—কিন্তু সমস্যাটা যাঁদের ঘিরে তাঁরা জানেন কি?

জানেন কি না জানি নে তবে না জানাটা যে অনুচিত এটা বুঝি।

অবশ্য আমাদের ভারতীয় ক্রিকেট কনট্রোল বোর্ডের মাননীয় সদস্যরা যে বুঝেও বোঝেন না—সে বিষয়েও আমরা নিঃসন্দেহ। তাহলে আর যাই হোক এতোদিন পরে পলি উমরিগড়কে অন্তত ক্রিকেট খেলার উন্নতির জন্যে ভারতীয় শিক্ষা মন্ত্রকের কাছে রিপোর্ট পাঠাতে হতো না।

আর সেই রিপোর্টকে কেন্দ্র করে ক্রীড়ারসিক, ক্রীড়া সমালোচক আর প্রাক্তন খেলোয়াড়দের নিজের নিজের মন্তব্য প্রকাশ করতে হতো না, করতে হতো না সমালোচনা......!

সমালোচনা......?

এই সময়টা বোধহয় সমালোচনার যুগ।

পলিটিক্স-এর প যিনি বোঝেন না তিনিই হলেন রাজনীতির সব চেয়ে বড় সমালোচক। আবার ওদিকে ক্রিকেট সম্বন্ধে যাঁর বিন্দু-বিসর্গ জ্ঞানও নেই, তিনিই হয়ে বসলেন ক্রিকেট সমালোচক.

তবে সবচেয়ে মজার ঘটনা ঘটেছিলো বছর কয়েক আগে! আমরা তখন সিটি কলেজে পড়ি। আন্তঃকলেজ নক আউটের সেমিফাইন্যাল, না কোয়ার্টার ফাইন্যাল খেলায় আমরা এমন একজন আম্পায়ারের দেখা পেয়েছিলাম 'যিনি ক্রিকেট খেলার ল' জানলেও, বোঝার আর সেই আইন মেনে সিদ্ধান্ত দেবার ক্ষমতা যাঁর ছিলো কম! ফলে তাঁর একটি আউটের সিদ্ধান্ত নিয়ে খেলার মাঠে সেদিন বেধেছিলো তুলকালাম কাণ্ড!

আমার জ্ঞান হবার পর থেকে শুনছি ভারতের ফাস্ট বোলিং সমস্যার কথা। তা যদি বছর দশেক থেকে এ সব বিষয় বোঝার মতো জ্ঞান হয়—তাহলে গত পনেরো-ষোল বছর ধরে শুনে আসছি এই একই কথা। আব ক্রিকেটের রেকর্ডস ঘেঁটে দেখছি যে বিষয়টি তার চেয়ে অনেক বেশি পুরোন।

অর্থাৎ ভারতের এই ফাস্ট বোলিং সমস্যাটা কিছু আর নতুন নয়। এটি অনেকদিনের বিরাট একটা চাহিদা।

অথচ এতোদিনেও তার কোন সুরাহা হয় নি। আদৌ হবে কি না সে বিষয়েও অবশ্য যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

কারণ এ সমস্যার সমাধান করার ক্ষমতা যাঁদের হাতে, তাঁরা চিরকাল শহরে বসে ভারতের জন্যে ফাস্ট বোলার খোঁজার খেলা

খেলেন। ফলে যে গুপ্তধন লুকোন আছে শহর থেকে অনেক দূরে পাড়াগাঁয়ের আঙিনায়, তার খোঁজ তাঁরা কোনদিনই পান না।

অথচ একটু ডাউনের দিকে গিয়ে দেখুন।

সত্যিকারের ফাস্ট বোলার হবার মতো কতো ছেলেই না সেখানে ফ্যা-ফ্যা করে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

অবশ্য ক্রিকেট তারা হয়তো খেলে না। কিন্তু গায়ের আর হাতের জোরে ঢিল দিয়ে গাছ থেকে শুধু ঝুনো নারকেল নয়, ডাবও পাড়ে। আমি নিজের চোখে

নাপিতেরা কেন সমালোচক হয় না

দেখেছি তাদের ঢিল দিয়ে ডাব পাড়তে। বিশ্বাস না হয় বাংলা দলের প্রাক্তন আর ভারতের সবচেয়ে বেশি অবহেলিত পেস বোলার ডি এস মুখার্জীকে একবার জিজ্ঞেস করে দেখুন। এক সময় উনিও ঐ অবিশ্বাস্য কান্ডটি করেছেন।

কিন্তু এ'দের দিকে নজর দেবার মতো অবসর আমাদের মাননীয় ক্রিকেট কর্তৃপক্ষের কোথায়? সময়ই বা কোথায়?

তাঁদের নজর তো শুধু বিদেশী কোচ, আর কোচিং-এর ওপর। ফলে টাকা খরচই সার। আখেরে দেখা যাচ্ছে কাজের কাজ কিছুই হয় নি। ভারত যেখানে ছিলো আজো রয়ে গেছে সেইখানেই।

তাই আজ সব জায়গায় খুঁজে দেখার দরকার সবচেয়ে বেশি। শহরে-শহরে, গ্রামে-গ্রামে চলবে এই খোঁজার পালা। চাই কি—উপজাতিমহলেও ঘুরে দেখতে হবে।

তা ছাড়া পরলোকগত স্যার ফ্রাঙ্ক ওয়েলের কথামতো দীর্ঘদেহী পাঞ্জাবী ছেলেদের কথাও ভুললে চলবে না। গায়ের জোর ওদের অনেকের চেয়ে বেশি। সুতরাং বলের জোর বেশি হওয়াটা এমন কিছু আর অস্বাভাবিক নয়।

কিন্তু অস্বাভাবিককে স্বাভাবিকের পর্যায়ে আনবে কে? সুতরাং সে গুড়ে বালি। আর যাই হোক— ওটি হচ্ছে না। ও সব খোঁজাখুঁজির মধ্যে আমরা থাকবো কি করে? আমাদের অবস্থাটা অনেকটা সেই পাতে দিলে খাই, আর না দিলে খাওয়াই হয় না গোছের। ফলে খোঁজা-খুঁজির পালার ওপর আপনা-আপনিই পড়ে যায় ইতির দাঁড়ি।

কলকাতার সেলুনগুলোতে যাঁরা চুল কাটার কাজ করেন, তাঁরা কেন যে রাজ-নীতিবিদ কিম্বা কড়া সমালোচক হন না বুঝি না। কারণটা বোধহয় খুলে না বললেও চলে। ও ধরণের অভিজ্ঞতা আমার, আপনার সকলেরই কোন না কোন সময়ে হয়েছেই।

এমন কোন বিষয় নেই যা ওঁরা জানেন না। এমন কোন সাবজেক্ট নেই যার ওপর ওঁদের দখল নেই। তা সে রাজনীতি বলুন কিম্বা সিনেমা, থিয়েটার আর খেলা-ধুলোই বলুন।

সিনেমার স্ট্রাইক চলছে, মীমাংসা সূত্র ওঁদের জানা। ভারতের ফাস্ট বোলার নেই। কিন্তু কি করলে পাওয়া যাবে তাও হয়তো একটু চিন্তা করলেই ওঁরা বলে দিতে পারবেন।

কিন্তু আমার মতো অজ্ঞ ক্রিকেট লেখকের অবস্থা হয়েছে আরো শোচনীয়।

জানি নে কিছুই অথচ ইচ্ছে অনেক কিছু করার, অনেক বড় হবার।

মনে আছে আমাদের বেলায় স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষায় লেটার এসেছিলো 'এম অফ ইয়োর লাইফ', আমি লিখেছিলাম নামকরা ক্রিকেট খেলোয়াড় হবো। কিন্তু আমার সে আশার মুখে ছাই পড়েছিলো বছর চারেক আগে কলেজের খেলায় পড়ে গিয়ে। শুধু খেলাই ছাড়তে হয় নি পুরো দু' বছর অকর্মণ্য করে রেখেছিলো সেই আঘাত।

তাই আজ এই মুহূর্তে ভোরবেলার ঝিরঝিরে হাওয়ায় হাজার প্রশ্নের জালে জড়িয়ে পড়ে নিজেকে বড় বিব্রত মনে হচ্ছে। আজ আমি জানি না আমি নিজে কি হতে চাই।

তবে কি আজকের এই সমালোচনার যুগে আমিও বনে গেছি এক সমালোচক......!

কিন্তু আমাদের দেশে খেলাধুলোয় সমালোচনার মান আজ কোথায় এসে দাঁড়িয়েছে? খুব যে একটা উঁচুতে এ কথা মানতে পারি না! আগেই বলেছি, আমাদের যার যা হওয়া উচিত ছিলো আমরা তা হই না। ফলে আমরা যা বলতে চাই—আসলে ঠিক ঠিক ভাবে সেইটি আর বলা হয়ে ওঠে না।

তাই সমালোচনার মাধ্যমে ভুল ধরে দিতে বসে আমরা নিজেরাই করে বসি ভুল! ভুলের পর ভুল। আর সেই ভুলের বোঝার ওপর বসে নিজেদের শোধরাতে গিয়ে আমরা নিজেরাই হারিয়ে ফেলি কুল।

ফলে যা বলতে চাই তা আর বলা হয়ে ওঠে না, যা করতে চাই তা আর করা হয়ে ওঠে না!

আর যাই হোক আমাদের দেশে সমালোচনার মান যদি সত্যিই উন্নত

শহরে ফাস্ট বোলার খোঁজা

হতো তাহলে নির্ভীক সমালোচনাকে ভয় করতেন তাঁরা, যাঁরাই সমালোচিত হোতেন। কিন্তু তাঁদের এখন যে ডোণ্ট কেয়ার ভাব, অর্থাৎ তাঁরা বেশ ভালোভাবেই বুঝে গেছেন যে ঐসব সমালোচনা ওঁদের কিছুই করতে পারবে না। ওঁরা যেন জানেন যে সমালোচকদের সমালোচনা করতে হয় তাই করেন! আসলে ওর কোন মূল্য নেই, নেই এতোটুকুও দাম।

একবার তাই ভেবে দেখুন, কোথায় আজ এসে দাঁড়িয়েছে খেলাধুলোর সমালোচনার মান......!

সম্পাদিকা—জয়ন্তী সেন
বসুমতী (প্রাঃ) লিঃ-এর পক্ষে ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীটস্থ কলিকাতা-১২
বসুমতী প্রেস হইতে শ্রীসুকুমার গুহমজুমদার কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বসুমতীর শাস্ত্র-প্রচার গ্রন্থরাজি

ধনুর্বেদ :

কাশীরাজ পণ্ডিত শ্যামাকান্ত তর্কপঞ্চানন সম্পাদিত। বহু আয়াসে তাঞ্জোরের প্রাচীন দুষ্প্রাপ্য পুঁথির সংগ্রহশালা, কাশীর কুইন্স কলেজ লাইব্রেরী, কাশী মহারাজার বিশাল গ্রন্থাগার হতে সংগৃহীত। মূল্য—২·০০ টাকা।

বেদান্তসার :

শ্রীমদ্ পরমহংস সদানন্দ যোগীন্দ্র বিরচিত : ধর্মশাস্ত্র প্রচার-ব্রতী উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় অনূদিত (সুবোধিনী-টীকা সংযুক্ত)। বেদের এই অংশেই জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান ব্রহ্মবিদ্যার দিব্যজ্যোতিঃ বিবস্থিত। মূল্য—২·০০ টাকা।

জ্ঞানসোল্লাস :

বশিষ্ঠানন্দ পুরী (অনুবাদ)।

মূল্য—২·০০ টাকা।

বিবরণ-প্রমেয়-সংগ্রহ :

ভারতীতীর্থ বিরচিত। সুপণ্ডিত শ্রীপ্রমথনাথ তর্কভূষণ অনূদিত। (১ম নাই) চারি খণ্ডে সম্পূর্ণ। মূল্য—প্রতি খণ্ড—৩·০০ টাকা।

শঙ্করাচার্যের গ্রন্থমালা:

পণ্ডিতপ্রবর পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত। সুবিস্তারিত ব্যাখ্যা ও বিবৃতি সন্নিবেশিত। মূল্য—১ম খণ্ড—৫·৫০ টাকা। ৩য় খণ্ড ৪·০০ টাকা।

যোগশাস্ত্র :

শিবসংহিতা, ঘেরণ্ডসংহিতা, ব্রহ্মসংহিতা, অষ্টাবক্র-সংহিতা, ষটচক্রনিরূপণম্, দত্তাত্রেয়প্রোক্ত যোগরহস্যম্, পরাশরপ্রোক্ত যোগোপদেশ। দুষ্প্রাপ্য সাতখানি যোগ গ্রন্থের সমাবেশ। কাপড় ও বোর্ডে বাঁধা। মূল্য—৫·০০ টাকা।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণায়ণ :

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের শ্রীমুখনিঃসৃত অমিয় নিস্যন্দিনী বাণী ভক্তপ্রবর উমাপদ মুখোপাধ্যায় সঙ্কলিত। মহামূল্য রত্নের সন্নিবেশ। বোর্ড বাঁধাই মূল্য—২·৫০ পয়সা।

শাণ্ডিল্যসূত্রম্ :

উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় অনূদিত—২·০০ টাকা।

ক্রিয়াকাণ্ড-বারিধি :

(ত্রিবেদ, উপনিষদ, স্মৃতি ও সর্বতন্ত্র হইতে সঙ্কলিত। সংবর্ধিত সংশোধিত ও সুসংস্কৃত সংস্করণ)।

বহু আয়াস ও অধ্যবসায় আহৃত এবং প্রচুর অর্থব্যয়ে মুদ্রিত আর্য সৎকর্মানুষ্ঠান সম্বন্ধীয় যাবতীয় তথ্যপূর্ণ এই বিরাট গ্রন্থশাস্ত্র প্রচারোদ্দেশ্যে একান্ত স্বল্পমূল্যে বিক্রয় হইতেছে। দীক্ষা প্রকরণ, নিত্যকৃত্য প্রকরণ, পূজা প্রকরণ, স্নানাদি প্রকরণ, ন্যাস প্রকরণ, ব্রত প্রকরণ, যাত্রা প্রকরণ, আসন ও মুদ্রা প্রকরণ-সমন্বিত মূল বিষয়-সমূহে ৮৬৩ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ প্রথম খণ্ড। মূল্য—১০·০০ টাকা

দ্বিতীয় খণ্ড। মূল্য—৮·০০ টাকা (যন্ত্রস্থ)।

তৃতীয় খণ্ড। মূল্য—৮·০০ টাকা (যন্ত্রস্থ)।

পবন-বিজয়-স্বরোদয়:

বায়ু জয়ই যোগের শ্রেষ্ঠ সাধনা। অলৌকিক সত্য নির্দেশক যোগক্রিয়ার গ্রন্থ। মূল্য—৩·০০ টাকা।

হিন্দুধর্ম পরিচয় :

ধর্মশাস্ত্রবিশারদ শ্রীসনৎকুমার রায়চৌধুরী প্রণীত। দ্বিতীয় সংস্করণ। মূল্য—৩·০০ টাকা।

আত্মানুসন্ধান :

শ্রীসুশীলকুমার ঘোষাল প্রণীত। প্রতিটি ধর্মপ্রাণ নর-নারীর অবশ্যপাঠ্য গ্রন্থ। মূল্য—২·৫০ পয়সা।

পুরশ্চরণ রসোল্লাস :

(দুর্লভ তান্ত্রিক গ্রন্থ। মূল সংস্কৃত ও বঙ্গানুবাদ)। মূল্য—৩·০০ টাকা।

যোগী যাজ্ঞবল্ক্যম্ :

যোগীপ্রবর মহর্ষি শ্রীযাজ্ঞবল্ক্য বিরচিতম্। মূল সংস্কৃত, বঙ্গানুবাদ ও ব্যাখ্যাসমন্বিত। মূল্য—২·০০ টাকা।

পঞ্চতীর্থ মাহাত্ম্য :

শ্রীকাশীমাহাত্ম্যম, শ্রীগয়ামাহাত্ম্যম, শ্রীবৈদ্যনাথ মাহাত্ম্যম শ্রীপ্রয়াগ মাহাত্ম্যম, শ্রীবৃন্দাবন মাহাত্ম্যম্। মূল সংস্কৃত ও পণ্ডিতপ্রবর শ্রীকালীপ্রসন্নকৃত বঙ্গানুবাদ। মূল্য—৩·০০ টাকা।

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড ॥ ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলিকাতা - ১২

Thursday, 9th May, 1968 SAPTAHIK [redacted] REGD. No. [redacted] C71
PRICE : 30 Paise GRAM : "BASUMATI" PHONE : 34-7771, 72, 73,

রান্নার ইতিকথা

আদিম যুগ

তখন মানুষ
মাংস পুড়িয়ে খেতো।
কিন্তু স্বাদ গন্ধ জানতো না!

কুকমী নিজস্ব মিলে বৈজ্ঞানিক প্রথায় প্রস্তুত

দ্বিতীয় যুগ

তখন মানুষ
প্রথম স্বাদ
ও গন্ধের
খবর পেলো!

কুকমী সর্বাধিক বিক্রীত গুঁড়ো মশলা

তৃতীয় যুগ

তখন মানুষ পালতোলা
জাহাজে ভারতের দিকে
মশলা আনতে ছুটলো!

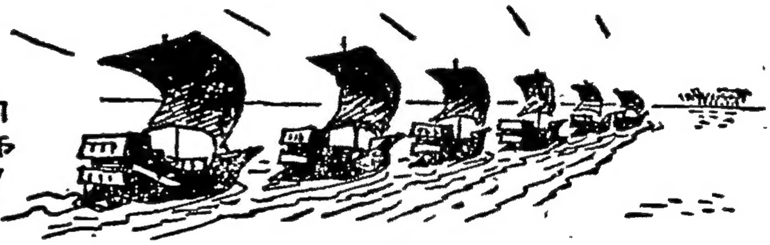

কুকমী মাসিক বিক্রয় — পনেরো লক্ষ প্যাকেট

বর্তমান যুগ

এখন মানুষ
মশলা তৈরীর
ঝামেলা ছেড়ে
তৈরী গুঁড়ো মশলা
ব্যবহার করতে
শিখলো!

কুকমী বাজারের সেরা গুঁড়ো মশলা

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

১২৫ বৎসরের অধিক প্রাচীন ও বর্তমানে মশলার বৃহত্তম প্রতিষ্ঠান

কৃষ্ণচন্দ্র দত্ত (স্পাইস) প্রাঃ লিঃ

২০১নং ও ২৩৫নং মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড, পোস্তা, কলিকাতা-৭

ফোন : ৩৩-১২০২, ৩৩-২৩৮১ 10 MAY 1968 গ্রাম : "স্পাইসমার্ট" মিল-কাশ